মাসিক বসুমতী

॥ কার্তিক, ১৩৬৫ ॥

॥ বিশ্বভারতীর সৌজন্যে ॥

প্রকৃতির স্বাক্ষর

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

# মাসিক বসুমতী

৩৭শ বর্ষ—কার্ত্তিক, ১৩৬৫ ] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [ দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা

## কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "আচ্ছা, এ কি বল দেখি? মা কালীকে দেখতে যাব মনে করেছি তো একেবারে সিধে মা কালীর মন্দিরে যেতে হবে। এদিক-ওদিক ঘুরে বা রাধাগোবিন্দের মন্দিরে উঠে যে প্রণাম ক'রে যাব, তা হবে না। কে যেন পা টেনে, সিধে মা কালীর মন্দিরে নিয়ে যায়—একটু এদিক-ওদিক বেঁকতে দেয় না! মা কালীকে দেখার পর, যেথায় ইচ্ছে যেতে পারি—এ কেন বল্ দেখি?"

"কি জানিস? যখন যেটা মনে হয়, করবো, সেটা তখনই করতে হবে—এতটুকু দেরী সয় না!"

"দেখ, নির্ব্বিকল্প অবস্থায় উঠলে তখন ত আর আমি-তুমি, দেখা-শুনা, বলা-কহা কিছুই থাকে না; সেখান থেকে দুই-তিন ধাপ নেমে এসেও এতটা ঝোঁক থাকে যে, তখনও বহু লোকের সঙ্গে বা বহু জিনিস নিয়ে ব্যবহার চলে না। তখন যদি খেতে বসি আর পঞ্চাশ রকম তরকারী সাজিয়ে দেয়, তবু হাত সে সকলের দিকে যায় না; এক জায়গা থেকেই মুখে উঠবে! এমন সব অবস্থা হয়! তখন ভাত, ডাল, তরকারী, পায়েস সব একত্রে মিশিয়ে নিয়ে খেতে হয়!"

"আবার এমন একটা অবস্থা হয়, তখন কাউকে ছুঁতে পারি না। (ভক্তদের সকলকে দেখাইয়া) এদের কেউ ছুঁলে যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠি।"

"ভাবে আবার একটা অবস্থা হয়, তখন খালি (শ্রীযুত বাবুরাম মহারাজকে দেখাইয়া) ওকে ছুঁতে পারি; ও যদি তখন ধরে ত কষ্ট হয় না। ও খাইয়ে দিলে তবে খেতে পারি।"

"তোমরা সাপ দেখেছ? সাপের জ্বালায় গেলুম! আবার তখুনি যেন ভক্তদের ভুলিয়া সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনীকেই (তাঁহাকেই যে ঠাকুর বর্ত্তমান ভাবাবস্থায় দেখিতেছিলেন, এ কথা আর বলিতে হইবে না) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—তুমি এখন যাও বাবু; ঠাকুরুণ, তুমি এখন সর; আমি তামাক খাব, মুখ ধোব, দাঁতন হয়নি।"

"আমি আর কি বলবো বাবু—সচ্চিদানন্দ যে কি (পদার্থ), তা কেউ বলতে পারে না। তাই তিনি প্রথম হলেন—অর্দ্ধনারীশ্বর! কেন?—না, দেখাবেন ব'লে যে পুরুষ-প্রকৃতি দুই-ই আমি। তার পর তা থেকে আরও এক থাক্ নেবে আলাদা আলাদা পুরুষ ও আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন।"

# বাগ্মী বিপিনচন্দ্রের জাতীয়শিক্ষা প্রচার

ডক্টর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

১৯০৫ অব্দের অক্টোবর মাসে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল, ইহার প্রতিবাদে সমগ্র বাঙ্গলায় যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গলার নরনারী বিশেষ ভাবে ছাত্র-সম্প্রদায়ের তরুণ ও কিশোরগণ যে ভাবে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়াই ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ সার্প এবং বঙ্গদেশের তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী মিঃ রিজলী ও নবগঠিত "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের চীফ সেক্রেটারী মিঃ লায়ন ছাত্রদিগের রাজনীতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া তিনখানা সার্কুলার প্রচার করিলেন, কলিকাতায় "অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত হইল। রংপুরে এক স্বদেশী সভাভঙ্গের পর ছাত্রগণ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিয়া মিছিল করিবার কালে তথাকার পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হইল, এবং স্কুলে তাহাদিগকে অর্থদণ্ড করা হইল, এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে এক নূতন আন্দোলনের সূচনা হইল। সভা সমিতিতে প্রত্যহ ঘোষিত হইতে লাগিল যে, আমরা গোলামখানার সংস্রব ত্যাগ করিব, আমরা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চাই।"

এই সময়ে বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ নায়কগণ সভায় সভায় ঘোষণা করিলেন, যদি তোমরা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চাও, যদি তোমরা অন্তরের সহিত আকাঙ্ক্ষা কর তবে জানিবে নিশ্চয়ই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হইবে। পান্তির মাঠে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ-হোষ্টেলের স্থানে) অনুষ্ঠিত এক সভায় ঘোষিত হইল যে, শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয় ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিবেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা প্রায় তিন মাস হইয়া গিয়াছে। এই তিন মাস কালের মধ্যে দেশের জন্য বহুপ্রকার সাহায্য, দান ইত্যাদি ঘোষিত হইয়া গিয়াছে কিন্তু এরূপ বিরাট দান তৎকাল পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইল, বিস্মিত হইল, মনে হইল সকলে মুহূর্ত্তে বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অভাবিত কল্পনায় উদ্দাম হইয়া উঠিল, বিপিনচন্দ্র ঘোষণা করিলেন, আমরা সুবোধচন্দ্রকে আজ হ'তে রাজা সুবোধচন্দ্র ব'লে অভিহিত করব, গভর্ণমেণ্ট এখানে সেখানে কত অজ্ঞাত কুলশীল অবাঙ্ছনীয় ব্যক্তিকে কয়েক সহস্র মুদ্রা পেয়ে বা না পেয়ে রাজা, মহারাজা উপাধি দিয়ে থাকেন, আমরা বিখ্যাত দানবীর প্রসিদ্ধ রাধানাথ মল্লিকের বংশের এই কৃতী পুরুষকে অতঃপর রাজা উপাধিতে ভূষিত করে আত্মসম্মান লাভ করব। সভার চারিদিক হইতে ধ্বনি উঠিল, 'ধন্য রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক', ধন্য তাঁর উৎসাহ, উদ্যম। আমাদের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি গঠনের উদ্যোগ সফল হউক।

## ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে মতান্তর

এই সময়ে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের পক্ষে এবং বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। পক্ষে ছিলেন বহু গণ্যমান্য দেশনায়ক, বিপক্ষে যাঁহারা ছিলেন তন্মধ্যে অগ্রণী ছিলেন তদানীন্তন মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউসন (বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যক্ষ মিঃ এন, এন, ঘোষ। তিনি কেবল যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিপক্ষে দাঁড়াইলেন তাহা নহে, তিনি বয়কট, স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতি দেশোন্নতিমূলক প্রত্যেক কার্য্যেরই তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্রকায় সাপ্তাহিক পত্রিকা ইণ্ডিয়ান নেশানে প্রায় প্রতি সংখ্যায়ই বিরূপ আলোচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ফলে তাঁহার প্রতি তরুণ সম্প্রদায় তো উগ্র হইলেনই, পরবর্তী কালে ইংরাজী 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় একদিন দেখা গেল প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি উদ্ধৃত রহিয়াছে, Mr. Nagendra Nath Ghose and Narendra Natb Gossain. (মিঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং নরেন্দ্রনাথ গোঁসাই), প্রবন্ধে দুই জনেরই কীর্তিকলাপ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূজাবকাশের পর তাঁহার স্বাস্থ্য পরিবর্তনের স্থান শিমুলতলার বাটীতে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বেঙ্গলী পত্রিকায় এই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের পক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই প্রকাশিত হইতেছিল না, কিন্তু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সম্ভবতঃ সুরেন্দ্রনাথের রিপণ কলেজ এবং ব্রাহ্ম সমাজের সিটি কলেজ এই দুইটির ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্থাপন ও রক্ষা করা যে সুকঠিন ব্যাপার তাহা সঞ্জীবনী পত্রিকায় লিখিতেছিলেন, সহসা সংবাদ পাওয়া গেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ফিরিতেছেন। বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি দেশনায়কগণ তরুণদিগকে উৎসাহিত করিয়া হাওড়া ষ্টেশনে সুরেন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করিতে পাঠাইয়া দিলেন। সুরেন্দ্রনাথ গাড়ী হইতে দেখিলেন, সহস্র সহস্র ছাত্র প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত, গাড়ী থামার পরেই শুনিতে পাইলেন, জয় সুরেন্দ্রনাথের জয়, আমরা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চাই। কেহ কেহ চিৎকার দিয়া বলিল রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, যদি তোমরা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চাও তবে তোমরা তা পাবে। তোমরা বলছ, রাজা সুবোধচন্দ্র, আমি বলছি তিনি রাজা নন, তিনি মহারাজা, সুরেন্দ্রনাথ ষ্টেশনের সম্মুখে আসিয়া বেঙ্গলী অফিসের গাড়ীতে চাপিয়া বসিলেন। ছাত্রগণ যাইয়া তাঁহার ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া চলিল। তাহারা কলেজ স্কোয়ারে উপনীত হইল, সুরেন্দ্রনাথ স্কোয়ারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তোমরা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি চাও, আমি বলছি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হবে রাজা নহেন মহারাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এরপর শত শত লোক লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে ইউনিভার্সিটি তহবিল পূর্ণ করবেন।

## রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয়

রংপুরে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করার জন্য ছাত্রদের জরিমানা করা হইয়াছে, এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে কলিকাতার ডন সোসাইটির কর্ম্মিগণ রংপুরের নায়কদের নিকট এক টেলিগ্রামে জানাইলেন, রংপুরের আকাশ-বাতাস বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে প্লাবিত হউক, আপনারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন ক'রেছেন, আমরা কয়েকজন শিক্ষক পাঠাচ্ছি,—শিক্ষকভাবে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই

ছিলেন এম, এ পরীক্ষার্থী, যতটুকু মনে হয়, প্রফেসর বিনয় সরকার, প্রফেসর রবি ঘোষ প্রমুখ চারি জন গিয়াছিলেন।

## কলিকাতায় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা

দেশমান্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতায় ফিরিয়া তাঁহার সহকর্ম্মিগণের উপদেশেই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্থাপনের উদ্যোগে ব্রতী হইলেন না। বিপিনচন্দ্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ এবং অন্যান্য বহু নব্য দলের নায়ক প্রত্যহ কলেজ স্কোয়ারে, বিডন স্কোয়ারে, পান্তির মাঠে ও অন্যান্য স্থানে সভা করিয়া স্বদেশী আন্দোলন, বিলাতী বর্জ্জন ও জাতীয় শিক্ষা প্রচারের আবশ্যকতা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতেই সংবাদ আসিতে লাগিল, ছাত্রদের ধরপাকড় রাজনৈতিক অপরাধের দরুণ স্কুল-কলেজ হইতে ছাত্র বিতাড়ন, কোন কোন স্থলে ছাত্রদের ধর্ম্মঘট পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, এই সময়ই দেশকর্ম্মিদের মধ্যে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী দুইটি দল গড়িয়া উঠিল।

১৯০৬ অব্দের প্রথম দিকেই বিপিনচন্দ্র পাল মহোদয় শ্রীঅরবিন্দ এবং কতিপয় দেশভক্ত তরুণসহ পূর্ববঙ্গ সফরে বাহির হইলেন। তিনি চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি সহরে উপস্থিত হইয়া জনসভায় ভাষণ প্রদান, জনমণ্ডলীসহ সহরে পথে পথে সুবৃহৎ মিছিল পরিচালনা করিয়া দেশপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিলেন।

পূর্ববঙ্গে প্রথম ল্যাপ্টেনাণ্ট গভর্ণর স্যার ব্যামফাইল্ড ফুলার নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ শাসন ব্যাপারে উন্মাদের মত যদৃচ্ছ পিউনিটিভ পুলিশ এবং গোর্খা-সৈন্য চালাইয়া দেশবাসীকে পিষ্ট করিতেছিলেন। লায়ন সার্কুলার প্রচার করিয়া ছাত্রগণকে উত্তেজনার চরম সীমায় পৌছাইয়াছিলেন।

বিপিনচন্দ্র সদলবলে কুমিল্লায় আসিয়া পৌছিলেন, সহরের হিন্দু সম্প্রদায় উৎসাহের প্রাবল্যে তাঁহাকে লইয়া মিছিল ও সভা-সম্মেলনে মাতিয়া গেল। বিপিনচন্দ্র বলিলেন, কেবল উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ এবং হৈ-হুল্লোড়ে কিছু হইবে না, তরুণ সম্প্রদায়কে মানুষ করিতে হইবে। সুতরাং চাই শিক্ষা, সুশিক্ষা, ফিরিঙ্গীর বিধি-নিষেধমুক্ত জাতীয় ভাবধারাপূর্ণ শিক্ষা।

কুমিল্লায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে সহরবাসী বিপিনচন্দ্রের চালনায় উদ্দাম হইয়া উঠিল। প্রত্যহ প্রভাতে সহরের তরুণ কর্মিদল শ্রীবিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিক্ষার ঝুলি লইয়া অর্থসংগ্রহে বাহির হইল। বিপিনচন্দ্র তাঁহার সহকর্ম্মী ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস রচিত সঙ্গীতটি গাহিবার জন্য শ্রীউল্লাসকর দত্ত (পরবর্ত্তী কালের বোমাবিশারদ) ও তাঁহার অনুগামী একদল কিশোরকে দিলেন। সঙ্গীতটি ছিল এইরূপ—

আমরা চাই না তব শিক্ষা
পেয়েছি নব দীক্ষা
এই নবীন যুগের নবীন মন্ত্রে পেয়েছি—
ঘুমপাড়ানো তব মন্ত্র
ভাবতাড়ানো এই তন্ত্র
বল ভাঙ্গানো মন্ত্র।
আমরা চাই না, চাই না, চাই না হে,
আমরা শিখিব আপন শাস্ত্র
পরিব নিজেরই বস্ত্র
ধরিব আত্ম অস্ত্র
করিতে আপনা রক্ষা।
আমরা চাই না তব শিক্ষা
পেয়েছি নব দীক্ষা॥

সহরের অধিবাসিগণ গৃহদ্বারে বহির্গত হইয়া টাকা-পয়সা ঐ তহবিলে দিয়া ধন্য হইলেন।

প্রত্যহ সকাল হইতে বেলা ১১টা ১২টা এই ভাবে অর্থসংগ্রহ চলিল, অপরাহ্ণে মহতী সভায় বিপিনচন্দ্র বজ্রনির্ঘোষে শুনাইলেন, ফিরিঙ্গীর অশন, বসন, ফিরিঙ্গীর শাসন শোষণ সমুদয়ই পরিহার করিতে হইবে। সঙ্গীতে শ্রীউল্লাসকর দত্ত সহরের দশ বারোটি তরুণ সহ সঙ্গীত গাহিতেন—

আর সহে না, সহে না, সহে না জননী
এ যাতনা আর সহে না
আর নিশিদিন হয়ে পরাধীন
পড়ে আছি প্রাণে চাহে না।

কখনও বা সঙ্গীতের ধ্বনি উঠিত—

বাজায়ো না আর মোহন বাঁশী
রুদ্ররূপে ভীমবেশে
প্রকাশ পরাণে আসি।
দলিত করহ চরণতলে
সকল ভীরুতা সব দুর্ব্বলে
সমরভেরী নিনাদ করালে
নাচাও শোণিতরাশি।

বিপিনচন্দ্রের অগ্নিময়ী বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দের প্রাণস্পর্শী নীরব সভাস্থ সকলকে দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামের জন্য অনুপ্রাণিত করিত। এই সকল সঙ্গীত ও বিপিনচন্দ্রের উচ্ছ্বাসময় ভাষণ দেখিতে দেখিতে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে জাতীয় বিদ্যামন্দির গড়িয়া তুলিল। কিন্তু তখনও কলিকাতায় পরবর্ত্তীকালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের আলোচনা বিবেচনা চলিতেছিল। বিপ্লবী সুবোধচন্দ্র মল্লিক পরিষদ গঠিত হইলে এক লক্ষ টাকা দিবেন, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য-চৌধুরী চারি লক্ষ টাকা দিবেন এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে। ধনাঢ্য ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত প্রভূত অর্থ দান করিবেন, ইহাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল।

বিপিনচন্দ্র কুমিল্লা হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তৎপরে কালিকচ্ছ সভাসম্মেলন করিয়া দেশপ্রেমের উল্লাসময়ী বক্তৃতা দিয়া ভৈরবগঞ্জে চলিয়া গেলেন। সেখানেও 'চাই না তব শিক্ষা', বিঘোষিত হইল। তৎপরে কিশোরগঞ্জ, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলা ও মহকুমার নায়কগণকে দেশমুক্তির জন্য ওতপ্রোত ভাবে সচেষ্ট করিয়া দিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি জেলায় প্রধান প্রধান সহরে দেখিতে দেখিতে জাতীয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। একমাত্র প্রাচীন পন্থী নায়ক অম্বিকা মজুমদার ফরিদপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধা দিয়

এক বৎসর পরে ১৯০৭ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অভিগঞ্জ হইতে আর্জেন্ট টেলিগ্রাম পাইয়া বিপিনচন্দ্র একমাত্র তাঁহার স্নেহভাজন সুরেশচন্দ্র দেবকে সঙ্গে লইয়া অভিগঞ্জে চলিয়া গেলেন। তখন পূর্ববঙ্গের ছোটলাটের পদে স্যার ব্যামফাইল্ড ফুলার আর নেই। সেই পদে সমাসীন হইয়াছেন অপর এক কুখ্যাতিসম্পন্ন সিভিলিয়ান স্যার ল্যান্সলেট হেয়ার। তিনিও পূর্ববর্তী স্যার ফুলারের শাসন হইতে আরও অধিক নির্দ্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার সহিত স্বদেশী দলন ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে নির্য্যাতিত করিয়া সমগ্র ভারতে অভূতপূর্ব কলঙ্ককালিমা বিস্তার করিলেন।

আমাদের চুণ্টা জাতীয় বিদ্যালয় অর্থাভাবে প্রায় অচল হইয়া গিয়াছিল। এই সংবাদ আমরা কুমিল্লায় পাইয়া একটি পরামর্শ সভা বসাইলাম, তাহাতে সন্তান সমিতির পাঁচ ছয়জন কর্ম্মী ছিল। আমরা স্থির করিলাম অগোণে আমরা অভিগঞ্জে চলিয়া যাইব। এবং বিপিনচন্দ্রের নিকটে যাইয়া আমাদের দুরবস্থার কথা বিবৃত করিব। পূর্ব বৎসরে তিনি যখন কালিকচ্ছ গ্রামে যাইয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন তখন আমরা চুণ্টা সন্তান সমিতির জন পঞ্চাশ কর্ম্মী লইয়া তাঁহাকে চুণ্টায় আনিয়া সভা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। চুণ্টা হইতে কালিকচ্ছ বিশ মাইল দূরে অবস্থিত। বিপিনচন্দ্র বলিয়াছিলেন সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে বিবিধ কর্ম্মতৎপরতার দরুণ চুণ্টায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। তিনি কিছুকাল পরে যখন পুনরায় আমাদের অঞ্চলে যাইবেন তখন তিনি দুই তিন দিনের মধ্যে চুণ্টায় যাইয়া অবশ্যই স্বদেশী প্রচার এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন সম্পর্কে বক্তৃতা দিবেন এবং যদি তার পূর্ব্বে চুণ্টায়ও অন্ততঃ মধ্য ইংরাজী স্ট্যাণ্ডার্ডের একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে পারি তবে তিনি আমাদের বিদ্যালয়টিকে উন্নত করিবার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন।

আমি আমার দুই সহকর্ম্মী স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রকিশোর সেন ও শ্রীকামাক্ষ্যাকুমার সেনকে সঙ্গে পাইয়া অভিগঞ্জে চলিয়া গেলাম। অভিগঞ্জে যখন পৌছিলাম তখন বিপিনচন্দ্রের ভাষণ দূর হইতে আমাদের কর্ণপটাহে ঘা দিতেছিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ ধরিয়া যাইয়া সভাস্থলে উপনীত হইলাম, শুনিতে পাইলাম বিপিনচন্দ্র বলিতেছেন, ঐ যে কবি গাহিতেছেন, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে।' বিপিনচন্দ্র কবিবরের ঐ বিখ্যাত সঙ্গীত সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিলেন। সভায় সহস্রাধিক লোক, ঘন ঘন করতালি, বন্দে মাতরম ধ্বনি আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। রাত্রি প্রায় দশটায় সভা ভঙ্গ হইল, আমরা বিপিনচন্দ্রের পশ্চাতে চলিলাম। তাঁহার বাসবাটি স্বর্গীয় প্রেমনারায়ণ করের ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা বিপিনচন্দ্রের অভ্যর্থনাকারীদের বাচনিক অবগত হইলাম পরদিন প্রাতে আমরা বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতে পারিব, রাত্রে সম্ভব নয়। আমরা আমাদের স্বগ্রামবাসী ডাঃ কামিনীকুমার সেন মহাশয়ের বাটিতে যাইয়া আমাদের চুণ্টা সন্তান সমিতিরই কতিপয় কর্ম্মীর নিকট আমাদের উদ্দেশ্য বিবৃত করিলাম। রাত্রিতে সভা, পরামর্শ হইল, নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রাতে পুনরায় বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সে সময়ে সেখানে প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন দেশকর্ম্মী উপস্থিত ছিলেন। আমরা যাইয়াই শুনিতে পাইলাম বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকা ও ইংরাজী বন্দে মাতরম পত্রিকা আসিয়াছে, লাহোরে "পাঞ্জবী" ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক যশোবন্ত রায় ও প্রকাশক আতোয়ালে রাজদ্রোহের মামলায় সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিয়াছেন। ইহা নিয়া পাঞ্জাবে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। পত্রিকাখানা লালা লাজপৎ রায় প্রতিষ্ঠিত। বিপিনচন্দ্র প্রেমনারায়ণ বাবুর বৈঠকখানায় উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি একখণ্ড কাগজ লইয়া পেন্সিল দিয়া একটি সঙ্গীত রচনা করিলেন। সঙ্গীতটি নিম্নে দিতেছি :—

তোরা আয় রে ভাই সব আয় চলে
জ্বলেছে আজ যজ্ঞের আগুন
আবার মায়ের দেউলে
তোরা আয় রে ভাই সব আয় চলে।

মাতৃভক্ত যশোবন্ত দেশভক্ত আতোয়ালে
গরীবের প্রাণ বাঁচাইতে গেছে ফিরিঙ্গীর জেলে
তোরা আয় রে ভাই সব আয় চলে,
যাও হে তুমি যশোবন্ত, যাও তুমি আতোয়ালে
আমরা আছি পাছে পাছে স্বরাজ সলিতা জ্বেলে।

গানটি রচনা করিয়া বিপিনচন্দ্র ঘোষণা করিলেন সেদিনই অপরাহ্ন তিনটায় একটা বিরাট প্রসেশন এই সঙ্গীত গাহিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিবে। সকলে যেন দলে দলে আসিয়া যোগ দেয়, তৎপরে হইবে একটি সভা যাহাতে যশোবন্ত রায়ের লিখিত প্রবন্ধ পঠিত হইবে এবং ফিরিঙ্গী কাজীর রায় পাঠ করিয়া তাহার সমালোচনা করিবেন। তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। তিনি সকলকে তখন বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন সকলে যেন যথাসময়ে সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই কুমিল্লা হইতে বিপিনচন্দ্রের আত্মীয় কুমিল্লার অনঙ্গমোহন ঘোষের এক তারবার্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে ছিল, কুমিল্লার ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্ট কনফারেন্স হইতেছে। বিপিনচন্দ্র তাঁহার কর্ম্মতালিকা বাদ দিয়া যেন কনফারেন্সে যোগ দিয়া তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এই সময়ে আমরা বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে সামান্য কথোপকথন করিতে সুযোগ পাইলাম। তিনি আমাকে চিনতে পারিলেন এবং বলিলেন, আমি তো কুমিল্লায়ই যাইব, সেখানে যেয়ে ডিষ্ট্রিক্ট কনফারেন্সের পর চুণ্টায় যাইবার দিন স্থির করিব। অপরাহ্ন তিনটায় বিপিনচন্দ্র রচিত সঙ্গীত গাহিয়া কয়েকশত লোকের একটা মিছিল সহরে পাঞ্জাবে অত্যাচারের কাহিনী বিঘোষিত করিল। তারপর শুরু হইল সভা, স্যার ল্যান্সলেট হেয়ার কতৃক বিশেষভাবে নিন্দিত 'সিলেট ক্রনিক্যাল' পত্রিকার সম্পাদক তেজস্বী শশীন্দ্রকুমার সিংহ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। অভিগঞ্জেরই একটি গায়কদল গাহিল—

ফিরিঙ্গী আর কি দেখাও ভয়
দেহ তোমার অধীন বটে
মন তো স্বাধীন রয়,
হাত বাঁধবে, পা বাঁধবে
ধ'রে না হয় জেলে দিবে
মনকে কিনাতে পার
তাতো সম্ভব নয়।

অসি দিয়ে হৃদয় জয়
তাও কি হয়, তাও কি হয়।

তারপর বিপিনচন্দ্র পাঞ্জাবী পত্রিকার রাজদ্রোহ মামলার বিবরণ বন্দেমাতরম্ পত্রিকা হইতে পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহার বঙ্গানুবাদ করিলেন এবং তৎপর বিচার—আদালতের রায়ও পাঠ করিয়া এবং বঙ্গানুবাদ করিয়া শুনাইলেন, বিপিনচন্দ্রের এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় সভাস্থ সকলকে পাঞ্জাবী ভ্রাতাদিগের দুর্দ্দশার কাহিনী বর্ণনা করিলেন। সভাস্থ সকলে উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িতেছিল। মুহুর্মুহুঃ শোনা গেল, "শুনুন, শুনুন, লজ্জা, লজ্জা।" গভীর রাত্রে সভা ভঙ্গ হইল। সভা হইতে প্রত্যাগমনকালে ছোট ছোট দল 'মাতৃভক্ত যশোবন্ত, দেশভক্ত আতোয়ালে' সঙ্গীত গাহিয়া স্ব স্ব অঞ্চলে চলিয়া গেল। আমরা পরদিন নৌকা ও ষ্টীমারযোগে আমাদের স্বগ্রাম চুণ্টায় পৌছিয়া বিপিনচন্দ্রের আগমনবার্ত্তা গ্রামবাসীকে শোনাইলাম। বিপিনচন্দ্র অভিগঞ্জ হইতে সিলেটে চলিয়া গিয়াছিলেন। সিলেটেও তিনি জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্ত অর্থ সংগ্রহের প্রবল চেষ্টা চালাইলেন এবং তৎপর তিনি করিমগঞ্জ হইয়া যথাসময়ে কুমিল্লায় যাইয়া ডিষ্ট্রিক্ট কনফারেন্সে যোগ দিলেন। তৎপরেই তিনি টেলিগ্রাম পাইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। চুণ্টায় আসা হইল না। চুণ্টার জাতীয় বিদ্যালয়ের অবস্থা অন্যান্য কয়েকটি কারণে একটু ভাল হইল। স্কুলের তিনখান ঘর এবং আসবাবপত্রাদিও শীঘ্রই প্রস্তুত হইল।

# একটি ছুরির কাহিনী

( বার্ণাড শ'র জীবনের একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে )

ইংলণ্ড। সভেনটির ষ্টেশন। সন্ধ্যা হয়-হয়। নানা দেশী, নানা ভাষার জনতার বিচিত্র ঐক্যতান থেকে একটু দূরে আবছা আলো-আঁধারির মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মানুষ—অদ্ভুত রকমের কুৎসিত আর চঞ্চল। ওকে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, ও যেন কারুর প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন। হঠাৎ ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল ষ্টেশনের। ২২ নম্বর প্ল্যাটফরমের যাত্রীরাও ব্যস্ত হয়ে উঠল, সাড়া পড়ে গেল তাদের মধ্যে—ট্রেন আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কালো ধোঁয়া উড়িয়ে লণ্ডন যাওয়ার গাড়ীখানা এসে ঢুকল প্ল্যাটফরমে। জনতা থেকে দূরে—প্ল্যাটফরমের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কুৎসিত লোকটিও চঞ্চল হোয়ে উঠল ব্যস্ততায়। দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো ও আলোর তলায়, দাঁড়ালো একটুক্ষণ, একবার চকিতে তাকিয়ে নিল চারি দিকে আর তারপরই পকেট থেকে বার করল এক বিরাট বড় ছুরি। ধারালো—চক্‌চকে। দেখল একবার গ্যাসের আলোয় ঝলমলানো নতুন ছুরিটিকে অতি সন্তর্পণে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তারপর আবার পুরে নিল ওর মিশকালো ওভারকোটটার বিরাট পকেটে। ছুটে গেল ট্রেণখানার অভিমুখে। গার্ডের গাড়ী হতে সুরু করে দ্রুত পায়ে ও এগিয়ে চলল প্রতিটি কামরার মধ্যে তীব্র সন্ধানী দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে আর মাঝে মাঝে পকেটে হাত দিয়ে সেই ধারালো ছুরিখানার অস্তিত্ব অনুভব করতে করতে। হঠাৎ প্রথম শ্রেণীর কামরার কাছে এসে ও দাঁড়িয়ে পড়ল নিস্পন্দ হোয়ে। ওর অতি ছোট ছোট চোখ দুটো হয়ে উঠল উজ্জ্বল, কুৎসিত মুখখানা ছেয়ে গেল আরও কুৎসিত হাসিতে। এতক্ষণে ওর প্রতীক্ষার হোল অবসান। খুঁজে পেল ও ওর ঈপ্সিতকে।

গাড়ীর মধ্যে বসে রয়েছেন একটি পৌঢ় মানুষ, হাতে সেদিনের 'সান্ধ্য দৈনিকখানা'। কুৎসিত লোকটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করল কিছুক্ষণ, তারপর এগিয়ে এলো তাঁর কামরার দরজার দিকে। দরজায় চাবি লাগানো, ও ঢুকতে পারল না। এদিকে গার্ডের বাঁশী বেজে উঠেছে, গাড়ী ছাড়ার সময় হোল। লোকটি ইতস্ততঃ করল এক মুহূর্ত্ত, কি যেন চিন্তা করল একটুক্ষণ; তারপরই সোজা গলে পড়ল জানালা দিয়ে, এসে বসল প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির ঠিক পাশটিতে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি তাঁর চশমাপরা চোখ দু'টি তুলে একবার তাকালেন অদ্ভুত-দর্শন আগন্তুকের পানে, তারপর আবার মন দিলেন খবরের কাগজের পাতায়। কিন্তু কাগজ 'পড়া আর হোল না'। চমকে উঠলেন আগন্তুকের কর্কশ গলার আওয়াজে।

হাতে সেই ধারালো ছুরিটি নিয়ে সে তাকিয়ে আছে তাঁরই দিকে। নির্জন চলন্ত গাড়ীতে ভীষণ-দর্শন, ছুরি হাতে, আগন্তুককে দেখে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ কেঁপে উঠলো, "আমায় বলছেন?" কর্কশ গলায় উত্তর দেয় আগন্তুক, "হ্যাঁ আপনাকেই। আমার এক 'প্রতিবেশী' এই ছুরিখানি দিয়ে বলেছিলেন, যদি কোন দিন তোমার চেয়ে কুৎসিত কাউকে দেখ, তাঁকে এই ছুরি···"

"না না, ও কি বলছেন—আমায়?" আগন্তুকের কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রায় আর্ত্তনাদ করে ওঠেন। "কোন উপায় নেই স্যার। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

গম্ভীর গলায় উত্তর দেয় আগন্তুক। "আমার সেই প্রতিবেশীর কাছ থেকেই আমি খবর পেলাম, আপনি আমার চেয়েও কুৎসিত এবং আপনি আসছেন এই ট্রেণেই। অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, আপনার দেখা পেয়েছি। এখন এই ছুরি দিয়ে···"

"ও কি কথা বলছেন আপনি? ওই ছুরি দিয়ে আমায়··· পুলিস··" ভীতত্রস্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠে দাঁড়ান। "হাঃ হাঃ হাঃ" কুৎসিত আগন্তুক হেসে ওঠে বিশ্রী গলায়। "এই চলন্ত গাড়ীতে পুলিশ কোথায় পাবেন আপনি? এটা আপনাকে আমি উপহার দেবই। আমার প্রতিবেশীর আদেশ।"

বলতে বলতে লোকটি জোর করে ছুরিখানা গুঁজে দেয় প্রৌঢ় ভদ্রলোকের হাতে। ভদ্রলোকের কম্পিত হাত থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ছুরিটি পড়ে যায় ট্রেণের মেঝেয় ঠক করে। তাতে লেখা রয়েছে, "সবচেয়ে কুৎসিতের জন্য।"

ইতিমধ্যে কখন পরের ষ্টেশন এসেছে, কখন অদ্ভুত আগন্তুক নেমে গেছে খেয়াল নেই। নতুন ইটালিক টাইপে খোদাইকরা সুন্দর ছোট ছোট অক্ষরগুলো আরও একবার পড়তে পড়তে ছুরিখানা পকেটে ভরে ফেললেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি—অর্থাৎ বাহ্যিক দর্শনে কুৎসিত অথচ অন্তরে শুভ্র ফুলের মত সুন্দর, পবিত্র আর কোমল—জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাববিপ্লবী—নাট্যকার—জর্জ বার্ণার্ড শ'। মুখে তাঁর শুধু ফুটে ওঠে এক টুকরো স্মিত হাসি, এই অতি নাটকীয় ঘটনায়।

—শ্রীললিত গোস্বামী।

# বিদ্যাসাগরের কৌতুকপ্রিয়তা

শ্রীঅশোককুমার ভঞ্জ-চৌধুরী

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনী-লেখক বিহারীলাল সরকার তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেন :—"বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই সময় বুঝিয়া, লোক বুঝিয়া রহস্য করিতেন। তিনি স্বাভাবিক রহস্যপটু ছিলেন। কর্মবীরের গাম্ভীর্যপূর্ণ চরিত্রে স্বাভাবিক রহস্য-রঙ্গের ভাব বড়ই মনোহর। যেন তরুণ অরুণ-কিরণোদ্ভাসিত প্রভাতের কাঞ্চনজঙ্ঘা।" বীরের গাম্ভীর্য্য, তরলের রসমাধুর্য্য অনেক সময় বিরল বটে কিন্তু যে চরিত্রে এই দুইয়েরই সমাবেশ, তাহা অতি মহান্। আনন্দ বাবু বলেন, "বিদ্যাসাগর আমাদের বাড়িতে আসিলে, ৭।৮ ঘণ্টার কমে বাড়ি ফিরিতে পারিতেন না। আমরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া তাঁহার মুখে রহস্য-রসালাপময় গল্প শুনিতাম। কখন হাসিতাম, কখন কাঁদিতাম, কখন ছবির মত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতাম, কখন তাঁহাকে আহ্লাদে আলিঙ্গন করিতাম। তিনি উপমার অক্ষয় ভাণ্ডার। নিত্য-নূতন গল্প, নিত্য-নূতন উপমা। গল্পে আমোদ করিতে এমন আর কেহ পারিতেন না।" (পৃষ্ঠা ২৪১-৪২)

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র জীবনী পর্য্যালোচনা ক'রলে দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেমন ছিলেন তেজস্বী, দৃঢ়চেতা ও কর্মনিষ্ঠ, আবার তেমনি ছিলেন অতিমাত্রায় কৌতুকপ্রিয়। এই কৌতুকপ্রিয়তা বাল্যকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সমান ভাবে বজায় ছিল। তাঁর দীর্ঘ দৈনন্দিন জীবনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা ঘটনার মধ্যে এই রহস্য-পটুতা, কৌতুকপ্রিয়তার বহুবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা একে একে সে-সকলের কিছু-কিছু আলোচনা করব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, সেই সময় একদিন অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁর ছাত্রদের সংস্কৃত-রচনা পরীক্ষার জন্যে তাদের এমন ভাবে শ্লোক রচনা করতে দিলেন যে, তার চতুর্থ চরণে থাকবে 'গোপালায় নমোঽস্তু মে' এই কথাটি। বালক বিদ্যাসাগর তখন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আমরা কোন গোপালের সম্বন্ধে রচনা করব? এক গোপাল (অর্থাৎ অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং) তো আমাদের সামনে রয়েছেন, আর এক গোপাল বহুদিন আগে বৃন্দাবনে লীলা ক'রেছিলেন!

অধ্যাপক মহাশয় তাঁর এই রসিক ছাত্রের রসিকতায় বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং হাসি সংবরণ ক'রতে পারেন নি।

আর একবার তিনি তাঁর এই কৃতী রসিক ছাত্রটিকে (অর্থাৎ বিদ্যাসাগরকে) সরস্বতী পূজা সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত কবিতা লিখে দিতে অনুরোধ করেন। বালক বিদ্যাসাগর লিখলেন—

লুচী-কচুরী-মতিচুর-শোভিতং
জিলেপি-সন্দেশ-গজা-বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্॥

বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটির সময় প্রায়ই বাড়ী বীরসিংহ গ্রামে যেতেন। সেই সময় ভাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে মাঝে মাঝে দুপুরে এখানে-সেখানে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়ার ভারী সখ ছিল তাঁর। পথে যেতে যেতে কোন নালা বা নর্দমা দেখলে কৌতুক করার উদ্দেশ্যে মেজো ভাই দীনবন্ধুকে তা' লাফ দিয়ে পার হতে ব'লতেন! দীনবন্ধু পার হ'তে গিয়ে প্রায়ই নালা-নর্দমার ভেতর পড়ে যেতেন। তখন বালক বিদ্যাসাগরের আমোদ দেখে কে!

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহ একটা নিরবচ্ছিন্ন কৌতুককর ব্যাপার। বিবাহকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনের বছর। এত অল্প বয়সে বিবাহে তাঁর মত ছিল না; কিন্তু মাতৃপিতৃভক্ত পুত্র বিদ্যাসাগরের পক্ষে তাঁর মাতাপিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সে যাই হোক্, তাঁর বিবাহ ব্যাপারটি আমরা তাঁর নিজের স্বাভাবিক রসপূর্ণ ভাষাতেই পাঠকদের কাছে পরিবেষণ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। কলকাতার এক বিবাহ-সভায় একদিন পরিহাসছলে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর নিজ জীবনের এই কৌতুককর বিবাহ ঘটনাটি বর্ণনা করেন :

"...এখন আর কি আছে? সেকালে বর বাসর-ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতে তাকে তার ক'নে খুঁজিয়া লইতে হইত। ছালনাতলায় শুভদৃষ্টির সময়ে একটিবার চারিচক্ষে দেখা হয় কি না সন্দেহ, সেই দেখায় বাসরঘরে আসিয়া ক'নে খুঁজিয়া বাহির করা কিরূপ কঠিন কাজ! আমার বিবাহের সময়ে বাসরঘরে পা দিতে না দিতে আমাকে বলিল, 'তোমার ক'নে খুঁজিয়া বাহির কর।' ক'নে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে শুনিয়া মহা মুস্কিলে পড়িলাম। গৃহপ্রবেশ করিতে না করিতে আমার উপর ক'নে খুঁজিয়া লইবার হুকুম হইল। আমি দেখিলাম, সেই মেয়ের

দঙ্গলের ভিতর থেকে আমার সেই অপরিচিতা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে খুঁজিয়া বাহির করা আমার কর্ম নয়—আমি ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষে আমারই বয়সের বেশ একটা টুকটুকে ফরশা মেয়েকে ধরিয়া বলিলাম, 'এই আমার ক'নে।' যেমনি ধরা অমনি এক মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল। কে কার ঘাড়ে পড়ে, কে কোথা দিয়া পলাইবে, তার পথ পায় না। আমি যাকে ধরিছি, তাকে খুবই ধরিছি, তার আর পলাইবার উপায় নাই। আমি তার হাত ধরিয়া বলিলাম, 'তুমিই আমার ক'নে, তোমাকে হ'লেই আমার ঘর চলবে। আমি আর ক'নে চাই না।' সে মেয়েটি ত বাপ রে মা রে গেলুম রে বলিয়া চীংকার করুক।' গিন্নীবান্নী গোছ দুই-একজন নিকটে আসিয়া বলিল, 'ও তোমার ক'নে নয়, ওকে ছেড়ে দাও।' আমি বলিলাম, 'ছাড়িব কেন! খুঁজে নিতে ব'লেছ, আমি খুঁজিয়া এইটিকে বাহির করিয়াছি, এইটি হলেই আমার বেশ মনের মত হবে।' তারপর সে মেয়েটি হাতে পায়ে ধরিয়া বলিল, 'আচ্ছা আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমার ক'নে বার করে দিচ্ছি।' তখন আপনারাই ক'নে আনিয়া হাজির করিল।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। একদিন তিনি দেখতে পান যে, তাঁর কলেজের এক অধ্যাপক তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তিনি তখনই অধ্যাপককে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে রহস্য করে বললেন, "কি হে, যাত্রার দল করেছ নাকি? তাই ছেলেগুলোকে বুঝি তালিম দিচ্ছিলে? আর, তুমি কী সাজবে? দূতী?"

আর একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নজরে পড়ে, এই অধ্যাপকের টেবিলে একগাছা বেত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্লাসে বেত নিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চাইলে অধ্যাপক বললেন যে, "ম্যাপ দেখানর জন্যেই তিনি ক্লাসে বেত নিয়ে গিয়েছেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন রহস্য করে বললেন, "রথ দেখা, কলা বেচা দুই-ই হয়। ম্যাপ দেখানও হয়, আবার ছেলেদের পিঠেও দু'-এক-ঘা বসান হয়।"

এখানে উল্লেখ্য যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছাত্রদের শারীরিক শাস্তিদান পছন্দ করতেন না এবং এ বিষয়ে তিনি তাঁর অধীন অধ্যাপকদের সতর্কও করে দিয়েছিলেন। আর এই অধ্যাপকের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল এবং তাঁকে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে ঐরূপ কৌতুকও ক'রতেন।

শেষ বয়সে বাদুড়বাগানের বাড়ীতে মেয়ে ও নাতি-নাতিনীদের মাঝে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দিনগুলি বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হ'ত। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি তাদের সঙ্গে নানারকম গল্পগুজব ক'রতেন; মাঝে মাঝে গল্পের ফাঁকে ফাঁকে দু'-একবার তামাক টেনে নিতেন। দাদুর মুখের 'প্রসাদী পান' লাভের আশায় নাতি-নাতিনীদের উৎসাহের ধুম প'ড়ে যেত। তাঁর কন্যারাও পর্যন্ত এই অমূল্য 'প্রসাদী পান'-এর প্রার্থিনী হ'তেন! বিদ্যাসাগর মহাশয় সবাইকে 'প্রসাদী পান' দিতেন, আর মাঝে মাঝে ব'লে উঠতেন, 'দাঁড়াও, পানে সম্বরা দিই'। অর্থাৎ পান খেতে খেতে এক একবার তামাক টেনে নেবেন।

এই ভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্থান-কাল-পাত্রভেদে নানারকম রসিকতা ক'রতেন। সকলেই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় নির্দোষ আনন্দ উপভোগ ক'রতেন। তাঁর এরকম আরো কয়েকটি রসিকতার বিবরণ উল্লেখ ক'রে প্রবন্ধের ছেদ টানব।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের আশায় তাঁর বাড়ী যান। বিদ্যাসাগরকে দেখেই ঠাকুর ব'লে উঠলেন, "আজ সাগরে এসেছি, কিছু রত্ন নিয়ে যাবো।" বিদ্যাসাগরও মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন, "কিন্তু এ সাগরে নোনাজল ভিন্ন আর কিছুই পাবেন না।"

একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। গিয়ে শুনলেন, গৃহকর্তা ভারী বিপদে প'ড়েছেন। নিমন্ত্রিত সকলে উপস্থিত, অথচ আয়োজন কিছুই হয়নি। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহকর্তাকে আশ্বাস দিয়ে ব'ললেন, "কোন ভয় নেই, তুমি ওদিকে আয়োজন ক'রতে থাকগে, আমি এদিককার ব্যবস্থা করছি।" এই ব'লে তিনি সভার মাঝখানে ব'সে দিলেন রসিকতার ফোয়ারা ছুটিয়ে। নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গকে তিনি হাসি-ঠাট্টায় আর গল্পগুজবে এমনি মশগুল ক'রে রাখলেন যে, কেউ তো বিরক্ত হওয়া দূরের কথা, আদৌ জানতেই পারল না যে তাদের অযথা বিলম্ব হ'য়ে যাচ্ছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে রন্ধন ক'রে সকলকে খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন এবং মাঝে মাঝে এরকম ভাবে অনেককে খাওয়াতেনও। খাওয়ানোর সময় প্রায়ই রসিকতার সুরে এই শ্লোকটি আওড়াতেন—

"হুঁ হুঁ দেয়ং হাঁ হাঁ দেয়ং দেয়ঞ্চ করকম্পনে।
শিরসি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে॥"

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যারা চিনত না, তাদের অনেকেই তাঁকে উড়িয়া বলে ভুল করত। এরকম ঘটনা তাঁর জীবনে কয়েক বার ঘটেছে। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই এক দিন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে হাসতে হাসতে গল্প করেছিলেন:

"আমি পটলডাঙ্গার পথ দিয়া যাইতেছিলাম; সেই সময় তাগা-হাতে, দানা-গলায়, তসর-পরা, বোধ হয় কোন বড় মানুষের ঝি যাইতেছিল। আমার চটিজুতার ধূলা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল। বলিল,—'আঃ মর, উড়ের তেজ দেখ।' ক্যাম্বেল সাহেব সত্য সত্যই আমাকে উড়ে করেছে।"

বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম এই ক্যাম্বেল সাহেবের সময় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় ক'জন পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে লাট-দরবারে গিয়েছিলেন। সেখানে বাঙালী ছাড়া আর সকলের মাথায় পাগড়ী। এই দেখে পণ্ডিতেরা বিদ্যাসাগরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে উত্তর দেন, "বাঙালী আর মাতৃভূমির আর কোন কাজ করতে পারেনি মাথার পাগড়ী খসিয়ে মাতৃভূমির ভার কমিয়েছে।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ছিল বিদ্যাসাগরের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। হরানন্দ অনেক দিন থেকে কাশীবাসী হয়েছিলেন। একদিন তিনি কাশী থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখতে আসেন। ভট্টাচার্য মহাশয়কে দেখেই অমনি বিদ্যাসাগরের মুখ খুলে গেল: "তোমায় শেষটা কাশীতে খেলে, মরবার আর জায়গা পেলে না! বলি, একটু গাঁজা-টাঁজা খেতে শিখেছ ত?" ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁকে গাঁজা খেতে বলার কারণ জানতে চাইলে

বিদ্যাসাগরের আবার রসিকতা চলল, "মনে কর, তোমার যদি কাশীপ্রাপ্তি হয়, তা'হলে ত শিব হবে। শিব হলে তোমার নন্দীভৃঙ্গী যখন গাঁজার আলবোলা ধরবে, তখন টানতে হবে ত! আগে থেকে অভ্যেস না থাকলে দম আটকে মরে যাবে, আর এত সাধের শিবত্ব তোমার যাবে ফসকে!"

কৌতুকপ্রিয় বিদ্যাসাগরের উপস্থিত-বুদ্ধিও ছিল অসাধারণ। উপস্থিত-বুদ্ধির ভিতরেও যে রসিকতার আমেজ থাকত, তা' সত্যিই বড় উপভোগ্য। দু'টি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা গেল।

"৺প্যারীচরণ সরকার, কালীকৃষ্ণ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীরা ছিলেন প্রায় সমসাময়িক। এঁরা মধ্যে মধ্যে লং সাহেবের গির্জায় আসতেন ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করতে। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় এসে দেখেন যে, গির্জার প্রাঙ্গণে একটি নেটিভ খৃষ্টান্ ছোকরা কালীকৃষ্ণ বাবুকে পাকড়াও ক'রে খুব হাত-পা নেড়ে বাইবেলে 'মোজেস্' ও যীশুর যত সব 'miracle' সংঘটনের উল্লেখ আছে, তাই বোঝাবার চেষ্টা করছে। আর প্রত্যেক বার কথার শেষে প্রশ্ন করছে—'কেমন? আপনি miracle মানেন তো?' বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ভাল মানুষ বন্ধুটিকে বিপন্ন বুঝতে পেরে এগিয়ে এসে ছোকরাকে বললেন—'আহাহা! কি করচেন সাহেব? এ লোক আপনার ও-সব কিছুই বোঝে না। Miracle আমি মশাই খুব ভাল বুঝি! এই ধরুন্ না কেন, আপনি জন্মাবামাত্র কারুর না মামা, কাকা, এমন কি ঠাকুর্দা'ও হতে পারেন, কিন্তু, বলুন তো—কোনও মানুষের এমন সাধ্য আছে কি—যে, সে জন্মাবামাত্র তার কোনও দূর সম্পর্কে ছোট ভাইয়ের ছেলের জ্যাঠা হতে পারে? কিন্তু, বলতে নেই—আমি দেখতে পাচ্চি—আপনি পুণ্যগ্রন্থ বাইবেলের কল্যাণে সে অঘটন ঘটিয়েছেন! অর্থাৎ, একেবারে জন্মেই দেখুন একজন বড় রকম জ্যাঠা হয়ে উঠেছেন! এটা কি একটা খুব প্রকাণ্ড miracle নয়? আপনিই বলুন!"

অতঃপর নেটিভ খৃষ্টান ছোকরার আর সেখানে টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না!···

একজন উগ্র জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ একবার কোনও সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে এসেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। এসে দেখেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঘিরে কয়েক জন অব্রাহ্মণ সেখানে উপস্থিত রয়েছে। তারা কেউ আগন্তুক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে দেখে উঠে দাঁড়ালো না, দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলো না, পদধূলি নিয়ে মস্তকে ধারণ করলো না। তিনি এ ব্যাপারে নিজেকে অপমানিত বোধ ক'রে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে অভিযোগ করলেন এবং সমবেত অব্রাহ্মণদের লক্ষ্য ক'রে ব'ললেন—"এই সকল অর্বাচীনদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই বর্ণশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই একদা এ দেশের এবং জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করেছিল। ব্রাহ্মণগণ সর্বদা সর্বত্র প্রণম্য।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই উত্তেজিত জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণকে হাস্য-মুখে বলেছিলেন, "দেখুন পণ্ডিত মহাশয়, গোলোকাধিপতি স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু একদা শূকররূপ ধারণ ক'রে বরাহ অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই ব'লে কি আপনি বা আমি ওই ডোমপাড়ার শূয়োরগুলোকে দেখলেই নারায়ণ জ্ঞানে ভক্তিভরে প্রণাম করি, না' পুজো করি?"

—'পাষণ্ড!' 'নাস্তিক'! ব'লে ব্রাহ্মণ ধুলোপায়েই বিদায় নিলেন।

একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, মহান্ কর্মবীর বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রায় সমুদয় অংশই এদেশের শিক্ষার বিস্তার সাধনের কার্যে ব্যয়িত হ'য়েছিল, কিন্তু অধুনা-প্রচলিত শিক্ষা ধারার ত্রুটি সম্পর্কে তিনি কিরূপ অবহিত ছিলেন, তার একটা প্রমাণ উল্লেখ ক'রে আমরা বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করব। উল্লিখিত অংশটিতে যেমন তাঁর সংস্কারমুক্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গীর প্রমাণ মিলে তেমনি মিলে তাঁর সরস কৌতুকপ্রিয় স্বভাবের পরিচয়! তাঁর ভাষাতেই বলি:

"দেশে শিক্ষাবিস্তার কিছুই হয় নাই! কেমন হয়েছে জান, একবার শুনিয়াছিলাম যে বিলাত হইতে এক রকম কল আসিতেছে, তাতে একদিকে একটি বাছুর (গোবৎসা) আর একদিকে কতকগুলা আক (ইক্ষুদণ্ড) প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। তারপর ক্রমে একদিকে আক হইতে রস—রস হইতে গুড়, গুড় হইতে চিনি প্রভৃতি প্রক্রিয়া যোগে, সন্দেশ প্রস্তুত করিতেছে। সন্দেশের রং ও ছাপ দেখিয়া লোক মোহিত হইয়া যাইতেছে। আর তার ছাঁচই বা কত প্রকার! কেহ বা তালশাঁস, কেহ বা আঁব, কেহ বা আতা, কেহ বা গোলাপ জাম প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু চাকিয়া দেখ, সবগুলির একই তার, একই স্বাদ! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের ভিয়ান্ও ঠিক সেইরূপ একপাকে তৈয়ারি মাল, কোনটিতে বা এম, এ, কোনটিতে বা বি, এ, কোনটিতে বা এল, এ, কোনটিতে বা এনট্রান্সের ছাপ দেওয়া আছে, যখন চাকিতে যাই, তখন দেখি, সবই এক পাকের জিনিস।"

বন্ধুজনের সঙ্গে তাঁর রসিকতার ঢং, রসিকতার ভাষা, উপমার প্রয়োগ বিশেষ ক'রে সে-যুগের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পরিবারের একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের পক্ষে বাস্তবিকই সাগ্রহে লক্ষ্য করার মতন।

পর্বত-প্রমাণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই অসাধারণ মানুষটিকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রিয়তা আমাদের কাছে আরো দুর্বোধ্য ক'রে তুলেছে বর্ষাদিনের মেঘমেদুর আকাশের তলে একই সময় রৌদ্র ও বৃষ্টির স্বপ্নময় খেলার মতন।

# কন্নড়ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ নারী-কবি মহাদেবী অক্কা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

ভারতবর্ষ মাতৃপূজার দেশ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই দেশের মাতৃমণ্ডলীর যতই শিক্ষা-দীক্ষা-হীনতা বা সমাজে ও পরিবারে অবনতা মনে করেছেন, ততই এ দেশকে একেবারে না বোঝার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ তাঁরা ভবিষ্যৎ কালের জন্য পুঞ্জীভূত করে রেখে গেছেন। সনাতন কাল থেকে ভারতের মাতৃসমাজ এই সনাতন সত্যকে একদিকে যেমন মাথায় করে রেখেছেন, অন্য দিকে কোলে-পিঠে করে বিবর্ধন করে তার সুপ্ত মগ্ন রূপাবলোকনে নিজেরা ধন্য হ'য়েছেন, দেশকেও ধন্য করেছেন।

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশের ভাষা নারী-কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা হচ্ছেন মহাদেবী অক্কা। তিনি বসব, চেন্নবসব প্রভৃতির সমসাময়িক ছিলেন এবং খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষ ভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নারী হয়েও মহাদেবী অক্কা ছিলেন সাহসে দুর্জয় এবং শিক্ষাদানে উদ্দীপ্ত—উৎসাহের জীবন্ত গোলকবিশেষ। সংসারের কোনও প্রকার বিপর্যয়ের নিকট তিনি কখনও মস্তক অবনত করেননি।

দাক্ষিণাত্যে "বসব" যখন বীর শৈবধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, তখন জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচারের সৌকর্যার্থে কন্নড় ভাষায় তাঁরা প্রচারকার্য সুরু করেন। তার ফলে যে "বাচন-সাহিত্যে"র সৃষ্টি হলো, তা'তে প্রায় ২০০ শত জন রচয়িতা আছেন—তন্মধ্যে নারীরাও আছেন। এই সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক বসবদেব নিজে এবং তার পরেই মহাদেবী অক্কার স্থান।

মহাদেবী বল্লীসবের নিকটস্থ উড়ুতড়ি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নির্মল চেট্টি ও মাতার নাম সুমতি। তাঁরা ছিলেন শিবভক্ত। মহাদেবী অতি বাল্যকালে "শিব" সম্বন্ধে সর্ব বিষয় জানবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করতেন। ভগবান তাঁকে দিয়েছিলেন অনুপম দেহলাবণ্য—যার ফলে দেশের রাজা কৌশিক তাঁর পাণিগ্রহণের জন্য লালায়িত হন। এ রাজা নানাভাবে মহাদেবী অক্কার পিতাকে বাধ্য করে মহাদেবীর পাণিগ্রহণে সমর্থ হন বটে, কিন্তু হৃদয় জয় করতে সমর্থ হলেন না কিছুতেই। দেহসুখপরাঙ্মুখী আত্মসংযমধনা এই মহানারীর সঙ্গে জাগতিক শক্তিসম্পন্ন রাজাকে সর্বতোভাবে পরাভব স্বীকার করতে হলো। রাজপ্রাসাদে যতদিন তিনি অবস্থান করছিলেন, ততদিন শিবারাত্রিক, শিবপূজার পরিপূর্ণ ঘটা জনসাধারণকে চমকিত করেছিলেন। শৈবধর্মের প্রতি অত্যাসক্তি প্রদর্শনের জন্য একদিন রাজা তাঁকে কিছু বলতেই তিনি তুচ্ছ রাজসিংহাসনের অধিকারীকে তুচ্ছতর প্রমাণিত করে বিশাল ধরিত্রীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণতলে স্থান নিলেন।

বসব ও অল্লমপ্রভু এ সময়ে কল্যাণপত্তনে অবস্থানপূর্বক ধর্মপ্রচার করছিলেন। মহাদেবী সেখানে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বসব তাঁর চিত্তের স্থৈর্য, বিচারপটুত্ব, অনুভবদার্ঢ্য, হৃদয়ের প্রসার এবং সর্বোপরি লোকোত্তর সাহস দেখে বিশেষ প্রসন্ন হন। কল্যাণপত্তনে আধ্যাত্মিক সমুন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে তিনি শ্রীশৈলদত্ত নামক স্থানে গমন করেন। এখানেই তিনি ভগবৎপ্রেমে সমধিক মাতোয়ারা হয়ে উঠেন এবং অচিরে "চন্ন (সুন্দর) মল্লিকার্জুনে"র সাক্ষাৎ পান।

বসবদেব স্বয়ং মহাদেবী অক্কাকে প্রশংসা করে বলেছেন যে, মহাদেবীর মত ভক্তের কাছে জগতের কিছুই ভারস্বরূপ হতে পারে না—অর্থাৎ জগতের সমস্ত ভার বহনে তিনিই হবেন সমর্থা—

কুহিল্লদঙ্গে ওলিদবরগে তনুবিন হঙুণ্টে
কূডল সঙ্গমদেবয়া
মহাদেবী অক্কনিচব ভক্তেরিগে অব
হবেয়ুঢ়োইল্লা নোডা প্রভুত্র।

কর্ণাট দেশের নারীকবি অভিনব বাগ্‌দেবী কান্তি হলসালরাজ বিষ্ণুবর্ধনের (খৃষ্টীয় ১১০৬-১১৪১ সাল) ভূষণ ছিলেন। তিনি ছিলেন জৈন নারী-কবি এবং অভিনবপম্পা বা নাগচন্দ্রের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কাজেই এই পূর্ববর্তিনী মহীয়সী নারীকবির সঙ্গে মহাদেবীর ভাবের বৈষম্য বস্তুগত্যা সুপ্রকট। কান্তি-চাতুর্যপূর্ণ কবিতারচনে ছিলেন পটু; কিন্তু ভাবের, বিশেষতঃ—ভাগবত চিন্তাধারার পরিপ্লাবনে দিশেহারা কবি ছিলেন মহাদেবী অক্কা ভগিনী। কবিতাগন্ধি ভাষা—গদ্যে মধুরিমময় ভাব প্রকাশে তিনি সর্বপ্রথম।

মহাদেবী অক্কা নিম্নলিখিত গ্রন্থ রচনা করেছেন—(১) বচনগলু (বা বচনসমূহ) (২) যোগাঙ্গ-ত্রিবিধি (ত্রিপদী); (৩) স্বৃষ্টিয়-বচন (ব্যাখ্যান-গদ্য) এবং (৪) অক্কগড়-পীঠিকে।

সংসারের সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন করে তিনি চন্ন মল্লিকার্জুনের প্রেমপাশে বদ্ধ হন এবং তাঁর সমস্ত রচনায় তাঁর প্রাণপতির প্রতি অলৌকিক ভাগবতপ্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখে আমরা ধন্য হই। বীরশৈব বচন-সাহিত্যের রথীরা প্রত্যেকে ভগবান্ শিবকে এক-একটি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত করতেন—ফলে প্রায় ২৮০ শত সাহিত্য-রথীর দেওয়া ভগবান শিবের ৩০০ শত নাম বীরশৈবসাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। "চন্ন মল্লিকার্জুন" নামে অক্কা শিবকে আরাধনা জানিয়েছেন।

একটি বচনে তিনি অলিসমূহ, বৃক্ষ, জ্যোৎস্না, কোকিল প্রভৃতি সকলকে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করছেন—তারা কেও তাঁর প্রাণের চন্ন মল্লিকার্জুনকে দেখেছে কি না; যদি দেখে থাকে, তাহলে তাঁকে ডেকে যেন মল্লিকার্জুনের সঙ্গে তারা সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়।(১)

মহাদেবীর বচনশক্তি উচ্চতম কোটিতে আত্মপ্রকাশ করে, যখন তিনি সংসারের প্রতি আন্তরিক উপেক্ষা, তীব্র বৈরাগ্য প্রকটনপূর্বক

---

(১) অলিসঙ্কুলবে, মানরবে (বৃক্ষসমূহ), বেলেদিং গলে (জ্যোৎস্না), কোগিলে, নিম্ম নিম্ম (স্ব স্ব) নেল্লরেনু (সকলে) বেড়ুবেন্নু (আমি প্রার্থনা করি)—এন্নো ডেয়া (যদি দেখে থাক) চেন্ন মল্লিকার্জুন দেবর কণ্ডরে করেদু তোরিরে (আমাকে ডেকে তাঁকে দেখাও)।

জগদ্বাসী সকলকে তাঁর নিজ প্রদর্শিত পথে আসবার জন্য আহ্বান জানান। একটি বচনে তিনি অনবদ্য সুরে ও ভঙ্গিতে বলছেন—"পাহাড়ের উপরে গৃহনির্মাণ করে জীবজন্তুদের ভয়ে ভীত হলে চলবে কেন? সমুদ্র-সৈকতে গৃহ নির্মাণ করে তরঙ্গমালা এবং ফেনরাশিকে ভয় করে কি লাভ? বাজারের উপরে গৃহ নির্মাণ করে জন-কোলাহলের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে কি ফল? এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে লোকের প্রশংসা ও অপ্রশংসায় বিচলিত না হয়ে বরং ধৈর্য স্থৈর্য সহকারে সব কিছু মেনে নেওয়া উচিত।" (২)

"শরণাগতি"র প্রভাবে কবির প্রাণের স্ফূর্তি শাশ্বত উৎসের ধারায় যেন উচ্ছল হয়ে উঠেছে। একটি কবিতায় তিনি বলছেন—"যদি আমার ক্ষিদে পায়, তজ্জন্য আছে ভিক্ষা; যদি আমার তৃষ্ণা পায়, তজ্জন্য আছে পুষ্করিণী, তড়াগ ও কূপ; যদি নিদ্রা পায়, তজ্জন্য আছে প্রাচীন গৃহ। হে চন্ন মল্লিকার্জ্জন!—আত্মসঙ্গতের জন্য আছ তুমি। শুষ্ক পত্র ভক্ষণ করেও আমি বেঁচে থাকতে পারি। যদি পর্বত আমার উপর এসে পড়ে, আমি তাকে পুষ্প বলে মনে করি। হে চন্ন মল্লিকার্জুন, যদি মস্তক ছুটে যায়, তা' হ'লে প্রাণ তোমার কাছে সমর্পিত হলো বলে মনে করি"। (৩)

বসব এবং প্রভুদেব যেমন ভূরি ভূরি সনাতা শিক্ষাবাণী প্রদান করেছেন, মহাদেবী তা' করেননি। কিন্তু যখন তাদৃশ বাণী প্রচার করেছেন, তখন স্পষ্টভাবে গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে সেই সব বাণী প্রচার করেছেন, বিশেষত:—বীরশৈবধর্ম সম্বন্ধে।...

বচন ব্যতীত কবির তিনটি গ্রন্থের মধ্যে কেবল একটি গ্রন্থ সম্বন্ধেই এখানে স্বল্পাবসরে কিছু লিপিবদ্ধ করবো। ত্রিপদী ছন্দে রচিত কবির যোগাঙ্গ ত্রিবিধ গ্রন্থ ক্ষুদ্রাকৃতিগ্রন্থ। এ গ্রন্থের ৬৭টি পদের মধ্যে নিজ সম্পর্কিত কিছু অংশের তাত্বিক বিষয়েরই সমালোচন অধিক রয়েছে। এক স্থানে কবি বলছেন—

"মোরের নাদব কেলি (শুনে) উড়িব (জ্বলন্ত) জ্যোতিয় নোড়ি (দেখে) সুবির (প্রবহনশীল) অমৃতবন্থু সবিদুণ্ড: (অমৃত খেয়ে) কারণ তোরেদেনু (ছেড়েদিলাম) জনমমরণব। এতে ভগবদ্দও প্রত্যেক বিষয়ে কবির মানসিক রতি প্রোজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

নিম্নোদ্ধৃত পদে কবি যেন নিজের জীবনের ঘটনাই সুব্যক্ত করছেন—উট্ট সিরয় (পরিহিত সাড়ী) সেলেদু কোট্টা (পরিত্যাগ করে) তোড়িগেয় হরিদু বিট্টেনু (ছিঁড়েছি) নানু (আমি) বিদু মুড়িয়া (খোলা চুল (এলে দেব কোট্টেন (দিয়েছি) এন্ন (আমার) তনু মনব।

ভগীরথ-খাতাবচ্ছিন্ন ধারায় গঙ্গার জল যেমন ধরিত্রীর বুকে নেমে এসে সমগ্র পৃথিবীকে করছে সুশীতল, তেমনি কবি মহাদেবীর ভাবগঙ্গাও পৃথিবীতে দুকূল প্লাবিত করে প্রবাহিত হচ্ছে। এমন মহিমভূষিতা দুহিতার জননী হয়ে ভারতমাতার অপায় গৌরব শতগুণ বর্ধিত হয়েছে, নিঃসন্দেহ!

---

(২) বেট্টদ (পর্বতের) মেলন্দু (অগ্রভাগে) মনের মড়ি (গৃহ নির্মাণ করে) মৃগংগলিগে (পশুসমূহকে) অঞ্জি দড়ে (ভয় করে) এন্তয়া (কি লাভ?)।

সমুদ্রদ (সমুদ্রের) তডেবল্লি (তটে) মনের (গৃহ) মড়ি (তৈরী করে) নরে (ফন) তেরে (তরঙ্গ) গলিগে (সমূহকে) অঞ্জি দড়ে এন্তয়া? (ভয় করে কি লাভ)? সস্তে (বাজারের) উলগে (ভেতরে) মনেয় মডি শব্দ নাচি দড়ে (আপত্তি করে) এন্তয়া। চেন্ন (সুন্দর) মল্লিকার্জ্জুনদেব ফেল ইয়া (শোন) লোক-দোলগে (এই পৃথিবীতে) পুট্টিদবলিকা (জন্মগ্রহণ করে) স্তুতি-নিন্দেগলু বন্দেড়ে (যা এসে পড়ে) মনদলি (মনে) কোপদ তোলদে (রাগ না করে) সমাধানিয়া গিরবেকু (সুখে শান্তিতে থাকবে)।

(৩) হাসিবাদোদে (যদি ক্ষিধে হয়), ভিক্ষান্নগলুণ্ট (উণ্ট—আছে); তৃষেয়দোদে (যদি তৃষ্ণা হয়), কেরে (পুষ্করিণী) হল্ল (তড়াগ) ভাবি (কূপ) হালু (সমূহ) ণ্ট (আছে)। শয়নক্কে (শয়নের জন্য) হালু (প্রাচীন) দেগুল (গৃহ) গলু (সমূহ) ণ্টু (আছে)।

চেন্ন মল্লিকার্জ্জুন আত্মসঙ্গতক্কে নীনু (তুমি) উণ্ট (আছে)। তরগেলেয় (শুষ্ক পত্র) মেলিদ্দ (খেয়েও) নানি (আমি) হেনু (থাকতে পারি)। গিরিমেলে বিদ্দরে (যদি পর্বত ছুটে পড়ে), এনগে (তাকে) পুষ্পবেম্বেনু (ফুল বলে মনে করি। চন্ন মল্লিকার্জ্জুন) শির (মস্তক) হরিদু (কেটে) বিদ্দরে (যদি পড়ে যায়) প্রাণ নিন (তোমাকে) র্গপিতবেম্বেনু (সমর্পিত হয়েছে বলে মনে করি।

# সংশয়

### আবদুল মজিদ

কি এক সঞ্চয়ে সুখী! তাকে আজো তুলে রাখি মনে।
তিনটি বছর দেখা নেই, দেখি হাতে গুণে।
ছায়াকে মাড়িয়ে চলি স্বচ্ছ কচি-ভোর,
আমার লক্ষ্যের স্থান আজো বহুদূরে।

কৃপণ আঙলে ছুঁই স্মৃতির পাথর—
মনের কাগজে রোজ দাগ কাটে সীসের অক্ষর।
অশেষ যন্ত্রণা নিয়ে তবু আমি সুখী,
তবে কি আমারো মন হলো সূর্যমুখী?

সে হয়ত ভুলে গেছে। তাকে মজ্জ রেখে, তার
মিছেই দুরাশা মোর (হয়ত বা) সে ভুল ভাঙার।

# ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প

শ্রীবিনায়ক সেন

১৮৯৭ সালের ১২ই জুন বিকেল পাঁচটা পনেরো মিনিটের সময় দক্ষিণ-এশিয়ায় এক বৃহৎ ভূমিকম্প হয়, পৃথিবীর ভূমিকম্পের ইতিহাসে এ রকম ভয়ানক ভূমিকম্পের আর উল্লেখ নেই। সেই ভূমিকম্পের কাছে কোয়েটার ভূমিকম্প বা ১৯৩৩ সালের বিহারের ভূমিকম্প তুলনায় অতি তুচ্ছ।

এই কম্পনের কেন্দ্রস্থল ছিল আসাম। কিন্তু বৃহত্তর কম্পন ৩০,০০০ বর্গমাইল ছড়িয়ে পড়ে। এই সুবৃহৎ ভূমিখণ্ডের সমস্ত ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকা ধ্বংস হয়ে যায়। কেন্দ্রস্থলের ১১,০০০ বর্গমাইল স্থানে ধ্বংস-লীলা এমনি হয়েছিল যে, মনুষ্যবাসের সমস্ত চিহ্ন সেখানে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এমন কি, সে জায়গা যে সে জায়গাই, পরে তা' বুঝতেই পারা যায়নি! জমি ফেটে উঁচু-নিচু হয়ে, এক জায়গার জমি আর এক জায়গাতে সরে গিয়ে এমনি ভাব ধারণ করেছিল, যেন সে এক নূতন ভূখণ্ড!

বিকেল পাঁচটার সময় স্বভাবতঃই মানুষ-জন ঘরে ছিল না। তারা ছিল বাইরে—কাজে। হঠাৎ ভূমিকম্প আরম্ভ হয়ে শেষ হয়ে যাবার পর অনেকেই তাদের বাড়ীর নিশানাই টের পায়নি। বিরাট লোকক্ষয়ের বেশীর ভাগই হয়েছিল মাটি ফেটে গিয়ে তার গর্ত্তে পড়ে বা বিরাট মাটির ঢিবি ছুটে উঠে মানুষ-জন চাপা দিয়ে। আসামের পাহাড়ের ধার ধ্বসে পড়ে পাহাড়িয়া অঞ্চলে বহুলোকের জীবন্ত সমাধি ঘটে।

১৫,০০০ বর্গমাইল জায়গা জুড়েই দালান-পাটের বেশী ক্ষতি হয়। কম্পনের ধাক্কা টের পাওয়া গেছল প্রায় ১৭৫০,০০০ বর্গ-মাইল জুড়ে। বহু দূরে দূরে পৃথিবীর বহু জায়গায় ভূকম্পন-ধরা আফিসে তাদের কলে এই ভূমিকম্প ধরা পড়েছিল। বিশেষ ভাবে ইটালীয় লিভিবনো ও স্পিনিয়ার কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় ৪,০০০ মাইলের কাছাকাছি।

দুরন্ত এবং ভয়ঙ্কর কম্পনটি স্থায়ী হয়েছিল মাত্র এক মিনিটের একটু কম কিন্তু সম্পূর্ণ কম্পন ছিল প্রায় তিন মিনিট। কম্পনের বেগের তীব্রতা এমনি হয়েছিল যে, মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি, ধাক্কায় মাটিতে গড়িয়ে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফেটে সমাধি ঘটে অনেকের।

এই ভূমিকম্পের উর্দ্ধমুখী উৎক্ষেপ এমনি ভয়ঙ্কর হয়েছিল যে, মাটি, মানুষ, জন্তু-জানোয়ার, ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা যেন ছুড়ে উপর দিকে ছিটিয়ে দিয়েছিল। পাহাড়ী জায়গার পাথর পূর্ব্বোক্ত স্থানে বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করে ধাক্কায় আকাশে উঠে ভিন্ন জায়গায় গিয়ে ছিটকে পড়েছিল।

যেমন ছিল উর্দ্ধোৎক্ষেপ, তেমনি ছিল আবার নিম্নটান। অনেক ইটের বাড়ি ভূমিকম্পের টানে এমনি ভাবে মাটির নিচে বসে গিয়েছিল যে, গর্ত্তের ভেতর তাদের শুধু ছাত ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিপথে পড়েনি। দোতলা তিনতলা বাড়ী বসে গিয়ে একতলা দেড়তলা হয়ে গিয়েছিল, অবশ্য তাদের কোন অংশই সম্পূর্ণ আস্ত ছিল না। অসংখ্য বাড়ী ভেঙ্গে ইট-পাথরের স্তূপে পরিণত হয়েছিল।

মাটির উপরে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ঢেউ খেলে গিয়েছিল, কম্পনের পরেও যা স্থায়ী হয়েছিল অনেক স্থানেই। সে ঢেউ দৈর্ঘ্যে হয়েছিল তিরিশ চল্লিশ হাত এবং উচ্চতায় দু'-তিন হাত। বহু স্থানে মাটি ফেটে উঁচু-নিচু হয়ে গিয়েছিল। বার মাইল লম্বা এমনি একটি ফাটলের খাড়াই উচ্চতায় হয়েছিল প্রায় পঁচিশ হাত। এই ফাটল ছিল উত্তর-দক্ষিণব্যাপী এবং এর পূর্ব্বদিক ছিল উঁচু ও পশ্চিম দিক নিচু। এমনি আর একটি আড়াই মাইল লম্বা ফাটলের উঁচু-নিচুর তফাৎ হয়েছিল প্রায় আট হাত। দীর্ঘ সাত মাইলব্যাপী আর একটি ফাটল তৈরী হয়েছিল, যার ধার উঁচু-নিচু হয়নি। ফাটলটি দৈর্ঘ্যে ছিল মাত্র কয়েক ইঞ্চি আর তার বিস্তার ছিল উত্তর-দক্ষিণব্যাপী। পাহাড়ের ধার ধ্বসে পড়ে পর্ব্বতগাত্র একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল, আর তার নিচে জমা হয়েছিল বিরাট মাটি, পাথর আর গাছ-গাছড়ার স্তূপ। গারো পাহাড়ের কাছাকাছি ৭০০ বর্গমাইল স্থান ফাটলে ফাটলে একেবারে ভরে গিয়েছিল, আর এই সব ফাটল দিয়ে পৃথিবীর গর্ভ থেকে বালি উঠে আর ছড়িয়ে পড়ে ক্ষেত-খামারের এমনি অবস্থা হয়েছিল যে, কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত চাষারা ঠিক ভাবে তাদের চাষ-বাস করতে পারেনি। অনেক স্থানেই যেখানে ছিল মাঠ, তৈরী হয়েছিল পুকুর আর যে জায়গায় ছিল পুকুর, হয়ে গিয়েছিল মাঠ। টেলিগ্রাফের খুঁটি, গাছ-গাছড়া, বাড়িঘর এমনি ভাবে স্থানচ্যুত হয়ে যায় যে মনে হয়েছিল তারা যেন সব জায়গা বদল করে বসে আছে। ভূমিকম্পের পর গভর্ণমেণ্ট থেকে আবার সব নূতন করে জরিপ করাতে হয়।

বিধ্বস্ত স্থান ও তার কাছাকাছি স্থানে অনেক দিন পর্য্যন্ত ছোট ছোট শেষ কম্পন লেগেই ছিল। ১৮৯৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত ৫৫২৩টি কম্পন গোণা হয়। এই সব কম্পন কেন্দ্র-স্থলের কাছাকাছি বিভিন্ন স্থান থেকে আরম্ভ হতো।

এই ভূমিকম্পের আংশিক ধ্বংসলীলা বাংলা দেশকেও ভোগ করতে হয়েছিল, বিশেষ উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে। এই ভূমিকম্পেই উত্তরবঙ্গে রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনাবাজার রাজবাড়ী পড়ে যায়। এর প্রকোপ কলকাতাকেও ব্যতিব্যস্ত করেছিল, তারই উল্লেখ করেছেন মহাস্থবির তাঁর জাতকের খাতায়। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকারও সম্ভবতঃ তাঁর' লেখায় তার উল্লেখ করেন। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন এমন লোক, বাংলা দেশে এখনও অনেকে বেঁচে আছেন যাঁদের অভিজ্ঞতা এখনই লিপিবদ্ধ হবার দরকার। পাঠকদের মধ্যে কেউ অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসবেন কি?

'Youth is a wonderful thing ; what a crime to waste it on children.' —*Bernard Shaw.*

[ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ভাষাগুলির মধ্যে বাংলার স্থান সর্ব্বাগ্রে, একথা মহাপণ্ডিত উইলিয়ম কেরীর ন্যায় ব্যক্তি বহুকাল পূর্ব্বেই অনুধাবন করিয়াছিলেন। ইহার নমুনাস্বরূপ কেরী সাহেবের একখানি মূল্যবান পত্র প্রকাশিত হইল।]

## উইলিয়ম কেরীর চিঠি

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলের বরাবরে—

মহোদয়বৃন্দ,

'চলিত মাসের ৮ই তারিখে কলেজ কাউন্সিলের সেক্রেটারীর নিকট হইতে যে পত্র আসে, তাহারই উত্তরে আমি এই লিপি পাঠাইতেছি। সেক্রেটারী তাঁহার পত্রে আমাকে লেখেন যে, কলেজে দেশীয় বাংলা বিভাগ যাহা বর্ত্তমান অবস্থাধীনে 'অতিরিক্ত' বলিয়া মনে হয়, সেইটি রাখার প্রয়োজন কতটা আছে, আমি যেন তাহা জানাই। সেইমতে আমি লিখিতে চাহিতেছি যে, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা বিভাগের জন্য মোট ব্যয় হইতেছে মাসিক ৫৮০৲ টাকা। এই ব্যয় নিম্নভাবে হয় :—

একজন প্রথম পণ্ডিত—মাসিক ২০০৲ টাকা হারে

একজন দ্বিতীয় পণ্ডিত—মাসিক ১০০৲ টাকা হারে

একজন রাইটিং মাষ্টার—মাসিক ৬০৲ টাকা হারে

একজন পণ্ডিত মাসিক ৬০৲ টাকা হারে

চারজন পণ্ডিত—প্রত্যেকে ৪০ টাকা হারে ১৬০৲ টাকা

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, ভারতে কথ্য সব কয়টি ভাষার মধ্যে স্বকীয় গুণবত্তার দিক হইতে বাংলা ভাষাই শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত কার্য্যকারিতার দিক হইতেও এই ভাষা অপর কোন ভাষার পশ্চাতে নয়। এই অবস্থায় আমি কোনক্রমেই এমন কোন কার্য্যক্রম অবলম্বনের পরামর্শ দিতে পারি না, যাহাতে ইহা কলেজে একটি অমর্য্যাদার অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং যেক্ষেত্রে পার্শী ও হিন্দুস্থানী বিভাগসমূহে প্রথম ও দ্বিতীয় পণ্ডিত রাখা হইয়াছে, সেই অবস্থায় এই বিভাগেও তাঁহাদিগকে রাখা সমভাবেই প্রয়োজন বলিয়া আমি মনে করি।

'......এইরূপ আশা করা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষাকে বর্ত্তমানে যেরূপ অভাবনীয় ও অসঙ্গতভাবে অবহেলা করা হইতেছে, ভবিষ্যৎ সেইটি আর করা হইবে না,...।

১৩ই আগষ্ট ১৮২২ ডব্লিউ কেরী।

## ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিঠি

[১৮৩১ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। নিমাইচন্দ্র শিরোমণি এই শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন।

এই বৎসর (১৮৩১) ২১ মে তারিখে সকল বিভাগের বহু ছাত্র সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেক্রেটারী জি, টি মার্শ্যালের নিকট আবেদন করেন। এই আবেদনপত্রে ন্যায়-শ্রেণীর ছাত্রবর্গের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাক্ষর আছে। আবেদনকারীরা লিখিয়াছিলেন :— ]

ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়িনাং ছাত্রাণাং

আমারদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ কেবল সংস্কৃত পাঠশালাতেই ইংরাজিভাষাধ্যয়নের রীতি উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু মাদর্শাতে উক্তভাষাধ্যয়ন ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে কেবল আমারদিগেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবেক নতুবা যে রাজা এতদ্দেশে ইংরাজি বিদ্যাবৃদ্ধ্যর্থে যত্নপূর্ব্বক বহুতর ধন ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন তাঁহার যে কেবল এতন্মহানগরস্থ প্রধান বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের উক্তভাষাভ্যাসবিষয়ে অমনোযোগ হইয়াছে ইহা কোনরূপেই সম্ভব নহে অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা যে অনুগ্রহপূর্ব্বক রীত্যনুসারে আমারদিগের ইংরাজিভাষাভ্যাসের অনুমতি প্রকাশ হয় তাহা হইলে ক্রমে রাজকীয় কার্য্য ও শিল্পাদি বিদ্যা জানিয়া লৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারি—লিপিরিয়ং জ্যৈষ্ঠস্যাষ্টদিবসীয়া—

[১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ন্যায়-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ঈশ্বরচন্দ্র একটি রচনা-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন।]

## বিদ্যাসাগরের প্রশংসাপত্র

[বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্র লাভ করেন। ইহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই; কৌতূহলী পাঠক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' পুস্তকে ইহার প্রতিলিপি দেখিতে পাইবেন।

৪ ডিসেম্বর ১৮৪১ তারিখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ মিলিত হইয়া বিদ্যাসাগরকে দেবনাগর অক্ষরে লেখা একখানি স্বতন্ত্র প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। প্রশংসাপত্রখানি এইরূপ :— ]

অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরায় প্রশংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুত কোম্পানিসংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১২ দ্বাদশ বৎসরান্ ৫ পঞ্চ মাসাংশ্চোপস্থায়াধোলিখিতশাস্ত্রান্যধীতবান্।

| | |
|---|---|
| ব্যাকরণম্ | শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মভিঃ |
| কাব্যশাস্ত্রম্ | শ্রীজয়গোপাল শর্ম্মভিঃ |
| অলঙ্কারশাস্ত্রম্ | শ্রীপ্রেমচন্দ্র শর্ম্মভিঃ |
| বেদান্তশাস্ত্রম্ | শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ |
| ন্যায়শাস্ত্রম্ | শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মভিঃ |
| জ্যোতিঃশাস্ত্রম্ | শ্রীযোগধ্যান শর্ম্মভিঃ |
| ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ | শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মভিঃ |

সুশীলতয়োপস্থিতৈস্তৈস্তৈস্তেষু শাস্ত্রেষু সমীচীনা ব্যুৎপত্তিরজনিষ্ট।

১৭৬৩ এতচ্ছকাব্দীয় সৌরমার্গশীর্ষস্য বিংশতিদিবসীয়ম্।

Rassomoy Dutta, Secretary.
10 Dec, 1841.

## শিক্ষাপরিষদের চিঠি

[ ৪ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছাড়িয়া পরদিন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে—এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের উপর ভার পড়িল। ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর "দীর্ঘচিন্তা ও যথেষ্ট বিবেচনা-প্রসূত" এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষাপরিষদে দাখিল করিলেন।* কলেজ-পরিচালনের বিধি-ব্যবস্থা ও পাঠ্য-প্রণালীর বহুবিধ পরিবর্ত্তন সমর্থন করিয়া এই রিপোর্ট লিখিত পুনর্গঠিত সংস্কৃত কলেজ যে সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনের কেন্দ্র ও মাতৃভাষা-রচিত সাহিত্যের জন্মক্ষেত্র হইবে, এবং এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই যে শিক্ষকরূপে একদিন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সাহিত্য-রস বিতরণ করিবে,—পরিবর্ত্তনের ফল যে একান্ত শুভ ও আশাপ্রদ, রিপোর্টে তিনি এ কথা দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন।

শিক্ষাপরিষদ এমনই একজন কার্য্যপটু, দৃঢ়চিত্ত লোককে চাহিতেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করা যায় কি না—এই কথাই কিছু দিন হইতে তাঁহারা ভাবিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত অবসর গ্রহণ করিলে পুরাতনের বাধা সরিয়া গেল। শিক্ষাপরিষদ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে লিখিলেন— ]

দশ বছর ধরিয়া বাবু রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কাজ করিয়া আসিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞান নাই বলিলেও চলে। তাহার উপর সারাদিন তিনি অন্যত্র দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন। কলেজের যখন কাজ চলে, তখন তিনি কলেজে উপস্থিত থাকিতে পারেন না। ফলে কলেজের শৃঙ্খলা শিথিল হইয়াছে। হাজিরা-খাতার উপর মোটেই নির্ভর করা চলে না, এবং নানারূপ গোলমাল ও অব্যবস্থায় কলেজের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—কার্য্যকারিতা একান্তভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অথচ এই বিদ্যালয় এক বিপুল ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান, কারণ কলেজের ছেলেদের নিকট হইতে মাহিনা লওয়া হয় না।

বাংলায় সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানের যে আন্দোলন সুরু হইয়াছে, কর্ম্মিষ্ঠ লোকের হাতে পড়িলে সংস্কৃত কলেজ সেই আন্দোলনের সহায়করূপে অনেক কাজ করিতে পারে।

বাবু রসময় দত্তের পদত্যাগে এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের একমাত্র অন্তরায় দূর হইল। কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডাঃ স্প্রেঙ্গার আরবী ভাষায় যেরূপ সুপণ্ডিত, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাওয়া যাইতেছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষাপরিষদের মতে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। একদিকে তিনি ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্য দিকে সংস্কৃত-শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মত উদ্যমশীল, কর্ম্মনিপুণ, দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালীর মধ্যে দুর্লভ। তাঁহার রচিত 'বেতালপঞ্চবিংশতি' ও 'চেম্বার্সের বায়োগ্রাফি'র বঙ্গানুবাদ সমস্ত গবর্ণমেণ্ট স্কুলকলেজেই বাংলার পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পড়ান হয়। তিনি অধ্যক্ষ হইলে বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ উঠিয়া যাইবে। এই দুই পদের বেতন মোট ১৫০৲ টাকা। অধ্যক্ষকে এই ১৫০৲ টাকা দিলেই চলিবে। সুতরাং এই পরিবর্ত্তনে ব্যয়বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা নাই।

[ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় সম্প্রতি অস্থায়িভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই সংস্কৃত কলেজের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল। ( ৪ জানুয়ারি ১৮৫১, অনূদিত )।

সরকার শিক্ষাপরিষদের প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। বিদ্যাসাগর মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন ( ২২ জানুয়ারি ১৮৫১ )। এক কথায় কলেজের সংস্কার, পুনর্গঠন ও পরিবর্ত্তনের পূর্ণ অধিকার তাঁহার হাতে দেওয়া হইল। ]

* *General Report on Public Instruction*, etc. 1850—51 গ্রন্থের ৩৮—৪৩ পৃষ্ঠায় এই দীর্ঘ রিপোর্ট মুদ্রিত হইয়াছে। সুবলচন্দ্র মিত্রের বিদ্যাসাগর-জীবনীতেও ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে।

## সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র নন্দীকে লিখিত চিঠি

শিলং

বিনয় সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শেখ সাদীর সহিত আমার তুলনা করিয়া আপনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পড়িয়া আনন্দ লাভ করিলাম। এজন্য আপনি আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন গ্রহণ করিবেন। ইতি, ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

স্বাঃ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

2. 4. 31
University College of Science
Calcutta.

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ইদানীং আমার শরীর অপটু। এই কারণে আপনার পুস্তিকাখানি রাখিয়া দিয়াছিলাম যে সুস্থ হইলে ধীরে ধীরে পড়িব। কিন্তু সেদিন খুলিবামাত্র আর পড়িবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। কয়েক দিনে অল্প অল্প করিয়া আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিলাম। বাস্তবিক বাংলা সাহিত্যকে আপনি একটি অপূর্ব্ব রত্ন উপহার দিলেন। "ওমর খৈয়াম" বুঝিতে হইলে সেই সময়ের কি প্রকার আবেষ্টন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কবি লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তাহা বিশদরূপে জানা আবশ্যক। এই হিসাবে "মুসলিম দর্শনে গ্রীক-প্রভাব" পরিচ্ছেদটি বড় শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। এই পুস্তিকাখানি লিখিতে আপনি যে কত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পাদটীকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমি সঙ্কেত পাইয়া Imperial Library হইতে Arabic thought and its place in history, By De Loay O' Lary ও Literary history of Arabs By Nicholson আনাইয়া পাঠ করিতেছি। বাংলাসাহিত্য আজ গল্প, উপন্যাসে প্লাবিত। এক কথায় বলিতে গেলে কথাসাহিত্য [illegible]

বাংলাসাহিত্যের কিছুই থাকে না। আপনার "ওমর খৈয়াম" এইজন্য বড়ই আদরের সামগ্রী। আশা করি সাহিত্যসেবিগণ ইহার রস পানে পরিতৃপ্ত হইবেন। ইতি—

বিনীত

স্বা:—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

20, May fair
Ballygunge
5. 9. 23

সবিনয় নিবেদন,

আপনার রচিত "কবি শেখ সাদী" পেয়েছি। এ বই যে আপনি সাদীর মূল গ্রন্থ আলোচনা করে লিখেছেন এতে আমি যারপরনাই সুখী হয়েছি। বাঙালা দেশের হিন্দুরা যে ফার্সী পড়েন না ও ফার্সী সাহিত্যের কোন খোঁজ রাখেন না, এটা আমার মতে নিতান্তই দুঃখের বিষয়। হিন্দু-মুসলমানের মনের মিল তখনই জন্মাবে যখন আমরা পরস্পরের সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখব। তাছাড়া ফার্সীভাষা না শিখলে আমরা মুসলমানযুগের ইতিহাসও লিখতে পারব না।

আপনার বই আমি পড়তে আরম্ভ করেছি। বইখানি শেষ করে, আমার মতামত আপনাকে জানাব। ইতি—

স্বাক্ষর—শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।

Moslyu House
Brooklands Avenue
Cambridge. 29th. May 1918

Dear Mr. Nandy,

Your letter of the 15th April and the Magh number of the "Tiveni" have just reached me. I find it a little difficult to write you without running a giving offence. But I am a quiet and (I hope) modest old pensioner and I trust you will take what I am going to say in good part, knowing as I do how traditionally kind and indulgent Indian youth is to old age. Well, when I answered your first letter I had no idea that I was writing to any one but yourself or that you would publish my letter, when a man writes for a largest public than a friendly correspondent, he picks his words more carefully. I confess I am abashed and confounded at finding myself represented as an authority on Bengali—or any other—literature, I do know a little Bengali, I even back it to beginners. I have a great affection and admiration for my native land, for its people and its language. But an authority on the language or the literature [illegible] am not so please please, please do not future publish private correspondence without knowledge and consent of your correspondent. It makes it very difficult for me to answer your questions freely and frankly.

However, not to answer definite questions might seem rude, might lead you to imagine that I have taken serious offence for what was in intention, I am sure, a trifling indiscretion. So here are such answers as I can give.

You ask me if you can get a copy of the proceedings relative to the acceptance of Swarnalata as text book. No, that is impossible. Some 7 or 8 years ago the senior examiner to the Civil Service Commissionors, Mr. Mair wrote privately to ask me if I could suggest suitable substitute for নবনারী than the text book. There had been a complaints that নবনারী was a little old fashioned in style and gave an inadequate idea of the present state of fiction and imagination prose in Bengali on which I suggested স্বর্ণলতা। There is now some tack of adding some of Sir Rabindranath Tagore's stories out of গল্পগুচ্ছ।

I delivered on lecture in London in Bengali novels, chiefly about B. C. Chatterji. There were few people present—not more than 2o in all.

I am sorry to say I have no photography of myself, and as aforesaid, I have a horror of publicity.

But I shall be glad to keep up a private correspondence with you, if you permit and to have your advice and help in matters relating to Bengali literature and language.

Yours very truly
Sd/ J. D. Anderson. *

P. S

I wonder if you are in any way related to my old dear friend Kalinath Nandy of Kaligacha. He died many years ago, he was a much esteemed member of the police force Sychet.

I have soldier sons and live in a state of incessant anxiety and as it happens my health is not good at present. Let this facts be an excuse for an inadequate answer to your letter.

Sd/ J. D. Anderson.

* (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক)

# ইন্দোচীনে ভারতীয় সভ্যতা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সারা ভারত যখন মুসলিম-কবলিত, তখনো ভারতের বাইরে প্রবল প্রতাপ হিন্দু সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব এবং তথায় ব্রাহ্মণ্যশক্তির অপ্রতিহত ক্ষমতার কথা আজকের দিনে অনেক ভারতীয়ের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করবে। অনেকেই হয়তো শুনে অবাক হবেন যে, ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিরা ইন্দোচীন, মালয়, সুমাত্রা, যাভা, বলিদ্বীপ প্রভৃতিতে রাজ্য স্থাপন করে শতাব্দীর পর শতাব্দী 'প্রবর-নৃপ-মুকুটমণি-মরীচি-চয়-চর্চ্চিত-চরণযুগল' হয়ে রাজ্য শাসন করেছেন। তাঁদের চতুরঙ্গ বাহিনীর বিজয়োল্লাসে এবং 'নৌবাট-হী-তী রবে' একদা সমগ্র ভারত মহাসাগর ও পূর্বসমুদ্র কম্পিত হয়ে উঠেছে। চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকর, ধনপতি-শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল পাটন যাত্রা, বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, কাব্য, হিন্দুশাস্ত্র বৌদ্ধজাতক, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতিতে বর্ণিত হিন্দু বণিকদিগের বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতসাগর পরিক্রমা —শুধুই যে কবির কল্পনা বা রূপকথার আখ্যায়িকা নয়—তার পিছনে ছিল যে একটা বিরাট ঐতিহাসিক পটভূমিকা, একথা ভাবলেও আজ বিস্ময় বোধ হয়। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকা নিয়ে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ আজ পর্যান্ত যতটুকু আলোচনা, গবেষণা বা ঐ সংক্রান্ত তথ্য উদ্ধার করেছেন, বিষয়বস্তুর বিশালতার তুলনায় এখনো তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

সুদূর অতীতে মহাভারতের যুগ থেকে, বিশেষতঃ খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে চতুর্দ্দশ শতক পর্য্যন্ত ভারতীয় অভিযাত্রিদল স্থলপথে জলপথে প্রথমে ইন্দোচীন এবং পরে মালয়, সুমাত্রা (সুবর্ণদ্বীপ), যবদ্বীপ, বোর্ণিও, বলিদ্বীপ প্রভৃতি পূর্ব্ব-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। কালে কালে এই অভিযাত্রিদলই ঐ সব দেশে গড়ে তুলেছিলেন এক বিরাট সাম্রাজ্য। এর ঐতিহাসিক সত্য বহুদিন পর্য্যন্ত বিশ্ববাসীর নিকট রূপকথা বলেই গণ্য ছিল। হিন্দুর সামাজিক আদর্শ সে যুগে এত সঙ্কীর্ণ ছিল না। আহার বিহার আচার ব্যবহার নিয়ে ছিল না এত মারামারি কাটাকাটি, এত ছুঁৎমার্গ ও ধর্ম্মান্ধতার গোঁড়ামী। সমস্ত জাতির সঙ্গেই সে যুগের হিন্দুরা অবাধে মেলামেশা করতে পারতেন এবং পারতেন বলেই নিজেদের উচ্চতর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাবে বিদেশী ও বিধর্ম্মীদিগকেও নিজ ধর্ম্মভুক্ত করে নিতে তাঁদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। অবশ্য প্রয়োজনবোধে বিদেশী বা বিধর্ম্মীদের কিছু কিছু আচার আচরণ নিজেরাও সময় সময় গ্রহণ করেছেন। সে যুগের হিন্দুসমাজ যে কত উদার ও কুসংস্কারমুক্ত ছিলেন, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের আচার-আচরণেই তা সুপরিস্ফুট।

ভারতীয় অভিযাত্রিদলের পুরোভাগে ছিলেন হাজার হাজার ব্রাহ্মণ। ইন্দোচীনে গিয়ে তাঁরা শুধু বসতি স্থাপনই করেননি, বিয়ে করেছেন সেখানকার বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ নারীদের। তারপর সারা দেশ-ব্যাপী বিস্তার করেছেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রভাব। অনার্য্য নাগোপাসকদের মধ্যে প্রচার করেছেন শিব, বিষ্ণু, ইন্দ্র, গণেশ, কালী, তারা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা-উপাসনা, আর্য্যসভ্যতা ও সংস্কৃত ভাষা। ভারতীয় নামানুসারে স্থাপন করেছেন কাম্বোজ, শ্যাম, চম্পা, মলয়, সুবর্ণ দ্বীপ (সুমাত্রা), বলিদ্বীপ প্রভৃতি রাজ্য আর যশোধরপুর, ভবপুর, ইন্দ্রপুর, অমোঘপুর, শ্রেষ্ঠপুর ইত্যাদি নামে মন্দির ও বৌদ্ধমঠ শোভিত অসংখ্য সমৃদ্ধিশালী নগর ও জনপদ। আজ সেই হারানো দিনের ইতিহাস প্রত্যেক ভারতবাসীর মনেই গৌরব ও গর্ব্বের সঞ্চার করবে; অথচ বিস্ময়ের কথা এই যে, আজ থেকে এক শত বৎসর পূর্ব্বেও বিশ্ববাসীর কাছে রূপকথা বা কল্পিত কাহিনী ছাড়া বৃহত্তর ভারতের কোন ঐতিহাসিক মর্য্যাদা ছিল না, ছিল না কোন ভারতীয়ের মনে এ সম্বন্ধে বাস্তব বা সুস্পষ্ট কোন ধারণা।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতের বাইরে পূর্ব্বাঞ্চলের বৃহত্তম হিন্দু উপনিবেশ ইন্দোচীনের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্বন্ধেই একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

## ঐতিহাসিক আবিষ্কার

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ। সমগ্র ইন্দোচীনে তখন ফরাসী আধিপত্য। রেভারেণ্ড বোলিভোঁ নামক জনৈক ফরাসী মিশনারী সর্ব্বপ্রথম এক অজ্ঞাত ও লুপ্ত ইতিহাসের সন্ধান দিয়ে এ সময়ে সভ্য জগৎকে চমকিত করলেন। ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ইন্দোচীনের কাম্বোডিয়া পর্য্যটনকালে গভীর অরণ্য মধ্যে সহসা এক প্রাচীন ভগ্নসৌধ তাঁর বিস্ময় ও কৌতূহল উদ্দীপ্ত করল। ফরাসী বিদগ্ধজন-সমাজে এই আবিষ্কারের সংবাদ পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে কাম্বোডিয়ার গভীর অরণ্য মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন দলে দলে অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের দল। আবিষ্কৃত হল কাম্বোডিয়ার পাঁচ শত বৎসরের অবলুপ্ত ইতিহাস। বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী সেই ভগ্নাবশেষের মধ্যে সন্ধান পাওয়া গেল পরিখা, প্রাকার, রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, সরোবর, বৌদ্ধমঠ, শিলালিপি, তাম্রশাসন, অসংখ্য হিন্দু দেবদেবী ও বুদ্ধমূর্ত্তি সমন্বিত এক বিশাল জনপদের। গবেষণার ফলে জানা গেল, এই ধ্বংসাবশেষই কাম্বোজের এককালের সমৃদ্ধিশালী রাজধানী আঙ্করথম বা প্রাচীন যশোধরপুর—যার ঐশ্বর্য্যের কথা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে তখনো রূপকথার কাহিনীর মতই প্রচলিত। ফরাসী পণ্ডিত এম,

মাহুত প্রাপ্ত শিলালিপি শিলালেখ, তাম্রশাসন ও মূর্তি প্রভৃতির সাহায্যে প্রথমে এই নগরের যে ঐতিহাসিক বনিয়াদ গড়ে তুললেন, প্রত্নতত্ত্ববিদ এম পেলিয়তের ঐকান্তিক চেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফলে তার ওপর আরো অনেক নতুন তথ্য সংযোজিত হল। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে আঙ্করথম রাজসভায় রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছিলেন চৌ-টা-কুয়ান নামক জনৈক চৈনিক পণ্ডিত। কুয়ান তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন আঙ্করথম সম্বন্ধে যে বর্ণনা করে গেছেন, আঙ্করের হারানো যুগের ইতিহাস রচনায় তাই হল সবচেয়ে প্রামাণ্য ও মূল্যবান উপাদান। এই ভাবে প্রথম স্তরে শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং দ্বিতীয় স্তরে চীন রাষ্ট্রদূতের বর্ণনা থেকে কাম্বোজের মোটামুটি একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গড়ে তোলা হল। ফরাসী ঐতিহাসিকদের উদ্যম কিন্তু এখানেই শেষ হল না। পরবর্তী যুগে এই লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের জন্য আরো ব্যাপক ভাবে তাঁরা কাজ আরম্ভ করলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ ডাঃ গুলোবো আরো ব্যাপক ভাবে খনন করে মৃত্তিকা-গর্ভ থেকে বহু মন্দির, মঠ, ভগ্ন গৃহ প্রভৃতির উদ্ধার সাধন করলেন। এর ফলে প্রাচীন নগরের সীমা নির্দ্ধারণ করাও সম্ভব হল। ডাঃ গুলোবো আঙ্করথমের নগর ও মন্দিরাদি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। বর্তমানে কাম্বোজের ইতিহাস রচয়িতাদের পক্ষে এসব বিশেষ মূল্যবান। পরবর্তী যুগে কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া পরিদর্শনান্তে কয়েক জন ভারতীয় ঐতিহাসিক ঐ সম্বন্ধে বহুবিধ প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করেন। কাম্বোজের লুপ্ত ইতিহাস সঙ্কলনে এগুলিও নিঃসন্দেহে মূল্যবান। আঙ্করথমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবিষ্কার হল আঙ্করভাটের বিরাট বিষ্ণুমন্দির ও বায়নের বিশাল বৌদ্ধমঠ। এই দুই বিশাল সৌধের বর্ণনার পূর্ব্বে কাম্বোজের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য ডাঃ হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ফরাসী তাঁবেদার বাওদাই সরকারের সঙ্গে ইন্দোচীনের (ভিয়েৎমিন) দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে সাম্প্রতিক ইতিহাস জনসাধারণ, বিশেষ করে সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রই জ্ঞাত আছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক এবং বাহুল্য বিবেচনায় সে সুপরিচিত কাহিনীর আর পুনরুল্লেখ করব না।

## প্রাচীন ইতিহাস

ফরাসী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায়, প্রাচীন ইন্দোচীনের চৈনিক নাম ছিল ফু-নান। কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া এককালে ছিল এই ফু-নানের অন্তর্ভুক্ত একটি রাজ্য। কাম্বোজের পূর্ব্বদিকে চম্পা ও আনাম রাজ্য, পশ্চিমে শ্যাম ও উত্তরে লাও দেশ অবস্থিত। ফু-নানের দক্ষিণে মালয় এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণে সমুদ্রমধ্যস্থ সুমাত্রা, জাভা, বলিদ্বীপ, সেলিবিস প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জকেও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

প্রাচীন চৈনিক কাহিনী থেকে জানা যায়, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কৌণ্ডিন্য নামে জনৈক ভারতীয় ব্রাহ্মণ ফু-নান গিয়ে সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফু-নানের হিন্দু রাজবংশ এই কৌণ্ডিন্য থেকেই উদ্ভূত। কৌণ্ডিন্য পরে ফু-নানের নাগবংশীয় অনার্য্য রাজকন্যা সোমাকে বিয়ে করে ফু-নানের অন্তর্গত কাম্বোডিয়ায় সর্ব্বপ্রথম হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। অপর এক কাহিনীও কতকটা একই ধরণের। নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ কৌণ্ডিন্য একদিন স্বপ্নে দেবতার আদেশ পেলেন—"দেবদত্ত ধনুর্ব্বাণ নিয়ে বণিকদের পোতে বিদেশ গমন করে তথায় রাজ্য স্থাপন কর।" পরদিন প্রত্যূষে দেবমন্দিরে এই দৈবধনু পেয়ে তিনি সেই ধনুসহ বণিকদের পোতে আরোহণ করে ফু-নানে এসে উপস্থিত হলেন। ফু-নানের রাণী সসৈন্যে তাঁকে বাধা দিতে এসে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করলেন। কৌণ্ডিন্য পরে এই রাণীকে বিয়ে করে ফু-নানে হিন্দু রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন এবং দেশবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রচার করলেন।

পূর্ব্বে এ দেশের অনার্য্য অধিবাসীরা নগ্ন থাকত, কৌণ্ডিন্য তাদের বস্ত্র পরতে শিখালেন এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার করলেন। কাম্বোজের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত অপর হিন্দুরাজ্য চম্পায় আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপির বর্ণনাও ঐ একই ধরণের—"কৌণ্ডিন্য নামক ব্রাহ্মণ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার নিকট যে শূল পেয়েছিলেন ফু-নান প্রদেশের কোন স্থানে তা প্রোথিত করেন এবং নাগরাজকন্যা সোমাকে বিয়ে করে এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।" ৬৫৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ এই শিলালিপিও যে প্রচলিত কিংবদন্তীকে ভিত্তি করেই রচিত, একথা বলাই বাহুল্য; সুতরাং এই উৎকীর্ণ লিপিকে কোন ক্রমেই ঐতিহাসিক মর্য্যাদা দেওয়া চলে না। শিলালিপির বর্ণনাকে সত্য বলে ধরে নিলে কাম্বোজের হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাতা কৌণ্ডিন্য যে মহাভারতের সমসাময়িক ব্যক্তি, এ কথাই প্রমাণিত হয়। যাই হোক, এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।

কৌণ্ডিন্যের বংশধরগণ প্রায় এক শত বৎসর ফু-নানে রাজত্ব করেন। এর পর ভারত থেকে আর একদল নতুন অভিযাত্রী ফু-নানে আগমন করেন। এই অভিযাত্রিদলের নায়কের নামও কৌণ্ডিন্য। অনুমান খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই দ্বিতীয় কৌণ্ডিন্য ফু-নানে আর একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম কৌণ্ডিন্য রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা হলেও ধর্ম্ম, সমাজসংস্কার ও প্রশাসনিক ব্যাপারে এই দ্বিতীয় কৌণ্ডিন্যই ফু-নান তথা কাম্বোজের ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত এই বংশের রাজারা ফু-নানে রাজত্ব করেন। এ যুগে ভারত, চীন ও ফু-নানের মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রদূত বিনিময়।[১] হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এ সময়ে শুধু ফু-নান ও ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জেই সমাবদ্ধ ছিল না, সুদূর চীন পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলন থাকলেও সমগ্র ফু-নানে ব্রাহ্মণ্য, শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবই ছিল সমধিক। ফু-নানের রাজা এ সময়ে নাগসেন নামক জনৈক হিন্দু সন্ন্যাসীকে ধর্ম্মপ্রচারক হিসেবে চীনসম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন। নাগসেন চীনসম্রাটের নিকট দেবাদিদেব মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়।[২] এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, চীনা সাহিত্য বা ইতিহাস থেকে আমরা ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু এবং বৌদ্ধপণ্ডিত অমোঘবজ্র, আদিসেন, কুমারজীব, কাশ্যপমাতঙ্গ, গীতমিত্র গুণভদ্র, গুণবর্ম্মন প্রভৃতির

---

১। ভারত ও ইন্দোচীন—প্রবোধচন্দ্র বাগচী—পৃঃ ৮

২। কাম্বোজ। স্বামী সদানন্দ—পৃঃ ৪

চীনদেশে গমন, অবস্থিতি এবং কীর্ত্তিকলাপের যতটা পরিচয় পাই, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচারকারী হিন্দু সন্ন্যাসী ও জ্ঞানী, গুণীদের কথা সে তুলনায় জানতে পারি খুব সামান্যই। যদিও বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধভিক্ষুদের সঙ্গে পাশাপাশি এমন কি তারও বহু পূর্ব্ব থেকে তাঁরাও চীন দেশে গমনাগমন এবং তথায় বসবাস করতেন এমন প্রমাণের অভাব নেই। এর মুখ্য কারণ এই যে, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চীনারা হিন্দুধর্ম্মকে ততটা প্রীতির চক্ষে দেখতেন না। পরিব্রাজক হুয়েনসাং-এর ভারত বিবরণীতেই এই মনোভাব সুপরিস্ফুট। তাই বলিয়া প্রাচীন যুগে চীনারা শুধু বৌদ্ধ ভারতের সঙ্গেই যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন, বৌদ্ধসংস্কৃতি ছাড়া হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের কোন পরিচয় ছিল না, এমন অনুমান করা সম্পূর্ণ ভ্রম।

চীনা ভাষায় এখনো বৈশেষিক ও সাংখ্যদর্শনের অনুবাদ পাওয়া যায়, এ ছাড়া আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবও চীনাদের মধ্যে যে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল তেমন ঐতিহাসিক প্রমাণেরও অভাব নেই। প্রাচীন যুগে চীনে আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষশাস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর ছিল। এজন্য মাঝে মাঝে ভারত থেকে হিন্দু চিকিৎসক ও ব্রাহ্মণ জ্যোতিষিগণ চীন-রাজ-দরবারে আমন্ত্রিত হতেন এবং সেখানে বিশেষ সমাদর লাভ করতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে নারায়ণ স্বামী নামক একজন হিন্দু চিকিৎসক চীনসম্রাটকে রোগমুক্ত ও দীর্ঘায়ু লাভের জন্য চিকিৎসা করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ শতকেই 'গৌতম' 'কাশ্যপ' ও 'কুমার' নামক তিনটি হিন্দু জ্যোতিষী চীনদেশের রাজধানীতে রাজকীয় জ্যোতিষ গণনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। ৭১৮ খৃষ্টাব্দে গৌতম সম্প্রদায়ের সিদ্ধ নামক জনৈক জ্যোতিষী 'নবগ্রহসিদ্ধান্ত' নামে যে তিথিপত্রী রচনা করেন চীনা ভাষায় লিখিত এ পুঁথির অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান। এ ছাড়া খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে পাঁচখানা হিন্দু জ্যোতিষ ও গণিতের বই চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। চীনারা হিন্দু মাত্রকেই ব্রাহ্মণ বলে মনে করত বলে এসব গ্রন্থের নামের পূর্ব্বে 'ব্রাহ্মণশাস্ত্র' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন 'ব্রাহ্মণ-গ্রহশাস্ত্র' 'ব্রাহ্মণ-জ্যোতিষশাস্ত্র' 'ব্রাহ্মণ-গণিতশাস্ত্র' ইত্যাদি। ৫১৬ খৃষ্টাব্দে গৌতম প্রজ্ঞারুচি নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জ্যোতিষী বারাণসী থেকে চীনে গিয়ে বসবাস করেন। তাঁর পুত্র গৌতম ধর্ম্মজ্ঞান চীন-সম্রাটের এত প্রিয় ছিলেন যে, ৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইয়াসেন নামক চীনের একটি জনপদের শাসনকর্ত্তৃত্ব পর্য্যন্ত লাভ করেছিলেন।৩

চীনের জাইতেন নামক বন্দরে এককালে হিন্দু ও বৌদ্ধ বহু ভারতীয় বসবাস করতেন বলে জানা যায়। এখানে একটি মন্দির-স্তম্ভে অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছে। ত্রয়োদশ শতকে মার্কো পোলোও জাইতেনকে 'একটি ভারতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র এবং এখানে পণ্যবাহী বহু ভারতীয় জাহাজ আনাগোনা করে বলে উল্লেখ করেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বেও দক্ষিণ-চীনে আবিষ্কৃত বিবিধ প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে কালিদাসের শ্লোকসমন্বিত একখানি সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধ-পণ্ডিতরা যে হিন্দুকাব্য পাঠ করতেন না, চীন-অধিবাসী হিন্দুরাই যে এ সব সংস্কৃত পুঁথির পাঠক ছিলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়।

৩। ভারত ও চীন। প্রবোধচন্দ্র বাগচী—পৃঃ ৫৬-৬০।

বোর্ণিও, যবদ্বীপ, মালয়, সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে সংস্কৃত পালি প্রভৃতি ভাষায় যে সব তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, ও-সব দেশে বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাজনৈতিক, বিধিবিধান, সামাজিক, রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। পশ্চিম যবদ্বীপের সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল, হিন্দু-আইন কানুন দ্বারাই রাষ্ট্র শাসিত হত। সুমাত্রা দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। পরিব্রাজক ফা-হিয়ান এখানে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ব্যাপক প্রভাবের কথা লিখে গেছেন। তবে পরবর্ত্তী যুগে কাশ্মীর রাজকুমার গুণবর্ম্মণের আগমনের পর ধীরে ধীরে দেশমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করে। অনেক শিক্ষিত লোকের মনে এ ধারণা এখনো বদ্ধমূল যে, ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধভিক্ষুরাই সর্ব্বপ্রথম ভারতের বাইরে গমন করেন। কিন্তু এ ধারণা যে কত ভ্রান্ত, বহির্ভারতীয় উপনিবেশগুলির প্রাচীন ইতিহাস আলোচন করলে তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। উপনিবেশ স্থাপন ও ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের বাইরে অভিযান ব্যাপারে প্রকৃত পক্ষে হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীরাই ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিভূমিরে আশ্রয় করেই পরবর্ত্তী যুগে ভারতের বাইরে হয়েছে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার ও অর্দ্ধপৃথিবীব্যাপী বিস্তার।

## কাম্বোজ নামের উৎপত্তি

সিলভাঁ লেভিপ্রমুখ ফরাসী পণ্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মহর্ষি কম্বু নামক জনৈক ঋষিই কাম্বোজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁদের মতানুসারে মহর্ষি কম্বুর ঔরসে অপ্সরা মীরার গর্ভেই কাম্বোজ রাজবংশের উদ্ভব এবং কম্বুর নাম থেকেই 'কাম্বোজ' নামের উৎপত্তি। প্রথমে ফু-নানের করদ রাজ্য হলেও অনুমান খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাম্বোজ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ফু-নানের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন হয়। আঙ্করথমে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত কাম্বোজের সিংহাসনে আরোহণ করেন ভববংশীয় ছয় জন রাজা। এ বংশে সবচেয়ে পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন ভববর্ম্মণ ও মহেন্দ্রবর্ম্মণ। এর পরে ৮ম শতাব্দী থেকে ১০০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুষ্করবংশীয় প্রায় ১৫ জন রাজা কাম্বোজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ বংশের জয়বর্ম্মণ, ইন্দ্রবর্ম্মণ, যশোবর্ম্মণ, 'পরমরুদ্রলোক' উপাধিধারী ঈশান-বর্ম্মণ এবং 'পরমবীরলোক' আখ্যাত রাজা জয়বর্ম্মণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুষ্করবংশের পর যে রাজবংশ সিংহাসন অধিকার করেন তার নাম সূর্য্যবংশ। এ বংশে সূর্য্যবর্ম্মণ, উদয়াদিত্যবর্ম্মণ এবং হর্ষবর্ম্মণ নামে তিনজন রাজা ১০০২ থেকে ১০১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সূর্য্যবংশের পর ১০১০ থেকে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত জয়বংশের প্রায় ১১ জন রাজা কাম্বোডিয়ায় রাজত্ব করেন। এর মধ্যে 'পরমবিষ্ণুলোক' সূর্য্যবর্ম্মণ, 'মহাপরমসৌগত' জয়বর্ম্মণ এবং 'পরমেশ্বরপদ' ৮ম জয়বর্ম্মণের খ্যাতি ও পরাক্রম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। আঙ্করথম এবং কাম্বোজের বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন থেকে উপরোক্ত রাজন্যবর্গের রাজ্যশাসন কাল এবং বিবিধ কীর্ত্তিকলাপের যতটুকু বিবরণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তারই সাহায্যে ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণ কাম্বোজের লুপ্ত ইতিহাস গড়ে তুলে এক অসাধ্য সাধন করেছেন।

# ব্যাবিলনের রাজকন্যা

( ভলতেয়ার থেকে )

## ( মুখবন্ধ )

'ব্যাবিলনের রাজকন্যা'—ফরাসী মনীষী ভলতেয়ার-এর লেখনী-নিঃসৃত, নামকরা একখানি উপন্যাস। ভারত এবং গঙ্গা-তীরবর্ত্তী দেশ ও ধর্ম্ম সম্পর্কে তিনি যে চিত্র এঁকেছেন তা অস্পষ্ট। যদিও তাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা তাঁ'র হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণ সম্পর্কে পরিপুষ্ট জ্ঞান না থাকারই কারণ।

উপন্যাস হিসেবে 'ব্যাবিলনের রাজকন্যা' আদর্শ প্রেমের অনবদ্য রূপচ্ছবি। রোমান্টিক একনিষ্ঠ প্রেম, প্রেম যা আমৃত্যু সত্যসন্ধ এর আদ্যন্তই মর্ম্মায়িত।

আধুনিক যুগে প্রেমের বড়াই যাঁরা করেন বস্তু-প্রেমের সম্মোহন-স্রোতে সুখের পানসীতে হাওয়া খেয়ে তাদের অশ্রদ্ধা না ক'রেও, সকলেরই মুখরুচিকর এই উপন্যাসখানি। অতীত ভারতের ঐশ্বর্য্য, তা'র ধর্ম্ম ও আদর্শের স্তুতি-প্রকাশক এই গ্রন্থখানি।

'ব্যাবিলনের রাজকন্যা'র কাহিনীটুকু অতি উপাদেয়। সেজন্যই, সংক্ষেপতঃ পাঠক-পাঠিকাদের আনন্দের জন্য পুনরাবৃত্তি করা প্রয়োজন মনে করি। গল্পটুকু এই :—

ব্যাবিলন-সম্রাট প্রাচীন বেলুসের একমাত্র কন্যা ও সন্তান, ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী রূপোত্তমা অসামান্যা ফর্মোজান্তের পাণিপ্রার্থী হ'য়ে এসেছেন মিশর-মহীন্দ্র, ভারতভূপাল ও শকদের মহীপাল।

প্রাচীন বায়াল আদেশ দিয়েছেন : নিমরোদ-এর ধনুর্ভঙ্গকারী, ভয়ঙ্করতম সিংহবিজেতা, প্রতিস্পর্দ্ধীদের পরাভবকারী প্রতিস্পর্দ্ধী-শ্রেষ্ঠের ত্রাণকর্ত্তা, সুরসিকতম, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী, সবচেয়ে ধার্ম্মিক ও গুণবান, এবং পৃথিবীর সবচেয়ে সুবিরলতম বস্তুটির অধিকারী যিনি—তিনিই রাজরাজকন্যার যোগ্যপাত্র।

ব্যর্থ হ'লেন তিন মহীপাল, এমন সময়ে গঙ্গাতীরবর্ত্তী গোপালকদের অধিপতিপুত্র, অমৃতজীবন বায়ালের প্রতিটি সর্ত্তই পালন ক'রলেন।

নিমরোদ-এর ধনুর্ভঙ্গ ক'রলেন সেও রাজকন্যাকে প্রীত ক'রলে কবিতা-মাধুর্য্যে। তাও আবার ধনুকের সাহায্যে, গজদন্তের ফলকে স্বতবিরচিত সংগীত সোনার কলমে উৎকীর্ণ ক'রে, তীর ছুঁড়ে, পাঠালে সে রাজকন্যার কাছে। সিংহটিকে হত্যা করে প্রতিযোগি-শ্রেষ্ঠকে পরিত্রাণ করলে সে। সিংহের মস্তকটি পাঠালে দাঁতগুলো উপড়ে তুলিয়ে, তার পরিবর্ত্তে বড়ো বড়ো চল্লিশটি হীরের টুকরো বসিয়েই, পৃথিবীর সুবিরলতম বস্তু ফিনিক্সকে দূত করে। পিতার অসুখের কথা শুনে, সর্ব্ব লোভ ত্যাগ করে সে চলে গেলো নিরহঙ্কারেই, যেমন নগণ্যবেশেই এসেছিলো, তেমনি নগণ্য মূর্ত্তিতেই, একশৃংগী অশ্বে চড়ে। সংগে মাত্র একটি বিশ্বস্ত অনুচর এবং যে দুতটি সংবাদ নিয়ে এসেছিলো তার পিতার অসুখের সে কেবল।

ফিনিক্স রয়ে গেলো রাজকন্যার কাছে।

রাজকন্যা তিন মহীপালকে উপেক্ষা করেই ফিনিক্সের যত্ন করলেন। সেই তাঁর একমাত্র সংগী নর্ম্মসহচর।

ক্রুদ্ধ মিশর-মহীন্দ্র ফিনিক্সকে মেরে ফেললেন তীর হেনে; মিশর-মহীন্দ্রের দেওয়া উপহারগুলি রাজকন্যা নষ্ট করবার আদেশ দিলেন।

শক-মহীপাল রাজকন্যা সর্ব্বদেবাকে নিয়ে উধাও হলেন রাত্রির সুযোগে। মিশর ও ভারত-মহীপাল লক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে রাজকন্যাকে ধরবার জন্যে একত্রেই সৈন্যচালনা করবার জন্য ব্যাবিলন ত্যাগ করলেন। বিজয়ী হলে শুরতি খেলে রাজকন্যাকে কে পাবেন, স্থির হবে।

শক-ভূপাল এগিয়ে আসছেন ত্রিশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে রাজকন্যা সর্ব্বদেবাকে স্বাধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। যুদ্ধ চললো, পরবর্ত্তী-কালের ট্রয়যুদ্ধ তার কাছে ছেলেখেলা!

বায়াল বললেন, রাজকন্যার পক্ষে বিশ্ব-পর্য্যটন প্রয়োজন। ঐ একটি উপায়ই রয়েছে তাঁর বিয়ের। প্রিয়তম ফিনিক্সের অনুরোধ ছিলো, রাজকন্যার প্রতি: তাঁকে যেন আরবের মরুভূমিতে দারুচিনি ও লবঙ্গের পাহাড় সমাচিত ক'রে তা'র উপরে রাখা হয়। ঐ তা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। সম্রাট বেলুস রাজকন্যাকে পাঠালেন, বায়ালের উপদেশ নিয়ে, বসরার মন্দিরে। সংগে রইলেন রাজকন্যার সখী ঈরলা, ভিষগাচার্য্য, সব চেয়ে প্রবীণ মন্ত্রী আর অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ। বসরার দেবতার সিদ্ধি আছে : অনূঢ়া মাত্রেরই বিয়ে হয় সেই দেবতার মন্দিরে হত্যা দিলে। রাজকন্যা বন্দিনী হ'লো মিশরের মহীপালের হাতে, বসরায় একটি সরাই-এ। মিশর-মহীন্দ্র প্রস্তাব করলেন : অসম্মানের প্রতিশোধ নেবেন। ব'ললেন তিনি, যে অভীষ্টটুকুর জন্য ব্যাবিলনে গেছলুম ছুটে, পেয়ে গেছি তাই। আমার সংগে নৈশভোজনে যোগ দিতে হবে আপনাকে, অংশিনী হতে হবে এক বিছানার। আর আমার অভিরুচি মতই ব্যবহার করবো আপনার সংগে।

রাজকন্যা কৌশল ক'রলেন, মিশর-মহীন্দ্রের সংগে তাঁর প্রধান পুরোহিতকেও আপ্যায়ন করতে।

মিশর-মহীন্দ্রের কাছে তিনি ব'ললেন সেই কটাক্ষই হেনে, যা জ্ঞানীতমদেরও সংসারে বোকা বানিয়েছে এবং শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমানদেরও করেছে অন্ধ।

'আপনিই আমার প্রিয়তম' ব'ললেন তিনি। 'আপনার প্রস্তাব আমার নিকটে খুবই হৃদ্য। তবে আমার একটু প্রার্থনা আছে। আপনার প্রধান পুরোহিতকেও অনুগ্রহ করে সংগে আনবেন। তিনি একজন চমৎকার টেবিলসংগী।'

আর মেয়েদের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে, জানেন তো ? সময়ে না সারালে স্বাস্থ্য, লালিত্য ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। নারীর ঐশ্বর্য্য তা'র স্বাস্থ্য, লালিত্য ও সৌন্দর্য। সভায় সৌন্দর্য্য সুন্দরী নারীর যৌবনোদ্‌ভিন্না উপস্থিতি : একথা কেউই অস্বীকার করেন না।

মিশর-মহীন্দ্র শুধু রাজিই হ'লেন, তাই নয়। সখী ঈরলাকেও সংগে থাকতে দিলেন রাজকন্যার।

রাজকন্যাকে সাজতে গুজতে ও উৎসব-আয়োজনের সুযোগ দিয়ে ফিরলেন মিশর-মহীন্দ্র।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিশর-মহীন্দ্র, তাঁর প্রধান পুরোহিত আর দেহ-রক্ষিগণ যখন এলেন, সকলেই ঔষধ-মিশ্রিত মদ্যপান ক'রে অঘোরে নিদ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়লেন।

রাজকন্যা পুরোহিতের ছদ্মবেশ পরলেন, তার দাড়ি কেটে নিজেই সাজলেন ; সখীকে সাজালেন সহ-পুরোহিতরূপে। তারপর সাফল্যের সংগেই জাগ্রত অন্যান্য প্রহরীদের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন, ঘোড়ায় চড়ে। এবং জাহাজে উঠে পৌছুলেন আরব দেশেই !

ফিনিক্সের উপদেশ রক্ষা করলেন, ফিনিক্স পুনর্জন্ম পেয়ে চিরসংগী হলো রাজকন্যার।

প্রিয়তম অমৃতজীবনের সন্ধানে ব্যোমপথে উড়লেন রাজকন্যা ও তাঁর সখী ঈরলা, ফিনিক্সের ব্যবস্থায়। পৌছুলেন এসে গংগাতীরে।

অমৃতজীবনের প্রাসাদে এসে শুনলেন, অমৃতজীবন নেই। অমৃতজীবনের শ্রদ্ধেয় মা'র সংগে দেখা করলেন। শুনলেন, অমৃতজীবন পাগলের মতো হয়ে কোথায় চলে গেছে।

'কারণ কী ?' জিজ্ঞেস করলেন রাজকন্যা।

চাতকপাখীকে অমৃতজীবন পাঠিয়েছিলো ব্যাবিলনের সংবাদ নিতে। চাতকপাখী ফিরে এসে জানালে : 'ব্যাবিলন-রাজকন্যা মিশর-মহীন্দ্রের প্রেমমুগ্ধা ; তাঁকে চুম্বন করেছেন রাজকন্যা। স্বচক্ষেই সে তা দেখেছে। চুম্বন করেছেন, তা'কেই যিনি হত্যা করেছেন ফিনিক্সকে।'

চাতক সংবাদটুকু পরিবেশন ক'রলে ঠিক সেই সময়েই, যখন অমৃতজীবন তা'র মা'র সংগে শোকপ্রকাশ ক'রছিলো পিতার মৃত্যুতে, ফিনিক্সের অকাল বিয়োগে। এবং যখন সে তা'র মা'র কাছে সবেমাত্র শুনছিলো, 'ব্যাবিলনের রাজকন্যা তোর জ্ঞাতি-বোন। সর্ব্বদেবাও বোন।'

ফর্মোজান্তে শুনলেন : ফর্মোজান্তের পিতৃব্যকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে তাঁ'র পিতামহ সম্রাট হ'ন ব্যাবিলনের। রাজ্যহারা সম্রাটের পুত্র সর্ব্বদেব গঙ্গাতীরবর্ত্তীদের দেশে এসে পৌছুলেন ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে। বিয়ে ক'রলেন, যা'র ফল সর্ব্বদেব অমৃতজীবন, মানুষের মধ্যে রূপোত্তম, সবচেয়ে শক্তিশালী, সাহসীতম, একনিষ্ঠ প্রেমোন্মত্ততম।

অমৃতজীবনের খোঁজে ব্যাবিলন-রাজকন্যা ছুটলেন চীন-মহাদেশে, শকবর্ষে, শীমেরীয়দের সাম্রাজ্যীর দেশে, তারপর যুরূপার উত্তর অঞ্চলে, সেখান থেকে রালবিয়নে ( ইংলণ্ডে ), রোমবসে, গলখণ্ডে আরো কতো বিচিত্র দেশে, বর্ষেখণ্ডে।

রাজকন্যা ছুটলেন অমৃতজীবনের পিছনে পিছনে, শুধু মুহূর্ত্তের ব্যবধানে র'য়ে যায় যোজন যোজন পথের ব্যবধান, অভীষ্ট মিলনে অসংগতি, নিষ্ফলতা।

পীরোনীজ পেরুতেই বীটিকায় রাজকন্যা বন্দি[illegible]লেন ইনকুইজিটরদের হাতে, কিন্তু ফিনিক্স পালালো। অমৃত[illegible] সন্ধান ক'রে সংবাদ দিলে সে।

অমৃতজীবন একশৃংগী অশ্বদের সাহায্যে মুক্ত ক'রলে রাজকন্যাকে ; মুক্ত ক'রলে বীটিকার রাজাকেও দাসত্ব থেকে ইনকুইজিটরদের, যাদের ওপরে আধিপত্য করেন তিনি যিনি বাস করেন রোমে, যিনি রাজাদেরও রাজা, ভৃত্যদের ভৃত্য, জাতিতে যিনি জেলে বা কুলী, মর্য্যাদার প্রতীক যাঁ'র চাবি ও জাল, যিনি তাঁ'র চাবিকাঠি দিয়ে সব রকমের তালাই পারেন খুলতে।

শুধু তাই নয়। ইথিওপিয়ার রাজা মিশর-মহীন্দ্রের শত্রু ; তিনি মিশর-মহীন্দ্রের অনুপস্থিতিতে মিশরভূমিকে ধূলিসাৎ ক'রছিলেন।

বীটিকার রাজার উপরোধে এবং পরিচয়পত্র নিয়ে অমৃতজীবন তার সংগে মিতালী করলে। অবরুদ্ধ ব্যাবিলনকে উদ্ধার করতে সেই মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হলো যার তুলনায় আধুনিক যুদ্ধগুলি [illegible] কর্ত্তকদের যুদ্ধমাত্র।

নৈতিক দুর্ব্বলতার জন্য ইথিওপিয়ার রাজার শিরশ্ছেদ করলে অমৃতজীবন নিজ 'বজ্র' তরোয়ালের সাহায্যে।

অবরুদ্ধ ব্যাবিলন মুক্ত হলো, অমৃতজীবন ফর্মোজান্তেকে বিয়ে করলে, সর্ব্বদেবার সংগে শক-ভূপালের বিয়ে সমর্থিত হলো। পরাজিত মিশর-মহীন্দ্রও ক্ষমা পেয়ে বন্ধুতে হলেন পরিণত।

উৎসব চললো বহুদিন ধরে। যার যা অভীষ্ট সে তাই পেলো। জয়ী হলো আদর্শই।

## এক

বায়াল বা দেবতার ভর।

প্রাচীন বায়াল আদেশ ও নির্দ্দেশ দিয়েছেন : ব্যাবিলনের মহান সম্রাট, প্রাচীন বেলুসের একমাত্র কন্যা ও সন্তান, এবং ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, রূপদক্ষা অসামান্যা ফর্মোজান্তেকে একমাত্র সেই পুরুষই লাভ করতে পাবেন, যিনি বাঁকাতে পারবেন নিমরোদ-এর মহাধনুখানি।

এই নিমরোদ ছিলেন ভগবান যীশুখৃষ্টের পূর্ব্বে একজন মহা-ধনুর্দ্ধর। তিনি রেখে গেছেন মহাধনু একখানি। ধনুকটি সাত ব্যাবিলনীয় ফুট দীর্ঘ। আবলুস কাঠে তৈরী। এবং ককেশাস পর্ব্বতের দারবেন্দ-এর নেহাই-এ যে লৌহ তৈরী হয়, তার চেয়েও বেশী শক্ত ও কঠিন। নিমরোদ-এর পর কোনো মর্ত্ত্যনিবাসীই এই বিচিত্র ধনুকটি বক্র করতে পারেনি।

আরো, এছাড়াও শোনা যায়, ভবিষ্যদ্‌বাণী হয়েছিলো : যে-বাহু ধনুটিতে গুণ পরাতে পারবে তা' ব্যাবিলনের রঙ্গক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া সব চেয়ে ভয়ংকর বিপজ্জনক সিংহটিকেও হত্যা করবে।

শুধু তাই নয়। ধনুবক্রকারী, সিংহবিজয়ী নত করবেন তাঁর সকল প্রতিযোগীকেই। কিন্তু সর্ব্বোপরি, তিনি হবেন খুবই সুরসিক, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী, সব চেয়ে ধার্ম্মিক ও গুণবান, আর অধিকারী হবেন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সুবিরলতম বস্তুটির।

তিন জন পৃথ্বীপালের আবির্ভাব হলো। এঁরা এলেন সম্রাটকুমারী অসামান্যা ফর্মোজান্তের পাণিপ্রার্থী হয়ে প্রতিযোগিরূপে। এঁদের একজন হলেন মিশরের ফ্যারাও, একজন ভারতের শ্রাহ এবং তৃতীয় জন হচ্ছেন শকদের সুমহান প্রধান খাঁ।

সম্রাট বেলুস দিন ধার্য্য করলেন। রাজপার্কের শেষ প্রান্তে রঙ্গক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হ'লো।

প্রকাণ্ড অঙ্গন। অঙ্গনটি ইউফ্রেটাস ও তাইগ্রীস নদ-যুগলের সুসম্মিলিত জলভারে সীমাবদ্ধ ছিলো।

রঙ্গস্থলটির আশে-পাশে তৈরী করা হয়েছিলো স্ফটিক পাথরের একখানি রঙ্গমঞ্চ। পঞ্চাশ লক্ষ দর্শকের বসবার স্থান সংকুলান হবে, এতো প্রশস্ত ছিলো সেই রঙ্গমঞ্চখানি। রঙ্গমঞ্চটির সম্মুখেই প্রতিষ্ঠিত ছিলো সম্রাটের সিংহাসন।

সম্রাট দর্শন দেবেন প্রিয়তম, একমাত্র কন্যা ও সন্তান, রূপদক্ষা অসামান্যা ফর্মোজান্তের সংগে। সমস্ত সভ্য আর পাত্রমিত্র সকলেরই সংগে পরিবৃত হয়ে। মহাভাট, ভাট ও ঐতিহাসিকগণও থাকবেন।

ডানে ও বামে, রাজসিংহাসন ও রঙ্গমঞ্চের মাঝখানে ছিলো স্বর্ণ-অঙ্গ সিংহাসনগুলি আর আসন-সকল তিন মহা মহীপালের জন্য। এবং অন্যান্য সকল ভূপতিদের জন্যও যাঁরা এই জমকালো [illegible]নীয় উৎসব দর্শন করতে আগমনে উৎসুক হ'তে পারেন।

[illegible] মিশর-মহীন্দ্র এলেন সর্ব্বপ্রথমে। বৃষ এপিসের পৃষ্ঠে চড়ে। এতে তাঁর শোভা পাচ্ছে আইসিস-এর সেতার।

পেছনে পেছনে তাঁর অগ্রসর হচ্ছে দু' হাজার পুরোহিত, তুষারের চেয়েও সাদা সূতি পরিচ্ছদে বিভূষিত; দু' হাজার নপুংসক, দু' হাজার ঐন্দ্রজালিক, আর দু' হাজার যোদ্ধা।

ভারত-ভূপতি এলেন শীঘ্রই এর পরে। বারোটি হাতী-টানা রথে চড়ে। মিশরের ফ্যারাও এর চেয়েও তাঁর ছিলো আরো বেশী সংখ্যাহীন ও বেশী দীপ্তিমান পারিষদবর্গ।

সর্ব্বশেষে এসে আবির্ভূত হলেন শক-মহীপাল। তাঁর সংগে রয়েছে বাছাই বাছাই যোদ্ধা, তীর ও ধনুকে সুসজ্জিত।

তুলনা-বিহীন ব্যাঘ্রবাহন তিনি। ব্যাঘ্রটিকে নিজেই পোষ মানিয়েছেন। আর সেটা দাঁড়ালে পারস্যের উৎকৃষ্টতম ঘোটকগুলির মতই মাটী থেকে সমানই উঁচু।

মূর্ত্তি ছিলো এই মহীপালের জমকালো ও রাজশ্রী-মণ্ডিত। প্রতিযোগীদের সকলকেই তিনি রাহুগ্রস্ত করেছিলেন। তাঁর নগ্ন-বাহুদ্বয় ছিলো যেমন পেশীময়, তেমনই সাদা। মনে হচ্ছিলো এর মধ্যেই যেন নিমরোদ-এর ধনুকটি নত্র ক'রে ফেলেছেন তিনি।

তিন মহীপাল প্রথমেই সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানালেন সম্রাট বেলুস ও তাঁর অসামান্যা কন্যা ফর্মোজান্তের সম্মুখে।

## দুই

ভাটেরা ক'রলে প্রশস্তি উচ্চারণ সম্রাট বেলুস ও তাঁর অসামান্যা দুহিতার। ঐতিহাসিকেরা লিপিবদ্ধ ক'রলেন পরবর্ত্তীকালের ঐতিহাসিকদের জন্য।

প্রাচীন বেলুস, ব্যাবিলন-সম্রাট মনে করেন, তিনিই বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁ'র পারিষদবর্গ সকলেই একথা তাঁকে শুনিয়েছেন। তাঁ'র ঐতিহ্য-লেখকেরাও তাঁ'র কাছে প্রমাণ ক'রেছেন এর সত্যতা।

সম্রাটের এই উপহাস্যতা তাঁকে ক্ষমা করা যেতে পারে। তাঁ'র কারণ এই: সম্রাটের পূর্ব্বপুরুষেরা অবশ্যই ব্যাবিলন তৈরী ক'রেছেন সম্রাটের সিংহাসন প্রাপ্তির ত্রিশ হাজার বৎসরেরও আগে। আর সম্রাটের কীর্ত্তি: তিনি ব্যাবিলনের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত ক'রেছেন। সম্রাটের রাজপ্রাসাদ ও রাজোদ্যান, আমরা জানি ব্যাবিলন থেকে কতিপয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ইউফ্রেটীশ ও তাইগ্রীসের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে রাজপ্রাসাদ ও রাজোদ্যানখানি প্রতিষ্ঠিত। নদ দুইটির উভয়তীরই নদের সলিলে বিধৌত হ'য়ে থাকে।

সুপ্রকাণ্ড প্রাসাদ সম্রাটের। প্রাসাদের সম্মুখ-অংশ তিন শত গজ বিস্তৃত। প্রাসাদের বুরুজ উঠেছে আকাশ ভিন্ন ক'রে।

চাতালটি পঞ্চাশ ফিট উঁচু, সাদা মার্ব্বেলের আলিসায় পরিবৃত। এর উপরে প্রতিষ্ঠিত র'য়েছে অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি, সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূপালদের ও মনীষীদের।

সমতল ছাদখানি তৈরী দু'প্রস্থ ইট দিয়ে, ইটের উপরে প্রলেপ দেওয়া সীসকের স্তরে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্তই। সমতল ছাদটিতে মাটি ঢালা হ'য়েছে বারো ফুট উঁচু ক'রে; এই মাটির বুকে জন্মানো হ'য়েছে, অরণ্যের মতো ক'রে জলপাই-এর গাছগুলি, কমলালেবুর গাছগুলি, লেবুগাছগুলি, তালগাছগুলি, লবঙ্গের গাছগুলি, নারিকেল গাছগুলি, দারুচিনি-তরুগুলি। গাছগুলি তৈরী করেছিলো বীথিগুলি যার মধ্যে সূর্য্যালোকসমূহও প্রবেশ করতে পারে না।

ইউফ্রেটীস নদের জল আনা হয়েছে পাম্প ক'রে। পাম্প ক'রে শ'খানেক ফাঁপা স্তম্ভের মধ্য দিয়ে। জল এসে পরিপূর্ণ ক'রেছে উদ্যানগুলির সুপ্রকাণ্ড মার্ব্বেল জলপাত্রগুলি। তারপর অন্যান্য প্রণালীর মধ্য দিয়ে প'ড়ে, পৌছে গেছে রাজপার্কে, সৃষ্টি করতে ছ'হাজার ফুট উঁচু জলপ্রপাতগুলি। আর লক্ষ সংখ্যক ঝর্ণাগুলি, যাদের উচ্চতা কচিৎ কল্পনা করা চলে; জলরাশি এর পর ফিরে গেছে ইউফ্রেটীস নদে, ফিরে গেছে যেখানকার জল সেখানেই।

সেমিরামিসের উদ্যান-সকল, যা বহু শত যুগ পরে, দিব্যদৃষ্টিতেই দেখতে পাচ্ছি, করবে পৃথ্বীবাসীদের আশ্চর্য্যান্বিত, সেগুলি প্রাচীন আশ্চর্য্যগুলির হতশ্রী অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়। এর কারণ-স্বরূপ বলা চলে, সেমিরামিসের সময় পুরুষদের ও স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে সব কিছুই সুরু করবে উৎসন্ন যেতে।

কিন্তু ব্যাবিলন অপেক্ষাও আরো বেশী প্রশংসনীয় বস্তু আছে, যা অন্যান্য সমস্ত বস্তুকেই নিষ্প্রভ করে তোলে। সে অপূর্ব্ব বস্তু হচ্ছে অসামান্যা ফর্মোজান্তে, ব্যাবিলন-সম্রাট প্রাচীন বেলুসের একমাত্র দুহিতা ও সন্তান, একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

তাঁরই ছবিগুলি ও মূর্ত্তিগুলি নিয়ে, পরবর্ত্তী যুগে প্র্যাক্সিটেলিস কুঁদবেন আফ্রোডাইটের মূর্ত্তি; কুঁদবেন ভেনাসের প্রতিমূর্ত্তি। দিব্যচক্ষেই দেখছি, ভাববাদীদের মতো।

কিন্তু হে মহামঙ্গলময় ভগবান, মূল ও নকলে কী পার্থক্যই না রয়ে গেলো! যেন স্বর্গ ও অমৃতের সংগে মর্ত্ত্য ও সলিল রেষারেষি করতে চাইছে।

সুতরাং সম্রাট বেলুস তাঁর অতুলনীয় সাম্রাজ্য অপেক্ষা অসামান্যা কন্যা সম্পর্কে বেশী অহংকারী, এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। সম্রাট-কুমারী ফর্মোজান্তে মাত্র অষ্টাদশী, উপযুক্ত স্বামী পেতে হবে তাঁকে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সেই মহাপুরুষেন্দ্রটিকে

## তিন

উৎসবের আনন্দ উপচে উঠছিলো পূর্ণ উজ্জ্বল ছন্দে। আসনের শ্রেণীগুলির মাঝে মাঝে কুড়ি হাজার বালক সেবক ও কুড়ি হাজার তরুণী বালিকা, সুনিপুণভাবে জলযোগ বিতরণ ক'রছিলো দর্শকদের মধ্যে।

সকলেই স্বীকার ক'রলেন: দেবতারা রাজাদের প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন প্রতিদিন উৎসব দেখার জন্যই। অবশ্য যদি উৎসবে বৈচিত্র্য থাকে, তবেই।

সকলেই স্বীকার ক'রলেন: মানব-জীবন অতীব ক্ষুদ্রই; দিনগুলি কেটে যায় দেখতে দেখতে। সুতরাং অন্য আর কোনো উপায়েই জীবন যাপন করা সমীচীন নয়।

সকলেই সমস্বরে ব'লতে লাগলেন: ভূরি ভূরি মামলা-মোকদ্দমা, রাশি রাশি ষড়যন্ত্র, গুচ্ছ গুচ্ছ যুদ্ধ, আর পুরোহিতদের কলহসমূহ যা মানুষের জীবন ফেলে ক্ষ'য়ে, নিশ্চিতই অসম্ভব ও ভয়ংকর বস্তু।

সকলেই সমস্বরে স্বীকার করেন: মানবকে সৃষ্টি ক'রেছেন ভগবান শুধু আনন্দ উপভোগ ক'রতেই। মানুষ নিশ্চিতই আমোদ-প্রমোদকে আসক্তিতে ও অবিরাম ভাবে পছন্দ ক'রতো না, যদি না ভগবান তাঁকে সে জন্যই সৃষ্টি করতেন।

সকলেই স্বীকার করলেন: মানবপ্রকৃতির সার-সত্তা হ'চ্ছে আনন্দ করাই; এছাড়া আর যা কিছু সবই পাগলামি।

এই প্রশংসনীয় নীতিশাস্ত্র কখনও মিথ্যে হয় নি; যদি কখনো বা হ'য়ে থাকে, তবে তা তথ্য-চক্রে বা সত্যের আলোকেই।

ভাটদের কণ্ঠ শোনা গেলো স্বরবিস্তারী যন্ত্রে, তা' সকলের কর্ণেই প্রবেশ ক'রলো:

তিন মহীপাল প্রথমেই সাষ্টাঙ্গ প্রণতি জানালেন সম্রাট বেলুস ও তাঁ'র অসামান্যা কন্যা ফর্মোজান্তেকে।

মিশর-মহীন্দ্র ব্যাবিলন-সম্রাটকন্যাকে উপহার দিয়েছেন নীলনদের দু'টি কুম্ভীর, দু'টি সিন্ধুঘোটক, দু'টি জেব্রা, দু'টি মিশরীয় মূষিক আর দু'টি মমি। আর দিয়েছেন মহাহার্মিসের গ্রন্থাবলী। তিনি মনে করেন, এই বস্তুগুলিই জগতের মধ্যে অতীব বিরল।

ভারত-ভূপাল উপহার দিয়েছেন এক শত হস্তী। প্রত্যেকটির উপরে এক একটি গম্বুজ সোনা-রঙ-করা কাঠ দিয়ে। ব্যাবিলনের সম্রাটদুহিতার পাদপ্রান্তে তিনি রেখেছেন মহাপুণ্য পবিত্র বেদগ্রন্থখানি, যা স্বয়ং যক্ষেরই শ্রীমুখ-নিঃসৃত। শকদের পৃথ্বীপাল যিনি লিখন-পঠনে অনভ্যস্ত, উপহার দিয়েছেন এক শত যুদ্ধ-তুরঙ্গম; কৃষ্ণবর্ণ শৃগালের জীর্ণ বস্ত্রে তা'রা সকলেই আচ্ছাদিত।

ব্যাবিলন-সম্রাট-দুহিতা পাণিপ্রার্থীদের সম্মুখে নত ক'রেছেন চোখ দু'টি। আনতি জানিয়েছেন তিনি কৃপা-লাবণ্যের সংগে। বিস্ময় মহান সে কৃপা লাবণ্য।

সম্রাট বেলুস রাজকর্মচারীদের বললেন, মহীপালদের নিয়ে যেয়ে এঁদের জন্যই সুরক্ষিত আসনগুলিতে বসিয়ে দিন।

তিনটি কন্যা যদি আমার থাকতো, বললেন তিনি মহীপালদের, তা হলে তবে আমি ছ'টি জাতিকেই সুখী করতে পারতুম।

রাজকর্মচারীরা যথারীতি অভিবাদনান্তে চ'লে গেলো কর্তব্য সম্পাদন করতে।

ব্যাবিলন-সম্রাট স্থির করালেন মহীপালদের ভাগ্য। উদ্দেশ, সিদ্ধান্ত করবেন কে প্রথম নিমরোদ-এর মহাধনুটিতে জ্যা আরোপণ করবেন।

সোনার মুকুটে নিক্ষেপ করা হলো তিনজন মহীপালের নাম।

মিশর-মহীপালের কার্ড উঠে এলো প্রথমেই, তারপর এলো ভারত-ভূপতির নাম।

শক-ভূপাল লক্ষ্য করে মহাধনুটির দিকে, আর তাঁর প্রতিযোগীদের পাশে, তৃতীয় হলেন বলে অনুযোগ উপাপন করলেন না কোনো।

## চার

তিন মহীপাল নামতে যাচ্ছেন বায়াল-নির্দিষ্ট ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজকন্যার ভাগ্য-বিধায়ক পরীক্ষাসমূহে। এমন সময়ে ঘের-এর ধারে দর্শন দিলেন একজন কিশোর আগন্তুক, শৃংগী-অশ্বে চ'ড়ে।

সঙ্গে ওঁর একজন অনুচর, ওঁর নিজেরই মতো অনুরূপ আরোহণকারী। আগন্তুক তরুণের কব্জিতে বসে আছে একটি প্রকাণ্ড বিহঙ্গম।

রক্ষিগণ গিয়েছে অবাক হয়ে এই সাধারণ সামরিক-সজ্জায় দেবতার মতো আকৃতিবিশিষ্ট একখানি মুখ দেখে।

সকলেই বলাবলি করছেন: হার্কিউলিসের দেহে এডোনিস-এর মুখখানি শোভা পাচ্ছে; রাজশ্রী-মহিমার সংগে মিলিত হয়েছে সৌন্দর্য-মাধুর্য্য।

আগন্তুকের কৃষ্ণ ভ্রূ-যুগল আর ওঁর দীর্ঘ সুরুচির কেশগুচ্ছ—এ সৌন্দর্য্যসমূহের সংমিশ্রণ ব্যাবিলনে সম্পূর্ণই অজ্ঞাত—সংমুগ্ধ করলো নিমন্ত্রিত মহোদয়দের সম্মিলনটিকে। সকলেই রঙ্গমঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালেন আগন্তুক তরুণ কিশোরকে ভালো ক'রে দেখবার জন্য।

রাজসভার সকল মহিলাই নিবদ্ধ করেছেন বিস্ময়কলিত দৃষ্টিগুলি ওঁর ওপরেই।

ব্যাবিলন-রাজরাজেশ্বরকন্যা, ব্যাবিলন-সম্রাট প্রাচীন বেলুসের একমাত্র কন্যা ও সন্তান এবং ব্যাবিলনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, যিনি এর আগে চোখগুলি নাবিয়ে দিলেন, ঐ দেখুন, তাদের ঊর্দ্ধেই তুলছেন। ঐ দেখুন, তার মুখখানি লজ্জারুণ হয়ে গেছে। ঐ দেখুন, তিন মহীপাল বিবর্ণ হয়ে পড়েছেন।

ঐ শুনুন, দর্শকেরা সকলেই রাজ-রাজেশ্বরকন্যা অসামান্যা ফর্মোজান্তেকে আগন্তুক তরুণ কিশোরের সংগে তুলনা করে চীৎকার করে বলছেন: সারা বিশ্বে আছেন ঐ একজনই তরুণ, যিনি রাজরাজেশ্বর-কন্যার মতই সৌন্দর্য্য-ললিত।

দ্বারপালেরা জিজ্ঞেস ক'রলে, বিস্ময়ে কণ্টকিত হ'য়ে, আপনি কোন দেশের নৃপতি?

আগন্তুক উত্তর ক'রলেন, ও সম্মান আমার নেই। তবে আমি বহু দূর থেকেই আসছি। কৌতূহলোৎসুক হ'য়েই আসছি একটু দেখতে, একটু পরীক্ষা ক'রতে।

আছেন কী তেমন ভূপাল—যিনি সম্রাটকুমারী অসামান্যা ফর্মোজান্তের উপযুক্ত?

রাজকর্মচারীরা ওঁকে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখ-শ্রেণীতে নিয়ে গেলো। একখানি বসাতে আসনে।

ঐ দেখুন, বসে র'য়েছেন সেই আগন্তুক সুপুরুষ, ঐ ওঁর ভৃত্য, ঐ ওঁদের দু'টি খড়গশৃংগী অশ্ব আর বিহঙ্গমা।

আভূমি আনতি জানাচ্ছেন উনি সম্রাট বেলুস, তাঁর অসামান্যা কন্যা ফর্মোজান্তে তিন জন মহীপাল ও সমগ্র সম্মিলিত ভদ্র মহোদয়দের।

ঐ দেখুন, আসনে বসে প'ড়লেন উনি। মুখ ওঁর লজ্জা-আরক্তিম। ঐ ওঁর খড়গশৃঙ্গী অশ্ব দু'টি শুয়ে আছে, ওঁর পদপ্রান্তে, ওর বিহঙ্গটি ওঁর কাঁধে দাঁড়া ক'রে ব'সে আছে। আর ঐ ওঁর অনুচরগণ, সংগে বহন করছে একটি ক্ষুদ্র থলি। ঐ সে আসন গ্রহণ করলে প্রভুর পাশেই।

আগন্তুক প্রতিযোগীদের পরিচয় শেষ হ'লো।

এর পরবর্তী ঘটনা সমূহ আপনাদের সমক্ষেই ঘটছে, নিজেরাই দেখে-শুনে চক্ষু-কর্ণের পরিতৃপ্তি সাধন করুন।

ঘোষণান্তে সম্রাট নিজে আসন গ্রহণ করলে।

## পাঁচ

বাঙ্গালের নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলিই সুরু হ'লো।

নিমরোদ-এর মহাধনু বের ক'রে আনা হ'লো হৈম আবরণ খুলে।

উৎসব-সমূহের মহান আচার্য্য,—সংগে তাঁর পঞ্চাশ জন বালক-সবক আর অগ্রে অগ্রে কুড়ি জন শিংগাবাদক, সেটা এনে দিলে মিশর-মহীন্দ্রের হাতে।

মিশর-মহীন্দ্র তাঁর পুরোহিতকে ব'ললেন, 'আশীর্ব্বাদ করুন।' পুরোহিত ধনুর্দ্ধর ও ধনুটিকে ক'রলে আশীর্ব্বাদ।

এর পর মিশর-মহীন্দ্র বলীবর্দ্দ এপিসের মস্তকে মহাধনুটিকে স্থাপন ক'রলেন। তাঁর সন্দেহই রইলো না, তিনিই এই প্রথম বিজয় লাভ করবেন।

মহাভাট ভাটগণ সুর ক'রে গাইতে লাগলো:

প্রাচীন বায়াল আদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন: ব্যাবিলনের মহান সম্রাট প্রাচীন বেলুসের একমাত্র কন্যা ও সন্তান, এবং ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, রূপদক্ষা, অসামান্যা ফর্মোজান্তেকে একমাত্র সেই পুরুষই লাভ ক'রতে পারেন যিনি পরাতে পারবেন নিমরোদ-এর মহাধনুখানি।

মহাধনুর্দ্ধর নিমরোদ-এর ধনুকটি সাত ব্যাবিলনীয় ফুট দীর্ঘ। বেলুস কাঠে তৈরী। কলেশাস পর্ব্বতের দারবেল-এর নেহাই-এ লৌহ তৈরী হয় তার চেয়েও বেশী শক্ত ও কঠিন। নিমরোদ-এর কোনো মর্ত্যনিবাসীই এই বিচিত্র ধনুটিকে বক্র ক'রতে পারেনি।

আরো, এছাড়াও শোনা যায়, ভবিষ্যৎবাণী হ'য়েছিলো: যে-বাহু নিমরোদ-এর মহাধনুটিতে গুণ পরাতে পারবে, তা ব্যাবিলনের ক্ষেত্রে ছেড়ে দেওয়া সব চেয়ে ভয়ংকর বিপদ ও আতংকজনক সিংহটিকে বধ করবে।

শুধু তাই নয়। মহাধনু-বক্রকারী, সিংহ-বিজয়ী নম্র ক'রবেন তাঁর সকল প্রতিযোগীকেই। কিন্তু সর্ব্বোপরি, তিনি হবেন মানব-রসবেত্তা, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক ও গুণবান। অধিকারী হবেন তিনি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুবিরলতঃ বস্তুটির।"

মিশর-মহীন্দ্র অবতরণ করলেন রঙ্গস্থলের মাঝখানে।

তিনি চেষ্টা করলেন। চেষ্টার অসাধ্য বিশ্বে কিছু নেই জ্ঞানীদের মুখে একথা শোনা যায়। মিশর-মহীন্দ্র চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করলেন বার বার।

শক্তি তার এলো ক্ষীণ হয়ে। সর্ব্ব-অঙ্গে দেখা দিলো আকুঞ্চন। মুখভংগী দেখে তাঁর দর্শকেরা হাস্যরোল তুললে। অসামান্যা ফর্মোজান্তেও সে হাসিতে যোগ না দিয়ে পারলে না।

মিশর-মহীন্দ্রের প্রধান পুরোহিত তাঁর কাছে এগিয়ে এলো। বললেন যে, "হে মহান্ সম্রাটাধিসম্রাট, বিসর্জ্জন দিন এই অসার সম্মান। এ শুধু মাংসপেশীগুলি আর স্নায়ু-সমূহের খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।"

আপনার বিজয় অনিবার্য্য অন্যান্য পরীক্ষায়। আপনি হবেন সিংহ-বিজয়ী। নাই বা হবেন কেন? অসিরিস-এর তরোয়াল শোভা পাচ্ছে আপনার অংগে।

ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজ-রাজকন্যা অংকলক্ষ্মী হবেন সেই মহীপালেরই, যিনি বিশ্বে সবচেয়ে সুরসিকতম। আপনি তো রহস্য-সমূহের সুগভীর তলেই প্রবেশ করেছেন।

ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজ-রাজকন্যা বিবাহ করবেন সবচেয়ে ধার্ম্মিক ও গুণবানকেই। সেই ভাগ্যবান মহীপাল নিশ্চিতই আপনি। নাই বা হবেন কেন? আপনার লালন-পালনের ভার বর্ত্তেছিলো মিশরের পুরোহিতদের উপরেই।

সবচেয়ে যিনি বড়ো দানবীর, তিনিই পাবেন রাজ-রাজকন্যা অসামান্যা ফর্মোজান্তেকে। আপনি ইতিমধ্যে দান করে দিয়েছেন সবচেয়ে সুশ্রীতম দুটি কুম্ভীর, আর আমাদের বদ্বীপের সবচেয়ে মনোরমতম দুটি মূষিক। বৃষরাজ এপিস আপনারই; আর, তা ছাড়া, মহান হার্মিসের বইগুলির মালিক আপনিই। এ সমস্ত হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুবিরলতম বস্তু।

আপনার সংগে অসামান্যা রাজকন্যা ফর্মোজান্তের জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারবেন জানবেন, এমন পুরুষ আর কেউ নেই পৃথিবীতে।

ঠিকই আপনি বলেছেন বললেন। মিশর-মহীন্দ্র। বসে পড়লেন তিনি নিজ সিংহাসনে পুনরায়।

## ছয়

ভারত-ভূপেন্দ্রের হাতে ওরা এনে দিলে নিমরোদ-এর ধনুটিকে। মহাভাট-ভাটেরা পুনরায় গাইতে লাগলো:

প্রাচীন বেলুস, ব্যাবিলনের সম্রাট মনে করেন, তিনি বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর পারিষদবর্গ সকলেই তাঁকে একথা শুনিয়েছেন। তাঁর ইতিবৃত্ত-লেখকেরাও তাঁর কাছে প্রমাণ করেছেন এর সত্যতা।

ব্যাবিলন অপেক্ষাও আরো বেশী প্রশংসনীয় বস্তু আছে, যা অন্যান্য সমস্ত বস্তুকেই পরিম্লান করে তোলে সে। অপূর্ব্ব বস্তু হচ্ছে অসামান্যা ফর্মোজান্তে ব্যাবিলন-সম্রাট প্রাচীন বেলুসের একমাত্র দুহিতা ও সন্তান, একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

ভারত-ভূপেন্দ্র চেষ্টা করলেন। শিবের অসাধ্য বলে একটা কথা আছে। শিবের চেষ্টার মতই চেষ্টা করলেন ভারত-ভূপেন্দ্র, ততোখানি না হলেও যৎসামান্য কম।

ফোস্কা পড়ে গেলো ভারত-ভূপেন্দ্রের হাতে। সে ফোস্কার যন্ত্রণা চোদ্দ দিন ধরে ভোগ করলেন পরে তিনি।

সান্ত্বনা পেলেন তিনি "এই ভেবে যে, শক-মহীপাল তাঁর চেয়ে বেশী ভাগ্যবান হবেন না নিশ্চয়ই।

এবারের পালা শক-ভূপালের, তাঁর আছে কৌশল ও শক্তি, উভয়েরই সংমিশ্রণ। মহাধনুটি মনে হ'লো তাঁর হাতে একটু স্থিতিস্থাপকতা লাভ করলো যেন। মহাধনুখানি একটু বক্র হয়ে পড়লো যেন।

মহাভাট-ভাটদের মুখে পুনরায় ধ্বনিত হলো: ভাববাদী দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছে: ব্যাবিলন-সম্রাট প্রাচীন বেলুসের একমাত্র দুহিতা ও সন্তান, একমাত্র উত্তরাধিকারিণী রূপদক্ষতমা অসামান্যা ফর্মোজাস্তেরই ছবিগুলি ও মূর্ত্তিগুলি থেকে পরবর্ত্তীকালে প্র্যাকসিটেলিন কুঁদবেন অ্যাফ্রোডাইটের মূর্ত্তি; কুঁদবেন ভেনাসের প্রতিমূর্ত্তি।

কিন্তু হায়! মহামঙ্গলময় ভগবান মূল ও নকলে কি পার্থক্যই না রয়ে গেলো! স্বর্গ ও অমৃতের সংগে যেন মর্ত্ত্য ও সলিল রেষারেষি করতে চাইছে।

শক-ভূপাল নিমরোদ-এর মহাধনুখানি আকর্ষণ করে বক্র করতে পারলেন না।

দর্শকেরা ভেবেছিলেন: শক-ভূপালের চেহারাখানা যেমন মনোজ্ঞ, নিশ্চয়ই তিনি অনুকূল অনুভূতির প্রেরণা যোগাতে পারবেন তাদের মনে। কিন্তু তিনি নিষ্ফল হলেন দেখে তারা উঠলো গোঙিয়ে, মর্ম্মরিয়ে।

ব্যাবিলনের রূপদক্ষতমা অসামান্যা রাজ-রাজকন্যার বিয়ে বুঝি আর কখনও হবে না, এই সিদ্ধান্তেই তারা পৌঁছুলেন।

## সাত

আগন্তুক তরুণ কিশোর নেমে এলো এক লম্ফ দিয়ে রঙ্গস্থলে।

শক-ভূপালকে সম্বোধন করে সে বললে, হে সম্রাট! আপনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হননি বলে বিস্মিত হবেন না যেন। আবলুস কাঠের এই ধনুগুলি তৈরী হয় আমারই দেশে। একে এক বিশেষ মোচড় দিতে হয়। আমি একে আকর্ষণ করলে যে গুণ প্রকাশ পাওয়া উচিত, তার চেয়ে আপনি একে বক্র করে বেশী গৌরবই অর্জ্জন করেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক তরুণ পুরুষ একটি তীর নিয়ে শরাসনে সন্ধান করলে, আকর্ষণ করলে নিমরোদ-এর মহাধনুটিকে এবং শর নিক্ষেপ করলে।

শর শাঁ-শাঁ করে বেড়ার বাইরেই গেল উড়ে, বহুদূরে।

দশ লক্ষ হাতে হাততালি পড়লো, প্রশংসা প্রমূর্ত্ত হলো এই অলৌকিক কৃতিত্বে। ব্যাবিলন প্রতিধ্বনিময় হয়ে উঠলো প্রশংসা-নিনাদে।

রমণীরা সবাই বলে উঠলেন, "অদ্ভুত সৌভাগ্যই বৈ কি, পরমসুন্দর ঐ কিশোরটির দেহ অতো শক্তির আধার!"

আগন্তুক তরুণ পুরুষ এর পর পকেট থেকে বের করলে এক খণ্ড গজদন্তের ফলক। সোনার সূচ্যগ্রে সেই ফলকে কি যেন সে লিখলে। মহাধনুটিতে ঐ ফলক আঁটলে এবং সবটুকু উপহার দিলে রূপোত্তমা অসামান্যা ব্যাবিলন-সম্রাট-দুহিতা ফর্মোজাস্তেকেই। সেই উপহারে কি একটা শোভন সৌন্দর্য্যশ্রী মাখা ছিল। উপস্থিত সকলেই হৃষ্ট হয়ে পড়লেন।

এর পর আগন্তুক তরুণ কিশোর নম্রভাবেই ফিরে গিয়ে নিজ আসন গ্রহণ করলে। নিজ বিহঙ্গম ও ভৃত্যের মাঝখানে।

সারা ব্যাবিলন আশ্চর্য্য-কলিত। তিন মহীপাল স্তম্ভিত। অতীব স্তম্ভিত! কিন্তু আগন্তুক তরুণ কিশোরের দৃষ্টিতে তা মোটেই ঠেকলো না।

অসামান্যা ফর্মোজাস্তে আরো বেশী আশ্চর্য্য হয়ে পড়লেন। আশ্চর্য্য হলেন, যে মুহূর্ত্তে তিনি পাঠ করলেন, মহাধনুটিতে নিবদ্ধ গজদন্ত ফলকটিতে এই সামান্য ছন্দোবদ্ধ পংক্তি কয়টি, কবিতাটি ক্যালদীয়া ভাষাতেই ছিলো লেখা:

যুদ্ধের তরে যদি নির্ম্মিত
মহানিমরোদী কার্ম্মুক,
প্রেম-দেবতার ধনুখানি তবে
গড়া সুখে ভরে দিতে বুক
লহ তুমি উহা, উহা তোমারই;
ঊর্দ্ধে মনোজ্ঞ মহাশূর
তোমারে দিয়াই নিম্নে বসুধা
বিজয়ে হয়েছে উৎসুক।
তিন মহীপাল মহাবলবান
সাহসে হয়েছে উন্মুখ,
তোমারি হৃদয়খানি জিনিবারে
প্রতিদ্বন্দ্বী হলো মম;
কিন্তু যাহার তরে তুমি ওগো—
দেখালে আদর অনুপম
ঈর্ষা সহিবে সারা নিখিলের
দেবতার মতো স্মিত মুখ। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক: শ্রীরমেশচন্দ্র দে।

"To be good is noble, but to teach others to be good is nobler—and less trouble."

—*Mark Twain.*

সহস্র সহস্র বৎসর পরে একদা সভ্যতার নবপত্তনের সময় বর্ত্তমান কালের কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির রামায়ণ-মহাভারতাদির ন্যায় বিকৃত ব্যাখ্যা, হিটলারকে সর্ব্বাংশে রাবণের ন্যায় অত্যাচারী রাক্ষসের পর্য্যায়ে বিচার তথা বর্ত্তমানের বিভিন্ন ধরণের ট্যাঙ্ক বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র, আণবিক অস্ত্রাদিকে অতীতের ভূপৃষ্ঠ ও আকাশে সঞ্চরণক্ষম বিভিন্ন প্রকারের রথ এবং বিভিন্ন ধরণের শক্তিসমন্বিত ক্ষেপণাস্ত্র বাণের ন্যায়ই আজগুবী উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে কার্টুন-চিত্রে এমন কি যুদ্ধের অব্যবহিত আগে ও পরে হিটলার মুসোলিনী প্রভৃতির ব্যঙ্গচিত্র ও বিকৃত চরিত্র কি বিকট দর্শন কদাকার দৈত্য-দানব-পিশাচের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় না? অনুমান করা কঠিন নহে যে, এই চিত্র-চরিত্র অবলম্বনে গ্রন্থ রচিত হইলে ইহাদের মানুষ বলিয়া ভবিষ্যতে কেহ ভ্রমেও স্বীকার করিবে না। রামায়ণে রথের যে কার্য্যকারিতার পরিচয় পাই তাহাও শূন্যচারী বিমান ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। মহাভারতে আমরা ঘোটকচালিত রথের উল্লেখ পাই। কিন্তু ঐ সকল রথের কার্য্যকারিতার যে পরিচয় দেওয়া আছে, তাহাতে একাধারে শূন্যচারী বিমান ও ভূপৃষ্ঠে চলমান ট্যাঙ্ক ইত্যাদির কার্য্যকারিতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় না কি? বিশেষ করিয়া চতুরশ্বচালিত—অর্থে চার অশ্বশক্তি অর্থাৎ 4 Horse Power এর অনুরূপ ধরিয়া নেওয়া কি অন্যায়? নল কর্ত্তৃক সমুদ্র বন্ধন কি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক নহে?

আজও কি জড়বিজ্ঞান সমুদ্রের উপরে সেতুনির্ম্মাণে সক্ষম হইয়াছে? সুষেণ মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া মৃতে প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিতেন। ভেষজ ও অস্ত্রোপচার-বিদ্যার চরমোৎকর্ষের দাবীদাররা আজও কি মৃতে প্রাণ সঞ্চারে সক্ষম হইয়াছেন? অথবা তাহা হয় নাই বলিয়াই অবিশ্বাস করিতে হইবে? বিমান ত মাত্র সেদিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আবিষ্কার করিল। তাহার পূর্ব্বেও রথের সাহায্যে শূন্যে বিচরণ ও মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করা ইত্যাদি বাস্তবে সম্ভব বলিয়া কেহ স্বীকার করে নাই? কেহ স্বীকার করে নাই বলিয়াই কি আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হয় নাই? তেমনি আজও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান বাস্তবে পরিণত করিতে পারে নাই, মাত্র এই যুক্তিতেই আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত কোনও বিষয়কে কবিকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পরন্তু ভারতীয় যন্ত্রবিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইলে আধুনিক বিশ্ব বিস্ময়ে অভিভূত হইবে। সেজন্য প্রয়োজন সংস্কৃতের প্রতি শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের অনুরাগ সৃষ্টি। একমাত্র রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা দানই তাহা সম্ভব করিতে পারে। কোটি কোটি লোক যখন সংস্কৃতের অনুশীলন করবে, তখন তাহারই মধ্য হইতে কাহারও কাহারও দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব প্রকটিত হইবে। কেন না; বিজ্ঞানের তথ্যগুলি অতিশয় দৃঢ় ভাবে সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে সন্নিবিষ্ট আছে। সাধারণ লোকের পক্ষে ত নহেই, প্রতিভাবানদের লইয়া কমিশন বসাইয়াও এ ধরণের কাজ সম্পন্ন হইবে না, সম্পূর্ণ স্বাধীন উন্মুক্ত মন লইয়া অনুশীলনে প্রবৃত্ত ব্যক্তিরাও একক প্রচেষ্টায়ই তাহা করিতে সক্ষম হইবেন। কেন না, ভারতীয় সাধন পদ্ধতির ধারা অবলম্বন করিয়াই ঐ-সব গুহ্যতত্ত্বে প্রবেশ করা সম্ভব। শাস্ত্রে আছে—

দুষ্করং যদ্ যদস্ত্যচ্চ তত্তদ যন্ত্রাৎ প্রসিদ্ধ্যতি।
যন্ত্রানাং ঘটনানোক্তা গুপ্ত্যর্থং নাজ্ঞতা বশাৎ॥

সমরাঙ্গন সূত্রধার, ৩১ অঃ।

যত দুষ্করই হউক না কেন, সকল কার্য্যই যন্ত্রদ্বারা সাধন করা যায়। কিন্তু ঋষিগণ গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই যন্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী সরল ভাবে ব্যক্ত করেন নাই, অজ্ঞতা বশতঃ নহে।

তস্মাদ বাক্তিকৃতেষ্বেষু ন স্যাৎ স্বার্থো ন কৌতুকং।
বস্তুতঃ কথিতং সর্ব্বং বীজানামিহ কীর্ত্তনাৎ।
অভ্যূহ্যং স্বধিয়া প্রাজ্ঞৈঃ যন্ত্রানাং কর্ম্ম যদ্ যথা।

সমরাঙ্গন সূত্রধার, ৩১ অঃ।

সেই সকল যন্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী সর্ব্বসাধারণের সুব্যক্ত হইলে কোন লাভ হইবে না বরং ক্ষতিই হইবে। বস্তুত পক্ষে সকল যন্ত্রের নির্ম্মাণ কৌশলই বীজাকারে শাস্ত্রে লিখিত হইল। সুপ্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা হইতেই সেই সকল যন্ত্রের প্রস্তুত প্রণালী তথা প্রয়োগ ক্ষেত্র বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

বৈজ্ঞানিক কৌশলে সুবিজ্ঞ তারকাসুর কর্ত্তৃক সেই সুপ্রাচীন কালে তাঁহার রাজ্যে সূর্য্যের তাপ নিয়ন্ত্রণ ও বৈদ্যুতিক কৃত্রিম চন্দ্রের দ্বারা অমাবস্যার অন্ধকার বিদূরণ ও ঝড়-ঝঞ্ঝা, নিয়ন্ত্রণ, এয়ার কণ্ডিসন ও স্পটনিক সাফল্যের চেয়েও অত্যুন্নত বৈজ্ঞানিক সাফল্যের পরিচায়ক।

সূর্য্যশ্চ তপ্যতে তাবদ্ যাবদ্দুঃখং ন জায়তে
চন্দ্রস্তত্র সদা দৃশ্যো বায়ুঃ সর্ব্বানুকূলবান্॥

জ্ঞানসংহিতা, ১ম অধ্যায়

বিদ্যুন্মালী নামক রাক্ষস তাহার সৌবর্ণ বৈদ্যুতিক বিমান সূর্য্যাস্তের সময় সূর্য্যের গতিপথে পাঠাইয়া পৃথিবীকে সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত রাখিতেন। ফলে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পৃথিবীতে রাত্রি হইতে পারিত না। শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের ৭ম অধ্যায়ের টীকায় লিখিয়াছেন—

'ততোঽর্কস্য পৃষ্ঠতো ভ্রমন্,
বিমানদীপ্ত্যা রাত্রিং বিলোপিতবান্।'

কিন্তু বিশ্বের মঙ্গলের জন্য এই সকল মহা বৈজ্ঞানিকদিগকে নিহত করিয়া গণচিত্তে তাহাদের প্রতি ঘৃণা উদ্রেকের জন্য ইহাদিগকে শয়তানরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে এবং সমস্ত বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল গূঢ় তত্ত্বের সাহায্যে শাস্ত্রে সংগুপ্ত রাখা হইয়াছে।

সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অজ্ঞাত অনেক তথ্য নিহিত আছে, যাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য বিধায় অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিই। বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বপ্রকার সমস্যা সমাধানের উপায় যে সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে আছে, একথা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে ঘোষণা করার সময় আসিয়াছে। বিদেশের বিজ্ঞজনেরাও তাহা স্বীকার করেন। পণ্ডিত ম্যাথিসন্ বলেন—এমন কোন সমস্যা নাই যাহা হিন্দুগণ আমাদের বহু পূর্ব্বেই চিন্তা করেন নাই বা তাহার সমাধান করেন নাই।

প্রবন্ধের অহেতুক কলেবর বৃদ্ধি অবাঞ্ছনীয় বিধায় এ ধরণের উপমার সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে বিরত রহিলাম। আসল কথা হইল একই জিনিষের বিবরণ সকল যুগে একই ভাবে ব্যাখ্যাত না হইতে পারে। তাহা ছাড়া ঐ সকল সুপ্রাচীন গ্রন্থে নানাজনের প্রক্ষি

শ্লোকাদিও বিভ্রান্তি সৃষ্টির কম সহায়ক হয় নাই। পরন্তু সুসমৃদ্ধ একটি ভাষায় স্বভাবতঃই রূপক বা অলঙ্কার প্রয়োগ বাহুল্য ঘটিয়া থাকে। ক্রমোন্নতির পথে জনসাধারণও ঐ সকল অলঙ্কার সমৃদ্ধ ভাব প্রকাশের সঙ্গে পরিচিত থাকে। তৎকালে ইহার কদর্থ হইবার কোন ভয় থাকে না। কিন্তু মধ্যযুগে এক অচিন্ত্যনীয় ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়া ভারত তাহার অতীতের যোগসূত্রটিকে নিঃশেষে হারাইয়া আজ নূতন ভাবে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাই কিছুতেই অতীতের অকল্পনীয় সমুন্নত ভাবধারার মর্ম্মদেশে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। ঈশ্বরানুগ্রহে যে দুই-একজন মনস্বী সামঞ্জস্যের যোগসূত্রটিকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, প্রতিকূল পরিবেশের চাপে পড়িয়া তাহারও যথাযথ প্রকাশ সম্ভব হইতেছে না। তাই আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন সেই পরিবেশের প্রতিকূলতাকে নির্ম্মমভাবে বিদূরিত করিয়া সশ্রদ্ধ চিত্তে বিশ্বাসপরায়ণ মন লইয়া অতীতের বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।' আজ প্রয়োজন সংযমী শ্রদ্ধাবান্ বিদ্যার্থীর, যাঁহারা সর্ব্বসংস্কারমুক্ত মন লইয়া নিরপেক্ষ ভাবে সবদিক বিবেচনা করিতে সক্ষম। তবেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, ঐহিক উন্নতিতে অপারগ হইয়াই নহে, পরন্তু ঐহিক উন্নতির চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াই ভারতের মনীষা ইহার কুফল অনুধাবন করিয়াছিলেন। তাই ভারতের অন্তরাত্মার বাণী,—'যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিং কুর্য্যাম্।'

একটি প্রশ্ন অনেকেই করিয়া থাকেন যে, যদি প্রকৃতই ভারত জড়বিজ্ঞানে এতই উন্নত ছিল, তবে তাহার কোন না কোন প্রমাণ—বিশেষ করিয়া গ্রন্থাদিতে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আংশিক ভাবে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে! এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। একথা সুবিদিত যে, সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থাদি বৈদেশিক অভিযানকারীদের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। তাহা ছাড়া জড়বিজ্ঞানের বলে রাক্ষস জাতি পৃথিবীর বুকে যে অত্যাচার অনাচারের প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা চালাইয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়া মানবসভ্যতাকে যাহাতে চিরতরে অবলুপ্ত করিতে না পারে, সেজন্য হয়ত বা স্বেচ্ছাকৃত ভাবেও কতক গ্রন্থাদি বিনষ্টও করা হইয়াছিল। তদুপরি রূপকের মাধ্যমে বা বীজাকারে সংগ্রথিত ঐ সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাবধারায় অর্থবোধ আমাদের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না বলিয়াই আজ এই অতীত সমুন্নতির কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আমরা দিতে পারি না। মন্ত্রগুপ্তি এবং বীজাকার অর্থাৎ অতি সংক্ষিপ্ত সার মর্ম্ম দ্বারা গুহ্য বিষয় সংরক্ষণের তৎকাল-প্রচলিত রীতি—যাহাতে নিজ গোষ্ঠীর বাহিরের কেহ সেই তত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিতে না পারে।

আজ আমাদিগকে সেই সব অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, বৎসর তিনেক পূর্ব্বে নিজস্ব সংবাদদাতা পরিবেশিত একটি সংবাদ স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য মঠাধীশ কলিকাতার বেহালা অঞ্চলে কোনও শিষ্যের বাড়ীতে অবস্থান কালে উক্ত সংবাদদাতার উপস্থিতিতে অথর্ব্ব বেদের একটি শ্লোকের রূপক ব্যাখ্যার সাহায্যে ট্রিগনম্যাট্রির অতি দুরূহ প্রশ্নও কি ভাবে অল্পবয়স্ক ছাত্রদের পক্ষেও সহজে সমাধান করা সম্ভব, তাহা দেখাইয়াছিলেন। এই ভাবেই আমরা দেখিতে পাইব যে, সংস্কৃতের ব্যাপক অনুশীলনের সুযোগ যদি দেখে আসে তবে ধীরে ধীরে ঐ সকল লুপ্ত গৌরবের পরিচয় আমরা পাইব এবং ইহাও সুনিশ্চিত যে, তখন জড়বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যও আমাদিগকে ভিখারীর ন্যায় পাশ্চাত্যের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। পরন্তু সমগ্র বিশ্বকে দিবার মত সম্পদ আমাদের হাতে আসিবে। প্রয়োজন শুধু ব্যাপক অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টির।

বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুনিয়াতে অপরিহার্য্য নহে, এমন কোন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ সম্ভব নহে। তাই আজ দেশের কল্যাণকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধতর ভারতবর্ষ গঠনে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সংস্কৃতের অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে একমত। জড়বিজ্ঞানের উন্নতিই সেই কাম্য সমৃদ্ধির দ্যোতক নহে। কিন্তু বর্ত্তমানের অপরিহার্য্য জড়-বিজ্ঞানের প্রভাবের মধ্যে বাস করিয়া এই বিষয়টিকে আমার একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। তাই প্রমাণ করিতে হইতেছে যে, সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেও একদিন জড়বিজ্ঞান সাধনার পরাকাষ্ঠা ঘটিয়াছিল। রসায়নশাস্ত্র, বীজগণিত, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান, ভেষজ, অস্ত্রোপচার, ব্যোমযান প্রভৃতি ক্ষেত্রে কণাদ, লীলাবতী, সুশ্রুত, বরাহমিহির, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ভরদ্বাজ আদি মহামনীষীদের অবদানের যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই যে কোন উন্নত দেশের গৌরববৃদ্ধির যোগ্য। সংখ্যার আবিষ্কারও এই ভারতের সংস্কৃত যুগেরই অবদান, যাহার অভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অসম্ভব তথা নিরর্থক বিবেচিত হইত।

আয়ুর্ব্বেদের ভেষজ-বিভাগের বিবরণ যতটা বিস্তারিত পাওয়া যায়, অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে ততটা পাওয়া যায় না। তাহার একমাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, যন্ত্রদানবের পেষণে সভ্যতা অবলুপ্তির আশঙ্কায় জড়বিজ্ঞানের ধ্বংসকারী শক্তি হিসাবে সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ-প্রক্রিয়াও লোপ করা হইয়াছিল। আজকের দিনে কতকটা অনুমান ও কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নাই। কিন্তু অনুমান ও কল্পনার ধারা অনুসরণ করিয়া যদি কোন বাস্তব সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তবেই তাহা স্বীকৃত হয়। বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারের মূলেও এই অনুমান ও কল্পনা অপরিহার্য্য। বাস্তবে রূপ দিতে না পারিলে কল্পনা কল্পনাই থাকে আর অনুমান অনুমানেই পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু কল্পনা ও অনুমানের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে কোন বাস্তব সত্যের যখনই সন্ধান মিলিল, তৎক্ষণাৎ সেই কল্পনা, সেই অনুমানই বাস্তব বলিয়া স্বীকৃত হইল। একটি ক্ষীণ সূত্র, যাহা প্রথম দৃষ্টিতে নিতান্তই উপেক্ষণীয় মনে হয়, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হন বলিয়াই না প্রত্নতাত্ত্বিকরা মহেঞ্জোদারোর ন্যায় কত শত শত পৌরাণিক স্মৃতিকে লোকলোচনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে সক্ষম হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিকরাও ঐ একই উপায়ে বৃহৎ বৃহৎ সাফল্যে উপনীত হইয়াছেন। কাজেই আজ আমরা যাহাকে কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাই তাহা কালই যে বাস্তবের স্বীকৃতি পাইতে পারে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই কোন বিষয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বর্ত্তমান জাগতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেও ইহার যাথার্থ্য আমরা যাচাই করিতে পারি।

মধ্যযুগের অবনতি ও অতীতের সমুন্নতির যোগসূত্র হারাইবার

দুইটি কারণের মধ্যে একটি হইল বিবর্ত্তনবাদ—উত্থান ও পতনের পুনরাবর্ত্তন। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকাইলে দেখা যায় চীন, জাপান, ইটালি, গ্রীস, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি দেশই কোনও না কোনও সময়ে এক অতি উন্নত অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল। সকলের উন্নতি এক পর্য্যায়ের ছিল না বটে কিন্তু প্রত্যেকেই কোনও একটা বিশেষ সময়ে পৃথিবীর অন্য সকল দেশ হইতে নানাদিকে উন্নত ছিল। আবার বিবর্ত্তনের ধারানুসরণ করিয়া অবনতিও ঘটিয়াছে। তাই ভারতের পক্ষেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? দ্বিতীয় কারণ হিসাবে আমি এই কথা উল্লেখ করিয়াছি যে, জড়বিজ্ঞানের উন্নতি যখন মানব সভ্যতা বিলুপ্তির উপক্রম করিল—যাহা আজকের পৃথিবীতে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে—তখন সেই ধ্বংসকারী বিদ্যাকে লুপ্ত অথবা সংগুপ্ত করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান জাগতিক পরিস্থিতির অনিবার্য্য পরিণতির সঙ্গে সঙ্গতি প্রমাণ করিতে পারিলে আমার এই অনুমান অসমর্থনীয় হইবে কেন?

আণবিক বোমা আবিষ্কারের পর হইতে পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মানব সভ্যতার সমূহ ধ্বংসের আশঙ্কায় আতঙ্কিত। তাই কি ভাবে এই সমূলে বিনাশের হাত হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করা যায়, ইহাই একমাত্র চিন্তার কারণ হইয়াছে। এরই পরিণতি হিসাবে আমরা দেখিতে পাই, আণবিক অস্ত্র নির্ম্মাণ ও পরীক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে সকল দেশের মনীষীরা একবাক্যে দাবী জানাইতেছেন. আংশিক সাফল্যও হইয়াছে। রাশিয়া একক ভাবেই নিজের উপর ঝুঁকি লইয়া আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করিয়াছে, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকাও সর্ত্তাধীনে আরও এক বৎসর পরীক্ষা চালাইবার পর বন্ধ করিতে রাজী হইয়াছে। কিন্তু বিপদ ইহাতেই কাটিল না। যদি যুদ্ধ লাগিয়াই যায় অথবা রাশিয়া একক স্বাগত সিদ্ধান্তের পরেও অপর পক্ষ পরীক্ষা চালাইয়া যায় তবে আণবিক অস্ত্রের সামূহিক ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষার আর কোন উপায় থাকিবে না। তাই একথা মনে করা কি সঙ্গত নহে—এ কথাই কি আজ পৃথিবীর মনীষীরা ভাবিতেছেন না যে, আণবিক শক্তি ব্যবহারের জ্ঞান যত দিন মানুষের থাকিবে তত দিন ইহাকে শুধু গঠনমূলক কাজেই সীমাবদ্ধ রাখা কোন আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির পক্ষেই সম্ভব হইবে না।

এরই মধ্যে আণবিক অস্ত্রকে শান্তির রক্ষক হিসাবে এক বিপজ্জনক তত্ত্বের অবতারণা করা হইতেছে। এর তাৎপর্য্য এই করা হয় যে, এই যুদ্ধ এত ভয়াবহ যে, কোন পক্ষই এই বিপর্য্যয় ঘটাইতে সাহস করিবে না অর্থাৎ পারস্পরিক ভয় হইতেই যুদ্ধ বন্ধ থাকিবে। এই তত্ত্বের অবাস্তবতা ইতিহাস একাধিক বার প্রমাণ করিয়াছে, সেক্ষেত্রে সমগ্র ভাবে আণবিক গবেষণার জ্ঞানকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়াই মানব সভ্যতাকে রক্ষার একমাত্র উপায় নহে কি? অন্যথায় আণবিক শক্তি ব্যবহারে সভ্যতা বিলুপ্তির পরিণতি হিসাবে ভবিষ্যতের মানব সমাজ বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানের চিহ্নটুকুও হয়ত খুঁজিয়া পাইবে না। এই সমূহ বিপদ হইতে মানব জাতিকে রক্ষার জন্যই না মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সত্যাগ্রহের পথ প্রদর্শন এবং শ্রীনেহেরুর পঞ্চশীলের প্রবর্ত্তন। যদি মহাত্মা গান্ধীর পথই জগৎ গ্রহণ করে—এক দিকে অহিংসা অপর দিকে সরল জীবন যাপন—তবে কি অপ্রয়োজনের জন্যই জড়বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ বহু তথ্যাদি অকেজো হইয়া পড়িবে না? অনুশীলনের অভাবে সুদূর ভবিষ্যতে যদি ঐগুলিকে আজগুবি কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেয় তবে তাহাও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় খুব অযৌক্তিক হইবে না।

ভারতের অতীত বৈজ্ঞানিক সমুন্নতির পরিচয় অবলুপ্তির এবং যে সামান্য পরিচয় এখনও পাওয়া যায়, তাহার প্রতি অবিশ্বাসও এই সকল কারণ সম্ভূত। কাজেই আজ পর্য্যন্ত অতীত ভারতের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যেটুকু বাস্তব প্রমাণ পাইয়াছি তাহার সূত্র ধরিয়া এবং বর্ত্তমানের বাস্তব ঘটনার অনিবার্য্য পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, সংস্কৃতের মাধ্যমে অতীত ভারতে জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সম্যক পরিচয় যেদিন প্রকাশিত হইবে, সেদিন সমগ্র জগৎ সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে ভারতের নিকট মস্তক অবনত করিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষার মর্য্যাদা না দিলে সংস্কৃত গ্রন্থাদির ব্যাপক অনুশীলনের সম্ভাবনা নাই এবং ব্যাপক অনুশীলন না হইলে ঐ সকল গ্রন্থাদিতে বিধৃত অতুলনীয় সম্পদের সম্যক ব্যবহারের দ্বারা ভারতকে আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার আশা দুরাশা মাত্র। তাই প্রবন্ধের শিরোনামার সহিত অসম্পৃক্ত হইলেও রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সংস্কৃতের দাবীর সমর্থনে সাধারণ ভাবে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করি।

ভাষা হিসাবে সংস্কৃতই যে পৃথিবীর ভাষা সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছে, একথা শ্রেষ্ঠ ভাষাতাত্ত্বিকরা স্বীকার করা সত্ত্বেও আধুনিক জড়বিজ্ঞানের যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দেহ পোষণ করেন—যে কোন সমৃদ্ধ ভাষায়ই যে জ্ঞান বিজ্ঞানের যে কোন ভাবধারা প্রকাশ সম্ভব, বাস্তব দৃষ্টান্তের অভাবে তাহা অনুধাবন করিতে যাঁহারা সক্ষম নন—তাঁহাদের আনুকূল্য লাভের জন্যই অতীত ইতিহাস ঘাঁটিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত দেশের রাজনৈতিক নেতারা পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবমুক্ত হইয়া স্বাধীন মননশীলতার দ্বারা দেশের অতীত ঐতিহ্যকে বিচার না করেন, সে পর্য্যন্ত শত যুক্তি, সহস্র দৃষ্টান্তও দেশকে এই আত্মঘাতী নির্ব্বিচার পরানুকরণ বৃত্তি হইতে মুক্ত করিতে পারিবে না। অথচ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে বর্জ্জন করিয়া কোন জাতিই প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নত হইতে পারে না।

বৈদেশিক ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীনেহেরুও বলিয়াছেন—প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে, আছে বিশিষ্ট এক সত্তা, ইহা গড়িয়া উঠে সেই দেশেরই বিশেষ পরিবেশে। গড়িয়া উঠে ধীরে ধীরে কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া। আবহমান অতীত হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা সব দেশের পক্ষেই শক্ত। খাদ্যের প্রতিক্রিয়া যেমন শরীরে দেখা দেয়, জাতির চিন্তাধারাও তেমন জাতিকে প্রভাবিত করে। বাহিরের ও ভিতরের কতকগুলি ব্যাপারই সমস্ত প্রকার চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। কথাগুলি খুব মূল্যবান—কিন্তু ভারতের জাতিগত বৈশিষ্ট্য কি, তাহা কি ভারতরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিয়া কি তাঁহারা নব ভারত গঠনে আত্মনিয়োগ

করিয়াছেন ? নির্লোভতাই ঋষিত্ব—ইহাই ভারতের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ; ভোগ-বিলাস বর্জ্জন ও ইন্দ্রিয়-সংযমই ভারতের জাতিগত বৈশিষ্ট্য। সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তা পরিবেশনই ভারতের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, একদল স্বার্থপর পরস্বাপহারী মুষ্টিমেয় লোককে দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া কোটি কোটি লোককে নিঃস্ব ভিখারীতে পরিণত করা ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নহে, জীবিকার্জ্জনের মানোন্নতির নামে ধনি-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বশ্রেণীর মানুষকে অপব্যয়ের হট্টগোলে এবং অধিক উপার্জ্জনের মরীচিকায় নিক্ষেপ করা ভারতের জাতীয় বৈশিষ্ট্য নহে। কবে ভারতবাসী পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিবে ? কবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃত ভারতবাসী হইতে চেষ্টা করিবে ? কে ভারতের জনগণকে পথ প্রদর্শন করাইবে ?

ভারতের বর্ত্তমান কর্ণধারদের জীবন এদিকে আদর্শস্থানীয় নহে। যাঁহাদের জীবন অনুসরণযোগ্য, বর্ত্তমানের হট্টগোলের বাজারে তাহারা লোকলোচনের অন্তরালেই থাকিয়া যান। এর পরে বাকী থাকে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহকস্বরূপ গ্রন্থাদি। সেই গ্রন্থাদির মাধ্যমে বিধৃত জাতীয় ভাবধারাকে সম্যক অনুসরণ করিতে হইলে প্রয়োজন বহু সংখ্যক ধীমান উচ্চাভিলাষী শিক্ষাব্রতীর। কেন না, জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও অনুশীলনের অভাবে আজ সে সকল গ্রন্থাদি ক্রমশঃই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে। বৈদেশিক আধিপত্যের অনিবার্য্য পরিণতিতেই দীর্ঘ দিনের অপরিচিতি আমাদিগকে এই অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। তাই আজ এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন যাহাতে অতীত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক সংস্কৃতের সঙ্গে ছিন্ন যোগসূত্রটি আবার স্থাপিত হয়।

"সংস্কৃতশিক্ষার ভবিষ্যং" শীর্ষক প্রবন্ধে আচার্য্য যদুনাথ সরকারও লিখিয়াছেন,—"সংস্কৃত ভাষা এবং সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যদিও আমাদের অধিকাংশেরই আজ উদাসীনতার অন্ত নাই, তবু সংস্কৃত উঠিয়া যাইলে ভারতের আত্মা যে আর সজীব থাকিবে না সে সম্বন্ধে আশা করি, সবাই আমার সঙ্গে একমত হইবেন। অতএব আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষার স্থানটা কি, সুস্থির চিত্তে একবার ভালো করিয়া তা বিচার করা প্রয়োজন।···নতুন ধরণের ইংরাজী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে উচ্চতর শিক্ষা একমাত্র সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই দেওয়া হইত।···সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগ্রণ যাহাতে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া, মাথা উঁচু করিয়া হাঁটিতে পারে, সেইজন্য সংস্কৃত ভাষার প্রতি সর্ব্বদাই কিছু সংখ্যক ধীমান উচ্চাভিলাষী যুবক ছাত্রকে আকর্ষণ করিতে হইবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইহার উল্টাটাই ঘটিতেছে।···শুধু মাত্র সাধারণ কয়েকজন ছাত্রের পক্ষে সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা সম্ভব নয়।

"আমার ধারণা, উপযুক্ত প্রতিনিধি পাইলে বিশ্বের শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃত তার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবে। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, প্রায় সমস্ত বিষয়েই।···আজকালকার যে কোন ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় সুস্থ সুন্দর কিছু লিখিতে হইলে সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠতম লেখকদের সবাই—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার যষ্টি ব্যতিরেকে কোন কালে ইহাদের কেহই কীর্ত্তির উচ্চ শিখরে উঠিতে সক্ষম হইতেন না।···ব্যাকরণের খুঁটিনাটি এবং অলঙ্কারাদি বাদ দিয়াও সংস্কৃত ভাষার একটু কার্য্যকরী জ্ঞান, যাহাতে অন্তত শুদ্ধ এবং সহজ বাক্য গঠন করা যায়—আমাদের দেশে আজ তা অবশ্য প্রয়োজন। ইহাতে আমাদের মনের কার্য্য-ক্ষমতা বাড়িবে। আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সুদীর্ঘ কালের ব্যবহারে এবং পরিবর্ত্তিত সমাজ ব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষায় ঐশ্বর্য্য একটু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। আমার ধারণা, বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।··· শিক্ষিত ব্যক্তিরা আপন আপন সংস্কৃতির জন্যে সংস্কৃত শিক্ষা করুক ; সংস্কৃত চিন্তাধারার সঙ্গে নিজের চিন্তাধারা মিলাইয়া দিক, হৃদয় দিয়া অনুভব করুক সংস্কৃত দর্শনের সত্য,—তাহা হইলে তারপর তাঁরা যখন নিজের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন তখন সেই সাহিত্য অধিকতর ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইতে বাধ্য।"

ভারতের সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় দুই জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মতামত উপরে উদ্ধৃত হইল। একজন প্রসঙ্গক্রমে ভারতের জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যজন সংস্কৃত শিক্ষার ভবিষ্যৎ তথা সংস্কৃত বিহীন ভারতমাতার মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া উদ্বেগ বোধ করিয়াছেন। এই উভয় বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন সংস্কৃতের ব্যাপক প্রচার ও অনুশীলন এবং তাহা সম্ভব একমাত্র সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দ্বারা। শুধু হিতোপদেশে বর্ত্তমান বস্তুতান্ত্রিক জগতে পাশ্চাত্য মায়ার অন্ধ-মুগ্ধতা পরিহার করিয়া দেশের শিক্ষিত যুব সমাজ কখনও সংস্কৃতের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইবে না। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বর্ত্তমান রাষ্ট্রকর্ণধারদের উন্নাসিক উপেক্ষাই সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণের প্রধান অন্তরায়। নতুবা হিন্দীর মত একটি অপুষ্ট ভাষাকে লইয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া জাতীয় অর্থের অপব্যয় ও অমূল্য সময়ের অপচয় করিয়া লোকদেখান ভারতীয়ত্বের জয়ঢাক পিটানর প্রয়োজন হইত না। আসলে ইংরাজী শিক্ষিত ঐ সব নেতারা স্ব স্ব জীবৎকালে ইংরাজীর ব্যবহার লোপ করিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্রে নিজেদের অপরিহার্য্যতার দাবী ক্ষুণ্ণ করিতে চাহেন না। তাই এমন একটি ভাষাকেই তাঁহারা বাছিয়া লইয়াছেন সরকারী ভাষা হিসাবে যাহারা ঘরে-বাইরে এতটুকু সমাদর নাই। ভারতে এমন অহিন্দীভাষী কয়জন আছেন, ভাষার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা হিন্দী শিক্ষা করেন ? বহির্ভারতের কথা ত উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। অথচ সংস্কৃতের সমাদর পৃথিবীর সর্ব্বত্র। হিন্দীভাষী অঞ্চলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১১ বৎসর পর এমন কি সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতির ৭ বৎসর পরেও সরকারী ভাষা হিসাবে কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইল না।

এখানেই নেতাদের স্বাদেশিকতার পরিপন্থী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। নতুবা বাংলা ও অন্যান্য যে সকল ভারতীয় ভাষা একটা রাজ্যের রাজকার্য্য পরিচালনের যোগ্যতা সঙ্গতভাবেই দাবী করিতে পারে, সেই সকল রাজ্যেই বা কেন এখনও স্ব স্ব ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে গৃহীত হইতেছে না ? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নাকি আলোচনা প্রসঙ্গে কবি নরেন্দ্র দেবের নিকট বলিয়াছেন—"আপনারা যে বাংলাভাষাকে এখনই সরকারী ভাষা হিসাবে গ্রহণের দাবী করিতেছেন—তবে কি আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে পরিভাষা শিখিয়া সরকারী কাজ চালাইতে হইবে ?" বিচার করিয়া দেখুন, সরকারী কার্য্যে মাতৃভাষাকে গ্রহণের অন্তরায়টা কোথায় ? একজন রাষ্ট্রনেতা অসতর্ক মুহূর্ত্তে অন্তরজ্বা

কাছে যাহা বলিয়াছেন, নীতিনিয়ন্ত্রণকারী প্রতিটি নেতার মনোভাবও তাই। কাজেই যুক্তিতর্কের যতই অবতারণা করা হউক না কেন, কোন সুফলের আশাই ততদিন নাই যতদিন রাষ্ট্রকর্ণধারগণ পাশ্চাত্য-প্রভাবমুক্ত হইতেছেন। কিন্তু আজন্ম-বর্দ্ধিত সংস্কার ত্যাগ ঐ সকল বর্ষীয়ান নেতাদের পক্ষে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তাই আমাদের নূতন নেতৃত্বের অভ্যুদয়ের প্রত্যাশার দিন গুণিতে হইবে—যে নেতৃত্ব সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবধারার মধ্যেই হইবে সৃষ্ট, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত, তবেই বর্ত্তমানের হিংসা, দ্বেষ রেষারেষিপূর্ণ জগতের ত্রাণকর্ত্তারূপে ভারতের পুনরভ্যুদয় সম্ভব। মহামানব শ্রীঅরবিন্দও তাহাই চাহিয়াছিলেন—আমরা পুনরায় বাঁচিয়ে তুলতে চাই অষ্টাদশ শতব্দীর ভারতকে নয়,—যে ভারত তার নৈতিক এবং মানসিক দীনতার জন্য বিদেশীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

আমরা চাই সেই প্রাচীন এবং অধিকতর শক্তিমান ভারতের অন্তঃশক্তি, আদর্শ ও পদ্ধতি সব বাঁচিয়ে তুলতে;—তার আরও কার্য্যকরী আকারের মধ্যে,—আরও আধুনিক যুগোপযোগী দৃঢ় সংহত রূপের মধ্যে,—The Brain of India, শ্রীমার বাণী আরও উৎসাহোদ্দীপক,—"ভারতের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত পরিষ্কার, ভারত বিশ্বের গুরু। বিশ্বের ভবিষ্যৎ কাঠামো ভারতের উপরই নির্ভরশীল। ভারত হল প্রাণবন্ত আত্মা এবং বিশ্বের অধ্যাত্ম জ্ঞানের জীবন্ত বিগ্রহ।" এই বাণীর সার্থক রূপায়ণের জন্য সংস্কৃতের বিশ্বব্যাপক প্রচলন অপরিহার্য্য। তাহা ত্বরান্বিত করিবার জন্যই সংস্কৃতকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিয়া একনিষ্ঠ প্রযত্নে বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা আহরণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে প্রতিটি ভারতবাসীকে। সংস্কৃত শিক্ষাবিহীন মাতৃভাষার জ্ঞান যে ভারতীয় যে কোণ আঞ্চলিক ভাষার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে অক্ষম—সংস্কৃতই যে ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার উৎসস্বরূপ সংস্কৃতের সাধারণ জ্ঞানও যে আমাদের মনের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে—একথা মনীষী যদুনাথ সরকার দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন। অতএব যে ভাষার মাধ্যম ব্যতীত কোন ভারতীয় ভাষাই সমৃদ্ধ হইতে পারে না, যে ভাষার মাধ্যমে ভারতীয়ত্বের প্রকৃত স্বরূপ নিহিত, যে ভাষা জ্ঞান বিজ্ঞানের যে কোন ভাব প্রকাশে সক্ষম, সর্ব্বোপরি যে ভাষা সর্ব্বভারতে সমভাবে আদৃত এবং আঞ্চলিক দোষমুক্ত বিধায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ বিমুক্ত—ভারতের মত বিভিন্ন ভাষাভাষী, রুচি-প্রকৃতিসম্পন্ন থেকে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যবিধৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী সেই সংস্কৃতই সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা হইবার সর্ব্বথা উপযুক্ত একমাত্র ভাষা।

যুক্তি যতই অবিসম্বাদিত হউক, বর্ত্তমান কর্ণধারগণ নানাকারণেই তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। তাই আজ দেশহিতৈষী প্রতিটি ব্যক্তিকে জাগ্রত জনগণের অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে অনুকূল করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। যে কোন কার্য্য-কারণ বশতঃই হউক না কেন, জনসাধারণের আওতার বাহিরে থাকার জন্য আজ সংস্কৃতের প্রতি জনচিত্তে যে অপরিচয়ের ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা দূরীকরণার্থে সর্ব্বপ্রকারে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যভাবে সংস্কৃতকে প্রচার করিতে হইবে। সংস্কৃতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দায়িত্ব এদিকে সুপ্রচুর। সহজ সুললিত শিক্ষামূলক সংস্কৃত শ্লোকের আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদসহ ব্যাপকভাবে প্রচার, আজও সংস্কৃত গ্রন্থাদির মধ্যে বিজ্ঞানানুশীলনের যে সকল প্রমাণ আছে, তাহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ, পাড়ায় পাড়ায় সংস্কৃত ভাষণ, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অল্পশিক্ষিত লোকদেরও সহজে সংস্কৃতে কথোপকথন শিক্ষাদান, সংস্কৃত জানা লোকদের পরস্পরের মধ্যে সংস্কৃতে কথোপকথন ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে সংস্কৃতকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই জাগ্রত জনমত সংস্কৃতকে তাহার যোগ্যস্থানে বসাইয়া ভাষাসমস্যার সুষ্ঠু সমাধান তথা ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ এক সুসমৃদ্ধ মহাভারতের অভ্যুত্থান সম্ভব করিয়া তুলিবে। আসুন আমরা প্রতিজনে গণসংগঠনের কাজে হাত দিয়া সেই শুভ মুহূর্ত্তকে ত্বরান্বিত করি।

বন্দে মাতরম

# নটী

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুঙুরে আহ্বান, আমি তনু-দেহে মায়াবহ্নি জ্বেলে
পতঙ্গের অমোঘ নিয়তি। আমি দু'চোখে আঁধার
বিচিত্র সঙ্কেতে দীপ্ত রেখেছি। ক্ষণিক মুঠা ঠেলে
প্রকৃতির প্রতিরূপ রচেছি মুদ্রায়। আমি তার
অনন্তশরীর ভেবে উৎসর্গিত ধূপের মিনতি
দেখিনি; কৃতার্থ ফুল আরাধ্যার চরণে কখন
ঝরে গেছে। শেষ রাত্রে উৎসবের নির্বাসিত জ্যোতি
সারেঙ্গীর শেষ ক্লান্তি ঠেলে মঞ্চে নিমেষে নির্জন!

মঞ্চ অন্ধকার। ক্লান্তি স্মৃতিজাগানিয়া শয্যা 'পরে,
শবের মিছিল, আমি চিনে নিতে পারিনে কারুকে।
শিথিল অঙ্গের আর্তি ভাষা মাগে কম্পিত অধরে;
ব্যবচ্ছিন্ন ভঙ্গীগুলি যেন প্রতিনায়িকা, কৌতুকে
উচ্চকিত। কী রোমাঞ্চ একদিন অর্চনার ভাষা
ভুলালো! ঘুঙুরে আজ সর্বনাশী আমায় দুরাশা।

# কবি কর্ণপুর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**অনুবাদ—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর**

২৪। পঞ্চম বিভাগটির নাম "বসন্ত-কান্ত"। এই সময়ে—রসাল প্রিয়মিলনের উৎকণ্ঠার মত···'রসালের' শাখায় শাখায় প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে নবীন মঞ্জরী; অনুরক্ত বীতশোক ভগবদ্ভক্তের মত···দিকে দিকে বিকশিত হয়ে ওঠে 'রক্তাশোক'; মুক্তপুরুষদের উচ্ছ্বাসজয়ী ভক্তজনের ভগবৎতত্ত্ব জ্ঞানাভ্যাসের মত···পুষ্পে পুষ্পে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে অতিমুক্ত-লতা; বীথিতে বীথিতে ফুটে ওঠে নবস্তবক "কোবিদার" যেন তারা শাস্ত্রার্থের অভিনব অধ্যায়-রচয়িতা পণ্ডিতের দল।

তখন রঘুনাথের বানরসেনার মত অধীর উল্লাসে ডেকে ওঠে কোকিল; মাতালের মত··· মধুরসের গন্ধ ছড়াতে থাকে মন্দার। "পুন্নাগের" তখন কী অনবদ্য কৌসুম-সমারোহ, যেন মহাসমরের এক সমাবেশ। বকুলের সে কী অপূর্ব সবলতা। যেন মনুজ-বংশাশ্রয়ী সবল এক ইক্ষ্বাকু-বংশ। সংসারে সুখের লেশমাত্র ভোগ করেই যেমন আনন্দিত হয়ে ওঠে জীব, তেমনি অতিসার সুখদায়ক 'লবঙ্গলতাটি'কে পেয়েই সুখী হয়ে ওঠেন "বসন্ত-কান্ত"।

আর কেবল ভ্রম হতে থাকে;—

এ কি ষড়জাদি সপ্তস্বরকে প্রাণবন্ত দেখছি, না সাত-পাপড়ি নবমল্লিকার বাহার দেখছি? মত্তহস্তীর মদধারার প্রবাহ দেখছি, না "করীর" বৃক্ষের ফুলফোটার নবলীলা দেখছি? প্রচণ্ডরাগ প্রেমিকাকে দেখছি, না ফুলের গন্ধে ভরা একটি বাতাসকে দেখছি?

২৫। এবং এই "বসন্ত-কান্ত" ঋতুবিভাগে—মধুর বধূর মত দেখতে হয় মধু-রজনীকে। শীত কেটে যায়। আর তাই যেন বিমল-কান্তি হয়ে, অমৃতহস্তখানিকে মেলে দিয়ে, চন্দ্রদেব আলিঙ্গন করেন তাঁর রজনীদেবীকে, মৃতের মধ্যে রোপণ করে দেন প্রাণ। মধুর হয়ে ওঠে মধু-পূর্ণিমা। কামধুরন্ধরী কে এমন রয়েছেন এই ভুবনে, যিনি এই বসন্তের মরধারামে না হয়ে ওঠেন রমণীয়া?

২৬। ফুলের বনটিকে দুলিয়ে দিয়ে তখন বাতাস বয়, ফুল তুলতে মালঞ্চে আসেন রমণীয়ারা, আনন্দে মাতাল হয়ে ওঠেন তরুণগণ। এঁরা কি বহু তরুণ? না ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বহু হয়েছেন? একটিই তরু যেন অপরিমিত ফুলে ফুলে ফুলময় হয়ে উঠেছে, রাত্রিহীন তার বিহার, খুলে পড়ছে গলার হার, কুসুমঝরার মত। ফুলের রেণুতে রেণুতে তখন সুপূর্ণা হয়ে ওঠেন দিগঙ্গনার দল। পদ্মের সুরভি ভালো, না এঁদের অঙ্গসুরভি ভালো!··· তাবৎ কৌতূহলে কণ্ঠ বাড়িয়ে এঁদের দিকে ধেয়ে আসে মধুকরের সংহতি। তারা এঁদের চিকণ ক'রে তোলে,··মোমের শিল্পের মত।

ফুল-কলিরা তখন মৌ ঝরিয়ে বলে—

রাজন্, গ্রহণ করুন কর। কী অপরাধ আমরা করেছি?

কিন্তু মধুপান করা দূরে থাকুক, ফুলগুলিকেই ব'কে দেন ভৃঙ্গরাজ, বলেন—

তোমরা ভারী দুষ্টু, অতি-মাতাল তোমরা, কামমদে তোমরা অলস মহিলা, মুখভরা তোমাদের গন্ধ।

২৭। এবং এই বিভাগে,—পল্লব-হীন পলাশ-বনের দিকে কটাক্ষ হেনে ভ্রমরেরা তর্ক জুড়ে দেয়—

বনান্তে···এ কী দেখছি যেন আমরা?

শুকপাখীদের রাঙা ঠোঁট না কিংশুকের রক্ত-ঐশ্বর্য?

আর তারপরে যখন ভ্রমররাজ—বন্দী হয়ে বসে থাকেন ফুলের কলির অন্দর-মহলে, তখন হঠাৎ তিনি শুনতে পান··· কোকিলের কুহু। চমকে ওঠেন। হাঁ, এ তো···কোকিলই ডাকছেন; আমের বনের মঞ্জরীর আস্বাদখানি নিশ্চয়ই তিনি নিয়েছেন; তাইতো ঐ ঠোঁট কাঁপিয়ে, গলা কাঁপিয়ে, কণ্ঠমূল থেকে বেরিয়ে আসছে তান। অমনি তিনি ডানা মেলে, উন্মুখী ফুলের কলির মুখখানিকে খোলা পেয়ে বেরিয়ে যান···মূর্তিমান যেন কুহু-নাদ।

আর এই সময়ে—

২৮। কন্দর্পদেব চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ান···মহামত্ত দুর্দান্ত যেন এক গন্ধ-গজ। তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণের পরিচয় জানিয়েই যেন চতুর্দিকে বাজতে থাকে কোকিল-কণ্ঠের মাতাল ঘণ্টি, আর মত্ত সুন্দরীদের হৃদয়-ক্ষেত্রে জাগ্রত হতে থাকে ভালবাসার নবাঙ্কুর।

আহা, পুষ্পের খনি এই বসন্তে,—বিজয় মহিমায় বিরাজ করেন বাসন্তী-শ্রী।

২৯। তাঁর কর্ণে দোলে নাগকেশরের কর্ণপুর, কণ্ঠে দোলে মাধবী-ফুলের মালা, বক্ষে দোলে বকুল-ফুলের তিন-লহর হার, ভালে জ্বলে কিংশুকের সিন্দুর। কর্ণুলিকা চম্পকের, কটিতটে বাহার খোলে··· রাঙা-শাড়ী অশোকের।

কী আনন্দেই না তখন নাচতে থাকে বনের লতা!" তাদের যেন ভাব লাগে।

ফুল ঝরায় তাদের হাসি, অশ্রুর···মধু ঝরায় নয়ন, অঙ্কুরের··· খেলা দেখায় রোমাঞ্চ।

৩০। ষষ্ঠ বিভাগটির নাম "নিদাঘ-সুভগ।"

এই সময়ে—

শিরীষ ফুলের প্রচুর সৌরভ···মনে পড়িয়ে দেয় কাশ্মীরদেশের (সীতল) জাফ্রানের গন্ধ! মল্লিকা-ফুলের ফুটন্ত শোভা দেখে মনে হয়, সরোবরে কোথা থেকে নামল এসে মল্লিকাক্ষ-হংসের দোল।

"পাটল"-ফুলের পর্য্যাপ্তি দেখে মনে হয়, আশ্চর্য, এই বৈশাখে, আশ্বিনের পাটল ধানের সম্পদ নিয়ে শরৎ এলেন কোথা হ'তে ?

আর "কুটজে"র উৎফুল্ল সমারোহ দেখে ভাবতে হয়···এ কি ইন্দ্রলোক ?

এই বিভাগে—নিদাঘের সৌভাগ্যটি যখন নামেন, তখন—"শতপত্রক" (কাঠ-ঠোকরা)—পাখীদের ডানার বাহারটিকে মনে হয়···শতদলপদ্মে-ভরা সায়র। এত উড়তে থাকে ফিঙে, যে মনে হয় পাহাড়ের ভিতর থেকে বুঝি বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। প্রচণ্ড বিরোচন-জ্বালায় এত জ্বলতে থাকেন সূর্য্যদেব, যে স্মরণে উদিত হয় প্রহ্লাদপুত্র "বিরোচনে"র প্রতাপ।

আর রাত্রির তামসিকতায় এত ঝরতে থাকে চন্দ্রদেবের স্পৃহণীয় কিরণ, যে মনে হয়, শ্রীবিষ্ণুর পদ-সেবা ক'রে চলেছেন বৈষ্ণবগণ।

এই সময়ে—অখণ্ড মজ্জন-স্নান বড় আরামের। এত আরামের যে মনে হয়, নিদাঘ-সৌভাগ্যই যেন ঈশ্বরের মতন বিধান করে দিচ্ছেন অনন্তসুখ···পূর্ণ প্রণতদের কল্যাণকল্পে। তখন ক্ষীণ হয়ে আসে রজনীর তামস অবসর, অনুকূল বইতে থাকে জগৎ-প্রাণ সমীরণ; আর মনে হতে থাকে যেন কোনো পুণ্যবান্ বিলাসসুখ উপভোগ করছেন চন্দন-রসের।

৩১। তখন চতুর্দ্দিকে পলায়ন করতে থাকেন···"শৈত্যগুণ"। কিন্তু পালাবেন কোথায় ? তাঁর মর্ম্মব্যথা হয়ে দাঁড়ান ঘন-ঘর্ম্ম। শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে আশ্রয় নিতেই হয়···ব্রজপদ্মিনীদের স্তন-দুর্গে।

তখন—গ্রীষ্ম-প্রতাপে পীড়িত হয়েই যেন, কিশলয়-ব্যজনী দিয়ে, এঁকে অশ্রান্ত বাতাস করতে বাধ্য হন···"তরু-লতিকা"।

এবং তাঁরা—নিজেদের ঘন-পত্রের ছায়া দিয়ে ঢাকা দিয়ে শীতল করে রাখেন মণিময় আলবালের সলিলটিকে। যেন তাঁরা অতিথি-নিপুণ পুণ্যকামীর দল; কৃপা-পরবশ হয়ে খুলে দিয়েছেন পানীয়শালা; তৃষ্ণা নিবারণ করছেন পশুর, পক্ষীর, প্রাণীর, সকলের।

৩২। তখন প্রখর হয়ে ওঠে তপনতাপ। আগুন ছুটতে থাকে সূর্য্যকান্তমণির দেহ থেকে। সে অগ্নির নির্ব্বাণ কামনায় মণিময় বিহারশৈল থেকে বিনির্গত হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে অতি শীতল নির্ঝর-জলধারা। ছায়াচ্ছন্ন বনবীথি দিয়ে তারা বহে যায়। নিদারুণ বৈশাখেও অকস্মাৎ যেন সৃষ্টি হয়ে যায় অকাল-বসন্ত। হাত ধরাধরি ক'রে, বীথিতে বীথিতে তখন কৌতুকরঙ্গে মেতে ওঠেন ব্রজদেবীরা। নূপুর বাজতে থাকে চরণে···ঝনন ঝন ঝনন ঝন্।

৩৩। এবং তখন—রৌদ্রাগ্নি-জটাজটিল "বায়ু"র-দল বিষধর সর্পনিঃশ্বাসের মত ধারণ করেন বিকরাল মূর্ত্তি; নিজেরাই নিজেদের উত্তাপিত করতে থাকেন অনির্ব্বৃতের মত। তারপরে প্রত্যেক জলাশয়ে মজ্জন করেও আত্মনির্ব্বাণ করতে তাঁরা পারেন না—অসমর্থদের মত অবশেষে শীতল হবার উদ্দেশ্যেই মিশে যান ব্রজ-পদ্মিনীদের স্তনের সুরভিতে।

আর—গ্রীষ্ম-ত্রস্ত জনতার ভীতি অপনোদনের জন্যই যেন অনুগ্রহ দেখিয়ে তখন চন্দ্র-রমণীয়া হয়ে ওঠেন "রজনী"; এবং আনন্দে মানুষ বলে ওঠে—"এমন যেখানে রাত, সেখানে তপ্তদিনও ধন্য।"

এবং তখন—নিদাঘের দিবাভাগে জলযন্ত্রভবনে কান্তাটিকে সঙ্গে নিয়ে, আনন্দে শয়ন ক'রে থাকেন "কৃষ্ণ"। আকীর্ণ হয়ে ওঠে ভবনখানি···কর্পূরের সূক্ষ্মরেণু বক্ষু স্যন্দমান জলবিন্দুতে; কাঁপতে থাকে মুক্তাবিতান···চঞ্চল চামরের চারু হিল্লোলে।

৩৪। কৃষ্ণের ভাল-প্রান্তের কুন্তলভারটিকে জড়িয়ে থাকে গজমোতির এক লহর মাল্য; তাঁর পরিধানে থাকে সোনার জলের মত মনোহর, পবন-স্পন্দানুমেয় একখানি বসন; তাঁর শ্রীঅঙ্গটিকে সজ্জিত ক'রে রাখে আর্দ্রচন্দনের পঙ্ক ও দু'-তিনখানি প্রিয় অলঙ্কার; আর মল্লী-কোরকের মাল্য দুলিয়ে খেলতে থাকেন শ্রীহরি।

এবং যখন অবসন্ন হয়ে আসে দিন, তখন শ্রীমতী নিদাঘলক্ষ্মী তাঁর বনসখীদের সঙ্গে নিয়ে সেবা করেন ভগবানের শ্রীচরণ। তাঁরা সকলেই কর্ণে পরেন শিরীষফুলের আভরণ, মাথায় দেন পারুলফুলের মুকুট, গলায় দোলান মল্লিকার মাল্য, আর বাহুতে বাঁধেন গিরিমল্লীর অঙ্গদ।

৩৫। এই ভাবে ছয় ঋতু-দ্বারা বিভেদিত হলেও, বৃন্দাবনে জোড়ে জোড়ে সৃষ্টি হয়ে যায় আরও তিনটি বিভাগ। এই হেতুই বৃন্দাবন নব-কানন। কিন্তু তাঁর মূলীভূত বিভাগটি ছয় ঋতু দ্বারাই উপসেবিত। অতএব অঙ্গাঙ্গিভাবে দশ বিভাগ এখানে বিদ্যমান।

৩৬। এই ষড়্‌ঋতুময় বিভাগে—ব্রজসুন্দরীরা···কি অপূর্ব্ব সুন্দর তাঁদের ভ্রূ··বিরামহীন উপাসনা করেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদিন।

তাঁদের,—সীমন্তে শোভা পায় "বর্ষহর্ষে"র নব-নীপ;
করতলে খেলা করে "শরদামোদে"র লীলারবিন্দ;
ললাটে লগ্ন হয়ে থাকে "হেমন্তসন্তোষে"র নবস্নিগ্ধ লোধ্র-পরাগ;
গলায় দোলে "শিশিরসুখাকরে"র বন্ধুক-মাল্য;
কর্ণটিকে রাঙা ক'রে রাখে "বসন্ত-কান্তে"র অশোক-স্তবক;
আর নীলকুন্তলে চমকাতে থাকে "নিদাঘসুতপে"র মল্লীদাম।

তাঁদের উপস্থিতিতে—মঞ্জুল হয়ে ওঠে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জ-মণ্ডপের সমারোহ মণীন্দ্রালয়গুলিকেও হার মানায় তাঁদের সৌন্দর্য-স্পর্দ্ধা। তখন—স্তবগান করে ওঠে কোকিল;

গুঞ্জনের আনন্দ ঝরায় ভ্রমর;
নিশি-প্রদীপের মত জ্বলতে থাকে ওষধি;
পুচ্ছ-সম্মার্জনী দিয়ে কুঞ্জ-মার্জনা করে দেয় চমরীরা।

এবং পরিবেশটিকে প্রসন্ন করে তোলে—

কস্তুরীহরিণ-বধূর অঙ্গ-সৌরভ।

৩৭। এই হেন বৃন্দাবনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছেন একটি নদী। নদীর নাম "যমুনা"।

ইন্দ্রনীলমণির একহারা লতানো হার,
নীলপদ্মের একছড়া মালা,
কাজলের একরেখা পরিখা,
বৃন্দাবনলক্ষ্মীর কালো-পাড় শাড়ী,—
—তাঁর উপমা।

৩৮। তরঙ্গ ওঠে যমুনায়, আর মনে হয় বিনীত ভক্তদের তিনি সমর্পণ করছেন প্রেমসুখ; কমল ফোটে যমুনায়, আর মনে হয় চিরলক্ষ্মী—সনাথিনী তিনি।

অবিনাশী এঁর সলিল। এঁর জলে নিত্য খেলা করে—বিপুল বলশালী মৎস্য ও সারসের দল। এঁতে অবগাহন যে কেবল সুখদ, তা নয়, এঁকে যাঁরা নমস্কার মাত্র করেন তাঁদেরও ইনি সুখদাত্রী।

আচমকা —নিমাই পোড়েল

মৃৎশিল্প —হরিপদ চক্রবর্তী

কাশ্মীরকন্যা
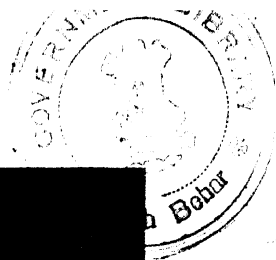
—সুধাবিন্দু বিশ্বাস

বেলুড়-মন্দির ( মহীশূর

—শ্রীমতী বিমলা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়-যাত্রায় ভারত

—অমিয়প্রসাদ চক্রবর্ত্তী

যন্ত্রমন্ত্র ( দিল্লী ) —শচীকুমার মিত্র

মৃত্যুর প্রত্যাশা

—রামকিঙ্কর সিংহ
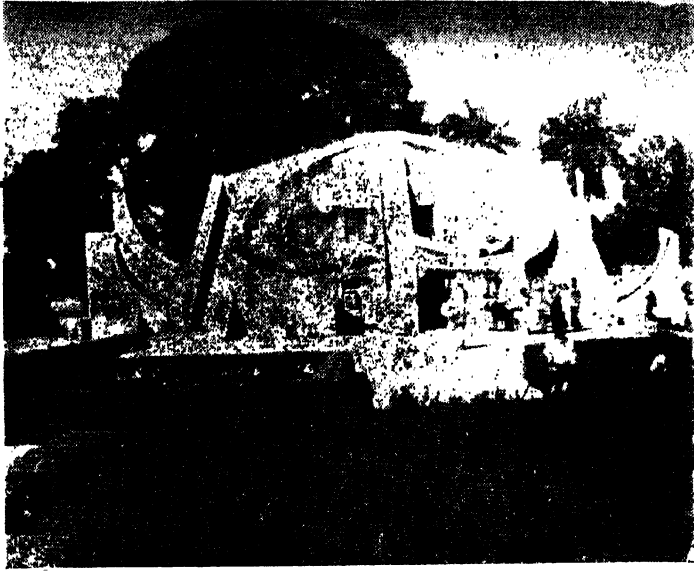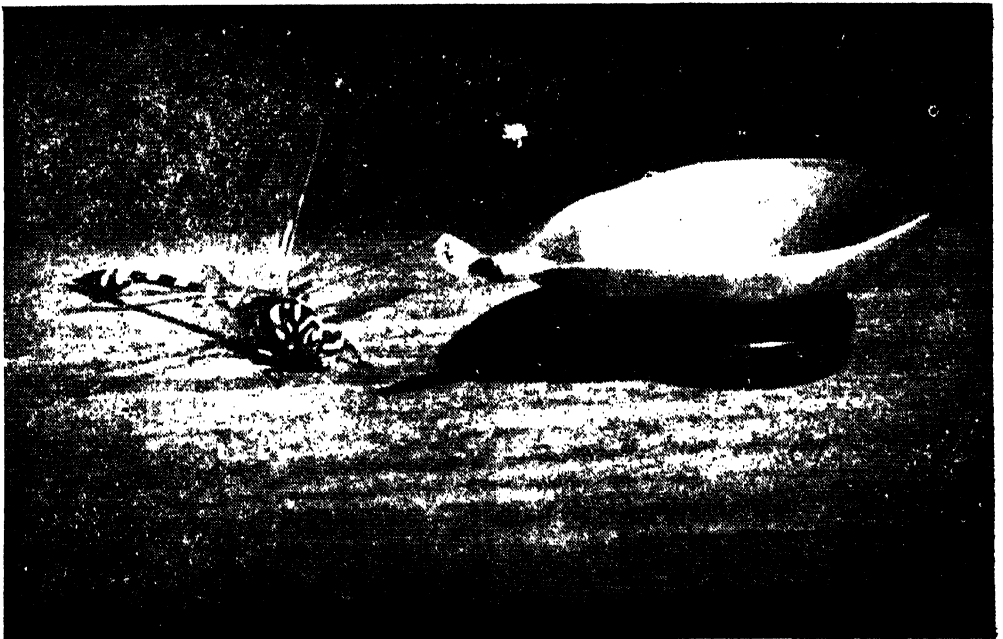
—নির্ম্মল বসু

# শিশু-জগৎ

—অশোকা ঘোষ

—দীপক বসাক

৩৯। একখানি লতাপাতা-আঁকা কঞ্চুলিকার মত, যমুনার বক্ষঃস্থলটিকে আবৃত করে রাখে চিন্মণি-ময়ী শৈবাল-লতিকা ; পয়োধরের ভ্রান্তি জন্মিয়ে সবিলাসে ভেসে বেড়ায় চক্রবাকমিথুন ; আর অত্যাশ্চর্য একখানি ওড়নার মত ভেসে থাকে কুমুদ-কহ্লারের পুষ্পপরাগ*। নীলপদ্মের নয়ন দিয়ে ইনি দেখেন, উড়ন্ত ভ্রমরের দাম দিয়ে বাঁধেন বেণী, মুখখানিতে হাসিয়ে রাখেন শতদল কমল, ঠোঁট দুটিতে নাচিয়ে রাখেন হল্লকের*প্রফুল্লতা। আর চরণের নূপুর হয়ে ধন্য হয়ে যায় কলহংস। এঁর নিতম্বের বেলাভূমে ক্রেঙ্কার করে সারস, মেখলার মত ; রাত্রিদিন অবাধে ইনি আরাধনা করেন শ্রীকৃষ্ণের ; তরঙ্গের বাহু মেলে তাঁর পায়ে ঢেলে দেন জলজ-ফুল। যেন ইনি কোন রমণীয়তার মূর্ত্তিধরা দেবী, অভিপ্রকাশ করে চলেছেন আপনাকে।

৪০। এঁর একূল ওকূল দুকূল ঘিরে কুসুম-বন। ফুলের ভারে ভেঙে পড়ে পাতায়-ছাওয়া শাখা। পুষ্পসাম্রাজ্যের প্রতিবিম্ব কাঁপে নীলিম জলে, আর জলের ভিতর সৃষ্টি হয়ে যায় আর একটি কুসুমবন। আর জলের নীচে ফুলমুকুলের ছায়ার সাথে ছায়া দোলে বনবিহগের। মাছের গোল সেগুলিকে খাদ্য ভেবে ঠোকরাতে আসে, আর দাঁড়িয়ে যায় ক্ষণোল্লাসে। আবার যখন নিশীথ রাতে, জলের তলায় ঝাঁকে ঝাঁকে ছায়া পড়ে গ্রহনক্ষত্রের, তখন শফরীরাও ঠোকরাতে আসে উৎকণ্ঠায়, ভাবে, যমুনায় খৈ ভাসছে অজস্র।

৪১। এই যমুনার মাঝখানে জেগে রয়েছে অনেক বালুচর (পুলিন)। সেগুলি যেন কর্পূরের টুকরো টুক্‌রো প্রবাহ, তিমিরোদগীর্ণ কান্ত কৌমুদীনাথের ভগ্নাংশ, বৃন্দাটবী দেবীর শ্রীখণ্ড-খণ্ডের অঙ্গরাগ, বিস্রস্ত বেণীদণ্ডের মধ্য-উজ্জ্বল মালতী-মাল্যের খণ্ড শোভা।

এই বালুচরগুলির কোথাও বিছিয়ে রয়েছে পান্নার অঙ্কুরের মত নব নব তৃণাঙ্কুর, কোথাও সাজানো রয়েছে ফুলের উপবন, কোথাও মঞ্জুল কুঞ্জ। আর যেখানেই উপবন সেখানেই আলো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক একটি চিন্ময় মণিমুক্তো।

৪২। মণ্ডপগুলির আঙিনায় ঘুরে বেড়ায় সারস, সরারি, কুরর, চক্রবাক, কলহংস প্রভৃতি জলপাখী। ঘুরে-ফিরে তাদের সঙ্গে কথা কয়,—কোকিল, টিয়ে, জীবঞ্জীব, চকোর প্রভৃতি বনপাখী। মনে হয়, কৃষ্ণকথা নিয়ে সভা জমকিয়ে, আলাপ-লীলায় মত্ত হয়ে উঠেছে মধুর একটি গোষ্ঠী।

এই যমুনার উভয় তীর মণি দিয়ে বাঁধানো। ছাড়া ছাড়া ঘাটগুলি সব মণির। কোনটি মরকতের, কোনটি কুরুবিন্দের, কোনটি বৈদূর্য্যের, কোনটি বিদ্রুমের। দু তীরেই ঘাট। ঘাটের সিঁড়িগুলি নেমে এসেছে জলে···পারম্পর্য্যে ; দু' পাটিদাঁতের মত শোভাদেবীর।

৪৩। ঘাটগুলির ডাইনে বাঁয়ে লতা-মন্দির। ঝকঝক করছে তাদের মণিমুক্তো। প্রত্যেক লতামন্দিরের চারটি কোণে প্রোথিত রয়েছে চারটি বৃক্ষ। তুলাকান্তি তারা। প্রত্যেক বৃক্ষের অধোদেশে উভয়পার্শ্বে দুটি দুটি করে লতার বাহার, যেন প্রত্যেকটিরই দুটি দুটি ক'রে প্রিয়া। মণিময় ফলে ফুলে আর পাতায় সমৃদ্ধ হয়ে চারটি গাছের উপর এমন ভাবে উঠে গেছে আটটি লতা, যে তাতেই [illegible]ন বিরচিত হয়ে গেছে সর্বাঙ্গসুন্দর একটি 'মণীন্দ্রমণ্ডপ'।

৪৪। ঐ চারটি গাছ এই মণীন্দ্রমণ্ডপের চতুঃস্তম্ভ। তাদের স্কন্ধ আর শাখা ফুলের ঐশ্বর্য্য নিয়ে বেঁকে উঠে রচনা করে দিয়েছে তার চারটি 'বলভী'।

ঐ বল্লীগুলি পুষ্পিতা হলেও, তাদের পল্লবগুলিই যেন গড়ে তুলেছে ছদ্রি (ছাউনী) ; পত্র-সন্নিবেশের কৌশল ফলিয়ে আবার কয়েকটি বল্লী সুন্দরভাবে নির্ম্মাণ করে ফেলেছে তার দ্বার ও ভিত্তি।

পুষ্পেরা রচনা করেছে মুক্তোর ঝালর-দেওয়া চূড়া-কলস, চামর, ইত্যাদি কত কি।

৪৫। এই শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে রয়েছেন "গোবর্ধন"।* পুরুষাবতারের মত সহস্রশীর্ষ সহস্রপাৎ এক গিরিবর।

তাঁর সানুতে সানুতে মণিমাণিক্যের ও কুঞ্জের এত প্রাচুর্য্য যে তাঁকে ভ্রম হয় মণিময় এক কটক-কুণ্ডলধারী মহা-বিনোদী পুরুষ ব'লে। আবার ধাতব-পদার্থের তিনি খনি-বিশেষ ;···তাই তাঁকে ভ্রম হয় ধাতু-যোনি শব্দ-গ্রাম ব'লে।

এই গিরিবর যে 'পর্ব্বতকুলভূষণ', সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ; যেহেতু যথাক্রমে,—(১) শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই ইনি, ভূভৃৎ-কুলভূষং স্বল্লেকলঙ্ঘী ধ্রুবের মতন, একদা লঙ্ঘনে করেছিলেন বৈকুণ্ঠধাম।

(২) এঁর অঙ্গে রয়েছে তুরযগাছ, গুহার অলঙ্কার ;

(৩) এঁর মুখের সৌম্য ভদ্রশ্রী মনে পড়িয়ে দেয় সচন্দন অথচ ভুজঙ্গহীন এক মলয় পাহাড়ের কথা ;

(৪) ভগবানের মত ইনি বিচিত্র বনমালাধারী ;

(৫) এঁকে বেষ্টন করে থাকে এত উৎস, যে এঁকে দেখায় যেন একখানি মহোৎসব কল্যাণ-আনন্দ ;

(৬) পৃথিবী-মণ্ডলের 'লোকালোক' পর্ব্বতের মতই ইনি বিশ্বনেত্র-রমণীয় ;

(৭) এঁর বটবৃক্ষগুলিতে ঝরি ঝোলে "আনন্দ"-মূলের ; অথচ এখানে রয়েছে বহু কন্দর-বিশিষ্ট একটি আনন্দ-কুঞ্জ।

(৮) এঁর বনভূমিতে খেলে বেড়ায় মৃগাদি জীবজন্তু ; হিংসাঘাত থেকে তিনি তাঁদের রক্ষা করেন।

৪৬। কৈলাস-পাহাড়ের সঙ্গে এঁর উপমা দেওয়া চলে না ; কেন না, ইনি রূপক ও রৌপ্যের বাইরে। মেরু পর্বতের সঙ্গেও এঁর উপমা দেওয়া চলে না ; এঁর অজাত-রূপত্বই তার প্রমাণ ; অধিকন্তু জাতরূপ (স্বর্ণ) এখানে বিরল।

৪৭। স্বর্ণ-বর্ণের মাধুর্য্য ছড়িয়ে অসংখ্য "নট"-গাছ (সোনালু) আলো করে থাকে গিরিশ্রেষ্ঠকে। নাটক-নাটিকার নটেদের মত তারা যেন নেচেই রয়েছে। অথচ আদিরসের বর্ণনায় এই নটেদের মুখে যেন মাধুর্য্যহীন ঐ ট-বর্গের বর্ণমালাটি নেই।

৪৮। আর গিরি গোবর্ধনে 'কালীয়ক'-তরুর মূল ঘেঁষে ছুটে চলে গেছে এক নির্ঝর। উপত্যকায় উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ে তার অপূর্ব গন্ধ। সাধারণ ঘাসগুলোও সেই গন্ধে গন্ধে হয়ে উঠেছে গন্ধ-তৃণ। 'হরিদ্রাব (নাগকেশর) দ্রুমের শিকড় ছুঁয়ে ঝরে পড়ে অনেক ঝর্ণা, ঝর্ণার জলের রঙটি হয়ে যায় শুকপাখীর ডানার রঙের মত ; ঝর্ণায় স্নানে নামে রুরু, চমর, চমরু, গবয়, গন্ধর্ব, সৃমর, রোহিষ, শশ, সম্বর প্রভৃতি হরিণের যূথ, তাদের গায়ের রঙ হয়ে যায় মরকত ; পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারে না তারা।

৪৯। অত্যন্ত বিচিত্র-দর্শন এই গিরি গোবর্ধন। ক্ষণে ক্ষণে,

নির্ণীত হল দিলীপকুমারের। বি, এস, সিতে নিলেন পদার্থ, রসায়ন ও গণিত, ভাল লাগলো না, শিল্পীর রসঘন মন খাপ খাওয়াতে পারে না বিজ্ঞানের নীরস অনুশীলনে, গবেষণাগারের দুর্গন্ধ তিক্ত করে ফেলে দিলীপকুমারের কবি-চিত্ত, সুরের আনন্দলোকে যে স্থাপন করতে চায় বসতি, কেমন করে সে বাসা বাঁধবে হ্যাসিড হাইড্রোজেন হ্যাটমের আঁস্তাকুড়ে? নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে পারলেন না বি, এস, সি পরীক্ষায়, পরের বছর গণিতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স নিয়ে বি, এস, সি পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ (১৯১৮)। তারপর বিলেত যাত্রা। কেম্বি জ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান। সেখানে একত্রে গণিত, আইন ও সঙ্গীতানুশীলন, ভাল লাগল না দিলীপকুমারের, এই ত্রিধারার সঙ্গম কালে প্রথম দুটিকে দিলেন বিসর্জ্জন ও শেষেরটির কোলে পরম নিরুদ্বিগ্নতায় আত্মসমর্পণ। বিলেতে ইওরোপের অন্যান্য দেশে থাকার সময় পৃথিবীর বহু প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী, চিন্তানায়ক ও প্রতিভাধরদের সংস্পর্শে এসেছেন দিলীপকুমার, পান-ভোজনে, নানাবিধ আলাপ-আলোচনায় তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছেন দিন। ১৯২১ সালে রোম্যা রোলঁ্যার সঙ্গে পরিচয়। রোলঁ্যার আগ্রহাতিশয্যে সুইজারল্যাণ্ডের লুগেনে ভারতের মার্গসঙ্গীত বিষয়ে বক্তৃতা দেন ও বুদাপেষ্টে আমন্ত্রিত হন সঙ্গীত বিষয়ক পাঠ দেবার জন্যে। ভারতের সঙ্গীত ও সংস্কৃতি বিষয়ক কয়েকটি বক্তৃতা এই সময় দিলীপকুমার ইওরোপের বিভিন্ন দেশে দেন। ঐ সময়েই তিনি কয়েকটি বিদেশীয় ভাষাও স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন।

১৯২২ সালে দেশে ফিরে আসার পর সঙ্গীতের জন্য পাগল হয়ে উঠল দিলীপকুমারের মন। সঙ্গীত-জগতের তদানীন্তন উজ্জ্বলতম তারকাদের কাছে পাঠ নিলেন ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে, সঙ্গীতকে অবলম্বন করে কয়েকটি গ্রন্থও করলেন রচনা। ক্রমে ক্রমে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও পাওয়া গেল দিলীপকুমারের নাম। ভ্রমণকাহিনী, নাটক, প্রবন্ধ এরাও নতুন রূপ পেল দিলীপকুমারের লেখনীর স্পর্শে। বাঙলার শিক্ষাধিকর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিষয়ক পাঠ্যসূচী প্রস্তুত করার জন্যে সাহায্য চাইলেন দিলীপকুমারের (১৯৩৮), এ উপলক্ষে দিলীপকুমারের রচিত দু'খানা সারগর্ভ পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হয়েছে। ১৯২৫ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের সর্বময় কর্তার আসন গ্রহণ করার জন্য দিলীপকুমারকে অনুরোধ করলেন পরলোকগত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়। আকাশবাণীর সর্বাধ্যক্ষের আসন গ্রহণ করারও অনুরোধ এল, (এ পদে দিলীপকুমারকে বরণ করা হোক, কবিগুরুর এই ছিল আন্তরিক ইচ্ছা) পূর্বোক্ত দুটির একটিও গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি দিলীপকুমারের পক্ষে।

১৯২৪ সাল। শ্রীঅরবিন্দকে প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন দিলীপকুমার। ১৯২৭ সালে আবার পশ্চিমে গেলেন কিন্তু পশ্চিম সে বারে তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারল না—দেশে ফিরে এসে ১৯২৮ সালে শ্রীঅরবিন্দের গ্রহণ করলেন শিষ্যত্ব। ১৯২৮ থেকে শুরু হল দিলীপকুমারের আশ্রম-জীবন। বিগত বছরগুলির জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্তন করলেন, একের জন্যে নয়, ১৯২৮ থেকে যা কিছু স্বপ্ন, ধ্যান, ধারণা সবই গঠিত হল সকলের জন্যে, পরার্থে ঈশ্বরের বেদীতে সেই দিন যেন পুরোপুরি ভাবে নিজেকে করলেন উৎসর্গ। চোখের সামনে হাসতে হাসতে যেন এক নতুন জগত ধরা পড়ল সন্ধানী দিলীপকুমারের কাছে। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার এক সাংস্কৃতিক অভিযানে দিলীপকুমারকে ভারতের বাইরে পাঠালেন। এ ছাড়াও সাধন-শিষ্যা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে সঙ্গে নিয়ে দিলীপকুমার বিশ্বের নানা স্থানে করলেন ভ্রমণ, পরিবেশন করলেন ধর্মসঙ্গীত, ইদানীং কালে একমাত্র ভক্তিমূলক সঙ্গীতই পরিবেশন করেন দিলীপকুমার।

বর্তমানে দিলীপকুমারের বাসস্থান বা কর্মস্থান পুণায়। সেখানে তাঁর হরিকৃষ্ণ-মন্দির বর্তমানে পূর্ণতার পথে। এ কাজে তাঁকে সবচেয়ে সাহায্য করে চলেছেন ইন্দিরা দেবী এবং তাঁর অন্যান্য অগণিত ভক্তমণ্ডলী। অলক্ষ্য থেকে ঝরে পড়ছে জনক-জননীর আর দীক্ষাগুরুর শুভাশীর্বাদ—চলার পথে মানবের যা চিরন্তন শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে বিভিন্ন ভাষায় রচিত দিলীপকুমারের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, গ্রামোফোন রেকর্ডের সংখ্যাও তাঁর প্রচুর। তাঁর নবতম উপন্যাস "ভাবি এক হয় আর" ধারাবাহিক ভাবে বর্তমানে আত্মপ্রকাশ করছে মাসিক বসুমতীর পাতায়।

জ্ঞানসাধক দিলীপকুমারের সীমাহীন পাণ্ডিত্যে শুধু দেশেই নয়, বিদেশেরও বহু চিরনমস্য জ্ঞানতপস্বীর পেয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি। এ দেশের রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, রাধাকৃষ্ণণ, গান্ধী, নেহরু, অন্য দেশের রোলাঁ, রাসেল, হাক্সলি, কাসিনস, ইয়ং হাসব্যাণ্ড, ওল্ড প্রমুখ দিকপাল মনীষীদের আশীর্বাদ-প্রীতি-অভিনন্দন স্বরূপণ ভাবে নিবেদিত হয়েছে দিলীপ-প্রতিভার উদ্দেশে।

বিদেশীয় মনীষীদের মধ্যে রাসেল সবচেয়ে আকৃষ্ট করেন দিলীপকুমারকে। ওঁর মত সৎ ব্যক্তি দিলীপকুমারের মতে অকল্পনীয়। প্রিয় বন্ধু সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে বলেন—দেশপ্রেমের জীবন্ত দীপ্তি ছিল সুভাষ, হৃদয়-সম্পদে তার মত বিত্তবান খুব কম দেখা যায়, দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন তার ছেলেবেলা থেকে ছিল। কৈশোর জীবনে তার প্রতিটি পদক্ষেপণ ছিল যেন ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার প্রাক-প্রস্তুতি।

দিলীপকুমারের অভিমতে জীবনের পূর্ণতা ও সবচেয়ে বড় সত্য ভগবৎ-উপলব্ধি।

এলগিন রোডের বহুখ্যাত "অজানা"র তিনতলার একটি ঘরে সেদিন আলোচনার ফাঁকে সাধক দিলীপকুমারকে মনে পড়ছে। প্রশ্ন করেছিলুম, আপনার মতে ভারতবর্ষের দিব্যভাবের পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছিল কোন মহাপুরুষের মধ্যে দিয়ে? বোধ হয় আমার অনেক প্রশ্নের মধ্যে সেই প্রশ্নটিই স্পর্শ করল দিলীপকুমারের মন, মুখে-চোখে যেন খেলে গেল আলোর তরঙ্গ, আমার প্রশ্নের উত্তরে হরিদ্রাভ বেশধারী সৌম্যমূর্তি তাপসের মধুস্রাবী কণ্ঠ থেকে ভেসে এল একটি মাত্র বাক্য—রামকৃষ্ণ!

## শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

[ লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনবিদ ও সুখ্যাত সাহিত্যিকার ]

স্বদেশের এক বিরাট পটভূমিকার উপর আহূত হয়েছে বিরাট ভোজসভা। নানাদিক থেকে নানাশ্রেণীর অতিথির হয়েছে আগমন। প্রতিটি অতিথিকে আপ্যায়িত করা হচ্ছে মুঠো মুঠো প্রেমে, হৃদয়ভরা অনুভূতিতে, বহুদূরগামী অন্তর্দৃষ্টিতে আর প্রতিটি অতিথির ভালদেশে লেপন করা হচ্ছে এক সংহতির জয়টীকা। সাহিত্য যে মিলনের প্রতীক। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সাহিত্যের আঙিনায় অধিক সংখ্যক অতিথির আগমন ঘটেছে আইনের দরবার থেকে।

সাহিত্যের সঙ্গে আইন যেভাবে মিতালী পাতিয়েছে, তার সঙ্গে তুলনীয় মিত্রতা আর কেউ পাতায়নি সাহিত্যের সঙ্গে। যে স্বনামধন্য আইনরথীর দল গৌরবের সঙ্গে বাসা বেঁধেছেন সাহিত্যের আঙিনায় তাঁদের নামের পূর্ণ তালিকা পেশ করা অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য। এঁদেরই মধ্যে একজন আজ আমাদের আলোচ্য পুরুষ—তাঁর নাম শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত। সুশান্ত-সা'র সার্থক স্রষ্টা নীরদরঞ্জন। আজকের দিনের সমগ্র বাঙলা দেশে ফৌজদারী মামলা পরিচালকদের মধ্যে সর্বজনস্বীকৃত অগ্রগণ্য মিঃ এন, আর, দাশগুপ্ত।

পিতৃদেব পরলোকগত রায়বাহাদুর কুমুদবন্ধু দাশগুপ্ত ছিলেন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তদানীন্তন সমাজে একজন অটল-প্রতিষ্ঠ বিখ্যাত নাগরিক। আদিনিবাস খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে। বরিশালের অন্তর্গত বাসণ্ডার জমিদারবংশ নীরদরঞ্জনের মাতৃকুল। মাতুলালয়ে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অগাষ্ট নীরদরঞ্জনের জন্ম। কুমুদবন্ধুর ছয় ছেলে ও চার মেয়ে। নীরদরঞ্জন সর্বজ্যেষ্ঠ, অন্যান্যদের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বি, সি, এস শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত, মহীশূরে প্রধান বিচারালয়ের বর্তমান প্রধান বিচারপতি শ্রীসুবোধরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং বিলেতের বার্মিংহামের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডক্টর সুধীররঞ্জন দাশগুপ্তের (বার্মিংহামের চিকিৎসককুলে এঁর স্থান বর্তমানে সর্বাগ্রে চিহ্নিত করা হয়েছে) নাম উল্লেখযোগ্য।

ডায়মণ্ডহারবার এইচ, ই, স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করলেন ১৯১১ সালে। কুমুদবন্ধু তখন সেখানকার এস, ডি, ও। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরিজীতে এম, এ, পাশ করলেন ১৯১৭ সালে, ১৯১৯এ আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হয়ে—কালাপানির ওপারের দিকে করলেন যাত্রা। ১৯২১ সালে সাগরপার থেকে দাশগুপ্ত-পরিবারে সংবাদ ভেসে এল যে বিদেশ বাস নীরদরঞ্জনের হয়েছে সার্থক। ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার গণ্ডীও তিনি সসম্মানে করে গেছেন অতিক্রম। বিলেতে থাকার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, সুধিবর দিলীপকুমার রায়, স্বর্গীয় কিরণশঙ্কর রায়, অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র প্রভৃতি তৎকালীন ইউরোপ-প্রবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটেছিল নীরদরঞ্জনের, তবে তারই মধ্যে শেষোক্তজনের সঙ্গে যে যোগাযোগ ঘটেছিল তা যেন ঘনিষ্ঠ থেকেও ঘনিষ্ঠতর। ১৯২২এ দেশে ফিরে এলেন নীরদরঞ্জন। বার য়্যাসোসিয়েশনের খাতায় যুক্ত হল আর একটি নাম। ক্রমে যুক্তি, তর্ক, বিবেচনা ও বিশ্লেষণের অনন্যসাধারণ নিপুণতা দিয়ে গড়ে উঠল নীরদরঞ্জনের জীবনের সাফল্য সোপান। আর সেই সোপানের শীর্ষদেশ অধিকার করতে বেশী সময়ও লাগল না নীরদরঞ্জনের। ফৌজদারী মামলার দুর্দ্ধর্ষ পরিচালকরূপে নীরদরঞ্জনের খ্যাতির পরিধি হ'ল বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর। প্রদেশ সরকার এঁকে নিযুক্ত করলেন ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ট্রাইব্যুনালের সভাপতিরূপে (১৯৪০-৪৮), অল ইণ্ডিয়া ল'ইয়ার্স ডেলিগেশানের নেতারূপে নীরদরঞ্জন চীন ভ্রমণ করেন ১৯৫৫ সালে। সেখানে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ভারত-চীন মৈত্রী সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্য এঁকে আহ্বান জানান। অল ইণ্ডিয়া ডেমোক্রাটিক ল'ইয়ার্স য়্যাসোসিয়েশানেরও ইনি একজন সহ-সভাপতি।

যে সব বিখ্যাত মামলা সুনিপুণভাবে পরিচালনার জন্যে নীরদরঞ্জনের নাম আইনের ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে, তাদের মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা, আলীপুর বড়যন্ত্রের মামলা, দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা, টেগার্টের হত্যা মামলা, ফারোকীর নির্বাচনের বৈধতা বিষয়ক মামলা, কর্ণেল মিত্র হত্যা মামলা, গৌর সরকার হত্যা মামলা প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখনীয়। আলীপুর বিচারালয়ে যখন নেতাজী ও কিরণশঙ্কর রায় অভিযুক্ত হলেন তখন নেতাজীর বিশেষ ইচ্ছায় নীরদরঞ্জন সেই মামলার ভার গ্রহণ করলেন—নীরদরঞ্জনের মনে পড়ে—এ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের উক্তি, "আই য়ুড লাইক টু বি ডিফেণ্ডেড বাই মিঃ এন, আর, দাশগুপ্ত" সুভাষচন্দ্র আরও বলেছিলেন—"জাষ্টিস এদের কাছে পাব না জানি, বাট আই ওয়াণ্ট এ ফাইটার হু ক্যান পুট আপ এ ফাইট ফর আওয়ার কেস," হিজলী হত্যাকাণ্ডের তদন্ত অনুসন্ধানের জন্যে নেতাজী এঁকেই হিজলী নিয়ে যান এবং একত্রে দিন চারেক সেখানে বাস করেন—এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিজ্ঞতা ও প্রকৃত তথ্যপূর্ণ বিবরণ তিনি "প্রবাসী"র পাতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। এ সব ছাড়াও তখনকার দিনের অধিকাংশ স্বদেশী মামলায় আসামী-পক্ষ সমর্থন করতে দেখা যেত নীরদরঞ্জনকে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ তরুণ-সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যে ব্যারিষ্টার নীরদরঞ্জনের তৎপরতা ও ব্যাকুলতার মধ্যে দিয়েই তাঁর গভীর দেশপ্রেমের আলেখ্য ফুটে ওঠে। প্রথম জীবনে ইনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, বি, সি, চ্যাটার্জী ও এস, কে, সেন প্রভৃতি স্মরণীয় ব্যারিষ্টারদের সহকারিত্ব করেছেন আবার পরবর্তী জীবনে বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন সহকারিরূপে পেয়েছেন বিচারপতি দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বর্তমান ষ্টাণ্ডিং কাউন্সেল অনিল মিত্র, সুপ্রীম কোর্টের বর্তমান রেজিষ্ট্রার অরিন্দম দত্ত, ভূতপূর্ব মন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায়, তদীয় সহধর্মিণী মায়া রায়, অজয় বসু প্রমুখ প্রখ্যাত আইনজ্ঞদের।

পূর্ব্বেই বলেছি, সাহিত্যের আঙিনাতেও নীরদরঞ্জনের বসতি সুনির্মিত। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ নীরদরঞ্জনের বাল্যকাল থেকেই। ১৯৩১ সালে নীরদরঞ্জনের বহুখ্যাত গ্রন্থ 'সুশান্ত-সা' আত্মপ্রকাশ করে পুষ্ট হল আশাতীত অভিনন্দনে। গ্রন্থরূপ পাবার আগে দীর্ঘকাল ধরে 'সুশান্ত-সা' পাঠক-সাধারণের দরবারে পরিচিত হয়েছে বিচিত্রার

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

কোন সমর্থন জানায় না। বুলু ঘোষ চল্লিশের কোঠায় পৌছিয়া গিয়াছেন, একথা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না!

শারীরিক গঠনের দিক দিয়া বুলু ঘোষ যতটা সৌভাগ্যবান, বংশ-পরিচয়ের ক্ষেত্রে তাঁহার ভাগ্য নিঃসন্দেহে অনেক ভাল। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রই জানেন; বুলু ঘোষ চন্দ্রমাধব ঘোষের প্রপৌত্র। পিতা বি, সি, ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টারদের অন্যতম; মাতা বীণাপাণি ঘোষ হুগলির এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-পরিবারের কন্যা। শ্রী ঘোষ বি, সি, ঘোষের পঞ্চ পুত্র ও তিন কন্যার সর্বজ্যেষ্ঠ। ১৯৪৮ সালে বি, সি, ঘোষ পরলোক গমন করেন। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ আদিনিবাস ঢাকা ত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে (প্রথমে বর্দ্ধমানে ও পরে কলিকাতায়) চলিয়া আসার পর হইতে তাঁহার বংশধররা কলিকাতায়ই বসবাস করিতেছেন।

শ্রীঘোষের মতে তাঁহার ছাত্রজীবন খুব বেশী ঘটনাবহুল নহে, তবে তাহা নিঃসন্দেহে আনন্দ-উজ্জ্বল। ১৯৩২ সালে তিনি মিত্র ইনষ্টিটিউশন হইতে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে প্রেসিডেন্সী হইতে বি, এ, পাশ করিয়া ব্যারিষ্টারী পড়িতে লণ্ডন চলিয়া যান। ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে মিডল্ টেম্পলে যোগদান করেন। ছাত্রজীবন হইতেই বুলু ঘোষের খেলাধূলা, গান-বাজনা প্রভৃতির উপর ঝোঁক খুব বেশী। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ক্রীকেট-টিমের অধিনায়ক ছিলেন; আবার কলেজের 'অটাম্ সোস্যাল' কমিটিরও সম্পাদক ছিলেন।

শ্রী ঘোষ কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে। প্রথমে তিনি কাজ শিখিতে সুরু করেন সুপ্রীম কোর্টের বর্ত্তমান চীফ জাষ্টিস এস, আর, দাশের নিকট। তাহার পর কাজ করেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান স্পীকার শঙ্করদাস ব্যানার্জীর সঙ্গে। তিনি অদ্যাবধি বহু মামলা পরিচালনা করিয়াছেন এবং অসংখ্য মামলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। পাটনা ফায়ারিং কেসে বিহার সরকার কলিকাতা হইতে দুই জন ব্যারিষ্টারকে লইয়া গিয়াছিলেন—এক জন শঙ্করদাস ব্যানার্জী, আর এক জন শ্রী ঘোষ। দমদম বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত কমিশনের সম্মুখে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস কর্পোরেশনের পক্ষেও বুলু ঘোষকেই অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। একাধিক মামলার ব্যাপারে প্রত্যহই তাঁহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের বিভিন্ন বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ভারত সরকারের প্রধান পাঁচ জন ব্যবহারজীবী প্রতিনিধির অন্যতম।

আইন-ব্যবসায়ে শ্রীঘোষের বৈশিষ্ট্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে হাইকোর্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে। তাঁহাদের বক্তব্য, বুলু ঘোষের বৈশিষ্ট্য তাঁহার সুন্দর সাবলীল জেরার ভঙ্গি বা ধারা। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করিয়া বা অহেতুক ভীতি প্রদর্শন করিয়া সময় নষ্ট করা শ্রীঘোষের স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ; তবে অল্পক্ষণে মূল সূত্রটি খুঁজিয়া বাহির করিতে কলিকাতা হাইকোর্টে বর্ত্তমানে বুলু ঘোষের জুড়ি মেলা নাকি ভার। একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর মতে, 'বুলু ঘোষ ইজ দি মোষ্ট ফাইটিং কাউন্সিল অফ্ দিস বার'।

শ্রীঘোষ বহু বিশিষ্ট ব্যারিষ্টারের সহকারিরূপে বিভিন্ন মামলায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৺শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, ৺শরৎচন্দ্র বসু, স্যার অশোক রায়, ৺বি, সি, ঘোষ, পি, আর, দাশ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে, স্যার এস, এম, বসুর কথা ছাড়িয়া দিলে কলিকাতা হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ীদের মধ্যে বর্ত্তমানে হেমনাথ সান্ন্যালের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। হাইকোর্টে আপনার বন্ধু কে কে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী ঘোষের বক্তব্য, আমার বন্ধু সকলেই; তবু বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে অশোক সেন, অজিত রায়, স্নেহাংশু আচার্য্য, অমিয়নাথ বসু, প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে হয়।

আইন ব্যবসা ছাড়াও শ্রী ঘোষের জীবনের আর একটি বিশেষ দিক রহিয়াছে। সেটি তাঁহার বিরাট বিস্তৃত সামাজিক জীবন। বুলু ঘোষ ক্যালকাটা ক্লাবের অবৈতনিক জয়েন্ট সেক্রেটারী। ১৯৫৪ সাল হইতেই তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত। শ্রী ঘোষের আমলে ক্যালকাটা ক্লাবের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; তাই তো তিনি ইউরোপীয়, আমেরিকান ও ভারতীয়দের সমান প্রিয়। তবে ক্যালকাটা ক্লাবের সেক্রেটারী বলিয়া শ্রী ঘোষ 'ইঙ্গ-বঙ্গ' নহেন। পাড়ার বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তিনি সমভাবে জড়িত থাকেন। ভবানীপুর অঞ্চলের একাধিক পূজা কমিটির তিনি সভাপতি।

১৯৩৬ সালে কলিকাতার বিশিষ্ট মল্লিক-পরিবারের প্রিয়নাথ মল্লিকের পৌত্রী অসীমা মল্লিকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। শ্রী ঘোষের মতই অসীমা ঘোষও সদাহাস্যময়ী। স্বামীর সঙ্গে সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করিলেও তিনি সংসার লইয়াই বিশেষ ভাবে ব্যস্ত। রেড ক্রস কমিটির ও ক্যালকাটা ক্লাবের সঙ্গে তিনি জড়িত। অবশ্য তাঁহাদের সংসার বিরাট হইলেও এক দিক দিয়া শূন্য—বুলু ঘোষ নিঃসন্তান।

## চার

প্রদীপের ডায়েরী হ'তে :

১৯৪৭ সাল, ১লা জানুয়ারী।

ডায়েরী লিখবার অভ্যাস আমার কোন দিনই ছিল না, আজও হয়ত লিখতাম না, কিন্তু এই নতুন অভ্যাসটা এসেছে দুই কারণে। প্রথম, আমার এক গুণমুগ্ধ সতীর্থ আমাকে এই ডায়েরীটা উপহার দিয়েছে এবং উপহার-লিপিতে লিখেছে যে, ১৯৪৭ সাল হবে আমার পক্ষে অসাধারণ একটা বৎসর, এই বৎসরের ঘটনাগুলো পরে যাতে বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে না যায় সেজন্যে আমি অবসর মত সেগুলো এখন এই ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করি। দ্বিতীয়তঃ, কাল, নতুন বছর উদ্বোধনের সন্ধিক্ষণে এবং তার পরে, যা ঘটল তা আমার কল্পনারও অতীত। আমার মনের রুদ্ধ ভাবকে প্রকাশ করতেই হবে এই ডায়েরীর পাতায়।

আমার জীবনের প্রথম চুম্বন পেল এমিলি, যা পাওয়া উচিত ছিল বন্দনার, হয়ত বা ছবির। ছবির কথা হঠাৎ মনে আসছে কেন? সত্যি কি আমি তার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম? এখন in retrospect বিশেষ করে কাল এমিলির সঙ্গে থাকবার পর মনে হচ্ছে, বোধ হয় হয়েছিলাম, নিজেরই অজ্ঞাতে। নইলে এমিলিকে নিয়ে যখন আমার এই ঘরে এলাম, (তখন রাত বোধ হয় দুটো হবে) তখন বার বার ছবির কথাই মনে হচ্ছিল কেন? বন্দনার কথা ত তখন একবারও মনে হয়নি? তার পর এমিলির দৃঢ় আলিঙ্গনে যখন নিজেকে সমর্পণ করে দিলাম, তখনও চোখের সামনে ফুটে উঠল ছবির আগ্রহোজ্জ্বল মুখ। শুধু মুখ নয়, নবকিশোরের সঙ্গে মোমিনপুরের ফ্ল্যাটএ যে ছবিকে আমি দেখেছিলাম, সে যেন ভেসে এল আমার পাশে, তার নিঃসহ যৌবনের অতৃপ্ত নগ্নতা নিয়ে।

সত্যি, আমরা নিজেদের কতটুকু জানি বা বুঝতে পারি? দু' দিন আগেও যদি কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করে আমাকে বলত যে, ১৯৪৭ সালের প্রথম রাত্রিতে লণ্ডনের এই অপরিসর অপরিচ্ছন্ন ঘরে আমি হয়ে থাকব একটি বিদেশী তরুণীর বাহুলগ্ন, আমি বিশ্বাস ত করতামই না, বরং অকৃত্রিম ক্রোধ এবং ঘৃণার সঙ্গে তার তীব্র প্রতিবাদ করতাম। আর আমার অবচেতন মনে ছবিকে পাবার লুব্ধ আকাঙ্ক্ষা যে ভাবে লুকিয়েছিল, তা-ও স্বীকার করতাম না।

অথচ, বিস্ময়ের কথা এই যে, এমিলির সঙ্গে রাত্রিযাপন করে আমার এতটুকু অনুশোচনা আসছে না। বরং মনে হচ্ছে, এই হওয়া উচিত ছিল। এই পরিণতি না হ'লেই আমাদের সম্বন্ধটা হয়ে দাঁড়াত অস্বাভাবিক, জীবনধর্ম্মবহির্ভূত। তাই বাড়ীতে ফিরে যাবার আগে এমিলি যখন আমাকে প্রশ্ন করল, আশা করি তুমি কোন অনুতাপ বোধ করছ না। তখন আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাকে বললাম; না, মোটেই না। এবং তার নিদর্শনস্বরূপ তার ঠোঁটের উপর বসিয়ে দিলাম আর একটি প্রগাঢ় চুম্বন।

আচ্ছা, এমিলির কথা লিখতে বা ভাবতে গিয়ে বার বার ছবির প্রতিকৃতিই মনে আসছে কেন? এমিলির জীবনে যদিও আমি প্রথম পুরুষ নই, তবু সে ত ছবি নয়। ছবির মত দেহ বিক্রয় করা তার ব্যবসা নয়।

তবে এটা কি আমার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় মনের প্রতিক্রিয়া? বিয়ের কথা না ভেবে, শুধু আকর্ষণের পরিণতি হিসেবে একটি মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে দেহের সমতলভূমিতে মিলিত হয় এদেশে—নিঃসঙ্কোচে। এখানে এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের দেশের নীতিবাগীশরা হয়ত মূর্চ্ছা যাবেন একথা শুনে!

ছবির কথাই আবার বলছি। স্বীকার করছি যে, তার জীবন আরম্ভ হয়েছিল সাধারণ পেশাদার মেয়ের মত, কিন্তু তার জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই সে নয়। ক্ষুধার তাড়নায়ই কি সে বাধ্য হয়নি পুরুষদের লালসা চরিতার্থ করতে? তার পর তার জীবনে এসে উপস্থিত হ'লাম আমি, কিন্তু তার ভার গ্রহণ করলাম না। স্নেহ, সহানুভূতির জন্য উন্মুখ ছিল তার মন, কিন্তু সত্যিকারের স্নেহ সে কতটুকু পেয়েছে? নবকিশোর যদি তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে থাকে, তবে সে কেন তার কাছে যাবে না? কি দিয়েছি বা দিতে প্রস্তুত ছিলাম আমি, যার উপর ভরসা করে তার ভবিষ্যৎ জীবন সে নিয়ন্ত্রিত করবে অন্য পথে? অপরাধ কি ছবির? অপরাধ যে আমারই।

এদেশের সমাজে এ-সব প্রশ্নই ওঠে না। মেয়েরা এখানে স্বাধীন। সব চেয়ে বড় যে স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, তা' এদের আছে। কাজেই এদেশে ছবির সমস্যা দেখাই যায় না। যে মুষ্টিমেয় কয়েক জন ছবির পথ বেছে নেয়, তারাও এ দেশের সমাজে অপাংক্তেয় নয়।

না, জীবনের যে সব নীতি আমি এত দিন দূর থেকে দেখে এসেছি, নিজেকে বাঁচিয়ে, দূরবীক্ষণের সাহায্যে, সে সব নতুন করে পর্য্যালোচনা করবার সময় এসেছে। লোকে হয়ত বলবে, আমার দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। আমি প্রতিবাদ করব না।

১৫ই জানুয়ারী।

এর মধ্যে এমিলির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়েছে, পলিটেক্‌নিক্‌-এ। প্রথম যেদিন দেখা হল—৩রা জানুয়ারী (২রা তারিখ পলিটেক্‌নিক্‌ বন্ধ ছিল)—তার মুখে কেমন যেন একটা অনুশোচনার চিহ্ন। আমি হেসে প্রশ্ন করলাম, ও কি এমিলি! অপরাধীর মুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? আমাকে এড়াবারই বা কেন এই প্রয়াস?

সে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, আজ ক্লাসের পর তোমার ওখানে আসতে পারি ?

আমি বললাম, নিশ্চয়।

যদিও বাসে আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম, আমাদের মধ্যে একটিও বাক্যবিনিময় হয়নি।

এমিলি কথা বলল আমার ঘরে ঢোকবার পর। প্রশ্ন করল, এ ক'দিন তুমি ভাল ছিলে ত, দীপ ?

হো হো করে হেসে আমি জবাব দিলাম, কেন থাকব না ? তোমার সন্দেহের কারণ ?

একটু অপ্রস্তুত হয়ে সে বলল, না, এমনি ভাবছিলাম।

—ভাবছিলে পয়লা জানুয়ারীর কথা, এই ত ? ভাবছিলে তোমার ভারতীয় বন্ধুকে টেনে নিয়ে এসেছ তার সুউচ্চ মঞ্চ থেকে এবং সেটা হয়েছে প্রকাণ্ড একটা অপরাধ ! তাহলে তোমাদের ভাষায়ই বলি, it had to happen some day and with somebody. আমার ভাগ্য ভাল—it was New Year's Eve and it was you !

এমিলি বলল, সত্যি বলছ, you have no regrets ?

—সত্যি বলছি, none whatsoever.

তার পর এমিলির মনের সংশয় ঘুচিয়ে দিলাম চুম্বনে, আলিঙ্গনে।

আরেক দিনের কথা। এমিলি আবার আমাকে প্রশ্ন করেছিল আমার ভারতীয় প্রেয়সীর কথা। যখন সে শুনল যে, আমার কাছে তার একখানা ফটোও নেই, সে ত অবাক ! বলল, তুমি বলছ তুমি তাকে জান তিন চার বছরেরও বেশী, অথচ কোন সময় তার একখানা ফটো সংগ্রহ করবার ইচ্ছেও হয়নি তোমার ?··· আশ্চর্য্য তোমাদের ভারতীয়দের মন !

এমিলিকে তখন বুঝিয়ে বলতে হ'ল যে, আমাকে দিয়ে যেন আমার দেশের সব লোককে বিচার না করে। আমি চিরকালই একটু খামখেয়ালী, সবাই যা করে তা আমি করতে পারিনে বলেই দুঃখ পাই, অপরকে দুঃখও দিয়েও থাকি।

তাছাড়া দেশে আমার জীবন ছিল ছন্নছাড়া। বিলেতে এসে তবু একটা স্থিতি হয়েছে, কিন্তু সেখানে ? সেখানে আমার না ছিল চাল, না ছিল চুলো !

এমিলি প্রশ্ন করল, তুমি তার কাছে চিঠি লেখ না কেন, দীপ ?

—জাহাজ থেকে একখানা লিখেছিলাম, তারপর আর লেখা হ'য়ে ওঠেনি।···এখন এক বছর অনভ্যাসের পর কলম ধরতে লজ্জা করছে।

—সেদিন, ৩১শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যায়, তুমি কার কাছে চিঠি লিখছিলে ?

—আমার দিদি, পাতান দিদির কাছে।

—পাতান দিদি, সে আবার কি ?

আমাকে তখন বুঝিয়ে বলতে হ'ল আমাদের দেশের এই পাতান দিদি, দাদা, বৌদি, খুড়ো, খুড়ি প্রভৃতির কথা। অবাক হয়ে সে শুনল, তারপর বলল, ভারী চমৎকার ব্যবস্থা ত ?

একটু পরে সে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, এখন তোমার আমার মধ্যে যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে, একে তোমার দেশের প্রথানুসারে কি বলবে ?

বড় কঠিন প্রশ্ন। অনেক ভেবে জবাব দিলাম, আমাদের দেশে এ রকম সম্পর্ক গড়ে উঠবার সুযোগ বা সুবিধে এখনও হয়নি সমাজ-ব্যবস্থা এর বিরুদ্ধে।

—অর্থাৎ, তোমাদের সমাজ মোটেই অনুমোদন করবে না এই ত ?

এবার আমার পাল্টা প্রশ্ন।—তোমাদের সমাজও অনুমোদন করছে কি এমিলি ?

—সম্পূর্ণ ভাবে অনুমোদন না করলেও আপত্তি করছে না অর্থাৎ, দুটি ছেলেমেয়ে যদি পরস্পরকে ভালবাসে তাহ'লে বিয়ে না ক'রে ও তারা একত্রে থাকতে পারে। সমাজ তাতে বাধা দেবে না যতক্ষণ তৃতীয় কোন পক্ষের ক্ষতি না হয়।

—আমাজের দেশে এই ব্যবস্থা চালু হতে বেশ দেরী হবে এমিলি !

—কে তোমাকে চালু করতে বলছে ?···এমিলি হেসে বলল।

৩০শে মার্চ।

অনেক দিন ডায়েরী লেখা হয়ে ওঠেনি। যে অভ্যাস কোন দিন ছিল না জোর ক'রে তার জের টেনে আনা সোজা কথা নয় !

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে এই যে, আমি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্ম-এ চাকুরী পেয়েছি। পলিটেক্‌নিক্ এ এসেছিলেন এই ফার্ম্মের একজন ডিরেক্টার—আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাশ করছি তাদের কয়েক জনকে ডেকেছিলেন, আমি ছিলাম তাদের অন্যতম ডিরেক্টার বাছাই করে নিলেন আমাকে এবং এদেশীয় আরও দু'জনকে।

সমাজের চোখে আমার মর্য্যাদা একটু বাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাও। আমার ইউনিট-এর বন্ধুদের ছেড়ে চলে আসতে একটু কষ্ট হয়েছে বই কি, প্রায় এক বছর ওদের সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করেছি !

এমিলি খুসী হয়েছে। আমার এই ক্ষুদ্র ভাগ্য পরিবর্ত্তনে। বলেছে, দীপ, মনে মনে আমি এখনও বুর্জোয়া, তাই শ্রমিকশ্রেণীর উর্দ্ধে কেউ উঠলে তাকে অভিনন্দন জানাই, যদিও জানি যে আজকালকার যুগে এটা রীতিমত সিডিশন।

দেশ থেকে গায়ত্রীদি'র চিঠি এসেছে। দেশের খবর অনেকটা আশাপ্রদ। নতুন বড়লাট (লর্ড মাউণ্টব্যাটেন) কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন এবং বলছেন যে, তিনি চান এই বছরের মধ্যেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। মনে হচ্ছে এবার দেশ সত্যি স্বাধীন হবে।

কিন্তু এই স্বাধীনতার বিনিময়ে মূল্য দিতে হবে ভারতবর্ষের ঐক্য। আমাদের মুসলমান ভাইরা চান আলাদা রাষ্ট্র—পাকিস্তান। পাঞ্জাব আর বাংলা দেশ নাকি দু' ভাগ করা হবে। এক ভাগ থাকবে হিন্দুস্থানে, অপর ভাগ পাকিস্তানে। পাঞ্জাবের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হবে, এ যে কল্পনাই করতে পারি না ! নদীমাতৃক বাংলা দেশ, যে বাংলা দেশের ধানের উপর বাতাস ঢেউ খেলে এসেছে যুগযুগান্ত থেকে, তার এক অংশ হবে বিদেশী রাষ্ট্র !

গায়ত্রীদি' লিখেছেন, কংগ্রেস এই দ্বিখণ্ডীকরণ পছন্দ করে না। তবে সমগ্র দেশের স্বাধীনতার কথা ভেবেই রাজী হয়েছে। তারা

দেখতে পাচ্ছে, পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত দেশব্যাপী আত্মকলহের অবসান হবে না, আর সেই নজীর দেখিয়ে বৃটেনও হয়ত ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। তাই কংগ্রেস এক রকম নিরুপায় হয়েই সম্মতি দিয়েছে।

আমি পলিটিক্স বুঝিনে, তবে সবাই যখন বলছেন উপায়ান্তর ছিল না, আমি মেনে নিচ্ছি। তা ছাড়া আমি আজ প্রায় এক বছর দেশের বাইরে, এখানে কেন কি ঘটছে তা' এখানে বসে বিচার করি এমন ধৃষ্টতা আমার নেই!

## পাঁচ

দেখতে দেখতে আরও কয়েক মাস কেটে গেল। এল ৪৭ সালের জুন। এপ্রিলের শেষ হতেই বসন্তের সমাগমটা প্রদীপ উপলব্ধি করছিল, জুন আসতেই তার মনে হ'তে লাগল লণ্ডনের বাইরে কোথাও বেরিয়ে যেতে হবে।

এমিলিকে তার আকাঙ্ক্ষার কথা জানাল। এমিলিও বলল যে প্রদীপের কয়েক দিন বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন।

—কোথায় আমরা যেতে পারি বলো ত ?···প্রদীপ জিজ্ঞাসা করল।

—আমরা ? আমি যাব একথা তোমাকে কে বলল ?

—সে কি ? তুমি যদি সঙ্গে না আস তাহ'লে কি হলিডে হবে আমার ?

—দুটো বাধা আছে, দীপ! প্রথম, সামনের নভেম্বরে আমার ডিপ্লোমা পরীক্ষা, এই গরমের ছুটিতে আমাকে তৈরী হতে হবে পরীক্ষার জন্যে, হলিডে করা চলবে না। দ্বিতীয়, আমি যদি লণ্ডনের বাইরে যাই, মা জিজ্ঞাসা করবেন কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে যাচ্ছি, ইত্যাদি। ওঁকে মিথ্যে কথা বলতে পারব না, অত্যন্ত অপ্রীতিকর একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তখন।

প্রদীপ আহত বোধ করল। বলল, আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমার সঙ্গে মেলামেশা কর, এই খবরটা তোমার মা জানেন।

—জানেন হয়ত, কিন্তু সোজাসুজি প্রশ্ন কখনও করেন নি। লণ্ডনের বাইরে যদি যাই তাহ'লে প্রশ্ন নিশ্চয়ই করবেন। আমি জানি, আমার এই ভীরুতার মধ্যে কোন লজিক নেই, তবু আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

প্রদীপ ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, তাহ'লে আমি যাব না।

—এটা তোমার অন্যায় আবদার, দীপ! আমার সুবিধে অসুবিধেও ত থাকতে পারে। মার কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আমার পরীক্ষাটা ত উপেক্ষা করবার জিনিষ নয়।

তারপর একটু মোলায়েম স্বরে বলল, তাছাড়া তুমিই ত আমাকে বলেছ যে তুমি চিরদিন পছন্দ করেছ একটু স্বতন্ত্র, একটু একা থাকতে। লোকের সংসর্গ, সাহচর্য্য বেশী দিন তোমার ভাল লাগে না। আজ তোমার স্বভাব হঠাৎ বদলে গেল কেন ?

অভিমানাহত স্বরে প্রদীপ বলল, যে দিনের কথা বলছ তা' অনেক পেছনে ফেলে রেখে এসেছি, এমিলি! তখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়নি!···তোমার সাহচর্য্য যে আমি কি তীব্র ভাবে কামনা করি তা কি তুমি এতদিনেও বুঝতে পারোনি ?

—এ তীব্রতা যে এখন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে তার প্রধান কারণ, বেশী দিন আমাদের পরিচয় হয়নি! এই কয়েক মাসের মধ্যেও আমরা পরস্পরকে নিবিড় ভাবে কাছে পেয়েছি কতটুকু ? হিসেব করে দেখো ত, পলিটেক্‌নিক্-এ দুটো ছুটকোছাটকা কথা বলা ছাড়া একটু নিরিবিলি তোমার সঙ্গে থাক্‌তে পেরেছি বোধ হয় সর্ব্বসমেত আট কি দশ ঘণ্টা! স্বল্পপরিচয়ের নভেলটি এখনও মরে যায়নি, তাই তোমার কামনা এখনও তীব্র রয়েছে।

—তোমারই কথা অনুসরণ করে বলছি, মাসখানেকের হলিডে একসঙ্গে কাটাতে পারলে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারব আরও ভাল করে। সেটা কি দু'দিক থেকেই কাম্য নয় ?

—না। আমি নিজেকে তোমার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের সম্মুখে তুলে ধরতে মোটেই রাজী নই। আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক আছে, সেগুলো তোমাকে জানতে দেওয়ায় কি সার্থকতা ? আধো-অন্ধকারে যা' লুকানো রয়েছে থাকুক না তা' সেখানে।···আর তাছাড়া তোমাকে আমি জানি, দীপ, এক মাস আমার নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য্যে তুমি হাঁপিয়ে উঠবে, তখন আমাকে দূরে ঠেলে দেবার জন্য তুমিই হয়ে উঠবে আগ্রহান্বিত।

প্রদীপ এবার যথার্থই রাগ করল। বলল, বেশ, তুমি আসতে না চাও, না এলে! কোন প্রয়োজনই নেই আমার কারো সাথিত্বের!

—লক্ষ্মী, দীপ, তোমার এই স্পিরিটই ত দেখতে চেয়েছিলাম!

প্রদীপ বলল বটে যে, সে একাই যাবে হলিডে করতে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে গেল না। জুন, জুলাই দু'মাস কেটে গেল, প্রদীপের ভ্রুক্ষেপই নেই। এমিলি অনেক বার চেষ্টা করল তাকে রাজী করাতে, কিন্তু একটা-না-একটা ওজর দেখিয়ে প্রদীপ লণ্ডনেই থেকে গেল।

অবশেষে এমিলি বলল, দেখছি তোমার সঙ্গে না এলে তুমি বাইরে আদৌ যাবে না! আমি আসব, কিন্তু একটা অনুরোধ, তিন চার দিনের বেশী আমাকে থাকতে বলো না। একটা জায়গায় তোমাকে স্থিতি করিয়ে দিয়েই আমাকে লণ্ডনে ফিরে আসতে হবে আসন্ন পরীক্ষার তাগিদে।

উপায়ান্তর না দেখে প্রদীপ অবশেষে এই মীমাংসায় রাজী হ'ল।

আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে তারা দু'জনে এল ব্রাইটনে—সমুদ্রতীরে। ব্রাইটন-এর সমুদ্রতীর লোকে লোকারণ্য, হোটেল, বোর্ডিংহাউস ভর্ত্তি। অনেক কষ্টে সহর থেকে একটু দূরে একটা বোর্ডিংহাউসএ এমিলি দু'খানা ঘর জোগাড় করল।

এমিলি ব্রাইটনএ রইল ঠিক তিন দিন। প্রদীপ অনেক অনুরোধ জানাল অন্ততঃ একটা সপ্তাহ থেকে যেতে, কিন্তু এমিলি কিছুতেই রাজী হ'ল না। প্রদীপকে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে ছুটে পালাল লণ্ডনে।

প্রদীপ ক্ষুণ্ণ হ'ল। সে একা-একা ঘুরে বেড়াতে লাগল সমুদ্র-সৈকতে, খান দুই-তিন বই নিয়ে। জনসমাগম যেখানে অপেক্ষাকৃত কম এরকম দু'-একটা জায়গা সে আবিষ্কার করে নিল এবং অধিকাংশ সময় কাটাতে লাগল নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে।

বই-এর পাতা ওলটাবার ফাঁকে ফাঁকে সে তার চিন্তাধারার রাশ

সম্পূর্ণ আলগা করে দিল। এমিলির ব্যবহার তার কাছে খুবই অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ঠেকছিল। যে তিন দিন এমিলি ব্রাইটনএ ছিল প্রদীপকে মুহূর্ত্তের জন্যও অনুভব করতে দেয়নি যে, সে এসেছে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য। বরং সে এমন ব্যবহার করেছে, নিজেকে প্রদীপের কাছে এমন অকুণ্ঠিতভাবে সমর্পণ করেছে যে, তার মনে হয়েছে এমিলি বোধ হয় তার পরিণীতা বধূ। প্রদীপের স্বাস্থ্য, তার ছোটখাট অভ্যাস নিয়ে সে করেছে উদ্বেগ প্রকাশ, বার বার তাকে সাবধান করে দিয়েছে বিলেতের সমুদ্রতীরের অবিশ্বাসী আবহাওয়া সম্বন্ধে। একদিন প্রদীপ বাইরে বেরুতে চায়নি ; কিন্তু এমিলি তাকে জোর করে নিয়ে এসেছে মুক্ত হাওয়ার সংস্পর্শে। সান্নিধ্য, সাহচর্য্য তাকে দিয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তা' উন্মুক্ত আকাশের নীচে, জনতার মাঝখানে। প্রদীপ বিরক্তি প্রকাশ করেছে, কিন্তু এমিলি তার বিরক্তি উপেক্ষা করে তাকে টেনে নিয়ে এসেছে সেই সব জায়গায়, যেখানে জনতার কোলাহল, উৎসবের মুখরতা। প্রদীপকে এক প্রকার বাধ্য করেছে স্লটমেশিনে পেনি ফেলে খেলা খেলতে, কার্নিভ্যাল বুথএ ঢুকে নানাপ্রকার বাজি রাখতে। প্রদীপ যদি নাচতে জানত তাহ'লে তাকে হয়ত নাচ-ঘরেও টেনে নিয়ে যেত এমিলি।

অথচ প্রদীপকে স্বীকার করতেই হবে যে, এই তিন দিন এমিলি তাকে নিবিড় সঙ্গ দিতে কুণ্ঠা করেনি। রাত বারোটার পর তারা যখন বোর্ডিংহাউসএ ফিরে এসেছে তখন নিঃশব্দে এমিলি চলে এসেছে প্রদীপের ঘরে, শুয়ে পড়েছে তার বিছানায়। তেমনি নিঃশব্দে প্রদীপ তাকে গ্রহণ করেছে, কিন্তু তৃপ্তি পায়নি। কোথায় যেন একটা ফাঁক, একটা অপূর্ণতা সব সময়ই থেকে গেছে।

তারপর এমিলি যখন লণ্ডনের ট্রেণ ধরতে চলে গেল ষ্টেশনে, সে কিছুতেই প্রদীপকে আসতে দিল না তার সঙ্গে। বলল, মাসখানেক পরেই ত আবার দেখা হবে, ষ্টেশনে সেণ্টিমেণ্ট্যাল ননসেন্স এর অভিনয় না করলে কোন ক্ষতি হবে না।

অভিনয়? প্রদীপ প্রতিবাদ করেছিল এবং এমিলিও দুঃখ প্রকাশ করে তার কথাটা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, কিন্তু তার সংকল্প থেকে বিচ্যুত হয়নি। বোর্ডিংহাউসে প্রদীপের ঘরেই তাকে একটি চুম্বন দিয়ে সে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

অদ্ভুত এই এমিলি! অদ্ভুত এই দেশের মেয়ে! অথবা মেয়ে-জাতটার ধর্মই কি এই? কে জানে ?···মেয়েদের সঙ্গে প্রদীপের পরিচয় কত অল্প, কত সঙ্কীর্ণ! বন্দনা, সুমিত্রা, গায়ত্রীদি', ছবি এদের কাউকেই কি সে বুঝতে পেরেছে সম্পূর্ণভাবে ?···নাঃ, এসব ভেবে কোন লাভ নেই, তার চেয়ে মনঃসংযোগ করা যাক হাতের বইটার ওপর।

আচ্ছা, ছবি এখন কোথায় আছে? তার নার্সিং কোর্সও বোধ হয় শেষ হয়ে এল। সে কি এখনও নবকিশোরের মিসট্রেস? বেচারী ছবি, কোন অপরাধ তার নেই। যৌবনের প্রারম্ভে লুব্ধ পুরুষের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছিল ক্ষুধার তাড়নায়, তার পর যদিও বা তার জীবনের গতির মোড় ঘুরবার সূচনা দেখা দিল, তখন রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াল নবকিশোর, তার অকুণ্ঠিত সহানুভূতি, সাহায্য নিয়ে।···আচ্ছা, কিসের প্রেরণায় সে নবকিশোরের অঙ্কলক্ষ্মী হয়েছে—কৃতজ্ঞতার না ভালবাসার?

ছবির কথা বার বার মনে হচ্ছে কেন আজ? এমিলি আ[র] ছবি—এক হিসেবে ছবিই তার জীবনের প্রথম নারী, বন্দনা নয়। বন্দনা প্রথম থেকেই ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে, তাকে তার জীবনে[র] নারী বলা অসঙ্গত, অশোভন হবে। অথচ ছবির কথা এমিলি জানে না, সে জানে যে প্রদীপের জীবনের প্রথম নারী বন্দনা, আর দ্বিতীয়া সে নিজে।

যদি, যদি সে নবকিশোরের উপর ছবির ভার না দিয়ে নিজে[ই] সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করত তাহ'লে ছবি কি তারই দিকে ঝুঁকত না উন্মুখ কৃতজ্ঞতায়? আর তখন সে কি করত? নবকিশোরের মত তাকে নিয়ে যেত মোমিনপুরের সেই ফ্ল্যাট এ? না, না, তা' কিছুতেই পারত না। ছবির কৃতজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'ত।

দূর ছাই! কেবলই অসম্ভাব্য সব কথা মনে আসছে! এমিলি যদি আজ কাছে থাকত তাহ'লে এ-সব চিন্তাধারা তাকে এতটুকু বিপর্য্যস্ত করতে পারত না। গল্পে, পরিহাসে এমিলি তাকে ডুবিয়ে রাখত, তার দুরন্ত মনকে করত শান্ত।

আচ্ছা, ঐ দূরে একটি ভারতীয় মেয়েকে দেখা যাচ্ছে যেন! হ্যাঁ, ভারতীয়ই বটে, এখানে শাড়ীর প্রাচুর্য্য নেই, তাই শাড়ীপরা কাউকে দেখলে সহজেই নজরে আসে।

তার দিকেই মেয়েটি হেঁটে আসছে যে! সে তাকে সম্ভাষণ করবে কি? বিদেশে দেশের মেয়ের প্রতি সৌজন্য দেখানো নিশ্চয়ই তার কর্ত্তব্য।

## ছয়

মেয়েটি অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছিল। প্রদীপের মনে হ'ল, অন্যান্য হলিডে মেকারদের মত সে-ও ভাবছে কোথায় যাওয়া যায়। বোধ হয় ব্রাইটন-এ আজকালের মধ্যেই এসেছে!

এ কি? চেনা-চেনা মনে হচ্ছে যেন?···আঁ্যা, এ যে ছবি! ছবি এখানে? বিলেতে? ব্রাইটন-এ!

হঠাৎ ছবির চোখ পড়ল প্রদীপের দিকে। সে-ও বোধ হয় আশা করেনি এখানে এই ভাবে প্রদীপের সঙ্গে তার দেখা হবে। সে থমকে দাঁড়াল।

প্রদীপ উঠে পড়ল, এগিয়ে গেল ছবির কাছে। প্রশ্ন করল, তুমি ছবি, নয় কি?

ছবি ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, হ্যাঁ।

যেন বহুদিনের পুরানো দুই বন্ধুর দেখা, এই ভঙ্গীতে প্রদীপ বলল, একেই বলে পৃথিবী কত ছোট। ব্রাইটনএ তোমার সঙ্গে দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি! ভাল আছ ত!

ছবি তবু কোন কথা বলল না, ঘাড় নেড়ে জানাল যে সে ভাল আছে।

—কবে এসেছ? কোথায় আছ?

এবার ছবি মুখ খুলল, বলল, গতকাল রাতে। আছি একটা বোর্ডিংহাউসে।

—একা এসেছ, না সঙ্গে আর কেউ আছে?

ছবি তিরস্কারের চোখে প্রদীপের দিকে তাকাল। তারপর বলল, একাই এসেছি।

দুজনে তখন হাঁটতে সুরু করেছে। প্রদীপ বলল, কোন তাড়া নেই ত ?

ছবি জবাব দিল যে, তার কোনই তাড়া নেই, সে বেরিয়েছে ব্রাইটনের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়টা করে নিতে।

—তাহ'লে চলো, ঐ দিকে যাওয়া যাক্। বিলেতে কবে এলে ?

—তা' মাস তিনেক হবে।

—কোথায় আছ ?

—লণ্ডনে। দেশের নার্সিং কোর্স শেষ হয়ে গেছে, একটা স্কলারশিপ পেয়েছি। এখানে সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালে কাজ করতে এবং শিখতে এসেছি। বছর দুই থাকতে হবে।

—বেশ, বেশ। আমিও লণ্ডনেই থাকি।

এবার ছবি প্রশ্ন করল, তাই নাকি ? আপনি কত দিন এদেশে আছেন ? কি করছেন ?

সংক্ষেপে প্রদীপ জানাল তার বিলেতে আসার ইতিবৃত্ত। বিলেতে আসার পর সে কি কাজ করছিল এবং এখন কি করছে, তা'ও তাকে জানাল। আর বলল যে ব্রাইটন-এ সে মাসখানেক থাকবে—একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।

ছবি বলল, আমার মাত্র দু'হপ্তা ছুটি। তারপর আমাকে ফিরে যেতে হবে হাসপাতালে।

—What a pity! সে যাই হোক, এই দু'হপ্তা দেখা-শুনো হবে নিশ্চয়ই।

ছবি কোন জবাব দিল না।

—তারপর দেশের খবর বলো। তুমি ত আমার অনেক পরে এসেছ, অনেক নতুন খবর দিতে পারবে নিশ্চয়ই ?

—নতুন খবর আর কি আছে, মিঃ গুহ ? কাগজে ত সবই দেখতে পান। আর দু'দিন পরেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হচ্ছে, এত দিন চলছিল তারই জন্য প্রস্তুতি।

প্রদীপের মনে পড়ে গেল আর দু'দিন বাদেই আসছে ১৫ই আগষ্ট।

—কলকাতার খবর বলো।

—কি খবর জানতে চান বলুন ?

কি খবর জানতে চায় তা' প্রদীপ ভালভাবেই বোঝে, ( ছবি ও বোঝে না কি ? ) কিন্তু প্রশ্নটা জিভের গোড়ায় এসেও আটকে গেল।

সে বলল, এই যে বাংলা দেশ বিভাগ করা হচ্ছে, কলকাতার কি'হবে ?

—কলকাতা ? কলকাতা পশ্চিমবাংলার মধ্যেই থাকবে। ওরা চেয়েছিল কলকাতাকে যুগ্ম রাজধানী করতে, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমবাংলার, কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজী হয়নি। ওদের রাজধানী হবে ঢাকায়।

—আর কলকাতার মুসলমান বাসিন্দারা ?

—তারা প্রায় সবাই কলকাতায়ই থাকবে। দু'-চারজন হয়ত ব্যবসার লোভে ঢাকায় যাবে, কিন্তু তারাও কলকাতার অফিসটা তুলে দেবে না।...আমরা ত আর মুসলমানদের তাড়াতে চাচ্ছি না !

—টেন্‌সন্ কি এখনও রয়েছে কলকাতায় ?

—না, এখন সব শান্ত। সবাই অপেক্ষা করে আছে ১৫ই আগষ্টের জন্য।

হাঁটতে হাঁটতে তারা এসে পড়েছিল, যেখানে সব চেয়ে বেশী কোলাহল সেখানে।

ছবি বলল, আপনার এত সব চেঁচামেচি ভাল লাগে ? আমার কিন্তু লাগে না !

প্রদীপ বলল যে সে ছবির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। এবং সেই জন্যই সে খান দুই বই নিয়ে বসেছিল নিভৃত ঐ কোণটায়।

—আপনি ক'দিন এখানে আছেন ?

—পাঁচ-ছয় দিন হবে।

—তাহ'লে ত ব্রাইটন্ আপনার বেশ পরিচিত হয়ে গেছে ! এখানে দেখবার কি আছে ?

—বিশেষ কিছুই নেই, এই সমুদ্রের ধারটা এবং একেই কেন্দ্র করে যে সব আমুজমেণ্ট বুথ্ গড়ে উঠেছে সে ছাড়া। তবে যারা নাচতে ভালবাসে, তাদের জন্য দু'-তিনটা বড় বড় নাচঘর আছে।

—আপনি নাচেন না !

—না, নাচ আসে না।

—প্রশ্নটা করার অবশ্য কোনই মানে হয় না। আমার আগেই থেকেই বোঝা উচিত ছিল আপনি নাচেন না।

এ কথার তাৎপর্য্য ? প্রদীপ চুপ করে রইল। তার একবার ইচ্ছা হ'ল সে ছবিকে প্রশ্ন করে, সে নাচে কি না, কিন্তু কি ভেবে এই প্রশ্ন সে উত্থাপন করল না।

ছবি নিজেই বলল, আমি কিন্তু একটু-আধটু শিখেছি এই বিদ্যেটা, দেশে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কয়েক জন নার্স-এর দৌলতে। আর এদেশে ত দেখছি প্রতি মাসেই একটা না একটা নাচের উৎসব লেগেই আছে। যেদিন উৎসব থাকে আমাদের হাসপাতালে সে কি উৎসাহ, কোলাহল! আমার কিন্তু এতটা ভাল লাগে না, যদিও মাঝে মাঝে নাচঘরে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই।

আরও খানিকটা দূর তারা এগিয়ে গেল। তারপর ছবিই বলল, এখন ফেরা যাক, বেশ ক্লান্ত বোধ করছি।

প্রদীপ প্রস্তাব করল যে, তারা দু'জনে কোন একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে লাঞ্চ খায়, কিন্তু ছবি রাজী হল না। বলল, আজ বোর্ডিং-হাউসে আমার প্রথম লাঞ্চ। বুড়ীকে বলে আসিনি, যদি সময়মত উপস্থিত না হই, তাহলে ভাববে নতুন জায়গায় এসে বুঝি হারিয়ে গেলাম।

প্রদীপ ছবিকে এগিয়ে দিল তার বোর্ডিংহাউসের দোরগোড়া অবধি। তারপর সে-ও চলে গেল তার নিজের আস্তানায়।

ছবির সঙ্গে প্রদীপের প্রায়ই দেখা হতে লাগল ব্রাইটন-এর সমুদ্র-সৈকতে। প্রদীপ লক্ষ্য করল, ছবির বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই। তবে তার বন্ধুত্ব যে বিশেষ কোন একজন ছেলে বা মেয়ের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এটাও তার নজর এড়াল না। যখন ছবি সহচর-সহচরী পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত, প্রদীপ সাধারণতঃ তাকে সম্ভাষণ করবার কোন চেষ্টা করত না—যেন সে অন্য কিছু দেখছে বা ভাবছে, এই ভাণ করে দৃষ্টি এড়িয়ে নিত।

ছবি এক দিন প্রশ্ন করল, আচ্ছা মিঃ গুহ, আপনি এত দিন ব্রাইটন-এ আছেন, আপনার বন্ধু বা বান্ধবী একটিও দেখছি না ত ?

—না থাকলে কি করে দেখাবে ? প্রদীপ জবাব দিল।

—আপনি ত চেষ্টাও করেন না ! এই সেদিন আমার দলের

দু'জনের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিলাম, তার মধ্যে একজন আপনার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত, কিন্তু পরের দিন যখন তার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হ'ল, আপনি এমন ব্যবহার করলেন, যেন তাকে জন্মেও কখনও দেখেন নি! বেচারী কি অপমানিত বোধই না করল! আমাকে বলছিল, তোমার ভারতীয় বন্ধুটি কি অহঙ্কারী!

—অহঙ্কার আমার এতটুকু নেই, ছবি! তবে এই সব প্রগল্‌ভা তরলচিত্ত মেয়েদের সংসর্গ আমার ভাল লাগে না।

—ওরে বাবা! আপনি বুঝি intellectual মেয়েদের সঙ্গ চান? তাহ'লে ব্রাইটন-এ এলেন কেন? লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়ামে গেলেই পারতেন।

—আমি কোন মেয়ের সঙ্গই কামনা করছি না, ছবি!

—তাহ'লে ত আপনার সঙ্গে আমার কথা বলাই উচিত হচ্ছে না! পরিহাসের সুরে ছবি বলল।

—তোমার কথা আলাদা।

—ধন্যবাদ! কিন্তু সত্যি বলছি মিঃ গুহ, আপনি যে জীবন-যাপন করছেন বা করবার চেষ্টা করছেন, তা' অত্যন্ত অস্বাভাবিক। রুবিকে যদি আপনার পছন্দ না হয়ে থাকে, তাহলে ডরিস-এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব?

অসহিষ্ণু ভাবে প্রদীপ জবাব দিল, তোমার রুবি, ডরিস কাউকেই আমার প্রয়োজন নেই, ছবি! আমি যেমন আছি, তেমনি থাকতে দাও।

—আপনার যা অভিরুচি! আমি অবশ্য আপনার ভালর জন্যই বলেছিলাম।

—এবার আমার ধন্যবাদ দেবার পালা। শত-সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তার পর প্রশ্ন করল, আজ তোমার কি প্রোগ্রাম? লাঞ্চের পর সমুদ্র-স্নান, তার পর বেশ পরিবর্তন করে ঘুরে বেড়ানো, ডিনার খাওয়া এবং পরিসমাপ্তি নাচঘরে?

—আজ এই প্রোগ্রাম একটু বদল করতে ইচ্ছে হচ্ছে। সমুদ্র-স্নানটা বাদ দিতে চাইনে, কারণ ওটা আমি সত্যি ভালবাসি, তার পরে বেশ পরিবর্তনও করব, তবে ভাবছি আজ আপনার স্কন্ধে আরোহণ করব কি না। আপনি সেদিন লাঞ্চ-এ নেমন্তন্ন করেছিলেন, গ্রহণ করতে পারিনি, তার বদলে আজ আমাকে ডিনারে নিয়ে যাবেন, মিঃ গুহ?

—তুমি আসবে? আমি খুব খুসী হ'ব। সাগ্রহে প্রদীপ বলল।

সন্ধ্যার একটু পরে তারা দু'জনে মিলিত হ'ল কার্ণিভাল ষ্ট্যাণ্ড-এর বাইরে।

প্রদীপ বলল, এবার তোমার হুকুম করবার পালা। এই সন্ধ্যা এবং রাতটা সম্পূর্ণ তোমার, তুমি যে অভিলাষ প্রকাশ করবে তা' আমি পূরণ করতে চেষ্টা করব, সাধ্যমত।

—সত্যি বলছেন? ছবি একটু যেন গম্ভীরভাবেই বলল।

—সত্যি বলছি।

—নাঃ, আপনাকে বিপদে ফেলবার ইচ্ছে আমার নেই। আমার দাবী খুবই সামান্য এবং সাধারণ। প্রথমে চলুন কার্ণিভ্যালে, তারপর কোথাও খেতে যাব, তারপর সমুদ্রতীরে খানিকটা ভ্রমণ, তারপর স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান এবং নিদ্রা।

—তথাস্তু। প্রদীপ বলল।

তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলল, আমাকে তুমি মিঃ গুহ ব'লে সম্বোধন করে আসছ, সম্বোধনটা বদলাতে পার না?

—কি ভাবে বদলাব বলুন ত? আপনার নামটা যে ভুলে গেছি, আপনাকে মিঃ পি, গুহ বলেই জানি!

ছবির কথার মধ্যে যেন একটা পরিহাসের সুর।

—আমার নাম তুমি নিশ্চয়ই জানো, এখন ভুলে যাবার ভাণ করছ। যাই হোক, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমার নাম প্রদীপ।

—ওঃ হো, এবার মনে পড়েছে। কিন্তু আপনাকে নাম ধরে ডাকতে কিছুতেই পারব না, মিঃ গুহ এই সম্বোধনটাই আমার মুখে বেশী শোভন হবে।

—আমি বুঝতে পারলাম না, ছবি!

—সব জিনিষই যে বুঝতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? না বোঝার আনন্দটাই একটু উপভোগ করুন না কেন?

তারপর চপল হাসি হেসে বলল, যত সব সীরিয়স আলোচনা করে আজকের এই সন্ধ্যাটা আপনি মাটি করে দিচ্ছেন। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না—চলুন, কার্ণিভ্যালের টিকিট কিনে নিয়ে আসুন।

কার্ণিভ্যালের ভেতরে গিয়ে ছবি হ'য়ে উঠল চঞ্চল, উচ্ছল, দুরন্ত। প্রদীপকে টেনে নিয়ে সে চলল এক ব্যুথ থেকে অন্য ব্যুথ-এ, প্রদীপকে বাধ্য করল তার হয়ে বাজি খেলতে, মৎস্যরাণী দেখবার জন্য লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নানারকম পরিহাস ক'রে প্রদীপকে সে করে তুলল উদ্ব্যস্ত। প্রদীপ পুরুষ মানুষ, তার উচিত নয় একজন মেয়ের সঙ্গে মৎস্যরাণী দেখা, তবু ছবি তার সঙ্গে এসেছে নির্ভয়ে, কারণ সে জানে প্রদীপের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে অন্য দিকে! তারপর তারা দু'জনে চড়ল নাগরদোল'য়, নেমে যখন এল তখন ছবির মাথা ঘুরছে, কিন্তু তবু তার ক্লান্তিবোধ নেই!

পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সমুদ্রের তীরেই এক রেস্তঁরায় ডিনার খেল, তার পর বেরিয়ে এল ভ্রমণে।···চারদিকে যুগল মূর্তি, হাতে হাত ধরে চলেছে, হয়ত একটু থেমে কয়েক মিনিটের জন্য পরস্পরকে চুম্বন বা আলিঙ্গন করছে, হাসছে গান করছে মনের আনন্দে। মাঝে মাঝে প্রদীপ বেশ একটু লাল হয়ে উঠ্‌ছিল, কিন্তু ছবির ভ্রূক্ষেপ ও নেই। যেন সে সম্পূর্ণ অন্য পৃথিবীর মানুষ, এই পৃথিবীর নরনারীর হাস্যলাস্য যেন তার বোধশক্তির বাইরে।

হাঁটতে হাঁটতে তারা দু'জনে এসে পড়ল প্রদীপের বোর্ডিংহাউস-এর কাছাকাছি। প্রদীপ প্রশ্ন করল, ক্লান্ত লাগছে কি, ছবি?

—একটু।

—আমার বোর্ডিংহাউস খুবই কাছে, একটু বিশ্রাম করবে?

—বেশ ত, চলুন না!

প্রদীপের পেছনে পেছনে ছবি ঘরে ঢুকল। ঢুকেই বলল, উঃ, কি গরম!···ব'লে সে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল।

প্রদীপ বলল, বসো।

ঘরে ছিল ছোট একটা ঈজিচেয়ার। ছবি সেখানে এলিয়ে দিল তার যৌবনদীপ্ত দেহ। আঁটসাট বাঁধুনীর ভেতর দিয়ে ফুটে উঠল প্রস্ফুটিত ফুলের সৌন্দর্য, প্রদীপ যেন আঘ্রাণ করল, অনাস্বাদিতপূর্ব আদিম এক সৌরভ।

প্রদীপ বলল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, ছবি ?···সঠিক জবাব দেবে ?

মিমীলিত চোখে ছবি জবাব দিল, প্রশ্ন করুন, সম্ভব হ'লে জবাব দেব।

—নবকিশোরের কোন খবর পাও ?

নবকিশোরের নাম উল্লেখে ছবি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে বসল। বলল, এ প্রশ্নের অর্থ ?

—অর্থ বিশেষ কিছু নেই, শুধু কৌতূহল।

—আপনার কৌতূহল মেটাতে আমি অক্ষম, মিঃ গুহ।

প্রদীপ চুপ করে রইল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, আর কোন প্রশ্ন তোমায় করব না, ছবি! শুধু তোমাকে জানাতে চাই যে, সেদিন মোমিনপুরে আমি নিজের উপর কন্‌ট্রোল হারিয়ে ফেলেছিলাম।··· আমার ব্যবহারের জন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত, আমাকে ক্ষমা করো।

ছবি কোন কথা বলল না, চোখ বুজে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসে রইল।

ছবির এই নীরবতা প্রদীপকে ক'রে তুলল ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত। সে হঠাৎ চেয়ারটার হাতলের উপর এসে বসল এবং এক হাত দিয়ে ছবির মুখখানা টেনে নিয়ে তার রক্তিম অধরের উপর এঁকে দিল গভীর চুম্বন।

মুহূর্ত্তের জন্য। ছবি সোজা উঠে দাঁড়াল, রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল, আপনার স্পর্দ্ধা ত কম নয়, মিঃ গুহ! আমার সরল ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে আমাকে ঘরে এনে অপমান করলেন!

—অপমান ? আমি ত তোমাকে অপমান করতে চাইনি, ছবি!

অপমান ছাড়া এ আর কি? তীব্র ভাবে ছবি বলল। আপনি মনে করেন আমি হচ্ছি পুরুষের খেলার পুতুল, যখন যে আমাকে একটু স্নেহসূচক কথা বলবে, একটু আদর করবে, আমি তখুনি হব তার শয্যাসঙ্গিনী! আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মিঃ গুহ, আমারও একটা সত্তা, একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যার তার আহ্বানে আমি সাড়া না-ও দিতে পারি!

—আমি ভুল করেছি, ছবি! কাতর ভাবে প্রদীপ বলল।

—ভুল বললে একে অনেক লঘু করে দেখা হবে, মিঃ গুহ! প্রথম যেদিন মোমিনপুরের ফ্ল্যাটে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তখন আপনি এমন ভাব দেখালেন যে আমি মনে করলাম আপনার মত সদাশয়, মহৎ ব্যক্তি আর হয় না। তারপর আপনি আপনার বন্ধুর ঘাড়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব চাপিয়ে সরে পড়লেন, একবারও ভেবে দেখলেন না, যার উপর দায়িত্ব চাপালেন সে তা গ্রহণ করবার উপযুক্ত কি না। তারপর যা অবশ্যম্ভাবী তাই হ'ল, আর তখন আপনি এলেন আপনার মহৎ বিরক্তি প্রকাশ করতে। অন্যের জীবন আপনার খুশী এবং খেয়াল মত চলবে না, চলতে পারে না, মিঃ গুহ!

—তোমার জীবন আমার খুশী অথবা খেয়াল মত নিয়ন্ত্রিত করতে চাইনি, ছবি!

—আপনি থামুন। তারপর হঠাৎ এখানে ব্রাইটন-এ হল দেখা। আমার উচিত ছিল আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করা, কিন্তু ভাবলাম, বিদেশে আমরা দু'জন বাঙালী, আগের পরিচয়ও আছে, কি প্রয়োজন অতীতের জের টেনে আনার? তাই আপনার সঙ্গে মিললাম। প্রথম থেকেই লক্ষ্য করলাম আমার বিগত জীবন সম্বন্ধে আপনার অদম্য কৌতূহল, ব্রাইটন এ আমি একা এসেছি না অন্য কেউ আমার সঙ্গে এসেছে, এই হল আপনার প্রথম প্রশ্ন। কোন অধিকারে আপনি আমার ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পান? মিঃ গুহ! তা ছাড়া আপনার মত নারীবুভুক্ষু পুরুষমানুষদের চিনতে আজকাল আমার দেরী হয় না। তাই খুবই চেষ্টা করলাম আপনাকে আমার দু'-চারজন বন্ধুর সঙ্গে ভাব করিয়ে দিতে, কিন্তু তাদের আপনার মনে ধরল না, তারা আপনার মত intellectual এর যোগ্য সঙ্গিনী নয়! নিজেকে প্রতারণা করবেন না। মিঃ গুহ, আপনি বুদ্ধিসম্পন্না সঙ্গিনী চান না, আপনি চান আমার, বন্দনা দেবীর মত সঙ্গিনী। যাদের বুদ্ধি হয়ত খানিকটা আছে, কিন্তু তা ছাড়াও আছে উত্তপ্ত দেহ, উদ্ধত বুক, রসসিক্ত ঠোঁট। এর জন্য আপনাকে দোষ দিচ্ছি না, কারণ এ চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পেতে হলে পাবার যোগ্য হ'তে হয়। আপনার না আছে সরল ব্যবহার, না জানেন টেকনিক!

ব'লে ছবি হাঁপাতে লাগল। অনেক দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে সে ক্লান্ত, অবসন্ন বোধ করল।

লজ্জায়, অপমানে প্রদীপ মাথা নীচু করে রইল।

কোটটা পরতে পরতে ছবি বলল, অনেকগুলো অপ্রিয় কথা আজ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মিঃ গুহ! এর জন্য ক্ষমা চাইব না, বরং প্রার্থনা করব ভগবান যেন আপনাকে আপনার মনের গোলক-ধাঁধার হাত থেকে মুক্তি দেন।···না, আপনাকে আমার সঙ্গে আসতে হবে না, আমি পথ চিনে নিজেই যেতে পারব। নমস্কার।

[ ক্রমশঃ।

## Stone two, please, Nurse!

Brain operations were performed by cavemen. Several Stone Age skulls in which holes had been drilled with flint or iron instruments, and primitive forms of iron drills, have been found. There is no evidence to show whether many of these operations were successful. But some of them, by nature of the appearance and location of the holes, may have been quite successful.

—*Sir Geoffrey Jefferson*

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত
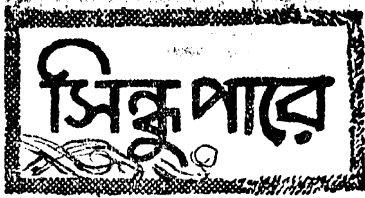
## ঊনিশ

কিছুদিন পরের আর একখানা চিঠি।

প্রিয়তম বিকো! রোলাণ্ড আজ-কাল প্রায় রোজই যাতায়াত সুরু করেছেন। মার দিক দিয়ে আদর-যত্নের ত্রুটি নেই—মার মনের আনন্দও যেন আর ধরে না! মার মেয়ের মনের খবরটি যদি চাও ত বলব—সেটি নিবিড় মনের গোপন কথা, চিঠিতে প্রকাশ করা চলে না। তাই সামনের ২৭ তারিখে তিন দিনের জন্য ত তোমার এখানে একবার আসার কথা। যদি ঠিক আসত মুখে বলব। ২৭ তারিখের জন্য ঘর রাখতে আমি জর্জ হোটেলে বলে রেখেছি।

আজ, আমি ও মা মিঃ রোলাণ্ডের মোটরে করে উইসবীচ বেড়িয়ে এলাম। বেড়িয়ে ফিরে এলাম—বিকেল ৫টায়। এখন রাত দশটা—যেমন রোজই করি, মাকে উপরে শুইয়ে দিয়ে এসে, নীচে বসে তোমাকে চিঠি লিখছি।

মিঃ রোলাণ্ড, অনেক দিন ধরেই মোটরে আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলছেন। মা অবশ্য গোড়া থেকেই রাজী কিন্তু আমি এত দিন মত দিই নাই। মত দিই নাই, তার অন্যতম কারণ—আমার লজ্জা করে। একে ত অত বড় একখানা গাড়ী রোজই আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ায়—পাড়ার লোকেরা চেয়ে চেয়ে দেখে—ভাবতে আমি যেন লজ্জায় মরে যাই। তার উপর যদি গাড়ী করে আবার বেড়াতে বেরুই সবাই চেয়ে চেয়ে দেখবে—ছিঃ ছিঃ, ভাবতে আমার মন কিছুতেই সায় দেয়নি। তাছাড়া আমার মনের দিক দিয়ে অন্য বাধাও ছিল—চিঠিতে সেকথা নাই বা বললাম। মিঃ রোলাণ্ড লোকটি সত্যই বড় ভদ্র। আমার তেমন ইচ্ছে নেই—লক্ষ্য করলেই আর পেড়াপীড়ি করেন না।

কিন্তু ক্রমে লক্ষ্য করলাম—মোটরে বেড়াতে যেতে আমার অনিচ্ছা দেখে মা মুষড়ে পড়ছেন। কথায় কথায় বুঝলাম—একদিন মিঃ রোলাণ্ডের মোটরে উইসবীচে বোনের কাছে বেড়িয়ে আসার তার বিশেষ সখ। জান ত বোনের কাছে যেতে পেলে মা আর কিছুই চান না। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত এক দিনের কড়ার করে মত দিলাম।

তোমার কথাটি কানে বাজছে। মুখ গম্ভীর করে বলছ—তা তার মুখ চেয়ে মাকে সর্ব্বাঙ্গীন খুসী করলেই ত সর্ব্ব দিক রক্ষা হয়। উত্তরে শুধু এইটুকু বলতে চাই—সর্ব্বদিক রক্ষা করা যে আমার স্বভাব নয়। একটা দিক নিয়েই হাবুডুবু খেয়ে মরি।

মত দেওয়ার আমার আর একটু কারণও ছিল। বারবারা এখন মার কাছে উইসবীচে আছে। থর্ণিতে হোটেল-প্রাঙ্গণে নতুন কটেজ তৈরী হচ্ছে ওদের জন্য। তৈরী হলে বারবারা সেখানে গিয়ে থাকবে। মঙ্কটন অবশ্য থর্ণিতেই থাকে—প্রায়ই আসে উইসবীচে। বিয়ের পরে বারবারার ধরণ-ধারণ কি রকম হল দেখতে একটু কৌতূহলও হয়েছিল মনে। তাই শেষ পর্য্যন্ত মত দিলাম।

ব্রেকফাষ্ট খেয়ে আমরা রওয়ানা হই—লঞ্চ খাই উইসবীচে গিয়ে। মাসী মিঃ রোলাণ্ডের পরিচয় পেয়ে কি যে করবেন, যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। মিঃ রোলাণ্ডকে মাথায় তুলে রাখতে পারলে যেন বাঁচেন। বারবারাকে দেখে বড় মজা লাগল—আহ্লাদে যেন ভেঙ্গে পড়ছে। মনে মনে ভাবলাম—বারবারার উপরে ভগবানের আশীর্ব্বাদ আছে, নৈলে এত অল্পে এত খুসী হয়ে ওঠা—

মাসী সমস্ত দিন ধরে মিঃ রোলাণ্ডকে নিয়েই ব্যস্ত। কি যে লক্ষ্য করেছিলেন জানি না, আসার সময়ে আমাকে চুমো খেয়ে কানে কানে বললেন—"ভাগ্যবতী মেয়ে।"

ফিরে এসে আস-গাছতলায় খানিকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। বারে বারে মনে প্রশ্ন উঠল—সত্যিই কি আমি ভাগ্যবতী!

তোমার লীনা

চিঠিখানা পড়ে মনটা যে আমার খুব খুসী হয়ে ওঠেনি—লেখাই বাহুল্য।

* * * *

আরও বেশ কিছু দিন পরের আর একখানি—

প্রিয়তম বিকো! আজ বিকেলে আমার বুকের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল। এখন রাত প্রায় দশটা। প্রাণটা এখন অনেকটা শান্ত। তোমাকে বসে চিঠি লিখছি।

ইদানীং মিঃ রোলাণ্ডের ব্যবহারে আমি মনে মনে একটু বিব্রত হয়ে উঠেছিলাম। যদিও মুখে এত দিন কিছুই বলেননি, কিন্তু তাঁর এত দিন আমাদের বাড়ী যাতায়াতের কারণটা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। সেটা শুধু আমিই লক্ষ্য করিনি, মাও বুঝে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সেই মাসীর কথা—আমাকে অনবরত বোঝাতে লাগলেন যে শেষ পর্য্যন্ত ভাগ্যলক্ষ্মী আমার উপর যে এত প্রসন্ন হবেন, এটা আমার ছেলেবেলা থেকে কোনও দিনই তিনি ধারণা করেননি। শুধু তাই নয়, আরও বোঝালেন—বুড়ো বয়সে মৃত্যুর আগে তিনি অন্ততঃ আমার দিক দিয়ে একটা শান্তি নিয়ে মরতে চান। মার কথার মধ্যে যুক্তি অকাট্য—সেটুকু বুঝতে আমার দেরী হয়নি। কিন্তু বিকো! যুক্তিটাই ত জীবনের সব নয়। একে একটা ভারী মন নিয়ে ঘুরে বেড়াই, তার উপর ইদানীং এই সব ব্যাপারে আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

মিঃ রোলাণ্ডকে তুমি ভুল বুঝ না—সেই কথাটিও এইখানে বলে রাখি। এত দিন মিঃ রোলাণ্ডের সঙ্গে মিশে আমি মনে মনে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছি। শুধু মিষ্টভাষী এবং শিষ্টাচারীই নয় মিঃ রোলাণ্ডের একটি বিশেষ গুণ—অপরের মনকে তিনি একটা অকৃত্রিম সহানুভূতি দিয়ে মেনে নিতে জানেন। তাই সহজ মেলামেশা সত্ত্বেও এত দিন তাঁর কাছে এতটুকুও বিপন্ন বোধ করিনি। ব্যবহারে কোনও দিক দিয়ে এতটুকু অসঙ্গতি কোনও দিন লক্ষ্য করিনি। কিন্তু ইদানীং? ইদানীং তাঁর কি হল? তিনি কি আমার মনটাকে আর মানতে রাজী নন? কিংবা আমার মন তিনি কি ঠিক বুঝতে পারেননি? অসাধারণ বুদ্ধিমান ত তিনি?

এক একবার ভেবেছি, তাঁকে ডেকে বলি—আমাকে আর
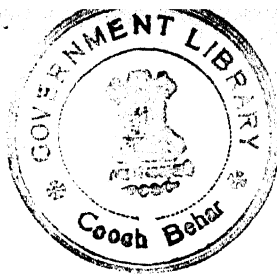
বিব্রতের মধ্যে ফেলবেন না। বলি—আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আপনাকে ঠকাতে চাই না। আমি জীবনে অন্য কোনও পুরুষের বুকে আশ্রয় নিতে পারব না—ভাবতেও আমার শরীর শিউরে ওঠে। ভেবেছি—রোলাণ্ডের মতন লোক, আমার মনের কথাটি শুনলে নিশ্চয়ই আমাকে দেবে মুক্তি। কিন্তু বলি বলি করেও এত দিন বলা হয়নি—গায়ে পড়ে বলিই বা কোন্ লজ্জায় ?

আজ মিঃ রোলাণ্ড বিকেলের দিকে এসেছিলেন। চা খেতে খেতে বললেন যে, তিনি পরশু দিন এ অঞ্চল ছেড়ে মাস খানেকের জন্য বাইরে যাচ্ছেন। বললেন—তাঁর যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছে নাই কিন্তু কাজের চাপে না গিয়ে উপায় নাই। অনেক চেষ্টা করেছেন যাতে না গিয়ে চলে, কিন্তু হল না। মা-ও শুনে খুব দুঃখিত হলেন। বললেন, তুমি চলে গেলে তোমাকে আমরা সব সময়ই হারাব।

আমার দিকে একবার চেয়ে মাকে বললেন, আমার মনটা পড়ে থাকবে আপনাদের কাছে। আপনাদের এখানে এলে, যে কী আনন্দ পাই আপনারা বোধ হয় তা ঠিক জানেন না।

ইদানীং মিঃ রোলাণ্ডের মুখে এই ধরণের কথা সুরু হয়েছে। আগে এ ধরণের কথা মিঃ রোলাণ্ড একেবারেই বলতেন না।

মা বললেন, বাবা ! তোমাকে ত আমরা একেবারেই আর পর মনে করি না। তুমি যে এখন আমাদের ঘরের একজন।

একটা কাজের ছুতো করে উঠে পড়লাম। উঠে বাড়ী ছেড়ে সোজা চলে গেলাম—অ্যাস গাছতলায়। নিজেকে একটু আড়াল করে রইলাম গাছতলায় বসে। কিন্তু হায় রে ! সেখানেও নিস্তার পেলাম না। একটু পরে মিঃ রোলাণ্ড স্বয়ং এসে হাজির হলেন সেখানে।

বললেন—আপনার মা ত ঠিকই বলেছেন। আমি ভাবলাম, হয়ত ঘরের কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তিনি বললেন—না, সে নিশ্চয়ই অ্যাস গাছতলায় গিয়ে বসে আছে, যাও না সেখানে। তাই এলাম।

কি আর বলি ! চুপ করে রইলাম।

শুধালেন, বসতে পারি ?

বললাম, বসুন না।

বিনা দ্বিধায় আমার পাশে বসে পড়লেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

—বললাম, বলুন।

শুধালেন, এই যে আমি পরশু চলে যাচ্ছি—এর কি কোনও মূল্য নাই আপনার মনে ?

কি বলি ? সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়—আমি ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। কিন্তু সেটা অত্যন্ত রূঢ় হবে। একটু ভেবে বললাম, আবার ত মাসখানেক পরে ফিরে আসবেন।

একটু হেসে বললেন, মাসখানেক সময়টা ত কম নয় !

চুপ করে রইলাম, কি আর বলি ? একটু পরে মিঃ রোলাণ্ড বললেন, মিস ফ্রেজার ! আজ গোটাকয়েক কথা আপনাকে বলতে চাই—যদি অনুমতি দেন। কথাগুলি না বলে আমি মনের শান্তি নিয়ে যেতে পারব না।

বুকটা কেঁপে উঠল। বলতেই হল, বলুন।

মিঃ রোলাণ্ড মাথাটা ঈষৎ নীচু করে আস্তে আস্তে বলে যেতে লাগলেন, আপনি বুদ্ধিমতী। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, আমি আপনাকে কি রকম ভালবাসি। এত যে ভালবাসা যায়—এর আগে কখনও টের পাইনি। কিন্তু আপনার মনে কোনও সাড়া জাগাতে পেরেছি কি না, আমি আজও বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ মিঃ রোলাণ্ড চুপ করে গেলেন। বুক ছাপিয়ে অনেক কথা উঠল—কিন্তু মুখে কোনও কথাই বলতে পারলাম না। একটু পরে মিঃ রোলাণ্ডই আবার বলতে লাগলেন, যদি সাড়া জাগাতে পেরে থাকি আজই আপনার কাছ থেকে বিবাহ-পণে আবদ্ধ হওয়ার সম্মতিটি নিয়ে যাব। আর যদি এখনও না পেরে থাকি, আমাকে সরলভাবে বলুন মিস ফ্রেজার ! আমি অপেক্ষা করব দিনের পর দিন, ধৈর্য ধরে ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে যদি কোনও দিন—

হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলাম, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ক্ষমা করুন মিঃ রোলাণ্ড ! আমি জীবনে বিবাহ করব না, করতে পারি না—

কেন জানি না—বুক ছাপিয়ে চোখে এল জল। পাছে মিঃ রোলাণ্ডের সামনে নিজেকে সামলাতে না পারি, এই ভেবে দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে—আমাকে ক্ষমা করুন—এই কথাটুকু বলেই চলে গেলাম বাড়ীর ভিতরে। সোজা গিয়ে শুয়ে পড়লাম—বিছানায়।

বিছানায় শুয়ে নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না—আকুল কান্নায় খানিকক্ষণ নিজেকে দিলাম ভাসিয়ে।

বিকো ! কেন এই কান্না ?

তোমার লীনা।

বুলা ! চিঠিখানা পড়ে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম। কই ! আনন্দে মনটা আমার উৎফুল্ল হয়ে উঠল না ত ?

* * * *

ক্রমে পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা পাশও করলাম। সংক্ষেপে বলে রাখি—M. R. C. P. পরীক্ষা দেওয়া আমার হয়নি—পাশ করলাম L. R. C. P. M. R. C. S. পরীক্ষা।

পরীক্ষা দেওয়ার কিছু দিন আগে ডডিংটন হাসপাতালে একখানা চিঠি লিখেছিলাম ডাঃ নায়ারের কাছে। পরীক্ষার পরে যদি কর্তৃপক্ষ আমাকে অন্ততঃ মাস তিনেকের জন্য হাসপাতালে আবার একটা চাকুরী দেন। যথাসময়ে জবাব পেলাম—তাঁরা সানন্দে আবার আমাকে হাসপাতালে গিয়ে যোগ দিতে অনুমতি দিয়েছেন। ডাঃ নায়ারের কাছ থেকেও একখানা চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন—প্রিয় ডাঃ চৌধুরী ! তোমার চিঠি পেয়ে এখানে আপাতত কোনও চাকুরী খালি নাই দেখে আমি গিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে তিন মাসের ছুটি চাইলাম এবং তোমার চিঠির কথা বলে, আমার অনুপস্থিতিতে তিন মাসের জন্য তোমাকে রাখার অনুরোধও জানালাম। কর্তৃপক্ষ প্রথমটা একটু গোলমাল করেছিলেন। যাই হোক শেষ পর্য্যন্ত রাজী হয়েছেন।

আমার ছুটি নেওয়ার দরকার হয়েছিল। কিছু দিন থেকে এখানে আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। এবং আমার পরীক্ষায় ভাল ভাবে তৈরী হওয়ার জন্য কিছু দিন লণ্ডনে গিয়ে বাস করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ইদানীং প্রায়ই মাঝে মাঝে অনুভব করেছি। তাই তোমার চিঠি পেয়েই ছুটি নেওয়া ঠিক করে

লাম। আশা করি, তোমার এসে কাজে যোগ দিতে কোনও
হবে না।

যদি তিন মাসের পরে আরও বেশী থাকতে চাও—আমাকে
মত জানিও। আমি ছুটি আরও বাড়িয়ে নেব। ভালবাসা
। তোমাদের কে, নায়ার।

চিঠিখানা পড়ে ডাঃ নায়ারের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা আরও গেল
। যাই হোক, পরীক্ষা দিয়েই চলে গেলাম ডডিংটনে। পরীক্ষার
ফল বেরুতে ত অন্তত মাস দেড়েক দেরী।

* * * *

দেখতে দেখতে ডডিংটনে পাঁচ মাসের উপর কেটে গেল। এল
ার দেশে ফিরে যাওয়ার দিনটি—২২শে অক্টোবর।

তিন মাসের জন্য ডডিংটন হাসপাতালে যোগ দিয়েছিলাম, তিন
ডডিংটনে কাটিয়ে দেশে ফিরে যাব—এই রকমই করেছিলাম ঠিক।
কি ফিরে যাওয়ার জাহাজ পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু
মাস কেটে যাওয়ার আগেই ডাঃ নায়ারের কাছ থেকে এক চিঠি
—তিনি আরও দু' মাসের ছুটি নিতে চান, যদি আমি ডডিংটনে
ও দু'মাস থাকতে রাজী হই। আমি যেন বেঁচে গেলাম। একটা
াধারণ উৎফুল্ল মন নিয়ে ডাঃ নায়ারের প্রস্তাবে রাজী হয়ে
ক্ষণাৎ জাহাজের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানালাম, জাহাজে আমার
যাওয়ার স্থানটুকু অন্তত: আরও মাস আড়াই পরে অন্য কোনও
াজে ব্যবস্থা করতে। যথাসময়ে চিঠির উত্তর এল—তারা আমার
রোধ রক্ষা করেছেন; ২২শে অক্টোবর টিলবেরী থেকে ছাড়বে
াজ—নাম China—সেই জাহাজে আমার বার্থ ঠিক করা
েছে।

ডাঃ নায়ারের চিঠি পেয়ে ফিরে যাওয়ার দিনটি পেছিয়ে
কেন যে এত উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম—সংক্ষেপে বলে
। বুলা! সরল ভাবেই বলি—তখন আমার যা মনের
, এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে আমার মন একেবারেই
নি। এই বছর দুয়ের মধ্যে আমার মনের শিকড় এমন
ভাবে এ দেশের মাটিতে বেঁধেছিল বাসা যে, এদেশ
ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতেই সমস্ত মনটা টন-টন করে
—মনে হত, মনটাই হয়ত যাবে ছিঁড়ে। এদেশের মাটির
বে জড়িয়ে ছিল মার্লিনের মনের নিবিড় অনুভূতির অপূর্ব্ব
তা।

অথচ একবার দেশে ফিরতেই ত হবে। একটা শুষ্ক কর্তব্যের
ান মনটাকে মাঝে মাঝে নাড়া দিত এবং তার উপর
চিঠির পরে চিঠি—বাবার যা শরীর, তিনি আর বেশী দিন
বেন না।—একবার যেতেই ত হবে। কিন্তু তবুও যতই যাওয়ার
টা এগিয়ে আসছিল ততই ক্রমে যেন অবসন্ন হয়ে এলিয়ে
ছিলাম। এমন সময় এল ডাঃ নায়ারের চিঠি। আমি যেন
ছেড়ে বাঁচলাম—আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে আমার
ঃ দু'মাস যেন পরমায়ু গেল বেড়ে।

অবশ্য আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলাম—ফিরে গিয়ে
ানেকের মধ্যে, আবার এদেশে আসব ফিরে। কিন্তু
জানি না, সে কথা ভেবে মনের মধ্যে একটা খুব জোর
লাম না। সেদিক দিয়ে আমার মনে যে কোনও
দ্বিধা বা সন্দেহ ছিল তা একেবারেই নয়। সে দিক দিয়ে
মন ঠিক করেই নিয়েছিলাম। কিন্তু তবুও—এখন ভাবি
আর মনে হয়, কথাটা ভেবে মনে যে কোনও জোর পাইনি,
আর প্রধান কারণ বোধ হয় মার্লিন কথাটার উপর কোনও
জোর দেয়নি। বারে বারে মার্লিনকে বলেছি—আমি ত বছর-
খানেকের মধ্যেই আসছি ফিরে। কিন্তু কথাটার ন্যায্য মূল্য
মার্লিনের কাছ থেকে আভাস-ইঙ্গিতেও কখনও পাইনি। আমার
মনের এ সংকল্পটি যে সে অবিশ্বাস করেছিল তা ঠিক নয়। বলেছিল
সে কথা আমাকে। কিন্তু কথাটা নিয়ে কই—কোনও উৎসাহের
সাড়া ত তার মধ্যে কোনও দিন জাগেনি!

* * * *

যাই হোক, দেখতে দেখতে দু'মাসের পরমায়ু আমার ফুরাল—
এগিয়ে এল ২২শে অক্টোবর। বুলা! আমার মনের অবস্থা যা
হয়েছিল আমি কি যে করে বসতাম জানি না কিন্তু দেশে ফিরে
যাওয়ার মনের জোরটুকু শেষ পর্য্যন্ত আমি যেন পেলাম—সেই
মার্লিনের কাছ থেকেই। একদিনের কথাবার্ত্তা একটু বলি—
কতকটা বুঝতে পারবে।

২২শে অক্টোবরের দিন চারেক আগেকার কথা। একদিন
বিকেলবেলা আমি ও মার্লিন বসে আছি মার্লিনদের বাড়ীর
পিছনের সেই অ্যাস গাছতলায়। মনে আছে দুজনেই
অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম—বোধ হয় বুকের ভারে মুখ
দিয়ে কারো কথা বেরুচ্ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত আমিই কথা
বললাম, লীনা!

খুব সংক্ষেপে উত্তর এল—উঁ।

বললাম—২২শে অক্টোবরের আর যে মোটে চার দিন বাকি—

আবার সংক্ষেপে উত্তর এল, জানি।

একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠলাম—না, না,
লীনা! আমি পারব না। কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে যেতে
পারবো না।

সোজা হয়ে উঠে বসল। চাইল আমার মুখের দিকে। বলল,
ছিঃ, তুমি এত দুর্ব্বল! আমি দুর্ব্বলতাকে ঘৃণা করি।

হঠাৎ মার্লিনের এ ধরণের কথায় একটু অবাক হলাম।
বললাম, কিন্তু—

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বেশ একটু জোরের সঙ্গে বলল—
যেতেই হবে তোমাকে। আর কিছুর জন্য না হোক, অন্ততঃ
তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধাকে অটুট রাখবার জন্য।

বোধ হয় একটু অভিমান ভরে বললাম, তুমি চাও আমি
চলে যাই—তাহলেই তোমার শ্রদ্ধা থাকবে অটুট?

ধীরে আমার হাত দুটি তুলে নিল নিজের হাতের মধ্যে।
ধীরে বলল বিকো! দেশে তোমার বাবা অসুস্থ—এখন তুমি
যদি আমার জন্য না যাও, আমি যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারব
না। সেদিক দিয়ে আমার মনটাকে বাঁচাও। আমার জন্য নিজেকে
ছোট করো না বিকো!

বললাম, তোমার জন্য না গেলে নিজেকে ছোট করা হবে—এ কথা
মানি না।

সে কথার উত্তর না দিয়ে, যেন একটু সান্ত্বনার সুরে আবার

বলল, বিকো ! তুমিই ত বারে বারে বলেছ—এক বছরের মধ্যে আবার ফিরে আসবে। এক বছর দেখতে দেখতে যাবে কেটে।

হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বললাম, এক বছর সময়টা কি কম নাকি ? তা-ও এ ইংল্যাণ্ডের এক বছর নয় লীনা ! সাত সমুদ্র তের নদীর পারের নতুন আবহাওয়ার এক বৎসর—উঃ, সে যে কত দিন আমি ত এখন ধারণাই করতে পারি না।

একটু চাপা রকমের হাসি উঠল। তার মধ্যে যে একটা করুণ সুর বেজেছিল, আজও মনে আছে।

* * * *

২২শে অক্টোবর। ভোর হওয়ার অনেক আগেই চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভেঙ্গে—কেন যে হঠাৎ এমন ভাবে ঘুম ভাঙ্গল—কিছুই যেন বুঝতে পারলাম না। মনের মধ্যে সবই যেন কেমন এলোমেলো—কিছুই যেন মনে পড়ছে না। হঠাৎ মনে হলো—আজ যে আমার এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার দিন।

বিছানা সংলগ্ন বৈদ্যুতিক আলোটি জ্বালিয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম—৬টা বাজতে ২৫ মিনিট বাকী। বাইরে তখনও অন্ধকার। ৮টা ৫ মিনিটে মার্চ্চ থেকে আমার ট্রেণ ছাড়বে। সাড়ে বারোটা নাগাদ ট্রেণ পৌছবে লণ্ডনে ! সেখানে ষ্টেশন বদল করে টিলবেরী ট্রেণে উঠতে হবে—ছাড়বে ছ'টোয়। সাড়ে চারটার মধ্যে টিলবেরী ঘাটে জাহাজে উঠতে হবে। ৫টায় জাহাজের দরজা যাবে বন্ধ হয়ে। জাহাজ চলে যাবে ইংল্যাণ্ডের মাটির স্পর্শ ছেড়ে দূরে।

ডাঃ নায়ার বলেছিলেন, এত শেষ মুহূর্ত্তে যাওয়াটা ঠিক নয়—একদিন আগে যাও।

কিন্তু একদিনের মূল্যটা তখন আমার জীবনে যে কতখানি, ডাঃ নায়ার তা কি করে বুঝবেন। হাসপাতালেই আছি। হাসপাতালের কাজ অবশ্য আমার দিন দশেক আগে ফুরিয়েছে, ডাঃ নায়ার এসে কাজের ভার নিয়েছেন। তবুও আমি হাসপাতালেই আছি, এ ক'টা দিন হাসপাতালে থাকার অনুমতি আমাকে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। ফিরে যাওয়ার সব বন্দোবস্তই একেবারে পাকা। এখন ৬টা বাজতে ২৫ মিনিট বাকী—৭টা ২০ মিনিটে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াবে হাসপাতালের দরজায়, ৬টার সময় চা' নিয়ে এসে আমার ঘুম ভাঙাবে।

চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইলাম—মনটা যে একেবারে অসাড়। কোনও আনন্দ ত নাই-ই—কোন বেদনাও টের পেলাম না। অলস অবশ, যেন এতটুকুও নড়তে পারে না।

ক্রমে মার্লিনকে নিয়ে মনটা গেল ভরে। কাল রাত্রে মার্লিনের সঙ্গে শেষ বিদায়ের পালাটি মনে পড়ল। কাল রাত্রে মার্লিনের মা আমাকে খেতে বলেছিলেন, অনেক রাত পর্য্যন্ত ছিলাম সেখানে। বিদায়ের সময় মার্লিনের হাত দুটি ধরে বলেছিলাম—লীনা ! কাল তুমি ষ্টেশনে আমাকে পৌছে দিতে যাবে ? ট্যাক্সিতে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব। সেই ট্যাক্সিই তোমাকে পৌছে দেবে বাড়ীতে।

সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল, না।

আবার বলেছিলাম, বেশ ! তাহলে কাল ষ্টেশনে যাওয়ার সময় আমি একবার তোমাদের বাড়ী হয়ে যাব—তোমার মুখখানা যাব দেখে।

এবারও সংক্ষেপে কিন্তু একটু জোরের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল—না, না।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কেন ?

একটু চুপ করে থেকে আমার বুকের উপর মাথাটি রেখে আবার বলেছিল—না বিকো, না।

একটু অভিমান হয়েছিল কি ? মনে নাই। বলেছিলাম, বেশ। আসব না।

ক্রমে বিছানায় শুয়ে শুয়েই কাল রাত্রের সমস্ত খুঁটিনাটি মনে পড়তে লাগল। মার্লিনের প্রত্যেক ব্যবহার, প্রত্যেক কথাটি একে একে এল মনে। কিন্তু কই ? কোনও ব্যবহারে, কোনও কথার মধ্যেই ত এমন কিছু খুঁজে পেলাম না, যাতে করে আমি চলে যাওয়ার দরুণ মার্লিনের মনের নিবিড় বেদনাটির কোনও আভাস পাই। বেশ স্বাভাবিক ধরণ-ধারণ ছিল তার কাল রাত্রে—বেশ সহজ সরল কথাবার্ত্তা। তবে কি—

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। খেতে বসে কাল রাত্রে মার্লিন কিছুই খেতে পারেনি। মার্লিনের মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুই কিছুই খাচ্ছিস না কেন মার্লি ?

সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল, ক্ষিদে নেই। সেটা কি—

হঠাৎ দরজার করাঘাতে চমক ভাঙ্গল। চা নিয়ে পরিচারিকা ঢুকল ঘরে। ঘড়িতে দেখলাম—ঠিক ৬টা।

* * * *

তৈরী হয়ে, হাসপাতালের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে এলাম হাসপাতালের সম্মুখের প্রাঙ্গণে। ঘড়িতে দেখলাম—৭টা বেজে ৩ মিনিট। ঠিক সময় আছে হাতে, একটুও বেশী নাই। মার্চ্চ ষ্টেশনে যেতে ২৫ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না। গগনে সবে উষার আভাস লেগেছে। বোধ হয় আকাশে মেঘ ছিল। একটা জলোহাওয়ার কনকনে পরশ লাগল গায়ে—এ যে ইংল্যাণ্ডের নিজস্ব।

জিনিষপত্র আগেই ট্যাক্সিতে তোলা হয়েছিল। ডাঃ নায়ার প্রভৃতি ২।৪ জন ট্যাক্সির কাছে আছেন দাঁড়িয়ে। আমি ট্যাক্সিতে উঠতে যাচ্ছি—হঠাৎ দেখতে পেলাম—টম্ ছুটে আসছে রাস্তা থেকে হাসপাতালের প্রাঙ্গণ বেয়ে ট্যাক্সির দিকে। এগিয়ে গেলাম। টমের হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, কি খবর টম ?

টম তখনও হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, মার্লি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে—কিছুতে জ্ঞান হচ্ছে না।

দ্বিতীয় কথা না বলে তাড়াতাড়ি হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে হার্টের কয়েকটা জরুরী ইনজেকসান সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সিতে এসে উঠে বসলাম। টমকে তুলে নিলাম ট্যাক্সিতে। ড্রাইভারকে বললাম, চল—সাংভেল গ্রাম।

ড্রাইভার একটু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে শুধাল, সাংভেল—স্যর ?

বললাম, হ্যাঁ—শীঘ্র চল।

চলল ট্যাক্সি। আমি বা টম্ কারও মুখে কোনও কথা নাই। হঠাৎ টম শুধাল, বেঁচে আছে ত ? বুকটা কেঁপে উঠল—মার্লিনের হার্টের অবস্থা ত আমি জানি।

* * * *

ক্রমে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল মার্লিনদের বাড়ীর সামনে। বাড়ীর দরজা খোলাই ছিল, আমি ও টম তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে

বসবার ঘরে ঢুকে দেখি, মার্লিন মেঝেয় কার্পেটের উপর অজ্ঞান অবস্থায় আছে পড়ে, মা পাশে স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে বসে আছেন। আমাকে দেখে কি যেন একটা বলতে গেলেন—কথা যেন গলা দিয়ে বেরুল না।

মেঝেয় মার্লিনের পাশে বসে মার্লিনকে একটু পরীক্ষা করে একটা ইনজেকসান দিলাম এবং আমার নির্দ্দেশ মত টম ঠাণ্ডা জল চোখে মাথায় দিতে লাগল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান এল ফিরে। আমার দিকে চোখ পড়তেই খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে রইল চেয়ে। তারপর চোখ বুজে গেল। লক্ষ্য করলাম—ধীরে ধীরে জল চোখের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

* * * *

কিছুক্ষণ পরে, মার্লিন খানিকটা সুস্থ হলে, মার্লিনকে ধরে নিয়ে গিয়ে উপরে শোবার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ইতিমধ্যে ওদের বাড়ীর ডাক্তার—ডাঃ মেননও এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শর ফলে আরও একটা ইনজেকসন দেওয়া হল। মার্লিনের মাকে ভয়ের কোনই কারণ নেই বলে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

উপরে বিছানায় শুইয়ে মার্লিনের পাশে বসলাম—মার্লিনের একখানি হাত তুলে নিলাম হাতে। বললাম, ভয়ের কিছু নেই লীনা! এটা হঠাৎ একটা অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার ফল।

ধীরে শুধাল, তোমার ট্রেণ কখন?

বললাম—আমার ট্রেণ চলে গিয়েছে। যাওয়াটা কিছু দিন পেছিয়ে দিলাম। তোমাকে এ অবস্থায়—

আবার চোখ বুজে গেল। বললাম, এইবার তুমি একটু ঘুমোও। এখন তোমার ঘুমান দরকার।

ইনজেকসানের ফলে কি না জানি না—সত্যই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মার্লিন যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ক্রমে মার্লিনের মা এসে ঢুকলেন ঘরে। ইসারায় তাঁকে কোনও কথা বলতে বারণ করলাম।

* * * *

কিছুক্ষণ পরে একা এসে নিরিবিলি বসলাম—মার্লিনদের বাড়ীর পিছনে অ্যাস গাছতলায়। কেন চলে এলাম, তার কারণ, মার্লিন ঘুমিয়ে পড়লে তার ঘরে বসে মনটা ক্রমেই বড় অশান্ত হয়ে উঠল। যেন তাকে নিয়ে আমার একটু নিরিবিলি থাকা দরকার। কেন যে মনটা ওরকম অশান্ত হল—বলতে পা'রি না।

অ্যাস গাছতলায় বসে সামনের দিকে চুপ করে রইলাম চেয়ে। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত দু'-চারটে গাছের নীচে ধূ-ধূ খোলামাঠ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, এবং তার মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে একটি রেলের লাইন—কোথায়! কত দূরে! রেলের লাইনটির দিকে চেয়ে, কেন জানি না, হঠাৎ মনে পড়ে গেল লণ্ডনে ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে ইংল্যাণ্ডের সেই প্রথম রাত্রি যেদিন ট্রেণ থেকে এসে নেমেছিলাম 'আমি ও চন্দ্রনাথ। কোথায় ছিল তখন আমার জীবনে মার্লিন—যার জন্য আমার জীবনটা এই দুই বছরের মধ্যে ওলট-পালট হয়ে গিয়ে আজ আমার দেশে ফিরে যাওয়া হল বন্ধ—কে জানে, হয়ত কোনও দিনই আর যাওয়া হবে না!

জীবন-লীলায় এ কী রহস্য! [ ক্রমশঃ

# লীনাকে

বিদ্যুৎকুমার দে-রায়

একবার মনে করো প্রথম যৌবন
উন্মত্ত পৃথিবী যবে আগন্তুক দ্বারে :
হয়তো তন্দ্রার মত চোখের ইশারা
ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাবে সবুজ পাহাড়ে।

একান্ত স্বপ্নের ঢেউ নিছক বর্ণনা
মনে হবে, তবু ভাবো চিন্তার খেয়ালে
চেনা-মুখ ভুলে গিয়ে আবার অতীত,
বিবর্ণ স্মৃতির ধোঁয়া আছে ছাখো গালে।

ঝড়ের পাগল মন খোলা এলোচুল,
হয়তো বা ভূমিকম্প—খুলেছ জানালা
নিবিড় পাখীর মত নীরব প্রহরে
ভাষা ছাড়া গাঁথা হ'ত কথিকার মালা।

মাকড়সা অন্ধকার, কান পেতে শুনি
তোমার বুকের মাঝে গাঢ় অনুভূতি;
সংগ্রাম ভূমিকা জাগে সবুজ ফসলে—
একবার ভাবো সেই গভীর বিস্মৃতি।

প্রশান্ত চৌধুরী

১০

'মিনার্ভায় লগুভগু'!
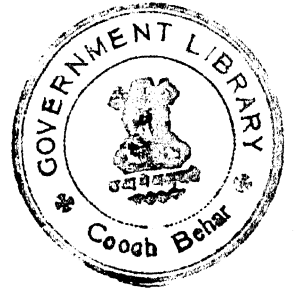
গল্প বলছিলেন নকুল ঘোষাল। প্রাচীন ব্যক্তি। বয়েস পঁচাত্তর। চিরকাল নাটকে চাকর সেজে এসেছেন। একবার বুঝি কোন্ নাটকে কার বদলে মন্ত্রী সেজেছিলেন। রাজা যেই ডাক দিলেন,—'মন্ত্রি'! নকুল বাবু চিরকালের অভ্যাসমতো সাড়া দিলেন, —'এজ্ঞে যাই।' মন্ত্রিত্বের সেইখানেই ইতি। তারপর আবার সেই নফরত্ব। নিরবচ্ছিন্ন দাসত্ব করে চলেছেন থিয়েটারে তা' বছর ষাটেক হবে। আমার নাটকেও বুড়ো চাকরের পার্ট পেয়েছেন। প্লে করেন, আর উইংশের ধারে কাঠের সিন্দুকের ওপর উবু হয়ে বসে বিড়ি টানেন। মাইনে পান মাসে তিরিশ টাকা।

সেই বৃদ্ধ নকুল ঘোষালকে ঘিরে স্টেজের পিছন দিকের চাতালে গল্প জমিয়েছে ছেলে-ছোক্‌রার দল। অমূল্য বাবুর পোষাক-ঘরের ডেক্‌চেয়ারে শুয়ে শুনতে পাচ্ছি নকুল বাবুর কণ্ঠস্বর।

বুঝলে কাণ্ড! সকালবেলা কলকাতার লোকেরা সব ঘুম থেকে উঠে দেখলে, শহরের দেওয়ালে-দেওয়ালে মস্ত-মস্ত পোষ্টারে বড় বড় কাঠের টাইপে ছাপা রয়েছে,—'মিনার্ভায় লগুভগু' 'মিনার্ভায় লগুভগু!' সকলেই তো অবাক! এ ওকে শুধোয় ও' তাকে শুধোয়। ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা কি?—সন্ধ্যেবেলা ভিড় জমে গেল থিয়েটারের সুমুখে। 'লগুভগু'টা কী বস্তু?

বস্তুটা নিতান্তই সাধারণ;—'লণ্ডভণ্ড'। প্রেস-এ 'ণ্ড'-এর টাইপ না থাকায় গ-এ হ্রস্বউ দিয়ে কাজ চালাতে গিয়ে এই অবস্থা!

হো-হো কোরে হেসে উঠলো সবাই। হাসির শব্দটা মিলিয়ে যেতেই শুনতে পাওয়া গেল শিশিরের কণ্ঠস্বর: বলি, তাহলে আমার বেত্তান্ত শুন ভাই সকলে মন দিয়া।

হৈ-হৈ করে উঠল সকলে: সুরু হোক্ সুরু হোক্।

শিশির সুরু করল: হবে জোর বছর পাঁচেক। সক্কালবেলা শয্যাত্যাগ-করে চুমুক দিয়েছি সবে চায়ের গ্লাসে। হঠাৎ দেখি, সামনের বাড়ীর দেয়ালে মস্ত কাগজে লাল রঙে বড় বড় অক্ষরে লেখা,—'বাঙলার মেয়ে চরিত্রহীন!' পড়েই তো চায়ের গরম একেবারে মাথায় গিয়ে উঠল!—অহো স্পর্দ্ধা! বাঙলার নারীসমাজের প্রতি এত-বড় কলঙ্ক লেপন!—জাগিয়া উঠিল সুপ্তসিংহ নাড়িয়া কেশর মুহুর্মুহুঃ। বুক ঠুকে বলে উঠলুম,—'আমরা ঘুচাবো মা তোর কালিমা। মানুষ আমরা; নহি তো মেষ।'—কারা প্রচার করছে এই অভদ্র অসভ্য কলঙ্ক? কে তারা? কঃ নামঃ? কিং গোত্রঃ? কস্য ছেলে? কুত্র বাসা? আজি রণে শত্রু বধ প্রতিজ্ঞা আমার। তেড়ে ফুঁড়ে গায়ে সার্ট চড়িয়ে চোখে চশমা এঁটে বেরুতে যাব,—হঠাৎ মাথায় পুষ্পবৃষ্টি। (পাশের বাড়ীর ছাদ থেকে পুরুৎঠাকুর ঠাকুরঘরের বাসিফুল ফেলছিলেন!)—ভাই সব, সেই দ্বাপর যুগে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার সময় একবার পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল, আর সেই হল আমার প্রতিজ্ঞায় দ্বিতীয় বার। নিঃশ্বাস বন্ধ কোরে বুক ফুলিয়ে তাকালুম আর একবার সেই জঘন্য পোষ্টারের দিকে। তাকাতেই মুহূর্তে সমস্ত নিঃশ্বাস নিঃশেষ বেরিয়ে গিয়ে চুপসে কাগজ হয়ে গেলুম একেবারে! কেন বল দেখি ভাই সব?

ভ্রাতারা নীরব।

শিশির বললে: ভাই সব,—চশমা চোখে দিয়ে ভাল কোরে তাকিয়ে দেখি,—ওটা এক থিয়েটারের বিজ্ঞাপন। একই দিনে পর পর 'বাঙলার মেয়ে' আর 'চরিত্রহীন' দুটো নাটক প্লে হবে, তারই প্ল্যাকার্ড!

অট্টহাস্যে মুখর হয়ে উঠল সবাই।

জমে উঠেছে ওদের আড্ডা। সে-যুগ আর এক যুগের থিয়েটারের পাবলিসিটির কায়দা-কানুন নিয়ে সুরু হয়ে গেল আলোচনা। শিশির এ-যুগের মুখপাত্র, নকুল ঘোষাল ও-যুগের। এ-যুগের চেয়ে ও-যুগের প্রতিই দেখা গেল শ্রোতাদের আগ্রহটা অধিক। নকুল ঘোষালই প্রধান বক্তা হয়ে উঠলেন তাই 'শেষ পর্যন্ত'। শোনাতে লাগলেন সে-যুগের থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের সত্যকার ইতিবৃত্ত।

: তখন থিয়েটারের কত বড় বড় সব হ্যাণ্ডবিল বিলোনো হতো জান? এক একটা চার-পাঁচ ফুট লম্বা। পেতে দিলে তিন জন লোক দিব্যি পা-মুড়ে বসতে পারতো।

—একবার। বোধ হয় ১৯০৩ কি ১৯০৪ সাল হবে। আজকের ঐ মিনার্ভা থিয়েটার তখন ছিল ৺চুনীবাবুর হাতে। চুনী বাবু ছিলেন ৺দানী বাবুর মামাতো ভাই। মিনার্ভার তখন বড্ড সময় খারাপ। নাটক আর একটাও লাগছে না কিছুতেই। কি করা যায়? ও-দিকে বসুমতীর স্বর্গীয় উপেন মুখুজ্যের ঘরেও তখন জমে গেছে এক গাদা বই। মতলব এসে গেল মাথায়। হ্যাণ্ডবিল বিলোনো হল রাস্তায় রাস্তায়,—মিনার্ভায় থিয়েটার দেখতে এলে বিনি পয়সায় ফাউ দেওয়া হবে বসুমতীর গ্রন্থাবলী। কনট্রাক্ট হল,—টিকিট যা বিক্রি হবে,

অর্দ্ধেক টাকা ৺চুনী বাবুর, বাকি অর্দ্ধেক টকো ৺উপেন বাবুর।

: কি হল তার পর ?—কৌতূহলী হয়ে উঠেছে শ্রোতার দল।

: হবে আবার কি ?—হৈ-হৈ ব্যাপার! সারা বিডন ষ্ট্রীট একবারে লোকে লোকারণ্য। কাতারে কাতারে লোক আসে থিয়েটার দেখতে, আর যাবার সময় অতুল গ্রন্থাবলী, মাইকেল গ্রন্থাবলী, বঙ্কিম গ্রন্থাবলী, গিরিশ গ্রন্থাবলী বগলে করে বয়ে ফেরে। মিনার্ভা জাঁকিয়ে বসলো আবার থিয়েটারের আসরে।

: দ্যাখাদেখি আর কোন থিয়েটার এ মতলব নেয় নি ?—কে এক জন প্রশ্ন করলো।

: নেয় নি আবার ? ক্লাসিকের ৺অমর দত্তও সঙ্গে সঙ্গে সুরু করে দিলেন ঐ প্যাঁচ। তিনি গোড়ায় বিলোলেন কালী সিংহের মহাভারত, শেষকালে একেবারে 'শব্দকল্পদ্রুম' পর্য্যন্ত।

: যাকে বলে এক রাজকন্যার সঙ্গে অর্দ্ধেক রাজত্ব।—কে এক জন বলে উঠল।

: উঁহু, তুলনাটা ঠিক হল না। এ হচ্ছে যেন এক শিশি কামিনীকুসুম তেলের সঙ্গে যাদু-ই-রুমাল এবং ৩২৭ দফা পুরস্কার।

—গলাটা শিশিরের।

যাদু-ই-রুমাল ? সেটা আবার কী বস্তু ? প্রশ্ন করলে কে একজন।

যাদু-ই-রুমাল জানিস না ? কী রে ? -চেঁচিয়ে উঠল শিশির! তার পর প্রায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে জার্মান-কি-মলম্ বিক্রেতাদের ঢঙে ভঙ্গিতে সুরু করে দিলে: ভাই সব, পাঁজী জানতো সবাই ? পঞ্জিকা ? ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ? উল্টে যাও ভাই সব তার পাতা। উল্টে যাও 'বৃহৎ মূল্য', দু টাকায় জুয়েল ফিটেড হাইক্লাস রিষ্টওয়াচ। উল্টে যাও 'আসল সর্বশক্তি মহাকালী কবচ চমৎকার।' উল্টে যাও 'মোহিনী অঙ্গুরী', 'সিদ্ধ বশীকরণ কবচ'। উল্টে যাও 'মোকাব্দি এ দবা'। উল্টে যাও 'কুজোবাজা ভূগুমন্ত্রী'! উল্টে যাও সেই সালসা-ওয়া বীরের ছবি, যে বীর পায়ের তলায় চেপে রেখেছে পশুরাজ সিংহকে আর অবলীলায় কাঁধে তুলেছে হাতীকে; আর সেই গলায় ঢোলকের মতন মাদুলি-ঝোলানো তাকিয়ায় ঠেস দেওয়া রুগ্নের ছবি! থামো গিয়ে সেইখানে ভাই সব, যেখানে ঢপ কেত্তনের বইয়ের বিজ্ঞাপনের তলায় আছে এক ত্রিকালজ্ঞ মহামুনির ছবি। সেইখানে পাবে সম্মোহিত যাদু-ই-রুমাল বা বশীকরণ রুমালের সন্ধান। ভাই সব, দেবদূতদ্বয়কে বশীভূত করিয়া সম্মোহনবিদ্যার দ্বারা এই রুমাল প্রস্তুত, এক ফোঁটা কামিনীকুসুম তৈল এই রুমালে ফেলিয়া যাহার সম্মুখে এই রুমাল ধরিবে ভাই সব, সে যত বড় রূপসী হৃদয়হীনা এবং দাম্ভিকাই হউক না কেন, তোমার পদতলে সে লুটাইয়া পড়িবেই ভাই সব। তাহার সহিত যদি আবার যাদু-ই-চশমা ব্যবহার করো ভাই সব, তাহা হইলে সেই চশমার ভিতর দিয়া পৃথিবীর যে কোন রমণীর ছবি দেখিলেই তাহাকে—

আর শোনা গেল না। দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন অমূল্য বাবু বিরক্ত মুখে।

এ ঘরে আপনি বসে রয়েছেন,—কোন যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে ছেলেগুলোর!

এর মাসখানেক পরেকার ঘটনাটা মনে পড়ে যাচ্ছে এই ফাঁকেই, মাঝখানের অনেকগুলো ঘটনাকে ডিঙিয়ে।

রবিবার সেদিন। ডবল শো। তিনটের শো ভেঙেছে কিছুক্ষণ হল। ঝাড়ুদারের দল অডিটোরিয়াম ঝাঁট দিয়ে চিনেবাদামের খোসা সরাচ্ছে তখন। থিয়েটারের ভেতরকার চায়ের ষ্টলের হরি বাবু দুপুরের শো-এ কত আমদানী হল হিসেব করছেন দুলে দুলে, সামনে আধ পেয়ালা ধূমায়মান 'ডবল-হাফ' নিয়ে। থিয়েটার থেকে রবিবারে চার আনা কোরে জলপানি দেওয়া হয় সকলকে। সিফটার, ইলেক্‌ট্রিশিয়ান, মিউজিক হ্যাণ্ড থেকে একেবারে সেই কাটা সৈনিকদের পর্য্যন্ত সকলেরই বরাদ্দ এটা। কেউ তার ওপর দু-চার আনা পকেট থেকে দিয়ে খাচ্ছেন চিংড়ির কাটলেট, মোগলাই পরোটা। কেউ বা তাই থেকে দু আনা পকেটে ফেলে খাচ্ছেন মুড়ি আর তেলেভাজা। কেউ বা চার আনাই পকেটে ফেলে ষ্টেজের পিছনকার জড়ো-করা কাটা-সীন আর উইংসের ফাঁকে ফাঁকে বসে বসেই ঘুমিয়ে নিচ্ছেন খানিকক্ষণ।

নেমন্তন্নবাড়ীতে এক-ব্যাচ লোক খাওয়ানো শেষ হওয়া এবং পরের ব্যাচ সুরু হওয়ার মাঝখানে ঝিয়েরা যখন এঁটোপাতা আর খুরি-গেলাস তুলে জল-ছড়া দিয়ে হাত মুছতে থাকে, তখন পরিবেশনকারীরা যে-মেজাজ নিয়ে ছাতের পাঁচিলে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরান, অনেকটা সেই মেজাজে সাজঘরের চেয়ারে বোসে বুড়ো ডাক্তারের পরচুলাটাকে টুপির মতন টেবিলে খুলে রেখে জর্দা-সহযোগে পান চিবোচ্ছিলুম—এমন সময় নিচের থেকে ভেসে এল বড়রকমের একটা কোলাহলের শব্দ।

হাত বাড়িয়ে নিচে ষ্টেজে নামবার সিঁড়ির দিকের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দুটো শোয়ের মাঝখানের এই আধ ঘণ্টা সময় নিরুপদ্রবেই কাটিয়ে দিতে পারবো ভেবেছিলুম। কিন্তু নিচের উপদ্রবটা এমনই বাড়তে লাগলো যে, শেষ পর্য্যন্ত উঠতেই হল চেয়ার ছেড়ে।

দরজাটা খুলে নিচে নামবার অন্ধকার সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি, প্রকাণ্ড একটা ভিড় জমে গেছে নিচে। নানা জনের নানা কলরবে কারুর বক্তব্যই বোঝা যাচ্ছে না ঠিক ওপর থেকে। সকলের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে চম্পকলতার কণ্ঠস্বর কনকনিয়ে উঠছে থেকে থেকে। আর, সেই ভিড়ের মাঝখানে ঘাড় হেঁট করে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে বগলাচরণ।

জুপিটার থিয়েটারের চৌহদ্দির মধ্যেই ঐ হরি বাবুর চায়ের ষ্টলের পিছনেই বহুকালের পুরোনো এক বুড়ো অশ্বত্থ গাছের তলায় আছে ছোট্ট একটি শিবমন্দির। জাগ্রত শিব। সন্ধ্যায় সেই শিবমন্দিরের আরতির ঘণ্টা বেজে উঠলেই থিয়েটারের যে যেখানে থাকে, পেন্নাম ঠুকে দেয় শিবের উদ্দেশে। সেই শিবমন্দিরের পুরোহিত বগলাচরণ। চেহারাটি মন্দ নয়। বয়স ৩৭।৩৮, মাথায় কোঁকড়া চুল,—চোখ দুটি বড় বড়। পাংলা উড়ুনির তলা থেকে ধবধবে সাদা পৈতেটা দেখা যায়। লেখাপড়া এগোয়নি বেশি দূর। গ্রামের পাঠশালা পর্য্যন্ত দৌড়। কথাবার্তায় চালচলনে ওঠাবসায় বেশ কিন্তু একটি সাত্ত্বিক ভাব আছে মানুষটির। কেয়া-খয়ের দিয়ে চমৎকার পান সাজে বগলাচরণ। মানুষটিকে লাগে বেশ। থিয়েটারের শেষে বাড়ী ফেরবার সময় ওর মন্দিরের চাতালে বসি খানিকক্ষণ। সুখ-দুঃখের কথা কই। ওঠবার সময় ও ঐ পান একখানি কোরে দেয় ও আমাকে ভালবেসে।

জুপিটার থিয়েটারের স্টেজের বাঁ ধারের একেবারে শেষে যেখানে একপাশে মাঝারি অভিনেতাদের সাজঘর, আরেক পাশে অভিনেত্রীদের,—তারই মাঝখানের চওড়া দেওয়ালে টাঙানো আছে রামকৃষ্ণদেবের একটি বড়-সড় ছবি। বগলাচরণ সন্ধ্যার ঠিক মুখেই রোজ একবার এই ছবিতে ধূপ-ধুনো ফুল-গঙ্গাজল দিয়ে যায়। মুদীর দোকানের গণেশ ঠাকুরটির মতোই এই ছবিটিই থিয়েটারের ব্যবসায়ের সিদ্ধিদাতা। কাজেই, পুজোর ব্যবস্থাটাও ঐ গণেশ ঠাকুরের মতোই। মাস গেলে নগদ আট আনা পয়সা প্রণামী পায় বগলাচরণ। এই সূত্রে প্রতিদিন একবার কোরে থিয়েটারের অন্দরমহলে প্রবেশ করে সে। ঘাড় নিচু কোরে ঢোকে, ঘাড় নিচু কোরে বেরিয়ে যায়। জন্মাষ্টমী-শিবরাত্রিতে বগলাচরণের হাতে ফল-মিষ্টি দিয়ে জলগ্রহণ করে যখন অভিনেত্রীরা,—বগলাচরণ ঘাড় হেঁট কোরে ঘামতে থাকে লজ্জায়।

এ-হেন বগলাচরণ ঐ ভিড়ের মধ্যে কেন দাঁড়িয়ে আছে অপরাধীর মত? চম্পকলতাই বা হাত-মুখ নেড়ে অমন চীৎকার করে চলেছে কী নিয়ে?

নিচের ভিড়ের মধ্যে থেকেও ড্রেসার বিজয় দেখতে পেয়েছিল আমাকে। ইসারায় ডাকতেই সকলের অজান্তে নিঃশব্দে উঠে এল আমার পাশে।

: ব্যাপারটা কি?—জিজ্ঞেস করলুম আবছা গলায়।

: এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না আপনি স্যার! যত সব নোংরা কাণ্ড। বলতে বলতে আমাকে প্রায় জোর কোরেই সাজঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে বিজয়। তারপর পাখার রেগুলেটরটাকে বাড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজে হাওয়া খেতে খেতে শুধু বললে, কলেঙ্কারী!

: হোলটা কি?

: আর বলেন কেন? ঐ যে চম্পকলতা? ঠাকুরের ছবিতে ফুল-জল দিতে এসে ঐ কালা পুরুত কি না ওর সাজের টেবিলের ওপর চুপিসাড়ে, যাদু-ই-রুমাল রেখে গেছে!

: যাদু-ই-রুমাল?

: হ্যাঁ স্যার! ত্রিকালজ্ঞ মহামুনির তৈরী বশীকরণ রুমাল। কাগজেতে ওর বিজ্ঞাপন আছে। সাংঘাতিক জিনিষ স্যার!

মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই শিশিরের বক্তৃতা। বললুম: ঐ সেই রুমাল চম্পকলতার ঘরে কে রেখেছে বললে? বগলাচরণ?

: হ্যাঁ স্যার!

: কি কোরে জানা গেল?

: বাঃ! মোক্ষদা ঝি বাইরের টুলে বসে ছিল, ও যে স্বচক্ষে দেখেছে বগলাকে মেয়েদের সাজঘর থেকে চুপিসাড়ে বেরিয়ে আসতে।

: তা ওটা যে যাদু-ই-রুমাল, তা নিঃসন্দেহে জানা গেল কি করে?

: বাঃ রে! জানা যাবে না কেন? ঐ ছোকরা শিশিরবাবু যেদিন ঐ যাদু-ই-রুমালের গল্প বলছিলেন, সেদিন ঐ বগলাচরণকে যে সবাই দেখেছে হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে সেই গল্প শুনতে। আর তাছাড়া, চাঁপা বলছে যে, রুমালে ও কামিনীকুসুম তেলের গন্ধ পেয়েছে।

: চাঁপাটা আবার কে?

: চাঁপা মানে ঐ চম্পকলতা স্যার! বড় ভাল মেয়ে স্যার! দুখী স্টকের ব্যাটা বীরু মল্লিক অনেক টাকা কবলেছিল, ওকে এক রাত্তির বাগানবাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে। টলাতে পারেনি একবার লালু পাইন বলেছিল—

থামিয়ে দিয়ে বললুম: ঠিক আছে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।

তিন লাফে ছুটে বেরিয়ে গেল বিজয়।

সাড়ে ছটার শোয়ের ওয়ার্নিং বেল বেজে উঠতে তখনকার মতো থেমে গেল যদিও ব্যাপারটা, তবু, ঝড়বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরেও বিদ্যুৎ যেমন থেকে থেকে চমকাতে থাকে, ঠিক তেমনি থেকে থেকে কনকনে গলায় কোঁসকোঁসানি চলতে লাগলো চম্পকলতার: কী ঘেন্না মা কী ঘেন্না, আমি অবলা মেয়েছেলে, পেটের দায়ে থিয়েটার করছি, কারুর সাতে নেই, পাঁচে নেই, মুখপোড়া বামুন কি না বশীকরণ রুমাল দিয়ে আমাকে নরকে নিয়ে যেতে চায়? তুই বামুনের ছেলে, ঘণ্টা নেড়ে খাস, আমরা সবাই জন্মাষ্টমী-শিবরাত্তিরে তোর হাতে ফল-মিষ্টি দিয়ে পেন্নাম করে উপোস ভাঙ্গি,—তোর পেটে পেটে কিনা এই বজ্জাতি! আমি বলে রুমালটা দেখে চিনতে পেরেছিলুম তাই রক্ষে, নইলে ঐ রুমালের কামিনীকুসুম তেলের গন্ধ শুঁকলেই হয়েছিল আর কি! তখন কি আর আমাতে থাকতে পারতুম আমি? ঐ হাড়হাভাতে বিটলে বামুনের পায়ের তলায় গিয়ে পড়তে হোত মুখ থুবড়ে। মা গো! ভাবলেও গা যেন শিউরে উঠছে!

চম্পকলতার কী সর্বনাশ হতে পারতো, তা নিয়ে অবশ্য মাথাব্যথা নেই কারুরই,—এক ঐ বিজয় ছাড়া।

বিজয় থিয়েটারের ভিটের অনেক দিনের ঘুঘু। ভালমানুষটির মতো কাঁচুমাচু মুখে থাকে সর্বক্ষণ। বেশি মাইনের অভিনেতাদের পিছু-পিছু ঘোরে। হুকুমের আগেই হুকুম তামিল করে। এক কালে অভিনেতাদের কাছ থেকে একটা উপরি আয়ের পথ খোলা ছিল ওর। বিনা মূলধনের ব্যবসা। বর্তমানে সে ব্যবসায় মন্দা চলেছে। ব্যবসাটা, দেবদাসের চন্দ্রমুখীর ভাষায় 'পাটের দালালী'। চোখ দিয়ে ওর জল পড়ে সদাক্ষণ। অনেকে বলে, ওটা ওর সেই পুরোনো ব্যবসার লোকসানের কড়ি। নিমতলার ওধারে যে বাড়ীর একতলায় থাকে ও একখানি ঘর নিয়ে, তারই দোতালার ঘরে ভাড়া থাকে চম্পকলতা। এর পরেও অবলা চম্পকলতার জন্যে বিজয়ের মাথাব্যথার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু বগলাচরণের এ কী হল? মুখচোরা শান্ত ধীর বগলাচরণ জলন্ধর থেকে যাদু-ই-রুমাল এনে লুকিয়ে চম্পকলতার সাজের টেবিলে রেখে দিয়েছে,—এ যে স্বপ্নেও ভাবা যায় না! বগলাচরণের ভেতরে কোথায় লুকিয়েছিল এমন একটা নির্লজ্জ লোভী! তার কাণ্ড দেখে বিস্মিতও যেমন হল সকলে, ভয়ও করতে লাগলো তেমনি। এমন একটা লোভী আমাদের ভেতরেও লুকিয়ে আছে নাকি? নিজেদের মনের এই ভয়ঙ্কর আশঙ্কা দূর করবার জন্যে সকলে প্রাণপণে এই বলে মনকে প্রবোধ দিতে সুরু করলে: মিথ্যে, মিথ্যে,—একথা সর্বৈব মিথ্যে। বগলাচরণের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয় কিছুতেই। এ সব ঐ চম্পকলতার বানানো কেচ্ছা।

কিন্তু সকলের সমস্ত নিশ্চিন্ততাকে ভেঙ্গে দিয়ে বগলাচরণ যখন অবনত মস্তকে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্বীকার করে নিলে, রুমালটা তারই, তখন আরো একবার শিউরে উঠলো সকলে। কি একটা ভয়ে বুকের ভেতরটা গুরগুর করে উঠলো। সকলের মনে হতে লাগলো,

[illegible]চরণকে নয়, নিজেকেই নিজেরা ঠিক চেনে না আজো। নিজের [illegible] অনেকখানিই বুঝি তাদের সম্পূর্ণ অজানা।

থিয়েটারের শেষে খানিকটা হেঁটে ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডটার কাছে এসে [illegible]য়েছি, এমন সময় পাশে এসে দাঁড়াল বগলাচরণ।

: আপনার পান।

প্রায় নির্জন রাস্তার আধো-আলো আধো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এক [illegible] পান বাড়িয়ে দিলে বগলাচরণ আমার সামনে।

তুলে নিলুম পানটা। আজই প্রথম ভুল হয়েছে ফেরবার পথে [illegible]চরণের মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসতে। ভুল নয় ঠিক; ইচ্ছে [illegible] যাইনি। বগলার সামনে দাঁড়িয়ে ওকে লজ্জায় ফেলতে [illegible]ছিল বলেই যাইনি।

: আচ্ছা আসি। বলেই ফিরে যাচ্ছিল বগলা নীরবে।

ডাকলুম : শোনো। তার পর কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে [illegible]স করলুম : রুমালটা সত্যিই তোমার?

: হ্যাঁ। সত্যিই আমার। কিন্তু ও-রুমাল আমি চম্পকলতার [illegible]বিলে রাখিনি; রেখেছিলুম, মালবিকা দেবীর সাজের টেবিলে।

[illegible]টুকু বলেই অনেকক্ষণের অবরুদ্ধ কান্নাটাকে আর চেপে রাখতে [illegible]লে না বগলাচরণ। ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে [illegible] পালিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। তার পর মিলিয়ে গেল [illegible]র অন্ধকারে।

আর সেই সঙ্গে আমার ভাবনার রাজ্য থেকেও মিলিয়ে গেল [illegible]চরণ সেই মুহূর্তেই। সেখানে এসে দাঁড়ালো চম্পকলতা।

চম্পকলতা। স্থুলাঙ্গিনী চম্পকলতা। শ্যামাঙ্গিনী চম্পকলতা। [illegible]ছিলেন তার পুরোনো আমলের থিয়েটারের নামকরা নৃত্যগীত-[illegible]সী অভিনেত্রী। চম্পকলতা নাচ শিখেছিল স্বর্গীয়া জননীর [illegible],—গানও শিখেছিল। সে নাচ, সে গানের কদর নেই এ যুগের [illegible]। সেই সঙ্গে কদর নেই এ যুগে ঐ চম্পকলতা-বেদানাবালাদের। [illegible]ও নয়, ষ্টেজের বাইরেও নয়। চম্পকলতাদের গান শুনে এন্কোর [illegible] না আর কোন দর্শক,—নাচ দেখে বাগানবাড়ীতে আমন্ত্রণ [illegible]য় না কোন কাপ্তেন। এ যুগের সব দিকের সব সৌভাগ্য [illegible] নিয়েছে, ঐ মালবিকা মজুমদার, হেনা হালদার, কৃষ্ণা কর আর [illegible]লেখা চ্যাটার্জিরা। ওরা পাতা কেটে চুল বাঁধে না, ওরা পান-[illegible]য় দাঁত রাঙায় না, পাশ-চিরুনী দেয় না মাথার চুলে। ওরা [illegible]স্নানে গিয়ে ফেরে না কপালে চন্দনের ছাপ নিয়ে, ওরা উঁকি [illegible] না শ্মশানে।

নিক্ নিক্ সব কেড়ে নিক্ ওরা। কেড়ে নিক্ দর্শকদের [illegible]নন্দন, আধুনিক কাপ্তেনদের মোহদৃষ্টি। উঠুক তাদের মোটরে, [illegible] বিলিতি হোটেল-রেস্তোঁরায়। কিন্তু ঐ বগলাচরণদের [illegible]-ই-রুমাল, তাও কেড়ে নেবে ওরা? ও-টুকুও পাওয়ার যোগ্যতাও নেই বেদানাবালা-ডালিমসুন্দরীদের?

চম্পকলতা তাই তো মালবিকার সাজের টেবিল থেকে লুকিয়ে [illegible] নিয়েছে বগলাচরণের যাদু-ই-রুমাল, তুলে নিয়ে চীৎকার করে [illegible] মাথায় করেছে।

জানুক লোকে, চম্পকলতারা আজো বেঁচে আছে। আজো [illegible]রা সুলভ নয়। তাদের প্রেম পাওয়ার জন্যে বগলাচরণদের [illegible]রে জলন্ধর থেকে আনাতে হয় যাদু-ই-রুমাল।

পরদিন রাত্রে প্লে ভাঙ্গার পর যথারীতি শিবমন্দিরের চাতালে গিয়ে বগলাচরণকে দেখতে পেলুম না। বেরিয়ে এলেন একটি বৃদ্ধ পূজারী-ব্রাহ্মণ। জানালেন, দোকানে-দোকানে গণেশপূজো করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন তিনি। বগলার গ্রামের লোক। এক মাসের জন্যে তাঁকে এ-মন্দিরের ভার দিয়ে বগলা দেশে গেছে।

বগলা নেই। চম্পকলতা আছে। এতটুকু ফাঁক পেলেই চম্পকলতা হাত-মুখ নেড়ে বলে :

মা গো, মা,—কী সর্বনেশে কাণ্ড! আমি অবলা মেয়েছেলে, পেটের দায়ে থিয়েটার করছি,—বশীকরণ রুমাল দিয়ে আমাকে কি না নরকে নিয়ে যেতে চায়?

বগলাচরণের রুমাল রাখার প্রকৃত ইতিহাসটা জানলো না কেউ একমাত্র আমি ছাড়া। জানালুম না কাউকেও। জানিয়ে দিয়ে চম্পকলতাকে তার এই কল্পিত দুর্ভেদ্যের আসন থেকে নামাতে মন চাইলো না।

## ১১

সে বহুদিনের কথা। সে হচ্ছে সেই যুগ, যে যুগে থিয়েটারের ষ্টেজের সামনে আজকের ঐ বিজলীবাতির ফুটলাইটের বদলে সারি সারি বসানো থাকত রঙ-বেরঙের কাচের ঠুলিলাগানো গ্যাসের বাতি। হল-এর অনেক উঁচু ছাদের মাঝখান থেকে ঝুলে থাকত গ্যাসের আলোর মস্ত মস্ত ঝাড় তাদের কারুকার্য-করা কাট গ্লাসের ডালপালা ছড়িয়ে। আর, থিয়েটারের ভৃত্যের দল লম্বা লম্বা বাঁশের আঁকশিতে আগুন বেঁধে জ্বালিয়ে দিত সেই ঝাড়লণ্ঠন। সেই যুগ, যে যুগের থিয়েটারের পিছন দিকের গ্যালারীর কাঠের ফাঁকে ফাঁকে বিরাট সংসার পেতে বসত ছারপোকার দল, কার্ণিসে কার্ণিসে বাসা বাঁধত কবুতরেরা। সেই যুগ, যে যুগে কনসার্টের দল ষ্টেজের সামনে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে দেখাত যন্ত্রসঙ্গীতের অনেক কেরামতি। সেই যুগ, যে যুগে সন্ধ্যে রাতে প্লে সুরু হয়ে শেষ হত সেই ভোর রাতে; আর, থিয়েটার থেকে সোজা গঙ্গায় গিয়ে স্নান সেরে কপালে চন্দনের ছাপ এঁকে বাড়ী ফিরতেন দর্শকেরা একেবারে সেই রোদওঠা সকালবেলায়। সেই যুগ, যে যুগে থিয়েটার ভাঙার পর মেয়েদের দিকের দরজায় দাঁড়িয়ে খ্যানখ্যানে গলায় চেঁচাত ঝি-এরা, 'পটলডাঙ্গার চৌধুরীবাড়ীর কে আছো নেমে এস গো—ও-ও-ও! দর্জিপাড়ার ঘোষেদের গাড়ী এসেছে এ-এ-এ—'

সেই যুগের গল্প শুনছিলুম বেনোয়ারী বাবুর কাছে।

থিয়েটারের সঙ্গে বেনোয়ারী বাবুদের সম্পর্ক অনেক দিনের। সেই ওঁর ছোড় দাদামশাই মহতাপচন্দ্রের আমল থেকে। মহতাপচন্দ্র ছিলেন যেমন সৌখীন, তেমনি ছিল তাঁর নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা।

ঘরে ঘরে তখন টানা-পাখা। পাংখাদার সকাল-সন্ধ্যে ঘরের বাইরে কাঠের টুলে বোসে ঢুলে ঢুলে পাখা টানে। মহতাপচন্দ্র হঠাৎ একদিন বলে উঠলেন,—উঁহু, চলবে না এই অপচয়। জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের তফাৎ তার মস্তিষ্কে। যে কাজে সেই মস্তিষ্ক লাগে না এক ফোঁটা, সেই কাজে লাগিয়ে একটা মানুষের শক্তির অপব্যয় করা অন্যায়। অতএব—

পাংখাদার একলুকে বরখাস্ত করে একজোড়া হনুমান কিনে

আনলেন মহতাপচন্দ্র। তার পর সুরু করে দিলেন তাদের ট্রেনিং। বেত্তিয়ে বেত্তিয়ে পাঠশালায় কত গাধাকে ঘোড়া করে দেন গুরুমশাইরা, আর হনুমানকে দিয়ে পাংখাদারের কাজ করাতে পারবেন না মহতাপচন্দ্র? বেত-এ না কুলোয়, চাবুক আনো।

এল চাবুক। কিন্তু টানা-পাখার দড়ি টানার চেয়ে সেই টানা-পাখার উপরে বোসে দোল খাওয়াটাই বেশি পছন্দ করতে লাগল হনুমান-যুগল। ধমক দিলে দাঁত খিঁচোয়। চাবুক মারলে পাংখার দড়ি চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।

কারণ কি এই অবাধ্যতার?

মহতাপচন্দ্র বললেন,—মনে ওদের সুখ নেই, তাই।

হনুমান-যুগলের মনকে খুশী রাখতে মহতাপচন্দ্র নিয়ে এলেন চারটি হৃষ্টপুষ্ট হনুমন্তী। মহতাপচন্দ্রের নিজের ছিল দু'টি সংসার। কাজেই হনুমানদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হল না।

হনুমন্তী আসার পর হনুমানদের যে মানসিক আনন্দ বর্দ্ধিত হল, সেটা তাদের ভক্ষিত কদলীর খোসার পরিমাণ দেখেই বোঝা যেতে লাগল। কিন্তু পাখা দোলে না তবু!

পাখা দুললো আরো মাসখানেক বাদে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আধ ডজন বড় সাইজের হনুমান প্রেজেন্ট করেছেন তখন মহতাপচন্দ্র। আর, তাঁর শয়নকক্ষের বাইরের কাঠের টুলে আবার একলু এসে বসেছে।

এ-হেন মহতাপচন্দ্র সুতোপটির এক ব্যবসায়ীকে ধার দিয়েছিলেন কয়েক হাজার টাকা। তার পর থেকে আর পাত্তা মেলে না তার। অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেল, লোকটি সুতোর ব্যবসায় ছেড়ে থিয়েটারের ব্যবসা ধরেছে, এবং তাতে নিজেকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে যে, সুদূর ভবিষ্যতেও মহতাপচন্দ্রের টাকা উশুল হওয়ার ক্ষীণমাত্র আশা নেই।

সেই ডোবা টাকা উদ্ধারের আশায় মহতাপচন্দ্র হাতে নিলেন সেই থিয়েটার। মতলব করলেন, কিছু টাকা ফেলে থিয়েটারকে ঠিকমতো চালু কোরে নিজের টাকাটা উশুল করে নেবেন।

সে-থিয়েটার যখন ছাড়লেন, তখন কয়েক হাজারের উদ্ধারের চেষ্টায় কয়েক লক্ষ টাকা ফেঁসে গেছে তাঁর।

এই ছোট দাদামশাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই থিয়েটারে যেতেন বেনোয়ারীলাল দত্ত। এই ভাবে থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সেই বাল্যকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল।

প্রধানা অভিনেত্রী কাদম্বিনীর বাড়ীতে থিয়েটারের পর প্রায়ই যেতেন ছোট দাদামশায়। কোন কোন দিন সঙ্গে থাকত তাঁর বালক দৌহিত্র বেনোয়ারীলাল। বালক বেনোয়ারীলাল দেখত, ছোট দাদামশাই কি একটা সরবৎ খেতেন সেখানে, এলাচ-দেওয়া পান খেতেন, গল্প করতেন কিছুক্ষণ, তার পর নাতির হাত ধরে নেমে এসে উঠতেন নিজের ঘোড়ার গাড়ীতে। কাদম্বিনী বড় ভাল বাসতেন বালক বেনোয়ারীলালকে।

সেই কাদম্বিনীকে এখনও বেশ মনে পড়ে বেনোয়ারীলালের। অসামান্যা সুন্দরী। শুধু একটিমাত্র মস্ত খুঁৎ। কাদম্বিনীর ঠোঁটের উপর ছিল গোঁফের রেখা, আর চিবুকে দাড়ির। আজো বেনোয়ারীলাল চোখ বুজলেই দেখতে পান সেই কাদম্বিনীর কটা-চোখের সোনালী দুটি উজ্জ্বল তারা।

কাদম্বিনীর জননীর চোখ ছিল আরো সোনালী। তাঁর গায়ের রঙ ছিল আরো উজ্জ্বল, আরো সাদা। জন্ম হয়েছিল তাঁর গোপীবল্লভপুরের মুখুজ্যেদের বাড়ীতে। আর, জন্মের পরের দিন তাঁকে চিরজন্মের মত ত্যাগ করতে হয়েছিল পিতৃপুরুষের ভিটে।

সে গল্প শুনতে গেলে আজ থেকে পিছিয়ে যেতে হবে অনেক দূর। চলে যেতে হবে সেই যুগে, যে যুগে ছয় দিনের পথ ছয় দণ্ডে চলে যাবার বিস্ময়কর বাষ্পীয় রথ এদেশে পদার্পণ করেনি।

সে-হেন সময়ে কোম্পানীর 'রেসেলা' হাঁটা পথে চলেছে শ্যামনগর-ব্যারাকপুর থেকে এলাহাবাদে। ব্যারাকপুরের সৈন্যবাহিনী চলেছে এলাহাবাদের সেনা-ব্যারাকে।

চলেছে রেসেলার কুচ্। চলেছে হাজার ঘোড়া, হাজার উট, হাজার গোরু। চলেছে সাহেব মেম আর তাদের বাচ্চা-কাচ্চা। চলেছে পাঁচশো সওয়ার, সাতশো তাঁবু, আটশো বয়েল গাড়ী। চলেছে ছক্কড়, এক্কা, গরুর গাড়ী। চলেছে অফিসার, দফাদার, জমাদার, কোত-দফাদার, উর্দি মেজর, ডাক্তার, ভিস্তি, মেথর। চলেছে চেয়ার, টেবিল, খাটিয়া, আলো, বালতি, গামলা হাতা খুন্তি। দিনে দশ-বারো মাইল করে পথ চলে এই বিরাট বাহিনী। তারপর থামে এক জায়গায়। তাঁবুর পর তাঁবু পড়ে বিস্তীর্ণ মাঠের উপর। গড়ে ওঠে তাঁবুর শহর। তাঁবুতে তাঁবুতে পাতা হয় টেবিল-চেয়ার, রসুই-তাঁবুতে চাপে বড় বড় ডেকচি-কড়াই।

আবার গুটোনো হয় তাঁবু। ভেঙ্গে যায় তাঁবুর শহর। আবার চলে কোম্পানীর রেসেলা কুচ্।

গোপীবল্লভপুরের কালেক্টরের কাছে খবর এল একদিন, অমুক দিন অমুক সময় কোম্পানীর রেসেলা এসে পৌঁছচ্ছে। তার ব্যবস্থা যেন সব ঠিক থাকে। কালেক্টর খবর দিলে তহশীলদারকে,—রেসেলা আসছে,—চাই এত মণ আটা, এত ঘি, এত মুরগী, এত পাঁঠা।

যথাদিনে এসে পৌঁছল সেই রেসেলা।

প্রথমে 'লাইনডুরি' এসে তাঁবু খাটালে,—চেয়ার-টেবিল পাতলে—তাঁবুতে তাঁবুতে অফিসারদের চিহ্নকরা ফ্ল্যাগ খাটালে,—তারপর রসদগার্ড এসে রসুইঘরের সরঞ্জাম গুছোতে সুরু করে দিলে,—তারপর একে একে এসে পৌঁছল পুরো বাহিনী। দেখতে দেখতে বনবিবির ধূ-ধূ মাঠটায় বসে গেল প্রকাণ্ড একটা শহর।

চিত্তেশ্বরের মন্দিরে পুজো দিয়ে ফেরার পথে মুখুজ্যেদের ছেলেমানুষ বৌ সঙ্গি-সাথীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দূর থেকে অবাক চোখে দেখছিল বনবিবির মাঠে হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা সেই আশ্চর্য্য তাঁবুর শহরের দিকে। হঠাৎ—

সামাল! সামাল! সামাল!—রেসেলার একটা ঘোড়া পাগল হয়ে গেছে।

বন্দুকের শব্দ—লোকেদের কোলাহল—মেমসাহেবদের তীক্ষ্ণ আর্তনাদ! মুখুজ্যেদের বৌ দেখতে পেল দূরে একটা সাদা ঘোড়া অনেকগুলো তাঁবুকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তীরের বেগে ছুটে আসছে। একটা বড় তাঁবুর দড়িতে পা লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঘোড়াটা। আবার উঠল। তারপর সেই তাঁবুর অরণ্যে কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর—

হঠাৎ আচমকা দেখা গেল অত্যন্ত কাছাকাছি একটা তাঁবুর পাশ থেকে বেরিয়ে ঘোড়াটা উল্কার মত বেগে ছুটে আসছে মুখুজ্যে

র দিকে। সভয়ে চোখ ঢেকে বসে পড়ল মুখুজ্যেদের বৌ ছের তলায়।

জ্ঞান হতে দেখলে, একটা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে আছে সে খাটিয়ায়। ক লালমুখো এক সাহেব চেয়ার নিয়ে বসে আছে তার খাটিয়ার । আবার লুপ্ত হয়ে গেল জ্ঞান।

মেসেলা বনবিবির মাঠ ছেড়ে চলে গেল তিন দিন পরে। বল্লভপুরের মুখুজ্যেদের বৌকে খোঁজ-খবর কোরে পৌঁছে দিয়ে তারা যাবার আগে। অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি নানা ক্রিয়াকাণ্ডের বে মুখুজ্যেরা ঘরে তুললেন সেই বৌকে।

মুখুজ্যেদের বৌ-এর কপালের ক্ষতটা সেরে উঠতে দেরী লাগল মন,—কিন্তু আর একটা কোন অদৃশ্য ক্ষত যেন ধীরে ধীরে বাঁধল মুখুজ্যেদের মনের কোণে।

দিন কেটে গেছে। গোয়ালঘরের পিছনে নতুন ঘর উঠেছে বেড়ার,—ডোমবুড়ী তিন দিন থেকে এসে গামলা গামলা ভাত আর লঙ্কা খাচ্ছে, নাড়ী কাটতে জুড়ি নেই ওর সারা বল্লভপুরে,—মুখুজ্যেদের বৌ-এর প্রথম ছেলে হবে।

হল। ছেলে নয়, মেয়ে। ধবধবে তার গায়ের রঙ,—বেড়ালের কটা তার চোখের মণি। মুখুজ্যেদের বৌ মনে মনে তার নাম চাঁপা।

সেই রাত্রে আঁতুড়ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বামী: ঐ ক ত্যাগ করতে হবে।

উরে উঠল মুখুজ্যেদের বৌ। কী বলছ তুমি?

হ্যাঁ। ডোমবুড়ী বলেছে ও লুকিয়ে পাচার করে দেবে। প্রাণপণে সদ্যোজাত কন্যাকে জড়িয়ে ধরে মুখুজ্যেদের বৌ।

কেন?

কেন? ওর চোখের মণি দেখেছ?

হ্যাঁ। কিন্তু—

কোন কিন্তু নেই। ও মেয়েকে সরিয়ে ফেলতেই হবে।

না-না-আ-আ-আ! চীৎকার করে উঠল মুখুজ্যেদের বৌ।

চেঁচিও না। মেয়েকে ত্যাগ করতে না পারলে তোমাকেই ছাড়তে হবে এই বাড়ী।

কেন? আবার ব্যাকুল প্রশ্ন মুখুজ্যেদের বৌ-এর।

দেখেছ ওর চোখের মণি?

আবার সেই এক উত্তর স্বামীর। যার কোন অর্থই বুঝতে পারে মুখুজ্যেদের বৌ। মেয়ের চোখ সোনালী তো হয়েছে কী? চোখ কি অকল্যাণের চিহ্ন?

সে অবধি রাতের অন্ধকারে অসুস্থ শরীরে সদ্যোজাত কন্যাটিকে নিয়ে পথে নামতেই হল মুখুজ্যেদের বৌকে,—অপরাধটা কোথায়, না বুঝে।

আশ্রয় দিলে ঐ ডোমবুড়ীই। তার মাতাল ভাইয়ের বাড়ী। বুড়ীর কাছ থেকেই জানতে পারলে মুখুজ্যেদের বৌ,—কোন সন্দেহে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। সেই অভাগিনী সরলা বধূটিকে।

হয়ে গেল। সেই সোনালী-চোখ মেয়ে হয়ে দাঁড়াল একদিন তয়ফাওয়ালী। আর, সেই তয়ফাওয়ালীর মেয়ে হল বেনোয়ারীলালের দাদামশায়ের থিয়েটারের প্রধানা অভিনেত্রী কাদম্বিনী।

থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন কাদম্বিনী পরিণত বয়সে। তখন তাঁর চুলের আশে-পাশে এক-আধগাছা পাকা চুল উঁকি দিতে সুরু করেছে। নাচতে জানতেন মুসলমানী ঢং-এ। গানের গলা ছিল তাঁর অপূর্ব! গীতিনাট্যের অভিনয়ে মাৎ করে দিতেন দর্শককে। একবার সাতারাম নাটকে জয়ন্তী সেজে গেয়েছিলেন 'উদার অম্বর শূন্য সাগর, শূন্যে মিলাও প্রাণ।'—সে গান সে-যুগের জীবিত শ্রোতাদের কানে আজও গেঁথে আছে।

বৃদ্ধ বয়সে ছোড় দাদামশাই যখন ব্যাধিগ্রস্ত হলেন, তখন দুই দিদিমার কেউই জীবিতা নেই। বারবাড়ীর একতলার হলঘরে শয্যা নিলেন ছোড় দাদামশাই। কাদম্বিনী প্রতিদিন আসতেন তাঁর সেবা করতে। আসতেন সেই ভোরবেলা,—দুপুরে একবার ফিরে যেতেন নিজের গাড়ীতে স্নানাহার করতে,—আবার বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। অমন সেবা দিদিমারাও করতে পারতেন কি না সন্দেহ!

মারা গেলেন ছোড় দাদামশাই। কাদম্বিনী চলে গেলেন তীর্থে দীর্ঘ দিনের অর্জিত সকল ঐশ্বর্য মঠে-মন্দিরে, হাসপাতালে, নারীকল্যাণ আশ্রমে দান করে দিয়ে কাশীবাসিনী হলেন সেই থেকে। ছেড়ে আর ফিরে আসেননি কোন দিন। কলকাতাতেও নয়।

বেনোয়ারীলাল দত্ত বলতে লাগলেন: গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালা শুনেছ কখনো ডাক্তার? সুন্দরের রূপ দেখে মজে গিয়ে বর্দ্ধমানের নারীরা যে গান গেয়েছিল, মনে আছে? ঐ যে গো,—'মদন-আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ,—কি গুণ করলে ঐ বিদেশী।'—একদিন সকালে ছোড় দাদামশায়ের গাড়ীতে কোরে একা গেছলুম ঐ কাদম্বিনীর বাড়ীতে কী একটা জরুরী চিঠি দিতে। কতই বা বয়েস তখন আমার? বালকই বলতে পার। কাদম্বিনী তখন পুজোর ঘরে। দাঁড়ালুম দরজায়। উনি তখন ৺রাধাবিনোদের জন্যে চন্দন ঘষতে ঘষতে গুন-গুন করে গাইছিলেন ঐ গানটি,—

'মদন-আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ;—কি গুণ করলে ঐ বিদেশী।
ইচ্ছে করে উহার করে প্রাণ সঁপে দে হই গো দাসী।
মন-মাঝি ছেড়েছে হাল ছিঁড়ে গেছে লজ্জাপাল,
তরী হল বানচাল,—কি করি বল সজনি॥'

জানো ডাক্তার, আজও সে-গানের সুর আর পরিবেশটি আমার মনে গেঁথে আছে। সাধারণ একটা ফাজলামির গান যে পরিবেশ আর গাওয়ার ভঙ্গিতে কোন্ উঁচুতে গিয়ে উঠতে পারে, সেদিনের সেই গান শুনলে তুমি বুঝতে পারতে ডাক্তার! এক লহমায় গোপাল উড়ের ঐ 'বিদেশী' একাকার হয়ে গেল ৺রাধাবিনোদের সঙ্গে। গানের সমস্ত অর্থটাই গেল বেমালুম বদলে।

আবার ঐ যে তোমার দাশু রায়ের ভক্তিমূলক গান,—'নন্দের নন্দন চিন্তামণি কি ধন চিনতে পারলি নে। যাঁরে চিন্তিলে যায় ভবচিন্তা তাঁরে চিন্তা করলি নে।'—ঐ গান শুনেছি নরীবালার মুখে। মনে হয়েছে যেন বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর ঢং-এর গান শুনছি।

নরীবালাদের সঙ্গে কাদম্বিনীর এইখানেই ছিল তফাৎ। কাদম্বিনীর জন্ম অন্ধকারে,—জীবন কাটাতে হয়েছে তাকে সাধারণ নষ্টা স্ত্রীলোকের মত। তার জীবনের গানে ভাগ্যবিধাতা ভাষা দিয়েছিলেন,—'মদন-আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ;' কিন্তু তার বুকের মধ্যে কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল একটি বৈরাগী, যে সেই চটুল

মানলেন মহতাপচন্দ্র। তার পর সুরু করে দিলেন তাদের ট্রেনিং। বত্তিয়ে বেত্তিয়ে পাঠশালায় কত গাধাকে ঘোড়া করে দেন গুরুমশাইরা, আর হনুমানকে দিয়ে পাংখাদারের কাজ করাতে পারবেন না মহতাপচন্দ্র? বেত-এ না কুলোয়, চাবুক আনো।

এল চাবুক। কিন্তু টানা-পাখার দড়ি টানার চেয়ে সেই টানা-পাখার উপরে বোসে দোল খাওয়াটাই বেশি পছন্দ করতে লাগল হনুমান-যুগল। ধমক দিলে দাঁত খিঁচোয়। চাবুক মারলে পাংখার দড়ি চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।

কারণ কি এই অবাধ্যতার?

মহতাপচন্দ্র বললেন,—মনে ওদের সুখ নেই, তাই।

হনুমান-যুগলের মনকে খুশী রাখতে মহতাপচন্দ্র নিয়ে এলেন চারটি হৃষ্টপুষ্ট হনুমন্তী। মহতাপচন্দ্রের নিজের ছিল দু'টি সংসার। কাজেই হনুমানদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হল না।

হনুমন্তী আসার পর হনুমানদের যে মানসিক আনন্দ বর্দ্ধিত হল, সেটা তাদের ভক্ষিত কদলীর খোসার পরিমাণ দেখেই বোঝা যেতে লাগল। কিন্তু পাংখা দোলে না তবু!

পাখা ঝুললো আরো মাসখানেক বাদে। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আধ ডজন বড় সাইজের হনুমান প্রেজেন্ট করেছেন তখন মহতাপচন্দ্র। আর, তাঁর শয়নকক্ষের বাইরের কাঠের টুলে আবার একলু এসে বসেছে।

এ-হেন মহতাপচন্দ্র সুতোপটির এক ব্যবসায়ীকে ধার দিয়েছিলেন কয়েক হাজার টাকা। তার পর থেকে আর পাত্তা মেলে না তার। অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেল, লোকটি সুতোর ব্যবসায় ছেড়ে থিয়েটারের ব্যবসা ধরেছে, এবং তাতে নিজেকে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে যে, সুদূর ভবিষ্যতেও মহতাপচন্দ্রের টাকা উশুল হওয়ার ক্ষীণমাত্র আশা নেই।

সেই ডোবা টাকা উদ্ধারের আশায় মহতাপচন্দ্র হাতে নিলেন সেই থিয়েটার। মতলব করলেন, কিছু টাকা ফেলে থিয়েটারকে ঠিকমতো চালু কোরে নিজের টাকাটা উশুল করে নেবেন।

সে-থিয়েটার যখন ছাড়লেন, তখন কয়েক হাজারের উদ্ধারের চেষ্টায় কয়েক লক্ষ টাকা কেঁসে গেছে তাঁর।

এই ছোট দাদামশাইয়ের সঙ্গে প্রায়ই থিয়েটারে যেতেন বেনোয়ারীলাল দত্ত। এই ভাবে থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সেই বাল্যকাল থেকেই গড়ে উঠেছিল।

প্রধানা অভিনেত্রী কাদম্বিনীর বাড়ীতে থিয়েটারের পর প্রায়ই যেতেন ছোট দাদামশায়। কোন কোন দিন সঙ্গে থাকত তাঁর বালক দৌহিত্র বেনোয়ারীলাল। বালক বেনোয়ারীলাল দেখত, ছোট দাদামশাই কি একটা সরবৎ খেতেন সেখানে, এলাচ-দেওয়া পান খেতেন, গল্প করতেন কিছুক্ষণ, তার পর নাতির হাত ধরে নেমে এসে উঠতেন নিজের ঘোড়ার গাড়ীতে। কাদম্বিনী বড় ভাল বাসতেন বালক বেনোয়ারীলালকে।

সেই কাদম্বিনীকে এখনও বেশ মনে পড়ে বেনোয়ারীলালের। অসামান্যা সুন্দরী। শুধু একটিমাত্র মস্ত খুঁৎ। কাদম্বিনীর ঠোঁটের উপর ছিল গোঁফের রেখা, আর চিবুকে দাড়ির। আজো বেনোয়ারীলাল চোখ বুজলেই দেখতে পান সেই কাদম্বিনীর কটা-চোখের সোনালী দ্যুতি

কাদম্বিনীর জননীর চোখ ছিল আরো সোনালী। তাঁর গায়ের রঙ ছিল আরো উজ্জ্বল, আরো সাদা। জন্ম হয়েছিল তাঁর গোপীবল্লভপুরের মুখুজ্যেদের বাড়ীতে। আর, জন্মের পরের দিনই তাঁকে চিরজন্মের মত ত্যাগ করতে হয়েছিল পিতৃপুরুষের ভিটে।

সে গল্প শুনতে গেলে আজ থেকে পিছিয়ে যেতে হবে অনেক দূরে। চলে যেতে হবে সেই যুগে, যে যুগে ছয় দিনের পথ ছয় দণ্ডে চলে যাবার বিস্ময়কর বাষ্পীয় রথ এদেশে পদার্পণ করেনি।

সে-হেন সময়ে কোম্পানীর 'রেসেলা' হাঁটা পথে চলেছে শ্যামনগর-ব্যারাকপুর থেকে এলাহাবাদে। ব্যারাকপুরের সৈন্যবাহিনী চলেছে এলাহাবাদের সেনা-ব্যারাকে।

চলেছে রেসেলার কুচ্। চলেছে হাজার ঘোড়া, হাজার উট, হাজার গোরু। চলেছে সাহেব মেম আর তাদের বাচ্চা-কাচ্চা। চলেছে পাঁচশো সওয়ার, সাতশো তাঁবু, আটশো বয়েল গাড়ী। চলেছে ছক্কড়, এক্কা, গরুর গাড়ী। চলেছে অফিসার, দফাদার, জমাদার, কোত-দফাদার, উর্দি মেজর, ডাক্তার, ভিস্তি, মেথর। চলেছে চেয়ার, টেবিল, খাটিয়া, আলো, বালতি, গামলা হাতা-খুস্তি। দিনে দশ-বারো মাইল করে পথ চলে এই বিরাট বাহিনী। তারপর থামে এক জায়গায়। তাঁবুর পর তাঁবু পড়ে বিস্তীর্ণ মাঠের উপর। গড়ে ওঠে তাঁবুর শহর। তাঁবুতে তাঁবুতে পাতা হয় টেবিল-চেয়ার, রসুই-তাঁবুতে চাপে বড় বড় ডেকচি-কড়াই।

আবার গুটোনো হয় তাঁবু। ভেঙ্গে যায় তাঁবুর শহর। আবার চলে কোম্পানীর রেসেলা কুচ্।

গোপীবল্লভপুরের কালেক্টরের কাছে খবর এল একদিন, অমুক দিন অমুক সময় কোম্পানীর রেসেলা এসে পৌঁছচ্ছে। তার ব্যবস্থা যেন সব ঠিক থাকে। কালেক্টর খবর দিলে তহশীলদারকে,—রেসেলা আসছে,—চাই এত মণ আটা, এত ঘি, এত মুরগী, এত পাঁঠা।

যথাদিনে এসে পৌঁছল সেই রেসেলা।

প্রথমে 'লাইনডুরি' এসে তাঁবু খাটালে,—চেয়ার-টেবিল পাতলে—তাঁবুতে তাঁবুতে অফিসারদের চিহ্নকরা ফ্ল্যাগ খাটালে,—তারপর রসদগার্ড এসে রসুইঘরের সরঞ্জাম গুছোতে সুরু করে দিলে,—তারপর একে একে এসে পৌঁছল পুরো বাহিনী। দেখতে দেখতে বনবিবি ধু-ধু মাঠটায় বসে গেল প্রকাণ্ড একটা শহর।

চিত্তেশ্বরের মন্দিরে পুজো দিয়ে ফেরার পথে মুখুজ্যেদে ছেলেমানুষ বৌ সঙ্গি-সাথীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দূর থেকে অবাক চো দেখছিল বনবিবির মাঠে হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা সেই আশ্চর্য্য তাঁবুর শহরে দিকে। হঠাৎ—

সামাল! সামাল! সামাল!—রেসেলার একটা ঘোড়া পাগ হয়ে গেছে।

বন্দুকের শব্দ—লোকেদের কোলাহল—মেমসাহেবদের তী আর্তনাদ! মুখুজ্যেদের বৌ দেখতে পেল দূরে একটা সাদা ঘো অনেকগুলো তাঁবুকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে তীরের বেগে ছুটে আসছে একটা বড় তাঁবুর দড়িতে পা লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঘোড়াট আবার উঠল। তারপর সেই তাঁবুর অরণ্যে কোথায় হারিয়ে গেল তারপর—

হঠাৎ আচমকা দেখা গেল অত্যন্ত কাছাকাছি একটা তাঁ পাশ থেকে বেরিয়ে ঘোড়াটা উল্কার মত বেগে ছুটে আসছে মুখুজ্যে

বৌ-এর দিকে। সভয়ে চোখ ঢেকে বসে পড়ল মুখুজ্যেদের বৌ
টগাছের তলায়।

জ্ঞান হতে দেখলে, একটা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে আছে সে খাটিয়ায়। কটকে লালমুখো এক সাহেব চেয়ার নিয়ে বসে আছে তার খাটিয়ার পাশে। আবার লুপ্ত হয়ে গেল জ্ঞান।

বেদেরা বনবিবির মাঠ ছেড়ে চলে গেল তিন দিন পরে। গাপীবল্লভপুরের মুখুজ্যেদের বৌকে খোঁজ-খবর কোরে পৌঁছে দিয়ে গেল তারা যাবার আগে। অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি নানা ক্রিয়াকাণ্ডের র তবে মুখুজ্যেরা ঘরে তুললেন সেই বৌকে।

মুখুজ্যেদের বৌ-এর কপালের ক্ষতটা সেরে উঠতে দেরী লাগল া তেমন,—কিন্তু আর একটা কোন অদৃশ্য ক্ষত যেন ধীরে ধীরে াসা বাঁধল মুখুজ্যেদের মনের কোণে।

দিন কেটে গেছে। গোয়ালঘরের পিছনে নতুন ঘর উঠেছে ছঁচা-বেড়ার,—ডোমবুড়ী তিন দিন থেকে এসে গামলা গামলা াস্তাভাত আর লঙ্কা খাচ্ছে, নাড়ী কাটতে জুড়ি নেই ওর সারা গাপীবল্লভপুরে,—মুখুজ্যেদের বৌ-এর প্রথম ছেলে হবে।

হল। ছেলে নয়, মেয়ে। ধবধবে তার গায়ের রঙ,—বেড়ালের তন কটা তার চোখের মণি। মুখুজ্যেদের বৌ মনে মনে তার নাম খলে চাঁপা।

সেই রাত্রে আঁতুড়ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বামী: ঐ য়েকে ত্যাগ করতে হবে।

শিউরে উঠল মুখুজ্যেদের বৌ। কী বলছ তুমি?

: হ্যাঁ। ডোমবুড়ী বলেছে ও লুকিয়ে পাচার করে দেবে।

প্রাণপণে সদ্যোজাত কন্যাকে জড়িয়ে ধরে মুখুজ্যেদের বৌ।

: কেন?

: কেন? ওর চোখের মণি দেখেছ?

: হ্যাঁ। কিন্তু—

: কোন কিন্তু নেই। ও মেয়েকে সরিয়ে ফেলতেই হবে।

: ন্-না-আ-আ-আ! চীৎকার করে উঠল মুখুজ্যেদের বৌ।

: চেঁচিও না। মেয়েকে ত্যাগ করতে না পারলে তোমাকেই াগ করতে হবে এই বাড়ী।

: কেন? আবার ব্যাকুল প্রশ্ন মুখুজ্যেদের বৌ-এর।

: দেখেছ ওর চোখের মণি?

আবার সেই এক উত্তর স্বামীর। যার কোন অর্থই বুঝতে পারে মুখুজ্যেদের বৌ। মেয়ের চোখ সোনালী তো হয়েছে কী? নালী চোখ কি অকল্যাণের চিহ্ন?

শেষ অবধি রাতের অন্ধকারে অসুস্থ শরীরে সদ্যোজাত কন্যাটিকে ক নিয়ে পথে নামতেই হল মুখুজ্যেদের বৌকে,—অপরাধটা কোথায়, ঝুই না বুঝে।

আশ্রয় দিলে ঐ ডোমবুড়ীই। তার মাতাল ভাইয়ের বাড়ী। ডোমবুড়ীর কাছ থেকেই জানতে পারলে মুখুজ্যেদের বৌ,—কোন সিত সন্দেহে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। সেই তৃমাতৃহীনা সরলা বধূটিকে।

দিন গেল। সেই সোনালী-চোখ মেয়ে হয়ে দাঁড়াল একদিন ফাওয়ালী। আর, সেই তয়ফাওয়ালীর মেয়ে হল বেনোয়ারীলালের ড় দাদামশায়ের থিয়েটারের প্রধানা অভিনেত্রী কাদম্বিনী।

থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন কাদম্বিনী পরিণত বয়সে। তখন তাঁর চুলের আশে-পাশে এক-আধগাছা পাকা চুল উঁকি দিতে সুরু করেছে। নাচতে জানতেন মুসলমানী ঢং-এ। গানের গলা ছিল তাঁর অপূর্ব! গীতিনাট্যের অভিনয়ে মাৎ করে দিতেন দর্শককে। একবার সীতারাম নাটকে জয়ন্তী সেজে গেয়েছিলেন 'উদার অম্বর শূন্য সাগর, শূন্যে মিলাও প্রাণ।'—সে গান সে-যুগের জীবিত শ্রোতাদের কানে আজও গেঁথে আছে।

বৃদ্ধ বয়সে ছোড় দাদামশাই যখন ব্যাধিগ্রস্ত হলেন, তখন দুই দিদিমার কেউই জীবিতা নেই। বারবাড়ীর একতলার হলঘরে শয্যা নিলেন ছোড় দাদামশাই। কাদম্বিনী প্রতিদিন আসতেন তাঁর সেবা করতে। আসতেন সেই ভোরবেলা,—দুপুরে একবার ফিরে যেতেন নিজের গাড়ীতে স্নানাহার করতে,—আবার বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। অমন সেবা দিদিমারাও করতে পারতেন কি না সন্দেহ!

মারা গেলেন ছোড় দাদামশাই। কাদম্বিনী চলে গেলেন তীর্থে দীর্ঘ দিনের অর্জিত সকল ঐশ্বর্য মঠে-মন্দিরে, হাসপাতালে, নারীকল্যাণ আশ্রমে দান করে দিয়ে কাশীবাসিনী হলেন সেই থেকে। ষ্টেজে আর ফিরে আসেননি কোন দিন। কলকাতাতেও নয়।

বেনোয়ারীলাল দত্ত বলতে লাগলেন: গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালা শুনেছ কখনো ডাক্তার? সুন্দরের রূপ দেখে মজে গিয়ে বর্দ্ধমানের নারীরা যে গান গেয়েছিল, মনে আছে? ঐ যে গো,— 'মদন-আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ,—কি গুণ করলে ঐ বিদেশী।'—একদিন সকালে ছোড় দাদামশায়ের গাড়ীতে কোরে একা গেছলুম ঐ কাদম্বিনীর বাড়ীতে কী একটা জরুরী চিঠি দিতে। কতই বা বয়েস তখন আমার? বালকই বলতে পার। কাদম্বিনী তখন পুজোর ঘরে। দাঁড়ালুম দরজায়। উনি তখন ৺রাধাবিনোদের জন্যে চন্দন ঘষতে ঘষতে গুন-গুন করে গাইছিলেন ঐ গানটি,—

'মদন-আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ;—কি গুণ করলে ঐ বিদেশী।
ইচ্ছে করে উহার করে প্রাণ সঁপে দে হই গো দাসী।
মন-মাঝি ছেড়েছে হাল ছিঁড়ে গেছে লজ্জাপাল,
তরী হল বানচাল,—কি করি বল সজনি॥'

জানো ডাক্তার, আজও সে-গানের সুর আর পরিবেশটি আমার মনে গেঁথে আছে। সাধারণ একটা ফাজলামির গান যে পরিবেশ আর গাওয়ার ভঙ্গিতে কোন্ উঁচুতে গিয়ে উঠতে পারে, সেদিনের সেই গান শুনলে তুমি বুঝতে পারতে ডাক্তার! এক লহমায় গোপাল উড়ের ঐ 'বিদেশী' একাকার হয়ে গেল ৺রাধাবিনোদের সঙ্গে। গানের সমস্ত অর্থটাই গেল বেমালুম বদলে।

আবার ঐ যে তোমার দাশু রায়ের ভক্তিমূলক গান,—'নন্দের নন্দন চিন্তামণি কি ধন চিনতে পারলি নে। যাঁরে চিন্তিলে যায় ভবচিন্তা তাঁরে চিন্তা করলি নে।'—ঐ গান শুনেছি নরীবালার মুখে। মনে হয়েছে যেন বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর ঢং-এর গান শুনছি।

নরীবালাদের সঙ্গে কাদম্বিনীর এইখানেই ছিল তফাৎ। কাদম্বিনীর জন্ম অন্ধকারে,—জীবন কাটাতে হয়েছে তাকে সাধারণ নষ্টা স্ত্রীলোকের মত। তার জীবনের গানে ভাগ্যবিধাতা ভাষা দিয়েছিলেন,—'মদন-আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ;' কিন্তু তার বুকের মধ্যে কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল একটি বৈরাগী, যে সেই চটুল

ভার্ধাকে অবলম্বন করেও শেষ পর্যন্ত গড়ে তুলেছিল একটি স্নিগ্ধ —পবিত্র ভাব। তাই, কাদম্বিনী যখন মারা গেলেন,—কাশীধামের অনাথ-আতুরের দল তাদের অম্বামাঈকে হারিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছে।

যদি জানতে চাও সে-যুগের থিয়েটারের কথা, একটা কড়া চুরুট ধরিয়ে দিয়ে বসে যাও বেনোয়ারী বাবুর সামনে।—

—ডি-এল-রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে এণ্টিগোনাসের মা-এর চরিত্র ছিল জানতে ?—হ্যাঁ, ছিল। আর, সে চরিত্রে অভিনয় করতেন তিনকড়ি দাসী।···নাম শুনেছ বেলবাবুর ? নাম শুনেছ রাধামাধব করের ? দু'জনেই 'প্রফুল্ল'-তে ভজহরি সেজেছিলেন। বেশি দিন নয়, মাত্র গোটা চল্লিশ বছর আগে মনোমোহন থিয়েটারের সঙ্গে একত্র বায়োস্কোপ দেখিয়ে প্লে হয়েছিল বিষবৃক্ষ আর মেঘনাদবধ, মনে আছে এ-কথা ? গিরিশের 'সৎনাম' নাটক কার উৎসাহে লেখা হয়েছিল জান ?—সিষ্টার নিবেদিতা।···মেছোবাজারের সিনেমায় বসে হিন্দী ছবি দেখতে দেখতে একবারও মনে করতে পার কি, নাম ছিল ওর এক কালে বীণা থিয়েটার ? বয়স ওর সত্তরের কাছাকাছি ?···মিনার্ভা থিয়েটারের প্রথম নাটক কি জান ? ম্যাক্‌বেথ। গিরিশ ঘোষের অনুবাদ। ১৮৯৩ সালের ২৮শে জানুয়ারি প্রথম প্লে হল তার। পীম সাহেব ছিলেন সে নাটকের ড্রেসার। তিরিশ বছর বাদে ঐ মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে গেল আগুনে।···

···ষ্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, বীণা, আর্ট থিয়েটার, কোরিন্থিয়ান্, ক্লাসিক, মনোমোহন, নাট্যনিকেতন, রঙমহল, চীপ থিয়েটার, নাট্যভারতী, শ্রীরঙ্গম, বিশ্বরূপা, অ্যালফ্রেড, কর্ণওয়ালিস,—অনেক থিয়েটারেরই তো নাম শুনেছ। নাম শুনেছ পেনালাট গঙ্গালাটের থিয়েটারের ? জানো, কারা ছিল সেই থিয়েটারের মালিক ? কবে হয়েছিল তার শুরু ? কী তার নাটক ? শোনো তবে,— সে থিয়েটারের মালিক ছিল কয়েক জন বালক। তাদের মধ্যে একজনের নাম দানী ঘোষ। আঠারো শো পঁচাত্তর নাগাদ প্লে হয়েছিল তার 'চিতোররাজ' আর 'পদ্মিনী' বাড়ীর উঠানে মাচা বেঁধে, কাগজের সিন্ এঁকে। দানী ঘোষ প্লে করেনি তাতে, ঢোলক বাজিয়েছিল গানের সঙ্গে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ,—দানী ঘোষ মানে বিখ্যাত দানীবাবু, গিরিশ-তনয় সুরেন্দ্রনাথই। দানী বাবুর নাম তোমরা শুনেছ সকলেই—শুনেছ তাঁর বড় বড় পার্টে বড় বড় অভিনয়ের কথা,—কিন্তু আমি তোমায় বলছি ডাক্তার, বড় বড় সীরিয়স পার্টের চেয়ে কমিক পার্ট তাঁর অনেক ভাল হত। গ্রাম্যবিভ্রাট নাটকে ওঁর 'ঘোলাকামার' কিংবা হীরকজুবিলী নাটকে 'মাতাল'-এর পার্ট যদি তুমি দেখতে ডাক্তার, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি আমার কথায় সায় দিতে। ভুনী বাবুও গিরিশ বাবুকে প্রায়ই বলতেন গুরুদেব, দানীকে কমিক্ পার্ট করতে না দিয়ে আপনি কী ভুলই করছেন। অর্দ্ধেন্দুর পর দানীর মত কমিক পার্ট করবার কেউ নেই ষ্টেজে।···

বেনোয়ারী বাবুর থিয়েটারের গল্পের সাল-তারিখ আঠার শো পঁচানব্বই-এর ওদিকে যায় না বড় একটা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গল্প পাবে তাঁর কাছে। আরো যদি পিছোতে চাও, তাহলে সিগারেটের প্যাকেটটা সদানন্দ বাগচীর সাজের টেবিলে খুলে রেখে বসে পড় তাঁর সামনে।

বেনোয়ারী বাবুর নাটকের সুরু বড় জোর রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বেলুনে বাঙ্গালী' কিংবা দুর্গাদাস দে'র 'পয়জারে পাজী' দিয়ে। সদানন্দ বাবুর কাছে কিন্তু তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন'-এও রেহাই নেই। আরো পিছিয়ে গিয়ে সুরু করে দেবেন তিনি—

: আরে ভায়া, তোমার ঐ তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন'ই বল, হরচন্দ্র ঘোষের 'সুশীলা-বীরসিংহ'-ই বল, আর যোগেন গুপ্তর 'কীর্ত্তিবিলাস'ই বল,—বয়স তো ঐ ১৮৫২ সাল হে! বাঙালী কিন্তু আধুনিক নাটক লিখেছে তারও বিশ বছর আগে। নাট্যকারের নাম কেষ্টমোহন বাঁড়ুজ্যে, ভাষা ইংরেজি, নাম 'The Persecuted' তবে ষ্টেজে প্লে যতক্ষণ না হচ্ছে, ততক্ষণ নাটক যেন ঐ যাদুঘরের খ'ড়-পোরা জন্তু। সে-হিসেবে দেখতে গেলে ঐ তর্করত্ন মশায়ের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'কেই বলতে পারো প্রথম বাংলা নাটক। সালটা হল ১৮৫৪।

কলকাতায় থিয়েটার সুরু হয়েছে কি আজকে ? সেই একেবারে আঠার শতাব্দীর শেষ দিক থেকে। ইংরেজী থিয়েটার অবশ্য। 'শাঁ-সুঁচি' থিয়েটারের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই ? ঐ থিয়েটার পুড়ে যেতে প্রিন্স দ্বারকানাথ সাহেবদের প্লের জন্তে বাড়ী জোগাড় করে দিয়েছিলেন। নাম শুনেছ বৈষ্ণবচরণ আঢ্যের ? সাহেবদের থিয়েটারে সাহেব-মেমেদের সঙ্গে সেক্সপীয়রের নাটকে নায়ক সাজতেন। বাঙালীর থিয়েটারের নেশা কি আজকের ভায়া ? বহু কাল, বহু কাল।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত-কথায় পড়েছ তো, পালে-পার্বণে নাটক হচ্ছে আর স্বয়ং মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদদের নিয়ে সেই নাটকে অভিনয় করছে। বৃদ্ধ অদ্বৈত পণ্ডিত পর্যন্ত প্লে করেছেন নাটকে! তা' সে মহাপ্রভুর সময়টা কবে ? ষোড়শ শতাব্দী বটে তো। তাহলে মনে কর, ষোড়শ শতাব্দীতেই যদি নাটকের এত চল যে, মহাপ্রভু, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ পর্যন্ত প্লে করছেন, তাহলে ঐ অভিনয়ের ব্যাপারটা অন্তত পক্ষে তারও দু-তিন শো বছর আগে থেকেই চালু ছিল নিশ্চয়ই বাঙালী-সমাজে।

তাহলে বোঝ ভায়া, নাটকে বাঙালীর নাটকপ্রীতিটা কতকালের জিনিষ!

[ ক্রমশঃ

"A Hollywood movie mogul is a fellow who closes staff meetings saying, All opposed will signify by saying 'I resign.'"

—*Groucho Marx.*

# ভাবি এক, হয় আর

শ্রীদিলীপকুমার রায়

## বত্রিশ

পল্লব স্তম্ভিত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রথম বিস্ময়ের ভাব কেটে যেতেই আনন্দে গর্বে ওর বুক দশ হাত হয়ে ওঠে: ধন্ম মোহনলাল—একেই বলি মরদ! কেবল একটা খেদ তবু আবছা সুরে ওর মনের মধ্যে বেজে ওঠে, যাকে কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারে না সে, এত বড় একটা কাণ্ড করবার আগে মোহনলাল ওকে একটু আভাসও দিল না! একবার মনে হল—হয়ত দেয়নি এই জন্তেই, যে পল্লব কুঙ্কুমকে না বলে থাকতে পারবে না। কিন্তু তার পরেই ফের জেগে ওঠে অভিমান: কেন? মোহনলাল ওকে গোপনে বলতেও তো পারত—কাউকে বলবে না কথা আদায় করে নিয়ে? ওর মনে খানিকক্ষণ এই ভাবে চলল আনন্দের সঙ্গে বিষাদের দ্বন্দ্ব। কিন্তু এর মধ্যে ঈর্ষার লেশও ছিল না বলে বিষাদ ও ক্ষোভ-ক না-মঞ্জুর করা ওর পক্ষে তেমন কঠিন হল না—আরো এইজন্তে যে, সব ছাপিয়ে ওর আনন্দ উঠেছিল ফুলে যে, মোহনলাল রিতাকে নিঃস্ব জেনেও পেছোয় নি। গেট খুলে সেই ফোয়ারার কাছে আসতেই দেখে—মোহনলালের বাহুবেষ্টনে রিতা! নববধূর সাদা পোষাকে ফুটফুটে চাঁদের আলোয় কী সুন্দর যে দেখায় ওকে! ওর মুখের সব রোখ, ঝাঁঝ, কাঠিন্ত যেন গলে গিয়ে বিশ্রব্ধা নববধূর কোমল কৃতজ্ঞতায় ফুলের মতনই ফুটে উঠেছে!

ওকে দেখেই দু'জনে উঠে দাঁড়ায়। মোহনলাল বলে: ভাই, তোমার কাছে আমি অপরাধী। তোমাকে বলা উচিত ছিল—মানে আমরা আজ—

পল্লব বাধা দিয়ে ওকে বলে: জানি, মোহন, আমি খানিক আগে গেটের দৃশ্যের দর্শক ছিলাম, সব শুনেছি আড়াল থেকে।

রিতা হাসিমুখে বলল: এরই নাম বুঝি ভারতীয় শালীনতা? গুপ্তচর কোথাকার! বলেই খিল-খিল ক'রে হেসে: কিন্তু তোমাকে শাস্তি দেবই দেব আজ। ব'লেও ওর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে ওর কপালে চুম্বন করে। পল্লব বিব্রত হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মোহনলাল হেসে বলে: এখনো? মনে নেই কুঙ্কুমের কথা: While in Rome you must do us the Romans do? মনে রেখো, ওকে প্রত্যভিনন্দন না করলে লাজুক নাম কিনতে পাবো, কিন্তু চাষা ব'লে তবে।

পল্লব রিতার দু' হাত নিজের দু' হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে: মুখের কথায় প্রত্যভিনন্দনের কি দরকার আছে রিতা? মোহনলালের সম্বন্ধে আমার মনোভাব কি তোমার অজানা?

রিতা পল্লবের কটি বেষ্টন ক'রে বলে: পল্ল! তোমাকে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না, O marieur cheri।[১] না, প্রতিবাদ নয়-তুমিই ক'রেছ আমাদের ঘটকালি আর কেউ নয়—নৈলে কি তার দেখা পেতাম এ ভাবে? যার জন্তে পথ চেয়েছিলাম অথচ জানতাম না সে-ও ছিল আমার পথ চেয়ে। ব'লেই গান ধ'রে দেয়:

Je veux voir ta tace De beaute eternelle..
Que m'entoure ta grace, Venue â mon appel:[২]

হঠাৎ মিসেস টমাসের অভ্যুদয়: রিতা! তোমার আংকল্ তোমাকে ডাকছেন। রিতা আজ যেন নেচে-কুঁদে চলে—হাওয়ায় উড়ে। "চলো আন্টি! চলো চলো।" মিসেস টমাস হেসে ওর পিছু নিলেন।

* * * *

মোহনলাল বলল: ভাই, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। ভালোই হ'ল, একটু সময় পাওয়া গেল।

পল্লব হেসে বলে: এখন আর আমাদের সঙ্গে কী কথাই বা থাকতে পারে ভাই? ঘটার পরে ঘটক তো অবান্তর।—না ঠাট্টা থাক। তোমাকে আগে বলি আমার কথা: সত্যি এ তোমার যোগ্য কাজই হয়েছে—বিশেষ ক'রে এই জন্তে যে রিতা আজ নিঃস্ব, নিঃসম্বল।

মোহনলাল বলে: ঠিক সেই জন্তেই আমাকে এত তাড়াতাড়ি বিবাহ করতে হ'ল। তোমাকে যে কিছু বলিনি ভাই তার কারণ—ওকে বিবাহ করব অবশ্য স্থিরই করেছিলাম, কেবল ভেবেছিলাম দু'দিন বাদে করাই ভালো, নানা কারণে। কাউন্ট তাই এক দিক দিয়ে আমাদের বন্ধুর কাজই করেছেন বলব, যেহেতু শুভস্য শীঘ্রম্। কিন্তু সে যাক। দরকারি কথাটা আগে ব'লে নিই। ব'লে একটু মুখ নিচু ক'রে ভেবে: কথাটা কী - বুঝতেই পারছ।

পল্লবও মুখ নীচু করে: হুঁ।

মোহনলাল মুখ তুলে পল্লবের দিকে চেয়ে বলে: কিন্তু উপায় কী বলো? ব'লে একটু থেমে: আশা করি কুঙ্কুম বুঝবে যখন... যখন...কী বলব বলো ভবিতব্য ছাড়া? ব'লে ঈষৎ করুণ হেসে: নৈলে কি আমার মতন সাবধানীও পাকে পড়ে?

পল্লব ওর চোখের দিকে চেয়ে বলে: এ-ধরণের কথা কেন ভাই এ শুভ দিনে? কুঙ্কুম—অবশ্য—মানে আমার মনে হয়—কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারে না।

মোহনলাল বলে: পল্লব, শোনো। আমি আর যাই হই অন্ধ নই; তুমি জানো। অথচ...অথচ...পাকে-চক্রে এমন ঘ'টে গেল যে এ ছাড়া আর কোনো পথই ছিল না। আমি ভগবানে বিশ্বাস করি কি না জানি না—এক এক সময়ে মনে হয় তিনি আছেন, আবার অন্য মূডে মনে হয় তিনি গুজব। কিন্তু একটা কথা আমার আজ মনে হয় যে কোনো একটা অদৃশ্য শক্তি আমাদের চালাচ্ছে—আমরা নিজেদের স্বাধীন ভাবি; ভাবতে ভালো লাগে ব'লেই। ব'লে একটু থেমে, শোনো বলি। আমার একটা খুব অহঙ্কার ছিল, তুমি জানো, যে আমি ঝোঁকের মাথায় কিছু করি না, এক পা এগুলে দু'পা পেছুই। কিন্তু কী প্রবল টানের স্রোতে যে প'ড়ে গেলাম—মনে হ'ল কোথায় আমার মনের জোর, কোথায় আমার ভেবেচিন্তে চলার প্রতিজ্ঞা? আমি জানতাম অবিশ্যি যে, রিতা আমাকে মুঠোর মধ্যে করেছিল প্রধানত তার অসামান্য রূপের মাদকতায়। না, শুধু রূপই নয়—তার উপর ওর আশ্চর্য প্রাণশক্তি। ওর জেদ রোখ ঝোঁক ঝাঁঝ সবই আমাকে পেয়ে বসল। আমার মনে হ'ল—হ'ল বলছি কেন, এখনো মনে হয় এমন মেয়ে আমি দুটি দেখিনি। ফলে দেশ, মা এমন কি কুঙ্কুমও ভেসে গেল।

---

১। চাই দেখতে মুখের তোমার রূপ অফুরাণ অনুরাগে।
২। রেখো ঘিরে কৃপায় অপার, এলে যখন আমার ডাকে।

এক দুর্নিবার কামনা আমাকে পেয়ে বসল। আমি জগতকে দেখলাম অন্য চোখে। ঈষৎ বিষণ্ণ কণ্ঠে: হয়ত কুঙ্কুম বলবে এরই নাম মোহ—যৌবনের দুর্বার তরঙ্গ। জানি না। কিন্তু যদি এ মোহই হয়—মানে, যদি রিতার সঙ্গে আমার বিবাহ পরিণামে ব্যর্থও হয়—তবু বলব, এ বড় অপরূপ মোহ; যার স্বাদ পেয়ে আমি আজ ধন্য—এমন স্বাদ যার জন্যে আমি সব ছাড়তে পারি। জানি—আমার আজকের মুড কাল না-ও থাকতে পারে। তুমি জানো, আমি নিজে তো কত বারই হেসেছি কারুর কারুর মোহ দেখে, বলেছি পাগলামি। কিন্তু তবু আজ আমি ভাবতেই পারি না যে আমাদের পরস্পরের প্রতি এ টান দু'দিন বাদেই শিথিল হয়ে যাবে। যে-ফুলটি স্বপ্নের বৃন্তে এমন অপরূপ রূপে ফুটে উঠেছে—তার রূপ রঙ মলিন হয়ে যাবে স্বপ্নভঙ্গ হবার সঙ্গে সঙ্গে। মনে হয়—বন্ধু-বান্ধব দেশ কর্তব্য কিছুই দাঁড়ায় না যে দুর্নিবার তোড়ের সামনে, তার পরমানন্দ কখনই বিফলতা আনতে পারে না। কিন্তু তবু বুকের মধ্যে খচ খচ করে বাজে ভাবতে যে, কুঙ্কুমকে হারানোর ব্যথার দাম দিয়ে তবে এ আনন্দ কিনতে হল।

পল্লব চুপ করে থাকে, মোহন বলে চলে: আজ ভাই তোমাকে আমার একটা অনুরোধ আছে। শোন মন দিয়ে। একটু থেমে, আজ আমি তোমার কাছে প্রার্থী। না, কথা কোয়ো না। হাঁ, সত্যিই প্রার্থী। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। কারণ, আমি জানি যে, যদি কেউ কুঙ্কুমের মন ফেরাতে পারে তবে সে তুমি। তাই আমি চাই—তুমি অন্তত চেষ্টা করবে যাতে—বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে—যাতে কুঙ্কুম আমার তরফের কথা ভাবে একটু। একথা বলছি আরো এইজন্যে যে, আমি নিশ্চয় জানি যে ও আমাকে কোনো কথাই বলবে না, বাইরে আমার এতটুকু নিন্দা পর্যন্ত করবে না। পরচর্চা, পরনিন্দা, গসিপ্‌, এ সবকে ও মনে-প্রাণে ঘৃণা করে। ওকে চিনি তো! ও কী করবে তা-ও জানি। ও আমার সম্বন্ধে একেবারে গুম্‌ হয়ে গিয়ে আমাকে ওর মন থেকে ছেঁটে বাদ দিয়ে দেবে—ঠিক যেমন মানুষ কোনো বিষিয়ে-ওঠা দেহাঙ্গকে কেটে বাদ দেয়। এ সম্ভাবনার কথা ভাবতেও আমার বুকের মধ্যে খালি খালি লাগে। তাই ভাই, তোমার কাছে আমার শুধু এই মিনতি যে তুমি অন্ততঃ আমাদের বর্জন কোরো না—আর পারো তো কুঙ্কুমকে বোলো যা যা তোমাকে বললাম।

বলেই মোহনলাল দু'হাতে মুখ ঢাকে।

পল্লব ওর কাঁধে হাত দিয়ে আর্দ্রকণ্ঠে ডাকে: মোহনলাল! ভাই। শোনো—আমি কথা দিচ্ছি···

এই সময়ে পিছনে খশ-খশ শব্দে দু'জনেই চমকে ওঠে ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়।

রিতার হাসিভরা আলোভরা মুখ রাস্তার আর্কল্যাম্পের তীব্র আলোয় মলিন দেখায়। ও ডাকে: মোহন!

মোহনলাল মুখ ফিরিয়ে অশ্রু গোপন করে।

রিতা বলে: কেন তবে আমার জন্যে···বলেই ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে।

মোহনলাল ওকে ধরে ভিতরে নিয়ে যায়।

পল্লব ভেবে পায় না কী ভাববে? শুধু বুকের মধ্যে ওর দুলে ওঠে অশ্রুসাগর।

## তেত্রিশ

পল্লব পরদিনই লণ্ডনে গেল বটে, কিন্তু ২১ রাসেল স্কোয়ারে গিয়ে শুনল: কুঙ্কুম ডাবলিন থেকে তিন চার দিন পরে ফিরবে। ও একটু মুশকিলে পড়ল। কারণ, লণ্ডনে ও এসেছিল শুধু কুঙ্কুমের সঙ্গে মোহনলালের বিবাহের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে—বিশেষ ক'রে মোহনলালের ওকালতি করতে। ওর ইচ্ছে ছিল মোহনলালের বিবাহের খবরটা কুঙ্কুম সর্বপ্রথম ওর কাছ থেকেই পায়। কারণ, কেমব্রিজের ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের মধ্যে অনেকেই মোহনলালকে পছন্দ করে না, তারা কুঙ্কুমকে খবরটা জানাবেই পল্লবিত ক'রে। ভেবে-চিন্তে ও কুঙ্কুমকে লণ্ডন থেকে লিখল ডাবলিনের ঠিকানায় সব-কথা জানিয়ে। শেষে লিখল—ও শুধু কুঙ্কুমের সঙ্গে দেখা করতেই লণ্ডনে এসেছিল, কিন্তু একা-একা লণ্ডনে অপেক্ষা করার চেয়ে কেমব্রিজে গিয়ে একটু জিরিয়ে নেওয়াই ভালো ভেবে কেমব্রিজেই ফিরছে, সেখানেই কুঙ্কুমের সঙ্গে দেখা হবে।

* * * *

কেমব্রিজে ফিরে মিসেস নর্টন ও রিনার স্নেহময় সাহচর্যে ও খানিকটা স্বস্তি হ'ল বটে, কিন্তু মোহনলালের জন্যে দুশ্চিন্তা সমানই রইল। মোহনলাল রিতাকে নিয়ে নরওয়ে গিয়েছিল 'মধুচন্দ্র' যাপন করতে। ফিরবার কথা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। পল্লব কেমব্রিজে ফিরে এল সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে। কুঙ্কুম লিখল, ডাবলিনে অনেক কিছু জানবার ও শিখবার সুবিধে হ'য়ে যাওয়ার দরুণ ওর কেমব্রিজে ফিরতে অক্টোবরের মাঝামাঝি হবে। পল্লব একটু বিমর্ষ হ'য়ে পড়ল বৈ কি! চিন্তার ভার সমানে ওর বুকে জগদ্দল পাথরের মতনই চেপে রইল।

মোহনলাল রিতাকে মিষ্টার টমাসের কাছে রেখে কেমব্রিজে ফিরল যথাকালে—কলেজ খুলবার দিন দুই আগে। পল্লবকে বলল: কেমব্রিজে ওর আর যে-একটা পরীক্ষা দেওয়া বাকি, সেটা পাশ ক'রেই ও রিতাকে নিয়ে দেশে ফিরবে। একটু দুঃখ ক'রেই বলল: মা শুনে খুব কান্নাকাটি ক'রে চিঠি লিখেছেন—ম্লেচ্ছ মেম-বউয়ের সঙ্গে প্রাণ গেলেও একসঙ্গে থাকতে পারবেন না। ব'লে একটু ঝাঁঝালো সুরেই বলল: এই হ'ল আমাদের ঋষিদের দেশের সনাতন মতিগতি: হিন্দু ছাড়া আর সবাই অস্পৃশ্য। সাধে কি স্বামী বিবেকানন্দ খেদ করেছিলেন—আমাদের সব ধর্ম গিয়ে ঢুকেছে শেষটায় ভাতের হাঁড়িতে!

পল্লব তর্ক করল না। একটু চুপ ক'রে থেকে শুধু বলল: হয়ত রিতাকে দেখলে তোমার মা ভালো না বেসে পারবেন না। বলে না—সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র?

মোহনলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল: আমার মাকে তো জানো না ভাই! সেকেলে মানুষ—সংস্কার তাঁকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছে, তার উপর বিপর্যয় শুচিবাই! গঙ্গাজল আর গোবরই তাঁর কাছে দেবতা। তবে তাঁকেই বা দোষ দিই কোন্‌ মুখে বলো—যখন দেখি—যাঁরা ভাবেন এক দিক দিয়ে সংস্কারের নাগপাশ কাটিয়ে উঠেছেন তাঁরাও পরীক্ষার সঙ্গে মুখোমুখি হ'তে না হ'তে গুড়গুড় ক'রে হন পুনর্মূষিক—হয় সম্মানের লোভে, নয় তথাকথিত রিয়্যাকশনরি যুক্তির প্রতাপে। অথচ তবু—ও তিক্ত হেসে বলে: চোখ চেয়ে আমরা দেখব না তো কোথায় আজ আমরা এসে পড়েছি। সমানে ক'রে চলেছি শুধু অতীতেরই জয়গান। [ ক্রমশঃ।

আশু চট্টোপাধ্যায়

সারাদিনের উপবাসের পর পেটে ভোজ্যবস্তু পড়তেই অরিন্দমের ধূমপানের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। এরপর সারারাত বাসর-ঘরে তার উপর চলবে মেয়েদের অত্যাচার। তাই সাময়িক ভাবে ছুটী নিয়ে সে বেরিয়ে এল।

রাত্রি অবশ্য গভীর হয়েছে। বাসন্তী রাত্রি। চাঁদের আলোয় গঙ্গার বুকে রূপালি চাদর পাতা রয়েছে। বিয়ে বাড়ীতে বেহাগ রাগে সানাই বাজছে। গঙ্গার ধারে জনপ্রাণী নেই। অরিন্দম খুসী মনে সিগারেট ধরিয়ে দুই ফুসফুস ভরে তার সুরভিত ধোঁয়া গ্রহণ করল। তার পর মুহূর্ত্তেই লক্ষ্য করল, দূরে একটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি।

বিয়ে বাড়ির কেউ হতে পারে, অন্য কেউ হতে পারে। গঙ্গাতীর তার জন্য রিজার্ভ করা নেই। তাই সে সেদিকে লক্ষ্য না করে জলের উচ্ছল গতিবেগের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু পূর্ব্বে যে-কোমল করপল্লবটি তার দক্ষিণহস্তের উপর উপুড় হয়ে নবপল্লবের মত থরথর করে কেঁপেছিল, তার রোমাঞ্চ এখনো তার দেহ মন থেকে মিলিয়ে যায়নি। এই বিহ্বল রাত্রি মানুষের জীবনে একবারই আসে।

তারপর সে মূর্ত্তিটিকে দ্বিতীয়বার লক্ষ্য করল। গঙ্গার পাড় দিয়ে নিচে নামছে—নারীমূর্ত্তি। অস্পষ্টভাবে যেন মনে হচ্ছে আঁচল স্খলিত হয়ে পড়েছে। চলার মধ্যে যেন একটা অসহায় ভঙ্গী। অরিন্দম একাগ্র মনোযোগে সেদিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি জলের খুব সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছে। এত রাত্রে কেউ স্নান করতে আসতে পারে না কি। না অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে? অরিন্দম রীতিমত চিন্তিত হল। সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে দ্রুতপদে সেদিকে অগ্রসর হল।

তাকে আসতে দেখে মেয়েটিও গতি বাড়িয়ে দিল; তাই গড়ানে [illegible] এবং মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আঁচলটা সত্যই মাটিতে লুটোচ্ছে, রুক্ষ চুল বুকে পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, চারপাশে হাওয়ায় উড়ছে। কঠিন মুখে সমস্ত হাড়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, চোখের দৃষ্টি প্রখর। অরিন্দমকে দেখে জলের কিনারায় থমকে দাঁড়াল।

এ আপনি কি করতে যাচ্ছেন? অরিন্দমের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

মেয়েটির সর্ব্বাবয়ব একবার কেঁপে উঠল, তারপর সে নিঃশব্দে রইল। কোনো উত্তর দিল না।

চলুন, উপরে চলুন। অরিন্দম অনুনয়ের কণ্ঠে বলল।

তার মুখে তখনো চন্দনের সাজ, সিল্কের পাঞ্জাবি থেকে মালার কুসুমগন্ধ বেরুচ্ছে। তার দিকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে থেকে মেয়েটি স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিল, আমি কি করছি, না করছি তাতে আপনার কি? আপনি ত ওই বিয়ে বাড়ির বর, ওখানে ফিরে যান।

আপনিও তাহলে যেখান থেকে এসেছেন, সেখানে ফিরে যান। অরিন্দম বলল।

মেয়েটি তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

চলুন, ওপরে উঠে চলুন। অরিন্দম মিষ্টি হেসে বলল।

কোথায় যাবো? মেয়েটি যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে প্রশ্ন করল।

কেন, আপনার বাড়ীতে, যেখানে আপনার আত্মীয় স্বজনরা আছেন। আপনাকে ভদ্রঘরের মেয়ে বলে স্পষ্ট বুঝতে পারছি। এত রাত্রে আপনি একা এখানে কি করছেন?

মেয়েটি এবার ধীরে ধীরে বলল, আমার বাড়ি নেই।

বাড়ি নেই? অরিন্দম বিস্মিত হয়ে বলল, বাড়ি নেই মানে কি? আপনি কি গ্রাম থেকে আসছেন? কেউ আপনাকে এখানে এনে কি আপনাকে পথে ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছে? আমাকে সব কথা খুলে বলুন। আমার যত অসুবিধেই হোক, আমি তাহলে এখনি আপনাকে সঙ্গে করে থানায় নিয়ে যাব, সেই লোকটির বিরুদ্ধে ডাইরী—

এতক্ষণে মেয়েটি হাসল, শীর্ণ করুণ হাসি। বলল, ওসব কিছু না। আপনি বিয়ে বাড়িতে যান। এখনি সকলে আপনাকে খুঁজতে বেরুবে। এখানে এসে নতুন বরকে আমার সঙ্গে গল্প করতে দেখলে তারা কি ভাববে। আমি স্নান করতে এসেছি। যান।

রাত দেড়টায় স্নান! মেয়েটি পাগল নয় ত! তাহলেও অরিন্দমের কর্ত্তব্য তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া। পাগলের কি কাণ্ডজ্ঞান আছে! তখনো সানাই একটানা বেজে চলেছে—তার মনকে টানছে বাসরঘরের দিকে। গঙ্গার প্রবল বাতাসে একটি উত্তপ্ত প্রগলভতা, সাগর-সৈকতের মত। আর যতদূর দৃষ্টি যায় চাঁদের আলো ছড়ানো রয়েছে সাদা চাদরের মত। মেয়েটির পরনে সাদা সাড়ী, কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর নেই। বয়েসটা অবিবাহিত থাকার পক্ষে বেমানান। অবশ্য এযুগে খুব সাধারণ ঘটনা এইভাবে নির্জ্জনে আত্মহত্যা করতে আসা। কিন্তু এত রাত থাকতে অরিন্দমের বিয়ের রাত্রেই কিনা তার এই মৃত্যুঅভিসার।

মেয়েটির হাসি আবার মিলিয়ে গেছে। মুখটা কঠিন, যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরী। চোখের দৃষ্টির প্রখরতা এখন নেই, কিন্তু চোখ মাটির দিকে নামিয়ে সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে।

চলুন, চলুন, অরিন্দম তাগাদা দিয়ে বলল, যা ভাববার কাল ভেবে ঠিক করবেন। নিশ্চয়ই আপনার একটা আস্তানা আছে। চলুন, ট্যাক্সি করে সেখানে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আপনি যাবেন না এখান থেকে? মেয়েটি রূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

আপনার একটা ব্যবস্থা না করে আমি যেতে পারিনা।

যান বলছি, নইলে আমি চীৎকার করে লোকজন ডাকব, তখন আপনার মুখ কোথায় থাকবে? মেয়েটি বলল।

অরিন্দম ক্রুদ্ধ হল। একে ত নির্ব্বোধের মত নিজের প্রাণ নষ্ট করতে এসেছে, তার ওপর আবার এই ব্যবহার। যে-লোকটা তার প্রাণ রক্ষা করতে এসেছে, তার সঙ্গে যে এই ভাবে কথা বলা চরম অকৃতজ্ঞতা এটুকু বোঝবার ক্ষমতাও যে মেয়ের নেই, তার সঙ্গে আর ভাল ব্যবহারের দাম কি। সেও রুক্ষ গলায় বলল, আত্মহত্যা করতে আপনাকে আমি দেব না, আপনাকে পুলিশের হাতে দেব।

এই বলে সে চেঁচিয়ে উঠল, পুলিশ, পুলিশ।

হয়ত সানাই-এর শব্দে তার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল। কিন্তু মেয়েটি ভয় পেয়ে হঠাৎ তার কাছে সরে এসে হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে বলে উঠল, কি করছেন, থামুন, চেঁচাবেন না।

হাত দিয়ে অরিন্দম মেয়েটির হাত নিজের মুখ থেকে সরিয়ে দিল।

মেয়েটি ব্যাকুল ভাবে বলে উঠল, ছি ছি, কি করলেন বলুন ত। যদি সত্যিই পুলিশ আসে তাহলে কি হবে?

অরিন্দম বিরক্ত ভাবে বলল, আমি না ডাকলে তুমি-ই ত আমাকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দিতে।

না, ডাকতাম না, ওটা আপনাকে ভয় দেখাবার জন্যে বলেছিলাম; যাতে আপনি চলে যান। পুলিশ বা লোকজন এলে ত আমিও মুস্কিলে পড়তাম, সেটা বুঝছেন ত?

অরিন্দম নরম আর অপ্রতিভ হয়ে বলল, রাগের মাথায় হঠাৎ 'তুমি' বলে ফেলেছি। তবে বয়েসে আমি যথেষ্ট বড়?

তুমি বলাতে একটুও রাগ করিনি। করব যদি আরো কিছুক্ষণ এখানে থাকেন।

তোমার আজ আত্মহত্যা করার কি এতই দরকার?

হ্যাঁ। মেয়েটি বলল। সে-কণ্ঠস্বরে বিচারকের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার মত অমোঘ নির্দ্দেশ।

অরিন্দম আশ্চর্য্য হয়ে ভাবল এ কিরকম কথা যে এই সুন্দর পরিবেশে মেয়েটিকে মরতেই হবে—যখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য আর ধরে না। এখনো তার দেহ মনে উৎসব রজনীর সমস্ত মাধুর্য টাটকা, সতেজ। এখনো আকাশের দুকুল ছেপে জ্যোৎস্নার জোয়ার চলেছে।

অরিন্দম আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগল বিয়ে বাড়ি থেকে তার খোঁজ করতে এখনো কেউ আসছে না কেন! তাহলে তার বা তাদের সাহায্যে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যায়। সাক্ষী থাকলে মেয়েটি চীৎকার করে কিছুই করতে পারবে না। হয়ত এমন কিছু বেশী সময় সে বাইরে আসেনি, তাই কারুর এখনো খেয়াল হচ্ছে না তার অনুপস্থিতিটা। অথচ জেনে শুনে একটি মেয়েকে ধীরে সুস্থে মরতে দিয়েও সে বাসর-ঘরে ফিরে গিয়ে আড্ডা জমাতে পারে না। তাতে প্রমাণ হবে সে অমানুষ, বাসর ঘরেরও রস ভঙ্গ হবে।
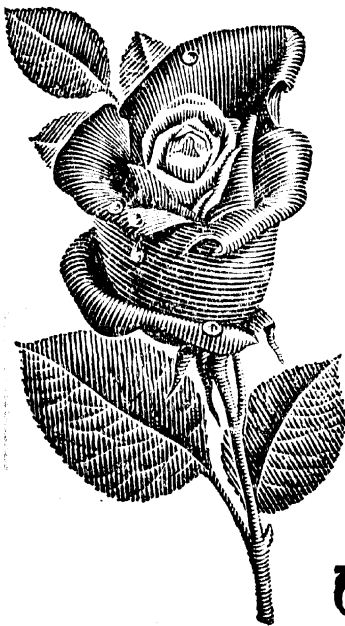
কিন্তু মরতে চায় কেন সেটাও ত বলবে। তাই সে একটু সদয় কণ্ঠে বলল, কেন তুমি আত্মহত্যা করা স্থির করেছ, সেটা অন্তত ত আমায় বলবে।

তা হলে আপনি ঠিক চলে যাবেন ?

কথা দিতে পারছিনা তবে শুনলে বিবেচনা করে দেখতে পারি।

তা হলে মন দিয়ে শুনুন, মেয়েটি মৃদু স্বরে বলল, বিয়ের দুবছর পরে আমার স্বামী মারা গেছেন। মারা গেছেন কিসে জানেন ? অনাহারে। একবছরের ছেলেটিকে ঝিবৃত্তি ক'রে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। সেটিও গেল কেন জানেন ? শক্ত অসুখে ওষুধ কেনবার টাকা ছিলনা বলে। এই কিছুক্ষণ আগে তাকে নিমতলায় পুড়িয়ে এলাম প্রতিবেশীদের সাহায্যে। তারা হয়ত এতক্ষণ আমায় খুঁজছে। কিন্তু নিষ্ঠুর ভগবানের এই জঘন্য পৃথিবীর মুখে নুড়ো জেলে দিয়ে কেন আমি চলে যাব না তা বলতে পারেন ?

কোনো উত্তর খুঁজে পেল না অরিন্দম, দেখল মেয়েটির মুখের রেখাগুলি আবার কঠিন হয়ে উঠেছে। শীর্ণ শরীরটি প্রতিজ্ঞার ঋজু। মনে হল সানাই-এর সুরটা যেন বিদ্রূপ করছে, চাঁদের আলোর প্লাবন যেন প্রকৃতির একটা চূড়ান্ত ন্যাকামা।

কিছুক্ষণ পরে সদয় কোমল কণ্ঠস্বরে সে বলল, কিন্তু জীবনটা নষ্ট করে কি লাভ বল ? বরং যদি সাহায্য করবার লোক পাও তা হলে' আর যারা না খেতে পেয়ে মরছে, রোগের সময় ওষুধ না পেয়ে মরছে, তাদের রক্ষা করবার চেষ্টা করতে পার। তা হলে তোমার জীবন সার্থক হবে। ভগবানকে গালাগাল দিতে নেই, মানুষের দুর্দ্দশার জন্মে মানুষই দায়ী।

একটু সময় মেয়েটি ভাবল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মনে হল এতক্ষণে তার চোখের কোলে দুটি অশ্রুবিন্দুর আবির্ভাব হয়েছে, যে নিটোল দুটি বিন্দু মুক্তোর চেয়ে দামী। মুখে ঘনিয়ে এল বর্ষা-সন্ধ্যার বনান্তের স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা।

তারপর এই প্রথম মিষ্ট কণ্ঠস্বরে বলল, আপনার কথা আমি মানি, কিন্তু কে আমায় সাহায্য করবে ? আমি একলা ত দুটো প্রাণও রক্ষা করতে পারলাম না। আপনি করবেন ?

অরিন্দম যেন অকূলে কূল পেল। সাগ্রহে বলল, নিশ্চয় সাহায্য করব, নিশ্চয় করব। তুমি এ-কথায় বিশ্বাস করতে পার। উঠে চল।

কিন্তু, এইবার মেয়েটি তার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আপনি আমাকে বলছেন আমার পুরনো কথা সব ভুলে যেতে, আপনাকে আশ্রয় করে আবার সংসারে ফিরে যেতে। আপনাকেও তাহলে তাই করতে হবে। আপনাকেও সকলকে ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে যেতে হবে। পারবেন ? না পারলে ফিরে যান, আমায় মরতে দিন।

কেন, সব ছেড়ে যেতে হবে কেন ? অরিন্দম আশ্চর্য্য হয়ে প্রশ্ন করল।

আপনার ক্ষণিক খেয়ালে ভুলে ফিরতে চাই না। আমাকে একবার ফিরিয়ে দিয়ে এসে আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাসরঘরে ফিরে যাবেন। আজকে এই মনের জোর পরে আর পাব কি করে !

অরিন্দম আশ্চর্য্য হয়ে বলল, এইসব কাজ করতে হলে আমাকে আমার জীবনের সব-কিছু ত্যাগ করতে হবে কেন সেইটাই বুঝতে পারছি না।

মেয়েটি নিজের মনেই বলে' চলল, সেই আবার আরম্ভ হবে দিন দিন তিল তিল করে মরা, শুধু নিজের পেট ভরাবার জন্মে ভিক্ষে করা, ঝি-গিরি করা, নয়ত আত্মীয়দের মুখ চেয়ে থাকা। কিসের জন্মে এই ভাবে বেঁচে থাকব, বাঁচবার আমার দরকার কি ? আপনাকে কিছুই ত্যাগ করতে হবে না, আপনি ফিরে যান, আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।

এই বলে সে অরিন্দমের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

তার ভাবভঙ্গী দেখে আর কথাবার্ত্তা শুনে অরিন্দমের স্পষ্ট মনে হল মেয়েটি বড় ঘরে জন্মেছিল এবং ভাল শিক্ষাও পেয়েছিল। তারপর ভাগ্যবিড়ম্বনায় এই পরিণতি। অরিন্দমের চোখের সামনে থেকে গঙ্গার জল, চাঁদের আলো মিলিয়ে গেল, সানাই-এর শব্দ আর কানে আসছে না। সে দেখতে পেল কর্দ্দমাক্ত অন্ধকার পথে অগণিত নর-নারী ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, ক্লান্তিতে হতাশায় তাদের পিঠ বেঁকে গেছে। এরা কোথায় যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে তা কে জানে। তার হঠাৎ মনে হল এই ভীড়ের মধ্যে সে নিজেও রয়েছে এবং সঙ্গে তার নব-পরিণীতা বধূও। কিন্তু তাদের এমনি বিশ্রী চেহারা হয়েছে যে আর যেন চেনাই যাচ্ছে না। এই মিছিলের কোথায় আরম্ভ আর কোথায় শেষ তা বোঝা যাচ্ছে না, শুধু তারা ক্লান্ত পা টেনে টেনে চলছে অসহায় ভাবে কোন সুনির্দ্দিষ্ট অমোঘ পরিণামের দিকে।

অরিন্দমের মনে হল তার এই সিল্কের পোষাক, তার মুখে চন্দনের সাজ যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে।

সে অবিচলিত গম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলল, চল, আমার হাত ধর, পাড়ের ওপরে উঠি চল !

মেয়েটি তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। তার চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। প্রশ্ন করল, তারপর ?

তারপর চলে' যাব তোমার সঙ্গে, অসহায় লোকেদের জন্মে তোমাতে আমাতে জীবন উৎসর্গ করব, যতদিন বাঁচব !

আপনার নতুন বিয়ে-করা স্ত্রীর কি হবে ? মেয়েটির ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসি।

তাকে দেখবার অনেক লোক আছে। কিন্তু তোমাকে দেখবার, ওই সব অসহায় লোকদের দেখবার, তাদের কথা ভাববার কেউ নেই। স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্যের অভাব হচ্ছে তা ঠিক, কিন্তু তা না হলে আরো বড় কর্ত্তব্য যে আমার করা হবে না।

হঠাৎ পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল মেয়েটি। উঠে দাঁড়িয়ে অরিন্দমের হাত ধরে বলল, চলুন, দাদা, আর আপনাকে কিছুই ত্যাগ করতে হবে না। আপনি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। আমিও আমার দাদা খুঁজে পেয়েছি। এখন আবার বেঁচে থাকতে পারব। আমাকে আমার বাসায় রেখে আসবেন চলুন।
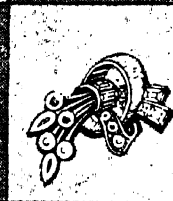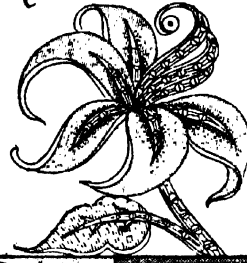
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাক্চারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১. বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ
B.B.

# নেতা

ডাঃ হরিনামপ্রসাদ বাজপেয়ী

[ লিখিত হিন্দী গল্পের অবলম্বনে ]

ধীরজ আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু—যাকে বলে এক গেলাসের ইয়ার। অবশ্য পানদোষ তার ছিল না। এক বছর আগে যখন ওর বাবা মারা যান, তখন আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম, আমার এখানে এসে থাকতে তার একাকী জীবনের বিষাদময় একঘেয়েমি ভোলবার জন্যে, কিন্তু তার পৈতৃক ব্যবসা দেখবার অসুবিধা হবে, এই অজুহাতে সে রাজী হয়নি। কথাটা ঠিক বলে আমিও আর জোর দিইনি। এখন সে নিজেকে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে অনেকটা খাপ খাইয়ে নিয়েছে। এ বিষয়ে সে সহযোগ পেয়েছে একমাত্র তার মুনিমজীর—তার নিজের বলতে মা, ভাই, বোন কেউ ছিল না।

ধীরজের মত লোক ব্যবসার চক্রব্যূহের মধ্যে কত দিন মন টেকাতে পারে? বিতৃষ্ণা তার আসবেই। কাজেই যখন একদিন সে এসে আমায় বললো, ভাই ডাক্তার! ব্যবসা আর ভাল লাগছে না। সময় কাটাবার অন্য কোন ফিকির জানা থাকে তো বলো। তখন আমি মোটেই আশ্চর্য হ'লাম না। দু' হাতে ওড়ালেও যার কখনও পয়সার অকুলান হবে না তার সময় কাটানো দুষ্কর কথাটা বিচিত্র বই কি! কিন্তু যারা তার সংস্বভাব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাদের কাছে নয়। আমি পরামর্শ দিলাম মামার সঙ্গে দেখা করা যাক, তিনি কি বলেন শুনি।

ধীরজের মামার বয়স প্রায় বছর চল্লিশেক কিন্তু দেখায় ত্রিশ-বত্রিশ। বেশ বাশভারী চেহারা, নাম উমাকান্ত হ'লেও লোকে তাঁকে উমা বাবু বলেই চেনে। কোন খাস জীবিকা নেই অথচ সব বিষয়েই ধুরন্ধর। কত দূর পড়েছেন কেউ বলতে পারে না। কেউ বলেন ওকালতী পাস, কেউ বলেন বিলেত-ফেরৎ ব্যারিষ্টার; আবার কারুর—বিশেষতঃ প্রতিবেশীদের ধারণা পাঠশালা পর্যন্ত যাননি। কোনটা সত্য এক মাত্র ভগবানই জানেন। তবে এটা ঠিক যে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারাগুলি তাঁর তেমনই আয়ত্তে যেমন

আপনার আমার এ, বি, সি, যে সব মোকর্দ্দমা বড় বড় উকীলরাও ছুঁতে নারাজ (হার নির্ঘাত বলে) সেগুলিও তাঁর যাদুমন্ত্রে জয়যুক্ত হয়ে ওঠে। এই কারণেই আশে-পাশের সমস্ত মোকর্দ্দমা তাঁর হাত দিয়েই আগে যায়। কাগজপত্র পড়ে তিনি যে রায় দেন সেটাই শেষ রায় বলে মানা হয়। মুস্কিল এই যে, উমা বাবুর দেখা পাওয়া ভার, একবার যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তো প্রার্থী মনে করে কাম ফতে।

ভাড়াটের সঙ্গে বাড়ীওয়ালার ঝগড়া, বাড়ীওয়ালা ভাড়াটে তাড়াতে চায়, কোন পারমিট যোগাড় করতে হবে—এই সব কাজ তিনি এক তুড়িতে করতে পারেন। তাঁর 'জুরিস্‌ডিকশানে' কোন মামলা হলো অথচ কেউ তাঁর সলা-পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলো না, এরকম কদাচিৎ হয়। যদি কখনও সে ভুল হলো তো তাঁর মুড খারাপ হয়ে যায় এবং সে ভুলের মাশুল পাড়াকে বেশ উঁচু দরেই দিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টা যার দরজা খোলা তাঁর ঘর অকস্মাৎ এক-দু'দিন বন্ধ হয়ে যায় এবং লোকেদের এসে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না; তখন খোঁজ নেওয়া হয় কার ভুলে এ-হেন অঘটন ঘটেছে। দোষীকে অবিলম্বে তাঁর চরণে এনে হাজির করা হয়, উমা বাবুর মুখ আবার হাসিতে ভরে ওঠে। সত্যি কথা বলতে কি, যে দিন উমা বাবুর বৈঠক বন্ধ থাকে সেদিন তাঁর মনটা খাঁ-খাঁ করতে থাকে—যেন একটা অতি প্রয়োজনীয় কোন জিনিস বাদ পড়ে গেছে। প্রতিক্ষণই তাঁর মনে হয় যেন কেউ তাঁর বন্ধ দরজায় করাঘাত করছে এবং যখন সে আওয়াজটা সত্যিই আসে, তখন তিনি পড়ি কি মরি করে বৈঠকখানার দিকে যান—যে রকম ভাবে যায় যেন কোন লোক বহু বর্ষ পরে তার প্রেয়সীকে দেখতে। রেলওয়ে বিভাগেও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি অসীম, সব কর্মচারীই বিশেষ করে টী-টীইরা তাঁর বন্ধু, বিনা টিকিটে কাককে কোথায় পাঠান তাঁর পক্ষে ছেলেখেলা। তাঁর মগজে হাজার হাজার ফন্দী-ফিকির গজ-গজ করছে—দরকার মত কোন একটা কাজে লাগানো নিয়ে কথা। ধীরজের সাথে যখন আমি উমা বাবুর বাড়ী গিয়ে পৌছলাম তখন তিনি বোধ হয় কোন মোকদ্দমার চিন্তায় গভীর ভাবে মগ্ন, এ কথা সে কথার পর ধীরজ জিজ্ঞাসা করল, মামাবাবু, সময় কিছুতে কাটতে চাইছে না, কি করা যায় বলুন তো?

আজব লোক তো তুমি। উমা বাবু বললেন, বাপের অত বড় ব্যবসা রয়েছে কি করতে? তোমার আবার সময় কাটানো নিয়ে মুস্কিল। অগত্যা আমায় বলতেই হলো, মামাবাবু, ধীরজ ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না।

তাই নাকি? উমাবাবু মন্তব্য করলেন, তবে তুমি নেতা হও। আজ-কাল নেতা হলে যত সহজে প্রতিষ্ঠার বৈতরণী পার হওয়া যায় অন্য কোন ক্ষেত্রে তত সহজে হওয়া যায় না। একটা গল্প শোন। একটা সরাইয়ে তিন জন শ্রান্ত পথিক এসে হাজির হল। এক জন ডাক্তার, দ্বিতীয় জন উকীল এবং তৃতীয় ছিল নেতা, চা খেতে খেতে তিন জনের মধ্যে তর্ক বাধল কার পেশা শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে। ডাক্তার নিজের পেশার সমর্থনে বলল, যখন মানুষের প্রথম জন্ম হ'লো তখন সংসারে এত ভয়ানক রোগের রাজত্ব যে ভগবান ডাক্তারকে সৃষ্টি করতে বাধ্য হ'লেন। সেইজন্যে বন্ধুগণ, ডাক্তারই এই আকাশের প্রথম তারা, যে হাজার হাজার বছর চকমক্ করবার পরও আজও পূর্বের ন্যায় উজ্জ্বল।

ডাক্তারের এই অভিমতকে কুঠারাঘাত করবার জন্য উকীল গর্জে উঠলো। সৃষ্টির সাথে সাথেই অরাজকতার জন্ম। জোর

মুলুক তার আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। এই অনিয়ম বিশৃঙ্খলা থেকে সমাজকে রক্ষা করবার জন্য উকীলরা বহু দিন লড়াই করে এসেছে। তারাই কায়দা-কানুন বানিয়েছে, এই কল্যাণ-শাসনকার্য্য আজও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। জর যে উন্নতি আজ তোমরা দেখতে পাচ্ছো, এর জন্য প্রধানতঃ কারা? তাই বলছি, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পেশা ওকালতী।

নেতা এতক্ষণ চুপ করে দু'জনের বাগাড়ম্বর শুনছিল। সে শুধু তুই বলল, কিন্তু সেই অরাজকতা, সেই অনিয়ম, সেই বিশৃঙ্খলা দৌলতে? কে সেই কৃতিত্বের অধিকারী? নেতারা না থাকলে াদের আর করে খেতে হতো না। চিরকাল নেতারা সব বিষয়ে া দিয়ে এসেছে, সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত দিয়ে আসবে। কাজেই ষয়ে আর দ্বিমত থাকতে পারে না যে, নেতারাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গিরিই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট পেশা।

নেতা হওয়ার ইচ্ছা অবশ্য ধীরজের ছিল কিন্তু তার সে সামর্থ্য গুণাবলী আছে কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল: তাই সে বে জিজ্ঞাসা করলো, মামাবাবু, আমার কি নেতা হওয়ার না সত্যই আছে?

উমা বাবু বললেন, কেন নেই? অবশ্যই আছে। দেখা যাক এক নেতা হতে গেলে কি কি গুণ থাকা অপরিহার্য? প্রথম হচ্ছে একটা বিষয়ে (যার মাথা বা মুণ্ডু নেই) যদি কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করতে পারে তো বুঝে নিতে হবে যে নেতা হওয়ার বীজ তার মধ্যে নিহিত আছে। উদাহরণার্থ, একটা খালি বোতল নিয়ে যদি কেউ বলে এটা ভর্ত্তি এবং তর্ক লাগলে পর জোর গলায় বলে যে এটা খালি নয় এবং যদি খালি হয়তো প্রমাণ করো বোতলটি খালি, তবে তার নেতা হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশো। তুমুল তর্কের দ্বারা একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক দেখিয়ে নিজের এবং অপরের মস্তিষ্কে তারতম্য স্থাপন করা একজন সফল নেতার পক্ষে দৈনন্দিন ব্যাপার। দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, সোজা জিনিসকে ঘোরালো করে তোলা। সহজ পথ থাকতে বাঁকা পথে লোকদের পরিচালিত করা এবং সেই দোষ তাদেরই ঘাড়ে চাপানো। তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় গুণ হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে নিজের রূপ বদলানো।

নেতার আবশ্যকীয় গুণের ফিরিস্তি শুনে মনে হলো ধীরজের নেতা হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হ'লেও মামাবাবুর সেই সব গুণ কম বা বেশী পরিমাণে আছে এবং তাঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

উমা বাবুর জিভের চাকা আবার ঘুরতে লাগলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নেতা তো হবে কিন্তু কোন পার্টির? প্রধানতঃ কংগ্রেস, পি, এস, পি, কম্যুনিষ্ট এবং জনসংঘ এই চার দলই বিচারযোগ্য। আসলে চারটে দল একই অঙ্কুর থেকে নির্গত, কিন্তু ফুল ফুটেছে চারটে বিভিন্ন রঙের। আমি প্রত্যেক পার্টির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছি। কংগ্রেসী হতে গেলে শুদ্ধ শ্বেতখাদি বেশভূষার সঙ্গে একটা

চামড়ার ব্যাগ এবং সংবাদপত্র আবশ্যক, পি, এস, পি, পতাকার নীচে উপরোক্ত বেশভূষা তো চাই-ই উপরন্তু হাতে একটা বই থাকাও প্রয়োজন। বক্তৃতার বিষয় সাধারণতঃ গ্রাম এবং চাষের সঙ্গে জড়িত থাকবে। রেস্তোরাঁ প্রভৃতি প্রকাশ্য স্থানে কৃষকদের দুর্দশা এবং তার প্রতীকার সম্বন্ধে মুখে সর্বদা খই ফুটতে থাকবে।

আমরা উমা বাবুর বিশ্লেষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। আর কম্যুনিষ্ট হওয়া তো আজকালকার যুবকদের ফ্যাশন। একমাথা উস্কোখুস্কো চুল এবং রাজকাপুর-মার্কা ছেঁড়া পাজামা বা পেণ্ট একজন কম্যুনিষ্টের ট্রেডমার্ক। বইয়ের পোকার মত সস্তাদরের মার্কসিষ্ট লিটরেচার খুঁটে খাওয়া চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে দিনভোর প্রায় কুড়ি-পঁচিশ কাপ কাল চা বা কফি খাওয়ার অভ্যাস থাকা চাই। সেই সময় ধোঁয়া এবং গোলমালে ভরা কফিহাউস তোমার হাসিতে ফেটে পড়বে, যাতে লোক উঠে উঠে দেখবার চেষ্টা করে ব্যাপারটা কি? তখন তুমি ক্ষেতে টাঙ্গানো হাঁড়ির মত মাথা নেড়ে নেড়ে মৃদু-মন্দ হাসতে হাসতে সকলকে নমস্কার জানাবে এবং লোকেরা বলে উঠবে, কমরেড ঘোষ হবে কিংবা ধীরজ কিংবা অন্য কেউ···

মামার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে এলেন। হ্যাঁ, এখন বাকী রইল জনসংঘ। সংঘী হতে গেলে হিন্দুধর্মের বিষয় চলনসই জ্ঞান থাকা দরকার, ইতিহাসের কিছু পাতা ছিঁড়ে সর্বদা পকেটে রাখতে পারলে তো ভালই হয়। প্রতাপ এবং শিবাজী সম্বন্ধীয় কিছু জলন্ত ঘটনার উল্লেখ করে ভারতীয় কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির দামামা অবিরত বাজানো চাই। আর মুখে ছুটবে এমন কথার তুবড়ি, যার মানে নিজেই সব সময় বোঝো না।

আচ্ছা তুমি ভেবে-চিন্তে পরে তোমার মতামত আমায় জানিও বলে মামা তাঁর দীর্ঘ উপদেশ সাঙ্গ করলেন। আমরাও ইঙ্গিত বুঝে কালক্ষেপ না করে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এক সপ্তাহ ধীরজের আর কোন খবর পাইনি। আবার তাকে একদিন আমার ডিস্‌পেনসারীর দিকে আসতে দেখা গেল—কিন্তু এবার সম্পূর্ণ নূতন বেশে—প্রায় আপাদমস্তক শুদ্ধ খাদিতে আবৃত এবং চোখে কাল চশমা লাগানো, হাতে তখনও চামড়ার ব্যাগ বা অন্য কিছু ওঠেনি। স্বাগত জানালাম এসো নেতামশাই, কি খবর?

জেনে-শুনেও বোকা সেজো না, ডাক্তার, মামা আজ আমাদের কৃপা বাবুর ওখানে নিয়ে যাবেন।

কৃপা বাবু আমাদের সহরের বিখ্যাত নেতা, প্রাসাদোপম অট্টালিকার মালিক এবং গোপন ভাবে অনেক প্রকার ব্যবসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। সন্ধ্যার সময় যখন আমরা কৃপা বাবুর বাসায় পৌঁছলাম তখন বাইরের ঘরে মামাবাবুর জোরালো আওয়াজ কানে এল। দরওয়ান আমাদের আধুনিকতম সজ্জায় সজ্জিত ড্রইংরুমে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল। প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পর কৃপা বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মামা বললেন, এরই বিষয়ে আপনাকে আমি সেদিন বলেছিলাম। সামাজিক আর নৈতিক অধোগতি দূর করতে আমার ভাগ্নে বদ্ধপরিকর। এদিকে ঘরের কারবার চুলোয় যাবার উপক্রম। আমরা তো বুঝিয়ে বুঝিয়ে হার মেনেছি, এখন আপনিই দেখুন।

উমা বাবু ধীরজকে চোখ টিপে ইসারা করলেন, সঙ্গে সঙ্গেই ধীরজ সুরু করল। যখন ঘর কর্দমময়, সর্বত্র কাঁটা ছড়ানো তখন কোন মানুষ সুখশয্যায় শয়ান থাকতে পারে? চারি দিক তমসাচ্ছন্ন, সমাজ পতনশীল, আর্থিক বৈষম্যের অপ্রতিহত অধিকার, এমন সময় নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কি আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে? যে পৃথিবী আমাদের জন্ম দিয়েছে, যার ক্রোড়ে আমরা লালিত-পালিত তার প্রতি কি আমাদের কিছুমাত্র কর্তব্য নেই? এক সুস্থ সমাজের নির্মাণ যেখানে ভেদাভেদ জ্ঞান থাকবে না, মানুষ সুখ এবং স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারবে, সেইটাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।

দম দেওয়া খেলনার মত ধীরজের একটানা বাক্যস্রোত সহসা বন্ধ হয়ে গেল। এমন সময় কামরায় প্রবেশ করল এক অতি সুন্দরী যুবতী। পরিচয় প্রদানের পর বুঝতে পারলাম তিনি কৃপা বাবুর স্নেহের দুলালী স্নেহলতা দেবী। ধীরজ আরও কিছু বলবার জন্য উসখুস করছিল কিন্তু কৃপা বাবুর কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পাওয়া পর্য্যন্ত মুখ খোলা অনুচিত বিবেচনায় চুপ ছিল।

নেতৃত্বসুলভ বাচনভঙ্গীতে কৃপা বাবু বললেন, উমা বাবু আপনার ভাগ্নে শক্তির একটা খনিবিশেষ। হাজার চাইলেও আপনি সেই শক্তির গতি ভিন্নমুখী করতে পারবেন না। পরন্তু সেরূপ প্রচেষ্টা দেশ এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর। তাছাড়াও এখন আমাদের নতুন ব্লাডের প্রয়োজন আছে।

মামাবাবু তো মুকিয়েই ছিলেন, তিনি এ সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। না, কৃপা বাবু আমি একে আটকাতাম না। কিন্তু প্রচণ্ড শক্তির উদ্দাম গতিতে যাতে ধীরজ পথভ্রষ্ট না হয় সেটাও দেখতে হবে। দেশসেবা পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নেই; তবে একজন ত্যাগী এবং অনুভবী নেতার সাহায্য ব্যতিরেকে সেটা বিড়ম্বনাময়। আপনি যদি—আর বলতে হলো না, কৃপা বাবু আনন্দে ধীরজের পলিটিকালগুরু হতে সম্মত হলেন।

মেঘ না চাইতেই জল। ধীরজ আর এক দফা লেকচারের লোভ সংবরণ করতে পারল না। কৃপা বাবু, সকলের আগে ভিখারী সমস্যার সমাধান করতে চাই, এটা পাথরের মত আমাদের বুকে চেপে বসে আছে।

যারা ভিক্ষাবৃত্তি পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যারা স্বেচ্ছায় ভিখারী হয়েছে তারা সমাজের পক্ষে একটা অভিশাপ। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, এই শ্রেণীর শতকরা ষাট জনের দৈনিক রোজগার দশ টাকার কম নয়। এই টাকার অধিকাংশ নেশা প্রভৃতি বদখেয়ালে অপব্যয়িত হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে শেখানো শব্দোচ্চারণ করতে করতে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায়, তখন এক দিকে যেমন মানবের হৃদয়বীণার উচ্চবৃত্তি সমূহ ঝনঝনিয়ে উঠে, তেমনি আর এক দিকে সমাজের বীভৎস এই পচনশীল ক্ষতগুলি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, শক্ত উপচারের প্রয়োজন কত গুরুতর। বিধানসভার আগামী অধিবেশনে ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে একটা আইন পাশ করানো উচিত।

ইতিমধ্যে চা প্রভৃতি এসে যেতে লেকচার বন্ধ করতেই হলো। কিন্তু ধীরজের তাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। প্রথম দিনেই যে কাজ এতটা এগিয়েছে তাতেই সে মহাখুসী।

পরদিন থেকে কৃপা বাবুর স্নেহচ্ছায়ায় ধীরজ নেতাগিরির নিত্য-ন পাঠ নিতে লাগল। শীঘ্রই স্বয়ংপূর্ণ নেতা হিসাবে তার কপ্রিয়তা যতই বাড়তে লাগল, আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ সেই মাণেই কমতে লাগল। খবর পেলাম স্নেহর স্নেহবন্ধনে পড়ে সময়জ্ঞান শিথিল হয়ে গেছে।

একদিন সকালে হঠাৎ ধীরজ এসে হাজির। সখেদে সুরু করলো, রছেলের মন বোঝা মর্মান্তিক ব্যাপার! এতদিন আমি জানতাম, আমায় চায় কিন্তু কাল যখন আমি ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব লাম, তখন সে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল এবং বলল, আমার সদাস্মিত নিশ্চয় আপনার ভুল বোঝার কারণ হয়েছে। নেতামশাই, জানেন না কিন্তু আমি তো জানি আপনার বাঁধাবুলি কপচানো টা ধারকরা! এ রকম তোতাপাখী আমার আদপেই পছন্দ। তুমিই বল ডাক্তার, এ কি শুধু আমার দোষ? নেতাদের ই এই। অবশ্য আমি দিব্যি করতে পারি, আমার সব বুলিই করা নয়। স্নেহকে দেখে আমার হৃদয়-দ্বার খুলে গিয়ে যে ক্যস্রোত নির্গত হয় যে সিমিলী-মেটাফরের ছড়াছড়ি হয়; তার ছুটা কৃতিত্ব অন্ততঃ আমার প্রাপ্য। স্নেহ আমার মনলতায় নিত্য-তন ফুল ফুটিয়ে এসেছে, নয়ত আমার সাধ্য কি কৃপা বাবুর মত ঝানু াক মুগ্ধ হয়ে আমার কথা শোনেন? এখন বল কি করি, শ্যাম াখি কি কূল রাখি? নেতাগিরি না স্নেহ, স্নেহ না নেতাগিরি। দিন কঠিন মেহনতের পর নেতার যে অঙ্কুর বেরিয়েছে স্নেহ সেটা পড়ে ফেলতে চায়।

ধীরজ স্থির থাকতে পারছিল না, কেবলই ছটফট করে বেড়াচ্ছিল। াই ভাবনার কথা, মামাকে বলেছিলে আমি জিগ্যেস করলাম।

সেইটাই তো ভুল হয়েছে ডাক্তার, শুনেই মামা বারুদের মত টে পড়ল। তোর চোদ্দপুরুষে কেউ কখনও প্রেমে পড়েছিল? ত কষ্ট করে কৃপা বাবুকে হাত করলাম। মনে করলাম, কানপুর কে উনাওয়ের নতুন রেলওয়ে কনট্রাক্টটা মারে কে। আর তুই ভাগা প্রেম করবার আর সময় পেলি না? আমি ও-সব জানি না, া বাবুকে ধরে কনট্রাক্টটা আমায় পাইয়ে দে, তারপর তুই স্নেহর যেখানে খুসী পালিয়ে যা আমার আপত্তি নেই। তবে হ্যাঁ, হের পাল্লায় পড়ে নেতাগিরি ছাড়লে গোল্লায় যাবি মনে থাকে যেন।

এধারে মামা, ওধারে স্নেহ, কার কথা রাখি? এ সমস্যার আমি কোন কিনারা পাচ্ছি না। স্নেহ বিনা আমার নেতা হওয়ার উৎসাহ অকালেই ঝরে পড়বে। অথচ স্নেহর কালকের আচরণ অদ্ভুত—আমার কাছে অর্থশূন্য। একটা মিষ্টি প্রবঞ্চনা, একটা মিথ্যা মায়ার মোহে এত দিন অন্ধ ছিলাম।

দেখ ধীরজ, আমি ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, এরূপ অবস্থায় চতুর ব্যক্তি শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা করে। মামাকে তুমি চটাতে পারো না, এদিকে স্নেহর মনের কথাও তুমি জান না, হতে পারে সে তোমায় পরীক্ষা করছে, মেয়েদের না মানে হ্যাঁ এবং ভাইস ভারসা।

ভালা রে মোর বুদ্ধিদাতা! ধীরজ খিঁচিয়ে উঠল, আমি কি এতই ন্যাকা যে, কই আর মাগুরের তফাৎ বুঝি না? স্নেহ সাফ সাফ বলে দিয়েছে যে নকল নেতা তার দু'চোখের বিষ।

তাই যদি হয়, তাহলে নেতাগিরি ছেড়ে প্রাণভরে স্নেহর সঙ্গে প্রেম করো, মামা আর পাকা ধানে কি মই দেবে?

মামা যদি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেয়, হতচ্ছাড়া রেলওয়ে কনট্রাক্ট মামার মাথা খেয়েছে।

তাহলে কোন জ্যোতিষীর কাছে যাওয়া যাক চল।

কাছেই শর্মাজীর কাছে যাওয়া গেল, তিনি কোষ্ঠী দেখে বললেন, তুঙ্গী চন্দ্র বৃহস্পতির ঘরে—গৃহলক্ষ্মী নাগালের মধ্যে থেকেও তোমার জীবনে প্রবেশ করতে পারছে না। কারণ, শনির দৃষ্টি।

বুঝলে ডাক্তার, মামাই শনি, আর কিছু শর্মাজী?

কার্য্যসিদ্ধি হবে, তবে কিঞ্চিৎ বিলম্বে।

আমরা জ্যোতিষীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এলাম।

মাসখানেক ধীরজের আর টিকির নাগাল নেই। এক দিন হঠাৎ কফিহাউসে দেখা হয়ে গেল। প্রথমে তাকে চিনতেই পারিনি, শার্ক স্কীনের দামী স্যুট পরনে, ধীরজকে তখন অন্য রকম দেখাচ্ছে। অন্তর্দ্বন্দ্বহীন প্রসন্নতার কিরণে সারা মুখ উদ্ভাসিত, হা-হা করে হেসে বলল, সব জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে দূর করেছি, নেতা হতেও চাই না, নেতার মেয়েকেও চাই না। এই ক'মাস ঘাড়ে কি ভূতই ভর করেছিল, আজ আমি সমুদ্রের হাওয়ার মতই অবাধ উদ্দাম।

অনুবাদিকা—অনুরাধা ভট্টাচার্য

# আমার গানে

### গোবিন্দপ্রসাদ বসু

আকাশে ঝড়: তবু এ দুটি চোখ জুড়ে
স্বপ্ন-রঙ জাগে এখনো, এই মন
আকাশ-ছুঁই-ছুঁই পাখির মত উড়ে
হাওয়ায় খেলা করে তুহিন নির্জন

ভালো-না-লাগা-ক্ষণ ডানায় ঝেড়ে ফেলে।
কণ্ঠে গান ভ'রে এখনো পথ হাঁটি
কুটিল রাত্রির কুয়াসা ঠেলে ঠেলে;
আমি যে ভালোবাসি আকাশ, ঘাস, মাটি

পাখির গান, ফুল, রূপালী নদীটিকে!
আমি যে জানি জানি: আমার গান শুনে
কোকিল ডাকবেই, ফুটবে দিকে দিকে
পলাশ-কিংশুক একদা ফাল্গুনে।

নমিতা বসু-মজুমদার

মুরারিমামাকে যখন প্রথম দেখি তখন আমার বয়স বেশী নয়। বোধ করি, পাঁচ-ছয় বছর। তারপর প্রায় দুই যুগ কেটে গিয়েছে, তবু সেই বয়সের প্রথম দেখাটা আজও আমার মনে কালকের দেখা কোনো উজ্জ্বল ছবির মত স্পষ্ট হয়ে আছে।

সময়টা গরমের ছুটি। ছুটিতে আমরা এসেছি মামাবাড়ীতে। আমকাঁঠালের নিমন্ত্রণে নয়। কেননা, মামাবাড়ী গ্রামে তো নয়ই, মফস্বল শহরেও নয়, একেবারে কলকাতা শহরে। আম-কাঁঠালের গাছও নেই, তার নিমন্ত্রণও নেই। মানরক্ষার মত নমো নমো করে বাজার থেকে আমকাঁঠাল কিনে এনে গ্রীষ্মদিনের সমাদর রাখতে হয়। তা হোক আমার এই অল্প বয়সের আজন্ম পশ্চিমবাসের পর প্রথম বাঙলাদেশ দেখবার আনন্দ আমার মত শিশুর কাছেও আমকাঁঠালের আমন্ত্রণের চেয়ে কম লোভনীয় লাগেনি। তাপদাহদগ্ধ দিল্লীনগরীর পর কলকাতাবাসের নাতিশীতোষ্ণ আহ্বান সিমলা-শিলংএর মত স্নিগ্ধকর না ঠেকলেও মা-বাবার কাছে ভালোই লেগেছিল। বিশেষ করে মায়ের। আর আমার তো কথাই নেই। আমার তখন সেই বয়স—যখন লীলাভরে সমস্তই শুধু সওয়া যায় তাই নয়, জীবনধারণের প্রতিটি দিনের প্রতি মুহূর্তটির কোণ বেয়ে আনন্দ উপচিয়ে পড়ে, তখন দিল্লীর দহনদাহকেও দাহ ঠেকে না, আবার কলকাতাযাত্রার আহ্বান সুদূর স্বপ্নলোক যাত্রার চেয়ে কম মোহময় লাগে না!

আমরা কলকাতায় আসবার দিনদু'য়েক পরেই দিদিমার নামে একটা চিঠি এলো। তাঁর কোন্ এক দূরসম্পর্কের কী এক মাসতুত না পিসতুত ভাই দূর পল্লীগ্রামে অসুস্থ হয়ে দীর্ঘদিন রোগভোগ করছেন। দীর্ঘদিন ব্যাধিগ্রস্ত থেকে তাঁর বোনের কথা মনে পড়েছে। বোনের সৌভাগ্যের বহুপল্লবিত বর্ণনা দিয়ে নিজের

দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়েছেন সালংকারে এবং একমাত্র মৃত্যুর দ্বারা যে তাঁর দুর্ভোগের সমাধান হ'তে পারে তা লিখে শেষে জানিয়েছেন,

: কিন্তু, মরণের স্বভাবটা বড় খামখেয়ালি। ডাকিয়া তা সাড়া মেলে না, আর যে মানুষটা সুখে-স্বচ্ছন্দে, আরামে-আয়েসে তাকে দিব্য ভুলিয়া আছে একেবারে তাহারই সমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। কাজেই মরণ যখন হইতেছেই না, তখন ভাবিতেছিলাম একবার তোমার বাসায় উঠিয়া চিকিৎসা করাইয়া নিতে পারিলে চাইকি এবারের মত সারিয়া-সুরিয়া বাঁচিয়া যাইতেও পারি।

জবাবে দিদিমা হয়ত তাঁকে আসবার কথা লিখেছিলেন। চিঠি পাঠাবার সপ্তাহের ভিতরেই একখানা গাড়ী এসে লাগল বাড়ীর সমুখে। আমরা ছোটরা তখন জটলা করছিলাম বাড়ীর সামনে গাড়ী-বারান্দার নিচে। অনেক দূর থেকেই গাড়ীটা নজরে পড়েছিল। কষ বেয়ে দমকে দমকে ফেনা-গড়ানো, হাড়-চামড়া-সার ঘোড়া দু'টি হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়তে দৌড়তে একটা ছ্যাকড়া গাড়ী টেনে ছুটে আসছিল। লাগামের শাসানি খেয়ে ঠিক সমুখটিতে থেমে যাওয়ায় কৌতূহলে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম। গাড়ী থেকে প্রথমেই নামল একটি বছর এগারো-বারোর কিশোর ছেলে। নেমেই একটি রুগ্ন মানুষকে হাতে ধরে অতি যত্নে নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সেদিন তাদের দিকে চেয়ে আমরা ছোটরা কেউ হাসি চাপতে পারিনি। অতি চেষ্টায় শেখা সহবৎ 'কাউকে দেখে হাসতে নেই' কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠেছিলাম।

ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া দুটোর মতই তাদের দশা। প্রায় বৃদ্ধের মত দেখতে রুগ্ন প্রৌঢ় মানুষটি। ব্যাধির মস্ত বড় ভার গুরুভার গাড়ীর ভারের মত আর হয়ত বা দৈন্যের শাসানি চাবুকের শাসানির মতই তাঁর উপরে অজস্রধারে পড়ে তাঁকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে, বয়সের ঠাহর করতে হয় না। কিন্তু, তখন আমাদের অতশত বিচার করবার বয়স নয়। তাঁকে আমরা বুড়ো মানুষ বলে খারিজ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু ছাড়তে পারিনি কিশোর ছেলেটিকে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তার পেটটি ডাগর, হাত-পা কাঠিকাঠি, ঠোঁটের দু' কোণে ঘা। সব চেয়ে হাস্যকর লেগেছিল তার দু' চোখের অসহায় ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি। শহরের চালাক ছেলেমেয়েদের হাসি-না-চাপা উচ্ছল ভংগীতে সে দৃষ্টি আরো অসহায় হয়ে উঠেছিল। এক পা-এক পা করে থেমে থেমে এগিয়েছিল বাপের হাত ধরে।

মুরারিমামার আদ্যোপান্ত স্মরণ করতে গেলেই এই থমকানো ভংগীর চলাটা মনে পড়ে যায়। আর নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতার কথা মনে করে আজ দুইযুগ পরেও নিজেকে শাসন করে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠি। কিন্তু সেই বয়সটা? তার না ছিল লজ্জা, না ছিল শরম, না ছিল দয়ামায়া। ছিল শুধু বাঁচবার প্রবল আনন্দ আর প্রচুর কৌতূহলের প্রভূততম কৌতুক।

আমাদের আসবার খবরে বড় মাসিমাও এসেছিলেন। ছোটদের

শ মিলে মিশে খেলাধুলো ঝগড়াঝাঁটি করে অন্তরংগ হয়ে ক'দিনেই। রুণুদিদি, ঝুনুদাদা, আমি আর আমার চেয়ে রের বড়ো ছোট মাসিমা মণিমাসির মধ্যে কোনো গোপনীয়তা না, এই প্রতিজ্ঞা হয়েছিল। ছোট মামাকে আমরা একটু করলেও মাঝে মাঝে আমাদের উৎসাহ দিতে তিনি খেলায় তেন।

বু এত হয়েও একটা অশান্তি আমাদের কাঁটার মত খোঁচা দিত। মণিমাসি একদিন বললে,—দেখেছিস্, ভাই, মুরারিদাদা আমাদের কথাই কইতে চায় না, কেমন মুরুব্বী মুরুব্বী ভাবখানা, নয়?

ঝুনুদাদা বললে,—হুঁ, ওর আবার মুরুব্বীপনা। বসে, ছোটমামা কলাশে পড়েন, আসছে বছর ম্যাট্রিক দেবেন, ওর চেয়ে বছরের বড় সেই ছোটমামাই মাঝে মাঝে আমাদের সংগে আসেন।

—তবে মুরারিমামাই বা আমাদের সংগে খেলতে আসবে না হিংসুটে গলায় দাবী জানাই।

—আসতেই হবে। জেদী গলায় বলেছিল রুণুদিদি।

ঝুনুদাদা ভারিক্কী চালে সান্ত্বনা দিয়েছিল,—আসবে কী করে? ভীতু। পাড়াগাঁয়ের ছেলে ভয় পায় আমাদের শহরের মেয়েদের। মণিমাসিকে ভোলানো অত সহজ ছিল না। ধৈর্য হয়ে বলেছিল,—যাই বলিসনে কেন, ও-যে ওই ভাবে মাদের সংগে একটাও কথা না বলে দিনরাত্তির বাপের সেবা ভাণ করবে, এ অসহ্য।

সত্যিই সহ্য হোত না আমাদের। মাঝে মাঝে মনে হ'ত ইচ্ছে করে কথা না বলে আমাদের অপমান করছে মুরারিমামা। দিনরাত্তির দু'ঠোঁট বুজে বাপের সেবা করে যাওয়াটা ছলমাত্র। যখনি বৈঠকখানা ঘরের পাশের ছোটকুঠুরীটার পাশ দিয়ে যেতাম, দেখতে পেতাম—শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে মুরারিমামা, নয়তো খল-নুড়িতে ওষুধ মারছে খটাং-খটাং আওয়াজ তুলে, মাথা টিপে দিচ্ছে, পাখা করছে, পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে নীরবে। প্রথম প্রথম আমরাও ঔদাসীন্য দেখিয়েছি। লেশমাত্র নজর নেই ভাবখানা। শেষে যত যেতে লাগল দিনের পর দিন আমাদের ঈর্ষা, ক্রোধ, অপমানবোধ তত উঠতে লাগল পুঞ্জীভূত হয়ে।

অপমানের জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছি সকলে, মণিমাসি বললে, —শোধ নিতে হবে।

মুরারিমামা স্নান করতে আসে আমরা দল বেঁধে কলতলায় একেবারে হুড়মুড়িয়ে ওর গায়ের ওপরে এসে পড়ি। দেখেশুনে সে ঠিকসময় স্নান করা ছেড়ে দিল। তবু গায়ে পড়তে আমরা ছাড়িনে। চলতে গিয়ে তার পা মাড়িয়ে দেওয়া, ধাক্কা দিয়ে সেই অবসরে চিমটি কাটা নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে উঠল। তাতেও মুরারিমামা কোনো জবাবই করত না। তার চোখ দু'টো আমাদের নিষ্ঠুর আমোদ উপভোগ করবার অক্লান্ত উৎসাহ দেখে ভয়ত্রস্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু, সেই অল্পবয়সের দেখা চোখে আমার যেন কখনো কখনো মনে হ'ত ভয় নয়, একটা ঘৃণাও উঠছে পুঞ্জীভূত হয়ে।

একদিন বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। বিকেল বেলায় তার থেকে কাপড় তুলতে এসে মুরারিমামা দেখতে পেলে, তার
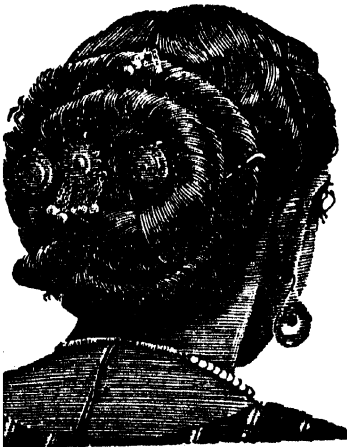
কাপড়খানায় মস্ত লম্বা ফালা দেওয়া, অথচ স্নান সেরে যখন মেলে দিয়েছিল তখনো অক্ষত ছিল।

মুরারিমামা কতক্ষণে দেখতে পাবে এই আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হয়ে আমরা পালা করে ঘর-বার করছি, মণিমাসি বাইরে বেরিয়েই ফিরে এলো মুখে আঁচল তুলে হাসি চাপতে চাপতে।—দেখবি আয়!

বাইরে বেরিয়ে আমরা আর হেসে বাঁচিনে। মুরারিমামা উঠানে দাঁড়িয়ে তার লাল কস্তাপেড়ে মোটা ধুতিটার দিকে সজলচোখে চেয়ে আছে। এমন ভাবে চেয়ে আছে যেন ধুতি নয়, নষ্ট হয়েছে সাত রাজার ধন এক মাণিক।

ঝুনুদাদা চাপাগলায় হাসিহাসি সুরে বললে,—বাবুর আর একখানা কাপড় রইল।

এমন সময় মণিমাসি ঝুনুদাদার কাঁধে হাত দিয়ে কী যেন ইসারা করল। সকলেই চুপ করে গেলাম, হাসি থামিয়ে দিলাম মুহূর্তে। দিদিমা সেইপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন,—মুরারি তোর কাপড়খানা এমন করে ছিঁড়লে কে রে?

আমাদের ভয়খাওয়া মুখের দিকে চকিতে নজর পড়ল তাঁর, মুখ উঠল টক্‌টকে লাল হয়ে।

—বুঝতে পেরেচি, বাঁদরের দল, সমস্তই তোমাদের কীর্তি। দাঁড়াও দেখচি তোমাদের।

দিদিমা এসেই আগে কান ধরলেন মণিমাসির,—তুই বল দলের সর্দারণী! কে ছিঁড়েছে ওর কাপড়?

ভয়ে আমাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। মণিমাসি থেকে সুরু করে আমাদের যে কী দশা হবে ভেবে বুক ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করছে উত্তাল তরংগে—এমন সময় মুরারিমামার মৃদু কণ্ঠস্বরে আমরা সকলে চমকিয়ে চাইলাম। দিদিমাও চাইলেন।

—পিসিমা।

মুরারিমামা আস্তে বললে,—মণির দোষ নেই, পিসিমা ওরা কেউ কাপড় ছেঁড়েনি।

—কে ছিঁড়েছে তবে? ভূতে না, তুই নিজে?

দিদিমার রাগের নামডাক আছে। কিন্তু কাণ্ড দেখ, ভীতু ওই পাড়াগাঁর ছেলে মুরারিমামা, ভয় না পেয়ে আস্তে অথচ স্পষ্টগলায় বললে; ইচ্ছে করে ছিঁড়িনি পিসিমা, তারে শুকুতে দিতে গিয়ে ফালা হয়ে গেল।

ক্ষণিকের জন্য সমস্ত মনোভাবটা গেল বদল হয়ে; আমরা সকলেই সদয় হয়ে উঠলাম মুরারিমামার ওপর। দিদিমা চলে যেতে কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললাম,—মুরারিমামাই আমাদের বাঁচিয়ে দিল, না হলে দিদিমার যা রাগ হয়েছিল, বাবাঃ!

মণিমাসি একেবারে ঝাঁঝিয়ে উঠল, বোধহয় তখনো তার কাণের জ্বালা মরেনি।

—যাঃ যাঃ, বাঁচিয়ে দিলে না আর কিছু। একহাত নিল আমাদের। দেখলি না কথাটা বলেই চলে গেল। ভাব করল আমাদের সংগে? ওর সমস্তটাই ভাণ।

ঝুনুদাদার গোপনমনে একটা দুষ্কর্মের খোঁচা বিঁধছিল। মণিমাসির নির্দেশ উৎসাহসহকারে তখন পালন করলেও পরে একটা অন্যায় বোধের এলাকায় এসে পড়েছে। আচারের মোড়কটা মণিমাসির হাতে দিয়ে বললে,—মণিমাসি, ওর সংগে ভাব করে আসব?

আচার ভাগ করছিল মণিমাসি, হাত থামিয়ে ঝুনুদাদার মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইল, তারপর বলল,—সেধে খবরদার ঝুনু, সকলের মাথা হেঁট করবি নে।

গরমের ছুটি ফুরোল। আমরা দিল্লী ফিরে যাচ্ছি। সকাল থেকেই আড়ালে আবডালে লুকিয়ে লুকিয়ে কান্না চাপ্‌ছে ঝুনুদিদি ঝুনুদাদা আর মণিমাসি। গাড়ীতে ওঠবার সময় কান্নাটা আর গোপন রইল না। ছোটমামারও চোখ ছলছল করতে লাগল। পরের বছর ফের আসবার অনুরোধ প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি সুরু হয়ে গেল।

গাড়ীবারান্দার নিচে জড়ো হয়েছে সকলে। অশ্রুসজল চোখে সকলকে দেখতে দেখতে আমার চোখ পলকের মত চলে গিয়েছিল একটা জানালায়। মুরারিমামা জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বাপের কাপড় পাট করছিল। চোখে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিল। ক্ষণেকের তরে আমার মনে হয়েছিল সে কটাচোখ ছোটমামার কাজল-কালো চোখের মতই স্নেহকাতর, অশ্রু ছলোছলো। কিন্তু, না নিশ্চয়ই আমার দেখার ভুল ছিল। কেন দুঃখ পেতে যাবে মুরারিমামা? জ্বালানো ছাড়া আমরা তো তাকে কোন সুখ দিইনি।

## দুই

পরের বছর আমাদের আসা হয়নি। তার অনেকগুলো পরের বছরও নয়। আসতে আমাদের ছয় বছর পার হয়ে গেল। মণিমাসির বিয়ে ঠিক হয়েছে।

আমাকে দেখে মণিমাসি চোখ কপালে তুলল,—ইস্, কী লম্বা হয়েছিস বীণা, তোকে যে চেনাই যায় না।

হেসে বললাম,—বেশ। তোমাকেই বুঝি চেনা যায় সেই মণিমাসি বলে?

সকলকেই লাগছে চেনা-অচেনায় মেশা। শুধু একজনকে চিনে উঠতে পারলাম না।

লম্বা চেহারা, লম্বা মুখে বড় বড় গোটাকয়েক দাঁত সব সময়ের জন্য বার হয়ে আছে, ঈষৎ কটা চোখে বিমর্ষ বিষণ্ণতা, মোটা খাড়াচুলে, পুরু ঠোঁটে আর আধময়লা জামা কাপড়ে এমনি একটা অনভিজাত ভংগী যে প্রথম দৃষ্টিপাতেই এ'বাড়ীর অনাত্মীয়তা প্রমাণ করে দেয়। অথচ ভংগীটা ঠিক চাকর বাকরের মতও নয়। নিজের চেহারা, নিজের দৈন্যের প্রতি আত্ম-সচেতন সলজ্জ কুণ্ঠার আর অবধি নেই।

—ওই ছেলেটি কে, মণিমাসি?

—কোন্ ছেলেটি? আরে। মণিমাসি চোখ বড় করল,—ওকে চিনতে পারলি নে? ও-যে মুরারিদাদা!

—মুরারি মামা! এখানেই আছে বুঝি?

মুরারিমামার বাবা আর গ্রামে ফিরে যেতে পারেন নি। কবিরাজী, এ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী করে ফের কবিরাজীতে ফিরে এসে আট মাস বাদে মারা গেলেন। তার পরে মুরারি মামার ফিরে যাবার কথা। কিন্তু, কি যে হোল তার, গ্রামের নির্জন মেঠো পথের মতই প্রায় নির্বাক্ ছেলেটি এক দিন দিদিমায়ের পা জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল,—আমাকে গাঁয়ে ফেরৎ পাঠাবেন না! দুটো

ত খেয়েও থাকতে দিন। আপনারা যা বলবেন তাই করব, মাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিন। গাঁয়ে আমার পড়া হবে না।

ারাম কেদারায় শুয়ে দাদামশায় ফরসীর নল মুখে দিয়েছেন, ঝে দিদিমা কথাটা তুললেন। দাদামশায় বললেন,—ঝামেলায় নেই, লেখাপড়া ওর হবে না। এগারো বারো বছর বয়সে ৱতীয় ভাগ পড়েছে। কবে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবে ঠিক ?

ানের ডিবে থেকে একটা পান তুলে নিয়ে আলগোছে মুখে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত কণ্ঠে দিদিমা বললেন,—বছর বারো পরে তো পারবেই।

াদামশাই নল নাবিয়ে বললেন,—তত দিন ও বসে বসে দার অন্ন ধ্বংস করবে নাকি ?

বার দিদিমা মুখঝামটা দিলেন,—তা বাপু, এতগুলো লোকের দু'মুঠো খেয়ে ও তোমাদের ফেল পড়িয়ে দেবে না।

াই থেকে এ-বাড়িতে রয়ে গেছে মুরারিমামা। আর আছে াছে, সকলেরই কাজ দিয়েছে কমিয়ে। বাজারে যেতে হবে,—রারি ; দোকানের সওদা আনতে হবে—কেন, মুরারি নেই ? পিসে যেতে হবে খাম কার্ডের দরকার—মুরারিই তো আছে ; অসুখ করেছে রাত জাগতে হবে—আহা, তুমি কেন আবার মুরারিই বসুক না জল পাখা নিয়ে।

কটা জিনিষ এবার দেখলাম, এখন এ বাড়ীর এক জন হয়েছে মামা। উভয় পক্ষের মাঝখানে পড়ে থাকা ঈর্ষা দ্বেষ ভয়লজ্জায় নখিল যবনিকাখানা আর নেই। তাকে অবহেলা করবার াকুর আছে কিনা জানিনে, সাধ্য নেই। সকলেই ক্ষণে-অক্ষণে াড়ছে—মুরারি, মুরারিদাদা ও মুরারিকাকা। আর মুরারিমামা ওপর থেকে একতালা, দোতলা, তিনতলা ভাঙাভাঙি করে া হুকুম তামিল করে যাচ্ছে নীরবে। ব্যাপারটা আমার চোখে ঠেক্‌ল। কেন জানিনা, আমার মনে হল এর চেয়ে সেই ঈর্ষা-ছিল ভালো। আমরা জ্বালিয়েছি বটে, অপমান করিনি।

ধু দেখলাম একেবারে ছোটদের সঙ্গে মুরারিমামার সম্পর্কটা তের, ঠিক্ হুকুম তামিল নয়। তাই ছোটদের মাঝখানে তার বিষণ্ণ চোখও ঝক্‌মকিয়ে ওঠে, বড়ো বড়ো দাঁতে হাসির ঢেউ যায়।

ণিমাসিকে সেকথা বলতেই বললে,—ছোটদের মোড়লি করে ক ? জানে বড়রা পুঁছবে না। বাবু আর তত বোকা নেইরে। কলকাতার জল পড়েছে, পেটে পেটে বিদ্যে। শুধু বিদ্যে-তই যা ঘাট্‌তি।

—পাশ করতে পারে না বুঝি ?

—সারা রাত জেগে মুখস্থ করলে পাশ করবার আর বাহাদুরি অতবড় সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে পড়ে ক্লাশ ফোরে। বাহাদুরী করে বাবু বয়েস কমিয়েছেন এখন নাকি ওঁর তেরো য়েস।

রারি মামাকে ভুলে গিয়েছিলাম। তার ওপর আর না ছিল া ছিল দ্বেষ। কিন্তু, মণিমাসি তার রাগ এখনো ভুলতে া। মুরারিমামার ঘাট্‌তি নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহের শষ থাক্‌ল না।

মণিমাসি বলে চলেছে,—বাবুর অনেক গুণ। রাত জেগে থিয়েটারের বই মুখস্থ করে। বংগে বর্গী, সাজাহান, প্রতাপাদিত্য সব মুখস্থ।

—মুরারিমামা বুঝি থিয়েটার করে ?

—করবে কী করে ? ওই তো চেহারা। একবার সরস্বতী পুজোয় ছোড়া'দের দলে ভিড়েছিল—তারা বললে, বড় জোর একটা খানসামার পার্ট দেওয়া যেতে পারে। ষ্টেজে ঢুকেই সেলাম করে বলতে হবে—হুজুর, খানা তৈয়ার হায়। তা শুনে বাবুর কী রাগ। দল ছেড়ে তো চলে এলেনই, রেগে ক'দিন কথাই বললেন না ছোড়দার সংগে। ওঁর মনে মনে সাধ উনি হিরো সাজবেন।

হাসতে থাকে মণিমাসি,—সেই থেকে শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে আছেন। ফোঁপর দালালী করেন, হাঙ্গাম-হুজ্জৎ সব কাঁধ পেতে নেন। একদিনের গল্প বলি, শোন।

বড়দি' এসেছেন পুজোর ছুটিতে। বড়দি আর বড়দা-মেজদার ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে থিয়েটার করবে। টুনু, রিণি, কাজল, বীথি সব রিহার্সাল দিচ্ছে। ষ্টেজ বেঁধে দেবার হাঙ্গামা, জিনিষপত্র সাজানো-গোছানর ঝামেলা, প্রম্পট করবার ঝক্কি সব মুরারিদাদার—তার বদলে সর্ত্ত কি ? না মুরারিদাদার ডাইরেক্‌শান মান্‌তে হবে।

আড়াল থেকে দেখছি অভিনয়-শেখানো। শুনে হেসে বাঁচিনে। এক জায়গায় আছে টুনু বলবে রিণিকে—চলে এসো নারী। টুনু তাই বললে। মুরারি দাদা একেবারে ক্ষেপে উঠল,—অমনি করে বলতে হয় নাকি ?
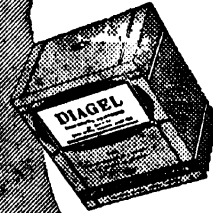
টুনু ভয়ে ঢোঁক গিললে—কেমন করে বলতে হবে ?

—কেমন করে কী ? এ তো সাধারণ কথা বলার মতই হয়ে গেল। বলতে হবে, বলেই মুরারিদাদা বেশ কায়দা করে হাত দু'খানা সামনে এগিয়ে দিয়ে ডান পাশে টেনে আনতে আনতে গলায় জোর লাগিয়ে বলল,—চলে—সে নারী—নিজের গলায় জোর লাগিয়েও মণিমাসী হাসি চাপতে পারে না। ছোঁয়াচ লাগল আমাকেও। যদিও জানি গল্প করতে গিয়ে মণিমাসি "অধিকন্তু ন দোষায়" ভেবে অনেক রঙ চড়িয়েছে, গলাতেও বেশী জোর লাগিয়েছে। তবু মুরারিমামার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পেয়ে কেমন যেন একটা তুচ্ছতার ভাব জেগে উঠল।

## তিন

তার পর আরো কয়েকবার দেখেছি মুরারিমামাকে। দাদামশায়ের শ্রাদ্ধ, রুণুদিদির বিয়ে, ছোটমামার বিয়েতে।

ছোটমামার বিয়ের নিমন্ত্রণ সেরে ফিরে আসার পর বেশী দিন হয়নি, দেখি, মা খুব মনোযোগ দিয়ে দিদিমার চিঠি পড়ছেন। পড়া শেষে বললেন,—এখন থেকে মুরারি মণির বাড়ীতে থাকবে।

মনে পড়ল ক্ষণে অক্ষণে মণিমাসির মুরারিমামাকে অপদস্থ করবার কথা। একটু তিক্তকণ্ঠেই বললাম,—কেমন কথা হোল মা ? দাদামশায় মারা যেতে না যেতেই আয় কমে গেছে অজুহাতে মামারা ওর ইস্কুল বন্ধ করে দিলেন, এখন দিদিমা মারা যাওয়া পর্যন্ত বুঝি তর সইছে না ? ওর ভার বইতে চাইছেন না বলে মণিমাসীর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে চান !

মা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। বললেন,—তা নয় রে। কাউকে বলিসনে যেন, হেমাংগর মানে মণির বরের টি, বি, হয়েছে।

কী সাংঘাতিক কথা ! ওই হাসিখুসি দেমাকে গরবে টলোমলো মেয়ে মণিমাসি, তারই বরের হয়েছে টি, বি !

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। থেকে বললাম,—তবু বুঝতে পারছিনে মা, মুরারিমামা ও বাড়ী যাবে কেন ?

—সেবা করবে কে ? মণির যে ছেলেপুলে হবে।

—তবে যে শুনেছিলাম ওরা বড়লোক ? নার্স রাখুক না কেন ?

—বড়লোক বলেই বুঝি টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দেবে ? এমনিতেই কত খরচ হবে, ক' বছরের ব্যাপার হবে কে জানে ? মা লিখেছেন, স্যানাটোরিয়ামে পাঠাবে ওরা। আর টাকাকড়ি খরচ করেই বা অত ভাল নার্স পাবে কোথায় ? সেবা করায় মুরারির জুড়ি নেই।

মার মুখ থেকে কথাটা বার হয়ে পড়ে এমন নিঃছিদ্র সত্যরূপ গ্রহণ করল যে উপেক্ষা করবার আর জো রইল না। নিঃশব্দে নীরবে রোগীর শয্যায় তার দিন রাত্রি যাপন আমরা কতবার প্রত্যক্ষ করেছি। রোগীর মুখের উপরে ফেলে-রাখা তার অপলক দুই চোখ, অনলস হাতের সেবা এত সহজলভ্য, জল-হাওয়ার মত আমাদের কাছে এতই বিনামূল্যের বস্তু ছিল যে, আমরা তার দাম কষে দেখবার কথা কখনো ভেবে দেখা দূরে থাক, তার সেবা করবার অন্তর্নিহিত উৎকণ্ঠা, আবেগ, শান্তি দেবার তৃষ্ণাটুকুকেও অনুভব করতে পারিনি। ভেবেছি এই সেবা দিয়ে দাবীহীন গৃহবাসের অজস্র ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করছে মাত্র ; তবুও পেরে উঠছেন না। কেন না, তার কটা চোখে, মোটা-খাড়া চুলে, বড় লম্বা দাঁত, পুরু ঠোঁট আর শিরাবারকরা কর্কশ আঙুলে যখনই চোখ ঠেকত রোগী ব্যতীত রোগীর আত্মীয়জন আমাদের সকলের সূক্ষ্মরুচি একটা স্থূলরুচির ধাক্কা খেয়ে চকিত হয়ে উঠত।

বছর ছয়েক কাটল। ঝুনুদাদার বিয়ে, আমার বিয়ে এমনি দু'-তিনটে উৎসব উপলক্ষ্যে আমরা সমবেত হলাম। অবশ্য মুরারি-মামার সংগে দেখা হোল না। মার কথাই সত্য হোলো। ছ'বছর ধরে আজ মদনাপল্লী, কাল ধরমপুর, পরশু ইটকী, নৈনিতাল করে ফিরতে লাগল মণিমাসির বর আর তার সংগে ছায়ার মত প্রতি দিনরাত্রির নীরব নির্বাক সংগী হয়ে ফিরতে লাগল মুরারিমামা।

ছ'বছরের শেষ বছরে দেখা হয়ে গেল মুরারিমামার সংগে।

দিদিমার অসুখের খবর পেয়ে আমরা তাঁর যত ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনীরা সকলে একে একে এসে পড়ছি। ক্রমে বেড়ে চলেছে অসুখ। যেন দুলছে একটা ঘন অন্ধকারের পর্দা, মনে হচ্ছে এইবারেই পর্দা উঠবে আর আশংকায় অপেক্ষা করে আছি পর্দা উঠলে কী-দেখতে হবে। এক একবার মনে হচ্ছে, এইবারই শেষ নিঃশ্বাস ফেলবেন দিদিমা। দিনরাত্রির উৎকণ্ঠাভরা সেবায় সকলে ক্লান্ত-শ্রান্ত আর উদ্বিগ্ন হয়ে আছি—এমন সময় একদিন রাত শেষ হয়ে ভোর হ'তে না হ'তেই ভারী আরাম লাগল শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহ-মনে। বিনিদ্র দু'-তিন রাত্রি ট্রেণে কাটিয়ে উসকো-খুসকো চুলে, আধময়লা জামাকাপড়ে বড় বড় দাঁত মেলে দিদিমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মুরারিমামা। আমাদের বিবাহের খবর পেয়ে যে একটি কথাও বলেনি সেই মুরারিমামা দিদিমার অসুখের খবর পেয়ে কান্নাকাটি, শেষ পর্যন্ত নাকি রাগারাগি করেই চলে এসেছে। তা আসুক। সেদিন তার দিকে চেয়ে আমাদের সকলেরই যেন মস্ত একটা ভার নেমে গেল।

আমাদের ছুটি দিয়ে মুরারিমামা বসল দিদিমার শিয়রে। বেশী দিন লাগল না। দিদিমাও তাকে ছুটি দিলেন। আমাদের সংগে কাঁধ দিয়ে দু'মাইলের পথে মুরারিমামা একটিবারও কাঁধ বদল করল না। দাহ শেষে ফিরে এসে সেই যে চিলেকুঠিতে দুয়োর দিল, খুলল পুরো দু'টো দিন পার করে দিয়ে।

চোখ-মুখ কান্নায় ভেঙে পড়া। দুয়োর-দেওয়া ঘরে বোধ হয় ছেলেমানুষের মত ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছে। দেখে কেউ বললে বাড়াবাড়ি। কেউ অবাক হোলো, প্রকাশ-অনভিজ্ঞ, নির্বাক দীর্ঘশ্বাস চেপে নেওয়া মুরারিমামার এমন কান্না কেউ ধারণায় আনতে পারে না।

কেউ না পারুক, মুরারিমামা বোধ হয় তার অন্তরের গভীরে বুঝতে পেরেছিল—এই বাড়ীর মধ্যে যে মানুষটি ছিল তার যথার্থ আপন, সেই গেল চলে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যেতে বড়মামা বললেন, মুরারি, বাবা নেই, মা-ও থাকলেন না। আমরা বলি কি, তুমি এখন তোমার বাড়ীতেই যাও।

ইতিপূর্বে সকলের মধ্যে একটা কানাকানি হয়ে গিয়েছে। কেমন যেন একটু খুক-খুক করে কাশে মুরারি, চোখ দু'টো ঈষৎ জল-জল করে। ঠোঁট দু'টো শুকিয়ে ওঠে বিকেলবেলা থেকে, কে জানে ঘুসঘুসে একটু জ্বরই বা হয় কি না বিকেলের দিকে, আর সকালবেলা

এমন যেন শ্রান্ত-ক্লান্ত ভাব। সকলেরই মত হোল ওকে বাড়ীতে রাখা আর নিরাপদ নয়।

বড়মামার কথাটা মুরারিমামা প্রথমে বুঝে উঠতেই পারল না। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল। পরে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রশ্ন করল, কার বাড়ী?

—তোমার নিজের। আমরা তোমার গ্রামের বাড়ীর কথা বলছি।

পরদিনই মুরারিমামা চলে গেল।

তার পর চার-পাঁচ দিনও কাটেনি। ফিরে যাব বলে আমরা গোছগাছ করছি, মুরারিমামা ফিরে এলো। বড়মামা, মেজমামা রাগারাগি করতে লাগলেন। এমন কি ছোটমামাও।

আর তাঁদের বকুনি খেতে খেতে রঙচটা ভাঙা টিনের তোরংগ, ছেঁড়া সতরঞ্চে জড়ানো ময়লা বিছানা, আর দু'-তিনটে ছোট-বড় ময়লা কাপড়ের পুঁটুলির পাশে মাথায় হাত রেখে বসে রইল মুরারিমামা।

কোথায় যাবে সে?

এগারো বছর বয়সে যে দেশ, যে বাড়ী, যে বাড়ীর মানুষ-জনকে ছেড়ে এসেছিল এতদিনের পর ফিরে গিয়ে তাদের কোথায়ও খুঁজে পায়নি। মা মারা গিয়েছিলেন ছেলেবেলায়, বাপও গিয়েছেন, দাদা বিয়ে করেছেন—বৌদিদি, ভগিনীপতি, ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্‌নে ভাগনীরা সব অপরিচিত। এমন কি নিজের ভাই-বোনদেরই প্রায় চিনে উঠতে পারল না। বুঝতে পারল না ওদের মনের গড়ন, ধরতে পারল না ওদের চিত্তের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে, গ্রাম্য সমাজের রীতিনীতিও আশ্চর্য রকমে আলাদা লাগল। কিছুতেই খাপ খেল না। শুধু সেই যে নাগাল পায়নি তাই নয়, একজন অত্যন্ত অপরিচিত বিদেশী মানুষ উড়ে এসে ঘর জুড়ে বসলে যে দশা হয় ওকে নিয়ে বাড়ীর লোকেরও সেই দশা।

এদের সে চিনতে পারে। বুঝতে পারে। ধরতে পারে। পারে বলেই বুঝি ফিরে এসেছিল।

ফিরে এসে ভাঙা পুরনো বাক্স, ছেঁড়া বিছানা, ময়লা পুঁটুলির পাশে মাথায় হাত রেখে বসে আর একটা কথাকে ধরতে লাগল মুরারিমামা।

এরা, যারা তার এত পরিচিত, যাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, রাগ-দ্বেষ, মান-অভিমান, লোভ-ক্ষোভ সমস্তর কণা-কণা অণুতম অণুর সংগেও যার নিবিড় পরিচয় সেই নিবিড় গভীর পরিচয়ের ক্ষেত্রেও তার নিজের বলতে এক টুকরো স্থান নেই।

## চার

পরের বছরই আমন্ত্রণ-লিপি পাঠিয়ে মণিমাসি আমাদের অবাক করে দিল। ওদের দ্বাদশ-বিবাহ-বার্ষিকীর নিমন্ত্রণ। আসল কথা, সমাবর্তন উৎসবের ছলে মণিমাসি তার স্বামীর আরোগ্যোৎসব পালন করছে। লিখেছে,—

তোর বরকে নিয়ে আসতেই হবে। কোনো ওজর-আপত্তি শুনব না।

হাওড়া ষ্টেশনে ট্যাক্সিবেকার হাঁকিয়ে ওরা এলো। হেসে বলল,

দেখলি তো আর কাউকে দিয়ে তোদের রিসিভ করাতে মন সরল না।

এবার দিদিমার বাড়ী, মামার বাড়ী নয়, উঠলাম মণিমাসির বাড়ীতে।

মণিমাসির শ্বশুরবাড়ীর লোকজন ছাড়াও মামাবাড়ীর ভিড় কম জমল না। মামারা, মামীমারা, মেসোমশায় মাসিমা, মা-বাবা, মামাত মাসতুত ভাই-বোন, রুণুদিদি তার বর, ঝুমুদাদা তার বউ, সকলেই জমায়েৎ হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও নাচ-গানের জলসা বসল। মস্ত আলপনা পড়ল হলঘর জুড়ে। বেলফুলের গোড়ে মালার ছড়াছড়ি আর কোণে কোণে রাখা ধূপদানে ধূপকাঠি পুড়তে লাগল দিশেহারা হয়ে। বিয়ের দিনের মতই জমকালো উৎসব, অথচ বিবাহ দিনের চেয়ে অনেক সুনিবিড়। বাইরের নানা লোক এসে ভিড় জমিয়ে যাচ্ছে না শুধু, এসেছে তারাই যারা অন্তরংগ জন—যারা অত্যন্ত আপন আত্মীয় আর প্রিয় বন্ধু-বান্ধবী।

পরদিন মণিমাসির সংগে এটা-সেটা নিয়ে গল্প করতে করতে হঠাৎ একজনের কথা মনে পড়ে গেল।

—আচ্ছা মণিমাসি, মুরারিমামা এখন কোথায়? তার নিজের বাড়ীতে আছে বুঝি?

মণিমাসি আমাদের চিরপরিচিত ভংগীতে ঠোঁট ওলটালো। বিরক্ত হলে চিরকাল যে ভংগী করে ঠিক তেমনি।

—ছাই! আছে নাকি কোনো চালচুলো যে যাবে? চিরকাল মাকে জ্বালিয়েছে, এখন আমাকে জ্বালাচ্ছে।

—তোমার এখানেই আছে তাহলে? তবে তাকে দেখছি না যে?

মণিমাসি তখন একটা বিস্তৃত বিবরণ দাখিল করল। যা বলল, তার অর্থ—মামাদের বকুনী খেয়ে মুরারিমামা কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। মাস দুই তার পাত্তা মেলেনি, সকলেই ভেবেছিলেন দেশে ফিরে গেছে। হঠাৎ একদিন পুঁটলী-পেঁটরা নিয়ে ফের হাজির। এবার আর মামাবাড়ীতে নয়, মণিমাসির বাড়ীতে। হেমাংগ মেসোমশায় বললেন,—এসেছে যখন থাক্।

মণিমাসি রেগে বলেছিল,—না। তোমাকে সম নাজেহাল করেছে! মায়ের অসুখের খবর পেয়ে রাগারাগি করে যে চলে এল, বিদেশ-বিভুঁয়ে একা তোমাকে কী কষ্ট পেতে হয়েছিল বল দেখি?

মেসোমশায় বলেছিলেন,—তা হয়েছিল একটু। কিন্তু, ছ'বছর ধরে সেই কষ্টটা ও-ই যে আমাকে পেতে দেয়নি, সে কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন?

মণিমাসির মতে মুরারিমামা শেষের দিকে যে অপরাধ করেছিল আগের ছ'বছরের নিরন্তর সেবা দিয়েও তার স্খালন হয় না। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে একটু কথাকাটাকাটি, মনকষাকষি সুরু হয়েছিল। অবশ্য সেটা বেশী দিন চলতে দেয়নি মুরারিমামা, নিজের মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত উঠিয়ে ওদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর নাকি অনেক তদ্বির করে হেমাংগ মেসোমশায় একটা হাসপাতালের ফ্রীবেডে ভর্তি করে দিয়েছেন। সেখানেই আছে সে।

—দেখ না, কম ভোগাচ্ছে আমাকে? মণিমাসি বললে,—প্রথম দু'-তিন মাস উনি দেখাশোনা করেছিলেন, তারপর নিজের ছেলেখেলা কথা নয়—আর যেতে পারেন না, টাকা মণিঅর্ডারে পাঠিয়ে দেন, তাই নিয়ে বাবুর রাগ কত? আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখলেন,—

হেমাংগবাবু, তুমি আমার জন্য যথেষ্ট করিয়াছ, তোমার ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না। আমি অনেকটা ভালো আছি, তুমি মিথ্যা অত টাকা পাঠাইও না।

চিঠি পড়ে এমন গা জ্বলে গিয়েছিল, বলেছিলাম, পাঠিয়ো না টাকা। বাবু বুঝুন যে দেমাক করলেই হয় না, মুরোদ থাকা চাই। তা তোর মেসোমশাই যেমন মানুষ, টাকা ঠিকই পাঠিয়ে চলেছেন।

এবার মণিমাসি নয় মেসোমশায়কে ধরলাম।

—মুরারিমামার ঠিকানাটা?

—যাবে নাকি দেখা করতে? বেশ বেশ। কত দিন যেতে পারিনি। কাজে-কর্মে জড়িয়ে পড়েছি।

উৎসাহের সংগে কথাটা সুরু করেও কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে দেখা করতে পারছেন না, এই কথাটা বলতে গিয়ে হেমাংগ মেসোমশায় এক সুগভীর লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠলেন।

ঠিকানা নিয়ে চলে আসছি মেসোমশায় ডাকলেন,—বীণা, শোনো। ফিরে দাঁড়াতেই মুখ না তুলে চোখ নিচু করেই বললেন, —গাড়ীটা দিতে পারলে সুবিধে হ'ত, কিন্তু মণিকে না জানানোই—

কথাটা শেষ করতে দিলাম না। ঘাড় নেড়ে বললাম,—জানাব না। জানি, জানালেই মণিমাসী বলবে—ক্ষেপেছিস! কী দরকার তোর ওখানে যাবার? তাছাড়া ফ্রী বেড, যত নোংরা, ডাটিকারবার।

ব্লক-নম্বর মিলেছে। করিডোর বয়ে ডান দিকে ঘর। ঘরে ঢুকেই স্বামীর দিকে এক পলক চেয়ে নিলাম। সুশ্রী, সুবেশ, ফিট্‌ফাট্ আমার স্বামীর ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

এদিকে বেডের পর বেডে ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের ভিড়। বিকেলবেলা: জ্বর এসেছে প্রায় সকলেরই। সমুখে দীর্ঘরজনীর উত্তপ্ত দাহের ঔজ্জ্বল্যের আভাসেও চোখে উজ্জ্বল জ্বালা ঘনায়নি। যেটুকু লেগেছিল তাকে সরিয়ে দিয়ে ঘনিয়ে ধরেছে দুর্ভর ভাবনা। শুধু নিজেকে নয়, হয়তো পুরো পরিবারটাকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দিতে হবে। বিকেলবেলা, প্রিয় আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সংগে মেলবার সময়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া এই দু'টি ঘণ্টা সময়। সময়টাতে ভাবনাধরা চোখের ওপরে কারুর একটা মেঘমেদুর ছলছলে ছায়া ছলছলিয়ে উঠেছে, কারুর ঠোঁটে ঝলক দিয়ে উঠেছে আকাশ-রাঙা-করা আষাঢ়-সন্ধ্যার করুণ-মধুর এক টুকরো হাসি।

সমস্ত বেডে এসেছে দর্শনার্থী। চার-পাঁচ থেকে সুরু করে নিচের দিকে একজনও আছে! হাতে কেরিয়ার, ফল, ঘরে তৈরী খাবার এনেছে সংগে। দু'-চারটি বেড ফাঁকা, তাদের কেউ আসেনি। তারা সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছে দরজার দিকে।

একটা কথা মনে হোল। বারো নম্বর বেডে মুরারিমামাও কি এমনি সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছে, কিংবা, তৃষ্ণা না মিটে চাইবার ইচ্ছাটাই গেছে মিলিয়ে?

নয়, দশ, এগারো, বারো। বারোর সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। টান-টান করে পাতা শূন্য বিছানা। মুরারিমামা বিছানায় নেই। হয়তো বা বেরিয়েছে। এমনি কয়েক জনকে দেখলাম বাহিরে, আপনজন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের খুশীটা একটু বেশী রকমের ঝকঝকে; সোনালী বিকেলবেলার মত। তারা জানে, কিছুদিন পরেই তারা ছুটি পাবে। মুরারিমামার অবস্থাও বুঝি তাই। মণিমাসি ভেবেছে যে, মুরারিমামা রাগ করে লিখেছে—ভালো আছি। আসলে অভিমানই করেনি সে, সত্যিই ভালো আছে। আর অভিমান করবেই বা কী করে? করবে কোন শূন্যের ওপরে?

—দয়া করে বলবেন কি, বারো নম্বর বেডে যিনি থাকেন, কোথায় গিয়েছেন?

নয়, দশ, এগারো, তেরো, চোদ্দ অনেকেরই চোখ এসে পড়ল আমাদের মুখের ওপরে, পড়ে স্থির হয়ে রইল।

প্রথম থেকেই আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি আমাদের ভাবনাহীন খুশিভরা চেহারা, পারিপাট্য। স্বচ্ছন্দ-পালিতের ললিতময় ভংগী সমস্ত এই ঘরের পক্ষে এত বেশী বেমানান যে অধিবাসী এবং অতিথিবৃন্দ সকলেই অপলকে চেয়েছিলেন। কারুর চোখে বিস্ময়, কারুর বা প্রশংসা, ঈর্ষা আর বিরক্তিও যে কোনো কোনো চোখে ছিল না এমন বলতে পারব না।

—কার কথা বলছেন? কী নাম? জবাব দিলেন এগারো নম্বর।

—শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন—

—বুঝেছি। ভদ্রলোক কথা শেষ করতে দিলেন না। ক্ষিপ্তভাবে বলে উঠলেন।

—এলেন তো পরশু এলেন না কেন?

কী কথার কী জবাব। জবাবটা সৌজন্যপূর্ণ তো নয়ই, এমন কি সুজনোচিতও নয়। তবু কেন জানি না আমার মনে লেশমাত্র রাগের উদয় হোল না। ক্ষিপ্ততার মাঝখানেও এমন একটা দাবী ছিল যে জবাবদিহি করতে বাধ্য হলাম,—পরশু আমরা বিশেষ একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কালও তার জের চলল। তাছাড়া ওঁর চিঠিটা তখনো পাইনি। কিন্তু, একথা বলছেন কেন বলুন তো? উনি দু'চারদিনের জন্যে কোথায়ও বেড়াতে গেছেন নাকি?

অপরিচিত মানুষকে এত কৈফিয়ৎ দেওয়া স্বামীর পছন্দ হচ্ছিল না। তবু সৌজন্য রক্ষা করে নির্বাক ছিলেন। শুধু ঠোঁটে অর্ধস্ফুট ভাবে ফুটে উঠেছিল বিরক্তির আভাস।

নয়, দশ, এগারো, তেরো, চোদ্দ সকলের বিস্ফারিত, অভিভূত, নির্বাক মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে কোনো জবাব পেলাম না। চারি দিকে থমথম্ করছে অর্থঘন নিস্তব্ধতা। এই নৈঃশব্দ বুকের ওপরে একটু ভার হয়ে চেপে বসলেও তার অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম, এঁদের প্রশ্ন করা বৃথা—মুরারি মামা কোথায় গিয়েছেন তা কেউ জানেন না।

স্বামীর দিকে ফিরে বললাম—আমাদের ফিরে যেতে হবে, এ' যাত্রা আর দেখা হোল না।

আবার ফিরে দু'তিনজনের মুখের দিকে চেয়ে অনির্দ্দেশ্যে ভাবে বললাম,—মুরারি মামা ফিরে এলে অনুগ্রহ করে তাঁকে একটা খবর দেবেন। বলবেন, বম্বে থেকে তাঁর ভাগ্নী রীণা এসেছিল দেখা করতে।

হঠাৎ নয় নম্বরের ঠোঁট কেঁপে উঠল, বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, —মুরারি বাবু আপনার মামা?

এবার স্বামী জবাব দিলেন। ধীর গম্ভীর অথচ স্পষ্ট গলায় বললেন,—নিজের নয়, খুবই দূর সম্পর্কের।

ফলের সাজি নিয়ে স্বামী বিব্রত হয়ে পড়েছেন দেখে হাতের সন্দেশের বাক্স টুলে নামিয়ে রাখলাম। স্বামী আমার অনুসরণ করলেন। হাতে করে জিনিষ বওয়া ওঁর অভ্যেস নেই। যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

—আচ্ছা, নমস্কার। আমরা তবে আসি। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলতে চাই।

—বলুন। তেরো নম্বর এতক্ষণে কথা বললেন।

—দেখুন, মুরারিমামার নাম করে এই ফল-মিষ্টি এনেছিলাম। ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আমার ইচ্ছে নেই। আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা যদি দয়া করে গ্রহণ করেন, ভারী তৃপ্তি পাব।

এগারো নম্বর একটুকরো বাঁকা হাসলেন। তাঁর হাসিটা বালুবেলায় বন্দী ক্ষীণ জলধারার মতই ঝিক্‌মিক্ করে উঠল। বললেন,—নিশ্চয়, আমাদেরি নিতে হবে বৈকি? কালও নিয়েছিলাম। পার্থক্য এই কাল যিনি এসেছিলেন কৌটা খালি

রুণুদিদি খিলি মুড়ছিল লবংগ গেঁথে, বললে,—তুই-ও যেমন দাদা, তোকে স্রেফ ধাপ্পা দিয়েছে।

—উহুঁ ধাপ্পা নয়। আমি দেখেছি রুমাল, চারদিকে শাদা স্তুনথে ডের কাজ, এককোণে মুগা দিয়ে "এম্" লেখা।

—আর চিঠি? মণিমাসি ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল।

—চিঠিও পড়েছি, খাসা চিঠি। হাতের লেখাটিও বেশ। কয়েকটা লাইন রীতিমত মুখস্থ হয়ে গেছে।

বলেই ঝন্টুদাদা কবিতার মত আউড়ে গেল,—

তুমি লিখেছ তোমার রূপ নেই। আমি তো সবার চোখ দিয়ে দেখিনি তোমাকে। আমার এই দুটি চোখে তাকেই দেখতে পেলাম, যে তুমি ভিতরের। আর সেই তোমার ভিতরকার রূপের বন্যায় স্নান করে ধন্য হয়ে গেল আমার এই দু'টি চোখ। তুমি তুমি যে অপরূপ গো!

পান সাজতে সাজতে আমরা স্তম্ভিত। থমকে গেল হাত, বিস্ময়ে হতবাক সকলে।

মণিমাসির কোঁচকানো ভুরু আরো কুঁচকে চোখের ওপরে নেবে পড়ল। চোখের বাঁকা তীর্যক দৃষ্টিটাকে দেখাতে লাগল শাণিত ভংগীতে। বোধকরি তার মনে বাজছিল যে এমন চিঠি তার বরও থাকে কোনোদিন লিখতে পারেনি, রূপের বাহিরের বর্ণনা দিয়েই [illegible]রেছে। লিখেছে, রাণীর মত রূপ তোমার, তুমি সম্রাজ্ঞী।

সম্রাজ্ঞী মণিমাসি ঈর্ষায় বিষাক্তকণ্ঠের সুতীব্রতা দিয়ে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল নৈঃশব্দকে।

—তোকে দেখাল এই চিঠি? বাহাদুরি নিতে বুঝি?

—সহজে কি দেখাতে চায়? সে এক কাণ্ড! দুপুরে শোবার জায়গা না পেয়ে চিলেকুঠিতে যাচ্ছি, দেখি সে-ঘরে মুরারিমামা আর টুনু। মুরারিমামা আস্তে আস্তে কি যেন বলে চলেছে আর টুনু লিখে চলেছে উবু হয়ে বসে। আমি এসেছি, ওরা টের পায়নি। পিছন থেকে হেঁকে উঠলাম—টুনু, কি হচ্ছে?

দুজনেই চমকে উঠল। মুরারিমামা থতমত খেয়ে টুনুর হাত থেকে লেখাটা নেবার চেষ্টা করতেই আমি বললাম,—টুনু, দেখব কি লেখা হচ্ছে। না হলে বড়মামাকে বলে দেব।

টুনু ভয় পেয়ে গেল। পড়ে দেখি, দিব্যি রসের কথা। গম্ভীর ভাবে বললাম—টুনু ছেলেমানুষ, ওকে এসব লেখাচ্ছ কেন?

আমতা আমতা করতে লাগল মুরারিমামা—লেখানো নয়, এই···এই···এই একটা চিঠি লেখাচ্ছিলাম।

—চিঠি লেখাচ্ছিলে? তুমি নিজে না লিখে ওকে দিয়ে লেখাচ্ছ কেন?

—আমার হাতের লেখাটা বড় বিশ্রী, টুনুর লেখা ভারী সুন্দর।

—তোমার আবার সুন্দর লেখার দরকার হোল কেন?

এ কথায় মুরারিমামা লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,—একটা চিঠির জবাব এটা। যে লিখেছে, তার লেখা সুন্দর।

—কই, দেখি সে চিঠি?

মুরারিমামা শক্ত হয়ে বলল,—না!

শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলাম,—বেশ, বড়মামাকে বলে দিচ্ছি; টুনুকে পাকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত মুরারিমামা কি যেন ভাবল। তার পর মেলে ধরল হাতের মুঠো—একখানা রুমাল আর একখানা নীল কাগজের চিঠি। পড়তে পড়তে তাজ্জব বনে গেলাম। ওর দাঁত, চোখ, চুল, ঠোঁ[illegible] দিকে চাই আর ভাবি—এমন চিঠি লেখা যায় নাকি এমন মানুষকে[illegible] মুখে সে কথা না বলে বললাম—রুমাল কেন?

বললে,—কিছু দিনের মধ্যেই চলে যাবে এখান থেকে, আর চি[illegible] দেওয়া যাবে না, তাই স্মৃতিচিহ্ন পাঠিয়ে দিয়েছে। রুমালটা এব[illegible] নাড়াচাড়া করে রুমাল চিঠি ফেরৎ দিয়ে আসছি। হঠাৎ আম[illegible] হাত চেপে ধরল—দাদাদের কাউকে বোল না ঝন্টুভাই, আমি [illegible] চিঠি তোমাকে দেখাব।

ব্যাপারটা শুনে আমরা একবাক্যে স্বীকার করলাম, কাণ্ডের ম[illegible] কাণ্ড বটে। কিন্তু মণিমাসি যে এর মধ্যে আর একটা কাণ্ড ব[illegible] করবার জন্য উদগ্র হয়েছিল, বুঝতে পারিনি। কলরব করে[illegible] একটা বলতে যেতেই ধমকে উঠল,—হাত চালিয়ে কাজ সেরে নে[illegible] তা নয়, তখন থেকে আবাড়ে গল্প গেলা হচ্ছে।

পরদিন মণিমাসি ঘুম ভেঙে উঠেই বললে,—ঝন্টু, তোকে একটা কাজ করতে হ'বে। ওদের চিঠি তো আর ডাকে যাতায়াত করে না, মাঝখানে দূত আছে, তার নামটা বার করে আনতে হবে।

অবাক হয়ে মণিমাসির মুখের দিকে চাইলাম। সারারাত ন[illegible] ঘুমিয়ে সে এই চিন্তাই করেছে নাকি?

আমার মত ঝন্টুদাদাকেও অবাক-চোখে চাইতে দেখে মণিমা[illegible] নিজেই পথ বাংলে দিল,—কিছুই অসুবিধে হবে না, দরকার পড়[illegible] শেষ অস্ত্রপ্রয়োগ করবি—তা লাগবে না, তোর ফাঁদে পড়ে গেছে[illegible] না বলতে পারবে না।

ঝন্টুদাদা কাজ হাসিল করে এলো। নাম মনোহর। মামা[illegible] বাড়ীর খানচার-পাঁচ বাড়ীর পরেই তার বাড়ী, টুনুরই সমবয়সী বন্ধু[illegible] মণিমাসি বললে,—তাই যখনি আসি দেখি মনোহরকে, আর [illegible] মাঝে মাঝেই তাকে ডেকে নিয়ে চিলেকুঠিতে খিল দেন, ভ[illegible] ভালো দূতিয়ালীটা।

সকালবেলাতেই ঝন্টুদাদাকে দিয়ে মণিমাসি কিনিয়ে আ[illegible] একনম্বরের ফুটবল। বিকেলবেলাতেই তাকে আলোচনারত দেখল[illegible] একটি ছোটছেলের সংগে আর তার একটু পরেই ছেলেটি তরতরি[illegible] নেমে গেল সিঁড়ি ভেঙে, তার হাতে সকালবেলাকা[illegible] সেই বল।

মণিমাসি ঘরে এলো। তার মধ্যে যেন বান ডেকেছে। ঠোঁ[illegible] হাসি, চোখে হাসি, হাসি তার চলনে-বলনে। বললে,—আ[illegible] সন্ধ্যেবেলায় ম্যাজিক দেখতে পাবি।

নতুন মামিমাকে ঘিরে বসে আছি। মণিমাসি এলো মনোহরকে সংগে নিয়ে। এসেই টুনুকে হুকুম করলে,—মুরারিদাদাকে ডে[illegible] আন্ দেখি, বলবি জরুরী দরকার।

মুরারিমামা এলো। এসেই মনোহরকে মণিমাসির পাশে দে[illegible] কেমন যেন দোমনা হয়ে গেল।

মনোহরের সংগে আগে কী মন্ত্রণা হয়েছিল জানা নেই, মণিমাসি প্রশ্ন করতে লাগল, জবাব দিতে লাগল মনোহর আর তার জবা[illegible] দমকে দমকে এক একটা করে পর্দা উঠতে লাগল।

—আচ্ছা মনোহর, তুমি মুরারিদাদাকে কার কাছ থেকে চি[illegible] এনে দাও?

—এনে দিইনে, লিখে দিই। মুরারিকাকা আস্তে আস্তে বলে আর আমি লিখে যাই।

—আর একখানা রুমাল ? যার চারিদিকে সূতো তুলে শাদা [র] কাজ করা আর এককোণে মুগা দিয়ে "এম" অক্ষর লেখা, রুমালখানা কার ?

—আমার।

—ঠিক বলছ ? কোনো মেয়ে তোমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে [দে]নি ? বলেনি, লক্ষ্মীভাই, রুমালটা চুপি চুপি মুরারিদাদাকে [দি]য়ে এসো তো ?

—কক্ষনো না। ও রুমাল দিদি আমাকে শেলাই করে [দি]য়েছিলেন [শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে। বলেছিলেন, মনোহর, [তো]র নাম লিখে দিলাম ইংরিজী অক্ষরে। অনেক ভুলিয়ে [ভা]লিয়ে মুরারিকাকা ওটা নিয়েছেন। আমি বলেছিলাম—আর [এক]খানা দেব ; সেই যে বউদি যেটা করে দিয়েছিলেন টকটকে [লা]ল গোলাপ ফুল। তা মুরারিকাকার জেদ ওই এম অক্ষরওলা [রুমা]লটাই ওঁর চাই।

মুরারিমামার দিকে চেয়ে দেখি সমস্ত মুখটা অসম্ভব ফ্যাকাশে [যে]ন দেহের সমগ্র রক্তস্রোত অন্য কোনো একটা পথ ধরে নিঃশেষে [বে]র হয়ে গিয়েছে, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনোমতে।

কুমুদাদা ক্ষেপে উঠল,—কী! আমাকে ধাপ্পা দেওয়া! [সব] মিথ্যে! দু'টো ছেলেকে দু'পাশে রেখে তুমিই সমস্ত বানিয়ে [ব]লছ। এতবড় ধাপ্পাবাজি।

মণিমাসি হেসে উঠল,—ধাপ্পা তোদের দেওয়া যায় যে। পারলি আমাকে দিতে ? যখনি শুনেছি সন্দেহ তখন থেকে। [এ]ক আদর করে 'এম' লিখে রুমাল বানিয়ে দেবে এমন মেয়ে জন্মেছে [না]কি ভু-ভারতে ? আর কী চিঠি! বাব্বা।

বলে মণিমাসি হেসে হেসে সুরু করলে, তুমি লিখেছ তোমার [রূ]প নেই। আমি তো সবার চোখ দিয়ে দেখিনি তোমাকে। আমার এই দু'টি চোখে তাকেই দেখতে পেলাম, যে তুমি ভিতরের। আর সেই তোমার ভিতরকার রূপের বন্যায় স্নান করে ধন্য হয়ে গেলে আমার এই দু'টি চোখ! তুমি যে অপরূপ গো!

শেষ করে খিলখিলিয়ে হাসতে লাগল মণিমাসি।

চিঠির বক্তব্য সুরু হতেই মুরারিমামা ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল। এখন শেষ হতে না হ'তেই তার কটা চোখ, লম্বা দাঁত, খোঁচাখোঁচা চুল, পুরু ঠোঁট সমস্ত কাঁপতে লাগল। সূক্ষ্ম সেই [ক]ল্পনার জালে বেদনার' মোড়া হয়ে মুরারিমামা সেই মুহূর্তের জন্য আমার চোখে অন্য একটা চেহারায় দেখা দিল।

হাসিতে ভরা দু'চোখ মেলে অনেকেই চেয়েছিল মুরারিমামার দিকে। মণিমাসির খিলিখিলি ধ্বনির সংগে মিশেছিল অনেকের ধ্বনি। এমন কি, নতুন বউ যে সেও হাসির ছোঁয়াচ এড়াতে পারেনি। মুচকি হেসেছিল মুখ নিচু করে।

মুরারিমামা এক সময় চলে গেল। তখনো মণিমাসির কলরবে ক্ষান্তি ধরেনি।

কী করে ফুটবল ঘুষ দিয়ে মনোহরের কাছ থেকে কথা বার করে নিতে পেরেছে নিজের সেই বুদ্ধির তারিফ করে নিন্দে করছিল মুরারিমামার শয়তানী বুদ্ধির। দিদিমা যা দু'চার আনা দেন, তাই দিয়ে চকোলেট, লজেন্স কিনে দিয়ে এই কাণ্ড। আর রুমালটার জন্যে মনোহর টুনুকে রাজভোগ খাইয়েও নাকি হয়নি আবার 'যখের ধন' বইটাকে ঘুষ দিতে হয়েছে।

মণিমাসি খুশী ভরে বলে চলেছিল—সন্দেহ কী সাধে হয়রে বাপু! অমন চিঠি! কেমন যেন নামকরা লেখকের লেখা গন্ধ। ঠিক তাই বইখানা হাতে করে দেখি হুবহু কপি। ছোড়দার বুককেস থেকে বার করে নিয়েছিল।

তামাসাটা আর ভালো লাগছিল না। বলে উঠলাম, মণিমাসি, আর কেন ? বেচারাকে অনেক লজ্জাই তো দিয়েছে। লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে কাঁপতে কাঁপতে সে গিয়েছে। কাঁদতে বাকি শুধু। অথচ, আমাদের কী এমন ক্ষতি করেছে বলো ? নিজের জীবনের মস্ত একটা সাধকে কল্পনায় রাঙিয়েছে মাত্র।

মণিমাসি ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই চোখে আগুন জ্বালিয়ে তুললে, দেখ বীণা, বাজে বকিস্ নি। ওকে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় কাঁদতে দেখলি তুই কোনখানে ? ওর ওই মিথ্যে ভণ্ডামি, ন্যাকামি, জোচ্চুরীকে বলবি জীবনের মস্ত একটা সাধ ? আর ঐ শয়তানী বুদ্ধিটা ? ওকি নাম বুঝি কল্পনায় রাঙানো ?

বেদনার নৈর্বাক নৈঃশব্দে আমি চুপ করেছিলাম আর মণিমাসি সুতীব্রস্বরে বলে চলেছিল।

—ওর আবার লজ্জা, দুঃখ, অপমান বোধ! আমি বলে রাখছি ওর সমস্তটাই ভাণ। থিয়েটারের বই পড়তে পড়তে থিয়েটার সর্বস্ব হয়েছে। তাও যদি ভালোমত করতে পারত তো বাহবা দিতাম। একটা চাকরের পার্ট করবার মুরোদ নেই যার তার আবার হিরো সাজবার সাধ। যাত্রার দলের রাজা বলো। কে যেন ফোড়ন কেটেছিল। আমার অন্তরের অন্তরতম গভীরে ঢেউয়ের পরে ঢেউ তুলে দিয়ে মণিমাসি বলেছিল, তাও নয়। ভাঁড়। ফার্স্ট ক্লাস ভাঁড় একটি।

The people to fear are not those who disagree with you but those who disagree with you and are too cowardly to let you know.

—*Napoleon*

রুণুদিদি খিলি মুড়ছিল লবংগ গেঁথে, বললে,—তুই-ও যেমন দাদা, তোকে স্রেফ ধাপ্পা দিয়েছে।

—উহুঁ ধাপ্পা নয়। আমি দেখেছি রুমাল, চারদিকে শাদা ফুলথ্রেডের কাজ, এককোণে মুগা দিয়ে "এম্" লেখা।

—আর চিঠি? মণিমাসি ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করল।

—চিঠিও পড়েছি, খাসা চিঠি। হাতের লেখাটিও বেশ। কয়েকটা লাইন রীতিমত মুখস্থ হয়ে গেছে।

বলেই ঝন্টুদাদা কবিতার মত আউড়ে গেল,—

তুমি লিখেছ তোমার রূপ নেই। আমি তো সবার চোখ দিয়ে দেখিনি তোমাকে। আমার এই দুটি চোখে তাকেই দেখতে পেলাম, যে তুমি ভিতরের। আর সেই তোমার ভিতরকার রূপের বন্যায় স্নান করে ধন্য হয়ে গেল আমার এই দু'টি চোখ। তুমি তুমি যে অপরূপ গো!

পান সাজতে সাজতে আমরা স্তম্ভিত। থমকে গেল হাত, বিস্ময়ে হতবাক সকলে।

মণিমাসির কোঁচকানো ভুরু আরো কুঁচকে চোখের ওপরে নেমে পড়ল। চোখের বাঁকা তীর্যক দৃষ্টিটাকে দেখাতে লাগল শাণিত ভংগীতে। বোধকরি তার মনে বাজছিল যে এমন চিঠি তার বরও তাকে কোনোদিন লিখতে পারেনি, রূপের বাহিরের বর্ণনা দিয়েই সেরেছে। লিখেছে, রাণীর মত রূপ তোমার, তুমি সম্রাজ্ঞী।

সম্রাজ্ঞী মণিমাসি ঈর্ষায় বিষাক্তকণ্ঠের সুতীব্রতা দিয়ে টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল নৈঃশব্দকে।

—তোকে দেখাল এই চিঠি? বাহাদুরি নিতে বুঝি?

—সহজে কি দেখাতে চায়? সে এক কাণ্ড! দুপুরে শোবার জায়গা না পেয়ে চিলেকুঠিতে যাচ্ছি, দেখি সে-ঘরে মুরারিমামা আর টুনু। মুরারিমামা আস্তে আস্তে কি যেন বলে চলেছে আর টুনু লিখে চলেছে উবু হয়ে বসে। আমি এসেছি, ওরা টের পায়নি। পিছন থেকে হেঁকে উঠলাম—টুনু, কি হচ্ছে?

দুজনেই চমকে উঠল। মুরারিমামা থতমত খেয়ে টুনুর হাত থেকে লেখাটা নেবার চেষ্টা করতেই আমি বললাম,—টুনু, দেখব কি লেখা হচ্ছে। না হলে বড়মামাকে বলে দেব।

টুনু ভয় পেয়ে গেল। পড়ে দেখি, দিব্যি রসের কথা। গম্ভীর ভাবে বললাম—টুনু ছেলেমানুষ, ওকে এসব লেখাচ্ছ কেন?

আমতা আমতা করতে লাগল মুরারিমামা—লেখানো নয়, এই···এই···এই একটা চিঠি লেখাচ্ছিলাম।

—চিঠি লেখাচ্ছিলে? তুমি নিজে না লিখে ওকে দিয়ে লেখাচ্ছ কেন?

—আমার হাতের লেখাটা বড় বিশ্রী, টুনুর লেখা ভারী সুন্দর।

—তোমার আবার সুন্দর লেখার দরকার হোল কেন?

এ কথায় মুরারিমামা লাল হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,—একটা চিঠির জবাব এটা। যে লিখেছে, তার লেখা সুন্দর।

—কই, দেখি সে চিঠি?

মুরারিমামা শক্ত হয়ে বলল,—না!

শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলাম,—বেশ, বড়মামাকে বলে দিচ্ছি; টুনুকে পাকিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত মুরারিমামা কি যেন ভাবল। তার পর মেলে ধরল হাতের মুঠো—একখানা রুমাল আর একখানা নীল কাগজের চি[ঠি] পড়তে পড়তে তাজ্জব বনে গেলাম। ওর দাঁত, চোখ, চুল, ঠোঁ[ট] দিকে চাই আর ভাবি—এমন চিঠি লেখা যায় নাকি এমন মানুষের মুখে সে কথা না বলে বললাম—রুমাল কেন?

বললে,—কিছু দিনের মধ্যেই চলে যাবে এখান থেকে, আর [দেখা] দেওয়া যাবে না, তাই স্মৃতিচিহ্ন পাঠিয়ে দিয়েছে। রুমালটা এ[কটু] নাড়াচাড়া করে রুমাল চিঠি ফেরৎ দিয়ে আসছি। হঠাৎ আ[মার] হাত চেপে ধরল—দাদাদের কাউকে বোল না ঝন্টুভাই, আমি [এ] চিঠি তোমাকে দেখাব।

ব্যাপারটা শুনে আমরা একবাক্যে স্বীকার করলাম, কাণ্ডের কাণ্ড বটে। কিন্তু মণিমাসি যে এর মধ্যে আর একটা কাণ্ড করবার জন্য উদগ্র হয়েছিল, বুঝতে পারিনি। ফলরব কা[রো] একটা বলতে যেতেই ধমকে উঠল,—হাত চালিয়ে কাজ সেরে [নে] তা নয়, তখন থেকে আবাতে গল্প গেলা হচ্ছে।

পরদিন মণিমাসি ঘুম ভেঙে উঠেই বললে,—ঝন্টু, তোকে এ[কটা] কাজ করতে হবে। ওদের চিঠি তো আর ডাকে যাওয়া-আসা করে না, মাঝখানে দূত আছে, তার নামটা বার করে আনতে হবে।

অবাক হয়ে মণিমাসির মুখের দিকে চাইলাম। সারারাত ঘুমিয়ে সে এই চিন্তাই করেছে নাকি?

আমার মত ঝন্টুদাদাকেও অবাক-চোখে চাইতে দেখে মণি[মাসি] নিজেই পথ বাংলে দিল,—কিছুই অসুবিধে হবে না, দরকার প[ড়লে] শেষ অস্ত্রপ্রয়োগ করবি—তা লাগবে না, তোর ফাঁদে পড়ে [সে] না বলতে পারবে না।

ঝন্টুদাদা কাজ হাসিল করে এলো। নাম মনোহর। [আমাদের] বাড়ীর খানচার-পাঁচ বাড়ীর পরেই তার বাড়ী, টুনুরই সমবয়সী। মণিমাসি বললে,—তাই যখনি আসি দেখি মনোহরকে, আর মাঝে মাঝেই তাকে ডেকে নিয়ে চিলেকুঠিতে খিল এঁটে, ভালো দূতিয়ালীটা।

সকালবেলাতেই ঝন্টুদাদাকে দিয়ে মণিমাসি কিনিয়ে আ[নলে] একনম্বরের ফুটবল। বিকেলবেলাতেই তাকে আলোচনার জন্য একটি ছোটছেলের সংগে আর তার একটু পরেই ছেলেটি হাসি[মুখে] নেমে গেল সিঁড়ি ভেঙে, তার হাতে সকালবেলার সেই বল।

মণিমাসি ঘরে এলো। তার মধ্যে যেন বান ডেকেছে [মুখে] হাসি, চোখে হাসি, হাসি তার চলনে-বলনে। বললে,—[আজ] সন্ধ্যেবেলায় ম্যাজিক দেখতে পাবি।

নতুন মামিমাকে ঘিরে বসে আছি। মণিমাসি এলো মনোহরকে সংগে নিয়ে। এসেই টুনুকে হুকুম করলে,—মুরারিদাদাকে ডে[কে] আন্ দেখি, বলবি জরুরী দরকার।

মুরারিমামা এলো। এসেই মনোহরকে মণিমাসির পাশে [দেখে] কেমন যেন দোমনা হয়ে গেল।

মনোহরের সংগে আগে কী মন্ত্রণা হয়েছিল জানা নেই, মণি[মাসি] প্রশ্ন করতে লাগল, জবাব দিতে লাগল মনোহর আর তার [সঙ্গে] দমকে দমকে এক একটা করে পর্দা উঠতে লাগল।

—আচ্ছা মনোহর, তুমি মুরারিদাদাকে কার কাছ থেকে চি[ঠি] এনে দাও?

[illegible] দিইনে, লিখে দিই। মুরারিকাকা আস্তে আস্তে বলে [illegible] আমি লিখে যাই।

[illegible] একখানা রুমাল ? যার চারিদিকে সূতো তুলে শাদা [illegible] করা আর এককোণে মুগা দিয়ে "এম" অক্ষর লেখা, [illegible]খানা কার ?

—আমার।

—[illegible] বলছ ? কোনো মেয়ে তোমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে [illegible] বলেনি, লক্ষ্মীভাই, রুমালটা চুপি চুপি মুরারিদাদাকে দিয়ে এসো তো ?

—কক্ষনো না। ও রুমাল দিদি আমাকে সেলাই করে দিয়েছিলেন [শ্বশুরবাড়ী যাবার আগে। বলেছিলেন, মনোহর, তোর নাম লিখে দিলাম ইংরিজী অক্ষরে। অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে মুরারিকাকা ওটা নিয়েছেন। আমি বলেছিলাম—আর একখানা নেব; সেই যে বউদি যেটা করে দিয়েছিলেন টকটকে লাল গোলাপ ফুল। তা মুরারিকাকার জেদ ওই এম অক্ষরওলা রুমালটাই ওঁর চাই।

মুরারিমামার দিকে চেয়ে দেখি সমস্ত মুখটা অসম্ভব ফ্যাকাশে যেন দেহের সমগ্র রক্তস্রোত অন্য কোনো একটা পথ ধরে নিঃশেষে বার হয়ে গিয়েছে, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনোমতে।

মুকুলদা ক্ষেপে উঠল,—কী! আমাকে ধাপ্পা দেওয়া! সমস্ত মিথ্যে! দু'টো ছেলেকে দু'পাশে রেখে তুমিই সমস্ত বানিয়ে চলেছ। এতবড় ধাপ্পাবাজি।

মণিমাসি হেসে উঠল,—ধাপ্পা তোদের দেওয়া যায় যে। পারল কি আমাকে দিতে ? যখনি শুনেছি সন্দেহ তখন থেকে। ওঁকে আদর করে 'এম' লিখে রুমাল বানিয়ে দেবে এমন মেয়ে জন্মেছে নাকি ভূ-ভারতে ? আর কী চিঠি! বাব্বা।

বলে মণিমাসি হেসে হেসে সুরু করলে, তুমি লিখেছ তোমার রূপ নেই। আমি তো সবার চোখ দিয়ে দেখিনি তোমাকে। আমার এই দু'টি চোখে তাকেই দেখতে পেলাম, যে তুমি ভিতরের। আর সেই তোমার ভিতরকার রূপের বন্যায় স্নান করে ধন্য হয়ে গেলে আমার এই দু'টি চোখ! তুমি যে অপরূপ গো!

শেষ করে খিলখিলিয়ে হাসতে লাগল মণিমাসি।

চিঠির বক্তব্য সুরু হতেই মুরারিমামা ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল। এখন শেষ হতে না হ'তেই তার কটা চোখ, লম্বা দাঁত, মোটামাথা চুল, পুরু ঠোঁট সমস্ত কাঁপতে লাগল। সূক্ষ্ম সেই কাঁপনের জালে বেদনার মোড়া হয়ে মুরারিমামা সেই মুহূর্তের জন্য আমার চোখে অন্য একটা চেহারায় দেখা দিল।

হাসিতে ভরা দু'চোখ মেলে অনেকেই চেয়েছিল মুরারিমামার দিকে। মণিমাসির খিলিখিলি ধ্বনির সংগে মিশেছিল অনেকের ধ্বনি। এমন কি, নতুন বউ যে সেও হাসির ছোঁয়াচ এড়াতে পারেনি। মুচকি হেসেছিল মুখ নিচু করে।

মুরারিমামা এক সময় চলে গেল। তখনো মণিমাসির কলরবে ক্ষান্তি ধরেনি।

কী করে ফুটবল ঘুষ দিয়ে মনোহরের কাছ থেকে কথা বার করে নিতে পেরেছে নিজের সেই বুদ্ধির তারিফ করে নিজে করছিল মুরারিমামার শয়তানী বুদ্ধির। দিদিমা যা দু'চার আনা দেন, তাই দিয়ে চকোলেট, লজেন্স কিনে দিয়ে এই কাণ্ড। আর রুমালটার জন্যে মনোহর টুনুকে রাজভোগ খাইয়েও নাকি হয়নি আবার 'যখের ধন' বইটাকে ঘুষ দিতে হয়েছে।

মণিমাসি খুশী ভরে বলে চলেছিল—সন্দেহ কী সাধে হয়রে বাপু! অমন চিঠি! কেমন যেন নামকরা লেখকের লেখা গন্ধ! ঠিক তাই বইখানা হাতে করে দেখি হুবহু কপি। ছোড়দার বুককেশ থেকে বার করে নিয়েছিল।

তামাসাটা আর ভালো লাগছিল না। বলে উঠলাম, মণিমাসি, আর কেন ? বেচারাকে অনেক লজ্জাই তো দিয়েছ। লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে কাঁপতে কাঁপতে সে গিয়েছে। কাঁদতে বাকি শুধু। অথচ, আমাদের কী এমন ক্ষতি করেছে, বলো ? নিজের জীবনের মস্ত একটা সাধকে কল্পনায় রাঙিয়েছে মাত্র।

মণিমাসি ঘুরে দাঁড়িয়ে দুই চোখে আগুন জ্বালিয়ে তুললে, দেখ বীণা, বাজে বকিস্ নি। ওকে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় কাঁদতে দেখলি তুই কোনখানে ? ওর ওই মিথ্যে ভণ্ডামি, ন্যাকামি, জোচ্চুরীকে বলবি জীবনের মস্ত একটা সাধ ? আর ঐ শয়তানী বুদ্ধিটা ? ওরি নাম বুঝি কল্পনায় রাঙানো ?

বেদনার নৈবার্ক নৈঃশব্দে আমি চুপ করেছিলাম আর মণিমাসি সুতীব্রস্বরে বলে চলেছিল।

—ওর আবার লজ্জা, দুঃখ, অপমান বোধ! আমি বলে রাখছি ওর সমস্তটাই ভাণ। থিয়েটারের বই পড়তে পড়তে থিয়েটার সর্বস্ব হয়েছে। তাও যদি ভালোমত করতে পারত তো বাহবা দিতাম। একটা চাকরের পার্ট করবার মুরোদ নেই যার তার আবার হিরো সাজবার সাধ। যাত্রার দলের রাজা বলো। কে যেন ফোড়ন কেটেছিল। আমার অন্তরের অন্তরতম গভীরে ঢেউয়ের পরে ঢেউ তুলে দিয়ে মণিমাসি বলেছিল, তাও নয়। ভাঁড়। ফার্স্ট ক্লাস ভাঁড় একটি।

The people to fear are not those who disagree with you but those who disagree with you and are too cowardly to let you know.

—*Napoleon*

# অলকার স্বপ্ন

ক্লাস বসবার আগেই সেদিন ক্লাস সেভেনের মেয়েদের মধ্যে হাসির রোল উঠল। অলকা নাকি স্বপ্ন দেখেছে ইন্দুলেখার সঙ্গে সেলিমের বিয়ে হয়ে গেল। সেলিম অর্থাৎ ইতিহাসের পাতায় সদ্য পড়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ। ইন্দু অসম্ভব চটে গেল। স্বপ্ন দেখার জন্যে নয়, ক্লাসে কথাটা রটনা করার জন্যে।

অবশ্য ইন্দুর বিষয়ে এ স্বপ্ন খুব বিচিত্র নয়। ও হোল ছোটবেলা থেকেই গিন্নী জাতের মেয়ে। রান্নার ক্লাসে ওর উৎসাহের অন্ত থাকেনা। সবাই তাই ওকে 'গিন্নী' বলেই ডাকতো আর আড়ালে হাসতো।

এই স্কুল কলেজের আনন্দময় দিনগুলি ওদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সবাই ওরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ইন্দুকে নিয়েই কথা—ইন্দুর জীবনে কিন্তু ইতিহাসের একটা স্থান রয়ে গেছে। ওর স্বামী বাংলার বাইরে কোন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক।

দূর প্রবাসে কত সন্ধ্যায় বসে গত জীবনের স্মৃতি ওর সামনে ভেসে যায়—অতীত যেন কথা কয়ে ওঠে। আর ওর মেয়ে উর্ম্মী যখন ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের পাতা খুলে পড়ে, তখন হঠাৎ ও হেসে ফেলে।

সেদিনের সেই গিন্নী ইন্দুলেখার সংসারে আজ তার কত কল্পনা সার্থক হয়েছে। সেদিনের খেলাঘরের গৃহিনী ইন্দুলেখার সংসার আজ আনন্দময়—কারণ তার সদাজাগ্রত কল্যানদৃষ্টি সংসারে সর্বদিকে প্রসারিত। পরিছন্ন ভাঁড়ার ঘরে মশলাধার আর টিনে রঙীন অক্ষরে লেখা বিভিন্ন ডাল আর মশলার নাম। ধোঁয়া ধুলো নেই রান্নাঘরে—বিভিন্ন দেশের সুন্দর গঠনের বাসনপত্রের সংগ্রহ। রান্নাঘরের পরিবেশে মন খুশী হয়ে উঠে—এখানেই তার কাজ আর অবসর।

ইন্দুর সংসার ছোট—স্বামী আর একমাত্র কন্যা উর্ম্মী। উর্ম্মীর জীবন গান বাজনা, লেখাপড়ায় পূর্ণ। তার কোন কৌতুহল নেই রান্নাবান্না সম্বন্ধে। মা কিন্তু এ নিয়ে ক্ষুন্ন হ'ন। তাকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কন্যার এ বিষয়ে কোন আগ্রহই দেখা যায়নি।

তারপর আরো দিন কেটেছে। উর্ম্মী কলেজের পড়া সদ্য শেষ করেছে—পড়াশুনায় তার অনুরাগ, গান বাজনায় তার আগ্রহ অপরিসীম। আর মা দুঃখ পান যে সাংসারিক বিষয়ে সে রয়ে গেছে তেমনি উদাসীন।

এমন মেয়েকেও সংসারের ডাকে সাড়া দিতে হয়—সানাইতে পূরবীর সুর বাজে, বর আসে বাংলার এক সমৃদ্ধ পরিবারের সুসন্তান।

যে সংসার তাকে বরণ করল সেখানে সে দেখল দেশী ও বিদেশী জীবনধারার ইঙ্গিত। আহারের বিষয়ে ও দেশীবিদেশী নানারকম রান্নায় তাদের পরিতৃপ্তি। এক আনন্দমুখর সুন্দর সংসার।

উর্ম্মী বুদ্ধিমতী মেয়ে। উপলব্ধি করল পরিজনদের সুখী করতে হলে যেমন গানবাজনা পড়শুনোর জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান আছে তেমনি সংসারকে উপেক্ষা করা চলেনা, জীবনের সে দিকটা তার অপরিচিতই রয়ে গেছে।

বুদ্ধিমতী মেয়ের মনে পড়ল তার সুগৃহিনী মায়ের কথা। কৌশলে সে একমাসের জন্যে ফিরে এলো তার মায়ের কাছে। ঘোরাঘুরি করতে লাগল ভাঁড়ার ঘর আর রান্নাঘরের আঙিনায়। মা বুঝলেন এ অহেতুক নয়।

মা'র কাছে সে প্রকাশ করলনা সত্য কথাটি। তারপর সে দেখলো নতুন দৃষ্টি দিয়ে মা'র সাজানো সংসারটি। ভাঁড়ার ঘরে দেখলো, সুদৃশ্য ঢাকনা দেওয়া খেজুর গাছ মার্কা 'ডালডার' টিনে সাজানো রান্নার বিভিন্ন উপকরণ।

মার কাছে সে জানলো যে 'ডালডার' উপাদানে যোগ করা হয় ভিটামিন 'এ' আর 'ডি' আর সবচেয়ে ওর মজা লাগলো যে মিষ্টি, লুচী থেকে সুরু করে ভাজা, তরকারী, মাছের ঝাল, ঝোল, মাংসের বিভিন্ন প্রণালী সবই 'ডালডায়' রান্না করা যায়—শুধু তাই নয়, খেতেও মুখরোচক হয়। এ হিসাবে দামেও সস্তা আর পুষ্টির দিক দিয়েও এর যথেষ্ট মূল্য আছে। 'ডালডা' সহজে, সর্বদেশে পাওয়া যায় শুধু ওই খেজুর গাছ মার্কা হলদে টিন দেখে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

উর্ম্মী মা'র কাছে 'ডালডার' মাধ্যমে কত রান্না করল—ওর কাছে তা নিত্য নতুন আবিষ্কারের মত। তার রস বৈচিত্র্যে সে নিজেই মুগ্ধ হোল।

শ্বশুরালয়ে যখন সে ফিরে গেল তার বিদ্যাবুদ্ধি আর বিশেষভাবে রান্নার সুখ্যাতি সবাই করতে লাগলেন।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

DL. 403B-X52 BG

# বুদ্‌বুদ

সোমেন্দ্রনাথ রায়

কেবিনে ঢুকলে প্রথমেই চোখে পড়ে রঙিন চাদরের কৌটোটা। সুদৃশ্য, তবে বেমানান।

কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্ত মাত্র। তারপর অভ্যস্ত হয়ে যায় চোখ। লোহার খাটে পুরু গদি। তার গায়ে টাঙানো উত্তাপ আর নাড়ির গতির চার্ট। মাথার দিকে মার্বল-টপ মিট-সেফ। নিচু নিচু কয়েকটা টুল এ-পাশে ও-পাশে। হাসপাতালের চেনা পরিবেশ।

তবু যেন একটু অন্য রকম। ল্যাভেণ্ডারের সুবাসে ঢাকা পড়ে গেছে ডেটল-ফর্মালিনের কটু গন্ধ। মিট-সেফের ওপরে পোড়া মাটির নটরাজ। তার পাশে চোঙা মতো জয়পুরী ফুলদানিতে একগুচ্ছ ম্লান রজনীগন্ধা। খানকয়েক চটি বই। আর ওই রঙিন কৌটোটা।

ডাক্তার মিত্রের কেস। এ্যাপেণ্ডিসাইটিসের রুগী। অপারেশন হয়ে গেছে, এখন সেরে ওঠার অপেক্ষা। গলা পর্য্যন্ত ধবধবে সাদা চাদরে ঢাকা। একটু ক্লিষ্ট, ঈষৎ ম্লান মুখ। শুয়ে আছে নিশ্চুপে বিজন সেন। লক্ষপতি কিরণ সেনের একমাত্র ছেলে। বিলেত-ফেরৎ, এঞ্জিনীয়ার। বেহালার ফ্যান কোম্পানীর পার্টনার ও পরিচালক।

শুধু সেই জন্যে নয়। ভয়ানক খেয়ালী ছেলে বিজন। এখন ঘুমোচ্ছে, তাই। জেগে থাকলে অসুস্থ শরীরেই যে কাণ্ড করে, তাতে ওর সুস্থ অবস্থার কথা ভাবতে গেলে মাথা ঠিক থাকে না। জেগে থাকলে মাতিয়ে রাখে। ঘুমোলেও কি নিস্তার? দীর্ঘ পল্লকের নিচে তুলি দিয়ে টানা চোখ। খাড়া নাক আর সুদৃঢ় চোয়াল। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখের পলক আর পড়ে না ওদের। দিনের বেলা রেখার, রাত্রে রেবার।

হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত নয়, প্রাইভেট নার্স ওরা। বারো ঘণ্টা ডিউটি, ষোল টাকা পারিশ্রমিক। এক ডাকে ওদের পাওয়া যায়, চেহারাও রেস্‌পেক্‌টেবল্। দুই বোন। দু' বছরের বড় রেখা। তবু তাকেই যেন ছোট দেখায়।

এখন সম্বল পেন্সন আর বাতের ব্যথা। মেয়েদের বিয়ে দেবার গ[...] করেনি। আড়রফল টক বলেই জানে। জীবন সম্পর্কে [...] অভিজ্ঞতা স্নেহলতার। অনেক রুগী আর ডাক্তারঘাঁটা [...] চাকরিতেও ঢোকায়নি মেয়েদের। স্বাধীন ভাবে উপার্জন কর[...] পরিপূর্ণ উপভোগ না-ই বা হল, চেখে দেখতে আপত্তি কি? [...] সারা জীবনের বঞ্চনার শিক্ষা ব্যর্থ না হয় যেন।

তবু এক এক সময়ে কেমন করে ওঠে বুকটা। সঞ্চয়ের [...] আছে, নিতান্ত সামান্য সে অঙ্ক। রূপ আছে মেয়েদের। [...] বয়েস যে পেরিয়ে যাচ্ছে। আসবে রোজগারে ভাঁটার পালা। [...] আগে ঘর দেখে দিতে না পারলে ধিক্কৃত কুমারী-জীবনের অ[...] জুটবে মায়ের ভাগ্যে।

তাই উদ্বিগ্ন মনে বাতের ব্যথা নিয়েই উঠে বসে স্নেহল[তা] জিজ্ঞাসা করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, আজ কি বলল রে বিজন?

মায়ের কথায় রাঙা হয়ে যায় রেখা। কী লুব্ধ আগ্রহে মা [...] শাঁসালো রুগীর দিকে বাড়িয়ে রেখেছে প্রত্যাশা! এর আগে [...] ডাক্তার আর রুগীর মনে তাদের নিয়ে দোলা জাগেনি, এমন [...] কিন্তু বিজনের ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। যেন কিছুটা সত্য বস্তু আছে [...] খেয়ালী ছেলেটির মুগ্ধ দৃষ্টিতে। ওর পরিহাস-রসিকতার ম[...] অনুচ্চারিত আত্মসমর্পণের সুরটি প্রচ্ছন্ন. তাকে মিথ্যা বলে অস্বী[কার] করতে প্রাণ চায় না। তবু বিচ্ছিরি লাগে মায়ের প্রশ্ন। [...] হয়, এমনই প্রশ্নই করে বুঝি মায়েরা, সদ্যবিবাহিত মেয়েকে।

অসহিষ্ণু স্নেহলতা প্রশ্ন করল, কি রে, কিছু তো বললি নে!

কি আবার বলব?

কি বলল আজকে বিজন?

বলবে আবার কি? আমরা কি তার কথা বলার মা[...] ভিজিটিং আওয়ারে কত লোক আসে, সে যদি দেখতে! বিছা[নায়] শুয়ে শুয়ে কেউ যে এত টাকা খরচ করতে পারে, কখনো দে[খিনি।] [...] হোটেল থেকে।

বাক্সটা যে কী সুন্দর! বার্মা থেকে আনানো গালার তৈরী। ...য়ে রেখেছে সেলাইয়ের জিনিষপত্র রাখবে বলে। আট টাকা ... চা রোজ তিরিশ-চল্লিশ কাপ তৈরী হয় বিকেলে। মুঠো ...কা বকশিস দেয় বয়-বাবুর্চিদের।

...পড় পালটাতে চলে যায় রেখা ঘর ছেড়ে। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে ...তার।

...য়েদের কল্যাণে জিভের স্বাদ পালটায় স্নেহলতা। ডিউটি ... সময় নামকরা হোটেলের ডিনার প্যাকেট সঙ্গে দিয়ে দেয় ...। আপত্তি করলে অভিমান করে। স্যাণ্ডউইচ, প্যাটি, মাংস ... মাছের চপ। খেতে খেতে প্রশ্ন করে, তোদের সঙ্গে কেমন ... করে বিজন?

...র জল ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে রেখা বলে, কেমন আবার? ...লোকের ছেলে; যা বলে, যা করে, সবই মানিয়ে যায়। আজ টেম্পারেচার দেখব বলে থার্মোমিটার লাগাতে গেছি মুখে। বলল, আপনি বরং নিজের মুখে দিন। আমার কেমন কামড়াতে ইচ্ছে ...রে ওটা মুখে দিলে।

তুই কি বললি?

বলব আবার কি? ওর পাগলামীর উত্তর দিতে হলে যে কোন ...স্থ মানুষ দু' দিনে পাগল হয়ে যাবে। ওর বিলেতের গল্প যদি ...নতে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত।

সে গল্প শুনতে তেমন আগ্রহ নেই স্নেহলতার। মেয়েদের কাছে ...বর নিয়ে জেনেছে সে, বড়লোকের একমাত্র খেয়ালী ছেলে বিজন ...খনও অবিবাহিত। অজস্র অর্থ থাকা সত্ত্বেও হাসপাতাল ছেড়ে ...র্সিংহোমে যেতে চায়নি, শুধু তার মেয়ে দুটির সঙ্গসুখের লোভে। ...জে মুখে স্বীকার করেছে এ কথা বিজন। ঝগড়া করেছে বাবার ...ঙ্গে। বিরক্ত হয়েছে বোনের ওপরে; সেই নাক-উঁচু মেয়েটি রেখা ...কে 'নার্স' সম্বোধন করেছে বলে। সুতরাং এমন সুপাত্র তার ...য়ত্তের বাইরে নয়, এই সম্ভাবনা মনে উদয় হওয়া মাত্র আর কিছুতে ...ন চেপে রাখতে পারে না লুব্ধ কৌতূহল। নেহাং বাতের ব্যাথায় ...ব্যাপারী!

কিন্তু বিজনের বিলেতের গল্প না শুনিয়েই বা থাকতে পারে কই ...? ছোট বোন রেবা ভিন্ন প্রকৃতির। বিজনের মনোভাব অগোচরে ...ই তার। তবু এমন ভাব দেখাবে, যেন লক্ষপতি কিরণ সেনের ছেলের ...ছ থেকে এমন ব্যবহার পাওয়াই স্বাভাবিক। দিদির মুখে বিজনের ...লেতের গল্প শুনে বিশেষ কিছু মন্তব্য করেনি রেবা। তবে ঠোঁট ...কিয়ে যেটুকু হেসেছে তাতেই প্রকাশ পেয়েছে যথেষ্ট তাচ্ছিল্য। ...র কাছে যা উপভোগ্য, তাকে কেউ তাচ্ছিল্য করলে যে বেদনা ...গে তার প্রাণে, তারই আবেগে মায়ের কাছে সে গল্প নতুন করে ...নাইল রেখা।

...বলো মা, সলজ্জ হাসিতে ভরে গেল তার মুখ। বিলেতে ... একে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল কিছুদিন। ওর যে ...র্স ছিল, সে দেখতে ছিল, ভারি সুন্দর। একদিন তার বদলে ... বুড়ি নার্স। দু-তিন দিন বুড়িকে সহ্য করার পর ... সেই পুরোনো নার্সকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তখন ... বুকে ব্যথার ভাণ করল। ডাক্তার, নার্স, কেউই ...না কিসের ব্যথা। অনেক ওষুধ আর ইনজেকসনের পর বুড়ি নার্স একদিন মিনতি করে বলল, তোমার ঠিক কোথায় ব্যথা লাগছে, একটু বলবে বাছা?

উত্তরে জানাল, ব্যথাটা ওর মনে।

আকাশ থেকে পড়ল বুড়ি। বল কি! ব্যথাটা তোমার বুকে নয়? মনে? তবে এত ওষুধ ইনজেকসন নিলে কেন?

ভালমানুষের মত মুখ করে বলল, তোমরা দিলে কেন?

বুড়ি হায় হায় করে উঠল। বলল, তুচ্ছ মনের ব্যথার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করলে?

ও জবাব দিল, এ আর এমন কি কষ্ট! তোমরা সেই আগের নার্সকে সরিয়ে দিয়ে যে কষ্ট দিয়েছ, তার কাছে ওষুধ ইনজেকসনের কষ্ট কিছুই না।

হতভম্ব হয়ে গেল বুড়ি। তারপর বোধ হয় মায়া হল। ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দিল সেই নার্সকে।

এ গল্প শুনে হাসল না স্নেহলতা। বলল, তোদের কাকে বেশী পছন্দ করে রে?

বিরক্তিকর প্রশ্ন। জবাব দিল রেখা, তা কি করে বলব? সেই জানে!

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল স্নেহলতার বুক চিরে।

* * * *

এখন সবে ভোর। শহরের প্রথম কাক ডেকে উঠল জানলার বাইরে মহানিমগাছটার ডালে। প্রথম ট্রাম প্রচণ্ড বেগে, প্রচণ্ডতর আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেল লাইন ধরে। হাইড্রান্টের নলে হোসপাইপ লাগিয়ে ফট ফট শব্দে রাস্তা ধোওয়া শুরু করল কর্পোরেশনের মজদুর। ভোরের প্রশান্তি আটকে আছে হাসপাতালের রেলিঙঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে। তার বাইরে অপরিচ্ছন্ন শহর। শোভন পোষাকে যারা ভদ্রলোক সাজে দিনের বেলা, এখন তাদের কদর্য ঘুমন্ত রূপ। রান্নাঘর থেকে উঠছে গল-গল করে ধোঁয়া। বাথরুমে বাসি কাপড় কাচার থপ থপ শব্দ। মেক-আপ মুছেফেলা শ্রান্ত অভিনেত্রীর মতো কী করুণ হতশ্রী চেহারা এই শহরের।

কিন্তু এখানে এই কেবিনে ঘুমন্ত বিজনের মুখখানি যেন ভোরের টাটকা ফুল। হাত দিয়ে ছোঁওয়ার লোভ সামলাতে পারল না রেবা।

দীর্ঘ পল্লবের ঢাকা খুলে অবারিত হল ঈষৎ রাঙা চোখ দু'টি। লজ্জিত হল রেবা। বলল, ঘুম ভেঙে গেল? আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। আর একটু ঘুমিয়ে নিন।

ওর কপালে ছোঁওয়ানো হাতখানা ধরল বিজন নিজের হাতে। বলল, গুন-গুন করে একটা গান শোনাতে পারেন? ভোরের ভৈরবী?

মৃদু হাসি খেলে গেল রেবার ঠোঁটে। বলল, আমি গান গাইতে পারি বলে মনে হয়?

কেন মনে হবে না? হাই চাপল বিজন। আপনার কাছ থেকে গান শোনার কথা যদি মনে হতে পারে আমার, তবে আপনার গান গাইতে পারা এমন কি অচিন্তনীয়?

আপনার ভাবনার তো কোন লাগাম নেই?

নেই-ই তো। জানেন, এক্ষুণি মনে হচ্ছিল, সারাজীবন রুগী হয়ে থাকতে রাজি আছি আমি, যদি আপনি সেবা করেন আমার।

একথা তো বিজনের অন্যতম রসিকতা মাত্র। তবু মিথ্যা

প্রলোভনে দুলে ওঠে মন। ভাবতে ভাল লাগে, নার্সের আবরণের নিচে যে নারী বাস করে, তার অন্তরের গহিনে, এই খেয়ালী ছেলেটি ভুলেছে তারই মায়ায়। তারপরই কঠিন হয়ে ওঠে মুখের রেখা। দিদির মতো নরম মন নয় তার, এইটুকুতে গলে যায় না। তাই হেসে বলল, দৈনিক যোল দু'গুণে বত্রিশ টাকা হিসেবে সে যে অনেক পড়ে যাবে। ক'দিন টানতে পারবেন ?

চোখে দুষ্টুমীভরা হাসি। বিজন বলল, সারাজীবন টানতে হলে রেট কমাবেন না কি ? যদি বলি, উপযুক্ত পোষাক আশাক, একখানা মোটার, হাতখরচের জন্যে প্রয়োজন মত টাকা আর থাকার জন্যে আমার শোবার ঘর—এই—এই—লজ্জা পাচ্ছেন তো ?

সামলে নিল রেখা। বলল, লজ্জা পাব কেন ? এর থেকে অনেক খারাপ কথা শুনতে হয়।

তাহলে খুব খারাপ কথা বলিনে, কি বলেন ? যাই হোক, টার্মস পছন্দ হয় ?

চোখে ঝিলিক এনে রেখা বলল, অফারটা শুধু আমাকে দিয়ে ঠকবেন কেন ? দিদিকেও দিয়ে দেখতে পারেন। সে যদি আরও সস্তায় বিকিয়ে দিতে চায় নিজেকে—

একটু গম্ভীর হয়ে বিজন বলল, এড়িয়ে যেতে চাইছেন যখন, তখন প্রস্তাবটা নিশ্চয়ই খুব লোভনীয় মনে হচ্ছে না আপনার কাছে। ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, এমন কিছু কি নেই আমার, যা আপনার ভাল লাগে ?

আছে বই কি ! হাসল রেখা। আপনার ওই চায়ের কৌটোটা খুব ভাল লাগে আমার।

হায় রে তুচ্ছ কৌটো ! আমার থেকেও ওর মূল্য হল বেশী ?

হলেই বা। সে তো শুধু আমার কাছে। দিদির কাছে তো নয় ? সে আপনার অর্থ ভক্ত।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিজন বলল, হয়ত অন্ধের ভক্তি ! আপনার ওই ফুলো-ফুলো রাতজাগা চোখ দু'টোর বড় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ও দুটোতে একটু মোহের ঘোর লাগলে খুসী হতাম।

আমি কিন্তু খুসী হতাম আপনি আর একটু ঘুমিয়ে নিলে।

গম্ভীর গলায় বিজন বলল, আর ঘুম পাড়িয়ে লাভ কি ? মনটা তো চুরি করে নিয়েছেন আমার অজান্তে। তার চেয়ে মূল্যবান আর তো কিছু নেই আমার !

নিস্তব্ধ দুপুরে ঝিমুনি লেগেছে শহরের চোখে। মহানিম গাছটার ডালে বিলম্বিত লয়ে ডেকে চলেছে একটা কাক। দূরে কোন ওয়ার্ডে ককিয়ে উঠল যন্ত্রণাকাতর রুগী। মোটা পর্দা টেনে দিয়েছে রেখা জানালায়, দরজায়। আবছায়া অন্ধকার কেবিনের ভিতরে।

বিছানার কাছেই বসে ছিল রেখা নিচু টুলে। ঘুমে ঢলে পড়ছিল মাথা। তার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বিজন বলল, আপত্তি না থাকলে এখানে মাথা দিয়ে শুয়ে নিন একটু।

হ্যাঁ, হাসল রেখা। কেউ এসে দেখলে বলবে কি ?

কে কি বলবে, সেই ভয়ে এই মুহূর্তের মধুর ইচ্ছেটার গলা টিপে মারতে হবে ?

—— ফির পাত

ভাগ হয়ে চলে যাবেন। আমাকে তো একাজ নিয়েই থাকতে হ। একবার দুর্নাম হলে কাজ পাওয়া যে কত শক্ত !

তাহলে এই কাজটা যাতে পার্মানেণ্ট হয় সে ব্যবস্থা করুন।

হেসে রেখা বলল, হাসপাতালে কি চাকরি করি আ পার্মানেণ্ট হব কেমন করে ?

আমার সঙ্গে সম্পর্কটা তো পার্মানেণ্ট হতে পারে।

তাকিয়ে দেখল রেখা বিজনের মুখের দিকে। জ্বল ওঠে দু'-চোখ অতি অনায়াসে। বলল, ঠাট্টা করছেন ?

ঠাট্টা করছি বলে মনে হয় ?

তা ছাড়া আর কি মনে হবে বলুন ?

কেন, মনে হতে পারে না, আপনাকে খুব ভাল লাগে আ নার্সের এই পোষাকের বদলে যদি দেখি জামদানী সাড়ির ঘো তুলে দিয়েছেন মাথায়, বসে আছেন আমার শোবার ঘরে প পা ঝুলিয়ে কপালে একটা মস্ত সিঁদুরটিপ এঁকে, চাবির গো আঁচলে বাঁধা—

অঝোরে কান্না নেমে এল রেখার চোখে। বিছানা নামিয়ে ফুলে ফুলে উঠল সে কান্নায়। মুখ তুলে বলল, কেন দেখান আমাদের ? আমি সামান্য, কোন গুণ নেই আ কিন্তু বিশ্বাস করুন, যদি প্রাণ দিয়েও আপনাকে সুখী পারতাম একটি মুহূর্তের জন্য, হাসিমুখে মরতে পারতাম আমি

আর প্রাণের বদলে যদি হৃদয় দিতে হত ?

প্রাণ বলুন, হৃদয় বলুন, যা আছে আমার সব দিয়ে সুখী করতে পারতাম আপনাকে—

তাহলে প্রাণের বদলে হৃদয়টাই দিন আমাকে। বু আমার হৃদয় তোমাকে দিলাম।

এতক্ষণে পরিহাস উপলব্ধি হল রেখার। রাঙামুখ নি বলল, আমার মতো মেয়ের হৃদয় নিয়ে কি হবে আ যদি খেলা করতে চান, বাধা দেব না। তাই যে আমা অনেক।

তাহলে ধরে নিতে পারি আপত্তি নেই আপনার ! কিন্তু ঠাট্টা করছি বলে সন্দেহ করবেন না। বিকেলে পাঠিয়ে দেব ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিসে। দেখবেন, সে মুহূর্তে সই করবার সময়ে হাত গুটিয়ে নেবেন না যেন।

নিজেকে সামলে রাখা কি কষ্টকর ! দু'জনের মাঝখানে ব্যবধান। তবু এখন, এই মুহূর্তে বুঝি ঘুচে গেছে সব। চিরন্তনী নারী পেয়েছে তার প্রেমিক পুরুষের স্পর্শ। হ অলীক, হোক তা এক দণ্ডের খেয়ালের খেলা। এই নিস্তব্ধ ছায়ান্ধকার কেবিনে এটুকুই একমাত্র সত্য। নিবিড় হয়ে স্বপ্ন দু'চোখে। তারপর যদি ভেঙে যায় ঘুম, ক্ষতি নেই। অনেক অসহ্য পরিস্থিতি সুসহ হয়ে উঠবে সে স্বপ্নের স্মরণে। পড়ল রেখার মাথা বিজনের বুকে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরে থর-থর কাঁপতে থাকল তার শরীর আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা

• • •

আকাশে বুঝি আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে কোন খেয়ালী পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে বিকেলের মেঘ। মহানিম ডালে এক পাল চড়াই উত্তেজিত হয়ে সেই সংবাদ আ

[illegible]ম্পারের কাছে। কেবিনে এখনও মানুষের মেলা। যারা [illegible] গেছে, তাদের চায়ের কাপে তলানির রঙ গাঢ় হয়ে এল।

[illegible] আওয়ার শেষ হবার আগেই ফিরে এল যতীন বিশ্বাস, [illegible] পার্সনাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। কাছে এসে বলল, নোটিশটা দিয়ে [illegible]।

[illegible] কানে গেল রেখার। চোখোচোখি হল বিজনের সঙ্গে। [illegible] তার মুখ আকাশের মেঘের মতো।

[illegible] দৃষ্টি তার দিক থেকে ফিরিয়ে তাকাল বিজন গৌরীর দিকে। [illegible] বোনের মিল মুখের আদলে। মনের আদলে তেমনি [illegible]। বাবার খুঁতখুঁতে স্বভাব পেয়েছে মেয়ে। সর্ববিষয়ে [illegible] অবহেলা।

[illegible] সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে গৌরী! একটু সময় লাগবে।

[illegible] উঠল গৌরীর ভ্রূ। দাদার কাছে একবার না আসা [illegible] কোথায়। কিন্তু তার ফলে দিলীপকে বঞ্চিত করতে হয়। [illegible] আর ক'দিন পরে চলে যাচ্ছে য়ু-কে। এফ-আর-সি-এস [illegible] আসছে বছর। বিলেত যাবার আগে তাকে বিয়ের বাঁধনে [illegible] ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন বাবা। শিশুকাল থেকে ছেলে-[illegible] দুটি মাতৃহীন। তাই মায়ের কর্তব্যও সারতে হয় কিরণ [illegible]কে। বাবার নির্দেশ পালন করা দুঃসাধ্য ছিল না কিছু। [illegible]দীপ তো বসে আছে হাত ধুয়ে। তার মা-বাবাও আগবাড়িয়ে [illegible]ছেন লক্ষপতি কিরণ সেনের মেয়েকে ঘরে আনতে। ইতস্ততঃ [illegible] শুধু গৌরী। ইতিমধ্যে এফ-আর-সি-এস এর থেকে উঁচু [illegible] কারও মনে রঙ ধরানো যাবে না কি? অবশ্য তাই বলে [illegible] তেমন সুযোগ না আসে, দিলীপকে দুঃখ দিয়ে লাভ কি? [illegible] প্রতিপ্রশ্ন করল সে, খুব জরুরী কিছু?

নিশ্চয়ই। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সম্পর্কে কথা বলতে চাই।

নিরুৎসুক গলায় গৌরী বলল, কি বলছ, বল।

তুমি যেন খুব ইনটারেষ্টেড নও মনে হচ্ছে। অবশ্য তাতে [illegible] যায়-আসে না। কারণ, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তবু [illegible] যখন আমার বোন, তখন সংবাদটা তোমাকে না জানানো [illegible]। আমি শ্রীমতী রেখা মজুমদারের সঙ্গে হৃদয়-বিনিময় [illegible] দুপুরে। আজ থেকে পনের দিন পরে শ্রীমতী [illegible] শ্রীমতী বিজন সেন। যতীন [illegible] কপিটা গৌরীর হাতে দেবেন।

[illegible] নোটিশটা তার হাতে দেবার [illegible] হাত ঝেড়ে সরে দাঁড়াল গৌরী।

[illegible] বিয়ে করবে তুমি?

[illegible] উনি নার্সই বটেন।

[illegible] কাছ থেকে ছিটকে চলে এল [illegible] কাছে। মিষ্টার সেন এখানে [illegible]নের পর একটু একটু করে [illegible] কথা জানো?

[illegible] বেশী সে কথা জানে কে?

[illegible] সে মাথা নিচু করে।

[illegible] দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুমি [illegible] জন্যে ভয়ানক পস্তাতে হবে তোমাকে, এ বলে রাখলাম। আমি এখুনি রিপোর্ট করছি ডাক্তার মিত্রের কাছে। এত [illegible] স্পর্দ্ধা। এই [illegible] ইনসোলেণ্ট, ইমপার্টিনেণ্ট—

গৌরী! আমি তোমার কাছে সমালোচনা চাইনি। বেশ ধীর স্বরে উচ্চারণ করল বিজন। শুভ সংবাদ তুমি আনন্দের সঙ্গে নেবে এই আশা ছিল আমার।

আমি তো পাগল হইনি!

সত্যিই যদি না হয়ে থাক, তবে দয়া করে তোমার কর্তব্যটুকু করবে নিশ্চয়ই। বাবাকে জানিয়ে দেবে আমাদের এনগেজমেণ্টের কথা। যতীন বাবু তাঁকে সাহায্য করবেন। আমি চাই সাধারণ অথচ সুন্দর উৎসব। সে কথা মনে রেখে তুমিও মতামত দিতে পার সেলিব্রেশন সম্পর্কে।

বয়ে গেছে আমার! আত্মহত্যা করার জন্য দড়ি ভাল কি পটাশিয়াম সায়ানাইড ভাল, সে বিষয়ে মাথা ঘামানোর উৎসাহ নেই আমার।

* * * *

রাত নেমেছে সহরের দু' চোখে। উৎসব শেষে ক্লান্ত নরনারী যেমন উজ্জ্বল আসরে ঢলে পড়ে এখানে-সেখানে, তেমনি করে গা এলিয়ে দিয়েছে আলোমাখা রাস্তাগুলো। দুরন্ত সমুদ্রের বাতাস দক্ষিণের অরণ্য-গন্ধ নিয়ে লুটোপুটি খায় দেওয়ালে দেওয়ালে। ছোট ছোট খুপরিতে চোখ জ্বলছে কারো; উত্তেজনায় বুকের রক্ত অস্থির!

অস্থির রেবার মনও। দিদির ডিউটি শেষ হয়েছে আটটায়। ওষুধ, টেম্পারেচার, পথ্য, রোগীর প্রতি [illegible] কর্তব্য [illegible] ঘাঁটাতেই শেষ হয়েছে। ডিটেকটিভ নভেল নিয়ে বসেছিল এতক্ষণ। চোখ ফেরাল বিজনের দিকে।

দেখতে দেখতে লোভ হয়। চুরি করে ঠোঁট ছোঁওয়াতে ইচ্ছে হয় ওই মুখে। হয়ত খুসী হবে বিজন। যদি না হয়? সন্ধ্যেবেলার কথা শুনেছে সে দিদির মুখে। চোখে দেখেছে নোটিশটা। বিশ্বাস হয়নি তবুও। হবে কি করে? লক্ষপতি কিরণ সেনের ছেলে বিয়ে করবে একটা পরিচয়হীন প্রাইভেট নার্সকে? তাও মাত্র ক'দিনের আলাপে? যদিই বা করে, সে বিয়ে ভেঙে দিতে সময় লাগবে কি ওর একটুও?

তবু দুলে ওঠে বুক। তার এত দিনের অভিজ্ঞতায় এমন পুরুষের সাক্ষাৎ মেলেনি। রূপকথার রাজপুত্র যেন! এক আশ্চর্য মুহূর্তে কৌটো খুলতেই বেরিয়ে পড়ল পক্ষিরাজ ঘোড়ার সওয়ার। তুলে নিল বুকে ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়েকে। উধাও নিরুদ্দেশে শুরু হল যাত্রা। শিরায় শিরায় রোমাঞ্চের বান ডাকে। নিজেকে কল্পনা করে স্বয়ম্বরা কন্যারূপে। উড়ছে চুল হাওয়ায়। ঘোড়ার খুরে ধুলোর মেঘ। প্রাণপণে ধরে আছে প্রিয়তমকে। বিদ্যুৎ ঝলসানো তলোয়ার হাতে নিয়ে ছুটে চলেছে সে শত্রুর মাঝ দিয়ে। আকাশে-বাতাসে এক বিচিত্র মূর্চ্ছনা। স্তিমিত হয়ে আসে চেতনা। বিলুপ্ত হতে চায় অস্তিত্ব দুঃসাহসীর নিবিড় আলিঙ্গনে।

পরক্ষণেই ভেঙে যায় স্বপ্ন। রাজপুত্রের অঙ্কশায়িনী সে নয়। তার দিদি। সে নয় কেন? যোগ্যতা কি তার কম ছিল? আসেনি কি অতিপ্রার্থিত সুযোগ? হেলায় কি ফিরিয়ে দেয়নি তার ঘুম-ভাঙানিয়া প্রেমিককে অবিশ্বাস করে, অবহেলা দিয়ে?

চোখ ছাপিয়ে উঠতে চায় জলে। প্রাণপণে দমন করে অবাধ্য অশ্রু। রক্তের স্বাদ পাওয়া যায় দাঁত দিয়ে চেপে-ধরা নিচের ঠোঁটে। দিদি কি পারবে তাল মিলিয়ে চলতে ওই পাগল নটরাজের সঙ্গে? বড় নরম মন যে ওর! বড় ঠাণ্ডা। দামাল শিশুর সঙ্গে দস্যিপনা করার সাহস কই দিদির?

রেবা! ডাকল বিজন চোখ খুলে।

হাসল রেবা ডাক শুনে। কাছে এগিয়ে গেল। ডাকছেন মিষ্টার সেন?

মিষ্টার সেন নয়, জামাইবাবু। তোমার মুখে এই ডাকটুকু শোনার লোভেই বিয়ে করতে যাচ্ছি তোমার দিদিকে, একথা বিশ্বাস হয় তোমার?

চোখে তির্যক হাসি টেনে রেবা বলল, খুব হয়।

বল কি? তুমি যে অবাক করলে! এ যাবৎ এতখানি বিশ্বাস তো কেউ করেনি আমাকে?

আমি করেছি। সেইটেই আমার লাভ।

কিন্তু আমি যে তোমায় কিছুই দিতে পারলাম না রেবা?

সে কি? ভুলে গেলেন এরই মধ্যে? দিলেন যে আমাকে চায়ের কৌটোটা?

উঃ, ওই চায়ের কৌটো! যত বার মনে হয় আমার থেকে ওটার মূল্য বেশী তোমার কাছে, তত বার ইচ্ছে হয়, টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলি ওই রূপসর্বস্ব কৌটোটাকে। আমার কাছে আর কোন প্রত্যাশা নেই তোমার?

ন্যায্য পাওনা যে কিছু নেই আমার!

নাই বা থাকল। উত্তাল হয়ে উঠেছে বিজনের কণ্ঠস্বর ডাইনি রাতের মায়ায়। অন্যায্য পাওনার কোন প্রত্যাশা কি জাগেনি মনের কোণে কখনো?

জাগেনি আবার! বাঁশীর ডাকে সাপের মতো দুলতে দুলতে জবাব দিল রেবা। সে প্রত্যাশার শেষ নেই, সীমা নেই।

তবে কেন দূরে আছ? কেন এমন কুরে কুরে খাওয়া যন্ত্রণায় পাগল করে তুলছ আমাকে?

রেবার তপ্ত নিশ্বাস পড়ল বিজনের গালে। ভারাতুর গলায় [illegible] আমি এসেছি, এসেছি আমি।

আচ্ছন্ন তন্দ্রার ঘোর লেগেছিল রেবার দু'চোখে। আশ্চর্য সুখ-স্বপ্ন দেখেছে সে ক'টি নিরবলম্ব মুহূর্তে। প্রথম বর্ষা-ধারা যেমন শুষে নেয় শুকনো মাটি, তেমনি নিঃশেষে আত্মসাৎ করেছে [illegible] আদরের প্রস্রবণ। তার পর এক সময়ে নেমে এসেছে চোখের পাতা। ঢলে পড়েছে খাটের উপরেই, বিজনের পাশটিতে।

ঘুম ভাঙতেই ছাঁৎ করে উঠল মন। ভেজা ভেজা ঠেকে ব্যাণ্ডেজ। রক্তের ঝাঁঝালো গন্ধ এল নাকে। ছিটকে উঠে পড়ে বিছানা থেকে। জ্বেলে দিল আলো। জানলার বাইরে প্রদোষান্ধকার। ভিতরের আলো বড় চোখে লাগে? তার চেয়েও চোখে লাগে নিজের শাড়িতে রক্তের গাঢ় দাগ। ভিজে গেছে বিছানা। যেন খেলেছে উন্মত্ত শিশু অশান্ত প্রাণের আবেগে। ঠাণ্ডা, নিথর বিজনের শান্ত মুখ। কপালে স্বেদ বিন্দু।

চিৎকার করে উঠছিল রেবা। প্রাণপণে দমন করল নিজেকে। তুলে নিল বিজনের হাত। পরীক্ষা করে দেখল নাড়ির গতি। [illegible] আছে। শীতল শিহরণের স্রোত নেমে গেল শিরদাঁড়া বেয়ে। [illegible] হাতে নিজের বাক্স খুলে বার করল শাড়ি আর ব্লাউজ। শেষ রাতের অবসর। তাড়াতাড়ি পালটে নিল পোষাক। রক্ত শাড়ি-জামা রাখল লুকিয়ে। ছুটে বেরিয়ে গেল ওয়ার্ডে। টেলিফোনে কোন রকমে সংবাদ দিল ডাক্তার মিত্রকে। তার পর ঢুকল কেবিনে। এখুনি এসে যাবে সকলে। তার আগে [illegible] একটুখানির জন্যেও কেঁদে নেওয়া দরকার।

ভোরের বাতাস, এ কেবিনে নিয়ে এলনা কোন [illegible] আশ্বাস। সাড়া জেগেছিল সর্বত্র! ভিড় করেছে কত [illegible] বিস্মিত হয়েছেন ডাক্তাররা। আগের সন্ধ্যায় যে রোগী দ্রুত ওঠার প্রত্যয় জানিয়েছে, অকস্মাৎ কেমন করে কোন ধমনিতে কী আঘাত লাগল, যার ফলে এই রক্তস্রাব? কত [illegible] ইনজেকসন দেওয়া হল অতি অল্পক্ষণের মধ্যে। বিমূঢ় চিকিৎসকদের বিভ্রান্ত করে মারা গেল বিজন, রেখা এসে পৌছুবার আগেই।

কী আকস্মিক পটক্ষেপ। চিন্তা করছিল নির্বাক মুহ্যমান [illegible] দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এর থেকেও আকস্মিক মৃত্যু হয়ত [illegible] করেছে সে। কিন্তু সারা জীবনে এর থেকে নাটকীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে কি তাকে আর কখনো? গতকাল সন্ধ্যায় [illegible] ভাবে অকস্মাৎ তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজন, সকালের মৃত্যুও তেমনি তার আর এক খেয়ালের খেলা যেন। [illegible] উঠল রেখার মন। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি সে কাল [illegible] সন্দেহ ছিল বিজনের আন্তরিকতায়। নোটিশ দিলেই কিন্তু বিয়ে হয়ে যায় না। পনের দিন পরে মৌখিক শপথ আর লিখিত প্রতিজ্ঞা সাক্ষীদের সামনে স্বাক্ষরিত হলে, তবেই না বিয়ে। তার আগে [illegible] উঠবে বিজন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবার সময়ে গাড়ি [illegible] বাড়িয়ে ধরবে খান দুই দশ টাকার নোট। পারিশ্রমিকের [illegible] উপরি বকশিশ দিয়েই মিটিয়ে দেবে মনে দোল জাগানোর খেসারত।

কিন্তু কে জানত, আজ সকালে এত বড় বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে তার জন্য? বিজনের গত সন্ধ্যার প্রতিজ্ঞা যে কত [illegible] আজকের এই মৃত্যু দিয়েই প্রমাণ করে গেল সেই খেয়ালী প্রেমিক। কত বড় সৌভাগ্য ক্ষণিকের জন্য নাগালের মধ্যে এসে, তার উষর জীবনের আঙিনায় আশার বিদ্যুৎ শিখায় উদ্ভাসিত করে, মিলিয়ে

[illegible] মতো। পেছনে রইল শুধু এক রক্তাক্ত ইতিহাস। [illegible] চেপে রাখা কান্না বেরিয়ে এল বুক মথিত করে। রক্ত [illegible] বিছনায় আকুল দুবাহু প্রসারিত করে কাঁদতে থাকল সে [illegible]।

[illegible]তে প্রৌঢ়, লক্ষপতি কিরণ সেন নির্বাক হয়ে গেছেন [illegible] পুত্রের মৃত্যুতে। উন্নাসিক গৌরীর মুখে নেই কথা। [illegible] দল নির্বাক উত্তেজনায় অস্থির। শুধু প্রাণপণে নিজেকে [illegible] রাখার দুরূহ চেষ্টা করে চলেছে রেবা। ডাক্তার মিত্র কিছু [illegible]রেননি। অনেক আস্থা তাঁর দু' বোনের ওপরে। কেউ [illegible] না বিক্রনের অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী কে! কিন্তু নিজের [illegible] সংশয় আছে রেবার? ব্যাকুল হাত দুখানা কোথায় রাখবে [illegible]!

মার্বেল-টপ, মিট সেফের ওপরে পোড়ামাটির নটরাজ [illegible]। তার পাশে রঙিন চায়ের কৌটোটা। অন্যমনস্কভাবে টেনে [illegible] রেবা সেটাকে। খুলে ফেলল ঢাকনা। শূন্য-গর্ভ কৌটো [illegible] আত্মসাৎ করেছে পিয়াসী অধর। গন্ধ রয়েছে এখনও [illegible] চায়ের সৌরভ কিন্তু একটু যেন কেমন কেমন। কাঁচা রক্তের ঝাঁঝালো গন্ধ [illegible] মিশে আছে চায়ের গন্ধের সঙ্গে। শেষ রাতে [illegible]নের বুকের কাছে শুয়ে যে রক্তের গন্ধ লেগেছিল নাকে, তাই বুঝি সঞ্চিত হয়ে গেছে শূন্যগর্ভ কৌটোয় চিরকালের জন্য। শিউরে উঠল রেবা। [illegible] খসে পড়ে গেল রঙিন [illegible] হাত থেকে। ভেঙে গেল টুকরো টুকরো হয়ে।

চমকে উঠে দাঁড়াল রেখা। আর দিদির [illegible] রক্তমাখা শূন্য বিছানায় ঢলে পড়ল রেবা জ্ঞান হারিয়ে।

# রাজধানীর পথে পথে

### উমা দেবী

## একটি কানা গলির মোড়ে

বৃষ্টিঝরা দুপুরের ছলনাভরা আলো-ছায়ায়
অপরূপ লাগল চোখে এই কানা গলির মোড়!
এর সামনেই লাল-রঙা ইটের প্রাসাদের প্রাঙ্গণে
ঝাউগাছ কাঁপছে থর-থর ক'রে
প্রচণ্ড পূবে হাওয়ায়—
আর তার পাশেই কাঠচাঁপার সতেজ তরুটি
ভরিয়ে রেখেছে অজস্র ফুলের সাজি
তার মোটা মোটা লম্বা পাতায় পাতায়।
এক একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটায় ঝরিয়ে দিচ্ছে
পীতাভ শাদা রঙের বড় বড় ফুল।
ঝাউগাছ কাঁপছে থর-থর করে—
ঐ হাওয়া কি ব'য়ে এনেছে তার কাছে
কোনো এক মহাদেশের মহাসাগর ঘেঁসে
পাতা-ঝরা অরণ্যের শীতকালীন নিঃস্বতা?
এনেছে কি বসন্তের ভরে-ওঠা নবপত্রের আন্দোলনে
ওক আর সীডারের—বীচ আর এলমের
পাইন আর ফারের কম্পিত ঘন ঘন স্পন্দনে
উত্তর প্রশান্ত স্রোতের আর্দ্র আর উষ্ণ বাতাসকে?

উপরে মেঘ ভেসে যাচ্ছে—ক্রমশ নিচু হ'য়ে—
জলভারে আর্দ্র—অবসন্ন আর মন্থর—
গর্ভভারক্লান্ত নবযৌবনার মতন।
কালো আর ভিজে ছায়ার নিচে
ঐ কাঠচাঁপাও তার উ[illegible] পীতাভ শ্বেত[illegible]র
মোটা মোটা লম্বা পাতার সাজিতে
সাজিয়ে রাখা ফুলে
স্বপ্ন দেখছে আজকের এই উদ্দাম ও
আকুল বর্ষার বাতাসে
সমুদ্রতীরের এলাচ-লবঙ্গের সৌরভ ছড়ানো
কোনো তীরভূমির—
যেখানে পীনোন্নততনু দক্ষিণী মেয়েদের
এলায়িত আর্দ্র কুন্তলজালে
আবদ্ধ হবে ওর পীতাভ শ্বেতপুষ্পগুলি
বর্ষণশীকরের চূর্ণরেণুতে—
স্খলিত হবার জন্য—কোনো প্রেমিকের
আরক্ত করযুগের উত্তপ্ত স্পর্শের হর্ষে।

একটি কানা গলির মোড়—
এক নগণ্য অখ্যাত ক্ষুদ্র গলির মোড়—
তবু মেঘের ব্যাকুলতার আকাশ যখন বিধুর হ'য়ে উঠেছে
এই মহানগরীর ঊর্দ্ধে
তখন ঐ বুনো ঝাউ আর কাঠচাঁপার আকুলতা
ছড়িয়ে গেল আমার মনে
এক রহস্যময় সৌন্দর্যের অবগাহনে।

চরিত্রের সঙ্গে দেয়ালে পিঠ দিয়ে যুদ্ধ করতে হলো তা আমিই জানি। বলে ফেলেই একটা চিন্তা ছেয়ে ফেললো আমাকে—যাঃ, সব শেষ! ঐ বাক্যটা আমাকে চরিত্রের দুর্গ থেকে বাইরের অধঃপাতের চোরাবালিতে ছিটকে পড়ার কারণ হ'য়ে দাঁড়ালো যেন।

মরিয়ার মতো বললাম। আর বলার পর—আরো চরমপন্থী হয়ে গেলাম যেন।

—ট্যাক্সি নেবেন? মেয়েটি বলল বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে!

ব্যস, সমস্ত মিলে গেছে—ঐ দিক থেকে অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন অন্য দিকগুলোর জন্যেই যা—

—একটু হাঁটাই যাক না একদিন! মাঠে একটু বসা—

কাঁপাগলায় বললাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে আমার শরীর অবশ হয়ে গেছে একটা অস্বস্তি আর অস্বাভাবিক উত্তেজনায়। এমন হয় জানতাম না।

—তা হয় না, পুলিশের বড় হাঙ্গামা রাস্তায়-ঘাটে। সে বলল।

—আচ্ছা চলুন, ঐ পুকুরধারে বসি ততক্ষণ!

—ওরে বাবা! ওখানে প্রতিটি লোকই শাদাপোষাকী পুলিশ। এই জায়গাটায় থিক থিক করছে ওরা। ট্যাক্সি, হোটেল বা বার ছাড়া কোনো জায়গায়ই নিরাপদ নয়! অনেক জ্ঞান সঞ্চার করল সে আমার ওপর।

—আচ্ছা ভেবে দেখা যাবে, কোথায় যাবো শেষে। তার আগে একটু ফাঁকায় বসতে চাই! চলুন হাঁটতে হাঁটতে কার্জন পার্কের পশ্চিম দিকে।

কথা বলতে বলতে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। যেন কতোদিনের চেনা—কতো কাছের মানুষ! মনে হলো আমার এতোদিনের প্রায় অমূলক আর ব্যবসায়িক ব'লে মনে হবার মতো ধারণাটা সত্যি। অর্থই মানুষকে মানুষের কাছে বেঁধে রাখে। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ভক্তির বন্ধনের পেছনেও বুঝি বা একটা সূক্ষ্ম অথচ মুখ্য, অর্থনৈতিক বন্ধন থাকেই [illegible] অবশ্যই থাকে।

ওকে এমন ভাবে হাঁটতে দেখে আমার তাই মনে হ'লো বার বার। আমার প্রস্তাবটা কিন্তু মনঃপূত হয়নি ওর। এ আবার কেমন কথা—ভাব ও হাবভাবে, গতিবিধিতে।

নিরামিষ, অপদার্থ লোক না কি? নেহাৎ বিকৃতিতাড়িত হয়েই সঙ্গ চায় না তো?

তা না হ'লে এই শীতে—কতো উষ্ণ জায়গা থাকতে—বলে কিনা কার্জন পার্কে বসব! মেয়েটি বোধ হয় এই সমস্তই ভাবছিল,—আমি বেশ বুঝতে পারলাম।

—কোথায় যাচ্ছি আমরা শেষ-মেশ? জিজ্ঞেস করল হঠাৎ।

—শেষ কি কেউ বলতে পারে আগে থেকে? বলতে পারেন পৃথিবীর, সভ্যতার, মনুষ্যত্বের শেষ? ক'লকাতার? ঐ মনুমেন্টের? আমার? আপনার? ঘাবড়ে গেলেও মানুষ অনেক সময় বক্তৃতামুখর হয়। বোধ হয় সেই জন্যেই বেশ রসিয়ে রসিয়ে কিসের হাত এড়াবার জন্যেই যেন বলছিলাম।

—কিন্তু আমার রেট্ জানেন তো পঞ্চাশ?

চমকে উঠলাম। এটা যে একটা Business Transaction কিছু ক্ষণিকের জন্যে ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম। থাকা গেল না।

—না জেনে কী আর ডাক দিয়েছি! খাদ্যতালিকার মতো আদেশ করা মজ্জাগত হয়ে গেছে আজকাল ঠকে ঠকে!

কী বুঝলো জানি না। হয়তো বেশ ইণ্টারেষ্টিং মনে হ'ল আমাকে, কিংবা হয়তো টাকাটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে হালকা হ'ল একটু—যেন হাওয়ায় ভেসে কাছে সরে এলো আমার। ফুলের পাক্ করা একটা অদ্ভুত পাঁচমিশেলী প্রসাধন দ্রব্যের গন্ধ [illegible] মৃদু-মন্দ।

—কিছু মনে করবেন না। ওটা নিয়ে পরে অনেকে গোল বাধান, কাজ মিটে গেলে, তাই—

—জানি।

আধো-আধো অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে এগোলাম মনুমেন্ট তলার সিমেণ্টকরা রাস্তাটা ধরে।

কার্জন পার্ক।

কার্জন বঙ্গভঙ্গ আইন করেছিলেন, কার্যে পরিণত ক'রে যেতে পারেন নি! আমরা নিদারুণ প্রতিশোধ পরায়ণতায়, ইতিহাসের নিষ্ঠুর বিধানে কিনা জানি না, কার্জন পার্ককে [illegible] বিচ্ছিন্ন করেছি। কেটেকুটে টুকরো টুকরো ক'রেছি—রাগের [illegible] যেমন বই টুকরো টুকরো করে ছোট ছেলেমেয়েরা। এখনো টিকে থাকা কার্জন পার্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা ছাতার মতো ছোট গাছের তলায় শিশির ভেজা ঘাসের ওপর বসলাম [illegible] বিছিয়ে।

—এখানে আধঘণ্টা বসব, তারপর চৌরঙ্গীর [illegible] কোনো এক 'বারে' গিয়ে উঠব। [illegible] বললাম।

ঠিক জানি তা করব না। এখানেই ওর কথা শুনে [illegible] মিটিয়ে ওর হাত এড়িয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার চেষ্টা করতে [illegible] প্রথম থেকেই যেন গা কেমন করছিলো তো করছিলোই।

—গল্প করবেন নাকি?

আমাদের কি অন্য গল্পের সময় আছে?

—আমি সময় অর্থাৎ নষ্ট সময়ের দক্ষিণা পুরিয়ে দেব, [illegible]

—কী গল্প করবেন? আচ্ছা হাঁদা লোক তো আপনি!

—আপনার কথা শুনব! নাম-ধাম পিতৃ-পরিচয়—[illegible] জীবিকায় এলেন এপর্যন্ত?

মেয়েটি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। ভয় পেয়েছে যেন।

—এইজন্য নিয়ে এসেছেন? খুব হয়েছে। অত বোকা নই [illegible] নড়ে-চড়ে ওঠার মতো অবস্থায় বললাম—ভুল করবেন না, [illegible] পুলিশের লোক নই!

—নিশ্চয়ই তাই—শাদাপোষাকী!

—বিশ্বাস করুন। আমি এক জন সাহিত্যিক, আপনাদের [illegible] জানবার, আপনাদের করুণ কাহিনী, বাধ্যতামূলক জীবনবৃত্তির [illegible] কথা লেখার স্বপ্ন আমার জীবনভর!

—সে তো পুলিশের থেকেও খারাপ! জানেন, আমাদের জীবনেরও একটা ভদ্র, শান্ত, মার্জিত দিক আছে? আপনি [illegible] লিখে জাহির করুন আর আমাকে ভাই-বোনদের উপবাসে [illegible] আত্মহত্যা করতে হোক—বেশ!

বিদ্যুতের মতো একটু এগিয়ে গেল সে।

—[illegible] করুন, এমন কিছু করব না যাতে ব্যক্তিগত ভাবে [illegible] ক্ষতি হয়। বরং সমষ্টিগত ভাবে আপনাদের শুভের [illegible], এই সমস্যাটাকে জাতের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে [illegible] যুদ্ধোত্তর বাঙলার কুষ্ঠরোগ আর আর্থিক বিপর্যয় ধরা [illegible]!

—[illegible]কে বিশ্বাস না করাটাই যে আমাদের ব্যবসায়িক নীতি [illegible] জানেন না। আপনি—বেশ বুঝতে পাচ্ছি—একেবারে [illegible] বাড়ি যান। আপনাকে টাকা দিতে হবে কিন্তু! [illegible] আমার যাকে বলে অফিস টাইমটাই নষ্ট করেছি!

[illegible]! কিন্তু নাম গোপন রেখেও তো বলা যায়! তাতে তো [illegible]কার কিছু নেই! আমার যে ভীষণ প্রয়োজন! উপন্যাস [illegible] হচ্ছে না—

কী ভাবল মেয়েটি এক মুহূর্ত। তার পর ঠিক এসে ধপাস ক'রে [illegible] পড়ল আবার।

—ঠিকই তো, টাকা যখন নিতে হচ্ছে, তখন কিছু অন্ততঃ দিতে [illegible] আপনাকে। এ ব্যাপারে 'Give and take' নীতি আমাদের। [illegible] টাকা ভিক্ষা নেবে কেন? গল্পই বলব! তবে কি জানেন [illegible] না। অফিসের চেয়ে ভয়ংকর এই সময়কার ঝাঁঝালো [illegible] শাস্তি হলেও নেশার মতো পেয়ে বসেছে! না [illegible] উঠবে! নিরামিষ গল্প জমে? তবু!

তীব্র সপ্তমে হাসল মেয়েটি! চমকে উঠলাম। মেয়েদের [illegible] এমনি উচ্চগ্রামে কি সব একই রকমের? আসার সময় [illegible] বারই চেয়ে চেয়ে দেখেছি। দিনের আলোয় আসলে যা [illegible] এখন বুঝেছি। প্রসাধন আর রাতের ওড়নায় বলতে কি [illegible] হয়েছে। তবে কয়েকটা বাইরের জিনিসের সাহায্য নিতে [illegible] অবশ্যই। কাঠামোয় খড়ের ওপর মাটির পর মাটি, তারপর [illegible] তবেই না সরস্বতী! শরীরের গঠনটিতে কিন্তু ভেজাল থাকলেও [illegible] আছেই। মুখখানাই শুধু আসলে কি বোঝাই যায় না, [illegible] আপ মহিমায়।

—কি দেখছেন? শেষকালে মত না পাল্টে ফেলেন আবার! [illegible] আবার হাসল ও। আমিও হাসলাম। মানুষ কতো [illegible] কা'কে কী বলছে!

—আমার নাম তন্দ্রা রায়।

বিনা জিজ্ঞাসার চটপট আত্ম-পরিচয় শুরু করলে[illegible]। ঠিক নাম বলছে না। বলে না কেউ। সন্দেহ বলেছে আমায়।

—আপনার ছদ্মনামটা তো বেশ নিয়েছেন। তন্দ্রাই তো! নিজে তন্দ্রাচ্ছন্ন না থাকলে এসব হয় না আর অপরকেও এমন করা যায় না।

—নামেই অবিশ্বাস করলেন তো কাহিনীকে বিশ্বাস করবেন কি করে?

—আপনি নাম-ধাম গোপন ক'রে কাহিনীটাকে শুধু সত্যি বলবেন, এই অনুরোধ। তা না হলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না। সমাজের চোখে কলমের খোঁচা দিয়ে জল বার করতে হবে আমাকে!

—কি হবে খোঁচায়? এ বরং ভাল্লো, কেউ দেখছে না, জানছে না, মাথা ঘামাচ্ছে না! সকলেই জেনে গেলে কেউ কাউকে বিশ্বাস করবে না। পাশের বাড়ির মেয়ের, হয়তো নিজের স্ত্রীর অতীত সম্বন্ধেও সন্দেহের বিষ পুষবে মানুষ মনে মনে। শান্তি নষ্ট হবে!

—নাও হ'তে পারে! অবহিত হ'য়ে সাবধানও হ'তে পারে মানুষ। প্রতিকারও আসতে পারে। থাক, বলুন!

—যুদ্ধের সময় বিমান আক্রমণের গল্প পড়তাম। ঝাঁকের পর ঝাঁক বিমান হানা দেয় শত্রুভূমিতে। যুদ্ধের সময় থেকে তেমনি ঝাঁকের পর ঝাঁক—দুর্যোগ-দুর্ঘটনা, দুঃখ-দুর্দশা-দুর্বিপাক হানা দিলো আমাদের দেশে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী বন্যা, দাঙ্গা, দেশভাগ—আর্থিক বিপর্যয়—কতো বলব—এসবের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় ঘুণ ধরল। মানুষের নীতির বালাই গেল ঘুচে। ক'লকাতা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে মামার বাড়িতে থাকতাম। বাবা ছিলেন অকর্মণ্য-প্রায়। দোকানে খাতা লিখে যৎসামান্য আয় করতেন। মামার বাড়ির আদর থাকে শুনেছি, আমরা শুধু অনাদরটাই দেখলাম। সেখানের লাথি-ঝাঁটায় মার আর আমাদের চলছিলো নরকভোগ। এর মাঝে বাবা গেলেন মারা। তখন আমি ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি কষ্টেসৃষ্টে। বলতে বলতে থামল মেয়েটি। আর এক অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রাজভবনের পাশ দিয়ে ইডেন গার্ডেনের দিকে

এঁকে-বেঁকে চলে-যাওয়া কুয়াশা উড়ে বেড়ানো—আবছা আবছা রাস্তাটার দিকে।

—সেটা উনপঞ্চাশ সাল। আবার বলতে সুরু করল যেন একটু ভেবে সালটা মনে ক'রে নিয়ে,—সংসারের বড় মেয়ে। দারিদ্র্য এসে গেল। ছোট ছোট ভাই-বোন। সবল অন্ধ হ'লেও শক্ত চড়া কী চ'তে হলো জোর ক'রে, চাকরী করব। মামারা কোন সাহায্যই করলেন না। নিজেই চাকরী খুঁজে বার করলাম আর একটি মেসের সাহায্যে—'ম্যাসাজ ক্লিনিকের' কাজ। প্রথমে ভালোই মনে হ'য়েছিলো নার্সের কাজের মতো লোকের সেবা। শেষে মেয়েদের দৈহিক—মানসিক এবং সবচেয়ে বড় আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ পুরোপুরি কর্তৃপক্ষকে পেতে দেখলাম। অজগরের মুখে অসহায় হরিণের মতো অবস্থা হলো একদিন। ডিউটি আওয়ার্সের মধ্যেই হলাম পুরোপুরি জনবনিতা, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। মনটা কাঠ হয়ে গেল যেন।

পাড়ার সকলে তখনও জানে কোথায় টেলারিং কলেজে কাজ পেয়েছি যেন। দৈনিক যাতায়াত করি। ক্রমে কাজ বাড়তে লাগল আর বাড়ি ফেরা কমতে কমতে নিজের অপরাধ বোধ থেকেই কিনা জানি না—এমন অবস্থায় এসে পৌঁছল যাকে বাড়ি আসা বন্ধই বলা যেতে পারত। শ্রদ্ধের লোকের মুখের দিকে তাকাতে ভয় করতো। অসহ্য ব্যাপার! তবু মাঝে মাঝে বাড়ি যেতেই হয়'তো। ভাই-বোনদের অর্থসাহায্য চলতে লাগল যথারীতি। পাঁচটি ভাই-বোন; কতো তাদের ভালোবাসা! দিদি চাকরি ক'রে সংসার চালায়। প্রতি রবিবার তারা উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে থাকতো জানলার বাইরে, লাল রাস্তার দিকে, আমার বাড়ি ফেরার পথের ওপর চেয়ে! দূর থেকে দেখলে কী সোরগোলই না প'ড়ে যেতো! আমার তাতে সুখ ছিল না। ওরা কী ভাবে, আর আমি কী করি! মেয়েটির গলা ভারী হ'য়ে উঠল; শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠ। স্পষ্ট অনুভব করলাম, তার চোখ থেকে জলের ফোঁটা বড় চকচকে গাল দিয়ে পিছলে পড়ছে—।

একটু থেমে যেন সামলে নিয়ে মেয়েটি বলল—এই ভাবে বেশ কিছুদিন কাটল। একবার অসুখও হয়ে গেল শক্ত। তারপর পুলিশ আক্রমণে ক্লিনিকগুলো ছারখার হয়ে যেতে রাস্তায় নেমেছি। প্রত্যহ নতুন নতুন লোকের সংস্পর্শ, তাদের অভিনব বদভ্যাস বিকৃতির দাসীত্ব, মুখের-গায়ের গন্ধ নীরবে সহ্য করা—বাড়ি যাওয়া প্রায় বন্ধ এখন। নিজের চাকচিক্য বজায় রাখতে সাহায্যের টাকা বাঁচে যৎসামান্য। জানি না ওদের চলছে কি করে! ওরা হয়তো ভাবছে, বড়লোক হয়ে ওদের এড়িয়ে চলি। আসলে কেন চলি তা আমিই জানি আর জানলেন আপনি।

চুপ করে শুনছিলাম আর মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিলাম মনে মনে—বলতে পারবো না কি এক মিল খোঁজার টানে। সেই অন্যমনস্কতেই বোধ হয়—হঠাৎ বলে উঠলাম উত্তেজিত সুরে—তুমি মাধবী! মাধবী দত্ত? শেষে তুমি-ই-ই? এ্যাঁ!

এক আর্ত চীৎকারের সঙ্গে আষাঢ়ে ক্ষুদে ব্যাঙের মতো প্রায় লাফ দিয়ে উঠল সে।

—কী করে জানলেন? আপনি কী করে জানলেন? থর-থর করে গলা কেঁপে উঠল তার।

—ভালো করে দেখেই সন্দেহ হয়েছিলো—গলা শুনে আর জানতে বাকী থাকলো না। তুমি পরিবর্তন হওয়া এবং অনেক দিন না দেখা আমাকে চিনতে পারোনি। আমি তোমার মামার বাড়ির পাড়ার সুব্রত ঘোষাল, যার কাছে মাট্রিকে উঠে পড়তে আসতে। কিন্তু কেন এমন সর্বনাশ করলে তুমি মাধু? পরক্ষণেই মনে হলো কী করলাম? এ কি করলাম! এতো বড় সর্বনাশ হয়তো ওর হাজার হাজার নাগরও করেনি। কেন বললাম? এ ঝোঁক কেন এলো আমার?

ততক্ষণে যা হবার হ'য়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে ও ব্যাগটা খুললো আর একটা ছুরি টেনে বার করে—কেন জানলেন? কেন আপনি জানলেন? বলতে বলতে পাগলের মতো আমার বুক তাক ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিছু ভেবে দেখার অবসর না দিয়ে। দুর্বল হাতে একবার দু'বার চালালোও বুঝলাম। তারপরেই আমাকে ছেড়ে বদ্ধ উন্মাদের মতো দৌড় দিল।

সামলে উঠে বুঝলাম, মোটা কোট থাকায় ক্ষত খুব বেশি হয়নি কণ্ঠার হাড়ের পাশের জ্বালানুভূতিতে মনে হ'লো ঐখানেই একটু ক্ষত হয়েছে।

কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে যা দেখলাম, তাতে হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল আমার। মাধবীর তন্বী দেহটা আলো-অন্ধকারে তীরের মতো ছুটতে ছুটতে তীব্র গতিতে বাঁক নেয়া এক পাঁচনম্বরী লম্বা ট্রেন বাসের সামনে আছড়ে পড়ল।

ক্যাঁ—চ—চ!

আর্তনাদ!

হৈ-চৈ—চীৎকার!

—ভিড়!

অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে থর-থর করে কাঁপতে কাঁপতে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম আর দেখলাম—অনেক লোকজন মিলে থ্যাঁতলানো চটকানো মাধবীর রুধির-দেহটা বাসের তলা থেকে টেনে টেনে বার করে আনছে।

Believe that you possess significant reserves of energy and endurance, and your belief will create the fact. *—William James*

Failure is more frequently from want of energy than from want of capital. *—Daniel Webster*

( তৃতীয় অধ্যায়—ব্লেনিম ক্রেসেণ্ট )

## হিমানীশ গোস্বামী

London is the epitome of our time, and the Rome of today—Emerson

And London Town of all towns I am glad to leave behind—-John Masefield

তিনতলার ঘরটি একদা ছেড়ে দিলাম। বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো, এমন ইচ্ছে তখনো হয়নি ; ঐ বাড়ীরই একতলায় নেমে এলাম। এই একতলার ঘরটি ছিল আকৃতিতে যথেষ্ট বড়। ঘরে হেঁটে বেড়ানো যেতো। ঘরের মধ্যেই ছিল জলের বেসিন। উপরের ঘরটাতে তা ছিল না—জলের জন্য পাশের ঘরে যেতে হ'ত। সেখানে বহু পুরোনো জল গরম করবার কল ছিল। সেটি পুরোনো হ'লেও কাজ চলতো, কিন্তু একটু বিপদও ছিল। জল গরম করবার গ্যাসের কলে একটা পাইলট লাইট জ্বালানো প্রয়োজন হ'ত, কিন্তু আমাদের গ্যাসের কলটির পাইলট লাইট খারাপ ছিল ব'লে জ্বলতো না সব সময়ে। ফলে দেশলাই-কাঠি দিয়ে গ্যাসে আগুন ধরাতে হ'ত। দেশলাই-কাঠিটি যদি আগে জ্বালিয়ে পরে গ্যাস খোলা হ'ত তাহ'লে বিপদ ছিল না। কিন্তু গ্যাস আগে খুলে পরে দেশলাই-কাঠি জ্বালালে বিস্ফোরণ হ'ত। প্রায়ই একটা না একটা বিস্ফোরণ লেগে থাকতো। বিশেষত: নতুন কোনো ভারতীয় এলে সংখ্যাটাও বাড়তো। আমাদের বাড়ীতে গড়ে সপ্তাহে তিনটে করে বিস্ফোরণ হ'ত।

সব চেয়ে বড় বিস্ফোরণটি ঘটেছিল যেদিন, সেদিন রবিবার—জানুয়ারী মাস। অরুণ পালিত আমি এবং প্রভাস চৌধুরী সেদিন ব্রাইটনে যাবো। সপ্তাহ তিনেক আগে থাকতেই কোচের টিকিট কিনে রেখেছিলাম। সকাল ন'টায় ভিক্টোরিয়া কোচ ষ্টেশন থেকে কোচ ছাড়বে, অতএব সকাল সকাল উঠতে হ'ল সেদিন। রবিবার ব'লে যে ন'টা পর্য্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকবো তার উপায় রইল না। সকাল বেলাতেই প্রভাস খুব আগ্রহ করে আমাকে আর অরুণকে ডেকে তুললো। ওরা দু'জনে একই জাহাজে এসেছিল, এবং দুজনে মিলে একসঙ্গে ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে এসেছিল।

ঘড়ির নাচ

প্রভাস আমাদের ডেকে তুলে মুখ ধুতে গেল ওপরে। আমি এবং অরুণ আমাদের ঘরের বেসিনে মুখ ধুচ্ছিলাম। হঠাৎ আওয়াজ হ'ল। নতুন এসেছিল এক ব্যানার্জি, সে সেই আওয়াজ শুনে প্রায় অজ্ঞান—সে তার আগের দিন রাত্তিরেই শুনেছে যে বহু জার্মান বোমা অবিস্ফোরিত অবস্থায় এখনো লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় র'য়ে গেছে, কখনো কখনো সেগুলো ফাটতেও পারে।

ব্যানার্জি বললো, এ যে খুব কাছে। বোধ হয় জার্মান ভি-টু!

ব্যানার্জি ভয়ে কাঁপছে। অরুণ সংক্ষেপে বললো, গ্যাস। ব্যানার্জি গ্যাস শুনে আরো আতংকিত হ'য়ে পড়লো। অরুণ বললো, প্রভাস—প্রভাস ক'রেছে এই কাজ! চলো, উপরে যাই। উপরে গিয়ে দেখি, স্নানের ঘরের দরজা বন্ধ।

আমার নতুন ঘরের দু'জন আইরিশ, মার্টিন এবং মাইকেল দরজা ধাক্কা দিচ্ছে। মিষ্টার এবং মিসেস ম্যাথার্স এসে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের বাড়ীর জাবন লোকুড়, চার জন ব্যানার্জি, (এঁদের বড়, মেজো, সেজো এবং ছোট ব্যানার্জি বলে ডাকা হ'ত।) আর দু-তিনজন এসে দাঁড়িয়েছেন। মণি পালিত সাণ্ডে-টাইমস হাতে।

দরজা খুললো না, অতএব ভাঙ্গা হ'ল। ভাঙতে বিশেষ কষ্ট হ'ল না। একটু চাপ দিতেই কাজ হ'ল।

অরুণ বললো, তিনতলায় এতগুলি লোক এসে দাঁড়ানোয় একটা বিপদ আছে—বাড়ীটা ভেঙে যেতে পারে। এতগুলি লোকের ভার সইবে না।

এই শুনে জনকতক ব্যানার্জি নেমে গেল।

এই চার জন ব্যানার্জি নিয়ে দিব্যি গোলযোগ বেধে যেতো—বিশেষত টেলিফোন কল এলে। মিসেস ম্যাথার্স টেলিফোন ধরে বলতেন [illegible]—মিষ্টার ব্যানার্জি। টেলিফোন।

চা[illegible]ন ব্যানার্জি ছুটতো টেলিফোন ধরতে।

এক জন টেলিফোন ধরতো—হ্যালো!

অন্য তিন জন দাঁড়িয়ে থাকতো অধীর আগ্রহে।

এক বাড়ীতে বহু ব্যানার্জি থাকায় আরো অনেক কাণ্ড, বিশেষ ক'রে কেউ যদি বাড়ীতে এসে ফিরে যেতো।

ডিনার খেতে খেতে হয়তো মিসেস ম্যাথার্স বললেন, মিঃ ব্যানার্জির কাছে এক জন এসেছিলেন।

চার জন ব্যানার্জি একত্রে জিজ্ঞেস করতো, কার কাছে?

—কার কাছে, তা তো জিজ্ঞেস করতে ভুল হ'য়ে গিয়েছে।

—কী নাম?

মিসেস ম্যাথার্স বলতেন, নামটা ঠিক মনে রেখেছি। হুঁ, পড়ছে—মিষ্টার ঠোকার—জাতে ভারতীয়।

মিষ্টার ঠোকার ব'লে কোনো ব্যানার্জিই কাউকে চেনে না।

—ঠোকার, ঠিক মনে আছে মিসেস ম্যাথার্স?

—নাকি সেকার? সেকারও হ'তে পারে।

—সরকার নয়?

—না: স্পষ্ট মনে পড়ছে এখন—সরকার নয়। তবে ঠো না-ও হ'তে পারে।

ার ব্যানার্জি দাঁতে দাঁত ঘষত। ব্যানার্জিদের নিয়ে মজা াও করতাম।

ানার টেবিলে একজন বললেন, একটি মেয়ে ব্যানার্জিকে ান করেছিল, কিন্তু ব্যানার্জি নেই শুনে ছেড়ে দিলো ান।

—কী নাম? চারজন ব্যানার্জির একটি প্রশ্ন।

—নাম তো ব'ললে না ছাই। সময়ই দিল না জিজ্ঞেস করবার।

—কী জাত?

—ইংরেজও হ'তে পার, আবার জার্মানও হ'তে পারে—ভারতীয় আশ্চর্য নয়।

ানারের পর টেলিফোনের সামনে আবার কিউ। চারজন ় তাদের চেনা সমস্ত মেয়েকে টেলিফোন করতে সুরু করেছে।

ই হ'ক দরজা ভেঙে দেখা গেল প্রভাস বিহ্বল ভাবে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত মুখ কাঠকয়লার মতো কালো। তার মাথার চকচকে চুলগুলির উপর ধুলো বালি জঞ্জাল। পাশে জল রবার কল কাত হ'য়ে পড়ে আছে। ছাদের অনেকখানি াথ টাবে এসে ভেঙে পড়েছে। ঘর ভাঙা ইঁট বালি সিমেন্টে প্রভাস একেবারেই নীরব।

রুণ এগিয়ে গেল। ডাকলো, প্রভাস! প্রভাস!

ানরকম সাড়া নেই।

ামরা প্রভাসকে ধরে নিয়ে এলাম নীচের ঘরে। আস্তে আস্তে র জ্ঞান হ'ল।

—আমি কোথায়? সে জিজ্ঞেস করলো।

—লণ্ডনে। অরুণ বললো।

—লণ্ডন কোথায়?

রুণ বললো, ইয়ার্কি মারছিস নাকি?

ন্তু প্রভাস ইয়ার্কি মারছিল না।

ানোক্রমে ব্রাইটনের কোচ ধরেছিলাম। ব্রাইটন লণ্ডন াহান্নো মাইল দূর, কোচে যাতায়াত ভাড়া সাড়ে সাত শিলিং চ গিয়ে নিজেদের সীটে বসে কাগজ খুললাম।

ম খবর নয়, কিন্তু মারাত্মক একটি খবর দেখে চমকে ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলে এতই কুয়াসা হবে যে এক র জিনিসও দেখা যাবে না। Visibility nil আরো াদ—

াস গ্যাস দুর্ঘটনার পর থেকে আর কথা বলছে না। কোনো তে পারছে না, রসিকতা করলে মোটে হাসছে না। অরুণ দিয়ে হাসানোর চেষ্টা করেছিল কয়েকবার। অরুণের ধারণা বিস্ফোরণের ফলে প্রভাসের হিউমার বোধ লোপ পেয়েছে। াগত প্রভাসকে হাসির গল্প বলছিল। আইরিশম্যান, ইত্যাদিদের নিয়ে মজার মজার তিন চারটে গল্প বললাম প্রভাস হাসল না। তা দেখে অরুণ বিচলিত হ'য়ে অরুণ বললো সেই গল্পটা জানিস প্রভাস, সেই যে াটি জার্মানের কাঁধে উঠে সমস্ত দিন বেড়িয়ে সন্ধ্যেবেলা : এই জার্মানটি আমাকে কি ক্লান্তই না করেছে। প্রভাস

অরুণ বললো, তবে ওই গল্পটি শোনো—একজন ইংরেজ ভদ্রলোক অপরিচিত এক বিশাল চেহারার ভদ্রলোককে বলছিলেন—আমাকে একজন আইরিশম্যানকে দেখিয়ে দাও, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে একজন কাপুরুষকে দেখিয়ে দেবো।

বিশাল ভদ্রলোকটি বললেন, আমি একজন আইরিশম্যান। ইংরেজ ভদ্রলোক নিজেকে দেখিয়ে বললেন, আর আমি হ'লাম একজন কাপুরুষ। প্রভাস হাসল না। সে কোচের সামনে এগিয়ে বসে পড়লো এক ভদ্রমহিলার পাশে। আমাদের সাহচর্য তার একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না।

কোচ চললো এগিয়ে। রোদ্দুর নেই—কিছু কুয়াসা আছে—ক্রমশ ঘন হ'চ্ছে। আমি আর অরুণ খবরের কাগজ পড়ছি। রাস্তার দুদিকে দেখবার হয়তো অনেক কিছু ছিল, কিন্তু কুয়াসায় কিছু দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ প্রচণ্ড এক আওয়াজ। দেখি প্রভাসের পাশের এক ভদ্রমহিলা প্রভাসকে চড় মেরেছেন।

অরুণ বললো, প্রভাস কি কাণ্ড করেছে! হয়তো কোনো অসভ্যতা···আমি বললাম, যাও না একটু দেখে এসো।

অরুণ গিয়েই ফিরে এলো। তার হাতে একটা আধ ইঞ্চি সত্ত-নিহত মশা। প্রভাসের গালে ওটি বসেছিল—পাশের ভদ্রমহিলা সেটিকে মেরেছেন। সেই প্রথম দেখলাম ইংল্যাণ্ডের মশা।

প্রভাসের গাল লাল।

খানিক পর আর একটা ব্যাপার ঘটলো সেটা মারাত্মক। ঘটলো প্রভাসের কপালেই। পাশের ভদ্রমহিলার একটি মাঝারি গোছের সুটকেস ওপরে সুটকেস রাখবার জায়গাতেই রাখা ছিল। ঠিক মতো বসানো হয়নি ব'লে কোচটি একটু জোরে মোড় ঘুরতেই সুটকেসটি প্রভাসের কপালে পড়লো তারপরে সেটা পড়লো তার কোলে। প্রভাসকে দেখলাম নিজের কপালে হাত বোলাতে। পাশের ভদ্রমহিলা খুবই দুঃখিত। সমস্ত পথ প্রভাস নিজের কপালে হাত বোলালো। কুয়াসা ঘন হ'তে ঘনতর হ'তে থাকলো।

আমার ঘরটি এবারে বড়। কিন্তু লোক বেড়ে গেল। আগে ছিলাম একা এক ঘরে। এখন তিনজনকে থাকতে হ'ল। মার্টিন এবং মাইকেল আমার গৃহসংগী। দুজনেই আইরিশ। দুজনেরই বয়স চল্লিশের উপরে—দুজনেই কাজ করে। তবে এক কারখানায়

টেলিফোনের সামনে ব্যানার্জিদের কিউ

# অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

## হিন্দু মেয়ের স্বামি-সংস্কার

### অরুণিমা মুখোপাধ্যায়

কথা হচ্ছিল সে-যুগ আর এ-যুগ নিয়ে। হিন্দু সমাজে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিয়ে। তুলনামূলক ভাবে। অতীতের দাম্পত্য সম্পর্কের সংগে বর্ত্তমানের। অতীত আর বর্ত্তমান।

বান্ধবীটি আমার উগ্র আধুনিকতাবাদী আর প্রাচীনতার শত্রু। অন্তত স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ নিয়ে। শত্রু বলছি এ জন্যে যে, প্রাচীনতার প্রতি তার আক্রমণ অনেকটা শত্রুসুলভ। তাঁর কাছে প্রগতিপন্থী আধুনিকতার সামান্যতম জিনিসও আদরণীয়। সংস্কারান্ধ প্রাচীনতার প্রতি তাঁর কী অবজ্ঞাসূচক কটাক্ষপাত! বলা বাহুল্য, বান্ধবীটি পলেটিক্সে এম-এ। নিখিল বিশ্বের নারী-জাগৃতির ইতিহাস তাঁর সুপরিজ্ঞাত। তাঁর মতে: Husband-এর প্রচলিত বাংলা 'স্বামী' কথার মধ্যে যদি অধীনতা বা Subordination-র ইংগিত থাকে তা হলে তা এ-যুগে প্রযুক্ত্য নয়। কারণ, অর্থনীতির কথা ধরেও সে-কালের স্বামি-প্রভুত্ব প্রগতিবাদী নারী এ যুগে স্বীকার করবে না। তার পরিপূর্ণ সত্তা নিয়ে নারী স্বাধীন থাকবে, তাতে কারুর হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। অবশ্য সে নারী-সত্তা অটুট থাকবে স্বামীর সংগে থেকেই। এ সম্বন্ধ অনেকটা Federation-র মতো। Federal Unit আর Union Govt.-র মতো স্বামি-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে Co-operation আর Co-ordination-এর সম্পর্ক থাকবে, কিন্তু Unitary unit গুলোর মতো Subordination থাকবে না। এ সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হলে উভয়ের বিচ্ছেদের অধিকার থাকবে। Divorce আইনের মাধ্যমে। আর এ আইন আশ্রয়ের প্রশ্ন ওঠে Degree of Centralisation-এর ওপর। স্বামি-স্ত্রীর অধিকার তার দিকে কেন্দ্রীভূত করতে পারবে না। এক কথায় এ সম্বন্ধ হল: অধীনতার মধ্যে স্বাধীনতা। অধীনতা হ'ল সহ-অবস্থানের কর্ত্তব্যের মধ্যে আর স্বাধীনতা তার ব্যক্তিসত্তার।

বান্ধবীটি এখানেই থামেনি। অনর্গল তাঁর কণ্ঠ: স্বামী মানেই আসামী, যদি তার প্রভুত্ব-পরায়ণতা দোষ থাকে। পুরুষে নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্বীকৃতি পাবে না। অন্তত যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণী মনের কাছে। এ বিংশ শতকের শেষার্ধে। স্বামীর পায়ে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের তো কথাই ওঠে না। এ বিশ্লেষণের যুগে যে অতীতের সংস্কারান্ধতা, অপবিশ্বাস, আর অমূলক ধারণাকে কাটিয়ে উঠবার যুক্তিবাদকে মেনে নিতে চাইছে, এটা কম সুখের কথা নয়। বর্ত্তমানের আলোয় সে-কালের স্বরূপের মধ্যে কতকগুলো কদর্য মনোবৃত্তি আর বিচারবোধহীন মূর্খতা হীনমন্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্ধতার ঠাঁই নেই এ যুগে। এ বিশ্লেষণী যুগে। বুদ্ধিবাদের যুগে। সম-অধিকারের যুগে। এ-যুগ আগামী দিনের নবপ্রভাত। আধুনিকতার গুণ-কীর্ত্তনে উচ্ছ্বসিতা বান্ধবীটি থামেন এখানে।

আর একটি বান্ধবী আমার আর এক মূর্তি। সম্পূর্ণ বিপরীত। মূর্তিমতী পতিব্রতা। তার প্রমাণ: সদ্য-অফিস-ফেরৎ শ্রান্ত স্বামীর জুতোর ফিতে খুলে দেওয়ার জন্যে তাঁর কী সুবিপুল সযত্ন ব্যস্ততা আর অফিস-গমনোন্মুখ স্বামীর পদকমলে তাঁর গলবস্ত্র কী গভীর সশ্রদ্ধ প্রণাম! বিংশ শতকের শেষার্ধে শিক্ষিতা-সুন্দরী মেয়ের এমন আত্মনিবেদনের আনুগত্য বিরলই বটে!

সে-কাল আর এ-কালকে তাঁদের জীবন দিয়ে বেঁধে রেখেছেন আমার দুইটি বান্ধবী। মনের দিক দিয়ে প্রাচীন ও আধুনিক। একজন ঠাকুরমাদের আমলের পতিদেবতা মনোভাব। অন্যজন অত্যাধুনিক। এ বিপরীতমুখী দু'জনই আমার ভাবনার বস্তু। বেশ চিন্তা করি ওঁদের দু'জনের জীবন নিয়ে। ভাবি, হয়তো ওরা দু'জনেই সুখী, নিজ নিজ থিওরী মেনে নিয়ে জীবনে। কিন্তু কার সুখ নির্ভেজাল? আজকের দাম্পত্য-জীবন নিয়ে আলোচনায় এটা মস্ত বড় প্রশ্ন। প্রাচীন-আধুনিকের দ্বন্দ্ব আর তার সমাধানের প্রশ্ন। দ্বন্দ্ব হল অতীতের অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন অতি-আনুগত্য—চোখ-বোজা স্বামি-সংস্কারের সংগে বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের যুক্তিবাদিতা, আত্মমূল্য-বোধের—মহত্ত্বমন্যতার। অবশ্য এ প্রশ্ন—'আমরা পূর্বপুরুষদের থেকে বেশী সুখী কি'? এই বৃহত্তম প্রশ্নের অধীন। সামগ্রিকতার অংশবিশেষ।

এ প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান ঐ বান্ধবীদ্বয়ের জীবনের মধ্যে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছি। আবিষ্কার করেছি অতীত-বর্তমানের মনোভাবের গ্রন্থিসূত্রকে। অতীত-বর্তমানের সুষ্ঠু স্বরূপকে। তবে সে সমস্ত সমাধান দেখা দিয়েছে বিশ্লেষণের আলোয়।

ভারতীয়তার মূল কথা আদর্শবাদ। আদর্শ-স্থাপনে আর অনুসরণে কী দুর্জয় সাধনা ভারতীয়ের! ধর্মপ্রাণ ভারতের। এই আদর্শবাদ তার ধর্মে-কর্মে, অধ্যাত্ম সাধনায়, ভ্রাতৃত্বে, পৌরুষে আর নারীত্বে—ভারতীয় রক্তের অণু-পরমাণুতে। এই রামায়ণ-মহাভারত পুরাণের ভীম-অর্জ্জুন পুরুষ-বীর্য্যের আদর্শ, লক্ষ্মণ-ভরত ভ্রাতৃত্বের, আর সীতা-সাবিত্রী-বেহুলা ভারতীয় নারীত্বের প্রতীক। ভারতীয় ঐতিহ্যের এ আদর্শবাদের মূলমন্ত্র থেকে একটা সংস্কারের বীজ উপ্ত হয়েছে ভারতবাসীর মনে। ধর্মের গঙ্গাজল ছিটিয়ে সে দৃঢ়মূল সংস্কারের চারা-গাছটিকে আজও সজীব রাখা হয়েছে মনে। আশী বছরের বৃদ্ধা ঠাকুরমার কোলে বসে তার নাতনীটি ছেলেবেলায় শুনে সীতা-সাবিত্রী

বেহুলার গল্প। অতুলনীয় পাতিব্রত্যের আদর্শের কাহিনী। হিন্দু ঘরের ছোট্ট মেয়ের মনের কোমল ভূমিতে এ বহুশ্রুত কাহিনীর তত্ত্বটুকু শিকড় ছড়িয়ে স্থায়ী হয়ে থাকে। এ স্থায়িত্বের ধাতটি রয়েছে তার উত্তরাধিকৃত রক্তকণিকায়। চির-জীবন লালন করে জন্মান্তরে সংক্রামিত করে দিয়ে যায় উত্তরবংশধারার মধ্যে। এই স্বামি-সংস্কারের বশে হিন্দু নারী জানে, পতি তার পরম-আরাধ্য দেবতা। পতি ছাড়া পরম ধন কিছু নেই আর সংসারে। স্বামীর জীবনই স্ত্রীর জীবন। স্ত্রী মনে-প্রাণে জানে :

'স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের নাহি আর গতি।
স্বামীর জীবন জীয়ে মরণে সংহতি।'

স্বপ্নে নিদ্রায়-জাগরণে, ধ্যানে-ধারণায়, চিন্তায়-কল্পনায় হিন্দু নারী জানে শুধু তার স্বামীকে। তাই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ নিহিত রয়েছে তার সতীত্বে। ভারতীয় ঐতিহ্য নারীত্ব ও সতীত্বকে এক করে ফেলেছে। পাতিব্রত্য নারীত্বের একমাত্র মাপকাঠি। সতীত্বকে বাদ দিয়ে নারীর অন্যান্য গুণাবলী ভারতীয় নারীর আদর্শের উপাদান জোগাতে পারে না। অবশ্য হিন্দুনারীর স্বামি-সংস্কার থেকে উদ্ভূত হয়েছে তার আরও গুণ—ধৈর্য্য, বীর্য্যবত্তা, সংযম আর আত্মিক শক্তি। এসব পাতিব্রত্যের সহগুণ। কন্যা বলা যেতে পারে। মায়ের চেয়ে মর্য্যাদায় কন্যা বড়ো হতে পারে না। হিন্দু নারী আদর্শের মধ্যমণি, সীতার চরিত্র দিয়েই তো তা প্রমাণিত হয়েছে। আর এমনি কত শত সীতাই তো হিন্দু নারীর মনে বাসা বেঁধে আছে চিরন্তন হয়ে কত যুগ-যুগান্ত ধরে সে মজ্জাগত সংস্কার—যা তার চিরজীবনের পরম ধর্ম—সে সংস্কারের রক্ত লালন করে চলেছে বংশানুক্রমিক ভাবে। স্বামীকে সে অন্যরূপ ভাবতে শেখেনি। আর রক্তেও সে কোন দিন 'বিপ্লবের বীজে'র অস্তিত্বকে প্রশ্রয় দেয়নি। স্বামি-স্ত্রী সম্পর্ককে বিচারবুদ্ধির মাপকাঠি দিয়ে তলিয়ে ভিন্ন ভাবে দেখতে সে শেখেনি আর ভয়ও ছিল। ধর্মভয়। সে জানে, স্বামীর প্রতি আনুগত্যশূন্য নারী বিধর্মী। সমাজে তাকে দেখায় দৃষ্টিহেয়।

হিন্দু নারীর স্বামী অসুন্দর হতে পারে, নির্গুণ হতে পারে, কুৎসিত-চরিত্র হতে পারে, কিন্তু তার কাছে সে স্বামীই। পরমপূজ্য দেবতা। দাম্পত্য-জীবনে অতৃপ্তি অসন্তোষ থাকলেও সে বিদ্রোহিনী হয়ে উঠতে পারে না। নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে না স্বামীর জীবন থেকে। সে-জীবন যে যজ্ঞের ধোঁয়া আর দীর্ঘ মন্ত্রোচ্চারণের বাঁধনে চিরবাঁধা। এক করে। নির্বিবাদে তাকে স্বামীর সন্তানের মাতৃত্বকে বরণ করে নিতে হয়। মুখ বুজে বয়ে নিয়ে যেতে হয় সংসারের কর্মভার। নিস্তরঙ্গ তটিনীর মতো। পরম শান্ত হয়ে।

আমাদের ঠাকুরমার কাছে শুনেছি, তাদের যুগের পতিপরায়ণতার কথা। শুনেছি, মাতাল স্বামীর হাতে প্রচুর প্রহার-লাঞ্ছনা পেয়েও

স্ত্রী তাকে অবজ্ঞা করতে পারতো না। সাহস পেতো না। তাকেও স্বামীর পায়ের 'দাসী' হয়ে থাকতে হত। কিছুটা বাধ্যতা আর কিছুটা দৃঢ়মূল স্বামি-সংস্কার। প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লিখতে গিয়ে প্রোষিতভর্ত্তৃকার হাত কাঁপতো। ভীষণ ভয়ে। কি লিখতে কি লিখে বসবে। কি কথায় স্বামী রাগ করবে। আর সে-চিঠি বিনয়ে, আনুগত্যে, আত্মনিবেদনে নমনীয়। 'প্রাণেশ্বরে'র প্রতি 'অধম দাসীর কোটি কোটি প্রণামান্তে বিনীত নিবেদন'—এ হল সে-যুগের স্বামি-সম্বোধনের দৃষ্টান্ত। আর উপসংহারের নমুনা: 'তোমার পায়ের অধম দাসী'। দাম্পত্য-জীবনের অন্যান্য সম্বন্ধের মধ্যেও এমন আত্ম-নিবেদিত আনুগত্যের মনোভাবটি পরিস্ফুট। হিন্দু নারী বাস্তব স্বাক্ষর বয়ে নেয় সিঁদূরটিপ আর শাঁখা-এয়োতির মাধ্যমে। তার সংগে ধর্মের পূতস্পর্শ লেগে আছে অবিচ্ছিন্ন হয়ে। তাই তার প্রতি হিন্দু নারীর কত মর্য্যাদা, তাকে অক্ষয় করে রাখার কী বিপুল ব্যাকুলতা! তাই সধবা-মৃত্যুর মতো বড় কিছু নেই আর হিন্দু মেয়ের কাছে। স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় না। হলে তা তার জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফল।

সমসাময়িক সাহিত্যের মুকুরে এই অন্ধ স্বামি-সংস্কারের মনোভাবটি ধরা পড়েছে। এতে নারীত্বের ওপর নৈতিকতা আরোপ করে তাকে খুব বড় করে দেখানো হয়েছে। সেখানে সতীত্ব শুধু নীতি-স্বীকৃত নয়, তা সমগ্র নারীত্বের নৈতিকতা। বঙ্কিমচন্দ্র তো তারই আভাস দিয়েছেন।

এ সব হল অতীতের কথা। পুরনো দিনের ধূসরতা। কিন্তু এ-যুগে হিন্দু মেয়ের স্বামি-সংস্কারের স্বরূপ কি?

এ বিজ্ঞানের যুগ, বিংশ শতকের একটা মস্ত বড় দান হল: এক বিশ্লেষণী মন নিয়ে, বুদ্ধি বাদ দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করার প্রবৃত্তি। আজ স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধও এমনি যুক্তিবাদের আলোয় বিচার্য হ'তে চলেছে। চিরাচরিত পতি-আনুগত্যের মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধতা আর কৃত্রিমতার কাটল আবিষ্কৃত হয়েছে। চোখবোজা সতীত্ব কোন যুক্তিবাদী মন মেনে নেবে কি করে? তাই স্ত্রীর ওপর স্বামীর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপনের দিন আর নেই। সে স্বামীর আদেশ-উপদেশ নির্দ্দেশের অধীন হয়ে হীনতা বরণ করবে না। নারীত্বের মর্য্যাদা এমনি আর পদদলিত হতে দেবে না।

আমাদের দেশে উনবিংশ শতকের নারী-প্রগতির সূচনা আভ্যন্তরীণ ভাবে প্রাচীন অন্ধ স্বামি-সংস্কার আর পুরুষ-আধিপত্যের প্রতিক্রিয়ারূপে এলেও বাইরের দিক থেকে পাশ্চাত্য প্রেরণা কম ছিল না। তখন ইয়োরোপের নারী-প্রগতি আন্দোলনের ঢেউ ভারতীয় অন্ধ সংস্কারের নিশ্চল শিলাস্তূপের ভিত্তি শিথিল করে দিতে আরম্ভ করেছিল। আজ বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে এসে সে ভিত্তি অনেকখানি শিথিল। ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে এমন আশঙ্কার হেতু আছে। অবশ্য ভারতের ধর্ম নমনীয় মাটিতে এ প্রগতি আন্দোলন অনেকটা বিপ্লবাত্মক—চিরাচরিত সংস্কারের উপর আত্মিক আঘাত। অতীতে মনোভাবের সংগে আপোষ-মীমাংসার দিকে বড় ঝোঁক নেই। তাই এ দেশের নারী আন্দোলনের মূলকথা হল: এ যুগের বুদ্ধিবাদের আলোয় আদিম রক্তের মধ্যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঐ অন্ধকারের আভাসটুকু মুছে ফেলার প্রয়াস। তাই তো—গোজামিল নয়। অন্ধ ধর্মবোধ নয়। চোখবোজা অভ্যাস-সংস্কার নয়। লোক-দেখানো, কৃত্রিম পতিপরায়ণতা নয়। পোষাকী সতীত্ব নয়।—এ যুগের নারী আন্দোলন অতীতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। আক্রমণের তীক্ষ্ণ দাঁত-নখও আছে! যুক্তিহীন অন্ধতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া।

পুরুষ-শাসিত সংসারে স্বামীর প্রতি এমনি অন্ধ আনুগত্য দু'টি কুফল বয়ে এনেছে। প্রথম হল: এতে নারীত্বের মর্য্যাদা পুরুষের পায়ের তলায় অপমানিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, নারীসত্তা সেখানে আপন স্বকীয়তা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। নারীত্বের বিকাশ হয়নি। আর হয়নি বলেই সে আপন সংসার গণ্ডীর বাইরে, শিক্ষা-সংস্কৃতির জীবনে পুরুষের চেয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। সেখানে নারীর মেধার দৈন্য ছিল না। দৈন্য ছিল সুযোগ-সুবিধার আর প্রাচুর্য্য ছিল হৃদয়হীন বন্দিদশার। তাই এ যুগের নারী-আন্দোলন মুক্তি-আন্দোলনও বটে। 'হিটলারীয় বন্ধনাগার—বন্দিত্ব' থেকে মুক্তির জন্য সক্রিয় সত্যাগ্রহ। স্বামীর দাসীত্ব থেকে মুক্তি। মন থেকে আনুগত্য, সম্প্রীতি না এলেও বাইরে তার একটা কৃত্রিম পরিচয় দিয়ে পাতিব্রত্যের অভিনয় আর কত দিন করবে হিন্দু নারী? এ যুগের মতে: পুরুষের প্রতি নারী-মনের অতৃপ্তি, অসন্তোষকে জীইয়ে না রেখে দু'জনের মন-জানাজানি করে বোঝাপড়া করে নিতে চায়। মীমাংসা করে দু'জন দু'জনের কাছে পরিষ্কার হতে চায়। মানসিক অশান্তি নিয়ে একটা জীবন কাটাতে সে বাধ্য নয়। এমনি কৃত্রিম দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে পবিত্রতা আরোপ করার অর্থ হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্যেই দু'টি জীবনে শান্তি আসতে পারে। এতে অন্যায় হয় না নিশ্চয়ই। বরং নীতি-স্বীকৃত। তাই সংস্কারান্ধ দাম্পত্য জীবনে নীতিবিরুদ্ধ ভণ্ডামির প্রশ্রয় আছে, মিলন-মধুর সুস্থ জীবনের আশ্রয় নেই।

বিয়ের প্রকৃত আদর্শ দু'টি অনুগত মনের একীভাব—মিলন। দু'জন পাশাপাশি থেকেও অমিল হলে তা বিয়ে নয়। তাতে অশান্তিরই বৃদ্ধি। সে যুগের অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টি নিছক কতকগুলো মন্ত্রোচ্চারণ আর যজ্ঞের ধোঁয়ায় বাঁধা-পড়া দু'টো জীবনের পাশাপাশি থাকাকেই দাম্পত্য জীবন বলে দেখেছিল। সেখানে বাইরের আনুষ্ঠানিকতাই বড়। হৃদয়ের মূল্য বাড়েনি সে বিয়ের, মূলে রয়েছে কৃত্রিমতা।

এ যুগের প্রগতিবাদীদের মতে দাম্পত্য সম্বন্ধের আদর্শ হ'ল অধীনতার মধ্যে স্বাধীনতা। এখানে অধীনতার অর্থ Subordination নয়। দুটি জীবনের একাত্মতার মধ্যে যে বন্ধন সে বন্ধনপাশে উভয়েই আবদ্ধ। দাম্পত্য সম্পর্কের কর্তব্যবোধ দিয়ে বাঁধা সে জীবন। কারুর আধিপত্যের অধীন কেউ নয়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম উভয়ের মিলিত জীবনের ক্ষতি। শুধু একক ভাবে নয়। তাই উভয়েরই Spirit of Sacrifice থাকা দরকার।

এ কালের নারীর শুধু রান্নাঘরে সীমাবদ্ধ নেই বলেই বাইরে তার আপন সত্তার অন্তর্মুখী বিকাশের ক্ষেত্র রয়েছে। এ মানবিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নারীত্বের বহির্মুখী স্ফূর্তিতে পুরুষের অধিকার বাধা হবে না। পুরুষের দিক দিয়েই সেই কথা। অথচ উভয়ে উভয়ের সাহায্যকারী। আজ নারী জীবনের বিভিন্নমুখী প্রকাশে পুরুষের সমকক্ষ হতে সচেষ্ট হয়েছে বলেই এ যুগের নারীত্বের সংজ্ঞা প্রাচীন যুগের থেকে তফাৎ হয়ে পড়েছে। সতীত্ব নারীত্বের অন্যতম গুণ বটে, কিন্তু সতীত্বই পরিপূর্ণ নারীত্ব নয়। এ যুগের প্রগতি

আন্দোলন সেই ফরমাসী সতীত্বের বিরুদ্ধে। যেমনি সতীত্বকে বাদ দিয়েও নারীসত্তা মর্য্যাদা পেতে পারে। যেমনি তা আন্তরিক সহমর্মিতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল শরৎ-সাহিত্যে। সেখানে পোষাকী পাতিব্রত্য আঘাত পেয়েছে বার বার।

অতীতের প্রতি বর্ত্তমানের এ আক্রমণটা অনেকটা বিপ্লবাত্মক। আবার তা মাঝে মাঝে পুরুষের দিকে কেন্দ্রীভূত হতে দেখা যায় কিছু সংখ্যক আধুনিকদের মধ্যে। নারীর পশ্চাৎবর্ত্তিতার জন্যে পুরুষ কিছুটা দায়ী ঠিকই, তবুও এমনি আক্রমণটা ঠিক শোভন সুন্দর নয়। তাহলে নারী তার জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের সহমর্মিতা আর সক্রিয় সহযোগিতা হারিয়ে ফেলতে পারে।

প্রগতিপন্থীদের একটি অভিযোগকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারিনি। হিন্দু নারীর শাঁখা-সিঁদুর ধারণ 'অসভ্যজনোচিত সংস্কার' কি না, বা 'পুরুষ-বর্বরতায় অপমানিতা নারীর গোপন বেদনার স্মৃতিচিহ্ন—রক্ত ও শৃংখলের প্রতীক কিনা' তা আজ আর বিতর্কের বিষয়। কারণ এ সংস্কারের ('কু' দিয়ে বিশেষিত করার মধ্যে যুক্তি দেখিনে) ধর্ম-কেন্দ্রিক ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকতে পারে। তাকে 'পুরুষ-বর্বরতা' বলা যায় না। তা ছাড়া শাঁখা-সিঁদুর যদি সামাজিক সংস্কারই হয়, এবং তা যদি কল্যাণ জ্ঞাপক হয়, তাহলে এ রীতিকে সকল নারীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মুছে ফেলার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাইনে। আলংকারিকতার যুক্তিতেও গ্রাহ্য হতে পারে। কপালে রক্ত সুন্দর সিঁদুর-টিপ, আর দু'হাতে শুভ্র-সুন্দর শাঁখার অলংকার—উজ্জ্বল-সুন্দর করে তোলে হিন্দু নারীকে।

তাই হিন্দু নারীত্বের আধুনিক স্বরূপ ভারতীয় সামাজিক জীবনের প্রাণকেন্দ্রে আঘাত দিয়ে বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন আনতে গেলে ভুলই করবে। মূল ভারতীয়তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রগতিবাদীদের কাজ হবে মূলের চারধারের কুসংস্কার, অজ্ঞানের আগাছাগুলোকে পরিষ্কার করে দেওয়া। ফরমাসী, মেকী পাতিব্রত্যকে বাদ দিয়ে হিন্দু নারীর ঐ পতি-অনুগত প্রেম মনটি সমাদরে গ্রাহ্য। তাইতো খাঁটি ভারতীয়তা। এতো হিন্দু দাম্পত্য-জীবনের প্রাণকেন্দ্র।

## অনাদৃতা কাব্যনায়িকা

### পূরবী চক্রবর্ত্তী

মহাভারতের কাব্যোদ্যান একাধিক নায়িকার বিহরণধন্য। সে উপবনের এখানে সেখানে বিভিন্ন কালের কত নরনারীর লীলা ছন্দিত হইয়াছে—কত সুন্দরীর আনন্দবেদনার রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়াছে—কত পাপের পঙ্কিলতায় তাহা অসুন্দর, পুণ্যের মহিমায় তাহা মুগ্ধকর হইয়াছে—সে ইতিহাসের হারাইয়া যায় নাই—ইহার প্রতিটি বনশাখের চিরহরিৎ পত্রের মর্ম্মরগানে তাহাই অবিরাম প্রতিধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। 'ভারত'—মহাকাব্যের প্রত্যক্ষ নায়িকা ভারতরাজ্ঞী দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা-গৌরবময় সুদীর্ঘ জীবনেতিহাসের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অবকাশমাত্র নাই। যে নারীর অপমানাহত চিত্ত-নির্ঝরের নিঃসরণ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অন্যতম অপ্রত্যক্ষ কারণ—পুরুষোত্তম যে পার্থভীর একান্ত সুহৃদ্—চিরকালের মানবচিত্ত যে সাধ্বীর সুমহান জীবনদর্শন হইতে জীবনাদর্শের প্রেরণা চাহিয়াছে, ধর্ম্মরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী সেই পরমানায়িকা যাজ্ঞসেনী আমাদের হৃদয়ে এক লোকোত্তর মহিমায় সমাসীন। তবু 'ভারত'-খণ্ডের সেই অসংখ্য কাব্যনায়িকার আনন্দমাধুর্য্য তাহাদের বেদনাতপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সে ছন্দান্বিত আবেদন বিস্মৃত হইবার নহে। দোষে-গুণে ক্ষমাহীনতায় দাক্ষিণ্যে ও চিত্তবিক্ষোভে কল্পলোকের দূরত্ব অতিক্রম করিয়া মর্ত্ত্যের মৃত্তিকায় নামিয়া আসিয়া জীবন-মনের অভিন্নতায় তাহারা আমাদেরই আপনজন হইয়া উঠিয়াছে—আমাদের আন্তর প্রীতিটুকু তাই তাহারাই আকর্ষণ করিয়াছে—'দেবযানী' সেই অগণিত ছন্দ-সম্ভবারই অন্যতমা।

দেবলোকের এক গোপন মন্ত্রণা-সভার বিষম পরিবেশে এই মধুর নামটির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। রাজপুরোহিত শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র-প্রভাবে নিহত দৈত্যসেনা পুনর্জ্জীবন লাভ করিতেছে—অপর পক্ষে দেবকুলে নিত্য মৃত্যু, নিয়ত বলক্ষয়। দেব-দৈত্য সংগ্রামের এই অসমঞ্জস পরিস্থিতিতে বিচলিত দেবগণ এক মিলন-চক্র আহ্বান করিয়া দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র সুবুদ্ধি কচকে দৈত্যাচার্য্য স্থানে বিদ্যার্থীর ছদ্মবেশে গমন করিয়া কৌশলে সেই অমৃতমন্ত্র আয়ত্ত করিয়া আনিতে অনুরোধ করিলেন। দেবেন্দ্র প্রমুখ নীতিবিদগণ সেইক্ষণে আচার্য্যের একমাত্র আদরিণী কন্যা দেবযানীর মনস্তুষ্টি বিধানই কার্য্যোদ্ধারের প্রকৃত উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে প্ররোচনা দান করিলেন—সেইক্ষণেই এই অনতিপরিচিতা ব্রাহ্মণকন্যার প্রীতিস্নিগ্ধ আনন্দ-উজ্জ্বল জীবনের উপর কূটনীতির ছায়াপাতে এক আসন্ন দুর্ভাগ্যের সঙ্কেত-মুখরতায় আমরা অধীর হইয়া উঠিলাম।

বিদ্যার্থিরূপে কচ শুধু আচার্য্যের স্নেহই লাভ করে নাই—আচার্য্যকন্যার সুকুমার হৃদয়টিও এই তরুণ ব্রহ্মচারী সহজেই অধিকার করিয়াছিল। তাহার সদা-তোষণ-নীতির ছলনায় বিমুগ্ধা এই রমণীর দেহমনের যৌবনবনে যেদিন প্রথম বসন্তের পদসঞ্চার রণিত হইল—সেদিন আসন্নপ্রায় নিদাঘের খরতাপজ্বালার কথা বিস্মৃত হইয়া বিরোধীকুল হিতৈষী এই তাপসকে নির্ব্বিচারে জীবনের প্রথম পুরুষরূপে বরণ করিয়া লইতে দেবযানী দ্বিধাবোধ করে নাই। এই ব্রাহ্মণকন্যার প্রীতিস্নিগ্ধ সদাসতর্ক দৃষ্টির প্রহরা কচকে সেই শত্রুবেষ্টিত গুরুগৃহে সকল বিপদজ্বালা হইতে অন্তরাল করিয়া রাখিত—তাহার প্রেমসিক্ত অন্তর এই জ্ঞানতপস্বীর কঠোর সাধনার দিনগুলি মধুময় করিয়া তুলিয়া চাহিত—তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি।

দৈত্যগণ এই কপটাচারীর দৈত্যপুরে আগমনের হেতু সম্পর্কে অবহিত হইয়া একাধিক বার তাহাকে নিহত করিয়া নিষ্কণ্টক হইতে চাহিয়াছিল। গুরুকন্যার দৃষ্টির অন্তরালেই এ অহিত সাধিত হইয়াছিল—তবু তাহার সদাশঙ্কিত হৃদয় সে অকল্যাণের ইঙ্গিত বুঝিতে ভুল করে নাই। বেদনাতুরা কন্যার প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প বিচলিত পিতৃহৃদয়কে বারে বারেই কচের অনুসন্ধানে নিরত ও পুনর্জ্জীবনদানে নিয়োজিত করিয়াছিল—অনাবিল কন্যাস্নেহ সেদিন জীবনের মমতা করে নাই। অজ্ঞাতসারে ভক্ষিত উদরস্থিত কচকে শুক্রাচার্য্য জীবনের পরম ধন গোপন সঞ্জীবন মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। পুত্রবৎ শিষ্যকে জীবনদানের জন্য আত্মত্যাগ করিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। কচও কৃতঘ্ন হয় নাই—সদ্যলব্ধ মন্ত্রদ্বারা গুরুকে সে পুনরুজ্জীবিত

করিয়াছিল। তবু মুগ্ধ পিতা মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় আপন অজ্ঞাতে শরণাগত দৈত্যকুলের প্রতি যে অবিচার করিলেন, কন্যার ব্যর্থ জীবন-ব্যথার বেদনায় সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত বহুগুণসকারিরূপেই দেখা দিয়াছিল।

এত দিনে যজনহীন গুরুগৃহবাসের কঠোর ব্রত কচের সাঙ্গ হইল। দেবলোকের নির্দ্দেশ সে পালন করিয়াছে—অমৃত-মন্ত্র আজ তাহার অধিগত। তাই গুরুপুত্রীর প্রতি সকল কর্ত্তব্যেরও পরিসমাপ্তি হইয়াছে—দেবযানীর আর কোনও প্রয়োজন তাহার জীবনে নাই। দুঃসময়ের দিনগুলির সাহায্য ও কৃতজ্ঞতাবোধ কচের হৃদয়ে বুঝি স্নেহের এক ক্ষীণশিখা জ্বালিয়া তুলিয়াছিল—তাহাই তাহাকে অধ্যয়ন-শেষে গৃহে প্রত্যাগমন-মুহূর্ত্তে দেবযানীর নিকট বিদায় ভিক্ষা ও প্রীতি-প্রার্থনা করিতে উদ্দীপিত করিয়াছিল। স্বপ্নভঙ্গের আকস্মিকতা এই নারীকে বিহ্বল করিয়াছিল—রূঢ় বাস্তবের খরস্পর্শ তাহাকে আতঙ্কিত করিয়াছিল সত্য—তবু সে স্পর্শে নয়নের মোহাঞ্জন তাহার মুছিয়া যায় নাই। দয়িত যখন বিদায় মুহূর্ত্তের চরমবাণী শুনাইতেছে, তখনও প্রণয়ব্যাকুলা আত্মনিবেদনে মুখর হইয়া উঠিতেছে—একান্ত প্রিয়জন যখন কোনও প্রেমের কথা নয়, আপ্তবাক্য উদ্ধরণে গুরুপুত্রীর প্রতি ভগিনীস্নেহের বারতা জানাইতেছে, উপেক্ষিতা শুধু একনিষ্ঠ হিতসাধনার প্রতিদানে প্রেমবিমুখ পুরুষের প্রীতিপ্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছে। কি নিষ্করুণ ভ্রান্তি! স্নেহকে দেবযানী প্রেম বলিয়া জানিয়াছে—প্রয়োজনের পরিচর্য্যাকে প্রণয়ের উপচাররূপে গ্রহণ করিয়াছে।

কি বেদনাকরুণ ইতিহাস! রমণীর সহজাত ব্রীড়া বিসর্জ্জন দিয়া উপযাচিকার মত সেই নিষ্ঠুর পুরুষের হৃদয়-দুয়ারে বারে বারে ব্যর্থ করাঘাত করিয়া আপন অন্তরের পবিত্র প্রেমকে শুধু কলঙ্কলিপ্ত করিয়াছে দেবযানী—গৌরবদীপ্ত করিতে পারে নাই! জীবন-বিপর্য্যয়ের ক্ষণে এই বেপথুমতী ক্ষোভে ক্রোধে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কচের প্রতি বিদ্যাবিফলের অকরুণ অভিশাপবাণী বর্ষণ করিয়াছে। কচ নিঃসংশয়ে জানিয়াছে—তাহার বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হইলেও শিক্ষণ কখনও অসার্থক হইবে না। তবু নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ সেদিন এই রমণীর হৃদয়বেদনার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই। যাহার জীবন ব্যর্থতার বিনিময়ে তাহার অন্তর কামনা সার্থক হইল, তাহাকেই নিদারুণ ব্রতভঙ্গলাভের অভিসম্পাতে জর্জ্জরিত করিয়া যাইতে অকারণ পৌরুষে বাধিল না!

সেই সুদূর পুরান দিনেই অনুদার বর্ণবিদ্বেষের প্রসার হইয়াছে! সেদিনও বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকন্যার পক্ষে নিম্নবর্ণসম্ভূত ক্ষত্রিয়-সন্তানের অন্তঃপুরচারিণী হওয়ার অগৌরব সামান্য ছিল না—এমন কি, তিন বর্ণের জননীরূপে স্বীকৃতা ব্রাহ্মণকুমারীর সহিত ক্ষত্রিয়কুলসম্ভব পুরুষের বিবাহ সমাজে অক্ষম অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত। অসবর্ণের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানের সে কঠোরতার পরিচয় দেবযানী জীবনগাথায় অনতিপরেই আমরা পাইয়াছি।

বিরহকাতরার দুঃখদিন যাপনের বিশদ বিবরণ আমরা পাই নাই। চৈত্ররথ কাননের সরোবরে যেদিন দৈত্যরাজদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা দাসীগণ সমভিব্যাহারে জলক্রীড়া করিতে চলিয়াছিল সেদিন আবার প্রফুল্ল দেবযানীকে তাহার অনুগমন করিতে দেখিলাম। উচ্ছল বয়স্যাদের অজ্ঞাতসারে প্রবল বায়ুবেগে তীরস্থিত পরিত্যক্ত বস্ত্রসকল একত্র হইয়া গিয়াছিল—উদ্ভ্রান্ত তাই দেবযানীর পরিধেয় আপন বলিয়া গ্রহণ করিয় জাত্যভিমানিনী আচার্য্যকন্যা সখীর সে আত্মবিস্মৃতি করিতে পারে নাই—'শূদ্রী' সম্বোধনে কঠোর তিরস্কার করিয় বৃষপর্ব্ব দুহিতার আত্মাভিমান আরও তীক্ষ, আরও f তাই শুক্রাচার্য্যকে শুধু দৈত্যরাজের আশ্রিত এক দরিদ্র ব্রাহ উল্লেখ করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় নাই—লাঞ্ছিতা আচার্য অক্লেশে এক অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়া হতভাগিনীর জীবনের কথা চিন্তাও করে নাই!

ভাগ্যের চক্রান্তে সেদিন চন্দ্রবংশ-অবতংস মহারাজ সসৈন্যে সেই বনে মৃগয়া করিতে আসিয়া তৃষ্ণার্ত্ত হইলেন—অনু সংবাদ শুনিয়া তিনি এক প্রাচীন তৃণাচ্ছন্ন অন্ধকূপে দেব দেখিতে পাইলেন। ধীমতী সহজেই তাঁহাকে নৃপতিরূপে লইল ও আত্মপরিচয় দান করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে ব করিল। আচার্য্যদুহিতার অঙ্গস্পর্শ করিতে ক্ষত্রিয় প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন—অবশেষে শরণাগতার ঐ অনুরোধ তাঁহাকে বিচলিত করিল—তাহার জীবনরক্ষা করিয়া সে কানন পরিত্যাগ করিলেন। অলক্ষ্যে দেবযানীর ভাগ্য শুধু এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

সহচরী ঘূর্ণিকার মুখে শুক্র সংবাদ পাইলেন, ক বনচারিণী কন্যা লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহার নিপীড়িত বিসর্জ্জন দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। আত্মগর্ব্বিতা শাস্তিবিধান অথবা তাহার আত্মনিঃশেষ পিতাকে লইতে হইবে—এই সমাচার অবগত হইয়া স্নেহব্যাকুল ছুটিয়া চলিলেন উপবনের পথে। অভিমানিনী কন্যা মুছাইয়া জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্য তাহাকে প্রবোধদান ক কৃতকর্ম্ম হইতে এ-হেন মনোব্যথার উৎপত্তি—ইহা উল্লেখ ক্রোধরূপ মহাপাপ হইতে অবোধ কন্যাকে বারে বারে প্র করিতে চেষ্টা করিয়াও তিনি ব্যর্থকাম হইলেন। ক্ষুব্ধ পি নারী ও ব্রহ্মহত্যাকারী দুষ্কৃতকারী দৈত্যগণের অসৎসঙ্গ ত্যা সঙ্কল্প লইলেন অসহায় বৃষপর্ব্ব তাঁহার চরণে দেশ-জাতি সমর্পণ করিয়া শরণাগত হইল—স্ববংশে সাগরে নিমজ্জনের ব্যক্ত করিয়া এই ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সে প্রতিনিবৃত্ত করিতে দৈত্যরাজের ঐকান্তিক ক্ষমাপ্রার্থনা দেবযানীকে বিচলিত ক তাহার ক্রূর প্রতিশোধস্পৃহা গর্ব্বিতা শর্ম্মিষ্ঠার দাসীত্ব কামনায় প্ররোচিত করিয়াছিল। তবু শর্ম্মিষ্ঠা হইল বিজয়িনী! প কুশলকামনায় পিতৃসত্যরক্ষার্থে সেই রাজনন্দিনী অকুণ্ঠিত চি দেবযানীর দাসীত্ব বরণ করিয়া লইল তখন তাহার গৌরব পার্শ্বে প্রতিহিংসাপরায়ণা আচার্য্যকন্যাকে কেমন হতশ্রী দেখাইল।

চৈত্ররথ কাননের আর এক বিহারদৃশ্য! সহস্র সুন্দরী মাতিয়াছে—সে উৎসবের কেন্দ্র কিশলয়শয্যাশয়ানা দেবযানী পাদতলে সেবানিরতা রাজদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য অ আরও একবার যযাতির মৃগ-অন্বেষণ ব্যাহত হইল। সে অভিশাপের সেই বেদনা-নীল সমুদ্র মন্থন করিয়া বুঝি প্রাচু সুখের অমৃতধারায় জীবন ধন্য করিতে চাহিয়াছিল দেবযানী

…ী রাজার সহিত কথোপকথনের ছলে উপযাচিকা হইয়া … প্রার্থনা করিল সে। যেদিন কর আকর্ষণ করিয়া দেবযানীকে …অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, কুলাচার মতে সেদিনই … পাণিগ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছিল—শুক্রকন্যার এই যুক্তি …ব্রতী রাজাকে বিষণ্ণ করিল—মহাভাগ তপোধন শুক্রাচার্য্যের … বিবাহ করিয়া পাপাচারে লিপ্ত হইতে ক্ষত্রবংশীয় এই ধর্ম্মশীল … অনিচ্ছুক হইলেন। প্রত্যাখ্যাতা কন্যার মর্ম্মবেদনা আচার্য্যকে …করিয়াছিল—স্বেচ্ছায় তিনি যযাতিকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। …নব্রতী মহাতপস্বীর নির্দ্দেশকে অনাচার বলিয়া অমান্য করিতে …পারিল না।

…খী দেবযানী যেদিন পতিগৃহের পথে যাত্রা করিল, তাহার … সেদিন ছায়ার মত তাহাকে অনুসরণ করিয়াছিল। পট্ট- …রূপে পতিপুত্রসৌভাগ্যবতী যখন সুখে যযাতির অন্তঃপুরে …ন করিতেছিল তখন অনতিদূরবর্ত্তী অশোককাননে জীবনের …ব্যর্থতার বীজ তাহার অজ্ঞাতসারে উপ্ত হইতেছিল। ব্যর্থ …লায় অশোকবনবাসিনী দৈত্যরাজকন্যা দুর্ব্বলচিত্ত …কে গোপনমিলনে প্ররোচিত করিয়াছিল। রূপমুগ্ধ রাজা … হইতে দূরে থাকিবার জন্য শুক্রের সে কঠোর নির্দ্দেশ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। রাজমহিষীর পরিচারিকারূপে সে তাঁহারও পরিজনভুক্ত —…দুহিতার এই যুক্তি সহজেই সত্যব্রত নরপতিকে বিচলিত করিয়াছিল। যযাতি শর্ম্মিষ্ঠার গোপন পরিণয় অচিরকালের মধ্যেই সম্ভব হইল।

দেবযানী ঈর্ষাপরায়ণা ছিল না। তাই শর্ম্মিষ্ঠার মাতৃত্বসংবাদে হিতৈষিণীর মতই এই রমণী সখীকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছিল। এক মহাঋষি শর্ম্মিষ্ঠাকে গ্রহণ করিয়াছেন—এই মিথ্যা সমাচারে সে … সুখী হইয়াছিল ও ঋষিপ্রিয়াজ্ঞানে পুত্রবতী সহচরীকে … বলিয়া প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিল।

ভাগ্যের কি নির্ম্মম পরিহাস! রাজমহিষী অবরোধে দুই পুত্রের …জীবন ধন্যজ্ঞান করিতেছে—আর তাহার অগোচরে অশোক- …তাহারই কৃপাপ্রার্থিনী এক পরিচারিকা তিন রাজকুমারের … রাজপ্রেয়সীরূপে জীবন সার্থক করিয়া চলিয়াছে। নিষ্ঠুর … রাজা-রাণী অশোকবন বিহারে আসিয়াছেন। শর্ম্মিষ্ঠার … তাঁহাদের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আনন্দবিধুরা …হৃদয় এই অপরিচিত সুন্দর কুমারদের দেখিয়া মাতৃস্নেহে …হইয়াছে—দেবযানী রাজসমীপে তাহাদের পরিচয় জানিতে …প্রকাশ করিতেছে—অপরাধী যযাতি নীরবে নতমুখে … আর শর্ম্মিষ্ঠার অবোধ সন্তানগণ তাঁহাকে পিতৃসম্বোধন … সেইক্ষণে দেবযানী হৃদয়ের সেই উৎকণ্ঠা ব্যাকুলতা …অস্থির চঞ্চল করিয়া তুলিল। হায়, বহু বিপর্য্যয় সহ্য …জীবনকুসুমটি আজ মধুর আনন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে—সত্যের …ঘাতে এত শীঘ্র তাহা সৌভাগ্যের বৃন্তচ্যুত হইয়া ব্যর্থতায় …? সত্য যখন বজ্রের মত শর্ম্মিষ্ঠাকুমারের মুখে প্রকাশ …যানী বিহ্বল আত্মহারা হইয়াছিল। কিন্তু সে শুধু …। মুহূর্ত্তপরেই বিদ্বেষবিষে তাহার অন্তর উদ্বেল হইল। … শর্ম্মিষ্ঠাকে সুতীব্র ভর্ৎসনায় জর্জ্জরিত করিয়া ক্ষমাহীন …রমণী ছুটিয়া চলিল তাহার আজন্মের সান্ত্বনার আশ্রয় স্নেহময় পিতৃসকাশে। ব্যথার ক্রোড়ে ব্যর্থতার অশ্রু লইয়া পিতৃ- সমীপে প্রতারক স্বামীর পাপের প্রতিবিধান চাহিল এই নারী—ভাগ্যের আঘাত সমাজের নিপীড়ন সহ্য করিয়া অসংখ্য হিন্দুকুলবধূর মত পাতিব্রত্যের পরম আদর্শের পথ অনুসরণ করিতে পারিল না দেবযানী।

শুক্রাচার্য্য প্রথমে তাহার এ বিদ্রোহ ক্ষমা করিতে পারেন নাই—পরম রোষবশে পতিনিন্দাকারিণী কন্যার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অশ্রুমুখী কন্যার হৃদয়ব্যথা যখন তিনি অনুভব করিলেন—তখন আহত পিতৃহৃদয়ে যে রোষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা দুরাচারী যযাতির জীবনের সকল কামনাকে ব্যর্থতায় নিঃশেষ করিতে চাহিল।

যযাতি শুক্রের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। তাই শুক্র অভিশাপ-ভয়ে-ভীত রাজা বিক্ষুব্ধা দেবযানীকে রাজগৃহে ফিরাইবার জন্য তাহার অনুসরণ করিতেছিলেন। যৌবনের সুখভোগলিপ্সা তাঁহার ক্ষান্ত হয় নাই। অকাল বার্দ্ধক্যের অভিশাপকে দূর করিবার জন্য কুটিল রাজা সেদিন তাই ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেবযানীর যৌবনসুখ ব্যাহত হইবে, এই আশঙ্কায় স্নেহান্ধ পিতা তখন যযাতিকে তাঁহার আত্মজের সহিত এক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জরা-বিনিময়ের অনুমতি দিলেন—তখন এই বিদ্রোহিণী নারীর চরমতম লাঞ্ছনার রূপ দেখিয়া আমরা স্তব্ধ হইলাম! যে পুরুষকে সে জীবনে ঘৃণা ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারিবে না—যে পুরুষ ভোগলিপ্সায় তাহার সুখের মিথ্যা কারণ দর্শাইয়া পুত্রের দুয়ারে নির্লজ্জভাবে যৌবন-ভিক্ষা করিতে পারে—অগত্যা তাহাকেই আত্মদান করিয়া যাইতে হইবে। বিদ্বেষে মন বিষাক্ত বেদনায় দেহ জীর্ণ হইবে—পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর অভিনয়ের কোন ত্রুটি হইতে পারিবে না! হায় রে নিদারুণ শাস্ত্রবিধি!

ইহার পরের ইতিহাস বিলম্বিত হয় নাই। শর্ম্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ কুমার সুমতি পুরু পিতার কুকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে তাঁহার জরাভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের অন্তে শুক্রাচার্য্যের আশীর্ব্বাদে এই রাজপুত্র প্রত্যাবৃত্ত যৌবনের সহিত তাহার পিতৃভক্তির পুরস্কারস্বরূপ রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিল তাহা আমরা জানিয়াছি। জরাগ্রহণে অনিচ্ছুক দেবযানীর দুই কুমার শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রদ্বয়ের সহিত পিতৃরোষে অভিশপ্ত-জীবন হইয়াছিল—তাহাও আমরা শুনিয়াছি। শুধু রাজ-অবরোধের এক অশ্রুমতী বধূ পরাজয়ের গ্লানিতে তাহার ব্যর্থ জীবনভার বহন করিয়া নিঃশব্দ চরণে কোথায় যে আত্মগোপন করিল—তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না! কাব্যলোক হইতে চিরলাঞ্ছিতা ছন্দনায়িকা দেবযানী চিরতরেই হারাইয়া গেল!

জরা-মৃত্যু মানুষের ইচ্ছাধীন কি না, সে প্রশ্নের প্রয়োজন আমাদের নাই। আমরা শুধু দেবযানীর জীবনগাথা পর্য্যালোচনা করিতে চাহিয়াছি। জীবনের তরুণ প্রভাবে যে সৌম্যকান্তি তাপসকে সে হৃদয়দান করিয়াছিল—তাহার সহিত মিলনে কোনও সামাজিক বাধা ছিল না। আমরা কল্পনা করিতে পারি—এই ব্রাহ্মণকন্যা প্রীতিস্নিগ্ধ এক সুখনীড়ের গেহিনী হইয়া জীবন সার্থক করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রতিকূল বিধিলিপি। তাই প্রীতির প্রতিদানে সে শুধু পাইল নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা!! সেই দিন হইতে এই সরলা বালার

নিষ্ফলায় নিষ্প্রভ জীবন নিষ্ঠুর বাস্তবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী সংঘাত-মুখর হইয়া উঠিল। অদৃষ্ট প্রাক্তনকর্ম্ম তাহাকে অহরহ ব্যর্থতার পথে লইয়া চলিল—তাহার সহিত যুদ্ধে অন্তর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল—তবু সে হার মানিতে চাহিল না। শর্ম্মিষ্ঠার পাপ অধিক নহে। তাই দাসীত্বের প্রায়শ্চিত্ত-শেষে সে লাভ করিল রাজাধিরাজ স্বামী, মহাঋষিপুত্র। দেবযানীর অপরাধ বুঝি অন্তহীন। জীবনব্যাপী লাঞ্ছনায় ব্যর্থতার বেদনায়ও তাহার সে পাপের ক্ষালন হইল না। এই নারী বারে বারে পুরুষের হৃদয়দুয়ারে এতটুকু অনুরাগের আশায় ভিক্ষার্থীর বেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আর শূন্যজীবন পাত্রখানি লইয়া অশ্রুপ্লাবিতবক্ষে প্রত্যাখ্যানের অপমান বহিয়া আবার ফিরিয়া গিয়াছে। এই ভাগ্যহতার বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র আধার তাহার স্নেহময় পিতার আশ্রয়। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই জীবনকে সে সার্থকতায় উজ্জ্বল করিতে চাহিয়াছে।

হায়, স্নেহকরুণ পিতৃহৃদয় অজ্ঞাতসারে কন্যাকে অবিরত শুধু চরমতম লাঞ্ছনার পথেই অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। তাহাকে দীপ্ত করিতে পারে নাই। ললাটলিপিকে ব্যর্থ করিয়া সৌভাগ্যের শিখরে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল দর্পিতা দেবযানী! বিধাতার নির্ম্মম প্রতিবিধানে তাই পরাজয়ের কলঙ্কে কবিকল্পলোক হইতে তাহার চিরনির্ব্বাসন হইল! কাব্যকার তাহার এই তরুণী নায়িকার প্রতি হয়তো সুবিচার করেন নাই। তবু আত্মসমাহিত কবিচিত্ত আপন অগোচরে বিচিত্র অনুভূতির অনুপম বর্ণসম্পাতে শোকোজ্জ্বলা নারীমূর্ত্তির যে সার্থক রূপসৃষ্টি করিয়াছে তাহার অপরূপ মাধুরী নিত্যকালের রসগ্রাহী মানুষের চিত্তকে অধিকার করিয়াছে। কবিকল্পনার উদয়াচল হইতে শাপভ্রষ্ট হইয়াছে দেবযানী। তবু মহাভারতের মানসলোকে এই অনাদৃতা কাব্যনায়িকা আজও অবিচলতার মহিমায় ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে। তাহার সে দীপ্ত উজ্জ্বল রূপ দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলাম।

## কয়েক দিন

### সীতা মুখোপাধ্যায়

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পা দু'টো পড়ার টেবিলের উপর তুলে দিয়ে জানলার ধারে সুমিত্রা বইটা পড়ছিল। হঠাৎ ওর মনে হল ঘরটা যেন তাড়াতাড়ি বড় বেশী অন্ধকার হয়ে গেছে, কুড়েমি করে কিন্তু ও আলো জ্বালালে না। জানলার বাইরে চোখ পড়তে ও দেখলে, শ্রাবণের ঘন-মেঘে আকাশটা ঢেকে গেছে, তার সঙ্গে ঝুপ-ঝাপ করে বৃষ্টিও পড়ছে। বাগানের গাছপালাগুলো ভিজে ভিজে যেন আরো ঘন সবুজ হয়ে উঠেছে। কয়েক দিন আগের ঠিক এমনি এক সন্ধ্যার কথা মনে হতে ও মিষ্টি করে একটু হাসল। টেবিলের উপর রাখা কফির পেয়ালাতে একটা চুমুক দিয়ে ভাবল যে, ও আজ সুনন্দাকে ফোন করেছিল ওদের বাড়ী যাবে বলে, কিন্তু মাথায় হাত দিয়ে দেখল যে চুল বাঁধা হয়নি, শাড়ীর দিকে নজর পড়তে বুঝতে পারল যে গা ধোয়া হয়নি। এতগুলো কাজ বাকি দেখে ও কোলের উপর খোলা আচমকা হাতের উপর একটা হাত পড়তে ও চমকে পাশ ফিরে দেখল সুনন্দাই ওর পাশের চেয়ারে গম্ভীর মুখে বসে আছে, কিন্তু চোখে দুষ্টুমির হাসি।

সুনন্দা এবার একটু মুচকি হেসে বললে—হলা শকুন্তলে, তুমি কি দুষ্মন্তের ধ্যানে মগ্ন ছিলে? আমি কি তাতে ব্যাঘাত ঘটালাম?

সুমিত্রা হেসে বললে, মরণ তোমার, আমি শকুন্তলা হতে যাব কোন দুঃখে? কারণ, আমার তিনি, মনে মনে নিজেকে দুষ্মন্ত ভাবতে চেষ্টা করলেও তার সত্যি রাজা দুষ্মন্তের মতন পাঁচটা-সাতটা রাণী-উপরাণী ছেড়ে একটা শকুন্তলাকেও ঠিকমতন পাকড়াও করতে পারছে না। সেইজন্যে আমারও তার ধ্যানে মগ্ন হবার কোন কারণ নেই। আমি তোর কথাই ভাবছিলাম।

সুনন্দা গম্ভীর মুখে জবাব দিলে, তুমি যে আমার কথা কা ভাবছিলে আমার জানা আছে, তোর না আজ আমাদের বাড়ী যাবা কথা ছিল? যাই হোক, আমাকে কি বই দিবি বলেছিলি সে বইটা দে।

সুমিত্রা চেয়ার ছেড়ে উঠে খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তারপ সুনন্দার দিকে পাশ ফিরে বোকা-বোকা মুখে বললে; ভাই নন্দ তুই শুনলে রাগ করবি কিন্তু আমার কোন দোষ নেই; ইচ্ছে ক কি আর তোর রাগের কারণ হতে চাই, তুই-ই বল।

সুনন্দা মুখটা যথাসাধ্য গম্ভীর কোরে বললে—যা বলবি ব না, অত ভণিতা করছিস কেন? বইটা দিবি না, এই তো?

সুমিত্রা আরও বোকা-বোকা মুখে বললে, না তা নয়। এ আর কি বলছিলাম কি যে, যার বই সে কিছুতেই রাখলে না বইটা নিয়ে গেল।

সুমিত্রা রাগ-রাগ মুখে বললে, থাক ঠিক আছে, আমার দরক নেই, আমি যোগাড় করে নেব।

সুমিত্রা এবার সত্যিই হেসে বললে তা তুই পারবি ন কারণ বইটার নাম আর লেখকের নাম আমার মনে নেই।

সুনন্দা আরো রেগে জবাব দিলে, বইটা আমি পড়তে চাই না আমি বাড়ী যাচ্ছি।

সুমিত্রা তখন ওর হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে দি বললে, বাবা কি রাগতেই পারিস! বুড়ো বয়সে আর রা করিস না, লোকে হাসবে। তা ছাড়া অত চটেই বা যাচ্ছিস কে বইটা আমার এত ভাল লেগেছে যে, প্রতিটি লাইন আমার ম আছে, এত সুন্দর করে আমি তোকে গল্পটা বলব যে, শুনে ব যে, হ্যাঁ সুমি গল্প বলতে পারে বটে!

সুনন্দা তখন বলল যে, আচ্ছা বল কিন্তু তোর তো এখ পর্য্যন্ত কিছুই করা হয়নি, অন্ততঃ চুলটা বেঁধে ফেল।

সুমিত্রা চুলটা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে তুই ততক্ষণ প থেকে দু' কাপ কফি ঢাল আর ওই দেওয়াল-আলমারিতে চান আছে বের কর। সুমিত্রা চুলটা বেঁধে শাড়ীটা বদলে, খাটের ওপর শুয়ে বললে, এইবার শোন তবে গল্পটা—আমার কিন্তু গল্পের না নায়িকার নাম মনে নেই; তাছাড়া হাতের কাছে যখন পছ কোন নামকও পাচ্ছি না, তখন নায়ক-নায়িকাকে ছেলেটি মেয়েটি বলে আখ্যাত করব।

একতলায় বাগানের দিকের একটা ঘরের ভিতর একটা ছেলে মেয়ে বসে বসে খালি কথা-কাটাকাটি করছে। ছেলেটি উত্তেজিত ভাবে মেয়েটিকে যে কথাই বলতে চাইছে, মেয়েটি খালি মাথা নেড়ে শুনতে অস্বীকার করছে। ওদের দু'জনের গোড়ায় একের একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ওদের দু'জনেরই অবস্থা ভাল বরং ছেলেটিরই অবস্থা একটু বেশী ভাল। মেয়েটির বয়স প্রায় আঠারো-উনিশ আর ছেলেটির ছাব্বিশ-সাতাশ। দু'জনকেই দেখতে ভাল, দু'জনেই অবিবাহিত, ছেলেটি ভাল চাকরি করে, মেয়েটি ত পাত্রী হিসাবে ভাল, ছেলেটিও তাই।

সুতরাং ওদের পরস্পরের এই মেলামেশায় ঘনিষ্ঠতা যে কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে তা না বলে দিলেও চলবে। ওদের পরিচয় খুব ছোটবেলা থেকেই; কারণ ওদের আলাপ-পরিচয় পারিবারিক দিক থেকে দূরসম্পর্কের কি রকম আত্মীয়তাও যেন রয়ে আছে। ছেলেটি কিছু গম্ভীর মেজাজের, কম কথা বলে; মেয়েটির স্বভাব ঠিক তার উল্টো। কিম্বা সে যে বেশী কথা বলে তা না, তবে দিনকতক থেকে ছেলেটি যে ওর উপর খুব বেশী কর্তামি করতে আরম্ভ করেছে, সেটাই যেন ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কোন অনাত্মীয় অবিবাহিত পুরুষের সঙ্গে মেয়েটির মেলামেশা করাটা ছেলেটি যেন অপছন্দ করছে, বিশেষ করে ওদেরই একটি চেনা-শোনা ছেলে রঞ্জনের সঙ্গে মেয়েটিকে কথা বলতে দেখলেই ছেলেটি যেন ওর উপর মারমুখী হয়ে ওঠে। তার অবশ্য একটা গুহ্য কারণ আছে, ছেলেটি যদিও মেয়েটিকে সেটা জানাতে চায় না, তবুও মেয়েটি যেন কোন রকমে সেটা জেনে ফেলেছে, আর সেই কারণেই মেয়েটি একটু ওর প্রতি বিরক্তও হয়েছে। আবার ছেলেটির অজ্ঞাতে তাকে এই নিয়ে ক্ষেপিয়ে মজা পায়। কারণটা হল এই যে, রঞ্জনের মেয়েটির প্রতি যথেষ্ট দুর্ব্বলতা আছে। আর চেহারার দিক দিয়ে না হোক, ছেলে হিসাবে রঞ্জন ছেলেটির চেয়ে অনেক ভাল, আর এইটিই হচ্ছে ছেলেটির রাগের কারণ।

যাই হোক, ঘরে বসে ছেলেটি প্রথমে মেয়েটিকে তার সঙ্গে কিছু কিনতে যাবার জন্যে দোকানে যেতে বলছিল, মেয়েটি ছেলেটির সঙ্গে একা বাইরে যেতে অস্বীকার করছিল। কারণ, বাড়ীর দিক দিয়ে ওদের যতই আলাপ থাকুক, কেবল মাত্র ওদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা যে কতদূরে গিয়েছিল সেটা ছেলেটির বাড়ীতে জানলেও মেয়েটির অভিভাবকেরা জানতেন না। তা ছাড়া ওদের বাড়ীটাও কিছু গোঁড়া ধরণের। যাই হোক, ছেলেটি তখন বললে যে, তারা হেঁটে যাবে না, ছেলেটির গাড়ীতেই যাবে, কেউ দেখতে পাবে না, কাজেই চিন্তার কোন কারণ নেই। তাছাড়া মেয়েটির বকুনি না খাবার ভার ছেলেটি নেবে। মেয়েটি তাতেও অস্বীকার করাতে, ছেলেটি মেয়েটিকে ওদের বাগানে যেতে বলল। মেয়েটি মথো নেড়ে জবাব দিলে যে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, তার উপর ঘাস ভিজে, তাছাড়া এখন ওর একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। ছেলেটি তখন সেই লোকের নাম জানতে চাইলে মেয়েটি জানালে যে, নাম বললে তুমি চিনতে পারবে না।

ছেলেটি তখন ভীষণ রেগে প্রচণ্ড ভাবে মেয়েটির হাতটা ধরে মুচড়ে দিয়ে বললে—তুমি কি মনে কর যে, তুমি একলাই আমাকে জব্দ করতে পার, আমি পারি না? তোমাকে আমি এমন শাস্তি দেব যে কোন দিনই তা ভুলতে পারবে না; আর তার জন্যে সারা জীবন অনুশোচনা করতে হবে।

মেয়েটি নিজের হাতের ব্যথা যথাসাধ্য গোপন করে হাসিমুখে ছেলেটির Challenge accept করে আস্তে আস্তে নিজের হাতটা ছেলেটির মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে যে, তোমার নিশ্চয় আর কিছুর বলার নেই—তাছাড়া আমারও শোনার মতন সময় নেই, কাজ আছে, এই বলে দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল।

আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বাইরের দরজা দিয়ে একজন লোক ঘরে ঢুকল, ছেলেটি চেয়ে দেখল যে লোকটি রঞ্জন। ছেলেটি কোন কথা না বলে নিজের গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিলে। ওদের যে এই ঝগড়া হল তাতে মেয়েটি মোটেই রাগেনি। ও ভেবেছিল যে ছেলেটি কয়েক দিনের ভিতরই আসবে কিম্বা ওকে ফোন করবে। কিন্তু কিছুই যখন হল না মেয়েটি তখন ছেলেটিকে ফোন করলে, কিন্তু ছেলেটির বদলে ওর দিদি জয়ন্তী ফোন ধরে জানাল যে ছেলেটি বাড়ীতে নেই, ওর কিছু যদি বলার থাকে তো বলতে পারে। ছেলেটি এলে জানাবে। মেয়েটি উত্তরে বললে যে, তেমন কিছুই বলার নেই, পরে ও আবার ফোন করবে।

মেয়েটি ফোন রাখলেও সুমিত্রার ঘরের ফোন সত্যিই বেজে উঠল, ও উঠে গিয়ে কার সঙ্গে কয়েকটা দরকারি কথা বলে ফোন রাখল।

সুনন্দা হেসে জিজ্ঞেস করলে, কে ফোন করেছিলো, তোমার দুষ্মন্ত? সুমি গম্ভীর গলায় বললে, না আমার বাবা। তারপর আড়মোড়া ভেঙে খাটে বসে বললে, কেমন লাগছে গল্পটা?

সুনন্দা এবার গম্ভীর মুখে বলে উঠল তুই বলে যা—

সুমিত্রা আবার আরম্ভ করলে—এই সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় মেয়েটির দাদা সমীর মেয়েটিকে বললে যে,-খুকু চল আজ হোটেলে খাব। মেয়েটি যখন গাড়ী করে ভিক্টোরিয়ার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ ওর দৃষ্টি আটকে গেল একটা চেনা গাড়ী দেখে। মেয়েটি অবাক হয়ে দেখল যে, ছেলেটি গাড়ী চালাচ্ছে আর পাশে অন্য একজন চুল-কাটা, ঠোঁটে রং-মাখা মহিলা বসে। মেয়েটির মনে হল যে ওই মহিলাটিকে ও কোথায় দেখেছে, খানিকক্ষণ বাদে ও বুঝতে পারল যে মহিলাটিকে একটি Cinema-hallএ দেখেছে আর ছেলেটিই ওই মহিলাটিকে দেখিয়ে মেয়েটিকে ওর সম্বন্ধে অনেক খারাপ কথাই বলেছিল। কিন্তু মেয়েটি বুঝতে পারল না যে, তবে আজ কেন ছেলেটি মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে চলেছে!

খানিকক্ষণ পরে মেয়েটি যখন ওর দাদার সংগে হোটেলে বসে খাচ্ছে তখন ওর কানে একটা অসংযত অশালীন হাসির আওয়াজ ভেসে এলো। মেয়েটি পিছন ফিরে দেখল যে, ছেলেটি ও মহিলাটি একটা টেবিলে বসে খাচ্ছে, ছেলেটিকে দেখে দেখে মনে হল যে বেশ Drink করেছে, আর অনভ্যাসের জন্য মাঝে-মাঝে হেঁচকি তুলছে, বেশবাস রুক্ষ ও অসংযত। মেয়েটির দাদা হঠাৎ ওকে বললে খুকু, তুই তো কিছু খাচ্ছিস না! কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মনে হল যে ওর মুখে যেন কে এক দোয়াত কালি উপুড় করে দিয়েছে। তারপর দৃষ্টিটা অন্যদিকে যেতে কারণটা বুঝতে পেরে মেয়েটিকে বললে, তোর বোধ হয় খাওয়া হয়ে গিয়েছে, চল এবার ওঠা যাক।

চলে যাবার সময় মেয়েটির মনে হল যে, ছেলেটি যেন ওকে দেখে চিৎকার করে হেসে উঠল। বাড়ীতে নিজের ঘরে শুয়ে

মেয়েটি ভাবতে লাগল যে ছেলেটি সত্যাই তাকে জব্দ করেছে, এত বড় শাস্তি ওকে আর বোধ হয় কেউ-ই দিতে পারত না। এক মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীর রূপটাই ওর কাছে অন্য রকম হয়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে ফোনের আওয়াজে ওর ঘোর কাটল, ফোন তুলতে ওদিক থেকে রঞ্জন ওকে বললে—কাল রাত্রির ট্রেণে আমি বম্বে যাচ্ছি, সেখান থেকে নতুন স্থান South Africa যাব। এর পর কয়েক বছর আর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না, তোমার বিয়ের সময়ও বোধ হয় আমি খুব সম্ভব থাকব না, তাই যাবার আগে তোমাকে কিছু দিয়ে যেতে চাই, তোমার কি কাল সকালে সময় হবে ?

মেয়েটি বলল হবে, তারপর খানিকক্ষণ কি ভেবে গলাটা যথাসম্ভব মোলায়েম করে বলল, তোমাকে একটা কথা বলার আছে, তুমি কি কিছুদিনের জন্যে তোমার যাওয়াটা পিছিয়ে দিতে পার না ?

—রঞ্জন জবাব দিল পারি কিন্তু কেন ? মেয়েটি আর কোন কথা না বলে ফোনটা রেখে দিল।

কয়েক দিন পর একজনের জন্মদিন উপলক্ষে কোন এক বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলায় ভোজের আয়োজন হয়েছে। বিরাট হলঘরে টেবিলে টেবিলে মেয়ে-পুরুষের ভিড়। কেউ নিজের সাজসজ্জা দেখতে ব্যস্ত আবার কেউ অন্যের। এই সময় একটি মেয়ে একলা সেই ঘরে এসে ঢুকল—দরজার কাছেই গৃহস্বামিনী উপস্থিত ছিলেন—মেয়েটি হাসিমুখে কয়েকটি কথা বলে তার হাতে নিজের উপহারটি দিয়ে ঘরের একটি কোণে যে টেবিলে কোন লোক ছিল না, সেইখানে গিয়ে বসল। চেয়ারে বসে মেয়েটি ভাবল যে সেখানে তার চেনাশোনা অনেকেই উপস্থিত আছে কিন্তু তেমন অন্তরঙ্গ কেউ-ই নেই—সুতরাং সে নিজের আহার্য্যে মন দিলে।

হঠাৎ তার কানে এল, বাঃ, মেয়েটিকে তো বেশ দেখতে, কিন্তু কি যে ছাই পাশ ফিরে বসেছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মেয়েটি আড়চোখে চেয়ে দেখলে তারই অদূরে একটি টেবিলে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে বসে আছে, তাদের ভিতরই একজন এই মন্তব্য করলে।

মেয়েটি তখন আর একটু পাশ ফিরে বসে দেখলে যে সামনের দেওয়ালে টাঙান একটা আয়নায় ওর ছায়া পড়েছে। নজর করে দেখলে যে সত্যিই ও খুব সুন্দরী, নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ হল, কিন্তু এই স্বভাবে লজ্জিত হয়ে ও অন্য দিকে মুখ ফেরালে। তখন অদূরের টেবিল থেকে চাপা কণ্ঠের মন্তব্য শুনতে পেলে, বাবা, ঘাড় বেঁকিয়ে বসে আছে দেখ না—যেন ফিল্ম-অ্যাকট্রেস, ঢং দেখে মরি! মেয়েটি আরও একটু পাশ ঘুরে বসলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলে, আরেকটি কণ্ঠস্বর। শুনতে পেলে, দেখ দেখ রমা অপূর্ব্ব। সবাই তখন দরজার দিকে মুখ বাড়িয়েছে, মেয়েটিও দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলে একজন ধুতি-পাঞ্জাবী পরা Manly চেহারার লোক ঘরে ঢুকছে।

মেয়েটি মুগ্ধ চোখে লোকটির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভাবলে যে সে লোকটিকে শুধু চেনেই না, হাড়ে হাড়ে চেনে। এই ভেবে হাসি চেপে মুখটা ঘুরিয়ে নিলে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে লোকটির চোখ মেয়েটির উপর পড়ল—কিন্তু সঙ্গে [illegible] ফেরাল। মেয়েটি খেতে

বলছে জান বাদল, ওই ভদ্রলোক কয়েক দিন আ[illegible] ব্যাপার করেছেন, ওর একটা History আছে, গল্প লেখা [illegible]

তখন একটি মেয়ে মিহি সুরে বললে, তোমা[illegible] পত্রিকায় ছাপা হয় তা আমরা জানি, কিন্তু এখনই ব[illegible] না তখন গল্পটা বলে ফেল অমিত।

অমিত অগত্যা একটা সিগারেট ধরিয়ে আরম্ভ[illegible] কিন্তু তার আগেই সুনন্দা বলে উঠলো ওই [illegible] চেহারা লোকটি আর সুন্দরী মেয়েটি কি তোম[illegible] নায়ক-নায়িকা ?

সুমিত্রা ভ্রূ কুঁচকে বললে আঃ, তুই বড় রসভ[illegible] গল্পটা আগে শোন। যাই হোক, অমিত গল্প আ[illegible] —ওই ভদ্রলোকটির সঙ্গে একটি মেয়ের খুবই আ[illegible] শুধু আলাপ কেন, বেশ হৃদ্যতা আছে, অন্য সব মেয়েরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে যে, সেটা তাদের আগে থেকেই [illegible] ছিল। অমিত বললে, রসভঙ্গ কোর না—যাই হোক, [illegible] ভদ্রলোকটির সঙ্গে মেয়েটির কয়েক দিন আগে খুব ঝগ[illegible] মেয়েটি লোকটিকে একরকম ভাবে তাদের বাড়ী থেকে [illegible] ভদ্রলোকটি মেয়েটিকে শাসিয়ে চলে আসেন।

কয়েক দিন আগে ভদ্রলোকটির সঙ্গে একটি মহিলাকে একটি হোটেলে খেতে দেখা যায়। সেখানে ছিল এবং সে লোকটিকে মাতাল অব[illegible] তারপর ওই মহিলাটিকে নিয়ে লোকটি আগে [illegible] করা একটি হোটেলের ঘরে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোক যেন খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে [illegible] সেটা চাপা দেবার জন্য সঙ্গে করে আনা ইংরাজী [illegible] মহিলাটিকে পড়তে দিয়ে একটা চেয়ারে বসে পকেট [illegible] বের করে ধরালেন। মহিলাটি একটু অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে Magazine এ মন দিলে।

খানিকক্ষণ পরে ভদ্রলোক দেখলেন যে, সিগারেট আর অবশিষ্ট নেই। তখন প্যাকে[illegible] বাইরে ছুড়ে দিয়ে মহিলাটিকে বললে—দেখুন অনে[illegible] decision স্থির করলাম—সেটা হচ্ছে এই যে, পুরু[illegible] যাকে আমি ভালবাসি না, তাকে কাছে পেতে চাই [illegible] কথা আপনাকে জানান হয়নি যে, আমি জীবনে ক[illegible] করিনি আর আজও খাইনি, কেবলমাত্র গন্ধ করার [illegible] সারা গায়ে ছিটিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু আমার অ[illegible] হয়েছিল যে, আপনিও ধরতে পারেন নি। যাই হোক [illegible] সাধুতা দেখাব বলেই যে আপনাকে এখানে এনে[illegible] রাগের মাথায় একজনকে জব্দ করব বলে করে [illegible] কাজের সাফাই আর আপনার কাছে চাই না [illegible] কাছে ক্ষমা চেয়ে আপনাকে ও নিজেকে ছোট [illegible] আপনার সময় অযথা নষ্ট করলাম বলে কিছু মনে [illegible] পকেট থেকে এক গোছা নোট মেয়েটিকে দিয়ে ঘর [illegible] এই বলে অমিত থামল। অন্য ছেলে-মেয়েরা জিজ্ঞা[illegible]

অমিত জবাব দেয়, তারপর আর [illegible]

সকলে আবার প্রশ্ন করে ওঠে—তুমি এত কথা জানলে করে, তোমার সঙ্গে তো ভদ্রলোকের আলাপ নেই ?

অমিত বলে, না তা নেই, তবে ওর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে, [illegible] নাম শেখর—আর শেখর হচ্ছে আমার বন্ধু ; তার মুখ [illegible]কেই আমি শুনেছি।

একে একে সবাই যখন চলে গেল মেয়েটি তখনও তার [illegible]লে বসে হঠাৎ দেখল যে, দূরের এক ঘর থেকে ওর সেই [illegible]-হাড়ে চেনা লোকটি বের হয়ে আসছে। দুজনেই দুজনকে [illegible]ার দেখলে, তার পর দুজনেরই মনে হল যে, একে অন্যকে চোখের [illegible]ার ডাকছে—যাই হোক, লোকটি এসে মেয়েটির টেবিলে বসল। [illegible] সেই সময় পাশের বারান্দা থেকে রঞ্জন এসে হলের ভিতর ঢুকল। [illegible]টির দিকে চোখ পড়লে ওর কাছে এসে বললে—এ কি, তুমি [illegible] এলে ? তোমাকে তো দেখিনি, তুমি এখন বাড়ী যাবে তো ? [illegible] আমি পৌঁছে দিচ্ছি।

ছেলেটির মুখ আবার গম্ভীর হয়ে উঠছে দেখে, মেয়েটি [illegible] অলক্ষ্যে টেবিলের তলা দিয়ে ছেলেটির হাতে একটু [illegible] দিয়ে ওর দিকে চেয়ে রঞ্জনকে বললে, না থাক দরকার [illegible] ওই আমাকে পৌঁছে দেবে। রঞ্জন চলে যেতে মেয়েটি ছেলেটিকে [illegible], কি, আমাকে পৌঁছে দেবে না ? ছেলেটি এইবার একটু [illegible]। গাড়ীতে যেতে যেতে ছেলেটি মেয়েটিকে বললে—দেখ আমি [illegible] ভুল করে খারাপ কাজ করেছি, অবশ্য সেটা তোমারই জন্যে। [illegible] তুমিই ষোল আনা দায়ী।

মেয়েটি হেসে বললে জানি, তুমি সেই কথা শেখর [illegible] বলেছ, আর শেখর দা' বলেছে তার কোন এক অমিত [illegible] বন্ধুকে, আর সেই অমিত তার অন্য বন্ধু ও বান্ধবীদের বলছিল এই রেস্তরাঁর টেবিলে বসে। সেই কথাগুলো আমি এতক্ষণ [illegible]। আমিও একটু ভুল করেছি কিন্তু তার আর সংশোধনের [illegible]। তোমার সঙ্গে হোটেলে দেখা হবার পরদিন আমি লোক না জানিয়ে রঞ্জনকে রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করেছি।

ছেলেটি তখন হাসিমুখে জবাব দিলে, এতে ভয় পাবার কি আছে ? এখনও তো লোক-জানাজানি হয়নি আর হলেই বা কি ? ওকে Divorce করে আমাকে বিয়ে করবে।

মেয়েটি একটু ম্লান হেসে বললে, কিন্তু রঞ্জন এসবের কিছুই জানে না ; তোমার আমার ইচ্ছাকৃত কিম্বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের মাশুলের দাম ও কেন গুণবে ? আরেকটু থেমে বললে না তা আর হয় না ; যা হয়ে গিয়েছে তাকে আর ফেরান যায় না। মেয়েটি আপন মনে কথা বলতে বলতে বুঝতে পারলে যে, ওর হাতের ভিতর ছেলেটির যে হাত ধরা ছিল সেটা যেন অসম্ভব ভারী হয়ে উঠেছে। শরীরের সমস্ত ভার যেন ওই হাতের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। মেয়েটি যখন ওর বাড়ীর সামনে গাড়ীর দরজা খুলে নামলে, তখন দেখলে যে ছেলেটির মুখের রক্ত যেন কে ব্লটিং-পেপার দিয়ে শুষে নিয়েছে। খানিকটা পরে ছেলেটি কোন কথা না বলে গাড়ী চালিয়ে চলে গেল। আর মেয়েটি ঠিক ততক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলো, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ছেলেটির গাড়ীর পিছনের লাল আলো দুটো ওর চোখের উপর থেকে মিলিয়ে না গেল।

সুমিত্রা গল্পটা শেষ করে বললে, কেমন লাগল রে, সুনন্দা শুধু বললে, বেশ ! সুমিত্রা এবার বললে ও গল্পের নায়ক-নায়িকার নাম আমার মনে পড়েছে, তাদের নাম সুব্রত আর সুমিত্রা আর সবার অগোচরে গল্পের অনেকখানি অংশ জুড়ে যে রয়েছে, সেই উপনায়কের নাম রঞ্জন নয়, রঞ্জিত। যাকে আমি কয়েক দিন আগে রেজিষ্ট্রি করে বিয়ে করেছি।

সুনন্দা ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ অবাক চোখে তাকিয়ে বললে, কয়েক দিনের ভিতর এত কাণ্ড হয়ে গেল আর তুই আমাকে কিছু জানালি না ?

সুমিত্রা জবাব দেয়, এই তো জানালাম। তাছাড়া গল্পের ছলে না বলে কথাটা কখনও সোজাসুজি ভাবে তোকে বলতে পারতাম না, বলে নিজের মুখভাব ঢাকবার জন্য পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

## অন্ধের পূজা

( জন মিল্টনের 'On His Blindness' )

যখন ভাবি কেমন করে নিব্‌ল আমার আলো
অর্দ্ধ দিনের আগেই, বিশাল আর এ আঁধার ধরায়,
এবং ভাবি শক্তি যাহা গোপন করা মৃত্যু সমতুল
আমাতে অনর্থ রহে, যদ্যপি এ বাসনা আত্মার।

[illegible] দিয়ে স্রষ্টারে পূজি, এবং জবাবদিহি
[illegible] কাজের, পাছে ফিরে করেন তিরস্কার,—
[illegible]দিনের কাজ কি চাহেন তিনি নিবিয়ে দিয়ে বাতি ?"
[illegible] প্রশ্ন শুধাই : কিন্তু জাগে ধৈর্য্য আমার।

অসন্তোষ নিবারণ হেতু, শীঘ্র আসে জবাব :
চান না ধাতা নরের সেবা, বা তাঁর দানও কোনো,
শ্রেষ্ঠ পূজক সে, যে বহে কোমল শাসন তাঁহার,
সুবিশাল সাম্রাজ্যপিতার ; আদেশ মাত্র শোনো।

সহস্র দূত অবিরাম ভূ-পরিক্রমার মাতে ;
সেবক তারাও দাঁড়িয়ে যারা সেবার প্রতীক্ষাতে।

অনুবাদ : শিপ্রা শিরালী।
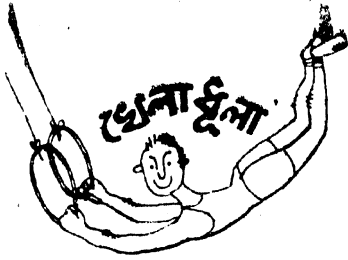
## জাতীয় সন্তরণ

এবারে খেলাধূলার আলোচনার পূর্বে সকলকে আমার বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এবার খেলাধূলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা। জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার সংগে সংগে হায়দ্রাবাদে আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। এই দুই প্রতিযোগিতায় দেখা গিয়েছে ভারতীয় সাঁতারুরা অনেক উন্নততর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। খেলাধূলার ক্ষেত্রে ভারতীয় সাঁতারুরা যে নৈপুণ্য প্রকাশ করছেন তা সত্যই আশাপ্রদ।

বিশ্বের সাঁতারের যে সমস্ত রেকর্ড আছে তার কাছে ভারতের এ-বারের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় যে নবতম রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে তা অতি নগণ্য। তথাপি ভারতীয় সাঁতারুদের এ কৃতিত্ব গৌরবজনক।

ভারতের খেলাধূলায় সাঁতারে যে নৈপুণ্য দেখা যাচ্ছে তাতে আমরা আশা করতে পারি, কয়েক বছর অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলন করলে বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সাঁতারুরা স্থান করে নিতে পারবেন। সমালোচকরা হয়ত বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলবেন, ভারতের পুরুষ সাঁতারুরা এখনও পর্যন্ত বিশ্বের মহিলা সাঁতারুদের রেকর্ড স্পর্শ করতে পারলো না, তাদের পক্ষে এ আশা অবান্তর। সে কথার উত্তর প্রসঙ্গে বলবো—বিগত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় সাঁতারুরা যে উন্নতির পরিচয় দিচ্ছে সেই থেকে আর উন্নত মান আশা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত হবে না।

সন্ধ্যা চন্দ

খেলাধূলার ক্ষেত্রে সাঁতার এখনও অবহেলিত। অথচ এই দিকে খেলাধূলার কর্তৃপক্ষরা দৃষ্টিপাত করলে সুফল পেতে পারেন।

বোম্বাই, দিল্লী ও অন্যান্য দু'-এক স্থানে সাঁতার শেখার সুবন্দোবস্ত আছে। তাছাড়া ভারতের আর কোথাও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাঁতার শেখার বন্দোবস্ত নেই।

বাংলাদেশের গ্রামের দিকে সাঁতার কাটার জন্য কিছু পুষ্করিণী বা দীঘি আছে কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাঁতার শেখার বন্দোবস্ত নেই। কলকাতায় দু'-একটি স্থানে সাঁতার শেখার সুবন্দোবস্ত আছে। কিন্তু সহরতলীতে সাঁতার শেখার কোনরূপ বন্দোবস্ত নেই বললেই চলে। দীঘি ও পুষ্করিণীর একান্ত অভাব। সেই সংগে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সাঁতার শেখার বন্দোবস্ত নেই।

বিজ্ঞানসম্মত সুইমিং পুল নেই, সাঁতার শেখার প্রতিষ্ঠান নেই। সরকার পক্ষ থেকে সাঁতার প্রতিষ্ঠানকে সাহায্যের কোন বন্দোবস্ত নেই। রাজকুমারী অমৃত কাউরের শিক্ষা পরিকল্পনায় বিদেশ থেকে অন্যান্য খেলাধূলার বিশেষজ্ঞ এনে সুবন্দোবস্তের প্রচেষ্টা হয়েছে। সাঁতারের দিকে দৃষ্টিপাত হলে ভারতের উদীয়মান তরুণ সাঁতারুরা বিশেষ উপকৃত হবেন।

এবারের জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১৩টি বিষয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ বিভাগে ১১টি ও মহিলা বিভাগে ২টি রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কয়েকটি বিষয়ে দেখা গেছে, সাঁতারুরা নিজেরা হিটে যে রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছিল ফাইনালে সে রেকর্ড ম্লান করে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এবার জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল সহ মোট ১২টি রাজ্যের আনুমানিক পৌনে দু'শতর উপর সাঁতারু যোগদান করেছিল। অন্য কোন বারে এত বেশী রাজ্য বা এত বেশী সাঁতারু যোগদান করেনি। তাই এবারকার সাঁতার প্রতিযোগিতায় দিল্লীতে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে, এল শ্রীমালী তিন দিনব্যাপী সাঁতার প্রতিযোগিতার উদ্বোধন দিনে পৌরোহিত্য করেন।

পুরুষদের প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল ১৪টি। তন্মধ্যে ১১টি বিষয়ে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষদের বিভাগের এ কৃতিত্বের জন্য সার্ভিসেস-এর সাঁতারুরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি বিষয় উল্লেখ খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইদানীং লক্ষ্য করা গেছে, এ্যাথলেটিক্স ও সাঁতারে সামরিক বিভাগের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। তার কারণ এই যে, সামরিক বিভাগের এ্যাথলেটরা অধ্যবসায় সহকারে অনুশীলন করেন। আর এই সু-পরিকল্পিত অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁদের সফলতা আসে। এর জন্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা সামরিক বিভাগের পরিবেশ। যেটি একান্তভাবে অভাব আমাদের সাধারণ জীবনে। পুরুষ বিভাগে ৬টি বিষয়ে নূতন রেকর্ড করেছে সার্ভিসেস দলের সাঁতারুরা। এর পরেই স্থান বোম্বাই রাজ্যের। বোম্বাই সাঁতারুদের রেকর্ড-সংখ্যা চার, আর বাকি একটি বিষয়ে রেকর্ড করেছেন বাংলার উদীয়মান সাঁতারু অরুণ সাহা।

সার্ভিসেস দল মোট ৯৬ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে। ৪৭ পয়েন্ট পেয়ে বোম্বাই দল দ্বিতীয় ও ১১ পয়েন্ট লাভ করে বাংলা দলে যথাক্রমে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে।

মহিলা বিভাগে মাত্র দুটি বিষয়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন হয়েছে। আর এ দুটি রেকর্ড করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে বাংলার তরুণী সাঁতারুরা রিলে রেসে ও ১০০ মিটার ব্যাক্ ষ্ট্রোকে।

এতদিন বোম্বাইয়ের ডলি নাজিরের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল মহিলা বিভাগে। তাঁর একক কৃতিত্বে বোম্বাই মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে আসছিল। কিন্তু এবার বাংলার মহিলা সাঁতারুরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করে বাংলাকে মহিলা বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রথমদিন বাংলার মহিলা বিভাগে দীর্ঘদেহী সাঁতারু কল্যাণী বসুর নিকট ২০০ মিটার ফ্রী ষ্টাইলে ডলি নাজির পরাজিত হবার পর আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। ফলে বোম্বাই রাজ্য মহিলা বিভাগে বাংলা অপেক্ষা অনেক পিছনে পড়ে গেছে। এবার জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাংলার সন্ধ্যা চন্দ্র ও কল্যাণী বসুর কৃতিত্ব সত্যই প্রশংসনীয়। ১০০ মিটার ব্যাক্ ষ্ট্রোকে সন্ধ্যা চন্দ্র ডলি নাজিরের ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর কল্যাণী বসু ২০০ মিটার ফ্রী ষ্টাইলে যেভাবে ডলি নাজিরকে পরাজিত করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। মহিলা বিভাগে বাংলা দল ৪৫ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। ১১ পয়েণ্ট পেয়ে বোম্বাই দ্বিতীয় ও ৩ পয়েণ্ট পেয়ে দিল্লী যথাক্রমে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

বাংলা এবং বোম্বাই দলের মধ্যে ওয়াটার পোলো খেলায় বাংলা দল ৬-৫ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করেছে। এবারকার খেলাটি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক হয়েছিল। বাংলা দল নৈপুণ্য সহকারে খেলে এ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে।

এবারকার নূতন রেকর্ডের খতিয়ান।

১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল—এল বাজাজ ( বোম্বাই ) ১মিঃ ০·৩ সেঃ
১৫০০ „ „ „ —হাবিলদার রাম সিং (সার্ভিসেস) ২০মিঃ ৫৪সেঃ
২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক—লেঃ নায়েক রামদেও সিং („) ১মিঃ ১৮·৮সেঃ
২০০ „ „ „ — ঐ („) ২মিঃ ৪৯·৭ সেঃ
১০০ মিটার ব্যাক্ ষ্ট্রোক—এল বাজাজ ( বোম্বাই ) ১মিঃ ১১·৮ সেঃ
২০০ „ „ „ —রূপচাঁদ ( সার্ভিসেস ) ২মিঃ ৪১·৩ সেঃ
১০০ মিটার ফ্লাই ষ্ট্রোক—অরুণ সাহা ( বাঙলা ) ১মিঃ ১২·৪ সেঃ
২০০ মিটার বাটার ফ্লাই ষ্ট্রোক—এস, জি, লাঠি (বোম্বাই) ২মিঃ ৫২ সেঃ
৪×১০০ মিটার রিলে—বোম্বাই (মনরেকার, লাঠি, বিনি ও বাজাজ) ৪মিঃ ২৩·২ সেঃ
৪×১০০ মিটার মেডলে রিলে—সার্ভিসেস—৪মিঃ ৫২·২ সেঃ
৪×২০০ মিটার রিলে—সার্ভিসেস—১০মিঃ ১০·৮ সেঃ
১০০ মিটার ব্যাক্ ষ্ট্রোক—সন্ধ্যা চন্দ্র ( বাঙলা ) ১মিঃ ২৯·৫ সেঃ
৪×১০০ মিটার রিলে—বাঙলা ( সন্ধ্যা চন্দ্র, অনুরাধা গুহঠাকুরতা গীতা দে ও কল্যাণী বসু ) ৬মিঃ ১৭·৭সেঃ

* * * *

অমীমাংসিত ভাবে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলার সংগে সংগে কলকাতা মাঠের ফুটবল-এর উপর একরকম যবনিকা পতনই হয়েছে। শীল্ডের ফাইনাল খেলার কোনরকম সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হয়। তাই ক'লকাতা মাঠে ক্রিকেটের মরশুম ও হকির মরশুম সুরু হওয়ার সময় হয়ে এসেছে। পাড়ায় পাড়ায় ক্রিকেটের আয়োজন চলছে। অচিরেই দেখা যাবে তার পূর্ণরূপ। তাই এই সময়ে ফুটবলের অন্যান্য বিশেষ প্রতিযোগিতাগুলির ক্ষেত্রে আসা যাক্।

দিল্লী ক্লথ মিলস্ ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবার ক'লকাতার দুটি খ্যাতনামা দল ফাইনালে উঠেছিল। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব এবার ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে ডি. সি. এম ট্রফি লাভ করে। দিল্লী ক্লথ মিল প্রতিযোগিতায় মহামেডান স্পোর্টিং দলের এইটি প্রথম সাফল্য। ইষ্টবেঙ্গল দল ইতিপূর্ব্বে এই ট্রফি তিনবার অর্জ্জন করেছে ১৯৫০, ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে।

দিল্লী ক্লথ মিলসের এই প্রতিযোগিতায় ক'লকাতার দলগুলির প্রাধান্য পুরোপুরি বজায় ছিল।

ভারতের দুটি বিশেষ ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা এখনও শেষ হয়নি। রোভার্স ও ডুরাণ্ডের আলোচনা আগামী বারে করার ইচ্ছা রইলো।

## টেনিস

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান বাজপেটির প্রদর্শনী টেনিস খেলা উপলক্ষে ক্রীড়া জগতে বিশেষ একটু সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

বাজপেটী তাঁরই দেশের একজন তরুণ খেলোয়াড় আণ্ডি ষ্টার্ণকে সংগে করে ভারত সফরে এসেছেন। ক'লকাতার সাউথ ক্লাবে দু'দিন প্রদর্শনী খেলার বন্দোবস্ত হয়।

ভারতের পয়লা নম্বরের খেলোয়াড় আর কৃষ্ণণ, ডেভিস কাপ টীমের অধিনায়ক নরেশকুমার ও তরুণ খেলোয়াড় প্রেমজিৎলাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নীচে প্রদর্শনী খেলার ফলাফল দেওয়া হল।

নরেশকুমার ৪-৬, ৭-৫ ও ৬-১ গেমে বাজপেটীকে পরাজিত করেন।

প্রেমজিৎলাল এক সেটের খেলায় ৭-৫ গেমে আণ্ডি ষ্টার্ণকে পরাজিত করেন।

নরেশকুমার ও প্রেমজিৎলাল ৬-৩ গেমে আর কৃষ্ণণ ও আণ্ডি ষ্টার্ণ অপেক্ষা এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় সেটে ৩-৩ গেমে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

আর কৃষ্ণণ—৬-৩ ও ৬-৪ গেমে ষ্ট্রেট সেটে বাজপেটীকে পরাজিত করেন।

আর কৃষ্ণণ ও নরেশকুমার ৭-৫ ও ৬-৫ গেমে প্রেমজিৎলাল ও বাজপেটীকে পরাজিত করেন।

* * * *

১৯৫৮ সালে জুলেস রিমেট কাপ বা বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের কেউ অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছেন। ১৯৫৮ সালে বিশ্ব কাপে যারা খেলেছে শুধু তারাই নন, যারা অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে যোগদান করেছিল তাদের উপরও এ নিয়মও বলবৎ থাকবে। সুতরাং ১৯৬০ সালের রোমের অলিম্পিকে ফুটবল টীম পাঠাতে বহু দেশের অসুবিধা হবে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে সব খেলোয়াড় জুলেস রিমেট কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন

১৯৫২ ও ১৯৫৬ সালের অলিম্পিকে তারা খেলেছেন। বলা বাহুল্য এর মধ্যে অনেক পেশাদার খেলোয়াড় আছেন। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় সৌখিন খেলোয়াড়দের স্থান—আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে এ্যামেচার ও প্রফেসন্যাল খেলোয়াড়দের একটা মীমাংসা হল। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি মি: এ্যাভেরী ব্রণ্ডেজ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

* * * *

এবার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা আঞ্চলিক ভাবে অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রতিযোগিতা পিছিয়ে যাওয়ায় ফুটবল মরশুম অযথা দেরী হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিশেষ ফুটবল খেলা আলোচনার দাবী রাখে। সেটি আন্ত: বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা।

বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দর্শকদের অসদ আচরণ বিশেষ দৃষ্টিকটু। সেই সংগে ক্রটিপূর্ণ খেলার পরিচালনা সত্যই লজ্জার বিষয়। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরাজয়ের মূলে অধিনায়ক চুণী গোস্বামী ও সি চন্দ না যোগদান করায় দলটি বিশেষ শক্তিশালী হয়নি। চুণী গোস্বামী ও সি চন্দ আই, এফ, এ শীল্ডের ফাইনাল খেলায় জন্য যেতে পারেননি বলে মনে হয় কিংবা ক্লাব কর্তৃপক্ষরা এই দুই কুশলী খেলোয়াড়কে ছাড়তে চায়নি। যাহা হউক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরাজয়ের জন্য ক্রটিপূর্ণ খেলার পরিচালনাকে দায়ী করা যায়।

* * * *

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতে দ্বিতীয় বার শীতের অতিথি রূপে আসছে। ভারতের সমস্ত ক্রীড়ামোদী মাত্রই এ সংবাদে অত্যন্ত প্রীত। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য একটি অনুশীলন খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্ষেত্রে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের গুরুত্ব কম নয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ভারত সফর করেছিল।

## জন্ম-মৃত্যু

'জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ'—শ্রীভগবান শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সপ্তবিংশতিতম শ্লোকে এই কথা বলিয়াছেন। তাঁহার এই কথায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জাত ব্যক্তিমাত্রেরই জন্ম হইবে, আর যাহার জন্ম হয়, তাহার মৃত্যুও হইবে। ইহাতে মনে হয়, জন্ম-মৃত্যু যেন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। আমরা এই জগতে দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক জাত জীবেরই মৃত্যু হয়, কিন্তু প্রত্যেক মৃতের জন্ম হয় কি না, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। যদিও মৃত জীবদের জন্ম আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, তথাপি উহাদের জন্ম আমরা অনুমান করিতে পারি, কারণ এই যে জীবনিচয় অহরহ জন্মগ্রহণ করিতেছে, উহারা কোথা হইতে আসিতেছে? এতদুত্তরে বলা চলে যে, উহারা মৃতদের রাজ্য হইতেই আসিতেছে। আমরা কেবল ব্যক্ত মধ্য জীবগণকে দেখিতে পাই,—জীবগণের আদ্যন্ত রহস্যাবৃত। এই কথাও শ্রীভগবান শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতিতম শ্লোকে বলিয়াছেন, যথা,

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা।

আমরা কেবল জীবগণের ব্যক্ত মধ্যভাগই দেখিতে পাই, তাহাদের আদ্যন্ত আমাদের নিকট চিররহস্যাবৃত। পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসরও একথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জগতের বস্তুনিচয়ের গতি হচ্ছে from the Imperceptible to the Perceptible and from the Perceptible to the Imperceptible অর্থাৎ এজগতের বস্তুনিচয় অজ্ঞাত জগৎ হইতে জ্ঞাত জগৎমধ্যে আসে, আবার উহারা জ্ঞাত জগৎ হইতে অজ্ঞাত জগতে চলিয়া যায়।

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা জীবকুলের স্বভাব একটু পর্য্যালোচনা করিলেই উপলব্ধি হয়। জাত জীবকুলের স্বভাব এরূপই যে, উহারা কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদি জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে একটা চিরন্তন বিচ্ছেদ থাকিত, তবে জাত জীবগণ কখনও মরিত না। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে একটা সঙ্গতি, আনুকূল্য বা যোগ্যতা রহিয়াছে, সেই জন্যই জাতজীবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর মৃত জীবগণ পুন: জন্ম পরিগ্রহ করে। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে সম্পর্ক আছে বলিয়াই জাত জীবদের মৃত্যু হয়। জন্ম ও মৃত্যু জীবের অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র। একথাও শ্রীভগবান শ্রীমদ্‌ভগবদ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বাবিংশতম শ্লোকে বলিয়াছেন। তিনি তথায় বলিয়াছেন,—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।

লোকে যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ জীবও এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর পরিগ্রহ করে, তখনই জীবের জন্ম মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

অজ্ঞ লোকেরা মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয় করিয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানিগণ মৃত্যুকে মোটেই ভয় করেন না, কারণ তাঁহারা জানেন যে, মৃত্যু অবস্থান্তর প্রাপ্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। মৃত্যুকে ভয় না করিবার আরও এক কারণ এই যে, আমরা যখন জীবিত থাকি, তখন আমাদের মৃত্যু ঘটে না, আর যখন আমাদের মৃত্যু ঘটে, তখন আমাদের কোন অনুভূতিই থাকে না, ভয় থাকা ত দূরের কথা, সুতরাং মৃত্যুভয় নিতান্ত অলীক ও অজ্ঞতা বা ভ্রান্তি হইতে প্রসূত। যদি জ্ঞানালোকের মানবের মন উদ্ভাসিত হয়, তবে তাহার মনে মৃত্যু ভয় থাকে না। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়াই শ্রীরাধিকা গাহিয়াছিলেন।

'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমা।'

বস্তুত: জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে একটা সঙ্গতি বা বন্ধুত্ব আছে, সেই জন্যই আমাদের মৃত্যুকে কোন ক্রমে ভয় করা উচিত নয়। জাত জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং অপরিহার্য্য অর্থে কা পরি দেবনা? অলমতিবিস্তরেণ।

—শ্রীবরদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

ফুলের মত...
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা সাবানে থাকে ক্যাড্রিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তোলে।
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান
প্রোপ্রাইটারী লিমিটেড এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।
RP. 152-X52 BG

## প্লাষ্টিক সভ্যতা প্রসঙ্গে

একবারটি ভেবে দেখুন। হঠাৎ মন্ত্রবলে আজকের পৃথিবীতে সমস্ত প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্য যদি উধাও হয়ে যায়, তাহলে কি হবে? গল্পে পড়া উপকথার মতো নতুন কোন ভাগ্যবান, আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ খুঁজে পেয়ে বুড়ো দৈত্যটাকে যদি আদেশ করেন,—তামাম দুনিয়ার যতো প্লাষ্টিক এই পৃথিবী থেকে বিদেয় করে দাও,—তাহলে আপনার আমার কি কোন ক্ষতি হবে? আপনি যদি বিজ্ঞানের ছাত্র না হন,—তাহলে ভাবনা-চিন্তার এতো ঝামেলায় যেতে চাইবেন না। প্লাষ্টিক থাকলো কি গেল তাতে আপনার আর ক্ষতি কি? যখন প্লাষ্টিকের আবিষ্কার এবং ব্যবহার শুরু হয় নি, তখন কি মর্ত্তলোকে মানুষের বসবাস করতে এমন কিছু অসুবিধে হতো?

কোন রসায়ন-বিজ্ঞানের ছাত্র যদি আপনার কথা শোনে, তাহলে সে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠবে। আহা—হা, করছেন কি? না ভেবে-চিন্তে আলাদীনের প্রদীপকে অতোটা সুযোগ দেবেন না, হঠাৎ সারা দুনিয়ায় একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। আমরা অসুবিধার কথা চিন্তা করছি না, ভাবছি অস্বাভাবিক অবস্থার কথা। রেডিয়োটা চাকচিক্যময় বাইরের কাঠামোটা হারিয়ে কঙ্কালে পরিণত হলো অথবা কোন যন্ত্রের প্লাষ্টিক নির্ম্মিত অংশ উড়ে যাওয়াতে কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, তা নিয়ে আমরা বিশেষ মাথা ঘামাচ্ছি না। যাঁরা প্লাষ্টিক নির্ম্মিত ফুসফুস ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাঁরা হঠাৎ ফুসফুসটা না খুঁজে পেয়ে পরলোকের টিকিটও কাটতে পারেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার লঙ বীচে উপবেশনকারী অথবা কোন মনোরম উদ্যানে ভ্রমণকারী শ্রীমান আর শ্রীমতীদের অবস্থাটা কি রকম হবে! আজকের দিনে পৃথিবীতে,—বিশেষ করে সমুদ্রের অপর তীরের দেশসমূহে পরিধানের জামাপ্যান্ট ইত্যাদির এক বৃহৎ অংশই প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্য দিয়ে তৈরী। সাঁতারকাটার পোষাকসমূহের মধ্যেও প্লাষ্টিকের প্রাধান্য যথেষ্ট বেশী, তাই আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ সত্যিই কৃপা করলে, ঠিক কি যে হবে তা বলা শক্ত!

গড়ের মাঠে, কোন লেকের ধারে বা হাইড পার্কে বেড়াবার সময় আপনার আর আমার লজ্জার পরিসীমা থাকবে না, শ্বেতনন্দিনীরা উজ্জ্বল হরিদ্রাভ পোখরাজদন্ত চেপে, চোখ কপালে তুলে—"হাউ হরিবোল", বলে মূর্চ্ছা যাবেন। অফিসের বড়সাহেব তাঁর চেম্বার ছেড়ে নড়বেন না, দরজা বন্ধ করে দিয়ে লজ্জা নিবারণ করবেন। অবশ্য দরজাটাও যদি প্লাষ্টিকে তৈরী হয়, তাহলে সে আবার আর এক ফ্যাসাদ।

আজকের দিনে কোন না কোন প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যের সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত। প্লাষ্টিক কথাটির সোজা বাংলা অর্থ হলো 'আকার প্রদানক্ষম',—অর্থাৎ সোজা ভাষায় সেই সব বস্তুকেই প্লাষ্টিক বলা চলে, যাকে ছাঁচে ফেলে সহজেই যে কোন আকার দেওয়া যায়। প্লাষ্টিকশিল্প চালু হওয়ার পর এই জাতীয় বস্তুর ছাঁচের দ্বারা যে কোন আকার গ্রহণ করার অত্যন্ত বেশী ক্ষমতা লক্ষ্য করে এর নাম দেওয়া হলো প্লাষ্টিক! যদিও সারা পৃথিবীতে এই সব বস্তুর প্লাষ্টিক নামটি চালু হয়ে গেছে, তবু হিসেব করলে দেখা যাবে, আজকের দিনে যেসব বস্তুকে আমরা প্লাষ্টিক-শ্রেণীতে ফেলি তাদের এক বিরাট অংশকে মোটেই ছাঁচে ফেলা হয় না। কোনটিকে যন্ত্রের সহায়তায় প্রস্তুত করা হয়, আবার কোনটিকে সূক্ষ্ম স্তরের আকারে বিন্যস্ত করে ফেলা হয় গুটিয়ে। অনেক প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যকে আঠাল বস্তু হিসাবে রঙের মধ্যেও ব্যবহার করা হয়। যে-সব প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তুকে ছাঁচে ঢালাই করে নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা লাভজনক, কেবল তাদেরই শিল্পক্ষেত্রে ছাঁচে ফেলা হয়, তা না হলে বিভিন্ন শ্রেণীর প্লাষ্টিকের চরিত্র অনুযায়ী দ্রব্যাদি প্রস্তুতকল্পে বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যবহারই সুপ্রচলিত।

আমেরিকার প্লাষ্টিক-বিশেষজ্ঞ কার্লেটন এলিস ( Carleton Ellis ) একটি সাধারণ সূত্রের মধ্যে প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তুসমূহের চরিত্র চমৎকার ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ভাষায় প্লাষ্টিক হলো এমন একটি পদার্থ যা সবসময়েই যে কোন আকার গ্রহণ করতে সক্ষম, অর্থাৎ যে বস্তু যান্ত্রিক চাপে বিকৃত হয় এবং এর দ্বারা বস্তুটির সংসক্তি বিন্দুমাত্র নষ্ট না হয়ে সে তার নতুন আকারটিকে ধরে রাখতে পারে, তাকেই বলা হবে প্লাষ্টিক। কয়েকটি বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থ সাধারণতঃ একেবারে গলে গিয়ে তরল পদার্থের মতো চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয় না। যে কোন অবস্থাতেই সে তার কঠিন পদার্থসুলভ কাঠামোর চারিত্রিক দৃঢ়লগ্নতা বজায় রাখে।

প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যের প্রথম আবিষ্কার হয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। অবশ্য অনেকেই মোম বা নানাপ্রকার রজন জাতীয় পদার্থের অতি প্রাচীনকালে ব্যবহারের সূত্র ধরে, বহুপূর্ব্বে মিশর অথবা রোমান সাম্রাজ্যের সময়ে প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থের ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক যুগে এই সব প্রকৃতিজ দ্রব্য নানাভাবে ব্যবহার করা হোত কিন্তু আজকের দিনে প্লাষ্টিক বলতে আমরা যে সংশ্লেষিত দ্রব্যসমূহকে বোঝাই, তার সঙ্গে এই সব প্রকৃতিজ বস্তু প্রচলিত বস্তুসমূহের একটু পার্থক্য রাখা বোধ হয় উচিত হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম সেলুলোজ নাইট্রেট জাতীয় প্লাষ্টিক আবিষ্কৃত হয়। শিল্পক্ষেত্রে এর নাম সেলুলয়েড,—এই বস্তুটির সঙ্গে অল্পবিস্তর আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত। বস্তুটির উদ্ভবের জন্য একসঙ্গে কয়েক জন বিজ্ঞানীকে কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেওয়া যায়। জার্ম্মাণ বিজ্ঞানী সি. এফ. শোনবিন ( C. F. Schonbein ), ইংরাজ বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার পার্কস ( Alexander Parkes ) এবং আমেরিকার হায়াট ( Hyatt ) ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম এই আবিষ্কার প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৬৩ সালের কথা। হাতীর দাঁতের দাম তখন অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল, বিলিয়ার্ড-বিলাসীদের হলো খুব দুরবস্থা। হাতীর দাঁতের দাম আকাশছোঁয়া। তাই বিলিয়ার্ডের বল প্রস্তুতকারক ফেলান আণ্ড কল্যানডার ( Phelan and Collander ) কোম্পানী হাতীর দাঁতের পরিবর্ত্তে বিলিয়ার্ড বল প্রস্তুতের উপযোগী যে কোন বস্তু

আবিষ্কার করার জন্য বেশ মোটা মূল্যের এক পুরস্কার ঘোষণা করলেন। সংশ্লেষণ বিজ্ঞানের সহায়তায় হাতীর দাঁত জাতীয় বস্তু তৈরীর চেষ্টা করলেন বারমিংহামের আলেকজাণ্ডার পারকেস। ১৮৬৫ সালে তিনি নাইট্রোসেলুলোজের সঙ্গে অ্যালকোহলের উপস্থিতিতে কর্পূর মিশিয়ে একটি কঠিন দ্রব্য প্রস্তুত করেন। কিছুদিন পরে এই একই বস্তু আমেরিকার হায়াট ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক পুনরাবিষ্কৃত হয় এবং তাঁরাই সর্বপ্রথম এর নাম সেলুলয়েড দিয়ে শিল্পক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে বস্তুটি প্রস্তুত করেন। হায়াট ভ্রাতৃদ্বয় সেলুলয়েড বল নির্ম্মাণ করে তাকে কলোডিয়ন (Collodion) দ্বারা আবৃত করে চমৎকার বিলিয়ার্ড-বল নির্ম্মাণ করলেন। বিলিয়ার্ড-বল প্রস্তুতকারক কোম্পানীর ঘোষিত পুরস্কারের লোভেই তাঁরা এই প্রচেষ্টা সুরু করেন। প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হলো, আবিষ্কার হলো সেলুলয়েডের। বিলিয়ার্ড-বিলাসীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও, ভাগ্যচক্রে পুরস্কারটা কিন্তু হায়াট ভ্রাতৃদ্বয় পান নি। এই আবিষ্কারের সাফল্য বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করে তুললো এবং তারা হাতীর দাঁতের মতো কৃত্রিম উপায়ে প্রবাল, প্রাণীর সিং, গালা প্রভৃতির অনুরূপ বস্তু প্রস্তুতকল্পে মনোনিবেশ করলেন। ১৮৯৭ সালে ক্রিসে এবং স্পিটেলার (Krische and Spitteler) কেজিনকে (Casein) ফরমালডিহাইড সহযোগে জমিয়ে কঠিন পদার্থে পরিণত করে কেজিন প্লাষ্টিক আবিষ্কার করেন।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিজ্ঞানী বেকেল্যাণ্ডের আবিষ্কার প্লাষ্টিকশিল্পে এক নতুন যুগের সূচনা করলো। তিনি ফরমালডিহাইডের (Formaldehyde) সঙ্গে ফেনল (Phenol) মিশিয়ে একটি রেজিন জাতীয় পদার্থ প্রস্তুত করলেন। আগেও কয়েকজন বিজ্ঞানী এই জাতীয় বস্তুর গবেষণাগারের মধ্যে সৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন কিন্তু তাঁরা এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেননি। তখনও পর্য্যন্ত জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা কোন বস্তুর উদ্ভব হলে তা হয় তরল অথবা কেলাস চরিত্রের কঠিন পদার্থ হবে। সুতরাং কোন পরীক্ষাতেই যদি এর ব্যতিক্রম ঘটতো তাহলে নতুন রাসায়নিক পদার্থের প্রতি বিজ্ঞানীরা মোটেই মনোযোগ দিতেন না। ডাঃ বেকেল্যাণ্ড জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানীদের এই সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী অগ্রাহ্য করে জগৎকে এই আশ্চর্য্য পদার্থ উপহার দিলেন। এই বস্তুটির আবিষ্কার বহু শিল্পকে নতুন আকার দিলো; সূচনা করলো আর এক নতুন শিল্পের যা প্লাষ্টিকশিল্পরূপে আজ মানবসভ্যতার ইতিহাসে মহাগুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই শ্রেণীর দ্রব্য দেখতে চমৎকার, দীর্ঘস্থায়ী, এ ছাড়া নানা প্রকার গুণাবলীর জন্য শিল্পক্ষেত্রে এর মর্য্যাদার পরিসীমা নেই। একে অতি সহজেই ছাঁচে ফেলে যে কোন দুরূহ আকার দেওয়া যায়। প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে একত্রে যে সব বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সন্নিবেশ ঘটেছে, তা যে কোন দ্রব্যের মধ্যে পাবার কল্পনা করাই দুষ্কর।

ডাঃ বেকেল্যাণ্ডকে কিন্তু ১৯০৯ সালে প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার করে সুপ্রচলিত করতে কম পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়নি। কোম্পানীর পরিচালকবর্গকে এই বস্তুটির অতিপ্রয়োজনীয় বহুমুখী ব্যবহারের সম্ভাবনার বিষয়ে স্থির নিশ্চিত করবার জন্য, সেই যুগেই তিনি এর প্রায় তিরিশটি সম্ভাব্য ব্যবহারের বিষয়ে পরামর্শ দেন। কয়েক বছরের মধ্যেই আবিষ্কর্ত্তার কীর্ত্তির চিহ্ন নামের মধ্যে বহন করে বেকোলাইটের গুঁড়া বাজারে আত্মপ্রকাশ করলো। বেকোলাইটের নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়লো। শিল্পক্ষেত্রে সংশ্লেষিত প্লাষ্টিকের প্রধান উদাহরণ বেকোলাইটের আণবিক কাঠামো প্রকাণ্ড, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ছোট ছোট আণবিক কাঠামো সমন্বিত অংশের সংযুক্তির মধ্যে দিয়ে এই বস্তুটির সৃষ্টি ঘটেছে। সেলুলয়েডের সঙ্গে বেকোলাইটের প্রধান তফাৎ এই খানেই। সেলুলয়েডে প্রস্তুতের প্রধান উপকরণ সেলুলোজ নাইট্রেটের আণবিক কাঠামোর মধ্যে পরমাণুগুলি আগের থেকেই বিরাট এক শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সন্নিবেশিত থাকে কিন্তু বেকোলাইটের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আণবিক কাঠামোর সংযুক্তি ঘটে বিশেষ ধরণের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সহায়তায়। এই পদ্ধতির ফলে এক ধরণের অণুর সঙ্গে ক্রমাগত আর এক ধরণের অণু একই ভাবে যুক্ত হয়ে, পরিশেষে সবকিছু মিলে-মিশে এক বিশাল ও জটিল আণবিক কাঠামোর সৃষ্টি করে।

ফেনল সহযোগে প্রস্তুত প্লাষ্টিক সমূহের রঙ বড় গাঢ়, তাই ফিকে বা হালকা রঙের উজ্জ্বল প্লাষ্টিক আবিষ্কারের জন্য প্রচেষ্টা সুরু হলো। দেখা গেল, ফেনলের পরিবর্ত্তে ইউরিয়ার (uria) সঙ্গে ফরমালডিহাইডের যদি সংযুক্তি ঘটে তাহলে ফিকে বা উজ্জ্বল, অত্যন্ত নয়নলুব্ধকর প্লাষ্টিকের গুঁড়া পাওয়া যায়। যে রাসায়নিক কার্য্য-কারণের দ্বারা ছোট ছোট আণবিক কাঠামো সমন্বিত বস্তুসমূহ ক্রমাগত পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে, জটিল কাঠামোর সৃষ্টি ঘটিয়ে রেজিন জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় তার নাম পলিমারাইজেসন (polymerization)।

ইউরিয়া যে ফরমালডিহাইডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি রেজিন জাতীয় দ্রব্যের উদ্ভব ঘটায়, তা জনৈক বিজ্ঞানী ১৮৯৭ সালে পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন। এরপর বহু দিন অনাদৃত হয়ে পড়ে থাকবার পর ১৯২০ সালে আবার বস্তুটি অনেক বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ফ্রিটস পোল্লাক (Fritz Pollak) এবং কুর্ট রিপপার (Kurt Ripper) এর উপর অনেক গবেষণা চালান। ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল, এই দশ বৎসর প্লাষ্টিকশিল্পের অগ্রগতির ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে। এই সময়ে কেবল শিল্পক্ষেত্রে ইউরিয়া প্লাষ্টিকের উৎপাদনই কেবল শুরু হয় নি, সংশ্লেষিত জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব্ব উন্নতির জন্য প্লাষ্টিক-শিল্পের বিস্তৃতির সম্ভাবনা আরও ব্যাপকরূপ ধারণ করেছে। প্রয়োজনীয় জৈবপদার্থের অণুগুলি একক হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে জটিল শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সম্মিলিত হয়ে প্রকাণ্ড প্লাষ্টিক-অণুর উৎপত্তি ঘটায়। ১৯২০—৩০ সালের মধ্যে রসায়ন বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি, নানাপ্রকার জৈবরসায়ন দ্রব্য অতি সুলভে উৎপাদন করবার উপায়ের সন্ধান দিল। এই সব জৈবরসায়ন দ্রব্য সমূহের অনেকগুলিই পরে দেখা গেল, প্লাষ্টিকশিল্পে নিয়োগ করা সম্ভব। বিভিন্ন শ্রেণীর প্লাষ্টিক উৎপাদনের চেষ্টায়, পরীক্ষামূলক ভাবে নিয়োগ করবার জন্য অতি সুলভে নানাপ্রকার রসায়ন দ্রব্যের সন্ধান দিয়ে এই দশক প্লাষ্টিক-শিল্পের অগ্রগতির অত্যন্ত সহায়তা করেছে।

প্লাষ্টিক-শিল্পের ইতিহাসে আর একটা কারণেও এই দশকের মর্য্যাদা খুবই বেশী। এই সময়েই বিজ্ঞানীরা বিরাট ও বিশাল শৃঙ্খলাবদ্ধ অতি ভারী প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্যের অর্থাৎ পলিমার

(Polymer) কাঠামোর চরিত্র নির্ণয় করেন। পলিমার কাঠামো বিষয়ে জ্ঞান লাভ করায়, বিজ্ঞানীরা আগের থেকেই অনুমান করে নিতেন, ঠিক কি ধরণের জৈব রসায়ন দ্রব্যসমূহের অণুগুলি এককরূপে ক্রমান্বয়ে সংযুক্ত হয়ে কি শ্রেণীর প্লাষ্টিকের উদ্ভব ঘটাবে। প্লাষ্টিক-অণুর আকার এবং তার কাঠামোর প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান নতুন নতুন নানা চরিত্রের প্লাষ্টিক সৃষ্টির পথ সুগম করে দিল। এই দশকে প্লাষ্টিক শিল্পে,—প্লাষ্টিক নামটি সর্বপ্রচলিত হয়ে উঠে, এবং প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থের গবেষণার ক্ষেত্রে আর একটি অতি মূল্যবান ঘটনা সংঘটিত হয়। আমেরিকার ক্যারোথারস (Carothers) বিশাল আণবিক কাঠামো সমন্বিত বস্তুসমূহের সংশ্লেষণ এবং তাদের কাঠামোর চরিত্র বিষয়ে গবেষণা করতে করতে নাইলন (nylon) প্রস্তুত করলেন। নাইলন প্লাষ্টিক জাতীয় একটি সংশ্লেষিত পদার্থ,—এর সর্বপ্রকার গুণ ও ব্যবহার প্রকৃতিজ সিল্কের অনুরূপ।

প্লাষ্টিক-শিল্পের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের প্রাথমিক পর্য্যায়ের এই হোল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তারপর গত তিরিশ বছরে সংশ্লেষিত জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানের জটিল বিজ্ঞান গবেষণার পথ ধরে এই শিল্প দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। আজকের দিনে নানাপ্রকার ব্যবহারিক সুযোগ ও সুবিধার জন্য আমাদের জীবনযাত্রায় আজ এ এক অপরিহার্য্য মর্য্যাদার অধিকারী। মানব সভ্যতার সুরু প্রস্তরযুগের মধ্যে দিয়ে, তারপর এক এক করে এগিয়ে এলো তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জ-যুগ এবং লৌহযুগ। আজকের নতুন যুগের নাম কেউ করেছেন আণবিক যুগ, আবার কেউ বলছেন এ হোল অ্যান্টিবায়োটিকের যুগ। কিন্তু লৌহসভ্যতার মতো আজকের সভ্যতাকে প্লাষ্টিক সভ্যতা নাম দিলে কেউ আপত্তি করতে পারবেন না।

যে কোন পরিবেশে নানা বিষয়ে এই প্রকাণ্ড অণুবিশিষ্ট বস্তুসমূহ অসাধারণ কার্য্যক্ষমতার পরিচয় দেয়। আণবিক শক্তির সঙ্গে এই সংশ্লেষিত জৈবরসায়ন দ্রব্য আবার মিতালী পাতিয়েছে। কিছুদিন আগে হারওয়েলের আণবিক বিজ্ঞানী ডাঃ চার্লসবি (Dr. A. Charlesby) জানিয়েছিলেন, কোন কোন প্লাষ্টিক জাতীয় দ্রব্য 'গামা রে' দ্বারা আক্রান্ত হলে এই পদার্থের চরিত্র একেবারে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্ত্তনের ফলে, ঐ সব বিশাল অণুবিশিষ্ট পদার্থগুলি থেকে যে নতুন বস্তুর উদ্ভব হবে, তা আবার শিল্প ক্ষেত্রে প্রবেশ করে মানব সভ্যতাকে নতুন ভাবে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে পারে। তবে একথা নিশ্চিত, পরমাণু শক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের দ্বারা প্লাষ্টিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ সাফল্যজনক বিরাট পরিবর্ত্তন আসবে।

আজকের দিনে শিল্পক্ষেত্রে বহু বিষয়েই প্লাষ্টিক নানাপ্রকা ধাতুর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন কি, সাম্প্রতিক এক সংবাদ প্রকাশ—সোভিয়েট রাশিয়া প্লাষ্টিকে নির্মিত এক ছোট জাহাজ নির্ম্মাণ করেছেন। এই জাহাজের ওজন দেড় টন এবং সবচে আশ্চর্য্যের কথা, এই দেড় টন জাহাজ প্রায় পনেরো টন ওজন বহন করতে পারে। ঠাণ্ডা ও গরম উভয় পরিবেশেই এই জাহাজ খুব মজবুত, তাছাড়া অগভীর জলে চলাচল করবার বিশেষ উপযোগী। গত মহাযুদ্ধের সময় প্লাষ্টিকের যে বহুমুখী ব্যবহারের পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম, আজকের দিনের প্লাষ্টিক সভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতি তার গৌরবকেও ম্লান করে দিয়েছে। আগামী যুগে এই বস্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে ধাতব সভ্যতার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে, তাতে বিজ্ঞানী মহলের কোন সন্দেহ নেই। বহুক্ষেত্রেই বর্ত্তমানে নানা প্রকার প্লাষ্টিক, প্রকৃতি অনুযায়ী ননফেরাস ধাতুসমূহের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে কোন উন্নতিকামী জাতিই বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে প্লাষ্টিক বিষয়ক গবেষণাকে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেন এবং সুযোগ সুবিধা দেন। আগামী কালে হয়তো আপনার উত্তরপুরুষ কেবল প্লাষ্টিকের ঘড়ির ব্যাণ্ডই পরবে না—প্লাষ্টিকের বাড়ীতে বাস করবে। আর অফিস যাবে প্লাষ্টিকের ট্রামে বাসে,—প্লাষ্টিকের টাকা-পয়সায় প্লাষ্টিকের টিকিট কিনে।

—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

# স্বাধীনতা

( পি, বি, শেলী )

বহ্নিমান পর্বতেরা দেয় একে অন্যের উত্তর ;
বজ্রনাদে তাহাদের প্রতিধ্বনি জাগে দিকে দিকে ;
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সিন্ধুদল জাগাইয়া যাথে পরস্পর,
এবং হিমশৈলচয় চূর্ণ হয় শীতেরই সম্মুখে,
ঝড়ের বিষাণ যবে বাজিয়া ওঠে এ বিশ্বলোকে।

এক খণ্ড মেঘ হ'তে খসে-যাওয়া বিদ্যুৎ-ঝলক
ব্যাপ্ত হয়ে চারিভিতে সহস্র দ্বীপের আলো হয়,
ভূমিকম্প করে যায় লীলা তার অতি ধ্বংসাত্মক—
নগরী পোড়ায়, শত লক্ষ দ্বীপে ত্রাস সঞ্চয় ;
ভূমির গর্ভেও তার জাঁতার ঘর্ঘর শ্রুত হয়।

তথাপি তোমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর বিদ্যুৎ হ'তেও,
ভূ-কম্প থেকেও দ্রুত পদক্ষেপ কর স্বাধীনতা ;
ডুবাইয়া দাও তুমি বারিধির ভীম গর্জনেও
আনে তব দৃষ্টিপাত অগ্নিবর্ষী পর্বতে ম্লানতা ;
আগ্নেয়ার আলো নহ তুমি এক সৌর ভাস্বরতা।

ঊর্মি হ'তে, গিরি হ'তে বাষ্প-আবরণ হ'তে আর
রবি-রশ্মি ছুটে যায় কুজ্ঝটি ও পবন ভেদিয়া ;
আত্মা হ'তে আত্মান্তরে, জাতি হ'তে অপর জাতিতে
সর্বগ্রাম জনপদে যায় তব আলো বিস্তারিয়া,
ভূ-স্বামী ও ভূমিদাস ত্রিযামার তিমির সমান
প্রভাত-আলোকে তব কেঁপে কেঁপে যায় মিলাইয়া।

অনুবাদ : জীবনকৃষ্ণ দাশ।
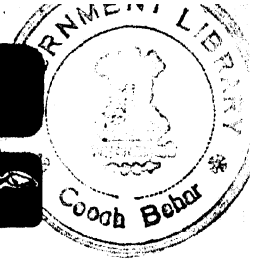
## নোবেল কমিটির উদ্দেশ্য সফল

পৃথিবীবিখ্যাত নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে লব্ধপ্রতিষ্ঠ রুশ কবি ও সাহিত্যিক বোরিস প্যাস্তারনাক নামক একজন বয়োজ্যেষ্ঠকে। এই লেখকের কাব্যসাহিত্যের সমাদর করেছেন বহু সমালোচক। কবির লেখা সত্যিই প্রশংসনীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই নোবেল পুরস্কারের মান থাকছে না আর। রাজনৈতিক কারণটাই পরিষ্কার হয়ে উঠছে, পুরস্কার দেওয়ার রীতিনীতিতে। উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠতা, জীবনবোধ ও সমষ্টিগত সমস্যার সমাধানের পথ প্রদর্শন যে সাহিত্যে নেই তেমন কোন লেখা কখনও ইতিপূর্বে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়নি। প্যাস্তারনাকের লেখা বিদেশে তেমন কেউ না পড়লেও নোবেল কমিটি কর্তৃক পুরস্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের চোখ প'ড়েছে তাঁর পুরস্কৃত গ্রন্থটির প্রতি। এই গ্রন্থে লেখক রুশ বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ চিত্র এঁকেছেন। সুতরাং বিপ্লবী রুশ সরকার এই বইখানির বিরুদ্ধে সুর তুলবেন, লেখককে রুশ লেখকগোষ্ঠী থেকে বহিষ্কার করবেন, সহজেই অনুমেয়। নোবেল কমিটি বর্তমানে যাঁদের দখলে তাঁরা নিশ্চয়ই অন্তরালে থেকে হাসাহাসি করছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য কাজে লেগেছে। রাশিয়া ক্ষিপ্ত হয়েছে, অন্য পক্ষ খুশী হয়েছে।

দেশে দেশে এখন লেখকদের সম্মুখে বহুতর সমস্যা। সত্য কথা বললে অনেক বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়। সত্য কথা লিখলেও তাই। কথা হচ্ছে এই, জাতীয় সরকারের অর্ডার মানতে পারবেন কি পৃথিবীর লেখককুল? মাথা বিকিয়ে দিতে পারবেন সরকারের পাদমূলে?

## বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ

বাঙলা দেশের প্রায় সকল সাময়িক পত্রপত্রিকা এ বছরেও যথারীতি শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশ করেছেন, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা খুব বেশী বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। অন্যান্য বছরের মত স্ফীতকায়া বিশেষ সংখ্যা অধিক নজরে পড়লো না। অনেকে আবার শুধু মাত্র নিয়মরক্ষার খাতিরে বিশীর্ণ কলেবরেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। লেখকদের লেখা সম্পাদক সসম্মানে ছেপেছেন। গত বিশ বছর আগের শারদীয়া সংখ্যার সূচিপত্র বর্তমানের সঙ্গে আমরা মিলিয়ে দেখছিলাম। লক্ষ্য করলাম, অঙ্গ-সজ্জা, বিষয়বস্তু, পরিবেশনের রূপ সবই ট্রাডিশন বজায় রেখে চলেছে। পূর্বসূরীদের এমন অদ্ভুত অনুকরণ সচরাচর দেখা যায় না। যাই হোক, ফ্রেম পুরাতন হ'লে ক্ষতি নেই, ফ্রেমের মধ্যের ছবি যদি পুরানো হয়, আপত্তির কারণ যথেষ্ট আছে। যে ছবি আমরা বার বার দেখেছি তাদের আবার দেখতে কেউ অর্থব্যয় করবেন না। ১৩৬৫ সালের বাঙলা শারদীয়া সংখ্যার অধিকাংশ গল্প আর প্রবন্ধ পড়তে পড়তে হতাশ হতে হবে। এই হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে কলকাতার খ্যাতিমান ও প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা ঘোরতর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সাহিত্যে যারা নবাগত, যারা সবে মাত্র হাত মক্স করছেন তাঁরা অপাঠ্য লিখতে পারেন। যা মন চায় আবোল তাবোল বলতে পারেন—এটা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু সাহিত্যে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত, তেমন পাকাপোক্ত রসিকচিত্ত যদি শুধু মাত্র বয়সের দাবীতে অসাহিত্যিক রচনা লিখে চলেন একের পর এক, আমরা জানি প্রতিবাদ জানাতে সাহস হয় না কারও। সাহিত্যের আনাচে কানাচে বিরুদ্ধ সমালোচনার গুঞ্জন চলে। এই ধরণের খ্যাতিমান লেখকদের অনেকে সাহিত্যের সার্টিফিকেট লিখছেন ইদানীং। এবং বলতে বাধা নেই একই মুখে স্বীকার করছেন, বই না পড়েই মন্তব্য জানিয়েছেন। এমন কথার যুক্তি কি থাকতে পারে, পাঠক বাতলাতে পারেন?

শারদীয়া সংখ্যার কোন কোন খ্যাতিমান লেখকদের লেখা সম্পর্কে এধারে সেধারে ইতিমধ্যেই ছাপার অক্ষরে কিছু কিছু আলোচনা দেখা দিয়েছে। প্রবন্ধ বা গল্পরচনা অপেক্ষা গল্প আর উপন্যাসের বিরুদ্ধ আলোচনাই চলছে। অর্থাৎ আমাদের সাহিত্যের অরিজিনাল বা মৌলিক লেখাই আলোচ্য। কিন্তু আমাদের ধারণা, পুরস্কারপ্রাপ্ত পাকাপোক্ত সাহিত্যিকরা বিনা দ্বিধায় পূর্ববৎ লিখতেই থাকবেন, থামবেন না। কেন না কোন কোন প্রকাশক ছাপার অক্ষরে লেখা দেখলেই বিনা বিচারে বই ছাপতে বদ্ধপরিকর। দাদনের লোভ সামলানো যায় না! অন্য দেশে সাহিত্যিক তাঁর রচনাশক্তি লুপ্ত হলে অবসর গ্রহণ করেন। পাঠকপাঠিকাকে উত্যক্ত করেন না। আমাদের দেশে সবই বিচিত্র!

## সাহিত্যে তান্ত্রিক যুগ

সাহিত্যের লুকানো আসর বসে কলকাতার কলেজ স্ট্রীটের ইদিক সিদিকে। চা, পান, সিগারেট, চপ-ডেভিল, চিকেন কাটলেট সহযোগে —প্রবীণ এবং নবীন লেখকদের বৈঠক চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এক পাশে প্রকাশকের কাউন্টার, অন্য পাশে চা-চক্রের চতুর্দিকে দিকপাল থেকে সদ্যফোটা সাহিত্যিকের হাসি আর গল্পগুজব। খুব নিরীহ ছবি—কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। বাঙলা সাহিত্যের অসীম সৌভাগ্য যে লেখকরা তেমন আগের মত হোটেল রেস্তোরাঁ-বার ঘেঁষে যাওয়া আসা করেন না। ফরাসী বেদিয়া বোহেমিয়ান শিল্পী-সাহিত্যিকের অনুকরণে বাঙলা দেশেও বহু সাহিত্যিক এই ছন্নছাড়া জীবন যাপন করেছেন। বর্তমানে এমন আত্মঘাতী ভাববিলাসের অভ্যাস বিরল বললেও চলে। তদুপরি বাঙালী সাহিত্যিকদের পরস্পরের মিলনের পথে দুস্তর বাধা। লেখকদের কোন ক্লাব নেই, একত্র হওয়ার স্থান নেই কোথাও। কোন কোন লেখক তাঁর গৃহে মিলনের ব্যবস্থা করেন—তাও সীমাবদ্ধ।

রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নীতিবাদের লড়াই আছে ফল্গুধারার মত গোপনগামিনী। তাই প্রকাশকের কুটরীর একফালি টেবিল ব্যতীত লেখকদের মেলামেশার যোগা স্থান আর কোথায় মিলবে ?

তবে জেনে অনেকেই খুশী হবেন প্রায় সব প্রকাশকের ঘরোয়া বৈঠকেই একটি মাত্র আলোচনা বর্তমানে 'জিজ্ঞাসা ? ? ?' হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটি—বাঙলা সাহিত্যে কোন যুগ চলেছে ? কার যুগ চলেছে ?

বঙ্গদর্শনের যুগ যাওয়ার সঙ্গে সাধনার আমল, ভারতী যুগের পর সবুজপত্র কল্লোল যুগও গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ, রবীন্দ্রনাথের যুগ, শরৎচন্দ্রের যুগ অনেকেই বলেন, শোনা কথা।

এই গুঞ্জরিত প্রশ্নের উত্তরও লেখকদের কেউ কেউ বলছেন,—বাঙলা সাহিত্যের হাল-আমলে ঘোর তান্ত্রিক যুগ আবার ফিরে এসেছে। ছদ্মবেশে অদ্ভুত ভেকধারী হ'তে হবে! ঘোর গৃহী হলেও গেরুয়া ধারণ করতে হবে! নারীমাংসের আহুতি দিতে হবে সাহিত্যের হোমানলে! তন্ত্রের জঘন্য রূপ ফুটবে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গে! তীর্থের আর পুণ্যের নামে 'পরনোগ্রাফী' সৃষ্টি করতে হবে। কলিতীর্থে এই বামাচারী পন্থা ভিন্ন নান্যঃ পন্থা! ততঃপর কংগ্রেসের উচ্চমহলে হাত থাকলে মা ভৈঃ! পুলিশও রেহাই দেবে। হাজারে হাজারে সংস্করণ হবে। আমাদের তাই অনুরোধ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন অনায়াসে সেই বিখ্যাত নিষিদ্ধ অশ্লীল বইগুলি পুনরায় চালু করতে পারেন। অর্ডার তুলে নিলেই চলবে। ব্যস!

# উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

## যুগে যুগে যার আসা

অজ্ঞানতার অন্ধকারে, অন্তরের দীনতায় অন্যায়ের প্রাবল্যে পৃথিবী যখন ভরপুর, নিপীড়িতা, জর্জরিতা ঠিক সেই সময়ে ধরার ব্যথাতুর বক্ষে পড়ে ভগবানের শুভ-পদার্পণ। ভগবান দেখা দেন যুগত্রাতা রূপে। পৃথিবীতে তিনি আবির্ভূত হন অন্যায় অশান্তি ও অসুন্দরের কবল থেকে তাকে মুক্ত করে শান্তি-সুন্দর ও পবিত্রতার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে। পৃথিবীর উপর আজ স্মরণাতীত কাল থেকে যুগ যুগ ধরে ভগবানের এই লীলার ধারাই বয়ে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যগগনে বাঙলার মাটি ধন্য হল রামকৃষ্ণের পদার্পণে। নররূপে আবার ভগবান এলেন ধরিত্রী থেকে অজ্ঞানতা কুসংস্কার কলুষতা দূর করতে তাঁরা উদাত্ত মেঘমন্দ্র মা ভৈঃ বাণীর পুণ্যপ্রভাবে বাঙলাদেশ ছেয়ে গেল ঋদ্ধিতে প্রজ্ঞায় মনীষায়। মানুষের বেশ নিয়ে ভগবান রামকৃষ্ণ মানবধর্ম সম্বন্ধে এক নতুন উপলব্ধি জাগালেন মানবচিত্তে। এই জ্যোতির্ময় পুরুষের পদপ্রান্তে বসে অগণিত নরনারী শ্রদ্ধাকুল চিত্তে শুনেছে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী যে সব বাণী জীবনের ক্ষতস্থান সমূহে দেখা দিয়েছে কল্যাণকর প্রলেপের মত। অর্ধশতাব্দীকাল স্থায়ী ঠাকুরের মর্ত্তজীবনের আলোকোজ্জ্বল ঘটনাগুলিকে অবলম্বন করে পূর্বোক্ত জীবনীগ্রন্থটি রচনা করেছেন স্বামী সত্যানন্দ। গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। ভাষার লালিত্যে ও বর্ণনকুশলতায় গ্রন্থটি পাঠকচিত্ত জয়ে সমর্থ হবে। সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যে লেখকের এক অবর্ণনীয় দরদ ও নিষ্ঠার ছাপ প্রকট হয়। বর্তমান বাঙলার জীবিত-জ্যেষ্ঠ কবি শ্রদ্ধেয় কুমুদরঞ্জন মল্লিক ভূমিকা রচনা করে গ্রন্থটির মর্য্যাদাবৃদ্ধি করেছেন। প্রকাশক—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবায়তন, ২ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, বরাহনগর। দাম পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## বাঙলা সাহিত্যের রূপ-রেখা
### ( দ্বিতীয় খণ্ড )

অতীত বর্তমানের বুকেও নিজের আসন অটল রাখে সাহিত্যের কল্যাণে। মানুষের মনের গহন কোণে হঠাৎ কোন এক বিশেষ লগ্নে যে চিন্তাধারা জন্ম নিল—লেখনীর মাধ্যমে সেই চিন্তাধারার প্রকাশ টল সাহিত্যের তকমা এঁটে। আজকের দিনের বাঙলা সাহিত্যের যে বিশ্বব্যাপী সমাদর তার পিছনে আছে এক বিরাট পটভূমিকা—বাঙলা সাহিত্যের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস। ১৮৫০ থেকে ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত—নির্দিষ্ট সময়টির মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা লেখক সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এই সাতান্ন-আটান্ন বছরে যে চমকপ্রদ বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের গতিধারা এগিয়ে চলেছিল সেই সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা পরিবেশন করেছেন লেখক গোপাল হালদার পূর্বোক্ত গ্রন্থটির মাধ্যমে। গ্রন্থটিকে তিনি কেবলমাত্র নীরস তথ্যের চাপে ভারগ্রস্ত করেন নি। জীবন-দর্শন থেকে সাহিত্যের সৃষ্টি। সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র অবিচ্ছেদ্য। তাই বাঙালীর সাহিত্য সাধনার ইতিহাস আলোচনাকালে বাঙালীর সমকালীন জীবনধারার পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। উপরোক্ত গ্রন্থে গোপাল হালদার সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বাঙালী জীবনের সমগ্র পরিবেশটি লেখনীর দ্বারা রূপায়িত করে গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। প্রকাশক—এ, মুখার্জী য্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

## নতুন ইয়োরোপ, নতুন মানুষ

শক্তিমান সাহিত্যিক মনোজ বসুর সৃজনী ক্ষমতা কেবলমাত্র উপন্যাস ও গল্প রচনাতেই গণ্ডিবদ্ধ নয়। ভ্রমণকাহিনী রচনাতেও তাঁর লেখনী সিদ্ধহস্ত। মহাচীন এবং মহারুশ ভ্রমণ করে ভ্রমণজাত অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত ইতঃপূর্বে মাসিক বসুমতীতেই লেখক লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উপরোক্ত গ্রন্থটিতে তাঁর ইয়োরোপ ভ্রমণের খুঁটি-নাটি তথ্য পর্যন্ত বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে। লেখক শুধু মাত্র পর্যটকই নন, তিনি দ্রষ্টাও বটে। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন এবং এই বিভিন্নতা থেকে যে বৈচিত্র্যের জন্ম সেই বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করেছেন লেখক প্রাণ ভরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধরূপী দৈত্যের ধ্বংস-নৃত্যের পৈশাচিক লীলা শেষ হবার পর তার জের টেনেও আজকের দিনে যে নতুন ইয়োরোপ গড়ে উঠছে, আজকের যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যে ভাবে তাদের দেশের জনসাধারণ হাত মিলিয়েছে সে সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র লেখনীর দ্বারা অঙ্কন করেছেন মনোজ বসু। মনোজ বসুর প্রাঞ্জল বর্ণনায় এক এক সময়ে উদ্দিষ্ট দেশ ও

মানুষ বইয়ের পাতা ভেদ করে পাঠকের সামনে যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র কাহিনীটির মধ্যে লেখক এক প্রীতিপূর্ণ মৈত্রীর সুর ফুটিয়ে তুলেছেন, ভ্রমণের মধ্যে, ভাব-বিনিময়ের মধ্যে, আদান-প্রদানের মধ্যে, দুই বিরাট মহাদেশের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধন ক্রমশঃই উত্তরোত্তর বলিষ্ঠ হোক, নিবিড় হোক, চিরস্থায়ী হোক—গ্রন্থের মধ্যে লেখকের অন্তরের এই আবেদনই যেন রূপলাভ করেছে। এখানকার একাধিক আলোকচিত্র গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছে। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

## সাহিত্যরুচি

বাঙলা সাহিত্যের প্রবন্ধের দরবারে সরোজ আচার্য এক বিশেষ আসনের অধিকারী। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধের সমষ্টি। গ্রন্থটিতে ষোলটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলি পাঠকের মনকে চিন্তার অপরিমাপ্য শীর্ষদেশে নিয়ে যায়। এই সুপাঠ্য সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি লেখকের যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে, সহস্র বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সামগ্রিক রূপ উদ্ঘাটনে তৎপর, মানুষের মানসলোকের প্রসারণে আগ্রহশীল। আজকের এই সমস্যাসঙ্কুল দিনে মানব সাধারণের ভবিষ্যৎ নির্মিত হোক চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে। পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে সরোজ আচার্যের লেখকসত্তা যেন বার বার এই কথাই বলতে চায়। প্রকাশক—ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

## এগারোটি বাঙলা নাট্যগ্রন্থের দৃশ্য নির্দশন

বাঙলার সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশের নাট্যসাহিত্যের দানও কম নয়। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত রূপ যিনি আজ শতবর্ষ ধরে বাঙলার নাট্য সম্পদ যেভাবে দেশীয় সাহিত্যকে ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে আসছে, তার সাক্ষী দেবে ইতিহাস। ভারতচন্দ্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন, ঈশ্বর গুপ্ত, উমেশ মিত্র, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার, মনোমোহন ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ, রাজকৃষ্ণ প্রমুখ তৎকালীন এগার জন সাহিত্যরথীর এগারটি নাটক থেকে বিভিন্ন দৃশ্যসমূহ বেছে নিয়ে একত্রে সংকলিত করে পূর্বোক্ত গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ রায়। সংকলন গ্রন্থটি পাঠ করলে তখনকার নাট্যকারদের নাটক রচনার নৈপুণ্য, চরিত্রসৃষ্টির সফলতা, ঘটনাবিন্যাসের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। এগারো জনের এগারটি নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যসম্বলিত গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। বাঙলার তৎকালীন নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহশীল, এই সংকলন গ্রন্থটি তাঁদের বিশেষ ভাবে সহায়তা করবে। প্রকাশক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দাম—ছ' টাকা মাত্র।

## এক মুঠো আকাশ

সকল দেশের সকল সমাজের সবিশেষ নির্ভরস্থল যুবশক্তি। চিরকাল ধরে সমাজ বিশেষ করে নির্ভর করে আসছে যুবশক্তির [illegible] র, অমিত তেজের, হৃদয়ের উদারতার প্রতি। যুব-সাধারণই [illegible] ভরসা, ভবিষ্যতের মেরুদণ্ড, এত বড় পবিত্র দায়িত্ব যাঁ[illegible] তাঁদের জীবনের বোধন অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে সংযত ভাবে হওয়া উচিত। নতুবা তাঁদের স্খলন অনিবার্য—আর সেই স্খলন জাতীয় জীবনের ভাগ্যাকাশের কালো মেঘের রূপান্তর মাত্র। দুঃখের বিষয়, আজকের দিনে যুবসম্প্রদায় যে ভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যাধারায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছেন, যে ভাবে অবনতির অতল গহ্বরে ক্রমশঃ নিমজ্জিত হয়ে চলেছেন, দিনের পর দিন যে রকম দায়িত্ববোধশূন্য হয়ে পড়ছেন তা চিন্তা করলে ব্যথা ও বেদনারই উদ্রেক হয়। উপরোক্ত গ্রন্থটিতে এই বাস্তব সত্যেরই নগ্নরূপ উদ্ঘাটন করেছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। গ্রন্থটির সম্বন্ধে আশা করি মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার কাছে বিশেষ পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ অতি অল্পকাল পূর্বে মাসিক বসুমতীতে এই উপন্যাসটিই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে বহুজনের প্রশংসাভাজন হয়েছিল। সমাজের বুকে এই অমঙ্গলের ছায়াপাত লেখকের লেখকচিত্ত তথা মানবচিত্তকে পীড়া দিয়েছে, তারই প্রকাশ এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় পরিস্ফুট। লেখকের রচনাশৈলী আকর্ষণীয়, ঘটনাবিন্যাস মনোরম। সমাজের প্রতি লেখকের সহানুভূতি ও দরদ তাঁর লেখার মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে। প্রকাশক—গ্রন্থম, ২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, (পরিবেশক পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিঃ, পত্রিকা ভবন, বাগবাজার) দাম পাঁচ টাকা মাত্র।

## গ্রহে-উপগ্রহে

অনেক কিছুরই শেষ পাওয়া যায়, তবে যায় না কৌতূহলের। দিনের পর দিন যেমন এগিয়ে চলছে মহাকালের অভিমুখে তিল তিল করে, তেমনই মানব-মনের কৌতূহলেরও পরিমাণ বৃদ্ধি হচ্ছে তিলে তিলে। ক্রমে তার দৃষ্টি জগতের সীমাও ছাড়িয়ে যায় একদিন। এত বড় বিশাল জগতটার বাইরে এর থেকেও বৃহৎ আরো কত অসংখ্য জগৎ যে হাজারে হাজারে পাশাপাশি অবস্থান করছে, হয়তো যাদে[র] কাছে আমাদের এই জগতটাই একটা ধূলিকণা ছাড়া কিছুই নয়, তাদের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানার জন্য [illegible]

পূর্বোক্ত গ্রন্থটিতে এই না-বাঙলা, যা এনজয় করেছি সেদিন, পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিবেশনে ঘটে 'চালিস আণ্ট'—নীলার পিছু পিছু বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যা[য়] গেলো।

নেই, জড়তা নেই[illegible]য়ে বছর দুয়েকের বড়। গত বছর বি-এ বিষয়গুলিকে [illegible], পাশ করতে পারেনি বলে আবার এ বছর সাহিত্যিক প্রস্তুত হচ্ছে। আর চতুর্দশী নীলা ক্লাশ নাইনের ছাত্রী। দিয়েছেন[illegible] ম্যালরোডে উঠেই প্রশ্ন করলো নীলা, আচ্ছা দাদা, গ্রহাণীদের পছন্দ করেন না কেন রে?

[illegible] বোধ হয় বাঙলা দেশ নিয়ে মা'র গল্প করার অসুবিধে হবে [illegible]—মা তো বাঙলা দেশে বেশী যাননি, অথচ বাঙলার গল্প এনতার করে যান অবাঙালীদের কাছে—পরিচ্ছন্ন গলায় হাসতে হাসতে বললে অরুণেশ।

শেলি বললো, দাঁড়াও খোকন, মাকে গিয়ে আমি এ কথা বলে দেব।

চালিস আণ্ট দেখে আর কি তোর কিছু মনে থাকবে শেলি,—আমিই বরং মনে করে দেব'খন বাড়ি ঢুকে—এবারও অরুণেশ হাসতে হাসতে বললো।

নিবিড় স্পর্শে ভরপুর এই শিল্প। শিল্প এবং বিজ্ঞানের সংমিশ্রণে এই বিশেষ শিল্পটির সৃষ্টি ও প্রকাশ। যাদুরত্নাকর শ্রীএ. সি, সরকার প্রতিভাধর যাদুবিদ্যাবিশারদ, এই তরুণ যাদুশিল্পী ইতিমধ্যেই শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিশ্বেরও নানাস্থানে লাভ করেছেন স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। কয়েকটি যাদুক্রীড়ার প্রয়োগকৌশল যথোচিত নিপুণতার সঙ্গে উপরোক্ত গ্রন্থে আলোচনা সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। যাদুবিদ্যানুরাগীদের আকৃষ্ট করার মত যথেষ্ট উপাদান এই গ্রন্থে আছে। ভূমিকাটি লিখে দিয়ে গ্রন্থটির মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়। প্রকাশক—মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম দু'টাকা মাত্র।

### ছুট

'ছুট' কাহিনীটির মধ্যে প্রশান্ত চৌধুরী ও জয়ন্ত চৌধুরী দু'টি অনাথ হতভাগা বালককে কেন্দ্র করে এক চিত্তাকর্ষক সুন্দর গল্প পরিবেশন করেছেন। আকাঙ্ক্ষা উদ্যম ও অধ্যবসায়ের জয়লাভ যে সুনিশ্চিত এ সত্যই গ্রন্থটির মধ্যে পরিস্ফুট। নিপীড়িত বালক দুটি জীবনের বোধনলগ্নেই যে অজস্র অভিজ্ঞতার ও বৈচিত্র্যের স্পর্শে সজীব হয়ে উঠল এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বনিয়াদ গড়ে তুলল সে কাহিনী অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে লেখকদ্বয় বর্ণনা করেছেন। সর্বশেষে এই সত্যই প্রকাশ পেয়েছে যে দুর্যোগ ও ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে যে জীবনের যাত্রাপথে পা দেয়—সে পদার্পণের ফল অবশ্যই মধুময়। কাহিনীটির গ কোথাও ব্যাহত হয় না এবং এক স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে আবেগে কাহিনী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভরপুর। অজিত গুপ্তের আঁকা অনেকগু ছবি গ্রন্থটিকে আরও মনোরম করে তুলেছে। ছেলে-মেয়ে দরবারে আপন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের জন্যে এই গ্রন্থ যথোচিত সমা লাভ করবে বলে আশা রাখা যায়! প্রকাশক—ইণ্ডিয় য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ গান্ধী রোড, দাম দু' টাকা চার আনা মাত্র।

### মৃগতৃষ্ণা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশ্লেষণধর্মী উপন্যা এ উপন্যাসে প্রেমের যে রূপ দেখা যায়, জীবনের সীমান্তে এসে প্রেম শান্ত বিনম্র। তৃষ্ণা এখানে কামনার উত্তেজনায় রূপান্ হয়নি। উত্তেজনা সংযত হয়ে জীবনের গভীরতায় অবগাহ করেছে। সেইজন্যে বোধ করি উপন্যাসটিতে এক সহজ দার্শনি নির্লিপ্ততা আগাগোড়া পরিব্যাপ্ত। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখার বৈশিষ্ট্য তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। মনোবিশ্লেষণের মাধ্য তাঁর কাহিনীতে এক আত্মিক চৈতন্য প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটিতে তাঁর গভীর রসবোধের পরিচয়ে বিদগ্ধ পাঠকমা তৃপ্ত হবেন। মূল্য তিন টাকা। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি., ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট।

## ভালবাসা

### যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

হৃদয় দিয়ে বুঝিনি তাই শরীর দিয়ে খুঁজেছি,
ভালবাসার মূল্য বৃথা তর্ক দিয়ে বুঝেছি।
বুঝিনি আমি এমন বোকা, গিয়েছি বৃথা বকে ;
ঋ... ...ান জাহ্নবীর ভেবেছি উৎসকে।
...া ষড়ঋতুর রঙ্গে
...বাসার সঙ্গে।
...বে চিত্ত,
...ত্য।

## দিনান্ত

### সুখেন্দু মল্লিক

আয়ুর অঙ্কে আরেক আঁচড় কেটে
হাওয়ায় যখন ভাসলো কঠোর দিন
পিছনে তাকিয়ে দেখলে কি ভাবা আছে—
যা কিছু হারালো সবই কি পেয়েছো ফিরে ?

উত্তর হতে বাঁক নিয়ে ছোটে ঝড়
দক্ষিণে প্রিয় অরণ্য চুরমার।
তোমার হাতের গোলাপ শুকনো হলে
কেউ মিশে গেছে সমুদ্রে নীল ঢেউ-এ।

শ্যামল বঁধুর খেলায় রাজ্যপাট
ভাঙাগড়া খেলে সুখী যে হয়েছে মনে
এত দিনে ছায়া দাঁড়িয়েছে পাশে তার
বকুল ঢেকেছে চেনা গ্রাম-অঙ্গন।

আলো সরে গেছে, ক্ষুব্ধ চার দেয়াল
ভেঙে যায় আর আকাশে হলুদ চাঁদ।
আমরা হারাবো কুয়াশার দেশে প্রিয় ;
দমকা হাওয়ায় কাঁপে নিমীলিত নদী।

মেঘের আড়ালে কবে ঢেকে গেছে চিল,
চিল নয় আহা বেদনার স্বর ঝরে ;
ঝরাপাতা এনে একটু আগুন জ্বালো
আর একবার দেখবো তোমার মুখ।

( উপন্যাস )

নীলিমা দাশগুপ্ত

অফিস-ফেরতা কেশবশংকর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, যাবে নাকি একবার ক্যাথলিক ক্লাবে ?

মিসেস তরুবালা বিশ্বাস উল বুনতে বুনতে তরল সুরে উত্তর লন—কেন, ক্যাথলিক ক্লাবে কেন হঠাৎ ? ব্যাপটাইজড চ নাকি ?

হাল্কা হাসলেন এ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল কেশবশংকর। তুমি সিমলার ও দিকটা যাওনি তরু ? ক্যাথলিক চার্চ বলিনি, থলিক ক্লাব—আগে ওখানকার স্যুইট খৃশ্চান ছাড়া পেতেন না, ন যে কেউ থাকতে পারেন। তোমাকে বলেছি তো আমাদের ন বাবু ওখানকার একটা স্যুইট নিয়েছেন। ছুটি নিয়ে গেছলেন কন্যাকে আনতে, আজই এসে পৌঁছেচেন, তাই—

স্বামীর কথা কেটে তরুবালা বলে বসলেন, যাই বল, এ্যাকাউণ্টস সার অবাঙালী হলেই ভাল হ'ত কিন্তু, বাঙালী আমার তত লাগে না।

কেশবশংকর তো বিস্মিত হলেনই, পুত্র-কন্যারাও মা'র ছাড়া কথায় অবাক হ'য়ে মা'র দিকে চাইলো একবার, উত্তর শোনার পর কেশবশংকর আর ক্যাথলিক ক্লাবে যাওয়ার তুললেন না, বসে বসেই টাই-এর নট ঢিলে করতে লাগলেন। রা ভাইকে ঘিরে কলকাতার গল্প শুনছিলো, কেশবশংকরের ত্র পুত্র অরুণেশ ওরফে খোকন কলকাতায় হিন্দুহোষ্টেলে থেকে ডেন্সি কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, ইংরিজী অনার্সের ছাত্র। কন্যা নীলা হঠাৎ বাবার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো। রমেন বাবুর ক'টি মেয়ে ?

একটি, তোরই বয়সী হবে বোধ হয়—

দেখেছো নাকি তুমি ? ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন তরুবালা।

হাঁ, দেখেছি বৈ কি। ষ্টেশন থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে র রাস্তা পড়ে যে। রমেন বাবু স্ত্রী-কন্যাকে পথে অপেক্ষা বলে অফিসের প্রয়োজনে এসেছিলেন একটু, তখন দেখেছি।

গবাড়িয়ে পরামর্শ দিলে না একরাশ ? তরুবালার ঠোঁটের চেতন বাঁকা হাসি।

দিলে চলে ? যা ট্রেচারাস ওয়েদার সিমলার, আমরা র আছি তাই ঠিক পাইনে আবহাওয়ার, তাছাড়া স্বার্থ রু, স্ত্রী-কন্যা কেউ অসুস্থ হ'য়ে পড়লেই রমেন বাবুর কাজের র মানে আমার অফিস সাফার করবে। স্বামীর কথায় খুশি হ'ননি তরুবালা তা তাঁর মুখের চেহারাতেই বোঝা নীলা লাফিয়ে উঠলো, চল বাপি, মেয়েটির সঙ্গে আলাপ সি।

গম্ভীর গলায় রায় দিলেন তরুবালা।

মা ? নীলার বিস্মিত প্রশ্ন। তরুবালা নীরব রইলেন। ত দ্রুতহাতে এক লাইন উলবোনা শেষ করলেন, তারপর কে তাকিয়ে প্রসন্ন উদার গলায় বললেন, যাও না খোকন, নিয়ে 'চার্লিস আণ্ট' দেখে এসো 'গেইটি'তে। আজই ওয়ানডারফুল ড্রামা। আমরা সকলেই দেখেছি, নীলার ন ফাংশান ছিলো বলে ওর দেখা হয়নি।

আনন্দে নেচে উঠলো, চল দাদা, সেই ভাল—কোণ দিয়ে তাকালো অরুণেশ ছোটো বোনের দিকে, য়ে ইংরিজী ড্রামা দেখতে যাওয়া মানে তো আমার প্রাণান্ত, তোকে বোঝাবো না আমি নিজে দেখবো, শেলি তুইও তৈরী হ।

তরুবালা বললেন, শেলি তো দেখেছে, অনর্থক আবার পাঁচটা টাকা খরচ করা কেন ?

নীলা ভাবলে, শেষকালে ওর যাওয়াটাই না বন্ধ হয়। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, দাদা, আজকাল আমি ইংরিজী বেশ বুঝি রে, তোকে বিরক্ত করবো না।

তুই ঘাবড়াস না, তোর যাওয়া হবেই—তারপর তরুবালার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে অরুণেশ বললো, তোমাকে টাকা দিতে হবে না মা, আমার পকেটমানি জমেছে কিছু—

শেলি এবার লাফিয়ে উঠলো, যা এনজয় করেছি সেদিন, দুবার দেখার মত বই বটে 'চার্লিস আণ্ট'—নীলার পিছু পিছু শেলিও প্রস্তুত হতে চলে গেলো।

শেলি খোকনের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। গত বছর বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিলো, পাশ করতে পারেনি বলে আবার এ বছর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আর চতুর্দ্দশী নীলা ক্লাশ নাইনের ছাত্রী। চড়াইটুকু ভেঙে ম্যালরোডে উঠেই প্রশ্ন করলো নীলা, আচ্ছা দাদা, মা বাঙালীদের পছন্দ করেন না কেন রে ?

বোধ হয় বাঙলা দেশ নিয়ে মা'র গল্প করার অসুবিধে হবে বলে—মা তো বাঙলা দেশে বেশী যাননি, অথচ বাঙলার গল্প এন্তার করে যান অবাঙালীদের কাছে—পরিচ্ছন্ন গলায় হাসতে হাসতে বললে অরুণেশ।

শেলি বললো, দাঁড়াও খোকন, মাকে গিয়ে আমি এ কথা বলে দেব।

চার্লিস আণ্ট দেখে আর কি তোর কিছু মনে থাকবে শেলি,—আমিই বরং মনে করে দেব'খন বাড়ি ঢুকে—এবারও অরুণেশ হাসতে হাসতে বললো।
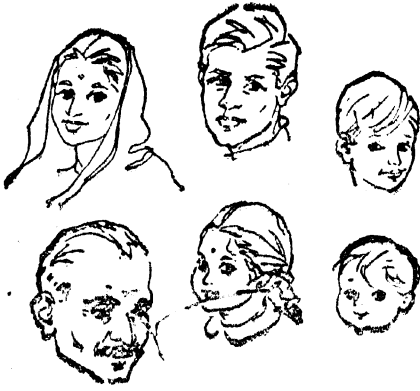
# আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গল্পসল্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন

"দ্যাখ্, আমি না হয় মুখ্যসুখ্য মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁ: যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন—"আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।"

রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিসুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

আমি অভ্যাস বশে ফিরে এলাম সানলাইট সাবান কিনে। রানীমা সানলাইট সাবান দেখে অনেকক্ষণ প্রাণ খুলে হাসলেন তারপর বললেন—"এত দাম দিয়ে সাবান কিনে আনলি; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সিল্কের জামাকাপড় তো কেউ পরেনা।" "কিন্তু রানীমা, আমার বাড়ীতে সব জামাকাপড়ই কাচা হয় সানলাইট সাবান দিয়ে।" রানীমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"বোনটি তুই বোধ হয় আমাদের বাড়ীর অবস্থা জানিসনা। আমরা এত দামী সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচব কি করে?"

আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হোল বলে ওঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম না। আমি রানীমাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে আবার ফিরে আসব কিন্তু কাজে এমন আটকে গেলাম যে আমার আর রানীমার কাছে যাওয়াই হোলনা।

বিকেলে আমার বাড়ীর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি রানীমা। বললেন—"ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন। সানলাইট সত্যিই আশ্চর্য্য সাবান। একবার দেখে যা!"

রানীমার উঠোনে গিয়ে দেখি সারি সারি পরিষ্কার, সাদা, উজ্জ্বল কাপড় টাঙানো—যেন একটা বিয়ের মিছিল চলেছে। রানীমা আমার কানে কানে বললেন—"আমি এত কাপড়জামা ধুয়েছি কিন্তু এখনও কিছুটা সাবান বাকী আছে···এ সাবানটা দামী নয়, মোটেই নয়—বরং সস্তাই।"

রানীমা বসে পড়লেন, তারপর বললেন "আমাকে একটা কথা বল তো। আমি শুনেছিলাম সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড় আছড়াতে হয়না। সেই জন্যে আমি শুধু সানলাইটের ফেণায় ঘষেই জামাকাপড় কেচেছি···তাতেই জামাকাপড় এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে···হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম, আচ্ছা বলতো সানলাইট সাবান এত ভাল হোল কি করে?" আমি রানীমাকে বোঝালাম—"রানীমা, সানলাইট সাবানটি একেবারে খাঁটি; তাই এতে ফেণা হয় প্রচুর। আর এ ফেণা কাপড়ের সুতোর ভেতর থেকে লুকোনো ময়লাও টেনে বের করে।"
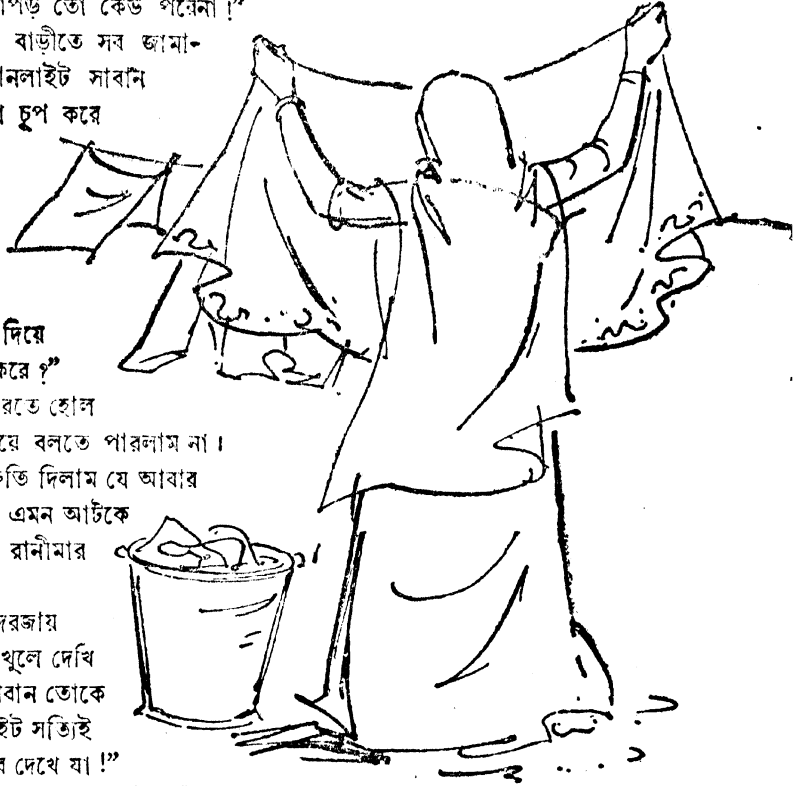
"ও! এখন বুঝেছি সানলাইট দিয়ে কাচলে জামাকাপড় কি করে এত তাড়াতাড়ি এত পরিষ্কার আর উজ্জ্বল হয় ওঠে। আর সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও আমার পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানীমা বললেন—"এবার কি বলবি বল। আমার হাতে অনেক সময় আছে।"

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

S. 261B-X52 BG

ঘরদুয়ার দেখিয়ে স্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন রমেন, কেমন, বাড়ি পছন্দ হয়েছে তো সর্ব্বাণী ?

খু—ব। বেশ ভাল বন্দোবস্ত কিন্তু—পাশে দাঁড়ানো ইনু ওরফে ইন্দ্রাণী হেসে উঠলো, বাবা, মার কেন এত ভাল লাগছে জানো ? আমাদের খাবার একেবারে প্রস্তুত কিনা, তাই, ষ্টেশন থেকে মা ভাবতে ভাবতে আসছিলেন রান্নার লোক যখন ঠিক হয়নি তখন এই অবেলায় গিয়ে কি না জানি অসুবিধেয় পড়তে হয়। এসে দেখলেন, শুধু ভাত তরকারী নয়, চমৎকার রঙের মাংস পর্য্যন্ত তৈরী।

সর্ব্বাণী হেসে সায় দিলেন, তা খানিকটা সত্যি, তা কে এসব রাঁধলে ? তোমার ঐ লোকটি নাকি ?

রমেন বললেন, রামদয়ালের চৌদ্দপুরুষ এলেও অমন রং বার করতে পারবে না মাংসের। এ সব আমার দুই বন্ধুর রান্না ;—তোমার রান্নার গর্ব গেলো তো সর্ব্বাণী ?

প্রায়—মুখ টিপে হেসে উত্তর দিলেন সর্ব্বাণী, তোমার বন্ধুরা গেলেন কোথায় ? তাঁদের দেখছিনে ?

আসবে, আসবে। অফিস-ফেরৎ বিকেলে আসবে। এই তো কাছেই ওঁদের অফিস, রেলওয়ে বোর্ড বিল্ডিং-এ—কথা শেষ হবার আগেই রমেন যাঁদের কথা বলছিলেন, তাঁদের অদূরে দেখা গেলো।

আসুন ! আ—সুন ! আপনাদের কথাই হচ্ছিলো, উনি তো আপনাদের রান্নার রং দেখে মোহিত একেবারে—ততক্ষণে আগন্তুকদ্বয় সামনে এসে গেছেন। হাত তুলে নমস্কার করলেন আগে সর্ব্বাণীকে তারপর রমেনকে : নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে সর্ব্বাণী চোখ বড় করে তাকিয়ে রইলেন একটু। এরা তো একেবারে ছেলেমানুষ, বড় জোর বয়স বছর ত্রিশ হবে, এতক্ষণ এঁদেরই রমেন বন্ধু বন্ধু করছিলো, আচ্ছা মানুষ যা হোক !

ইন্দ্রাণী ভেতর থেকে দু'হাত দিয়ে দুটো চেয়ার নিয়ে এলো। রামদয়াল মৃদুগলায় প্রতিবাদ করে ছুটে গিয়ে ইন্দ্রাণীর হাত থেকে চেয়ার দুটো নিতে যাচ্ছিলো, ঘাড় নেড়ে বারণ করলে ইন্দ্রাণী, চেয়ার দুটি আগন্তুকদের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললো, বসুন।

থ্যাঙ্ক ইউ—অমল, রথীন একসঙ্গে ধন্যবাদ জানালেন ইন্দ্রাণীকে। তারপর রমেনের দিকে চেয়ে হাসিমুখে অমল বললেন, কিন্তু, এখন আমরা বসবো না রমেনদা', অফিস পালিয়ে এসেছি—

একটু বসুন, পরিচয়টা তো হয়ে যাক—স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে রমেন বললেন, ইনি অমল গাঙ্গুলি আর উনি রথীন ব্যানার্জি, এঁরা শুধু আমার বন্ধু নন, সিমলার সমস্ত বাঙালীদের বন্ধু,—ভারসাটাইল জিনিয়াস,···পড়া-শোনা, গান-বাজনা, ছবি আঁকা, রান্না—আরো যে কত-কিছু জানেন, এঁদের গুণাবলী একমুখে বলে শেষ করা যাবে না—তারপর অমল-রথীনের বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আর এ আমার মেয়ে ইন্দ্রাণী, এবার ম্যাট্রিক দেবে আর ইনি ইন্দ্রাণীর মা।

যাক্ বাবা বাঁচা গেলো, মিসেস দত্ত নন তাহলে—স্রেফ আমাদের বৌদি—এতক্ষণে স্বাভাবিক হ'তে পেরে এগিয়ে এসে টপ্ ক'রে পায়ের ধূলো নিলেন অমল গাঙ্গুলি। রথীনও তাই করলেন। সর্ব্বাণী যেন আড়ষ্ট হ'য়ে পড়লেন একটু, একে একেবারে অচেনা, তায় বামুন। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। তারপরই সহজগলায় মেয়েকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, ইনু, কাকাদের প্রণাম করলিনে ? ইনু যেন প্রস্তুতই ছিলো, চটপট সেরে নিলো প্রণাম, অমল রথীন যাবার উদ্যোগ করতেই সর্ব্বাণী বললেন, একটু দাঁড়ান, এক মিনিট, আমি আসছি, দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেলেন সর্ব্বাণী। মিনিট চারেকের মধ্যেই ফিরে এলেন দু'হাতে দুটো ডিস নিয়ে। পেছনে রামদয়ালের হাতে জলের গ্লাস, ইনু ভেতর থেকে একটা টিপয় এনে চেয়ার দু'টির সামনে রাখলো। ডিসের ওপর চোখ ফেলে শুধু অমল গাঙ্গুলিই নয়, স্বল্পবাক রথীন ব্যানার্জিও জোরগলায় প্রতিবাদ করে উঠলেন, না না, এখন আমরা কিছু খাব না বৌদি ! এতখানি মাংস নিয়ে এসেছেন, আপনারা খাবেন কী তাহলে ?

এটুকু না খেলে আমার খুব কষ্ট হবে কিন্তু। আমাদের সুবিধের জন্য অফিসের আগে এত সব রান্না ক'রে রেখে গেছেন, তারপর এখন আবার চড়াই-উৎরাই ভেঙে এসেছেন, খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাদের, অনেক মাংস আছে, আমি না হয় ডেকচিটা এনে দেখাচ্ছি। এমন সহজ সরল আন্তরিকতা সর্ব্বাণীর কণ্ঠে ছিলো, তাকে অবহেলা করা যায় না।

অমল, রথীন বিনা বাক্যব্যয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন, ডিসে মাংস, দু' স্লাইস ক'রে পাঁউরুটি আর কলকাতা থেকে আনা গিরিশের কড়াপাকের সন্দেশ ছিলো। খেয়ে রুমালে হাত মুছতে মুছতে অমল বললেন, বা: ! চমৎকার সন্দেশ তো ! রথীন উঠে দাঁড়িয়ে একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গির সঙ্গে বললেন, ওঁদের কিন্তু এখন পর্য্যন্ত খাওয়াই হয়নি—রমেন বাধা দিয়ে বললেন—না, না, ব্যস্ত হবেন না, আমরা সোলনে হেবি টি খেয়ে নিয়েছি। নমস্কার জানিয়ে প্রসন্নমুখে অমল রথীন বিদায় নিলেন।

লনেই ছিলেন সকলে। রবিবারের বিকেলে, হেমন্তের বিকেল এ সময় বাড়ীতে কেউ থাকেন না সিমলায়, কিন্তু, মা-বাবাকে সাক্ষী রেখে বাজি ধরে আজ ব্যাটমিণ্টন খেলছে অরুণেশ, দু' বোনকে ও একলাই হারাবে। খুব জমাটি খেলার মাঝখানে অরুণেশ হঠাৎ ব্যাট নামিয়ে বললো, মা, কা'রা যেন আসছেন এবং মনে মনে অতিথিদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো। ওর হাত ইতিমধ্যেই টাটিয়ে উঠেছিলো, বাজি জেতা ওর পক্ষে সম্ভব হতো না কিছুতেই গরমের ছুটিতে সিমলায় এসে একাধিক বার হারিয়েছে ও নীলা-শেলিকে, মাস চারেকের মধ্যেই বোনেরা এমন হাত পাকিয়ে ফেলবে, এতটা অনুমান করেনি অরুণেশ।

সকলেই মুখ ফেরালো। কেশবশংকর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে অস্ফুটে বললেন, তরু, রমেন বাবুরা এসেছেন এবং লন-চেয়ার ছেড়ে নিজের ভারি শরীরটা নিয়ে বেশ দ্রুত এগিয়ে এলেন সামনের দিকে আসুন, আসুন।

নীলা ব্যাট হাতে করেই ছুটে এসেছিলো, টপ ক'রে ইনার একটা হাত ধরে বললো, তোমার নাম কী ভাই ?

ইন্দ্রাণী।

খুব সুন্দর নাম ! আমার নাম নীলা, খুব ছোট্ট নাম না ? এসো আমরা বাগানে বেড়াইগে, নীলা প্রায় টেনেই নিয়ে চললো ইন্দ্রাণীকে। কেশবশংকর দেখলেন, তরুবালা চেয়ারে বসেই উল বুনতে শুরু করেছেন। উনি নিজেই মহাসমাদরে রমেন সর্ব্বাণীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন

এবং স্ত্রীর সঙ্গে কানুন মাফিক পরিচয় করিয়ে দিলেন। তরুবালা আধবোনা ব্লাউজটা কোলে নামিয়ে রেখে মোলায়েম আভিজাত্যের হাসি হাসলেন একটা।

বসুন, বসুন, কেমন লাগছে সিমলেটা? উত্তর শোনার অপেক্ষা না ক'রেই নিজের ডান পাশ-ঘেঁসা পোষা সারমেয়কে ধমকে উঠলেন, হানী, হানী! ও, ইউ নটি ডগ. অফ্ ফ্, অফ্ ফ্। হানী তৎক্ষণাৎ চলে গেলো। কুকুরের বাধ্যতায় যে আত্মপ্রসাদের আলো মুখে ফুটলো তরুবালার, সে দিকে তাকিয়ে সর্বাণী মনে মনে হাসলেন।

ঠাণ্ডা জল আদৌ ব্যবহার করবেন না, বুঝলেন রমেন বাবু! কোনোরকম অসুখই নেই সিমলায়, কেবল ঐ একটি অসুখ ছাড়া—ঠাণ্ডা লাগলো কী নিমুনিয়া। কথা শেষ করে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন কেশবশংকর।

তা বলে ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে বসে থাকবেন না যেন, হিল ষ্টেশনে হাটাহাটি না করলে একেবারেই খিদে হয় না। আর এক দফা উচ্চহাস্য শুরু করলেন কেশবশংকর।

নীলা! এসো এদিকে। সন্ধ্যের সময় বাগানে ঘুরছো কেন?—স্বামীর হাসিকে চাপা দিয়ে তরুবালা উঁচুগলায় ডাক দিলেন মেয়েকে, যে কেউ বাঙালীকে পেলেই হলো নীলার—তখন আর দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না মেয়ের···শেষের কথাটা স্বামীর দিকে তাকিয়ে শেষ করলেন তরুবালা।

আজ তো নীলুর মস্ত উৎসবের দিন তরু, ওর সমবয়সী বাঙালী বন্ধু নেই বলে কী ওর কম দুঃখ ছিলো! নীলুর উৎসবে আমরা কী ভাবে যোগ দিতে পারি তাই ভাবছি আমি—আবার জলদগলায় হেসে উঠলেন কেশবশংকর।

তরুবালার আর বসে থাকতে ভাল লাগলো না! উলবোনাটা কাশ্মীরীথলির মধ্যে ভ'রে উঠে দাঁড়ালেন। নীলা ইনার হাত ধরে টানতে টানতে প্রায় হুড়মুড় ক'রে মা'র কাছে এসে পড়লো, মা, আমাকে ডাকছিলে?

নীলু! কী হচ্ছে দিনকে দিন? কতকগুলো বিশ্রী বদভ্যাস ডেভেলপ্ ক'রে ফেলেছো দেখতে পাচ্ছি···চলে গেলেন তরুবালা ন ছেড়ে।

বসো মা বসো, তোমার নাম ইন্দ্রাণী বুঝি? তুমি কোন ক্লাশে পড়ো? তরুবালার অসহ্য উদাসীনতায় ইনা কিছুটা আড়ষ্ট হ'য়ে পড়েছিলো কিন্তু কেশবশংকরের গলায় কী শুনলো কে জানে, নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে হাসিমুখে উত্তর দিলো, আমি এবার ম্যাট্রিক দেবো।

ভেরি গুড! নীলা, ইন্দ্রাণী তোমার এক বছরের সিনিয়র হলে?

সিনিয়র হ'লে কী হবে বাপি, আমি ইনাকে আমার বন্ধু ক'রে নিয়েছি। ইন্দ্রাণীর হাত ধরে টানতে টানতে নীলা বাড়ির ভেতরে নিয়ে চললো। কেশবশংকর এবার অত্যুচ্চগলায় বয় চৈতরামকে হাকাডাকি শুরু ক'রে দিলেন।

বড় হলঘরে ঢুকে চার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রাণী নীলাকে বললো, তোমাদের তো বই-এর কালেকশন দেখছি প্রচুর—আমাকে কিন্তু ভাই কিছু কিছু বই পড়তে দিতে হবে।

নিশ্চয়ই বই দেব, আজই নিয়ে যাও'না তুমি।

ইন্দ্রাণী বই-এর আলমারীগুলি একনজর দেখে নিয়ে বললো, এ কী! কোনো বাংলা বই নেই কেন? সবই তো দেখছি হিন্দি আর ইংরিজী—।

নীলা সপ্রতিভ হয়ে উত্তর দিলো, আমরা তো বাংলা জানিনে। আমাদের এখানে ত হিন্দি মিডিয়ম, বাংলা বই নিয়ে আর হবে কী?

শেলি এসে বললো, মিস মরফি কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন।

আজকে যেতে বলেছে তাঁকে—করিডোরে বেরিয়ে বৈজুরামকে ডাক দিয়ে নীলাই মিস মরফিকে চলে যাওয়ার কথা বলে দিলো। হলঘরে ঢুকে একটা আলমারী খুলে ছবির এ্যালবামগুলি টানাটানি ক'রে বার করতে লাগলো নীলা, খুব ভাল ভাল ছবির বই ওর কাছে আছে, বন্ধুকে দেখাতে হবে। শেলি ইসারায় কিছু একটা বোঝাতে চেষ্টা করলো, কিন্তু নীলার দিদির দিকে তাকাবার আদৌ ফুরসুত নেই। তরুবালা ঢুকলেন, নীলা, মিস মরফিকে আমি বসতে বলেছি, তুমি অন্ততঃ আধ ঘণ্টা পড়ে এসো।

ন্‌না···! আমি আজ পড়বোই না। ইন্দ্রাণী নিজের বিস্ময়ের বুদবুদ গিলে প্রশ্ন করলো।

মাষ্টারমশাইরা এখানে রবিবারেও পড়ান বুঝি?

না, তা নয়—নীলা বললো, মিস মরফি ফ্রেঞ্চ পড়ান আমাকে উইক ডেজে ওঁকে আবার দুটো কলেজ এ্যাটেণ্ড করতে হয় কি না—বিস্ময়ের যে বুদবুদগুলি গলা পর্যন্ত নেমেছিলো, সেগুলি আবার ফেনিয়ে উঠলো।

নীলা, হিন্দি শিখছো, ফ্রেঞ্চ শিখছো—অথচ বাংলা নয় কেন? খুব আশ্চর্য কিন্তু!

বাংলা ভাষা বড্ড বেশী বাংলা—

তার মানে?

তার মানে, ভয়ানক মিনমিনে—উত্তর দিয়ে নীলা হেসে ফেললো।

কে বলেছেন এ কথা?

উত্তর না দিয়ে নীলা মা ও দিদির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, মুখ নামিয়ে এ্যালবামের পাতা ওল্টাতে লাগলো।

তোমাদের কী কষ্ট, না ভাই?

কেন, কষ্ট কেন? নীলা ছবির থেকে চোখ তুললো।

রবীন্দ্রনাথ পড়তে পারলে না! জানো ভাই, সেদিন ডিবেটিংএ একজন অবাঙালীকে শুধু এই পয়েন্ট নিয়েই হারিয়ে দিয়েছি আমি,···আর, মাইকেল মধুসূদনের জীবনী জানো তো? তিনি করেছিলেন কী। এর পর ছবির এ্যালবাম বন্ধ হলো। ইন্দ্রাণী নীলার পাশে বসে মাইকেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী শুরু করলো। শেলি ও তরুবালা হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মুখের ভাব আদৌ প্রসন্ন নয়। যেন একটা দ্রুতধাবমান ফিয়াট কাদা ছিটিয়ে দিলো মূল্যবান ক্রাইসলারে। করিডোর পার হবার আগেই ইন্দ্রাণীর সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর কানে এলো: "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন···"

চায়ের টেবিলে তরুবালা এত অতিরিক্ত ভদ্রতা করলেন সর্ব্বাণীর সঙ্গে, সর্ব্বাণীর গলা দিয়ে চা যেন আর নামতে চায় না।

চায়ে মিষ্টি ঠিক হয়েছে তো? ঠাণ্ডা হয়নি তো? দেখুন তো বৈজুর হাতের মোগলাই খেতে পারেন কি না?

আর একটা গোলাপজাম নিন, একটু কেক, পেষ্ট্রি একটা, অন্ততঃ একটা পেটিস নিতেই হবে। সে কী! কিছুই খাচ্ছেন না! কোনোটাই ভাল হয়নি বুঝি? সর্ব্বাণী দু-তিনবার স্বামীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করলেন। রমেন বুঝলেন চায়ের আসরের সুর শুরু থেকেই বেসুরো এবং বিলম্ব হবে যত তত বেশি ছন্দপতন ঘটবে! কিন্তু উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে, অন্য যে কোনো জায়গা হলে—চলো সর্ব্বাণী, আজ অমুক জায়গায় একবার না গেলেই নয়—বলার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াতেন রমেন। বস-এর বাড়িতে সে প্রশ্ন ওঠেই না। বস-এর বদলে বস-এর স্ত্রী যদি পদমর্যাদা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হন, তাতে নতুনত্ব বা আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কাজেই স্ত্রীকে চোখ দিয়ে বলতে চাইলেন: এতটাই যখন দেখলে, শেষটুকুন দেখাই যাক না, মন্দ কী। আমার তো মজাই লাগছে।

ইন্দ্রাণীদের অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলো নীলা। কেশবশংকর গেট পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এসে প্রাথমিক পরামর্শ অনেক দিলেন: এখানকার জলে আয়রণ একটু বেশি পরিমাণে, খাবার জলটা ফুটিয়ে খাবার ব্যবস্থা করবেন, বাইরে থেকে ঘুরে এসে বিশেষ করে চড়াই ভাঙার পর অসহ্য পিপাসা পেলেও তখুনি কিছুতেই জল খাবেন না, কিছুতেই না। অন্ততঃ মিনিট দশেক নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবেন। হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়লে ঘরে যদি চিমনী জ্বালান, তখন বাইরে বার হবার প্রয়োজন হলে, বেশ কিছু চিমনীর কাছ থেকে অনেকটা দূর সরে গিয়ে তারপর বার হবে ভুল হয়েছে কী সাডন এক্সপোজার। এক টুকরো কাঁচা সবজী রো খেতেই হবে সিমলায়—না হলেই চীলব্রেন; সঙ্গে সঙ্গে চীলব্রেন ম যে আঙুলের এক রকম ঘা তাও জানাতে ভুললেন না। অ চড়াই ওঠার সময়—সর্ব্বদা স্মরণে রাখবেন, যে শম্বুকগতি উঠতে হবে।

পাহাড়ীদের দিকে একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, কি রকম আ আস্তে ওরা ওপরে ওঠে। হুয়াইল ইউ লিভ ইন রোম, ডু এ্যাজ রোমান্স ডু—শেষের কথাটা ইন্দ্রাণীকে উদ্দেশ্য করে বলে উচ্চহ করে গেট থেকে বিদায় নিলেন কেশবশংকর। নীলা সামনের চড় পর্য্যন্ত এসে ইনার হাত ঝাঁকিয়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলে ইন্দ্রাণীকে বেগুনী রংএর চমৎকার এক গুচ্ছ জ্যাপনীজ এ্যানিমো উপহার দিয়েছে নীলা। ফুলের তোড়াটা গালের এক পাশে চে ধরে ইনা বললো, ভারি ভাল।

রমেন হেসে বললেন, কী ভাল রে ইনা? ফুল না তোর বন্ধু?

দুই-ই খুব ভাল বাবা! খুব আস্তে আস্তে উঠতে লাগলেন ওঁরা

নীলা বাড়ি ফিরে দেখলো, ওর দিদি শেলি বেশ একটু ধারা মেজাজে ওর বন্ধুর সমালোচনা করছে, মার মুখের চেহারাও মোটে মসৃণ নয়। ও একবুক খুশি আর একমুখ আলো নিয়ে ছুটে ছুটতে বাড়ি ফিরেছিলো, ঘরে ঢুকেই মনে হলো—মেঘ জমেছে অনেক মেঘ। আজকের হেমন্ত-সন্ধ্যায় ও যেন হঠাৎই পাওনা বেশি অনেকখানি খুশি কুড়িয়ে পেয়েছিলো। একটা নতু আনন্দের রুদ্ধদ্বার যেন সামান্য একটু খুলে দিয়ে গেছে ইন্দ্রাণী নীলাকে সে ঘরে ঢুকতেই হবে দরজা খুলে, ঢুকবে ও নিশ্চয়ই এ ইনার সাহায্যেই ঢুকবে।

হলঘরে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই শুনে ফেললো: এক ফোঁটা চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ের মুখে বড় বড় বিজ্ঞ বিজ্ঞ কথা কলকাতার শিক্ষেই ঐ। অরুণেশ কাজুবাদাম চিবুতে চিবুতে প্রতিবাদ করলো, এই শেলি, খবরদার কলকাতার শিক্ষার খোঁটা দিবি না,···সত্যি সত্যি আলোচনা করলে পাঞ্জাবী শিক্ষা ঘায়েল হয়ে কোথায় তলিয়ে যাবে। তবে, মেয়েটি একটু ডেঁপো— সন্দেহ নেই, কলকাতার মেয়েরা একটু এঁচোড়ে পাকা হয়।

নীলার ভয়ানক ভাল লেগে গেছে ইন্দ্রাণীকে, সে মুখ গোমড়া করে চুপ করে রইলো। দাদার সঙ্গেই ওর সব চেয়ে বনে ভাল, সেই দাদাই যখন দিদির সুরে সুর মেলালো তরুবালা কেমন একরকম নিরুত্তাপ-ছোঁয়া গলায় বললেন একটু ডেঁপো নয়, অসম্ভব ডেঁপো। এদিকে মস্ত মস্ত কথা শোনালে কিন্তু একথা বলতে পারলে না—আমি বসছি তুমি প'ড়ে এসোগে যাও। নীলার চোখ তার বাবাকে খুঁজলো কিন্তু কেশবশংকর তখন ওপরে, নীলার চোখের আলো ঝিলিমিলি মিলিয়ে গিয়ে ছায়া ঘনালো, সেটা নজরে পড়লো অরুণেশের। বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো অরুণেশ, এই নে, কাজুবাদাম খা।

নীলা হাত বাড়িয়ে কাজুবাদাম নিলো, কিন্তু মুখের ভাব আগের মতই রইলো। অরুণেশ মুখ টিপে হেসে বললো, কি রে নীলা

ঐ ডেঁপো মেয়ে একদিনেই তোর বন্ধু হয়ে গেলো নাকি? দেখিস'খন চাক্ লাগাবার কায়দা আমি তোকে শিখিয়ে দেবো, এত ইংরিজী ছবির নাম শিখিয়ে দেবো তোকে, এক ফাঁকে নামগুলো শুনিয়ে দিস বন্ধুকে, দেখিস হাতড়ে আর কথা খুঁজে পাবে না।

নীলা চোখ বড় করলো, দাদা, সত্যি শিখিয়ে দেবে তো?

দাদা! ক্লান্ত পায়ে ঘরে ঢুকে ধপ করে নীলা বসে পড়লো অরুণেশের পায়ের কাছে। নীলার বুক জোরে জোরে ওঠা-নামা করছে —দাদা, তুই আজ বার হোসনি?

অরুণেশ বিছানায় শুয়ে একটা ইংরিজী উপন্যাসে ডুবে গিয়েছিলো, ই থেকে মুখ তুললো এবার, বোনের জোরে জোরে শ্বাস নেওয়া দেখে হাসলো একটু। বেরিয়েছিলুম বৈ কি কিন্তু তোর আগেই বুঝতে পেরেছিলুম যে আজ বৃষ্টি হবে—কথা শেষ করে অরুণেশ জানলা দিয়ে চলমান মেঘমালার দিকে তাকালো।

গায়ের কোট একটানে খুলে ফেললো নীলা, তুই নিশ্চয়ই ম্যাল পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছিস, না দাদা?

হাঁ, তাই।

তবে? আমার মত ক্যাথলিক ক্লাব থেকে এলে বুঝতিস যে আমিও অনেক আগেই বুঝেছি যে বৃষ্টি হবে।

চড়বড় ক'রে বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেলো। অরুণেশ উঠে বসে বাইরে চোখ মেলে দিলো। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথের ধারে সুসংবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে পাইন-সেডার-চের। এলোমেলো পাতার ঝালরে টুপটাপ ক'রে বৃষ্টি ঝরছে আবার রোদের সোনালী ঝিলিকও কাঁপছে, যাবো-কি-যাবো না'র দ্বিধায়। মুগ্ধদৃষ্টিতে অরুণেশ তাকিয়ে আছে সে দিকে।

যাই, চৈতরামকে একটু কফি আর পাকোড়ী করতে বলে আসি—ওড়না দুলিয়ে চলে গেলো নীলা। নীলার পরনে সালোয়ার, কামিজ আর চুন্নী (ওড়না)। ঘরে-বাইরে ও এই পোষাকই পরে। ওর দিদি বাইরে বার হবার সময় শাড়ি পরা শুরু করেছে সবে; বাইরের বেশবাস ছেড়ে নীলা এসে জাঁকিয়ে বসলো খাটের ওপর।

কি রে তুই পার্টিতে গেলিনে নীলা?

না, রোজ রোজ পার্টি এ্যাটেণ্ড করতে আমার একদম ভাল লাগে না। সিমলায় তো পার্টি লেগেই আছে—বিছানায় পা তুলে বেশ আয়েসী ভঙ্গিতে বসলো নীলা।

জানিস দাদা! কালকের গার্ডেন পার্টিতে ভারি মজা হয়েছে—বোনের দিকে চোখ ফেরালে অরুণেশ।

চা খেতে খেতে সবাই পোজ নিচ্ছে, ফটো তোলা হচ্ছে কি না! মিসেস গোবিলের দাঁতগুলি খুব সুন্দর, সেজন্য কেকে কামড় দিয়ে আছেন তো আছেনই—আর মিসেস কাপুরের চুল খুব সুন্দর, খোঁপাটা যাতে ফটোতে আসে সেজন্য ঘাড় বেঁকিয়ে রইলেন তো রইলেনই—এদিকে আবার গভর্ণরের সঙ্গেও ফটো ওঠা চাই—সে ভারি মজার দৃশ্য, সব চেয়ে মজা হ'য়েছিলো, যেই কয়েকজোড়া

বৃষ্টি পড়লো, সব অবাঙালী দুড়-দাড় ক'রে দৌড় মারলো লেডিজ পার্কের সেই ছোটো ঘরটার মধ্যে। বৃষ্টি থেমে গেলো তখনই, বাঙালীরা প্রায় সকলেই বসে ছিলেন, কিন্তু অবাঙালীরা আর বেরুতে পাচ্ছেন না, ঠোঁটের রং আর গালের রং গ'লে সে যা দশা হয়েছে, মুখ মেরামত না করে কী ক'রে বার হবেন? সে যা মজা হ'য়েছিলো দাদা, আমি তো হেসে বাঁচিনে! মা সেজন্য খুব ক্ষেপেছেন, পার্টি এ্যাটেণ্ড করার মত আমি নাকি ভদ্র হইনি। বয়েও গেলো, আমার ভালও লাগে না ওসব সাত সতেরো হাঙ্গামা। আমি এখন মজা ক'রে—

চৈত্‌রাম ট্রেতে ক'রে কফি আর পাকোড়ী নিয়ে এলো, ট্রেশুদ্ধ টিপয়ের ওপর রেখে চলে গেলো আবার। পাকৌড়ী অর্থাৎ পেঁয়াজি আর বেগুনি। সিমলায় বেসনগোলা ডুবিয়ে যাই ভাজবে তাকেই বলে পাকোড়ী। ভাই-বোনে পাকোড়ীর সদ্ব্যবহার শুরু ক'রে দিলো।

দেখ, দাদা, তোর বুদ্ধিতে পড়ে আজ আমি এ্যায়সা বেকায়দায় প'ড়ে গিয়েছিলেম—সপ্রশ্নদৃষ্টিতে অরুণেশ তাকালো বোনের দিকে।

ইন্দ্রাণীর টেবিলে আজ একটা ইংরিজী কবিতার বই দেখে—

কি বই? অরুণের প্রশ্ন।

ওয়ালটার ডেলা মেয়ারের একখানা কবিতার বই—

হুঁ! তারপর? এঁদের বই পড়েছো? আমি ঝাঁ ক'রে তোর কাছ থেকে শেখা ইংরিজী কবিদের নাম আওড়ে জিগ্যেস করলাম,—এঁদের লেখা কেমন লাগে তোমার?

ইনা বললে, না ভাই, পড়লাম আর কবে? এই তো সবে শুরু করেছি। এঁদের মধ্যে কা'কে তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে নীলা?

আমি তখন রীতিমত ঘামতে শুরু করেছি।

অরুণেশ প্রশ্ন করলো—কাদের নাম করছিলি তুই?

কেন? তুমি যাদের নাম বলে দিয়েছিলে—ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, বাইরন, শেলী, কীটস, টেনিসন, ব্রাউনিং।

বোনকে থামিয়ে অরুণেশ বললে, তা, এঁদের যে কোনো একজনের নাম বলে দিলেই পারতিস?

বাঃ! একেবারে কিছু না পড়েলই বুঝি বলা যায়?

ক্লাশ নাইনে পড়িস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী, কীটস—এঁদের কোনো কবিতাই পড়িসনি?

নীলা ঘাড় নাড়লো, একটু পরে বললো, ঐ পড়ার বইতে যা দু'-একটা আছে, তা আমি ভাল, ক'রে পড়িওনি, বুঝিওনি।

হা হতোঽস্মি! তারপর তুই কী করলি, ঘামতে ঘামতে বাড়ি ফিরে এলি?

তাই আসা যায় নাকি? ইনা যা চালাক মেয়ে, সব ধরে ফেললো—

তার মানে? পিঠটান ক'রে বসলো অরুণেশ।

আমার অবস্থা দেখে মিটি-মিটি ক'রে হাসলো ইনা, তারপর বললো—নামগুলো কে শিখিয়েছে নীলা, তোমার দিদি? আমি বললুম—না, দাদা।

তারপর? নীলাকে থামতে দেখে প্রশ্ন করলো অরুণেশ।

তারপর আর বলবো না দাদা, তুই রাগ করবি—

বলে যা তুই, রাগ করবো না—

ইনা বললে, তোমার দাদার নাম খোকন কে দিয়েছিলেন ভাই?

আমি জিগ্যেস করলুম, কেন?

ইনা বললো, অনেক সময় নামের সঙ্গে স্বভাবের আশ্চর্য্য মিল হয়ে যায়। তোমার দাদা এখনও ভারি ছেলেমানুষ আছেন।

ভরা উনিশের অরুণেশের রক্ত টগবগিয়ে উঠলো। উত্তেজনার ঠেলায় চলকে পড়লো খানিকটা কফি। ঝাপট দিয়ে বললো অরুণেশ।

না, ছেলেমানুষ থাকবে না, তোমার মত এঁচোড়ে-পক্ক হবে—খবরদার নীলা, কাল থেকে তুই ঐ ডেঁপো মেয়ের কাছে যেতে পারবিনে—বুঝলি? নীলা ঘাবড়ে গিয়ে বললো।

আচ্ছা, তারপর ক'টি মুহূর্ত নীরবে কাটলো। কফি এবং পেঁয়াজি বেগুনি শেষ করে মেজাজ আবার নর্মাল টেমপারেচার নেমেছে। সহজ গলায় বোনকে প্রশ্ন করলো অরুণেশ।

তুই তার উত্তরে কী বললি?

আমি বললুম, আমার দাদার সঙ্গে একদিনের আলাপ হলেও তোমার এ কথা মনে আসতো না ভাই, আমার দাদা দারুণ ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র।

বোনের ছেলেমানুষি কথায় অরুণেশ এবার তো-তো করে হেসে উঠলো।

নীলা বললো। আমি তখন রীতিমত রেগে গেছি—অনেক মজার গল্প শুনিয়ে তারপর আমার রাগ ভাঙালো ইনা।

ব্যস ঠিক আছে—বই হাতে করে আবার অরুণেশ ঝুপ, ক'রে শুয়ে পড়লো, এই নীলা, আর বকর বকর করিস না, বইখানা শেষ করতে দে আমাকে।

দাদা শোন্!

অরুণেশ বই-এর পাতায় চোখ রেখেই বললো।

নীলা চুপ করলি।

শুধু আর একটা কথা বলবো, পরের-বার যখন কলকাতা থেকে আসবি, আমার জন্য একটা ফুটোআলা বাক্স নিয়ে আসিস।

ফুটো-আলা বাক্স? সে আবার কী জিনিষ? এবার বোনের দিকে অরুণেশ না তাকিয়ে পারলো না।

ঐ যে যাতে পয়সা জমায়, আমাদের ক্লাশের অনেক মেয়ে জমাচ্ছে—আমি এবার সব পয়সায় টফি-কাজুবাদাম না খেয়ে জমাবো ঠিক করেছি।

হাল্কা হাসলো অরুণেশ।

ও, তাই বল। তা হঠাৎ পয়সা জমাবার সখ চাপলো যে?

ইন্দ্রাণীও জমাচ্ছে কি না।

তাই, তোকেও দলে টানতে চাইছে।

বাঃ! টাকা-পয়সার কথা কী কেউ কারো কাছে বলে? আমি আন্দাজেই বুঝতে পারলাম।

কি রকম?

আমি আজ যখন গিয়েছি, ইন্দ্রাণী একদম টের পায়নি আমার পায়ে ছিলো ক্রেপসোলের জুতো, ওর পড়ার ঘরে গিয়ে পেছনে দাঁড়িয়েছি, তবুও টের পায়নি ইনা। আমি যেই ও

চোখ টিপে ধরবো বলে এগিয়েছি, ইনা টেবিলে দুহাত রেখে তার মধ্যে মাথা গুঁজে ফেললো। তারপর মাথা ঘসতে ঘসতে বলতে লাগলো, ঈশ! সমস্ত দিনে আজ কিছু সঞ্চয় হলোনা।

কী বললে তোর বন্ধু? চোখ বড় করে আবার উঠে বসলো অরুণেশ, ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো ও।

—সমস্ত দিনে কিছুই সঞ্চয় হলো না—তারপর বোনের দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হাসতে লাগলো।

তুই তো একেবারে ঠিক ধরেছিস নীলা—তারপর আবার হাসি।

শনিবার বিকেলের দিকে রমেন স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ষ্টেশন দিয়ে নাভা পর্যন্ত নেমে আবার ফিরলেন। কাগলির নাম করেই বেরিয়েছিলেন, কিন্তু আর নামতে সাহস হলো না সর্ব্বাণীর। ধীরে ধীরে উঠছেন এঁরা। কার্টরোড ধরে কিছুটা এগোতেই, একটা মোটর ওঁদের সামনে দিয়ে অল্প কিছুটা গিয়ে আবার ব্যাক করে ওঁদের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে গেলো। মোটরের দরজা খুলে প্রথমে নামলেন মিসেস মালতী গুপ্ত; তারপর মিঃ মনোজ গুপ্ত। মিঃ গুপ্ত পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটারী। ছোট সিমলায় বেলমোর-এ বিল্ডিং-এ থাকেন, বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ি, তার চেয়েও বিরাট বাগানখানা। সজ্জন এবং পরোপকারী বলে সিমলায় মিঃ গুপ্তের খুব খ্যাতি আছে।

কী কাণ্ড, সাবি! তুই এখানে! অথচ আমি একদম জানিনে। বিস্ময়ের চোটে মিসেস গুপ্ত প্রথমে নমস্কার করতে ভুলে গিয়েছিলেন, রমেনকে হাতজোড় করতে দেখে তাড়াতাড়ি নমস্কার করে নিলেন। তার পর মিঃ গুপ্তর দিকে তাকিয়ে কলকণ্ঠে বলে উঠলেন, এই যে আমার বান্ধবী সর্ব্বাণী, ওর গল্প এত করেছি তোমার কাছে আর বোধ হয় নতুন করে কিছু বলতে হবে না।

মনোজ গুপ্ত নমস্কার জানিয়ে সহাস্যমুখে বললেন, না, হবে না। তারপর সর্ব্বাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, স্কুল-কলেজে কেউ কোন দিন আপনাকে কমপিট করতে পারেনি, কথা একাধিক বার মালতীর কাছে শুনেছি, তাছাড়া দুষ্টুমির ও আপনাদের শুনেছি কিছু—কথা শেষ করে।

মনোজ গুপ্ত রমেনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে একটু হাসলেন। ই হেসে উঠলেন একসঙ্গে, আরো একটু আলাপ এগোলো। ন্দ উৎসের একটা রুদ্ধমুখ যেন খুলে গেছে মালতীর, চল সাবি। দেরী নয়, আজই চল আমাদের বাড়িতে। মাসখানেক হলো ছিল—অথচ কী কাণ্ড! উঠুন মিঃ দত্ত গাড়িতে উঠুন, এসো ন্দ্রাণী, এসো। সমাদরে গাড়িতে আহ্বান জানালেন মালতী। ন মনোজ গুপ্তের পাশে বসলেন রমেন দত্ত। পেছনে ওরা জন। গাড়িতে উঠে সর্ব্বাণী বললেন, মালা, তোর স্বভাব ই একেবারে আগের মত রয়ে গেছে—এতটুকু বদলায়নি! লের মা হোসনি বুঝি এখনও? শেষের কথাটা খুব অস্ফুটে র আরোহী দুজনের কান বাঁচিয়ে বললেন।

খিল-খিল ক'রে হেসে উঠলেন মালতী গুপ্ত, তাই বটে, তুই কন্যে এক পুত্রের মা আমি, ছেলে বড় না হ'য়ে মেয়ে বড় হলে বোধ হয় শাশুড়ী হয়ে যেতাম এতদিনে—আমার স্বভাব বদলায়নি বলছিস, তোর যে চেহারা বদলায়নি এতটুকু, একেবারে তন্বী—সেই কুড়ি বছরের মত চেহারা, আরো সুন্দর আরো নিটোল হয়েছিস কিন্তু—

পাশেই মেয়ে বসে, সর্ব্বাণী একটু লজ্জিত হয়ে নড়ে-চড়ে বসলেন। ইনু ফট করে বলে ফেললো, সত্যি মাসীমা, মা'র সঙ্গে রাস্তায় বা'র হলে সকলেই মাকে বলে দিদি নাকি আমার? গাড়ি চালাতে চালাতে মনোজ গুপ্ত হো-হো করে হেসে উঠলেন। সকলেই সে হাসিতে যোগ দিলেন। সর্ব্বাণীর কানের পাশ দুটো গরম হলো একটু।

ইনু, বড়দের কথার মধ্যে কিন্তু কথা বলতে হয় না—মেয়েকে নিষেধ করে আড়ষ্টতা কাটাতে চাইলেন সর্ব্বাণী।

সাবি! এস-বি'র সেই দুরবস্থার কথা মনে আছে? বেচারা অধ্যাপক বোর্ডের কাছে গিয়ে হাত কাঁপাতে লাগলেন, অমন যে গম্ভীর প্রকৃতির লোক কেমন নার্ভাস হয়ে তোতলাতে লাগলেন তখন। অবিকল এস-বি'র আলুমাথাটি আঁকা হ'য়ে আছে বোর্ডে। তলায় লেখা আছে—আলু! বসো...! বসো...! —ভাগ্যিস ছেলেদের হাতের লেখা ব'লে বোঝা গিয়েছিলো, না হলে কি যে করতেন। বেচারা দীনদয়ালের কাজ বাড়লো কত, দুপুরে ছেলেদের ক্লাশ শেষ হবার পরই ঝাড়ন নিয়ে ছোটাছুটি করতো।

প্রফেসর আর-এম-এর এ্যালিটারেশনের ভূত কাঁধ থেকে যেদিন নামিয়েছিলি মনে আছে সে কথা? ভদ্রলোক মনের আনন্দে সবে সেদিন শুরু করেছিলেন: ইন দি বাওয়ার, দেয়ার ওয়াজ এ টাওয়ার; সাডন্‌লি শাওয়ার কেম্ অন্ দি টাওয়ার এ্যাণ্ড ইন দ্যাট টাওয়ার দেয়ার ওয়াজ এ লেডি। তুই ফট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললি: মে আই ডেসক্রাইব হার ড্রেস স্যার, বলেই পাঁচ মিনিট ধরে শুধু এ্যালিটারেশন দিয়ে তুই পোষাকের বর্ণনা করে গেলি। ঈশ! বেচারা আর-এম, তারপর কি সংযত হ'য়ে আমাদের ক্লাশে লেকচার দিতেন!

আর সেকেণ্ড ইয়ারের সেই কথা মনে আছে সাবি? বোটানির প্রফেসর বি, জি, ছবি এঁকে ফুলের স্ট্যামেন ষ্টিগমা বোঝাচ্ছিলেন, কোন্ ফুলের যেন ছিলো পাঁচটা মেল, একটা ফিমেল। তুই হঠাৎ আস্তে বলে ফেললি—এ যে দেখছি দ্রৌপদী। বাণীটা ছিলো পাশে, যা হাসির রোগ ওর, ওর হাসির ঠেলায় সব মেয়েরা জেনে ফেললো। তারপর সারা ক্লাশময় হাসির ঢেউ। প্রফেসর বি, জি তো—হোয়াটস দি ম্যাটার? হোয়াট মেকস ইউ লাফ? প্রশ্ন ক'রে ক'রে হয়রাণ হ'য়ে শেষকালে রেজিষ্ট্রি বগলে ক'রে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন। সারা রাস্তাই দুই বন্ধুর পুরোনো-স্মৃতি রোমন্থন চললো। [ক্রমশঃ।

# কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার কার্য্যাবলী

ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে দক্ষতা ও শৃঙ্খলা আনার জন্য রেজিষ্ট্রার, কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশনস এবং ইন্সপেক্টার অফ কলেজেস-এর তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগকে এক করা হয়। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া বা টাকা-পয়সা ফেরং দেওয়ার ব্যাপারে যাহাতে অহেতুক বিলম্ব না হয় আমি তাহার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেই। আনন্দের বিষয় যে, আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়া আসি তখন এগুলির ব্যাপারে আর তেমন কোন অভিযোগই ছিল না।

২। পরীক্ষার ফলাফল ফাঁস হওয়ার বিশ্রী ব্যাপারটি আমাকে কঠোর হস্তে দমন করিতে হইয়াছিল। আমি এ ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছিলাম এবং আমার কার্য্যকালে বে-আইনীভাবে পরীক্ষার নম্বর জানার সমস্ত সুযোগই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

৩। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারের বিভাগটি আমাকে ঢালিয়া সাজাইতে হইয়াছিল। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন পার্টটাইম ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়া কাজ চালান হইত। অবশ্য সেই পার্টটাইম ইঞ্জিনিয়ারের পারিশ্রমিক কম ছিল না। তাঁহার মাসিক বেতন ছিল ৪ শত টাকা; ইহা ছাড়া পরীক্ষিত বিলের উপরও তিনি কিছু পাইতেন (এবং সে পরীক্ষাকার্য্যটি তিনিই সম্পাদন করিতেন)। ব্যয়-বরাদ্দ বা বিল যাহাতে কম হয় এইটি দেখাই যাঁহার কর্ত্তব্য, সেই ইঞ্জিনিয়ারকে বিল কিংবা খরচের উপর কিছু দিতে যাওয়া আমার নিকট একটি হাস্যাস্পদ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। আমি এ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া মাসিক বেতনের একজন হোলটাইম (সারাক্ষণের) ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করি। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্ত্তনের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুটা সাশ্রয় হয়।

৪। আমার কার্য্যকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় এবং এজন্য আমি বাহিরের লোক দ্বারা পরিচালিত টেষ্ট পরীক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসটিকে সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত করিতে হইয়াছিল। প্রেসটি যাহাতে বাহিরের কাজ করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কিছু আয় করিতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থাও করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে একটি বিশেষজ্ঞ-কমিটি নিয়োগ করিয়া প্রেসের কাজকর্ম সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট প্রেস, ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস প্রভৃতি হইতে একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ লইয়া এই কমিটিটি গঠিত হইয়াছিল।

৬। আমার কার্য্যকালে প্রফেসার ও লেকচারারদের (পার্ট ও হোলটাইম) বেতনের হার নির্দ্ধারিত হয় এবং কাহারও ক্ষেত্রে যাহাতে কোন পক্ষপাতিত্বমূলক ব্যবহার না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। সকলেই যাহাতে স্বাভাবিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইনক্রিমেণ্ট পাইয়া যান, আমি সে ব্যবস্থাও করিয়াছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকুরী কাহারও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে, এ ব্যাপারটা আমি একেবারেই সহ্য করিতে পারিতাম না। সহকারী লেকচারারদের পদ বিলোপ ক হয় এবং পূর্ব হইতেই যাঁহারা এই সমস্ত পদে নিযুক্ত ছিলে তাঁহাদের লেক্চারারের গ্রেড দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ব্যবস্থার উন্নতির জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ইহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুটা ব্যয় বৃদ্ধি ঘটিলেও লেক্চারার সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

৭। যাহাতে কাহারও ন্যায়সঙ্গত দাবী অগ্রাহ্য করিয়া অন্যা ভাবে পরীক্ষক নিযুক্ত করা না হয়, আমার সময় তাহারও ব্যব করা হইয়াছিল।

৮। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই আমি লক্ষ্য করি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের সংস্কার প্রয়োজন। অবিলম্বে তাহা সম্পন্ন করা হয়। আমি ইহাও লক্ষ্য করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা যে সমস্ত ঘরে বসিয়া কাজ করেন সেগুলির মধ্য দিয় আলোবাতাস চলাচল করে না। দেখিলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অনেকেই যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছেন। চিন্তা করিয়া মনে হইল, এই বন্ধঘরগুলির সঙ্গে এই মারাত্মক ব্যাধির যোগাযোগ আছে। আমি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখিয়া যাইবার আমন্ত্রণ জানাই। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ্; তাঁহার সুপারিশ অনুসারেই ঐ সমস্ত ঘরে আলো-বাতাস ঢুকিবার ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বের অবস্থার সঙ্গে বর্তমান ব্যবস্থার তুলনা করিলে যে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এই ঘরগুলির কত উন্নতি হইয়াছে। বিজ্ঞান-কলেজের সংস্কার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘরে বায়ু চলাচলের স্থাপনের জন্য সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে ঋণ দিয়াছিলেন। সহজ কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

৯। আমি মার্ক-শীট দেওয়ার একটি নতুন নিয়ম চালু করি পূর্বে মার্ক-শীটের জন্য ফলাফল প্রকাশের পরও প্রায় তিন চার সপ্তাহ অপেক্ষা করিতে হইত। নতুন নিয়ম অনুসারে ফলাফল প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই মার্ক-শীট দিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১০। বেতন দেওয়া বা পত্রের উত্তর পাওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে ছাত্রদের অভিযোগ সম্পর্কে দ্রুত কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের পদ্ধতি চালু করা হয়।

১১। আমার কার্য্যকালে সিণ্ডিকেট বা সিনেটের কোন সদস্যেরই বিশ্ববিদ্যালয় বা উহার পরিচালক-মণ্ডলীর উপর প্রভাব প্রয়োগের কোন সুযোগই ছিল না।

১২। গ্রেসনম্বর দেওয়া বন্ধ করার ফলে ফেলের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। পাশ-ফেলের মূল কারণগুলি অনুসন্ধানের জন্য ১৯৫২ সালে একটি কমিটি গঠিত হয়। এ সম্পর্কে অধ্যক্ষদের মতামতও গ্রহণ করা হইয়াছিল। পরিশেষে মূল কারণগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হয়। ফেলের সংখ্যা হ্রাস করার জন্য কলেজগুলিতে টিউটোরিয়াল ক্লাস খোলার একটি সুপারিশ ছিল। আমার কার্য্যকালেই বিশ্ববিদ্যালয় টিউটোরিয়াল ক্লাসের

ব্যবস্থা করার জন্য বিভিন্ন কলেজকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এ ব্যাপারেও কোন কোন মহল হইতে বাধা আসে।

১৩। সুরেন্দ্রনাথ, সিটি, বিদ্যাসাগর ও বঙ্গবাসী—এই কলেজ কয়টির পরিচালন ব্যবস্থায় উন্নতি আনয়নের জন্য আমি ১৯৫২ সালে সরকারের নিকট হইতে অর্থ সাহায্য আদায় করি। এই প্রসঙ্গে চ্যান্সেলারের সঙ্গেও আমার আলোচনা হয়। কলেজগুলির শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি হইলে এবং ছাত্রের সংখ্যা নির্দিষ্ট হারের মধ্যে রাখা হইলে আরও সরকারী সাহায্য আদায় করিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আমি দেই।

১৪। প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট (স্থানটি তেমন ভাল নহে) ও মুরলীধর সেন লেনে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের দুইটি হোষ্টেল ছিল। আমার কার্য্যকালে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য দুইটি নূতন হোষ্টেল চালু করা হয়। ইহার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দশ বারো হাজার টাকা ব্যয় বাড়ে। কিন্তু ছাত্রদের জন্য উত্তম আবাসের ব্যবস্থা হওয়ায় এ ব্যয়বৃদ্ধিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কুণ্ঠা ছিল না।

১৫। আমি কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য একটি হোষ্টেল নির্মাণকল্পে ভারত সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা সাহায্য দিয়াছিলেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া দেখিলাম টাকা আছে বটে কিন্তু কাজ কিছুই হয় নাই। আমার কার্য্যকালে বালিগঞ্জ সারকুলার রোডের উপর পালিত ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি লওয়া হয় এবং ৮০ হইতে ১০০ জন ছাত্রের থাকার উপযোগী একটি হোষ্টেল তৈরী করা হয়।

১৬। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া লক্ষ্য করিলাম যে, প্রায়ই অফিসের সময়ের পর ছাত্রদের অভিভাবকরা উপাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের অভাবে তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে সময়মত নির্দেশ দেওয়া যায় না। আমি সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের হাজিরার ব্যাপারে একটু কড়াকড়ি করি। কর্মচারীদের অপরাহ্ন ৫টা পর্যন্ত অফিসে থাকিতে অনুরোধ করা হয় এবং কর্মচারীরাও তদনুযায়ী কাজ করেন।

১৭। উচ্চশিক্ষার ব্যয় যাহাতে না বাড়ে, সেদিকে সর্বদাই আমার দৃষ্টি ছিল। একবার রেজিষ্ট্রেশন ফি ২ টাকা হইতে ৫ টাকা এবং অপর একটি ফি ৫ টাকা হইতে ১০ টাকা করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ছাত্ররা আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলে যে, ফি বৃদ্ধি করিলে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা হইবে। অথচ দেশে উচ্চশিক্ষা প্রসারের প্রধান প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও টাকা চাই। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বর্দ্ধিত পরিমাণে সরকারী সাহায্য আদায়ের উদ্দেশ্যে আমি ছাত্রদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এই সাক্ষাৎকারের পিছনে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষার ব্যয় যতটা সম্ভব কম রাখা।

১৮। খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ছাত্রাবাসগুলিতে ভাল চাউল সরবরাহের ব্যবস্থাও আমি করিয়াছিলাম।

১৯। বিজ্ঞান-কলেজে ছাত্রদের বেতন নেওয়ার কোন কাউণ্টার ছিল না; বেতন দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে হইত। আমি কার্য্যভার গ্রহণ করার পর ছাত্ররা আসিয়া অভিযোগ করে যে, কয়েক বৎসর ধরিয়া বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন থাকিলেও কার্যতঃ কিছুই হইতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে আসিয়া ফি দেওয়ায় অযথা তাহাদের সময় নষ্ট হয়। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমি তিন দিনের মধ্যে বিজ্ঞান-কলেজে ফি নেওয়ার কাউণ্টার খোলার ব্যবস্থা করিয়া দেই।

২০। ছাত্রীদের পক্ষ হইতে হোষ্টেল ও বাথরুম সম্পর্কে আমার নিকট বহু বার অভিযোগ আসে। আমি অভিযোগগুলি দূর করি প্রকৃত প্রস্তাবের তিন দিনের মধ্যে বাথরুম খুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করি। বলা বাহুল্য, ছাত্রীদের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হয়।

২১। ছাত্ররা যখনই অভিযোগ করিত যে, পাঠ্যবিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে পড়ান হয় নাই, তখনই আমি বিশেষ লেকচারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি।

২২। একবার একটি ছাত্র অভিযোগ করে যে, সে উপযুক্ত নম্বর পায় নাই এবং তাহার উত্তর-পত্র যথাযথ ভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছে কি না সে সম্পর্কে তাহার সন্দেহ আছে। অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য আমি তৎক্ষণাৎ একটি কমিটি নিয়োগ করি, কমিটির বিচারকালে আমি নিজেও উপস্থিত ছিলাম। উত্তর-পত্রগুলি পুনঃপরীক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

২৩। বাঙ্গালার ছেলেরা যাহাতে আন্তঃরাজ্য-প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইতে পারে, আমি তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি। এডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, ফরেষ্ট সার্ভিস প্রভৃতি পরীক্ষায় বাঙ্গালার প্রতিযোগীরা প্রচুর সংখ্যায় অকৃতকার্য্য হইতেছে দেখিয়া আমি পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন জনশিক্ষা বিভাগীয় ডিরেক্টার অধ্যাপক শ্রীরবিদাস ভট্টাচার্য্য এবং আরও কয়েকজন শিক্ষাবিদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া এ সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনা করি। আমার ইচ্ছা ছিল যে, আই-সি-এস ছাত্রদের যেভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয় বাঙ্গালী ছেলেদের সেই ভাবে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য সাময়িক ভাবে ইংলণ্ড হইতে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক আনা হউক। অবশ্য আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কিছুদিন পরে আমাদের দেশের লোকেরাই আই-সি-এস এর পদ্ধতিতে ছাত্রদের ট্রেনিং দিতে পারিবে।

২৪। আমি মনে করি, নিয়মানুবর্তিতা জাতীয় চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ছাত্র ও কর্মচারীরা যাহাতে নিয়মানুগ হন, আমি সেজন্য বারংবার তাহাদের অনুরোধ করিয়াছি; আমি কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়াছিলাম যে, ছাত্রদের বক্তব্যগুলি যেন তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই শুনেন।

২৫। পরীক্ষার ব্যাপারে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি পরীক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নোক্ত পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়াছিলাম।

(ক) কলেজ সমূহের অধ্যক্ষদের সুপারিশের উপর ছাত্রদের ফলাফল ঘোষণা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষাণ্মাসিক পরীক্ষা গৃহীত হওয়া উচিত। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি দেওয়ার দায়িত্ব থাকিবে, সেখানে সেইজন্য অল্পসংখ্যক উপযুক্ত ছাত্র বাছাই করিতে হইবে এবং তাহাদের স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থায় ছাত্রদের প্রদত্ত পরীক্ষার ফি হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আয় হয় তাহা দারুণ হ্রাস পাইবে। অথচ এই আয়ের একটি অংশ নিয়োজিত হয়

শ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ( স্নাতকোত্তর ) বিভাগের সাহায্যে। ই কারণেই প্রস্তাবটি গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

(খ) তবে আমি ইহাও প্রস্তাব করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়কেই যদি রীক্ষা নিতে হয় এবং আমাদের ছাত্ররা যদি নিয়মনির্দ্ধারিত মতে বশ্যক পাশ-নম্বর পাইতে অক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে (১) পাশ-নম্বর বশ্য কমাইতে হইবে; (২) পাঠ্যতালিকা অবশ্য হ্রাস করিতে হবে; (৩) পড়ার বিষয় অবশ্য কমাইতে হইবে এবং (৪) প্রশ্নপত্র এন ভাবে রচনা করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্ররা উত্তরসমূহ াবিবার, পড়িবার ও পুনঃপরীক্ষার সময় পায়। আমি এই স্তাবও করি যে, প্রশ্নগুলি সহজ-সরল করিতে হইবে এবং র্দ্দিষ্ট মান ও নিয়ম-কানুন অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে ঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে।

আমি গ্রেস-নম্বর দেওয়ার বিরোধী ছিলাম। প্রায়ই আমার াকট এই প্রশ্নটি তোলা হইত যে, উত্তরপত্র পরীক্ষায় সর্বত্রই ক ধারা অনুসরণ করা যায় না। কথাটি আমি মানিয়া লই; ন্তু তারপর বলি যে, এই ব্যবস্থায় যদি গলদ থাকে, তাহা ইলে পরীক্ষা গ্রহণ আদৌ প্রয়োজন কি? পরীক্ষা যদি গ্রহণ রিতেই হয়, তাহা হইলে তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট মান রাখিতে হবে এবং সেই মানের ভিত্তিতেই উত্তরপত্রগুলি পরীক্ষা করিতে হবে। মান নির্দ্ধারণ করার পর গ্রেস-নম্বর দিয়া ছাত্রদের রীক্ষায় পাশ করান একটি হাস্যাস্পদ ব্যাপার! আমি ইহাও লি যে, এইরূপ ভাবে ছাত্রদের পাশ করান হইলে উহা দ্বারা নসাধারণকে ঠকানো হইবে। প্রকাণ্ড পাঠ্যতালিকা ও পাঠ্যবিষয় র্দ্ধারণ করিয়া এবং শতকরা উঁচুহারে পাশ-নম্বর বাঁধিয়া দিয়া রপর গ্রেস-নম্বর দিয়া ছাত্রদের পাশ করান হইল বলিয়া ঘোষণা রিলে অপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকেও প্রতারিত করা হয়। অথচ মি কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বে কোন কোন সময় ১৫ হইতে ২০ নম্বর র্য্যন্ত 'গ্রেস' স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে।

যাঁহারা আমার মতের বিরোধী ছিলেন, তাঁহাদের সহিত মার তর্ক হয়। আমি বলি যে, বহুদিনের নিয়ম-কানুনই তো ইয়াছে এবং এই নিয়মগুলি স্যার গুরুদাসের মত একজন মহান ক্তির আশীর্বাদপূত। সুবিচার কি ভাবে হইতে পারে, স্যার গুরুদাস হা জানিতেন। বিরোধীদের আমি দেখাইয়া দেই যে, পরীক্ষার াফলের ব্যাপারে যাহাতে কোন অন্যায় না হয় তাহার জন্য ষ্ট সাবধানতার ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষা শেষ হইবার পরই ান পরীক্ষকগণ প্রশ্নপত্রগুলি পরীক্ষা করেন: তারপর প্রধান ীক্ষক ও অন্যান্য পরীক্ষকদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই কে প্রশ্নাবলীর জটিলতা বা অপরাপর বিষয়ে আলোচনা হয় ং নম্বর কি ভাবে দিতে হইবে, সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুসারে নমুনাস্বরূপ কয়েকখানি উত্তরপত্র পরীক্ষা হয়। প্রধান পরীক্ষকগণ পরীক্ষিত পত্রগুলি দেখেন; র উদ্দেশ্য তিনি যে নির্দেশ দিয়াছেন সেই অনুসারে উত্তরপত্রগুলি হইয়াছে কি না তাহা লক্ষ্য করা। নিজের নির্দেশ অনুসারে উত্তরপত্র সমূহ পরীক্ষিত না হইয়া থাকিলে তিনি পুনঃপরীক্ষার র্দেশ দেন। এই ভাবে পত্রগুলি পরীক্ষা চলিতে থাকে। প্রতি হে পরীক্ষকগণ মুখ্যপরীক্ষকের নিকট কিছুসংখ্যক উত্তরপত্র পাঠান, তিনি আবার সেগুলি পরীক্ষা করেন, নম্বর ঠিক করিয়া দেন, নম্বর কোথায় এক ভাবে বাড়ান যায় দেখাইয়া দেন। পরীক্ষক-বোর্ডের বৈঠকে বিষয়টি পুনরায় আলোচিত হয়। আমি যখন উপাচার্য্য ছিলাম, সেই সময় গ্রেস-নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে বোর্ড আমার মতামত জানিয়া সুবিচারের ব্যবস্থা করেন। আমার মনে হয় যে, ইহার পর গ্রেস-নম্বর দেওয়ার আদৌ কোন অবকাশ নাই। আমি পূর্বেও মনে করিতাম এবং এখনও করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির যে অভিযোগ রহিয়াছে, গ্রেস-নম্বর দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত থাকাই তাহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

এতদ্ব্যতীত, পাশের নম্বর যদি ৩০ হইয়া থাকে এবং একজন ছাত্রকে যদি ২৯ নম্বর পাইলেও পাশ করাইয়া দেওয়া হয়, তবে যে ছাত্র ২৮ নম্বর পাইল তাহাকে কেন পাশ করাইয়া দেওয়া হইবে না? এবং তাহাকে যদি পাশ করাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে যে ২৭ নম্বর পাইল তাহাকেই বা কেন পাশ করিতে দেওয়া হইবে না? এই ভাবে অন্যদেরও প্রশ্ন উঠিতে পারে। ছাত্ররা অধিক সংখ্যায় পাশ করিল কি ফেল করিল, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরীক্ষার মান নির্দ্ধারিত হইলে সর্বক্ষেত্রে সুবিচার হইতে পারে না। ধরাধরির লোক থাকুক আর নাই থাকুক, সকল ছাত্রের প্রতি সুবিচার করাই ছিল আমার লক্ষ্য। এইজন্যই আমি পরীক্ষা ব্যবস্থার উল্লিখিত পরিবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

২৬। পরীক্ষকদের আমি বার বার অনুরোধ জানাইয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন উত্তরপত্রগুলি সর্ব্বাবস্থায় নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার্থী যে নম্বর পাইল, তাহাতে আরও এক, দুই কিংবা তিন নম্বর যোগ দেওয়া হইবে কি না, সে সম্পর্কে সন্দেহ হইলে পরীক্ষকদের উচিত হইবে সমস্ত পত্রটি আবার পড়া ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষার্থী পাশ করার উপযোগী কি না তাহা দেখা এবং সেই অনুসারে তাহাকে পাশ করান। পরীক্ষকরা অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহারা শিক্ষক। ছাত্রদের সম্পর্কে এবং ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে সিণ্ডিকেটের অ-শিক্ষক সদস্যদের চেয়ে তাঁহাদের জ্ঞান অনেক বেশী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পরীক্ষকদের উপর ভরসা করাই ভাল হইবে।

২৭। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া দেখিলাম যে, শ্রী সি, সি বিশ্বাসের আমলে শিল্প ট্রাইবুনাল যে আদেশ দিয়াছিল উহা সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী হয় নাই। আমার সময়ে সিণ্ডিকেটের সম্মুখে একটি নূতন দাবীপত্র পেশ করা হইলে উক্ত রোয়েদাদ পুরাপুরি কার্য্যকরী করা হয়।

২৮। আমার চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্ততঃ দুই জন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোককে সরাইয়া দেওয়া হয়।

২৯। ১৯৫০ সালের মে মাসে আমি যখন উপাচার্য্য হই, তখন অবধি আমার পূর্ববর্তী উপাচার্য্য সি, সি বিশ্বাসের আমলে নিযুক্ত স্যার বি, এল মিত্র তদন্ত কমিটির রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের মাত্র একটি অংশ মুদ্রিত হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় আইন-সচিবের দায়িত্ব গ্রহণকল্পে শ্রীবিশ্বাস উপাচার্য্যের পদ ছাড়িয়া যাইবার সময়ে আমার হাতে প্রথম খণ্ডের অমুদ্রিত অংশ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি রাখিয়া যান। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল না বলিয়া চারিদিক হইতে অভিযোগ ওঠে। আমি আচার্য্য ( চ্যান্সেলার ) ডাঃ কে, এন কাটজুর সঙ্গে দেখা করিয়া ব্যাপারটি তাঁহাকে জানাই এবং অনুরোধ

করি যে, তিনি যেন তাঁহার নিজের প্রেসে রিপোর্টটি মুদ্রণে আমাকে সাহায্য করেন। ১৯৫০ সালের ৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে অর্থাৎ কার্য্যত: আমার নিয়োগের দিন হইতে ছয় মাসের ভিতর তিনটি খণ্ডের মুদ্রণই সম্পন্ন হয়। অনেকে এইরূপ ভয় দেখান যে, রিপোর্টটি প্রকাশিত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হইবে। আবার আমি ডা: কাটজুর সঙ্গে পরামর্শ করি। তিনিই কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট আইনবিদ। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন যে, রিপোর্টটি গোপনীয় বলিয়া চিহ্নিত করিয়া সিনেটের সদস্যদের মধ্যে বিলি করিতে হইবে। তদনুসারে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে এই রিপোর্ট সিনেটের সদস্যদের মধ্যে বিলি করা হয়। সিনেটের সদস্যরা এই সম্পর্কে ইচ্ছামত কার্য্যব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকারী ছিলেন। ইচ্ছা করিলে ও প্রয়োজনীয় মনে করিলে তাঁহারা অনায়াসেই রিপোর্টটি প্রকাশ করিতে পারিতেন। অনেকেই বলেন, স্যার বি, এল, মিত্র কমিটির রিপোর্টটি চাপিয়া দিয়াছেন। উল্লিখিত ঘটনাবলী জানার পর আর কাহারও যে অভিযোগ উত্থাপনের অবকাশ থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

৩০। প্রবল বাধার মধ্যেও দুই-একটি ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম সহ কলেজ সমূহের পরিচালন-সংস্থার জন্য একই ধরণের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং এ ব্যাপারে কিছুটা সাফল্যও অর্জন করিয়াছিলাম। স্বজনপোষণ ও দুর্নীতির অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই আমি এই কাজে অগ্রসর হইয়াছিলাম।

৩১। আমি কলেজগুলির অধ্যাপকদের প্রতি নির্দেশ দেই যে, যিনি যতই সুদক্ষ হউন না কেন, ছাত্রদের সহায়তা কল্পে সকলকেই নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত থাকিয়া কাজ করিতে হইবে। কোন অবস্থায়ই কোন অধ্যাপককে বিলম্বে আসিতে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বে চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না।

৩২। আমি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া জানিতে পারি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অল্প কয়েক দিন কাজ করিয়াই একজন অধ্যাপক কার্য্যত: পুরা বেতনে (অধ্যয়নের জন্য) ছুটি লইয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছেন। এই রকম ঘটনা নাকি পূর্বে আরও ঘটিয়াছিল। আমি ইহার বিলোপ করিয়া নির্দেশ দেই যে, কয়েক বৎসর কাজ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ষ্টাডি লিভ (অধ্যয়নার্থ ছুটি) মঞ্জুর করা হইবে না। ইহা ব্যতীত এই ধরণের ছুটি মঞ্জুরের সময় বিভাগীয় অধ্যক্ষকে এই মর্মে সুপারিশ করিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকের অনুপস্থিতির সময়ের জন্য লেকচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ পড়িবে না।

৩৩। কোন কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করার পূর্বে আমি সর্বদাই সিণ্ডিকেটের অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সদস্যদের এবং কলেজগুলির অধ্যক্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছি। পর্য্যাপ্ত পর্য্যালোচনা ব্যতীত কোন পরিবর্তন সাধন করা বা নতুন কোন কার্য্যক্রম গ্রহণ করা আমি অন্যায় মনে করি।

৩৪। কার্য্যভার গ্রহণ করিলে আমাকে জানান হয় যে, বেশ কিছুকাল হইতে পদক ও পুরস্কার বিতরণ বন্ধ আছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেগুলি বিতরণের ব্যবস্থা করি।

৩৫। আমি কার্য্যভার গ্রহণের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিরাট বিশৃংখলার অবাধ রাজত্ব চলিতেছিল, সে বিষয়ে অনেকেই একমত। একজন প্রাক্তন উপাচার্য্যের মত হইল যে, সেই বিশৃংখলার রাজত্বে আমি মাত্র ৪ বৎসরের মধ্যে শৃংখলা ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিলাম। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আগুন জ্বলিতেছিল এবং আপনি ব্যতীত আর কেহ সে আগুন নির্বাপিত করিতে পারিত না।

আমার মূল লক্ষ্য ছিল, সবক্ষেত্রে ন্যায়বিচার চালু করা। সর্বত্রই যাহাতে একই ধরণের কার্য্যপদ্ধতি চালু হয় আমি তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য ভাল কাজ করিতে বাধা আসা স্বাভাবিক এবং বিশেষ করিয়া কায়েমী স্বার্থে আঘাত দিলে সে বাধা প্রবল হইতে বাধ্য। তবে আমার বিবেক এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, আমি যাহা কিছু করিয়াছি সকলই ছাত্রদের মঙ্গলার্থে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে।

আমার ছাত্রদের অনুরোধেই আমি এই নিবন্ধটি রচনা করিয়াছি। যখন উপাচার্য্য ছিলাম, তখন যত ছাত্র আমার নিকট আসিত আজ তাহার চেয়ে অনেক বেশী ছাত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাহাদেরই অনুরোধে এই প্রবন্ধ। আজ আমার হাতে অবসর সময় পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী; তাই ছাত্ররা আসিলে তাহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সুযোগ পাই। স্বভাবতই আলোচনাকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। অনেক ছাত্রই জানিতে চাহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আমি কি করিয়াছি। অনেকে আবার আমার কার্য্যাবলীর একটি পূর্ণ তালিকাও চাহে। আমার বিদায়-সম্বর্দ্ধনা-সভায় অন্যতম বক্তার ভাষণে আমার কার্য্যাবলীর একটি তালিকা পাইয়াছিলাম। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে আমি ছাত্রদের তাহার একটি প্রতিলিপি দিয়াছিলাম।

কয়েক দিন পূর্বে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তাঁহার পত্রিকার একটি ক্রোড়পত্রের জন্য আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। হাতে খুব কম সময় ছিল, কিন্তু তাঁহার অনুরোধ এড়ান গেল না। তাই ছোট্ট প্রবন্ধে আমার মোটামুটি বক্তব্য উপস্থিত করিয়া বলি যে, স্থানান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বিশদভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। তাহার পরই সেই আলোচনার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ জোরালো হইতে থাকে। তাই বর্তমান প্রবন্ধটি লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। ভবিষ্যতে আরও লিখিবার ইচ্ছা রহিল। আমি অবশ্য এমন দাবী করি না যে, আমি যাহা যাহা করিয়াছি সকলই নির্ভুল বা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। আমার মনে হয়, পৃথিবীতে কেহই সে দাবী করিতে পারেন না। আর সব সময় সকলকে সন্তুষ্ট করাও সম্ভব নহে। তবে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, কোন অভিসন্ধি লইয়া বা ব্যক্তিগত স্বার্থে আমি কিছুই করি নাই। অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহাই করিয়াছি।

পরলোকগত ডক্টর মেঘনাদ সাহার নিকট ঋণ স্বীকার না করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। ডক্টর সাহা বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁহার পরামর্শের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা ছিল। বিদায় 'সম্বর্দ্ধনায় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত না করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা চলে না। অবশ্য সে

যেন মনে না করেন যে, আমি ডক্টর মেঘনাদ সাহার সার্টিফিকেট উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা আমার অভিপ্রায় নহে। তাঁহার বক্তব্য উদ্ধৃত করিতে আমি এই জন্য আনন্দ পাই যে, আমি যাহা কিছু করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি মুগ্ধ ছিলেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি যাহা অনুমোদন করিতেন বাঙ্গালার জনগণও তাহাতে পরিতৃপ্ত হইবেন।

সে দিনে ডক্টর সাহা তাঁহার ভাষণে আমার প্রসঙ্গে যাহা বলেন—"আমার পূর্ববর্ত্তী বক্তাগণ আপনার গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে আমি চাহি না। তবে আমি এইমাত্র বলিব যে, তাঁহারা আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, উহার গুরুত্ব আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি। এই প্রসঙ্গে আর এক-দুইটি কথা মাত্র আমি বলিতে চাই। আপনার আমলেই নানা অসুবিধা সত্ত্বেও নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যাভবন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপনার বিরাট ভূমিকা আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। ঘরে-বাহিরে সকল দিক হইতে আমরা খুব অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। আপনি প্রধান মন্ত্রীকে সে সময় যে পত্র লেখেন, তাহা শুধু বিচক্ষণতারই পরিচায়ক নয়, কাজের পক্ষেও অত্যন্ত সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার পরই তিনি এই ইনষ্টিটিউটকে প্রভূত সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আভ্যন্তরীণ সঙ্কটও খুব বেশী রকম ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমরা শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহানুভূতি পাই। তিনি আমাদিগকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার ও আপনার সমর্থনেই এই বিদ্যাভবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। আমি সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতার সহিত আপনার অবদান স্বীকার করিব। আপনার আমলে এই ইনষ্টিটিউটের সহিত আর একটি ফ্যাকাল্টি যুক্ত করা হইয়াছে এবং উহা হইতেছে ফ্যাকাল্টি অব টেকনোলজি। এই ব্যাপারে আপনার অবদান ও সাহায্যের কথা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব।

অধ্যাপক হিসাবে যখনই কোন সঙ্কটে পড়িয়া আপনার নিকট আমি আসিয়াছি, আপনি মনোযোগ সহকারে আমার বক্তব্য শুনিয়াছেন এবং আমাকে এমন ভাবে পরামর্শ দিয়াছেন, যাহাতে আমার উপকার হইয়াছে। সেদিনের কথা আমার স্মরণ আছে—সিণ্ডিকেটের কক্ষে আমরা মিলিত হইয়াছিলাম এবং ছাত্রগণ আমাদের বাহিরে যাইতে দিতেছিলেন না। এই অবস্থায় সারারাত্রি কাটাইয়া ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে আপনি অপূর্ব্ব ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। অনুরূপ আর একটি ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে যাইয়াও আপনি প্রভূত দৃঢ়তা দেখান, ইহা আমার স্মরণ আছে।

মহোদয়, আমরা একটি নূতন যুগে প্রবেশ করিতেছি। ৫০ বৎসর ধরিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ব্যবস্থা চালু ছিল, উহার অবসান ঘটিয়াছে। এক্ষণে এক নূতন ব্যবস্থা চালু হইবে।... পুরাতন ব্যবস্থার শেষের কয়েকটি বৎসরে আপনার নেতৃত্বাধীনে কাজ করার পরম সৌভাগ্যের কথা আমি স্মরণ করিব। আপনি বরাবর স্থিরচিত্তে বিচার-বিবেচনা করিয়া আসিয়াছেন এবং প্রতি ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির ঊর্দ্ধে থাকিয়া কাজ করিয়াছেন।...এই কথা কয়টি বলিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের শিক্ষা ব্যাপারে আপনার বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টার জন্য আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিব।"
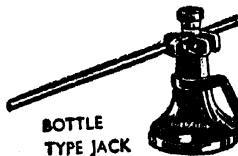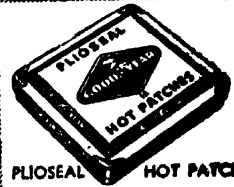
# যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বিবি

## ছায়ামরু।

সহরটা ছেড়ে পেছন পেছন সাত আট মাইল ফলো ক'রে
ভূতে ধরেছে কি কাউকে কখনো, বুসসার্টে কালো টাই পরে ?
শিশু রোদ্দুর খেয়ালা করছে, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ পূবের দিকে,
থেকে থেকে আলো, মাঝে মাঝে ছায়া, কিছু ডিপ-ডিপ, কিছুটা ফিকে।
রানওয়ে ঘুমোয় বিমান ঘাঁটীতে, কুমারী মেয়ের সাঁথির মত,
কুয়াশায় ভরা, যেখানে সিঁদুর বড় ঈপ্সিত অভ্যাগত।
গুনগুন করে কি যেন গাইছি, হু হু করে মরে কেবল বুক,
মনে পড়ে শুধু দেখে তো এসেছি মার-কাকীমার মলিন মুখ।

বাগ্‌দত্তা তো কুমারী ললিতা, মন থেকে মুছে সব অতীত,
কোমর বেঁধেছে, মাটি খুঁড়ে গাঁথে আগামী ভবিষ্যতের ভিত।
কাশীর বাড়ীতে, অজানা অচেনা বিমলবাবুর শোবার ঘরে,
রাজ্য যে তার কি করে ছড়াবে, অন্য মেয়েরা কি সব করে ?
সেই ভাবনায় দুরু-দুরু বুক, নিখিলের কথা রাখে না মনে,
কেন বা রাখবে, ভদ্রমেয়ে কি আস্কারা দেবে ইতর জনে ?
এখন তো ভাবি, বিয়ে হলে পরে অদল-বদল অনেক হ'বে,
পারবো কি আমি মানিয়ে চলতে, সন্দেহ লাগে, সব কি স'বে ?

মেয়েদের বেশ মজার জীবন, গোড়া থেকে গাছ উপড়ে নিয়ে,
অন্য মাটিতে আবার পুঁতবে, অভিধানে তার অর্থ বিয়ে।
বাবা মা, তাঁদের প্রকৃসি চলবে, শাঁখ আর উলু-উলুর ধুমে,
এক মিনিটেই লতিয়ে জড়াবে, ললিতা চট্টো বন্দ্যো-ক্রমে।
তারপর টেনো বরের দিকটা, যা' কিছু ঘটুক, সব ব্যাপারে,
সিন্দুকে তুলো নিজের অতীত, ভালো কিউরিও বিকোতে পারে।
শুধু নির্জলা অপরিচিতির দ্বিধা-থরোথরো কাঁপুনি নিয়ে,
অজানা-পুরুষ-অঙ্কশায়িনী, শুয়ে থেকো ঘরে খিলটা দিয়ে।

দ্বিধাবিভক্ত মনটা যখন হঠাৎ ভূত যে ধরলো এসে,
চিঠি দিতে চায় এমন বেহায়া, সপ্রতিভের মতন হেসে।
তুমি কি ভাবছো, ললিতা চট্টো, লক্ষ্মী মেয়ের মতন নিলে,
ট্রেটারের চিঠি সুড়সুড় ক'রে, ললিতাকে ভাবো অতোটা ঢিলে ?
মুখের দিকেই তাকালুম না তো, দরকার নেই কোন চিঠির,
বললুম শুধু চোখ নিচু ক'রে ; দূরে রেলগাড়ী, তার সিটির,
শব্দটা এলো, আমার কথায় এমফ্যাসিসের মতন ঠিক,
বললে নিরুক আঁস্তাকুড়েতে, মিথ্যে প্রেমের সব ঝিলিক।

নিলুম না চিঠি হাতে ক'রে মোটে, তোতলা কি হয়ে গেছে নিখিল ?
তু-তু-তুমি কিছু বু-বু-বুঝছোনা, আই এ্যাম্ ট্রু, ষ্টি-টি-ষ্টিল !
পৃথিবীতে যতো ঘৃণা আছে আর, যতো সন্দেহ, অবিশ্বাস,
তাই চোখে নিয়ে চেয়ে দেখলুম, মুখেতে করেছে দাড়ীর চাষ !
কায়দা ভোলেনি, নিচের দিকটা, কাঁচি চালিয়েছে, ফরাসী কাট্,
সেই দাড়ী মুখে, বুকে কালো টাই—সিওরলি স্যাম লাভার ক্যাট্।
বাঁচলুম, ঐ ওয়ার্ণিং বেল, বাজছে প্লেনটা ছেড়ে যাবার,
হাতে গোঁজা চিঠি ছুঁড়ে ফেললুম, পড়লো জুতোর ওপরে তার।

চলে গেলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, বিরক্ত হয়ে প্লেনেতে গিয়ে,
সিটে বসলুম, দেখলুম এলো, অভদ্রভূত সঙ্গ নিয়ে।
প্লেন ছেড়ে গেল, সুমুখের রোতে বসেছে, চাইছে পেছন ফিরে,
মঙ্গলবারে ভূতের মহিমা, আষ্টে পৃষ্ঠে ধরেছে ঘিরে।
ও যতো চাইছে, চোখ নিচু ক'রে ইগনোর করি কোমর বেঁধে,
বেহায়া কেবল ফিরে তাকাচ্ছে, টানা-টানা চোখ মরছে সেধে।
একবার এসে জিজ্ঞেস করে, কানে তুলো আমি দিয়েছি নাকি,
উপদেশ দিলে, বেল্ট্‌টাকে যেন টাইট করেই লাগিয়ে রাখি।

হু-হু করে প্লেন উড়ছে ওপরে, মেঘরাজ্যের এলাকা ছেড়ে,
স্পর্শ করতে চাইছে আকাশ, পাখীর মতন পাখনা নেড়ে।
হায় ধরিত্রি, কতো দূরে তুমি, কোথা পর্বত, কোথায় নদী,
এখানে কেবল নীল আর নীল, নীল আকাশের নেই অবধি।
পেছনের দিকে ললিতা বসেছে, সুমুখের সিটে বসে নিখিল,
নিচ দিয়ে ধোঁয়া মেঘ উড়ে যায়, মাথার ওপরে কি ঘন নীল !
নিখিল ভাবছে, আগের ভাবটা কেমন করে যে জমানো যায়,
ললিতা বোঝে না, কেন এক প্লেনে জুটে গেছে এসে নিখিল রায়।

মানুষ কি পারে মাটি ছেড়ে দিতে, মাটির স্পর্শ চায় মানুষ,
যতোই ওড়াক ভাবের আকাশে, আগুন জ্বালিয়ে মন-ফানুস।
বালির ওপরে কে ঘর বেঁধেছে, অসীম শূন্যে কে বাঁধে নীড় ?
মানুষের মাটি মানুষকে চায়, মানুষের বুক মুখের ভীড়।
ঐ ওৎ পেতে প্যাসন্ বসেছে, তৃতীয় আসনে প্রথম রোতে,
মনে হয় যেন দশটা হাজার মাইল তফাৎ আমাতে ওতে।
অনবরতই মাইট্ হ্যাভ্ বিন্ ঝমঝম করে বাজছে কানে,
ফেলে-আসা কথা অতীত দিনের জোরেই সেদিন আঁচল টানে।

কেমন করে যে ভুলবো সে কথা, সেই সন্ধ্যের আগুন থেকে,
ছড়িয়ে পড়েছে দাউ দাউ দাউ, পঞ্চশরের ভস্ম মেখে।
মুছে ফেলা সেটা এতো কি সহজ, ভুলি মনে করি: ভোলা কি যায় ?
সর্পদষ্ট মৃতদেহ নিয়ে বেহুলা ভাসছে আজো ভেলায়।
নিখিল তো ছিল আমার জীবনে, মস্ত বড়োই জায়গা জুড়ে,
তারপর খাঁচা কবে খুলে গেছে, কবে চলে গেছে পাখীটা উড়ে।
আর কেন মিছে সে সব ভাবনা, হাতছানি দেয় অন্য প্রেম,
নতুন ফ্যাসানে ছবিটা বাঁধাবো, তাইতো কিনেছি নতুন ফ্রেম।

ননষ্টপ প্লেন নয় আমাদের, প্রথমে নাবলো এলাহাবাদে,
নাবলুম নিচে মাটির ওপরে, ব্রেকফাষ্ট খেতে নিখিল সাথে।
টেবিলেতে গিয়ে বসে পড়লুম, নিখিলেশ ঘেঁসে বসেছে পাশে,
যতো কথা কয়, তার চেয়ে বেশী দাঁত বার করে বিশ্রী হাসে।
বললে, যাচ্ছি বেনারসে আমি, চিঠি লিখেছেন গুরুমা কাল,
সমস্ত কথা বলেছি তো তাঁকে, তিনি ধরছেন দু'হাতে হাল।
বলেছি, ললিতা নিখিল দু' জনে ভালোবাসে, তাই বিয়েটা হ'লে,
দু'জনার দুটো তরুণ জীবন সার্থক হ'বে ফুলে ও ফলে।

বলিনি তখনো একটা কথাও, খেতে খেতে ভয়ে শিউরে মরি,
গুরুমার কাছে গিয়েছে বলতে সব কথা, ছি ছি, গলায় দড়ি।
নেই না আমার বিশ্বাস ওকে, তবু ভয়, সব পারে নিখিল,
লজ্জা সরম যার ধড়ে নেই, যে সহজে করে তালকে তিল,
মাত্রার জ্ঞান নেই এতোটুকু, যার কাছে নেই লঘু ও গুরু,
সে লোক কখনো বুঝতে কি পারে, কোথা শেষ হবে, কোথায় সুরু ?
মনে না, তবু আবার বললে, শ্রীশ্রীযোগমায়া আমার মাকে
সম্মতি দিয়ে চিঠি দিয়েছেন সে দিন তখুনি জরুরি ডাকে।

বকবক করে কত কি বললে, কথা না বলেই গেলুম প্লেনে,
নিখিল তো যাবে গুরুমার কাছে, প্রয়াগ থেকেই পরের ট্রেণে।
এতো তো বললে, অমন লোকের সত্যি মিথ্যে বোঝাই দায়,
কেমন করে বা বিশ্বাস করি ঠিক কথা বলে নিখিল রায় ?
সত্য কথাই বলে থাকে যদি, ভীষণ সাহস বলতে হবে,
শেষে শেষে গিয়ে জুজুকে ধরবে, সে কথাটা বলো ভেবেছি কবে ?
এরোপ্লেন চলে, সব দিকে ছি, ছি, শব্দ হচ্ছে ছি-ছিই শুধু,
বুকের ভেতরে বড়ো জ্বালা করে, লজ্জা-আগুনে জ্বলছি ধু-ধু।

মেঘের সীমানা আবার ছাড়িয়ে নভোনীলিমায় ওঠে বিমান,
প্লেন আমরা নর-নারী বসে, ধ্বক ধ্বক বাজে ক'খানা প্রাণ।
আর দেখছি একরাশ ঐ দৈত্যের মতো মেঘের দল,
বিমানের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মেঘে ঢেকে গেছে একটা পল !
প্লেনে একটি ভদ্রমহিলা হয়ে পড়েছেন এয়ার সিক্,
ওয়াক ওয়াক শব্দ হচ্ছে, বাকীটা তোমরা বুঝেছো ঠিক।
কাকীমার সজল চাউনি মাঝে মাঝে শুধু পড়ছে মনে,
তা, নিখিল উঠে পড়েছে কি কাশীর গাড়ীতে এতোক্ষণে ?

ভেবেই পাই না নিখিলের কথা সত্যি যে হবে কেমন করে,
প্রাচীনপন্থী শ্রীশ্রীযোগমায়া ভীষণ কঠিন মনে তো পড়ে !
ললিতাকে বিয়ে করবে নিখিল, এ ব্যাপারে তিনি রাজী হলেন ?
আগে তো দেখিনি কোনদিন তাঁকে কোন কথা নিয়ে এতো গলেন !
তারপর বোঝো, টু ছাট এফেক্ট, মাকে চিঠি লেখা হয়ে গেছে
আমোদে নিখিল পথে মাঠে ঘাটে, ধেই ধেই করে বেড়ায় নেচে !
নিখিল বললে, গুরুমার মতে প্রেম পৃথিবীতে সবার বড়ো,
বাঁশ যদি হয় জাতকুল, প্রেম-কঞ্চি, বাঁশের চেয়েও দড়ো।

বলেছেন নাকি নিখিলকে তিনি বল্লিরাও তো জাতে বামুন,
বামুন করতো যজন যাজন, বল্লি মাজন, হজমী নুণ !
তারপর যদি তা নাই হ'ত, হ'ত যদি দুটো আলাদা জাত,
এক পঙক্তিতে না যদি পড়তো রায়, চট্টোর খাবার পাত—
এসে যেতো তাতে এতোটুকু নাকি, দাঁড়াতেন যদি অতনু এসে,
চাইতো দু'জনে যদি দু'জনকে, সত্যি সত্যি ভালোই বেসে ?
জেন্যুইন প্রেম যেখানে রয়েছে, মহামুক্তির সেখানে বীজ,
বললে নিখিল এই সব কথা, ওতো একখানি আস্ত 'চিজ'।

তারপর আরো কথা আছে শোনো, যে রকম মা অর্থোডক্স্
ললিতাই হবে মাতৃহন্ত্রী, গিভিং হারএ ডজন্ সক্স্ !
অবশ্য যদি গুরুমা লেখেন, নিশ্চয় মা তো রাজি হবেন,
তারপর বিয়ে হয়ে গেলে পরে, সংসার ছেড়ে চলে যাবেন।
না, না, বলি শোনো, বলুন গুরুমা, তার কাছে গিয়ে বলবো আমি,
মিথ্যাচারী ও নিখিলেশ রায়, লায়ার হিসেবে বেজায় নামী।
আমি ওকে মোটে ভালোবাসি না কো, বিমল বন্দ্যো, সেইতো ভালো,
হোকগে কিছুটা টাক-টাক মাথা, রংটা খানিক হোক না কালো।

নবাব বেগম সুর্মা আতর, সেই দেশ, তার ড্রিমিং বুকে,
মহাদিল্লীর ওপরে ওপরে, নীচু দিয়ে চলি পূর্বমুখে।
আশেপাশে দেখি কতো যে কবর, কত প্রাসাদের ইটের স্তূপ,
কতো জায়গায় কতো চাপা কথা, চুপ চুপ কতো চোখের রূপ।
দিল্লী এসেছে, আশা আছে মনে, প্রতিমা আসবে সিমলা থেকে,
প্রোষিতভর্ত্তা, অতএব যাবে নয়াদিল্লীর লাড্ড্ চেখে।
প্যালাম বিমানঘাঁটীতে এলুম, মাটিতে হঠাৎ প্লেন নেবেই,
ট্যাক্সি ট্র্যাকেতে গড়গড় চলে, যেন দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই।

এরোড্রোমে ঠিক এসেছে প্রতিমা, চোখে-মুখে হাসি পড়ছে ফেটে,
হলুদ হলুদ নাইলন শাড়ী, প্রকাণ্ড খোঁপা ঢেকেছে নেটে।
হাতে বেঁটে ছাতা, ভ্যানিটি ব্যাগটা, চাপ্পাল পায়ে, স্লিম ফিগার,
দেখে মনে হয় সারা শরীরটা, অতনুর হাতে গ্রিম্ ট্রিগার।
বললে, এসেছি পরশু দিল্লী, চিঠি লিখে ডেকেছিল নিখিল,
সকালে বেয়ারা তোর টেলিগ্রাম, নিয়ে এলো ছেড়ে সিমলা হিল।
থ্রিল আছে ললি, হাজারটা থ্রিল, তোর জন্যেই ব্যাগেতে ভরা,
এখন এমন অবস্থা যাতে, বন্যা এসেছে, ভেসেছে ধরা।

[ ক্রমশঃ।

## ভবানী মুখোপাধ্যায়

### তেরো

তরুণ বয়সে বার্ণার্ড শ'কে দেখেই এইচ, জি, ওয়েলস বলেছিলেন "a raw, aggressive Dubliner"—সুতরাং এই দুই সাহিত্য-সতীর্থের প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়নি—পরেও নয়।

ফেবিয়ান সোসাইটিতে ১৯০৩এ এইচ, জি, ওয়েলসকে সদস্যরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব করলেন বার্ণার্ড শ, আর গ্রাহাম ওয়ালাস,—ওয়েলস কিন্তু সদস্য হয়ে আড়াই বছর ফেবিয়ান সোসাইটিকে উপেক্ষা করেছেন। ওয়েব-দম্পতি তাঁকে পছন্দ করতেন তাঁর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি এবং সমাজতন্ত্রে আগ্রহের জন্য। বার্ণার্ড শ'ও ওয়েলসকে ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী সেন্ট জেমস থিয়েটারে দুজনের প্রথম দেখা হল। সেদিন হেনরী জেমসের নাটক Guy Domville অভিনীত হয়েছিল, অভিনয়ান্তে নাট্যকারকে দর্শকরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। ওয়েলস তখন Pall Mall Gazette-এর নাট্য-সমালোচক, অথচ নাটক সম্পর্কে এতটুকুও আগ্রহ নেই!

Pall Mall Gazette-এর নাট্য-সমালোচক পদটি খালি হয়েছে শুনে ওয়েলস প্রার্থী হয়ে সম্পাদক কস্‌টের সঙ্গে দেখা করলেন।

কস্‌ট প্রশ্ন করলেন—আপনার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কতটুকু?

ওয়েলস তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—'রোমিও জুলিয়েটে' হেনরী আর্ভিং আর এলেন টেরীর অভিনয় দেখেছি, আর 'প্রাইভেট সেক্রেটারী' নাটকে দেখেছি পেনলীকে।

কস্‌ট আবার জানতে চাইলেন—আর কিছু নয়?

ওয়েলস বললেন—না, আর কিছুই নয়।

মহাখুসী হয়ে সম্পাদক কস্‌ট বললেন—চমৎকার! তাহলে রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য হবে একেবারে তাজা, উন্মুক্ত মন নিয়ে কাজ শুরু করুন। আপনাকেই নেব।

সেই হার্বার্ট জর্জ ওয়েলসের সঙ্গে আর একজন তরুণ নাট্য-সমালোচক জর্জ বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে অভিনয়ান্তে দেখা, দুজনে একত্রে একই পথে বাড়ি ফিরছেন, নাটক সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে, শ বললেন—কি বিশ্রী হট্টগোল করে সব, দর্শক বা অভিনেতা কেউ জেমসের সংলাপের মাধুর্য ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারেনি।

ওয়েলস লক্ষ্য করলেন বার্ণার্ড শ'র পোষাক-পরিচ্ছদ। সাধারণ জ্যাকেট সুট—আর দেখলেন—প্রদীপ্ত শুভ্র মুখের ওপর আগুন রঙের পাতলা শ্মশ্রুরাজি।

এই দিনের কথা উল্লেখ ক'রে এইচ, জি, ওয়েলস বলেছেন—ডাবলিনী টানের ইংরাজীতে বার্ণার্ড শ' সেই রাত্রে আমার সঙ্গে বড় ভায়ের মত ভঙ্গীতে কথা বলতে লাগলেন। বেশ লাগছিল আমার। আমার তাঁকে ভালো লাগল, আর সেই ভালো লাগাই সারাজীবন অক্ষুণ্ণ রয়ে গেল। ( I liked him with a liking that has lasted a life-time. )

রঙ্গমঞ্চের কাজে ব্যস্ত থাকলেও বার্ণার্ড শ'কে এইচ, জি, ওয়েলসের ফেবিয়ান সোসাইটি'সংস্কার প্রচেষ্টাকে সক্রিয় ভাবে প্রতিরোধ করতে হয়েছে। ওয়েলস ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ফেবিয়ান সোসাইটিতে যোগদান করলেও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে সুরু হল তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টা। এই বছরেই ৯ই ফেব্রুয়ারী এইচ, জি, ওয়েলস এক প্রবন্ধ পাঠ করলেন—"Faults of the Fabian"—এই প্রবন্ধে তিনি বললেন যে, 'ফেবিয়ান সোসাইটি তার ড্রয়িংরুম মার্কা আলোচনার কাজ অতিক্রম করেনি।' ওয়েলসের অতৃপ্তির প্রধানতম কারণ—সোসাইটির আকৃতি তখনও অতি ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত দরিদ্র। ওয়েলসের ধারণা ছিল, মহৎ কাজ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বিরাট জনতাই তার যোগ্য, ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মূল্যহীন, সব কিছুই বিরাট হওয়া চাই। তিনি প্রবন্ধের মাধ্যমে বললেন—ফেবিয়ানদল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন চান। স্বচক্ষে আজকের সভা নিরীক্ষণ করুন, এই ছোট সভাগৃহ, দু-চারটি সদস্য, এখানে-ওখানে ছড়ানো—আর বাইরে যেয়ে ষ্ট্রাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ান, ব্যবসাকেন্দ্রের বিরাট প্রাসাদগুলি লক্ষ্য করুন, বিজ্ঞাপনের চমক দেখুন, জনবহুল পথঘাট এবং অসংখ্য মানুষের ভীড়ের দিকে তাকিয়ে দেখুন। এই বিরাট ও সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের ভিত্তিমূলে আঘাত করেই আপনারা পরিবর্তন আনতে চান তাহলে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার অকিঞ্চিৎকরত্ব বিবেচনা করুন

এই ভাবে ওয়েলস ফেবিয়ান সোসাইটির সব কিছুরই সমালোচনা করলেন, সোসাইটির বক্তব্য তাঁর কাছে—"Ill written and old fashioned harsh and bad in tone, assertive and unwrite."

সদস্যসংখ্যা অবিলম্বে বাড়ানো প্রয়োজন। ফেবিয়ান সোসাইটির চেষ্টাতেই যে লেবর পার্টির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, বা ওয়েলস কর্তৃক নিন্দিত ফেবিয়ান সোসাইটির বিভিন্ন নিবন্ধাবলী অনেকেই আগ্রহ সহকারে পড়েছেন, আর স্বদেশে ও বিদেশে অনেক রাজনীতিক তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা যে ফেবিয়ান সোসাইটির পরিকল্পনা, এসব তথ্য যেন এইচ, জি, ওয়েলসের অজ্ঞাত, বা জানা থাকলেও তিনি তা উপেক্ষা করেই আক্রমণ সুরু করলেন।

ফেবিয়ান সোসাইটির যাঁরা প্রবীণ সদস্য বা old gang তাঁরা ওয়েলসের এই সংস্কার-সংগ্রাম প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করলেন না। ওয়েলস ফেবিয়ান সোসাইটির পক্ষে অনুপযুক্ত। তখনকার ফেবিয়ান

সোসাইটির নেতৃত্ব ছিল মূলতঃ ওয়েব, শ, ব্লানড, ওয়ালাস এবং অলিভিয়ারের হাতে, old gang বলতে তাঁদেরই বোঝাতো। ওয়েব এবং অলিভিয়ারের প্রথম শ্রেণীর সরকারী কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। ওয়ালাস ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক, উচ্চশিক্ষিত এই তিন জনেই শ' এবং ব্লানডকে হাতে গড়েছিলেন,—ফেবিয়ান দলে যোগদানের সময় উভয়েই ছিলেন ওয়েলসের মতো উদ্দাম প্রকৃতির সাহিত্যিক। অভিজ্ঞদের হাতে পড়ে তাঁরা উপযুক্ত কর্মীতে পরিণত হয়েছিলেন, কমিটির পরিচালন পদ্ধতি বা বিধি-নিষেধের সম্পর্কে পারদর্শী হয়েছিলেন। নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধির জন্য এঁদের চেষ্টা ছিল অসীম!

বার্ণার্ড শ' অবশ্য কিঞ্চিৎ ফেবিয়ান মুদ্রাদোষের জনক, এবং সেই মুদ্রাদোষই ওয়েলসকে বিরক্ত করেছিল, তবে যাঁরা নেতৃস্থানীয় তাঁদের সকলেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁরা তাই বিরক্ত ছিলেন না। এই দলে তাই এইচ, জি ওয়েলস বে-মানান। তিনি এদের চেয়ে দশ বছরের ছোট, দশ বছর পিছিয়ে। এতটুকু প্রতিবাদ সহ্য করার শক্তি ছিল না ওয়েলসের, বন্ধু মহলে এইচ, জি ছিলেন বেশ পরিহাসরসিক, কিন্তু বিতর্কে এইচ, জি, ওয়েলস ক্ষমাহীন, শিষ্টাচার-বিরহিত।

মিসেস ওয়েব বলেছিলেন—এইচ, জি, তোমার এই অভব্যতার ফলেই তুমি কোনো দিন জনসমাজে দাঁড়াবার যোগ্যতা লাভ করবে না।

গোড়া থেকেই ওয়েলস যেন এই দলে এসেই বিজিত হয়েছিলেন, বিপ্লবের উপযোগী মনোভাব বা প্রস্তুতি তাঁর ছিল না, সহিষ্ণুতাও নয়। আর মূলতঃ তিনি দুটি মানুষের বিরোধী ছিলেন, একজন ওয়েব অপর ব্যক্তি বার্ণার্ড শ'। এঁরা দুজনেই ছিলেন সভা পরিচালনায় অতিশয় দক্ষ এবং কুশলী বক্তা।

আকৃতিতেও ওয়েলস এঁদের কারো সমকক্ষ ছিলেন না, এরা সবাই লম্বায় ছ'ফুট, কেউ আবার তারো বেশী, অলিভিয়ার এবং ব্লানড ছিলেন দানবাকৃতির মানুষ, অলিভিয়ার গ্রেহাম ওয়ালাসকে অনায়াসে তুলে ছুঁড়ে ফেলতে পারতেন, আর ব্লানড এমনই শালপ্রাংশু মহাভুজ যে, বার্ণার্ড শ' কোনো দিন তাঁর পাশের আসনে বসতেন না। সকলেই বেশ সুদর্শন এবং সুপুরুষ, ওয়েলস এঁদের কাছে বামনসদৃশ।

এই সব বিরাট ব্যক্তিত্ব ও পণ্ডিতমহলে ওয়েলসের কোনো আসন পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু ফেবিয়ানরা উদার মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ছিলেন, তারা সকলেই লেখক এইচ, জি, ওয়েলসের রচনাবলী পড়েছিলেন, তাদের তাই বিশ্বাস ছিল ওয়েলসের বক্তব্যও গ্রহণযোগ্য হবে। বন্ধুমহলে আলাপচারে ভালো লাগলেও সভাগৃহে তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রুতিকটু হয়ে উঠতো, তবু-তাঁর বক্তৃতা সবাই শুনতো। কারণ তাঁর নাম এইচ, জি, ওয়েলস, মেজাজ ঠিক থাকলে তাঁর বক্তব্যও শ্রুতিসুখকর হত।

'Faults of the Fabian' এই বক্তৃতার পর ফেবিয়ান সোসাইটির কার্য্যকরী সমিতির সদস্য এবং সমিতি বহির্ভূত কয়েক জনকে নিয়ে একটা কমিটি গঠিত হল, তার উদ্দেশ্য হল—কি ভাবে সোসাইটির পরিধি, প্রভাব, আয়, এবং কর্মধারা সম্প্রসারিত করা যায় তা বিবেচনা করা। এই কমিটিতে ওয়েব বা শ' ছিলেন না, মিসেস ওয়েব সার্লেট অন্যতম সদস্য ছিলেন, আর মিসেস ওয়েলস সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন। ওয়েলস পরিচালিত স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হল আর সেই সঙ্গে পাঠানো হল কার্য্যকরী সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত আরেকটি রিপোর্ট। এই রিপোর্টের মুসাবিদা করেছেন বার্ণার্ড শ' এবং সাহিত্যগুণে অপর রিপোর্টের চাইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ। ওয়েলস পরিচালিত কমিটির প্রস্তাব ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা, কয়েক বছর পরে সেই প্রস্তাব কার্য্যকরী করলেন ওয়েব এবং বার্ণার্ড শ', তাঁদের প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হল The New Statesman, ওয়েলস তখন নিষ্ক্রিয়। ৭ ডিসেম্বর ১৯০৬ থেকে ওয়েলস-কৃত রিপোর্টের আলোচনা সুরু হয় এবং তার সমাপ্তি ঘটে ১৯০৭ এর ৮ই মার্চে, বলা বাহুল্য, বার্ণার্ড শ'র ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। উদ্বোধনী বক্তৃতায় বার্ণার্ড শ' যা বলেছিলেন তা নাকি তুলনাহীন, এই বুদ্ধির তরজা লড়াইয়ে ওয়েলসকে পিছু হঠতে হয়েছিল সেদিন। ওয়েলস Faults of the Fabian প্রবন্ধ পাঠ করার অনেক আগে থেকেই ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগেই তা চতুর্গুণ বেড়ে গেল! স্বভাবতঃই এইচ, জি, ওয়েলস এই ব্যাপারে সেদিন খুসী হতে পারেন নি। ফলে ১৯০৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সোসাইটির সদস্যপদে ইস্তফা দিলেন। এই ভাবে সোসাইটি ত্যাগের অন্য কারণ থাকতে পারে, তবে মূল কারণ ওয়েব এবং শ'র কাছে পরাজয়। এর শোধ নিয়েছিলেন ওয়েলস তাঁর The New Machiavelli গ্রন্থে!

বার্ণার্ড শ' যে আসলে ওয়েলসের প্রীতিকামী বন্ধু এবং সজ্জন, এই চিন্তা কোনো দিন মনে ঠাঁই দেন নি এইচ, জি, ওয়েলস।

ওয়েলসের মতে বার্ণার্ড শ' 'ignorant sentimentalist,' তাঁর বিজ্ঞানসম্মত মন বদ্ধ ঘরের মত, সেখানে নতুন কোন তত্ত্বের ঠাঁই নেই, মার্কস তাঁর কাছে 'shallow impostor in sociology,' নেপোলিয়ান 'Third rate wicked cad' মাত্র। সুতরাং এইচ, জি, ওয়েলসকে ফেবিয়ান সোসাইটি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন নি 'old gang' তাঁর কাছে তাই চমকপ্রদ মনে হয়নি। ওয়েলসের পর 'old gang' ধীরে ধীরে সোসাইটি ত্যাগ করেছেন। ওয়েলস যা ভুল করেছেন তা তাঁর বয়সোচিত। তিনি ভেবেছিলেন, সোসাইটির তরুণ সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধির প্রয়োজন, এবং বিরাট ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার জন্য কিঞ্চিৎ সাহস ও উদ্যমের প্রয়োজন। 'old gang' সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা তাঁদের ধারণা তাই বিভিন্ন এবং সেই ধারণাই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেছিলেন। ওয়েলস যে চমকপ্রদ সোসাইটির স্বপ্ন দেখেছিলেন তা তরুণোচিত। সোসাইটি নিজস্ব ক্ষমতা ও শক্তি অনুসারে যতটুকু করা সম্ভব তাই করেছেন। ওয়েলসের খ্যাতিকে তাঁরা সোসাইটির কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে প্রচেষ্টা সার্থক হল না। পরবর্তীকালে এ্যানী বেসান্ট বা মার্কিন মহিলা হ্যারিয়েট ব্লাটস্‌ও ফেবিয়ান সোসাইটি ত্যাগ করেছিলেন।

তার পর old gang-এর পালা, ওয়ালাস যখন দেখলেন, সোসাইটি পার্লামেন্টারী লেবার পার্টি গঠনের জন্য সচেষ্ট, তখন তাঁর মনে হল বিজ্ঞানসম্মত সমাজবাদ থেকে এরা অনেক দূরে। তিনি তখন দলত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তা হিসাবে আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে লেবার পার্টি পার্লামেন্টে বিরোধী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত

লন, ফেবিয়ান সোসাইটির কাজ শেষ হল। লেবার পার্টির ভাণ্ডারে অনেক টাকা, ওয়েলসের স্বপ্ন সার্থক হল, কিন্তু সে টাকা ড ইউনিয়নের, সোস্যালিষ্ট অর্থ নয়। বার্ণার্ড শ'কে ex-officio স্য করে লেবর রিপ্রেসেনটেশন কমিটিতে নেওয়া হল, কিন্তু তিনি বিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ; তাই প্রথম লেবর পার্টির নেতা হার্ডি বার্ণার্ড কে সরিয়ে দিলেন। ফেবিয়ান সোসাইটির মৃত্যু ঘটলো। old ing ১৯১১ পর্যন্ত ফেবিয়ান সোসাইটির কঙ্কাল আগলে বসে লেন, এই বছরই বার্ণার্ড শ' পদত্যাগ করলেন।

ব্লানড জনপ্রিয় সাপ্তাহিকের সম্পাদক, অলিভিয়ার জামাইকার র্ণর, ওয়েব লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আর বার্ণার্ড শ' তিমান নাট্যকার—নাটকের ভূমিকায় সমাজবাদী মন্তব্য দিয়ে নি তাঁর সমাজবাদী মনোভংগী অক্ষুন্ন রাখলেন।

১৯৪১-এর এপ্রিল মাসে Major Barbara দেখে উৎসাহিত চ, জি, ওয়েলস বার্ণার্ড শ'কে যে চিঠি লেখেন, সেটি সব সংখ্যায় কাশিত হয়েছে—সেই পত্রের শেষ লাইন—whatever happens or we've had a pretty good time.—

পারস্পরিক মনোমালিন্য, তুচ্ছ মতভেদ, বাদ প্রতিবাদ সত্ত্বেও য়ের মনেই সহানুভূতির স্রোত প্রবাহিত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের য় বোমাবিধ্বস্ত লণ্ডনের বিপর্যয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বার্ণার্ড শ' তাঁকে চিঠি খলেন এ্যায়ট সেণ্ট লরেন্সে এসে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়ে। সে ঠির কোনও জবাব এল না।

বার্ণার্ড শ' পুনরায় লিখলেন, ওয়েলস এবং ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবির ান ক্ষতি না হলেই আমি খুশী, লণ্ডনের অদৃষ্টে যা খুশি ঘটুক, তা মার সইবে। এই চিঠিরও উত্তর এলো না।

ওয়েলস সম্ভবত: বীরোচিত মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। অথচ ৪৪-এ The Political whats' what পাঠ করে বার্ণার্ড শ'কে খলেন—

"In the interest of artistic photography, you ust never die, your wicked old face in rontispiece in the best piece of camera work you ve ever inspired I am glad that I provoked e book ( The political whats' what ) and latter I will send you a comment on it.....in e meanwhile bless you—H. G"

১৯৪৬-এর ১০ই আগষ্ট এইচ, জি, ওয়েলসের মৃত্যু হয়। িট্রিস ওয়েবের মৃত্যুর পর বার্ণার্ড শ' চঞ্চল হয়েছিলেন তাঁর নের গোপনীয় তথ্য প্রকাশের সম্ভাবনায়, ওয়েলসের মৃত্যুর পর লস লিখিত বার্ণার্ড শ' সম্পর্কিত ঘৃণাসূচক মন্তব্য প্রকাশের পথ করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। ওয়েলসের শারীরিক অসুস্থতার াদ পেয়ে তাঁর বাসভবনে হাজির হলেন। কিন্তু তাঁকে ক্ষুণ্ণ মনে তে হ'ল, দর্শনের অনুমতি পাওয়া গেল না।

ওয়েলস মনে করেছিলেন, বার্ণার্ড শ'ই আগে মারা যাবেন, এই ily Express পত্রিকার পক্ষ থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে বার্ণার্ড শ'র ক-প্রশস্তি লিখে রেখেছিলেন। সেই রচনাটি বার্ণার্ড শ'র মৃত্যুর ম্পাদক ওয়েলসের জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুমতি নিয়ে প্রকাশ করেন। এই কুৎসিত রচনাটিতে এইচ, জি, ওয়েলস সারা জীবন ধরে বার্ণার্ড শ' সম্পর্কে যে তীব্র ঈর্ষার জ্বালা পোষণ করেছেন, তা নির্মম ভাবে ব্যক্ত করেছেন।—একমাত্র শান্তি তখন উভয়েরই পরলোকে।

## চোদ্দ

দীর্ঘদিনের এক অভিশাপ এই যে, মানুষ অমরত্ব লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটু স্থান পাওয়ার কাঙাল হয়। বার্ণার্ড শ' তাঁর খ্যাতি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তাঁর ধারণা, তিনি বহু বিষয়ে কৃতিত্ব দেখালেও কোনো একটি ব্যাপারে স্বীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে পারেননি। তিনি বলতেন, আমার একটি নাটকও অমরত্বের দাবী রাখে না। বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়কর সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে না।

তাঁর নাটকে প্রধান ভাবধারা ও মনোভংগীরই প্রাধান্য। Man and Superman-এ জীবনের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, Candida নাটকে সুখের উন্মত্ত বিস্ফোরণ, The Devil's Disciple নাটকে বলা হয়েছে, মহৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রেমের প্রয়োজনীয়তা অকিঞ্চিৎকর।

এই কালে তিনি Getting Married নাটকটি রচনা করছিলেন। এ নাটকও 'মাস্টারপীস' বা মহৎ শিল্পকর্ম হবে না, যদি না এক মহৎ মুহূর্ত এই নাটকের সমাপ্তিকে অনুপ্রাণিত না করে। তিনি বন্ধুদের বলতেন—

"The more I try professional art the greater becomes my horror and weariness of it. I'll make my new play impossible in point of length and subject."

বার্ণার্ড শ' মনে করতেন, তাঁর অন্য নাটকাবলী বক্স অফিসের দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত হলেও নাটক হিসাবে অসফল হয়েছে। Getting married নাটকে তাই নতুন ধারা প্রবর্তন করতে হবে, কোনো বাহ্যিক বা প্রক্ষিপ্ত বিষয় থাকবে না। এই সময়েই বার্ণার্ড শ' সিগমনড্ ফ্রয়েডের রচনাবলী পাঠ করেন। ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক নিবন্ধাবলী পাঠ করে বার্ণার্ড শ' বলেন—"I have said it all before him !"

Getting Married নাটক হেমার্কেট রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। বার্নার্ড শ'র মনে হল পাত্র-পাত্রীকে তিনি যেভাবে এঁকেছেন, অভিনেতৃবৃন্দ তার অন্তর্নিহিত অর্থ ঠিকমত বুঝতে পারেননি। বার্নার্ড শ' বললেন—'রাসকিন কেন পাগল হয়েছিলেন জানো, তাঁর বক্তব্য তিনি বোঝাতে পারেননি বলে।'

বার্নার্ড শ' অবশ্য অতিশয় সচেতন ব্যক্তি। বুদ্ধিভ্রংশ হওয়ার মানুষ তিনি নন। নাট্যকার ও দর্শকের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়াই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

এই সময় বার্নার্ড শ' The Sanity of Art-এর ভূমিকা রচনাতেও ব্যস্ত। এই ভূমিকায় বার্নার্ড শ' আর একবার লিখলেন, সাংবাদিকতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস,—'সাংবাদিকতাই সাহিত্যের চরমতম অভিব্যক্তি'।

বার্নার্ড শ'র বয়স এদিকে বেড়ে চলেছে, প্রথম যখন Liberty পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। নতুন শিল্পভংগী নব-নাট্য আন্দোলন, বা নব্য সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর মতামত Degeneration-এর মতো একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করবেন, এই তাঁর বাসনা ছিল। ছবিতে পোষ্ট-ইম্প্রেসনইজম, কবিতায় ইমেজিসম এবং নাটকে এক্সপ্রেসনিজম তাঁর বোধগম্য ছিল না। সীজান, এজরা পাউণ্ড, টি, এস, এলিয়ট, জেমস জয়েস, ইউজিন ওনিল, ষ্ট্রাভিনস্কি, উইনড্হাম লুইস, পিকাসো সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—'They say that they are expressing themselves, but they obviously have no selves to express'.

এদিকে সার্লোট স্বামীর অমরত্ব রক্ষার অন্তবিধ ব্যবস্থায় সচেষ্ট। বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রঁদাকে তিনি এক হাজার পাউণ্ড পাঠিয়েছেন, বলেছেন—'এই টাকার জন্য আপনার কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই, তবে অভিপ্রেত হলে আমার স্বামীর একটি আবক্ষ মূর্তি করে দেবেন।'

সার্লোট এই মূর্তিটির জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন; হয়ত ভেবেছিলেন, যদি টাকাটা রঁদা গ্রহণ করেন, তাহলে ব্যালজাকের মতো বার্নার্ড শ'র একটি মূর্তিও গড়ে দেবেন। ব্যালজাকের মূর্তিটি অতি ভালো লেগেছিল সার্লোটের।

রঁদা অনুসন্ধান করে জানলেন এই ইংরাজ ভদ্রলোকটিকে,—ফ্রান্সে তাঁর কোনও পরিচয় পেলেন না, তবে লোকটি নিঃসন্দেহে শাঁসালো বুর্জোয়া। রঁদার অর্থের প্রয়োজন নেই, সময়ও নেই। চরিত্র এবং তৎ সংলগ্ন রোমান্সেই তাঁর আগ্রহ অধিক।

শ'-দম্পতি ফ্রান্সে গিয়ে রঁদার সঙ্গে দেখা করলেন, রঁদার মন কিন্তু বার্নার্ড শ'র মুখ দেখে প্রসন্ন হল না। সার্লোট বললেন—আমার স্বামী ইংলণ্ডের ভলতেয়র। বার্নার্ড শ'র খ্যাতির প্রমাণ করলেন। জার্মাণ কবি রিলকে তখন রঁদার সব কিছু কাজকর্ম করে দেন। বার্নার্ড শ' যখন রঁদার প্রস্তরমূর্তির জন্য বসে থাকতেন এবং সার্লোট চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতেন, রিলকে তা লক্ষ্য করতেন। সার্লোট সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'যেন রামছাগলের অঙ্গে 'বাসন্তী বাতাস।' সার্লোট ভাস্কর রঁদার কাছে আবেদন জানাচ্ছেন আমার স্বামীকে অমরত্ব দান করুন।

সার্লোট বলতেন—যত সব ব্যঙ্গ চিত্রকর আর ফটোগ্রাফার স্বামীকে মেফিস্টোফিলেস (ফাউষ্টের শয়তান) হিসাবে দেখাতে চান অথচ তাঁর মুখে যীশুখৃষ্টের স্বর্গীয় জ্যোতি। আপনারও কি তাই মনে হয় না?

রঁদা বললেন—মিঃ শ'র খ্যাতি বা অখ্যাতির কিছুই আমার জানা নেই। তবে তিনি যা আমি তাই করে দেব।

রঁদা ফরাসী মানুষ, সার্লোটকে ক্ষুণ্ণ করতে তাঁর মনে লাগলো, তিনিও তাই অবশেষে বললেন—হ্যাঁ, শ'র মুখে যীশুখৃষ্টের দিব্য-জ্যোতি বর্তমান।

বার্নার্ড শ' এর আগে কোনও ভাস্করকে কাজ করতে দেখেন নি, তাই রঁদার কর্মপদ্ধতিতে তিনি আনন্দ পেলেন।

মূর্তি শেষ হল, সার্লোট আনন্দে আকুল, বার্নার্ড শ' কিন্তু তেমন খুশী হলেন না। তাঁর চোখ কই? এ যেন অন্ধের মত দেখাচ্ছে। সার্লোট মহাখুসী, ব্যালজাকের মূর্তিটা কিনে নিয়ে, শ'র মূর্তির সঙ্গে বসবার ঘরটিতে সাজিয়ে রাখলেন।

বার্নার্ড শ' অবশেষে বললেন—তা মন্দ নয়, আগামীকালের মানুষ জানবে, এই সেই বার্নার্ড শ' রঁদার মূর্তির মডেল। আর অভিধানে থাকবে—শ' বার্নার্ড—রঁদার ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু, অন্যথা অজ্ঞাত।

গ্রানভিল বার্কার কিন্তু এই মূর্তিটার তেমন প্রয়োজন আছে মনে করেন নি, তিনি বলেছিলেন—ভেলাসকয়েজ অঙ্কিত পোপ ইনোসেণ্টের পোর্টরেটই বার্নার্ড শ' অবলম্বনে অঙ্কিত, আর সেই যথেষ্ট।

এই সময়টা শ'-দম্পতি এখানে-ওখানে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, কখনও হোটেলে, কখনও গ্রামে, এবং পরে যে বাড়িতে তাঁরা অবস্থান করছিলেন সেই বাড়ি বিক্রী হবে শুনে কিনে নিলেন, নাড়ানাড়ি করার অসুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই নাকি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। (এই বিষয়ে পূর্ববর্তী এক পরিচ্ছেদে বিস্তারিত বলা হয়েছে)। বার্নার্ড শ' মনে করেছিলেন এ্যায়ট সেন্ট লরেন্সের আকাশে এমন এক প্রশান্তি আছে যা তাঁরা সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেও পাননি। সার্লোট তেমন উৎসাহিত বোধ করেন নি, তবে গ্রামে থাকার সুবিধা অনেক, উইকএণ্ডে লণ্ডন ছাড়ার হাঙ্গাম পোয়াতে হয় না।

শ'-দম্পতি শীকার-অভিযাত্রী নন, এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, সকলে জানল এরা তেমন বনেদী ঘর নয়। গ্রামের ধর্মযাজকের স্ত্রী এসে গ্রামাস্কুলের জন্য একটা কিছু পুরস্কার দিতে অনুরোধ জানালেন।

বার্নার্ড শ' বললেন—আমি একটা মোটা টাকার প্রাইজ দিতে রাজী, যে ছেলে সবচেয়ে অভব্য তাকে, স্কুলে আমিও তাই ছিলাম, এখন আমার দিকে দেখুন।

সার্লোট দেখলেন, এই দুরধিগম্য গ্রামেও মেয়েরা তাঁর স্বামীর পিছনে ধাওয়া করে। অনেক কৌশলে তাঁকে আগলে রাখতে হয়। বার্নার্ড শ' মেয়েদের উৎসাহিত করার অনেক পন্থা জানেন, তাদের চিঠিপত্রের জবাব দেন, দেখা করার অনুমতি দেন। সার্লোট জানতেন, পঞ্চাশোত্তর পুরুষও ভয়ংকর, এই সময় আরেক বার বয়ঃসন্ধির চাপল্য মানুষকে আক্রমণ করে, তাই তিনি সচেতন থাকেন।

অনেক তরুণী বার্নার্ড শ'র প্রতি এমনই আসক্ত হয়ে পড়লেন যে, তাঁকে ঠেকিয়ে রাখা দায়। একটা মোটর-সাইকেল জোগাড় করে সে এ্যায়ট সেন্ট লরেন্সে প্রায়ই ছুটে আসতো। তার ধারণা, সে একা এই মহাপুরুষের মর্ম বুঝতে পেরেছে। ভাবাবেগপূর্ণ প্রেমের

পরিধির বাইরেই দুজন। মাঝে মাঝে রাত দশটায় এসে হাজির হত, বার্ণার্ড শ'র এই বাসভবন যেন তারই বাড়ি এবং বার্ণার্ড শ' যেন তার স্বামী, এমন ভাব দেখাতো।

বার্ণার্ড শ'র প্রতি তার বেশ প্রভাব, শ'র প্রভাবও মেয়েটির ওপর কম নয়। উভয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভাব আছে। অবশেষে সার্লোট আর তাকে বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না, এখন মেয়েটি কাছাকাছি এক মাঠে তাঁবু ফেলত বা একটা গোলাবাড়িতে আস্তানা নিত। বার্ণার্ড শ'ও স্থানীয় এক সরাইখানায় তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন।

সার্লোট ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রানভিল বার্কারের কাছে অনুযোগ করলেন। আবেদন জানালেন এই সংকট থেকে ত্রাণ করবার জন্য, কারণ গ্রামে মুখ দেখাবার আর উপায় থাকছে না।

গ্রানভিল বার্কার সেই সময় উইকএণ্ডে এ্যায়ট সেণ্ট লরেন্স আসতেন। তিনি বার্ণার্ড শ'কে বললেন—আপনি স্ত্রীর প্রতি আপনার কর্ত্তব্য পালন করছেন না, মেয়েটিরও ক্ষতি করছেন।

বার্ণার্ড শ' তখন বার্কারকে বললেন—মেয়েটি চমৎকার, বুদ্ধিমতী, মাধ্যমে আমি তারুণ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। পাটি ব্রুক ওর চমৎকার পড়া আছে, চমৎকার আধুনিক মনোভঙ্গী, র রীতিমত সরল, স্পষ্টাস্পষ্টি সব কথা বলতে পারে।

গ্রানভিল বার্কার উত্তেজিত হয়ে বললেন—আমি মেয়েটাকে খুন বো, আপনাকে আমি এই বিশ্রী পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে চাই; াহ মানে স্ত্রীর প্রতি আনুগত্য, এ ছাড়া তার আর অন্য অর্থ নেই।

বার্ণার্ড শ' বললেন—মেলোড্রামাটিক হয়ে লাভ নেই, এতে মেয়েটির মজা বাড়বে, ও এই সবের অনেক উর্দ্ধে, আসলে ও শুধু নারী নয়, মহানারী Super-woman।

এই মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং সাহচর্যের কথা সেভিয়ান ভঙ্গীতে অতিরঞ্জিত করলেন বার্ণার্ড শ'। লর্ড সামারহেস এবং টারলেটনের দ্বৈতভূমিকায় আপনাকে রূপায়িত করে বার্ণার্ড শ' তাঁর নতুন নাটক Misalliance রচনা করলেন। এই নাটকটি তাঁর সমগ্র নাটকাবলীর মধ্যে ক্লান্তিকর। এই নাটকে লর্ড সামারহেস টিপাটিয়াকে বলছেন—"যথাসম্ভব সোজাসুজি বলা যায় সেইভাবেই বলি। তুমি যখন বলো আমি নির্বোধের মত কাণ্ড করেছি, জেনো সেখানে আমি কবি-নির্বোধ হিসাবেই রূপায়িত। যৌনক্ষুধার বশে আমি প্রলুব্ধ হইনি, ঈশ্বরের করুণায় অনেক দিন আগেই সে অবস্থা পার হয়ে এসেছি—এ আমার দ্বিতীয় শৈশব নয়, শিশুসখ্যতার কামনাও নয়, এ শুধু নিষ্পাপ আবেশ, আমার বয়সের আধ্যাত্মিকতা এবং জ্ঞানকে তোমার তারুণ্যের সেবায় কয়েক বছরের জন্য নিবেদন করছি মাত্র।"

এই নাটকে সন্তানদের প্রতি পিতামাতার সম্পর্ক সম্বন্ধে এক ধারা বিবরণী দেওয়া আছে। বার্ণার্ড শ'র মতে জনক জননীরা সন্তানদের ঠিকমত জানেন না, তাদের নিয়ে কি করা উচিত, তাও তাঁদের জানা নেই। ছেলেমেয়েরা তাই বাপ-মাকে এত বিসদৃশ বস্তু মনে করে।

[ ক্রমশঃ।

# লঘু মুহূর্ত্ত

সমীর সেন

গীর্জায় ছুটো বাজে, শীতের দুপুর
এলোমেলো হাওয়া বয়, রেডিওতে সুর,
নবীন ঘণি তোলে, দেখি একমনে
পাশের বাড়ীর মেয়ে উলকাঁটা বোনে।

রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে। একরাশ চুল
শ্রাবণের নদী যেন, স্বপ্নের ফুল,
চোখের খোঁপায় গোঁজা, আঁচলের সাপ
বাতাসে দুলছে ফণা, আমি চুপচাপ।

বসে আছি জানালায়, চোখে পড়ি নাই
সে মেয়ের, সে তো কত প্রগাঢ় কথাই,
বুনছে হয়তো তার নিপুণ আঙুলে
স্মরণের কাঁটা দিয়ে হৃদয়ের উলে।

তারই লাল আভা লেগে গাল মাখামাখি
কাউকে পড়েছে মনে, আমাকেই নাকি?
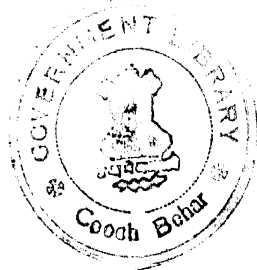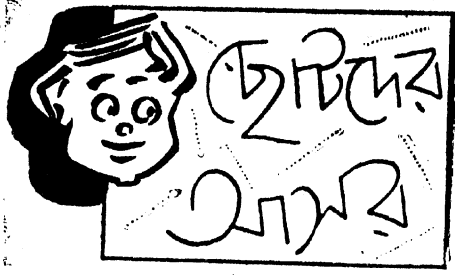
নেপালের রাজধানী কাটমণ্ডু।

এখানে পৌঁছে শান্তনু, কিশোর এবং ললিতা একটি সরকারী অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। নেপালের দৃশ্যাবলী এই তিনটি বাঙালীর চোখে অপরূপ লাগলো। সেখানকার বাড়ীঘর, প্রাসাদ, দোকানপাট সবই অন্য রকম। ওরা সারা শহর বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখছে আর অবাক হয়ে যাচ্ছে। ওখানকার মানুষও অদ্ভুত! কলকাতায় তারা অনেক নেপালী দেখেছিল কিন্তু ওদের দেশে ওরা যেন অন্যরকম। সব চেয়ে অসুবিধা হচ্ছে, তাদের কথা বোঝবার উপায় নেই। বাঙলা বা হিন্দী কথাও তারা বোঝে না।

যাই হোক, একটি দোভাষীর সন্ধান ওরা পেল, যে হিন্দী এবং সামান্য বাঙলা বোঝে এবং কথা বলতে পারে। এই দোভাষীর সঙ্গে শান্তনু বন্ধুত্ব করে নিল। এর নাম টুশাং বাহাদুর।

টুশাংকে দেখলে খুব বিশ্বস্ত মনে হয়। বয়েস বেশি নয়, বোধ হয় বছর তিরিশ হবে। শান্তনুর তাই মনে হয়েছিল, কিন্তু 'ওমর' কত জিজ্ঞাসা করায় সে বললে বিয়াল্লিশ। শীতের দেশের এমনি মজা, বয়েস বেড়ে যায় কিন্তু শরীরটি বেশ কাঁচা থাকে। শেষে বার্দ্ধক্য এলে তখন মুখে বলিরেখা পড়ে।

টুশাং-এর লালচে রং, দাড়িতে দু'-চার গাছা লোম, চুল বড় বড়। গায়ে মোটা কম্বলের মত পশমের জামা। পায়ে ভারী মোটা চামড়ার জুতো।

টুশাং-এর সাহায্যে শান্তনু ওখানকার সরকারী মহলে আলাপ পরিচয় করলো, কিন্তু ওর উদ্দেশ্য শুনে কেউ বিশেষ উৎসাহ দিল না। তিনজন তরুণ বাঙালীকে দেখে একজন প্রবীণ অফিসার হেসেই ফেললো। সে স্পষ্ট বললে, বাঙালীর পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। পাহাড়ে চড়া একমাত্র শেরপাদেরই কাজ। য়ুরোপের সাহেবরা, যারা

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী**

শীতপ্রধান দেশের লোক, যাদের পাহাড়ে চড়া অভ্যাস আছে তারা কিছুটা পারতে পারে।

শান্তনু এই মন্তব্য শুনে মোটেই দমে গেল না। সে বললে, পায়ে-হাঁটা পথ ধরেই তারা এগিয়ে যাবে। যতদূর যাওয়া যায়।

সত্যিই ওরা একদিন বেরিয়ে পড়লো। টুশাং হলো ওদের গাইড। ছোট ছোট পনি ঘোড়া নেওয়া হলো তিনটি। আরও দু'জন শেরপা চললো সঙ্গে।

শান্তনুর ধারণা ছিল, তাদের যেতে হবে পশ্চিম দিকে ধবলগিরির পথে, নওয়া কোট হয়ে আরও উত্তরে কিম্বা পশ্চিমে। কিন্তু টুশাং বললে, হুজুর, আমার যতদূর মনে হয়, তাতে পুবদিকে আমাদের চলতে হবে—এই রাস্তায় পড়বে সামেছাপ, আরও দূরে ভোজপুর। সে বললে, আমার ঠাকুমার কাছে আমি সোনালি ঝরণার কথা শুনেছি ছোটবেলায়। তবে আমরা কেউ দেখিনি, কেউ দেখেছে বলেও শুনিনি। শুধু গল্পই শুনেছে সবাই।

শান্তনু আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললে, বাহাদুর চলো, আমরা যাবো সেখানে। আমরাই প্রথম দেখবো, পৃথিবীর লোককে আমরাই বলবো প্রথম এই অপূর্ব দৃশ্যের কথা। পারিশ্রমিকের জন্য তুমি ভেবো না।

কিশোর ও লালী ওরাও চঞ্চল হয়ে উঠলো উৎসাহে। লালী বললে, যাওয়া যাবে তো, বাহাদুর? দেখো, তোমার ওপরই নির্ভর করছে।

টুশাং বললে, আমি আমার প্রাণ দিয়েও আপনাদের কা করবো!

ওরা যাত্রা করেছে পুবের পথ ধরে। এত দিনে সত্যিকা একটা অভিযান হচ্ছে ওদের—এই কথাই ভাবছে তিনজনে। বিপ যতই থাক সামনে, রহস্য যতই থাক ভবিষ্যতের গর্ভে—অনিশ্চি পথে এগিয়ে যাওয়ার একটা আনন্দ আছে। লালী ত একটা বক্তৃতা দিয়ে দিল। মেয়েরা আর ঘুমিয়ে নেই। তারা সুযোগ পে সব কাজেরই যোগ্য হ'তে পারে···

ওর কথা কেড়ে নিয়ে কিশোর বললে, শুরুতেই সব কথা ব ফেলিস না লালী, শেষে আর কথা খুঁজে পাবি না। এখন ঐ ঘোড়ার দিকে নজর রাখ।

দু'জন শেরপা পিঠে ক'রে নিয়েছে ওদের জিনিষ-পত্তর, রসদ আর তাঁবুর সরঞ্জাম। টুশাং তাদের পিঠে চাপড় দিয়ে উৎসাহিত ক'রে নিলে। ঘোড়াগুলোও ঠিক মেজাজে আছে কিনা দেখে নিতে ভুললো না।

শহরের সীমানা ছাড়িয়ে পায়ে-হাঁটা পাহাড়ী রাস্তায় পড়লো ওরা। এ রাস্তা সমতল নয়—কিছুক্ষণ ঢালু পথে নেমেই উঠতে হচ্ছে আবার চড়াই পথে। ঢালু পথে নামার সময়ই মুস্কিল। ঘোড়া যখন নামতে থাকে, তার পিঠটাও ঢালু হয়। তখন বসা হয় কষ্টকর, পিছন দিকে অনেকখানি হেলে বসতে হয়। অনভ্যস্ত যারা তাদের তখন ভীষণ ভয় করে। মনে হয় গড়িয়ে পড়লাম বুঝি! বাহাদুর প্রত্যেক পনির সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো, অশ্বারোহীদের শিখিয়ে নিতে লাগলো, কি ভাবে বসতে হবে, আর কি করতে হবে।

যেখানে পথ কিছুটা সমতল সেখানে সবারই খুব স্ফূর্তি। লালী একবার গেয়ে দিল, চল, চল, চল রে চল।

উঁহু। বাহাদুর হুঁসিয়ার করে দেয়, গান করবেন না, আ

শেষপর্য্যন্ত তাঁহারই আদেশে চ[illegible]ভবাসীর কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা [illegible] অন্যান্য [illegible]তগণ মনে করতেন, ইউরোপ ভারতবর্ষকে শিক্ষা দিতে পারে কিন্তু তিনি সর্বদাই মনে করতেন, ভারতের কাছে আমাদের অনেক কিছুই গ্রহণীয় আছে। ভারতবাসীর জীবনচরিত লেখার দায়িত্ব সে সময়ে অন্য কোন বিদেশী পণ্ডিত গ্রহণ করেন নি কিন্তু তিনি সোৎসাহে কৃতী ভারতীয়দের জীবনচরিত লিখেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাই তিনি লিখেছিলেন তাঁর জীবনী ও উপদেশমালা।

অত্যন্ত সাদাসিদা ছিল তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ। তার চেয়েও বেশী সাদাসিদা ছিল তাঁর মন। ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, সুদূর বিদেশে বসেও তিনি সব সময়ে চিন্তা করতেন ভারতবাসীর কথা। কিসে আমাদের কল্যাণ হয়, আমরা কি করে আবার জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠ হতে পারি, তার কথা। এদেশের লোকেরা যখন ওদেশে যেতেন তখন এই ঋষিকল্প মানুষটি তাঁদের সংগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতেন।

ভারতবর্ষকে তিনি এত ভাল বাসতেন যে, কোন দিন তিনি ভারতে আসবার চেষ্টা করেননি। এর কারণ হচ্ছে তিনি যে ভারতকে কল্পনার তুলি দিয়ে চিত্রিত করে রেখেছিলেন মনের মধ্যে, তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকায়। ভারতবর্ষে না এলেও ভারতবাসীর সংগে তিনি আত্মার ঐক্য স্থাপন করেছিলেন। তাই ধনী ব্যক্তিরা পণ্ডিত বিদায়ে তাঁকে উপহার পাঠাতেন শাল। গুণীরা বই লিখে পাঠাতেন তাঁর কাছে প্রশংসা লাভের আশায়। উৎসাহী ব্যক্তিরা তাঁর পরামর্শ চেয়ে লিখতেন চিঠি। মোটের উপর তিনি ছিলেন আমাদের হিতৈষী বন্ধু।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের এই হিতৈষী বন্ধুটি হচ্ছেন আচার্য মোক্ষমূলার। জার্মানীতে তাঁর জন্ম। আজীবন ভারতবর্ষের সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যিনি গবেষণা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কোন কাজই যে ছোট নয়, একথা তিনিই শিখিয়েছেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে।

## জয়-পরাজয়

### শ্রীবাসুদেব পাল

লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় একদিন গাঙ্গোনাটের পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা 'সুহই' সুর-আলাপ করছিলেন। সেই সুরের বিমোহনতায় কোন এক বণিক বধূ রাজবাড়ীর কাছে কূয়োয় জল তুলতে এসে মুগ্ধ হয়ে কুয়োয় কলসী না নামিয়ে নিজের ছেলের গলায় দড়ি দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল!—বিদ্যুৎপ্রভার গান শেষ হ'লে আরেকজন মহাসঙ্গীতজ্ঞ গান ধরলেন। নাম তাঁর বুঢ়নমিশ্র। দিগ্বিজয়ী গায়ক তিনি। উড়িষ্যা থেকে এসেছেন। তিনি যে সুরটি আলাপ করলেন নাম তার পঠমঞ্জরী! গান শেষ হ'লে দেখা গেল, নিকটস্থ একটি পিপ্পলবৃক্ষের সমস্ত পাতা ঝরে গেছে।—সবাই ধন্য ধন্য করে উঠলো।

—রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁকে জয়পত্র দিতে উদ্যত হয়েছেন, এমনি সময় জয়দেব মিশ্রের পত্নী পদ্মাবতীর সেখানে আবির্ভাব ঘটলো। [illegible]মস্ত ব্যাপার শুনে পদ্মাবতী বলেন, 'আমি ও আমার কবীন্দ্র স্বামী [illegible]বিত থাকতে কার সাধ্য জয়পত্র নিয়ে যায়?'—পদ্মাবতীর [illegible]হেন বাক্যে সভায় একজন উত্তর করলেন, 'বেশ, তুমি একটি রাগ আলাপ করো দেখি, তারপর তোমার স্বামীকে অবশ্যই ডাকা হবে।'—পদ্মাবতী 'গান্ধার' রাগ গাইলেন আর অমনি গঙ্গায় দূরে যে সব নৌকা ছিল সেগুলো নিকটে চলে এলো! সভাসদগণ পুনরায় ধন্য-ধন্য করে উঠলো।

বুঢ়ন-মিশ্রও হটবার পাত্র নন। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিচারে আমার রুচি নেই। আপনারা ওঁর স্বামীকে খবর দিন।'—কিছুক্ষণ পরেই রাজার নির্দেশ মতো জয়দেব মিশ্র তথায় এসে হাজির হলেন। বললেন, 'আপনারা কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন? আমার স্ত্রী-ই তো জয়লাভ করেছে!'

সভাস্থ অপর একজন উত্তর করেন, 'তা বটে! কিন্তু ঠাকুর, আমরা আপনার গুণাগুণটাও দেখতে চাই। বুঢ়নমিশ্রের সঙ্গীত-লহরীতে বৃক্ষ নিষ্পত্র হয়েছে। যদিও এটা বসন্তকাল এবং বসন্তকালে স্বভাবতঃই বৃক্ষের সব পাতা ঝরে যায়।'

জয়দেব জবাব করলেন,—'বেশ, উনি গান ধরুন। ঐ নিষ্পত্র বৃক্ষ সপত্র হোক্!'

—একথা শুনে বুঢ়নমিশ্র ভগ্নকণ্ঠে উত্তর করেন, 'না আমি তা পারবো না! আপনি যদি পারেন তবে দেখিয়ে দিন।'—জয়দেব পুনরায় বললেন।

—'বেশ, তাহলে স্বীকার করুন যে, যে ঐ বৃক্ষকে সপত্র করতে পারবে সেই-ই এ প্রতিযোগিতায় জিতবে?'

—বুঢ়নমিশ্র এ কথায় রাজি হলেন। তারপর জয়দেব 'বসন্তরাগ' সুরু করলেন। মুহূর্তে 'গীতগোবিন্দে'র স্রষ্টার অপূর্ব্ব সঙ্গীতের অনুপম সুর-শৃঙ্গারে নিষ্পত্রবৃক্ষ সপত্র হ'য়ে উঠলো!

—সভায় এইবার যে জয়ধ্বনি উঠলো, তার সুর সম্পূর্ণ বিভিন্ন মহা উল্লাসময়।

## আমাদের বিদ্যাসাগর

### শ্রীকমলকুমার মিত্র

বাংলার আকাশে যখন দুর্যোগের ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন, যখন বাঙালী জাতি শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-তেজস্বিতা, দয়া, আত্মসম্মান প্রভৃতি সকল কিছুই হারাইতে বসিল এবং ইঙ্গ-বঙ্গের নেশায় প্রমত্ত হইল, তখনই এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। ইনি কে জানেন? ইনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাল্যে শ্রমের সহিত অপরিসীম কষ্টসহিষ্ণুতার, যৌবনে অনাড়ম্বরতার সহিত অপরিসীম তেজস্বিতার এবং প্রৌঢ়ে লোকহিতকর কর্ম্মের সহিত দানশীলতার সংযোগ স্থাপন করিয়া, সভ্যতাভিমানী, শিক্ষিত ও তেজোদীপ্ত শ্বেতাঙ্গের সম্মুখে বাঙালীর স্বজাতীয়ত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন।

এই মহাপুরুষের জন্ম হয়, বাংলা ১২২৭ সনের ১২ই আশ্বিন, মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভগবতী দেবী, তখন তাঁহার পিতা মাসিক সামান্য মাত্র বেতন পাইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করিতেন, পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহাকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। আট বৎসর পর্য্যন্ত তিনি ঐ পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিলেন। তবে বাল্যকালে তিনি যে অত্যন্ত দুষ্টু ছেলে ছিলেন, তার ভুরি ভুরি প্রমাণ

রহিয়াছে। গুরুমহাশয়ের অনুরোধে ঠাকুরদাস তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতা লইয়া আসিলেন। নয় বৎসর বয়সে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পিতার সহিত বীরসিংহ হইতে কলিকাতা ৫২ মাইল পথ পদব্রজে আসিলেন। পথিমধ্যে পিতার মারফৎ মাইলষ্টোনের ইংরাজী লেখাগুলি শিক্ষা করিয়া লইলেন। এই স্মৃতিশক্তির বলেই তিনি পিতার নিকট একের পর এক ইংরাজী অঙ্ক শিক্ষা করিতে লাগিলেন, মাত্র নয় বৎসর বয়সে, সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে তিনি ভর্ত্তি হইয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইলেন। বিদ্যালয়ের পাঠগুলি মনে রাখিয়া বাসায় আসিয়া, পিতার নিকট বলিতে হইত। সামান্য ভুলে তাঁর কঠোর শাস্তি হইত। তৈল কিনিবার পয়সা না থাকায় গ্যাসের আলোতেই তাঁহাকে পড়িতে হইত।

প্রত্যহ গৃহের রান্না করা, বাসন মাজা, প্রভৃতি সাংসারিক যাবতীয় কাজগুলি তাঁহাকেই করিতে হইত এবং ফাঁকে ফাঁকে যে সময় পাইতেন পড়াশুনাতেই নিবিষ্ট থাকিতেন। দুই বৎসরের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ শেষ করিয়া, সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অল্প বয়সের সুযোগে নানারূপ আপত্তি উঠা সত্ত্বেও, তিনি যথার্থ কলাকৌশলের পরিচয় দিয়া, সকলের হৃদয় জয় করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং জয়যুক্ত হইলেন। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতিশাস্ত্র, বেদান্ত দর্শন, প্রভৃতি সকল বিষয়েই অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রের সকল পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া, তৎকালীন পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করেন। লেখাপড়া সমাপ্ত হইলে অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেব তাঁহাকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৫০৲ টাকা বেতনে চাকুরী দিলেন। ইহাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত। সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল এই কলেজে অধ্যাপনা করিবার পর, তিনি সংস্কৃত কলেজে সহকারী-সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত বিবাদ ও অন্যায় প্রভুত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। এই সময়ে তিনি কিছুদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উচ্চহারে চাকুরী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বেশী দিন যাইতে না যাইতেই সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকের প্রয়োজন হইল। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরকে এই চাকুরী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, স্পষ্ট ভাষায় তিনি অধ্যক্ষের ক্ষমতা চাহিয়া বসিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত ইহাতে পদত্যাগ করিলেন। সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল। বিদ্যাসাগরই সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। দেখিতে দেখিতে তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টায় কলেজের সম্পূর্ণ চেহারা বদলাইয়া গেল। গোড়ার গলদ ধরিয়া ফেলিয়া তাহার প্রতিকার করিলেন। ভারতের প্রাচীন পুঁথিগুলি এত দিনে নষ্ট হইতে বসিয়াছিল। তিনি সেইগুলি সযত্নে রক্ষা করিলেন। প্রচণ্ড গরমে পড়া ও পড়ান উভয়ই কষ্টকর। সেজন্য তিনি বাংলা দেশে গ্রীষ্মের ছুটী বা সামার ভ্যাকেসনের ব্যবস্থা করিলেন। আজিও এ ব্যবস্থা চালু আছে।

পিতামাতার প্রতি তাঁর ছিল অচলা ভক্তি আর বন্ধুদের প্রতি ছিল অগাধ ভালবাসা, তার বহুবিধ প্রমাণ রহিয়াছে। ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে মাতা তাঁহাকে বাড়ী আসিতে লিখেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট ছুটি চাহিয়া বিফল-

...যাদের পাহাড়ে চড়া অভ্যাস আছে...

মনোরথ হইয়া, চাকুরীতে ... রেলপথ ছিল না। হাঁটিতে হাঁটিতে ... আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পারাপারের খেয়া না পাওয়ায় মাতৃনাম স্মরণ করিয়া দামোদর ও পরে দারকেশ্বর নদী সাঁতরাইয়া পার হইয়া, এক প্রহর রাত্রে বাড়ী পৌছিয়া, মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতৃভক্তির পরিচয় পাইয়া মাতা দুই হাতে বৎসকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পিতৃভক্তির পরিচয়ও বিরল নয়। পিতার বহুদিন হইতে একটি টোল খুলিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটে তাহা সম্ভব হয় নাই। প্রথম পরীক্ষার বৃত্তিতেই তিনি পিতার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাধ পূর্ণ করিলেন।

বন্ধুদের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালবাসা। সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিদ্যাসাগরকে চাকুরীর জন্য বলিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে একবার ব্যাকরণের একটি পদ খালি হইলে, মার্শাল সাহেবের নিকট সোমবারে লোকের দরকার জানিতে পারিয়া পদব্রজে সেই দীর্ঘ ৩০ মাইল পথ হাঁটিয়া রবিবারে দ্বিপ্রহরে কালনায় পৌছিলেন। বাচস্পতি তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন।

তিনি দয়ার সাগর ছিলেন। গরীব দুঃখীদের দুঃখ দেখিলে, তিনি জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য, যথাযথ চেষ্টা করিতেন। এ সম্পর্কে শত শত গল্প রহিয়াছে। তার একটি মাত্র উল্লেখ করিতেছি। কথিত আছে, একদিন বিদ্যাসাগর এক দুর্দশাগ্রস্ত মাদ্রাজবাসীর দারিদ্র্যের কথা জানিতে পারিয়া, কর্ম্মচারীকে কলুটোলার সেই বাড়ীর নম্বর দিয়া সবিশেষ জানিবার জন্য পাঠাইলেন। গৃহস্বামী ছয় মাসের ভাড়া বাবদ ৩০৲ টাকা পান; ঐ টাকা পরিশোধ করিয়া, উঠিয়া যাইতে পীড়াপীড়ি করেন, এইরূপ জানাইলে কর্ম্মচারীটি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় জানিয়া, পাঁচটি কন্যা, দুইটি পুত্র ও স্বামি-স্ত্রীর রুগ্ন ও শীর্ণ অবস্থা দেখিয়া অতীব বেদনা অনুভব করিয়া, বিদ্যাসাগরকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ দয়ার সাগর ভাড়া ৩০৲ টাকা, খোরাকী ১০৲ টাকা এবং নয়খানি কাপড় পাঠাইয়া দিয়া, প্রতিমাসে ১৫৲ টাকা দিবেন অথবা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার খরচ দিতে পারেন, জানাইলেন। স্বদেশ যাইতে ১০০৲ টাকা লাগিবে জানিয়া, দানবীর কর্ম্মচারী মারফৎ উহা প্রেরণ করাইয়া তাঁহাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে অনুমতি করিলেন। বিদেশীর দুঃখেও যে তিনি কাতর,— এ-ই ত তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

অন্যায়কে তিনি কোন দিনই প্রশ্রয় দিতেন না। তাই ত কবি তাঁহাকে "বীরসিংহের সিংহশিশু" আখ্যায় অভিহিত করেছেন। ছাত্রদের তিনি আন্তরিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার হৃদয় ছিল যষ্টিমধুর মত। যষ্টির সাহায্যে অন্যায়কে তিনি কঠোর হস্তে দমন করিতেন, আবার বুকভরা মধুতে সকলকে ভালবাসিতেন। একবার সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ভাষার শিক্ষক কালীচরণ বাবুর অল্প বয়সের সুযোগ পাইয়া, ছেলেরা ক্লাসে গণ্ডগোল করিয়া তাঁহাকে অপমানিত করেন। বিদ্যাসাগর সংবাদ পাইবামাত্র, ছাত্রদের ক্লাস হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ছেলেরা ময়েট সাহেবের নিকট নালিশ করিল। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরের উপরই এই বিচারের ভার দিলেন।

শেষপর্য্যন্ত তাঁহারই আদেশে ছাত্রদল কার্ বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিবার পর মুক্তি পাইল।

আত্মসম্মান ও তেজস্বিতায় তিনি বাংলার উজ্জ্বলের মুখোস। হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ বাঙালীদের ভাল নজরে দেখিতেন না। তিনি তাহাদের মানুষ বলিয়া মনে করিতেন না। একবার কোন দরকারে বিদ্যাসাগর তাঁহার নিকট গেলে, বসিবার কথা ত দূরে থাকুক সাহেব টেবিলের উপর পদ উত্তোলন করিয়া দোলাইতে দোলাইতে সজোরে পাইপ টানিতে লাগিলেন। ইহাতে বিদ্যাসাগরের মুখ রাগে ও অপমানে লাল হইয়া উঠিল। পরে কোন দরকারে কার সাহেব বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে গেলে, অনুরূপ ব্যবহার পাইলেন। পরক্ষণেই অভদ্রতার জন্য কার সাহেব ময়েট সাহেবের নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন। বিদ্যাসাগরের ডাক পড়িল। তিনি নির্ভীক ও সাহসিকতায় তাঁহারই অভদ্রতার ব্যঙ্গোক্তি জানাইলেন। ময়েট সাহেব খুসী হইলেন। কার আপন অন্যায়ের জন্য নিজের ত্রুটী স্বীকার করিলেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে দেশবাসীর জন্য তাঁহার দান বর্ণনাতীত। ১৮৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেসনে সংস্কৃত কলেজের কর্ম্মধারা বিষয়ে একটি রিপোর্ট পেশ করেন এবং তাহারই অনুসরণে বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইল। তিনি চারিটি জেলার অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন। ছেলে ও মেয়েদের জন্য উচ্চবিদ্যালয় এবং অশিক্ষিত বড়দের জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসনে এফ-এ ও বি-এ পড়াইবার অনুমতি চাহিলেন। দেশের লোকেরা পড়াইবেন শুনিয়া, তাঁহারা অবাক হইয়া গেলেন। প্রথমত: অনুমতি পাওয়া না গেলেও শেষ পর্য্যন্ত সম্ভব হইল। ইহাই সর্ব্বপ্রথম বেসরকারী কলেজ। আপ্রাণ চেষ্টায় দেশীয় অধ্যাপকেরা ১৮৭৪ খৃ: এফ-এ দলকে পরীক্ষা সমরে অবতীর্ণ করাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরই ছাত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন। পাঁচ বৎসর পরে বি-এ, পড়াইবার অনুমতি পাওয়া গেল। বিদ্যাসাগর এবং আরো কতিপয় বাঙালী দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

বিধবা বিবাহ ও স্ত্রী থাকা কালীন বিবাহ চলিবে না,—এই বিল দুইটি পাশ করাইয়া তিনি বাঙালীর যে কি উপকার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করা যায় না। তিনি সহজবোধ্য বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে উচ্চস্তরে পৌছাইয়াছেন। তিনি ইংরাজী ভাষার আদর্শে আমাদের বাংলা ভাষায় দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলান, কোলান, প্রভৃতি চিহ্নের ব্যবহার করিয়া, পড়িবার ও বুঝিবার অনেকখানি সাহায্য করিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া—এই ভাষাকে অনেকখানি উন্নততর করিয়াছেন। তিনি বাংলাশিক্ষার প্রথম পুস্তক বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য়) লিখিয়া বাঙালীর শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছিলেন। এ ছাড়াও উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠম, বেতালপঞ্চবিংশতি, সীতার বনবাস, আখ্যানমঞ্জরী, কথামালা, চরিতাবলী, বোধোদয়, শকুন্তলা প্রভৃতি পুস্তকগুলি রচনা করিয়া, বিশেষ উপকার সাধন করেন।

অপরিসীম পাণ্ডিত্য, যশ, অর্থ—এই সকল থাকা সত্ত্বেও, তিনি ছিলেন বিলাসহীন, নিরভিমান ও নিরহঙ্কার। দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায় ও অন্ধের যষ্টি। এক কথায় তাঁহাকে রত্নাকর বলিলে, কিছুমাত্র ভুল হয় না।
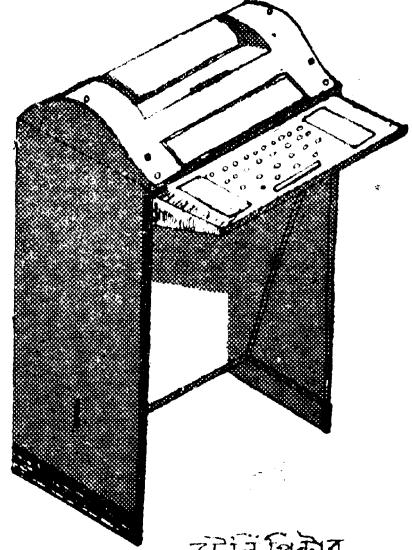
## টেলিপ্রিন্টার

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

টেলিগ্রাম, টেলিফোন, এমন কি টেলিস্কোপের সঙ্গেও আমাদের কিছু কিছু পরিচয় আছে। টেলিভিসনের কথাও আমরা শুনেছি কিন্তু টেলিপ্রিন্টার আমাদের অনেকের কাছে একেবারেই নতুন।

গ্রীক ভাষায় "টেলি" কথাটির অর্থ হ'চ্ছে দূর। টেলিগ্রামে দূরের লোককে আমরা তাড়াতাড়ি খবর পাঠাই, টেলিফোনে দূরের মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলি, টেলিস্কোপে দূরকে নিকটতর করে দেখতে পাই আর টেলিভিসনে দূরের ছবি চোখের সম্মুখে এসে দেখা দেয়। কিন্তু টেলিপ্রিন্টার যন্ত্রটি তাহলে কি?

প্রিন্টার কথাটির অর্থ, যে ছাপিয়ে দেয় অর্থাৎ মুদ্রাকর। যে যন্ত্র দূর থেকে ছাপিয়ে দেয় তাকেই বলা হয় টেলিপ্রিন্টার।

সাধারণ লোকে এই যন্ত্রটিকে সংবাদপত্র অফিসে দেখলে ভাববে, এটা একটা বড় আকারের টাইপরাইটার! কিন্তু যাঁরা জানেন, তাঁরা বুঝবেন,—ওটা এমন একটা যন্ত্র যার সাহায্যে এখানে বসে কোনও সংবাদ টাইপ করলে দূর দূরান্তরের যন্ত্রে গিয়ে সেটা আপনা থেকেই ছাপা হয়ে বেরিয়ে যায়।

আটলাণ্টিক সাগর পার হয়ে যে এরোপ্লেন চলে তার চালকের কামরার মধ্যে একটা টেলিপ্রিন্টার দেখে যাত্রীরা হয়ত বিস্মিত হবেন। কিন্তু ওটা এখানে রাখতে হয়, কারণ আটলাণ্টিকের উপর দিয়ে রেডিওর স্বরলহরী খুব ভীড় করে আসে। তার ফলে এরোপ্লেনকে যে সব জলবায়ুর অবস্থার খবর দেওয়া হয়, তা অনেক

সময় পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়। টেলিপ্রিণ্টারের খবরগুলো 'কোড' অর্থাৎ সংকেত চিহ্নদ্বারা পাঠানো হয়। সেটা আরও সংকীর্ণ রেডিও সংযোজকে (ব্যাণ্ড) চলে। যে যাতায়াতের পথটা (চ্যানেল) একটা কণ্ঠস্বর গ্রহণ করবার মত প্রশস্ত, সেটা বারটা টেলিপ্রিণ্টারের সংবাদ বহন করতে পারে।

স্কটল্যাণ্ডের সহরে বসে জলবায়ুর খবরটা টেলিপ্রিণ্টারের টাইপ যন্ত্রে তুলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ওটা এরোপ্লেনের রিসিভারে গিয়ে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে। চালকও সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুসারে প্লেনখানির গতি নিয়ন্ত্রণ বা উঠানামার ব্যবস্থা করতে পারেন। ব্যবসার ক্ষেত্রেও টেলিপ্রিণ্টারের কাজ অসাধারণ। ধর, আমি কৃষ্ণনগর থেকে ভোরে এক লরী পাকা কলা, আম, পেঁপে, লিচু এই সব পাঠালাম কলকাতায়। মাল বোঝাই দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেলিপ্রিণ্টারে জানিয়ে দিলাম—এই এই ফল যাচ্ছে। কলকাতার এজেণ্ট তালিকাটি পেলেন টাইপকরা কাগজে। তার ফলে কলকাতায় জিনিসগুলি পৌঁছবার আগেই পাইকারী খরিদ্দার ঠিক হয়ে গেল। লরী কলকাতায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই জিনিষ বিক্রী।

এটা কম সুবিধার কথা নয়। পাকা ফল একটু দেরী হ'য়ে গেলেই নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু টেলিপ্রিণ্টারের সাহায্যে এত তাড়াতাড়ি খরিদ্দার জোগাড় করে বিক্রী করে দেওয়া গেল ফলগুলি যে, তার একটাও নষ্ট হ'তে পারল না!

টেলিফোনে আমরা দূরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি কিন্তু টেলিফোনে কথা বলার অসুবিধা আছে অনেক। কখনও কখনও এমনও হয় যে, টেলিফোনে কথা পরিষ্কার বুঝা যায় না। দূরপাল্লার পথ হলে অনেক সময় কথাগুলি জোরে বলতে হয় এবং জোরে বলতে গেলেই কাছের লোকে কি বলছি তা শুনতে পায়। তা ছাড়া অন্য কেউ চেষ্টা করলে মাঝপথে টেলিফোনের কথাগুলি শুনেও ফেলতে পারে।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় টেলিপ্রিণ্টার খুব কাজে লেগেছিল। টেলিপ্রিণ্টারের কথাগুলি টাইপযন্ত্রে ছাপবার সময় কেউ কোন কথা শুনতে পাবে না, আড়ি পেতে কেউ জানতেও পারবে না কি কথা হচ্ছে। উভয় পক্ষের গোপন কথাগুলি প্রয়োজন ক্ষেত্রে 'টেলিক্রিপটন' (tele crypton) নামক ছোট বাক্সে বন্দী করে রাখা হয়। পরবর্তীকালে দরকার হ'লে ঐ কথাগুলি পর্দার উপর ফেলে আর আর পাঁচজনকে দেখানও যেতে পারে।

টেলিফোনে কথা বললে তার কোন 'রেকর্ড' থাকে না। আমার উপরওয়ালা আজ টেলিফোনে আমাকে যে নির্দেশ দিলেন, এক মাস পরে যদি তিনি তা অস্বীকার করেন, তা হলে ত' আমি বোকা হয়ে যাব!

টেলিপ্রিণ্টারে কিন্তু সেটি হবার যো নেই। ছাপার অক্ষরে তাঁর নির্দেশটা থেকে যাবে—অস্বীকার করবার উপায় থাকবে না।

১৯০৬ সালে Mor Krum কোম্পানী এই টেলিপ্রিণ্টারের প্রবর্তন করেন। ১৯১৫ পর্যন্ত এর বিশেষ উন্নতি হয়নি। ইতিমধ্যে জার্মানীর এক বেতার-বিজ্ঞানী টেলিপ্রিণ্টারের আর একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই টেলিপ্রিণ্টারকে আরও কার্যকরী করে তোলে 'লিনো টাইপ' দিয়ে 'টেলি টাইপ সেটি' যন্ত্র আজ-কাল অনেক বড় বড় সংবাদপত্রের অফিসে ছিদ্রযুক্ত সরু কাগজের ফিতেয় দূর-দূরান্তের খবর আসে। ঐ কাগজের ফিতেটাকে 'টেলিটাইপ সেটার' যন্ত্রে বসালে ঐ যন্ত্র আপনা থেকেই 'লিনো টাইপ' চালাবে—সেজন্য আগেকার দিনের পিয়ানো বাজিয়ের মত কারও 'বাড' টিপতে হবে না! এই যন্ত্র সাহায্যে আজ-কাল একই সংবাদপত্র তিন-পাঁচশো মাইল ব্যবধানে থেকেও একই সময় দু জায়গা থেকে ছাপিয়ে বের করা সম্ভব হচ্ছে। বিলাতে টাইমস পত্রিকা এই যন্ত্রযোগেই পার্লিয়ামেণ্টের একেবারে আনকোরা টাটকা খবরগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশন করতে পারে।

## মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

| ভারতের বাহিরে ( ভারতীয় মুদ্রায় ) | |
|---|---|
| বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে | — ২৪৲ |
| ষাণ্মাসিক " | — ১২৲ |
| প্রতি সংখ্যা " | — ২৲ |
| **ভারতবর্ষে** | |
| ( ভারতীয় মুদ্রামানে ) বার্ষিক সডাক | — ১৫৲ |
| " ষাণ্মাসিক সডাক | — ৭·৫০ |

| ভারতবর্ষে | |
|---|---|
| প্রতি সংখ্যা ১·২৫ | |
| বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে | — ১·৭৫ |
| **পাকিস্তানে ( পাক মুদ্রায় )** | |
| বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ | — ২১৲ |
| ষাণ্মাসিক " " " | — ১০·৫০ |
| বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " | — ১·৭৫ |

॥ আলোকচিত্র ॥

দার্জিলিং —রথীন রায়

পুকুর-ঘাটে —অরুণ মুখোপাধ্যায়

হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের সমাধি
( শ্রীরঙ্গপত্তম )

—নির্মল দত্ত

[ ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম ধাম
ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না ]

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউ

( খড়দহ )

—গজেন্দ্রমোহন গোস্বামী

শুভ-সূচনা

—মীরেণ অধিকারী

রাতের কলকাতা —কান্তি ভাই (সাংরিলা)
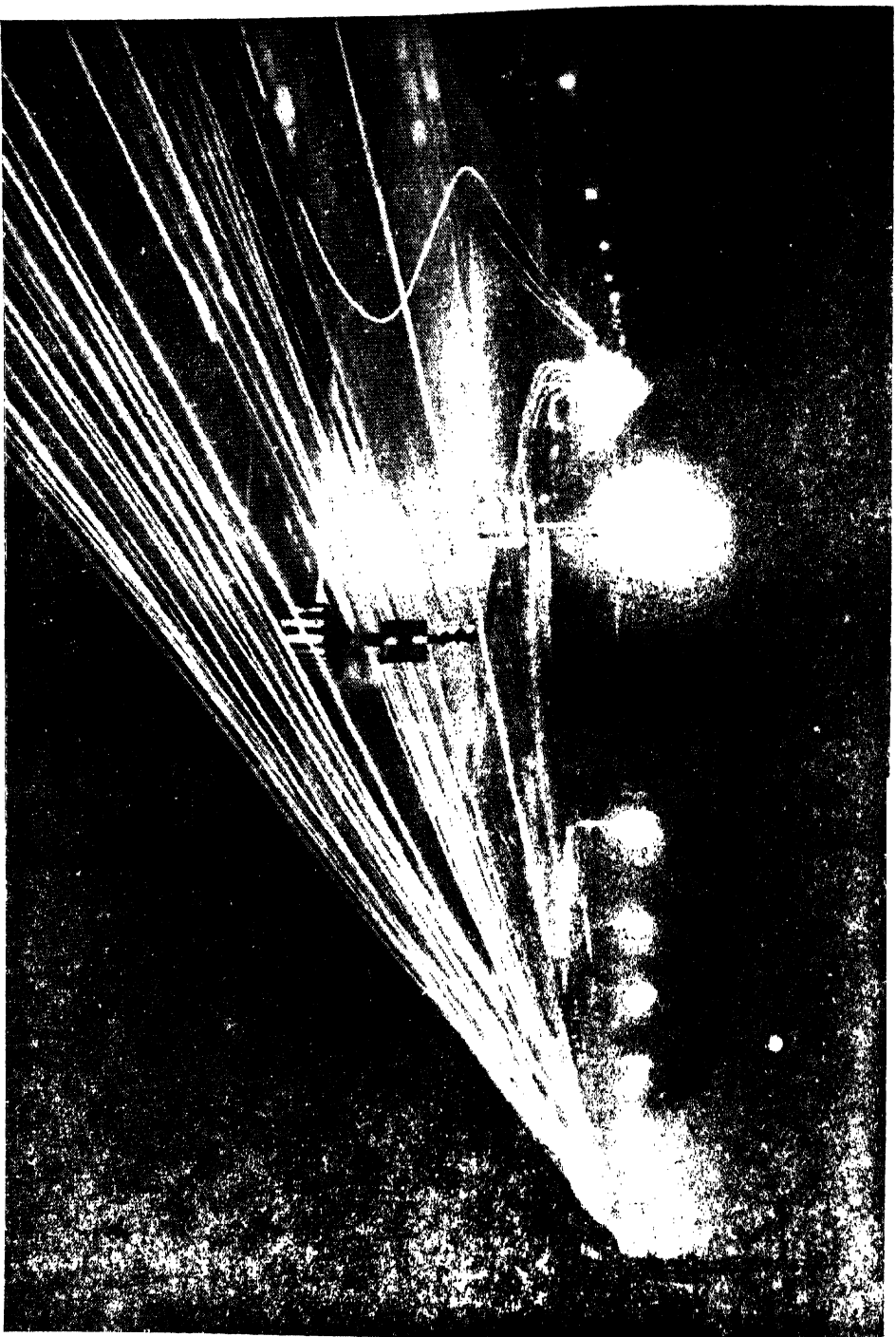
# ক্লীয়ারটোন সপ্তাহ—৩রা থেকে ৯ই নভেম্বর

## ক্লীয়ারটোন ··· স্বচ্ছন্দ আরামে জীবন যাপনের নানারকম সরঞ্জাম

**বাড়ী, অফিস, হোটেল ও ক্যান্টিনে ব্যবহারের জন্য ··· ভারতেই তৈরী হয়**

**ক্লীয়ারটোন** ট্রেডমার্কযুক্ত এসব চমৎকার সরঞ্জাম ব্যবহারে আজকাল আরো সহজে ও আরামে জীবন কাটাতে পারেন। ক্লীয়ারটোন-এর জিনিসপত্র আধুনিক কায়দায় ভারতের প্রয়োজন মতো বিশেষ ঢংও **ভারতেই তৈরী করা** হয় আর বিক্রীও করা হয় উচিত দামে।

**ক্লীয়ারটোন**-এর এই সমস্ত জনপ্রিয় সাজসরঞ্জাম আজই দেখুন। এর প্রত্যেকটি জিনিস আপনার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কত স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ক'রে তুলতে পারে তা দেখলেই বুঝবেন।

**Kleertone ক্লীয়ারটোন—স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার সহায়ক সুন্দর জিনিস।**

'ক্লীয়ারটোন' ওয়াটার হীটার

'ক্লীয়ারটোন' ওয়াটার বয়লার

'ক্লীয়ারটোন' ইস্ত্রি

'ক্লীয়ারটোন' বৈদ্যুতিক কেটলি

'ক্লীয়ারটোন' থারমাল জার
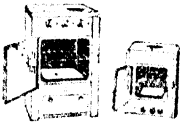
'ক্লীয়ারটোন' কুকিং রেঞ্জ
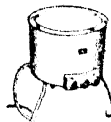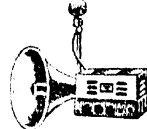
'ক্লীয়ারটোন' বৈদ্যুতিক চুল্লী

'ক্লীয়ারটোন' বক্তৃতা প্রচারের যন্ত্রপাতি
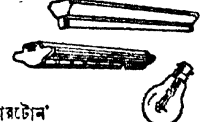
'ক্লীয়ারটোন' বাতি, ফ্লুরেসেণ্ট টিউব ও ফিক্সচার
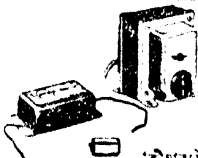
'ক্লীয়ারটোন' চোক, স্টার্টার ও ট্রান্সফর্মার

'ক্লীয়ারটোন' ঝালা দেবার যন্ত্র

'ক্লীয়ারটোন' ফ্লাড্ লাইট

'ক্লীয়ারটোন' বৈদ্যুতিক ঘড়ি

'ক্লীয়ারটোন' ষ্টীলের ফোল্ডিং চেয়ার ও টেবিল

আমাদের শো-রুমে এসে দেখুন—

**জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড**

৩ ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ● অপেরা হাউস, বোম্বাই-৪ ● ফ্রেজার রোড, পাটনা ● ১/১৮ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ ● ৩৫/৭৯ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর ● যোগধিয়ান কলোনী, চাঁদনী চক, দিল্লী।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

সুলেখা দাশগুপ্তা

যতীন বাবুর টেলিগ্রামখানা যে দিন সন্ধ্যায় এসে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিল তার পরের দিন সকালে সুদর্শনদের কলকাতা রওনা হবার কথা। সমস্ত বাড়ীময় চলছিল সেই আসন্ন বরযাত্রা-পর্বের বিরাট আয়োজন। সুদর্শনের ঘরেও সেই আয়োজনই চলছিল, সুদর্শনও ঘরেই ছিল। তবে মঞ্জু দিব্যদৃষ্টি লাভ করলে আজ এই বিশে আষাঢ়ের ভোরে, তাকে যে ভাবে বসে উনবিংশতিতম সিগারেট শেষ করে বিংশতিতম সিগারেট ধরাতে দেখতে পেতো সে দিন তা দেখতে পেতো না। দেখতে পেতো, মেঝের উপর মস্ত একটা ফাইবারের সুটকেশের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সুদর্শনের ছোট বোন দাদার প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গোছগাছ করছে আর সুদর্শন বোনের কাজের দিকে লক্ষ্য রেখে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে, মাঝে মাঝে এটা ওটা নির্দেশ দিচ্ছে আর মনের মধ্যে মৌরীর কথাই নাড়াচাড়া করছে।

এ কিছু আশ্চর্য্য কথা নয়। বিয়ের দুদিন আগে অবসর পেলেই যে বর কনের কথা ভাবতে বসবে, এর চাইতে স্বাভাবিক আর কি হতে পারে? কিন্তু সুদর্শনের নিজের কাছেই এক এক সময় বিস্ময় লাগে মৌরীর সঙ্গে পরিচয়ের এই একমাস ধরে। সে মৌরীর কথা ছাড়া আর দ্বিতীয় বিষয় কিছু ভাবেনি। সেই এক সন্ধ্যার—একটা রাতের ঘটনা কত রকম ভাবে কত বার যে সে উলটে পালটে ভেবেছে! সে ছেলেমানুষের মতো বলে উঠেছিল, ভাবছি বাবাকে গিয়ে মস্ত এক প্রণাম করবো।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মৌরী—কেন?

—আনন্দে। কৃতজ্ঞতায়। তার নির্বাচনে মুগ্ধ হয়ে! কিন্তু আমাকে কি রকম লাগল জানতে চাইলেও আপনি তো নিশ্চয়ই মুখ খুলবেন না।

চুপ করেই ছিল মৌরী।

—কি বলবেন না তো?

—এ সময়টুকুর ভেতর কি আর একজনকে চেনা যায়!

—যেটুকু যায়।

—পোষাক ভালো। চেহারা মন্দ নয়। ড্রইংরুম আলাপে দখল আছে।

হেসে ফেলেছিল সুদর্শন—ড্রইংরুমের পাশের ঘরের সাক্ষাৎটার জন্যই তবে আর সব জানা তোলা রইল। আর এই ড্রইংরুমের পাশের ঘরের উল্লেখের মাত্র একটা অদ্ভুত [illegible]

মৌরীর তখনকার সেই বিহ্বল দৃষ্টি। ছেড়ে দেওয়ার পর সেই তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা।

বসে থাকতে পারে না সে আর তখন। উঠে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করে দেয়। তার শিরা-উপশিরা আর রক্তপ্রবাহের ভেতর যেন একটা না একটা পাগলা মত্ততার স্রোত বয়ে চলে, সেই মধ্য রাতে শুধু একমাত্র শাড়ীর আঁচল গায়ে জড়িয়ে এসে দাঁড়ালো শেষ রাতে কাছে পাওয়ার জন্য।

বাবা যখন সেদিন অফিসঘরে ডেকে নিয়ে যতীন বাবুর টেলিগ্রামটা সুদর্শনের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সুদর্শন সেটা পড়ে প্রথম কিছুই না বুঝতে পারার দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল—মানে?

বাবা মুখের পাইপটা নামিয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে সহানুভূতি জানিয়েছিলেন—এই বেদনাদায়ক ঘটনার জন্য তিনি সত্যই বেদনা বোধ করছেন।

টেবিলের ওপর টেলিগ্রামটা কাগজচাপা দিয়ে চেপে রেখে চলে এসেছিল সুদর্শন নিজের ঘরে। অনেকগুলো মিলিত বাজনা উচ্চগ্রামে এবং দুর্দান্ত ঝড়ের সুরে বাজতে বাজতে যখন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, তখনকার সেই হঠাৎ নিঃশব্দের মতো সুদর্শনের অনুভূতি যেন নিঃসীম নিঃশব্দে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। ঘরে এসে বসবার সময় নিতান্ত অভ্যাস বশেই একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বসেছিল সে।

বাড়ীর ভেতর একটা বিস্ময় আর হতভম্ব ভাব বয়ে চলেছিল। বৌদিরা-বোনরা বলেছিল—এমন কাণ্ড শুনিনি দেখিনি। শুধু গল্পে পড়েছি।

মা বলেছিলেন—যা হবার তা তো কেউ আটকাতে পারে না—তবু যে বিয়ের পর না হয়ে যা ঘটবার আগেই ঘটে গেল এ-ও রক্ষে।

মার কথা শুনে সুদর্শনের মনে হয়েছিল, আজ না ঘটে যদি বিয়ের পরেই এই দুর্ঘটনাটা ঘটতো তবু এখনকার চাইতে নিজেকে অনেক বেশী সৌভাগ্যবান মনে করতো সে। আজ তবে মৌরীর মৃত্যু সংবাদটা তার কাছে শুধু সংবাদ হয়েই আসতো না। মৌরীর শোকযাত্রা তার জন্য অপেক্ষা করতো। সে গিয়ে মৌরীর দুটো ঠাণ্ডা হাত টেনে নিয়ে তাতে মুখ ঢেকে বসে থাকতে পারতো যতক্ষণ তার খুসী। কেউ বাধা দিত না। কেউ অস্বাভাবিক ভাবতো না। কিন্তু আজ তার সামান্য শোকও সবার কাছে হাস্যকর ঠেকবে। দুদিন পর হলে যেটা মানাতো, দুদিন আগে সেটা কারুর চোখেই মানানসই ঠেকবে না।

চায়ের কাপ নিয়ে বৌদি কখন ঘরে ঢুকেছিলেন, সুদর্শন টের পায়নি। কাপটা টেবিলে রাখার শব্দে তারাভরা আকাশ থেকে চোখটা ফিরিয়ে ঘরের দিকে আনতেই, মুহূর্ত আগে পরেও হলেও চোখে যে জলের আভাসটুকুও দেখা যেত না—কল্পনায় মৌরীর দুই হাতে মুখ ঢেকে তখন সুদর্শনের দু চোখে তার যে আভাসটা এসে গিয়েছিল সেটা দেখে ফেললেন বৌদি। চা রেখে চলে গেলেন তিনি। তার চাপা গলা শোনালেন—এই রেডিওগ্রামটা বন্ধ করো না। একটু বাদেই দেখা গেল সামনের বারান্দায় হৈ হৈ চেঁচামেচি করে যে ছেলে-মেয়েগুলো খেলা করছিল, তাদের যেন কে সরিয়ে নিয়ে গেল সেখান থেকে।

এ বাড়ীতে বধূ হয়ে আসবার কথা ছিল, এই সম্মানটুকু তার নিশ্চয়ই প্রাপ্য।

কিন্তু টেলিগ্রাম সে তো যে কেউ বিয়ে ভেঙ্গে দেবার জন্য শত্রুতা করে পাঠাতে পারে। চিঠি—একটা চিঠি না হলে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সমস্ত বাড়ী উন্মুখ হয়ে রইল যতীন বাবুর চিঠির জন্য। গোছগাছ বন্ধ রইল কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে ফেলা হলো না। তারপর দিন এক্সপ্রেস ডেলিভারিতে সে চিঠিও এসে গিয়ে এ ব্যাপারের সমাপ্তি টেনে দিল সবার মনে। দিল না কেবল সুদর্শনের। উনিশে আষাঢ়ের পাওয়া চিঠি এই বিশে আষাঢ়ের সকালের ভেতর প্রতি ঘণ্টায় কি একবার করে চোখের কাছে মেলে ধরেনি সে! এ যেন কন্যার আকস্মিক মৃত্যুতে শোক মুহ্যমান পিতার পত্র নয়। চিঠিটাতে যেন ব্যথার চাইতে ক্ষোভের সুর বেশী। দুঃখের চাইতে আশা ভঙ্গের। বেদনার চাইতে চাপা রাগের। শোককাতর কথা আছে কিন্তু কোথাও পিতৃহৃদয়ের আর্ত ক্রন্দনধ্বনির সাড়া মিলছে না।

নিরুপায় যতীন বাবু বাধ্য হয়ে কি এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন? বেঁকে বসেছে মৌরী? যতীন বাবুর চিঠিটার অন্তর্নিহিত সুর সে কথাই বলছে না?

কিন্তু যতীন বাবুর চিঠি যা বলে যুক্তিতে তা টিকতে চায় না। তার সঙ্গে পরিচয়ের পর তাকে ভালো না লেগে থাকলে, সে কথা জানাবার বহু সময় পেয়েছিল মৌরী। বিয়ের দুদিন আগের জন্য কেন সে চুপ করে থাকবে? জন্মদিনে সে উপহার পাঠিয়েছিল চিঠি লিখছিল। উত্তরের প্রশ্ন ওঠে না তাই সে কথা সুদর্শনের মনেও আসেনি। তাই ওগুলো দিয়ে অবশ্যি কোন কিছু প্রমাণ হয় না। তবে কি মৌরী সে দিন থেকেই তার অমতের কথা জানিয়ে দিয়েছিল? পরিবারের লোকেরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করেছে—আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা মিথ্যা জ্বলে পুড়ে ছাই হতে হতে যখন আঙুলে এসে তাপ লাগলো তখন সেটা ছাইদানে ফেলে উঠে দাঁড়ালো সুদর্শন। 'ফাইব ফিফটি ফাইবের' ভরা টিনটা হাতে লেগে পড়ে গড়াতে গড়াতে ঠেকল গিয়ে দেয়ালে। সিগারেটগুলো ছড়িয়ে রইল মেঝেতে। চাকরটা এসে উঁকি দিলে তাকে ইসারা করলো সেগুলো তুলে নিয়ে যেতে। সে গুলো তুলে আর একটা নতুন টিন কেটে রেখে দিয়ে গেল সামনে।

বোন এসে বললো, চলো না বেড়িয়ে আসবে কার্সিয়ং? তিস্তার পাঁচ হাজার ফিট উপরে ফরেষ্ট বাংলোর সেই নির্জন পাহাড় আর নদীর রমণীয় পরিবেশে একবার গেলে তুমি দেখো আর আসতেই চাইবে না এই ধুলো-বালির রাজত্বে। এর পর ডাক্তারী শুরু করলে তো যখনই বলবো শুনবো কেবল কাজ আর কাজ। কলকাতা, এই লগ্নে যখন তুমি এমন অদ্ভুত চেহারায় দেখা দিলে তখন এখন থাক। তবে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

শুনে ভগিনীপতি এসে ঘরে ঢুকলেন। চোখের ইঙ্গিতে যেন সুদর্শনকে কি একটা রহস্যের আভাস দিয়ে বললেন, তুমি প্রায় অবিবাহিত স্ত্রী বিয়োগে যে রকম মুষড়ে পড়েছ রমণীয় পরিবেশ ছাড়াও রমণীর প্রয়োজন আছে মনে হচ্ছে। পাহাড়ের পাহাড়ী মেয়ে—সুদর্শন ভগিনীপতির স্থূল ঠোঁটের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সিগারেটের টিনটা এগিয়ে ধরল তার দিকে।

মৌরী মঞ্জুর মনে হতে লাগলো কতকগুলো ঝোড়ো ঘটনা যেন ওদের উপর উপর দিয়ে ঝড়ের মতোই বয়ে নিয়ে ফুরিয়ে গেল কোথায় সে সব ঘটনা আর কোথায়ই বা সে সব ঘটনার নায়ক নায়িকারা। পর্দার ছবির মতো যেন ঘটনা শেষে মিলিয়ে গেল তারা। বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে কে বলবে মাত্র পক্ষকাল পূর্বেও এ বাড়ীর একটি লোকের মুখে খাওয়া ছিল না। চোখে ঘুম ছিল না। মনে শান্তি ছিল না। আজ সে এমনি শান্ত ঠাণ্ডা স্বাভাবিক। রামু রান্নাঘরে মাছের ঝোলের সম্বরা গন্ধে কাশছে। পিসিমা আহ্নিকে বসেছেন। বাবা দাদা বেরিয়েছেন বেড়াতে। অমিতা গেছে তার ছেলে মেয়েকে দেখে আসতে। বাসুদেব এখানে নেই। সে চলে গেছে তার কাজের জায়গায়। ছুটি শেষ হবার আগে এবং মৌরীর দিক থেকে এক রকম মুখ ফিরিয়ে থেকেই। ছাদে পায়চারী করছিল মৌরী মঞ্জু, কলেজ থেকে ফিরে একটা পাটি বিছিয়ে তার উপর শুয়ে পড়ে বললো—যাক্ গেল তো সব চুকে বুকে। এখন তুই কি করবি ঠিক করলি শুনি? এই ভাবে ছাদে পায়চারী আর ঘরে ইজিচেয়ার—বই? না আর কিছু।

মৌরীও শুয়ে পড়ল আকাশের দিকে মুখ করে। বললো—তুই কি করবি?

ক্রমশঃ—পৃঃ ৩

—তুই কি করবি—আমার ঠিক তো কিছু বেঠিক হয়নি। আমার সে খসড়া তৈরী করাই আছে।

—শুনি?

—জীবনের খসড়াই হোক আর ছবির খসড়াই হোক আগে দেখাতে নেই বা বলতে নেই। খসড়া সব সময়ই হয় বেশী বলে নাতো কম বলে। ঠিক বলে না কখনোই।

—আমি ঘরের লোক। বেশী হলে খুসী হবো। কম হলে কাউকে বলবো না।

—আচ্ছা। তোরটা বল আগে?

—আমি পড়বো।

—এম-এ?

—না। আইন।

—আইন!

—হাঁ।

—উকিল হবি? উত্তেজনায় উঠে বসল মঞ্জু।

—ব্যারিষ্টার হবো।

—উঃ দিদি। বলে উঠে একটা ঘূর্ণপাক খেয়ে এলো মঞ্জু। অদ্ভুত—অদ্ভুত—অদ্ভুত। এই তো জীবন। আইনটা তোর পক্ষে কেমন হবে দুদিন আগে হলে আমার মনে সন্দেহ জাগতো। এই কয়দিনের লড়াই-এ তোর কথার ধার দেখে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি তোর উপযুক্ত লাইনই হবে এটা। বক্তৃতায় বেগ যা আছে—ঠিক আছে। শুধু আবেগটা একটু কমাতে হবে। আবার তক্ষুণি মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো, না তাই বা কেন। আবেগ ছাড়া যে বেগ সে তো যন্ত্রের বেগ। মানুষের বেগে আবেগটাই তো হওয়া চাই প্রধান—

মৌরী বললে—এবার শুনি তোর বাসনাটা?

—আমার?

'হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা—

রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।

উত্তরীয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে

জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে কণ্ঠ হতে—নির্বারিত স্রোতে।'

রামু এসে ছাদের দরজায় মুখ বাড়ালো। মঞ্জুকে লক্ষ্য করে বললো—একজন দিদিমণি এসেছেন তোমার কাছে।

তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো মঞ্জু নীচে। জয়াকে দেখে, আরে জয়া তুই! বলে এগিয়ে তার দুটি হাতের মুঠো টেনে নিয়ে বললো—ঠিকানা দিয়ে, পথঘাট চিনিয়ে কতবার বলে এলাম আসিস একদিন। সেই একদিন এই এতোদিনে হলো! আয় বোস। জয়াকে চেয়ারে বসিয়ে নিজেও চেয়ার টেনে বসল মঞ্জু। তারপর কেমন আছিস? ভালো?

—আমাকে দেখে কি মনে হয়?

—তোকে দেখে? জয়ার গভীর কালীপড়া চোখ ও তার দুটি ক্লান্ত পাতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মঞ্জু। তারপর বললো—ভালো নয়।

প্রথমে নীরবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল জয়া। কিন্তু তারপরই তার সমস্ত মুখ-চোখের কেমন যেন রূপান্তর ঘটে গেল। অস্বাভাবিক জলজলে হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টিটা। বললো—কেন? যদিও শাড়ীটা কোঁচকানো মোচড়ানো তবু শাড়ীটা বেশ দামী তো? হাত দিয়ে শাড়ীর আঁচলটা তুলে দেখালো জয়া।

তাকিয়ে রইল মঞ্জু।

—হাতের বালা দুটো যে গিনির তা কি বোঝা যাচ্ছে? গলার মালার, কানের দুলের সাদা পাথরগুলো যে কাচ তা কি ধরা পড়ছে? পায়ের স্যাণ্ডেলটায় কাঁচা চামড়ার আঁসটে গন্ধটা কি ওখান থেকে পাচ্ছিস—তবে?

তেমনি ভাবে তাকিয়ে রইলো মঞ্জু জয়ার দিকে।

জয়া মাথার এলোমেলো চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে কানের দুপাশে ঠেলে দিতে দিতে বললো—চুলগুলো অগোছালো ছিল। এই তো দিলাম ঠিক করে। ভালো দেখাচ্ছে না এখন? হেসে উঠল সে।

'কার চুল এলোমেলো কি বা তাতে এলো-গেলো,

কার চোখে কত জল কি হবে মেপে?'

হাসিমুখ আর জলজলে দৃষ্টি ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো জয়ার। চেয়ারের পেছনদিকে মাথাটা হেলিয়ে দিল সে। একটা আস্ত নিঃশ্বাস টেনে সেটা ফেলতে ফেলতে বললো—

'জেনে কি বা প্রয়োজন অনেক দূরের বন,

রাঙা হোল কুসুমে না বহ্নিতাপে?'

আমাকে দেখে কি মনে হয়? জিজ্ঞাসা করেছিল যে জয়া সে ভাব নিয়ে, এ যেন সে জয়া নয়!

একটু চা খাওয়া মঞ্জু! [ক্রমশঃ

# চেনা গানের সুর

## গোবিন্দ গোস্বামী

গ্রীষ্মের সোনালী দিনে সূর্যের ঝিলিক

বর্ষার উন্মন তার তৃষ্ণাহত দিক।

শরতে উদ্দাম বেগে যৌবন হৃদয়

হেমন্ত-প্রাঙ্গণে এসে হয়ে যায় ক্ষয়।
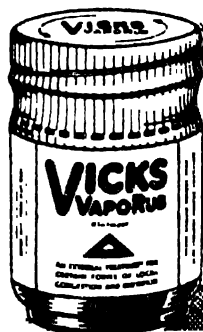
## ভিটামিন-পিল্ ব্যবহার

জীবন-ধারণ ও জীবনী-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য 'ভিটামিন' বা খাদ্যপ্রাণ অপরিহার্য্যভাবে প্রয়োজন—এ সম্পর্কে আজকের দিনে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু এও আমরা ভালভাবেই জানব—আমাদের নিত্যভোগ্য খাদ্যদ্রব্যের একটিতেই সব জাতীয় খাদ্য-উপাদান থাকে না। সুতরাং শরীরের পূর্ণাঙ্গ পুষ্টির জন্য একটিমাত্র খাদ্যই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না। মিশ্র, সুষম বা সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য গ্রহণের জরুরী দাবীটিও উঠে ঠিক এই থেকেই।

এক্ষণে প্রশ্ন—সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্য সংগ্রহ করা আমাদের ক'জনার পক্ষে সম্ভবপর? এই সংগ্রহের পথে আর্থিক বাধাই সব চেয়ে বড় বাধা। যেখানে এই বাধা অতিক্রম করা গেল, সেখানেও সংগৃহীত খাদ্য টাট্কা ও ভেজালহীন কিনা, অর্থাৎ ভোগ্য খাদ্যটিতে প্রত্যাশিত ভিটামিন সত্যি কতটা আছে, এইটি তলিয়ে দেখবার প্রশ্ন উঠে। এবং এও ঠিক, যতক্ষণ সাধারণ মানুষের অবস্থা-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হবে, ততক্ষণ এ প্রশ্নের মীমাংসা অমনি সম্ভবপর নয়।

এর পর স্বতঃই প্রশ্ন উঠবে আর একটি—দৈনন্দিন খাদ্য থেকে আবশ্যক ভিটামিন পাবার সম্ভাবনা যে ক্ষেত্রে কম, সে ক্ষেত্রে ভিটামিনের অভাব পূরণের সত্যি উপায় কি? শরীর-বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞরা এই নিয়ে ভেবেছেন বহুদিন। ইহারই ফলস্বরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে বহু উপকারী ভিটামিন-পিল্ বা ভিটামিন-বটিকা। আজকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই পিল্ ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সে সাধারণতঃ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে। জানা যায়—একমাত্র আমেরিকাতেই ভিটামিন বিক্রয় হয়ে থাকে বছরে ২৫ কোটি ডলারের মতো।

অবশ্য একথা বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, ভিটামিন-পিল্ সেবন করে ভিটামিনের অভাব পূরণ অপেক্ষা উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ করেই সে অভাব মেটাবার চেষ্টা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। আবারও একই উত্তর হাজির করতে হয়—সামঞ্জস্যপূর্ণ খাদ্যের সংস্থান যেখানে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেক্ষেত্রে নর-নারী ও শিশুদের পক্ষে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ভিটামিন-পিল্ সেবন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এক্ষণে কোন্ ভিটামিন কি গুণ বা শক্তিসম্পন্ন কোন্টি শরীরের পক্ষে কেন প্রয়োজন—সেইটি পর্য্যালোচনা করে দেখা যাক।

ভিটামিন-এ—সবুজ তরি-তরকারী, দুধ, মাখন, ডিমের কুসুম—এ সকল ভোগ্য দ্রব্য এই খাদ্যপ্রাণ সমন্বিত। শরীর বৃদ্ধি ও পুষ্টির বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধক। দৃষ্টিহীনতা ও 'রাতকাণা' রোগ নিবারণের ক্ষমতাও এর অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

ভিটামিন-বি (বি-১ ও বি-২)—দেহের পুষ্টিসাধন ও ক্ষয়পূরণের জন্য ভিটামিন-এ'র ন্যায় ভিটামিন-বি'ও অত্যাবশ্যক। ভিটামিন বি-১ (থিয়ামাইন) পরিপাক শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক এবং এর অভাবে অজীর্ণ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বেরিবেরি প্রভৃতি ব্যাধি দেখা দেয়। অপরদিকে ভিটামিন-বি (রিবোফ্লাবিন) অভাব থেকেই চর্ম্মরোগ এবং মুখে ও জিহ্বায় ঘা ইত্যাদি হয়।

ডিম, দুধ, টমেটো, কমলালেবু প্রভৃতি এবং ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, যাঁতাভাঙ্গা আটা—এ সকলে ভিটামিন বি-১ আর পালং, মসুরি, মুগ ও ছোলার ডাল, ডিমের শ্বেতাংশ প্রভৃতিতে ভিটামিন বি-২ পর্য্যাপ্ত রয়েছে।

ভিটামিন-সি—বিভিন্ন জাতীয় লেবু, আম, আনারস, আপেল, বাঁধাকপি, মূলা, পেঁপে, টমেটো প্রভৃতি ভিটামিন-সি সমন্বিত। এই জাতীয় ভিটামিন রক্তশোধন করে—অপরদিকে এর রয়েছে ব্যাধির আক্রমণ প্রতিরোধক শক্তি। দাঁত, অস্থি ও পাকস্থলীকে সতেজ ও সক্রিয় রাখতে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। এই খাদ্যপ্রাণটির অভাবে দেহে স্কার্ভি নামক দুরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ভিটামিন-ডি—দেহ মজবুত করে গঠনের পক্ষে ইহা একরূপ না হলে নয়। এই ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ হাড়ের পুষ্টিসাধন করে এবং শিশুদের যে রিকেট ব্যাধি দেখা দেয়, ভিটামিন-ডি'র অভাব এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। মাংস, দুধ, ঘি, ডিমের কুসুম, কডলিভার অয়েল প্রভৃতিতে এই খাদ্যপ্রাণ প্রচুর বিদ্যমান। নিয়মিত পদ্ধতিতে সূর্য্যকিরণ শরীরে লাগালে চর্ম্মের নিম্ন দেশেও এই শ্রেণীর ভিটামিন (ভিটামিন-ডি) সৃষ্টি হয়—বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষায় এইটি দেখেছেন।

ভিটামিন-ই—ডিমের কুসুম, কডলিভার অয়েল, ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, আটা, অঙ্কুরিত ছোলা—এ সব পদার্থে ভিটামিন-ই রয়েছে পর্য্যাপ্ত মাত্রায়। শরীরের পক্ষে এই বিশেষ ভিটামিনটিও একান্ত প্রয়োজনীয়। আধুনিক শরীর বিজ্ঞানীদের অভিমত—এইটির অভাবে শরীরের মূলীভূত শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়।

এই পাঁচটি ভিটামিন ছাড়াও আরও কয়েকটি ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, শরীর রক্ষা ও পুষ্টির দাবী থেকে এগুলোকেও বাদ দিলে চলে না। এই প্রসঙ্গে ভিটামিন-কে'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শরীর থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে পরম সহায়ক এই ভিটামিনটি। অন্যক্ষেত্রে অপরাপর ভিটামিনেরও কার্য্যকারিতা লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

ভিটামিন আবিষ্কারের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় জানা যায়—১৯১১ সালে এক পোল রসায়নশাস্ত্রবিদ্ এইটি আবিষ্কারের গৌরবের অধিকারী। গবেষণাকালে একটি পদার্থ খুঁজে তিনি পান, যাতে বেরিবেরি রোগ নিরাময় করা সম্ভব হ'ল। উক্ত বিজ্ঞানীর নাম কাসিমির ফাঙ্ক এবং তাঁর আবিষ্কৃত পদার্থের নামকরণই হয় 'ভিটামিন'। 'ভিটা' (Vita) একটি লাটিন শব্দ; ইহ 'প্রাণ'কে বুঝায়। আলোচ্য পদার্থটিতে যে 'এমাইন নাইট্রোজেন' রয়েছে, সেই থেকে [illegible]
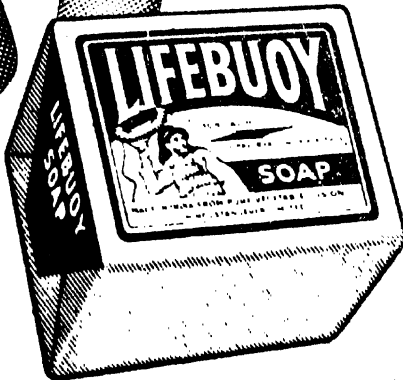
যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
L. 278-X52 BG

আজকাল চিকিৎসাকেন্দ্র ও ঔষধালয়গুলোতে ভিটামিন-পিলের একরূপ ছড়াছড়ি। ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খাদ্যপ্রাণ পাওয়া অবস্থাধীনে দুষ্কর বলেই এ সকল পিল্ ব্যবহার করার কথা উঠছে, সে গোড়াতেই বলা হ'ল। তবে নিজে থেকে ব্যবস্থাপত্র হাতে না নিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসরণ করাই সর্ব্বক্ষেত্রে সমীচীন।

## মনোমত বৃত্তি নির্ব্বাচন

চলমান সংসার একটি বিরাট কর্ম্মশালা—এখানে নিঃসংশয়ে কাজ বা বৃত্তি রয়েছে রকমারী। এই অবস্থায় কোন্ বৃত্তি কার পক্ষে উপযুক্ত হবে—কে ঠিক কোন্ কাজের দায়িত্ব নেবেন, সে একটি মস্ত বড় কথা। জীবিকার্জ্জনের জন্যই মূলতঃ কাজ করা বটে, কিন্তু সুষ্ঠুভাবে সম্যক্ দায়িত্ব পালনের জন্ত উপযুক্ত ও মনোমত বৃত্তি নির্ব্বাচন চাই সর্ব্বাগ্রে।

প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে তাহলেই—যে কাজ বা বৃত্তি গ্রহণ করা হবে, তার উপর মনের ষোল আনা সমর্থন থাকা দরকার। কি মাস মাহিনা, কি কাজের ধরণ, কি চাকরীর অবস্থা—কোন দিক থেকেই আপত্তি বা অসন্তোষ থাকলে চলবে না। যা-ই বলা হোক্ না কেন, আসলে টাকার জন্যই কাজ। আবার মাস শেষে পর্য্যাপ্ত টাকা পেতে হলে কাজটিও হওয়া চাই সে-পর্য্যায়ের। কাজ করে কে কা পেলেন, সেই নিয়েই আধুনিক সমাজে লোকের মান নিরূপিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া উপযুক্ত কাজের বিনিময়ে উপযুক্ত বেতন বা মজুরী পেলে আত্মপ্রসাদ যেমন হয়, তেমনি দেখা দেয় আত্মবিশ্বাস!

মানুষের বৃত্তি বা জীবিকার জরুরী প্রশ্নটি নিয়ে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চিন্তা-আলোচনা হয়ে আসছে বহু দিন থেকেই। বাস্তব ক্ষেত্রে একটি জিনিষ লক্ষ্য করা গেছে—কি মার্কিণ পুরুষ, কি মার্কিণ নারী—সকলেই প্রাত্যহিক জীবনে কাজের প্রত্যাশী এবং কাজ করা মানেই অর্থ উপার্জ্জন, জীবিকার সংস্থান। অপর দিকে যে বৃত্তি নির্ব্বাচন করা গেলো, সংশ্লিষ্ট কর্ম্মীর ব্যক্তিত্ব গঠনে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে।

এইটি সর্ব্বত্র সহজভাবে স্বীকার্য্য—মানুষ কাজ চায়—কাজের মধ্যে যতক্ষণ থাকা যাবে, ততক্ষণই সে সর্ব্বাধিক সুখী। সমাজ-বিজ্ঞানী জাডসন টি ল্যান্ডিস একটি পর্য্যালোচনা চালিয়েছিলেন বিভিন্ন পেশার পাঁচ শত লোক নিয়ে। তাতে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন কাজ থেকে অবসর নিয়ে মানুষ খুব স্বস্তি বোধ করে না। পরন্তু বেশীর ভাগ নর-নারীই কর্ম্ম-জীবনে কঠোর শ্রম করে কিংবা বিরাট দায়িত্ব বহন করে আনন্দ পেয়ে এসেছেন অতিমাত্র। অবশ্য এখানেও গোড়াতেই উপযুক্ত কাজ বা বৃত্তি নির্ব্বাচনের প্রশ্নটি থেকে যায়।

একটি কথা এক্ষণে স্পষ্ট—কর্ম্মজীবনে প্রবেশের পূর্ব্বেই ভালরকম ভেবে চিন্তে দেখা দরকার, কোন্ লাইনে ঢুকলে জীবনে প্রত্যাশিত সফলতা অর্জ্জন করা যাবে, অর্থ উপায় হবে নিশ্চিতরূপে অন্ততঃ শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অবশ্য সে ধরণে কাজ হয় না অর্থাৎ উপযুক্ত লোকই যে উপযুক্ত পদ পাবে, এমন গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা এখানে নেই। এর কুফল বা প্রতিক্রিয়াও অনিবার্য্য—কাজের নিজস্ব দিক এবং যিনি কাজ করছেন বা করবেন, তার দি থেকেও। মোটের উপর জীবনে প্রতিষ্ঠা উন্নতির জন্ত যোগ্যতানুরূপ পছন্দসই কাজ বা বৃত্তি না পেলে নয়।

মার্কিণ মুলুকে কাজের প্রশ্নের এই ধারাটি নিয়েও পর্য্যালোচন চালান হয়েছিল এরই ভেতর। দেখা গেছে এখানেও কর্ম্মজীবনে তলা থেকে যারা উর্দ্ধতন পদে উন্নীত হয়েছেন, তাদের বেশীর ভাগই নির্দ্দিষ্ট কাজটিকে গ্রহণ করতে পেরেছে অন্তরের সঙ্গে আর এরই ফলে এমনটি হয়েছে সম্ভবপর। পক্ষান্তরে যারা পিছনেই পড়ে থাকলেন শেষ অবধি—তাদের অন্ততঃ অর্দ্ধেকের ক্ষেত্রে এই কথাটি অনায়াসেই প্রযোজ্য যে, কর্ম্মক্ষেত্রে তারা আশানুরূপ আনন্দ পান না—নির্দ্ধারিত কাজের সঙ্গে তাদের মনের হয় নি মিল।

একই ব্যক্তি সকল ধরণের বৃত্তি বা কাজের উপযোগী হবেন, এমনটি আশা ও দাবী করা ভুল। পাশ্চাত্যের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রাও এই অভিমত স্বীকার করে থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে একজন লোকের একটা বিশেষ দিকে ঝোঁক বা প্রবণতা থাকতে পারে, অন্যদিকে দেখা যাবে তার হয়ত রয়েছে ঔদাসীন্য বা অক্ষমতা। কথাটি ঘুরিয়ে এ-ও বলা যায়—একটি ক্ষেত্রে যিনি অযোগ্য ও অপটু বলে বিবেচিত, অপর বিশেষ ক্ষেত্রে তিনিই হয়ত নিতান্ত দক্ষ ও যোগ্য প্রমাণিত হবেন। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হল—কাজ করতে যেয়ে এই নির্দ্দিষ্ট বায়গাটি অর্থাৎ পছন্দসই বৃত্তিটি খুঁজে বার করাই হল সবচেয়ে বড় কথা।

পরিপূর্ণ দক্ষতার সঙ্গে এবং একান্ত সুষ্ঠুভাবে কাজ কি ভাবে হতে পারে, অন্ততঃ পশ্চিমী কর্ম্মবিদ্ ও চিন্তানায়কেরা এই বিষয়ে কম ভাবছেন না। এখন অবধি মোটামুটি মত যে-টি প্রকাশ পেয়েছে—তাতে দেখা যায়, কার্য্যকরী সুফল লাভের দাবীতে সর্ব্বাধিক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সকালের দিকে হাতে নিলেই ভাল। কথাটি শিল্প-সংস্থা সমূহের পক্ষে যতটা খাটে, অফিস-কর্ম্মীদের বেলাতেও সমভাবেই প্রযোজ্য—অন্তত বিশেষজ্ঞ মহলের এইটি দাবী। তাঁদের বিবেচনায় দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজলেই কাজের উৎসাহ হ্রাস পেয়ে আসে এবং নির্দ্ধারিত কাজটি তেমন আশানুরূপ ভাবে হয়ে উঠে না। অপরাহ্নের মুহূর্ত্তগুলোতেও কাজে শৈথিল্য ও মন্থরগতি প্রায় সর্ব্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

দিবসের তাপমাত্রা কিছুটা থাকলে কোন্ কাজ গুণ ও পরিমাণগত দিক থেকে ভাল হয়, সেইটি নিয়েও পর্য্যালোচনা হয়েছে। জন্স্ হাকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেইটি নিশ্চয়ই ভেবে দেখবার। তাঁরা বলতে চেয়েছেন—কঠোর কায়িক শ্রমের পক্ষে মোটামুটি ৬০ ডিগ্রী তাপমাত্রা অনুকূল। অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রমের বৃত্তি বা কাজ হলে ৬৫ ডিগ্রী তাপ থাকলেও ক্ষতি নেই। টেবিলে কাজ করা যেখানে—সেক্ষেত্রে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে কাজের দক্ষতার কিছুটা তারতম্য হবে। শীতকালের সবচেয়ে অনুকূল তাপমাত্রা হচ্ছে ৬৮ ডিগ্রী থেকে ৭৩ ডিগ্রী। অপর দিকে গ্রীষ্মের দিনগুলোতে তাপ ৭৫ ডিগ্রী থেকে ৮০ ডিগ্রীর ভেতর থাকলে নির্দ্দিষ্ট কাজ সর্ব্বাধিক সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হবে এবং কাজের গতিও হবে অনেকখানি দ্রুত।

কিন্তু এর পরও আবার বলতে হয়, মনোমত বৃত্তি যদি না জুটল
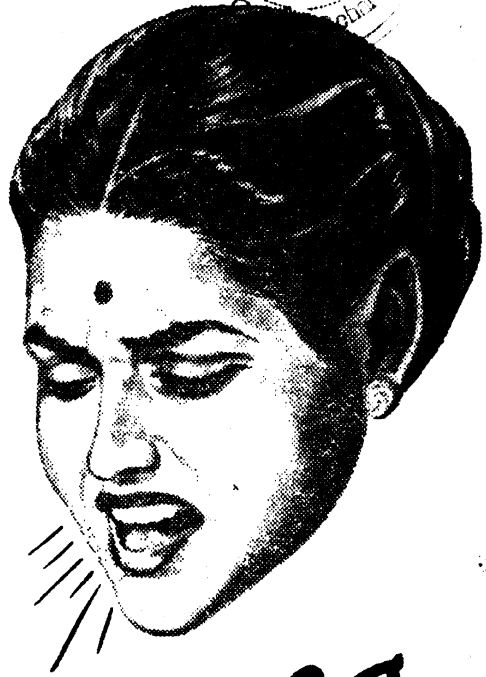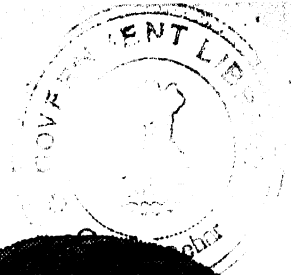
কোন কাজই আশানুরূপ সাফল্যের সঙ্গে এবং নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে করতে পারে না। শিল্পসংস্থাসমূহে ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে দেখা গেছে প্রধানত: কাজে একঘেয়েমির জন্য অর্থাৎ বৈচিত্র্যের অভাবের দরুণ অনুপস্থিতের হার সব সময়ই বেশী থাকে। মোটের উপর যিনি যে কাজ করলেন, তা থেকে অবিরাম ধারায় উৎসাহ, তৃপ্তি ও আনন্দ না পেলেই নয়। সুতরাং এমন একটি বৃত্তি বা কাজই খুঁজে পেতে হবে, মানসিক দক্ষতার সঙ্গে যার থাকবে একটা বেশ সামীপ্য গোড়া থেকেই।

এক শ্রেণীর লোক অবশ্য রয়েছেন, যে কোন কাজের নামেই তাদের হয়ত বিতৃষ্ণা। কাজ করতে যেয়ে কাজ ছেড়ে দিতে পারেন যখন তখনই। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা ব্যক্তিবিশেষের মনের এই অভিপ্রেত অবস্থা ঠিক একরকম বাতিক বা ব্যাধি বলে অভিহিত করেছেন। সামাজিক বা অর্থনৈতিক চাপ যদি থাকলো তবেই এই শ্রেণীর লোকরা কোন কাজ বা বৃত্তি আঁকড়ে থাকলে অসহ্য অর্থহানভাবে পাল্‌টিয়ে চলবেন বৃত্তির পর বৃত্তি—কাজের পর কাজ। আবার কাজ করে করেও পিপাসা মিটে না অর্থাৎ কাজ-পাগলা যা কাজপ্রিয় লোকও সমাজে দৃষ্ট হয় বহু সংখ্যায়। তাদের বেলায় দেখা যায়, অবসর সময়ে বসে থাকাটাই যেন একটা মস্ত অস্বস্তি, কাজের মাঝেই ডুবে থাকতে চান তাঁরা দিনরাত।

গড়পড়তা হারে বলতে গেলে কি পরিমাণ লোক স্ব-স্ব বৃত্তি বা কাজে লেগে থেকে সন্তুষ্ট, এই প্রশ্নটি স্বভাবতঃই উঠতে পারে। এই নিয়েও একটি তদন্ত বা পর্য্যালোচনা চালিয়েছিলেন ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষম মনস্তত্ত্ববিদগণ। মাটি খননকারীদের থেকে সুরু করে বিভিন্ন কাজে বিশেষজ্ঞদের মনোভাব পর্যন্ত খতিয়ে দেখেছেন। ফলাফলে দেখা যায়—শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ কর্ম্মী নিজ নিজ কাজ বা বৃত্তিতে সুখী। অবশিষ্টরা বলতে চান—তাদের কাজে আনন্দ পাবার অবকাশ আছে খুব কম এবং আত্মোন্নতি বা আত্মবিকাশের পথ নিতান্ত অপ্রশস্ত। অবশ্য এই হিসাব যে সর্ব্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য, জোর গলায় এ বলা চলে না।

পশ্চিমী বিশেষজ্ঞদের পর্য্যালোচনায় আরও একটি জিনিস ধরা পড়েছে—কেরাণীবৃত্তি যারা গ্রহণ করেছেন, তাদের চেয়ে কায়িক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকার্জ্জনকারীরা অধিকতর সুখী। যন্ত্রকুশলী বা ট্রেনিংপ্রাপ্ত কারিগরদের ক্ষেত্রেই এই অভিমতটি বেশী করে খাটে। তবে কারিগর মাত্রই কেরাণী বা অফিস কর্ম্মীদের অপেক্ষা কাজে যে অধিক তৃপ্তি পান, এইটি অস্বীকার করা চলে না।

কাজ করতে যেয়ে কাজ না করার মনোভাব কেন দেখা দেয়, কর্ম্মজীবী লোকের অতৃপ্তি ও অসন্তুষ্টির উৎস কোথায়—বিশেষভাবে এইটি ভাবতে হবে। খোঁজ করলে দেখা যাবে, শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ লোকই বলতে চাইবেন - সংশ্লিষ্ট কাজটি যোগ্যতা আনুপাতিক নয়, এর গতি প্রকৃতি মনের পর্য্যায় আপনি সাড়া জাগায় না। আর শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ লোককে চাকরীতে থাকা অবস্থাতেও অতৃপ্ত দেখা যায়, এর মূলে রয়েছে দারুণ অর্থনৈতিক কারণ। তাদের সব সময়ই একটা ধারণা যে পরিমিত অর্থ তারা পেতে পারেন, সেইটি পাচ্ছেন না আর অগ্রগতির সুযোগ বা পথ তাদের সব রুদ্ধ। শতকরা অবশিষ্ট ১০ভাগের কথা বলা চলে—কাজের প্রতি তাদের যে অশ্রদ্ধা, 'বস' বা কর্ত্তৃপক্ষকে পছন্দ না করা কিংবা পরিচালকমণ্ডলীর কর্ম্মনীতিতে অনাস্থাভাবই এর জন্য দায়ী। কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কাজের চাপও সাধ্যে কাজ না করতে চাওয়ার একটি বড় কারণ বলে ধরা পড়েছে। মোটের উপর, পছন্দসই কাজ বা বৃত্তি নির্ব্বাচনের প্রশ্নটি সর্বাবস্থায় জরুরী, এইটি যেখানে হয়ে গেলো, সেখানেই জানতে হবে লক্ষ্মী, সেখানেই মঙ্গল।

# কবিতা

শেখ সিরাজুদ্দীন আহমদ

গতিশীল ধরণীর কবিতা
প্রভাতের মায়াভরা সুষমায়
থরে থরে এঁকে চলে সীমাহীন ভাষা।
ঘন ঘন পাখীদের কাকলি
সুদূরের আহ্বানে সাড়া দেয়
বয়ে যায় এঁকে যায় মন-মাঝে ছায়া।
নিদাঘের ঝিম-ঝিম আবেশে
নিমীলিত আঁখিদের পাখনায়
ধীরে ধীরে মুছে যায় স্মৃতিটা।

গোধূলির ফাগমাখা সাথে
সাগরের উত্তাল ওষ্ঠ
চুপি চুপি তটিনীর কর্ণে
কি যে বলে ফিস-ফিস শব্দে
বঙ্কিম লজ্জা ঢেকে দেয়
আঁধারের গুণ্ঠনে বালুতট।
গুণ্ঠন সরিয়ে চকিতে
গোপনে সে দেখে নেয় সাগরে
আঁখি মুদে ভরে নেয় খালি ঘট।

গতিশীল ধরণীর সংগীত
নীরবে গেয়ে চলে আবেশে
পলে পলে নতুনের ইংগিত
ধীরে তোলে মন-মাঝে গুঞ্জন
শেষহীন কবিতার মধুক্ষণ
ভরে দেয় ধরণীর লাস্য।
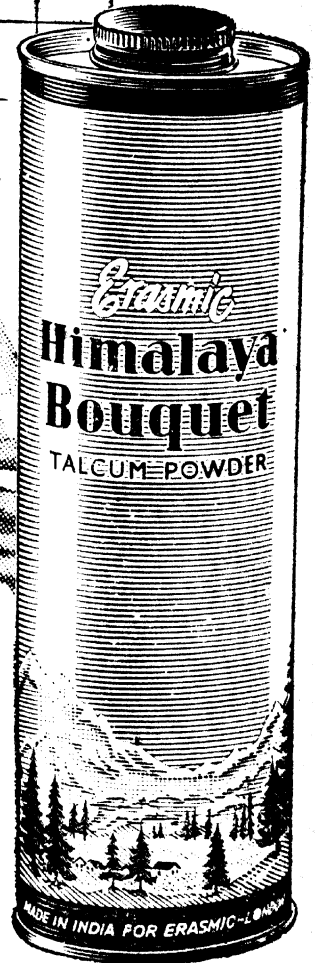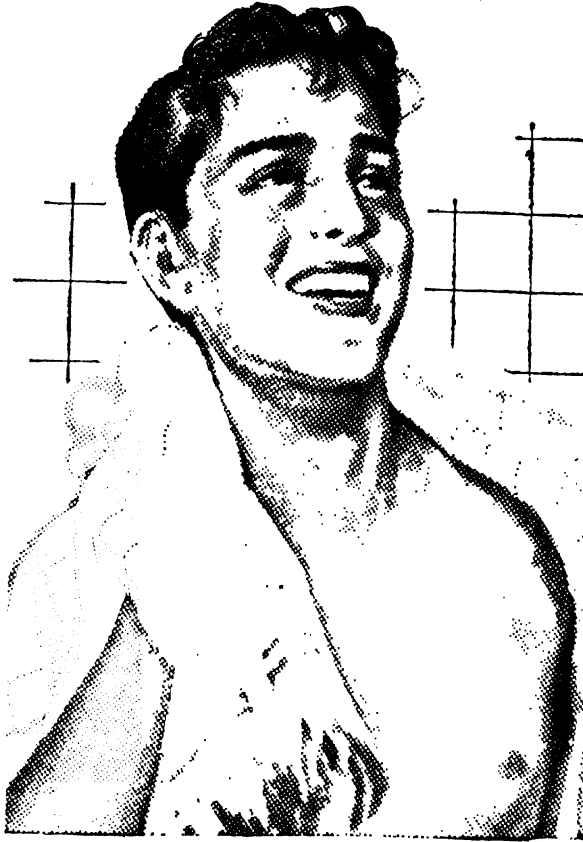
# গীতিকার রামপ্রসাদ

### কালীপদ লাহিড়ী

আনুমানিক ১৭১৮ থেকে ১৭২৩ সালের মধ্যে সাধক রামপ্রসাদের জন্ম হয়। সেই সময় তাঁর জন্মস্থান হালিশহর ছিল শক্তিসাধনা ও বৈষ্ণব ধর্ম-সাধনার পীঠস্থান, দুই সাধনার ধারা প্রবাহিত ছিল হালিশহরে। রামপ্রসাদের পিতা রামরাম সেন কবিরাজ বাস করতেন সেই হালিশহরে, যেখানে ছিল শক্তি-সাধনার উৎস। যে বংশে শিশু রামপ্রসাদের জন্ম সেই বংশে বরাবর শক্তিরূপিণী শ্যামা-মায়ের পূজা হয়ে এসেছে; তা ছাড়া রামপ্রসাদ ছিলেন একজন কালীভক্ত। তাই শ্যামা-মায়ের প্রতি রামপ্রসাদের শিশুকাল থেকেই প্রবল আকর্ষণ। শৈশবকালে তিনি দেবদেবীর নানা মূর্তি গড়তেন, কখনও পিতাকে প্রশ্ন করতেন, শিব যখন কালীর স্বামী তখন শিবের বুকে কালীমাতার অবস্থান কেন? পিতা ও পুত্রে এই ভাবে চলত নানা সমস্যার সমাধান, নানা প্রশ্নের উত্তরদান। এই ভাবেই সাধক রামপ্রসাদের শৈশব অনুপ্রাণিত হয়েছিল শ্যামা-মায়ের প্রতি ভক্তির ভাববন্যায়। উত্তরকালে সাধনা ও শ্যামা-সংগীতের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশে এনেছিলেন এক নূতন ভাবধারার জোয়ার।

"বামদিকে হালিশহর ডাহিনে ত্রিবেণী।
দুকূলের জপতপে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক ঘাটে করে স্নান।
বাস, হেম, তিল, ধেনু কেহ করে দান॥"
(কবিকঙ্কণ চণ্ডী)।

রামরাম সেন পুত্রকে শিক্ষা দেবার চেষ্টার ত্রুটি করেন নি, কিন্তু রামপ্রসাদ যতই বড় হতে লাগলেন, ততই তাঁর শিক্ষায় বা সাংসারিক কার্যে বৈরাগ্য ভাব লক্ষ্য ক'রে পিতা চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। অথচ তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। সেই সময় প্রত্যেক শিক্ষিত লোককে ফার্সি ও হিন্দী শিখতে হ'তো। রামপ্রসাদও এই দুই ভাষা অতি অল্প আয়াসে আয়ত্ত ক'রে সকলকে স্তম্ভিত করে দিলেন। পিতার ইচ্ছানুযায়ী তিনি তাঁদের জাত-ব্যবসা কবিরাজী শিক্ষা লাভ ক'রে কালক্রমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'ভিষক্' উপাধিতে ভূষিত হলেন বটে, কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসার প্রতি তাঁর কোনই আগ্রহ ছিল না। রোগীর সহিত রোগের বিষয় আলোচনার পরিবর্তে নানাপ্রকার কাব্য ও তত্ত্বকথার আলোচনা করতেন। ক্রমে ব্যবসা ও সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধায় আর্থিক অবস্থারও অবনতি হ'তে আরম্ভ করল। বৃদ্ধ পিতা পুত্রের জন্য চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। এই সময় সকলে পরামর্শ দিল, পুত্রের বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। অবশেষে পুত্রকে সংসারী করবার অভিপ্রায়ে এক শুভ লগ্নে সুলক্ষণা সর্বাণী দেবীর সহিত তাঁর বিবাহ দিলেন। কি কোন আকর্ষণই রামপ্রসাদকে ভুলিয়ে রাখতে পারল না। বিবাহ কিছুদিন যেতে না যেতেই পিতা বুঝতে পারলেন, সংসার ও অর্থ আকর্ষণের চেয়ে একটি প্রবল শক্তি পুত্রকে টানছে। হালিশহরের নিকট গঙ্গার ধারে নিবিড় অরণ্যে রামপ্রসাদ কিসের খোঁজে পাগলের ন্যায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, কোন রাত্রে বাড়ী ফিরতেন, কোন রাতে বাড়ীতেও ফিরতেন না। এমন সময় দেখা হ'ল এক শক্তিসাধক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। ইনিই বাংলার তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ মহাসাধক আগমবাগীশ। সন্ন্যাসীর নির্দেশ মত রামপ্রসাদ তন্ত্রের সাধনা করতে থাকেন। এমন সময় বৃদ্ধ রামরাম সেন দেহত্যাগ করলেন। সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল রামপ্রসাদের স্কন্ধে। তিনি শ্যামা-মা ছাড়া কিছুই জানেন না, সংসারে তিনি নিতান্ত অসহায়। তাঁর কান্নার সুর আপনা হতেই বেরিয়ে আসত গানের ছন্দে ও সুরে।

সেই গানেই ছিল তাঁর অন্তরের কথা, প্রার্থনা ও মনের দুঃখ-কষ্টের কথা তাঁর গানের সুরে ও ছন্দে ধ্বনিত হয়েছে এক অভিনব ভাবের অভিব্যক্তিতে।

"অন্ন দে গো অন্নদে
অন্ন দে গো অন্নদে।
জঠরের জ্বালা সহে না তারা
কাতর হইও না প্রসাদে।"

অনাহার, অনটনের তীব্র কশাঘাতে শরীর ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ল। অবশেষে রোগে শয্যার আশ্রয় নিতে হল তাঁকে। দুঃখের সংসারে দারিদ্র্য শোকও এসে দেখা দিল একই সাথে।

"রোগ শোক দুটি ভ্রাতা
কেহ কুশল কেহ দাতা,
দুটী দুটি ক্ষুধা, তৃষ্ণা
যশ, প্রশংসা নাই কারো কাছে।"

দারিদ্র্যের জন্য বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট বহু গঞ্জনা সহ্য করতে হ'তো তাঁকে, তাই বড় দুঃখে গেয়েছিলেন :—

"ভাই, বন্ধু, দারা, সুত
নির্ধন বলে সবাই রোষে।"

একে কঠিন দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে তিনি বিব্রত, তার উপর সংসারে আরও দু'জন লোক বেড়েছে। তাঁর প্রথমা কন্যা পরমেশ্বরী ও পুত্র রামদুলাল জন্মগ্রহণ করল। এদের ভরণপোষণের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর মন শ্যামা-মায়ের চিন্তায় মগ্ন। অবশেষে একদিন মনস্থ করলেন, যত দিন চাকুরী না পাওয়া যায়, তত দিন তিনি বাড়ী ফিরবেন না। এই সময় বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীদুর্গাচরণ মিত্র রামপ্রসাদের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা শুনে ত্রিশ টাকা

াইনের চাকুরী দিলেন। কিন্তু হিসাবের খাতায় মন কিছুতেই সল না, কি যেন দেবভাবে তাঁর মন পরিপূর্ণ। হিসাবের খাতায় াসাবের পাশে পাশে লেখা অপূর্ব সংগীত, ভাষা ও ভাবের ব্যঞ্জনায় নবন্ধ।

"আমায় দাও মা তবিলদারী
আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী।
পদরত্ন সবাই লুটে
ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা
সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।" ইত্যাদি

হিসাবের খাতায় গান লেখার কথা ক্রমে দুর্গাচরণের কানে ৌছিল। একদিন রামপ্রসাদকে ডেকে পাঠালেন দুর্গাচরণ, ামপ্রসাদ বরখাস্তের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দুর্গাচরণের নিকট াজির হলেন। দুর্গাচরণ দেখলেন, হিসাবের খাতায় ভাবসমৃদ্ধ ান, মুগ্ধ হয়ে গেলেন রচনা-নৈপুণ্যে ও ভাষার ছন্দে। রামপ্রসাদকে কজন প্রতিভাবান সাধক হিসেবে দিলেন তাঁর স্নেহ-ক্রোড়ে স্থান। ই থেকে দুর্গাচরণের প্রদত্ত ত্রিশ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থায় সংসারের ভার অনেকটা মিটে গেল। সংসারের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি মা-মাকে ডাকবার সুযোগ পেলেন বেশী। তিনি বুঝেছিলেন যে, কা-পয়সার চেয়ে অমূল্য সম্পদ 'মায়ের কৃপা'। তাই তাঁর মনের র সংগীত হয়ে ফুটে উঠল।

"কাজ কি সামান্য ধনে
ও কে কাঁদছে তোর ধন বিহনে।
সামান্য ধন দিলে তারা
পড়ে রবে ঘরের কোণে।"

রামপ্রসাদ চাইলেন অমূল্য সম্পদ। কবে মায়ের চরণ স্পর্শে ে উঠবে হৃদয়পদ্ম—

"এমন দিন কি হবে তারা
কবে তারা তারা তারা বলে
তারা বয়ে পড়বে ধারা।"

হঠাৎ দুর্গাচরণের ব্যবসা অচল হয়ে পড়ে। তার ফলে ্প্রসাদের মাসিক বৃত্তিও বন্ধ হয়ে যায়। রামপ্রসাদের জীবনে ম আসে দুর্যোগের গভীর রাত্রি। মা বাবা গেলেন, তার ুদিন পরে তাঁর জীবনসঙ্গিনী সর্বাণীও দেহ রক্ষা করলেন। ক তাপে ভেঙ্গে পড়ল রামপ্রসাদের মন। কাতরস্বরে ইলেন—

"ছিলেম গৃহবাসী, বানালে সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী!"

অভিমানে ও ক্ষোভে হৃদয় হ'তে বেরিয়ে এল—

"ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষে মেগে খাব
মা বলে আর কোলে যাব না!"

একদিন বাড়ীর সামনে বেড়া মেরামত করছিলেন রামপ্রসাদ। জগদম্বা তাঁর কন্যার মূর্তি ধরে এসে বেড়ার বাঁধন ফিরিয়ে ন। এর পর থেকে রামপ্রসাদ মাতৃসাধনায় নিমগ্ন হ'য়ে গেলেন। লেন;—

"মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া?
ও মন ভাব শক্তি পাবে মুক্তি
বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া।
নয়ন থাকতে দেখলে না মন
কেমন তোমার পোড়া কপাল
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া।"

স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে রামপ্রসাদ গেলেন কাশীতে, সেখানে দিব্যমূর্তি দর্শনে তাঁর সমস্ত চৈতন্য আলোকময় হ'য়ে উঠল, গভীর সমাধির মধ্যে নিমগ্ন হলেন রামপ্রসাদ। গয়া, গঙ্গা ও কাশী তাঁর নিকট এক হয়ে উঠল, সমস্ত চেতনাকে আপ্লুত ক'রে জেগে উঠল আনন্দ ও অমৃত। তিনি গাইলেন;—

"আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে
গয়া, গঙ্গা, বারাণসী।" ইত্যাদি—

তাঁর বাড়ীর কাছে পঞ্চবটী তৈরী করে, সেখানে তান্ত্রিক সাধনার জন্য পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসলেন। কঠোর সাধনার পর রামপ্রসাদ সিদ্ধিলাভ করলেন। তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করলেন, একই মহাশক্তি নানা রূপে নানা নামে বিশ্বসংসারে প্রকট হ'য়ে আছেন। রামপ্রসাদ গাইলেন,—

"ঐ যে কালী, কৃষ্ণ শিব রাম
সকল আমার এলোকেশী!
শিবরূপে ধর শিঙা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী।
ও মা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।"

তিনি শৈব নন, বৈষ্ণব নন, শক্তিসাধক এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূর্তিমান প্রতীক রামপ্রসাদ। তাঁর অমরত্বের পরিচয় তাঁর প্রসাদী-সংগীতে ও প্রসাদী সুরে। শুধু লৌকিক ভাষা নয়, লৌকিক গ্রাম্যসুর আত্মসাৎ ক'রে তিনি নিজস্ব সংগীত ও সুরসৃষ্টি করেছেন। এই গান বাংলার কোটি কোটি মানুষের অন্তরের গান, প্রসাদী সুর তাদের মর্মোৎসারিত বেদনার সুর। পথে, ঘাটে, মাঠে, মাঝিদের কণ্ঠে, মেলায়, ভিখারীর মুখে মুখে ফেরে, সাধক কবি রামপ্রসাদের গান, নিভৃত পল্লী গৃহস্থদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব ক'রে। তাই বাংলার মাটিতে প্রসাদসংগীত ও সুর শাশ্বত হ'য়ে জেগে আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটা করুণ ছবি ফুটে উঠেছে এই গানের মধ্যে। রামপ্রসাদের সংগীতের বিশেষ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আত্মসমর্পণের চেয়ে বিদ্রোহের সুর ও চ্যালেঞ্জের সুরই প্রধান। আর যা কিছু প্রশ্ন বা অভিযোগ সেই মাতৃরূপী শ্যামার কাছে। প্রথম যুগের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে বাংলা দেশে শক্তি-সাধনার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই তাঁর সুরে বিদ্রোহ ও অভিযোগের সুরই প্রধান। বিশেষতঃ তাঁর গান, গ্রাম্য জীবনের উপমা ও রূপক, জমিজমা ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা দিয়ে সহজ করে গাঁথা, বুঝতে কষ্ট হয় না! রামপ্রসাদের ঐতিহ্য বাংলার ও বাঙালীর লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর রাজসভার আসন অলঙ্কৃত করার জন্য অনুরোধ জানালেন, তিনি পঞ্চবটী ছেড়ে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তার পর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আবক্ষ গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করে মাতৃনাম উচ্চারণ করতে করতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ ক'রে দিব্যদেহ ধারণ করেন। তাঁর জীবনের মর্মকথা, বাংলার সাধনার মর্মকথা আজও অমর হ'য়ে আছে তাঁর গানে।

## আমার কথা (৪৬)

### ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ

'শিল্পীর জীবনের সত্য এবং সার্থক পরিচয় তাঁর সাধনার মধ্যেই নিহিত থাকে। প্রাত্যাহিক জীবনের সহস্র তুচ্ছ ঘটনার ভীড়ে তার পরিচয় সন্ধান করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। শিল্পানুরাগীর দল যদি কেবল মহৎ শিল্পীর জীবনী পাঠ ক'রেই পরিতৃপ্ত হন, তাঁর আদর্শ ও সাধনাকে শ্রদ্ধাসহকারে বরণ করতে না পারেন, তাহলে সে শিল্পীর জীবনচরিত প্রকাশের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।'—ভারতের অন্যতম যন্ত্রসংগীত-শিল্পী ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ তাঁর জীবনকাহিনী বিবৃত করার আগেই এ ভূমিকাটুকু সেরে রাখলেন।

ইং ১৯১১ সালের ২০শে জুন ভারতের সংগীতসাধনার অন্যতম পীঠস্থান বারাণসীতে মুস্তাক আলি খাঁর জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন দিল্লীর মোগলদরবারের গায়ক। তাঁর পিতা ওস্তাদ আসীক আলি খাঁ ছিলেন ওস্তাদ বরকতউল্লা খাঁর প্রিয় শিষ্য এবং পাতিয়ালার State musician। বলা বাহুল্য, পিতার কাছেই তাঁর সেতার

ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ

শিক্ষার সূত্রপাত। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি সেতার শিক্ষা সুরু করেন এবং বার বছর বয়সেই বারাণসীর এক নামজাদা সংগীতসভায় সেতার বাজিয়ে প্রতিভার পরিচয় দেন। তখন থেকেই নিজেকে সর্বাগ্রগণ্য করে তোলার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর হ'ন।

চোদ্দ বছর যখন তাঁর বয়স, তখন এক শীতের রাত্রে এক বন্ধুর সংগে পরামর্শ ক'রে তিনি গোপনে কলকাতায় চলে আসেন এবং নিঃসংগ অবস্থায় মেছোবাজারের এক মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভাগ্যচক্রে কলকাতায় হ্যারিসন রোড ও চিৎপুরের সংযোগস্থলে দৈনিক দু'আনার বিনিময়ে তিনি এক ফলওয়ালার দোকানে বিক্রেতার কাজ নেন। একদিন পাশেই এক সাধুর সেতার বাজনায় মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর সংগী হন। সাধুটি প্রখ্যাত সুরকার রাইচাঁদ বড়ালের নিকট তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে ওস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ, ওস্তাদ আলতাফ হোসেন খাঁ, সামামত খাঁ প্রমুখ গুণিজনের স্নেহসাহচর্য লাভ করেন। তদানীন্তন বিখ্যাত টপ্পাগায়ক বিজয় মুখার্জী, শ্রীঅনাথনাথ বসু প্রমুখ গায়করা তাঁকে সাহায্য করতে থাকেন। অবশেষে শ্রীঅমৃতলাল সিংহ মহাশয়ের অনুরোধে পিতার কাছে ফিরে যান। এবং সংগীত সাধনায় সমস্ত মন-প্রাণ নিয়োজিত করেন।

১৯২৯ সালে তিনি প্রথম কলকাতা বেতার কেন্দ্রে যোগদান করেন। ১৯৩২ সালে তিনি নাগপুর গমন করেন এবং অমরাবতী, বেলগাঁও, পুণা, গোয়া, মীরাট, প্রভৃতি বহু স্থান ভ্রমণ করেন।

ধীরে ধীরে সারা ভারতে তাঁর সুনাম প্রচারিত হয়। ১৯৩২ সালে জৌনপুর রাজ্যে তিনি সভাশিল্পী ( State musician ) পদগ্রহণ করেন কিন্তু রাজার সংগে মনোমালিন্য হওয়ায় সে পদ ত্যাগ করে কলকাতায় আসেন। ঐ বছরই তিনি কাশীর এক বিখ্যাত সংগীতসংঘ কর্তৃক 'সেতারসুধাকর উপাধিতে ভূষিত হ'ন।

ওস্তাদ আলি খাঁর বংশে সংগীত সাধনার ইতিহাসে বিখ্যাত 'সেনীয়া ঘরানার' প্রভাব বিদ্যমান। তাঁর পিতার গুরু ওস্তাদ বরকতউল্লা খান ( আফতাব-ই-সেতার ) মহীশূরের সভাশিল্পী ছিলেন। তিনি জয়পুরের অমৃতসেনজীর কাছে সংগীত শিক্ষা করেন, যিনি মিঞা তানসেনের উত্তরপুরুষ। ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সেতারে মসিদখানি গৎ বাদনে তখন সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কলকাতায় থাকাকালীন ওস্তাদ আমীর খাঁ সাহেবের কাছেও তিনি কিছুদিন তালিম নিয়েছিলেন এবং ফলে রেজাখানি গৎ আয়ত্ত করেন। সংগীত সাধনার ক্ষেত্রে ওস্তাদ আলি খাঁর উল্লেখযোগ্য সংযোজন মসিদখানি' এবং 'রেজাখানি' গৎ, এর সমন্বয়ে নতুন সুরের বন্দেজ চনা। এবং এই সুরের ভাগী একান্ত ভাবে তাঁর নিজস্ব।

সেতার ব্যতীত ইনি সুরবাহার ( বীণা ) তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রেও পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। তাঁর কণ্ঠসংগীতও উপভোগ্য।

ওস্তাদ আলি খাঁ মনে করেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের অনন্ত সাধনার সাহায্যে সংগীতের যে রাগরূপ রচনা করে গেছেন, আমাদের পক্ষে এখন তার থেকে বিচ্যুত না হ'য়ে সেগুলি আয়ত্ত করার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত। তাঁদের সাধনার ধারা বজায় রাখাই আমাদের প্রধান কর্তব্য।

সারা ভারত জুড়ে তাঁর প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী আছে, তাঁদের সকলকে তিনি এই শিক্ষাই দিয়ে আসছেন। যন্ত্রসংগীতের সাধনা, সার এবং উৎকর্ষ সাধনার দিকে তাঁর একাগ্র লক্ষ্য আছে। সেতারীমাত্রেই সেতারকে সম্মান করবে এবং শুধু সংগীতচর্চার প্রবাহে আপন স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন না দিয়ে যথার্থ গুণীজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অগ্রণী হবে—তাঁর শিক্ষার্থীদের কাছে এই তাঁর নির্দেশ।

ব্যক্তিগত জীবনে নিরহংকারী, সদালাপী, মিষ্টভাষী ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সংগীত সাধনাকেই জীবনের সার সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। জনতার উন্মত্ত করতালি বা অর্থের মোহ তাঁর সেই নির্জন, স্তব্ধ সাধনায় বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। ভারতে এবং বিদেশে চীন ও রাশিয়া প্রভৃতি দেশ ভ্রমণের আহ্বানে তাই তিনি সাড়া দেননি, এবং ১৯৩৪ সালে একটি রেকর্ড ক'রে আত্মপ্রচার থেকে দূরে সরে এসেছেন।

তাঁর বিচিত্র, কণ্টকিত ধ্যানস্তব্ধ সাধনার স্বাক্ষরবাহী জীবন-কাহিনী শেষ করার আগে ওস্তাদ আলি খাঁ ভারতীয় শিল্পিগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত একটি নিরুক্তি স্মরণ ক'রে বললেন—"ভারতীয় সংগীতের উৎপত্তি দাক্ষিণাত্যে, লালন পালন পশ্চিম ভারতে এবং মৃত্যু হোলো বাংলায়।" আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি মৃদু হেসে বললেন, "ভারতীয় সংগীতশিল্পীরা চিরকাল বাংলা দেশে এমন উৎসাহ ও সম্বর্ধনা পেয়েছেন যে এখান থেকে তাঁরা আর যেতে চাইছেন না, সেই অর্থেই 'মৃত্যু' বলেছি আর তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আমি স্বয়ং।"

১৯৩৫ সালে ওস্তাদ আলি খাঁ শ্যামবাজারের ব্রাহ্মণ-পরিবারে রাজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তদবধি কলকাতায় স্থায়িভাবে বাস করছেন। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি বাংলাতেই কাটাতে চান। ওস্তাদ আলি খাঁর শিক্ষাজীবনে তাঁর সহধর্মিণীর উৎসাহ ও প্রেরণার অংশ স্বল্প নয়। তাঁদের কোনো সন্তান নেই; কিন্তু তাঁর সুরসন্ততি বিচিত্র ছন্দে, রূপে, ঝংকারে দেশকালের সীমা পার হ'য়ে শাশ্বত প্রতিষ্ঠান অংগীকারে কালান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

## রূপক

দীপ্তি সেনগুপ্তা

মেঘের অলক নিয়ে হে রূপসী-কন্যা
বকুলীপ ধীরে আলি,
সন্ধ্যার প্রথম লগ্নে কান্নার সুবেলা বেলায়
তোমার স্মিত ওই হাসিটির জন্য
এবং চিররূপ চম্পক-অঙ্গুলি
পরশ প্রার্থনা করে ছায়ারূপ ধরে।

দীপ্র ওই সুতনুকা! রূপসী রাত্রির মোহ
চোখের কাজল ঘিরে আজো দুই চোখে।
চাঁদ আর গঙ্গার জলে রূপবতী ছায়াপথ
বৃত্তপথ রচে,
রূপমায়ার মিলন-মুহূর্তের আল্পনায়—
জন্ম নেয় নতুনতর পৃথিবীর আর এক গতির প্রবাহ।

### ... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি পাহাড়ী ফলওয়ালীর আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। আলোকচিত্র 'রামকৃষ্ণ' ( মেদিনীপুর ) কর্তৃক গৃহীত।
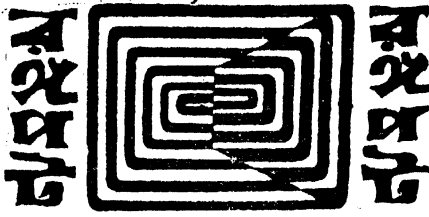
# স্মৃতির টুকরো

( পূর্ব-প্রকাশিতের পর )

সাধনা বসু

"শ্রীকৃষ্ণ" মঞ্চস্থ হবার পরই আমরা দুজনে দুজনকে করলুম বাকদান, তবে একটা চুক্তিতে। চুক্তিটি এই—বাকদান ততদিন পর্যন্ত কার্যকরী হবে না যতদিন না তা হওয়ার মত বয়েসের গণ্ডীতে আমার পদার্পণ হয়।

পারস্পরিক বাক বিনিময়ের পরবর্তী এবং বহু প্রতীক্ষিত শুভ মঙ্গলশঙ্খনাদের পূর্ববর্তী এই অন্তর্বর্তী সময়টির মধ্যে এমন দুটি ঘটনা আমাদের উপর দিয়ে বয়ে গেল, তা একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক অন্যদিকে তেমনই নৈরাশ্যজনকও।

জগতের সুপ্রসিদ্ধা নৃত্যশিল্পী য়্যানা প্যাভলোভা (Anna Pavlova) তখন কলকাতায়। একা নয়, সসম্প্রদায়ে। এম্পায়ার থিয়েটারে (অধুনা রক্সী প্রেক্ষাগৃহ) তিনি নৃত্যানুষ্ঠান প্রদর্শন করতেন। মধুর "আলিবাবা"ও ঐ একই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হোত। স্বভাবতঃই সে মাদাম প্যাভলোভার সংস্পর্শে আসে এবং একদিন তাঁকে ও তাঁর কর্মসচিব মিঃ লেভিটাফ (Mr. Levitoff) কে আমাদের নাট্যানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্যে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। আমাদের "বিউটি কোরাস" মুগ্ধ করেছিল মাদাম প্যাভলোভাকে। অসাধারণ পরিতৃপ্তি তিনি পেয়েছিলেন ঐ নাট্যানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়ে। সেই সময় রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করে একটি সাঙ্কেতিক নৃত্যনাট্য (Ballet) রচনার পরিকল্পনায় মেতে উঠলেন মাদাম প্যাভলোভা। মধুর সঙ্গে এ বিষয় চলল তাঁর আলাপ আলোচনা। ঠিক হল, তিনি দেশে ফিরে গিয়ে সেখানকার প্রাথমিক ব্যবস্থা সমস্ত সম্পূর্ণ করে মধুকে জানালে তখন মধু আমাদের সকলকে নিয়ে রওনা হবে কারণ, তাঁর নৃত্যনাট্যের গোপিনীদের ভূমিকা আমাদেরই দেওয়া হয়েছিল। অনুমান করুন, সেই সাগরপারের বিরাট মহাদেশ দেখার কল্পনা এক কিশোরীর অপরিণত মনে কতখানি উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে!

মাদাম প্যাভলোভা আমাদেরও এক সন্ধ্যায় আহ্বান জানালেন তাঁর অনুষ্ঠানে। তাঁর "Dying swan"এর স্মৃতি অনেকগুলো বছরের ওপার থেকে যেন আজও সজীবত্ব ঘোষণা করে চলেছে।

ইস্কুলে পড়ার সময়, বেশ মনে আছে, একটি ইংরিজী প্রবাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—Man propose but God disposes. কথাটি যেন অক্ষরে অক্ষরে জীবন্ত হয়ে উঠল প্যাভলোভার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। প্যাভলোভার বার্তা বহন করে এল লিপি—তার পাঠোদ্ধার করে জানা গেল যে, বর্তমানে প্রযোজকবর্গ অতিরিক্ত ব্যয়ভার গ্রহণে অক্ষম। এমনিতেই মাদাম প্যাভলোভার সম্প্রদায়ের (corps de ballet) সভ্যসংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত। কল্পনা দিয়ে তিলে তিলে গড়া তাসের ঘর হঠাৎ যেন একটা দৈত্যের মত ঝড়ের দমকা হাওয়ার বেগে ভেঙে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। প্রথম ঘটনাটি বললুম, এবার দ্বিতীয় ঘটনাটি তুলে ধরি। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল যখন উদয়শঙ্করকে হরেনদা' (স্বর্গীয় হরেন ঘোষ) আমাদের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। বিস্তারিত বিবরণ পরে জানাচ্ছি।

মেজ জ্যাঠামশাই স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র সেন তখন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টার আসনে সমাসীন। উদয়শঙ্কর তখন লণ্ডনে অবস্থান করে পাঠ নিচ্ছেন অঙ্কনবিদ্যা সম্বন্ধে অবশ্য সেই সময়ই অপেশাদারী ভাবে কয়েকটি ভারতীয় নৃত্যও তিনি প্রদর্শন করেছেন। যদিও তিনি নিজে একজন সুনিপুণ অঙ্কনশিল্পী ছিলেন তবুও নৃত্যকলা সম্বন্ধে অধ্যয়ন বা অনুশীলনের প্রতি এক সুগভীর আগ্রহ অধিকার করল তাঁর সমস্ত প্রাণ-মন আর তা ছাড়া তাঁর দেহের গঠন ও বিন্যাসটিও ছিল একজন নর্তকেরই উপযোগী। সেদিক দিয়ে অর্থাৎ আকৃতির দিক দিয়ে তাঁর অভীষ্ট সফল হবার কোন অন্তরায় রইল না।

মাদাম প্যাভলোভার নবকল্পিত নৃত্যনাট্যে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাভিনয়ের জন্যে এক তরুণের সন্ধানে তখন ব্যাপৃত ছিলেন মিঃ লেভিটাফ। অবশেষে মেজজ্যাঠাইমা শ্রদ্ধেয়া মৃণালিনী সেনের মাধ্যমেই মাদাম প্যাভলোভার সঙ্গে একদিন পরিচিত হলেন উদয়শঙ্কর। উভয় চল্লিশের সঙ্গে প্রাক্ ত্রিশ। প্রাচীর সঙ্গে প্রতীচী। ইউরোপের সঙ্গে এশিয়া। এ ঘটনা মেজজ্যাঠাইমাই একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমায় জানিয়েছিলেন।

প্যাভলোভার নৃত্যনাট্যে কৃষ্ণের ভূমিকার জন্য সসম্মানে নির্বাচিত হলেন উদয়শঙ্কর। প্যাভলোভার সঙ্গে ব্যাপক পর্যটন সমাপ্ত করে মহানগরী কলকাতায় ফিরে এসে উদয়শঙ্কর মনস্থ করলেন নিজেই একটি সম্প্রদায় গঠন করার, যার নামকরণ তিনি পরে করলেন "উদয়শঙ্কর য়্যাণ্ড হিজ হিন্দু ডান্সারস"। নবপ্রতিভার সন্ধানে উদয়শঙ্কর তখন মগ্ন-চিত্ত—অন্ধকারের অন্তর্গর্ভে। যার আসন ছিল কাছে তখন তিনি নিজে যেতে চাইছেন আলোর রাজ্যের চারিধারে, জীবনমঞ্চের যারা নেপথ্যশিল্পী; তাদের তখন তিনি তুলে ধরতে চাইছেন পাদপ্রদীপের সামনে। গড্ডলিকার স্রোতে যাদের বয়ে যাচ্ছে জীবনধারা তাদের গতির মোড় ফেরাতে তখন তিনি বদ্ধপরিকর। সম্ভাবনার খাতায় লেখা নেই যাদের নাম তাদেরই তিনি চরিত্রে তুলতে চাইছেন রসবোদ্ধাদের মুঠো মুঠো অভিনন্দনে। ঠিক এই রকম সময়েই অর্থাৎ যখন তাঁর হৃদয়ে অদম্য আকাঙ্ক্ষা, অন্তরে প্রাণজয়ী প্রত্যাশা আর নয়নে বিচিত্র স্বপ্নের বন্যাধারা উদয়শঙ্কর একদিন আমাদের বাড়ীতে করলেন পদার্পণ। আমার নাচ তিনি দেখেছিলেন এবং দু'-তিনবার আমাদের বাড়ীতে আসার পরই তাঁর সম্প্রদায়ে আমার যোগদানের জন্যে বাবা-মার কাছে প্রস্তাব করলেন। মধু তখন পাঞ্জাবে, "খাইবার ফ্যালকন" নামে একটি নির্বাক ছায়াছবি পরিচালনরত। বাবা-মা রাজী হলেন, তবে ঠিক হল যে, আমার তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন থাকবেন। গোল বাধল সেখানেই, উদয়শঙ্করের প্রযোজকের কাছে এ প্রস্তাব গৃহীত হল না, আর্থিক দিকের ব্যাপারটা চিন্তা করেই আমার তত্ত্বাবধানার্থে আর একজনকে দলভুক্ত করার প্রস্তাবটি একেবারে

নাকচ করে দিলেন। ব্যস, উদয়শঙ্করের সম্প্রদায়ে আমার যোগদানের প্রসঙ্গও সেইখানেই ইতি। তদানীন্তন জীবনে অতিরিক্ত উত্তেজনার পর সীমাহীন হতাশা সেই জীবনে দ্বিতীয় বার ঘটল।

মধুও ফিরে এল লাহোর থেকে। অন্তরের পুঞ্জীভূত অনুভূতির যেন ঘটতে থাকে বাঙ্ময় বিকাশ। দেখতে দেখতে ১৩৩৭ সালের অঘ্রাণ মাসের (ডিসেম্বর ১৯৩০) সেই দিনটিও এসে গেল—ছাঁদনাতলার দিন, এল সেই পরম প্রেয় মার্গশীর্ষ, দুয়ারে করাঘাত করতে লাগল জীবনের সকল প্রশ্নের অবসানের লগ্ন, সেদিনের ভোরের ভৈরবী যেন স্নিগ্ধ থেকে স্নিগ্ধতর, সন্ধ্যায় শোভনতা যেন মূর্ত্তিমান বসন্তদূত, সেদিনকার রাত্রির শান্ত-মৌনরূপ যেন মধুগাম্ভীর্য্যের লীলাধার। মনে হল, দু'জোড়া চোখ যেন এক-জোড়া হৃদয়ের করল সমুদ্রমন্থন, এক-জোড়া হৃদয়ের মধ্যে থেকে সার্থকতার অমৃতকুম্ভ উদ্ধার করল দু'জোড়া চোখ, একজোড়া হৃদয়ে পূর্ণতার ফসল ফলাল দু'জোড়া চোখ। স্বয়ং চিত্রভানু রইলেন প্রত্যক্ষদর্শী।

মনে আছে আমাদের বিয়ের দিনটি ছিল ১৩ই ডিসেম্বর। সংখ্যা-শাস্ত্রের মধ্যে "তেরো" যেন দুয়োরাণীর ছেলে ও বেচারী কি যে দোষ করেছে জানা যায় না কিন্তু সাগরের অপর পারের অধিবাসীদের ওর বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ। সমস্ত অবজ্ঞা-ঘৃণা-উপেক্ষা বহন করবার জন্যই যেন ওর সৃষ্টি, "তেরো" অবাঞ্ছিত কিন্তু অপরিহার্য্য কারণ ও না এলে চোদ্দ বা পনেরো বা ষোলো বা পরবর্তী অগণিত সংখ্যাকুলের সৃষ্টি হোত কেমন করে? আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে বিভীষিকারই রূপ নিয়ে দেখা দিল ত্রয়োদশ দিনটি, ফলে তেরো হ'ল পনেরো, আটচল্লিশটি ঘণ্টা পিছিয়ে দিতে হ'ল। ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য বর্তমানের কাছ থেকে দুটো দিন কেড়ে নেওয়া হল। ১৫ই ডিসেম্বরই আমাদের বিয়ে হ'ল। তবে মনে হয় যে পূর্ব-বিজ্ঞাপিত দিনটিতে ও কাজ সমাধা হলেই তার পরিণতি শুভই হোত। তার আগে সমস্ত আহ্বানলিপির মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হয়ে গেছে, এমন কি খাম লেখা পর্যন্ত, দিন পরিবর্তনের যখন স্থির হল তখন হাতে মাত্র দু'-তিনটি দিন অবশিষ্ট, তারই মধ্যে পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তিটুকু পৌঁছে দিতে হল সমগ্র নিমন্ত্রিত-নিমন্ত্রিতাদের দরবারে। আমার জীবনের সেই অবিস্মরণীয় দিনটিতে লিলি কটেজে প্রায় হাজার অতিথির ঘটেছিল পদার্পণ।

মধুর "দি খাইবার ফ্যালকন" তখনও সমাপ্ত হয়নি। খাইবার গিরিবর্ত্মে আর কোহাটের অভ্যন্তরে কোন কোন স্থানে তার তখনও চিত্রগ্রহণের কাজ অনেক বাকী। অতএব সাময়িক কর্মক্ষেত্রেই মধুকে ফিরে যেতে হবে, মন আনন্দে ভরে উঠল যখন শুনলুম আমিও তার সহযাত্রিণী, আর সেই যাত্রাই হবে আমাদের মধুচন্দ্রিমার উদ্দেশে পদক্ষেপণ। মোটরে আমরা যাত্রা করলুম এবং যেতেও লাগলুম থেমে থেমে, ইতিহাসের আলোয় পুষ্ট যেসব স্থান সেগুলি অবলোকন করে আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য ভরপুর হয়ে উঠল পরিতৃপ্তির অনির্বচনীয় আস্বাদে।

মধু যখন ইুডিওতে কাজে লিপ্ত থাকত ফিরোজপুর রোডের বাঙলোয়, আমার তখন সময় কাটত গৃহস্থালীর কাজে। বাগান করে আর অপরাহ্নে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলে। অবশ্য

কেবলমাত্র খেলাধূলো আর ঘরকন্না করে আমি সময় কাটাতুম, তা যেন ভাববেন না, আমার নিজের কাজেও দিনেকের জন্যে আমি প্রকাশ করিনি বিন্দুমাত্র শৈথিল্য। ঐ খেলাধূলা গৃহস্থালীর ফাঁকগুলি আমার ভরে যেত নৃত্য-রচনায় এবং নৃত্য-অভ্যাসে। এইখানে ভাবধারার ক্ষেত্রে আমার নিজের একটা স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করে রাখি যথোচিত সম্ভ্রম সহকারেই। গতানুগতিকতা কোন দিন আমার অন্তরে পায়নি আসন। একই জিনিষের পুনরাবৃত্তি ঘটে যাবে অনন্তকাল ধরে এ আমার অসহ্য। অবশ্য পুরোনোকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না, পুরোনোকে সরিয়ে রেখে নতুনের সৃষ্টি অসম্ভব, পুরোণোকে বাদ দিলে নতুনকে খুঁজে পাওয়া যায় কি? নাচের ক্ষেত্রেও সেই নীতিই আমি অনুসরণ করেছি বিশেষ করে নৃত্যাংশ রচনার ক্ষেত্রে, তাই আমার তৈরী নাচের মধ্যে পুরোনোর কাঠামোয় নতুনের মূর্তিই দেখতে পাবেন, পুরোনো পটের উপর নতুনের ছবি আঁকাই আমার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন-সাধনা, যা খুসী বলতে পারেন।

মধুর ফিরতে বেশ দেরী হোত, তারপর শুরু হোত আমাদের দীর্ঘ যুগল ভ্রমণ, বেশীর ভাগ লরেন্স গার্ডেন্সের দিকেই, আর সেই পথ চলতে চলতেই হ'তে থাকত আমাদের শিল্প সম্বন্ধে পারস্পরিক ভাবধারার বিনিময়, চিন্তা ও কল্পনার আদান-প্রদান, জীবন-স্বপ্নের ব্যাখ্যাপূর্ণ আলোচনা। আনন্দ আর নিরানন্দের পদক্ষেপণ যেন একেবারে তালে তালে, এতটুকু তার হয় না এদিক-ওদিক। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের পরেই দেখা দিল অবিচ্ছিন্ন নিরানন্দ। কয়েক মাসের মধ্যেই দেখা গেল মধুর শারীরিক উত্তাপের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে দিনের পর দিন, তখনও মধুর কাজ অসমাপ্ত, মধুও বেপরোয়া, কাজ সে শেষ করবেই, কাজের নেশায় সে তখন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-অচেতন, অসুস্থতাও তাকে যেন আটকে রাখতে পারছে না, মরীয়া হয়ে উঠেছে সে কাজ শেষ করার জন্যে। মধুর প্রযোজক ভদ্রলোকটি বেশ দরদী ও বিবেচক, তিনিও মধুকে বারংবার অনুরোধ করেছিলেন বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে, কিন্তু হায় রে, কে কার কথা শোনে—তারপর একে লাহোরের উত্তাপে মে মাস, দেখতে দেখতে সেই অগ্নি-উত্তাপ আমার অঙ্গে প্রভাব বিস্তার করল পুরোপুরিভাবে ঋতুর সাহায্য ও সমর্থন নিয়ে। এইবার মধুর মধ্যে দেখলুম চিন্তার ছাপ, নিজের শত অসুস্থতাও যার কর্মোদ্যমে এতটুকু করতে পারেনি রেখাপাত আমার অসুস্থতায় সে রীতিমত নিরুদ্যম হয়ে পড়ল, গভীর দুশ্চিন্তায় সে যেন তলিয়ে গেল, লক্ষ দুর্ভাবনা যেন তীরবেগে তাকে আক্রমণ করল একসঙ্গে—উপায়ান্তর না দেখে আমাকে সে কলকাতায় পাঠিয়ে দিল বাবা-মার কাছে আর ঠিক হল যে, আমাকে পাঠিয়ে দিয়েই সে যাত্রা করবে খাইবার গিরিবর্ত্মের অভিমুখে।

মনে পড়ছে, লাহোর ত্যাগের ঠিক প্রাক্কালেই মধুকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলুম যে, শরীরের প্রতি সে যত্ন নেবে আর যথাশীঘ্র আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করেই সে তার যাত্রাপথের মুখ ফেরাবে কলকাতার দিকে—যেখানে তারই জন্যে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকবে উৎকণ্ঠা আর প্রতীক্ষায় ভরা এক কিশোরী-বধূর ব্যাকুল মন।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

## যৌতুক

প্রেমের স্থান সকলের উচ্চে। প্রেমের আলোকরশ্মিতে ভস্মীভূত হয়ে যায় যত কিছু বাধা-প্রতিবন্ধক কুটিল চক্রান্ত। প্রেমের স্নিগ্ধতার কাছে সকল প্রকার যুক্তি ও বুদ্ধির চিরকালের পরাভব। বাঙলার শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখনীজাত "যৌতুক"-এর গল্পাংশ উপরোক্ত ভিত্তির উপরেই গঠিত। দু'টি পরিবারকে কেন্দ্র করে এর গল্প গড়ে উঠেছে। উমাশঙ্কর চৌধুরী ও বীরেন চাটুজ্যে—এই জমিদারদ্বয়ের মধ্যে একটা বিরোধের আভাস দেখা দিল সামান্য দেড় বিঘে জমিকে কেন্দ্র করে, উমাশঙ্করের কন্যা সুধীরা পলাশডাঙায় এল জমির ব্যাপারের নিষ্পত্তি করতে। রাস্তায় লৌহযান লাভ করল ক্ষণিক বৈকল্য, ওদিকে বীরেনও যাত্রা করে পলাশডাঙার উদ্দেশে একই অভিপ্রায়ে। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ ও বীরেনের গাড়ীতেই সুধীরা বাড়ী আসে, তার পরেও দেখা হয় কিন্তু তখনও পরিচয় অজানা ও সেই অপরিচয়ের মধ্যে দিয়েই হয় হৃদয় বিনিময়—ঘটনাচক্রে সুধীরা জানতে পারে যে তার প্রেমের পাত্র আর কেউ নয়, স্বয়ং তারই প্রতিদ্বন্দ্বী, যার সম্বন্ধে মনে মনে পোষণ করে এসেছে ঘৃণা ও যাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্যেই এই পলাশডাঙায় তার আগমন। ফলে বীরেনের পরিচয় উদ্ঘাটিত হবার পরই সে পায় রীতিমত আঘাত; তবে আঘাত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সুধীরার প্রেমিক মনে জন্ম নিল এক নতুন চেতনা, যার ফলে বীরেনের উদ্দেশে সযত্ন লালিত সমস্ত ঘৃণা মন থেকে মুছে ফেলল সে এবং সেইজন্যেই বীরেনকে বিপদে ফেলবার সমস্ত ষড়যন্ত্রে সে নিজেকেই রীতিমত বিপন্না বোধ করতে থাকে। তারপর নানা ঘটনার ফলে উমাশঙ্করের পলাশডাঙায় আগমন ও অবশেষে বীরেন-সুধীরার শুভমিলন।

প্রেমের যে মহিমান্বিত চিত্রটি এখানে উপেন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বিশেষ ভাবে হৃদয়গ্রাহী এবং মনকে আকৃষ্ট করে যথেষ্ট পরিমাণে। সুধীরার কাছে বীরেন ছিল তার প্রবল শত্রু, বীরেনের প্রতি তার অন্তরে বৈরিভাবই পোষিত ছিল কিন্তু অপরিচয়ের ছায়াতেই গড়ে উঠল দু'জনের প্রেম। ফলে প্রেমের চির-উজ্জ্বল জ্যোতিতে সমস্ত বৈরিতা কোথায় যে মিশিয়ে গেল তার কোন ঠিকঠিকানাই নেই। আজন্ম শত্রুতাকে ছাপিয়ে গেল দু'দিনের প্রেম। সমগ্র কাহিনীটির মূলসূত্রটিই এই। তবে চিত্রায়ণে লক্ষ্য করা গেল যে পরিচালক (বা চিত্রনাট্যকার) মূল গ্রন্থ থেকে বহু ঘটনা বাদ দিয়েছেন, মূল গ্রন্থে মূল কাহিনীর গতি—অস্বীকার করার উপায় নেই—স্থানে স্থানে বাধা পেয়েছে বহু অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার আবির্ভাবে। কিন্তু সমস্ত অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি পরিহার করে ঠিক যতটুকু ঘটনা মূল সূত্রের সঙ্গে জড়িত, ঠিক ততটুকু ছবিতে দেখিয়েছেন পরিচালক, তবে এই কাহিনী সংক্ষেপণও একবাক্যে প্রশংসা করা যায় না, পরিচালকও অভ্রান্ত নন বা ত্রুটিমুক্ত নন। 'যৌতুক'এর যে সব ঘটনা সত্যিসত্যিই মর্মস্পর্শী, এবং যেগুলি রাখলে ছবি ভারগ্রস্ত তো কিছুতেই হোত না উপরন্তু পরিপূর্ণতার স্পর্শে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হোত বহুগুণ—সেই সব ঘটনাগুলোও পরিচালক একেবারে বাদ দিয়ে গেছেন কাহিনীর সংক্ষেপকরণের দিকে দৃষ্টি রেখে। সুধীরা আর বীরেনের মধ্যে সংলাপগুলিই পরম উপভোগ্য। বীরেনের

মুখ দিয়ে যে সব সংলাপে উপেন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়েছেন তার তীক্ষ্ণতার আগুনে সুধীরার অহমিকা এবং অতিরিক্ত আত্মসচেতনতা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরিচালক যদিও তার কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন কিন্তু তা হলেও আরও ব্যবহার করার মত স্বাধীনতা ও সুযোগ তাঁর যথেষ্টই ছিল। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, কাহিনী সংক্ষেপণের দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি দেওয়ার ফলে কাহিনীর ওজন-জ্ঞান তাঁর (বা চিত্রনাট্যকারের) অধিকারের বাইরে চলে গেছে। চিত্রনাট্যও যথেষ্ট দুর্বল ও অসংবদ্ধ; যার ফলে এক-এক সময়ে ঠিক বোঝা যায় না যে যা দেখছি তার নাম যৌতুক না কৌতুক? রাখাল চরিত্রটি যে ভাবে চিত্রায়িত হয়েছে তাতে তার পরিণতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তেই পৌঁছোনো যায় না। চরিত্রটি যেমনই অস্পষ্ট তেমনই ধোঁয়াটে। সে সুধীরার পাণিপ্রার্থী না শিক্ষক কন্যাটির পাণিপ্রার্থী এ প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তরই ছবিটির মাধ্যমে পাওয়া যায় না। তার উপর রাখালের শেষ দেখলুম সে কলকাতা যাত্রা করল কিন্তু শিক্ষককন্যাটি যাকে দ্বিতীয় নায়িকারূপে দেখানো হচ্ছে এবং ছবির মধ্যে যাকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা বা উপিতি দেওয়া হয়েছে তার শেষ অবধি কি হল এ সম্বন্ধে পরিচালক কোন উত্তরই দেননি, অথচ এই প্রসঙ্গে পরিচালকের নীরবতা কি সমর্থনযোগ্য?

অভিনয়াংশে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন উত্তমকুমার ও সুমিত্রা দেবী। নানাবিধ ঘটনা-জাত বিভিন্ন অভিব্যক্তির যথোচিত বিকাশ ঘটেছে এঁদের অভিনয়কুশলতায়। একদিকে অপূর্ব দৃঢ়তা অন্যদিকে প্রাণস্পর্শী কোমলতার সংমিশ্রণ ঘটেছে মলিনা দেবীর অনুপম অভিনয়ে। কমল মিত্র, জীবেন বসু ও কালী সরকারের অভিনয়-শক্তির দ্বারা চরিত্রগুলির মধ্যে প্রাণ সঞ্চারে সমর্থ হয়েছেন, এঁরা ছাড়াও ভূমিকালিপিতে আছেন ধীরেন চট্টোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল তুলসী চক্রবর্তী, শান্তি ভট্টাচার্য, খগেন পাঠক এবং শীলা পাল। সঙ্গীতাংশ খারাপ না হলেও হেমন্তকুমারের অনবদ্য সৃজনীপ্রতিভার পরিচায়ক নয়, অন্যান্য সঙ্গীতবিদদের তুলনায় হেমন্তকুমারের কাছে বাঙালী যে একটু বিশেষ ধরণের প্রতিভার পরিচয় পাবার ইচ্ছা রাখে তা আর কেউ না ভুললেও আজকের দিনে একজন বোধ করি বিস্মৃত হয়েছেন পুরোপুরি আর সেই জন স্বয়ং হেমন্তকুমার ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নয়।

## রঙ্গপট প্রসঙ্গে

বাঙলার বিখ্যাত গায়ক এবং সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বর্তমানে অবতরণ করেছেন চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে, তাঁর প্রযোজনাধীনে যে ছবিটি গড়ে উঠছে তার নাম "নীল আকাশের নীচে" যেটি পরিচালনা করছেন মৃণাল সেন এবং যার মাধ্যমে বিকাশ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস প্রভৃতি শিল্পীদের অভিনয় দেখতে পাওয়া যাবে। এর গল্পাংশ এক চৈনিক শ্রমজীবীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। * * "যান্ত্রিক" নাম নিয়ে একদল নতুন পরিচালক একত্রে দর্শকবৃন্দকে প্রথম অভিবাদন জানাচ্ছেন যার মাধ্যমে—সেই ছবিটির নাম "চাওয়া-পাওয়া"-এতে অভিনয় করবেন বলে যে সব খ্যাতনামা শিল্পীর নাম ঘোষিত হয়েছে তার মধ্যে ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, শুভেন মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সুচিত্রা সেন এবং রাজলক্ষ্মী দেবীর নাম উল্লেখনীয়। * * প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিচালনাধীনে চিত্রায়িত হচ্ছে "ভ্রান্তি"। অভিনয় করতে দেখা যাবে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, নির্মলকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসবী নন্দী ও তপতী ঘোষ প্রমুখ কৃতী শিল্পীদের। * * বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম আগামী অবদান দেবী ফুল্লরা, সম্পাদনার ভারও তিনিই গ্রহণ করেছেন। রূপায়ণে আছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অসিতবরণ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, কালী সরকার, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, সবিতা বসু, তপতী ঘোষ, কবিতা রায়, শুক্লা দাস প্রভৃতি শিল্পিবর্গ। * * গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার প্রভাব ছায়াপাত করেছে অনন্ত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা নির্মীয়মান ছায়াছবি "সেবা"র কাহিনীর উপর,. কাহিনীর বিভিন্ন ভূমিকাগুলি যথাযথ অভিনয়ের ভার গ্রহণ করেছেন অসিতবরণ, অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী মলয়া সরকার, কমলা মুখোপাধ্যায়, কবিতা রায় প্রমুখ অভিনয় শিল্পিগণ।

## চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

### শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

মহিষাসুরমর্দ্দিনী দেবী মহামায়াকে পুণ্যতিথি মহালয়ার ঊষাকালীন মনোরম আবেশে শ্রীশ্রীচণ্ডীর স্তোত্র-পাঠ ও সঙ্গীত-মূর্চ্ছনার মাধ্যমে প্রতি বৎসর প্রথম আহ্বান জানান হয় কলিকাতা আকাশবাণী হ'তে। উহাতে আগ্রহী শ্রোতাদের মনে উদয় হয়—এক অনির্বচনীয় আলোড়ন—এক স্নিগ্ধ পবিত্রতা—এক প্রণম্য ভক্তি। এই অনুষ্ঠানের প্রধান হোতা হ'লন সর্বজন-পরিচিত ও বৈচিত্র্যের অধিকারী শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।
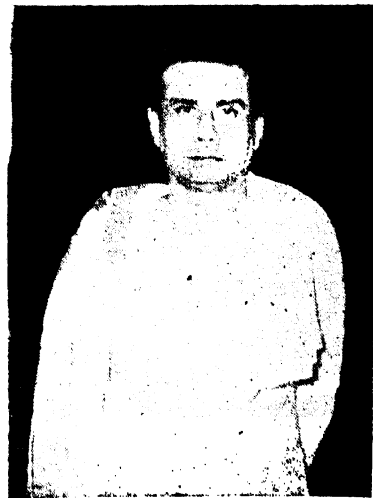
শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

১৯০৪ সালের জুন মাসে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কলিকাতা স্মল কজেস্ কোর্টের পূর্ব্বতন প্রধান অনুবাদক ৺রায়সাহেব কালীকৃষ্ণ ভদ্র এবং মাতা ৺সরলা দেবী। আদিনিবাস বনগ্রাম মহকুমার দত্তপুকুর গ্রামে এবং মাতুলালয় বরাহনগর। ১৯২৩ সালে তিনি কলিকাতা টাউন স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কটিশ চার্চ্চ কলেজে ভর্তি হন। মধ্যখানে অসহযোগ আন্দোলনে জড়িত হওয়ায় বিদ্যাশিক্ষা স্থগিত থাকে। পরে বিদ্যাসাগর কলেজে যোগদান করিয়া ১৯২৭ সালে বি, এ, পাশ করেন। আইন কলেজে অধ্যয়নের সময় ই, আই, রেলওয়ের কলিকাতা অফিসে কর্ম্মগ্রহণ করেন। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ থাকা সত্ত্বেও চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া তিনি ১৯২৭ সালে জনৈক শিল্পী হিসাবে নবগঠিত কলিকাতা বেতার ষ্টেশনে যোগদান করেন। সেই সময় তথায় ৺নৃপেন্দ্র মজুমদার, রাইচাঁদ বড়াল ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ব্যতীত পরিচালক মিঃ ওয়ালিক্ ( Wallick ) ও অন্যান্য কর্ম্মীরা অ-ভারতীয় ছিলেন। যোগদানের এক মাস পূর্ব্বে মণি মজুমদারের উদ্যোগে প্রার্থী হিসাবে আগত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অমনোনীত হন এবং পরে একটি নাটকে অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হইয়া আসেন ও স্থায়িকর্ম্মী হিসাবে গৃহীত হন। ছয় মাসের ভিতর তিনি সহঃ-পরিচালক ( প্রোগ্রাম ) পদে উন্নীত হইয়া নাটক, Ladies-hour ও সাহিত্যসভা বিভাগত্রয়ের পত্তন করেন আর সঙ্গীত বিভাগের ভার গ্রহণ করেন সুরস্রষ্টা রাইচাঁদ। ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক বেতারের ভার গ্রহণের বিষয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অগ্রণী ছিলেন। পুনরায় দুই বৎসর বাদে উহাকে সরকারী প্রভাবমুক্ত করিবার উদ্যোগ হইলে উক্ত তিন জন ভারতীয় কর্ম্মীদের প্রচেষ্টায় Indian State Broadcasting Service রূপে কেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে থাকে। সেই সময় বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে উহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অশেষ পরিশ্রম করিতে হইত। আর সাইগল, হরিশবালী, জ্ঞান গোস্বামী, রাইচাঁদ তাঁহার সঙ্গে Broadcasting Technique আয়ত্ত করিতেন।

বেতারে প্রথম নিয়মিত নাটক অভিনীত হয় শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'জমাখরচ' শীতাংশুজ্যোতি মজুমদারের ( বকুবাবু ) পরিচালনায় আর অংশগ্রহণকারীদের নাম ৺নৃপেন্দ্র মজুমদার, ৺যোগেশ বসু ( গল্পদাদু ) আশু দে ( মনো রেডিওর মালিক ), আবীরাবালা ও প্রফুল্লবালা। সেই সময় বেশীর ভাগ শিল্পী দক্ষিণা পেতেন আড়াই বা পাঁচ টাকা, বক্তৃতার জন্য দেওয়া হত পাঁচ টাকা আর উচ্চশ্রেণীর শিল্পী যথা কৃষ্ণচন্দ্র দে, ৺দুর্গাদাস ব্যানার্জ্জি, ৺সাইগল ও জ্ঞান গোস্বামীর প্রতি অধিবেশনের জন্য দশ টাকা পাইতেন।

শ্রীভদ্র প্রায় চল্লিশটি নাটক এইচ, এম, ভি, সেনোলা, মেগাফোন ও হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীগুলির পক্ষে পরিচালনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম রেকর্ড-নাট্য হল 'সীতা'। ইহাতেই তিনি প্রথম একদিকে পূর্ণদৃশ্যের প্রয়োগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্বয়ং নাটক লিখিয়া রেকর্ডবদ্ধ করিয়াছেন।

১৯৩৩ সালে যামিনী মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও শ্রী ভদ্র একত্রে 'রংমহল' মঞ্চ পরিচালনাভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পরিবেশিত প্রথম নাটক 'অভিষেক'এ ৺দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভরত' ভূমিকা চিরস্মরণীয় হয়। মিনার্ভাতে শ্রী ভদ্রের প্রথম পরিচালিত নাটক 'অর্জ্জুনবিজয়', ষ্টারে 'বিদ্যাপতি', নাট্যনিকেতনে 'ঋণং কৃত্বা' ও নাট্যভারতীতে কাজী নজরুলের 'মধুমালা'। পরে দুর্গাদাস ও অহীন্দ্র চৌধুরীর সহিত তিনি নাট্যভারতীর পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন।

জ্যোতিষ মুখার্জ্জি শ্রী ভদ্রের প্রথম চিত্রনাট্য 'ভোটভণ্ডুল' পরিচালনা করেন। 'স্বামীর ঘর' চিত্রটিতে যদিও তাঁহার নাম পরিচালক হিসাবে ছিল, তথাপি অর্দ্ধেকাংশ অন্য একজন ব্যক্তি পরিচালনা করেন।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ জানান যে, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থীর উদ্যোগে বাণীকুমার 'মহিষাসুরমর্দ্দিনী' গীতিনাট্যটি লেখেন এবং ১৯৩১ সাল হইতে উহা নিয়মিত 'মহালয়ার প্রাতে' অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশ করিবার সময় ৺মোহিতলাল, ৺রবীন্দ্র মৈত্র, যোগানন্দ দাস, ৺ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীরদ চৌধুরী ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে উহার লেখকগোষ্ঠীভুক্ত করেন। উহাতে শ্রী ভদ্রের প্রথম নাটক 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' প্রকাশিত হয়। পরে উহাতে রবীন্দ্র মৈত্র লিখিত 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নামক কমেডী নাটকটি বাহির হয়। সেই সময় 'কল্লোল যুগ' ও 'শনিবারের চিঠি'র মধ্যে সাহিত্য-বিষয়ক কোন্দল পাঠকশ্রেণীর আনন্দবর্দ্ধক ছিল। 'চ্যাংড়া' ও 'গুণ্ডা' আখ্যায় পরস্পর পরস্পরকে ভূষিত করেন। তখন শ্রীশৈলজানন্দ মুখার্জ্জি স্বতন্ত্র ভাবে 'কালি-কলম' দল সৃষ্টি করেন। উক্ত লেখকগোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যে খুবই রেষারেষি থাকা সত্ত্বেও শ্রী ভদ্র প্রতিটি দলের প্রতিটি লেখকের নিকট স্বভাবসিদ্ধমাধুর্য্যে প্রিয় ও অন্তরঙ্গ ছিলেন। এমন কি, উক্তগুণের জন্য আজও তিনি সকল শ্রেণীর শিল্পীর নিকট আদৃত। তাঁহার সমাদর সকলের নিকট—তাঁহার সর্ব্বত্র অবারিত দ্বার—তাঁহার মানসিক শুভ্রতা সকল বিষয়ে। তিনি হলেন লেখক, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রোতাদের 'প্রিয়বরেষু' ও 'পরম রমণীয়'।

১৯৪৫ সালে তিনি কলিকাতা আকাশবাণীর executive পদত্যাগ করিয়া চুক্তিবদ্ধ শিল্পী হন এবং বর্ত্তমানে উহার নাট্য-বিভাগে প্রযোজক ও প্রধান পরিচালক হিসাবে যুক্ত হইয়াছেন।

লেখক হিসাবে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ পাঠক-সমাজে পরিচিত। বাঙ্গালী সমাজ-জীবনের সুন্দর চিত্র-অঙ্কন বিরূপাক্ষের 'ঝঞ্ঝাট', 'বিষমবিপদ', 'অযাচিত উপদেশ', 'বিচিত্র চরিত্র', 'নিদারুণ অভিজ্ঞতা' ও 'কেলেঙ্কারী'তে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার লিখিত নাটক 'মেস নং ৪৯' ও 'ব্ল্যাক-আউট' কলিকাতা মঞ্চে সু-অভিনীত হয়। তৎকৃত 'সীতারাম' ও 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসদ্বয়ের নাট্যরূপ প্রশংসিত হয়।

বৈচিত্র্যময় জীবন—বৈচিত্র্য ব্যবহার—পরিহাসপ্রিয়তা—তার জানা-অজানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা—সাক্ষাৎকারীর মনে সত্যই রেখাপাত করে।

## বেত্রাঘাত ও পদাঘাত।

"পাকিস্তানের ব্যবহার—এমন কি মিষ্টার আয়ারকে বেত্রাঘাত ও পদাঘাত এবং তাঁহার পত্নীকে চপেটাঘাত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য লোকসভায় অনুমতি দেওয়া হয় নাই। পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন—দুই বা তিন দিনের মধ্যে তিনি ঐ সকল বিষয়ে বিবৃতি দিবেন। সেই কয়দিনের মধ্যে ভারত সরকারের আর কয়জন কর্মচারী লাঞ্ছিত হইবেন? এই তিন দিনের মধ্যে ত পণ্ডিত জওহরলাল পাকিস্তানকে কোচবিহারের ও ত্রিপুরার কিয়দংশ প্রদানের আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি ভারতের সম্মহানির গুরুত্ব লঘু করিবার চেষ্টায় বলিয়াছেন—(১) ঘটনাগুলি—যত অসঙ্গতই কেন হউক না—ব্যক্তিগত। (২) পাকিস্তানের সেনা সন্নিবেশ সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। বেত্রাঘাত তাঁহার পৃষ্ঠে ও পদাঘাত তাঁহার উদরে হয় নাই বলিয়াই কি সে সকলে গুরুত্ব নাই?" —দৈনিক বসুমতী

## ব্যর্থ শিশু-উৎসব

"পণ্ডিত নেহরুর জন্মদিন উপলক্ষে অন্যান্য স্থানের মত কিষণগঞ্জেও শিশুদিবস পালনের উদ্যোগ-আয়োজন হয় বটে, কিন্তু অভাবনীয় এক ঘটনার জন্য সমস্ত আয়োজন পণ্ড হইয়া যায়। উৎসব-উপলক্ষে কিষণগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে একটি নাটক অভিনয় করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু কয়েকজন ছাত্র সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এই যুক্তিতে যে, যেহেতু নিকটেই একটি মসজিদ অবস্থিত, অতএব নির্ধারিত স্থানে গীত-বাদ্যের অনুষ্ঠান হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। এই বিরোধিতার ফলে নাটকাভিনয়ের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় এবং সেই কারণে নির্দোষ শিশু-উৎসবের আয়োজন পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়া পড়ে। বিরোধিতামূলক প্রস্তাবের মধ্যে অবশ্য নূতনত্ব নাই, ইহা বহু পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। যে পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব আসিয়াছে এবং যে অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করিয়া ইহা উত্থাপিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। বিদ্যালয়ের সুকুমারমতি বালকগণকে ধর্মের প্রতি এমন প্রগাঢ় নিষ্ঠা পোষণ করিতে দেখিয়া, মসজিদের পবিত্রতা সম্বন্ধে এমন স্পর্শকাতর হইতে দেখিয়া সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। যেখানে প্রবীণের মস্তিষ্ক শিশুর স্কন্ধে বসিয়া কথাকথিত কিশোরগণকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালনা করে, শিশু-উৎসবের আয়োজন সেখানে পণ্ডশ্রম, শিশু-উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সেখানে উপেক্ষিত; শিশুরা বস্তুতঃ সেখানে উদয়-শিখরে বসিয়া অস্তাচলের পানে চাহিয়া আছে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

## সামুদ্রিক মৎস্য

"মৎস্যাভাব-প্রপীড়িত কলিকাতাবাসীকে কেন্দ্রীয় কৃষিদপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণাপ্পা আরো বেশী করিয়া সামুদ্রিক মাছ খাইতে অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন। কলিকাতায় বৎসরে ৯০ হাজার টন মাছ দরকার হয়, ইহার মধ্যে ২০ হাজার টন আসে পাকিস্তান হইতে। এই শেষোক্ত মাছের আমদানী ইদানীং অনিয়মিত হইয়াছে। কলিকাতায় মৎস্য-সঙ্কটের নাকি ইহাই কারণ। মাত্র এক-পঞ্চমাংশ মাছের অনুপস্থিতিতেই এত বড় বিপর্যয় ঘটিয়াছে, ইহা যদিও সরলচিত্তে মানিয়া নেওয়া কঠিন, তবু নদী নালা ও পুকুরের মাছ অপেক্ষা সমুদ্রের মাছে অভ্যস্ত হওয়ার প্রতি উপমন্ত্রী-মহাশয়ের উপদেশটি আশা করি মৎস্যাশী বাঙালী-সমাজ ভাবিয়া দেখিবেন। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় অনেকেই নিশ্চয় দেখিয়াছেন, সামুদ্রিক মাছ নামে অভিহিত বস্তুগুলির খুব বড় একটা অংশ এমন বিকটদর্শন যে, তা খাদ্য বলিয়া ভাবিতে ভয় করে। যে অংশ আদরণীয় ও উদরণীয় হইতে পারে, তাহার পরিমাণও যথেষ্ট নয়, দামও একেবারে জলের মতো নয়। তাছাড়া বাঙালী পাকযন্ত্রের দোষেই হয়ত তাহার অনেকাংশই পরিপাক হইতে চায় না। কাজেই উপদেশ উত্তম হইলেও, তা দিয়া মাছের সাধ কয়জন মিটাইতে পারিবেন জানি না। তবে আগে দেখিয়াছি, চাউলের অভাব রকমারি পরিপূরক খাদ্য দিয়া মিটানোর পরামর্শ দেওয়া হইত। কিন্তু কোন সুলভ পরিপূরক হাতের কাছে যখন আগাইয়া আসিল না, তখন আর একটি কথাও শোনা গেল না। সমুদ্রের মাছে মাছের চাহিদা না মিটিলেও নিশ্চয় একই ভাবে মৌন অবলম্বন করা হইবে। যেহেতু তাহাই সবচেয়ে নিরাপদ!" —যুগান্তর।

## নেহরুর স্বৈরতন্ত্রী শাসন

"কংগ্রেসী কর্তারা আত্মস্বার্থে নিজেদের দলীয় সরকারকে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বলিয়া জাহির করিয়া থাকেন। কিন্তু লোকে জানে—কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখার মতোই কথাটা একান্ত হাস্যকর। মোহভঙ্গ বহুদিন আগেই হইয়াছে। এখন সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আসিতে হইতেছে। অসাধু চিরদিন সাধুর মুখোস পরিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে না। স্বার্থান্ধ, ক্ষমতালোলুপ স্বৈরাচারীদের মুখোস একদিন খুলিয়া পড়িবেই। কংগ্রেসী সরকারের আসল রূপ বহু পূর্বেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এখন লোকে ইহাদের কি ভাবে বাহির করিয়া দিবে তাহাই ভাবিয়া [illegible]

আওতায় ভারতবাসীকে কাল যাপন করিতে হইতেছে তাহা পূর্বপরিচিত মানব-সভ্যতাবিরোধী হিটলার-ষ্ট্যালিনের পদচিহ্নাঙ্কিত একনায়কতন্ত্রের নামান্তর মাত্র। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইহাদের স্বৈরতন্ত্র শাসনকাল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার কালো কালির বর্ডার দ্বারা চিহ্নিত করা আছে। আত্মস্বার্থে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে গলা টিপিয়া হত্যা করিতে কসুর করে নাই। জাতীয় আদর্শকে বিকৃত করিয়া নিজ উদ্দেশ্য সাধনে অপপ্রয়োগ করিয়াছে। বিবেক-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়াছে। বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও বেতনভোগী পাইক পেয়াদার দ্বারা গোটা দেশকে বন্দুকের কুঁদার তলায় দাবাইয়া রাখিয়াছে। অন্যান্য দেশের লোক ইতিহাস অনুধাবন করিয়া এই জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে। আর ভারতবাসীকে নেহরু-শাসনে ইহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইতেছে। ইহাদের সঙ্গে নেহরু সরকারের তফাৎ এই যে—তাহারা জনসাধারণের ভাত-কাপড়ের প্রাথমিক সমস্যাটা সমাধান করিয়া তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছে। নেহরু সরকার তা-ও পারেন নাই। গোটা দেশটাতে লুঠেরাদের সমর্থন ও সাহায্যে সামাল দিয়া চলিয়াছেন।"

—স্বস্তিকা ( কলিকাতা )।

## তুগলুকী খেয়াল

"মহম্মদ তুগলুক মৃত্যুর সময় তাঁর খেয়ালটি বোধ হয় আমাদের সরকারকে দিয়ে গেছেন। সম্প্রতি ভারত সরকার স্থির করেছেন, হাওড়া হতে দুর্গাপুর পর্য্যন্ত ১৬ কোটি মুদ্রা ব্যয়ে ১ শত মাইল দীর্ঘ পথ নির্ম্মাণ করবেন। রাস্তাটি ৩ শত ফিট চওড়া হবে, তাহার উপর দিয়ে শুধু মোটর গাড়ী চলাচল করবে—গো-মহিষের গাড়ীর জন্য পৃথক রাস্তা নির্ম্মিত হবে। সেখানে হাওড়া হতে দুর্গাপুর কি আসানসোল ও তার পার্শ্ববর্তী শিল্প অঞ্চলে পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলাচল হবার সম্ভাবনা আছে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড যা আছে, তা আরও চওড়া করে পৃথক অংশে গো-মহিষের গাড়ী-চলাচল করান যেতে পারত, কিন্তু সরকার সেধার দিয়ে না গিয়ে নতুন আর একটি রাস্তা নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। রাস্তাটি ৩ শত ফিট চওড়া হলে মাটি নেওয়ার জন্য দু'পাশে আরও দেড় শত ফিট করে জায়গার প্রয়োজন হবে। ১শত মাইল লম্বা আর প্রায় ৬শত ফিট চওড়া—এই পরিমাণ জায়গার হাওড়া, হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার যে অংশটুকু পড়বে—তা সারা পশ্চিম বাংলায় সব চেয়ে উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্র। আর, এরই পাশ দিয়ে গেছে ডি, ভি, সির খাল—তাতেও গেছে প্রভূত জমি। যে অংশে সেচের জন্য খাল কাটা হল—তার অনেকখানিই যদি পীচ দিয়ে মোড়া হয়, তবে খালের জল কোন্ স্থানের জন্য ?"

—নিশান ( বর্দ্ধমান )।

## মুখপত্র নাই

"সম্প্রতি একটি দৈনিকে প্রকাশিত 'কেরেলীর চোখে বাঙালী' শীর্ষক একটি পত্রে, পত্রলেখক বাঙালীদের চরিত্রগত কয়েকটি ত্রুটির কথা সমালোচনা করিয়া সুধিগণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি শুধু চরিত্রগত ত্রুটির কথাই উল্লেখ করেন নাই, কতকগুলি গুণপণারও অকুণ্ঠ চিত্তে প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি অনুসারে আমরা দেখিতেছি যে, বর্ত্তমানে বাংলা দেশের নেতৃত্ব কলিকাতা গ্রহণ করিয়াছে। কলিকাতার কৃষ্টি, কলিকাতার সংস্কৃতি প্রভৃতি মফঃস্বলের বাঙালীগণ অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন মফঃস্বলবাসীদের নিজের কথা বলিবার থাকিলেও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের ঢক্কা নিনাদে তাহা চাপা পড়িয়া যায়। বড়ই আনন্দের কথা যে, একা কেরালা রাজ্যে ২০ খানা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। সেখানকার মফঃস্বলের বাণী সদরের অধিবাসীকেও গ্রহণ করিতে হয়। অথচ কেরালা হইতে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত হইয়াও বংলাদেশে দৈনিক পত্রিকা ( মাত্র কয়েকখানি ) একমাত্র কলিকাতাতেই সীমাবদ্ধ মফঃস্বলের একপ পত্রিকা প্রকাশের প্রচেষ্টা সফল হওয়ারও প্রয়োজনীয়তা আছে। মফঃস্বল এত কাল কলিকাতার কথা শুনিয়া আসিয়াছে। আজও কি মফঃস্বলের নিজেদের কথা শুনাইবার সময় আসে নাই ?"

—ভাগীরথী ( কালনা )

## কংগ্রেসের দুর্গ বড়বাজার

"গত ২১শে অক্টোবর কলিকাতা পুলিশ বড়বাজার কটন স্ট্রীটে হানা দিয়া একটি গোপন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আবিষ্কার করিয়াছে ফাটকাবাজীর অপরাধে ৪০০ শত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে। পুলিশের কর্ম্মতৎপরতা প্রশংসনীয় কিন্তু ঘটনাটা ঘটিয়াছে বড়বাজারে, তাই এই ব্যাপারে শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে তাহাতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কলিকাতার কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় এই সংবাদটি ছাপা হইয়াছে কিন্তু যে সকল ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের কাহারও নাম সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় নাই। এমন কি, যে একজনের নিকট ১৫ হাজার টাকা পুলিশ পাইয়াছে ও যাহাকে "নাটের গুরু" বলিয়া পুলিশ মনে করে বলা হইয়াছে সেই ব্যক্তির নাম এবং যে বাড়ীতে গোপন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ধরা পড়িয়াছে সে বাড়ীর নম্বর প্রকাশ করা হয় নাই। ইতিপূর্বে আর একবার কলিকাতা পুলিশ গোপন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ আবিষ্কার করিয়াছিল, কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করিয়াছিল কিন্তু তারপর সে ঘটনার কি হইল তাহা অনেকেই জানেন। কংগ্রেসের দুর্গ বড়বাজারের ঘটনা, তাই পরিণতি সম্বন্ধে সংশয় জাগে।"

—বীরভূম বাণী।

## ভাগচাষ বিচারের বিপর্য্যয়

"কাঁথি মহকুমার ভাগচাষ কেস বিচারের জন্য কুড়ি জন বিভিন্ন সরকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করিতেছিলেন। গত ৩রা অক্টোবর তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তাঁহাদের ক্ষমতা লোপ করিয়া কাঁথি, রামনগর ও এগরা থানার জন্য একজন এবং পটাশপুর, ভগবানপুর ও খেজুরী থানার জন্য একজন, এই দুই জন কানুনগো রেভিনিউ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রকাশ প্রায় দুই সহস্র কেস এই মহকুমার বিচারাধীন রহিয়াছে, তদুপরি এই আসন্ন ধানকাটার সময় বহু থানার নিষ্কারণ এবং ফসল বিভাগের কেস রুজু হইবে। সাবেক ভাগচাষ-অফিসারগণের ক্ষমতা লোপ হওয়ায় তাঁহারা কোন নূতন কেস রুজু লইতে পারেন না অথচ গেজেটে প্রকাশের জন্য মাসাধিক কাল গত হইল এখনও নবনিযুক্ত রেভিনিউ অফিসারদ্বয় কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই। এই অবস্থায় যে সমস্ত

ভাগচাষী থানার নির্দ্ধারণ ও ফসল বিভাগের জন্য কেস রুজু করিতে চায় তাহাদের দুরবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। এতদ্ব্যতীত তিনটি থানার পক্ষে একজন অফিসার থাকিয়া কি ভাবে সুচারুরূপে বিচারকার্য্য ত্বরান্বিত করিতে পারিবেন তাহাও ভাবিবার বিষয়। প্রতি থানায় একজন করিয়া অফিসার নিযুক্ত করিলে ভাগচাষ কেস বিচারের সুবিধা হইত। যতদিন না নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয় ততদিন এই অফিসারগণ প্রতি থানায় নির্দিষ্ট দিনে কোন কেন্দ্রস্থলে ক্যাম্পকোর্ট না করিলে দরিদ্র ভাগচাষীগণের পক্ষে সাক্ষী-প্রমাণাদি সহ দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া বহুব্যয়ে কেস চালান সম্পূর্ণ অসম্ভব।"

—দেশপ্রাণ ( মেদিনীপুর )

## মূল্য নিয়ন্ত্রণ না প্রহসন ?

"বহু-বিঘোষিত অর্ডিনান্সের সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর, জনসাধারণ আশা করিয়াছিল যে, সর্ব্বপ্রকার নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের সর্ব্বোচ্চ মূল্য সরকার নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন এবং জনসাধারণ সেই নির্দ্ধারিত মূল্যে যাহাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে, সে সম্বন্ধে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে, সরকার সর্ব্বপ্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করিয়া কেবলমাত্র কয়েকটি দ্রব্যমূল্য—যথা ময়দা, আটা, বেবীফুড প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করিলেন। এই নিয়ন্ত্রিত মূল্যের দ্রব্যগুলি বর্ত্তমানে স্থানীয় বাজারে আর পাওয়া যাইতেছে না। যদিও অতি কষ্টে সংগ্রহ করা যাইতেছে, কিন্তু সে জন্য দেড়গুণ হইতে দুইগুণ মূল্য বেশী দিতে হইতেছে। দ্রব্যমূল্য নির্দ্ধারিত করিবার পূর্ব্বে জঙ্গীপুর রঘুনাথগঞ্জে ইচ্ছামত ময়দা এবং আটা যথাক্রমে ৮০ ও ৷৮০ সের দরে পাওয়া যাইতেছিল, কিন্তু ২০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে উক্ত দ্রব্যগুলির নির্দ্ধারিত মূল্য ঘোষিত হইবার পর স্থানীয় জনসাধারণ দেখিতে পাইল যে, এখানকার বড় বড় পাইকারী ব্যবসাদারদের দোকান হইতে উক্ত দ্রব্যগুলি ভোজবাজীর মত উধাও হইয়া গিয়াছে। ক্রেতাগণ উক্ত ব্যবসাদারদিগের দোকানে ময়দা ও আটা খরিদ করিতে যাইলে তাহারা জানাইয়া দিতেছেন যে, তাহাদের দোকানে ময়দা আটা নাই। অসহায় জনসাধারণ নিরুপায় হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে।"

—ভারতী ( রঘুনাথগঞ্জ )।

## বনগ্রাম হাসপাতালে জনৈক ডাক্তারের কীর্তিকলাপ

"ডাঃ সুধাংশুকুমার বসু দেশ বিভাগের সময় হইতেই গাঁড়াপোতা দাতব্য চিকিৎসালয়ের জেলা-বোর্ড কর্ত্তৃক নিযুক্ত ডাক্তার। এই ডাক্তারখানাটি গাঁড়াপোতা, সুন্দরপুর, কনিয়াড়া ও আষাড়ু ইউনিয়ন বোর্ড সমূহ কর্ত্তৃক জেলা-বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ও সাহায্যে পরিচালিত এবং ইহার জন্য এক একটি স্বতন্ত্র কমিটি আছে। উক্ত ডাক্তারবাবুটির একটু পরিচিতি প্রয়োজন। তিনি একাধারে গাঁড়াপোতা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীশান্তি উকিলের বড়-দাদা এবং হাসপাতাল কমিটি সম্পাদক সুন্দরপুরের শ্রীজিতেন মিত্র ভাগিনা হইতেছে। বোধ হয় সেই কারণে তিনি দেশ বিভাগের সময় হইতেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ডাক্তারবাবু হিসাবে ঐ হাসপাতালে নিযুক্ত আছেন। সংবাদে প্রকাশ, তিনি ২৫।৩০ বিঘা ধানী জমি, ২।৩ বিঘা ফলের বাগান, দীঘি, পুকুর প্রভৃতির মালিক হইয়াছেন। গাঁড়াপোতার উপর নূতন দোতলা বাড়ীতে ( শুনা যায় বাড়ীটি তাঁহার স্ত্রীর নামে ) তিনি বাস করেন। ঐ হাসপাতালে ঔষধ এবং ডাঃ বসুর নিরবচ্ছিন্ন অনুপস্থিতির জন্য রোগীরা বিশেষ হয়রাণ হন বলিয়া প্রকাশ এবং সেই জন্যই মাত্র ১০।১২ জন রোগীও প্রতিদিন হয় না। ডাক্তারবাবু রাজনীতিতে এদিকে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতেছেন বলিয়াও প্রকাশ এবং তিনি মণ্ডল কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তার পদ পাইয়াছেন বলিয়াও জানা গেল। তিনি প্রায় সমস্ত দিনই রাজনৈতিক ও নিজ বৈষয়িক মামলা মোকর্দ্দমার কাজে বনগ্রাম সহরেই থাকেন বলিয়াও শুনা যায়। তাই জনসাধারণ প্রশ্ন করে যে, তিনি এই মৌরসীপাট্টা বজায় রাখেন কি ভাবে ?"

—পল্লীসমাজ ( বনগ্রাম )।

## বর্গী এলো দেশে

"পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় বর্গী আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। যেরূপ আবহাওয়া দেখা যাইতেছে, তাহাতে এবার ধান্য উঠিলেই সরকারের পক্ষ হইতে প্রবল উদ্যমে ধান্য সংগ্রহ অভিযান সুরু হইবে। গত ১ই নভেম্বর জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বণ্টনের ভার রাজ্য সরকারগুলিকে নিজ ব্যবস্থায় গ্রহণ করিতে হইবে। পশ্চিম-বাংলার কুখ্যাত কন্‌ট্রোলপন্থী সরকার তো হাত ধুইয়াই বসিয়াছিলেন। খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ-মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিয়াছেন। আবার সেদিনের কথা মনে পড়িতেছে। অনেক কাণ্ড করিয়া কন্‌ট্রোল অপদেবতাকে বহুদিন পরে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। ফুড ডিপার্টমেণ্ট এই জন্যই লুঠ ডিপার্টমেণ্ট বলিয়া জনসাধারণের নিকট আতঙ্কের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। আবার কন্‌ট্রোলপন্থীর দল চঞ্চল ও সরব হইয়া উঠিতেছে। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, নিয়ন্ত্রণ প্রথা যদি সকল ক্ষেত্রে ও স্তরে সুষ্ঠু এবং সুনিয়ন্ত্রিত হয় তাহা হইলে কাহারো কিছু বলিবার থাকে না। কিন্তু যে সরকারের হাতে দেশ শাসনের ভার রহিয়াছে এবং তাঁহাদের উপযুক্ত চেলাচামুণ্ডারা সংগ্রহ ও বণ্টনের মুরুব্বি হইয়া বসিয়া সেখানে যে নন্দোৎসব চলিবে তাহার সহিত ধান্য-প্রধান পশ্চিমবঙ্গবাসী বিশেষভাবে পরিচিত। দেশের উত্তরোত্তর সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতিতে সরকার হইতে ধান্য সংগ্রহ করা উচিত, কিন্তু তাহা কুখ্যাত ফুড ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমে নহে।"

—দামোদর ( বর্দ্ধমান )

## নেহেরু নিরুপায়

"ভারতের প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন যে 'অত্যন্ত সামান্য' পণ্ডিত নেহেরু তাহার খবর জানেন। কিন্তু ইহার প্রতিকারে তিনি এখন 'নিরুপায়'। কারণ, প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা এত বেশী যে, সামান্য বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলেও রাজকোষের উপর বিরাট চাপ পড়িবে। ইহাই তাঁহার সুস্পষ্ট জবাব। প্রাথমিক শিক্ষকেরা অতঃপর কি বলিবেন ?"

—পল্লীবাসী ( কালনা )

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রী...

## পত্রিকা সমালোচনা

প্রথমেই জানিয়ে রাখি, পত্র-পত্রিকা পাঠ করা আমার এক উগ্র নেশা। কত লোক আছেন যাঁরা পান-তামাক-মদ-তাস-পাশার নেশায় আচ্ছন্ন, কত মহিলা আছেন যাঁরা পান-দোক্তা-জর্দা-চা-সিগারেট ইত্যাদিতে মশগুল। আমি কিন্তু আত্মঘাতী নেশার পক্ষপাতী নই। পান-সিগারেট খাই না ক্যান্সার হওয়ার ভয়ে, মদ্যপান করি না লিভার পাছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্য নেশার কথা বাদ দিচ্ছি। পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, সেই তুলনায় আমার পত্র-পত্রিকা পাঠের নেশা অনেক বেশী নির্দোষ ও লাভজনক। এ নেশায় শুধু যে আমার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটায় তা নয়, চক্ষু ও মনের সকল বিবাদ ভঞ্জন হয় পত্রিকা মারফৎ। আমি প্রায় সর্বসমেত পনেরোখানি সাময়িক পত্র পড়ি, তন্মধ্যে মাসিক বসুমতীকে ঠাঁই দিই শীর্ষে। কেন তাই বলছি একে একে। বসুমতীর প্রধান আকর্ষণ, বাঙলা দেশে এই একমাত্র পত্রিকায় সম্পাদনার একটি বিশিষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। কাগজখানি পড়তে পড়তে মনে হয়, বিষয়বস্তু ও অঙ্গবিন্যাসের সমাবেশে দস্তুরমত কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। গত কয়েক মাসে পত্রিকার প্রথম দিকে যে-সব গল্পরচনা প্রকাশিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই মৌলিক গবেষণাপ্রসূত। আশ্চর্য্য হই, এই সকল লেখার লেখকরা বাঙলা সাহিত্যে নবাগত। আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন, কয়েক জন বিখ্যাত পুরাতন লেখকদের হাল আমলের রচনা পড়তে পড়তে সত্যিই ক্লান্তি এসে যায়। পাতার পর পাতা উল্টে যাই, কিন্তু বই শেষ করতে পারি না। লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হয়। যদি অনুমতি দেন, এই সব বিখ্যাতদের রচনার আঙ্গিক ও বৈয়াকরণিক দোষ ধ'রে কিছু কিছু সমালোচনা আপনার কাছে পাঠাতে পারি। যোগ্য মনে করলে বিনা দ্বিধায় ছাপতে পারেন। বলতে পারেন কেন লেখকদের সাহিত্যের এমন দৈন্যদশা? আমি বলতে পারি। বাঙলা দেশের লেখক-লেখিকাদের মধ্যে যাঁরা যশের শিখরে উঠেছেন তাঁদের অনেকেই ঘরকুনো, একটা বাঁধাধরা গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন—যেখানে সাহিত্যের মালমসলা নেই বললেই চলে। কোন কোন লেখক বিদেশী লেখক এবং কেতাবকে স্রেফ হজম ক'রে ফেলছেন। বিদেশী ছায়া উগরে ফেলছেন নিজেদের লেখায়। অথচ বিদেশী লেখক-লেখিকারা যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন আর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন—তেমন প্রচেষ্টা এ দেশের সাহিত্যিকের দেখি না কেন? তাই লেখার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয়। পদে পদে অজ্ঞতার ছাপ। ব্যাকরণের ভুল, তথ্যের ভ্রান্তি ছত্রে ছত্রে তুলে ধরা যায়। মাসিক বসুমতীতে কয়েক জন নবাগত লেখক-লেখিকার লেখা পাই। পড়তে সত্যিই ভাল লাগে। বুঝতে পারি মাসিক বসুমতী ও বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। বেলা দেবী (মেদিনীপুর)।

## বাঙলা সাহিত্যে ছদ্মনাম

আশ্বিন মাসের মাসিক বসুমতীতে শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাং সাহিত্যে ছদ্মনামের প্রচলন' নামে যে প্রবন্ধটি বেরিয়েছে, ত এক জায়গায় শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম 'শ্রীবাসব' ব উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এস. সি. সরকার প্রকাশিত 'ফেনা শ্রীগুরু প্রকাশিত 'খাওলা', 'একাকার', বিশ্ববাণী প্রকাশিত 'একমু মাটি' প্রভৃতি উপন্যাসের লেখক 'শ্রীবাসব' যে শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যা নন, সে সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত। আমি আশা করি যে, শ্রীআশুতো মুখোপাধ্যায় নিশ্চয়ই আমাকেই সমর্থন করবেন। এই চিঠিটা প্রকা করলে বিশেষ বাধিত হব। বিনীত, বরেন ঘোষাল। কলিকাতা-১২

আপনাদের পূর্বমাসের সংখ্যায় ছদ্মনামের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে 'বেদুইন' দেবেন দাস ছাপা হইয়াছে। উহা ঠিক নহে 'বেদুইন'—দেবেশ রায় হইবে। সংশোধন করিলে বাধিত হইব নিবেদন—কর্ম্মাধ্যক্ষ (বিদ্যোদয় লাইব্রেরী) কলিকাতা-১।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Please quote on the following: Basumati 1922-1957, 1958 and continuation. We would appreciate information on any volumes you have available. Thank you.—The University of Chicago Library. Chicago 37, Illinois.

আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্যন্ত ছয় মাসের চাঁদা ৭.৫০ পাঠাইলাম। সরিতা চক্রবর্ত্তী, Belvedere, Calcutta.

Sending herewith Rs. 15/ as the subscription of monthly Basumati for one year. Please send the same as usual.—Domohani Railway Institute, Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক মূল্য (আশ্বিন হইতে ফাল্গুন) এতদ্দ্বারা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিবেন। Pusparani Mittra, Cuttack.

দুইখানি মাসিক বসুমতীর জন্য ৬ মাসের (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত) মোট ১৮৲ টাকা পাঠাইলাম। Taruner Asar, Kanpur.

I am to reiterate that you should treat me as a new subscriber although I wish to subscribe to your magazine since 'Sravan' 1365 B. S. to maintain the continuity. Kindly receive the annual subscription of Rs 15/.—Maya Banerjee Midnapore.

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত ৬ মাসের মাসিক বসুমতীর ৭৷৷০ পাঠাইলাম। বিন্দুবাসিনী দেবী, হাজারিবাগ রোড।

I am remitting herewith Rs. 7·50 n. p. towards the half-yearly subscription of your Monthly Basumati, commencing from Kartick.—Sri Basanti Devi, Cuttack.

বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। Reba Mittra, Giri Road, Madras.

৩৭শ বর্ষ ] ১৩৬৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্য্যন্ত [ ১ম খণ্ড

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা

৩৭শ বর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫ ] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [ দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা

# কথামৃত

স্বামী তুরীয়ানন্দ। তাঁর কথা সব হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এই তোমরা এত সব লেখাপড়া শিখে এলে—সব ত্যাগ ক'রে। কি করছ? দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কোন রকমে দিন যাপন হচ্ছে। ঠাকুর যেমন বলতেন, 'মা দিন তো গেল, এখনো তোমার দেখা পেলুম না'—সেই রকম কে বলে? সে রকম ইচ্ছা কই? Damp, spiritless (ম্যাদাটে, নিস্তেজ) নিরুদ্যম হয়ে বসে আছ। এ সব পড়ে রক্ত গরম হয় না? তোমাদের যেন মাছের রক্ত। 'জীবন্মৃত: কোঽবা? নিরুদ্যমো যঃ।'

জীবনের সাতাশ বৎসর কেটে গেল। স্বামীজী বলেছিলেন, উনত্রিশ বৎসরের মধ্যে সব সেরে নিয়েছি। তা তোমাদের কোন দোষ নেই। আমাদের যেমন দেখছ, তেমনি তো তোমরা করবে। ভক্তদের কাছ থেকে টাকা আসছে, আর কোন রকমে দিন কাটছে। আমরা কি আর এখন সে রকম পরিশ্রম করছি? বলছি, বুড়ো হয়েছি—diabetes, nonsense (বহুমূত্র হয়েছে, বাজে কথা)! ওসব excuse (ওজর)। স্বামীজী শেষ দিন পর্যন্ত খেটে গিয়েছেন। দেখেছি, শেষ অসুখের সময় বুকে বালিশ দিয়ে হাঁপাচ্ছেন; কিন্তু এদিকে গর্জাচ্ছেন। বলছেন, 'ওঠ, জাগ, কি করছ?'

ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'কাম আরও বাড়িয়ে দাও।' আমি তো শুনে অবাক্! বলেন কি, আবার বাড়াতে হবে? তখন বললেন, 'কাম আর কি? প্রাপ্তির কামনা তো? তাঁকে পাবার জন্য কামনা কর, খুব কামনা বাড়িয়ে দাও। তখন অপর কামনাগুলি উপে যাবে।'

ভজন-টজন তো কর না? খালি কাজ। আমার সেবা করছ? ঘোড়ার ডিম করছ! আমি বলি, তুমি জেনো যে, প্রভুর কৃপায় আমি নিজে এখনও সব করতে পারি। তোমার সেবার কিছু দরকার হয় না।

ঠাকুর একদিন তাঁর গলার অসুখের কথা বলেছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার কি ওসব অনুভব হয়? তিনি বললেন, 'তুমি কি কথা বললে গো? শরীর কি কখনও সাধু হয়? মনটাই সাধু হয়ে যায়।' তা না হ'লে শুধু idiot (মূঢ়)-এর মত শান্ত ভাব হবে। কষ্ট অনুভব হচ্ছে, খালি চেপে রয়েছি—ও বড় কিছু নয়। তবে এই বোধ যদি হয় যে এসব শরীরের—আমার নয়, আমি শরীর থেকে আলাদা, তবেই ঠিক।

—স্বামী তুরীয়ানন্দের কথাসংগ্রহ হইতে।

# বিপ্লবের সন্ধানে

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার অন্যতম প্রবীণ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী, জীবনের স্মৃতি' নামক সম্প্রতি প্রকাশিত পুস্তকের একস্থানে—অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর ফাঁসির বিবরণ উপলক্ষ্যে—আমার মতন একজন নগণ্য কর্মীর নাম উল্লেখ করে,—হয়ত বা অন্যমনস্কেই,—আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমার আগে আরো যাঁদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারতো, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই নাম তিনি উল্লেখ করেননি। তাছাড়া তিনি তাঁর বইয়ে অনেক খুচরো খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় কথাও বাদ দিয়েছেন,—হয়ত বইটাকে সংক্ষিপ্ত করার জন্যেই,—যেসব কথার মধ্যে জ্ঞাতব্য, মনোহারী, চমৎকার কথাও আছে প্রচুর।

বইখানা পড়তে পড়তে আমার তখনকার দিনগুলোর কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক আনুষঙ্গিক এবং প্রাসঙ্গিক কথা মনে পড়তে লাগলো,—স্মৃতির পুরানো ভাণ্ডারের কোণায় কোণায় অব্যবহার্য্য ডেয়ো-ঢাকনার মতন বহুদিন অনড় অবস্থায় পড়ে থেকে যেগুলো 'ছাতা পড়ে' প্রায় উহ্য হয়ে এসেছিল। ঐ ফাঁসির মামলা সম্পর্কে আমার নাম নিয়ে একটু মনোহারী একটা ঘটনাও মনে পড়ে গেল,—আর এখানে আমি সেইটুকু উপলক্ষ্য করেই আমার এই স্মৃতিকথা মাঝপথ থেকেই শুরু করলুম।

'যাদুদা'র সঙ্গে আমার প্রথম দেখা ১৯১৫ সালের শেষ বা '১৬ সালের প্রথমে,—জার্মাণ ষড়যন্ত্র ও প্রথম বিপ্লব প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে যাওয়ার পর। তখন 'দাদা'—'বাঘা যতীন'—বালেশ্বরে বুড়ী-বালামের তীরে প্রথম বাঙ্গালী বিপ্লবী দলের ট্রেঞ্চ-যুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস রচনা করে, বৃটিশ সরকারের সশস্ত্র পুলিশের গুলীতে চিত্তপ্রিয়-মনোরঞ্জনের সঙ্গে নিহত হয়েছেন! বাঙ্গলার বিপ্লবিজগতে একটা মর্মান্তিক চাপা শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম নেতা রাসবিহারী বসু পালিয়েছেন জাপানে। 'দাদার' অন্যতম সহকারী নরেন ভট্টাচার্য্য সি মার্টিন রূপে ব্যাঙ্কক থেকে জাপানে এবং তারপর আমেরিকায় পালিয়েছেন (পরবর্ত্তী কালে যিনি রুশিয়ায় গিয়ে এম, এন রায় রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন)। অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া হুগলী), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), অতুল ঘোষ (কুষ্টিয়া নদীয়া), সতীশ চক্রবর্ত্তী (খুলনা), পাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (নদীয়া), নলিনী কর (নদীয়া), এবং ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)—এই সাত জন নেতা—ফেরারী বিপ্লবী—গোয়েন্দা সর্দার টেগার্ট এঁদের খুঁজে বার করার জন্যে সারাদেশ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন। এছাড়া আরো অনেক পলাতক বিপ্লবী দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে। ভোলানাথ পরে গোয়াতে গ্রেপ্তার হন, এবং সেখানেই পুলিশের অত্যাচারে নিহত হন। জার্মাণ ষড়যন্ত্রের সরকারী আংশিক বিবরণ পরবর্ত্তীকালে রৌলট কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে।

এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ একদিন আমার এক সতীর্থ 'যাদুদা'কে পৌছে দিয়ে গেল আমাদের টালার বাড়ীতে। বাড়ীটার সম্মুখের অংশের প্রবেশ-দ্বার বড়রাস্তার ওপর, সে অংশটা বরাবর ভাড়া দেওয়া থাকতো; আর পিছনের অংশের প্রবেশদ্বার পাশের গলির মধ্যে, সেই অংশে আমরা বাস করতুম। ভিতর-বাড়ী থেকে বার-বাড়ীতে আসা যেত একটা সরু গলিপথ দিয়ে। সে সময়ে বা'র বাড়ীটা খালি ছিল, এবং সদর দরজায় ছিল তালা লাগানো। পলাতকদের থাকার পক্ষে সে ছিল চমৎকার জায়গা। পুলিশের তাড়ার মুখে এমনি কেউ কেউ পলায়নের পথে দু'-এক দিনের জন্যে সেখানে আশ্রয় নিতো। আমি তাদের ভিতর-বাড়ী দিয়েই নিয়ে আসতুম, এবং বা'র করে' দিতুম।

এই ভাবেই একদিন যাদুদা' এলেন—একমুখ চাপদাড়ি, চুলগুলো বড় হয়েছে, সাধারণ বাঙ্গালীর পোষাক। প্রাথমিক কথাবার্তার পর তাঁর পথপ্রদর্শক বিদায় হ'লে তিনি আমাকে বললেন,—তুমি ভাই একটা কাজ করতে পারবে? তখনও আমার প্রথম রোমাঞ্চ কাটেনি,—আমি তাঁর কাজে লাগার আনন্দে উৎসাহিত হ'য়ে বললুম, কি? তিনি একটু মৃদু হাসিমুখে বললেন,—আমার মাথার চুলগুলো কোনরকমে একটু ছেঁটে কমিয়ে দিতে পার? তুমি যা পার, তাতেই হবে।

হরি হরি! কিন্তু দরকারী কাজ মাত্রেরই মর্য্যাদা যে সমান, এই কথাটার অন্তর্নিহিত সত্য সেদিন প্রথম অনুভব করলুম, এবং সাগ্রহে ও সপ্রতিভ ভাবে বললুম,—খুব পারবো। তারপর একখানা কাগজকাটা কাঁচি নিয়ে যাদুদা'কে ছাতে নিয়ে গিয়ে সাবধানে সেই প্রথম যে চুল ছাঁটলুম, তা নেহাৎ নিন্দের নয়। সন্ধ্যার সময় যাদুদা' যখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন, তখন তিনি দিব্যি একজন লুঙ্গীপরা মৌলবী সাহেব।

১৯১৬ সালের জুলাই মাসে স্বনামধন্য গোয়েন্দা নেতা, যিনি স্বয়ং টেগার্ট সাহেবেরও গুরু বলে পরিচিত, সেই বসন্ত চাটুয্যে

বিপ্লবীদের গুলীতে নিহত হওয়ার পর যখন বিপ্লবীদের ঝাড়ে-বংশে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হল, তখন আমিও ঝাঁকের মধ্যে আটকা পড়ে গেলুম, এবং বিনা বিচারে অন্তরীণ হলুম। তিন বছর অন্তরীণ থাকার পর '১৯ সালের শেষে যখন ছাড়া পেলুম, তখন বাংলার আকাশ-বাতাসে একটা থমথমে ভাব, প্রকাশ্য বা গুপ্ত কোন আন্দোলনই নেই, বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝা তখন দ্বিতীয় বার নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে পাঞ্জাবে,—অমৃতসর জালিয়ানওয়ালাবাগে।

সুতরাং আমি একটা বিপ্লব লাগিয়ে দিলুম বাড়ীতে—পৈতৃক বাড়ী বেচে ফেললুম, এবং বরাহনগরে এক বাড়ী ও সিঁথিতে একটু জমি কিনে, বাকী টাকায় ব্যবসা সুরু করে দিলুম, ১৯২০ সালে।

সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের ঢেউ আবার বাংলাকে নাড়া দিলে। '২০ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকা থেকে সদ্য-প্রত্যাগত লালা লজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হল, এবং সেখানে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ হল। ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে নতুন গঠনতন্ত্র 'দেশজোড়া কংগ্রেস সংগঠনের কার্যক্রম গৃহীত হল। দেশবন্ধু বাংলার আন্দোলনের নেতৃত্ব নিলেন। ইতিমধ্যে অমরদা 'যাদুদা' প্রভৃতির ওপর থেকে ওয়ারেন্ট তুলে নেওয়া হয়েছে, শত শত মুক্ত বিপ্লবী কর্মী ফিরে এসেছে। দেশবন্ধু তাঁদের ডাক দিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের 'এক বছরে স্বরাজ' প্রোগ্রামটাকে তোমরা একটা চান্স দাও, কংগ্রেসে যোগ দাও। যুগান্তর দলের নেতারা ডাকে সাড়া দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। দেশবন্ধু একদল আত্মভোলা 'রেডিমেড' কর্মী পেয়ে গেলেন। অসহযোগ আন্দোলন এগিয়ে চললো।

ঢাকের বাদ্যি শুনলে গাজুনে পিঠ চড় চড় করে ওঠে। একবার একটু ভেবে নিয়ে, কাঁদা ব্যবসা তুলে দিয়ে দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লুম। দাদাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস সংগঠনের মারফৎ বৈপ্লবিক সংগঠনের নেশায় মেতে উঠলুম। এক বছরে অহিংসা আর চরকার জোরে স্বরাজ হবে, এই আজগুবী কথাটার মনে মনে একটা ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলুম এই যে, এক বছর অনন্যমনে খেটে ন্যাশান্যাল স্কুল কলেজ আদালত প্রভৃতি তৈরী করে নিয়ে খাজনা বন্ধ করে স্বরাজ ঘোষণা করে দেওয়া হবে, আর স্বরাজ ঘোষণার পর কংগ্রেসের অহিংসা নীতির অবসান হবে, লাগবে একটা সশস্ত্র লড়াই ইংরেজের সঙ্গে, এই ভাবেই আমাদের বিপ্লব আসবে। তারপর কি হবে, সেটা জানেন দাদারা।

মহাত্মাজীর যে এই রকমই একটা প্ল্যান আছে, না হলে একটা আক্কেলওয়ালা লোক সজ্ঞানে অমন আজগুবী কথা যে বলতে পারে না, আমার তখন পর্যন্ত এই রকম ধারণাই ছিল। আমার এক সহকর্মী ছিলেন আমার চেয়ে সব রকমেই পাকা, তিনি বলতেন মহাত্মাজী খাঁটী জাতকাট খাটমল-খিলানেওয়ালা—সশস্ত্র বিপ্লবের সব চেয়ে বড় শত্রু। শুনে তখন পর্যন্ত আমার প্রাণে ব্যথা লাগতো।

যাই হোক, ঘরের খেয়ে দিন-রাত চরকার পাক আর চরকী পাকে দিন কাটতো, সুতরাং হাতের টাকা ফুরোতে দেরী লাগলো না, এবং শেষ পর্যন্ত বাড়ী-জমি বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে হল। বিপ্লব করে দেশ স্বাধীনও করবো, আর বাড়ী ব্যবসা টাকার পুঁটলিও অক্ষত থাকবে, এতো এক বছরে স্বরাজের চেয়েও আজগুবী কথা! এ যুগের মত দেশ-সেবা করে বড়লোক হওয়ার রেওয়াজ তখন ছিল না, বরং যে দু'-এক জন সে চেষ্টা করেছে, তাদের দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বলে গুলী করে মারারই রেওয়াজ ছিল। অবশ্য দু-একজন যে ফস্কেও যায়নি, তা নয়।

সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া টাকা নিয়ে বেশ কিছুদিন স্বদেশী হাঙ্গামায় মশগুল থাকলুম প্রেমানন্দে। তারপর '২৪ সালের শেষে ৩নং রেগুলেশনে একদিন জেলে চলে গেলুম। স্বরাজের সবখানিই বাকি থেকে গেল।

'২৫ সালের শেষে যখন মেদিনীপুর জেলে বদলী হয়ে যাদুদা'র সঙ্গে দেখা হল, তখন আমার মহাজন সুদে আসলে ১৬০০০ টাকার দাবীতে আমার নামে মামলা ঠুকেছেন। আমি কোর্টে হাজির হওয়ার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করি, আর কর্তারা দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন। এমনি ভাবে কিছুদিন চলার পর '২৬ সালের শেষ দিকে দয়াময়েরা আমাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলী করলেন, যাতে আমার মামলার তদ্বির কারক আমার সঙ্গে জেলে দেখা করে উপদেশ নিতে পারেন। এখানেও আমার অনেকগুলো দরখাস্ত উপরোক্ত ভাবে নামঞ্জুর হল। আমার কোর্টে হাজির হওয়া কিছুতেই হল না।

ইতিমধ্যে যাদুদা'ও আলীপুর জেলে বদলী হয়ে এসেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামীরাও সেখানেই কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন।

জেলের ফটকের ভিতরের প্রধান রাস্তা থেকে একটা গলিপথ বেঁকে এসে আমাদের ৫েট ইয়ার্ডের দরজায় শেষ হয়েছে। গলির একপাশে দুটো জেল-হাজতী ইয়ার্ড এবং ফাঁসির ইয়ার্ড,—আর একপাশে গুদাম, ঘানিঘর এবং দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ড। আমাদের ইয়ার্ডের দরজা থেকে গলিতে বেরোলেই কয়েক ফুট তফাতে একদিকে দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের একটা দরজা, এবং তার বিপরীত দিকে ফাঁসীর ইয়ার্ডের দরজা। তিনটে দরজাই সব সময়েই বন্ধ থাকে। ফাঁসীর ইয়ার্ডে সেল খালি বলে দরজায় কোন পাহারা নেই; দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের দরজার ভিতরে একজন দেশী ওয়ার্ডার পাহারা থাকে, তার হাতে থাকে দরজার চাবি; আর আমাদের ইয়ার্ডের দরজার ভিতরে একখানা টেবিল ও চেয়ার নিয়ে বসে পাহারা দেয় একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার, চাবি হাতে নিয়ে।

দক্ষিণেশ্বরের অপর পাশে পুরানো বম্ব ইয়ার্ডে তখন আন্দামান ফেরৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীরা থাকেন। তার মধ্যে শিবপুর ডাকাতি মামলার নরেন ঘোষচৌধুরী, ভূপেন ঘোষ, সানুকূল চাটুয্যে, এবং রাজাবাজার বোমার মামলার অমৃত হাজরা ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের পিছন এবং আমাদের পাশের দিকে ইউরোপীয়ান কয়েদীদের ইয়ার্ড।

দক্ষিণেশ্বর ও বম্ব ইয়ার্ড এবং ইউরোপীয়ান ইয়ার্ডের বন্দীরা প্রত্যেকে পৃথক সেলে থাকেন, এবং সন্ধ্যা হলেই নিজ নিজ সেলে তালাবন্ধ হন। আমাদের ইয়ার্ডে বেশ বড় চৌহদ্দীর মধ্যে দোতলা ব্যারাকঘর—এক এক তলায় ৮।১০ জন করে রাজবন্দী একসঙ্গে থাকেন, এবং সে ব্যারাকঘরের দরজায় তালা পড়ে রাত ন'টার সময়।

দিনের বেলা দক্ষিণেশ্বর ও বম্ব ইয়ার্ড এবং ইউরোপীয়ান ইয়ার্ডের চার্জে থাকে একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার, এবং সে-ই কয়েদীদের সেলে বন্ধ করে। তারপর রাত্রে পাহারা দেয় দেশী ওয়ার্ডারেরা এবং কয়েদী নাইট-ওয়াচম্যানেরা।

আমাদের ইয়ার্ডের দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে ফাঁসির ইয়ার্ডের সবখানিই পরিষ্কার দেখা যায়—দুই ইয়ার্ডের মাঝে আছে একটা ফুট আষ্টেক উঁচু দেওয়াল মাত্র। আর দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের দোতলার বারান্দার কোণায় এসে ওরা দাঁড়ালে আমাদের বারান্দা থেকে কথাবার্তাও চলে।

তখন গোয়েন্দা বিভাগের ডি আই জি ছিলেন লোম্যান—আর তাঁর নীচেই আসল বড়কর্তা, বসন্ত চাটুয্যের পদের উত্তরাধিকারী, ভুপেন চাটুয্যে—যাঁকে হত্যা করার দায়েই অনন্তহরি-প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসি হয়েছিল। তিনি ছিলেন রায়বাহাদুর।

তিনি তখন মাঝে মাঝে রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। জেলগেটের অফিসে বসে দু'-একজন রাজবন্দীকে একে একে ডেকে পাঠাতেন, এবং কুশলপ্রশ্নের পর একটু গল্পগাছা করে চেষ্টা করতেন, তাঁর কোন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে একটু আধটু হদিশ সংগ্রহ করতে।

রাজবন্দীরা সরকারের কাছে সরাসরি কোন দরখাস্ত করলে সেগুলো সবই নাকচ হত,—এবং রায়বাহাদুরকে সে কথা বললে তিনি পরামর্শ দিতেন, আর একখানা দরখাস্ত দিতে আই-বির ডি আই জির মারফৎ। সেভাবে দরখাস্ত দিলে তার সুফল পাওয়া যেত। আমার মামলা সম্পর্কে অবশ্য এরকমের কোন সৌভাগ্য আমার হয়নি!

যাই হোক,—সুফল দানের এই সুব্যবস্থা করে রায়বাহাদুর রাজবন্দীদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত করেছিলেন, তার সুফলও ক্রমে দেখা দিতে সুরু করলো। রায়বাহাদুর গেটে এসেছেন শুনলেই কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে ইয়ার্ড থেকে খবর পাঠাতেন,—এবং তখন তিনি ডেকে পাঠাতেন। অবশ্য এরকম কাণ্ড সকলেই করতেন না,—বলাই বাহুল্য।

দেখাসাক্ষাৎ বেশ সহজ ও চালু হওয়ার পর ক্রমে রায়বাহাদুর স্বয়ং আমাদের ইয়ার্ডে পায়ের ধূলো দিতে সুরু করলেন। কোন অফিসার জেলের মধ্যে এলে জেল-কানুনের নিয়মে তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে একজন ওয়ার্ডারকে সঙ্গে পাঠানো জেল-অফিসারদের ডিউটি। প্রথম প্রথম রায়বাহাদুরের সঙ্গে এমনি দেহরক্ষী ওয়ার্ডার থাকতো। শেষ পর্যন্ত রায়বাহাদুর দেহরক্ষী সঙ্গে নিতে চাইতেন না,—একাই আসতেন। ঘটনাচক্র যেদিন নতুন পথে ঘুরলো, সেদিনও তিনি আমাদের ইয়ার্ডে একাই এসেছিলেন,—অনুশীলন পার্টির নেতা অসুস্থ নরেন সেন ওরফে রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে দেখতে। রায়বাহাদুর অনেক দিন তাঁকে ডেকে পাঠালেও তিনি কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাননি।

দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের বন্দীরা তাদের দোতালার বারান্দায় বসে গলিপথে রায়বাহাদুরের যাতায়াত দেখতো এবং হয়ত বা কেউ গান ধরে দিতো—'তোরে নেয় না কেন যম।' তরুণদের এইসব তারুণ্য গায়ে মাখার মতন কাঁচা লোকতো রায়বাহাদুর নন! বরং হয়ত তিনি আশা করতেন, এদের মধ্যে কেউ হয়ত ক্রমে একদিন দরখাস্ত নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে, এবং তিনি বাগিত করে তাদের সঙ্গেও খাতির জমাতে পারবেন।

সেদিন ঘটনাটা সুরু হল ঠিক সেই ভাবেই। তিনি যখন আমাদের ইয়ার্ড থেকে বেরিয়েছেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা।

হাজতী ইয়ার্ডের দোতলায় তালা লাগাতে যাচ্ছে দেশী ওয়ার্ডার,—আর ইউরোপীয়ান ইয়ার্ডের দোতলার সেলগুলো বন্ধ করছে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার। তাদের বন্ধ করার পর সে দক্ষিণেশ্বরওয়ালাদের বন্ধ করবে। তারা তখনও দোতলার বারান্দায় বসে আছে।

আমাদের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার রায়বাহাদুরকে বার করে দিয়ে দরজায় চাবি দিয়েছে ভেতর থেকে। তার পরই দক্ষিণেশ্বরের বারান্দা থেকে কেউ রায় বাহাদুরকে ডেকেছে 'একটু কথা কইতে চাই' বলে। এতদিনে বুঝি সুযোগ এল ভেবে রায়বাহাদুর ওদের দরজায় টোকা মেরেছেন, এবং ভিতর থেকে দেশী ওয়ার্ডার চাবির ফুটো দিয়ে রায় বাহাদুরকে দেখে দরজা খুলে দিয়ে সেলাম করেছে।

সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে বন্দীদের কেউ বেরিয়ে এসে এক শাবলের বাড়িতে রায়বাহাদুরকে ধরাশায়ী করেছে,—তিনি একবার টুঁ শব্দ করতে পারেননি। কানের ওপর দিয়ে শাবলখানা মাথার হাড়গোড় ভেঙ্গে চৌচাপটে বসে গেছে,—একটা চোখ একেবারে বেরিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ এই বীভৎস কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত ওয়ার্ডারের ধাত ছেড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে,—সে হাতের বাঁশীটা বাজাতেই ভুলে গেছে। হাজতীদের দোতালা থেকে ওয়ার্ডারের নজরে পড়েছে, গলিপথে বুঝি কেউ কাউকে মারছে। দেখেই সে রেওয়াজ মাফিক পাগলা ঘণ্টির নির্দেশক ঘনঘন হুইস্‌লের আওয়াজ ছেড়েছে। তখন দক্ষিণেশ্বরের ওয়ার্ডারের হুঁস হয়েছে, এবং সেও বাঁশী বাজিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সারা জেলে বাঁশীর আওয়াজের সঙ্গে গেটে পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠেছে।

পাগলা ঘণ্টি বাজলেই বাইরের গারদ থেকে সকল ওয়ার্ডার ও জমাদারকেই সশস্ত্র হয়ে ছুটে এসে জেলে ঢুকতে হয়। যে যেমন অবস্থায়ই থাক,—তাকে ছুটে আসতেই হবে। হয়ত বা কেউ রুটি বেলতে বেলতে বেলুন নিয়েই ছুটে আসে,—হয়ত কেউ পায়খানার ঘটি হাতেই ছুটে আসে। সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ সশস্ত্র পুলিশের ফাঁড়ি থেকে একদল সশস্ত্র পুলিশ এসে জেলখানা ঘিরে ফেলে। সকলে সব সময় সজাগ আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ পাগলা ঘণ্টি বাজানো হয়, এবং কেউ অনুপস্থিত থাকলে গাফিলতির জন্যে তাকে সাজা দেওয়া হয়।

কিন্তু কয়েদীদের যখন প্রায় বন্ধ করা হয়ে গেছে, তখন পাগলা ঘণ্টি, এবং গলির বাঁশীটা যেন একটু হুড়োহুড়ি করে বাজছে, শুনে সকলেরই মনে হয়েছে, একটা কোন বড় রকমের কাণ্ডই ঘটেছে। যে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার ইউরোপীয়ান কয়েদীদের বন্ধ করছিল, সে বারান্দার কোণায় ছুটে এসেছে, সঙ্গে দুজন কয়েদীও এসেছে। তারা গলির দিকে উঁকি মেরে দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল। সেই ওয়ার্ডারই সেই কয়েদীদের বন্ধ করে দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডে এল, এবং সকলকে নিজ নিজ সেলে হাজির দেখে সেল বন্ধ করে ফেললে।

পাগলা ঘণ্টি পড়লে আমাদেরও বন্ধ হতে হয়। আমরা কয়েকজনে তখন ব্যাডমিণ্টন খেলছিলুম, বিরক্ত হয়ে ঘরে ফিরলুম, এবং আসার পথে দেখলুম আমাদের ওয়ার্ডার চাবির ফুটো দিয়ে দেখছে। আমিও এগিয়ে গিয়ে তাকে ঠেলে একবার দেখলুম, রায়বাহাদুর গলিতে পড়ে আছেন। ওয়ার্ডার ব্যস্ত হয়ে বললে, চল চল। তার সঙ্গে এসে ঘরে বন্ধ হলুম। সকলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি? সে শুধু 'রায়বাহাদুর' উচ্চারণ করে ইসারায় বুঝিয়ে দিলে, কাৎ। পরে দেখে আবার এসে বলে গেল, বোধ হয় শেষ।

সে গিয়ে দরজার পাশের চেয়ারে চুপ করে বসলো। মুখে ভয় ও দুশ্চিন্তার ছাপ। দেখতে দেখতে গলিতে ভিড় হয়ে গেল, জেলের কর্মচারী এবং সশস্ত্র পুলিশ, আর বোধ হয় গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন। একটু পরেই আমাদের ইয়ার্ডে হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকলেন স্বয়ং লোম্যান সাহেব, একাই—এবং যাদুদা'র সঙ্গে কথা বইতে কইতে বার বার বলতে লাগলেন, ওঃ, তারা কেন আমাকে মারলে না!

লোম্যান যাওয়ার একটু পরেই ওয়ার্ডার এসে খবর দিলে, আই-বি অফিসারেরা আমাদের ইয়ার্ড সার্চ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কাপ্টেন মালেয়া অনুমতি দেননি। ওয়ার্ডারের মুখে স্বস্তির আভাস। মালেয়া নাকি বলেছেন, ব্যাপারটা যখন আমাদের ইয়ার্ডের বাইরে ঘটেছে এবং ইয়ার্ডের দরজার ভিতরেই একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের পাহারা আছে, তখন তিনি এ ইয়ার্ডকে কিছুতেই জড়াতে দেবেন না। লোকটা অসাধারণ!

যাই হোক, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দু'জন মাত্র;—(১) দক্ষিণেশ্বরের ওয়ার্ডার—সে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, তার পক্ষে কে কি করেছে বলা অসম্ভব।

আর (২) হাজতী ইয়ার্ডের ওয়ার্ডার,—সে দূরের দোতলা থেকে দেখেছে, তার পক্ষে লোক চেনা অসম্ভব।

কিন্তু ফাঁসী কয়েক জনকে দিতেই হবে! কাজেই কোর্টে ওদের ওয়ার্ডার সাক্ষী দিলে, অনন্তহরি চাবি কেড়ে নিয়ে দরজা খুলেছে, প্রমোদ মেরেছে, আর বীরেন বাঁড়ুয্যে (বর্তমান কমিউনিষ্ট সদস্য, বিধান সভা) ওদের সাহায্য করেছে। স্বয়ং রায়বাহাদুর চাবি খুলতে বললে হুকুম অমান্য করতে সে পারে না, অথচ কাজটা বে-আইনী। ওয়ার্ডার বেচারী ফ্যাসাদে পড়ে মিথ্যা সাক্ষী দিলে, আর তাকে সমর্থন করে মিথ্যা সাক্ষী দিলে দু'জন পূর্বোক্ত ইউরোপীয়ান কয়েদী, আর একজন মুসলমান কয়েদী, যে আমাদের সখের বেতবোনা শেখাতে আসতো, এবং ঘটনার অনেক আগেই চলে গেছে। এই কয়েদীগুলোকে দণ্ড মকুব করে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

বিচারে প্রথমে তিন জনেরই ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল, পরে আপীলে অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম বহাল রইলো, আর বীরেন বাঁড়ুয্যের ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

এই আপীলের মামলার সময় বিচারক জজ র‍্যাঙ্কিন, পাবলিক প্রসিকিউটর নগেন ব্যানার্জি, এবং আসামী পক্ষের উকীল শৈলেশ বিশী ও মন্মথ সরকার অকুস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন আমাদের বারান্দার সামনে এসেছেন, তখন সংবাদপত্রে একটু প্রচারের মৎলবে উকীলদের লক্ষ্য করে আমি চেঁচিয়ে বললুম, এদের বিচারের একটা নমুনা দেখে যান। আমার একটা সিভিল সুট এক বছরের ওপর ঝুলছে, আমাকে কিছুতেই কোর্টে হাজির হতে দিচ্ছে না, আমার সব দরখাস্ত তারা বাতিল করেই চলেছে। উকিলরা একবার আমার চেনা মুখখানা দেখে নিয়ে গেল।

তারপর থেকে কাগজে মামলার খবর পড়ি আর নজর রাখি, আমার মামলার কথা কিছু কাগজে বেরুলো কি না। হঠাৎ একদিন দেখি যে, আসামী পক্ষের উকীলরা এক চমৎকার থিওরী খাড়া করেছে—ষ্টেট ইয়ার্ড ও ফাঁসির ইয়ার্ডের মধ্যেকার ফুট আটেক উঁচু পাঁচিলের ধারে একটা ছোট আমগাছ আছে, যার সাহায্যে ষ্টেট ইয়ার্ড থেকে ফাঁসির ইয়ার্ডে যাওয়া যায়—এইভাবে ষ্টেট ইয়ার্ড থেকে গলিতে এসে কেউ রায়বাহাদুরকে মেরে যেতে পারে। তেমন লোকও ষ্টেট ইয়ার্ডে আছে, নারাণ ব্যানার্জি—সরকার তার অনেক দরখাস্ত বাতিল করেছে, আর তার মধ্যে রায়বাহাদুরেরও হাত ছিল, এবং সেজন্তে রায়বাহাদুরের ওপর নারাণ ব্যানার্জির রাগ থাকাও স্বাভাবিক!

পড়ে বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলুম,—ফাঁকতালে রাতারাতি বেশ একটু হিরো হিরো ভাব। এই থিওরী নিয়ে জেলার রায়ান সাহেবকে বেশ লম্বা জেরা করা হয়েছে। জবাবে রায়ান বলেছে, নারাণ ব্যানার্জির দরখাস্ত বাতিল হওয়ার কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু যেহেতু ঐ আমগাছটার কাছেই ষ্টেট ইয়ার্ডের দরজার পাশে সর্বদা একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার পাহারা থাকে, অতএব সেখান দিয়ে কারো পক্ষে ফাঁসির ইয়ার্ডে আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া ফাঁসির ইয়ার্ড থেকে গলিতে আসাও অসম্ভব, কারণ দরজা সর্বদা তালাবন্ধ থাকে, এবং ডিঙ্গিয়ে আসারও কোন কায়দাই নেই।

রায়ানের কথাগুলো আরো ভাল লাগলো,—আর আপনাদের খুব সঙ্গোপনে বলি—সেই প্রথম বুঝতে পারলুম, মনের কোণে বোধ হয় একটু উৎকণ্ঠাও লুকিয়ে ছিল।

যাই হোক, আমরা আশা করতুম ফাঁসির হুকুমগুলো নিশ্চয়ই রদ হবে। কিন্তু যখন দুজনের ফাঁসীর হুকুম বহালই রইলো,—তখন থেকে আমাদের মনের ওপর যেন একটা মেঘলা গুমোট ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে উঠলো।

ওদের ওখান থেকে সরিয়ে একটা একতলা ছোট ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—এক সারি সেল,—সকলে দিনরাত পৃথক পৃথক সেলে বন্ধ। সেলগুলোর সামনে দিয়ে একটা লম্বা রাস্তা মাত্র আছে, আর সে রাস্তায় দিনরাত সশস্ত্র ওয়ার্ডার পাহারা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। বাইরের দরজায়ও দিনরাত একজন জমাদার পাহারা আছে।

জায়গাটা আমাদের ইয়ার্ড থেকে বেশ খানিক দূরে,—আমরা রাত্রে চীৎকার করে ওদের গান শোনাতুম, স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনাপূর্ণ গান। আমাদের তালাবদ্ধ জগতে তখন আমি ছিলুম একজন গাইয়ে। আজ যদি আপনারা আমার গান শোনেন, তাহলে কি বলবেন আন্দাজ করতে আমার ভয় হয়। কিন্তু তখন আমিও জোর গলায় গাইতুম,—আর সকলে চুপ করে শুনতোও। পুজো এল,—আমরা মতলব করলুম কিছু ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ওদের অন্ততঃ একটা দিন কিছু খাওয়াতে হবে। যাদুদা' এবং বঙ্গ-ইয়ার্ডের নরেন ঘোষ চৌধুরীর ব্যবস্থায় একদিন রাত দুপুরে মস্ত এক হাঁড়ি রসগোল্লা ইয়ার্ডগুলোর পাঁচিল ডিঙোতে ডিঙোতে চলে গেল ওদের ডেরায়, এবং ওদের সেলে সেলে রসগোল্লা পরিবেশনও হয়ে গেল সুশৃঙ্খলে। যতগুলো ওয়ার্ডার, কয়েদী ওয়ার্ডার, জমাদার—মায় বড় জমাদার পর্যন্ত—সংশ্লিষ্ট ছিল, সবাই বন্ধু হয়ে গেল। কাপড়, তেল, সাবান ও নগদে কিছু খরচও হয়ে গেল। আনন্দও হল।

ক্রমে ফাঁসির দিন এগিয়ে এল। আমরা দরখাস্ত করলুম, অন্য জেলে ফাঁসির ব্যবস্থা হোক,—দরখাস্ত না-মঞ্জুর হল। আবার দরখাস্ত করলুম, ফাঁসির দিন আমাদের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা হোক, হল না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, আমরা কেউ ইচ্ছে করলে রাত্রে হাসপাতালে গিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু সেখানে সকলের জায়গা

আমাদের ইয়ার্ডের দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে ফাঁসির ইয়ার্ডের সবখানিই পরিষ্কার দেখা যায়—দুই ইয়ার্ডের মাঝে আছে একটা ফুট আষ্টেক উঁচু দেওয়াল মাত্র। আর দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের দোতলার বারান্দার কোণায় এসে ওরা দাঁড়ালে আমাদের বারান্দা থেকে কথাবার্তাও চলে।

তখন গোয়েন্দা বিভাগের ডি আই জি ছিলেন লোম্যান—আর তাঁর নীচেই আসল বড়কর্তা, বসন্ত চাটুয্যের পদের উত্তরাধিকারী, ভূপেন চাটুয্যে—যাঁকে হত্যা করার দায়েই অনন্তহরি-প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসি হয়েছিল। তিনি ছিলেন রায়বাহাদুর।

তিনি তখন মাঝে মাঝে রাজবন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। জেলগেটের অফিসে বসে দু'-একজন রাজবন্দীকে একে একে ডেকে পাঠাতেন, এবং কুশলপ্রশ্নের পর একটু গল্পগাছা করে চেষ্টা করতেন, তাঁর কোন প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে একটু আধটু হদিশ সংগ্রহ করতে।

রাজবন্দীরা সরকারের কাছে সরাসরি কোন দরখাস্ত করলে সেগুলো সবই নাকচ হত,—এবং রায়বাহাদুরকে সে কথা বললে, তিনি পরামর্শ দিতেন, আর একখানা দরখাস্ত দিতে আই-বির ডি আই জির মারফং। সেভাবে দরখাস্ত দিলে তার সুফল পাওয়া যেত। আমার মামলা সম্পর্কে অবশ্য এরকমের কোন সৌভাগ্য আমার হয়নি!

যাই হোক,—সুফল দানের এই সুব্যবস্থা করে রায়বাহাদুর রাজবন্দীদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত করেছিলেন, তার সুফলও ক্রমে দেখা দিতে সুরু করলো। রায়বাহাদুর গেটে এসেছেন শুনলেই কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে ইয়ার্ড থেকে খবর পাঠাতেন,—এবং তখন তিনি ডেকে পাঠাতেন। অবশ্য এরকম কাণ্ড সকলেই করতেন না,—বলাই বাহুল্য।

দেখাসাক্ষাৎ বেশ সহজ ও চালু হওয়ার পর ক্রমে রায়বাহাদুর স্বয়ং আমাদের ইয়ার্ডে পায়ের ধুলো দিতে সুরু করলেন। কোন অফিসার জেলের মধ্যে এলে জেল-কানুনের নিয়মে তাঁর দেহরক্ষী হিসেবে একজন ওয়ার্ডারকে সঙ্গে পাঠানো জেল-অফিসারদের ডিউটি। প্রথম প্রথম রায়বাহাদুরের সঙ্গে এমনি দেহরক্ষী ওয়ার্ডার থাকতো। শেষ পর্যন্ত রায়বাহাদুর দেহরক্ষী সঙ্গে নিতে চাইতেন না,—একাই আসতেন। ঘটনাচক্র যেদিন নতুন পথে ঘুরলো, সেদিনও তিনি আমাদের ইয়ার্ডে একাই এসেছিলেন,—অনুশীলন পার্টির নেতা অসুস্থ নরেন সেন ওরফে রামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীকে দেখতে। রায়বাহাদুর অনেক দিন তাঁকে ডেকে পাঠালেও তিনি কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাননি।

দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডের বন্দীরা তাদের দোতালার বারান্দায় বসে গলিপথে রায়বাহাদুরের যাতায়াত দেখতো এবং হয়ত বা কেউ গান ধরে দিতো—'তোরে নেয় না কেন যম।' তরুণদের এহেন তারুণ্য গায়ে মাথার মতন কাঁচা লোকতো রায়বাহাদুর নন! বরং হয়ত তিনি আশা করতেন, এদের মধ্যে কেউ হয়ত ক্রমে একদিন দরখাস্ত নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে, এবং তিনি বাধিত করে তাদের সঙ্গেও খাতির জমাতে পারবেন।

সেদিন ঘটনাটা সুরু হল ঠিক সেই ভাবেই। তিনি যখন আমাদের ইয়ার্ড থেকে বেরিয়েছেন, তখন প্রায় সন্ধ্যা।

হাজতী ইয়ার্ডের দোতলায় তালা লাগাতে যাচ্ছে দেশী ওয়ার্ডার,—আর ইউরোপীয়ান ইয়ার্ডের দোতলার সেলগুলো বন্ধ করছে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার। ওদের বন্ধ করার পর দেশী দক্ষিণেশ্বরওয়ালাদের বন্ধ করবে। তারা তখনও দোতলার বারান্দায় বসে আছে।

আমাদের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার রায়বাহাদুরকে বার করে দিয়ে দরজায় চাবি দিয়েছে ভেতর থেকে। তার পরই দক্ষিণেশ্বরের বারান্দা থেকে কেউ রায় বাহাদুরকে ডেকেছে 'একটু কথা কইতে চাই' বলে। এতদিনে বুঝি সুযোগ এল ভেবে রায়বাহাদুর ওদের দরজায় টোকা মেরেছেন, এবং ভিতর থেকে দেশী ওয়ার্ডার চাবির ফুটো দিয়ে রায় বাহাদুরকে দেখে দরজা খুলে দিয়ে সেলাম করেছে।

সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর থেকে বন্দীদের কেউ বেরিয়ে এসে এক শাবলের বাড়িতে রায়বাহাদুরকে ধরাশায়ী করেছে,—তিনি একবার টুঁ শব্দ করতে পারেননি। কানের ওপর দিয়ে শাবলখানা মাথার হাড়গোড় ভেঙ্গে চৌচাপটে বসে গেছে,—একটা চোখ একেবারে বেরিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ এই বীভৎস কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত ওয়ার্ডারের ধাত ছেড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে,—সে হাতের বাঁশীটা বাজাতেই ভুলে গেছে। হাজতীদের দোতালা থেকে ওয়ার্ডারের নজরে পড়েছে, গলিপথে বুঝি কেউ কাউকে মারছে। দেখেই সে রেওয়াজ মাফিক পাগলা ঘণ্টির নির্দেশক ঘনঘন হুইস্‌লের আওয়াজ ছেড়েছে। তখন দক্ষিণেশ্বরের ওয়ার্ডারের হুঁস হয়েছে, এবং সেও বাঁশী বাজিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সারা জেলে বাঁশীর আওয়াজের সঙ্গে গেটে পাগলা ঘণ্টি বেজে উঠেছে।

পাগলা ঘণ্টি বাজলেই বাইরের গারদ থেকে সকল ওয়ার্ডার ও জমাদারকেই সশস্ত্র হয়ে ছুটে এসে জেলে ঢুকতে হয়। যে যেমন অবস্থায়ই থাক,—তাকে ছুটে আসতেই হবে। হয়ত বা কেউ রুটী বেলতে বেলতে বেলুন নিয়েই ছুটে আসে,—হয়ত কেউ পায়খানার ঘটি হাতেই ছুটে আসে। সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ সশস্ত্র পুলিশের ফাঁড়ি থেকে একদল সশস্ত্র পুলিশ এসে জেলখানা ঘিরে ফেলে। সকলে সব সময় সজাগ আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ পাগলা ঘণ্টি বাজানো হয়, এবং কেউ অনুপস্থিত থাকলে গাফিলতির জন্য তাকে সাজা দেওয়া হয়।

কিন্তু কয়েদীদের যখন প্রায় বন্ধ করা হয়ে গেছে, তখন পাগলা ঘণ্টি, এবং গলির বাঁশীটা যেন একটু তাড়াহুড়ি করে বাজছে, তাতে সকলেরই মনে হয়েছে, একটা কোন বড় রকমের কাণ্ডই ঘটেছে। যে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার ইউরোপীয়ান কয়েদীদের বন্ধ করছিল, সে বারান্দার কোণায় ছুটে এসেছে, সঙ্গে দুজন কয়েদীও এসেছে। তারা গলির দিকে উঁকি মেরে দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল। সেই ওয়ার্ডারই সেই কয়েদীদের বন্ধ করে দক্ষিণেশ্বর ইয়ার্ডে এল, এবং সকলকে নিজ নিজ সেলে হাজির দেখে সেল বন্ধ করে গেল।

পাগলা ঘণ্টি পড়লে আমাদেরও বন্ধ হতে হয়। আমরা কয়েকজনে তখন ব্যাডমিণ্টন খেলছিলুম, বিরক্ত হয়ে ঘরে ফিরলুম। এবং আসার পথে দেখলুম আমাদের ওয়ার্ডার চাবির ফুটো দিয়ে দেখছে। আমিও এগিয়ে গিয়ে তাকে ঠেলে একবার দেখলুম, রায়বাহাদুর গলিতে পড়ে আছেন। ওয়ার্ডার ব্যস্ত হয়ে বললে, চল চল। তার সঙ্গে এসে ঘরে বন্ধ হলুম। সকলে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি? সে শুধু 'রায়বাহাদুর' উচ্চারণ করে ইসারায় বুঝিয়ে দিলে, কাং। পরে দেখে আবার এসে বলে গেল, বোধ হয় শেষ।

সে গিয়ে দরজার পাশের চেয়ারে চুপ করে বসলো। মুখে ভয় ও দুশ্চিন্তার ছাপ। দেখতে দেখতে গলিতে ভিড় হয়ে গেল, জেলের কর্মচারী এবং সশস্ত্র পুলিশ, আর বোধ হয় গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন। একটু পরেই আমাদের ইয়ার্ডে হন্তদন্ত হয়ে এসে ঢুকলেন স্বয়ং লোম্যান সাহেব, একাই—এবং যাদুদা'র সঙ্গে কথা কইতে কইতে বার বার বলতে লাগলেন, ওঃ, তারা কেন আমাকে মারলে না!

লোম্যান যাওয়ার একটু পরেই ওয়ার্ডার এসে খবর দিলে, আই-বি অফিসারেরা আমাদের ইয়ার্ড সার্চ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাপ্টেন মালেতা অনুমতি দেননি। ওয়ার্ডারের মুখে স্বস্তির আভাস। মালেত্তা নাকি বলেছেন, ব্যাপারটা যখন আমাদের ইয়ার্ডের বাইরে ঘটেছে এবং ইয়ার্ডের দরজার ভিতরেই একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারের পাহারা আছে, তখন তিনি এ ইয়ার্ডকে কিছুতেই জড়াতে দেবেন না। লোকটা অসাধারণ!

যাই হোক, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দু'জন মাত্র;—(১) দক্ষিণেশ্বরের ওয়ার্ডার—সে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, তার পক্ষে কে কি করেছে বলা অসম্ভব।

আর (২) হাজতী ইয়ার্ডের ওয়ার্ডার,—সে দূরের দোতলা থেকে দেখেছে, তার পক্ষে লোক চেনা অসম্ভব।

কিন্তু ফাঁসী কয়েক জনকে দিতেই হবে! কাজেই কোর্টে ওদের ওয়ার্ডার সাক্ষী দিলে, অনন্তহরি চাবি কেড়ে নিয়ে দরজা খুলেছে, প্রমোদ মেরেছে, আর বীরেন বাঁড়ুয্যে (বর্তমান কমিউনিষ্ট সদস্য, বিধান সভা) ওদের সাহায্য করেছে। স্বয়ং রায়বাহাদুর চাবি খুলতে বললে হুকুম অমান্য করতে সে পারে না, অথচ কাজটা বে-আইনী। ওয়ার্ডার বেচারী ফ্যাসাদে পড়ে মিথ্যা সাক্ষী দিলে, আর তাকে সমর্থন করে মিথ্যা সাক্ষী দিলে দু'জন পূর্বোক্ত ইউরোপীয়ান কয়েদী, আর একজন মুসলমান কয়েদী, যে আমাদের সখের বেহালা শেখাতে আসতো, এবং ঘটনার অনেক আগেই চলে গেছে। এই কয়েদীগুলোকে দণ্ড মকুব করে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

বিচারে প্রথমে তিন জনেরই ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল, পরে আপীলে অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম বহাল রইলো, আর বীরেন বাঁড়ুয্যের ফাঁসির হুকুম রদ হয়ে হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

এই আপীলের মামলার সময় বিচারক জজ র‍্যাঙ্কিন, পাবলিক প্রসিকিউটর নগেন ব্যানার্জি, এবং আসামী পক্ষের উকীল শৈলেশ বিশী ও মন্মথ সরকার অকুস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন আমাদের বারান্দার সামনে এসেছেন, তখন সংবাদপত্রে একটু প্রচারের মৎলবে উকীলদের লক্ষ্য করে আমি চেঁচিয়ে বললুম, এদের বিচারের একটা নমুনা দেখে যান। আমার একটা সিভিল স্যুট এক বছরের ওপর ঝুলছে, আমাকে কিছুতেই কোর্টে হাজির হতে দিচ্ছে না, আমার সব দরখাস্ত তারা বাতিল করেই চলেছে। উকিলরা একবার আমার চেনা মুখখানা দেখে নিয়ে গেল।

তারপর থেকে কাগজে মামলার খবর পড়ি আর নজর রাখি, আমার মামলার কথা কিছু কাগজে বেরুলো কি না। হঠাৎ একদিন দেখি যে, আসামী পক্ষের উকীলরা এক চমৎকার থিওরী খাড়া করেছে—ষ্টেট ইয়ার্ড ও ফাঁসির ইয়ার্ডের মধ্যেকার ফুট আষ্টেক উঁচু পাঁচিলের ধারে একটা ছোট আমগাছ আছে, যার সাহায্যে ষ্টেট ইয়ার্ড থেকে ফাঁসির ইয়ার্ডে যাওয়া যায়—এইভাবে ষ্টেট ইয়ার্ড থেকে গলিতে এসে কেউ রায়বাহাদুরকে মেরে যেতে পারে। তেমন লোকও ষ্টেট ইয়ার্ডে আছে, নারাণ ব্যানার্জি—সরকার তার অনেক দরখাস্ত বাতিল করেছে, আর তার মধ্যে রায়বাহাদুরেরও হাত ছিল, এবং সেজন্যে রায়বাহাদুরের ওপর নারাণ ব্যানার্জির রাগ থাকাও স্বাভাবিক!

পড়ে বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলুম,—ফাঁকতালে রাতারাতি বেশ একটু হিরো হিরো ভাব। এই থিওরী নিয়ে জেলার রায়ান সাহেবকে বেশ লম্বা জেরা করা হয়েছে। জবাবে রায়ান বলেছে, নারাণ ব্যানার্জির দরখাস্ত বাতিল হওয়ার কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু যেহেতু ঐ আমগাছটার কাছেই ষ্টেট ইয়ার্ডের দরজার পাশে সর্বদা একজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার পাহারা থাকে, অতএব সেখান দিয়ে কারো পক্ষে ফাঁসির ইয়ার্ডে আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া ফাঁসির ইয়ার্ড থেকে গলিতে আসাও অসম্ভব, কারণ দরজা সর্বদা তালাবন্ধ থাকে, এবং ডিঙ্গিয়ে আসারও কোন কায়দাই নেই।

রায়ানের কথাগুলো আরো ভাল লাগলো,—আর আপনাদের খুব সঙ্গোপনে বলি—সেই প্রথম বুঝতে পারলুম, মনের কোণে বোধ হয় একটু উৎকণ্ঠাও লুকিয়ে ছিল।

যাই হোক, আমরা আশা করতুম ফাঁসির হুকুমগুলো নিশ্চয়ই রদ হবে। কিন্তু যখন দুজনের ফাঁসীর হুকুম বহালই রইলো,—তখন থেকে আমাদের মনের ওপর যেন একটা মেঘলা গুমোট ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে উঠলো।

ওদের ওখান থেকে সরিয়ে একটা একতলা ছোট ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—একসারি সেল,—সকলে দিনরাত পৃথক পৃথক সেলে বন্ধ। সেলগুলোর সামনে দিয়ে একটা লম্বা রাস্তা মাত্র আছে, আর সে রাস্তায় দিনরাত সশস্ত্র ওয়ার্ডার পাহারা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। বাইরের দরজায়ও দিনরাত একজন জমাদার পাহারা আছে।

জায়গাটা আমাদের ইয়ার্ড থেকে বেশ খানিক দূরে,—আমরা রাত্রে চীৎকার করে ওদের গান শোনাতুম, স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনাপূর্ণ গান। আমাদের তালাবন্ধ জগতে তখন আমি ছিলুম একজন গাইয়ে। আজ যদি আপনারা আমার গান শোনেন, তাহলে কি বলবেন আন্দাজ করতে আমার ভয় হয়। কিন্তু তখন আমিও জোর গলায় গাইতুম,—আর সকলে চুপ করে শুনতোও। পূজো এল,—আমরা মতলব করলুম কিছু ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ওদের অন্তত: একটা দিন কিছু খাওয়াতে হবে। যাদুদা' এবং বন্ধ-ইয়ার্ডের নরেন ঘোষ চৌধুরীর ব্যবস্থায় একদিন রাত দুপুরে মস্ত এক হাঁড়ি রসগোল্লা ইয়ার্ডগুলোর পাঁচিল ডিঙোতে ডিঙোতে চলে গেল ওদের ডেরায়, এবং ওদের সেলে সেলে রসগোল্লা পরিবেশনও হয়ে গেল সুশৃঙ্খলে। যতগুলো ওয়ার্ডার, কয়েদী ওয়ার্ডার, জমাদার—মায় বড় জমাদার পর্যন্ত—সংশ্লিষ্ট ছিল, সবাই বন্ধু হয়ে গেল। কাপড়, তেল, সাবান ও নগদে কিছু খরচও হয়ে গেল। আনন্দও হল।

ক্রমে ফাঁসির দিন এগিয়ে এল। আমরা দরখাস্ত করলুম, অন্য জেলে ফাঁসির ব্যবস্থা হোক,—দরখাস্ত না-মঞ্জুর হল। আবার দরখাস্ত করলুম, ফাঁসির দিন আমাদের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা হোক, হল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, আমরা কেউ ইচ্ছে করলে রাত্রে হাসপাতালে গিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু সেখানে সকলের জায়গা

হবে না। তখন আমরা পরামর্শ করে স্থির করলুম, সরকার যখন মনে করেছে, আমাদের সামনে ওদের ফাঁসি দিয়ে আমাদের ভয় দেখাবে, তখন আমরা এই বর্ব্বরতার জবাব দোব এইখানে থেকেই—আমরা জয়ধ্বনি করবো, পুষ্পবৃষ্টি করবো, দেখাবো, আমরা ফাঁসি দেখে আরো সাহসই সঞ্চয় করেছি, তাদের বর্বরতা ব্যর্থ হয়েছে।

ফাঁসির আগের রাত্রে সারারাত বন্দে মাতরম্ ধ্বনি এবং স্বদেশী গান চললো—ওরাও বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করে মাঝে মাঝে সাড়া দিয়ে চললো। আমরা প্রচুর ফুল সংগ্রহ করে তোড়া বেঁধে রেখেছি। ভোরবেলা ওদের স্নান করিয়ে নতুন পোষাক পরানো হয়েছে। এদিকে ফাঁসির মঞ্চের ওপর লোহার বীম বসিয়ে দড়ি খাটানো হয়েছে—এক ইঞ্চি মোটা ম্যানিলা রোপ, ডগায় একটা ফাঁস—পাশাপাশি দুটো দড়ি ঝুলছে। কিছু সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট এসেছেন। আমরা দোতলার বারান্দার সামনের জানালায় জানালায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছি।

ওদের ওখান থেকে সমবেত কণ্ঠে আকাশ কাঁপিয়ে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি উঠলো, আমরাও সাড়া দিলুম। দেখতে দেখতে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি এগিয়ে এল নিকটে। তার পরের দৃশ্য অপূর্ব, অভাবনীয়।

পিছনদিকে হাতকড়ি লাগানো দুই জোয়ান দৌড়ে এসে লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে পাশাপাশি দুই গহ্বরের ঢাকনির ওপর বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালো—মুখে মুহুর্মুহুঃ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি। আমরাও প্রতিধ্বনি করে চলেছি এবং জানালা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছি।

দেখতে দেখতে জল্লাদ এগিয়ে এসে ওদের মাথা-মুখ ঢেকে গলা পর্যন্ত টুপি পরিয়ে তার ওপর দড়ির ফাঁস এঁটে দিলে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মাকেন্না রুমাল নেড়ে ইসারায় আদেশ দিয়ে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে চলে গেলেন! জল্লাদ একটা হাতল টেনে দিলে, গহ্বরের ঢাকনি দুটো নেমে গেল, ওদের দেহ দুটো ঝপ করে গহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল,—দড়ি দুটো টান হয়ে ঝুলতে লাগলো!

সব শেষ হয়ে গেল। আমরাও যেন অবসন্ন হয়ে শয্যাগ্রহণ করলুম। বিরাট উত্তেজনার পর নেমে এল যেন এক রিক্ত নিস্তব্ধতা। নীরব কান্না ছিল সকলেরই চোখে। শুধু চট্টগ্রামের নির্মল সেন কেঁদেছিল মেঝেয় লুটোপুটি করে। প্রমোদ ছিল তার ছোট ভাইটির মতন।

তারপরের বিষণ্ন দিনগুলোর মধ্যে আমার সে যুগের চিন্তাধারা রূপ নিয়েছিল এক কবিতায়—এক পরম গৌরবমণ্ডিত শোক-স্মৃতিচিত্ররূপে।

### অনন্ত-প্রমোদ

পরপদ-নিপীড়িত ভারতের মুক্তি
দুজনার এই শেষ উক্তি—
প্রলয়ের কালো মেঘ
ঘূর্ণী ঝটিকা বেগ
তাদের জীবন সাথে ক'রেছিল চুক্তি—
ছিলনাকো তর্ক ও যুক্তি।

গলিত শবের এই শান্তির শ্মশানে
বসেছিল তারা শব-সাধনে
প্রেতের অট্টহাসি
পিশাচের মায়ারাশি
টলাতে পারেনি সেই দৃঢ় শব-আসনে
ভারত-জননী ধ্যান মগনে।

মায়া মরীচিকা করি পদাঘাতে চূর্ণ
যখন সাধনা হল পূর্ণ—
সাধ হল দেখিবারে
জীবনের পরপারে
অচিন গোপন পুরে আছে কোন্ রত্ন
আঁধার জলধিতল মগ্ন।

মৃত্যুর ডাক শুনি' উল্লাসে মত্ত
জীবনের সেই সার সত্য—
ছুটিয়ে লাফায়ে আসি
দাঁড়াইল পাশাপাশি
গলায় পরাতে ফাঁসি চির অভ্যস্ত
জল্লাদ কম্পিতহস্ত।

বন্দে মাতরম্ আনন্দে গাহিল
জননীর পদযুগ স্মরিল—
হাসি হাসি দুই বীর
গর্বোন্নত শির—
মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপ দিয়া পড়িল
জয় রবে ত্রিভুবন ভরিল।

জননীর মান বেচে উদরের জন্য
এ জগতে যেই পাপী ঘৃণ্য—
তাদের শিক্ষা দিতে
নিজ প্রাণ ডালি দিতে
জননী-ভক্ত বীর নাহি হল ক্ষুণ্ন
ধন্য রে বীর তোরা ধন্য।

ছুটে আয় কে আছিস জননীর ভক্ত
ঢেলে দিতে হৃদয়ের রক্ত—
যারা আজ গেল চলে
অপূর্ণ কাজ ফেলে
ঐ ডাকে তাহাদের আত্মা অতৃপ্ত
ছুটে আয় জননীর ভক্ত।

* * * *

আমার নিজের মামলারও যথাসময়ে যবনিকাপাত হল অত্যন্ত মামুলী ট্রাজেডীতে—একতরফা ডিক্রী হয়ে। বন্দিদশা থেকে সেবার যখন মুক্ত হলুম, তখন সর্ববন্ধনমুক্ত হয়ে এসে দাঁড়ালুম একেবারে পরিষ্কার শানবাঁধানো ফুটপাথে। [ক্রমশঃ

# প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাপদ্ধতি

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

শিক্ষার ইতিহাস মানুষের মর্য্যাদার ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির ইতিহাস। পৃথিবীর প্রত্যেকটি সভ্য দেশের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্ত পরিবর্ত্তন ও রূপায়নের মূলে রহিয়াছে শিক্ষা ও শিক্ষার প্রভাব। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানত ধর্মকেন্দ্রিক—পার্থিব বন্ধন হইতে মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভের পন্থা মাত্র। ফলে, 'ধর্ম্ম ও তাহার বিস্তারিত অনুষ্ঠানাদি হিন্দুযুগের শাস্ত্রকারগণকে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে, আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্য লইয়াই ধর্ম্ম শিক্ষাধারাকে নিরূপিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

নৈষ্ঠিক ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মাচরণের দ্বারা প্রভাবান্বিত এই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে তৎকালীন সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্ত্তনের একটি সুনিয়মিত ধারা পরিলক্ষিত হইলেও শ্রমজ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যথেষ্ট পরিমাণে অস্পষ্ট ও সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। অবশ্য বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্য, বৈদেশিক পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, শিলালেখন প্রভৃতির খণ্ড প্রমাণাদি ও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ হইতে শিল্প ও বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা চলে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষাকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে। বৈদান্তিক, শিল্প-বাণিজ্যিক ও রম্যকলা সম্বন্ধীয় শিক্ষার মধ্যে অর্থ উপার্জ্জনের দিক দিয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিবেচিত হইত। চৈনিক পরিব্রাজক ই-ৎসিং চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের মূল্য নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'নীরোগ দেহই সুস্থ জীবন যাপনের উপায়। সুতরাং শরীরকে নীরোগ রাখিতে হইলে ভেষজ-শাস্ত্র অধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য।'

সিন্ধু সভ্যতার যুগ হইতেই ভারতবর্ষে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চ্চা প্রচলিত ছিল। সে যুগে অজীর্ণ-রোগ, বহুমূত্র, অন্ত্রপীড়া ও বাত-প্রদাহে শিলাজিৎ, চক্ষু কর্ণ, গলদেশ ও চর্ম্মের রোগে জীবাস্থি ব্যবহৃত হইত। হরিণ ও গণ্ডারের শৃঙ্গও ভেষজরূপে পরিগণিত হইত এবং প্রবাল ও নিম্বপত্রেরও আয়ুর্ব্বেদিক মূল্য স্বীকৃত ছিল।

ঋগ্বেদে বর্ণিত শিক্ষাপদ্ধতি প্রধানতঃ আত্মকেন্দ্রিক হইলেও জনকল্যাণমূলক অর্থকরী শিক্ষা একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। বৃত্তিশিক্ষা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্তোত্রাদি হইতে ইহার প্রচলন প্রমাণ করা যায়। একটি স্তোত্রে উল্লিখিত আছে, 'আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিভিন্ন বৃত্তি অনুসরণ করি। আমি কবি, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা আদর্শগৃহিণীস্বরূপা, শস্যচূর্ণকারিণী। ভিষক্ পিতা নিশ্চয়ই অর্থ উপার্জ্জন মানসে রোগ নিরাময় বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অন্য বহু স্তোত্র হইতে জানা যায় যে, বৈদিক যুগে ভেষজ-বিজ্ঞান চর্চ্চায় বিভিন্ন ওষধির গুণাগুণ বিচার ও রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা বহুলাংশে ঐশী শক্তির উপর ন্যস্ত হইলেও আর্য্যগণ চিকিৎসাবিদ্যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল না। জলমগ্ন মৃতপ্রায় রেব ঋষির প্রাণসঞ্চার, চ্যবন ঋষিকে যৌবনশক্তি দান, পরাত্রিজের অন্ধত্ব ও খঞ্জতা মোচন এবং পঙ্গু বিশপালের লৌহপদ স্থাপন আর্য্যগণের চিকিৎসাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। শেষোক্ত ঘটনা শল্য-চিকিৎসার একটি চমৎকার উদাহরণ।

ভারতীয় ভেষজ-শাস্ত্রের আদিগ্রন্থ অথর্ববেদে জ্বর, কুষ্ঠ, ক্ষত, ক্ষয়কাশ, উন্মাদ রোগ, গণ্ডমালা, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য, আক্ষেপ, বিদ্রধি, পাণ্ডু, বাতপ্রদাহ, কফপিত্তজনিত পীড়া, চক্ষুরোগ, পুরুষত্বহীনতা, সর্পদংশন বিষপান প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের উল্লেখ ও তাহাদের প্রতিষেধক ঔষধের উল্লেখ আছে। সুদীর্ঘ অনুশীলন ও ব্যাপক গবেষণার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বৈদিক ঐতিহ্য বহন করিলেও যথেষ্ট পরিমাণে সুনিয়মিত ও বিধিবদ্ধ হইল। শিক্ষালাভের জন্য পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষার্থী গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করায় তাহার গতানুগতিক জীবনধারায় এক বিরাট পরিবর্ত্তন সূচিত হইল। সাধারণ পুঁথিগত শিক্ষায় যে ধারণা ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ব্যবহারিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া সামরিক ও চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষায় সেই বিধিগুলি কঠোরভাবে অনুসৃত হইল।

সুশ্রুতসংহিতার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী একটি বিশেষ উপনয়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গুরুগৃহে প্রবেশাধিকার লাভ করিত। চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণেচ্ছু প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর দৈহিক ও নৈতিক কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা অত্যাবশ্যক ছিল। তাহাদের অবয়বাদি হইবে সুগঠিত ও সুদৃঢ়। তাহারা হইবে সাহসী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন, বিনয়নম্র ও শ্রমসহিষ্ণু এবং তাহাদের চিন্তাধারা ও কর্ম্মানুষ্ঠানে থাকিবে ধৈর্য্য, উৎসাহ, তিতিক্ষা ও নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি।

শুভদিনে বিস্তারিত যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা শিক্ষার্থী শিক্ষারম্ভের অধিকার পাইত। সুসংস্কৃত বেদীর সম্মুখে দধি মধু ও ঘৃতসিক্ত খদির, পলাশ, দেবদারু ও বিল্ব বৃক্ষের সমিধ দ্বারা হোমযজ্ঞ অনুষ্ঠান

শেষে প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও ইন্দ্রাদি দেবগণকে আবাহনের পর আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের পুরোধা ধন্বন্তরি, ভরদ্বাজ, আত্রেয়, পরাশর, হারীত, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন ঋষিদের অর্চনা করা হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের যে কোন শিক্ষার্থীই উপযুক্ত বিবেচিত হইলে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার পাইত।

উপনয়ন অনুষ্ঠানের শেষে গুরু শিক্ষার্থীকে অগ্নিসাক্ষী করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধি-নিষেধ পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইতেন।

১। ছাত্রাবস্থায় প্রতিটি শিক্ষার্থী কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, আলস্য ও আত্মঅহমিকা জয় করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গের মহান ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

২। শিক্ষাশেষে চিকিৎসক হইয়া সে বিনা পারিশ্রমিকে দ্বিজ আচার্য্য, অনাথ, আতুর, সন্ন্যাসী, সহকর্মী ও অতিথি-অভ্যাগতের রোগ পরীক্ষা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিবে।

৩। অশুচি ও পাপাচারীর চিকিৎসা সে কদাপি করিবে না।

৪। শিক্ষার্থী হইবে দেহ-মনে পবিত্র ও সংস্কারমুক্ত। চিকিৎসক হিসাবে অন্তঃপুরিকাদের অঙ্গস্পর্শের অধিকার জন্মিবে বলিয়া তাহার চরিত্র হইবে উদার ও কালিমাশূন্য।

শিক্ষার্থীকে ছয় মাসকাল পর্যবেক্ষণ ও বুদ্ধি-অভীক্ষার পর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে চরম প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত। সাধারণতঃ সপ্তবর্ষব্যাপী অধ্যয়নকাল নির্দ্দিষ্ট ছিল।

কতকগুলি বিশেষ দিনে অনধ্যায় বা শিক্ষা-বিরতি ঘটিত। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে, প্রত্যুষে ও সন্ধ্যাকালে, বজ্র বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জনের সময়ে, শ্মশানভূমি ও বধ্যভূমির সন্নিকটে, যুদ্ধক্ষেত্রে, জাতীয় উৎসব দিবসে ও অশুভ সূচনায় শাস্ত্রপাঠ ও শিক্ষাদান বন্ধ থাকিত।

গুরুগৃহে প্রবেশলাভের পর ছাত্রেরা চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিত। শিক্ষার্থীকে বহুবিভক্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্রের শুধুমাত্র একটি বিভাগে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলে চলিত না, তাহাকে বহুশাস্ত্রজ্ঞ হইতে হইত। মিলিন্দ পঞ্‌হো ও ই-ৎসিংএর সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, শিক্ষাগ্রহণ কালে প্রত্যেকটি ছাত্রকে বিভিন্ন রোগের কারণ নির্ণয়, রোগের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসাবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শিক্ষা দেওয়া হইত। অস্ত্রোপচার শিক্ষাদান প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীকে প্রথমে ছুরিকা ধারণ ও ছুরিকামুখ প্রবিষ্টকরণ পদ্ধতি বিস্তারিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান শোধনপদ্ধতি, পচননিরোধক প্রলেপ প্রয়োগ-বিধি শিখান হইত। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচারে তৎপরতার প্রতিও সম্যক দৃষ্টি রাখা হইত।

মহাবর্গ জাতকে উল্লিখিত সুবিখ্যাত চিকিৎসক কৌমারভৃত্য জীবক কর্তৃক রাজগৃহনিবাসী জনৈক শ্রেষ্ঠীর মস্তিষ্কপীড়ায় করোটিতে এবং বারাণসীর এক বণিকপুত্রের আকস্মিক পতন হেতু জড়িত অন্ত্রকে সুসন্নিবেশ করিবার জন্য উদরে অস্ত্রোপচার প্রাচীন ভারতে শল্য-চিকিৎসার অগ্রগতি সম্বন্ধে সার্থক প্রমাণ বহন করিতেছে। দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ না করিলে এইরূপ দক্ষতা অর্জ্জন করা কখনও সম্ভব হইত না। চরকসংহিতার মতানুসারে শিক্ষার্থিগণকে ব্যাধি-বিজ্ঞান, নরদেহতত্ত্ব, ভ্রূণতত্ত্ব, আরোগ্য-বিজ্ঞান, বিষ-বিজ্ঞান, শব-ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি, বাল-চিকিৎসা-বিধি ও ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষাদান করা হইত।

মহামতি সুশ্রুতও এই পাঠ্যসূচী অনুমোদন করিয়াছে। ইহা ছাড়া বিশেষ ক্ষেত্রে পশুচিকিৎসা পদ্ধতিও পাঠ্যসূ অন্তর্গত ছিল। অঙ্গরাজ রোমপাদ ও ঋষি পালকাপ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে রচিত হস্তি-চিকিৎসার প্রামাণ্য 'হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ' ও ঋষি শালিহোত্র রচিত 'অশ্বশাস্ত্র' তৎকা পশু-চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছে। নাগার্জ্জুন রচিত 'রসরত্নাকর' গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করা যায় চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্রমোন্নতির সহিত পারদাদি ধাতুর ব্যবহা আরম্ভ হয়। দীর্ঘায়ু ও যৌবনশক্তি লাভকল্পে বিভিন্ন ধ ঘটিত সুরাসার প্রস্তুত প্রণালীও শিক্ষা দেওয়া হইতে থাকে।

ভেষজ-বিজ্ঞানের ছাত্রকে কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষাল করিলেই চলিত না। তাহাকে একাধারে শাস্ত্রে ও কর্ম্মে অভিজ্ঞ লাভ করিতে হইত। একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক আয়ুর্বে শাস্ত্রসমূহে পণ্ডিত হইবেন এবং তাঁহার অর্জ্জিত পাণ্ডি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযুক্ত হইবে—ইহাই আদর্শ বলি গৃহীত হইত। প্রতিটি শিক্ষার্থী অধ্যয়নকালে এই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া চলিত। প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য চিকিৎসা ছিল। ছাত্রেরা তথায় চিকিৎসা পদ্ধতি ও ছেদন-বিদ্যায় ব্যবহারি শিক্ষালাভ করিত।

জাতকসূত্র হইতে জানা যায় যে, শিক্ষার্থিগণ ইচ্ছা করিলে কো একটি বিশেষ চিকিৎসায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিত। এ প্রসঙ্গে সর্পাঘাতের চিকিৎসক, উদর ও চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞের উল্লে দেখা যায়।

পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ ও ই-ৎসিং বলিয়াছেন, বৈদান্তিক ও বৌদ্ধশাস্ত্রে শিক্ষালাভের সহিত প্রতিটি ছাত্রকে কতকগুলি ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করিতে হইত। এইগুলির মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন অন্যতম। ই-ৎসিং নিজে চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কুমারজীব, গুণভদ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ধর্মশিক্ষকেরা বাধ্যতামূলক শিক্ষা হিসাবে চিকিৎসাবিদ্যায় প্রাথমিক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ভেষজ-বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়।

কৌমারভৃত্য জীবকের জীবনকথা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সপ্তবর্ষব্যাপী অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীকে ব্যবহারিক ও লিখিত পরীক্ষা দিতে হইত। কথিত আছে, আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য আত্রেয় জীবককে শিক্ষাশেষে চারিদিন তক্ষশীলা নগরীর চতুষ্পার্শ্বে দুই যোজন ভূখণ্ড চক্র দিয়া সেস্থানে যতপ্রকার তরুলতা-গুল্ম দৃষ্ট হইবে, সেগুলি পরীক্ষান্তে তাহাদের ভেষজ গুণাগুণ নির্ণয় করিতে বলিয়াছিলেন। পরীক্ষাশেষে জীবক বলিয়াছিলেন যে, উদ্ভিদজগতে কোথাও একটিও নির্গুণ লতাগুল্ম নাই। আচার্য্যদেব শিষ্যের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কৌমারভৃত্য উপাধিতে বিভূষিত করেন। উপরোক্ত কাহিনী হইতে আমরা চিকিৎসাবিদ্যায় চরম পরীক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সুন্দর ধারণা করিতে পারি এবং শিক্ষার্থীর উচ্চ পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হই।

আয়ুর্ব্বেদিক শিক্ষার্থীর জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকাবলীর মধ্যে

'অথর্ববেদ,' 'চরকসংহিতা' ও 'সুশ্রুত-সংহিতা' আদিগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। অপরাপর প্রামাণ্য গ্রন্থের মধ্যে কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত দৃঢ়বল রচিত চরক-সংহিতার পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত সংস্করণ, নাগার্জ্জুন ও চন্দ্রট বিরচিত সুশ্রুত-সংহিতার সংশোধিত সংস্করণ, চরক ও সুশ্রুত লিখিত সংহিতাদ্বয়ের আলোকে রচিত 'ভেলসংহিতা,' বাগভট রচিত 'অষ্টাঙ্গসংগ্রহ' ও 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংগ্রহ', মাধবকর লিখিত 'মাধব-নিদান', বৃন্দ রচিত 'সিদ্ধিযোগ' বা 'বৃন্দমাধব', চক্রপাণি ও বঙ্গসেন বিরচিত গ্রন্থদ্বয়, ধন্বন্তরি রচিত ভেষজ-অভিধান 'নিঘণ্টু', কাশ্যপ রচিত নিঘণ্টুর পুনর্লিপিত সংস্করণ, রসশাস্ত্রজ্ঞ নাগার্জ্জুনের 'রসরত্নাকর,' চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের 'অভিলষিতার্থ চিন্তামণি' বা 'মানসোল্লাস' ও অমর রচিত 'অমরকোষ' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষাদানের কেন্দ্ররূপে তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা ও বলভী সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ভিষকপ্রবর জীবক তক্ষশীলায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে তক্ষশীলা নগরী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং তথায় শিক্ষালাভ মানসে বহু দূরবর্ত্তী জনপদ হইতে শিক্ষার্থিগণ উপস্থিত হইত। আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলেও মেধাবী ও তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছাত্রকে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিয়া উৎসাহিত করা হইত। নালন্দা, বিক্রমশীলা ও বলভী বিশ্ববিদ্যালয়েও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের সহিত ছাত্রেরা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। এই প্রসঙ্গে হিউয়েনসাঙ ও ই-ৎসিং-এর বিবরণী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নকালে প্রতিটি শিক্ষার্থী যাহাতে রোগবিমুক্ত দেহ ও মন লইয়া পরম স্বচ্ছন্দতার সহিত যথোচিত শারীরিক ও মানসিক শ্রম করিতে পারে, সেই জন্ম তাহাকে ব্যক্তিগত পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের কতকগুলি নিয়ম পালনে শিক্ষা দেওয়া হইত। গৃহ্যসূত্র ও অগ্নিপুরাণে নিয়মিত দন্তধাবন, নিত্যস্নান, আবাসগৃহের পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষণ, নির্দিষ্ট স্থানে নিষ্ঠীবন ও আবর্জ্জনাদি নিক্ষেপ সম্বন্ধে বহুবিধ উপদেশ ও নির্দেশ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন্ সাঙ্ও ই-ৎসিং এবং আরবদেশীয় লেখক সুলেমান ও ইবন অল ফাকী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে দেশজ সাহিত্যের উপরোক্ত নির্দ্দেশগুলিকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন।

প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদীয় শিক্ষালাভের রীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে সেবক বা পরিচারক সম্বন্ধে কিছু না বলিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। রোগী বা রোগিণীর ব্যাধি নিরাময়ের জন্ম সুচিকিৎসার সহিত সুনিয়মিত সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন—এ কথা সে যুগেও স্বীকৃত হইত। সেই কারণে পারদর্শী সেবক বা পরিচারকের অভাব ছিল না। প্রত্যেকটি সার্থক শুশ্রূষাকারীকে নানা সদ্গুণে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইত। শুশ্রূষাকারী হইবে সুদেহী, ধৈর্য্যশীল, স্নেহময়, সদাপ্রফুল্ল ও সহানুভূতিপ্রবণ। চিকিৎসক প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ প্রণালীতেও তাহাকে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, তাহারই উপর চিকিৎসকের সুনাম নির্ভর করিতেছে। তাহার প্রাণময় সেবাই পীড়িতের মনে আনিতেছে ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের শক্তি ও রোগমুক্তির আশা।

এই প্রসঙ্গে 'মহাবর্গ' জাতকের একটি কাহিনী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একদা আনন্দ সমভিব্যাহারে ভগবান বুদ্ধ সঙ্ঘারামের ভিক্ষুদের বিশ্রামস্থানগুলির নৈশ পরিদর্শনকালে জনৈক পীড়িত ভিক্ষুকে একাকী পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখিয়া আনন্দের সাহায্যে তাহার সেবাশুশ্রূষা করেন। পরদিন তিনি সঙ্ঘের সভা আহ্বান করিয়া পীড়িতের সেবাশুশ্রূষা সম্বন্ধে সমগ্র ভিক্ষু সম্প্রদায়কে নির্দ্দেশ দান করেন ও বিস্তারিত নিয়মাবলীর প্রবর্ত্তন করেন। ধর্মশিক্ষালাভের সহিত প্রত্যেকটি ভিক্ষুকে সেবাব্রতের দীক্ষা লইতে হইবে। তাহাকে রোগবিশেষে ঔষধ প্রয়োগের প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। পীড়িতের উপযুক্ত পথ্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাকে পরিবেশন করিতে হইবে। সমস্ত প্রাপ্তির বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া সংস্কার ও ঘৃণামুক্ত হৃদয়ে তাহাকে পীড়িতের সেবা করিতে হইবে। তাহার মধ্যে একাধারে থাকিবে মাতৃবৎ স্নেহ, বন্ধুবৎ প্রীতি ও ভৃত্যবৎ আনুগত্য"।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নারী সেবিকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য নারীরত্ন বিশাখা কর্ত্তৃক পীড়িত ভিক্ষুদিগকে ও শুশ্রূষাকারিণীদিগকে ঔষধ ও পথ্য দানের কথা আমরা জাতককাহিনী হইতে জানিতে পারি।

'অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংগ্রহ' হইতে আমরা তৎকালীন ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারি। প্রত্যেকটি ঔষধ হইবে বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদযুক্ত, রুচিকর, সুনির্ব্বাচিত, সুপরিমিত ও আশু ফলপ্রদায়ী।

রোগ হইতে দ্রুত মুক্তিলাভ করিবার জন্ম রোগীকেও যথেষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি রোগী হইবে নির্লোভ ও ঈশ্বরবিশ্বাসী এবং সে বিনা প্রতিবাদে চিকিৎসকের নির্দ্দেশাবলী পালন করিবে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, অপরাপর বিজ্ঞানের ন্যায় ভেষজ-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। তখনকার দিনে সমস্তই আত্মকেন্দ্রিক ধর্ম্মের অনুশাসনের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকায়, চিকিৎসাবিদ্যা চর্চ্চার নিয়মাবলী ধর্ম্মাচরণের অঙ্গরূপেই পরিগণিত হইত। কিন্তু যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান যখন ধর্ম্মের ও সংস্কারের বন্ধন ভাঙ্গিয়া বিশুদ্ধ যুক্তির পথে পরীক্ষালব্ধ সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, তখন চিকিৎসা-শাস্ত্রও নিজেকে সরল ও সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে মুক্ত করিয়া বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণক্রিয়ায় সংযুক্ত করিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বর্ত্তমান ইতিহাস সেই পরিবর্ত্তিত ইতিহাস।

---

এই প্রবন্ধ রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লওয়া হইয়াছে :

1. The History & Culture of the Indian people—Volumes, I, II, III & IV—Edited by Shri R. C. Majumdar & Shri A. D. Pusalker.
2. Hindu Civilization—Shri R. K. Mookerji.
3. Ancient Indian Education—Shri R. K. Mookerji.
4. Education in Ancient India—Shri A. S. Altekar.
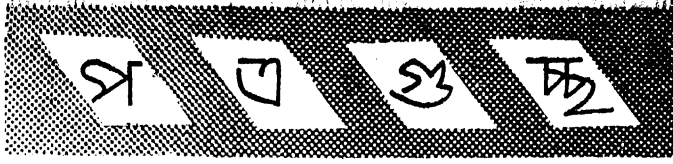
## আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও স্বীয় শিষ্য স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে লেখা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী

১

ওঁ

গাজীপুর

২৮ পৌষ ১৭৯১ শক

প্রীতিভাজনেষু,

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

তোমার ২ অগ্রহায়ণের পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা ৩০ কার্ত্তিকের বেহালায় ব্রহ্মোৎসবের আনন্দ উপভোগ করিলাম। ৩০ কার্ত্তিকে যদিও আমার দুর্ব্বল শরীর তোমাদের সন্নিধানে যাইতে পারি নাই, তথাপি আমার মন তথায় বিচরণ করিতেছিল। আমি তো অল্পে অল্পে এ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ১১ মাঘের উৎসব তোমার হৃদয়ের উৎসাহের উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি ও উদার ভাব ও সবিনয় বাক্য সেদিন অনেক কার্য্য করিবে। তোমার মঙ্গল হউক, তোমার সাধু কামনা সকল পূর্ণ হউক। ইতি—

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

২

জলন্ধর

২৫ ফাল্গুন, ১৭৯১ শক

প্রীতিভাজনেষু,

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

তোমার সুবিস্তার পত্রসকল নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি। হৃদয়-মন-প্রাণে তুমি ব্রাহ্মধর্ম বিস্তারের জন্য দিবানিশি যে পরিশ্রম করিতেছ, ঈশ্বর তাহার ফল মুক্তহস্তে বিধান করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার যাহার সঙ্গে একবার আলাপ হয়, তাহাকেই তুমি তোমার হৃদয়ের গুণে বদ্ধ করিয়া রাখ। এই প্রকারে ক্রমাগত তোমার বন্ধুবর্গের বৃদ্ধি হইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে তোমার বলবৃদ্ধি হইতেছে। আমি তোমাকে সর্ব্বদা পত্র লিখিতে পারি বা না পারি তোমার পত্র যেন আমি নিয়তই পাই, এই আমার প্রার্থনা। তুমি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগ্রত হইয়া আছ এবং আমার আন্তরিক বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্যের প্রশস্ততা তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বর তোমার শরীর-মন-আত্মাকে নিয়তই বলবীর্য্য প্রেরণ করুন।

ইতি—

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

৩

ওঁ

ধর্ম্মশালা

১ বৈশাখ, ১৭৯২ শক

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ।
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ।
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ॥

প্রীতিভাজনেষু,—

অদ্য নববর্ষের প্রথম দিনে তোমাকে সমালিঙ্গন করিয়া নমস্কার করিতেছি। তোমার প্রতি আমার মনের প্রীতি ও আদর গ্রহণ কর। এই ১৭৯২ শকেও এই দেহপঞ্জর মধ্যে থাকিয়া এই ভূলোক হইতে তোমাকে যে এই পত্র লিখিতেছি—এই-ই আশ্চর্য্য—

বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে !!!

চৈত্র মধুমাসে তিনখানি তোমার মধুময় পত্রদ্বারা সর্ব্বত্র কুশল সংবাদ পাইয়া মনের উল্লাসে আছি। তোমার পিতৃশ্রাদ্ধ শ্রীযুক্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে—শ্রীরামবাবু প্রভৃতি বন্ধুবর্গের যত্নে তোমার আবাসবাটীর কণ্টকোদ্ধার হইয়াছে—ব্রাহ্মণ সদ্বংশজাত শাস্তপ্রকৃতি ব্রাহ্মদিগের আন্তরিক অনুরাগে বেহালা ব্রাহ্মসমাজ উত্তম চলিতেছে—ইহা তোমার হৃদয়ের সদ্ভাবের ফল। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগের প্রতি এ প্রকার প্রসাদ বিতরণ করেন যে, তাহার শত্রুরা ভয় পায় ও বন্ধুরা আকৃষ্ট হয়।

"তং প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত প্রতিষ্ঠাবান ভবতি। তন্মহইত্যুপাসীত মহান ভবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত মানবান্ ভবতি। তন্নম—ইত্যুপাসীত নম্যন্তেস্মৈ কামাঃ। তদ্‌ব্রহ্মেত্যুপাসীত ব্রহ্মবান্ ভবতি।"

জিতেন্দ্রনাথ ও পাকড়াশীর পরামর্শে বর্দ্ধমানের ট্রাষ্টডীড প্রস্তুত করিবে এবং তাহার ব্যয় জ্যোতির নিকট হইতে লইবে।

ভবানীপুর লণ্ডন মিশনারী সংক্রান্ত খৃষ্টিয়ানদিগের কীর্ত্তন শুনিয়া অতীব কৌতুকাবিষ্ট হইলাম। এইক্ষণে হরিসভার উপায় কি?

হেমেন্দ্রের রচিত নূতন গান একটি অদ্য তোমাকে উপহার দিতেছি—

আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি,
হৃদাকাশ মাঝে শত চন্দ্রমা বিরাজে।
দেখ রে অনুপম ভাবসুন্দর মধুময়;
এক দৃষ্টে আত্মার পানে মাতা হয়ে
অবনত আছেন প্রেমভাবে তাকায়ে
শূন্য পূর্ণ আজি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

৪ ধর্মশালা
২৫শে আষাঢ়, ১৭৯২ শক

প্রীতিভাজনেষু,

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

বর্ষশেষের দিনে তুমি আদি সমাজে যে উপদেশ দিয়াছিলে তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল, তাহাতে নিষ্প্রয়োজনীয় কথা একটিও নাই। তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্যামবাজারের ব্রাহ্মসমাজের জন্য তুমি এত পরিশ্রম করিয়াও তাহার নেতা হইতে পারিলে না, ইহা অতি দুঃখের বিষয়।

অগ্রসর ব্রাহ্মেরা খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদিগের অনুকরণ করিতে ভালবাসেন এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের টিকি কাটিতে চান ও সমাজকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলেন; তুমি আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে উপাসনার সময়ে খালি পায়ে উপাসকদিগের সহিত একাসনে বসাইয়া সমাজের গৌরব রক্ষা করিয়াছ। ইহা তোমারই কাজ। ঐ সাহেবকেও ভক্তিমান ও বিচক্ষণ বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুমি আর একটি পুত্রের মুখদর্শন করিয়াছ ঈশ্বর তোমাকে প্রজার দ্বারা কীর্ত্তির দ্বারা মহান করিতেছেন। তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কি নাম রাখিয়াছ এবং তাহার বয়স কত হইল? তোমার পুত্রেরা দীর্ঘায়ু হইয়া যথাকালে ঈশ্বরপ্রেম লাভ করিয়া ভাগ্যবান হউক এই আমার আশীর্বাদ। নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

৫
ওঁ

প্রীতিভাজনেষু—

নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে তুমি যে প্রকার উৎসাহের সহিত নূতনরূপে সূত্রপাত করিতেছ ইহাতে আমি অতীব সন্তুষ্ট হইতেছি। ঈশ্বর তোমাকে চিরজীবী করিয়া এই দুর্ভাগা বঙ্গদেশের শ্রী ও ধর্ম্মের উন্নতি করুন। এই আমার প্রার্থনা। তুমি যাহা কল্যাণ বলিয়া জানিবে তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবে। ঈশ্বর তোমার শুভ সংকল্প সিদ্ধ করিবেন। ইতি— শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

৬
ওঁ তীরা পর্ব্বত
২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৩ শক

সুসম্পাদেষু—

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

তোমার পত্র সকল এই অরণ্যমধ্যে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভিষিক্ত করিতেছে। আমার প্রতি তোমার যে প্রকার অটল অনুরাগ ইহাতে আমার স্নেহ তোমার প্রতি সহজেই ধাবিত হইতেছে। তোমার হৃদয় মন প্রসন্ন থাকুক, তোমার সকল কামনা পূর্ণ হউক, তোমার জয় হউক।

গোকুলকৃষ্ণ বাবুর যেমন হৃদয় তেমনই কার্য্য। তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠা ও সদ্ব্যবহারে তিনি সকলের মনকেই আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার নম্রতা, তাঁহার বিনয়ে সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছে। তাঁর মনের ভক্তির প্রভাবে সমাজ স্থলে উপাসনা সময় দীপমালা ও উজ্জ্বল ও পরিশোভিত হইয়াছিল। এমত স্থলে তোমার সম্যক পরিতুষ্ট হইবে না তো আর কোথায় হইবে?

তুমি লিখিয়াছ, ব্রাহ্ম বিবাহের নিয়ম লইয়া মহা গোলযোগ হইতেছে। তোমরা তাহার প্রতিবাদের চেষ্টা করিতেছ—উত্তম। কত লোকের স্বাক্ষর সেই নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা আমাকে জানাইবে। সারদা ও নবগোপাল বাবু এতদিনে কি সিমলাতে সেই আবেদনপত্র লইয়া যান নাই?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

৭ বাক্রোটা শেখর
ওঁ ২১ আষাঢ় ১৭৯৩ শক

প্রীতিভাজনেষু

সাদর নমস্কার—

বিশ্বাসের নিকট হইতে তোমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অবধি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। পরে তোমার এই ২২ আষাঢ়ের পত্র পাইয়া প্রাণ পাইলাম। তোমার শরীরের উপর তুমি কিছুই যত্ন কর না। কখনো ঝড়ের মধ্যে যাইয়া হাত ভাঙ্গো, কখনো বা বৃষ্টিতে ভেজ, হয়তো উপরি উপরি রাত জাগো, ইহাতে শরীর কি প্রকারে ভালো থাকিতে পারে? সাবধান হইয়া চলিবে, সম্প্রতি অধিক পরিশ্রম করিবে না।

তারপরে ব্রাহ্মবিবাহের আইন হইবার বিষয় কি শুনিয়াছ আমাকে অবগত করিবে।

রাজনারায়ণ বাবু মধ্যে মধ্যে পাদ্রি-ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমাকে লিখিয়াছেন—আমি তাঁহাকে এই উত্তর দিয়াছি—

"তুমি এখন এক-একদিন সমাজের প্রকাশ্য উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত আছ—অতি আহ্লাদের সহিত ইহাতে আমি অনুমোদন করিতেছি"—অতএব তুমি তাঁহার সঙ্গে উপাসনা করিবার জন্য এক বুধবার প্রথমতঃ স্থির করিবে এবং সেদিন তাঁহাকে তুমি সমাদরপূর্ব্বক বেদীতে বসাইয়া দিবে··

ইতি— শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

৮ অমৃতসর
ওঁ ১৭ পৌষ ১৭৯৩ শক

প্রীতিভাজনেষু—

সাদর নমস্কার—

তোমার পত্রসকল প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের যে বর্ণনা করিয়া আমাকে সবিশেষ সকল সংবাদ অবগত করিয়াছ, তাহাতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সমান আমার নিকটে সে সকল প্রতীতি হইল। ইহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছি। এই ক্ষণে ১১ মাঘের উৎসব নির্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে হয়।

রবীন্দ্র প্রভৃতি বালকেরা বেহালাতে পারায়ণে যে যোগ দিয়াছিল তাহা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। তাহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম কি প্রকার শিক্ষা হইতেছে তাহা আমি কিছুই শুনি নাই। তোমার পাথেয় ব্যয়ের আদেশ এই পত্র মধ্যে পাঠাইতেছি গ্রহণ করিবে এবং তোমার শারীরিক কুশল সম্বাদ লিখিয়া আমাকে সন্তোষ রাখিবে। মঙ্গলদাতা তোমাকে সকল প্রকার বিপদ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়া তোমার হৃদয়ে শান্তি ও আনন্দ প্রেরণ করিতে থাকুন। —ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

## বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও লেডী অবলা বসুর পত্রাবলী—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে লেখা

( ১ )

Cambridge mass,
8th Jan. 1909,

বন্ধু,

আশা করি ইতিপূর্বে আমার চিঠি পাইয়াছ। অনেক দিন দেশের নানা দুঃসংবাদ পাইয়া একেবারে অভিভূত ছিলাম, তবে এখন মরার বেয়ে খাড়া কিছু নাই, মনে করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে সান্ত্বনা পাইয়াছি। আর নানা কার্য্যে মন অন্যদিকে নিয়োজিত করিয়াছি। শুনিয়া সুখী হইবে এখানে American Association for Advancement of Science হইতে বিশেষরূপে আহূত হইয়া বক্তৃতা দিতে Baltimore গিয়াছিলাম। সেখানে অনেক বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে আমার কলের সাহায্যে নূতন গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। Washington এর Agricultural Departmentএ আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেখানে বৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণায় বৎসরে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, এক সহস্র বৈজ্ঞানিক এই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা আমার অনুসন্ধান হইতে অনেক ফল প্রত্যাশা করেন। আর এক সপ্তাহ পরে Illinois যাইব। তখন রথীর সহিত দেখা করিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

তারপর তোমার সংবাদ জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। ঝড় ও দুর্ঘটনার মধ্যেও তোমার রোপিত বৃক্ষ যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে তাহার সন্দেহ নাই। বৃথা তর্ক ছাড়িয়া যাহার কিছু করিবার আছে তাহাই সম্পন্ন হউক।

তোমার বিদ্যালয় কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে বিশেষ করিয়া লিখিও, ইহাকে বিবিধ দিকে পূর্ণ করিতে হইবে। এ দেশে শিক্ষার নূতন নূতন উপায় ইংলণ্ড হইতে সর্বতোভাবে উৎকৃষ্ট। যদি কখনও সুবিধা হয় তবে Teachers' Collegeএ একজন যুবককে পাঠাইলে অনেক উপকার প্রত্যাশা করা যায়।

মনে করিও, তোমার বোলপুর ও শিলাইদহের কথা সর্বদা স্মরণ করি। সেই প্রথম যখন শিলাইদহে গিয়াছিলাম—সে আজ কত বৎসরের কথা—আজও প্রত্যেক দৃশ্য মনে পড়িতেছে। অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প লিখিয়া রাখিও। প্রতিদিন একটি-দু'টি শুনাইতে হইবে। জীবনের সন্ধ্যাকালে স্বপ্নরাজ্য জাগিয়া উঠিবে। তাহাই অনেক সময় প্রকৃত, এসব মিছা ছোট ঘটনাই অস্থায়ী।

তোমার জগদীশ

২

1 Birche Grove Acton
London W
27th March, 1902 ( ? )

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

অনেক সময়ে আপনাকে চিঠি লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু সময়াভাবে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই।

এখানে আপনার বন্ধুর বিষয়ে যাহা শুনি তাহা আপনাকে অনেক সময়ে জানাইতে ইচ্ছা হয়। কারণ, আপনি শুনিলে আনন্দিত হইবেন জানি।

এতদিন পরে অধ্যাপক মহাশয়ের সমুদয় শ্রম সার্থক হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। Botanist এবং Biologistরা তাঁহার theory অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছেন, কেবল physicistরা এখনও অগ্রসর হন নাই; সে জন্য বোধ হয় France ও Germanyতে যাইতে হইবে। ইংরেজরা এই সকল বিষয়ে অত্যন্ত conservative আমরা দূর হইতে ইয়োরোপকে সমুদয় সদ্গুণের আধার বলিয়া মনে করি, কিন্তু দুই তিন বৎসর ইহাদের সঙ্গে থাকিলে অভ্যন্তরের খবর যাহা পাওয়া যায় তাহার তুলনায় আমাদের দেশ কোথায় পড়িয়া আছে? এখানে scientific menদের মধ্যে যেরূপ intrigue এবং দ্বেষ তাহা শুনিয়া অবাক হই। যাক, সে সব কথা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কেবল অধ্যাপক মহাশয়ের খবর দেওয়াই আমার অভিপ্রায়। আজকাল এখানকার বৈজ্ঞানিক যুবকসম্প্রদায় অধ্যাপক মহাশয়ের theory লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, সেদিন একজন আমাদের বাড়ীতে আসিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের অনুপস্থিতি কালে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত আমার নিকট তাঁহাদের আনন্দ ও উৎসাহ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন যেমন Darwin Biologyকে revolutionize করিয়া দিয়াছেন তেমনই Prof. Bose's theory will revolutionize our whole idea of molecular physics. লোকটি তো একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। বলিলেন, if only prof. Bose will allow us, a dozen of us who thoroughly know our subject are willing to fight for him.

আজ আর সময় নাই।

নিঃ—শ্রীঅবলা বসু

৩

London (?)
26th July 1902 (?)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

বহুদিন পূর্ব্বে জেনারেল এসেম্ব্লিতে আপনার একটি বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম, এত দিন পরে আপনার নৈবেদ্য ও বঙ্গদর্শনে সেই সব কথা স্পষ্টরূপে প্রকটিত দেখিয়া আমরা কত সুখী হইয়াছি বলিতে পারি না।

বঙ্গদর্শন আপনি হাতে লইয়াছেন দেখিয়া ও গত দুই সংখ্যা পড়িয়া আশা হইতেছে যে, আপনার আহ্বানে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত উচ্চ আশাগুলি একমুখী হইয়া বঙ্গদর্শনে প্রচারিত হইবে এবং বঙ্গদেশে নতুন যুগের উদয় হইবে।

নৈবেদ্যের কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ ও উপকার লাভ করিয়াছি। এত ভালো লাগিয়াছে যে, ভুলচুকের নানা আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনাকে তাহা না জানাইয়া পারিলাম না।

আশা করি, আপনার সহধর্ম্মিণী সন্তানসহ কুশলে আছেন। বেলার শুভবিবাহ ও স্বামিসৌভাগ্যের সংবাদ পাইয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি।

এখানে বাঙ্গালী ছেলেরা অধ্যাপক মহাশয়কে একটি ভোজ দিয়াছিল, তাহার বিবরণ মুকুলে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। যদি পাঠাইতে পারি তবে পড়িয়া দেখিবেন। অধ্যাপক মহাশয়ের বক্তৃতাটি অতি সুন্দর হইয়াছিল, বৃদ্ধ নৌরজী ও রমেশ বাবু তাহাতে উপস্থিত ছিলেন, ৫।৬ জন মহিলাও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। Holborn Restaurantএ সম্মিলন হয়।

আপনি ও আপনার সহধর্ম্মিণী আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানিবেন।

নিবেদিকা
শ্রীঅবলা বসু

৪

1, Lavenders Gardens
Clapham Common, S. W.
20th March 1908,

কবিবরেষু,

অনেক দিন হইল আপনাকে পত্র লিখিব ভাবিয়াছি কিন্তু নানা কারণে হইয়া উঠে নাই। চিঠিপত্র না লিখিলেও জানিবেন, আমাদের হৃদয় আপনার সমুদয় শোক-দুঃখে আন্দোলিত ও ব্যথিত। আপনার বিপদে আমরা যেরূপ কষ্ট পাই, আপনার ধৈর্য্য ও ঈশ্বরপ্রীতি দেখিয়া আমরা সেইরূপ আশ্বস্ত হই। আপনি যে সব গুরুতর আঘাত পাইতেছেন, তাহা সামলাইয়া প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিকের মত আরও গভীরতম ভাবে সাধু কার্য্যে ও চিন্তাতে মনোনিবেশ করিতেছেন। ইহাকেই প্রকৃত ঋষিভাব বলা যায়। আপনার অসামান্য সহ্যগুণ দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। সেবার বড়দিনের ছুটীর সময় অশান্তিপূর্ণ চঞ্চল হৃদয় লইয়া শিলাইদহে গিয়াছিলাম, আপনার সঙ্গে দুটি কথা বলিয়াই নবজীবন লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছিলাম। সে কথা আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না।

যাহাকে এত যত্নে ও স্নেহে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন—সে সব আশা চূর্ণ করিয়া অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া মায়ের কোলে গেল। আপনি মনকে শান্ত সমাহিত করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে সমুদয় শক্তি ও চিন্তা দেশের কাজে অর্পণ করিতেছেন, ইহার উপরে আমাদের বাক্য ব্যর্থ। আপনাকে আর কি বলিতে পারি—আপনার মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হউক। আমরা ধন্য হই, জন্মভূমি ধন্য হউক। প্রাদেশিক অধিবেশনে আপনার বক্তৃতা পড়িয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আপনি এই সঙ্কটের সময় দেশবাসী সকলকে একমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বঙ্গদেশকে সকলের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন। কারণ, শুনিতে পাই যে, অন্য দেশীয় দেশভক্তেরা নাকি বাঙ্গালীর আবার একতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছে এবং বলিতেছে, তবে ইহারা কেন সুরাট কনভেন্‌সানে সহি করিলেন? যাহা হউক, আশা করি বঙ্গদেশে একতার ফল ফলিবে। আপনি কিন্তু বরাবর পৃথক হইয়া থাকিবেন এবং এখন যেমন কার্য্য করিতেছেন তেমনি করিবেন। আপনার হইতেই আপনার সংসর্গে থাকিয়া সেই সব লোক গঠিত হইবে, যাহারা আপনার আদর্শমত গ্রামে গ্রামে যাইয়া কাজ করিবে। আমাদের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু এদেশে যে সব ছেলে আসে তাহাদের হইতে কথা ছাড়া কোন কাজ আশা করা যায় না। এ জন্যই আমার মনে হয়, আপনার স্কুলের ছেলেদের কত বেশী আবশ্যক। তাহারা বিদেশে আসিয়া আরও বড় হইয়া যাইবে।

আপনি সভাভঙ্গে কি বলিয়াছিলেন তাহা কোন কাগজেই দেখিলাম না। শুনিতে পাই তাহা খুব হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। অধ্যাপক মহাশয়ের শরীর মাঝে খুব অসুস্থ ছিল—এখন অনেকটা সুস্থ বটে, কিন্তু হৃদয়ের অবসন্নতা গভীর। এখন বসন্তের পূর্ব্বাভাস, গাছপালা সবই নির্জ্জীব, তাহারা কিছুতেই সাড়া দেয় না তাহারা না জাগিলে উঁর অবসন্নতা দূর হইবে না।

রথী শরৎ বাবুর কাছে অধ্যাপক মহাশয়ের বিষয় একটা চিঠি লিখিয়াছেন। তাহাতে জানা গেল যে ইলিনয় হইতে উঁকে লেকচারার করিয়া লইবার খুব সম্ভাবনা আছে। হয়তো রথী আপনার কাছেও লিখিয়াছেন। এটা সুসংবাদ বটে।

আমরা লণ্ডনে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে চাই। আপাততঃ বাড়ীতে বাড়ীতে করিলেই ভালো। এখানে উপযুক্ত লোক নাই। সেজন্য প্রস্তাব করিতেছি যে, যাঁহার বাড়ীতে উপাসনা হইবে তিনি ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করিবেন। আপনার ইহাতে কি বক্তব্য? আদি সমাজের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি একখানা পাঠাইতে পারেন কি? তাহা এই সমাজের সম্পত্তি হইবে। আরও অনেক লিখিবার ছিল, কিন্তু আজ এখানেই আসি। আবার যখন সকলে একত্রিত হইব তখন কত গল্প করা যাইবে। আশা করি বেলা ও মীরা ভাল আছে। পিসিমা এখন কোথায় আছেন?

আপনাদের
অবলা বসু

( ৫ )

C/o Mrs. Ole Bull
Studio House
168, Brattle Street,
Cambridge, Mass. U. S. A.
20th Nov. 1908.

প্রিয়বরেষু,

লণ্ডন ছাড়িয়া আপনাকে পত্র লিখি নাই বটে কিন্তু সর্ব্বদাই আপনার কথা ভাবিতেছি এবং আমরা কত সময়ে আপনাকে নিকটে পাইবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। এ সময়ে আপনি আমাদের সঙ্গে আমেরিকায় থাকিতে পারিলে কত সুখী হইতাম। রথীদের ত যাইবার সময় হইয়াছে; আপনি কি আসিতে পারেন না? এত কথা জমিতেছে যে, আপনি এখানে থাকিলে খুব সুখে থাকা যাইত। চিঠিতে কিছু লেখা যায় না। গানের বহিতে আপনার ছবি দেখিয়া

আমরা বড় দুঃখিত হইয়াছি। এত খারাপ দেখাইতে চেষ্টা করা কি আপনার উচিত? আমি দেশে থাকিলে কখনই আপনাকে এই ছবি ছাপাইতে দিতাম না। আপনাকে জোর করিবার কেহ নিকটে নাই বলিয়া আপনি এই ছবি ছাপাইতে দিয়াছেন। এবার দেশে গিয়া আপনাকে প্রতিজ্ঞা করাইব, যে, আপনি আমাকে না দেখাইয়া কোন ছবি কাহাকেও দিবেন না। আমি জানি, আপনি বৃদ্ধ বয়সের ভাণ করিবেন, কিন্তু আমার কাছে তাহা করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, আমার স্বামী আপনা হইতে বড়। আমেরিকা আসিলে আপনি নিজকে বৃদ্ধ বলিতে লজ্জাবোধ করিবেন। কারণ এখানে ৬০।৭০ বৎসরের পুরুষ ও মেয়েকে কিছুতেই ৫০ এর বেশী মনে হয় না। এই ছবি দেখিয়া আপনাকে শারীরিক ও মানসিক অবসাদের প্রতিমূর্ত্তি মনে হয়! কিন্তু আমাদের কবিকে এই অল্প বয়সে অবসন্ন দেখিতে পারিব না। আপনাকে আরও কাজ করিতে হইবে। তাহা জানেন? আপনি ছেলেদের স্কুল করিয়াছেন, এখন মেয়েদের জন্ত কিছু না করিয়া আপনাকে অবসন্ন হইতে দিব না। আপনি এবারে আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন। আমি এই কার্য্যে আমার শক্তি নিয়োগ করিতে চাই। মেয়েদের জাতীয়ভাবে বিদ্যাশিক্ষা করিবার সময় আসিয়াছে। এখন পর্যন্ত আমাদের হাতে কাজ করিবার অনেক আছে। আপনি ছেলেদের স্কুলটিকে যে রকম রক্ষা করিয়াছেন, আশা করি এই সময় লোকে তাহার মূল্য বুঝিয়া ছেলে পাঠাইতেছে। স্কুলে প্রবর্ত্তিত ঋতু-উৎসবগুলি খুব চমৎকার! এখানে একদিন স্কুলের ছেলেমেয়েরা গাছ পোঁতে, আমাদের ১লা বৈশাখ বা কোনদিন এমন একটা উৎসব করিলে বেশ সুন্দর হয়। বিশেষ যদি কার্পাস পোঁতা যায়।

রথীদের সঙ্গে এখনও দেখা হয় নাই। জানুয়ারীতে হইবে। রথী ওঁর লেকচার দেওয়া সম্বন্ধে খুব খাটিয়াছে। ফলে এত নিমন্ত্রণ আসিয়াছে যে, উনি সব রাখিতে পারিলেন না। কেবল ৫।৬টা প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবেন। এখানে বোষ্টন সহরে যে দুইটা বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতে সকলেই খুব প্রশংসা করিয়াছে। এখানে ওঁর বই অনেক লোকে পড়িয়াছে ও ওঁর চিন্তাধারার অনুবর্ত্তক এক মস্ত শ্রেণী আছে। তাঁহারা ওঁকে খুব অভ্যর্থনা করিতেছেন। আমেরিকাতে নিত্য নূতন দৃশ্য দেখিতেছি। এখানকার ইতিহাস পড়িলে ও ছোট ছোট ঘটনা শুনিলে মনে নূতন উৎসাহ ও উদ্যম আসে। অরবিন্দ ছুটিতে আপনার কাছে গিয়াছিল শুনিয়া খুসী হইয়াছি। সে খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছে। আশা করি, আপনার মেয়েরা ভালো আছে। শরৎকালে আপনার বোটে নিশ্চয় খুব সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছেন। এখানকার শরৎকালের নানাবর্ণের পাতাতে অতিশয় মনোরম শোভা হয়। আমরা এক মাস নদীর পারে মিসেস বুলের একটা বাড়ীতে ছিলাম। জোয়ার-ভাঁটা দেখিয়া গঙ্গার কথা স্মরণ হইত, যদিও এদেশে নদীর পাড় অতিশয় সুন্দর ও পরিষ্কার। এখানে কত কথা লিখিবার আছে কিন্তু রথীরা অনেক লিখিয়াছে। সে জন্ত আমার লেখার আবশ্যক নাই বোধ হয়। কিন্তু আপনার বিষয় অত্যন্ত চিন্তিত আছি জানিবেন। আপনি একলা একলা মনকে আরও ভারাক্রান্ত করিতেছেন এই ভয় হয়। একলা-একলা শোক সহ্য করা অত্যন্ত কঠিন। কাহাকেও বলিতে পারিলে ও সহানুভূতি করিবার লোক পাইলে অনেক লাঘব হয়। আমার চিরকাল স্মৃতিতে থাকিবে, শীতকালে আপনার বোটে আপনার কাছ থেকে কি রকম সান্ত্বনা পাইয়াছিলাম। আপনাকে বুঝাইবার আমার কোন শক্তি নাই। কেবল এইটুকু বলিতে ইচ্ছা হয় যে সুখদুঃখ একই জিনিসের রূপান্তরমাত্র। এবং বঙ্গদেশের সব সন্তান আপনার। তাহারা সকলেই আপনার মুখ চাহিয়া আছে। ঈশ্বর আপনার একটিকে নিজ কোলে লইয়া গিয়াছেন, তাহার বদলে শত সহস্র শিশু সন্তান আপনার অপেক্ষায় আছে, তাহাদের কথা স্মরণ করিয়া অবসাদ দূর করুন। দূর, বহুদূর হইতে আমাদের হৃদয়ের প্রীতি ও স্নেহ আপনার কাছে গিয়া আপনাকে কতকটা সবল যেন করিতে পারে।

আপনার বৌঠাকুরাণী
অবলা বসু

# কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ : পথের পাঁচালী

ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

১

ভাবলে বিশেষ দুঃখ হয় যে, বিভূতিভূষণের মত সাহিত্যিকের উপযুক্ত মর্য্যাদা আজ পর্য্যন্ত হ'ল না! না হ'ল তাঁর সম্বন্ধে কোনও উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ, না হ'ল তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বিচার বিশ্লেষণ। ভাসা-ভাসা আলোচনা আর উচ্ছ্বসিত জীবনালেখ্যের টুকরো আমরা পেয়েছি কিন্তু ঐটুকুই কি তাঁর পাওনা? বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যে 'পথের পাঁচালী'র আবির্ভাব আকস্মিক হ'লেও আসন চিরন্তন। আকস্মিক আবির্ভাব এইজন্যই বলছি যে, বাংলা সাহিত্যে ঠিক 'পথের পাঁচালী'র পথপ্রস্তুতি ঘটেনি। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরতের উপন্যাস ভিন্ন জাতের, মূলে তার প্রেম, কেন্দ্রে তার সমাজ। প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষের জীবন, মানুষের সমাজ তার আলোচনার বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতি মানুষের মতই প্রাধান্য পেয়েছে বটে—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে যুবচিত্তের সুরসঙ্গতি; বিভূতিভূষণে প্রকৃতির সঙ্গে শিশু-কিশোরের সুরসংহতি। প্রকৃতি ত এখানে কেবল পটভূমিকা নয়। প্রকৃতির মধ্যে যে সুর বাজে গাছে পাতায় ঝড়ের বুকে মাঠের মাঝে তারই রক্তে-মাংসে গড়া রূপ অপু-দুর্গা। যে সমাজ না-পাওয়ার দেশ সে সমাজের চিত্র পাই বঙ্কিম-রবীন্দ্র শরৎচন্দ্রে। 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুণ, হরিহর, সর্ব্বজয়া সেই না-পাওয়ার-দেশের মানুষ হ'লেও—'পথের পাঁচালী'র কেন্দ্রভূমিতে 'সব পেয়েছির দেশ'—সে-দেশ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সে দেশের পথ আঁকা-বাঁকা দেহ নিয়ে রামায়ণ মহাভারতের দেশে যাত্রা করে, বাঁশ বাগানের পিছনকার ডোবা বৈপায়ন হ্রদ-এর রূপ নিয়ে ফুটে উঠে। নাম-না-জানা পাখীর ডাকে সেখানে কিশোরের ঘুম ভাঙ্গে, আবার চোখের পাতায় ঘুম আসার ক্ষণে 'শুভ্র-জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী'তে গ্রামের দেবী বিশালাক্ষী পুলিনশালিনী ইচ্ছামতীর কাশফুলের বনে নেমে আসেন। সেখানে ঝড় দেখা দেয় কিশোর-কিশোরীর আনন্দ চঞ্চলতার উদ্দীপন বিভাব হ'য়ে। মৃত্যু সেখানে সুনীল আকাশপারের চিরন্তনের হাতছানি। এই দেশকে এই কিশোর-কিশোরীকে বাংলা সাহিত্য প্রথম বারের মত পেল। স্বর্গীয় কিশোর-কিশোরীর স্থূল সম্ভোগকীর্ণ পার্থিব প্রেম আমরা পেয়েছি রাধাকৃষ্ণলীলায়। এখানে পার্থিব কিশোর-কিশোরীর স্বর্গীয় প্রীতি-মাধুর্য্যকেই কেবল পেলাম না, পেলাম মানস-বৃন্দাবনকেও।

যে গ্রাম বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে রূপ পেয়েছে, তা হচ্ছে যৌবনের পুষ্পিত আনন্দের পটভূমিকায় অভাবক্লিষ্ট গ্রাম—দলাদলি সেখানে নিত্য, প্রেম সেখানে রোমাণ্টিক, সুন্দর অপুর চোখে যে গ্রাম ফুটে উঠেছে, সুন্দর ও অপরিচয়ের মিলনে রোমাণ্টিক, সে গ্রাম অভাব-জগতের নয় ভাব-জগতের। কালিদাসের অলকাপুরী যৌবনের পিয়ারী (বর্তমানের 'প্যারী'), 'পথের পাঁচালী'র নিশ্চিন্দিপুর কৈশোরের মায়াজগৎ। এ জগৎকে বাংলা-সাহিত্যে প্রথমবারের মত দেখা গেল 'পথের পাঁচালী'তে—নায়ক-নায়িকারূপে কিশোর-কিশোরীকে দেখা গেল প্রথমবারের মত—প্রকৃতিকে জীবন্ত চরিত্ররূপে দেখা গেল প্রথমবারের মত। কিশোর নায়ক অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'। প্রকাশের সাথেই তার সমাদর ঘটেছে—কিন্তু পাণ্ডুলিপি হ'তেই সর্ব্বসংশয় ছিন্ন করে তার আবির্ভাব ঘটেনি ১৩৩৫ এর বিচিত্রায়। 'প্রবাসী' পত্রিকা তা পত্রস্থ করেনি—উপেন গঙ্গোপাধ্যায় তাকে সাদরে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। (শনিবারের চিঠি: অগ্রহায়ণ ১৩৫৭তে উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ভাগলপুরের ওকালতি ছেড়ে উপেনবাবু 'বিচিত্রা' নিয়ে নামলেন—পশারের ক্ষেত্র হ'তে প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে। বাংলা-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ অভিজাত পত্রিকারূপে প্রতিষ্ঠা ঘটল 'বিচিত্রা'র—'বিচিত্রা' প্রকাশের দ্বিতীয়বর্ষে ১৩৩৫এ প্রকাশিত হ'ল 'পথের পাঁচালী' প্রতিষ্ঠিত হলেন বিভূতিভূষণ। 'বিচিত্রা'র প্রথম বর্ষেই আমরা গল্পলেখক বিভূতিভূষণকে পেয়েছি ('বৌ চণ্ডীর মাঠ' গল্প: শ্রাবণ ১৩৩৪; বিচিত্রা) কিন্তু সে গল্পের মধ্যে বিভূতিভূষণের পরিচয় ফুটে ওঠে নি। তা কাঁচা হাতের লেখা। উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সজাগ দৃষ্টি ছিল দেশ-বিদেশের সাহিত্য-মন্থনজাত সুধা বিতরণের দিকে। বস্তুতঃ ১৩৩৫এর বিচিত্রার পাতা উল্টে আমরা দেখি মণীন্দ্রলাল বসু কর্তৃক ফন আর্থার স্নিতস্লার-এর Liebelie এর অনুবাদ 'প্রেমের খেলা' নাটকে। অন্নদাশঙ্কর বিদেশ ভ্রমণ কাহিনী পরিবেশন করছেন অনবদ্যভাবে 'পথে প্রবাসে'র মধ্যে। ভ্রাম্যমান দিলীপকুমার টুকরো লেখা লিখছেন। 'বালির কথা' সুরেন্দ্রনাথ কর-এর লেখায়, আর পেরীর চিত্রশালার রেখাচিত্র ফুটে উঠছিল সমালোচকের হাতে। একদিকে Continental রচনা ও Continent এর স্বাদ—অন্যদিকে সুরু হল ধারাবাহিক রচনা রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' আর বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'। পথের পাঁচালীতে Continental উপন্যাসের স্বাদ ছিল আর দেশের নাড়ীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল বলেই হয়ত বিচিত্রার কর্তৃপক্ষ বিভূতিভূষণের অভ্যর্থনা করেছিলেন কারণ, আমাদের বাংলাদেশের নিঁখুত ছবিখানি, বিদেশী টেকনিকের ধারানুসারী 'পথের পাঁচালী'তে দেখা দিল প্রথমবারের মত···এর পূর্ব্বে কোনও বাংলা উপন্যাসে বাংলার এ চিত্র ফুটে উঠেনি।

Continental সাহিত্য-দরদী 'বিচিত্রা'র লেখকগোষ্ঠী। তাঁর মধ্যে এলেন বিভূতিভূষণ। তাঁর মন, তাঁর প্রাণ এই বাংলাদেশের মধ্যেই মগ্ন ছিল আমৃত্যু। অদ্ভুত টান ছিল তাঁর এই মাটির সঙ্গে! এই দেশ—এই জীবন—এর ত প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়নি সাহিত্যের ক্ষেত্রে। 'পাঁচালী' নিয়ে নামলেন। পরে কোনও বন্ধু সমালোচক বলেছিলেন যে পাঁচালী নামটা বড় গেঁয়ো-গেঁয়ো সেকেলে সেকেলে। সেইদিনই ত সে চিরকালের বাংলার গ্রামকে প্রকাশ করছে বলেই ত 'পাঁচালী' নামের পরিবর্ত্তন চাননি লেখক···বন্ধুর অনুরোধেও না। আবার 'পথের পাঁচালী' কেবল বাংলাদেশ দিয়ে অনুপ্রাণিত নয়, Continent দ্বারা অনুপ্রেরিত। ফরাসী ভাষায় রোমাঁ্যা রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' প্রকাশিত হয় ১৯০৪—১২ দশ খণ্ডে। ১৯১৫ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর একাধিক ভাষায় এই গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ পড়াশুনা করতেন প্রচুর···বিদেশের নানা পত্র পত্রিকা হ'তে জ্ঞানবিজ্ঞানের 'বিবিধ সংগ্রহ' প্রকাশ করতেন বিচিত্রার পাতায়। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ···বিচিত্রার সহ-লেখকদের মধ্যে ইউরোপের সাহিত্যপ্রীতিও ছিল গভীর; এই বিচিত্রার মধ্যে জাঁ ক্রিস্তফের ধারানুসারী শিশু-কিশোর-জীবনস্বপ্ন-কেন্দ্রিক পথচলার কাহিনী বাংলাদেশের পল্লীর নিখুঁত চিত্র দিয়ে আত্মজীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ফুটিয়ে তুললেন বিভূতিভূষণ বিচিত্রার পাতায় ১৯২৮ সালে। 'পথের পাঁচালীর' মধ্যে চিরন্তন হ'ল Jean Christophe এর প্রথম খণ্ড L'Aube ( The Down ) ···চিরন্তন হ'ল বাংলার প্রকৃতি গাছপালা নাম-হারা মানুষ—নাম-না-জানা পথপ্রান্তর। অনেকে ভাসা-ভাসা আলোচনা করেছেন 'পথের পাঁচালীর' উপর জাঁ ক্রিস্তফের প্রভাব নিয়ে কিন্তু সে-প্রভাব কি ধরণের তার বিস্তারিত আলোচনা করেন নি। অন্তত ক'রলেও আমার নজরে পড়েনি। কেউ স্বর্ণলতার পাঠশালার দৃশ্য এবং অপুর পাঠশালার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু প্রভাব যেখানে সবচেয়ে গভীর সেখানে কারুর নজর পড়েনি, আশ্চর্য্যের কথা! বিভূতিভূষণে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি প্রেম বাণী রূপ পেয়েছে অপু-দুর্গার জীবনায়নে। আর কেবল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আত্মিক যোগ নয়, রবীন্দ্রনাথের শাব্দিক প্রভাবও লক্ষণীয়। কোথাও কোথাও বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের পংক্তির পর পংক্তিকে সামান্যতম রূপান্তরিত ক'রে পংক্তির পর পংক্তির মধ্য দিয়ে সরাসরি প্রকাশ ক'রেছেন। অথচ এত বড় প্রভাবটা কারুর সমালোচনায় আলোচিত হয়েছে বলে দেখতে পাইনি! তাই গভীর দুঃখের সঙ্গে প্রথমেই বলেছি যে, বিভূতিভূষণকে আমরা পেয়ে হারিয়েছি, কিন্তু কি পেয়েছি আর কি হারিয়েছি, তার হিসাব মিলাতে বিশেষ কেউ রাজী হয় নি।

বিভূতিভূষণ যে যুগে 'পথের পাঁচালী' নিয়ে এলেন তখন বাংলার কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আধিপত্য, আর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যগুরু। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিভূতিভূষণের কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তা তাঁর ডায়েরী গ্রন্থাবলী থেকেই জানা যায় ( উর্মিমুখর : পৃ: ৭৪ )। কিন্তু শরৎচন্দ্র কি তাঁকে প্রভাবান্বিত করেন নি? অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটা আত্মিক যোগাযোগ ছিল—প্রকৃতিপ্রেমের যোগাযোগ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে নিষ্ক্রিয় পুরুষ আর বহুবলধারিণী নারীর মধ্যে শৃঙ্গার-বাৎসল্য রস। ভবঘুরে, ডানপিটে ছন্নছাড়া নায়কের জয়গান। অনুভূতি প্রকাশের তির্য্যক ভঙ্গীও শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্রে হৃদয়ের প্রেম বীতরাগের, অশ্রদ্ধার ছদ্মবেশে আপনাকে প্রচার করে—আক্রমণ সেখানে আমন্ত্রণের নামান্তর। রমা-রমেশ, ষোড়শী-জীবানন্দ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে হৃদয়ানুভূতির তির্য্যক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে বড় প্রেমের দূরে ঠেলা কাছে টানার চাইতে মিলনগন্ধী। বিভূতিভূষণ সরল মানুষের সহজ অনুভূতিপ্রকাশ নিয়ে উপন্যাসে অগ্রসর হয়েছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মন, বিভূতিভূষণের 'বন' প্রধান। তাই একথা মনে হয়েছিল যে, বিভূতিভূষণে শরৎচন্দ্রের প্রভাব পড়েনি। কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্যসৃষ্টির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখতে পেয়েছি, বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রকেও কোথাও আদর্শ করেছেন।

ধরা যাক, বিভূতিভূষণের ছোট গল্প সংগ্রহ-গ্রন্থ 'বিধু মাষ্টার'এর 'অসমাপ্ত' গল্পটি। গল্পটির জন্ম লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিন্তু রচনারীতিতে 'শ্রীকান্ত'-এর অনুসরণ স্পষ্ট। স্মরণ করুন 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্ব্বে রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তর পরিচয় ঘটনাটি, আর মনে রাখুন শরৎচন্দ্রের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি—

"এতক্ষণে আমার সংশয় কাটিয়া গেল। ঠিক চিনিতে পারিলাম ···এই সেই রাজলক্ষ্মী!···কিন্তু কে সে, কোথায় দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না।···পিয়ারী হাতের আংটি খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল।··· আমার আর একটি কথা তোমায় রাখতে হবে।···পিয়ারী হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটি চাপিয়া ধরিয়া··· ইত্যাদি—"

ইহার সহিত তুলনা করুন 'অসমাপ্ত' গল্পটি। কোন্নগরে সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করতে এসে অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া বাল্যসখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাকে চিনতে পারেননি লেখক, কিন্তু সে দিনের পরদিন লেখকের সঙ্গে বিবাহ-মিলন স্বপ্নে বিভোর। এ খবরটি ঘুণাক্ষরেও লেখকের জানা ছিল না। তাকে অনেক পরে চিনতে পারলেন। বিভূতিভূষণের ভাষায়—

"এখন ইহাকে ভাল করিয়াই মনে পড়িয়াছে—আমার কিছু দিনের বাল্যসঙ্গিনী একটি অত্যন্ত মুখর চঞ্চলা বালিকার ছবি। আবছায়া ভাবে ইহার দু-একটি বাল্যলীলাও মনে পড়িতেছে।··· বিস্ময়ে আমার মুখে কথা জোগাইল না! শাস্তি বলে কি! এমন ভুলও মানুষের হয়। সমস্ত কথাটা বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় নয় এটা—তবুও এক চমকে ইহার মনের অনেকখানিই দেখিতে পাইলাম। সভা করিতে আসিয়াছি বিদেশে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া এতখানি দরদ দেখাইবার ঠিকমত কারণ আমি অনেক হাতড়াইয়াও খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না—অনেকখানি পরিষ্কার হইয়া গেল। * * * পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—'আবার কবে আসবেন দাদা?' 'সময় ত পাইনে, তবে ইয়ে আসব বই কি।'··· হঠাৎ খপ্ করিয়া আমার হাত দুখানা তাহার দুই হাতের মধ্যে লইয়া আর্দ্র কণ্ঠে অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—'না দাদা, আমি সব জানি, সব বুঝি। আপনি যে নিজের জীবনটা এ ভাবে কাটিয়ে দিলেন, সেজন্য আমার মনে তুষের আগুন জ্বলে দিন-রাত—আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে—রাখবেন বলুন'।"

উপরের আলোচনা হ'তে এটুকু বোধ হয় বলা অনুচিত হবে না

যে, বিভূতিভূষণ কোথাও কোথাও শরৎচন্দ্রকেও অনুসরণ করেছেন। ছোটগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথকেও তিনি অনুসরণ করেছেন যেমন—

"কত সতী রমণীর আর্ত্তক্রন্দনে নিঃশব্দ রাত্রে চৌধুরীবংশের সুদীর্ঘ রঙমহল যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদের সেই ব্যাকুল কণ্ঠধ্বনি ঝিল্লিরবের সহিত তালে তালে শব্দিত হইয়া মরিতেছে। তাহাদের বিকট অট্টহাস্য হয়ত এখনো ভগ্নপ্রাসাদের প্রাচীরে আঘাত খাইয়া ফিরিতেছে।

* * * *

চারিদিকে সেই বর্ষাপ্রকৃতির গুঞ্জন কোনো এক বিরহিণীর আর্ত্তক্রন্দনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল।"

* * * *

উল্লিখিত উদাহরণগুলি বিভূতিভূষণের 'অভিশাপ' গল্প থেকে নেওয়া। অংশগুলির সঙ্গে (গল্পটির সঙ্গেও) রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্প এবং 'সাজাহান' কবিতার যোগ আছে কিনা (তব পুরসুন্দরীর নূপুর নিক্কণ ভগ্নপ্রাসাদের কোণে মরে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে কাঁদায় রে নিশার গগন) তা রসিক পাঠককে দেখিয়ে দিতে হবে না।

এই সকল আলোচনা হ'তে এটি বোধ হয় স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে যে, বিভূতিভূষণ কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে আদর্শ করতে দ্বিধা করেন নি। তাই 'পথের পাঁচালী'র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'ডেভিড কপারফিল্ড' ও 'অপুর পাঠশালা'র সাদৃশ্য আবিষ্কার করবার জন্য পণ্ডশ্রম করার পূর্ব্বে শরৎ-রবীন্দ্র প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাটা বোধ হয় অসমীচীন হবে না। শরৎচন্দ্র ভিন্নধর্মী লেখক হ'লেও মনে হয় বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী'তে যাত্রাদর্শনের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের যাত্রাদর্শন প্রভাবিত। অবশ্য এটা আমার অনুমান, সিদ্ধান্ত নয়। পাঠকদের বিচারবুদ্ধির সামনে তুলনীয় অংশগুলি উদ্ধার করছি। 'শ্রীকান্ত'র যাত্রাদর্শন প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র লিখেছেন—

"দত্তদের বাড়ীতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ায় সখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইতেছে।···

সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না!—

মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্য্যয় কাণ্ড।—তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হাবান পলসাঁই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।···

মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ বা সভয় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল,—কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল। কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইল না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেন্টুলানের মুট চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর, ধন্য বীরত্ব!"

* * * *

আনন্দের সীমা নাই—মগ্ন হইয়া দেখিতেছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্য মনে মনে তাঁহার শতকোটি প্রশংসা করিতেছি এমন সময় পিঠের উপর একটা আঙুলের চাপ পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখি ইন্দ্র।

বিভূতিভূষণের রচনায় অপুর যাত্রাদর্শন স্মরণ করুন।—

"যাত্রা আরম্ভ হয়।—সেবার সে বালক কীর্ত্তনের দলের যাত্রা শুনিয়াছিল—সে কি আর এ কি!—

কলিঙ্গরাজের সহিত বিচিত্রকেতুর যুদ্ধে তলোয়ার খেলা কী? যায় বুঝি ঝাড়গুলো গুঁড়া হয়ে, নয় তো কোন হতভাগ্য দর্শকের চোখ দুটি বা যায়। রব ওঠে, ঝাড় সামলে ঝাড় সামলে। কিন্তু অদ্ভুত যুদ্ধকৌশল—সব বাঁচাইয়া চলে—ধন্য বিচিত্রকেতু!"

* * * *

অপু অপলক চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকে, মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া যায়; এমন তো সে কখনো দেখে নাই।

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলে—খোকা বেশ দেখতে পাচ্ছ তো?

তাহার বাবা কখন আসিয়া আসরে বসিয়াছে অপু জানিতে পারে নাই।—

* * * *

শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের রচনা ভিন্নশ্রেণীর। তাই এখানে এবং আর কোনও কোনও স্থানে আকস্মিক সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য না হ'লেও একথা বলা সঙ্গত হবে না যে বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্রের দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত। পূর্ব্বেই বলেছি, গভীর প্রভাব এসেছে রোলাঁ এবং রবীন্দ্রনাথ হ'তে।

রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ' গ্রন্থের প্রারম্ভে নবজাতক 'জাঁ ক্রিস্তফ'এর দোলনায় শোওয়া অবস্থা ('The new born child stirs in his cradle') 'পথের পাঁচালী'তে অপুর জীবনারম্ভ বর্ণনা ঐখান থেকেই। জাঁ ক্রিস্তফের মা লুইসা সর্বজয়ার মত নিরন্তর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছে আর পিতা Melchior মদ্যপ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বাদ্যযন্ত্রী। এক্ষেত্রে হরিহরও সেই ধরণের।

তবে বিভূতিভূষণ হরিহরকে চিত্রিত করেছেন নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হতে। বিভূতিভূষণের জন্ম ১৮৯৩ খৃঃ ১২ই সেপ্টেম্বর, সংসার অত্যন্ত অস্বচ্ছল। পিতা কথকতা ইত্যাদির মধ্যে এখানে-ওখানে ভবঘুরে দিন কাটিয়ে দিতেন···সংসারের সঙ্গে সংশ্রব তাঁর বিশেষ ছিল না। মাঝে মাঝে সংসারের ভয়াবহ আর্থিক অনটনের মধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত কয়েকটি আশার কথা শুনিয়ে দূরে চলে যেতেন। শনিবারের চিঠি ১৩৫৭র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বিভূতিভূষণের জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। তাতে জানা যায়, বিভূতিভূষণ আপন পিতার আদর্শেই হরিহর, এক আত্মীয়ার আদর্শে ইন্দির ঠাকরুণ এবং নিজের বাল্য-কৈশোরের কল্পিত বাস্তব মূর্তি নিয়ে গড়েছেন অপুকে। এদিকে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অন্যদিকে জাঁ-ক্রিস্তফ। সর্ব্বজয়ার রাঁধুনীগিরি আদর্শ মনে হয় লুইসা। সেখানে এক স্থানে জাঁ-ক্রিস্তফ রাঁধুনী মা লুইসার কাছে এসে রাঁধুনীর ছেলে হিসেবে বড়লোকের বাড়ীতে যে অসম্মান পেয়েছে তাই বোধ হয় বড়লোকের বাড়ীতে রাঁধুনীর ছেলে অপুর অসম্মানের আদর্শ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সকলের কিশোরজীবনে ছোট ছোট বাঁশের কঞ্চি অদ্ভুত দাগ রেখে গেছে। অপুর জীবনেও এসেছে—

"বাঁকা কঞ্চি অপুর জীবনে এক অদ্ভুত জিনিষ। একখানা

শুকনো হালকা, গোড়ার দিক মোটা আগার দিক সরু, বাঁকা কঞ্চি হাতে করিলেই অপুর মন পুলকে শিহরিয়া ওঠে, মনে অদ্ভুত সব কল্পনা জাগে। একখানা বাঁকা কঞ্চি হাতে করিয়া এক একদিন সে সারা সকাল কি বৈকাল আপন মনে বাঁশবনের পথে কি নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়; কখনো রাজপুত্র, কখনো তামাকের দোকানী, কখনো ভ্রমণকারী, কখনো বা সেনাপতি, কখনো মহাভারতের অর্জ্জুন।

একটা বাখারি কিংবা হালকা কোন গাছের ডালকে অস্ত্রস্বরূপ হাতে লইয়া সে বাড়ীর পিছনে বাঁশবাগানের পথে অথবা বাহিরের উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায় ও আপন মনে বলে—তারপর দ্রোণ তো একেবারে দশ বাণ ছুঁড়লেন, অর্জ্জুন করলেন কি, একেবারে দুশোটা বাণ দিলেন মেরে। তারপর—ওঃ সে কি যুদ্ধ! বাণের চোটে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল!"

*    *    *    *

এ অভিজ্ঞতা আমার, আপনার জাঁ-ক্রিস্তফের, অপুর, বিভূতিভূষণের। তবে রচনার কালানুক্রমিক বিচারে মনে রাখতে হবে জাঁ-ক্রিস্তফে এই কঞ্চি-বাখারি-সম্ভব স্বপ্নবিহ্বলতা পূর্ব্বেই অনবদ্য ভাষায় সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ইংরাজী অনুবাদ হতে নিচের অংশটি উদ্ধার করলাম :—

"It is impossible to imagine what can be made of a simple piece of wood, a broken bough found alongside a hedge...It was a magic wand. If it were long and thin it became a lance, or perhaps a sword, to brandish it aloft was enough to cause armies to spring from the earth. Jean Christophe was their general, marching in front of them, sitting them an example and leading to the assault of a hillock. If the branch were flexible, it changed into a whip. Jean Christophe mounted on horseback and leaped precipices. Sometimes his mount would slip, and the horseman would find himself at the bottom of the ditch, sorrily looking at his dirty hands and barked knees."

আবার দেখুন 'পথের পাঁচালী'র নিম্নোদ্ধৃত অংশ :—

"এক দৌড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া গৃহকার্য্যরত মাকে জড়াইয়া ধরিত। * * * আহারাদির পর তাহার মা কখনো কখনো জানালার ধারে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছেঁড়া কাশীদাসী মহাভারতখানা সুর করিয়া পড়িত। * * * জানালার বাহিরে বাঁশবনের দুপুরের রৌদ্রমাখানো শেওড়া ঘেঁটু বনের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মহাভারতের —বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে সে তন্ময় হইয়া যায়। মহাভারতের সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কর্ণের চরিত্র বড় ভাল লাগে তাহার কাছে। এবং 'জাঁ ক্রিস্তফ' গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত অংশ—

"He hugs her close. How he loves her! Every body, everything! ...He sleeps. The cricket on the hearth cheeps. His grandfather's tales, the heroes float by in the happpy night...To be a hero like them!...Yes he will be that...he is that..."

জীবন ও স্বপ্ন বিষয়ে রোলাঁ বলেন :—

"The pendulum of life moves heavily, and in its slow beat the whole creature seems to be absorbed. The rest is on more than dreams, snatches of dreams...dreams, dreams. All is a dream both day and night."

বিভূতিভূষণ বলেন :—

জীবন বড় মধুময় শুধু এই জন্য যে, এই মাধুর্য্যের অনেকটাই স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়া গড়া। (পৃঃ ২১০)

...শুধুই স্বপ্ন দেখে, দিন নাই, রাত নাই সর্ব্বজয়া শুধুই স্বপ্ন দেখে (পৃঃ ২১১)।

অপুর অবোধ দুরন্তপণা যখন মায়ের ভর্ৎসনায় প্রতিহত হয়, তখন রাগ অভিমান নিয়ে সে আত্মগোপন করে, চিন্তা করে আপন মৃত্যুর। যে মৃত্যুর ফলে মায়ের চোখে জল আসবে। মায়ের এই অনুভূতির সম্ভাবনায় তার মনের অভিমান প্রতিশোধের আনন্দে রূপান্তরিত হয়েছে। আবার নির্জ্জন গোপন স্থানে লুকিয়ে সে ভয়ে কেঁদেছে। বিভূতিভূষণের ভাষায়—

"রাগে আত্মহারা হইয়া দাওয়া হইতে নামিয়া বাহিরের উঠানের দিকে ঠিক সেইরূপ মরীয়ার মত ছুটিল।—তাহার মনে হইল এখন যদি একটা ভূতে আমায় তুলে একেবারে মগডালে নিয়ে যায় তো বেশ হয়—মা খুঁজে খুঁজে কেঁদে ম'র, ভাবে কেন সন্ধ্যেবেলা 'ছাই খাও' বললাম, তাইতো খোকা আমার রাগ ক'রে কোথায় অন্ধকারে মেঘ মাথায় বেরিয়ে চলে গেল, আর ফিরে এলো না। ভূতের হাতে সে মরিয়া গেলে মা'র কি রকম কষ্ট হইবে তাহা সে খানিকক্ষণ প্রতিহিংসার আনন্দ উপভোগ করিল।"

জাঁ ক্রিস্তফও অনুরূপ ভাবে বিভাবিত :

"Yes what if he were to kill himself to punish them...The sight of all this softened his misery. He was on the point of taking pity on their grief; but then he thought that it was well for them, and he enjoyed his revenge."

'পথের পাঁচালী'র লেখক বাংলা সাহিত্যে সোঁদা মাটির গন্ধ, 'টাটকা ভিজা মাটির গন্ধ' উপহার দিয়েছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও রোলাঁর হাতে 'the smell of the damp earth' সুন্দর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। 'পথের পাঁচালী'র আনন্দ। আনন্দ প্রসারের আনন্দ বিরাম চিহ্ন শুদ্ধ স্মরণে আনে আমাদের রোলাঁ বর্ণিত "Joy! Joy! There is nothing...oh infinite happiness!"

জাঁ ক্রিস্তফ ও বন্ধু অটো অপু-দুর্গার মত লোকালয় হ'তে অনেক দূরে ঝড়ের মধ্যে পড়েছে অপু-দুর্গার সেই নিভৃত আ" অন্বেষণক্ষেত্র..."দূর" বলিয়া এবং জনপ্রাণীর বাসশূন্য গভীর বনে মধ্যে বলিয়া এ সব স্থানে কেহ বড় একটা আম কুড়াইতে আসে না (তুলনীয়—"They were in a deserted country hal

an hour from the nearest house" )। সেখানে "মাঝে মাঝে দমকা ঝড়ের সোঁ—ও—ও বোঁ—ও—ও ডাল-পালা ঝাপটের শব্দে ঝড় নেমে আসে" ( তুলনীয়—"Suddenly a whirling wind raised the dust, twisted the trees and lashed them furiously" )। চতুর্দ্দিকে মেঘ ( They came up from every side like a cavalry Charge" ) রণোন্মুখ অশ্বারোহী সৈন্যের মত। বিভূতিভূষণের ভাষায় ( পথের পাঁচালীর অন্য এক স্থানে )" কালো কালো মেঘের রাশ হু হু উড়িয়া পূব হইতে পশ্চিমে চলিয়াছে—দূর আকাশের কোথায় যেন দেবাসুরের মহাসংগ্রাম বাধিয়াছে, কোন কৌশলী সেনানায়কের চালনায় জলস্থল—আকাশ একাকারে ছাইয়া ফেলিয়া বিরাট দৈত্য সৈন্যবাহিনীর পর বাহিনী, অক্ষৌহিণীর পর অক্ষৌহিণী, অদৃশ্য রথী মহারথীদের নায়কত্বে ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে।" তারপর জাঁ ক্রিস্তফ ও অটোর চতুর্দ্দিকে "A blinding savage light flashed, the heavens roared, the vault of the clouds rumbled. In a moment they were wrapped about by the hurricane, maddened by the lightning, deafened by the thunder, drenched from head to foot."

এদিকে অপু-দুর্গার চতুর্দ্দিকে "ভৈরবী প্রকৃতির উন্মত্ততার মাঝখানে ধরা পড়া দুই অসহায় বালক-বালিকার চোখ ঝলসাইয়া তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ" খেলে যায়। অবশেষে তারা "আপাদমস্তক সিক্ত অবস্থায় বাড়ী ফেরে।"

রোলাঁর প্রিয় বিরাম চিহ্ন সেমিকোলন, তিন ফুটকি (···) এবং সেমিকোলন ও বিভূতিভূষণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হয়েছে দেখা যায়। "পথের পাঁচালী"র শেষাংশের উপর রোলাঁর প্রভাব আরও স্পষ্ট। রোলাঁর ইংরাজী অনুবাদে পাই—

And the little puritan of fifteen heard the voice of his God :

"Go, go, and never rest."

"But whither, Lord, shall I go ? Whatsoever I do, whither soever I go, is not the end always the same ? Is not the end of all things in that ?"

"Go on to Death, you who must die ! Go and suffer, you who must offer ! You do not live to be happy. You live to fulfil my Law. Suffer ; die. But be what you must be a man."

"পথের পাঁচালী"র সমাপ্তি-সঙ্গীত অপূর্ব্ব···অনবদ্য গদ্য কবিতা··· 'লিপিকা'র রং মাখানো। "পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিয়া বলেন—মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি ধলচিতের খেয়াঘাটের সীমানায়। তোমাদের সোনাডাঙা মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে, বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে, পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে··· দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে···

বিভূতিভূষণের এই অনবদ্য সমাপ্তি-সঙ্গীত রোলাঁর ভাবানুসারী ও রবীন্দ্রনাথের ভাবানুসারী। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র "পায়ে চলার পথ" রচিত হয়েছে ( তুলনীয় "পথের পাঁচালী" নাম ) আশ্বিন ১৩২৬-এ ( ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ )। তার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত হ'ল :—

"এই তো পায়ে চলার পথ। এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে বটগাছতলায়, তারপরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেঁকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে, তার পরে তিসির ক্ষেতের ধার দিয়ে আম-বাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্মদীঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন্ গাঁয়ে পৌঁচেছে জানিনে।

···নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুর পাড়, দ্বাদশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়াল বাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে—সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে, আর একটি বারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, 'এই যে।' এ পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয়।

···সেই একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্য্যাস্তের দিকে—এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর এক সোনার সিংহদ্বারে। ···বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্য্যাস্তের দিক পর্যন্ত ইশারা মেলে রাখে।"

হুবহু অনুসৃতি 'পথের পাঁচালী'র উদ্ধৃত অংশে।

তবুও 'পথের পাঁচালী' অপূর্ব্ব···অনুপম···অনবদ্য। এর কোথাও প্রভাতের মালিন্য নেই···স্বীকরণের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত সর্ব্বাংশ। কারণ বিভূতিভূষণের ঋণ অপেক্ষা দান অনেক বেশী। বিচার করলে সেক্সপীয়র বা রবীন্দ্রনাথ কেউই ঋণী কম নন···তবু ওদেশে বা এদেশে এঁরা অনুপম। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের গৌরব। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে জাঁ-ক্রিস্তফের পাশে 'পথের পাঁচালী'কে বরমালা দিয়েছেন অতুল'বাবু। আগামী সংখ্যায় 'পথের পাঁচালী'র অবিনশ্বরত্ব কোথায়, তা বিচার ক'রব। এ সংখ্যার আলোচনা হ'তে এ ভুল যেন কারুর না হয়,আমি বিভূতি বাবুকে ছোট করার চেষ্টা করেছি। নিঃসন্দেহে 'পথের পাঁচালী'কার নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর রসলোকে স্থান ক'রে নিয়েছেন এবং ভারতীয় সাহিত্যে এমন অভিনব ও চিরন্তন উপন্যাস আজ পর্যন্ত একটিও লেখা হয়নি।

[ ক্রমশঃ।

## ···এ মাসের প্রচ্ছদপট···

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে পুরী, কুলদা আশ্রমের দেওয়ালগাত্রস্থিত প্রস্তরশিল্পের নিদর্শন মুদ্রিত হইয়াছে। এই আলোক-চিত্রখানি শ্রীমতী ছবি গঙ্গোপাধ্যায় গৃহীত।

# একটি ভেজা চিঠি

## সুধাংশু দে

"চিঠিতে কি ভোলে মন
বিনা দরশনে ?
শিশিরে কি ভিজে বন
বিনা বরিষণে ?"

গ্রাম-দেশে, বিশেষ ক'রে পূর্ববাঙলায় পাত্রী দেখার সময় যখন মেয়ের গুণপণার ফর্দ দেওয়া হয়, তখন চটের উপর মোটা রঙিন সুতোয় তোলা ফুল ( অনেক সময় টবসমেত ), যার নিচে সযত্নে এই লাইন ক'টি লেখা থাকে—অনেকে হয়ত লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। অনেক সময় এ আবার চট ছেড়ে কাপড়ের টুকরোয় স্থান পায়, এবং তা আয়না দিয়ে সুন্দর ক'রে বাঁধিয়ে বেড়ায় ঝুলিয়ে রাখা হয়—বিশেষ ক'রে বাইরবাড়ী ঘরের বেড়ায়।

বিনা বরিষণে বন যেমন পুরোপুরি ভেজে না, তেমনি বিনা দর্শনে মন পুরোপুরি ভেজে না। কিন্তু শিশির-ভেজা বন আর বরিষণ-ভেজা বন-এ অনেক পার্থক্য। পার্থক্য বলেই, দু'টোর পরিবেশ রূপকল্প অনুভূতি, আবেদন স্বাদ—সবই ভিন্নতর। রায়শেখরের ভাষায়—

( ক ) তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম মোহনে একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর ॥

( খ ) হিমকর কিরণ হিম অনিবার।
দিশি দিশি হিমগিরি পবন বিথার
* * *
না দেখিয়া তঁহি বর নাগর কান।
কাতর অন্তর আকুল পরাণ ॥

এ-ক্ষেত্রে কিন্তু বরিষণ-ভেজা বন চাই ; শিশির-ভেজা বন চাই না। যেমন—এখানে প্রয়োজন দর্শনের, দর্শন চাই ; চিঠি চাই না। নিষ্প্রয়োজন—এই জন্যে যে, বিরক্তিকর। কেন না—

বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
—( মুরারি গুপ্ত )

ফ্যাসাদ হলো, অনেক সময় দর্শনেও আবার সব নিষ্পত্তি হয় না। যেই গোলমাল সেই গোলমালই থেকে যায়। এমন কি, গোলমাল আরো বেশি জট পাকিয়েও যায়।

দুহুঁ অদরশে দুহুঁ অতি সে বিয়াকুল
দরশনে ঐছন রঙ্গ ॥
—( প্রেমদাস )

ধ'রে নেয়া গেল, না-হয় দর্শনে একটা-কিছু রফাই হলো। কিন্তু তার পরও যে আছে···এবং সব-শেষের শেষ কোথায়, তা-ই কে জানে !—

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

এক যুগে অর্থাৎ এক জীবনের আয়ুর পরিধিতে কিছু না হলেও, অনেক যুগকে একজীবনের আয়ুর পরিধিতে পেলে পর—হিয়া যতই তেতে থাকুক না কেন, শেষটায় কী যে অবস্থা দাঁড়াত, তা অবশ্য এখনই বলা কঠিন।

মোটের ওপর, দর্শকের যত দর্শনই থাকুক না কেন—এবং পাত্রপক্ষের উদরপূর্তি ষোড়শোপচারে যত তোয়াজ করেই করা যাক না কেন—দর্শনেই যে শুধু দায়গ্রস্ত পাত্রীপক্ষের পেট ভরে না, তা বোধ হয় নতুন ক'রে এত বিনিয়ে-বিনিয়ে না বললেও চলতে পারে।

পাত্রী-দর্শন-পর্ব না হয় কোন রকম যেন-তেন-প্রকারেণ শেষ হলো, কিন্তু তার পরও ত আছে—কত চিঠি লেখালেখি ! সর্বশেষে যদিও বা বরিষণ—কিন্তু তার আগে কত সাধ্যসাধনা, কত দর-কষাকষি !

আপাততঃ না-হয় 'পহিলে দর্শনধারী' ; কিন্তু 'পিছারি গুণ-বিচারী'র ( গুণ—যৌতুক ইত্যাদির পরিমাণ ) সময় যে আবার চিঠির প্রয়োজন হবে না, এমন কথাও কসম খেয়ে বলা যায় না !

তা সত্ত্বেও, চিঠি বনাম দর্শন এবং শিশির বনাম বরিষণ-এর দর্শনে যেতে আপত্তি কী !

সব সময় দর্শনে যে মন ভোলে, তা যেমন ঠিক নয়—তেমনি সময়-সময় চিঠিতে যে মন না ভোলে, তা-ও কিন্তু ঠিক নয়।

আর, প্রথমেই বলে রাখছি—মন যেমন কেবল শিশিরেই সিক্তি হয় না, বরিষণেও হয় ; চিঠিও তেমনি কেবল অশ্রুসিক্তনেই সিক্ত হয় না, বরিষণেও হয় ;—এই যে মন-ভোলানো আর বন-ভেজানোর সব ব্যাপার ( এবং তার রকমফের ), এইখানেই বোধ করি যত রাজ্যের ট্রাজেডি !

চিঠির পরিবর্তে সাক্ষাৎ দর্শন বেশির ভাগ সময় কাম্য। তাই ব'লে যে চিঠির একেবারেই কোন প্রয়োজন নেই, এমনও কোন কথা নয়। যে-ক্ষেত্রে চিঠি ছাড়া গত্যন্তর নেই—সেইখানেও চিঠি একটি না হলেই নয়। তা ছাড়াও কিন্তু এমন অনেক মুহূর্ত প্রত্যাসন্ন হয়, যখন দর্শনের পরিবর্তে চিঠি অনেক বেশী জরুরী। যেমন—বরিষণ-ভেজা বনের তুলনায় মনের অবস্থা-বিশেষে ( এবং সময়-সময় কর্মের অবস্থা-বিপাকে ) শিশির-ভেজা বন এক এক সময় অধিক কাম্য।

দর্শনের প্রয়োজন তীব্র অনুভূত হলেও, গ্রাম-দেশের মেয়েরাও যে চিঠির প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা অনুভব করে না—এমন নয়। প্রসঙ্গত, পাত্রীর গুণপণার ফর্দের মধ্যে আগেরটির মত আরেকটি বাঁধানো আয়নাও লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায়, যা'তে লেখা থাকে—

"যাও পাখী, বল তারে—
সে যেন ভোলে না মোরে।"

এখানে পাখীই চিঠি। পাখীতে কবিত্ব থাকলেও বাস্তবতা অনুপস্থিত নয়। আগেকার দিনে যখন এখনকার মত ডাক-সরবরাহ ব্যবস্থা চালু ছিল না, তখন পাখী মারফৎ চিঠি আদান-প্রদান চলতো। তা'হলে, এই অর্থে বলা চলে—এখনকার ডাক-বিভাগই আগেকার 'যাও পাখী'র পাখী। আগেকার পাখীর সঙ্গে এখনকার পাখীর গরমিল বা গোঁজামিল যেমন অনেক, তেমনি মিলও কমতি যায় না—অন্ততঃ চিঠি গোলমাল কারর ব্যাপারে।

—এ ত গেল, পাখী দিয়ে আসল পাখী কিম্বা রামপাখী পাকড়াও

করার কথা। কিম্বা, যোগাযোগ রাখা অথবা করার ব্যাপার। তা' ছাড়াও ত পাথীর ( মানে—চিঠির ) প্রয়োজন। এবং সে-প্রয়োজনও নেহাৎ ফেলনা নয়।

শুধু চিঠিতে মন ভেজে না, তা যেমন অনস্বীকার্য—তেমনি, এমন অনেক কথা আছে যা' চিঠিতে মুখর, কিন্তু দর্শনে বোবা। সময় সময় হারাও বটে। সময়-বিশেষে এমনও অনেক কথা হ'তে পারে—যা'র টেপ-রেকর্ডিং একান্ত আবশ্যক ; কিন্তু তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নাগাল-বহির্ভূত। আবার পত্রসাহিত্য-অনুরক্তরা হয়ত বলবেন—যেমন বক্তৃতায়, তেমন কথায়, অনেক অবান্তর এলোমেলো কথা থাকে, যা অত্যন্ত অন-আর্টিষ্টিক। কিন্তু চিঠিতে সেই আর্ট, পুরোপুরি না হলেও, অনেকখানি অক্ষত থাকে। পত্রসাহিত্য-অনুরক্তরা শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনের কথাবার্তার চাইতে চিঠির কথাবার্তার মূল্য অধিক দিয়ে থাকেন—অবশ্য যে ক্ষেত্রে চিঠি সাহিত্য-পর্যায়ভুক্ত হওয়ার দাবি রাখে। সাহিত্যানুরক্ত বা সাহিত্যানুরক্তাদের কাছে দর্শনের চাইতে আর্ট অনেক বেশি মূল্যবান—সে আর বেশি কী! তবে, আপাততঃ তুলনামূলক ভাবে দর্শন বড় কি দরশন বড়—তা অবশ্য এক দুরূহ সমস্যা!

'চিঠিতে কি ভোলে মন বিনা দরশনে' এ যখন অবস্থা, তখন ধরে নিতে হবে সত্যি চরম অবস্থা, তা যে অবস্থা বিপর্যয়েই হোক না কেন। এবং তখন দর্শন এড়িয়ে যত দর্শনের বাতচিৎই করা যাক না কেন, তা যে নিতান্তই বেসুরো—তাতে বোধ হয় সুরাসুর সবাই একমত। ঐ অবস্থায় চিঠি অপেক্ষা দর্শন অধিক কাম্য হলেও, আবার কিন্তু দর্শনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চিঠির প্রয়োজনই সর্বাগ্রগণ্য। কাজেই, তখন চিঠি পাওয়াটা বিরক্তিকর হলেও দেওয়াটার এবং লেখাটার মধ্যে বিরক্তি বা অশ্রদ্ধা থাকলে কিন্তু সব কিছু ভেস্তে যাবার সম্ভাবনা। এসব ক্ষেত্রে চিঠি লেখার ব্যাপারে কতখানি যত্নবান বা যত্নবতী হওয়া প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়। তা না হলে যে কী পরিমাণ বিভ্রান্তি বা বিভ্রাটের সৃষ্টি হতে পারে, তা স্বামীর কাছে লেখা ( গ্রাম থেকে বিদেশে সহরে ) জনৈকা স্বল্প-শিক্ষিতা মহিলার এই চিঠিতে পরিষ্কার বুঝা যাবে।

স্বামীর কাছে মহিলাটির আসলে বলার ছিল এই : "শ্রীশ্রীচরণ-কমলেষু॥ প্রণামপূর্বক নিবেদন এই, তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে শান্তি পাইলাম। সমস্ত খবর লিখিতে বলিয়াছ বলিয়া লিখিতেছি। ভাসুরঠাকুর একটি ছাগল কিনিয়াছেন। রোজ আধসের করিয়া দুধ দেয়—কলাপাতা, কচি-কচি ঘাস খাইয়া। মা দুইবার বমি করিয়াছেন। ঠাকুরের মুখে সব শুনিবে। গ্রামের চাষারা—সব খেজুরগাছ কাটিতেছে। আমার গরু দুটি ভাল আছে। বাবা দাড়ি কামাইতে যাইয়া মুখ কাটিয়া ফেলিয়াছেন। বিন্দি পিসী সাপের কামড়ে মারা গিয়াছে। খুকী খোকা রোজ পাঠশালায় যায়। না পড়িয়া ঘুমায়না। খেলা করে বিকেলবেলায়। আমি একপ্রকার ভালই আছি। তুমি বাড়ী আসিও। না আসিলে দুঃখিত হইব। তোমার চাকুরী গিয়াছে শুনিয়া দুঃখিত। এই ছিল তোমার কপালে? আমার পা ফুলিয়াছে। তোমার শরীর কেমন? আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিলাম। খোকাকে পত্র দিও। প্রণতা···বিরাম চিহ্নে, বিশেষ করে দাঁড়িতে গোলমাল করায় চিঠিটি হয়ে গিয়েছিল এই : "শ্রীশ্রীচরণকমলেষু॥ প্রণামপূর্বক নিবেদন এই, তোমার পত্র পাইয়া দুঃখিত। অন্তঃকরণে শান্তি পাইলাম সমস্ত খবর লিখিতে। বলিয়াছ বলিয়া লিখিতেছি। ভাসুরঠাকুর একটি ছাগল। কিনিয়াছেন রোজ আধসের করিয়া দুধ। দেয় কলাপাতা। কচি-কচি ঘাস খাইয়া মা দুইবার বমি করিয়াছেন ঠাকুরের মুখে। সব শুনিবে? গ্রামের চাষারা—সব খেজুর গাছ। কাটিতেছে আমার গরু দু'টি। ভাল আছে বাবা। দাড়ি কামাইতে যাইয়া মুখ কাটিয়া ফেলিয়াছেন বিন্দিপিসী। সাপের কামড়ে মারা গিয়াছে খুকী। খোকা রোজ পাঠশালায় যায় না পড়িয়া। ঘুমায়না, খেলা করে। বিকেলবেলায় আমি একপ্রকার ভালই আছি। তুমি বাড়ী আসিও না। আসিলে দুঃখিত হইব। তোমার চাকুরী গিয়াছে শুনিয়া দুঃখিত। এই ছিল তোমার কপালে আমার পা। ফুলিয়াছে তোমার শরীর? কেমন—আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিলাম খোকাকে। পত্র দিও। —প্রণতা···॥" *

যতি বা বিরতির সঙ্গে মতি ও গতির সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ বলেই বোধ হয় যতি বা বিরতি জ্ঞানের অভাব ঘটলে, ছেদ-চিহ্নে চরম বিচ্ছেদই শুধু আনে না—সময়-সময় এক একটা মহা বিভ্রাটেরও সৃষ্টি করে থাকে। এবং তার প্রমাণ এই হাতে হাতে।

বলতে কোন দ্বিধা নেই যে—কি সহর, কি গ্রাম, সর্বত্র মেয়েদের দাঁড়ি-জ্ঞানের অভাব একটু বেশি। সহরের তথাকথিত রবীন্দ্র-ভক্তদেরও দেখেছি—তাঁদের দাঁড়ি-জ্ঞানের কত অভাব! ( বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ দাঁড়ি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ) তাঁরা আর-কিছু না-করুক, কবিগুরুর দাঁড়ির প্রতি নজর রাখলে এ-দৈন্য থেকে যে রেহাই পেতে পারতেন—তা বলার প্রয়োজন আছে, মনে করি। মুস্কিল হলো, এখন দাঁড়ি নিয়ে বেশি টানাটানি করতে গেলে অনেক মহাশয় ব্যক্তিই ভয়ে-ভয়ে হয় দাঁড়ি একেবারেই তুলে দেবেন, নয়ত অযথা দাঁড়ি লাগিয়ে বসবেন জায়গা বে-জায়গায়।

তবু রক্ষা, আমার সঙ্গে যে-সব রবীন্দ্রভক্তের ( তথাকথিত সমেত ) আলাপ পরিচয়, দাঁড়ির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি সহজাত এবং সদাজাগ্রত! এখন বর্ষাকাল। শিশির নয়, বরিষণ। রায়শেখরের বর্ণনায়—

গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলসই।

কিম্বা, গোবিন্দদাসের বর্ণনায়—

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত।
দশ দিশি দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার।

---

* শ্রীননী দাশগুপ্ত রচিত এই নক্সাটি অনেকদিন পূর্বে হিজ মাষ্টার্স'র রেকর্ড ছিল। পরে অবশ্য তাঁর 'বিদূষক' গ্রন্থেও এটি সংযোজিত হয়। এখন উভয়ই দুষ্প্রাপ্য। হাস্য-কৌতুক শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে এটি আমার সংগ্রহ করা।

অথবা, অনন্তদাসের বর্ণনায়—

মেঘ দুরন্দুর, দাদুরীর বোল
ঝিঁঝা ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরী-ছটা,
হিয়ার পুতলি দোলে॥

আবার ভূপতি সিংহের বর্ণনায়—

প্রথম ছার আষাঢ় আওল
আহুঁ গগন গম্ভীর।
* * *
আওয়ে শাওন বরিখে ভাওন
ঘন শোহায়ন বারি।

এখন যেমন শিশির নয়, বরিষণ—তেমনি প্রয়োজন: চিঠি নয়, দর্শন।

আর, দর্শন শুধু অসম্ভব বলেই নয়—দর্শনের তাগিদেও আবার চিঠির প্রয়োজন।

'এমন দিনে তারে বলা যায়'—তেমন একটি দিনে হয়ত 'তার' দর্শন অভাবনীয়, অসম্ভব। কিন্তু চিঠি সম্ভব ও স্বাভাবিক—যদিও তাতে মন ভুলবে কি-না বলা কঠিন। কিন্তু সে-অবস্থায় চিঠি যদি আবার অ-সম্ভব কিম্বা অ-স্বাভাবিক হয়ে পড়ে—তা হলেও অবস্থা আরো কাহিল।

এদিকে বর্ষার প্রচণ্ড বর্ষণ। স্বভাবতঃই, তার অভাব এখন অভাবনীয়। বন—বরিষণ-ভেজা। কিন্তু, মন—শিশির-ভেজা। অন্ততঃ একটি চিঠি পাওয়ার সম্ভাবনায়।

ঠিক সেই সময়, উসখুস করতে-করতে চিঠির বাক্স গিয়ে খুলতেই যদি 'এমন দিনে তারে বলা যায়,'—তেমন একজনের চিঠি পাওয়া যায়, তা' হলেও কোন কথাই নেই। (আর, আজকাল 'তাদের' চিঠি পোষ্টকার্ডেই অধিক নিরাপদ।)

অবশেষে···সত্যি 'তার' চিঠি। কিন্তু তা অ-সম্ভব না-হয়েও অ-স্বাভাবিক। ভাব বা অভাবের কথা চুলোয় যাক, চিঠিটি সম্পূর্ণ অভাবনীয়। একেবারেই অবোধ্য। বরিষণ-ভেজা চিঠি।

শিশির-ভেজা মনে বরিষণ-ভেজা চিঠিতে—প্রাণ ভেজা ত দূরের কথা, প্রাণ ওষ্ঠাগত; শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার উপক্রম। আর, তার সঙ্গে এত দর্শন অ-দর্শনের কথা কোথায় যে তলিয়ে গেল, বেশ খানিকক্ষণ তার কোন হদিশ পাওয়াই দুঃসাধ্য।

তবু শিশির-ভেজা বুকে বরিষণ-ভেজা চিঠির আগুন নিয়ে 'ডাক বিভাগ' বেঁচে থাক, এই হয়ত হবে শেষ প্রার্থনা।

## মজুর

মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্লান্ত কর্ম শেষে ফিরে গেছে মজুর দল,
কারখানা পড়ে আছে শ্রান্ত-ক্লান্ত হ'য়ে
দিনাবসানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে।
কলগুলো পেয়েছে বিশ্রাম, যেমন পেয়েছে
মজুরগুলো। কালো-রঙের কলগুলো আর
কালো-দেহের মানুষগুলো যেন মিতালি পেতেছে!
জড়ের সঙ্গে প্রাণের মিতালি,—তাই প্রাণ জড়কে
করেছে প্রাণবান ঐ কারখানা ঘরে।
দিনাবসানে প্রাণ হ'য়ে যায় যেন জড়;
প্রাণের স্পর্শে প্রাণবান হয়েছিল যে জড়, প্রাণছেদে
সে জড়ই হয়, সত্যি প্রাণও জড় হ'য়ে যায়, মিথ্যা কি না!

ফুলে ভরা, ফলে ভরা, আনন্দে ভরা
এই পৃথিবীর কোন এক অজ্ঞাত প্রান্তে
নির্বাসনে পড়ে আছে এই মজুরের দল।
আনন্দ বুঝি ভুলেছে এরা বাঁচার তাগিদে।
তবু আনন্দের উৎস এরা। আনন্দে ভাসি আমরা,
সে আনন্দের উৎস সন্ধানে যাই না! আর—সে যে
বড় অন্ধকার, বড় কাল। তবু এদেরও আশা আছে,
ভালবাসা আছে, জীবনের তৃষা আছে। কোন একক্ষণে
জন্ম দিল এক শিশুকে কোন এক বস্তির নিঃসীম
অন্ধকার ঘরে। জন্মলগ্নে ঘোষিত হল সে
পৃথিবীর কাছে মজুর-সন্তান বলে;
জীবনের সব ভুলে চিনবে সে ঐ কারখানা
মিতালি পাতাবে সে ঐ কলে।

## কবি কর্ণপূর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**অনুবাদ—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর**

এই রাজধানীতে মহারাজ নন্দভ্রাতা উপানন্দাদির বিদ্যমান রয়েছে বহু "পুর"। দুর্ভেদ্য তাদের প্রাচীর; দেখলে মনে হয়, অরুণোদয় দেখছি প্রাচীমূলে। তাদের মরকত-ভাস্বর মহাপথ দেখি, আর মনে হয়, সূর্যদেবকেই দেখছি, যেন ঐ তাঁর হাতের পান্নরি লাগামখানি দুলছে বিশাল ঘোড়ার মুখ থেকে; তাদের বিতানিক মণিতোরণ দেখি, আর মনে হয়, এইগুলিই নিশ্চিত জগতের একমাত্র উৎসবক্ষেত্র; তাদের অত্যুচ্চ অট্টালিকা দেখি, আর মনে হয়, অট্টহাসি হেসে মহাদেব নাচছেন।

এই পুরগুলির মধ্যে রয়েছে অনিন্দ্যসুন্দর বহু মন্দির। নাম তাদের 'মণি-নিশান্ত'। নিশান্তের সূর্যোদয়ের মত নিজের বিপুল জ্যোতিঃতে তারা জ্যোতির্ময়।

এই পুরগুলির প্রত্যেকটি ছাউনী ( পটল ) সোনার, যেন সোনার সাজে সেজে রয়েছে নারায়ণ। প্রত্যেকটি ছাঁচে ( বলী ) বড় বড় মুক্তার লহর, যেন মুক্তপুরুষদের হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসছে ব্রহ্মানন্দ। কী সুন্দর তাদের বিদূরমণির পাড়িগুলো ( বলভী )! নিঃশঙ্কে সেগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে—শ্রেষ্ঠ সৈন্যাধ্যক্ষদের মত। বাঁকা-কাঠের ছাউনীদার পাড়িগুলোও ( গোপানসী ) চন্দ্রকান্তমণির; চমকে যেতে হয়; যেন জ্যোৎস্না পান করতে বসে গেছে একঝাঁক চকোর! নানান রত্ন দিয়ে মোড়া অলিন্দ। রত্নপুর? না রত্নপাহাড়।

রাজধানীর এই স-দাম ও হেমাসন—সনাথ 'পুর'-গুলিকে দেখলেই মনে পড়ে যায় পার্বতীনাথকে; যেন তিনি তাঁর উৎসবমালা-ধারিণী পত্নীটিকে সঙ্গে নিয়ে ব্রতী হয়ে রয়েছেন সংসার-যজ্ঞে।

৫৩। যে পুরটিতে মহারাজ নন্দ থাকেন, সেই পুরটিই সর্বপ্রধান। তার প্রাচীর নীলকান্তমণির, ভবন পান্নার, শিখর স্বর্ণের, স্তম্ভ প্রবালের, বেড়াগুলি স্ফটিকের, চাঁদনী বৈদূর্য্যের; তোরণ-গৃহ রাজাবর্ত্তমণির; বিরাট সিংহদ্বার বেদাগ মাণিক্যের। প্রত্যেকটিতে এত বিভিন্ন রকমের কারুকাজ যে, হার মেনে যায় দেবতাদের রথগুলিও।

নন্দরাজভবনের একটি দেয়ালে, শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ মণি দিয়ে খোদাই করে বসানো রয়েছে কতকগুলি টিয়ে পাখী। ছবির টিয়েগুলির সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে ঘরের টিয়েগুলিও বিস্ময়ে নিস্পন্দ হয়ে থমকে দাঁড়ায়। এগুলো জীয়ন্ত না ওগুলো জীয়ন্ত! ঐ যাঃ, সন্দেহে দুলতে দুলতে মুগ্ধাঙ্গনারা ভুল করে ছবির টিয়েগুলোকেই খাইয়ে দিতে যান দাড়িমের দানা। কী লজ্জা, মা কী লজ্জা!

৫৪। এই পুরে থাকেন ব্রজরাজ শ্রীনন্দ। মূর্তিমান যেন বাৎসল্য রস, শরীরধারী যেন শুদ্ধসত্ত্ব, সর্বসৌভাগ্যের যেন শ্রেষ্ঠাংশ, আনন্দ-সমুদ্রের যেন দ্বীপ। চিৎ-বিলাসের মত একটি পরিবর্ত্তন-হীন অবস্থায় নিত্য বিরাজ করতেন শ্রীভগবানের পিতৃভাব-ভাবুক শ্রীনন্দ।

৫৫। তাঁর সধর্মচারিণীর নাম 'শ্রীযশোদা'। নিজের কুলের যশোদাত্রী তিনি। যেন একটি কল্পবল্লরী, সফল হয়েছেন শ্রীভগবানকে প্রকাশ করে; যেন মূর্ত্তিমতী বাৎসল্য রসের শ্রী; যেন সঞ্চারিণী তেজোমঞ্জরী।

৫৬। এই পুরে বাস করেন বহু গোপ। তাঁরা সকলেই যে পশুপতি, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা অ-হর, অ-ভব, ও অ-রুদ্র; অর্থাৎ চৌর্য্যবৃত্তি-হীন, জন্মমরণ-হীন ও অনুগ্র-মূর্ত্তি। গব্য-পদার্থ তাঁদের জীবিকা হলেও তাঁরা গব্য ( অর্থাৎ পার্থিব ) জীব নন, তাঁরা চিন্ময়।

৫৭। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো গোপ ব্রজরাজ নন্দের সনাভি জ্ঞাতি, পরম্পরা-সম্বন্ধে কেউ বা তাঁর আত্মীয়। তাঁদের অপত্যেরা শ্রীকৃষ্ণের সহচর। আহা, এই গোপেরা যেন মূর্ত্তিমান ভগবদ্ধর্ম, তাঁদের পত্নীগণ মূর্ত্তিমতী ভক্তিবৃত্তি, এবং কন্যারা ভগবৎ-প্রেয়সী।

৫৮। যে সব গোপবালক সহচর ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের, তাঁরা সকলেই শ্রীসনকাদি ঋষিদের মত নিত্য-কুমার। সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সমবয়সী পাখীদের মত খেলে বেড়াতেন বন-প্রদেশে।

শ্রীকৃষ্ণের তাঁরা তুল্যগুণে গুণী; একই রকমের সূতো, হারের কেবল ভেদ। অবাক করে দেয় তাঁদের মাথার নিত্য-স্বচ্ছ কেশ; শরৎকালের সরোবর যেন হাসছে। সকলেরি অঙ্গে মৃগমদের চর্চ্চা। সকলেরি আনন শরৎ-ঋতুর বিলাসের আসনের মত পদ্মফোটা। সমান-শ্রুতি···যেমন ষড়জ-মধ্যম-পঞ্চমস্বর। সুগন্ধি ফুলের মত সুন্দর নাসা। পাশার ঘুঁটির মত চঞ্চল চোখ। ওজস্বী সুঠাম গ্রীবাগুলি মনে পড়ায় রঘুনাথ-সহায় সুগ্রীবকে। শিশু হস্তীর শুণ্ডের মত দীর্ঘস্থূল হস্ত। অপূর্ব একটি আভা নিত্য খেলে বেড়ায়, তাঁদের প্রত্যেকেরই বক্ষে; যেমন চিক্‌চিক্ করে চমকায় ক্ষীর-সমুদ্রের ধীর ঢেউ। সদাসুখীদের মত উৎসব-প্রবীণ উরুদেশ। চন্দ্র-কোমল তাঁদের শ্রীপাদ।

এঁরাই হচ্ছেন শ্রীদাম সুদাম বসুদাম সুবলাদি শ্রীকৃষ্ণ-সহচর। নিত্য দশাভেদ-হীন। দেবতাদের চেয়েও তাঁরা বরণীয়।

৫৯। দ্বিতীয়তঃ ঐ যাঁরা গোপদের প্রসিদ্ধা কন্যাগণ তাঁরা সকলেই কমনীয়া কিশোরী।

সু-কবিতার চরণগুলির মত তাঁদের চরণগুলি অতি সুকুমার; মনোবৃত্তির মত গতিরাগ-নিরুপমা তাঁদের জঙ্ঘালতা; উরুগুলি যেন রম্ভা-স্তম্ভারোপিত উৎসব-ক্ষেত্র; জানুগুলি অতি মনোহর। অর্থ-প্রকাশিকা টীকা দেখে যেমন বুঝতে হয় দুরূহগ্রন্থের বৃত্তি, তেমনি তাঁদেরকে বুঝতে হলে দেখতে হয় তাঁদের "কটিতটীকা"। অশ্বত্থপত্রের মত নতোন্নত উদরের শিখরে তাঁদের মোহন আবর্ত্ত-নাভি দেখলেই মনে হয়···"না ভিঃ" আর ভয় নেই; ভগবানের নামোচ্চারণের মতই যেন ভয় ভাঙিয়ে দেয় ঐ না-ভি। কী দীন তাঁদের মধ্যদেশ, যেন ভগবানের কৃপা ঝরে পড়েছে দীনের প্রতি। তাঁদের নবোদ্ভিন্ন পয়োধরের উপমা মেলে খুঁজে পায় নবমেঘমালিনী বর্ষাশ্রীতে, তাঁদের বাহু-লালিত্যের আয়তির তুলনা মেলে আয়ত-তমিস্রা হেমন্তশ্রীতে।

আর তাঁদের শঙ্খের মত রেখাঙ্কিতা গ্রীবা! স্নানান্তের শিরঃশোভাটিকে যেন আহ্লাদে ধরে রেখেছে···নবীন এই শঙ্খদান। আর তাঁদের বরানন! বলি, পদ্মফুলকেও কি মাজা যায়? আর

এঁদের নাসিকা! স্মরণে আনে তিলকুসুমামোদিনী বাসন্তী-শ্রীকে। তাঁদের চোখের চাউনিতে যেন অনুগৃহীত হয়ে যায় নীলপদ্ম। ভগবানের গুণ-গীতায় মত তাঁরা কর্ণ-রম্যা। কুবেরের পুরসুন্দরীদের মত, আহা, যেন নিত্য নেচেই আছে এঁদের অলকাবলী। আর কী চুল! চোখ ভুলে যায়; বরুণদেবের শিল্পকলাটিকে যেন পরিপাটি গুছিয়ে রেখেছেন বারুণী।

৬০। ভগবৎপ্রেয়সী এই গোপকন্যাদের মধ্যে বিরাজ করেন আর একটি কিশোরী। নিখিল রমণী-সমাজের তিনি মৌলি-মণিমালা।

শৃঙ্গার-করুণ বৈদর্ভী রীতির মত, তিনি রসভাবময়ী, মাধুর্য্য ওজঃ প্রসন্নতাদি সর্বগুণে গুণময়ী ও সালঙ্কারা। বিশ্বগুণের তিনি খনি। আহা—

তিনি কি প্রেম-মাকন্দের সুরভি-বিধুর কনক-কেতকী?

তিনি কি মাধুর্য্য-মেঘের তড়িৎ-মঞ্জরী?

তিনি কি সৌন্দর্য্যের নিকষ-পাষাণে কনকের রেখা?

আনন্দ-ইন্দুর জ্যোৎস্না? বসন্তের হাসি? চৌষট্টি কলার জন্মভূমি, লাবণ্য-সমুদ্রের মূল-শ্রী, কন্দর্পের ভুজদর্পের শ্রেণী-সমা এই কিশোরীটির নাম—"শ্রীরাধিকা"।

৬১। অনেকেই তাঁকে "গৌরী" বলে ডাকেন; তাই বলে তিনি পর্ব্বতনন্দিনী গৌরী নন, সহস্র গৌরীর চেয়েও তিনি শ্রেষ্ঠা। এবং যেহেতু, শীতের সময় যাঁর তনুখানি তপ্ত হয় ও গ্রীষ্মে হয় শীতল, এবং যেহেতু তাঁর স্তনযুগ অতি কঠিন, সেই হেতু অনেকে আবার তাঁকে "শ্যামা" বলেও ডাকেন। তাই বলে তিনি শ্যামলবরণী নন। তিনি অনাদি-কিশোরী, সুকুমারী, সখীদের প্রাণস্বরূপা, সুরূপা, অধিকারিণী হয়ে বসে রয়েছেন বিশ্ব-সৌভাগ্যের।

৬২। কোনো কোনো শাস্ত্রবেত্তা এঁকেই "মহালক্ষ্মী" ব'লে নিশ্চয় করেন; তান্ত্রিকেরা বলেন "লীলা"; কেউ বলেন—ইনিই "আনন্দিনী-শক্তি"।

বিশাখা, ললিতা ইত্যাদি কিশোরীরা তাঁর প্রিয়সখী—রূপে গুণে তাঁরা শ্রীরাধিকার সমান, যেন প্রতিচ্ছায়া।

৬৩। এই রাজধানীতে আর একটি ললনারত্ন রয়েছেন, তাঁর নাম "শ্রীচন্দ্রাবলী"। তিনিও যূথেশ্বরী। একটি নয়, দুটি নয়, চাঁদের শ্রেণীর মতই তিনি পরমাহ্লাদ-বিধায়িনী।

তিনি গুণময়ী—প্রকৃতিদেবীর মত। তিনি রূপময়ী—দৃষ্টিদেবীর মত! তিনি রসময়ী—জলদেবীর মত। ফুলের মতই তিনি সর্বত্র ছড়িয়ে বেড়ান পরমানন্দের গন্ধ। পদ্মা, শৈব্যা ইত্যাদি কিশোরীরা তাঁর প্রিয়সখী।

এই রাজধানীতে রয়েছেন আরও একটি যূথেশ্বরী, তাঁর নাম 'শ্যামা'। শ্রীরাধার তিনি স্বপক্ষা; তাঁরও অধীনে রয়েছেন বহু যূথেশ্বরী।

৬৪। রাজধানীতে বাস করেন বহু বিপ্র। তাঁরা পরম দয়ালু! যেন প্রত্যেকেই মূর্ত্তিমান ভাগবৎ-ধর্ম! শম দম তিতিক্ষা ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি হলেও সাত্বত-শাস্ত্রের তাঁরা প্রবক্তা। বেদের মধ্যে তৎ-শাস্ত্রের অনুকূলে যা কিছু রয়েছে তারই অভ্যাসে তাঁরা নিত্যরত। কয়েকজন আবার "পঞ্চরাত্র" নামা গ্রন্থবিশেষটিতেই একমাত্র মগ্ন হয়ে থাকতেন। তাঁরা প্রতিগ্রহ করতেন;—একমাত্র রজরাজের দান; তাঁরা যাজকতা করতেন,—একমাত্র ব্রজরাজের।

৬৫। স্তোম-প্রিয় বিপ্রেরা—হয় জ্ঞানে নয় আনন্দে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে থাকতেন, তাঁদের আঘাত করতে পারত না কাতরতা। বিদ্যার বিদ্যোতনায় প্রকাশ পেত তাঁদের পরম চাতুর্য্য, তাঁদের আতুর করতে পারত না পরাজয়। পত্নী-মাধুর্য ও বিত্ত-মাধুর্য থাকলেও অভাব কোথায় তাঁদের নর-মাধুর্যের? মৈত্রী-প্রভৃতি গুণবৈচিত্র্যের সহজাত অধিকারী হলেও তাঁরা ছিলেন কেবল শুদ্ধসত্ব; তাঁদের মধ্যে মিশ্রীভূত হতে পারত না রাজসিকতা বা তামসিকতা।

কত আর বলি! এই রাজধানীর তৈলিক, তাম্বুলিক, মালিক শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার, তন্তুবায় ইত্যাদি সকলেই চিন্ময়; চিন্ময় হয়েও তাঁরা পালন করতেন মনুষ্যধর্ম। মনুষ্যধর্মী হয়েও ঐশ্বর্যদাতা হয়েও, পুণ্যজনেশ্বর হয়েও, তাঁরা কিন্তু কুবেরের মত ছিলেন না; একজনেরও ছিল না কুৎসিত শরীর; একজনেরও ছিল না পিঙ্গলবর্ণ, নরবাহন।

৬৬। বেশী কি আর বলব, এই রাজধানীতে কেবল পুলিন্দ-জাতির নামটিতেই বিকৃতি দেখা যেত, আসলে তাঁরা ছিলেন সর্বদেবতার রতিপ্রদ। জাতি-ফুলের নামে বিহ্বল হলেও ভ্রমর কি সব ফুলেরই মন ভরায় না?

৬৭। বিরাট বিরাট গোগৃহ রয়েছে এই রাজধানীতে। প্রত্যেক গোশালার চারটি ক'রে মহামরকতিকমণির দেয়াল। অকীর্ণ দেয়াল। দেয়ালের উপর পান্নার ছাঁট; সেই ছাঁটে অচঞ্চল নিবদ্ধ রয়েছে নীলপ্রান্ত সোনার বরগা। ছাঁটের চার কোণে আরও চারটি পান্নার ছাঁট। চাল-বের-করা বাঁকে সেগুলিকেও দেখায় বিরাট। ছাঁটগুলির প্রত্যেকটিতে সুসম্বদ্ধ রয়েছে চারটি ক'রে পুষ্পরাগ মণি বসানো কৌণিক। কৌণিকগুলিতে সংযুক্ত রয়েছে মহানীলা (পাংড়ি)। পাহাড়ের গায়ে যেমন পাথর বসানো থাকে নানান্ রঙের, তেমনি গোগৃহের ছাউনীগুলিও নানান্ রঙের মণি-খচিত।

এই মহা-গোগৃহগুলি পণ্ডিতদের মত নিস্তব্ধ; সজ্জনদের মত নির্মল ও অসঙ্কুচিত; এরা মহারাজ-ভবনের গোপুরগুলির মত অনেক সিংহদ্বার-বিশিষ্ট। সেথায় ফুর-ফুর করে বাতাস বয়, আর উড়ে চলে যায় গোখুর ধূলি।

৬৮। গোশালার অঙ্গনে অঙ্গনে নৈচিকী গাভীদের অনিন্দ্য সমাবেশ। কী তাদের অঙ্গবর্ণ! যেন সুকবির কাব্য। গাভীগুলি সর্ব্ব-শুক্ল,—যেন সরস্বতী-শরীর, যেন পূর্ণিমার রাতি; অলনীল তাদের শিং—যেন নীলমণি-পর্বতের—শিখর; কী ঘন, আর কী শুভ্র তাদের পুচ্ছ-চামর,—অঙ্গনাদের যেন চাঁচর চিকুরের মহিমা; ভগবানের রিপুচ্ছেদী সুদর্শনচক্রের মত—প্রসারী পুচ্ছের সে কী তেজস্বী গরিমা! এত ঢেউখেলানো তাদের গলকম্বল যে মনে হয়, স্নানোচ্ছল তীর্থ-সলিলের চিত্র দেখছি; এত নধর তাদের পালান, যে চোখে ভেসে ওঠে গণপতি-শরীর!

এত সুখের তাদের দোহন যে মনে হয়, তারা যেন সুব্রতা তাপসী। প্রত্যেকটি গাভীই অবন্ধ্যা, মনের মত অনধীন। সব গাভীই কামধেনু, যেন সর্বকামপ্রদ চিন্তামণি।

এরা তাদের চতুর্দিকে এমন আনন্দে খেলে বেড়ায় বাছুরের দল, যে মনে হয় কুটজ ফুল বুঝি ফুটে রয়েছে বৈশাখের কাননে।

৬৯। বাছুরগুলির দৌড়-ঝাঁপ লাফালাফির বিরাম নেই। এত সুন্দর দেখায়, যে একবার মনে হয়,—ঐ বুঝি বা পৃথিবীতে ছড়িয়ে
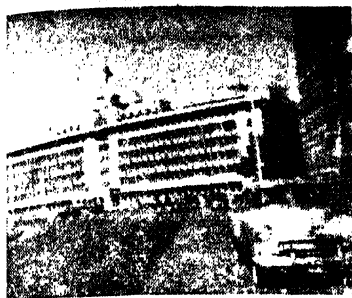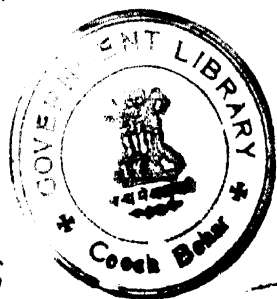
ক্ষীণদৃষ্টি —সন্তোষ সেনগুপ্ত

ধান-শুকানো

কোণারকের মন্দির — রঞ্জিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
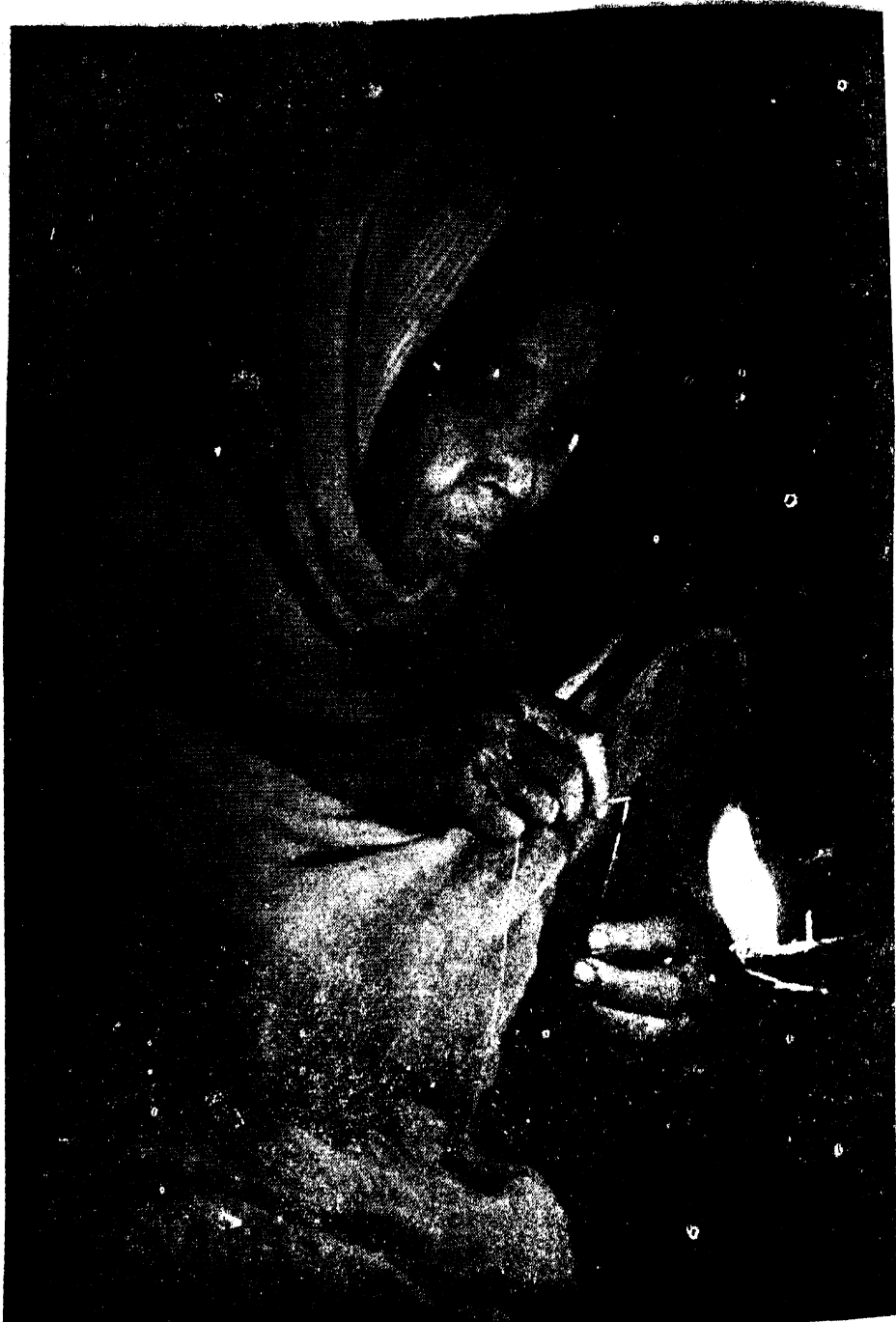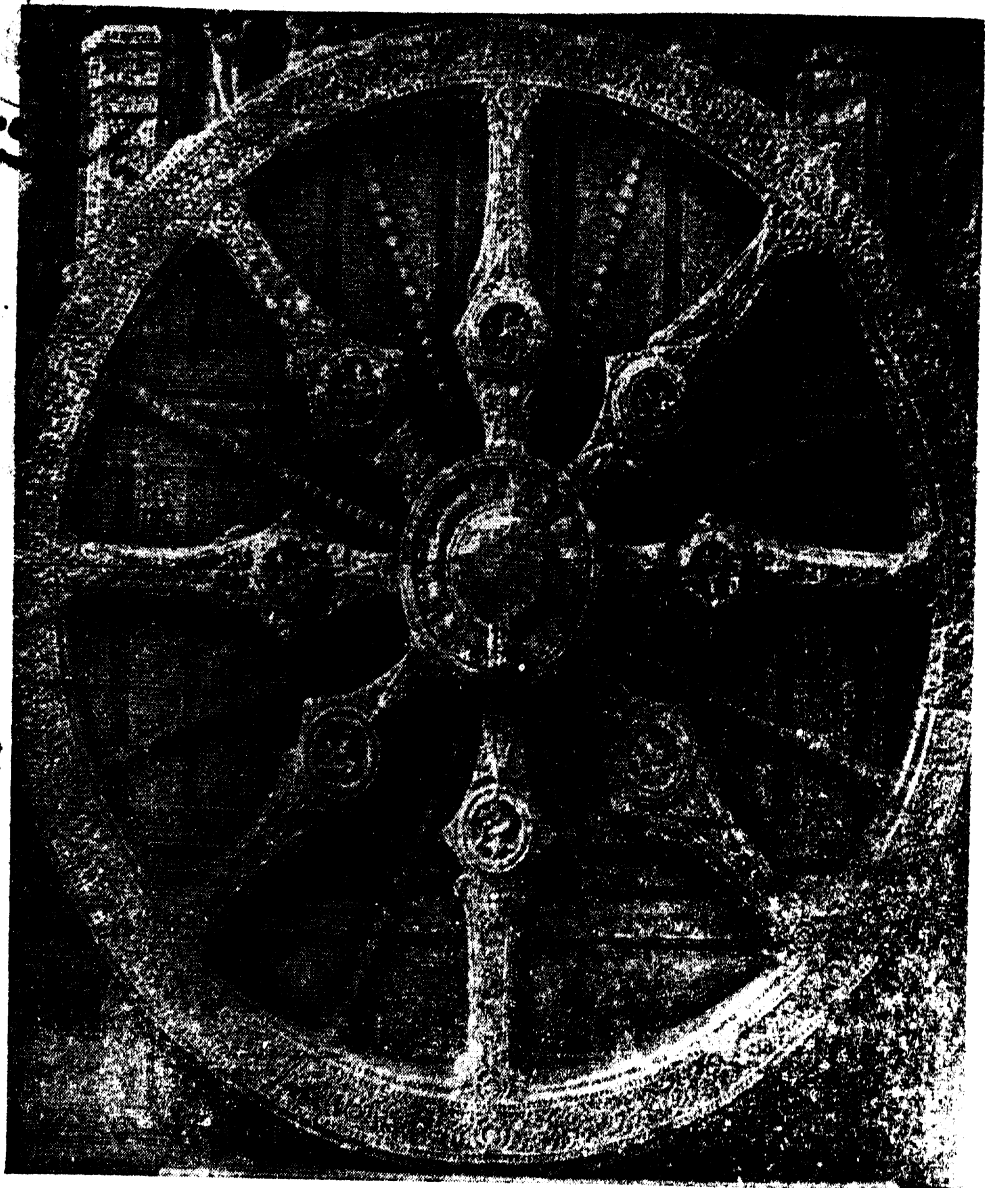
পড়েছে জ্যোৎস্নার সজীব গর্ভ, ঐ বুঝি বা চলে বেড়াচ্ছে কৈলাসের শিলা খণ্ড ; আবার তখনি মনে হয়, না, না, তা নয়, ওগুলো মহাদেবের অট্টহাসির গিটকিরি, ওগুলো ক্ষীরসাগরের নরম নরম ফেনা।

শুভ্রসত্ত্বের মাংসপিণ্ডের মত…বাছুরগুলিও অপ্রাকৃত।

১০। এবং এখানে রয়েছে অগণিত মহাবৃষ। তাদের বর্ণ ধূসর ; খুরক্ষুণ্ণ মণিময় ধূলো লেগেই যেন ধূসর হয়ে গেছে তাদের বিশাল দেহ। স্ফটিক-পর্বতের গণ্ডশৈলের মত তাদের দর্শন, দধি-মহাসমুদ্রের মহোর্ম্মির মত দুর্বার তাদের ব্যবহার ; মুনিদের মত সায়ংগৃহী ; জীবন্মুক্তের মত স্বেচ্ছাচারী।

তাদের মহাবিষাণ নয়নে ভ্রান্তি আনে দিকহস্তীদের দীর্ঘ দন্তের ; তাদের মহা-ককুদ স্মরণে ভ্রান্তি আনে শ্বেতচ্ছত্রী নৃপসভার ; তাদের সদা হাম্বারবে আভাস ভাসে মহা-গর্বের।

বিরাট গলকম্বলগুলি ঝুলিয়ে তাঁরা চলেন আর মনে হয়…গলায় কম্বল ঝুলিয়ে বৈরাগীরা চলেছেন ; স্তব্ধারুণলোচনে তাঁরা চেয়ে থাকেন, আর মনে হয়…মাতাল দেখছি না তো !

চতুষ্পাদ ধর্মের মত বিলাস বিচরণ করেন এই মহাবৃষভেরা… গোকুলে।

এই-হেন গোকুলের কলার কলাংশ দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে "সুরভি-লোক" ( গোলোক-ধাম )।

১১। গোকুল নগরের অনেকগুলি রয়েছে শাখানগর। তথায় বাস করেন বণিকদল। চতুষ্পথগুলিতে দাঁড়াও, দেখতে পাবে তাঁদের অজস্র বিপণি। সূতো ফেলে যেন সেগুলিকে সমশ্রেণী করে রচনা করা হয়েছে। মণি-মাণিক্যের নির্ম্মাণ, মুক্তার ঝালর ঝোলানো দোকান ; সাগরগর্ভের যেন মুক্তাকোষ। প্রবালের অলিন্দ, যেন রাঙা পাতায় মোড়া বসন্তদিনের তরু। শিখরে শিখরে এত বাহার পতাকায় যে মনে হয়…দোকানগুলিই যেন মহারাজের বিজয়-পতাকিনী।

বণিকদের বিপণি আবাসগুলি নিতান্ত উপভোগ্য। কোনোটি যেন বাসন্তীলক্ষ্মী…ভুরভুর করছে ফুলগন্ধে ; কোনোটি যেন মহাশৈলের অধিত্যকা…বিবিধ গন্ধদ্রব্যে সুগন্ধী ; কোনটি যেন মণির খনি… মণিমাণিক্যের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত, কোনোটি যেন বিলাসী নাগরিকের বক্ষতট…চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও ঘনসারের সৌরভে আমোদিত ; কোনটি যেন সোনার ফসলের ক্ষেত…ভেসে বেড়াচ্ছে শালিধান্যের গন্ধগৌরব।

১২। এই হেন ব্রজপুরের মধ্যস্থলে রয়েছে শ্রীমন্নন্দ মহারাজের মহানগর। মহানগরের চৌদিকে দক্ষিণ সমীর বিকম্পিত। বহু বিপিন সেথায়, বিশেষ বিশেষ বহু দ্রুমের সমুল্লাস ; তারা যেন সাগরতীরে ছড়াছড়ি দেখছি বিদ্রুমের ; লোকে চমকে ওঠে, সেখানকার বিশেষ বিশেষ কুঞ্জ ও গুল্ম দেখে ; যেন স-কুঞ্জর ও স-গুল্ম এক মহাসৈন্যের সমাবেশ। ব্রততী-ব্রাত দেখে সকলেই থমকে ভাবে, এই বিপিনগুলিই কি তপস্বী ?

হেথায় কুঞ্জে কুঞ্জে দোল খেয়ে যায় বনের পাখী…বয়েস-ভোলা রসিক প্রিয়ের মত।

১৩। হেথায় পথগুলি পিচ্ছিল হয়ে থাকে অবিশ্রান্ত ঝরে-পড়া "গুগ্‌গুলু" গাছের নির্যাসে। কি নির্মল কি সরস সেই নির্য্যাস হাত বরাবরি করে, এই সিক্ত পথ মাড়িয়েই বনদেবীরা যান অভিসারে।

পথের ধারে "বদর" গাছের বন, গাছের গায়ে আলতো-আলতো ককুদ ঘষে বন-বৃষভ ; গুঁড়িয়ে যায় গাছের ছাল ; উড়তে থাকে গালার রেণু ; ঝরতে থাকে মৌ ; ভিজে তিমতিম্ করে বনের পথ। পথ ধরে বনদেবীরা চলেন ; কষ্ট না ক'রেই, পায়ে আলতা পারেন তাঁরা।

এই পথের ধারেই বেলা পোহায় বন্য মেষের দল ; আনন্দে চোখ বুজে তারা ভিরিয়ে ভিরিয়ে চিবোয় "বাক্কোল" গাছের ফল ; সুখের বাতাসে সুবাসিত হয়ে যায় দিগন্ত।

শিঙের ডগা দিয়ে বন-মহিষেরা চিরতে থাকে "শরল" গাছের "দেবদারু" গাছের চারু বল্কল ; গন্ধে মেদুর হয়ে যায় গগনতল।

বনকরীদের শাবকগুলি কেবলে ভেঙে আর জোড়া লাগাতে চায়, শল্লকী গাছের গন্ধ পাতা ; গন্ধে ছেয়ে যায় গিরিতট।

বন-ধেনুরা আস্বাদন করে পঙ্কলেশহীন "গন্ধতৃণ" আর "নবদূর্বা," গন্ধ-বন্ধু হয়ে ওঠেন ধরণী।

কাননের সীমানায় সীমানায় শান্তি সমুদ্রে যেন অবগাহন করতে করতে খেলা করেন পুলিন্দ-সুন্দরীরা ; "মরিচ"-ফুলের ছোট্ট ছোট্ট গুচ্ছ, দোলানে কানে, "কর্পূর-কদলিকা" ভেঙে ভেঙে বার করে নেন গন্ধ-রস, পানের পাতায় মাখিয়ে মাখিয়ে চিবোতে থাকেন রসিয়ে।

আর দলে দলে বাঁদরগুলো দোহাতি ছিঁড়তে থাকে গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষাফল ; খায় আর ছড়ায় ; বিছিয়ে যায় বনপথ।

১৪। এই বিপিনগুলি ছাড়াও অন্য অনেক রয়েছে কাম্য কানন এখানে।

কোনো কাননে ফলেছে শুধু আম, কাঁটাল, খর্জ্জুর, নারিকেল আর পিয়াশাল ; কোনো কাননে বাহার দিয়েছে শুধু পলাশ, বট, পাকুড়, খদির, বেল আর জাম ; কোনো কাননে কেবল ফুটেছে বকুল, নাগ, পুন্নাগ, মধুক আর গিরিমল্লিকা ; আবার কোনো কাননে আলো জ্বেলেছে কেবল অশোক, বক, পারুল, চাঁপা আর কনকচম্পক। একটি কাননে শুধু শিরীষ, বট, শিশু, লোধ, মাদার আর কোশতকী ; অন্যটিতে, পিয়াল, নট, শল্লকী, শরল, শাল, আর পীলু ; একটি কাননে কেবল কদবেল আর করমচা ; অন্যটিতে কদম, গাব, আমড়া ; একটি কাননে বাঁশের ঝাড়, করবী ; অন্যটিতে বাহার দিয়েছে কদলী আর লবলী। কত কানন, ইয়ত্তা নেই ! কোথাও তমাল, নবমালিকা, স্বর্ণযূথিকা শ্বেত যুঁইএর কানন ; কোথাও কুরণ্টক, লবঙ্গিকা, দমনক আর মাধবীর কানন, কোথাও আবার স্থলপদ্ম, মল্লিকা, কদলী, প্রিয়ঙ্গু আর তুলসীর ঝাড়। যতই কাটো ততই বাড়ে। বৃন্দাবনের সবই বিচিত্র ! আর এই কাননগুলিতে রয়েছে অজস্র দীঘি, অজস্র তড়াগ, অজস্র সায়র। ভাসন্ত সেখানে সুরখান, বক, সারস, হাঁস, কুরর, কাদম্ব ; হাসন্ত সেখানে লাল নীল শাদা সুঁদি শাঁপলা কহ্লার কমল। ঢেউ খেলছে স্বচ্ছ জলে ; ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ।

১৫। এই বিপিন ও কাননসমূহের মধ্যে, হাঁ, একটি রয়েছে বটে বন ; তার নাম বৃহদ্বন। সেটিতেও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ব্রজপুরপুরন্দরের আর একটি রাজধানী ; খাস-রাজধানীর সেটি সামিল।

[ ক্রমশঃ।

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা।

১

'এর জন্যে তুমি কাঁদছ?' নিমাই তাকাল রঘুনাথের দিকে।

রঘুনাথ মুখ তুলল না।

'এর জন্যে কাঁদবার কি হয়েছে! এ তো অতি তুচ্ছ কথা। তুমি কিছু ভেবো না। আমি এখুনি তা গঙ্গায় ফেলে দিচ্ছি।'

চমকে মুখ তুলে তাকাল রঘুনাথ। তার অশ্রুপ্লুত মুখে আতঙ্কের ছায়া পড়ল।

কিন্তু নিমাইয়ের যে কথা সেই কাজ। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল গঙ্গায়।

'এ কি, জলে ফেলে দিলে?' রঘুনাথ আর্তনাদ করে উঠল।

'তা ছাড়া আবার কি? ঐ অফল শাস্ত্র দিয়ে কী হবে? কিছু হবে না। ওতে আর আমার দরকার নেই।' রঘুনাথের কাঁধের উপর হাত রাখল নিমাই: 'তোমার বইয়েরই জয়জয়কার হোক।'

এক চৌপাঠিতে পড়ে দুজন, নিমাই আর রঘুনাথ। রঘুনাথ বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ হলেও নিমাইয়ের সঙ্গে পেরে ওঠে না। নিমাই সারা দিন খেলা করে বেড়ায়, কখন যে পড়া তৈরি করে কে বলবে, অথচ হেন প্রশ্ন নেই যার উত্তর তার না-জানা। রঘুনাথ থই পায় না।

'কখন পড়িস রে নিমাই?' জিগগেস করে রঘুনাথ।

'আর কখন! রাত্তিরে।' নিমাই গম্ভীর হবার ভাব করলে।

'বলিস কি! কার কাছে পড়িস?'

'কার কাছে আবার! সরস্বতীর কাছে।'

নিমাই ঠাট্টা করছে, হেসে উঠল রঘুনাথ। কিন্তু এত বিদ্যার সমীচীন ব্যাখ্যাই বা কি!

গুরুমশাই একটা প্রশ্ন দিয়েছেন রঘুনাথকে। কিছুতেই তার সমাধান হচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে দিন চলে গেল, রান্না নেই, স্নান নেই—সারাদিন উপবাসী রঘুনাথ।

'কি হল?' হেঁকে গেলেন গঙ্গাদাস।

প্রশ্নের ফল বের করতে সেই সন্ধ্যে। তাও কত কসরৎ করে, কত মাথামুড় খুঁড়ে। গুরুকে দেখিয়ে খুশি করে তবে ছুটি।

সন্ধ্যা-অন্তে রান্না করতে বসেছে রঘুনাথ। এমন সময় নিমাই এসে হাজির। এ কি, এত দেরি আজ রান্নার!

'আর বলিসনে! গুরুমশাই এমন এক প্রশ্ন দিয়েছেন যে ভাবতে-ভাবতেই দিন কাবার! সারাদিন খেতে পাইনি এক মুঠো।'

'খুব কঠিন প্রশ্ন?' নিমাইয়ের দুচোখ কৌতূহলে উজ্জ্বল।

'খুব।'

'আমাকে শোনা না প্রশ্নটা। দেখি না পারি কিনা।'

শোনাল রঘুনাথ। নিমেষে নিমাই বলে দিল উত্তর। প্রচ্ছন্ন প্রাঞ্জল হয়ে দাঁড়াল। নিগূঢ় নির্মলের চেহারা নিলে।

সহসা নিমাইয়ের দুহাত চেপে ধরে রঘুনাথ বললে, 'ভাই নিমাই, তুই কি মানুষ, না, তুই সত্যিই বিশ্বম্ভর?'

সেই দুই সতীর্থ বড় হয়ে বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে ঢুকেছে। বড় হয়ে মানে চৌদ্দ বছরে পা

দিয়ে। গঙ্গাদাসের চৌপাঠিতে ব্যাকরণ সারা হয়েছে, এবার সার্বভৌমের টোলে স্যায় পড়বে দুজনে।

চৌপাঠিতে পড়তে ব্যাকরণের একখানি টিপ্পনী লিখেছিল নিমাই, এবার টোলে এসে লিখতে শুরু করল স্যায়ের টিপ্পনী। নবদ্বীপে নতুন কোনো বই চালানো দুরূহ, কিন্তু কেন কে জানে, নিমাইয়ের ব্যাকরণের টিপ্পনী সমাজে চালু হয়ে গেল সহজে। এখন এই স্যায়ের টিপ্পনীই কোন না অঢেল অভ্যর্থনা পাবে!

কথাটা কানে উঠল রঘুনাথের। সে তখন তার 'দীধিতি' লিখছে, তার মুখ পাংশু হয়ে গেল। নিমাইয়ের হাতে তার বই নিশ্চয়ই মার খাবে। ভেবেছিল স্যায়ের ব্যাখ্যায় বিশ্বজয়ী হবে, এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে দুচোখ অন্ধকার দেখল।

'ভাই, তুমি স্যায়ের ভাষ্য লিখছ?' বিরলে পেয়ে নিমাইকে জিগগেস করল রঘুনাথ।

'হাঁ, চেষ্টা করছি।'

'আমাকে একটু দেখাবে?' রঘুনাথের স্বরে ভয়ের কুয়াশা।

'নিশ্চয়ই দেখাব।' নিমাই আনন্দের লহর তুলে বললে, 'কাল যখন টোলে আসব তখন আনব পুঁথি।'

'আনবে?' রঘুনাথের স্বরে সংশয়। প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছেও কি মন্ত্রগুপ্তি নেই নিমাইয়ের?

'তারপর যখন গঙ্গা পার হব তখন নৌকোয় তোমাকে পড়িয়ে শোনাব।'

নৌকোয় ফিরছে দুজনে। নিমাই পড়ছে তার পুঁথি আর রঘুনাথ এককর্ণে শুনছে। কী সুন্দর লিখেছে নিমাই, গহনাতিগহন তত্ত্বকে কী অপূর্ব সারল্যে স্থাপন করেছে! এই না হলে প্রসাদকান্তি। যে কথা বোঝাতে রঘুনাথ নিয়েছে পুরো এক পৃষ্ঠা তা নিমাই মাত্র দুই ছত্রে সেরেছে। যে শব্দ শোনামাত্রই অর্থের প্রত্যয় হয় তাই সকল রস ও রচনার প্রাণ। নিমাইয়ের রচনায় জলের স্বচ্ছতার মত ভাষার বিমলতা। সর্বগ্রন্থির বিমোচন।

দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল রঘুনাথ।

'এ কি, কি হল তোমার?' পড়া বন্ধ করল নিমাই: 'কাঁদছ কেন?'

'ভাই, তোমার এ রচনা প্রকাশ হলে আমার প্রতিষ্ঠার আর আশা নেই। না, বিন্দুমাত্র না।' রঘুনাথ কান্নায় আরো ডুবে যেতে লাগল।

'প্রতিষ্ঠার আশা?' আহতের মত তাকাল নিমাই।

'তা ছাড়া আবার কি। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হব, আমার বই-ই সর্বমান্য হবে এই তো আমার একমাত্র স্বপ্ন।' মুখ কিছুতেই তুলবে না রঘুনাথ: 'আজ আমার সেই আশায় ছাই পড়ল। তোমার এ বই থাকতে আমার বই আর কে পড়বে? আমি পরাভূতের মত সংসারে ঘুরে বেড়াব।'

রঘুনাথের দুঃখে নিমাইয়ের চোখ ছলছল করে উঠল। তার একটা সামান্য পুঁথি রঘুনাথের সুখের কণ্টক হবে? তার যশের প্রতিবন্ধক? কিছুতেই নয়। পুঁথিটা টেনে গঙ্গায় ফেলে দিল অনায়াসে।

নামের জন্যে কান্না? প্রতিষ্ঠার জন্যে কান্না? হায়, কৃষ্ণের জন্যে কাঁদো।

এত দিনের এত পরিশ্রম এত গবেষণা সব এক মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিলে? ভেঙে ফেললে উচ্চাশার সৌধচূড়া? এতটুকু মায়া হল না?

অফলা বিদ্যার জন্যে আবার মায়া কি?

স্যায়শাস্ত্র কি বন্ধ্যা?

স্যায়শাস্ত্র হচ্ছে তর্ক করে বুদ্ধি খাটিয়ে যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করা। ঈশ্বরকে? ঈশ্বর কি স্যায়শাস্ত্রে অস্বীকৃত নয়? মোটেই নয়। স্যায়শাস্ত্রে যুক্তিবলে জগৎকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়ে আছে।

স্যায়মতে প্রমেয় বা প্রমাণের বিষয় দ্বাদশ। আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ আর অপবর্গ। যেহেতু ঈশ্বরের উল্লেখ নেই, মনে হতে পারে, স্যায় ঈশ্বরকে বুঝি প্রত্যাখ্যান করেছে। আসলে 'আত্মা' শব্দেই জীবাত্মা বা জীব ও পরমাত্মা বা ঈশ্বর লক্ষিত হচ্ছে। ঈশ্বর আত্মারই প্রকারভেদ।

ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ আর জ্ঞান এই ছ'টি আত্মার গুণ। এ ছ'টি গুণ দেহেন্দ্রিয়ে নেই। এ ছ'টি গুণ থেকেই আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এদের মধ্যে ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান এ তিনটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুয়েরই লক্ষণ; কিন্তু বাকি তিনটি, মানে, দ্বেষ, সুখ আর দুঃখ জীবাত্মায় থাকলেও পরমাত্মায় নেই। পরমাত্মায় কেবল নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন এবং নিত্যজ্ঞান। এই গুণত্রয়ের আশ্রয়ই হচ্ছে

ঈশ্বর। ন্যায়মতে ঈশ্বর সগুণ পদার্থ, সাংখ্যের পুরুষ বা বেদান্তের ব্রহ্মের মত নির্গুণ নন।

কিন্তু প্রমাণ কি?

ন্যায়মতে প্রমাণ চার রকম। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান আর শব্দ। শব্দ মানে শ্রুতি বা আগম বা আপ্তবাক্য। ঈশ্বর লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। উপমান বা সাদৃশ্যজ্ঞানের ফলও তাকে বলা যায় না। একমাত্র নির্ভর আগমে ও অনুমানে। অন্যে জ্ঞান-সঞ্চার করবার জন্যে প্রকৃত জ্ঞানী যে বাক্য ব্যবহার করে তাই আপ্তবাক্য। যার ভ্রম নেই, প্রমাদ নেই, প্রতারণার প্রবৃত্তি নেই, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা নেই, তার উপদেশই আপ্ত উপদেশ। বেদই সেই আপ্ত উপদেশ। তা না মানো অনুমানকে মানতে হবে। ধূম দেখলেই জানতে হবে আগুনকে। নদীর পূর্ণতা দেখলেই জানতে হবে বৃষ্টি হয়েছে দেশান্তরে। সুতরাং আগমে ও অনুমানেই ঈশ্বর সিদ্ধ।

পর্বত বা সাগর সাবয়ব। তার মানে তার অংশ আছে। যা সাবয়ব ও স্থূল, যার অংশ আছে, তা 'জন্য' পদার্থ। জন্যমাত্রেরই জনক বা কর্তা আছে। যেমন ঘট দেখে বোঝা যায় কুম্ভকার। আর কর্তা মানেই সচেতন কর্তা। অচেতন পদার্থে ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান নেই। ইচ্ছা, প্রযত্ন ও জ্ঞান ছাড়া কর্তৃত্ব অসম্ভব। ঘটের উপাদান মাটি। কিন্তু সচেতন কুম্ভকারের প্রযত্ন ছাড়া ঘটের উৎপত্তি হয় কি করে? তেমনি পর্বত আর সাগর শুধু কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। কে না জানে পরমাণু জড়বস্তু। কোনো জ্ঞানী ইচ্ছুক ও প্রযত্নবান পুরুষ এই পরমাণুসমষ্টি স্থাপিত করলেই তবে পর্বত বা সাগর বা বিশ্বজগতের জন্ম। জীব পৃথিবীর জনক হতে পারে না। পৃথিবীর নিমিত্ত-কারণ পরমাত্মা। সেই ঈশ্বর নামে পরিভাষিত।

কী দরকার ছিল ঈশ্বরের এই সৃষ্টি করায়? মন্দমতি লোকও বিনা প্রয়োজনে কাজে প্রবৃত্ত হয় না। ঈশ্বরের তো কোনো অভাব নেই, রাগ-দ্বেষ-দুঃখ নেই, তবে কেন এই তাঁর বিশ্বরচনা? নৈয়ায়িকরা তারও উত্তর দিয়েছেন। বলছেন, ঈশ্বরের করুণাই তাঁকে সৃষ্টির কাজে প্ররোচিত করেছে। জীবের মুক্তিই তাঁর একমাত্র প্রয়োজন। অনাদিকালে সঞ্চিত জীবের শুভাশুভ কর্মের ফল একমাত্র ভোগের দ্বারাই ক্ষয় পেতে পারে। সুতরাং কর্মক্ষয়ের জন্যেই এই ভোগ্যজগৎ ও ভোগায়তন দেহের দরকার। কর্মক্ষয়ের জন্যেই জগৎ সৃষ্টি।

'পুনরপি জননং পুনরপি মরণং', এই জন্ম-মরণ-প্রবাহের নাম প্রেত্যভাব। কবে এ আরম্ভ হয়েছে কেউ বলতে পারে না, কিন্তু তার সমাপ্তির কথা বলেছে ন্যায়। সমাপ্তি অপবর্গ। অপুনর্জন্মই অপবর্গ। সব সুখই দুঃখসংস্পৃষ্ট, সুতরাং সুখের সন্ধান মুমুক্ষুর লক্ষ্য নয়। দুঃখনিবৃত্তিই লক্ষ্য। জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহের সমুচ্ছেদ ও তাতে সর্বদুঃখের বিরামের নামই অপবর্গ বা মোক্ষ।

এ সবই ন্যায়ের কথা। তর্কযুক্তির কথা। তর্ক-বিদ্যা নিরর্থিকা।

'প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা নাহি আর।'

কৃষ্ণভক্তিই পরাবিদ্যা। লোকে বিদ্যার্জন করে কেন? শুধু ঈশ্বরে ভক্তিমান হবে বলে। 'পড়ে কেন লোক? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে। সে যদি নাহল তবে বিদ্যায় কি করে?'

যাই বলো, কোনো লৌকিক যুক্তি দিয়েই ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপিত করা যায় না, ঈশ্বরতত্ত্ব একমাত্র অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং ঈশ্বরকে অনুভবের মধ্যে নিয়ে এস। সেই অনুভবেই রসের উত্থান। সেই রসেই ভক্তি। আর সেই ভক্তিতেই বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন ঈশ্বরের প্রকাশ।

এক কথায়, শ্রীকৃষ্ণভজনই ভক্তি। ইহলোক ও পরলোকের কামনা বর্জন করে ভগবানে চিত্ত অর্পণ বা তন্ময়তাই ভক্তি। 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে। সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা।' ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি। জগৎকে যে ভালোবাসা দিয়ে ঢেকে রেখেছি, তা ঈশ্বরকে দেওয়ার নামই ভক্তি। ষড়রিপুকে স্বতন্ত্র ভাবে নিধন করবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে না। মধুর ভাবগুলিকেও নষ্ট করবার দরকার নেই। শুধু ভজনে শুধু ভক্তিতেই ষড়রিপুর বিষদাঁত ক্ষয় হয়ে যাবে। গাঢ় হবে মধুরের উৎসব। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর মধুরের রসবৈচিত্রী। নরোত্তম ঠাকুর বলছেন, কাম দাও 'কৃষ্ণসেবার্পণে', ক্রোধ 'ভক্তদ্বেষী জনে', লোভ 'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা', মোহ 'ইষ্টলাভ বিনে' আর মদ 'কৃষ্ণগুণগানে।' আর সিদ্ধাবস্থায় প্রেম যদি জাগে তাহলে তার মাৎসর্য্য কোথায়?

'মায়াবাদী কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ।
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥

সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল॥'

যারা সব জ্ঞানমার্গের লোক, যারা শুধু কর্মকেই ফলদাতা ভাবে, যারা যুক্তি দিয়ে ভগবানকে বিচার করতে চায়, যারা পরদ্বেষী, ভগবৎবিমুখ, তাদের প্রেমবন্যা স্পর্শও করল না। তারা চিরদগ্ধ মরুভূমি হয়ে রইল।

ভগবানের পরমসারভূতা স্বরূপশক্তির প্রধানবৃত্তির নাম হ্লাদিনী। হ্লাদিনীর প্রধান বৃত্তিই ভক্তি। অপর নামে রতি, প্রীতি, প্রেম। সিদ্ধির চেয়ে রতি গরীয়সী, মুক্তির চেয়ে ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবায় চিত্ত যার নিমগ্ন, তার মোক্ষে কোনো স্পৃহা নেই। যে মহানন্দে ভগবৎকথাসাগরে বিহার করে, সে চতুর্বর্গকে তৃণের মত জ্ঞান করে। ঈশ্বরসেবা বর্জন করে ভক্ত সালোক্য-সাযুজ্য-সামীপ্য বা স্বারূপ্য—কোনো মুক্তিই চায় না।

"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া
কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া।"

যারা ভুক্তি-মুক্তি পেয়েই খুশি তাদের শ্রীকৃষ্ণ আর ভক্তি দেন না। যাদের অন্তরে শুধু ভুক্তি-মুক্তির স্পৃহা তাদের পক্ষে ভক্তি সুদুর্লভা। ভুক্তি-মুক্তির বাসনা দূর হলে পরেই ভক্তির সমুচ্ছ্বাস। কিন্তু শ্রীচৈতন্য পাত্রাপাত্র বিচার করলেন না। যা শ্রীকৃষ্ণ পারেননি তাই তিনি পারলেন—প্রেম দিলেন নির্বিচারে। আসক্ত-অনাসক্ত, সজ্জন-দুর্জন, হিন্দু-মুসলমান সকলকে। যেহেতু শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হয়েও স্বতন্ত্র ঈশ্বর।

'হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিল যথাতথা।
জগাই মাধাই পর্যন্ত অন্যের কা কথা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—প্রেম-নিগূঢ়-ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে-তারে, না কৈল বিচার॥'

ভক্তিই অমৃতস্বরূপা। ভক্তিই মধুরিমার পূর্ণিমা।

২

ফাল্গুন-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। চন্দ্রগ্রহণ লেগেছে। ঘরে-ঘরে ঘাটে-ঘাটে উঠেছে হরিধ্বনি।

সেই হরিধ্বনির মধ্যে নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে শচীমাতার কোল আলো করে প্রকট হল গৌরহরি। আকাশের কলঙ্কী চাঁদকে দিয়ে কি হবে যখন নিষ্কলঙ্ক চাঁদের উদয় হল ভূতলে। আর যার সমস্ত সত্তাই শ্রীনামকীর্তন তার জন্মক্ষণে 'জগভরি হরিধ্বনি' হবে না তো কি।

'হরি বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য নৃত্য করে দেব কুতূহলী॥
প্রসন্ন হৈল দশ দিগ, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল॥'

আট-আটটি কন্যা হয়েছিল শচীর, সব একে-একে গত হয়েছে। তারপর জন্মেছে প্রথম পুত্র, বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপের বয়স যখন নয় কি দশ, আবির্ভূত হল গৌরহরি। উঠোনে নিমগাছের নিচে আঁতুড়ঘর, সেইখানে ভূমিষ্ঠ হল বলে নাম হল নিমাই। যেন যমের মুখে তেতো লাগে, তাই।

'ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাই।'

চৈতন্যভাগবতে বলছে :

'ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাঞি।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম নিমাঞি॥'

চৌদ্দ শ' সাত শকের ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে সিংহরাশিতে নিমাইয়ের জন্ম। এবার কৃষ্ণ নয়, এবার গৌর। এবার যমুনা নয়, গঙ্গা। এবার রাধা-কৃষ্ণ বা ভক্ত ভগবানের পৃথকত্ব নয়, এবার 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।' এবার রাই-কানু মিলিত তনু। এবার 'না সো রমণ না হাম রমণী। দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি।' এবার পতি-পত্নী ভক্ত-ভগবানের মন একত্র পেষণ করা, কিংবা পেষণ করে একত্র করা। এবার মিলনে বিরহ, বিরহে মিলন। আস্বাদ্য আর আস্বাদক একসঙ্গে। এবার অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। এবার ব্রজপ্রেম নয় এবার জীবপ্রেম। 'যদি গৌর না হত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা জগতে জানাত কে।'

'জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবনে করে যার চরণ-বন্দন॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
নদীয়া নগরে দণ্ডকমণ্ডলুকর॥
কেহ বলে পূরবে রাবণ বধিলা।
গোলোকের বিভবলীলা প্রকাশ করিলা॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার॥
বাসুদেব ঘোষ কহে করি জোড়হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ॥'

বিশ্বরূপ বলদেব, নিমাই কৃষ্ণ। আর নিত্যানন্দের অংশই বিশ্বরূপ। সুতরাং নিতাই নিমাইয়ের বড় ভাই। 'কৃষ্ণ-বলরাম দুই চৈতন্য-নিতাই।'

কৃষ্ণকথা বলো, কৃষ্ণকথাই শ্রোত্রহর, মনোহর। সেই উত্তমশ্লোকের গুণানুবাদে মূর্খ ও পাষণ্ড ছাড়া আর কার অরুচি হবে? কৃষ্ণের পদনিঃসৃতা গঙ্গা। যেমন স্বর্গ মর্ত ও পাতাল তিন লোককে পবিত্র করে, তেমনি কৃষ্ণপ্রশ্ন বক্তা, শ্রোতা, প্রচ্ছক বা প্রশ্নকারককে উদ্ধার করে। 'অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥'

দর্পিত দৈত্যদের ভূরিভারে আক্রান্ত হয়ে খিন্না পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হল। ক্ষীরোদসাগরের তীরে গিয়ে ব্রহ্মা পুরুষসূক্তে বা বেদমন্ত্রে দেবাদিদেব জগন্নাথের স্তব করতে লাগলেন। আকাশবাণী হল, শ্রীহরি অবতীর্ণ হবেন যদুবংশে, বসুদেব-গৃহে। আর যশোদার গর্ভে জন্ম নেবেন যোগমায়া—বিষ্ণুমায়া—কৃষ্ণলীলাসঙ্গিনী। আর জন্ম নেবেন সহস্রবদন স্বরাট অনন্তদেব।

দেবক আর উগ্রসেন দুই সহোদর ভাই। দেবকের সাতটি মেয়ে, সর্বকনিষ্ঠার নাম দেবকী। এই সাত-সাতটি মেয়েকেই বিয়ে করেছে বসুদেব। শূরবংশের বসুদেব, বাস করে পুণ্যনগরী মথুরায়। কংস উগ্রসেনের ছেলে, দেবকীর চেয়ে বয়সে বড়, প্রভূত স্নেহ করে ছোট বোনকে। বোনের বিয়েতে প্রাণপণ পরিশ্রম করেছে কংস, এমন কি, নবোঢ়াকে নিয়ে যখন বসুদেব যাচ্ছে রথে করে, অশ্বের রশ্মি ধরল এসে কংস, বললে, আমিই এই রথ চালিয়ে নিয়ে যাব। সহসা অশরীরী দৈববাণী হল, 'রে মূর্খ, সারথিরূপে যাকে তুমি বহন করে নিয়ে যাচ্ছ সে দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান তোমার প্রাণহন্তা হবে।'

এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হল কংস, পরক্ষণেই কর্তব্য স্থির করে ফেলল। এক হাতে দেবকীর চুল টেনে ধরল, আরেক হাতে প্রচণ্ড খড়্গ তুলল তাকে বধ করতে। তখন সেই কুলদূষণকে সম্বোধন করে বললে বসুদেব, 'আপনি সুপ্রশস্য, ভোজবংশের যশস্কর। সুতরাং বিবাহোৎসবের দিনেই কি করে আপনি স্ত্রীলোককে, বিশেষ করে আপনার বোনকে, হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন? দেহের সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুও জন্ম নিয়েছে, আজ হোক বা এক শতাব্দী পরেই হোক, দেহিগণের মৃত্যু ধ্রুব। সুতরাং নিজে কেন হিংসকের ভূমিকা নিচ্ছেন? দেখুন আপনার বোন কৃপণা পুত্রিকোপমা কাষ্ঠপুত্তলীর মত অচেতনপ্রায় হয়েছেন, সুতরাং এই কল্যাণীকে বধ করা আপনার উচিত হবে না।'

কিন্তু দুরাচার কংস নিবৃত্ত হবার লোক নয়। সে আবার খড়্গ তুলল।

তখন অনুপায় হয়ে বসুদেব বললে, 'দৈববাণী যা হয়েছে তাতে দেবকীর থেকে আপনার কোনো ভয় নেই, দেবকীর পুত্রের থেকেই আপনার ভয়। বেশ, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দেবকীর পুত্র হওয়ামাত্রই তাকে আমি আপনার হাতে তুলে দেব।'

কংস জানত, বসুদেব সত্যভাষী, কথার অপলাপ করবে না।

ছেড়ে দিল দেবকীকে। দেবকী বাঁচল বটে কিন্তু তার ছেলের কি হবে? প্রথম ছেলে হতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বসুদেব সেই ভয়সম্ভবকে পৌঁছে দিল কংসের হাতে। কংস বললে, 'এ শিশুকে আপনি নিয়ে যান। এর থেকে আমার কোনো ভয় নেই। আপনার অষ্টম সন্তানই আমার মৃত্যুর কারণ, আমি তার জন্যেই অপেক্ষা করব।'

বসুদেব ছেলে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু নারদ এসে গোল বাধাল। নারদ কংসকে বললে, 'যদুবংশের সকলেই দেবতা, কৃষ্ণের লীলাসহচর, আর কে না জানে, কৃষ্ণ তোমার চিরশত্রু। পূর্বজন্মে তুমি কালনেমি নামে অসুর ছিলে আর বিষ্ণু তোমাকে বধ করেছিলেন। সুতরাং সব দিক থেকেই তোমার সাবধান হওয়া দরকার।'

কংস পাংশু হয়ে গেল। বসুদেব আর দেবকীকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করলে। আর তাদের যেমনি পুত্র জন্মাতে লাগল তাদেরকে নিধন-কারণ বিষ্ণু মনে করে একে-একে বধ করতে লাগল। শুধু তাই নয়, যদু, ভোজ ও অন্ধকদের সার্বভৌম রাজা পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে নিজেই সিংহাসনে আরূঢ় হল। আত্মতর্পণ কামনাই যাদের একমাত্র ব্রত, তারা বাপ মা ভাই বোন কাউকেই হত্যা করতে কুণ্ঠিত হয় না।

বলদর্পিত কংস একে একে দেবকীর ছ-ছ পুত্র বিনাশ করল। শুধু তাই নয়, অসুররাজদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাদবনিগ্রহে লেগে গেল। যাদবগণ যে যেখানে পারল পুণ্য মথুরামণ্ডল ছেড়ে পালাতে লাগল

এখানে-সেখানে, পঞ্চালে-কেকয়ে, বিদর্ভ-বিদেহে। এদিকে সপ্তম গর্ভ উৎপন্ন হল দেবকীর। ঐ গর্ভ বিষ্ণুর কলা, অনন্ত-নামধেয় অংশ। ঐ অংশই বলরাম। বলরাম যদি নিহত হয় কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ হবে না, সুতরাং তাকে বাঁচানো চাই। বিশ্বাত্মা বিষ্ণু তখন যোগমায়াকে আদেশ করলেন, তুমি যাও, নন্দগোকুলে বসুদেবের পত্নী রোহিণী আশ্রয় নিয়েছে, তুমি দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করে রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। তার পর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর নন্দন হয়ে জন্মাব আর তুমি নন্দের পত্নী যশোদার গর্ভে জন্মাবে। লোককুল তোমাকে সর্বকামপ্রদাত্রী ও সর্ববরেশ্বরী বলে পূজা করবে। নানা নামে বিখ্যাত হবে তুমি পৃথিবীতে—দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা আর অম্বিকা। তুমিই আমার আবরিকা শক্তি, তুমিই প্রপঞ্চাধিকারিণী মহামায়া।

যথাদিষ্ট করল যোগমায়া। দেবকীর গর্ভলক্ষণ তিরোহিত হল আর রোহিণীর কোলে জন্ম নিল বলরাম। গর্ভ সংকর্ষণ করে নেবার জন্যে নাম হল সংকর্ষণ। লোকমনোরঞ্জক হওয়াতে 'রাম' আর বলীদের মধ্যে দুর্ধর্ষ হওয়াতে 'বলভদ্র'-ও নাম নিল। শক্তি আর কান্তির সমাহারস্বরূপ সংক্ষেপে আখ্যাত হল বলরামে।

ভক্তের অভয়দাতা ভগবান পূর্ণরূপে বসুদেবের মনে আবির্ভূত হলেন। মনোমধ্যে শ্রীমূর্তি ধারণ করে বসুদেব দিবাকরের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠল। অনন্তর, পূর্বদিক যেমন শশাঙ্ককে ধারণ করে, তেমনি শুচিস্মিতা শুদ্ধসত্ত্বা দেবকী অচ্যুতকে ধারণ করল। যাতে সমস্ত জগৎ বাস করছে দেবকী তারই আবাসস্থান হয়ে উঠল। কিন্তু নিজের এই গহন আনন্দ অন্যকে জানাতে পারছে না দেবকী। ঘটের মধ্যে যেমন দীপশিখা কিংবা জ্ঞানবঞ্চকের অন্তরে যেমন সুন্দর কথা রুদ্ধ থাকে তেমনি কংসের কারাকক্ষে সে শৃঙ্খলিতা। কিন্তু একদিন কংস দেখতে পেল তাকে। দেখল অঙ্গপ্রভায় অন্ধকার কারাকক্ষ আলোকিত করে বসে আছে দেবকী। কোথায় বিষাদে-মালিন্যে আচ্ছন্ন ছিল, এখন যে দেখি 'প্রভয়া বিরোচয়ন্তী'—এর অর্থ কি? নিশ্চয়ই আমার প্রাণহর হরি দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। এখন আমার কি কর্তব্য?

মানসনেত্রে গর্ভশায়ী শ্রীহরিকে দেখে ফেলল কংস। কিন্তু চুপ করে থাকলে চলবে না। তবে কি দেবকীকে বধ করব? দেবকীকে বধ করলে একসঙ্গে স্ত্রীবধ ভগিনীবধ ও গর্ভিণীবধের পাতক হবে, তাতে যশ, শ্রী ও পরমায়ু ক্ষীণ হবে দিন-দিন। যে শুধু হিংসা করেই জীবনধারণ করে সে জীবন্মৃত। তাহলে কি করি? হরির প্রতি বৈরবন্ধনপূর্ব্বক তার জন্মের জন্য প্রতীক্ষা করি। বিষাক্ত বিদ্বেষে হরিসংলগ্ন-মন হয়ে বিরাজ করতে লাগল কংস। দিনরাত্রির মধ্যে এক মুহূর্তও তার শান্তি নেই, হরিচিন্তা থেকে বিচ্ছেদ নেই, শত্রুতায় তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের মত উদ্যত হয়ে রইল। খেতে-শুতে উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সর্বসময় হৃষীকেশকে চিন্তা করে জগৎ-তন্ময় দেখতে লাগল।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ঘনান্ধকার নিশীথে কংস-কারাগারে ভূমিষ্ঠ হলেন শ্রীহরি। বসুদেব দেখল, কি অদ্ভুত শিশু! চতুর্ভুজ, অম্বুজেক্ষণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসলক্ষ্ম, গলদেশে কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবাস, বর্ণ সান্দ্রপয়োদের মত মনোহর। বৈদূর্য, কিরীট ও কুণ্ডলের প্রভায় কেশদাম দেদীপ্যমান, অঙ্গদে-কঙ্কণে-মেখলায় সুশোভান্বিত; কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করতে লাগল বসুদেব।

দেবকী বললে, 'আপনার এ অলোকিক চতুর্ভুজ রূপ সম্বরণ করুন। নচেৎ কংস আপনাকে সহজেই চিনতে পারবে।'

নিষ্কিঞ্চন সামান্য শিশু হয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ!

ওদিকে জন্মরহিত হয়েও যোগমায়া যশোদাকে নিমিত্তমাত্র করে জন্ম নিল ব্রজগৃহে। মায়াবশে যশোদার স্মৃতি অবলুপ্ত হয়েছে। তার কি হয়েছে, পুত্র না কন্যা, তার জ্ঞান নেই।

কারাগারের প্রহরীরা ঘুমে ঢলে পড়ল। লৌহদ্বার খুলে গেল সহসা, অর্গল আর শৃঙ্খল আর প্রতিবন্ধ হল না বসুদেবের। শিশুকৃষ্ণকে নিয়ে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। জলদ গর্জন আর বর্ষণ করছে একসঙ্গে, অনন্তদেব সহস্র ফণা বিস্তার করে বসুদেবকে আবৃত করে চলতে লাগল পিছে-পিছে। আবর্ত-আকুলা যমুনা পথ ছেড়ে দিল বসুদেবকে, যেমন রামচন্দ্রকে পথ ছেড়ে দিয়েছিল সিন্ধু। যমুনা উত্তীর্ণ হয়ে বসুদেব নন্দব্রজে এসে দেখতে পেলেন এখানেও গোপ-গোপীরা নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে। শিশুপুত্রকে যশোদার শয্যায় শুইয়ে তার কন্যাকে নিয়ে পুনর্বার

কারাগৃহে ফিরে এল বসুদেব। দ্বার আবার বন্ধ হল, ফিরে এল প্রাক্তন বন্ধনদশা।

যোগমায়া কেঁদে উঠল। প্রহরীরা নিদ্রোত্থিত হয়ে বুঝল নবীন শিশুর জন্ম হয়েছে। কংসের কাছে পৌঁছুল প্রসববার্তা। উন্মত্তবেগে স্খলিতপদে ছুটে এল সুতিকাগৃহে। দেবকী কাতরকণ্ঠে চাইল শিশুর প্রাণভিক্ষা। কংসের এতটুকুও দয়া হল না, সদ্যোজাতাকে কেড়ে নিল দেবকীর বাহু থেকে, শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করল সবেগে। আর-আরবার শিশুরা শুধু রক্তে-মাংসে স্তূপীকৃত হয়ে নিঃশব্দে নিহত হয়েছে, এবার আরেক রকম হল। দেবকী সবিস্ময়ে চেয়ে দেখল সায়ুধাষ্টমহাভুজা মহামায়া উর্দ্ধাকাশ বিরাজমানা। বজ্রপরুষকণ্ঠে ভর্ৎসনা করে উঠেছে কংসকে: 'আমাকে বধ করে তোর লাভ কি? তোর পূর্বশত্রু তোর অন্তক হয়ে জন্মেছেন অন্য কোথাও।'

'কোথায়?' রুক্ষমূর্তি কংস গর্জন করে উঠল।

'অন্য কোথাও।' অন্তর্হিত হল যোগমায়া।

'মা, কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে।' যশোদার কাছে গোপবালকেরা এসে নালিশ করলে।

'দেখি, দেখি, মুখ খোল্ তো।' যশোদা সবেগে আকর্ষণ করল কৃষ্ণকে।

কৃষ্ণ প্রথমে চাইল পরিহার করতে, শেষে মা'র নির্বন্ধের আতিশয্যে মুখব্যাদান করল। যশোদা সভয়ে দেখল, সেই মুখের মধ্যে স্থাবর জঙ্গম অন্তরীক্ষ দিঙ্মণ্ডল জ্যোতির্মণ্ডল সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, গিরি, সাগর দ্বীপ—সমুদয় বিশ্ব বিরাজ করছে। এ কি সুদুর্দর্শ রূপ, এ কি দৈবী মায়া! কিন্তু যশোদা পরাভব মানবে না। তুমি যেই হও, তুমি আমার শিশু, তুমি আমার বাৎসল্যের অধীন। ঐশ্বর্যের পণে চাই না তোমাকে, তোমাকে চাই মাধুর্যের পণে—সন্তান-স্নেহের নিবিড়তায়।

শচী খই-সন্দেশ খেতে দিয়েছে নিমাইকে। নিমাই তা না খেয়ে মাটি তুলে খেয়েছে।

'দেখি শচী ধাঞা আইলা করি হায় হায়।
মাটি কাড়ি লৈয়া বৈল মাটি কেন খায়॥
কান্দিয়া বলিল শিশু কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ॥
খই সন্দেশ অন্ন যত মাটির বিকার।
এই মাটি সেই মাটি কি ভেদ বিচার॥'

[ ক্রমশঃ।

# পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তী

শ্রীবাসুদেব পাল

রাণাঘাট ষ্টেশন থেকে মিনিট পনেরর পথ। এখন পথটির নাম হ'য়েছে—'পালচৌধুরী ষ্ট্রীট।' আগে ছিল বড়বাজার। এদিকে পাকা-সড়ক, ওদিকে চূর্ণি। চূর্ণি-নদী। স্বচ্ছ কাচের মতোই টলমল করে যার জল! এই চূর্ণিরই পূর্বপারে একটি সুবৃহৎ পুরোনো অট্টালিকা। এই অট্টালিকায় কৃষ্ণ পান্তীর অমর-স্মৃতির বিমুগ্ধ-স্বাক্ষর!

পান বেচে খায় কৃষ্ণ পান্তী
তারে দিলি মা জমিদারী?'

রামপ্রসাদ সঙ্গীতেরই একটি সুললিত পদ!

—কত শত দিনের কথা এ সব। পান বিক্রি ক'রে সংসার চলতো বলেই তাদের উপাধি হয়েছিল 'পান্তী।' এই দরিদ্রবংশেরই সন্তান কৃষ্ণ পান্তী। একদিন কুলগুরুর মাতৃশ্রাদ্ধে কৃষ্ণ এক মালসা দবণ সিধেস্বরূপ গুরুগৃহে নিয়ে হাজির হয়। কুলগুরু তার এ-হেন শিষ্যের সংসারের অবস্থা বুঝেও বুঝেন না! অযথা আর্থিক অবস্থার সংঘাত হেনে শিষ্যকে বজ্রকণ্ঠে তিরস্কার করেন।

—শিষ্যের মনে অকস্মাৎ নিদারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। নিজ পৌরুষের উপর আসে ধিক্কার। প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে সে, 'যে ক'রেই হোক অর্থ উপার্জ্জন ক'রে বিরাট ধনী হ'তে হবে। অর্থেরই যখন এত মূল্য!'

তারপর একদিন ঈশ্বর-সাক্ষী রেখে 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী;' স্মরণ ক'রে, সে বেরিয়ে পড়লো তার অভীষ্ট পথে। কত বাধা পথে! কিন্তু সমস্ত কিছুকেই উপেক্ষা ক'রে সে উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে চলে! মাঝে মাঝে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়! পরক্ষণেই মনে পড়ে যায় কুলগুরুর জ্বালাময়ী ভর্ৎসনা! এমনি ক'রেই কেটে যায় দ্বাদশ বৎসর। দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে তার নাম। ছড়িয়ে পড়ে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায়। কত-শত সওদাগর পাঠালেন তার নামে উপঢৌকন! মানপত্র দিলেন সুধীজনেরা। স্তাবকের দল জুটলো অগণিত। কিন্তু, সব্বাই যেন ভুলে যেতে চাইলে কৃষ্ণ পান্তীর শৈশবকাল! দুঃখ-নিশার দুঃসহ-অধ্যায়!

একদিন যে গুরুর গঞ্জনা তার বুকে লাঞ্ছনার ঝঙ্কার তুলেছিল, সেই গঞ্জনাই পরোক্ষ ভাবে রাঙিয়ে তুলেছিল তার ভাগ্যাকাশ।

—এখনও কৃষ্ণ পান্তীর নামে সমগ্র বাংলাদেশ তথা নদীয়াবাসীর মনে এক বিচিত্র চিন্তার আলোড়ন ওঠে।

# ইন্দোচীনে ভারতীয় সভ্যতা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

## ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ

বাল্মীকি রামায়ণে কয়েকটি স্থানে প্রসঙ্গক্রমে কাম্বোজের নাম পাওয়া যায়। আদিকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশৎ সর্গে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কামধেনু সংক্রান্ত কলহে বশিষ্ঠ কাম্বোজ ও বিবিধ ম্লেচ্ছসৈন্যের সাহায্যে বিশ্বামিত্রের বাহিনীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেন বলে বর্ণিত আছে। এ কাহিনী থেকে শুধু এ সত্যটুকুই আবিষ্কৃত হয় যে, সে যুগেও আর্য্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ কাম্বোজীয় ম্লেচ্ছবাহিনীর সাহায্য নিতেন। রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারতে অনেক বেশী ক্ষেত্রে কাম্বোজের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, কালিদাসের রঘুবংশ এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও কাম্বোজের নামোল্লেখ আছে। রামায়ণের আমলে ভারতীয়রা ভারতের বাইরে গিয়ে কোথায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও মহাভারতে কর্ণ কর্তৃক কাম্বোজ জয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্রোণপর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম পদতলে উপবিষ্ট কর্ণকে তাঁর বীরত্বের প্রশংসা করে বলেছেন—"তুমি দুর্য্যোধনের মঙ্গলার্থে অসাধ্যসাধন করেছ, বাহুবলে কাম্বোজগণকে, গিরিব্রজরাজ নগ্নজিৎকে, অম্বষ্ঠ, বিদেহ গান্ধার, উৎকল, মেকল, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, নিষাদ, ত্রিগর্ত্ত ও বল্মীকগণকে পরাজিত এবং হিমালয়স্থিত রণনিষ্ঠুর কিরাতগণকে বশীভূত করেছ"...ইত্যাদি। এছাড়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত ব্যূহমুখে এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ অংশে কাম্বোজসৈন্যের নিয়োগ থেকেও তাদের রণকুশলতার ও বিশ্বস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রোণপর্ব্বের ১১৯ অধ্যায়ে দেখা যায়, সাত্যকি দুর্জ্জয় কাম্বোজ, শক ও যবনদিগকে বিদ্রাবণ করে সারথিকে রথ চালাতে আদেশ করেছেন :—

কাম্বোজসৈন্যং বিদ্রাব্য দুর্জ্জয়ং যুধি ভারত।
যবনাঞ্চ তৎসৈন্যং শকানাঞ্চ মহাবলম্।
ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ সাত্যকিঃ সত্যবিক্রমঃ।
প্রহৃষ্টস্তাবকান্ ভিত্বা সূতাং যাহীত্যচোদয়ৎ।

শক, পারদ, কিরাত, বল্মীক প্রভৃতি করদ বা বেতনভুক্ ম্লেচ্ছসৈন্যের ন্যায় কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণও তাঁর রণদুর্জ্জয় বাহিনী নিয়ে দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন এবং প্রবল যুদ্ধের পর অর্জ্জুনের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। কাম্বোজরাজের মৃত্যুর পরও কাম্বোজবাহিনী শেষ পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করে বিশ্বস্ত ভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। এ সব ঘটনা থেকে কর্ণ কর্তৃক কাম্বোজ জয়ের পর কাম্বোজরাজ দুর্য্যোধনের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, এমন অনুমান করা যেতে পারে। সুতরাং মহাভারতের সময় থেকেই কাম্বোডিয়ায় প্রথম ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয় কিংবা স্থাপনের সূত্রপাত হয়, এবং পরবর্ত্তী যুগে বিভিন্ন অভিযাত্রীদলের গমনাগমনের ফলে কাম্বোজ ও ভারতের যোগাযোগ সুদৃঢ় ও ঘনিষ্ঠতর হয়; এমন সিদ্ধান্তকে একেবারে কাল্পনিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, বিবিধ পুরাণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং রঘুবংশের বর্ণনা থেকে কাম্বোজ বহির্ভারতীয় দেশ, কি ভারতের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রদেশ, সে বিষয়ে একটা সংশয় সৃষ্টি হয়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ত্রিংশ অধ্যায়ের ৪১ প্রকরণে কাম্বোজ, সিন্ধু ও আরট্ট উত্তর-পূর্ব্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত দেশ বলে বর্ণিত হয়েছে। কালিদাসের রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ে চতুর্থ সর্গের ৬৮।৬৯ শ্লোকের—'বিনীতাধ্বশ্রমাস্তস্য সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ' এবং 'কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ' প্রভৃতি উক্তি থেকে কাম্বোজকে সিন্ধুনদ-তীরস্থ প্রদেশ বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক।

একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে কৌটিল্য বা কালিদাস-বর্ণিত সিন্ধুতীরস্থ এই কাম্বোজ যে কোন প্রদেশ নয়, ম্লেচ্ছ কাম্বোজবাসীদের একটি ভারতীয় ঘাঁটি বা উপনিবেশ মাত্র, তা সহজেই অনুমান করা যায়। রঘুবংশে দিগ্বিজয়ী রঘুরাজ সীমান্তস্থিত হুণ, পারসিক, 'পাশ্চাত্য যবন' বা গ্রীকদিগকে একে একে পরাভূত করে সিন্ধুতীরে কাম্বোজ-বাহিনীকে আক্রমণ করেন। এ বর্ণনা থেকে ভারত-সীমান্তে হুণ, পারসিক ও গ্রীকদের মত কাম্বোজও যে একটা বৈদেশিক ঘাঁটি বা উপনিবেশ, এমন অনুমান অনায়াসেই করা যেতে পারে।

প্রাচীন যুগে ভারতীয় আর্য্যগণ ভারতীয় বা বহির্ভারতীয় অনার্য্য বা বিধর্ম্মী মাত্রকেই ম্লেচ্ছ বলতেন এবং যুদ্ধে অনেক সময় এ সব ম্লেচ্ছবাহিনীর সাহায্য নিতেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ম্লেচ্ছবাহিনী বা বাহিনীর নায়করা অনেকে ছিল তাদের অনুগত সামন্ত, আবার অনেকে ছিল বেতনভুক সৈনিক। এই বেতনভুক বা অনুগত বাহিনীর বসবাসের জন্য তাঁরা রাজ্যের প্রান্তভাগে অনেক সময় জায়গীর দিতেন, ফলে এ-সব অঞ্চলে সময় সময় তাদের ঘাঁটি বা উপনিবেশ গড়ে উঠতো। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বেতনভুক সৈন্য রাখার প্রথাটা শুধু প্রাচীন যুগে কেন, ইদানীং কালেও পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত আছে। যুদ্ধোত্তরকালেও মালয়ের জঙ্গলযুদ্ধে বৃটিশ কর্তৃক নেপালী সৈন্য নিয়োগের কথা অনেকেই জানেন।

মহাভারতের সভাপর্ব্বের ২৬ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে প্রাগ্জ্যোতিষপুররাজ ভগদত্ত কিরাত, চীন এবং সাগরতীরস্থ অনুপদেশবাসী ম্লেচ্ছসৈন্য-পরিবৃত হয়ে অর্জ্জুনের গতিরোধ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে। এস্থলে সাগরতীরস্থ

অনুপদেশবাসী ম্লেচ্ছ বলে যাদের বর্ণনা করা হয়েছে, তাদের মালয় ও ইন্দোচীনবাসী কাম্বোজীয় বলেই অনুমিত হয়। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে প্রাচীন ভারত ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের যে ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে কাম্বোজ যে ভারতের বাইরে পূর্বসমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী দেশ, সে সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না। উক্ত পুরাণের ৪৯ অধ্যায়ের৫২ শ্লোকে অঙ্গদ্বীপ বা ইন্দোচীনের ম্লেচ্ছ অধিবাসীদের মধ্যে কাম্বোজেরও নাম পাওয়া যায়।

কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরা অঙ্গলৌকিকাঃ।
চীনাশ্চৈব তুষারাশ্চ পহ্লবাশ্চ ক্ষতোদরাঃ।।

এর পরে ৫২ অধ্যায়ে জম্বুদ্বীপের মধ্যে অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও বরাহদ্বীপ নামে নানা রত্নসমন্বিত ও বিবিধ প্রাণি-পরিপূর্ণ ছয়টি দ্বীপের উল্লেখ করা হয়েছে—

জম্বুদ্বীপপ্রদেশাস্তু ষড়ন্যে বিবিধাশ্রয়াঃ।
অত্র দ্বীপাঃ সমাখ্যাতা নানারত্নাকরা ক্ষিতৌ।।
অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ।
শঙ্খদ্বীপং কুশদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ।।
অঙ্গদ্বীপং নিবোধ ত্বং নানাসত্ত্বসমাকুলম্।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্দ্বীপং বহু বিস্তরম্।।

অর্থাৎ অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, মলয়দ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও বরাহদ্বীপ নামে নানা প্রাণি-পরিপূর্ণ ও রত্নরাজি-সমন্বিত ছয়টি দ্বীপ এই জম্বুদ্বীপ বিদ্যমান। এর মধ্যে প্রথমে অঙ্গদ্বীপের কথা বলছি। ঐ দ্বীপ অত্যন্ত বিস্তৃত, নানা রত্ন, প্রবাল, স্বর্ণের আকর, বিভিন্ন শ্রেণীর ম্লেচ্ছ-অধ্যুষিত। আবার ৪৮ অধ্যায়ে অঙ্গদ্বীপকে একটি উপদ্বীপ এবং এর কটিদেশে নাগনিলয় এবং সাগর বিরাজিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ম্লেচ্ছ-অধ্যুষিত দেশ হলেও তারা হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনা করে, এ কথাও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের বর্ণনানুসারে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অঙ্গদ্বীপকে আনাম ও কাম্বোজ বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন। ('বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ২৮৩ পৃঃ)

উপরোক্ত বর্ণনাদি এবং বিবিধ শিলালিপির সাহায্যে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অঙ্গদ্বীপ অর্থাৎ কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়াকে নাগোপাসক অনার্য্য দেশ বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন। হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পর কাম্বোজের ম্লেচ্ছ অধিবাসী ক্মের খেমুররা যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। উভয় দেশের মধ্যে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতার ফলে হিন্দুরাও কাম্বোজীদের রীতি-নীতি কিছু কিছু গ্রহণ করেছিলেন, এমন ঐতিহাসিক নজিরেরও অভাব নেই। ভারতীয় রাজন্যগণ রণকুশল কাম্বোজীদের বেতনভুক সৈন্য হিসেবে অনেক সময় নিজ রাজ্যে আমন্ত্রণ করে আনতেন এবং তাদের বসবাসের জন্য সীমান্ত অঞ্চলে জায়গীর প্রভৃতি দিতেন। যার ফলে সিন্ধুতীরে এক কালে কাম্বোজীদের একটি ঘাঁটি বা উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এ যুগে ভারতীয়গণ জল স্থল উভয় পথেই যে কাম্বোজ যাতায়াত করতেন এমন প্রমাণেরও অভাব নেই। স্থলপথে আসাম বা প্রাগজ্যোতিষপুর পার হয়ে ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়ে তাঁরা মালয় এবং ইন্দোচীনের চম্পা ও কাম্বোজে যাতায়াত করতেন। এ ছাড়া সমুদ্রপথে তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বন্দর থেকে ভারতীয় 'বাণিজ্যপোত যে চীন, জাপান, সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা) বর্হিণদ্বীপ (বার্ণিও) যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, আফ্রিকা-উপকূল, এমন কি সুদূর রোমে পর্য্যন্ত যাতায়াত করত টলেমি, পেরিপ্লাস, ফাহিয়ান এবং হুয়েনসাং প্রভৃতি বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বর্ণনা থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

চম্পা ও কাম্বোজের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে যে সব শিলালিপি শিলালেখ, তাম্রশাসন প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কতক দেবনাগরী, কতক পালি, তামিল, কতক বা স্থানীয় ক্মের ভাষায় লিখিত। এসব লিপিতে নীতিবাক্য, অনুশাসন, রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্ম্মীয় বিধি-বিধান এবং বহু হিন্দু ও বৌদ্ধরাজার নাম ও রাজ্য শাসনকালের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ উত্তর-ভারতের হিন্দুরাজারা দেবনাগরী, মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত, বৌদ্ধরাজারা পালি এবং দাক্ষিণাত্যের হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধরাজারা তামিল ভাষা ব্যবহার করতেন। বলা বাহুল্য, আর্য্যাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্যের হিন্দু বা বৌদ্ধরাজারা যাঁরাই যখন কাম্বোজের সিংহাসনে বসেছেন দেশে তখন তাঁদের ভাষাই প্রচলিত হয়েছে। তাছাড়া রাজাদের ধর্ম্মমতের প্রভাবও দেশ ও জাতির ওপর প্রতিফলিত হয়েছে। এর ফলে অনেক সময় হিন্দু-মন্দির যেমন বৌদ্ধমঠে রূপান্তরিত হয়েছে, তেমনি বৌদ্ধমঠেও অনেক সময় স্থাপিত হয়েছে হিন্দু-বিগ্রহ। কাম্বোজ ও আঙ্করথমের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এমন রূপান্তরিত বৌদ্ধমঠ ও হিন্দুমন্দিরের সংখ্যা বড় কম নয়।

উপাদান ও তথ্যের অভাবে খৃষ্টীয় প্রথম থেকে অষ্টম শতক পর্য্যন্ত কাম্বোজের ইতিহাস কিছুটা অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও নবম শতক থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এর যে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়, তা কীর্ত্তি ও গৌরবে সমুজ্জ্বল।

## আঙ্করথম ও বায়ন-মন্দির

৮০২ খৃষ্টাব্দে জয়বর্ম্মণ নামে একজন শক্তিমান্ রাজা কাম্বোডিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। জয়বর্ম্মণ নিজেকে সুমাত্রাদ্বীপের সূর্য্যবংশীয় রাজা শ্রীবিজয়ের বংশধর বলে পরিচয় দেন। কাহারো মতে জয়বর্ম্মণ এবং কাহারো মতে তৎপরবর্ত্তী রাজা যশোবর্ম্মণই আঙ্করথম নগরীর প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর নামানুসারেই এ নগরীর আদিনাম ছিল যশোধরপুর। নগরের বিশাল প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাকার প্রায় ৯ মাইলব্যাপী সম-চতুষ্কোণ যশোধরপুরকে বেষ্টন করে আছে। প্রায় ৯শত বৎসর হিন্দু রাজারা প্রবল প্রতাপে এ নগরীতে রাজত্ব করেছেন। এ রাজ্যের পরাক্রমশালী রাজাদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং সপ্তম জয়বর্ম্মণ, যশোবর্ম্মণ ও দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ যুগে কাম্বোজ এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, কোচীন-চীন, লাওস, শ্যাম, ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ এবং সমগ্র মালয় উপদ্বীপ এর অধিকারভুক্ত হয়েছিল। রাজধানী আঙ্করথমের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির কথা এককালে প্রবাদের মত ছড়িয়ে পড়েছিল দেশে-বিদেশে। অনুমান নবম খৃষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় জয়বর্ম্মণের সময় এ নগরীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং তৎপরবর্ত্তী চতুর্থ নৃপতির শাসনকালে তা সমাপ্ত হয়।

নগরের ভগ্নপ্রাকার, সিংহদ্বার ও গোপুরগুলি এখনো এর বিশালতা ও ভাস্কর্য্যের পরিচয় দিচ্ছে। পুরীর প্রাকার দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাড়ে ৭ মাইল এবং প্রাকারের বাইরের পরিখাও প্রায় ৫০০ ফুট প্রশস্ত। নগর প্রবেশের পাঁচটি দ্বারের

মধ্যে **প্রধান দ্বারটির নাম ছিল বিজয় তোরণ। তোরণের অভ্যন্তরের নক্সা কতকটা ক্রুসের মত। তোরণশীর্ষে আছে তিনটি** শিখর এবং শিখরগুলির উপরিভাগে চারদিকে চারটি বিরাট মুখ। চারটি মুখ দেখে কেহ কেহ একে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি, কেহ বা চারটিই শিবের মূর্ত্তি বলে অনুমান করেন। আঙ্করথম যে জেলায় অবস্থিত এখন তা মঠ-মন্দির, প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদ ও গৃহাদিতে পরিপূর্ণ। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এককালে এইটিই ছিল হিন্দু অধিবাসীদের কেন্দ্রভূমি। এখনো এখানকার সু-উচ্চ মঠ-মন্দিরাদি বহুদূর থেকে যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মঠ-মন্দিরসহ সমগ্র নগরটি জঙ্গলে আচ্ছাদিত ছিল।

আঙ্করথমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি হল, নগরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত বায়নের বিরাট বৌদ্ধমন্দির। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা সপ্তম জয়বর্ম্মণ এই মন্দির বা মঠ নির্ম্মাণ করেছিলেন। এ মন্দিরের বিশালতা ও অপূর্ব্ব স্থাপত্যশৈলী পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারীদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করে। প্রস্তর-নির্ম্মিত এই মঠের ভাস্কর্য্য, গঠন-পারিপাট্য, মূর্ত্তিশিল্প, কারুশিল্প প্রভৃতি এবং সর্ব্বোপরি এর বিশালতা যে কোন দর্শককে মুগ্ধ ও বিস্ময়বিমূঢ় করে তুলবে। পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীদের মতে মিশরের পিরামিড ছাড়া পৃথিবীর আর কোন কিছুর সঙ্গেই এর ভাস্কর্য্য রীতির তুলনা মিলে না। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রায় ৪০ খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, যার সাহায্যে কাম্বোজের বহু ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। আঙ্করথমের অন্যান্য মন্দিরের ন্যায় এ মন্দির-গাত্রে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে আছে প্রাচীন কাম্বোজগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, দশম শতাব্দীর কাম্বোজীদের সমরাভিযানের দৃশ্য, জনবহুল নগরী ও রাজপ্রাসাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্যাবলী, রাজসভায় বন্দিগণ পরিবেষ্টিত রাজা এবং তাঁর রাজকার্য্য পরিচালনার নানাধরণের ঐতিহাসিক চিত্রপট। বায়ন-মন্দিরে আদিতে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্ত্তীকালে ইহা বৌদ্ধমন্দিরে রূপান্তরিত হয়। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ব্বর থাই আক্রমণের ফলে কাম্বোজের এই অপূর্ব্ব স্থাপত্য-শিল্প গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

## আঙ্করভাট মন্দির

আঙ্করথমের অনতিদূরেই কাম্বোজের তথা সমগ্র প্রাচ্য পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি আঙ্করভাটের মন্দির অবস্থিত। কাম্বোজের যুগ-যুগান্ত রক্তাক্ত অভিযান ও ধ্বংসের ইতিহাসের মধ্যে এ বিরাট বিষ্ণুমন্দির অতীতের সাক্ষিস্বরূপ আজও যে মাথা উঁচু করে আছে এ বড় কম বিস্ময় নয়। শুধু কাম্বোডিয়া কেন, সমগ্র ইন্দোচীন এমন কি সারা হিন্দুজগৎ খুঁজলেও, কি বিশালতা, কি নির্ম্মাণ-কৌশল, কি মূর্ত্তি বা প্রাকার-চিত্রশৈলী—কোন দিক দিয়েই আজ আর আঙ্করভাটের তুলনা মিলবে না। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগে রাজা ধরণীধরবর্ম্মণের রাজত্বকালে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় এবং দ্বিতীয় রাজা সূর্য্যবর্ম্মণের রাজত্বকালে প্রায় ৪০ বৎসরে উহা সমাপ্ত হয়। এই মন্দিরে এক সময় ৬০।৭০ হাজার লোক পূজা দিতে আসতো। মন্দিরের পরিচালনভার ১৮ জন প্রধান পুরোহিতের ওপর ন্যস্ত ছিল এবং এঁদের অধীনে ২৭৪০ জন সাধারণ পুরোহিত এবং ২২৩২ জন সহকারী পুরোহিত সমগ্র মন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহ করতেন। এছাড়া মন্দিরে ৬১৫ জন দেবদাসী নিযুক্ত ছিল। শিলালিপিতে উৎকীর্ণ এসব তথ্য মন্দিরের বিশালতা ও জাঁকজমকের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় সমান—দৈর্ঘ্যে প্রায় ১,১০০ গজ এবং প্রস্থে ১০৮০ গজ। চতুর্দ্দিকে ২ শত গজ প্রশস্ত সুগভীর পরিখা এবং পরিখার পর সু-উচ্চ চতুষ্কোণ পাষাণ-প্রাকার দ্বারা মন্দিরটি দুর্গের ন্যায় পরিবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত। প্রাকারের চারিদিকে চারটি প্রবেশপথ পরিখার ওপর প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতুদ্বারা বাইরের সঙ্গে সংযুক্ত। পশ্চিমদিকের প্রবেশদ্বারটিই প্রধান তোরণ বা গোপুরম। কতকটা দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের অনুরূপ পদ্ধতিতে নির্ম্মিত হলেও বিশালতা, শিল্পসৌন্দর্য্য ও স্থাপত্যবিন্যাসে আঙ্করের গোপুরম অতুলনীয়, দাক্ষিণাত্যের কোন গোপুরমই এর সম-মর্য্যাদা লাভের যোগ্য নয়। পরিখার উপরিস্থ সেতু পার হয়ে গোপুরম-এর মধ্য দিয়ে মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হলে এর বিশালতা দেখে চমৎকৃত হতে হয়।

মূল মন্দিরে যেতে হলে এই প্রাঙ্গণমধ্যস্থ প্রস্তরনির্ম্মিত পথ ধরে অগ্রসর হতে হয়। গোপুরম হতে মন্দির পর্য্যন্ত এই পথটি প্রায় ৩৭০ গজ দীর্ঘ এবং পথের দু'পাশে কারুকার্য্যশোভিত সপ্তমস্তকযুক্ত নাগমূর্ত্তির সারি সারি স্তম্ভ। প্রধান মন্দিরের চারদিকে পর পর তিনটি বেষ্টনী এবং বেষ্টনীগুলি একটি থেকে অপরটি প্রায় কুড়ি ফুট উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধতর হয়ে মূল মন্দিরের দিকে উঠে গেছে। মূল মন্দিরের পাঁচটি চূড়া এবং মধ্যস্থলের সর্ব্বোচ্চ চূড়াটি ভূমিতল থেকে ১৮০ ফুট উচ্চ। মন্দিরটি উচ্চ হতে উচ্চতর তিনটি ধাপে এমন সুকৌশলে নির্ম্মিত যে, মূল মন্দিরে আরোহণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র মন্দিরের আকৃতি, গঠনপ্রকৃতি ও বিশালতা সঠিক উপলব্ধি করা একপ্রকার অসম্ভব। মূল মন্দিরের চারদিকের প্রাঙ্গণগুলি জলপূর্ণ, সুতরাং ওগুলিকে প্রাঙ্গণ না বলে সরোবর বলা উচিত। স্থানীয় ভাষায় এগুলিকে বলে 'শ্র'। মন্দিরের চারিপাশের অলিন্দগুলি উৎকীর্ণ লিপিচিত্র ও দেবদেবী-মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। সমস্ত মূর্ত্তি ও উৎকীর্ণ চিত্রাদি দেখতে হলে প্রায় ৫ মাইল পথ পরিক্রমা করতে হয়। কোথাও ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত, পদতলে কুরুবীরগণ উপবিষ্ট, কোথাও রথারূঢ় অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন, কোথাও বা হনুমানের পৃষ্ঠে চড়ে রামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত।

এ ছাড়া বাণরাজার সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ, যমপুরীর বিচার-দৃশ্য, সমুদ্র-মন্থনে দেবাসুর সমাবেশ, শিব-পার্ব্বতী, বিষ্ণু, গণেশ, ঐরাবত-পৃষ্ঠে ইন্দ্র, হংসারূঢ় ব্রহ্মা প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি ও চিত্রে অলিন্দ পরিপূর্ণ। এক দিকে ক্ষোদিত আছে কাম্বোজরাজ সূর্য্যবর্ম্মণ ও তাঁর পরিবারবর্গের মূর্ত্তি। এমন জাঁকজমক ও কারুকার্য্যশোভিত প্রাকারচিত্র কাম্বোজের আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ! কোথাও পীনপয়োধরা সুন্দরী রাজান্তঃপুরিকারা মহাপায়ায় উপবিষ্টা, সর্ব্বাঙ্গে তাদের রত্নালঙ্কার ঝকমক করছে। কোথাও অপরূপ রূপসী রাজকন্যা চতুর্দ্দোলায় গমন করছেন, সহচরীগণ ব্যজন করছে চামর। কোথাও সশস্ত্র বর্ম্মাবৃত রাজপুরুষ, নর্ত্তক, ধানুকিগণ বীরদর্পে দণ্ডায়মান। কোথাও রাজসভা—রাজা, রাজকুমার, পারিষদবর্গ, যোদ্ধাগণ নিজ নিজ পদোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে আসনে উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান। এসব দৃশ্যপট থেকে সে-যুগের রাজা এবং রাজসভার মোটামুটি একটা ধারণা অনায়াসেই

করে নেওয়া যায়। আঙ্কর-মন্দিরের এসব মূর্ত্তির আলোকচিত্র ইন্দোচীনের বাজারে বিক্রয় হয় এবং বিদেশী ভ্রমণকারীরা আগ্রহভরে তা ক্রয় করেন। ফরাসী সরকার এবং ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদগণের ঐকান্তিক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে ৫ শত বৎসরের পরিত্যক্ত জঙ্গলাকীর্ণ আঙ্করথম নগর আঙ্করভাট ও বায়নসহ অসংখ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ-মন্দিরের আবিষ্কার বা পুনরুদ্ধার আজ সমগ্র সভ্য জগতের কাছে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, তুলে ধরেছে হিন্দু-সভ্যতার অতীত যুগের এক বিস্মৃত ইতিহাস বিশ্ববাসীর সম্মুখে।

গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর কাম্বোজের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই দিনে দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী পরে কাম্বোজের হিন্দু রাজা সবাই সোয়াম ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ সহ খুব জাঁকজমকের সঙ্গে আঙ্করভাট-মন্দিরে এসে সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজো দেন। সমগ্র মন্দির সেদিন মঙ্গলঘট ও দীপমালায় সজ্জিত হয়ে এক অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করে। শঙ্খ, ঘণ্টা, বাদ্য আর জনকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠে মন্দিরের বিশাল প্রাঙ্গণ। এমনি করে পাঁচ শতাব্দী পরে আঙ্করে শায়িত নারায়ণের যোগনিদ্রা ভঙ্গ হল, কাম্বোজবাসী ফিরে পেল যেন তাঁর মঙ্গল আশীর্ব্বাদ, প্রসন্ন দৃষ্টির বরাভয়, আর সেই সঙ্গে ফিরে পেল তার যুগ-যুগান্তের হারানো ঐতিহ্যের অতুল বৈভব। এ উৎসবে ইন্দোচীনের ফরাসী গভর্ণর জেনারেল এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ফরাসী রাজপুরুষরা যোগদান করেছিলেন। প্রাচীন প্রথানুসারে এই স্মরণীয় দিনে কাম্বোজের অভিজাতবর্গ মন্দিরে এসে দেবতার সমুখে রাজানুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। সেই দিন থেকে আজো পর্য্যন্ত কাম্বোজবাসীরা বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে আঙ্করভাটে এসে বিষ্ণুর পূজো দিয়ে প্রাচীন প্রথা পালন করে আসছেন।১

## অন্যান্য মন্দির ও মঠ

আঙ্করথম নগরের বাইরেও সমগ্র কাম্বোডিয়া জুড়েই রয়েছে হিন্দু কৃষ্টি ও সভ্যতার অগণিত নিদর্শন। সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে নগর, মন্দির, মঠ, সরোবর প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ। এই বিরাট ঐতিহ্যের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া একটি মাত্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। এখানে কেবল মাত্র কয়েকটি নগর, মন্দির ও শিলালিপির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। সম্বর নামক গ্রামের নিকট কাম্বোজের চেনলা রাজবংশের প্রাচীন রাজধানী ঈশানপুরের ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভববংশের রাজারা এখানে ষাটটি মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন। অধিকাংশ মন্দিরের ভিতরেই নানা প্রকার দেবদেবীর বিগ্রহ এবং লিঙ্গময় শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। একটি মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে লিখিত আছে—"রাণী সাকারমঞ্জরী দুইটি দেবমূর্ত্তি—সরস্বতী ও নৃত্যেশ্বর এবং নন্দিনের রৌপ্যমূর্ত্তি স্থাপন করেছিলেন।" আর একটি শিলালিপিতে "ঈশানবর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিতেশ্বর মন্দির স্থাপিত" এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ আছে। অপর একটি শিলালিপিতে রাজা ঈশানবর্ম্মা ও রাণী সাকারমঞ্জরীর নাম উল্লিখিত আছে। শ্যামরাজ্যের সীমান্তে প্রাস্তেইছমুম দুর্গের নিকট পড়ে আছে দ্বিতীয় জয়বর্ম্মণের রাজধানী মহেন্দ্রপুরীর ধ্বংসাবশেষ। এখানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি থেকে জানা যায়, এই সীমান্ত কয়েক বার থাই জাতি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়েছিল। এখানকার লোকেশ্বর বোধিসত্ত্বের মন্দিরের নির্ম্মাণ প্রণালী অনেকটা বায়ন ও আঙ্করভাট মন্দিরেরই অনুরূপ। অপর একটি মন্দিরে একটি বিরাট লিঙ্গময় শিবমূর্ত্তি আছে। এ ছাড়া ফু-নানের রাজধানী ব্যাধপুর এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্যতম চেনলা রাজধানী শ্রেষ্ঠপুরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যেও বহু মঠ, মন্দির ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্নোম চিনর নামক স্থানে একটি কালীমন্দিরে এবং পূর্ণাগিরি পর্ব্বতমালার ওপরও কতকগুলি মন্দির ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।২

কাম্বোজের প্রতি নগরে ও মন্দিরে হিন্দু সভ্যতার যে কত ঐতিহাসিক উপাদান এখনো অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রত্যেকটি মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত আছে পৌরাণিক ঘটনাবলীর চিত্র, ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশ, নীতি, অনুশাসন ও অসংখ্য বিধি-বিধান। এ ছাড়াও নগরমধ্যস্থ ও মন্দির-সংলগ্ন পুস্তকাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, বিরাট আকারের জলাশয় সমূহ এবং ছায়াতরুশোভিত রাজপথের ধ্বংসাবশেষ এখনো হিন্দুকৃষ্টি সভ্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

## চৈনিক দূত চৌ-টা-কুয়ন

১২৯৯ খৃষ্টাব্দে আঙ্করথমে এসেছিলেন চৈনিক রাষ্ট্রদূত চৌ-টা-কুয়ন। তিনি তৎকালীন আঙ্করথম নগর সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসেবে তার ঐতিহাসিক মূল্য যে যথেষ্ট, একথা বলাই বাহুল্য। চৌ-টা-কুয়ন লিখেছেন—আঙ্করের বাইরের প্রাকারের পরিধি ২০ লি ( মাইল )। পাঁচটি বৃহদাকার সিংহদ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়, সিংহদ্বারগুলির পাশে সারিবদ্ধভাবে আরো ছোট কতকগুলি দ্বার আছে, প্রাকারের বাইরে প্রশস্ত পরিখা, পরিখার বাইরে বাঁধানো উঁচু রাস্তা। নগরে প্রবেশ করতে হলে পরিখার উপরিস্থ সেতু পার হতে হয়। সেতুগুলির দুই পাশে সবশুদ্ধ ১০৮টি বিরাটাকৃতি ভীষণদর্শন দানবমূর্ত্তি রাজধানীর রক্ষিরূপে দণ্ডায়মান। সিংহদরজার উপরিভাগে বুদ্ধের পাঁচটি মস্তক—চারটি প্রস্তর-নির্ম্মিত কিন্তু মাঝেরটি স্বুবর্ণমণ্ডিত। সিংহদরোজার দুই পাশে বিশালকায় প্রস্তরনির্ম্মিত হস্তিসমূহ। অহোরাত্র সশস্ত্র প্রহরিগণ দ্বার রক্ষা করছে। কুকুর বা গুরুরাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের নগর প্রবেশ নিষিদ্ধ। সহরের ঠিক মধ্যস্থলে সমোচ্চ স্বুবর্ণময় গম্বুজের নাম বায়ন।

বায়নের চারধারে ৫১টি প্রস্তরময় গম্বুজ ও কয়েক শত গৃহ। পূর্ব্বদিকে একটি স্বর্ণমণ্ডিত সেতু এবং সেতুর দুই পাশে দুইটি করে স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহমূর্ত্তি ও আটটি বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি। বায়নের মন্দিরের নিকটেই রাজপ্রাসাদ, রাজপ্রাসাদের শয়নকক্ষের নিকট একটি স্বুবর্ণনির্ম্মিত গম্বুজ আছে, এর নাম 'বিমানোকস্'। চৌ-টা-কুয়ন বায়ন; মন্দিরের এক লি উত্তরে 'বাফুয়ন' নামে একটি সু-উচ্চ পিত্তলনির্ম্মিত গম্বুজের অজস্র প্রশংসা করে বলেছেন, যিনি একবার এ গম্বুজটি দেখেছেন; জীবনে কখনো তিনি তা ভুলতে পারবেন না।

---

১। কাম্বোজে হিন্দুস্থাপত্য—স্বামী সারদানন্দ—৩৬-৩৭ পৃঃ

২। Indian Cultural Influence in Cumbodia—Dr. Bijan Raj Chatterjee.

রাজা এবং রাজ্যের নারী-পুরুষ সকলের চুলই মাথার ওপর চূড়ার মত বিন্যস্ত। নবম ও দশম শতাব্দীর অনেক প্রস্তরমূর্ত্তির কেশপ্রসাধনভঙ্গী দেখে এ বর্ণনার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। কাম্বোজীরা কোমরে একখানা বস্ত্র জড়ায় কিন্তু স্কন্ধদেশ অনাবৃত রাখে। কেবলমাত্র রাজা স্বয়ং গুলবাহার পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেন এবং মস্তকে স্বর্ণমুকুট ধারণ করেন। রাজার মাথায় যখন মুকুট থাকে না, তখন মাথার ঝুঁটিতে সুগন্ধ পুষ্পমালা জড়িত থাকে। রাজার গলায় প্রায় দেড় সের ওজনের একটি মুক্তোমালা, হাতে পায়ে স্বর্ণালঙ্কার এবং অঙ্গুলিতে বৈদূর্য্যমণির অঙ্গুরীয়ক শোভা পায়।

রাজপ্রাসাদের বাইরে গমন কালে রাজার সঙ্গে যে শোভাযাত্রা বের হয়, চৌ-টা-কুয়ন তার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে তৎকালীন আঙ্করের হিন্দু রাজাদের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য্যের বেশ একটা পরিচয় পাওয়া যায়। শোভাযাত্রার সর্ব্বাগ্রে দেহরক্ষী অশ্বারোহী বাহিনী, তারপর চলে পতাকা ও বাদ্যভাণ্ড। এর পর ধীর মন্থর পদক্ষেপে এগিয়ে চলে পুষ্পনিবদ্ধকবরী বিচিত্র বর্ণাঢ্য বসনপরিহিতা শত শত সুন্দরী তরুণী—হাতে তাদের প্রজ্বলিত দীপাধার; তরুণী বাহিনীর পশ্চাতে চলে স্বর্ণ-রৌপ্য পাত্র ও অলঙ্কারাদি বহন করে রাজপ্রাসাদের পরিচারিকার দল এবং তৎপশ্চাৎ হস্তিপৃষ্ঠে মন্ত্রিগণ, রাজকুমার ও রাজপুরুষগণ, এদের সঙ্গে থাকে অসংখ্য রক্তবর্ণের ছত্র। এর পর পাল্কী, রথ এবং গজপৃষ্ঠে গমন করেন রাজমহিষীগণ এবং তৎপশ্চাৎ রাজ-অন্তঃপুরচারিণীর দল; এদের মাথায় শোভা পায় শত শত স্বর্ণনির্ম্মিত ছত্র। এর পর রাজার দেহরক্ষিণী নারীবাহিনী এবং সর্ব্বপশ্চাৎ সশস্ত্র প্রহরিবেষ্টিত হয়ে গমন করেন রাজা স্বয়ং, হস্তিপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান—হাতে তাঁর 'প্রাযান' বা ইন্দ্রপ্রদত্ত পবিত্র তরবারি।

চৌ-টা-কুয়ন রাজপ্রাসাদের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রাজপ্রাসাদে বিশেষ অনুমতি ছাড়া কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রাসাদের প্রধান ভবনটি খুব জাঁকজমকপূর্ণ এবং স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। যে গৃহে রাজসভা বসত তার জানালাগুলির ফ্রেম সব সোনার পাত দিয়ে মোড়া। সভাস্থলের দুই ধারে চতুষ্কোণ স্তম্ভের সারি এবং এই স্তম্ভগাত্রে ৫০খানি দর্পণ শোভিত। এ ছাড়া রাজসিংহাসনের উভয়দিকের দেওয়ালেও শোভা পাচ্ছে অনেকগুলি বৃহদাকার ধাতুনির্ম্মিত দর্পণ। এই দর্পণের সমুখে সোনার ফুলদানী ও ধুনুচি, ধুনুচিতে ধূপধুনা ও সুগন্ধ দ্রব্য পোড়ান হয়।

চৈনিক দূতের এ সব বিবরণ থেকে তৎকালীন কাম্বোজের বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজাদের রাজসভা, ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমকের অতি সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাসাদ, স্তম্ভ ও মূর্ত্তি প্রভৃতির ভগ্নস্তূপ ছাড়া আজ আর সে ঐশ্বর্য্যের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই, তথাপি আঙ্করের হারানো ইতিহাস সঙ্কলনে এই চৈনিক বিবরণই যে সব চেয়ে মূল্যবান ও প্রামাণ্য উপাদান, একথা বলাই বাহুল্য।

## ধ্বংসের ইতিহাস

অনুমান ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে শ্যাম-সৈন্যগণ সহসা একদিন কাম্বোজ আক্রমণ করে। এই আকস্মিক আক্রমণের সময় রাজা ছিলেন সপরিবারে আঙ্করভাট-মন্দিরে, আঙ্করবাসীরাও ছিল না তেমন সতর্ক বা প্রস্তুত। সুতরাং তাদের দুর্ব্বল প্রতিরোধ ব্যবস্থা পারলো না দুর্ব্বার শ্যামবাহিনীর গতিরোধ করতে। রাজা সপরিবারে মন্দির মধ্যে অবরুদ্ধ হলেন। বাইরে আসবার কোন উপায় না থাকায় তিনি সুরক্ষিত মন্দিরমধ্য থেকেই যতদিন সম্ভব আত্মরক্ষা করলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন আত্মরক্ষার সকল সম্ভাবনা নিঃশেষিত হল, তখন তিনি আত্মসমর্পণ অপেক্ষা সপরিবারে প্রাণ বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হলেন। ডেকে পাঠালেন মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে। তারপর মন্দিরের বিপুল রত্নরাজি ও স্বর্ণালঙ্কার মাঝের গম্বুজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে সপরিবারে তারই মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এবং অনুচরদিগকে গম্বুজের চারটি দ্বারই ইষ্টক দিয়ে গেঁথে ফেলতে হুকুম করলেন। এইরূপে বিপুল ধনৈশ্বর্য্যসহ রাজা সপরিবারে সেই গম্বুজ-মধ্যে চিরসমাহিত হলেন।

রাজপ্রাসাদ-মধ্যস্থ শিবমন্দিরেও ঘটলো অনুরূপ ঘটনা। প্রধান পুরোহিত মন্দিরের বিপুল ধনরত্ন কোন গুপ্তকক্ষে লুকিয়ে ফেললেন। বিজয়ী শ্যাম-সৈন্যগণ গুপ্তধনের সন্ধানের জন্য পুরোহিতের ওপর নির্য্যাতন সুরু করল কিন্তু নির্ব্বাক ব্রাহ্মণের মুখ খোলা গেল না। ক্রুদ্ধ শ্যামসৈন্যের খড়্গাঘাতে পুরোহিতের মস্তক কণ্ঠচ্যুত হল কিন্তু ভঙ্গ হল না তাঁর মৌনতা। ফলে সেই বিপুল রত্নরাজিও ঐশ্বর্য্যের সন্ধান চিরদিনের মত অজ্ঞাতই রয়ে গেল!

কাম্বোজবাসীদের বিশ্বাস মন্দিরমধ্যে কোথাও না, কোথাও এ বিপুল রত্নসম্ভার এখনো লুক্কায়িত আছে, একদিন না একদিন হয়তো তার সন্ধান মিলবে।

হিন্দুসভ্যতার যে কত ঐশ্বর্য্য, কত ঐতিহ্য সম্পদ এই বিপুল ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এখনো আত্মগোপন করে আছে, তা সম্যক্ নির্ণয় করা আজ পর্য্যন্তও সম্ভব হয়নি। ভারতের মূল ভূখণ্ডে মুসলিম আক্রমণে যে সব ঐতিহাসিক সম্পদ এককালে নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কাম্বোজ, শ্যাম, চম্পা, মালয় এবং দ্বীপময় ভারতে এখনো তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা করলে এরই সাহায্যে কোন দিন হয়তো ভারতের সেই তমসাচ্ছন্ন হিন্দুযুগের ওপর হবে আলোকপাত। আবার নতুন করে রচিত হবে ভারতের ইতিহাস।

সমাপ্ত

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

## কুড়ি

এইবার আমার জীবনের প্রথম পর্ব্ব শেষ করি—সত্যিই আমার দেশে ফিরে যাওয়া হল না।

* * * *

মার্লিনের শরীর অবশ্য বেশী দিন খারাপ ছিল না—দিন পাঁচ সাত বিশ্রাম নেওয়াতেই শরীর ঠিক হয়ে গেল।

ডডিংটন হাসপাতালে আমার বসবাস গুটিয়ে দিয়েই ত আমি দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়েছিলাম—তাই সেদিন সকালবেলা মার্লিনদের বাড়ীতে মার্লিন একটু সুস্থ হলে হাসপাতালে আর আমার ফিরে যাওয়া সম্ভবপর হল না। গিয়ে কিছুদিনের জন্য বাসা নিলাম ডডিংটনেই—জর্জ হোটেলে। সকালবেলা মার্লিন একটু সুস্থ হলে মার্লিনের মা আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, বাবা, একেই বলে অদৃষ্টের ফের, কোথায় আজ তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছিলে—শুধু শুধু কি বাধাটাই পড়ল। তুমি যে মার্লিনের জন্য এতটা করলে—সত্যিই তোমার এ ঋণ আমরা কোন দিন শোধ করতে পারব না।

বললাম—না—না। এ আর বেশী কি। আপনারা আমাকে এত স্নেহ করেন—এ অবস্থায় আপনাদের ফেলে চলে যাওয়াটা কি আমার ঠিক হত? দেশে, না হয় দুদিন পরেই যাব।

একটু ভেবে শুধালেন, হাসপাতাল থেকে ত চলে এসেছ—তুমি এখন থাকবে কোথায়?

বললাম—না হাসপাতালে আর ফিরে যাওয়া চলবে না। দেখি, জর্জ হোটেলে দু'-চারদিন থেকে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করব।

বললেন—আমাদের বাড়ীত বড্ড ছোট। নইলে দু'-চারদিন তোমাকে এখানেই থাকতে বলতাম।

বললাম—তাতে আর কি হয়েছে। জর্জ হোটেল ত আপনাদের এখান থেকে বেশী দূর নয়—সেখান থেকে যে ক'টা দিন আছি আমি প্রায় সব সময়ই মার্লিনের খবরাখবর রাখতে পারব।

* * *

জর্জ হোটেলে আছি—রোজই দুবেলা মার্লিনদের বাড়ী যাই, থাকি অনেকক্ষণ। মার্লিনের কথা ছেড়েই দিচ্ছি—মার্লিনের মা'র ব্যবহারে আমি সে সময়টা সত্যিই অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম। মার্লিনের দরুণ দেশে ফিরে যাওয়া বন্ধ করেছি—এ কৃতজ্ঞতা তিনি যেন রাখবার জায়গা পাচ্ছিলেন না, তাই যেন মন থেকে সমস্ত স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছিলেন আমার উপরে।

এই ভাবে পাঁচ-সাত দিন কাটবার পর একদিন মার্লিন আমাকে শুধাল বিকো! তোমার বাবা কেমন আছেন?

বললাম—অনেক দিন কোনও চিঠিপত্র পাচ্ছি না

বলল—তা তুমি ত এখন জর্জ হোটেলে আছ—সেখানেকী তোমার চিঠিপত্র ঠিক আসবে?

বললাম, হ্যাঁ। আমি হাসপাতালে টেলিফোন করে বলে দিয়েছি—আমার যাওয়া হয়নি। চিঠিপত্র এলে যেন জর্জ হোটেলে পাঠিয়ে দেয়।

একটু চুপ করে থেকে বলল—এইবার ত আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি—এইবার তুমি দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা কর।

একটু হেসে বললাম—তুমি আমার দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য এত অস্থির হয়েছ কেন শুনি?

একটু চাপা রকমের হাসি হেসে উঠল এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ল একটি দীর্ঘনিশ্বাস। মুখে কিছু বলল না।

আমিই বললাম—এইবার সুবিধামত একদিন লণ্ডনে গিয়ে ব্যবস্থা করে আসব।

সেই দিনই রাত্রে জর্জ হোটেলে গিয়ে দাদার চিঠি পেলাম—বাবা আর ইহজগতে নাই।

* * * *

বুলা! বিশ্বাস কর আর না কর, কী অসম্ভব বেদনা পেয়েছিলাম মনে—এতদিন পরে চিঠিতে সে কথা লিখে তোমাকে বোঝাতে পারব না, বোঝাবার চেষ্টা করে লাভই বা কি? কিছু না খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম দু'হাত দিয়ে বুকটা চেপে—ছেড়ে দিলে যেন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বাবার মুখখানা মনে করে থেকে থেকে সমস্ত রাত কেঁদেছি—আজও মনে আছে।

সকালবেলা উঠে এক অদ্ভুত ভাব এল মনে—দেশের দিকটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে, যেন দেশের সঙ্গে আমার আর কোনও যোগ নাই, হঠাৎ একেবারে ছিঁড়ে গেছে। সুধা রয়েছে বরুণ রয়েছে, তোমরা আছ—কই কোনও যোগসূত্র ত খুঁজে পেলাম না! বাবা নাই—তিনি আমাকে একবার শেষবারের মত দেখতে চেয়েছিলেন—না—না, সে আবহাওয়ায় এখন আর আমি যেন কিছুতেই গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। চা খেতে খেতে খবরের কাগজ খুলে কাজের বিজ্ঞাপন দেখতে লাগলাম। কোথায় কোন হাসপাতালে ডাক্তারের কাজ খালি আছে।

হঠাৎ চোখে পড়ল—উইসবীচে নর্থ কেমব্রিজসায়ার হাসপাতালে ছ'মাসের জন্য একটি ডাক্তার চাই। অবাক হয়ে ভাবলাম—সৃষ্টিলীলার এ কোন রঙ্গ! উইসবীচ—ডডিংটনের এত কাছে—বাসে যেতে ঘণ্টাখানেক লাগে মাত্র। কৈ আমি ত ডডিংটনের কাছাকাছি কোনও হাসপাতালের কথা বিশেষ করে ভেবে খবরের কাগজ দেখতে বসিনি!

প্রাণে উৎসাহ এল—তৎক্ষণাৎ দরখাস্ত করে দিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল—ডাঃ নায়ার। তিনি ত উইসবীচে অনেক দিন ছিলেন। কর্তৃপক্ষকে জানেন নিশ্চয়ই। তাঁকে দিয়ে একটু সুপারিশ করতে হবে। কাল সকালে যাব তাঁর কাছে।

ডডিংটনের হাসপাতাল ছেড়ে চলে আসার পর ত তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ডডিংটন হাসপাতালে থাকতে তাঁর কাছ থেকে অপরিসীম স্নেহ পেয়েছি—অথচ আমার দেশে ফিরে যাওয়া যে বন্ধ হল কেন বন্ধ হল, কিছুই ত তাঁকে বলিনি। কী-ই বা বলব—এই ভেবে বোধ হয়, যদিও ডডিংটনে আছি, তাঁর সঙ্গে আর দেখা করিনি! এখন গিয়ে কি বলব? সে যা হয় হবে, ভেবে মনটাকে ঘুরিয়ে নিলাম।

মনটা ঘুরে গিয়ে আবার পড়ল—বাবার সেই স্নেহমাখা মুখখানার উপরে। চোখে আবার ভরে এল জল। বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম।

সেদিন সকালে আর মার্লিনদের বাড়ী যাইনি।

*    *    *    *

বিকেলে মার্লিনদের বাড়ী গেলাম। মার্লিন আমার মুখের দিকে চেয়ে যেন চমকে উঠল। বলল, তোমার কি হয়েছে বিকো! অসুখ করেছে ?

বললাম, না।

শুধাল, তবে মুখের চেহারা এরকম কেন ?

বললাম, লীনা! চল কোথাও গিয়ে একটু নিরিবিলি বসি।

চল, বলে বাড়ীর পিছনে, ফাঁকায় সেই যে অ্যাসগাছটি আছে, তার তলায় নিয়ে গেল। বসলাম দু'জনে সেখানে। আমার হাত দু'খানি দু'টি হাতের মধ্যে নিয়ে শুধাল, কি হয়েছে তোমার বিকো ?

দুবার বলতে গিয়ে কথাটা গলায় ঢেউ খেলিয়ে আটকে গেল। কোনও রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, আমার বাবা আর ইহজগতে নাই। কালই চিঠি পেয়েছি।

বেচারা! বলে আমার মাথাটি সযত্নে কাত করে ধরে রাখল নিজের কাঁধের উপরে। তারপর চুপ করে রইল বসে। তখন নিজেকে সামলাতে পেরেছিলাম কি না—এখন আর আমার মনে নাই।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ। তারপর মার্লিনই কথা কইল। বলল, আমার জন্যই বাবাকে তুমি শেষ দেখা দেখতে পেলে না।

তাড়াতাড়ি বললাম, না—না লীনা! তা নয়। আমি যদি সেদিন দেশে ফিরেও যেতাম তবুও বাবাকে গিয়ে পেতাম না। চিঠি আসতে ত তিন সপ্তাহ লেগেছে। তার আগে তিনি মারা গিয়েছেন। ভাগ্যিস সেদিন আমার যাওয়া হয়নি।

শুধাল, কেন ?

বললাম, তোমাকে ছেড়ে দেশে গিয়ে, অত বড় ফাঁকা আমি সইতে পারতাম না।

একটু চুপ করে থেকে শুধাল, এখন ত তোমাকে একবার দেশে ফিরে যেতেই হবে ?

শুধালাম, কেন ?

বলল, বাপের মৃত্যুর পর ছেলের ত কি সব—

বললাম, না না লীনা, সেদিক দিয়ে আমার করণীয় কিছুই নাই। দাদা আছেন—যা করবার তিনিই করবেন।

আবার খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। তারপর বললাম, লীনা, আমি আর দেশে ফিরে যাব না। অন্ততঃ বেশ কিছুদিন ত নয়ই।

চুপ করে রইল। সে কথার কোনও উত্তর দিল না;

*    *    *    *

ক্রমে উইসবীচ হাসপাতালে গিয়ে যোগ দিলাম। উইসবীচের চাকুরীটির জন্য আমাকে একেবারেই বেগ পেতে হয়নি। ডভিংটনে কাজ করার দরুণ আমার নাম কর্তৃপক্ষের জানা ছিল, বোধ হয় আমার সুনামের কথাও শুনেছিলেন তাঁরা। তারপর ডাঃ নায়ারকে বলাতে তিনি নিজে গিয়ে একদিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে আমার কথা বলে এসেছিলেন।

উইসবীচের কথা আগেই শুনেছ। উইসবীচ ঠিক ডভিংটনের মত গ্রাম নয়—ছোট একটি সহর। দোকান-পসারও অনেক বেশী এবং তিন-চারটে ভাল ভাল হোটেল আছে। তারই একটির যেটি বোধ হয় সব চেয়ে বড়, মালিক মার্লিনের মাসী। হোটেলটির নাম হোয়াইট লায়ন।

উইসবীচ হাসপাতালে যোগ দেওয়ার জন্য ডভিংটন ছেড়ে যাওয়ার সময় মার্লিন আমাকে বলেছিল, বিকো! তুমি কিন্তু আমার মাসীদের বাড়ীর সঙ্গে বেশী মেলামেশা কর না।

মার্লিনকে কেন একথা বলেছিল বুঝতে আমার দেরী হয়নি। প্রথমত মার্লিন তার মাসীদের বাড়ীর কাউকেই কোনও দিনই বিশেষ পছন্দ করে না, এ খবর আমি আগেই জানতাম। তারপর আমার সঙ্গে মার্লিনের মেলামেশা—একে আমি ভারতীয়, তার উপর বিবাহিত, এসব খবর মাসীদের বাড়ী ইতিমধ্যেই পৌঁছেছিল, কেন না, জামাই মক্কটনের ত কিছুই অজানা ছিল না। এবং এই নিয়ে মার্লিনের মাসীর সঙ্গে তার মার যে একটা মনোমালিন্যের সূচনা হয়েছিল সেটুকুও আমার লক্ষ্য এড়ায়নি, যদিও এ নিয়ে কোনও স্পষ্ট কথা আমার সঙ্গে তাদের হয়নি। বাড়ীর আবহাওয়ায়, আভাসে ইঙ্গিতে, ব্যাপারটা সহজেই বুঝেছিলাম।

তাই মার্লিন ওদের এড়িয়ে চলত এবং ওরাও ইদানীং আর কোনও যোগাযোগ রাখেনি, তা-ও জানি। কাজেই মার্লিনের কথায় বিস্মিত হওয়া ত কিছুই ছিল না। বলেছিলাম, আমার কি দরকার, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করবার ?

উইসবীচে নর্থ কেম্বস অর্থাৎ নর্থ কেমব্রিজসায়ার হাসপাতালটি মোটেই ডভিংটন হাসপাতালের মতন ফাঁকা নয় এবং এর কোনও জানালা দিয়েই দূর দিগন্ত পর্য্যন্ত ছড়ান মাঠ দেখা যায় না। হাসপাতালটি উইসবীচ সহরের মধ্যেই অবস্থিত। তবে হাসপাতালের সামনে একটি সুন্দর বাগান আছে এবং হাসপাতালের গায়ে, উত্তর-পশ্চিমে একটি প্রকাণ্ড পার্ক হাসপাতালের জানালাগুলি দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। আমার শোবার ঘরের জানালাটি এই পার্কের দিকেই।

উইসবীচের কাজে সপ্তাহে আমার দেড় দিন ছুটি ছিল, একদিন পুরো এবং একদিন এক বেলা অর্থাৎ বেলা দুটোর পর থেকে। এই দুই দিনই আমি বাস ধরে চলে যেতাম ডভিংটনে। যেদিন পুরো ছুটি সেদিন সকালবেলা ব্রেকফাষ্ট খেয়ে যেতাম চলে এবং সমস্ত দিনটা মার্লিনদের বাড়ী কাটিয়ে রাত্রে সাপার খেয়ে আসতাম ফিরে। আর যেদিন দুটোর পর ছুটি হত লাঞ্চ খেয়েই চলে যেতাম ডভিংটনে। উইসবীচে বাস এসে দাঁড়াবার জায়গাটি হাসপাতালের খুব কাছেই ছিল। মার্লিনও মাঝে মাঝে এক একদিন চলে আসত উইসবীচে। হাসপাতালের সংলগ্ন সেই পার্কটিতে কোনও একটি নিরিবিলি গাছতলায় দু'জনে বসে বিকেল থেকে সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প করে কাটিয়ে দিতাম. তারপর মার্লিনকে তুলে দিয়ে আসতাম বাসে।

*    *    *    *

দিনগুলি কেটে যেতে লাগলো। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে এই সময় কিছুদিন আমার মনের দিক দিয়ে একটা প্রবৃত্তি ক্রমে প্রবল হয়ে উঠল, সে কথাটাও এইখানে বলে রাখি। আমার বাপ যে কত বড় ঘরের ছেলে দেশে আমাদের বংশমর্য্যাদা যে কত বড়, এই কথাটা

শুধু মার্লিন নয়, মার্লিনের মার কাছেও মাঝে মাঝে কথায়-বার্ত্তায় জাহির করতে শুরু করলাম এবং তাতে একটা তৃপ্তি পেতাম। বাবার মৃত্যুতে মনে যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম—এটা কি তারই প্রতিক্রিয়া? মার্লিনের জন্য দেশে ফিরে যেতে দেরী করেছি, মার্লিন আমার জীবনে না এলে হয়ত ঠিক সময়ই দেশে ফিরে যেতাম, বাবাকে দেখতে পেতাম তাহলে—তাই নিয়ে কি মনের কোনও কোণে একটা অনুশোচনা ছিল? তাই কি মার্লিনদের বিশেষ করে কথাটা শুনিয়ে মনে একটা সান্ত্বনা পেতাম? কিম্বা মার্লিন, অত বড় ঘরের সুশিক্ষিত ছেলে রোলাণ্ডকে আমার জন্য বিবাহ করতে রাজী হয়নি, তাই কি মনের গহনতলে আমার একটা ক্ষোভ ছিল? সেই ক্ষোভটাই কি প্রবল হল, বাবার মৃত্যুশোকে সমস্ত মনটা ওলোট-পালোট হয়ে গিয়ে—তাই কি, আমিও রোলাণ্ডের চেয়ে কোনও অংশে কম নই, এই কথাটা জাহির করার প্রবৃত্তি হঠাৎ এল মনে? জানি না। মানুষের মনের বিচিত্র গতি মানুষ নিজে কি জানে?

আজ জীবনের অপরাহ্ণে সে সময়ের আমার সেই মনোভাবটির কথা ভেবে লজ্জা পাই। মনে কত দৈন্যই না ছিল তখন? যাই হোক, এর জন্য পরে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল—সে সব অনেক পরের কথা।

একদিনের কথাবার্ত্তা একটু বলি—কতকটা বুঝতে পারবে।

সেদিন আমার ছুটি ছিল, তাই সকালে ব্রেকফাষ্ট খেয়েই উইসবীচ থেকে রওনা হলাম ডডিংটন অভিমুখে। লংডেল গ্রামে মার্লিনদের বাড়ীতে যখন এসে পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় ১১টা। মার্লিন ত জানত—তাই সে সদর দরজার কাছেই অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। আমার হাত দু'টি ধরে বলল, তুমি আসতে বড় দেরী কর।

বললাম, এর নাম দেরী? এই নভেম্বর মাসে ব্রেকফাষ্ট খেয়ে উইসবীচ থেকে ডডিংটন হয়ে লংডেল গ্রামে এসে ১১টার মধ্যে পৌঁছান; এ আর কেউ পারত না (একটু মৃদু হেসে) স্বয়ং আর্থার রোলাণ্ডও নয়।

হেসে মার্লিন বলল, আবার বেচারা রোলাণ্ডকে নিয়ে টানাটানি কেন?

বললাম, আহা—বেচারা! তাকে টানলে যে তোমার মনে টান লাগে, সেটা ত বুঝিনি।

আদর-মাখান চাহনিতে আমার দিকে চেয়ে বলল, তুমি সত্যি বড় দুষ্টু।

ইতিমধ্যে ওভারকোটটি খুলে ঝুলিয়ে রাখলাম সদর দরজার কাছের আলনায়। নভেম্বর মাসের প্রচণ্ড শীত—বাইরে শুধু মেঘাচ্ছন্নই নয়, থেকে থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। শীতকালে বিলেতে সেটা স্বাভাবিক।

বললাম, চল আগুনের কাছে বসি—আজ বেজায় ঠাণ্ডা।

চল, বলে আমাকে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে গনগনে আগুন ইতিমধ্যেই মার্লিন জ্বালিয়ে রেখেছিল, বোধ হয় আমারই জন্য। আগুনের কাছ ঘেঁষে বসে হাত-পা খানিকক্ষণ সেঁকে যেন বাঁচলাম। মার্লিনও আমার কাছেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

শুধালাম, তোমার মা কোথায়? এখনও নামেন নি?

বলল, না! তিনি একেবারে লাঞ্চের সময় নামবেন।

শুধালাম, এত ঠাণ্ডায় তাঁর শরীর ভাল আছে ত?

বলল, হ্যাঁ, লাঠি ভর করে নিজেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁটেন।

শুধালাম, আমার দেওয়া বড়িগুলি ঠিক নিয়মমত খাচ্ছেন ত?

বলল, হ্যাঁ। তাতে বোধ হয় উপকারও হয়েছে।

বললাম, ওঁর যে জাতীয় বাত, একেবারে ত সারবার নয়।

একটু চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বলল, ওঁর মনটা আজ দুদিন ধরে ভারী খুসী।

বললাম, কেন? বিশেষ কি কিছু কারণ ঘটেছে?

বলল, হ্যাঁ।

শুধালাম, কি ব্যাপার?

বলল, পরশু আর্থার রোলাণ্ডের একটা চিঠি এসেছে মার কাছে—অনেক দিন পরে।

শুধালাম, আবার আর্থার রোলাণ্ড? কি চিঠি?

বলল, বিশেষ কিছু নয়। তিনি আবার এ অঞ্চলে নিজের বাড়ীতে ফিরে এসেছেন। মাকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন—আমাদের সব কুশল ত?

শুধালাম, শুধু ঐটুকুই—আর কিছু নয়?

মার্লিন মৃদু হেসে বলল—লিখেছেন, সুবিধামত একদিন এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

ওঃ—বুঝেছি বলে চুপ করে গেলাম।

একটু পরে মার্লিন শুধাল—কি বুঝলে?

বললাম—বুঝলাম কেন তোমার মার মনটা এত খুসীতে ভরে উঠেছে। তিনি নিশ্চয়ই সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠির জবাব দিয়েছেন।

মার্লিন বলল—চিঠি একখানা লিখেছেন—কিন্তু কি লিখেছেন জানি না।

বললাম—মেয়ের জীবনে এত বড় ব্যাপার—অথচ মেয়ের সঙ্গেই পরামর্শ করে লেখেননি?

মার্লিন একটু গম্ভীর হয়ে গেল। সংক্ষেপে উত্তর দিল, না।

আমার কথাটা বলার ধরণে কি মার্লিনের প্রতি একটু খোঁচা ছিল? তা যদি হয় ত, তার ত কোনও কারণই ছিল না। রোলাণ্ডের প্রতি মনোভাবে কোনও দিক দিয়ে এতটুকু ত্রুটী ধরার হেতু সে ত কোনও দিনই দেয়নি আমাকে? তবুও তাকেই ঐ নিয়ে খোঁচা দেওয়ার প্রবৃত্তি আমার কেন হল?

খানিকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। পরে আমিই বললাম—লীনা! রোলাণ্ডকে আমিই ঠিক বুঝতে পারি না। অভিজাত বংশের ছেলে সে—তার আত্মসম্মান জ্ঞান টনটনে হওয়া উচিত। তুমি একবার তাকে স্পষ্টই প্রত্যাখ্যান করেছ, তারপরেও আবার তোমাদের সঙ্গে এই যোগাযোগ করার চেষ্টা—এর মধ্যে যে একটা দৈন্য আছে, সেটা তাকে মানায় না।

মার্লিন চুপ করে রইল। কোনও কথা বলল না। একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম—কেন, তুমি ত জান লীনা—আমি বিবাহিত শুনে তুমি যখন আমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কেটে দিয়েছিলে, আমি কি কোনও চেষ্টা করেছিলাম তোমার সঙ্গে আবার একটা যোগাযোগ করতে? বুকটা আমার তখন ভেঙ্গে যাচ্ছিল কিন্তু তবুও ত আমি এক পা এগুইনি। এইটেই খাঁটী আভিজাত্যের লক্ষণ—একেই বলে আত্মসম্মান।

মার্লিন চুপ করেই রইল। ক্রমে লাঞ্চ খাওয়ার সময় হল! টেবিল সাজিয়ে মার্লিন মাকে নিয়ে এল নিচে। খাওয়ার টেবিলে অনেক কথাবার্ত্তা হল। বলা বাহুল্য, মার্লিনের মা আমাকে দেখে খুব খুসী হয়েছিলেন।

কথায় কথায় আবার এল রোলাণ্ডের কথা। সেইটেই যে মার্লিনের মা'র মনের সব চেয়ে বড় কথা আজ—তাই তিনি কথাটা যেন আর চেপে রাখতে পারলেন না! আমার দিকে চেয়ে বললেন —জান, আর্থার রোলাণ্ড আবার চিঠি লিখেছেন।

কথাটা ওঠাতে মার্লিন যেন একটু অস্বোয়াস্তি অনুভব করল। তাড়াতাড়ি বলল, ও সব কথা থাক না মা!

মা হেসে বললেন, মেয়ে আমার রোলাণ্ডের কথা বললে লজ্জা পায়। ডককে আর না বলার কি আছে। ডক তোকে যে রকম ভালবাসে, শুনলে খুসীই হবে।

আমি বললাম, হাঁ—এ ত সুখের কথা।

মা বললেন, তোমার ত রোলাণ্ডের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কি চমৎকার ছেলে বল ত। অত বিদ্বান, পয়সার অভাব নেই অথচ এতটুকু অহঙ্কার নেই—কি মিষ্টি কথাবার্ত্তা ধরণ-ধারণ।

বললাম, ঐটেই ত অভিজাত বংশের বৈশিষ্ট্য।

মা বললেন, সত্যিই কত বড় বংশ ওরা—এ অঞ্চলে অত বড় বনেদী বংশ আর নেই।

বললাম, আপনার কথা শুনে আমার বাবাকে মনে পড়ছে—এই ত সেদিন বাবাকে হারিয়েছি।

মা বললেন, আহা! বড় দুঃখের কথা—

বললেন, তাই বোধ হয় বাবার কথা প্রায়ই ভাবি। কত বড় বনেদী বংশের ছেলে তিনি ছিলেন আপনি ত জানেন না—আমাদের দেশে যাকে বলে রাজবংশ, অর্থাৎ আপনাদের দেশের লর্ড-পরিবারের সমান। অথচ কি মধুর নম্র বাবার স্বভাব ছিল—জীবনে কাউকে কোনও দিন একটা কড়া কথা বলেননি!

মার্লিনের মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সত্যিই—এমন বাপকে একবার শেষ দেখা দেখতে পেলে না!

* * * *

যাই হোক, এই ধরণের কথা মাঝে মাঝে বলতে সুরু করেছিলাম এবং এই প্রবৃত্তিটা সে সময় বেশ কিছুদিন ছিল আমার মনে। তখনও তোমার পাঠান পূজনীয় পিতামহ 'সুশান্ত-সা'র' আত্মজীবনী আমার হাতে আসেনি। তখন আমি জানতাম—আমার পিতামহর ভাইকে খুন করার অপরাধে জেল হয়েছিল, এবং সেদিক দিয়ে একটা লজ্জা ছিল আমার মনে। কিন্তু কই, সে লজ্জাটুকুতেও আমার মনের এই প্রবৃত্তি এতটুকুও সংযত হয়নি।

শুধু তাই নয়, মনে আছে একদিন কথায় কথায় মার্লিনদের বলেছিলাম, কোনও বংশের সত্যিকারের আভিজাত্য শুধু পয়সার উপর নির্ভর করে না, বংশটি কলঙ্কহীন কি না, সেটাও দেখা দরকার।

যদিও এখন ঠিক মনে নাই, তবুও কথাটা যে রোলাণ্ডকে উপলক্ষ্য করেই বলেছিলাম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কেননা কথার পিছনে একটু ছোট্ট কাহিনী ছিল। বড় জমিদার বংশ তাই রোলাণ্ডের বংশের বিবরণ এ অঞ্চলের কারোরই বিশেষ অজানা ছিল না। আমি শুনেছিলাম—রোলাণ্ডের পিতামহ অর্থাৎ সার হেনরী রোলাণ্ডের বাপ স্ত্রী এবং পুত্রকে ইংলণ্ডে রেখে একটি বিবাহিতা স্ত্রীলোককে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন অষ্ট্রেলিয়া এবং সেইখানেই তিনি মারা যান।

যাই হোক বুলা! তখন রোলাণ্ডকে উপলক্ষ্য করে কথাটা বলতে আমার যে একটুও বাধেনি এবং এতটুকুও লজ্জা হয়নি—এ কথাটা ভাবলে আজ আমার লজ্জা হয়। আমারই বংশে পিতামহ 'সুশান্ত-সা'র কাহিনী আমি ত এতটুকুও ভুলে যাইনি, যদিও সে কাহিনীটি গোপন করে ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম আমার অন্তরতম অন্তরে—এ দেশের সকলের চক্ষুর আড়ালে। তাই আজ ভাবি—আমারই মুখ দিয়ে কথাগুলি বেরুল কি করে?

* * * *

যাই হোক, দেখতে দেখতে প্রায় ছয় মাস কাটল—ফুরিয়ে এল আমার উইসবীচে চাকরীর মেয়াদ। যদিও বাবার মৃত্যুতে মনে একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম, তবুও মার্লিনকে নিয়ে আমার সেই স্বপন-ঘেরা দিনগুলি ক্রমে মধুর হতে মধুরতরই হয়ে উঠেছিল—যেন এ স্বপন কোনও দিনই ভাঙ্গবে না। কোনও দিন ভাঙ্গতে পারে—একথা ভাবতেও যেন শিউরে উঠতাম।

তবুও অদ্ভুত মানুষের মন!

যদিও বাবার মৃত্যুর পরে মনে মনে ভেবেছিলাম—বাবাকেই দেখতে পেলাম না, দেশে ফিরে আর কেন যাব, তবুও ছয় মাস কাটতে না কাটতে মনের গহনতল থেকে দেশে ফিরে যাওয়ার একটা তাগিদ উঠতে লাগল এবং মাঝে মাঝে তাই নিয়ে মনে একটা অস্বোয়াস্তি অনুভব করতে সুরু করলাম; যদিও সে তাগিদটি আমার ঠিক মনোমত একেবারেই ছিল না। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে ভাবলাম—আগের বারের মত এবারে আর এক বছর নয়, উইসবীচে চাকরী শেষ হলে মাস পাঁচ-ছয় দেশে ঘুরে এলে হয়। সুধা অত করে লিখছে। তারপর আশ্চর্য্য! এবার আমার দেশে ফিরে যাওয়ার কথায় মার্লিনের কাছ থেকে কোনও উৎসাহ ত পেলামই না, বরং বুলা! মনে আছে ত গতবার যখন দেশে ফিরে যাওয়া ঠিক করেছিলাম—তার পিছনে শুধু উৎসাহ নয়, প্রেরণা পেয়েছিলাম এই মার্লিনের কাছ থেকেই। কিন্তু এবার?

মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে মার্লিনকে একদিন বললাম, লীনা! উইসবীচের কাজ ত শেষ হয়ে এল। এইবার ভাবছি, মাস পাঁচ-ছয় দেশে ঘুরে আসি। যাওয়া আসায় প্রায় মাস দুই লাগবে—আর মাস তিনেক থাকব সেখানে—কি বল?

মার্লিন চুপ করে রইল কোনও জবাব দিল না। শুধালাম, কই—তুমি কিছু বললে না?

শুধু বলল, তা আমি আর কি বলব?

বললাম, তোমার মত না হলে ত আমি যাব না—তুমি তা জান।

বলল, তুমি তোমার দেশে ফিরে যাবে, আমি কেন বাধা হব?

বললাম, বাধার কথা হচ্ছে না লীনা! তোমার সম্মতি চাই।

নিজের মনেই একটু হেসে উঠল, হাসিটি করুণ। বলল, আমি তোমার কে, যে আমার সম্মতির কোনও মূল্য আছে?

একটু অবাক হয়ে মার্লিনের মুখের দিকে তাকালাম। সেই মার্লিনের মুখে এ আবার কি কথা! মেয়েদের চরিত্রের সত্যই কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। দেবা ন জানন্তি—

সহসা মার্লিনই আবার কথা কইল, তুমি তোমার দেশে তোমার আপনার লোকেদের কাছে ফিরে যাবে—এ ক্ষেত্রে আমার কি বলার আছে ?

কথার মধ্যে ঈষৎ উত্তেজিত সুরটি আমার লক্ষ্য এড়ায়নি।

* * * *

যাই হোক, ভেবে ভেবে মাস পাঁচ-ছয়ের জন্য একবার দেশে ঘুরে আসা ঠিকই করে ফেললাম। তখন এপ্রিল মাস—এদেশের উপর শীতের প্রকোপটা অনেকটা কমে এসেছে, মাঝে মাঝে সূর্য্যের আলো দেখতে পাওয়া যায়। এই সূর্য্যের আলোর দিকে চেয়ে তোমাদের দেশের ঝক্‌ঝকে সূর্য্যের আলোর কথা মনে করে এই সিদ্ধান্তে তখন একটা জোর পেয়েছিলাম কি না, এখন আর মনে নাই। লণ্ডনে জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আমার ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য চিঠিও লিখে দিলাম।

যাওয়া ঠিক করে ফেলেছি—এ কথাটা অবশ্য তখনও মার্লিনকে বলা হয়নি—তাকে ত বলতেই হবে। মার্লিন ত অবুঝ নয়—কেমন বিশ্বাস ছিল, মার্লিন শেষ পর্য্যন্ত সম্মতিই দেবে।

মার্লিনের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, কথাটা কিন্তু মার্লিনকে বলি বলি করেও বলতে পারছিলাম না। কেন জানি না। মার্লিনের সঙ্গে এ বিষয়ে শেষ কথাবার্ত্তায় ব্যাপারটা নিয়ে মার্লিনের মনোভাবের যে পরিচয় পেয়েছিলাম—তাই কি কথাটা বলতে বাধল ? বুঝতে আমার দেরী হয়নি যে বাবার মৃত্যুর পরে আমার দেশে ফিরে যাওয়ায় মার্লিনের মন আর সহজ নাই। দেশে আমার স্ত্রী আছে—এখন আর সে যেন আমাকে ছাড়তে রাজী নয়, অথচ আমাকে ধরে রাখবার কোন জোরও তার নাই—এই নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব চলেছে তার মনে। কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে মার্লিনের মনকে আমি ঠিক সমর্থন করতে পারছিলাম না। প্রথমবার যখন দেশে ফিরে যাওয়া স্থির করি—এই সামান্য কয়েক মাস আগেকার কথা—তখনও ত দেশে আমার স্ত্রী ছিল। এক বাবার মৃত্যুতেই—? যাই হোক, ও বিষয়ে আর কোন কথা তুলিনি এবং সেদিনকার কথাবার্ত্তার পরে, কথায়-বার্ত্তায় ওদিককার কোনও আভাষ ও শুধু আমি নয় মার্লিনও যেন এড়িয়ে চলত। কিন্তু কথাটা মার্লিনকে ত বলতেই হবে।

এই নিয়ে প্রায়ই ভাবি এবং একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ একটা যেন উপায় খুঁজে পেলাম। আচ্ছা—মার্লিনকে আমি বিবাহ করে যাই না কেন ? যদিও দেশে আমার স্ত্রী আছে—বিবাহে ত এদেশের আইনের দিক দিয়ে কোনও বাধা নাই ? যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে খালি আমার নয়, মার্লিনের মনের দিক দিয়েও ত তাহলে ভালই হবে। বিবাহ করে যদি মাস ছয়ের জন্য দেশে ফিরে যাই তারও একটা জোর থাকবে আমার উপরে এবং তার দাবী যে অগ্রাহ্য করে দেশেই থেকে যাব, এতটা হীন আমি নই, মার্লিন ত তা জানে—এ বিশ্বাস তার উপরে আমার আছে। এবং আমার দিক দিয়ে—আমিও তাহলে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যেন যেতে পারি। কোনও জোর তার উপর নাই অথচ একটা মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে তাকে ফেলে দূরে চলে গেলে, যদি শেষ পর্য্যন্ত তাকে হারাই—না, না, সে কথা ত আমি কল্পনায়ও ভাবতে পারি না। সব দিক দিয়ে বিবাহ করে যাওয়াই ভাল।

পরের দিনই কথাটা মার্লিনের কাছে তুললাম। কথায় কথায় বললাম লীনা ! যে রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে আমাকে একবার কিছুদিনের জন্য দেশে ঘুরে আসতেই হবে।

মাথা নীচু করে চুপ করে রইল—কোনও কথা বলল না। আবার বললাম, অথচ তোমাকে ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া, হোক না সামান্য কয়েক মাসের জন্য—এ ও যে ভাবতে পারি না !

চুপ করেই রইল।

আবার বললাম—এক মহা সমস্যায় পড়েছি।

এইবার বলল—যদি যাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়—যাও।

বললাম—কিন্তু—

বলল—যার উপায় নাই—তা ত সইতেই হবে।

বললাম—লীনা ! শোন। আমি ভেবে আমার এই সমস্যার একটা সমাধান বার করেছি।

আমার মুখের দিকে তাকাল—কিছু বলল না।

বললাম—লীনা ! এটা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি—তোমাকে নইলে জীবনে আমার চলবে না। তোমারও যে তাই—তাও জানি। তাই বলি—এস, আমরা বিবাহ করি। বিবাহ করে, কিছুদিন তোমাকে রেখে না হয় দেশে ঘুরে আসব। বিরহটা তাহলে আমিও হয়ত সইতে পারব এবং তোমার মনের দিক দিয়েও—

কথা থামিয়ে দিয়ে বলল, না—না—তা হয় না।

শুধালাম, কেন লীনা ? আইনের দিক দিয়ে বিবাহে ত কোনও বাধা নাই ?

শুধু বলল, আইনটাই ত সব নয়।

বললাম, লীনা ! কথাটা একটু তলিয়ে ভেবে দেখ।

একটু চুপ করে রইল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তা হয় না বিকো ! আমাকে বিবাহ করলে তোমার দেশে ফিরে যাওয়া হতে পারে না।

সত্যই কথাটার তাৎপর্য্য আমি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। তাই শুধালাম, কেন লীনা ! তোমার কথার মানে কি ?

আবার চুপ করে গেল। এত ভেবে ঠিক করলাম অথচ আমার মনের কথাটা ঠিক বুঝতে চাইল না বলে মনে মনে একটু অভিমান হয়েছিল কি ? বিবাহের প্রস্তাবেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে—এই কি ছিল আমার মনের বিশ্বাস ?

বললাম, লীনা ! তুমি বড় অবুঝ। কথাটা একটু তলিয়ে ভেবেও দেখলে না ?

উঠে দাঁড়াল। বিষণ্ণ চোখ দুটি অসাধারণ গম্ভীর। ধীরে বলল, তুমি আমাকে বিবাহ করে দেশে গিয়ে অন্য স্ত্রীর সঙ্গে ঘর-সংসার করবে—তা সইবার শক্তি আমার নাই বিকো !

* * * *

সব গোলমাল হয়ে গেল। একেই ত দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই, নেহাত কর্ত্তব্যের দিক দিয়ে অন্তরতম অন্তরের একটা কড়া তাগিদে একবার দেশে যাব ঠিক করেছিলাম। কিন্তু—

মার্লিনের সঙ্গে শেষ কথায় মার্লিনের যে মনোভাব টের পেয়েছিলাম—বুঝতে আমার অবশ্য এতটুকুও দেরী হয়নি এবং সেদিক দিয়ে তার প্রতি আমার যে একেবারেই সহানুভূতি ছিল না, এমনও

নয়। কিন্তু মার্লিন ত সব জেনে-শুনেই আমাকে ভালবেসেছিল—সবই সইবার জন্ম সে যেন ছিল প্রস্তুত।

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত ঘটনার স্রোত অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘুরে গেল অন্ত দিকে। আবার বলি—জীবনস্রোতের অতল গভীরে, মহাশক্তির মহালীলার ঘাত-প্রতিঘাতে।

সেদিন ২৩শে এপ্রিল—উইসবীচের কাজের মেয়াদ ফুরুতে আর মাত্র দিন সাতেক বাকী। সকালবেলা দোতলার লাউঞ্জে বসে চা খাচ্ছি—খেয়ে নীচে হাসপাতালে কাজে যাব। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। সেই ঘরেই টেলিফোন ছিল—ধরলাম। আমারই টেলিফোন—ডডিংটন থেকে টম করছে।

টেলিফোনে টম বলল, আপনি এখুনিই চলে আসুন।

শুধালাম, কেন? কি ব্যাপার?

ভারি গলায় বলল, মার্লিনের মা হঠাৎ ভোরবেলা হার্টফেল করে মারা গেছেন।

চমকে উঠলাম—কোনও রকমে হাসপাতালের কাজ থেকে রেহাই নিয়ে চললাম ডডিংটন অভিমুখে।

* * * *

সেই ডডিংটনের চার্চ—পরের দিন সকালবেলা মার্লিনের মাকে কবর দেওয়া হল—একটা এলমগাছের তলায়। মেঘাচ্ছন্ন সকাল—মনে হল শুধু মলিনই নয়, বড় করুণ। সেই ডডিংটন চার্চের বড় বড় গাছের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে একটা শনশনে হাওয়ায় একটা চাপা কান্না যেন ভেসে বেড়াচ্ছিল চার্চটির প্রাঙ্গণে। চার্চের পাদ্রী এবং গ্রামের লোকের মধ্যেও কয়েকজন ছিলেন সেখানে। মার্লিনের মাসী কবর দেওয়ার সময় ছিলেন না। তিনি আগের দিন, খবর পেয়ে একবার মার্লিনদের বাড়ী এসেছিলেন সঙ্গে একটি মেয়ে নিয়ে। সন্ধ্যার আগেই মেয়েকে নিয়ে ফিরে চলে যান। এমন কি, মার্লিনের ঐ অবস্থা, তাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্ম মেয়েটিকে রেখেও যাননি। যতক্ষণ মার্লিনদের বাড়ীতে ছিলেন—বোনের কবর দেওয়ার সুবন্দোবস্ত করার কাজ নিয়েই ছিলেন ব্যস্ত—মার্লিনের দিকে যে খুব বেশী নজর দিয়েছিলেন, এমন কথাও বলতে পারি না। বোধ হয় ও-বাড়ীতে আমার উপস্থিতি তাঁর পক্ষে হয়েছিল অসহ্য!

কবর দেওয়া হচ্ছে—আমি মার্লিনকে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছি। চুপ করে মার্লিন একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—চোখে এক ফোঁটাও জল নাই—মাথাটা কখনও বা কাত করে রাখছে আমার কাঁধের উপরে। আমি মার্লিনকে একটি হাত দিয়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম—তাই মাঝে মাঝে তার সমস্ত শরীরটা যে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, সেটুকু সহজেই বোঝা গেল।

ক্রমে কবর দেওয়ার পর্ব্ব শেষ হল। একে একে সবাই নিজেদের সহানুভূতি ভরা দুঃখ জানিয়ে মার্লিনের কাছ থেকে নিলেন বিদায়।

আমি মার্লিনকে বললাম, চল, এইবার বাড়ী যাই।

মার্লিন বলল, একটু বসব।

মার্লিনকে ধরে নিয়ে গিয়ে দুজনে বসলাম একটু দূরে চার্চের কোণে একটি প্লেন গাছের তলায়, সেখানে একটি বেঞ্চ পাতা ছিল। বসে, মার্লিনকে জড়িয়ে ধরে মার্লিনের মাথাটা কাত করে রাখলাম আমার বুকের উপরে—যে ভাবে মার্লিন বসতে ভালবাসে।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ—কি আর বলব।

হঠাৎ মার্লিন বলল, এখন আমি কোথায় দাঁড়াব? প্রাণভরা সহানুভূতি নিয়ে বললাম, কেন? আমি ত আছি লীনা!

একটু চুপ করে থেকে বললাম, লীনা! এস, এইবার আমরা দুজনে বিবাহ করি।

তারপর? এই কথাটি বলে এতক্ষণ পরে একটা অঝোর কান্নায় যেন ভেঙ্গে পড়ল আমার বুকের উপরে।

আমার বুকের উপরে সেই কান্নায়-ভাঙ্গা দেহখানি জড়িয়ে ধরে শুধু প্রেম নয়, একটা অভূতপূর্ব্ব দরদে প্রাণটা উঠল ভরে। বেচারী—জগতে ত আর কেউ নাই, আমারই জন্ম যেন সবই হারিয়েছে।

আবেগভরে একটু জোরের সঙ্গে বললাম, লীনা! লীনা! এই চার্চে বসে শপথ করছি তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমি কোনও দিন দেশে ফিরে যাব না।

কান্নায় ভাঙ্গা তনুখানি অবশ অসাড় ভাবে এলিয়ে পড়ল আমারই প্রাণের কিনারায়—যেন একটা নিশ্চিন্ত বিশ্রামে।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটল। একটু সুস্থ হলে কানের কাছে মুখ নিয়ে শুধালাম, লীনা! আর আমাকে বিবাহ করতে দ্বিধা নাই ত?

ঈষৎ মাথা দুলিয়ে জানিয়ে দিল—না।

* * * *

কিছু দূরে চেয়ে দেখি, টম হাঁটু ভেঙ্গে মাথা নীচু করে বসে আছে মার্লিনের মা'র কবরের পাশে।

**প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত**

# ফ্লীট ষ্ট্রীট

[ *Shane Leslie* লিখিত "Fleet Street"-এর ভাবানুবাদ ]

যখনই দেখি চেয়ে,
ছুটে চলে সংবাদপত্র নিয়ে;
বিক্রেতার দল। বলি "টাটকা খবর"
কর্ম্মমুখর পথ দিয়ে।
ক্ষিপ্র দৃঢ় পদক্ষেপে।

দেখে মনে হয় আসবে এমন দিন,
যেদিন ধরণী হয়ে যাবে লীন;
তারা ছুটে যা'ব এমনি ঘোষণা করে—
পৃথিবীর শেষ দিন।
ঈশ্বরপ্রেরিত দূতরূপে।

অনুবাদক—শ্রীভাস্কর দাশগুপ্ত।
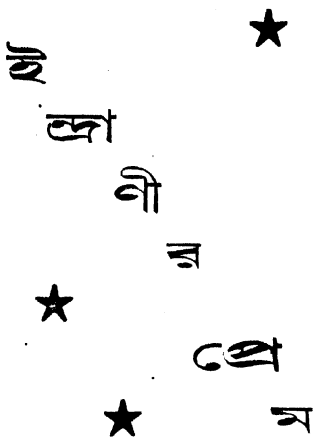
(উপন্যাস)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলিমা দাশগুপ্ত

এ-ট্ বেম্লোতে অর্থাৎ মিঃ বিশ্বাসের বাড়িতে আজ বিরাট পার্টি। উপলক্ষ্য ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি। অতিরিক্ত আলোতে আর ফুলেতে সুন্দর বাড়িখানা আজ আরো সুন্দর হয়েছে। সামনেই সমান ছাঁটাই-করা বিরাট লনখানা যেন মনোরম একখানি গালিচা। ঘরে না বসে সকলেই বেতের বাগান-চেয়ার অধিকার ক'রে লনে বসে আছেন। মেয়ে-পুরুষ সবারই বেশভূষা বর্ণাঢ্য। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, নানা রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে আছে যেন লনের মাঝখানে।

একমুখ প্রসন্নতা নিয়ে গৃহস্বামী ঘুরে ঘুরে তদ্বির-তদারক করে বেড়াচ্ছেন সকলের। অনেকে এসেছেন—অনেকে। পরিচিত কাউকেই বাদ দেননি কেশবশঙ্কর। যাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-ঘনিষ্ঠতা তাঁরাও এসেছেন, যাঁদের সঙ্গে সামান্য ফিকে আলাপ তাঁরাও এসেছেন। অসংখ্য ওজর-আপত্তি এবং অজস্র কৈফিয়তের ভয় দেখিয়েও তরুবালা স্বামীকে নিরস্ত করতে পারেননি। কেশবশঙ্করের সৌম্য-স্নিগ্ধ মুখের আভা প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ করে সকলকে। ফিকে-আলাপ ঘন হ'তে দেরী হয় না। নির্দিষ্ট সময়ে গৃহস্বামিনী মিসেস তরুবালা সকলের সামনে এসে কিছুটা করজোড়ের ভঙ্গিতে সুমিষ্ট স্বরে আহ্বান জানালেন সবাইকে। বুফে। ডাইনিং হলের একপাশে পুরুষরা এবং একপাশে মহিলারা ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন। ছোটো-বড় ছেলে-মেয়েরা এককোণায় জড়ো হয়েছে। সর্বাণীর মত আরো দুজন নবাগতা এসেছেন, তাঁদের মিষ্টার দুজন অফিসের কাজে দিল্লী গেছেন, তাই অনুপস্থিত। হঠাৎ যেন মস্ত একটা কাজ ভুলে গিয়েছিলেন, সেইরকম মুখের ভাব করে তরুবালা বিশ্বাস বলে উঠলেন, আই এ্যাম সো সরি—লেট মী ইনট্রোডিউস ইউ ফার্ষ্ট টু মিসেস চাউড্রি এ্যাণ্ড মিসেস রে। স্মিতমুখে সকলেই চোখ তুলে তাকালেন।

—ইনি মিসেস চাউড্রি, সি-ডবলিউ-পি-সির ডিরেক্টার মিঃ —র জায়গায় এসেছেন মিঃ চাউড্রি, আর ইনি মিসেস রে, এঁট ব্যাঙ্কের নোতুন এজেন্ট যিনি এসেছেন মিঃ রে—তাঁর স্ত্রী। তারপর নবাগতা দুজনকে একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন একমাত্র সর্বাণী ছাড়া। সর্বাণীর ঠিক পেছনে দাঁড়ানো ইনা। দুজনের বেশ-বাসে রং-চং বড় কম, আর মা-মেয়ে দুজনেরই মুখ যেন বৃষ্টিধোয়া স্নিগ্ধ তাজা যুঁই ফুলের মত। সকলেরই চোখ পড়লো ওদের ওপর। পরস্পর নমস্কার বিনিময়ের পর মিসেস রে অর্থাৎ অনীতা রায় সর্বাণীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, ইনি কোথায় থাকেন? এঁকে তো চিনলাম না?

ইনি—?—হ্যালো টুকটুক! এত বড় হয়েছো তুমি সো লাভলি! মিসেস পাকড়াশি, আপনার ছোটো মেয়ে ভারি সুন্দর হয়েছে তো? কথা শেষ ক'রে সুন্দর হেসে টুকটুকের আপেল-রঙা গাল দুখানি আলতো টিপলেন তরুবালা, —এ কী মিসেস চাউড্রি, আপনি একেবারে কিছুই খাচ্ছেন না—আর একটু পুডিং নিন, মিসেস তালুকদার, আপনাকে একটা শ্যামি কাবাব, মিসেস গুপ্তা, আপনাকে—অতিথিদের খাওয়ার তদারকীতে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তরুবালা। একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরুষদের লাইনের একপাশে দাঁড়িয়েছিলো অরুণেশ, ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করছিলো। দেখলো, একেবারে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী, পাশে দাঁড়ানো নীলা বক্ বক্ করে চলেছে সমানে, সেদিকে ইন্দ্রাণীর মনও নেই কানও নেই। কিশোরী ইন্দ্রাণীকে অদ্ভুত উদ্দীপ্ত দেখাচ্ছে, চোখের ছেলেমানুষের চাউনি বদলে একেবারে যেন বয়স্কার মত হ'য়ে যাচ্ছে। কিন্তু সর্বাণী একেবারে নির্বিকার, মুখের সামান্যতম একটি পেশীও বিচলিত হয়নি। মিসেস গুপ্তা অর্থাৎ মালতী নবাগতা দুজনকে ওঁর চৌদ্দ বছরের সিমলা-লব্ধ অভিজ্ঞতা অনর্গল দিয়ে যাচ্ছেন। অল্পদূরেই দাঁড়ানো ওঁর পুরানো বান্ধবী সর্বাণী, দুবার সর্বাণী চোখ দিয়ে মালতীকে ডেকেছিলেন কিন্তু মালতী গুপ্তার এখন অবসর কোথায়? বান্ধবীর চোখের ডাকে মামুলী হাসি দিয়ে উত্তর সেরেছেন মালতী। আস্তে আস্তে গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠলো ডাইনিং হল। তরুবালাকে সামনে পেয়ে অনীতা রায় আবার বললেন, কৈ, এঁর সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন না? ইনি—

সুস্পষ্ট অবহেলা আর তাচ্ছিল্য ফুটে উঠলো তরুবালার কণ্ঠে, ইনি, এঁদের অফিসের রমেন বাবু, তাঁর স্ত্রী-ক্যাথালিক ক্লাবে থাকেন—আবার অন্যদিকে চলে গেলেন তরুবালা। অনীতা রায় সর্বাণীর সামনে এগিয়ে এলেন, আপনাকে খুব চেনা-চেনা লাগছে, কোথায় দেখেছি বলুন তো?

বিব্রত সর্বাণী আবছা হাসলেন, আমার মতন আর কাউকে দেখে থাকবেন হয়তো—

না, খুব চেনা-চেনা লাগছে, আপনি কি পড়াশুনো কলকাতায় করেছেন?

আরো বিব্রত হ'লেন সর্বাণী, আরো অস্বস্তি বোধ করছেন, হ্যাঁ কলকাতাতেই, হয়তো আমার আদল আছে এমন আর কাউকে দেখে থাকবেন আপনি।

ভারি আশ্চর্য মিল কিন্তু—অনীতা রায় হাসলেন, ভারি একলা পড়ে গেছি, কালকে আসুন না আমাদের বাড়িতে—আমাদের ব্যাঙ্কের বাড়ির পাশ দিয়েই তো আপনাদের ক্যাথলিক ক্লাবের যাওয়ার রাস্তা, আপনার মেয়েকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন কিন্তু—আমি

তার পর পরশু আপনাদের বাড়ি বেড়াতে যাব—আবার হাসি দিয়ে কথা শেষ করলেন অনীতা।

এমন আন্তরিক আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না সর্ব্বাণী, বললেন, আসবো।

অরুণেশ ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে লনের দিকে চলে গেলো। কেমন যেন আনমনা হ'য়ে পড়েছে ও। লাইলাক্ গাছের ঝোপ পর্যন্ত এসে দেখে ফেললো শেলিকে—একটি যুবককে নিয়ে গল্পে মগ্ন ও। অরুণেশ চেনে একে, জুনিয়র তালুকদার—গিরীন তালুকদার। গিরীন শেলির কাঁধে হাত দিয়ে ঘন হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সম্ভবতঃ খুব মজার কাহিনী শোনাচ্ছে—সামান্য বিরতির পরই উচ্চরোলে হাসি শোনা যাচ্ছে। অরুণেশ সরে এলো ওখান থেকে। বাগানের উত্তর-পশ্চিম প্রাচীর হানি-সাকলের লতা দিয়ে ছাওয়া। ভারি স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধ হানি-সাকলের। সেখানে এসে দাঁড়ালো অরুণেশ, ভাল লাগছে না ওর। কলকাতায় ফেরার আরো দশ দিন বাকী আছে, আগামী কালই ফেরার দিনটি হ'লে যেন বড় ভাল হতো।

খাওয়া শেষ ক'রে আবার লনে এসে বসেছেন সবাই। সিজনটাইমে ড্রইংরুমের চেয়ে লনই এঁদের বেশি ভাল লাগে। বাড়ি যেতেই ইচ্ছে সকলের কিন্তু খাওয়ার পরই বাড়ি ফেরার কথা ব্যক্ত করা নাকি একান্তই অভদ্রতা। তাই মেকী সৌজন্য বজায় রাখার জন্য মেকী হাসিতে মুখ ভরিয়ে সবাই লনে এসে বসেছেন। জমানো কথাবার্তা এখন হচ্ছে খুব কমই, পাইপের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে আর হাল্কা দু-একটা টুকরো কথা, ইণ্ডিয়ার ফরিন পলিসি, বাস্তার বর্তমান এ্যাটিচিউড, এ্যামেরিকার গূঢ় চাল···ইত্যাদি। তবে মেয়েদের আলোচনা আরো অনেক ঘরোয়া—মিসেস পাকড়াশি যে নাইলন শাড়িখানা প'রে এসেছেন তার বর্ডার হাতে তৈরী এবং তার শিল্প-নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ সকলেই। সেটা, উনি গেলো শীতে যখন দিল্লী গিয়েছিলেন, সেখানে একটা বিশেষ দোকানে অর্ডার দিয়ে করিয়ে এনেছেন। সেই বিশেষ দোকানের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা হলো,—এত ভিড় সে দোকানে, কনট্রোলের সময় র‍্যাশনের দোকানের যা কিউ হতো, তার চেয়েও অনেক বেশি। তবে শেষমেষ উনি শ্রোতাদের আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, ওঁর সেই দোকানের ওপর ইনফ্লুয়েন্স খুব বেশি আছে, তোমরা যদি চাও তাহলে উনি ইত্যাদি—

—তারপর, মিসেস বিশ্বাসের হাতের তৈরী আজকের কেক একেবারে অতুলনীয়! তার রেসিপীটা প্রায় সকলেই জেনে নিলেন। যদিও এই রেসিপী সকলেই ভুলে যাবেন এ বাড়ির গেট পার হওয়ার আগেই। প্রতি পার্টির পরেই গৃহস্বামিনীর হাতের তৈরী একটি কি দুটি জিনিষের খুব বেশিরকম প্রশংসা ক'রে তার রেসিপী প্রায় সকলেই জেনে নেন। নবাগতা কেউ, যাঁরা এই পার্টি-পলিটিক্সে রপ্ত নন তাঁরা এঁদের আগ্রহের আতিশয্য দেখে ভাববেন, বাড়িতে গিয়ে আজ রাত্রেই ঐ জিনিষটি ওঁরা বানিয়ে ফেলবেন হয়তো বা। কিন্তু পুরাতনীরা জানেন, পার্টি অন্তে দু-একটা খাদ্যদ্রব্যের খুব বেশিরকম প্রশংসা ক'রে তার রেসিপী জেনে নেওয়া এবং তা শুনে হোষ্টেস-এর অত্যধিক খুশি হওয়ার প্রকাশ করার ভঙ্গিমা এ দুটোই মেকানিকাল। এ ব্যাপারে হাই সোসাইটির মহিলাদের খুব সম্ভব একটা মিউচ্যুয়াল আপোসও আছে। যিনি লীড নেন, অর্থাৎ যা হোক একটা কিছু ভাল বলতে হবে, ভেবে-চিন্তে যথাযথ বলার প্রয়োজন নেই কোনো—তাঁর মুখ দিয়ে প্রথম যেটা বার হয়, সকলেই সমস্বরে না হ'লেও পরের পর সায় দেন সেটায়। মিসেস 'এ' কেকের প্রশংসা ক'রে বসলেন, সকলেই মিসেস 'বি-সি-ডি' পরের পর মিহি সুরে বলে গেলেন: এমন কেক ওঁরা অনেক দিন কেন, আর খানইনি! কিন্তু যে বয়টা টেবিল সাফ করেছে তাকে শুধোলে জানা যেতো, সকলের ডিসেই সেদিন কেকের প্রায় পুরো টুকরোই পড়ে আছে। কারণ আর কিছু নয়, কেকটা সেদিন আদৌ ভাল বেকড হয়নি।

নীলা তার বন্ধুকে নিয়ে একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজছিলো, বিরাট বাগানে যতগুলি লতানে গাছের ঝোপ আছে সবই অধিকৃত! কোনো কোনো ঝোপে একজোড়া অর্থাৎ একটি মেয়ে একটি ছেলে, আর কোনো ঝোপে একাধিক, এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে নীলা বাগানের উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে এলো। যেখানে হানিসাকলের বেড়া আর তারই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে এক ধারে দাঁড়ালো অরুণেশ। ইনার চলা দেখলে মনে হয় আর যা ইচ্ছেই ওর থাক্, বাগানে বেড়ানোর ওর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। কিছুটা যেন যন্ত্রচালিতের মত নীলার পেছন পেছন ঘুরছে। নিভৃতে এসে নীলা প্রশ্ন করলো, তোমার আজ কী হয়েছে ভাই ইনা?

সামান্য বিরতি, তারপর ইনার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, কৈ কিছু না তো?

আজ আমার সঙ্গে গল্পই করলে না? কৌতুক কণ্ঠ নীলার।

ইনা চেষ্টা ক'রে সচেতন হলো, আজ শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না ভাই, বোধ হয় মাথা ধরেছে—

এতক্ষণ বলতে হয়! দাঁড়াও এ্যাসপ্রো নিয়ে আসছি—চঞ্চলা নীলা চুন্নী দুলিয়ে ছুট দিলো।

ইনা অন্যমনস্ক হ'য়ে পার্টির নিমন্ত্রিতা মহিলাদের কথা ভাবছিলো। প্রায় বেশির ভাগ মিসেসেরই সুনিপুণ পরিচ্ছদে সিনেমার সর্বাধুনিক আভিজাত্য, তবু বেশবাশ এবং পেন্টকরা চামড়ার তলায়ও আসল বয়সটা উঁকি দিচ্ছিলো নগ্নভাবে, স্মরণ করিয়ে দেবার ইচ্ছে হয়—তিরিশ বছর আগেই দুর্ভাগ্যক্রমে পনেরো বছর পার হ'য়ে গেছে।

অরুণেশের কর্তব্যবোধ ঠেলে এগিয়ে দিলো ইনার কাছে। ছোটো বোনের বান্ধবীকে 'তুমি' সম্বোধনই করতে গেলো, কিন্তু ইনার আধখানা গালে দোতলার খোলা জানলার আলো এসে পড়েছে, সেই কপোলে চিবুকে এমন কিছু দেখলো অরুণেশ, যাতে 'তুমি' উচ্চারণ হলো না মুখ দিয়ে। আস্তে বললো, আপনি কিন্তু কিছু খাননি, আমি দেখেছি।

আনমনা ইনা মৃদু আলো-ছায়াতে অরুণেশের আগমন প্রথমটা টের পায়নি, একটু চমকে উঠে তার পর স্থির চোখে তাকালো অরুণেশের দিকে। মুহূর্ত দুই অপলক চোখে তাকালো ইনা, ওর ঠোঁটের কোণটা বিদ্রূপে বঙ্কিম হলো, নিঃশ্বাস দ্রুত হলো একটু, তার পর কেটে কেটে বললো, আর কিছু দেখেননি?

অরুণের চোখের আলো নিবলো, একসঙ্গে অনেকগুলো কথা ঠোঁটের সামনে এসে ভিড় ক'রে যেন গিঁট পাকিয়ে গেলো [illegible]

তার পর ওর ঠোঁট থেমে থেমে শুধু তিনটে শব্দ উচ্চারণ করলো, দেখেছি।

ব্রেকফাষ্ট সেরে দিল্লী ষ্টেশনে পায়চারী করছিলো অরুণেশ, সতীর্থ সুপ্রিয়র সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। বাঁ হাতে ছোটো একটা হোল্ড-অল আর ডান হাতে এ্যাটাচি নিয়ে হন-হন করে আসছিলো সুপ্রিয়। অরুণেশের চেহারা চোখের নাগালে পড়তেই আরো দ্রুত এগিয়ে এলো, আরে, রাজপুত্তুর তুই? তুইও চললি নাকি কলকাতায়?

হুঁ।

ছুটির এখনও পাঁচ দিন বাকী, সিমলার মত জায়গা ছেড়ে কলকাতায় চল্‌লি, কী ব্যাপার? সিমলার চেয়েও কলকাতা ভাল, তাই প্রমাণ করতে না কি রে?

তাই বটে—অরুণেশ হেসে ফেললো, আর তোর উত্তর কী? তুই যে দিল্লী ছেড়ে চললি?

আমার? ঠোঁট ছুঁচোলো করলো সুপ্রিয়, আমার 'অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত্রির' গোছের অবস্থা, আমার কাছে কলকাতা দিল্লী সব সমান। সুপ্রিয় শৈশবে মা-বাবাকে হারিয়েছে, মামার কাছে মানুষ। ওর মামা রাধিকারমণ দিল্লীতে এ-জি-সি-আর-এ কাজ করেন। মোটামুটি অবস্থা। ভাগ্নেকে হিন্দু হোষ্টেলে রেখে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াবার মত সঙ্গতি ওঁর নয়। দশ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্স ছিলো সুপ্রিয়র বাবার। সেটা ফিক্সড ডিপোজিটে রাখা আছে। তারই সুদে পড়ার খরচ চলে সুপ্রিয়র, প্রাইভেট টুশানিও করে একটা। উত্তর শুনে অরুণেশ চুপ করে গেলো।

দাঁড়া, আগে একটা বাঙ্ক নিয়ে নি—সুপ্রিয় একটা ইণ্টার ক্লাশ কামরায় চটপট উঠে গেলো। অরুণেশ এগিয়ে গেলো সেই কামরার সামনে। চাদর আর কম্বল বিছিয়ে একটা গোটা বাঙ্ক অধিকার করে, এ্যাটাচিটা নিচের সিটের এক পাশে রেখে নেমে এলো সুপ্রিয়, তারপর রাজপুত্তুর, তোমার কামরা কত দূরে?

অরুণেশ বেশ অপ্রতিভ হলো যেন। হস্ত প্রসারিত করে অদূরে একটা কুপ নির্দেশ করলো।

আরে দূর! ব্যাচেলারের কুপে যেয়ে আনন্দ নেই। চল তোর সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীকে দেখে আসি!

সুপ্রিয়র হাত ধরে টানলো অরুণেশ, দেখে আনন্দ পাবিনে, লোয়ার বার্থে ইয়া পেটমোটা এক দিল্লীবালা বসে আছে; তার চেয়ে তুই গল্প কর, শুনি।

অরুণেশের অপ্রতিভ মুখের দিকে এক পলক তাকালো সুপ্রিয়, তার চেয়ে চলে আয় আমার কামরায়। ঐ পেটমোটার সহযাত্রী হওয়ার চেয়ে আমার সঙ্গ অনেক সহনীয় হবে তোর কাছে—ভয় নেই, শোবার ব্যবস্থা করে দেব আমি—অরুণেশ সানন্দে সায় দিলো এ প্রস্তাবে।

গার্ড কনডাক্টরকে বলে একটা কুলি নিয়ে দুই বন্ধু চললো কুপের দিকে। বিছানা বেঁধে সুটকেস আর বিছানা তুলে দিলো কুলির মাথায়। বেতের ঝুড়ি, টিফিন ক্যারিয়ার, ফ্লাস্ক, টর্চ—দুই বন্ধু ভাগাভাগি করে নিয়ে দ্রুত নেমে পড়লো। সহযাত্রী দিল্লীবালা অরুণেশের প্রস্তাব শুনে তার গোল চোখ গোল করলেন আরো! এমন তাজ্জবের বাত জীবনে শোনেননি। বন্ধু যখন কলেজে বন্ধু, তখন মোলাকাত হবে, হরদম মোলাকাত হবে। ... রাস্তাটুকু সঙ্গে যাওয়ার জন্য এতনা রোপায়ার টিকিট নষ্ট কেউ ক... আজীব আদমী তো এই অরুণেশ!

সুপ্রিয় বাঙ্কের কম্বলটা সরিয়ে সেখানে অরুণেশের হোল্ডঅল পাতলো, বেঞ্চের তলায় ঢুকিয়ে দিলো সুটকেশ ও বেতে... ঝুড়ি, তারপর কুলি বিদেয় করে কম্বল বিছিয়ে দুই বন্ধু বসলো। একজন বিহারী ভৃত্য তিন কুলির মাথায় প্রচুর মাল নিয়ে ঠেলাঠে... করে ঢুকলো কামরায়। মাল নামিয়ে হৈ-চৈ করে রাখার ব্যবস্থা লেগে গেলো ভৃত্য। দুই বন্ধুরই নজরে পড়লো মালের অর্দ্ধেক খাদ্যসামগ্রীতে ভরা এবং সে সব খাদ্য থেকে খুব ভাল খোসবু ব... হচ্ছে।

বেশ হয় এ-সব খাবারের শেয়ার পেলে না রে? বন্ধুর দি... তাকিয়ে সুপ্রিয় বললো।

এই না, সুপ্রিয়, খবর্দার ওসব দুষ্টুমি করতে পারবে না, আ... দুজনের লাঞ্চের অর্ডার দিয়েছি ডাইনিং-কারে। ঈষৎ উৎকণ্ঠি... অরুণেশের গলা।

তুই কী রে অরুণেশ? এই বয়েসে বুড়িয়ে গেলি নাকি? আ... কী চুরি করে খাব? ওরা সেধে অফার করতেও তো পারে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো সুপ্রিয়।

সিমলায় এবার কেমন এনজয় করলি? উত্তরে অরুণেশ না... ঘাড় নাড়লো।

হোপলেস! এই বয়স, টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই তবু আনন্দের পাত্র পূর্ণ করে নিতে পারিস না?

অরুণেশ এবার পাল্টা প্রশ্ন করলো, তুই ছুটিতে কেমন এন... করলি—তাই বল শুনি।

নেহাৎ মন্দ নয়, তবে শেষের দিকটা মামার হাতের গলাধাক্কা না খেতে হলেই ভাল ছিলো।

কী বাজে বকছিস—অরুণেশ হেসে ফেললো।

সত্যি প্রায় ছোট গল্পের নায়ক হতে চলেছিলুম রে, তবে শে... বিয়োগান্ত নাটক হয়ে গেলো। অরুণেশ সপ্রশ্ন চোখে তাকালে... সুপ্রিয় বেঞ্চে পা তুলে ঠেস দিয়ে বেশ আরাম করে বসলো, তা... শুরু করলো, আমাদের বাড়ির একেবারে লাগোয়া হলো বৃদ্ধ সাধু... সাহার বাড়ি। চাঁদনি চকে অনেকগুলি দোকান আছে ওঁর, যু... সময় টাকা কামিয়ে এখন একেবারে লালে লাল। দিল্লীর অ... নামী লোক লুকিয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে হাজার হাজার টা... ধার নিয়ে যান সাধুচরণের কাছ থেকে। আমার মামা তো খু... বলতে অজ্ঞান! মামাকে নাকি পুত্রবৎ ভালবাসেন, মুনাফা নিয়ে মামার কাছে কেনাদামে জিনিষপত্র বেচেন। তা থাকগে সাধুচরণের মা-বাপমরা পৌত্রী শ্রীমতী পুঁটুরাণী হলো নায়িক... আমার মামাতো বোন মাধুরীকে টেবিলক্লথের ওপর কয়েক ডিজাইন এঁকে দিয়েছিলাম। সেই ডিজাইনই হলো কা... ক'দিন কানের কাছে মাধুরী ঘ্যানর ঘ্যানর করলো, ওর বা... পুঁটুরাণীর দুটো টেবিলক্লথের ওপর ডিজাইন এঁকে দিতে হবে আমি নাকি খুব ভাল আঁকতে পারি। শেষকালে বিরক্ত হ... বললুম, আচ্ছা এনে দিস টেবিলক্লথ, দেব খ'ন এঁকে। দু...

খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় গড়াচ্ছি, টেবিলক্লথ হাতে নিয়ে স্বয়ং পুঁটুরাণী এসে হাজির। উঠতে হলো, বললুম,—মাধু কোথায়?

শ্রীমতী পুঁটু আমার দিকে একবার তাকালো, চোখ নামালো, মুখ রাঙা করলো, তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, মাধুরী খাচ্ছে, এখুনি আসবে। আমার ভয়ানক হাসি পেলো, অত লজ্জা যদি, একা ঘরে ঢোকার কি দরকার ছিলো! মাধুর খাওয়ার পর এলেই হতো, শ্রীমতী পুঁটুর হাত থেকে টেবিলক্লথ নিয়ে দুটোর দুকোণায় এক এক টানে দুটো ডিজাইন এঁকে দিলাম। তারপর মুখ তুলে দেখি, পুঁটুরাণী সেই একই ভাবে গায়ে কাপড় জড়িয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, বসতে বলা উচিত ছিলো আমার। সে অভদ্রতাটুকু পোষাবার জন্য ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম—কেমন পুঁটুরাণী, টেবিল-ঢাকনার ডিজাইন পছন্দ হয়েছে তো? ব্যস, ওতেই প্রেমে পড়ে গেলো শ্রীমতী। মুখ লাল ক'রে কোন মতে বললো, খুব পছন্দ হয়েছে, তারপর চট করে একবার আমার দিকে চোরা-চোখে তাকিয়ে টেবিলঢাকনা দুটো হাতে নিয়ে গায়ের কাপড় সামলাতে সামলাতে বেরিয়ে গেলো।

বড্ড বখে যাচ্ছিস সুপ্রিয়! অরুণেশ বাধা দিলো।

আরে রাখ, যা-ই বোস নীতিবাগীশ হোস নে—নীতিবাগীশদের জীবনে অশেষ দুর্গতি।

অরুণেশ হাসলো, আচ্ছা, উপদেশ ধীরে-সুস্থে নেব'খন তোর কাছ থেকে, তোর কাহিনীটুকু তো শেষ কর আগে?

তারপর, সদা-সতর্ক সাধুচরণ সাহার হাতে নাতনীর সুদীর্ঘ প্রেমপত্রখানি পড়ে গেলো। ওহো! সে প্রেমপত্র পড়ে বুড়োর কি বিপত্তি—চোখ দুটো বোধ হয় গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়েছে।

মেলা ফাজলামো করিস না সুপ্রিয়!

সত্যি—তোর বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি, সে চিঠি দেখার সৌভাগ্য অবশ্য আমারও হয়নি কিন্তু মাধুর কাছে একটু আধটু শুনেছি, পুরো একপাতা ধরে শুধু প্রণয়-সম্ভাষণ, কানে যেতেই আয়েসা রক্ত টগবগ ক'রে উঠলো আমার, কুমারীহরণ তো কোন ছার, পরকীয়া হরণও স্বচ্ছন্দে ক'রে ফেলতে পারতেম।

অরুণেশ সজোরে হেসে উঠলো, তারপর?

তারপর, যা হোয়ে থাকে, সাধুচরণের দুই ধমকে পুঁটুরাণী কবুল করলো, ওর কোন দোষ নেই, আমিই ওকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবো বলে ক্রমাগত ফুসলাচ্ছি—তাই ওকে রাজি হ'তে হয়েছে এবং ওর মৃতা মায়ের গয়নার বাক্স লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার বুদ্ধিও দিয়েছি আমি! নাতনীর জবানী সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করলেন সাধুচরণ, অবিলম্বে তলব পড়লো মামাকে তারপর আমাকে, সমস্ত শুনে ধিক্কারে ও লজ্জায় মুখ লুকোবার জন্য আঁচল না পেয়ে হাটি-হাটি পা-পা করে সাধুচরণের বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলাম, বিচারে নির্বাসন দণ্ড হলো আমার—অবিলম্বে দিল্লী ছাড়তে হবে এবং এ হুকুম বলবৎ থাকবে শ্রীমতী পুঁটুরাণীর শুভবিবাহ পর্যন্ত। তথাস্তু! দোষী নিজে জানিলো না কিবা অভিযোগ, বিচার হইয়া গেলো তার। বাঃ রে! এ তো বড় অদ্ভুত বিচার! কথা শেষ ক'রে হো-হো করে কামরা ফাটিয়ে হেসে উঠলো সুপ্রিয়।

অরুণেশ হাসিমুখে বললো, মানতেই হবে তোর কথা বলায় মুন্সিয়ানা আছে।

শুধু কথার টেকনিকে মন গলে না হে ব্রাদার, তোমার মত রাজপুত্তুর হতেম যদি, তাহলে সুন্দরী তন্বীরা আমার প্রেমে পড়ার জন্য কমপিটিসন লাগিয়ে দিতো দেখতিস, তুই একেবারে কিস্সু না—

এই চুপ কর সুপ্রিয়, বড্ড মুখ খারাপ তোর—

আরে তোদের ভাল ছেলেদের মত আমার মুখে লাজ, পেটে খিদে নেই, যৌবনের দাবীকে অস্বীকার করলে, প্রকৃতি অন্য উপায়ে তার প্রতিশোধ নেয়।

দোহাই সুপ্রিয়, চুপ কর, এ-সব বই-এর বুলি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলিসনে, গাড়িতে মেলাই লোক উঠেছে।

সুপ্রিয় চোখ চালিয়ে আরোহী-আরোহিণীদের ভাল ক'রে একবার দেখে নিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো, বাঁচা গেলো, আমরা ছাড়া আর কেউ বাঙালী নেই দেখছি—

সেই সুগন্ধযুক্ত খাবারের মালিকরা এতক্ষণে এসে পৌঁছেছেন। একজন বুড়ো মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সপরিবারে চলেছেন। বুড়োকে সমাদরে সুপ্রিয় তার পাশে বসালো। বিপরীত বেঞ্চিতে গলা পর্যন্ত ওড়না দিয়ে ঢাকা একটি বুড়ি ও দুটি বউ বসলো। হাতঘড়িতে গাড়ি ছাড়ার সময় দেখে নিয়েই হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো সুপ্রিয়। অরুণেশ, বস একটু, আমি আসছি এখুনি—দ্রুত পা চালিয়ে গাড়ী থেকে নেমে গেলো সুপ্রিয় আর উঠলো একেবারে গাড়ি যখন সবে চলতে শুরু করেছে।

একটু ব্যস্তই হয়েছিলো অরুণেশ, দরজা খুলে দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিলো বন্ধুর জন্য। ছুটে এসে গাড়িতে উঠলো সুপ্রিয়। আচ্ছা ভাবনায় ফেলেছিলি যা হোক, গিয়েছিলি কোথায়?—অরুণেশ প্রশ্ন করলো।

চল বসি, বলবো এখন সময় মত।

গাড়ির স্পীড ক্রমশঃ দ্রুততর হলো। যাত্রীরা সকলেই ওর মধ্যে যতটুকু আরাম ক'রে বসা যায় তার ব্যবস্থায় মন দিলো। সুপ্রিয় যেন একটু উসখুস করছে। ওর পাশে বসা বৃদ্ধ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক একবার মাত্র মামুলি প্রশ্ন করেছিলেন, কাঁহা যাইয়েগা? তারপরই পেছনে হেলান দিয়ে সকাল ন'টায় ঝিমুবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন কেন কে জানে?

কি রে অরুণেশ, মনে মনে খুব চটছিস তো? সুপ্রিয় বললো।

কেন, চটবো কেন?

কুপ থেকে টেনে নিয়ে এলাম ইনটার ক্লাশে।

অরুণেশ হাসলো, তুই আনলি কি রকম, আমি তো নিজেই এলাম!

অরুণ, তুই বরং বাঙ্কে শুয়ে পড় একটা বই নিয়ে।

ঠিক আছে, তোর ডান পায়ে চোট লেগেছে নাকি সুপ্রিয়? অত সাবধানে পা ভাঁজ করছিস।

হাঁ রে, সাইকেল এ্যাকসিডেণ্ট বলতে পারিস।

সাইকেল এ্যাক্‌সিডেণ্ট! অরুণেশের বিস্ময় কণ্ঠস্বরে প্রকাশ হলো।

এ্যাকসিডেন্টের গোড়ার কথা যদি বলি, তাহলে তোর হিসেবে তা নীতিবিরুদ্ধ।

কি রকম ? প্রচ্ছন্ন আগ্রহ অরুণেশের গলায়।

ডোণ্ট মাইণ্ড—মুখ টিপে হাসলো সুপ্রিয়, আজকাল মেয়েদের, বিশেষ ক'রে দিল্লীর মেয়েদের লজ্জা বল্, শালীনতা বল্, আব্রু বল্ শুধু হাত দুটোকে নিয়ে—

সে আবার কী ? অরুণেশ হাসলো।

কেন ? তুই দেখিসনি মেয়েরা আজ-কাল ব্লাউজের বুক-পিঠ একেবারে সংক্ষেপ ক'রে সেটা পুষিয়েছে হাতায় ?

অরুণেশ লাল হলো।

চোখটা অভ্যস্ত হ'তে একটু সময় লাগে তো—আগের সুরেই বলে চললো সুপ্রিয়, দিল্লী যাওয়ার কয়েক দিন পরে কাশ্মীরীগেটের সামনে দিয়ে বাইকে ক'রে যাচ্ছি, একটি মেয়ে উল্টোদিক থেকে একেবারে সামনে এসে গেছে, সুন্দরী কিন্তু মুখের দিকে তাকাবো কী, বুকে কোনো আবরণ প্রায় নেই বললেই চলে, ব্লাউজের গলা নাভিদেশ পর্যন্ত নেমেছে আর কটিদেশ উন্মুক্ত একেবারে,—তার ওপর উলঙ্গবাহার শাড়িখানি। আমি আমার চোখ দুটোকে সামলাতে সামলাতে বাইক থেকে ধপাস ক'রে প'ড়ে গেলাম।

এই সুপ্রিয়, চুপ কর—আরক্তিম অরুণেশ বন্ধুকে থামাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু, সুন্দরী নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে এতই সচেতন, আমার পতনে লজ্জিত না হ'য়ে বরং খুশি হ'লেন যেন। লিপষ্টিক্-রঞ্জিত ঠোঁট বেঁকিয়ে ফিক্ করে একটু হেসে আমাকে পার হ'য়ে গেলেন—আর আমি আমার জখমী হাঁটুটা নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কোনো মতে বাড়ি ফিরে এলাম, ব্যথাটা প্রায় সেরেই গেছে, তবু বেকায়দা হলেই জয়েণ্টের মাঝখানটা খচ্ ক'রে ওঠে।

অরুণেশ মিটি-মিটি হাসতে লাগলো।

হাসিস না অরুণেশ, মানুষের চাল চলনের ছাঁদ বেমালুম বদলে যাচ্ছে। মেয়েদের কাজ আবার বেড়ে গেছে একটা, কোমর পেণ্ট করতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। সেজন্য যেদিন পার্টি থাকে, লাঞ্চের পরই সুন্দরীরা লেগে যান কোমর পেণ্ট করতে—যাই বলিস, মেহনত কী কম ? মুখের ভাব এমন গম্ভীর ক'রে কথা শেষ করলো সুপ্রিয় যে, অরুণেশ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। দিনকে দিন বড্ড ফাজিল হচ্ছিস সুপ্রিয়, আর এত বানিয়ে আর বাড়িয়ে বলতে পারিস—

বিশ্বেস হচ্ছে না তো আমার কথা ? আগের মতই কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে সুপ্রিয়, শোন্ তবে—একদিন কুতুবমিনার দেখতে গিয়েছিলাম, কুতুবমিনারে উঠেছি বার কয়েক, সেজন্য ওঠার আর বিশেষ সখ নেই, চারিদিকে ভাঙা ভাঙা দেয়ালের গায়ে যে শিল্পগুলো ছিলো, সেগুলো লক্ষ্য করছিলুম। হঠাৎ পেছন থেকে—আপনি কি কুতুবে উঠবেন ? কণ্ঠ তো নয়, যেন ঝিঝিঁর স্বর। চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, পেছনে দণ্ডায়মানা একজন অষ্টাদশী তন্বী। অবশ্য বয়েসটা তখন আমার যা মনে হয়েছিলো তাই বললুম, না হ'লে মেয়েদের বয়েস আঠারো কী আটাশ তা বোঝা পুরুষের সাধ্য নয়। অষ্টাদশী আবার বললে—আপনি কুতুবে উঠবেন ? একা-একা উঠতে আমার ততটা সাহস হচ্ছে না। অষ্টাদশীর আহ্বানে খুশি হয়েই চললুম। তন্বীর কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা, ওপরে উঠে ফটো তোলার সখ চেপেছে মালুম হলো। সবে তৃতীয় ধাপ শুরু করেছি, তন্বী বিড় বিড় ক'রে বললো, দেখুন বড্ড আন্ ইজি ফীল্ করছি—বলতেই ঢলে পড়লো আমার গায়ে। আমি শক্ত হাতে [illegible] করিয়ে রাখলুম কিছুক্ষণ, মিনিট পাঁচেক পরে অষ্টাদশী সামলে [illegible] মিন-মিন ক'রে বললো, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ—আর [illegible] ওপরে উঠবো না। নেমে এলাম তারপর। আর এক দফা ধন্য[বাদ] জানিয়ে চলে গেলেন তন্বী। একটু পরেই আমার নজর পড়[লো] ডানহাতের দিকে। আরে ! এ যে উজ্জ্বল গৌরবর্ণ—হাতের বর্ণ [দেখে] আমি চমৎকৃত একেবারে। সবাই আমাকে শ্যামবর্ণ ব'লে অভি[হিত] করেন কেন ? মনে মনে তাই ভাবতে শুরু করেছি, হ[ঠাৎ] বাহাতটা চোখে পড়ে গেলো—আর সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ঘাটন হ[য়ে] গেলো গৌরবর্ণ রহস্য। মনে পড়ে গেলো অষ্টাদশীর কো[মর] পেঁচিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম, কোমরের পেণ্টটা শুকো[বার] আগেই তন্বী বেরিয়ে পড়েছেন আর কি। ক্ষুণ্ণ মনে পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ঘসে ঘসে রং তুলে ফেললাম—কাহি[নী] শেষ ক'রে সুপ্রিয় বন্ধুর মুখের ভাবটা বেশ ভাল ক'রে একটু দে[খে] নিলো, তারপর সহাস্যে বললো, তোকে বখিয়ে দিচ্ছি, না অরুণেশ ? উত্তরে অরুণেশ নীরবে ঠোঁট টিপে হাসলো একটু।

একটা ষ্টেশনে থেমে গাড়ী আবার চলতে শুরু করলো। কয়েক-জন লোক ওঠা-নামা করলো। কামরায় বিচিত্র কণ্ঠের না[না] গুঞ্জন। সুপ্রিয় আড়চোখে কয়েক বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করলো বৃদ্ধ[ের] দিকে। পূর্ববৎ নিমীলিত চোখে বসে আছে [illegible] ভদ্রলোক।

একটা মজা দেখ্‌বি ? অরুণেশের কানের কাছে মুখ এনে বল[লো] সুপ্রিয়। অরুণেশ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

দেখ্ তো আগে, দেখি তোর ডানহাতখানা ?

অরুণেশ কিছুটা বিস্মিত হয়ে বন্ধুর দিকে হাতখানা বাড়ি[য়ে] দিলো। মুখে অদ্ভুত গাম্ভীর্য এনে হাতখানা দেখতে লাগলো সুপ্রিয়। অরুণেশ কৌতুক চোখে তাকিয়ে রইলো শুধু। এর পর সুপ্রিয় পকেট থেকে বার হলো কাগজ আর পেন্সিল। একটি চৌকো ছকের মত কেটে সুপ্রিয় তার এক একটা খোপে এক একটা [illegible] ছবি আঁকতে লাগলো। অরুণেশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আ[র] মুখ টিপে হাসছে। না, সুপ্রিয়র আঁকার হাত খুব সুন্দর, কেম[ন] এক এক টানে সব এঁকে যাচ্ছে—মনে মনে ভাবলো অরুণেশ।

অরুণেশ শোন্ ! তোর হাত দেখে এবার অতীত ভবিষ্য[ৎ] বলে যাব আমি, তুই মুখের চেহারা এমন করবি যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে আমার কথা, মাঝে মাঝে মুখেও প্রকাশ করবি সেটা। খুব আস্তে আস্তে সুপ্রিয় বললে কথাগুলি।

অরুণেশ কৌতুক বোধ করছে খুব, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। অরুণেশের অতীত ভবিষ্যৎ বেশ গলা চড়িয়ে বলে যাচ্ছে সুপ্রিয়, চোখে-মুখে মুগ্ধভাব ফুটিয়ে বসে আছে অরুণেশ, আর মাঝে মাঝে সজোরে ঘাড় নেড়ে বলছে—একদম্ ঠিক আছে। স্থির পুকুরের জলে যেন ঢিল ছুঁড়লো কেউ। সকলেই মুখ ফিরিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সুপ্রিয়র দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, বৃদ্ধের নিমীলিত চোখ খুলে গেছে কখন। চোখে কেমন এক রকম উদ্‌গ্রীব প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে বৃদ্ধ। হাত দেখা শেষ করে সুপ্রিয় বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললো, ঝুড়ি থেকে কমলা বার কর দেখি, গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ—ঝুড়িতে জলখাবার গুছিয়ে সব শুকনো খাবার ও ফল

দিয়ে দিয়েছিলেন, সে কথা ভুলেই গিয়েছিলো অরুণেশ। বন্ধুর কথায় খেয়াল হলো, ঝুড়ি থেকে চারটে কমলা আর কিছু কলাকান্দ আর বালুসাই একটা ডিসে তুলে বন্ধুর সামনে ধরে দিলো।

জেরাসে মেহেরবাণী কিজিয়ে জী—বৃদ্ধ মাড়োয়ারীর কণ্ঠে করুণ আবেদন। দুই বন্ধুই ফিরে তাকালো, বৃদ্ধ দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে সুপ্রিয়র দিকে। কমলা লেবু খেতে খেতে প্রথমে মৃদু আপত্তি জানালো সুপ্রিয়, তারপর যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও নেহাৎ বুড়ো মানুষের কথা ঠেলতে পারলো না, মুখে এমনি ভাব ফুটিয়ে হাতখানা টেনে নিলো। অরুণেশের বুক ঢিব-ঢিব করছে, না জানি কী ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসায় সুপ্রিয়! বৃদ্ধের হাতের পাতায় স্থির গভীর দৃষ্টি রেখে সুপ্রিয় প্রশ্ন করলো, আপকা মুলুক আজমীর থা?

জী হাঁ।

আপকা নাম মদনলাল তুলসান?

জী হাঁ।

আপ কেয়া দিল্লীমে পনেরো সালোঁসে ঠারথা হায়?

জী হাঁ, বৃদ্ধর ড্যাব-ড্যাবে চোখ ক্রমশঃ বিস্ফারিত হতে থাকে। সুপ্রিয়র মুখের চেহারা একেবারে নিরীহ, ভালমানুষ গোছের। অন্য দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলো মনে হলো, তারপর বৃদ্ধ তুলসানের বাঁহাত দেখতে চাইলো। কাঁপা-কাঁপ বাঁহাতখানি বাড়ালো সকরুণ মদনলাল তুলসান। বাঁহাতখানিও আগের মতই দেখলো সুপ্রিয়, চিৎ করে, উপুড় করে, কাত করে, টান করে, তারপর ধীরে-ধীরে বললো, আপকা মনমে কুছ সুখ নেহি, আপকে একই বেটেকো দো দফে সাদী করায়া, লেকিন কিসিকা কোই বালবাচ্চা নেহি হুয়া! স্তম্ভিত বৃদ্ধ রুদ্ধ গলায় উত্তর দিলো, আপনে যো কুছ ভি কহা·হায়, সব ঠিক হায়। আপ মেহেরবাণীসে ইয়ে ভি বাতা দেঁ কি কালীমায়ী মেরে ইচ্ছেকো পূরণ করেঙ্গে ইয়া নেহি? কেয়া আপনে পোতে কী দর্শন মুঝে মিলেগী?

সুপ্রিয় ভুরু কুঞ্চিত ক'রে চিন্তিত মুখে বললো, এ বাত তো আপকে লেড়কেকে হাত না দেখকে বলনে নেহি সেকেগা—

তুলসান-সহধর্ম্মিণী অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচিত ক'রে ফিসফিসিয়ে সুপ্রিয়কে উদ্দেশ্য ক'রে শুধালো, বহুয়োঁ কা হাত দেখনেসে কোই ফয়দা মিলেগা? হাঁ, এ তো তো সেকতা জী—সুপ্রিয় উত্তর দিলো।

বাজুবন্ধ আর কাঁকনবলয়ের রিনঝিন নিক্কণে বোঝা গেলো, বউ দুটি চঞ্চলা হ'য়ে পড়েছে রীতিমত। দুটি বউ-এরই শুধু বাম হাত দুখানি পর পর দেখে অতি উল্লসিত গলায় জবাব দিলো সুপ্রিয়, জরুর! জরুর! দোনোকে দো দো বাচ্চা হোঙ্গে—কালীমায়ী কৃপা করেঙ্গি। চঞ্চলা বউ দুটি আরো চঞ্চলা হ'য়ে নিজের নিজের ওড়না সামলাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। বৃদ্ধার অবগুণ্ঠন কপালের ওপর উঠে গেছে, আনন্দোদ্ভাসিত বৃদ্ধার তোবড়ানো মুখখানি দেখে অরুণেশ ভেতরে ভেতরে কেমন একরকম গ্লানি বোধ করতে লাগলো। নিজে একজন নীরব দর্শক হয়েও বন্ধুর ছলনার অংশীদারও মনে হতে লাগলো নিজেকে। বৃদ্ধ মদনলাল তুলসানের দু' চোখের দু'কোণে দুটো জলের ফোঁটা চিক-চিক ক'রে উঠলো। গাঢ় কণ্ঠে বললো, সাচ মুচ বাবুজী!—রামজী আপকা ভালা করে, রামজী আপকা ভালা করে। তার পর বার হলো সুদৃশ্য দুখানি বড় আকারের রূপোর রেকাবি, আর তাতে শাশুড়ীর আদেশমত বউ দুটি একের পর এক খাবার সাজাতে লাগলো—পুরী, সেউ, চাটনী, লাড্ডু, পেঁড়া, মিঠি, আরো কত র লাল-হলুদ রঙের মিঠাই, যার নাম সুপ্রিয়, অরুণেশ কেউ জানে ন

তুলসান-পরিবারের একান্ত অনুরোধে এবং বন্ধুর জোর তাগা অরুণেশকে একটা রেকাবি হাত পেতে নিতেই হলো এবং খে হলো। কিছু ফেলা গেলো অবশ্য, সমস্ত মিঠাই শেষ অরুণেশের সাধ্যের বাইরে। নিজে খেতে খেতে এবং সুপ্রি নির্বিকার ভাবে খাওয়া দেখতে দেখতে অরুণেশের অস্বস্তি আরো দ্বিগুণ চাড়া দিয়ে উঠলো। না, এ যেন পরোক্ষ প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে সুপ্রিয়কে, এর প্রতিবিধান একটা করতেই হ খাওয়া শেষ করে, অপাঙ্গে বৃদ্ধ তুলসানের আত্মমগ্ন তৃপ্ত মুখখ দেখে মনে মনে কেবল ভাবতেই থাকলো অরুণেশ। তারপর যখন রাত্রি নামলো ট্রেনের কামরায়, ঘুম নামলো সক চোখে, একা অরুণেশ কপট নিদ্রার ভাণ ক'রে ক'রে প্র গুণছিলো যেন, আস্তে আস্তে বন্ধুকে ঠেলা দিয়ে জাগালো। ধড় ক'রে উঠে বসলো সুপ্রিয়, কী হয়েছে অরুণেশ? একই ব বাক্স বিছানা সব নামিয়ে দুই বন্ধু শোবার জায়গা করে নিয়েছি

অরুণেশ উঠে বসেছিলো আগেই, চাপাগলায় চেঁচাতে নি করলো বন্ধুকে, তারপর সেই সুরেই প্রশ্ন করলো, বৃদ্ধ তুলসা নাম ধাম পেশা উদ্দেশ্য ও জানলো কী করে?

সুপ্রিয় সামান্য একটু ইতস্ততঃ করে জানালো, এ্যাটেন কামরায় গিয়ে বৃদ্ধর ভৃত্যের কাছে তার প্রভুকে খুব আদমি বড়া আদমি বলে কথায় কথায় সব জেনে নিয়েছে। কথা শেষ করে বন্ধুকে অনুযোগের সুরে বললো, এর জন্য আমার পাকা-মিঠে ঘুমটাকে নষ্ট করলি তো? পরে জি করলে হতো না? কিন্তু এর উত্তরে রীতিমত তিরস্কারের সুপ্রিয়র এই আচরণের সমালোচনা করলো অরুণেশ, আর তার বন্ধুর আরো সামনে সরে এসে অনেকক্ষণ ধরে অত্যন্ত ম কি যেন সব পরামর্শ দিলো, কিছুই শোনা গেলো না, দেখা গেলো সুপ্রিয়র পকেট থেকে এক চিলতে কাগজ চেয়ে কি একটুখানি লিখে কাগজটা আবার ফেরৎ দিলো সুপ্রিয় লেখাটা এক-নজর দেখে নিয়ে পকেটে সাবধান করে রেখে দি সুপ্রিয়। তারপর দুই বন্ধুই সটান শুয়ে পড়লো। সকাল হ বৃদ্ধ তুলসানের প্রাত্যহিক কার্য্য সমাপন হতেই সুপ্রিয় নরম গ শুধালো, আপকা লেড়কা কাঁহা হায়? দিল্লী—প্রসন্নমুখে উত্তর দি মদনলাল তুলসান। সুপ্রিয় বললো, দেখিয়ে কাল রা হামকো কালীমায়ীসে আদেশ মিলা, মায়ী আপকে লেড়কে কলকাত্তা আনেকো কহা হায়। চোখ বড় করলো। কালীমায়ী আপকো আদেশ দিয়া? আপসে কালীমায়ী বহুত প্রসন্ন হায় বাবু পর মেরে লেড়কেকো কিঁউ কলকাত্তে বুলায় হায়? কণ্ঠে কিছু গাম্ভীর্য আনলো সুপ্রিয়, চৌরিঙ্গিমে এক বহুত ভারি ডাক্টর হ —ডাঃ লাহিড়ি, উন্‌কী দেখায় কে দাওয়াই খানেকো কহা হায়

আপকো উনকা পাত্তা মালুম হায়? বৃদ্ধর কণ্ঠে অস আগ্রহ। হাঁ জী, হাম আপকো লিখ দেতা হায়—সুপ্রিয় অ লেখার চেষ্টা না ক'রে গত রাত্রের অরুণেশের লেখা ডাঃ লাহিড়ি নাম-ঠিকানা-লেখা চিলতে কাগজটা পকেট থেকে বার ক'রে বৃ হাতে দিলো।

[ ক্রমশঃ।
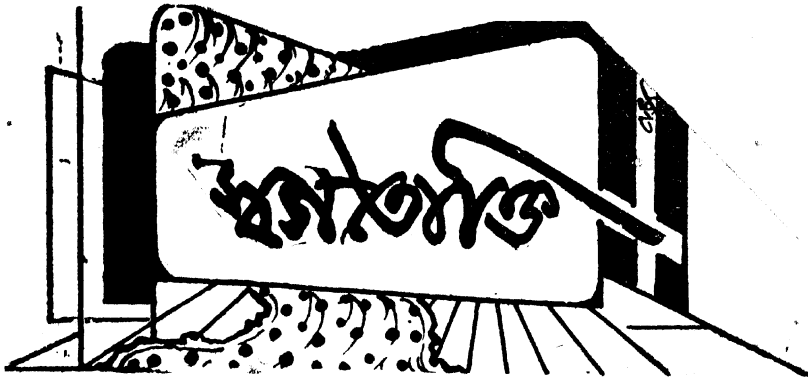
প্রশান্ত চৌধুরী

১২

সত্যি, কত কাল? কত কাল আগে আমরা প্রথম নাটক অভিনয় করেছি এদেশে? কী নাম ভারতের প্রথম নাটকের? কী নাম তার প্রথম নাট্যকারের?

শোনা যাক তাহলে একটি গল্প—

বসন্তোৎসব।

উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছে সাকেত। সাকেতের উৎফুল্ল নরনারী ছুটে এসেছে নদীর তীরে সাঁতারের প্রতিযোগিতা দেখতে। নদীর জলে সাদা ফেনা তুলে সাঁতার কেটে চলেছে সাকেতের তরুণ-তরুণীরা। তীরে দাঁড়িয়ে বাহবা দিচ্ছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা।

সকল প্রতিযোগীকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে দুজন। দুজনের কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। ওপারের মাটিতে গিয়ে হাতও ছোঁয়ালে দুজনে একসঙ্গে। একজন তরুণ, আরেকজনা তরুণী। দুজনে তাকালে দুজনের দিকে। দুজনের মনে গাঁথা হয়ে রইল দুজনের মুখ। তারপর বসন্তোৎসবের বিচিত্র সমারোহের মধ্যে জনারণ্যে কোথায় হারিয়ে গেল দুজনে!

অনেক দিন পরে দুজনে আবার দেখা হঠাৎ।

বসন্তোৎসব নয়। জনতার ভিড় নয়। নির্জন নদীতীরে সন্ধ্যা নামছে ধীরে ধীরে। এমনি সময়ে দুজনে দেখতে পেলে দুজনকে।

: তুমি?

: তুমি?

কিছুক্ষণ কথা নেই আর।

সোনালী তারা মেয়েটির চোখে। চুলবাঁধার ছাঁদটা নতুনতরো।

: তুমি কি গ্রীসের মেয়ে?—ছেলেটি শুধোয়।

: না তো! আমি ভারতবর্ষেরই মেয়ে। একই জন্মভূমি তোমার আমার। দেখছ না, প্রাকৃতে কেমন কথা বলছি আমি? গ্রীসের ভাষাই জানি না।

: কিন্তু তোমার চোখ? তোমার নাক? তোমার চুলের ছাঁদ?

: দুপুরুষ আগে আমরা গ্রীসের মানুষ ছিলুম কি না, তাই। কিন্তু বাবাও আমার এদেশের লোক। ... এসেছিলেন এখানে ব্যবসা করতে। আর ফিরে যাননি দেশে। কেউ যাবেনও না কোন দিন। যেমন গ্রীসের অনেক মানুষ এদেশে এসে এদেশটাকেই স্বদেশ করে নিয়েছে, ঠিক তেমনি। আমার জন্ম এই দেশেই। নাম আমার প্রভা। তোমার?

: আমার নাম? অশ্বঘোষ। আমার মায়ের নাম সুবর্ণাক্ষী। নামে সুবর্ণাক্ষী হলেও তোমাদের মত অমন সোনার রঙের চোখই নেই তাঁর।

: তুমি? শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আনন্দে বড় বড় হয়ে উঠে প্রভার বড় বড় একজোড়া সোনালী চোখ। তুমিই অশ্বঘোষ? কবি, গায়ক, বাদক, পণ্ডিত, দার্শনিক, ক্রীড়াবিদ্ অশ্বঘোষ? সাকেতের তরুণী মহলে যাঁর রচিত গান ফেরে মুখে মুখে?

: হ্যাঁ। আমিই সেই। কিন্তু ক্রীড়ার প্রতিযোগিতায় তুমিই তো দিয়েছ আমায় হারিয়ে। তেমন প্রতিযোগিতা হলে কাব্যে, গানে, বাদনে, পাণ্ডিত্যে কে জানে তোমার কাছে হয়তো হেরে যাব সবেতেই।

: বাঃ! হারলে কোথায় তুমি? সমান সমান তো হল সেদিন। কিন্তু সত্যি করে বলতো,—শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ছাপিয়ে গিয়েও ইচ্ছে করেই একসঙ্গে তীরের মাটি ছুঁয়েছিলে কি না?

: সে কথা থাক। আগে বল, আবার কি দেখা হবে আমাদের?

: ডাকলেই আসি।

: এসো তাহলে। রোজ। এমনি সন্ধ্যায়। এই শান্ত নদীর তীরে।

প্রতিদিন দেখা হয় দুজনের। ভারতের ছেলের সঙ্গে গ্রীসের মেয়ের। ভারতের ছেলে বাঁধে গান,—গ্রীসের মেয়ের কণ্ঠে প্রাণ পায় সেই গীতি। সন্ধ্যার সূর্য ডুবে যায় নদীর জলে, পাখীরা ফিরে যায় কুলায়ে, আকাশের বুকে ফুটে উঠতে সুরু করে উজ্জ্বল তারার দল। তখন ফিরে যায় দুজনে দুদিকে। একজন ফিরে যায় ব্রাহ্মণদের পাড়ায়, আরেকজনা গ্রীক-পল্লীতে।

একদিন কিন্তু, সূর্য তখনো অস্ত যায়নি, পাখীরা ফেরেনি কুলায়ে, আকাশের বুকে উঁকি দেয়নি একটিও তারা,—এমন সময় প্রভা বললে: যাই।

[illegible]

: রাগ কোর না। সামনেই বুদ্ধপূর্ণিমা। এক মাস ধরে উৎসব চলবে আমাদের। সেই উৎসবে নাটক করব আমরা। তারই মহলা আজ।

: তোমরা কি বৌদ্ধ?

: হ্যাঁ। জানতে না? সাকেতের বৌদ্ধবিহারে রয়েছেন শ্রমণ ধর্মরক্ষিত। তিনিও তো জাতিতে গ্রীক,—জন্ম মিশরে। আছেন শ্রমণ সুমন,—ইরাণের মানুষ। আছেন মহাস্থবির ধর্মসেন,—চণ্ডালের ঘরে জন্ম তাঁর। আমাদের গ্রীক্-পল্লীর সবাই আমরা বৌদ্ধ।

: ওঃ! কিন্তু নাটক না কিসের মহলা না কী যেন বলছিলে?

: হ্যাঁ। নাটক। মঞ্চ বেঁধে অভিনয় করি আমরা।

: অভিনয়? মঞ্চ বেঁধে?—ব্যাপারটা ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারেন না অশ্বঘোষ।

: গ্রীক্ নাটক প্রাকৃতে অনুবাদ করে নিয়ে অভিনয় করি আমরা। আজ তার মহলা। আমার জন্যে সকলে অপেক্ষা করছে সেখানে। আজ যাই?

নাটক···মহলা···চণ্ডাল-শ্রমণ···গ্রীক-বৌদ্ধ···! বিস্ময়ের নব নব তাড়নায় বিহ্বল হয়ে গেছেন তখন অশ্বঘোষ। অভিভূতের মতো শুধু বলেন: এসো।

প্রভা চলে যায়। হঠাৎ পিছু ডাকেন অশ্বঘোষ: প্রভা, শোন।

ফিরে আসে প্রভা।

: কী বলছ?

: তোমাদের ঐ যে মঞ্চাভিনয়, ঐ যে নাটক,—দেখাবে আমাকে?

: যাবে? যাবে তুমি আমাদের পল্লীতে? তাহলে যে কী আনন্দই পাই আমি, তুমি তা জান না কবি! কিন্তু সত্যি যাবে কি তুমি? তুমি ব্রাহ্মণ। পা দেবে আমাদের পল্লীতে? তোমাদের যে পদে পদে নিষেধ, পদে পদে বাধা।

আমি যাব—দৃঢ়কণ্ঠে বললেন অশ্বঘোষ।

গেলেন অশ্বঘোষ। দেখলেন নাটক। মুগ্ধ হলেন। শুনলেন নাট্যকারদের নাম,—এসকাইলাস, ইউরিপিডিস, সোফোক্লিস, আরিষ্টোফেনিস। শুনলেন নাটকের নাম,—এগামেমনন, ইলেকট্রা, আন্টিগোন। দেখলেন প্রভাকে ক্যাসাণ্ড্রার ভূমিকায়। রোমাঞ্চিত হলেন অশ্বঘোষ।

অভিনয়ের শেষে ফিরে চলেছেন অশ্বঘোষ। তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে রয়েছে শুধু নাটক আর প্রভা, প্রভা আর নাটক।

বাধা এল প্রথম পিতার কাছ থেকে। প্রভা যবন। ভারতীয় হলেও যবন। তাছাড়া বৌদ্ধ। আর অশ্বঘোষের জন্ম পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে। কাজেই বন্ধ করতে হবে প্রভার সঙ্গে মেলামেশা। ধর্মের নিষেধ

নিষেধ! বিস্মিত হন অশ্বঘোষ। উল্টে চলেন পুঁথির পাতা। কার নিষেধ? কোথাকার নিষেধ? কবেকার নিষেধ? বৈদিক ঋষিদের নিষেধ নেই তো কোথাও? বেদের কোথাও তো নেই এমন নিষেধ! এমন ভাবে কারা নিষেধের বেড়াজাল বেঁধে নিজেদের গুটিয়ে ছোট করে ফেলছে? এ কী নিদারুণ সঙ্কীর্ণতা!

মনে পড়ে যায় প্রভার কথা।

সাকেতের বৌদ্ধবিহারে রয়েছেন শ্রমণ ধর্মরক্ষিত। জাতিতে গ্রীক, জন্ম মিশরে। আছেন শ্রমণ সুমন,—ইরাণের মানুষ আছেন মহাস্থবির ধর্মসেন,—চণ্ডালের ঘরে তাঁর জন্ম!

ওঁরা সকলেই বৌদ্ধ। সকলে এক। ভেদাভেদ নেই বোধ মানুষে মানুষে।

ব্রাহ্মণ অশ্বঘোষ মনে মনে প্রণাম নিবেদন করলেন তথাগতের উদ্দেশে।

প্রভার সঙ্গে প্রতিদিন মিলিত হন অশ্বঘোষ। এই অশ্ব[illegible] নিষেধ তিনি মানেন না।

প্রভা বলে: কবি, নাটকের অভাবে গ্রীক-নাটকের প্রাকৃ[illegible] অনুবাদের অভিনয় করি আমরা। তুমি কেন লেখ না মৌলি[illegible] নাটক? তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, তুমি পণ্ডিত, তুমি কবি, তুমি শিল্পী, তু[illegible] গায়ক, তুমি বাদক,—একাধারে এত গুণে গুণী তুমি। তুমি কে[illegible] লেখ না নাটক? আমি বলছি কবি, তুমি পারবে।

: পারবো?

: নিশ্চয়ই পারবে।

অশ্বঘোষ আবেগে জড়িয়ে ধরেন প্রভার দুটি গৌর নিটোল হাত

: প্রভা, তোমার সঙ্গে মিশি বলে আমার সমাজের লোকে আমাকে বিদ্রূপ করে। আমাকে বলে যবন। বলুক ওরা। আ[illegible] তো জানি, ওরা ভুল বলে। ওরা ভুলে গেছে যে, বেদের কোথা[illegible] নেই মানব-বিদ্বেষের প্রচার,—কোন সমর্থন নেই আজকের এ[illegible] প্রচলিত জাতিভেদ বর্ণভেদের। তাছাড়া, থাকতও যদি, তোমাকে আমি ত্যাগ করতে পারতুম না কোন দিন প্রভা! তোমাকে ছা[illegible] আমার সমস্ত জীবন মিথ্যে। তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ।

প্রভা বলে: স্বীকারই যদি করছ, তাহলে—তাহলে তার বদ[illegible] আমাকে দাও কিছু?

: তোমাকে? তোমাকে অদেয় আমার কী আছে প্রভা?

: দাও তাহলে নাটক। ভারতের নিজস্ব ভাষায় লেখা [illegible] প্রথম মৌলিক নাটক।

নির্বাক হয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অশ্বঘোষ প্রভা[illegible] আরক্ত মুখের দিকে। সরযূ নদীর তীরে আরক্ত সূর্য তখন লুকি[illegible] যাচ্ছেন অস্তাচলে।

লেখা হল নাটক। 'উর্বশী-বিয়োগ'। ঋগ্বেদের ঋষি উর্বশী[illegible] নিয়ে কালে কালে একটু একটু করে যে গল্পকাহিনী গড়ে উঠে[illegible] তাকে অবলম্বন করে গান বেঁধেছিলেন একদিন কবি অশ্বঘোষ সে গান ফিরতো সাকেতের তরুণ-তরুণীর মুখে মুখে। এবা[illegible] লিখলেন নাটক।

ইন্দ্রপুরীর নর্তকী অপ্সরা উর্বশী। নৃত্যের তালভঙ্গের অপরা[illegible] স্বর্গচ্যুতা হয়ে নেমে আসতে হল তাঁকে মর্ত্যলোকে। মর্ত্যভূমি মিলন হল তাঁর রাজা পুরুরবার সঙ্গে। উর্বশীর প্রেমে বিভোর রা[illegible] পুরুরবা। দিন কেটে যায় আনন্দ-গানে। কিন্তু ধীরে ধীরে এদি[illegible] ফুরিয়ে আসে উর্বশীর অভিশাপের কাল। একদিন মর্ত্যের পুরুরবা ছেড়ে স্বর্গের উর্বশীকে আবার ফিরে যেতে হয় ইন্দ্রসভায়। উর্ব[illegible] অন্তর্ধানে পুরুরবা শোকে উন্মাদ। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রাজ্য-সংসার সব [illegible]

ভুলে সব কিছু ফেলে ব্যাকুল হয়ে জলে-স্থলে পর্বতে-অরণ্যে খুঁজতে থাকে তাঁর উর্বশীকে। আকুলকণ্ঠে বার বার ডাক দেন—উর্বশী, উর্বশী, ফিরে এস। উর্বশীর কাছ থেকে সাড়া আসে না। প্রতিধ্বনি কেঁদে ফেরে বনে-বনান্তে।

শুধু নাটক লিখেই ক্ষান্তি নেই। অশ্বঘোষ রাত জেগে দেন তার মহড়া। দিনের বেলা আঁকেন তার দৃশ্যপট।

অবশেষে হল একদিন অভিনয়। ভারতের প্রথম নাটক 'উর্বশী-বিয়োগ' অভিনীত হল সাকেতের গ্রীক্-পল্লীর রঙ্গমঞ্চে। নাটক লিখেছেন অশ্বঘোষ, অভিনয় শিক্ষা দিয়েছেন, দিয়েছেন গানের সুর, নৃত্যের ছন্দ, এঁকেছেন দৃশ্যপট,—এমন কি অভিনয়ও করেছেন তিনি পুরুরবার ভূমিকায়। আর উর্বশী? উর্বশীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে প্রভা।

সে অভিনয় মুগ্ধ করেছে সমগ্র সাকেতবাসীকে। মুগ্ধ করেছে নাটকের ভঙ্গি,—নাটকের কাহিনী। সাকেতের নরনারী দলে দলে ভিড় করেছে নাটমঞ্চে রাতের পর রাত। সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের প্রথম নাট্যকারের নাম। উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা, পাটলিপুত্র, দশপুরা,—যেথানে আছে গ্রীকপল্লী, যেথানে আছে নাটমঞ্চ, সেইখানে এ-নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে। আয়োজন হচ্ছে গ্রীক ভাষায় এ নাটকের অনুবাদ করে মিশরে পাঠাবার।

কেউ কি ভেবেছিল তখন একবারও যে, নাটমঞ্চের পুরুরবাকে বাস্তব জীবনের বিস্তীর্ণ মঞ্চে দাঁড়িয়েও ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক দিতে হবে তার উর্বশীকে? সাড়া দাও উর্বশী, সাড়া দাও?

ভারতের প্রথম নাট্যকার হিসাবে অশ্বঘোষের নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষে। এল আবার সেই সমাজের নির্মম ভ্রমাত্মক অনুশাসন। পিতার নিষেধ। প্রভা ভিন্ন জাতির মেয়ে, ভিন্ন তার ধর্ম। অশ্বঘোষের সঙ্গে তার মেলামেশা অন্যায়। এ-বারণ না শুনলে অশ্বঘোষকে ছাড়তে হবে সমাজ, ছাড়তে হবে বাপ-মাকে, ছাড়তে হবে আত্মীয়-বন্ধুকে। হতে হবে অপাঙক্তেয়।

এমনি সময় অশ্বঘোষের জননী সুবর্ণাক্ষী হলেন পীড়িত। দেহত্যাগ করলেন তিনি। শ্রাদ্ধকার্য সাঙ্গ করে অনেক দিন পরে অশ্বঘোষ আবার চলেছেন প্রভার সঙ্গে দেখা করতে। প্রভার জন্যে তিনি সব কিছু ত্যাগ করতেই প্রস্তুত।

কিন্তু কোথায় প্রভা? প্রভা নেই। প্রভা উর্বশীর মতোই বিদায় নিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। শুধু রেখে গেছে পত্র,—

'চললুম কবি! এ জীবনে হল না মিলন। তোমাকে সবকিছু থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শুধু আমার করতে চাই না, তাই বিদায় নিলুম। যে সরযূ নদীর বুকে আমাদের প্রথম দেখা। যে সরযূর তীরে আমাদের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। যার তীরে বসে কেটে গেছে আমাদের কত তারকিনী রাত্রি। সেই সরযূর বুকেই আশ্রয় নিলুম এ-জন্মের মতো। আমার প্রণাম নিও তুমি। আর, আর আমার ভালবাসা।'

সরযূর তীরে ছুটে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠলেন একবার অশ্বঘোষ,—'প্রভা!' তারপর চুপ হয়ে গেলেন।

পাটলিপুত্র-দশপুরের নাটমঞ্চে হয়তো তখন তাঁরই রচিত ভারতের প্রথম নাটক। 'উর্বশী-বিয়োগে'র নায়ক পুরুরবা ব্যাকুল আহ্বানে ব্যথিত করে তুলেছে দশ দিক,—'উর্বশী সাড়া দাও।'

হুঁ:!

গল্পটা শুনে একটা তাচ্ছিল্যের নিঃশ্বাস ফেললেন কবিরাজ রাজেন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ।

আমাদের জুপিটার থিয়েটারেরই রাস্তার দিকের একতলার ঘরে তাঁর কবিরাজী ওষুধপত্রের দোকান। তক্তপোষের উপর টান্ করে পাতা আধময়লা বোম্বাই চাদরের উপর খান তিন চার আধময়লা তাকিয়া। তারই একটায় ঠেস দিয়ে কখনো বিড়ি এবং কখনো হুঁকো পান করেন কবিরাজ মশাই। শুধু কবরেজি নয়, সেই সঙ্গে জ্যোতিষচর্চাও করে থাকেন। সন্ধ্যের পর খদ্দের না থাকলে আমাদের থিয়েটারের আড্ডায় প্রায়ই হাজিরা দেন।

থিয়েটারের কারুর গলা ভাঙলেই কবরেজমশাই বড়ি দেন। সে বড়িতে কাজ হোক আর নাই হোক, বড়িগুলি ভারী সুস্বাদু এবং মুখরোচক। কাজেই জুপিটার থিয়েটারের অভিনেতাদের গলা যদি একটু ঘন ঘনই ভাঙে, তাহলে অবাক হবার কিছু নেই।

: হুঁ!

কবরেজমশাই হুঁকোটাকে নামিয়ে রাখলেন তক্তপোষের নিচে।

: কী নাম বললে ভারতের প্রথম নাটকের?

: আজ্ঞে, 'উর্বশী-বিয়োগ'।

: লেখকের নাম?

: অশ্বঘোষ।

: বয়েস?

: মহারাজ কণিষ্ক? সেই তাঁর আমলের মানুষ অশ্বঘোষ।

: ওঃ,—তাহলে তো একেবারে অর্বাচীন!—কবিরাজ মশাই মৃদু হেসে নস্যর ডিবেয় আঙুল পোরেন। কণিষ্কের আমল, সে তো এই সেদিনের কথা। আমাদের নাটক কত দিনের জান?

শিশিরের বড়মামা এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান্ হিষ্ট্রির অধ্যাপক। কাজেই ইতিহাসের আলোচনায় তার একটা জন্মগত অধিকার আছে। সে বলে উঠল: শুনেছি মাহেঞ্জোদরো-হারাপ্পার মাটি খুঁড়ে সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে নৃত্যাভিনয়েরও নাকি নিদর্শন পাওয়া গেছে। কিন্তু তাকে ঠিক.....

: সাড়ে চার?—হেসে উঠলেন কবরেজমশাই। সাড়ে চার হাজার বছর আগে শুধু স্টেজড্রামাই নয় হে, স্টেজফ্রাইটের ওষুধ পর্যন্ত বের করে ফেলেছি আমরা। বলি, মহাভারত পড়েছ? পড়েছ বিরাটপর্ব?

শিশির বললে: পড়েছি বৈ কি।

: ছাই পড়েছ।—চিঁচিয়ে উঠলেন কবরেজমশাই। পড়েছই যদি তো বিরাট রাজার প্রাসাদে যে নাট্যশালা ছিল সে কথা মনে পড়ছে না কেন? বলি, ওহে নাট্যকার?

: আজ্ঞে।

: বলি, হরিবংশের বিষ্ণুপর্বটা পড়া আছে তো, না কি তা-ও নেই?

: আজ্ঞে তা আছে।

: তা সেই হরিবংশে যাদবদের সমুদ্রযাত্রা, জলক্রীড়া, ছালিক্যগান, দেবনর্তকীদের সাহচর্যে অভিনয়, এ-সব কথা কি নেই?

: আজ্ঞে তা আছে।

: তবে? মহাভারত কি আজকের? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি আজকের? সে-সব হচ্ছে লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার ব্যাপার। তখন মানুষের মাপ ছিল সাড়ে পাঁচ হাত। আর, তখন ছিল তিরিশ ইঞ্চিতে হাত। বুঝেছ?

শিশির হেসে প্রতিবাদ করে: লক্ষ লক্ষ কি বলছেন কবরেজমশাই? পণ্ডিতরা বলছেন,—মহাভারতের বয়েস খৃষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ২০০র মধ্যে। তার বেশি নয়।

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কবরেজমশাই: পণ্ডিত! তোমাদের ঐ-সব মাংস-পেঁয়াজ-রসুন-খাওয়া পণ্ডিত তো? জানে কি ওরা?

শিশির আবার কি একটা বলতে যাচ্ছিল, ইসারায় থামিয়ে দিই ওকে। কবরেজমশাই নিজেই গজ গজ করতে থাকেন: বলে কি না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বয়েস খৃষ্টপূর্ব চারশো,—তার মানে আড়াই হাজারও নয়! যত সব অধার্মিক ম্লেচ্ছের দল। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি। দ্বাপর যুগটা কত কাল আগে গেছে জান? প্রায় পাঁচ হাজার বছর। তারও আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার বছর আগে ত্রেতা। তারও বারো লক্ষ বছর আগে সত্যযুগ। ভারতবর্ষে নাটকের সৃষ্টি সেই সত্যযুগে। বুঝলে?

আমরা সবাই নির্বাক শ্রোতা বনে গেছি ততক্ষণে।

সেই সত্যযুগে অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের লড়াই তো লেগেই থাকতো। একবার অমনি একটা ভীষণ লড়াই-এ অসুরদের হারিয়ে দিয়ে দেবতারা ফিরেছেন সবাই ইন্দ্রের রাজসভায়। খুব হৈ-হৈ হচ্ছে, আনন্দ হচ্ছে, সোমরস পান হচ্ছে। এমন সময় দেবতাদের বৌ-এরা সব দুঃখু করে বললে যে, হায়, এত বড় একটা যুদ্ধ হল, অসুররা সব কচুকাটা হল, দেবতারা সবাই দেখল, কিন্তু আমরা মেয়েরা কিছুই দেখতে পেলুম না!

এই কথা? ইন্দ্র বললেন, দেবগণ, এস আমরা একদল অসুর আর একদল দেবতা সেজে দেখিয়ে দিই কেমন করে যুদ্ধ হয়, কেমন করে অসুররা হেরে গিয়ে পালায়।

ব্যস,—সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা সবাই দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন। একদল অসুর, আর একদল দেবতা। সুরু হল মিথ্যে লড়াই। আহত হওয়ার ভাণ করে পড়ে যেতে লাগলেন অসুরবেশী দেবতারা। কেউ বা ভয়ে পলায়নের ভাণ করতে লাগলেন।

সেই থেকে হল নাটকের সুরু, অভিনয়ের সূত্রপাত। সেই প্রথম নাটকের অভিনেতা, রণজয়ী দেবতারা;—দর্শিকা দেবীর দল।

আধ পোয়া আন্দাজ ব্যাঘ্রকম্পন খাঁটি নস্য নাসিকাগহ্বরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কবিরাজ রাজেন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ গর্বভরে বললেন: তাহলেই বুঝতে পারছ, ভারতবর্ষে নাটকের বয়সটা কত?

আমরা সবাই সমস্বরে বলে উঠলুম: কোটি বছর।

১৩

একশ চৌষট্টি বছর।

হ্যাঁ, আজ থেকে একশ চৌষট্টি বছর আগে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর তারিখে ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল বিজ্ঞাপন।

By Permission of the Honorable the Governor-General.

MR. LEBEDEFF's

New Theatre in the Doomtullah, Decorated in the Bengalee Style Will be opened very shortly, with a Play calle[d]

THE DISGUISE

পন্দনামা, গোলেস্তাঁ, বোস্তাঁ, জেলেখা, আল্লামী পড়ুয়া সেযুগের বাঙালী-মহলে এ-বিজ্ঞাপন হয়ত ঠিক ভাবে পৌঁছয়নি। দৃষ্টিতে পৌঁছলেও লোচনের পথ দিয়ে তা মরমে গিয়ে নিশ্চয়ই পশেনি। এ বিজ্ঞাপন বাঙালীর 'মরমে পশিলে' নবীন বসুর থিয়েটার আবির্ভাবের জন্যে নাটকে বাঙালী আরো চল্লিশ বছর নিশ্চয়ই ধরে বসে থাকতে পারত না, তার অনেক আগেই নাট্যমঞ্চের 'আকুল করিত তার প্রাণ'।

প্রথম আধুনিক বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা বাঙালী হলেও, যাঁর সহায়তা না পেলে রাশিয়া দেশের মানুষ হেরাসিম লেবেডেফের পক্ষে সম্ভব হত না ডুমতলায় বাংলা নাট্যশালা গড়ে তোলা, তিনি ছিলেন বাঙালীই। নাম ছিল তাঁর গোলোকনাথ দাস। হেরাসিম লেবেডফের ভাষাশিক্ষক ছিলেন তিনি। লেবেডেফের বাংলায় অনুবাদ করা 'ডিসগাইস্' নাটকের জন্যে বাঙালী অভিনেতা অভিনেত্রী জোগাড় করে দিয়ে তিনিই করেছিলেন অসাধ্য সাধন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর ২৫ নম্বর ডুমতলায় হয়েছিল প্রথম বাংলা থিয়েটারের প্রথম বাংলা নাটকের প্রথম অভিনয়। তারপরে আবার পরের বছরের ২১শে মার্চ তারিখে।

তারপর?

তারপর একদিন হেরাসিম গেলেন ফিরে। ডুমতলার নাট্যমঞ্চ হারিয়ে গেল বিস্মরণের যবনিকার আড়ালে। গোলোকনাথ দাসকে ভুলে গেল সবাই। বাঙালী আবার মেতে উঠল তার অভ্যস্ত আমোদ-প্রমোদে। তার সেই সাবেকী কুস্তি আর মুরগীর লড়াই, যাত্রা পাঁচালী কবিগান আর হাফ আখড়াইয়ের আসরের আনন্দোল্লাসে।

বাঙালী ধনবানের বাগানে তখন কুস্তির দঙ্গল চলে। সংবাদপত্রে খবর বেরোয়:—

"...জমিদারের বাগানে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল, স্বদেশীয় বিদেশী মোগল পাঠান মুসলমান বাঙ্গালি তাহারা দুই ২ জন এক ২বার মল্লযুদ্ধ করিয়াছিল...এই কুস্তি দর্শনে হৃষ্টমনে ঐস্থানে শ্রীযুত বিচারকর্ত্তা সাহেব লোকেরা ও আর ২ ইংরেজ লোকেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেক মান্য লোকও গিয়াছিলেন..."

শুধু মোগল পাঠান মুসলমান বাঙ্গালীই নয়। কলকাতার মোকাম পাথুরিয়াঘাটায় তখন—

"...প্রত্যহ বৈকালে বালিকা প্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে তাহাতে তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি দুই ২জন এক ২ব

মল্লযুদ্ধ করিয়া থাকে। বিশেষতো বালিকারদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন...”

অন্যত্র—

“...কতকগুলিন প্রকৃষ্ট বলিষ্ঠ লোক ঐস্থানে আসিয়াছিল তাহারা দুই ২জন এক ২বার মল্লযুদ্ধ করে প্রথমে হাতাহাতি পরে মাতামাতি মাকামাকি ঝাঁকাঝাঁকি হুড়াহুড়ি দুড়াদুড়ি ঠাসাঠাসি কষাকষি ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি শেষে গড়াগড়ি বাড়াবাড়ি উলটাপালটি লপটালপটি করিয়া বড় শক্তাশক্তির পর একজন জয়ী হয় তাবৎ লোক তাহাকে সাবাসি২ বলিয়া উঠে..”

এই লাফালাফি মাকামাকি ঠাসাঠাসি ঝাঁকাঝাঁকির ঝাঁকুনিতে মজে গিয়ে সৌখীন বাঙালীর মনেও থাকে না যে, কোন দিন ডুমতলায় লেবেডফ আর গোলোক দাসের চেষ্টায় থিয়েটার নামে একটা নতুন কাণ্ডের গোড়াপত্তন হয়েছিল। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চের ক্যালকাটা গেজেটে যে সৌখীন দর্শক সমাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, গেরাসিম লেবেডফ, হয় সেই দর্শক সমাজের মনে কোন দাগ কাটেনি ঐ লেবেডফের থিয়েটার, না হয় সে খবরটা পর্যন্ত ভাল করে পৌঁছয়নি তাদের কাছে। তাই বাঙালীর বাগান-বাড়িতে সেই পুরোনো চালে যথারীতি চলতে লাগল বেগম জান, হিঙ্গুল, আশরুম, জিনৎ, ফৈজ বক্শ, নান্নিজান আর সুপনজানদের নাচ।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের পর তিরিশ বছরের মধ্যে কলকাতার সংবাদপত্রে আর একবারো প্রকাশিত হল না কোন বাংলা নাট্যশালার অভিনয়ের সংবাদ। বাঙালীর সংবাদপত্রে বকেয়া চালে চলতে লাগল নাচের মজলিসের খবর,—

“...দিনেক দুই দিন পূর্ব্বে সাহেব লোকেরদিগের নিকটে টিকিট অর্থাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পঠান গিয়াছিল তাহাতে নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তদ্দিনে নয় ঘণ্টার কালে আসিতে আরম্ভ করিয়া এগার ঘণ্টা পর্য্যন্ত সকলের আগমনেতে নাচঘর পরিপূর্ণ হইল.....অনন্তর কএক তায়ফা নর্ত্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল ইহাতে তদ্বিষয়ে রসিকেরা অত্যন্ত তুষ্টি প্রকাশ করিলেন.....”

প্রকাশিত হতে লাগল কবির লড়াইয়ের সংবাদ,—

“...অনন্তর গানারম্ভ প্রথমতঃ ভবানীবিষয় পরে সখীসম্বাদ, পরে খেউড়। ইহাতে উভয় দলে কবিতা কৌশলে তাল মান বাণস্বরূপ হইয়া ঘোরতর সমর হইয়াছিল সে রণে রসিক বিচক্ষণ সমূহের মনোরঞ্জন হইয়াছিল...”

নাটকে বাঙালীর অভিনয়ের সখ তখনও মিটছে সং-এ—দুধের সাধ ঘোলে।

“গত সপ্তাহে মোকাম চুঁচুড়াতে অনেক ২ আশ্চর্য সং করিয়াছিল। তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরামজীকে রাজা করিয়াছিল ও শ্রীমতী রাধাকে রাজা করিয়াছিল এবং সুন্দর নৌকাতে নৌকাখণ্ড যাত্রা হইয়াছিল এবং শরৎকালীন দশভুজা মূর্ত্তি এবং শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ এই ২ রূপ অনেক প্রকার সং হইয়াছিল...”

ধনবান ব্যক্তির নতুন বাড়ীর গৃহপ্রবেশ উৎসবেও তখন সং হচ্ছে ;—

“ঐ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্লণ্ডীয় বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে, ভাঁড়েরা নানা সং করিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে একজন গো বেশ ধারণ পূর্ব্বক ঘাস চর্ব্বণাদি করিল।”

১৮২২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় খবর বেরোচ্ছে,—

“এইক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে অনেক ২ প্রকার ছদ্ম বেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী দুই সং আইসে দ্বিতীয়তঃ এক সং কলিরাজা তৃতীয়তঃ এক সং রাজার পাত্র চতুর্থ এক সং দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম দুই সং চট্টগ্রাম হইতে আগত এক সাহেব ও এক বিবি, ষষ্ঠ দুই সং ঐ সাহেবের দাসদাসী।...এই অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক ২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে ২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটি হইতে পারে।”

এই নতুন যাত্রার পরিপাট্যের সংবাদ থেকে খবরের কাগজের পাতায় আবার নতুন কোরে বাঙলা থিয়েটারের সংবাদ প্রকাশ হতে লেগেছিল অনেক দিন। ১৭৯৫ থেকে ১৮৩৫ ;—একেবারে পুরো চল্লিশটি বছর। বাঙালীর উদ্যোগে বাংলা নাট্যশালায় বাংলা নাটকের অভিনয়ের সেই প্রথম উদ্যোক্তার নাম শ্রীনবীনচন্দ্র বসু।

কলকাতার সেই প্রথম বাঙলা নাট্যালয়ের পর একে একে এল বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ, এল বেলগেছিয়া নাট্যশালা, এল মেট্রোপলিটান থিয়েটার, পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়, শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েটরিক্যাল সোসাইটি, জোড়াসাঁকো থিয়েটার, বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়, ন্যাশনাল থিয়েটার। একে একে এলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রাজা প্রতাপ সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, মাইকেল মধুসূদন, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। এলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল। এলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর, শিশির ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী,...

এলেন হৃদয়রাম কোঙার।

সেই ১৭৯৫-এর লেবেডফের থিয়েটার থেকে সুরু করে আজকের আমাদের এই জুপিটার থিয়েটার পর্যন্ত বাঙলা থিয়েটারের এই দীর্ঘদিনের ইতিহাসটাকে খতিয়ে দেখছিলুম সাজঘরে একা বসে বসে, এমন সময় এলেন জুপিটার থিয়েটারের বর্তমান লেসী শ্রীহৃদয়রাম কোঙার। ঢুকলেন ঘরে। এবং কোন প্রকার ভূমিকা না করেই বলে উঠলেন : সাংবাদিকদের জন্যে আমি কিন্তু একটা স্পেশ্যাল শো-এর ব্যবস্থা করছি।

বললুম : বেশ তো।

: বেশ তো নয়। ততক্ষণে একটা গোল্ডফ্লেককে অগ্নিসংযোগ কোরে ঘুসি পাকিয়ে টানতে সুরু করে দিয়েছেন হৃদয়রাম। বদন এবং ঘ্রাণ উভয় ইন্দ্রিয়ের পথকেই ধূমায়িত করতে করতে বললেন : বেশ তো নয়, ৬টা পঞ্চাশ নাইটের আগেই করছি কিন্তু।

বললুম : পঞ্চাশ নাইটের হাঙ্গামাটা চোকবার পরে ৬টা করলেই তো চলত।

হাসলেন হৃদয়রাম : ঐ লিখতেই পারেন আর অ্যাকটি-ই

করতে পারেন আপনারা, ঘটে যদি ব্যবসাদারী বুদ্ধি আপনাদের কিছুমাত্র থাকে। আরে মশাই, আগে সাংবাদিকদের ডেকে খাতির করলে তবে তো পঞ্চাশ নাইটের মুখে পাবলিসিটিটা জোরদার হবে। পাবলিসিটির যুগ এটা মানেন তো? সাহিত্যই বলুন, পলিটিক্সই বলুন, ব্যবসাই বলুন আর অভিনয়ই বলুন, পাবলিসিটি ছাড়া গতি নেই। 'কলৌ পাবলিসিটি হি কেবলম্'।

সিগারেট-সমেত ঘুসিতে মুখ লাগিয়ে লম্বা একটা টান দিয়ে নিয়ে বলে চললেন হৃদয়রাম: ঐ যে আপনাদের পি-আর-এস পি-এইচ-ডি প্রফেসর বিধু বাঁড়ুজ্যে;—ঐ যে নাকে চুল, কানে চুল, দাঁত মাজে না সাতজন্মে, চশমার ফ্রেমে একজোড়া গোল কাচের পেপারওয়েট লাগানো যার,—জানেন, উনি কানে কম শোনেন, চোখে কম ছাখেন?

বললুম: জানি।

: জানেন, অভিনয়ের তিনি অ বোঝেন না একেবারে।

: হুঁ।

: সেই বিধু বাঁড়ুজ্যেকে দিয়ে বাণী থিয়েটার কী কাণ্ডটাই করিয়ে নিলে জানেন?

: উঁহু।

: বাণী থিয়েটার নাটক খুলেছে তখন নতুন একটা। প্রথম নাইটেই দেখতে গিয়েছিলুম। সেকেণ্ড অ্যাক্টের থার্ড সিন্-এ নায়ক-নায়িকার দেখা হয়েছে জ্যোছ্না রাতে নদীর ধারে। নায়ক বললে, 'এই শান্ত নদীতীরে আজ আমরা একা।' নায়িকা বললে, 'সত্যিই কি একা?' সঙ্গে সঙ্গে হল-এর মাঝখান থেকে দর্শকদের একজন তারস্বরে বলে উঠলেন,—'আজ নয়। তবে শীগ্‌গিরই হবে বৎসে।'

আমাকে হেসে ওঠবার ফুরসৎটুকু পর্যন্ত না দিয়েই বলে যেতে লাগলেন হৃদয়রাম: তা' সে হেন ট্রাশ নাটককে কি না ঐ বিধু বাঁড়ুয্যের সার্টিফিকেট ছাপিয়ে স্রেফ পাবলিসিটির জোরে জমিয়ে দিলে ব্যাটারা। ওরা বিধু বাঁড়ুজ্যেকে দিয়ে লিখিয়ে নিলে,—"নট+ণক—ক হচ্ছে নাটক। আর, অভি—নী+অলভ্ হচ্ছে অভিনয়। এ-দুয়ের ব্যাপারেই বাণী থিয়েটার যে সাফল্য দেখিয়েছেন তা' 'মুদ্রারাক্ষস', 'শকুন্তলা', 'রত্নাবলী' কিংবা এসকাইলাস-এর 'এগামেমনন'কেও ছাপিয়ে গেছে। ছাপিয়ে গেছে ইউরিপিডিস-এর 'ইলেকট্রা', সোফোক্লিসের 'আন্টিগোন'কেও।"

তার পর 'রসঘন', 'ঘটনার নিবিড়লগ্নতা', 'আঙ্গিকের নিগূঢ় পারিপাট্য', গোছের সব বড় বড় কথা দিয়ে কি সব লিখে শেষকালে লিখলেন,—"ধূমকেতু নাটক গ্রীষ্ম-তাড়িত কলকাতার অধিবাসীদের কাছে নাটাম্রের মতই তৃপ্তিদায়ক।" তার পর সেই প্রশংসা-বাণী বড় বড় অক্ষরে ছাপিয়ে দিলে ওরা কাগজে-কাগজে। ঐসব যোগ-বিয়োগের চিহ্ন দেওয়া সমোক্তিতো আর ঐ 'এগামেমনন' 'ইলেকট্রা' পড়ে পাবলিকের একেবারে চক্ষুস্থির। সবাই বললে, এত বড় একটা দুর্দ্ধর্ষ পণ্ডিত যখন এত বড় কথাটা বলেছে, তখন·····। ব্যস্, দেখতে দেখতে ওদের নাটক কেঁপে-ফুলে বিড়ি থেকে একেবারে সিগার হয়ে উঠল মশাই!

: বিড়ি থেকে সিগার! কথাটা ত জবর বলেছেন।—বললুম আমি।

: আমাদের অ্যাঙ্গলো-বেঙ্গলি মেসিনারী কম্পানীর ডেভিডসন আমার তেলকলের মেসিন সারাতে এসে ওর চেয়ে জবর কথা বলেছিল মশাই এক দিন। বলেছিল, A play is like a cigar. If it is bad, it wou'nt draw; if its good; every-one wants a box.—কথাটা জবর নয়?

তার পর আমার উত্তর কিংবা হাসি শোনবার জন্যে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করেই বললেন: আচ্ছা, 'নাটাম্র' কথাটার মানে কি মশাই, বলুন ত?

: তরমুজ।

: তরমুজ? উফ্! তরমুজের মতন নাটক? য়্যাঁ? কী লাগসই কথাখানা ছেড়েছেন বলুন দিকি বিধু বাঁড়ুজ্যে?—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হৃদয়রাম: একেই বলে পাণ্ডিত্য। তরমুজের মতন তৃপ্তিদায়ক নাটক!—তরমুজ··তরমুজ···

কিছুক্ষণ তরমুজ চর্বণের পর অনুযোগের সুরে বললেন: কত দিন থেকে বলছি, বেশ জবর ভাষায় একটা বিজ্ঞাপনের ম্যাটার লিখে দিন, তা আপনার দ্বারা এত দিনেও হল না!

: কেন লিখে তো দিয়েছিলুম।

: ও তো পানসে মামুলি ভাষা। আরে মশাই, পাবলিসিটি মানে হচ্ছে ঘটকালী। ঘটকের মত একেবারে বেপরোয়া বলতে হবে,—এমন পাত্রটি আর ভূভারতে নেই। চাঁদের মতন রূপ, বেম্পতির মতন বিদ্যে, ভীমের মতন গতর, কুবেরের মত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স। মানে ঐ এগামেমননকেও ছাপিয়ে গেছে গোছের হৈ-চৈ ব্যাপার চাই।

একটু থেমে ছোট-হয়ে-যাওয়া সিগারেটটাকে জানালা গলিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন: কিংবা ঐ জুয়েল থিয়েটারের মতন বড় বড় অক্ষরে লিখতে হবে,—ভারতে তথা এশিয়ায় সর্বপ্রথম ঢাকাই শাড়ির আঁচলার দ্বারা আচ্ছাদিত আরামদায়ক আসন। বিখ্যাত কামস্কাটকা'য় চিত্রকর ফুনিটাবেকা কর্তৃক অঙ্কিত অভিনব দেওয়াল-চিত্র। কিংবা ঐ নাচঘরের মতো,—পটোত্তোলনের নব নব ভঙ্গি; চাষার কুটিরের মাচায় সত্যকার আসল লাউ-কুমড়া; ছেঁচের উপর বৃষ্টিপতন; ছায়াচিত্রের সাহায্যে নায়কের স্বপ্নদর্শন প্রকাশের বিচিত্র ব্যবস্থা; সিনেমা-নর্তকী সুজাতার নাইট-ক্লাব নৃত্য।

একটা অস্থির আক্ষেপের সুরে বললেন হৃদয়রাম কোঙার: কিছু একটা করুন মশাই! আর,—

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একটু খাটো গলায় বললেন: কিছু মনে করবেন না,—নাটকে একটু, মানে ইয়ে, একটু সেক্স ছাড়ুন।

ঠোঁটের ওপর স্পিরিটগামের তুলিটা বোলাতে গিয়েও থেমে গেলুম। তাকালুম হৃদয়রামের মুখের দিকে।

অর্থাৎ?

আহা, বোঝেন না বুঝি কিছু?—নববিবাহিতা তরুণী বধূর মতোই লজ্জাজড়িত হৃদয়রাম কোঙারের কণ্ঠস্বর।

বললুম: বক্ষ মানে বুক, ঋক্ষ মানে ভাল্লুক, অক্ষ মানে চোখ, লক্ষ মানে লাখ,—সবই মনে পড়ছে কিছু কিছু। কিন্তু 'সেক্স' কথাটা কোথাও শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না!

কী যে রসিকতা করেন! তখনও হৃদয়রামের কণ্ঠস্বরে লজ্জাবতী নায়িকার সঙ্কোচ: সেক্সপীয়রের বাংলা যদি সেক্সপীর হয়, তাহলে—

আমার অট্টহাস্যে চাপা পড়ে গেল হৃদয়রামের বাকি কথা।

হাসির বেগটা থামতে বললুম : জলবৎ হয়ে গেল এতক্ষণে। কিন্তু আপনার ঐ 'সেক্স' বস্তুটাকে নাটকে ছাড়তে হয় কি কোরে, সেই বিদ্যেটাই যে জানা নেই মোটে।

নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে জুৎ করে বসলেন এবার জুপিটার থিয়েটারের বর্তমান অধীশ্বর : এই ধরুন সেযুগের থিয়েটারের সখীর নাচ। ঐ যে কথায় কথায় ওরা কখনও তাপসবালা, কখনও হারেমের বাঁদী, কখনও সভানর্তকী সেজে হেলে-দুলে, ঘুরে-ফিরে, গোল হয়ে, তারা হয়ে, অর্দ্ধচন্দ্র হয়ে, একজনের পায়ের তলা দিয়ে আরেকজন গলে গিয়ে, হাতে হাতে শেকল বেঁধে, শুয়ে, বসে, স্বরবর্ণের লি (৯) হয়ে নাচতো, আর নাচতে নাচতে ফুটলাইটের সামনে এগিয়ে এসে পানঠাসা মুখে ফিক্-ফিক্ করে হাসতো,—ওটা কী ?

যন্ত্রচালিতের মতো বলে উঠলুম : সেক্স।

এক্স্যাক্টলি ! ঠিক ধরেছেন ! তবে ও-ধরণের সেক্সতে তো আজকাল চলে না। আজকাল আরো সূক্ষ্ম সেক্স চাই। মানে পালিশ করা সেক্স।

সেটা কী বস্তু ?

মনে করুন, নাটকের নায়িকা সুইমিং-পুলে সাঁতার কাটতে যায়। সেখানে রঙীন্ গোল ছাতার তলায় আমেরিকান টাইপের লেটেষ্ট ডিজাইনের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে নায়িকা তার বান্ধবীদের সঙ্গে। সকলেরই অঙ্গে সাঁতারের পোষাক। এই অবস্থায় তারা প্রেমজরজর নায়িকার সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা করতে করতে হঠাৎ তাকে ঠোনা মেরে নেচে নেচে গান ধরলে একটা। ধরুন কীর্তনই একটা—'সই কে বলে পিরীতি ভাল।' সীনটা তাহলে কেমন জমে বলুন তো ?

আমার জবাবটা শোনবার জন্যে অপেক্ষা না করেই লাফিয়ে উঠলেন নিজের হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে !

: এই রে ! কথা বলতে বলতে খেয়ালই নেই একেবারে। আজ 'বাঙলা দেশ' কাগজের অ্যাড্ভারটিজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের এবং দাস আসবেন ফ্যামিলি পাস্ নিয়ে থিয়েটার দেখতে। গেট্-এর কাছে থাকব বলেছি।

যেতে যেতে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন থমকে : বেশ ভালো করে বিজ্ঞাপনের ম্যাটার কিন্তু একটা রাখবেন মশাই তৈরী করে। ভুলে যাবেন না যেন। আর—

: আর ভবিষ্যতের নাটকে আপনার উপদেশ মতো একটু সেক্স দিতেও ভুলে যাব না।—আমিই বলে দিলুম হৃদয়রামের হৃদয়ের কথাটা।

এবার হৃষ্টচিত্তেই বেরিয়ে গেলেন হৃদয়রাম 'বাঙলা দেশ' কাগজের এবং দাস অ্যাণ্ড ফ্যামিলির জন্য দেড় ডজন ডবলডিমের মামলেট আর চায়ের অর্ডার দিতে।

হৃদয়রামের স্বর্গীয় পিতৃদেবের নাম লোহারাম হলেও ব্যবসাটা তাঁর লোহার ছিল না মোটেই। গভঃ রেজিঃ শিয়াল মার্কা অকৃত্রিম খাঁটি সরিষার তৈলের কাষ্ঠঘানির মালিক ছিলেন তিনি।

মন্দ লোকে বলে, শিয়ালকাঁটা নামক বস্তু বিশেষটির একান্ত কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপই নাকি লোহারাম ট্রেডমার্কে শিয়ালের ছবি ব্যবহার করেছিলেন। কেউ বলে, ওটা নাকি তাঁর ধূর্তামির যথোপযুক্ত প্রতীকচিহ্ন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্কাটা শিয়ালের ছিল না ঠিক। ছিল কথামালার সেই শিয়াল ও দ্রাক্ষাফলের। অর্থাৎ,—"দ্রাক্ষাফল তুল্য রক্তবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর এই তৈলকে যাহারা ভেজাল বলিবে,—তাহারা ঐ কথামালার শৃগালের মতই মিথ্যাভাবী।"

পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর পিতৃদত্ত কাঠের ঘানি ঘুরিয়ে দিব্যি তৈলাক্ত হয়ে উঠেছেন যখন হৃদয়রাম, ঠিক তখনই পাড়ার 'বাহির মাণিকতলা অবৈতনিক নাট্যসঙ্ঘের' ছেলের দল হৈ হৈ কোরে ক্লাবের সভাপতি বানিয়ে দিলে তাঁকে। সভাপতি হয়েই হৃদয়রাম 'সঙ্ঘ' মুছে দিয়ে করে দিলেন 'সংস্থা'।

সকলে বললে,—একেই বলে আধুনিকতা !

হৃদয়রাম পকেট থেকে মণিব্যাগ বের করে বললেন,—পাঁচ টাকার গরম সিঙ্গাড়া নিয়ে এস হে কেউ চটপট্।

নাট্যসংস্থার সপ্তম অবদান 'কেদার রায়'-এর রিহার্স্যাল চলে ঢিমে তেতালে। মাঝে মাঝে ক্লাবের দরজায় এসে দাঁড়ায় লোহারাম অয়েলমিলের ভ্যানগাড়ী। হৃদয়রাম রিহার্স্যাল শোনেন। ভ্যানগাড়ী থেকে আসে তিন চ্যাঙাড়ী আলুর চপ আর সন্দেশ। সামনের চায়ের দোকান থেকে আসে চা। রিহার্স্যালের পর অভিনেত্রী মঞ্জুলিকা পালকে বাড়ি পৌঁছে দেন হৃদয়রাম।

মঞ্জুলিকা পালকে বাড়ি পৌঁছে দিতে দিতে ক্রমেই নিজের আর বাড়ি ফেরা হয়ে ওঠে না হৃদয়রামের। হৃদয় হারান হৃদয়রাম মঞ্জুলিকার কুঞ্জবিতানে। এবং অবশেষে, একদিন দেখা যায়, ঘূর্ণায়মান কাঠের ঘানির লাভের টাকায় জুপিটারের ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ লীজ নিয়েছেন হৃদয়রাম। খুলছেন নাটক মঞ্জুলিকাকে নায়িকা কোরে।

কিন্তু মঞ্জুলিকাকে কে বাঁধিতে পারে ? তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে, নব নব হৃদয়রামে সুতীব্র পুলকে !

চঞ্চলা মঞ্জুলিকা একদিন হৃদয়রামের কাঠের ঘানি ছেড়ে বাসা বাঁধলে কোন্ টাগরমলের লোহার গদীতে !

মঞ্জুলিকা গেল ; কিন্তু জুপিটার থিয়েটারের ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের নেশায় তখন জড়িয়ে গেছেন হৃদয়রাম। তাই কাঠের ঘানি আর ষ্টেজের ঘানি ঘুরতে লাগল একই সঙ্গে। প্রথমটি দেয় তেল ; দ্বিতীয়টি মধু। একটাতে মেটে পেটের ক্ষিধে, আরেকটাতে মনের।

[ ক্রমশঃ।

# আমার বীণার সুর

**বকুল বসু**

[...]দিন কলহাস্যে সুষমায় তোমার সে অবিদিত কথা
[...]মার কুঞ্জবনে তুমি পাখী উড়ে যাবে বাতায়নে যথা তথা,'
[...] মুহূর্ত-যুগ পরে স্মরণের পাখায় পাখায়
[...]মার উত্তর পাই দীনতম সুরে ডানামেলা গানের ভাষায়।

আমার বীণার সুর অসীম অনন্ত ঝাপটিয়া কোন দিন হায়
লবে না ক্রন্দন তুলি যাবে না হারায়ে দীনতারে কভু দেবে না আশ্রয়,
কোন দিন অতীতের বারতা লয়ে তোমার স্মরণনদীর কূলে,
জীবনের নবনীত খেয়াপথে এ কুটিরে দেবে না কি দেখা ভুলে ?

# ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

## জর্মনি

### এক

প্যারিসে দিন সাতেক কাটিয়ে পল্লব জর্মনি রওনা হ'ল। ট্রেনে দুধারে ছোট-বড় সবুজ ক্ষেত দেখতে দেখতে ওর মন উদাস হ'য়ে যায়। মোহন ও কুঙ্কুম দুজনেই আজ কতদূরে। কুঙ্কুম দেশে ফিরে গেছে, মোহনলালও রিতাকে নিয়ে রওনা হ'ল বলে। শুধু সে-ই প'ড়ে রইল একা বিদেশে—গান শিখতে!

তার একটুও ভাল লাগে না। কী হ'বে এ দেশের গান শিখে? কিন্তু না, 'স্টেডি' হ'তে হবে। কুঙ্কুমের কথা মনে পড়ে: দেশকে জাগাতে হবে গান গেয়ে—জপ করে মনে মনে।

ট্রেনে এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ও ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখল, জাহাজে ক'রে দেশে ফিরছে, অদূরে দেখা যায় দেশের মাটি! ওর সর্বাঙ্গে পুলক জেগে ওঠে। জাহাজ থেকে নামতেই দেখে একদল স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে কুঙ্কুম ওকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে, গাইতে গাইতে:

"ভারত আমার, ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।"

পল্লব আশ্চর্য হ'য়ে বলে: এ কী! কুঙ্কুম! তুমি গান গাইছ?

কুঙ্কুম হেসে বলে: যার বন্ধু সার্বভৌম চারণ, গান করা থেকে তাকে ঠেকায় কে? ধরো—

কিন্তু বলতেই ওদিক থেকে রিতা ধরল: Allons enfants de la patrie—la jouv de gloive est arrivé...

সঙ্গে সঙ্গে পল্লব ধ'রে দেয় এর বাংলা প্রতিরূপ:

"ভারত রাত্রি প্রভাতিল যাত্রী! অরুণ শঙ্খ ঐ বাজিল রে!"...

সঙ্গে সঙ্গে কুঙ্কুম মোহনলাল ও স্বেচ্ছাসেবকের দল কোরাস ধরে: "চল আগে···চল আগে···নব জাতির জীবন জাগে···নব প্রেমে রাঙিল রে!"

ঘুম ভেঙে গেল···ট্রেন চলেছে বিদেশ বিভুঁয়ে ভু-ভু ক'রে। ওর দুচোখ জলে ভরে আসে···আহা! স্বপ্ন যদি বাস্তব হ'ত, আর বাস্তব হ'ত স্বপ্ন!...

### দুই

কলোনের বিখ্যাত গির্জার চেয়ে কিন্তু পল্লবের ভালো লাগল রাইন নদীর অনিন্দ্য শোভা। কলোনে ও একটা হোটেলে দিন সাতেক কাটালো শুধু রাইনের বুকে স্টীমারে করে ঘুরে বেড়াতে। কী অপরূপ নদী! দুধারে গাছপালার কী বাহার! সবুজের যেন আগুন লেগেছে! ওর কেবলি মনে পড়ে— রাইন উপত্যকা সম্বন্ধে বাইরণের দুটি অবিস্মরণীয় লাইন:

"There can be no farewell to scenes like thine:
The mind is coloured by thy every hue!....

কলোন থেকে গেল বন্-এ বীটোভেনের জন্মস্থান। সে তাঁর বিখ্যাত আবাসটি দেখতে না দেখতে ওর মনে উ জেগে উঠল। ভারতবর্ষে এ-হেন দীপ্তচরিত্র জন্মেছে বটে সাহিত্যে, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে, কিন্তু সঙ্গীতে এমন যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে কবে? মনে পড়ল বীটোভে জীবনের একটি ঘটনা: একদিন কবি গেটে ও বীটোভেন ব ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ পাশ দিয়ে চলে গেল জর্মনর চৌঘুড়ি। গেটে টুপি খুলে হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। বীটো টুপি না খুলে ঋজু হ'য়ে দাঁড়িয়েই গেটেকে ভর্ৎসনা বললেন: টাকা ছাড়া রাজার কী আছে শুনি? যে আমার আছে বিশ্ববিজয়ী প্রতিভা। টুপি খুলবে তো র আমাদের সামনে।

ভাবতে ভাবতে ওর বুকের মধ্যে গৌরবের জোয়ার ওঠে ও বীটোভেনের মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে টুপি খুলে প্রণাম ক মনে পড়ল এক ইংরাজ কবির উচ্ছ্বাস:

Heaven is music, and Thy beauty's
Birth is heavenly!

### তিন

কিন্তু 'সাইট-সীইং' যাদের স্বধর্ম তাদের দলে পল্লব কোনো নাম লেখায় নি। তাই দিন কয়েক যেতে না যেতে ও অতিষ্ঠ উঠল। মনে পড়ে কেবলই কুঙ্কুমের কথা: সময় বৃথা নষ্ট কিছু নয়—দেশকে জাগাতে হবে। বার্লিনে গিয়ে আর গান শেখ না করলেই নয়। কুঙ্কুম ওকে দিয়েছিল ওর বন্ধুর নাম-ঠিক ও তাকে তার করল—সামনের রবিবার সকালে অমুক ট্রেনে ব পৌঁছিবে। রুডল্‌ফ্‌ মান্‌ পিঠ-পিঠ জবাব পাঠালেন টেলি willkommen (স্বাগতম্)—বাস; পল্লব বলল মনে মনে—ব লোক বটে! একটি বৃথা কথাও নেই।

পল্লব নিশ্চিন্ত হ'য়ে কুঙ্কুমকে আর মিসেস নর্টনকে লি যে ওর ভ্রমণ সারা হ'ল, শুধু পঠন সুরু হওয়া বাকি।

*　　*　　*　　*

রুডল্‌ফ মান বার্লিনের বিরাট পৎসদাম ষ্টেশনে পল্লবকে বের করল বৈ কি। ওর কাছে এসেই টুপি খুলে একগাল হেসে হের বাগচি? পল্লব আশ্বস্ত হ'য়ে টুপি খুলে বলল: য়া হে হের মান! অতঃপর যথাবিধি সুশীল হাসি, করপীড়ন, সম্ভাষণ ইত্যাদি।

পল্লব কুঙ্কুমের উপদেশ মত কেম্ব্রিজে মাস তিনেক জর্মন কথা কওয়ার তালিম নিয়েছিল জনৈক জর্মন অধ্যাপকের কাছে।

*　　*　　*　　*

বিখ্যাত "কুরফুরস্ত ডেন্দাম" রাজপথে গেতাই মরাং মস্রেস্ এক বৃদ্ধ জেনেরাল বাস করতেন ততোধিক বৃদ্ধা স্ত্রীকে নিয়ে। ভদ্র তথা ঋজু তথা কেতাদুরস্ত। রুডল্‌ফ ওকে তাঁদের আ পেশ ক'রে বিদায় নিল।

পল্লব আরো ভরসা পেল গেহাইমরাতের সুন্দর ফ্ল্যাটে কী চমৎকার সেন্ট্রাল হীটিং! ইংলণ্ডে এযাবৎ শুধু গৃহচুল্লী এসেছে। সেন্ট্রাল হীটিং-এ ঘর এক ভাবে গরম থাকে— গরম রাখে শুধু কাছের মানুষকে, একটু দূরে গিয়ে বসেছ কি গেছ হাড়কাঁপুনি শীতে! নাঃ, বিজ্ঞান মানুষের বন্ধু বৈ কি!

পরদিনই রুডলফ পল্লবকে নিয়ে গেল শতের্ণেশ কনজারভেটোরিয়ামের ( Sternes Conservatorium ) ডিরেক্টরের কাছে। ডিরেক্টর ওকে এক রুশ বেহালাবাদক ও এর্ন্স্টশুলৎস নামে এক গীতিশিক্ষকের কাছে বেহালা শেখা ও কণ্ঠসাধনার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। বেহালা বাজাতে ওর ভালো লাগলেও প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'য়ে উঠল দুদিনেই। কিন্তু খাস জর্মন পদ্ধতিতে কণ্ঠ সাধনা করতে না করতে ও উল্লসিত হ'য়ে উঠল। গীতিশিক্ষক ওকে আরো পুলকিত করে তুললেন বিস্ময় প্রকাশ ক'রে: বিদেশীর কণ্ঠ আমাদের জর্মন কণ্ঠ সাধনার পদ্ধতিতে এত সহজে সিদ্ধিলাভ করতে পারে—এ আমি চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না···ইত্যাদি—শুধু তাই নয়, তিনি ওকে বললেন যে, ও যদি মাত্র চার পাঁচ বৎসর ইতালিয়ান ও জর্মন গান শেখে তবে যে কোনো অপেরায় গান গেয়ে প্রচুর টাকা উপায় করতে পারে। পল্লব শিউরে উঠে তাঁকে বলল: ধন্যবাদ মাইনর হের্। আপনাদের অপেরায় ঢুকে এদেশের গান গেয়ে টাকা করা আমার জীবনের অন্তিম লক্ষ্য নয়।

হের শুলৎস চক্ষু কপালে তুলে বললেন: In Gottes Namen ! Was meinen sie ? Man sagt : Reichtum ist kein ungliick. ( ১ )

পল্লব হেসে বলে: Aber sagt man nieht auch : wer genug hat ist reich ? ( ২ )

হের শুলৎস নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বললেন: Verzeihen Sie—sie sind noch nicht trocken hinter den onren, mein Herr ! ( ৩ ) রক্ত গরম মানেই মাথা গরম। তবে আর কী বলুন? আমি শুধু আপনার ভালো ভেবেই বলতে গিয়েছিলাম—খানিকটা কর্তব্যবোধেই বলব—যে আপনার কণ্ঠসম্পদকে নষ্ট করবেন না। এত বড় মূলধন নিয়ে খুব কম মানুষই জন্মায়—অন্তত: আমাদের মতে। আউফ হ্বীদারসেহেন! ( ৪ )

## চার

বার্লিনে এসে পল্লবের মন অনেকটা সুস্থ বোধ করল। কুঙ্কুমকে বলেছিল—রুডলফ কথা রেখেছে। কুঙ্কুম ওকে বলেছিল—বার্লিনের ভারতীয় ক্লাবে কয়েকটি লোকের সঙ্গে আলাপ করতে: মহৎ বিপ্লবী, যাঁদের দেখাও পুণ্য—দেশের জন্যে দেশত্যাগী—ইত্যাদি।

পল্লব বিপ্লবী শুনে খুব ভরসা পায়নি। কিন্তু কুঙ্কুমের কথা রাখতে গেল ভারতীয় ক্লাবে—যদিও বুক গুর গুর ক'রে উঠল যেদিন ওর আলাপ হ'ল বিখ্যাত হের, চট্টোর সঙ্গে। ইনি আজ দশ বছর অনিকেত অবস্থায় সারা যুরোপে ভ্রাম্যমান। বিয়ে করেছেন এক সুইড, বিধবাকে। তাঁর দৌলতে ওর আরো ভারতের নানা প্রদেশের বিপ্লবীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। কুঙ্কুমের সুপারিশপত্র ছিল, কাজেই সবাই ওকে বলল: স্বাগতম্।

সেখানে কিন্তু ওর সব চেয়ে ভালো লাগল যাকে সে আদৌ বীর কি বিপ্লবী নয়। কাজেই তাকে হাজার দেখলেও পুণ্য বাড়বার কথা নয়। অথচ তবু ওর মন টানল এই অ-বীর ও অবিপ্লবী—যে দুনিয়াকে রঙিন চোখে তো দেখেই না, এমন কি শাদা চোখেও নয়—দেখে স্রেফ সংশয়ীর চোখে।

বন্ধুটির নাম য়ুসুফ। বিচিত্র মানুষ! দেশ থেকে বি, এ পাশ করে প্রথমে যায় ইতালিতে চিত্র-বিদ্যা শিখতে, তার পর অক্সফোর্ডে দর্শন পড়তে। তারপর সারা য়ুরোপে খামখেয়ালে ঘুরে ঘুরে কেবল ভাষার পর ভাষাই শেখে: ফরাসি ও জর্মন তো বটেই, তার উপর ইতালিয়ান স্পানিশ, পোলিশ—সর্বোপরি রুশ। পল্লব ওকে জলের মতন এতগুলো ভাষা বলতে শুনে অবাক্—বিশেষ ক'রে ওর মুখে অনর্গল রুশ ভাষা শুনে। যৌবনের উচ্ছ্বাস—যা দেখে তাকেই পূজার বেদীতে চড়ায়। পল্লবও য়ুসুফকে বরণ ক'রে নিল কসমোপলিটান কালচারের আদর্শ মুখপাত্র বলে। আরো এই জন্যে যে য়ুসুফ ছিল একটি রুশ সিনেমার প্রডিউসার।

কিন্তু শুধু ওর নানা ভাষাকুশলতাই নয়, য়ুসুফের অনেক কিছুই ওর ভালো লাগল—বিশেষ করে ওর সংস্কারমুক্ত মন। বুঝি মোহনলাল ওর সংস্কার থেকে এতটা মুক্তি পায় নি! য়ুসুফকে দেখে ওর কেবলি মনে হ'ত ভাগবতের অবধূতের কথা—যে কোনো কিছুতেই নেই, অথচ সব তাতেই আছে।

কিন্তু না, অবধূতের উপমা দেয়ই বা কেমন ক'রে? অবধূত তো শুধু সামাজিক সংস্কারমুক্তই নয়, পরমানন্দের অসীমে আসীন: য়ুসুফের কোথাওই নেই আশ্রয়। অবধূত সব কিছু থেকেই কিছু নেয়—কিছু বাদ দিয়ে: য়ুসুফের কোনো কিছুতেই মন বসে না—সব কিছুতেই অবিশ্বাস।

সত্যি, এমন মানুষ ও কস্মিন্‌কালেও দেখেনি—যে না বিশ্বাস করে ডিমোক্রাসিকে, না বলশেভিসমকে; যার না আস্থা আছে নমাজ পড়ায়, না ধ্যান-ধারণা প্রতিমা-পূজায়; যে পুসিফুটের নাম শুনলে হাসে আবার মাতাল দেখলে করে ভ্রূকুটি; যে নারীর অটল সতীত্ব শুনলে বলে—উঃ! আবার সাফ্রেজিষ্ট আন্দোলনের উল্লেখে বলে—দূর! না পুনর্জন্ম—না নির্বাণ; না বন্ধন না মোক্ষ; না মূর্খতা—না কালচার। তবে কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে মানুষ—সব বিষয়েই সংশয় যার স্বধর্ম? শেষে কী সর্বনাশ!—ও নতুন কিছুতে সংশয় প্রকাশের আর অবকাশ না পেয়ে শেষে সংশয়ী হ'য়ে উঠল কি না ওর নিজের সংশয় সম্বন্ধে! পল্লব ভাবে আর হাসে, আর যতই হাসে ততই যেন ওকে ভালোবেসে ফেলে আরো—আরো। এমন সৃষ্টিছাড়া মানুষ যে সৃষ্টিতে আছে কে জানত?

## পাঁচ

য়ুসুফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে পল্লবের আর কিছু লাভ হোক বা না হোক একটা মস্ত লাভ হ'ল এই যে, ওর মনে রোখ চেপে উঠল যে এ-হেন নানা ভাষা-ধুরন্ধরের বন্ধু হ'লে খানিকটা অন্তত: তার সারূপ্য অর্জন করতে হবে; কম ক'রেও চারটে য়ুরোপীয় ভাষা শেখাই চাই!

---

১। ভগবান, ভগবান! বলেন কী? বলে—টাকা থাকাটা দোষ নয়।

২। কিন্তু এ-ও বলে না কি—যে অল্পে তুষ্ট সেই ধনী?

৩। ক্ষমা করবেন— আপনি এখনো কাঁচা আছেন মহাশয়!

৪। Auf Wiedershen—ফের দেখা হবে

একদিন বলল ওকে একথা। তাতে য়ুসুফ বলল: হয়েছে। ইউরেকা। আমার কেবল এই একটি জায়গায় সংশয় নেই যে বিদেশকে জানা ও চেনা বাঞ্ছনীয়, আর বিদেশীকে ভালো ক'রে জানতে চিনতে হ'লে সব আগে চাই তার ভাষা শেখা। কারণ প্রতি জাতের অন্তরাত্মা খতিয়ে ফুটে উঠেছে তার ভাষার মাধ্যমেই তো। 'অতএব হে তরুণ স্বপনী,' বলে য়ুসুফ ওর চিরাভ্যস্ত ব্যঙ্গের সুরে, 'কোমর বেঁধে শেখো নানা ভাষা।' তবে চারটে ভাষা যথেষ্ট নয়, মিনিমাম হ'ল পাঁচ—The ideal number—যেহেতু ইংরাজি, ফরাসি, জর্মন ও ইতালিয়ান হ'ল অতীত তথা বর্তমান জগতের প্রতিনিধি, রুশ ভাষা হ'ল ভবিষ্যতে জগতের অগ্রদূত। তবে রুশ ভাষা একটু কঠিন; শিখো পরে—এই চারটে ভাষা শেখা হ'লে তবে। হ্যাঁ, আমি জানি কার কাছে শিখলে সুবিধে হবে: ফ্রাউ ক্রামার। বিপদ নেই এতে, যেহেতু তিনি ফ্রয় লাইন নন—ফ্রাউ (৫) বিধবা বর্ষীয়সী, ক্লান্তিহীনা পৃথিবীরই ম'ত—এযাবৎ আশী বার ঘুরেছেন সূর্যের চার ধারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, তিনি একজন খাঁটি অভিজাত, সুরসিকা, তীক্ষ্ণধী ও আনন্দময়ী। তোমার তাঁকে ভালো লাগবেই লাগবে। কেবল তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'তে না হ'তে তুমি আমাকে অবজ্ঞা করবে এই যা ভয়। মক্কেল হারাতে চায় কে?

সে কি?

আর সে কি! আমি জানি মাত্র সাতটা ভাষা। তিনি জানেন এগারটা।

বলো কী!

য়ুসুফ হাসে: আরো একটি ভয় আছে কেবল এবার তোমার জন্যে।

ভয়? কিসের?

বর্ষীয়সীরা বড়ই সাবধানী আর বিজ্ঞ তো। কাজেই বেজায় উপদেশ দেন। তুমি ভাই, এখনো বিজ্ঞ হ'তে পারোনি, অসাবধান হ'য়ে খাসা তর-তর ক'রে চলছ—শিখছ ঘা খেতে খেতে, পরের মুখে ঝাল খেয়ে নয়। তাই ভয়। কিন্তু না, কুঙ্কুম সেন যার পরম বন্ধু সে সহজে সাবধানী হ'তে পারবে না। তাই চলো ফ্রাউ ক্রামারের কাছে তোমাকে দাখিল ক'রে দিই। আরো এই জন্যে যে, তাঁর চমৎকার সার্ল আছে। সেখানে রকমারি শিল্পী আসেন, তোমার লাগবে ভালো।

পরদিন য়ুসুফ পল্লবকে নিয়ে গেল ফ্রাউ ক্রামারের কাছে পেশ করতে। তিনিও থাকতেন ফ্রেদেরিক শত্রাসে। নিজের বাড়ির তিন তলায়।

## ছয়

ফ্রাউ ক্রামারের বয়স একাশী। আমেরিকায় তাঁদের হীরা-মুক্তার মস্ত কারবার ছিল। হের ক্রামার ছিলেন উদ্যমী বণিক, তার উপর আমেরিকার আবহাওয়া দেখতে দেখতে হ'য়ে উঠলেন নিযুতপতি। ফ্রেদেরিক শত্রাসে একটি প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি কিনে ধূমধাম সুরু ক'রে দিলেন। গৃহিণী অসামান্যা সুন্দরী, বিদুষী, এগারটা ভাষা জানেন। সব জাতের সঙ্গেই হৃদ্যতা। তার উপরে চমৎকার সার্ল। কাজেই ক্রামার-গৃহ হ'য়ে উঠল বার্লিনের শ্রেষ্ঠ কালচারের একটি আদর্শ পীঠস্থান।

এমনি সময়ে বাধল ১৯১৪-র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। নিয়া[তির] পরিহাস, আমেরিকায় ক্রামারদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত [হ'ল]। তারপর জর্মন নোটের পতন—যে-মার্কের দাম ছিল এক শিলিং সে-এক ফার্দিং-এরও মর্যাদা পেল না। পল্লব যখন বার্লিনে [এল] ১৯২১এ—তখন মার্ক ফের খানিকটা উঠেছে বটে, তবু পাউণ্ডে মেলে হাজার মার্ক,—কুড়ি মার্কের জায়গায়। যুদ্ধের [পর] মার্কের বাজার-দর আরো প'ড়ে যায়। ফলে ক্রামারের ব্যাঙ্কে ম[জুদ] দশ লক্ষ টাকার মূল্য দাঁড়াল দশ হাজারেরও কম।

দুঃখে ক্রামার ফ্রাউ ক্রামারকে নিয়ে গেলেন সুইডেনে নতুন বা[স] করতে। সেখানে একদিন নৌকাবিহার করতে গিয়ে ফ্রাউ ক্রা[মার] জলে পড়ে যান। হের ক্রামার ঝাঁপিয়ে পড়লেন বৃদ্ধা স্ত্রীকে বাঁচা[তে]। বৃদ্ধা বাঁচলেন কিন্তু তীরে এসে বৃদ্ধের ফুসফুস গেল থেমে। শি[ক্ষিতা] পতিব্রতা বার্লিনে ফিরে এলেন: 'তুজনায় বাহির হ'য়ে ফি[রিলাম] একা ঘরে।'

ফ্রাউ ক্রামারের বয়স তখন ছিয়াত্তর। তু'টি মাত্র মে[য়ে]। একজনের বিয়ে হয়েছিল আমেরিকায় আর একজনের রুশ দে[শে]। উভয়েই বিধবা মা-র ভরণ-পোষণের ভার নিতে রাজি ছিলেন, কি[ন্তু] তেজস্বিনী বৃদ্ধা লিখে পাঠালেন: ধন্যবাদ! আমি অস্তত য[ত দিন] না শয্যা নিচ্ছি, কারুর গলগ্রহ হব না।

তিনি নিচের তুটি ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে নানা জা[তির] ছাত্র-ছাত্রীকে নানা ভাষা শিখিয়ে জীবিকা উপার্জন কর[তে সু]রু করলেন। ত্রিশ-চল্লিশটি ছাত্র-ছাত্রী জুটল—কাজেই ওঁর কোন প্রকা[রে] চ'লে যেত। পল্লব ওঁর কাছে জর্মন ও ইতালিয়ান ভাষায় তা[লিম] নিতে আরম্ভ করল।

## সাত

ফ্রাউ ক্রামার ছিলেন সত্যিই আনন্দময়ী। পল্লবকে বরণ কর[লে]ন সহজ আনন্দে। পল্লব রোজ সকালে এক ঘণ্টা ক'রে ইতালিয়ান[ে] এক ঘণ্টা ক'রে জর্মন ভাষায় কথা কইবার চেষ্টা করত। ফ্রাউ ক্রামা[র] বলতেন: কথা-আলাপের মধ্যে দিয়ে ভাষা শিক্ষাই সবচেয়ে সহজ [ও] শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি—শিশুরা শেখে যে-ভাবে। ফলে তু-তিন মাসের মধ্যেই পল্লব জর্মন ও ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলতে শিখল মোটামুটি। ফরাসি ভাষাটা ও আগেই শিখেছিল, বিশেষ ক'রে রিতার দৌলতে। ও ভাবল, আর কয়েক মাস পরেই রুশ ভাষায় তালিম নেওয়া সুরু করবে—ফ্রাউ ক্রামারের কাছে। রুশ ভাষা তিনি এমন কি য়ুসুফে[র] চেয়েও দ্রুত বলতেন। তাঁর রুশ জামাতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওঁর রুশ ভাষায় প্রবেশ এত স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর হ'য়ে উঠেছিল।

এই রুশজামাটি ওঁকে মস্কো থেকে প্রায়ই লিখত বার্লিনে অ[ত] কষ্ট ক'রে না থেকে মস্কোয় আসতে। কিন্তু জামাই ১৯২০ সা[লে] হঠাৎ চেকা পুলিশে ঢুকে হঠাৎ-নবাব হ'য়ে উঠেছিল ব'লে তি[নি] তার নাম শুনলেই কানে আঙুল দিতেন। রুশদেশের পুলিশ[ের] অকথ্য অত্যাচারে তেজস্বিনীর স্বাধীন মন বিদ্রোহিনী হ'[য়ে] উঠেছিল। বলশেভিসমের নামও তিনি সইতে পারতেন না।

কিন্তু শুধু এই জন্যেই নয়। আসলে ফ্রাউ ক্রামার ছি[লেন]

৫। Frau = Mrs. Fraulein = Miss

একটি আশ্চর্য বৃদ্ধা—যুসুফের ভাষায়। যা ধরতেন ছাড়তেন না, যা ছাড়তেন তার দিকে আর ফিরেও তাকাতেন না। তাই বার্লিনে থাকবেন যখন স্থির করলেন, তখন সে সংকল্প বজায় জন্ত সুরু করলেন দিনে সাত আট ঘণ্টা ক'রে ছাত্রছাত্রীদের ভাষা শিক্ষা দিতে।

তাঁর কেবল একটি আনন্দ ছিল : প্রতি রবিবারে তাঁর সাল'-তে নানা শিল্পীদের ডাকা, তাদের গান শোনা, তাদের সঙ্গে আলাপ করা, যা পারেন তাদের খাওয়ানো—যদিও চা ও একটু-আধটু কেক স্যাণ্ডুইচ ছাড়া কোনো এলাহি ভোজ্যের সংস্থান করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

## আট

ফ্রাউ ক্রামারের ফ্ল্যাটের নিচের তলায় থাকতেন একটি জর্মন এঞ্জিনিয়ার—আডলফ গুৎমান্। পল্লবের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় ফ্রাউ ক্রামারের সাল'তেই। পল্লবের গুৎমানকে ভালো লেগে গেল বিশেষ ক'রে এই জন্তে যে, ও ছিল জর্মন সঙ্গীতের এক পরম বোদ্ধা। পল্লব জর্মন গান শিখছে শুনে গুৎমান্ উৎসাহিত হ'য়ে ওকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করত ওর ফ্ল্যাটে আর শোনাত কত যে জর্মন রেকর্ড—বলত কত জর্মন সঙ্গীতকারের জীবনী বীতোভেন, মোৎসার্ট, মেণ্ডেল্সন, ভাগনার···বুঝিয়ে দিত কোন সঙ্গীতকারের প্রতিভা কী ভাবে নবসৃষ্টির পথ কেটে নিয়েছে। কেবল ওর একটি প্রবণতা পল্লবের ভালো লাগত না—ও জর্মন ছাড়া আর কোনো জাতির সঙ্গীত নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করত না। যুসুফ পল্লবকে বলত, থের গুৎমান হলেন সঙ্গীতরাজ্যে পেট্রিয়ট—যা নেই জর্মনিতে তা নেই কোথাও—এই ভাব। ওঁদের জাতীয় সঙ্গীত তো জানো : Deufschland iibsr alles—জর্মনি সবার উপরে! কিন্তু পল্লবের মন তবু ওকে বরণ ক'রে নিয়েছিল এইজন্তে যে, নিজের এলাকায় ও একজন খাঁটি বোদ্ধা। জর্মন জাতির উগ্র স্বাজাত্য বোধ সম্বন্ধে অনেক কিছু ও জানতে পেরেছিল এই মানুষটির কাছে। কেবল ভাবত মিষ্টার টমাসের কথা : যে এ-যুগের বাণী দেশভক্তি নয়—বিশ্বভৌমিকতা।

## নয়

পল্লবের সবচেয়ে ভালো লেগে গেল ফ্রাউ ক্রামারের দোতলার বাসিন্দাদিগকে। তিন বোন—খাস রাশিয়ান। ওদের ওখানে পল্লব প্রায়ই সন্ধ্যায় গিয়ে আড্ডা দিত—সামোভার থেকে পরিবেশিত রুশ চা-র সঙ্গতে।

ওদের অভিভাবক, বড় দাদা, মস্কোতে ময়দার মিলে যুদ্ধের আগে অনেক টাকা করেন। কিন্তু ১৯১৪-র যুদ্ধের উৎপাতে ওদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়—তিনটি মিলের মধ্যে দুটি হয় অচল—মিলের শ্রমিকরা সৈনিক হয়ে জর্মন ফ্রণ্টে চলে যাওয়ার দরুণ। একটি মিল কোনোমতে চালাতেন ওদের দাদা—বহু কষ্টে। লেনিন দণ্ডধর হবার সঙ্গে সঙ্গে—১৯১৮ সালে ব্রেষ্ট লিটস্কের সন্ধির পরে—শ্রমিকরা অনেকে মস্কোয় ফিরে এলে এ-তৃতীয় মিলটি তিনি ফের খানিকটা খাড়া করেন বটে, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে অত্যধিক মানসিক উদ্বেগ তথা শারীরিক পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ফলে মিল থেকে আশানুরূপ আয় হ'ত না। এই তিন বোন তখন বার্লিনে চলে আসে দাদার ভার খানিকটা লাঘব করতে। বার্লিনে ওরা কোনোমতে নিজেদের জীবিকা উপার্জন করত। দুটি বোন বার্লিনের এক স্কুলে রুশ ভাষার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হয়েছিল। বড় বোন খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারত ব'লে এখানে-ওখানে ছোট-খাট কন্সার্ট দিয়ে কিছু টাকা পেত। ফলে তাদের স্বচ্ছন্দে না হোক—চলে যেত। বড় বোনের আশা ছিল—ক্রমশ সে কন্সার্টে বেশি টাকা উপার্জন করবে। ছোটো দুটি তারই মুখ চেয়ে ছিল। সর্বকনিষ্ঠা মস্কোতেই থাকত দাদার দেখাশুনো করতে—দাদা তাকেই ভালোবাসতেন সবচেয়ে বেশি।

## দশ

এই তিন বোনের মধ্যে বড়টির সঙ্গেই পল্লবের বেশী বনিবনাও হ'য়ে গেল। ওর নাম—নাতাশা ইভানোভনা চের্তকফ। বয়স বছর ছাব্বিশ—পল্লবের চেয়ে চার পাঁচ বৎসরের বড়। দেখতে সাধারণ সুন্দরী বলা চলে না—যদিও যৌবনের জৌলুষ ওর দেহ থেকে তখনো বিদায় নেয় নি।

পল্লবের ওকে ভালো লেগে গেল প্রধানত ওর পিয়ানো শুনে। কোনো এমেচার মেয়েকে ও কখনো এমন চমৎকার পিয়ানো বাজাতে শোনে নি। নাতাশা যখন তন্ময় হ'য়ে পিয়ানো বাজাত তখন ওর শাদামাটা মুখও উঠত এক অপরূপ আভায় দীপ্ত হ'য়ে। পল্লবকে ও প্রায়ই বলত—ওর উচ্চাশার অন্ত নেই, ও চায় পিয়ানো বাজিয়ে সত্যিকার গুণীদের মধ্যে নাম করতে, তাই নিয়মিত যেত বার্লিনের বিখ্যাত পিয়ানিষ্ট বুসোনির কাছে পিয়ানোর টেকনিক আরো আয়ত্ত করতে।

পল্লব অবাক হ'য়ে গেল। মানুষ টাকার জন্তে, চাকরির জন্তে, পড়ার জন্তে স্বদেশ ছেড়ে দেশান্তরে গিয়ে প্রবাস-জীবন যাপন করে বৈ কি! কিন্তু মস্কো ছেড়ে বার্লিনে বসবাস করা শুধু একজন বড় পিয়ানিষ্টের কাছে অঙ্গুলি-নৈপুণ্য অর্জন করতে—একে সে কী নাম দেবে ভেবে পায় না, আরো এইজন্তে যে, সে দেখত নাতাশার দশটি আঙুল পিয়ানোর বোর্ডের উপর সময়ে সময়ে এত দ্রুতবেগে দৌড়য় যে চোখে দেখাই যায় না প্রায়। একদিন থাকতে না পেরে নাতাশাকে বলল : তুমি বুসোনির কাছে আরো কী শিখবে শুনি? যে-মেয়ে বার্লিনে এসে খাস জর্মনদের মধ্যে কন্সার্টে পিয়ানো বাজিয়ে বৎসর খানেকের মধ্যেই নাম ক'রে ফেলেছে, যার পিয়ানো শুনে সমঝদাররাও হাততালি দেন—সে আরো কী শিখবে মাথামুণ্ডু? এখন তুমি শেখা ছেড়ে সৃষ্টি করো।

নাতাশার মুখে ফুটে উঠল করুণ হাসি, বলল : সৃষ্টি? কী বলছ তুমি জানো না। মেয়েরা আর যাতেই কেন না সৃষ্টি করুক সঙ্গীতে ওরিজিনাল কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা পারি—গতানুগতিকের পথে চ'লে বড় জোর একটু আধটু ট্যালেণ্ট দেখিয়ে পাঁচজনকে আনন্দ দিতে। অপর সুরকারদের রচনা বেহালা বা পিয়ানোয় তুলতে পারি আমরা নিখুঁত, কিন্তু উৎকৃষ্ট সনাটা, চেম্বার মিউসিক, অপেরা কি সিমফনি রচনা—বলতে বলতে ওর ম্লান হাসি আরো ম্লান হ'য়ে আসে—না 'মনামি', যা হবার নয় তা কদাচ হয়—যার অন্য নাম প্রতিভা, মনীষা, 'ফ্রীক' যাই বলো। মেয়েদের আর যাই থাক, নেই সৃষ্টির প্রতিভা—তবে তারা 'ফ্রীক' হ'তে পারে বটে উল্টে হ'য়ে—পুরুষদের টেক্কা দিতে চেয়ে।

পল্লবের মনে সন্দেহ হয়েছিল অনেক দিন আগে থেকেই যে, নাতাশার মনে কোথাও একটা নিহিত ব্যথা আছে, যাকে ভুলতেই ও একলাটি বিদেশে এসে দিন কাটাচ্ছে—প্রাণপণে পিয়ানো বাজিয়ে মনের দুঃখ ভুলতে চেয়ে—যেমন মানুষ অনেক সময়ে শোক ভুলতে চায় মদে ডুবে। য়ুসুফের সঙ্গে একদিন এই নিয়ে কথা হয়। তাতে য়ুসুফ ওকে বলে: বলি নি? এমনি করেই শিশুর চোখ ফোটে, শুঁয়ো পোকা হয় প্রজাপতি ধীরে ধীরে।

পল্লব উষ্ণ সুরে বলল: কথায় কথায় ঠাট্টা! আমি তোমার চেয়ে ক'বছর ছোট শুনি যে, শিশু বলে গাল-মন্দ করছ?

য়ুসুফ ওর কাঁধে হাত রেখে নরম সুরে বলল: অমন কথা বলে? শিশু মানে কি গাল-মন্দ? স্বয়ং ঈশা কী বলেছেন ভুলে গেলে?—শিশু হও তবে পাবে স্বর্গরাজ্যের পাসপোর্ট। খৃষ্টান মিসটিকদের কথা শোনো নি—God speaks through the mouths of babes and fools? বলে মৃদু হেসে: না ভাই, বিশ্বাস করো—তোমার সরলতা দেখে যখন তোমাকে শিশু বলি তখন তার মধ্যে ব্যঙ্গের আমেজ থাকে না, থাকে—কী বলে বোঝাই?—একটু খেদ মতন যে, আমি যদি এমনটি হ'তে পারতাম। কিন্তু শোনো বলি—যখন কথাই উঠল। নাতাশাদের সঙ্গে আমার মস্কোতে আলাপ ছিল। ওদের দাদা ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি আমাকে বলেছিলেন একদিন দুঃখ করে যে, নাতাশা ভালোবেসেছে এক অতি হীনচরিত্র পুলিশের কর্তাকে। সে ওকে বিয়ে করবে না, কেবল খেলাচ্ছে। হলও তাই, মাস ছয়েক পরেই সে নাতাশাকে খেদিয়ে দিয়ে বিয়ে করল এক কমিসারের মেয়েকে। নাতাশা তার পরেই চলে আসে বার্লিন। পিয়ানো ও সত্যিই ভালো বাজায়, কিন্তু এখনো ও এমেচারই আছে বলব। এদেশে পিয়ানোয় নাম করতে হ'লে বিপর্যয় খাটতে হয় ভাই! আমার এক চেক-বান্ধবী আছেন তিনি প্রাগে সত্যিই নাম করেছেন। তিনি গত দশ বৎসর প্রতিদিন গড়ে ক'ঘণ্টা ক'রে পিয়ানো বাজিয়ে এসেছেন জানো? দশ ঘণ্টা।

পল্লব শিউরে ওঠে: বলো কি?

য়ুসুফ বলে হেসে: ভাই, সঙ্গীত, অভিনয়, ছবি-আঁকা এসব তাতেই কলাকারু। এ দেশের শিল্পীদের বাইরেই সুখের, যশের, বিলাসের মুখোস। মুখোস খুললেই দেখতে পাবে—ওদের মুখে ভাবনা চিন্তার গুমট, কপালে—উদ্বেগের বলীরেখা। তাছাড়া নাতাশার ট্যালেন্ট থাকলেও নেই একটি প্রধান গুণ—আত্মবিশ্বাস। তাই আমার মনে হয় না ও কোনোকালেও বড় পিয়ানিস্ট হ'তে পারবে। ও বিয়ের জন্যেই তৈরি হয়েছে। কোনো গড়পড়তা ভালো ভর্তা পেলে ওর পীন বক্ষঃস্থল পারবে তার মাথার কুশন হ'তে, বুঝলে? এই-ই হ'ল ওর স্বধর্ম। কিন্তু ওকে ভুলেও বোলো না যে ওর দাদার সঙ্গে আমার আলাপ আছে। আমি যখন মস্কোয় সিনেমায় কাজ করতাম তখন আমার দাড়ি ছিল, নামও ছিল অন্য। এখন আমি দাড়ি কামিয়ে যৌবনের জৌলুষ ফিরে পেয়েছি—ভোল বদলেছি—ওরা আমাকে চিনতে পারবে কেমন ক'রে?

পল্লবের মন খারাপ হ'য়ে যায়। বেচারি মেয়ে! কিন্তু এ কী বিড়ম্বনা? যা পেতে পারে তা চায় না, অথচ যা চায় তা ওর নাগালের বাইরে!

## এগারো

এর পর থেকে পল্লব স্থির করল, নাতাশাকে একটু প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করবে। এখানে ওর কোনো ভয়ই ছিল না, কেন না, নাতাশা দেখতে কুরূপা না হলেও নবযৌবনের চেকনাই নেই। তাছাড়া খুব মিশুকও নয়। কাজেই ওর সঙ্গে মেশা মানে "আগুন নিয়ে খেলা" নয়। ও আগুন শুধু জাতেই—ঝিঙ্ক নেই ওর প্রাণশক্তির তাপ, মনমাতানো রূপচ্ছটা। আর যেখানেই মেলা-মেশা করলে ভয় থাক না কেন—এখানে অন্ততঃ বিপদ নেই।

তাই ও নাতাশাকে নানা অপেরা কন্সার্টে নিয়ে যেত দামী টিকিট ক'রে। এক পাউণ্ডে তখন বার্লিনে বিকোয় হাজার মার্ক, কাজেই পল্লব বার্লিনে ছিল রাজার হালে। সময়ে সময়ে নাতাশার দুই বোন কাতিয়া ও মাশাকেও নিয়ে যেত কন্সার্টে, থিয়েটারে, নানা কার্নিভালে, স্কেটিং-এ। নাতাশাদের বার্লিনের খরচ চালাতে হ'ত ভেবে-চিন্তে। কাজেই পল্লব ওদের কাছে অভ্যুদিত হ'ল খানিকটা সাগরপারের রাজপুত্রের মতনই। নাতাশা ওকে সময়ে সময়ে ঠাট্টা করত "le prince charm ant" ব'লে।

এই সূত্রে কিন্তু পল্লবের একটি লাভ হ'ল: নাতাশার কাছে ও রুশ সুরকারদের শুধু প্রতিভা নয়, আঙ্গিক তথা শৈলী সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানল—যা গুরুমানের কাছে জানবার সুযোগ ছিল না। ওদের কাছে কয়েকটা রুশ গানও শিখল। ওর বিশেষ ভালো লাগত বিখ্যাত ভল্গা-মাঝির গান: কী করুণ বেশ! ওদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই ধ'রে দিত তিয়ের গার্টেনে নৌকায় দাঁড় টানতে টানতে:

"এ উখ্‌ নেম্‌...এ উখ্‌ নেম্‌"

কাতিয়া একটু ইংরাজি শিখেছিল, সে এ রুশ গানটির ইংরাজি সংস্করণটি পল্লবকে শিখিয়েছিল:

Yo heave ho...Yo heave ho...
Let us pull once more, once more...
Ai da da ai da...ai da da ai da...
Curly birch trees soon will pass...

## বারো

এমনি করে দু-তিন মাসের মধ্যেই এ-তিন বোনের সঙ্গে ওর আলাপ মিতালিতে পরিণত হ'ল। সকালবেলা ও ফ্রাউ ক্রামারের কাছে ঘণ্টা দুই জর্মন ও ইতালিয়ান ভাষায় তালিম নিয়েই ছুটত রুশ বেহালাবাদকের কাছে। ফিরে ঘণ্টা দুই বেহালা অভ্যাস করত। তারপর রকমারি রেস্তরাঁতে (প্রায়ই য়ুসুফের সঙ্গে) সানন্দে তালব্য সুখের সঙ্গতে গল্পালাপ করত। য়ুসুফ ওকে নিত্য-নতুন গল্প বলত বিশেষ ক'রে ওর রুশ জীবনের সম্বন্ধে। সময়ে সময়ে পল্লব চমকে যেত বৈ কি, বিশেষ ক'রে বলশেভিকদের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনে। পল্লবের সময়ে সময়ে বিশ্বাস হ'ত না, বলত মানুষ এমন অমানুষ হ'তে পারে?

য়ুসুফ হেসে বলত: মানুষ যে কী পারে আর কী না পারে, তার হদিশ কি কেউ পেয়েছে ভাই আজ অবধি? তুমিই তো সেদিন বলছিলে, তোমার বান্ধবী রিতার বাপ কাউন্ট পিনোর কথা যিনি টাকার জন্যে মেয়েকে বেচতে চেয়েছিলেন এক ধনী লম্পটের কাছে। বলশেভিকদের ভুল হয়েছে কোনখানে জানো? ওরা ভাবে প্রপাগাণ্ডা

বা প্রতিষ্ঠান দিয়ে মানুষকে রাতারাতি বদলে দেওয়া যায়। কিন্তু এ সবই হ'ল বাঁদরকে পোষাক পরিয়ে টেবিলে বসানো। সেদিন এক ছবিতে দেখলাম কী জানো? এক শিম্পাঞ্জিকে সাহেব সাজিয়ে ছুরি-কাঁটা ধরানো হয়েছে। সে খাচ্ছে চপ কাটলেট নিখুঁৎ সভ্যভব্য চালে। কিন্তু তাই ব'লে কি বলবে যে, সে সত্যি মানুষ ব'নে গেছে ভিতরে ভিতরে? বলশেভিকরাও ঠিক ঐ ভুলই করেছে ভাই, ভেবেছে পুলিশের পরোয়ানা দিয়ে মানুষকে মনীষী বানানো যায় রাতারাতি। ওরা চেয়েছিল ভালো করতেই বটে, অন্তত লেনিন চেয়েছিলেন। কিন্তু ভালো করবেন কাদের দিয়ে শুনি? স্বার্থপর এডিটর আর নিষ্ঠুর গুপ্তচর? আর লেনিন যে লেনিন—তিনিও তো চেকা পুলিশের সাহায্যেই আজ দণ্ডধর। এ পথে মুক্তি নেই ভাই!

এই ভাবে গল্পালাপ সেরে, ছুটো থেকে আড়াইটে পর্য্যন্ত একটু বিশ্রাম ক'রে তিনটে বাজতে না বাজতেই পল্লব ছুটত কণ্ঠ সাধনার তালিম নিতে। ওর সব চেয়ে ভালো লাগত এই জর্মন পদ্ধতিতে কণ্ঠ সাধনা। শিক্ষকের কাছে রোজ আধ ঘণ্টা তালিম নিয়েই ঘরে ফিরে ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে গলা সাধত ও নতুন-শেখা গানগুলি অভ্যাস করত। তারপর সন্ধ্যা হ'তে না হ'তে হাজির দিত নাতাশাদের ফ্ল্যাটে; সেখানে রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত কাটাত গানে গল্পে হাসি-গাটায়। কখনো কখনো সেখানে য়ুসুফ এসে সামোভার থেকে রুশ া সেবন করতে ব'সে যেত, কখনো বা ফ্রাউ ক্রামার এসে যোগ দিতেন। আড্ডা তখন জ'মে উঠত বৈ কি!

## তের

সেদিন ছিল নাতাশার জন্মদিন। ওরা একটু বেশি রকম জল-াাবারের ব্যবস্থা করেছিল।

পল্লব সন্ধ্যা ছ'টায়ই এসে হাজির নাতাশার জন্যে একটি পাারাসল কনে।

নাতাশা খুশি হওয়া সত্ত্বেও কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বলল: কেন াত খরচ করলে? বলিনি তোমাকে দামী উপহার না াতে?

পল্লব হেসে বলল: আমার কি গায়ে লেগেছে ভাবছ? এক াউণ্ডে এখন হাজার মার্ক পেলে মনে রেখো।

এই সময়ে য়ুসুফ এসে হাজির। তার হাতে একটি সুন্দর ায়েদের হ্যাণ্ডব্যাগ।

নাতাশা ফের কৃত্রিম কোপে বলল: এই জন্যেই আমি মাশা ও াতিয়াকে বলেছিলাম, আমার জন্মদিনের কথা কাউকে না বলেই তিথিদের অভ্যর্থনা করতে। জন্মদিন বললেই যাঁরা উপহার নিয়ে জির হন—

য়ুসুফ নাতাশাকে জনান্তিকে রুশ ভাষায় কী বলল। নাতাশার ।রাঙা হ'য়ে ওঠে। বলল: শ—শ।

পল্লব য়ুসুফকে জিজ্ঞাসা করে সকৌতূহলে: কী বললে ই?

য়ুসুফ চোখ মিট-মিট ক'রে জর্মন ভাষায় বলে: সে কি ভাই ার সামনে বলা যায়? জানাই তো আমি স্বভাবে কি রকম জুক!

নাতাশা ওরি দেওয়া ব্যাগ দিয়ে ওর বাহুতে আঘাত ক'রে বলল: কী সাংঘাতিক মানুষ আপনি! Schrecklich! ৬

য়ুসুফ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলে: আর কী নিষ্ঠুর আপনি! Gefiihlos! ৭

নাতাশা হাসে: নিষ্ঠুর? কোদালকে কোদাল বলার নাম সত্যকথন না নিষ্ঠুরতা?

য়ুসুফ হাসে: সত্যের চেয়ে নিষ্ঠুর কি জগতে আর কিছু আছে ফ্রয়লাইন?

কাতিয়া হেসে বলে: আপনি এক সময়ে লাজুক ছিলেন, আপনার একথা যদি সত্যিই হয়, তবে মানতেই হয় যে, আপনি নিজের ভোল বদলে ফেলেছেন বটে—Von oben bis unten. ৮

য়ুসুফ হেসে বলে: মানুষের এর চেয়েও গভীর রূপান্তর হ'তে পারে ফ্রয়লাইন কাতিয়া! উদাহরণত আমার একটি বন্ধু আছে যে এক সময়ে বলত যে কোনো নারীকে একবারো যদি কেউ চুম্বন করে, তবে তাকে বিবাহ না করলে সে নরকে যাবেই যাবে।

মাশা চেঁচিয়ে ওঠে: Gerechter Himmel! ৯

কাতিয়া হেসে বলে: তাঁর বদলটা কী রকম হ'ল? এখন তিনি যাকে দেখেন তাকেই চুম্বন করেন?

পল্লবের মনে অস্বস্তি জেগে ওঠে—মনে প'ড়ে যায় কুঙ্কুমের কথা। যদি এধরণের কথাবার্তা সে শুনত—কী ভাবত? য়ুসুফের জবাব দেবার আগেই সে ব'লে বসে: আজ নাতাশার জন্মদিনে এ সব বাজে কথা থাক্। নাতাশা, তুমি একটু পিয়ানো বাজাবে?

নাতাশা পল্লবের দিকে তাকিয়েই ফিক ক'রে হেসে বলে: বাজাব, কিন্তু আগে বলো একটা কথা। ব'লেই য়ুসুফকে: না প্রশ্নটা আপনাকেই করা ভালো: বলুন না—আপনার সে-বন্ধুটির আজ কী অবস্থা? খবর রাখেন নিশ্চয়ই?

য়ুসুফ বলল: রাখি কিন্তু বললে পল রাগ করবে—কারণ সে ওরও বন্ধু।

নাতাশা পল্লবের দিকে ফিরে হেসে বলে: পল, তোমার এ-রকম দারুণ বন্ধু ক'-টি আছে?

পল্লব একটু রাগ করেই বলে: কি রকম বন্ধু?

নাতাশা বলে: যিনি ভাবেন মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে একটু এদিক ওদিক হ'তে না হ'তে পুরুষরা সরাসরি নরকে যায়?

পল্লব একটু বিরক্ত হয়ে বলে, নাতাশা, আমাদের দেশের ধারণা এ-সব বিষয়ে হয়তো একটু বেশি কড়াক্কড় হ'তে পারে। কিন্তু তাই ব'লে ব্যঙ্গ কিছু যুক্তি নয়। তোমাদের প্রকাণ্ড বল-রুমে যে-কোনো অপরিচিত আগন্তুক যে-কোনো অপরিচিতাকে বুকে নিয়ে নাচে ব'লেও তো আমরা ব্যঙ্গ করতে পারি?

নাতাশা ওর হাতের উপর হাত রেখে বলে: রাগ কোরো না পল, আমরা সত্যিই একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছি। তবে যে-প্রথাটার উল্লেখ ক'রে তুমি খোঁটা দিলে সেটা কি খুব মন্দ?

পল্লবের রোখ চেপে গেল, বলল: আমার তো তাই মনে হয়। নাচতে যদি হয় পরিচিতকে নিয়ে নাচলেই তো হয়। যার তার সঙ্গে নাচা—

---

৬। ভয়ঙ্কর। ৭। নিষ্ঠুর! ৮। আপাদমস্তক। ৯। বাবা গো!

য়ুসুফ কি একটা বলতে যেতেই নাতাশা বাধা দিয়ে বলে: কিন্তু নাচটা তো তাল নিয়ে কথা পল! তাই পরিচিত অপরিচিতের তর্ক এখানে কি অবান্তর নয়?

পল্লব একটু বিব্রত হ'য়ে বলে: তা ব'লে···মানে দৃষ্টিকটু ব'লে তো একটা জিনিষ আছে, না নেই?

এবার য়ুসুফ জবাব দেয়: এ তোমার কেমন যুক্তি পল? যাতে আমরা অভ্যস্ত নই, তাকে অনেক সময়েই তো প্রথমে সওয়া যায় না। আমার মনে আছে, প্রথম যখন এদেশে আসি মেয়েদের সিগারেট খাওয়া আমার চোখে একটুও ভালো লাগত না। এদের দেশের অনেকের কাছেও তেমনি আমাদের হাতে-খাওয়াটা দৃষ্টিকটু লাগে। তাই ব'লে কি আমরা মেনে নেব যে আমরা অসভ্য ব'লেই হাতে খাই?

পল্লব আতপ্ত সুরে বলল: আমরা মেনে না নিতে পারি, কিন্তু তাই বলে কি এরা বলতে ছাড়ে যে আমরা সভ্য হয়নি? শুধু এরাই বা বলি কেন, আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত ইঙ্গ-বঙ্গও কি সাহেবদের ধামাধরা হ'য়ে বলেন না যে, বিলিতি কেতায় সিদ্ধিলাভ না করলে সভ্যতা অসিদ্ধ? তাই আমরাও যদি রুখে উঠে বলি যে এদের নানা রীতি অশোভন, তাতে কী এমন দোষ হয় শুনি? এরা আমাদের যে কোনো আচারকে নিয়ে করবে হাসাহাসি, আর আমরা থাকব মুখ বুজে—ওদের যা দেখি সবতাতেই বাহবা দিয়ে?

নাতাশা পল্লবকে এতটা উষ্ণ কখনো দেখে নি, তাই ওর কাঁধে হাত রেখে বলল: আচ্ছা আচ্ছা—আমি বুঝেছি, কেবল—

এমন সময়ে দোরের ঘণ্টা বেজে ওঠে ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···

কাতিয়া দোর খুলে দিতেই ফ্রাউ ক্রামারের প্রবেশ। সবাই উঠে দাঁড়ায়। নাতাশা আগুনের কাছে একটা সোফা সরিয়ে দিয়ে বলে: বসুন ফ্রাউ ক্রামার, এইখানে—আগুনের কাছে। আজ বেজায় ঠাণ্ডা। এক পেয়ালা চা?

ফ্রাউ ক্রামার বললেন: Vielen Dank; meine liebe! ১০

কাতিয়া সামোভার থেকে এক পেয়ালা চা ঢেলে তাঁর হাতে দিল। ফ্রাউ ক্রামার চামচ দিয়ে চা নাড়তে নাড়তে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন: হাসির যে হুল্লোড় তোমরা বাধিয়েছ তাতে আর টিঁকতে পারলাম না আমার ঘরে। কিন্তু কী ব্যাপার শুনি? দিও কিঙ্কিং—না করে বঞ্চিত।

মাশা বলল: মসিয়ে বাকচির দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা কম বলে আমরা তাঁকে নির্দয়ভাবে কোণঠেসা করেছিলাম। উনি আমাদের নিশ্চয়ই ভারি প্রগল্‌ভা ভেবেছেন।

ফ্রাউ ক্রামার টপ ক'রে বললেন: পল! আমাকে তোমার ব্রীফ দাও। আমি তোমার এমনি ওকালতিই করব যে, কোণঠেসা তো কী—ওরা সলজ্জে ঢুকবে গর্তে গুড় গুড় করে।

পল্লব খুশি হয়ে বলল: দেখুন তো, কী অবিচার? ওরা প্রমাণ করতে চায় যে, আমাদের দেশের মেয়েরা অন্তঃপুরের অন্ধকূপে বন্ধ থেকে মনুষ্যত্ব খুইয়ে ব'সে থাকে – যেখানে য়ুরোপের মেয়েরা—

ফ্রাউ ক্রামার পাদ পূরণ করলেন: অন্তরীক্ষের ঝোড়ো হাওয়ায় পরীর মতন ডানা মেলে উড়তে উড়তে শেষটায় সবপারতা দেবী হয়ে ওঠে—এই তো? ব'লে ঈষৎ ব্যঙ্গ হেসে: আমার কিন্তু মনে হয় পল, যে তোমাদের মেয়েদেরই জিৎ—যেহেতু তারা যাই করুক না কেন, মেয়েলি সুষমা খুইয়ে বসে না। আমাদের মেয়েরা মনুষ্যত্ব বলতে বোঝে পৌরুষ—কাজেই সবতাতেই পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে না পারে পুরুষ বনতে, না পারে তাদের কাছ থেকে মেয়েদের প্রাপ্য খাজনা আদায় করতে। ফলে হয়ে ওঠে—কিম্ভূত-কিমাকার এক আধুনিক পোলিশ কবি দেখে-শুনে হকচকিয়ে গিয়ে·লিখছেন কি সাধে—

স্বরূপ তোমার উদ্‌ভ্রান্তেরে বলো না—
পুরুষবেশিনী হ্রস্বকেশিনী ললনা!

মাশার মুখ লাল হয়ে উঠল: তীরন্দাজি করেছেন ভালো ফ্রাউ ক্রামার! কেবল নিশানা ফস্কে গেলেন, এই যা। না, ঠাট্টা রেখে বলুন তো—আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে এদেশের মেয়েরা পুরুষের নানা অধিকার দাবি ক'রে ভুল করেছে? এদেশের সভ্যতায় নব্যাদের দান কি আপনি অস্বীকার করেন?

ফ্রাউ ক্রামার দুহাত তুলে শিউরে উঠে বললেন: Zu Hilfe! ১১ নব্যাদের দান অস্বীকার! আমার এ-হেন দুর্নাম বটলে আর কি কোনো নব্যা আসবেন আমার সালঁতে— যাঁদের সম্বন্ধে সাক্ষাৎ শেলি বলেছেন: They speak now wisdom once they could not think?

কাতিয়া বলল: আপনার সঙ্গে কথায় কে এঁটে উঠবে, ফ্রাউ ক্রামার? মাশা মুখে যাই বলুক না কেন, জানে তো হাড়ে হাড়ে তার wisdom কী রকম সাংঘাতিক হ'য়ে উঠেছে। ওর এক বন্ধু সেদিন ওকে তাই বলছিল যে ওর কথাবার্তার বাঁধুনি দেখে তার সময়ে সময়ে বেগ পেতে হয় ঠাহর করতে যে, ও পুরুষ না—আপনার কবির ভাষায়—হ্রস্বকেশিনী সত্যিই কোনো ললনা!

মাশা কুপিত স্বরে বলে: মিথ্যুক! সে একথা বলেছিল আমার সম্বন্ধে—না তোর? চুল আগে ছেঁটেছে কে—আমি, না তুই, তুই, তুই?

ফ্রাউ ক্রামার বাধা দিয়ে বললেন: আহা-হা, চটো কেন 'শেরি'! বিরলকেশিনী হওয়া তো আর কিছু নিন্দের কথা নয়। হয়ত এর পরে দেখব, মেয়েরা টাকেও পুরুষদের টেক্কা দিচ্ছে। ভালো হোক, মন্দ হোক—কোনো পুরুষে যখন আমাদের সম্বন্ধে ছুটো মন্তব্য করে তখন কি আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে না গো? আমরা মুখে যত জাঁকই করি না কেন, যে পুরুষদের মতামতের আমরা তোয়াক্কা রাখি না, মনে মনে জানি তো আমরা কী দুর্ভাবনায় পড়ি, যদি দু'দিন দেখি ওরা আমাদের লক্ষ্যই করছে না। নৈলে কি নিত্যি পড়ি যত রাজ্যের ফ্যাশনের ফ্যাসাদে?—দু'দিন আমরা ওদের দৃষ্টিতে না পড়লে জামার হাতা বাদ দিয়ে, টুপিতে বাগান সাজিয়ে, চোখের পাতায় নীল মাস্কারা ঘ'ষে, চিবুকে তিল এঁকে ওদের চমকে দেবার জন্যে মরীয়া হ'য়ে উঠি না কি?

য়ুরুলে কোরাসে হেসে ওঠে। হাসি থামলে য়ুসুফ মাশার দিকে কটাক্ষ ক'রে বলে: এবার আপনাদের কেস বুঝি আর টেঁকে না

১০। বহু ধন্যবাদ প্রিয়সখী!

১১। সর্বনাশ (help!)

ক্রয়লাইন। জানেন তো, আসামীদের অবস্থা কী দাঁড়ায়, যদি তাদের মধ্যে একজনও হঠাৎ অ্যাপ্রুভার ব'নে যায় ?

মাশা জবাব দেবার আগেই নাতাশা বলে বসে : কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে অ্যাপ্রুভারের অভিযোগটা কি শুনি ?

ফ্রাউ ক্রামার বললেন : এমন কিছু না, শুধু এই যে, আজকাল আমরা বাইরে একটু পাখার ঝাপটা দিতে সুরু করলেও খাঁচা দেখতে না দেখতে পাখা গুটিয়ে বলি : খাঁচার কাছে কি আর আকাশ লাগে ! কিন্তু এখনো মনে রেখো, আমরা মুখে স্বীকার করি না যে-কথা মনে মনে জানি : যে খাঁচা ভাঙা এক, আর আকাশকে আপন করা আর।

কাতিয়া গম্ভীর হ'য়ে বলল : ঠাট্টা থাক্ ফ্রাউ ক্রামার ! আপনি কি সত্যিই বলতে চান যে, আমরা পর্দানশীন খাঁচা-বিলাসিনী মেয়েদের চেয়ে আকাশকে বেশি ভালোবাসি না ? এও কি একটা কথা হ'ল ? যা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের কোঠায়ই পড়ে—

ফ্রাউ ক্রামার হেসে বললেন : শেরি ! সংসারে আমরা অনেক কিছুই স্বতঃসিদ্ধ ধরে নিয়ে বলি—বা রে আমি ! কিন্তু জ্ঞানীরা জ্ঞানী হন তখনই, যখন তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ গুজবকে সন্দেহ করতে শেখেন। বলেই য়ুসুফকে : কেমন গো সন্দেহ-সম্রাট, ঠিক বলিনি ?

য়ুসুফ হেসে জবাব দিতে যাবে, এমন সময় দোরের ঘণ্টা ফের বেজে উঠল। নাতাশা চমকে উঠে দোর খুলে দিতে গেল। রাত প্রায় এগারোটা, এমন অসময়ে কে এ অতিথি ?

দোর খুলতেই তিন বোন চেঁচিয়ে উঠল : আইরিন !

একটি কুড়ি-একুশ বয়সের তন্বী তরুণী ঘরে ঢুকেই নাতাশাকে জড়িয়ে ধরল, তারপর কাতিয়া ও মাশাকে। পল্লব মুগ্ধনেত্রে তাকিয়ে রইল : কি অপরূপ মুখ, চোখ, রং, গড়ন !

ফ্রাউ ক্রামার এগিয়ে এসে নবাগতার দু' গালে চুম্বন ক'রে এবার ফরাসিতে বললেন : এসো শেরি ! বোসো।

পল্লব ও য়ুসুফ উঠে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার তাদের দিকে তাকিয়ে নাতাশা উৎফুল্ল হ'য়ে ফরাসিতে বলল : আমাদের সব ছোট বোন—আইরিন ইভানোভনা চের্তকফ।

য়ুসুফ দ্রুত রুশভাষায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করল।

আইরিণ খুশি হ'য়ে বলল : দা দা দা। (১২)

তারপর নাতাশা আইরিনকে টেনে আনল পল্লবের সামনে : এই হল আমাদের পরিবারের সেরা রূপসী—বলি নি ? নামও বলেছি বোধ হয় অনেক বারই ?

পল্লব সকুণ্ঠে বলল : হ্যাঁ।

নাতাশা আইরিনকে বলে : আর ইনিই হ'লেন আমাদের নবলব্ধ শিল্পী বন্ধু পল্লব বাকচি।

আইরিন পল্লবের দিকে তাকিয়েই হাত বাড়িয়ে ফরাসি ভাষায় বলল : বঁ সোয়ার ( শুভ সন্ধ্যা ) মসিয়ে—

নাতাশা টপ ক'রে বলল : মসিয়ে টসিয়ে চলবে না এখানে। ও আমাদের ছোট ভাই—পল।

আইরিন হেসে বলল : বঁ সোয়ার, পল !

পল্লব মুগ্ধ নেত্রে ওর দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল : বঁ স্যোয়ার মাদমোয়াসেল—

নাতাশা বলল : এখনো মাদ্‌মোয়াসেল ? বলো আইরিন। কেমন মিষ্টি নাম বলো তো ?

য়ুসুফ হেসে বলল : কিন্তু নামের চেয়েও বেশি মিষ্টি নামী।

সবাই হেসে উঠল। আইরিনের গাল দুটি লাল হ'য়ে ওঠে।

## চোদ্দ

নাতাশার ফ্ল্যাটে আর ঘর ছিল না ব'লে আইরিন শার্লতেনবুর্গে একটি গৃহস্থ-পরিবারে একটি ঘর নিল। তারা শুধু ওকে প্রাতরাশ দিত। বাকি খাওয়া-দাওয়া বাইরে। এ-ব্যবস্থায় আইরিন খুশি বই অখুশি হ'ল না। কারণ নাতাশা পল্লবকে পরে বলেছিল—আইরিন একটু বেশি একরোখা মেয়ে, তাই বেশি কাছে এলেই ওর সঙ্গে অপরের ঠোকাঠুকি লাগে। পল্লবের একথা শুনে একটু আশ্চর্যই লেগেছিল, কারণ আইরিনকে দেখে ওর মনে হয়েছিল সৌকুমার্য, লাবণ্য ও কোমলতার প্রতিমূর্তি। একথা একদিন কাতিয়াকে বলতেই সে হেসে গড়িয়ে পড়ল, বলল : যে ঘর করে সেই জানে ঘরণী কেমন, মনামি ! আইরিন 'কোমলা'-ই বটে !

পল্লব এ-কথাকে আমলই দিল না, মনে মনে বলল : দূর ! এ সেই চিরকেলে বোনে বোনে রেষারেষি। আইরিনের ধরণ-ধারণে ও খুঁৎ পেত না।

যতই দিন যায় ততই ও মুগ্ধ হয় ! মনে হয় যেন রিতাও এত সুন্দরী ছিল না। তার সৌন্দর্যে চমক ছিল বটে, কিন্তু এমন সুষমা ? এমন মাধুর্য ? ওর মনে হয় বিল্বমঙ্গলের বিখ্যাত গান : 'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্' : সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, তন্বী দেহলতা, নিটোল গড়ন, নিখুঁত মুখ, যুগ্ম ভ্রূ, চাঁচর কেশ, সদাপ্রফুল্ল হাসি, ঢেউয়ের মতন অঙ্গরেখা, ফুলের পাপড়ির মতন ওষ্ঠাধর, দুধে-আলতার মতন রং—একটু লজ্জা পেতে না পেতে হ'য়ে ওঠে সিঁদুর-রাঙা, সুঠাম গতিভঙ্গি—সবার উপর কাজল-কালো চোখ। কী আশ্চর্য দুটি চোখ—কত রকম ব্যঞ্জনায় ভরা, আর কী গতিশীল—যেন আয়না—যে রঙের কাছে ধরবে সেই রঙই তুলবে ফলিয়ে ! এই আলো, এই ছায়া ! এই হাসি ভরা, এই চিকিয়ে ওঠা ! এই তীক্ষ্ণ, এই উদাস—যেন বহুরূপী !

আগে ও সপ্তাহে তিন-চারদিন নাতাশাদের ফ্ল্যাটে হাজিরি দিত, এখন রোজ না এসে পারে না। মাঝে মাঝে একটু কুণ্ঠা যে উঁকিঝুঁকি না দেয় এমন নয়, কিন্তু কোনো সন্ধ্যায় দেরি করলেই হয় নাতাশা নয় আইরিন ওকে টেলিফোন করে, অতঃপর কেউ কি পারে 'না' বলতে ?

তাছাড়া এখন থেকে অপেরা কন্সার্টে নাতাশাকে নিয়ে যাবার সময়ে ঐ সঙ্গে আইরিনের জন্যেও একটি ক'রে টিকিট না কিনলেই নয়। আইরিন যে গান-পাগল—তাকে সঙ্গে না নিলে চলে—বিশেষ যখন ও এসেছে বার্লিনে গানেরই তালিম নিতে ?

আইরিন বিখ্যাত জর্মন-গায়িকা লিলি লেমান্-এর সুনজরে প'ড়ে গেল—তাই জর্মন গান শেখার সুবিধাও হ'য়ে গেল বৈ কি।

[ক্রমশঃ

১২। রুশ ভাষায় দা মানে হ্যাঁ।
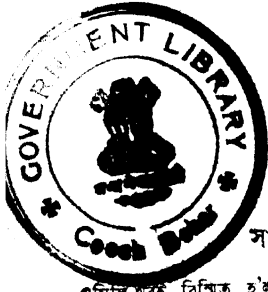
# অভিযাত্রী

ডক্টর নবগোপাল দাস, আই, সি, এস

## সাত

এমিলি খুবই বিস্মিত হ'ল যখন সে শুনল যে, তার চলে আসার কয়েক দিন পরেই প্রদীপ ব্রাইটন্ থেকে ফিরে এসেছে। সে ছুটে গেল প্রদীপের কাছে, উদ্বিগ্ন ভাবে প্রশ্ন করল তার শরীর ভাল আছে কি না।

ম্লান হাসি হেসে প্রদীপ বলল যে তার শরীরের এতটুকু অসুস্থতা নেই, কিন্তু ব্রাইটন্-এর আবহাওয়া তার আর ভাল লাগছিল না ব'লে সে আসতে বাধ্য হয়েছে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে এমিলি বলল, না দীপ, ব্রাইটন-এর আবহাওয়া বিষিয়ে যাবার পেছনে অন্য কোন গূঢ় কারণ আছে!

—গূঢ় কারণ আর কি থাকতে পারে? তোমার অভাবটাকেই কারণ বলে ধরে নিতে পার—পরিহাস করে প্রদীপ বলতে চেষ্টা করল।

—সেটা হয়ত অন্যতম কারণ, কিন্তু প্রধান কারণ নয়। আমাকে বলতে কি কোন বাধা আছে?

প্রদীপ চুপ করে রইল, তারপর বলল, বলব, এক সর্ত্তে।

—কি সর্ত্ত?

—সর্ত্তটা আর কিছুই নয়, সব কথা জেনেও তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাবেনা? অন্ততঃ আমাকে সুযোগ দেবে to prove myself?

—কি পাগলের মত কথা বলছ, দীপ! এমন কি অন্যায় তুমি করতে পার যার জন্য আমি তোমাকে ছেড়ে যাব? আর একজন মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছিল, এই ত? তার জন্য দায়ী তুমি নও, তার জন্য দায়ী আমি অর্থাৎ আমার অনুপস্থিতি এবং ব্রাইটন-এর ছোঁয়াচে হাওয়া!

এমিলির কথার ভঙ্গীতে প্রদীপ আশ্বস্ত বোধ করল। ধীরে ধীরে সে তার কাছে খুলে বলল সব কথা—ছবির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কাহিনী থেকে সুরু করে শেষ প্রত্যাখ্যানের অধ্যায় পর্য্যন্ত। এতটুকু গোপন সে করল না।

শান্তভাবে এমিলি সব শুনল, তারপর প্রদীপের মুখটা নিজের বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল, আমার প্রিয়তম দীপ, আমি তোমাকে বলছি, তুমি অপরাধ কিছুই করোনি, তবে কতকগুলো ভুল, ছেলেমানুষী বোকামি করেছ, যার জন্য আজ তোমাকে এতখানি কষ্ট পেতে হ'ল। তুমি শীগ্‌গীরই ভুলে যাবে তোমার জীবনের এই পরিচ্ছেদ, আমার যতটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমার ব্যথা ধুয়ে-মুছে ফেলতে।

—আমি এখনই অনেকটা হালকাবোধ করছি, এমিলি!

—তোমার উচিত ছিল, অনেক আগেই ছবির কথা আমাকে বলা। আমি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারতাম কোথায় তোমার ভুল হয়েছিল। তাহ'লে তুমি এই শেষের ভুলটা হয়ত করতে না—অন্ততঃ পরিসমাপ্তিটা এই ভাবে হ'ত না।

—সঙ্কোচে আমি তোমাকে বলতে পারিনি।

—সেটা বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু এ জাতীয় সঙ্কোচ ভবিষ্যতে তোমাকে কাটিয়ে উঠতে হবে, দীপ! নইলে জীবনে অনেক দুঃখ পাবে এবং যারা তোমার সংস্পর্শে আসবে তাদের দুঃখেরও কারণ হবে।

—তুমি দুঃখ পেয়েছ, এমিলি?

—মোটেই না। কারণ আমি এদেশের মেয়ে, এসব কাহিনী শুনে আমরা মূর্চ্ছা যাই না। তাছাড়া, তুমি ত জান, আমার জীবনও সরলগতিতে বয়ে যায়নি, তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পূর্ব্বে আমিও দু'-একজনকে ভালবেসেছি, তাদের শয্যাসঙ্গিনীও হয়েছি। কিন্তু সে সব এখন বিস্মৃতির গর্ভে, সে সব পুরনো অনুভূতি আমার মনে অশান্তি আনে না, আমাকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয় না।

—আমার মনটাকেও যদি তোমার মনের মত গড়ে তুলতে পারতাম, এমিলি!

—দুটো মন কখনও এক ছাঁচে ঢালা যায় না, দীপ! তবে, [illegible] কতকগুলো মোটা সূতো অনুসরণ করতে পার, যাতে ভবিষ্যতে তোমাকে এই জাতীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়।

পরের দিন ১৫ই আগষ্ট। প্রদীপ গেল ইণ্ডিয়া হাউস-এ। অসংখ্য নর-নারী ছাত্র-ছাত্রীতে ইণ্ডিয়া হাউস ভর্ত্তি, ভারতবর্ষ [illegible] স্বাধীনতা পেয়েছে, তারই উৎসব করছে প্রবাসী ভারতবাসীরা। জাতীয় সঙ্গীতের পর হাইকমিশনার শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মহাত্মা গান্ধীর প্রতি। যাঁর যুদ্ধ আজ হয়েছে সাফল্যমণ্ডিত। প্রদীপ যখন তার ঘরে ফিরে এল, তার মুখ উজ্জ্বল, মন আনন্দে ভরপুর।

দেখল, এমিলি তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার ঘর সাজিয়ে দিয়েছে নানা রং-এর ফুলে। তার বিছানার উপর নতুন একটা ঢাকনি।

—এ কি করেছ তুমি এমিলি?

—ভাবলাম তোমার আনন্দে আমিও একটু অংশগ্রহণ করি। আপত্তি আছে?

গভীর স্নেহে প্রদীপ এমিলিকে চুম্বন করল।

এমিলি বলল, জবাব পেলাম। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করল, ইণ্ডিয়া হাউস-এ কি হয়েছিল, পরিচিত'কাদের সঙ্গে দেখা হল ইত্যাদি।

—দেশ ত স্বাধীন হল, দীপ, এবার তোমার মনটাকে স্বাধীন করতে চেষ্টা কর।

—তার মানে ?

—মানে আর কিছুই নয়, আত্মপ্রত্যয় তোমার আছে জানি, কিন্তু সেটা অনেক সময় চাপা পড়ে থাকে তোমার যুক্তিবাদের পাথরে। জীবনটাকে লজিক-এর আইনে সব সময় বেঁধে রাখা যায় না, কাজেই বাঁধা-ধরা নীতির মাপকাঠিতে সব সময় এর বিচার করো না। জানি, তোমার আদর্শবাদী মন এতে ব্যথা পায়, কিন্তু তোমাকে থাকতে হবে এই মাটির পৃথিবীতে, যেখানকার শতকরা নব্বুই জন লোক আদর্শকে আমল দেয় না মোটেই, দিলেও সেটার ব্যতিক্রম করে নিজেদের সুযোগ এবং সুবিধামত।

—আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, এমিলি ! আমাদের দেশের স্বাধীনতার ইতিহাস যদি পর্য্যালোচনা করি তাহ'লে দেখতে পাই, এই স্বাধীনতা এসেছে আদর্শবাদের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার ফলে। অন্য দেশেও নিশ্চয়ই তাই। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যা খাটে। মানুষের ক্ষেত্রে তা কেন খাটবে না ?

—আমি সে-কথা বলছি না, দীপ ! আদর্শ বা সত্যনিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হতে আমি বলছি না, আমি বলছি এই যে, তুমি সবার মধ্যে এসব দেখবার আশা করো না, নিজেই দুঃখ পাবে। অর্থাৎ তুমি আগে থেকেই নিজের চারদিকে একটা কৃত্রিম আবরণ সৃষ্টি করে রেখো না, ব্যতিক্রমকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা করো।

একটু পরে এমিলি বলল, একটা অনুরোধ করতে পারি ?

—কি ?

—বন্দনার কাছে একখানা চিঠি লেখ।

—হঠাৎ এই অনুরোধের কারণ ?

—হঠাৎ নয়, অনেক দিন থেকেই আমি তোমাকে বলেছি যে তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তুমি ভুল করেছ। এখন একটা অজুহাত এসেছে, তোমার দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখানে তোমার কেমন লাগছে, সেটা জানিয়ে একটা উপক্রমণিকা অন্ততঃ সৃষ্টি করতে পার !

—আমি ত তোমাকে আগেই বলেছি, বন্দনা আমার কাছ থেকে কোন চিঠির প্রত্যাশা করে না। তাছাড়া তার অবসরের মধ্যে আমি অনধিকার প্রবেশ করতে চাই না।

—এটা নিছক অভিমানের কথা হল, দীপ ! কি করে তুমি জানলে যে সে তোমার চিঠির প্রত্যাশা করে না ? একবার লিখেই দেখ না !

—আর কঠোর উত্তর বা নিরুত্তর পেয়ে আনন্দে নাচতে থাকি, কেমন ?

—এটা তোমার একটা কমপ্লেক্স হয়ে দাঁড়িয়েছে, দীপ ! যদি সে জবাব না দেয় আর লিখো না। যদি তার জবাব মধুর না হয় তার প্রতি জবাব দেবার পথ ত খোলাই থাকবে।

—আচ্ছা, আমি বন্দনার কাছে চিঠি লিখি বা না লিখি, তা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন ?

—বলব ? প্রথম, আমার মতে তুমি বন্দনার প্রতি অবিচার করছ। আমি মেয়েমানুষ, তাই তার পক্ষ হয়ে তোমার সঙ্গে লড়ছি। দ্বিতীয়, বন্দনার সঙ্গে তোমার সহজ সম্বন্ধ যদি পুনঃস্থাপিত হয় তাহলে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব।

—অর্থাৎ, আমি তোমার ঘাড়ের বোঝা, আমাকে অন্যের কাঁধে তুলে দিয়ে তুমি আলগা হতে চাও।
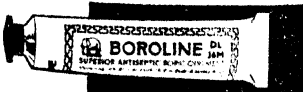
—খানিকটা তাই। চিরকাল ত আমরা একসঙ্গে থাকতে পাব না! একটা দিন আসবে, যখন আমাদের পরস্পরের কাছে বিদায় নিতেই হবে। সেই বিদায়ের সময়টাতে আমি একটু শান্তি পাব, যদি আমি জানি যে তোমাকে ভালবাসবার, তোমার দেখাশুনো করবার একজন লোক রয়েছে।

প্রদীপ হাসল।

—হেসো না, দীপ! তুমি ভাবছ এবার আমিই সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে উঠছি। মোটেই নয়। অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল চোখ দিয়ে ভবিষ্যৎটা দেখছি বলেই এ-সব কথা ভাবছি এবং উভয়কে প্রস্তুত করছি।

প্রদীপ এবার রাগ করল। বলল, আচ্ছা, এমিলি, তুমি আমার কাছে আস সপ্তাহান্তে একদিন বা তারও কম। সেই সময়টায় তুমি অন্যের কথা না তুলে তোমার আমার কথা বলতে পার না? আমি তোমাকে ভালবেসেছি, এমিলি!

—না, দীপ, ভালবাসা একে বলে না। আমাকে তোমার ভাল লাগে, একথা আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু আমাকে ভালবেসেছ একথা বলে নিজেকে প্রবঞ্চনা করো না। আমার দিক থেকে কোনই ভ্রান্তি নেই এসম্বন্ধে। ভালবাসার প্রকৃত রূপ দেখবার এবং অনুভব করবার দুর্ভাগ্য আমার হয়েছিল, আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস না, আমিও তোমাকে ভালবাসি না!

প্রদীপ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। এমন করে এর আগে কেউ তার মনকে বিশ্লেষণ করেনি!

এমিলি বলে চলল, আমি তোমার কতকগুলো খোরাক জুগিয়েছি মাত্র, শুধু দেহের খোরাক নয়, মনেরও। আমার তৃপ্তি সেইখানে। ছবির প্রত্যাখ্যানে তুমি যে আজ মুহ্যমান হ'য়ে পড়োনি তারও কারণ আমি। এতে দুঃখিত হয়ো না দীপ! তুমি তোমার নিজেকে অতিক্রম করে উঠতে পারছ না—পারা সহজও নয়। আমিও আমার নিজের অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির নিগড়ে বাঁধা।

এমিলি প্রদীপের ঘাড়ে একটা হাত রাখল। তারপর বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, দীপ! সপ্তাহান্তে একদিন বা তারও কম আমি তোমার কাছে আসি, সেই মূল্যবান সময়টা নষ্ট করা উচিত নয় এই প্রকার বিশ্লেষণে। বিশ্লেষণের কি শেষ আছে কখনও? চুলোয় যাক এই আলোচনা, বাতিটা নিবিয়ে দাও, আমাকে আদর করো।

এমিলি চলে যাবার পর প্রদীপ কেবলই ভাবতে লাগল বন্দনাকে নিয়ে আলোচনার কথা। ঠিকই বলেছে এমিলি, নিছক অভিমানের বশবর্তী হয়ে সে বন্দনার সঙ্গে সম্পর্কে ত্যাগ করেছে। আজ এক বছরেরও বেশী হতে চলল, একখানা পোষ্টকার্ড লিখেও সে বন্দনাকে জানায়নি যে সে ভাল আছে! সে নিজে না জানালে তার ঠিকানাই বা বন্দনা পাবে কোত্থেকে?

কিন্তু কি লিখবে সে বন্দনার কাছে? তাকে সম্পূর্ণভাবে গোপন করে যেতে হবে এমিলির কথা। সেটা কি উচিত হবে?

না, সে অত্যন্ত সাধারণ একখানা চিঠি লিখবে। কি প্রয়োজন গোড়াতেই এমিলির কথা পাড়বার? একবার ছবির বিষয় যে ভুলবোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, এমিলির কথা তুলে সে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করতে চায় না!

অবশেষে সে লিখল:

'বন্দনা, অনেকদিন'পরে তোমার কাছে চিঠি লিখছি। লিখবার একটা অজুহাত আছে, সেটা হচ্ছে যে গতকাল ছিল ১৫ই আগষ্ট। যে দিনটার জন্য আমরা সবাই হয়েছিলাম উৎকণ্ঠিত, অবশেষে তা এল। এখানে আমরা—ভারতীয়েরা—নিজেদের মত আমোদ আহ্লাদ করেছি। খবরের কাগজে দেখতে পাচ্ছি সারা ভারতবর্ষব্যাপী উৎসবের সজ্জা। আশা করি তুমি ভাল আছ।

আমার নিজের খবর এই যে, আমি এখানে একটা এঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্ম-এ চাকুরী করছি, আর সাথে সাথে সন্ধ্যাবেলায় পলিটেকনিক্ ক্লাশ করছি। আরও তিন বছর এইভাবে ক্লাশ করতে হবে, তারপর হয়ত একটা ডিপ্লোমা পাব।—আর সেই সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতাও হবে যথেষ্ট। আশা করি স্বাধীন ভারতে চাকুরীর অভাব হবে না।

তোমার বাবা কেমন আছেন? নবকিশোরের খবর কি? সুমিত্রার সঙ্গে দেখা হয় কি? জ্যোতির্ম্ময় বাবু কি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন? যে সুযোগের অপেক্ষায় তিনি ছিলেন সেই সুযোগ এখন এসেছে, দেশের কল্যাণ সাধনের পথে আর কোন বাধাই ত এখন রইল না। ওঁর খুবই উচিত একটা দায়িত্ব গ্রহণ করা।

আমার ঠিকানা ওপরে দিলাম। মাঝে মাঝে চিঠি দিলে খুসী হব। ইতি —প্রদীপ'

পরের সপ্তাহে এমিলি যখন এল তখন প্রদীপ তাকে জানাল যে তার উপদেশানুসারে সে বন্দনার কাছে চিঠি লিখেছে।

এমিলি বলল, You are a darling, দীপ!

## আট

যথাসময়ে বন্দনার কাছে প্রদীপের চিঠি পৌঁছাল। পরিচিত হস্তাক্ষর, কম্পিতবক্ষে বন্দনা চিঠিখানা খুলল।

খুবই সাধারণ চিঠি। কোন উচ্ছ্বাস নেই, কোন অভিযোগ বা অভিমানও নেই। এ যেন নতুন এক প্রদীপ!

বার বার চিঠিখানা সে পড়ল। তার ড্রয়ার থেকে বের করল জাহাজ থেকে লেখা প্রদীপের প্রায় দেড় বছর আগেকার সেই অন্য চিঠিটা। দুটো পাশাপাশি সে রাখল, না কোন ক্ষোভ, কোন অনুযোগ নেই প্রদীপের এই দ্বিতীয় চিঠিতে।

বন্দনারও কোন অভিযোগ নেই প্রদীপের প্রতি। দীর্ঘ অবকাশে সে নিজেকে বিশ্লেষণ করতে সুরু করেছিল। তারও একবার মনে হয়েছিল যে, ছবির বিষয় নিয়ে বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়েছে। তাছাড়া কথাপ্রসঙ্গে আরও দু'-একবার নবকিশোরের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল ছবির নাম—বন্দনার মনে প্রশ্ন জেগেছিল নবকিশোরের সঙ্গে ছবির কি সম্পর্ক? তবে কি প্রদীপ অপরাধী নয়, অপরাধী নবকিশোর নিজে?

নবকিশোরকে এসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন সে করেনি। ছিঃ, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করাও যে মনের অপ্রসারতার পরিচায়ক

তাছাড়া, তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে দিয়ে প্রদীপ চলে গেছে, কি লাভ হবে অতীতের এই পরিচ্ছেদের পুনরাবৃত্তি ক'রে ?

কিন্তু আজ প্রদীপের চিঠি পেয়ে তার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। চিঠিখানা নিয়ে সে সোজা হাজির হ'ল নবকিশোরের কাছে।

—দাদা, প্রদীপ বিলেত থেকে চিঠি লিখেছে।

—তাই নাকি ? এত দিন পরে ? কি খবর তার ?

—এই দেখ না !—ব'লে বন্দনা নবকিশোরের হাতে চিঠিখানা দিল।

—বাঃ, বেশ গুছিয়ে নিয়েছে ও ! চাকুরী করছে, ডিপ্লোমার জন্য তৈরী হচ্ছে, দেশে যখন ফিরবে তখন সে হবে মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার। তা' বেশ ভাল, তুই লিখে দিস আমাদের ফার্ম্ম-এ তার জন্য জায়গা খোলা রইল।

—যা লিখবার আমি লিখব। আমার তোমাকে দু'-একটা প্রশ্ন করবার আছে, দাদা !

একটু ভয়ার্ত্তভাবে নবকিশোর বন্দনার দিকে তাকাল।

—কি বল্ না ? ভণিতা করছিস কেন ?

—প্রদীপ আর ছবির সম্বন্ধে তুমি যে কথা আমাকে বলেছিলে তার কতটুকু সত্যি, আর কতটুকু বানানো, দাদা ?

—এই ত্যাখ, আবার সেই পুরানো কথা তুললি ! তুই জানিস আমার বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আমি করতে চাইনি, তুই-ই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার পেটের মাঝ থেকে সব কথা বার করে নিলি। আর এখন প্রশ্ন করছিস তার কতটুকু সত্যি, কতটুকু বানানো ? একেই বলে মেয়েমানুষী নিরপেক্ষতা !

—অপরাধটা যে আমার তা' আমি মেনে নিচ্ছি দাদা, কিন্তু আমার সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব দাও। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যা' বার হ'ল তাই কি সব, না আরও কিছু আছে ?

নবকিশোর এবার অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করল। কি বলতে চায় বন্দনা ? ছবির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বন্দনা কি তার কারো কাছ থেকে শুনেছে নাকি ?

নবকিশোরকে নীরব দেখে বন্দনার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হ'ল। সে বলল, তুমি ছবিকে দেখেছ নিশ্চয়ই ?

আমতা-আমতা ক'রে নবকিশোর বলল, হাঁ, তা' দেখেছি বই কি—প্রদীপদা'ই ত আলাপ করিয়ে দিয়েছিল !

ব'লেই নবকিশোর উপলব্ধি করল যে সে একটা প্রকাণ্ড ভুল ক'রে বসল।

—তুমি তার সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে কেন ?

একটু রাগত ভাবে নবকিশোর বলল, সে সব দিয়ে তোর কি প্রয়োজন ? তুই দেখছি উকিলের মত জেরা করতে সুরু করেছিস !

কাতরকণ্ঠে বন্দনা বলল, তুমি বুঝতে পারছ না, দাদা, আসল ব্যাপারটা জানা আমার কতখানি প্রয়োজন। তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে খুলে ব'লো কি হয়েছিল।

ততক্ষণে নবকিশোর নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছে। বেশ কঠিন কণ্ঠেই বললে, তোকে যা বলেছি তার মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই, বন্দনা !

বন্দনা তবু সন্তুষ্ট হ'ল না। প্রশ্ন করল, বোঝা যাচ্ছে, তোমার সঙ্গে ছবির মাঝে মাঝে দেখা হয়। তার ঠিকানা জান ?

নবকিশোর বলল, আবার তুই জেরা করতে সুরু করলি ? আমি তোর এই প্রশ্নের জবাব দেব না।

বন্দনা এবার তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করল। বলল, বেশ, তুমি যদি আমাকে না ব'লো তাহ'লে আমাকে সুমিত্রার শরণাপন্ন হ'তে হবে।

নবকিশোর এবার রীতিমত ভয় পেল। বলল, এ তোর ভারী অন্যায়, বন্দনা ! এসব ব্যাপারে সুমিত্রাকে জড়াতে চাচ্ছিস কেন ?

—তাহ'লে তুমিই আমাকে ব'লো, দাদা !

—তবে শোন। প্রদীপদা' আমাকে বলেছিল ছবির জন্য নার্সি-এর ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ক'রে দিতে, আমি সেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। সেই সূত্রে মাঝে মাঝে দেখা হ'ত।

—দেখা হ'ত ? এখন হয় না ?

—সে এখানকার কোর্স শেষ করে স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত চলে গেছে, আজ তিন-চার মাসেরও বেশী হ'ল। কোথায় আছে, সে খবরও রাখি না। আমার কি প্রয়োজন ? তাচ্ছিল্যের সুরে নবকিশোর জবাব দিল।

বন্দনা আর কোন কথা বলল না, নবকিশোরের কাছ থেকে চিঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে সে চলে এল তার ঘরে।

কেঁচো খুঁড়তে এ কি সাপ বেরিয়ে এল এবার ? ছবি বিলেতে ? কি উদ্দেশ্যে সে গিয়েছে সেখানে ? প্রদীপের সঙ্গে মিলিত হতে কি ? বন্ধুবৎসল দাদা কিছুতেই সব কথা খুলে বলবে না তাকে।

প্রদীপের এই হঠাৎ চিঠি লেখার কারণও কি ছবি ? ছবিকে কাছে পেয়ে তার পূর্ব্বস্মৃতি জেগে উঠেছে, তাই কি সে বন্দনার কাছে চিঠি লিখেছে ?

না, এ কি ছেলেমানুষি করছে সে ! ছবি যদি প্রদীপের কাছে গিয়েই থাকে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কেন হবে বন্দনার কাছে চিঠি লেখা ? কিন্তু, কিন্তু, ছবি কি সত্যি নার্সিং-এর স্কলারশিপ নিয়ে বিলেতে গেছে, না এ-ও একটা অজুহাত মাত্র ?

কার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবে সে ? কে তাকে পরামর্শ দেবে ? হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল গায়ত্রীর কথা। গায়ত্রী দিদির কাছে সে যাবে, তাকে সব কথা খুলে বলবে, এবং তার কাছে চাইবে উপদেশ, প্রদীপের এই চিঠির জবাব সে দেবে কি না, এবং দিলেও কি লেখা সঙ্গত হবে ?

টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুঁজে সে বার করল মিঃ সুপ্রকাশ করের ঠিকানা। গায়ত্রী বলল, সে খুব খুসী হবে বন্দনা, যদি পরের দিন বিকেলে এসে তার কাছে চা খায়।

দু'খানা চিঠিই ব্যাগ-এ পুরে বন্দনা এল গায়ত্রীর কাছে।

—এসো বন্দনা, এসো। সেই একদিন দেখার পর আর তোমার কোন খবরই পাইনি। অবশ্য আমরাও ত মাঝখানে মফঃস্বলে ছিলাম। তা' ভাল আছ ত ?

—ভাল আছি, গায়ত্রীদি'।

—প্রদীপের চিঠিপত্র পাও ত ?

বন্দনা চুপ করে রইল। তারপর বলল, সে সম্বন্ধেই আপনার কাছে পরামর্শ করতে এসেছি। প্রায় দেড় বছর পরে গতকাল তার একখানা চিঠি এসেছে।

—সে কি ? বিস্মিত ভাবে গায়ত্রী বলল। তোমার কাছে

এত দিন চিঠি লেখেনি ? আমার কাছে ত নিয়মিত ভাবে লিখে যাচ্ছে। ব্যাপারখানা কি বলো ত ?

অশ্রুসজল মুখ তুলে বন্দনা গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল।

—ও কি, তুমি কাঁদছ ? ছিঃ, প্রদীপের এ ভারী অন্যায়। কি ছেলেমানুষি করছে সে। তোমার কাছে একখানাও চিঠি লেখেনি এত দিন ?

বন্দনা প্রদীপের চিঠি দু'খানা গায়ত্রীর হাতে দিল। গায়ত্রী পড়ল, তারপর ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলল, কিছুই বুঝতে পারছি না, বন্দনা ! বিলেত যাবার আগে কোন বিষয় নিয়ে তোমাদের আলোচনা হয়েছিল ? কি অন্যায় সে করেছিল ?

ধীরে ধীরে বন্দনা খুলে বলল ছবির কাহিনী, নবকিশোরের কাছে যতটুকু শুনেছিল। তারপর সে প্রকাশ করল তার সংশয়ের কথা। প্রথম সংশয়, তার দাদা ছবি সম্বন্ধে অনেক কিছু বোধ হয় গোপন করে গেছে। দ্বিতীয় সংশয়, কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে ছবি বিলেতে গেছে ?

ছবির ইতিবৃত্ত শুনে গায়ত্রী ত স্তম্ভিত ! প্রদীপ যে ছবির মত মেয়ের সঙ্গে এই ভাবে জড়িয়ে পড়েছে তা' বিশ্বাস করা কঠিন ; গায়ত্রীকেও ত সে ঘূণাক্ষরে কোন কথা বলেনি। নাঃ, এসব হচ্ছে নবকিশোরের বানানো কাহিনী, প্রদীপের মত আদর্শবাদী ছেলে কখনও ছবির সাহচর্য্য কামনা করতে পারে না। এই রহস্য উদ্ঘাটন করতেই হবে।

বলল, তোমার দাদার কাছ থেকে ছবির পুরো নাম, এখানে কোন হাসপাতালে ট্রেনিং নিয়েছিল তার নাম, এ-সব আমাকে জোগাড় করে দিতে পার ?

ম্লানমুখে বন্দনা বলল, দাদা কিছুই বলবে না, তার ভয়, আমি হয়ত এমন কিছু আবিষ্কার ক'রে ফেলব যা' তার পক্ষে সুবিধাজনক হবে না।

—তা হ'লে ত মুস্কিল হ'ল। চিন্তিত ভাবে গায়ত্রী বলল। তারপর বলল, আচ্ছা, র'সো। আমিই প্রদীপের কাছে চিঠি লিখব, সোজাসুজি প্রশ্ন ক'রে। আমার বিশ্বাস, আমার কাছে সে কিছু গোপন করবে না।

কৃতজ্ঞ চোখে বন্দনা গায়ত্রীর দিকে তাকাল। বলল, আপনি কিন্তু এই চিঠির কথা উল্লেখ করবেন না অথবা বলবেন না যে, আমি আপনার কাছে এসেছিলাম।

— সে সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

—আমি কি প্রদীপের চিঠির জবাব দেব, দিদি ?

—নিশ্চয় ! তুমি কেন তাকে সন্দেহের অবকাশ দেবে যে আমরা তার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করছি ?—অবশ্য আমার ওকে চিঠি লেখাটা গোয়েন্দাগিরি নয়, এ হচ্ছে সম্মুখ আক্রমণ !

হপ্তা দুই পরে একই ডাকে প্রদীপ পেল দু'খানা চিঠি, একখানা বন্দনার, আর একখানা গায়ত্রীর।

বন্দনা সহজ ভাষায় তার চিঠির জবাব দিয়েছে, জবাবে ছবির কোনই উল্লেখ নেই। অনেক দিন পরে প্রদীপের যে চিঠি লিখবার সময় হয়েছে, সেজন্যে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে এবং তাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছে তার কাজে এবং পড়ায় সাফল্যের জন্য। নবকিশোর যে বলেছে যে তার ফার্ম্ম-এ প্রদীপের জন্য জায়গা খোলা থাকবে, সে কথাও লিখতে ভোলেনি। তারপর সে খবর দিয়েছে সুমিত্রার এবং জ্যোতির্ম্ময় বাবুর। সুমিত্রার সঙ্গে নবকিশোরের হয়ত শীগগিরই বিয়ে হবে, অন্ততঃ জ্যোতির্ম্ময় বাবুর এবং তার বাবার সেই ইচ্ছা। আর জ্যোতির্ম্ময় বাবু মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি, তিনি থাকতে চান সিংহাসনের পেছনে প্রচ্ছন্ন শক্তি হিসেবে, প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে চান না।

প্রদীপ হাসল। তারপর গায়ত্রীর চিঠি খুলল। একথা সেকথার পর গায়ত্রী লিখেছে :

"তোমার কাছে আজ একটা বিষয়ে প্রশ্ন করতে চাই, আশা করি এতটুকু গোপন না করে তোমার দিদির কাছে সব খুলে লিখবে। এখানে আমরা শুনলাম, ছবি নামে একটি মেয়ের সঙ্গে নাকি অদ্ভুত ভাবে তোমার পরিচয় হয়েছিল। তারপর সেই মেয়েটির নার্সিং শেখবার ব্যবস্থাও তুমিই করে দিয়েছিলে, এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করে সে নাকি বিলেতে গেছে, উচ্চতর একটা ডিপ্লোমা নিতে। তোমার দিদির কাছে এ সম্বন্ধে কিছুই বলোনি, হয়ত কোন সঙ্গত কারণ ছিল। কিন্তু এখন তোমার দিদি জানতে চায়, প্রথম কি সূত্রে ছবির সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছিল, দ্বিতীয়, তুমি কি সত্যি তার নার্সিং শেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলে, এবং তাই যদি হয়ে থাকে, কেন ? তৃতীয়, সে বিলেতে গেছে কি উদ্দেশ্যে এবং চতুর্থ, বিলেতে তার সঙ্গে তোমার দেখা হয় কি এবং হয়ে থাকলে তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধটা কি। আমি জানি, তুমি কোন প্রকার গোপনতা পছন্দ কর না। তাই আশা করি, ফেরং ডাকে আমার প্রশ্নগুলোর সহজ এবং সরল জবাব পাব। আর তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে লেখো, তোমার বিশ্বাসের অমর্য্যাদা আমি করব না।"

প্রদীপ আবার না হেসে পারল না। যেখান থেকেই গায়ত্রী খবর পেয়ে থাকুক না কেন, চিঠিটার পেছনে যে মিঃ করের সিভিলিয়ানি মুসাবিদা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু কে এই সংবাদদাতা ? বন্দনা নিজে নয় ত ?

না, তাহ'লে বন্দনা এমন স্বাভাবিক ভাবে তার কাছে চিঠি লিখতে পারত না।—কে জানে সিভিলিয়ানদের আড্ডায় কত গুপ্তচর থাকে, তাদেরই মধ্যে একজন ( প্রদীপের শুভানুধ্যায়ী ) গায়ত্রীর কাছে এই খবর পৌঁছে দিয়েছে কি না !

কি জবাব সে দেবে ? গায়ত্রী তার প্রশ্নগুলোর সহজ এবং সরল জবাব চেয়েছে, কিন্তু চিঠিতে সহজ এবং সরল জবাব দেওয়া কি সম্ভব ?

সে ঠিক করল, এমিলির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তার জবাব লিখবে।

এমিলিকে গায়ত্রীর চিঠিখানার প্রাসঙ্গিক অংশটুকু তর্জ্জমা ক'রে পড়ে শোনাল। সঙ্গে সঙ্গে বন্দনার জবাব যে এসেছে, সে খবরও দিল।

এমিলি আনন্দ প্রকাশ করল যে, প্রদীপের চিঠি লেখা ফলপ্রসূ হয়েছে। বলল, যাক্, এবার বরফ ভেঙে গেছে, আশা করি এর পর পত্রবিনিময় আরও সহজ, আরও স্নেহপূর্ণ হবে।

—তোমার ওই এক চিন্তা, এমিলি ! আমার উপস্থিত সমস্যা হচ্ছে দিদির, মিসেস্ করের, প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়া, সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য ক'রো দেখি !

—ছবির সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক তার আমি কি জানি? ব্যবহার করবে তুমি, আর জবাব লিখে দিতে হবে আমাকে? চমৎকার ব্যবস্থা ত! পরিহাসের সুরে এমিলি বলল।

—লক্ষ্মীটি, আমাকে আর জ্বালিয়ো না। আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশী ভাল জান ছবির সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক। আমি একটা খসড়া জবাব লিখে রেখেছি, তুমি শুনবে?

দু'জনে মিলে কাঁটাছাঁটা করে জবাব তৈরী করল। জবাবটা গিয়ে দাঁড়াল এই:

"ছবি সম্বন্ধে তুমি গোটাকয়েক প্রশ্ন করেছ, তার সহজ এবং সরল জবাব চেয়েছ। আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করলাম সহজ এবং সরল জবাব দিতে, তবে সব বিষয় বোধ হয় বোঝাতে পারলাম না—যদি ভবিষ্যতে সুযোগ পাই অনুচ্ছেদগুলো পূরণ করব।

প্রথম, ছবির সঙ্গে পরিচয় হয় অত্যন্ত অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে, এক—এ, আর, পি ভলান্টিয়ারের মাধ্যমে। আমার কোন অসাধু উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ছিল তার উল্টো। আদর্শবাদী আমি, চেয়েছিলাম তার জীবনের গতির মোড় ফিরিয়ে দিতে।

দ্বিতীয়, তার নার্সিং শেখার ব্যবস্থা আমি করিনি, নবকিশোর করেছিল, তবে আমারই অনুরোধে। এসব বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই আমি নবকিশোরের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে নার্সিং শিখেছিল পি, জি, হাসপাতালে। তখন তার সঙ্গে মাত্র একদিন দেখা হয়েছিল, নবকিশোর আমাদের সঙ্গে ছিল। ছবির সঙ্গে দেশে এই আমার শেষ দেখা। যতদূর জানি, নবকিশোর নিয়মিত ভাবে ছবির খোঁজখবর করত।

তৃতীয়, ছবি বিলেতে এসেছে নার্সিং-এর উচ্চতর ডিপ্লোমা নিতে (তার নিজমুখে শোনা সত্য-মিথ্যা জানি না), দেশ থেকে স্কলারশিপ নাকি পেয়েছে। সে এখানে এসেছে প্রায় চার-পাঁচ মাস হ'ল, কিন্তু আমি তার আসা সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ব্রাইটন বলে একটা জায়গায়, যেখানে আমি গিয়েছিলাম হলিডে করতে।

চতুর্থ, বিলেতে ছবির সঙ্গে এই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা। সে স্বাধীন জীবন যাপন করছে, ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে তার দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, আমার বা তার দিক থেকে কোন অভিলাষও নেই।

আশা করি, যা' যা' জানতে চেয়েছ, সবই এই জবাবের ভেতর থেকে পাবে।"

প্রদীপ দু'বার তিন বার পড়ল। তারপর বলল, জবাবটা কিন্তু ঠিক হ'ল না, এমিলি! আমি নিতান্ত সাধু সেজে বসে রইলাম, ব্রাইটন-এর ব্যাপারটা ত বলা হ'ল না!

এমিলি বলল, আবার সেই ব্রাইটন-এর ব্যাপার? তোমার এই অদ্ভুত বিবেকের সঙ্গে তাল রাখা যায় না! বেশ, পুনশ্চ করে লিখে দাও। ব্রাইটন-এ আমি ছবিকে চুমু খেয়েছিলাম, উদ্দেশ্য মোটেই সাধু ছিল না! কিন্তু ছবিই আমার গালে চড় মেরে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, এবং তারপর থেকে স্থির করেছি যে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না!

প্রদীপ বলল, কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি, এমিলি! তুমি যা' বলবে তা'ই হ'বে।

## নয়

আরও পাঁচ মাস পরের কথা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি। বিলেতে প্রদীপের জীবন চলেছে গতানুগতিক ভাবে। দিনের বেলায় ফার্ম, সন্ধ্যায় পলিটেক্‌নিক-এ ক্লাস, আর মাঝে মাঝে এমিলির আগমন—এই ছিল তার রুটিন।

দেশ থেকে গায়ত্রীর চিঠি এসেছিল, তার জবাবের উত্তর। গায়ত্রী লিখেছিল, "প্রদীপ ভাইটি, তোমার চিঠি পেয়ে আমার সব সংশয় ঘুচে গেছে। ছবিকে জড়িয়ে তোমার নামে এখানে যে কুৎসা রটেছিল বা রটবার উপক্রম হয়েছিল, আমি অবশ্যি কোন দিনই বিশ্বাস করিনি। তোমার লেখা চিঠি আমার হাত আরও সুদৃঢ় করে দিয়েছে। এ সম্বন্ধে তোমাকে আর প্রশ্ন করব না।" বন্দনার কোন উল্লেখ এই চিঠিতে ছিল না।

বন্দনার কাছে ইতিমধ্যে প্রদীপ দু'-তিনখানা চিঠি লিখেছে উচ্ছ্বাসহীন, সংক্ষিপ্ত চিঠি। বন্দনার জবাবও এসেছে দেড় মাস দু'মাস অন্তর একখানা করে। দেশের খবর, কলকাতার খবরেই তার চিঠি ভর্ত্তি থাকত। সুমিত্রার সঙ্গে অবশেষে নবকিশোরের বিয়ে হ'য়ে গেছে, এই খবরটা শেষের একটা চিঠিতে ছিল।

ছবির সঙ্গে প্রদীপের আর দেখা হয়নি। লণ্ডনের বিরাট জনপ্রবাহে দেখা না হওয়াটা আশ্চর্য্যের বিষয় মোটেই নয়।

আবার নতুন বছরের সূচনা নিয়ে এল ৩১শে ডিসেম্বর। এবার এমিলি তার কাছে নেই, সে গিয়েছিল মাকে নিয়ে তার দিদিমার কাছে। লণ্ডনের বাইরে, পঞ্চাশ মাইল দূরে ছোট একটি শহরে দিদিমা মৃত্যুশয্যায়। এমিলি অবশ্য প্রদীপকে বলে গিয়েছিল যে খুব চেষ্টা করবে ৩১শে ডিসেম্বর রাত বারোটার আগে ফিরে আসতে প্রদীপ যেন অন্ততঃ রাত দশটা পর্য্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করে, তার মধ্যেও এমিলি যদি এসে না পৌঁছয়, তাহলে সে বুঝবে যে তার পক্ষে আসা সম্ভব হ'ল না।

প্রদীপ বার বার তার হাত-ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছিল। দশটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকী। বোধ হয় এমিলি আসতে পারল না, হয়ত বা তার দিদিমার অবস্থা খুবই খারাপ, হয়ত বা তাঁর অন্তিম হয়ে গেছে। প্রদীপের কেবলই মনে হচ্ছিল, আগের বছরের এই রাতটির কথা—কি ভাবে এমিলি জোর করে তাকে নিয়ে গিয়েছিল তার ঘরের বদ্ধ আবেষ্টনীর বাইরে। তারপর পিকাডিলি সার্কাসে নতুন বৎসরকে আবাহন (তার কাছে এই বছরটা কত ঘটনাবহুল, কত বৈচিত্র্যময়), সেখান থেকে এমিলিকে নিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন এবং নতুন বছরের নতুন উন্মাদনায় এমিলির তার কাছে, অথবা তার এমিলির কাছে আত্মসমর্পণ।

ঘড়িতে দশটা বাজল। আরও পনেরো মিনিট কাটল। না, বাইরে সে যাবে না, ঘরেই বসে থাকবে, এমিলির প্রতীক্ষায়। কে জানে, উৎসবের রাত, পথে যা ভিড়, এমিলি হয়ত এসে পৌঁছবে একটু দেরীতে। তাকে দেখতে না পেলে সে অত্যন্ত নিরাশবোধ করবে।

হঠাৎ তার দরজায় কে টোকা মারল। প্রদীপ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজাটা খুলে দিল।

না, এমিলি নয়, তার বাড়ীর বুড়ী ল্যাণ্ডলেডি।

—মিঃ গুহ, আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে, কোন এক হাসপাতাল থেকে, অত্যন্ত জরুরী।

হাসপাতাল? সে কি! তাড়াতাড়ি সে ছুটে গেল টেলিফোনের কাছে।

—আপনি মিঃ দীপ গুহ কথা বলছেন? আমি সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালের ক্যাসুয়্যালটি ওয়ার্ড থেকে বলছি। মিস এমিলি বার্ক নামে একজন মহিলা আধ ঘণ্টা হ'ল এখানে এসেছেন। গাড়ী অ্যাক্সিডেণ্ট-এর কেস, অত্যন্ত সীরিয়স, আপনাকে খবর দিতে বললেন—আপনি যদি এখানে চলে আসতে পারেন, ভাল হয়। আমি টেলিফোন ছেড়ে দিচ্ছি।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল প্রদীপ কয়েক মিনিট। বুড়ী ল্যাণ্ডলেডি প্রশ্ন করল, কোন খারাপ খবর নয়ত, মিঃ গুহ?

—আমার এক বন্ধু গাড়ী অ্যাক্সিডেণ্টে হাসপাতালে এসেছে। অবস্থা মোটেই ভাল নয়। আমাকে এখখুনি যেতে হবে।

বুড়ীর কাছ থেকে সেণ্ট বার্থোলোমিউ হাসপাতালের নির্দেশ জেনে প্রদীপ ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়। লোকে লোকারণ্য, চারদিকে উৎসবের মাতামাতি। ষ্ট্যাণ্ড-এ একটাও ট্যাক্সি নেই। প্রদীপ হাঁটতে সুরু করল, তার পর কিছুদূর গিয়ে একটা ট্যাক্সি মিলল।

হাসপাতালে প্রদীপ যখন পৌছল, তখন সাড়ে এগারোটা হবে। Enquiry Counterএ প্রশ্ন করে সে সোজা ছুটল Casualty Wardএর অভিমুখে। বাইরে একজন নার্স দাঁড়িয়েছিল। প্রদীপ তাকে চিনতে পারল, সে আর কেউ নয়, ছবি।

—আপনি? এখানে! আপনার পরিচিত কোন কেস আছে নাকি? ছবি প্রশ্ন করল।

—হ্যাঁ, এমিলি বার্ক ব'লে একটা কেস একটু আগে এসেছে। আমাকে টেলিফোন করা হয়েছিল, কেমন আছে সে?

—ওঃ, আপনিই দীপ গুহ? আমি বুঝতেই পারিনি! আপনার নাম প্রদীপ বলেই জানতাম। আসুন, এদিকে আসুন।

Emergency Operation Roomএর বাইরে একজন ডাক্তার বসেছিলেন। ছবি প্রদীপকে নিয়ে গেল তাঁর কাছে, বলল, ইনিই হচ্ছেন মিঃ দীপ গুহ, মিস বার্ক-এর বন্ধু, আমাদের টেলিফোন মেসেজ পেয়ে এসেছেন। ব'লে ছবি চলে গেল তার ডিউটিতে।

—বসুন। এখখুনি ত দেখতে পাবেন না, ব্লাড ট্রান্সফিউশন দেওয়া হচ্ছে। কেস সত্যি সীরিয়াস।

—কি হয়েছিল বলুন ত? উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—কি আর হবে, সেই চিরন্তন নিউ ইয়ার্স ইভ ক্যাসুয়্যালটি। নিজেই গাড়ী চালিয়ে আসছিলেন লণ্ডনের দিকে, পুলিশ-রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছি গাড়ী চালাচ্ছিলেন ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে। লণ্ডনের কাছাকাছি এসে তাঁর সামনে পড়ে যায় উৎসবোন্মত্ত ছেলে-মেয়ের দল। বোধ হয় তাদের এড়িয়ে যাবার প্রয়াসে ব্রেক কষেন। কিন্তু আজ অল্প অল্প বরফ পড়েছে দেখেছেন ত, চাকা skid করে গাড়ীটা ধাক্কা লাগে একটা ল্যাম্পপোষ্টে, বাঁদিকের মাডগার্ড এঞ্জিনের খানিকটা চুরমার হয়ে গেছে। মিস বার্ক ষ্টিয়ারিং হুইলটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন, বুকে, বাঁ-হাতে, কোমরে খুবই জখম হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে চিন্তার কারণ হচ্ছে যে তাঁর মাথায় চোট লেগেছে।

—আপনাদের কি মনে হয়? Will she recover?

—বলা কঠিন, অপারেটিং সার্জ্জন বলতে পারবেন।

কাঠ হয়ে প্রদীপ বসে রইল, অপারেটিং সার্জ্জনের নিষ্ক্রমণের অপেক্ষায়।

আধ ঘণ্টারও বেশী কেটে গেল। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারটা বাজল। নতুন বৎসর—১৯৪৮ সাল।

হাই তুলে বিরক্তিসূচক মুখভঙ্গি করে ডাক্তারটি বললেন, একেই বলে অদৃষ্ট! নিউ ইয়ার্স ইভ, কোথায় একটু ফুর্ত্তি করব, না বসে থাকতে হচ্ছে এই হাসপাতালের করিডরে! আমাদের ডিউটি পড়ে by lots—আমার অদৃষ্ট এমন খারাপ যে lotএ আমারই নাম উঠল।

আরও আধ ঘণ্টা কেটে গেল। Emergency operation room থেকে শাদা overall প'রে বেরিয়ে এলেন সার্জ্জন, তাঁর পেছনে পেছনে একজন বিলিতি নার্স।

ডাক্তারের সম্মুখে আসীন প্রদীপকে দেখে তিনি বললেন, আপনিই মিঃ গুহ? আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, ব্লাড ট্রান্সফিউসন ক'রেও কোন ফল হ'ল না। মনে হয় না আমরা ওঁকে বাঁচাতে পারব। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, ভেতরে যেতে পারেন, নার্স আপনাকে নিয়ে যাবে।

রক্তহীন মুখ নিয়ে নার্সের সঙ্গে প্রদীপ ঢুকল অপারেশন থিয়েটারে। এক পাশে ভাঁজকরা পর্দার আড়ালে লোহার খাটের উপর শুয়ে আছে এমিলি। সমস্ত মুখ তার ব্যাণ্ডেজ করা, খোলা আছে শুধু তার দুটি চোখ, নাক এবং ঠোঁট। বাঁ-হাত এবং সারা বুক এবং কোমরও ব্যাণ্ডেজ করা। গায়ের উপর একটা পুরু শাদা চাদর। তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন নার্স, পাশের টেবিলে ইনজেকশন-এর যন্ত্রপাতি, ওষুধ।

প্রদীপ এসে এমিলির মুখের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল। নার্স এগিয়ে দিল একখানা চেয়ার, প্রদীপ সেখানে বসল।

—তুমি আসতে পেরেছ, দীপ! I am so glad! ভয় হচ্ছিল বুঝি সময়মত পৌছতে পারবে না! উঃ—বড় যন্ত্রণা!

নার্স এগিয়ে এল ইনজেকশনের সূঁচ হাতে করে। এমিলি বলল, একটু পরে, নার্স—এখন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে কি লাভ হবে, ঘুম ত আসবেই, তার আগে আমার fiance'র সঙ্গে দুটো কথা বলতে দাও।

নার্স অপ্রস্তুত হয়ে স'রে দাঁড়াল।

—শোন, দীপ, আমি বলেছিলাম দশটার মধ্যে তোমার কাছে পৌছব, তাই গাড়ীটা চালিয়েছিলাম একটু বেগে। তারপর হঠাৎ কি যে হ'য়ে গেল কিছুই খেয়াল নেই। দিদিমার অবস্থা এখনও ভাল নয়, তাই মাকে তাঁর কাছে রেখে আমি একাই বেরিয়ে পড়েছিলাম, to keep my assignment with you!—I have kept my assignment, কি বল?

প্রদীপের চোখ জলে ভরে উঠল।

—ছিঃ, কেঁদো না। এই হয়ত ভাল হ'ল। তবে, দীপ,

তোমাকে একটা secret কথা বলে যাই। এই কয় দিন আমি নিজের মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছিলাম, অবশেষে স্থির করেছিলাম যে নতুন বছরে আমিই তোমার কাছে প্রোপোজ করব। এটা ১৯৪৮ সাল, লীপ্ ইয়ার, জানত? আমাদের দেশের রীতি হচ্ছে লীপ ইয়ারে মেয়েরা ছেলেদের কাছে প্রোপোজ করতে পারে, অবশ্য ছেলেরা সেই প্রোপোজাল প্রত্যাখ্যান করতে পারে নিঃসঙ্কোচে। তাই নয় কি, নার্স?

নার্স-এর চোখও ছলছল্ করে উঠছিল। সে শুধু বলল, আপনি কথা বলবেন না, মিস বার্ক, আপনার বিশ্রাম নিতান্ত দরকার।

একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল এমিলি। বলল, বিশ্রাম? বিশ্রামের অবসর যথেষ্ট মিলবে, নার্স! আমার fiance'কে এই কথাগুলো বলবার সুযোগ ত আর পাব না।—হ্যাঁ, কি বলছিলাম, দীপ? ওঃ, আমি না হয় প্রোপোজ করতাম, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণ করতে না। কি ভাবে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে বল দেখি?—ঐ যে একটি মেয়ে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল—নামটা মনে আসছে না—

—ছবির কথা বলছ তুমি?

—হ্যাঁ, ছবি। এইবার মনে হয়েছে, তার নাম ছবি।—না, না, তার প্রত্যাখ্যানের পেছনে ছিল অন্য কারণ, আর তোমার প্রত্যাখ্যানের মূলে থাকত—মূলে থাকত—

এমিলি কথাটা শেষ করতে পারল না, যন্ত্রণাসূচক একটা মুখভঙ্গী করল। নার্স এসে তাড়াতাড়ি তার ডান হাতে একটা ইনজেকশন দিয়ে দিল।

ঘুমিয়ে পড়বার আগে এমিলি অস্ফুটস্বরে বলল, তুমি তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে যেয়ো, দীপ, ইংলণ্ডের আবহাওয়া তোমার সইবে না।

ভোর ছয়টার একটু পরে এমিলি মারা গেল।

প্রদীপ বাড়ীতে ফিরল তন্দ্রাগ্রস্তের মত। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করেছিলেন এমিলির মাকে খবর দিতে—প্রদীপ তাই আ সেখানে অপেক্ষা করল না। শুধু বলে এল, যদি কোন প্রয়োজন হয় তাকে খবর দিলেই সে চলে আসবে।

হাসপাতাল থেকে বেরুবার সময় ছবির সঙ্গে আমার মুখোমুখি হয়েছিল। ছবি বলেছিল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত মিঃ গুহ! যদি আপনার কোন প্রয়োজনে আসতে পারি আমাকে জানালে খুসী হব আমাকে এই হাসপাতালের টেলিফোনেই পাবেন—আমি যদি না থাকি এরা মেসেজ রেখে দেবে।

প্রদীপ এর কোন জবাব দেয়নি।

একটা অধ্যায়ের শেষ হল আজ। একেই বলে জীবনের ড্রামা ঠিক একটি বৎসর, অধ্যায়ের সুরু ১৯৪৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে তার ইতি ১৯৪৮ সালের ঐ তারিখটিতে! অথচ, চব্বিশ ঘণ্টা আগেও যদি প্রদীপকে কেউ বলত যে পরিসমাপ্তি হবে এই ভাবে তাহলে সে বিশ্বাস করত না, হেসে উড়িয়ে দিত। নিয়তির কাছে সে পরাভব স্বীকার করেনি কখনও, কিন্তু এখন সে দেখতে পেল মানুষ কত অসহায়, তার আস্ফালন কত অলীক!

কি অর্থ হয় এই বেঁচে থাকায়? কেন মানুষ জন্মায়? মৃত্যু যেখানে অবধারিত, শুধু অবধারিত নয়, যে কোন মুহূর্তে আসতে পারে, তখন মানুষ কেন বোকার মত, পাগলের মত চীৎকার করে অর্থের জন্য, যশের জন্য, স্নেহ-ভালবাসার জন্য? চারদিকে এ হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, কাম, লোভ, এ-সবই একদিন হঠাৎ মিলিয়ে যাবে বুদ্বুদের মত—মৃত্যুর নিষ্ঠুর অথচ অবশ্যম্ভাবী সংঘাতে। এমিলির আকস্মিক মৃত্যুতে প্রদীপ আজ প্রথম অনুভব করল যে, জীবনটা অনেকখানি উপন্যাসের থেকে। নিয়তির কাছে মানুষ অতি দুর্বল, অশক্ত! [ক্রমশঃ

# বিবাহ

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

এখন কেমন আছো, সঁাথির জ্বলন্ত এই সুখে।
জানালার আকাশকে দেখ ঘুমের কবোষ্ণ নীড়
ছেড়ে, সোহাগের প্রিয় দুবেটি জড়িয়ে খুশিমুখে।
অঙ্গুলি তিন বাই চারে কোনো উচ্ছল অস্থির,
আর নেই। বসনে তো কাঁপে নাকো ফাল্গুনী হাওয়া।
দ্বিপ্রহরে কাক ডাকে; তিতির ছাতার কতো দূরে
মহুয়ার মুক্তি কই, পিয়ালের স্বপ্নকে পাওয়া?
রাত্রে কতো তারা ওঠে।

আবার সে বুকে এলো ঘুরে
: বিপু-করা দিনগুলি বিভব-জরিতে যায় ভরে।
নিপুণ কবরী বাঁধে। গুন-গুন গান গায় ঘরে॥

# অনিকেত

সাত্যকি

আর এক ফার্লং।

আর এক ফার্লং গেলেই নীলাঞ্জনা বিশ্রাম পাবে, সেই সঙ্গে আমরাও।

নীলাঞ্জনা আমাদের লরীটার নাম।

টপ-গীয়ার থেকে টেনে থার্ড গীয়ারে আনলুম। গাড়ীটা বেজায় আস্তে আস্তে যাচ্ছে। মাল তো আর কম চাপে নি। বোঝাই গাড়ী টপ-গীয়ারে ভাল চলতে চায় না। অথচ এ পথটুকু পেরুতে কত সময়ই না লাগবে।

হেড-লাইটের তীব্র আলোয় পীচ-ঢালা রাস্তা ঝক-ঝক করে উঠছে। কিন্তু সে গাড়ীর খুব সামনের রাস্তাটাই। দূরের রাস্তা কুয়াশায় ঢাকা কুয়াশা পড়ছে। মাঘের শেষে কুয়াশার জোর বেশ বেড়ে গেছে। মুকুল ঝরছে। আমের মুকুল। দুর্বল বোঁটা থেকে খসে খসে পড়ছে অসহায় মঞ্জরী।

আর ঝরছে—পাতার শেষপ্রান্ত থেকে কুয়াশার ফোঁটা-ফোঁটা জল—অনেকক্ষণ ধরে-জমে-থাকা শিশিরবিন্দু।

গাড়ীর আওয়াজ কানের মধ্যে রিমঝিম করছে। বাইরে শীত। ভেতরে আমরা—আমি আর কানাই—গ্যাসোলিনের গন্ধ আর রাস্তা থেকে উড়ে আসা ধুলায় অস্থির। গা এঁটেল মাটির মতো হয়ে গেছে। অথচ এ পথটুকু আর ফুরোতেই চাইছে না।

মাত্র রাত্রি দশটা। অথচ চারিদিক কী নিঝুম! এপাশে ওপাশে মাঠ—হু-হু করা মাঠ। দূরে চীৎকার করছে নেকড়ে আর শেয়াল। কিম্বা হায়েনাও হতে পারে। হায়েনা? দূর, হায়েনা এখানে কোথায়? কিন্তু ঐ খনখনে বুককাঁপানো হাসিটা সত্যি বিচ্ছিরি। কাছাকাছি লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। সামনে যে বাতি জ্বলছে, কেঁপে কেঁপে জ্বলছে মোমবাতি—ওটাই আমাদের নিশানা। আমার ও আমার মতো আর দশটা গাড়ীর পতিত আশ্রয়স্থল।

—কানাই! আমি এক্সেলেটারে একটু চাপ দিয়ে ডাকলুম।

—হুঁ! সিদ্ধি খেয়ে ঝিমুচ্ছিল কানাই। চোখ বন্ধ করেই উত্তর দিল।

—চালানগুলো সব রেডী করে রাখ। এ দারোগা ব্যাটা নতুন। হঠাৎ ফস করে যেস-কেস লিখে দিতে পারে।

—সব ঠিক আছে। চলো তুমি। কেস করবে না ইয়ে—একটা অশ্রাব্য গাল দিল কানাই।

আমি আর কোন কথা না বলে ষ্টিয়ারিং ধরে বসে রইলুম। গীয়ারটা এখন বদলানো দরকার। অনেকক্ষণ থার্ড গীয়ারে চলছে গাড়ী। টেনে নামালুম টপ-গীয়ারে। ঐ বিরক্তিকর একঘেয়ে আওয়াজটা বন্ধ হোল। গাড়ী ঝিকঝিক করতে করতে এগিয়ে চললো। ইচ্ছে হচ্ছিল এক্ষুণি যদি গাড়ীটা উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু উপায় নেই। গভর্ণর বাধা। ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল আমাদের সীমা। বোঝাই গাড়ী ঘণ্টায় বিশ মাইল চলে কি না চলে।

আর সামান্য রাস্তা। তারপরেই জেলার সীমান্ত। নদীয়া আর চব্বিশ পরগণার সংযোগ-স্থল।

হল্টিং ষ্টেশন জাগুলিয়া।

সারি সারি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সবার শেষে আমি গাড়ী দাঁড় করালুম।

ত্রিপল-গায়ে বড় বড় জি. এম. সি. গাড়ীগুলি দোতালা বাড়ীর সমান উঁচু দেখাচ্ছে। আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে এই যন্ত্রদানবগুলি। এক্ষুণি হয়তো কোন কোনটা জেগে উঠবে। আওয়াজ তুলবে ভয়ঙ্কর। প্রতিবাদ করবে খানিকক্ষণ। তারপর সুড়সুড় করে চলতে থাকবে একান্ত বাধ্য ভৃত্যের মত।

জাগুলিয়া। চেকিং পোষ্ট। একটা ভুষো-ছড়ানো হ্যারিকেন জ্বেলে কাজ করছে দারোগা। সঙ্গে দুটো মাত্র পুলিশ। ছেঁকে ধরে আছে গাড়ীর ড্রাইভার, মালিক, কুলিরা। হয়তো কেস লিখছে পর পর। নয়তো পাশ করে দিচ্ছে তাড়াতাড়ি তাদের, যাদের সঙ্গে 'জান-পয়চান' আছে সুড়ঙ্গপথে।

আমি দু' গ্যালন তেল কিনে ট্যাঙ্কে আগে ঢাললুম। হাফ-কোয়ার্টার মবিল ওয়েল দিয়ে বনেটটা বন্ধ করে দিলুম। কুলি ঝড়ুয়াকে জল ঢালতে বলে এগিয়ে গেলুম চালান পাশ করাতে।

গাড়ী পাশ করিয়ে ফিরে আসছিল গঙ্গুরাম। মাঝারী গড়নের দেহ, চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। এই শীতেও ওর গায়ে মাত্র একটা হাতকাটা ফতুয়া। বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলছিল। দেখে মনে হোল যেন কোন্ এক বিশ্ব জয় করে এলো।

—কি গো, কী লাদাই করলে? গঙ্গুরাম জিগ্যেস করল।

—এই সামান্য সরষে।

—এখনি মাল উঠতে সুরু করেছে নাকি? কোন ঘরের মাল?

—তিনকড়ি সামন্তর।

—কত ? বলেই একটু তির্যক হাসলো গঙ্গুরাম।

—নব্বই বস্তা হবে। কিছু গণ্ডগোল আছে নাকি ?

—না, ইয়ে, গণ্ডগোল কিসের ? নম্বরী কাগজের গুণে কি আর গণ্ডগোল থাকবার জো আছে !

—তোমার কত ?

—আমার ?—আবার সেই হাসি হাসল গঙ্গুরাম। চোখ একটু কায়দায় ঘুরিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলো গঙ্গুরাম যে, বইবার চেয়ে একটু বেশীই মাল তুলেছে সে। বোঝা গেল কেন সে লম্বা লম্বা পা ফেলে আসছিল।

কানাই একটা চালান খুলে ধরে দিল দারোগার সামনে। দারোগা ঝানু লোক। চেকিংএ যারা চাকরি করে তারা বেশ বুদ্ধিমানই হয়। দারোগাদের যারা নির্বোধ বলে গাল দিয়ে থাকে, তারা যদি এই সব জায়গায় কর্তব্যরত অবস্থায় তাদের দেখতো !

চালান দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কী। কথা তিনি খুব কমই বলেন। অথবা বলবার অবসর নেই। বিশেষ করে এই রাত্তিরে। গাড়ীর পর গাড়ী রাতারাতি কাজ সারতে চায়। রাত্তিরে রাস্তা খালি থাকে, ঝক্কিঝামেলাও থাকে কম। বোধ হয় এই জন্তেই রাত্তিরে বেশী ভীড় ডাউন গাড়ীর।

—কৈ, আর চালান থাকে তো বার করুন, দারোগাবাবু বললেন।

কানাই বোকার মতো আরো একটা চালান বার করে দিল। কানাই দুটো চালান তৈরী করেছিল, ফাঁকি দেবে বলে। কিন্তু ফাঁকি সে দিতে পারলো না। আনাড়ির মত দুটো চালানই বার করে দিলো।

বোমা মেরে মাল পরীক্ষা করে এলো একটা সেপাই। তার হাতে এখনো ধুলোমাখা একমুঠো সরষে। মাল পরীক্ষা করতে করতে এরা সর্বজ্ঞ হয়ে উঠেছে। গাড়ীর উচ্চতা দেখলে তারা বলে দিতে পারে কত বস্তা আর কী মাল আছে। এমন কি, অন্ধকারেও তারা সহসা ভুল করে না।

এদিকে দারোগাবাবু লিখেই চলেছেন ডায়েরী। থামবার আর নাম নেই। মাথা নীচু করে খুব তাড়াতাড়ি পেন্সিল দিয়ে তিনি কী লিখছেন বুঝতে পারলুম না। সন্দেহ হল। এত লেখার কী আছে বাবা !

—আরে কানাই, বাবুকে সিগারেট দাওনি ? ত্যাখো দিকি ? ঝড়ুয়া, যা যা, চা নিয়ে আয় বাবুর জন্যে। নিন স্তর, সিগারেট খান। আমি তাড়াতাড়ি একটা যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি এড়াবার জন্যে এগিয়ে আসি।

—ধন্যবাদ, আমি এখুনি বাসায় যাব। চায়ের দরকার নেই। আর সিগারেট আমি খাই না। দারোগাবাবু লিখতে লিখতেই বাব দিলেন।

—তা-ও কী হয় স্তর ! আপনি নতুন এসেছেন, এখনো আলাপ-পরিচয় হয়নি। আমি মোসাহেবী চালে বলতে থাকি, কানাই, সরভাজা দাও বাবুকে, খাবার সময়, স্তর, একটু চেখে দেখবেন। ফার্ষ্ট ক্লাশ চিজ।

—ছাব্বিশ তারিখে কেষ্টনগর কোর্টে যাবেন, দারোগাবাবু একটা কাগজ দিতে দিতে বললেন, বেশী কিছু হবে না। হয়তো বিশ-পচিশ টাকা ফাইন হবে।

—এ হেঁ হেঁ। কেস করে দিলেন ? একটু বলবেন তো ! একদম রেডী ছিলুম না। রাত্তিরে আবার ভাল দেখতেও পাই না। মহা ফ্যাসাদে ফেললেন যা হোক।

—ফ্যাসাদ আর কী। ওভারলোডিংএ আপনাদের লাভ হয়, জানি। নইলে পোষায় না। কিন্তু আমরা কী করব বলুন ? নতুন এসেছি এখানে। কিছু কিছু কেস না দিলে আমাদেরও চ[illegible] না। আর তা ছাড়া, দু' দশ মণ ছাড়া যায়। বেশী আর [illegible] করে ছাড়ি, বলুন ?

—কোর্ট হচ্ছে আঠার ঘা। সাধে কী আর কোর্টে যেতে চাই না

—আরে মশায়, লরীওয়ালাদের হামেশাই দু-দশটা পেটি [illegible] লড়তে হয়। নইলে ইজ্জৎ থাকে না।

ইজ্জতে আঘাত হেনে দারোগাবাবু আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠলেন বাড়ির দিকে পা বাড়াবেন। সামনেই সরকারী বাসভবন। রাত্তি[রে] উনি প্রায় সাড়ে দশটা এগারটা পর্যন্ত থাকেন। এর পরে যে-সম[য়] গাড়ী আসে তা প্রায়ই সিপাইরা পাশ করিয়ে দেয়। খুব জরু[রী] দরকার ছাড়া দারোগাবাবুকে আর কেউ বিরক্ত করে না।

সিপাইরা এসময়ে দোস্তী পাতিয়ে নেয় ড্রাইভারদের স[ঙ্গে] চা-পান আর সিগারেট চাকরি করতে ঢোকা অবধি তারা কি[নে] খায় না কখনো। এতে নাকি তাদের বদনাম হয়। সত্যি, ফোক[টে] পেয়েও যে গাঁটের পয়সা খরচ করে তাকে নেহাত আহাম্মক ছা[ড়া] আর কী বলা যায়, তা তো জানি না !

দারোগাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা এগিয়ে গেলুম। কথাবা[র্তা] যা সারবার সেরে নিলুম। আমিই এ-সব করি। কানাই আমা[র] অংশীদার। সে এসব বলা-কওয়ার ভিতরে নেই। গাড়ীর সাজ সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি দেখাশুনো করে কানাই আর আমি দেখি ব্যবসা দিক।

গাড়ী পাশ করিয়ে এগিয়ে এলুম। চব্বিশ পরগণার রাস্তা গাড়ী এসে দাঁড়াল।

ভিড়। বেশ ভিড় গেট কালীতারা কেবিনে। সামনের চুল্লী গনগনে আগুন। মস্ত এক ট্যাঙ্কে জল ফুটছে। ভিতরে গুল[জার] করছে একগাদা লোক। কুলি আর ড্রাইভার, ব্যাপারী আ[র] দালাল। কোন-না-কোন চেনামুখ এর মধ্যে থেকে প্রায়ই বেরোয়।

—আরে এসো, ভায়া, এসো। মহিম হালদার এক কো[ণ] থেকে সাদর আহ্বান জানাল। তারপর, চলছে কেমন ?

—ভাল। আপনার খবর কী, বলুন ?

—আমার আবার খবর ! আজ বিশ বছর লরী চালা[চ্ছি] এ লাইনে। কোন খারাপ খবর শুনেছে কেউ আমার সম্বন্ধে বলো না হে, শ্রীমন্ত ! তুমি তো বাবা, আমারও গুরু।

—আরে ছ্যা। যে শুনেছে তার কানে গরম সীসে ঢুকুক শ্রীমন্ত খকখকিয়ে উঠলেন।—যোয়েছ মহিম, আমাদের যুগই [ছি]ল আলাদা। সাদা কারবার করেছি চিরদিন। পুলিশের স[ঙ্গে] আজ-কালকার মতো এত টানাপোড়েন বাবার জন্মে দেখিনি।

—এই যে এখন লরী-লরী চাল কালোবাজারে যাচ্ছে, বলি [কী] হেনস্তা করছে কেউ ? মঙ্গল সাউ তো এক বছরে লাখপতি হয়ে গেল। লরীর কারবারে লাখপতি, হুঁ। সরকার কী করতে পারলে তার ? দিব্যি বাড়ি-গাড়ি করে আরামসে দিন কাটাচ্ছে
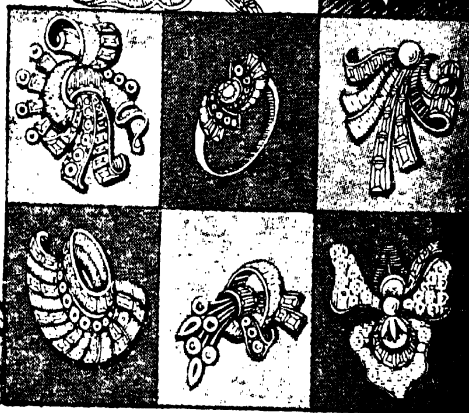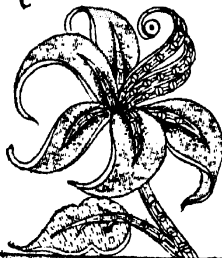
আর আমরা যে-তিমিরে সে-তিমিরেই আছি। মহিম হালদার সখেদে মনের ঝাল মিটোলেন।

কানাই ততক্ষণে চা নিয়ে উনুনের ধার ঘেঁষে বসে পড়ে মৌজ করে চুমুক দিচ্ছে। যাদের মাল নিয়ে যাচ্ছি, তাদের সরকার নটবর। সে কৌটা খুলে হালুয়া বার করে খেতে বসল। সঙ্গে চার আনা দামের পাঁউরুটি আর দুধ। নটবর দু' আনার আলুর দম চেয়ে নিল। নইলে কেবিনের মালিককে হাত করা যাবে না।

গ্রেট কালীতারা কেবিনের একমাত্র স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ভাদুড়ী। ভাদুড়ী মশায় ভারী অমায়িক। মাথায় গোবী মরুভূমির একটা ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। দু'-একটা চুল এদিক ওদিক করুণভাবে ঝুলছে। যে কোন মুহূর্তে স্থানচ্যুত হতে পারে। উন্নত নাক, ক্ষুদ্র চোখ ও তামাটে গায়ের রঙে এই বেঁটে মানুষটি সবারই মন জয় করে নিয়েছে। নইলে আরো ত দোকান আছে। ঐ তো ওদিকে 'পেয়ারাবাস' তারপরেই 'অন্নছত্র', রাস্তার উপরের গুমটিগুলির তো কথাই নেই। কিন্তু ভিড় এখানেই বেশী।

আসবাবপত্রের মধ্যে মামুলি কাঠের লম্বা লম্বা বেঞ্চি। উনুনের ধার ঘেঁষে সাজান হয়েছে ছোট ছোট জলচৌকি। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্যে আছে খান দুই হাতলভাঙ্গা, ছারপোকা-বোঝাই বিবর্ণ চেয়ার—অথবা তেপায়া বলাই ভালো। আরাম করে বসবার আগেই মাশুল আদায় করতে থাকে ক্ষুধার্ত ছারপোকার দল। গরমের দিনে বেঞ্চিগুলি বাইরেই পাতা থাকে, ঘরের ভিতরটা তখন আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত হয়ে উঠে। আর শীতের দিনে আরাম করে আগুন পোয়াতে আসে ক্ষণিকের যাত্রী।

ছাঁচা বেড়ার গায়ে কয়েক বছরের খানকয়েক পুরানো দেয়ালপঞ্জী। সিনেমাষ্টারদের ছবি বলেই বুঝি ফেলে দেয়নি। আর আছে গোটা দুই লম্বা লম্বা পোষ্টার। সে কোন মান্ধাতার আমলের ছবির বিজ্ঞাপন, তা জানি না।

আমি লোকদেখানো এক গ্লাস চা নিয়ে বসলুম। আমার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু চা খাওয়া নয়। অথচ সকলের সামনে দিয়ে আমাদের জন্যে বিশেষ ভাবে রক্ষিত ঘরে যেতেও পারছি না। ঐ মহিম হালদারই নানান কৈফিয়ৎ চাইতে আরম্ভ করবে। আচ্ছা মুশকিলে ফেললে যা-হোক। এক কৌটা মদ পেটে না পড়লে স্রেফ জমে যেতে হবে। আর তা ছাড়া এতখানি রাস্তা যাবই বা কী করে!

ভাদুড়ী মশায় আমার ছটফটানি বুঝলেন। তিনি চোখ দিয়ে ইসারা করে শুধু অপেক্ষা করতে বললেন। রাত্রি বারটা হোল প্রায়। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব! ভোরবেলা কলকাতায় মাল পৌঁছে দিতে হবে। মনে মনে নিজের উপর নিজেরই রাগ হতে লাগল। একটা বোতল কিনে নিলেই হোত।

কানাই নির্বিকার। একটা 'কাঁচি' ধরিয়ে বাবু হয়ে বসে বসে টানছে। ওর সিগারেটের ধোঁয়ায় আমার মনটাও আচ্ছন্ন হয়ে গেল। দূরত্তোর। আজকের রাতটা মিছিমিছি কাটছে।

একটা উপায় বার না করতে পারলে চলছে না। জোর করে উপায় বার করা যায় না, জানি। কিন্তু এতটা আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছি যে, হয় এমুহূর্তেই গাড়ী ছাড়ব, নয় বোতল নিয়ে কোথাও যাব।

—ভাদুড়ী মশায়! আমি গম্ভীর হয়ে ডাকলুম।

হন্তদন্ত হয়ে ভাদুড়ী মশায় ছুটে এলেন—কি স্যর, কোন অপরাধ হয়েছে?

—নিশ্চয় হয়েছে। আমি গলায় বেশ জোর দিয়েই বলি—আপনার এখানে খাওয়া-দাওয়া করি, এটা বোধ হয় আপনি চান না?

—কেন, কেন? ভাদুড়ী মশায় বিস্ময়াভিভূত।

—দেখছেন এ গেলাসটা কত নোংরা! কার না কার এঁটো গেলাসে খেতে দিচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে জলের কি এতই অভাব যে আপনারা কষ্ট করে বাসনপত্রগুলো অবধি পরিষ্কার করে ধুতে পারেন না?

হাত কচলাতে কচলাতে ভাদুড়ী মশায় খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে, স্যর! এবারকার মতো মাপ করুন। আমি এক্ষুণি জল আনতে পাঠাচ্ছি। কিছু খাবার টাবার দিতে বলি?

ব্যস।

কাজ আমার হয়ে গেছে। আমি জানি, চতুর-চূড়ামণি ভাদুড়ী মশায় আমার অভিযোগ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিকার করবার জন্যে এক্ষুণি বালতি হাতে কেলো বেরিয়ে যাবে টিউব-অয়েল থেকে জল আনবার জন্যে।

পয়সা চুকিয়ে দিতে আমি উঠে পড়লুম।

যাবার আগে কানাইকে বলে গেলুম সরকার মশাইকে জমিয়ে রাখতে। নইলে সে আবার চেঁচামেচি সুরু করতে পারে।

টিউব-অয়েলের ধারে দু'নম্বরের এক বোতল ধেনো আর দুটো বড় বড় পেঁয়াজ পড়ে আছে। আশ্চর্য বুদ্ধিমান এই ভাদুড়ী! ঠিক বুঝেছে আমি কেমন করে কোথায় মাল চালান দিতে বলছি। নইলে এত খদ্দের সে হাতে রাখতে পারে?

বোতল আর পেঁয়াজ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম খানিকক্ষণ। কোথায় যাওয়া যায়। গাড়ীতে বসে বসে খাব? সরকার ব্যাটা এসে পড়তে পারে, কিম্বা পুলিশেরই যদি কেউ আসে?

পামা—পামার বাড়ি যাব? এই এত রাত্তিরে? কী এমন রাত হয়েছে?

মাঠে বসেই না-হয় খাওয়া যাবে।

কখন যে এদিকে ভাবতে ভাবতে চলতে সুরু করেছি, বুঝতে পারি নি। খোয়ার রাস্তায় নেমে জোরে জোরে এগুতে লাগলুম। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছনো যায়।

ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছ। মহীরুহ। ঘুমুচ্ছে গ্রাম, গাছ আর মাঠ। পাখীর আওয়াজ ভরে তুলছে না গ্রামের পথ। পেঁচার ডাক কিংবা বাদুড়ের পক্ষ সঞ্চালন হিল্লোল তুলছে না নিস্তরঙ্গ নিঃশব্দতায়।

পামার ঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। নাঃ, কোন সাড়াশব্দ নেই কোথাও। বোধ হয় দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে পামা। শীতের মাঝরাতে ওর ঘুম ভাঙ্গাতে কষ্ট হচ্ছিল। আহা লেপের মধ্যে কী আরামেই না ঘুমুচ্ছে। একটা চিন্তাহীন নিশ্ছিদ্র নিটোল ঘুম।

দরজায় খুব ধীরে ধীরে ধাক্কা দিলুম। নাঃ! ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেছে। [illegible]। কোন সাড়া নেই।

দেরী হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন এক একটি ঘণ্টা হিমে ভিজছি।

জোরে ডাকব?

—পামা, ও পামা, পামা·····

হতাশ হয়ে ফিরেই আসব ঠিক করেছি। না ফিরে কোন উপায়ই আর নেই দুটোর আগেই গাড়ী ছাড়তে হবে। ভোরে আবার একটা আপের 'টিপ' ঠিক করা আছে। সময় মত না পৌঁছুতে পারলে ফক্কে যাবার সম্ভাবনা। বাজার যা পড়েছে।

বাতি জ্বলে উঠল। হঠাৎ দেখি পলতেটা উস্কে দিলো কে লম্ফের। পামার ঘরে বাতি দেখে আশার সঞ্চার হোল। যাক। এতক্ষণ হিমে ভেজা তাহলে একেবারে মাঠে মারা যাবে না।

সাড়া দিচ্ছে না কেন? মুষড়ে পড়লুম আবার।

শাড়ীর খস্‌খস্‌ আওয়াজ হচ্ছে না? ওঃ, তাহলে কাপড় পরছে? আর দুমিনিট না হয় দাঁড়ালুম। এতক্ষণ কষ্ট করতে পারলুম আর একটু পারবো না?

দরজায় আবার ধাক্কা দিলুম।

—কে? ভেতর থেকে ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো পামা।

—আমি গো, আমি। দরজাটা খুলবে একটু?

জানালার বেড়ার ফাঁকে আমার মুখ দেখা গেল। ভয় পেয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে বললুম—আমি নয়ন।

একগাল হেসে পামা বলল—দাঁড়াও, খুলচি।

ওর চোখে তখনও ঘুমের আমেজ। দুহাতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল—কতক্ষণ থেকে ডাকছ?

ঘরের ভিতরে জাঁকিয়ে বসে বললুম—অনেকক্ষণ। আধ ঘণ্টা-টাক নিশ্চয়ই হবে।

—ও মা, সে কি? আমি নাকি এতক্ষণ না-জেগে থাকতে পারি। বাব্বা, মাঝ-রাত্তিরে অন্তত মিথ্যে কথা বন্ধ কর।

কামড়ে বোতলের কর্কটা খুলে ফেললুম। সঙ্গে সঙ্গে—শুকনো আলকাতরা দাঁতে, ঠোঁটে লেগে গেল। মুখের লালা লেগে আমার চেহারাটা যা হোল দেখবার মতো। দুঃখ এই যে, নিজের চেহারা আয়না ছাড়া নিজে দেখা যায় না।

পামা হেসে উঠল। ফুলে-ফুলে, গমকে গমকে হাসি। মুখে কাপড়ের আঁচল গুঁজে হাসতে লগল।

আমি মুখ ধোবার জন্যে এদিক-ওদিক জলের সন্ধান করে না পেয়ে, এক চুমুক মদ দিয়ে ঠোঁটটা পরিষ্কার করে নিলুম।

বোতলটা মুখে দিতে যাব, এমন সময় পামা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল। আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই বলল—মদ খেতে হয় বসিয়ে। এরকম চাষাড়ে খাওয়া আমি দেখিনি কোন জন্মে। দাঁড়াও।

গ্লাস বার করল দুটো। আনল এক ঘটি জল। পকেট থেকে পেঁয়াজ দুটো বার করলুম। দাঁত দিয়ে উপরের এক প্রস্থ ছাল ছাড়িয়ে ফেলে চিবুতে লাগলুম।

খানিকটা মদ ঢেলে তাতে জল মেশালো পামা। ভাগাভাগি করে দুটো গ্লাসে ঢালা হোল মদ। ধান্যেশ্বরী। জয় হোক, মা

গলা দিয়ে যখন নাবিয়ে নিলুম সবটা, তখন পেঁয়াজের ঝাঁঝ আর মদের তীব্রতা মাথার মধ্যে আনলো এক তীব্র শিহরণ। বুকের মধ্যে নেমে গেল উষ্ণ-উপসাগরীয় স্রোত—তির্যক পথে একান্ত আপন ভঙ্গীতে!

## দুই

বেলা গড়িয়ে আসছে। শীতের বেলা। সূর্যি থাকতে থাকতে মাঠের কাজ সারতে হবে। ধারে-পাশে বসতি নেই। এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে গোলপাতার ছাউনি দেওয়া আড়ত—মাল জমা হয় যেখানে ক্ষেত থেকে। সামনে ক্ষেতের ওপর শুকনো সজীব আর ধানের গোড়া—বসন্তের দাগের মত চিত্রিত—কী ছিল আর কী যেন নেই।

—একে-এক। দুয়ে-দুই—

হাঁপাতে হাঁপাতে ওজন করছিল কিষাণ। পাল্কি চলে সুর। খালি গা! সজল হয়ে ওঠে বুঝি বা।

নীলাঞ্জনা দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়ি-পাল্লার গা-ঘেঁষে। মাল নেবে। ঝড়ুয়া জল ঢালছিল গাড়িতে। কানাই আর নটবর কী ফিসফিস করছে।

হাওয়া দিচ্ছে। বিষণ্ণ হয়ে আসে মন। শীত চলে যাচ্ছে। ক্ষেত উজাড় করে এবার রবিশস্য হয়েছে। মাষ আর মুগ; ছোলা আর সরষে; মটর আর মসুর।

উদার আকাশ ভাবনায় নীল। মেঘ নেই। মাঝে মাঝে এত মন-ভোলানো নীল হয়ে উঠে আকাশ! অনেক অনেক উঁচুতে কালো কালো চলমান বিন্দু। ঈগল। বোধ হয় মনের চঞ্চলতা ভুলে যেতে চায়। অস্থির হয়ে বৃত্তাকারে ঘুরছে। পৃথিবীর দিকে করুণ আর সন্ধানী দৃষ্টি রেখে।

ডান দিকে পাতাঝরা শিমূল—রুক্ষ আর রুগ্ন। তাকে জড়িয়ে আদর করছে শ্যামল বনলতা। নীচে ছোট ছোট বনফুলের গাছ। আকন্দ আর শিয়ালকাঁটা।

বাঁ দিকে ইন্দারা—কুয়ো বলাই ভাল। দু-চার ঘর বসতি। কাদামাটির গাঁথনি দেওয়া পাকা বাড়ি। ধনবান কৃষক-পরিবার আভিজাত্যে ডগমগ।

তার পাশ দিয়েই কাঁচা রাস্তাটা হঠাৎ অনেকখানি ঢালু হয়ে নেবে গেছে। ছোট্ট একটা গুমটি। চা আর বিড়ি, পান আর সস্তা সিগারেটের খুচরা দোকান। বিস্কুট আর মুড়িও পাওয়া যায়।

—বস্তা রেখেছেন ঠিক করে, সরকার মশাই? আমি সরকার মশাইকে জিগোস করলুম।

—কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না। সব ঠিক করে দোব। মাথা দুলিয়ে সরকার মশাই বললেন।

—ছেঁড়া-ফাটা বস্তা দেবেন না যেন।

—না, না। সে-সব ভাবতে হবে না আপনাকে।

—ভাবতে তো হবে না কিছুই; মাল ওজনে কমতি পড়লে সন্দেহ করেন আপনারাই!

এক হাত জিভ কেটে সরকার মশাই উত্তর দিলেন—আরে রামঃ,

রয়েছেন। ওসব আমার কাছে পাবেন না। আর তা ছাড়া আপনারা তো জাত-ড্রাইভার নন।

—সে কি সরকার মশাই? জাত-ড্রাইভার নই? তবে কি বেজাত?

—দেখুন দিকি খামোকা কেন অকথা-কুকথা টেনে আনছেন। আমি বলেছি আপনারা ভদ্রলোকের ছেলে, তাই।

কানাইকে নিয়ে চা খেতে চললুম।

এক পা এগুলেই দোকান। গুটি গুটি পা ফেলে যখন পৌঁছলুম, তখনো দিনের আলো নিবে যায়নি। একটা কি দুটো লোক চা খাচ্ছিল আর দোকানীর সঙ্গে কথা বলছিল। পায়ের চাপে লাঞ্ছিত বেঞ্চি ঝেড়ে ঝুড়ে বসলুম।

—কি দোব বাবু, আপনাদের? দোকানী চাকরটা জানতে চাইল।

—দুটো ডবল-হাফ আর মাখন-বিস্কুট। কানাই হুকুম দিল—ডিম আছে ডিম? নেই? থাকগে।

বড়লোকি আবহাওয়া সৃষ্টি করা কানাইয়ের স্বভাব। ও বেশ জানে, এসব দোকানে চা-বিস্কুট ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। তবু।

কে একজন খদ্দের বলছিল—এই যে কুপার্স ক্যাম্পে বিশ্রী ব্যাপার চলছে, এ সম্বন্ধে কেউ কি বলবার নেই?

চা বানাতে বানাতে দোকানী উত্তর দিল—কার মাথাব্যথা পড়েছে মশাই, পরের ব্যাপারে নাক গলাবে? তা ছাড়া রিফিউজীরা তেমন সুবিধের লোক নয়।

—অসুবিধের কি হোল? চায়ে একটা চুমুক দিয়ে কথাবার্তায় যোগ দিলুম।

কুপার্স ক্যাম্পের কুব্যবস্থা নিয়ে তর্ক চলছিল। বেশ বুঝতে পারলুম ঘটনাস্থলে এদের কেউ যায়নি। লোকপরম্পরা যে-খবর তারা সাধারণত শুনে থাক, তাই নিয়ে তারা এমন রসালো আর মনোজ্ঞ গাল গল্পের সৃষ্টি করে যে ভাবলে অবাক হতে হয়।

কুপার্স ক্যাম্প হচ্ছে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের জন্যে বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত শিবির। রাণাঘাট থেকে সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে এর অবস্থিতি। মার্কিণ সৈন্যাবাসের সানবাঁধানো জায়গার চারিদিকে কাঁটা তারের ছাউনি। ক্যাম্প হবার মত প্রশস্ত জায়গাই বটে।

বাস্তুহারা—সর্বহারার সে চেহারা আজ অনেকেরই মনে নেই। দুর্দিন মনে না রাখারই কথা। তবু যাদের গা থেকে এখনো দাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি, তারা দীর্ঘ নিশ্বাসের মাঝে তাই জীইয়ে রাখতে চায়। নিজের দেশের সুখ-দুঃখের দিনগুলি আজ পাঁজর ভাঙ্গার কোলাহলের মাঝখানে সমাধি লাভ করেছে। সমাধি—বিলুপ্তি নয়। কবরের উপরের স্মারক চিহ্ন—জ্বলে, ধিকিধিকি জ্বলে।

নিজের দেশ, নিজের ঘর এক মুহূর্তেই আর নিজের বলে কিছু রইল না। ছেঁড়া মাদুর, ভাঙ্গা বাসন আর জীর্ণ তোরঙ্গ নিয়ে ছুটে এলো পদ্মা-ধলেশ্বরী থেকে অগুণতি মানুষ।

আশা ছিল কত, হয়ত স্বপ্ন ছিল বিরাট। বানপুরের প্লাটফর্মে ঠিকরে পড়ে ভেঙ্গে গেল কত কল্পনা। অসম্ভব সাধ যাদের ছিল, সাধ্য তাদের রইল না। অক্ষমতা পঙ্গু করে দিল আগামী যুগের এক বিশাল জনতাকে।

বাঁচবার আশায় যারা এলো, তারা ক্যাম্পে মাথা গোঁজবার স্থান পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়ে গেল। সরকার যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি আশ্রয়প্রার্থীদের থাকবার ও খাবার সুব্যবস্থা করে দিলেন।

অথচ একদল ছিদ্রান্বেষী—যারা নিজেরাও শান্তিতে থাকতে চায় না এবং অপরকেও শান্তিতে থাকতে দিতে চায় না—তারা বিবাদ বাধালো।

অপবাদ রটলো কয়েকটি অফিসারের নামে। কুৎসা। লোকের মুখে হাত চাপা দেওয়াও যায় না কিম্বা টাকাও থামাতে পারে না রসনার দুর্বার গতি।

রিফিউজী মেয়ে। একদল বাস্তুহারা অসহায় মেয়ের নামকরণ হোল নতুন করে।

আজ কেউ কারো বন্ধু নয়। স্বার্থপর। সবাই নিজের নিজের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত। পৃথিবী তাই আপন নিয়মেই স্বার্থপর হয়ে উঠেছে।

পাপ?

পুণ্য কিসে আছে? নিজেকে বঞ্চিত করার মধ্যে? সামনে লোভনীয় সামগ্রী অথচ উপভোগ করার সুযোগ কত কম। যদি একটু কৌশল, একটু সান্নিধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তবে ক্ষতি কী?

পরের ব্যাপারে অত্যুৎসাহী মানুষ নিজের রূপ বদলাতে পারে না, চায় না।

এই দোকানী কিংবা আজ যারা ব্যভিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তারাই যদি সুযোগ পায়, তবে কী তারা ছেড়ে দেবে? ভাববে মুহূর্তের জন্যেও যে এদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা অন্যায়?

পামা তো'এমনি একটা রিফিউজী মেয়ে। যার বিলুপ্ত হয়েছে সমাজে থাকার স্থান। আমি তো তাকে ফেলে দিইনি। তাকে বাঁচবার পথ আমিই দেখিয়ে দিয়েছি।

এদের আলোচনা এমনি এক ধরণের। ভালো লাগলো না। নিজেকে দিয়ে অন্যকে বিচার করতে মানুষ যত দিন না শিখবে তত দিন মানবসমাজে একতরফা অবিচার চলবেই।

এদিকে দোকানে একটা দুটো করে খদ্দের আসছিল। এরকম আলোচনা চললে ভিড় বেশ বেড়ে যাবে বুঝতে পারলুম। উঠতে হবে। বেলা আর নেই। বস্তা সাজাতে হবে। চালান তৈরী করতে হবে। অনেক কাজ বাকী।

বেরিয়ে এলুম। পাশের ঝোপ থেকে একটা বেজী রাস্তায় এলো। তাকালো না কোন দিকে। ঢুকে গেল রাস্তার ওপাশের ঝোপে। বোধ হয় শিকারের সন্ধান পেয়েছে।

—কী হে, বেজীর সাক্ষাৎ শুভ না অশুভ? আমি কানাইকে জিজ্ঞেস করলুম।

—দুত্তোর শুভ না অশুভ। খালি মেয়েলীপণা তোমার।

—কিন্তু তুমি তো আমার অংশীদার।

—অংশীদার ব্যবসায়ে। অন্য কিছুতে নয়।

—ও, আমি জুয়া খেলতে রাজী হইনি বলে বুঝি, তোমার অমৃতে অরুচি?

- রুচি কোন দিন ছিল না, নয়ন!

—তাহলে থাক। তুমি তোমার জুয়া নিয়ে থাকো। আমায় দলে টানতে চেও না।

বস্তা বোঝাই করা হয়েছে। সাজাতে হবে। পর পর। দেখতে সোজা মনে হলেও অত সোজা নয় জিনিসটা। বস্তার সংখ্যা আর ওজন অনুযায়ী ঠিক ঠিক সাজাতে না পারলে খুবই অসুবিধা হয়; পরে অন্য বস্তা রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না! ভিন্ন ভিন্ন ঘরের মাল হলে ত কথাই নেই। জায়গা মত সাজান না থাকলে খুঁজে বার করতে অনেক সময় নেয়।

কানাই গাড়ীতে বস্তা সাজাতে লেগে গেল।

—এই, এই, উল্লুক, ওরকম নয়। পশ্চিম দিক, পশ্চিম দিক। আঃ, জ্বালালে! আমার মাথার দিকে চেয়ে আছে হতভাগা। আমার মাথায় সাজাবি নাকি? চোখ নেই? দেখ, দেখ, এই-এই এরকম। একে একে·····

সন্ধ্যা আসছে। মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে ধীরে। প্রথমে ছায়া দীর্ঘ হয়, দীর্ঘতর, তারপর মাঠ ছেয়ে ফেলে। ছায়া গোল হয়ে আসে। পশ্চিম থেকে পুব। দক্ষিণ থেকে উত্তর। বেষ্টন করে প্রকৃতির অঙ্গ। আঁধার! আলো-আঁধারের মসৃণ আবরণ। ধূঁয়া। প্রথম কুয়াশা। সমস্ত মিলে গ্রাস করে শ্রান্ত দিনের শেষ আলোকশিখাকে। তারপর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের আবেষ্টনীতে ঘুমিয়ে পরে কোলাহল। স্তিমিত হয়ে আসে কর্মোদ্যম।

খুব জরুরী না হলে, লণ্ঠন জ্বেলে আড়ত থেকে মাল তোলার রীতি নেই। আমাদের আর সামান্যই বাকী আছে। খান দশ-বারো বস্তা হবে।

কানাই নেবে এলো।

—কই সরকারমশাই, জল দিন। হাত-পা ধোব। কানাই হাঁক দিল।

—এই যে, এই যে। পটলা, পটলা।

—যাই হুজুর। হাত কচলাতে কচলাতে বুড়ো, প্রায় অন্ধ গোছের একটা লোক এসে দাঁড়াল।

—বাবুদের হাত-পা ধোবার জল দাও। সরকার মশাই ঘরের ভিতর চলে গেলেন।

—এট্টু দাঁড়ান। জল নে আসি। পটলা বালতি হাতে এগুচ্ছিল।

—দাঁড়াও। এখানে জল নেই? কদ্দূর যেতে হবে? কানাই বুড়োর হাড়-জিরজিরে অবস্থা দেখে সমবেদনায় ভেঙ্গে পড়ল।

—সামেনটাতে কুয়ো আছে।

—চল আমিও যাই তোমার সঙ্গে। যাবে নাকি, নয়ন?

ওদের সঙ্গ নিলুম। কিছু করবার নেই বলেও বটে আর দিনের শেষে মুখে-চোখে একটু জলের ছিটে দেওয়ার জন্যেও বটে।

এখনো এমন আঁধার হয়নি যাতে লণ্ঠন ছাড়া চলা যায় না। রাস্তা বেশ দেখা যাচ্ছে। ভিজে উঠছে সব। ঘরে ঘরে শাঁখ বাজলো। ঘর বলতে ক'টা ঘরই বা, ঐ তো কুয়োর চার পাশে ক'টা বাড়ি! তবু তারই মধ্যে বাঙালীর গ্রাম্য পরিবেশ সুষ্ঠুভাবেই ফুটে উঠেছে।

অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে স্নান করছে একটা মেয়ে। বোঝার জো নেই কুমারী কি বিবাহিতা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একটা ছেলে। পাহারাদার।

যেতে লজ্জা বোধ করলুম। কানাই পর্যন্ত হকচকিয়ে গেছে। শীতের ভরসন্ধ্যের স্নান! বাব্বাঃ!

কাপড় গুছোল স্নানরতা মেয়েটি।

ভিজে-কাপড়ে সুন্দর দেহগড়ন যাদের, তাদের রূপের অসামান্য জৌলুষ দেখা দেয়।

ওরা লজ্জা পায় না। সবার সামনে পুকুরে নদীতে স্নান করায় অভ্যস্ত গ্রামের মেয়েরা। কিন্তু কেউ যদি শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তবে লজ্জা হয় বৈ কি। স্বাভাবিক লজ্জা। ওরাও মানুষ তো!

আমাদের আসতে দেখে বোধ হয় স্নান অসমাপ্ত রেখেই চলে যাচ্ছিল মেয়েটি। অদ্ভুত সুন্দর, অপরূপ শিহরণ জাগিয়ে।

চেয়ে রইলুম।

ঝাঁকি লাগল। পা পিছলে প্রায় গায়ের উপরেই পড়ে গেছে কানাই! অচেনা জায়গা। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে বা পিছলে পড়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। সামলে নিলুম দুজনেই।

নীলাঞ্জনা চলতে সুরু করল পলাশী থেকে। রাণাঘাটে থামবে একবার, তারপর কলকাতা। তখন ছ'টা। সমস্ত মাঠ থামছে। সারাদিনের পরিশ্রমের চিহ্ন স্ফটিক হয়ে ফুটে উঠছে। অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে চঞ্চলা পৃথিবী।

উঁচু-নীচু মেঠো আর খোয়াভাঙ্গা পথের উপর দিয়ে ঝকঝক করতে করতে নীলাঞ্জনা চলল আপন মনে। রাত্রির বুকে মানুষের গন্ধ-পাওয়া দানবের মতো অগ্নিগোলকের নিশানা সম্মুখে রেখে।

[ ক্রমশঃ।
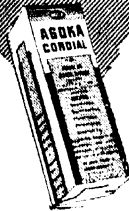
# ব্যাবিলনের রাজকন্যা

( ভলতেয়ার থেকে )

## আট

ছোট্ট গোপগাথাখানি অপ্রসন্ন করলো না এই অসামান্যা রাজকন্যাকে। প্রাচীন রাজসভার কোনো কোনো লর্ড অবশ্যই এর সমালোচনা করলেন। আগন্তুক তরুণ কিশোর কল্পনা-নির্জ্জীব, উৎকৃষ্ট কাব্যের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন তিনি, বললেন তাঁরা। আগেকার দিনে, সেই শুভ প্রাচীনতম সময়গুলিতে, সম্রাট বেলুস তুলিত হতেন সূর্য্যের সংগে ; ফর্মোজান্তে চাঁদের সংগে, তাঁর কণ্ঠদেশ বুরুজের সংগে, আর তাঁর বক্ষোদেশ এক বুশেল গমের সংগে।

কিন্তু মহিলারা সকলেই একবাক্যে বললেন, পরিপাটি হয়েছে পদ্যগুলি। তাঁরা চমৎকৃত হলেন। চমৎকৃত হলেন এই ভেবে : একজন সুষ্ঠু ধনুর্দ্ধর যিনি, তিনি সুষ্ঠু রসিকও হতে পারেন এমন !

সম্রাট-কন্যার সহচরী রাজরাজকন্যাকে বললে, সম্রাটকুমারি, প্রতিভার ঐশ্বর্য্য যাচ্ছে উৎসন্ন হয়ে এখানে যে। ওঁর রস-প্রজ্ঞা আর সম্রাট বেলুসের মহাধনু ওই তরুণ কিশোরের পক্ষে কী উপকারে আসবে বলুন ?

প্রশংসার পাত্র করতে ওঁকে বললেন ফর্মোজান্তে।

আঃ, বললো সহচরী দাঁত চেপে আর একখানি মাত্র গোপগাথা গাইলেই উনি প্রিয়পাত্র হয়ে পড়বেন।

*　　*　　*　　*

সম্রাট বেলুস জ্ঞানীদের সংগে আলোচনা করেছেন। ঘোষণা করলেন তিনি, তিন জন মহীপালের মধ্যে কেউ-ই নিমরোদ-এর মহাধনু বাঁকাতে পারেন নি। অস্বীকার করবার কিছু নেই অবশ্যই। তবুও খুবই প্রয়োজন, রাজকন্যার বিয়ে হয়।

রাজকন্যাকে পাবেন তিনিই, যিনি সুপ্রকাণ্ড সিংহটিকে বধ করতে পারবেন। মহাসিংহটিকে সেজন্যই খাঁচায় পুরে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত করা হয়েছে।

মিশর-মহীন্দ্র স্বদেশের সর্ব্বপ্রকার প্রজ্ঞা-গৌরবের মধ্যেই লালিত-পালিত হয়েছেন। তিনি দেখলেন, সমুচ্চভাবেই অত্যন্তই হাস্যকর হবে, যদি কোন নরপতি বন্যজন্তুর মুখে নিজেকে অনাবৃত করে দেন শুধু উদ্বাহ-বন্ধন পরতেই।

তিনি স্বীকার করলেন ফর্মোজান্তেকে অধিকার করা অত্যন্তই মূল্যবান। কিন্তু তিনি দাবী করলেন, যদি মহাসিংহটিই তাঁকে মেরে ফেলে, তবে ঐ ব্যাবিলন-সুন্দরীকে তিনি কখনো কী পরিণয়সূত্রে বাঁধাতে পারবেন ? নিশ্চয়ই না।

ভারত-ভূপেন্দ্র মিশর-মহীন্দ্রের অনুভূতিগুলির সংগে নিজেকে অভেদ করে তুললেন। উভয়েই একই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলে পর ব্যাবিলন-সম্রাট আমাদের সংগে তামাসা ক'রছেন। সৈন্যবাহিনী নিয়ে আমাদের আসতেই হবে। শাস্তি দিতে হবে তাঁকে।

সুপ্রচুর প্রজাকুল রয়েছে আমাদের। তারা নিজ নিজ প্রভুদের স্বার্থে মৃত্যু বরণ করা উচ্চ সম্মানীয় বলে মনে করে। অথচ সম্রাট আমরা, আমাদের কাউকেই একগাছি সুপবিত্র কেশও হারাতে হবে না।

সহজেই আমরা ব্যাবিলন-সম্রাটকে পারবো সিংহাসনচ্যুত করতে।

তারপর রূপবিত্ত ফর্মোজান্তে ? তাঁর জন্যে গুরতি খেলায় আমাদের দু'জনের ভাগ্য স্থির করলেই চলবে।

চুক্তি সাঙ্গ হলো।

উভয় মহীপালই ফর্মোজান্তেকে জোর ক'রে ধরে নিতে, নিজ নিজ রাজ্যে বিশেষ সুস্পষ্ট আদেশ পাঠালেন, ত্রিশ লক্ষ সৈন্যবাহিনী এখুনি সমাবেশ করো।

## নয়

বীর-বাচ্চা শকদের মহীপতি। বীরেন্দ্রের মতো তিনি একাকীই নামলেন রঙ্গস্থলে। হাতে বাঁকা তরোয়াল।

নৈরাশ্যজনক ভাবে তিনি ফর্মোজান্তের প্রেমে পড়েননি।

গৌরবই ছিলো এপর্যান্ত তাঁর একমাত্র অনুরাগ বা প্যাসান। গৌরবই তাঁকে নিয়ে এসেছে ব্যাবিলনে। তিনি দেখাতে চান, যদি ভারত বা মিশরের মহীপালের সিংহদের মুখে নিজেদের সমর্পণ করে জীবন বিপন্ন করবার মতো প্রজ্ঞাশীল নন, তিনি অন্য দিকে ছিলেন অতি সাহসীই। এই সম্মানের প্রতি ঘৃণা বহন না করতে রাজকীয় সম্মান রক্ষা কল্লে। তাঁর সুবিমল শৌর্য্য তাঁকে নিজ শার্দ্দূলের সাহায্য নিতেও উৎসাহ দিলে না।

এগিয়ে গেলেন তিনি একাকীই, হালকা হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে; মাথায় কেবল ইস্পাতের শিরস্ত্রাণ স্বর্ণ-বিখচিত। এবং তুষারের মতো সাদা তিনটি অশ্বপুচ্ছে অলংকৃত।

লেলিয়ে দেওয়া হলো শক-ভূপালের উপরে সব চেয়ে সুপ্রকাণ্ড সিংহটিকে যা য়্যাণ্টি-লেবানন পর্ব্বতগুলোয় জন্মেছে এ পর্য্যন্ত।

ভয়ংকর তার থাবাগুলি। মনে হয় ঐ থাবাগুলি দিয়ে সে তিন মহীপালকেই একসংগে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারে।

আর তার প্রকাণ্ড চোয়াল। তিন জনকেই পারে গ্রাস করে ফেলতে। তার কুৎসিত ভয়ংকর গর্জ্জন সমূহ সমগ্র রঙ্গস্থানই প্রতিধ্বনিত করে তুলেছিলো।

অহংকারী পালোয়ান দুটি পরস্পরের দিকে ছুটে গেলো দ্বন্দ্বযুদ্ধে।

শকদের বীরেন্দ্র-পুঙ্গব সিংহটার কণ্ঠদেশেই বিদ্ধ করলেন নিজ তরোয়ালখানি, কিন্তু তরোয়ালের খণ্ড লাগলো সেই সব মহাদন্তগুলিরই একটিতে, যাদের কোনো কিছুই বিদ্ধ করতে পারে না ; কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলো তা।

অরণ্যের ভয়ংকর হিংস্র জীব, সেই আঘাতে উন্মত্ত হয়ে উঠে, এরই মধ্যে শক-মহীপালের মাংসে তার রক্তলোলুপ নখরগুলিকে বসিয়ে দিয়েছে দেখা গেল।

তরুণ কিশোর আগন্তুক এই রকম একজন ভূপালের বিপদে মর্মাহত হয়ে লাফিয়ে প'ড়লো রঙ্গস্থানে, বিদ্যুৎস্ফুরণের চেয়েও দ্রুততর বেগে।

তৎক্ষণাৎ সে কেটে ফেললে সিংহের মস্তকটিকে। কেটে ফেললে সে একই দক্ষতার সংগে যা' তারপর থেকে প্রদর্শিত হ'য়ে আসছে ইউরোপীয়দের টুর্ণামেণ্টগুলিতে, যখন কৌশলী তরুণ অশ্বারোহীরা মুরদের মাথাগুলি অংগুলিগুলি বর্শা বা তরোয়ালে বিদ্ধ ক'রে নিয়ে গেছে জয়োল্লাসে।

তারপর ছোটো একখানি কৌটো বের ক'রলো সে। উপহার দিলে সেটা শক-ভূপালকে, এই বলে। অত্র শ্রীভবৎ, এই ছোটো কৌটোটির মধ্যে প্রকৃত আঘাতশোধক ঔষধ পাবেন। এ ঔষধ শুধু আমাদের দেশেই জন্মে।

আপনার গৌরবাঢ্য আঘাত-সমূহ নিরাময় হ'য়ে যাবে এক মুহূর্ত্তেই।

দৈবই কেবল বাধা দিয়েছে আপনাকে সিংহের উপরে বিজয়ী হ'তে, তত্রাচ আপনার শৌর্য্য-বীর্য্য অবশ্যই প্রশংসার্হ।

শক-ভূপালের মনে ঈর্ষা অপেক্ষা কৃতজ্ঞতাই বেশী জাগ্রত ছিলো। ধন্যবাদ দিলেন তিনি তাঁর পরিত্রাণকর্ত্তাকে। আলিঙ্গন করলেন স্নেহের সংগে তাকে ; তারপর ফিরলেন নিজ বাসাবাটীতেই ঘাসের উপরে স্পর্শ দিতে বেদনা-শোষক উদ্ভিজ্জ নির্য্যাস প্রলেপের।

## দশ

আগন্তুক তরুণ কিশোর দিলে সিংহের মস্তকটি তা'র অনুচরটির হাতে।

অনুচর রঙ্গস্থলের ঊর্দ্ধে যে সুপ্রকাণ্ড ফোয়ারাটি ছিলো তা'র জলে সিংহের মস্তকটি ধুয়ে নিলে। এবং রক্ত-কণা, নিঃশেষেই সব ঝরিয়ে ঝরিয়ে, তা'র ছোটো থলি থেকে বের ক'রলে একজোড়া চিমটে। উপড়ে ফেললে সিংহের চল্লিশটি দাঁত, আর তা'র বদলে সেখানে বসিয়ে দিলে চল্লিশটি বড় বড় হীরের টুকরো। সবগুলিই সমান আকৃতির।

অনুচরটির প্রভু তার যথোচিত বিনয়ের সংগে ফিরে গেল নিজের আসনে। সিংহের মস্তকটি দিলে সে তা'র পাখীটিকে।

সুন্দর বিহঙ্গ, বললে সে, এই সামান্য নিদর্শনটুকু নিয়ে যাও। রাখো গিয়ে ফর্মোজান্তের পাদোপান্তে।

বিহঙ্গম গেলো উড়ে, ভয়ঙ্কর জয়চিহ্নখানি আঁকড়ে ধ'রে তা'র একটি পা দিয়ে। উপহার দিলে সে সেটা রাজরাজকন্যাকে, বিনয়ার্দ্র ভাবে আনতি জানিয়ে। এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণতি দিয়ে রাজরাজকন্যার সমুখে।

চল্লিশটি হীরের টুকরো ঝ'লসে দিলে সকলেরই চোখগুলি। এরকম মহৈশ্বর্য্য এ পর্য্যন্ত অহংকারী ব্যাবিলনের কাছে ছিলো অজ্ঞাতই। মরকত, পোখরাজ, নীলকান্তমণি, দাড়িম্বমণি এগুলোই সব চেয়ে মূল্যবান অলংকাররূপে গণ্য হ'য়ে এসেছিলো এ পর্য্যন্ত।

সম্রাট বেলুস ও তাঁর সারা রাজসভা বিস্ময়ে জর্জ্জরিত!

আরো বেশী বিস্মিত ক'রলে তাদের সেই পাখীটি, উপহারটুকু এনে দিয়েছিলো যে। আকৃতিতে বিহঙ্গটি ছিলো উৎক্রোশের মতো, কিন্তু তার চোখগুলি ছিলো এমনই নম্র সুকোমল, যেমন গৃধ্রের হয় অহংকারী ও ত্রাসসঞ্চারী। তার ঠোঁটখানি ছিলো গোলাপী রঙের, অনেকটা রাজকুমারী ফর্মোজান্তের মুখখানির মতন। তার ঘাড়খানি দেখতে ইন্দ্রধনু-রঙা কিন্তু আরো বেশী উজ্জল ও আরো বেশী চমৎকার, পাখীটির পাখায় ঝলমল করছিলো সুবর্ণের সহস্র সহস্র বর্ণাভা। তা'র পা দুটি ছিলো যেন রৌপ্য ও ধূম্রশোণিতের সংমিশ্রণ ; আর তা'র পুচ্ছখানি পরবর্ত্তী কালে দেবী জুনোর রথে যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর পাখী সুসজ্জিত হ'তো তাদের পুচ্ছের সৌন্দর্য্যকেও পরাস্ত ক'রতো।

মনঃসংযোগ, কৌতূহল, আশ্চর্য্যতা ও আনন্দ গোটা রাজসভার বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো চল্লিশটি হীরকখণ্ড আর পাখীটির মধ্যে। বিহঙ্গটি দাঁড়ে ব'সেছিলো পিল্লাদার রেলে, সম্রাট বেলুস আর তাঁর অসামান্যা কন্যা ফর্মোজান্তের মাঝখানে।

অসামান্যা সম্রাটকন্যা তার গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগলেন, আদর করলেন তাকে বারে বারে, চুমু খেলেন অজস্রই। পাখীটি যেনো তার আদরানুগ্রহগুলি সশ্রদ্ধ আনন্দের সংগেই গ্রহণ করছিলো। অসামান্যা রাজরাজকন্যা যখন তাকে চুমুগুলি খেলেন, সে-ও খেলে বার বার চুমু, তারপর অসামান্যা রাজরাজকন্যার দিকে তাকালে নম্র সুকোমল চোখ দু'টি দিয়ে।

রাজরাজকন্যা তাকে বিস্কিট ও পেস্তা দিলেন খেতে। সে ঐ বিস্কিটগুলি ও পেস্তাগুলি ধূম্রলাল ও রৌপ্যবর্ণ নখরে আঁকড়ে ধ'রে ঠোঁটের নিকটে ব'য়ে নিয়ে গেলো, অবর্ণনীয় লালিত্যের সংগে।

## এগারো

সম্রাট বেলুস হীরকগুলি যত্নের সংগে পরীক্ষা করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, আমার নিজেরই প্রদেশগুলির একটিতেও অতো ঐশ্বর্য্যপূর্ণ অথ্য নিশ্চয়ই বিরল!

আদেশ দিলেন তিনি, রাজকর্ম্মচারীদের তিনজন ভূপালের জন্য যে সমস্ত মহনীয় উপহার নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, তার চেয়েও বেশী জমকালো উপহার দিতে হবে আগন্তুক তরুণ কিশোরকে।

তরুণ কিশোর এই, তিনি বললেন, নিঃসন্দেহই চীন সম্রাটের পুত্র, অথবা রাজপুত্র ইয়োরোপা বা মিশর-সংলগ্ন আফ্রিকার।

মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব না ক'রে ব্যাবিলন-সম্রাট মাষ্টার অফ দি হর্স বা অশ্ব-মহাধ্যক্ষকে পাঠালেন অপরিচিত তরুণ কিশোরকে অভিনন্দন জানাতে। পাঠালেন জিজ্ঞেস করতে, আপনি কী চীন, ইয়োরোপ বা আফ্রিকা এই তিনটির কোনো একটির প্রবল-প্রতাপ রাজ্যাধীপ? কী বিস্ময়-জাগানো ঐশ্বর্য্য সমূহ আপনার! অথচ আপনি একটিমাত্র ভৃত্য ও একটি ছোট থলি নিয়েই বা এসেছেন কেনো, এর কারণ কী?

অশ্বপতি এগুচ্ছিলো রঙ্গস্থলটির দিকে সম্রাট বেলুসের বাণী নিবেদন করতে। এমন সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলো আর একজন অনুচর খড়্গৌকশৃংগী অশ্বে চড়ে।

অনুচর আগন্তুক তরুণ কিশোরকে সম্বোধন করে বললে, প্রভুপত্র অমিয়শ্রী আপনার পিতা মৃত্যুশয্যায়। আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।

# অলকার স্বপ্ন

ক্লাস বসবার আগেই সেদিন ক্লাস সেভেনের মেয়েদের মধ্যে হাসির রোল উঠল। অলকা নাকি স্বপ্ন দেখেছে ইন্দুলেখার সঙ্গে সেলিমের বিয়ে হয়ে গেল। সেলিম অর্থাৎ ইতিহাসের পাতায় সদ্য পড়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ। ইন্দু অসম্ভব চটে গেল। স্বপ্ন দেখার জন্যে নয়, ক্লাসে কথাটা রটনা করার জন্যে।

অবশ্য ইন্দুর বিষয়ে এ স্বপ্ন খুব বিচিত্র নয়। ও হোল ছোটবেলা থেকেই গিন্নী জাতের মেয়ে। রান্নার ক্লাসে ওর উৎসাহের অন্ত থাকেনা। সবাই তাই ওকে 'গিন্নী' বলেই ডাকতো আর আড়ালে হাসতো।

এই স্কুল কলেজের আনন্দময় দিনগুলি ওদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সবাই ওরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ইন্দুকে নিয়েই কথা—ইন্দুর জীবনে কিন্তু ইতিহাসের একটা স্থান রয়ে গেছে। ওর স্বামী বাংলার বাইরে কোন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক।

দূর প্রবাসে কত সন্ধ্যায় বসে গত জীবনের স্মৃতি ওর সামনে ভেসে যায়—অতীত যেন কথা কয়ে ওঠে। আর ওর মেয়ে উর্ম্মী যখন ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের পাতা খুলে পড়ে, তখন হঠাৎ ও হেসে ফেলে।

সেদিনের সেই গিন্নী ইন্দুলেখার সংসারে আজ তার কত কল্পনা সার্থক হয়েছে। সেদিনের খেলাঘরের গৃহিনী ইন্দুলেখার সংসার আজ আনন্দময়—কারণ তার সদাজাগ্রত কল্যানদৃষ্টি সংসারে সর্বদিকে প্রসারিত। পরিছন্ন ভাঁড়ার ঘরে মশলাধার আর টিনে রঙীন অক্ষরে লেখা বিভিন্ন ডাল আর মশলার নাম। ধোঁয়া ধুলো নেই রান্নাঘরে—বিভিন্ন দেশের সুন্দর গঠনের বাসনপত্রের সংগ্রহ। রান্নাঘরের পরিবেশে মন খুশী হয়ে উঠে—এখানেই তার কাজ আর অবসর।

ইন্দুর সংসার ছোট—স্বামী আর একমাত্র কন্যা উর্ম্মী। উর্ম্মীর জীবন গান বাজনা, লেখাপড়ায় পূর্ণ। তার কোন কৌতুহল নেই রান্নাবান্না সম্বন্ধে। মা কিন্তু এ নিয়ে ক্ষুন্ন হ'ন। তাকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কন্যার এ বিষয়ে কোন আগ্রহই দেখা যায়নি।

তারপর আরো দিন কেটেছে। উর্ম্মী কলেজের পড়া সদ্য শেষ করেছে—পড়াশুনায় তার অনুরাগ, গান বাজনায় তার আগ্রহ অপরিসীম। আর মা দুঃখ পান যে সাংসারিক বিষয়ে সে রয়ে গেছে তেমনি উদাসীন।

এমন মেয়েকেও সংসারের ডাকে সাড়া দিতে হয়—সানাইতে পূরবীর সুর বাজে, বর আসে, বাংলার এক সমৃদ্ধ পরিবারের সুসন্তান।

যে সংসার তাকে বরণ করল সেখানে সে দেখল দেশী ও বিদেশী জীবনধারার ইঙ্গিত। আহারের বিষয়ে ও দেশীবিদেশী নানারকম রান্নায় তাদের পরিতৃপ্তি। এক আনন্দমুখর সুন্দর সংসার।

উর্ম্মী বুদ্ধিমতী মেয়ে। উপলব্ধি করল পরিজনদের সুখী করতে হলে যেমন গানবাজনা পড়শুনোর জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান আছে তেমনি সংসারকে উপেক্ষা করা চলেনা, জীবনের সে দিকটা তার অপরিচিতই রয়ে গেছে।

বুদ্ধিমতী মেয়ের মনে পড়ল তার সুগৃহিনী মায়ের কথা। কৌশলে সে একমাসের জন্যে ফিরে এলো তার মায়ের কাছে। ঘোরাঘুরি করতে লাগল ভাঁড়ার ঘর আর রান্নাঘরের আঙিনায়। মা বুঝলেন এ অহেতুক নয়।

মা'র কাছে সে প্রকাশ করলনা সত্য কথাটি। তারপর সে দেখলো নতুন দৃষ্টি দিয়ে মা'র সাজানো সংসারটি। ভাঁড়ার ঘরে দেখলো, সুদৃশ্য ঢাকনা দেওয়া খেজুর গাছ মার্কা 'ডালডার' টিনে সাজানো রান্নার বিভিন্ন উপকরণ।

মার কাছে সে জানলো যে 'ডালডার' উপাদানে যোগ করা হয় ভিটামিন 'এ' আর 'ডি' আর সবচেয়ে ওর মজা লাগলো যে মিষ্টি, লুচী থেকে সুরু করে ভাজা, তরকারী, মাছের ঝাল, ঝোল, মাংসের বিভিন্ন প্রণালী সবই 'ডালডায়' রান্না করা যায়—শুধু তাই নয়, খেতেও মুখরোচক হয়। এ হিসাবে দামেও সস্তা আর পুষ্টির দিক দিয়েও এর যথেষ্ট মূল্য আছে। 'ডালডা' সহজে, সর্বদেশে পাওয়া যায় শুধু ওই খেজুর গাছ মার্কা হলদে টিন দেখে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

উর্ম্মী মা'র কাছে 'ডালডার' মাধ্যমে কত রান্না করল—ওর কাছে তা নিত্য নতুন আবিষ্কারের মত। তার রস বৈচিত্র্যে সে নিজেই মুগ্ধ হোল।

শ্বশুরালয়ে যখন সে ফিরে গেল তার বিদ্যাবুদ্ধি আর বিশেষভাবে রান্নার সুখ্যাতি সবাই করতে লাগলেন।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

DL. 403B-X52 BG

তরুণ কিশোর আগন্তুক আকাশের দিকে একবার চোখ দুটি তুললে, করলে অশ্রু বিসর্জ্জন আর শুধু এই কথা দুটিই বললে, এসো, চলি আমরা।

মাষ্টার অফ দি হর্স সম্রাট বেলুসের অভিনন্দন-বাণী জানাল সিংহবিজয়ী চল্লিশটি হীরক প্রদাতা, বিহঙ্গপ্রভুকে। অনুচরটিকে জিজ্ঞেস করলে, কোন দেশে থাকেন এই তরুণ বীরেন্দ্রের জনক সম্রাট ?

অনুচর উত্তর দিলে, এঁর পিতা একজন সুপ্রাচীন গোপালক। তাঁর দেশে তাঁকে সকলেই ভালোবাসে।

সংক্ষিপ্ত এই কথা-বিনিময়টুকুর অবসরে আগন্তুক তরুণ কিশোর ইতোমধ্যে একটি একশৃঙ্গী অশ্বে আরূঢ় হয়ে পড়ছিলো। মাষ্টার অফ দি হর্সকে সে বললে, সম্রান্ত ভদ্রমহোদয়, অনুগ্রহ ক'রে আমার নম্র আদেশানুবর্ত্তিতা সম্রাট বেলুস ও তাঁ'র অসামান্যা কন্যার নিকটে উপস্থিত ক'রবেন। আমি যে-পাখীটিকে তাঁ'র কাছে রেখে যাচ্ছি তা'র যেনো তিনি বেশ যত্ন নেন, এ প্রার্থনা করি আমি সাহসের সংগেই। আমার পাখীটি তাঁ'র মতই অনন্যসাধারণ।

এই কথাগুলি ব'লে আগন্তুক তরুণ কিশোর উধাও হ'য়ে গেলো। বিদ্যুতের বিলসনে যেনো।

অনুচর দু'টি চললো তার পেছনে পেছনে, তারাও দৃষ্টির বহির্ভূত হ'য়ে গেলো।

অসামান্যা ফর্মোজান্তে উচ্চ চীৎকারে ফেটে-পড়া রোধ করতে পারলেন না।

পাখীটি ফিরে গেলো রঙ্গস্থানে। ফিরে গেলো যেখানে প্রভুটি তার উপবিষ্ট ছিলো। মনে হ'লো, সে খুবই ব্যথিত হয়েছে প্রভুকে আর না দেখতে পেয়ে।

তারপর অসামান্যা রাজকাজকন্যার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে এবং তার সুকুমার সুন্দর-শ্রী হাতখানি ঠোঁট দিয়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে, মনে হোলো উৎসর্গ করলে আপনাকে তাঁরই সেবায়।

সম্রাট বেলুস আগেকার চেয়েও বিস্মিত হয়ে পড়েছেন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না, অমন অদ্ভুত কিশোর পুরুষটি পুত্র একজন রাখালের !

সম্রাট বেলুস লোকজন পাঠালেন তরুণ কিশোর আগন্তুকের পেছনে। কিন্তু তারা ফিরে এলো সকলেই।

বললে, যে একশৃংগাশ্বগুলি টগবগিয়ে তিন আগন্তুক ব্যক্তি উধাও হয়েছেন, তাঁদের পাকড়াও করতে পারলে না আমাদের দ্রুতগামী অশ্বেরাও।

আর তাঁরা যে-গতিতে পর্য্যটন করছেন, তাতে দিনে একশো লীগ যাওয়া নিশ্চয়ই অতীব সামান্য।

## বারো

সকলেই আলোচনা করছিলো : অতি অদ্ভুত ঘটনাই বটে ! বৃথা অনুমান সকলকেই করে তুলেছিলো ক্লান্ত-খিন্ন।

রাখালের ছেলে ! চল্লিশটি হীরকের খণ্ড দান করতে পারে ? কেনোই বা সে চড়ে একশৃঙ্গাশ্বে ?

হতভম্ব সকলেই। ফর্মোজান্তে পাখীটিকে আদর করতে করতে সুগভীর দিবা-স্বপ্নে ডুবে গেলেন।

রাজকন্যা সর্ব্বদেবা তাঁর দ্বিতীয়া খুড়তুতো বোন। খুবই রূপশ্রী-মণ্ডিতা, ফর্মোজান্তের মতোই ছিলেন তিনি রূপদক্ষা। বললেন তিনি, বলতে পারিনে, এই তরুণ অর্দ্ধদেবতাটি কোনো রাখালের ছেলে কি না। তবে মনে হয় কী, জানো ? তোমার বিয়ের সব ক'টি সর্ত্তই তো উনি পূর্ণ করেছেন। নিমরোদ-এর ধনুটিকে ভঙ্গ করেছেন ; সিংহটিকে জয় করেছেন। বেশ রসিক মানুষও বটে ; স্বতঃস্ফূর্ত্ত কবিতাও গুটিকয় উনি রচনা করেছেন তোমার উদ্দেশ্যে।

সুপ্রকাণ্ড চল্লিশটি হীরকখণ্ড তোমায় দিয়েছেন। এর পরেও কী অস্বীকার করবে, উনি সবচেয়ে বেশী দানশীল ন'ন ?

আর ওঁর ঐ পাখীটি ? ওটা জগতের সুবিরলতম বস্তু। ওঁর গুণেরও কোনো সমকক্ষ নেই। উনি তো তোমার সংগে থেকে যেতে পারতেন। অথচ দেখো না ওঁর পিতা অসুস্থ, একথা শুনবামাত্রই উনি দ্বিধা করলেন না তোমায় ছেড়ে যেতে।

বায়ালের কথা পূর্ণ হ'লো সব রকমেই। শুধু এক বিষয়েই তা' পূর্ণ হতে বাকি আছে। বায়ালের দাবী আছে, উনি ওঁর প্রতিযোদ্ধাদের নত করবেন। কিন্তু উনি তার চেয়েও যে বেশ কিছু ক'রেছেন উনি জীবন রক্ষা করেছেন সেই প্রতিদ্বন্দ্বীরই, যাকে উনি ভস্ম করতে পারতেন। আর বাকী দুজনকে পরাস্ত করবার কথাও না উঠতে পারে না। তবু উনি সহজেই তাদের পরাভূত ক'রবেন।

মনে করি, তোমার এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তুমি যা বলছো সবই সত্যি, বললেন ফর্মোজান্তে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং সব চেয়ে সুশ্রী প্রিয়তম পুরুষটি হবেন রাখালের ঔরসজ ? এ-ও কী সম্ভব কখনও ?

অপেক্ষাকারিণী সহচরী আলাপে করলো যোগদান। সে বললে, অনেক সময় রাখাল কথাটি রাজা অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাখাল নামে ডাকা হয় রাজাদের। তার কারণ হচ্ছে, এই রাজারা ভেড়ার দলের লোম কেটে নেয় খুব ঘন ক'রে।

আর এই তরুণ বীরেন্দ্র-পুরুষটি ভালো সেজেগুজে আসেননি, তাই নয় কী ? সঙ্গে আনেননি কোন সহচর, লোক-লস্কর ; এরও হেতু আছে অবশ্যই। এর সরল গুণও শ্রেষ্ঠ, রাজাদের বাহ্য আড়ম্বরের কাছে—এটাই প্রমাণ করতে চান উনি। ওঁর ইচ্ছে—রাজরাজেশ্বরকন্যা অসামান্যা ফর্মোজান্তে ওকে গ্রহণ করুন ওঁর নিজের গুণের জন্য।

এ কথাই মনে হয় আমার বার বার। রাজরাজপুত্রী একমাত্র উত্তর দিলেন—পাখীটিকে সহস্র সহস্র সুকোমল চুম্বন ক'রেই।

## তের

এদিকে মহান ভোজনোৎসবের আয়োজন চ'লছিলো। সম্মানার্থে তিনটি ভূপালের আর অন্য সব রাজাদের যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন সেই উৎসব-পর্ব্বে !

রাজরাজকন্যা আর রাজভ্রাতুষ্পুত্রীকেই ভার নিতে হ'লো সর্ব্ব সম্মানের। রাজাদের দেওয়া হ'লো গুচ্ছ গুচ্ছ উপহার। ব্যাবিলনের ঐশ্বর্য্যের উপযুক্ত উপহারগুলিই বটে !

ভোজনোৎসব সুরু হবার প্রাক্কালে, সম্রাট বেলুস মন্ত্রীদিগকে ও পারিষদবর্গকে আহ্বান করলেন। উদ্দেশ্য, রূপময়ী ফর্মোজান্তের বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা করা।

সেই সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ যে-ভাবে কথাটা পাড়লেন, তা এই :—

আমি বৃদ্ধ। কী যে করি বা কা'কে যে আমার কন্যারত্নটিকে সম্প্রদান করি, তা ঠিক করতে পারছিনে। যে পুরুষটি ছিলেন এর উপযুক্ত, তিনি নীচ রাখাল একজন শুধু।

ভারত-ভূপেন্দ্র আর মিশর-মহীন্দ্র—এরা উভয়েই ভীরু, কাপুরুষ শক মহীপাল আমার পছন্দসই বটে। কিন্তু তিনি একটি সর্ত্ত পূর্ণ করেন নি।

বায়ালের সাহায্য নিতে হ'লো দেখছি আবার।

ইত্যবসরে আপনারা মন্ত্রণা করতে থাকুন। বায়াল যা আদেশ দেন—সেই আদেশের আলোকেই আমরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছুবো। ভূপাল মাত্রেরই কর্ত্তব্য, অমর দেবতাদের প্রকটিত আদেশ অনুযায়ীই কাজ করা।

প্রার্থনানিলয়ে উপস্থিত হলেন সম্রাট বেলুস। বায়াল উত্তর দিলেন তাঁর প্রশ্নের :—

তোমার পুত্রীর বিয়ে হবে তখনই, শুধু যখন বিশ্বপর্য্যটন করা হবে তার।

অবাক হলেন সম্রাট বেলুস। ফিরলেন তিনি। ফিরলেন মন্ত্রীদের আর পারিষদদের কাছে, এই উত্তর নিয়ে।

মন্ত্রীদের সকলেরই ছিলো সুগভীর শ্রদ্ধা বায়ালের প্রতি। সকলেই ঐক্যমত পোষণ করলেন, সকলেই স্বীকার করলেন। বায়ালই ধর্ম্মের ভিত্তি, একসুরে সকলেই বললেন তাঁরা। বললেন, বিচারশক্তির উচিত বায়ালের সমুখে নীরব হওয়া।

বায়াল আছে বলেই তো রাজারা রাজত্ব করতে পারছেন প্রজাদের ওপরেও। আর জ্ঞানি-গুণিবৃন্দ রাজাদের ওপরেও।

বায়াল যদি না থাকতো, তবে পৃথিবীতে থাকতো না ধর্ম্ম বা শান্তি।

বায়ালের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা জানিয়েও সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেন : বায়ালের এবারের আদেশ কিন্তু সম্পূর্ণ ই ধৃষ্টতা। সুতরাং এ আদেশ অমান্য করাই উচিত।

একটি তরুণী মহিলা বিশেষত সুমহান ব্যাবিলন সম্রাটের দুহিতার পক্ষে, কোথায় যাচ্ছেন তা না জেনেও, নিখিল ভুবন পর্য্যটনে বের হওয়া সম্পূর্ণই অশোভন।

উচিত কর্ত্তব্য হচ্ছে বিয়ে না করা, বা গোপন, লজ্জাজনক ও হাস্যকর কোনো উদ্বাহ-বন্ধন না পরা। এক কথায় বলা চলে, বায়ালের কাণ্ডজ্ঞান ছিলো না।

মন্ত্রীদের মধ্যে সব চেয়ে ছোটো উনোদাস। সকলের চেয়ে বেশ সুচতুর ও সুকৌশলী ইনি। বললেন ইনি, বায়ালের কথা যে তাৎপর্য্যহীন, তা-ও নয়। বায়াল কোনো সুপবিত্র ধর্ম্মযাত্রার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। বায়ালের কথা থেকে একথাই মনে হয়। আর আমি অসামান্যা রাজরাজকন্যার পথি-প্রদর্শক হতে অসম্মত নই।

পরিষদ সর্ব্বকনিষ্ঠের অভিমতেই মত দিলেন। কিন্তু সকলেই বললেন, আমি উপশূরেন্দ্র (squire) হবো।

সম্রাট স্থির করলেন, রাজকন্যা অগ্রসর হতে পারেন আরবীয় পথ ধরে, পাঁচশো ক্রোশের মধ্যে এক দেবতার মন্দিরে। মহা-তীর্থস্থান। জাগ্রত দেবতা। তরুণী কন্যাদের সকল বিবাহ আয়োজিত হয়ে থাকে সেই দেবতার দ্বারে প্রণাম ও অর্ঘ্য দিলে। এ রকম প্রসিদ্ধি আছে। সঙ্গে যাবে রাজকন্যার পরিষদের সব চেয়ে প্রাচীনতম সভ্যজন।

নৈশভোজে সকলেই ছুটলেন সিদ্ধান্তের শেষে।

## চৌদ্দ

উদ্যানগুলির কেন্দ্র ভূমিভাগে, দু'টি জলপ্রপাতের মাঝখানে। ডিম্বাকৃতি একটি প্রকোষ্ঠ। ব্যাসে শ' তিনেক ফুট। নীল ছাদ। সোনার তারায় তারায় বিখচিত। নক্ষত্রমণ্ডলী সমেত সকল গ্রহেরই সেখানে সমাবেশ আছে। ঠিক যেন একজন প্রতিনিধি। প্রত্যেকেই অধিকার করে আছে শুদ্ধ ন্যায্য ক্ষেত্রটুকু।

ছাদখানি আবর্ত্তন করে ঠিক আকাশের মতই। যন্ত্রদেবতারই অনুগ্রহফল। তবে যন্ত্রদেবতারা সকলেই অদৃশ্য। যেমন অদৃশ্য সেই তাঁ'রা যাঁ'রা করেন আকাশের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ।

দশ লক্ষ মশাল স্ফটিক পাথরের স্তম্ভক্ষেত্রগুলোর ভিতরে বসানো ; আলোকিত করছে তারা ভূমিগুলি। আলোকিত করছে ভোজনকক্ষের অভ্যন্তর।

কুড়ি হাজার সোনার ডিস আর পানপাত্র। টেবিলের ওপরে সারিবদ্ধভাবে স্তূপীকৃত ও রক্ষিত।

এর বিপরীত দিকে রয়েছে অন্যান্য বেঞ্চগুলো। গীতবাদ্যকারগণ ভর্ত্তি ক'রে রেখেছিলো সেগুলোকে।

আরো দুটি রঙ্গমঞ্চ ছিলো পরিপূর্ণ। একটিতে ছিলো সকল ঋতুর উপযোগী ফলমূলগুলি। অন্যটিতে ছিলো স্ফটিকের দু'-হাতলযুক্ত পাত্রগুলো! সেগুলিতে জগতের সর্ব্বপ্রকার সুরাই ফিনকুটি কাটছিলো। ঝকঝকে।

অতিথিরা ক'রলেন আসন গ্রহণ। একখানি গোল টেবিলের চারদিকে ব'সেছেন তাঁরা। টেবিলটিতে নানা ধরণের মূল্যবান মণিরত্নের ফুল ও ফলের নক্সা।

রূপধন্যা ফর্ম্মোজান্তে ভারত-ভূপেশ ও মিশর-মহীশ্বরের মাঝখানে বসেছিলেন, রূপসী সর্ব্বদেবা ব'সেছিলো শকদের ভূপতির কাছ ঘেঁসে।

প্রায় ত্রিশ জন রাজা সেখানে ছিলেন উপস্থিত। প্রত্যেকেই রাজপ্রাসাদের এক একজন রূপোত্তমা রমণীর পাশে উপবিষ্ট হ'য়েছেন।

ব্যাবিলন-সম্রাট ব'সে র'য়েছেন মাঝখানে কন্যার বিপরীত দিকে। তাঁকে দেখে মনে হয়, তিনি যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছেন উভয় সঙ্কটের মাঝখানে। এদিকে তিনি শোকে মর্ম্মাহত এই ভেবে যে, এখনো আইবুড়ো একমাত্র সন্তানটির বিয়ে দিয়ে উঠতে পারেনি, অন্যদিকে আনন্দে উৎফুল্ল এই মনে করে যে, এখনো একমাত্র সন্তানটি তাঁর রয়েছে। তাঁরই বুক জুড়ে।

ফর্ম্মোজান্তে বললেন, হে মহামহিম সম্রাট, মহনীয় পিতা, পাখীটিকে আমারই পাশে টেবিলের উপরে চাই বসিয়ে রাখতে। পাদানুমতি ভিক্ষে করি।

ভিক্ষের কথা না মা! তোমাকে অদেয় কি আছে? এ তো তার ত সামান্যই, সানন্দেই করছি তোমার ইচ্ছার অনুমোদন।

প্রভু' সঙ্গীতের অনুষ্ঠান চলছিল। সঙ্গীত প্রতিটি রাজেন্দ্রকেই পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলো আপ্যায়ন করতে, তাঁর প্রতিবেশিনীকে। ভোজনোৎসব ছিল যেমন মনোরম, তেমনই জমকালো।

ফর্ম্মোজান্তেকে পরিবেশন করা হয়েছিল সৌরভোপাদেয় মাংসের চাটনি। তাঁর পিতা ব্যাবিলন-সম্রাট এ চাটনির খুবই ভক্ত।

রাজরাজকন্যা বললেন, সম্রাটাধিসম্রাটের কাছে এটা নিয়ে উপস্থিত হওয়া উচিত।

আজ্ঞে এক্ষুণিই, বললে বিহঙ্গ।

অদ্ভুত কৌশলে ডিসটিকে ধরলে সে। নিয়ে গেল। উপহার দিলে নমস্কার দিয়ে, মহান সম্রাটাধিসম্রাটকে।

নৈশভোজে যাঁরাই কখনো বসেছেন, এ রকম আশ্চর্য্যান্বিত তাঁরা আর কখনো হননি!

সম্রাট বেলুস পাখীটিকে অত্যন্ত আদর করলেন। অসামান্যা কন্যা যেমন করেন, তার চেয়ে কম নয়।

বিহঙ্গটি এবার আবার উড়ে গেল, তাঁর পাশে এসে উপস্থিত হতে। উড়বার সময় ঝাঁকিয়েই সে তার পুচ্ছটি মেললে। প্রসারিত পুচ্ছে কত রকমেরই রঙের খেলা যে দেখা গেল, তার ইয়ত্তা নেই কোনো। ডানা থেকে পড়তে লাগলো সোনা ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে। উজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যে সকলেরই চোখ রইলো নিবদ্ধ হয়ে তার দিকে। গীতবাদ্যকারদের গীতবাদ্য স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল, সকলেই স্তব্ধ, গতিহীন। নড়ন-চড়ন একরত্তি নেই। কারু মুখে গ্রাস উঠছে না। কেউ কথা বলছে না। শুধু শোনা যাচ্ছিল গুচ্ছ গুচ্ছ প্রশংসা-মর্ম্মর।

## পনেরো

ব্যাবিলন-সম্রাট-কুমারী সারা নৈশ ভোজোৎসব শেষ করলেন, চুম্বন-মুদ্রিত করলেন পাখীটির মুখে, সর্ব্ব অঙ্গে। জগতে যে সিংহাসনপতিরা থাকতে পারেন, এ কথা সম্পূর্ণই বিস্মৃত হয়ে পড়লেন তিনি।

সামান্য একটা পাখীর ওপরে এত স্নেহ! আর আমরা এক একজন দিকপালের চেয়েও বেশী, আমরা কি ওঁর চোখে কিছুই নই?

ভারত-ভূপেন্দু ও মিশর-মহীন্দ্রের অন্তরে ঈর্ষা, ঘৃণা, ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিলো লেলিহান অন্তরেই।

উভয়েই প্রতিজ্ঞা করলেন মনে মনে, শীঘ্র শীঘ্র নিয়ে আসতেই হবে ত্রিশ লক্ষ সৈন্যের বাহিনী, প্রতিহিংসা নিতে।

আর শকদের ভূপাল? তিনি ব্যস্ত ছিলেন সর্ব্বদেবার আপ্যায়নে। তাঁর প্রাণ মাৎসর্য্যপূর্ণভাবে অবহেলা করে অসামান্যা ফর্ম্মোজান্তের অমনোযোগিতা, বরং তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, প্রকাশ করছিলো আরো বেশী উদাসীনতাই।

পরমাসুন্দরী উনি, বলে উঠলেন তিনি, স্বীকার করতেই হবে; তবে ওঁকে দেখে মনে হয়, উনি সেই নারীদেরই একজন, যাঁরা সর্বসময়েই নিজেদের সৌন্দর্য্য নিয়েই থাকে ব্যস্ত, আর যাঁরা মনে করেন মনুষ্যজাতি তাঁদের নিকটে কৃতকৃতার্থই থাকবে, যখন তাঁরা নিজেদের সাধারণ্যে তোলেন দৃষ্টিপাত্রী করে।

আমাদের দেশে আমরা পুতুলদের প্রশংসা করিনে। আমি বরঞ্চ এই রূপময়ী প্রস্তরমূর্ত্তিটির চেয়ে শীঘ্র শীঘ্র গ্রহণ করবো একজন কুশ্রী রমণীকে; যিনি বশংবদা আর বিবেচনাশীলা।

দেবি, আপনারও ওঁর মতো আছে সম্মোহন-মায়াগুলি, আছে ললিত-চারুতা সমুদায়। তাছাড়া, আপনার আরেকটি গুণও খুব আকর্ষণীয়। আপনি অপরিচিতের সংগে আলাপ করা অসম্মানজনক মনে করেন না।

আমি শকদের সরলতা নিয়েই স্বীকার করবো, আমি আপনার জ্ঞাতি-বোনের চেয়েও বেশী পছন্দ করি আপনাকে।

শক-ভূপাল নিশ্চয়ই রাজরাজকন্যা ফর্মোজান্তের চরিত্র সম্যক উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি; ওঁকে দেখে যে রকম ঘৃণাশীলা মনে হয়, ও-রকম ছিলেন না অবশ্যই উনি।

কিন্তু যাই হোক, রাজপুত্রী সর্ব্বদেবা শক-নৃপতির প্রশংসাগুলি উপভোগ করেছিলেন ভালোই। তাঁদের আলাপ হয়ে উঠছিলো খুবই রসঘন আর কৌতূহলোদ্দীপক। তারা পরস্পরের প্রতি প্রসন্ন সন্তৃপ্ত এবং নিশ্চিন্ত হয়ে পড়লেন, টেবিল ছেড়ে উঠবার আগে।

## ষোল

নৈশভোজনান্তে অতিথিরা পাইচারি করছিলেন রাজকুঞ্জ উদ্যানগুলিতে। শক-ভূপাল আর সর্ব্বদেবা একখানি নিভৃত নিকুঞ্জ খুঁজে না নিয়ে পারলেন না।

সর্ব্বদেবা মূর্ত্তিময়ী সরলতা। শক-নৃপতিকে তিনি যা বললেন তা এই—

আমি ঘৃণা করিনে আমার জ্ঞাতিবোনটিকে, আমার থেকে উনি বেশী সুন্দরী। অবশ্যই আমি এ সত্যটুকু অস্বীকার করিনে স্বীকার করি একথাও, উনিই ব্যাবিলন-সিংহাসনে বসবেন।

আপনাকে প্রসন্ন করার সম্মানই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনাকে বাদ দিয়ে ব্যাবিলনের রাজমুকুটের চেয়েও আরো বেশী পছন্দ করি আমি আপনাকে নিয়ে শকদের সাম্রাজ্য।

তবে একটা সত্য কথা না বললেই নয়, সেটা এই—এই রাজমুকুট অধিকার-বসে আমারই। জগতে অধিকার বলে যদি কিছু আছে স্বীকার করতে হয়, তবে এ সিংহাসন আমারই। সিংহাসন আমারই। আমি জন্মগ্রহণ করেছি নিমরোদ-বংশের জ্যেষ্ঠ শাখায়। ফর্মোজাস্তে জন্মেছেন কনিষ্ঠতর শাখায়। ওঁর পিতামহ আমার পিতামহকে সিংহাসনচ্যুত করেছেন। হত্যা করেছেন তাঁকে।

তবে এই হচ্ছে ব্যাবিলন-রাজবংশের শোণিতের শক্তি! বললেন শক-ভূপাল। আপনার পিতামহের কী নাম ছিলো?

সর্ব্বদেব নাম ছিলো তাঁর। ঐ নাম থেকেই প্রসূত আমারও নাম। আমার বাবার নাম ছিলো ঐ একই, সর্ব্বদেব।

আমার বাবাকে, আমার মায়ের সংগে নির্ব্বাসিত করা হয় সাম্রাজ্যের দূরতম অংশে।

তাঁদের মৃত্যুর পর, সম্রাট বেলুস দেখলেন, আমার নিকট থেকে তাঁর কোনো আতংকের কারণ নেই।

সুতরাং তিনি আমাকে নিজ দুহিতার সংগে লালন-পালন করে তুলতে গররাজি হলেন না। তবে আমার বিবাহ না হওয়াই উচিত, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন তিনি।

আমি আপনার পিতা, পিতামহ এবং আপনার স্বার্থে চাই প্রতিহিংসা নিতে, বললেন শক-মহীপাল। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, বিবাহ করবেনই আপনি। আগামী পরশু আমি আপনাকে সরিয়ে ফেলবো। খুব ভোরে।

আগামী কাল ব্যাবিলন-সম্রাটের সংগে আমাকে মধ্যাহ্ন ভোজনে যোগ দিতে হবে।

আমি আপনার অধিকার রক্ষা করবোই। আপনার অধিকার রক্ষা কল্পে ত্রিশ লক্ষ সৈন্যের বিপুল বাহিনী নিয়ে করবো প্রত্যাবর্ত্তন।

সম্পূর্ণ সম্মত আছি আমি, বললেন রূপসী সর্ব্বদেবা।

পরস্পর পরস্পরকে সম্মানের বাক্য দান করে সংগ ত্যাগ করলেন তাঁরা। [ক্রমশঃ।

অনুবাদ—শ্রীরমেশচন্দ্র দে

# উপনিষদমালা

[ তৈত্তিরীয় ২য় বল্লী, ৪র্থ অনুবাক ]

তুমি আছ, এই যে সহজ ছোট দুটি কথা
এই কথাটি বোঝাতে মোর প্রাণের আকুলতা
জানি না কোন ভাষা দিয়ে
এই কথাটি যাই বুঝিয়ে
না দেখা সেই অরূপরতন রাজেন বুকে যেথা
দেখা যাঁরে যায় না তাঁরে দেখার ব্যাকুলতা।

কত যে গান গাইনু প্রভু, তোমারি উদ্দেশে
ফিরলো তারা তোমায় খুঁজে কত যে দেশে
মনে মনে তোমার ধ্যানে
রই যে মগন অধীর প্রাণে
তবু তোমার সীমা না পাই রইলে কী বেশে?
অবাক হয়ে দেখছি আছ কাছেই ত হেসে।

মনের মাঝে ধরার মত মন কি কারুর আছে?
কথায় কোথায় প্রকাশ করি বল' বা কার কাছে
কথার মাঝে অকথিত
ধ্যানের মাঝে সীমাতীত
দরশ পরশ পায় না নাগাল তবু এ মন যাচে
বুকের মাঝে আসন তোমার সবার চেয়ে কাছে।

ভাষা যেথায় স্তব্ধ হল মিছেই কথার মালা
মনের সেথায় নাইক প্রবেশ মিথ্যা মনের জ্বালা
খুঁজে খুঁজে না পায় দিশা
বৃথা তাহার সকল আশা
আকুল হল পরাণ শুধু মিথ্যা পূজার ডালা
না পেলে তাঁয় বৃথাই জীবন বৃথাই আসার পালা।

কেন মিছে ভাবনা এত না পেয়ে সন্ধান?
দেখবে চেয়ে জগৎ বেয়ে আনন্দেরি বান
জেনো তাঁরে পাবেই পাবে
শূন্য হৃদয় পূর্ণ হবে
দুঃখমোচন, শঙ্কাহরণ নির্ভয় অম্লান
অমৃতেরি সরোবরে আনন্দে কর স্নান।

অনুবাদ—পুষ্প দেবী

লাংটু চটিতে ওরা যখন এসে পড়লো তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। পাহাড়ের গায়ে ঢালুর ওপর কিছু কিছু দোকানপাটও ছিল সেখানে। টিম-টিম করে তেলের আলো জ্বলছে।

একদিনের ভ্রমণে ওরা যে অত ক্লান্ত হয়ে পড়বে তা ওরা আগে ভাবতেই পারেনি। পথশ্রমের পর একটা আশ্রয় দেখলেই মনটা নেচে ওঠে। ওরাও উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

নামে মাত্রই চটি ওটা। পাথরের চৌকো slab সাজিয়ে সাজিয়ে দেয়াল, মাথায় মোটা শালকাঠের বরগার ওপর টিনের চাল। জানলা বলে কোনও পদার্থ নেই, আছে উঁচুতে কয়েকটা ফোকর। তা দিয়ে আলো বা হাওয়া কেউ-ই ঢুকতে পারে না।

টুশাং মালপত্তরগুলো নামালো শেরপাদের পিঠ থেকে। ঘোড়াগুলো একটা খুঁটির সঙ্গে রাখলো বেঁধে। তারপর চটির মালিকের সঙ্গে নেপালী ভাষায় আলাপ করতে লাগলো সে।

শান্তনু বললে, গরম পানীয় একটা দরকার এখন। বাহাদুর, চা পাওয়া যাবে এখানে?

মাখন-দেওয়া ঠাণ্ডা এক রকম পানীয় এলো, তার চেহারা, গন্ধ আর বর্ণ দেখে ওরা কেউ-ই খেতে পারলো না। অগত্যা গরম জল চেয়ে ওরাই চা তৈরী করে নিল। লালী এ ব্যাপারে খুবই

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

শ্রীশৈল চক্রবর্তী

ক্ষিপ্রহস্ত। তারপর, রাত্রের আহার কোনও রকমে সেরে ওরা শোবার ব্যবস্থা করে নিতে যাবে, এমন সময় চটিওয়ালা একজন লোককে এনে হাজির করলো ওদের কাছে।

এ লোকটি আপনাদের কাজ-কর্ম করে দেবে, বললে সে। পরে কিছু বখশিস দিলেই চলবে।

প্রদীপের আলোয় লোকটিকে দেখলো ওরা। মুখখানা বিরাট, ভুটিয়া জাতীয় বলে মনে হলো। মুখটা দেখলে ভাল লাগে না। তার ওপর একটা চোখ কানা। এক চোখে তাকায় অদ্ভুতভাবে। বাঁ-দিকের চোখটা খোলা থাকলেও চোখের তারা দেখা যায় না। চোখের ওপরের পাতা এতই ফোলা এবং ঝুলে আছে। দু'-চার গাছা লোমের গোঁফ নীচে ঝুলে পড়েছে। মাথায় বেঁটে। হাতগুলো দেখলে বোঝা যায় যে অমানুষিক শক্তি আছে ঐ হাতে।

জিগ্যেস করায় লোকটির নাম বললে, সমশের। শান্তনু সমশেরকে দিয়ে মোটঘাট খোলা ও বিছানা পাতার ব্যবস্থা করিয়ে নিচ্ছে। লালী এক কোণে দাঁড়িয়ে শুধু লক্ষ্য করছে তাকে।

প্রদীপ জ্বেলে রেখেই ওরা শুয়ে পড়লো। ঘরের দরজা যথারীতি হুড়কো দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে কি না টর্চ জ্বেলে দেখে নিলে শান্তনু। শুধু দরজা নয়, ঘরের সব দিকটাই দেখলো সে। কাঠের জবড়জং একটা আলনা ছিল, তাতেই ওরা রেখেছিল ওদের পোষাকগুলো। টর্চের আলোয় হঠাৎ শান্তনুর মনে হলো যেন আলনার পেছনে একটা গোপন দরজার মত কি রয়েছে।

সে ডাকলো, কিশোর!

সাড়া নেই, কিশোর তখন ঘুমে অচেতন। সাড়া দিল লালী। সে বললে, কি হলো আবার, শানুদা'?

শীগ্‌গির উঠে এসো, একটা জিনিষ দেখে যাও। লালী কম্বল ছেড়ে উঠে দেখে, সত্যিই তাই। যাই থাকুক, ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেই হয়, বললে সে।

কিন্তু বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থাই নেই যে। খিল বা ছিটকানি কিছুই নেই।

তা'হলে উপায়? লালী চিন্তিত হয়ে বললে। আচ্ছা শানুদা', সমশেরকে তোমার কি রকম মনে হয়েছে? আমার কিন্তু লোকটাকে মোটেই ভাল লাগেনি।

আমারও তাই, বললে শান্তনু। তবে, নেপালী ভুটিয়ারা সাধারণত: বিশ্বাসী হয়।

কিন্তু তুমি যাই বলো, ও যেভাবে আমাদের জিনিষপত্রগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল, আমার মনে হলো যেন ও হিসেব করছে কোনটায় কি কি দামী জিনিষ আছে।

তাছাড়া, শান্তনু বলে ওঠে, কি দরকার ছিল চটিওয়ালার ওকে আমাদের ঘরে ঢুকিয়ে দেবার? তাই থেকে, আমারও একটু যেন সন্দেহ হচ্ছে এখন।

—গুপ্ত-দরজা সম্বন্ধে কি করবে?

—কিশোরকে ডাকবো?

—ডেকে লাভ নেই, টুশাং কোথায় শুয়েছে?

—ও শুয়েছে ঘরের বাইরের বারান্দায়, শেরপা দুজনও ওখানে ঘুমুচ্ছে। ওরা ঘুমুচ্ছে যেন মড়ার মত। টুশাংকে একটু সজাগ করে দিলে কেমন হয়?

ডেরা বাঁধবার উদ্দেশ্যে কবি, বৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক-পত্নী এসে চড়লেন। বোট ছাড়ে-ছাড়ে, এমন সময় এদিকে কুঠিবাড়ির দোতলায় জাপানী মিস্ত্রী ( কুঠিবাড়ির তত্ত্বাবধানের জন্যে তখন এক জাপানী মিস্ত্রী সপরিবারে বাস করত ) ঢুকতেই দেখতে পেল নরম বিছানার ওপর শোয়ানো ঘুমন্ত এক শিশু। নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক-পত্নী তাঁর শিশু সন্তানের কথা ভুলে গেছেন। আর যায় কোথা, বোট ছাড়ার আগেই খবরটা দিতে হবে। দৌড়তে আরম্ভ করল জাপানী মিস্ত্রী। ওর দেখাদেখি দু'জন মুসলমান বরকন্দাজ তারাও বাবুমশায়কে ( রবীন্দ্রনাথকে ) খবরটা দিয়ে বাহবা নেবার জন্যে ছুটতে আরম্ভ করল প্রাণপণে। বোট তখন ছেড়ে দিয়েছে। পাড় থেকে অনেকখানি দূরে। তিন জনের ডাকাডাকিতে বোট আবার ঘুরে এল পাড়ের দিকে। ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন কবি, বৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক-পত্নী—কি ব্যাপার? তিন হাঁফানো কণ্ঠে উত্তর এল। কুঠিবাড়িতে এক খোকা ফেলে এসেছেন। শুনে বাবুমশায় বললেন, ছি ছি মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে—তারপর ওদের দিকে চেয়ে বললেন, যাও তোমরা নিয়ে এসো, দেখো ঘুম যেন না ভাঙ্গে। বলতেই ওরা আবার ছুটল উল্টো দিকে। কিন্তু কুঠিবাড়িতে ঢুকে ব্যাপার দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল তিন জন। নরম বিছানায় অতি যত্নে শোয়ানো আর কেউ নয়, একটি ডল পুতুল। ( এখানে উল্লেখ্য যে লেডি অবলা বসু নিঃসন্তান হওয়ায় একটি ডল পুতুল নিয়ে সময় কাটাতেন। ) যাই হোক, ঘাটে বোট বাঁধা রয়েছে, খবরটা একবার দিতেই হয়। তিন জনে গুটি-গুটি পায়ে আবার ফিরে এল পদ্মায়। কিন্তু কোথায় বোট? কোথায় বা বাবুমশায়? কল-কল স্রোত যেন পরম রসিকতায় খিল-খিল করে হেসে উঠল।

# বীর কুম্ভের দেশপ্রেম

## সুজিতকুমার নাগ

বীর কুম্ভের নাম শুনেছ?

কি বললে, শোননি তো? না শুনবারই কথা। তাঁর নাম ইতিহাসের এক কোণে আছে, যা কেউ হয়ত জানে না। সেই বীর কুম্ভের কথা আজ তোমাদের বলব।

অনেক—অনেক বছর আগে হামু সিংহ বলে এক রাজা বাস করতেন। তাঁর রাজ্য ছিল সুখের, শান্তির। প্রজারা আনন্দে বাস করতো। তাঁরই রাজ্যের লোক কুম্ভ। কিন্তু কুম্ভ ছিল চিতোরের রাণার আশ্রয়ে পালিত, ও একজন বিশ্বাসী প্রজা। চিতোরের রাণার সংগে হামু সিংহের ছিল বিবাদ। ঝগড়া তো লেগেই ছিল, সেই সংগে হত যুদ্ধ।

এদিকে এক ঘটনা ঘটল। চিতোরের রাণা যত বারই হামু সিংহের বুঁদির কেল্লা আক্রমণ করতে যায়, তত বারই বিফল হয়ে ফিরে আসেন বার বার। চিতোরের রাণা এই অপমান সহ্য করতে না পেরে তিনি এক প্রতিজ্ঞা করে বসলেন: যেমন করে হোক, সাত দিনের মধ্যে আমায় বুঁদির কেল্লা জয় করতেই হবে, নইলে জলগ্রহণ করব না।

চিতোরের রাণার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনে সবাই তো হতবাক। সেনাপতি ভাবছেন কি করা যায়? মন্ত্রী ভাবছেন, কি করে মহারাণাকে এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা থেকে বাঁচানো যায়?

যুদ্ধের সাজ-সাজ রব। চারদিকে সৈন্য সমাবেশ। কিন্তু রাণা তো জানেন, মহাবলশালী হামু সিংহকে পরাজয় করা দুঃসাধ্য। তবুও চেষ্টা করতে হবে। রাজ্যের সেনাপতি আর মহামন্ত্রী ভাবতে লাগলেন, কি করা যায়? গোপন পরামর্শ চলে।

সেনাপতি বলেন, মন্ত্রী শোনেন। ঠিক হল একটা নকল গড় গড়া হোক। সেই গড় রাণা আক্রমণ করলে, ধূলির সাথে তা মিশে যাবে। রাণার প্রাণ, ও চিতোরের মান দুই-ই রক্ষা হবে। হলও তাই।

কিন্তু কুম্ভের কাছেও যখন এ কথা গেল, তখন কুম্ভ চিৎকার করে উঠল, বললে, না, না, এ হতে পারে না, আমি বুঁদির সন্তান, রাণা কিছুতেই পারবেন না, আমার দেশকে অপমান করতে।

দূরে দেখা যাচ্ছে নবনির্মিত নকল গড়। সৈন্যদের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। ছল-ছল চোখে কুম্ভ দাঁড়িয়ে, আর ভাবছে, মনে মনে বলছে, জয় মা ভবানি, জয় মা, আমাকে শক্তি দাও, সাহস দাও।

একা দাঁড়িয়ে কুম্ভ। সেনাপতি দেখতে পেয়ে বললেন, আরে কুম্ভ যে, এখানে দাঁড়িয়ে! মহারাণা এখনই এই গড় আক্রমণ করবে, যা সরে যা।

না, না, তা হতে পারে না। কুম্ভ বললে, তোমরা তা পারবে না।

হেসে উঠলেন সেনাপতি, বললেন, আরে বেইমান, রাণার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে তুই বিশ্বাসঘাতকতা করছিস, সরে যা কুম্ভ, নইলে তোরও জীবন ধূলির সাথে মিশে যাবে।

কুম্ভ হেসে উঠলো। চোখে-মুখে তার দেশপ্রেমের জ্যোতি, বললে, জীবনের চেয়ে স্বাধীনতা অনেক মূল্যবান।

সেনাপতি তো অবাক! কি করবেন? মহারাণা তো এখনই আসবেন। হবে কি? না, না, তা হতে পারে না।

যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠেছে। রাণা আসছেন। রাণা বললেন, কি সেনাপতি, এখনও গড় আক্রমণ করনি?

কুম্ভ চিৎকার করে উঠলো, বললে না, তা হতে পারে না, আমি বুঁদির সন্তান, জীবিত থাকতে তা হতে দেব না।

মন্ত্রী রাগে চিৎকার করে উঠলেন, বললেন, সরে যা, নইলে এই কামানের তোপে তুইও উড়ে যাবি।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো কুম্ভ, বললে, নইলে তোমাদের জয়ের পতাকা উড়বে কেমন করে?

আর কে কুম্ভের কথা শোনে, সৈন্যরা মহা উল্লাসে গড় আক্রমণ করলে, আর কুম্ভ একা সেই নকল দুর্গের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে তার প্রাণ দিলো, দেশের জন্যে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। রাণা বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলো, তাঁরও দু চোখে জল। কুম্ভের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, কুম্ভ বললে ক্ষীণ কণ্ঠে; পারলাম না, পারলাম না, আমি একা কি করব? মরবার আগে বলে যাই, চিতোরের এই বিবাদ, এই কলহ, রাণা চিরকালের জন্যে ঘুচিয়ে ফেলুন। সব শান্ত। অস্তগামী সূর্য্য বিদায় নিচ্ছে, সৈন্যরা ফিরে যাচ্ছে, মহারাণা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, শোন মহামন্ত্রি! অদ্ভুত এই আত্মত্যাগ বালক কুম্ভের, দেশের স্বাধীনতা/

রক্ষার জন্যে যে বীর এই ভাবে প্রাণ দিতে পারে, সেই তো দেশপ্রেমিক। আজ থেকে বীর কুম্ভের নাম চিরস্মরণীয়।

শুনলে তো বীর কুম্ভের কথা? কি অদ্ভুত আত্মত্যাগ! তাই না? তুচ্ছ নকল গড়। তাহলে কি হবে, তবুও সে তো মাটির, তার মায়ের, তার জন্মভূমির।

# মুণ্ডহীন উপত্যকার কাহিনী

### শ্রীদেবব্রত ঘোষ

নাহান্নি উপত্যকার সোনা শ্বেতাঙ্গদের জন্যে নয়। যারা এই নিষেধ অমান্য করে নাহান্নির সোনা গ্রাস করার চেষ্টা করবে, দেবতার অভিশাপে তাদের মৃত্যু অবধারিত। সংক্ষেপে এই হল কানাডার নাহান্নি অঞ্চলের রেড ইণ্ডিয়ানদের বহুল-প্রচলিত একটি সতর্কবাণীর বঙ্গানুবাদ।

নাহান্নি উপত্যকা কানাডার সুদূর উত্তরে প্রায় তিনশো বর্গ-মাইল জুড়ে গহন গিরিসঙ্কুল প্রদেশে অবস্থিত। চারি দিকে যতদূর দেখা যায় শুধুই কেবল আকাশ-ছোঁয়া পাইন ও সিডারের জঙ্গল। গভীর গিরিখাত ও কুয়াশার মুকুটপরা সু-উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী নাহান্নিকে সর্ব্বদাই যেন একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্যের আবরণে ঢেকে রেখে দিয়েছে। বহুদিন ধরে এখানকার বন্য অধিবাসী ও রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে, নাহান্নি উপত্যকায় নাকি প্রচুর সোনা পাওয়া যায়। এই কুসংস্কারে বিশ্বাস করে দেশ-বিদেশের বহু দুঃসাহসী স্বর্ণ-অভিযাত্রী (Gold-Hunter) নাহান্নি উপত্যকায় সোনা খুঁজতে এসে অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। কারণ, তাঁদের কঙ্কালগুলি আবিষ্কৃত হলে দেখা গেছে, সেগুলি অধিকাংশই মুণ্ডহীন। তাই নাহান্নি উপত্যকা বর্ত্তমানে মুণ্ডহীন উপত্যকা নামেই সমধিক পরিচিত।

নাহান্নি অঞ্চলে সোনা খুঁজতে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রাণ হারান কানাডার ম্যাকলিয়ড ভ্রাতৃদ্বয়। উইলিয়াম ম্যাকলিয়ড ও ফ্রাঙ্ক ম্যাকলিয়ড। পরে অবশ্য আসল ঘটনা প্রকাশিত হলে জানা যায় যে, উক্ত অভিযানে ম্যাকলিয়ড ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম সঙ্গী ও অনুসন্ধানকারী মিঃ উইলিয়াম ষ্টার্ক-ই কৌশলে তাঁদের হত্যা করেন। কারণ, তাঁরা নাকি নাহান্নি অঞ্চলের অগাধ স্বর্ণ-ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছিলেন। যাই হোক, কিছুদিন পরে মিঃ ষ্টার্কও অজ্ঞাত কারণে রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন।

এর পর জন পটার নামে একজন দুঃসাহসী ও ডানপিটে যুবক স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের নিষেধ উপেক্ষা করে মুণ্ডহীন উপত্যকায় সোনা খুঁজতে গিয়ে প্রাণ হারান। এক বৎসর পরে অনুসন্ধানকারী দল কর্ত্তৃক পটারের মুণ্ডহীন কঙ্কাল আবিষ্কৃত হলে দেখা যায়, তখনো তাঁর হাতের মুঠিতে শক্ত করে রাইফেল ধরা আছে। একটি গুলীও ব্যবহার করা হয়নি। এমন কি, কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায়ও তাঁর মৃত্যু হয়নি। তাহলে পটারের মৃত্যু হল কেমন করে! আর তাঁর মুণ্ডই বা গেল কোথায়? অবশ্য এই সকল প্রশ্নের আজো কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

পটারের মৃত্যুর পর বিল পাওয়ার্স নামে আর একজন অভিজ্ঞ স্বর্ণ-অভিযাত্রী একাই মুণ্ডহীন উপত্যকায় সোনা খুঁজতে গিয়ে প্রাণ হারান। দুই বৎসর পরে অনুসন্ধানকারী দল কর্ত্তৃক বিলের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হলে দেখা যায়, জন পটারের মত তারও কঙ্কাল মুণ্ডহীন। খোঁজ-খবর নিয়ে আরও জানা যায় যে, খাদ্যদ্রব্যের অভাবে অথবা বিষাক্ত সাপের কামড়ে বিলের মৃত্যু হয়নি। তাহলে তাঁর মৃত্যু হল কেমন করে? আগের মতই এ প্রশ্নের উত্তর আজও অজ্ঞাত।

জন পটার ও বিল পাওয়ার্স-এর রহস্যজনক মৃত্যুর পর আর্ণেষ্ট সাভার্ড নামে কানাডার একজন খনি-বিশেষজ্ঞ মুণ্ডহীন উপত্যকায় সোনা খুঁজতে গিয়ে নিরুদ্দিষ্ট হন। প্রায় এগারো মাস পরে অনুসন্ধানকারী দল কর্ত্তৃক সাভার্ড-এর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হলে দেখা যায়, আগের মতই তাঁরও কঙ্কাল মুণ্ডহীন এবং মৃত্যুর কারণও রহস্যাবৃত।

সাভার্ড-এর মৃত্যুর পর কিছুদিন যাবৎ এই অভিযান বন্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে আর্থার ষ্ট্যানলি নামে একজন ঝানু স্বর্ণ-অভিযাত্রী স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের সমস্ত বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে এমন কি তাঁর পূর্ব্ববর্তী হতভাগ্যদের রহস্যজনক মৃত্যুকাহিনী জেনে-শুনেও আবার মুণ্ডহীন উপত্যকায় সোনা খুঁজতে গিয়েছিলেন। প্রায় দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তাঁর কঙ্কালটি মুণ্ডহীন অবস্থায় একটি নাম-না-জানা ঝর্ণার ধারে পাওয়া যায়। আর্থার ষ্ট্যানলি নাহান্নি উপত্যকার মাত্র কুড়ি মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তারপরই তাঁর জীবনের উপর নেমে আসে মুণ্ডহীন উপত্যকার "অভিশপ্ত মৃত্যু।"

মুণ্ডহীন উপত্যকার এই রহস্যজনক মৃত্যু নিয়ে এ পর্য্যন্ত বহু আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু রহস্যের কোন সমাধান হয়নি। অনেকের মতে নাহান্নি অঞ্চলের গভীর অরণ্যে নরমুণ্ডশিকারী রেড ইণ্ডিয়ানরা বাস করে। তারাই হতভাগ্য স্বর্ণ-অভিযাত্রীদের মাথাগুলি কেটে নিয়ে গেছে। আবার অনেকের মতে মার্কিণ মুল্লুকের ডাকসাইটে খুনী ও গুণ্ডা প্রকৃতির শ্বেতাঙ্গরা আইনের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে আত্মগোপন করে আছে। তারাই উক্ত হতভাগ্যদের মাথাগুলি "গুম" করে দিয়ে এই উপত্যকা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে একটা কুসংস্কার ও ত্রাসের সঞ্চার করতে চেয়েছে। অবশ্য এগুলি নিছক অনুমান ছাড়া কিছুই নয়।

যাই হোক, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মার্কিণ মুল্লুকের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বর্ণ শিকারী মিঃ ফ্রাঙ্ক এম, ডব্লিউ হেণ্ডারসন এই কুখ্যাত ও অভিশপ্ত মুণ্ডহীন উপত্যকা থেকে প্রায় তিরিশ ভরি সোনা সংগ্রহ করে ফিরে আসেন। আর মিঃ হেণ্ডারসনই একমাত্র ভাগ্যবান শ্বেতাঙ্গ স্বর্ণ-শিকারী, যিনি মুণ্ডহীন উপত্যকার অভিশপ্ত মৃত্যুকে উপেক্ষা করে সর্ব্বপ্রথম জীবিত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছেন।

মিঃ হেণ্ডারসন ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক মিঃ জন প্যাটারসন্ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে নাহান্নি উপত্যকার দুইটি বিপরীত দিক থেকে অভিযান শুরু করেন। মিঃ প্যাটারসন কানাডার রাজকীয় বিমান-বাহিনীর একখানি স্পিটফায়ার বিমানের সাহায্যে প্যারাসুটযোগে নাহান্নি উপত্যকার অভ্যন্তরে অবতরণ করেন। কথা ছিল, নাহান্নি নদীর জলপ্রপাতের কাছে একটি নির্দ্দিষ্ট জায়গায় এসে তিনি মিঃ হেণ্ডারসন-এর সাথে মিলিত হবেন। মিঃ হেণ্ডারসন দীর্ঘদিন ধরে বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করে ও বিঘ্নসঙ্কুল পথ

অতিক্রম করে শেষ পর্য্যন্ত নাহান্নি নদীর জলপ্রপাতের কাছে তাদের পূর্ব্বনির্দিষ্ট জায়গায় এসে উপস্থিত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মিঃ প্যাটারসন আর তাঁর বন্ধুর সাথে এসে মিলিত হতে পারেন নি। এমন কি, পরে মিঃ হেণ্ডারসন-এর নেতৃত্বে বিশেষ ভাবে গঠিত একটি অনুসন্ধানকারী দলও আপ্রাণ চেষ্টা করে তাঁর কোন হদিস করতে পারে নি।

মিঃ হেণ্ডারসন-এর কাছ থেকে মুণ্ডহীন উপত্যকা সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ তথ্য অবগত হওয়া যায়। ফোর্ট সেণ্ট জন-এর "আলাস্কা হাইওয়ে নিউজ" পত্রিকার প্রকাশিকা ও মহিলা-সাংবাদিক মিস জর্জিনা মারের নিকট তিনি খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করেছেন—"নাহান্নি উপত্যকার অগাধ স্বর্ণভাণ্ডারের সন্ধান আমি পেয়েছি।" মিঃ হেণ্ডারসন-এর ভাষায়—It (gold) exists there in unbelievable amounts, lying coarse and free on the bottoms of mountain streams and thickly set in quartz veins which thread the face of the rocky canyons hemming in the Nahanni River. Its richness is fabulous, breath-taking and I have never seen so much raw gold visible to the naked eye and merely waiting to be picked up.

কিন্তু নাহান্নি উপত্যকার অগাধ স্বর্ণ-ভাণ্ডারের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে মিস মারের যাবতীয় প্রশ্নগুলি তিনি অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে এড়িয়ে গেছেন।

মিঃ হেণ্ডারসন আরো বলেছেন—নাহান্নি উপত্যকার স্বর্ণরাজ্যে পৌঁছুতে আমাকে সুদীর্ঘ এক হাজার মাইল দুর্গম ও দুরারোহ পার্ব্বত্যপথ, অসংখ্য গিরিখাত, গভীর নদী-নালা প্রভৃতি অতিক্রম করতে হয়েছিল। এখানকার মৃত্যুহিম নিস্তব্ধতা—মন-কেমন-করা হু-হু হাওয়ার অবিরাম ক্রন্দন-ধ্বনি আমার মনে এক অব্যক্ত ভয়ের সঞ্চার করেছিল। সর্ব্বদাই মনে হত যেন কোন অদৃশ্য শত্রু আমার পিছনে ছায়ার মত অনুসরণ করছে। অথচ বহু চেষ্টা করেও আমি সেই অদৃশ্য শত্রুর দেখা পাই নি। এমন কি, নরমুণ্ড-শিকারী রেড ইণ্ডিয়ানদের সাথেও আমার দেখা হয়নি। এ যেন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যপুরী! চির-রহস্যের আবরণে নিজেকে রহস্যময়ী করে রেখেছে। তবে নাহান্নি অঞ্চলের রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বহুল-প্রচলিত প্রবাদটিকে আমি নিছক অন্ধ কুসংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না। তাহলে সত্যের অপলাপ করা হবে। কারণ, মুণ্ডহীন উপত্যকায় যাঁরাই রাতারাতি বড়লোক হবার বাসনা নিয়ে সোনা খুঁজতে গেছেন, তাঁরাই শুধু রহস্যজনক ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। কিন্তু যাঁরা (সোনা ছাড়া) ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণা ও আরমিন বীভার প্রভৃতি লোমশ জীবজন্তু শিকার করতে গেছেন তাঁরা সকলেই অক্ষত দেহে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন।

সম্প্রতি কানাডা ও মার্কিণ সরকার নাহান্নি উপত্যকার অগাধ স্বর্ণ-ভাণ্ডারের সন্ধানে যুগ্মভাবে জল, স্থল ও আকাশপথে অভিযান শুরু করেছেন। মিঃ হেণ্ডারসন এই অভিযানের নেতা। ইতিমধ্যেই বেতারযোগে অভিযাত্রীদের কাছ থেকে যে সকল সংবাদ পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে নাহান্নি উপত্যকা কানাডার "দ্বিতীয় ক্লনডাইক"-এ পরিণত হবে। কিন্তু তবুও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে প্রশ্ন জাগে—সত্যিই কি মিঃ হেণ্ডারসন চির-রহস্যময়ী নাহান্নির রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হবেন?

# পেঙ্গুইনের জন্মকথা

## সুধাংশু ঘোষ

অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষাও বৃহৎ যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ 'দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে রয়েছে তাকে ইংরেজীতে আণ্টার্কটিকা বলে। আমরা একে বাংলায় কুমেরু মহাদেশ বলতে পারি। বর্ত্তমানে কুমেরু মহাদেশ সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কারণ, বারটি দেশের অভিযাত্রী দল সেখানকার অনেক বৈজ্ঞানিক-তথ্য সংগ্রহ করে সম্প্রতি নিজ নিজ দেশে ফিরে এসেছেন।

কুমেরু মহাদেশ শাশ্বত তুষারের রাজ্য। এর পাহাড়, পর্ব্বত, সাগর সব কিছুই তুষারে আচ্ছন্ন। এখানে গাছপালা জন্মায় না। প্রাণিবিরল এই ভূভাগে মাত্র কয়েকটি অতি বিচিত্র জীবের বাস। শৈত্য যেখানে সারা বছরই শূন্য ডিগ্রীর বহু নিম্নে, সেখানে সাধারণ প্রাণীর জীবনধারণ একরকম অসম্ভবই।

কুমেরু মহাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে পেঙ্গুইনের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। পড়ার বইয়ে এবং চলচ্চিত্রে পেঙ্গুইনের ছবি নিশ্চয় দেখেছ। সিনেমার পর্দায় দেখেছ, পেঙ্গুইনরা কেমন কাল পুরু ওভারকোটে পিঠঢাকা মানুষের মত খাড়া হয়ে চলা-ফেরা করে। পেঙ্গুইনদের পাখী বললেও, ওরা পাখীর মত উড়তে বা লাফিয়ে চলতে পারে না; শুধুই হাঁটে।

মানুষের মতই পেঙ্গুইন সামাজিক জীব। বোধ হয় মানুষ অপেক্ষাও সমাজপ্রিয়। পেঙ্গুইন কচিৎ দলচ্যুত হয়। শতাধিক, এমন কি, সহস্র সহস্র পেঙ্গুইন এক একটি দলে মানব-সৈনিকের মত শৃঙ্খলা বজায় রেখে বিচরণ করে। এমন কি একই সঙ্গে এদিক ওদিক তাকায়।

শৃঙ্খলা রক্ষা পেঙ্গুইনরা সম্ভবতঃ স্বতঃই শেখে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে মানুষেরও অনুকরণযোগ্য এই শৃঙ্খলাজ্ঞান মনুষ্যেতর প্রাণী হয়েও পেঙ্গুইনদের মধ্যে এল কি করে?

তোমরা পড়েছ ভূপৃষ্ঠের একভাগ স্থল, তিনভাগ জলে ঢাকা। তোমরা এ-ও পড়ে বা শুনে থাকবে যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দক্ষিণে যে অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে তারা এককালে অনেক দিন আগে সাগরজলে ডুবে-যাওয়া বিস্তৃত এক মহাদেশের সু-উচ্চ পর্ব্বতরাজির শিখরদেশ ছিল। এই মহাদেশের অবস্থিতির সময় এশিয়ার জন্ম হয়নি। আমরা আজ ভারত উপমহাদেশের যে বিরাট অংশকে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি বলি, তাও একদিন ছিল বিস্তীর্ণ জলরাশির নিচে। বুড়ো পৃথিবীতে এই ভাঙ্গা-গড়া শাশ্বতকালের—আজ যেখানে উর্ব্বরা শস্যক্ষেত্র, একদিন যেখানে সগর্ব্বে সাগরতরঙ্গ খেলা করতে পারে। অবশ্য এই পরিবর্ত্তন সময় সাপেক্ষ। তিল তিল করে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছরে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে।

হাজার হাজার বছর আগে কুমেরু মহাদেশ আজকের মত তুষারাবৃত ছিল না। কুমেরু মহাদেশ ছিল উর্ব্বরা। ওখানে বসতি ছিল অসভ্য ও উন্নতিশীল মানুষের।

তোমরা "লাষ্ট ডেইজ অফ পম্পাই" নিশ্চয় পড়েছ ? বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত কত কম সময়ের মধ্যে সমৃদ্ধ পম্পাই নগরীকে ভস্মীভূত করে দিয়েছিল। আমরা বলতে পারি, পম্পাই ধ্বংস হয়েছিল নগরের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে পাপের বোঝা পূর্ণ হওয়ার ফলে।

দক্ষিণ মেরুকে ঘিরে থাকা ভূভাগেও পাপের বোঝা পূর্ণ হয়েছিল! সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় অত্যধিক আরামপ্রিয় ও অসংযমী হয়ে পড়েছিল। সংযম হারানই সবচেয়ে বড় পাপ। অসংযমী হয়ে সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি এত নিষ্ঠুর ও ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়েছিল যে তাদের এবং তাদের আশে-পাশে যারা ছিল তাদেরও সর্ব্বনাশ ঘনিয়ে আসছিল।

কিন্তু কুমেরু মহাদেশের ধ্বংস এল হঠাৎ; ভবিষ্যতের পম্পাই নগরীর ধ্বংসের মতই হঠাৎ। ভূকম্প, বৃষ্টি, বন্যা, ঝঞ্ঝা, অগ্ন্যুৎপাত, কুজ্ঝটিকা, এক কথায় সৃষ্টিধ্বংসী মহাপ্রলয় হঠাৎ এল কুমেরু মহাদেশে। মাটি সমুদ্রের জলে ডুবে যেতে লাগল। জাহাজ নৌকো মহাদেশের অধিবাসীদের সাগরপারে অন্য কোন ভূভাগে পৌঁছে দেবার জন্যে পাড়ি দিল। সত্যি এদের জাহাজ নৌকো কূলকিনার পেয়েছিল কি না, কোন প্রাণী জীবন্ত সেখানে পৌঁছেছিল কি না, আজও তা কেউ জানে না।

সকলেই কুমেরু মহাদেশ ছেড়ে গেল, রইল কেবল বীর-যোদ্ধৃদল, আর তাদের মতই নির্ভীক তাদের পত্নীরা। এরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করল লোকজন গৃহপালিত পশুপাখীদের নৌকা-জাহাজে নিরাপদে তুলে দেবার কাজ। নিজেদের নিরাপত্তার কোন খেয়ালই এদের রইল না।

মহাপ্রলয়ের শেষে বন্যার জল শুকিয়ে এলে শ্রান্ত সৈনিক দল ও তাদের সহধর্ম্মিণীরা দেখল, শস্যশ্যামলা মহাদেশ বিশাল তুষারমরুতে পরিণত হয়েছে, চারিদিকে তুষার-শীতল সাগর আর তারি মধ্যে ভেসে চলেছে বরফের বড় বড় চাঁই। তখন কুমেরু মহাদেশে নৌকো নাই, জাহাজ নাই, সেখান থেকে পলায়নের কোন উপায় নাই। সুতরাং পরোপকারী যোদ্ধ-দম্পতীদের ঐ বরফের দেশেই থাকতে হল।

মাসের পর মাস অনাহারে বা স্বল্পাহারে থেকে এবং প্রচণ্ড শীতের চাপে যোদ্ধৃ-দম্পতীরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। তাদের দেহ ছোট হয়ে গেল—এরাই হল বর্ত্তমানের পেঙ্গুইন-পাখীর পূর্ব্বপুরুষ। সুশৃঙ্খল সৈনিকদের সন্তান বলেই শত-সহস্র বৎসরের বিবর্ত্তনের মধ্যেও পেঙ্গুইনরা আজও এত শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলে।

## সোনার দেশে

### অশোক মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ আমেরিকার নিউ-মেক্সিকো প্রদেশ। সেখানকার একটি শহর। নাম—পেনস-অ্যালটস ( Penos Altos )। এই শহরের উত্তরাঞ্চলে কোন অজ্ঞাত স্থানে আত্মগোপন করে আছে এক সোনার পাহাড়—যার বুকে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্ণসম্পদ সঞ্চিত। সোনার পাহাড়টির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ঠিক কোথায় যে এর অবস্থান, তা আজও নির্ণীত হয়নি। অগণিত ভাগ্যান্বেষী গুপ্তধনের আশায় বেরিয়ে পড়েছে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে। তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছে নিউ-মেক্সিকোর অরণ্যভূমি। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। সোনার পাহাড় ধরা দেয়নি সভ্য মানুষের লুব্ধ দৃষ্টির সামনে।

সোনার পাহাড়টির দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল একজন মাত্র পেনস-অ্যালটসবাসীর। নাম তার অ্যাডামস। অ্যাডামসের বংশগত পেশা ছিল খনিজ সংগ্রহ। এই উদ্দেশ্যে বেরিয়েই সে হঠাৎ সন্ধান পেয়েছিল ঐ রহস্যমণ্ডিত পাহাড়টির।

আজ থেকে শতাধিক বৎসরের আগের কথা। সেটা ১৮৩৬ সাল। অ্যাডাম্‌স পেনস অ্যালটস শহরেরও সীমানা পেরিয়ে উত্তরমুখো হয়ে চলেছেন খনিজ অন্বেষণে। চারদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর বন্ধুর পার্ব্বত্য উপত্যকা। এরই মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তখন হঠাৎ তার চোখের সামনে ফুটে উঠল এক অপরূপ দৃশ্য! দূরে একটা উজ্জ্বল লাল আভা লকলক করছে আকাশের নীচে। চাপা আগুনের মত। এ কি ভৌতিক মায়া? অ্যাডাম্‌সের সর্ব্বশরীর হয়তো মুহূর্ত্তের জন্য রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে থাকবে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে সামলে নিল নিজেকে। নির্ভীক পায়ে এগিয়ে চলল আভা লক্ষ্য করে। ধীরে ধীরে তার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল একটি ছোট লাল পাহাড়।

তারপর অ্যাডাম্‌সের অভিজ্ঞতা রূপকথার গল্পেরই মত বিস্ময়কর! পাহাড়টায় পৌঁছে সে আবিষ্কার করলে, ঐ লাল রঙ অন্য কিছুর নয়—কাঁচা সোনার। সারাটা পাহাড় ঢেকে আছে তাল তাল সোনার আবরণে। সেই অবিশুদ্ধ সোনার চাপা দীপ্তি লাল মেঘের মত ঘিরে আছে পাহাড়টাকে।

বুকের অশান্ত উত্তেজনা কিছুটা স্থির হয়ে এলে, অ্যাডাম্‌স তার কাঁধ-ব্যাগটা পূর্ণ করে নিল এই মহামূল্য রত্নে। কিন্তু এখানেই সূচনা হল তার দুর্ভাগ্যের। যুগ যুগ ধরে যে সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে এখানে, তার সামান্য অংশই সংগ্রহ করেছিল অ্যাডাম্‌স, তবু সোনার পাহাড়ের অভিশাপ থেকে সে মুক্তি পেল না। এক অসভ্য উপজাতি ঐ অরণ্য অঞ্চলের বাসিন্দা। সোনার পাহাড়কে যকের মত পাহারা দিয়ে রাখে তারা। অ্যাডাম্‌স এদের সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বৃষ্টির মত ছুটে এসে বিঁধতে লাগল তার সর্ব্বাঙ্গে। সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

একটা নিবিড় ঝোপের অন্তরালে আশ্রয় নিল আহত অ্যাডাম্‌স। ক্ষিপ্ত শত্রুরা তাকে দেখতে না পেলেও এলোপাথাড়ি তীরবর্ষণ করে চলল। সারা দিনভর চলল এই আক্রমণ। তারপর যেন আশীর্ব্বাদের মত নেমে এল রাত্রির অন্ধকার। এবার শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে অ্যাডাম্‌স নিঃশব্দে পালাতে লাগল ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে। তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তখন রক্তের স্রোত বইছে। রক্ত-চিহ্ন অনুসরণ করে পাছে শত্রুরা তাকে ধরে ফেলে, এই ভয়ে একটা পাহাড়ী নদী সে পার হয়ে গেল রাত্রির মধ্যে।

পরদিন যখন সকাল হল, তখন সে অনেকটা নিরাপদ দূরত্বে চলে এসেছে। সোনার পাহাড়ের রক্ষকেরা ফিরে গেছে নিরাশ হয়ে। কিন্তু এখানেই অ্যাডাম্‌সের দুর্দ্দশার শেষ নয়—বরং শুরু। অরণ্য-সঙ্কুল পার্ব্বত্যভূমির মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়ল সে। ক্ষুধাতৃষ্ণা, পথশ্রম আর অপরিচিত পথ পর্য্যটনের ক্লান্তি তাকে মৃতপ্রায় করে

তুলল। তবু দুর্ব্বার প্রাণশক্তি নিয়ে অদম্য উৎসাহে জীর্ণশীর্ণ দেহকে সে টেনে নিয়ে চলল।

তারপর একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে, দাড়িগোঁফ-ভরা মুখ নিয়ে টলতে টলতে মুমূর্ষু অ্যাডামস হাজির হল পেনস-অ্যালটসে। কাঁধে তার সেই সোনাভরা ব্যাগটা। কিন্তু তার জীবন-দীপ তখন প্রায় নিবে এসেছে। একজন চিকিৎসকের কাছে তৎক্ষণাৎ নিয়ে যাওয়া হল তাকে। কিন্তু চিকিৎসকের সব চেষ্টা বিফল হল। পেনস-অ্যালটসে পৌঁছবার মাত্র এক ঘণ্টা পর অ্যাডামস মারা গেল। মৃত্যুর আগে সে অস্পষ্ট ভাষায় বলে গেল তার অভিযান-কাহিনী।

অ্যাডামস সঙ্গে যতটুকু সোনা বয়ে আনতে পেরেছিল, তা বিক্রী হল সাত হাজার ডলার মূল্যে। আইন অনুযায়ী টাকাটা পেল অ্যাডামসের উত্তরাধিকারী।

অ্যাডামস-আনীত সোনা এখনও ঐ শহরে রক্ষিত আছে। আজও দুঃসাহসী মানুষেরা প্রতি বছর দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে এই গুপ্তধন উদ্ধারের আশায়। কিন্তু নিউ-মেক্সিকোর পর্ব্বত-অঞ্চলের ঠিক কোনখানে যে আত্মগোপন করে আছে অ্যাডামস-বর্ণিত লাল পাহাড়টি, তা আজ পর্য্যন্ত কেউ খুঁজে বার করতে পারেনি!

## চাঁদ

### শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ

তোমরা প্রায়ই কাগজে পড়ে থাকবে যে, আজ-কাল চাঁদের দেশের খবরাখবর জানবার জন্য ভীষণ চেষ্টা চলছে। তোমরা জান যে, চাঁদ পৃথিবী হতে উৎপত্তি হয়েছে এবং চাঁদকে বৈজ্ঞানিকেরা সেজন্য পৃথিবীর উপগ্রহ বলে। মোটামুটি চাঁদের সম্বন্ধে যা জানা গেছে তাতে এইটুকুই টের পাওয়া গেছে যে, চাঁদ আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে নিকট-প্রতিবেশী। পৃথিবী হতে দূরত্ব মাত্র ২,৩৮,০০০ (দু লক্ষ আটত্রিশ হাজার) মাইল। আর আকারে আমাদের পৃথিবীর প্রায় উনপঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ যদি ৪১টা চাঁদ একত্র করা যায় তবে আমাদের পৃথিবীর সমান হবে। চাঁদের সম্বন্ধে মানুষের কৌতূহল ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে।

চাঁদের ওপরদিকটা বা উপরিভাগ আমরা দেখতে পাই। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যতটা জানা গেছে, তাতে বোঝা যায় যে চাঁদে সমতল ভূমি, পাহাড়, আগ্নেয়গিরির মুখ, উপত্যকা ও গুহা অনেক আছে। আমরা খালিচোখে চাঁদে যে কালোদাগ বা কলঙ্ক-চিহ্ন দেখতে পাই আমরা যাকে খরগোস বা বুড়ি চরকা কাটছে বলে মনে করি, ঐগুলি সমতল ভূমি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরাজীতে ঐগুলি Maria বা Seas নামে অভিহিত। এই নামকরণে মনে হয় যে, কোটি কোটি বছর আগে ঐগুলি সমুদ্র ছিল কিন্তু এখন নেই।

এই সমতল ভূমি একেবারে আমাদের গড়ের মাঠের মত সমতল নয়, এতে অনেক ছোট ছোট পাহাড় ও গর্ত্ত আছে। পাহাড়গুলির বেশীর ভাগই পৃথিবীর পাহাড়গুলির থেকে বেশী উঁচু। এখানে অর্থাৎ চাঁদে লহিবনিজ বলে একটা পাহাড় আছে, সেটা প্রায় ৩৬০০০ হাজার ফুট উঁচু। আমাদের গৌরীশঙ্করের বা মাউণ্ট এভারেষ্টের চেয়ে প্রায় ৭০০০ হাজার ফুট বেশী উঁচু। বোঝ ব্যাপারটা! এপিনাইন বলে একটা পর্ব্বতশ্রেণী আছে যেটা আমাদের হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত—শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে, এই পর্ব্বতশ্রেণী ৪৬০ মাইল বিস্তৃত। এসব ছাড়া ডরফেল, ক্লাডিয়াস, ক্যাসেটাস, কাটিয়াস প্রভৃতি অনেক পাহাড় আছে। শুধু তাই নয়, এই সব পাহাড়ের অনেকের আবার আগ্নেয়গিরির মুখ (Crater) আছে। আমাদের পৃথিবীতে পাহাড়ের যেমন আগ্নেয়গিরির মুখ আছে চাঁদেও তেমনি অনেক আগ্নেয়গিরির মুখ আছে। এইগুলির মধ্যে টাইকো (Tycho) সবচেয়ে উঁচু আর খালি চোখে আমাদের পৃথিবী থেকে দেখা যায়। পূর্ণিমার রাত্রে বা পরিষ্কার আকাশে যদি চাঁদের দিকে চাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, চাঁদের নীচের দিকে একটা মারবেলের মত খুব উজ্জ্বল পদার্থ দেখা যায়, উহার নাম টাইকো। এটার মুখ কত চওড়া, শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। বেশী নয়, মাত্র ৫৩ মাইল অর্থাৎ এখান থেকে বর্দ্ধমান ছাড়িয়েও খানিকটা।

বুঝতেই পারছ কি অবস্থা! Schumidt নামে এক গ্রীক বৈজ্ঞানিক চাঁদের যে দিকটা আমরা দেখতে পাই, শুধু সেই দিকটাতেই ৩০,০০০ হাজার আগ্নেয়গিরির মুখ গণনা করেছেন। তবে সেই সব আগ্নেয়গিরিগুলি এখন মৃত। সেখানে এখন আর কোনও অগ্ন্যুৎপাত হয় না। আগ্নেয়গিরির মুখ ছাড়া চাঁদের আল্পস প্রদেশে একটা প্রকাণ্ড উপত্যকা আছে। রিটা নামে আগ্নেয়গিরির মুখের কাছে আর একটা প্রকাণ্ড উপত্যকা আছে, যেটা লম্বায় প্রায় ১৮৭ মাইল আর চওড়ায় ১০ মাইল। (দীপেন্দ্র, টুলটুল, বীথির মত রিটা কারুর নাম ভেবো না। এই নামের বানান—Rheita)।

এগুলি ছাড়া চাঁদের মধ্যে ফোস্কা ফোস্কা মত অনেক উজ্জ্বল পদার্থ দেখা যায়। সেগুলি আর কিছুই নয়, পর্ব্বতের শিখর প্রদেশ। সূর্য্যের আলোয় এ রকম উজ্জ্বল দেখায়।

আর একটা কথা মনে রেখো যে, আমরা কখনও চাঁদের পুরোটা দেখতে পাই না। পূর্ণিমার দিনে ফুটফুটে চাঁদকে পুরো বলে মনে হয় কিন্তু সেদিন আমরা চাঁদের অর্দ্ধেকটা পুরো দেখতে পাই, বাকি অর্দ্ধেকটা এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত, অপরিচিত। আরও মজা যে, চাঁদের নিজের কোনও আলো নেই—একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সূর্য্যের আলোয় সে আলোকিত।

## খোকার প্রশ্ন

### শ্রীবাসন্তী বসু

ঝুনুর বাবার হঠাৎ অসুখ—ভাবান্বিত তাই তো সব
সে-সংবাদে আসছে স্বজন স্তব্ধ তা'রা অসম্ভব।
শুশ্রূষাতে মগ্ন সবাই কেমন যেন ভাব সবার,
চিকিৎসকও আসছে কত সহর থেকে বারংবার।
অক্সিজেন ও ইঞ্জেকশন ওষুধ-পথ্যে ঘর ঠাসা
তবু যে রোগ বেড়েই চলে—ব্যর্থ বুঝি সব আশা!
নিরাশ হ'য়ে বলাবলি করছে যখন সকল লোক
সেই সময়ে 'ঠাকুরঘরে' মা যে তাহার ভাসায় চোখ।
ছোট ভাই তার বাবলু এসে শুধায় চুপে মাকে তার
কী হলো মা, কাঁদছো কেন? বলো না মা একটি বার?

সঙ্কর্ষণ রায়

শোভন ভাল ছেলে। বইয়ের পাতার বাইরের দুনিয়াকে ও চেনে না। বইয়ের পাতায় দুনিয়ার তিনশো কোটি মানুষের সাহচর্য সে পায়—কিন্তু মানুষের সঙ্গ ওর কাছে ভীতিপ্রদ।

পড়ার টেবিলে রোমের ইতিহাস নিয়ে বসেছে শোভন—অতীতের হারানো দিগন্ত থেকে উদ্ধার করা দুর্ধর্ষ জীবন-সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস। অবশ্য সবই ছাপার অক্ষরে বন্দী। মৃত অতীতের পাঠোদ্ধার মাত্র। আজকের প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের মাঝে একটি রক্তবিন্দুও বেরিয়ে আসবে না এই যা ভরসা। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে প'ড়ে যেতে পারছে শোভন।

বাড়ির চার তলাতে পড়ার ঘরটি খুবই নিরিবিলি। শহরের কোলাহল এখানে এসে পৌঁছয় না। বইয়ের পাতায় তার অখণ্ড মনোনিবেশে কোন বাধা নেই।

পাঠ্য-বিষয়ের পারম্পর্যগুলো আজ কেমন যেন এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে। পড়ছে বটে কিন্তু মনের অনেকখানি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

অবশেষে বই বন্ধ ক'রে ঘরের খোলা জানালার ধারে এসে দাঁড়াল শোভন। জানালার নীচে ছাতের কার্ণিস ঘেঁসে সাজানো রয়েছে ফুলগাছের টবগুলি। অজস্র ফুলের সম্ভারে টবের পাটকেলি রঙ হারিয়ে গেছে। বইয়ে ফুল সম্বন্ধে প'ড়েছে সে অনেক কিন্তু সত্যিকারের ফুলের দিকে কোন দিন তার নজর পড়েনি। ফুল যে সুন্দর, আজই বুঝি সে আবিষ্কার করল। টবে টবে অনেক রঙের বর্ণালীর মাঝখানে রজনীগন্ধার শুভ্রতাই বিশেষ ক'রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার শুভ্র ঋজুতায় শুভ্রা সেনকে দেখতে পায় সে।

শুভ্রা! হঠাৎ যেন তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। আজ শুভ্রা তার দিকে তাকিয়েছিল। ইতিহাসের অনার্সের ক্লাসে প্রফেসারের আসনের পাশে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট বেঞ্চের অদূরে আজ তাকে বসতে হয়েছিল অন্যত্র জায়গা ছিল না ব'লে। সাধারণতঃ সে পেছনের বেঞ্চিতে ব'সে থাকে। আজ পেছনের সব ক'টি আসন ছেলেরা আগে-ভাগেই দখল করেছিল। সামনের শূন্য বেঞ্চিটা ছাড়া আর কোথাও স্থান ছিল না।

মেয়েদের বেঞ্চির সান্নিধ্য তার প্রতিটি মুহূর্তের মধ্যে অস্বস্তির সঞ্চার করছিল। বইয়ের পাতা ছেড়ে প্রফেসারের দিকেও মুখ তুলতে পারছিল না সে।

প্রফেসার মিত্র রোম সাম্রাজ্যের পতন সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। তাঁর সামনেই শোভন ব'সে ছিল বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে। প্রফেসার মিত্র হঠাৎ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শোভন, রোমান এম্পায়ারের পতনের আসল কারণ কোনটি তোমার মনে হয় বলো তো?

শোভন মুখ তুলে তাকায়—মানে তাকাতে বাধ্য হয়। প্রফেসার মিত্রের মুখের পানে তাকাবার আগেই শুভ্রার সঙ্গে তার দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। তার মনে হ'ল, শুভ্রা যেন এতক্ষণ নির্নিমেষে তার দিকেই চেয়েছিল।

শোভনের চোখের সামনে সমস্ত ক্লাস-রুমটা যেন দুলে ওঠে। অস্ফুট কণ্ঠে প্রফেসার মিত্রের প্রশ্নের জবাবে সে যে কী বলেছিল, তা তার খেয়াল নেই।

প্রফেসার মিত্র তার প্রশ্নের জবাবে খুশি হ'য়ে বললেন, এক্জ্যাক্টলি আমারও তাই মত। অথচ এই নিয়ে সেদিন য়ুনিভার্সিটির প্রফেসার লাহিড়ীর সঙ্গে আমার খুব তর্ক হ'য়ে গেল। প্রফেসার লাহিড়ীর নাম শুনেছ তো?

শোভনকে আবার তাকাতে হয়—আবার তার ঊর্দ্ধমুখী দৃষ্টির সামনে শুভ্রার আয়ত চোখের চাউনির বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। এবারে মনে হ'ল যে শুভ্রার রক্তাভ পাতলা ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে।

ক্লাসের বাকি সময়টা আগাগোড়া সে প্রাণপণ বইয়ে মুখ গুঁজে রইল। কিন্তু বইয়ের পাতার কালো অক্ষরগুলোর মধ্যে কাজল-কালো চোখের দৃষ্টিই যেন ফুটে উঠতে থাকে বার বার।

শুভ্রাকে এত দিন দূর থেকে দেখেছে শোভন। কাছের থেকে কোন মেয়ের দিকেই তাকাবার সাহস নেই তার। তার পড়ার ঘরের বাইরের নিষিদ্ধ জগতে যেন রঙের আবর্ত্ত সৃষ্টি ক'রে মেয়েরা আনা-গোনা করে—কলহাস্যে নদীর স্রোতের মত ভেসে যায়— মায়াবনের মরীচিকা যেন ওরা! ওদের দেখে চিরদিনই ভয় পেয়েছে সে—তার মনের মধ্যে ওদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ কৌতূহলকে দমন ক'রে এসেছে বরাবর।

শুভ্রাকে আজ কাছে থেকে দেখল শোভন। তার অদেখা জগতের প্রথম শুভ্র বিস্ময় যেন। ফুলের শাদা পাপড়ির মত মুখ, তার চেয়ে কোমল ও পেলব আর কিছুই বুঝি কল্পনা করা যায় না। মুখের হাসি যেন সেই নিখুঁত শুভ্রতা থেকে বিচ্ছুরিত সাতটি রঙের অপরূপ বর্ণালী। পাতলা রক্তাভ ঠোঁটে অনেক অশ্রুত মধুরতম সঙ্গীত যেন নীরব হ'য়ে রয়েছে। মুখের অপরূপ লাবণ্যে পরিপূর্ণতা আছে—আছে চারদিকের সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠা স্বয়ংসম্পূর্ণতা। মসৃণ মুখের কমনীয়তার তরঙ্গ তার শুভ্র গ্রীবাকে অতিক্রম ক'রে নেমে এসেছে—নেমে এসে বন্দী হয়েছে বসনের শাসনে। সিল্কের শাড়ির রেখায় রেখায় অদেখা অনুপম রূপের ইশারা—যা কল্পনা করবার দুঃসাহস হয়নি শোভনের।

জানালার বাইরে রজনীগন্ধার স্তবকে যেন শুভ্রার মুখের প্রতিচ্ছবি। নির্নিমেষে চেয়ে থাকে শোভন।

দিন কয়েক বাদে লাইব্রেরীতে লাইব্রেরিয়ানের জন্য অপেক্ষা করছিল শোভন। লাইব্রেরিয়ানের আসনের পাশে বুকশেলফে রাখা বইগুলোর ওপর অন্যমনস্ক ভাবে নজর বোলাচ্ছিল সে। এমন সময় পাশ থেকে মিষ্টি মেয়েলি কণ্ঠে কে যেন ডাকল, শোভন বাবু!

শোভন চমকে ওঠে—দেখল, শুভ্রা তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

শুভ্রা তার বিমূঢ় দৃষ্টির ওপর বিলোল কটাক্ষ হেনে বললে, একই ক্লাসে এতদিন পড়ছি—অথচ আপনার সঙ্গে আলাপই হয়নি। আপনি আমাদের এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ান কেন বলুন তো? আমরা কি আপনার আলাপের অযোগ্য?

শোভনের বুকের ভেতরটাতে তোলপাড় হতে থাকে, স্তিমিত মনে যেন আবেগের সমুদ্রোচ্ছ্বাস ওঠে। কিন্তু মুখে কোন কথা ফোটে না।

তার চোখ দুটি শুধু শুভ্রার সান্নিধ্যের আলোয় অবগাহন করে। আকাশের সুদূর নীহারিকার বিস্ময় যেন তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

অদূরে দেওয়ালে ঝোলান কার্ডটির দিকে চেয়ে শুভ্রা বললে, ঐ দেখুন কত বড় ক'রে 'সাইলেন্স' লেখা রয়েছে—এখানে দাঁড়িয়ে আলাপ করা যাবে না—চলুন কফিহাউসে যাই।

কফিহাউস!—শোভন আচ্ছন্নের মত বলে!

শুভ্রা হাসে। শুভ্র মুখে রঙিন হাসি। হাসি তো নয়—ঝর্ণার তরল উচ্ছ্বাস—যেন জলতরঙ্গ বেজে ওঠে। শুভ্রা হেসে বললে, আপত্তি আছে?

না, না।—আরক্ত মুখে শোভন বলে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত শুভ্রাকে অনুসরণ করে শোভন। সকলের অবাক চোখের সামনে ওরা কফিহাউসে ঢুকল। কফির সুবাসভরা ঘরের এক কোণে একটি টেবিলে ওরা দুজনে মুখোমুখী হয়ে বসল।

টেবিলের কাচের ওপর হাত দুটি রেখে শুভ্রা বললে, একতরফা আলাপ হয় না। আপনি কিন্তু একটি কথাও বলেননি!

এমন সময় ওদের টেবিলের পাশে কফিহাউসের উর্দ্দিপরা খানসামা এসে দাঁড়াল। শোভন যেন অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে কয়েক মুহূর্তের জন্য অব্যাহতি পেয়ে যায়। খানসামার দিকে চেয়ে সে কফির অর্ডার দেয়।

শুভ্রা বলে, সেদিন রোম সাম্রাজ্যের পতনের আসল কারণটি সম্বন্ধে প্রফেসার মিত্রকে আপনি যা বলছিলেন তা ভাল করে শুনতে পাইনি। ওটা বরং বলুন। বোধ হয় সহজ আলাপে আপনার রুচি নেই।

এবারে শোভনের মুখ ফুটল। সে মাথা নীচু করে বলতে থাকে, রোমান সাম্রাজ্যের পতন কেউ-ই আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। সময় লঙ্ঘন করার উপায় নেই আমাদের শত সাধ থাকলেও। অতএব রোমান সাম্রাজ্যের পতনের আসল কারণটা তর্কসাপেক্ষ। ও নিয়ে আলাপ করা মানে তর্ক করা। ও তর্ক ক্লাসরুমে বা পড়ার ঘরে ভাল জমতে পারে, কিন্তু তার স্থান এখানে নয়।

চমৎকার বলেছেন তো! শুভ্রা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠে।

শোভন মুখ তুলে তাকাল—কয়েক মুহূর্তের জন্য পরস্পরের চোখের আলোয় অবগাহন করে ওরা। শুভ্রার নিষ্পলক মর্মভেদী দৃষ্টি শোভনের সর্বাঙ্গে যেন বৈদ্যুতিক প্রবাহের সঞ্চার করে।

এর পর আলাপ অনেকটা সহজ হ'য়ে আসে। শোভনের ভীরু কুণ্ঠা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়।

অচিরে মনের দুস্তর লজ্জার বাধা লঙ্ঘন ক'রে চোখ তুলে দু' চোখ ভ'রে শুভ্রাকে দেখবার সাহস সঞ্চয় করে শোভন. এতদিন দেখা-না-দেখার রহস্যের মাঝে রহস্যময়ী হ'য়ে ছিল শুভ্রা। আজ শোভন দেখল, অনাবৃত হাত দুটির শুভ্র রূপের তরঙ্গ আঙুলের ডগা থেকে কাঁধ পর্যন্ত উঠে এসেছে—রহস্যলীন অপরূপের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বন্দী হয়েছে বসনের শাসনে। জর্জেটের বর্ণসম্ভারকে ভেদ ক'রে উঠেছে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের বৃত্তাভাস। শোভন চুরি ক'রে দেখে—অপরূপ রূপরহস্যের মধ্যে তার ভীরু কল্পনা অবগাহন করতে চায়। তার মনে হ'ল যেন জর্জেট-সিল্কের কৃত্রিম আবরণ দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পিষ্ট করা হয়েছে একটি সুন্দর সাজান বাগানকে—বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে ভোরের আলোকে।

শোভনের মুগ্ধ চোখের আরতি শুভ্রার নজর এড়ায় না। সে দেখল, বইয়ের পাতায় ছাপার অক্ষরের মধ্যে হারিয়ে যায় নি শোভনের চোখের আলো। মনে মনে পুলকিত হ'য়ে ওঠে সে।

শুভ্রা এক সময় বললে, কফিহাউসে কী রকম ভিড় দেখেছেন? চলুন, অন্য কোথাও যাই।

শোভন বললে, কোথায় যাবেন? কলকাতায় এমন জায়গা কী আছে, যেখানে ভিড় নেই?

শুভ্রা হেসে বললে, কেন? গড়ের মাঠ রয়েছে তো! কিংবা লেক বা ইডেন গার্ডেন?

শোভন বলে, নির্জনতা যারা খোঁজে ও সব জায়গায় তো তাদেরই ভিড়।

শুভ্রা বলে, তা হলে কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো?

কোথাও যেতে হ'বে না। চারদিকে ভিড় থাকলেও কফি-হাউসের এই কোণটি আমাদের দু'জনের পক্ষে যথেষ্ট নির্জন। একবার আপনার চার পাশে চেয়ে দেখুন না যে যার টেবিলে যথেষ্ট নির্জন বোধ করছে কি না।

শুভ্রা বললে, সত্যি ভারি চমৎকার সব কথা বলেন আপনি! অথচ দূর থেকে দেখে মনে হ'ত আপনি বুঝি মৌনব্রত নিয়ে আছেন।

ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে ওঠে শোভন। কফির পেয়ালার ভেতরে চামচেটা নাড়তে নাড়তে সে বলে, সংস্কৃত শ্লোকটা জানেন তো?
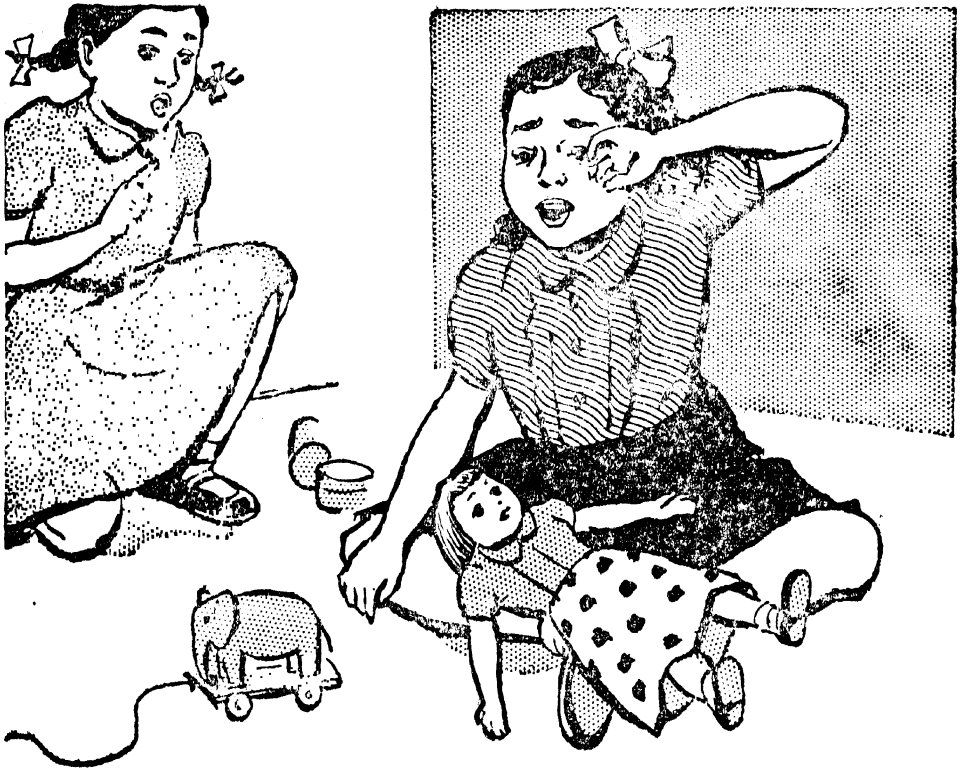
# ছোট্ট মুন্নি কেন কেঁদেছিল

মুন্নি ফোঁপাতে আরম্ভ করল তারপর আকাশফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মুন্নির বন্ধু ছোট্ট নিন্থু ওকে শান্ত করার আপ্রান চেষ্টা করছিল, ওকে নিজের আধ আধ ভাষায় বোঝাচ্ছিল—"কাঁদিসনা মুন্নি—বাবা আপিস থেকে বাড়ী ফিরলেই আমি বলব—" কিন্তু মুন্নির ভ্রূক্ষেপ নেই, মুন্নির নতুন ডল পুতুলটির দুধে আলতায় মেশানো গালে ময়লার দাগ লেগেছে, পুতুলের নতুন ফ্রকের ওপর পড়েছে ময়লা আঙ্গুলের ছাপ—আমি আমার জানলায় দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটি দেখছিলাম। আমি যখন দেখলাম যে মুন্নি কোন কথাই শুনছেনা তখন আমি নিজে এলাম। আমাকে দেখেই মুন্নির কান্নার জোর বেড়ে গেল—ঠিক যেমন 'এঙ্কোর, এঙ্কোর' শুনে ওস্তাদদের গিটকিরির বহর বেড়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশির মেয়ে নিন্থু—আহা বেচারা—ভয়ে জবুথবু হয়ে একটা কোনায় দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঠিক কি করব বুঝতে পারছিলামনা। এমন সময় দৌড়ে এলো নিন্থুর মা সুশীলা। এসেই মুন্নিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—"আমার লক্ষ্মী মেয়েকে কে মেরেছে?"

**কান্না জড়ানো গলায় মুন্নি বলল—"মাসী, মাসী, নিন্থু আমার পুতুলের ফ্রক ময়লা করে দিয়েছে।"**

'মূকং করোতি বাচালম্'! আমাকে বাচাল করে তোলার কৃতিত্ব বোধ হয় আপনারই।

শুভ্রার মুখের শুভ্রতাতে রক্তিমার সঞ্চার হ'ল—যেন শাদা মেঘে সন্ধ্যার স্বর্ণলেখা এসে লেগেছে। সে বললে, মানে হচ্ছে আপনার সব কথা এত দিন আপনি ষ্টক ক'রে রেখেছিলেন!

রেখেছিলাম—বোধ হয় আপনার জন্মই রেখেছিলাম,—শোভন হেসে বলে।

শুভ্রার স্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখ দু'টি প্রদীপ্ততর হ'য়ে ওঠে। সে বলে, চলুন আমার বাড়ি। আমার পড়ার ঘরে কেউ এসে আমাদের ডিষ্টার্ব করবে না।

শোভনকে একরকম জোর ক'রে তার বাড়িতে নিয়ে গেল শুভ্রা। তার মৃদু সলজ্জ আপত্তি সে কানেই তুলল না।

শুভ্রার মা বললেন, তোমার কথা অনেক শুনেছি বাবা!

শোভন লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে।

শুভ্রার মা বলে চলেন, আমার দুরন্ত মেয়েটার পড়াশুনায় একেবারে মন নেই বাবা! আমাদের কথা ও শুনতেই চায় না। ওকে যদি একটু শাসন করো তো ভাল হয়।

শুভ্রার চোখ দুটিতে কৌতুক উপচে ওঠে। সে বললে, শোভন বাবুকে আমার ওপর মাষ্টারি করতে বলছ না কি তুমি?

মা হেসে বলেন, মাষ্টারি কেন—রীতিমত শাসন করতে বলছি।

শোভনকে পড়ার ঘরে নিয়ে এসে শুভ্রা বললে, মা তো আপনাকে আমার শাসনকর্তা হতে বললেন! নিন, শাসন করুন।

শুভ্রা তার ক্লান্ত দেহটিকে রকিং-চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শোভনের আনত মুখের পানে।

শোভন একবার মুখ তুলে তাকিয়েই মাথা নীচু করে। তার বুকের মধ্যে মৃদু-মধুর শিহরণ জেগে ওঠে।

শুভ্রা খানিক বাদে বললে, চুপ করে বসে আছেন কেন? করুন শাসন? বলে কৌতুকোদ্ভাসিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় শুভ্রা।

রকিং-চেয়ারে বসে অল্প অল্প দুলছিল শুভ্রা। এলোমেলো হয়ে বসেছে—ক্লান্তিতে খানিকটা অসংবৃত, আত্মবিস্মৃত।

তার ক্লান্ত, অবসন্ন দেহের তটে সমুদ্রোচ্ছ্বাসের আভাস। কাঁধের আঁচল ঈষৎ খসে হেলে পড়েছে, তার সুযোগ নিচ্ছে আত্মপ্রকাশোন্মুখ যৌবন। দেহের দু-কূল ছাপিয়ে ওঠা সব শাসনের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী আত্মঘোষণা গোপন থাকে না।

শোভন চুরি করে চেয়ে দেখে। তার সলজ্জ কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে আদিম বর্বরতা যেন ঝলসে ওঠে। শুভ্রা তা' লক্ষ্য করে। খ'সে পড়া আঁচলটি কাঁধে তুলে নিয়ে মুচকি হেসে বলে, মেয়েদের শাসন করা সোজা নয় কিন্তু!

শোভন চমকে উঠে মুখ তুলে তাকায়।

শুভ্রা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বসুন, চা নিয়ে আসছি।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সহজ হ'বার চেষ্টা করে শোভন। কলেজের আসন্ন ইলেকশনের প্রসঙ্গ তুলে আলোচনা শুরু করে সে।

শুভ্রা বলে, কলেজে যতক্ষণ থাকি ইলেকশনের মাতামাতিতে কান ঝালাপালা হ'য়ে যায়। ইলেকশনের কথা থাক। এখন বলুন তো রোমান ইতিহাসটা আমার এমন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে কেন?

শোভন হেসে বললে, প্রফেসার মিত্রের লেকচারের গুণে বোধ হয়।

শুভ্রা বলে, প্রফেসার মিত্রের লেকচার কখনো মন দিয়ে শুনেছি ব'লে মনে হচ্ছে না—আমার রোমান ইতিহাস বুঝতে পারার চেষ্টাটা ওঁর লেকচার-নিরপেক্ষ।

শোভন বলে, পরীক্ষা এখনো অনেক দূরে। রোমান ইতিহাসের দুর্বোধ্যতা নিয়ে না-ই বা মাথা ঘামালেন এখন?

তা' হ'লে কী ক'রব? শুভ্রা যেন কাতরকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

শোভন বলে, খুব শক্ত প্রশ্ন করেছেন। আপাতত আমার দিক থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করাটাই একমাত্র করণীয়। কলেজের ও বাড়ির পড়াশুনার রুটিনের বাইরে কখনো কিছুই করিনি—আমার জীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ডাইভার্শন বোধ হয় আপনার সঙ্গে আলাপ করা।

ওয়াণ্ডারফুল! শুভ্রা হেসে বলে। আপনার কথা শুনে আমারও মনে হচ্ছে আমার দিক থেকেও আপনার সঙ্গে আলাপ করাটাই একমাত্র করণীয়। এখন বলুন তো আলাপে ও প্রলাপে তফাৎ কী?

তফাৎ! শোভন একটু চিন্তা ক'রে বলে, আর খানিক বাদে সহজের টের পাবেন। কারুর সঙ্গে সহজ ভাবে আলাপ করতে আমি অভ্যস্ত নই—কাজেই আলাপের সীমারেখা আমার কাছে অস্পষ্ট—আমার আলাপ হয়তো আর কিছুক্ষণ বাদেই প্রলাপে দাঁড়াবে।

শুভ্রা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে হেসে ওঠে। তার দেহের রেখায় রেখায় নৃত্য-তরঙ্গিত নদীর স্রোতের মত ভেসে যায় সে হাসি।

হাসতে হাসতে এলোমেলো হ'য়ে পড়ে শুভ্রা। তার আত্ম-বিস্মৃতির সুযোগ নিয়েই যেন কাঁধ থেকে আঁচল খ'সে পড়ে—কাঁচলবন্দী যৌবনের পরিপূর্ণতা ব্লাউসের স্বচ্ছ আবরণ ভেদ ক'রে আত্মপ্রকাশ করে।

শোভনের চোখ দুটিতে দুঃশাসনের জ্বালা।

আঁচল তুলে নিল না শুভ্রা। কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে শোভনের জ্বালা-ধরা চোখ দুটির দিকে।

শোভনের মস্তিষ্কের ভেতরটাতে ঝিম ধরে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলে, আজ চলি।

শুভ্রা হাসল। পাতলা ঠোঁট দুটির ফাঁকে ক্ষুরের ধার যেন ঝলসে ওঠে। অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে, ভয় পেলেন নাকি?

শোভন লাল হ'য়ে ওঠে। নির্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে নতমুখে।

ভাষা হারিয়ে ফেললেন দেখছি! শুভ্রার গলার স্বরে যেন বিদ্রূপ ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বেত্রাহতের মত চমকে ওঠে শোভন।

শুভ্রা উঠে দাঁড়িয়ে কাছে এসে বললে, আলাপ বা প্রলাপ কোনটাই জমল না—তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছেন যে বড়! বলে শোভনের চোখ দুটির ওপর নিবিড় দৃষ্টি নিবদ্ধ করল শুভ্রা।

শোভনের দেহের শিরায়-উপশিরায় যেন বিদ্যুতের স্রোত বয়ে যায়। শুভ্রার আয়ত চোখ দুটির বিলোল কটাক্ষ যেন তার ভীরু পৌরুষের মর্মমূলে গিয়ে বিদ্ধ হয়।

শোভনের বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ায় শুভ্রা। তার চোখ দুটির কামনার ভাষা পাঠোদ্ধার করতে ভয় পায় শোভন।

শুভ্রা হেসে বলে, আজকের মত তোমাকে ছেড়ে দিলুম। কিন্তু আবার কখনো যদি সুযোগ পাই তখন কিন্তু—

তার প্রদীপ্ত চোখে যেন বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে শোভন। ত্রস্ত পদক্ষেপে ঘর থেকে সে বেরিয়ে যায়।

মাথার ভেতরে অগ্নিদাহ নিয়ে সারা রাত জেগে রইল শোভন। তার মনের সুপ্ত কামনাগুলি বিনিদ্র রাতের আঁধারে যেন ফুল ফোটায়। শুভ্রার শুভ্র যৌবনের প্রতিবিম্ব যেন তার চারদিকের অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করে রাখে। সেই আলোর অরুণরাগে শোভনের সুসুপ্ত পৌরুষের ঘুম ভাঙ্গে।

পরদিন কলেজে গেল না শোভন। সারাদিন পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল—দুপুরে পার্কের বেঞ্চিতে রোদের দাহ মাথায় করে বসে রইল।

গ্রীষ্মের দুপুর। রোদের তাতে সর্ব্বাঙ্গ পুড়ে যায়। কিন্তু তা যেন সে টেরই পাচ্ছে না। দুঃসহতর জ্বালা তার বুকের মধ্যে।

সন্ধ্যার ছায়া সারা দিনের তাপের ওপর ঠাণ্ডা প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। কিন্তু শোভনের বুকের আগুন নেবে না।

উদ্‌ভ্রান্তের মত শুভ্রাদের বাড়িতে এল শোভন। শুভ্রা তাকে দেখে অবাক হয়ে বলে, এ কী ঝোড়ো কাকের মত চেহারা হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ নাকি?

শোভন নির্বাক্। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে শুভ্রার মুখের পানে—তার মনের আগুন দু'চোখে জ্বলে।

তার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পায় শুভ্রা—বলে, অমন করে চেয়ে আছ কেন?

শোভন অস্ফুট কম্পিত স্বরে বলে দেখছিলাম তুমি কত সুন্দর!

শুভ্রার দু'চোখে কৌতুক উপচে ওঠে। সে বললে, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নাই বা দেখলে—আমার ঘরে এসে দু'চোখ ভরে দেখো।

শুভ্রার পেছনে পেছনে তার ঘরে এসে ঢুকল শোভন। শোভনের মুখের দিকে তির্য্যক দৃষ্টি হেনে শুভ্রা বললে, বই পড়া নজর তোমার একেবারে ক্ষয়ে যায় নি দেখছি!

এ আমার নতুন দৃষ্টি শুভ্রা!—আবেগ-কম্পিত স্বরে শোভন বললে। এ দৃষ্টি তুমিই দিয়েছ আমাকে।

সবুর করো। তোমার নয়া নজরের পরীক্ষা পরে হবে। আপাতত তোমার চায়ের ব্যবস্থা করিগে। ভাগ্যিস তুমি এলে শোভন! নইলে একা-একা সন্ধ্যাটা কী করে কাটাতাম কে জানে! বাড়ির সবাই গেছেন সিনেমায়। মাথা ধরেছে বলে আমি যাইনি। একটু বোসো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা ক'রে নিয়ে আসছি।

চায়ের তেষ্টা নেই আমার। তেষ্টা আমার চোখে—আমার বুকজোড়া। এ তেষ্টা তুমি মিটিয়ে দাও শুভ্রা! তার শুকনো ঠোঁট দুটি শুভ্রার রক্তাভ কোমল কম্পিত ওষ্ঠাধরে তৃষিত চুম্বন এঁকে দেয়।

শুভ্রার মৃদু আর্ত্তনাদ শোভনের কানেও যায় না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যত্নকৃত বেশবাসের আবরণ সরিয়ে অনাবৃত যৌবনের শুভ্র বিস্ময়কে উদ্‌ঘাটিত করে শোভন। যেন তার কল্পমায়াকে কায়ার মধ্যে আবিষ্কার করে সে।

শুভ্রা দু'হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেয় শোভনকে। চেঁচিয়ে বলে, জানোয়ার কোথাকার!

শুভ্রার অগ্নিস্রাবী দৃষ্টির সামনে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে শোভন।

শুভ্রা চেঁচিয়ে বলে, বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

শুভ্রার বাড়ি থেকে শোভন বেরিয়ে আসে। মড়ার মত সাদা হ'য়ে উঠেছে তার মুখ। তার তখনকার মৃত্যুশীতল শূন্য চোখের দৃষ্টি কারুর চোখে পড়লে সে হয়তো ভয় পেত।

নিদারুণ গ্লানিবিদ্ধ বুকের মধ্যে দুঃসহ জ্বালা। দু' চোখে দুর্বিষহ দাহ নিয়ে পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে থাকে শোভন।

রাত তখন অনেক। পার্ক প্রায় শূন্য। পার্কের আঁধারের মধ্যে শোভনের মনের অন্তর্গ্লানির প্রতিবিম্ব যেন সহস্রগুণ আকার ধারণ করে। দূরে ল্যাম্পপোষ্টের আলোয় শুভ্রার অগ্নিস্রাবী দৃষ্টিই যেন ঝলসে ওঠে।

শরীর ও মনের এ নিদারুণ জ্বালা কোথায় জুড়োবে সে! কোথায় নামাবে সে তার প্রত্যাখ্যাত পৌরুষের নির্বাক বেদনার ভার।

অবশেষে শোভন উঠে দাঁড়াল। পার্কের বাইরে এসে শূন্য রাজপথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে অনেকক্ষণ।

শেষ ট্রামটি চলে গেল। সুষুপ্তির আমেজ দু' পাশের বাড়িগুলোতে নেমে এসেছে। সুখ-সুপ্ত মহানগরীর নিদ্রার শিয়রে সে যেন তার জেগে থাকাকে রূঢ়ভাবে অনুভব ক'রল।

শূন্য রাস্তাগুলিতে পাগলের মত ছোটাছুটি ক'রে বেড়ায় শোভন। কলকাতার রাস্তাগুলোকে তার এই নিঃসঙ্গ নৈশ বিচরণ চিহ্নিত করে সে যেন অদ্ভুত এক ধরণের আনন্দ বোধ করল। তার এই নৈশ নিরুদ্দেশ পথ চলার জন্যই বুঝি রাস্তাগুলি তৈরী করা হয়েছিল।

প্রশস্ত রাজপথ থেকে সঙ্কীর্ণতম গলি পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ জটিল পথের জাল আবিষ্কার করে শোভন।

হঠাৎ একটি সঙ্কীর্ণ গলির আঁধারের সুমুখে থমকে দাঁড়াল শোভন। ল্যাম্পপোষ্টের ক্ষীণ আলোর পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে এগিয়ে গিয়ে চমকে ওঠে শোভন। অন্ধগলির আঁধারের সঙ্গে একাকার হ'য়ে শুভ্রাই বুঝি দাঁড়িয়ে আছে! হয়তো তারই প্রতীক্ষায়।

ভাল ক'রে চেয়ে দেখল শোভন। শুভ্রা নয়। কিন্তু মেয়েটির চোখ দুটিতে তারই উদ্দেশে সুস্পষ্ট আমন্ত্রণ ঝলসে উঠেছে—ল্যাম্পপোষ্টের অস্ফুট আলোয় জ্বলন্ত অঙ্গারের মত প্রদীপ্ত প্রতীক্ষাব্যগ্র দৃষ্টির লক্ষ্য সে ছাড়া কেউ নয়।

শোভন চেয়ে দেখে। শুভ্রা তাকে যা দেয় নি—এই মেয়েটি তাই তাকে দিতে চায়।

শোভন উল্লসিত হয়ে ওঠে। শুভ্রার রূঢ় প্রত্যাখ্যানের শোধ নেবার সুযোগ বুঝি উপস্থিত।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে নোণা-ধরা জীর্ণ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে সঙ্কীর্ণ অন্ধ গলির পথে হাঁটতে থাকে সে। গলি যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখানকার অতলস্পর্শী অন্ধকারে এসে মেয়েটি তার হাত ধরল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত মেয়েটির সঙ্গে একটি পুরোনো একতলা বাড়ির মধ্যে একটি স্যাঁৎসেঁতে ঘরে এসে দাঁড়াল শোভন।

মেয়েটি সুইচ টিপে আলো জ্বালল। সঙ্গে সঙ্গে শোভনের চোখের সামনে নির্লজ্জ ক্ষুরধার হাসি অগ্নির মত ঝলসে ওঠে মেয়েটির মুখে-চোখে। তার সর্বাঙ্গে উদ্ধত যৌবনের নির্লজ্জ বিকৃত আত্মপ্রকাশ।

কিছুক্ষণ বাদে শোভনের মনে হল যেন ক্লিন্ন আঁধারের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে সে। তার পৌরুষ লাঞ্ছিত হয় বিকৃত ক্ষুধার কাঁদে।

এ তো সে চায় নি! কোথায় সেই শুভ্র সুন্দর শুচিস্মিত যৌবন-রহস্য—যার অনাবৃত সৌন্দর্যের রেখায় রেখায় স্বর্গের আলোর স্বর্ণলেখার ইসারা পেয়েছিল সে! কোথায় সেই অনির্বচনীয় অনিন্দ্য নন্দন-কানন! এ যে কামনার অন্ধ গলি—রুদ্ধশ্বাস ক্লেদাক্ত ক্ষুধার বিদ্রূপ!

মেয়েটির ঘর থেকে শোভন যখন বেরিয়ে এল, তখন তার সমস্ত শরীর-মন অসাড় হয়ে গেছে। তার মনে হচ্ছিল যেন তার যৌবনের কামনার রঙিন ফুলগুলি সব শুকিয়ে ঝরে গেছে।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের ভগ্নাংশ তখন পূব-দিগন্তে উঁকি দিয়েছে। ঐ দূর আকাশের চাঁদের মধ্যে সে যেন শুভ্রাকে দেখতে পেল। তার এই ক্লিন্ন অস্তিত্বের নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে সে যেন হাসছে। ঐ শুভ্র সুদূর আলো যেন তার লাঞ্ছনাকে বিদ্রূপ করছে। ওকে অপমান করতে চেয়ে চিরন্তন অন্ধকারের কাছে আত্মবিক্রয় করেছে সে। নিদারুণতম লজ্জার দুর্বিষহ গ্লানির ভার কী করে বইবে সে?

পর পর অনেকগুলো গ্লানির ভারে অবনত দিন জীবন্মৃতের মত কাটিয়ে দিল শোভন। ক্লাসে সবচেয়ে পেছনের বেঞ্চিতে বসে থাকে—কারুর সঙ্গে কথা বলে না—অফ্ পিরিয়ডগুলো লাইব্রেরীর হলঘরের অন্ধকার কোণে গা ঢাকা দিয়ে কাটায়।

হঠাৎ একদিন লাইব্রেরীর ঐ অন্ধকার কোণে এসে তাকে আবিষ্কার করল শুভ্রা।

আমাকে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন?—কম্পিত অবরুদ্ধ স্বরে শুভ্রা বলে।

দুঃসহ আবেগ শোভনের সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তোলে। চকিতে মুখ তুলে একবার সে দেখে নিল শুভ্রাকে। রজনীগন্ধার পবিত্রতা নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে—তার ক্লিন্ন অপরাধবোধে জর্জর মন যেন তার এই শুচি-শুভ্র সান্নিধ্যকে সইতে পারছিল না।

তুমি কী আমার ওপর রাগ করেছ?—শুভ্রা ব্যাকুল কণ্ঠে বলে।

রাগ! শোভন অবাক চোখে তাকালো।

শুভ্রা চমকে ওঠে তার মুখের দিকে চেয়ে। তার ফ্যাকাশে মুখে যেন মৃত্যুর শূন্যতাকে প্রত্যক্ষ করল শুভ্রা।

কী হয়েছে তোমার বলো তো? শুভ্রা অস্ফুট আর্তকণ্ঠে ব'লে ওঠে।

শোভন ত্রস্ত চোখে ইতস্ততঃ তাকিয়ে বললে, এটা লাইব্রেরী-ঘর শুভ্রা!

হোকগে লাইব্রেরীঘর। কিন্তু কী হ'য়েছে তোমার? আমাকে বল শোভন—বল।

কী আর বলব! তোমার কাছে আমার অপরাধের শেষ নেই। ক্ষমা চাইবার অধিকারও তো নেই আমার।

ক্ষমা চাইবে কেন? তুমি তো কোন অপরাধ করো নি! মাথা নীচু করে শুভ্রা বলে। তোমার স্বাভাবিক দাবীকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম—অপরাধ আমিই করেছি। আমাকে ক্ষমা করো তুমি। শুভ্রার গলার স্বর কান্নায় ভিজে ওঠে।

শোভনের চোখ দুটি দুর্নিবার বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে ওঠে।

চল আমার সঙ্গে। শুভ্রা চোখ মুছে বললে।

কোথায়?

আমাদের বাড়ীতে।

তোমাদের বাড়ীতে! শোভনের মনে হ'ল যেন তার অন্ধ কারাগারের আগল ভেদ ক'রে শুভ্র আলোর আমন্ত্রণ এসেছে।

কিন্তু তার শরীর-মনের অন্ধকারের কীটগুলো কী ক'রে এই আলোকে সহ্য ক'রবে?

কী ক'রে যাবো শুভ্রা! শোভন ব্যাকুলকণ্ঠে বলে। তুমি তো জানো না—

না, না—কিছু শুনতে চাইনে। যেতেই হ'বে তোমাকে আমার সঙ্গে।

একরকম জোর করে শোভনকে নিয়ে গেল শুভ্রা তার বাড়িতে।

শুভ্রার ঘরের মধ্যে দিনান্তের ছায়া ঘনায়। আলোছায়ার সন্ধিক্ষণে শুভ্রা মুখ তুলে তাকাল—তার গভীর রহস্যভরা চোখ দুটি যেন সন্ধ্যার নিবিড় মায়ার সঙ্গে একাকার হ'য়ে যায়।

হঠাৎ শোভনকে গভীর আলিঙ্গনের মধ্যে বেষ্টন ক'রে শুভ্রা বললে, আমার সব তোমাকে দিতে চাই। নাও আমাকে—কেড়ে নাও।

শুভ্রার আত্মসমর্পণ-ব্যাকুল চোখ দুটির দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকায় শোভন।

...সেই আশ্চর্য সুন্দর নিরাবরণ শুভ্রতা আধো-আলো—আধো-ছায়ার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অনাঘ্রাত ফুলগুলির উপর ভ্রমরের লুব্ধ বিচরণ—যৌবনের রহস্যের তটে দুঃসাহসী অভিযান-দু'জনে দু'জনের দেহের সীমা পার হয়ে যেন পরিপূর্ণ মিলন খোঁজে।

কিন্তু শুভ্রার যৌবনতটে কোথায় সেই অসীম সুন্দর! পরিপূ মিলনের সেই গভীর আকাঙ্খা নিমেষের মধ্যে কামনার অন্ধগলি পথে যেন দিশেহারা হয়ে যায়। এত দিনের নিবিড়তম আশ্লে স্বপ্নঘোর ভেঙ্গে যায়। স্বর্গীয় কামনার রঙিন আলো যেন ক্লি আঁধারে উধাও।

শুভ্রার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে জোর করে মুক্ত করে উ দাঁড়ায় শোভন।

শুভ্রা আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে, ও কী হ'ল তোমার?

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে শোভন বলে, আমি পারবো না শুভ্রা-পারবো না।

কেন? কেন?—শুভ্রা প্রায় হাহাকার করে ওঠে।

না, না, আমায় মাপ করো তুমি।—ব'লে ঘর থেকে বেরি যায় শোভন।

# যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বিবি

## মায়াতরু

পাথরটা ভিজে শ্যাওলায় ভরা, এখানে বসবি, পাগল নাকি।
মেঘলা আকাশ কাছে পেলে তোর রাখবে না আর কিছু বাকি।
এখুনি ঝরবে ঝর ঝর ঝর, ফুল্ল তনুকে ভিজিয়ে দেবে,
তারপর কাল ডাক্তার এসে গুণে গুণে মিছে ভিজিট নেবে।
এখানে কাছেই পাগলা গারদ, চল কাল গিয়ে ভর্তি হবি,
লুনাটিক হলি এতো দিন পরে, বহুদিন থেকে ভাবার, কবি।
ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ তো ঘনিয়ে, দিন রাত্তির আকাশ ঝরে,
ললিতা, আজকে বাড়ী ফিরে চল, দেখ গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি পড়ে।

আজকে দু'জনে ঘরে গিয়ে বসি, পাহাড়তলীর বর্ষানিশা,
সন্ধ্যাবেলায় আঁচল ধরেছে, যৌবনমদে অন্ধ-দিশা!
এখুনি আসবে দস্যি-মেয়েটা, সিগনাল দেয় সব পাইন,
স্বভাবটা ঠিক নিখিলের মতো, কিচ্ছু মানে না কোন আইন।
গাড়ীর মধ্যে এই বেলা চল, ইয়ারকি করা বেরিয়ে যাবে,
উপত্যকায় আদল বুকের এখুনি সে মেয়ে জড়িয়ে পাবে।
সারারাত্তির ছাড়াছাড়ি নেই, কেবল সোহাগ সর্বনাশা,
চুম্বনে তার মৃত্যুর ক্ষুধা, সইতে পারবি সে ভালোবাসা?

বাড়ী ফিরলুম বললে ললিতা, আজকে দু'জনে ঘরেই বসি,
ফুলদানি তাতে বেলা আনমনা, কুঁড়ি-গোলাপের খুলেছে কষি।
এইখানে বসি তোর পাশ ঘেঁষে, বিরহের কিছু গা দিকি গান,
বাদল-রাতের সুরে-সুরে মেলা হু-হু বাতাসের সুরেলা টান।
ঘন-মেঘে নেই মনের মানুষ, মিছে মন্দিরে দীপের মেলা,
ললিতার আর প্রতিমার বুকে দপ-দপ করে বিরহ-জ্বালা।
থাকগে রেডিও বন্ধ আজকে, বহুদিন পরে "আঁখির লোর,
কেন মিছে ঝরে" সেই গানটাই, শুনবো আজকে রাত্রিভোর।

এমন বর্ষা, কি হবে রান্না? একটু খিচুড়ি তুই রাঁধিস,
আজ ঝরো-ঝরো এলোথোঁপা থাক, বিরহ কবরী কাল বাঁধিস।
ঐ দেখ এলো ঝমঝম করে, বিদ্যুৎ মিছে ঝলসে মরে,
শ্রীমতীর ছাতি 'যাওত ফাটিয়া' প্রতিমার বুক কেমন করে।
আজকে মাতুক বিরহের রাত, গায়ে কাঁটা জাগা গান গা তুই,
দু'জনে একলা, সুরসংঘাতে এক ভেঙ্গে ভেঙ্গে কর না দুই।
মনের মানুষ কতো দূরে আজ, তবু মনে হবে সুরের মোহে,
পাশেই রয়েছে তৃষ্ণা আকুল, দু'জনে আদর করছি দোঁহে।

তার পরদিন চায়ের টেবিলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে,
অস্থির করি প্রতিমাকে আমি, বলি, সব কথা বলতো খুলে?
তোর কাছে এসে কি করে জুটলো, এই এতো দূরে নিখিল রায়,
খুব মাথামাখি, না হ'লে প্রতিমা নিখিলের ডাকে দিল্লি যায়?
ছায়া মাড়ালে যে পাপ হয় ওর, এতো আস্কারা কিসের ওকে,
বুঝবি যেদিন অসভ্যপণা বসবেই করে মদের ঝোঁকে।
তোর কি গরজ, তুই মিছিমিছি কেন ওকে মিছে দিস যে নাই,
ভেবে তো কিছুই পাই নাকো আমি, জিজ্ঞেস করি তোকেই তাই।

প্রতিমা বললে, শোন রাই, তবে গোড়া থেকে আমি সবটা বলি,
এক ছিল মেয়ে খুব সুন্দরী, তার নাম ছিল চট্টো ললি।
তাদের বাড়ীর পাশের বাড়ীতে, ডাক্তার বাবু এক যে ছিলো,
বেজায় গরম কি একটা দিয়ে ললিতার গায়ে সে ছ্যাঁকা দিলো।
দেখোতো মস্ত ফোস্কা পড়েছে, কেন ছ্যাঁকা দিলে আমার গায়ে?
ডাক্তার বলে, ঠাণ্ডা মলম চাও যদি, দেবো লাগিয়ে ঘায়ে।
ললিতা কি কম? আগুন আগুন গরম করেছে চিমটেটাকে,
তা' দিয়ে এমন ছ্যাঁকা দিয়ে দিলে জ্বালায় নিখিল, চেঁচিয়ে হাঁকে।

বয়ে গেছে ওকে ছ্যাঁকা দিতে যেতে, সারা মন দিয়ে ঘেন্না করি,
নিখিলের কথা মনে হলে পরে সাধ যায় ডুবে এখুনি মরি।
আহা মরে যাই, শোনো শোনো রাই, ললিতা আবার করলে সুরু,
প্রতিমা বলে যে আর এক মেয়ে, তার বর, তার নামটা পুরু।
আদরের নাম অরুণের ওটা, অরু ছিল পুরু এখন চালু
ব্যাকরণ নেই আদরের নামে, চড়াই কখনো কখনো ঢালু।
পুরু আর তার বন্ধু নিখিল এক ইস্কুলে আপনি থেকে,
অ আ ক খ আর যটকে দুজনে একদিনে নাকি সবটা শেখে।

মুখে পোড়া ঘাটা নিয়েই নিখিল এইখানে এলো সিমলা হিলে,
প্রতিমা তো তার-পাড়া-প্রতিবাসী, যেমন দেখলে, চিনেই নিলে।
আমি হই তার বন্ধুর বউ, বরের বন্ধু নিখিল তাই,
আদর যত্ন খাবার টেবিলে, সন্ধ্যেবেলায় গান শোনাই।
এমনি করেই প্রতিমা করেছে নিখিল রায়কে খুব খাতির,
বর যে রাগবে, যদি না যত্ন ভালো করে করি তার সাথীর।
বরের বন্ধু বলতো কিন্তু ললিতার কথা অনর্গল,
কি সব হয়েছে, কেমন করে যে জয়ী হবে তার প্রেম অটল।

বিশ্বাস হয় বলতো ললিতা, ন্যাকামির কথা, অটল প্রেম ?
দেখছি নিখিল ভীষণ ঘোড়েল, ডিপ মানে খুব গভীর গেম,
গোড়াগুড়ি থেকে খেলেই যাচ্ছে, কি যে ও চাইছে নিজেই জানে,
ললিতা তো তাকে ভাসিয়ে দিয়েছে ঘৃণার নদীতে ভাঁটার টানে !
সত্যি বলছি একটুও নেই নিখিলের দিকে টান আমার,
দেখছিস নাকো, পাছে ভূতে ধরে, আঙুলে আংটি খাঁটা তামার।
দুঃখু লাগছে এইটুকু দেখে মিছেই মেশালি ভস্ম-ঘিতে,
আর কি পেলি না অন্য বাউকে, একেবারে কোলে বসিয়ে নিতে ?

প্রতিমা বললে, বলি শোনো রাই, এখনো অনেক কাহিনী বাকী,
মনে মনে কথা গজগজ করে, আর কতো দিন লুকিয়ে রাখি !
অরুণই তো ওকে মৎলব দিলে, কাশীর গুরুমা ধরতে তাঁকে,
বুঝিয়ে বলতে ভাতবুল মিছে, যদি ভালোবাসা সত্যি থাকে।
অনুমতি তাঁর আদায় করেই, তক্ষুণি চিঠি কলকাতায়,
ললিতার মার নামে ঠিক যেন, জরুরী ডাকেতে নিজে পাঠায়।
গুরুমা দেবেন আদেশ চিঠিতে, নিখিলের সাথে ললির বিয়ে,
খুব শীগগির হয়ে যায় যেন হর্তুকি আর সিঁদুর দিয়ে।

অরুণই তো তাকে বুদ্ধি জোগালে, কালী কালী বলে তুলতে হাই,
গুরুমার মন কালী কালী বলে ভবজরে করে ভেজানো চাই।
অরুণ বললে, ও সঠিক জানে গুরুমার খুব নরম মন,
সাঁতলাতে হবে সেদ্ধ হলেই কালী কালী বলে দিয়ে ফোড়ন।
আদাজল খেয়ে ধন্না দাওগে, ঠিক হয়ে যাবে সফলকাম,
বারে বারে বোলো কাম কতোটুকু, জীবনে সত্যি কেবল রাম।
সেই উপদেশ নিয়ে তো নিখিল গুরুমার কাছে তখুনি গেলো,
তিন চার দিন পরে তারপর বিজয়-গর্বে দৌড়ে এলো।

কথা শুনি আর ভয়ানক রাগে শুধু ফোঁস ফোঁস করেই মরি,
গুরুমা না হয় বলে দিয়েছেন, আপত্তি যদি আমিই করি ?
আমার মতটা কিছু নয় বুঝি, আমি নিখিলকে না যদি চাই,
কি ফল ফলবে তুড়ি দিয়ে শুধু কালী কালী বলে তুললে হাই ?
আমি যাকে শুধু ঘেন্নাই করি, যার নাম শুনে গা-বমি করে,
এ কেমন কথা, যেতে হবে শেষে বউ সেজে সেই লোকের ঘরে ?
অপমান করে সেই দিন থেকে চোরের মতন লুকিয়ে থাকে,
সখ কম নয়, সেই অসভ্য বিয়ে করবার ইচ্ছে রাখে।

প্রতিমাকে আমি সোজা বললুম, ওকে যদি শেষে বিয়েই করি,
সেই রাত্তির পোয়াবার আগে নিশ্চয় দেবো গলায় দড়ি।
জানিস কি তুই, সেই দিন থেকে, একবার ভুলে করেনি দেখা,
একটা লাইন লিখে পাঠায়নি, অপমানে আমি জ্বলেছি একা।
আহা মরে যাই, বিরহিনী রাই, কেমন করে যে কাটালি দিন,
হাজারটা বিছে বুকে কামড়েছে, গায়েতে ফুটেছে হাজার পিন।
মথরায় গেলে নিঠুর কালা, কতো দুর্দশা শ্রীমতী ভোগে,
গত্তি লাগেনি গায়ে এত্তোটুকু, শুকিয়ে কাঠিটি বিরহ-রোগে।

হাসতে হাসতে প্রতিমা বললে, ওর হাসি দেখে গা জ্বালা করে,
মরণতো নেই, হাসছেই শুধু, দুটো পাটা দাঁত বেরিয়ে পড়ে।
বললে, সত্যি সেই দিন থেকে দেখা করেনিকো নিখিল আর ?
একি শুনি, ছি ছি এতো ফেথলেশ, স্কাউণ্ড্রেল ও, নয় লাভার।
তারপর উঠে, আলমারি থেকে, কি যেন আনলে খামেতে ভরে,
বললে এবার ম্যাজিক দেখাবো, বোস চোখ দুটো বন্ধ করে।
সাত যে গুণবো এক দুই ক'রে তার আগে চোখ খুলতে মানা—
সাত বললেই এক চোখ খুলে, তাকাবি যেমন তাকায় কানা।

ইয়ারকি নয়, দেখাবো এখুনি, পৃথিবীতে যেটা দেখেনি কেউ,
এক ফোঁটা জল তাতেই জাগাবো জগৎ ভাসানো মস্ত ঢেউ।
আস্ত মানুষ, মুণ্ডুটা তার, দেখবি রয়েছি পায়ের নিচে,
মুখে জিভ নেই, একেবারে বোবা, দেখবি সে লোক গান গাইছে।
একটা সূর্য দেখে এসেছিস, দশটা সূর্য দেখাবো আজ,
উলটো দিল্লী, উলটো আগ্রা, দেখবি সেখানে উলটো তাজ।
সিমলায় এসে ছ' মাস শিখেছি মাষ্টার রেখে আমি ম্যাজিক
দেখবি এবার প্রতিমার নাম ছড়িয়ে পড়বে দিকবিদিক।

ইয়ারকি নয়, অতি অদ্ভুত দেখবি কি ভানুমতীর খেলা ?
দেখাবো একটা ছোট আংটিতে দুটো ডিম আর মুরগী মেলা।
আমি ঠিক পারি মন্তর দিয়ে তোকে করে দিতে নিখিল রায়,
নিখিলেশ তাকে প্রতিমা বানাতে, বল কতোটুকু সময় যায় ?
আসন-পিঁড়িতে চুপ করে বোস, নাক টিপে থাক ডান দিকের,
ঐ দিকে তাকা, একদৃষ্টেই, ঐ ডান দিকে ঐ চিকের।
এমন জিনিষ দেখাবো ললিতা, দেখিসনিকো যা কখনো আগে,
মন্তর কিছু পড়লে দেখবি, বাসী মড়া সে-ও চেঁচায় রাগে।

রোজারা যেমন ঝাড়-ফুঁক করে, ডান হাত ঠিক তেমনি ভাবে,
গায়ে ও মাথায় ঘোরাতে লাগলো, বললে এখুনি খেলা দেখাবে।
একবার শুধু নাড়লে আঁচল, মেঝের ওপরে ছিটকে গিয়ে,
ফটো একখানা পড়লো উল্টে, সোজা হেডলং ডাইভ নিয়ে।
ফটোটা কুড়িয়ে দেখলুম আমি, আমাদের ফটো, আমি, নিখিল,
নিখিল দাঁড়িয়ে আমি বসে আছি, হাসি হাসি মুখ প্রচুর থ্রিল।
ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, বললে ললিতা গানের সুরে,
মিলন হল না, বিরহিনী রাই, কেঁদে কেঁদে মরে একলা দূরে।

চেঁচাতে গেলুম, শব্দ হ'ল না, ফটো পড়ে গেল ধপাস করে
হাত থেকে ফের মেঝের ওপরে, সারা পৃথিবীটা উঠলো নড়ে।
এটা কি করে যে সম্ভব হ'ল নিখিলের পাশে আমার ফটো,
নিজে তুলিয়েছি ? কখখনো নয়,—মিথ্যে আমার ওপরে চটো।
নিজের চোখেই দেখছি তো আমি, সন্দেহ লাগে ফটো তো ঠিক
কে জানে হয়তো এটা যাদুকরী প্রতিমা রায়ের ম্যাশিং ট্রিক।
সেই দিন সেই সন্ধ্যের পরে দেখাই হয়নি আমাতে ওতে,
অথচ দেখ না নিখিলের পাশে ভাসছি ইন্দ্রজালের স্রোতে।

[ ক্রমশঃ।

**রজত সেন**

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকালে বারান্দার কাঠের খুঁটিতে ঠেস-দেওয়া পিঠখানি মাইনর স্কুলের ব্ল্যাক-বোর্ডের মত মনে হয়। রাস্তা থেকে দরজাটা ঠেলবার আগে পুরো এক মিনিট মিত্তির বাবুর সরকারকে ভাবতে হয়েছে : দ্বিধা, সন্দেহ, আশংকা। বাবরী-চুলে বার কয়েক হাত বুলাতে হয়েছে, সুগন্ধি রুমালে মুখ মুছতে হয়েছে, চকচকে পাম্প-সু জোড়া পরীক্ষা করেছে ; তারপর দরজাটা ফাঁক করতেই সেই পিঠ।

হাঁটুর উপর কাপড় তুলে এসেছিল দাশরথি। পাশেই মাদুরের উপর আফিম-ছিটানো বিড়ির বাণ্ডিল আর দেশলাই, হাওয়ায় দুলছে মাথার একরাশি চুল ; পেশীবহুল, বলিষ্ঠ বাহুর একটা পাশ দেখা যাচ্ছে, ঐ বাহুতে কি প্রচণ্ড শক্তি থাকতে পারে—তা একবার ভাবল মনোতোষ হালদার। বারান্দায় প্রান্তে আর একবার উঁকি মারল মিত্তিরদের সরকার বাবু, উনুনের পাশে আঁচল-ঘেরা পিঠটা দেখা গেল, আর সুন্দর খোঁপাটি ; রাত্রে আসবার সাহস হয় না তার, অনেক দিন ভেবেছে আসবে, আসতে পারেনি, আগ্নেয়গিরি নিয়ে খেলা করবার পরিণামটা সে জানে।

জুতোর শব্দ যে শোনা গেল না তা নয়, কিন্তু মুখ ফিরালো না দাশরথি। বিনা আহ্বানে বারান্দায় উঠে আসতে পারল না মনোতোষ, উঠোনেই কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

কে? সরকারবাবু না কি? বিড়ির বাণ্ডিলটা হাতে নিল দাশরথি। মাধু! আর এক বাটি চা। বসুন।

হাতের ভর দিয়ে বারান্দায় পা ঝলিয়ে বসল মনোতোষ হালদার, মাথায় ততক্ষণে আঁচল তুলে দিয়েছে মাধুরী।

এবারে দাশরথির আধখানা মুখ দেখতে পাচ্ছে মনোতোষ, বড় মুখটার নিয়ম মাফিক গড়ন, কপালে কোনো রেখা নেই, তাই প্রথম দৃষ্টিতে খানিকটা কোমলতার আভাষই দেখা যায়, ঘন ভ্রূর নিচে প্রায় নিরীহ চোখ, প্রায়-ক্লান্ত কৌতুহলী দৃষ্টি, মনোতোষ আড়-চোখে তাকাল, ঐ বিশাল বুকের মধ্যে কিশোরী মেয়েটিকে কল্পনা করে শিউরে উঠল সে।

কি খবর বলুন, সকালেই কি মনে করে? একটা বিড়ি ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল দাশরথি, ফস্ করে দেশলাই জ্বালল, শিখার উপর দিয়ে তাকাল, কাল চোখের তারায় আগুনের ছায়া জ্বলজ্বল করে উঠল ; আর তখনই মনোতোষের মনে হল, দাশরথির চোখ নিরীহ নয়, দৃষ্টি শান্ত নয়।

ভাবলাম যাই একবার, দাশরথি বাবুর খোঁজটা নিয়ে আসি।

খানিকটা ধোঁয়া বার করে দাশরথি বলল, ও! বাড়িভাড়া এখন দিতে পারব না মশাই, হাতে কিছু নেই।

মনোতোষ জানে, ঐ দাশরথির চূড়ান্ত কথা, ওর আর ব্যতিক্রম হবে না, কোনো কারণেই নয়। না, ভাড়ার তাগিদ দেবার জন্য আমি আসিনি, মনোতোষ থামল, খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে ওদের শোবার ঘরটা দেখা যাচ্ছে, একটি মাত্র তক্তপোষ, গুটানো আধ-ময়লা বিছানা, তক্তপোষের নিচে পুরোনো, রং-চটা একটি ট্রাঙ্ক, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, হয়ত ঘরের মধ্যে আর কিছুই নেই। এই ওদের সংসার, আর বারান্দার প্রান্তে রান্নার টুকিটাকি জিনিষ, এই নিয়েই তিনটি বছর তারা কাটিয়ে দিয়েছে এ-বাড়িতে। সাত মাসের ভাড়া বাকি পড়ে গেল কি না—শেষকালে আপনারই— কোন কথাটা বলবে সে? কষ্ট? না অসুবিধা? শেষ পর্যন্ত যোগ করে দিল, অসুবিধা হবে। এই হয়, দাশরথির সংগে কথা বলবার সময় তাকে শব্দ নির্ব্বাচন করতে হয়, বদলাতে হয় ; অনেক সময় উপযুক্ত শব্দ খুঁজে না পেলে বক্তব্যের মোড় ঘুরিয়েও দিতে হয়েছে।

না, হাতে টাকা এসে গেলে আর অসুবিধা কি? বিড়ির ছাই ঝাড়ল দাশরথি, তার খানিকটা উড়ে গিয়ে পড়ল মনোতোষের সিল্কের জামায়, হ্যাঁ, টাকা এসে গেলেই বুঝলেন? বিড়ির টুকরোটা উঠানে ছুঁড়ে ফেলল সে।

মনোতোষ বুঝেছে ; কিন্তু একটা ব্যাপার আজও তার মাথায় ঢোকেনি, টাকাটা আসে কোথা থেকে? চাকরী করে না লোকটা, কোনো চাকরীই নয়, অথচ, এমন উটকো টাকা আসে কোথা থেকে? এক সংগে একশ' টাকা পর্যন্ত ভাড়া মিটিয়ে দিয়েছে সে, [illegible]

গ্লাসে চা নিয়ে এল মাধুরী, চকিতে একবার তাকাল মিস্তিরদের সরকার বাবু, ঐ দৈত্যটার বরাতে এমন বৌ? নিচু হয়ে চা রাখল সে; মোটে দুগাছি সরু চুড়ি, টাকা যখন পায়—তখন কয়েকটা গয়না গড়িয়ে দিলেই ত পারে।

বড় গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিল দাশরথি, মনোতোষ অপেক্ষা করল, জানে, অপেক্ষা করে লাভ নেই; দাশরথি কখনই তাকে গ্লাসটা দিতে অনুরোধ করবে না. অগত্যা চা তুলে নিল সে।

গ্লাস মাটিতে নামিয়ে রাখল দাশরথি। বলল, আমি মশাই কলকাতার বাইরে যাচ্ছি কয়েক দিনের জন্যে, সস্ত্রীক; ফিরে এসে আপনার বাড়িভাড়াটা দিয়ে দেব।

তা বেশ, বেশ। কোথায় যাবেন ভাবছেন?

মেদিনীপুর, জমিজমা নিয়ে গোলমাল বেধেছে, একবার যাওয়া দরকার, ভাবছি—একটা ভাগের জমি বিক্রি করে দেব, কিছু প্রাপ্তি সম্ভাবনাও আছে।

কদিন থাকবেন ঠিক করেছেন?

ঝামেলা মিটতে যত দিন লাগে, এই ধরুণ সপ্তা দুই।

তা বেশ, বেশ, খানিকটা পরিবর্তনও হবে, কলকাতা বড় একঘেয়ে জীবন মশাই! চা শেষ করে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল মনোতোষ. একটা সিগারেট উঁচু করে বলল. নিন।

দাশরথি বাণ্ডিল থেকে একটা বিড়ি বার করল, মুখে রাখল; মনোতোষ কশ করে দেশলাই জেলে আগুনটা এগিয়ে দিল, দাশরথি নিজের দেশলাই জেলে বিড়ি ধরিয়ে নিল।

মনোতোষ সিগারেট ধরাল, আস্তে আস্তে টানতে লাগল। তাহলে আমি উঠি?

আসুন। বলল দাশরথি, মুখ না ফিরিয়েই।

মনোতোষ হালদার আস্তে আস্তে চলে গেল।

সন্ধ্যের পর দাশরথি ট্যাক্সী নিয়ে এল. জিজ্ঞেস করল, সব গুছিয়ে নিয়েছ?

হ্যাঁ, গুছোবার আর কি আছে, একটি ত ট্রাংক।

কেন রান্নার বাসনপত্র?

সব দিয়েছি, কোথায় যাব আমরা?

কেন? মেদিনীপুর।

ভারি ট্রাংকটা স্বচ্ছন্দে সে দুহাতে উঠিয়ে বড় ট্যাক্সীর পিছনে তুলে দিল, তারপর একটা বস্তা আর সব খুচরো জিনষপত্র—যা ট্রাংকে ঢুকাবার অসুবিধা ছিল। বাইরের দরজায় একটা তালা লাগিয়ে দিল দাশরথি।

ট্যাক্সী এল দক্ষিণ-কলকাতার এক নির্জন পল্লীতে। চারতলা একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাবার নির্দেশ দিল দাশরথি, মুগ্ধ বার করে তাকাল মাধুরী, অন্ততঃ একশ জানালায় বাতি জ্বলছে।

গাড়ি থেকে নামল দাশরথি, বলল, তুমি এক মিনিট বোসো, দেখি একটা লোক পাওয়া যায় কি না, জিনিষপত্রগুলি দোতলায় তুলে দেবে।

ড্রাইভারের পাশে যে লোকটি বসেছিল—সে বলল, এখানে আর লোক কোথা পাবেন স্যর, আমিই মালটা তুলে দিচ্ছি, আমায় কিছু দিয়ে দেবেন।

তাই ঠিক হল। লোকটি কৃশকায়, সাবধানে তার মাথায় ট্রাংকটা তুলে দিল দাশরথি, এখানে আর নিজে সে মালপত্র টানাটানি করবে না।

দোতলায় সিঁড়ির কাছেই ঘর, আস্তিন-গুটানো সার্টের পকেট থেকে লম্বা চাবি বার করল সে, এক-পাল্লার দরজা। ভিতরে গিয়ে বাতির সুইচ টিপল দাশরথি, মাঝারি ঘর, ঝকঝক করছে সাদা দেওয়াল, এক কণা ধুলো নেই কোথাও, চিবুকে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে মাধুরী বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল চারদিকে, সিলিং থেকে পাখা ঝুলছে, দু'পাশে দুটি দেওয়াল-তাক, একটি স্প্রীং-এর খাট।

এখানে রাখ ট্রাংক। নির্দেশ দিল দাশরথি।

জিনিষপত্র জড়ো করা হল ঘরের মাঝখানে। ট্যাক্সী-ভাড়া আর লোকটিকে আট আনা বাড়তি দিল দাশরথি। মাধুরী পাশের ঘরে এল, একই আকারের ঘর, পাখা ঝুলছে, তারপরে ছোট এক টুকরো বারান্দা, রাস্তা দেখা যায়, নির্জন রাস্তা, গ্যাস-বাতির নরম আলো জ্বলছে, বারান্দার পাশে রান্নাঘর, স্নানের ঘর, পরিষ্কার, একটু ময়লা নেই কোথাও, সামনের ঘরে ফিরে এল সে, লোহার খাটে পা ঝুলিয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়েছে দাশরথি, চলন্ত পাখার অতি মৃদু অস্পষ্ট একটা শব্দ!

ব্যাপার কি? মাধুরী হাসছিল।

সুবিধা পেয়ে একটা ভাল বাড়িতে উঠে এলাম।

ও, কত ভাড়া?

ছাপ্পান্ন টাকা, অগ্রিম একটা পয়সাও দিতে হবে না।

কেমন করে পেলে?

রূপচাঁদকে মনে আছে? আমাদের বাড়িতে এসেছে কয়েক বার, স্কুলে পড়ত আমার সংগে, কুমড়ো ফুলের মত গায়ের রং?

তোমার কাছ রাত্ত-বিরেতে কত লোকই ত আসে, না, আমার মনে নেই।

মনে থাকবার মত চেহারা, লাল চোখ, টিয়া-নাক, অনেক দিন পরে দেখতে পেয়ে পিঠে একটা চাপড় মেরেছিলাম, এমনই স্বাস্থ্যবান লোক—পায়ের কাছে কি না ঘুরে পড়ে গেল, রাস্তার মাঝখানে এক কেলেংকারী, দশ মিনিট পরে চোখ খুলে উঠে বসল রূপচাঁদ দত্ত।

তোমার চাপড় ত। প্রাণটা বেরিয়ে যায়নি এই ঢের।

দুজনেই হাসল।

রূপচাঁদের বাবা এটর্ণী ছিলেন, অল্প বয়সে মারা যান, কিছু নগদ টাকা আর ছোটখাটো একখানা বাড়ি রেখে যেতে পেরেছিলেন ভদ্রলোক। ম্যাট্রিকটা কোনো রকমে ফেল করে আমি ছুটকে গেলাম, রূপচাঁদ বি এ পাশ করল, বাবার বন্ধু এক নাম-করা এটর্ণীর অফিসে কাজ নিল সে, ভাবলাম, যাক, বন্ধুদের মধ্যে একজনের অন্তত হিল্লে হয়ে গেল। ভদ্রলোক খুবই বিশ্বাস করতেন রূপচাঁদকে, রূপচাঁদও তার বিনিময়ে এক মক্কেলের গচ্ছিত দশ হাজার টাকা তাঁর দেরাজ থেকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল, আমার কাছে এসে হাজির, বলল, বাঁচা, পুলিশ পিছু নিয়েছে, বললাম বাঁচাতে পারি, আধাআধি বখরা করবি? বলল, রাজী।

দাশরথি আর একটা বিড়ি ধরাল, মাধুরী ততক্ষণে ট্রাংকের উপর বসেছে হাঁটুর উপর কনুই রেখে, দুই হাতের মধ্যে চিবুক ডুবিয়ে।

বললাম, মাল বার কর্। রূপচাঁদ বলল, অসুবিধা আছে, অন্তত: কয়েক মাস যাক, তোর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করব না। ছ'মাস ওকে আগলে আগলে রাখলাম, পুলিশ হাল ছেড়ে দিল, ওকে বললাম, ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি আর মোটা গোঁফ রাখ, প্যান্ট-কোটের সংগে গলায় বো'লাগা, আর—

বো কি?

সাহেবরা গলায় আটকায়, কালো প্রজাপতির মত; আর বললাম—সব সময়ে ইংরেজীতে কথা বলবি, খবরদার, ভুলেও একটি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করবি না, পুলিশ ধরতে পারবে না। তাই হল। আরও মাস দুই লাগল ভোল বদলাতে, ওর বাপও ওকে চিনতে পারত কি না সন্দেহ! জিজ্ঞেস করলাম—টাকা কোথায় রেখেছিস? জানতাম বাড়িতে ও রাখেনি, পুলিশের লোক বাড়ির সব জিনিষ তচনচ করে ফেলেছে। সন্ধ্যেবেলা একটা খারাপ পাড়ায় নিয়ে গেল। মেয়েটি ওকে দেখে আঁৎকে উঠতে যাচ্ছিল, রূপচাঁদের গলার শব্দ শুনে সামলে নিল, বলল, আ: মরণ! এ আবার কি ঢং?

মেয়েটি কেমন? মাধুরী জিজ্ঞেস করল।

দাশরথি একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, ছ'মাস পরে রূপচাঁদকে দেখে ও খুসি হয়নি, ভেবেছিল ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে নিশ্চয়, অনেক টালবাহানার পরে ব্যাংকের পাশবইটা বার করল সে, ভয়ে ভয়ে কিছু টাকা সে খরচ করে ফেলেছে, শ'-দুয়েক বেশ! কথামত তুমি আর তিনশ' পাবে, বলল রূপচাঁদ, কাল ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে রাখবে—আমি রাত্রে আসব। মেয়েটি বলল না কিছু।

রাস্তায় রূপচাঁদকে বললাম, শেষ পর্যন্ত টাকা তোমার হাতে এসে পৌঁছাবে কি না—আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। হয়ত রূপচাঁদ ঐ আশংকাই করছিল, কেন না—তার মুখ কালো হয়ে উঠেছে ততক্ষণ। কি করা যাবে? ও জিজ্ঞেস করল। পাহারা দিতে হবে—যাতে না পালিয়ে যায়, আমি বললাম।

কয়েকটা টান দিয়ে বিড়িটা ঘরের কোণায় ছুঁড়ে ফেলল দাশরথি। ব্যাংকের ঠিকানাটা দেখে নিয়েছিলাম, ঠিক দশটার সময় হাজির হলাম, রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানটায় এগারোটা পর্যন্ত দুজনে আধ ডজন করে ডিম আর পাঁচ পেয়ালা করে চা খেলাম। ঠিক এগারোটার সময় ট্যাক্সী থেকে নামল মেয়েটি, ট্যাক্সীর পিছনে ট্রাংক আর বিছানা বাঁধা, ভিতরেও কিছু টুকিটাকি জিনিষপত্র। ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে রেখে ও ব্যাংকে ঢুকল। রূপচাঁদ বলল, রাস্তায় এত লোক—ওর কাছ থেকে টাকা নেওয়া যাবে কি করে? জিনিষপত্র নিয়ে বেরিয়েছে, হয়ত ট্রেনের টিকিটটাও কাটা হয়ে গেছে; চ্যাচামেচি করে লোক জড় করবে, পুলিশ এসে পড়বে। বললাম, কিস্সু হবে না, চায়ের দামটা মিটিয়ে দে, চুপ করে বোস। মিনিট কুড়ি পরে হাতব্যাগটা বুকের কাছে চেপে ধরে ও বেরিয়ে এল ব্যাংক থেকে, ট্যাক্সী-ড্রাইভার ইতিমধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছে, নিশ্চয় ওকে মোটা বখ্‌শিসের লোভ দেখানো হয়েছে, কিংবা চেনা ট্যাক্সী; বললাম

রূপচাঁদকে—ও যেই গাড়িতে উঠে বসবে, তুই সামনের দরজা খুলে উঠে পড়বি, আমি ও-পাশের দরজা দিয়ে উঠব, আর, তাড়াহুড়ো করিস না, সব ভেস্তে যাবে ; রূপচাঁদ বলল, ও চ্যাঁচাবে, বললাম, চ্যাঁচাবে না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে রাস্তাটা পার হয়ে এল মেয়েটি। চায়ের দোকানের সামনেই দাঁড়িয়েছিল ট্যাক্সী, আমাদের সেজন্যে খানিকটা সুবিধে ছিল। গাড়িতে উঠল সে, রূপচাঁদ এক দিকে আর আমি অন্য দিকে উঠে পড়লাম ; চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল সে, বাঁ হাতে ওর মুখ চেপে ধরলাম, ডান হাতের লম্বা, ধারালো ছুরির ফলাটা ট্যাক্সী-ড্রাইভারের পিঠে ঠেকিয়ে বললাম, চালাও, নয় ত ছুরি—বলেই খোঁচা দিলাম, জামার উপর রক্তের দাগ দেখা দিল, ওকে আশ্বস্ত করলাম—ভাড়ার উপর আরও দশ টাকা পাবে, নয়ত নিমতলা। মেয়েটি পায়রার মত ছটফট করছিল, বাঁ হাতের কনুইটা ওর বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম, অসাড় হয়ে গেল সে।

ট্যাক্সী দৌড়ে চলল ; বললাম, রেস কোর্স।

রেস কোর্সের পাশে নির্জন রাস্তায় আসতে গাড়ি থামাতে বললাম, গাড়ি থামল। ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে খুলে দেখলাম—সব একশ টাকার নোট, দশ টাকার নোটের ছোট একটা বাণ্ডিল।

নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে, আমি আর রূপচাঁদ ; মেয়েটি এত হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল—তার মুখ থেকে একটিও শব্দ বের হল না ; তিনখানি একশ টাকার নোট রূপচাঁদকে দিয়ে বললাম, ওকে দে। রূপচাঁদ বলল, কি দরকার। বললাম, না, দে। রূপচাঁদ ওর কোলের উপর নোট তিনখানি ফেলে দিল ; ড্রাইভারকে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, ভাড়াটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নেবে। আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করল না সে, গাড়ি চালিয়ে দিল।

টাকাটা ভাগ করে নিলাম আমরা, সমান ভাগ। দাশরথি আর একটা বিড়ি বার করল। আস্তে আস্তে ধরাল, আস্তে আস্তে কয়েকটি টান দিল।

মাধুরী জিজ্ঞেস করল, অতগুলো টাকা গেল কোথায়?

দাশরথি হাসল, টাকা আবার থাকে না কি? সেই রূপচাঁদ এই ফ্ল্যাটটি জোগাড় করে দিয়েছে, চার তলায় থাকে, বিয়ে করেছে, গোটা কয়েক ছেলে-মেয়ে আছে ; হয়ত খুবই মুস্কিলে আছে, না হলে আমাকে আর স্মরণ করবে কেন? চাল-ডাল আছে? একটা-দুটো দিন চালিয়ে নিতে পারবে?

ট্রাংক ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মাধুরী, তা চালিয়ে দেয়া যাবে, বলল সে, কিন্তু তারপর কি করবে? তুমিই বা কি এমন কম মুস্কিলে পড়েছ?

দাশরথি দাঁড়িয়ে পড়ল, যাই, ভদ্রমহিলার সংগে দেখা করে আসি।

কোন্ ভদ্রমহিলা?

যাঁর বাড়ি, তিন তলায় থাকেন।

বন্ধ দরজায় টোকা দিল দাশরথি। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, একটি মধ্যবয়স্কা রমণী দরজাটা খুলে দিল, প্রথম যেদিন সে কথাবার্ত্তা পাকা করতে এসেছিল—সেদিন একে দেখেনি।

সামনের ঘরটা বসবার, পুরু গালিচা পাতা, নরম গদি-আঁটা এক সেট সোফা, রেডিও আর দুটি বই-এর আলমারি।

আপনি বসুন। কি নাম বলব?

দাশরথি, দোতলার একটা ঘরে ভাড়া এলাম আজ।

হয়ত ঝি, কিংবা সেবিকা, কিংবা দেখাশুনো করবার লোক পুরু পর্দা সরিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকল সে, দাশরথি বসল সোফা মধ্যে গা ডুবিয়ে।

এক মিনিট পরে প্রৌঢ়া আবার এল, আসুন, ওঁর শরীরটা ভা নেই।

পাশের ঘরে এল দাশরথি।

বড় পালংকের উপর বালিশে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছিল মিসেস চৌধুরী, কোমর পর্যন্ত কাশ্মীরী শালে ঢাকা, নক্সা দেখে দাশরথির মনে হল অন্তত হাজার টাকা দাম হবে শালের।

দাশরথি নমস্কার করল।

নমস্কার ফিরিয়ে দিল না মিসেস চৌধুরী, বলল, ও আপনি? বসুন চেয়ারটায়।

এত মিহি আর এত মৃদু গলার স্বর দাশরথি আগে কোনো দিন শোনেনি। চেয়ারে বসল সে, মাটিতে পুরু গালিচা পাতা।

অলকার মা, আমায় এক গ্লাস জল দাও, চা খাবেন? বা অন্য কিছু?

না, বলল দাশরথি, আমার দরকার নেই কিছু!

রান্নাঘর, স্নানের ঘরে যাবার মাঝখানের দরজায় তেমনি পর্দা খাটানো।

অলকার মা ঘরের কোণ থেকেই জল নিয়ে এল, প্লেটের উপর জলের গ্লাস।

অর্দ্ধেক জল অতি ধীরে ধীরে পান করল মিসেস চৌধুরী, দাশরথি লক্ষ্য করল, গ্লাসের মধ্যে জলের ভিতর মিসেস চৌধুরীর দাঁত দেখা গেল না।

গ্লাসটা ফেরত দিয়ে তেমনি মিহি গলায় বলল, আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না কয়েক দিন ধরে, সামান্য একটু জ্বরও হচ্ছে বোধ হয়। তা—আপনার ঘর পছন্দ হয়েছে ত?

দাশরথি ঘাড় নাড়ল।

মিসেস চৌধুরী দেখতে লাগল তাকে।

দাশরথি চোখ ফিরিয়ে নিল, ঘরের মধ্যে একটা কাচের, আর একটা লোহার আলমারী, ড্রেসিং টেবিল, আর দেয়ালের অন্য দিকে একটা সিন্দুক। সিন্দুকটা মজবুত, ভারি, নূতন।

আপনি ত খুব লম্বা-চওড়া আর জোয়ান লোক, দাশরথি বাবু! এমন ত দেখিনি কখনও। একটু হাসল মিসেস, দাঁতগুলি বাঁধানো কি না বোঝা গেল না।

দাশরথি মুখ ফিরাল, বলল, যদি জ্বর হয়, ডাক্তার দেখানো উচিত।

ষাট বছরের কম নয় মিসেস চৌধুরীর বয়স ; ভাবল দাশরথি, কনুই পর্যন্ত সাদা জামার হাতা, উঁচু গলায় লেশ লাগানো, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল, ভাল করে দেখলে কিছু সাদা চুল নজরে পড়ে। পাতলা, লম্বা গড়ন ; ফর্সা রঙ, বড় চোখ আর উঁচু নাক।

ডাক্তার? হ্যাঁ, দেখাব, দু'-একটা দিন দেখি। রূপচাঁদ বাবু

বলছিলেন আপনার কথা, আপনারা নাকি ছেলেবেলাকার বন্ধু, উনি ত প্রায়ই আসেন, খোঁজ খবর নিয়ে যান, অলকার মা ঠিক আটটার সময় রাত্রির খাবারটা নিয়ে আসবে, সাড়ে আটটার সময় ও চলে যাবে, তারপর—এই এত বড় বাড়ি, তেইশখানা ফ্ল্যাটে প্রায় দু' হাজার লোক, আর আমি একা, ভয়ানক একা। সেই সতেরো বছর আগে—যেদিন আমার স্বামী মারা যান—সেদিন থেকে আমি একা। কেমন যেন চোখ ছলছল করে উঠল মিসেস চৌধুরীর, সিন্দুকটার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

আমি উঠলাম। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল দাশরথি।

না, বসুন। বালিশ থেকে মাথাটা সোজা করল মিসেস চৌধুরী। অনুরোধ নিশ্চয়ই নয়, এমন কি আদেশও নয়।

দাশরথি আবার বসল চেয়ারে।

মিসেস চৌধুরী হাসতে লাগল, প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে। দাশরথির মনে হল অনেক দূর থেকে মুরগীর ডাক শুনতে পাচ্ছে সে। হাসির ধাক্কায় ওর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। খোঁপার নিচে ঘাড়ের প্রান্তটা হঠাৎ মনে হয় কোনো কিশোরী মেয়ের ঘাড়, মুখ তুলে দাশরথির মুখের উপর চোখ রাখল সে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক আর অদ্ভুত সে-দৃষ্টি, কঠিন, নির্মম, মমতাহীন, —আমাকে সবাই ঘৃণা করে।

তেমনি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল মিসেস চৌধুরী—দাশরথির মুখ দেখে বুঝবার চেষ্টা করল কথাগুলি কোনো প্রভাব ঘটাতে পারল কি না, কিন্তু কোনোই ভাবান্তর দেখা গেল না তার মুখে!

কেন সবাই আপনাকে ঘৃণা করবে?

কেন? বহুদূর থেকে আবার সেই মুরগী ডেকে উঠল যেন, আমার টাকা, আমার মত অপদার্থ, নিষ্কর্মা লোকের এত টাকা থাকবে কেন? কোন্ অধিকারে?

অলকার মা ঘরে ঢুকল, আটটা বাজল, আপনার খাবার দেব?

হ্যাঁ, তৈরী কর!

এমন কি আমি, ফিস-ফিস করে বলল, মিসেস চৌধুরী, আমি জানি ঐ অলকার মা-ও আমায় ঘৃণা করে, যদি কোনো দিন সুযোগ পাই ত আমাকে খুন করে টাকাকড়ি জিনিষপত্র নিয়ে পালাবে, কে আমাকে দেখবার আছে? যেন ভয়ানক এক বিশ্বস্ত লোকের কাছে নিতান্ত গোপনীয় কথা প্রকাশ করছে—তার মুখে এমনি ষড়যন্ত্রের হাসি ফুটে উঠল, আরও গলা নামিয়ে বলল, একটু অপেক্ষা করুন, ও আমার খাবার নিয়ে আসুক, মজা দেখতে পাবেন।

কি মজা?

খাবারের সঙ্গে সংগে একটা বেড়াল আসবে, আলাদা বাটিতে আগে বেড়ালটাকে খেতে দেব, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে দেখব বেড়ালটা মরে কি না।

অলকার মা খাবারের থালা নিয়ে এল, অনেকগুলি বাটি থালার উপর সাজানো। ওর পায়ে-পায়ে ঘরে এসে ঢুকল মোটাসোটা সাদা একটি বিড়াল।

আমি তাহলে উঠি?

আসুন, আবার আসবেন, কেমন ? ফাজিল মেয়ের মত হাসল মিসেস চৌধুরী।

লোহার খাটে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল রূপচাঁদ, দরজার ওপাশ থেকে রান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কি রে! ছিলি কোথায় এতক্ষণ ? তেমনি পাতলা আর হালকা চেহারা, পিছনে উল্টানো চুল, টিয়া-নাক।

রাস্তায়। বলল দাশরথি।

তবে যে তোর বৌ বলল, বাড়িউলীর সংগে দেখা করতে গেছিস ?

গিয়েছিলাম, দেখা হল না, ঝি না কে একজন বলল শরীর খারাপ, শুয়ে পড়েছে।

আসলে দেখা করবার মতলব নেই, বুঝলি ? শরীর খারাপ, না হাতি, অমন সব সময়েই বলে, কাছে ঘেঁসিস না, সাংঘাতিক মেয়েমানুষ!

তোর সংগে আলাপ হয়েছে ?

মাথা খারাপ!

তবে এত খবর জানলি কেমন করে ?

দুনিয়ার লোক জানে। রূপচাঁদ সিগারেটের প্যাকেট বার করল, খুবই সস্তা সিগারেট, সিল্কের জামাটা কয়েক জায়গায় সেলাই-করা, ধুতিটা অপরিষ্কার, দেখে মনে হয়, সপ্তা দুয়েক খুব যত্ন করে পরছে, জুতোজোড়া নিতান্তই মেরামতের প্রয়োজন। চোখে-মুখে ক্ষুধা আর ক্লান্তির ছাপ। নে, সিগারেট খা।

না, বিড়ি আছে। ব্যাপার কি ?

কিসের ব্যাপার ?

হঠাৎ এই অসময়ে নিয়ে এলি কেন ?

তুই কাছে থাকলে ভরসা পাই।

দাশরথি বিড়িটা ধরাল।

পরদিনই সাড়ে আটটার পর দাশরথি নিঃশব্দে তিন তলায় এল।

মিসেস চৌধুরীর ঘরের দরজা বন্ধ, আস্তে আস্তে দরজায় ঠেলা দিল সে, দরজাটা খুলে গেল, ঘরটা অন্ধকার, ওপাশের পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে; রূপচাঁদের গলার শব্দ শুনতে পেল সে, আর খুব চাপা-গলায় মুরগী ডাকছে। দাশরথি বেরিয়ে এল, দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

দুদিন পরে সাড়ে আটটার পর সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়েছিল দাশরথি, গোটা তিনেক বিড়ি শেষ করে আর একটা ধরাবে কি না ভাবছিল, অলকার মা তাকে দেখে আঁচলটা কপাল পর্যন্ত টেনে দিল।

ঘরে কেউ আছে না কি ? জিজ্ঞেস করল দাশরথি।

না, কেউ নেই ত ?

দ্বিতীয় বার না তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল অলকার মা।

দাশরথি উপরে উঠে এল। দরজাটা ঠেলে দেখল, বন্ধ। টোকা দিল সে।

খুট করে চাবি ঘুরাবার শব্দ হল।

মিসেস চৌধুরীর পরনে লম্বা কালো সিল্কের কিমোনো, বাঁ দিকে বুকের উপর নক্সাকরা লাল ড্রাগন থাবা উঁচিয়ে রয়েছে, কিমোনোর লম্বা পকেটে হাত দুটি ঢুকানো। কেন ? দাশরথি ভাবল, কেন ? হাতের মুঠোয় কি আছে ?

এক টুকরো মধুর হাসি উপহার দিল মিসেস চৌধুরী, আসুন, আমি ভেবেছিলাম রূপচাঁদ বাবু, তিনি প্রায়ই আসেন, আসুন।

মিসেস চৌধুরী এক পাশে সরে দাঁড়াল, দাশরথি ঢুকল ঘরে।

আপনি যান আমার ঘরে, আমি আসছি দরজা বন্ধ করে, বাতি নিবিয়ে, রেডিওটা খুলে দেব না কি ?

না। দাশরথি ওর পাশ কাটিয়ে অন্য ঘরে ঢুকল, তার অর্থ কারুকে পিছনে থাকতে দেবে না মিসেস চৌধুরী।

চেয়ারে বসবার আগেই হাত বাড়িয়ে বালিশ দুটি উঁচু করে দেখল দাশরথি, বালিশের নিচেই চাবির রিঙে আধ ডজন চাবি; বসল সে।

মিসেস চৌধুরী ঘরে এল, খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসল, রূপচাঁদ বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন আপনি আসেন কি না। একটা পা তেরচা করে ছড়িয়ে দিল, কিমোনোর নিচে আর কিছু নেই, কোমরের কাছে লাল রেশমের দড়ি দিয়ে বাঁধা, উরুর খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে, স্পষ্ট, মসৃণ, দুধ-গোলাপী চামড়া; দাশরথি চোখ ফিরিয়ে নিল।

খাটের উপর উঠে বসল মিসেস চৌধুরী, পা ছড়িয়ে; দাশরথি তখনও চোখ ফেরায়নি। কিমোনোর পকেট থেকে হাত বার করে বালিশের নিচে একবার মাত্র ঢুকাল সে।

ধন্যবাদ, আপনি যে এলেন! বলল মিসেস চৌধুরী, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ত ?

কিছু না।

আপনার যদি অভ্যাস থাকে আপনি স্বচ্ছন্দে ধূমপান করতে পারেন, আমার কোনো আপত্তি নেই, গন্ধটা আমার ভালই লাগে। জানেন ? মিসেস চৌধুরীর গলায় কাল্পনিক ষড়যন্ত্রের আভাস, আমি কিন্তু লুকিয়ে দু-একটা সিগারেট খাই, কারুকে বলবেন না যেন। বলবেন না ত ?

না বলব না।

আমি জানি আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি।

দাশরথি সোজা হয়ে বসল, ফতুয়ার পকেটে লম্বাফলা ধারালো ছুরিটা বুকের কাছে ঠেকছে বার বার, চকিতে একবার তাকাল সে। ড্রাগনের নিচে স্খলিত স্তন, তার নিচে দুটো হাড়ের মাঝখান দিয়ে সোয়া দু'ইঞ্চি ছুরির ফলা ঢুকিয়ে দিলেই হৃৎপিণ্ড।

কিন্তু—

আপনার ঘুমোবার সময় হল বোধ হয় ?

না, আমি শুই সেই দশটায়, বসুন না আপনি, আপনি চলে গেলে ঐ যে সিন্দুকের ওপর বই দেখছেন একখানা নিয়ে পড়ব, জানেন ? ওর মুখে সেই ফাজিল মেয়ের হাসি। বইগুলো কিন্তু ভালো নয়।

ড্রাগনটা হাঁ করে আছে, লক্ষ্য ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, শার্টের নিচে গা চুলকাবার ভাণ করে ছোরার বাঁটটি স্পর্শ করল সে।

কিন্তু—

আপনার আর জ্বর আসেনি ত ?

একটু-আধটু জ্বর হলেই বা কি এসে-যায়। ও-সব কিছু নয়, বুঝলেন ? সব চাইতে বিস্ময়কর হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কিসে—কোন রোগে আমার মৃত্যু হবে, মজা হচ্ছে কোনো মানুষই তা আন্দাজ করতে

পারে না, আপনি আন্দাজ করতে পারেন, কিসে আপনার মৃত্যু হবে? উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল মিসেস চৌধুরী

না, পারি না। ছোরার বাঁটটা শক্ত করে ধরল সে।

কি হল? আপনার জামার নিচে পোকা ঢুকেছে না কি?

নাঃ। হাত বার করে আনল দাশরথি।

কালো রেশমের ওপর লাল রক্তের দাগটা কেমন দেখাবে ভাববার চেষ্টা করল সে। মৃদু একটা সুরভি দাশরথির নাকে লাগছিল, বিছানায় কিংবা কিমোনোয় ছিটানো কোনো সুগন্ধ হবে। না, কোনো মানুষই জানে না, কেমন করে তার মৃত্যু ঘটবে।

কিন্তু—

না, প্রয়োজন সত্ত্বেও দাশরথি কোনো দিন ছোরা বসাতে পারেনি; হয়ত প্রয়োজন তেমন জরুরি ছিল না, কিন্তু তার ব্যতিক্রম হবে না—এমন কোনো যুক্তি নেই; ছোট্ট একটা কাঁধ-ঝাঁকুনী দিল সে, সহজ; পাঁচ মিনিটের ব্যাপার।

কি হল? গরম লাগছে? পাখাটা চালিয়ে দেবেন না কি?

না, গরম লাগছে না। বলল দাশরথি।

ছুরির দরকার কি? অযথা রক্তপাত; কে জানে হয়ত ছিটকে গিয়ে তার হাতে জামায় রক্ত লেগে যেতে পারে। ছুরির ইস্পাতের চাইতেও শক্ত আঙুল তার, চামড়ায় কালচে-নীল দাগ পড়বে ঠিকই, আঙুলের চিহ্ন পড়বে না।

কিন্তু—

অলকার মা-কে রাত্রে এখানে থাকতে বললেই ত পারেন, একেবারে একা।

মিসেস চৌধুরী পেটের উপর রেশমের দড়িটা নাড়াচাড়া করতে লাগল, বিশ্বাস কি?

পায়ের কাছে বালিশটার উপর চোখ পড়ল তার, আরও সোজা, বালিশটা মুখের উপর জোরে চেপে ধরা আরও সোজা; মৃত্যুর, মৃত্যুর কোনোই বীভৎস চিহ্ন থাকবে না শরীরে, শান্ত মরণ, সুখের মরণ, শুয়ে শুয়ে হঠাৎ হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া, ছোটো টেবিলের উপর টাইমপীস্ ঘড়িটার দিকে তাকাল দাশরথি, ন'টা সতেরো; ন'টা কুড়িতেই—আর তিন মিনিট পরে।

আপনার কি কেউ-ই নেই, আপনজন কেউ—এত বড় বাড়ি, এত টাকা!

আত্মীয়ের অভাব কি? তারা সব ওঁৎ পেতে আছে—আমার মৃত্যুর জন্যে, আমার টাকার জন্যে—

চুপচাপ। মৃদু টিকটিক শব্দ শুধু।

অনেকে আমাকে উপদেশ দেয় উইল করতে, এমন কি আমার এটর্ণী পর্যন্ত। কেন আমি উইল করব? কাকে দিয়ে যাব আমার টাকা? তা ছাড়া—মিসেস চৌধুরী নিঃশব্দে হাসছিল আমি এখন মৃত্যুর কথা একেবারেই ভাবছি না।

দাশরথি ঘড়ির দিকে তাকাল আর বালিশের দিকে।

নাঃ, কেন আপনি মৃত্যুর কথা ভাবেন অযথা মৃত্যু ত একদিন আসবেই, আজ কিংবা কাল, কিংবা দশ বছর পরে একদিন, আগে থাকতে সে-কথা ভেবে মনকে কাতর করার কোনোই অর্থ হয় না।

দাশরথি বিস্মিত হল, মুগ্ধ হল; এমন ভাল কথা সে কখনো আগে বলেনি। ঠিক ন'টা কুড়ি।

মিসেস চৌধুরী হাত বাড়িয়ে বালিশটা নিয়ে ঘাড়ের নিচে রাখল। আর আরামে চোখ বুজল এক মুহূর্তের জন্যে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল দাশরথি, আচ্ছা, আমি যাই, তাহলে?

যাবেন? আচ্ছা আসুন, আবার আসবেন।

দাশরথি বাইরের ঘরে এল পর্দা সরিয়ে, এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, গোল পিতলের হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল।

গোটা কয়েক টাকার নিতান্তই দরকার ছিল, তাই সন্ধ্যেবেলা বেরুতে হয়েছিল দাশরথিকে। ফিরতে ন'টা বেজে গেল। রাত্রির খাওয়াটা শেষ করে মাটিতে মাদুর পেতে শুয়েছিল দাশরথি—পাখাটা চালিয়ে দিয়ে। মাধুরী খেতে বসেছে। না, কিছুই জোগাড় হয়নি, একটি টাকাও নয়, মাধুরী বলেছে সকালবেলার চাল নেই; সে-জন্যে ভাবনা করছে না সে, টাকা তার আসবেই—যেখান থেকে হোক; হাতে যাদের টাকা আসে না—দাশরথি সে দলভুক্ত নয়। চোখ বুজল সে; দু'হাজার লোকের কলরব স্তব্ধ হয়ে আসছে! সাড়ে দশটা বাজে হয়ত; কলতলায় বাসন ক'টা ধুয়ে নিচ্ছে মাধুরী।

দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দে উঠে বসল দাশরথি। চঞ্চল ক্ষিপ্র আঘাত।

দরজাটা খুলে দেবার আগেই আবার সেই শব্দ!

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মিসেস চৌধুরী; সেই কিমোনো, ড্যাগনটা হাঁ করে রয়েছে! পায়ে লাল ভেলভেটের চটি; বিশৃংখল মাথার চুল।

আসুন, আমার সংগে।

দাশরথি আর একবার তাকাল, অস্বাভাবিক উজ্জল চোখ, দ্রুত নিঃশ্বাসের সংগে বুক উঠছে-নামছে। জামাটা গায়ে দেব না?

দরকার নেই! মাথাটা পিছন দিকে ঝাঁকুনী দিয়ে হেসে উঠল মিসেস চৌধুরী, দাশরথির বুকের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত একবার চোখে বুলিয়ে নিল, যান। সিঁড়ি দেখিয়ে দিল সে।

দাশরথি উপরে উঠে এল, পিছনে মিসেস চৌধুরী।

দরজায় চাবি ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, আমার ঘরে যান।

একটা বালিশ মাটিতে পড়ে আছে, বিছানার চাদরটি কুঁচকানো।

বসুন।

দাশরথি বসল না; চেয়ারটাও ঠিক জায়গায় নেই।

মিসেস চৌধুরী বসল খাটের উপর, পা তোলবার সময় হাঁটুর নিচে কিমোনো নেমে গেল; বালিশে হেলান দিয়ে কিমোনোর প্রান্ত টেনে দিল পায়ের উপর, জিজ্ঞেস করল, সিগারেট আছে না কি?

ব্যাপারটা কি? দাশরথি জোরে নিঃশ্বাস টানল কয়েকবার, ঘরের বাতাসে বারুদের মৃদু গন্ধ! আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার নজর পড়ল টিপয়ের নিচে এক পাটি জুতো।

কি ব্যাপার? মিসেস চৌধুরী জোরে হেসে উঠল, সমস্ত শরীরটা তার কাঁপছে। হাসি থামিয়ে বলল, দেখুন না খাটের নিচে!

নিচু হয়ে দেখল দাশরথি। দুখানি পা দেখা গেল প্রথমে, তারপর অস্পষ্ট অন্ধকারে সম্পূর্ণ দেহটা। পা ধরে টেনে বার করল দাশরথি, গলার কাছে হাত দিয়ে অনুভব করল, প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে শরীর। সেই তালিমারা সিল্কের পাঞ্জাবী, সেই কালো-পাড় তাঁতের ধুতি, বুকের বাঁ দিক থেকে তখনও রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, ঘন হয়ে এসেছে প্রায়।

হি হি হি হি···

দাশরথি চেয়ারটার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি জানি ও মতলব নিয়ে আসত, মাথায় ওর ফন্দি ঘুরছে; পাখাটা চালিয়ে দিন।

এটা হত্যা—বলল দাশরথি।

আমাকে শেখাবেন না। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ও কি করল জানেন?

শুনছি; কি?

ঐ যে বালিশটা দেখছেন! ঐ বালিশটা চেপে ধরল আমার মুখের উপর; আর দু সেকেণ্ড হলে আমিই ঠিক অমনি করে পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতাম, রক্ত অবশ্য দেখা যেত না; আর—সিন্দুকের চাবিটাও বালিশের নিচেই ছিল, লোকে বলত—বুড়ো মানুষ হার্ট ফেল করে মারা গেছে, চমৎকার! না? ঠিক সময় মত দুহাতে একটা ধাক্কা দিতে পেরেছিলাম, তবেই না? দ্বিতীয় বার আক্রমণ করবার সময় আর ওকে দিইনি, এই যে। বালিশের তলায় হাত দিয়ে মিসেস চৌধুরী ছোট খেলনার মত একটা পিস্তল বার করল, উঁচিয়ে ধরল নলটা দাশরথির বুকের উপর লক্ষ্য করে, একটা গুলীই যথেষ্ট জানি—কোথায় গুলী ছুঁড়তে হয়, সোডার বোতলের ছিপি খোলার মত একটা শব্দ হবে মাত্র, সাইলেন্সার লাগানো আছে, দেখবেন? মিসেস চৌধুরীর অস্বাভাবিক, উন্মুক্ত চোখের দৃষ্টি যেন দু টুকরো জ্বলন্ত কাঠ-কয়লা।

ওটা সরান এখান থেকে! মিসেস চৌধুরী পিস্তলের নল দিয়ে দেহটা দেখিয়ে দিল।

দাম লাগবে। বলল দাশরথি।

পাঁচ?

না, পাঁচে হবে না।

কত?

দশ। হাজার টাকার নোট নেব না।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে মিসেস চৌধুরী বলল, রাজি।

চাবিটা নিয়ে সিন্দুকের কাছে গেল সে, লম্বা চাবি ঢুকিয়ে সিন্দুকের ডালা খুলল, ভিতরে আরও খোপ, আবার চাবির শব্দ হল, ড্রয়ারের মৃদু ঘড়ঘড় আওয়াজ, আড়চোখে দাশরথির দিকে তাকিয়ে কয়েক তাড়া নোট পরীক্ষা করে বলল, হবে। পিস্তলটা মাটি থেকে তুলে বিছানায় ফিরে এল সে।

এখন এগারোটা, দাশরথি বলল, বারোটার সময় আমি আসব। দুটো পা ধরে দেহটাকে আবার খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিল দাশরথি, তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বারোটার সময় আবার দরজায় টোকা দিল সে।

ভিতর থেকে মিহি গলার প্রশ্ন হল, কে?

দাশরথি বুঝতে পারল, মিসেস চৌধুরী দরজার ও-পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল।

দরজা খুলুন! দরজার উপর মুখ রেখে চাপাগলায় বলল দাশরথি।

ভিতরে ঢুকে দাশরথি দরজা ভেজিয়ে দিল, বাইরের ঘরে বাতি জ্বালা হয়নি, অস্পষ্ট অন্ধকারে মিসেস-এর হাতে পিস্তলটা চকচক করে উঠল। পর্দা সরিয়ে ওপাশের ঘরে গেল সে, পিছনে দাশরথি।

নিন।

নোটের তাড়াটা হাতে নিয়ে দাশরথি বুঝতে পারল গুণে দেখবার দরকার নেই, ফিতে দিয়ে বাঁধা একশ খানি একশ' টাকার নোট, ফতুয়ার পকেটে ঢুকিয়ে রাখল। পা ধরে টেনে বার করল রূপচাঁদের মৃতদেহ, কাঁধের উপর তুলে নিল, পর্দা সরিয়ে বাইরের ঘর, তারপর অন্ধকার সিঁড়ি; পিছনে চাবি ঘুরাবার শব্দ।

একতলায় সিঁড়ির নিচে নামিয়ে রাখল দেহটা, এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল, একেবারে নির্জন পথ, গ্যাস-বাতি জ্বলছে।

আধ ঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর একটা রিক্সা পাওয়া গেল, দাশরথি বলল, রেল-লাইনের ধারে যেতে হবে।

রিক্সাওয়ালা বলল, রাত হয়ে গেছে, আট আনা লাগবে।

তা দেব, কিন্তু কাছেই বাড়িতে এক মাতোয়ালা বাবু আছে, বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, তাকে নিয়ে যেতে হবে।

চার আনা বেশী লাগবে।

দাশরথি উঠে বসল। রিক্সা থামিয়ে দাশরথি বাড়ির ভিতরে ঢুকল।

এবারে আর ঘাড়ে তুলল না, পিঠের নিচে হাত দিয়ে সোজা করে টানতে টানতে নিয়ে এল রিক্সার কাছে, বলল, রিক্সা এনেছি, ওঠ ওঠ।

ওকে নিয়ে রিক্সার উঠে পড়ল, পাশে বসিয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরল দেহটা, বাহুর উপর ঢলে পড়ল মাথা।

লাইনের কিছু দূরে রিক্সা থামিয়ে নেমে পড়ল দাশরথি, ভাড়া মিটিয়ে দিল ; তার কোলের মধ্যে রূপচাঁদের মৃতদেহ, বলল, তুমি যাও।

যাবার আগে রিক্সাওয়ালা আর একবার তাকাল, এমন দৃশ্য হয়ত সে আগে কখনও দেখেনি !

কোল থেকে কাঁধে তুলে নিল সে দেহটা, উঁচু-নিচু কাঁকর-ছড়ানো পথ দিয়ে রেল-লাইনের উপর উঠে এল, দেহটাকে শুইয়ে দিল লাইনের উপর, যেন বুকের উপর দিয়ে চাকাগুলি যায়, ঠিক একটায় একখানি গাড়ি যাবে।

মাঝ-রাত্রে ড্রাইভার সতর্ক থাকে না, সতর্ক থাকবার কথা নয়। হয়ত ট্রেণ থামিয়ে ফেলতে পারে, বলা যায় ; কিন্তু আপাততঃ এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা কি আর হতে পারে! দাশরথি নেমে এল, রাস্তা পার হয়ে বড় অশ্বত্থ গাছটার পিছনে দাঁড়াল সে ; একটা বিড়ি ধরাল, রাস্তার উপর হেড লাইটের আলো পড়তে একটু ঘুরে দাঁড়াল সে, রাত-পুলিশের গাড়ি দৌড়ে গেল।

একটা বিড়ি শেষ করে আর একটা বিড়ি ধরাল দাশরথি, যদি ট্রেণ থামে, পুলিশে খবর যাবে, গুলীতে মারা গেছে, পিস্তলের খোঁজ পড়বে।

মেঘের আওয়াজের মত গুড়-গুড় শব্দ হল, ট্রেণ আসছে, এ লাইনে এটিই শেষ ট্রেণ, সার্চ-লাইটের আলো দেখা গেল, ইঞ্জিন, তারপর কামরার আলো।

না, ট্রেণ থামল না। সামান্য একটা শব্দের জন্যে কান পেতে ছিল দাশরথি, তা-ও শোনা গেল না।

আর একটা বিড়ি ধরিয়ে আস্তে, আস্তে, বাড়ির পথ ধরল দাশরথি।

# রাজধানীর পথে পথে

উমা দেবী

## গির্জা, মোরগ ও মেঘ

গির্জার উঁচু চূড়া নভস্পর্শী হ'য়ে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে
ঈশ্বরের একটি শান্ত আদেশের মত।
বসন্তে যখন আমের গাছগুলি সুরভি মুকুলে ভরে ওঠে
ক্ষুদে ক্ষুদে মৌমাছিরা—ডাল নাড়া দিলে—
ঝিরঝিরে বৃষ্টির দানার মতন ঝরে পড়ে
ফিকে সবুজ মুকুলরেণুর সঙ্গে সঙ্গে—
আর দক্ষিণের বাতাসের সৌরভে মদির হয়ে ওঠে চার পাশ
তখনও সে গির্জার উঁচু চূড়া দাঁড়িয়ে থাকে শান্ত হয়ে
ঈশ্বরের একটি অবিচল আদেশের মত।

যেদিন নামে বর্ষা—
ধোঁয়ার মতন মেঘে মেঘে দম-বন্ধ-হওয়া আকাশ থমথম করে
তখন থেকে থেকে বিদ্যুতের লেলিহান অগ্নিজিহ্বা যেন
লেহন ক'রে যায় তার চূড়ার অটলতাকে—
হাঁকতে থাকে বজ্র—হানতে থাকে ঝঞ্ঝা—
অজস্র বর্ষণের ধারাহত চূড়া
শরাহত—শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত তবু থাকে অবিচল হ'য়ে
যেন সে ঈশ্বরের একটি কঠোর ও প্রশান্ত আদেশ।

আজকে সকাল গড়িয়ে দুপুর কেটে এল বৈকাল—
গির্জার প্রাঙ্গণে সবুজ তৃণগুচ্ছে জ্বলতে লাগল নববর্ষার বৃষ্টিবিন্দু—
শেষ সূর্যের তির্যক কিরণে
এমন সময়ে ছুটে এল কোথা থেকে কয়েকটি মোরগ
তাদের উদ্ধত লাল ঝুঁটি কাঁপিয়ে
ল্যাজের লম্বা পালকেরকোমলতায় বাতাসের রোমাঞ্চ জাগিয়ে
বাদলার পূবে হাওয়াকে চিরে চিরে ডেকে উঠল তীব্র তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বরে—

এক—দুই—তিন—চার—পর পর অনেকগুলি—
প্রতিধ্বনিত হল তাদের উল্লাস গির্জার প্রশস্ত হলে পবিত্র বেদীতে,
তারা ডেকে উঠল অনেকেই—ঘাড় বাঁকিয়ে—পিঠ ঝাঁকিয়ে
আধ-বোজা চোখে—গির্জার পবিত্র প্রাঙ্গণে—
যার চূড়া এত কাল শান্ত হয়ে ছিল ঈশ্বরের অমোঘ আদেশের মত।

কিন্তু যে নভ এত কাল তাকে আশ্রয় দিয়েছে
সে আজকের বৈকালীন আসরে
সেই ডাক শুনে হঠাৎ যেন লাল হ'য়ে উঠল—
কাঁপা-কাঁপা মেঘে মেঘে আবীররেণু ছড়িয়ে গেল
ছড়িয়ে পড়ল মোরগের লাল ঝুঁটিতে ঝকঝকে চুনির চূর্ণের মতন।

মোরগেরা ডাকতে লাগল—এক দুই তিন একসঙ্গে অনেকগুলো—
লাল মেঘ সোনালি মেঘে ডুবে গেল—
সোনালি ডুবল বাদামী, সবুজ ও বেগুনিতে—
সেই আকাশ কত রঙ ফেরাতে লাগল—
সেই লাল ঝুঁটি-ওলা মোরগের ডাকের সঙ্গে মিল রেখে রেখে ;
সব শেষ ডাক থামার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রঙ শান্ত হয়ে এল
একটি গোলাপি রঙের মেঘে।

সেই গোলাপি মেঘ স্পর্শ করে রইল গির্জার চূড়োকে—
ঈশ্বরের একটি সুন্দর প্রতিজ্ঞার মতন—
—হৃদয়ের একটি রঙিন আশ্বাসের মতন—
যা আদেশ নয়—বিধান নয়—বিধি-নিষেধ নয়—কিছু নয়
শুধু মানুষের আশা সেখানে নভস্পর্শী হয়েও মাটিতে ছুঁয়ে আছে
ঐ গির্জার চূড়ায় লেগে-থাকা সোনালি মেঘের মতন—
—হৃদয়ের গোলাপি নেশার মতন।

**মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য**

আরিজোনার আবছা সবুজ ঘরে বসে ক্ষৌণীশ সেনের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ললিতা মিত্রের মাথার ভেতরে পোকার মতো কুরে কুরে মরে কতকগুলো কথার ক্লান্তি। তেল-মাখানো একটা লাঠি ধরে একটা বাঁদর দশ হাত উঠছে আর তিন হাত পড়ে যাচ্ছে। অঙ্কটা দেখাতে এসেছিলো ভাইপো সকালে। তখনি বিশ্রী লেগেছিলো। এখন সারাদিন পোষ্ট-টেলিগ্রাফে অডিট করে এসে তেলতেলে মুখে অপেক্ষা করা কি যে ক্লান্তিকর অনুভূতি! আবার এখনো মনে পড়লো সেই অঙ্কটার কথা। সব রকম সক্রিয় প্রচেষ্টার সমাধি যেন রচনা করেছে অঙ্কটা। উঠতে পারে দশ হাত, আবার তিন হাত পিছলে পড়ে যাবে বাঁদরটা। আবার উঠবে। আবার পড়ে যাবে। এমনি করে হয়তো এক দিন উঠবে লাঠিটার ডগায়। তখন আর ওঠবার কোন মানেই থাকবে না। এই যেমন উপমা টানতে ভয় পেলেও একটা আত্মনিপীড়নের বিশ্রী মজাও অনুভব করলো ললিতা। এই যেমন উনিশে এপ্রিল ক্ষৌণীশের জন্মদিন। উনিশ বছর ধরে এই তারিখটি পালন করছে ললিতা। এমনি ক'রে এসে কোনো চা-এর দোকানে বসা। সাহিত্য, সংস্কৃতি বা রাজনীতি নিয়ে স্বল্প কথায় আলোচনা শেষ ক'রে উপহারটি দেওয়া। এমনি ক'রে ললিতার জীবনে সাঁইত্রিশটা বছর এলো।

চল্লিশ বছর বয়সটা কিছু নয়। অন্ততঃ ক্ষৌণীশকে ঢুকতে দেখে তাই মনে হলো ললিতার। ক্ষৌণীশ বিদ্বান, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, স্বীকৃতি-প্রাপ্ত। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করবার স্বীকৃতিস্বরূপ হাজার টাকা মাসে মাসে পাচ্ছে সে দেশ থেকে। তার ফ্ল্যাটে পশ্চিমের বিদ্বানরা চা, কফি অথবা ডিনার খেয়ে থাকেন। এত পেয়েছে বলে ক্ষৌণীশ এমন ঝরঝরে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়েও সপ্রতিভ। ললিতাকে দেখে সঙ্গের মেয়েটিকে সে নিচু গলায় বললো—উনিই হচ্ছেন আমার সেই ভক্ত পাঠিকা। জন্মদিনটায় ওঁর নিমন্ত্রণ না রাখলে বড় দুঃখ পান।

মেয়েটি হাসলো। বললো,—আমি টিকিট করতে চললাম। নিউএম্পায়ার। ভুল না।

—কে বাজাচ্ছে?

—মেনুহিন।

বেরিয়ে গেল লক্ষ্মী আয়ার। ক্ষৌণীশ এসে বসলো ললিতার টেবিলে। ক্লান্ত আর করুণ দেখাচ্ছে ললিতাকে। পুরান কাগজের ফুলের মতো। ক্ষৌণীশ বললো।

—কতক্ষণ বসে আছেন?

—এই তো কিছুক্ষণ।

সেই পুরান বয় এলো। চা দিলো। চা ঢাললো ললিতা। ক্ষৌণীশের ক্ষিদে ছিলো। স্যাণ্ডউইচ, চিজ, প্যাটি আর পেষ্ট্রি বাছবিচার না করেই খেল সে। তারপর গলা পরিষ্কার করে সোজা হয়ে বসলো। অপ্রীতিকর কথা। কিন্তু ললিতাকে না বললেই নয়। বললো—কাজটা নিলেন না কেন সেই কলেজে? অফিসের কাজ ভালো লাগছে না বললেন। এত করে চেষ্টা করলাম।

—এমন অশিক্ষিত পরিবেশে থাকবো কি করে?

ক্ষৌণীশের এত রাগ হলো যে জবাব দিল না। তারপর ললিতা ক্ষীণ হাসলো। অনেক আগে কা'রা যে বলতো ক্ষীণ হাসিতে তাকে মানায় কথা না বলে। প্যাকেটটা এগিয়ে দিলো। বইখানার পাতায় পাতায়—ক্ষৌণীশকে ললিতা লেখা। হাসলো ক্ষৌণীশ। ধন্যবাদ দিলো। তারপর বললো।

—যা হয় কিছু একটা করুন। এম, এ পাশ করে কেরাণীগিরি করবার কোন মানে হয়? আর তাই যদি করেন তো পরীক্ষা দিন। মাইনে বাড়ুক। ললিতা আবার হাসলো। বিলটা দিলো। বললো এখন কি করবেন?

—একটু কাজ আছে।

সন্ধ্যের মুখে ভবানীপুরের দিকে ফিরতে ফিরতে ললিতার মনে হলো সত্যিই কোন মানে হয় না। দুনিয়াশুদ্ধ মানুষ জানে ললিতার আর ক্ষৌণীশের মধ্যে আছে প্রেম। এ প্রেম বিয়ের প্রয়োজনের অতীত। উনিশ বছর কেন পনেরো বছর আগেও ললিতার সম্পর্কে ভাবতো মানুষ। আজ আর কেউ ভাবে না। বাস্তবকে স্বীকার করেনি ললিতা। আজ আর নিজে হাতে গড়া বৃত্তের মধ্যে পাক না খেয়ে উপায় নেই তার। ক্ষৌণীশ যে তাকে ভালোবাসে না, কোন দিনও বাসেনি, সে কথা ললিতা ভাল করেই জানে। তবু নিজেকে ঠকিয়ে দুনিয়াকে ঠকিয়ে, ঐ একরকম অভ্যাসের পাকে পড়ে রয়েছে ললিতা।

চৌধুরী ম্যানসনে ঢুকতে গিয়ে চট করে কয়টা বকুল ফুল কুড়িয়ে নিলো ললিতা। তখনই মনে পড়লো সেই গান—'তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে।' এই গান উঠেছিল যখন, তখন ললিতারও যৌবন ছিল। চৌধুরী ম্যানসনের সামনে বকুল গাছগুলোতে ফুল ফুটতো মৌসুমে। ললিতার আঠারো বছরের মন কি একরকম সাড়া পেতো। আজ আটান্ন সালে ললিতাদের বাড়ীর আশে-পাশে আর ফাঁকা জায়গা নেই। চৌধুরী ম্যানসনকে লজ্জা দিয়ে আরো কত বাড়ী উঠেছে। সেদিন যারা জন্মালো, অথবা একান্তই শিশু

# উনি ভিটামিনের রং দেখলেই চেনেন !

অবাক হয়ে যাচ্ছেন ? কিন্তু ভিটামিনের থেকে সত্যিই রং বেরোতে পারে। এবং এই অভিজ্ঞটি ফটো ইলেকট্রিক যন্ত্রের সাহায্যে ভিটামিনের রং দেখেই তার ক্ষমতা বলে দিতে পারেন।

এত সঠিক তথ্য জানার দরকার কি ? কারণ, আমরা জানি যে আপনি হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষগুলি কেনার সময় সবসময় ভাল জিনিষই আশা করেন।

কাঁচা মাল কেনা থেকে তৈরী জিনিষপত্র পর্য্যন্ত অভিজ্ঞ, কুশলী এবং বৈজ্ঞানিকেরা বারে বারে পরীক্ষা চালান। এইভাবে পরীক্ষা চালানো হয় বলেই অমূল্য জাতীয় সম্পদ বাঁচে—উৎপাদনের সময়ও বাঁচে।

এইসব কারণেই আমরা আপনাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করেছে এমন ভাল জিনিষপত্র স্বল্পমূল্যে দিতে পারি।

দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 17-X[illegible] 50

ছিলো, আজ সেই সব মেয়ের যৌবনের দিন। এখনকার মেয়েরা স্বরূপ্রসাধনে সুন্দর আর স্বেচ্ছাচারী হতে জানে। তাদের একঝাঁক যখন বেরোয় চৌধুরী ম্যানসন থেকে, (তাদের মধ্যে ললিতার ভাইঝি বুল্গা-ও থাকে) তাদেরই দেখে সবাই। তাদের পাশ দিয়ে আজও নরম মেঘরঙের কাপড় আর শাদালেসের জামা পরা সাঁইত্রিশ বছরের ললিতা তেমনই স্মিতহাসি ঠোঁটে মেখে (সারাদিন অফিসের পর হাসি টেনে রাখা যে কি শক্ত) তাড়াতাড়ি খুটখুট করে ঢুকে যায়। ঢোকবার সময় মৌসুমের বকুল ফুল দুটো-একটা যা পায় তুলে নেয় ত্রস্ত আঙুলে। উনিশ বছর ধরেই এমনি করে ফুল তুলে নিচ্ছে ললিতা। এখন আর কেউ তাকে দেখে কি?

ললিতার বৌদির ভাই অরূপ হাসে। বলে—সেজদি', তোমাদের মোনালিসা এলো।

একদিন যে এই অরূপও ললিতার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে একজন ছিলো সে কথা বৌদি-ও বোধ হয় ইচ্ছে করেই ভুলেছেন। তবু বিশ বছরের সম্পর্ক। আধাপ্রৌঢ় অবিবাহিত ননদকে নিয়ে হাসতে তাঁর বাধে! বলেন—ললিতা, চা খাবি আয়।

গলার স্বরটি আজও চমৎকার! গান জানে না ললিতা। তবু একদিন অরূপ বলেছিলো—তুমি কোন দিন গান গেয়ো না ললিতা! তোমার কথাই যেন গান।

সেই অরূপের ছেলে এখন ক্লাস নাইনে পড়ে। তবু ললিতা সম্ভবত সেদিনের কথা মনে করেই সুন্দর করে জবাব দেয় বৌদিকে। বলে—যাই।

চা-এর টেবিলে বসে থেকে ললিতা শুধু সংস্কৃতি জগতের খবরাখবর নেয়। অরূপ সাংবাদিক। কিছু খবরাখবর রাখে। কিন্তু খবরের কাগজে চোখ বুলিয়ে যতটুকু জানা যায় ললিতার তাতে মন ভরে না। তার সংস্কৃতির ক্ষিদে আরো গভীর। আরো তীব্র। কেক, লুচি অথবা সন্দেশ আঙুলের ডগায় তুলে চা-এর পেয়ালার ওপর দিয়ে সে তীব্র ব্যাকুলতার সুরে কথা বলে—হাওয়ার্ড ফাষ্টকে নিয়ে মেইনষ্ট্রীমের মন্তব্যগুলি পড়েছেন তো? তার ওপর আমাদের শচীন সান্ন্যালের মতামতটা কি রকম যেন দায়িত্ব এড়ানো ধরণের লাগল না?

—বাঁশ আর গালার একজিবিশনে মনে হলো না, যে ওদের ওপর আমাদের সভ্যতার ছাপটা বিশ্রী ভাবে পড়ছে। অন্তত: প্রকাশভঙ্গীতে?

—এ্যাকাডেমির একজিবিশন আমি আর দেখি না! শিল্পীরা আত্মবিক্রয় করে বসে আছেন খ্যাতির কাছে।

—চীনে প্রতিনিধি পাঠাতে কেন যে আপনারা দময়ন্তী মুদ্গেলকারকে পাঠালেন না! ওর নাচের মধ্যে যেটাকে আপাত সরলতা বলে ভুল করা হয়—

সাধ্যমতো জবাব দেয় অরূপ। তখন ললিতা আরো সোচ্চারিত গভীর হতাশায় বলে—

—কিছু হচ্ছে না। কিছু হচ্ছে না অরূপ বাবু, আমি আশার আলো এক কোঁটাও দেখতে পাচ্ছি না।

অরূপের স্ত্রী মঞ্জুকে ললিতা অনেক দিন আগেই দেহসর্বস্ব একটি মেয়ে বলে বাদ দিয়ে রেখেছে তার মন থেকে। ললিতা উঠে গেলে পরে মঞ্জুই মন্তব্য করে বড় ননদকে অসন্তুষ্ট করেও।

পোষ্ট এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের কেরাণী! ওর এতো মতামতের দরকার কি? নিজে যদি লেখক বা কবি বা অন্য কিছু হতো, ত' বুঝতাম! আর ক্ষৌণীশ সেন ত, শুনি মিস আয়ারের সঙ্গে ঘুরছেন। ললিতার সঙ্গে না এত ভাব?

ললিতার সঙ্গে ক্ষৌণীশের যে প্রেম, তার স্বরূপ বোঝা ললিতার বৌদির সাধ্য নয়। ক্ষৌণীশকে যতটুকু দেখা গিয়েছে, তাঁর ধারণা হয়েছে ছেলেটি চালবাজ ও ধুরন্ধর। একি রকম ছেলে, যে একটি মেয়েকে উনিশ বছর ধরে টাঙিয়ে রেখেছে অথচ বিয়ে করলো না? ভালো লাগে না তাঁর। ক্ষৌণীশ আজ চল্লিশ বছরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক। স্বদেশ ও বিদেশের টাকায় বার বার বিদেশ ঘুরে এসেছে। চৌরঙ্গী পাড়ায় ফ্ল্যাট নিয়েছে। হাজার খানেক টাকা রোজগার করে। বহিরাবরণটা আজও আগেকার মতোই, স্বল্পভাষী, গর্বিত এবং অহমিকায় ভরা। ছেলে ছোকরার ব্যাপার ত নয়। এরকম একজন বয়স্ক পুরুষকে তিনি কি বলবেন?

তবু প্রেম ছিলো। ছিলো যে এ কথা ললিতার মুখেই শোনা। ললিতার মুখ থেকে আজও সে কথা তার অফিসের বান্ধবীরা শোনে। শোনে ছোট্ট ঘরে জটলা করে বসে। মেয়েরা বড্ড শ্রদ্ধা করে ললিতাকে। চাকরীই করতে এসেছে তারা। সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কে এমন অন্তরঙ্গ জ্ঞান রাখে ললিতা যা শুনে তারা নিজেদের সীমিত জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। এখন আর ললিতার সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন তোলে না। তাদের মধ্যে সাহিত্যে অনুরাগ আছে যাদের তারাই ললিতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে! ললিতা একদিন দেখতে রীতিমতো ভালো ছিল। শ্যামল রঙ তার সহায় হয়েছিলো। কোনো মেঘের দিনে তার খোলা চুল দেখে ক্ষৌণীশ না কি বিদিশার নিশার সঙ্গে উপমা দিয়েছিলো ভরাট গলায়। ললিতার মধ্যে একটি মেঘমেদুর রহস্যের ভাব ছিলো। কে না জানে এই দেহাতীত রহস্যের আভাসই মেয়েদের নায়িকা করে তোলে?

সে লাবণ্যের সামান্য অবশিষ্ট আছে আজও। ললিতার কথাবার্তা কিন্তু যে কোন আত্মসচেতন যুবতীর মতোই আত্মবিশ্বাসে প্রোজ্জ্বল। তার কথায় মনে হয়, আজও যেন সে সেই উনিশ বছরের ললিতা, যাকে দেখে ক্ষৌণীশ—

তবে ক্ষৌণীশ বিয়ে করলো না কেন? এ প্রশ্ন কোনো সোজা বুদ্ধির মেয়ের মুখে শুনে সুন্দর নাকটি কুঁচকে ললিতা বিস্মিত তাচ্ছিল্যে তাকালো! তারপরেই তার চোখে-মুখে নামল বেদনা! বোঝা গেল এ প্রসঙ্গ এমন যে, জিজ্ঞাসা করলে ললিতা বেদনাহত হবে। উত্তর দেবে না। তবে ললিতা কথা বললো। বললো—বিয়ের কথা ওঠে না। বিয়ে যখন করিনি, জেনো অলজ্ঘ্য কোনো কারণ আছে। আরো কি জানো, বিয়ে করার পেছনে কতকগুলো জৈব চাহিদা থাকে। আমার বা তার সে দাবীগুলো নেই।

বিয়ে করতে চলেছে রীতা। মেয়েটির স্বাস্থ্য ভালো। হাসিখুসী। এখন জেদের সঙ্গে তর্ক সুরু করলো সে। বললো—সকলে কিছু আর আদর্শ নিয়ে বাঁচতে পারে না। তারা বিয়ে করবে। দুনিয়া চলবে স্বাভাবিক নিয়মে। আপনি এমন ভাবে কথা বলছেন যেন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলো ঘৃণ্য কিছু।

—তুমি ভুল বুঝছো রীতা! যা সুস্থ, তা-ই সুন্দর। আমি লতে চেয়েছিলাম, আমি বা ক্ষৌণীশ কেউ-ইসে-কথা অস্বীকার করি। শুধু আমাদের জীবনে তার প্রয়োজন নেই।

—সে-ও আমি বলবো অস্বাভাবিক। ব'লে উঠে গেল রীতা। র সঙ্গিনীদের বললো—এক দিন যা-ই থাক না-থাক, আজ আর ণীশ সেন ললিতাদি'কে ভালবাসে না। আমি জানি না, রিসার্চ-দার মিস আয়ারের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক! ওসব কথা ললিতাদি' বাঁচাতে বলে।

সে বলে—নিজের সাথে মুকাবিলা করবার সাহস নেই ললিতার। াই স্বীকার করতে চায় না সত্য।

রীতার কথা কেউ মানে না। তারা যা জানে, ললিতার বাড়ীর লে, এমন কি বড় বড় ভাইপো-ভাইঝিরাও তাই জানে। জানে , ললিতা আর ক্ষৌণীশ বহু দিন ধরে প্রেমে পড়ে আছে। এ মন এক প্রেম, যাকে জীইয়ে রেখে ক্ষৌণীশ নিজের পথ পরিষ্কার রে নিলো। মেয়েদের প্রেম আত্মত্যাগেই সার্থক। তাই ললিতা ান দিন দাবী অবধি জানালো না। তারা দেখা করলো—রিজোনা, ফেরাজিনি আর ব্যুফে-তে। বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে হিত্যচক্রে দেখা হলো। কথা হলো। আজও নাকি হয়। এতেই কি দুজনের মন এত ভরে আছে যে, বিয়ের দরকার হয় না।

এমনি করে সাহিত্যিক সংস্কৃতির কথা দিয়ে যারা ভালোবাসে, য়ে করে, জোরের সঙ্গে বাঁচে, তাদের প্রতি উঁচু স্তরের বুদ্ধিজীবীর তা অনুকম্পার সঙ্গ চেয়ে—সর্বোপরি ক্ষৌণীশের ও তার সেই শেষ রহস্যভরা সুগভীর প্রেমের কুহেলি দিয়ে নিজের চারিপাশে কটা আবরণ ললিতা এই সাঁইত্রিশ বছর অবধি টেনে রাখলো।

যৌবন কখনো কখনো প্রাপ্তযৌবনের ওপর অকারণে নিষ্ঠুর । সম্ভবতঃ সেই কারণেই রীতা ললিতার আত্মবিশ্বাসের আবরণটা াঙতে তৎপর হলো। সামান্য কথায় একদিন যেচে খোঁচা দিলো। লো—আপনি আশ্চর্য বাস্তব-বিমুখ মানুষ ললিতাদি'! বলছেন ই অফিসের জীবনটা কিছুই নয়। তার বাইরে আপনার অনেক বন আছে। বাঁচবার উৎস আছে। আমি বুঝি না। এখানে ন আট ঘণ্টা কাটে আপনার, বাড়ীতে বসে ফাইল অডিট করতে । আপনি ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারছেন না। তবে টাকে তুচ্ছ ব'লে লাভ কি?

—তুচ্ছ বলছি না। বলছি এর বাইরেও বাঁচবার অনেক কারণ াছে। ললিতার দুর্বল কণ্ঠকে ডুবিয়ে রীতা তীব্র বিবাদের সঙ্গে বললো—তা থাকুক না কেন। তবে এখানে আপনি বলে াকেন অন্যান্য কথা। সাহিত্য সংস্কৃতির সমস্যা ও আদর্শের কথা। আমার মনে হয়, আমরা যারা সক্রিয়ভাবে লেখক, বুদ্ধিজীবী, বা সমালোচক নই, তাদের এই সব ভাসা-ভাসা আনুগত্যের কোন দাম নেই। আমরা যারা এ কথা বলি, তারা হচ্ছে জীবন-বিচ্ছিন্ন। বাস্তব সত্যটাকে মুখোমুখি দেখি না—আর কল্পনার জগতে বাস করি। এই ধরুন না কেন আপনার কথা। যতোই উঁচুস্তরে মেলামেশা থাক না কেন আপনার, আপনি তো আসলে কেরাণী?

—রীতা!

অনুপমা, কমলা এদের তীব্র তিরস্কার উপেক্ষা করে রীতা আবার তীক্ষ্ণ হাসলো। বললো—সেটা স্বীকার করতে লজ্জা কেন আপনার? উটপাখীর মতো বাস্তববিমুখ হয়ে লাভ নেই ললিতাদি'! জানবেন সকলকেই আজকে নিজের নিজের শিবিরে ঠেলে দিচ্ছে জীবনসংগ্রাম। অবশ্য জীবনটাই যে সংগ্রাম তা-ই যদি অস্বীকার করেন।

এতগুলি সত্যি কথা ঝরঝরিয়ে বলে রীতা নিজের খোঁপা ঠিক করে মুখে পাউডার লাগালো। যৌবন-কঠিন বুকে আঁচল টেনে খুটখুট করে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল। বিশ বছরের রীতা। যাকে যেচে বিয়ে করছে সহকর্মী দিলীপ বসু। আর সত্যিকথার ঝাপটায় সাদা হয়ে গেল ললিতা। অন্য মেয়েগুলি এই বিগত-যৌবন মেয়েটির সামনে লজ্জা পেলো নিজেদের অল্পবয়সের জন্যে। ললিতাও সেক্‌শনে চলে গেল। ক্যাস সার্টিফিকেট সেক্‌সনের দুই বুড়োর মাঝখানে বসে লালকালিতে দাগ দিতে থাকলো খাতায়। মুখ তুললো না।

তার সম্পর্কে কত জনের মনে এ রকম প্রশ্ন জেগেছে? বাড়ীতেই যে শত্রু-শিবির স্থাপিত হয়েছে তা কে জানে? ভাইঝি বুলা আর ভাই-পো বাদল এখন উঠতি মানুষ। তাদের বন্ধু-বান্ধবে বাড়ী ভর্তি। তাদের মধ্যে দিয়ে পিসী ব্রিটিশ কাউন্সিলে বসে কবিতার ওপর ইংরেজ অধ্যাপকের বক্তৃতা শোনে; ফিল্মসোসাইটিতে ছবি দেখে, কনফারেন্স নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়, তাতে তারা ইদানীং লজ্জা পাচ্ছে। ললিতার বন্ধুদের ছেলেমেয়েরাই কত বড় হলো। যে যার সমস্যা নিয়ে আছে। ললিতা তাদের মধ্যে নিজের কুমারী-কুমারী ভাব আর সংস্কৃতির চাহিদা নিয়ে ঘুরে আজকাল আর

সুবিধে করতে পারে না। যৌবনকালে আরিজোনা ফেরাজিনিতে বসে চা-এর ধোঁয়ার ওপর দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা করতো যারা তারা পরবর্তীদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে গেছে নিজের নিজের জীবনে। ললিতা তবু যায়। ক্ষৌণীশ আসে। অনেক কাজ হাতে নিয়েছে ক্ষৌণীশ। অনেক নামডাক তার। আজকাল আসবার সময় পায় না। তবু সে আসে। সে শুধু অভ্যাসের তাগিদে। ভাসা-ভাসা কথা হয়। ললিতা বলে।—গড়ের মাঠে নতুন পাতা এসেছে। দেখেছেন?

বলে একরকম ক্লান্ত পিপাসা ও আর্তি নিয়ে চেয়ে থাকে। ক্ষৌণীশ বিব্রত বোধ করে। বলে,—হ্যাঁ। চমৎকার! আমি সোসাইটিতে যাচ্ছি। আপনি যাবেন নাগেশ্বরের লেকচার শুনতে?

বলেই ভয় পায় ক্ষৌণীশ। ললিতার কুঁজো পিঠ, চোখে-মুখে ক্লান্তি, পরাজয় ও কেরাণীগিরির ছাপ। সোসাইটিতে আজ বৃটিশ কাউন্সিলের সকলে আসবেন। তাছাড়া মিস আয়ারও থাকবে তার দাদার সঙ্গে। ঝানু আই, এফ, এস, আয়ারের সঙ্গে আলাপ হবার কথা আজ। লেকচারের পর আয়ারের বাড়ীতে ডিনার।

ললিতা বোঝে কি না বোঝা যায় না। বলে—না। নাগেশ্বরের লেখা ষ্টেটসম্যানে পড়েই ভালো লাগেনি আমার। তা ছাড়া Soil Erosion সম্পর্কে ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোকের বইটাই ত—

পরে সোসাইটির দিকে পোর্টফোলিও বগলে গেরুয়া পাঞ্জাবী পায়জামা আর মারাঠি চটির বিদ্যাজীবী পোষাকে চলতে চলতে ক্ষৌণীশ নিজেকে ধিক্কার দেয়! এই মেয়েটি কেন যে তাকে বার বার ফোন করে আরিজোনায় আসতে অনুরোধ করে, সে জানে না। তবু আসে বলে নিজেকে ছোট মনে হয় তার। আসে ভদ্রতার খাতিরে। সেই কবে বীরেন মিত্রের বাড়ী যেতো সে। সেই থেকে দেখছে একে। ভালোবাসা, রহস্যময় ভাব। এদিকে কিছু করলো না। বিয়ে করলো না। কেরাণীগিরি করে। ক্ষৌণীশকে বার বার ডাকে। জন্মদিনে ললিতার পাঠানো ফুল, বই, বা চিঠি পেয়ে তার যে কি বিব্রত ও খারাপ লেগেছে, তা আবার মনে করলো ক্ষৌণীশ। কি চায় তার কাছে? আজ ক্ষৌণীশের যা প্রতিপত্তি হয়েছে, তাতে আর এরকম একটা মূর্ত্ত হতাশা ও পরাজয়কে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। বিরক্ত ক্ষৌণীশের মনে হলো ললিতা তার ভদ্রস্বভাবের সুযোগ নিচ্ছে।

ঘরে ফিরতে সেদিনও ললিতা একমুঠো বকুল ফুল কুড়িয়ে নিলো। ঘরে ফিরে স্নান করে দক্ষিণের বারান্দায় বসে বকুলগন্ধী দক্ষিণা বাতাসে মুখ ডুবিয়ে দিয়ে মনে হলো অনেক আছে তার। রীতার রূঢ় ইঙ্গিত সে সহজেই উপেক্ষা করতে পারে।

এশিয়াটিক সোসাইটির লেকচার শোনবার পরে ঘটনা ঘটলো দ্রুতগতিতে। অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট লক্ষ্মীবেক্কট আয়ারের পঁচিশ বছরের তেজস্বী মন যখন ডক্টর সেনকে চাইছে, বাধা দেবার কথা ভাবতে পারলেন না ভগিনীগত প্রাণ অকৃতদার আয়ার সাহেব। লক্ষ্মীর নিজের পঞ্চাশ হাজার টাকা আর কিছু হীরে আছে। তাছাড়া সে গুণী মেয়ে। চমৎকার ছবি তোলে। ভালো টাইপ জানে। ক্ষৌণীশের মনে হলো, এই বিয়ে করে সে বেশ একটা পশ্চিমের অধ্যাপক-জীবনের গতি নিজের জীবনে আমদানী করবে। দুজনেই কাজ করবে, টাকা আনবে, কাঁধে ক্যাম্পস্যাক আর ক্যামেরা নিয়ে ঘুরবে বেপরোয়া হয়ে। বক্‌সার ষ্টেটের জঙ্গল আর অতিথি-অধ্যাপক হয়ে হারভার্ডের পথে সর্ব্বত্রই তারা ঘুরবে সমান আগ্রহ নিয়ে। দুজনেই লণ্ডন বি, বি, সি, থেকে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবে।

ষ্টেটসম্যানে খবরটা পড়ে বৌদি উত্তেজিত হয়ে ললিতার ঘরে গেলেন। বললেন—এ কি ললিতা! এত যে আলাপ, এত ঘনিষ্ঠতা, এ কি ব্যবহার তার?

ললিতা জবাব দিলো না। বৌদি উত্তেজিত হতে থাকলেন উত্তরোত্তর। বললেন—তোমার দাদাকে বলছি আমি। আজ না হয় সে বিখ্যাত হয়েছে। একদিন ত' যথেষ্ট আলাপই ছিলো। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন তাকে।

—না। না বৌদি, না। ব'লে ললিতা সহসা বৌদির পায়ে পড়ে গেল। তিনি যে তার চেয়ে তিন বছরের মাত্র বড় সে কথা মনে রাখল না। হাঁপাতে হাঁপাতে সকরুণ ভাবে বললো—
—এর পরে তাকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে আর ছোট করো না।

কিন্তু বৌদির স্বায়তঃই রাগ হয়েছে। আর ললিতা যাই মনে করুক, ললিতার অগৌরবে তিনিও ব্যথা পেয়েছেন। এ যে চূড়ান্ত লজ্জার কথা! এত প্রেম ললিতা-ক্ষৌণীশের—সে কথা এই ললিতার মুখেই কত জন শুনেছে। এখন ঝট ক'রে ক্ষৌণীশ অন্য একজনকে বিয়ে করবে তাতে কথা হবে না? ললিতার যে বিয়ের বয়স নেই, তা কি বৌদি জানেন না? তবু ক্ষৌণীশের সঙ্গে বিয়ে হলে হতো একরকম।

বৌদি দাদার কাছে চললেন দেখে ললিতা পাগলের মতো ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো। বললো—বৌদি, শোন, দাদাকে তুমি তার কাছে পাঠালে কলঙ্কই বাড়বে।

—তবু তাকে জবাব দিতে হবে। অস্বীকার ত' করতে পারবে না সে?

—অস্বীকার-ই করবে।

—কি বললে?

ব'লে ললিতার বৌদি হতবাক হয়ে গেলেন। আজীবন বাস্তিতে মুখ গুঁজে ললিতা বাস্তবকে অস্বীকার করেছে। আজ সহসা বাস্তবকে চীৎকার করে স্বীকার করতে গিয়ে সে বিভ্রান্ত হয়ে গেল। বিভ্রান্ত, দিশাহারা ললিতা কেমন একরকম তীব্র সরু গলায় বললো—এতদিন ধরে যত কথা বলেছি আমি সব মিথ্যে বৌদি! সেরকম ভাবে কোন ভালবাসা তার ছিল না।

—ললিতা!

গলা নামিয়ে এনে ললিতা বললে—যদি সে একবার-ও বিয়ের কথা বলতো, কবে বিয়ে হয়ে যেতো বৌদি!

ললিতার এই নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ দেখে বৌদি-ও কম বিভ্রান্ত নন। ললিতা তাঁর ওপরেই চোখ তুললো। বললো—

—তোমরা বিয়ে করতে বলতে সে কত দিন আগে। তারপরে ত তুমি-ও বলোনি! তাই এখন আর এসব কথার কোন মানে হয়?

এবার বিমূঢ় হলেন বৌদি। একদিন ললিতা বিয়ে করেনি—পাণিপ্রার্থীরা তার যোগ্য নয় বলে। আর যে মেয়ে এত স্বাধীনচেতা, তার মুখ থেকে এই ধরণের কথা বেরুতে পারে কে তা ভেবেছিলো? আবছা মনে হলো বৌদির, হ্যাঁ, ছেলে আর মেয়ে আর নিজের সুখ নিয়ে বেশী জড়িয়ে পড়ে ললিতার সম্পর্কে অবিচার তাঁরা করেছেন।

খুবই জটিল পরিস্থিতি। তিনি সৎলোক বলেই তাঁর মনে হলো তাঁর-ও কিছু দায়িত্ব ছিলো।

বেরিয়ে গেলেন বৌদি।

ললিতার দাদা, ছোড়দা, বুলা আর বাদল ললিতার কাছ দিয়ে হাঁটল না। বুঝল এ একটা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। নিজের দুঃখ নিয়ে একলাই থাক ললিতা।

ললিতা প্রথমটা ভাবলো দুঃখে মুহ্যমান হয়ে যাবে সে। আজ আর মাথা তুলতে পারবে না। জীবনটা তাহলে একান্তই ব্যর্থ হয়ে গেল তার!

জীবনটা তো কবে-ই অভ্যাসে পরিণত হয়েছে তা ত জানে না ললিতা, তাই এত বড় দুঃখে-ও দুঃখ বোধ হলো না তার। সন্ধ্যার সময় ভাবলো একবার যাবে। ঘুরে আসবে সেই সব পুরোন জায়গাগুলোতে। যেখানে সে যেত যৌবনকালে। যখন রেকর্ডে বাজতো সেই গান—'তুমি যে গিয়াছ!'

একটা অদ্ভুত ইচ্ছা হলো ললিতার। সেই দিনক্ষণগুলোকে একবার ধরবেই মুঠো করে। এই সব আলোচনা, সাহিত্য, এলিয়টের কবিতা, চৌরঙ্গীতে সায়াহ্ন, আরিজোনায় সন্ধ্যা, ব্রিটিশ কাউন্সিলে মিউজিক, এর মধ্যেই না বেঁচে আছে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলো? না কি সেগুলোও কিছু নয়? বালির ওপর জলের কোঁটার মতোই মিথ্যে? তবে কি এতদিন ধরে শুধু মিথ্যে, অবাস্তব কতকগুলো জীবন নয়, জীবনের ছায়া ধরে ধরে সে বেঁচেছে? কখনোই তা হতে পারে না। তা যদি হয় তবে মরে যাবে ললিতা। তার দুঃখে আকাশ দীর্ণ হবে। সে শেষ হয়ে যাবে।

প্রসাধন হলো না। কোন মতে বেরিয়ে চৌরঙ্গীতে গেল ললিতা। ট্যাক্সি চড়ে গঙ্গার ধারে গেল, ভিক্টোরিয়ার সামনের মাঠে বসে রইলো দু' মিনিট—এই সব জায়গায় বসে তার কত দিন গিয়েছে। সেখান থেকে উজিয়ে এলো লিণ্ডসে স্ট্রীট। আরিজোনায় বসে সেই বয়কে ডেকে চা দিতে বললো। ঘরের সাজসজ্জা দেখলো। বার বার ভাবতে চেষ্টা করলো—বুক ভেঙে যাচ্ছে তার। ভয়ানক দুঃখ হচ্ছে।

জীবনের ট্র্যাজেডি এমনই নিষ্ঠুর যে, কিছুই মনে হলো না ললিতার। এ সব জায়গায় কোনো মুহূর্ত আজ আর বেঁচে নেই। কবে যে তারা মরে গিয়েছে, তা ললিতা জানে না। হয়তো ললিতার যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই মুহূর্তগুলো-ও মরেছে। তার পর থেকে সে যে সব কথা বলেছে, ভেবেছে, ক্ষৌণীশকে নিয়ে কত কথা রচনা করেছে, সবই অভ্যাসের বশে। এ শুধু একটা অভ্যাস। জীবনটা যে কবে শুধু অভ্যাসে পর্যবসিত হয়েছে, তাও জানত না ললিতা।

সিনেমা ভাঙলে আরিজোনায় প্রচুর ভীড় হয়। এক পেয়ালা চা নিয়ে বয়স্ক, ক্লান্ত, কালিপড়া মুখ ললিতা আর কতক্ষণ বসে থাকবে! উঠে পড়লো সে। একটা পরিচিত গলায় হাসি শোনা গেল না? হ্যাঁ। ক্ষৌণীশ আর একটি মেয়ে বসলো টেবিলে। তারা তাকে দেখল না। ললিতা দেখলো। কিন্তু তার মনে কোন সুগভীর আঘাতও লাগল না। তবে ক্ষৌণীশ-ও কি মনের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল? বিস্মিত হতে চেয়ে-ও পারলো না ললিতা। বিস্ময় ও তীব্রতা হারিয়েছে।

এ পথ সে পথ ঘুরে ঘুরে ললিতা সাঁইত্রিশটা বছরের ক্লান্তি পিঠে টেনে যখন ফিরলো তখন রাত ন'টা বাজে। আজ আর খুটখুট করে এস্ত পায়ে ঢুকলো না ললিতা। চটিটা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে এলো পিঠ নিচু করে চোখ নামিয়ে। বকুলগাছটার অনেক ফুল আজও পড়েছিলো পথে। ফুলগুলো স্বচ্ছন্দে মাড়িয়েই এলো ললিতা। চকিত আঙুলে কুড়িয়ে নেবার কথা একবারও মনে হলো না। আর সেই গানটার প্রথম কলি, যা উনিশ বছরের অভ্যাসে মন রোজই গুনগুন্ করতো—তাও আজ মনে পড়লো না ললিতার। বকুলগন্ধী বাতাস যে তার চোখের জলে ভেজা গালের ওপর ঝাপটাচ্ছে তা ত অনুভব করতে পারলো না ললিতা! আস্তে আস্তে উঠতে উঠতে মনে হলো সিঁড়িগুলো আজ ফুরোচ্ছে না। লবণাক্ত চোখের জলে ব্লাউজের আর শাড়ীর কিনারা ভিজে যাচ্ছে। আজ কেন, সিঁড়িগুলো আর কোন দিনও বুঝি ফুরোবে না।

# সমাধি-সঙ্গীত

[ R. L. Stevenson-এর Requiem শীর্ষক কবিতার অনুবাদ ]

উদার গগন যবে ভরে যায় তারায় তারায়
খুঁড়িয়া সমাধি-ভূমি তলে তার রাখিও আমায়।
জীবন-মরণ মোর অভিষিক্ত আনন্দ-ধারায়—
এখানেও পাতিলাম নিজ আশে অনন্ত শয়ন!

সমাধি-ফলকে মম এই কয় ছত্র লিখে দিও:
হেথায় শায়িত যে গো এই ঠাঁই তার বরণীয়।
বহু সমুদ্রের পর পাইল নাবিক তার গৃহ,
শিকারী পর্বত হতে ফিরিল যে আপন ভবন।

অনুবাদ—শ্রীআদিত্যকুমার বসু

"It is true I had my Sundays to myself; but Sundays; admirable as the institution of them is for purposes of worship; as for that very reason the very worse adapted for day of unbending and recreation." —*Charles Lamb.*

# লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায়

### হিমানীশ গোস্বামী

লণ্ডনে যতই শীতের মাসগুলি আসতে লাগলো আর যেতে লাগলো, নবেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী ইত্যাদি আমরা হতাশ হ'য়ে পড়তে লাগলাম। কই তেমন ঠাণ্ডা কোথায়? আমরা নানা রকম গরম হবার পোশাক সংগে রেখেছিলাম—কিন্তু সেগুলো সব প্রয়োজন হ'ল না। দস্তানা হাতে পরবার কোনো প্রয়োজন হ'ল না। এমন কি, যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়ছে না বলে কেমন খারাপও লাগতে লাগলো। কেউ কেউ তবু দস্তানা পরতে লাগলো এবং হারাতে লাগলো। দস্তানা ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে কোনো কাজে লাগে না। অনেকে শখ ক'রে নরম চামড়ার দস্তানা কেনেন হাত গরম হবে ব'লে, কিন্তু দস্তানা নিয়ে নানা রকম ভাবে বিব্রত হ'তে হয়। দস্তানা পরলে সে হাত দিয়ে প্রায় সমস্ত রকমের কাজ করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। জামার বোতাম লাগানো, টাই পরা, চিঠিখোলা, সিগারেট ধরানো এগুলি প্রায় অসম্ভব। তা ছাড়া পকেট থেকে পয়সা বার করতে গেলে বেজায় অসুবিধে। তাই দিনের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ বার দস্তানা খোলা আর পরা এই নিয়েই থাকতে হয়। প্রতি বার দস্তানা খুলে আবার যত্ন ক'রে কোটের বা জ্যাকেটের পকেটে রাখতে হয়। এত বেশি দস্তানা লণ্ডনে হারায় যে অত দাম দিয়ে কেনবার কোনো অর্থ হয় না।

মণি পালিত বলতেন, যদি দস্তানা কিনতেই হয় তবে বাপু তিন শিলিং-এর উলওয়ার্থের দস্তানা কেনাই সুবিধের—তাতে অবশ্য ছত্রিশ শিলিঙ দামের দস্তানার মতো ঠাণ্ডা আটকায় না, এমন কি সেগুলো পরাও যা না পরাও প্রায় তাই—কিন্তু তবু কম পয়সার উপর দিয়ে যায়। লণ্ডনের পথে চলতে চলতে দস্তানা রাস্তায় পড়ে থাকার দৃশ্য অতি সাধারণ ঘটনা। কেউ এক মাসের মধ্যে একবারও দস্তানা না হারালে তার প্রতি লোকেরা সন্দেহের চোখে দেখে। যে লোক এত সাবধান দস্তানা সম্পর্কে, সে হয় বেজায় কৃপণ নয় তো সে মিথ্যেবাদী। এ রকম লোকেদের সংসর্গ লোকে এড়িয়ে চলে।

লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় কত দস্তানা পরে থাকতে দেখেছি তার সীমা-সংখ্যা নেই। ঘন উলের ছোটদের দস্তানা, সাদা লাল এবং অন্যান্য রঙের। ছোট ছোট দস্তানা, তারপর আরো বড় দস্তানা। দস্তানার আকার যত বড় হয় তার রঙ হয় তত সাধারণ, ছাইরঙা দস্তানাই বেশি। একেবারে কালো রঙের দস্তানা সাধারণত মেয়েদের জন্য। একদিন আমাদের বুড়ো ব্যানার্জি বললেন (সব চেয়ে বড় ব্যানার্জির বয়স ত্রিশ—কিন্তু তাঁকেই বুড়ো বলে ডাকা হত।) এদেশে দস্তানার ব্যবসা খুব লাভজনক। লোকে এত হারায়! শুনে প্রভাস বললো, বহু লোক তেমনি আবার দস্তানা কেনেই না মোট। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে অনেকেই দস্তানা পরে। তাই দেখা যায় বহু লোককে দু' হাতে দু'রকম দস্তানা। তারপর প্রভাস বললো, দস্তানা-জোড়া খুব সাবধানে রাখতে হবে—হারিয়ে না যায়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাই প্রভাস দস্তানা জোড়াটি হারিয়ে এলো ল্যাডব্রোক গ্রোভ স্টেশনে।

আর একটি জিনিস খুব হারায় সে হল ছাতা। লণ্ডনের তো আবহাওয়ার স্থিরতা নেই—সকালে ভয়ানক বৃষ্টি হয় তো, বেলা বারোটায় বদলে গেল দৃশ্য একেবারে—রোদ্দুরে ভ'রে গেল সমস্ত সহর। ছাতা রোদ্দুরে কেউ মাথায় দেয় না—অতএব বাস থেকে নামবার সময় ছাতা নিয়ে নামতে ভুল হয়ে যায়—রেস্তোরাঁ থেকে বেরুতে ছাতার কথা মনে পড়ে না।

ছাতা আমরা কেউ ব্যবহার করিনি কখনো। টুপিও না। ভারতীয় ছাত্ররা এসব ব্যাপারে খুব সহজ। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রেরা লণ্ডনে এসে দুঃখ পায় শীতকালে একটি জিনিসের অভাবে—সে হল তুষার!

কোথায় তুষার?

বড়দিনেও তুষার পড়েনি। জানুয়ারী গেল, ফেব্রুয়ারী গেল, তুষারের কোনো চিহ্ন নেই। একদিন পড়েছিল আধ মিনিটের জন্য—ছোট ছোট টুকরো। কিন্তু সে তো নেহাত ফাঁকি!

মণি পালিত বললেন, লণ্ডনে স্নো বিশেষ পড়ে না। কোনো কোনো বছর একেবারেই পড়ে না। শুনে মনে খারাপ হ'য়ে গেল আমাদের। স্নো দেখতে পাব না লণ্ডনে? সেই যে পড়েছিলাম রবার্ট বৃজেসের কবিতা:

All night it fell, and when full inches seven
It lay in the depth of its uncompacted lightnes...

এপ্রিল মাসেও স্নো পড়বে না ব'লে মনে হল। বসন্ত এসে গেল। ড্যাফোডিল ফুলেরা হৈ-চৈ করে জেগে উঠলো শীতে শক্ত হয়ে যাওয়া জমিকে ভেঙে ফেলে। প্রাচীনের দেয়াল নবীনের প্রাণোচ্ছ্বাস

দিল ভেঙে। শীত বুড়োর মৃত্যু হ'ল ড্যাফোডিলের ছোঁয়ায়। ড্যাফোডিল আহ্বান করল আরো অগণিত ফুল এবং ফলকে। ঘাসের রঙ হল সবুজ।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য! শীতের পত্রহীন গাছেদের দল—হঠাৎ সুরু করে দিল নতুন পাতা গজানোর কাজ। এত তাড়াতাড়ি গাছগুলো পাতায় ভরে যায় যে হঠাৎ অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ওরা ওভারটাইম খাটে সম্ভবত। লণ্ডনে বসন্ত এসে গেল। "টাইমস" দৈনিক খবরের কাগজে একটি পত্রলেখক লিখলেন, 'আমি কোকিল দেখেছি—এ বছরের প্রথম কোকিল সম্ভবত।'

বসন্ত যখন একেবারে জেঁকে বসেছে—এপ্রিল মাসের প্রায় শেষ—এমনি সময় একদিন হঠাৎ সুরু হল তুষারপাত। আশ্চর্য করে দিল আমাদের। এমন আশ্চর্য হবার কোনো কথা নয় অবশ্য। কিছুদিন আগেই পড়েছিলাম একজন অ্যামেরিকান কমেডিয়ানের মন্তব্য, "ইংল্যাণ্ডে আমি চার ঋতু কাটিয়েছি। আমি পেয়েছি বসন্তের হাওয়া, গ্রীষ্মের সূর্য, শরতের শান্ততা এবং শীতের ঠাণ্ডা এবং তুষার।" খানিক থেমে বলেছিলেন, "অবশ্য এ সমস্তই একদিনের মধ্যেই ঘটেছে।"

তুষারপাতের দুটো দিক আছে। একটি ঘরের মধ্য থেকে বাইরে তাকানো। এমন সুন্দর দৃশ্য আর দেখা যায় না। সমস্ত সাদা—উজ্জ্বল সাদা। গাছের পাতা আর দেখা যায় না—হালকা তুষার ঢেকে দিয়েছে। এমন স্বর্গীয় মনে হয়! কিন্তু তুষারের ফলে রাস্তা অচল হয়। মোটর গাড়ির দুর্ঘটনা বেড়ে যায়। বাস আস্তে চলে। অনেক সময় ট্রেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেমে থাকে তুষার জমে থাকার জন্য। পাড়াগাঁয়ে বিশেষ ক'রে কত ফুট যে জমে যায় তুষার, অনেক সময়ে এমন হয় যে, কতক কতক অঞ্চল তুষারের ফলে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। তখন এরোপ্লেনে ক'রে সে সব জায়গায় খাদ্য সরবরাহ করা হয়। তা ছাড়া কাদা জমে। তুষার গলছে না—লোকেরা তুষারের উপর দিয়ে যাচ্ছে, ধুলো আর তুষার মিলে কাদার সৃষ্টি হয়। জুতো ভালো জাতের না হ'লে পায়ে ঠাণ্ডা লাগে বেশ, আমাদের দেশের অনেক জুতোই তুষারে অচল।

আমাদের পাড়ায় একটি স্ন্যাক্ বার ( Snack Bar ) ছিল।

দুত

মাত্র একটিই আমাদের পাড়ায় ছিল। সে দোকানে দু পেনি দামের চা এবং তিন পেনি দামের সসেজ রোল পাওয়া যেতো। এই দোকান খুলতো সকাল ছটায়, রাত প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত খোলা থাকতো। এর কাছেই একটি সিনেমা আর আমাদের বিখ্যাত টিউব ষ্টেশন—ল্যাডব্রোক গ্রোভ। এই স্ন্যাক বারটিতে প্রায় সমস্ত সময়ে লোকের ভিড় লেগে থাকতো—যদিও জায়গার পরিমাণ ছিল নেহাতই কম। এই দোকানে রাত আটটা পর্যন্ত সিগারেটও পাওয়া যেত। রাত আটটার পর কিনতে গেলে অন্তত এক কাপ চা খেতেই হ'ত। ইংল্যাণ্ডে যে কেউ ইচ্ছে মতো সিগারেট বেচতে পারে না—যখন তখন তো নয়ই। আর আমি যখনকার কথা বলছি, তখন ইচ্ছে মতো ব্র্যাণ্ডও পাওয়া যেত না। প্লেয়ার্স সিগারেট সবাই পছন্দ করত কিন্তু দোকানদারের কাছে সমস্ত সময় তা পাওয়া যেত না—কেবলমাত্র মণি পালিত বরাবর প্লেয়ার্স সিগারেট কিনতেন। তিনি বলতেন, কৌশল জানা প্রয়োজন। কিন্তু কি সে কৌশল, তা কখনো প্রকাশ ক'রতেন না। আমাদের মণিদা খুব হিসেব ক'রে চ'লতেন। এই সময় লণ্ডন ট্র্যানস্‌পোর্ট সিদ্ধান্ত করলো ভাড়া বাড়াবে কোনো কোনো টিকিটের। টিউবের সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক টিকিট পাওয়া যায়। ত্রৈমাসিক টিকিট কেনাটা সবচেয়ে লাভজনক। মণি দা বরাবরই সাপ্তাহিক টিকিট কিনতেন, কিন্তু ভাড়া বেড়ে যাবার আগের দিন একেবারে তিন মাসের টিকিট কিনে ফেললেন। সবাইকে বললেন কথাটা। সবাই মণিদার বুদ্ধিতে আশ্চর্য হ'য়ে গেল। কিন্তু হিসেবে একটু ভুল হ'য়েছিল। মণিদার টিকিট ছিল পিকাডিলি পর্যন্ত। ভাড়া সাড়ে ছ পেনি (দূরত্ব তিন মাইলের কাছাকাছি) কিন্তু সেবারে লণ্ডন ট্র্যানস্‌পোর্ট যেমন ভাড়া বাড়িয়েছিল—দেড় পেনির টিকিট দু পেনি হ'য়েছিল, আড়াই পেনির টিকিট তিন পেনি হ'য়েছিল, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে সাড়ে ছ পেনির টিকিটের দাম বাড়ানো হয়নি, কমিয়ে ছ পেনি করা হ'য়েছিল। মণিদা, আমাদের যতদূর ধারণা ঐ একবারই ঠকেছিলেন।

রোজ একরকম খাদ্য খেতাম; বিকেলে হাইড পার্কে যেতাম শনি রবিবার, চারদিন সন্ধ্যেবেলা স্কুলে যেতাম, আর সপ্তাহে একদিন কেবল সময় পাওয়া যেত যা ইচ্ছে করবার। আমরা সেদিন সিনেমা দেখতাম।

এই সময়কার ডায়েরী থেকে একটি রবিবারের ঘটনা তুলে দিচ্ছি তারিখ আঠারোই মে ১৯৫২ সাল:

"সকালে বেশ দেরি হ'ল ঘুম ভাঙতে। সেই পুরোনো সকাল—আর সেই পুরোনো ব্রেকফাষ্ট—ডিম, টোষ্ট আর কর্ণফ্লেকের সংগে খানিক দুধ, তারপর চা—চিনিহীন। মাসে দু পাউণ্ড বরাদ্দের একটু চিনিও অবশিষ্ট আর নেই—বহুদিন হল তা ফুরিয়েছে, আর সাতদিনের আগে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। খবরের কাগজ আজ আসেনি। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েন রবিবারে বেরোয় না। টেবিলে আজ মিঃ সালিকের সংগে আলাপ হল, এদেশে এসেছে অর্থনীতি পড়তে। আজ সে কোথাও বেরোবে না। আজকের এমন চমৎকার রোদ তার মন ভোলাবে না একটুও।

"নিশীথের ঘরে গেলাম—সে তখনও ঘুমুচ্ছিল। ওকে ডেকে তুলে রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা করলাম—আর আলোচনা

করলাম বাইরের রোদ্দুর সম্পর্কে। গত পোনের দিন স্নান করা হয়নি, অতএব চট করে স্নান করে নিলাম। গ্যাস মিটারে পাঁচটি পেনি ফেললাম, এবং খুব সাবধানে পাইলট লাইটটি জ্বাললাম। কারণ আমাদের গ্যাসের কলটিতে কিছু ত্রুটি আছে আর প্রায়ই বিস্ফোরণ হয়।

"লাঞ্চ খেলাম বেলা একটায়। সেই সাধারণত যা খাই একই প্রেসড বীফ, আলু সেদ্ধ আর অল্প চারটে ভাত—এ ছাড়া টেবিলে রুটি আর মার্গারিণও ছিল। খাবারের স্বাদ খুব খারাপ—নেহাৎ বেজায় খিদে পেয়েছিল বলেই খেতে পারলাম। তা ছাড়া খাবার খেতে খারাপ হলেও এর মধ্যে খাবারের সমস্ত গুণই ছিল—তাই আর সে নিয়ে বিশেষ অভিযোগ করলাম না।

"অ্যাটম বোমা সম্পর্ক একটি আমেরিকান পুস্তিকা পড়তে সুরু করলাম লাঞ্চের পর—তারপর Picture Post এর একটি প্রবন্ধ পড়লাম হরোর কমিক সম্পর্কে বেশ সুন্দর লেখাটি। এর পরে ঘুম এসেই যেত যদিনা কানুনগো এসে আমাকে ডেকে তুলতো। ও বললো হাইড পার্কে গিয়ে ওখানকার সার্পেন্টাইনে একটি বোট ভাড়া করে ঘোরা যাক। রাজি হয়ে গেলাম।

"অরুণকেও সংগে নিলাম। সবাই মিলে মার্বল আর্চ টিউব ষ্টেশনে নেমে মাটির তলাকার রাস্তা দিয়ে হাইড পার্কে এসে ঢুকলাম। পার্কে প্রচুর লোকজন। গত ফেব্রুয়ারীতে রাজার মৃত্যুর সময় ছাড়া এত ভীড় হাইড পার্কে আর দেখিনি।

"নানারকম লোক বক্তৃতা দিচ্ছিল, আর এক এক দল সেসব বক্তৃতা শুনছিল। বক্তৃতা কতরকমই না—রাজনৈতিক, ধর্মসম্পর্কীয় এবং আরো কত কি। লোকেরা বক্তৃতা শুনছিল সোশ্যালিষ্টদের, কমিউনিষ্টদের এবং ফ্যাসিস্টদের। তারা শুনছিল কালো লোকদের অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে বক্তৃতা। তা ছাড়া ছিল অ্যানার্কিষ্টরা। এই সমস্ত বক্তৃতা হচ্ছে—আবার এদের কাছাকাছি কিছু কম বয়সী ছেলে-মেয়েরা ক্রমাগতই গান করছিল। তাদের গানের মধ্যে কোনো ধর্ম ভাব বা রাজনৈতিক ভাব ছিল না—কেবলই আনন্দের জন্য সেগুলি তারা গাইছিল।

"আমরা ওদের অতিক্রম করে চললাম। কানুনগো আমাদের কিছুতেই সেখানে থাকতে দিল না—সে কেবলই বলতে লাগলো একটা বোট ভাড়া করা চাই আজ। আমরা মাঠ পেরিয়ে চললাম বোটের দিকে। মাঠে কত লোক শুয়ে বা বসে—আর ছোটরা কেউ খেলছে কেউ বা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে—অনেকটা কোলকাতার ঘুড়ির মতো—তবে হাইড পার্কের ঘুড়িগুলোতে ল্যাজ লাগানো আছে।

"সার্পেন্টাইনে পৌছলাম। লম্বা একটা লেক, তবে বালীগঞ্জের লেকের চাইতে ছোট। প্রচুর বোট তাতে এক, দুই, তিন এবং চার জনকে বসে থাকতে দেখলাম। একটি বোটও পেলাম না আমরা। বিরাট কিউ হয়েছে বোট নেবার জন্য। অরুণ বললো, আমাদের আগেই আসা উচিত ছিল। কানুনগো বললো, সে আগেই জানতো এমনটি হবে। কিন্তু সে বলেনি সে সম্পর্কে একটি কথা। সমস্যা হল, করি কি?

"অরুণ বললো সিনেমায় গেলে হয়। কানুনগো বললো হাইড পার্কে হাঁটা বা দৌড়ানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। আমি বললাম, চলো পার্কের বক্তৃতা শুনিগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অরুণের জিত হ'ল। আমরা সস্তা একটি সিনেমা হল খুঁজে বার করলাম আর খুব খারাপ দুটি ফিল্ম দেখে বাড়ী ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম।"

হাইড পার্কের বক্তৃতা শুনলে আশ্চর্য হ'য়ে যেতে হয় একটি জাত কতখানি পরমতসহিষ্ণু হ'তে পারে। একজন লোক কতখানি স্বাধীন মত প্রকাশ করতে পারে। অবশ্য হাইড পার্কের ইতিহাস বরাবর শান্তিপূর্ণ ছিল না। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে শোভাযাত্রাকারীদের উপর পুলিশ গুলী চালায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সেই শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন উইলিয়াম মরিস। এই শোভাযাত্রায় ছিলেন তরুণ বার্ণার্ড শ'। গুলীর আওয়াজ হতেই বার্ণার্ড শ' দৌড়ে পালাচ্ছিলেন। এক বন্ধু বললেন, কাপুরুষ! তুমি পালাচ্ছ? বার্ণার্ড শ' উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ পালাচ্ছি, চিরকালের মতো মরে থাকার চাইতে একবারের জন্য কাপুরুষ হওয়া অনেক ভালো। এই হাইড পার্কে শুনলাম, আমাদের পরিচিত একটি ছেলে কিছুদিন আগে বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছিল। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না কিন্তু সবাই মজা করে হাততালি দিচ্ছিল। এই ছেলেটি ব্যারিষ্টারী পড়ত, তাই যাতে সে ভাল বক্তৃতা দিতে পারে ঘাবড়ে না গিয়ে সে জন্য মাঝে মাঝে হাইড পার্কে এসে বক্তৃতা দিত। কোনদিন বাংলায় ইংরেজদের যথেষ্ট গালাগাল করতো—এমন হাসি হাসি মুখ ক'রে যেন সে খুব মজার কথা বলছে। সে বলতো, জোচ্চোরা, মূর্খ তোমরা সব—শালা বদমায়েস, তোমাদের দেশ কচুরও অধম। একদিন একজন বয়স্ক ইংরেজ বক্তৃতার পর আমাদের বন্ধুকে বললো, ভাই আমি তোমার একজন ভক্ত হয়ে পড়েছি, তোমাকে আমি বীয়ার খাওয়াবো। আমাদের বন্ধু বলেছিল- আপনার ভুল হয়েছে—আমি এক ঘন্টা কেবল ইংরেজদের গালাগাল করেছি। ইংরেজটি বললেন, তা জানি। কারণ আমি বাঙলা জানি। প্রায় ত্রিশ বছর কোলকাতায় ছিলাম। ইংরেজদের প্রতি তোমাদের রাগের কারণ আমি বুঝি।

বাংলা-জানা ইংরেজ আমরা কিছু কিছুর সন্ধান পেয়েছি, সমস্ত সময়েই অপ্রত্যাশিত ভাবে। বাঙালীদের অভ্যেস রাস্তায়, বাসে চেঁচিয়ে বাংলায় তর্ক করা। মাঝে মাঝে খুব অবাক হয়ে গিয়েছি। একদিন আমাদের পাড়া থেকে একটু দূরে চেপষ্টাও রোডের কাছেকার রক্সি সিনেমার বাসষ্টপে দাঁড়িয়ে আছি, সম্ভবত আমি অরুণ পালিত এবং প্রশান্ত ঠাকুর। এমন সময় তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। বাংলা-জানা এক সায়েব, নাম গুডহাম। নামটা বাংলায় অনুবাদ করলেন—ভালো শুয়োর। বললেন তাঁকে বাংলায় ভালো শুয়োর বলে ডাকতে।

ভালো শুয়োরে'র বয়স ষাটের উপর। তাঁর কাহিনী বিরাট, বিশাল। একটি উপন্যাস তৈরি হতে পারে। আসামে এবং বাংলা দেশে মেডিক্যাল সার্ভিসে ছিলেন। বহুদিন অবসর গ্রহণ করেছেন, এখনও পেন্সন পান—তাতে চলে না ভালো। পিয়ানো শেখান লোকদের আর কুকুরের দৌড়ের বাজী ধরেন। তাতে তাঁর খুব কমই হার হয়। তাঁর কুকুরের দৌড়ের একটি সিষ্টেম আছে—তাতে হারা নাকি সম্ভব নয়। প্রশান্ত এবং অরুণ সম্ভবত মিষ্টার গুডহামের সংগে পড়ে দেখা করেছিল। আমি আর যাইনি সময়ের অভাবে।

এক রবিবারে সকালে তুমুল তর্ক চলেছে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে। ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে। আমাদের বাড়ীতে প্রচুর রাজনীতিতে উৎসাহী ছেলে থাকতো। একদিন দেখি ওয়াড্রোবের (Wardrobe) উপরে একগাদা পোষ্টার—তাতে সাইক্লোষ্টাইল করে বাংলায় লেখা; টেড ব্র্যামেলিকে ভোট দিন। একজন বুঝিয়ে দিল গত নির্বাচনের সময় ওগুলো ছাপানো হ'য়েছিল। কিন্তু বাংলায় কেন? শুনলাম কেবল বাংলায় নয়, ভারতীয় অনেকগুলি ভাষাতেই সেগুলি করা হ'য়েছিল এবং ডক অঞ্চলে বিলি করা হয়েছিল। ডক অঞ্চলে অনেক ভারতীয়ের বাস। যাই হ'ক আমাদের টেবিলে সমস্ত সময়ের হিসেব নিলে দেখা যেত শতকরা ৭৫ ভাগ সময় রাজনীতির আলোচনা হ'ত। এই রাজনীতি আলোচনা মণিদা বিশেষ পছন্দ করতেন না। তিনি বলতেন, রাজনীতি করতে চাও করো, কিন্তু খাবার সময় চেঁচিও না। অন্য কেউ ওরকম উপদেশে কর্ণপাত করত না। তর্ক চলতো। মাঝে মাঝে তর্ক অসহ্য থামতো। একদিন যেমন থেমেছিল।

ভয়ানক তর্কের মাঝে হঠাৎ জীবন লোকুড়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল গামছা! গামছা পরে লণ্ডনে? মণিদা বললেন, হুঁ, তাই তো বলি। আমার পরিচিত হরিপদ বাবু এলেন লণ্ডনে, এক মাঝারি হোটেলে। সকালে উঠে ঠাণ্ডা জলে চান করা অভ্যেস। চানের ঘর থেকে গামছা পরে নিজের ঘরে আসছিলেন—এই লণ্ডনেও। লণ্ডনে প্রথমতো কেউ চান করে না, চান করলেও ঠাণ্ডা জলে কেউ চান করে না—রাজনৈতিক আলোচনা স্তব্ধ। সবাই সবাই শুনতে লাগলো অধীর আগ্রহে; তখন সকাল সাড়ে ছটা সাতটা হবে। একটি পরিচারিকা ঘরে চা নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখলেন গামছা পরা হরিপদ বাবুকে। হরিপদ বাবু বেঁটে মোটা এবং কালো। তার সংগে লাল গামছা! অপরূপ সমন্বয়। পরিচারিকার প্রথমে হাত কাঁপতে থাকে। তারপর গা, তারপর সমস্ত ট্রে সমেত চায়ের সরঞ্জাম গড়িয়ে পড়ে। পরিচারিকা পরে বলে সে ভূত দেখেছিল!

উপরের ঘটনা সত্যিই ঘটেছিল কি না জানি না। তবে আমাদের বাড়ীতেই একটা 'ভূত দেখা' ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন আমাদের বাড়ীতে নতুন দুটি ছেলে এসেছে—একজন আবার ব্যানার্জি। সে হ'ল আমাদের চার নম্বর ব্যানার্জি অর্থৎ ছোট ব্যানার্জি। ছোট ব্যানার্জির সংগে এক আধ মিনিট আলাপ হ'ল, সেদিনই জাহাজ থেকে নেমেছে—তক্ষুণি কোথায় বেরিয়ে গেল কার সন্ধানে। তারপর রাত্তির দশটা পর্যন্ত সে এল না। আমরা ভাবলাম পরে আসবে—এই ভেবে শুতে গেলাম।

রাত প্রায় তিনটের সময় হঠাৎ আমার গায়ে প্রবল এক ধাক্কা। চোখ মেলে দেখি মাইকেল আর মার্টিন। কী ব্যাপার? মাইকেল কাঁপতে কাঁপতে বললো, ভূত! এ বাড়ীতে ভূত আছে! আমি বললাম, না ভূত নেই। ভূত বলে কোনো জিনিস নেই। মাইকেল ব'ললো, আমি স্পষ্ট দেখেছি। আমি বললাম, ওতে প্রমাণ হয় ভূত নয় সেটা। ভূতকে দেখা যায় না! মাইকেল রেগে বললো, ভূতের রূপ দেশে দেশে বদলায়। আমাদের দেশে ভূত দেখা যায়। আমি তখন বললাম, কৈ দেখি কোথায় তোমার ভূত? মাইকেল বললো, তেতলার সিঁড়িতে—বাথরুম থেকে আসছি, হঠাৎ দেখতে পেলাম। ঠিক যেন একটা লোক বসে রয়েছে। কালো মুখ।

আমাকে সাহস দেখাতেই হ'ল। ভারতীয় হিসেবে এবং অলৌকিক তত্ত্বে বিশ্বাস করি না, অতএব একটা লাঠি হাতে নিলাম। প্রায় অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে কাঁচ-কাঁচ আওয়াজ করতে করতে উঠছি, দেখি সত্যিই একটা লোক বসে আছে। লোকটির গায়ে ওভার কোট। হাঁটুর উপর তার দুটি হাত এবং মাথাটা তার হাতের উপর বিশ্রাম করছে। হঠাৎ ওভার কোটটিকে পরিচিত মনে হ'ল। ডাকলাম, ব্যানার্জি! মাথা তুললো সে। ঠিক ধরেছি—নয়া আমদানী ব্যানার্জি মশাই আমার দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হাসবার চেষ্টা করলেন। মাইকেল এবং মার্টিন দুজনে নেমে চলে গেল নিশ্চিন্ত হ'য়ে।

বললাম, কী ব্যাপার—সিঁড়িতে?

—আর কোথায় থাকবো বলুন?

—কেন ঘরে?

—কোন ঘরে? আমার ঘর গুলিয়ে ফেলেছি। রাত বারোটায় বাড়ীতে এসেছি, কাউকে যে জিজ্ঞেস করবো তার জো নেই—আবার ভুলে অন্যের ঘরে না যাই, তাও তো দেখতে হবে?

—তা বটে। এক কাজ করুন, এই ঘরে একটি খাট খালি আছে, এই ঘরে সাবধানে গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

—আপনি দেখিয়ে দিন।

দেখিয়ে দিলাম।

মণিদা একদিন বললেন, পোর্টোবেলো রোডের এক মাছের দোকানে ঠিক কাতলার মতো একরকম মাছ দেখে এসেছি। ওটাকে রান্না করতে হবে।

আমরা বললাম, আপনি রান্না করতে পারেন?

আমি খুব ভালো রান্না করতে পারি। কোলকাতার হোটেল হার মেনে যায় আমার রান্নার।

—তবে, এতদিন বলেননি কেন? আর রান্নাই বা করেন না কেন?

—বুঝলে ভাই, এদেশে কি আর রান্না করতে এসেছি। ভেবেছিলাম ঐ হাংগামার মধ্যে আর যাবনা! কিন্তু কাতলা মাছ দেখে আর লোভ সামলানো গেলনা। আমি মিসেস ম্যাথার্সকে বলে রাখছি রান্নাঘরটি আমাদের চাই বিকেল বেলা। শনিবার তো বিকেলে রান্না হয় না।

মণিদা একজন "অ্যাসিষ্টান্ট" নিয়ে চললেন পোর্টবেলো রোডে। যখন ফিরে এলেন তখন তাঁরা নিয়ে এলেন আলু, কপি, টোম্যাটো, চাল, চিংড়ি মাছ, মাখন আর প্রায় দুসেরি একটা কাতলা জাতীয় মাছ। ইংরিজি নাম কার্প। প্রতি পাউণ্ডের দাম আড়াই শিলিং।

মণিদা বললেন, সব সমেত খরচ হ'ল প্রায় এক পাউণ্ড। এ সপ্তাহে প্রত্যেকের চার শিলিং ক'রে খরচ পড়বে—যদি পাঁচ জন খাই আমরা। আগামী সপ্তাহে খরচ পড়বে দু আড়াই শিলিং এক একজনের।

—আগামী সপ্তাহেও রাঁধবেন?

—প্রত্যেক শনিবার রান্না করবো আমি।

সপ্তাহ পাঁচেক এমনি চলার পর মণিদা ব্লেনিম ক্রেসেণ্ট ছেড়ে সেণ্ট লুকস রোডে চলে গেলেন পাড়াতেই। সে বাড়ীর মালিকও মিসেস ম্যাথার্স।

[ক্রমশঃ।

## মারিয়া মন্তেসরী

কল্যাণী দত্ত

মন্তেসরী শিশুশিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে আমরা প্রায়ই সকলেই পরিচিত। কিন্তু তাঁর কর্মময় জীবনকথা আমাদের বেশীর ভাগেরই জানা নেই বললেই চলে। তাই আমি এখানে মন্তেসরীর জীবনকথা নিয়ে কিছু আলোচনা কোরব।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট ইতালীর 'আনকোনা' অঞ্চলে মারিয়া মন্তেসরী জন্মগ্রহণ করেন। মারিয়ার প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হয় মফঃস্বলে। বাবা ছিলেন প্রাচীনপন্থী, কাজেই শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে তিনি বাবার নিকট হতে পেয়েছিলেন বাধা আর মায়ের নিকট অনুপ্রেরণা। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর উচ্চশিক্ষার জন্ম মারিয়া এলেন রোম নগরীতে। এবার জীবনে তিনি কোন পথে চলবেন অর্থাৎ কোন পেশা গ্রহণ করবেন, তাই ভাবতে লাগলেন। বাবা-মার বাসনা, মারিয়া শিক্ষয়িত্রীর বৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু মারিয়ার সেদিকে মোটেই আকর্ষণ নেই। যে বিষয়ে নেই অনুরাগ সে কাজে নিযুক্ত হলে তা সার্থক হবার সম্ভাবনা কম। অঙ্কশাস্ত্রে মারিয়া চিরদিনই দক্ষ। তাই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বেন বলে তিনি স্থির করলেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষা করা তখন নারীদের পক্ষে খুবই দুরাশার বিষয় ছিল। তবুও বহু বাধা-বিপত্তি দূরে সরিয়ে পুরুষদের টেকনিক্যাল স্কুলে তিনি যোগ দিলেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিংও যে ভাল লাগে না। জীবতত্ত্ব জানার জন্ম মন হল আগ্রহী। কিন্তু এ ইচ্ছাও কিছুদিন বাদে গেল চলে। এর পর তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করবার জন্ম। কিন্তু তখন মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করবার দ্বারও ছিল রুদ্ধ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মারিয়াকে জানিয়ে দেন যে, কোন মেয়েকেই মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রী হিসাবে নিয়োগ করা একেবারেই অসম্ভব।

বাবার ঘোরতর আপত্তি, মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা, এত বাধা পেয়েও মারিয়া কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না।

চেষ্টা একদিন সফল হল। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার তিনি অনুমতি পেলেন। ইতালীর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম ছাত্রী তিনিই। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে কলেজে ভর্তি হয়েও তিনি শান্তি পেলেন না। কলেজের ছাত্রগণ তাঁর প্রতি নানাপ্রকার দুর্ব্যবহার করতে সুরু করল। তাদের অন্যায় ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে একাই তাঁকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ শব-ব্যবচ্ছেদ। কিন্তু এই কাজটির সময়ও এল এক মস্ত ঝামেলা। ছেলেদের সঙ্গে তাঁকে শবব্যবচ্ছেদ করতে দিতে কলেজ-কর্তৃপক্ষ অসম্মতি প্রকাশ করলেন। কারণ, একাজকে তখন নীতিবহির্ভূত বলে মনে করা হত। তাই ছাত্রদের কাজ শেষ হয়ে যাবার পর মারিয়ার কাজ সুরু হত। প্রায়শঃই তিনি রাত্রিতেই শবব্যবচ্ছেদ করবার সময় পেতেন। মৃতদেহের রাশির মধ্যে একা-একা কাজ করতে করতে এই বৃত্তির প্রতি মনে এসে গেল বিরক্তভাব। একদিন শবব্যবচ্ছেদ করবার সময়ই তিনি চলে গেলেন সব ফেলে।

চিকিৎসাশাস্ত্র আর তিনি অধ্যয়ন করবেন না। এই বৃত্তি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে একেবারে অসম্ভব! রাস্তা দিয়ে আসবার সময় তাঁর দৃষ্টি পড়ল এক ভিখারিণীর পুত্রের প্রতি। তিনি দেখলেন যে, ফেলে-দেওয়া রঙীন কাগজের টুকরো নিয়ে ছেলেটি নিবিষ্টচিত্তে খেলা করে চলেছে। ছেলেটির মনে নেই কোন দুঃখ, নেই তার মুখে কোন বিষাদের ছায়া। রঙ্গীন কাগজের টুকরোটি নিয়েই সে মহা খুসী! মারিয়া ভাবলেন যে, এত নগণ্য জিনিষটি পেয়ে ঐ শিশুটি যদি এত খুসী থাকতে পারে; তাহলে তিনিই বা কেন ডাক্তারী পড়তে পারবেন না?

মারিয়া পুনরায় ফিরে গেলেন মেডিক্যাল কলেজের শব-ব্যবচ্ছেদাগারে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারী পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। মারিয়া মন্তেসরীই ইতালীর প্রথম মহিলা-চিকিৎসক। এই গৌরব লাভ করায় ইতালীয় নারীসমাজে তিনি খুবই সম্মানজনক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিন নারী-সম্মিলনীতে ইতালীয় মহিলা সমাজের প্রতিনিধি হয়ে যোগ দেন। এর পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সম্মেলনে তিনি প্রতিনিধি হয়ে যোগদান করেছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তীর্ণ হবার পর তাঁকে রুগ্ন ও বিকৃত-মানস শিশুদের এক ক্লিনিকে সহকারী চিকিৎসকের পদে নিয়োগ করা হয়। এ সময় তাঁকে পাগলা গারদের উন্মাদদের সঙ্গে কার্য্যোপলক্ষে মেলামেশা করতে হত। এখানে তিনি দেখতে পান কতকগুলি জড়বুদ্ধি ছেলেকে। যারা উন্মাদ নয় এবং অপরাধীও নয়; কিন্তু মাত্র বুদ্ধিহীনতার অপরাধে তারা এই উন্মাদদের সঙ্গে দুর্বহ জীবন যাপন করে চলেছে!

এদের দেখে মারিয়ার মন কেঁদে উঠল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এই সব মানুষদের কি করে ভাল করা যায়। তিনি বহু পরিশ্রম করে জড়বুদ্ধি শিশুদের জন্ম একটি সরকারী স্কুল স্থাপন করান। স্কুলটির কর্তৃত্বভার দেওয়া হয় তাঁকেই। যাদের ছিল না জগতে কোন প্রয়োজন, এত কাল মানুষ নামের অযোগ্য ছিল যারা; পরে সেই সব হতভাগ্য শিশুদের অভাবনীয় উন্নতি দেখে সকলেই মুগ্ধ হল। এর মূলে ছিল ডাঃ মন্তেসরীর অদম্য আগ্রহ ও সহানুভূতি। এর পর রোমের বস্তি অঞ্চলের শিশুদের স্কুলে দায়িত্ব নেবার জন্ম মারিয়ার আমন্ত্রণ আসে। মারিয়া তাতে সাড়া দেন। ষাটটি শিশুকে নিয়ে মারিয়া স্কুলের কাজ সুরু করেন। কিন্তু শিশুরা বড়ই অবাধ্য। বাঁধাধরা নিয়মে তারা পড়াশুনা করতে চায় না, বাড়ী থেকে স্কুলে আসতে কাঁদে আর খেলাধূলা করতে খুব ভালবাসে। শিশুদের লেখাপড়ার প্রতি কি ভাবে মন বসানো যায়, ডাঃ মন্তেসরী দিবারাত্র শুধু এই বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এর ফলে তিনি শিশুশিক্ষার

এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। মন্তেসরী শিশুশিক্ষা পদ্ধতিতে নেই কোন শাসন বা হুকুম। এই প্রথার মূল কথা হচ্ছে শিশুদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশু যাতে তার শিক্ষায় আগ্রহশীল হয়ে ওঠে, সেই প্রণালীই শুধু অবলম্বন করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শুধু তদারক করেন এবং পথ দেখিয়ে চলেন!

মন্তেসরীর এই আবিষ্কার শিশুশিক্ষার জগতে এক নতুন আলোকপাত করে এবং এজন্য তিনি পৃথিবীর নানা দেশ হতে আমন্ত্রণ পান বক্তৃতা দেবার জন্য। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে আমাদের ভারতেও তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীজওহরলাল নেহরু প্রমুখ ব্যক্তিগণের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। সে সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় ইতালীর নাগরিক বলে বৃটিশ সরকার তাঁকে দেশে ফিরে যেতে দেননি। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

মারিয়া মন্তেসরী আজ বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে আজ জগতের সমস্ত শিশুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। তাই তিনি তাঁর আবিষ্কারের মধ্যেই অমর হয়ে রয়েছেন।

## আমি ছুটেছিনু 'আলোছায়া' পিছু পিছু

( I followed the Twilight—Nouguchi )

উষার আভাস কোথা যায় ভেবে ছুটিনু তাহার পাছে,
দেখি সে মিলায় দিনের প্রখর আলোয়—
প্রদোষের আলো কোথা যায়, তার খোঁজ নেব কার কাছে,
হারিয়ে গেল সে রাতের গভীর কালোয়।

কাল রাতে আমি খুসীর নেশায় কেঁদেছি গভীর সুখে,
আজ নেমে আসে বেদনাবিধুর নিশি।
একই রূপ দেখি আলোয় ছায়ায়, দেখি সুখে আর দুঃখে
একদেহে বুঝি ওরা দুটি আছে মিশি।

অনুবাদিকা—মানসী চট্টোপাধ্যায়।

## যে নদী মরুপথে

### শ্রীমতী প্রতিমা রায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের ঘটনা।

আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে বিশাল মোটরটা এগিয়ে চলেছিল লাহোরের পথ ধরে। পৌষের মাঝামাঝি। দুর্দান্ত শীতে নৈশ পৃথিবী অন্ধকারকে যেন আরো নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরেছে, তার ওপরে ঢাকা পড়েছে কুয়াশার এক ধূসর কম্বল। পেছনে সহরের আলো-উজ্জ্বলতা ক্রমেই মিলিয়ে আসছিল, শুধু সামনের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল হেড লাইটের তীব্র রশ্মি।

ড্রাইভ করছিলেন কর্ণেল নিজে। সামনের রাস্তার দিকে তাঁর দুটি প্রখর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ কিন্তু মন পিছিয়ে চলেছিল বিগত দিনের হারান পথের দিকে। কর্ণেল অর্জুন সিং চাকরীর পদমর্য্যাদা, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি যত সব কিছু চিরদিনের মত ছেড়ে ফিরে যাচ্ছেন লাহোরে—তাঁর পৈতৃক বাসগৃহে, তাঁর প্রথম যৌবনের নিভৃত নীড়ে। যেখানে এখন আর কেউ থাকে না, বৃদ্ধ এক দেওয়ান ছাড়া। সেই পরিত্যক্ত অনাদৃত ঘরে এতদিন পরে আজ আবার তাঁকে ফিরে যেতে হচ্ছে, কিন্তু কেন?

পেছনের সীটে তাঁর আদরিণী মেয়ে শকুন্তলা নরম কুশানে মাথা হেলিয়ে চোখের জল ফেলছিল নিঃশব্দে। মধুর সম্ভাবনা নিয়ে যে মুহূর্ত্তটি তার জীবনে ধরা দিতে এগিয়ে এসেছিল, অকস্মাৎ তাকে সে হারাল কেন? কি অপরাধে পেল সে এই নিষ্ঠুর দণ্ড?

চোখ বুঁজে নিদ্রার স্মরণ নিচ্ছিলেন শুধু মিসেস অর্জুন সিং। একটানা জীবনের লীলায়িত নৃত্যের তাল হঠাৎ যেন কেটে গেল, সে ভেবে আর তিনি মনকে পীড়িত করতে চাইছিলেন না; শুধু একটা খুঁতখুঁতে 'কেন'র হাত থেকে যে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন তা-ও নয়। ব্যাপারটা শুধু অভাবনীয়ই নয়, এমন একটা সময় ঘটল, যা ঠিক ও-সময় ঘটার কোন যুক্তিই তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আনন্দের সম্ভাবনায় পূর্ণ, কর্ণেলের আশু পদোন্নতির প্রত্যাশায় প্রোজ্জ্বল যে মুহূর্ত ঠিক সেই মুহূর্ত্তে।

অফিস থেকে ফিরে বিনা ভণিতায় কর্ণেল বললেন, চাকরী ছেড়ে দিলাম। লাহোরে ফিরে যাব।

অবাক চোখে চেয়ে স্ত্রী অবার্থ প্রশ্নটি করে বসলেন,—কিন্তু কেন?

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে নিস্পৃহ উত্তর দিয়েছিলেন কর্ণেল,—সারা জীবন যে চাকরীই করব, এমন শপথ কখনো গ্রহণ করেছিলাম বলে ত মনে পড়ে না?

মিসেস সিং জানতেন, এর পরে আর প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। কর্ণেলের সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত। তার থেকে তাঁকে টলানোর সাধ্য স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তারও নেই। সে-ক্ষেত্রে কারণ জানা আর না-জানা দুই সমান মিসেস সিংয়ের কাছে।

সেদিন ছিল একটি বিশেষ দিন। কমাণ্ডার-ইন-চীফ আসছেন, তারই আনুষঙ্গিক আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত। তরুণ ক্যাপ্টেন অনুপ সিং কর্ণেলের প্রিয়পাত্র। সব সময়ে সব কাজেই সে অগ্রণী! সেদিনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কর্ণেলের মনে সে যে এক গভীর সন্দেহের রেখাপাত করেছিল সেইটাই শুধু জানত না কেউ। আর্মীর গণ্ডীতে গণ্ডীতে যারা থাকত তারা জানত অনুপ সিং কর্ণেলের বিশেষ স্নেহভাজন। অথচ মিসেস সিং ও কন্যা শকুন্তলার আগ্রহ-আতিশয্য না থাকলে কোন দিনই কর্ণেল তাকে নিজের বাড়ীর ত্রিসীমানায় প্রবেশের অধিকার দিতেন না। সেই বিশেষ অনুষ্ঠানের দিনটিতে অনুপ সিং খেটেছিল সব চেয়ে বেশী আর তার ফলে সব কিছুই হয়েছিল সুষ্ঠু ও সাফল্যমণ্ডিত। কর্ণেলের মনে সেজন্য ছিল একটা কোমল কৃতজ্ঞতা। এই ছেলেটি যে একদিন আর্মীতে সব ক'টি সিঁড়ি অতিক্রম করে সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠবে তার সমস্ত লক্ষণই যেন কর্ণেল সব সময়ে তার মধ্যে দেখতে পেতেন আর এক দুরন্ত সন্দেহে মন ক্ষত-বিক্ষত হোত। সময়ে সময়ে সে যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াত, কি এক উত্তেজনায় কর্ণেল নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে নিজেকে দমন করতেন।

সেদিন উৎসব-রাত্রে যখন অনুপ সিং তন্ময় হয়ে নাচছিল শকুন্তলার সঙ্গে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কর্ণেল লক্ষ্য করছিলেন শুধু শকুন্তলাকে, তাঁর অতি আদরের একমাত্র সন্তান। তার দুটি আয়ত নেত্রে ও

রক্তিম গণ্ডে তিনি দেখতে পেলেন অতিরিক্ত আভা! যেন তার হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ হঠাৎ প্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে অন্যমনস্ক ভাবে একবার দাড়িতে হাত বুলোলেন কর্ণেল। এক বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন আজ তিনি, সে তাঁর মেয়ের সম্বন্ধে। একটা গভীর চাঞ্চল্য অনুভব করলেন নিজের মধ্যে অর্জুন সিং।

বেশী দিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হোল না। পেশোয়ারে একটা এমারজেন্সী ইউনিট পাঠাবার ব্যবস্থা সেরে বাংলোয় ফিরছিলেন সেদিন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একবার তাঁর হাসপাতালে যাওয়া দরকার। কিছুদিন ধরে পায়ের তলার কড়াটা রীতিমত কষ্ট দিচ্ছে! অল্পরেই গাড়ী এসে থামল হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে। সামনের প্রশস্ত সিঁড়িতে উঠতে যাবেন অর্জুন সিং, দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গতিও তাঁর সেখানেই স্থির হয়ে পড়ল। এক বৃদ্ধের হাত ধরে ওপর থেকে নেমে আসছেন এক মহিলা—সুশুভ্র মাথার চুল, না চেনারই কথা; কিন্তু কর্ণেল চিনলেন ঠিকই। কারণ, সেই সময় মহিলাও চোখ তুলে চাইলেন আর সেই মুহূর্ত্তেই তিনি চিনতে পারলেন। সে চোখ, সে দৃষ্টি ভোলবার নয়, ভুলতে পারেন না কর্ণেল। বহু বিনিদ্র রজনীতে, নিস্তব্ধ অন্ধকারে তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে ঐ চোখ আর ঐ মনোমোহিনী দৃষ্টি!

সে-ও কি চিনতে পেরেছে তাঁকে? হয়ত পেরেছে, হয়ত বা পারেনি। তিরিশ বছর আগের এক সুশ্রী তরুণকে আজকের এই অর্দ্ধ-পক্ক গুম্ফ-শ্মশ্রুমণ্ডিত প্রৌঢ়ত্বের আধারে যদি খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে হয়ত সেও চিনে থাকবে। কিন্তু মহিলা নেমে গেলেন অবিকৃত সৌকুমার্য্যে। সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে এসে কর্ণেলের অবাধ্য মন ফিরে চেয়ে দেখতে বাধ্য করল।

দেখলেন, অনুপ সিং অদূরে থেমেছে এসে তার টু-সীটারে। দরজা খুলে গেল, বৃদ্ধকে নিয়ে মহিলা উঠে বসলেন।

তৎক্ষণাৎ কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললেন অর্জুন সিং। প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের জন্য বহুবার জীবনে বহু প্রশংসা অর্জন করেছেন, আজও তার অভাব ঘটল না।

পরের দিন সকালে অফিসে এসেই সর্ব্বপ্রথমে নিজের পদত্যাগ-পত্র তৈরী করে ফেললেন। তারপরে ডেকে পাঠালেন অনুপ সিংকে। অনুপ সিং এসে দাঁড়াতে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকে দেখলেন অর্জুন সিং কয়েক মুহূর্ত্ত ধরে। শেষে বললেন—বিশেষ জরুরী একটা চিঠি নিয়ে তোমাকে আজই যেতে হবে দিল্লীতে। একাজের জন্য তোমাকেই উপযুক্ত বলে মনে করেছি। আজ রাত্রের মেলে তুমি যাবে।

আদেশ অমান্য হবে না জানাল অনুপ সিং। এবার সে যেতে পারে কি না ভাবছে যখন, অর্জুন সিং জিগ্যেস করলেন—খাস বাড়ী কোথায় তোমার?

বুন্দেলখণ্ডে।

আর কে আছেন?

মা আর দাদামশায়।

কাল তুমি হাসপাতালে গিয়েছিলে তাঁদের আনতে বোধ হয়? তাঁরা কি এখানেই থাকেন?

সম্প্রতি এসেছেন।

আর তোমার বাবা? কোথায় তিনি? কি নাম? অর্জুন সিংয়ের প্রখর চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলছে, জ্বলে-যাওয়া প্রদীপের শেষ শিখার মত!

সর্দার সুজন সিং। তিনি আমার জন্মের আগেই স্বর্গে গেছেন। স্থির, নিষ্কম্প, জ্যোতির্ময় দৃষ্টি অনুপ সিংয়ের, যেন স্বর্গের আলো এসে পড়েছে তার দুই চোখে। নিবে গেল চোখ অর্জুন সিংয়ের। জীবনে এই প্রথম নিষ্প্রভ হলেন; জড়িয়ে এল গলার স্বর!

আচ্ছা তাহলে আজকের রাত্রেই—সসম্ভ্রমে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে অনুপ সিং কক্ষ ত্যাগ করল।

* * * *

কি হবে সুজন?

ভীরু গলায় জিগেস করেছিল একদিন একটি মেয়ে, কেনালের ধারে আবছা অন্ধকারে বসে।

ভয় নেই তোমার। আজকেই আমি সুখবর এনে দেব।

কিন্তু সুজন, তোমরা ধনী! তায় তুমি তাঁদের একমাত্র সন্তান, যদি না মত দেন—কি হবে আমার—সন্দেহে আবিল হয়ে ওঠে স্বর।

এত অবিশ্বাস? সুজন সিং কোন দিন কথার খেলাপ করেনি, প্রেম, আর তাই সে করবে কি না তোমার কাছে? মা বাপের একমাত্র সন্তান বলেই ত আমার জোর বেশী, তুমি ভয় পেও না কিছু।

বড় গলায় বলে এসেছিল বটে, কিন্তু ভুল করেছিল সুজন সিং। স্নেহেরও যে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে তা সে জানত না। মা-বাপের নিজস্ব দাবীর কাছে তাঁরা ছেলের দাবী মানলেন না।

বললেন—অসম্ভব, তা হয় না। খানদানী ঘরে তোমার বিয়ে ঠিক করে রেখেছি।

সুজন ক্ষেপে গেল। আগুন হয়ে ছুটল ক্রোধে, উত্তেজনায় রাতের অন্ধকারে পথ ধরে। প্রেমকে সে বলে আসবে মা-বাপের মত না পেলে কিছু যায়-আসে না তার। ভালবাসবার আগে সে ত তাঁদের মত নিতে যায়নি, কাজেই এখন মত চাইতে যাওয়াই তার ভুল হয়েছে। প্রেমকে নিয়ে সে দেশত্যাগী হবে।

নিভৃতে দেখা করে আদরে, আশ্বাসে শান্ত করে সেদিন সুজন ঘরে ফিরে এসেছিল। কিন্তু পরের দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গিয়ে সে দেখলে, গভীর দুঃখই শুধু তার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে; প্রেম নেই, কেউ নেই সেখানে,—শূন্য বাড়ীর রুদ্ধ দরজায় নির্বাক তালা ঝুলছে।

প্রথমটা হতচকিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি সেদিন সুজন সিং। কেন সে আগের রাত্রেই চলে গেল না প্রেমকে নিয়ে? কেন সে এ সুযোগ দিল তাকে? টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করবার জন্যই সে একটা দিন নিয়েছিল কিন্তু প্রেম তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। ক্ষতবিক্ষত মনে তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিঁধছিল সে ব্যথা। আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল সে। মা-বাপের প্রতি বিতৃষ্ণায়, আক্রোশে সে-ও সে রাত্রে গৃহত্যাগী হোল। ত্যাগ করে গেল সমস্ত সম্বন্ধ আর তার সঙ্গে পিতৃদত্ত নামটাও। মাতামহীর রাখা অর্জুন সিং নামই সেদিন সে গ্রহণ করল একমাত্র নামরূপে।

মেয়ের হতাশ, বিষণ্ণ মুখের দিকে চাইতে পারছিলেন না অর্জুন সিং। তিরিশ বছর আগের রিক্ত বেদনা নতুন করে তীব্র হয়ে উঠেছিল তাঁর হৃদয়ে।

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে গাড়ী, আর রুদ্ধশ্বাসে ভাবছেন অর্জুন সিং। সামনে নিথর একটানা কালো পথ—কিন্তু এ ছাড়া কি আর অন্য পথ ছিল? ছিল শুধু অনন্ত খাদ—অতলস্পর্শী—হিমেল হাওয়াতেও স্বেদবিন্দু ফুটে উঠল কর্ণেলের কপালে!

## ফাঁকি

### গীতা গুহ

আমার নিঃসঙ্গ জীবনের তিরিশটা বছর কেটে গেছে। অবশ্য নিঃসঙ্গ বললে অনেকেই হয়ত আপত্তি জানাবে। কারণ, খুব ছোটবেলা থেকেই আমার চারিপাশে সংগী ছিল অনেক। কিন্তু তবুও আমি নিঃসংগ। হয়ত সকলকেই ভালবাসতে হোত বলে কারুকে আপন করতে পারিনি। কিম্বা আমার মনটাকে এমন গড়েছিলেন বিধাতা, যে জীবনের সব কিছুকেই ছুঁয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু গ্রহণ করতে পারেনি। জীবনে আমার এত বেশী ঘটনা ঘটেছে, এত রাশি রাশি অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে যে, তা লিখতে বসলে হয়ত বা একটা বৃহৎ উপন্যাস সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সব কথাই আজ আমার মনে পড়ে না। কিম্বা তারা মনের এমন গহন গোপন স্থানে সঞ্চিত হয়ে আছে যে, তাদের খুঁচিয়ে বার করা আজ আর সহজ হবে না।

জীবনের তিরিশ বছর কেটে গেল। আমার কোনদিন মনে হয়নি, জীবনটা দীর্ঘ। বরঞ্চ ভাবছি, দিনগুলো যেন বড় বেশী তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে—তার গতি বড় দ্রুত। আর জীবনের এই যে নিঃসঙ্গতা, একে আমি ভালই বেসেছি। এ জনসমুদ্রের মাঝখানে থেকেও একটা ছোট্ট দ্বীপের সৃষ্টি আমি রচনা করেছি কল্পনার জালে, তা আমার গর্বের বস্তু হয়ে থাক। চারি দিকের এই বিরাট জনতার মাঝখানে থেকেও আমি তাদের আপন করিনি, তবু তাদের দূরেও চলে যেতে বলিনি—বরং তাদের আমি কাছেই টেনে এনেছি। চারিদিকের এই বিরাট জনতার মাঝখানে থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে গেছি পর পর। মাঝে মাঝে অবশ্য আমার বিশেষ কোন বন্ধু-বান্ধবের কাছে শুনতে হয়েছে, আমি ভণ্ড। আমি তখন হেসেছি, গর্বিত বলে তারা ঠাট্টা করেছে। তবু দেখেছি, এরা আমাকে ভালবেসেছে, আমার সুখ-দুঃখের ভাগ

নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আমিও তাদের খুব কাছে সরে গেছি, তবু কোন বন্ধনে তারা আমায় বাঁধতে পারেনি। বড় বেশী হেসেছি, বড় বেশী কথা বলেছি; লোকে বলে, খুব কম চিন্তা করেছি। যারা যা বলেছে সহাস্য মুখে তা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করিনি। তাই বোধ হয় সকলে আমাকে এত ভাল বেসেছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আমাকে দেখেছেন করুণার চোখে। এই বিজ্ঞ ব্যক্তির দলে প্রথমেই নাম করা যেতে পারে আমার স্বামীর। তিনি নাকি সংসার সম্বন্ধে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, তাই আমার এই লঘু চাঞ্চল্যকে তাঁর পুরুষোচিত গাম্ভীর্য সহকারে সব সময়ে গ্রহণ করে এসেছেন। আমার স্বামীর এই অসীম করুণা, এই অটল গাম্ভীর্য্যটিকে অবশ্যই আমার শ্রদ্ধা করা উচিত।

জীবনের এতগুলো দিন চলে গেছে। আমার এই ঘর-সংসার, বিবাহিত জীবনও আজ একটানা স্রোতের মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের দেখা দিয়ে কেটে চলেছে দ্রুত চপল গতিতে। আজ হঠাৎ এমন 'সলিলকি' আরম্ভ করেছি কেন? অবশ্য এমন করে ভাববার প্রয়োজনটাই বা কোথায়? জীবনে কোন্ বস্তুই বা ভেবে-চিন্তে গ্রহণ করলাম? যা এসেছে তা কেবল মেনে নিয়েছি। তাই আমার কাছে কিছুই অদ্ভুত বা অসম্ভব নয়।

বিয়ের পর কয়েক দিন আত্মীয়-বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি আমার অসীম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু সৌভাগ্যটা কোন দিক থেকে এসেছে তা আজও বুঝতে পারলাম না—তবু আমি অসুখী নই, একথা জোর করেই বলতে পারি। গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তিরা বার বার জানিয়েছেন, এমন স্বামী, শ্বশুরঘর পাওয়া বহু পুণ্যের ফল। বান্ধবীদের কাছ থেকে জেনেছি, অর্থে, সম্মানে, রূপে, গুণে আমার রাজ্যে আমার স্বামী অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এসব কোন কথাই অতিরঞ্জিত নয়, মানতেই হবে আমি সৌভাগ্যবতী। অনেকের কাছেই শুনতে পাই, আমার মত একটি নির্বোধ, চপল, সংসার-অনভিজ্ঞ মেয়ের পক্ষে এমন একজন সৌম্য শান্ত সংসার-অভিজ্ঞ স্বামী লাভ পরম সৌভাগ্যের কথা। মাঝে মাঝে আমার স্বামীও আমায় এই কথাটা মনে করিয়ে দিতেন—তাই তাঁর অতি সাবধানী, অতি হিসাবী বুদ্ধি আমার সব কথাকেই সব ইচ্ছাকেই খেয়াল বলে নিঃসংকোচে এড়িয়ে চলে যায়। এ-ও কি আমার কম সৌভাগ্যের কথা? আমার মতের আবার কোন একটা মূল্য আছে? এ কথা আজ কেন, বহু বার বহু দিন আগে থেকে আমি শুনে আসছি। তবু, এ ধারণা আজও কি আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে? আমার বিবেচনাহীন বুদ্ধি সব জায়গায় কথা বলবে, সব সময় যে তার আর্জি অমনোনীত হয়ে ফিরে আসে, তাতে সে কিছুমাত্র ম্লান হয় না।

ধনিগৃহে আদরে লালিতা একমাত্র কন্যা ছিলাম আমি, অনেক দিক থেকে অনেক প্রশ্রয় পেয়েছি সেখানে। কিন্তু আমার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ, আমার বুদ্ধিকে কেউ কোন দিন সেখানেও বড় বেশী স্থান দেননি। তাঁরা সবাই কেবল আমায় স্নেহ করেছেন, ভালবেসেছেন, মনে হয় তাঁদের স্নেহ-ভালবাসার উৎসরূপে আমাকে তৈরী করাই সেখানে ছিল আমার সার্থকতা। আমার সব কিছুই তাঁদের কাছে ছিল ছেলেমানুষী। এত ভালবাসা পেয়ে, স্নেহ-মমতার কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেও আজ আমার মনে হয়, আমি যেন কারুরই আপন হতে পারিনি। সারা জীবন ধরে এমন একজনকে খুঁজেছি, যে, আমার ভাল-মন্দ দুটো দিকেরই খোঁজ পাবে—কেবল আমার হৃদয় নয়, আমার বুদ্ধি আর বিচারশক্তিকে গ্রহণ করে আমায় নেবে কাছে টেনে। আমায় সে কেবল বুদ্ধিহীনা নারীভাবে দেখবে না—আমার ব্যক্তিত্ব, আমার নারীত্বের মর্যাদাও থাকবে তার কাছে। আমার বিয়ের মাসখানেক পরে কোন বান্ধবীকে এ-কথাটা বলেছিলাম। সে তখুনি সিদ্ধান্ত করল, কোন কারণে নিশ্চয়ই স্বামীর 'পরে অভিমান করেছি।

সেদিন ওর কথা শুনে হেসে ফেলেছিলাম একটু জোরেই। বান্ধবী আমার ছেলেমানুষী সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে কত কি মন্তব্য করেছিল, তা আজ মনে নেই। যা হোক, পরাজয় স্বীকার করে এক রকম মেনে নিতে হয়েছিল, অভিমান করেছি স্বামীর 'পরে। তখন আমি ছিলাম বাপের বাড়ীতে, স্বামী ছিলেন দূরে।

তার পর স্বামী যখন এলেন, বান্ধবীটি স-কলরবে জানাল, আমার অভিমানের কথা। স্বামী কিন্তু কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না, বরং বান্ধবীর কথাই মনে মনে স্বীকার করে নিলেন। নতুন দাম্পত্য জীবনে এমন মান-অভিমান বোধ হয় স্বাভাবিক—না হওয়াই বরং অসংগত। সেই দিন রাত্রে স্বামীর ঘরে গিয়ে দেখলাম, তিনি আমার জন্যে খুব দামী একখানা জর্জেটের শাড়ী আর একজোড়া হীরের দুল কিনে রেখেছেন—হয়ত বা মান ভাঙ্গাবারই জন্যে। আমি হাসিমুখেই উপহার গ্রহণ করেছিলাম—কিন্তু সে উপহারে সজ্জিত হতে মনে হয়নি একদিনও। স্বামীও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেননি। বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন, কিম্বা নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন তিনি, স্ত্রী কি সাজে সজ্জিতা হচ্ছে, সেদিকে নজর দেবার অবসর নেই তাঁর। কেবল বন্ধু মহলে শুনেছেন, নববধূ এমন মান-অভিমান করে থাকে প্রায়ই—তখন আলতা-শাড়ী ইত্যাদি দিয়ে তার মান ভাঙ্গানো সহজ হয়। আমার স্বামী অর্থবান, তাই দামী উপহার দিয়ে অতি সহজেই স্ত্রীর মান ভাঙ্গাতে সক্ষম হতে পারবেন। সেই সহজ সরল বিশ্বাসেই স্বামী কাজ করে গেছেন, আমার বলবার কিছু নেই। সুতরাং আমি সুখী। এমন ভাবেই আমার বিবাহিত জীবনের দশটি বছর কেটেছে। স্বামী এমন কাজ করেন নি যাতে আমার হাসি-খুসীর অভাব হতে পারে।

তাই আজ এতদিন পরে যদি আমি কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে বসি তবে সে তো হবে মূর্খতা! সে কাজ আমি করব না আর অতটা চিন্তা-শক্তি বুদ্ধির কাজ আমার দ্বারা কি সম্ভব হতে পারে? এ সব অনধিকার চর্চা সকলকে হাসাবে কেবল? আচ্ছা কেউ কি আমাকে কোন দিন চিনতে পারল না? আজও কি সকলের স্নেহ আর ঔদার্য তাদের সবার কাছ থেকে আমাকে, আমার প্রকৃত স্বরূপকে আড়াল করে রেখেছে? কিম্বা, সবাই আমাকে যেমন ভাবে গ্রহণ করেছে তাই আমার প্রকৃত পরিচয়।

স্বাস্থ্যান্বেষণে এসেছি আজ কিছুদিন হল পশ্চিমের কোন ছোট সহরে। একটা কথা বলা হয়নি, মনের দিকে প্রচুর আনন্দ [illegible] করে ও শরীরটা কেন জানি আমার বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে আজ কয়েক বছর ধরে। ধনীর কন্যা আমি, স্বামীও আমার ধনবান। শরীরটাতে পূর্ব শক্তি অর্জন করতে পারি যাতে তার জন্যে চেষ্টার কোন ত্রুটি হচ্ছে না। কাজের মানুষ আমার স্বামী, তাই তিনি নিজে বড় কাছে আসতে পারেন না, কিন্তু আমার চিকিৎসা

ইত্যাদির ত্রুটি যাতে কিছুতেই না হতে পারে, সে জন্যে তাঁর ধনাগার খোলা রয়েছে সব সময়ে। এত দয়া, এত বড় কর্তব্য-জ্ঞান সহজে চোখে পড়ে না, এ কথা যদি না মানতে পারি তবে আমি অকৃতজ্ঞ। আমার স্বামীর দানের মূল্য দিতে আমি অক্ষম, এ ঋণ শোধ করা আমার সাধ্যের অতীত।

সকলের কাছ থেকে এত মমতা, এত স্নেহ পেয়েও আমি কারুকে কাছে টানতে পারলাম না, এ আমারই ত্রুটি। তাই নিজের এই অক্ষমতাকে গোপন করবার জন্যেই আমি এত হেসেছি, সকলকেই ভালবাসি, এমন অভিনয় করে চলেছি বার বার কিন্তু অভিনয় কি সত্য হয়ে যেতে পারে জীবনে? তবু সংশয় করবার আজ আর প্রয়োজন নেই, এমন ভাবেই তো আমার জীবনের সব শান্তি রক্ষা হয়ে চলেছে। অতীতের অনেক কথাই আমার জীবন থেকে মুছে গেছে, তার কোন চিহ্নই নেই বাকি। কিন্তু আজ এই রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে বার বার কেন জানি মনে হয়, কোথায় যেন রয়েছে একটা মস্ত বড় ফাঁকি! সে ফাঁকি আর পূর্ণ হবে না কোন দিন। এ সব চিন্তা মন থেকে দূর করবার কত চেষ্টা করে চলেছি। কয়েক দিন হোল আমার সঙ্গীর অভাব ঘটেছে, অপরের সংগে কথার আদান-প্রদান কমেছে, তাই মনটার ভেতর চলেছে অবিশ্রান্ত বকুনি। সকলেরই কাজ আছে, পাখীর মত আত্মীয়-স্বজনও আজকাল আর এত দূরে আসতে পারে না আমার তত্ত্বাবধানে। কিন্তু কেউ আমায় বঞ্চনা করেনি, যদি বঞ্চিত হয়েছি ভেবে আজকে দুঃখ করতে বসি, তবেই হবে পরাজয়।

মাস কয়েক আগে আমার পুরাতন বান্ধবী কণিকা এসেছিল এদিকে বেড়াতে। সে আশ্বাস দিয়ে গেছে, তার দাদা কুণালকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়িই আবার একবার আসবে। আমি তাদের প্রতীক্ষায় বসে আছি, আমার অনেক বান্ধবীর মধ্যে কণিকাও একজন। অন্য সকলের মত ওর সংগেও আমার আছে গভীর প্রীতির সম্পর্ক।

আর কুণাল? সে-ও আমার বহুদিনের পরিচিত বন্ধু। আমার বিবাহিত জীবনের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত তার বিশেষ কোন খবর রাখেনি। আমার অনেক পরিচিত ব্যক্তির মত সে-ও বোধ হয় বিস্মৃতির অতল গর্ভে ছিল লুকিয়ে। কণিকার সংগে দেখা হোত মধ্যে মধ্যে। আমি যখন ধনীর কন্যামাত্র ছিলাম, তখন কণিকার মধ্যে কোন সংকোচ দেখিনি, কিন্তু আমার পদোন্নতি হবার পর অর্থাৎ ধনীর স্ত্রী হবার সম্মান যখন পেলাম—পুরাতন বান্ধবী কণিকা দূরে চলে গেল। আমার স্বভাবই হোল, যে দূরে চলে যায় তাকে টানতে চাই না—যখন যে আমার কাছে এসেছে তাকে অবহেলা করিনি।

কণিকার জীবনের দশ বছর কেটেছে মেয়েস্কুলে শিক্ষা করার কাজে। আজীবন কুমারী থাকবার ব্রত ও গ্রহণ করল কেন? এ প্রশ্ন একদিন করেছিলাম। ও সহাস্য মুখে জানিয়েছিল, বিয়ে দেবার মত সংগতি ওর দাদার নেই। দাদা ওর থেকে মাত্র দু'বছরের বড়, আর মা-বাবাকে ওরা অল্প বয়সেই হারিয়েছিল।

কিন্তু কুণাল বিয়ে করেনি কেন? বাঙ্গালীর ছেলের বিয়ে করতে সংগতির প্রয়োজন হয় নাকি? চাকরী-জীবন আরম্ভ হলে বিয়ের

পাশপোর্ট তাদের হাতে সহজে এসে পৌঁছয়—অবশ্য সব ক্ষেত্রে চাকরীর জন্যেও বিশেষ অপেক্ষা করতে হয় না কিন্তু কণিকাকে এ প্রশ্ন আমার কোন দিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। ইচ্ছা আছে, কুণালের সংগে সত্যি যদি আবার দেখা হয় তাকেই এ প্রশ্ন করব।

কণিকার সংগে কবে, কি ভাবে আমার পরিচয় হয়েছিল তা আজ ভাল ক'রে মনে পড়ে না। আমার অবস্থার সংগে ওর অবস্থার পার্থক্য ছিল গভীর! কিন্তু তার জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের বাধা সৃষ্টি হয়নি। ওর বাড়ীতে ছিল আমাদের অবারিত দ্বার। ওকে আমার খুব ভাল লেগেছিল, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভাল লাগত কুণালকে। আমি বেশ জানি, ধনীর দুলালী আমাকে কুণাল সব সময়ে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত। যদিও সকলের কাছ থেকে ভালবাসা আর যত্ন পেয়ে আমার মনটা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল, তবু আমার প্রতি কুণালের এই যে অবহেলা, এটাই আমার তার প্রতি আকর্ষণকে বাড়িয়ে তুলেছিল! আমি বার বার তার কাছে গিয়ে আমার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছিলাম সেদিন, কোন সংকোচ লজ্জা আমার ছিল না। কণিকার কাছে আমার এ ব্যবহার হয়ত বা ছেলেমানুষীরই নামান্তর ছিল—কিন্তু কুণাল কি ভাবত তখন? আমার জীবনে এত মানুষ এসেছে, কত মানুষ বিদায় নিয়েছে! আমি জানি, একমাত্র কুণাল বুঝেছিল কেবল চপলতা আর অধীরতাই আমার প্রকৃতির সত্য রূপ নয়। তবু কুণাল ভীরু, আমার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা দেবার সাহস তার ছিল না। আমার ব্যক্তিত্ব? স্বামী শুনলে, কতই না হাসবেন!

আস্তে আস্তে আমি জানলাম, কুণাল সত্যি আমাকে অবহেলা করে না—সে-ও আমাকে চায়। আমার আকর্ষণের মূল্য তার কাছে আছে বৈ কি! তবু সে থাকতে চায় দূরে। হয়ত সে-ও মনে মনে সন্দেহ করে, আমার মত মেয়ের হৃদয়ের অনুভূতির পিছনে একটা খেয়াল থাকলেও থাকতে পারে না।

একবার দারুণ টাইফয়েড হয়েছিল কুণালের। ওর অসুখের সময় আমি বার কয়েক গিয়েছিলাম ওদের বাড়ীতে। সেবা-শুশ্রূষা করবার শিক্ষা আমার নেই, ও সব আমি পারিও না—তবু কণিকার অবিশ্রান্ত সেবা দেখে আমার যেন কেমন মনে হোত। আর কুণালের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চেয়ে বড় ব্যথা পেতাম। আমার ইচ্ছে হত ওর খুব কাছে গিয়ে কণিকার কর্মভার কিছু লাঘব করি। কিন্তু এমন দুঃসাহসের কাজ করেছি আমি, এত বড় একটা রোগীর পাশে বসেছি, এ খবর পেলে বাড়ীতে সকলে যে হতচেতন হয়ে পড়বেন! কেবল একদিনের জন্যে আমি আমার ভয় ভাবনা ঝেড়ে ফেলেছিলাম—সে মাত্র একটি দিন!

কুণাল তখন প্রায় ভাল হয়ে এসেছে, কণিকা কোন কাজে গেছে বাড়ীর বাইরে। আমি গিয়েছিলাম ওদের বাড়ী, কুণাল একা বিছানায় শুয়েছিল চুপচাপ। আমার জানা ছিল না কণিকা বাড়ী নেই। মনে হয়, কণিকার কথা তখন ভাবিনি কিছু।

কুণালের শীর্ণ সুন্দর মুখটার দিকে চেয়ে আমি কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলাম—আমার সেদিনকার ভাবকে ব্যক্ত করা আজ কেন, কোন দিনই সম্ভব হবে না। এমন অপূর্ব অনুভূতি আমার মনে কোন দিন জাগেনি। কি ভেবেছিলাম তখন জানি না; হয়ত কিছু না ভেবেই, আমি গিয়ে আমার ডান হাতখানা রেখেছিলাম কুণালের কপালে। আমার বেশ মনে আছে, কুণাল একটুও চমকে ওঠেনি—ও কি আমায় দেখতে পেয়েছিল আগে? বোধ হয় না। কুণালের চোখ বোজা ছিল। কিন্তু সে ধীরে ধীরে আমার হাতটাতে একটু চাপ দিয়ে ডাকল, রত্না, তুমি!

এবার আমি চমকে উঠেছিলাম; হাতটা আমার কাঁপছিল থর-থর করে, আজও আমি বিশেষ চেষ্টা না করে সেদিনের কথা মনে আনতে পারি। কুণাল অতি সহজ ভাবে বলল, আমি জানতাম আজ তুমি আসবে। আমার কাছে আসতে তুমি সংকুচিত হবে না এমন পরিষ্কার ভাবে এর আগে সে আমার সংগে কথা বলেনি। কিন্তু চঞ্চলা, চপলা, বুদ্ধিহীনা আমার মুখ দিয়ে সেদিন কোন কথাই বার হোল না।

এর কত দিন পর আমি শুনলাম, আমার বিয়ের সব ঠিক হয়েছে। মেয়ের বিয়ে দেওয়া মা-বাবার কর্তব্য—এর জন্যে মেয়ের মতামত নেবার বিশেষ কোন প্রয়োজন থাকে না। অবশ্য বেশী ক্ষেত্রেই মত নিলে দেখা যায়—সম্মতির অভাব নেই। আর আমার মত ছেলেমানুষের আবার মত নেবে কি? তাই ভাল ঘর দেখে, ধনবান পাত্র দেখে মা-বাবা আমার বিয়ে স্থির করে তাঁদের কর্তব্যই সম্পাদন করেছিলেন। আমার বিয়ে, এমন কথা শুনেছিলাম বাড়ীতে কয়েক দিন ধরে, বিশেষ আমল দিইনি। আমার considerate স্বামী আমার ফটো দেখে আর বাবার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ নিয়েই বাবার একমাত্র কন্যাকে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। তাই মেয়েদেখা নামক যে বিরাট পর্ব চলে আসছে আমাদের সমাজে, তা থেকে আমি মুক্তি পেয়েছিলাম। আমার আশীর্বাদের ঠিক আগের দিন জানলাম, আমার বিয়ের পাকা কথা। কথাটা শুনেই আমি চলে গিয়েছিলাম কণিকাদের বাড়ী। সেদিনও কণিকা বাড়ী ছিল না। হয়ত ও বাড়ী থাকলেও আমি ওকে অনায়াসে এড়িয়ে কুণালের সংগে দেখা করতাম। আমার বিয়ের সংবাদ শুনেই কেন মনে হয়েছিল, আজ আমার কুণালকে বড় প্রয়োজন।

অন্য দিনের মত আজও আমি সহজ ভাবে কুণালের ঘরে এসে ঢুকলাম। কুণাল একাই বসেছিল। আমি কোন ভূমিকা না করে বললাম, আমার বিয়ে, তুমি কি এ বিয়ে বন্ধ করতে পারবে কুণাল?

আজকে কুণালের অবাক হবার পালা, প্রথমে সে কিন্তু আমার কথা বুঝতেই পারল না!

আমি অধীর ভাবে বললাম, শুনতে পেলে না তুমি, আমার বিয়ে, বুঝেছ? তুমি আমায় কথা দিতে পারবে—এ বিয়ে যদি আমি বন্ধ করতে পারি, তার জন্যে যে অসম্মানটা ভোগ করতে হবে আমাকে, তার কিছুটা অংশ নেবে তুমি? বল, তুমি কি তা পারবে?

কুণাল কি সেদিন ভেবেছিল, এ-ও আমার ছেলেমানুষী? না, কুণাল সেদিন আমাকে কিছুটা বুঝেছিল—সে কথা আমি অস্বীকার করব না। কুণাল এবার মুখ তুলে চাইল আমার দিকে—কুণালের সংগে আমার প্রীতির সম্পর্ক বহুদিনের—কিন্তু তা কি এত গভীর! আমি তো সামান্য একটা মেয়ে—এত বড় দুঃসাহস এল কোথা থেকে? কুণাল এবার ধীর ভাবে বলল, এ সব কি বলছ তুমি রত্না? আমি তখনও হেসেছিলাম। এত বড় উত্তেজনায়

কুয়াভালুম ( দক্ষিণ-ভারত )

—মানবচন্দ্র মিত্র

নেশা

—দিলীপ রায়

চা-বাগান

—সুধাবিন্দু বিশ্বাস

ওরা কাজ করে

—রমেন বাগচী

গান্ধী-ঘাট ( কুমারিকা অন্তরীপ )

—সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়

গোধূলিবেলায় —রামকিঙ্কর সিংহ
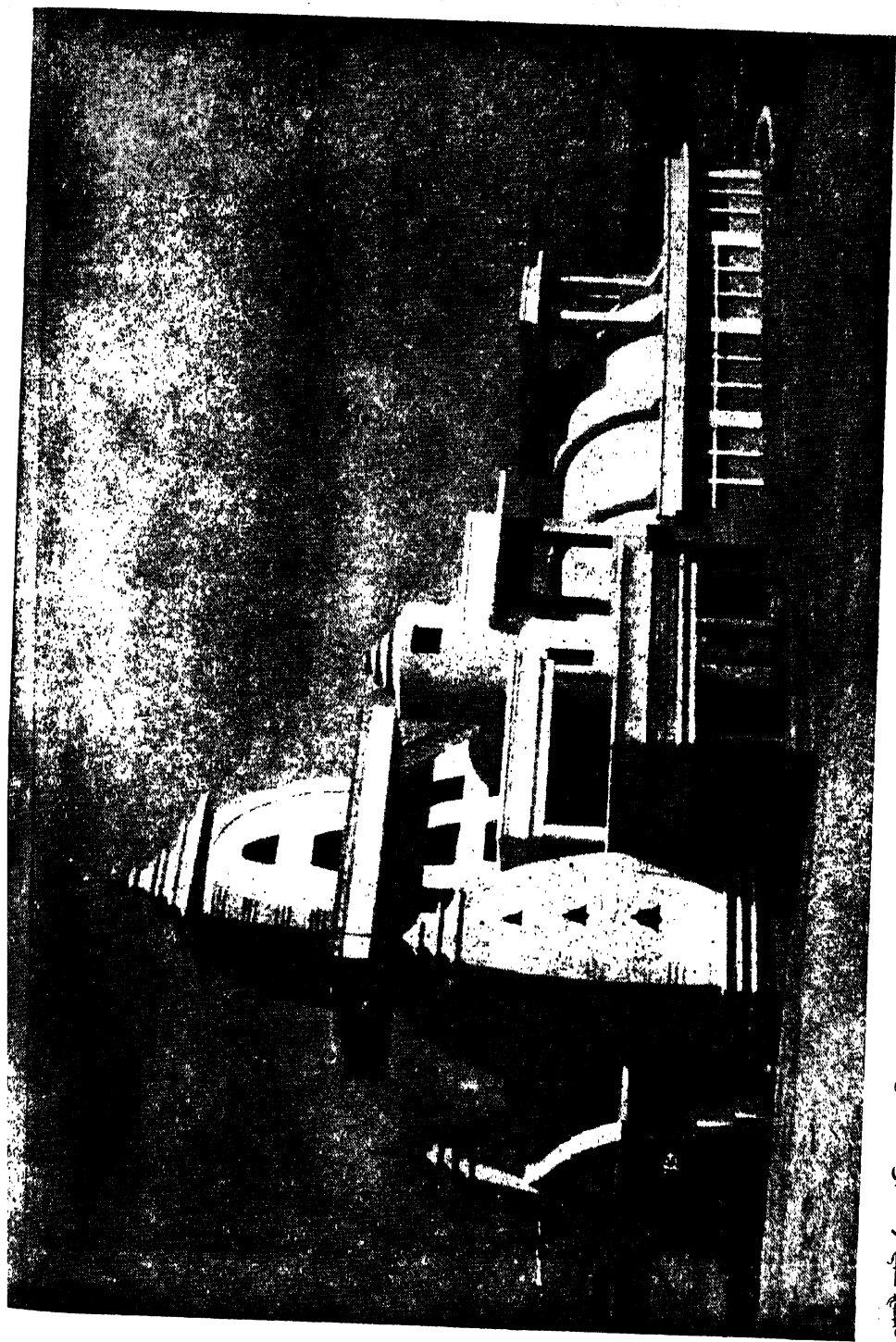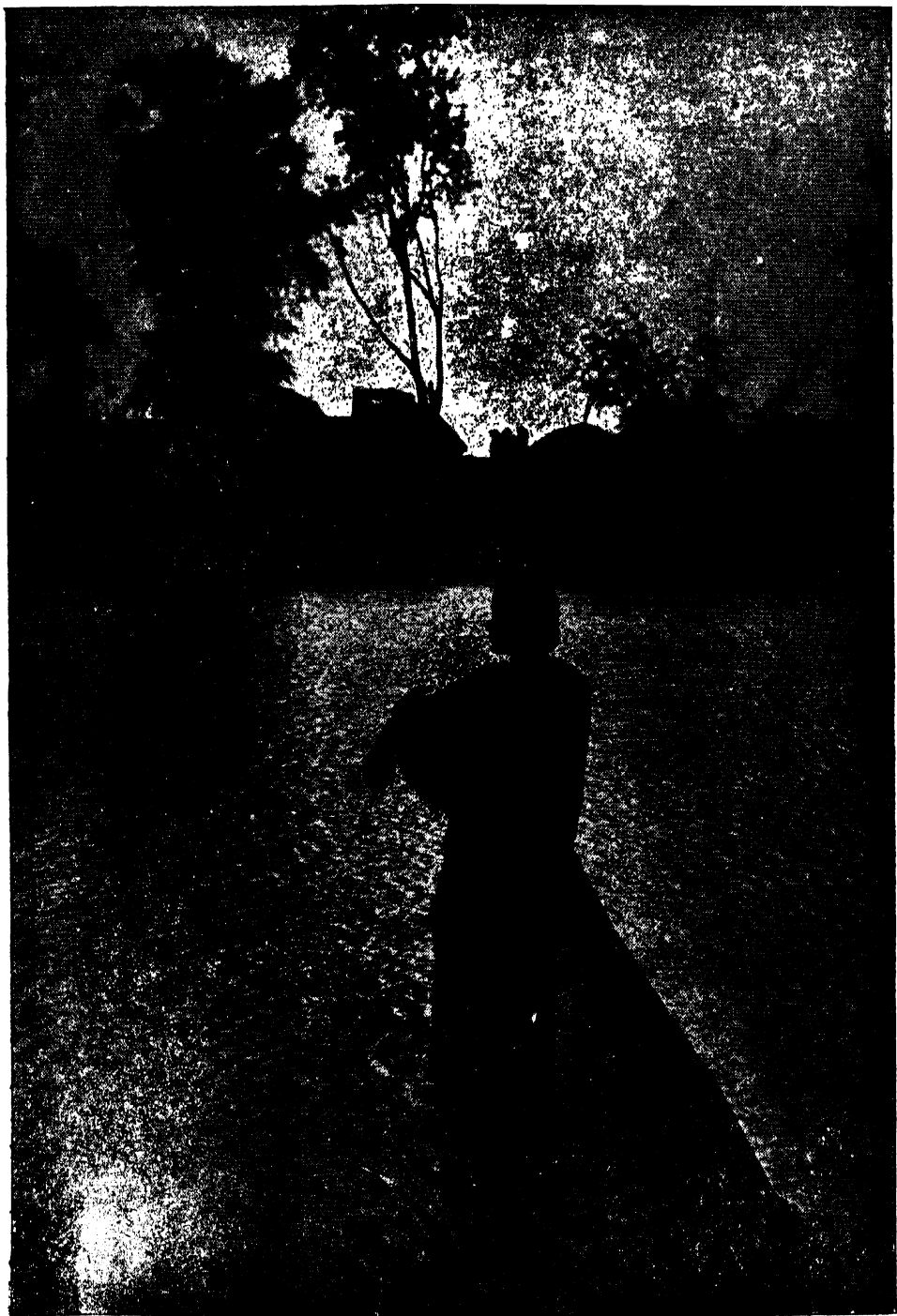
আমার হাসি বন্ধ হয়নি, বললাম, অতি সহজ ভাষায় কথা বলছি, তাও তুমি বুঝলে না ? কিম্বা বুঝেও আজ বুঝতে পারছ না ?

আমি এর পর আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম, কুণাল মাথা নীচু করে বসেছিল। এবার আমি ধীর পদে বেরিয়ে এলাম—আমার উৎসাহ থেমে গিয়েছিল, হাসি বন্ধ হয়েছিল। পথে নেমে এসে শুনতে পেলাম, কুণালের ক্ষীণ আহ্বান। কিন্তু আমি আর দাঁড়াইনি।

পরদিন নির্বিঘ্নে আমার আশীর্বাদ সারা হল, কোন আপত্তি করিনি। মুখে আমার আবার হাসি ফুটেছিল, কিন্তু খুসী হয়েছিলাম কি ?

কণিকাদের বাড়ীতে আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে আমি নিজেই গিয়েছিলাম। কত হেসেই সেদিন কুণাল আর কণিকার সংগে গল্প করে এলাম। কিন্তু কুণাল একটা কথাও বলেনি, কেমন যেন অদ্ভুত বিমনা হয়ে পড়েছিল ও।

আমার বিয়েতে কণিকা এসেছিল, কুণাল এল না। ও আসবে না তা জানতাম। সেই যে কুণালকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছিলাম আমি, তারপর ওর সংগে আমার এই দীর্ঘ দশ বছরে আর একদিনও দেখা হয়নি। আমি কয়েক বার গেছি কণিকার সংগে দেখা করতে, কিন্তু কুণাল দেখা করেনি।

আজ এত দিন পরে রোগশয্যায় শুয়ে আমি কণিকাকে চিঠি দিয়েছিলাম—কণিকা তাই এসেছিল। আমার রোগজীর্ণ দেহের দিকে তাকিয়ে কণিকা সেদিন যাবার আগে সহসা বলেছিল, রত্না, আমি আবার আসব তোর কাছে। এবার দাদাকে নিয়ে আসব ভাই! আমি অকারণেই হেসে উঠেছিলাম।

কিন্তু কণিকা চলে যাবার পর থেকে দিন গুণছি, কুণাল আর কণিকা কবে আসবে ? আজকে কণিকার চিঠি এসেছে, ও আসতে পারবে না—কিন্তু কুণাল আসবে।

চিঠিটা পেয়ে আমি খুসীই হয়েছি। কণিকা আসবে না এ সংবাদ কেমন যেন একটা মুক্তির আনন্দ নিয়ে এসেছে, কুণাল আসবে একা। যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আমি আক্রান্ত হয়েছি তা থেকে মুক্তি নেই কোন দিন, এ খবর জানা আছে আমার। এই হাসিতে খুসীতে ভরা চিরপরিচিত পৃথিবীর কাছ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হবে খুব তাড়াতাড়িই। এমন দিনে আমার পুরাতন বন্ধু কুণালকে একা পাব আমার রোগশয্যায়, একথা ভাবতে বড় আনন্দ হচ্ছে। আমি জানি, আমার কর্মব্যস্ত, বুদ্ধিমান স্বামী এ সংবাদ শুনলেও কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করবেন না। এই রুগ্না স্ত্রীর প্রতি তাঁর আছে অসীম করুণা।

কাল সকালে কুণাল এসে পৌঁছাবে এখানে। ভারি আনন্দ হচ্ছে সেকথা মনে করে। আমার নিজের মনেই কত কথা হয়ে আছে এর মধ্যে। তাই দিন আমার যেমন দ্রুতভাবে কেটে চলে তেমন ভাবেই চলেছে। প্রতি মিনিট সেকেণ্ড যেন চলেছে ছন্দ মিলিয়ে তালে তালে নৃত্যের ভংগীতে।

আমার বহু প্রতীক্ষিত, বহু আকাঙ্ক্ষিত দিন এসেছে আজ, কুণাল এসে পৌঁছেছে। কাল রাত্রে জ্বরটা বেড়েছিল, বুকের যন্ত্রণাও অনুভব হয়েছিল—কাশির সংগে রক্তও পড়েছিল বেশ—নার্স বার বার জানিয়েছিল, আমার এখন ঘুমান উচিত। কিন্তু আনন্দে উত্তেজনায় আমার ঘুম আসেনি। আমি যে চিরকালের ছেলেমানুষ—নিজের এ শক্ত ব্যাধির সম্বন্ধেও সচেতন হবার ক্ষমতা নেই আমার! ভাল একটা স্যানিটোরিয়ামে পাঠাবার ইচ্ছা স্বামী প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আমি এই ছোট সহরটাতে থাকতে চেয়েছিলাম কয়েক দিন। ছেলেমানুষের এই অনুরোধটুকু করুণাময় কর্তব্যপরায়ণ স্বামী রেখেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

কুণাল এসে আমাকে দেখে খুব বেশী চমকে উঠেছিল। আমার দারুণ রোগের সংবাদ সে জানত, তবু বোধ হয় আমার এমন রক্তহীন বিবর্ণ মুখ দেখবার আশা সে করেনি। দীর্ঘ দশ বছর পরে দেখা হয়েছে—পুরাতন কুমারী রত্নাকে আজ খুঁজে পাবে কোথায় ? রুগ্না, বিবাহিতা রত্না কিন্তু আজও তেমনই হাস্যময়ী আছে—এ কথা আমি প্রমাণ করেছি কুণালের কাছে। কুণালের ব্যথাভরা চোখ-দুটোর দিকে চেয়ে আমার হাসি পেয়েছিল।

কুণালের টাইফয়েড যে দিন হয়েছিল, তার শয্যাপার্শ্বে আমি স্থান করে নিতে পারিনি। কিন্তু আমার এই দারুণ রোগ-শয্যার ওপর বসে পড়তে সে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করল না, হঠাৎ মনে হল, আমার বুদ্ধিমান স্বামী আর আমার ঘরে ঢোকেন না আজ-কাল।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, সামনে তো চেয়ার আছে কুণাল, আমার বিছানার ওপর বসছ কোন সাহসে ?

কুণালের মুখটা বড় বেশী ম্লান হয়ে গিয়েছিল। সে অতি মৃদু স্বরে বলল, তুমি এত দিন আমার কাছে বড় কিছু একটা চেয়েছিলে আমি জবাব দিতে পারিনি। আজকে আমি যা চাইব,

তুমি তা না দিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করো না। আমার রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলোর মধ্যে দিয়ে কুণালের সরু সরু লম্বা আঙুলগুলো চলছিল অতি ধীর ভাবে।

আমি একটু হেসে বললাম, আজকে আমার দেবার আর কিছু সেই কুণাল! তবে ভয় হয়, আমার এত কাছে থাকলে এই ভীষণ অসুখটা না দিয়ে ফেলি তোমাকে।

কুণালের মুখে কোন কথাই জোগাল না। সশব্দে হেসে আমি কুণালকে উৎফুল্ল করবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দারুণ কাশির বেগ আমাকে নিরস্ত করল।

কুণাল ব্যাকুল ভাবে আমার বুকের ওপর তার নিজের হাতটা চেপে ধরে বলল, তুমি আর কথা বল না রত্না, তুমি চুপ করে থাক। তোমাকে আর হাসতে হবে না, তুমি চুপ কর।

আমার কাশি সহজে থামতে চাইল না; কিন্তু এত যন্ত্রণার মধ্যেও কুণালের সেই অসহ্য বেদনাপূর্ণ চোখ দুটোর দিকে চেয়ে থাকতে কেমন যেন আনন্দ হচ্ছিল।

নার্স এসে জানাল, কুণালের বাইরে যাওয়া উচিত। কিন্তু সে কথা কুণালের কানেও গেল না। সে ব্যথাভরা ব্যাকুল চোখ মেলে তাকিয়েছিল আমার দিকে। সেই চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে এত যন্ত্রণার মধ্যেও আমি একটা জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম যা আমাকে জানাচ্ছিল, যে বস্তুটা আমি এত দিন খুঁজে ফিরেছি তার সন্ধান পেয়েছিলাম একদিন কুণালেরই কাছে। মৃত্যুপথযাত্রী আমার জীবনে আজ এতদিন পরে সেই কুণাল এসেছে, কিন্তু আজ আমি তাকে গ্রহণ করতে পারব না।

এত হাসি, আনন্দ-চপলতার মধ্যে যে শূন্যতা আমার জীবনে আছে, তা পূর্ণ হবার নয়। এই বিরাট শূন্যতাকে নিয়েই আমায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। তবু আমি বলতে পারব না, মনে তৃপ্তি না নিয়ে জগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছি এ অভিযোগ করা আমার অন্যায় অকৃতজ্ঞতা! কি পেলাম না তার হিসাব কষতে তো কোন দিনই বসিনি আজ; জীবনের এই শেষ দিনে কেন তা করতে গিয়ে নিজের কাছে নিজে ছোট হব?

আজ একটা বড় শুভসংবাদ এসেছে আমার কাছে। এত স্বস্তি আর তৃপ্তি আমি পাচ্ছি, তা কা'কে জানাব? খুব হাসতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু সে পথও বন্ধ। আমার স্বামী আবার বিয়ে করছেন। তিনি কর্তব্যপরায়ণ, নিজেই আমাকে তাই সংবাদটা দিয়েছেন। সান্ত্বনা জানিয়ে লিখেছেন, আমার দেখা-শোনার কোন ত্রুটিই হবে না। কিন্তু আমার রোগ তো আর সারবার নয়, তাই তিনি এতদিন অপেক্ষা করেছিলেন, আজ বুঝেছেন আমার আশা তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু আমার জন্যে তাঁর জীবনটাকে নষ্ট করবেন কি করে? তাছাড়া একটা বংশধরও নেই তাঁর, সুতরাং দ্বিতীয় বার বিয়ে ছাড়া আর কোন পথ বেছে নেবেন তিনি? অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ চিঠি। আমার স্বামী সব সময় ভেবে-চিন্তে কাজ করেন, সুতরাং আমার না খুসী হওয়া অন্যায় হবে।

কুণালকে সংবাদটা জানিয়েছিলাম; সে শুনে শুধু বলল, কি নিষ্ঠুর! জোরে হাসা আমার বারণ; তাই মৃদু হেসে তাকে শুধালাম—আমার এ রোগটা, না আমার স্বামী? কিম্বা নিজেকেই আজ নিষ্ঠুর বলে অপবাদ দিলে না তো?

এ প্রশ্নের কোন জবাব সে দিতে পারল না, কেবল কেমন এক ভাবে চাইল আমার রোগজীর্ণ পাণ্ডুর মুখের দিকে। সে দৃষ্টির সামনে আমি আজ আর হাসতে পারলাম না।

## ভাগ্য?

### রমলা দেবী

সে অনেক দিনের কথা ;—

ছোট্ট ছেলে বাপ-মা-মরা ঘুরে বেড়ায় ছন্নছাড়া,
পায় না খেতে সময় মতন ঘোরে হেথা-হোথা।
ভাইয়েরা তার কেউ দেখে না আপন করে কেউ ডাকে না,
হেলা-ফেলার খায় দুটো ভাত বেড়ায় যথা-তথা।
ছোট্ট ছেলের ছোট্ট ত্রুটি বড় হয়ে ওঠে ফুটি
মামা-মাসী দাদা-পিসির অবিরাম তর্জ্জনে।
মিষ্টি কথা কেউ বলে না স্নেহের দুয়ার কেউ খোলে না,
ছোট্ট মনে অনেক আঘাত সরমে অভিমানে।
ছোট্ট প্রাণে সয় যে আঘাত, পেল সে যে অনেক ব্যাঘাত
জীবনপথের চলার মাঝে নিত্য নব-নব।
কচি মনে কেবল ভাবে, কবে আমার সময় হবে
করে আবার সসম্মানে নতুন মানুষ হব।

এমনি করে ষোল বছর কাটল একে একে,
মামা-মাসী দাদা-পিসি বলল তারে ডেকে
"বয়স তোমার অনেক হল বসে বসে খাওয়াটা আর
দেখায় না'ক ভাল'
কাজ-কর্ম্ম কর কিছু এবার বসে বসে খাবার
সময় গেছে কেটে" বলল ডেকে ডেকে।
কাজ-কর্ম্ম কোথায় পাবে অতটুকু ছেলে,
সে কথাটা ভাবল না কেউ দিল তারে ঠেলে
কারখানার এক কুলির কাজে।
লোহা-লক্কড় নিয়ে খেটে মরে সকাল দুকুর-সাঁঝে।
এমনি করে চলল অত্যাচার কচি দেহের 'পরে,
পড়ল শেষে জ্বরে।
তবুও তারে দিল না কেউ ছুটি ধরে চুলের মুঠি
পাঠিয়ে দিল কাজে, বলল "মরি লাজে,
এই বয়সেই ফাঁকি দিতে শেখা,
না জানি কি দুঃখ আছে এর কপালে লেখা।"

তার পরেতে যা ঘটল জানে সবাই তা
পরের দিনের কাগজেতে ছাপল খবরটা।
একটি ছোট্ট খবর
নয়ক' মোটে জবর।
কারখানার এক এ্যাক্সিডেন্টে মরেছে এক কুলি,
অসাবধানে জয়েন্ট লেগে ভেঙ্গে মাথার খুলি।

এমনি করেই শেষ হয়ে যায় ছোট্ট জীবন কত,
হিসাব তাহার নাইক' জানা এই ছেলেটির মত।

## পসারিণী

### কুমারী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওগো পসারিণী, কোথা যাও তুমি
পাহাড়ী নদীর ধার দিয়ে।
তোমার মতন চলেছে নদীরা
কত কি স্মৃতির পসরা নিয়ে।

নীড় বাঁধা ছলে হয়তো বা তুমি
ভেঙেছ কতই হৃদয়ের আশা।
তোমার মতন নদীও যে হায়
ভেঙেছে কত না সুখের বাসা

পথেতে চলেছ নটিনী ছন্দে
শিথিল কবরী পড়েছে খসে।
নীল শাড়ীখানি অঙ্গে জড়ানো
থমকে তাকাও পথের শেষে॥

মাথায় তোমার কিসের পসরা
মনেতে তোমার কিসের ভীড়।
চোখেতে তোমার কিসের ইসারা
স্বপ্ন দেখছ বাঁধবে নীড়।

## ২৩শে জানুয়ারী

### মালতী সেনগুপ্তা

কৃষ্ণা রজনীর কুজঝটি-জটাজালে জননি, দেহ হোল কীর্ণ
হায় রে! নিঃশেষিত, ক্ষয়িত! অতিহীন মাতা অন্তর দুঃস্থ দীর্ণ
ক্ষয়িত জীবনী, ঘৃণিত, অবনত হয়ে আহত-মানে-খর্ব্ব
হায় দীর্ণিত, শীর্ণিত, রিক্ত দেহমন নির্জ্জিত সত্তা গর্ব্ব।
রণলাঞ্ছিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত দীনা বিত্তবিচ্যুত বঙ্গ,
শ্বেতবিজিত নিপীড়িত ধ্বস্ত জননি, বর অঙ্গ।
শতাব্দ সন্তেরি পুষ্পিত প্রাণাহুতি শুভ্র অমল শত লক্ষ,
আসিল প্রস্তুতি নায়ক অবতার সূচিত হোল শুভ পক্ষ,
চিহ্নিত লগনে উদিত যুগভানু, হোল অতীত কৃষ্ণা রাত্রি,
ধ্বনিত গম্ভীর সঙ্গীতবাণীময় "স্বাগত ওগো অভিযাত্রী"।
যৌবনদৃপ্তির নির্ভীক মনোময়, অতি উচ্ছল, উজ্জ্বলদ্যুতি,
বিশ্বের বিস্ময়ে, আনন্দে, নবক্ষণে নর-অন্তর কম্পিল স্তুতি।
পৌরুষবহ্নি দীপ্তিত শিখানলে, মত্ত অসুর হোল স্তব্ধ
মথিত আবেগ ইঙ্গিতে প্রাণে প্রাণে স্ফূর্ত্ত চেতন নব লব্ধ!
অজেয় সাধন কঠোর মহাতপে নব জাগ্রত মুক্তিমন্ত্র
বিদ্রোহী-বিপ্লবে ভুবন বিমোহিত হোল চূর্ণিত শৃঙ্খল-তন্ত্র।
সেদিন বিগত সফল মনোলোকে মুক্তিপিপাসা হোল তৃপ্ত
ধন্য জন্মভূমি, প্রণবে শ্রীময়িতা নব গৌরবে জ্যোতি দৃপ্ত।
মানসশিখরে অপূর্ব্ব ক্ষণময় উদিত আজি শুভ তিথি,
হে পার্থ-সারথি, উত্তর নরলোক পূজিছে তব মহাস্মৃতি।

## সেদিন যা বলিনি

### শ্রীমতী স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায়

চুপি চুপি একটা কথা বলি তোমায়
সেদিন তোমাকে যে বলেছিলাম না—
"আমি কারুকে ভালোবাসি না"
সেটা মিথ্যে কথা
তুমি চলে যাবার পর বুঝতে পারলাম ;
আমি ভালোবাসি,
আরও পাঁচ জনের মতই ভালোবাসি
হয়তো তার চেয়ে বেশীই ভালোবাসি
বেশী? হ্যাঁ, অনেক বেশী
তবে কা'কে সেটা আমি ঠিক জানি না
দাঁড়াও, এটাও বোধ হয় মিথ্যে হোলো,
আমি জানি—
কিন্তু তোমাকে সেদিন বলতে পারিনি
আজ বলছি, শোনো,
সে কে জানো?
সে হচ্ছে "তুমি"।

## একটুখানি

### মাধবী ভট্টাচার্য

খুব বেশী নয়, একটুখানি—
একটুখানি পেলেই আমি মানবো অনেকখানি।
একটু ক্ষণের বিভল বাসর,
একটি রাতের বিজন আসর,
দণ্ড কয়েক নিবিড় মনের নিশীথ কানাকানি—
এই নেব আর চাই না কিছু, এই তো অনেকখানি।
আর যা কিছু দিবার তাহা সংগোপনে রাখিস,
দেখলে আমার বেহায়া ভরম্ লজ্জা দিয়ে ঢাকিস।
( মুক্ত আমার দেহের পাখী শংকা যদি ভাঙ্গে! )
না হয় তারে সোহাগ ভরে
দু' কথা কোস বুকের পরে
ভুলিয়ে তারে আদর করিস মুখেতে মুখ আনি—
আর কিছু সে চায় না ও, এই তো অনেকখানি।
মোর শিথিল শয়ান দেখে যদি
তোর বক্ষতলে বহে নদী,
তুফান যদি দেখেই ফেলিস যুগল ভুরুর ফাঁকে,
ভয় পাসনে—বলছি তোকে চুম দিয়ে দিস ঝাঁকে।
মৃত্যু-শীতল মন্ত্র যদি শোনাই অবশেষে—
তুই একটু হেসে হেসে ঘোমটা দিবি টানি,
এর বেশী ও চায় না মোটে এই তো অনেকখানি।
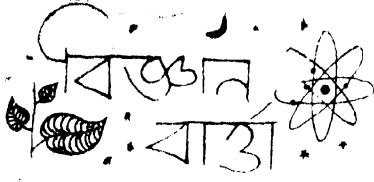
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু নব্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের পুর্নজাগরণের প্রথম ও প্রধান পথিকৃৎ। নভেম্বর মাসে বিজ্ঞানাচার্য্যের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হলো, সমগ্র ভারতবর্ষে তাই এই মহামানবের জন্মশতবার্ষিকী-পূর্তি শ্রদ্ধাসহকারে পালন করা হয়েছে। আমরা তাঁর জীবন ও কীর্তির দু'-চারকথা এখানে স্মরণ করছি।

১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর, ময়মনসিংহে জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বলে জগদীশচন্দ্রের শৈশব ও বাল্যকাল ফরিদপুরেই কাটে। ভগবানচন্দ্র বসু, একজন অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, আদর্শ চরিত্র পুরুষ ছিলেন। শতরকম কাজে ব্যস্ত থাকলেও পুত্রের বাল্যশিক্ষার দিকে তাঁর সজাগ নজর ছিল! তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে বাল্যশিক্ষালাভ করা সম্ভব হলে শিক্ষার ভিত্তি সুদৃঢ় এবং মনের গঠন সম্পূর্ণ হয়। তাই তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁর পুত্রকে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়ে না ভর্তি করে, স্থানীয় বাংলা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। এই বাংলা বিদ্যালয়ে কৃষক, জেলে প্রভৃতি সাধারণ পরিবারের ছেলেরা লেখাপড়া করতো। তাদের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের মাতৃভাষার মধ্যে দিয়ে বাল্যশিক্ষা সুরু হলো। ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় আরও বিশ্বাস করতেন যে অহঙ্কার ও পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ করে মানুষের মতো দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করলে মনের প্রসারতা বাড়ে এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে।

পিতার স্বপ্ন নিষ্ফল হয়নি, জগদীশচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা সার্থক হয়েছিলো। এই শিক্ষা থেকেই ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীর তরুণ মনে সঞ্চারিত হয়েছিলো দেশের জনসাধারণের প্রতি ভালবাসা, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ এবং দেশপ্রেম। সেই জেলে ও কৃষক-পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার ফলে, সেই অপরিণত বয়স থেকেই বিজ্ঞানাচার্য্যের প্রকৃতির সঙ্গে এক গভীর প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। প্রকৃতির সঙ্গে এই নিবিড় মিতালীই তাঁর ভবিষ্যতের কর্মধারাকে কম প্রভাবান্বিত করে নি। প্রকৃতিবোধ এবং প্রকৃতির প্রতি ভালবাসাই তাঁকে প্রকৃতির বুকে জীবনের সন্ধানের গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেছিল। বাল্যকাল থেকেই রামায়ণ আর মহাভারত, এই দুটি গ্রন্থের প্রভাব জগদীশচন্দ্রের শিশুমনে একেবারে গিয়েছিল গেঁথে,—মহাবীর কর্ণের আদর্শ চরিত্র তাঁর কাছে সবচেয়ে ভালো লাগতো।

বাংলা বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে জগদীশচন্দ্র কোলকাতার হেয়ার স্কুলে এসে ভর্তি হন তখন তাঁর বয়স মাত্র ন'বছর। কিছুদিন পরে তিনি কোলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হলেন। এখানে তিনি হোস্টেলে থাকতেন, কিন্তু হোস্টেলে আর যারা থাকতো তারা সবাই কলেজের ছাত্র। সমবয়সী কোন বন্ধু না থাকার জন্য সময় কাটান তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়লো। কি করে তিনি সময় কাটাবেন? সময় কাটাবার জন্ত ছোট্ট জগদীশচন্দ্র হোস্টেলের উঠোনের এক কোণে একটি ছোট বাগান করে তার পরিচর্য্যা করতেন। প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালবাসা এখানেও আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে জগদীশচন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজেই ভর্তি হন।

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করবার সময় জগদীশচন্দ্র এমন একজন অধ্যাপকের সংস্পর্শে আসেন, যিনি তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এই অধ্যাপকের নাম ফাদার লাফোঁ। ফাদার লাফোঁর পড়াবার ক্ষমতা ও প্রণালী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ছিল। এই শিক্ষকের শিক্ষা ও এক্সপেরিমেণ্ট করবার অসাধারণ নৈপুণ্য থেকেই জগদীশচন্দ্র তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। জগদীশচন্দ্র আসামের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে এই সময় এক কঠিন জ্বর নিয়ে ফিরে আসেন, ফলে রোগাক্রান্ত শরীর নিয়ে পড়াশুনায় অনেক বাধার সম্মুখীন হলেন। এই অসুখের জন্ত বি, এ, পরীক্ষায় বেশী কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এইবার উচ্চশিক্ষার জন্ত জগদীশচন্দ্র বিলাত যেতে মনস্থ করলেন। কিন্তু টাকা কোথায়? তাঁর পিতা বাংলাদেশে নানা রকম শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টায় ইতিমধ্যে সব অর্থই হারিয়েছেন। এখন জগদীশচন্দ্র বিদেশ যাত্রার টাকা কোথায় পাবেন? পুত্রের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করে দেবার জন্ত মা এলেন এগিয়ে, তিনি তাঁর নিজের অলঙ্কার বিক্রী করে পুত্রের উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রার পথ সুগম করে দিলেন। জগদীশচন্দ্র ইংল্যাণ্ডে গিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করতে সুরু করেন, কিন্তু তাঁর রুগ্ন শরীর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করার পরিশ্রম সহ্য করতে পারলো না। তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরের কথা বিবেচনা করে সকলে তাঁকে অন্ত কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে পরামর্শ দিল। তিনি বিজ্ঞান পড়ার জন্ত কেমব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজে ভর্তি হয়ে ন্যাচারল সায়েন্সে 'ট্রাইপোস' পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে সুরু করলেন। ক্রাইষ্ট কলেজের শিক্ষাই এই ভারতীয় বিজ্ঞানকর্মীর ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান সাধনার ভিত্তি সুদৃঢ় করে দিল। এখানে তিনি অনেক প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান। এখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালের কাছ থেকে পদার্থ-বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করেন। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে তাঁর শিক্ষক ছিলেন বিখ্যাত অধ্যাপক ফ্রান্সিস ডারুইন ও ভিনে, এবং প্রাণি-বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণের সময় মাইকেল ফষ্টার, ফ্রান্সিস ব্যালফোর প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সংস্পর্শে আসার তাঁর সৌভাগ্য হয়। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান সাধনার মধ্যে বাস্তব কর্মদক্ষতার যে পরিচয় আমরা পাই, এই বিজ্ঞানীদের শিক্ষা ও সাহচর্য্যই তার অন্যতম উৎস। জগদীশচন্দ্র কেমব্রিজের ট্রাইপোস ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস, সি, উপাধি লাভ করে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে বড়লাট লর্ড রিপণের সহায়তায় জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথমে পদার্থ-বিজ্ঞানের এক অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। এই পদ পেতেও তাঁকে কম পরিশ্রম করতে হয়নি। তাঁর ভগিনীপতি শ্রীআনন্দমোহন বসু মহাশয়ের বন্ধু অধ্যাপক ফসেট, বড়লাট লর্ড রিপণের কাছে যে পত্র লিখে দিয়েছিলেন, তার সাহায্যেই জগদীশচন্দ্র এই পদ লাভ করেছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজেই জগদীশচন্দ্রের গবেষক-জীবন সুরু হয়। এখানেই বিদ্যুৎতরঙ্গের উপর তিনি যে গবেষণা করেছিলেন, তা

বিশ্বের বিজ্ঞান-জগতে তাঁকে এক অসাধারণ মর্য্যাদার অধিকারী করে। বিদ্যুৎতরঙ্গের উপর তাঁর মহামূল্যবান গবেষণাবলীর জন্ম তাঁকে লণ্ডন বিশ্ববিত্যালয় ডি, এস, সি উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত বিজ্ঞানাচার্য্য এই প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের খ্যাতি যখন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো, তখন ভারত সরকার এই বিজ্ঞানীকে গবেষণা করবার জন্ম মাত্র ২৫০০৲ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করলেন। এই সামান্ত টাকা নিয়ে, অতি সাধারণ মিস্ত্রির সাহায্যে যন্ত্রপাতী নির্ম্মাণ করে বিজ্ঞানীকে তাঁর গবেষণা চালাতে হয়েছিলো। শত অসুবিধা, বাধা, বিপত্তি কোন কিছুই এই মহাবিজ্ঞানীর সাধনার পথচ্যুতি ঘটাতে পারেনি। ১৮৯৪ সালের ৩০শে নভেম্বর, ৩৫ বৎসরের জন্মদিনে, তিনি বিজ্ঞান সাধনার জন্ম নিজেকে উৎসর্গ করবেন বলে যে সঙ্কল্প করেছিলেন, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তা অটুট রেখে গেছেন। বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর কর্ম্মপ্রতিভার অবদানে ভারতের বিজ্ঞান চেতনার মর্য্যাদা আবার নতুন ভাবে পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি যে ভাবে তাঁর গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন, তা কেবলমাত্র জগদীশচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। ছাত্রদের পড়াবার অসংখ্য ক্লাশের বোঝা কাঁধে নিয়ে তিনি যে সামান্ত অবসর পেতেন, তাই অসাধারণ পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের সঙ্গে বিজ্ঞান গবেষণার কাজে নিয়োজিত করতে হতো।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ বিষয়ক গবেষণার দ্বারা জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সঙ্গে আলোক-তরঙ্গের সাদৃশ্য সুপ্রমাণিত করে বিখ্যাত জার্ম্মাণ বিজ্ঞানী হার্ৎসের অসমাপ্ত কাজ সুসম্পূর্ণ করেন। এই সময় তিনি কোলকাতার টাউন হলে, ৭৫ফুট দূরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সহায়তায় সঙ্কেত পাঠিয়ে বেতার যুগের সূচনার সন্ধান দেন। তিনি যে বেতার তরঙ্গের গ্রাহক-যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছিলেন, তৎকালীন বিজ্ঞান-জগতে গ্রাহক-যন্ত্রের ক্ষেত্রে তার প্রাধান্ত বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্র দ্বারা নির্ম্মিত বিদ্যুৎ-তরঙ্গের প্রেরক এবং গ্রাহক-যন্ত্রের আকার ছিল খুবই ছোট; অনায়াসে একে একটি সুটকেশে বহন করে নিয়ে গিয়ে, যে কোন স্থানেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সঙ্গে আলোক-তরঙ্গের সাদৃশ্যাবলী পরীক্ষা-মূলকভাবে দেখান যেতো।

১৮৯৬ সালে সরকার, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রকে কিছুদিনের জন্ম ইংল্যাণ্ডে পাঠান। এই সময় রয়াল ইনসটিটিউসনের শুক্রবাসরীয় সান্ধ্যবৈঠকে তিনি আলোক ও তাপ-তরঙ্গের সঙ্গে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সমধর্ম বিষয়ে যে বক্তৃতা দেন, তা ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী মহলকে মুগ্ধ করেছিল। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন স্বয়ং এই বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে দর্শক গ্যালারীতে উঠে এসে বসুপত্নীকে তাঁর স্বামীর অসাধারণ বিজ্ঞান গবেষণার জন্ম আনন্দ অভিনন্দন জানান। এর পর, সুরু হলো এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর বিজয়যাত্রা। প্যারিস, বার্লিন যেখানেই তিনি বক্তৃতা দিলেন, সেখানেই সমস্ত বিজ্ঞানীমহলে উঠলো ধন্ত ধন্ত রব!

১৮৯৮ সালে জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরে এসে জড়পদার্থ নিয়ে গবেষণা সুরু করলেন। ১৯০০ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিজ্ঞান মহাসম্মেলনে তিনি আবার আমন্ত্রিত হন। সেখানে তিনি বাংলা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধি হয়ে জড় ও জীবের সাড়ার ঐক্য বিষয়ে যে অতুলনীয় ভাষণ দান করেন, তা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বন্দিত হয়। গবেষক-জীবনের শেষ পর্য্যায়ে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদদেহ-বিজ্ঞানের গবেষণায় তাঁর চিন্তাধারা ব্যাপৃত রেখেছিলেন। বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে বিজ্ঞানাচার্য্যকে আরও অনেক বার বিদেশযাত্রা করতে হয়েছিল, প্রতিবারই তিনি তাঁর গবেষণালব্ধ অতুলনীয় ফলাফলের সাহায্যে ভারতবর্ষের জন্ম মহা সম্মান অর্জ্জন করে নিয়ে এসেছিলেন।

এই মহাবিজ্ঞানী দেশ ও বিদেশ থেকে অজস্র রকমের সম্মান অর্জ্জন করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণের পর সরকার তাঁকে ঐ কলেজের 'এমেরিটাস অধ্যাপক' নিযুক্ত করেন। পরে তাঁকে দেন নাইটহুড এবং সি, এস, আই উপাধি। বিলাতের রয়াল সোসাইটী এই মহাবিজ্ঞানীকে তাঁদের ফেলো নির্ব্বাচিত করে সম্মানিত করেন। অ্যাবারডীন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেন এল, এল, ডি উপাধি। দেশবাসী সত্যদ্রষ্টা এই মহাবিজ্ঞানীকে তাঁদের অন্তরে কৃতজ্ঞ চিত্তে শ্রদ্ধাভরে স্থান দিয়েছে। কেবল বিজ্ঞানাচার্য্যকেই নয়,—তাঁর সহধর্ম্মিণী অবলা বসু মহাশয়াকেও দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ জানায়। এই মহীয়সী নারীর অনুপ্রেরণা, সহানুভূতি এবং নীরব সহযোগিতার ফলেই বিজ্ঞানঋষি তাঁর সাধনাকে জয়যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে গিরিডিতে বেড়াতে গিয়ে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ ঘটে। সেখানে স্নানাগারে প্রবেশ করে তিনি যে জ্ঞান হারান, সে জ্ঞান আর ফিরে আসে না। ৭৯ বছর বয়সে এমনি আকস্মিক ভাবেই ২৩শে নভেম্বর সকাল ৮টার সময়, ভারতের এই সত্যদ্রষ্টা মহামানব পরলোকগমন করেন। তাঁর নশ্বর দেহ কোলকাতায় নিয়ে এসে সৎকার করা হয়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-প্রতিভার কথা বিশ্ববাসী চিরকাল সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। এই মহামানবের প্রতি আমরা আমাদের অন্তরের প্রণাম জানাই। —পঙ্কধর মিশ্র।

ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোনো কোনো ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশভাষা সকল ঐ পরভাষা বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা একথা কহেন তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড-ভূমি দ্বারা পূর্ণ করিবেন। কোনো দেশের ভাষা যে এককালে উচ্ছিন্ন হয় ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, ইতিহাসেও ইহার উদাহরণ প্রাপ্ত হয় না। ইহা সত্য যে গ্রীক ও রোমান লোকেরা আপনারদিগের অধিকৃত দেশে আত্মভাষা প্রচারের যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্যে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিলেন? এই সকল দেশের ভাষা উচ্ছেদ করিতে তাঁহারা কতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন? স্বভাবতঃ অধিকারি জাতির অধিকার নাশের সহিত অধিকৃত দেশ হইতে তাহারদিগের ভাষা লুপ্ত হইতে থাকে।—রাজনারায়ণ বসু।

এবার খেলাধূলা লেখার মুখে দেখছি, অনেক সংবাদ জমা হয়েছে। গত দেড় মাসের মধ্যে যেন খেলাধূলার হাট বসে গিয়েছিল। এক দিকে শীতের অতিথি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ইতিমধ্যে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা শেষ করে দিয়েছে। অপর দিকে কলকাতার সাউথ ক্লাবে টনি ট্রাবার্ট, পাঞ্চ সেগুরা, ফ্রাঙ্ক সেজম্যান, কেন রোজওয়াল প্রমুখ বিশ্বের ধুরন্ধর টেনিস খেলোয়াড়রা খেলে গিয়েছেন। তার উপর আছে রোভার্স কাপের কথা। এ ছাড়াও দু'টো সাঁতার প্রতিযোগিতার কথা।

## রোভার্স কাপ

আবার বোম্বাইয়ের ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাব রোভার্স কাপ লাভ করে বোম্বাইয়ের খেলাধূলার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করল। ক্যালটেক্স স্পোর্টস ক্লাবই বোম্বাইয়ের একমাত্র বেসামরিক দল রোভার্স কাপ লাভ করল। এ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত ভাবে রোভার্স কাপের ইতিবৃত্ত আলোচনা করা যাক।

ডুরাণ্ডের পর এবং আই-এফ-এ শীল্ডের খেলার দু' বছর আগে বোম্বাই-এ রোভার্স খেলা সুরু হয় ১৮৯১ সালে। বোম্বাই-এ রোভার্স ক্লাবের প্রচেষ্টা এবং উৎসাহে এ প্রতিযোগিতার সুরু। বর্তমানে যে রোভার্স কাপটি খেলা হয় সেটি পার্সী ব্রাডলীর পরিকল্পনা অনুসারে তৈরী। ১৮ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কারুকার্যমণ্ডিত কাপটিকে কেন্দ্র করে পশ্চিম-ভারত ফুটবলের সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ।

রোভার্স কাপে ভারতের বিভিন্ন দল অংশ গ্রহণ করেছিল এবং ফাইন্যালে বোম্বাইয়ের ক্যালটেক্স দল ক'লকাতার মহামেডান স্পোর্টিং দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। এবং শেষ পর্য্যন্ত মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ৩-২ গোলে পরাজিত হওয়ায় ক্যালটেক্স দল বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করল।

ফাইন্যালে পরাজিত হয়ে মহামেডান স্পোর্টিং দল প্রতিবাদ করে প্রতিযোগিতা কমিটির নিকট। শেষ পর্য্যন্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হওয়ায় পুরস্কার বিতরণী সভায় ক'লকাতার মহামেডান স্পোর্টিং দল পুরস্কার গ্রহণ না করে অখেলোয়াড় জনিত মনোভাবের পরিচয় প্রদান করেছে।

## টেনিস

গতবারের মত এবারেও ক'লকাতার সাউথ ক্লাবে ২২শে ও ২৩শে নভেম্বর পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়দের প্রদর্শনী খেলার আয়োজন হয়েছিল। গতবারের মত এবার দর্শক সমাগম প্রভূত হয়নি। প্রথম দিন অপেক্ষা দ্বিতীয় দিনের খেলা উত্তেজনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হয়েছিল।

দুই দিন দুটি করে সিঙ্গল্স ও একটি করে ডাবল্সের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।—ফ্রাঙ্ক সেজম্যান ও কেন রোজওয়ালের খেলা দর্শকদের আনন্দ দান করে। এঁদের ক্রীড়াশৈলী ও চাতুর্য্যপূর্ণ মারগুলি সত্যই প্রশংসার অপেক্ষা রাখে না। প্রথম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের জয়জয়কার ছিল, একথা বলা মোটেই অত্যুক্তি হবে না। দ্বিতীয় দিনে টার্ন ট্রাবার্ট ও কেন রোজওয়ালের চমকপ্রদ খেলা বিস্ময়ের সূচনা করে।

প্রথম দিনের সিঙ্গলসের খেলায় কেন রোজওয়াল ৭-৫ ও ৬-৩ গেমে পাঞ্চ সেগুরাকে এবং ফ্রাঙ্ক সেজম্যান ৬-১ ও ৬-২ গেমে টনি ট্রাবার্টকে পরাজিত করে।

ডাবলসের খেলায় কেন রোজওয়াল ও ফ্রাঙ্ক সেজম্যান ৭-৫ ও ৬-৩ গেমে টনি ট্রাবার্ট ও পাঞ্চ সেগুরাকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনে কেন রোজওয়াল ও টনি ট্রাবার্টের প্রথম সিঙ্গলস খেলাটি ৮৪ মিনিট কাল ধরে হয়েছিল। বিশ্বের এই দুই ধুরন্ধর খেলোয়াড় চমকপ্রদ ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়ে কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের প্রভূত আনন্দ প্রদান করেছেন। শেষ পর্য্যন্ত কেন রোজওয়াল ৯-৭ ও ৯-৭ গেমে টনি ট্রাবার্টকে পরাজিত করেন। সেজম্যান ও সেগুরার মধ্যের খেলাটিতে সেজম্যান ২-৬, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে সেগুরাকে পরাজিত করেন।

এই দিন ডাবলসের খেলাটি আর শেষ হয়নি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সংগে সংগে ক'লকাতার পেশাদার টেনিস প্রদর্শনী খেলার উপর এবারকার মত যবনিকা প'ড়ল।

## সাঁতার

ক'লকাতায় দুটি সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। আজাদ হিন্দ বাগে দুটি সাঁতারেরই ব্যবস্থা হয়েছিল রাত্রের দিকে।—একটি সাঁতার পরিচালনা করে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং ফেডারেশন, রাজ্য চ্যাম্পিয়ানসিপ নামে অপরটি ন্যাশানাল সুইমিং ক্লাবের বার্ষিক প্রতিযোগিতা।

অল্প পরিসরে বিশদ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই মোটামুটি সাঁতার প্রতিযোগিতা দুটির উপর আলোচনা করব।

এই দুই প্রতিযোগিতায় লক্ষ্য করা গেছে, বাংলার মহিলা সাঁতারুরা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করে দিয়ে। জুনিয়র, ইণ্টারমিডিয়েট ও সিনিয়র বিভাগে ছেলেরা রাজ্য রেকর্ড ম্লান করে বাংলার সাঁতার-মানকে উন্নত করেছে।

ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যা কুমারী সন্ধ্যা চন্দ ও ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির সভ্যা কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা। ১০০ মিটার পিঠ-সাঁতারে কুমারী সন্ধ্যা চন্দের উন্নতি সত্যই প্রশংসার পরিচায়ক। দিল্লীতে গত অক্টোবর মাসে সন্ধ্যা চন্দ ১ মিঃ ২৯.৮ সেঃ ১০০ মিটার পিঠ-সাঁতারে ভারতীয় রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেন। আর এবার আজাদ হিন্দ্ বাগে বাংলার রাজ্য চ্যাম্পিয়ানসিপের প্রতিযোগিতায় আরও উন্নত রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১মিঃ ২৮-৪ সেঃ। আবার এক সপ্তাহ পরে ন্যাশান্যাল সুইমিং এসোসিয়েসনের

প্রতিযোগিতায় ২৮-২ সে: অতিক্রম করে ভারতীয় রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছেন। অপর দিকে কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতা সমান কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন ১০০ মিটার বুক-সাঁতারে।

দিল্লীতে অনুরাধা গুহঠাকুরতা কোন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি বটে কিন্তু তিনি আজাদ হিন্দবাগে রাজ্য চ্যাম্পিয়ানসিপে ১০০ মিটার বুক-সাঁতার ১-৩৭ সে: অতিক্রম করেন আবার এক সপ্তাহে পরে ন্যাশান্যাল সুইমিং এসোসিয়েসনের প্রতিযোগিতায় এই সময়কে আরও উন্নত করেন ১-৩৬'৩ সে:। কুমারী সন্ধ্যা চন্দ ও কুমারী অনুরাধা গুহঠাকুরতার রেকর্ড জাতীয় রেকর্ডের অনুমোদন পাবে না। কারণ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার রেকর্ড ছাড়া কোন রেকর্ডই জাতীয় রেকর্ডের অনুমোদন লাভ করে না।

ঠিক মত অনুশীলন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলো পেলে বাংলার সাঁতারুরা একদিন বিশ্বের দরবারে সাঁতারে অন্য দেশের সাঁতারুদের সমকক্ষ হবে, এ আশা করা যায়।

সাঁতারের আলোচনা কালে আরও একটি সংবাদ দেওয়া যাক। কলকাতায় মিহির সেন ফিরে এসেছেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু, পশ্চিম-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি প্রমুখ বিদগ্ধ জনেরা তাঁকে জানিয়েছেন সাদর সম্ভাষণ।

গত কয়েক দিন আগে কলকাতার বিশিষ্ট সাঁতার-প্রতিষ্ঠান সেনট্রাল সুইমিং ক্লাব শ্রীব্রজেন দাস ও শ্রীমিহির সেনকে সম্বর্দ্ধনা করার আয়োজন করেন। কিন্তু মিহির সেন মহাশয় কোন এক অজ্ঞাত কারণ বশত: সে সম্বর্দ্ধনায় উপস্থিত হননি। এতে বহু উৎসাহী ব্যক্তি নিরাশ হয়েছেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে মিহির সেন যে মর্য্যাদা লাভ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে এ ব্যবহার কেউ আশা করেননি। মিহির সেনের উপস্থিত না হওয়ার কোন কারণ পাওয়া যায়নি। মনে হয় মিহির সেনের মনে ক্ষোভই একমাত্র কারণ। কারণ, তিনি ইংলণ্ডে থাকাকালীন সময়ে বাংলা দেশের কোন এক দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলেছিলেন, বাংলা দেশের কোন সাঁতার-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে কোন অভিনন্দন জানান হয়নি। আমার মনে হয়, এই ক্ষোভই অনুপস্থিত থাকার কারণ। অবশ্য অন্য কারণও থাকতে পারে।

## শীতের অতিথি

দীর্ঘ সাড়ে তিন মাস ধরে ভারত সফর করার জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতে এসে খেলা আরম্ভ করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের এবারকার সফর তৃতীয় সফর। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রথমবার ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় বার ও এবার নিয়ে ভারতের মাটিতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল তৃতীয়বার পদার্পণ করল। ইতিপূর্ব্বে দুইবারই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল রাবার লাভ করে ফিরে গেছে।

প্রত্যেক বারের মত এবারও পাঁচটি টেষ্ট খেলার বন্দোবস্ত হয়েছে। গত দুবারের পাঁচটি টেষ্ট খেলার মধ্যে চারটি করে খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয় ও একটি করে টেষ্ট ম্যাচের খেলায় জয়লাভ করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল 'রাবার' লাভ করে। ১৯৪৮-৪৯ সালে চতুর্থ টেষ্ট ও ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় টেষ্ট জয়লাভ করার গৌরব অর্জ্জন করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল।

এবার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল পাঁচটি টেষ্ট ম্যাচ সহ ১৭টি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলে এবার খেলোয়াড়-সংখ্যা ১৭ জন।

## প্রথম টেষ্ট

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে ভারত বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে!

গোলাম আমেদ অধিনায়কত্ব করার জন্য অক্ষমতা জানাইলে পলি উম্রিগড়ের উপর অধিনায়কত্বের ভার আসিয়া পড়ে। অপর দিকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়কত্ব করার কথা ছিল ফ্রাঙ্ক ওরেলের। কিন্তু তিনি ম্যাকেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা করার জন্য অক্ষমতা জানান। সেইজন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়কত্বের ভার গ্রহণ করেন গেরি আলেকজাণ্ডার।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ব্যাট করতে নেমে ২২৭ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। প্রথম দিনের খেলায় ৫০ রাণে প্রথম তিন জন ব্যাটসম্যান হাণ্ট, হোল্ট ও সোবার্সকে হারানোর পর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলে সাময়িক বিপর্য্যয় দেখা দিলে চতুর্থ উইকেটে কানহাই ও কোলি স্মিথ দৃঢ়তার সংগে খেলে বিপর্যয় রোধ করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর কোলি স্মিথ ৪ ও ৫ রাণের মাথায় গুপ্তের বলে ক্যাচ তুলিলে রাম দুইবারই ক্যাচ ফেলিয়া দেন। প্রথম দিনের খেলায় কানহাই-এর ব্যাটিং সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। দ্বিতীয়

পঙ্কজ রায়

উম্রিগড়

দিনের খেলায় ভারতীয় দলের ব্যাটিং-বিপর্যয় ঘটে। বিরতির পূর্ব্বে ভারতীয় দল ৪০ রাণে ৪টি উইকেট হারায়। উম্রিগড় ও রামচাঁদ দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া দলের পতন রোধ করিবার চেষ্টা করেন। ১২০ রাণে উম্রিগড় ও ১৩৮ রাণে রামচাঁদ বিদায় গ্রহণ করিলে ভারতীয় দলের বিপর্য্যয় আসন্ন হইয়া পড়ে। ১৫২ রাণে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস সমাপ্ত হয়।

ফাষ্ট বোলিং-এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানদের পরাভবের যথাযথ কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৭৫ রাণে অগ্রগামী থেকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২৩ রাণে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। দ্বিতীয় ইনিংসে সেবার্সের ১৪২ নট আউট উল্লেখযোগ্য রাণ। মধ্যাহ্ন ভোজের ৪০ মিনিট পূর্ব্বে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে ভারতীয় দল ৩১৮ রাণে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। নরী কন্‌ট্রাক্টর দুর্ভাগ্যক্রমে রাণ আউট হইয়া গেলে পি, রায় ও উম্রিগড় দৃঢ়তার সহিত খেলিয়া দলের বিপর্যয় রোধ করেন। ভারতীয় খেলোয়াড়রা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত খেলিয়া দলকে পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের পি. রায় উম্রিগড়, রামচাঁদ ও হরদিকরের রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় ব্যাট্‌সম্যানরা সাড়ে নয় ঘণ্টা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর পঞ্চম দিনের শেষে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ২৮১ রাণ করিয়া অপরাজিত থাকিতে সমর্থ হয়।

প্রথম টেষ্টের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল।—

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ১ম ইনিংস—২২৭ রাণ (সেবার্স ২৫, কানহাই ৬৬, স্মিথ ৬৩, বুচার ২৮, গুপ্ত ৮৬ রাণে ৪ উই: রামচাঁদ ৩১ রাণে ২ উইকেট, নাদকার্নি ৪০ রাণে ২, গার্ড ১১ রাণে ১ হরদিকার ১ রাণে ১)।

ভারত ১ম ইনিংস—১৫২ (উম্রিগড় ৫৫, রামচাঁদ ৪৮; গিলক্রিষ্ট ৩৯ রাণে ৪, হল ৩৫ রাণে ৩ এ্যাটকিনসন ২১ রাণে ২)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ২য় ইনিংস—৪ উই, ৩২৩ ডিকে: (সেবার্স ১৪২ নট আউট, বুচার ৬৪ নট আউট স্মিথ ৫৮, গার্ড ৬৯ রাণে ২, গুপ্তে ১১১ রাণে ২)।

ভারত ২য় ইনিংস—৫ উই: ২৮১ (পি, রায় ৯০, উম্রিগড় ৩৬, রামচাঁদ ৬৭ নট আউট, হরদিকার নট আউট ৩২, মঞ্জরেকার ২৩, এ্যাটকিনসন ৫৬ রাণে ১)।

[অমীমাংসিত]

১২ই ডিসেম্বর কানপুরের জুট ম্যাটিং উইকেটে দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতের পক্ষে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়েরা মনোনীত হয়েছেন।

গোলাম আমেদ (অধিনায়ক) এন, এস, তামানে (উইকেট রক্ষক), পলি উম্রিগড়, পঙ্কজ রায়, নরী কন্‌ট্রাক্টর, বিজয় মঞ্জরেকার, জয়সিং গোড়পাড়ে, জি, এস, রামচাঁদ, কান্দু বোরদে, সুভাষ গুপ্তে, বেসু প্যাটেল।

দ্বাদশ খেলোয়াড়—বসন্ত রঙ্গনে।

অতিরিক্ত—দলজিৎ সিং ও সেনগুপ্ত।

# গোপন কথা

## আনন্দ বাগচী

তৃষ্ণার নিবৃত্তি নেই, দাঁড়িয়েছে দরজার কপাট
কঠিন শিথান করে, দূরপাল্লায় রেখে চোখ,
ঘরে কি বাহিরে কেউ নেই, সামনে নেই, ধূ-ধূ মাঠ
জলছে তো জলছেই, বুকে একটি কথার শায়ক।
সুরে সে বাজে না, রঙে আঁকা তাকে যায় না কখনো
কী সখি, গোপন কথা, তুমি কিংবা আমি চলে গেলে;
সময় যে নেই তাও নয়, বেলা যায়নি এখনো,
ব্যথাটা বুকেরই মধ্যে তবু ঘুরছে অল্প পাখা মেলে।

যন্ত্রণা বুকের মধ্যে বাসা নিল, তুমি কিবো আমি চলে গেলে
জলে ঢেউ দেয়, গাছে পাতা ঝরে, ধূসর অক্ষরে
ছাপা বই ঝাপসা হয়ে কোলে প'ড়ে থাকে, ডানা মেলে
উড়ন্ত কান্নার মত রৌদ্রদগ্ধ চিল ওড়ে, ঘরে
সমস্ত না-বলা-বাণী ঘন যামিনীর মত হয়,
কিছুই হয়নি বলা, যেই মনে পড়ে চতুর্দিকে
হবহু রয়েছে ঠিক যা-যা ছিল, শুধু নেই একটু সময়
তাই সব ঝাপসা, তাই ব্যথা, তাই রঙ হয় ফিকে।

আসল কথাটা শুধু একটুখানি, আর সব হিজিবিজি ব্লটিঙের গায়।

# কবি

## সজলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সুদূর শূন্যে নীলিমা নীল,
মনের শূন্যে গভীর দুখ।
কাল পাথরের ভুখা মিছিল,
মন-প্রস্তর নীরব, মূক।

বাহিরে শ্যামল-রঙোচ্ছ্বাস,
মনে শ্যামলের আকুলতা।
আনে বসন্ত-পূর্ব্বাভাষ,
মন-বসন্ত ধ্যানরতা।

আকাশে মেঘের তরণী যায়,
মনেতে আশার তরণী তাই—
টলমল, তাই হিমেল বায়—
তৃপ্ত, খুশীর অন্ত নাই।

তাই তো গানের জন্ম দিই,
মন-বনানীর আঁকি ছবি।
উজাড় দুঃখ ভাষায় নিই,
সৃষ্টি-পিয়াসী আমি 'কবি'।
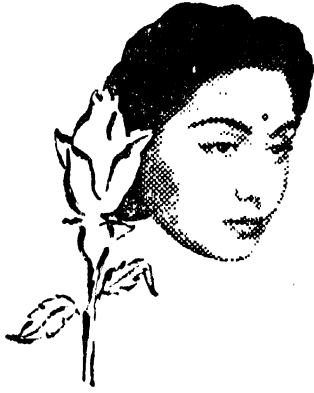
GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

# সাহিত্য পরিচয়

## লেখক-লেখিকাদের সমস্যা

অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, বাঙলা দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা পাঠানোর 'নিয়মাবলী' ছাপা হয়ে থাকে। বিবিধ নিয়ম লিখে জানানো সত্ত্বেও পত্রিকা-সম্পাদকগণ এমন সব পাণ্ডুলিপি এবং চিঠি পেয়ে থাকেন—যা ছাপার বা পাঠের যোগ্য নয় আদপেই। কলকাতার একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় বিভাগ লেখক-লেখিকাদের জন্য পালনীয় নিয়মাবলী প্রকাশ করছেন। এই নিয়মসমূহ লেখক-লেখিকাদের পক্ষে যেমন লজ্জাকর, পাঠকের পক্ষেও তেমনি হাস্যকর! উক্ত পত্রিকায় সম্পাদককে 'Aditor' বা 'Auditor' এই সম্বোধনে যাঁরা আহ্বান জানাবেন, তাঁদের প্রতি লেখা না পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সকল লেখিকা তাঁদের নামের পূর্ব্বে 'শ্রীমতী' শব্দ ব্যবহার করবেন, তাঁরাও যেন লেখা পাঠাতে বিরত থাকেন। যাই হোক, শুধুমাত্র ভুল বানান বা ভুল শব্দ নয়,—অপাঠ্য হস্তাক্ষর; কাগজের দুই পৃষ্ঠায় কালির পরিবর্তে হয়তো পেন্সিলেই লেখা; পাণ্ডুলিপিতে ঠিকানার বালাই নেই; লেখার আয়তন সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, ইত্যাদি। ভাবতেও আশ্চর্য্য লাগে, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ লেখক-লেখিকাদের সাধারণ জ্ঞান এতই সঙ্কীর্ণ, ভ্রান্তিপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ। যদিও এখানে আমরা উল্লেখ করতে বাধ্য হবো, মাসিক বসুমতীর নতুন লেখক-লেখিকাদের প্রায় অধিকাংশই সকল নিয়ম রক্ষা ক'রতে সচেষ্ট আছেন।

বাঙলা দেশে লেখা বা সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা অনেকের আছে। চেষ্টা ও অনুশীলনের অভাব নেই অনেকের। তবুও পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে হ'লে এবং লেখা ছাপার অক্ষরে দেখতে হ'লে কি কি জানতে হয়—এ ধারণা অনেকের নেই বললেই চলে। কি লিখবো, কেন লিখবো, কার জন্য লিখবো—এই সব জরুরী ও জটিল প্রশ্ন আমরা দূরে সরিয়ে রাখছি। কিন্তু কেবল মাত্র কতকগুলি অতি সাধারণ জ্ঞানের অভাবে সংখ্যাতীত সম্ভাবনাপূর্ণ লেখা সম্পাদকের দপ্তর থেকে ফিরে যায়। অর্থাৎ যে ফুল শত দলে বিকশিত হতে পারতো সেই ফুল অকালে ঝরে যায় নিরুৎসাহতায়। যদিও এমন পরিস্থিতিতে লেখক-লেখিকারা মাত্রাতিরিক্ত অভিমানে সকল দোষ সম্পাদকের স্কন্ধেই ন্যস্ত করতে বদ্ধপরিকর। এবং তখন তাঁদের অভিযোগ :—সম্পাদকরা নিজেদের দল পোষণ করেন। দলের বাইরে থেকে কা'কেও ঠাঁই দেন না। ভাল লেখা প'ড়েও দেখেন না।

যদিও কত দুঃখে, কত কষ্টে আর কত অসুবিধার মধ্যে সম্পাদকরা লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি করেন, অনেকেই অনুমান করতে পারেন না। গোষ্ঠীভুক্ত লেখকরা নিম্ন নিয়ম পালন করেন। যেমন—

(১) পাণ্ডুলিপি অপরিচ্ছন্ন করেন না। কিম্বা পেন্সিলে কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লেখেন না। ছাপাখানার কম্পোজিটরদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন।

(২) পত্রিকার আয়তন ও পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুযায়ী এবং ছাপানো লেখার আয়তন দেখে নিজেদের লেখার আয়তন সীমাবদ্ধ রাখেন।

(৩) লেখায় বানান ভুল, ভুল শব্দ বা কোন প্রকার টেকনিকাল ভুলকে প্রশ্রয় দেন না।

(৪) লেখার শেষে নাম ও ঠিকানা লিখতে ভুলে যান না।

(৫) লেখার জন্য নিষেধ-আইন মেনে চলেন। যাতে লেখা ছাপার পর সম্পাদককে বিপদে পড়তে না হয়।

লেখক-লেখিকা যথেচ্ছা লেখা পাঠাবেন আর সম্পাদক তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবেন—এ এক কল্পনাবিলাস! লেখক-সম্প্রদায়কে পত্রিকা-সম্পাদকের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা করতে হবে। দুই সম্প্রদায়ই পরস্পর নির্ভরশীল। একজকে বাদ দিয়ে যখন অন্যের স্থিতি অসম্ভব, তখন শুধুমাত্র সামান্য অজ্ঞতা যেন এই সুসম্পর্ককে ধূলিসাৎ না করে।

যদিও আমরা, সম্পাদকরা আর লেখক-লেখিকারা যতই সহযোগিতার আশ্রয় নিই, তবুও বাঙলা দেশের ভবিষ্যতের লেখক-লেখিকারা একের পর এক ভুল ক'রেই চলবেন। কেন না, লেখার জন্য সকল রকম জ্ঞান অর্জ্জনের কোন রাস্তাই খোলা নেই। বিদেশে ভবিষ্যতের লেখক-লেখিকা সৃষ্টি হয় দুই পদ্ধতিতে। যথা—

(১) খ্যাতিমান লেখকদের পরিচালনা ও নির্দ্দেশে। তাঁদের প্রদত্ত শিক্ষা ও দীক্ষায়।

(২) লেখক-বিদ্যালয় আছে প্রায় সকল শিক্ষিত দেশে। এই সব বিদ্যালয়ে পাণ্ডুলিপি তৈরী থেকে লেখা ছাপিয়ে উপার্জ্জনের পথ পর্য্যন্ত দেখিয়ে দেওয়া হয়। সাহিত্যসৃষ্টি বিষয়ক অন্যান্য শিক্ষা ও পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়ার রীতি পালন করে। বিদেশে পত্রিকার সম্পাদকরা একেবারে পুরোপুরি তৈরী লেখক-লেখিকা পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যান।

আমাদের দেশের খ্যাতিমান লেখক-লেখিকারা (হয়তো সকলেই নয়) ভবিষ্যতের লেখক-লেখিকাদের শিক্ষাদানের পরিবর্ত্তে তাঁদের পিঠ চাপড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।

সুতরাং তবে কি আমাদের দেশে লেখক-বিদ্যালয় সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট হওয়া কল্পনাতীত? হয়তো স্বপ্নাতীত। সুতরাং বাঙলা পত্রিকার সৃষ্টি কতকগুলি নিয়মে ভবিষ্যতে সাহিত্যের আঙিনায় সহস্র সহস্র লেখক-লেখিকা ফুল-আকারে ফুটবেন, আশা করা যায় না। আমরা বিশ্বাস করি না। আসল কথা, মূল সমস্যার সমাধান যদি না হয়, মূলগত শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের ও দানের যদি পাকাপাকি ব্যবস্থা না হয়—বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তবে শ্রেফ অন্ধকার।

লেখা শেষ হওয়ার ক্ষণে হঠাৎ শুনলাম, মাননীয় শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মহাশয় লেখক-লেখিকাদের 'ক্লাব' প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছেন। আমরা আশা রাখি, তাঁর চেষ্টা ফলবতী হবে। অতঃপর সেই প্রতিষ্ঠিত ক্লাবের মাধ্যমেও অনেক কিছু গঠনমূলক ও সৃষ্টিধর্মী কাজ চলতে পারে।

# উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

## বঙ্গ প্রসঙ্গ

পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সকল সুধীর শ্রদ্ধাভিনন্দনে ঝলমলিয়ে উঠেছে বাঙলা ভাষা। বাঙলা ভাষা এমন একটি ভাষা, যে নিজেই নিজের পরিচয়, যে নিজেই নিজের ইতিহাস, যাকে অবলম্বন করে সারা বিশ্বের বুকে বাঙালী ছড়িয়ে দিতে পেরেছে নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয়। উৎপত্তি থেকে শুরু করে বাঙলা ভাষা আজ যে পরিপূর্ণতার পেয়েছে আস্বাদ সে ক্ষেত্রে প্রবন্ধের অবদানও অনস্বীকার্য। সাধারণতঃ গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে পাঠক-পাঠিকার যে আগ্রহ দেখা যায়, প্রবন্ধ-সাহিত্য পারে না ঠিক সেই পরিমাণের আগ্রহ আকর্ষণ করতে। অথচ একথা ভোলা যায় না যে, বাঙলা সাহিত্যের পুষ্টির ক্ষেত্রে প্রবন্ধও এক বিরাট সহায়ক। পূর্বোক্ত গ্রন্থটি একটি মূল্যবান প্রবন্ধের সংগ্রহ। সম্পাদনাকার্যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন যশস্বী লেখক সুশীল রায়। পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি রামমোহন থেকে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার পর্যন্ত পঁয়ত্রিশ জন মনীষীর বিভিন্নবিষয়ক সারগর্ভ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে এই সংগ্রহগ্রন্থে। বাঙলা সাহিত্যের প্রায় এক শ' বছরের গতিধারার একটি মনোরম চিত্র ধরা পড়েছে এই সংগ্রহগ্রন্থটির মধ্যে। পাঠক-সাধারণ (বিশেষ করে বাঙলা সাহিত্যের বহুমুখীন বৈচিত্র্যপূর্ণ গতিধারার অপরূপ ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহ পোষণ করেন) আমার আশা রাখি, এই সুসম্পাদিত গ্রন্থটি পাঠ করে উপকার লাভ করবেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের ভূমিকা রচনা সমগ্র গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার আমাদের কাম্য। প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন, ৮১ গান্ধী রোড। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

## কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং বিংশ শতাব্দীর বোধনলগ্নে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে যে বরণীয় কবিকুল আবির্ভূত হলেন কবিতার আকাশে—তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তারকারূপে ছন্দসম্রাট সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনায়াসে করা যায় নামোল্লেখ। মাত্র একচল্লিশটি বছরের স্বল্পস্থায়ী জীবনে কবিতা ও কবিতাপাঠকের মধ্যে যে অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার করে গেছেন সত্যেন্দ্রনাথ, তা কখনই অমলিন হবার নয়। ধ্বনিমাধুর্য, শব্দচয়ন, ছন্দের ঝঙ্কার সত্যেন্দ্রকাব্যকে দিয়েছে অসামান্যতা, যার তুলনা মেলা ভার এবং এক কথায় যা অননুকরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি, স্বাজাত্যাভিমান, চরিত্র-পূজা, ইতিহাসে অসাধারণ দক্ষতা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় দখল বাঙালী জাতির এক পরম গর্বের বস্তু। দুঃখের বিষয়, সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাঙালী উদাসীন! সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে পরিমাণ আলোচনা ও গবেষণা হওয়া উচিত ছিল, বলতে বাধ্য হচ্ছি, সে পরিমাণে তা হয় নি। আজ পর্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা আলোচনাদি হয়েছে সংখ্যায় তা নিতান্ত নগণ্য। বাঙলা সাহিত্যের এই অভাব উপরোক্ত গ্রন্থটির মাধ্যমে পূর্ণ হবে বলে আশা করা যায়। সুসাহিত্যিক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন সাহেবের বিদুষী কন্যা সানজিদা খাতুনের প্রতিভার ছাপ পাওয়া যায় গ্রন্থটিতে। শ্রীমতী খাতুন এতে সত্যেন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত ও নিখুঁত আলোচনা করেছেন। সত্যেন্দ্রকাব্যের প্রতিটি দিক কেন্দ্র করে নানা তথ্যপূর্ণ আলোচনার সন্নিবেশ গ্রন্থটিকে করে তুলেছে আকর্ষণীয়। গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে লেখিকা যে কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করেছেন, তার ছাপ ফুটে ওঠে গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। সত্যেন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনা ছাড়াও সত্যেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সুলিখিত রচনা গ্রন্থের এক বিশেষ আকর্ষণ। গদ্যশিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এক নতুন আলোকপাত করা হয়েছে। বাঙলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান, সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানস, রচনাশৈলী, রচনার ক্ষেত্রে স্বকীয়তা, নিপুণতা ও অলোকসামান্যতা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা পাঠক-পাঠিকাকে তৃপ্ত করবে আশা রাখি। শ্রীমতী খাতুনের এই গ্রন্থটি তার যথাপ্রাপ্য সমাদর লাভ করুক সুধিবৃন্দের দরবারে, এই কামনা করি। প্রকাশক নিতাইচন্দ্র দাস, ১৩-এ বিপিন পাল রোড। কলকাতার পরিবেশক, ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

## শারদীয়া

বাঙলা সাহিত্যের দরবারে একটি বিশেষ আসন যে প্রথিতযশা সাহিত্যশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অধিকারভুক্ত, একথা কোনমতেই করা যায় না অস্বীকার দীর্ঘদিন বাঙলা সাহিত্যের সেবা করে বিভূতিভূষণ বাঙলা সাহিত্যের গঠনপথে করেছেন সহায়তা আর লাভ করেছেন খ্যাতি, যশ ও শ্রদ্ধা। উপরি-উল্লিখিত গ্রন্থটি কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন। গল্পগুলি স্বকীয়তায় ভরপুর। পটভূমিকাগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং প্রতিটি গল্পের মধ্যে লেখকের প্রস্ফুটিত মর্মবাণী বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। লেখকের বক্তব্য যেমনই বলিষ্ঠ, তেমনই সারগর্ভ। বিভূতিভূষণ প্রতিটি গল্প রচনার ক্ষেত্রে উজাড় করে দিয়েছেন পুঞ্জীভূত দরদ, আন্তরিকতা ও লালিত্য। এতে মোট এগারোটি মর্মস্পর্শী গল্প স্থান পেয়েছে। বাঙলার পাঠক-পাঠিকার কাছে "শারদীয়া" তার যথাযোগ্য সমাদর লাভ করুক, এই প্রার্থনাই করি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৯৩ গান্ধী রোড। দাম—তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র।

## নজরুলকে যেমন দেখেছি

বাঙলা ভাষার কবিতাসম্ভারকে যে কবিকুল সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে গেছেন আপন-আপন প্রতিভায়, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের অন্যতম এবং বৈশিষ্ট্যবান। নজরুলের কবিতার মধ্যে যে ঝড়ের বেগের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, ঘুমন্ত জাতিকে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে তার অবদানও অনেকখানি। নজরুলের কবি-কল্পনাই বলুন আর কবিতা-সৃষ্টিই বলুন, তার জন্ম দিয়েছিল নজরুলের মানবপ্রেম। এই মানবপ্রেমী কবিটিকে মানব হিসেবে কেমন দেখেছেন, জেনেছেন, চিনেছেন, সে সম্বন্ধেই নিজের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি বিস্তারিত ভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন সুলেখিকা শামসুন নাহার মাহমুদ উপরোক্ত গ্রন্থটির মাধ্যমে। মানুষ নজরুল যে এক অফুরন্ত আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ—লেখিকার রচনা বিশেষ ভাবে সেই সত্যটির অনুকূলেই সাক্ষ্য দেয়। গ্রন্থটিতে লেখিকাকে লেখা নজরুলের অপূর্ব পত্র, তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

এবং তাঁর কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র সংযোজন করে গ্রন্থের মর্যাদাবৃদ্ধি করা হয়েছে। নজরুলানুরাগী পাঠক-পাঠিকা তৃপ্তিলাভ করুন এই গ্রন্থটি পাঠ করে, এই আশাই আমরা রাখি। প্রকাশক—নবযুগ প্রকাশনী, ২১-বি নাসিরুদ্দীন রোড (পার্ক সার্কাস), কলকাতার পরিবেশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## অনামী

বঙ্গ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দিলীপকুমারের অবদান সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই। তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার উদ্দেশে অভিনন্দন জানিয়েছেন পৃথিবীর সংস্কৃতি-জগতের বহু বরেণ্য দিকপাল। বাঙলা দেশের কাব্য-সাহিত্যও বহুলাংশে পুষ্টিলাভ করেছে দিলীপকুমারের কল্যাণে। "অনামী" তাঁর রচনার একটি সংগ্রহ। তাঁর বহু মৌলিক কবিতা, অনুবাদ-কবিতা, গান, ভজন ও তাঁকে লেখা দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন মনীষীর পত্রাবলী সংযোজিত হয়েছে। অনামীর প্রথম প্রকাশ ঘটে আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, এর প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছিলেন স্বয়ং শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ। এই গ্রন্থটির মাধ্যমে দিলীপকুমারের অনুরাগীরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন। দিলীপকুমারের গাওয়া যে বিখ্যাত গানগুলি রসিকমহলে আলোড়ন জাগিয়েছে তাদেরও কয়েকটি এই গ্রন্থে যুক্ত হয়েছে, দিলীপকুমারের সুন্দর, সাবলীল মনোরম কবিতাবলী পাঠকচিত্তে সঞ্চার করবে এক রসঘন অনুভূতি। কবিতা রচনায় দিলীপকুমারের দক্ষতা, নিপুণতা ও কুশলতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত তাঁর মৌলিক ও অনূদিত কবিতাগুলির মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদী কবিতাটি যুক্ত করে গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি করা হয়েছে। পত্রাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, কবিবর কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কবিসমালোচক মোহিতলাল মজুমদার, সমারসেট মম, জর্জ রাসেল (এ ই), লোয়েস ডিকিন্সন, শ্রীমতী জয়েস চাডউইক, সঞ্জীব রাও, স্যার পল ডিউকস, কৃষ্ণপ্রেম প্রভৃতির পত্রগুলি পরম উপভোগ্য। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় য়্যাণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## ছিলেনবাবুর দেশে

অল্পকালের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের দরবারে নিজের আসন করে নিতে সমর্থ হয়েছেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার কাছেও তাঁর নাম অজানা নয়। "ছিলেনবাবুর দেশে" তাঁর সাতটি ছোট গল্পের সমষ্টি। এর মধ্যে কয়েকটি শারদীয়া দৈনিক বসুমতী ও মাসিক বসুমতীর মাধ্যমেই প্রকাশলাভ করেছে। গল্পগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, গতিবান এবং গতানুগতিকতার দোষমুক্ত। সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় গল্পগুলির সৃষ্টি, আড়ষ্টতা, জড়তার ছাপ মেলে না। সাতটি গল্পের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ "ছিলেনবাবুর দেশে" নামক গল্পটিই বিশেষ ভাবে পঠিতব্য। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী শ্রীঅন্নদা মুন্সী। প্রকাশক—আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস, ৩৪ চিত্তরঞ্জন য়্যাভিনিউ। দাম—সুলভ সংস্করণ দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা এবং শোভন সংস্করণ তিন টাকা মাত্র।

## আনোখীলাল পাখোটিয়া

আজকের দিনে এমন একদল নরনারীর আবির্ভাব ঘটেছে যাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র ফাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধার করা, স্বার্থসিদ্ধির জন্য হেন কাজ নেই যা এরা পারে না। সমাজের সর্বত্র এদের অবাধ গতিবিধি, যে সকল বিভাগের প্রধানের পদ এরা অধিকার করে থাকে সে সম্বন্ধে এদের জ্ঞানের পরিমাণ একেবারে শূন্য, এই অপদার্থদের জন্য সারা দেশে ঘনিয়ে আসছে এক বিরাট দুর্যোগ—যা এত বড় দেশকে অবলুপ্তির পথেই পরিচালিত করছে। শক্তিমান সাহিত্যিক বিক্রমাদিত্য ক্ষমার অযোগ্য এই আত্মকেন্দ্রিকদের সন্দেশে মোক্ষম এক অপূর্ব চাবুক উপহার দিয়েছেন উপরোক্ত উপন্যাসের মাধ্যমে। ব্যবসায়ী আনোখীলাল, শাদীলাল ছুছুন্দর, ছ ভানু, বি-জি-এস বাইভি মিটার, ধাপ্পামার্কেটের সম্পাদক চা মাশচটক, দেশসেবিকা লুটি লুটি হালদার, কবি দোকনা প শেয়ারের দালাল বুটালাল লুটেরমল, আকাশ-কুসুম বটন মিল আণ্ডার কারেন্ট ইলেক্ট্রিক কোম্পানী, খট খট জুট মিলস, পুলিশ স্পাই পটাশ নন্দী, রিপোর্টার হৈ-চৈ পতিতুণ্ড, স্যার গটা মিটার, য়্যাটর্নি ঘুষরাম চৌধুরী—সলিসিটার্স য়্যাণ্ড তোয়াট নট, তঞ্চক ভেলভেলেটা চক্রবর্তী প্রভৃতি চরিত্র ও প্রতিষ্ঠানগুলির নামক থেকেই অনুমান করা যায় যে, বিক্রমাদিত্যের কশাঘাত ব পরিষ্কার এবং কত তীব্র! এই সময়োপযোগী গ্রন্থটির ■ বিক্রমাদিত্যের উদ্দেশে আমরা অভিনন্দন জানাই। শিল্পী অজি গুপ্তের প্রচ্ছদ-চিত্রাঙ্কন প্রশংসালাভে সমর্থ হবে। প্রকাশ—ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ প্রাঃ লিঃ, ৷ গান্ধী রোড। দাম—দু' টাকা আট আনা মাত্র।

## তিন সর্গ

সাহিত্যিক অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম মাসিক বসুমতী পাঠক-পাঠিকার কাছে অপরিচিত নয়। বর্তমানে এঁর এ নাট্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি ছোট ছোট তিনটি নাটকের সমষ্টি। নাট্যকারের স্বীকৃতি থেকেই জানা যায় যে, নাটকগুলি বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব ছায়াপাত করেছে। নাটকগুলি বাঙলা দেশের পাঠক-সাধারণকে আকৃষ্ট করবে বিশেষ করে তার যুগোপযোগিতার জন্যে। প্রথম নাটকটি জীবনের প্রতি এক বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে, কল্পনা আর বাস্তব পৃথক নয়, একই বস্তুর দু দিক। এক সঙ্গে তারা চলছে। তালে তালে, মেপে মেপে এ চলার শেষ নেই। এ চলা চিরকালের চলা। নাট্যানুরাগীরা অমরেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থটি পাঠ করে আনন্দ পাবেন বলে মনে করা যেতে পারে। গ্রন্থের নামকরণটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। সুন্দর প্রচ্ছদচিত্রটি এঁকেছেন শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত। প্রকাশক—আর্ট য়্যাণ্ড লেটার্স পাবলিশার্স, জবাকুসুম হাউস, ৩৪ চিত্তরঞ্জন য়্যাভিনিউ। দাম—সুলভ সংস্করণ এক টাকা বাষট্টি নয়া পয়সা ও শোভন সংস্করণ দু' টাকা মাত্র।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**সুলেখা দাশগুপ্তা**

দস্তরমতো দুর্বোধ্য ঠেকছিল মঞ্জুর জয়াকে। সে কিছুই বুঝে উঠতে না পারার একটা দৃষ্টি নিয়ে জয়ার দিকে তাকিয়ে বসেছিল। জয়া চা খাওয়ানোর কথা বলতেই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সে। এই চা দেবার কথা মঞ্জু নিজেই কখন বলে আসতো—হয়তো এতক্ষণে চা খাবার এসেও যেতো কিন্তু জয়াই ওকে সব ভুলিয়ে বসিয়ে রেখেছিল। ওর কথা, ওর চোখের অস্বাভাবিক ধারালো দৃষ্টি ও সে দৃষ্টির আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসা ভাব, চেয়ারে মাথা হেলিয়ে একটা মস্ত নিঃশ্বাস টানা এবং ফেলার সঙ্গের আবৃত্তি—চকিত বিস্ময়ে লক্ষ্য করছিল মঞ্জু। জয়া চা চাইতে 'আসছি' বলে উঠে গেল সে চায়ের ফরমাস করে আসতে। ফিরে এসে দেখলো জয়া ঠিক সেই ভাবেই হেলানো মাথায় বসে আছে। মঞ্জুও কি করা যায় কি বলা যায়, কিছুই ভেবে না পেয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর যেন কিছু বলার জন্যই বললো, জানিস জয়া, এই কিছুদিন আগে একদিন চৌরঙ্গির ফুটপাত দিয়ে আমি যাচ্ছি—রাত তখন এই সাতটা সাড়ে-সাতটা হবে। হঠাৎ মনে হলো তুই দাঁড়িয়ে। এমন আশ্চর্য্য মিল তোর সঙ্গে যে, আমি তোর নাম ধরে তাকে ডেকে পর্য্যন্ত উঠেছিলাম। কিন্তু মেয়েটি ডাক শুনে, ফিরে তাকিয়ে উল্টো দিকে হাঁটা দিল। বুঝলাম ভুল করেছি। কিন্তু সত্যি বিস্ময়কর মিল ছিল তোর সঙ্গে মেয়েটির চেহারার।

মাথাটা চেয়ারে যে ভাবে রাখা ছিল, ঠিক সেই একই ভাবে রেখে জবাব দিল জয়া—আমি—তাই নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে মিল থাকবে।

—তুই ?

—হাঁ।

—তবে আমায় দেখে অন্য দিকে চলে গেলি কেন ?

এবার মাথা সোজা করে সাপের মতো কোমর টান করল জয়া। হঠাৎ উত্তেজনায় যেমন কতকটা লাল রক্ত মুখে ছুটে এসে গাল দুটোকে লাল করে তোলে, তেমনি কোথা থেকে যেন কতকটা দুষ্ট রক্ত ছুটে এসে, ওর সাদাটে কাগজের মতো ঠোঁট দুটোকে মিষ কালো করে তুললো। জবাব দিল সে—ওটা আমার দুরন্ত ব্যবসায়িক সময় যে।

এতক্ষণ জয়ার মুখের ভাব পরিবর্তন মঞ্জুর দৃষ্টি একটু এড়ায়নি কিন্তু এবার ওর মুখের রং পরিবর্তনটার দিকে মঞ্জুর দৃষ্টি পড়ল না। মঞ্জুর সমস্ত বিস্ময় আর আগ্রহ ধাওয়া করল জয়ার কথার দিকে। নতুন কথা—নতুন চিন্তা মুহূর্তে সে দিকে নিজেকে ছুটিয়ে দিতে মঞ্জুর সময় লাগে না। বললো—ব্যবসায়িক সময়! মানে তুই ব্যবসায় নেমেছিস ? মা ভৈঃ! রইল পড়াশুনা। রইল বাঙ্গালীর সংস্কৃতি—হবো মোরা ব্যবসায়ে মাড়োয়ারী সমান। বল তুই কিসের ব্যবসা করছিস ?

আমিও করবো। ওঃ, দস্তরমতো মৌলিক চিন্তা রে জয়া! তোকে অভিনন্দন করছি—হাত বাড়িয়ে দিল মঞ্জু জয়ার দিকে।

জয়া সে হাতে হাত মিলালো না। গম্ভীর কণ্ঠে বললো—বাজারের চাহিদা বুঝে ব্যবসা স্থির করতে হয়।

—সে তো ব্যবসার গোড়ার কথা। সবাই জানে। সে চাহিদাটা কিসের, কিসের সব চাইতে বেশী আর তুই-ই বা কিসের করছিস ? আঃ, সত্যি আইডিয়াটা কি যে অপূর্ব লাগছে আমার!

জয়া মঞ্জুর অধৈর্যে আর চঞ্চলতায় হাসল। সে হাসি এতো সুন্দর এতো স্বাভাবিক যে, জয়ার মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে যে ভয়টা এসে যাচ্ছিল সেটা কেটে গেল মঞ্জুর। ওর হাসিটা যেন শিশুর অজ্ঞতার প্রতি বড়দের হাসি।

না না জয়ার কিছু হয়নি। জয়ার এই ক্লান্তি, এই বিষণ্ণতা, এই কালিঢালা চোখের নীচ—এ-সব অনভ্যস্ততার দুঃশ্চিন্তার। নৈরাশ্যের। নতুন পথের দূর যাত্রার।

জয়া বললো—বাজারের চাহিদা বুঝে যেমন ব্যবসা ঠিক করতে হয় সেটা বুঝতেও আবার তেমনি বহু ঘা খেতে হয়—অন্ততঃ আমি তো তাই খেয়েছি। প্রথমে মা আর মেয়েতে মিলে বসে বসে হাতের কাজ করলাম। কাশ্মীরী, গুজরাটী, মণিপুরী নক্সার উপর রেশমী রঙ্গীন সুতার ঘর বুনতে বুনতে কিছু রঙ্গীণ কল্পনাও করলাম ঘরের অভাব দূর করার। সেলাইটা মা-মেয়েতে জানি। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সব কাজ একটা ব্যাগে ভাঁজ করে তুলে নিতে নিতে ভাবতে লাগলাম। একাজ যে দেখবে সেই পছন্দ করবে, তারই চোখে লাগবে। না কিনে কখনই পারবে না। প্রথম বোঝাটা ঠিক হলো। যে দেখল সেই কাজের প্রশংসায় বার বার ঘাড় মাথা নাড়তে লাগল, কিন্তু দ্বিতীয় বোঝাটা ঠিক হলো না। একজন যদি একটা ট্রে-ঢাকনা কেনে তো বিশ জন কিছুই কেনে না। দেখে পছন্দ করে। ভেতরে যায়। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে ভেতর থেকে পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসে। পছন্দকরা জিনিষগুলো হাতে তুলে দিয়ে বলে, না ভাই, বাবু মানা করছেন। হাতে হাতে জিনিষ ময়লা হয়ে উঠল—দাগ ধরলো, মা বললেন, আগুন জ্বালিয়ে দাও এগুলোতে।

—বাজে। ছেড়ে দিয়েছিস তো ও রকম সেলাই নিয়ে ঘোরা ?

—হাঁ।

—বেশ করেছিস। একে ব্যবসা বলে না ছাই বলে।

আবারও হাসল জয়া। বললো—তারপর গিয়ে একটা দোকানের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এলাম তাদের ষ্টেশনারী জিনিষপত্র বিক্রি করে দেবার। টাকায় এক আনা কমিশন। এবার আরো চমৎকার। হাত ওল্টালো জয়া—সেলাই নিয়ে গিয়ে দরজায় দাঁড়ালে তবু দেখি বলে ভেতরে নিয়ে বসাত। এবার বাবুরা দরজায় গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র হাতের কাগজ নিয়ে গিয়ে বিরক্ত মুখে ভেতরে ঢোকেন। মেয়েরা শুধু মুখটুকু বাড়িয়ে বলে দেয়, দরকার নেই। অনুরোধ করলে, অনুনয় করলে একটু যে ব্যথিত তারা না হয় তা-ও

নয়। বলে, এ সব তো আর বিলাসী জিনিষ নয়, দরকারী জিনিষই। কিনতে হয় প্রতি মাসে মাসে। কিন্তু উনি মানা করছেন। বলছেন ওর জানা-শোনা দোকান থেকে নিয়ে আসবেন। কি করবো ভাই!

মঞ্জু বলে উঠল, বাজে একেবারে বাজে এগুলো। কেউ নেয় নি—নিলেই বা কি হতো? এগুলোকে কি ব্যবসা বলে নাকি! এটাও গেছে তো?

—তা গেছে।

—বাঁচা গেছে। এখন কি করছিস তাই শুনি?

—এখন? এখনেরটা একেবারে মোক্ষম ব্যবসা। এখন আর কোন বাবু বা উনি বৌ-মেয়েকে দিয়ে বিরক্ত মুখে যেতে বলে পাঠান না—তবে তারা অবশ্যি বাড়ীতে যাওয়া বা দেখা করাটা পছন্দ করেন না। তাদের জন্য অপেক্ষা করতে হয় রাস্তায়। আর এই প্রথম দেখলাম চাহিদার অন্ত নেই। তিক্ত মন পরীক্ষকের হাতের কলমের নির্দয়-কাটা দাগটার মতো নীচের ঠোঁটটাকে তেরছা করলো জয়া—

অন্ধকার ঘরের মতো জয়ার চোখ দুটো এমন গভীর অন্ধকার ঠেকতে লাগল মঞ্জুর কাছে যে, সে যেন সেই চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুই ঠাওর করে উঠতে পারল না। বুঝে উঠতে পারল না, কি বলছে জয়া—অর্থই বা কি তার কথার।

রামু চা আর খাবারের ডিস রেখে গেল। জয়া কাপটা কাছে টেনে এনে তাতে একটু চুমুক দিয়ে বললে—বাঃ; ভারি মিষ্টি গন্ধ তো চা-টার! কি চা খাস রে তোরা?

অন্যমনা মঞ্জু ওর কাপটা কাছে টেনে নিতে নিতে বলল—ও সব আমি জানিনে। বৌদি জানেন।

—বৌদি! অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠল জয়া। তোর বৌদি আছেন নাকি?

—হাঁ। আমার দুই দাদা। বড়দা' বিয়ে করেছেন।

—তোর বড়দা' তোর বৌদিকে খুব ভালোবাসেন, না? সেই অদ্ভুত হাসিটা জয়ার আরো যেন বেড়ে উঠতে লাগল। হাসতে হাসতে বললো, তুই আমাকে পাগল ভাবছিস? হাঁ, নিশ্চয়ই ভাবছিস। নইলে চুপ করে থাকতিস নে। এক্ষুণি বলে উঠতিস, বাঃ, সে তো নিশ্চয়ই। চায়ের কাপটা হাতে ছিল জয়ার। সে তো নিশ্চয়ই বলার সঙ্গে সঙ্গে তার হাসির দমক এমন বেড়ে গেল যে কোন মতে চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল সে। তার পর দমবন্ধ হয়ে আসা হাসি হাসতে লাগল দু হাতে বুক চেপে ধরে। অতি কষ্টে হাসিটা থামিয়ে রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললো—মেয়েগুলো এমন বোকা যে সেজন্য আমার হাসি পায়। চোখ-মুখ মুছে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসে চায়ের কাপটা সবেমাত্র জয়া আবার টেনে নিতে যাচ্ছিল, বাইরে জুতোর শব্দ শুনতে পাওয়া গেল কারু আসার। ধরা কাপ ছেড়ে তো জয়া দিলই, মুখের ভাব পরিবর্তন যা হলো তার তা আরো বিস্ময়কর! ত্রাসে ভয়ে যেন সে নীল হয়ে গেল। কেউ এলো মঞ্জু?

জয়ার মাথার গোলমাল সম্বন্ধে মঞ্জুর মনে আর কোনো দ্বিধা

ছিল না। সে খাবারের ডিসটা এগিয়ে দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললো—কেউ যদি হয় তাতে হয়েছে কি ? তুই চা খাবার খেয়ে নে।

—বাড়ীর ছেলেরা কেউ যদি হয়! যেন স্বগতোক্তি করল জয়া। যদি মুখচেনা বেরিয়ে যায় ? পাতলা রোগা শরীরটা তার যেন বার দুই তিন শিউরে উঠল। মঞ্জু কিছু বুঝে উঠবার আগেই শাড়ীর আঁচলটা দিয়ে মুখের একটা দিক আড়াল করে পালিয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে তড়িৎ পায় দরজার দিকে হাঁটা দিল সে। 'আমি পালাই' এই কথাটা তার শুনতে পাওয়া গেল দরজার মুখে। পড়ে রইল খাবার। পড়ে রইল চা। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু। ওকে একা ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হলো ? কথাটা মনে হতেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলো মঞ্জু রাস্তায়। রাস্তার দু'ধার দেখতে দেখতে এসে উপস্থিত হলো সে একেবারে ট্রামলাইন পর্য্যন্ত, কিন্তু জয়ার দেখা পেলো না। ফিরে এসে নীচের ঘরের টেবিলের পাশের ভাঙ্গা চেয়ারটার উপর দুহাতে মাথা চেপে ধরে বিমূঢ়ভাবে বসে রইল সে। জয়া যেন ওকে ধরে, ওর বুদ্ধি অনুভূতি চেতনা—সব কিছুকে ধরে কষে এমন কয়টা ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে যে তারা কেউ আর ঠিক জায়গায় নেই।

পরের দিন বেলা আড়াইটে তিনটে। কলেজ থেকে অন্যমনস্ক মনে বেরিয়ে এলো মঞ্জু। পথও চলতে লাগলো অন্যমনস্কের মতো। ট্রামের উদ্দেশ্যে সে চলছিল। উঠেও বসত সে ট্রামেই। কিন্তু যে ফুটপাতটা ধরে সে হাঁটছিল তার ধার ঘেঁষা পার্কটার একটা মাথা-ঝাঁকড়া গাছের হলদে ফুল ছিটানো ছায়া ঢাকা তলা যেন ওকে দাঁড় করিয়ে ডাক দিল একটু বসে যাওয়ার জন্য। লোহার রেলিংঘেরা পার্কটায় ঢোকবার জায়গা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছিল মঞ্জু। ঘুরে গিয়ে পার্কের গেট ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল। সূর্য্য তখন প্রায় মাথার উপরই। গাছের তলাগুলো ছাড়া কোথাও ছায়া নেই। সেই হলদে ফুলছিটানো গাছটার তলায় এসে ঘাসের উপর বসে হাতের কলেজ-ফাইল আর কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রাখল সে পাশে। পা দুটোকে দিল সামনের দিকে টান করে মেলে। গাছের গোল ছায়ার ঘেরটা ছাড়িয়ে পায়ের পাতা দুটো এসে পড়ল রোদে। পিঠটা রাখল সে গাছের গায়ে। হাত দুটো কোলের উপর।

কাল সমস্ত রাত সে জয়ার জন্য উদ্বেগ বোধ করেছে। কলেজের সময়ের অনেকটা আগে বেরিয়ে তাই সে গিয়েছিল জয়ার খবর নিতে। বাইরের রকের উপর গালে হাত রেখে বসেছিল জয়ার দশ বছরের ভাই। ওকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। চিনতে পেরেছিল।

তখন যদিও কিছুই মনে হয়নি কিন্তু এখন মঞ্জুর মনে হচ্ছে, ওকে দেখে তার মুখে যে ভাবটা ফুটে উঠেছিল তার চেহারাটা যেন কতকটা দুর্ভাবনাগ্রস্ত রোগীকে নিয়ে রাত কাটানোর পর ভোরের আলো দেখার মতো। তাড়াতাড়ি দুহাতে ঠেলে ভেজানো দরজা সে খুলে দিয়েছিল। বলেছিল, দিদি ঘরে। একটা দুর্ভাবনার চাপ যেন বুক থেকে নেমে গিয়েছিল যার জয়া ঠিক মতই বাড়ী এসেছে। তুমি এ ভাবে বসে কেন ? কথাটা শুধু বলার জন্যই বলে ভেতরে চলে গিয়েছিল সে। গিয়ে ঢুকেছিল জয়ার ঘরে। কিন্তু ঘরে ঢুকেই প্রথমে যার অসন্তুষ্ট দৃষ্টির সঙ্গে চোখাচোখি হলো তিনি জয়ার মা। দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি শ্লথভঙ্গিতে গা এলিয়ে ঘুমিয়ে থাকা জয়ার চৌকির পাশে। যে শাড়ী-জামা পরে জয়া ওদের বাড়ী গিয়েছিল সেই কাপড়-জামা পরা। ডান হাতটা ঝুলে পড়েছে চৌকির বাইরে। বাঁ হাতটা চাপা পড়েছে পিঠের তলায়। খোঁপাটা ভেঙ্গে খুলে কাঁটা-ফিতেশুদ্ধ লুটোচ্ছে মাটিতে। মুখটা কিছুটা হাঁ করা বিকৃত। যেন তাকে জোর করে তেতো ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। আর ঘুম ভেঙ্গে যাবার ভয়ে শুইয়ে দেবার সাহস নেই, তাই মেয়ের গড়িয়ে পড়ে না যাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে দাঁড়িয়ে আছেন মা। মঞ্জুর সঙ্গে চোখাচোখি হতে দরজার কাছেই তিনি জানিয়ে দিলেন ওকে, জয়া ঘুমোচ্ছে। ডাক্তারের নিষেধ আছে ওকে জাগাতে।

শুনে এবং তাঁর অসন্তোষ লক্ষ্য করে তক্ষুণি চলে আসতে যাচ্ছিল মঞ্জু। কিন্তু জয়ার মাকে ওরই দিকে এগিয়ে আসতে দেখে থামলো সে। দরজার কাছে এসে মেয়ের দিকে নজর রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করলেন জয়ার মা—কাল জয়া তোমার ওখানে গিয়েছিল ?

—হাঁ।

—কখন ?

—সন্ধ্যের সময়।

—কতক্ষণ ছিল ?

—ঘণ্টাখানেকের বেশী হবে না।

—ও: আচ্ছা। বলে তিনি তাঁর স্বস্থানে ফিরে যাবার জন্য পেছন ফিরলেন। জয়ার চোখ-বসে-যাওয়া, কালিঢালা মুখটার দিকে স্থির লক্ষ্যে একবার তাকিয়ে মঞ্জুও ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দুদিন আগেও যে জয়াকে দেখেছে, আর কাল যে জয়াকে দেখেছে তারা।

এ বাড়ীতে এসে যে জয়ার মাকে দেখেছিল সে জয়ার মা আর এই জয়ার মা এরাও যেন এক নয়। সে দিনের জয়ার মা ছিলেন উদাস অনাসক্ত। ছেঁড়া নোংরা শাড়ীটা বেআব্রুর পর্য্যায়ে চলে গেছে কি না, ভাতের থালায় ছেলেমেয়েদের শুধু ভাতই দিচ্ছেন কি না, ডাল মসলার ছিটের ভরা হাতলভাঙ্গা কাপে বন্ধুকে চা দেবার জন্য, আর শুধু চা দেবার জন্য মেয়ে ক্ষেপে উঠল কি না, দু আনার সিঙ্গাড়া আনতে গিয়ে তা থেকে দুটো পয়সা চুরি করে ছেলে দিদির হাতে মার খেলো কি না—কিছুতে দরকার নেই তার। কিছুতে প্রয়োজন নেই তার। কাশতে কাশতে দুহাতে বুকটা চেপে ধরে কাঠির মতো শরীরটার টুকরো চারটাকে একসঙ্গে কোথাও ঠেস দিয়ে রেখে, চোখ বুজে বসতে পারলে আর সব বাড়তি। ঠেস দেওয়া পিঠের দেয়ালটুকু ছাড়া দুনিয়াটা বাড়তি। দীর্ঘদিন অক্ষুধা আর অরুচি রোগে ভোগার পর তিনি যেন বিরাট ক্ষুধা নিয়ে জেগে উঠেছেন! এই এক মাসে চেহারার পরিবর্ত্তনও হয়েছে তার আশ্চর্য্য রকম। শরীর ভরেছে। ঢিলে চামড়া টান হয়ে শরীরের ফর্সা রংটা বেরিয়ে এসেছে। বয়স কমে গিয়ে দেখাচ্ছে তাকে জয়ার বড় বোনটোনের মতো। রকের উপর তেমনি গালে হাত রেখে বসেছিল জয়ার ভাই। ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। ওর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। প্রথমটায় খেয়াল করেনি মঞ্জু। তারপর বিস্মিত হয়ে তাকালো ওর দিকে—আমায় কিছু বলবে ?

—দিদির সঙ্গে দেখা হলো আপনার ?

—না তো! তোমার দিদি ঘুমিয়ে আছেন যে।

—ডাকলেন না কেন ?

মঞ্জু সস্নেহে ওর মাথায় হাত রাখল—ঘুমন্ত মানুষকে অযথা তুলতে হয় না।

—ঘুমের মানুষ কোথায়! দিদিকে তো ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে।

—ওই হলো। রাতে ঘুম না হওয়াটা তো ভালো নয়। তাই রাতে যাদের ঘুম না হয় তাদের ওষুধ খাইয়েই ঘুম পাড়াতে হয়। তাদের আর জাগাতে নেই।

—রাতে কোথায়! দিদিকে তো ওষুধ খাইয়েছে এই কতটুকু আগে—জোর করে। দিদি বাড়ী ফিরেছে তো এই মাত্র।

পা দুটো যেন থেমে যেতে চাচ্ছিল মঞ্জুর। থামতে দিল না। নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে চলতে লাগল সে।

—আপনি আবার আসবেন তো?

—আসবো।

—কাল?

—কাল—ভাবতে হলো মঞ্জুকে। জয়ার মার কথাই ভাবতে হলো তাকে। ওর আসা যে তিনি পছন্দ করছেন না সে কথাটাই। ওর আসাটাই কি কেবল—না কারু আসা-যাওয়াই তিনি চাচ্ছেন না? ছেলেটির একটা হাত হাতে তুলে নিল মঞ্জু। বললো—কাল না হলেও নিশ্চয়ই আমি আসবো।

গাছের ছায়ার ঘেরটা পার হয়ে বাইরে গিয়ে পড়া পায়ের পাতা দুটো রোদে গরম হয়ে উঠতে লাগল। পা দুটোর গরমে আর রোদের তাপে তেতে লাল হয়ে উঠতে লাগল মঞ্জুর গাল-মুখ। তবু সে সরল না নড়ল না। কোলের ওপর তেমনি দু হাত রেখে বসে রইল।

'আমাদের দাবী মানতে হবে।'

মোড়ের মাথা থেকে সমবেত জনতার ধ্বনি কানে আসতেই মঞ্জু পা গুটিয়ে মুখ ঘোরালো রাস্তার দিকে। বড় বড় পোষ্টার নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসতে লাগল একটা মিছিল। ছুটে এসে পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়ালো মঞ্জু। একসঙ্গে বহু জনতার সমাবেশ, তাদের সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি, তাদের সমুষ্টিবদ্ধ হাতের দাবী—এ সব দেখলে ওর ভেতরটায়ও যেন কেমন একটা অনির্দ্দেশ্য আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। ওঠানামা করতে থাকে ভেতরটা সংঘবদ্ধ জনতার পায়ের তালে তালে। ওর ইচ্ছে করে ও চিৎকার করে বলে ওঠে—না, না ভুল বলছ তোমরা! মুষ্টিবদ্ধ হাতের শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া আমাদের দাবী মানতে হবে নয়। ওতে আমাদের শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া দাবী শূন্যেই মিলিয়ে যায়। দুদিনের মিছিল আর প্রতিবাদে ফুরিয়ে গিয়ে ঘরে এসে বসে হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বলি, আমাদের দাবী ওরা মানল না। ও কথা নয়। মুষ্টিবদ্ধ হাতের ধ্বনি অপর হাতের শক্ত মুঠোয় ধরে বলো, 'আমাদের দাবী আমরা মানাবো।' দাবী মানা না মানা ওদের মর্জির উপর খেয়াল-খুসীর উপর ফেলে না রেখে দাবী মানানোর দায়টা নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসো। তবেই না দুদিনের মিছিলে ফুরিয়ে যাবো না। 'মানাবোটা' যতক্ষণ না মানিয়ে উঠতে পারবো থেমে যাওয়া আমাদের থাকবে না। নইলে, আমাদের দাবী মানতে হবে।—মানব না।—মানতে হবে।—মানব না। তার পর? তারপর ওরা দিল না, ওরা শুনল না। ওরা মানল না। না—না এ সমস্ত ভিক্ষার নৈরাশ্য বাণী। এ ফাঁকা কথা। মিছিলটা ধ্বনি তুলতে তুলতে চলে গেলেও চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু।

—নমস্কার!

চমকে ডান দিকে ঘাড় ফেরালো মঞ্জু। দেখল নীল হাসিমুখে নমস্কার জানাচ্ছে ওকে।

হাত তুলে নমস্কার করতে করতে বললো—আপনি! বাঃ, ভারি সুন্দর দেখা হয়ে গেল তো!

নীল পার্কের রেলিং-এর উপর হাত রেখে বললো—আপনার কিন্তু কোন আগ্রহ ছিল না দেখা করার! থাকলে ইচ্ছে করলেই আপনি খোঁজ নিতে পারতেন।

হাসল মঞ্জু—আপনার দিক থেকেও কোন আগ্রহের পরিচয় আমি পাইনি।

কিন্তু ছিল। আপনাদের বাড়ী একদিন এসে উপস্থিত হবো কি না। সে কথাও ভেবেছি। কিন্তু আপনারা যদি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন। সে যাক্, খবর কি বলুন?

মঞ্জু নীলের হাতরাখা রেলিংটাকে দেখিয়ে বললো—হয় এটার এ পিঠে আপনাকে আসতে হয়, নয়তো আমাকে এটার ওপিঠে যেতে হয়। এভাবে কি কথা চলে? আপনি এ পিঠে এলে তো এসে পড়বেন ফুটপাতে। তখন আবার বসবার জায়গা খুঁজতে হবে। তবে আপনি ভেতরে আসুন।

নীল যেন একটু ভাবনায় পড়ল, কি করবে।

—কি সময় নেই?

—আমি কি জানতাম আপনার সঙ্গে আজ দেখা হবে! মুখে এ কথা বললেও নীল পার্কে ঢোকবার গেটটা কোথায় দেখে নিয়ে দাঁড়ান আসছি বলে সে ভিন্নমুখী চলল।

সূর্য্য তখন অনেকটা পশ্চিমে ঢলে এসেছে। গাছের ছায়াটা এতক্ষণ যেখানে ছিল সেখান থেকে সরে গিয়ে লম্বা হয়ে পড়েছে। পুব দিকে। মঞ্জুকেও দিক্ পরিবর্ত্তন করতে হলো। পুব দিকের লম্বাটে ছায়ার উপর গিয়ে বসল সে।

নীল এসে হাতের ভারী মোটা ফাইলটা পাশে রেখে বসল। বসেই পকেটে হাত ঢোকালো সিগারেটের জন্ত।

মঞ্জু বললো—আপনার কাজ ছিল বুঝি?

গোল্ডফ্লেকের ভরা টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিতে নিতে নীল বলল—তা ছিল একটু।

—তবে তো আপনাকে ডেকে বসিয়ে ভালো করলাম না?

—দেখা যাক। একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে সেটা ধরাতে ধরাতে জবাব দিল নীল।

—কি দেখা যাবে?

—ডেকে বসিয়ে ভালো করলেন কি না।

—সেটা দেখবেন কি ভাবে?

—একটু কাজ ক্ষতি করে বসে যদি আর একটা তার চাইতে বেশী কাজ হয়।

—আমার কাছে?

—আপনি একজন কম কেউ নাকি। কম কাজের মানুষ নাকি।

বিস্ময়ে গালে বাঁ হাতের দুটো আঙুল রাখল মঞ্জু—আপনি আপনার স্কুলের জন্ত টিচার খুঁজতে বেরুননি তো?

উচ্চস্বরে হেসে উঠল নীল। বললো—স্কুল হলে বলা যায় না কি করতাম। তবে ও বালাই চুকে গেছে।

—বলেন কি! আপনি খুঁজতেন আর নাই খুঁজতেন—আমি নিজেই যে শিক্ষয়িত্রীর আবেদনপত্র নিয়ে হাজির হবো ভাবছিলাম—সত্যি বলছি। সত্যিই বলছিল মঞ্জু। ও মনে মনে ভেবে রেখেছিল নীলের স্কুলে গিয়েও কলেজের অফ পিরিয়ডে পড়িয়ে আসবে।

আকাশের দিকে মুখ করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নীল বললো, না স্কুল করা হলো না। বাড়ীটা যার তিনি তার ভোজপুরী দারোয়ান দিয়ে আমাদের ভাঙ্গা টেবিল-চেয়ারগুলো বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। ভাঙ্গাবাড়ী বলেই যে তার ভেতর ইচ্ছেমতো মাথা গলানো যায় না, পাকা গোঁফে তা দিয়ে পাকা বাঁশের লাঠি হাতে তার দারোয়ান সে কথাই ঘোষণা করছে।

—ওটার গেটই বা কোথায়, তালা দেবার দরজাই বা কোথায়? ওটা তো ভাঙ্গা ভুতুড়ে বাড়ী যাকে বলে তাই।

—পরিচিত ওটা ওনামেই। বাড়ীটা দেখে যখন একটা স্কুল করার কথা মনে এলো, খোঁজ-খবর করেও বের করতে পারলাম না বাড়ীটা কার। কি নাম তার। কোথায় সে থাকে। জানবেই বা কে। কোন এক বিলাসী জমিদারের শহর ছাড়ানো বনের বাগানবাড়ী। সামনে ধারে লোকালয় বা বসতি কিছুই ছিল না। উদ্বাস্তরা এসে নতুন আস্তানা গড়েছে। নূপুরের শব্দ আর সেতারের ঝঙ্কারের সঙ্গে ভুতের ভয়েই হয়তো কেউ বাসা বাঁধেনি, তবে দরজা জানালা খুলে টুলে যা দু-একটা অবশিষ্ট ছিল তা তুলে নিয়ে তারা কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! আমি যে মালিকের নাম-ঠিকানা কিছুতেই খুঁজে বের করতে পারলাম না কিন্তু তার ঠিকানা ঠিক খুঁজে বের করে গিয়ে উপস্থিত হলো। আর লাঠি হাতে দারোয়ানের এসে উপস্থিত হতেও সময় লাগল না।

এক বিখ্যাত সাহিত্যিক বলেছেন, বহু জিনিষ আমরা ফেলে দিতাম, যদি তুলে নেবার লোক না থাকত। হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নীল পশ্চিম আকাশের যে দিকটার দিকে তাকিয়ে রইল সেদিকে তাকিয়ে থাকতে চোখের তখনও কষ্ট হবার কথা। আগুন গলানো মেঘের ভেতর থেকে সূর্য্যের যে ছোট গোলাকৃতিটুকু দেখা যাচ্ছিল তার তেজও চোখের পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু সমুদ্র যেমন সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে থাকে ঠিক তেমনি যেন নীলের গভীর নীল দু' চোখ সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

বেদনাবোধ করল মঞ্জু। বললো—আপনারা মালিকের সঙ্গে দেখা করলেন না কেন?

মঞ্জুর দিকে দৃষ্টি ফেরালো নীল—আমার আগ্রহ ছিল না। অন্যেরা করেছিলেন।

—কি বললো সে? কি করতে চায় সে বাড়ীটা দিয়ে?

—সে কিছুই করতে চায় না। যে কিছু করতে চায় সে কিনে নিক। নয়তো ভাড়া দিক।

—এই পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে তাকে কেউ ভাড়া দিয়েছে?

—রাগ করে লাভ নেই। এই বিশ-ত্রিশ বছর কেউ চাইতে আসেনি। এলে নিশ্চয়ই সে আমাদের চাইতে বেশী দাক্ষিণ্য লাভ করতো না।

চুপ করে রইল মঞ্জু। পার্কে বড়দের ভীড় আরম্ভ না হলেও ছোটদের ভীড় তখন শুরু হয়ে গেছে। ঝিয়েরা বাচ্চাদের ছেড়ে দিয়ে বসে গেছে গল্প করতে। বাতাসে কিছু গুঁড়ো ফুল ঝরিয়ে দিয়ে গেল ওদের কোলে মাথায়। ফুলগুলো কোল থেকে একটা একটা করে হাতে তুলে নিতে নিতে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করলো—আচ্ছা, প্রথম দিন গিয়ে আমরা দেখেছিলাম বিশ্ব পেছনে রেখে বসে আপনি যেন কি লিখছেন। আপনি লেখেন।

নীল গোল্ডফ্লেকের টিনটা মঞ্জুর দিকে বাড়িয়ে ধরল। লিখি না তো কি। এই যে চারমিনারের বদলে গোল্ডফ্লেকের টিন দেখছেন এটা আমি লিখে উপায় করেছি জানেন? আরে আরে দাঁড়ান—হাত তুলে থামানোর ভঙ্গি করলো নীল। মুখ-চোখ অমন উদ্ভাসিত করে তুলবেন না। লিখি, তাই বলে আমি লেখক নই। কোন স্বনামধন্য লেখকের সঙ্গে পরিচিত হবার গৌরব আপনি বোধ করবেন না। বরং নামটা যে আপনি জানেনই না—আমার সেই লজ্জা ঢাকতে আপনাকে কথা খুঁজতে হবে। কাগজের অফিসে কাজ করে এমন কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। যাই! বসি। গল্প করি। সময়ে অসময়ে তাদের রিপোর্ট তৈরী করতে সাহায্য করি। দু'-একটা নিজস্ব ছুটোছাটা লেখাও যে না বের হয় তা নয়। তবে সম্প্রতি এক বড় লোকের সুনজরে পড়ে গেছি। তাঁর ধারণা হয়েছে তার মনের কথা, বলার কথা বুঝে নিয়ে বিস্ময়কর ভাবে তা আমি প্রকাশ করতে পারি। আর একটা সিগারেট বের করে সেটা ধরিয়ে নিয়ে বললো—একটিন করে গোল্ডফ্লেক সিগারেট তিনিই রোজ আমার জন্য এসে টেবিলের উপর রেখে দেন। গাড়ী পাঠান। গিয়ে পৌঁছানো মাত্র একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করেন। দু-একটা এ-কথা সে-কথার পরই কি লিখতে চান তা বলতে চেষ্টা করেন। তারপর টিনটা আমার দিকে আরো ঠেলে দিয়ে লাইটার জেলে আমার সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে, 'এবার লিখুন আপনি' বলে একেবারে ঘর ছেড়ে চলে যান। এয়ার কণ্ডিশন ঘরে। মূল্যবান সিগারেট টানতে টানতে নিজেকে আমার সম্রাট মনে হতে থাকে।

মঞ্জু বললো—তাঁর মনের কথাগুলো আপনি আশ্চর্য্য রকম গুছিয়ে লিখতে পারেন! তার মানেই হলো আপনি যা লেখেন সেগুলোকেই তার নিজের কথা মনে হয়।

—পাগল নাকি। তার চিন্তা, আমার চিন্তা—তার বলার কথা আর আমার বলার কথা কি এক? তা নয়। তার চিন্তাকেই আমি রূপ দেই। দু'-চারটে কথায়ই তার বক্তব্য আমার বোঝা হয়ে যায়। সেগুলোকেও আমি জোরের সঙ্গেই যুক্তির সঙ্গে দাঁড় করাই।

—অপরের চিন্তা নিয়ে চিন্তা করা, লেখা—এ আপনার পীড়াদায়ক মনে হয় না?

—তার চাইতে অনেক বেশী পীড়াদায়ক চিন্তা মনে হয় বসে বসে পেটের চিন্তা করাতে। নির্বোধ আর ঘ্যানঘেনে প্রিয়জনের অবুঝ দাবীর মতো তার সেই একঘেয়ে ঘ্যানঘেনানি চাওয়া তাকে শান্ত না করে, ঠাণ্ডা না করে কোন উপায় নেই তার দিক থেকে মনটাকে একটুও দূরে সরিয়ে নেবার।

আপনি সেদিনও এই লেখাই লিখেছিলেন?

—না। ওটা এখনও কোন লেখা নয়। লেখার আয়োজন মাত্র।

যদি লিখে উঠতে পারি, তবেই আমি লেখক কি না তার পরীক্ষা হবে, এ সব তো বাজে।
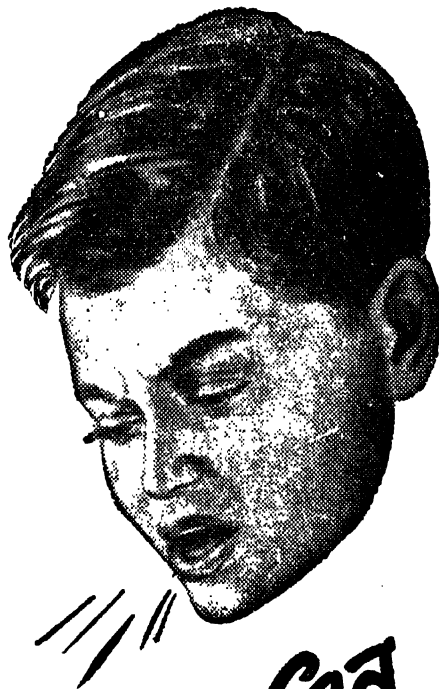
[ ক্রমশঃ।

কাশির মূলকারণ দূর করুন
SIROLIN
'ROCHE'
for COUGHS COLDS and all irritable and inflamed conditions of the Chest and Respiratory Tract
সিরোলিন খান
নিরাপদ পারিবারিক ওষুধ
সিরোলিন কেবল যে কাশি 'থামিয়ে দেয়' তা নয়—কাশির মূলকারণ দুষ্ট-জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

## পনেরো

বার্ণার্ড শ' বিশ্বাস করতেন যে, মানব-সমাজের নিকৃষ্টতম প্রতিনিধিরও মহৎ কর্ম করার সামর্থ্য আছে। তাকে দিয়ে ত করানো যায়—তা যদি না সম্ভব হয় তাহলে মানব জাতির কোনো আশা বা ভরসা নেই। এই কারণেই আর একটি ধর্মীয় নাটক রচনার প্রয়োজন হল, মানবতাই যেখানে বড়ো, বার্ণার্ড শ' প্রমাণ করতে চান যে Life-force বা জীবন-শক্তির প্রভাবে অতি সহজেই এই কষ্ট করা যায়। The shewing-up of Blanco Posnet-এর সংলাপ ঘটনা এবং সংঘাতবহুল। ইউনাইটেড ষ্টেটসের একটি অঞ্চলের পটভূমিতে এক ঘোড়াচোরের কাহিনী।

ব্লানকো পসনেট ঘোড়া চুরি করেছিল, সে জানতো ধরা পড়লে পাবে মৃত্যুদণ্ড। ঘোড়া চড়ে যাওয়ার পথে জনৈক মহিলা অত্যন্ত উত্তেজিত ভঙ্গীতে এসে তার পথরোধ করলেন। ঘোড়াটা তার চাই, মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। পসনেট তাকে ঘোড়াটা দিয়ে প্রায় কুড়ি মাইল পথ পায়ে হাঁটলো। সে কিন্তু ঘোড়া চুরির অপরাধে ধরা পড়লো। জনৈকা ব্যাপিকা রমণী সাক্ষ্য দিল যে, সে স্বচক্ষে তাকে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু দণ্ডপ্রাপ্তির মুহূর্তে যে রমণী ঘোড়াটা ধার নিয়েছিল সে এসে বলল, ব্লানকো পসনেটকে কখনও দেখেনি—ফলে পসনেটের জীবন রক্ষা হল। স্বৈরিণী মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের কথা শুনে অভিভূত হয়ে বলল—আমিই মিথ্যা বলেছি। ব্লানকোর মুখ দিয়ে বার্ণার্ড শ' নিজের বক্তব্য বলেছেন—আর এই কথা ক'টির জন্যই নাটকটি নিষিদ্ধ হয়েছিল।

"He's a sly one. He's a mean one, He lies low for you ; He plays cat and mouse w th you. He lets you run loose until you think you are shut of Him ; and then, when you least expect it, He's got you..."

ঈশ্বর এবং মানুষ সম্পর্কে বিড়াল ও মুষিক কল্পনা বার্ণার্ড শ' ভিন্ন আর কে করবে? সেই কালে Life-force সম্পর্কে এই তাঁর ব্যক্তিগত সংযোগ।

এই নাটক ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লেখা শেষ হয়, হিজ ম্যাজেষ্টিস থিয়েটারে শিশুদের জন্য একটি সাহায্য-রজনীর উদ্দেশ্যে মঞ্চস্থ করা স্থির হয়। এই নাটক পড়ে বীরবোহম ট্রী আতংকিত হলেন। ব্লানকো পসনেটের ভূমিকা ট্রীর জন্যই রচিত হয়। তার যোগ্য ভূমিকা সন্দেহ নেই। লর্ড চেম্বারলেন এই নাটক অভিনয়ে সম্মতি দিলেন না। তাঁর মতে ঈশ্বর-বিরোধী এই নাটক গ্লানিকর।

ডাবলিনের এ্যাবী-থিয়েটরে 'হর্স-সো উইকে' লেডী গ্রেগরী এই নাটক প্রযোজনা করলেন, এই রঙ্গমঞ্চের ডাইরেকটর ছিলেন ডব্লু, বি, ইয়েটস আর লেডী গ্রেগরী। সেখানেও সরকারী মহল আপত্তি করেছিলেন। সেন্সর এই নাটকে বেশ্যার ভূমিকায় আপত্তি করেননি কিংবা নৃশংসতার পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলেন নি। তাঁরা চেয়েছিলেন ঈশ্বর সম্পর্কে কয়েকটি আপত্তিকর কথা তুলে দিতে, ঈশ্বরকে মহিমামণ্ডিতরূপে প্রকাশ করাই তাঁদের ইচ্ছা। বার্ণার্ড শ' এই অনুরোধ রক্ষা করতে নারাজ। যাই হোক, ডাবলিনে অভিনয় কালে দর্শক-সাধারণ এই নাটকের মধ্যে কমেডির রস পেলেন, এবং এর ধর্মীয় দিকটা উপেক্ষা করলেন। সেন্সর সংক্রান্ত জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্যদান কালে বার্ণার্ড শ' স্বীকার করলেন, তিনি Conscientiously immoral writer—

বার্ণার্ড শ' হয়ত মনে করেছিলেন যে, এই নাটক রচনায় তিনি টলষ্টয়ের Power of Darkness দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, আসলে কিন্তু এ নাটক তাঁর Devil's Disciple এরই রূপান্তর। Heartbreak House-এ শ' হয়ত মনে করেছিলেন, তিনি শেখভের দ্বারা অনুপ্রাণিত, অথচ এই নাটক তাঁর Getting Married এবং Misalliance এর ধারাবাহী। এই তিনটি নাটক নিয়ে একটি triology, তবে Blanco Posnet নাটকেই তাঁর বক্তব্যের চরম অভিব্যক্তি। আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুতে তিনটির মধ্যেই আশ্চর্য সমমমিতা আছে। তিনটি নাটকেই আছে সমান দুঃসাহসিকতা এবং সংলাপও সেই বৈঠকখানার কথোপকথন এবং ওপরতলার সমাজ সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র সেই অপরিবর্তনীয় মনোভংগী।

বার্ণার্ড শ' টলষ্টয়কে এক খণ্ড নাটক পাঠালেন, সেই সঙ্গে এক চিঠিতেই লিখলেন—

"আমার কাছে এখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, তবে ঈশ্বরতুল্য প্রজ্ঞা ও শক্তিসম্পন্ন এক সৃজনীশক্তি নিয়তই সংগ্রামশীল। সর্বশক্তিমান ও সর্বনিয়ন্তার স্থান গ্রহণের জন্যই তার এই সংগ্রাম। যে সব নর-নারী জন্মগ্রহণ করছেন তাঁরা এই উৎকর্ষ লাভের নবতম প্রচেষ্টা!...আমরা ঈশ্বরকে সাহায্য করার জন্যই আছি, ঈশ্বরের কর্মের সহায়ক—তাঁর ত্রুটি সংশোধন করে দেবত্বলাভের জন্যই আমাদের প্রয়াস।"

টলষ্টয় অভিযোগ করেছিলেন, Man and Superman-এ বার্ণার্ড শ যথোচিত গুরুত্ব বজায় রাখেননি, তার ফলে গভীরতম মুহূর্তে দর্শকের হাস্যোদ্রেক হয়েছে। বার্ণার্ড শ' জবাবে বলেছেন—"কেনই বা করবো না? হাসি ও রঙ্গকে নির্বাপিত করা হবে কেন? মনে করুন এই পৃথিবীটাই ঈশ্বরের একটা পরিহাস মাত্র, সেই পরিহাসকে সরস না করে বিরস করবেন কি?"

"বার্ণার্ড শ' টলষ্টয়কে প্রসন্ন করেছিলেন, তার মূলে ছিল বার্ণার্ড শ'র উক্তি—'আর্ট ফর আর্ট সেক'—এই নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই। 'আর্টাৎ পরতরং' ন হি—এই নীতি আমার নয়, আর্ট ছাড়া আর কিছু যদি আমার লেখায় না থাকে, আর্ট-অতিরিক্ত যদি কিছু না লিখতে পারি, তাহ'লে আর আমার মূল্য কি ?"

টলষ্টয় কিন্তু এই চিঠি পড়ে বেদনানুভব করলেন, এ চিঠি তাঁর কাছে তাই a painful impression মাত্র।·

এই চিঠির জবাব এল কয়েক মাস পরে। চিঠিটা যখন টলষ্টয় পেয়েছিলেন তখন তিনি এক পারিবারিক সংকটে বিপর্য্যস্ত। তিনি লিখলেন—

৯ই মে, ১৯১০

'প্রিয় মিঃ বার্ণার্ড শ',

আপনার নাটক এবং সরস চিঠি পেয়েছি। সানন্দে আপনার নাটক পাঠ করেছি, বিষয়বস্তুতে এবং ন্যায় সংক্রান্ত প্রচার মানুষের মনে সাধারণতঃ অতি অল্প প্রভাব বিস্তার করে, আপনার এই উক্তিতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। যাঁরা তরুণ তাঁরা যা ন্যায় তার বিরোধিতা করাটাই প্রশংসনীয় মনে করেন, একথা ঠিক ; কিন্তু সেই কারণে ন্যায় বা নীতির প্রচারের কোনও প্রয়োজন নেই, এই অর্থ হয় না। এর একমাত্র কারণ, যাঁরা প্রচারক তাঁরা যা প্রচার করেন তা পালন করেন না, অর্থাৎ তার নাম ভণ্ডামী।

* * * *

দেবতা এবং অশুভ সম্পর্কে আপনার যা উক্তি সেই বিষয়ে আমি আপনার Man and Superman সম্বন্ধে যা বলেছি তারই পুনরুল্লেখ করতে চাই। অর্থাৎ ঈশ্বর এবং অশুভ সংক্রান্ত সমস্যা এমনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তা লঘু ভাবে আলোচনা করা চলে না। সেই কারণেই আপনাকে স্পষ্ট বলছি, আপনার চিঠির শেষাংশ পাঠ করে গভীর বেদনাবোধ করছি···

ভবদীয়
লিও টলষ্টয়।"

বার্ণার্ড শ'র চিঠির শেষাংশে ছিল—

"If the World was one of God's jokes, would you work any the less to make it a good joke instead of a bad one ?"

টলষ্টয়ের এই চিঠিতে গভীর ভাবে বিচলিত হলেন বার্ণার্ড শ'। থিয়েটারের করতালির চাইতে ক্ষীণ প্রশংসা তাঁকে অনেক বেশী পুলকিত করত। পরাজয়ের গ্লানিমণ্ডিত ম্লান দিনগুলিতে একমাত্র আশা ছিল, উইলিয়াম মরিস বা লিও টলষ্টয়ের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। এই দুজনেই তাঁদের আত্মিক শক্তিতে সারা জগতকে চমকিত করেছিলেন। পরিহাস-প্রিয়তার জন্য শুধু টলষ্টয়-ই যে বার্ণার্ড শ'কে তিরস্কার করেছিলেন তা নয়। আরো অনেকেই তাঁকে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু এই মনোবৃত্তি ছিল তাঁর মজ্জাগত। উত্তরাধিকার-সূত্রে এই মনোভাব তাঁর পৈতৃক বৈশিষ্ট্য ! এই ভাবেই স্বতোৎসারিত ভঙ্গীতে তাঁর কথা মনে আসতো, চেষ্টা করতে হত না, সুতরাং তার গতিরোধ করাই কঠিন।

নীতি প্রচার যদি মানুষের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার না করে, তাহলে দুর্নীতি প্রচার করলে কি হয়,—এই হল তাঁর পরবর্তী নাটকের বিষয়বস্তু। এর পরবর্তী নাটকে বার্ণার্ড শ'র বক্তব্য হল—"The young had better get into trouble to have their souls awakened by disgrace—" এই নাটকের বিষয়বস্তু টলষ্টয় দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, এর উৎস স্যামুয়েল বাট্‌লার। এই নাটকের নাম Fanny's First Play,—আড়াই বছর ধরে মঞ্চে এই নাটক অভিনীত হল, গ্রাণভিল বার্কারের স্ত্রী লীলা ম্যাক্‌কার্থী নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এই নাটকেই দেখা গেল, বার্ণার্ড শ' শুধু Court Theatre-এর মুষ্টিমেয় বিদগ্ধ দর্শকের প্রিয় নাট্যকার নন। তিনি সকলের, মুদী, দোকান-কর্মচারী, শহরতলীর দরিদ্র জননী—সকলের কাছেই তিনি মজার মানুষ—জর্জ বার্ণার্ড শ'।

Fanny's first play নাটক ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রচিত। এই নাটকে বার্ণার্ড শ' তাঁর নাট্য-সমালোচকদের নিয়ে রঙ্গ করেছেন। লীলা ম্যাক্‌কার্থীর হাতে পাণ্ডুলিপি দিয়ে বার্ণার্ড শ' বললেন—"এই নাটকে আমি নাম স্বাক্ষর করিনি, এমন ভাবে প্রযোজনা করবে যে, সবাই যেন মনে করে এই নাটক জেমস ব্যারীর রচনা। সজ্ঞানেই বলতে পারো লেখকের নাম "B", মোটা অক্ষরে B..."

সেই নাটক ৬০০ শত রজনীর গৌরব লাভ করলো।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রচিত বার্ণার্ড শ'র দু'খানি নাটক লণ্ডনে নিষিদ্ধ হয়েছিল, একটির নাম Press Cuttings আর অপরটি The shewing-up of Blanco Posnet। প্রথম নাটকটি নিষিদ্ধ ; কারণ, সেই নাটকে দু'জন খ্যাতনামা মনীষীর সম্বন্ধে বক্রোক্তি ছিল,

মিচেনার এবং বালস্টুইথ। Press Cuttings সাময়িক ঘটনার ভিত্তিতে রচিত হলেও তার মধ্যে বার্ণার্ড শ'র নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তাই তাঁর সব নাটকের মত এই নাটকেও সর্বকালিক আবেদন বর্তমান। কিন্তু The shewing-up of Blanco Posnet নাটকের He's a sly one, He's a mean one—প্রভৃতি কটূক্তি শিষ্টাচার-বহির্ভূত মনে হ'ল সেন্সর কর্তৃপক্ষের। জর্জ আলেকজাণ্ডার রেডফোর্ড নামক সম্ভ্রান্ত সলিসিটর ছিলেন নাটকের সরকারী পাঠক। তিনিই তখন প্রকৃতপক্ষে ইংরাজী নাটকের সর্বাধিনায়ক। নাটক নিষিদ্ধ হওয়ার ফলেই ডব্লু, বি, ইয়েটস এবং লেডী গ্রেগরী ১৯০৯, ২৫শে আগষ্ট ডাবলিন শহরে The shewing-up of Blanco Posnet মঞ্চস্থ করলেন। ইংলণ্ডের নাট্য-সমালোচকরা সেদিন সকলেই ছুটেছিলেন ডাবলিনে, একটা ভয়ংকর কিছু দেখার আশায়। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, একখানি ধর্মমূলক নাটক দেখতে হচ্ছে, স্বভাবতঃই তাঁরা হতাশ হলেন। ফলে তাঁরা লর্ড চেম্বারলেনের অফিসের নাট্য-বিচারককে না ঠুকে নাট্যকারের ওপর আক্রমণ সুরু করলেন।

রেডফোর্ড যে ভাবে নাটক নিষিদ্ধ করছিলেন, তার ফলে সর্বত্র একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হল, ভদ্রলোকের সাহিত্য-বোধ ছিল সীমাবদ্ধ অথচ তাঁর হাতেই নাটকের বিচারের ভার। এই ধূমায়িত অসন্তোষের ফলেই ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের লিবারেল দল পরিচালিত সরকার হাউস অফ লর্ডস এবং হাউস অব কমন্সের সদস্যদের নিয়ে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি অন ষ্টেজ প্লেস, এই নামে একটা কমিটি নিযুক্ত করলেন সেন্সর সংক্রান্ত বিচার বিবেচনার জন্য। লর্ড-স্যামুয়েল (তখন শুধু হার্বার্ট) এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন।

এই অনুসন্ধান কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্যাবলী মাত্র তিন শিলিং তিন পেনস মূল্যে সরকারী পুস্তিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। রেডফোর্ড, উইলিয়াম আর্চার, বার্ণার্ড শ', গ্রাণভিল বার্কার, স্যার জেমস ব্যারী, ফরবেস রবার্টসন, জন গলসওয়ার্দি, লরেন্স হাউসম্যান, গিলবার্ট মারে, হল কেইন, ইস্রায়েল জাংউইল, স্যার আর্ণার পিনেরো, জি, কে, বেসটারটন হাউস অব কমন্সের স্পীকার প্রভৃতি এই কমিটিতে যে সব সুদীর্ঘ বিবৃতি দান করেন, তা এই পুস্তিকায় আছে। সাহিত্য সম্পর্কে এত মূল্যবান সরকারী দলিল আর নেই।

বার্ণার্ড শ'র সুদীর্ঘ বিবৃতিতে এই কমিটি প্রায় বানচাল হয়ে পড়ল—শ'র বিবৃতির মধ্যে তাঁর আইনজ্ঞ মনের পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করার মত।

বার্ণার্ড শ' বললেন—"সেন্সরসিপ প্রদত্ত লাইসেন্স পাওয়া যে সমস্ত নাটক এখন লণ্ডন শহরের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, তার মূল লক্ষ্য যৌন-বুভুক্ষা উদ্রেক করা।

চেয়ারম্যান বলেছিলেন—যৌন-দুর্নীতি (immorality), শ' বললেন তা নয়, কথাটা হবে যৌন-পাপ (vice)।

তখন চেয়ারম্যান প্রশ্ন করলেন—আমার মনে হয়, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় ব্যাপারে রঙ্গমঞ্চকে নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত রাখাই আপনার মত, তবে রঙ্গমঞ্চে যৌন-পাপ সম্পর্কিত উত্তেজনামূলক কিছু অভিনীত হলে তা নিষিদ্ধ করা উচিত। বার্ণার্ড শ' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—"তা নয়, আমি একথা স্বীকার করি না, যৌন-পাপ উদ্রেক করার জন্য যদি কাউকে অভিযুক্ত করতে হয়, তাহলে থিয়েটারের ম্যানেজারকেও অভিযুক্ত করা যাবে অতি সামান্যতম অপরাধে। প্রধান ভূমিকাভিনেত্রী যদি সুন্দরী হন কিংবা একটা চমৎকার হ্যাট মাথায় দেন—তাহলে সেটাও অপরাধের আওতায় পড়বে। যা নির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট নয় সেই সম্পর্কে আমার তীব্র আপত্তি আছে।

যৌন-পাপ উদ্রেককারী বিষয় সম্পর্কে আপনারা যে কোনও আইন করতে পারেন তার আগে তার প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দেশ করে দিতে হবে। সোজাসুজি একটা সাধারণ আইন তৈরী করলে চলবে না, যৌন-পাপ উদ্রেক করতে পারে এমন বস্তুর কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকার অর্থ আইনের হাতে ঢালা ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া। কোনো স্ত্রীলোক হয়ত মুখ-হাত ধুচ্ছেন, কিংবা একটা ভালো পোষাক পরেছেন, কিংবা ঐ জাতীয় কোনো কর্মের জন্য পথচলতি মানুষ তাতে আকৃষ্ট হতে পারে এবং বলতে পারে—এতদ্দ্বারা আমার মনে যৌন-পাপ প্রবৃত্তি উদ্রেক করা হয়েছে—এই ধারণের সাধারণ ধারা অতি সাংঘাতিক, কোনো আইনজীবী হয়ত তা সমর্থন করবেন না।"

যাই হোক, এই কমিটির সুপারিশের ফলে নাটকাভিনয়ের অনুমতিদান ব্যবস্থা অনেক পরিবর্তিত হল, তার আর একটি কারণ পরবর্তী লর্ড চেম্বারলেন আর্ল অফ ক্রোমার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন।

কমিটির আর একটি সিদ্ধান্তে কিন্তু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল, তাঁরা বার্ণার্ড শ'র বিবৃতির কিছু অংশ মাত্র শুনে বাকিটা আর শুনতে চাইলেন না। এই সিদ্ধান্ত এমন ভাবে চতুর্দিকে পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল যে, বার্ণার্ড শ'কে কি বলতে দেওয়া হয়নি, তা জানার আগ্রহ সকলের বেড়ে গেল। ফলে অনেক বেশী লোক বার্ণার্ড শ'র বিবৃতি সংগ্রহ করে পড়তে লাগল। বার্ণার্ড শ' তাঁর বিবৃতিতে এমন অনেক কথা লিখেছিলেন এমন সব শব্দ বাক্য এবং উপমা প্রয়োগ করেছিলেন, যা শুধু—সাধারণ পাঠক নয়, সাংবাদিকরাও ভুল বুঝেছেন। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা নিজের সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'র উক্তি 'a Specialist in immoral and heretical plays—' কথাটির ঠিক অর্থ ধরতে পেরেছেন, সাধারণ মানুষ প্রচলিত অর্থ অনুসারেই মানে বুঝেছে। অনেকে মনে করলেন, বার্ণার্ড শ' অশ্লীল সাহিত্যলেখক, নির্লজ্জ ভাবে আত্মপ্রচার করছেন। কিন্তু সে সব সাময়িক, পরিশেষে তাঁর জয় হোল।

সরকারী পুস্তিকাটির দাম তিন শিলিং তিন পেন্স হলেও, ফুলস্কেপ সাইজের চারশো পাতার বই। বার্ণার্ড শ' The shewing-up of Blanco Posnet নাটকের ভূমিকায় এই সুদীর্ঘ রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে দিয়েছেন কমিটির দু'-চার জন সদস্যের অপরূপ রেখাচিত্র।

অবশেষে একদিন লণ্ডন শহরেও এই নাটক অভিনীত হল, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হল এবং দিনের পর দিন অভিনীত হলেও কেউ আপত্তি করেন নি, বা কোনো গোলমাল হয়নি।

## ষোলো

এদিকে বার্ণার্ড শ' অমায়িক ভদ্রলোক। বয়সের সঙ্গে সৌম্য শান্ত হয়ে উঠছেন। স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে এদিক-সেদিকে বেড়িয়ে বেড়ান। সাফল্যমণ্ডিত নাটকের রচয়িতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করেছেন। যে সব নাট্যকারকে সমালোচক হিসাবে একদা

উপেক্ষা করেছেন এখন তাঁদের সঙ্গে একই সূত্রে তাঁর নামও যুক্ত হয়ে আলোচিত হয়। শান্ত সান্ধ্য চিত্তবিনোদনে মানুষ যে রঙ্গমঞ্চে বার্ণার্ড শ'র নাটক অভিনীত হয় সেই সব রঙ্গমঞ্চেই ছোটে। ছোট-বড়ো সব রকমের চার্চে তাঁকে সবাই বক্তৃতা দিতে ডাকে, স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী সভা থেকে, যে সব বড়ো সভায় পীয়র বা টোরী পার্টির সদস্যরা উপস্থিত থাকেন, সেখানেও বার্ণার্ড শ'র আহ্বান আসে, একই মঞ্চে বক্তৃতা দেন বার্ণার্ড শ'। অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে আমন্ত্রণ এল ছাত্রদের কাছে ভাষণ দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে। এই কালে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসও বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত, সেইখানে ওয়েব-দম্পতির সঙ্গে বার্ণার্ড শ'রও খ্যাতি প্রচারিত হতে লাগল।

নিউ রিফর্ম ক্লাবে এক বক্তৃতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন বার্ণার্ড শ', কিন্তু সেখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয় আধুনিক ধর্ম। নাটক সম্পর্কে একটি কথা বলতে নারাজ। বললেন, আমার সঙ্গে নাটকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে বলেই আমার এই ক্লান্তি।

এই নিউ রিফর্ম ক্লাবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বার্ণার্ড শ' প্রথমেই যে কথা বললেন তা শুনে শ্রোতারা ত' অবাক! তিনি বললেন—

"আজ এই সভায় এই বিষয়ে বলার একমাত্র হেতু অতি সাধারণ। আমি দেখেছি যে-মানুষের ধর্মপ্রীতি নেই, সেই ধর্ম-বিরহিত মানুষ, কাপুরুষ এবং কুৎসিত। বর্তমান সভ্যতা যেখানে পৌঁছেছে সেই পঙ্ক থেকে তাকে উদ্ধার করতে হলে আমাদের প্রয়োজন ধর্মের।"

বার্ণার্ড শ' বললেন, তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য মানুষকে আত্মা সম্পর্কে উত্তরোত্তর আগ্রহান্বিত করা। যে-কারণে আত্মা মানুষের দেহের একটি বিশেষ যন্ত্র তা বোঝানো প্রয়োজন। বার্ণার্ড শ' এক একটি আসরে এক রকমের কথা বলেন, ফলে তাঁর কথা সবাইয়ের মুখে মুখে। আর সবাই বিভিন্ন বার্ণার্ড শ'র কথা বলে, কারণ বার্ণার্ড শ' সকলের উপযুক্ত কথা বলেছেন। এই সভায় বার্ণার্ড শ' তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন—

"If you allow people who are caddish and irreligious to become the Governing force, the nation will be destroyed. We are to-day largely governed by persons without political courage, and that is what is the matter with us."

ধর্মপ্রাণ মানুষ বলতে বার্ণার্ড শ' কি বুঝেছেন কে জানে? বার্ণার্ড শ'র ধারণা-মাফিক ধর্মপ্রাণ মানুষের সংখ্যা অধিক নয়। কিন্তু Life Force এর মাপকাঠিতে বিচার করলে ব্লানকোপ সুনেটের উক্তিতে ধর্ম থেকে বিচ্যুত মানুষকেও জালে টানা যায়।

বার্ণার্ড শ'র মতে ক্যাপিটালিজিম বা ধনতান্ত্রিকতা অধর্ম। এই অধর্মের কল তাই অতি অল্পসংখ্যক মানুষের চেষ্টায় ধীরে ধীরে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। একদিন এর চিহ্নও থাকবে না। বার্ণার্ড শ' এইখানে আশাবাদী। তীব্র আশাবাদ তাঁর মূলমন্ত্র। Life-force তাঁর কাছে একমাত্র ধর্ম, এই ধর্মে প্রার্থনা নেই, কৃচ্ছ্রসাধন নেই, ব্রতোপবাস নেই, কোনো তোড়জোড় নেই। এই তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম, এই তাঁর স্বর্গ, এই তাঁর স্বর্গ।

এই ধর্মের জন্য আত্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। নিরামিষ ভোজনে আগ্রহের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা নেই। এই তাঁর ভাল লাগে, বেশী কাজ করা যায়, তাই আজীবন এই ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। সার্লোট কিন্তু চেষ্টা করেও আমিষ ভোজন ত্যাগ করতে পারেন নি। সেণ্ট আলবানসের বিশপ শ'-দম্পতিকে যখন ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন তখন বার্ণার্ড শ' লিখলেন—"আমিই একমাত্র সিংহ, যে শুধুমাত্র তৃণভোজী।"

বার্ণার্ড শ' তাঁর রচনায় যাঁদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে শ্লেষ করেছেন, তাঁরাই তাঁর চার পাশে ভীড় করে এসেছেন, শিক্ষকরা তাঁর সভায় দলে দলে এসে যোগ দিতেন, ডাক্তাররা তাঁর বন্ধুত্ব কামনা করতেন, ধনিক সম্প্রদায়, যাঁদের বার্ণার্ড শ' প্রচণ্ড কশাঘাত করেছেন, তাঁরাও বার্ণার্ড শ'র সরস রসিকতার অনুরাগী পাঠক এবং ভক্ত। সারা পৃথিবীতেই এই ভাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

এই সময়ে একদিন একখানি চিঠি পেলেন বার্ণার্ড শ'। চিঠিটা লিখেছেন উইলিয়াম রথেনষ্টাইন—

১লা জুলাই, ১৯১২

"প্রিয় শ',

আমার একান্ত বাসনা, তুমি এসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখে যাও। তোমার জীবনে তুমি সাধু-সজ্জন বেশী দেখোনি, মহৎ কবি হয়ত সংখ্যায় অনেক কম দেখেছ। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তরফ থেকেও পরিষ্কার ভাবে দেখে যাওয়া উচিত যে, ইংলণ্ড মানে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া নয়। তুমি একদিন এসো, এসে ওঁর সঙ্গে আলাপ করে যাও। বাংলার সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা, প্রজ্ঞা, ধর্ম, আভিজাত্য, গণতন্ত্র প্রভৃতি সব কিছুরই প্রতিনিধি এই রবীন্দ্রনাথ। ভারতের আর কোনও প্রতিনিধি যদি আমাদের পক্ষে দেখা না হয়ে ওঠে তাহলে এই এক ব্যক্তিকে দেখেই আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ভারতবর্ষ সারা বিশ্বের মধ্যে এক সার্থকতম দেশ। আমার এই কথাগুলি তোমার কাছে বালসুলভ চপলতা মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের সদ্গুণের

ভিত্তি, শক্তি, কৌশল এবং সজীবত্ব—ব্যক্তিগত উৎকর্ষ নয়। তোমরা দু'জনে এমনই বহুবিধ গুণবিচারে তার অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করতে পারবে, সচরাচর এমন সুযোগ হয়ত পাওয়া সম্ভব নয়···

তোমার ডব্লু. আর"

এই চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারলেন না জর্জ বার্ণার্ড শ'। চিঠিখানি তিনি বার বার পড়লেন। জীবনের অনেক ভুল বোঝাবুঝির কথা স্মরণে এল। তিনি কি আবার ভুল করবেন! সাধু-সন্ত তিনি জীবনে কম দেখেন নি, তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে সহকর্মী হিসাবে কাজও করেছেন. তাঁদের মধ্যে রয়েছেন উইলিয়াম মরিস, চার্লস ব্রাডলো, এ্যানা বেসান্ত, প্রিন্স ক্রোপটকিন, সিডনী ও বিয়েট্রিস ওয়েব, আরো অনেকে। কবিও জীবনে অনেক দেখেছেন —ইয়েটস, অসকার ওয়াইল্ড, এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার, উইলিয়াম মরিস, সুইনবার্ণ, জর্জ মেরেডিথ,—এমনই কতক জন। তবু রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হবে,—তিনি সাধু এবং কবি। এ এক বিচিত্র আহ্বান!

চরম উৎকর্ষ! ব্যক্তিগত মহত্ত্ব! তাই বা কেমন! ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে যদি মানুষের বোধ না থাকে তাহলে কি প্রয়োজন শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষ বিচারে? চিঠি পড়ে তেমন উৎসাহিত হতে পারলেন না বার্ণার্ড শ' কিন্তু তাঁর স্ত্রী সার্লোট উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, তিনি সহজে শান্ত হলেন না, প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক টান ছিল। তিনি বার্ণার্ড শ'কে বললেন—এ আহ্বান উপেক্ষণীয় নয়, চলো দেখেই আসি। ভারতের বাণীবাহক রবীন্দ্রনাথকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য কম কথা নয়!

অগত্যা প্রস্তুত হতে হয়, বার্ণার্ড শ' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ করার জন্ম রীতিমত প্রস্তুত হলেন। তাঁর কবিতা সংগ্রহ করে পড়লেন, তেমন বুঝলেন না, একদিন ওয়াল্ট হুইট ম্যানের কবিতাও তাঁর কাছে এমন দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পও পড়লেন। আলাপের আগে সব জানা প্রয়োজন।

সার্লোট বললেন—"তুমি একাই যেন কথা বোলো না, রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকেও দু'-চার কথা শোনা চাই, সেই ফাঁক রেখো।"

বার্ণার্ড শ' গম্ভীর হয়ে বললেন—"নিশ্চয়ই, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমার নিজেরও একটা উপযুক্ত ধারণা হওয়ার প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ হয়ত কখনও আমার নামই শোনেন নি। কি বলো?"

ভারতের এই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই নরওয়ের জোহান বোয়ার বলেছিলেন—"He is India bringing to Europe a new divine symbol, not the Cross, but the Lotus".

যথাসময়ে লণ্ডনে উপস্থিত হয়ে রথেনষ্টাইনের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা সুরু করলেন জর্জ বার্ণার্ড শ'। তিনি আহারের সময় খেলেন খুব কম, তার ফলে বিরামবিহীন আলাপাচারের সুযোগ পাওয়া গেল। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান, আহারে অপচয় করা চলে না। গোড়াতেই বার্ণার্ড শ' বলছিলেন রবীন্দ্রনাথকে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা কি। রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ সহকারে শুনলেন। বার্ণার্ড শ' নাকি সেদিন গান্ধীজী সম্পর্কেও কিছু বলেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে বার্ণার্ড শ' রসিকতা করে বললেন—"সাধুর পোষাকে অনেক অসাধুকে দেখেছি আবার অনেক অসাধুর মধ্যে সাধুও দেখেছি। ভারতবর্ষে সাধুরা শ্রদ্ধার পাত্র, পূজা পান তাঁরা, আর দেখুন আমাদের এই দেশে সাধুরা উপহাসের বস্তু। আমার মত মানুষ তাদের অবজ্ঞার পাত্র। আমাকে আমার মহত্ত্বের তৃষ্ণা চেপে রাখতে হয়। আমার পিতৃদেবকে যেমন চাপতে হয়েছে পান-তৃষ্ণা।"

এমন সময় সেই আসরে চা পরিবেশিত হল।

বার্ণার্ড শ' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আমার চা চাই না। প্রাচ্য দেশ থেকে তিনটি বিষ এদেশে চালান এসেছে, চা, সংস্কৃতি আর সুরুচি।"

রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন—"তা বটে, তবে আপনারাও তিনটি ভয়ংকর বিষ আমাদের দেশে রপ্তানি করেছেন।"

সকলেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন—"সে আবার কি? কি সেই বস্তু?"

রবীন্দ্রনাথ ধীর গলায় বললেন—"সেই তিনটি হল, বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প আর প্রতিযোগিতা।"

এর পরই অর্থসম্পদ সম্পর্কে এক বিতর্ক সুরু হল। অর্থ অনর্থ না পরমার্থ। বার্ণার্ড শ' বললেন—"পৃথিবীতে অর্থই সব, টাকার কাছে কিছু নয়, এ না হলে কিছুই করা যায় না, এ মহাসম্পদ। সভ্যতার একমাত্র আশ্বাস।"

রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় গলায় বললেন—"আপনার এই উক্তি আমি সমর্থন করতে পারি না। আমি দরিদ্র দেশের মানুষ, দারিদ্র্য সেখানে মহৎ সম্পদ। সেখানকার মানুষের দারিদ্র্যই তাকে বিনয় এবং সারল্যের অলঙ্কার দিয়েছে, সেই তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, পৃথিবী আনন্দমাধুরীতে পরিপূর্ণ। কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ, তাই পশুর। দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ, তাই মানুষের।" এর পর আলোচনা আর বেশীক্ষণ চলেনি।

বার্ণার্ড শ' বলেছেন, "আমি সেদিন রবীন্দ্রনাথকে জয় করতে পারিনি। আমি একটু কাবু হয়ে পড়েছিলাম। হয়ত তাঁর সুদীর্ঘ সাদা দাড়ি দেখেই একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এমন সুন্দর সিল্ক-মসৃণ দাড়িও মানুষের হয়।"

জর্জ বার্ণার্ড শ' নাকি বিরাট দাড়ি দেখে বার বার এমনই হতবাক হয়েছেন। নিজের দাড়ি তেমন মনোমত না হওয়ায় তাঁর মনে মনে দুঃখ ছিল।

রবীন্দ্রনাথ এবং বার্ণার্ড শ'র এই সাক্ষাৎকারের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন বার্ণার্ড শ'র প্রতিবেশী মিঃ ষ্টিফেন উইনষ্টেন।

রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে কেউ হয়ত কোনও ডায়েরী রাখেন নি এই বিচিত্র সাক্ষাৎকারের।

[ ক্রমশঃ।

Himalaya
Bouquet
TALCUM POWDER
MADE IN INDIA FOR ERASMIC-LONDON
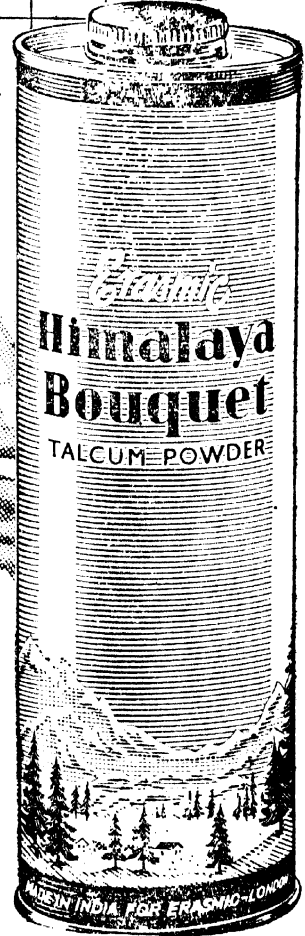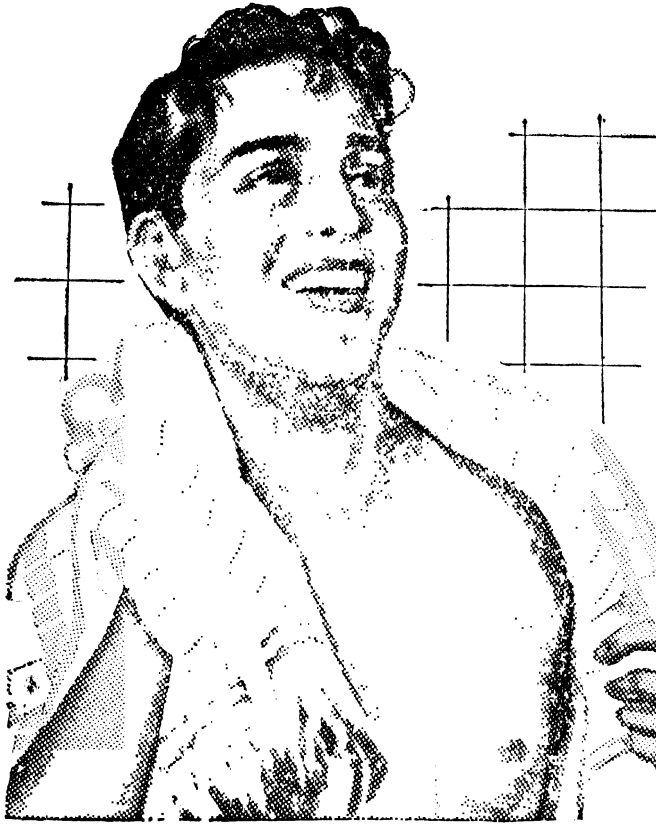
# হিমালয়

## বোকে ট্যালকাম পাউডার

ব্যবহার করতে এত আরাম! কিনতেও খরচ কত কম।

HB. 17-X52 BG

## সুরশিল্পী অতুলপ্রসাদ সেন

ঢাকা সহরে ১৮৭১ সালের ২০শে অক্টোবর অতুলপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হওয়ার পর তাঁর মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের গৃহে লালিত-পালিত হন। এই পরিবার বাঙলা দেশের এক বিশিষ্ট সুসংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবার। কালীমোহনের কবিত্ব সুশিক্ষা, ব্যক্তিত্ব ও সুকণ্ঠের প্রভাব কিশোর অতুলপ্রসাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং উত্তরকালে অতুলপ্রসাদের প্রতিভা বিকাশে তাহা সহায়ক হয়েছিল। তাঁর ছাত্রজীবন কলিকাতাতেই অতিবাহিত হয়েছিল। ১৮৯৪ সালে বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসে তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। পরে এই লক্ষ্ণৌ সহর তার গভীর শ্রদ্ধা দিয়ে কবি অতুলপ্রসাদকে একেবারে নিজস্ব করে নিয়েছিল। বাঙালী ও অবাঙালী সকলেই উপলব্ধি করতেন যে, লক্ষ্ণৌ-এর নাগরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কবি অতুলপ্রসাদ জুগিয়েছিলেন প্রেরণা ও শক্তি। তিনি ছিলেন একাধারে আইন-ব্যবসায়ী, নেতা, সমাজসেবক, সংগীতসাধক ও সুসাহিত্যিক।

বাংলা ভাষা আজ তার নিজ মহিমায় মহিমান্বিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতেই বাংলা ভাষা এক নূতন ধারায় প্রবাহিত হতে সুরু করে। এই সময় হতে বাংলা গদ্যের স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির ও উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা সুরু হয়। বাংলা ছড়া ইতিপূর্বেই নূতন রূপপরিগ্রহ করে নূতন ধারায় প্রবাহিত হ'তে সুরু করেছিল। ক্রমে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসে বাংলা ভাষা আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করল এবং বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির জটিল তত্ত্ব ও তথ্য সাবলীল করে প্রকাশ করবার মত শব্দসম্ভারে বাংলা ভাষা ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে উঠল। অবশেষে বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা মধ্যে পরিগণিত হ'য়ে বিশ্বের দরবারে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করল। বহু কবি, সুরশিল্পী, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী যাঁরা বাংলা ভাষাকে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছেন, কবি অতুলপ্রসাদ তাঁদের অন্যতম। তাই তাঁর একটি বিখ্যাত গানে বাংলা ভাষার জয়যাত্রার জয়গান। এ গানটি বহু গীত ও সমাদৃত।—

"মোদের গরব মোদের আশা আ মরি, বাঙ্গালা ভাষা।
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালবাসা॥
কি যাদু বাংলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে!
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥
ওই ভাষাতেই নিতাই গৌর আনলে দেশে ভক্তিধারা,
আছে কি এমন ভাষা এমন দুঃখ শ্রান্তিনাশা?
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
ঐ ভাষারই মধুর রসে বাঁধলে সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনল মালা জগৎ জিনে,
তোমার চরণ-তীর্থে মা গো জগৎ করে যাওয়া আসা।
ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকলাম 'মা' 'মা' বোলে;
ঐ ভাষাতেই বলব হরি সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা॥"

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছাড়াও কবি অতুলপ্রসাদের সংগীতচর্চা তাঁর প্রতিভাকে এক সার্থক সৃষ্টির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অতুলপ্রসাদের ভাব ও চিন্তার অন্তরঙ্গতা বাঙলার গীতি-সাহিত্যেরই এক নব রূপায়ণের হেতু। তাঁর গান বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং বাঙালীর চিত্তকে দিয়েছে নব-সৃষ্টির সন্ধান! অতুলপ্রসাদ স্বীয় বৈশিষ্ট্য নিয়েই সংগীতজগতে দেখা দিয়েছেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে, সমস্ত বেদনাকে তিনি পরম রমণীয় গানে রূপান্তরিত করে গেছেন। তাঁর জীবনের বিচিত্র অনুভূতি সরল স্নিগ্ধ রসে পরিব্যাপ্ত, যা জীবনে শান্তির প্রবাহ বইয়ে দেয়। এত গভীর অনুভূতি ছিল বলেই, তাঁর সৃষ্টি সার্থক হয়ে ফুটে উঠেছে। ঠুংরি গানে যেমন নানা সুরবৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলবার অবকাশ আছে, অতুলপ্রসাদের রচনাতেও তেমনি আছে সুর-বিস্তারের অবকাশ। রাগসংগীতের মত তাঁর গানের একটা স্বতন্ত্র ষ্টাইল আছে। তাঁর গানে শুধু কাব্যসৌন্দর্যই নেই, আছে মনের বিস্তৃতি ও কাব্যসুষমাকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস। তাই তাঁর গানে রাগসংগীতের অনুরাগিগণ খুঁজে পেয়েছে নূতন সৃষ্টির পথ। রাগপ্রধান রচনায় অতুলপ্রসাদের কৃতিত্ব বড় কম নয়। বিভিন্ন রাগ মিশ্রণে যেমন 'চাঁদনি রাতে কে গো আসিলে' গানটিতে আছে বেহাগ, খাম্বাজ ও পিলু এই তিনটি রাগের সংমিশ্রণ। তাঁর বহু বাউল গানে আছে রাগ-সংগীতের সুষমা। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন; 'একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করে দেখি, তবে দেখতে পাব যে, তাতে আমাদের সংগীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সুরগুলো স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ-রাগিণী ও-রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁসে গিয়েও তাকে স্পর্শ করে না।' (সঙ্গীতের মুক্তি)।

অতুলপ্রসাদের গানে টপ্পার পরিচয় বেশী। এর কারণ তিনি করুণ রসের স্রষ্টা; টপ্পা গান করুণ রস ও গভীর ভাব-সমন্বিত। এই জন্যই নিধুবাবুর করুণরসাত্মক গানগুলিও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ যুগের গানে টপ্পার বৈশিষ্ট্য ক্রমেই লুপ্ত হ'তে বসেছে। গজল গান রচনায় তিনি বোধ হয় সর্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করেন, নিম্নলিখিত গজল গানটি তাঁর সার্থক সৃষ্টি—

"কত গান যে হ'ল গাওয়া
আর মিছে কেন গাওয়া ও?
* * *
বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া
আরও ব্যথা ভুলে যাওয়া
যদি ব্যথী নাহি আসিবে
এত ব্যথা কেন পাওয়াও?"

তাঁর গানে রামপ্রসাদের অনুস্মৃতি দেখা যায়।

"আরে দে দে বলব না তোরে
যা দিলি তুই কাঙালরাণী
তাই তো আবার নিলি হ'বে।
দুঃখ বিপদ যদি দিতে চাও মা
দাও তবে সে বোঝা মাথার ওপর তুলে।
যখন বোঝা ভারি হবে
তুই নাবাবি আপন করে।"

উপনিষদের বাক্য মধুরূপের কল্পনায় কবি গেয়েছেন ;—

"তুমি দিবসে মধুর
নিশীথে মধুর
মধুর তুমি স্বপনে।
তুমি স্বজনে মধুর
মধুর তুমি গোপনে।"

কবি তাঁর গান দিয়ে করেছেন সুন্দরের পূজা ;—

"কভু নির্মল নীল প্রাতে
কনক কিরীট মাথে
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতি সুন্দর।"

মিলনবাদের নূতন তত্ত্ব শুনিয়েছেন তিনি তাঁর গানের ভাষায় ;—

"মন্দিরে মসজিদে লড়াই
প্রবেশ করে দেখ রে দু ভাই
অন্দরে যে একজনাই।"

আবার কখনও তিনি শুনিয়েছেন জাগৃতির গান ;—

"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী—
উঠ আদি জগতজনপূজ্যা।"

ভক্তহৃদয়ের মূর্ছনা ধ্বনিত হ'য়ে ফুটে উঠেছে তাঁর গানে, পরম আরাধ্যের কামনায় ;—

"হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে?
* * * *
আমার সকল সুখে সকল দুখে
তোমার চরণ ধরব বুকে
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই ক'বে।"

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ন্যায় তাঁর বহু কবিতা গায়নী রীতিতে রচিত। প্রথমে এসেছে সুর, পরে কবিতা, এইটি অতুলপ্রসাদের কবিতার বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া, তাঁর সুরবৈচিত্র্যও বড় কম নেই; কোথাও রাখালের বাঁশীর মেঠোসুর, কোথাও মাঝির কণ্ঠনিঃসৃত ভাটিয়ালী সুর, আবার কোথাও কীর্তন কিংবা রামপ্রসাদী সুর।

—তিনি সাহিত্যসেবাও করতেন। তিনি 'উত্তরা' নাম একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। বংগ-সাহিত্য-সম্মেলন আহবানে সাহিত্য-সেবক অতুলপ্রসাদের নিষ্ঠাশীল কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উত্তর প্রদেশের লিবারেল সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন এবং একাধিক বার উদারনৈতিক সম্মেলনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি আউধ বার এসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিশোধ' কাব্য অতুলপ্রসাদের নামে উৎসর্গ করেন। তাঁর কবিত্বের সব চেয়ে বড় পরিচয়, অল্প কথায় ও সরল কাথায় ভাবগূঢ়তার প্রকাশ। সামান্য কথা দ্বারা অসামান্যের ব্যঞ্জনা তাঁর সৃষ্টির নূতনত্ব। রীতির চেয়ে আছে তাঁর গানে ও কাব্যে অন্তরের পরিচয়, কাব্যের প্রাণবস্তু।

স্বরলিপি সহযোগে তাঁর গানগুলি স্থায়ী করার ব্যবস্থা করা যেমন দেশবাসীর কর্তব্য, তেমনই প্রয়োজন আছে, এই সব বিস্মৃতপ্রায় প্রতিভাবান কবি ও সুরশিল্পীদের স্মরণীয় করে রাখা নানা আলোচনা ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

—কালীপদ লাহিড়ী

## ভীষ্মদেব সঙ্গীত-পরিষদ

গত ১৪ই অগ্রহায়ণ পরিষদের প্রথম মাসিক সঙ্গীতের আসর বিবেকানন্দ রোডস্থ 'মেহতা হল'এ সুসম্পন্ন হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক ও ডাঃ নারায়ণচন্দ্র রায়, এম, এল, এ।

শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ও সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে খেয়াল ও পরে ঠুংরি পরিবেশন করেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গত করেন শ্রীমতী লক্ষ্মী বসু (হার্মোনিয়াম) ও শ্রীকানাই দত্ত (তবলা)। এঁরা ছাড়া কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী কল্যাণী রায়, শ্রীপ্রবোধ চক্রবর্তী, শ্রীগোরাচাঁদ দত্ত (তবলা) শ্রীমতী কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পিবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উত্তর পাড়ার শ্রীসমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

## সঙ্গীতানুষ্ঠান

গত ৬ই ডিসেম্বর কামারপাড়া রোড (চুঁচুড়া) আঢ্য-বাটীর পূজাপ্রাঙ্গণে 'যদু ভট্ট সঙ্গীত সমাজে'র মাসিক তৃতীয় অধিবেশন সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল যথাক্রমে সভাপতির ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। কুমারী কৃষ্ণা মুখার্জ্জি শকুন্তলা মুখার্জ্জি ও শুক্লা মুখার্জ্জি একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গাহিবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথি স্বর্গীয় যদু ভট্টের অসাধারণ সঙ্গীতনৈপুণ্য সম্বন্ধে আলোচনা এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। সমাজের সম্পাদক বলেন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার করাই সমাজের উদ্দেশ্য। তিনি স্থানীয় সঙ্গীতরসিকদের সহযোগিতা কামনা করেন। ইহার পর কুমারী কাবেরী মুখার্জ্জির রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দিয়া সঙ্গীতানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। কুমারী শুক্লা ব্যানার্জ্জির ধ্রুপদ গানের পর কুমারী স্বপ্না ও তারা মুখার্জ্জি খেয়ালে অংশ গ্রহণ করেন। ইহার পর শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল তাঁর ধ্রুপদ ও ধামার গানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দেখান ও শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করেন। মৃদঙ্গ সঙ্গতে শ্রীরাজীবলোচন দে সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীসুনীল নিয়োগীর খেয়াল ও শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর সেতার বাদন বিশেষ উপভোগ্য হয়। শ্রীমহানন্দ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীদীননাথ ভট্টাচার্য্যের তবলা সঙ্গত সকলের নিকট আকর্ষণীয় হয়। যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীচন্দ্রভূষণ মুখার্জ্জি ও শ্রীমাণিকলাল আঢ্যের অক্লান্ত পরিশ্রম প্রশংসনীয়।
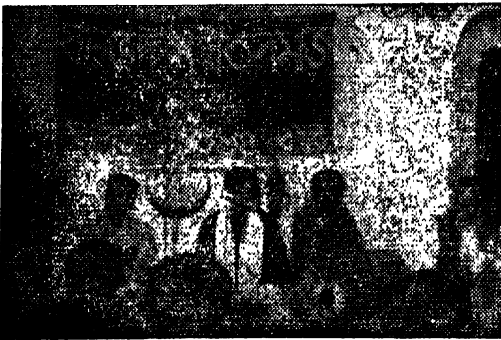
যদু ভট্ট সঙ্গীত-সমাজের ৩য় অধিবেশন

## আমার কথা (৪৭)

### শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

পাঁচ বৎসরের শিশু 'সীতাহরণ' যাত্রা শুনে পরদিন প্রাতে অবিকল সুরে গাইতে লাগল প্রতিটি গান আধ-আধ ভাষায়—স্নেহময়ী জননী মুগ্ধ হলেন কনিষ্ঠ পুত্রের সুমিষ্ট স্বরে—উপহার দিলেন একটি হারমনিয়ম বাদ্য—নিজের খেয়ালে বাজিয়ে ও গান গেয়ে চঞ্চল সেই ক্ষুদ্র বালক—আবার গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে সঙ্গীত নকল করল শোনামাত্র—চমৎকৃত করল প্রত্যেককে—ভবিষ্যতের এক বিরাট শুভ সম্ভাবনা দেখা গেল তাঁহার মধ্যে। পরবর্ত্তী কালে এই বালককে বাংলা তথা ভারতবর্ষে পেল সঙ্গীত-কলানিধি, দরদী-গায়ক ও সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়রূপে।

১৩১৬ সালের ২২শে কার্ত্তিক (৮ই নভেম্বর ১৯০৯) ভীষ্মদেব হুগলী জেলার সরাই গ্রামস্থ স্বগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন ৺আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও মাতা ৺প্রভাবতী দেবী। মাতুলালয় গুড়াপের সন্নিকটস্থ ভাণ্ডারা গ্রামে। ইঁহাদের বংশোদ্ভূত ছিলেন পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, সাধক বামাক্ষ্যাপা ও সাধক কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজিয়েট বিদ্যালয় হ'তে প্রবেশিকা ও বিদ্যাসাগর কলেজ হ'তে I. Sc. পাশ করেন। সেই সময় আন্তঃকলেজ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তিনি খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং Best man পুরস্কার হিসাবে একটি রূপার তানপুরা পান। কলেজে ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করতেন এবং সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা ও পুস্তক পাঠ করতেন। মাংস তাঁহার প্রিয় খাদ্য।

ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের শিষ্য ৺নগেন্দ্রনাথ দত্ত ভীষ্মদেবের প্রথম সঙ্গীতগুরু হন। ইঁহার পিসতুত ভ্রাতা ৺শরৎচন্দ্র দাস নগেন বাবুকে সর্ব্বসময় বিশিষ্ট গায়কদের নিকট শিক্ষাধীন রাখিবার আয়োজন করিতেন। একদিন বালক ভীষ্মদেব গুরুর বৈঠকখানায় যখন সঙ্গীতে মগ্ন, তখন প্রবেশদ্বারে দণ্ডায়মান ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেব কণ্ঠস্বর শুনিয়া মোহিত হয়ে যান এবং পরদিবস হইতে গৃহে আসিয়া নিয়মিত ভীষ্মদেবকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন।

১৩ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম রেকর্ড (H M V) বাংলা টপ্পা 'সখি, কি করে লোকেরই কথা' ও 'এত কি চাতুরী সহে প্রাণ' গৃহীত হয়। ১৯৩৪ সালে কাজী নজরুল ইসলাম শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মেগাফোন কোম্পানীর 'বাহার' ও 'বসন্ত' সুরে প্রথম হিন্দী রেকর্ড করান। পরে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়

১৯৩৪ সালে দ্বিতীয় নিখিল ভারত সঙ্গীত-সম্মেলনের বেনারস অধিবেশনে শ্রীচট্টোপাধ্যায় যোগদান করেন। ওস্তাদ নাসিরুদ্দীন খাঁ, শ্রীকৃষ্ণরতন ঝঙ্কার, কৃষ্ণরাও ভাস্কর পণ্ডিত, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, বিনায়ক রাও পটবর্দ্ধন প্রভৃতি কৃতী শিল্পীরা উহাতে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে 'আশোয়ারী' ও 'জৌনপুরী টোরী'র গান্ধার নিয়ে বিতর্ক সুরু হইয়া দুই দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি হয় নাই। চতুর্থ দিনে পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের 'মালকোষ' ও 'ভজন' এর পর ভীষ্মদেব রে পা পঞ্চম সহ 'সম্পূরণ মালকোষ' নিখুঁত ভাবে গাইলেন। শ্রোতার দল হলেন নির্ব্বাক, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীরা মুগ্ধ হলেন! আর শিল্পী স্বয়ং যেন গানের মাধ্যমে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন।

যখন ভীষ্মদেব সঙ্গীতে সমাপ্তি টানলেন, তখন ওস্তাদ নাসিরুদ্দীন খাঁ সাহেব নিজ আসন ছেড়ে এসে তরুণ ভীষ্মদেবের উদ্দেশ্যে বলেন, "মালকোষ এ বাচ্চাই গায়া হায়।" এস্থলে বলে রাখি যে, মালকোষ গান সব সময় 'রে পা' পঞ্চমবর্জ্জিত করেই গাওয়ার রীতি। কিন্তু নিজ সাধনায় বাঙ্গালী তরুণ সেদিন শোনালেন রে পা পঞ্চমসহ সম্পূর্ণ মালকোষ নিখিল ভারতীয় অনুষ্ঠানে—আর দেখালেন যে সুরভ্রষ্ট হয় না তাতে—কোন ত্রুটি থাকে না তাতে। গানের সাম্রাজ্যে সেদিন বাঙ্গালী পেল এক উচ্চাসন।

ইহার পর শ্রীচট্টোপাধ্যায় পর পর কয়েক বৎসর উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অবৈতনিক সঙ্গীতশিল্পী ও একমাত্র বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করিয়া বহু স্বর্ণপদক ও অন্যান্য পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

১৩৩৭ সালে মেগাফোন কোম্পানী ছাড়িয়া তিনি ফিল্ম করপোরেশন অব ইণ্ডিয়াতে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন। সেই সময় বোম্বের রঞ্জি মুভীটোন তাঁহাকে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু পূর্ব্বব্যবস্থানুযায়ী তিনি উহা গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। ফিল্ম করপোরেশনে তাঁহার প্রথম বাংলা চিত্র 'মুক্তি' ও প্রথম হিন্দী চিত্র 'কয়েদী'। ইহার পর আরও কয়েকটি ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

১৯৪০ সালে ৺চিত্তরঞ্জন গাঙ্গুলী ও শ্রীদিলীপ রায়ের প্রভাবে শ্রীচট্টোপাধ্যায় পণ্ডিচেরীস্থ 'শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে' গমন করেন। তিন মাস পরে ফিরে আসার কথা ছিল—কিন্তু প্রায় আট মাস বাদে পত্র মারফৎ তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে জানান যে, Mother আশ্রমে থাকার সম্মতি দিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনে অক্ষম। স্নেহময়ী জননী, ভ্রাতৃবৎসল দাদা ও ভীষ্মদেবের প্রিয় সঙ্গীত-শিষ্য রাজকুমার শ্যামানন্দ সিংহ (বনেলীরাজ) রওয়ানা হলেন পণ্ডিচেরীর উদ্দেশ্যে। নিজ মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল 'আশ্রম-জননী'র আর উপস্থিত ছিলেন আশ্রম সম্পাদক শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত। Mother বললেন, 'মাতৃদর্শন পেয়েছে ভীষ্মদেব—সে আর সংসারে ফিরে যাবে না।' জননী জানালেন, 'সে মাতৃদর্শন পেয়েছে তাতে আশ্চর্য্য হব না—কারণ আমার শ্বশুরের বংশ যে সাধকবংশ। সত্যকারের মাতৃদর্শন হলে—আমি মা হিসাবে তাকে নিয়ে যাব—তা সে যেখানেই থাকুক।' সম্পাদক শেষে জানালেন যে, ভীষ্মদেব বাবুর যাওয়া হবে না। কিয়ৎক্ষণ পরে ভীষ্মদেব সঙ্গীত-শিষ্য শ্যামানন্দ বাবুকে বলেন যে তাঁহার যাওয়া হবে না। কিন্তু প্রিয়শিষ্য গুরুজীকে না নিয়ে সে ফিরতে পারেন না। অবশেষে পনের দিনের জন্য শ্রীচট্টোপাধ্যায় মা, দাদা ও রাজকুমারের সাথে কলিকাতায় ফিরলেন। কয়েকদিন পরে শ্যামানন্দ বাবু গুরুজীকে নিয়ে গেলেন বনেলীতে। পরে তাঁহার মা ও সহধর্ম্মিণী সেখানে গমন করেন। তিন মাস অবস্থানের মধ্যে প্রিয়শিষ্য বহুরূপে চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁহার গুরুজী যাতে পুনরায় সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে ঘিরে রাখেন। কিন্তু ভীষ্মদেব বাবু আকুল হতেন পণ্ডিচেরী আশ্রমে ফিরে যাওয়ার জন্য আর বলতেন যে, সঙ্গীত তিনি Mother এর নিকট রেখে এসেছেন। তিন মাস পরে শ্রীচট্টোপাধ্যায় পণ্ডিচেরী ফিরে গেলেন। পুত্র চলে যাওয়ায় মাতা প্রভাবতী দেবী দ্বাদশ বৎসর শুধু চা পানের উপর জীবন ধারণ করেছিলেন আর সাংসারিক কাজকর্ম্মের মধ্যেও ভগবৎ সাধনায় নিজেকে বরাবর নিমজ্জিত রাখিতেন। ১৯৪৭ সালে ভীষ্মদেব বাবু ফিরে এলেন কলিকাতায়। তাঁহার মাতৃদেবী ইহার ছয় মাস পূর্ব্বে জানিয়েছিলেন, পুত্রের স্বগৃহে আসার কথা। প্রত্যাবর্ত্তনের পর বহু সঙ্গীতরসিক সুধী ও বিশিষ্ট শিল্পীরা তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় সঙ্গীত সাধনার জন্য অনুরোধ করেন। ইহার কয়েক মাস পরে শ্রীচট্টোপাধ্যায় সঙ্গীতচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি নিয়মিত সাধনা করিতেছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হয় এবং হাসপাতালে থাকাকালীন চিকিৎসক-প্রবর ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় প্রত্যহ ভীষ্মদেব বাবুর সম্বন্ধে খোঁজ খবর লইতেন।

শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, গৃহে কখনও রেওয়াজ করিতেন না—সোজাসুজি আসরে গান গাইতেন। এই সম্বন্ধে অনুযোগ করায় তাঁহার সঙ্গীত-গুরু একবার বলেছিলেন, অনেক সাধনা আছে তার—গাইবার আগে কেবল গানগুলি মনে করিয়া দেওয়া দরকার। কত বড় গুণী শিল্পী তিনি এই কয়টি কথায় জানা যায়।

হুগলী জেলার বংশবাটীর শ্রীঅশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী দীপ্তিকণা দেবীর সহিত ভীষ্মদেব বাবু পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহাদের তিন পুত্র নিখিলানন্দ, অখিলানন্দ ও বাবলু।

সর্ব্বশ্রী শচীন দেববর্ম্মণ, শৈলেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রকাশকালী ঘোষাল, যূথিকা রায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী তাঁহার নিকট সঙ্গীতশিক্ষা করেন। সম্প্রতি গঠিত 'ভীষ্মদেব-সঙ্গীত-পরিষদ' শ্রীচট্টোপাধ্যায়কে এক সভায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মায়ের উপর অগাধ শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা তারাপ্রসন্ন বাবুকে বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যথার্থ পথপ্রদর্শক হিসাবে পাওয়া—শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের জীবনেতিহাসে উল্লেখযোগ্য। আসার সময় বারে বারে মনে এল যে, বাংলা তথা ভারত কি আবার শুনতে পাবে না সুপ্তশিল্পীর উদাত্ত কণ্ঠে পুনরায় মধুর সঙ্গীত পরিবেশনা ?

শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

## চশমা ও তার ব্যবহার

ক্ষীণদৃষ্টিকে দৃষ্টিদানের জন্য চশমার উপযোগিতা যে কতখানি, তা নিশ্চয়ই বলবার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, আজকের দিনে এর ব্যবহার খুবই বেশি, শুধু এদেশেই কেন, বিশ্বের সর্ব্বত্র। বিজ্ঞানের সহায়তা পেয়েই ব্যাপকতা লাভ করেছে এইটি অতীত দিনের তুলনায় বহু পরিমাণে।

কিন্তু প্রশ্ন, এই পরম সম্পদ (চশমা) যা মানুষের উপনেত্ররূপে গণ্য, এর প্রথম সৃষ্টি বা আবিষ্কারের কাহিনীটি কি? এই মৌলিক প্রশ্নটির সঠিক উত্তর অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি আজও অবধি। সহজ কথায়—চশমার আবিষ্কারক সত্যি কে এবং কখন কি ভাবে এসে এইটি মানুষের উপকারে লাগতে সুরু করে, এ সকলই বহুল গবেষণার বিষয়। পশ্চিমী মহলের এটি দাবী—ফ্লোরেন্টাইন ঋষি আলেকজেণ্ডার ড স্পাইনা চশমার প্রথম আবিষ্কারক এবং এইটি তিনি আবিষ্কার করেন ১২৮৫ সালে।

তথ্যসন্ধানী পণ্ডিতদের একটি শ্রেণীর দাবী মেনে নিলে বলতে হয়, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১২৮৩ সালে জনৈক চীন সম্রাট 'লেন্‌স্' (দৃষ্টিসহায়ক যন্ত্র) ব্যবহার করতেন। তবে সেটি নাকি কাচনির্ম্মিত ছিল না—ছিল পুরোপুরি স্বচ্ছ পাথরের। এ-ও জানা যায়, আকাশের নক্ষত্ররাজিকে ভাল করে অবলোকনের জন্যই অজ্ঞাতনামা সম্রাট খুঁজে নিয়েছিলেন এই উপায়টি। তখনকার দিনে রাজারাজড়াদের দৃষ্টি হ্রাস পেলে ক্রীতদাসদের হুকুম করতেন তাঁরা প্রয়োজনীয় জিনিস পড়ে শোনাবার জন্যে, এমন কাহিনীও অপ্রচলিত নয়।

আমরা আসলে যে ধরণের চশমা বা দর্শন-যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত, তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কনফুসিয়াসের রচনায়। কিন্তু লক্ষ্য করবার—এই মহামানবও (ধর্ম্মগুরু) চীন দেশেরই ছিলেন একজন অধিবাসী। যীশু খৃষ্টের জন্মেরও প্রায় ৫ শত বছর আগে (অর্থাৎ বুদ্ধদেবের সমসাময়িক কালে) কনফুসিয়াস এই দাবীটি রেখে গেছেন—চশমা পরিয়ে একজন মুচির দৃষ্টিশক্তিহীনতার ব্যাধি নিরাময় করেছেন তিনি নিজ হাতে। দৃষ্টি সম্বন্ধীয় শাস্ত্র তথা বিজ্ঞান সম্পর্কে এই মানুষটি ওয়াকিবহাল ছিলেন, এমন কোন ইঙ্গিত অবশ্য তাঁর রচনায় লিপিবদ্ধ নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীয় পর্য্যটক মার্কো পলো যখন চীন সফরে গেলেন, দেখতে পান তিনি—খুব ছোট ছোট অক্ষরে লেখা জিনিসের পাঠোদ্ধারের জন্য লোকরা সেখানে বহু ক্ষেত্রে 'লেন্‌স্' ব্যবহার করছে।

ইতিহাস পর্য্যালোচনায় একটি জিনিস জানতে পারা যায়, চশমার ক্ষেত্রে গোড়ায় রোজার বেকনের অবদান বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ১২৭৬ সালেই তিনি প্রচার করলেন—বৃদ্ধ ও ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের পক্ষে এর উপযোগিতা সত্যি কতখানি। কিন্তু এইটিকে কেন্দ্র করে তখনই কোন বড় রকমের শিল্প-সংস্থা বা ব্যবসা গড়ে উঠল না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নুরেন বার্গে চশমা-নির্ম্মাতাদের একটি 'গিল্ড' বা চক্র স্থাপিত হলে পর এর বাজার সম্প্রসারিত হতে থাকে আপনি। তখন থেকেই ইউরোপের স্থানে স্থানে ফ্রেমে সজ্জিত অবস্থায় 'লেন্‌স্' বিক্রীও আরম্ভ হয় এবং সে ক্রমেই ব্যাপক ভাবে। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছে ইংল্যাণ্ডের এমন একটি চশমা নির্ম্মাতা কোম্পানী তা আজও চালু দেখতে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যেতে পারে—প্রথম যুগের চশমা-নির্ম্মাতারা শিল্পী বা কারিগর মাত্র ছিলেন—দৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞান-সূচিত স্পষ্ট ধ্যান-ধারণা তাঁদের প্রায় ছিল না। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিলাস সামগ্রী হিসাবে পর্য্যাপ্ত অর্থের বিনিময়ে এই জিনিসটি তখন তাঁরা সরবরাহ করতেন। চক্ষু বা দৃষ্টিশক্তির ভাল-মন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার জরুরী প্রশ্নটি তাঁদের নিকট ছিল অনেকটা গৌণ। আরও একটি কথা—পুরাদস্তুর চশমার দোকান (অপটিক্যাল ষ্টোর) বলতে যা বুঝায়, ইউরোপে সে খোলা হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাশেষি আর আমেরিকায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে।

প্রথমাবস্থায় ধনিক ও বিলাসীর বিলাস-সামগ্রীরূপে চালু হলেও এ যুগের মানুষের কাছে চশমা ঠিক বিলাস বা ফ্যাসন নয়—ইহা নিঃসংশয়ে একটি অত্যাবশ্যক মূল্যবান জিনিস। কখন কার দৃষ্টিশক্তির বিপর্য্যয় ঘটবে—চক্ষু বাঁচাবার হবে প্রয়োজন, কেউ বলতে পারে না। অপর দিকে চল্লিশের কোঠায় পড়লেই চশমা ব্যবহারের তাগিদ পরিলক্ষিত হয় বহুক্ষেত্রে। চক্ষু-বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রথম চোখ ভালরকম পরীক্ষা করিয়ে নিতে হয়—তারপর 'পাওয়ার' অনুযায়ী মনোমত জিনিস সংগ্রহ করে নিলেই এখন মিটে যায়। বলতে কি, মানুষের রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে আজ অসংখ্য ডিজাইন সৃষ্টি হয়েছে চশমার কাচ আর ফ্রেমের।

একটি শ্রেণীর চশমার সঙ্গে সকলেই প্রায় পরিচিত, যাকে বলা হয় সান্-গ্লাস বা গগ্‌ল্। সূর্য্যতাপ অর্থাৎ প্রখর আলোর প্রতিক্রিয়া থেকে চক্ষুকে নিরাপদ রাখবার জন্যই বৈজ্ঞানিকদের এই আবিষ্কার। এই শ্রেণীর চশমার প্রচলনও ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে দেখতে পাওয়া যায়। সবুজ নীল, কালো প্রভৃতি রকমারী রঙ বিশিষ্ট লেন্‌সই বাজারে তৈরী হয়ে আসছে এখন। কিন্তু জানা যায়, সবুজ লেন্‌স সর্ব্বাগ্রে তৈরী হয় ইংল্যাণ্ডের কারখানায় আর সেটি পঞ্চদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে। তুষারের উপর প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মিতেও মানুষের দৃষ্টিহীনতা দেখা দিয়ে থাকে—পর্ব্বতারোহীদের এইটি বহুল অভিজ্ঞতা। এই তুষারজনিত অন্ধত্বের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে এস্কিমোরা কত যুগ ধরে ব্যবহার করে এসেছে কাঠ বা হাতীর দাঁতের তৈরী 'গগ্‌ল্'।

দৃষ্টি (চশমা)-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি মস্ত অবদান রেখে গেছেন পাশ্চাত্যের স্বনামধন্য দার্শনিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। একই লেন্‌সে দূরের ও কাছের জিনিস দেখতে যাতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে কড়া নজর রেখে ১৭৮৪ সালে তিনিই সর্ব্বপ্রথম

'বাইফোকেল গ্লাস' ( দুই খণ্ড কাচসমম্বিত চশমা ) আবিষ্কার করেন। এতে দেখতে দেখতে একটা বেশ সাড়া পড়ে যায় দেশ-দেশান্তরে। ফ্রাঙ্কলিনের পর অবশ্য এই শ্রেণীর চশমার উন্নতি সাধিত হয়েছে প্রচুর এবং সে বিভিন্ন দিক থেকেই। একটি উল্লেখযোগ্য উন্নতি—পূর্বে যেক্ষেত্রে 'বাইফোকেলে'র দুটি 'পাওয়ার' বিশিষ্ট কাচ আলাদা দেখা যেতো পরিষ্কার, সেস্থলে বিজ্ঞানের সহায়তায় এক্ষণে উহাদের একীভূত করা সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ এমনি মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ধরতে পারা যায় না চট করে—এ সত্যি 'বাইফোকেল' কি না। এই চশমা নির্মাণে মার্কিণ ফার্মগুলো বিশেষ উদ্যোগী, এইটুকুও প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়।

চশমা ব্যবসায়ের পূর্ব্বে চক্ষু ঠিকভাবে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ বা ব্যবস্থাপত্র না নিয়েই এ যদি ব্যবহার করা হয়, তবে চোখের প্রভূত ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা। 'লেন্‌স' ব্যবহারের এই জরুরী দিকটির প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বৃটিশ বিজ্ঞানী টমাস ইয়ং ১৮০১ সালে। তার পূর্ব্বে চশমার কাচ পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থাই ছিল না বলতে পারা যায়। চোখ পরীক্ষার যে পদ্ধতিটি আজকাল বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়, সেইটি মিউনিকের জোসেফ ভন ফ্রনহোফারের ( ১৭৮৭—১৮২৬ ) অবদান। পরীক্ষার অপর বিশেষ ব্যবস্থার গৌরবের অধিকারী জার্ম্মাণীর ভন হেম হোজ। তিনিই ১৮৫১ সালে অর্থাৎ এক শত বছরের অধিককাল আগে বর্তমান যুগে অতি প্রয়োজনীয় 'অপথেলমোস্কোপ' যন্ত্রটি আবিষ্কার করে গেছেন।

চশমার কাচের জন্য ভারতকে এযাবৎ বরাবর বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। এক্ষণে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয়েছে বটে কিন্তু এই ব্যাপারে পর-নির্ভরতার বিন্দুমাত্র অবসান ঘটেনি। অথচ চশমার ব্যবহার এখানে অন্য অনেক দেশের তুলনায় বেশী বলা যায়। সম্প্রতি জাতীয় সরকার দেশের অভ্যন্তরে চশমার কাচ নির্ম্মাণের একটি কারখানার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু এতে পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন সম্ভব হলেও বিপুল চাহিদা মিটবে না। এই ব্যাপারে সরকারী প্রযত্ন ও মনোযোগ আরও বেশি পরিমাণে নিবদ্ধ হবে, এইটুকু আশা করা যায়।

## কি খাওয়া যায় ?

জীবনধারণ তথা শরীরের ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টির জন্য খাদ্য চাই আমাদের অপরিহার্য্য ভাবে। কিন্তু নির্বিচারে কতকগুলো খাদ্য-খাবার গ্রহণ করলেই হল না, পাকস্থলীতে উপযুক্ত পাচক-রসের সাহায্য পেয়ে ভুক্ত খাদ্য যথার্থ পরিপাক হবে, মনের সে বিশ্বাসও আগে থেকে না থাকলে নয়। কখনও কখনও, অবশ্য মনের নিছক একটা খেয়াল-খুশি বা ভুল ধারণা থেকেও অনেক ভাল খাদ্য আমরা বাতিল করে দিই। এমনটি কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না, অন্ততঃ শরীরবিজ্ঞানী বা খাদ্য-বিশেষজ্ঞরা এই দাবীই রাখছেন।

দৈনন্দিন আহার কালেই দেখা যায়—কেউ কেউ আমরা মনে করি, একটি বিশেষ আহার্য্য আলাদাভাবে খেলে যেখানে উপকার হয়, অপর কোন আহার্য্যের সাথে সে-টি মিশিয়ে খেতে নেই। কারণ, খেলে আশানুরূপ সুফল বা উপকার পাওয়া যাবে না কিংবা উপকারের মাত্রা কমে যাবে বহুল পরিমাণে। মনের এই ধারণা থেকেই মাছের সঙ্গে দুধ খাওয়া বর্জ্জিত হয়ে আসছে বহু ক্ষেত্রে। ডিম বা মাংস খেয়েও দুধ খেতে আপত্তি করেন, এমন লোক প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা—যদি এভাবে আহার করা হয়, তা হলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হবে বেশি—দুধ বা মাংস পাকস্থলীতে গিয়ে অমনি হজম হতে চাইবে না। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এণ্ড সার্জন্‌স-এর বাওক্যামিষ্ট ডাঃ আবেল লাথজা এইটি নিতান্ত অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলতে চান সরাসরি— এ হলো মনের একটি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ধারণা। কেন না, আলাদা ভাবে খাদ্য গ্রহণ করলেও একটি মুহূর্ত্তে সকল আহার্য্যই পাকস্থলীতে একত্র হবে। সেজন্য এই বিভাগের স্পষ্ট দাবী—খাদ্য-ব্যাপারে এই ধরণের ভুল-ভ্রান্তি বা আশঙ্কা থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই মঙ্গল।

আহার্য্য বিষয়ে সাধারণতঃ কিরূপ ভুল ধারণা চলতি, এখানে সেইটি আরও একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্। একটি ধারণা—রুটি আগুনে সেঁকে, অর্থাৎ 'টোষ্ট'করে নিলে এর উপকারিতা হ্রাস পেয়ে যায়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের দাবী মেনে নিলে বলতে হয়—এমনটি কখনই হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে খাবার রুটিটা যদি একটু সেঁকে নেওয়া গেলো, তবে দেখা যাবে খেতেও হয়েছে এ সুস্বাদু আর সহজপাচ্যও হয়েছে। রুটিতে আগুনের তাপ বেশি পরিমাণে যদি দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রেই মাত্র খাদ্যপ্রাণ বা খাদ্যের সারবস্তুটি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা।

অপর একটি ভ্রান্তি—উত্তমরূপে রান্না করা মাংস অপেক্ষা কাঁচা মাংস অধিকতর পুষ্টিকর। এই উক্তিও মেনে নিতে রাজী নন, বিশেষ করে প্রাচ্যের খাদ্য-বিশেষজ্ঞগণ। তাঁরা এই বলতে চান, মাংসে যে প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় উপাদান আছে, তাপে সেইটি নষ্ট হয়ে যায় না। অপর দিকে বরং রান্না করার দরুণ আহার্য্য মাংস হজমের পক্ষে সমধিক সহায়ক হয়ে থাকে।

রিফ্রিজেরেটার বা ঠাণ্ডা আধারে মৎস্যাদি সংরক্ষিত করার কালে লবণ যেন ছড়িয়ে দেওয়া না হয়, বহুক্ষেত্রে এমন একটি ধারণা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞদের পরিষ্কার দাবী বা অভিমত—এ আগাগোড়া একটি ভ্রান্তি বিশেষ, নুনের সহায়তায় ঠাণ্ডা আধারে মাছ সংরক্ষণে আরও বরং সুবিধাই হয়।

এমন একটি ধারণাও আমরা অনেকেই পোষণ করি, অতিরিক্ত মিষ্টি খেলে পরিণামে 'ডায়াবিটিজ' বা বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়।

শরীরবিজ্ঞানীরা এই উক্তিও নাকচ করছেন যথার্থ যুক্তি দেখিয়ে। তাঁরা বলেন, অতিমাত্র মিষ্ট দ্রব্য আহারের কুফল যেটি হওয়া সম্ভব, সে হচ্ছে শরীরে বাড়তি মেদ বা চর্ব্বি হয়ে পড়া।

এক শ্রেণীর লোক রয়েছেন, যাঁদের মনের বিশ্বাস, গরম গরম রুটি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর আর গুরুপাকও বটে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের দাবী এর ঠিক উল্টো বলা যায়। তাঁদের মতে চুল্লি থেকে সদ্য বের করে আনা গরম রুটি সাধারণ রুটির মতোই পুষ্টিকর। হজমের দিক থেকেও এই দুই-এর ভেতর উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। গরম রুটি ভালরকম না চিবিয়ে গলাধঃকরণ করার ঝোঁক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়—এই কাজটিই সমর্থনযোগ্য নয়। অন্যথা, যে ভাবেই রুটি আহার করা হোক, উপকার দর্শাবে প্রায় একই মাত্রায়।

অপর ভ্রমাত্মক ধারণা বা মনের বিশ্বাস—দিন ও রাত্রির নিয়মিত দুইটি ভোজনের মাঝখানে ঘন ঘন খেতে গেলে ক্ষিধে নষ্ট হয় আর হজম শক্তিরও ব্যাঘাত ঘটে। এই যুক্তিও মেনে নিতে পারেন নি শরীরবিজ্ঞানী ও চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞগণ হুবহু। তাঁরা স্পষ্টত: এই অভিমত প্রকাশ করেছেন—প্রশ্নটি আসলে কি খাওয়া হচ্ছে, সেইটির উপর নির্ভর করে। মিষ্টি বা চর্ব্বিজাতীয় খাদ্য খেলে ক্ষিধে কমে যায় আর কম ক্ষিধে নিয়ে খেতে গেলে ভুক্ত দ্রব্য সহজে হজম হতে চাইবে না, এ স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্রদের এবং অফিস আদালত ও কারখানার কর্ম্মীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, মাঝখানে কিছু টিফিন করে নিলেই ফল ভাল হয়। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কর্ম্মক্ষমতা যেমন বৃদ্ধি পায়, কর্ম্মজনিত অবসন্নতাও দূরীভূত হয় একই সঙ্গে।

সারাদিনে কতটুকু জল খাওয়া হবে, এই নিয়েও রকমারী ধারণা আমাদের মধ্যে চলতি। এর ভেতর একটি মস্ত ভ্রান্তি—অতিরিক্ত জল খেলে অতিরিক্ত স্ফীতকায় হওয়ার ভয় থাকে। বিশেষজ্ঞরা এই যুক্তিটি উড়িয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, শরীরের ধর্ম্মই এই—অতিরিক্ত জল সে ধরে রাখবে না। এই অবস্থায় যিনি যত বেশি জল খেতে চাইবেন, আপত্তি নেই, ক্ষতিরও কারণ নেই।

এমন লোকও দেখতে পাওয়া যায়, যাঁরা ভাবেন মস্তিষ্কের পুষ্টির জন্য মাছ অপরিহার্য্য। কিন্তু আসলে এইটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবী করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেন—বিশেষভাবে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াবে, এইরূপ কোন একটি খাদ্য এখন অবধি আবিষ্কৃত হয় নি মস্তিষ্কের অতিরিক্ত খাটুনি যেখানে, সেখানে খাদ্যের প্রয়োজ স্বীকার্য্য কিন্তু এর জন্য অতিরিক্ত শক্তি বা খাদ্যপ্রাণ-সম্পন্ন খাদ্য খুঁজে পেতে হবে—এই ধরণের ধারণা ভ্রমাত্মক।

রান্না করা খাদ্য না খেয়ে কাঁচা খাদ্য আহার করা সম্ভব হলে উপকার বেশি হত, কারও কারও মনের এই দৃঢ় বিশ্বাস। খাদ্য-বিশেষজ্ঞগণ কিন্তু এইটি মেনে নিতে পারেন নি। তাঁদের বক্তব্য—রান্না হলেই খাদ্যের ভেতর বীজাণু থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে আর সেরূপ খাদ্য যতই উপাদেয় হবে, ততই হবে সহজপাচ্য বা লঘুপাক। এইখানেই তাঁরা থেমে যান নি—একটু এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, রান্না খাদ্যের পরিবর্ত্তে কাঁচা খাদ্য গ্রহণ করতে সুরু করলে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে ও পরমায়ু কমে যাবে মারাত্মক ভাবে।

আমাদের ভেতর অনেকেরই আর একটি বিশ্বাস বলবৎ—গরুর দুধের চেয়ে ছাগলের দুধ ভাল অর্থাৎ অধিকতর উপকারী। কিন্তু এ-ও এক কথায় মেনে লওয়া চলে না। আলোচ্য গরু বা ছাগলটি যে খাদ্য খাবে, তার উপরই দুধের গুণাগুণ নির্ভর করবে, খাদ্যপ্রাণের দিক থেকে বিবেচনা করলে গরুর দুধ ও ছাগলের দুধের মধ্যে মূলত: পার্থক্য নেই।

জ্বর হলে সম্পূর্ণ উপোস দেওয়াই শ্রেয়:—এইরূপ একটি ধারণা সমাজে বহুদিন থেকেই রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্‌রা এই ধারণা নিতান্ত অসার বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা দাবী করছেন—জ্বরাক্রান্ত রোগীকে মাঝে মাঝে কিছু পরিমাণ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য দিতে হবে। তবে সেইটি যেন সহজপাচ্য বা লঘুপাক হয়, এইটি দেখা দরকার। শরীরের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবার জন্যেই অসুস্থ অবস্থাতেও খাদ্য চাই আর সেটি খেতে হবে অবশ্য চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে।

আর একটি ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা—রাত্রির খাওয়া বেশি হলে ঘুমঘোরে দু:স্বপ্ন দেখার আশঙ্কা থাকে। কথাটি ঠিক এই ভাবে মেনে নিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা রাজী নন। রাত্রিতে মাত্রাতিরিক্ত আহার করলে হজমের ব্যাঘাত ঘটবে, আর হজমের ব্যাঘাত হলে সুনিদ্রা হতে চাইবে না, এ সহজেই অনুমেয়। মোটের উপর, খাদ্য গ্রহণের সঙ্গে স্বপ্ন দেখা না দেখার মৌলিক কোন সম্পর্ক নেই, বিশেষজ্ঞদেরই এই অভিমত।

আগামী সংখ্যা হইতে
ধারাবাহিক উপন্যাস

## ব ন কে টে ব স ত

(বাঙলার সুন্দরবন অঞ্চলের পটভূমিকায়)

মনোজ বসু

## বিচারপতি শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ মিত্র

[ স্বনামধন্য আইনরথী ]

বিংশ শতাব্দীর তখন একেবারে গোড়ার দিক। কাতরাসের দেওয়ান তখন যশোর জেলার কলোরার স্বর্গীয় ভুবনমোহন মিত্র মহাশয়। তাঁর সহধর্মিণী স্বর্গীয়া নীরদবাসিনী দেবীর গর্ভে ডালটনগঞ্জে ১৯০৪ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করলেন তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র—পরবর্তীকালের স্বনামপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ, কলকাতার মহাবিচারাধিকরণের অন্যতম বিচারক ও মানবদরদী ভাষাবিদ শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ মিত্র মহাশয়। ভুবনমোহনের তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম বিখ্যাত ব্যবহারজীবী শ্রীযশপ্রকাশ মিত্রের নামও বিশেষভাবে উল্লেখনীয়, বর্তমানে যশপ্রকাশ কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত শেখ আবদুল্লার ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান সরকারী আইন উপদেষ্টা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ইতিহাসেও তাঁর নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে থাকবে।

জামতাড়া বিদ্যালয়ে জ্যোতিপ্রকাশ যখন অধ্যয়নরত সেই সময়ে সুবিখ্যাত প্রধান শিক্ষক কেশব হাজারীর সংস্পর্শে তিনি আসেন। ১৯১৯ সালে গিরিডি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এবং ১৯২১ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে যথাক্রমে প্রবেশিকা ও আই-এ পরীক্ষায় হন উত্তীর্ণ। এর পর জ্যোতিপ্রকাশের ইংল্যাণ্ড যাত্রা—সেখানে অক্সফোর্ডের ওরিয়েল কলেজে (১৩২৬ সালে অর্থাৎ আজ থেকে ৬৩২ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত) যোগদান করে অল্পকালের মধ্যে Responsions পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সালে ঐ কলেজ থেকেই প্রথম ভারতীয় হিসেবে মডার্ণ গ্রেড্স পরীক্ষার মাধ্যমে গ্র্যাজুয়েট হন। কলেজের এক বছর কম ছ'শো বছরের ইতিহাসে এই প্রথম একজন ভারতীয় অনুরূপ সম্মান লাভ করলেন। ছাত্র হিসেবে জ্যোতিপ্রকাশের অসাধারণ মেধারই এ পরিচায়ক। এই সময়ে রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস, গ্রেট অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারীর প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক স্যার উইলিয়ম ক্রেগী প্রভৃতি বিশিষ্ট পুরুষদের সংস্পর্শে আসেন, শেষোক্ত জনের প্রভাবে জ্যোতিপ্রকাশের অন্তরে

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ মিত্র

শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করার বাসনা জন্মায়। ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করতেন জ্যোতিপ্রকাশ, অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান মজলিশেরও তিনি ছিলেন সম্পাদক।

১৯২৬ সালে বিদেশের বুকে ভারতের গৌরব বর্ধন করে জ্যোতিঃপ্রকাশ ফিরে এলেন পুণ্যপবিত্র ভারতভূমিতে। ১৯২৭ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স কলেজে (অধুনা শ্রীরাম কমার্স কলেজ) অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করে শীঘ্রই অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। এই সময়ে "মানি, ব্যাঙ্কিং, কারেন্সী" নামক তাঁর বহুপঠিত, বহু-আলোচিত, বহুপ্রশংসিত গ্রন্থটি রচিত হয়। ব্যারিষ্টারী পড়ার আশায় কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে আবার ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন (আগষ্ট ১৯৩০) ও ইংল্যাণ্ডে ইনার টেম্পলএ যোগ দেন। ঐ বছরেই ডিসেম্বরের মধ্যেই পরীক্ষার প্রথমার্ধ ও শেষার্ধে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩১ সালের ২৭শে জানুয়ারী ইংল্যাণ্ডের হাইকোর্ট অফ জাষ্টিসের তালিকাভুক্ত হন। ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে ফিরে এসে ৫ই মে তালিকাভুক্ত (এনরোল্ড) হয়ে ১লা জুন অবিস্মরণীয় আইনরথী মিঃ বারওয়েলের চেম্বারে যোগ দেন। এই বারওয়েল সাহেবেরই বিরাটত্ব কথাসাহিত্যিক 'শঙ্কর' তাঁর বহু অভিনন্দিত গ্রন্থ "কত অজানারে"র মাধ্যমে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মিঃ বারওয়েলের উদারতা, মানবতা ও পরোপকারিতার প্রতি বিচারপতি মিত্রও অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন।

বিচারপতি মিত্র রেলপথ সংক্রান্ত মামলাসমূহ পরিচালনা করতেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে বিহটা ট্রেণ দুর্ঘটনার মামলায় তিনি আইনের পরামর্শদাতা ছিলেন। ১৯৪০ সালে নদীয়ার জয়রামপুরে ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় তিনি প্রথমে আসামী পক্ষ ও পরে নিহত ইন্দুভূষণ সরকার ও ভূপেন্দ্রকিশোর বসুর পক্ষ সমর্থন করেন। প্রমাণ করেন যে, কোনরকম অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের জন্যে নয়, রেলপথের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেই গলদ থাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে গেছে ও নিহতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ানো হয়। এরই ফলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্বন্ধে রেলপথের সংবিধান সংশোধিত হয়। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে ইনি প্রধান আইনোপদেষ্টা হিসেবে ক্যালকাটা ডিষ্টারবেন্সেস এনকোয়ারী কমিশন-এ সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সরকারীপক্ষ সমর্থন করেছিলেন স্যার এন. পি. ইঞ্জিনিয়ার। কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার পেট্রিক স্পেনস। ১৯৪৮ সালে গান্ধী হত্যা মামলায় বীর সাভারকরের পক্ষ সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র। এ ছাড়াও দেওয়ানী, ফৌজদারী, হত্যা সংক্রান্ত আরও অসংখ্য মামলা ভারতের বিভিন্ন আদালতে অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে তিনি পরিচালনা করেছেন। ১৯৪৯ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী কলকাতায় বিচারাধিকরণের অন্যতম বিচারকের আসনে অভিষিক্ত হলেন কৃতী আইনবেত্তা জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র।

আইনের অসংখ্য কাজের চাপে দৈনন্দিন কর্মসূচী পূর্ণ থাকা সত্বেও আর একটি বিরাট কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন জ্যোতিপ্রকাশ আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। শিশুদের দেবতার সঙ্গে তুলনা করলে বোধ করি আর যাই হোক অন্যায় হয় না। বালগোপালকে লালন পালনের ক্ষেত্রে জ্যোতিপ্রকাশের পৃষ্ঠপোষণা অপরিসীম। ফুলের মত কোমল, নিষ্পাপ,

পবিত্রতার প্রতিমূর্তি শিশুদের মধ্যে যারা বিশ্বের প্রথম আলো দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অসহায় অবস্থায় পতিত হয়—সেই স্বজনহীন শিশুদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে রেখে তাকে তিলে তিলে মানুষ করে তোলার মহান্ কার্যে জ্যোতিপ্রকাশের উৎসাহ, আন্তরিকতা ও সহায়তা তাঁর দরদী মনেরই পরিচয় বহন করে। বেহালার (ঠাকুরপুকুর) চিলড্রেন্স হোম তাঁরই প্রচেষ্টায় সুপরিচালিত হচ্ছে, সোদপুরে শিশুরক্ষা সমিতির নতুন বাড়ীর নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়েছে তাঁরই অনুপ্রেরণায়, পাণিহাটির গোবিন্দকুমার হোমের মাধ্যমে বাঙলার নারীরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠার আলো দেখতে পাচ্ছেন তাঁরই অধিনায়কতায়। ইনষ্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথেরও প্রতিষ্ঠাতা সভ্য তিনিই। মনে হল, যেন আইনরথী হিসেবে ভারতব্যাপী সম্মানের থেকেও শিশুপালন কর্মের সফলতালাভই তাঁকে অভিভূত করে অনেক বেশী। কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সভাপতির আসন তিনি এইবার নিয়ে চারবার অলঙ্কৃত করলেন। ছাত্রজীবনে খেলাধূলার প্রতিও ছিল তাঁর প্রবল অনুরাগ। এখনও কলকাতার বহু ক্রীড়ানুষ্ঠানে দর্শকরূপে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়।

বিচারপতি মিত্র হুগলীর পালেরা গ্রামের স্বর্গীয় ডাঃ ক্ষীরোদ-কুমার বসুর মেয়ে শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে—খৃষ্টীয় ১৯৩২ অব্দে।

## ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার

[ প্রথিতযশা সুচিকিৎসক ]

রক্ষণশীলতার সঙ্গে প্রগতিবাদের, প্রবীণের সঙ্গে নবীনের, জ্ঞান-গরিমার সঙ্গে নিরহঙ্কারিতার ও বিত্ত উপার্জনের সঙ্গে মানবতাবোধের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায় স্বভাবনম্র, সদালাপী, জনদরদী কলকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদারের মধ্যেই।

বাঙলাদেশের এক বিখ্যাত সাংস্কৃতিবান পরিবারে ডাঃ মজুমদারের জন্ম। প্রসিদ্ধি, খ্যাতি ও সফলতার আলোয় উজ্জ্বল এই মজুমদার-পরিবার। এই পরিবারের স্বর্গীয় কৃষ্ণজীবন মজুমদার ছিলেন নীল-বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। কৃষ্ণজীবনের পুত্র বাঙলার সর্বজনশ্রদ্ধেয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যিনি ক্যালকাটা হোমিও স্কুলের (বর্তমানে কলেজ) প্রথম পত্তন করেন এবং গত শতাব্দীর শেষাংশে আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হোমিওপ্যাথী সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রতাপচন্দ্র স্বর্গীয় ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ীর বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন এবং হোমিওপ্যাথি বিদ্যার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন বিহারীলালের প্রভাবেই। প্রতাপচন্দ্রের মেয়েদের মধ্যে স্মরণীয় নাট্যকার পূজনীয় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এবং বিখ্যাত শিকারী ও ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় কুমুদনাথ চৌধুরীর সহধর্মিণীদের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতাপচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি উপাধিধারী সুখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার। জিতেন্দ্রনাথের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ কলকাতায় ১৯০৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের জননীর নাম শ্রদ্ধেয়া রাসেশ্বরী দেবী মহোদয়া।

১৯২২ সালে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশান থেকে প্রবেশিকা ও ১৯২৪ সালে সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করে আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরের বছর এডিনবরার মেডিক্যাল ফ্যাকালটিতে ভর্তি হন কিন্তু অসুস্থতার জন্যে দেশে ফিরে আসতে হয়। ১৯২৫ সালেই কারমাইকেল (বর্তমানে আর-জি-কর) মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯৩১ সালে ধাত্রীবিদ্যা ও নিদানশাস্ত্রে অনার্সসহ এম-বি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। আবার এরই মধ্যে ১৯২৯ সালে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে শারীরবৃত্ত বিষয়ে সাধারণ ডিগ্রী কোর্সে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ প্রথম স্থান অধিকার করে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন স্বর্ণপদক লাভ করেন। কারমাইকেলে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালীন ইনি হোমিপ্যাথী চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তকগুলি পাঠ করে ঐ বিদ্যা স্বীয় আয়ত্তাধীনে আনার চেষ্টা করতে শুরু করেন। প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে ১৯৩২ সালে এম, এস, সি পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ হন, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিখ্যাত ধাত্রী-বিদ্যাবিদ পরলোকগত ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাসের অধীনে ধাত্রী-বিদ্যায় আবাসিক স্কলার হিসেবে শিক্ষানবীশী করাকালীন ভূপাল বসুর সহযোগিতায় ইনি কারমাইকেল কলেজ ছাত্রসঙ্ঘ গঠন করেন যার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন এই দু'জন। ১৯৩৩ সালে আবার বিদেশ যাত্রা করে ছ'মাসের মধ্যে ইংল্যাণ্ড থেকে এল-আর-সি পি ও এম-আর সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দেশে ফিরে এসে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন।

হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার জন্য আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ তাঁকে গ্রহণ করে নি কিন্তু পরলোকগত ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় তাঁকে সসম্মানে ন্যাশান্যাল মেডিক্যাল স্কুলে ক্লিনিকাল টিউটার-ইন-সার্জারিরূপে গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে ডাঃ রায় ডাঃ মজুমদারকে বিদ্যালয়টিকে মহাবিদ্যালয় করে তোলার এবং বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক

ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার

নরেন্দ্রনাথ সেনকে যাদবপুর টি, বি, হাসপাতাল নির্মাণের ব্লু প্রিণ্ট ইত্যাদি তৈরী করার ভার অর্পণ করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি পুনরায় এডিনবারায় গিয়ে সাড়ে চার মাসের মধ্যে এফ-আর-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে এসে সহযোগী অধ্যাপকরূপে চিত্তরঞ্জন হাসাপাতালে যোগদান করেন। এই সময় স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের পুত্র ডাঃ অজয় আচার্য ও ডাঃ মজুমদার যুগ্মভাবে সেখানকার ছাত্রসঙ্ঘ গড়ে তুলতে সহায়তা করেন ও পরে উক্ত হাসপাতালের কার্যকরী সমিতির সদস্য ও সহ-সম্পাদকের কাজও করে থাকেন। ১৯৪৫ সালে পদত্যাগ করে পুরোপুরি ভাবে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। উক্ত শাস্ত্রটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং তার প্রসারকল্পে সরকারী অনুমোদন পাওয়ার জন্যে কয়েকজন প্রবীণ হোমিওপ্যাথের সাহায্যে হোমিওপ্যাথিক ষ্টেটফ্যাকাল্টি স্থাপনা করেন। সর্বোচ্চ ভোট লাভ করে ইনি তিনবার তার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫০ সালে ভারত সরকার এই প্রাদেশিক সংস্থাটিকে নিখিল ভারত উপদেষ্টা পরিষদরূপে সংগঠিত করেন ও ডাঃ মজুমদারকে হোমিওপ্যাথিক উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য মনোনীত করেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত হোমিওপ্যাথিক অনুসন্ধান সমিতির (১৯৪৭) ইনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ ছাত্রজীবন থেকে। বহুদিন পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের ইনি সভ্য ছিলেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনয়ন না পাওয়ায় ইউ, এস, ও'র, প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রী জে, সি, গুপ্তের সঙ্গে, কিন্তু তাতে ডাঃ মজুমদার সফলকাম হতে পারেন নি। এই সময়েই তিনি মার্ক্সবাদ সম্বন্ধীয় পুস্তকসমূহ এবং সাংবাদিক জগতের দিকপাল পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় হিন্দু দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট দলের প্রচুর সমর্থনে ইনি জয়লাভ করেন, প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে ইনি পার্টির সদস্য হলেও নির্বাচনের সময় পার্টির সদস্য ছিলেন না। ১৯৫৪ সালে 'VOKS'এর আমন্ত্রণে এক সাংস্কৃতিক অভিযানের সদস্যরূপে মস্কো গমন করেন এবং বিশেষ ভাবে এশিয়াস্থ সোভিয়েট দেশসমূহ পরিভ্রমণ করেন। ১৯৩০ সালে পাবনার হরিনারায়ণ চক্রবর্তীর মেয়ে শ্রীমতী অণিমা দেবীর সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

ছাত্রজীবনে ফুটবল, টেনিস, হাডুডু প্রভৃতি খেলায় ডাঃ মজুমদারের দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছিল। ক্রীড়ানুরাগী বলেই কিছুদিন আগে বিধান সভায় কলকাতায় ষ্টেডিয়াম গঠন সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তার নির্মাণকার্য আরম্ভ না হওয়ায় ডাঃ মজুমদার দুঃখপ্রকাশ করেন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত দলের অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের মতামতের মূল্য সঠিক ভাবে নিরূপণ করা বিধেয় বলেই ডাঃ মজুমদার মনে করেন। তাঁর কাছে আরও জানা গেল যে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার বহুল প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যত্নবান হয়েছেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিস্তায় আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তনই ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের আদর্শরূপেই গণনীয়।

## শ্রীকালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়

[ লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্প পরিচালক মিঃ কে, সি, চ্যাটার্জী ]

সার্থক শিল্পী যখন স্বরোদের বিভিন্ন তারে তাঁর মোলায়েম হাতের পরশ লাগান তখন সেই বিভিন্ন তারের বিভিন্ন ধ্বনির মধ্য থেকেই বেজে ওঠে একটি মাত্র সুর—ঠিক যে সুরটি বাজাতে চান শিল্পী। তার একাধিক, তাদের ধ্বনিও বিভিন্ন; কিন্তু তবু সব ছাপিয়ে ভেসে ওঠে সেই সুরটিই—অসংখ্য ধ্বনির মধ্যেও যার পরশ লাগে প্রত্যেক সমঝদারের কানে। এইটাই সুরপ্রাধান্য—অসংখ্য স্বরের মধ্যে ও সুরটিই প্রধান।

এই মরজগতেও এমন কিছু মানুষ এখনও আছেন, যাঁদের জীবন সুরপ্রধান। একটা সুরই তাঁদের গোটা জীবনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে; তাঁদের সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে, সমস্ত আচার ব্যবহারের মধ্যে ভেসে ওঠে সেই সুরটিই—সেই সুরের পরশ লেগে থাকে তাঁদের জীবনের ছোটবড় প্রায় সমস্ত ঘটনার মধ্যে। এঁদের জীবন ঘটনা-বহুল হলেও সুরপ্রধান, ঘটনা এঁদের জীবনে গৌণ, মুখ্য সুর, এমনি সুরপ্রধান জীবন শ্রীকালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর ৫৮ বছরের জীবনের প্রায় সব কিছুর মধ্যেই লেগে আছে একটি সুরের পরশ—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; যেমন বাজাও তেমনি বাজি।

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এই যন্ত্র-যন্ত্রীর মন্ত্র পেয়েছিলেন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কাছে। অবশ্য বিধিমত রামকৃষ্ণদেব তাঁর দীক্ষাগুরু নন, কারণ তাঁর জন্মগ্রহণের অন্ততঃ বছর চৌদ্দ আগে ঠাকুর দেহান্তরিত হয়েছেন—তাঁকে দীক্ষা দিয়েছেন রামকৃষ্ণেরই অন্যতম প্রধান মন্ত্রশিষ্য স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ)। তবু বাল্যকাল থেকেই রামকৃষ্ণের সেই মন্ত্রই তাঁর জীবনের মূল সুর—যে সুর দীক্ষাগুরুর সাহচর্য্যে হয়ে উঠেছে আরও প্রবল—যে সুর আজও বাজছে তাঁর কর্মময় জীবনের প্রতিটি ক্ষণে।

প্রেরণা পাওয়ার মত গৌরবময় কর্মজীবন শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের। বাঙ্গালার এক সাধারণ পল্লীগ্রামের এক অতি সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। কষ্টের ছাত্রজীবন সাঙ্গ করে তিনি যোগ দিলেন বিড়লাদের প্রতিষ্ঠানে সামান্য কর্মচারিরূপে। তারপর ধীরে ধীরে উন্নতি, দৃঢ়পদক্ষেপে সোপানের পর সোপান অতিক্রমন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে'বিড়লারা খুঁজে পেলেন শিল্প প্রতিভার স্বাক্ষর; পাকা শিল্পপরিচালক করে গড়ে তুললেন তাঁকে। উৎসাহ দিয়ে, আগ্রহ নিয়ে কাজ শেখালেন নিজেরাই। আজ তিনি বাঙ্গলার দুটি বৃহত্তম শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরিচালক (এয়ার কণ্ডিশানিং কর্পোরেশন ও ইণ্ডিয়া সিপিং এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর) এবং আরো কতকগুলির পরিচালক (চম্পারণ মার্কেটিং কোঃ লিঃ, সরন ট্রেডিং কোঃ লিঃ, ন্যাশন্যাল প্রেসিং কার্ড কোঃ লিঃ, ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া মার্কেটিং কোঃ লিঃ, হিন্দুস্থান ডিসকাউণ্টিং কোঃ লিঃ, এবং ন্যাশন্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইণ্ডাষ্ট্রিস লিঃ এর ডিরেক্টর।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার উন্নতির মূল কি? কুণ্ঠিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়, উন্নতি কতটা করেছি জানি না, তবে আমার মনে হয় ইংরেজীতে যাকে সিনসীয়ারিটি বলে উন্নতি করতে হলে সেই জিনিষটার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশী। যে কোন কাজে সাফল্য অর্জন করতে গেলে সিন্‌সীয়ার হতেই হবে। ফাঁকি

দিয়ে সার্থকতা বা সাফল্য লাভ করা যায় না—ফাঁকিতে সাময়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলেও হতে পারে। একটা গল্প বলি—মহাপুরুষ মহারাজ তখন বেলুড়ে, হঠাৎ একদিন তাঁর ইচ্ছে হোল কালজাম খাবেন। সেটা কালজামের কাল নয়; ভক্তরা মহাচিন্তায় পড়লেন, কালজাম কোথায় পাওয়া যায়। তবু মহারাজ খেতে চেয়েছেন, সকলেই সুরু করলেন কালজামের অন্বেষণ—খোঁজ খোঁজ—কালজাম খোঁজ। আমিও কালজাম খুঁজছি। কিন্তু কোথাও পাই না, কালজামের সন্ধান আর মেলে না; হঠাৎ দেখি নতুন বাজারে এক বুড়ি পচা কয়েকটা কালজাম নিয়ে বসে আছে। বুড়ির কাছেই খোঁজ পেলাম ভাল কালজামের, নিউ মার্কেটের এক কোণের এক দোকানে এক মুসলমানের কাছে আছে কয়েকটা ভাল কালজাম, তার কাছ থেকেই পচাগুলো নিয়ে এসেছে বুড়ি। ছুটলাম নিউমার্কেটের সেই কোণের সেই দোকানীর কাছে। সত্যিই পেয়ে গেলাম কালজাম—মনের মত কালজাম। জাম নিয়ে চললাম বেলুড়ে; পুরনো কলকাতা, রাত হয়ে গিয়েছে, তবু চললাম বেলুড়ে—মহারাজ খেতে চেয়েছেন। বেলুড়ে পৌঁছে দেখি মহারাজ তখনও জামের প্রতীক্ষায় বসে আছেন—পথ চেয়ে আছেন। জাম পেয়ে কি খুশী মহারাজ; বললেন, আমি জানতাম জাম পাওয়া যাবেই, তুই নিয়ে আসবিই। একটু থেমে গেলেন শিবানন্দের কালাচাঁদ, তারপর আবার সুরু করলেন—চাই একাগ্রতা, চাই নিষ্ঠা, চাই ভক্তি, চাই শ্রদ্ধা; এগুলির যোগাযোগ ঘটলে প্রায় সবই সম্ভব।

সম্ভব যে হয় শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ই তার প্রমাণ। হোটেল ক্লাবের হৈহুল্লোড়কে ঘেন্না করেও, সাহেবী কেতায় পাইপ বা সিগারেট না টেনেও, কোন রকম নেশার ধারে কাছে না ঘেঁষেও কে, সি চ্যাটার্জী আজ বাঙ্গলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প পরিচালক বলে স্বীকৃত। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, দাঁও মারার মনোবৃত্তিটা বাঙ্গালীকে ছাড়তে হবে; কিনে বেচলাম, মোটা টাকা পকেটস্থ করলাম, এ মনোভাবটা খারাপ। এতে যেমন ব্যবসায়ে স্থায়িত্ব আসে না, তেমন থাকে না সততা। শিল্প গড়, ধীরে ধীরে বড় হও—তাতে স্থায়িত্ব আছে, সততা আছে। কে, সি চ্যাটার্জীর মতে, বাঙ্গালীকে শিল্প গড়ে তুলতে হবে, তবেই বাঙ্গালী জাগবে।—পরশ্রীকাতরতা থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ নিজের কিছু থাকে না। নিজে কাজ কর, বড় হও, পরের শ্রী দেখলে তখন আর মন কাতর হবে না।

প্রাইভেট আর পাবলিক সেক্টরের প্রশ্ন তুলে ধরলাম কে, সি চ্যাটার্জীর সামনে, আপনার কি মত? দেখুন—উত্তর দিলেন শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়—ছেলেকে যদি ঘরের মধ্যে বেঁধে রাখতে চান তবে ছেলের খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর; আমার মত, ছেলেকে বুঝিয়ে দিন ভাল মন্দ, তার দায়িত্ব কর্তব্য, দেখবেন, ছেলে খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে। প্রাইভেট সেক্টর সম্পর্কেও আমার বক্তব্য তাই। আর সরকারী কাজে নিয়ম কানুন মেনে চলতে গেলে দেরী হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যে দেরী হলে চলবে না; চটপট কাজ হওয়া চাই।

ব্যবসা জগৎ ছাড়াও সমাজের সঙ্গে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কাজে তিনি

শ্রীকালাচাঁদ চট্টোপাধ্যায়

প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন। সময় পেলেই তিনি চলে যান বেলুড়ে—ঠাকুরের পাদমূলে বসে অপার শান্তি লাভ করতে।

তবে অশান্তি তিনি বড় একটা ভোগ করেন না। তিনি তো যন্ত্র মাত্র, ঠাকুর যেমন বাজাচ্ছেন তেমনি বাজছেন। সাংসারিক জীবনে তিনি সুখী। তাঁর পিতা জীবিত (৮৫), মাতা ৭৮ বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ করেছেন। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের দুই পুত্র ও এক কন্যা; স্ত্রী ধর্মপ্রাণা মহিলা।

## বিনয়চন্দ্র সেন

[ অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ]

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার কিংবা অনুরূপ কোন পরিবারের গুরুত্ব প্রসিদ্ধি না থাকলেও, নিঃসন্দেহেই কৃষ্টি-কলায় শিক্ষা-দীক্ষায় বৈশিষ্ট্যবান ভাস্বর বাঙালী পরিবারের মধ্যে সেন-পরিবার বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। যে পরিবারের কথা বলছি তার পুরুষ- শিরোমণি হলেন স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন, বাংলা সাহিত্যে যাঁর কর্মকৃতির পরিমাণ, গুরুত্ব ও গভীরতা আজো বাঙালী সাহিত্যপ্রিয়দের সশ্রদ্ধ বিস্ময়।

দীনেশচন্দ্রের ঐশ্বর্যবন্ধ উত্তরাধিকার সার্থকভাবে বহন করে নিয়ে যেতে পেরেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তর পুরুষেরা, অধ্যাপক অরুণচন্দ্র সেন, অধ্যাপক বিনয়চন্দ্র সেন, অধ্যাপ শ্রীচন্দ্র সেন, আধুনিক বাংলা কবিতার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সমর সেন—এঁদের ব্যক্তি ও কর্মজীবনের মধ্যে দীনেশচন্দ্রের সাধনার ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়েছে।

এবং সেই কারণেই বলেছি, দীনেশচন্দ্রের পরিবার নিঃসন্দেহেই একটি বিশিষ্ট বাঙালী পরিবার।

দীনেশচন্দ্রের অন্যতম পুত্র সদ্য-উল্লিখিত শ্রীবিনয়চন্দ্র সেন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট ফরিদপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বিনয়চন্দ্রের মাতা স্বর্গতা বিনোদিনী দেবী ছিলেন আদর্শ মাতৃত্বের দৃষ্টান্তস্থল, ১৯১৬ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিনয়চন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯১৮ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে আই-এ পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং ১৯২০ সালে বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন; পরীক্ষায় এবংবিধ সাফল্যের পুরস্কারস্বরূপ তিনি ঠাকুরদাস স্বর্ণপদক ও পোষ্টগ্রাজুয়েট জুবিলী স্কলারশিপ পান। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম, এ, পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে 'ইউনিভার্সিটি গোল্ড মেডাল' লাভ করেন। এম, এ-তে তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বিশেষ পাঠ্য স্বরূপ নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে আইন পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন।

এম, এ পাশ করার পরে বাংলার শিক্ষাজগতের স্বনামপ্রসিদ্ধ পুরুষ হেরম্ব মৈত্রের আমন্ত্রণে ১৯২৩ সালে সিটি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর আহ্বান আসে এবং তিনি সেখানে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। সিটি কলেজ ছেড়ে আসায় সেখানকার ছাত্ররা খুব অসুবিধায় পড়ল। হেরম্বচন্দ্র তাঁকে অনুরোধ জানালেন অবসর সময়ে তাঁর কলেজে গিয়ে ছাত্রদের পড়িয়ে আসতে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কেও তিনি সেই সঙ্গে অনুরোধ জানালেন যেন বিনয়চন্দ্রকে অনুমতি দেওয়া হয়।

বিনয়চন্দ্র সেন

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতি পেয়ে তিনি নিয়মিত সিটি কলেজে গিয়ে পড়িয়ে আসতেন। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের চাপে তিনি ঐ কলেজে বেশি দিন অতিরিক্ত অধ্যাপনা করতে পারেন নি। কয়েক বছর অধ্যাপনা করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে প্যারিস যাত্রা করেন; প্যারিসে কয়েক মাস থাকার পর তিনি লণ্ডনে আসেন এবং লণ্ডনকেই শিক্ষাস্থল হিসাবে নির্বাচিত করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ডক্টর এল, ডি, বার্ণেট্‌র অধীনে বাংলা দেশের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন এবং ১৯৩ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি, এইচ, ডি উপাধি অর্জন করেন তাঁর এই গবেষণাকার্য 'Some Historical Aspects of Bengal inscriptions' নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টরেট ছাড়া প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি এবং মোয়াট স্বর্ণপদকও বিনয়চন্দ্র সেন লাভ করেছেন। প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাস ছিল তাঁর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি-পরীক্ষার গবেষণার বিষয়। তাঁর এই গবেষণার একটি অংশ Studies in the Vatakas' নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'জার্নাল অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব লেটার্স'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া ডক্টর সেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কিত অনেক গবেষণামূলক মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

ইতিহাসের অধ্যাপক বা মূলত ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলীর রচয়িতা হলেও ডক্টর সেন অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক ও অধ্যাপকের মতো অরসিক বা শীর্ণচিত্ত নন। বাংলা সাহিত্য তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, এবং আজ হয়তো শুনে অনেকে অবাক হবেন, আজকের বিদগ্ধ ইতিহাসবেত্তা ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন জীবনের শুরুতে ছিলেন নিষ্ঠাবান সাহিত্যব্রতী। সদিক থেকে তিনি পিতার যোগ্য সন্তান, পিতার সাহিত্য-সাধনার মশালবহনের যোগ্যতায় বিশিষ্ট। দশ বছর বয়সে সাহিত্যসেবী বিনয়চন্দ্রের প্রথম লেখা টেনিসনের 'Enoch Arden'এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। বারো বছর বয়সে ঢাকার একটি পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প বেরোয়। আরো পরে, যৌবনে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত নারায়ণ-এ সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সাহিত্যপ্রাণ বিনয়চন্দ্রের জীবনের আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা হলো, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি চিঠি লেখা। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উন্নতি প্রসঙ্গে কতকগুলি গঠনমূলক প্রস্তাব দিয়ে বি, এ ক্লাসে পাঠরত ছাত্র বিনয়চন্দ্র সাহস করে যে চিঠি লিখেছিলেন, বলা বাহুল্য, তা কবিগুরুর প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছিল।

বিনয়চন্দ্রের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রীতির বড় প্রমাণ একটি ঘটনাতে প্রমূর্ত। এই ঘটনার উল্লেখ বাংলা সাহিত্যের, বিশেষত বাংলা সাময়িকপত্রের খাতিরে, করা বিশেষ প্রয়োজন। যে ভাষায় বিশেষজ্ঞ পত্রিকার প্রকাশ নিতান্তই অনুল্লেখ্য, সেই ভাষাতেই আজ থেকে প্রায় আটত্রিশ বছর আগে সম্পূর্ণতঃই ইতিহাস-বিষয়ক একটি পত্রিকা বেরিয়েছিল; নাম ইতিহাস ও আলোচনা, সম্পাদক ছিলেন অরুণচন্দ্র সেন, বিনয়চন্দ্রের দাদা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীপ্রমথনাথ সরকার। বিনয়চন্দ্রের অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির প্রচ্ছদ পট এঁকে দিয়েছিলেন। মুখ্যত গবেষণামূলক এই পত্রিকা অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন, জাপানী অধ্যাপক কিমুরা প্রমুখের

ঐতিহাসিক আলোচনায় সমৃদ্ধ হত। এই পত্রিকা এক বছর চলেছিল, গ্রাহক ও পাঠক সাধারণের আগ্রহ সত্ত্বেও এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করতে হয়েছিল। কারণ এই পত্রিকার প্রাণ ছিলেন, বিনয়চন্দ্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার পড়া তিনি তখনও ডিঙোননি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিনয়চন্দ্রই নিজের বৃত্তির টাকায় পত্রিকার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন। 'ইতিহাস' নামে এখন যে ইতিহাস বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার পথ প্রদর্শক ও পরিকল্পনাদাতা রূপে ইতিহাস ও আলোচনা'র নাম অবশ্যস্মর্তব্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ডক্টর সেনের প্রীতির ঘনিষ্ঠসম্পর্ক, বত্রিশ বছর ধরে তিনি শিক্ষকতা কার্যে ব্যাপৃত। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগেই শুধু নন, সংস্কৃত পালি, আধুনিক ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি বিভাগের সঙ্গেও তিনি শিক্ষকরূপে সংশ্লিষ্ট।

ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেন তাঁর সাধনার জন্য বিদ্বৎ সমাজের কাছ থেকে সম্মান ও প্রশংসা পেয়েছেন প্রচুর। তাঁর মূল গবেষণাগ্রন্থ এবং জাতক-প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ বার্ণেট, অ্যালার্ন, সিলভাঁ লেভী, উইণ্টারনিজ এবং সি, ভি বৈদ্য, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদেশী ও দেশী পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শন করেছেন। ১৯৫০ সালে ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস শাখার (প্রথম শাখা) সভাপতি নির্বাচিত হন। বলা বাহুল্য, উক্ত অধিবেশনে তাঁর সভাপতি-ভাষণ সুধী সমাজের প্রশংসা অর্জন করেছিল। এ ছাড়া বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স রচনার সময় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বর্গত অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর যোগ এখনো ঘনিষ্ঠ। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও তিনি নানাভাবে সংশ্লিষ্ট। কয়েক বছর আগে তিনি অধ্যাপক-প্রতিনিধি হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

শিক্ষক হিসাবে শ্রীযুক্ত সেনের তুলনা মেলে খুবই কম; অধ্যাপনার মাধুর্য ও ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক স্নেহশীলতায় তিনি আদর্শ শিক্ষকের দৃষ্টান্তস্থল। তাঁর অধীনে যাঁরা গবেষণা করেন ও করেছেন তাঁরা জানেন তাঁদের জন্য তাঁর পরিশ্রম কত গভীর, কত আন্তরিক কত হৃদয়স্পর্শী!

# আমার কবিতা

## সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়ে যায়
রঙচুট এক দিগন্ত
আমি জেগে থাকি রাতের প্রহরে
নির্জীব শ্লথ হাতে খুলে দিই দূর জানালা
বিশাল মুক্তির গন্ধে চেয়ে দেখি
আমার সমুখে আর এক উপান্ত…।

আমার যত স্বপ্ন অমলিন
ভীড় করে আসে আশ্চর্য্য স্তব্ধতায়
প্রাণ পেয়ে হা-হা করে হাসে
আমি কবি, আমার কবিতা প্রাণের কুহেলিকায়…।

মানুষের এলোকেশী আশা
আমার কাকজ্যোৎস্নার আলো
জানালার ফ্রেমে আঁকা রাত্রির পালঙ্কে
আমার কবিতা গুঁড়ো-গুঁড়ো
বারাঙ্গনা চোখে আনে পূর্ণতার অগাধ প্রত্যয়
পঙ্কিল কদর্য্য আর বিক্ষুব্ধ হাহাকারে
খুঁজে ফেরে প্রাণের কল্লোলের কিশলয়।

মানুষের গোপন রন্ধ্রে যে পিপাসার বালুচর
তারে আমি প্রাণ দেব আমার কবিতায়
এ সূর্য্য, এ পৃথিবী
কে সংশয় বুকে তুলে নেয়
তারে আমি রূপ দেব প্রত্যহের প্রয়োজনীয়তায়।

আমি কবি, মানুষের ভুলের ফসল আমার কবিতায়
চরম প্রান্তির নিচে পরম দীর্ঘশ্বাস ইন্দ্রিয়াতীত
সর্বানুভূতিতায়।

# স্মৃতির টুকরো

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

সাধনা বসু

দেশে ফিরে এলুম। প্রবাস থেকে স্ববাসে, পাঞ্জাব থেকে বাঙলায়। নানকের দেশ থেকে চৈতন্যের দেশে। তারপর মনে পড়ছে, হ্যাঁ, পরিষ্কার মনে পড়ছে গিয়েছিলুম একটি ফুটবল খেলার ম্যাচ দেখতে, সেই রাত্রেই অনুভব করলুম আমি ধরা পড়ে গেছি অসুস্থতার কঠিন মুঠোর মধ্যে। একটি একটি করে উত্তাপের বাণের আঘাতে আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলুম, উপায়ান্তর না দেখে আমাকে আশ্রয় নিতে হল শয্যার সান্ত্বনা-ঝরা বক্ষে। ডাক্তার ডাকা হল, বিধি-বিধানও তিনি দিলেন যথারীতি, চিকিৎসাও চলতে লাগল তাঁর নির্দেশক্রমে কিন্তু জ্বর কমল না। দেখতে দেখতে সে নিতে লাগল প্রবল থেকে প্রবলতর রূপ, প্রবলতর থেকে প্রবলতম, অনুধাবন করে জানা গেল এর নাম টাইফয়েড। ডাক্তাররা ডাক্তারের কাজই করে যেতে লাগলেন, টাইফয়েডও পালন করতে থাকে আপন ধর্ম। এখানেই শেষ নয়, এর পর আরও আছে, লাহোর থেকে সংবাদ এল যে অসুস্থতার প্রাচীর মধুর কাছেও অনতিক্রান্ত। আমার শারীরিক অবস্থার ভয়াবহতার কথা ভেবেই মধুর অসুস্থতার খবর আমাকে শোনানো হয়নি। আমি নিজে যখন রোগের যন্ত্রণায় কাতর তখন আমি জানতেও পারছি না যে ঠিক আমারই মত সুদূর লাহোরে আরও একজন এমনি ভাবেই রোগ শয্যায় শয়ান। জুনে কলকাতা ফিরল মধু, তার স্বাস্থ্য অত্যন্ত দুর্বল। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের পরামর্শ চাইলে তাঁরা দু জনেই বললেন অবিলম্বে রাঁচী যাত্রা কর কারণ রাঁচীর জলবায়ু শুষ্ক। অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে মধুর রোজই একটু একটু করে ঘুষঘুষে জ্বর হোত। আমার শরীরের বিষয় তো আগেই উল্লেখ করেছি—আমার তখন মনে হোত যে হয় তো আমাকে ফেলেই সে রাঁচী চলে যাবে। এখন আমার মনে হচ্ছে যে রোগের প্রতি আমরা বোধ হয় একটু অতিরিক্ত রকমের বিনয়গুণ, সৌজন্য-বোধ ও ভদ্র-আচরণ দেখিয়ে ফেলেছিলুম—তাই বোধহয় সেও সঙ্কল্প করল যে এরা যখন এত দরদী তখন এদের প্রত্যেকেরই যদি আতিথ্য নেওয়া যায় তো মন্দ কি—বাস যে কথা সেই কাজ তার কঠোর-ভয়াল গাম্ভীর্যের ছায়াপাত হ'ল একে একে আমাদের পরিবারের প্রত্যেকের দেহে। মা ভয়ানক পীড়িতা হয়ে পড়লেন—তাঁর দেহে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হল তীব্রভাবে অনুভূত। তাঁকে যেতে হল নার্সিং হোমে। দাদাও পড়লেন টাইফয়েডে। আমাদের গৃহের আঙ্গিনা জুড়ে চলতে লাগল রোগের মহোৎসব। বাকী রইলেন কেবলমাত্র বাবা। অপত্যস্নেহে সমস্ত শক্তি দিয়ে অক্লান্তবেগে যুদ্ধ করতে লাগলেন রোগের সঙ্গে আর এই যুদ্ধে তাঁর প্রধান অস্ত্র ছিল সেবা শুশ্রূষা, যত্ন পরিচর্যা এদের সব কটিরই জন্ম বুকভরা স্নেহ থেকে। আমাদের দাম্পত্যজীবনের সূচনা হল এমনি করেই, বিয়ের ছ'মাসের মধ্যেই আমরা দু'জনে দুজনকে দেখছি গুরুতররূপে পীড়িত অবস্থায়। আমার শাশুড়ী এই সময়ে রাঁচী থেকে এলেন। জীবন মরণের সন্ধিক্ষেত্রে তখন চলছে আমার অবাধ আনাগোণা, মনে হোত ঠিক যেন জীবন মরণের মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে —মনে হোত যেন জীবনে আর মরণে কোন প্রভেদ নেই, ভারাক্রান্ত শরীরে কখনও বা মনে হোত জীবন আর মরণ বর্তমানে বুঝি মিলে মিশে হয়ে গেছে একাকার। বেয়াল্লিশটি দিন পরে শরীরের তাপ-মাত্রা নীচের দিকে নামতে লাগল, ভার যেন কমে গেল, পর্বতপ্রমাণ অস্বস্তি যেন সরে গেল দেহ থেকে, নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণার হাত থেকে আনন্দময় মুক্তি। একটু সুস্থ হয়েই আমিও জোর করলুম যে মধুর সঙ্গে আমিও রাঁচী যাব। তাই হল, আমার পেড়াপেড়ি অগ্রাহ্য হল না। মধুর ও আমার সঙ্গে রাঁচী যাত্রা করলেন আমার শাশুড়ী ও বাবা। এইবার মধুর পালা। শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রম ও অশান্তি গভীরভাবে আহত করল তার স্বাস্থ্যকে, বিছানা নেওয়া ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর রইল না। রাঁচীর আকাশে-বাতাসে তখন মৌসুমীর স্বাক্ষর, প্রতিটি ধূলিকণা তখন বহন করছে মৌসুমীর বার্তা, দিকদিগন্ত তখন প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে মৌসুমীর তূর্য-নিনাদে, শুনেছিলুম শুকনো জলবায়ু এসে দেখলুম মৌসুমীর বিজয়-বৈজয়ন্তী। ক্যালেণ্ডারে তখন সেপ্টেম্বারের জয়যাত্রা। আমি তখন ক্রমশঃই সুস্থ হয়ে চলেছি, সেই সময়ে মাকে (আমার শাশুড়ীকে) মনে হোত ঠিক স্বর্গের দেবীর মত, রোগের কঠিন মুষ্টি থেকে আমাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করলেন তাঁর অমৃতময়ী মাতৃস্নেহ দিয়ে, অসুস্থতার অন্ধকারে আলো দেখিয়ে আমাকে পথ চেনাল তাঁর স্নেহের পুণ্যজ্যোতিঃ—সেই আলোই আমাকে পৌঁছে দিল সুস্থতার বিশাল রাজ্যে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে মধুর সেবার কাজে আমিও মাকে ( আমার শাশুড়ীকে ) সাহায্য করতে লাগলুম, এইভাবে মায়ের আর আমার দুজনের মধ্যে গড়ে উঠল এক অটুট বন্ধন, দুজনে দুজনের অত্যন্ত কাছে এসে গেলুম, মা আমাকে পুরোপুরিভাবে হৃদয়ের মধ্যে নিবিড় ভাবে টেনে নিলেন ঠিক নিজের মায়ের মতই। জীবনের বা সমাজের সহস্র বাধা-বিপত্তি প্রতিবন্ধক রইল একদিকে আর তাঁর সীমাহীন স্নেহ রইল অন্যদিকে। তিনি আমাকে ডাকতেন 'লক্ষ্মী' বলে ( আমি জানি না ঐ সম্বোধনের আমি কতটুকু যোগ্য। ) মনে হয় এক সদ্য রোগমুক্তা কিশোরীর তার রুগ্ন স্বামীর শয্যাপ্রান্তে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে রোগের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ সক্ষম হয়েছিল তাঁর মাতৃচিত্তকে স্পর্শ করতে।

দর্শনের ক্ষেত্রে আমার শ্বশুর মশাইয়ের যেমনি ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য—তেমনই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়।

তথাকথিত জগত থেকে তিনি ছিলেন অনেক দূরে, বলতে গেলে এক রকম বিচ্ছিন্নই। তখন তিনি জীবনের শতাব্দী কালের চার ভাগের তিন ভাগে এসে গেছেন। সেই বয়েসেও তিনি প্রতিদিন শয্যাত্যাগ করতেন ভোর পাঁচটায়। তারপরই বাগানে চলে যেতেন যৌগিকক্রিয়ায় শরীরচর্চার জন্যে। একটু একটু করে আবার নৃত্যচর্চা সুরু করলুম, নিয়মিতভাবে আবার আমার নাচের অভ্যাস আরম্ভ হল, গতানুগতিক জীবনধারার হল সমাপ্তি, অসুস্থ পরিবেশ প্রাণ পেল নৃত্যের জীবনময় ছন্দে। গানের চর্চাও সেই সঙ্গেই আবার সুরু হ'ল। এতে মধুকেও আনন্দ দেওয়া হোত আবার আমারও নিজের কাজ এগিয়ে যেত। সে এক সন্ধ্যায়—আমি নেচে চলেছি আপন মনে—হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন বাবা (আমার শ্বশুরমশাই) আমি বিব্রত হয়ে পড়লুম—নাচ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেলুম তৎক্ষণাৎ, মনে পড়ছে প্রফুল্ল হাস্যে তিনি বললেন—সাধনা, তোমার নাম সাধনা—যে শব্দের অপর অর্থ অনুধ্যান, ভোরবেলায় আমি যখন বাগানে যাই সেই সময় তুমিও বাগানে যাও না কেন, সূর্যোদয়ের রক্তিম মুহূর্তে, মুক্ত বায়ুর মধ্যে, প্রকৃতির অপূর্ব পরিবেশে তোমার নৃত্যসৃষ্টির নব নব উপকরণ খুঁজে পাবে মা, তোমার শরীরও অটুট থাকবে, এই স্থাখো না, আমিও নাচি অবশ্য ঠিক তোমার ধরণের নয়, আমার নাচ অন্য ধরণের, স্বাস্থ্যকে অটুট রাখার উপযোগী। সত্যান্বেষী পবিত্রচিত্ত, কল্যাণকর্মী বৃদ্ধের সারগর্ভ নির্দেশ পালন করার ইচ্ছে সেদিনকার যৌবনের উদ্দামতার মধ্যে প্রবলভাবে থাকলেও ধৈর্যের ছিল নিতান্ত অভাব।

আস্তে আস্তে মধুও সেরে উঠতে লাগল। বাড়ীর সকল রকমের সুবিধা ও মায়ের করুণাঝরা স্নেহে সে একটু একটু করে আরোগ্যের মুখ দেখতে লাগল, আস্তে আস্তে চলাফেরাও করতে থাকে সে, আমার মনে আছে আমরা একত্রে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতুম পদব্রজে শুধুমাত্র ভ্রমণমানসে। এই ভ্রমণপর্ব আমরা একটি প্রবচনে অভিহিত করতুম—পরস্পরকে প্রায়ই বলতুম—চল জীবনটা দেখে আসা যাক। রাঁচী মেন রোড ধরে অনেক দূর এগিয়ে যেতুম—এই "জীবন" দেখতে, তাকে খুঁজে বার করতে, তাকে বরণ করতে, তাকে প্রণাম করতে। চিকিৎসকদের দরবার থেকে উপদেশ এল জলবায়ু পরিবর্তনের দরকার দার্জিলিঙ যাওয়াই আমাদের স্থির হল, এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে উল্লেখ না করা অত্যন্ত অন্যায় হবে আমার পক্ষে সেটি হচ্ছে কুচবিহারের মহারাণী (বর্তমানের মহারাজ মাতা) ইন্দিরা দেবী বাবার অনুরোধে সানন্দে তাঁদের দার্জিলিঙ-এর বাড়ীটি আমাদের বাস করতে দিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে তাঁর সাহায্য বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ইন্দিরা দেবীর সঙ্গেও আমাদের আত্মীয়তার যোগসূত্রও অবিচ্ছেদ্য। বড়পিসিমার তিনি পুত্রবধূ সেদিক দিয়ে তিনি আমার বৌঠান। দার্জিলিঙএ স্বাস্থ্যের দিক থেকে আমরা প্রভূত উপকার পেলুম। বহুল পরিমাণে উদ্ধার হল আমাদের হৃতস্বাস্থ্য, সত্যি খুব ভাল লেগেছিল দার্জিলিঙকে সেই সময়ে। আমাদের সঙ্গে আমার মাও গিয়েছিলেন। দার্জিলিঙ থেকে আবার আমরা রাঁচীতে এলুম। একরকম সেই থেকেই আমাদের জীবনে আবার লাগল স্বাভাবিকতার পুলক পরশ। আমাদের দ্বৈত জীবনধারা স্বাভাবিকতার কূল ঘেঁষে বয়ে চলতে লাগল। আমাদের জীবনের উপর অস্বাভাবিকতার স্পর্শগুলি একে একে যেতে লাগল মিলিয়ে। অবশ্য সন্তরোগমুক্ত বলে যথোচিত সাবধানতা সহকারেই কাটিয়েছি দিন, অনেকরকম স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে। এর পর বিভিন্ন চায়ের আসরে, আনন্দোৎসবেও পূর্বের মতই আমরা করেছি যোগদান। পুজোর সময়ে আমার শ্বশুরবাড়ীতে এক বিরাট ব্যাপার। ঐ সময়টিতে অসংখ্য লোকের সমাগমে জীবনের সোনার কাঠির স্পর্শ পেয়ে সারা বাড়ী ঝলমলিয়ে উঠত হাসিতে, সৌন্দর্যে, দীপ্তিতে।

কিছুকাল পরের কথা। মধু আবার কাজে আত্মনিয়োগ করার সঙ্কল্প করলে। ১৯৩২এর শেষাশেষি জামসেদপুর ঘুরে আমরা কলকাতায় এলুম। ডাঃ রায় ও ডাঃ মিত্র দু'জনেই বাধা দিলেন মধুকে, তাঁরা জানালেন যে এ রকম গুরুতর পীড়া থেকে মুক্তিলাভ করে এত অল্পকালের মধ্যে এ রকম পরিশ্রম শুরু করা অত্যন্ত অসমীচীন। মধু শুনল না, কোন বাধাই তাকে আটকে রাখতে পারল না, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ফিল্ম কোম্পানীতে সে যোগ দিল, একটি উর্দু ছবি (সেলিমা)র পরিচালনভার সে গ্রহণ করল, এখানে আশ্চর্যের বিষয় যে, এই সহস্র পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে চিকিৎসকদের দুর্ভাবনা ব্যর্থ করে মধুর স্বাস্থ্য বলতে নেই ক্রমশঃই উন্নত হতে লাগল। বিস্মিত হলেন চিকিৎসকের দল, পৃথিবীর বুকের উপর আজও এইরকম কয়েকটি ঘটনার অভিনয় হয়ে যায় বলেই তো সাড়ে তিনশো বছরেরও আগে জগতের বরেণ্য মহাকবি সেক্সপীয়ারের অমর সৃষ্টি হ্যামলেটের অমর উক্তি—দেয়ার আর মোর থিঙ্গস ইন হেভেন য়্যাণ্ড আর্থ দ্যান আর ড্রেম্ট অফ ইন ইওর ফিলসফি—আজও মানুষের মনে বার বার দোলা লাগায়, জাগায় আবেদন, আকর্ষণ করে সকল দেশের সকল কালের নরনারীর শ্রদ্ধা।

চৌরঙ্গী প্লেসে এখনকার রক্সী প্রেক্ষাগৃহের কাছে আমরা একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিলুম। ছবির কাজের সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চাভিনয়ের কাজেও এগিয়ে এল মধু। সি-এ-পির গায়ে আবার সে বারেকের জন্যে ছুঁইয়ে দিল সোনার কাঠি। এম্পায়ার থিয়েটারে (এখনকার রক্সী) রবীন্দ্রনাথের "ডালিয়া" দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ হল (১৯৩৩)। নায়িকা টিনীর চরিত্রটি রূপ দেওয়ার ভার পড়ল আমার উপর। এর মহড়া চলত আমার ননদ ভারতীয় লোকসভার ভূতপূর্বা সদস্যা সুষমা সেনের পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে (ইনি বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক ভাই প্রসন্নকুমার সেনের পুত্র স্বনামধন্য স্বর্গীয় ডক্টর প্রশান্তকুমার সেনের

সাধনা বসু

সহধর্মিণী ) অভিনয়ের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহদানও ছিল বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

জীবনের গোড়ার দিকে অবিস্মরণীয় যে ক'টি চরিত্র অভিনয় করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এও তার মধ্যে একটি। এই চরিত্রটি অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং অভিনয়শিক্ষা দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। এই শিক্ষাদান চলত জোড়াসাঁকোয় কিংবা জগদ্বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ ডক্টর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বরাহনগরের বাগানবাড়াতে। আমার ন'পিসীমা স্বর্গীয়া মণিকা মহলানবীশ ( সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক স্বর্গীয় সুবোধচন্দ্র মহলানবীশের সহধর্মিণী ) ছিলেন প্রশান্তচন্দ্রের আপন জ্যাঠাইমা। মহড়ায় আমার সঙ্গে বাবা ও মধুও যেতেন। আমার অসীম সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ আমার অভিনয়ে এতদূর তৃপ্তিলাভ করেছিলেন যে কেবলমাত্র উদ্বোধন রজনী ছাড়া অন্যান্য সব কটি ( মোট তিনটি ) প্রদর্শনীও ধন্য হয়েছিল তাঁর পুণ্য পদস্পর্শে। প্রথম রজনীর অভিনয় শেষ হবার পর কবিগুরুর কাছ থেকে আহ্বান এল। কবিগুরুর আহ্বান পাওয়া অভাবনীয় গৌরবের পরিচায়ক বলেই বোধ হয় সেদিনকার সেই আহ্বান আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে বিদ্যুতের মত পুলক-রোমাঞ্চ বয়ে গেল। আমার কাছে ডালিয়ার অভিনয় সম্বন্ধীয় পুস্তিকাকারে একটি বিবরণী ছিল, সেই পুস্তিকার মুখপত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি পূর্ণ-পৃষ্ঠা আলেখ্য মুদ্রিত ছিল, সেই মুদ্রিত আলেখ্যের গায়ে সস্নেহে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিলেন "সাধনাকে, আমার আশীর্বাদের সঙ্গে। আমি আনন্দিত"। তার পর এই জীবনটার উপর দিয়ে কত ঘটনা-দুর্ঘটনার বন্যাই তো বয়ে গেল, কত কিছুর হ'ল ওলোট-পালোট, এদিক-ওদিক, পরিবর্তন, কত বিভিন্ন ধারায় জীবনের নদী বয়ে গেলে তা সত্ত্বেও আজও আমি সযত্নে শিরোধার্য করে রক্ষা করে আসছি দেবতার প্রসাদী ফুলের মত সেই লেখাটি যার তুল্য নেই, যার সমান নেই, যার দ্বিতীয় নেই। [ ক্রমশঃ।

অনুবাদ : কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

## সূর্যতোরণ

বাঙলা দেশের ভাস্করদের জীবনকাহিনী সেই সঙ্গে আধুনিক গৃহসমস্যা সমন্বিত এক সুদীর্ঘায়তন ছায়াচিত্র। বাঙলা দেশের ভাস্কর্যবিদ্যার সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় গাঢ় কিন্তু ভাস্করদের জীবনের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অনেকেরই জ্ঞানের অভাব। সোমনাথ কৃতী ছাত্র, কর্তৃপক্ষের দলাদলির যূপকাষ্ঠে সে হয় বলি ফলে তার চরম পরীক্ষার অভিজ্ঞানপত্র লাভে সে হয় বঞ্চিত। এমনি সময়ে সে সংস্পর্শে আসে অসাধারণ প্রতিভাবান ভাস্কর বিপ্রদাসের। যাঁর অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য সাধারণে বুঝতে পারে না যে জন্যে সাধারণ লোকের সহানুভূতি থেকে তিনি বঞ্চিত। নিঃসঙ্গ বিপ্রদাসের সংস্পর্শে আসে সোমনাথ, বিপ্রদাসের অভিনবত্ব মুগ্ধ করে সোমনাথকে, যে অভিনবত্ব শুধু তাঁর কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের চলা-ফেরা হাসা-কাঁদার মধ্যেও। হঠাৎ আকস্মিক ভাবে অত্যল্পকালের মধ্যেই দেহান্ত ঘটে বিপ্রদাসের। সোমনাথকে অন্নের জন্যে এক কারখানায় শ্রমিকের কাজ নিতে হয় যে কারখানার মালিক মিঃ চ্যাটার্জী, যাঁর লেখিকা কন্যা অনীতাকে বস্তির মধ্যে ইতিপূর্বে এক দুর্বৃত্তের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল সোমনাথ, কারখানায় দু'জনের দেখা হয় আবার স্বভাবসুলভ বিরোধও বাধে। এই সময় ভাগ্যের সহায়তায় সোমনাথ বছরের শ্রেষ্ঠ ভাস্করশিল্পী নির্বাচিত হওয়ায় প্রবাশু ভাবে সে সম্বর্ধিত হ'ল বিপ্রদাসের বন্ধু শিবশঙ্করের প্রচেষ্টায়, এইখানে অনীতা জানতে পারল সোমনাথের প্রকৃত পরিচয়। কিছুকাল পরে মিঃ চ্যাটার্জীর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটতে থাকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন রাজশেখর নামধারী এক বিচিত্রপুরুষ। বস্তীতে তাঁর জন্ম, ( মিঃ চ্যাটার্জী যে বস্তির মালিক ) তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় মালিকের কর্মচারীর অত্যাচারে সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে তিনি হলেন বদ্ধপরিকর, মিঃ চ্যাটার্জীর সমস্ত সম্পত্তি নিজের অধীনে এনে প্রস্তাব করলেন সব কিছু তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারেন যদি অনীতা তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়। বাবার সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখেই অনীতা রাজী হয় এবং তার প্রস্তাবানুযায়ী রাজশেখরও সম্মত হন তার কল্পনার বাস্তব রূপ দিতে, অনীতার কল্পনা ছিল যে এক ত্রিশতলা অট্টালিকা নির্মাণ করে বস্তীবাসীদের ভালভাবে আলো-বাতাসের মধ্যে বাস করার সুযোগ করে দেবে। রাজশেখর এর নির্মাণের ব্যয়ভার গ্রহণ করে নির্মাণকার্যের ভার দিলেন সোমনাথের উপর। এ দিকে অনীতা সোমনাথের প্রতি আকৃষ্টা হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে এ ঘটনা রাজশেখরের চোখ এড়াতে পারে না কিন্তু অনীতার অন্তরের আবেদনের কোন সাড়াই পাওয়া যায় না সোমনাথের কাছ থেকে। রাজশেখর নিজের বিবাহের দিনও স্থির করে ফেলল অনীতাও সোমনাথকে পাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। এ-হেন অবস্থায় "সূর্যতোরণ"কে অসমাপ্ত অবস্থায় রেখেই সোমনাথ দূরে সরে গিয়ে একটি চাকরি বেছে নিল। সূর্যতোরণের নির্মাণের দায়িত্ব সে দিয়ে গেল সহপাঠী বন্ধু সুব্রতকে। সুব্রত নানাভাবে সোমনাথের কাছে উপকারী কিন্তু চিরকাল অপরের সামনে সে করেছে অস্বীকার যে তার কর্মকৃতিত্বের জন্যে অর্জিত সুনাম ন্যায়তঃ সোমনাথের প্রাপ্য। সুব্রত অত্যন্ত অর্থপিশাচ, অর্থের লালসায় কোন কর্মই তার অসাধ্য নয়; মিঃ চ্যাটার্জীর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে ছিল গভীরভাবে যুক্ত তাঁর প্রতিষ্ঠানের কলঙ্কের জন্যেও সেই দায়ী। কর্মান্বেষী বিপন্ন সুব্রতকেই শেষ অবধি সোমনাথ দিল সূর্যতোরণ গঠনের ভার কিন্তু সুব্রত তার স্বপ্নকে সংবাদপত্রের ব্যঙ্গের খোরাক করে তুলল সূর্যতোরণ যা হল তা দেখে তাকে পশুশালাই বলা যায়। অনীতা ফিরিয়ে আনল সোমনাথকে। সোমনাথ নিজের হাতে ধ্বংস করল সূর্যতোরণকে। থানায় গিয়ে সে করল আত্মসমর্পণ, বিচারে কোন আইনজ্ঞের সাহায্য না নিয়েই সে প্রমাণ করল সে নির্দোষী, বিচারক তাকে মুক্তি দিলেন। রাজশেখর সেই দিনই তার সঙ্গে অনীতার বিবাহোৎসবে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন সোমনাথকে। সোমনাথ ও অনীতা দুজনেই রাজশেখরের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় পৌঁছে দেখল রাজশেখর আত্মহত্যা করেছেন এবং মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে তিনি স্বীকার করে গেছেন যে পয়সায় সব পাওয়া যায়, খালি পাওয়া যায় না মন। মৃত্যু দিয়ে তিনি অনীতা সোমনাথের মিলনের বাধা অপসারণ করে দিয়ে গেলেন। নতুন করে গড়ে উঠল সূর্যতোরণ। সফল হল অনীতার সমস্ত কল্পনা। অনীতা সোমনাথ দুজনে শ্রদ্ধা জানাতে থাকে রাজশেখরের আত্মার উদ্দেশে।

এই কাহিনী। গল্পটি লিখেছেন গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, পরিচালনা করেছেন অগ্রদূত, সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অভিনয়াংশে প্রধান ভূমিকায় আছেন বিকাশ রায়, উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। বিশিষ্ট ভূমিকাগুলি রূপ দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ—এঁরা ছাড়াও শিশির বটব্যাল, বীরেশ্বর সেন, গঙ্গাপদ বসু, মিহির ভট্টাচার্য্য, শিশির মিত্র, গৌর সী, সলিল দত্ত, দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, শ্রীমান দীপক, শোভা সেন, কবিতা রায়, কমলা অধিকারী প্রমুখ শিল্পিবর্গ ভূমিকালিপি সমৃদ্ধ করেছেন।

## মর্মবাণী

ঐতিহাসিক গবেষককে কেন্দ্র করে গল্পটি লেখা। একটি কৃতী ছাত্র এম-এ পাশ করে ঐতিহাসিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার ফলে যে ভীষণ পরিণতি তার জীবনে দেখা দিল—সেই ভাবধারায় মর্মবাণীর গল্পাংশ রচিত।

বরুণ ভালভাবে পাশ করার পর মিশরীয় ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার সময় এক রাজকন্যার কাহিনী তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে—এই বিষয়ের মধ্যে পুরোপুরিভাবে নিজের চিন্তাধারাকে আবদ্ধ রাখার ফলে তার ধারণা জন্মায় যে সেই রাজকুমারীর জীবন-নায়ক। এ হেন অবস্থায় তার বিবাহ হয় ঘটনাচক্রে, দেখা গেল যে নববধূ অরুণার আকৃতি হুবহু তিন হাজার বছর আগেকার রাজকন্যার মত। অন্ধ স্নেহে বশীভূত হয়ে বরুণের মা তার চিকিৎসা ভালভাবে করতে দিতে চান না—অরুণা পিত্রালয়ে ফিরে যেতে চায় কিন্তু তার বাবা তাকে বোঝালেন পতিসেবাই নারীর জীবনে শ্রেষ্ঠতম কর্তব্য। বরুণের মানসিক অবস্থা যখন ক্রমশঃই ভয়াল হয়ে উঠতে লাগল তখন তার পরিচর্যার জন্যে এক নার্স এল। বরুণের পাগলামি কিন্তু যা কিছু অরুণাকে কেন্দ্র করেই—মাকে সে মা বলে জানছে, বোনকে বোন বলে জানছে—তাদের সামনে তার অভিব্যক্তি বিংশ শতাব্দীসুলভ, কিন্তু অরুণাকে দেখেই তার মন-প্রাণ ধ্যান ধারণা সব কিছু পিছিয়ে যায় তিন হাজার বছরে। বরুণকে শান্ত রাখার জন্যে অরুণাও অবিকল মিশরীয় রাজকন্যার অভিনয় করে, এবং তাতে সত্যি বরুণ শান্তও থাকে এবং অরুণার অত্যন্ত বাধ্য থাকে, তাকে ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না বরুণের। কিন্তু এভাবে তো সারা জীবন কাটানো যায় না—নার্স অরুণাকে বোঝাল যে কি পাপের জন্যে এই অস্বাভাবিক পরিবেশে অরুণা নিজের জীবন আহুতি দেবে—অরুণাকে এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের উপদেশ দেওয়ায় নার্স কর্মচ্যুত হয়, অবশেষে একদিন অনন্যোপায় হয়ে অরুণা গৃহত্যাগ করে সেই নার্সেরই আশ্রয়ে যায় এবং ঐ বিদ্যা আয়ত্তে এনে নিজেও হাসপাতালের নার্সের শ্রেণীভুক্ত হয়। এদিকে উপায়ান্তর না দেখে (অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলা যেতে পারে) বরুণের মা রাজী হলেন বরুণের মস্তিষ্কে অস্ত্রচালনার সম্মতি দিতে এবং তদনুরূপ কাজও হয় সাফল্যের সঙ্গে। হাসপাতালে এক মৃত রোগীর উদ্দেশে তার সহধর্মিণীর বিলাপ শুনে অরুণা বুঝতে পারে যে স্বামী ছাড়া নারীর দ্বিতীয় গতি নেই। বরুণের অস্ত্রোপচারের সংবাদও তার কানে আসে। অবিলম্বে সে কাঁকের হাসপাতাল অভিমুখে যাত্রা করে। সর্বশেষে ব্যাধিমুক্ত বরুণের সঙ্গে তার বহু-বাঞ্ছিত মধুমিলনে

ছবিটির সমাপ্তি। গল্পটি লিখেছেন মনোজ ভট্টাচার্য, সংলাপ-যোজনা করেছেন প্রশান্ত চৌধুরী, সুর সংযোগ করেছেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। সুশীল মজুমদার পরিচালিত এই ছবিটির নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন অসীমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। অপরাপর ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, অনুপকুমার, ডাঃ হরেন, দিলীপ দে, দিলীপ রায়, অশোক সরকার, চন্দ্রা দেবী, ছায়া দেবী, মঞ্জু দে, সুপ্রিয়া চৌধুরী, লীলা পাল, সুব্রতা সেন, সুদীপ্তা রায়, রাজলক্ষ্মী, শান্তা দেবী, সীমা প্রভৃতি খ্যাতনামা ও খ্যাতনাম্নী শিল্পিবৃন্দ।

## ধূমকেতু

বাঙলাদেশে অপরাধাত্মক ছবি তোলার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযোজকবর্গকে উদাসীন দেখা যায়—অথচ বোম্বাই একের পর এক অপরাধতত্ত্ব সম্বলিত ছবি উপহার দিয়ে বাজার মাত করে চলেছে অবশ্য রুচিবান এবং সুবোদ্ধা দর্শকসাধারণ তথাকথিত ছবিগুলিকে মোটের উপর ছবি বলেই আখ্যাত করবেন কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের অবকাশ আছে। বাঙলাদেশের দর্শক সাধারণের একটি আকাঙ্খা পূর্ণ করল ধূমকেতু, বাঙলাদেশ আবার আর একখানি অপরাধমূলক চিত্র উপহার পেল গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর কাছ থেকে। দশ বছর আগে এঁদেরই উপহার 'কালোছায়া' বাঙলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি বদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছে বললেও অতিশয়োক্তি হয় না।

ছবিটিতে একটির পর একটি হত্যাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে—প্রত্যেক হত্যাকাণ্ডের মূলে "ধূমকেতু" নামধারী এক অজানা লোক। অবসর-প্রাপ্ত পুলিশ কমিশনার মিঃ চ্যাটার্জীর কন্যার প্রেমাসক্ত গোয়েন্দা সুরথের উপর ভার পড়ল ধূমকেতু-রহস্যের সমাধান করবার, কিন্তু কোন হত্যাকাণ্ডই বাধা দিতে পারে না সুরথ কিংবা পুলিশের অন্য কেউ। শেষ হত্যাকাণ্ডের পর জানা গেল যে ধূমকেতু আর কেউ নয় স্বয়ং ভূতপূর্ব পুলিশ কমিশনার মিঃ চ্যাটার্জী। ধরা পড়ার পরমুহূর্তেই এবং আত্মহত্যা করে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাকে ফাঁকি দেওয়ার পূর্বমুহূর্তেই তিনি স্বীকার করে যান যে এমন বহু অপরাধী আছে যাদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আইন তাদের দণ্ড দিতে অক্ষম। আইনকে সেদিক দিয়ে করায়ত্ত করে তারা বেশ সম্মানের সঙ্গেই সমাজে বিচরণ করে। পুলিশ কমিশনার হিসেবে আইন অতিক্রম করা এঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না—তাই অবসর গ্রহণ করে এদের ধ্বংস করে পৃথিবীকে কয়েকটি নরপিশাচের ভার বহন করার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

মোটামুটি গল্পের সারাংশ এই। ছবিটি পরিচালনাও করেছেন স্বয়ং গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। পুলিশ কমিশনারের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন ছবি বিশ্বাস। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন অসিতবরণ ও সবিতা চট্টোপাধ্যায় (বর্তমানে বসু)। এঁরা ব্যতীত অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, পাহাড়ী সান্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, শিশির মিত্র, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা, বাণীবাবু, ধীরাজ দাস, সুনীত মুখোপাধ্যায়, সরল মুখোপাধ্যায় গীতা সিং, শিবানী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

## রঙ্গপট প্রসঙ্গে

শরৎচন্দ্রের লেখনীধন্য "ছবি"র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত এই ছবিতে অবতীর্ণ হচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, আশীষকুমার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, ভানু চট্টোপাধ্যায়, মালা সিনহা, নিভাননী দেবী, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। * * প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পরিচালনাধীনে "গলি থেকে রাজপথ" এর চিত্ররূপ গড়ে উঠছে। দীনেন গুপ্তের আলোক-চিত্রায়ণের মাধ্যমে ছবিটিতে দেখতে পাওয়া যাবে ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, অনুপকুমার, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী এবং সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিনয়। * * "শ্রীরাধার মান" ছবিটিকে পরিচালক বংশী আশের আগামী অবদান বলে ধরা যেতে পারে। সুর সংযোগের ভার নিয়েছেন রথীন ঘোষ। অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন মহেন্দ্র গুপ্ত, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, নবকুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, পদ্মা দেবী, গীতা সিং, ভারতী রায়, মিতা চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি শিল্পিবৃন্দ। * * নবরত্নকৃত চিত্রনাট্য অনুসারে "দেবর্ষি নারদের সংসার" চিত্রকাহিনীটি পরিচালিত করছেন পঞ্চভূত। রূপায়ণে থাকছেন ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিৎ রায়, পশুপতি কুণ্ডু, মিণ্টু দাশগুপ্ত, প্রভা দেবী, মায়া দেবী, রাণী দেবী প্রমুখ অভিনয়শিল্পীরা। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে দেখা যাবে সুখ্যাত সুরকার দুর্গা সেনকে।

## তবে কি হইবে ?

"আজ যদি জেনারল আইউব খাঁ জম্মু-কাশ্মীর-লাডক অধিকার করিবার প্রস্তাব করেন খালের জলের সমস্যার মীমাংসার সঙ্গে পাকিস্তানের ঐ সব ত্যাগ করিবার প্রস্তাবের মীমাংসা হইবে তবে কি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাহাতেও সম্মত হইবেন না ? আসামে ও পশ্চিমবঙ্গে ভারত সরকার যে ক্লৈব্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই যে পাকিস্তানের সাহস দুঃসাহসে পরিণত করিতে সাহায্য করে নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে ? পণ্ডিত জওহরলাল যদি আসামে ও পশ্চিমবঙ্গে দৃঢ়তার পরিচায়ক নীতি অবলম্বন করিতেন, তবেই পাকিস্তান সংযত হইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই ; কেন করেন নাই তাহা বুঝিতে পারা যায় না। এ দিকে একটি বিষয়ের প্রতি আমরা ভারত সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা প্রয়োজন মনে করি। পূর্ব্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হইতে পারে অর্থাৎ পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানের বর্ত্তমান সামরিক শাসন ধূলিসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে পারে এই আশঙ্কায় নাকি পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তানে সেনাবল প্রেরণ করা হইতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে গণবিদ্রোহের সম্ভাবনা পূর্ব্বে শুনা যায় নাই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুই স্বীকার করিয়াছেন পাকিস্তানের সমরসজ্জা ভারতের পক্ষে আশঙ্কার কারণ কেহ কেহ মনে করেন, পাকিস্তান আমেরিকার নিকট হইতে যে সমর সরঞ্জাম সাহায্য লইতেছে, তাহা প্রচুর এবং তাহা ভারতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবারই সম্ভাবনা। আজ কি পণ্ডিত জওহরলাল ও তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডল মনে করিবেন যে এমনও হইতে পারে যে, গণবিপ্লবের নামে পূর্ব্ব পাকিস্তানে যে সমরসজ্জা হইতেছে, তাহা ভারতের প্রতি প্রযুক্ত হইতেও পারে ?"

—দৈনিক বসুমতী।

## সতর্ক দৃষ্টি প্রয়োজন

"গত কয়েকদিন হইতে এই মর্মে সংবাদ প্রচারিত হইতেছে যে, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্থানে ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবনা নাকি আসন্নপ্রায়। সংবাদে ইহাও প্রকাশ যে, সম্ভাব্য সে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য করাচীর কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদল পূর্ব পাকিস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন এবং সৈন্য ও সাজসরঞ্জামবাহী সেই সব জাহাজ পাকিস্থানী নৌবহরের প্রহরাধীনে চট্টগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কেবল তাহাই নয়, তেজগাঁ ও কুমিল্লায় এক স্কোয়াড্রন করিয়া জঙ্গী বিমানও নাকি মোতায়েন রাখা হইয়াছে। সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম চলাচল সম্বন্ধীয় সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার অর্থ ও তাৎপর্য অন্য দৃষ্টিকোণ হইতেও অনুধাবন করা প্রয়োজন। পূর্ব পাকিস্থানের তথাকথিত বিদ্রোহ প্রচেষ্টা পাকিস্থানের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার, কাজেই সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখা দরকার, পূর্ব পাকিস্থানে যদি সৈন্যদল ও সমরসম্ভার সত্যই আসিয়া পৌঁছাইয়া থাকে তাহা কি নিছক আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে, না তাহার পশ্চাতে অন্য কোন সামরিক দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে ? সংবাদে যে সমরায়োজনের কথা বলা হইয়াছে তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ব্যাপক এই সমর-প্রস্তুতি বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে গড়িয়া তোলা হইতেছে কি না তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। হইতে পারে ইহার লক্ষ্য হয়তো ভারত, সম্ভাবিত বিদ্রোহের জনরব রটনা করিয়া তাহারই অন্তরালে ভারতবিরোধী এই সমর-প্রস্তুতি গড়িয়া তোলা হইতেছে—অন্তত: একরূপ সিদ্ধান্তে কেহ যদি আসিয়া উপনীত হন, তাহা হইলে সে সিদ্ধান্ত কি একেবারে অসঙ্গত হইবে ? মায়াবী আয়ুব খাঁর গতিবিধি বিশেষ সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## অর্থ ও ব্যবসা

"ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, এখানে শতকরা ৮০ জনেরও বেশী লোক দারিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। বার্ধক্যের বা দুর্দিনের জন্য নিজের চেষ্টা দ্বারা নিয়মিতভাবে কিছু সঞ্চয় করা ইহাদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য। যে সব প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আছে, সেখানে কর্মী যত অভাবগ্রস্তই হউক না কেন—মাসের শেষে বেতনের একটা অংশ দুর্দিনের জন্য জমা হইয়া থাকে ; এবং মালিকের চাঁদায় উহা ডবল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যে সব স্থানে তাহা নাই সেখানে সতত অভাবের জন্য সাধারণ কর্মীর পক্ষে স্বেচ্ছায় কিছু সঞ্চয় করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। অন্যদিকে ঠিকা মজুর, চাষী, রিক্সাওয়ালা, নৌকার মাঝিমাল্লা, দোকানের কর্মচারী, ছোট ছোট অফিসের কেরাণী, বেসরকারী ছোট ছোট স্কুলের শিক্ষক ইত্যাদি বিভিন্ন উপজীবিকায় রোজগার এত অনিশ্চিত কিম্বা এত কম যে, নিজের ইচ্ছায় সঞ্চয় করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অথচ বার্ধক্যের জন্য ইহাদের পক্ষেও কিছু সঞ্চয় করা অবশ্য প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক কোন ব্যবস্থা ব্যতীত তাহা সম্ভব হইবে না। সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে জাতিগঠনের আদর্শ ঘোষণা না করিলেও বৃটেনে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে—সরকারী বা বেসরকারী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রত্যেকটি বয়স্ক নরনারীকেই বার্ধক্যের জন্য সংস্থানের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। এদেশেও একরূপ সুযোগ অত্যাবশ্যক। ছোট বা বড় কিম্বা শিল্প ব্যবস্থা বা অন্য যে ধরণের কারবারই হউক না কেন—বেতনভুক কর্মচারী ও শ্রমিক প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চয়ের বাধ্যতামূলক পরিকল্পনা বলবৎ করিতে আর বিলম্ব উচিত হইবে না। এমন কি নিজেদের বুদ্ধি বা শ্রমের দ্বারা যাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকার্জন করিয়া থাকে,—যথা, কৃষক, ঠিকা মজুর, মাঝিমাল্লা, রিক্সাচালক, পান-বিড়ির দোকানদার ইত্যাদি। তাহারাও যাহাতে সরকারী প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড পরিকল্পনায় যোগ দিতে পারে—সেরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক। ইহার ফলে সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

চড়া জিনিষপত্র কিনিবার ঝোঁকও হ্রাস পাইবে। অন্যদিকে জাতির মোট সঞ্চয় বৃদ্ধির এবং ভোগের জন্য ব্যয় হ্রাসের ফলে মোটের উপর আর্থিক অবস্থারও কিছুটা উন্নতি অবধারিত।"

—যুগান্তর।

## সরকারী কর্ম্মচারীর খেয়ালখুশীতে ?

"নেহরু-নুন চুক্তিতে বেরুবাড়ী কেন পাকিস্থানকে দেওয়া হইল, ২৪শে নবেম্বর বৈদেশিক দপ্তরের পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে পণ্ডিতজী তাহা জানাইয়াছেন। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—কুচবিহারের "আঁ-ক্লাভ"গুলা ( enclave ফরাসী শব্দ, এবং পণ্ডিতজী উহার ফরাসী উচ্চারণ ছাড়া করেন না ) চোরাই চালানের আড্ডা ছিল, তাই দিয়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রিদিব চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন—'তবে বেরুবাড়ী দিলেন কেন, বেরুবাড়ী তো আঁ-ক্লাভ নয় ?' পণ্ডিতজী বলিলেন—'আমি কি করিব ? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের মত নিয়া এ সব ঠিক করিয়াছি।' এই ব্যাপারে চীফ সেক্রেটারী সত্যেন রায় কতটা দায়ী আমরা জানি না, কিন্তু সুরিটা ভিতরে বসিয়া কলকাঠি নাড়িতেছেন ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বাঙ্গলাদেশ কি এতই ডুবিয়াছে যে, রাইটার্স বিলডিং-এর কয়েকজন কর্ম্মচারীর খেয়ালখুশীতে দেশের মাটি বেহাত হইবে, দেশের লোক বিদেশী হইবে ? ভরসার কথা এইটুকু যে, ভারত সরকার, বেরুবাড়ী প্রভৃতি দাতব্য করিবার জন্য যে আইনের খসড়া পাঠাইয়াছিলেন লিগাল রিমামব্রান্সার করুণা হাজরার আপত্তিতে মন্ত্রিসভা তাহা পাশ করিতে পারেন নাই, ফেরৎ দিতে হইয়াছে।"

—যুগবাণী ( কলিকাতা )।

## দণ্ডকারণ্য

"আবার সেই ভুল করিবার আশঙ্কা। বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের জন্যই এই বিশাল ভূখণ্ডের আবিষ্কার, অথচ এখনও নানামুনির নানামত এক হইল না। দণ্ডকারণ্যে যে বাঙ্গালীরা গিয়া দ্বিতীয় বাংলাদেশ সাজাইয়া লইতে পারিত, এই কথাটা কি আর কাহারও মাথায় ঢুকে নাই! বাস্তুহারা হইয়া বড় বড় নেতার মাথা যে এমন ঘুলাইয়া যাইবে, তাহা তো স্বপ্নেও ভাবা যায় নাই। এই সেদিন হাতে পাইয়াও আন্দামান দ্বীপটা একরকম হাত-ছাড়া হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ হয়ত নেতাজীর স্মৃতিপূত হইয়া সমস্ত দ্বীপটাই বাঙালী সংস্কৃতির দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারিত। সেই বাঙালী সেখানে গেল, কিন্তু জাঁকিয়া বসিতে পারিল না। বাঙালী গেল, কিন্তু বাংলা ভাষাকে হটাইয়া হিন্দীর জয় পতাকা উড়িল। দণ্ডকারণ্যে যেন আর সে ভুল না হয়। এখানে ওখানে তাঁবুর তলে পড়িয়া তিক্তায়ে নৈতিক অধঃপতন ডাকিয়া আনা অপেক্ষা একটা নতুন দেশে ঝাঁপাইয়া পড়াটা কি অসঙ্গত ? ইউরোপের দল সাত সমুদ্র পাড়ি মারিয়া দিগ্বিজয় করিল, আর দু'পা আগাইয়া একটা নতুন রাজ্যে বাঙালীর ঘুঁটোগাড়ি করিতে ডাকাডাকি শুনিয়াও বুদ্ধির প্যাঁচ কষাকষি চলিবে ? গয়ংগচ্ছ করিয়া লাভ নাই। সরকার উদ্বাস্তু শিবির তুলিয়া দিবেনই—ইহা ধ্রুবনিশ্চয় জানিয়া বাঙ্গালী ঐক্যবদ্ধ হও বর্দ্ধমানের দুর্গাপুরে বাঙ্গালীর ঠাঁই নাই। এই নূতন পরিকল্পনায় সরকার সুবিধা দিয়াছেন, দিতেছেন, দিবেনও। সুতরাং দণ্ডকারণ্যে নূতন বাংলা গড়িয়া তুলিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই কল্যাণকর হইবে, সন্দেহ নাই।"

—পল্লীবাসী ( কালনা )।

## বাঙলা দেশের পথ-ঘাট

"স্বাধীনতার পর জেলা বোর্ডগুলির খুব কম রাস্তারই সংস্কার হইয়াছে। জেলা বোর্ডে এ বিষয়ে অভিযোগ জানাইলে জেলা বোর্ড বলিয়া থাকেন যে তাহাদের রাস্তা মেরামত করিবার মত টাকা নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বে জেলা বোর্ডের যে আয় ছিল বর্ত্তমানে তাহা নাই—কারণ সরকার সে সকল আয় কুক্ষিগত করিয়াছে। অপরদিকে জিনিষপত্র এবং মজুরী প্রভৃতির দর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে জেলা বোর্ড আর রাস্তা মেরামত করিতে পারিয়া উঠিতেছে না। একটি নূতন রাস্তা করিতে পশ্চিমবঙ্গে মাইলে গড় প্রায় ৫০ হাজার টাকা খরচ পড়ে। সে ক্ষেত্রে জেলা বোর্ডের ( পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্র ) হাজার হাজার মাইল তৈরী রাস্তা নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সে দিকে সরকারের ভ্রূক্ষেপ নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলা বোর্ডগুলি রাখিবেন কি তুলিয়া দিবেন তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই অস্থির মতির জন্য কোটি কোটি টাকার জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। না, জেলা বোর্ডে ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি যে সকল বিভাগ আছে তাহারাও বেকার আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সকল কাজের লোককে কাজ না করাইয়া বেতন দেওয়াও আর এক-প্রকারের অর্থের অপচয় হইতেছে। এ ছাড়া এই সকল রাস্তায় বাস, মোটরগাড়ী প্রভৃতি যানবাহন চলাচল করে কিন্তু রাস্তা খারাপ হওয়ার দরুণ প্রায়ই গাড়ীগুলির অংশসকল ভাঙ্গিয়া যায়। মোটরগাড়ীর অধিকাংশ অংশ বিদেশ হইতে আসে—ফলে এইভাবে বহু বৈদেশিক মুদ্রাও ব্যয় হয় এবং ব্যবসাদারদের অর্থেরও যথেষ্ট অপচয় হয়। দরিদ্র পশ্চিমবঙ্গের করদাতাদের অর্থ লইয়া এই ধরণের ছিনিমিনি খেলিয়া যে সরকার অর্থের অপচয় করে—সে সরকারের নিকট আমরা কি ভাল আশা করিতে পারি ? সরকারের অবিলম্বে এই দিকে মনোযোগ দিয়া জেলা বোর্ড রাখিবেন কি তুলিয়া দিবেন, সে বিষয়ে একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলুন। আসল কথা, প্রজার রক্ত হইতে সংগৃহীত অর্থে যে সকল রাস্তা নির্মিত হইয়াছে সরকারের অবিমৃষ্যকারিতায় তাহা কোনরূপ নষ্ট করিতে দেওয়া যায় না।"

—জি, টি, রোড।

## সংস্কৃত ভাষা জাতির রক্ষাকবচ

"হিন্দী-ইংরাজী-সংস্কৃতের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কাহার মধ্যে সত্য সত্যই ভারতের মর্ম্মকথা রহিয়াছে। ইংরাজী বিদেশিনী, কাজেই স্বাধীন ভারতে তাহা অচল। সেদিনকার ভাষা হিন্দীতে—যাহা মূলতঃ একটি পরিপূর্ণ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নহে

বলিয়াই সুধীমণ্ডলীর অভিমত—এমন কোন ভাষাসম্পদ বা ভাষাগত প্রকাশ ক্ষমতা নাই যদ্দ্বারা তাহাকে রাষ্ট্রভাষারূপে দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করা যায়। রাষ্ট্রভাষারূপে গৃহীত হইবার সবদিক্ দিয়া যোগ্যতা থাকিলে আছে সংস্কৃত ভাষার। এ ভাষার একটা অতীত আছে এবং তাহা মহান ঐতিহ্যমণ্ডিত ইহা অবিসংবাদিত। কেবল মহনীয় অতীতের ঐতিহ্যই সংস্কৃতের পক্ষে একমাত্র যুক্তি তাহা নহে, পরন্তু সংস্কৃত এমন একটি ভাষা যাহার মধ্যে ভারত কেন সমগ্র সভ্য দুনিয়া এই এখনকার বিজ্ঞান-প্রবণ যুগেও এমন একটা জিনিষের সন্ধান পায় যাহা সম্ভবতঃ অন্য কোনও ভাষাতে নাই। 'সত্যমেব জয়তে'—এই কথা কয়টি বর্ণ বা পদের সমষ্টি ব্যতীত কিছু নহে। কিন্তু ইহার আবেদন কি সর্ব্বকাল সমভাবে সর্ব্বজনীন নহে? ইহা বোধ করি সম্ভব হইয়াছে সংস্কৃতের মহিমাতে। এবং সংস্কৃত ভাষার গরিমা এইখানেই। দেশ এবং জাতি স্বরূপে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর একটা পরিচয় রহিয়াছে। তার একটা চারিত্রিক বিশিষ্টতা রহিয়াছে যাহার মিল সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির মধ্যে পূর্ণভাবে নাই। এই অতীত ঐতিহ্যকে জানিতে হইলে, তাহাকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করিতে হইলে সংস্কৃতকে জানিতে হইবে। মূলতঃ আর্য্যভাষা বলিতে অমর ভাষা সংস্কৃতকেই বোঝায়। ভারতীয় জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা চিরকাল ধরিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। জন্মের শুভ আনন্দ উৎসবে যেমন মন্দ্রগম্ভীর স্বরে সংস্কৃত উচ্চারিত হইয়া থাকে তেমনই মৃত্যুর দুঃখময় সময়েও করুণ সুরে এই সংস্কৃতেই আহ্বান জানান হয়—প্রিয়জনের প্রতি। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বর্ত্তমান রাষ্ট্রভাষা বিবাদের সুষ্ঠ সমাধান কল্পে সংস্কৃতের এই দাবীর বিষয় স্বীকার না করিয়া পারিবে না। আমরা আশাভরা হৃদয়ে আগামী হুগলী জেলা সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনের প্রতি চাহিয়া আছি।

—পুণ্যভূমি ( তারকেশ্বর )।

## পঞ্চমবাহিনী সাবধান!

"ভারত-সীমান্তে পাক্ বাহিনীর এই তাণ্ডবকে কেহ কেহ পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর স্নায়ু যুদ্ধের মহড়া বলিয়া উপেক্ষা করিলেও, ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু গত ১০ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে: ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে যে পাকিস্থানী হামলা চলিতেছে, আসলে এইগুলি ক্ষুদ্র আকারের 'পররাজ্য আক্রমণ' ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি জানান যে, সীমান্ত রক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতের শক্তিকামী প্রধান মন্ত্রী ও পাক্ সামরিক বাহিনীর কর্ত্তাদের মনোভাবে যুদ্ধের বা একটা বড় রকমের সংঘর্ষের নিশ্চিত সম্ভাবনা পাইতেছে, তাঁহার এই উক্তিতেই ইহার স্বীকৃতি মিলিয়াছে ভারতের সীমান্তের এই সংঘর্ষের আশংকা বা যুদ্ধের আশংকা যেমন আজ অধিকতর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি দেশের সর্ব্বত্র এক শ্রেণীর পাক পঞ্চম বাহিনীর লোকজন যে সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে, এই সম্পর্কেও আমাদের কোন সন্দেহ নাই। দেশের বাহিরের এই সংকটের সহিত ভিতরের এই আশংকাকে ছোট করিয়া দেখিলে চলিবে না। এখনও এই দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, পাকিস্থানের ভারত-বিদ্বেষী কার্য্যকলাপে তাঁহারা উল্লাসবোধ করেন। সর্ব্বাগ্রে এই পঞ্চম বাহিনীর সম্পর্কেই অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।"

—বীরভূম বার্ত্তা।

## পথ দুর্ঘটনা

"মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া রাধারঘাট-সাঁইথিয়া এবং বহরমপুর-কলিকাতা সড়কে এই জাতীয় দুর্ঘটনা প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ঘটনার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ট্রাকচালকেরা নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়া থাকে। ট্রাকের সহিত বাসের সংঘর্ষ, ট্রাকের ধাক্কায় রিক্সাচালক নিহত, ট্রাকের তলায় বালকের জীবনান্ত, ট্রাক চাপা পড়িয়া গো-মহিষ নিহত, এইরূপ প্রায় প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রেই ট্রাককে মুখ্য অভিনেতা রূপে দেখা যায়। আমরা সংবাদপত্রে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ভয়াবহ দুর্ঘটনার সংবাদ পড়িয়া স্তম্ভিত হই। কিন্তু এই সমস্ত সড়কগুলিতে দিন দিন যেরূপ দুর্ঘটনার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে তাহাতে বহরমপুর-শিলিগুড়ি রোড কোন দিন উন্মুক্ত হইলে তাহা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুর্ঘটনার রেকর্ডকে ম্লান করিয়া দিবে কিনা সে কথা কে বলিতে পারে? আমরা মনে করি, এই জাতীয় দুর্ঘটনার মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া কেহই সমর্থন করিবে না। যাঁহাদের হাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রহিয়াছে তাঁহারা ইহা রোধ করিতে পারেন না বলিলে বিশ্বাস করা যায় না। দুর্ঘটনা রোধ অবশ্য কেবলমাত্র সপ্তাহ পালন করিলে হয় না, তাহা আমরা জানি। আন্তরিকতার সহিত কঠোরহস্তে আইনের প্রয়োগ হইলে সময় থাকিতেই ইহার প্রতিরোধ করা যায় এবং তাহা করা হউক, আশা করি শাসন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমাদের এই অনুরোধ অরণ্যে রোদনে পর্য্যবসিত হইবে না।"

—জনমত ( মুর্শিদাবাদ )।

## মধ্যস্কুল পরীক্ষার ভূত

"আসাম মধ্যস্কুল পরীক্ষা এক অপূর্ব্ব ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রবল আন্দোলনের ফলে অবশেষে সরকার এই পরীক্ষা উঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের যেন তাহাতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছে। তাহারা নাকি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, প্রতি স্কুলের ষষ্ঠ মান শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উত্তরের খাতার শতকরা ৫খানা করিয়া কাগজ স্কুল ইন্সপেক্টারের কাছে পাঠাইতে হইবে। তিনি যদি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে নম্বর ঠিক ভাবে দেওয়া হইয়াছে তবেই স্কুলের হেডমাষ্টার বা হেড মিষ্ট্রেস পরীক্ষার ফল ঘোষণা করিবেন। কিন্তু কাজটা বড় কঠিন মনে হওয়ায় পরে কর্তৃপক্ষ মহকুমায় মহকুমায় এক একটি কমিটী গঠন করিয়া উপরিউক্ত ভাবে পরীক্ষার খাতা আবার পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত মহকুমা কমিটীর কাছে মহকুমার সমস্ত হাই স্কুল, মধ্য ইংরাজী ও মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ মান শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা শতকরা ৫ খানা করিয়া পাঠান হইবে। এই সমস্ত কমিটী তাহা পরীক্ষা করিবেন, প্রয়োজন হইলে স্কুলের ষষ্ঠ মান শ্রেণীর সমস্ত খাতাও তাঁহারা পরীক্ষা করিবার অধিকার রাখেন। এই ভাবে উত্তরের কাগজ পরীক্ষা করার কি মূল্য বা যৌক্তিকতা আছে তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে কি বুঝিতে হইবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ষষ্ঠ মান শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণে ঠিক ন্যায় বিচার করিতে পারিবেন না? তাহাই যদি হয় তবে প্রতিকারের যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে কোন ফলই আসিবে না, একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। পরীক্ষা সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচেষ্ট না হইয়া এই খামখেয়ালী কেন? মধ্যস্কুল পরীক্ষা উঠাইয়া দেওয়ায় পরীক্ষা প্রবর্তকদের মনে যে আঘাত লাগিয়াছে তাহারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই ধরণের নির্দ্দেশ, এরূপ মনে করিলে অন্যায় হইবে কি?"

—যুগশক্তি ( করিমগঞ্জ )।

## ধান-চালের মূল্যনিয়ন্ত্রণ

"ধান উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার পঃ বঙ্গ সরকারকে ধান-চাউল সংগ্রহ ব্যাপারে উদ্যোগী হইতে বলিয়াছেন। অতি মুনাফানিরোধক অর্ডিন্যান্স অনুসারে ধান চাউলের দর এখনই বাঁধিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। শ্রীনেহরু সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করিয়াছেন ইহা খুবই ভাল কথা। কিন্তু কমিটি করিলেই উৎপাদন বাড়িবে না বা ঘাটতি পূরণ হইবে না! এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতে প্রতি একর জমিতে ধান্য উৎপন্ন হয় মাত্র ৭০০ পাউণ্ড অথচ জাপানে হয় ৩৭৫০ পাউণ্ড, চীনে হয় ২৩৮৭ পাউণ্ড। অপরদিকে ভারতে প্রতি একরে গড়ে ৬০০ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয় আর জাপানে হয় ১৮০০ পাউণ্ড। এক মণ সমান মোটামুটি ৮২ পাউণ্ড। সারা ভারতে খাদ্যের প্রয়োজন কত এবং দেশে উৎপন্ন হয় কত আর ঘাটতির প্রকৃত পরিমাণ কত তৎসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক গত এগার বৎসর ধরিয়া খাদ্য ঘাটতি মিটাইবার জন্য বিদেশ হইতে কত খাদ্য প্রতি বৎসর কেনা হয় এবং তাহা কি দরে কেনা হয় সে তথ্য প্রকাশিত হইলে ভারতের প্রকৃ অবস্থা জানা যাইবে।"

—প্রলাপ ( মেদিনীপুর

## কেন এই নিষ্ক্রিয়তা?

"সম্প্রতি এই চর এলাকাগুলি লইয়া উভয় রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট জেল কর্তৃপক্ষের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। সেই বৈঠকে কি সিদ্ধা গৃহীত হইয়াছে তাহা না জানা গেলেও পুর্ব্ব বৈঠকগুলিতে যে নজী আছে তাহাতে জনসাধারণের আশ্বস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই সীমানা বিরোধ মীমাংসার জন্য র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ, বাগে ট্রাইবুনা বা পরবর্ত্তী মীমাংসার সুবিধাজনক আশাটুকু পাকিস্থান মানিয় লইয়াছে, অসুবিধাজনক অংশ মানিতে অস্বীকার করিয়াছে। পূর্ব্বে বিরোধীয় এলাকা ছিল না এরূপ বিভিন্ন জায়গায় তাহারা একের পর এক হামলা করিতেছে। ভারত সরকার পাকিস্তানের সহিত কনফারেন্সে বসিতেছেন এবং অবধারিত ভাবে সেই এলাকাগুলিতে "ডিসপিউটেড এরিয়া" বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। এই নীতির ফলে সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে সর্ব্বদা এই আশংকা জাগিতেছে যে, পাকিস্তানী হামলা হইলে সরকার তাহাদের ধনসম্পত্তি, জীবন ও জমিজমা রক্ষার কোন দায়িত্বই গ্রহণ করিবেন না। কোন রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনে এই ধারণা হইতে দেওয়া নিশ্চয়ই সরকারের পক্ষে গৌরবজনক নয়। এই ব্যাপারে কতকগুলি মূলগত প্রশ্নেরও আশু মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। রাজ্যের কোন এলাকা এভাবে পাকিস্তানকে ছাড়িয়া দেওয়ার সংবিধানগত অধিকার তাঁহাদের আছে কি না। ভারতরাষ্ট্রের নাগরিকদের ধন সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব সরকারের আছে কি না। এই দায়িত্ব যেখানে এড়াইয়া যাওয়া হইতেছে সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দিতে সরকার বাধ্য কি না? কোন চুক্তির অসুবিধাজনক অংশ যদি অপরপক্ষ গ্রহণ না করে তাহা হইলে সেই চুক্তি আমাদের দিক হইতে বলবৎ করা হয় কোন্ নীতিতে? নুরপুরের সংলগ্ন চর এলাকার বিরোধে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নেতাদের কার্য্যকলাপ জনসাধারণকে আরও ব্যথিত ও বিভ্রান্ত করিয়াছে! সূতী হইতে নির্ব্বাচিত জনপ্রতিনিধি শ্রীরেণুকা রায়, এম-পি ও শ্রীলুৎফল হক, এম-এল-এ আজ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন প্রকাশ্য বিবৃতি দেন নাই বা লোকসভা ও বিধানসভার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেন নাই। জেলা কংগ্রেসের সভায় এই চর এলাকা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আমরা আশা করিব যে, সেই গৃহীত প্রস্তাবের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিমতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করিবেন। বামপন্থী দলগুলির আচরণও এ সম্পর্কে প্রশংসাযোগ্য নয়।"

—ভারতী ( রঘুনাথগঞ্জ )

## সুপরিকল্পিত অরাজকতা

"দেখিতেছি শুধু স্থানীয় চাষীর ধান নয়, সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারীর অন্তর্ভুক্ত প্রায় দুই শত বিঘা খাস জমির ধান সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও লুণ্ঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া বহু

চাষীর ধানও এই সপ্তাহে লুণ্ঠিত হইয়াছে। কামারগড়ের পুলিশ শিবির ও রায়নার থানা পুলিশ এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন গৃহে খানাতল্লাস করে নাই ও কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই। আমরা গত ১৬ই অগ্রহায়ণ হইতে যে ধান্য লুণ্ঠনের বিবরণ পাইতেছি, তাহাতে দেখিতেছি গত ২৪শে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ১১ জন চাষীর মাঠ হইতে যে ধান্য চুরি বা লুণ্ঠন হইয়াছে, তাহা পূর্ব পরিকল্পিত এবং অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম চাষিগণের সকলেই স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং তাঁহার দলের বিরাগভাজন। বিশ্বস্তসূত্রে ঐ অঞ্চলের যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে দুর্বৃত্তদলের পাণ্ডা নাকি প্রকাশ্যে শাসাইয়াছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলি তুলিয়া না লওয়া পর্যন্ত এইরূপ চলিবে। পুলিশ যদি এই সূত্র ধরিয়া ভালভাবে তদন্ত করেন, তাহা হইলে দুর্বৃত্তদলকে অনায়াসে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইবেন। অত্যধিক প্রশ্রয় পাইয়া যাহারা সরকারী জমি হইতে নিষেধাজ্ঞা সত্বেও দলবদ্ধভাবে এক রাত্রেই একটা বিরাট অঞ্চলের ধান্য লুণ্ঠন করিতে পারে এবং পুলিশ শিবির নীরব দর্শক হইয়া বসিয়া থাকে, তখন সেখানে কাহার রাজত্ব চলিতেছে তাহা চিন্তা করিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি।"

—দামোদর।

## আভ্যন্তরীণ চিত্র

"সঠিক তথ্য পরিবেশন না করিলে সরকারই শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়িবে এবং ভুলের খেসারৎ দিতে প্রাণান্ত হইবে। কেন না শেষ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া চড়া মূল্যে খাদ্য আমদানী করিতে হইবে, সেই সঙ্গে দরিদ্র দেশবাসীকে খাদ্যাভাবে ভুগিতে হইবে। আমন ফসল সবে মাত্র উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখনই আশাতীত ভাবে ধান্যের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে—অথচ চাউল-মূল্য ধান্য-মূল্যের প্রায় তিনগুণ রহিয়া গিয়াছে; এই অস্বাভাবিক অবস্থা কোন কালে কোথাও ঘটিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দরিদ্র চাষী যে মূল্যে ধান্য ঋণ লইয়াছে বর্তমান মূল্যে তাহা পরিশোধ করিতে হইলে চাষীর গৃহে পৌষ মাসে এক ছটাক ধান থাকিবে না। 'বাম্পার ক্রপ' বলিয়া চীৎকার করিয়া দরিদ্র কৃষকের সর্বনাশ ডাকিয়া আনা হইতেছে। আমরা—রাজ্যের মফঃস্বল এলাকার সাংবাদিকরা—জানি এ বৎসর 'বাম্পার ক্রপ' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা হয় নাই। ক্যানাল অধ্যুষিত অঞ্চলে ভালো ফসল হইলেও ঐ 'বাম্পার' মার্কা ফসল হয় নাই। জানি না সরকারের আত্ম-প্রসন্নতা এই তথ্যের ভিত্তিতেই থাকিবে কি না! আমরা মনে করি সমস্ত জেলার জেলা শাসককে ভার দেওয়া হইলে প্রকৃত অবস্থা জানিবার সুযোগ সরকার পাইবেন।"

—বর্দ্ধমানবাণী।

## অগ্নিকাণ্ড ও তাহার প্রতিরোধ

"সম্প্রতি কলিকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পাশাপাশি ২টি বড় কাঠগুদামের ১টি প্রায় সম্পূর্ণ ও একটি আংশিক ভস্মীভূত হইয়াছে। ১৫খানি দমকলের সাহায্যে আপ্রাণ চেষ্টায় ১০০ জন দমকলকর্মী ও অফিসারগণ তিন ঘণ্টা পরে অগ্নি আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হন। দমকল বাহিনীর ডিরেক্টার মিঃ সি, এম, গাগরলি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া নেতৃত্ব করেন, এবং তিনি অভিযোগ করেন যে হাইড্রেণ্টে জলের চাপ বলিতে প্রায় কিছুই না থাকায় অগ্নি আয়ত্তে আনিতে তাঁহাদের অনেক সময় লাগিয়াছে। তিনি মনে করেন যে হাইড্রেণ্টে জলের চাপ ঠিকমত থাকিলে এক ঘণ্টার ভিতরেই অগ্নি আয়ত্তে আসিত। হাইড্রেণ্টে জল না পাইয়া নিকটবর্ত্তী তিনটি পুকুর হইতে জলবাহী গাড়ী করিয়া জল আনিতে হইয়াছে, এবং ইহাতে অযথা কালক্ষেপ হইয়াছে। দমকল বাহিনীর অধিনায়কের উপরোক্ত উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যদি দমকলবাহিনী প্রয়োজনমত জলের সরবরাহ না পান তো অগ্নিকে তাঁহারা আয়ত্তে আনিতে পারেন না; সুতরাং ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা বা সহরে দমকল বাহিনী রাখিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না, সেই সঙ্গে অগ্নিনির্ব্বাপনের প্রয়োজনমত জল সরবরাহের ব্যবস্থাও রাখিতে হইবে। আসানসোল সহরের জলাভাব সুবিদিত। এখানে ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে কাঠগুদাম প্রভৃতিরও অভাব নাই; সুতরাং দৈবাৎ যদি বড় একটা অগ্নিকাণ্ড হয় এবং তাহা অগ্নিকাণ্ডের মরশুমে গ্রীষ্মকালে হয়, তবে দমকলবাহিনীর পক্ষে সে অগ্নি সহজে আয়ত্তে আনা সম্ভব হইবে কি প্রকারে?"

—আসানসোল হিতৈষী।

## শোক-সংবাদ

### ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়

প্রখ্যাত দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় গত ১৩ই অগ্রহায়ণ ৬০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ইনি রাজ্য সরকারের দন্ত বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান, ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ ডেণ্টাল কাউন্সিলের সভাপতি, রাজ্যপালের অবৈতনিক ডেণ্টাল সার্জেন প্রভৃতি সম্মানসূচক পদসমূহ অলঙ্কৃত করেছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাঙলার শিল্পী ও সাহিত্যিক সমাজে একজন অভিন্নহৃদয় দরদী বন্ধুর অভাব ঘটল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## পত্রিকা-সমালোচনা

আমাকে আপনাদের গত বছরের ফাল্গুন ও চৈত্র (১৩৬৪) মাসিক বসুমতী সংখ্যা দুইটি পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। V.P.P. যোগে Surface Post-এ (Sea Mail) পাঠাইবেন। যদি এরূপ কোনও ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে অন্য কি ভাবে পাঠাইবার সুবিধা হইবে আমাকে জানাইলে আমি তদনুসারে আপনাদেরকে নির্দ্দিষ্ট মূল্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিব। আর 'লণ্ডনে' যদি আপনাদের কোনও কার্য্যালয় থাকে, তবে আমাকে তাহার ঠিকানা জানাইলে আমি ওখানেই মূল্য জমা দিতে পারিব। যাহা হউক, যত শীঘ্র হয় আমাকে উপরোক্ত ঠিকানায় সংবাদ পাঠাইবেন। আপনাদের মাসিক বসুমতী আমার পড়িতে ভাল লাগে। অন্তত: পক্ষে গত দশ বছর অবধি আপনাদের পত্রিকাটি পড়িয়া আসিতেছি। আমার মতে বর্ত্তমান বাংলার সাময়িকী-গোষ্ঠীর মধ্যে আপনাদের উক্ত পত্রিকাটি শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিবার অধিকার রাখে। এ কারণ বিলাতে আসিয়াও আপনাদের পত্রিকা পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি এবং নিয়মিত পড়িয়া থাকি। যে কোন কারণেই হউক, আমার উক্ত দুইটি সংখ্যা (ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৬৪) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে কারণ পড়ায় অনিচ্ছাকৃত ছেদ পড়িয়াছে—যাহা আমি দিতে দিতে চাই না—এই জন্ম আপনাদের পত্রিকার বর্ত্তমানের যেগুলি ধারাবাহিক গল্পই আমি গোড়া হইতে পড়িয়া আসিতেছি। অতএব যথাসম্ভব শীঘ্র আমাকে ঐ দুটি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন—এনরায় অনুরোধ করিতেছি। আমার ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আপনাদের পত্রিকার সর্ব্বতোমুখী উন্নতি ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি কামনা করি। —শ্রীঅমিয়নাথ বর্ম্মা। Indian Student Bureau, 87, West Cromwell Road, London S. W. 5

আপনার স্মারকপত্র কয়েক দিন হোলো পেয়েছি, কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য যথাসময়ে উত্তর না দিতে পারার জন্যে দুঃখিত। আপনি বসুমতী যথারীতি পাঠাবেন। আমি ওপরে যে ঠিকানা দিচ্ছি আপাতত সেই ঠিকানাতেই পাঠাবেন—পরে ঠিকানা পরিবর্ত্তন হলে যথাসময়ে জানাবো। আশা করি বসুমতী যাতে নিয়মিত পাই তার ব্যবস্থা করবেন। একটা কথা না লিখে পারছি না। মহাভারতের যুধিষ্ঠির যদি আজকের বসুমতী পড়তেন, তা' হলে পৃথিবীতে সুখী কে?—এই প্রশ্নের উত্তরে—যে বসুমতী নিয়মিত পড়ে, এটা না বলে থাকতে পারতেন না। এটা নিছক Flattery নয়, কারণ প্রবাসে 'Master minds'দের বসুমতীর মাধ্যমে পাই।—শ্রীআরাধনা ঘোষ, C/o. Mr. S. K. Ghosh, Munsiff-Magistrate, Civil Court, Arrah.

বসুমতী আমি পড়ে আসছি আমার বাপি-বিয়ের পরদিন হতে। টাঙ্গানাইকায়ারের এক গণ্ডগ্রামে কি করে বসুমতী পৌছাল, আমার স্বামী গত ১২ বৎসর ধরে বসুমতীর গ্রাহক এবং উক্ত কারণেই বর্ত্তমানে আমিই এ সুদূর দেশে বসে বসে সব কিছু বুঝতে পেরেছি আপনাদের পত্রিকার গ্রাহকা হিসাবে। আমি আজ এই বলতে চাই যে, গত ৫ মাসের ছুটীতে দেশে গিয়ে অনেক পত্রিকা তো ঘাঁটলেম, কিন্তু বসুমতীর তুলনা হয় না। অতুলনীয় পত্রিকাখানি শুধু জ্ঞানই বাড়ায় না, প্রবাস-জীবনে প্রবাসীর জীবনের দুঃখটুকুও মুছে ফেলে।—শ্রীঅনীতা চক্রবর্ত্তী, C/o. S. K. Chakrabortty, Post Box 1502, DAR-ES-SALAAM. Tanganyika Territory.

### আশ্বিন (১৩৬৫) সাহিত্য-পরিচয়পর্বে আরও কয়েকটি ছদ্মনাম

| ছদ্মনাম | আসল নাম |
|---|---|
| অনামী | স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য |
| অমিত সেন | সুশোভন সরকার |
| অমিত রায় | প্রমথনাথ বিশী |
| অগ্নিমিত্র | বিমলচন্দ্র ঘোষ |
| অনুপমা দেবী | অনুরূপা দেবী |
| ইন্দিরা দেবী | স্বরূপা দেবী |
| উত্তম পুরুষ | সন্তোষকুমার ঘোষ |
| উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী | কামদারঞ্জন রায় |
| ওয়াকে-নবীশ | প্রাণতোষ ঘটক |
| কবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | বিমল রায়চৌধুরী |
| কৃত্তিবাস ভদ্র | প্রেমেন্দ্র মিত্র |
| কুশ | কুমারেশ ঘোষ |
| কাকাবাবু | প্রভাতকিরণ বসু |
| গুণময় মান্না | গুণধর মান্না |
| চিরঞ্জীব শর্ম্মা | ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (সম্পাদক নববিধান) |
| জানোয়ারচন্দ্র শর্ম্মা | প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় |
| দীনবন্ধু মিত্র | গন্ধর্ব্বনারায়ণ মিত্র |
| দীপঙ্কর | কালিদাস নাগ |
| দী, কু, সা, | দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল |
| নাদুমণি | নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় |
| নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় |
| নীহারিকা দেবী | অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত |
| পরিব্রাজক | ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩১৩) |
| পি, সি, সরকার | প্রতুলচন্দ্র সরকার |
| বিজ্ঞানানন্দ স্বামী | হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় |
| বা, না, দা | বারীন্দ্রনাথ দাশ |
| বাণীকুমার | বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য |
| বাণভট্ট | নীহাররঞ্জন গুপ্ত |
| বাসবী বসু | ভক্তি দেবী |
| বিরূপাক্ষ সর্বাধিকারী | হিরণকুমার সান্যাল |
| ভবভূতি ভট্টাচার্য্য | " |
| মধুপ | ইন্দিরা দেবী |
| মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় | প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় |

| ছদ্মনাম | আসল নাম |
|---|---|
| মুশাফির | সৈয়দ মুজতবা আলি |
| বাণী দেবী | অনুরূপা দেবী |
| লেখরাজ সামন্ত | শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় |
| শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | " |
| শঙ্খ ঘোষ | চিত্ত ঘোষ |
| শঙ্করাচার্য্য | ভবানী মুখোপাধ্যায় |
| সুবাস | পরিমলকুমার রায় |
| সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (কুন্তলীনির রচনাটি) | শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| সুমিত্র | সুকুমার মিত্র |
| সত্যসন্ধ সিংহ | নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত |
| হেমেন্দ্রকুমার রায় | প্রসাদ রায় |
| নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ-কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্ | দীনবন্ধু মিত্র (গন্ধর্ব্বনারায়ণ মিত্র) |
| কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য | ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর |

—অসিতরঞ্জন সেন, ১৮এ, লেক টেরেস, কলিকাতা-২৯

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Herewith sending Rs. 15/- to cover the period up to next Aswin.—Deohall Indian Club, Assam.

Remitting subscription for Monthly Basumati for six months from Kartick to Chaitra.—Nilima Bose, Darjeeling.

চাঁদা পাঠাচ্ছি ছয় মাসের, বই পাঠাবেন।—B.P. Sur, Gaya.

Half yearly subscription for your monthly magazine M. Basumati from Kartick 1365 B.S. to Chaitra is sent herewith.—Bipratikuri Junior High School, Birbhum.

Annual subscription of Basumati Patrika (Monthly Journal) is sent herewith.—A. L. Bhowmick, Rishyamukh Govt. High School, Tripura.

আসছে বছরের জন্য অগ্রিম ১৫৲ পাঠাইলাম। মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—Sm. Kamala Basu, Dist. Thana.

We have today remitted Rs. 15/- covering the subscription to M. Basumati on behalf of our client, The Librarian University Library, University of Saugar for the period Sept.—Oct. '58 to Aug.—Sept. '59.—Current Technical Literature Co. Private Ltd. India House, Bombay.

আগামী ৬ মাসের চাঁদাস্বরূপ ৭।০ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত সংখ্যা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Mrs. Bina Ghose, Parel, Bombay.

গত ভাদ্র সংখ্যা হইতে এক বৎসরের জন্ম গ্রাহিকা হইতে করি। ১৫৲ টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠালাম।—সাহান Ranigunj.

Sending herewith Rs. 7·50 n.P. as half y subscription for Masik Basumati.—Dimb Borah, Helem, Assam.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক (কার্ত্তিক—চৈত্র) চাঁদা পাঠা নিয়মিত বই পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—নীলিমা দেবী, Dinajpur.

Sending herewith Rs. 7·50 n.P. only bein half yearly subscription from Kartick San —Railway Institute, Nowgonj, Assam.

বসুমতার ষাণ্মাসিক (কার্ত্তিক, ১৩৬৫ থেকে) ৭।০ পাঠালাম। আশা করি, গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে নেবেন।—Kamala Bagchi, Paharipara, Jalpaiguri.

৬ মাসের গ্রাহক-মূল্য পাঠাইলাম। আপনাদের উ উন্নতি কামনা করি।—Sm. Madhabi Ghose, Desha Park West, Calcutta.

আগামী ছয় মাসের (কার্ত্তিক হইতে চৈত্র) চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত ক —Sm. Madhabika Chatterjee, Puri.

Annual subscription Rs. 15/- is sent here —Berhampore Girl's College.

মাসিক বসুমতীর দেয় চাঁদা আশ্বিনে (১৩৬৫) শেষ কার্ত্তিক—চৈত্রের জন্ম ৬ মাসের চাঁদা ৭।০ টাকা পাঠা —বাসন্তী ঘোষাল, Mirzapur, U. P.

I am sending by M. O. Rs. 7·50 to cor as a subscription for your Masik Bas magazine.—P. K. Neogy, Cox Town, Bangalo

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠালাম। পূর্ব্বের মত নিয়মিত পাঠাবেন।—Latika Lahiri, Luc

Being the yearly subscription for your mo issue of Basumati is sent herewith. Kindly ar to send monthly issue from November 19 Mrs. Pratima Nathan, Coimbatora, S. India.

Herewith Rs. 7·50 n.P. being my subscri —Kabita Majumder, Allengunj, Allahabad.

I am sending herewith Rs. 17·04 n.P. (Rs yearly subscription, Rs. 1·80 n.P. Express de & Re. 0·24 n.P. for under Certificate of Pos as advance subscription for Monthly Basu —Binarani Sarker, Dhanbad.

আমাদের গ্রাহক-মূল্যের মেয়াদ আশ্বিন সংখ্যায় শেষ জানিলাম। আগামী ১ বৎসরের চাঁদা ১৫৲ গ্রাহক-মূল পাঠাইলাম।—Santamayee Girls High School, P (Manbhum).

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

# মাসিক বসুমতী

৩৭শ বর্ষ—পৌষ, ১৩৬৫ ] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [ দ্বিতীয় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা


## ওরে মিটিয়ে নে !

ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়ের বাটী কামারপুকুরের অনতিদূরে সিহড়-গ্রাম ছিল। ঠাকুর তথায় মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া সময়ে সময়ে কিছু কাল কাটাইয়া আসিতেন। একবার ঐ স্থানে ঠাকুর রহিয়াছেন এমন সময়ে হৃদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারামের সহিত গ্রামের এক ব্যক্তির বিষয়কর্ম্ম লইয়া বচসা উপস্থিত হইল। বকাবকি ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হইল এবং রাজারাম হাতের নিকটেই একটি হুঁকা পাইয়া তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করিল। আহত ব্যক্তি ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিল এবং ঠাকুরের সম্মুখেই ঐ ঘটনা হওয়ায় এবং তাঁহাকে সাধু, সত্যবাদী বলিয়া পূর্ব্ব হইতে জানা থাকায় সে ব্যক্তি ঠাকুরকেই ঐ বিষয়ে সাক্ষিস্বরূপ নির্ব্বাচিত করিল। কাজেই সাক্ষ্য দিবার জন্য ঠাকুরকে বন-বিষ্ণুপুরে আসিতে হইল। পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুর রাজারামকে ঐরূপে ক্রোধান্ধ হইবার জন্য বিশেষরূপে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন; এখানে আসিয়া আবার তাহাকে বলিলেন—"ওকে ( বাদীকে ) টাকা কড়ি দিয়ে যেমন করে পারিস্ মোকদ্দমা মিটিয়ে নে; নয়ত তোর ভাল হবে না; আমি তো আর মিথ্যা বল্‌তে পার্‌ব না। জিজ্ঞাসা কর্‌লেই যা জানি ও দেখেছি সব কথা ব'লে দেব।" কাজেই রাজারাম ভয় পাইয়া মামলা আপোসে মিটাইয়া ফেলিতে লাগিল।
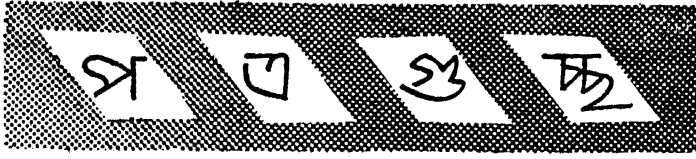
# নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পত্র-বিনিময়

[ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি এবং ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভা নির্ব্বাচিত হন। হরিপুরা হইতেই গান্ধীজী এবং সর্দ্দার প্যাটেলের দল নেতাজীর নীতির বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহারা করিতেছিলেন যে, নেতাজীর নেতৃত্বের ফলে, কংগ্রেস হইতে পুরাতন নেতাদের বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য ১৯৩ সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচনের জন্য তিনি দাঁড়াইলে, গান্ধীজী নিজস্ব প্রার্থী ডাঃ সীতারামিয়াকে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে খাড়া করেন। বি ভোটাধিক্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র নির্ব্বাচিত হন। গান্ধীজী বলেন, "সীতারামিয়ার পরাজয়, আমার পরাজয়।" অতঃপর ফেব্রুয়ারী ম কংগ্রেসের অধিবেশনে মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়; সর্দ্দার প্যাটেলের দল পন্থ প্রস্তাব পাশ করাইয়া প্রকৃতপক্ষে নেতাজীর প্রতি অ প্রকাশ করেন। গান্ধীজী তখন রাজকোটে সত্যাগ্রহে ব্যস্ত, ত্রিপুরীতে অনুপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি নেতাজী সুভাষের নিকট সমস্যা হইল কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠন করা। এই সময়ে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহাকে মানভূম জেলার জামা'ডো অন্তর্গত জিয়ালগোড়ায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আনা হয়। সেই সময় গান্ধীজীর সহিত, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন, সত্বর জাতীয় সং আরম্ভ ইত্যাদি বিষয়ে নেতাজী শয্যাশায়ী অবস্থাতেই পত্রালাপ করেন। জামাডোবা হইতে ২৪শে মার্চ্চ, ১৯৩৯-এ নেতাজীর টেলিগ্রাম দিয়া উহার সুরু হয় এবং ৫ই মে, ১৯৩৯-এ বৃন্দাবন হইতে মহাত্মা গান্ধীর এক টেলিগ্রাম দিয়া উহার শেষ হয়। মোট ৩ টেলিগ্রাম এবং ১৬টি পত্র-বিনিময় হয়। পত্রগুলির মধ্যে আমরা প্রথম তিনটি পত্র ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া দিলাম।—

## নেতাজীর প্রথম পত্র

জিয়ালগোড়া পোঃ,
জেলা মানভূম, বিহার।
২৫শে মার্চ্চ, ১৯৩৯

প্রিয় মহাত্মাজী,

কংগ্রেসের ব্যাপারে একটা অচল অবস্থা ঘটাইয়াছি বলিয়া যাঁহারা অভিযোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদের অভিযোগের উত্তরে যে সাংবাদিক বিবৃতি (শনিবার, ২৫শে মার্চ্চ) অদ্য আমি দিয়াছি, তাহা সম্ভবতঃ আপনি দেখিয়াছেন। আমাদের সম্মুখে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হইতেছে, নূতন কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি গঠন করা। ব্যাপকতর অর্থপূর্ণ আরও কতকগুলি সমস্যা পূর্ব্বাহ্নে আলোচনার উপর উহার সন্তোষজনক সমাধান নির্ভর করিতেছে। যাহা হউক, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্যা সম্বন্ধেই আমি প্রথমে আলোচনা করিতেছি।

এই সমস্যা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর যদি আপনি আপনার অভিমত প্রকাশ করেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকিব :—

(১) কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন সম্পর্কে আপনার সাম্প্রতিক ধারণা কিরূপ? উহা একদলীয় হইবে অথবা বিভিন্ন দল ও উপদলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে, যাহার ফলে উক্ত কমিটি, মোটের উপর, যথাসম্ভব কংগ্রেসের সর্ব্বদলের প্রতিনিধি-স্থানীয় হইবে?

(২) আপনি যদি এখনও এই অভিমত পোষণ করেন যে কমিটি একদলীয় হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে স্পষ্টতঃই একদিকে আমার ন্যায় ব্যক্তির এবং অপর দিকে সর্দ্দার প্যাটেল এবং অন্যান্যের উক্ত কমিটিতে স্থান হইতে পারে না। (আমি অবশ্যই একথা উল্লেখ করিব যে, একদলীয় কমিটি গঠনের বিরোধিতা আমি এতাবৎ করিয়া আসিতেছি।)

(৩) বিভিন্ন দল ও উপদল লইয়া কমিটি গঠনে যদি আ রাজী থাকেন, তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যানুপাতিক হার। হইবে?

আমার মতে, কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি প্রধান দল বা ব্লক অ সম্ভবতঃ উহাদের মধ্যে একটা শক্তিসাম্যও আছে। রাষ্ট্ৰ নির্ব্বাচনে সংখ্যাধিক্য ছিল আমাদের পক্ষে। ত্রিপুরীতে সংখ্যা ছিল অপর পক্ষে। যাহা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মনো ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। সি, এস্, পি যদি তখন নিরপে থাকিত, তাহা হইলে বহু বাধা সত্ত্বেও (পরবর্ত্তী পত্রে বা সা ঐ বিষয়ে আলোচনা করিব) সাধারণ অধিবেশনে আমরাই সংখ্যা লাভ করিতাম;

(৪) আমি যদি সাত জন সদস্যের নাম করি আর আ যদি সর্দ্দার 'প্যাটেলকে' দিয়া সাত জন সদস্যের নাম উ করান, তাহা হইলে আমার মতে উহা সমতামূলক ব্য হইবে।

(৫) আরও, আমাকে যদি রাষ্ট্রপতিরূপে কাজ চালা হয় এবং যথাযথরূপে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা হ সাধারণ সম্পাদক আমারই নির্ব্বাচিত ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক।

(৬) কোষাধ্যক্ষের নাম সর্দ্দার প্যাটেল অনুমোদন কর পারেন।

এক্ষণে পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্ব আমি আলোচনা করিতেছি। (অন্য একটি পত্রে এ বিষয়ে অ বিস্তৃত আলোচনা করিব।) প্রথমতঃ, আপনি কি মনে করেন এই প্রস্তাব আমার প্রতি অনাস্থাসূচক এবং তাহার ফলে, আ পদত্যাগ করা উচিত বলিয়া কি আপনি মনে করেন? পন্থ প্রস্তাব কয়েক প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এমন কি যাঁহারা উহার সমর্থ

তাঁহারাও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই আমি এই প্রশ্ন করিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব পাশ হওয়ার ফলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিরূপ দাঁড়াইল? কংগ্রেস শাসনতন্ত্রের ১৫ ধারা অনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে কয়েকটি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং উক্ত শাসনতন্ত্রের উক্ত ধারা আজিও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। কিন্তু অপর দিকে পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আপনার ইচ্ছানুসারে আমাকে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি গঠন করিতে হইবে। সুতরাং মোট ফল কি দাঁড়াইল? আমার কি কোনও মূল্য রহিল? আপনি কি আপনার খুসী এবং ইচ্ছামত কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণের নামের তালিকা প্রণয়ন করিবেন এবং আমি কেবল আপনার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিব? এইরূপ করা হইলে কংগ্রেস শাসনতন্ত্রের ১৫নং ধারাকে সংশোধন না করিয়াই বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে।

এ-সম্পর্কে একথা আমাকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবে উপরিউক্ত ধারা স্পষ্টতঃই শাসনতন্ত্রবিরোধী এবং বে-আইনী। প্রকৃতপক্ষে, বিলম্বে পেশ করার দরুণ উক্ত প্রস্তাবটি নিয়মমাফিক করা হয় নাই। কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে জাতীয় দাবী সংক্রান্ত প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাবটি শ্রীশরৎচন্দ্র বসু উত্থাপন করিলে, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ তাহা যেমন নিয়মমাফিক হয় নাই বলিয়া না-মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তেমনি উক্ত পন্থ প্রস্তাবটি সমগ্র ভাবেই না-মঞ্জুর করিবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আমার ছিল। আবার, আইনের দিক হইতে, পন্থ প্রস্তাবটি স্বীকার করিয়াও, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন সংক্রান্ত শেষ ধারাটি আমি না-মঞ্জুর করিতে পারিতাম, যেহেতু উহা কংগ্রেস শাসনতন্ত্রের ১৫ নং ধারার বিরোধী ছিল। কিন্তু মানসিক গঠনে আমি অত্যন্ত গণতান্ত্রিক বলিয়া আইনের খুঁটিনাটির উপর গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহি না। উপরন্তু, আমি এরূপ মনে করিয়াছিলাম যে, যখন বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন শাসনতন্ত্রের পশ্চাতে আশ্রয় লওয়া পুরুষোচিত কার্য্য নহে।

এই পত্র শেষ করিবার পূর্ব্বে আমি আর একটি বিষয়ে আলোচনা করিতে চাই। সকল প্রকার বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও যদি আমাকে রাষ্ট্রপতির কাজ চালাইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে কি ভাবে কাজ চালাইতে বলেন? আমার স্মরণ আছে, গত ১২ মাস যাবৎ আপনি মধ্যে মধ্যে (সম্ভবতঃ প্রায়ই) উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন যে, নির্জ্জীব রাষ্ট্রপতিরূপে আমাকে আপনি দেখিতে চাহেন না, চাহেন আমি যেন নিজেকে প্রকাশ করি। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ওয়ার্দ্ধায় যখন আমি দেখিলাম যে, আমার কর্ম্মসূচীর সহিত আপনি একমত হইলেন না, তখন আপনাকে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমার সম্মুখে দুইটি বিকল্প পথ রহিয়াছে—হয় আমার ব্যক্তি-সত্তাকে মুছিয়া ফেলিতে হইবে আর না হয়, আমাকে আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় থাকিতে হইবে। যতদূর আমার স্মরণ হইতেছে, আপনি তখন উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, আমি যদি স্বেচ্ছায় আপনার অভিমত স্বীকার না করি তাহা হইলে, আমার আত্মবিলুপ্তি আত্মনিগ্রহেরই সামিল হইবে এবং আত্মনিগ্রহ আপনি সমর্থন করিতে পারেন না। গত বৎসর যেরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন এখনও কি সেইরূপ পরামর্শ দিবেন যে, রাষ্ট্রপতিরূপে আমাকে কাজ চালাইয়া যাইতে হইলে নির্জ্জীব রাষ্ট্রপতিরূপে তাহা করা সঙ্গত নহে?

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের পর হইতে, বিশেষ করিয়া ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর হইতে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেসের বিভিন্ন দল ও উপদলগুলির পক্ষে একজোট হইয়া কাজ করিয়া যাওয়া যে এখনও সম্ভব, তাহা আমার উপরিউক্ত আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে।

আমার পরবর্ত্তী পত্রে সাধারণ সমস্যাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অদ্যকার সাংবাদিক বিবৃতিতে তাহার কয়েকটির বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছি।

ধীরে ধীরে হইলেও আমি নিশ্চিত আরোগ্যের পথে চলিয়াছি। মনে হয়, দ্রুত আরোগ্যের প্রধান বাধা নিদ্রার অভাব।

আশা করি, অত্যধিক কার্য্যভার সত্ত্বেও, আপনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতেছেন।

প্রণামান্তে, আপনার স্নেহভাজন, সুভাষ।

## মহাত্মা গান্ধীর উত্তর

ট্রেণ হইতে,
ঠিকানা, পূর্ব্ববৎ বিড়লা ভবন
নূতন দিল্লী,
২৪, ৩, ৩৯

প্রিয় সুভাষ,

আশা করি, ধীরে ধীরে উন্নতির পর, তুমি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবে।

এই পত্রের সহিত শরতের পত্রের এবং আমার উত্তরেরও অনুলিপি পাঠাইলাম। উহা যদি তোমার ভাবনারও প্রতিষ্ঠান হয়, তবেই আমার কথাগুলি খাটিবে। মোটের উপর, কেন্দ্রে অরাজকতার অবসান আবশ্যক। তোমার অনুরোধ অনুসারে আমি একেবারে মুখ বন্ধ করিয়া আছি, যদিও বর্ত্তমান সঙ্কট সম্পর্কে আমার মতামত প্রকাশের জন্য চাপ দেওয়া হইতেছে।

প্রস্তাবটি (পন্থ প্রস্তাব) প্রথম আমি দেখি এলাহাবাদে। আমার মনে হয় বিষয়টি খুবই পরিষ্কার। তোমাকেই অগ্রণী হইতে হইবে। আমি জানি না, জাতীয় কাজকর্ম্মে মনোযোগ দিবার কতখানি সামর্থ্য এখন তোমার আছে। যদি সে- সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে তোমার সম্মুখে যে একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক পথ খোলা রহিয়াছে তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

আমাকে আরও কয়েক দিন দিল্লীতে থাকিতে হইবে।

ভালবাসা, বাপু।

## নেতাজীর দ্বিতীয় পত্র

জিয়ালগোড়া পোঃ,
জেলা মানভূম, বিহার,
২১শে মার্চ্চ, ১৯৩৯।

প্রিয় মহাত্মাজী,

দুই একদিনের মধ্যেই আপনাকে পত্র লিখিব ইতিমধ্যে একটি জরুরী বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। এ, আই, সি, সির কার্য্যকরী

সাধারণ সম্পাদক শ্রীনরসিং পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের জন্ত তিনি প্রায় ২০ দিনের নোটিশ চান। নিয়মানুসারে, এ, আই, সি, সির সদস্তগণকে ১৫ দিনের নোটিশ অবশ্যই দেয়। তাঁহার মতে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে নোটিশ পৌঁছিবার জন্ত আরও ৪।৫ দিন সময় প্রয়োজন। সুতরাং মোটের উপর আমাদের ২০ দিন সময় আবশুক।

আপনার অনুমতিসাপেক্ষে, আমি ভাবিতেছিলাম যে, ২০শে এপ্রিলের কাছাকাছি তারিখ স্থির করিলেই উপযুক্ত হইবে। কিন্তু একটি বাধা আছে। শুনিলাম, বিহারে গান্ধী সেবাসঙ্ঘ সম্মেলন নাকি ২০শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং দুইটি সভা পরস্পরের ঘাড়ে গিয়া পড়িবে! এ, আই, সি, সির এবং ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হইবে কলিকাতায়। সেখানে এই সময়ে আপনার উপস্থিতি অত্যাবশুক—না হইলে চলিবে না। গান্ধী সেবাসঙ্ঘ সম্মেলনের পুর্ব্বে অথবা পরে এ, আই, সি, সির অধিবেশন হউক—এই প্রস্তাব আমি করিতে পারি কি? পুর্ব্বে হইলে, আপনি প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া তাহার পর বিহার যাইতে পারিতেন। পরে হইলে, আপনি প্রথমে বিহারে আসিয়া তাহার পর কলিকাতায় আসিতে পারিতেন। পুর্ব্বে হইলে গান্ধী সেবাসঙ্ঘ সম্মেলনকে এক সপ্তাহের জন্ত পিছাইয়া দিতে হইবে। আর পরে হইলে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের দিন এপ্রিলের শেষ দিকে স্থির করিতে হয়।

এই বিষয়টি ভাবিয়া দেখুন এবং এ, আই, সি, সি কখন বসিবে, সে সম্পর্কে আপনার উপদেশ আমাকে দিন। পরিশেষে জানাইতেছি যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের সময় আপনাকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে।

আমার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে। আপনার রক্তের চাপ পুনরায় বাড়িয়াছে শুনিয়া চিন্তিত আছি। আমার বিশ্বাস, আপনি অত্যধিক পরিশ্রম করিতেছেন।

প্রণামান্তে—

আপনার স্নেহের

সুভাষ

মহাত্মা গান্ধী, বিরলা ভবন।

নূতন দিল্লী।

# রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্র

[ এই পত্র দুইখানি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ কবিবর প্রিয়নাথ সেনকে লিখিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্তা বেলার বিবাহ ব্যাপারে কবিগুরু যে সমস্তায় পড়িয়াছিলেন, তাহার পরিচয়-পত্র দুইখানিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অপ্রকাশিত পত্র আমরা কবিবর প্রিয়নাথ সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমোদনাথ সেনের সৌজন্তে পাইয়াছি।—স ]

ওঁ

May 1901.

ভাই

উত্তম কথা। আর আমি কিছু বলিব না। বিবাহ জ্যৈষ্ঠের শেষেই স্থির কর। আমি বুধবারে শিলাইদহে যাত্রা করিয়া পরিজনবর্গকে কলিকাতায় লইয়া আসি—বাদবিতণ্ডা মনস্তাপ পরিতাপ যথেষ্ট হইয়া গেছে এখন অশান্তিকে বিশ্রাম দেওয়া যাক। আমাদের বাড়িতে অনেক বিবাহ হইয়া গেছে—আমার কন্তার বিবাহেই প্রত্যেক কথা লইয়া দর দস্তর হইল ইতঃপূর্ব্বে এমন ব্যাপার আর হয় নাই। এ ক্ষোভ আমার থাকিবে। দশ হাজারের উপর আবার আরো দুই হাজার চাপাইয়া ব্যাপারটাকে আরো কুৎসিত করা হইয়াছে। পরমাত্মীয়কে প্রসন্নমনে দান করিবার সুখ যে আমার আর রহিল না, আমাকে পাক দিয়া মোচড় দিয়া নিংড়াইয়া লওয়া হইল! শুভকর্ম্মের নির্ম্মল প্রসন্ন মঙ্গল ভাবকে বিধিমতে নষ্ট করিয়া আমার যে কিরূপ গভীর মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছে তাহা তোমাকে বলিতে পারি না। এ বিবাহে আমার এবং বেলার মার উভয়েরই মনের মধ্যে একটি ক্ষতরেখা রহিয়া গেল, এমন কি তিনি কন্তার মাতা হইয়াও এ বিবাহে যথেষ্ট উৎসাহী হন নাই। যাহা হউক ভুলিবার চেষ্টা করিব। মঙ্গলকর্ম্ম মঙ্গলের জন্তই হউক!

তোমার

রবি

ভাই

আর একটা বুঝি গলদ করিয়াছি। আজ তোমার পত্র আমার স্ত্রীকে দেখাইলে তিনি তোমার পত্রোদ্ধৃত কন্তা দেখান'র সর্ত্ত পড়িয়া বলিলেন—ইহা বিধিসম্মত নহে, বাড়ীর সকলেই ইহাতে আপত্তি করিবেন এবং আমার পিতা ইহাতে কোনমতেই অভিমত দিবেন না। আমি দেখিতেছি, সাংসারিক কর্ম্মের সম্বন্ধে আমি নিতান্ত গর্দ্দভ এবং অনভিজ্ঞ। সত্য কথা বলিতেছি, এ প্রস্তাবে তুমি যখন কোন সঙ্কোচের কারণ প্রকাশ কর নাই, তখন ইহাতে যে কাহারো বিশেষ আপত্তি হইবে তাহা আমার মনে উদয় হয় নাই। এই মূঢ়ের প্রতি দয়া করিয়া এই সমস্ত সঙ্কট হইতে তুমি আমাকে কেন সামলাইয়া রাখ নাই? বিবাহের পুর্ব্বে কন্তাকে বর বাড়িতে দেখাইতে লইয়া যাওয়া যে সর্ব্বপ্রকার শিষ্ট প্রথার বিরুদ্ধ তাহা আমার গৃহিণী সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমাদের বাড়িতে পুরুষ অভিভাবক কন্তাগৃহে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসে—এবং চিন্তা করিয়া দেখিলে সেইটেই সঙ্গত প্রথা। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, এই কথাটা লইয়া আবার একটা বিপ্লব উপস্থিত হইবে এবং কথার প্রত্যাহার লইয়া তোমাদের কাছে লজ্জিত হইব। তোমার উপর ছাড়া আর কাহারো উপর আমি রাগ করিতে পারি না। তুমি ত একাধিক জামাতার শ্বশুর, সংসারে তুমি আমার অপেক্ষা অনেক দূরে অগ্রসর হইয়াছ—তুমি কেন এরূপ আচারগর্হিত প্রস্তাবে আপত্তি না করিয়া আমাকে ইহার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিলে? দুঃখ এই যে, আমার

নিরেট মূর্খতার কুটুম্বিতার পথ প্রথম সূত্রপাতেই এরূপ সংশয়ে সঙ্কটে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। এবং আমাদের আরো দুঃখ এই যে, তুমি আমার পরিবারস্থ আত্মীয়েরই মত হইয়া আমাদের পরিবারের তরফ হইতে সকল কথা বিচার না করিয়া তোমার অনভিজ্ঞ বন্ধুকে এই সমস্ত সংশয়জালের মধ্যে জড়িত করিলে? কন্যা দেখান, সর্ব্বত্রই delicate ব্যাপার—অতি বড় কন্যাদায়গ্রস্তও বিবাহের পূর্ব্বে বরের গৃহে কন্যাকে দেখাইতে লইয়া যায় না—বিবাহের যদি কোন কথা না হইত তবে কোন একটা উপলক্ষ্য করিয়া লইয়া যাওয়া তেমন কঠিন হইত না—কিন্তু এখন কি করিয়া হয়? তুমি বলিবে, তখন স্বীকার করিলে কেন? তাহার উত্তর—আমি নির্ব্বোধ—এ সকল সাংসারিক বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও নাই, বিবেচনাও অল্প—তখন আমার স্ত্রী কাছে থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারিত না। কিন্তু তুমি ত আমার মত নও—তুমি কেন এমন প্রস্তাব তুলিলে? আমাকে সতর্ক করিলে না? আমি কি তোমার উপর নিতান্ত নির্ভর করি নাই? তোমরা আমার সম্মুখে সঙ্কট উপস্থিত করিবে এবং আমিই কেবল বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়া চলিব, এই কি কথা? আমি যদি বিচারে অক্ষম হই তুমি কি আমার হইয়া সঙ্গত অসঙ্গত ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া আমাকে অনর্থক জটিলতা হইতে উদ্ধার করিবে না?

—তোমার রবি

# আধুনিক ইরাণে এক মাস

যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার

আজ এক মাসেরও অনেক বেশী দিন হয়ে গেল, আমরা সদলবলে ইরাণের রাজধানী তেহেরান সহরে ম্যাজিক দেখাতে এসেছি। এদেশের সবচাইতে বড় বনেদী 'তেহেরান থিয়েটারে' এক সপ্তাহের জন্য এসে এখন সগৌরবে পঞ্চম সপ্তাহে পদার্পণ করলাম। এদের নাদির শাহ একদিন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন, আমরা যেন তারই প্রতিশোধ নিতে এসেছি। আমরা এদেশ আক্রমণ করতে আসি নাই, এদের বিত্ত লুণ্ঠন করতে আসি নাই—এসেছি চিত্তরঞ্জন করে চিত্ত জয় করতে। আমরা ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ইন্দ্রজালের গৌরবময় পতাকা বহন করে দেশের পর দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। যে জাপানে আধুনিক আমেরিকা তাঁদের আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা করে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে লোকসমাজকে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত করে তুলেছিল, আমরা সেখানেও ভগবান বুদ্ধের দেশের বাণী নূতন করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।

চেরীফুলের দেশে আমরা রণভেরী না বাজিয়ে গান্ধী-নেহেরুর দেশের শান্তির দূত হয়েই গিয়েছিলাম। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত তীর্থসলিল (Water of India) সে দেশের জনগণের চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রাচ্যদেশ সমূহ চিরকালই অধ্যাত্মতত্ত্বের ধাত্রী, ভারতের ঐতিহ্য তাই অতি সহজেই জাপানে পোষ মানিয়েছিল। জাপান অতি আধুনিক দেশ, বারম্বার ভূমিকম্প হয়ে দেশ চুরমার হয়ে যায়, জাপানীরা আবার পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্য্য আহরণ করে নিজেদের দেশে নূতন করে তিলোত্তমার সৃষ্টি করে; তাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অপূর্ব্ব এক সংমিশ্রণ হয়েছে আজিকার নূতন জাপানে। ভারতের বা প্রাচীন এশিয়ার সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তারা অতি আধুনিক আমেরিকান সভ্যতাকে অপূর্ব্ব ভাবে খাপ খাইয়েছে। টোকিওতে যেমন কাঠ আর কাগজের তৈয়ারী বাড়ী আছে, তেমনি আছে অতি আধুনিক গগনচুম্বী কংক্রীটের (Sky Scrapper) বিরাট হর্ম্ম্যরাজি। বাড়ীতে থাকাকালে এরা 'কিমোনো' পরে, মাদুর 'তাতামীর' উপর হাঁটু গেড়ে বসে, আর 'আরিগাতো গোজাইমাস্তে' বলে অতিথি আপ্যায়ন করে, ঘরে বসে ভাত 'গোহান' খায়, ঠিক আবার তেমনি অফিসে পুরাদস্তুর সাহেবী কোটস্যুট পরে চেয়ার-টেবিলে বসে আধুনিক কায়দাদুরস্ত ভাবে 'ইণ্টার কম্যুনিকেশনে' কাজকর্ম্ম চালায়! 'গেইসা' মেয়েরা যেমন 'তাকারাজুকা'তে মাথায় খোঁপা বেঁধে পাখা বা ছাতা হাতে খাঁটি জাপানী কায়দায় নাচে, আবার সেই মেয়েরাই ববকাটা চুলে (বলা বাহুল্য, আধুনিক জাপানের মেয়েরা সবাই বব ছাঁটে চুল কাটে, মাথায় যে খোঁপাটা পরে ওটা কৃত্রিম), গাউন পরে 'ভ্যানিটী ব্যাগ' হাতে নাইট ক্লাবে যায়, 'রক এণ্ড রোল' নাচে।

জাপানীরা পার্টিতে গিয়ে স্যাম্পেন, মার্কিণী ককটেইল বা ভোট্‌কা খায় আবার বাড়ীতে ফিরে এসে ঠিক তেমনি ভাবেই নিজেদের পার্টিতে জাপানী 'সাকিয়াকী'র সদ্ব্যবহার করে। ফলে জাপানের সমাজ-জীবনে দুইটা পরস্পর-বিরোধী সংস্কৃতির অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই অত্যদ্ভুত মিলন একমাত্র ঐ অনুকরণপটীয়ান, তীক্ষ্ণধী, প্রত্যুৎপন্নমতি জাপানেই সম্ভবপর হয়েছে। এ বিষয়ে আধুনিক জাপান চিরকাল ভারতবর্ষ এবং ইরাণের উপর টেক্কা মেরেছে। ভারতীয়রা নিজেদের পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরব করেই দিন কাটাচ্ছিলেন, সম্প্রতি সমাজ সংস্কার, বিবাহ সংস্কার, জন্মনিয়ন্ত্রণ, আণবিক গবেষণা, ভারী শিল্প উৎপাদন, মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন। এত কাল যখন আমরা ব্যাকরণের সূত্র, তর্ক-শাস্ত্রের তাল টিপ করিয়া পড়ে না, পড়িয়া টিপ করে, প্রভৃতি ব্যাপার লয়েই ব্যস্ত ছিলাম—নবীন জাপান তত দিনে প্রগতিশীল হয়ে শৌর্য্যবীর্য্যে পরাক্রান্ত হয়ে নিজেদের দেশকে কয়েক বছরের মধ্যে 'অসভ্য' বিশেষণ থেকে 'নবীন' বিশেষণে ভূষিত করেন। কবি তার জীবদ্দশাতেই 'অসভ্য জাপান'কে 'নবীন জাপান' লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, কোরিয়া-প্রান্তে নবীন জাপান সেদিন রুশকে পর্য্যুদস্ত করেছিল। ভারও যদি নেহেরুর আমলে প্রগতিবাদী হয়ে না উঠতো, আজও যদি সে তার পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিয়ে নিজেদের কৌলীন্যের দাবী নিয়ে জনসমাজে হাজির হ'ত তবে তার অবস্থা আজিকার ইরাণের মতই হত।

আজ ভারত প্রগতিবাদী হয়েছে, পরের সঙ্গে জুড়িদার না

হয়ে সে তার স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ করতে শিখেছে, তাই বর্ত্তমান যুগে ভারত ক্রমেই পৃথিবীর শক্তিমান পাঁচটি জাতির অন্যতম একটি হতে চলেছে। আজ লোকেরা লণ্ডন, ওয়াশিংটন, প্যারিস, মস্কোর সঙ্গে সঙ্গে নয়াদিল্লীর কথা উচ্চারণ করে। উপর মহলে পণ্ডিত নেহেরু ও মিশরের নাসেরের সুনাম খুবই শোনা যায়। এরা ইতিহাসের পাতায় নব যুগের স্রষ্টারূপেই চিরপরিচিত থাকবেন।

জাপান বা জার্ম্মাণী নামে কোনও দেশ নাই। ওটা ইংরাজী ভাষাভাষী ইংরেজ আমেরিকার দেওয়া নাম। জাপানের আসল নাম নিপ্পন বা নিপ্পুন, আর জার্ম্মাণীর আসল নাম আলামেইন বা ডয়েচল্যাণ্ড। ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরাই শুধু জাপান ও জার্ম্মাণী বলে, নতুবা অপর দেশে বা স্বদেশে এরা নিপ্পন বা আলামেন নামেই সমধিক পরিচিত। গত মহাযুদ্ধের আগে দেখেছি, জাপান নামটা সিঙ্গাপুর, হংকং পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যেত। জাপানের লোকেরা এমন কি চীনারাও ও দেশকে নিপ্পন বা নিপ্পুন বলতো। নিপ্পুন অর্থ সূর্য্যোদয়ের দেশ—যে দেশে সূর্য্য উঠে। চীন ভূখণ্ডের পূর্ব্ব-প্রান্তে অবস্থিত বলেই সকলে ওটাকে সূর্য্য উদয়ের দেশ বলে মেনে নিত। আমার মনে হয়, আজ রূপক অর্থেও ওটা সূর্য্যোদয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। এখন অবশ্য ইংরেজ বিশেষ করে আমেরিকার দৌলতে নিপ্পনের নূতন জাপান নামটাই বেশী পরিচিত হয়েছে। তেমনি এ যুগে পারস্যের নাম হয়েছে ইরাণ। জাতিতে এরা ইরাণী, ভাষা ইরাণীয়ান নয়, ফার্সি বা পারসি ; এদেশে ফারদৌসী, সেখ সাদী প্রভৃতি খ্যাতিমান কবি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

হাফিজ, ও রুবাইয়াৎ ওমরখৈয়ামের নাম এ দেশের ঘরে ঘরে। এরা সেখ সাদী, ওমরখৈয়াম, ফারদৌসীর নাম চিরস্মরণীয় করে রাখতে চায়, নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কে বৃদ্ধি না করাতে চায়? বর্ত্তমানে এদেশে ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকার আধিপত্য খুবই বেশী। নানা রকম রাজনৈতিক চুক্তি করে, নানা ভাবে আর্থিক সাহায্য, কৃষি ও সামরিক সাহায্য, ডলার ঋণ প্রভৃতির দৌলতে আমেরিকা-ইংরেজগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের ভাব খুবই বেশী। এ দেশে প্রচুর তৈল (পেট্রল) পাওয়া যায় আর সুচতুর প্রতীচ্যবাসিগণ এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে যৌথ কোম্পানী গঠন করে এদেশের তৈল ব্যবসায়ে বিরাট প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি করে নিয়েছে। জাপান, রুশ ও জার্ম্মাণীর আধিপত্য এখানে অনেক কম, মার্কিণী প্রভাবই সর্ব্বাধিক—রাজনীতির নানা কৌশলে নানা রন্ধ্রে এখানে মার্কিণী শক্তি পরিব্যক্ত। তা ছাড়া বাজারে ইওরোপ ও আমেরিকার জিনিষপত্রে ভরপুর। এ দেশে কোনও বড় শিল্প বা কারিগরী নাই। দেশের অধিকাংশই মরুভূমি। যতটা জায়গা চাষ-আবাদ হয় তাতেই নিজেদের দেশের অন্নের সংস্থান হয়েও বিদেশে রপ্তানী হয়। ভাল ভাবে জল সেচনের ব্যবস্থা করে আধুনিক উন্নত পদ্ধতিতে কৃষিকার্য্যের ব্যবস্থা করলে 'এদেশ বিরাট শক্তিমান হয়ে উঠতে পারে। এ দেশে বড় বড় ভারী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। কিন্তু এ দেশের লোকেরা অধিকাংশই চাকুরীজীবী।

এ দেশের বাজেটের পাঁচভাগের চারি ভাগই ব্যয়িত হয় সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন ব্যাপারে। ১৯৫৪ সাল থেকে শতকরা ৩৫ ভাগ এই ঘাটতি পূরণ হচ্ছে আমেরিকার সাহায্যে। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে ইরাণে যে বৎসর শেষ হয়েছে, তাতে আমেরিকা গভর্ণমেণ্ট বাজেটে নগদ দুই শত লক্ষ ডলার এবং মালপত্রে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার সাহায্য করেছে, অধিকাংশ পণ্যদ্রব্যই এদেশে বিদেশ থেকে আনা হয় আর সেগুলি উঁচুদামে বিক্রয় হয়। কলিকাতায় যে লাক্স সাবানের দাম ছয় আনা, এখানে তার দাম এক টাকা চার আনা, সব জিনিষই প্রায় এই রকম। এরা তাতেই সুখী। বর্ত্তমান পৃথিবীতে যতটা পেট্রল আছে তার এক-অষ্টমাংশ মজুত আছে এদেরই দেশে, এই তরল সোনার অধিকারী হয়েই ইরাণের লোকের দৈনিক গড় আয় আজ ভারতবাসীদের চাইতে অধিক, এ জন্যই আজ এদের বাড়ী গাড়ী রাস্তাঘাট ঝকঝকে। এদের রাস্তায় কত বিচিত্র বর্ণের সুদৃশ্য মোটরগাড়ী ঘুরে বেড়ায়, আমেরিকার নিউইয়র্কেও তা চোখে পড়েনি।

ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মাণী, আমেরিকা ও রুশ পরস্পর প্রতিযোগিতা করে এদেশে ভাল ভাল মোটরগাড়ী পাঠায়। সেদিন নাইলনের তৈরী মোটর গাড়ীতে চড়ে বেড়ালাম। সহরের এখান-সেখানে যেতে সুদৃশ্য টাক্সি সর্বদা পাওয়া যায় মাত্র দশ রিয়েল (প্রায় দশ আনা) ভাড়া। 'পেট্রলের দাম গ্যালন-প্রতি আন্দাজ এক টাকা চার আনা। কম পয়সায় কাপ্তেনী করার জায়গা পৃথিবীতে খুব কমই আছে—ইরাণে এসে মোটর গাড়ীতে চড়ে বেড়ানো বা গাড়ী কেনা একটা বড় কথা নয়। জলপাইগুড়ি কুচবিহার অঞ্চলে বড় বড় জোতদারেরাও হাতী কিনে থাকে, তাই বলে হাতী কেনা সবার পক্ষে সহজ নয়। হাতী পোষাও সহজ নয়। তেহেরাণ থেকে ইংরাজী, ফরাসী এবং পারস্য ভাষায় খবরের কাগজ ছাপা হয়। পারস্য ভাষায় পত্রিকার প্রচারসংখ্যা সর্ব্বাধিক, তারপর ফরাসী, সর্ব্বশেষে ইংরাজী। এদেশে ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা ফরাসী ভাষার কদর বেশী। ইংরেজরা এদেশে ব্যবসা করতে এসেছে কিন্তু ভাল করে এদের মন জয় করতে পারে নাই। বড় বড় ব্যবসায়ে ইংরেজ আমেরিকার লোকেরা এদের 'পার্টনার'! এদেশে টেলিভিশন আছে—দশ হাজার সেট টেলিভিশন গত এক বছরের বিক্রী হয়েছে। আমাদের দেশে 'টেলিভিশন' আজ পর্য্যন্ত হয় নাই—স্বপ্ন হয়েই আছে। জাপানের ঘরে ঘরে 'টেলিভিশন।'

টেলিফোন আমাদের দেশে, জাপানে ও ইরাণে প্রচুর আছে। আমাদের দেশে টেলিফোন যন্ত্র আজ-কাল অধিকাংশ ভারতবর্ষে তৈরী হচ্ছে, জাপানের টেলিফোন যন্ত্র সবই জাপানে তৈরী, ইরাণের পঞ্চাশ হাজার টেলিফোনের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ বৃটিশ (জি, ই, সি) তৈয়ারী এবং বাকী এক-পঞ্চমাংশ জার্ম্মাণীর (সিমেন্স কোম্পানীর) ভারতে টেলিভিশন যন্ত্র তৈরী হয় নাই—জাপানের সবগুলিই নিজেদের দেশে জাপানে তৈয়ারী আর ইরাণের সবগুলিই 'আমেরিকান টেলিভিশন' পেপসি কোলা কোকাকোলার এজেন্সিও খোলা হয়েছে। জার্ম্মাণীর বিয়ার, বিলাতী মদের বাজার এখানে ভরপুর, জাপানীরা নিজেদের দেশে 'সাকুরা বিয়ার' 'নিপ্পন বিয়ার' ছাড়া খায় না—তারা স্বদেশপ্রেমিক। আমাদের দেশের মনোবৃত্তি এখনও বিলাতী জিনিষ পেলে দেশী জিনিষ কিনবো না। অথচ টুথপেস্ট, ফাউণ্টেন পেনের কালি আজকাল আমাদের দেশে এমন ভাল বেরিয়েছে যে বিদেশীদের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা কষ্টকর, কিন্তু আমাদের স্বদেশপ্রেমিক মনোবৃত্তি কোথায়? আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র না হলে এ সব জিনিষ চক্ষুতে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে কে? বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র যা আবিষ্কার

করেছিলেন—অন্য দেশ তা আবিষ্কার করে অনেক পরে। কিন্তু আমরা কি জগদীশচন্দ্রের প্রাপ্য মর্য্যাদা ঠিক মত দিয়াছি ? আমরা কি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে ঠিক সময়ে চিনেছিলাম—সম্মান দিয়েছিলাম ?

রবীন্দ্রনাথ এই পারস্যে এসেছিলেন—তাঁর কত সুনাম। আমরা নিজেদের দেশকে চিনি না, সম্মান দিতে জানি না। রবীন্দ্রনাথের নামে কলিকাতায় একটা বড় রাস্তার নামকরণ এখনও সম্ভব হইল না! অথচ এই তেহেরাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাস্তার নাম 'ফারদৌসী এভিনিউ' ওরা ফারদৌসী স্কোয়ারে বিরাট মূর্ত্তি স্থাপন করেছে 'কবি ফারদৌসী'র। তেমনি সাদীর নাম কত বেশী এদেশে।

প্রত্যেক দেশেই যুগে যুগে একজন শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হয়—এদেশেও হয়েছিল। মধ্যযুগে এরাই ছিল প্রকৃত আর্য্য, এদেশের সভ্যতা দিগ্বিজয় করেছিল। বিদ্যা বুদ্ধি স্থাপত্যশিল্পে এরা যে গৌরবময় সম্মান অর্জ্জন করেছিল, সেকথা আজ পৃথিবীর সকল দেশই শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করে। কিন্তু সেই মধ্যযুগের পারস্য ভারতের রামরাজত্বের মতই গল্পে পরিণত হয়েছে। ইস্পাহান পারসিপলিশে এদের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন স্থাপত্য শিল্প দেখলে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মাথা অবনত হয়ে পড়ে। কিন্তু আজকার পারস্য আর সেই পারস্য নাই—এটা যে এখন ইরাণ। এখানে বর্ত্তমান প্রতীচ্যের সভ্যতা প্রবেশ করে নাইট ক্লাব—রক ও রোলের দেশে পরিণত হচ্ছে।

রাজা রেজা শাহ্ পাহলভী বুঝতে পেরেছিলেন। তাই পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে তিনি মেয়েদের মুখে ঘোমটা তুলে দিলেন, প্রতি বৎসর শত শত ইরাণী ছাত্রকে বিদেশে পাঠিয়ে শিক্ষিত করে আনলেন, দেশকে নূতন দেশাত্মবোধে জাগ্রত করলেন। দেশকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করে তিনি নূতন নূতন রাজপথ, রেল লাইন ও নূতন নূতন সহর সৃষ্টি করলেন। সমুদ্রের সীমানা তিন মাইল থেকে ছয় মাইলে বৃদ্ধি করলেন, দেশে ধন্য ধন্য রব পড়ে গেল। তেহরাণের সবচাইতে বড় রাস্তার নাম রেজা শাহ্ এভিনিউ। এরা বড় রাস্তাকে রোড বা এভিনিউ বলে না, বলে কেয়াবান। শাহ্ রেজার নাম ঘরে-ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়—তিনি আর আজ নাই।

পৃথিবীতে কেহই অমর হয়ে আসেন নাই কিন্তু তাঁর কীর্ত্তি অমর হয়ে রয়েছে। আজিও বিদেশীয়রা এদেশে এলে সেই শাহ্ রেজার পবিত্র স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক দেন। গান্ধীঘাটে ফুলের মালা দেবার মত এটাও ইরাণে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আজ বর্ত্তমান ইরাণ বাগদাদচুক্তি অনুযায়ী ইংরেজ, আমেরিকা তুরস্ক ও পাকিস্থানের বন্ধু। দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজদ্বারে শ্মশানে এরা বন্ধু। কিন্তু এক মাস জনগণের মনের খবর নিয়ে দেখেছি, এরা মনে প্রাণে ভালবাসে ভক্তি করে বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে। পণ্ডিত নেহেরু সম্বন্ধে এদের শ্রদ্ধা অপরিসীম, মুখে এরা স্বীকার করে না কিন্তু অন্তরে এরা ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করে। আমি পাঁচ সপ্তাহ খেলা দেখিয়েছি—প্রত্যেক দিন ইরাণের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে খেলা আরম্ভ করি আর খেলা শেষ হলে "জনগণ-মন" ভারতের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে সমাপ্ত করি। প্রত্যেক দিন পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহ লোক যুগপৎ দাঁড়িয়ে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আমাদের ইন্দ্রজাল—এদেশে আদৃত হয়েছে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পোষাক, সাজসজ্জা, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত এরা সবাই এখন জানতে পেরেছে—চিনতে পেরেছে। আমরা রাস্তায় বের হলে এরা ভীড় জমায়—কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে সম্মান প্রদর্শন করে আর বলে "হিন্দুস্থান খেলী খুব" অর্থাৎ "ভারতবর্ষ খুব ভাল।" কোনরূপ চুক্তি নাই, রাজনীতির কোনও চাল বা চাপ নাই, আর্থিক সাহায্য বা প্রলোভনের লেশমাত্র নাই, আক্রমণের ভীতি নাই—আমরা জনগণের মনে নির্ম্মল আনন্দ পরিবেশন করতে এসে এদের চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছি—আমরা নিজদিগকে ধন্য মনে করছি। ভারতের জয় হউক!

# বিপিনদা

শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়

জীবনের চেয়ে জীবনের আদর্শকে যিনি সবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন, সেই বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ছিলেন বিপ্লবের মূর্ত্ত-প্রতীক আজীবন ব্রহ্মচারী ত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁর কর্ম্মময় জীবনের ছোট একটি ঘটনার কথা বলছি। তাঁরই মুখ থেকে শোনা একটি রোমাঞ্চকর ঘটনার বিবরণ মাত্র।

বিপিনদা'র সঙ্গে শেষের দিকে কয়েক বৎসর ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার সুযোগ আমার হয়েছিলো। এই সান্নিধ্যের ফলে আমি অনুভব করেছিলাম যে, তিনি প্রচ্ছন্নভাবেই কাজ করতে ভালবাসতেন। আত্মপ্রচারকে কোন দিনই তিনি প্রশ্রয় দেননি। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের গতিপথে কত যে চাঞ্চল্যকর দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটে গিয়েছে, কত যে দুঃখ বেদনা তিনি হাসিমুখে উপেক্ষা করে গিয়েছেন, কত বিপদকে তুচ্ছ করে দুর্জ্জয় সঙ্কল্প বুকে নিয়ে মৃত্যুর সামনা-সামনি দাঁড়িয়েও হাসিমুখে এগিয়ে গিয়েছেন তার খবর এখনও বাংলা দেশের বহু রাজনৈতিক কর্ম্মীর অন্তরের মণিকোঠায় কিছুটা সঞ্চিত রয়েছে বটে, তবে বৃহদংশ লুপ্ত হতে চলেছে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে।

যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তথ্যটি সংগ্রহ করেছি, ঠিক সেই ভাবেই আমি জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করছি।

১৩৫০ সালের আষাঢ় মাস। টেক্সমাকোর (Texmaco) রাজদ্রোহিতার মামলা নিয়ে তিনি অত্যন্ত বিব্রত। পয়সার অভাব তো আছেই, তার উপর সাক্ষী-সাবুদের গোলমাল তো লেগেই রয়েছে। তাই কি উপায়ে মামলাটি পরিচালনা করা যায় সেই সম্পর্কে পরামর্শ চলছে কয়েক জন বিশ্বস্ত সহকর্ম্মীর সঙ্গে ৫৫নং সার্পেন্টাইন লেনের নীচের ছোট্ট ঘরটিতে। তারি কাঁকে দেখা করতে এলেন নামকরা কংগ্রেসকর্ম্মী নিপীড়িত উদ্বাস্তু চাকুরীপ্রার্থী শোষিত শ্রমিক ভাইয়েরা, এমনি কত রকমের মানুষ। কেউ বা নিলেন সার্টিফিকেট, কেউ বা আশীর্ব্বাদ, কেউ বা নিলেন সামান্য উপদেশ। দেখলাম, বিপিনদা' কিন্তু বিমুখ করলেন না কাউকেও। এই ভাবে বেলা হয়ে

গেল দশটার কাছাকাছি। কর্ম্মীরা সকলেই বিদায় গ্রহণ করলেন আমি শুধু অপেক্ষা করতে লাগলাম সুযোগের প্রতীক্ষায়। উদ্দেশ্য ছিল মামলার বিষয়বস্তু কি ভাবে 'নয়া সমাজে' প্রকাশ করা যায়, তারই একটা নির্দ্দেশ নেওয়া। বলবার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছি, ঠিক এমনি সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন একজন বর্ষীয়সী খৃষ্টান মহিলা—সঙ্গে সাহেবী ধরণের পোষাক-পরা একজন খোঁড়া বৃদ্ধ মুসলমান ভদ্রলোক। বর্ষীয়সী মহিলাটি বিপিনদা'র কাছে এসে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলে উঠল—বিপিনদা', আপনি আমায় বাঁচান।

একটু উৎসুক হয়ে উঠলাম ব্যাপারটা জানবার জন্ম। বৃদ্ধার মুখ থেকে যা শুনতে পেলাম, তাতে বেশ বোঝা গেল যে, ওই মুসলমানটা বৃদ্ধার বাড়ীর ভাড়াটিয়া এবং বহু দিন যাবৎ বাড়ী ভাড়া বন্ধ করে বসে আছে—নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও ভাড়া দেওয়া ত দূরের কথা, ওঠবার নাম পর্য্যন্ত করে না। এই নিয়ে খানিকটা বাদবিতণ্ডা চলছে, এমনি সময় চেয়ে দেখি, বার বার বিপিনদা'র নামটা শুনে মুসলমানটির যেন বেশ ভাবান্তর উপস্থিত হলো। মুখে-চোখে ভীতির লক্ষণ পরিস্ফুট। আস্তে আস্তে পিছু হটতে হটতে একেবারে এসে পড়ল ঘরের শেষ প্রান্তে। মতলবটা বোধ হয় সরে পড়বার। আমিও অবস্থা বুঝে খানিকটা এগিয়ে এসে তাকে বিপিনদা'র পাশটায় বসিয়ে দিলাম। সে বসল বটে কিন্তু খানিকক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিপিনদা'র দিকে চেয়ে থাকবার পর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে উঠলো—আচ্ছা, আপনিই কি সেই জামালপুরের বিপিনদা'?

বিপিনদা আস্তে আস্তে মুখটা তার দিকে ফিরিয়ে জবাব দিলেন —হ্যাঁ, তুমিই ঠিক ধরেছ, তুমি কি তখন সেইখানে ছিলে?

সে উত্তর করল—ছিলাম বলছেন কি? কোন রকমে বেঁচে ফিরে এসেছি। তার সাক্ষ্য দেখুন না, বলে তার খোঁড়া পা-টাকে আমাদের সামনে এগিয়ে দিলো।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না বিপিনদা', এ আবার আপনার কবেকার ঘটনা।

বিপিনদা' তখন চোখ থেকে high power এর চশমাটি খুলে নিজের কোলের উপর রেখে বলতে শুরু করলেন: তবে শোন—সেটা বোধ হয়, ১৯০৫ কি ১৯০৬ সালের কথা। তখন আমার বয়স ১৭ কি ১৮। বালক বললেও ভুল করা হবে না। সে দিনের ঘটনাটি আমি যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এমনি দিনই ছিল সেদিন—আকাশটি ছিল এমনি নির্মেঘ! ক'জনে গিয়ে উঠেছি জামালপুরের কাছারী-বাড়ীতে। জানিস তো পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ কিছু না কিছু লেগেই ছিল। বেড়ে যেত যখন এই বৃটিশ মহাপ্রভুরা তাতে ইন্ধন যোগাতেন, সেই সময়ে হিন্দু-স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার—বাসন্তী-প্রতিমা ভঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ অত্যাচার ও উপদ্রবে সেখানকার হিন্দুরা তটস্থ-সন্ত্রস্ত। মুসলমান গুণ্ডারা বেশ বেপরোয়াভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিল তাদের গুণ্ডামী। হিন্দুরা একেবারে তটস্থ। এই সব শুনে কলকাতায় আমাদের মনটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে গেল। কি স্বদেশী করছি—যদি মা-বোনের ইজ্জতই বাঁচাতে না পারলাম! সঙ্কল্প করলাম। হিন্দুর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে, সে জীবনের বিনিময়েও।

এই সময় আমাদের আত্মোন্নতি সমিতির দলপতি ছিলেন, শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী। শ্রীঅরবিন্দও ছিলেন পিছনে, ডাক পড়ল আমাদের ক'জনের উপর। হরিশ শিকদার, প্রভাস দে, সুধীর সরকার, নরেন বোস ও আমার ভার পড়লো এই কাজটি হাসিল করবার। সকলে বেরিয়ে পড়লাম প্রত্যেকে দু'টি করে পিস্তল কোমরে গুঁজে। উঠলাম এসে কাছারী-বাড়ীতে। অচেনা লোক দেখে কথাটা যেন মনে হলো কিছু প্রচারও হয়ে পড়লো। ওরা তোড়-জোড় করে এলো এক দিন। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড জনতা আমাদের একেবারে ঘিরে ফেলে দিলো চারিদিক থেকে, আমরাও গত্যন্তর না পেয়ে বেপরোয়া ফায়ার করতে সুরু করে দিলাম। যতদূর মনে হয়, ফায়ার করেছিলাম প্রায় আঠার বার। দেখলাম ও পক্ষের বেশ ঘায়েল হয়েছে। কেউ বা পড়েছে শুয়ে আর কেউ বা খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাচ্ছে পালিয়ে।

ঠিক এই সময় মুসলমান ভদ্রলোকটি বিপিনদা'কে বাধা দিয়ে বলে উঠলো—ফায়ার তো আপনারা করেছিলেন—কিন্তু যদি আর বিলম্ব হয়ে যেতো—তবে আর আপনাদের কারও চিহ্নও পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া যেতো কি না সন্দেহ! আমি এত নিকটে গিয়ে পড়েছিলাম—আপনি কিন্তু তা টেরও পাননি—। দেখুন না তাইতো আমার এই দুর্দ্দশা!

বিপিনদা' কথাটিকে একটু মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—সেটা তুমি আর বেশী কি বলছ সাহেব—আমাদের অবস্থা যে খুব সঙ্গীন হয়ে উঠেছিলো—তা আমরা বেশ বুঝতেই পেরেছিলাম —কিন্তু তুমি এটাও মনে রেখো যে, আমরা প্রাণকে তুচ্ছ করে বিপদের ঝুঁকি নিয়েই এ কাজে হাত দিয়েছিলাম।

আমি একটু উৎসুকের সঙ্গে বললাম, তারপর কি হলো বিপিনদা'?

একটু গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললেন—হিন্দুত্ব বাঁচালাম বটে—কিন্তু আমাদের অবস্থা হয়ে উঠলো-একবারে সঙ্গেমিরে।

রাত্রের দিকে পুলিশ একদল এসে আমাদের সব Search করতে সুরু করে দিলে। কাছারী-বাড়ীর মোটা মোটা ভোজপুরী দরওয়ানগুলো যে কোথায় সরে গেল তার টিকির চিহ্ন পর্য্যন্তও পাওয়া গেল না। পালাবার চেষ্টা বৃথা। কোনও পথ খোলা নাই, আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলাম। কিন্তু এরই মাঝে যে সময়টুকু পেয়েছিলাম— সেই ফাঁকে প্রভাসকে কিছু কিছু অস্ত্র তার জিম্মায় দিয়ে চাষার পোষাক পরিয়ে মৈমনসিংহের দিকে সরিয়ে দিলাম। তখন মৈমনসিংহে District Conference চলছে। সুরেন ঘোষ মহাশয়ের রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক জীবনের সূত্রপাতও এই প্রভাসদের সংস্পর্শে এসে। তারপর আমরাও এই ভাবে কয়েক দিন হাজত বাসের পর Identify করতে না পারায় বেকসুর খালাস পাই। শুনেছি, ডাঃ ভূপেন দত্ত মহাশয়ের হস্তক্ষেপের ফলেই আমাদের Identification সাফল্যমণ্ডিত হয়নি।

এর পর থেকেই বেশ লক্ষ্য করেছি, ওখানে অত্যাচারের মোড় একেবারে বেশ ঘুরে যায়।

এরই মধ্যে চেয়ে দেখি, কখন যে দুপক্ষের মধ্যে মিটমাট হয়ে গিয়েছে। দুপক্ষই বিপিনদা'র পায়ের কাছে হাত ঠেকিয়ে বললো— আমাদের মিটে গিয়েছে বিপিনদা'! আমরা এখন উঠি। আমার কিন্তু যে কাজের জন্ম এতক্ষণ বসে থাকা, তার কোন কিনারাই হল না সে দিন।

৩

**সর্বকামবর্ষী** কৃষ্ণের স্তব করছেন দেবতারা: 'ভগবন, আপনি সত্যব্রত, সত্যই আপনার সঙ্কল্প, সত্যই আপনার প্রাপ্তিসাধন। আপনি ত্রিসত্য, অর্থাৎ আপনি তিনকালে সত্য। আপনি সত্যের কারণ ও সত্যে অবস্থিত। আমরা আপনার শরণাপন্ন হলাম। এই দেহপ্রপঞ্চ আদিবৃক্ষস্বরূপ, এক প্রকৃতি এর আশ্রয়, সুখ-দুঃখ এর দুই ফল, সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণ এর মূল; ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এর চার রস; পঞ্চ ইন্দ্রিয় এর জ্ঞান; শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা এর ছয় স্বভাব; রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র এই সাতটি এর ত্বক; পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি অহঙ্কার এই আটটি এর বিটপ; নবদ্বার এর নয় ছিদ্র এবং দশ প্রাণ এর পত্র। জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুই পাখী এই বৃক্ষে বাস করছে। আপনিই এই বৃক্ষের উৎপত্তিস্থান লয়স্থান ও পালনকর্তা। যে আপনার মঙ্গলময় নাম ও রূপ শ্রবণ চিন্তন বা উচ্চারণ করে বা অন্যকে করায়, আপনার চরণসেবায়ই যে নিবিষ্ট, তাকে আর সংসারে আসতে হয় না পুনর্বার। আপনি ঈশ্বর, আপনার জন্মমাত্রেই আপনার চরণভূতা এই ধরিত্রীর ভাব অপনীত হল। আপনি অসংসারী, আপনার জন্মের কারণ আপনার লীলা ছাড়া আর কিছু নয়। আর জীবাত্মার যে জন্ম স্থিতি ও ধ্বংস হয়ে থাকে তা আপনার অবিদ্যা থেকেই উৎপাদিত—আসলে জীবাত্মারও জন্মাদি কিছু নেই। বারে-বারে অবতীর্ণ হয়ে আমাদের যেমন পালন করেছেন, এবারও, হে যদুশ্রেষ্ঠ, অবনীর গুরুভার হরণ করুন।' 'ভারং ভুবো হর যদূত্তম।'

'কৃষ্ণাম্বুভবলাহক।' কৃষ্ণ মেঘ ছাড়া আর কি। মেঘ বলেই তো কৃষ্ণ কামবর্ষী। পাপদাবদগ্ধ ধরণী তাপে-তৃষ্ণায় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এবার ঝরবে অমিয়-নির্ঝর। দলিতাঞ্জন-চিক্কণ স্নিগ্ধকান্ত নবঘন দেখা দিয়েছে। 'লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে, হেন মেঘ যবে দেখা দিল।' 'কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎ-শস্য উপর, বরিষয়ে লীলামৃতধার।'

শুধু প্রার্থনায়ই নেমে এল মেঘ। 'ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার।' 'ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্মসেতু।' ক্ষেতের আল বা সেতু হচ্ছে ক্ষেতের রক্ষক। তেমনি অবতার হচ্ছে ধর্মের রক্ষক। এবার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হল অদ্বৈতের আহ্বানে, অদ্বৈতের হুঙ্কারে।

শান্তিপুরে বাস, বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, নাম কমলাক্ষ মিশ্র। সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম, মহত্তম বৈষ্ণব, দীক্ষা নিয়েছেন কৃষ্ণভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে। সে যুগে বৈষ্ণবেরা সমাজে বিশেষ কলকে পেত না, এক কোণে পড়ে থাকত লাঞ্ছিতের মত। লোকেরা বিষহরি, বাশুলী বা মঙ্গলচণ্ডীর পুজো করত। কৃষ্ণ-নামে কারু আস্থা নেই, সাড়া নেই, যারা কৃষ্ণনাম করে, যাদের কৃষ্ণনামে উন্মাদনা, তারা সব উপহাসের বস্তু। শুধু বিদ্যা ও বিষয় ব্যাপারের আয়োজন, ভক্তির বাষ্প নেই কোনোখানে। বৈষ্ণবেরা ম্লান, বিমর্ষ। চারিদিকে কেবল প্রাণহীন বিদ্যা ও জ্ঞানহীন বিষয়ের হাঁকডাক।

'সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা-উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষপূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥'

কিংবা—

'কেহো পাপে কেহো পুণ্যে করে বিষয়ভোগ।
ভক্তি গন্ধ নাহি—যাতে যায় ভবরোগ॥'

ভবরোগ কি? ভোগেচ্ছাই ভবরোগ। তার ক্ষয় ভক্তি-রসে। 'যেই রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ।' যেখানে স্বয়ং কৃষ্ণ বশীভূত সেখানে আর কিসের কান্না, কিসের কামনা?

কমলাক্ষের বাড়িতে বৈষ্ণবদের সভা বসে। সেখানে নিজেদের হীনাবস্থা নিয়ে পরস্পর তারা দুঃখ করে। কি অভাবে এই দৈন্যদশা? কবে ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের?

কমলাক্ষ হুঙ্কার ছাড়ে: 'আর দেরি নেই, আর্তত্রাণ-পরায়ণ মঙ্গলায়তন হরি। আসবেনই আসবেন।' তারপর সাসঙ্গ-ধ্যানে প্রার্থনা করে: 'হে কৃষ্ণ, অবতীর্ণ হও, কলিজীবের দুরবস্থা দূর করো। হে করুণা-ঘনাবলোকন, পুরটসুন্দরদ্যুতি, এ প্রাণহীন প্রীতিহীন জড়াদ্ধকারকে তোমার আবির্ভাবের খড়্গে খণ্ড-বিখণ্ড করে দাও।'

এই কমলাক্ষই উত্তরকালে অদ্বৈত-আচার্য।

এই অদ্বৈতের হুঙ্কারে-কাকুতিতেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। অদ্বৈতেরই গর্জনে-ভজনে। গর্জনও করছে ভজনও করছে। জোরও করছে আবার মিনতিও করছে। একদিকে ডাকাতে চীৎকার আরেক দিকে পীড়িত-বিপন্নের অনুনয়। দাহ আর দৈন্য একসঙ্গে।

'হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে প্রেমার হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনেই হইল সাক্ষাত॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ভক্তিযোগ ধন্য॥'

কিংবা—

'আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার হেতু যাঁহার হুঙ্কার॥'

অদ্বৈত আর কি করে? কৃষ্ণকে তুলসী আর জল দেয়। এক পত্র তুলসী আর এক গণ্ডুষ জল। 'তুলসী-মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে। নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা-কুতূহলে॥'

'গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করেন সমর্পণ॥' আর যে জল-তুলসী দেয় কৃষ্ণকে, তার ঋণ শোধ করতে পারে, ঘরে এমন ধন নেই কৃষ্ণের। সুতরাং কৃষ্ণ কি করে? নিজেকেই বেচে দেয় ভক্তের কাছে। স্বতন্ত্র হয়েও ভক্তপরবশ হয়ে যায়।

তাই যখন কৃষ্ণকে পূজা করো, স্মরণ করো কৃষ্ণের পাদপদ্ম। কৃষ্ণ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই লীলা-মানুষবিগ্রহ, বনমালী পীতবাস, সেই বেণুবাদ্যবিশারদ, গাঢ়চিত্তে এই সান্নিধ্য কল্পনা করো। স্থাপন করো সাক্ষাৎ সম্পর্ক। সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তিযুক্ত হও। প্রবৃত্তি নেই শুধু আবৃত্তি—সেখানে শত শ্রবণ কীর্তন করলেও 'কৃষ্ণপদে প্রেমধন' মিলবে না।

সুতরাং 'অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।' 'কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার। এমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥'

'শুন শ্রীনিবাস! গঙ্গাদাস! শুক্লাম্বর!
করাইব কৃষ্ণ সর্ব-নয়ন-গোচর॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ, আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণভক্তি তোমা সভা লৈয়া॥
যবে নাহি পারোঁ তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারিভুজ, চক্র লমু হাতে॥
পাষণ্ডী কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস॥'

তেরো মাস মায়ের গর্ভে বাস করেছে, শিশু দেখতে অনেক বড় ও বলবান হয়ে জন্মাল। 'সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিশাল-হৃদয়। আজানুলম্বিত ভুজ তনু রসময়॥'

'শ্রীচৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥ সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে। কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥' মেয়েরা কোলে নেয় শিশুকে, কোলে ধরে রাখতে পারে না, ছাপিয়ে পড়ে। আর কি রূপ, চন্দ্র-ভানু যেন একত্র উদয়, তপ্ত আর দ্রব, দীপ্ত আর মধুর একসঙ্গে। গলিত লাবণ্যে সুবলিত আকৃতি। আয়ত-বিশাল চোখে মর্ত-দুর্লভ করুণা। করতল আর পদতল যেন প্রস্ফুট কমল—কনক-কমল। সর্ব-অঙ্গে নিমলকান্তির স্রোত। এত রূপ কি মানুষে সম্ভব? এত করুণাবারি ধরেছে, এ কি মানুষের চোখ?

'রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।' শুধু ঐশ্বর্যস্বরূপ নয়, আবার মাধুর্যবিগ্রহ। শুধু নিজেকে নিজের সম্ভোগ নয়, ভক্তের মধ্য দিয়ে নিজেকে আস্বাদন। ভক্তের আনন্দবর্ধনেই নিজের যশোবর্ধন। এবং

ভক্তকে তিনি এই আনন্দ দিচ্ছেন কেন? নিজের সুখবাসনায় নয়, ভক্তের প্রতি নিরুপাধিক করুণায়। তিনি শুধু রসিকশেখর হলে ভক্তকে বৈধীভক্তি নিয়ে থাকতে হত, তিনি পরমকরুণ বলেই ভক্তের রাগভক্তিরই সমুচ্ছ্বাস।

তারই জন্যে নিমাইয়ের দুটি চোখে করুণার কালিন্দী।

কিন্তু থেকে-থেকে নিমাই কেঁদে ওঠে কেন? হরিনাম শোনবার জন্যে। হরিনাম শুনলেই তার কান্নার বিরাম। হরিনাম শুনলেই তার তরল-হাসির তরঙ্গ। 'তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন। হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥'

কে একটি প্রতিবেশিনী নিমাইকে কোলে নিয়েছে আদর করে। তৎক্ষণাৎ শিশুর আকাশ-ফাটানো কান্নার রব উঠল। প্রতিবেশিনী ভীষণ অপ্রস্তুত, কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না শিশুকে। এটা-ওটা কত খেলনা দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছে, আদর-আরাম দিচ্ছে, তবু নিমাই নাছোড়বান্দা। যেমন-কে-তেমন, কান্নায় সে প্রখর-মুখর।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন শচীরাণী। বললেন, 'তুমি যে নাজেহাল হয়ে গেলে ছেলে নিয়ে।' ও কিছু নয়, বারকতক হরি বলো, ছেলে চুপ করবে দেখো।'

হরি হরি! মার মার! ছেলের আর কান্না নেই, মুখে-চোখে প্রসন্নতার ঢেউ।

কৃষ্ণনাম অমৃতসিন্ধু—'যার একবিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনু-মনে, হাসে-গায় করয়ে নর্তন।' নাম বলো, নাম শোনাও, নামই বলিষ্ঠ সাধন, নামই পরপদপ্রাপ্তির অমোঘ পাথেয়। 'তস্য নামঃ মহদ্‌যশঃ।'

আরেক দিন কাঁদছে নিমাই। চাঁদ দে মা বলে বায়না ধরেছে। জ্যোৎস্নারাত্রির আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে শচীরাণী ডাকছেন চাঁদকে, সকাতরে আয়-আয় বলছেন। অবুঝ চাঁদ গ্রাহ্যও করছে না। নিমাইও তেমনি নাছোড়। চাঁদ না দিবি তো ধুলোয় লোটাব, মাথামুড় খুঁড়ব। 'বাসু বলে এ ছাবাল ধুলায় লোটাবা, স্নেহভরে তুমি মাগো কত ঠেকাইবা।' আকুল হয়েছে শচীরাণী, ভেবে পাচ্ছেন না কি করে শান্ত করবেন ছেলেকে। সহসা দেয়ালে-টাঙানো রাধাকৃষ্ণের একখানি ছবির দিকে চোখ পড়ল, সেটা পেড়ে এনে ছেলের হাতে দিলেন। কোথায় কান্না!

এবার নিমাইয়ের কণ্ঠে হাসির লহর, কর্ণানন্দী কলধ্বনি।

> 'রাধাকৃষ্ণ চিত্র এক মিশ্রগৃহে ছিল।
> পুত্র শান্তাইতে শচী তাহা হাতে দিল॥
> চিত্র পাঞা গোরাচাঁদের মনে বড় সুখ।
> বাসু কহে মাটে পঁহু হের নিজ মুখ॥'

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তি। তার এক শক্তি আনন্দদায়িকা। তার অন্য নাম হ্লাদিনী। হ্লাদিনী শক্তির ঘনীভূত বিলাসই প্রেম। প্রেমের প্রগাঢ়তম রূপই মহাভাব। আর মহাভাবের মহত্তমা প্রতিমা রাধিকা। গোবিন্দানন্দিনী। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়সার-স্বরূপা। শ্রীকৃষ্ণ প্রেম, রাধিকা আনন্দ। প্রেম আর আনন্দ অভেদ, যেমন বহ্নি আর তার দীপ্তি, মৃগমদ আর তার গন্ধ। তাই রাধাকৃষ্ণ অভেদ, একাত্মা। একাত্ম হয়েও কিন্তু লীলারসের আস্বাদের জন্যে দুই ভিন্ন দেহে অভিব্যক্ত। কিন্তু এমন এক রস আছে যা দুই দেহ একীভূত না হলে সম্ভোগ হয় না। সে সম্ভোগে রসিকশেখর কৃষ্ণকে রাধিকার ভাব-কান্তিকে অঙ্গীকৃত করতে হয়। সে রসের নাম প্রেমভক্তি। এই প্রেমভক্তি একমাত্র শ্রীচৈতন্যে। তাই রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য।

> 'রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
> অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
> সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
> ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥'

৪

উপেন্দ্র মিশ্রের ছেলে জগন্নাথ মিশ্র। বাড়ী শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণ গ্রামে। বৈদিক ব্রাহ্মণ, দেখতে পুরন্দরের মত, নবদ্বীপে এসেছেন বিদ্যার্জ্জন করতে, আর পাণ্ডিত্যেও উপাধি পেয়েছেন পুরন্দর। নবদ্বীপ তখন বিদ্যার বন্দর, চতুর্দিকে শুধু বিদ্যার বাণিজ্য। যে বিদ্বান সেই সুন্দর, সেই সার্থক, সেই সুখী, সর্বত্র এই তখন মূল্যায়ন। কাঞ্চনের কৌলীন্য নয় পাণ্ডিত্যের কৌলীন্য। বিদ্বান দেখলেই লোকে সমীহ করে, আদর করে, প্রথম পঙ্‌ক্তিতে আসন দেয় সভাতে। ধনীরাও গৌরব ধনে নয়, পণ্ডিত পোষণে। মায়েরাও কন্যার জন্যে 'বিত্ত' চায় না 'বিদ্যা' চায়।

রামভদ্র ভট্টচাজ্জের টোলে পড়তে এসেছে জগন্নাথ। তার সহপাঠী বাসুদেব সার্বভৌম, অধ্যাপক মহেশ্বর

বিশারদের ছেলে। ছাত্ররা এসে দেখল, ন্যায়শাস্ত্রই পড়ানো হয় না টোলে। কি করে হবে! ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা শুধু মিথিলায়। ভারতবর্ষের যে কোনো অঞ্চলের ছাত্র হও, যদি ন্যায় পড়তে চাও, মিথিলায় গিয়ে ধন্না দাও। তাও, পড়তেই পাবে, পড়ার শেষে দেশে বই নিয়ে যেতে পারবে না। তার মানে? তার মানে বাঙালি পড়ুয়াকে মিথিলার প্রচণ্ড ভয়। বাঙালি যদি বই একবার হাতে পায়, তার যেমন মেধা, সে নিজেই নৈয়ায়িক হয়ে উঠবে। ন্যায়শাস্ত্রে মিথিলার আর কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য থাকবে না। তাই বাঙলাকে বুদ্ধিতে না পারো বইয়ে কাঙাল করে রাখো।

বটে? এই কথা? বাসুদেব মিথিলায় গেল ন্যায় পড়তে। ন্যায়ের প্রকাণ্ড গ্রন্থ মুখস্থ করে ফিরে এল।

নবদ্বীপে নতুন টোল খুলল। ভারতবর্ষের প্রান্ত-উপান্ত থেকে পড়ুয়ারা আসতে লাগল দলে-দলে। ন্যায়ের দ্বীপ এখন নবদ্বীপে। মিথিলা শিথিল হয়ে গেল।

আরেক অধ্যাপক নীলাম্বর চক্রবর্তী। তার বড় মেয়ের নাম শচী শচীকেই নীলাম্বর জগন্নাথের হাতে সমর্পণ করলেন।

বিশ্বরূপকে সঙ্গে নিয়ে তোমরা একবার এস, জগন্নাথ ও শচীর উপর আদেশ এল ঢাকা দক্ষিণ গ্রাম থেকে। জগন্নাথের মা শোভাদেবী লিখে পাঠালেন, কতদিন তোমাদের দেখি না। বিশ্বরূপ এখন না জানি কত বড়টি হয়েছে।

সপুত্রকলত্র জগন্নাথ ফিরে এল নিজ গৃহে। কিন্তু কদিন পরেই শোভাদেবী অপূর্ব এক স্বপ্ন দেখলেন। দেখলেন, কে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে বলছেন, তোমার পুত্রবধূর গর্ভে শ্রীভগবান আবির্ভূত হয়েছেন, শীগগির ওদের নবদ্বীপে পাঠিয়ে দাও। এবার নবদ্বীপই নবীন হরিক্ষেত্র।

ত্বরান্বিত হয়ে ফিরে এল জগন্নাথ। 'শচীগর্ভে বৈসে সর্ব-ভুবনের বাস। ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ॥'

জ্যোতির্বিৎ বিপ্র এসে বললে, 'এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ। এর থেকেই সর্বধর্মের স্থাপন হবে। হবে সর্বজীবের উদ্ধার। এই সর্বভূতদয়ালু।'

'ভাগবতধর্মময় ইহান শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃভক্ত ধীর॥'

বিশ্বরূপের ছোট ভাই, নাম হল বিশ্বম্ভর।

গুপ্ত ভাবে গোপালের খেলা খেলছে নিমাই চার মাসের শিশু, ঘরে শুয়ে আছে একলা, শচী ছুটে এসে দেখে, ঘরের সমস্ত জিনিসকে কে ফেলে ছড়িয়ে ছত্রাকার করে দিয়েছে, ভেঙেছে দধি-দুধের হাঁড়ি মেঝেময় ছিটিয়ে দিয়েছে ধানচালের পসরা। কই, ঘরে আর লোক কই, কোন দৈবের এই অঘটন। বাহুতে অঙ্গদ-বলয়, কটিতে কিঙ্কিণী, পায়ে মগরা খাড়ু, গলায় বাঘ-নখ, উঠোনে হামাগুড়ি দিচ্ছে নিমাই। হাতের কাছে যা পাচ্ছে, শাপ-ব্যাঙ, তাই ধরছে মুঠো চেপে। একদিন একটা সাপের উপর দিব্যি শুয়ে পড়ল, সাপ কুণ্ডলী করে জড়িয়ে ধরল শিশুকে। সবাই ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগল, ডাকতে লাগল গরুড়-গরুড়। সাপ বন্ধন খুলে পালাতে চাইল কিন্তু নিমাই ছাড়তে রাজি নয়। আর থেকে-থেকেই তার আঙিনা পেরিয়ে গঙ্গার দিকে যাত্রা। যখন ঘরের দিকে যায় তখন তার নগ্ন পায়ে নূপুরের ধ্বনি।

জগন্নাথ বলে, 'আমার এ পুত্রের দেহে গোপাল এসেছে।'

'কে এসেছে জেনে আমার দরকার নেই।' শচী নিমাইয়ের মাথায় রক্ষা বেঁধে দেয়। 'যেই আসুক, আমার বাছার যেন অমঙ্গল না হয়। আমার বাছা যেন সুস্থ থাকে।'

নামকরণের সময় অনেক কিছুই ধরতে দিয়েছে নিমাইকে। ধান, পুঁথি, খড়ি, সোনা, রূপো, মাটি—আরো কত কি। কিন্তু নিমাই সব ফেলে 'ভাগবত' ধরেছে। ধরেছে ভক্তি, ধরেছে লোকসুমঙ্গলা হরিকথা।

'জগন্নাথ বোলে, শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥'

ভাগবত কী? ভাগবত ভক্তির সুধাসত্র। ভক্তি কী? শ্রীকৃষ্ণে সতত যুক্ততাই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণকথাই 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে।'

'সত্যং পরং ধীমহি।' সেই নিরস্তকুহককে, সেই স্বপ্রকাশ সত্যস্বরূপকে, পরমাত্মাকে ধ্যান করি। এ তো ব্যাসদেবের কথা। কিন্তু আমরা, আমরা যারা কলিহত জীব, যারা মন্দপ্রজ্ঞ, মন্দভাগ্য ও অল্পায়ু, যাদের 'নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবা চ ব্যর্থকর্মভিঃ'—

যাদের রাত্রি নিদ্রায় ও দিন ব্যর্থ কর্মে কেটে যায়—তাদের উপায় কি হবে? উগ্রশ্রবা সূত বললেন, তোমরা শুধু ভাগবত, ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করো। তোমাদের শুধু ভগবৎকথায় রতি হোক, তোমরা 'বাসুদেবকথারুচিঃ' হয়ে উঠো।

সকল বেদের প্রতিপাদ্য বাসুদেব, সকল যজ্ঞের লক্ষ্য বাসুদেব, সকল যোগের লভ্য বাসুদেব, সকল ক্রিয়ার গতি বাসুদেবে। জ্ঞান তপস্যাধর্ম বাসুদেবেই নিহিত। বাসুদেবই জীবের পরা গতি। কিন্তু কী হবে বেদে-বাদে, যাগে-যজ্ঞে, ক্রিয়ায়-অনুষ্ঠানে যদি ভগবানে অহেতুকী ভক্তি না জন্মায়? যারা আত্মারাম, যারা নির্গ্রন্থ, অর্থাৎ যারা ছিন্নবন্ধন তারাও শ্রীহরিকে অহেতুকী ভক্তি করে থাকে। সুতরাং অহেতুকী ভক্তিই জীবের পরমধর্ম। অহেতুকী ভক্তি ছাড়া আর মঙ্গলময় পথ নেই। হরিকথাই তাই শ্রোতব্য, স্মর্তব্য, কীর্তিতব্য। যদি বক্তা থাকে শোনো হরিকথা, যদি বক্তা না থাকে হরিকথা কীর্তন করো, আর যদি বক্তা ও শ্রোতা কেউই না থাকে, তবে মনের নির্জনে স্মরণ করো বাসুদেবকে। শ্রীকৃষ্ণকে ছুঁয়ে থাকো সব সময়—এক মুহূর্তও যেন নিরালম্ব বলে নিজেকে না অনুভব করো।

আর কিছু নয়, শুধু ভক্তি, তীব্র ভক্তি। সকামী হও বা সর্বকামী হও বা মোক্ষকামী হও, শুধু প্রগাঢ় ভক্তিতে একান্ত ভক্তিতে আরাধনা করবে পুরুষোত্তমকে। ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। ভগবানের নামগুণের শ্রবণে কীর্তনে ধ্যানে-আরাধনে, তাঁর ভক্তের সেবাচর্যায় ও ভক্তি-গ্রন্থের পাঠে-আবৃত্তিতেই জন্মাবে ভক্তি। নিরন্তর যে হরিকথা শোনে তার ত্রিগুণজ বিক্ষেপ দূরে যায়, বিষয়ে বৈরাগ্য আসে, আত্মা প্রসন্নতায় আরূঢ় হয়। 'পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি।' মনের প্রসন্নতাই শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ। সুতরাং যে হরিগুণ গান করে সেই আয়ুষ্মান।

'শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মে-জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥'

ভক্তের হৃদয় ভগবান আবার ভগবানের হৃদয় ভক্ত। 'সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।' 'ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম।' ভক্তের দেহ শ্রীকৃষ্ণের মন্দির আর ভক্তের হৃদয় তাঁর অচল সিংহাসন। অতএব ভক্তিসাধনই সর্বসাধন।

নিমাই হাঁটতে শিখেছে, আর হাঁটতে শিখেই শুরু করেছে নাচতে। শচী তাকে আঁট করে কাপড় পরিয়ে দিয়েছে, মাথায় চূড়া বাঁধা, তাতে ফুল গোঁজা, গলায় বনমালা, গোপালের বেশে, শচীর আঙিনায় নাচছে কনকোত্তম। নীরোগ নিটোল দেহ, ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত বুক, অরুণ-গৌর শিশু কোটি-কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করে এসেছে। যে দেখছে সেও নেচে উঠছে সঙ্গে-সঙ্গে। আধো মধুস্বরে হরি বলছে নিমাই। তুমিও যদি বলো সেই সঙ্গে, তবেই নিমাই হাসে, যদি না বলো তো শুনবে তার আর্তনাদ।

'এমন শিশুর রীতি কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনে হরিধ্বনি॥
তাবত ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরিধ্বনি যাবত না শুনে॥'

তারপর ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে নিমাই। লজ্জা কি, আনন্দবাসরে তুমিও ধূলিধূসর হও।

শচী ছুটে এসে ছেলেকে কোলে তুলে নিচ্ছে। সোনার অঙ্গ মুছে দিচ্ছে আঁচলে।

চুরি করে খেতে শিখেছে নিমাই। পড়শীদের ঘরে ঢুকতে শিখেছে। সন্তোষ করে কেউ যদি খই-সন্দেশ দেয় তা নিমাই বেশীর ভাগই বিলিয়ে দিচ্ছে দু-হাতে। তাদেরই দিচ্ছে, যারা তার সঙ্গে করেছে হরিনাম। এ তো ভারি মজা। নিমাইয়ের যোগাড়-করা খাবারের পাহাড়ে ভাগ বসাবার লোভে মেয়ে-পুরুষ সবাই এখন তাই তাকে দেখলে হরি-হরি বলে। শুধু বলে না, হাততালি দেয়, কেউ-কেউ বা নাচে। যদি কোনো বাড়ি খাবার না দেয় সেখানে নিমাই সিঁদ কাটে। ভাতের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে ভাত খায়, কড়াতে চুমুক দিয়ে দুধ। যার ঘর শূন্য, তার অন্তত হাঁড়িটা ভেঙে দিয়ে আসে। আরো উৎপাত, ঘরে যদি শিশু থাকে তাকে কাঁদায়, নয়তো তার মুখে কালিঝুলি মেখে ভূত সাজায়। প্রায়ই ধরা পড়ে না, যদি কখনো পড়ে দৈবযোগে, তখন ছাড় নেবার জন্যে তার মিনতির কি অভিনয়।

'এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ, দোহাই তোমার॥'

এবার নিজে চোর নয়, অপর চোরের হাতে ধরা পড়ল নিমাই।

ঘরের বাইরে কখন কত দূরে চলে এসেছে, চোর দেখল কে একটি সরল সুঠাম ফুটফুটে শিশু। শিশুর

রূপ নয়, অঙ্গের আভরণই আকৃষ্ট করল চোরকে। নিমাইকে কাঁধে তুলে নিল। মনে মনে স্থির করল, বাড়ি নিয়ে গিয়ে শিশুর গা থেকে খুলে নেব গয়না, তারপর শিশুকে দূরে নির্জনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। যদি বা তাতে বাধা পড়ে, শিশুকেই সরিয়ে দেব সংসার থেকে।

পথ দিয়ে লোক চলছে কাতার দিয়ে। কেউ কিছু সন্দেহ করছে না। কি করে বা করবে! নিমাই যে একটুও টুঁ করছে না, পরম নিশ্চিন্তে কাঁধের উপর বসে পা ঝুলিয়ে চলেছে। সবাই ভাবছে যার শিশু সেই বুঝি নিয়েছে কাঁধে করে, শহর ঘুরে চলেছে গাঁয়ের দিকে। কাঁধে চড়ে কেমন গরব করে চলেছে দেখ না।

তবু কারু-কারু বুঝি সন্দেহ হল। অমন লোকের কাঁধে এমন কনকের পুত্তলি! জিগগেস করে, 'কোথায় চলেছ খোকা!'

হাসি-হাসি মুখে নিমাই বলে, 'বাড়ি চলেছি।'

অমন স্বচ্ছ-সরল মুখে কথা বলছে যখন, অমন অকুণ্ঠ কণ্ঠে, তখন আর সন্দেহ কি।

এ দিকে, নিমাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, শচী আর জগন্নাথ পাগলের মত হয়ে পড়েছেন। শুধু বাপ-মা নয়, এ-পাড়া ও-পাড়া। খোঁজ, খোঁজ, চার দিকে লোক ছুটোছুটি করতে লাগল, কিন্তু কোথায় নিমাই! কোথায় সকলসুন্দর সহজসুন্দর গৌরহরি!

'আর কদ্দূর বাড়ি?' জিগগেস করল নিমাই।

'এই তো এসে পড়েছি। আর দেরি নেই।'

কিন্তু, ও কি, পথের ঠিক ঠাহর পাচ্ছে না চোর। না, এই তো পথ—এই তো, এই দিক দিয়েই তো। চোর দ্রুত করল পদক্ষেপ।

'এই যে বাবা, বাড়ি এলাম।' চোর কাঁধ থেকে নামাল নিমাইকে।

এ কি, এ যে শচীর ঘরের দরজায়ই নিমাইকে নামিয়ে দিয়েছে। ওরে, তোকে কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কে আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল! ব্যাকুল বাহুতে শিশুকে জড়িয়ে ধরলেন জগন্নাথ।

'বা, এই যে একটা লোক কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে, কত দূর নিয়ে গিয়েছিল, কত পথ হেঁটে-হেঁটে, ঘুরে-ফিরে আবার এইখানেই রেখে গেল দেখছি।'

কোথায় সেই চোর?

বৈষ্ণবী মায়ায় সে কি পথ হারিয়েছে, না কি বৈষ্ণবী কৃপায় সে পথ পেল?

নারায়ণ যার কাঁধে এসে উঠলেন তার আর পথ পেতেই বা বাকি কি, ঘর পেতেই বা দেরি কোথায়!

[ ক্রমশঃ।

# কলঙ্কিনী

বিমলচন্দ্র সরকার

তোমাকে দেখলাম—ইডেনের ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ।
উদ্‌ভ্রান্ত, মমতা ভরা দৃষ্টি পৃথিবীর চারিদিকে মেলে ধরেছ।
হাতে একটি পাত্র, পয়সা চাইছ : একটি পয়সা।
একখানা শত-ছিন্ন শাড়ীতে লজ্জা ঢেকেছ কোনভাবে
এলায়িত চুল, সীঁথির সীমন্তে সিঁদুর,
যেন শুকতারার মত নিষ্প্রভ নিথর!
রোদে পুড়ে, জলে ভিজে দেহখানা যেন
তোমার একটি পোড়া কাঠ হয়ে গেছে।
এই দেহেও একদিন ছিল যৌবন।

হেমন্তের স্বপ্নভরা সোনার কামনা
আর ছিল বাঁচার সংগ্রামী সাধনা।
এক নব দম্পতী তোমার দিকে চেয়ে
নীরবেই হেঁটে চলে গেল বহু দূরে।
ওদের মত বাঁচার সাধ, আশার স্বপ্ন একদিন
দাম্পত্য জীবনের নীড় বাঁধবার স্বপ্ন রঙিন
তোমার বুকেও কি নীরবে ঘুমিয়ে ছিল না?
ঘর বাঁধবে স্বজনার ভালবাসায়
একান্ত মমতায় মাটির সীমানায়।

এক স্বার্থপর পুরুষ কামনায় উন্মত্ত হয়েই
তোমার কুমারীত্বকে করেছিল কলঙ্কিত—
সেই লালসার চিহ্ন, ক্ষতের মত বুকে বয়ে
কলঙ্কিনী মেয়ে, পথে দাঁড়িয়েছ ভিখিরিণী হয়ে!
তোমাদের বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাসে কি
সমাজ-জীবনের পড়িল এই অধ্যায়—

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

১৬। উক্ত হল শ্রীবৃন্দাবনের অখিল বৃত্তান্ত। বৃত্তান্তগুলি অলৌকিক হলেও লোক-মধ্য-পাতিত্ব তাঁদের স্বীকৃত; মাংসচক্ষু জনতা তাঁদের লৌকিকের মত ক'রে দ্যাখেন; নয়নের দোষ থাকলে শাদা শাঁখও হলদে হয়।

কিন্তু···ভগবদিচ্ছাই প্রবল: তাই—এই গোকুলে নিত্য বিরাজ করেন দুটি অধীশ্বর। একজনের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণের পিতৃভাব-মঙ্গল; তিনি 'নন্দ'।

আর এক জনের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণের মাতৃভাব-মঙ্গল; তিনি "যশোদা।"

তাঁদের কোলে শিশুর মত জন্ম নিতে নিতে, আনন্দে ডগমগ করেন—নিত্যকিশোর। যিনি ভগবৎ-শ্রেষ্ঠ, যিনি লীলানিধি, তাঁর লীলার অসাধ্য কি কিছু রয়েছে?

১৭। এবং ভগবানের লীলানিধিত্বই প্রবল; তাই—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নন্দ-যশোদার প্রসিদ্ধ বাৎসল্যরসটিকে আমোদিত করবার উদ্দেশ্যে, পালন ও লালনের আনুকূল্যে শিশু হয়ে, অলৌকিক সমস্ত ভাবের মাধ্যমে জগতে হন সলৌকিক।

অ-লোক হলেও· কেবল তাঁতেই ঘটতে পারে···গো, লোক ও গোপীদের নিয়ে তাঁর বিলাস।

লোক-ব্যতীত···শোভাই হইতে পারে না, তাঁর বাল্যাদি লীলা এবং অসুরনাশ-লীলা।

ইতি আনন্দ-বৃন্দাবনে ভগবৎ-স্থানতত্ত্বমলী নামক প্রথম স্তবক।

## দ্বিতীয় স্তবক

১। তারপরে—

(১) পিতা শ্রীনন্দ ও মাতা শ্রীযশোদার, তথাবিধ সৌভাগ্যের সংবর্দ্ধনের জন্য; এবং—

(২) রাক্ষস লক্ষণ অসুরদলপতিদের পদভরে ভগ্নপ্রায় ধরিত্রীদেবীর নিদারুণ যন্ত্রণা দর্শনে ব্যথিত-হৃদয় হ'য়ে ব্রহ্মা যখন ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণুর নিকটে পরিত্রাণার্থ ও অবতারার্থ নিবেদন জানান, তখন তদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য ও লৌকিকলীলার মাধ্যমে নিজেকেও রসীকৃত-করণের জন্য—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাসনা হয়—তিনি অবতীর্ণ হবেন ধরাতলে। এবং তাই তিনি উক্ত পিতা, মাতা ও বন্ধুস্বজনাদি সকলেরই আবির্ভাব ঘটান ধরাতলেও।

২। উক্ত প্রকার নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপদুহিতারা যখন আবির্ভূতা হন লোকমধ্যে, তখন বিশেষ ক'রে তথায় প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন "শ্রুতি"গণ; কারণ গোপ-দুহিতাদের কামনা-অনুযায়ী তাঁরাও কামিতা। এবং পোতর্জ্জকে হয়েছিলেন "মুনি-"গণ; কারণ দণ্ডকারণ্যবাসী সীতাসখা শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীবিলাস-দর্শনে তাঁরাও হয়েছিলেন তৎ-কাম-কামিত। স্বকীয় সাধন অনুসারে সিদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়ে "শ্রুতি"-গণ ও মুনিগণ জন্ম নেন অন্যান্য গোপ-মিথুনদের গৃহে গৃহে।

৩। এবং ভগবতী "যোগমায়া"—যিনি শ্রীভগবানের অশেষ-বিশেষ দুর্ঘট-ঘটনা-পটীয়সী নিরুপমা শক্তি,—তিনিও ভগবৎ-প্রেরিতা হয়েই, এবং তাঁকেই অঙ্গীকার ক'রে অলক্ষ্য-বিগ্রহেই অবতীর্ণ হন—তত্র।

৪। সেইখানে—সেই বৃহদ্বনে—শ্রীভগবানের অবতরণের পূর্ব্বেই অবতীর্ণ হন শ্রীনন্দাদি সকলে। শ্রীভগবানের অবতরণের পরে অবতীর্ণ হন ভগবানের নিত্যসিদ্ধ সখাগণ ও প্রেয়সীরা। অতঃপর অবতীর্ণ হন দ্বিবিধ সাধনসিদ্ধেরা।

৫। এই ধারায়, যখন ধরায় আসন্ন হ'য়ে এল ভগবানের অবতার-কাল তখন, বহুকাল পরে কান্ত ফিরে এলে কান্তা-র যেমন হয় তেমনি বিপুল আনন্দে পুলকিতা হয়ে উঠলেন পৃথিবী; ভগবৎ-উপাসকদের মনগুলির মত ভুবন আমোদিত ক'রে হর্ষ-প্রসন্ন হয়ে উঠলেন সর্ব-পদার্থ-স্রষ্টী সলিল; পাঞ্চজন্য শঙ্খের মত দক্ষিণাবর্ত্ত হয়ে সমুজ্জ্বলন জ্বলে উঠলেন অগ্নি; ভগবৎ-জনের আলিঙ্গনের মত স্নিগ্ধ-শীতল ও মধুর হয়ে গেলেন বিশ্বপাবন পবন; ভগবৎ-ভক্তের হৃদয়ের মত নৈর্ম্মল্য-পুষ্ট হলেন আকাশ; এবং হরিভক্তদের জন্মের মত নিত্য সুফল-দাতা ও নিরাকুল হয়ে উঠলেন বিটপিকুল।

মনে হল, যেন চুল পেকে এসেছে দেবদ্রোহী অসুরদের পরমায়ুর; মনে হল যেন স্বর্গবাসী সুরদের আশালতাগুলি ফলোন্মুখী হয়ে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে; মনে হল যেন শ্রীহরির প্রসাদতৃপ্ত হয়ে ভাগবতদের মনোবৃত্তিগুলির মত প্রসন্না হয়ে পড়লেন দিকগুলি। মণিমন্ত্রৌষধির বলে উদ্ধত বিষের মত, কোথায় যেন অকস্মাৎ ধরণীপৃষ্ঠ থেকে সব চলে গেল রোগ, পাপ ও সমস্ত অপরাধ। শান্ত হয়ে গেল প্রাণীদের দুঃখ, কল্যাণ এল বিশ্বজনের মনে, পৃথিবীর মনুষ্যের অঙ্গলতায় জাগল মঙ্গল-তারুণ্যের প্রবর্ত্তনা, উল্লসিত হয়ে উঠল বিশ্বের গুণী হৃদয়, ফল ধরল বিশ্ববাসীর সুকৃত, এবং উন্মীলিত হল চক্ষুষ্মানদের অর্দ্ধবদ্ধ দর্শন-পথ।

৬। পরিপূর্ণ ও মঙ্গলময় গুণাবলীর বিকাশে, দূষণ-সঙ্কোচশূন্য হয়ে যখন অবসন্ন হয়ে আসছেন দ্বাপর যুগ তখন ধীরে ধীরে নিবিড় জলদজনের আশ্রয়স্বরূপ সমাগত হল একটি ভাদ্রমাস। এবং তারপরে, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অপক্ষেপহীন ও পরহিতকর রসময় সময়ে, যখন চন্দ্রদেব অবস্থান করছেন সর্বগুণারোহিণী রোহিণীতে, তখন আয়ুষ্মতী যোগে উৎসবদায়িনী রজনীর মধ্যভাগে স্ব-প্রকাশ প্রাদুর্ভাব

রূপ নয়, অঙ্গের আভরণই আকৃষ্ট করল চোরকে। নিমাইকে কাঁধে তুলে নিল। মনে মনে স্থির করল, বাড়ি নিয়ে গিয়ে শিশুর পা থেকে খুলে নেব গয়না, তারপর শিশুকে দূরে নির্জনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। যদি বা তাতে বাধা পড়ে, শিশুকেই সরিয়ে দেব সংসার থেকে।

পথ দিয়ে লোক চলছে কাতার দিয়ে। কেউ কিছু সন্দেহ করছে না। কি করে বা করবে! নিমাই যে একটুও টুঁ করছে না, পরম নিশ্চিন্তে কাঁধের উপর বসে পা ঝুলিয়ে চলেছে। সবাই ভাবছে যার শিশু সেই বুঝি নিয়েছে কাঁধে করে, শহর ঘুরে চলেছে গাঁয়ের দিকে। কাঁধে চড়ে কেমন গরব করে চলেছে দেখ না।

তবু কারু-কারু বুঝি সন্দেহ হল। অমন লোকের কাঁধে এমন কনকের পুত্তলি! জিগগেস করে, 'কোথায় চলেছ খোকা!'

হাসি-হাসি মুখে নিমাই বলে, 'বাড়ি চলেছি।'

অমন স্বচ্ছ-সরল মুখে কথা বলছে যখন, অমন অকুণ্ঠ কণ্ঠে, তখন আর সন্দেহ কি।

এ দিকে, নিমাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, শচী আর জগন্নাথ পাগলের মত হয়ে পড়েছেন। শুধু বাপ-মা নয়, এ-পাড়া ও-পাড়া। খোঁজ, খোঁজ, চার দিকে লোক ছুটোছুটি করতে লাগল, কিন্তু কোথায় নিমাই। কোথায় সকলসুন্দর সহজসুন্দর গৌরহরি।

'আর কদ্দূর বাড়ি?' জিগগেস করল নিমাই।

'এই তো এসে পড়েছি। আর দেরি নেই।'

কিন্তু, ও কি, পথের ঠিক ঠাহর পাচ্ছে না চোর। না, এই তো পথ—এই তো, এই দিক দিয়েই তো। চোর দ্রুত করল পদক্ষেপ।

'এই যে বাবা, বাড়ি এলাম।' চোর কাঁধ থেকে নামাল নিমাইকে।

এ কি, এ যে শচীর ঘরের দরজায়ই নিমাইকে নামিয়ে দিয়েছে। ওরে, তোকে কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, কে আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল! ব্যাকুল বাহুতে শিশুকে জড়িয়ে ধরলেন জগন্নাথ।

'বা, এই যে একটা লোক কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে, কত দূর নিয়ে গিয়েছিল, কত পথ হেঁটে-হেঁটে, ঘুরে-ফিরে আবার এইখানেই রেখে গেল দেখছি।'

কোথায় সেই চোর?

বৈষ্ণবী মায়ায় সে কি পথ হারিয়েছে, না কি বৈষ্ণবী কৃপায় সে পথ পেল?

নারায়ণ যার কাঁধে এসে উঠলেন তার আর পথ পেতেই বা বাকি কি, ঘর পেতেই বা দেরি কোথায়!

[ ক্রমশঃ।

# কলঙ্কিনী

### বিমলচন্দ্র সরকার

তোমাকে দেখলাম—ইডেনের ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে আছ।
উদ্‌ভ্রান্ত, মমতা ভরা দৃষ্টি পৃথিবীর চারিদিকে মেলে ধরেছ।
হাতে একটি পাত্র, পয়সা চাইছ: একটি পয়সা।
একখানা শত-ছিন্ন শাড়ীতে লজ্জা ঢেকেছ কোনভাবে
এলায়িত চুল, সঁাথির সীমন্তে সিঁদুর,
যেন শুকতারার মত নিষ্প্রভ নিথর!
রোদে পুড়ে, জলে ভিজে দেহখানা যেন
তোমার একটি পোড়া কাঠ হয়ে গেছে।
এই দেহেও একদিন ছিল যৌবন।

হেমন্তের স্বপ্নভরা সোনার কামনা
আর ছিল বাঁচার সংগ্রামী সাধনা।
এক নব দম্পতী তোমার দিকে চেয়ে
নীরবেই হেঁটে চলে গেল বহু দূরে।
ওদের মত বাঁচার সাধ, আশার স্বপ্ন একদিন
দাম্পত্য জীবনের নীড় বাঁধবার স্বপ্ন রঙ্গিন
তোমার বুকেও কি নীরবে ঘুমিয়ে ছিল না?
ঘর বাঁধবে ত্বজনার ভালবাসায়
একান্ত মমতায় মাটির সীমানায়।

এক স্বার্থপর পুরুষ কামনায় উন্মত্ত হয়েই
তোমার কুমারীত্বকে করেছিল কলঙ্কিত—
সেই লালসার চিহ্ন, ক্ষতের মত বুকে বয়ে
কলঙ্কিনী মেয়ে, পথে দাঁড়িয়েছ ভিখিরিণী হয়ে!
তোমাদের বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাসে কি
সমাজ-জীবনের পঙ্কিল এই অধ্যায়—
কোন দিন—মুছে, মুছে যাবে না?

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

৭৬। উক্ত হল শ্রীবৃন্দাবনের অখিল বৃত্তান্ত। বৃত্তান্তগুলি অলৌকিক হলেও লোক-মধ্য-পাতিত্ব তাঁদের স্বীকৃত; মাংসচক্ষু জনতা তাঁদের লৌকিকের মত ক'রে ছাখেন; নয়নের দোষ থাকলে শাদা শাঁখও হলদে হয়।

কিন্তু···ভগবদিচ্ছাই প্রবল: তাই—এই গোকুলে নিত্য বিরাজ করেন তুটি অধীশ্বর। একজনের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণের পিতৃভাব-মঙ্গল; তিনি 'নন্দ'।

আর এক জনের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণের মাতৃভাব-মঙ্গল; তিনি "যশোদা।"

তাঁদের কোলে শিশুর মত জন্ম নিতে নিতে, আনন্দে ডগমগ করেন—নিত্যকিশোর। যিনি ভগবৎ-শ্রেষ্ঠ, যিনি লীলানিধি, তাঁর লীলার অসাধ্য কি কিছু রয়েছে?

৭৭। এবং ভগবানের লীলানিধিত্বই প্রবল; তাই—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নন্দ-যশোদার প্রসিদ্ধ বাৎসল্যরসটিকে আমোদিত করবার উদ্দেশ্যে, পালন ও লালনের আনুকূল্যে শিশু হয়ে, অলৌকিক সমস্ত ভাবের মাধ্যমে জগতে হন সলৌকিক।

অ-লোক হলেও কেবল তাঁতেই ঘটতে পারে···গো, লোক ও গোপীদের নিয়ে তাঁর বিলাস।

লোক-ব্যতীত···শোভাই হইতে পারে না, তাঁর বাল্যাদি লীলা এবং অসুরনাশ-লীলা।

ইতি আনন্দ-বৃন্দাবনে ভগবৎ-স্থানতত্ত্বাবলী নামক প্রথম স্তবক।

## দ্বিতীয় স্তবক

১। তারপরে—

(১) পিতা শ্রীনন্দ ও মাতা শ্রীযশোদার, তথাবিধ সৌভাগ্যের সংবর্দ্ধনের জন্য; এবং—

(২) রাজন্য লক্ষণ অসুরদলপতিদের পদভরে ভগ্নপ্রায় ধরিত্রীদেবীর নিদারুণ যন্ত্রণা দর্শনে ব্যথিত-হৃদয় হ'য়ে ব্রহ্মা যখন ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণুর নিকটে পরিত্রাণার্থ ও অবতারার্থ নিবেদন জানান, তখন তদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য ও লৌকিকলীলার মাধ্যমে নিজেকেও রসীকৃত-করণের জন্য—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাসনা হয়—তিনি অবতীর্ণ হবেন ধরাতলে। এবং তাই তিনি উক্ত পিতা, মাতা ও বন্ধুস্বজনাদি সকলেরই আবির্ভাব ঘটান ধরাতলেও।

২। উক্ত প্রকার নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধিকা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপদুহিতারা যখন আবির্ভূতা হন লোকমধ্যে, তখন বিশেষ ক'রে তথায় প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন "শ্রুতি"গণ; কারণ গোপ-দুহিতাদের কামনা-অনুযায়ী তাঁরাও কামিতা। এবং প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন "মুনি-"গণ; কারণ দণ্ডকারণ্যবাসী সীতাসখা শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীবিলাস-দর্শনে তাঁরাও হয়েছিলেন তৎ-কাম-কামিত। স্বকীয় সাধন অনুসারে সিদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়ে "শ্রুতি'-গণ ও মুনিগণ জন্ম নেন অন্যান্য গোপ-মিথনদের গৃহে গৃহে।

৩। এবং ভগবতী "যোগমায়া"—যিনি শ্রীভগবানের অশেষ-বিশেষ দুর্ঘট-ঘটনা-পটীয়সী নিরুপমা শক্তি,—তিনিও ভগবৎ-প্রেরিতা হয়েই, এবং তাঁকেই অঙ্গীকার ক'রে অলক্ষ্য-বিগ্রহেই অবতীর্ণ হন—তত্র।

৪। সেইখানে—সেই বৃহদ্বনে—শ্রীভগবানের অবতরণের পূর্ব্বেই অবতীর্ণ হন শ্রীনন্দাদি সকলে। শ্রীভগবানের অবতরণের পরে অবতীর্ণ হন ভগবানের নিত্যসিদ্ধ সখাগণ ও প্রেয়সীরা। অতঃপর অবতীর্ণ হন দ্বিবিধ সাধনসিদ্ধেরা।

৫। এই ধারায়, যখন ধরায় আসন্ন হ'য়ে এল ভগবানের অবতার-কাল তখন, বহুকাল পরে কান্ত ফিরে এলে কান্তা-র যেমন হয় তেমনি বিপুল আনন্দে পুলকিতা হয়ে উঠলেন পৃথিবী; ভগবৎ-উপাসকদের মনগুলির মত ভুবন আমোদিত ক'রে হর্ষ-প্রসন্ন হয়ে উঠলেন সর্ব-পদার্থ-স্রষ্টা সলিল; পাঞ্চজন্য শঙ্খের মত দক্ষিণাবর্ত্ত হয়ে সমুজ্জ্বলন জ্বলে উঠলেন অগ্নি; ভগবৎ-জনের আলিঙ্গনের মত স্নিগ্ধ-শীতল ও মধুর হয়ে গেলেন বিশ্বপাবন পবন; ভগবৎ-ভক্তের হৃদয়ের মত নৈর্ম্মল্য-পুষ্ট হলেন আকাশ; এবং হরিভক্তদের জন্মের মত নিত্য সুফল-দাতা ও নিরাকুল হয়ে উঠলেন বিটপিকুল।

মনে হল, যেন চুল পেকে এসেছে দেবদ্রোহী অসুরদের পরমায়ুর; মনে হল যেন স্বর্গবাসী সুরদের আশালতাগুলি ফলোন্মুখী হয়ে পৃথিবীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে; মনে হল যেন শ্রীহরির প্রসাদতৃপ্ত হয়ে ভাগবতদের মনোবৃত্তিগুলির মত প্রসন্না হয়ে পড়লেন দিক্‌গুলি। মণিমন্ত্রৌষধির বলে উদ্ধৃত বিষের মত, কোথায় যেন অকস্মাৎ ধরণীপৃষ্ঠ থেকে সব চলে গেল রোগ, পাপ ও সমস্ত অপরাধ। শান্ত হয়ে গেল প্রাণীদের দুঃখ, কল্যাণ এল বিশ্বজনের মনে, পৃথিবীর মনুষ্যের অঙ্গলতায় জাগল মঙ্গল-তারুণ্যের প্রবর্ত্তনা, উল্লসিত হয়ে উঠল বিশ্বের গুণী হৃদয়, ফল ধরল বিশ্ববাসীর সুকৃত, এবং উন্মীলিত হল চক্ষুষ্মান্‌দের অর্দ্ধবল দর্শন-পথ।

৬। পরিপূর্ণ ও মঙ্গলময় গুণাবলীর বিকাশে, দূষণ-সঙ্কোচশূন্য হয়ে যখন অবসন্ন হয়ে আসছেন দ্বাপর যুগ তখন ধীরে ধীরে নিবিড় ভক্তজনের আশ্রয়স্বরূপ সমাগত হল একটি ভাদ্রমাস। এবং তারপরে, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অপক্ষেপহীন ও পরহিতকর রসময় সময়ে, যখন চন্দ্রদেব অবস্থান করছেন সর্বগুণারোহিণী রোহিণীতে, তখন আয়ুষ্মতী যোগে উৎসবদায়িনী রজনীর মধ্যভাগে স্ব-প্রকাশ প্রাদুর্ভাব লীলায় আবির্ভূত হলেন যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। যিনি পূর্ণানন্দ

তিনি এলেন। জীবের ন্যায় তাঁর জননী-জঠর সম্বন্ধ ও বন্ধন ছিল না বলেই তিনি এলেন। অনুরূপ বিলসিত করুণার বিতরণের নিমিত্তই তিনি এলেন, চাঁদ যেমন লীলাভরে নাচতে নাচতে আসেন—পূর্বদিগঙ্গনার কোলে।

জন্ম-জন্মান্তরের তপঃ সৌভাগ্যের ফলে শ্রী"বসুদেব" ও "দেবকী" উপলব্ধি করেছিলেন, একদিন তাঁরা পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভ করবেন শ্রীভগবানের। তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বাসুদেব-স্বরূপে তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে ক্ষণকালের জন্য জুড়িয়ে দেন তাঁদের দুজনের স্তনন্ধয়ত্বের অভিমান। এবং ততঃপর শ্রীগোবিন্দ-স্বরূপে নিত্যসিদ্ধ পিতৃমাতৃভাব-ভাবুক শ্রীনন্দ ও যশোদাদেবীর স্বীকার করেন তনয়ত্ব।

৭। তারপরে, কংসের ভয়ে যে 'বাসুদেব-স্বরূপটিকে নিয়ে এসেছিলেন শ্রীবসুদেব সেই বাসুদেব-স্বরূপের সঙ্গে যখন শ্রীগোবিন্দ-স্বরূপের ঐক্য ঘটে যায় তখন বাসুদেব-স্থ "শঙ্খচক্রাদি" চিহ্নগুলি আপনা হতেই বিরাজ করতে থাকেন শ্রীগোবিন্দ-স্বরূপের করতলে ও চরণতলে। "কৌস্তুভ," "বেণু" ও বনমালা,···যাঁরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে, তাঁরাও সময়ের প্রতীক্ষায় অবস্থান করতে থাকেন অলক্ষ্যভাবেই।

৮। পূর্ব্বেই, নৃশংস কংসের ভয়ে ভীত হয়ে, দেবকী ব্যতীত অন্য ভার্য্যাদের স্থানান্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন শ্রীবসুদেব। তখন তিনি তাঁর প্রিয়সুহৃদ্ শ্রীব্রজরাজের ভবনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরোহিণীদেবীকে। দেবকীর সপ্তম-গর্ভে যখন অবতরণ করেন ভগবানের ধাম-বিশেষ "শ্রীসঙ্কর্ষণ" তখন ভগবানের ইচ্ছানুক্রমেই শ্রীরোহিণীদেবীর গর্ভে তাঁকে প্রাপিত করেছিলেন ভগবতী "যোগমায়া"। শ্রীভগবান অবতীর্ণ হবার পূর্ব্বেই শ্রীরোহিণী দেবী যথাসময়ে ব্রজরাজ-ভবনে জন্মদান করেছিলেন শ্রীসঙ্কর্ষণের।

৯। তারপরে—ভবিষ্যতে, মধুর চরিতাবলীর দাক্ষিণ্যে আত্মারাম মুনিদের ভক্তিযোগে প্রবর্ত্তিত করবার অভিপ্রায় নিয়ে নানান্ লীলারস-রচনার মাধ্যমে নিজের ভক্তদের আনন্দিত করবার বাসনা নিয়ে এবং দৈত্যসৈন্যের পদভরে অতিভারাক্রান্ত ধরণীকে বীতভার করবার উদ্দেশ্য নিয়ে, ব্রজপতি-গৃহে জন্মলাভ করেন মূর্ত্তানন্দ শ্রীভগবান,—প্রাকৃত একটি শিশুর মত।

১০। এই আবির্ভাবই যেন একটি ঐশ্বর্য্য।

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্পাদনা করতে লাগলেন যোগমায়া"র।

সূতিকাসদনের মণিভিত্তিগুলি ভেদ করে ফুটে উঠল তাঁর স্নিগ্ধ শরীরের শোভা। শোভার প্রতিবিম্বের ছলনায় তিনি যেন একটি একটি করে গড়ে দেখিয়ে দিতে লাগলেন সচ্চিদানন্দ গুণগুলির কায়-ব্যূহ। আর সেই সূতিকাসদনটিকে পরম রমণীয়তার সেই খনিবিশেষটিকে ফুল-গন্ধে-পরাজিতা অপরাজিতার সেই লতামণ্ডপটিকে তিনি আনন্দিত করে তুললেন সৌন্দর্য্যে।

১১। এবং তারপরে তিনি সেই সদানন্দ-সরস প্রসিদ্ধ ওজঃস্বরূপ প্রকট হলেন যশোদার ক্রোড়ে; নীলপদ্মের মত।

এ নীলপদ্মকে আঘ্রাণ করেনি কোনো ভ্রমর; এর সৌরভটিকে চুরি করেনি কোনো বাতাস, এর জন্ম হয়নি কোনো জলে, একে স্পর্শ লাগেনি কোন ঢেউ-এর কোন কণায়, একে দেখেননি কেউ কোথাও।

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সূতিকাগৃহের সর্বত্র, পরিজনেরাও নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। তার পর সদ্যোজাত শিশুদের ক্রন্দনের মত একটি সরস ক্রন্দন তুললেন বালকরূপী শ্রীহরি।

এই কি তবে ওঁকার!

ওঁকারই কি তবে, মহৎ লীলোৎসব কর্মের পূর্ব্বেই ভগবানের কণ্ঠের উপকণ্ঠে এসে, সূচনা করে দিয়ে গেলেন মঙ্গল? উত্থিত হয়েছে কলরোদনের ধ্বনি, আর জেগে উঠেছেন ব্রজপুরের পুরন্ধ্রীরা। চোখ মেলতেই তাঁরা দেখতে পেলেন তাঁকে! চিৎ হয়ে তিনি শুয়ে রয়েছেন আধ খোলা আঁখি। আশ্চর্য, এমন চুকচুকে গা কেমন করে হল! বলি, কে মাখাল গন্ধতেল? কে ঢালল কস্তুরী? তবে কি এঁকে স্নান করিয়ে গেছেন মাধুর্য্য, গা মেজে গেছেন লাবণ্য, চন্দন মাখিয়ে গেছেন সৌন্দর্য, গয়না পরিয়ে গেছেন ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী? আহা, এ যেন একেবারে নতুন খনির নীলকান্তমণির অঙ্কুর! তমালের একটি পল্লব, নবীন মেঘের উপরাগ, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর কস্তুরিকৌটা, সৌভাগ্যসম্পদের সিদ্ধাঞ্জন। আঁতুড়ঘরের পিদ্দিমের শিখার মত দেখতে চাঁপাফুলের অর্ঘ্য দিয়ে এঁকে কি এই পূজা করে গেলেন ভবনদেবী? আহা, কচি কচি পীতার মত মরি মরি কী গায়ের জ্যোতিঃ! জ্যোতিঃ লেগে আঁতুড়ের প্রদীপগুলোর চেহারাও হয়ে গেছে নীলপদ্মের কুঁড়ির সামিল?

ছেলেই বটে। দেখেছেন, এরি মধ্যে কপালে ঠেকেছে ভাঙা ভাঙা চুল! কী নরম, কী তুলতুলে হাতের আঙুল! কর মুঠো করে রয়েছেন। যেন উনি লুকিয়ে রাখছেন ভগবল্লক্ষণ মৎস্যাঙ্কুশাদি চিহ্ন। একটি ক্রন্দনেই যেন দূর হয়ে গেছে আঁতুড় ঘরের সমস্ত বালাই।

১২। পুরন্ধ্রীদের হর্ষধ্বনিতে জেগে উঠলেন জননী। এবং ছেলে হয়েছে জেনে যেই নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়লেন দেখতে, অমনি ছেলের তনুটিতে তিনি দেখতে পেলেন প্রতিবিম্বিতা নিজেকেই। এ আবার কার ছায়া পড়ল? দূর হ যাঃ। ভয়-ত্রাসে যেই তাড়াতে গেছেন অমঙ্গলে ছায়াটাকে, অমনি ছায়া সরে যায় আর তিনি দেখতে পান ছেলের মুখ।

নিঃসীম হর্ষাবেশে! ভুলে যান ত্রাস, চোখের জল হয়ে অজস্র বিন্দুতে ঝরে পড়ে স্নেহ; ছেলের গলায় যেন মুক্তা-মালার ভেট।

১৩। এই কি তাঁর ছেলে?

···এ তো এক আঁজলা কস্তুরীর পাঁক। সুধার সাগর যদি শ্যামলবরণ হয়, তবে এ যেন তার মন্থন করা এক খাব্‌লা ননী। এ যেন মৃগমদের শ্যাম-রস-মাখানো এক খামি দুধের ফেনী।

নিজের গা কোমল, তবু তাঁর মনে হয়, এমন কঠিন কোলে কেমন করে শোয়াই। কেমন যেন ভয় হয়। কিন্তু সে ভয় এক পলকের। পয়োধর থেকে ততক্ষণে ঝরে পড়ছে স্নেহের ক্ষীর। নিজের দেহটিকে বাঁকিয়ে ছেলের অধরপুটে তিনি তুলে দিলেন স্তনবৃন্ত। দুগ্ধ পান করালেন ছেলেকে।

১৪। ভিড় জমিয়ে ফেললেন ব্রজপুরের পুরন্ধ্রীরা। তাঁরা শ্রী যশোদাকে শিখিয়ে দিলেন, কেমন করে ছেলেকে স্তন দিতে হয়।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

আলোকচিত্র—বিশু মুখোপাধ্যায়

আলিম্পন

—মণ্টু মল্লিক

গঙ্গাতীর

—গোবিন্দলাল দাস

তিস্তাতীর

—মনোজিৎ মৈত্র

পিকিনিজ

—রথীন ভাদুড়ী

দে দোল দোল

—নির্মলকুমার দে

প্রতীক্ষা

—মোহন চক্রবর্তী
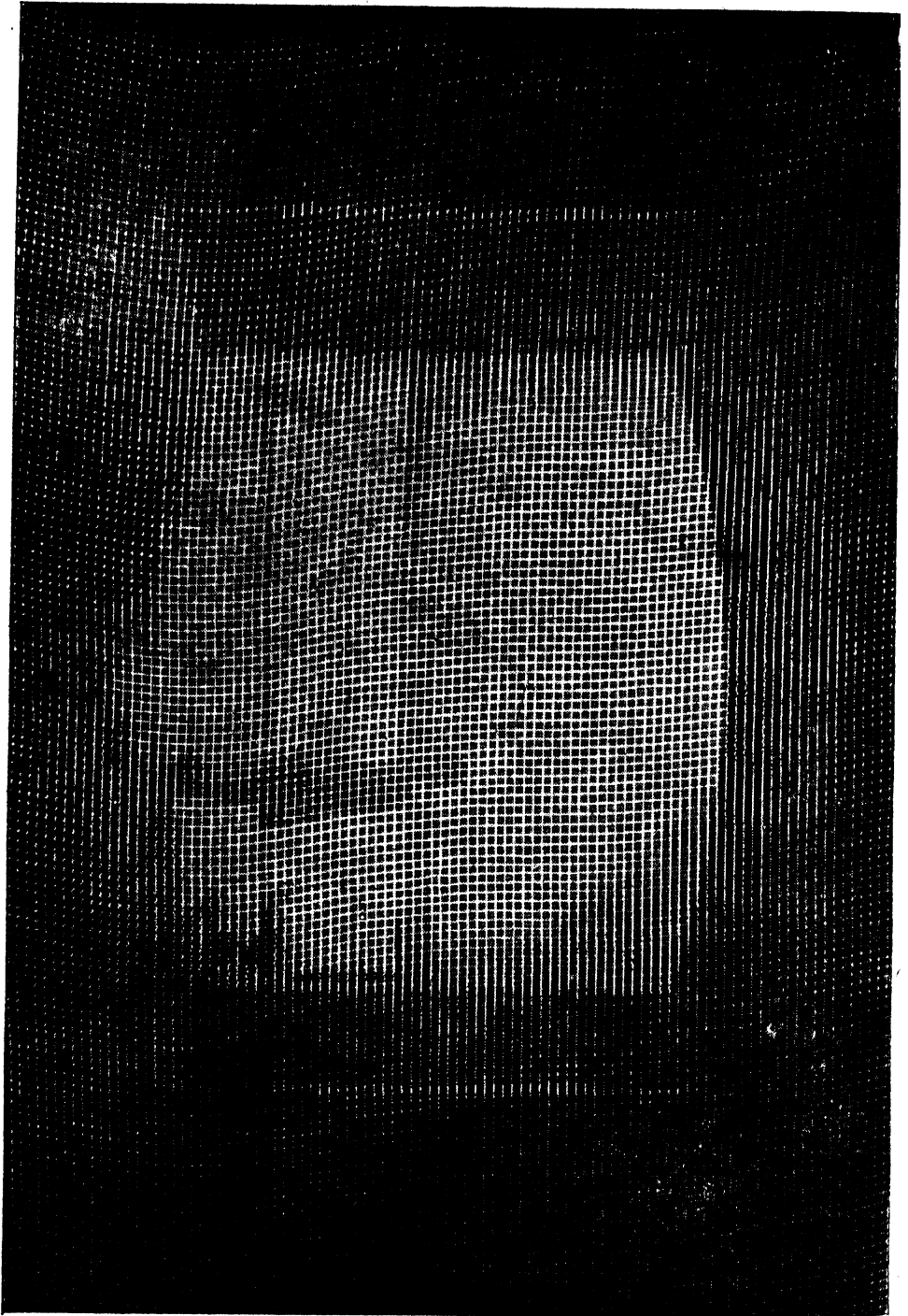
শিখে নিয়ে শ্রীযশোদা তখন নিজের কোলের উপর ছেলেকে যথারীতি শুইয়ে আবার দিলেন দুধ; স্নেহের আবেগে অনর্গল ঝরে পড়তে লাগল মূর্ত্তিমান অমৃতরসের মত স্তন-ক্ষীর।

কিন্তু অত দুধ নিঃশেষে পান করবে কেমন করে ছেলে! কচি কচি বাঁধুলি ফুলের মত লাল টুকটুকে ঠোঁটের কষ গড়িয়ে উথলে পড়ছে দুধ, ভাসিয়ে দিচ্ছে গালের তলা। অতি-মিহি কাপড়ের আঁচল দিয়ে শ্রীযশোদা অমনি মুছিয়ে দিলেন গাল, বন্ধ করলেন দুধ-খাওয়ানো। তারপর সমস্ত আদর দিয়ে, সমস্ত স্নেহ দিয়ে দেখতে লাগলেন ছেলেকে। গভীর বিস্ময় ঘনিয়ে এল তাঁর নয়নে।

১৫। কচি কচি সারা দেহ,—এ কি তবে নীলকান্তমণি দিয়ে গড়া? ঠোঁট দুটি কি কুরুবিন্দের? হাত-পা কি পদ্মরাগের? শিখরমণির কি নখর?—হঠাৎ জননীর মনে হল তাঁর শিশুটিই বুঝি মণিময়।

আবার পরক্ষণেই মনে হল,—

না, না, ফুলে ফুলে ফুলময়
এ কে গড়ল আমার তনয়!
নীলকমলের গা,
বাঁধুলির ঠোঁট,
জবাফুলের হাত পা,
ফুলের ছড়াছড়ি—
নখে হাসছে মল্লীকুঁড়ি!

হঠাৎ এক অসম্ভব তর্ক উঠল মনে—না, না, এ হতেই পারে না। এ তো আমার দেহের ফুল নয়! কিন্তু অবকাশ পেল না বিতর্ক। হঠাৎ জননীর চোখ ছুটে গেল ছেলের বুকের ডানদিকে। ও কিসের চিহ্ন! ও কি মৃণালের তন্তুচূর্ণের মত সুন্দর স্নিগ্ধ শ্রীবৎসাখ্য রোমরাজি! না বুকের দুধের ছিটে পড়ে অমন দাগ হয়ে গেছে ওখানে? চীনাংশুকের অঞ্চল দিয়ে জননী মুছিয়ে দিতে গেলেন দাগ, কিন্তু দাগ উঠল না। ধক করে উঠল মায়ের মন। তবে কি এটি মহাপুরুষের লক্ষণ? অমনি ছেলের বুকের বাঁদিকে ছুটে গেল তাঁর চোখ। সেখানেও দাগ। এ যে লক্ষ্মীচিহ্ন! যেন একটি তমালপাতার বাসায় বসে রয়েছে একটি ছোট্ট ফিকে হলুদ বাঁকপাখীর (বিহঙ্গিকা) বাচ্ছা।

না, না তাই বা কেমন করে হয়? এ তো বিদ্যুতের কুঁড়ি জড়ানো মেঘের অঙ্কুর! এতো সোনার রেখায় রাঙানো কষ্টি পাথরের টুকরো। মায়ের চোখের দেখা ফুরোতেই আর চায় না। আবার ছাখেন। ছাখেন—হাতের পাতা, পায়ের পাতা, একটু বেশী অরুণ, যেন যমুনার ঢেউ-এ ভাসছে চার-পাঁচটি পদ্মফুলের লাল পাপড়ি। কুচ্‌কুচে কোঁকড়ানো চুল; যেন অতিমাতাল একদল ভোমরা আর ঘুরঘুর করতে না পেরে নিশ্চল হয়ে ঠায় বসে পড়েছে।

কপালের উপর কুঁচো কুঁচো চুল। অন্ধতমসার যেন নব নবাঙ্কুর। জোড়া চোখে নীলপদ্মের ঘুমঘুম্ স্বপ্ন। ফুলো ফুলো গাল; যেন বুড়বুড়ি কাটছে নীলকান্তমণির জৌলুষ। কান তো নয়; যেন পান্নার লতায় দুখানি নতুন ধরা পাতা। নাকের ডগটি—আঁধার গাছের ফল; নাকের পুটটি···যমুনার বুদ্‌বুদ; ঠোঁট দুটি—দ্বিদল জবার কুঁড়ি আর চিবুকটিও কী সুন্দর! যেন টসটসে পাকা যমজ জাম···ছোটটি।

দেখতে দেখতে জননীর মনে হল,—নয়ন-নির্মাণের ফল তাঁরও বুঝি এবার পাকল; আনন্দের সাগরে তিনিও যেন এই সন্তস্নান সেরে উঠলেন।

১৬। আর ঠিক সেই একই সময়ে ব্রজরাজ শ্রীনন্দ তাঁর দুকান ভরে শুনতে পেলেন পুরন্ধ্রীদের মঙ্গল ঘোষণা—

মহাভাগ, আপনার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন।

বহুকাল ধরে অপূর্ণ ছিল ব্রজরাজের তনয়বাসনা। তাই আশাতীত এই শুভসংবাদ যেন অমৃতধারায় সিঞ্চিত করে দিল তাঁর পরুষ হৃদয়। দীর্ঘ বৈশাখের শুষ্ক পল্লল যেন পূর্ণ হয়ে উঠল অভাবিত বর্ষণে। ব্রজরাজের প্রাণে নামল পরমা নির্বৃতি।

কে যেন তাঁকে স্নান করিয়ে গেল হর্ষের বর্ষায়; হঠাৎ যেন তিনি প্রবেশ করলেন আনন্দের মহার্ণবে; হঠাৎ তাঁকে যেন আলিঙ্গনে বেঁধে ফেললেন আনন্দের মন্দাকিনী।

"ব্রহ্মানন্দ-সাক্ষাৎকা'র যেন নিজেই নিজের চমকপ্রদ মূর্ত্তি প্রকট করে প্রথমেই ব্রজরাজকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন সূতিকা-ভবনে। চাতুর্য ফলিয়ে ব্রজরাজের হস্তাবলম্ব হলেন তাঁর সুচিরসঞ্চিত "সুকৃতি"-রাশি এবং "উৎকলিকা" দেবী যেন তাঁকে পিছন থেকে ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন আঁতুড়ঘরে। দ্রুত চরণে প্রবেশ করলেন ব্রজরাজ। নিকটে গেলেন, দেখতে পেলেন তাঁর তনয়কে।

এ দর্শন—যেন ঘন আনন্দের বীজ-দর্শন;
—যেন বিশ্বমঙ্গলের মঙ্গল-জাগৃতির
অঙ্কুর-দর্শন।

১৭। নয়নের সমস্ত সুখ নিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন তাঁর তনয়টিকে, সিদ্ধাঞ্জনলতার ঐ পল্লবটিকে,—পুণ্যের নন্দন-কাননের ঐ কুসুমটিকে, উপনিষদ-কল্পলতা-বিতত্তির ঐ আশ্চর্য্য ফলটিকে।

অপরাজিতা লতার মত ঐ তো শরীর ব্রজেশ্বরীর, তাতে এমন ফুল কেমন করে ফুটল?

দেখতে দেখতে তাঁর সমস্ত সত্তায় ব্রজরাজ অনুভব করলেন একটি অলৌকিকী দশা। যেন তিনি পেয়ে গেছেন শুভ আশার সর্ব্ব সম্পত্তি; যেন তিনি সিদ্ধকাম হয়ে গেছেন আনন্দ-সাক্ষাৎকারের চমৎকারিতায়।

বিপুল সুখের আবেশে পুলকিত হয়ে উঠল তাঁর অঙ্গ। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন,···উৎকীর্ণের মত, লিখিতের মত, পুনঃ সুপ্তোত্থিতের মত। আনন্দে অশ্রু-নিপাতে স্তিমিত হয়ে এল তাঁর দুনয়ন।

তারপরে ব্রজরাজ আহ্বান করলেন উপনন্দ সনন্দ প্রভৃতি গোপশ্রেষ্ঠদের, আহ্বান করলেন তাঁর পৃথ্বীসূর্য্য পুরোধাকে। তাঁদের দিয়ে অনুষ্ঠান করলেন পুত্রের জাতকর্মাদি ক্রিয়া। এবং তারপরে স্বপুত্রের মঙ্গল-কামনায় আরম্ভ হয়ে গেল তাঁর নব-প্রসূত অসংখ্য গোবৎসের দান। প্রত্যেকটি বাছুরের সোনা দিয়ে বাঁধানো শিঙ, রূপো দিয়ে বাঁধানো খুর, গলায় জড়ানো মণিময় মাল্য। দানের প্রাচুর্যে ব্রাহ্মণগৃহগুলির প্রত্যেকটিই যেন রূপান্তরিত হয়ে উঠল সুরভিলোক। নিমেষের মধ্যেই ব্রজরাজের আদেশে প্রত্যেকটি আঙিনায় নির্ম্মিত হয়ে গেল—তিল-পর্বত, হিরণ্য-পর্বত মণি-পর্বত।

১৮। এত দান দেখলে জনতার মনে হওয়াই স্বাভাবিক,—চিন্তামণি কল্পতরু ও কামধেনু, শক্তিহীন হয়ে পড়েছেন; রত্নাকর

সমুদ্রে আর রত্ন নাই, কেবল পড়ে রয়েছে জলজন্তুগুলো, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর আর কিছুই নেই—হাতের লীলাকমলটি ছাড়া।

১৯। শ্রীব্রজপুর-পুরন্দরের শুভ কুমার আবির্ভূত হয়েছেন—দেখতে দেখতে এই জগন্মঙ্গল ধ্বনি···পথে পথে মুখে মুখে চলে বেড়াতে লাগল চতুর্দ্দিকে। তার আগেই ততক্ষণে সানন্দে উপনন্দ সন্নন্দ প্রভৃতি গোপশ্রেষ্ঠদের মুখ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছে আদেশ।

সেই আদেশমত তাঁদের পরিজনেরা ভাল ভাবে নিয়ে আসতে লাগল দুধের তৈরী যত সামগ্রী। বাঁকগুলি চমৎকার: বহুবর্ণের পট্টসূত্র দিয়ে তৈরী তাদের শিক্; বাঁকের লাঠিগুলি মণিময়; প্রত্যেক বাঁকে ঝুলছে অনেকগুলি করে মণি-ঘট। মণি-ঘটের কোনোটিতে ঘৃত, কোনোটিতে ননী, কোনোটিতে নির্জলা, কোনোটিতে আধজলা ঘোল, কোনোটিতে ছানা;—সমস্তই গব্য-রস।

দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোলে পসরা সাজিয়ে পরিজনেরাও এল, আর উপনন্দ সন্নন্দ-আদি সকলেই হাতে বুকে মাথায় বাঁধলেন মণি-মণ্ডন। হলুদছোপানো মঙ্গলবাস যথেষ্ট বলে আজ মনে হল না, তাঁরা পরলেন সোনার চাদরের কাপড়; বিদ্যুৎকে চমকে দেয় তাদের ছটা। হাতে সোনা-বাঁধানো রতন ছড়ি, উল্লাসে অধীর হয়ে উঠলেন সকলে। পরমানন্দ যেন সাগর হোলো, আর গোপেরা তার বাঁধ ভেঙে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লেন—বিরাট ঢেউ-এর মত।

২০। আর ঠিক সেই সময়ে ব্রজনগরের নাগরীরা দলে দলে আসতে আরম্ভ করে দিলেন ব্রজরাজের প্রাসাদের অভিমুখে। মনোরথের অতীত, অত্যন্ত কমনীয় একটি সংবাদ তাঁদের কানে এসে পৌঁছেচে। সেই সংবাদটিকেই কানের দুল করে তাঁরা আসতে লাগলেন। এ জন্মে এত আনন্দ তাঁরা পাননি। এ আনন্দ যেন সুরভির মত কোমল।

পড়ে রইল ঘরের কাজ। ললিতকণ্ঠে নেচে উঠল মণি-হার। হার মানাল উতরোল উৎকণ্ঠা। তরল দ্যুতি হানতে লাগল খণ্ড খণ্ড মাণিক্য। কন কন করে অখণ্ডমঞ্জিমায় বাজতে লাগল কঙ্কণ। সুখের সোহাগে চমকাতে লাগল বাজুবন্ধের হীরে।

সারা গায়ের গয়না যেন কথা কয়ে বলছে 'আমায় দেখ, আমায় দেখ।'

মণিমঞ্জুষিকায় এত কাল সংরক্ষিত ছিল যে সব মহার্ঘ মেখলা, তারাও আজ যেন পূজা করতে লাগল নিবিড় নিতম্ব, আরোহণ মঙ্গল বাজাতে লাগল ছোট্ট ছোট্ট ঘুন্টি।

বিলোলকবরী নাগরীরা মরালগতিতে আসতে লাগলেন। হেলতে দুলতে সোনার মঞ্জীর পায়ে পায়ে বাজে ঝনঝন।

তাঁরা দেখতে এলেন শ্রীকেশবকে; যিনি সদ্য আবির্ভূত, যিনি আপন জ্যোতিঃতে আপনি আলো।

শুধু হাতে কেমন করে আসবেন? প্রত্যেকেরই হাতে কাঞ্চন-থালা। মঙ্গলারতির ফল ফুল দই দূর্বা আতপ চাল মণিদীপ সবই সাজানো রয়েছে তাতে। হলুদবরণ চীনে খোঞ্চেপোষের সূক্ষ্মতায় সোনার থালা ঢাকা।

ঝম্ ঝম্ করে মণি-নূপুরে ঝঙ্কার তুলে, দশ দিক মুখরিত করতে করতে তাঁরা প্রবেশ করলেন রাজসদনে।

২১। তারপরেই সোজা পৌঁছে গেলেন সূতিকা-ভবনে। পৌঁছেই দেখতে পেলেন,—অভিনবটিকে, নয়ন সার্থক নবীন ফলটিকে, মহৌষধির সম্বিৎ-বিধায়ক ঐ পল্লবটিকে। মনে হল একটি নীল মহোৎপল যেন তাঁদের বাৎসল্য-সরোবরে ভাসছে।

ফুলের মত তাঁরা বর্ষণ করলেন আশীর্ব্বাণী—চিরজয়ী হও, চিরজয়ী হও।

অর্চ্চনা-ভরা চোখে আর পলক পড়ে না কারো। গড়িয়ে যায় বেলা।

ব্রজেশ্বরীর সৌভাগ্যসারই শরীরী হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন···এই ভেবে তাঁরা প্রথমে সকলে মিলে স্তব করতে লেগে গেলেন ব্রজেশ্বরীকেই। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে তাঁরা সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে এসে বসে পড়লেন অলিন্দে, এবং আরম্ভ করে দিলেন মঙ্গলগান। সঙ্গীতির সুরীতিতে কমনীয় হয়ে উঠল তাঁদের কমলমুখ এবং মনে হল কমলের অভ্যন্তরে বুঝি গুঞ্জনমধুর ঝঙ্কার তুলে মোহনীড় বিরচন করেছে ভ্রমরেরা।

তারপরে যখন অতি কৌতুকের আবেশে প্রণয়ভরে তাঁরা এ ওর মুখে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন পদ্মফুল; যখন, মাখিয়ে দিতে লাগলেন গন্ধতেল, হলুদজল, আর থামি থামি ননী; যখন, বাঁধুলি ফুলকে হার মানিয়ে নাচাতে লাগলেন রাঙা ঠোঁটের পাতা; যখন পাতার উপর খেলাতে লাগলেন জ্যোৎস্না-জয়ী হাসি;—তখন মনে হল ব্রজ-নাগরীরা যেন খর্ব্ব করে ফেলেছেন ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরও সৌভাগ্য-গর্ব্ব।

এবং সেই সময়ে, সেই অঙ্গনভূমিতে, ব্রজপুরপুরন্দরের সমীপে দলে দলে উপস্থিত হয়ে গেলেন ব্রজধামের প্রসিদ্ধ গোপবৃন্দ। পরমানন্দে তাঁরা বিভোর। সে কী আনন্দের প্রমত্ততা! তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে নির্ভয়ে ছুড়ে মারতে লাগলেন চন্দ্র-গোলকের মত পিণ্ড পিণ্ড ননী, বড় বড় করকার মত ছানার গোলা, আর দধিসমুদ্রের কাদা তুলে তুলে জ্যোৎস্নার মত চাপ চাপ দই।

সকলের হাতেই মণিময় পিচকারী; সকলেই ভরছেন দই দুধ মাঠা আর ঘোল; সকলেই মেশাচ্ছেন গলানো সোনার মত হলুদ-পেষা জল; সকলেই মেশাচ্ছেন মহাসুগন্ধি তেল; আর তার পর এ ওর গায়ে, ও এর গায়ে ধারাবর্ষণ!

আর সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে নাচ! মৃদু মৃদু বাজতে থাকে মৃদঙ্গ পণব ডমরু আর ঝর্ঝর। ঢিম্ ঢিম্ বাজতে থাকে মর্দল, জয়ঢাক, মঙ্গলভেরী। বিচিত্র বাদিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরি মুখে ফুটতে থাকে মঙ্গল-সঙ্গীত, সঙ্গীতের ফাঁকে ফাঁকে বিশেষ ক'রে উঠতে থাকে চর্চ্চরিকা দ্বিবাদিকা জম্ভলিকা প্রভৃতি গীতচ্ছন্দের ভেদ। গোপেদের অনভ্যস্ত কণ্ঠেও সাক্ষাৎ তাঁরা নেমে এলেন; এই ছন্দগুলি সহসা। এবং আহ্লাদে ভরিয়ে দিলেন ব্রজরাজকে, ভরিয়ে দিলেন অপূর্ব আবির্ভাব কুমারকে।

২২। এবং এর মধ্যে উঠতে লাগল ব্রাহ্মণদের মঙ্গলাশীষ বেদ-নির্ঘোষ।

জনতার সহস্রমুখ থেকে উদ্গীর্ণ হতে লাগল জয়-জয়-ধ্বনি।

চারুনট চারণদের মুখ থেকে,
কৌল-কীর্ত্তনীয়া 'মাগধ'-দের মুখ থেকে,
পুরাণ-বক্তা 'সূত'-দের মুখ থেকে,
রাজস্তুতি পাঠক "বন্দী"-দের মুখ থেকে,

ফুলের তোড়ার মত বেরিয়ে আসতে লাগল—স্তবগান।
নাদব্রহ্মময় হয়ে গেল সমস্ত সময়।

[ক্রমশঃ।

## শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

[ বর্ষীয়ান বরণীয় সাহিত্যশিল্পী ]

বিংশ শতাব্দী তখন চোখ মেলেছে। চোখ মেলেছে, তবে প্রথম দশকের সীমা তখনও তার অনতিক্রান্ত অর্থাৎ সে আজ অর্ধশতাব্দী কাল আগের কথা—বাঙলার সাহিত্যের আকাশে তখন দ্বাদশ আদিত্যের শক্তি নিয়ে নবযুগের বাল্মীকি কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ বিরাজমান। বাঙলাদেশ ধন্য হচ্ছে বহু শক্তিমান সাহিত্যশিল্পীর শুভ আবির্ভাবে। বাঙলাদেশে নতুন করে জন্মাচ্ছে সাহিত্যচেতনা। তখনকার দিনের একটি যুবকের কথা বলছি। যুবকটি আইনের ছাত্র। মেধাবী, তীক্ষ্ণধী, যশস্বী। সাহিত্য-জননীর উদাত্ত আহ্বান তার কাছেও গিয়ে পৌঁছোয়। সাহিত্যের দরবারে শুরু হল তার আনাগোনা, ক্রমেই তা বৃদ্ধি পেতে লাগল, স্বভাবতঃই আইনের অধ্যয়নে একটু একটু করে শৈথিল্য দেখা যায়। কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথই একদিন বললেন সাহিত্যের নেশাটা রেখো—তবে পেশা হিসেবে কোনদিনই তাকে গ্রহণ কোর না—কারণ, আজকের দিনের তুলনায় সেদিনকার সমাজে অর্থলক্ষ্মী সরস্বতীর সেবকদের বিশেষ কৃপার চোখে দেখতেন না। যশ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা বাসা বাঁধত তাঁদের থেকে দূরে। লক্ষ্মীর সঙ্গে যে সরস্বতীর বিবাদ চিরন্তন। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের উপদেশ যুবকটি শিরোধার্য করে নিলেন—আইনের পরীক্ষায় যথারীতি কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন—ভবিষ্যৎ কালে একজন দক্ষ আইনজ্ঞ হিসেবেও অর্জন করলেন সুনাম—আর তার চতুর্গুণ সুনাম তিনি অর্জন করলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে একাধারে কবি, গীতিকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, শিশুসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সাময়িকী সম্পাদক, নাট্যকার, ব্যঙ্গ-রচনার রচয়িতা হিসেবে। বাঙলা সাহিত্য সাদরে গ্রহণ করল সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে। আজকের দিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়কে।

চব্বিশ পরগণান্তর্গত ইছাপুর গ্রামের স্বর্গীয় কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়ের ছেলে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বর্গীয় হরিদাস মুখোপাধ্যায় বিবাহ করেন বাঙলার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অগ্রদূত, পুরোধা ও পথিকৃৎ এবং বাঙলা ভাষায় প্রথম অপেরা লেখক (সতী কি কলঙ্কিনী), নাট্যপরিচালক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে স্বর্গীয়া পুরসুন্দরী দেবীকে। নগেন্দ্রনাথের আর একটি মেয়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন বাঙলার বরণীয়া সাহিত্যিকা স্বর্গগতা অনুরূপা দেবী। নগেন্দ্রনাথের বাবা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্সপিয়রের নাটকাবলীর বাঙলা ভাষায় প্রথম অনুবাদক, তা ছাড়া একটি মৌলিক নাটকেরও (ইন্দুপ্রভা) তিনি স্রষ্টা। ইছাপুরেই ১৮৮৪ সালের ৯ই জানুয়ারী (পৌষ ১২৯০) সৌরীন্দ্রমোহনের জন্ম। প্রাথমিক পাঠগ্রহণ শুরু হয় ইছাপুর এম, ই, স্কুলে। সাত বছর বয়সের সময়ে অত্যন্ত অকালে পিতৃবিয়োগ ঘটায় মা ও ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতা চলে আসায় সাউথ সাবার্বাণ স্কুলে ভর্তি হন। এই সময়ে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটত—প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায় বলতেন, ইংরিজী শেখ, ইংরিজী চর্চা কর, ইংরিজী পড়, আর প্রধান পণ্ডিত শ্রীপতি কবিরত্ন বলতেন মাতৃভাষাকে পূজা কর, মাতৃভাষাকে বন্দনা কর, মাতৃভাষাকে প্রণাম কর। ভবিষ্যৎ কালের বাঙলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহনের মধ্যে বলা বাহুল্য, শেষোক্ত জনের বক্তব্যের আবেদন রেখাপাত করত বেশী। ১৮৯৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। সিটি কলেজে শুরু করলেন এফ, এ পড়তে কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় মেসোমশাই (প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে ও অনুরূপা দেবীর বাবা) স্বর্গীয় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরে তাঁকে নিয়ে যান ও স্থানীয় তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজ থেকে এফ, এ পাশ করেন (১৯০১), এর পর কলকাতায় ফিরে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে কিছুদিন পড়ে ১৯০৪ সালে জেনারেল য়্যাসেমব্লিস ইন্‌ষ্টিটিউশান (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে বি, এ পাশ করেন। বি, এ, পাশ করে যোগ দিলেন এম, এ ও আইন ক্লাশে, পড়তে থাকেন য়্যাটর্নিশিপ। অল্পকালের মধ্যে মাতৃবিয়োগ ঘটায় পড়াশুনায় ছেদ টেনে দেন; পরে রবীন্দ্রনাথের উপদেশানুসারেই ১৯১১ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুলিশ কোর্টে ওকালতি শুরু করলেন। সহপাঠীদের মধ্যে ছন্দসম্রাট সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবীণ সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহর্ষির জীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাষ্যকার অজিত চক্রবর্তী, সিভিলিয়ান গুরুসদয় দত্ত, অধ্যাপক নলিনী শাস্ত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বালক সৌরীন্দ্রমোহন পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে মাতামহের বইগুলি পড়েন ও নিভৃতে কবিতা লিখে যান। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের কাঙ্গালিনী কবিতাটি, রাজা ও রাণী নাটক ও ছোট গল্পগুলি পড়ে নতুন স্বের স্পর্শে অভিভূত হন ও নিজেও ছোট ছোট নাটক লিখতে শুরু করলেন। কিছুকাল পরে অনুরূপা দেবীর মাধ্যমে পরিচিত হলেন পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী ও তাঁর সুযোগ্যা কন্যা সরলা দেবীর সঙ্গে ক্রমে সেখান থেকেই পরিচিত হলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সৌরীন্দ্রমোহনের কবিতা পড়ে আনন্দ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পেলেন স্বর্ণকুমারী। রবীন্দ্রনাথ বললেন, সংস্কৃত ও ইংরিজী কবিতা বাংলায় তর্জমা কর—ছন্দ পরে এসে যাবে। এ আজ বারটি বছর আগেকার কথা। ভাগলপুরে পড়ার সময় বন্ধু বর্তমানের প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টের বাড়ী একদিন—বোঝা, কাশীনাথ, অনুপমার প্রেম নামক কয়েকটি ছোট গল্প পড়ে এক নতুন অনুভূতিতে ভরে উঠলেন, অনুসন্ধানে জানলেন যে, লেখক এক ভবঘুরে, বেকার এবং অতি অখ্যাত। বিভূতিভূষণের বোন বিখ্যাত লেখিকা স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবী ব্রতোপলক্ষে কয়েকটি ব্রাহ্মণ সন্তানকে ভোজনে নিমন্ত্রণ জানালেন। সেইখানে সেই উপলক্ষে পরিচয় হল কৃশকায় এক ব্রাহ্মণ সন্তানের সঙ্গে, পূর্বোক্ত গল্পগুলির লেখক তিনিই। তাঁর নাম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালের বাঙলার অপরাজেয় সাহিত্যশিল্পী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙালীর একান্ত আপনার শরৎচন্দ্র। কথায় কথায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—কবিতা লিখিয়েদের ভাষা ঠিক জুগিয়ে যায় তবে গল্পের প্লট পাওয়া যায় মানুষকে ঠিকমত দেখতে শিখলে, শরৎচন্দ্রের এই কথা থেকেই প্রেরণা পেয়ে গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন সৌরীন্দ্রমোহন।

১৯০১ সালে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্তভাবে হাতে লেখা পত্রিকা 'তরণী' প্রকাশ করেন। ১৯০২ সালে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে পাঠানো শরৎচন্দ্রের 'মন্দির' গল্পটি কুন্তলীন পুরস্কারের মানানুসারে প্রথম স্থান অধিকার করে আর বিশেষ পুরস্কার পায় সৌরীন্দ্রমোহনের বৌদির 'কাণ্ড' নামক গল্পটি। ১৯০৩ সালে তাঁর মুক্তি ও পরের বছর তার শাস্তি গল্প দুটি যথাক্রমে কুন্তলীনের দ্বিতীয় ও প্রথম পুরস্কার লাভ করে। এই গল্প দুটি তার আগে তরণীতে প্রকাশিত হয়েছিল। সরলা দেবীর অনুরোধে ১৯০৭ সালে ইনি ভারতীর পরিচালনভার গ্রহণ করেন ও শরৎচন্দ্রের বড়দিদি তিনিই ভারতীতে ছাপতে আরম্ভ করেন। প্রথম দু'সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের নাম ছাপা হয় নি, তৃতীয় সংখ্যা থেকে লেখার সঙ্গে লেখকের নামও প্রকাশিত হতে থাকে। সৌরীন্দ্রমোহনেরই অনুরোধে ১৯০৮ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী আবার ভারতীর সম্পাদিকা হন। এই সময় অবনীন্দ্র-জামাতা স্বনামধন্য সাহিত্যিক স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও ভারতীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিধবা হবার পর ( ১৯১৩ ) স্বর্ণকুমারী ভারতী থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তার কিছু পরেই ( বৈশাখ ১৩২২ ) ভারতীর সম্পাদক হিসেবে দেখা গেল সৌরীন্দ্রমোহনের নাম ( মণিলাল সহ )। ১৯২৩ সালে সম্পাদনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন ও পরের বছর সরলা দেবীর উপর ভার দিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন ভারতীর সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করেন। বসুমতীর স্বত্বাধিকারী ও মাসিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহনের অন্তরঙ্গতা ১৯২৬ সাল থেকে। ১৯২৮ সাল থেকে বসুমতীর সঙ্গে ইনি নিবিড় ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন ও নারীমন্দির, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য, ছোটদের আসর প্রমুখ বিভাগগুলির অবতারণা করেন। এ ছাড়াও বসুমতীতে ছদ্মনামে তিনি বহু লেখা লিখেছেন, রসরাজ অমৃতলালের মৃত্যুর পর সতীশচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে বৈকুণ্ঠ শর্মা ছদ্মনামের অন্তরালে বসুমতীতে ব্যঙ্গাত্মক রচনা লেখা আরম্ভ করেন। কুন্তলীনের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত তাঁর লেখাটি পড়ে পরিতৃপ্তি লাভ করে বিদ্যাসাগর-দৌহিত্র বিখ্যাত সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় সুরেশ সমাজপতি এঁর সঙ্গে নিজে সাক্ষাৎ করেন ও তার পর সাহিত্যে সৌরীন্দ্রমোহনের রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০৯ সালে সৌরীন্দ্রমোহনের প্রথম গল্পগ্রন্থ শেফালি প্রকাশিত হয়। প্রথম উপন্যাস দরদী প্রকাশিত হ'ল ১৯২০ সালে।

রসরাজ অমৃতলাল ছিলেন সৌরীন্দ্র-জননী পুরসুন্দরীর বড় ছেলের মতন, তাঁরই প্রেরণায় ও পরিচালনাধীনে ১৯০৮ সালে সৌরীন্দ্রমোহনের যৎকিঞ্চিৎ নাটিকাটি ষ্টারে অভিনয় হয়। ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথের "মুক্তির উপায়"এর নাট্যরূপ দেন সৌরীন্দ্রমোহন—'দশচক্র' নাম নিয়ে সেই নাটকটি ষ্টারে অভিনীত হল এবং নাট্যরূপ পড়ে রবীন্দ্রনাথ অপরিসীম আনন্দলাভ করে সেটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করার অনুমতি দিলেন। ১৯১২ সালে অসুস্থ গিরিশচন্দ্রের আহ্বানে বরেণ্য অভিনেতা স্বর্গীয় মহেন্দ্র মিত্রের মাধ্যমে সৌরীন্দ্রমোহনের 'দরিয়া' অভিনীত হয়। এ ছাড়া দীর্ঘকাল ধরে বাঙলার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে সৌরীন্দ্রমোহনের যে সব নাটকের অভিনয় হয়েছে, তাদের মধ্যে গ্রহের ফের, রূমেলা, কাজরী, হারানো রতন ( পরিচালনায়—নটগুরু শিশিরকুমার ), মন্দির ( পরিচালনা—মধু বসু ); স্বয়ংবরা, লাখ টাকা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত নাট্যাভিনয়ের মহড়ায় সৌরীন্দ্রমোহন নির্দেশাদি দিতেন ও এতে সমকালীন প্রসিদ্ধ অভিনয়শিল্পীর দল ভূমিকা গ্রহণ করতেন ও অভিনয় দেখে প্রতিভার বরপুত্রের দল আনন্দরসের সন্ধান পেতেন। চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গেও সৌরীন্দ্রমোহনের যোগ আজকের নয় বা তা কমও নয়। ম্যাডান থিয়েটার্সের নির্বাক ছবি তোলার সময়ে সৌরীন্দ্রমোহন প্রভূত সহায়তা করেছিলেন টাইটেল লেখক, সাবটাইটেল লেখক ও কাহিনীকার হিসেবে। নিউ থিয়েটার্সের কালজয়ী চিত্র চণ্ডীদাসের সংলাপ রচয়িতা তিনিই এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের গাওয়া ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে আর সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে—নামক বিখ্যাত গান দুটি তাঁরই লেখা। গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্রীপঙ্কজ মল্লিকের প্রথম যে গান দুটি ( আমারে ভালবেসে আমারি জাগিয়া ও ও কেন গেল চলে ) ধরে রাখা হয় সেগুলিও সৌরীন্দ্রমোহনের লেখনীজাত। সৌরীন্দ্রমোহনের কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত সহধ৹ ও বাবলা ছায়াছবি দুটি আন্তর্জাতিক সমাদরে ধন্য হয়। পিয়ারী, আঁধি, লাখটাকা প্রভৃতি ছায়াচিত্রগুলির কাহিনীকার তিনিই। আজ পর্যন্ত অজস্র উপন্যাস, গল্প, নাটক সৌরীন্দ্র-লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে। শিশুদের প্রখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'মৌচাক'এর প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর নামও উল্লেখনীয়। শিশুসাহিত্যে নারীচরিত্র সৃষ্টি লালকুঠি উপন্যাসটির মাধ্যমে সর্বপ্রথম তিনিই করেন। বর্তমানে পৃথিবীর সকল দেশের রূপকথা সংগ্রহ করে মাতৃভাষায় সেগুলির রূপান্তরণের চেষ্টায় তিনি ব্রতী হয়েছেন। শিশুসাহিত্য, রূপকথা জাতীয় সাহিত্য তাঁর অবদানে বহুলাংশে পুষ্ট হয়েছে। গীতিকার হিসেবেও অবদান তাঁর কম নয়। তাঁর বহু রচনার গুজরাটি ও হিন্দী অনুবাদ হয়েছে। বল্কান ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের কয়েকটি রূপকথা তাঁর দ্বারা বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয়ে ( রাজ্যের রূপকথা, প্রথম খণ্ড ) ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথমা পত্নীর পরলোকগমনের পর বারুইপুরের স্বর্গীয় তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে শ্রীমতী সুবর্ণলতা দেবীকে ইনি বিবাহ করেন। সঙ্গীতের প্রতি সুবর্ণলতা দেবীর প্রবল অনুরাগ। সৌরীন্দ্রমোহনের

পুত্র, কন্যা ও জামাতাদের মধ্যে যথাক্রমে প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক শ্রীসৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভগবানদত্ত কণ্ঠসম্পদের অধিকারিণী বাঙলার বিশিষ্ট গায়িকা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র এবং ময়মনসিংহের মহারাজকুমার কৃতী ব্যারিষ্টার শ্রীস্নেহাংশু আচার্যের নাম সবিশেষ উল্লেখনীয়।

## ডক্টর নবগোপাল দাস

[ প্রখ্যাত সাহিত্যিক—সুখ্যাত সিভিলিয়ান ]

আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ, চিন্তাকে কাজে পরিণত করার সাহস, অনাড়ম্বর জীবনযাপন বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে সহজে স্বার্থত্যাগ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অগাধ মাতৃভক্তি মানবজীবনে ঈপ্সিত সম্পদ। আনন্দের কথা, প্রখ্যাত সিভিলিয়ান ও সুলেখক ডক্টর নবগোপাল দাস—এই সমস্ত গুণের অধিকারী।

১৯১০ সালের ২০এ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় ডক্টর দাসের জন্ম হয়। আদিনিবাস ঢাকাতেই, মাতুলালয়ও। পারসিক উর্দু ভাষায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মুন্সী হরিমোহন দাস নবগোপালের পিতামহ। বাঙলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পরলোকগত ডক্টর দুর্গামোহন দাস নবগোপালের পিতৃদেব। মায়ের নাম শ্রদ্ধেয়া গিরিবালা দেবী। ঢাকাকে শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির গরিমায় গরীয়সী করে তোলার ক্ষেত্রে এই পরিবারের অবদান অতুলনীয়।

ডক্টর নবগোপাল দাসের ছাত্রজীবন সাফল্যের আলোয় উজ্জ্বল। প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করে বংশের মুখ করেছেন উজ্জ্বল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি করেছেন গর্ব, শুভার্থীদের অন্তরে জাগিয়েছেন অবর্ণনীয় আনন্দ। ঢাকা জুবিলি স্কুল থেকে ডক্টর দাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম (১৯২৬), আই-এস-সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় (১৯২৮), বি-এ পরীক্ষায় অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান (১৯৩০) অধিকার করতে সক্ষম হন। এর পর ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন ও ১৯৩১ সালে আই-সি-এস পরীক্ষায় লিখিত বিষয়গুলিতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন কিন্তু মৌখিক পরীক্ষা আশানুরূপ না হওয়ায় মেধানুসারে ষষ্ঠস্থান ও ভারতীয় তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ভারতে ফিরে এলেন নবগোপাল। শুরু হ'ল কর্মজীবন, যার পর থেকে আজ দীর্ঘ পঁচিশ বছর পেরিয়ে এলেন যথেষ্ট সম্মান, খ্যাতি আর প্রতিপত্তির সঙ্গে। ভারতবর্ষে এসে প্রথমে রাজশাহীতে ও পরে বারাসাতে কর্মে নিযুক্ত হন। এর পর প্রাদেশিক সরকারের অর্থবিভাগে কিছুকাল থাকার পর পটুয়াখালি মহকুমার ভার গ্রহণ করেন। কর্মে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতি সম্বন্ধীয় ব্যাপক অধ্যয়নে বিন্দুমাত্র ছেদ পড়ে নি। ১৯৩৬ সালে ঐ বিষয়ক তাঁর গবেষণাগ্রন্থ ব্যাঙ্কিং য্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স ইন ইণ্ডিয়া প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস। গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ও বেসরকারী মহলে বিপুল সমাদর লাভ করে। অর্থনীতি সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে অধ্যয়নের জন্যে "ষ্টাডি লিভ" নিয়ে তিনি পুনর্বার ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন ও লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ যোগ দেন। পূর্বোক্ত পুস্তকটির উপরে ভিত্তি করে ১৯৩৮ সালে তিনি সেখান থেকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্টারপ্রাইস ইন ইণ্ডিয়া বিষয়ে থিসিস লিখে পি, এইচ, ডি (ইকন) উপাধি লাভ করেন। ১৯৪০ সালে তাঁর ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল প্ল্যানিং হোয়াই য্যাণ্ড হাও নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। দেশে ফিরে এসে তিনি বিষ্ণুপুরে কর্মে নিযুক্ত হন, কিছুকালের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধান সম্পর্কিত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হিসেবে কলকাতায় চলে আসেন। নয়াদিল্লীতে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং য্যাডভাইসাররূপে যোগ দেন। অবিভক্ত বাঙলার জনসংভরণ বিভাগের অধিকর্তা (১৯৪৩), নিয়োগ ও পুনর্বাসনের আঞ্চলিক পরিচালক (১৯৪৬), নিয়োগ ও পুনর্বাসনের প্রধান পরিচালক (১৯৪৭-৫২), প্রাদেশিক সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব (১৯৫২-৫৬), প্রভৃতি প্রভূত দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহ ডক্টর দাসের দ্বারা অলঙ্কৃত, পরে এক বছর তাঁকে সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি বিভাগেরও ভার গ্রহণ করতে হয়েছিল। সর্বশেষে এনফোরসমেণ্ট বিভাগের স্পেশাল অফিসারের আসনে এঁকে সমাসীন দেখা গেছে, স্পেশাল অফিসার থাকাকালীন দুর্নীতি নিরোধে যে সকল ব্যবস্থা তিনি অবলম্বন করেন এবং দুর্নীতি নিরোধকল্পে যে শক্তি, আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা সংবাদপত্রসমূহ ও জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও অভিনন্দনে বিভূষিত হয়। গত ডিসেম্বর মাসে সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর নিয়ে ১লা জানুয়ারী থেকে বোম্বাইতে এমপ্লয়ারস-ফেডারেশানের প্রধান পরিচালকের কর্মভার গ্রহণ করেছেন। সরকারী কর্মে যোগদানের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে বীরেশ্বর মিত্র ও গ্রীফিথ স্বর্ণপদকদ্বয় দ্বারা সম্মানিত করেছেন।

বাঙলার সাহিত্যজগতেও নবগোপাল দাস মহাশয়ের আসন অটল, দীর্ঘদিন অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও সেবার দ্বারা বাংলাসাহিত্যের ইনি শ্রীবৃদ্ধি করে আসছেন। বর্তমানে কিছুকাল যাবৎ মাসিক বসুমতীতেই তাঁর একটি উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে,

ডক্টর নবগোপাল দাস

মাসিক বসুমতী যাঁরা ভালবাসেন ও নিয়মিত পাঠ করেন, তাঁদের কাছে এ সম্বন্ধে নতুন করে আর বলার কিছু নেই। বংশের মহান ঐতিহ্যই তাঁকে সাহিত্যসাধনায় অফুরন্ত প্রেরণা জুগিয়েছে। ছেলেবেলা থেকে সাহিত্যের প্রতি দেখা গেছে নবগোপালের অবর্ণনীয় অনুরাগ। নবগোপালের প্রথম উপন্যাস সাগর দোলায় ঢেউ ও প্রথম ছোট গল্পের বই তারা দু'জন। এ ছাড়াও বাঙলার বহু বিখ্যাত সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তাঁর অজস্র ছোট গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৩৪ সালে ঢাকা জেলার শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ছোট মেয়ে শ্রীমতী উমা দেবীর সঙ্গে নবগোপালের শুভপরিণয় সুসম্পন্ন হয়। সংস্কৃতির দরবারে শ্রীমতী উমা দেবীও অপরিচিতা নন। বাঙলা দেশের স্বনামধন্যা চিত্রশিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী উমা দেবীও একজন। উমা দেবীও কয়েক বার ভারতের বাইরে ভ্রমণোদ্দেশে গেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ডক্টর স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা অধ্যাপক ডক্টর ভূপেন্দ্র ঘোষের সহধর্মিণী অধ্যাপিকা ডক্টর শ্রীমতী সতী ঘোষ উমা দেবীর দিদি।

ডক্টর দাসের কর্মদক্ষতা সর্বস্তরে লাভ করে যথাযোগ্য সমাদর, তা ছাড়া বিশেষত্ব এই যে, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর মধুর আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহার তাঁর সহকর্মীদের এবং অধস্তন কর্মীদের অন্তর অভিভূত করে; এই খানেই বোঝা যায় যে কর্মক্ষেত্রে ডক্টর নবগোপাল দাস কতখানি জনপ্রিয়।

## শিল্পাচার্য অসিতকুমার হালদার

[ ভারতবন্দিত চিত্রশিল্পী ]

ভারতভূমি শিল্পবর্ষ। ভারতের মৃত্তিকার অণুতে পরমাণুতে শিল্পের বীজ। ভারতের নরনারীর মনের গহন কোণে বিদ্যমান শিল্পচেতনা। তারই ছায়া পড়েছে বিভিন্ন মঠে, মন্দিরে, প্রাচীরচিত্রে, উদ্যান সজ্জায়, রাজসভা অলঙ্করণে। অবশ্য ভারতবাসীদের মধ্যে নিজস্ব শিল্পবোধ সম্বন্ধে বর্তমান কালের এই ব্যাপক জাগরণের বয়েস খুব বেশী নয়। কিছু বেশী অর্ধ শতাব্দী। সংস্কৃতি মিলনতীর্থে শিল্প সংহিতার প্রথম মন্ত্রপাঠ করলেন অবনীন্দ্রনাথ। নব্য শিল্প চেতনার জন্মদাতা! নবতর শিল্প-পথের প্রথম পথিকার শিল্প জাহ্নবীর ভগীরথ। বিংশ শতাব্দী যখন সদ্যোজাত শিশু তখনই এক পবিত্র লগ্নে ভারতীয় শিল্পের এই নবজাগরণ সূচিত হল। যে বিরাট সম্পদের অধিকারী ভারতের নরনারী সেই সম্বন্ধে তাদের সচেতন করতে এগিয়ে এলেন অবনীন্দ্রনাথ শত সহস্র ব্যঙ্গকে পাথেয়রূপে গ্রহণ করে, সংখ্যাতীত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে, অগণিত প্রতিবন্ধককে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে আপন অভীষ্ট পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকেন অবনীন্দ্রনাথ। সর্বমানবের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে যে পরিকল্পনা জন্ম নেয় তা কখনও বরণ করে না ব্যর্থতা। অবনীন্দ্র-অভিযানও ব্যর্থ হয়নি। তাঁর আহ্বানে দেশ জেগে উঠল, মেতে উঠল, ভরে উঠল। সেদিন-সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে অফুরন্ত স্বপ্ন-সম্পদের অধিকারী, নিষ্ঠাবান, উদ্যমী, প্রাণবন্ত যে ক'টি তরুণকে সেই দুর্গম যাত্রাপথের আপন অনুগামিরূপে পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ—আজকের দিনের প্রবীণ শিল্পাচার্য—একাধারে চিত্র, সাহিত্য ও অভিনয়শিল্পী—বৃটিশ ভারতে অবস্থিত কোন শিল্প-মহাবিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় স্থায়ী অধ্যক্ষ শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

শিল্পাচার্য অসিতকুমার হালদার

কলকাতা থেকে নাতিদূরে জগদ্দল অঞ্চলে হালদারদের আদিনিবাস। ইঞ্জিনিয়ার কেনারাম হালদারের পুত্র রাখালদাস হালদার (১৮৩৪-৮৭)। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বাঙালীর অধ্যাপক পদে নিয়োগের সংবাদ আজকের দিনে আনন্দ বহন করে নিশ্চয়ই—কিন্তু করে না কোন নতুনত্ব কিন্তু শতবর্ষ আগে এই সংবাদ বাংলাদেশের অধিবাসীদের মনোলোকে যে জিনিষ জাগিয়ে তুলত তার নাম বিপুল বিস্ময়। সে যুগে এ জাতীয় সংবাদের দ্বারা বাঙালীর মনে বিস্ময় সঞ্চার যাঁরা করেছিলেন রাখালদাস তাঁদেরই একজন। সকল দিকেই বাঙালী প্রদর্শন করেছে আপন আপন কৃতিত্ব, বিস্মৃতির ব্যাপারেও। সে ক্ষেত্রেও তাঁরা অগ্রগণ্য, সেইজন্যেই বোধ হয় আমরা একজনকে মনে রাখি দশজনকে ভোলার জন্যে। তেমনই রাখালদাস হালদার—এই নামটি আজকের দিনে অনেকের কাছে অপরিচিত হলেও সেদিন এই নামটিই আকর্ষণ করেছে দেশের ও বিদেশের সুধী সমাজের অকৃত্রিম অভিনন্দন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে বরণ করলেন সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকরূপে (১৮৬০) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তালিকায় প্রথম যুক্ত হল একটি ভারতীয় নাম। রাখালদাসের আগে কোন ভারতীয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পান নি। কাব্য রচনায়, চিত্রশিল্পে অনুবাদ-সাহিত্যেও যথেষ্ট দক্ষতা ছিল রাখালদাসের। রাখালদাসের বড় ছেলে স্বনামধন্য বাঙালী সুকুমার হালদারও (১৮৬৪-১৯৪৮) শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কম দক্ষতার অধিকারী ছিলেন না। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন শ্রদ্ধাস্পদ পুরুষ। ইংলিশ ডায়েরী অফ য়্যান ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্ট, এ মিড-ভিক্টোরিয়ান হিন্দু, রামমোহন রায় য়্যাণ্ড হিন্দুইসম্ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন। সুকুমার হালদারের অনুজ স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্র হালদারও বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানদের অন্যতম। ইম্পিরিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (কুপার্স হিল) এর প্রথম ভারতীয় ছাত্র নির্মলচন্দ্র ভারতের রেলওয়ে বোর্ডেরও ছিলেন প্রথম ভারতীয় সচিব, তা ছাড়া অধুনা অবলুপ্ত এন, ডব্লিউ, রেলপথেরও তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় এজেণ্ট। এই কীর্তিমান বাঙালীর ১৯১৮ সালে যখন দেহান্ত ঘটল তখন তাঁর বয়েস মাত্র ঊনচল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। এমনি করে অকালে নির্মলচন্দ্রের জীবন-প্রদীপ যদি নির্বাপিত না হোত তাহলে বাঙালীর গৌরব ও কর্মকৃতিত্ব যে আরও অনেক বর্ধিত হোত, এ কথা বলাই বাহুল্য।

সুকুমার হালদার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন স্বর্গীয় যদুকমল মুখোপাধ্যায় ও স্বর্গীয়া শরৎকুমারী দেবীর মেজ মেয়ে স্বর্গীয়া সুপ্রভা দেবীর সঙ্গে। সুপ্রভা দেবীর মা শরৎকুমারী দেবী ছিলেন পুণ্যশ্লোক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সেজ মেয়ে ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা। সুপ্রভা দেবীর গর্ভে ১৮৯০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর জোড়াসাঁকোর বিশ্ববন্দিত ঠাকুরবাড়ীতে অসিতকুমারের জন্ম। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হলেন অসিতকুমারের মাতৃ-মাতুল।

কর্মজীবনে সুকুমার হালদার ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কর্ম-ব্যপদেশে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁকে বাসা বাঁধতে হোত, বাল্য-জীবনে বাবার সঙ্গে অসিতকুমারকেও ঘুরতে হয়েছে অনেক জায়গায়, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিদ্যালয়ের পাঠগ্রহণ করতে হয়েছে অসিতকুমারকে। নিতান্ত শৈশবে পটশিল্পী ঝড়েশ্বর চক্রবর্তীর কাছে প্রথম অঙ্কনবিদ্যায় পাঠ নেন। শ্রীকৃষ্ণের একটি ছবি আঁকার রীতি-কৌশল সম্বন্ধে ঝড়েশ্বর অসিতকুমারকে আলোকিত করেন। অঙ্কন-বিদ্যায় শিল্পাচার্য অসিতকুমারের এই প্রথম দীক্ষালাভ। ১৯০৪ সালে বিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণে ছেদ টেনে দিলেন অসিতকুমার। ১৯০৫ সালে সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন অসিতকুমার। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব প্রথম গ্রহণ করেন আচার্য নন্দলাল বসু। তার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথকে গুরুরূপে বরণ করলেন অসিতকুমার ও স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৯১১ অবধি শিল্প-বিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে যুক্ত ছিলেন অসিতকুমার। বাল্যকালে অর্থাৎ ১৯০৫ সালে শিল্প-বিদ্যালয়ে যোগদানেরও আগে অসিতকুমারের আঁকা ছবিগুলির প্রধান উপজীব্য ছিল রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেওয়া পৌরাণিক কাহিনীসমূহ। ভারত সরকারের ভাস্কর লেনার্ড জেনিংস্‌এর কাছে ভাস্কর্য-বিদ্যা সম্বন্ধেও পাঠ নেন অসিতকুমার। এখানে সতীর্থরূপে পেলেন ভারতবরেণ্য ভাস্কর শ্রদ্ধেয় শ্রীহিরণ্ময় রায়চৌধুরীকে। ১৯১১ সালে শিল্প-বিদ্যালয় ত্যাগের পর শান্তিনিকেতনে যান অসিতকুমার। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে গেলেন। তখনকার শিশু বিভাগে (১৯১২) ধীরেন দেববর্মণ, মণি গুপ্ত, অন্নদা মজুমদার প্রভৃতিকে নিয়ে ছবি আঁকা শেখাতে আরম্ভ করলেন। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার পর এই ছাত্রের দল শান্তিনিকেতনে আবার ফিরে আসেন। ১৩২৬-২৭ সালের বিবরণীতে জানা যায় যে তখন আশ্রমে সাহিত্যে একত্রিশ জন, সঙ্গীতে বাইশ জন ও ললিতকলায় বারো জন ছাত্র ছাত্রী ছিলেন। অধ্যাপকদের মধ্যে সাহিত্যে ছিলেন দশ জন (রবীন্দ্রনাথ সহ), সঙ্গীতে তিন জন (দিনেন্দ্রনাথ সহ) ও ললিতকলা বিভাগে ছিলেন অসিতকুমার একা। কলাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন অসিতকুমার ও তার গোড়াপত্তন তিনিই করেন। গোড়ার দিকে ছাত্র-ছাত্রীরূপে অসিতকুমার যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কলকাতার সরকারী শিল্প ও কারু মহা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদ্বয় মুকুলচন্দ্র দে ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হীরাচাঁদ দুগার, ধীরেন দেববর্মন, মণি গুপ্ত, অন্নদা মজুমদার, প্রতিমা ঠাকুর, সবিতা ঠাকুর (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট ছেলে কৃতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী) সুকুমারী দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চিত্রাঙ্কনের কোন কোন বিষয়ে বর্ষীয়সী চিত্রশিল্পী পূজনীয়া সুনয়নী দেবীকেও শিষ্যারূপে পেয়েছেন অসিতকুমার। ১৯১৫ সালে আচার্য নন্দলাল বসুকে তিনি আশ্রম দেখান ও তাঁরই উৎসাহে এবং প্রচেষ্টায় কবিগুরু কবিতায় নন্দলালকে অভিনন্দন জানান। ১৯১১ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে সব নাটকের অভিনয় হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটির অভিনয়ে অসিতকুমার অংশগ্রহণ করেছেন শুধু তাই নয় মঞ্চ সজ্জা ও রূপসজ্জার সমূহ দায়িত্ব অসিতকুমারের উপরেই ন্যস্ত ছিল। ভারতীয় শিল্পকলা ও বিদেশী শিল্পকলার পার্থক্য অনুধাবন করার উদ্দেশ্য নিয়ে অসিতকুমার ইংল্যাণ্ড যাত্রা করলেন (১৯২৩) সেখানে তদানীন্তন দিকপাল শিল্পীবৃন্দের সান্নিধ্য লাভ করেন ও বিখ্যাত সংগ্রহশালাগুলি পরিদর্শন করেন, তিনি দেখলেন যে মডেলকে কেন্দ্র করে সেখানে যে শিল্পসমূহ সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে দাঁড়াবার ভঙ্গী কেশের বিন্যাস এমন কি আঙ্গুলের রেখাগুলি পর্যন্ত নিখুঁতভাবে জীবন্ত হয়ে উঠছে ঠিকই, তবে পাশ্চাত্য-শিল্পীরা একটি জায়গায় চরমতম পরাজয় বরণ করছেন—ছবির চোখ ফোটাতে। সব কিছু নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও চোখের কাজে তাঁরা কৃতিত্ব দেখাতে পারছেন না। দৃষ্টি সর্বদাই শূন্য থেকে যাচ্ছে, দৃষ্টির মধ্যে প্রাণ পাওয়া যাচ্ছে না—চোখের তারা দুটি যেন মৃত, এইখানেই অসিতকুমারের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, বিদেশের শিল্প-সম্ভারের তুলনায় বিশেষ করে সাবলীলতার দিক থেকে অজন্তার স্থান কত উচ্চে। বিদেশ থেকে ফিরে এসে জয়পুরের রাজকীয় শিল্প মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষরূপে যোগ দিলেন এক বছরের জন্যে। এর পরে উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বানে লক্ষ্ণৌর সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের আসন অলংকৃত করেন অসিতকুমার (১৯২৫-৪৫)। পূর্বেই বলেছি, বৃটিশ ভারতে অবস্থিত কোন সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে ভারতীয়দের মধ্যে স্থায়িভাবে প্রথম নিযুক্ত হলেন অসিতকুমার। ১৯৪১ সালে রাজশক্তিও তাঁকে সম্মানিত করেন।

অসিতকুমারের আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে কুণালের চক্ষুলাভ, রাসলীলা, বর্ষালক্ষ্মী, আপদ-বিদায়, ওমরখৈয়াম, প্রভৃতির নাম উল্লেখনীয়। এছাড়া বত্রিশটি ছবির সাহায্যে চিত্রে বুদ্ধের জীবনী ও তিরিশটি ছবির সাহায্যে চিত্রে ভারতের ইতিহাস রচনা করেছেন অসিতকুমার। অসিতকুমারের আঁকা বহু ছবির বিষয়বস্তু অবলম্বন করে গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ গান লিখেছেন, যথা—তুমি যে সুরের আগুন—আসা যাওয়ার মাঝখানে—মরণের সাগর পাড়ি দেব—একলা বসে—পাতার বাঁশী প্রভৃতি! শিল্পীদের মধ্যে এ সৌভাগ্য আর কেউ অর্জন করতে পারেন নি। শিল্পক্ষেত্রে অসিতকুমারের সবচেয়ে বড় যা অবদান তা হ'ল লাক্ষা রঞ্জিত কাঠের উপর ছবি আঁকার প্রবর্তন করা। এ রীতির তিনিই প্রবর্তক।

অসিতকুমার শুধু চিত্রশিল্পীই নন, প্রতিভাবান সাহিত্যশিল্পীও, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি অজস্র ফসল ফলিয়েছেন। শিশুদের সাহিত্যেও তাঁর অবদান অল্প নয়। তাদের জন্যে প্রচুর একাঙ্কিকা তিনি লিখেছেন তাছাড়া এক সময়ে যুক্তাক্ষর একেবারে বাদ দিয়ে কুড়িটি গল্প তাদের জন্যে তিনি লেখেন (১৩২১), ছেলেদের জন্যে কয়েকটি সুপাঠ্য গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা, 'প্রথম পড়া' গ্রন্থে অক্ষর পরিচিতির ক্ষেত্রে শিশুদের তিনি প্রভূত সহায়তা করেছেন। মেঘদূত, ঋতুসংহার প্রভৃতি অমর কাব্য তাঁর দ্বারা অনূদিত। মৌলিক কাব্যগ্রন্থ মানসমুকুরে তাঁর কবি-প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন, কাব্যে গৌতমগাথা ও রাজগাথা (অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনীর কাব্যরূপ) সৃষ্টি করে সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন, স্মৃতিকথামূলক রচনা 'রবিতীর্থে'

বর্তমানে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পথে, বহু উপাদান ও তথ্যে ভরপুর এই গ্রন্থটি অনুরাগীমহলে সাড়া জাগাবে আশা রাখি। সাহিত্য-জগতের সঙ্গে অসিতকুমারের যোগাযোগ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে যেকথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—তা হচ্ছে যে বাংলা-সাহিত্যে কথ্যভাষা প্রসারের ব্যাপক জয়যাত্রার ইতিহাস থেকে অসিতকুমারের নামও বাদ দেবার নয়। অজন্তাকে কেন্দ্র করে ভারতের শিল্প সম্বন্ধে ভারতীতে অসিতকুমার একটি প্রবন্ধ লেখেন (১৩১৭) সম্পূর্ণ কথ্যভাষায়, সেই প্রবন্ধের রচনাশৈলী মুগ্ধ করে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তার পরেই বোম্বাইপ্রবাসকে কেন্দ্র করে সত্যেন্দ্রনাথেরও একটি স্মৃতিকথামূলক রচনা 'ভারতীতে প্রকাশিত হয়, যার রচনাশৈলীতে অসিতকুমারের রচনাভঙ্গীর ছাপ বহুলাংশে পতিত হয়। ঢাকার একটি পত্রিকা এই বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথকে প্রবল আক্রমণ করেন—তারই উত্তরে পূজনীয় সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর "সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা" শীর্ষক তাঁর বহুবন্দিত প্রবন্ধটি লেখেন। ( চৈত্র ১৩১৯ ) বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ এই প্রবন্ধটি প্রকাশমাত্র বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল পাঠকচিত্তে, বাঙলাসাহিত্যে কথ্যভাষা প্রচলনের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হ'ল, কথ্যভাষা দিয়ে সাহিত্যকে কতখানি সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করা যায়, তারই প্রমাণ দিতে নিয়মিত ভাবে লেখনী ধারণ করলেন দিকপাল সাহিত্যিক বীরবল প্রমথ চৌধুরী। বাঙলার সাহিত্যাকাশে দেখা গেল আর একটি দ্যুতিমান তারকা।

ভারতের শিল্পপথের অন্যতম প্রধান পথিক অসিতকুমারকে জিজ্ঞাসা করি যে, এ পথের প্রধান পাথেয় কি—উত্তর আসে—অফুরন্ত কল্পনা—প্রাচুর্য। অসিতকুমারের মতে ভারতে শিল্পচর্চা সবচেয়ে ঔজ্জ্বল্যর সার্থকতা পূর্ণতালাভ করেছিল খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী—এই হাজার বছরের মধ্যে। আজকের দিনে স্বাধীন ভারত সরকার শিল্পের প্রসার কল্পে যে নীতি গ্রহণ করেছেন শিল্পাচার্যের মতে তা কখনই সার্থকতা লাভ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে শিল্পীর মন এতটুকু তৃপ্তিলাভ করেনি—ভারত সরকার যেন ক্রমশঃই ভারতীয় চিত্রগুলিকে ইয়োরোপীয় প্রভাবের চিহ্নে ভরিয়ে তুলছেন এবং জেনে-শুনেই এ কাজ তাঁরা করছেন। জিজ্ঞাসা করি—শিল্পের ক্ষেত্রে আজ যে গলদ দেখা দিয়েছে যার ফলে শিল্পের অমঙ্গল ঘটছে—এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? উত্তর আসে—সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, মিলিয়ে যাবে, লুপ্ত হয়ে যাবে, যা কৃত্রিম, যা দূষিত, যা অন্তঃসারশূন্য তার অবসান একদিন না একদিন হবেই হবে—শুধু চিরকাল অক্ষয়, অমলিন, অমর হয়ে যে থাকবে—তার নাম সত্য, তার নাম সুন্দর, তার নাম শিব।

## শ্রীরমেশচন্দ্র পাল

[ বাঙলার খ্যাতনামা ভাস্কর ]

পূর্ববর্তী ভারতীয় শিল্পসাধকদের ঐশ্বর্যময় উত্তরাধিকার বহনের সচেতন দায়িত্ববোধ আর কল্পনার গতিশীলতা নিয়ে যদি কোন শিল্পীর আত্মপ্রকাশ দেখি—তখন শিল্পীর পরিচয় সংগ্রহের জন্য ঔৎসুক্য অনুভূত হয় অতি স্বাভাবিক ভাবেই। ঠিক এই ঔৎসুক্যের তাগিদেই শিল্পী রমেশ পালের পরিচয় জনসমক্ষে তুলে ধরছি।

পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত বাঘিয়া গ্রামে ১৩২৫ সালে শ্রীযুক্ত পাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র পাল ও পিতামহ স্বর্গীয় রামকুমার পাল বিশেষ শিল্পানুরাগী ছিলেন—এবং 'রুদ্রপাল' সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরুষ। তাছাড়া এই পরিবারের স্বাদেশিকতা, শিক্ষাবিস্তার, দরিদ্রসেবা, অতিথি-আপ্যায়ন ও নানা জনহিতকর কার্যের কথা উক্ত অঞ্চলে আজও সুবিদিত।

দেশের বাড়ীতে রমেশচন্দ্র স্কুলজীবন কাটিয়েছেন। প্রাকৃতিক আবহাওয়া ও পারিবারিক পরিবেশ শৈশবেই তাঁর শিল্পগত উত্তরাধিকারকে সনাক্ত করেছে। কিশোর বয়সেই রমেশচন্দ্র নানাবিধ চিত্র ও মৃন্ময়মূর্তি নির্মাণে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হয়ে থাকতেন। ১১৩৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মহানগরী কলকাতায় আসেন ভাগ্যান্বেষণে। ১৯৪০ সালে সরকারী কলাবিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। কিন্তু খরচ বহনের আর্থিক সঙ্গতি ছিল না তখন। সুরু হলো দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম। আহার বাসস্থানের বিনিময়ে ছাত্র পড়িয়ে এবং অবসর সময়ে কিছু মূর্তিগড়ে, ছবি এঁকে ও বহু পরিশ্রম করে অধ্যয়নকালীন নিজের খরচ চালাতে লাগলেন। উক্ত শিল্পবিদ্যালয় হতে বাৎসরিক পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কনসেসন এমন কি বৃত্তিও পেলেন। ১৯৪৫ সালে উক্ত সরকারী চারু এবং কারুশিল্প মহাবিদ্যালয় হতে সর্বশেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়ে এলেন রমেশচন্দ্র। তারপর চলল বাস্তবক্ষেত্রে কঠোর জীবন সংগ্রাম। নানা বাধার ঘাত-প্রতিঘাত চলল শিল্পীর জীবনের উপর দিয়ে অগ্নিপরীক্ষার মত। কিন্তু মনোবল কখনো হারান নি তিনি।

সৌভাগ্যক্রমে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির আহ্বানে কয়েকটি প্লাষ্টারের প্রতিমূর্তি তৈরী করে সামান্য কিছু অর্থের সংস্থান করলেন। এই যৎসামান্য অর্থকে সম্বল করে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শিল্পতীর্থস্থানগুলি পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেন। মন্দিরগাত্রে, গুহাগহ্বরে দেবশিল্পের যে সব নিদর্শন আছে—তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মনিয়োগ করলেন তিনি প্রতিমাশিল্পে। যে কোন কারণেই হোক সেদিন বাংলাদেশে মৃন্ময় প্রতিমা শিল্পে ছিল এক বিশেষ দৈন্য—এবং সুধীমহলে প্রতিমা-শিল্পীরা ছিলেন বিশেষ অনাদৃত। সেই যুক্তিবিহীন অনাদরের বিরুদ্ধে চালনা করলেন তিনি এক আন্দোলন। শিক্ষিতমহলে স্বীকৃত হলো প্রতিমাশিল্পের অবদান। প্রতিমা-শিল্পের কারুকলাকে তিনি অভিষিক্ত করলেন চারুকলার কৌলিন্যে।

রমেশচন্দ্রের নির্মিত সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার ও ফায়ারব্রিগেডে পূজিত দেবীদুর্গার মৃন্ময় মূর্তির কলানৈপুণ্য দেখে বিমোহিত হ'ল বাংলার জনসাধারণ। শিল্পীকে স্বাগত জানালেন তদানীন্তন বাংলার কলারসিক প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানালেন ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তারপর ১৯৫৫ সালে শারদীয় মাতৃমূর্তি নির্মাণে জনগণের ভোটের সমর্থনে সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে মেসার্স 'গিণি ম্যানসন' শিল্পী রমেশচন্দ্রকে বিজয়-স্মারক স্বরূপ একটি হীরকাঙ্গুরীয় দ্বারা অভিনন্দিত করেন এবং মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে এক বিপুল সম্বর্ধনা জানান। শুধু

দেশেই নয়, বিদেশ থেকেও ডাক এলো। আমেরিকার 'মিচিগান ওয়েন ইউনিভার্সিটির' কর্তৃপক্ষ ভারতীয় শিক্ষাসংস্কৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর একটি মূর্তি সংগ্রহ করা প্রয়োজন বোধ করেন এবং রমেশচন্দ্রের নির্মিত একটি সুন্দর মূর্তি উচ্চমূল্যে ক্রয় করে নিয়ে উক্ত ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরী ভবনে সযত্নে স্থায়ী ভাবে স্থাপনা করেন।

আমাদের দেশে অনেকেই ভুলে যান ভাস্কর্যের আর প্রতিমাশিল্পের সম্পর্কের কথা। বাংলাদেশে ধাতুপাথরের কাজের চেয়ে মাটির কাজ বেশী হওয়ার কারণ হয়ত তা পলিমাটির যাদু! রমেশচন্দ্রের মৌলিকতা মণ্ডিত মৃন্ময় মূর্তি স্বীকৃত ও কীর্তিত হয়েছে ভাস্কর্যের মহিমায়। তবুও শিল্পীর মনে গ্লানি ও অবসাদের ছায়া ঘনীভূত হোয়ে এলো মৃন্ময় মূর্তির ক্ষণস্থায়িত্বের জন্যে। অর্থাৎ মৃৎশিল্পের সাফল্য শিল্পমানসে সাময়িক গৌরবের একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করলেও স্থায়ী আনন্দ দিতে পারল না। তাই তিনি স্থায়ী ও শাশ্বত রূপ সৃষ্টির প্রেরণায় ভাস্কর্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। জড় ও জীবজগতের ক্রমবিকাশের ধারাকে লক্ষ্য করে কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, মানুষ, দেবতা প্রভৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরলেন ভাস্কর্য মূর্তির মাধ্যমে। মনুষ্যসমাজের অর্থনৈতিক ব্যবধানের প্রতিও কটাক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার ভাস্কর্যে। যুগ ও জীবন সম্বন্ধে শিল্পী সম্পূর্ণ সচেতন। তাই তাঁর সৃষ্টিতে দেখা যায়, দুঃখ দৈন্য জর্জরিত মেহনতী মানুষ কৃষাণ কুলী মজুরের এবং বেকার যুবকের হতাশাময় ভাস্কর্য মূর্তি। এঁর একাধিক ভাস্কর্য মূর্তি সর্বভারতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত ও প্রশংসিত। তাঁর শিল্পায়তন 'রূপভারতী'তে গেলে দেখা যায় বিগত ও বর্তমান কালের বহু মনীষী ও বরেণ্য নেতাদের প্রাণ প্রদীপ্ত ভাস্কর্য মূর্তি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, মহাকবি মধুসূদন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ডাঃ সুন্দরীমোহন প্রভৃতির মার্বেল ও ব্রোঞ্জ মূর্তি উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীরামকৃষ্ণ ও মধুসূদনের মূর্তি। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব মর্মরমূর্তি দেখে 'পরম পুরুষ' রচয়িতা শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শিল্পীকে ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, মূর্তির মুখাবয়বে এক দিব্য ব্যঞ্জনার প্রতিফলনে রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রে এ এক অনবদ্য নিদর্শন।

মধুসূদনের প্রতিমূর্তি নির্মাণে এক অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন শিল্পী। দেশী এবং বিদেশীয় কয়েকজন ভাস্করের অসফল প্রচেষ্টার পর ভাস্কর রমেশ পাল মহাকবির মর্মরমূর্তি অতি নিপুণ ভাবে খোদিত করে শিল্পী সমাজের মুখোজ্জ্বল করেছেন। প্রায় শতবর্ষ পূর্বের এক বিলীয়মান আলোকচিত্রই ছিল মহাকবির একমাত্র প্রামাণ্য আলেখ্য। উক্ত চিত্র এবং জীবনী অবলম্বন করে নানা গবেষণার সমন্বয়ে আকৃতিক সাদৃশ্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে অতি সার্থকভাবে রূপসমৃদ্ধ করে তুলেছেন তিনি। প্রবীণ

শ্রীরমেশচন্দ্র পাল

সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীঅতুল বসু উক্ত মূর্তি দর্শন করে মুক্তকণ্ঠে শিল্পীকে আশীর্বাদ করেন।

হঠাৎ শিল্পীকে জিজ্ঞেস করলাম, এসব কার্যে মাল মশলার অভাব বা অসুবিধা কিছু আছে কি না। শিল্পী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই! প্রথমতঃ ভাস্কর্যের মাধ্যমে দেশের বরেণ্য ব্যক্তিদিগকে ধরে রাখবার ব্যাপারে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে যেন একটা উদাসীনতা। তারপর অতি উত্তম কোয়ালিটির মার্বেল এবং যন্ত্রপাতি আমাদের দেশে নেই, অথচ বিদেশ থেকে আনবার ব্যাপারে ভারত সরকারের বহু বাধা নিষেধ এবং ব্রোঞ্জ ঢালাইয়ের বিষয়ে নেই নির্ভরযোগ্য কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান। যেটুকু হচ্ছে তা শুধু শিল্পীদের স্বকীয় চেষ্টায় এবং কঠোর পরিশ্রমে। বাংলা তথা ভারত সরকারের কর্তব্য তাঁদের দৃষ্টিকে আরো উদার এবং উন্মুক্ত করে ভাস্করদের ঐসব বাধাগুলিকে অপসারণের জন্য দরদ নিয়ে এগিয়ে আসা।

রমেশচন্দ্রের শিল্পাদর্শে দেখা যায় পাশ্চাত্য পদ্ধতি ও প্রাচ্যরীতির সমন্বয়। সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনায় কোন ভৌগোলিক অপদেবতার প্রবেশাধিকার দেন নি, দু' তরফকেই একসঙ্গে টেনে এনেছেন ইনি—কলালক্ষ্মীর শ্রীমণ্ডিত অঙ্গনে।

## এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শিল্পী ও ভাস্কর শ্রীরমেশ পাল নির্মিত বাক্‌দেবী মূর্তির আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

মনোজ বসু

## এক

গাঙের নাম করালী। ভাঁটার সময় নিতান্ত লিকলিকে চেহারা। নিকানো আঙিনার মতো লোনা কাদার উপর গাঙ যেন ঘুমিয়ে পড়ে। জোয়ারবেলা সেই গাঙের চেহারাটা দেখ। ভয় করবে। পাশাপাশি জলে ভরভরতি। জঙ্গলের অন্ধিসন্ধি অবধি জল। এপারে ওপারে লোকে যত বাঁধ দিয়েছে ছলাৎ ছলাৎ করে থাবড়া মারে তার গায়ে। বাঁধ কমজোরি হল তো ঘেরির ভিতর ঢুকে পড়বে।

করালী থেকে খাল বেরিয়েছে। মোহানার এই জায়গায় নুন তৈরি হত। নিমকির মোহানা বলে এখনো ডাক। খালের ওপারে বড় বাদা, জন্তু-জানোয়ারের বসতি। এপারে চর, চরের লাগোয়া ছিটে-জঙ্গল। খলসি কাঁকড়া চাঁদাকাঁটা গেঁয়ো এই সমস্ত গাছ। তারই প্রান্তে একটুকু ডাঙার উপরে বড় কেওড়া গাছ একটা। নিমকির লোকেরা সেকালে ঘর বানিয়েছিল। তারই ভিটে ঐ উঁচু ডাঙা। ডাঙার উপরে হাঁড়িকুঁড়ি-ভাঙা চাড়া ছড়ানো বিস্তর। কেওড়াগাছও সম্ভবত সেই আমলের। নৌকোয় যেতে যেতে দু-চার বাঁক আগে থেকে গাছের মাথা নজরে আসে। মাঝি আঙুল তুলে নিশানা করে: ঐ যে—এসে গেলাম সাঁইতলা। ঐ সাঁইতলা থেকে হতে হতে চর ও জঙ্গলের সমস্ত জায়গাটা হয়ে গেছে সাঁইতলা। খালের নাম সাঁইতলার খাল। কিছু দূরে চৌধুরিঘেরির বাঁধের গায়ে গায়ে বাগদি তিওর-কাওরা-বুনোরা ঘর বেঁধে আছে, দিব্যি এক গাঁয়ের মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারও নাম সাঁইতলা।

কাঙালি চক্কোত্তি জঙ্গল বন্দোবস্ত নিয়ে মেছোঘেরি করলেন। বাঁধ দিলেন করালীর কূল ঘেঁসে। ভাগ করে বাঁধ দিলেন—জলের তোড়ে একটা ভেঙে যায় তো পিছনের বাঁধ থাকবে, ঘেরির মাছ বেরুতে পারবে না। মেছোঘেরির পাশে অপ্রয়োজনীয় ভিটের ডাঙাটুকু বাঁধের বাইরে রইল। দেবস্থান করবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু বড়লোক হয়ে ফুলতলার গঞ্জে ঘরবাড়ি বানিয়ে সেখানকার বাসিন্দা হয়ে যাওয়ায় দেবস্থানের মতলব চাপা পড়ে গেল। কোথা থেকে এক সাধু এসে আস্তানা করলেন কেওড়া গাছের নিচে। সাধনভজন হত। বাদায় যাতায়াতের সময় নৌকো বেঁধে মাঝিমাল্লারা সিকিটা দুয়ানিটা প্রণামী রেখে সাধুর আশীর্বাদ নিয়ে যেত। কিন্তু বাঘে মুখে করে বোধকরি সাধনোচিত ধামেই নিয়ে গেল সাধুকে এক রাত্রে। সাধু বা সাঁইয়ের আসন বলে সাঁইতলা নাম।

বয়ারখোলার গগন গুরু চৌধুরিঘেরিতে সেই একটা রাত্রি কাটিয়ে গেল। নিয়ে এসেছিল জগন্নাথ আর বলাই। সাঁইতলা জায়গাটা মনে ধরল সেইসময়। চৌধুরিঘেরির মাতব্বর অনিরুদ্ধ যাবার সময় বলল, আবার আসবেন বড়দা। এমন ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এলে হবে না, আট-দশ দিন থাকতে হবে এবারে এসে। যা চেয়েছিল তাই—এসে পড়ল গগন সত্যি সত্যি। আট-দশটা দিন কেন—থাকবে অনেকদিন, অনেক বছর। অতএব চুকিয়ে বুকিয়ে আসতে হল বয়ারখোলার ওদিকটায়। মাঘমাস অবধি দেরি করতে হল। বাড়ি বাড়ি তখন ক্ষেতের ধান উঠে গেছে, বয়ারখোলায় আবার সবাই বড়লোক। গগনগুরুর পোষাল না তো নতুন গুরু নিয়ে আসবে তারা—গোলা-আউড়িতে ধান বোঝাই, এখন কেউ পরোয়া করে না। ভাত থাকলে কাকের কোন অভাব আছে? যার কাছে যে মাইনে পাওনা, ত্রৈলোক্য মোড়ল মধ্যবর্তী থেকে সমস্ত মিটিয়ে দিল। কিছু বেশিও ধরে দিল—বর্ষার সময়টা গুরুমশায় বড্ড কষ্ট পেয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ।

লেখাপড়া-জানা মানুষ গগন, তায় উকিল ভবসিন্ধু গণের বাড়ি কিছুদিন থেকে এসেছে। অতএব উপরের মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা না বলে হুট করে এসে পড়তে পারে না। চৌধুরিদের বাড়ি ও সদর-কাছারি ফুলতলা। আধা-শহর জায়গা। রেল আছে, ইচ্ছে হল তো কলকাতায় চলে যাও রেলগাড়ি চেপে। অথবা তরতর বাদার দিকে নেমে যাও নৌকোয়। ফুলতলায় সব চেয়ে বড় বাড়ি মেছো-চক্কোত্তির। আরে দূর, কী বললাম—মেছো-চক্কোত্তি বললে তো ক্ষেপে যাবেন এখনকার চৌধুরি বাবুরা। ও নাম ছিল প্রথম যখন ব্যবসায়ের পত্তন হয়, কাঙালি যখন নিজ হাতে বোঠে বেয়ে মেছো-নৌকা নিয়ে গাঙ-খাল করে বেড়াতেন। মেছো-চক্কোত্তি বলত তাঁকে সবাই। মেছো বিশেষণটা জুড়ে যাওয়ায় চক্কোত্তি উপাধিটাও দূষ্য হয়ে গেছে এখন। চক্কোত্তি ছেড়ে চৌধুরি হয়েছেন হালের বাবুরা। এমন কি কাঙালি নামটার মধ্যে সেকেলে দারিদ্র্যের গন্ধ—ঐ নাম কদাপি উচ্চারণ কোরো না বাবুদের সামনে।

বাদায় যাবার-আগে গগন ফুলতলার চৌধুরিবাড়ি চলে গেল: ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা করব।

পড়ে গেছে ম্যানেজার প্রমথ হালদারের সামনে। প্রমথ বলেন, উটকো লোকের সঙ্গে বাবুর দেখা হয় না। দরকারটা কি বলো আগে শুনি।

সমস্ত শুনে নিয়ে বললেন, বুদ্ধি ঠাউরেছ ভালই। বোসো দাস মশায়। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে নেই। ঐ একটুকু ছিটে জঙ্গল—বাবু অবধি গিয়ে পোষাতে পারবে? আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে নাও, আমি ঠিক করে দেব।

গগন কাতর হয়ে বলে, কি দরের মানুষ আমি, চেহারায় মালুম পাচ্ছেন। যার নেই মূলধন, সেই আসে বাদাবন। গায়ের এই জামাটা আগে কামিজ ছিল—হাতা ছিঁড়ে গিয়ে এখন হাত কাটায় দাঁড়িয়েছে। পরনে ছেঁড়া-ন্যাকড়া—

লাটবেলাট কে তোমায় বলছে বাপু? ছোট বাবু অবধি খোঁজ করছিলে—তাই তো বলি, ষষ্ঠিপুজোর মুরোদ নেই, দুগ্‌গি তোলার সাধ! ছেঁড়া-ন্যাকড়া থাকে, তারই এক চিলতে দিয়ে যাও, সলতে পাকাবো। পরে যেদিন শাল-দোশালা হবে, তারও একখানা গলায় জড়িয়ে দিও। দেওয়া তো একদিনে ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

হি-হি করে খানিকটা হেসে নিয়ে হঠাৎ হাসি থামিয়ে প্রমথ বললেন, ছোটবাবুর নজরানা দশ আর এদিককার আমলান খরচা কুড়ি—

তিরিশ? আরে সর্বনাশ, বার দশেক বিক্রি করে দেখুন আমায়, তাতেও তিরিশ উঠবে না।

ছোটবাবু অর্থাৎ কাঙালি চক্কোত্তির ছোট ছেলে অনুকূল চৌধুরির কাছে গিয়ে প্রমথ বলেন, হুজুর, আমাদের এক নম্বর ঘরির বাইরে বন কেটে ঘেরি বানাবে বলছে। গুরুগিরি করত, বাঁধ বাঁধার মজাটা জানে না। এক কোটালে বাঁধের সমস্ত মাটি ধুয়ে সাফ করে দেবে। কাটিঘায়ে প্রাণটা দেবে, কিম্বা বাঘের পেটে যাবে। সাধু মানুষ মন্তোর দিয়ে রুখতে পারলেন না, সেখানে ঐ লোক যাচ্ছে সাউথুরি করতে।

আরও গলা নামিয়ে বলেন, আমাদের ভালই। বনের এক কাটা হয়ে থাকবে, ঘেরিটাও চিহ্নিত হয়ে যাবে। আখেরের কাজে আসবে।

অনুকূল বলেন, যা করে করুকগে। কিন্তু লেখাপড়ার মধ্যে যাচ্ছি নে।

বটেই তো! গণ্ডগোল বাধিয়ে গবর্ণমেণ্ট খেসারতের দাবি না তুলতে পারে শেষটা।

ছোটবাবু এসে দাঁড়ালে গগন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে পদতলে পাঁচ টাকার নোট একখানা রাখল। প্রমথর আমলান খরচার কদ্দুর কি হল প্রকাশ নেই।

সাঁইতলার সত্যি মালিক কে, ঠিকঠাক বলা মুশকিল। কাঙালি চক্কোত্তি যখন বন্দোবস্ত নেন, নিমকির ভিটেটুকু ছাড়া বাকি সমস্ত গাঙের নিচে। চর পড়ে গিয়ে তার পরে ডাঙা বেরুল। জঙ্গল ভেকে উঠল সেখানে। গাঙ ক্রমশ দূরে গিয়ে পড়েছে, কোটালের সময় ছাড়া বাঁধের গোড়ায় জল পৌঁছয় না। দু-সারি বাঁধ নিরর্থক এখন। এই নতুন চরে ভেড়ি বেঁধে গগন মেছোঘেরি বানাবে। চৌধুরিরা বাঁধ দিয়ে সীমানা ঘিরে নিয়েছিলেন। আর গাঙের মালিক হলেন খুদ গবর্ণমেণ্ট। নতুন চর কার ভাগে পড়বে? চৌধুরির না গবর্ণমেণ্টের—বুঝুন ওঁরা মামলা-মোকদ্দমা ও লাঠিবাজি করে। ততদিন হাত কোলে করে বসে থাকা চলে না। গগন তো ছোটবাবুকে বলে-কয়ে দখল নিয়ে বসল। দখলই হল স্বত্বের বারো আনা—আইনে সেই রকম বলে। একবার চেপে বসতে পারলে, ব্যস, ওঠাবে কার বাপের সাধ্য?

তাই হয়েছে। চরের কিনারে ঝাঁকড়া মাকড়া গেঁয়োর শিকড়ের সঙ্গে ডিঙি এনে বাঁধল। ডিঙি জগন্নাথের। কিনেছে না আর কোন কায়দায় পেয়েছে—ওসব গোলমেলে কথা জিজ্ঞাসা কোর না। মোটের উপর, এই ডিঙির সম্বলে সে বাদার কাজকর্ম করে বেড়ায়। পোষা ঘোড়ার মতো তার পোষ-মানা ডিঙি। বনকরের বাবুদের চোখের সামনে দিয়ে হাউইবাজির মতন সাঁ করে বেরিয়ে যাবে, অথবা ইঁদুরের মতো জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর ঢুকে পড়বে, ডিঙি যেন আপনা হতে তা বুঝতে পারে। সেই ডিঙি সাঁইতলায় এনে বাঁধল। বাদার কাজে যাচ্ছে না আপাতত। সে হোক গে, এ-ও এক কাজ বটে তো—নতুন জায়গায় বড়দা'কে নিয়ে এলো, খানিকটা তার স্থিতি করে দেওয়া।

কাজ অনেক—জঙ্গল কাটা, মাটি কেটে ভেড়ি বেঁধে চর ঘিরে ফেলা, আলা বানানো। সমস্ত শীতকালের ভিতরে। বর্ষা নামবার আগে তো নিশ্চয়ই—চারিদিক ডুবে গিয়ে সারা অঞ্চলে তখন এক ঝুড়ি মাটি মিলবে না। চৈত্র মাসেরও আগে—সাঁড়াসাঁড়ি বানের আগে বাঁধের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। লোক লাগাতে হবে বেশি করে।

বেওয়ারিশ এক চালাঘর আছে পাড়ার একদিকে। এমন অনেক পড়ে থাকে বাদা অঞ্চলে। যে লোক বেঁধেছিল, সুবিধা পেয়ে সে অন্য কোথাও সরেছে। স্ত্রীলোকের টানেও হতে পারে। ঘরের মায়া করে মানুষ এক জায়গায় পড়ে থাকে না। মায়া করার বস্তুও নয়। খুঁটির উপরে দু'খানা মাত্র চাল। সেই ঘের—আলাঘর যত দিন না হচ্ছে, সেখানে গিয়ে উঠেছে। শীতকাল বলে তিনদিকে গোলপাতার বেড়া দিয়ে নিল, চালের উপরেও নতুন গোলপাতা ফেলল কয়েকটা। দিনমানে কাজেকর্মে বাইরে বাইরে থাকে, রান্নাবান্নাও ফাঁকার উপর। রাত হলে কেউ ডিঙিতে, কেউ বা চালা ঘরে ঢুকে পড়ে। নতুন এসে গগনের ভয়-ভয় করে, বিশেষ করে সাধুবাবার ঐ পরিণাম শুনে। সাধু হলেও বাঘে রেহাই করল না। শুকনো কাঠকুটো জড় করে উঠানের উপর আগুন ধরিয়ে দেয়, আগুন জ্বলে সারা রাত্রি। দু-রকমের কাজ হয়—আগুনের তাপে শীত কম লাগে, আর আগুন দেখে ভয় পেয়ে খালপারে বাদার জন্তু-জানোয়ার এ-মুখো এগোয় না।

নিমকির ভিটে দেবতার নামে আছে অনেক কাল থেকে, দেবস্থানই হোক তবে ওখানে। গগনদের গাঁয়ের জাগ্রত রটন্তী কালী ঠাকরুন গ্রাম রক্ষা করে আসছেন। চারু আর বিনি-বউকে তাঁর পাদপদ্মে সঁপে রেখে এসেছে। এখানেও তারা কালীমাতার দৃষ্টির উপরে থাকবে। বট-অশ্বত্থ এ তল্লাটে নেই—ভিটের কেওড়া-গাছতলাই হোক তবে কালীতলা। জঙ্গলে কুড়ালের কোপ দেবার আগে ঐ কেওড়াতলায় ভক্তিভরে প্রণাম করে কিছু ছাঁচবাতাসা রেখে এসেছে। দিন আসে তো তখন নিরামিষ বাতাসা-ভোগ নয়, ঢাকঢোল

বাজিয়ে পাঁঠা বলি দিয়ে তোমার বার্ষিক পুজোর বন্দোবস্ত হবে মা-জননী।

আলার জায়গা ঠিক হয়েছে। খালের কিনারে পাড়ার কাছাকাছি—চৌধুরির সীমানা পার হয়ে এসেই। মানুষের কাছে থাকতে হয়, দায়ে-বেদায়ে মানুষ কাজে লাগে। জলের কাছে থাকতে হয়, মালপত্র বওয়াবয়ির তাতে কম হাঙ্গামা। আলার কাজ হচ্ছে আস্তে-ব্যস্তে। ডিঙি নিয়ে জগা আর বলাই বাদায় ঢুকে গরানের ছিটে ও গোলপাতা কেটে আনল। গরানের ছিটে চেঁচে-ছুলে রুয়ো বানাচ্ছে। বন কাটতে লেগেছে অনেকে। বারো-চোদ্দ খানা কুড়াল পড়ছে। কুড়ালের কোপে মড়মড় শব্দে গাছপালা ভুঁয়ে পড়ে। সমারোহ ব্যাপার। শুধু সাঁইতলা বলে কেন, অঞ্চল জুড়ে সাড়া পড়ে গেছে। ঘেরি হচ্ছে একটা নতুন। বাদার কাঠুরে-বাউলরা খালের পথে যেতে আসতে কাণ্ডকারখানা দেখে। ঘাড় উঁচু করে তুলে দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে।

উপর থেকে গগন হয় তো ডাকল, এসো না। নৌকো ধরে বসে যাও একটুখানি।

না দাদা, বড় তাড়া। আর এক দিন।

অথবা, পাড়েই ধরল নৌকো। কাদা ভেঙে উপরে উঠে এলো। এই সব জায়গা জনপদের মতো নয়। নতুন লোক দেখলে স্ফূর্তি হয়, হাতের মুঠোয় স্বর্গ পাওয়ার মতো। আলাপ-পরিচয় করে জমিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

বোসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তামাক খাও। কি তামাক—বড়-তামাক চলবে তো?

আরে দাদা, যা বাস বেরিয়েছে তোমাদের ছোট-তামাকই তো বড্ড বেহদ্দ।

খাটুনির মানুষরা খাটাখাটনি করে। আর গুলতানি করে বসে বসে আর একটা দল। মানুষের আনাগোনা নতুন চরের উপর। মানুষ না লক্ষ্মী—মানুষের পায়ে পায়ে তো অর্ধেক জঙ্গল সাফসাফাই হল, সাপখোপ পালিয়ে গেল। কেউ হাসে: মাথা খারাপ এদের। এক রত্তি চরের উপর কী ঘেরি বানাবে, আর ক'টা মাছ জন্মাবে! আবার কেউ বলে, হেসো না, ছোট থেকে বড়। কাঙালি চক্কোত্তির কোন ধনসম্পত্তি ছিল গোড়ার দিকে? ব্যবসা না-ই হল, একটা ওঠা-বসার জায়গা তো হবে খালের মুখটায়। মা-কালীর থান হয়ে তো রইল!

ঘেরি বাঁধা হল এবং ঘেরির ঝাঞ্জের যে রকম বিধি—চৈত্রমাসে বানের জল তুলে দিল ঘেরির খোলে। জলের সঙ্গে বালির মতন মাছের ডিম। ডিম ফুটে মাছ জন্মাবে, মাছ বড় হবে, সেই মাছ ধরে ধরে বিক্রি। ব্যবসাটা হল এই। জমতে সময় লাগে। অথচ কী আশ্চর্য, আষাঢ় পড়তে না পড়তে নতুন আসাঘর বানানোর আগেই ভাঙা ঢালার ভিতর টাকা বাজানোর টুং টাং আওয়াজ। শেষরাত্রে গগন দাস খেরো-বাঁধা খাতা খুলে রেজগি-পয়সা থাকে থাকে সাজিয়ে নিয়ে বসেছে। বলি, কি ব্যাপার—আসল বাণিজ্যটা কি, ভাঙো দিকি একটু।

সমস্তটা দিন তাক করে থাকো। কিছু নয়। অলস নিষ্কর্মা কতকগুলো মানুষ জঙ্গল-কাটা চরের উপর আড্ডা দিচ্ছে, অথবা ঘুমুচ্ছে ছায়াচ্ছন্ন কালীতলায় পড়ে পড়ে। ভাত জোটায় কেমন করে, হ্যাঁ? আর সে ভাতও সামান্য ব্যাপার নয়—আহারের সময় একদিন নজর করে দেখো, বাড়া-ভাত বেড়ালে ডিঙিয়ে এপার-ওপার করতে পারে না।

দিনমানে এই। রাত্রিবেলা আলাদা এক চেহারা। যত রাত হয়, মানুষগুলো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ঝোপে-জঙ্গলে লুকানো খেপলাজাল নিয়ে ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে যেন পাখি হয়ে কে কোন দিকে সরে পড়ল। পাড়ার ভিতর থেকেও বেরিয়ে পড়ছে অমনি। যত অন্ধকার, ততই মজা। মরদগুলোর দু-চোখের মণি ধ্বকধ্বক করে জ্বলে যেন। অন্ধকার সমুদ্রে ডুব-সাঁতার দিয়ে চক্ষের পলকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ওরা তো বেরিয়ে গেছে। আরও অনেকক্ষণ পরে মোটাসোটা চিকণ চেহারার তিন-চারটে মানুষ কোথা এসে মাদুর বিছিয়ে বসল। মাছের পাইকার। বৃষ্টিবাদলা হল তো ঘরের ভিতরে, নয় তো খাল ধারে নতুন বাঁধের উপর। তাড়াহুড়ো নেই—গল্পগুজব হচ্ছে, কলকে ঘুরছে হাতে হাতে। আকাশে পোহাতি তারা উঠল, ফিরে আসে এইবার মাছ-মারা লোকগুলো। মাছ মেরে নিয়ে আসে। কেউ আনে খালুইতে, কেউ ডালায় ঢেলে। যে জালে মাছ ধরেছে, কেউ বা সেই জালের সঙ্গেই জড়িয়ে নিয়ে আসে। গাছগাছালির আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলো, কিম্বা গাঙের খোল থেকে মাথা তুলে উঁচু বাঁধের উপর এসে দাঁড়াল। আগে ছিল না বুঝি এরা কেউ—আকাশ থেকে পড়ে গেল অথবা পরীতে উড়িয়ে এনে ফেলল, এমনি ধারা মনে হবে আপনার।

মাছ-ধরা ব্যাপারটা যেন লুকোচুরি খেলা ঘেরিওয়ালাদের সঙ্গে। চৌধুরিগঞ্জের সঙ্গে বিশেষ করে। পাশাপাশি পাঁচটা ঘেরি ওঁদের—অকূল সমুদ্রের মালিক হয়ে বসে আছেন। অন্যলোকের ছিটেছাটা এদিকে সেদিকে, ছোট ব্যাপার নিতান্তই। ছোট ঘেরির মালিক হয়তো বা নিজে আলায় চেপে বসে আছে, দরকার মতো নিজ হাতেই মাছ বাছাই করে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ওজনে বসে গেল। পরের উপর নির্ভর নয় বলে বাড়াবাড়ি রকমের পাহারা ঐ সব জায়গায়। মুশকিল বেশি যেখানে। গাঙ-খাল গবর্ণমেণ্টের—জাল ফেলার কড়াকড়ি নেই। তবু মানুষ সেদিকে বড় ঘেঁসে না। অনেক খেটে অনেকক্ষণ জাল ফেলাফেলি করে তবে হয় তো যৎসামান্য উঠল। আর ঘেরির ভিতরে, বলা যায়, জিইয়ে রাখা মাছ। জো-সো করে ফেলে দিলেই হল। বিফলে যাবে না। জাল টেনে তোলা দায় হয় কখনোসখনো, মাছের ভারে জাল ছেঁড়ে।

চৌধুরিঘেরির আলায় সেই এক রাত্রির ব্যাপার দেখেছিলে। মাছের নৌকো রওনা করে দিয়ে লোকজনের ছুটি। দু-চার জনে ঘোরাঘুরি করে জলের উপর একটু নজর রাখে এইমাত্র। গগনের দল ঘাঁটি করার পরে বন্দোবস্ত পালটেছে। রাত জাগতে হচ্ছে দস্তুরমতো, নানান দল হয়ে ঘেরিগুলো পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছে। কাদা মেখে আছাড় খেয়ে বাঁধের উপরে কখনো ঘুরছে। কখনো বা শালতি ডোঙায় জলের উপরে।

ওই—ওই দেখ এক বেটা শয়তান—

সাঁ-সাঁ করে জল কাটিয়ে পাহারার শালতি সেইখানে এসে পড়ল। কা কস্য পরিবেদনা। গাছের ফাঁকে ঘোলাটে জ্যোৎস্না পড়ে মনে হয়, একটা মানুষ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে এমন

য জায়গাটায় পৌঁছে শালতি থেকে নেমে এদিক-সেদিক ঘুরে দেখেও ন্দেহ যেতে চায় না। রাত দুপুরে জান কবুল করে ধ্বজি ঠেলা, মস্ত বাজে হয়ে গেল। এর জন্যেও রাগ হচ্ছে মাছ-মারাদের উপর। কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে বসে থেকে এদের নিয়ে যেন খেলাচ্ছে।

সেটা নিতান্ত মিছা নয়, তক্কে তক্কে আছে মাছ-মারারাও। বেসামলি হয়েছে কি চমক লাগবে জাল ফেলার শব্দে। ছুটোছুটি করে পৌঁছবার আগেই খেওন তুলে সরে পড়েছে। মাঝে মাঝে দ্বীপের মতো থাকায় জুত হয়েছে তাদের। কোন দ্বীপের জঙ্গলে ঘাপটি মেরে আছে, বুঝবে সেটা কেমন করে? পাশ কাটিয়ে হয়তো বা একেবারে দু-হাতের ভিতর দিয়ে চলে গেলে—গেছ বেশ খানিকটা—নিঃসীম স্তব্ধতার মধ্যে ঝপ্‌পাস করে আওয়াজ। আওয়াজের আশ্বাসে ফিরে গিয়ে হয়তো বা দেখবে, মাছসুদ্ধ জাল হাতে তোমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ফ্যা-ফ্যা করে হাসছে সীমানার রেখের নিচে গিয়ে। সীমানার ওপার গেলে আর কিছু করবার নেই—কলা দেখাবে ঐখানটা দাঁড়িয়ে। বাদা অঞ্চলের অলিখিত আইন এই। মানুষ খুন করেও এলাকার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালে বাপ করি গায়ে হাত দেওয়া চলবে না।

রাত দুপুরে হল্লোড় এমনি। চোরের সঙ্গে গৃহস্থ পারে কখনো? অত বড় জলাভূমির অন্ধিসন্ধি নখদর্পণে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। আর ও-পক্ষ ওৎ পেতে রয়েছে—কোন একখানে পাহারার কমজোরি দেখেছে কি অমনি গিয়ে পড়ল। ভোররাত্রি অবধি এমনি—হঠাৎ চুপচাপ একেবারে। পাহারাদারয়া হাই তুলে আলায় ফিরল, শোবে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে। মাছ-মারাও ফিরে আসে—গগন ও ব্যাপারিরা লণ্ঠন জেলে পথ তাকিয়ে আছে তাদের। দর কষাকষি ব্যাপারিদের সঙ্গে। মোহানার মুখে ভগা বলাই পচা ডিঙি নিয়ে আছে। জোয়ার এসে গেল—অস্থির ডিঙি মাথা ঝাঁকাঝাঁকি করছে। টানের চোটে ডিঙি-বাঁধা দড়ি না ছিঁড়ে যায়। গোন বয়ে যায়, তাড়াতাড়ি কর হে তোমরা। —তাড়াতাড়ি।

মাছ মারতে যে ক'জন বেরিয়েছিল, সবাই সব দিন যে ভরা জাল নিয়ে ফিরবে এমন কথা নয়। ঘেরির পাহারাদার ধরে ফেলেছে হাতে নাতে। চোরের দশ দিন, গৃহস্থের একটা দিন তো বটে! ধরতে পারলে শাস্তিটা বড় বিষম। শাস্তি বাদারাজ্যের বিধান মনুযায়ী। মারধোর নয়, থানা-পুলিশ নয়—জালগাছি এবং সদিনের মাছ কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দেবে। এদের কিন্তু আগের দুটো পছন্দ। মার দিলে গায়ের উপর দিয়ে গেল—একটু না হয় গা-গতর ব্যথা হবে, আবার কি! থানা-পুলিশ হলে আরও ভাল—থাকা ঘরে রেখে ভরপেট খাওয়াবে। এই সমস্ত না হয়ে পেটের ভাতে টান। জরিমানার পয়সা চুকিয়ে দিলে তবে জাল ফেরত মিলবে। রোজগার বন্ধ সেই ক'দিন। জরিমানার পয়সাই বা আসে কোথা থেকে? ধারধোর নেবে, কিন্তু বাদাবনে ক'টা খাজে খাঁ বসত করে যিনি নিজের খরচ-খরচা চালিয়ে তার উপর অন্তের থামল দিতে পারে?

অতএব উপোস দাও, এবং হাত পেতে বেড়াও এর-তার কাছে। আগে ছিল এই ব্যাপার। গগন এসে পড়ায় দুর্ভোগের শেষ হয়েছে। গিয়ে মুখের কথাটি বলো, খাতায় নাম লিখে সঙ্গে সঙ্গে অগ্রিম জরিমানার পয়সা দিয়ে দেবে। জাল ফেরত এনে বুড়ো-হালদারের নাম নিয়ে আবার রুজিরোজগারে লাগো। মাছ এনে তুলবে অবশ্য সাঁইতলায়—গগন যে খাতা খুলেছে, সেখানে। তুলবে নিজেরই গরজে—এমন দরদাম আর কোথায়? কিনবার খদ্দেরই বা কোথা? নিয়মমাফিক বৃত্তির সঙ্গে এই আগাম দেওয়া জরিমানার পয়সাও অল্পসল্প করে কেটে নেয়। মাছ-মারার গায়ে লাগে না।

বুদ্ধিটা দিয়েছিল জগা: ঘেরির মাছ বাড়তে লাগুক, কিন্তু ততদিনের উপায় কি বড়দা? চৌধুরিরা সিন্দুক খুলে রমারম খরচ করে। তোমার তো গুরুগিরির ঐ ক'টা টাকা সম্বল। এক কায়দা বলি, শোন। এই পথ ধরো—

আচ্ছা মাথা বটে! পেটে বিদ্যে থাকলে জগা দারোগা-হাকিম হয়ে যেত। গাঙ-খালের মুখটায় ভাল একটু জায়গা করে বসা কেবল। ভোরের সময় কিছু দাদন ছেড়ে সন্ধ্যাবেলা ষোল আনা উসুল করে নেওয়া। আপাতত অস্থায়ী চালা ঘরে শুরু করে দিল। জমে আসছে দিব্যি। আলাঘর বাঁধা হয়ে গিয়ে এর মুখে ওর মুখে দূরদূরান্তর চাউর হয়ে পড়লে আরও জমবে। মেছোঘেরিতে আগে লোকে জাল ফেলত খাবার মাছের লোভে, বিক্রির মতলবে নয়। বিক্রি করতে হবে মানবেলায় নিয়ে গিয়ে—যেখানে লোকে পয়সা দিয়ে মাছ কেনে। অনেক দূরের ফুলতলা না হোক, কুমিরমারি অন্তত পক্ষে। দুটো-চারটে মাছ নিয়ে নৌকো করে গিয়ে খরচা পোষাবে কেন? ঘেরিওয়ালাদেরও মাথাব্যথা ছিল না এই সব মাছ-মারা নিয়ে। পেটে আর কতই বা খাবে! দু-পাঁচবার হৈ-হৈ করে পাহারাদারে রীতি রক্ষা করত। গগন খাতা খোলবার পরে সেই -খের মাছ মারা এখন পুরাদস্তুর ব্যবসা। মাছ মারার মানুষও দিনকে দিন বাড়ছে। সামাল-সামাল পড়ে গেছে সব ঘেরিতে। গালিগালাজ করে গগনের নামে। শুধু গালিগালাজে শোধ যাবে বলেও মনে হয় না, লাঠিসোটা নিয়ে এসে পড়তে পারে। রোগা টিমটিমে পচা, চি-চিঁ করে কথা বলে। ডিঙি পাওয়ার কাজে রোজ রোজ নগদ পয়সা পেয়ে তারও প্রতাপ খুব। সে তড়পায়: আসুক তাই। টের পেয়ে যাবে আদায় কেমন ঝাঁজ। আমরাও জানি লাঠি ধরতে। লাঠি কেন, বল্লম-সড়কি-কালা। জগা আরও রোখ বাড়িয়ে দেয়: আর দেশি বন্দুক! জালের কাঠি ভরে নিয়ে যায় এক দেওড়ে, মানুষ কোন ছার, বড় বড় কুমির চার-পা মেলে চিত হয়ে পড়ে। বিলাতি ফঙ্গবেনে বন্দুক কি করবে তার কাছে? কামারের কাছ থেকে বন্দুক গড়িয়ে আনব—অ্যাঁ, পচা?

গোড়ায় খোসামোদ করে ব্যাপারি আনতে হল। হতে হতে এখন চার-পাঁচ জন এসে জোটে। নিলামের মতন ডাকাডাকি হয়। এক সিকি—দেড় সিকি—যাকগে বাপু, দুই। তাতেও ছাড়বিনে? পায়রা-চাঁদা—তা কি হয়েছে? চাঁদি রূপোও তো এত দামে বিকোয় না রে। আর আধখানা উঠতে পারি—এই শেষ। দিবি? আর এক ব্যাপারি এক পাশে হয়তো নিঃশব্দ ছিল এতক্ষণ। পুরোপুরি তিন বলে মাছগুলো নিজের ঝোড়ায় সে ঢেলে ফেলল। গগন খাতায় লিখে নিচ্ছে। প্রতি ব্যাপারির আলাদা ঝোড়া। দরদামে পটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে

মাছ ঝোড়ায় ঢেলে নেয়। সমস্ত ঝোড়া তুলে ফেল এবার ডিঙিতে। তাড়াতাড়ি, সময় বয়ে যায়। ব্যাপারিরা কেউ কেউ উঠে পড়ল। এখন আর পাল্লাপাল্লি নেই। এ ওকে বিড়ি দিচ্ছে, পান খাওয়াচ্ছে—গলাগলি ভাব। যত কেনাবেচা হবে, টাকা-প্রতি এক পয়সা বৃত্তি গগনের। হিসাব করে দেখ, কতয় দাঁড়াল। ডাক্তারি ও গুরুগিরির চেয়ে ভাল। খাতা আর সাঁইতলার ঘেরি যত জমবে, তত আরো বেশি ভাল হবে।

বেচাকেনা সারা হতে পুবের আকাশ রাঙা হয়ে আসে। সাঁ-সাঁ করে জল কেটে তীরের মতন ছুটেছে ডিঙি। জোরে—আরও জোরে। বারোবেঁকির খাল—বাঁকের সংখ্যা বারো, নিতান্তই বিনয় বশে বলা হয়েছে। গুণতি করলে পঁচিশ-ত্রিশের কম হবে না। কাঁচামালের কাজ-কারবার—যত তাড়াতাড়ি নিয়ে পৌঁছানো যায়। যে ঝোড়াখানায় ছটো টাকার কমে হাত ছোঁয়ানো যাবে না, পৌঁছুতে দু-ঘণ্টা দেরি হয়ে যাক—আট আনার পয়সা দিয়ে নিতে চাইবে না কেউ তখন। মাছ হল এমনি বস্তু। এতগুলো বাঁক মেরে ঠিক ঠিক সময়ে মাল পৌঁছে দেওয়া জগাই পারে শুধু। তাই তার খোশামুদি। তবু তো যাচ্ছে—বড় ঘেরিওয়ালাদের মতো ফুলতলার বাজার অবধি নয়, তার অর্ধেক পথ কুমিরমারি। মনোহরের বাড়ি থেকে পালিয়ে গগন যেখানে ডাক্তার হয়ে বসেছিল। কুমিরমারির অঢেল উন্নতি—দিব্যি ছোটখাট এক গঞ্জ হয়ে উঠেছে। নতুন রাস্তার আগাগোড়া মাটি পড়ে গেছে। রাস্তা আরও খানিকটা টেনে শেষ হবে চৌধুরিগঞ্জ গিয়ে। খাল বাঁধা হচ্ছে দু-তিনটা। যেখানে বড় কাদা, ঝামা ইট খোয়া ফেলা হবে সে সব জায়গায়। বছরের কোন সময়ে মানুষজনের চলতে যাতে অসুবিধা না হয়। অনুকূল চৌধুরির তদ্বিরে সমস্ত হচ্ছে—ঠিকাদার তিনি। মাটি-কাটা কুলি বিস্তর এসে পড়েছে বাইরে থেকে, কুলি খাটানোর বাবুরা এসেছে। গদাধরের হোটেল ফেঁপে উঠছে দিন দিন—গদাধর ছাড়াও নতুন এক রাঁধুনে বামুন রেখেছে, আর চাকর দু-জন। জগার ডিঙি ঘাটে লাগতে না লাগতে নিকারিরা এসে নগদ পয়সায় সমস্ত মাছ কিনে নেয়। খুচরো বিক্রি তাদের—কতক বেচে ওখানেই গঞ্জের উপর বসে। কতক বা ডালিতে ভরে মাথায় বয়ে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তরের হাটে। ফুলতলার তুলনায় দর অবশ্য সস্তা। কিন্তু শেষ রাতে বেরিয়ে ফুলতলা পৌঁছুতে, খুব তাড়াতাড়ি হলেও, সন্ধ্যা হয়ে যাবে। চৌধুরিগঞ্জের মতো সন্ধ্যারাত্রে বেরুবার উপায় তো নেই। তবে দর যত সস্তা হোক, মাছ-মারাদেরও বিনি পুঁজির ব্যবসা—লোকসান কিছুতে হবে না। রাস্তার কাজ পুরোপুরি শেষ হতে দাও, এই কুমিরমারি গঞ্জই কী সরগরম হবে দেখো তখন। মোটরবাস চলবে—বাসের ভিতরে মানুষ, ছাতের উপরে মাছের ঝোড়া। সাঁ করে ছুট দিল, সকাল হবার আগেই কুমিরমারি। এবারে জলপথে মোটরলঞ্চে চাপিয়ে দাও। চৌধুরিগঞ্জ এবং আর পাঁচটা ফেরিওয়ালা যা করছে। ফুলতলায় বাবুভায়েরা দাঁতন করতে করতে বাজারে এসে দেখবেন, সাঁইতলার মাছ এসে পড়েছে।

তিন পহর রাতে মাছ-মারাদের অপেক্ষায় ঝিমোতে ঝিমোতে গগন এই সমস্ত ভাবে। ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে। দূর বলে তখন আর কিছু থাকবে না। জগাটা কাজ ছেড়ে দিয়ে যাবো যাবো করছে, জগা কিম্বা কারও তোয়াক্কা করবে না আর তখন। হে মা কালী, বিস্তর লজ্ঝাগজ্ঝির পর অভাগা সন্তান বনে এসে পড়েছে, এইবারে স্থিতি হয় যেন। খেলিয়ে খেলিয়ে আর মজা কোরো না মা-জননী। [ক্রমশঃ।

## মন-আয়না

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, মানুষের মুখ হচ্ছে তার মনের দর্পণ। মনে কি ভাব রয়েছে, অস্পষ্ট হলেও মুখমণ্ডলে তার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। অন্ততঃ এইটা বিশেষজ্ঞদের চক্ষু সহজে এড়িয়ে যেতে পারে না। সর্ব্বহারা দুঃখীর মুখের যে বিষণ্ণতা দেখা যাবে, পরম নিশ্চিন্ত কোন মানুষের মুখাবয়বে সেই ছাপ থাকা অসম্ভব। একজন জ্ঞান-তপস্বী বা চিন্তাশীলের চোখে-মুখে বুদ্ধিমত্তা ও মনীষার ছাপ পড়বে, কিন্তু তাই বলে অন্ত সকলের ক্ষেত্রেও সেইটি লক্ষ্য করা যাবে, এমন আশা বৃথা। আবার একজন নিষ্ঠুর খুনে বা ডাকাতের মুখাকৃতিতে যে ভীষণতার ছাপ থাকবে, সাধু-সজ্জনের মুখে সাধারণতঃ সেইটি থাকতে পারে না। কবির চোখে-মুখের প্রসন্নতা ও স্বপ্নানুভাব অস্ত্রধারী সৈনিকের মুখে থাকবে, এমনটি আশা করা ভুল। সহজ কথায়, বিভিন্ন পেশার লোকদের মুখের প্রতিচ্ছবি বিভিন্ন রকমের হওয়াই স্বাভাবিক। সর্ব্বোপরি, একটি কথা বেশ জোর দিয়ে বলা চলে—ভণ্ডতা যেখানে নেই, সে অবস্থায় মন সাদা বা স্বচ্ছ থাকলে মনের মুকুরে মুখও স্বচ্ছ দেখাবে, আর মন কালো থাকলে মুখচ্ছবিও হবে যথারীতি কালো।

# সতেরো

কিছু কাল আগে, সেন্ট মার্টিন লেনে বিষণ্ণ সন্ধ্যায় প্রবল বর্ষণের ফলে আটকে পড়েছিলাম। একটা অপরিসর বারান্দার নীচে এসে দাঁড়ালাম, কিছু পরে আরো তিন জন ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। গম্ভময় আকৃতি, সম্ভবত: সম্ভ্রান্ত ধরণের কারিগরী শিল্পের কাজ করেন। আশ্চর্য। আমাকে অবাক করলেন ওঁরা, কোথায় ঘোড়ার কথা আলোচনা হবে তা নয়, তাঁরা সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা সুরু করলেন, রীতিমত বিশুদ্ধ কণ্ঠসঙ্গীত। তাঁরা অতীতে সঙ্গীত শাস্ত্রে স্ব স্ব অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করছিলেন, তাঁদের সময়কার প্রিয় গায়কদের কণ্ঠে শোনা গানের নমুনাও মাঝে মাঝে গাওয়া হচ্ছিল। এই সূত্রে কথা উঠল তাঁদের সমসাময়িক কোনো জনপ্রিয় গান কারো মনে আছে কি না। অবশেষে, তাঁদের একজন একটি বাঁশী বার করলেন এবং তিন জনে অতি সুন্দর ভাবে নীচু গলায় তিন-অংশে লেখা একটি গান আরম্ভ করলেন, পথচারী জনতা বৃষ্টির উৎপাতে এদিকে তেমন লক্ষ্য করবেন না ভেবে, কণ্ঠস্বর আরো একটু চড়লো। কয়েক ফিটের মধ্যেই যে একজন বিচক্ষণ সঙ্গীত-সমালোচক উপস্থিত আছেন, এই বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন না। সমালোচক এই সঙ্গীতে অতিশয় নিঃসন্দেহে পরিতৃপ্ত হলেন, তবে বিস্মিত হ'ননি। এই কথা ক'টি বার্ণার্ড শ' তাঁর Music in London 1890-94 নামক গ্রন্থে স্বয়ং লিপিবদ্ধ করেছেন।

বার্ণার্ড শ'র বিখ্যাত নাটক Pygmallion-এর পরিকল্পনা কিন্তু আরো অনেক আগে, তাঁর মা যখন লণ্ডন চলে এলেন তখন তরুণ বার্ণার্ড শ' পিতা কার শ'র সঙ্গে ডাবলিনের এক বাসায় এসে ওঠেন, সেই সময়েই নাকি এই নাটকের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে।

Pygmallion নাটক ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর ভিয়েনায় হফ্‌বুর্গার থিয়েটারে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। বার্ণার্ড শ'র এই নাটকের জনপ্রিয়তা অসীম, বিদেশে মঞ্চস্থ হওয়ার পর লণ্ডন শহরে ওয়েষ্ট এণ্ডে যখন মঞ্চস্থ হল তখন সমালোচকরা স্তব্ধ, দর্শক ভেঙে পড়ল। আর এই নাটক শুধু লণ্ডন শহরেই ছ'সাত দফায় দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত হয়েছে, এবং শুধু মঞ্চে নয়, পর্দায় এই নাটক কম সাফল্য অর্জন করেনি।

লণ্ডনের হিজ ম্যাজেসটিশ থিয়েটারে ১৯১৪, ১১ই এপ্রিল তারিখে এই নাটক প্রথম অভিনীত হল, নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বীয়রবোহম ট্রী আর মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল। প্রফেসর হেনরী হিগিনসের ভূমিকায় ট্রীকে তেমন মানায় নি, তবু বার্ণার্ড শ'কে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল, কারণ মিসেস ট্রীর তাই কনট্রাক্ট। নাটকের সাফল্যের ফলে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত এই নাটক চলল, আরো চলতো হয়ত কিন্তু সারাজেভোয় আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ড নিহত হলেন, এবং তার পরেই সুরু হল প্রথম মহাযুদ্ধ।

অনেক আগেই এই নাটকের কথা মনে জেগেছিল শ'র। শ' লিখেছেন - Cæsar and Cleopatra—আমার মন থেকে সোজা মুছে গেছে, আমি ওদের জন্য একটা নতুন নাটক লিখবো। সেই নাটকের নায়ক ওয়েষ্ট-এণ্ডের ভদ্রলোক আর নায়িকা হবে ইষ্ট

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এণ্ডের আর্টিচের জরদা-লাল পালকযুক্ত টুপীপরা এপ্রণধারিণী সাধারণ মেয়ে। তখন থেকেই বার্ণার্ড শ' ফুলওয়ালী মেয়ের কথা ভাবছেন। অনেক দিন কেটে গেল, একদিন সেন্ট জেমস থিয়েটারে Bella Donna নাটক দেখেছেন বার্ণার্ড শ', থিয়েটারের অভিনেতা ম্যানেজার এক অঙ্কের বিরতির অবসরে বার্ণার্ড শ'কে সাজঘরে আহ্বান করে বললেন—আমাদের একটি নাটক দিন না।

বার্ণার্ড শ' তাঁর হাতে এনে দিলেন Pygmallion। আলেকজাণ্ডারের কাছে নাটকটি পড়ে শোনালেন বার্ণার্ড শ'। আলেকজাণ্ডার অহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন—চমৎকার। এই নাটক নির্ঘাৎ হিট করবে। ফুলওয়ালীর ভূমিকায় যে কোনও অভিনেত্রীর কথা বলবেন তাঁকেই আমি নেব, যতই খরচ হোক। তবে মিসেস ক্যামবেলকে এই ভূমিকা দেওয়ার চাইতে আমার মৃত্যুই ভালো।

বার্ণার্ড শ' বললেন—তা হয় না, এই নাটক আমি ওর জন্যই ত' লিখেছি। বার্ণার্ড শ' বলেছেন, আমার যত দোষই থাক এই বিষয়ে আমি আন্তরিক সততা রক্ষা করবো।

কিন্তু বিপদ অন্য দিকে। কোনো নামকরা অভিনেত্রী এমন একটি অভব্য ভূমিকা নিয়ে ফুলওয়ালীর ভূমিকায় নামতে রাজী হবেন না। শুধু কি তাই, তার ভাষাও কদর্য—এপ্রণ পরে মাথার টুপীতে অসট্রিচের জরদা-লাল পালক এঁটে বলতে হবে—Walk! Not bloody likely!

পার্কে বেড়াতে যাবে কি না ফ্রেডী আইনসফোর্ড হিলের এই প্রশ্নের উত্তরে ফুলওয়ালী এলিজাবেথ ডু লিটল এই কথাই বলেছিল। এ একেবারে অচিন্তনীয়—সকিং।

বার্ণার্ড শ' কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলেন। এই ভূমিকা নিয়ে সোজাসুজি ত' মিসেস ক্যামবেলের মত অভিনেত্রীকে ত' বলা চলে না—এই ভূমিকায় আপনাকে হাতের দস্তানার মত খাপ খাবে। অতএব একটা মতলব ঠিক করা হল। বার্ণার্ড শ'র বান্ধবী এডিথ লিটলটনকে লিখলেন, আপনাকে নাটকটি পড়ে শোনাচ্ছে

চাই, আর সম্ভব হলে ঐ দিনই মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলকে যদি চায়ের নিমন্ত্রণে আহ্বান করেন ত' ভালো হয়।

সেই ব্যবস্থাই হ'ল। Bella Donna নাটকের সাফল্যে তখন মিসেস ক্যামবেল উৎফুল্ল, এই চক্রান্তের কিছু বিসর্গ না জেনে চায়ের আসরে সেদিন এসে হাজির হলেন।

মিসেস ক্যামবেলের কাজ ছিল শিল্পী, লেখক, অভিনেতা প্রভৃতিদের অপদস্থ করা। তাই এই আয়োজনে তিনিও খুশী, বার্ণার্ড শ'কে জ্বালাতন করার সুযোগ পাওয়া যাবে, কম কথা নয়।

চা পানান্তে নাটক পাঠ সুরু হল। বার্ণার্ড শ' বলেছেন, অতঃপর কি ঘটল তাঁর বন্ধু হেসকেথ পীয়রসনকে—

বেশ চলছিল, তারপর ফুলওয়ালীর কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হল Ah-ah-ah-oh-oh-oh-oo,—মিসেস ক্যামবেল তখনও বোঝেননি যে এই আস্তাকুঁড়ের ফুলওয়ালীই মূল ভূমিকা—তাই সুযোগ বুঝে বললেন—মিঃ শ' এ কি! দয়া করে এই বিশ্রী আওয়াজটা বন্ধ করুন—ওটা তেমন মধুর নয়।

বার্ণার্ড শ' অবিচলিত কণ্ঠে নাটক পাঠ করে চলেছেন এবং এই ধ্বনি আরো উৎকট করে তুললেন।

আবার মিসেস ক্যামবেল বললেন ও কি! মিঃ শ,' না না। এ বড় বিশ্রী। এমন বেয়াড়া শব্দ করবেন না, এ রীতিমত কুৎসিত কাণ্ড!

এবারও দৃকপাত করলেন না মিঃ বার্ণার্ড শ'। তিনি এইবার আরো বিকৃত ভাবে পুনরাবৃত্তি করলেন—Aaaaaaaaaah-oh-ooh!!! অতি বীভৎস ব্যাপার! সহসা মিসেস ক্যামবেলের মনে সন্দেহ জাগল, এই কি তাঁরই ভূমিকা নাকি!

এ ভূমিকা অভিনয়ের ক্ষমতা তাঁর আছে। বার্ণার্ড শ' সব করতে পারেন। সতর্ক হয়ে মিসেস ক্যামবেল রসিকতা বন্ধ করে একমনে নাটক শুনতে লাগলেন।

গভীর স্তব্ধতার মধ্যে নাটক পড়ে চললেন বার্ণার্ড শ'—এবং পাঠ শেষে মিসেস ক্যামবেল বার্ণার্ড শ'কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন এমন একটি মহৎ নাটক পাঠ করে শোনানোর জন্য। নামভূমিকায় নির্বাচিত করে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে এই কথা বললেন।

সেই দিনই স্থির হল, শ' মিসেস ক্যামবেলের বাড়ি যাবেন আর সব খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা করার জন্য। বার্ণার্ড শ' বলেছেন, আমি মিসেস ক্যামবেলের কাছে যাওয়ার সময় বেশ শান্ত সমাহিত ছিলাম, এখন এক ডজন ডেলাইলার চাইতেও আমি অনেক উঁচুতে, এই আমার ধারণা ছিল, শুধু ব্যবসাদারি কথাই বলা যাবে এই স্থির ছিল। কিন্তু মিসেস ক্যামবেলের মাকড়সার জালে শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়তে হল, তার হাত থেকে আর নিষ্কৃতি নেই। ফলে বার্ণার্ড শ' ঘোরতর প্রেমে পড়লেন, এই অভিনেত্রীর আকর্ষণ থেকে আপনাকে মুক্ত রাখতে পারলেন না। বার্ণার্ড শ' বলেছেন—and dreamed and dreamed and walked on air as if my next birthday were my twentieth. I could think nothing but a thousand scenes of which she was the heroine and I the hero—And I am on the verge of 56—

বার্ণার্ড শ' এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, লিখেছে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মনোরম, এমন হাস্যকর আর কিছু ঘটো শুক্রবার প্রায় এক ঘণ্টা একত্রে ছিলাম, ট্যাক্সিতে উভয়ে বেড়ালা কেনসিংটন স্কোয়ারে দু'জনে একসঙ্গে এক সোফায় বসলাম—অ আমার বয়স গায়ের আঙরাখার মত যেন খুলে পড়ল—পঁয়ত্রিশ ঘ প্রেমে ডুবে আছি, আর এই জন্যই ওর সকল পাপ ধুয়ে-মুছে যাক।

মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল সেইকালের কথা তাঁর আত্মজীবনী My Life and Some Letters গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হল—

আমাদের পরিচয়ের গোড়ার দিকে এই ধরণের কথা বলত—

আমি। ঈশ্বর কি?

উনি। আমিই ঈশ্বর।

আমি। বোকামি কোরো না।

উনি। মুখখানি না থাকলে তোমার কি হত?

আমি। আমি আর তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।

উনি। যা খুসী বলো, গাল দাও, আমার কিছু এসে যায় না। দু'শ বছর পরে পৃথিবীর লোক বলবে তুমি আমার রক্ষিতা এবং—আমাদেরই সন্তান।

শ্রীমতী স্টেলা ( মিসেস ক্যামবেল ) এবং জোয়ীর ( বার্ণার্ড শ' ) অপরূপ বিরহ মিলন-কথা বিস্তারিত ভাবে আগে বলা হয়েছে, এই পরিচ্ছেদে শুধু Pygmallion সংক্রান্ত তথ্যই পরিবেশিত হবে।

প্রেমের প্রাথমিক পর্যায় কাটবার পর, বৈষয়িক কথাবার্তা শুরু হল, মিসেস ক্যামবেল স্বয়ং নাটকটি প্রযোজনা করা স্থির করলেন। প্রশ্ন উঠল, প্রধান ভূমিকার নায়কের অংশ কে গ্রহণ করবে, মিসেস ক্যামবেল খুসীমত নানারকম নাম প্রস্তাব করতে লাগলেন, বার্ণার্ড শ' লোরেনের নাম প্রস্তাব করলেন, কিন্তু সেই কথা কানে তোলে না মিসেস ক্যামবেল। বার্ণার্ড শ' ছাড়বার পাত্র নন। মিসেস ক্যামবেল লোরেন সম্পর্কে যা খুসী বললেন, আমিও সেই কথা তাকে বলে এলাম—শুনে লোরেন যা মুখে এল বলল। সে সব কথা তিনি মিসেস ক্যামবেলকে জানালেন। মিসেস ক্যামবেল বিরক্ত হয়ে বললেন—এ তোমার দুষ্টবুদ্ধির খেলা। অবশেষে বার্ণার্ড শ'র কৌশলে মিসেস ক্যামবেল এবং লোরেনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হল।

কিন্তু লোরেন আমেরিকায় গেল, সেখানে সে চুক্তিবদ্ধ, ফলে আবার কলহ সুরু হল। মিসেস ক্যামবেল রাগ করে বললেন—আমি জীবনে কখনো লিজার পার্ট করবো না, এই বলে দেশভ্রমণে চলে গেলেন।

এই কারণেই Pygmallion নাটক বার্লিন এবং ভিয়েনায় প্রথম অভিনীত হয়।

মিসেস ক্যামবেল সমসাময়িক কাহিনী লিপিবদ্ধ করে লিখেছেন—

জোয়ীর সঙ্গে গতকাল থিয়েটারে কিছু কথাকাটাকাটি হয়েছিল, সম্ভবতঃ Pygmallion সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে, আর আমি প্রায়

[ ৫১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

# রকেট ও মহাকাশ ভ্রমণ
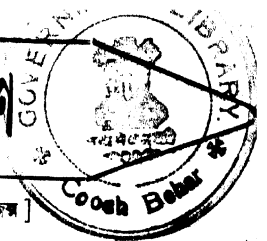


শ্রীবিন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় [ সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ]

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা এ যুগের মানবকে তাহার সদাচঞ্চল কর্মব্যস্ততায় সাহায্য করিবার জন্ত অনেক রকমেরই জলযান, স্থলযান ও বায়ুযান দিয়াছে। মাতা বসুন্ধরার বুকের উপর তাহার ভ্রমণবিলাসী সন্তানদের ছুটাছুটির আর অন্ত নাই। কিন্তু হায়, কোল ছাড়িয়া সামান্ত দূর যাইবারও শক্তি এযাবৎ মানুষের ছিল না। ঊর্দ্ধে, বায়ুস্তরের মাত্র দশ মাইলের বেশী উঠিতে গেলেই, একালের সর্বশ্রেষ্ঠ বায়ুযান জেটপ্লেনেরও সমস্ত শক্তির সর্বাপেক্ষা কুশলী নিয়োগের প্রয়োজন হয়।

কল্পনায় স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে ভ্রমণ করিতেছে মানুষ অনাদিকাল থেকেই। বিজ্ঞানীর ব্যোমবিহারের পরিকল্পনাও খুব অল্পদিনের নয়। তবে মাত্র গত বৎসরই * নভেম্বর মাসে মানুষ পাঠাইতে পারিয়াছে তাহার সবচেয়ে পুরাতন বিশ্বাসী বন্ধুকে—ব্যোমবিহারের অভিজ্ঞতা লাভের জন্ত। কুকুরী লাইকা সোভিয়েটের দ্বিতীয় উপগ্রহে চড়িয়া, ভূপৃষ্ঠের ১৫০ মাইল হইতে হাজার মাইল উপর দিয়া, ঘণ্টায় আঠার হাজার মাইল বেগে সাত দিন ক্রমাগত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছে এবং সমস্ত অভিজ্ঞতা মানুষকে রেডিওযোগে জানাইয়া, অনাহারে, নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া, মানুষের বন্ধুত্বের ঋণ শোধ করিয়াছে।

মহাকাশ ভ্রমণের একমাত্র যান রকেট। পৃথিবীর বায়ুর বাহিরেও এবং বাহিরেই ইহার গতি অব্যাহত। অভ্যন্তরস্থ ইন্ধনের দহনের ফলে সৃষ্ট, অতি উত্তপ্ত বায়ুর ভীমবেগে নিঃসরনের বিপরীত ক্রিয়ার ফলে রকেট পায় প্রচণ্ড গতিবেগ। মহাশূন্যে, পৃথিবীর বায়ুস্তরের বাহিরে এই গতি হইবে অবাধ এবং অর্জিত শক্তি রহিবে অক্ষুণ্ণ। মানুষের সৃষ্ট অন্যান্য যানকে সমস্তক্ষণই কোন না কোন রকমের পথের বাধার বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, গতিবেগকে বজায় রাখিতে সর্বসময়ই তাহাদের ইঞ্জিন চালু রাখিতে হয় ও ইন্ধন পোড়াইতে হয়। মহাশূন্যে ভ্রমণের মজাই এই যে, একবার গতিবেগ অর্জন করিলে, ইহা আর নষ্ট হইবার ভয় নাই।

বাধাহীন শূন্যতায় বিনা আয়াসে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম করা যাইবে। কিন্তু এই অনায়াস ভ্রমণ সম্ভব কেবল পৃথিবীর মহাকর্ষক্ষেত্রের বিস্তারের বাহিরে। মাতা বসুন্ধরার বিপুল আকর্ষণকে অতিক্রম করিতে হইলে সেকেণ্ডে ১১'২ কিলোমিটার † বা ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল গতিবেগ অর্জন করিতে হইবে। আর গতিবেগ সেকেণ্ডে আট কিলোমিটার বা ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল হইলে ভূপৃষ্ঠের ২০০ মাইল উপর দিয়া, সামান্য বৃত্তাভাস কক্ষে, পৃথিবীর মহাকর্ষক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকিয়া, দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা চলিবে। গতিবেগ ইহাপেক্ষা অল্প হইলে, ভূপৃষ্ঠে অবতরণ অবশ্যম্ভাবী। আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র—যাহা ৪০০০ বা ৬০০০ মাইল দূরের লক্ষ্যস্থানের উপর আপতিত হইবে—সেইগুলিকে ঘণ্টায় ১৫০০০ মাইল গতিবেগ দিতে হইবে। ১৫০০ মাইল পাল্লার আন্তর্দেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে ঘণ্টায় ১০,০০০ মাইল বেগে উৎক্ষিপ্ত করিতে হইবে। আর এই রকেটযুগের সূচনাকারী গত মহাযুদ্ধের বিধ্বংসী জার্মাণ রকেট V—2 ঘণ্টায় ৩৭০০ মাইল বেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, ২০০ মাইল দূরে আঘাত হানিত।

এই প্রচণ্ড গতিবেগ সম্ভব কেবলমাত্র বায়ুহীন শূন্যতায়। বায়ুমণ্ডলের ভিতরে, বায়ুকণার সহিত সংঘর্ষে বিপুল শক্তিক্ষয় অনিবার্য। এই সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত তাপমাত্রাও হইবে অসহনীয়। ঘণ্টায় ২০০০ মাইল বেগে যে বায়ুযান চলিয়াছে, তাহার ডানা ও অন্যান্য স্থানগুলি উত্তাপ সহ্য করিবার উপযোগী নিকেল ক্রোমিয়াম ষ্টীলের পাত দ্বারা তৈয়ারী করিতে হইয়াছে। বায়ুর সহিত ঘর্ষণে, V—2 রকেটগুলির অগ্রভাগ উত্তাপে অগ্নিময় রক্তাভ হইয়া উঠিত। আট কিলোমিটার বেগে যখন রুশিয়ার প্রথম উপগ্রহ ও তাহার রকেট, ঊর্ধ্বাকাশের অতি ক্ষীণ বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত ঘনস্তরে প্রবেশ করিল, তখন অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহারা ভস্মীভূত হইয়াছিল।

বায়ুহীন নিরবলম্বতায় গতিবেগ অর্জন করিতে পারে একমাত্র রকেটযান। সাধারণ জলযান বা বায়ুযানের মত চতুর্দিকের জল বা বায়ুকে পিছনে ঠেলিয়া দিয়া ইহাকে অগ্রসর হইবার বেগ আহরণ করিতে হয় না। অভ্যন্তরস্থ দাহ্যপদার্থ ও অক্সিজেন রকেটের দহনকক্ষে বিপুল চাপ ও তাপমাত্রার সৃষ্টি করিয়া পুড়িতে থাকে। দহনক্রিয়ায় উদ্ভূত বায়বীয় পদার্থগুলি এই চাপ ও তাপের ফলে রকেটের নালীমুখ ( Nozzle ) দিয়া ভীমবেগে বাহির হইয়া আসিতে থাকে। রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন বায়ুনিহিত এই তাপশক্তি, নির্গমনপথের ডি লাভাল উদ্ভাবিত সঙ্কোচমুখী প্রসারমুখী নালীমুখ দ্বারা, (De Laval's Convergent Divergent Nozzle), বায়ুর নির্গমনের গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অতুলনীয় এই গতিবেগ, বিস্ফোরকের বিস্ফোরণেও এত গতিবেগ উৎপন্ন হয় না। ইহারই বিপরীত ক্রিয়ায়, নিউটনের নিয়ম অনুসারে, রকেটও পায় প্রচণ্ড গতিবেগ। সমস্ত ইন্ধন নিঃশেষ হইবার পর, রকেট যে গতিবেগ অর্জন করিবে, গাণিতিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা হিসাব করিলে, নিম্নলিখিত সূত্রটি পাওয়া যায়।

$$V = Vc \ln \frac{m_\circ}{m} - gt \sin \theta$$

V—হইল রকেট অর্জিত গতিবেগ; Vc—নালীমুখ হইতে দগ্ধ বায়ুসমূহের নির্গমনের গতিবেগ; $m_\circ$—ইন্ধনপূর্ণ রকেটের ওজন ও m—ইন্ধনহীন রকেটের ওজন; g—পৃথিবীর অভিকর্ষের পরিমাপ; t—জ্বালানী পুড়িবার সময়; $\theta$—রকেটের গতিপথ দিগন্তরেখার সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহার পরিমাপ।

---

* ১৯৫৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর।

† এক কিলোমিটার = ৩২৮০ ফিট = ৫/৮ মাইল।

অর্জিত গতিবেগ যে বায়ুনির্গমনের গতিবেগ অপেক্ষা খুব বেশী হইতে পারে না, তাহা এই সূত্র হইতে সহজেই অনুধাবন করা যায়। ইন্ধনপূর্ণ রকেটের ওজন ইন্ধনহীন রকেটের ওজনের প্রায় তিনগুণ হইলে অর্জিত গতিবেগ বায়ুনিঃসরণের গতিবেগের সমান হইবে, আর আট গুণ হইলে প্রায় দ্বিগুণ হইবে। $g\ t\ \sin\theta$ অংশটি অভিকর্ষের বিপক্ষতা জনিত গতিক্ষয়। দহনের সময় 't' কমিলেই এই ক্ষয়ের পরিমাণ কমে। রকেটগতি নিরূপণের অপর দুইটি বিশিষ্ট সূত্র হইল, বায়ুনির্গমের বিপরীত ক্রিয়া উদ্ভূত বল বা $Thrust = v_c\ dm/dt$, এবং রকেট ইঞ্জিন চালু থাকিবার সময়, $t = (m_o - m)/\frac{dm}{dt}$ সাধারণতঃ তরল ইন্ধনচালিত রকেটগুলিতে বলের পরিমাণ ইন্ধনপূর্ণ রকেটের ওজনের দেড় গুণ হইতে দুই গুণের সমান এবং ইঞ্জিন চালু থাকিবার সময় মাত্র ৬০ সেকেণ্ড হইতে ১৫০ সেকেণ্ড হয়। অতি অল্প সময়েই রকেটের কার্য শেষ হইয়া গতিবেগ অর্জিত হয়। অর্জিত গতিবেগ রকেটকে অবলীলাক্রমে মহাকাশে, ভূপৃষ্ঠ হইতে শত শত কিলোমিটার ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয়, এবং উহা বাধাহীন শূন্যে এক বৃত্তাভাসকক্ষে ছুটিয়া চলে। বহু পথ অতিক্রম করিয়া, পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে, শেষ পর্যন্ত ইহা আবার ভূপৃষ্ঠে নামিয়া আসে।

নিম্নে আমরা তিন রকম রকেট-ইঞ্জিনের বর্ণনা করিব। প্রথম দুই রকম রাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্ভূত শক্তিদ্বারা চালিত। তৃতীয়টির গতিবেগ উৎপন্ন হইবে আণবিক শক্তি হইতে।

কঠিন রাসায়নিক ইন্ধন দ্বারা চালিত রকেটগুলির নির্মাণ-কৌশল সর্বাপেক্ষা সরল। মিশ্র এলুমিনিয়ম বা ষ্টীলের চাদরে নির্মিত একটি লম্বা নলের ভিতর থাকে বিশেষ এক প্রকারের কঠিন রাসায়নিক ইন্ধনে নির্মিত একটি শূন্যগর্ভ দণ্ড। পশ্চাদ্দিকের প্রজ্বালকে (Igriter) অগ্নি-সংযোগ ঘটিলে অতি অল্প সময়েই দণ্ডমধ্যের সমগ্র স্থান ব্যাপিয়া ইন্ধন জ্বলিতে থাকে। রাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্ভূত গ্যাস, বিপুল চাপ ও তাপের সৃষ্টি করিয়া, সংকোচমুখী প্রসারমুখী নালীপথ দিয়া ভীমবেগে বাহির হইয়া আসে। ইহারই বিপরীত ক্রিয়ার প্রচণ্ড ধাক্কায় রকেট পায় গতি। পাঁচ-দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই সমস্ত জ্বালানী নিঃশেষ হয়। ইন্ধনদণ্ড নিজেই খোলের চাদরকে উৎপন্ন চাপ হইতে কিছু পরিমাণে এবং তাপ হইতে প্রায় সমগ্রভাবেই রক্ষা করে বলিয়া, এইটি সেইরূপ পুরু ও অগ্নিসহ হইবার দরকার করে না। এই জন্য এই ধরণের রকেট নির্মাণ সহজ ও অল্প ব্যয়সাপেক্ষ। এই ধরণের রকেটের কার্যকারিতা একান্তভাবেই কঠিন জ্বালানীটির উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। বিগত মহাযুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, অসংখ্য রকমের যুদ্ধাস্ত্রে, এই ধরণের রকেটের প্রচুর ব্যবহার হইয়াছে। সম্ভাব্য সকল রকমেরই কঠিন ইন্ধনের তাপশক্তি অক্সিজেনে দাহিত তরল ইন্ধনের তুলনায় বেশ কিছুটা কম, সেইজন্য এই ধরণের রকেটের কার্যকারিতাও অনেকটা হীনস্তরের। তবে সম্প্রতি নাকি কঠিন ইন্ধনেরও বিশিষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

তরল ইন্ধন ব্যবহারকারী রকেটগুলিতে একটি দহনকক্ষ থাকে। পাম্পের সাহায্যে এই কক্ষে স্পিরিট, গ্যাসোলীন, হাইড্রাজিন বা অন্য কোন তরল দাহ্য পদার্থ পাঠান হয়। অপর একটি পাম্প দ্বারা তরল অক্সিজেন বা অন্য কোন দাহকও ওই কক্ষে প্রবিষ্ট করান হয়। অনেকগুলি নালী মুখ দ্বারা পাতলা চাদরের আকারে উদ্গীরিত দাহ্য তরল পদার্থটি অক্সিজেন গ্যাসে বিপুল তেজে ও অকল্পনীয় ক্ষিপ্রতায় জ্বলিয়া বায়ুভূত হয়। কক্ষমধ্যের চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ২০০ হইতে ১০০০ পাউণ্ড ও তাপমাত্রা ২৮০০° হইতে ৪০০০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উঠিয়া পড়ে। ডি লাভাল উদ্ভাবিত নালীমুখ দ্বারা প্রসারিত হইয়া, রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন, কার্বন ডাই অক্সাইড ও মনঅকসাইড, ষ্টীম, নাইট্রোজেন, প্রভৃতি গ্যাস অতি উত্তপ্ত অবস্থায়, বেগে বাহির হইয়া আসে। এই নির্গমনের গতিবেগ আধুনিক রকেটগুলিতে সেকেণ্ডে প্রায় ২.৮ কিলোমিটার মাত্রায় পৌঁছিয়াছে।

প্রধান নালীমুখ ও দহনকক্ষের দেওয়াল যাহাতে এই প্রচণ্ড উত্তাপে গলিয়া না যায়, সেইজন্য দাহ্য পদার্থটির একভাগ দেওয়ালের ভিতর দিয়া বেগে প্রবাহিত করা হয়। ইহাতে দেওয়াল ঠাণ্ডা থাকে। ইহা ব্যতীত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে জ্বালানী দহনকক্ষে ও নালীমুখের সঙ্কোচগামী স্থানে অবিরত প্রবেশ করিয়া বাষ্পীভূত হয় এবং তাপনিরোধকারী এক বাষ্পের আবরণে কক্ষগাত্র রক্ষা করে। এই ভাবেই কক্ষমধ্যস্থ বাষ্প যখন ৩০০০° ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডেরও বেশী তাপমাত্রায় জ্বলিতে থাকে, তখন কক্ষগাত্রের তাপমাত্রা ১০০০° ডিগ্রিরও কম থাকে।

জ্বালানী ও তরল অক্সিজেনের পাম্প দুইটি টার্বাইন দ্বারা পরিচালিত হয়। এই টার্বাইন আবার হাইড্রোজেন পারক্সাইড বিশ্লিষ্ট হইয়া উৎপন্ন ষ্টীম দ্বারা পরিচালিত হয়। টার্বাইন বিঘূর্ণিত করিয়া বাহির হইবার পর এই ষ্টীম কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার নালীমুখ দ্বারা বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। বিভিন্ন নালীমুখে নিক্ষিপ্ত ষ্টীমের পরিমাণ কম-বেশী করিয়া রকেটের নিজ অক্ষমেরুকে বেষ্টন করিয়া আবর্তনের প্রয়াসকে প্রশমিত করা হয়।

প্রধান নালীমুখ দ্বারা নির্গত বায়ুর দিক হালের ( Rudder or Jetevator ) সাহায্যে সামান্য পরিবর্তন করিয়া রকেটের ঊর্দ্ধগমনের দিক নিয়ন্ত্রিত করা যায়। ঘূর্ণি নির্দেশিত স্বনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের দ্বারা ( Gyro stabilized servo control ) পরিচালিত হইয়া, বিপথগমনের সমস্ত প্রভাবকে ব্যর্থ করিয়া রকেটটিকে নির্দিষ্ট দিকে ইহারা পরিচালিত করে। এই যন্ত্রের সাহায্যেই আবার রকেটটিকে পূর্ব্ব পরিকল্পিত কোন বিশিষ্ট গতিপথে (Programmed flight) ক্রমপরম্পরায় চালিত করা যায়।

বৃহদাকারের রকেটগুলিতেই তরল ইন্ধন ব্যবহার করা লাভজনক। ইন্ধনপূর্ণ ও ইন্ধনহীন অবস্থার ওজন বা ভারের অনুপাত $m'/m$ এই রকেটগুলিতে চার হইতে সাত পর্যন্ত হয়। আকারে বৃহৎ না করিলে ইঞ্জিনপৃষ্ঠ বল, পাম্প, টার্বাইন, রকেটদেহ ও জ্বালানীর আধার, স্বনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রসমূহ ও তদুপরি বাহিত মালের সামগ্রিক ওজনের বহুগুণ হইতে পারে না। ইন্ধন ও দাহকের আধার দুইটি পাতলা চাদরে তৈয়ারী করিলেই চলে এইজন্য যে, উহাদিগকে দহনকক্ষের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করিতে হয় না। পাম্প দুইটিতেই এই চাপের বেশীর ভাগ সৃষ্ট হয় এবং উহারাই আধার দুইটিকে এই বিষম চাপ হইতে রক্ষা করে। তবে রকেটের ঊর্দ্ধগমনের সময় আধারকক্ষ দুইটিকেই যথেষ্ট চাপে প্রসারিত রাখা হয়। ইহাতে তাহাদের দৃঢ়তা বাড়ে এবং তাহারা রকেটের অতি দ্রুত গতিবৃদ্ধি জন্য আবিষ্ট অতিরিক্ত ওজন বহন করিতে সমর্থ হয়। আধারের ওজন এইজন্য ইন্ধনের ওজনের তুলনায় অতি সামান্যই হয়।

আণবিক শক্তি পরিচালিত কোন রকেট এ পর্যন্ত ভূমি ছাড়িয়া ওঠে নাই। তবে এ বিষয়ে অনেক রকমই পরিকল্পনা হইয়াছে। নিম্নে একটি পরিকল্পনার বিবরণ দেওয়া হইল। অনতিদূর ভবিষ্যতেই এইরূপ একটি রকেটকে আমরা হয়ত পৃথিবী পরিক্রমায় অগ্রসর হইতে দেখিব। বিশেষ ধরণের একটি আণবিক চুল্লী হইবে ইহার তাপশক্তির উৎস। ইউরেনিয়ম ২৩৫ এর তবক, গ্রাফাইটের পাতলা পাতের (ইঞ্চির এক-দশমাংশ পুরু) দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত থাকিবে। আণবিক ইন্ধনের এই মূলবস্তুগুলিকে বায়ু-নির্গমের জন্য সামান্য সামান্য ফাঁক রাখিয়া স্তরে স্তরে সাজান হইবে। ছয় হইতে আট ফুট ব্যাসের ও প্রায় সেইরূপই লম্বা মাপের চুল্লীগর্ভে ইউরেনিয়ম ২৩৫ এর পুনঃ সঞ্জাতনী নিউট্রনকৃত বিভাজন (Fission) প্রবলতেজে চলিতে থাকিবে। আণবিক শক্তির বিকাশে উৎপন্ন নিউট্রন ও চূর্ণীকৃত ইউরেনীয়ম অণুশেষগুলি গর্ভমধ্যস্থ গ্রাফাইটকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিবে। চুল্লীগর্ভের চতুষ্পার্শ্ব বেরিলিয়ম ধাতু বা অক্সাইডে গঠিত নিউট্রন প্রতিফলক বেষ্টনী দ্বারা আবৃত থাকিবে। এই বেষ্টনীর কিছু অংশের প্রতিফলক ঘুরাইয়া উল্টাপিঠের নিউট্রন শোষণকারী বস্তুও আনিবার ব্যবস্থা থাকিবে। উত্তরোত্তর নিউট্রন বৃদ্ধির ফলে গর্ভমধ্যস্থ গ্রাফাইটের তাপমাত্রা বিপদসীমার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলে, স্বনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রদ্বারা প্রতিফলকের পরিবর্ত্তে শোষকবস্তু ঘুরাইয়া আনিয়া এই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত রাখা যাইবে। এইরূপ চুল্লীমধ্যে পাম্পের সাহায্যে বিপুল চাপে (প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ১০০০ পাউণ্ড) তরল হাইড্রোজেন প্রবিষ্ট করান হইবে। চুল্লীমধ্যে বায়ুভূত ও উত্তপ্ত হইয়া এই হাইড্রোজেন গ্যাস শেষ পর্য্যন্ত রকেটের ডি লাভাল নালীমুখ দিয়া বেগে বাহির হইয়া আসিবে।

আণবিক চুল্লীর উত্তাপে চালিত রকেটের অন্যান্য যন্ত্রপাতি তরল রাসায়নিক ইন্ধন চালিত রকেটের সমগোত্রের হইবে। তবে ইহার চুল্লীমধ্যস্থ গ্যাসের উত্তাপ রাসায়নিক চুল্লীর গ্যাসের মত অত বেশী করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ইউরেনীয়ম ও গ্রাফাইট যতটা তাপমাত্রা সহ্য করিতে পারিবে, নির্গত গ্যাসের তাপমাত্রা তদপেক্ষা কমই হইবে। এবং এই ইউরেনীয়ম গ্রাফাইট নির্মিত চুল্লীর মূলবস্তু সম্ভবতঃ ৩০০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের বেশী তাপমাত্রা সহ্য করিতে পারিবে না। তথাপি চালনবস্তু (Propellant) হাইড্রোজেন হইলে, ইহার লঘুতার জন্য, নির্গত গ্যাসের গতিবেগ, সেকেণ্ডে সাত কিলোমিটার—রাসায়নিক রকেটের আড়াইগুণ বেশী হওয়া সম্ভব। উপযুক্ত এইরূপ একটি রকেট, দৈর্ঘ্যে দেড় শত ফুট প্রস্থে পনর ফুট এবং ওজনে দুই শত টনেরও বেশী হইবে। পাঁচ হইতে পনর মিনিট পর্যন্ত চলিয়া, ইহার ইঞ্জিন একটি পর্যায়েই ইহাকে সেকেণ্ডে আট কিলোমিটারেরও বেশী গতিবেগ প্রদান করিয়া, এক অতি বৃহৎ কৃত্রিম উপগ্রহরূপে পৃথিবী পরিক্রমায় পাঠাইতে সক্ষম হইবে।

মানুষ আজ পৃথিবীর মহাকর্ষকে অতিক্রম করিবার শক্তি নিঃসন্দেহে অর্জন করিয়াছে। তাহার সৃষ্ট কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ, যাহার কোন একটি হয়ত এখনই আমাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে—ইহার নিশ্চিত প্রমাণ। তবে মহাকাশে ভ্রমণ কেবল পৃথিবীর আকর্ষণ ছাড়াইবার বেগ অর্জন করিলেই সফল হইবে কি? মহাকাশ অসীম, সুবিপুল তাহার বিস্তার। গন্তব্যস্থল অতি অল্প, দূরত্বের তুলনায় তাহাদের বিস্তার অকিঞ্চিৎকর। এখানে ভ্রমণে বাহির হইলে, চিরকালের মত হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। সর্বনিকটে আছে চন্দ্র—মাত্র দুই লক্ষ উনচাল্লিশ হাজার মাইল দূরে। এই গোলকটির ব্যাস মাত্র দুই হাজার এক শত মাইল। সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার গতিবেগ অর্জন করিতে পারিলেই এ স্থানে পৌছান সম্ভব। আজ এই গতিবেগ অর্জন করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু নির্দিষ্ট মাত্রায় ও নির্ভুল দিকে গতিবেগ অর্জিত হইলে তবেই উপযুক্ত কক্ষপথ ধরিয়া ব্যোমযান চলিতে থাকিবে।

এই কক্ষপথ নিয়ন্ত্রিত করিবে প্রথমে পৃথিবী ও তৎপরে সূর্য ও সর্বশেষে চন্দ্রের মহাকর্ষ। ঘূর্ণায়মান পৃথিবী হইতে ঠিক সময়ে বাহির হইয়া এই গতিবেগ অর্জন করিয়া, উপযুক্ত কক্ষপথ ধরিতে হইবে। তবেই চার-পাঁচদিন চলিয়া ব্যোমযান চন্দ্রলোকের দশ বিশ হাজার মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িবে। চন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সময়, গতিসম্বরণকারী রকেটের (Retro-Rocket) সাহায্যে গতিবেগ কিছুটা হ্রাস করিয়া দিতে হইবে। তখনই ব্যোমযান চন্দ্রের মহাকর্ষ ক্ষেত্রের কবলিত হইয়া এক নূতন বৃত্তাভাসকক্ষে চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে।

সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য এই মহাশূন্য ভ্রমণের চেষ্টায় মানুষ এযাবৎ চার বার ব্যর্থকাম হইয়াছে। এর পরের গন্তব্যস্থলই হইবে নিকটস্থ মঙ্গল বা শুক্রগ্রহ। সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটারেরও কিছু বেশী গতিবেগ অর্জন করিয়া, পৃথিবী হইতে ঠিক সময়ে এবং উপযুক্ত দিনে যাত্রারম্ভ করিতে হইবে। পৃথিবীর মহাকর্ষক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া সূর্যের মহাকর্ষক্ষেত্রে গতিবেগের মাত্রা ও দিক নিয়ন্ত্রিত করিয়া গন্তব্যস্থানের সংযোগকারী এক বৃত্তাভাসকক্ষে ব্যোমযানকে চালিত করিতে হইবে। ইহার ১৪৬ দিন পরে, প্রায় ত্রিশ কোটি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শুক্রগ্রহের সন্নিকটবর্ত্তী হওয়া যাইবে। দশ-বিশ লক্ষ মাইল দূরত্বের মধ্যে আসিয়া পড়িবার পর, আবার গতিপথ নূতন করিয়া অবস্থা অনুযায়ী, নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। তবেই শুক্রপৃষ্ঠের দশ-বিশ হাজার মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়া যাইবে। শুক্রগ্রহের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়া, ইহাকে বেষ্টন ও অতিক্রম করিয়া যাইবার সময়, কিছুটা বেগ সম্বরণ করিলেই শুক্রের উপগ্রহে পরিণত হইয়া প্রলম্বিত বৃত্তাভাসকক্ষে শুক্র প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, ইহাকে পর্যবেক্ষণ করা চলিবে। পর্যবেক্ষণের ফল মনুষ্যসমাজের গোচর করিতে হইলে ফিরিতে হইবে। অল্পবিস্তর এই ধরণের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব। কিন্তু পথের শেষে পৃথিবীকে পাইতে হইলে ৪৭০ দিন অপেক্ষা করিবার পর, যাত্রাশেষের যাত্রাসুরু করিতে হইবে। দুই বৎসর এক মাস মহাশূন্যের মহাপ্রবাসে থাকিবার পর আবার স্বদেশে—ভূমণ্ডলে ফিরিয়া আসা সম্ভব। মঙ্গলগ্রহের পথে যাত্রা করিলে দুই বৎসর আট মাস পরে ভ্রমণ শেষ হইবে।

এই ভ্রমণে মানুষকেই ব্যোমযানের ভিতরে চালনদণ্ড হাতে ধরিয়া বসিতে হইবে। পৃথিবী হইতে রেডিওযোগে দশ-বিশ কোটি মাইল দূরের ব্যোমযানকে পরিচালনার সঙ্কেত প্রেরণ করা সম্ভব হইবে না। দুই বৎসরের খাদ্য-পানীয়, নিঃশ্বাসের বাতাস ও জীবনধারণের জন্য সহস্র রকম আনুষঙ্গিক লইয়া যাত্রা করিতে হইবে। সর্বশেষে,

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া, ভস্মীভূত না হইয়া, মহাকাশ ভ্রমণের বিপুল গতিবেগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে সংহত করিয়া, নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিতে হইবে। পরিচালনার ত্রুটি, বিবেচনার সামান্য ভুল, লক্ষ্যস্থল হইতে ব্যোমযানকে কোটি মাইল দূরে লইয়া ফেলিবে, সময়ে সংশোধন না করিতে পারিলে লক্ষ্যবস্তুকে ধরাই যাইবে না এবং মহাশূন্যের তেপান্তর মাঠে হারাইয়া যাইতে হইবে। সমগ্র মনুষ্য-জাতির সাধনা ও অগ্রগতি হয়ত শতাব্দীশেষে এই প্রচেষ্টাকেও সাফল্যমণ্ডিত করিবে। হয়ত বা আয়ন রকেটের ( Ion Rocket ) কল্পনা সত্যে রূপায়িত হইবে। অফুরন্ত আণবিক শক্তি পরিচালিত এই রকেট যে সামান্য পরিমাণ আয়নিত সিজিয়ম ধাতুকণা ( Cæsium ion ) নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইবে। তাহাতে ইহার ইঞ্জিন বহু কাল চালু রাখা যাইবে। অবিরত গতি-বৃদ্ধির জন্য শেষ পর্যন্ত অভূতপূর্ব গতিবেগের সৃষ্টি হইবে এবং দুই বৎসরের ভ্রমণকাল সংক্ষেপ হইয়া হয়ত বা দুই সপ্তাহে শেষ হইবে। পৃথিবীর জীব মানুষ তখন নির্ভয়ে সৌরমণ্ডলের সর্বস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবে।

সৌরজগৎ ত্যাগ করিয়া অন্য সৌরজগতে যাত্রা করিতে হইলে প্রায় আলোকের গতিবেগে ছুটিতে হইবে। সর্বনিকটস্থ নক্ষত্রটিরও দূরত্ব সাড়ে চার আলোকবর্ষ। সেখানে পৌঁছিতে শতাব্দী কাটিয়া যাইবে। ফোটন রকেটে ( Photon Rocket ) চড়িয়া, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া আত্মীয় বন্ধু-সমভিব্যাহারে, জন্মের মত পৃথিবীর বাস উঠাইয়া দিয়া, অন্য সৌরজগতে নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার আশায় অগস্ত্যযাত্রা করিতে হইবে। আর আলোকের গতিবেগ যদি সত্যই লাভ করা যায়, তবে আর ভয় নাই। সময় অগ্রসর হইবে না। অজর, অমর হইয়া, এক ব্রহ্মাণ্ড ( Galaxy ) হইতে আর এক ব্রহ্মাণ্ডে ছুটিয়া বেড়ান যাইবে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সমতুল্য হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে নির্বিকার নিরভিলাষী মহাপুরুষের মত ভ্রমণ করা চলিবে।

# চারু-চিত্রশিল্প সার্ব্বজনীন সূক্ষ্ম অনুভূতির উৎস

শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

ভাবরাজ্যের অধিবাসী, মুক্তস্বভাব ইষ্টপূজারী, মন্দির অভ্যন্তরে ধূপ, ধুনা, কর্পূর, পুষ্প-চন্দন সৌরভে মাতোয়ারা হ'য়ে চৈতন্যের স্বাদ গ্রহণ করে। প্রকৃতিজয়ী ইষ্টপূজারীর গুরুগম্ভীর, শান্ত সৌম্য পরিণত স্বভাব, সার্ব্বজনীন সূক্ষ্ম অনুভূতির মহামিলন তীর্থকেন্দ্র। বিশ্বপ্রকৃতি মানবজাতিকে কেন্দ্রস্থ হ'য়ে একতাসূত্রে সার্ব্বজনীন ভাববিন্যাস করবার জন্য জাতীয়তাবোধরূপ প্রাণরজ্জুতে টান দিয়েছে। সর্ব্বধর্ম্ম, সর্ব্বকর্ম্ম-সমন্বয়কারী রূপশ্রী বা শাশ্বত সৌন্দর্য্যের উপাসনায় চারু-চিত্রশিল্প মাধ্যমে কার্য্য সুরু করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে, কি উপায়ে জড়ে চৈতন্য উদয় হবে, তাহা বিশ্বপ্রকৃতি গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে।

মানুষের মনোরাজ্যে যে স্বভাবের ভাবরাশি বর্ত্তমান, তাহার প্রকাশপথে-অভাব-ভাব ব্যাধিরূপে বাধা সৃষ্টি করে। ব্যাধির প্রকোপে আলোক তিরোহিত হয় এবং ঘোর অন্ধকারে আমরা আপন সত্তা বা স্বভাবহারা হয়ে ব্যাধিগ্রস্ত দশা প্রাপ্ত হই। এই মহাকাল ব্যাধি অজ্ঞান-অন্ধকারমুক্ত হবার জন্য স্বভাবের চিন্তা করতে হবে। কিন্তু অভাব-রাজ্যের এমনই রহস্য, যখনই আমরা স্বভাবের চিন্তা করতে যাই, তখনই যেন জীর্ণ কঙ্কালসার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা দলে দলে আসে ও কর্কশ কোলাহলে চিন্তাধারা ঘোলাটে করে দেয় এবং মাকড়সার জালবুনার মত আমাদের উপর অলীক চিন্তাজাল বিস্তারে প্রভাবিত করে। কাজেই অর্থহীন অনর্থকারী সকল চিন্তা ছেড়ে দিয়ে দৃঢ়তার সহিত কাজ সুরু করতে হবে, একান্ত অবশ্য জড়ক্ষুধার সামগ্রী সংগ্রহের জন্য নয়, ইহা নির্ম্মল আনন্দলাভের জন্য। যাহা মানুষকে পরিবর্ত্তনশীল জগতে অনন্তকাল ধরে বাঁচিয়ে রেখেছে। অভাব পূরণের চিন্তায় জীবনের সবটা সময় ব্যয় করেও দুর্ভোগ প্রশান্তি সম্ভব হয়নি, কেন না, ব্যাধিগ্রস্তের বিশ্বগ্রাসী অস্বাভাবিক ক্ষুধা নিবারণ করা যায় না। মনের খাঁটি খোরাক, আত্মতৃপ্তির জন্য চারু-চিত্রশিল্প সাধনায় ব্রতী হয়ে প্রথমে কোন কিছু প্রকাশ করবার আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। থাকবে কেবল আনন্দ।

চিত্রশিল্পের একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, তাহা আপন প্রকৃতি দ্বারা যখন যেভাবে প্রকাশ হতে চায় হবে, তার জন্য কোন তাগিদ প্রয়োজন হবে না। একাজে চাই প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস ও ঐকান্তিক আত্মনির্ভরতা। উপাসনামূলক পন্থায় অঙ্কিত চিত্রাবলীর মধ্যে যাহাই প্রকাশ হউক না কেন, তাহাতে জোর করে কোন রূপ দেবার চেষ্টা থাকবে না, থাকবে বলিষ্ঠ প্রয়োগ-চিহ্ন, রং, রেখায় আলো ও কালোর নির্ভীক বিচরণ। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকল মানুষ যে যার আপন ভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে এবং নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে স্বজাতির সহিত আলাপ-আলোচনায় সঙ্গতি বজায় রেখে আনন্দ পায়। যাহা নির্ম্মল আনন্দদায়ক তাহা স্বজাতীয়, আর যাহা পীড়াদায়ক দুর্ব্বলকারক তাহা বিজাতীয়। আপনার জনকে আপন করতে যেমন কোন কায়দার প্রয়োজন হয় না, চিত্রশিল্প অনুশীলন কালেও কোন কায়দার প্রয়োজন নেই, তাহা স্বাধীন সত্তায় প্রকাশিত হ'তে চায়।

প্রত্যেকেই যে মনের দেয়ালে ছবি আঁকে একথা হয়তো অনেকের জানা নেই, কিন্তু প্রকৃতি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বারে বারে জানিয়ে দিচ্ছে. শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র আপামর সকলকে রুজীরোজগারের কাজ সমাধা ক'রে সারা দিন-রাতের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির ক'রে নিতে হবে। সেই সময়টি একমাত্র সৌন্দর্য্য উপাসনায় চারুচিত্র-শিল্প মাধ্যমে সাধন ব্যতীত

আর কিছুই থাকবে না। চিত্রশিল্পের অনুশীলন কার্য্যে মনোনিবেশ হ'লে আনন্দ-উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে এবং নানা ব্যস্ততার মধ্যেও সময় জুটে যাবে। আনন্দ-সায়রে অবগাহন করতে পারলে সব ময়লা সাফ হ'য়ে চিত্তে চৈতন্য-প্রতিবিম্ব পড়বে। চৈতন্য-প্রতিবিম্বই (Real Portrait of Atma) Real Portrait আঁকতে হ'লে চিত্রকরের চিত্তশুদ্ধি চাই। উপাসনারত শুদ্ধচিত্ত শিল্পী, সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্, ত্রিধারা-সমন্বিত আনন্দরূপ চিনতে পারে ও তার সান্নিধ্য লাভ করে। সৌন্দর্য্যপিপাসু প্রেমিক শিল্পীর জীবন—প্রচ্ছদপটে রূপ, রস, গন্ধ ভরপুর,—সৎ-চিৎ-আনন্দ প্রতিফলিত হ'লে দেখতে পায় ত্রিকাল সমন্বিত প্রকৃতিপুঞ্জে সেই একই মহৎ প্রতিচ্ছবি প্রশান্ত মূর্ত্তিতে বিরাজমান।

ত্যাগনিষ্ঠ শিল্পীর দার্শনিক সৃষ্টির বিভিন্ন রূপ—রঙ্গমঞ্চে আলো ও কালোর নাচনে সাম্য ও শান্ত দর্শন করে এবং চিত্র রচনায় নির্ভীক প্রয়োগ-প্রণালী মন্ত্রমুগ্ধ আলো ও কালোর পূর্ণ ঐক্যতানে গতিমুক্ত হয়। চিত্র রচনার বিষয়বস্তু সন্নিবেশ কালে গ্রহণ ও বর্জ্জনের উপর চিত্রচরিত্র নির্ভর করে। সকলেরই দর্শনশক্তি আছে কিন্তু দেখার তারতম্যে বুঝা যায় রুচিবোধ। যার যেরূপ রুচি, প্রকৃতি তার চোখে সেই রূপে ধরা দেয়। ত্যাগনিষ্ঠ ও ভোগলিপ্সু উভয়ের রুচিবোধে পার্থক্য আছে। ত্যাগনিষ্ঠ অখণ্ড দর্শন করে আর ভোগলিপ্সু অখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড দেখে এবং খণ্ডিত বস্তুর একটি দেখতে গিয়ে আর একটির সহিত সমতা হারিয়ে ফেলে।

রহস্যাবৃত থাকা সত্ত্বেও দার্শনিক অখণ্ড দর্শন করে। যে খণ্ড খণ্ড দেখে তার দৃষ্টি অতি সাধারণ। চারুচিত্র-শিল্পে এই নিম্নস্তরের সাধারণ দৃষ্টির স্থান নেই। রুচি অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষেরই একটা প্রয়াস থাকে, তাহা স্বাভাবিক গতিতে চালিত না হলে মরে যায় বা অর্দ্ধমৃত হয়ে থাকে। ব্যায়ামবীর হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু স্বাস্থ্য বজায় রাখতে ব্যায়াম করা সকলের প্রয়োজন আছে। সেইরূপ একনিষ্ঠ সাধনব্রতী শিল্পী হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু রুচিবোধ জাগাবার জন্য চারুচিত্র-শিল্প মাধ্যমে সৌন্দর্য্যের উপাসনা করা সকলের প্রয়োজন বা কর্ত্তব্যের বহু উর্দ্ধে, যেহেতু ইহা মানব সভ্যতার প্রধান অঙ্গ ও সার্বভৌমিকত্বের শ্রেষ্ঠ অবদান।

মৃতপ্রায় জাতিকে সৌন্দর্য্যের উপাসনায় রং ও রেখার যাদুমন্ত্রে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। রং যে কি বস্তু, রং-এর আসল সত্তা কি, তাহা জানা না থাকলে চিত্র রচনায় রং প্রয়োগে সমতা থাকে না। রং-এর পরিচয় থাকা চাই, তবে চিত্রে রং প্রয়োগে সমতা সম্ভব। "সৌন্দর্য্যপ্রীতিই রং, রং হল জীবন, সৌন্দর্য্যই সত্যের প্রতিচ্ছবি। রং ছাড়া কেহই বাঁচতে পারে না। রংশূন্যতাই মৃত্যু। রং ভিতর ও বাহিরে সৌন্দর্য্য খুঁজে পেতে সাহায্য করে এবং সৌন্দর্য্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ ভিতর-বাহিরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে। সাম্য অবস্থায় স্থায়িভাবে অবস্থান করবার জন্যই যোগ সাধন। একনিষ্ঠ যোগসাধনার কালে আপামর সকলে জীবন-গতিচ্ছন্দে সাম্য অবস্থা প্রাপ্ত হবে। নিঃস্বার্থ চিন্তা, কল্পনা ও কাজে মানুষ আত্মপরিচয় লাভ করে এবং সুন্দরের উপাসনায় মুক্তস্বভাব হয়। জীবন-যুদ্ধে জয়ী হতে চাই মুক্তস্বভাব, যাহা মানুষকে জড় অতিক্রমণের পথে পূর্ণ সহায়তা করে। ক্ষয়িষ্ণু ব্যাধির মত সমাজের বুকে স্বার্থপরতার ষড়যন্ত্র হয়ে বেঁচে থাকা জীবনের উদ্দেশ্য নয়; মহত্তের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করে অমৃতত্ব লাভ করাই মানব-জীবনের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বপ্রকৃতি মহত্তের সান্নিধ্য লাভ করবার জন্য সর্বদাই সজাগ এবং নশ্বর জগতে তার অস্তিত্ব-চিহ্ন যেন অমর হয়ে থাকে ইহাই অভিলাষ। তাই জগতে অমর মহান ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রকৃতি চিরদিন বশ্যতা স্বীকার করেছে; কিন্তু এরূপ মহান ব্যক্তির সংখ্যা চিরদিনই খুব অল্প। প্রকৃতির দাস যারা, এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা পৃথিবীর প্রায় সবখানি জুড়ে ব'সে আছে। মহান ব্যক্তিরা যুগে যুগে জড়ে চৈতন্য উদয়ের জন্য সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। আজও ত্যাগনিষ্ঠ সাধক সাধনব্রতী হ'য়ে জড়সর্ব্বস্বদের চৈতন্য উদয়ের পথ পরিষ্কার ও যুগোপযোগী পথ আবিষ্কার কাজে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাদের হিতার্থে এ প্রচেষ্টা, তারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বীতরাগ। তারা ভাবে, এতে তাদের স্বার্থহানি হবে বা স্বার্থকতা কোথায়? বৃহত্তর স্বার্থের জন্য মহানুভব ব্যক্তিগণ যেখানে আত্মত্যাগে দৃঢ়নিশ্চয়, নিতান্ত জড়সর্ব্বস্ব স্বার্থপর ব্যক্তিরাই সেখানে বাধা সৃষ্টিকারী। ইহা হয়তো প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতিকে যারা বশে আনতে পারেনি বা একথা যাদের কল্পনার বাহিরে, তাদের কাছে এর সত্যতা প্রমাণ হওয়া দুরূহ ব্যাপার এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে মহানুভবের জীবনযজ্ঞ পূর্ণাহুতি না হওয়া পর্য্যন্ত জড়সর্ব্বস্বদের চৈতন্য উদয় হওয়া সম্ভব নয়। যাদের জড়ভোগ সমাপ্ত তাদের জীবনে চৈতন্য উদয় শুভ মুহূর্ত্ত আগতপ্রায়। চিত্রশিল্পিবর্গের খেয়াল রাখা উচিত—একটি ধূলিকণায়, একটি কীটাণুকীটের মধ্যে যে গুণ ও সৌন্দর্য্য আছে তার কিঞ্চিৎ মাত্র যদি চিত্রে থাকে তবে তাহাই চিত্রজগৎকে সৌন্দর্য্যপূর্ণ করতে পারে। আমরা চিত্রশিল্পীরা চিত্র-চরিত্রের ভাল-মন্দ নিয়ে যে বড়াই করে থাকি তাহাতে (Real quality) প্রকৃত গুণবত্তার পরিচয় যত না থাকে, অহঙ্কারের ছাপ থাকে অনেক বেশী। সর্ব্বসৃষ্টিতে সমগুণ বর্ত্তমান জেনে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাই যথার্থ (quality painting। উচ্চাঙ্গের চিত্র। শিল্পিজীবনে দার্শনিক চক্ষু ও চিন্তা দিয়ে সর্ব্বত্র সমতা, সমগুণ সন্ধান এবং দর্শন পাওয়াই আসল কথা জেনে, বাহ্যিক আচার ব্যবহারে সন্তুষ্টি বিরক্তির বাহিরে যাওয়ার চেষ্টাই সত্যকার চিত্রশিল্পীর জীবনযজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানে দুর্দ্দমনীয় প্রয়াস। (struggle of true Artist for the sake of living truth.)

এই চিত্রযুগে, সার্ব্বজনীন সূক্ষ্ম অনুভূতির উৎস, চারুচিত্র-শিল্পরূপ যোগাসনে সর্ব্বধর্ম্ম সর্ব্বকর্ম্ম-সমন্বয়কারী শাশ্বত শান্তির আধার সৌন্দর্য্য উপাসনায় জড়িয়ে খেলাপর্ব্ব শেষ হবে এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশে যুগধর্ম্মে দীক্ষিত রূপমুগ্ধ বিশ্বপ্রকৃতির মহাযোগ সাধনায় সৌন্দর্য্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আবির্ভূত হবেন। যুগ-সন্ধিক্ষণে, আত্মবলিদানে দৃঢ়নিশ্চয় প্রকৃতি আহ্বান জানাচ্ছেন, জাতি জাগো, জীবন-প্রদীপ প্রজ্বালিত কর; যোগাসনে একনিষ্ঠ সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী, জাতি জাগো। জাগো!! জাগো!!!

# বন্যেরা বনে সুন্দর

## শ্রীবিকাশকান্তি রায়চৌধুরী

সুন্দরবনের বনভূমি জুড়ে যেমন আছে প্রচুর রূপ আর রং-এর মোহময় পরিবেশ, তেমনি আছে প্রচুরতর প্রাণনাশের প্রয়াস। অজস্র হিংস্রতা আর হানাহানির দাপটে বনের প্রাণ-প্রাচুর্য্য এক এক সময় স্তিমিত হয়ে আসে। বন্য প্রাণের স্পন্দন শুধু বুঝতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা বছরের পর বছর বনের নাড়ী টিপে বসে থাকেন মুমূর্ষু রোগীর পাশে মমতাময়ী ধাত্রীর মত। বনকে যাঁরা পেয়েছেন বন্ধুর মত নিবিড় সাহচর্য্যে, উপলব্ধি করেছেন তার অন্তরাত্মার সাথে একাত্মতা, তাঁরাই শুধু দেখতে পেয়েছেন তার মহিমময় বন্যসুন্দর রূপ। বনের বিশালরাজ্যে আমাদের বাসভূমির মতই একটা সমাজ-শৃংখলা বর্তমান। আপাতদৃষ্টিতে যতখানি অনিয়ম তার চাইতে অনেক বড় অলিখিত এক নিয়মে বনের জীবনতন্ত্রী বাঁধা। যতখানি হানাহানি তার বন্যতায় বিদ্যমান তার চাইতে অনেক বেশী প্রীতি-প্রেমও সেখানে বিরাজমান। একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনের যোগসূত্রে তার জীবজগতের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। সেই যোগসূত্রকে অনুভব করা যায় মমতাময় হাতের স্পর্শে, শিকারীর রুক্ষ চাহনিতে হারিয়ে যায় ওদের জীবনযাত্রার ছন্দ।

জন্তু জানোয়ারের বিচিত্র জীবনধারায় বনের বানরই বোধ হয় মানব-সমাজের সব চাইতে কাছাকাছি। স্বর্গের নারদমুনির ভূমিকাটি বনভূমিতে এরাই চমৎকার ভাবে অভিনয় করে চলে। বানরই বনের স্বভাব-গোয়েন্দা। তাই এদের সামাজিকতার উপর গোয়েন্দাগিরি করা মানুষের পক্ষে মোটেই সহজ কাজ নয়। রাজস্থানের পাহাড়ী জংগলে যাদের আড্ডা, তারা আকারে বড় কিন্তু বুদ্ধিতে দড় নয়। তারা বুদ্ধির চাইতে নির্ভর করে শক্তির উপর। স্বভাবে যেমন হিংস্র, ব্যূহ রচনায় আর যুদ্ধকৌশলে তেমনি দুর্জয়।

বানরের নিজের রাজ্য যদি কোথাও থাকে তো সে সুন্দরবন। উঁচু গাছের ডালে চড়ে এরা লক্ষ্য রাখে বনের দূর প্রান্ত অবধি। বন্দুকওয়ালা মানুষ বনে ঢুকলো তো এরা দল বেঁধে তেড়ে আসবে। ভেঙচি কেটে, গাছের ডাল নাড়িয়ে, হুপ-হাপ শব্দে অকারণ লম্ফঝম্প দিয়ে মানুষকে ভয় দেখাবে। মানুষকে যদি বিপথে পরিচালিত করতে পারলে তো ভাল, নইলে সবাই মিলে সমস্বরে কোরাস গাইতে সুরু করবে—কি-ই-ই-ই। বানরদের এই কোরাস শুনলেই হরিণেরা পালিয়ে যাবে চোখের পলক পাতে। বাঘের আবির্ভাব নিশ্চিত হলেই বানরেরা গাছের ডালে গলাগলি হয়ে বসে গম্ভীর ঐক্যতান সুরু করে হুপ, হাপ হুপ। হরিণের দল যদি বনের পুব দিকে ছুটে পালায় তবে বানরেরা হয় উত্তর নয় দক্ষিণ দিকের গাছগুলিতে জড় হয়ে অবিশ্রাম ডাল নাড়তে থাকবে। প্রায়ই দেখেছি, বাঘ তার গতিপথ বদলে বানরেরা যেদিক থেকে গাছ নাড়া দিচ্ছিল সেই দিকেই চলে যায়। বোধ হয় বাঘ ভাবে, ঐ পথেই হরিণের দল গেছে বলেই হরিণ-বন্ধুরা পথটি পাহারা দিচ্ছে। এমনি করে বাঘকে ভুলপথে পাঠিয়ে ওরা খুব একচোট ঠোঁট উলটে হেসে নেয়। তারপর হৈহৈ হৈহৈ করে গাছের ডালে দোল খাবে কয়েক বার, ক্লান্ত হয়ে শেষে গাছের ডালে বসবে আর হাততালি দিয়ে পরস্পরের মুখ চেয়ে শুধু বলতে থাকবে 'কিচির মিচির।'

সবলের কবল থেকে দুর্বলকে রক্ষা করতে এরা যতখানি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সবলের লড়াই বাধিয়ে দিয়ে মজা লুঠতে এরা তার চাইতে কিছু কম ব্যস্ত নয়। কোথাও বাঘ শুয়ে একটু বিশ্রাম করছে, কিংবা ভূরিভোজনের পরে নিশ্চিন্ত মনে দিবানিদ্রার আমেজটুকু ভোগ করছে, বানরের মাথায় অমনি দুষ্ট বুদ্ধি গজালো। বার কয়েক গা-মাথা চুলকে সে তার ফন্দীটা ঠিক করে নিলে। তারপর গাছের মাথায় চড়ে দেখে নিলে শূকরের অবস্থিতি। গাছ থেকে নেমে কিংবা ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে সে চললো শূকরের কাছে।

বন্য শূকর ঠিক বদমেজাজী নয়। তবে চটিয়ে দিলে সে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। আর কাঠগোঁয়ার তো! শূকরের সুমুখে গিয়ে বানর এমনি ভংগী দেখাবে যেন সে শূকরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে। শূকর দু'-একবার অগ্রাহ্য করে বটে, কিন্তু বানরের ভেংচি কাটা আর লম্ফঝম্ফ দিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান তার বেশীক্ষণ সয় না। যেই চটে গিয়ে শূকর তেড়ে আসে অমনি বানর পালায় ভোঁ দৌড় দিয়ে। বেকায়দা হলেই লাফিয়ে উঠে পড়বে একটা গাছে। আবার তার সুমুখে নেমে সেই যুদ্ধং দেহি ভঙ্গিমা, আবার শূকর বানরকে আসে তেড়ে। এমনি করে শূকরকে সে ভুলিয়ে আনবে বাঘের আস্তানায়। বাঘ আর শূকর—দুই জাতিশত্রুর কোন মতে একবার চোখোচোখি হলেই হলো। বনভূমি কেঁপে ওঠে থরথরিয়ে। শূয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ আর বাঘের গর্জনে গাছের পাখীরা কলরব করতে থাকে। কিন্তু শাখায় নিশ্চিন্ত ঔদাস্যে বসে বানর দল তখন হাততালি দেয় আর মাথা নেড়ে বীরত্বের তারিফ করে, কিংবা লম্ফঝম্ফ দিয়ে মুখে খ্যাক্-খ্যাক্ শব্দ করে, উভয়পক্ষকে উৎসাহিত করে যুদ্ধে।

শুধু মজার খাতিরে নয়, মানুষের প্রাণরক্ষার জন্যে মানববংশের পূর্বপুরুষ বলে কথিত এই জীবটি কৌশলে এবং আপন বুদ্ধিচাতুর্য্যে এমনি একটা লড়াইয়ের সূত্রপাত করেছিল বলেই আজ আমি এই ঘটনাটি আমার পাঠকবর্গকে শোনাতে পারলুম।

সেদিন ছিল ৪টা চৈত্র বুধবার ১৩৪৮ সাল—আখেরি চাহার সুম্বার পরব ছিল মুসলমানদের। সারাটা সকাল থেকে দুপুর অবধি ঘুরেছি 'গ্যাঁচাপোল' পাখী শিকারের চেষ্টায়। শেষ পর্য্যন্ত শিকারের আশায় হাল ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত দেহ নিয়ে বসে পড়লুম একটা বেশ পরিষ্কার জায়গা দেখে। মধ্যাহ্ন-ভোজপর্ব সমাধা করে বনকর সাহেব ময়না আর তার এক সাকরেদকে নিয়ে নিকটে এক 'কূপের' কাজ তদারক করতে চললেন। কালী কপালী নিকটে কোথাও মৌচাকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তারি সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। লঞ্চের মাঝি সৌকতকে নিয়ে রয়ে গেলুম শুধু আমি। সৌকত একটু ভীতু মানুষ, বার বার গাছে চড়ে বসবার জন্যে মিনতি করে। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। বনের কিছুটা দূর পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সুতরাং সাহস দিয়ে সৌকত আলিকে বললুম, এমন জায়গায় বাঘ আসে না মিঞা আর আসলেও সে ফিরে যাবে না। তখন কে জানতো বিধাতার কত বড় পরিহাস আমি আহ্বান করলুম আমার অহংকারে। বনঘুঘু আমি, তারপর বনকর অফিসের সবাই জানে, তাদের সাহেবের মত অসমসাহসী শিকারী নেই ভূভারতে। আর আমি কিনা

বাঘের ভয়ে···। পাশের মাটিতে শোয়ানো গাছের গুঁড়িটার উপর সটান শুয়ে পড়ে মুখে নিশ্চিন্ত তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে সৌকতকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, বাঘকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। মিনিট কয়েক মোটে শুয়েছি, চোখের পাতা জুড়ে এসেছে ঘুমে, সৌকত ভয়জড়িত কণ্ঠে বলে সাহেব, দুটো বানর আমাদের দিকে কি রকম করছে। একবার চোখ টেনে চেয়ে দেখলুম। সত্যিই তো, দুটো বানর গাছের ডালটা ধরে এক জায়গাতে দাঁড়িয়ে অনবরত লাফাচ্ছে। আমি উঠে বসতেই ওরা মাটিতে নেমে অমনি লাফাতে সুরু করলে। অথচ মুখে রা-বাক্য নেই। ভারী অদ্ভুত লাগলো। ভাল করে একবার চারিদিকটা দেখে নিলুম। না, কোথাও কিছু নেই উপরে, নীচে, ডাইনে বামে সবই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কোথাও কিছু নেই।

আবার শুয়ে পড়লুম। সৌকত তো পাহারায় আছেই। ঘুম এসেছিল। বেশ গাঢ় ঘুম। আচমকা ধাক্কার এক চোটে ঘুম ছুটে গেল এক নিমিষে, সৌকত আলি আমাকে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে কাঁপছে—বা—আ—আ—আ। ভয়ে তার শরীরটা একেবারে কাঠ হয়ে গেছে, দেহে এসেছে আসুরিক বল। ভাল করে কিছু বুঝবার আগেই গম্ভীর চাপা আওয়াজ এলো 'হা-আ-আ-তা।' বাঘের হাই তোলার শব্দেই পায়ের নীচের মাটি উঠলো কেঁপে। আমি তখন ভয়ার্ত সৌকতের বাহুবেষ্টনের বেড়াজালে এক প্রকার বন্দী, বিদ্যুৎগতিতে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে বজ্রের ঘা বসিয়ে দিলুম সৌকতের মুখে। সৌকত আলি টলে পড়লো মাটিতে। মাটিতে পড়ে আছে প্রায় সমান্তরাল ভাবে, চার-পাঁচটি গাছের গুঁড়ি হাত তিরিশেক জায়গা জুড়ে। মাটি থেকে গুঁড়িগুলোর অবস্থিতি একই রকমের নয় বলে উচ্চতার তারতম্যে সৃষ্টি হয়েছে এক একটা ফাঁক। সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে বলিষ্ঠ চারখানি ডোরাকাটা পা। একবার তার লম্বা গোঁফজোড়াটাও দেখতে পেলুম। বাতাসের গতি প্রতিকূল থাকায় আমরা বাঘের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি না। নইলে অনুকূল বাতাসে এক মাইল দূর থেকেও নাকে আসে ওর গায়ের উৎকট ঝাঁঝালো গন্ধ। গুলী করবার সুযোগ নেই দেখে খুব সন্তর্পণে পিছু হটে গুঁড়ি মেরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ কোন আশ্রয়ের আশায় হাতকয়েক মোটে এগিয়েছি, শুকনো পাতার মড়-মড় শব্দে সচকিত হয়ে উঠলে বাঘটা। এক লাফে সুমুখের গুঁড়িটা ডিঙ্গিয়ে এসে কান খাড়া করে দাঁড়ালে। আমিও বুকে হাঁটা বন্ধ রেখে চুপটি করে পড়ে রইলুম।

কোথাও কোন শব্দ নেই। তবুও যেন বাঘের সন্দেহ হয়। মাটি শুঁকে সে মানুষের নিশানা করতে চায়। টুক্‌ করে দ্বিতীয় গুঁড়িটা লাফিয়ে এবার সে এসে পড়লো আমারই গুঁড়িটার ওপাশে। গাছের আড়ালে মাটি শুঁকে শুঁকে সে কয়েক বার চলাফেরা করলে ব্যস্ত পদে। আমার অবস্থা তখন নিতান্ত নিরুপায়ের মত। বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আমি তার মাথাটাকে কিছুতেই পাচ্ছি না। অথচ আমার সাথে ওর দূরত্ব বোধ হয় কয়েক ফুটের বেশী নয়। সম্ভবত: বাঘটা আমার অবস্থিতির কথা জানতে পেরেছিল, তাই হিংস্র গর্জনে তার ক্রোধ প্রকাশ করলে। সৌকত হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে গাছের আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠলে, 'আ-ল-লা।' বাঘটা সৌকতকে দেখেও কিন্তু তাকে আক্রমণ করলে না। শুধু মুখ তুলে আর একবার গর্জন করলে। মাচায় বসে গাছের গায়ে ছাগল বা গরু বেঁধে রেখে বাঘকে প্রলুব্ধ করে শিকারীরা। সম্ভবত: সেই কথা মনে করে বাঘটা সৌকতকে ছেড়ে মনোযোগ দিলে আমার দিকে। গুঁড়ির দুপাশে থেকে চললো দুজনের লুকোচুরি খেলা। কেউ তার আশ্রয় থেকে বার হয় না।

এমনি করে যতই সময় কাটতে থাকে ততই বাঘের রাগ বেড়ে উঠতে থাকে, ক্রুদ্ধ হুংকার তত ঘন ঘন ছাড়তে থাকে। আমিও পিছু হটতে হটতে এমন এক স্থানে এসে পড়েছি যে, সোজা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর সাথে ফয়সালা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাঘটাও শেষ পর্য্যন্ত এই লুকোচুরি খেলায় বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লো সোজা শক্তির পরীক্ষায়। এইবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়লুম আমরা—জীবন-মৃত্যুর চরম মুহূর্ত। বাঘটা কিন্তু তেড়ে এলো না বা লাফিয়ে পড়বার লক্ষণ প্রকাশ করলে না। গাছের ডালগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে মুহুর্মুহু গর্জনে বনভূমিকে কম্পিত করে তুললে। ১২ বোরের ৩০ ইঞ্চি ব্যারেল ও ৩ ইঞ্চি চেম্বারের ইজেক্টর 'এমপায়ার' আমি স্থির লক্ষ্যে রেখে এক পা এক পা করে পিছনের বড় গাছটার দিকে চলেছি। বাঘের স্বভাবজাত শিকার-বুদ্ধিতে আমার চালাকি ধরা পড়ে গেল। শত্রুকে নিরাপদ আশ্রয়ের সুযোগ দেওয়ার অর্থ যে কি, সে তা বেশ জানে। তাই দ্রুত কয়েক পা এমন ভঙ্গিতে তেড়ে এলো যে আমি ঘোড়াকল টিপে বসি আর কি। থমকে দাঁড়াতে হলো। আবার সুযোগ বুঝে আমি একপা পিছনে চলি তো বাঘটা দুপা এগিয়ে আসে। আমাদের ব্যবধান ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে দেখে একবার ভাবলুম গুলী চালাই। কিন্তু আবার মনে হলো তাতে বিপদ আরো বেশী। পেছনের গাছটা আর দুপা হটলেই বোধ হয় পাওয়া যায়। কিন্তু শত্রু এখন স্থিরদৃষ্টি রেখেছে আমার চোখের উপর। অকস্মাৎ বানরের কলরব আর পিছনের হুড়মুড় শব্দে হাতের বন্দুকটাও বুঝি কেঁপে উঠলো। মরীয়া হয়ে আমি গাছের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালুম পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণের অবকাশ রোধ করে। বিদ্যুৎবেগে আমার গা ঘেঁষে ছুটে গেল এক বন্য শূকর। চোখের পলকে বাঘ লাফিয়ে পড়লো শূকরের ঘাড়ে আর শূকরের থুঁতনীর আঘাতে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

এবার বাঘ আর লাফ দিলে না। মাটিতে শুয়ে পড়লো শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার ভংগীতে। শূকর তীব্রবেগে তার চোয়াল উঁচিয়ে আক্রমণ করলে বাঘকে। বাঘ ক্ষিপ্রতার সাথে লাফ দিয়ে শূকরের আক্রমণ ব্যর্থ করলে। তারপর পেছন থেকে লাফিয়ে পড়লো বিপক্ষের উপর আর কামড় বসালে শত্রুর ঘাড়ে। শূকর মুখটা মাটিতে ঢুকিয়ে ডিগবাজী দিয়ে গড়িয়ে পড়তেই বাঘও ছিটকে পড়লো মাটিতে। এবার সে তার ধারালো দাঁত দিয়ে আঘাত করলো বাঘের পেটে। বাঘ ধরলে ওর ঘাড় কামড়ে। শূয়োর তার ধারালো দাঁতে লাঙ্গলের ফলার মত মাটি চষে বাঘকে ঠেলে নিয়ে এলো আমার দিকে। লাফ দিয়ে সরে পড়লুম তাই রক্ষে। নইলে বাঘটাকে ঠেলে এনে আমার

ঘাড়েই ফেলতো ঠিক। গাছের গায়ে শূকর বাঘকে এমনি ঠেসে ধরলে যে, বাঘ শত্রুর ঘাড়ের কামড় ছেড়ে আত্মরক্ষার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে। ভীষণ হুংকার করে বাঘ তার প্রচণ্ড থাবার আঘাতে শূয়োরকে পিছু হটতে বাধ্য করলে।

আবার লাগলো লড়াই। এতক্ষণ এমন ক্ষিপ্র গতিতে লড়াই চলছিল যে আমি অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম। আত্মরক্ষার যেন তাগিদ ছিল না মনে। এইবার গাছে চড়ে নিজেকে নিরাপদ ব্যবধানে সরিয়ে নিতে হবে। কে জানে এই যুদ্ধের ফলাফল কি। কি সর্বনাশ! সৌকত আলি অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আর বানর দল তাকে টানাটানি করে তার গায়ের ফতুয়া, লুঙি ছিঁড়ে টুকরো ট্যানা বানিয়েছে। সৌকতকে ওরা ছোট ছোট গাছের ডাল চাপা দিয়ে বোধ হয় বাঘের দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখতে চেষ্টা করেছে। তখনও দেখলুম কেউ কেউ ওকে গাছের ভাঙা ডালের পাতার আবরণে ঢেকে রাখতে ব্যস্ত। সৌকতকে পাহারা দিতে গিয়ে আমার আর গাছে চড়া হল না। অবিশ্যি আসল বিপদ আমার কেটে গেছে। আবার যুদ্ধ দেখতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত বন্য শূকরকে ধরাশায়ী করে ব্যাঘ্ররাজ জয়ের হুংকার ছাড়লে। আহত রক্তাক্ত দেহের ক্ষতস্থান চেটে বাঘটা আঘাতের ধাক্কা সামলে নিচ্ছে সবে, কোথা থেকে ছুটে এসে ওর সুমুখে পড়ে গেল কালী। বাঘ আর ফুরসৎ পেলে না বিশ্রামের। পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে কালীর কাঁধের উপর বসালে দুই থাবা। বাঘ আর কালী জড়াজড়ি করে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। মুহূর্ত মধ্যে কালী বাঘের উপর চেপে বসলে। এক ঝাঁকুনিতে বাঘ কালীকে ছিটকে ফেলে দিলে তার বুকের উপর থেকে।

মুহূর্তের অবকাশ না দিয়ে বাঘ সুমুখের পা দুটো তুলে দ্বিগুণতর শক্তিবেগে থাবা মারতে লাগলো কালী-কপালীর লোহার মত শক্ত চওড়া বুকে। কালীর গতিবেগও অসাধারণ ক্ষিপ্র। মাটিতে পড়েই সে আবার বিদ্যুৎগতিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানোয়ারটা তার থাবা দুটো ওর বুকে বসাবার আগেই কালী তার হাতের টাংগীটা ঘুরিয়ে বাঘের মাথা লক্ষ্য করে হানলে প্রচণ্ড আঘাত। লক্ষ্য ফসকে টাংগীর ঘা পড়লো বাঘের ঘাড়ের উপর। ভীষণ গর্জন করে বাঘটা মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। চোখের পলক ফেলতেই যেটুকু দেরী। আবার সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে। কিন্তু সে আর হলো না। আমার বন্দুকও ওরই গর্জনের সাথে গর্জে উঠলো সমান ওজনের ভারী ও ভয়ংকর শব্দে। জোড়া গুলী একসংগে যেয়ে বিঁধলো ওর মাথায়। দু-একবার এদিক-ওদিক দুলে ওর মাথাটা আপনা থেকেই ঝুলে পড়লো মাটিতে। বাঘটা হাত-পা বিছিয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটির শয্যায়।

বাঘের সেই বিশাল স্পন্দনহীন দেহটাকে নেড়েচেড়ে কালী আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে, দেখছো রাজাভাই! ব্যাটা সত্যিই জাতরাজা। কি গর্বিত ভংগীটা দেখছো। শূয়োর তার ধারালো দাঁত দিয়ে পেটটাকে ফেড়ে দিয়েছে একেবারে, টাংগীর ঘায়ে মাথাটা প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ঘাড় থেকে। তবু কি অমিত বল আর কি দুরন্ত গর্জন।

এইবার সমস্ত ঘটনাটি বোঝা গেল পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা আর বিচ্ছিন্ন কার্য্যকারণগুলিকে একই যোগসূত্রে গেঁথে। যে গুঁড়িটার উপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, সেই গুঁড়িটা থেকে তৃতীয় গুঁড়িটার তলায় মস্ত একটা খাদ। সেই খাদে শুয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন ছিল বাঘটি, আমাদের কিছু আগে থেকেই। খাদের ভেতর কিছু টাটকা মাংস থেকে তখনও জমাট রক্তের দাগ মোছেনি। প্রচুর হাড়গোড় ছড়িয়ে রয়েছে খাদের মধ্যে। ভূরিভোজনের পর বাঘের নিদ্রাটা হয়ে পড়েছে অনেকটা কুম্ভকর্ণের মত। হয়েছিলও তাই। তবে ভূরি-ভোজনের পর মানুষের মতই ওদের জলপিপাসা বেড়ে ওঠে। তাই বড়জোর ঘণ্টা দেড়েক একটানা ঘুমিয়ে চলে আবার জল খেতে। পেট ভরে জল খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আজও ঠিক তাই ঘটেছে। বানর দুটো আমাদের বোঝাতে চেয়েছিল বাঘ ঘুমুচ্ছে আমার পাশে শুয়ে। পাছে চেঁচামেচিতে বাঘের ঘুম ভেঙে যায় সেইজন্যেই ওরা নিঃশব্দে অবিশ্রান্ত লাফিয়ে আমাদেরকে পালিয়ে যেতে ইংগিত করেছে। আমি ঘুমিয়ে পড়লে সৌকত দেখেছে, পুরুষ বানরটা গাছের মাথায় উঠে কি যেন দূরের জিনিষ সন্ধান করলে। তারপরে ছুটে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে। আমাদের প্রাণরক্ষার জন্যেই সে শূকরকে ভুলিয়ে এনেছে এখানে। সে তো জানে, বাঘটা এখুনি ঘুম ভেঙে উঠবে আর আক্রমণ করবে আমাদিগকে।

যখন ওদের কাছে বিদায় নিলুম আমরা তখন বানর-দম্পতি গলা জড়াজড়ি করে বসে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। হাত নেড়ে বিদায় জানাতেই ওরা ঠোঁট উলটে হাসলে আর হাততালি দিয়ে প্রত্যুত্তর দিলে। বোধ হয় বললে, 'বাহাদুর মানুষ ভাই! সাবাস! কিন্তু ভুলে যেয়ো না আজ আমরা ছিলুম তাই রক্ষে। অকৃতজ্ঞের মতো আর যেন বন্দুক উঁচিয়ে ধরো না আমাদের বুক লক্ষ্য করে।'

সরকারী নথিপত্রে লেখা হলো ঘটনাটি-একেবারে জৌলুষহীন নীরস ৪৬টি শব্দের সংখ্যাতাত্ত্বিক সমাবেশে। তারিখ দেওয়া হয়ো ১৮ই মার্চ—১৯৪২ সাল।

# সিমলা কালীবাড়ীর লোকপ্রিয়তা

**সুধাংশু ঘোষ**

মঙ্গলবার, বিকেল সাড়ে চারটা। স্ক্যাণ্ডেল পয়েণ্টে ঘুরছি। শুনলাম একটি দশ-বার বছরের দেশী হলেও, ধবধবে ফর্সা মেয়ে, তদ্রূপই ফর্সা সমবয়স্কা সাথীকে পরিষ্কার শুদ্ধ ইংরিজিতে বলছে, চল, কালীমন্দিরে যাই, জিলিপী মিলবে।

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত সিমলার কালীমন্দিরের কথা বলছি। মঙ্গলবার একটি বিশেষ দিন হলেও, প্রতিদিনই সকাল পাঁচটা হতে রাত এগারটা পর্য্যন্ত, কখনও-সখনও তার পরেও, কালীমন্দিরের দরজা খোলা থাকে। শিশু বৃদ্ধ গরীব ধনী স্ত্রী পুরুষ, এক কথায় বৃহত্তর হিন্দু সমাজের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই সিমলার কালীমন্দিরে জগৎজননীর দর্শনার্থে আসেন। এঁদের মধ্যে গৃহীও থাকেন, সংসারত্যাগী পরিব্রাজক, আত্মদর্শী সাধুও থাকেন। কেউ কেউ শুধু একবার দর্শনে এসে দর্শনী দিয়েই যান না, দেখেছি একই ব্যক্তি দিনে একাধিক বার আসেন, উদাত্ত কণ্ঠে 'মা'কে ডাকেন, ডেকে আনন্দ লাভ করেন।

জনৈক ব্যক্তিকে একদিন মন্দিরের চত্বরে তৃতীয় বার ঘুরতে দেখে প্রশ্ন করলাম, একই জায়গায় বার বার আসেন কেন? ভদ্রলোক স্থানীয় এবং পাহাড়েরই অধিবাসী। তিনি নিজেই প্রশ্ন করলেন, কেন আসি? চুপ করে রইলেন, বোধ হয় উত্তর পেলেন না।

আমিও তো ঘুরে ঘুরে সিমলায় যাই। কাজে নয়, নিছক ঘুরতে, গাঁঠের পয়সা খরচ করে। একা নয়; সস্ত্রীক সপুত্র, তিনটি প্রাণী প্রায় প্রতি বছরই। কালীবাড়ীতেই উঠি, সেখানেই জায়গা মেলে। কেন সিমলায় যাই, কাশ্মীর নয়, মুসৌরী নয়, ডালহৌসী নয়। দার্জ্জিলিং নয়, হয়ত অনেক দূর বলেই। কেন কালীবাড়ীতে উঠি, থাকি? হোটেল মেলে। চেষ্টা করলে প্রবাসী বাঙ্গালীদের কারুর বাসায় মাস খানেক বাসের জন্যে আস্তানাও মেলে, কিন্তু কালীবাড়ীতেই উঠি কেন? উত্তর পাই না।

সিমলার কালীবাড়ীর অতিথিশালায় শুধু আমি উঠি না। গ্রীষ্মকালে সেখানে অনেকেই ওঠেন, শুধু সমতল ভূমি হতে এসে নয়, সিমলার অন্তর্গত নীচু পাহাড়ের প্রবাসীরাও উচ্চে অবস্থিত কালীবাড়ীতে এসে ওঠেন। এঁরা দু-একদিন নয়, বেশ কয়েক সপ্তাহ, এমন কি মাসাধিক কালও কালীবাড়ীতেই কাটান। কেউ প্রতি সীটে দিনে এক টাকা নয় আনা দিয়ে থাকেন, কেউ থাকেন মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় গোটা একটি ঘর নিয়ে। কেউ রান্না করে খান, কেউ অতিথিশালার হোটেলেই খান, চা জলখাবারের ব্যবস্থাও সেখানেই করেন।

ম্যাল রোডের উপরে, সিমলার কেন্দ্রস্থল "রীজ" হতে চলা পথে দুই মিনিটের মধ্যে কালীবাড়ী বাংলা দেশের বাইরে বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রধান। নয়া দিল্লীর কালীবাড়ী এখনও তৈরীর পথে। সিমলার কালীবাড়ী এখনও বাড়তির দিকে। বিরাট সাততলা অতিথিশালায় এখনই প্রায় সত্তর জনের স্থান সঙ্কুলান হয়। পাশেই তৈরী হচ্ছে দোতলা দশ কামরার আর একটি পাকা বাড়ী অতিথিদের জন্যেই।

সেক্রেটারী মশায় আশা করেন, নতন বাড়ী তৈরী হলে সমগ্র অতিথিশালায় প্রায় শত খানেক লোককেই একই সময়ে থাকবার জায়গা দেওয়া যেতে পারে। প্রয়াস শুভ। কিন্তু অর্থ? সিমলায় রোজগেরে বাঙ্গালী বোধ হয় সর্ব্বসমেত এক শত; সুতরাং বর্ত্তমানে সিমলাবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের অর্থ-সামর্থ্য আগের মত অসীম নয়। মন্দিরে যে প্রণামী পড়ে, 'হল' ও পান্থশালা হতে যা আয় হয় মাত্র তার উপরেই ভরসা রাখলে অতিথিশালার বিস্তার ও উন্নতি সময় সাপেক্ষ। অন্যান্য কারণ বাদ দিলেও দূর প্রবাসে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান বলে ও সিমলার কালীবাড়ী বৃহত্তর বাঙ্গালী পরিবারের নিকট বিস্তৃতি ও উন্নতির জন্যে সাহায্য আশা করতে পারে।

শুধু দিল্লী, কানপুর বা আগ্রা-প্রবাসী বাঙ্গালীই সিমলার কালীবাড়ীতে আসেন না। অবাঙ্গালীও, পাঞ্জাবীই হোন বা মাদ্রাজীই হোন, সিমলার কালীবাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করে। সুদূর বাংলা, আসাম থেকেও অনেকে সিমলায় বেড়াতে আসেন, কালীবাড়ীতেই ওঠেন, থাকবার জায়গাও পান।

গাঁঠের পয়সা খরচ করেই হোক্, রেলের পাশেই হোক্ বা সরকারী কর্ম্মে সাধারণের পয়সাতেই হোক্, সিমলার বন্ধু-বান্ধব না থাকলে সেখানে বাঙ্গালীর প্রথম গন্তব্যস্থল হল কালীবাড়ী। কারণ, জায়গা ওখানে হবেই। উপস্থিত পৃথক ঘর বা জায়গার অভাব হলেও 'হল' বা গ্যালারীতে স্থানের সঙ্কুলান হয়েই থাকে। তারপর

সিমলা কালীবাড়ী—শ্রীশ্রীকালীমাতা

সিমলায় বন্ধু-বান্ধব না থাকলেও কালীবাড়ীতে উঠলে আগন্তুকগণ দু-এক দিনের মধ্যেই নতুন বন্ধু পেয়ে যান।

কবে ভেবেছিলাম শিলং-নিবাসী এবং সরকারী চাকুরীর জন্যে বর্ত্তমানে কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দত্তরায়ের সঙ্গে পরিচয় হবে? পরিচয় হল, অমায়িক ভদ্রলোক; স্ত্রী সারল্যে ভরা। ভদ্রলোকের চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের সময় এসে গিয়েছে অথচ ছোট বড় সবাইকার সাথেই প্রাণ খুলে মিশলেন। গিন্নী কলকাতা ফিরে আমার স্ত্রীকে পৌছান সংবাদ পাঠালেন। তিন দিনের পরিচয়েই এত ঘনিষ্ঠতা। কানপুরের শ্রীমতী আভা পাকড়াশীর সাথে কালীবাড়ীতেই পরিচয় হল—স্বামী ও দুই পুত্র নিয়ে বলতে গেলে ভারত ভ্রমণেই বার হয়েছেন। ভদ্রমহিলা কয়েকটি মাসিক পত্রিকার লেখিকা। কেদার-বদরী ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সাহিত্যের ছোঁয়াচ দিয়ে বর্ণনা করলেন। কত উদাহরণ দেব? এঁদের সাথে আর কখনও সাক্ষাৎ হবে কি না জানি না, তবে সিমলায় কালীবাড়ীতে যে পরিচয় ঘটে, অন্ততঃ পত্র বিনিময়ের মধ্যে তা চিরস্থায়ী করতে আপত্তি কি? সত্যি বলতে দিল্লীতে গত এক বছরের মধ্যে যত নূতন পরিচয় ঘটেনি, সিমলার কালীবাড়ীতে মাত্র পঁচিশ দিনে তার চেয়ে বেশী নর-নারী ও বালক-বালিকার সঙ্গে পরিচয় হল। যাঁদের দিল্লীতে চিনতাম না, সিমলায় তাঁদের চিনলাম। দিল্লীতে দৈনন্দিন সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও যাঁদের সাথে মুখের আলাপও হয়নি, সিমলার কালীবাড়ীতে তাঁদের সাথে সদ্ভাব গড়ে উঠল। এই সদ্ভাব-সৃষ্টির জন্যেই বোধ হয় সিমলা প্রবাসী কোন কোন বাঙ্গালীও গ্রীষ্মকালে যখন সিমলার কালীবাড়ী নূতন অতিথিতে ভরে ওঠে, অস্থায়িভাবে কালীবাড়ীর অতিথিশালায় আশ্রয় নেন, শীতের মধ্যে ঘন কুয়াশায় কালীমন্দিরের প্রাঙ্গণে সময়ের অপেক্ষা না করে গভীর রাত পর্য্যন্ত নূতন অতিথিদের সাথে আলাপ চালিয়ে যান।

এই পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, একদলকে ছেড়ে আসতে আর একদলের মনে কষ্ট হয়। শুধু অতিথি নয়, কালীবাড়ীর কর্ম্মীদের চক্ষেও অতিথি ছেড়ে যাবার সময় করুণ দৃষ্টি দেখলাম। এই করুণ দৃষ্টি মায়াস্পৃষ্টই, আর্থিক ক্ষতির কল্পনায় নয়, কারণ অন্ততঃ গরমকালে কালীবাড়ী খালি পড়ে না। উদাহরণ দিই। সেদিন দিল্লী-প্রবাসী শ্রীযুক্ত পালের ছোট-বড় আট জন অতিথি সিমলা ছাড়লেন। কালীবাড়ীর পরিদর্শক 'মালী'কে একটি ছেলে বললে, "মালী, কালীবাড়ী খালি।" কিন্তু কালীবাড়ী খালি হল কই! এক ঘণ্টার মধ্যেই উঠে এলেন নয় জন নূতন অতিথি। বাস্তবিকপক্ষে দিল্লীর দৈনিকগুলিতে টুরিষ্টদের সিমলা ছেড়ে যাবার সংবাদ ফলাও করে মুদ্রিত হবার পরেও সিমলা কালীবাড়ীর অতিথিশালা ভরাই রইল।

আবার প্রবন্ধের প্রারম্ভেই ফিরে আসি। ফিরে ফিরে সিমলার কালীবাড়ীতে কেন আসি জানি না, তবে আসি এবং প্রতিবারই নীচে ফেরার সময় পেয়ে থাকি কালীবাড়ীর বৈতনিক ও অবৈতনিক কর্ম্মচারিগণের এবং সিমলা-প্রবাসী নূতন বন্ধুদের আবার আসবার নিমন্ত্রণ।

## অন্য মত

### রাধামোহন মহান্ত

বালীগঞ্জ এলাকার পায়ে-চলা কোন এক বাঁধা রাজপথ
এ তো নয় অতীন্দ্রিয় জগতের দার্শনিক কাণ্টের সড়ক,
এখানে পাবে না তুমি ল্যাম্পের সস্নেহ-স্পর্শ, সেবা বন্ধুবৎ,
কেমনে মেলাবে ঘড়ি কাণ্টের চলার সাথে করিয়া পরখ?
এখানে নিস্তব্ধ কাল, সময়ের নিয়মের কোন মূল্য নাই,
নিয়ন-রোমাঞ্চ-কাঁপা অনির্দেশ জোনাকির চেলীর বসন
আনন্দ-হতাশা মাখা; বনানীর মর্মে বাজে রোশন সানাই
কাঁকড়াবিছার প্রেমে; মুখচন্দ্রে মুগ্ধ মন, নয়নে নয়ন!

বালীগঞ্জ এলাকার পায়ে-চলা সেই এক সড়কের ধারে
পদাতিক শিরীষেরা পঙ্গু মনে স্বপ্ন দেখে; বিমুগ্ধ তারার
অভিসার আকাশের নীলিমায়! ঝিঁঝিপোকা সন্ধ্যার আঁধারে
সতর্ক সঙ্কেতে জাগে; একালের ব্যাঙ্কিলের খোলা বারান্দায়
এক কোণে একজোড়া কলাপীর কলতানে উচ্ছল হৃদয়,
রঙীন-শাড়ীর পাকে রোজ দেখা আমাদের সভানো মেয়েটি
যেন বনতটে রহস্য-নিলীন; পৃথিবীর প্রাণের পাত্রটি
আবেগে নিঃশেষ করে, কী গভীর জীবতৃষা, অচেল সঞ্চয়!

শত শত পৃথিবীর পলিতলে অঙ্কুরের উন্মেষ আশায়
কান পেতে কেউ শোনে অনাগত জীবনের নাড়ীর স্পন্দন;
কেউ তৃপ্ত চেয়ে পেয়ে, কেউ কাঁদে চিরকাল ব্যর্থ প্রত্যাশায়,
রজ্জুতে সাপের ভ্রমে কেউ কাটে বসুধার মায়ার বন্ধন!
ইন্দ্রনীল সন্ধ্যা নামে বালীগঞ্জ এলাকার পথের অলকে,
জীবন-ঘড়ির কাঁটা তখন মেলাতে পারো চোখের পলকে!

প্রশান্ত চৌধুরী

## ১৪
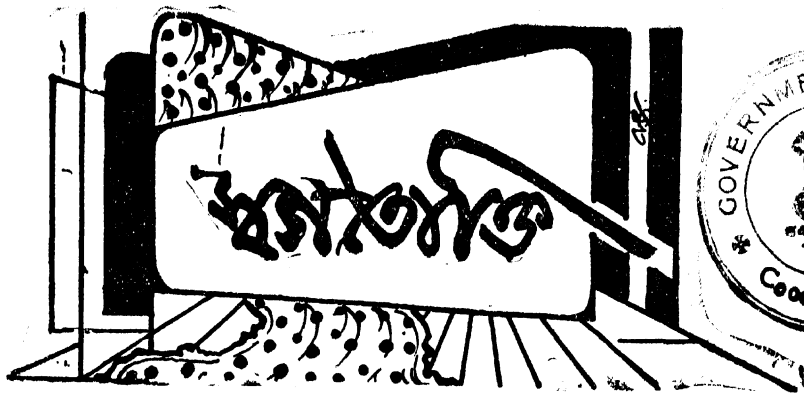
পঞ্চাশৎ অভিনয়-রজনী।

জুপিটার থিয়েটার বিয়েবাড়ীর সাজে সেজেছে আজ সকাল থেকে। মায় গেটের মাথায় নবৎ-এর মঞ্চটা পর্যন্ত বাদ যায়নি। সন্ধ্যে হয়ে থেকে প্রবেশপথের মাথায় ঝোলানো বুটিদার ভেলভেটের পর্দার ঠিক নিচেয় দাঁড়িয়ে আছেন হৃদয়রাম কোঁচার গরদের পাঞ্জাবী আর ঢাকাই ধুতিতে ফিটফাট হয়ে। তাঁর ঠিক পাশেই গিলেদার আদ্দির হাঁটুঝুল পাঞ্জাবী, চুমুটকরা থান ধুতি, কালো সিল্কের মোজা, এ্যালবোর্ট জুতো, কুঁচোনো উড়ুনী আর মোষের শিং-এর ছড়িতে সুশোভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন প্রৌঢ় হরিশ বাবু। হৃদয়রামকে যদি বলি কন্যাকর্তা তো হরিশ বাবুকে বলতে হবে কনের ছোট-ঠাকুর্দা!

জুপিটার থিয়েটারের কেউ নন হরিশ বাবু। কোন থিয়েটারেরই কেউ নন আর তিনি। এককালে ছিলেন। আজ থেকে বিশ বছর আগে পর্যন্ত ম্যানেজারী করেছেন একটা না একটা থিয়েটারে। সে যুগে ননীগোপাল রায় যখন যে থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, সে থিয়েটারের ম্যানেজারের গদিটা থাকতই থাকত হরিশ গাঙ্গুলীর জন্য রিজার্ভ করা।

ননীগোপাল রায় কোন থিয়েটারেরই মালিক ছিলেন না কোন দিন—নিতান্তই পৃষ্ঠপোষক মাত্র।

টাকার অভাবে নতুন বই খোলা যাচ্ছে না? আচ্ছা, নাও হাজার কয়েক; শোধ দিও লাভের টাকা পেলে। কিন্তু একটি সর্ত, আমার ঐ হরিশ ভায়াকে ম্যানেজারী করতে দিতে হবে। মাইনে? মাইনে তোমরা আর কি দেবে? সে তো আমি আছিই। শুধু ঐ ম্যানেজারের চেয়ারটা আর মাতব্বরিটা চাই।

বহু থিয়েটারই পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে ননীগোপাল রায়ের। অথচ তিনি নাট্যরসিক, এত বড় অপবাদ তাঁকে তাঁর অতি বড় শত্রুরাও দিতে পারেনি কোন দিন। মদ খাননি কোন দিন জীবনে। বাগানবাড়ী ছিল একটা পৈত্রিক। সেটা জুড়ে কাঠের বাক্স না সুতোর মিলের ববিন্ তৈরী করার মস্ত কারখানা ফেঁদেছিলেন একটা। ফাঁক রাখেননি সেখানে এতটুকু বেলেল্লাগিরি করবার। হিসেবী ব্যবসায়ী। পাক্কা সংসারী মানুষ। বয়স এগিয়ে চলেছে। চুলে ধরেছে পাক। সারাদিনের কাজকর্মের শেষে মাঝে মাঝেই যেতেন কোন না কোন থিয়েটারে। একেবারে সটান অন্দরমহলে। বসে থাকতেন একটু চেয়ার নিয়ে ষ্টেজের পিছনদিকের প্রায়ান্ধকার চাতালে। তাঁর মস্ত চুরুটের কড়া গন্ধ পেলেই ছুটে এসে ঘিরে ধরত তাঁকে ছোট-বড় অভিনেত্রীর দল। অভিনেত্রীদের সঙ্গে কতকগুলো বাঁধা-ডায়ালগ ছিল তাঁর :—

'হাঁ রে চারু? ও কী ব্লাউজ পরে ষ্টেজে নামছিস? তোদের প্রোপাইটারের কি পকেট গড়ের মাঠ? দিস্ দিকিনি তোর গায়ের জামা একখানা,—দেব খান কয়েক ব্লাউজ করিয়ে।...ও নীরদা, যাচ্ছ কোথায়? কী সেজেছ? আধুনিকা? ঐ নাকি আধুনিক ব্লাউজের কাট্? লোকে সাধে আজকাল থিয়েটারকে ছ্যা-ছ্যা করছে? দিও তোমার গায়ের মাপ,—হাল্‌ফ্যাশনের ব্লাউজ কা'কে বলে দেখতে পাবে।...বলি ও স্মৃতি, ঐ এক পোষাকে হোটেলের ছুটো সীনেই নাবিস নাকি তুই? ওতে কি মন ভরে লোকের? একসেট চাইনীজ পোষাক করিয়ে দেব, দেখিস নাচ কেমন জমে যায়। জানিস তো, থিয়েটারে আগে হল 'দর্শনদারী' পিছে 'গুণবিচারী'?—'

অভিনেত্রীরা দিত তাদের গায়ের জামা। ননীগোপাল বাবু সেই জামা হাতে নিয়ে ফিরে যেতেন। ক'দিন পরে আসতেন আবার নতুন জামার স্তূপ নিয়ে।

'পর তো দেখি, কেমন ফিট হল গায়ে তোর চারু!—দেখি নীরদা, এস তো কাছে, কাঁধের কাছে জামাটা যেন কুঁচকে রয়েছে মনে হচ্ছে।—দেখি দোখ স্মৃতি, সরে এসো তো, লাগিয়ে দিই পিঠের বোতাম ক'টা।—'

ব্যস্, ঐ পর্যন্তই। ঐতেই তাঁর আনন্দ। এর বেশি এগোতে ভাখেনি কেউ তাঁকে কোন দিন। কোন দিন যদি নিতান্তই খুব অসংযত হয়ে পড়েছেন তো—

'রেবা? শরীর খারাপ না কি? মুখটা যেন ভার-ভার, চোখ ছুটো যেন কেমন কেমন লাগছে যে! কাছে এস তো, দেখি তোমার গা।'

সরে এসেছে তরুণী অভিনেত্রী। ননীগোপাল রায় তার কাঁধ আর চোয়ালের মাঝখানে গলার এক পাশে হাতের উল্টোপিঠ ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ অনুভব করেছেন তার দেহের উত্তাপ, তারপর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলেছেন,—'নাঃ, গা ভালই। 'তবু রাত্রে আজ আর ভাত-টাত না খেয়ে শুকনো কিছু খেয়ো।'

ঐ পর্যন্তই। ঐ চরম। ঐ যথেষ্ট। শুধু ঐটুকুর জন্যে থিয়েটারে আনাগোণা করতেন ননীগোপাল রায়। পড়ন্ত থিয়েটারকে জাঁইয়ে তোলবার জন্যে করতেন পৃষ্ঠপোষকতা।

কত বিচিত্র বাসনা মেটাতে কত মানুষই যে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন রঙ্গালয়ের,—কে রেখেছে তার হিসেব ?

আর্থিক অবস্থায় আশমান-জমিন্ ফারাক থাকলেও হরিশ বাবু ছিলেন এই ননীগোপাল বাবুর বন্ধু। সৌখীন যাত্রাদলে গান গাইতেন নিয়মিত সেজে। থাকতেন ননী বাবুদেরই পাড়ায়। সারা জীবনের বাসনা ছিল পাবলিক থিয়েটারের ম্যানেজার হওয়ার। যত দিন ননীগোপাল বেঁচে ছিলেন, তত দিন সে বাসনা মিটিয়ে নিয়েছেন প্রাণ খুলে। ননী বাবুর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সে পদও হয়েছে অপহৃত।

পদ গেলেও আজও সেই নেশাটা যায়নি। আজও যে-কোন থিয়েটারের যে-কোন উৎসব-রজনীতে দেখা যাবেই যাবে তাঁকে থিয়েটারের সুসজ্জিত দ্বারদেশে; এমন কি নিমন্ত্রিত না হয়েও। তারপর, মুহূর্তমধ্যে থিয়েটারের মালিকের জায়গায় তিনিই হয়ে উঠবেন কর্তাকর্তা। উৎসব-সভাপতি গাড়ী থেকে নেমে আগে তাঁকেই করবেন নমস্কার। ফেরবার সময় বিশেষ করে তাঁকেই বলে যাবেন,—'আচ্ছা চললুম হরিশ বাবু।' হরিশ বাবু হাতজোড় করে বলবেন,—'তাড়াহুড়োতে ঠিকমত খাতির-যত্ন হয়তো করতে পারিনি;—মনে করবেন না কিছু।'

হরিশ বাবুর আনন্দ ঐটুকুতেই।

মানুষের মনের তার কার যে কোন্ পর্দায় বাঁধা কে জানে! কেউ খুশীতে কেঁপে উঠছে 'সা'-এর কাঁপনে, কেউ বা 'পা'-এর মীড়ে। কেউ অর্থে, কেউ যশে। কারুর নেশা হয় মদে, কারুর আফিঙ-এ। কেউ খুশী বাবরি রেখে, কেউ বা ঘাড় কামিয়ে। কারুর মন বিকোতে চায় সেই হাটে,—যেখানে 'নস্য উড়ে আকাশ জুড়ে কাহার সাধ্য দাঁড়ায়'। কারো বা সেইখানে, যেখানে 'পাখি তাদের শোনায় গীতি, নদী শোনায় গাথা।'

ঐ হরিশ বাবুকে প্রথম দেখেছিলুম প্রায় বছর পঁচিশেক আগে। স্কুলের প্লে হবে ষ্টেজ ভাড়া নিয়ে। আমরা ছেলের দল ষ্টেজ রিহার্স্যালের দিন সকালে জমা হয়েছি সবাই ষ্টেজে। মাষ্টারমশাইরা তখনও এসে পৌঁছন নি। নিজেরাই একটু রিহার্স্যাল দিয়ে নিচ্ছি ততক্ষণ। কী একটা দৃশ্যের পার্ট কিছুটা সবেমাত্র বলেছি, এমন সময় কোথা থেকে হুঙ্কার এল,—'জোরে!'

সবাই সভয়ে চমকে উঠে দেখি,—ওপরের রয়্যাল বক্স-এ দাঁড়িয়ে আছেন এক জাঁদরেল ব্যক্তি। পরনে তাঁর খাঁকি হাফপ্যান্টের মধ্যে গোঁজা খাঁকি হাফসার্ট, হাতে মোষের শিং-এর ছড়ি, মুখে কাঠের পাইপ। যেন যুদ্ধের মিলিটারী কমাণ্ডার!

হুঙ্কারের উৎস আবিষ্কার করে আমরা আরো একবার কেঁপে উঠলুম!

নেমে এলেন হুঙ্কারকর্তা গটগট করে সটান একেবারে ষ্টেজের ওপরে, যেখানে আমরা ক'টি অভিভাবকহীন অসহায় বালক কাঁপছি ভয়ে ঠক-ঠক করে।

এটা থিয়েটার। চেঁচিয়ে কথা বলো।

আমরা নীরবে কম্পমান। নীরব না বলে মূকই বলি বরং।

আমাদের ভীতিবিবর্ণ নির্বাক মুখের দিকে তাকিয়ে নিতান্তই দয়ার্দ্র শান্ত মোলায়েম কণ্ঠে এবার বললেন ভদ্রলোক: কথা জোরে বলা যায়।

একটু থামলেন। মৃদু হাসলেন। গলাকে এক পর্দা চড়িয়ে আবার সেই একই উক্তির পুনরাবৃত্তি করলেন: কথা জোরে বলা যায়।

আবার থামলেন। আবার হাসলেন নিঃশব্দে। এবারের হাসিতে গর্ব মেশানো। গলা আরও এক পর্দা চড়িয়ে আবার বললেন: কথা জোরে বলা যায়।

: কথা জোরে বলা যায়!

: কথা জোরে বলা যায়!

: কথা জোরে বলা যায়!...

প্রতি বার এক এক পর্দা জোরে চড়ছে গলা। ধাপে ধাপে উঠছে ওপরে। তিমি, তিমিঙ্গিল, তিমিঙ্গিলগিল। জোরে, জোরে, আরো জোরে। তারপর অন্তিম হুঙ্কার—

: কথা জোরে বলা যায়।

কানে তালা লেগে গেছে তখন সকলের।

উনি থামলেন। সার্কাসের পালোয়ান যেমন বিরাট মেহনৎ-কসরতের হাঁফ-ধরানো খেলা দেখাবার পরেও অদ্ভুত একটা অক্লেশ-হাসিমুখে দু'হাত প্রসারিত কোরে অভিবাদন জানায় দর্শকদের, ঠিক তেমনিধারা হাসিমুখে তাকালেন উনি আমাদের বিস্মিত মুখের দিকে। তারপর নিশ্চয়ই বলেছিলেন কিছু আমাদের; কিন্তু আমরা শুধু তাঁর ঠোঁট নাড়াটুকুই দেখেছি—কথা শুনতে পাইনি এক তিল। কানের ভেতরটায় ভোঁ-ভোঁ চলছিল তখন!

চলে গেলেন ভদ্রলোক।

আমাদের ক'টি বালকের অগাধ বিস্ময় আর অসীম শ্রদ্ধাকে অক্লেশে অবহেলায় প্যান্টের ডান পকেটে পুরে বাঁ-হাতে পাইপ ধরে টানতে টানতে ষ্টেজের এমন একটা ফাঁক দিয়ে অন্তর্ধান করলেন ভদ্রলোক,—যেদিকে ঢুকতে থিয়েটারের দ্বারোয়ান আমাদের দাঁত খিঁচিয়ে বারণ করে গিয়েছিল কিছুক্ষণ আগেই। শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে সেদিন আরো কতক্ষণ যে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম আমরা।

যথাদিনে আমাদের প্লের পর সেই সিংহনাদকারী হরিশ বাবু যখন আমার পিঠে চাপড় মেরে বললেন,—'তোমার পার্ট মন্দ হয়নি'—আমার সেই অপরিসীম সৌভাগ্যে বন্ধুরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল সবাই।

এ যেন ভুলোর বানান-ভুলে-বোঝাই কবিতার খাতা দেখে রবীন্দ্রনাথ বলছেন,—'বেশ লিখেছ।' রাস্তার গলিতে ন্যাবার ফুটবল খেলা দেখে গোষ্ঠ পাল বলছেন,—'ছেলেটার হবে।' প্যাকিং বাক্সের কাঠের তৈরী বিচিত্র ব্যাটে পেঁচোর ক্রিকেট খেলা দেখে ব্র্যাডম্যান পিঠ চাপড়ে বলছেন,—'প্রমিস আছে।'

অভাবনীয় অচিন্তিতপূর্ব কল্পনাতীত সেই সৌভাগ্যে সারা রাত ঘুমোতে পারিনি সেদিন আমি।

হরিশ বাবুর সঙ্গে দ্বিতীয় বার দেখা হয়েছিল সেই বছরেরই শেষ দিকে, রঙমহল থিয়েটারে। কাশী থেকে বড়দা' এসেছেন, তাঁর

সঙ্গে ভাইয়েরা সবাই গেছি 'ভটিনীর বিচার' দেখতে। জমাটি বই। দৃশ্যে দৃশ্যে জমে উঠছে নাটক। মুহুর্মুহু চমক। শেষ দৃশ্যে পৌঁছে গেছে তখন নাটক। বিচার হচ্ছে ভটিনীর। উন্মুখ হয়ে আছি বিচারের ফলাফলের জন্যে। রুদ্ধশ্বাস। ছুঁচটি পড়লে শব্দ শোনা যায় প্রেক্ষাগৃহে। এমন সময় এলেন নাটকের রহস্যময় পুরুষ ডাঃ ভোস,—'মিঃ লর্ড..'

সুরু করলেন ডাঃ ভোস তাঁর জবানবন্দী। নাটকের গুপ্ত-রহস্যের বদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করতে লাগলেন তিনি ধীরে ধীরে। আদালতকক্ষে উঠল গুঞ্জন।—এমন সময় ঢুকলেন কোর্ট-ইন্সপেক্টর।

ঢুকলেন তিনি। কাঁপলেন। নীরব।

ভেতর থেকে প্রম্পটারের গলা শোনা গেল: আঃ! করছেন কি? বলুন, বলুন,—"যদি গোলমাল করেন, তাহলে বেরিয়ে যান দয়া করে ঘর ছেড়ে"—বলুন—

কোর্ট-ইন্সপেক্টর কম্পিত ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁ চিঁ করে বলে উঠলেন: যদি গোলমাল না করেন, তাহলে—তাহলে—।

তারপরেই বেগে অন্তর্ধান।

হাস্যরোলে ভরে উঠল ঘর। সমস্ত দৃশ্যটা মাটি হয়ে গেল একেবারে। ছ্যা-ছ্যা করতে লাগল সবাই। বড়দা'র পার্শ্ববর্তী একটি দর্শক বড়দা'কে বললেন: প্রোগ্রামটা দেখুন তো দাদা, কে ঐ লোকটা? সমস্ত সীন্‌টাকে একেবারে মার্ডার করে দিলে ব্যাটা? মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না তো ষ্টেজে নামা কেন রে বাপু?

বড়দা' প্রোগ্রামের পাতা উল্টে অভিনেতার নাম খুঁজতে লাগলেন।

আমি কিন্তু অনেক আগেই জেনে ফেলেছি তাঁর নাম। চিনে ফেলেছি তাঁকে।—হরিশ বাবু!

কান্নায় তখন গলা বুজে গেছে আমার!

হরিশ বাবুর সঙ্গে তৃতীয় বার দেখা এই জুপিটার থিয়েটারে, আমার নাটকের উদ্বোধন দিবসে। তারপর থেকে দেখা হয় হামেসাই। আলাপ জমে ওঠে ধীরে ধীরে।

চেহারা অনেক বদলে গেছে, পোষাকটি কিন্তু বদলায়নি। সেই খাঁকি প্যাণ্ট আর হাফসার্ট। ছড়িটাও আছে। শুধু সেই পাইপটা নেই। তার বদলে আমদানী হয়েছে জার্মাণ-সিলভারের বই-ডিবেয় এক প্রকার মিহি মশলা। নস্যির মতো এক টিপ তুলে নিয়ে ফেলে দাও গলায়। ডালচিনি আর পিপারমিণ্ট ছাড়া আর কি কি চূর্ণ যে মেশানো আছে তাতে, বুঝতে পারা যাবে না ঠিক;—কিন্তু গলায় ভারী একটা আরাম পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক থিয়েটারের বাড়িতে প্রবেশ করলেই হাত পাতে সবাই। জার্মাণ-সিলভারের ডিবে শূন্যগর্ভ হতে পনেরো মিনিটও লাগে না।

থিয়েটারের সাবেকী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ফোটোর একটা অ্যাল্‌বাম আছে তাঁর কাছে। জীর্ণ অ্যাল্‌বাম। পোকায় ঝাঁঝরা করে দিয়েছে পাতা। নষ্ট করে দিয়েছে অনেক ছবি। তার কোনোটা ফোটোপ্রিণ্ট, কোনোটা বা কোন্ অধুনালুপ্ত সাময়িকপত্রের পাতা থেকে ছিঁড়ে-নেওয়া ছাপা-ছবি। কয়েকটি ছবিতে নিজেও আছেন। মাঝে একবার বাব্‌রি চুল রেখেছিলেন,—সেই অবস্থায় তালিমবালার সঙ্গে যে ফোটো তুলেছিলেন বটু বাঁড়ুজ্যেদের বাগান-বাড়ির পুকুরঘাটে, সেটার অধিকাংশই পোকায় কেটে দিয়েছে আজ বছর দশেক আগে। আক্ষেপটা কিন্তু আজও টাটকা রয়েছে!

নতুন কারুর সঙ্গে আলাপ হলেই প্রথমে বাড়িয়ে দেন ঐ জার্মাণ-সিলভারের ডিবে,—তার পরেই ঐ অ্যালবাম। আর তার পরেই হাফ সার্টের বুকপকেটে আলাদা কাগজের খামে রাখা তাঁর 'ভাবের অভিব্যক্তি'র ছন্দে হয়ে-যাওয়া অনেকগুলি ফোটোপ্রিণ্ট।

প্রত্যেকটা ছবির তলায় কোন্‌টা কোন্ ভাবের অভিব্যক্তি, তা' বড় বড় হরফে লেখা আছে। আছে বলেই রক্ষে! নইলে হাস্যকে ক্রন্দন, ক্রন্দনকে বিস্ময়, বিস্ময়কে প্রেম, এবং প্রেমকে জিঘাংসা বিষাদ হর্ষ ভীতি চিন্তা কিংবা যে কোন কিছুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতেই হত আমাকে নিঃসন্দেহে।

জুপিটার থিয়েটারে আমাদের তৃতীয়তম দেখা হওয়ার দিন সমস্ত কিছু দেখানো হয়ে যাবার পর হরিশ বাবু তাঁর শতছিন্ন মনিব্যাগের একান্ত গোপন এক খোপ থেকে অতি সন্তর্পণে ছোট্ট এক টুকরো ফোটো বের কোরে অত্যন্ত গর্বভরে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন: কার ছবি বলো তো?

ছবিটা দেখতে লাগল না এক মুহূর্তও। কিন্তু জবাবটা দিতে লাগল অনেকক্ষণ। অনেক ভেবেচিন্তে বললুম: এডলফ্ হিট্‌লার।

মুচকি হাসলেন হরিশ বাবু। অবিকল সেই পঁচিশ বছর আগে আমাদের ষ্টেজ-রিহার্সালের দিনের মতন গর্বমিশ্রিত হাসি। চেয়ারের হাতলে ছড়ির মাথাটা আলতো ঠুকতে ঠুকতে বললেন: ভাল করে ত্যাখো। ভাল করে ত্যাখো।

দেখবার দরকার ছিল না বিন্দুমাত্র। কিন্তু তবু অভিনিবেশ সহকারে দেখার ভাণ করতে হ'ল আমাকে, এবং আবার ভাবতে বসতে হল।

এবার বললুম: ও হো! এতক্ষণে চিনেছি;—চার্লি চ্যাপলিন।

ছড়ির হাণ্ডেলটা চেয়ারের হাতলে মাথা কুটতে লাগল এবার আরো জোরে জোরে। হরিশ বাবুর ঠোঁটের কোণের মৃদু হাসিটা ছড়িয়ে পড়ল এবার তাঁর মুখের সর্বত্র।

: ঠিক দেখেছ?

: আজ্ঞে হ্যাঁ।

: ঠিক?

: হুঁ।

: ভাল করে দেখেছ?

: হ্যাঁ।

: ফোটোটা আমার।

—বলেই দাঁড়িয়ে উঠলেন হরিশ বাবু। মুখে গর্বমিশ্রিত হাসি নয় এবার। হাসিমিশ্রিত গর্ব।

: আপনার? আপনি!

—অপার বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে আমার মুখে-চোখে।

: আমার নিজের হাতের মেক্-আপ।

: দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পা নাচাতে লাগলেন হরিশ বাবু।

: আশ্চর্য!

বাধ্য হয়ে আরো একবার তাকাতে হল ছবিটার দিকে। হ্যাঁ, হরিশ বাবুই। একেবারে এক লহমায় একটি বার মাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ

হবামাত্রই চেনা যায় যে, এ ছবি হরিশ বাবু ছাড়া আর কারুর নয়। প্রথম বার দৃষ্টিনিক্ষেপ করেই চিনেছিলুম তাঁকে। তাঁর নিজস্ব চোখ-কান-নাক-চুলের কোথাও পরিবর্তন নেই এতটুকু। নাকের ডগায় আঁচিলটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দৃশ্যমান। শুধু কালি দিয়ে ঠোঁটের ওপর মাছি-গোঁফ আঁকা হয়েছে একটা তেড়াবেঁকা কোরে। উটপাখীর বালিতে মাথা গোঁজার মতো, এতটুকু একটা মাছি-গোঁফ এঁকেই হরিশ বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস, নিজেকে তিনি বেমালুম লুকিয়ে ফেলে হিটলার কিংবা চার্লি হয়ে গেছেন!

হরিশ বাবুর সেই নিতান্তই হাস্যকর ছবিটির দিকে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার একবার বললুম: সত্যি আশ্চর্য! এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না!

ফোটোটা সযত্নে মনিব্যাগে গুঁজে হরিশ বাবু অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে আর একবার বাড়িয়ে দিলেন তাঁর সেই জার্মাণ-সিলভারের বই-ডিবে।

: নাও হে, গলাটা সাফ করে নাও।

সেই থেকে জমে উঠেছে আলাপ। মাঝে মাঝেই আসেন। বাইরে থেকে খান দুই-তিন সীন দেখে চলে আসেন সটান ষ্টেজের অন্দরমহলে। সকলের সামনেই ডাকেন: চৌধুরী!

এগিয়ে যাই।

: আজকে হয়েছে কি তোমার? শরীর খারাপ? ড্রপটা ঠিক মত নিতে পারলে না তো!—আরো একটু বাঁদিকে সরে দাঁড়িয়ে ফোকাসটাকে হাফ নেবার চেষ্টা করো দিকিন। আর, চড়াও, চড়াও, গলা আরো চড়াও।

একেবারে হাতেগড়া শিষ্যের কাছে গুরুর নির্দেশের মতো ভঙ্গি।

শিশির রাগ করে। বলে: আপনি যাই বলুন স্যার, ঐ বুড়ো কিছু বোঝে না অভিনয়ের। বলে কি না, ড্রপটা ঠিক মতো নিতে পারোনি! হুঁ:! পাঁচজনের সামনে মাতব্বরী দেখিয়ে গেল। আপনি কেন যে ওকে আস্কারা দেন বুঝি না!

কিন্তু এটুকু সম্মান ওঁকে না দিয়ে করি কী? যে মানুষটা শুধু থিয়েটারে ম্যানেজারী আর মাতব্বরী করার তীব্র বাসনায় সংসার থেকে, অর্থ থেকে, শিক্ষা থেকে হয়েছেন বঞ্চিত;—শৈশবে পেয়েছেন পিতামাতার তিরস্কার,—যৌবনে পেয়েছেন স্ত্রীর ঘৃণা, আত্মীয়-স্বজনের তাচ্ছিল্য,—প্রৌঢ়াবস্থায় পেয়েছেন পুত্রদের উপেক্ষা,—আজ তাঁর জীবনের এই সায়াহ্নবেলায় কী করে তাঁকে জানাই যে, তোমার ফোটো দেখে মোটেই হিটলার বা চার্লির সঙ্গে ভুল হয় না? কী করে বলি যে, অভিনয় সম্বন্ধে তোমার কোন নির্দেশই পালনীয় নয় বিন্দুমাত্র?

জীবনের আর সকল দিক থেকে বঞ্চিত এই বৃদ্ধটির পায়ের তলা থেকে তাঁর এই একমাত্র গর্বের জমিটুকুও কেড়ে নিলে তিনি দাঁড়াবেন কোথা?

পঞ্চাশৎ অভিনয়োৎসবের সুসজ্জিত দ্বারপথে কর্তাকর্তার মর্য্যাদায় ভেলভেটের চেরা-পর্দার নীচে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর আনন্দ থেকে এমন মানুষকে কি বঞ্চিত করতে আছে?

## ১৫

পঞ্চাশৎ অভিনয়োৎসব।

জুপিটার থিয়েটারে সুসজ্জিত দ্বারের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে গাড়ীর পর গাড়ী। নামছেন নিমন্ত্রিত নাট্যরসপিপাসুর দল। হরিশ বাবু মৃদু হেসে প্রত্যেকের হাতে তুলে দিচ্ছেন একটি করে রক্ত-গোলাপ। আর, হৃদয়রাম কোঙার তুলে দিচ্ছেন পঞ্চাশৎ অভিনয়-রজনীর রিবনবাঁধা সুদৃশ্য 'সুভেনির।'

নামলেন বিখ্যাত 'ছাঁওয়া মাচা' কাগজের ততোধিক বিখ্যাত মালিক-সম্পাদক শ্রীচাটনি। চুলে তেল থাকে না তাঁর, জামায় বোতাম থাকে না, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা থাকে, হাতে থাকে পেঙ্গুইন সিরিজের কোন একটা নামী ইংরিজি বই। মুখে-চোখে একটা দার্শনিক-দার্শনিক নির্লিপ্ত ভাব। পিতৃদত্ত নাম ছিল বিহারীলাল হাজরা। বদলে হয়েছেন শ্রীচাটনি। ওঁর কাগজে শুধু সিনেমা নয়, থিয়েটারেরও খবর থাকে। ছায়াচিত্রের সঙ্গে মঞ্চাভিনয়। ছায়া এবং মঞ্চ। তাই তো কাগজের নাম 'ছাঁওয়া-মাচা।' নিজের এবং কাগজের নামেই সম্পাদকের তীব্র আধুনিকতার পরিচয়। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে এমন অভিনেতা-অভিনেত্রী নেই যাঁর সঙ্গে পাশাপাশি ও ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে ছবি তোলেননি শ্রীচাটনি। বিশেষ কোরে অভিনেত্রী।

ষ্টুডিওর পথে হঠাৎ দেখা—শ্রীচাটনি ও ললিতা দেবী। 'ছাঁওয়া-মাচা'র নিজস্ব ক্যামেরাম্যান শিবেন দাঁ-এর ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে 'ক্লিক' করেছে।

অভিনেত্রী কোয়েলা গুপ্তা তাঁর সদ্যক্রীত গাড়ীর বনেটে বসে ভুট্টা খাচ্ছেন শ্রীচাটনির সঙ্গে ভাগাভাগি কোরে। ক্লিক্ কোরে উঠতে ভুল করেনি শিবেন দাঁ-এর রোলিকর্ড।

গৃহদেবতার পূজারতা ভক্তিমতী অভিনেত্রী কুমারী ভেলভেট বিশ্বাসের পাশে মুগ্ধদৃষ্টিতে করজোড়ে বসে আছেন শ্রীচাটনি। অমনি ক্লিক্ করেছে 'ছাঁওয়া-মাচা'র ক্যামেরা।

রাত্রিবাস পরিধান কোরে নিদ্রা যাবার পূর্ব মুহূর্তে এলায়িত-কুন্তলা যৌবনবতী জোনাকী সেন অভিনীতব্য চিত্রনাট্যের একটি বিশেষ নারীচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করছেন শ্রীচাটনির সঙ্গে। শিবেন দাঁ-এর ক্যামেরা মুহূর্ত বিলম্ব করেনি ছবি নিতে।

ভ্রাতা ও ভগিনী আছে শ্রীচাটনির সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। ছড়িয়ে আছে তারা মিতিজাম মন্দারহিলে, কটক কাঠমাণ্ডুতে, ক্যালকাটা কালিকটে, এবটাবাদ এলান্দিপুরমে, জনাই জব্বলপুরে, কাশ্মীরে কন্যাকুমারিকায়। ভগিনীরা ভাইফোঁটার দিনে রেজিষ্টার্ড খামে তাদের শ্রীচাটনিদা'কে পাঠায় শুকনো ফুলের পাপড়ি; ভ্রাতারা হোলির দিনে পাঠায় আবীর। ভগিনীরা চায় চঞ্চলকুমারদের ঠিকানা, ভ্রাতারা চায় চপলাকুমারীদের। আর, পড়ার ঘরের টেবিল থেকে ব্যাকরণকৌমুদী সরিয়ে 'ছাঁওয়া-মাচা'র বম্বেকলিং কিংবা মাদ্রাজ নিউজ বিভাগে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনের লোমহর্ষক সংবাদ এবং ছবি দেখতে দেখতে শ্রীচাটনিদা'র দুষ্প্রাপ্য সৌভাগ্যে কাঁটা দিয়ে ওঠে তাদের গায়ে।

'ছাঁওয়া-মাচা'র শ্রীচাটনির পর একে একে নামতে লাগলেন পাদপ্রদীপ, প্রতিসীরা, পর্দা, ছবি ও গান, চিত্রালী প্রভৃতি খুচরো সিনেমা-পত্রিকার বিখ্যাত সমালোচকের দল। সিনেমার নায়কদের চেয়েও সেজেছেন এঁরা। দল বেঁধে এঁরা দোতলার তিনখানা বক্স অধিকার করতে চলে যেতেই হৃদয়রাম কোঙার কানে কানে বললেন: আগামী মঙ্গলবার দিন দেখবেন ঐ সব কাগজগুলোয় আপনার নাটক সম্বন্ধে কী জোর সুখ্যাতি বেরোয়।

মিনিট দশেক বাদেই দোতলার তিনখানা বক্সের জন্যে এগারো প্লেট ডবল ডিমের মামলেট, আর এগারো কাপ কফি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

ট্যাক্সি থেকে নামলেন দুর্দান্ত পণ্ডিত ডাঃ দুর্গাগতি পাকড়াশী। যথারীতি অন্যমনস্কতা বশতঃ ট্যাক্সির ভাড়া না মিটিয়েই রক্তগোলাপ আর সুভেনির নিয়ে ঢুকে গেলেন ভিতরে। ভাড়ার টাকা এল জুপিটারের ক্যাশ থেকে।

দুর্গাগতি পাকড়াশী দুর্দ্ধর্ষ পণ্ডিত। গ্যাংটক মিউজিকের ওপর তিনি কবে বুঝি সুবৃহৎ বই লিখেছিলেন একখানা। ছাপা হয়েছিল উনপঞ্চাশ কপি। পাঠানো হয়েছিল ফ্রান্সের মঁসিয়ে ক, বৃটেনের কাউণ্ট খ, ম্যারিকার মিষ্টার গ, জার্মাণীর ভন্ ঘ,—ইরাণ-তুরান-জাপান-হল্যাণ্ড-রাশ্যা-চীন-স্পেন-পর্তুগালের ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, এঁদের কাছে। তাইতেই বিখ্যাত রাতারাতি। তার পর থেকে এই সুদীর্ঘ বত্রিশ বছরে আর গ্রন্থ লেখেননি একখানাও। লিখে চলেছেন শুধু সার্টিফিকেট।

—'মুগ্ধ হয়েছি ছবি দেখে।'

—'তুলির টানে বোল্ডনেস আছে।'

—'নাটকটি রসঘন।'

—'খেয়ালের তান-কর্তব অপূর্ব!'

—'নৃত্যলক্ষ্মীর বরমাল্য পড়ুক তোমার গলে।'

—'উপন্যাসের চরিত্রগুলো শুধু নিজেই ভাবেনি, পাঠককে ভাবিয়েছেও।'—ইত্যাদি

এতবড় একটা সর্বজ্ঞ ব্যক্তি হয়েও কী অমায়িক মানুষ!

নেবুতলা স্পোর্টিংয়ের টেনিসবল খেলার পারিতোষিক বিতরণ? ডাকো দুর্গাগতি পাকড়াশী মশাইকে। 'না'-টি পাবে না। ট্যাক্সির ভাড়াটি দিও, ফুলের মালাটি দিও, বড় পেটে ভাল খাবার-দাবার দিও; প্রাইজ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে গায়ে-কাঁটা-দেওয়া দীর্ঘ একখানি বক্তৃতা তিনি অম্লানবদনে বিতরণ করে যাবেন তোমাদের। জানতে পারবে তোমরা, স্পোর্টসের ভিতর দিয়ে কেমন করে পাওয়া যায় সেই ভূমাকে, যে-ভূমাকে ছাড়া সুখ নেই কোথাও। 'ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।'

গড়পারের উকীল-বাবুদের উঠোনে সতরঞ্চি বিছিয়ে সর্বভারত আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন কোরে সভাপতি খুঁজছো? ভাবনা কি? ডাঃ দুর্গাগতি পাকড়াশী আছেন। ট্যাক্সিভাড়া,—একথালা খাবার,—আর একটি ফুলের মালার বিনিময়ে তোমরাও পেতে পারো ভূমার আনন্দ।

'নাল্পে সুখমস্তি।'

বক্তৃতায় ভূমা ছাড়া আর কিছু বিলিয়ে সুখ নেই ডাঃ দুর্গাগতি পাকড়াশীর। হাডুডুডুর প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনই হোক আর ভারতনৃত্যের আসরই হোক, শেষ পর্যন্ত ভূমায় এসে পৌঁছবেনই ডাঃ পাকড়াশী। তাঁর বক্তৃতায় all reads lead to ভূমা।

যাবার আগে বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী কিছু দিয়ে যাবার জন্য কলম ধরেছেন আবার দীর্ঘকাল বাদে। বিরাট একটা রিসার্চ ওয়ার্ক সুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথের ওপর। রিসার্চের বিষয়,—রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'ট'।

সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলী তন্ন-তন্ন করে খুঁজে তিনি হিসেব করে চলেছেন কবির সকল রচনার মধ্যে কত কোটি কত লক্ষ কত হাজার 'ট' ব্যবহার করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই হিসেব শেষ হলে তিনি প্রমাণ করবেন যে, এই 'ট'-এর বিপুল ব্যবহারের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-মানসের একটি বিশেষ দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কবি-মানসের সেই বিশেষ দিকটি ঐ 'ট' অক্ষরের ব্যবহার ছাড়া প্রকাশ করা যেত না কিছুতেই।

ল-এ নয়, ব-এ নয়, ক-এ নয়,—নহে প-এ ম-এ। ট-এ শুধু আছে তার বিপুল ইঙ্গিত।

ট নামক অক্ষরটির মাথায় আছে প্রাচীন তর্কবাগীশদের মতো দীর্ঘ বাঁকা শিখা। ওটা যুক্তির তীক্ষ্ণতার প্রতীক। আর, ট-এর নিচের দিকে আছে মাছ-ধরার বঁড়শি। ওটা পাঠকের মনকে ভুলিয়ে গেঁথে তোলার আশ্চর্য শক্তির প্রতীক। সমগ্র রবীন্দ্র-রচনাবলীর মধ্যেও আছে এই দুই বস্তু। এক দিকে যুক্তির তীক্ষ্ণতায় তা' ভেদ করে সংস্কারের জটিল বাঁধন, আর এক দিকে ভাবার মাধুর্যে তা' গেঁথে যায় পাঠকের মর্মের মধ্যে। রবীন্দ্ররচনায় এই যে কোটি কোটি ট-এর ছড়াছড়ি,—এটা আকস্মিক নয়, অকারণ নয়, অহেতুক নয়। এর প্রয়োজন ছিল। এর বিশেষ একটি তাৎপর্য আছে। ত্রিংশ কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদে যেমন দেশজননীকে জাগিয়ে তুলেছে,—ত্রিংশ (কিংবা দ্বিত্রিংশ কিংবা হিসেব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কে জানে কত?) কোটি ট-এর টঙ্কারে তেমনি জেগে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী ভাবা।

ডাঃ দুর্গাগতি পাকড়াশী তাঁর এই যুগান্তকারী বিপুলায়তন গ্রন্থের ভিতর দিয়ে প্রমাণ ক'রে দিয়ে যাবেন,—ল-এ নয়, ব-এ নয়, ক-এ নয়,—নহে প-এ ম-এ। ট-এ শুধু আছে তার বিপুল ইঙ্গিত।

জুপিটার থিয়েটারের দোরে এসে নামলেন পণ্ডিত গঙ্গাধর সাংখ্যতীর্থ। মটকার বেনিয়ান গায়ে, পরনে বোম্বাই মিলের সুপারফাইন চকচকে ধুতি, পায়ে শান্তিনিকেতনী কারুকার্য-করা বিদ্যাসাগরী চটি। কোন বেসরকারী কলেজে মোটা মাইনেয় রঘুবংশম্-ভট্টিকাব্যম্ পড়ান। ঊর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষ যজমানী করে খেয়েছেন। দশকর্মের দোকানীদের তারা সাপ্লাই দিয়েছেন যজমানদের কাছ থেকে পাওয়া দানের বাসন, মধুপর্কের বাটি, গামছা আর আসন। যজমানবাড়ীর কাঁচকলা আর মটর ডাল খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে পণ্ডিতমশাইদের পরিবারের সকলের। ঘৃত সেবনে হয়েছে মেদবৃদ্ধি, কাটা ফল উদরসাৎ করে দূরীভূত হয়েছে কোষ্ঠ-কাঠিন্যের ক্ষীণতম আশঙ্কা!

গঙ্গাধর সাংখ্যতীর্থ পিতৃপুরুষের বৃত্তি পুরোপুরি গ্রহণ না করলেও বর্জনও করেননি সম্পূর্ণ। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কিংবা শিক্ষাবিভাগের কর্তাব্যক্তিদের বাড়ীর শ্রাদ্ধে বিবাহে-অন্নপ্রাশনে আজো শিখায় ফুল গুঁজে শালগ্রাম শিলা নিয়ে হাজিরা দেন। দক্ষিণা গ্রহণ করেন না। তার পরিবর্তে পদোন্নতিটাকে নিশ্চিত এবং ত্বরান্বিত করে তোলেন।

এই গঙ্গাধর সাংখ্যতীর্থদের বাদ দিয়ে সভা মানে শিবহীন যজ্ঞ। প্রতি সভায় এঁদের নিমন্ত্রণ। শহরের প্রতি সভা ডাকিছে তাঁহারে।

সভাপতি, প্রধান অতিথি, উদ্বোধকের পাশেই প্রথম সারিতেই

থাকে তাঁর আসন। ফুটফুটে কচি-কচি খুকীদের কাছ থেকে তিনিও লাভ করেন ফুলের মালা।

সকল পূজার আগে গণেশ-পূজা। সভার সকল কাজের আগে 'মঙ্গলাচরণ'। উনি সেই কাজের কাজী। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া বেসুরো কণ্ঠে সংস্কৃতে গান গেয়ে যান। পনেরো আনা লোক মানে বুঝতে পারে না তার। সেইখানেই ওঁর গর্ব। অশুদ্ধ উচ্চারণে নাতিদীর্ঘ স্তোত্রপাঠের শেষে থাকে তাঁর একটি বিশেষ উদ্ধৃতি প্রত্যেকটি সভাতেই,—'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।' ঐ 'ভবতু' পর্যন্ত বলেই বসে পড়েন চেয়ারে। বসে বসেই শুনতে পান উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর করধ্বনি।

এই 'অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু' করে করে নিজের কর্মজীবনের আরম্ভ থেকে মাঝখান অবধি দিব্যি চালিয়ে এসেছেন ভদ্রলোক। আশা রাখেন, এই ভাবে সকলের মন রেখে চলতে পারলে একদিন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করতে পারবেন।

সদলবলে নামলেন ব্রতীন সেন। শ্যামবর্ণ রোগা-হেন মানুষটি। ডানদিকের রগের চুলকে প্রচণ্ড অধ্যবসায়ে বাঁদিকের রগের চুলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ঢাকা দিয়েছেন মাথার টাক। অত্যন্ত কড়া দাড়ি, ক্ষুরের টানে দাড়ি গেলেও তার সবুজ আভাটি ছড়িয়ে থাকে তাঁর গণ্ডদেশ জুড়ে। প্রিয়তম দূরে চলে গেলে প্রিয়ার বক্ষ জুড়ে যেমন থাকে তার স্মৃতি!

সুবিখ্যাত গায়ক ইনি। খেয়াল নয়, ঠুংরী নয়,—নয় ধ্রুপদ, ধামার, গজল, গীত। কীর্তন-রামপ্রসাদী, বাউল-ভাটিয়ালী, আধুনিক-রবীন্দ্রসঙ্গীত, কিছুই গান না তিনি। শুধু গান করেন উদ্বোধন সঙ্গীত। অর্থাৎ ইন্দ্র-চন্দ্র দুর্গা-কালী শিব-কেষ্ট সকলকে বাদ দিয়ে ব্রহ্ম সার করেছেন।—'উদ্বোধন সঙ্গীত হি কেবলম্!'

বড় বড় সভায় তিনি আছেনই আছেন তাঁর এলোচুল-ছাত্রী এবং ফাঁপা-চুল ছাত্র-পরিবৃত হয়ে। সভার প্রারম্ভে কাঠের টেবিলে হারমোনিয়ম রেখে দাঁড়িয়ে আছেই আছে তাঁর 'জনগণমন' কিংবা 'সুজলাং সুফলাং'। শেষোক্ত গানটির বন্দে-র 'এ' এবং 'মাতরম্'-এর 'মা'এর ওপর তাঁর দীর্ঘক্ষণব্যাপী স্বরতরঙ্গ বিক্ষেপ শ্রোতাদের ধৈর্যতরণীকে বানচাল করতে অদ্বিতীয়!

আঠারোখানি রক্তগোলাপ এবং আঠারোখানি আর্টপেপারের চক্‌চকে সুভেনির নিয়ে সদলবলে ঢুকে গেলেন ব্রতীন সেন জুপিটার থিয়েটারের প্রবেশপথ দিয়ে।

তিন ফুট রোড ক্লিয়ারেন্স-ওয়ালা হুড দেওয়া মস্ত ফোর্ডগাড়ী থেকে চুনুটকরা ইস্কিপাড় ধুতির কোঁচা হাতে নিয়ে নামলেন স্থুলকায় ধনীর দল, পিছনে নিয়ে চেক-কাটা শান্তিপুরী সাবেকী শাড়ি-পরা ততোধিক স্থুলকায়া গৃহিণীদের। রিক্সার পর্দা সরিয়ে নামলেন সদ্য ম্যাট্রিক পাশ কোরে কলেজে-ঢোকা দেবর লক্ষ্মণ সঙ্গে নিয়ে মাতৃসমা বৌদিদিকে। বাস থেকে নামলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা সঙ্গে নিয়ে নাট্যরসপিপাসা।

কিন্তু এঁদের সকলের ভিড়ের ফাঁকে কখন যে নেমেছিলেন বাণী থিয়েটারের ভাড়া-করা বধিরের দল, কেউই টের পায়নি তা'। টের পাওয়া গেল নাটক সুরু হওয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ষ্টেজের ড্রপ উঠতেই দেখা গেল, কোন্ বাদ্‌শার হারেমে সারিবন্দী চেয়ারে বসে আছেন গণ্যমান্যের দল। বসে আছেন সভাপতি ডাঃ দুর্গাগতি পাকড়াশী, প্রধান অতিথি শ্রীক্ষেত্রচরণ গড়গড়ি এম-এল-এ। বসে আছেন পণ্ডিত গঙ্গাধর সাংখ্যতীর্থ, 'ছাঁওয়া-মাচার' শ্রীচাটনি। বসে আছেন হৃদয়রাম কোভার, ব্রতীন সেন, হরিশ গাঙ্গুলী এবং আরো কেউ কেউ।

ব্রতীন সেনের উদ্বোধন সঙ্গীত দাঁড় করিয়ে রাখলে সকলকে পুরো আধটি ঘণ্টা ধরে। সে শাস্তি শেষ হবার পর মুহূর্তেই পণ্ডিত গঙ্গাধর তাঁর বেসুরো সংস্কৃতর চন্দ্রবিন্দু আর বিসর্গ ছুঁড়ে মারলেন দর্শকদের মিনিট পনেরো। তিনি যদি থামলেন তো সুরু হল ক্ষেত্রচরণ গড়গড়ির ভবিষ্যৎ-ইলেকশনের ক্ষেত্র প্রস্তুত। ক্ষেত্রচরণের বক্তৃতার ষ্টীমরোলার দর্শকের ধৈর্যকে যখন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে প্লেন করে দিয়ে বিদায় নিলে, তখন ভূমার পিচ ছড়াতে লাগলেন ডাঃ দুর্গাগতি পাকড়াশী। সবশেষে হৃদয়রাম কোভার সেই পিচের উপর তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বালি ছড়িয়ে দিয়ে রাস্তা খুলে দিলেন, এবং তার পরেই সুরু হয়ে গেল নাটক। সুরু হতেই টের পাওয়া গেল, আমাদের সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে হল্-এর মধ্যে কখন ঢুকে গেছেন একদল ভাড়াটে বধির।

প্রথম দৃশ্যটা সবে তখন পৌঁছেছে মাঝপথে। এক্‌সেনট্রিক জমিদারের ভূমিকায় বৃদ্ধ সদানন্দ বাগচী সবেমাত্র জমিয়ে তুলছেন অভিনয়, এমন সময় দর্শকদের পিছনের সারি থেকে চীৎকার ভেসে এল,—

: লাউডার।

পাঁচ মিনিট পর আবার আর এক কোণ থেকে,—

: একটু জোরে দাদা!

দশ মিনিট পরে আবার,—

: গলায় ছিঁচকে দাও বাবা,—তামাকের গুল্ জমেছে।

আচম্‌কা আবার হুঙ্কার,—

: লাউডার। শুনতে পাচ্ছি না।

আবার,—

: দাদারা কি সাবু খেয়ে এসেছ?

এই রকম বার ছয়েক হবার পর বেশ টের পাওয়া গেল যে, এরা নির্ঘাৎ ভাড়া-করা বধিরের দল; এবং হৃদয়রাম কোভারের স্থির বিশ্বাস, উক্ত বধিরের দলকে ভাড়ার টাকা দিয়েছে,—'ঐ শালা বাণী থিয়েটারের পান্নু আড্ডি। আমাদের নাটক শালার নাটকের সেল নামিয়ে দিয়েছে কি না, তাই ব্যাটার গায়ের জ্বালা ধরেছে।'

ক্রমেই বিরক্তিটা বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণ বেশ চুপচাপ থাকে, তারপর মোক্ষম জায়গাতেই তাগ্ বুঝে চিৎকার করে ওঠে বাণী থিয়েটারের ভাড়া-করা বধিরের দল,—

: লাউডার। লাউডার।

ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন শেষ পর্যন্ত কুমুদ বাবু। কুমুদ বাবু এ-নাটকের সেকেণ্ড হিরো। অভিনয় করতে করতে হঠাৎ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠলেন,—ননসেন্স! তার পর ষ্টেজ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন গট-গট করে।

তাড়াতাড়ি ড্রপ পড়ে গেল। হল-এর আলো উঠল জ্বলে। পাঁচ মিনিট বাদেই হৃদয়রাম কোভার হাসিমুখে সংবাদ আনলেন,—বাণী

থিয়েটারের ভাড়া-করা যে মানুষগুলি 'কর্ণে ন বধিরঃ' ছিল এতক্ষণ, দর্শকরা তাদের প্রত্যেককে 'পাদে ন খঞ্জঃ' করে দিয়ে গেটের বাইরে রেখে এসেছে। এইবার নাটক চলবে সুখ্যতি।

সকলেই সুখ্যাতি করতে লাগলেন কুমুদ বাবুর। ভাগ্যিস তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন অমনি, তাই তো পাজীগুলোকে ঠেঙিয়ে বিদেয় করে দিলে লোকেরা। নইলে—

সুখ্যাতি করলেন না শুধু একজন।

অভিনয় শেষ করে সাজঘরে বসে মুখের রঙ তুলছি, ঢুকলেন বেনোয়ারীলাল দত্ত।

: তোমাদের কাছ থেকে ওটা আমি আশা করিনি ডাক্তার!

: কোন্‌টা?

: ঐ ননসেন্স বলে ষ্টেজ ছেড়ে চলে যাওয়াটা।

: কিন্তু—

: না, না ডাক্তার। তোমরা সব শিক্ষিত, রসিক। তোমাদের কাছ থেকে অন্তত আরো বড় কিছু আশা করেছিলুম। দুষ্ট দর্শকের দুষ্টমী ঘোচানোর ঐ কি রসিকের দাওয়াই? আমাদের সেই সেকালে মুস্তফী সাহেব দিতেন এই সব দুষ্ট দর্শকদের মোক্ষম দাওয়াই। সে দাওয়াই যেমন তেঁতো ঠিক তেমনি মিষ্টি।

: যথা?

: মনে পড়ছে না ঠিক নাটকের নামটা। একদল পাজী লোক এসে খুব জ্বালাচ্ছে অভিনেতাদের। ভ্যাঙচাচ্ছে, বেজায়গায় হাততালি দিচ্ছে, সিটি বাজাচ্ছে। মুস্তফী সাহেব একটা সিন্-এ প্লে করে উইংস দিয়ে এক্সিট নিচ্ছেন, এমন সময় ঐ দুষ্ট দর্শকদের একজন দুষ্টমী করে নাকে পায়রার পালক ঢুকিয়ে হ্যাঁচ্চো করে বিকট হেঁচে দিল এবং আর একজন চিংকার করে উঠল,—'যেও না, যেও না, হাঁচি পড়েছে।'

সারা হল্-এ হাসির রোল উঠল। মুস্তফী সাহেবের কো-অ্যাক্ট্রেস তো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছেন। মুস্তফী সাহেব কিন্তু ভয়ও পেলেন না, রেগেও উঠলেন না। ননসেন্সও বললেন না তোমাদের মতো। হাসিমুখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় কো-অ্যাক্ট্রেসের দিকে চেয়ে বললেন,—'ও কিছু নয় গো। ও গো-হাঁচি। গোরুর নাকে খড় আটকেছে। ওতে বাধা হয় না।' বলেই গট-গট করে বেরিয়ে গেলেন। হেসে উঠল সবাই। দুষ্ট লোকটির মুখ একেবারে চুণ।

আর একবার। এ-নাটকের নামটাও ভুলে গেছি এখন। মুস্তফী সাহেব বুঝি বাড়ীর কর্তা না কি সেজেছেন। কোন্ একটা দৃশ্যে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে করতে ডাকছেন ভৃত্যকে,—'হরে!' হরের দেরী হচ্ছে আসতে নাটকেরই তাই নির্দেশ। হরে দেরী করবে আসতে, আর গৃহকর্তা উত্তেজিত হয়ে চেঁচাবেন,—হরে, হরে, হরে!

যথারীতি চেঁচাচ্ছেন মুস্তফী সাহেব,—'হরে, হরে, হরে!' এমন সময় গ্যালারী থেকে এক দুষ্ট দর্শক অভিনেতাকে জব্দ করবার জন্তে ভাঙ্গা গলায় রঙ্গ করে চেঁচিয়ে উঠল,—'এজ্ঞে যাই কত্তা!'

এতটুকু চটলেন না অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে সেই দর্শকের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলেন,—'ওরে ব্যাটা, তুই ওখানে ঐ ভদ্দরলোক বাবুদের সঙ্গে বসে আছিস হতভাগা! আর আমি ডেকে ডেকে মরছি। উঠে আয়, উঠে আয় হতচ্ছাড়া!'—বাচাল দর্শকের একেবারে ঘাড়টি হেঁট।

আর একবারের কথা মনে আছে। পালার নাম আবুহোসেন। গিরিশ বাবুর লেখা। মিনার্ভা থিয়েটারে প্লে হচ্ছে। আবুহোসেন সেজেছেন মুস্তফী সাহেব। ঐ যে যে-দৃশ্যে বাদশার রক্ষীরা আবুহোসেনকে বেঁধে পাগলাগারদে নিয়ে যায়, সেই দৃশ্যে আবুর মা যেই না 'ও বাপ রে,—আমার কি হল রে।' করে কাঁদতে সুরু করেছে, অমনি একদল বদমাইস দর্শক গণ্ডগোল করবার জন্তে আবুর মাকে ভেঙচে সমস্বরে এমন কাঁদতে সুরু করে দিলে যে, প্লে করা দায়।

যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন মুস্তফী সাহেব। আবুর জননীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—'মা, আর কাঁদিস নে, তোর দুঃখে ঐ ভাখ ওখানে শেয়াল-কুকুরেও কাঁদছে।'

এর পর সারা নাটকে শেয়াল-কুকুররা আর একবারও হুক্কা হুয়াও করেনি, ঘেউ-ঘেউও করেনি। সারাক্ষণ লজ্জায় আর অপমানে মুখটি বুজে বসেছিল।

মিঃ ফুট-এর নাম হয় তো তোমরা শোননি ডাক্তার! গ্যারিকের সমসাময়িক খুব রসিক অভিনেতা ছিলেন তিনি ওদেশের। বুড়ো বয়সে তাঁর একটু পায়ের দোষ হয়েছিল। একটু খুঁড়িয়ে চলতে হত। একদিন অভিনয় করছেন,—বিরুদ্ধপক্ষের একদল ভাড়াটে লোক তাঁর ঐ খোঁড়া পা নিয়ে তাঁকে ইতরের মত ভ্যাংচাতে লাগল ক্রমাগত। ফুট সাহেব মৃদু হেসে বললেন,—'Make no allusion to my weakest part, did I ever attack your head?'

ইতরগুলো আর ভ্যাংচাতে সাহস করেনি।

তোমাদের মতো শিক্ষিত ইয়ংম্যানদের কাছেও আমি ঐরকম কিছু একটা রসালো জবাব আশা করেছিলুম ডাক্তার! তোমরাও যে আর পাঁচজনের মত রেগে 'ননসেন্স' বলে ষ্টেজ ছেড়ে চলে যাবে,—এটা ভাবিনি।

থামলেন বেনোয়ারীলাল দত্ত।

আমি নীরবে মেক্-আপ তুলতে লাগলুম।

[ ক্রমশঃ।

Work is love made visible. And if you cannot work with love but with only distaste, it is better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms of those who work with joy.

—*Kahlil Gibran*

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৮ সালের এক সন্ধ্যায় এসপ্লানেডে ডেকার্স লেনের মোড়ের কাছে রাস্তায় বিরাট ভিড় জমেছে—উদ্বাস্তু সত্যাগ্রহ, মহিলাদের পালা। রাজ্যপালের বাড়ীর গেটের সামনে অনেকগুলো খালি বাস দাঁড়িয়ে আছে,—তার সামনে পুলিশের ব্যারিকেড,—তারপর উদ্বাস্তু মহিলা-সত্যাগ্রহীর দল, অনেকের কোলে শিশুও আছে—অনেকখানি রাস্তা জুড়ে বসে বিচিত্র স্বরগ্রাম-সমন্বিত কলকাকলিতে নিযুক্ত।

"আগো সাতটা বাইজ্জা গেল যে—কত রাইত করবা?" হঠাৎ নেতারা পুলিশদের জানিয়ে দিলেন, এইবার তাঁরা প্রস্তুত। মেয়েরা উঠে দাঁড়ালো। পুলিশদল দুদিকে সরে একটু রাস্তা করে দিলে। মেয়ের দল ব্যারিকেড ভেদ করে গিয়ে বাসে উঠতে লাগলো,—এবং আগে উঠে বসবার জায়গা দখল করার জন্যে বেশ হুড়োহুড়িও চলতে লাগলো—সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটু খেঁচাখেঁচিও।

এক বাসের মধ্যে থেকে শোনা গেল,—"আগো, তুমি ক্যান আইলা? তোমার ত্যান কাইল আহনের কথা।"

কাজেই সার্জেন্টকে ডেকে বলা হল, আমারে লামাইয়া দেন, আমি কাইল আহুম। সার্জেন্ট অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে তাঁকে বাস থেকে নামিয়ে দিলে। তিনি ব্যারিকেডের এপারে চলে এলেন।

এই হল রাজনৈতিক সংগ্রামে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারের এক সর্বাধুনিক চিত্র। একটা মামুলী নিরীহ আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র।

১৯২১ সালের শেষ দিকে আইন অমান্য করে কংগ্রেসীসভা করা উপলক্ষে আর এক রকমের গ্রেপ্তার চলতো। কলেজ স্কোয়ারে সভা ঘোষণা করা হয়েছে। পুলিশ স্কোয়ার থেকে লোক বার করে দিয়ে আগে থেকেই ফটক বন্ধ করে পাহারা বসিয়ে দিয়েছে চারি দিকে এবং কলেজ ষ্ট্রীটে একলরী পুলিশ ও প্রিজন-ভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করছে।

হঠাৎ নির্দিষ্ট সময়ে চারি দিক দিয়ে রেলিং টপকে কতকগুলো লোক স্কোয়ারের মধ্যে ঢুকে পড়লো, এবং একজন এক বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করে দিলে,—চারি দিকে ঘিরে দাঁড়ালো একটা ছোট ভিড়। তারপর হঠাৎ লরী থেকে পুলিশের দল নেমে এসে স্কোয়ারে ঢুকে সভার ভিড়টাকে ঘিরে ফেললে, এবং তাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে প্রিজন-ভ্যানে তুললে। গ্রেপ্তার হওয়াই প্ল্যান, কাজেই গ্রেপ্তারে রোমাঞ্চ নেই!

একটু রোমাঞ্চ প্রত্যাশী চালাক দু-চার জন ঠিক সময়ে একটু সরে গিয়ে পুলিশ কর্ডনের বাইরে দাঁড়াতো,—প্রথম প্রথম পুলিশ তাদের গ্রাহ্য করতো না। ক্রমে তারা যখন তেড়ে ধরা সুরু করলে, তখন চোঁচা দৌড় মেরে রেলিং টপকে পালানো হল আর এক রোমাঞ্চ।

আমি থাকতুম এই চালাকের দলে। আর দুজন তরুণ বিপ্লবী—অতুল রায় (বর্তমানে আলিপুরের উকীল) আর কানাই দাস (ভূতপূর্ব কংগ্রেসী এম এল এ) একদিন আমার সঙ্গে ছিল। রেলিং টপকে পালাতে গিয়ে আমার কাপড় খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গিয়েছিল বলে কানাই দাস আজও দেখা হলে খোঁটা দেয়।

কিন্তু বিপ্লবের গোপন আয়োজনে যারা গা-ঢাকা দিয়ে ঘোরে,—ডাকাতী, গোয়েন্দা খুন,—বোমা-পিস্তলের জোরে ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারত স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত,—ধরা পড়লে যাদের প্রথমে একচোট ছ্যাঁচা, এবং তারপরে জেল-দ্বীপান্তর ফাঁসি, কার ভাগ্যে কি ঘটবে, কিছুই জানা নেই,—তাদের যখন পুলিশের সঙ্গে প্রথম মোকাবিলা হয়,—তার রোমাঞ্চটাকে লোমহর্ষকও বলা চলে।

পুলিশের সঙ্গে আমার এমনি প্রথম পরিচয় হয়েছিল,—ইংরেজ রাজত্বে বৃটিশ পুলিশের হাতে নয়, ফরাসী রাজ্যে ফরাসী পুলিশের হাতে। ভয় নেই—যতটা ভাবছেন, ততটা কিছু নয়—আমি ফরাসী চন্দননগরের কথা বলছি। কিন্তু আমি তুচ্ছ হলেও চন্দননগর তুচ্ছ ভাববেন না। ১৯১৫-১৬ সালের চন্দননগর ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অভিনয় করেছে। শহীদ কানাইলালের গৌরবময় পবিত্র স্মৃতিমণ্ডিত চন্দননগর!

১৯১৬ সালের মার্চ মাসে একদিন উপর থেকে নির্দেশ এল, কিছু দিন বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে থাকতে হবে। প্রাথমিক উপদেশও পেলুম। আমরা কাজ করতুম সতীশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে, যিনি তখন ফেরার। ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র ছাড়াও তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ—তিনি কলকাতা এবং আশ-পাশের সকল রাজনৈতিক খুন ও ডাকাতির সঙ্গে জড়িত।

উপদেশ মত বেলা দশটার সময় হেদুয়ার পশ্চিম ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। দু-এক মিনিট পরেই একজন ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কামারহাটি যেতে হলে কোথা দিয়ে যাওয়া সহজ, বলতে পারেন? আমি বললুম, সেখানে আপনার বিজ্‌নেসটা কি? তিনি নমস্কার করে বললেন, আসুন। চললুম তাঁর সঙ্গে। "কামারহাটি" আর "বিজ্‌নেস"—এই দুটো শব্দ ছিল কোড। আমার কোন চেনা লোক কিছু জানলো না।

যে রকম কার্যকলাপে গুপ্ত সমিতি লিপ্ত, তাতে আত্মগোপন এবং মন্ত্রগুপ্তি,' এই দুটো নীতি ছিল অবশ্য পালনীয় সকলের পক্ষেই। কোন কার্যসূত্রে যার সঙ্গে যার মুখ-চেনা হয়, তা ছাড়া কেউ কাউকে জানবে না, মুখচেনার পরও কেউ কারো নাম-ঠিকানা জানতে চাইবে না, এই সব ছিল অলঙ্ঘ্য বিধি। পরে কংগ্রেসী আমলে পরিচয় হল, ভদ্রলোক সমলার অমরকৃষ্ণ ঘোষ—ফেরারী নেতা অতুল ঘোষের ছোট ভাই।

যাই হোক, তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন এক মেসে, এক ক্ষিতীশ বাবুর কাছে, এবং বিকালে ক্ষিতীশ বাবু আমাকে নিয়ে হাওড়ায় ট্রেণে উঠলেন। সন্ধ্যার সময়ে দুজনে নামলুম চন্দননগরে। তার পরে সোজা পূবমুখো বড় রাস্তা ধরে গঞ্জের বাজারে একটা বড় গোলদারী দোকানে কিছু কথা কয়ে ক্ষিতীশ বাবু আমাকে এক বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে, বাড়ীর একমাত্র বাসিন্দা এক দাদার হাতে দিয়ে চলে গেলেন। দাদা তখন ডন-বৈঠক করে ঘেমে উঠেছেন।

দাদার বেশ মোটাসোটা ভীষণ জোয়ান শরীর, বয়স আমার চেয়ে আমাক্তই বেশী, দু'বেলা বহুক্ষণ এক্সারসাইজ করেন—কিছুই জানি না, ক তিনি। ঘরটা প্রায় খালিই, দু-একটা মাদুর-বালিস-হ্যারিকেন মাত্র সম্বল। রাত্রে বোধ হয় দুধ-গুড় দিয়ে যবের ছাতুই খাওয়া হল।

মানুষ জীবনে কত কথাই না শোনে, কিন্তু এক-একটা কথা যেন মনের মধ্যে গভীর ভাবে কেটে বসে যায়। সহস্র কথা যখন বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে যায়, তখন সেই কথাটা যেন নতুন আকাশপ্রদীপের মত সব স্মৃতির ওপরে জ্বল-জ্বল করে জ্বলতে থাকে। প্রথম দিনই দাদার মুখে এমনি একটা কথা শুনেছিলুম—সারা জীবন ধরে সহস্র বার যে কথাটা মনে হয়েছে—"যে কাজে নেমেছ, সেটা তোমার নিজের কাজ, এটা সর্বদা মনে রেখো। সকলে এপথ ছাড়লেও, আমি ছাড়লেও—তুমি ছেড়ো না—কারো মুখ না চেয়ে নিজের কাজ করে যেও।"

তার পরদিন সে বাড়ী ছেড়ে অনেকখানি হেঁটে সকালবেলাই গিয়ে উঠলুম হলদেডাঙ্গার এক প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে একটা বড় দোতলা পাড়ো বাড়ীতে। সে অঞ্চলটায় শুধু বড় বড় বাগান,—মাঝে মাঝে এক-আধটা বাড়ী,—অনেকখানি তফাতে তফাতে দু'-চার ঘর গরীব লোকের বাস। সদর গলিটা থেকে একটা ভাঙ্গা ক্যালভার্ট পার হয়ে প্রথমে ঢুকলুম এক বাগানে, তারপর একটা পুকুর এবং বাঁশবাগান ঘুরে আর একটা বড় পুকুর। তারই অপর পারে একটা প্রকাণ্ড বান-বাঁধানো ঘাট—একটু ফেটে-ফুটে গেছে—ঘাটের দুপাশে বেশ বড় রোকো। তারপর এক প্রকাণ্ড গাড়ীবারান্দার নীচে দিয়ে ঢুকতে হয় বাড়ীর একটা বড় হলঘরে। তার ওদিকেও গাড়ীবারান্দা।

সে হলঘরের মেঝের সিমেন্ট উঠে গেছে, এক দিকে ভাঙাচোরা উপ্-টোকনার রাশি, আর এক দিকে একটু জায়গা মাটি দিয়ে লেপে এক উনুন বানান হয়েছে, এবং আর এক কোণে শুকনো ডালপালার ঢাঁড়ি। সে ঘরে এক উড়ে মালী থাকে এবং রাত্রে রেঁধে খায়। সকালে পান্তা খেয়ে সহরে কাজ করতে যায়—গাই-দোহানো প্রভৃতি ঠিকে কাজ।

সে ঘর থেকে ভেতরের উঠোনে পড়ে পাশের দিকের সিঁড়ি দিয়ে উঠলে আগে ছাদ, তারপর প্রকাণ্ড হলঘর, এবং তারপর বাইরের গাড়ীবারান্দার ছাদ—সামনে পুকুরঘাট। উপরের ঐ অংশটুকু বেশ ভালই আছে, সিঁড়ির পর থেকে বাড়ীর পিছনের অংশটার ভিত খানিক নেমে গেছে,—ফলে দোতলার ছাদ ফেটে আধ হাত ফাঁক হয়ে গেছে।

বাড়ীটা মানকুণ্ডুর খাঁ বাবুদের। এক যোগেশ ভট্টাচার্য বাড়ীটা ভাড়া করেছেন—এক অনিল বসু পরিবার নিয়ে থাকবেন বলে—নায়েব আগাম টাকা নিয়ে রসিদ দিয়েছেন, সেটা আমার কাছে থাকলো। আমি তৃতীয় ব্যক্তি বাড়ীতে থাকবো,—দাদা শুধু দিনের বেলায় থাকবেন—রাত্রে অন্যত্র—রাত্রে আমি একা।

তার আগে পর্যন্ত আমার ভূতের ভয়ে গা ছমছম করার অভ্যাস ছিল—বিশেষতঃ সরু সিঁড়িপথের তিনটে বাঁক পার হয়ে ওপরে উঠতে যেন দম আটকে আসে—কিন্তু সবই যেন বেমালুম সহজ হয়ে গেল। আমার 'কাজ হল, সারা সহরে কোথায় কোন বাড়ী বা ঘর খালি আছে, হবু ভাড়াটেরূপে তার সন্ধান করে বেড়ানো আর মাঝে মাঝে জগদ্দল কাঁকনাড়া এবং গোঁদলপাড়ায় জুটমিলে চাকরীর সন্ধান করা।

হলঘরের আসবাবের মধ্যে খান দুই মাদুর, কয়েকটা পাতলা বালিশ, দুটো হ্যারিকেন, একটা ষ্টোভ, দড়িতে ঝোলানো দু'-একটা কম্বল-চাদর, আর দেওয়ালের গায়ে পেরেকে আটকানো এক তিজেল হাঁড়ি—চন্দননগরের হাঁড়ি। দেওয়ালের গা-আলমারির এক তাকে আছে ছোট আয়না-চিরুণী, ক্ষুর সাবান—আর এক তাকে দু'-একটা পেটেণ্ট ওষুধের প্যাকেট বোতল, কিছু "উদ্বোধন" মাসিকপত্র, কিছু খবরের কাগজ—আর এক তাকে কয়েকটা ঠোঙ্গায় কিছু চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, ডিম, যবের ছাতু, চিনি প্রভৃতি এবং দু'-একটা বাটি গেলাস অ্যালুমিনিয়ম বা এনামেলের। এক কোণে জলের কুঁজো, বালতি,—এবং চিরপরিচিত অপরিহার্য মগ।

বাগানের পরে ছোট্ট এক কুমোরপাড়া, সেখানে থাকে দুর্লভ ঘোষ, মালি তাকে বলে এল, সে একটু দুধ দিয়ে গেল। ষ্টোভ জ্বেলে দুধটা অ্যালুমিনিয়মের বাটিতে জাল দিয়ে তুলে রাখা হল তাকের ওপর, রাতের জন্যে। তিজেল হাঁড়িতে খিচুড়ী পাক করা হল, এবং মেঝেয় হাঁড়ি নামিয়ে দুদিকে দুজনে বসে বাঁ হাত দিয়ে হাঁড়ির কানা চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে হাঁড়ি থেকে গরম খিচুড়ী হাপুস-হুপুস করে খেয়ে ফেলে হাঁড়িটা ধুয়ে আবার দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো হল। রাত্রে যবের ছাতু দুধ দিয়ে মেখে খাওয়া হল, এবং দাদা চলে গেলেন।

বাগান থেকে সদর গলিতে বেরিয়ে উত্তর-পশ্চিমে দু'-একটা গলি ঘুরে গড়ের ধারে পড়া যায়, এবং গড়ের জঙ্গলের মাঝের একটা সুঁড়িপথ দিয়ে ওপারে গিয়ে একখানা বড় ক্ষেতজমি পার হলেই চুঁচুড়া ষ্টেশনের কাছে পৌঁছানো যায়। কলকাতা থেকে সটান হলদেডাঙ্গায় আসতে হলে চুঁচুড়া ষ্টেশন দিয়েই আসা হত।

গঞ্জের গোলদারী দোকানটা ছিল খবরাখবর আদান-প্রদানের ঘাঁটী। একদিন ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে গেছে, আমি দোকানে গিয়ে বললুম, রাতে কোথাও থাকার ব্যবস্থা করতে। তাঁরা আমাকে নিয়ে গেলেন বোড়াইচণ্ডীতলায় শ্রীমতিলাল রায়ের বাড়ীতে আর এক ফেরারী আসামীর কাছে। তিনি হচ্ছেন মন্মথ বিশ্বাস,—পরবর্তী কালের আত্মশক্তি লাইব্রেরীর মোটাদা'।

কিছু কথাবার্তার পর তাঁর খানা এল মতি বাবুর বাড়ী থেকেই, খান কয়েক রুটী এবং খানিকটা ডুমুরের তরকারি—নির্ভেজাল ডুমুর। বাড়ীর বাইরে গলিতে আসতে ডুমুরগাছ দেখেছিলুম, মনে হল। সেই খানা দুজনে ভাগ করে খেয়ে শুয়ে পড়লুম। বাইরের দিকে একক ঘর, বাড়ীর কেউ জানতেই পারলো না।

উত্তরবঙ্গের—বোধ হয় অনুশীলন পার্টির এক ফেরারী নেতা

নিকুঞ্জ করও তখন চন্দননগরে ছিলেন। গঞ্জের দক্ষিণদিকে খানিকটা গিয়ে রাস্তা যেখানে গঙ্গার এক প্রকাণ্ড ঘাটের কাছে শেষ হয়েছে এবং ঘাটের অপর দিকে ট্রাও সুরু হয়েছে,—সেই ঘাটের কাছে রাস্তার শেষে একখানা ছোট সাইকেল-পার্টসের দোকান সাজিয়ে নিকুঞ্জ বাবু থাকতেন।

একদিন সন্ধ্যার পর মোটাদা'র কাছে গিয়েছি, দেখি যে মতি বাবুর বড় বৈঠকখানায় অনেক লোক বসে আছেন, আর মতি বাবু লেকচার দিচ্ছেন—ব্রাহ্ম উপাসনার মতন শান্ত, ধীর, অনুচ্চ স্বরে। মোটাদা'র কাছে শুনলুম, ওরা বাঙ্গালী পল্টনে যাচ্ছে কাল, আজ তাই মতিবাবু ওদের উপদেশ ও আশীর্বাদ দিচ্ছেন। সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে অনেক কল্পনা করেছিলুম। আমাদের তখন একরকম ভাঙ্গাহাট—জার্মাণ ষড় যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে,—বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্ল্যান বানচাল হয়ে গেছে, পার্টির মাথার ওপর সরকারী নির্যাতনের দণ্ড পূর্ণশক্তিতে নেমে'এসেছে। আবার কত দিনে কি ভাবে আমাদের সুযোগ আসবে—কে জানে!

যাই হোক, প্রথম কয়েক দিন টো-টো করে ঘুরে চন্দননগরের পথঘাটগুলো রপ্ত করে নিয়েছিলুম। ক্রমে দু'-এক জায়গায় গরীব বুড়ো একক দোকানদার দেখলে জিজ্ঞাসা করি, হ্যাঁ মশায়, এদিকে কোথাও বাড়ীটাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় বলতে পারেন? কেউ বলে, উই ওখানে পাড়ার মধ্যে গিয়ে খোঁজ করুন। কেউ বলে, ক'খানা ঘর চাই? কিন্তু কেউ যখন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে আপনি কোথা থেকে আসছেন, তখন ভারি অসোয়াস্তি বোধ হয়।

এমনি করেই ক্রমে সারা চন্দননগরে অনেক খালি বাড়ী এবং ঘরের সন্ধান করে ফেললুম। সহরের বুকের ওপর ভাল দোতলা বাড়ী ওপর-নীচে আটখানা ঘর—ভাড়া পাঁচ টাকা। শুনে দাদা বললেন, হুঁ, ওটা মেয়র নারাণ পালের বাড়ী, ও চলবে না। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ঘনবসতি যেখানে, সেখানে চলবে না।

একদিন বারাসাতের শেষ প্রান্তে এক বাড়ীর খবর আনলুম। দাদা বললেন, ওটা বৃটিশ চন্দননগর, ফরাসী এলাকার বাইরে, ওখানে আর যেও না। অর্থাৎ ফরাসী চন্দননগরের পাশে এক ফালি বৃটিশ চন্দননগরও আছে!

মাঝে মাঝে এক-আধটা রগড়ও হত। ট্রাণ্ডের শেষে এক প্রকাণ্ড চমৎকার বাগানবাড়ী—একেবারে গঙ্গার ওপর। ভাড়া পাওয়া যেতে পারে—বাড়ীর মালিকদের আর একটা বাড়ীও আছে সহরের মধ্যে। সেখানে কাছারী আছে। গিয়ে উঠলুম সেখানে। এক বৃদ্ধ তামাক খাচ্ছিলেন—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, নাম কি? নাম বললুম। তিনি ব্রাহ্মণের হুঁকোটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, বসুন। যন্ত্রচালিতবৎ হুঁকোটি নিয়ে সাবধানে ফুঁকো টান দিতে দিতে বললুম, বাগান-বাড়ীটার ভাড়া কত? তিনি বললেন, নিতে পারবেন?—কুড়ি টাকা মাসে। আমি আর কথা না বাড়িয়ে, ও বাবাঃ, বলে হুঁকো ফিরিয়ে দিয়ে সরে পড়লুম। ধূমপানের অভ্যাস ছিল না, রাস্তায় মাথাটা কেমন যেন ঘুরতে লাগলো। একটা বাড়ীর বাইরের রোয়াকে শুয়ে খানিক ধাতস্থ হয়ে ফিরে এলুম।

যে সব ভদ্রলোক কলকাতায় চাকরী-বাকরী করেন, তাঁরা বেরোবার পর পাড়ার ভেতর যেতুম। একদিন এক বাড়ীতে ঘর খালি আছে শুনে গিয়েছি,—বাড়ীতে শুধু এক বৃদ্ধা থাবেন, আর কেউ নেই,—তিনি জিজ্ঞাসা করছেন তোমাদের সংসারে ক'জন লোক? পাশের বাড়ীর এক বুড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। আমি বলছি থাকবে একজন মাত্র লোক,—মিলে চাকরী করে। একটু রেঁধে খাওয়ার জায়গা—নতুন বুড়ী ফোঁস করে উঠেছে,—তোমরা বোমার দলের লোক নও তো? আমার প্রায় পিলে চমকে উঠেছে,—বললুম, সে আবার কি কথা! বুড়ী বললে,—হ্যাঁ গো, আজ-কাল অমন কত আসে। আমি তাড়াতাড়ি কোন রকমে সর্টকাট করেই সরে পড়লুম। দাদা শুনে শুধু একটু হাসলেন।

বস্তুতঃ, তখন বৃটিশ স্পাই এবং ফেরারী বিপ্লবী চন্দননগরে অনেক ছিল, কিন্তু ধরা কেউ পড়তো না। কারণ বৃটিশ পুলিশকে ফরাসী পুলিশের অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট বাড়ীতে খানাতল্লাসী করতে হত। পুলিশের কর্তা মাত্র ফ্রেঞ্চম্যান, আর সবই বাঙ্গালী, এবং তার মধ্যে দলের লোকও ছিল অনেক। কাজেই খানাতল্লাসীর আগেই বাড়ীতে খবর পৌঁছে যেত, এবং ফেরারীও ফেরার হত।

চন্দননগর যে ফরাসীরাজ্য,—একথা তখন সত্যিই অনুভব করা যেত। একদিন রাস্তার ধারে এক মুচির কাছে জুতো সারাচ্ছি, হঠাৎ এক পুলিশ এসে পা বাড়িয়ে দিলে, জুতোটা তার পালিশ করে দিতে হবে। মুচি গ্রাহ্যই করলে না। সে আর একবার তাগিদ দিতে মুচি চোখ তুলে ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, আরে যাও যাও, ই আংরেজকা রাজ নেহি হায়। পুলিশ বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

স্থানীয় লোক ফরাসী পুলিশের কাছে রিপোর্ট করলে, তারা যদি খানাতল্লাসী বা গ্রেপ্তার করতে আসতো, শুধু তাহলেই ধরা পড়া সম্ভব হত। আমার কেসে তাই হয়েছিল। সেটা জানলুম গ্রেপ্তারের পরে।

একদিন খবর হল, সতীশদা' সন্ধ্যার পর হলদেডাঙ্গার বাড়ীতে আসবেন, আমি যেন আগে থেকে উপস্থিত থাকি। আমি সন্ধ্যার আগেই বাড়ী গেলুম। তখন কালবৈশাখীর মেঘ আকাশ কালো করেছে, ঝড় আসে-আসে। ঘরে গিয়ে হ্যারিকেন জেলে দরজা-জানালা বন্ধ করলুম। দাদা আগে থেকেই সতীশদা'র জন্যে অন্যত্র রয়ে গেছেন।

ক্রমে বাইরে ঝড় উঠলো,—দমকা বাতাস দরজা-জানালায় ধাক্কা দিতে সুরু করলে। তারপর সুরু হল বৃষ্টি, কিন্তু পাগলা হাওয়া বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত আকাশ-ভাঙ্গা ঝড়-বৃষ্টির উন্মত্ত তাণ্ডব এবং কর্ণপটহবিদারী বজ্রাঘাত! হ্যারিকেনটা জেলে রেখেই শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, এর মধ্যে যদি সতীশদা' এসে দরজা ঠেলাঠেলি করেন, তাহলে কি টের পাব?—উপায় হবে কি! মনকে প্রবোধ দিলুম, আজ আর তিনি আসতে পারলেন না। সেটা যে কত বড় সৌভাগ্য, তা' তখন বুঝিনি।

ঘুমোতে পালুরম না—অনেক রাত পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে বোধ হয় ছোট-বড় পঞ্চাশটা বজ্রপাত চললো। ঝড়ের ধাক্কায় ঘরটা যেন মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে আর ভাবি, ঘরচাপা পড়েই বুঝি মরতে হল! শেষ রাত্রে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না।

ঘুম কিন্তু ভোরবেলাই ভেঙ্গেছে – আকাশ তখন লড়াইয়ের পর বিশ্রাম নিচ্ছে। মগ নিয়ে ছাদে বেরিয়েছি,—হঠাৎ পাশের আলসের ওপর দিয়ে পুকুরপাড়ের রাস্তার দিকে নজর পড়তেই দেখি, সারি

বেঁধে আসছে রীতিমত এক পুলিশবাহিনী। একবার মুহূর্তের জন্যে মাথাটা চন্ করে ঘুরে উঠলো—তারপর আবার স্টেডি হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে পুলিশবাহিনী বাড়ীটা ঘিরে ফেললে, এবং এক দল সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ করে ছাদে পৌঁছে গেল, এবং প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে আমার চারিচক্ষের মিলন হল। মগ দেখিয়ে বললুম, একটু দাঁড়াও, দেরী হবে না। বলে আমি পায়খানায় ঢুকলুম, ওরা বাইরে ভিড় করে দাঁড়ালো।

বাইরে পুলিশের ভিড়, এবং মাথার মধ্যে এক মুঠো কেঁচোর কিলবিলির মতন হিজিবিজি চিন্তার ভিড়—কোষ্ঠ বেচারী 'থ' হ'য়েই রইলো। তার সঙ্গে আপোষ করে বেরিয়ে পড়লুম। তারপরে সদলবলে ঘরে ঢুকে সুরু হল অগ্নিপরীক্ষার পালা। ডাহা মিথ্যে কথাগুলোকে বেপরোয়া ভাবে পটাপট সত্যের মতন সাজিয়ে বলার অভ্যাস তো ছিল না,—কিন্তু ক্ষেত্রকর্মবিধীয়তে—আজকের দায় যে সারতেই হবে! হলও নেহাৎ মন্দ নয়।

ফরাসী পুলিশ সাহেব ফরাসীতে প্রশ্ন করলেন, এক বাঙ্গালী অফিসার বাংলা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আর সব লোক গেল কোথায়?

আমি—আর কেউ তো এখানে থাকে না—আমি একাই থাকি—আর এক উড়ে মালী—সে কাল সহর থেকে ফিরতে পারেনি।

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন কোঁস করে উঠলো—মিথ্যে কথা, মোটা-মোটা চশমা-পরা লোক—আমি দেখেছি।

দেখলুম, দুর্লভ ঘোষ—বুঝলুম ঐ ব্যাটাই ইনফরমার। বললুম আমি জামাজোড়া পরে চশমা পরলেই আমাকে মোটা দেখায়।

প্র:—আপনি কোথা থেকে কি জন্যে এখানে এসেছেন?

উ:—এসেছি কলকাতা থেকে, জুটমিলে চাকরী খুঁজতে। গোঁদলপাড়া জুটমিলের বড়বাবু অমূল্য বাবু আশা দিয়েছেন বলে পবিবার আনার জন্যে বাড়ী ভাড়া করেছি।

প্র:—এ জঙ্গলে এলেন কেন? সহরে তো বাড়ীঘরের অভাব নেই—ভাড়াও বেশী নয়।

উ:—বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে তালডাঙ্গার ফটকের কাছে চারু দাসের বাড়ীতে এসেছিলুম, দেখি:তিনি সপরিবারে :বাইরে গেছেন—বাড়ী তালাবন্ধ। তারপর পাশের দোকানে জিজ্ঞাসা করে এই বাড়ীর সন্ধান পেলুম। খাঁ বাবুদের নায়েবের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছি। (চন্দননগরের উত্তর সীমানার একদিকে তালডাঙ্গার ফটক,—পার হলেই চুঁচড়োর এলাকা)।

প্র:—চারু বাবু আপনাকে চেনেন?

উ:—হ্যাঁ—তাঁর মেয়ে সরস্বতীর বিয়েয় আমি এসেছি—তাঁর স্ত্রীকে আমি মেজ মাসী বলি।

এ কথাটার অনেকখানিই সত্যি। চারু বাবুর ন' শালী এক সময়ে আমাদের বাড়ীতে ভাড়া ছিলেন, আমি তাঁকে মাসীমা বলতুম—আর তিনি আমাকে বলতেন আমার বড় ছেলে। তাঁর স্বামী বিখ্যাত সিন-পেণ্টার দেবেন্দ্রনাথ দাস আমাদের বাড়ীতেই মারা যান। আমি তখন থেকেই মাসীমা'র ডান হাত-স্বরূপ হয়েছিলুম। তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলুম এবং তাঁর সঙ্গেই চারু বাবুর বাড়াতে এসেছিলুম সরস্বতীর বিয়েতেই।

চারু দাস চন্দননগরের একজন অবস্থাপন্ন গণ্যমান্য ভদ্রলোক। সাহেবের একটা ভাল ধারণাই হল, মনে হল।

প্রশ্ন—অতগুলো "উদ্বোধন" এখানে কেন?

উ:—কয়েক দিন একা থেকে গোছগাছ করতে হবে বলে বাড়ী থেকে এনেছি—শুয়ে শুয়ে ঐগুলোই একটু পড়ি।

একটা এডওয়ার্ডস টনিকের প্যাককরা বোতল ছিল,—অফিসার সেটা তুলে নিয়ে ভার দেখে বললেন, এটাতে কি আছে?

উত্তরে এই দেখুন, বলেই সেটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে একটানে কাগজ ছিঁড়ে ফেললুম—এডওয়ার্ডস টনিকই বেরুলো দেখে আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। কারণ, আমি জানতুম না, ওটা সত্যিই ওষুধের বোতল।

এর পর নীচে গিয়ে পুকুরঘাটের সাঁকোয় বসে ওঁরা রিপোর্ট লিখতে সুরু করলেন—আমি দুরু-দুরু হিয়া নিয়ে সপ্রতিভ ভাবে দাঁড়ালুম। এমন সময় দেখা গেল মালীপুঙ্গব আঁচলে কিছু সওদা, এবং একটা ভিজে নারকেলপাতা নিয়ে পুকুরপাড় ধরে আসছে। এসে একেবারে ভ্যাবাচাকা কিন্তু ঘাবড়েছে বলে মনে হল না। তারপর চললো তার ওপর জেরা।

তাকে একটা করে কথা জিজ্ঞাসা করে, আর আমি আগেই তার জবাবটা দিয়ে বলি,—বলুক না ও ঠিক কি না। দুর্লভ কোঁস করে ওঠে—আপনি কেন কথা কইছেন? শেষে অফিসার আমাকে বারণ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে মালী অবস্থাও বুঝে নিয়েছে, এবং আমার জবাবের লাইনটাও ধরতে পেরেছে।

দুর্লভ ঘোষ বললে—বলুক না ও—মোটা-মোটা বাবু এখানে আসা-যাওয়া করে কি না। অফিসার মালীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর কেউ আসে এখানে?

মালী দিব্যি ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে—আউ কেই আসিনি।

অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন,—এই বাবুই বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন?

পরবর্তী সম্ভাব্য প্রশ্ন অনুমান করে টপ করে আমি বললুম,—ঐ মালীই তো আমাকে সঙ্গে করে নায়েব বাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছে। মালী বেমালুম সায় দিলে।

দুর্লভ ঘোষেদের পরাজয় হল। সাহেব বললেন,—আপনার বিরুদ্ধে রিপোর্ট খারাপ, আপনি এখানে থাকতে পারবেন না। আপনি চন্দননগর ছেড়ে চলে যান।

প্রায় কাঁদ-কাঁদ ভাবে বললুম—বেকার সংসারী মানুষ, একটা চাকরীরও আশা পেয়েছি,—আমার ওপর এতটা নির্দয় হবেন না।

মনে হল সাহেবের মন গললো। তিনি বললেন—এখানে থাকার অনুমতি নিয়েছেন আপনি? অফিসার মালীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর এখানে থাকার পাশ আছে? হুকুম নিয়েছিস?

আমি বললুম, আমি তো নিয়ম-কানুন কিছু জানি না, আমি আজই দরখাস্ত করে দোব, দয়া করে মঞ্জুর করে দেবেন, না হলে মারা যাব। মালী বললে,—হিঁ:—মু তিরিশি বর্ষ ইঁয়াড়ে রহিছি কৌ দিনি কেই কিছি কহিলা নি—হুককুম কঁড়? আমি বললুম, ওরও দরখাস্ত আমি আজ করিয়ে দোব।

সাহেবের কথা মত অফিসার বললেন, এখন চলুন তো আমাদের সঙ্গে, পরে সে সব দেখা যাবে।

পুলিশের দলের সঙ্গে আমি এবং মালী চললুম। আশা এবং আশঙ্কায় মনটা দুলছে—বৃটিশ স্পাইগুলো জানবেই, তারপর কি? পকেটে নায়েবের লেখা ভাড়ার রসিদখানা, বডি সার্চ করবেই—

কাজেই পথে একটু ঘন ঘাসবন দেখে প্রস্রাব করতে বসে পকেটের ভাঁজকরা কাগজখানা ঘাসের মধ্যে গুঁজে দিয়ে হালকা হলুম।

পুলিশ হেড কোয়ার্টারে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অফিসার এসে বললেন, সাহেব হুকুম দিয়েছেন—আপনি থাকার জন্য দরখাস্ত দিন। যত সব মিথ্যে রিপোর্ট—হুঁ—

কোনো ছুতোয় অফিসারকে দুটো টাকা দেওয়ার মৎলবে বললুম আপনারা দরখাস্ত লিখে দিন, আমি আপনাকে পান খেতে এই যৎসামান্য দিচ্ছি। তিনি টাকা দুটো নিয়ে বললেন, আপনার বাগানে অনেক কাঁচা-মিঠে আমের গাছ আছে, খাওয়াতে হবে কিন্তু! আমি বললুম, বিলক্ষণ! যখন আলাপ হল, তখন—

দুজনেরই দরখাস্ত দেওয়া হয়ে গেল। মালীর সঙ্গে বাড়ী ফেরবার পথে গঞ্জের গোলদারী দোকানে খবর দিয়ে গেলুম,—সার্চ হয়ে গেছে,—ধরে নিয়ে গিয়েছিল,—ছেড়ে দিয়েছে—কেউ যেন ও বাড়ীতে না যায়—আমি বাড়ী গিয়ে একবার ডঙ্কা মেরে আসি। তাঁরা খবর দিলেন, জল-ঝড়ে কাল সতীশদা' আসতে না পেরে বেঁচে গেছেন, কিন্তু আজ তিনি ঐ বাড়ীতেই আসবেন। আপনি চুঁচড়োর পথে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে নিয়ে অতুলদা'র কাছে পৌঁছে দেবেন।

অতুলদা'। এত দিন যাঁর সঙ্গে একহাঁড়িতে খিচুড়ী খেয়েছি, তিনিই অতুল ঘোষ! সমগ্র ব্যাপারটাই যেন কেমন ভাল লাগতে লাগলো। পুলিশের কাছে নাম-ঠিকানা দিয়েছিলুম সঠিকই—কারণ, ভেবে নিয়েছিলুম, এরা আমাকে আটকে রেখে বৃটিশ পুলিশ দিয়ে আমার বাড়ীতে অনুসন্ধান করাবে—নাম-ঠিকানা ঠিক না হলেই বিপদ। বিপদ কেটে যাওয়ার পর কিন্তু মনে হতে লাগলো, সঠিক নাম-ঠিকানাটা না দিলেই ভাল হত। কথাটা কিন্তু মোটেই ঠিক নয়।

বাড়ী ফেরার পথে মালীকে একখানা আটহাতি কাপড় কিনে দিলুম—আগের কথামত। ব্যাটা ঘুঘু, অনেক কাজ করেছে।

বাড়ী গিয়ে দেখি, কালো, হাড়-জিরজিরে এক বৃদ্ধ—নায়েব মশাই এক চাকর নিয়ে এসেছেন, এবং ঘাটের সাঁকোয় বসে তামাক খাচ্ছেন। বুঝলুম খবরটা মানকুণ্ডু পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। আমরা পরস্পরের কাছে অপরিচিত—কাজেই আমি আগেই বললুম,—আমি যোগেশ বাবুর ভাই—বাড়ীটা সাফ-সুফ করে রাখার জন্যে এসেছি। পাড়ার লোকে মিথ্যে নালিশ করে পুলিশ এনেছিল, তারা পরীক্ষে টরীক্ষে করে ছেড়ে দিলে।

নায়েব মশাই তড়পাতে সুরু করলেন,—আমার ভাড়াটে আমার বাড়ীতে ঝাটো হয়ে নাচবে,—তো-শালাদের কি?—আমি কালই কোর্টে নালিশ করবো, আমার প্রজার ওপর কেন অত্যাচার হয়? আমি যত হাসিমুখে বলি,—থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে তো, আর দরকার কি ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে—নায়েব মশাই ততই চীৎকার করেন, আমি ছাড়ছি না, দেখে নোব শালাদের, আমার প্রজার ওপর পুলিশ হামলা! (বাড়ীটার একটা ঐতিহ্য ছিল—চন্দননগরের সস্তা মদের লোভে কলকাতার বাবুরা মাঝে মাঝে মেয়েমানুষ নিয়ে এসে ঐ বাড়ীটা ভাড়া করতেন।)

বুড়ো বুঝি আবার এক নতুন ফ্যাসাদ ঘটায়! ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লুম। কিন্তু হাসিমুখ বজায় রেখে থাকগে যাক্ বলে বুড়োকে ঠাণ্ডা করে বিদেয় করলুম। মালী রাঁধতে গেল, আমি কিছু ছাতু খেয়ে শুয়ে পড়লুম। আকাশ-পাতাল চিন্তা—বৃটিশ পুলিশ জানবেই, যদি ফেরারীদের দলেই ভিড়তে হয়, আমার জন্যেও পার্টির খরচ বাড়বে, আর লীডারদের জন্যে পার্টি যা করে, আমার জন্যেও তা করা কি সম্ভব? উচিত? দেখি দাদারা কি বলেন।

পরবর্তীকালে সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে ঠাট্টা করে বলতুম, পাঁঠা খাওয়ার জন্যে আস্ত পাঁঠা আর গরম মশলা কিনে আনা হল, পাঁঠা ব্যাটা গরম মশলাগুলো খেয়ে ফেললে!

টাকার জন্যে ডাকাতি-খুন, তা থেকে মামলা এবং ফেরারী—আরো টাকার প্রয়োজন, আরো ডাকাতি—এই দুষ্টচক্র সৃষ্টি।

যাই হোক, সন্ধ্যার পর বেরিয়ে চুঁচড়োর পথে গলি আর গড় পাইচারী করতে লাগলুম। ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোলের মানুষ চেনা যায় না। পথে জনমানব নেই। অনেকক্ষণ পাইচারির পর হঠাৎ সামনে দেখি এক লম্বা-চওড়া অবয়ব। বুঝলুম সতীশদা'ই, কিন্তু যদিই তা না হয়! তিনি অমন জায়গায় একজন লোক দেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন, আমিও পিছু নিলুম নিঃশব্দেই। সুতরাং তিনিও আরো জোরে পা চালালেন। আমার পক্ষে হল প্রায় হাফ-দৌড়।

সর্বনাশ করলে! যে রকম এগিয়ে গেছেন, আমার পক্ষে আগে গিয়ে বাগানের মুখে দাঁড়ানো অসম্ভব। যদি উনি বাগানে ঢুকে পড়েন, আর যদিই স্পাই-ওয়াচ থাকে। কাজেই চেনা গলার আওয়াজ দেওয়ার জন্যে পিছন থেকে সহজ গলায় বললুম,—কে যায়?

কাজ হল, গলার আওয়াজ চিনেছেন, দাঁড়ালেন। আমি এগিয়ে মুখটা দেখে নিয়ে বললুম, বাগানে ঢুকবেন না, বাড়ীটা আজ সার্চ হয়ে গেছে, আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ছেড়ে দিয়েছে। চলুন, পরে সব শুনবেন। তিনি বললেন অতুল কোথায়? বললুম, ঠিক আছেন তাঁর ডেরায়। তিনি বললেন, তাহলে এইবার তুমি আমাদের সঙ্গেই থেকে যাবে? আমি বললুম, একবার বাড়ী গিয়ে ওদিককার অবস্থা দেখে সেটা স্থির করাই কি ঠিক হবে না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাহলে এখন তুমি ফিরে যাও, আমি ডেরা চিনি, একাই যেতে পারবো। আমি ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম। আবার চললো আকাশ-পাতাল চিন্তা। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেললুম।

পরদিন সকালে গঞ্জের গোলদারী দোকানে খবর দিলুম, আমি বাড়ী যাচ্ছি, অবস্থা বুঝে পরে আসবো। সেই দিনই কলকাতায় চলে এলুম। কিন্তু সটান গিয়ে বাড়ীতে না উঠে এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠলুম, এবং বাড়ীতে খবর না দিয়েই কয়েক দিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে দেখলুম, বাড়ীতে কোন পুলিশ এনকোয়ারী হয় কি না। গণ্ডগোল হয়নি বলে যখন বুঝলুম, তখন বাড়ী গেলুম। চন্দননগরের স্পাইগুলো ফাঁকিবাজ।

চন্দননগরে আর ফিরে যাওয়ার দরকার হল না, এবং আগের মতন কলকাতায় থেকেই কাজ করতে লাগলুম।

যে বন্ধুর বাড়ীতে গা-ঢাকা দিয়েছিলুম, তাঁদেরও বাড়ীর সংলগ্ন একটা পৃথক অংশে ফেরারীদের একটা আড্ডা কিছু দিন ছিল। সেখানে তিন-চার জন বাস করতো, এবং আসা-যাওয়া করতো অনেকে। টালার ডাকাতির ঠিক আগে সে বাড়ী ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ডাকাতির বিবরণও কম মনোহারী নয়।

বন্ধুটি হচ্ছেন হারাধন ওরফে হারু। রাণাঘাটের হারাধন ঘটক। তিনিও ডিফেন্স অ্যাক্টে আটক হয়েছিলেন, আমাদের অনেকের সঙ্গেই।

[ ক্রমশঃ।

# কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ : পথের পাঁচালী

ডক্টর সুধাকর চট্টোপাধ্যায়

২

উপন্যাস বস্তুটি আমাদের দেশে একশ' বছয়ের আগন্তুক, যদিও কথাটি পুরোনো। সংস্কৃতে কল্পিত কাহিনী হিসেবে উপন্যাস শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য গদ্যে রচিত এক বিশেষ ধরণের কল্পিত কাহিনীরূপে ইংরাজী 'নভেল' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে এই কথাটির ব্যবহার বেশী দিনের নয়। ওদেশের সাহিত্যে নভেলের অদ্ভুত রূপ পরিবর্ত্তন ঘটেছে, আমাদের দেশেও কিছু কিছু ঘটেছে। মধ্যযুগের 'পিকারেস্ক নভেল' ও আজকের 'কন্টিনেণ্টাল নভেল'ও নভেল। প্রথমটি বখাটে বাহাদুরের শক্তি ও আসক্তিচর্চ্চার বিচ্ছিন্ন আখ্যায়িকায় ভরপুর। কেন্দ্রস্থলে নায়ক। সে হিস্পানী সভ্যতার অপকীর্ত্তি। বিদ্যাসুন্দরের অনুকরণে অনেক বই লেখা হয়েছিল কবিতায় বাংলাদেশে। তার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এই জাতীয় নভেলের কিন্তু কোনও সংযোগসূত্র নাই। এই জাতীয় 'নভেল' ইংরাজের ঘরে অতিথি হিসেবে এসেছে,' ঘরের লোক হ'য়ে উঠতে পারেনি। বররুচি, থ্যাকারে, ডিকেন্সে আমরা নভেলের শান্ত সুন্দর সংযত রূপ পেয়েছি। ওয়াল্টার স্কট-এ মধ্যযুগের পটভূমিকায় কল্পিত বাস্তব কাহিনীর চমৎকার রূপ— রোমান্স। এই সাহিত্যের শাখায় ফরাসী সংস্কৃতির ছাপ ছিল। তাই হিস্পানী বর্ব্বর রুচির 'পিকারেস্ক নভেল' সূক্ষ্মরসবোধকে তৃপ্তি দেয়নি, অতীত যুগের 'রমন্যাস' রোমান্স দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'রোমান্স'ও রচনা করেছেন সাহিত্যসৃষ্টির উদ্যোগপর্ব্বে, অপূর্ব্ব উপন্যাসও রচনা করেছেন। 'রোমান্স'এর রূপ পরিবর্ত্তন অপেক্ষা নভেলের রূপ পরিবর্ত্তন ঘটল ইংরাজী সাহিত্যে। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে গভীরতর কৌতূহল দেখা দিল। একটি ব্যক্তি নয়, একটি পরিবারের বিচিত্র ইতিহাস ফরসাইট পরিবারের উপন্যাসে তুলে ধরলেন গলসওয়ার্দি। জগৎ-জীবন-কেন্দ্রিক ব্যাপকতর রহস্যবোধ কন্টিনেণ্টাল নভেলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বাস্তবজীবনের নিবিড়তর অভিব্যক্তি সে উপন্যাসের অভিনবত্ব। সেই বাস্তব জীবনের উপরে লোকোত্তরতার মায়াজাল সংক্রামিত করেছেন জাঁ-ক্রিস্তফে রোম্যাঁ রোঁলা। আকৃতি ও প্রকৃতিতে পূর্ব্বযুগের নভেল-এর সঙ্গে এ নভেলের গভীর প্রভেদ।

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাসের সূত্রপাত একরকম বঙ্কিমচন্দ্র হ'তে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সের জগতে জগৎসিংহকে নিয়ে গেছেন গড়মান্দারণের পথে। ওয়াল্টার স্কটের আদর্শ অনুসরণ ক'রে ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে মোগল পাঠানের বিরোধ বিক্ষোভের মধ্যে কাহিনীর উপাদান খুঁজে নিয়েছেন। খাঁটি উপন্যাসের ক্ষেত্রেও যখন বঙ্কিমচন্দ্র এসেছিলেন, যেমন 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' গ্রন্থে, সেখানেও উঁচু সুরের কথাবার্ত্তা এবং নির্ব্বাচিত বিশেষ ঘটনার প্রবাহ। বিষপান, পলায়ন, রহস্যময় পুনরাবির্ভাব, জলনিমজ্জন, পিস্তল ব্যবহারের ঘনঘটায় আমাদের নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আবেগচঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। এখানে অবাস্তবতার স্পর্শ নেই। কিন্তু অতিবাস্তব দিনের পর দিনের ঘটনাহীন ঘটনার ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি তা-ও নেই। রয়েছে বাস্তব হতে নির্ব্বাচিত বিশেষ ঘটনার বিপুল সম্ভার। রবীন্দ্রনাথে শরৎচন্দ্রে একই ধরণের বিশেষ ঘটনার বিচিত্র বিবরণ। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' বিশেষ ঘটনার সুনির্বাচিত রূপ নয়— শিশু এবং কিশোর-জীবনের আবেগবিহীন প্রতি দিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ইতিহাস। অসি-ঝনঝন নেই, আগ্রা প্রাসাদের ষড়যন্ত্র নেই, কাপালিক ভৈরবী নেই, পিস্তলের গুলী নেই, সম্মোহনবিদ্যার প্রয়োগ নেই, অন্ধের চক্ষুপ্রাপ্তি নেই। অর্থাৎ যে সমস্ত ঘটনা বিশেষ সংবাদ বা news নয়, যার মধ্যে চমৎকারিত্ব নেই তারই বর্ণনা। তবু তা ক্লান্তিকর রোজনামচা না হয়ে একটি জীবন্ত সত্যে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সমস্যা-সমাকীর্ণ পৃথিবীর উপর আদর্শের আলোক বিকিরণ করেছেন।

'পথের পাঁচালী'তে সমাজ-সংস্কারের আদর্শানুসরণ নেই, তবু তা আদর্শলোকের জিনিষ। 'পথের পাঁচালী'র উপজীব্য বাস্তব পৃথিবী, লক্ষ্য আদর্শলোক। তাই বিভূতিভূষণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে রিয়ালিষ্ট, বিন্যাসের বিচারে আইডিয়ালিষ্ট। কেন্দ্রভূমিতে পল্লীগ্রাম আছে কিন্তু সে পল্লীগ্রাম শরৎচন্দ্রের পল্লীগ্রাম নয়। এখানে দলাদলিতে উন্মত্ত গ্রামের চতুর্দিকে লাভ-ক্ষতির টানাটানি এবং কলহ সংশয়ের হানাহানিতে পল্লীর প্রাণ বিপর্য্যস্ত নয়। অভাব, অশিক্ষা, অনটনে-ভরা পল্লীর রেখাচিত্র শরৎচন্দ্রের সজীব হ'লেও বিভূতিভূষণের পল্লী সে ধরণের নয়। কারণ, এখানে কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র দুটি নিসর্গমুগ্ধ বালক-বালিকা।

শরৎচন্দ্রের পরিণত বুদ্ধি মানুষ কাহিনীর কেন্দ্রস্থলে এবং পল্লী স্বভাবতঃই সেখানে জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্র। অপরিণত শিশু-কিশোরের কাছে পল্লী-প্রকৃতির স্বর্ণভাণ্ডার। সেখানে গাছে গাছে রূপকথার রাজ্যের পাখী, মাঠের পাশের আঁকাবাঁকা রাস্তাটি রামায়ণ-মহাভারতের দেশের মধ্য দিয়ে কোন দূরে চলে যায়। পাঠশালার পিছনের পচা পুকুর শ্রুতিলিখননিরত বালকের কাছে জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি হ'য়ে দেখা দেয়। প্রকৃতি আনন্দচঞ্চল অপু-দুর্গার লীলাক্ষেত্র। সেখানে পল্লীর পরিণত মানুষ হরিহর, সর্বজয়া, ইন্দিরঠাকরুণ জরা দারিদ্র নিয়ে কোথায় তলিয়ে যায়। দুটি মধুর প্রাণের সহজ আনন্দের আগমনে পল্লী-প্রকৃতির বীভৎসতা এবং দরিদ্র-জীবনের অসচ্ছলতা

অবলুপ্ত হয়ে যায়। 'পথের পাঁচালী'র লেখক একধারে 'রিয়ালিষ্ট'-এর মত সংসারের ব্যথাকরুণ রূপটি তুলে ধরেছেন, অন্যধারে 'আইডিয়ালিষ্ট'-এর মত 'এই বাহু এই বাহু আগে কহ আর' বলে আনন্দের উদার জগতে আমাদের নিয়ে চলে গেলেন। সূর্য্যাস্তের রাঙা রঙে কদর্য্যও সোনায় মোড়া হ'য়ে দেখা দেয়। শিশুচিত্তের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় আমাদের পরিচিত কদর্য্য পৃথিবীও সোনায় মোড়া হ'য়ে যায়। বদ্ধ-জীবনের মধ্যেও মধুবাতাসের প্রবাহকে আমরা উপলব্ধি করি; 'পার্থিবং রজঃ' কোন মন্ত্রবলে মধুময় হয়ে যায়; বৃক্ষলতাগুল্ম যেন মধু বর্ষণ করে। 'পথের পাঁচালী'র পল্লীর চতুর্দ্দিক মধুরতায় আচ্ছন্ন।

তাই উপন্যাস বিচারে 'পথের পাঁচালী'র লেখককে কেউ 'রিয়ালিষ্ট' না বলে 'আইডিয়ালিষ্ট' বলেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, বিভূতিভূষণ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মত সংসারের আদর্শরূপ গঠনে বিশেষ আগ্রহশীল নন। তিনি ন্যাচুরালিষ্ট ( Naturalist ) তাঁর আদর্শবাদ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় হ'লেও সে জীবনের কেন্দ্রস্থলে মূঢ়-ম্লান-মূক মুখ নেই, আছে রহস্যমধুর প্রকৃতি এবং প্রকৃতির চতুর্দ্দিকে অনন্তরূপে অভিব্যক্ত এক অচেনা চিরচেনা শক্তি। তাই প্রকৃতিকে তিনি কেবল পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করেননি, সজীব সত্তা হিসেবে গ্রহণ ক'রেছেন। সংসারের সমস্ত সমস্যাকে আচ্ছন্ন ক'রে আছে প্রকৃতিপূজকের ধ্যানদৃষ্টি। সেই দৃষ্টির সামনে ইছামতীর পাশে শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীতে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী বিশালাক্ষী দেবীর আবির্ভাব স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। গাছের সবুজে আর পাখীর গানেতে যে বাণী উৎসারিত, প্রকৃতির সেই বাণীকে কান পেতে শুনেছেন বিভূতিভূষণ।

'পথের পাঁচালীতে' সেই বাণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। তাই 'পথের পাঁচালী' অসাধারণ ঘটনা-সমৃদ্ধ, অসি ঝনঝন ও ষড়যন্ত্র সমাকীর্ণ সাধারণ উপন্যাস না হ'লেও এক ধরণের সার্থক উপন্যাস। উপন্যাসের ঘাত-প্রতিঘাত হয়ত এখানে নেই, বাহিরের ঘটনার দ্বারা চরিত্রের পরিবর্ত্তন বা চরিত্রের বিশেষ প্রবণতার পথে ঘটনার অগ্রগতি এখানে দেখা যাবে না। অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই। প্রেম, যৌবনের প্রবলতম আবেগে, উপন্যাসের প্রধানতম আলম্বন এর মধ্যে নেই। তাই একে উপন্যাস না বলে 'পাঁচালী' বলতে চেয়েছিলেন হয়ত ঔপন্যাসিক। কারণ 'পাঁচালী' 'পাঞ্চালিকা'-মূলকই হোক বা 'পা-চালি' অর্থাৎ পা-চালিয়ে নৃত্য ক'রেই হোক তা আসলে পাঁচ মেশালি জিনিস। প্রচলিত 'পাঁচালী'র গান সাজ বাজানো, ছড়া কাটানো, গানের লড়াই এবং নাচ এই পাঁচটির সমাবেশ এর মধ্যে না থাকলেও জীবনপথের বিচিত্র পাঁচমেশালী পালাগানকে 'পথের পাঁচালী' নাম দিয়ে বোধ হয় লেখক এই গ্রন্থের উপন্যাস লক্ষণ বিচারে উদ্ধত সমালোচকের না-বলা-প্রশ্নের শেষ উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে গ্রন্থটিকে সাধারণ শ্রেণীর উপন্যাস বলে গ্রহণ না ক'রে একে নূতন শ্রেণীর উপন্যাস বলে গ্রহণ করার কোনও বাধা নেই। কারণ উপন্যাসের আদর্শ যুগে যুগে বদলেছে এবং বদলাবে। এক জায়গায় তা স্থির হ'য়ে থাকেনি। আর এই ধরণের অভিনব শ্রেণীর উপন্যাস রচনায় বিভূতিভূষণ প্রথম ও প্রধান।

৩

আমাদের উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ এক অনন্যসাধারণ কবিপ্রতিভা। রবীন্দ্রনাথ কবি···উপন্যাসেও তিনি কবি। বঙ্কিমচন্দ্র কবি নন ঔপন্যাসিক। সে রূপ তাঁর 'ললিতা-মানস'এ। সেখানে কবি হিসেবে তিনি অসার্থক। এ ছাড়া কবিতা বা গান তিনি উপন্যাসের মধ্যে কিছু কিছু উপহার দিয়েছেন। কিন্তু এক মাত্র 'বন্দে মাতরম্' ছাড়া আর কোনওটি-ই উল্লেখযোগ্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মত শরৎচন্দ্রও সমাজ-সংসারকেই সব বলেছেন, এ জীবনের কলরবকে মিছে বলেন নি। 'কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতিপ্রেম এবং 'শ্রীকান্ত'-এ শরৎচন্দ্রের প্রকৃতিপর্য্যবেক্ষণ আমরা লক্ষ্য করি বটে কিন্তু বিভূতিভূষণের প্রকৃতিলীনতা তার মধ্যে নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-নাটকে যে প্রকৃতিপ্রেমের বন্দনাগান, বিভূতিভূষণের উপন্যাসে তারই বর্ণনা।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেম উপন্যাসক্ষেত্রে তাঁর সহায় ও শক্তি। প্রকৃতিপ্রেমের প্রাবল্য তাঁর সমাজ-চেতনাকে গ্রাস করেছে। যে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আমাদের পল্লীর রিক্ত নিরানন্দ প্রাণহীন জীবন ধুঁকে ধুঁকে কোনও রকমে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, তারই চতুর্দ্দিকে বিভূতিভূষণ বর্ণরাগের অজস্রতা লক্ষ্য করেছেন। অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের অভাববোধ নিয়ে বঞ্চিত মানুষের দুঃখ-ব্যথা নিয়ে তিনি পল্লীকে বড় ক'রে তোলেন নি। বরঞ্চ রোমান্টিক কবির সুদূর পিয়াসা নিয়ে পল্লীকেই ভাবজগতে রূপান্তরিত ক'রেছেন। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের মত কল্পনাপ্রবণ রোমান্টিক কবি কেবল নন, রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষাও গভীর কল্পনাপ্রবণতা তাঁর রচনাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। কারণ, রবীন্দ্রনাথ এই সংশয়-বিক্ষুব্ধ কঠোর কর্মচঞ্চল ধূলিধূসর বাস্তব পৃথিবীকে অস্বীকার ক'রে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে মানস অভিসার করেছিলেন। আর বিভূতিভূষণ এই ধূলিধূসর বাস্তব পৃথিবীকেই সেই স্বপ্নের অলকাপুরীতে রূপান্তরিত করেছেন।

পল্লীচিত্রণে শরৎচন্দ্র অভাববোধ-পীড়িত, বিভূতিভূষণ ভাববিহ্বল। বিভূতিভূষণের পল্লী অবাস্তব নয়। তাতে বাস্তবের অতিক্রমণ নেই, আবার স্থূল বাস্তবের আক্রমণ নেই। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পার্থক্য কেবল ধ্যানদৃষ্টিতে নয়···কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরিকল্পনাতেও। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কেন্দ্রস্থলে দ্বিধাদ্বন্দ্বগ্রস্ত মানুষ···বিভূতিভূষণের উপন্যাসের কেন্দ্রস্থলে নির্দ্বন্দ্ব প্রকৃতি। বিভূতিভূষণের কবিসত্তা কেবল পল্লী-জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই বিকাশের পথ খোঁজেনি। আরণ্যকের মধ্যে তা লোকালয়ের সংস্রব-বিমুক্ত বনস্পতির অটল গাম্ভীর্য ও ধূ-ধূ করা ধূলি ধূসারিত উদার প্রান্তরের মধ্যে আপন সার্থকতার সন্ধান করেছে। সেখানে ঋতু বদলের পালা কেমন ক'রে সুরু হয়, বসন্তের গাছভরা গোলগোলি ফুলের শোভা-যাত্রার মধ্যে কেমন করে একদিন গ্রীষ্মের দারুণ অগ্নিবাণ সুরু হয়ে যায়; তৃষাদীর্ণ পৃথিবীর নিদারুণ জলকষ্টের মধ্যে বাঘে ও হরিণে একঘাটে এসে জল খায়, তারই অনুপম রেখাচিত্র আমরা পাই। মানুষ নায়ক, পটভূমিকা অপেক্ষা প্রধান নয়। পরিবেশের সঙ্গে সুসঙ্গত মিলনে সে অভিন্ন, সে সুন্দর। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য মানুষের বক্রতা, উক্তি ও হৃদয়ের বৈষম্য, আচরণ ও জীবনের বৈপরীত্য। সেখানে সরল, সুন্দর মনোরম প্রকৃতি তাই উপেক্ষিত।

শরৎচন্দ্র অরণ্যকে পটভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করেননি, করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলায় এবং বিভূতিভূষণ যাকে এমন প্রকৃতি ও

মানুষের লীলাক্ষেত্র বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের মত কেউ পারেননি। তবু একথা বলব যে, অরণ্যনায়িকা কপালকুণ্ডলার জীবনের মধ্যে যত গভীর ভাবে অনুপ্রবিষ্ট, 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে তত উজ্জ্বল ভাবে সন্নিবিষ্ট নয়। অনেক প্রাচীনকাল হতেই ভারতীয় সাহিত্যে অরণ্য আপন স্থান করে নিয়েছে। বাল্মীকির কাব্যে রামের নির্ব্বাসনকেন্দ্র বনভূমি, নায়িকা সীতার হরণকেন্দ্র বনভূমি, নায়ক-নায়িকার মিলনকেন্দ্র পঞ্চবটী, বিরহকেন্দ্র অশোককানন বা বাল্মীকির আশ্রমও অরণ্য। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, বাল্মীকির যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেকেই এই নগর ফিরিয়ে অরণ্য চেয়েছেন কিন্তু বিভূতিভূষণ কেবল চাননি 'পথের পাঁচালী' ও 'আরণ্যক'-এ এই লৌহ-লোষ্ট্রকাষ্ঠে ভরা নাগরসভ্যতার পরিবর্ত্তে তিনি সংগ্রহ করেছেন আরণ্যমধু এবং সেই মধুপানে বিমুগ্ধ পাঠকচিত্তকেও আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও মানুষের মিলন বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলায় অগ্রণী, বিভূতিভূষণ অগ্রগণ্য। প্রকৃতির কচি কিশলয়ের গান অপু, ঝরাপাতার বেদনা দুর্গা। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এরা, এরা ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসির চাইতেও প্রকৃতিময়। প্রকৃতি এদের প্রাণকেন্দ্রে যেমন প্রাণকেন্দ্রে আরণ্যকের চরিত্রগুলির। কারণ অন্য ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে প্রকৃতি পটভূমি বিভূতিভূষণে পীঠস্থান। তাঁদের লক্ষ্য সমান। 'পথের পাঁচালী'তে সমান উপলক্ষ্য, লক্ষ্য প্রকৃতি। তাই বিভূতিভূষণ অনন্যসাধারণ।

বিভূতিভূষণের সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তারাশঙ্কর শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারী। আঞ্চলিক জীবনধারা, ক্ষয়িষ্ণু জমিদার সম্প্রদায়, অনভিজাত সাঁওতাল সম্প্রদায় তাঁর লেখায় জীবন্ত। তিনি রাঢ় দেশের রুক্ষ প্রকৃতি ও মানবসম্প্রদায়ের ঔপন্যাসিক। বিভূতিভূষণে যশোহর অঞ্চল থাকলেও তিনি আঞ্চলিক সাহিত্যিক নন। কারণ তিনি মানুষের সামাজিক—আর্থিক দিকটাকে অত প্রাধান্য দেননি। তাই বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করের সমগোত্রীয় নন। সমসাময়িক 'বনফুল' বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপন্থী। অন্তরাকাশ বিদীর্ণ করা তাঁর বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের বিদ্যুৎবিলাস আমাদের চমকিত করে। তাঁর মধ্যে আকস্মিকতার আচমকা আঘাত আছে। আর আছে অণুবীক্ষণের তলায় মানুষ দেখার প্রবণতা। তারই ফলে আমাদের কাছে যে-মানুষটি শুভ্র-দেহ নিরঞ্জন, বনফুলের অণুবীক্ষণের তলায় তার সমস্ত পাতলা চামড়ার কদর্য্য বিরাটাকার রোমকূপ। আপাত সরল সহজ মধুরজীবনের অন্তরালে বক্র কদর্য্য বীভৎস জীবনের ইতিহাসকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। বিভূতিভূষণ দূরবীক্ষণ দিয়ে আকাশের নক্ষত্ররাশি দেখতে ভালবাসতেন, ভালবাসতেন সেই দূরবীক্ষণ দিয়ে মানুষ আর জগৎকে দেখতে। তাই তাঁর কাছে সব কিছুই দূরত্বের ব্যবধানে সুন্দর, রহস্যের কুয়াশা ঢাকা। সরল মানুষ, সহজ জীবন তাঁর দূরবীক্ষণে ধরা পড়েছে। কালের দিকে তাকিয়ে অতীত ইতিহাসকে তেমনই স্পষ্ট দেখেছেন। পরপারের জীবন তাঁর কাছে তেমনি স্বচ্ছ হয়ে দেখা দিয়েছে 'দেবযান' 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এ। তারানাথ তান্ত্রিকের কাহিনীর মধ্যে অলৌকিকের সঙ্গে অবিশ্বাসের যোগ থাকলেও অন্যত্র অলৌকিক-বিশ্বাস বিভূতিভূষণে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাহিনী ও রসসৃষ্টিতেও বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্য দুর্লক্ষ্য নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোমান্সঘেঁষা। রবীন্দ্রনাথ সংলাপ বা বিতর্কনির্ভর। শরৎচন্দ্র শেষ জীবনে (বিশেষ ক'রে 'শেষপ্রশ্ন'-এ) এই বিতর্কধারা কাহিনীতে অনুসরণ করলেও তাঁর রচনায় বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট আখ্যায়িকার অজস্রতা (বিশেষ করে শ্রীকান্ত-এ)। তারাশঙ্করেও তাই। বনফুলের মধ্যে ঘটনা ও দুর্ঘটনার প্রাবল্য। অর্থাৎ বনফুল অদ্ভুত রসের সাধক---বিভূতিভূষণ শান্ত রসের কবি। উপন্যাসের ঘটনা বলতে যা বোঝায় সেই ধরণের আবেগ, ঘাত-প্রতিঘাত, আবর্ত্তসঙ্কুল জীবনযাত্রা বিভূতিভূষণ ঠিক গ্রহণ করেননি ; ফলে বিভূতিভূষণের মধ্যে গড়মান্দারণের পথে কোন জগৎসিংহকে আমরা দেখি না, পিস্তলের গুলীতে কারুর মৃত্যু ঘটে না, অসতীর জীবনে সতীত্ব এবং সতীর জীবনে অসতীত্ব, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করার তাঁর অবসর নেই। ধ্যানদৃষ্টিতে তিনি সংসার ও জীবনকে দেখেছেন অধিকাংশ স্থলে। তাই কাহিনীর গতি মন্দাক্রান্তা, প্লটের চমক উপন্যাসে অনুপস্থিত। এক জাতীয় ঘটনা এবং এক জাতীয় চরিত্রের পুনরাবৃত্তিতে ভরা তাঁর 'পথের পাঁচালী' 'আরণ্যক' ; তবুও আমাদের সংঘাত আঘাত বিক্ষুব্ধ জীবনের ঊর্দ্ধে যে প্রসন্ন আকাশের উদার বিস্তৃতি আছে বিভূতিভূষণের মধ্যে সেই নীলাকাশের নিঃসীম প্রশান্ত বিস্তৃতিকে আমরা লক্ষ্য করি এবং পল্লীগ্রামের কর্দমপঙ্কলিপ্ত রুক্ষ অনভিজাত জীবনের চক্রবালে সেই আকাশের স্পর্শমায়ায় আমরা অভিভূত হই। [ ক্রমশঃ।

# যখন হারাবো আমি

গোবিন্দ গোস্বামী

হেথা আজ ক্লান্ত আমি, যদি বা কখনো
মনে মনে শান্তি পাই এইটুকু জেনো
সেই ত য, তুমি মোর। তোমার স্মৃতিরে
মনের সেতারে বেঁধে, সিম্ফনি তুলেছি আমি হৃদয়ের নীড়ে।
যেখানে সমুদ্র-স্বপ্ন তরংগিত কামনার আবেগ-উন্মন
সেখানে বেঁধেছে সেতু আমাদের মন।

হেথা আজ ক্লান্ত আমি যদি বা কখনো
মনে মনে শান্তি পাই এইটুকু জেনো
সে শুধু তোমার স্মৃতি আমার হৃদয়ে
লিখে রেখে যেতে চাই বিক্রান্ত-বেদন-গাথা নিরংকুশ জয়ে!
যখন হারাবো আমি এ ক্লান্ত দেহ ও মন রবে না এখানে
আমার অতীত হয়ে পৃথিবীর প্রান্তে তুমি থেকো বর্তমান।

## দশ

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও তিনটি বছর। এর মধ্যে প্রদীপ বিলেতের কোর্স সমাপন করে পেল তার ডিপ্লোমা। ওদিকে ফার্মও তার কাজে খুসী হয়ে তাকে দিল বড় বড় প্রশংসাপত্র। ইংলণ্ডে অভিজ্ঞলোকের অপ্রাচুর্য্য, ফার্ম প্রস্তুত ছিল প্রদীপকে পাকাপাকি ভাবে তাদের অফিসার গ্রেড-এ ভর্ত্তি করে নিতে, কিন্তু সে রাজী হ'ল না। স্বাধীন ভারতে তার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন অনেক বেশী—গায়ত্রীও বার বার এই কথাই লিখছিল।

এই তিন বছর প্রদীপ কাটিয়েছিল ব্রহ্মচারীর মত। এমিলির মৃত্যুতে জীবনের অর্থহীন কলরবের উপর তার যে ধিক্কার এসেছিল, তা' যদিও ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে আসছিল, তবু শুধু দৈহিক আনন্দের প্রতি কোন আসক্তি তার ছিল না বললেই চলে।—ইচ্ছা করলে লণ্ডনের বিরাট নাট্যশালা থেকে সে একাধিক শয্যাসঙ্গিনী সংগ্রহ করতে পারত, কিন্তু সেদিকে তার প্রবৃত্তি যায়নি।

ছবির সঙ্গে তার আরও দু'-একবার দেখা হয়েছিল, একবার একটা থিয়েটার-গৃহে, আর একবার উইম্বলডন্ টেনিস খেলার মাঠে। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ভাবে সে ছবির সঙ্গে বাক্যবিনিময় করেছিল। যখন তারা মুখোমুখি এসে পড়েছিল, ছবি তাকে প্রশ্ন করেছিল তার পরীক্ষার কথা, তার দেশে ফেরার সময় হ'ল কি না। আর সে-ও পাল্টা প্রশ্ন করেছিল অনেকটা ঐ জাতীয়।

অবশেষে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে সে ভারতগামী এক জাহাজে রওনা হ'ল দেশের পথে। সুদীর্ঘ চার বৎসর পরে এই প্রত্যাবর্ত্তন।

ওদিকে দেশেও পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছিল অনেক, অন্তত: বাহ্যিক প্রকাশে। স্বাধীনতা লাভের পর প্রথমে তৈরী হ'ল রাষ্ট্রের কাঠামো, ভারতবর্ষ বেছে নিল সাধারণতন্ত্র। দেশকে উন্নত করবার জন্য বসল কমিশন, তাঁরা তৈরী করলেন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া। বাইরে থেকে হঠাৎ যাঁরা উপস্থিত হ'লেন তাঁরা অবাক্ হয়ে দেখলেন, দেশের লোকের মধ্যে জেগেছে একটা বিরাট উপলব্ধি—একটা অনুভূতি যে অবশেষে সুযোগ মিলেছে, দেশকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে হবে এবং সেই সমৃদ্ধির অংশ দিতে হবে ছোট-বড় সবাইকে।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেননি তার পেছনে ছিল খানিকটা আদর্শবাদ। চিরকাল তিনি কর্ম্মী, অর্থের লালসা তাঁর কোন দিনই ছিল না, তাই বন্ধুদের অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা ক'রে রয়ে গেলেন মন্ত্রিসভার বাইরে।

বৃটিশ আমল থেকেই জ্যোতির্ম্ময় বাবু একটা সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। সেটা হচ্ছে যে অর্থের চেয়েও বড় হচ্ছে ক্ষমতা, বিশেষ করে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যদি সম্ভবপর হয় যবনিকার অন্তরাল থেকে। মহাত্মা গান্ধীও ত সর্ব্বদা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট থাকেননি। এমন অনেক সময় গেছে যখন তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বাইরেও ছিলেন; তবু তাঁর ক্ষমতা, তাঁর প্রভাব ছিল অতুলনীয়! জ্যোতির্ম্ময় বাবু বেছে নিলেন গান্ধীজির পন্থা।

অবশ্য গান্ধীজির মত যদি তাঁর নিঃস্বার্থতা থাকত, তিনি যদি হতেন দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য একাগ্রচিত্ত, তাহ'লে কিছুই বলবার ছিল না। কিন্তু যে আত্মম্ভরিতা, যে দম্ভ এত দিন প্রকাশিত হয়েছিল বিদেশী রাজশক্তির প্রতিবাদে, আজ তা' ছড়িয়ে পড়ল নতুন রাজশক্তির যারা বিন্দুমাত্র সমালোচনা করতে সাহস করে তাদের প্রতি অস্ত্রপ্রয়োগে।—কংগ্রেসের যারা বিরুদ্ধাচারী, তারা সবাই দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, এই হ'ল তাঁর একমাত্র অনুধাবন।

এর ফল হ'ল এই যে, ধীরে ধীরে তাঁর চারদিকে গড়ে উঠল স্বার্থান্বেষী স্তাবকের দল। এঁরা প্রতিপক্ষের যাদেরই প্রতি ছিল কোন অভিযোগ, তাদের সম্বন্ধে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর কাছে নানারকম নিন্দা করতে লাগলেন, কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে, কখনও পরোক্ষে। প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে, তারাই আসল স্বার্থান্বেষী, অত্যাচারী।—ধীরে ধীরে জ্যোতির্ম্ময় বাবু তাঁর পার্শ্বচরদের কথা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করতে লাগলেন এবং তাঁর মনের মধ্যে গড়ে উঠল একটা দাম্ভিক আত্মপ্রত্যয়, যা' কোন প্রকার বাধা বা যুক্তি মানে না।

অটলবিহারী বাবু জ্যোতির্ম্ময় বাবুর এই মানসিক উদ্ভবের সুবিধা গ্রহণ করতে এতটুকু দেরী করলেন না। জ্যোতির্ম্ময় বাবুকে বৈবাহিকরূপে পেয়ে বাজারে ইতিমধ্যেই তাঁর দাম অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল, এখন অটলবিহারী বাবুর বাড়ীতেই আনাগোনা সুরু করেছিল কত অনুগ্রহপ্রার্থীর দল। তিনি এদের মধ্যে বাছাই করতে সুরু করলেন। যারা সত্যি সত্যি অনুগত, অর্থাৎ যারা বিদ্রোহের কথা স্বপ্নেও মনে করতে পারে না, তাদের তিনি দিলেন আশ্বাস। আর আশ্বাস দিলেন আর এক শ্রেণীর লোককে, যাদের মারফতে তাঁর ব্যবসার উন্নতি, ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমা হবার সম্ভাবনা।

বাছাইকরা লোকদের নিয়ে তিনি যেতে সুরু করলেন জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বৈঠকখানায়। সেখানে আসতেন শুধু মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের সম্প্রদায় নয়, বড় বড় বিলাতি কোম্পানীর সাহেব, ধনী মাড়োয়ারী, পদস্থ ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, এমন কি গর্ব্বোদ্ধত সিভিলিয়ান সুপ্রকাশ রয় এবং তাঁর অনেক সতীর্থ। জ্যোতির্ম্ময় বাবু সর্ব্বদা ব্যস্ত, কাউকে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু যারা প্রার্থী, যারা উপযাচক, তারা ঐ সময়টুকু পেলেই কৃতার্থ। অটলবিহারী বাবু সর্ব্বদা দেখতে লাগলেন জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ঐ মাপা পাঁচ মিনিটটুকু যেন উপযুক্ত পাত্রে বর্ষিত হয়।

নবকিশোরেরও উন্নতি হ'ল। সুমিত্রাকে বিয়ে করার পর তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খানিকটা খর্ব্ব হলেও তার ক্ষতিপূরণ সে পেল অন্য ভাবে। শ্বশুরের অনুগ্রহে সে অচিরেই বহাল হ'ল একটা বিলিতি কোম্পানীর শাখা-ম্যানেজার ভাবে এবং তারই কয়েক মাসের মধ্যে কোম্পানীর খরচে সে সস্ত্রীক চলে গেল ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণী সফর করতে। বামপন্থী এক কাগজে এ সম্বন্ধে কটু মন্তব্য করা হয়েছিল কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় বাবুর মুখপত্র থেকে এল তীব্র প্রতিবাদ। জ্যোতির্ম্ময় বাবুর নিরপেক্ষতা এবং নির্লিপ্ততার উপর সন্দেহ প্রকাশ, এ যে ঘোরতর সিডিশন!

মিঃ সুপ্রকাশ করও দলের মধ্যে ভিড়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে, তিনি হচ্ছেন সিভিল সার্ভেণ্ট অর্থাৎ অনুন্নত দাস। কি প্রয়োজন তাঁর প্রতিবাদ করায়? বৃটিশ আমল থেকেই তিনি শিখে এসেছিলেন যে সিভিল সার্ভেণ্টের কর্ত্তব্য হচ্ছে নির্ব্বিচারে হুকুম তামিল করা, হুকুমের যুক্তিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করাও যে ঔদ্ধত্য! তাই নতুন যুগেও তিনি অনুসরণ করলেন সেই নীতি, যদিও মাঝে মাঝে তাঁর সিভিলিয়ানি বিবেকও হয়ে উঠত একটু চঞ্চল, একটু ক্ষুব্ধ। এই সব মুহূর্ত্তে মনকে সান্ত্বনা দিতেন এই বলে যে, তিনি যদি হুকুম তামিল না-ও করেন, তাহ'লে কর্ত্তাদের নির্দ্দেশ পালন করবার লোকের অভাব হবে না। তখন উপকার হবে কার? মাঝখান থেকে তাঁরই হবে সমূহ ক্ষতি।···এমন বোকামিও কেউ করে, বিশেষ ক'রে পেন্সনের প্রাক্কালে?

নতুন পরিবেশের সঙ্গে স্বামীর সামঞ্জস্য আনবার কঠিন কাজে স্ত্রী গায়ত্রীই এক কালে এগিয়ে এসেছিল ·এবং সেই উদ্দেশ্যে অনেক পার্টিও দিয়েছিল নতুন যুগের প্রভুদের এবং তাদের অনুচরবৃন্দকে। কিন্তু একদিন সে-ও বেঁকে দাঁড়াল, যখন সে দেখল যে আদর্শ সিভিল সার্ভেণ্ট হবার প্রচেষ্টায় সুপ্রকাশ সাধারণ নৈতিক অনুশাসনেরও অবমাননা করছে। ঘটনাটা ঘটল যখন একজন কর্ম্মপ্রার্থী গায়ত্রীর এক বন্ধুর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল গায়ত্রীর বাড়ীতে।

গায়ত্রী অনিমেষের কাহিনী শুনল। সে শুনল যে, তার স্বামীরই অধীনস্থ এক দপ্তরে একটি অফিসারের চাকুরী খালি হয়েছিল, যথারীতি বিজ্ঞপ্তি এবং ইণ্টারভিয়্যুর পর সুপারিশ কমিটি তাকেই মনোনয়ন করে, কিন্তু মিঃ কর এই মনোনয়ন গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, তার স্থানে তিনি মনোনয়ন করবেন অপর একজনকে, যার স্থান অনেক নীচে।

গায়ত্রী বলল, দেখুন, ওঁর অফিসিয়াল ব্যাপারে আমি কখনও হস্তক্ষেপ করি না। কাজেই কি কারণে উনি আপনাকে সিলেক্ট করেননি, সে সম্বন্ধে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করতে আমি অসমর্থ।—নিশ্চয়ই কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

করুণ ভাবে অনিমেষ বলল, যুক্তিসঙ্গত কোনই কারণ নেই, মিসেস কর! আসল কারণ হচ্ছে এই যে, উনি যাকে নিতে চান, তিনি হচ্ছেন জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র।

—এ আমি বিশ্বাস করি না।—দৃঢ় ভাবে গায়ত্রী বলল।

—আমি মিছে কথা বলছি না, মিসেস কর!—আপনিই ওঁকে প্রশ্ন করে দেখবেন, আমি নিশ্চিত জানি, উনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

সন্ধ্যার পর মিঃ কর যখন বাড়ীতে ফিরলেন, তখন গায়ত্রী উত্থাপন করল অনিমেষের কথা—নিতান্ত সঙ্কোচের সঙ্গে।

—আমার অফিসিয়াল ব্যাপার নিয়ে তুমি ত এত দিন মাথা ঘামাওনি, গায়ত্রী! আজ হঠাৎ?

—মাথা ঘামাতাম না, কিন্তু অনিমেষ আমার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে বলেই প্রশ্ন করছি।

একটু বিরক্তির সঙ্গে মিঃ কর জবাব দিলেন, অনেক কারণ আছে, যার জন্য আমরা অনিমেষকে এই চাকুরীর জন্য বিবেচনা করতে পারি না।—সব কথা তোমাকে খুলে বলা যায় না।

কাতর ভাবে গায়ত্রী বলল, ভবিষ্যতে এ-সব বিষয় নিয়ে তোমাকে আর বিরক্ত করব না। আজ আমাকে বল কি কারণ—আমি কাউকে বলব না, অনিমেষকেও নয়।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে মিঃ কর বললেন, একটা কারণ, অনিমেষ হচ্ছে বামপন্থী, সরকারের নীতির সে নিন্দা করে থাকে।

—আর অন্য কারণগুলো কি?

—আরেকটা কারণ, এই চাকুরীটা দিতে হবে অন্য একজনকে, ওপর থেকে হুকুম এসেছে।

—হুকুম এসেছে? লিখিত হুকুম?

—তুমি বড্ড তর্ক কর, গায়ত্রী! সরকার হুকুম কি সব সময় কাগজে-কলমে লিখে দেন? মুখের নির্দ্দেশই যথেষ্ট।

—তার মানে, যদিও তোমাদের কমিটি বলছে যে, অনিমেষই সবচেয়ে যোগ্য প্রার্থী। তবু সে চাকুরীটা পাবে না। কারণ, তোমার ওপরওয়ালা কারোর অন্য প্রার্থী আছে। অনিমেষকে বাতিল করবার জন্য তোমরা খুঁজে খুঁজে বার করেছ অত্যন্ত অর্থহীন একটা ওজর—কি না, সে সরকারের নীতির নিন্দা করে থাকে। কে সরকারের নীতির নিন্দা করে না শুনি? তুমি করো না? আমি করি না?

গায়ত্রী সত্য সত্যই রেগে উঠেছিল। বলে চলল, তবু খানিকটা সান্ত্বনা থাকত যদি জানতাম যে, যাকে তোমরা চাকুরীটা দেবে বলে স্থির করেছ সে তার উপযুক্ত! এক কালে নির্ভীক নিরপেক্ষ অফিসার বলে তোমার কত প্রশংসা শুনেছি জনসাধারণের কাছে, বন্ধু মহলে। কোথায় গেল তোমার নির্ভয়, তোমার নিরপেক্ষতা?

ক্লান্ত ভাবে মিঃ কর বললেন, তোমার তিরস্কার আমি মেনে নিচ্ছি গায়ত্রী, কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা। আমি আপত্তি করলেও সে আপত্তি টিকবে না।

তীব্র শ্লেষমিশ্রিত কণ্ঠে গায়ত্রী বলল, পৃথিবীর মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষদের ঐ এক কথা: আমি আপত্তি করলেও সেই আপত্তি টিকবে না, আমি যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ করি তাহলে আমার স্থানে আসবে এমন লোক—যার বিবেক বলে কোন পদার্থই নেই! অতএব যে পথে সবচেয়ে কম বাধা, সেই পথই অনুসরণ করা যাক। •

মিঃ কর চুপ করে রইলেন।

যথাসময়ে বন্দনা প্রদীপের চিঠি পেয়েছিল। রওনা হবার হপ্তাখানেক আগে প্রদীপ তার কাছে চিঠি লিখেছিল, তার ডিপ্লোমা লাভের খবর দিয়ে এবং তাকে জানিয়ে যে মাসখানেকের মধ্যেই সে দেশে পৌঁছবে।

প্রায় তিন সাড়ে তিন বৎসর পত্রবিনিময় তারা করেছে, কিন্তু

বন্দনার কাছে প্রদীপ রয়ে গিয়েছিল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। প্রদীপের চিঠিতে ভালবাসার এতটুকু প্রকাশ সে দেখেনি, একমাত্র তার জাহাজ থেকে লেখা প্রথম চিঠিটায় ছাড়া। বিলেতের আবহাওয়াই বোধ হয় মানুষকে এমন করে বদলে দেয়!

তবে একটা পরিবর্তন তার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। বন্দনা লক্ষ্য করেছিল, ১৯৪৮ সালের পর অবধি প্রদীপের চিঠিগুলোর মধ্যে ছিল একটা অবসাদের সুর, যেন সে অত্যন্ত ক্লান্ত, জীবনের বোঝা আর বইতে পারছে না। বন্দনা তার এক চিঠিতে একবার এ সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করেছিল, কিন্তু প্রদীপ এই প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ অবধি প্রদীপের চিঠিতে বিষাদের ছায়া ছিল অবিচ্ছিন্ন।

বন্দনা প্রদীপের চিঠিগুলো গায়ত্রীকে দেখাত। ছবি সংক্রান্ত ব্যাপারে গায়ত্রীর হস্তক্ষেপ করার পর অবধি গায়ত্রীদি'র সঙ্গে তার বন্ধুত্ব অনেকখানি গভীর এবং সহজ হয়ে এসেছিল। গায়ত্রী ও প্রদীপের এই অবসাদের কোন কারণ নির্দ্ধারণ করতে পারেনি। অবশেষে তারা দু'জনেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, এতদিন দেশের বাইরে থাকার ফলে প্রদীপের মত লোকের মনে বিষাদের ছায়া পড়া মোটেই আশ্চর্য্যের নয়।

## এগারো

যে তিন সপ্তাহ প্রদীপ জাহাজে ছিল তার অধিকাংশ সময় সে কাটাল নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে এবং নিশ্চুপ আত্মবিশ্লেষণে। জাহাজে পূর্ব্বপরিচিত বিশেষ কেউ ছিল না, দু'-চারজনের সঙ্গে পরিচয়ের যে সূত্রপাত হয়েছিল তা' হয়ত খানিকটা অন্তরঙ্গতায় পূর্ণতালাভ করতে পারত, কিন্তু প্রদীপ সেদিকে ঘেঁষল না। সে নিজেকে মগ্ন রাখল বই-এর পাতায় এবং সমুদ্রের কালো, নীল, লোহিত জলের ধ্যানে। ফলে, তার সঙ্গে যারা আলাপ করতে সুরু করেছিল তারাও ধীরে ধীরে কেটে পড়ল।

সে ভাবতে লাগল, দেশের নতুন পরিবেষ্টনে তার স্থান কোথায় হবে। যে ভাবে এবং যে সময়ে সে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল (পলায়ন বই কি? এমিলিও ঠিক এই আখ্যাই দিয়েছিল তার প্রস্থানকে) তাতে তার ভূতপূর্ব্ব শুভানুধ্যায়ীরা যে খুসী হয়নি, তা' সে খানিকটা আন্দাজ ক'রে নিয়েছিল। সেবাব্রতী কর্ম্মী প্রদীপ আজ বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ডিপ্লোমা এবং প্র্যাক্‌টিক্যাল ট্রেনিংএর ছাপ নিয়ে "সাহেব" হয়ে ফিরছে, এটা কি সকলে পছন্দ করবে? যারা তার সহকর্ম্মী ছিল তারা কি একটু অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করবে না?

কিন্তু সকলেই নিশ্চয় তাকে অবহেলা করবে না। খবরের কাগজে সে পড়েছে দেশনেতৃবৃন্দের আবেদন—বিরাট কাজ পড়ে আছে প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্মুখে, তোমরা এসে যোগদান করো এই মহান্ অভিযানে, গড়ে তোল নতুন ভারত, এনে দাও তাকে বিশ্বের দরবারে প্রথম শ্রেণীতে। এই চার বছরে যেটুকু অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে তা' সে উৎসর্গ করতে চায় দেশের কাজে। নিজের খাওয়া-পরার মত এবং মাসে মাসে কিছু বই কেনবার মত টাকা পেলেই সে হবে সন্তুষ্ট।
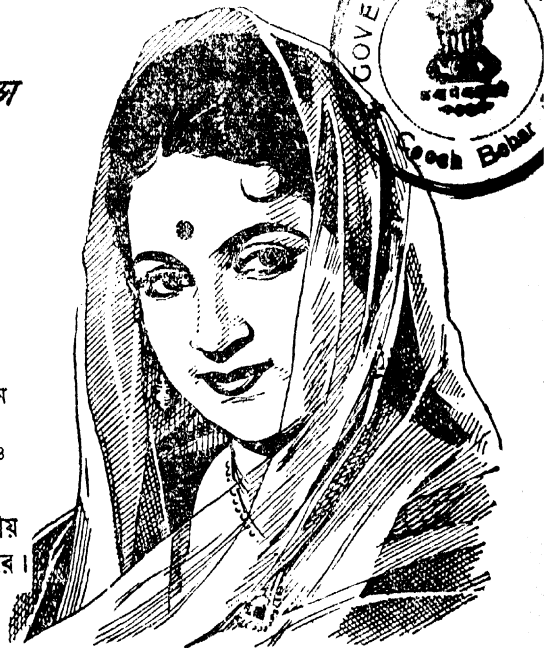
আচ্ছা, বন্দনা তাকে গ্রহণ করবে কি ভাবে? ইচ্ছা করেই সে বন্দনার কাছে কোন উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি লেখেনি। তার জীবনের একটা অধ্যায় যা' এমিলির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত—বন্দনার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। সেটা সম্পূর্ণ গোপন রেখে সে কি করে বন্দনাকে জানায় তার একাকাঙ্খ, প্রার্থনা করে তার সহানুভূতি, তার স্নেহ-ভালবাসা?

শুধু এমিলির কথা নয়, ছবির কথাও জানাতে হবে বন্দনাকে। কোন ঘটনাই বাদ দেওয়া চলবে না, সেই মোমিনপুরে ছবির সঙ্গে প্রথম আলাপ থেকে সুরু করে ব্রাইটন-এর উপসংহার পর্য্যন্ত।

আচ্ছা, এ-সব বন্দনাকে জানিয়ে কি লাভ? বিশেষ ক'রে এমিলির কাহিনী? কুহেলিকার অন্তরালে থাকুক না পড়ে তার বিগতজীবন! এমিলি এ পৃথিবীর বুক থেকে চলে গেছে চিরদিনের জন্য, আর ছবিও নিঃশেষে মুছে গেছে তার জীবনের পটভূমিকা থেকে! কি প্রয়োজন জের টেনে আনবার এমন দুটো অধ্যায়ের, যার ছায়া বন্দনাকে হয়ত কোন দিনই স্পর্শ করবে না।

কিন্তু এ কি Machiavellian নীতি অনুসরণ করবার কথা ভাবছে সে? অবশেষে সে, প্রদীপ, ব্যবহারিক জগতের লাভ-লোকসানের মাপকাঠিতে স্থির করবে তার কর্ম্মপদ্ধতি? না, না, যত ক্ষতিই হোক্ না কেন, প্রতারণার আশ্রয় সে নিতে পারবে না। হাঁা, প্রতারণা বই কি! যখন তুমি জান যে অপর পক্ষ তোমাকে বিশ্বাস করছে, গ্রহণ করছে নির্বিচারে, তখন তার কাছে তোমার জীবনের অত্যন্ত নিবিড় অধ্যায়গুলো গোপন করে যাওয়া প্রতারণা ছাড়া আর কি?

প্রদীপ অনেক ভাবল, কিন্তু কি করবে কিছুই স্থির করে উঠতে পারল না।

বোম্বাই থেকে প্রদীপ সোজা চলে এল কলকাতায়, গায়ত্রীর কাছে। গায়ত্রীই তাকে লিখেছিল যে কলকাতায় যত দিন তার অন্য ব্যবস্থা না হয়, সে যেন তার কাছেই থাকে; তার ফ্ল্যাটটা বেশ বড়, প্রদীপকে রাখতে কোনই অসুবিধা হবে না। কৃতজ্ঞচিত্তে প্রদীপ গ্রহণ করল গায়ত্রীর আমন্ত্রণ।

সে অবাক্ হয়ে দেখল, এই কয়েক বছরের মধ্যে মিঃ কর কি ভয়ানক ভাবে বদলে গেছেন! প্রথমতঃ, তাঁর বয়স যেন এগিয়ে গেছে অন্ততঃ দশ বা পনর বছর। চুলগুলো প্রায় শাদা হয়ে এসেছে, নেই সেই আগেকার গাম্ভীর ঔদ্ধত্য। দ্বিতীয়তঃ, কথা বলেন তিনি খুবই কম, সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত, যখন কাজ থাকে না তখনও অন্যমনস্ক। এর আগেও প্রদীপ তাঁর কাজে ব্যস্ততার পরিচয় পেয়েছে কিন্তু তখন তার মধ্যে প্রাণ ছিল, এখন কাজের চাপ যেন তাঁকে জোর করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

আরও অবাক হল মিঃ করের বেশভূষা, চালচলনের পরিবর্তন দেখে। খদ্দরের বুশসার্ট বা গলাবন্ধ কোট ছাড়া অন্য কোন পোষাক তিনি পরেন না, পাইপ খাওয়া এক প্রকার ছেড়ে দিয়েছেন বললেই চলে, সন্ধ্যাকালীন নিয়মিত পানীয়ও খান চুপি চুপি, যেন কেউ জানতে না পায়। তাঁর ড্রইংরুমের পর্দাগুলো খাদি প্রতিষ্ঠানের আমদানী, এবং ম্যান্টেলপিস্‌এ আছে মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত নেহরুর প্রতিকৃতি। যাতে ঘরে ঢুকলেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় সেদিকে।

প্রদীপ একটা প্রশ্ন করবার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। গায়ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, দিদি, নতুন যুগ এসেছে, তাই নতুন পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করার প্রয়াসটা অসঙ্গত নয়। কিন্তু সার জন হার্বার্ট এবং মিঃ কেসির স্বাক্ষরিত ফটোগুলো গেল কোথায়? তোমার সেই ক্রেট-এর ঘরে নয় ত?

ক্ষণিকের জন্য গায়ত্রীর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। বলল, সেগুলো বাক্সে বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়েছে।

প্রদীপ আরও লক্ষ্য করল, মিঃ কর প্রতি রবিবার ভোর আটটার সময় কোথায় বেরিয়ে যান, বাড়ীতে ফেরেন দশটা, এগারোটা বা বারোটায়।

প্রদীপের প্রশ্নের উত্তরে গায়ত্রী বলল, উনি যান ওঁর মন্ত্রীর বাড়ীতে।

—কেন? রবিবারে আবার কি কাজ? শনিবারেও ফেরেন সেই সন্ধ্যা সাতটায়!

—উনি যে এখন সেক্রেটারী হয়েছেন। অনেক জরুরী কাজ থাকে।

—প্রত্যেক রবিবারে?—সবিস্ময়ে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—সে আমি কি করে জানব, প্রদীপ! ওঁকে যেতে হয়।

প্রদীপ তবু নাছোড়বান্দা। প্রশ্ন করল, কিন্তু কোন ফাইল নিয়ে যেতে ত দেখি না!

—আঃ, প্রদীপ, কেবল প্রশ্ন! সব সময় ফাইলের প্রয়োজন হয় না।

—দিদি, তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।

—কেন?

—কেন তা' তুমি নিজেই জানো। তুমি কেন মিঃ করকে ব'লো না যে কোন লাভ নেই এই প্রকার মূর্ত্তিপূজায়?—আমি নিজেই হয় ত বলতাম, কিন্তু আমি যে তোমাদের অতিথি, অনধিকার চর্চ্চা আমার শোভা পাবে না।

—আমাকে যে তুমি বলছ সেটা বুঝি অনধিকার চর্চ্চা নয়?

—তোমাকে মিসেস কর হিসেবে বলছি না, বলছি আমার দিদি হিসেবে।

—শোন, প্রদীপ, তুমি সদ্য-সদ্য বিলেত থেকে এসেছ, তাই তোমার কাছে এসব অদ্ভুত ঠেকছে। কিছুদিন এখানে থাকলে এ তোমার গা-সওয়া হয়ে যাবে।

—ঐ ভয়ই ত আমি করছি, দিদি! স্বাধীন ভারতের রাজকর্মচারীদের গতিবিধির নমুনা দেখে এখন চাঞ্চল্য জাগছে, কিন্তু দু'মাস পরে আমারও হয়ত মনে হবে, এ অত্যন্ত স্বাভাবিক, শুধু স্বাভাবিক নয়, শোভনও।

—প্রদীপ, তুমি এখনও আগেরই মত ভাবালু রয়েছ। এভাবে পৃথিবীতে বাস করা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম, এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই।

—হয়ত তোমার কথাই ঠিক, দিদি! বিলেতের ঘোপটা এখনও গায়ে লেগে রয়েছে কি না, তোমাদের আশীর্ব্বাদে সেটা কেটে যেতে খুব বেশী দেরী হবে না!

প্রদীপ ভেবেছিল গায়ত্রীর সঙ্গে এমিলির কাহিনী আলোচ

বে, ছবি সম্পর্কিত যে সব কথা চিঠিতে বলা হয়নি তা'-ও বে। কিন্তু মিঃ করকে উপলক্ষ্য ক'রে তার এবং গায়ত্রীর ধ্যে যে বাদানুবাদ হ'ল তাতে তার কেবলই মনে হতে লাগল যে গায়ত্রীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহানুভূতি সে পাবে না।

অশান্ত এবং অবরুদ্ধ মন নিয়ে সে গেল বন্দনার কাছে।

বাড়ীতে বন্দনা ছিল একা। কম্পমান চক্ষে সে অপেক্ষা করছিল প্রদীপের আগমন। গায়ত্রীর বাড়ী থেকে টেলিফোন করে প্রদীপ তাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল যে সে আসছে।

—এই চার বছরে তোমার চেহারার এতটুকু পরিবর্ত্তন হয়নি ত' বন্দনা! প্রদীপ বলল।

বন্দনা সত্যি কাঁপছিল, কিন্তু সে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করল প্রদীপের এই সহজ সম্ভাষণে। নতমুখে, অথচ একটু হেসে জবাব দিল, তুমি খুব পরিবর্ত্তন দেখবে আশা করেছিলে বুঝি?

—না, তবে ভেবেছিলাম, স্বাধীন ভারতে অনেকের মত তোমার চেহারাও ঠিক আগের মত থাকবে না। যাক সে কথা, তোমার বাবা, দাদা, ওঁরা কোথায়?

—বাড়ীতে নেই। তোমাকে টেলিফোনে বলেছিলাম, ভুলে গেছ বুঝি?

অপ্রস্তুত ভাবে প্রদীপ জবাব দিল, এই দেখ, আমার যে কি হয়েছে, সব কথাই ভুলে যেতে সুরু করেছি! তোমাকে যে ভুলিনি, সেটাই আশ্চর্য্য!

তারপর একটু গম্ভীর ভাবে বলল, শোন, বন্দনা, আমাকে খানিকটা সময় দিতে হবে, অনেক কথা বলবার আছে। তোমার বাড়ীতে যদিও এখন কেউ নেই, তবু সুরু করতে ভরসা পাই না, কখন তোমার দাদা অথবা বাবা এসে পড়েন।

—খুবই জরুরী কথা কি? উদ্বিগ্ন ভাবে বন্দনা প্রশ্ন করল।

—জরুরী বই কি, তবে এমন জরুরী নয় যে দু'দিন অপেক্ষা করা চলে না। ঘণ্টা দুই দরকার হবে, তুমি ভেবে-চিন্তে ব'লো, কোন দিন এবং কোথায় এই সময়টুকু পেতে পারি।

—তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে দিচ্ছ, প্রদীপ! এমন কি কথা আছে যা' বলতে দু'ঘণ্টা লাগবে?

—সে রহস্য এখন ভাঙ্গতে পারব না। যথাসময়ে এবং যথাস্থানে শুনতে পাবে।

এবার প্রদীপ অন্য কথার অবতারণা করল। বলল, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, এক পেয়ালা চা' দিতে পার?

লজ্জিত ভাবে বন্দনা বলল, দেখ, আমারও কেমন ভুল! চায়ের জল বসিয়ে রেখে এসেছি, তোমার হেঁয়ালি শুনতে গিয়ে খেয়ালই ছিল না।

সে ছুটল চা' তৈরী করতে।

মিঃ করের নির্দ্দেশমত সে তার আবেদনপত্র পাঠাল সরকারী এবং বেসরকারী তিন-চারটি দপ্তরে—চাকুরী প্রার্থনা ক'রে। মিঃ কর আশ্বাস দিলেন যে তিনিও চেষ্টা করবেন যাতে শীগগিরই একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। বললেন, তোমার যে ডিপ্লোমা এবং অভিজ্ঞতা আছে, তাতে বেশ মোটা মাইনেই পাবে বলে মনে হয়।

প্রদীপ বলল যে, সে খুব মোটা মাইনের প্রার্থী নয়। সে চায় এমন কাজ যেখানে তার উপরওয়ালা তার হাতে ছেড়ে দেবেন অনেকখানি দায়িত্ব। সে নিজে হাতে গড়ে তুলতে চায় কোন একটা প্রতিষ্ঠান—একা নয়, সকলের সাহায্য নিয়ে।

এর কয়েক দিন পরে প্রদীপ গেল জ্যোতির্ম্ময় বাবুর ওখানে। গায়ত্রীর কাছ থেকেই সে শুনেছিল জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সময়ের মূল্যের কথা—তাই বুদ্ধিমানের মত আগে থেকেই তাঁর সেক্রেটারীর মারফৎ অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট করে নিয়েছিল।

প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর জ্যোতির্ম্ময় বাবুর কামরায় তার ডাক পড়ল। পূর্ব্ব অভ্যাসমত সে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করল।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু খুসী হলেন। তাকে বসতে বললেন, কুশল-প্রশ্ন করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, বিলেতে তার শিক্ষার কথা এবং এখন তার কি প্ল্যান্।

সংক্ষেপে প্রদীপ জানাল কি কি বিষয়ে সে ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করে এসেছে। আরও জানাল যে, মিঃ করের নির্দ্দেশানুসারে সে কয়েক জায়গায় পাঠিয়েছে তাঁর আবেদনপত্র।

—মিঃ কর? কোন মিঃ কর?—জ্যোতির্ম্ময় বাবু চেয়ারে উঠে বসলেন।

প্রদীপ মিঃ করের পরিচয় দিল।

—সিভিলিয়ান কর? তার সঙ্গে তোমার আলাপ হ'ল কি করে?

প্রদীপ বলল যে, বিলেত যাবার অনেক আগেই তার পরিচয় হয়েছিল মিঃ কর এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে।—মিসেস কর যে তাকে অনেকখানি স্নেহ করেন, তার আভাসও সে দিল।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, প্রদীপ, তুমি কি ক'রে এঁদের দলে ভিড়লে, যখন আমরা এঁদের সঙ্গে করছিলাম যুদ্ধ! এ যে রীতিমত চক্রান্ত!

প্রদীপ হঠাৎ গরম হয়ে উঠল। বলল, আমি চক্রান্ত করিনি, মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়! সিভিলিয়ান বলে ওঁরা যে অপাংক্তেয়, এ নির্দ্দেশ আমাদের কখনও দেওয়া হয়নি। তাছাড়া ওঁদের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা আমি করিনি, করবার প্রয়োজন হয়নি। মানুষ হিসেবে ওঁদের সঙ্গে মিশে'ছি।

বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় বাবু বললেন, মানুষ? তুমি সুপ্রকাশ করকে মানুষের পর্য্যায়ে ফেল? মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ যত এই উচ্ছিষ্টভোজী সিভিলিয়ানের দল!

প্রদীপ ত স্তম্ভিত! যে কথা জ্যোতির্ম্ময় বাবুর মুখ দিয়ে আজ হঠাৎ বেরিয়ে এল তা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, প্রদীপ জোর করে বলতে পারে না, বিশেষ ক'রে এই কয় দিনে মিঃ করকে সামনাসামনি পর্য্যবেক্ষণ করার পর। কিন্তু তার কেবলই মনে হ'তে লাগল, কি হতভাগ্য এই সব রাজকর্ম্মচারীর দল! প্রাণপণে তারা প্রভুর সেবা করছে, কিন্তু যাদের সেবা করছে তারা খাতির করে, সময় সময় ভয়ও করে বা, কিন্তু শ্রদ্ধা করে না! হায় মিঃ সুপ্রকাশ কর!

জ্যোতির্ম্ময় বাবু বলে চললেন, কারও ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করা আমার স্বভাব নয়, তবে তুমি আমার ছেলের মত, এবং এককালে ছিলে কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী, তাই তোমাকে বলছি, এঁদের সংস্রব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করো। এঁরা হচ্ছেন মিউজিয়ম পীস। বৃটিশ রাজত্বে বিলিতি প্রভুরা এঁদের দিয়ে করিয়ে নিতেন কতকগুলো

অপ্রীতিকর কাজ। যখনই আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে চেঁচিয়ে বলতাম বৃটিশ কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করছে, তখন সরকার সাজতেন সাধু, ভারতীয় সিভিলিয়ানদের দেখিয়ে বলতেন, এঁরা ত তোমাদেরই আপনজন, এঁরা যা করছেন তাকে তোমরা অত্যাচার বল ? আর বিদেশেও চলত অনুরূপ প্রোপাগ্যাণ্ডা, অন্যায় বিদ্রোহ করছে কয়েক জন মুষ্টিমেয় লোক, দেশের শাসনভার ত দেশীয় কর্ম্মচারীদেরই হাতে !

—অথচ আপনারা এঁদেরই সাহায্য নিয়ে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন চালাচ্ছেন ?

—সেটা হচ্ছে ট্যাকটিক্স, প্রদীপ ! আমরা অরাজকতার সৃষ্টি করতে চাইনে। যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এক্ষুণি সব ওলট-পালট করা চলবে না, তাই এঁদের আমরা গ্রহণ করেছি। যত দিন আমাদের আদর্শ আমাদের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করবেন, আমরা এঁদের ভাতে মারব না। কিন্তু ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের দৃঢ়তা, এঁদের নেই !

—আপনি বড্ড sweeping কথা বলছেন। এর ব্যতিক্রম কি কখনও আপনার চোখে পড়েনি ?

জ্যোতির্ম্ময় বাবু একটু ভাবলেন, তার পর বললেন, হ্যাঁ, চোখে পড়েছে বই কি ! কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই—ব্যতিক্রমকে অবলম্বন ক'রে সাধারণ সংজ্ঞা টানা যায় না। তা ছাড়া, আবার বলছি, তোমার মিঃ কর এই ব্যতিক্রম নন।

এর জবাবে প্রদীপ কি বলবে ভেবে পেল না।

জ্যোতির্ম্ময় বাবু বললেন, আমার মতামত আমি তোমার ওপর জোর ক'রে চাপাতে চাই না, কিন্তু এখনও আমার উপদেশ, তুমি মিঃ করের সংসর্গ বর্জ্জন করে চলো।

জ্যোতির্ম্ময় বাবুর পাশের টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনটা তুললেন, তারপর বললেন, আচ্ছা, এখন তুমি এসো, দিল্লী থেকে একটা ট্যাঙ্ককল এসেছে, অত্যন্ত জরুরী এবং গোপনীয় কল এটা।

প্রদীপ নমস্কার করে বেরিয়ে এল।

## বারো

প্রদীপ বেরিয়ে এল অনেকটা মুহ্যমানের মত। জ্যোতির্ম্ময় বাবুর সঙ্গে কথোপকথন তাকে ক'রে দিয়েছিল বিপর্য্যস্ত, বিক্ষিপ্ত ! যে সিভিল সার্ভিসকে সে এত দিন জেনে এসেছে ইস্পাতের বর্ম্মরূপে, এই হয়েছে তার পরিণতি ! আর এঁদের সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের কি উচ্চ ধারণা ! তার ইচ্ছা করছিল, এখুনি যেয়ে মিঃ করকে সব কথা বলে, এবং তাঁকে অনুরোধ করে যেন এই শেষ মুহূর্ত্তেও তিনি তাঁর আত্মসম্মান বিসর্জ্জন না দেন। তাঁর স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখেন।

অন্যমনস্ক ভাবে সে চলতে শুরু করেছিল ভবানীপুরের ফুটপাত ধরে। চমকে উঠল যখন কে একজন তার ঘাড়ে হাত রেখে বলল এই যে, প্রদীপ বাবু না ?

প্রদীপ দেখল, প্রশ্নকর্ত্তা আর কেউ নয়, এ-আর-পির সেই সন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

সন্তোষ বলল, কত দিন পরে দেখা, প্রদীপ বাবু ! শুনলাম আপনি নাকি বিলেত গিয়েছিলেন ? কবে ফিরলেন ? আমাদের ত আর সে সৌভাগ্য হ'ল না !

প্রদীপ মোটেই খুসী হল না সন্তোষের এই গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গতায়। নিছক ভদ্রতার খাতিরে সে তার প্রশ্নগুলোর জবাব দিল সংক্ষেপে।

সন্তোষ কিন্তু তাতে এতটুকুও অপ্রস্তুত বোধ করল না। বলে চলল, আপনি এখন মস্ত বড়লোক। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়ত লজ্জাবোধ করেন। আমরা ত আপনাকে ভুলতে পারিনে। সেই মোমিনপুরের ফ্ল্যাট-এর কথা মনে আছে ত ?

প্রদীপ এবার সত্যি বিরক্তি বোধ করল। কি মতলব সন্তোষের ? হঠাৎ মোমিনপুরের ফ্ল্যাট-এর পুনরাবৃত্তি কেন ?

কিন্তু একটু পরেই বোঝা গেল যে, সন্তোষ মোমিনপুরের উল্লেখ করেছে পরিচয়ের সূতো টেনে আনতে, কোন গূঢ় উদ্দেশ্য তার নেই।

—চাকুরী পেয়েছেন কি ?···সন্তোষ প্রশ্ন করল।

—না, এখনও পাইনি। এই ত সবেমাত্র দেশে ফিরেছি।

—তা মুরুব্বি যদি জোগাড় করতে পারেন তাহলে মোটা চাকুরী পেতে বিশেষ দেরী হবে না। আপনার অনেক contact আছে, connexions আছে, আপনার কথা আলাদা !

—কি বলছেন আপনি সন্তোষ বাবু ?

—নতুন বিলেত থেকে এসেছেন কি না, তাই দেশের হাওয়াটা এখনও রপ্ত হয়নি। দেখুন, অপেক্ষা করুন, অনেক কিছু শিখবেন।

—আপনার লজ্জা করে না এই ভাবে দেশের নেতাদের নিন্দা করতে ? বেশ একটু ভর্ৎসনাসূচক স্বরেই প্রদীপ বলল।

সন্তোষ এতটুকু ভড়কাল না। বলল, সত্যি কথা বলতে লজ্জা করবে কেন প্রদীপ বাবু ? দেশের নেতাদের কথা বলছেন, ওঁরা আছেন বড় বড় পলিসি নিয়ে ব্যস্ত, সাধারণের অভিযোগ ওঁদের কানে সব সময় পৌছয় না, পৌছলেই আশেপাশে যাঁরা আছেন তাঁরা প্রাণপণে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন এসব হচ্ছে have-notদের নিষ্ফল আস্ফালন। আনন্দের বিষয় এই যে অমাত্য পারিষদবর্গের এই প্রচেষ্টা সফলও হয়।

—আনন্দের বিষয় বলছেন কেন ? বিস্মিত ভাবে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—সোজা কথা বুঝছেন না ? আমরা ত এই-ই চাই—আমরা চাই যে দেশে অসন্তোষ আরও বাড়ুক, যাতে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের মাঝ থেকে জ্বলে ওঠে নতুন বিদ্রোহের বহ্নি। আমরা তখন তৈরী করব নতুন সমাজ, দূর করে দেব এই সব ক্যাপিট্যালিষ্টবৎসল স্বার্থান্বেষীদের।

—আপনারা ? আপনারা কে ?

—ওঃ, আপনাকে বলা হয়নি বুঝি ? আমি যে মোমিনপুর এলাকার এক বামপন্থী পার্টির সেক্রেটারী এবং কোষাধ্যক্ষ। আমাদের সঙ্গে ভাব রাখবেন প্রদীপ বাবু ! এক কালে আমরা আপনার কাজে আসতে পারি।

সন্তোষের এই গর্ব্বোদ্ধত কথা শুনে প্রদীপের সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করছিল, কিন্তু তার কৌতূহল বিরক্তিকে অতিক্রম করে গেল। দেখাই যাক না, লোকটা আরো কি বলতে চায়। চার বছর সে দেশছাড়া, দেশের নতুন রূপ সে দেখতে পাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। এ অভিজ্ঞতা উপেক্ষণীয় নয়।

প্রদীপ বলল, আপনাদের পার্টি সম্বন্ধে একটু খুলে বলুন ত ?

আপনি পঞ্চমবাহিনীর লোক নন আশা করি। আর হলেই

যা কি, পঞ্চমবাহিনীর অনেক লোককেই আমরা দেখেছি। হ্যাঁ, আমাদের পার্টির নেতার নাম আপনি খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখেছেন। আমরা এখন কলকাতায় এবং তার উপকণ্ঠে জনমত সৃষ্টি করছি বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা পাবার পরও শাসকদের শোষণনীতি যে এতটুকু বদলায়নি, সেটা প্রমাণ করাই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। তাই আমরা খুঁজে বেড়াই ছিদ্র, কোথায় সরকারের কি গলদ। তা উপস্থাপিত করি আমাদের সাপ্তাহিক সান্ধ্য মজলিস-এ। আপনি আসবেন আমাদের মোমিনপুরের বৈঠকে? আজই একটা মিটিং আছে।

প্রদীপকে একটু ইতস্ততঃ করতে দেখে সন্তোষ বলল, আপনার ভয় নেই, আপনাকে 'এখ্‌খুনি আমাদের পার্টিতে যোগ দিতে বলছি না। তবে আপনারা বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ লোক, আপনারা আসুন, দেখুন দেশের লোক কি বলছে বা ভাবছে।

হাতে উপস্থিত কোন কাজ নেই, প্রদীপ রাজী হ'ল সন্তোষের সঙ্গে যেতে।

প্রদীপ সব চেয়ে আশ্চর্য্য বোধ করল, যখন সন্তোষ তাকে নিয়ে চলল মোমিনপুরের সেই ফ্ল্যাট-এর পথে।

প্রশ্ন করল, কোথায় চলেছেন, সন্তোষ বাবু! আমি আপনাদের পার্টিমিটিং-এ যেতে চাই, আর কোথাও নয়।

সন্তোষ হাসল। বলল, ঠিক জায়গায়ই যাচ্ছি, প্রদীপ বাবু! দেশের হাওয়া বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতিও বদলে গেছে। আপনার সেই পরিচিত জায়গায়ই যাচ্ছি, কিন্তু সেখানে আমরা সীরিয়স কাজ করি, মেয়েমানুষ নিয়ে খেলা করার অবসর কোথায়? তা ছাড়া দেখতে পাচ্ছেন না আমার পরিবর্ত্তন? ছিলাম এ-আর-পি'র একজন বিশিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা, আর এখন হয়েছি বামপন্থী পার্টির স্থানীয় সম্পাদক।

পরিবর্ত্তনের মত পরিবর্ত্তনই বটে! প্রদীপের মনে জাগল সেই অনেক বছর অতীতের স্মৃতি, যখন সে সন্তোষের প্ররোচনায় এসেছিল ছবির সকাশে। সত্যি, বড় অনভিজ্ঞ সে।

দু'জনে এসে উপস্থিত হল সেই আগেকার কামরায়। এবার দেয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি নেই, তার পরিবর্ত্তে আছে প্রতিকৃতি। আসবাবপত্রের মধ্যে আছে একটি টেবিল এবং একটি হাতলওয়ালা কাঠের চেয়ার। তা' ছাড়া সামনে বিস্তৃত রয়েছে ময়লা একটি সতরঞ্চি। সেখানে বসে আছে জন কয়েক কুলিশ্রেণীর লোক, দু'-একজন কলেজের ছাত্র এবং আরও কয়েক জন ছেলে-মেয়ে, যাদের কোন বিশেষ পর্য্যায়ে ফেলা যায় না।

সন্তোষ বলল, চেয়ারের অভাব, প্রদীপ বাবু! আপনাকে 'সতরঞ্চির উপর বসতে হবে।

প্রদীপ দ্বিরুক্তি না করে আসন গেড়ে বসল।

সন্তোষ সুরু করল সভার কাজ।

বলল, ভাই সব, 'বোনেরা, এক সপ্তাহ পরে আমরা মিলিত হয়েছি আমাদের এই সভায়। আপনারা অনেকেই জানেন আমাদের উদ্দেশ্য কি। যাঁরা নবাগত, যাঁরা আজ প্রথম এই সভায় এসেছেন (এর মধ্যে আমার এই বন্ধুও আছেন) তাঁদের অবগতির জন্ম বলছি আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্ত্তমান সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা এবং হঠকারিতার প্রতিবাদ করা। কিন্তু শুধু বক্তৃতা দিলে চলবে না, সরকারের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে ভেতর থেকে অসাড় করাই হবে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি। এর জন্ম প্রস্তুত থাকতে হবে এখন থেকেই। মোমিনপুরের চটকলে পুঁজিবাদী মালিকেরা শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার আরম্ভ করেছেন, তার প্রতিরোধ করব আমরা—এটাই হবে আমাদের প্রথম অভিযান!

শ্রোতাদের মধ্যে দু'-একজন বলে উঠল, ধর্ম্মঘট, আমরা ধর্ম্মঘট করতে চাই!

সন্তোষ বলল, না, ধর্ম্মঘট করবার সময় এখনও আসেনি,। আমাদের ইউনিয়নের বাইরে এখনও অনেক শ্রমিক আছে, যারা সম্পূর্ণ ভাবে মালিকদের করতলগত। এখনই ধর্ম্মঘট সুরু করলে শেষ পর্য্যন্ত তা' আপনারা চালাতে পারবেন না। আমি বলব, আপনারা অন্য 'পন্থা অবলম্বন করুন। কাজে বিরতি দিন, যে কাজ এক·ঘণ্টায় করা সম্ভব তা' করুন দু'ঘণ্টায়, কল খারাপ হয়ে গেলে তা' সারাতে অবহেলা করুন। দেখবেন, এই উপায়ে আপনারা·'মালিককে করে তুলবেন উত্যক্ত, এবং তিনি বাধ্য হবেন আপনাদের কাউকে বরখাস্ত করতে। এখন 'এই অন্যায় বরখাস্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবেন আপনারা সকলে। সরকার হয়ত মালিকের পক্ষ সমর্থন করবে, 'শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ডাকবে, তখন সুযোগ আসবে সংঘবদ্ধ ভাবে ধর্ম্মঘট করবার। শ্রমিকের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করলে কোন 'শ্রমিকই ·চুপ ক'রে বসে থাকতে পারবে না—সে আপনাদের ইউনিয়নের সভ্য হোক বা বাইরের লোক হোক। বলুন, ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

উপস্থিত যারা ছিল সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

এর পর সন্তোষ বলল, সামনের শনিবার এখানে আবার মিটিং হবে। আমরা তখন শুনতে চাইব যে পথ আজ আপনাদের বাৎলে

দিলাম তাতে আপনারা কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন। আবার বলুন, ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

প্রতিধ্বনি উঠল, ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

সভাভঙ্গের পর সন্তোষ প্রদীপকে প্রশ্ন করল, কি মনে হয় আপনার প্রদীপ বাবু? এই ভাবে ভেতর থেকে sabotage করাই কি সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ নয়? ১৯৪২ সালেও ত এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়েছিল।

প্রদীপ বলল, কিন্তু ১৯৪২ সালের সঙ্গে তখনকার তুলনা করছেন, সন্তোষ বাবু? তখন আমাদের প্রতিপক্ষ ছিল বিদেশী শাসক, আর এখন আমাদেরই নমস্য, আমাদেরই প্রতিনিধিরা হয়েছেন কর্ণধার। আপনাদের অভাব-অভিযোগ যদি কিছু থাকে তাহ'লে তা' উপস্থাপিত করুন এঁদের সম্মুখে, এঁরা নিশ্চয়ই শুনবেন আপনাদের কথা।

—আপনি পাগল হয়েছেন, প্রদীপ বাবু! ওঁরা শুনবেন না। শুনতে চাইলেও ওঁদের শুনতে দেবে না পার্শ্বচরবৃন্দ। এ অবস্থায় direct action ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই!

—আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না, সন্তোষ বাবু! আপনারা যে পদ্ধতি অনুসরণ করছেন সে যে বিপ্লবের, অরাজকতার সৃষ্টি করবে। আমরা এখন চাই শান্তি, বিশ্রাম। যুদ্ধে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে ক্লান্ত, মুহ্যমান দেশকে আগে বাঁচিয়ে তুলতে হবে ত! আপনাদের ছোটখাট অভিযোগ দূর করবার জন্য অন্য পথ গ্রহণ করুন।

সন্তোষ হাসল। বলল, আপনার এখনও বুর্জোয়া মেণ্টালিটি রয়ে গেছে প্রদীপ বাবু! আপনি যাকে ছোটখাট অভিযোগ বলছেন, তা আমাদের কাছে অতি বৃহৎ। আর এসব অভিযোগের নিষ্পত্তি আবেদন করে, দরবার করে হবে না, এর নিষ্পত্তি হবে দলবদ্ধ সংগ্রামে।

—কিন্তু তাতে যে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে, উন্নতির গতি প্রতিহত হবে, তা ছাড়া অনেক নির্দোষ নিরীহ লোক নানাপ্রকার অসুবিধায় পড়বে।

—ঐ ত আমরা চাই, প্রদীপ বাবু! ছুটকোছাটকা সংগ্রামকে অবলম্বন করে আমরা একদিন চালাব বৃহত্তর সংগ্রাম। যারা এত দিন আমাদের শোষণ করে এসেছে, তাদের স্বীকার করতে হবে পরাজয়। আপনার ভয় নেই প্রদীপ বাবু! আমাদের বর্তমান প্রভুদের মতিগতি যদি বদলায়, তাহলে তাঁদের আমরা ফেলে দেব না, যেমন তাঁরা ফেলে দেননি, বৃটিশ যুগের সিভিলিয়ানদের।

মোমিনপুরের মিটিং থেকে প্রদীপ ফিরল আরও বিহ্বল হয়ে। এ কোন্ পথে চলেছে দেশ? কেন? দেশের যাঁরা নেতা, তাঁরা কি বুঝতে পারছেন না যে, এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষের কারণগুলো গোড়া থেকে উপ্‌ড়ে না ফেললে তার বিষাক্ত শেকড় ছড়িয়ে পড়বে সমাজের প্রতি কোণে, দেশের মাটির প্রতি অণু-পরমাণুতে?

বাড়ীতে ফিরেই মিঃ করের সঙ্গে দেখা।

—অনেক রাত হ'ল যে প্রদীপ? কোন পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি?

প্রদীপ ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

ডিনারে বসে প্রদীপ প্রশ্ন করল, আচ্ছা, মিঃ কর, আপনার কি ধারণা আপনাদের যাঁরা বর্তমান প্রভু, যাঁদের বিরুদ্ধে আপনারা এত দিন চালিয়েছেন অভিযান, তাঁরা মনে মনে আপনাদের শ্রদ্ধা করেন?

—একথা জিজ্ঞাসা করছ কেন, প্রদীপ?—গায়ত্রী বলল।

—জিজ্ঞাসা করছি এই জন্যে যে, দু'-চারজনের সঙ্গে কথা বলে আমার প্রতীতি হয়েছে, এঁরা আপনাদের সহ্য করেন মাত্র, মনে মনে তাঁদের রয়েছে পুঞ্জীভূত রোষ, অশ্রদ্ধা!

মলিন হাসি হেসে মিঃ কর জবাব দিলেন, এ আর নতুন কথা কি বলছ, প্রদীপ? এ ত আমি অনেক আগে থেকেই জানি!—এদের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা তাঁদের অনুভূতি গোপন ক'রে রাখেন, যাঁরা ততটা বুদ্ধিমান নন তাঁরা প্রকাশ করে ফেলেন।—এর জন্য অবশ্য দায়ী আমরা, আমাদের সাহস নেই প্রতিবাদ করি। অপমান আমরা হজম করে যাই নির্বিবাদে।

—কিন্তু কেন করেন, মিঃ কর? এসব জেনে-শুনেও আপনাদের মনে বিদ্রোহ জাগে না?

—না, বিদ্রোহ জাগে না। জাগলেও তার বিপক্ষে আমরা উপস্থাপিত করি নানাপ্রকার যুক্তি। সমাজে যে প্রতিষ্ঠাটুকু আছে, আমাদের যারা অধীন তাদের উপর ক্ষমতা ব্যবহার করবার যে সুযোগটুকু আমরা পাই, তা, আঁকড়ে ধরে থাকতে চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব।—না, প্রদীপ, তুমি এ সম্বন্ধে আর কিছু ব'লো না, আমি নিজেই স্বীকার করছি, আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ।

বলতে বলতে মিঃ করের গলাটা যেন একটু ভারী হয়ে এল। প্রদীপ লক্ষ্য করল, গায়ত্রীও আঁচলের খুঁট দিয়ে তার চোখটা মুছল।

[ক্রমশঃ।

In almost every aspect of human life, exact science has succeeded and surpassed the wildest predictions and hopes; but in one respect it has failed completely: it has not brought happiness to humanity.

*—Boris Sokoloff*

# চিত্রতারকার মত লাবণ্য —

## কত সহজেই আপনার হতে পারে !

চিত্রতারকা সুমিত্রা দেবীর মত অপূর্ব লাবণ্য আপনারও হতে পারে— যদি আপনি লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করেন। "লাক্সের সরের মত সুগন্ধ ফেণা ত্বকের পক্ষে এত ভাল" সুমিত্রা দেবী বলেন, "এটি আমার লাবণ্যকে মোলায়েম এবং সুন্দর রাখে।" সুন্দরী সুমিত্রা দেবীর কথা শুনুন। আপনার লাবণ্যের জন্যে নিয়মিত লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করুন।

বিশুদ্ধ, শুভ্র **লাক্স টয়লেট সাবান**

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LUX

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্ত্তৃক প্রস্তুত।
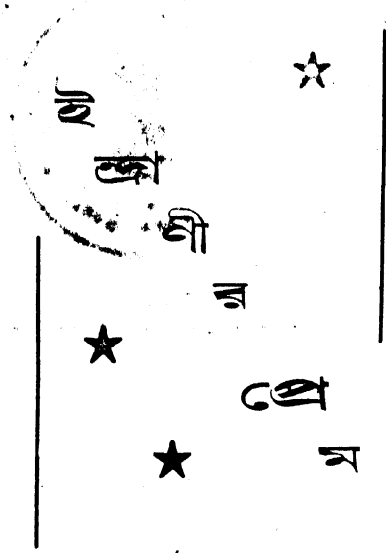
( উপন্যাস )

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

নীলিমা দাশগুপ্ত

ইনাকে দরজার সামনে নামিয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেলো। দরজার সামনে ইনার দাদামশায় জিতেন্দ্রনাথ সেন, দিদিমা শিশিরকণা ও মামাতো বোন মীনাক্ষী দাঁড়িয়েছিলো। জিতেন্দ্রনাথ ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, ইনু, ওঁদের একটু চা-টা না খাইয়েই ছেড়ে দিলে? কাজটা কিন্তু ঠিক হলো না।

আমি অনেক বলেছি দাদু, ওঁরা বললেন, এত লঙ জার্ণি করার পর আর কোথাও বসতে ইচ্ছে করে না, স্নান না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই!

সিমলা থেকে ইনা যাঁদের সঙ্গে এসেছে, শুভেন ও শোভনা, এঁরা পুজোর ছুটিতে সিমলা বেড়াতে গিয়েছিলেন, ম্যালে বেড়াতে বেড়াতে সর্ব্বাণীর সঙ্গে শোভনার একদিন আলাপ হয়। ওঁরা আর এক সপ্তাহের মধ্যেই কলকাতা ফিরছেন শুনে, ওঁদের সঙ্গেই ইনাকে কলকাতায় পাঠাবেন তখুনি ঠিক ক'রে ফেলেন, স্কুলের ছুটির মেয়াদ অবশ্য আরো এক সপ্তাহ ছিলো, কিন্তু সব সময় তো আর সঙ্গী পাওয়া যায় না মনোমত! সঙ্গী না পেলে ছুটি নিয়ে রমেনকেই মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হতো। তার চেয়ে এ ভালই হলো।

ইনার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ঘরে ঢুকে গেলো, ভৃত্য রতন এসে ইনার মালপত্র নিয়ে গেলো। দাদু, দিদিমা ও মামীকে প্রণাম ক'রে ইনা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। পেছন থেকে এসে ঝুপ ক'রে গলা জড়িয়ে ধরলো মীনাক্ষী। এই মীনা—মীনাক্ষীর হাত লেগে ইনার খোঁপা ভেঙে ছড়িয়ে পড়লো পিঠে। মীনা হাত নামিয়ে ইন্দ্রাণীর সামনে দিকে এসে বললো, কী সুন্দর তুই হয়েছিস ভাই! খলিত আঁচলটা কাঁধে তুলতে তুলতে ইনা বললে—আমি আবার অসুন্দর ছিলাম ক'বে রে?

ওরে বাব্বাঃ—খিল-খিল ক'রে হেসে উঠলো মীনা—আগে ছিলি পদ্মের কুঁড়ি, এখন প্রস্ফুটিত পদ্ম। কলেজে ঢোকার আগেই না টোপর মাথায় দিতে হয়, তাই ভাবছি।

তোর কি টোপর আর বিয়ে ছাড়া আর কোনো কথাই নেই? হঠাৎ গুরুগম্ভীর হলো ইনার কণ্ঠস্বর। খিল-খিল ক'রে আবার হেসে উঠলো মীনা, এই ইনা, খবর্দার, অমন মাষ্টারনী-মাষ্টারনী মুখ করবিনে। মেয়েদের একমাত্র এবং অ-দ্বিতীয় পথ হলো লাল চেলি পরে, টোপর মাথায় দিয়ে, গাঁঠছড়া বেঁধে শ্বশুরবাড়ির ঠিকানায় রওনা হওয়া। ঘুম থেকে উঠে আবার না ঘুমানো পর্যন্ত আমাদের চার পাশে এত যে আয়োজন প্রয়োজন শুধু সেই শ্বশুরবাড়ির রাস্তার দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য, বুঝলি? এই যে লেখাপড়া, গান-বাজনা, কাজ-কর্ম শেখা সব।

ছিঃ ছিঃ মীনা, এমন ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের কথা আমার সামনে জীবনে তুই উচ্চারণ করতে পারবিনে। তাহলে তোর সঙ্গে কথা বলা একদম বন্ধ ক'রে দেব, একেবারে জন্মের মত আড়ি, বুঝলি?

—আমি স্নান করতে চললুম, দিদা ডাকলে বলে দিস—নিচু হ'য়ে ট্রাঙ্ক খুললো ইনা। একেবারে ওপরেই জর্দারঙের একখানি নোতুন জর্জেট শাড়ি ছিলো। সেটা আগে বার ক'রে মীনাক্ষীর সামনে ধরলো।

দেখ তো মীনা, এ রংটা তোর পছন্দ কি না, আমি পছন্দ করেছি এ রংটা—

মীনাক্ষী গম্ভীর হ'তে জানে না, ওর মনের দিগন্ত সবটুকুই নির্মেঘ। মুহূর্ত দুই বোধ হয় একটু থতিয়ে গিয়েছিলো, জর্জেট শাড়িখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আবার হৈ-হৈ ক'রে উঠলো।

ইস্ ইনা, তুই কী অন্তর্যামী? আমার এরকম একখানা শাড়ির অনেক দিন থেকে বড্ড শখ রে! কিন্তু, তুই নিজের জন্য কিনিসনি?

বাড়িতে পরার সাধারণ শাড়ি-ব্লাউজ ট্রাঙ্ক থেকে টেনে টেনে বার করতে করতে ইনা বললো—হ্যাঁ, আমিও কিনেছি অবিকল তোর মত। কাপড়-জামা নিয়ে ট্রাঙ্ক বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ালো ইনা।

মীনাক্ষী হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসলো—এই ইনা, মা'র জন্য কিছু আনিসনি?

না তো—ইনার এই মুহূর্তে স্মরণ হলো রাঙামামীর জন্য কিছু না আনাটা ভারি ভুল হ'য়ে গেছে। ইনাকে ভাবতে দেখে মীনাক্ষী বললো, আর কিছু এনেছিস নাকি?

বিশেষ কিছু নয়, শুধু দাদুর জন্য একখানা লাঠি আর একটা কাশ্মীরী মাফ্‌লার—

ইনা, তুই বরং এক কাজ কর, দাদুকে শুধু লাঠিটাই দে, আর মাকে দিয়ে দে মাফ্‌লারটা।

ঠিক আছে, তাই দেব—ইনা নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্নান করতে চলে গেলো। কাপড়খানা হাতে নিয়ে মীনাক্ষীও চঞ্চল পায়ে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

এই 'মীনাক্ষী জিতেন্দ্রনাথের স্বর্গগত বড় ভাই মহেন্দ্রনাথের পৌত্রী। মহেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র গুণেন ছিলেন অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ আর প্রকৃতি ছিলো ভারি নিরীহ। গ্রহের ফেরে দ' পাঁচ

করে উনি ওকালতি পেশা নিয়েছিলেন। এ পেশা ওঁর নয়, তা যখন বুঝলেন, তখন অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। পিতা মহেন্দ্রনাথ ছিলেন গ্রামের একজন আদর্শবাদী স্কুলমাষ্টার, সেই স্কুলেরই দরিদ্র একটি মাষ্টার আইনের অবিচারে দীর্ঘমেয়াদী কারাবরণ করেন এবং কারাগারেই মৃত্যু হয় তাঁর এবং তার ফলে তাঁর পরিবারের জীর্ণ-ভগ্ন আবরণটুকুও চিরকালের মত ঘুচে যায়, ছেলেকে আইন পড়ানোর এইটেই নাকি আসল কারণ বলে সবাই বলাবলি করে থাকেন। গুণেন কলকাতায় এসে জীবনটাকে একটু ভদ্রগোছের গুছিয়ে নিয়ে বসবার আগেই বাবা কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন অতি দুঃস্থ একটি ভদ্রলোকের পরমাসুন্দরী কন্যা সুবর্ণবালাকে এবং তার অল্প কাল পরেই এপারের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিলেন মহেন্দ্রনাথ। স্ত্রীকে নিয়ে অল্প একটুকাল বিচিত্র একটি আকাশে বিচরণ করলেন গুণেন, তারপর যখন পাওনাদাররা পৌনঃপুনিক ভাবে পালা করে দেখা দিতে লাগলো, তখন বিচিত্র সেই সুনীল আকাশ থেকে ধূসর কর্কশ মাটিতে একেবারেই অকস্মাৎ যেন পতন হলো গুণেনের।

এমন অবস্থা যখন বাইরে, তখন ঘরেও শুরু হলো বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সুবর্ণবালার আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন গুণেন। যার ভেতর অপার্থিব সব কিছু উনি অনুভব করেছেন, তার এ কী হলো? তারপর সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরে সুবর্ণবালার বেসুরো কণ্ঠের একটানা অভিযোগ শুনে এসেছেন গুণেন। যে অপূর্ব্ব রূপসীর রাজেন্দ্রাণী হওয়ার কথা ছিলো, সে কি না চাকরাণী, বামনী সব! নিজেদের অবস্থা লুকিয়ে কেন বিয়ে করা হয়েছে? ম্লান হাসি হেসে আপোষ করতে চেয়েছেন গুণেন, কিন্তু সে হাসি আগুনে ঘি-এর ছিটের মতই। তবু, শেষের চার বছর কাকা জিতেন্দ্রনাথের আশ্রয়ে অনেকটা স্বস্তি পেয়েছিলেন, ছায়াও পেয়েছিলেন, বাইরের আঘাত আর পেতে হয়নি সে চার বছর, একমুখী ঘরের আঘাতই সহ্য করে গেছেন বুক পেতে।

জিতেন্দ্রনাথ কুচবিহারে বেসরকারী একটি কলেজে ইংরিজীর অধ্যাপক ছিলেন। কলকাতায় একটি নোতুন কলেজ স্থাপনের প্রারম্ভে কর্তৃপক্ষ ওঁকে আহ্বান জানান, সেই আহ্বানের মধ্যে আবেদনের সুর ছিলো—আপনি এসে গ'ড়ে তুলুন এই কলেজ, আপনি এলে আমাদের পরিকল্পনা সার্থক হবে। মাইনা অনেক কম জেনেও জিতেন্দ্রনাথ ইতস্তত করেননি। মনস্থির করে কুচবিহার কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় আসার পরও বছর দুয়েকের মধ্যে জিতেন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রের সাংসারিক অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। মাঝে মাঝে গুণেন এসে কাকা-কাকীমার খবরাখবর জেনে যেতেন আর নিজেদের খবর জানিয়ে যেতেন। শিশিরকণা, সুবর্ণবালা এবং নাতনীর উল্লেখ যত বারই করেছেন, কোনো কিছু অজুহাত দিয়ে সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে গেছেন গুণেন।

এমন কি শিশিরকণা যেদিন বললেন, গুণেন, তোর ঠিকানাটা রেখে যা, ওঁর সময় না হলে সর্ব্বই আজ নিয়ে যাবে বলেছে। গুণেন চোখ কপালে তুললেন,—পাগল নাকি কাকীমা, আমার বাড়ির চারি পাশে যা সব নোতুন রাস্তা বার হয়েছে, সাবির কর্ম্ম নয় ও বাড়ি খুঁজে বার করা, আমিই কোনো একটা ছুটি-ছাটাতে তোমাদের এসে নিয়ে যাবো। সর্ব্বাণীই শেষে নিরস্ত করেছিলো মাকে,—বড়দার বাড়ির ব্যাপার নিয়ে বোধ হয় কোনো রকম গোপন দুঃখ আছে, তুমি যাওয়া নিয়ে আর জেদ করো না মা! গুণেন ধরা পড়ে গেলেন সর্ব্বাণীর বিয়েতে। বিয়ের মাস খানেক আগে শিশিরকণার জেদে জিতেন্দ্রনাথ ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিশেষ ভাবে তাগাদা দিয়ে বললেন, কাল ঘুম থেকে উঠেই তোমাদের আসা চাই এখানে, বাড়ি ভাল করে বন্ধ-টন্ধ ক'রে তালা দিয়ে এসো। সংসারে উদাসীন কেতাব-পাগল ভোলানাথ কাকার কাছে গুণেন মিথ্যে কোনো অজুহাত তুলতে পারেননি। পরদিন সকালেই স্ত্রী সুবর্ণবালা ও চার বছরের কন্যা এনাক্ষীকে নিয়ে কাকার বাড়ীতে এসে উঠলেন। প্রণামের পালা চুকলে শিশিরকণা নাতনীকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বললেন, দিদু ভাই, তোমার নাম কি বলো তো?

—এনাক্ষী সেন, থেমে থেমে চার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ভীরু গলায় এনাক্ষী উত্তর দিলো। এত রোগা হলে চলবে না দিদু-ভাই, অনেক বেশি বেশি খেয়ে মোটা হতে হবে, কেমন?

পেছনে দাঁড়ানো সুবর্ণবালা ঘোমটাটা সামান্য একটু টানবার ভঙ্গি ক'রে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, বেশি বেশি খাওয়া জুটলে তো? ঐ এক কৌটা শিশুর পেটে এক ছটাক দুধ পর্যন্ত পড়ে না। অপরাধী মুখ করে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেলেন গুণেন, তার পেছন পেছন সুবর্ণবালাও। সর্ব্বাণী ভেতর থেকে ছুটে এসে এনাক্ষীকে কোলে তুলে আদরে চুমায় একেবারে অস্থির ক'রে তুললো। জিতেন্দ্রনাথ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন নাতনী এনার দিকে; কেমন যেন দিশাশূন্য দৃষ্টি, দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ভারি গলায় বললেন, —শিশির, কী হাস্যকর প্রচেষ্টা আমার দেখেছো? ছেলেদের ভাল করবো বলে, তাদের কল্যাণের জন্য দিনের পর দিন রাতের পর রাত রক্ত জল ক'রে খেটে যাচ্ছি পাগলের মত, অথচ আমাদের গুণেন, দাদার আদরের দাদার হাতে তৈরী গুণেন, আমাদের আত্মজসম গুণেন, আমাদের চোখের অদূরেই অনশনে দিন কাটাচ্ছে, অথচ আমি— সামনের শূন্য দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা অবলম্বন যেন খুঁজতে লাগলেন জিতেন্দ্রনাথ।

এনাকে কোলে নিয়ে পায়ে পায়ে ভেতরে চলে গেলো সর্ব্বাণী, তারপর আর গুণেনকে ওঁরা ছাড়েননি। শিশিরকণা নাতনীকে দুধ খাইয়ে খাইয়ে আর অলিভ অয়েল মাখিয়ে মাখিয়ে এক মাসের মধ্যেই মোটা ক'রে ফেললেন। সর্ব্বাণীর বিয়ের জামা-কাপড়ের সঙ্গে এনাক্ষীর নানান ডিজাইনের প্রচুর ফ্রক হলো, সুবর্ণবালাকেও এক প্রস্থ শিল্কের শাড়ি-ব্লাউজ কিনে দিলেন। কিন্তু, সুবর্ণবালার জিভের ধার আর কমলো না, না হ'লে কাকার দাক্ষিণ্যে বাকী জীবনটা গুণেন বেশ মসৃণ ভাবেই কাটাতে পারতেন। বিয়ের পর যখনই সর্ব্বাণী বাপের বাড়ি এসেছে, এনার জন্য এনেছে দামী দামী জামা, সৌখিন সুন্দর খেলনা।

পিসির দেওয়া জামা গায়ে দিয়ে এনা যখন দম-দেওয়া পুতুল আর কলের ইঞ্জিনের পেছনে আনন্দে হাততালি দিতে দিতে কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ দুলিয়ে ছুটোছুটি শুরু করলো,

এক সুবর্ণবালা ছাড়া আর সকলেই এক সঙ্গে বসে শিশুর সেই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতেন। মাঝে মাঝে দম-দেওয়া পুতুল ডিগবাজি খায় আর এনাও কচি কচি মুঠি মেঝেতে ভর দিয়ে ডিগবাজি খাওয়ার ব্যর্থ অভিনয় করে খিল-খিল ক'রে হেসে ওঠে। সমস্বরে হেসে ওঠেন ঘরের সবাই, সর্ব্বাণীর মনে হতো যতখানি আনন্দ ওর পাওয়ার কথা তার চেয়েও যেন উপরি পাওনা পেয়ে গেলো ও, সেই প্রথম দিন, গুণেনরা যেদিন এলেন, সে দিনের রাত্রির কথা মাঝে মাঝেই মনে পড়ে সর্ব্বাণীর। রাত্রি সাড়ে দশটা বেজে গেছে, শুয়ে পড়েছে সবাই, সব ঘর অন্ধকার, শুধু সর্ব্বাণীর পড়ার ঘরে আলো। নিয়ম ক'রে এগারোটায় শুতে যায় সর্ব্বাণী, তার আগে বিছানা আশ্রয় কোনো দিন করে না। বছরখানেক আগেও রাত্রি দুটো পর্যন্ত জাগতেন জিতেন্দ্রনাথ। এখন রক্ত চাপের জন্য রাত জাগতে ডাক্তারের একেবারে নিষেধ।

পর্দায় দীর্ঘাকৃতি ছায়া পড়তে সর্ব্বাণী বিস্মিত হয়ে এগিয়ে এলো, পর্দা দুলে উঠলো, ঘরে ঢুকলেন জিতেন্দ্রনাথ, চোখ নিচু করে কী যেন ভাবতে ভাবতে আসছেন, দীর্ঘ ঋজু শরীর একটু ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, মুখের সেই সদাপ্রসন্নতার জায়গায় জমাট বেঁধেছে অস্থিরতা, কপালের হিজিবিজি অসংখ্য।

বাবা!

মেয়ের আহ্বানে চিন্তাকুল দৃষ্টিতে তাকালেন জিতেন্দ্রনাথ,—মা সর্ব্ব! তোর কি ঘুম পেয়েছে?

না বাবা!

হিউম্যানিজম সম্বন্ধে দার্শনিক ব্যাখ্যাগুলি আজ একটু আলোচনা করি আয়। মেয়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে টেবিলের বই-এর স্তূপে চোখ রেখে আবার আস্তে আস্তে বললেন জিতেন্দ্রনাথ,—আচ্ছা সর্ব্ব! তোর নিজস্ব মতামত কী? মানবতা সিদ্ধির জন্য পার্থিব কাজকে আঁকড়ে ধরা, না অমরতালাভের জন্য তাকে অবহেলা করা—কোন পথ ঠিক?

বাবার চোখের অতল গভীরতার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বাবার মনটা হাতড়াতে চেষ্টা করছিলো সর্ব্বাণী। বাবার কাছে এসে বাবার কাঁধে হাত রাখলো,—বাবা! তোমার রাত জাগতে যে মানা একেবারে—কাল সকালেই চা খেতে খেতে এ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করবো, আজকে চলো বাবা, তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আমি ঘুম পাড়িয়ে দি।

মেয়ের জেদের কাছে হার মানতে হয়েছিলো জিতেন্দ্রনাথকে। বিছানায় এসে অসংখ্য বার এপাশ-ওপাশ করে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলো সেদিন। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়িয়ে শব্দহীন পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সর্ব্বাণী। উন্মুক্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলো কিছুকাল। অল্প দূরে ভিন্ন খাটে শোয়া শিশিরকণাও যে গাঢ় নিদ্রার অভিনয় করে চুপ করে পড়ে আছেন—সেটাও অজ্ঞাত নয় সর্ব্বাণীর। দু' বছর হলো কলকাতায় এসেছেন অথচ বড়দা অর্থাৎ গুণেনের দিকে নজর দেননি ওরা, এ মারাত্মক ভ্রমের সংশোধন রাতারাতি কি ভাবে হতে পারে, তারই উপায় নিশ্চয় খুঁজে বেড়াচ্ছে শিশিরকণার মন। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানালো সর্ব্বাণী: ঈশ্বর! তুমি আমাকে অনেক দিয়েছো, আমার বাবার মত বাবা, আর মা'র মত মা পাওয়া যে কী পাওয়া—কী যে পরম সৌভাগ্য, আমার উপর তোমার এ অকৃপণ দান আমি দিন-রাত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছি অন্তর্যামী! আমার নোতুন জীবনেও তোমার আশীর্ব্বাদ যেন এমনি ভাবেই থাকে।

বিয়ের বছর দুই পরে বাপের বাড়িতে এসে বেশ কিছুদিন ছিলো সর্ব্বাণী, প্রায় এক বছরের মত, প্রথম পোয়াতি, শিশিরকণা খুব অল্প মাসেই মেয়েকে কাছে এনেছিলেন। ভরাট সেবা-যত্নে অস্থির ক'রে তুললেন মেয়েকে। আর সর্ব্বাণী আগের চেয়ে অনেক বেশি তার বাবাকে নিয়মিত ভাবে পেতে লাগলো। জিতেন্দ্রনাথ যে তাঁর অমূল্য সময় থেকে রোজ দু'তিন ঘণ্টা ওর জন্য খরচ করছেন সেজন্য সর্ব্বাণী ভারি কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলো বাবার ওপর। গোলাপ ফুলের মত এনাক্ষী পিসির পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতো, গুণেনও সময় পেলেই ঐ আলাপ-আলোচনার আসরে এসে বসতেন, বৌদি সুবর্ণবালাকে ওদের আসরে সভ্য করার জন্য অনেক টানাটানি করে শেষে হাল ছেড়ে দিলো সর্ব্বাণী। সুবর্ণবালাকে ডাকলেই শরীর খারাপের অজুহাত দিতো,—আমার ভয়ানক শরীর খারাপ করছে ঠাকুরঝি, আমি বসতে পারছিনে। এর পর সুবর্ণবালার সন্তান সম্ভাবনার সংবাদ সর্ব্বাণীই প্রথম জানালো শিশিরকণাকে। সকলেই খুব আনন্দিত, এনাক্ষীর সময় শরীরে আর কিছু ছিলো না, শুধু চারখানি হাড়—একথা শিশিরকণাকে আকারে ইঙ্গিতে অনেকবার জানিয়ে দিয়েছেন সুবর্ণবালা। সে ক্ষোভ, সে আক্ষেপ, এবার মিটিয়ে দিতে চাইলেন শিশিরকণা। আত্মজা সর্ব্বাণীর মতই নিটোল সেবা যত্ন চললো সুবর্ণবালার, তবু, সুবর্ণবালার কেমন যেন একটা রোখ চেপে গিয়েছিলো, রোগও বলা চলে তাকে, শিশিরকণা যে খাদ্য অথবা পানীয় সর্ব্বাণীকে দিতেন, সুবর্ণবালার মনে হতো—সে সব ওঁর খাদ্য পানীয়ের অপেক্ষা স্বাদেও ভাল, পরিমাণেও বেশি। সর্ব্বাণীর খাওয়ার সময় কোনো কিছু ছল ছুতো ক'রে সুবর্ণবালা ঘরে ঢুকে উঁকি মেরে দেখে যেতেন খাবারটা।

সর্ব্বাণীই বৌদির রোগটা টের পেলো, তারপর অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত করলো একটা, শিশিরকণাকে বললো,—আমাদের যা কিছু খাবার কিম্বা ফলের রসটস তুমি খাবার ঘরের টেবিলে ঠিক ক'রে রেখো, আমরা ঠিক সময়ে খেয়ে নেব, তোমায় হাতে করে আর এনে দিতে হবে না মা! শিশিরকণাও ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন কতকটা, তিনি মেয়ের প্রস্তাবটা সহজেই অনুমোদন করলেন। এর পর, সুবর্ণবালার খাওয়া না হতে কোনো দিন সর্ব্বাণী খাবার ঘরে ঢোকেনি। সুবর্ণবালার নিত্যিনোতুন ছোটোমনের পরিচয়ে সর্ব্বাণী বলেছিলো একদিন শিশিরকনাকে, মা, আমার মনে হয় এত দরিদ্র-মনের সঙ্গে এভাবে জড়িয়ে না থেকে, দূরে রেখে সাহায্য করা ভাল। বিবাহিতা মেয়েকে সেদিন তিরস্কারই করেছিলেন শিশিরকণা,—ছিঃ সর্ব্ব! মা'র কণ্ঠের এমন ভর্ৎসনার সুর একেবারেই অচেনা সর্ব্বাণীর। অমৃতের পুত্র এই মানুষ, সে অমৃতের এক বিন্দু স্বাদ পায়নি সুবর্ণ, এ যে তার কত বড় দুর্ভাগ্য, তা কী একবার ভেবে দেখেছিস? বিস্ময়ে মা'র শক্ত হ'য়ে আসা মুখের দিকে তাকিয়েছিল সর্ব্বাণী একটুকাল, তার পর অনুতপ্ত কণ্ঠে বললো,—মা, আমাকে ক্ষমা কর।

এই শিশিরকণা আর এই জিতেন্দ্রনাথের মেয়ে সর্ব্বাণী। আর এই সর্ব্বাণী তার বিরাট স্বপ্নের রূপ, মহান কল্পনার রূপ ধীরে ধীরে শিশু-ইন্দ্রাণীর মনে দিতে চেয়েছে—দিয়েছে, এখন ইন্দ্রাণীর পনেরো বছর বয়সে মাঝে মাঝেই সর্ব্বাণীর মনে হয়, মেয়ের মনের আকাশের নাগাল এখনই বুঝি পাচ্ছেন না।

স্নান সেরে আবার ট্রাঙ্ক খুললো ইনা, কাশ্মীরী মাফলারটা বার করলো। ট্রাঙ্ক বন্ধ ক'রে মাফলার হাতে নিয়ে নিচে নেমে এলো। সুবর্ণবালা তখন মেয়ের শরীর-চর্চ্চায় লেগেছেন। কাঁচা হলুদ কাঁচা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে মীনাক্ষীর হাত-মুখ ডলছেন।

রাঙামামী! ইনার ডাকে ঘাড় ফিরিয়ে একমুখ হাসলেন সুবর্ণবালা, ঐ মাফলার বুঝি এনেছিস আমার জন্য? ও মা, কোথায় যাব, ঐ অমন নক্সাকাটা মাফলার এই বুড়ো বয়েসে গলায় দেওয়া যায়?

মীনা মাফলারের খবরটা আগেভাগে দিয়ে দিয়েছে জেনে ইনা হাসলো, তার পর সেই কথা বললো যাতে মামী সবচেয়ে বেশি খুশি হ'ন, বুড়ো বয়েস মানে? তোমাকে যে কী সুন্দর আর কী ছেলেমানুষ দেখায় রাঙামামী!

নে নে রাখ,—খুশি উপ্‌চে-পড়া গলায় বললেন সুবর্ণবালা, দিদিমা হয়ে গেছি কবে, আমি এখন ছেলেমানুষ, এক মুহূর্ত চুপ করেই আবার, মাফলারের কাজটা কিন্তু ভারি খাসা, তা ইমু, তুই যখন হাতে ক'রে এনেছিস, তখন আমি গলায় দেব বৈ কি। কথা শেষ ক'রে জোরে জোরে মেয়ের হাত ডলতে লাগলেন সুবর্ণবালা।

মীনাক্ষী ও ইন্দ্রাণী দুজনেই ম্যাট্রিকের ছাত্রী এবং দুজনেরই টেষ্ট পরীক্ষা একেবারে সামনে। টেবিলে মুখোমুখি খেতে বসে দুই বোনে পড়ার আলোচনা করছে। খাবার তদারকী করছেন সুবর্ণবালা।

শিশিরকণা স্নান শেষ করে পূজোর ঘরে ঢুকেছেন। পাহাড়ী হাওয়ায় ইন্দ্রাণীর চেহারায় অন্যরকম একটা লাবণ্য হয়েছে, সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সুবর্ণবালা ভাবতে লাগলেন, মীনাক্ষীকে আর কী মাখানো যায়, তারপর বলেই ফেললেন ইমুর গোলাপি গালের দিকে তাকিয়ে।

সিমলা তো শুনেছি সাহেব-মেমের দেশ, ও দেশের লোকেরা কত-কিছু বোধ হয় জানে, ইমু, সিমলায় তুই কী মাখতিস রে? হঠাৎ তোকে এখন দেখলে সকলেই ভাববে যে তোর রং বুঝি মীনুর চেয়েও ফরসা।

মামীর কথার অন্তর্নিহিত খোঁচাটা হাসিমুখে হজম করলো ইনা, কিছু না তো রাঙামামী, ফর্সা দেখাচ্ছে বুঝি আমাকে—বাঁ হাতটা তুলে একপলক তাকালো ইনা, এ হচ্ছে সিমলার জলবাতাসের গুণ।

মীনা মুখে কপট গাম্ভীর্য এনে বললে—মা শোনো! একটা খুব ভাল উপায় আমার মাথায় এসেছে, যখন আমার ফরসা রঙের

দরকার হবে, তখন এক মাস আমি সিমলায় খুকুমণি পিসির কাছে থেকে আসবো, হলুদবাটা, সরবাটা মাথা থেকে এখনকার মত আমায় রেহাই দাও মা, আমার পরীক্ষা একেবারে সামনে।

ঝাপট দিয়ে উঠলেন সুবর্ণবালা, তোমার কথামত আমাকে চলতে হবে কি না, তোমার এই এই ধিঙ্গিপানা স্বভাব আমার একটুও পছন্দ নয়, ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই তোমার বিয়ে দেওয়ার কথা কাকাবাবু-কাকীমাকে আমি বলবো।

ইনা এবার জোরে হেসে ফেললো, রাঙামামী তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে? এখনই তুমি মৌনার বিয়ের কথা ভাবছো?

স্নেহের আভাসের কয়েকটি রেখা ফুটলো সুবর্ণবালার ঠোঁটে, না মা, মাথা আমার এখনও খারাপ হয়নি, তবে আজকালকার মেয়েদের রকম-সকম দেখে খারাপ হ'তে বোধ হয় দেরীও নেই বেশি—ইনা চুপ, একটা সূক্ষ্ম সচেতন হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে সুবর্ণবালা বলে চললেন, কাকাবাবুর চোখে তো দুনিয়ার সকলেই ভাল, এই ডবকা বয়েস মৌনুর কাকাবাবু কিনা ঠিক করলেন একজন জোয়ান মাষ্টার; এ তো আর এনা নয় যে শান্ত-শিষ্ট একেবারে ভালমানুষ, এই মৌনুটার জলিফলি স্বভাবের জন্য আমি একেবারে অস্থির—পড়বি তো চুপচাপ বসে পড়, তা না কেবল হা-হা আর হি-হি। পড়ার মধ্যে এত হাসির কথা ওঠে কিসে তাও বাছা ভেবে পাইনে। কাকাবাবুর কাছে মাষ্টারের পরিচয় জিগ্যেস করাতে জানতে পারলুম—মাষ্টারের মা-বাপ কেউ নেই, বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। মা গো! পুলিশের ওপর ঘেন্না আমার চিরকালের, আমাদের বাড়ির পাশেই ছিলো পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের বাড়ি—তার স্ত্রীর সঙ্গে আমি ভাল করে কথা পর্যন্ত কোনো দিন বলিনি। কথা শেষ করে সম্ভবতঃ বিরূপতাটা ভাল করে বোঝাবার জন্য মুখ বেঁকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন সুবর্ণবালা। সুবর্ণবালার ওলট-পালট যুক্তিহীন কথায় ইনু মৌনু দুজনেই অবাক।

ইনু প্রশ্ন করলো, দাদু তোর জন্য মাষ্টার মশাই রেখেছেন বুঝি?

দই দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে মৌনু বললো, হুঁ, সে ভারি মজা—দাদুর একদিন যন্ত্রণা হয়েছিলো মাথায়, আমি অডিকোলন দিয়ে, কপাল টিপে, চুল টেনে ভাল করে দিলুম। দাদু উঠে বসে বললেন,—ভারি ভাল লাগছে এখন মৌনুদিদি, নিয়ে আয় তো তোর বইপত্তর, ম্যাট্রিকের জন্য কেমন তৈরী হয়েছিস দেখি। আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম, দাদু! তুমি এমন, এতক্ষণ ধরে মাথা টিপে টিপে তোমার মাথার যন্ত্রণা ভাল করলুম আর তার পুরস্কার এই? দাদু অবাক হয়ে বললেন, কেন? আমি বললুম, আমাকে যা জিগ্যেস করবে, আমি তার একটিরও উত্তর দিতে পারবো না। এমন স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে দাদু বোধ হয় হকচকিয়ে গেলেন একেবারে, দিদাইকে ডেকে বললেন—মৌনুর পড়াশুনোর খোঁজ করিনি আগে, বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে।

দিদাই উত্তর দিলেন, এখনও তো সময় আছে, ভাল দেখে মাষ্টার রেখে দাও না একজন।

দাদু চুপ করে ভাবতে লাগলেন। পরদিন সকালে আবার আমার ডাক পড়লো, বললেন, বন্ধুদের জানাশোনা যদি কোনো ভাল মাষ্টার থাকে তো খোঁজ নিতে, আজই যেন নেওয়া হয়, মাইনা যা চান, তাই দেবেন। আমি ভেবে দেখলাম, সুমনার মাষ্টার মশাইকে রাখলেই আমার পক্ষে ভাল হবে। ও তো আমার চেয়েও এককাঠি সরেস ছাত্রী ছিলো, কিন্তু সেকেণ্ড টারমিন্যালে দেখলাম অদ্ভুত ইমপ্রুভ করেছে সব ক'টা সাবজেক্টেই পাশের নম্বর পেয়েছে। গেলাম সুমনার কাছে।

সুমনা বললে, সুপ্রিয়দা' অর্থাৎ ওর মাষ্টার মশাই সম্প্রতি দিল্লী গেছেন, কাল-পরশু নাগাদ ফিরবেন। যদি উনি আর ট্যুশানি করতে আপত্তি না করেন, কারণ ওঁর আবার পরীক্ষা সামনে কি না, তাহলে আমি নিজে সঙ্গে করে তোদের বাড়ি নিয়ে যাব।

—আমি জিগ্যেস করলুম,—কী পরীক্ষা দেবেন? সুমনা বললে,—বি-এ।

আমি বললুম, বি-এ পড়ুয়া আবার মাষ্টার কি রে?

—না রে, ভারি চৌখস মাষ্টার, বিশেষ করে আমাদের মতন ছাত্রীদের পক্ষে—আমি তো মাষ্টার মশাইকে রেখেছি সেকেণ্ড টারমিন্যালের মাত্র দেড় মাস আগে, আমার উন্নতি দেখেছিস তো? আমি সুমনার যুক্তি স্বীকার করে মাষ্টার মশাইকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চলে এলাম। মাইনে যা চান তাই দেব—সেটাও জানিয়ে দিলাম সুমনাকে। দু'দিন পরে, মাষ্টারকে নিয়ে সুমনা হাজির। দাদুর সঙ্গে মাষ্টার মশাই-এর পরিচয় করিয়ে দিয়ে সুমনা চলে গেলো।

মাষ্টার মশাইকে দেখে দাদু বললেন।—তুমি তো ভারি বাচ্চা মাষ্টার হে! আপনিটা মুখে এলো না, কিছু মনে করো না।

মাষ্টার মশাই হেসে বললেন, না, না, আপনি আমার ঠাকুরদাদার বয়সী, আমাকে আবার আপনি বলবেন কী!

দাদু জিগ্যেস করলেন, কোথায় থাকো তুমি? মাষ্টারমশাই হিন্দুহষ্টেলের নাম করলেন।

দাদু বললেন,—তুমি ছাত্র তাহলে? মাষ্টারমশাই বললেন যে তিনি এবার বি-এ দেবেন।

দাদু তারপর জিগ্যেস করলেন,—ম্যাট্রিকের ছাত্রীকে তুমি পড়াতে পারবে?

মাষ্টারমশাই ভারি মজার জবাব দিলেন,—খারাপ হলে পারবে পড়াতে, ভাল হ'লে পারবো না!

দাদু হো-হো করে হাসতে লাগলেন, তারপর নাম জিগ্যেস করে জানলেন সুপ্রিয় সোম।

দাদু তারপর বললেন, আচ্ছা সুপ্রিয়, ভারি মজার কথা বলেছো কিন্তু তুমি—তোমার ও কথার পেছনে যুক্তি কী?

মাষ্টারমশাই বললেন, ম্যাট্রিক পাশ করানোর মত বিদ্যা কিম্বা টেকনিক তাঁর ভাল ক'রে জানা আছে, কিন্তু ভাল ছাত্রছাত্রীর কোচ করা, মানে তাদের লেটার কী ষ্টার পাইয়ে দেওয়া তা তাঁর আয়ত্তের বাইরে।

দাদু আর এক দফা হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন,—ভেরি গুড, আমার মৌনুদিদির পক্ষে তুমি খুব ভাল মাষ্টার হবে। তোমার বাবা-মা কোথায় থাকেন?

মাষ্টারমশাই বললেন, তাঁর বাবা-মা কেউ নেই। বাবা পুলিশের দারোগা ছিলেন, একটা ডাকাতি কেস ধরতে গিয়ে, ডাকাতের গুলীতে জখম হয়ে মারা যান আর মা তার এক মাস পরে।

দাদুর মুখের ভাব এমন হলো যেন প্রশ্নটা জিগ্যেস ক'রে অত্যন্ত

অন্যায় কাজ করে ফেলেছেন তিনি, আস্তে আস্তে বললেন,—তাহলে এ কথাই ঠিক হলো, তুমি মীনুদিদিকে পড়াবে। এর পর খুব সম্ভব মাইনা নিয়ে আমার সামনে আলোচনা করবেন না বলে দাদু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—যাও মীনুদিদি, মাষ্টারমশাই-এর জন্য চা আর জলখাবার নিয়ে এসো।

চা-জলখাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি, দাদু মাষ্টারমশাই-এর সঙ্গে খুব গল্প জুড়ে দিয়েছেন। মা'র ডাকে ভেতরে চলে এলাম আমি।

মা আড়াল থেকে মাষ্টারমশাইকে দেখে নিয়েছেন। গম্ভীর গলায় জিগ্যেস করলেন,—এই মাষ্টার কি তোর জন্য ঠিক করলেন নাকি কাকাবাবু?

বললুম,—বোধ হয়।

তার পর মাষ্টারমশাই-এর ঠিকুজি-কুলুজি নিয়ে আমার সঙ্গে জোর জেরা শুরু করলেন মা।

সবটারই উত্তর দিলাম,—জানিনে।

মাষ্টারমশাই চলে যাওয়ার পর দাদু আমাকে বললেন,—তোমার বই-টই সব ঠিক ক'রে রেখো মীনু, আজ বিকেল থেকেই সুপ্রিয় পড়াতে আসবে। ভারি ভাল ছেলেটি, ওর সঙ্গে কথা বলে আজকের সকালটা আমার খুব ভাল কাটলো।

হঠাৎ মা ঘরে ঢুকলেন,—অত ছেলেমানুষ মাষ্টার মীনুর জন্য ঠিক করবেন না কাকাবাবু!

দাদু বললেন,—আমি তো ঠিক ক'রে ফেলেছি বৌমা, কথা দিয়ে ফেলেছি। তা ছাড়া এনার জন্য তো বুড়ো মাষ্টার রেখেছিলুম, তুমি তো অনুযোগ করেছো অনেক দিন—এবার মাষ্টারমশাই নাকি চেয়ারে বসে কেবল ঢোলেন, এ তো খুব ভালই হলো।

মা দাদুর কথার উত্তর দিতে না পেরে আমার দিকে এমন কটমট ক'রে তাকালেন যে, আমি চট করে সরে পড়লাম সেখান থেকে। তার পর মা নিশ্চয়ই মাষ্টারমশাইএর ঠিকুজি-কুষ্ঠি দাদুর কাছ থেকেই জেনে নিয়েছেন সব। মাষ্টারমশাই-এর কাহিনী শেষ করলো মীনা। দু'জনেরই খাওয়া হ'য়ে গিয়েছিলো অনেকক্ষণ, হাত শুকিয়ে একেবারে কাঠ। তাড়াতাড়ি মুখ ধুতে উঠে গেলো।

ইন্দ্রাণী এক ট্রাঙ্ক বোঝাই ক'রে বই নিয়ে গিয়েছিলো সিমলায়, সে ট্রাঙ্কের তালাই খোলেনি, তেমনি ভাবেই আবার ফিরে এসেছে। ট্রাঙ্ক খুলে বইগুলো টেবিলে সাজাতে সাজাতে ভাবছিলো ইন্দ্রাণী,—বড্ড অন্যায় হ'য়ে গেছে, এত ফাঁকি দেওয়া ঠিক হয়নি আদৌ, বিশেষ করে অঙ্কে যখন এত কাঁচা, কোনো বারই ভাল নম্বর ওঠে না। সমস্ত অঙ্কের বই গুছিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো বাবার কাছে অঙ্ক করবে ব'লে, কিন্তু একটি পাতাও ওল্টায় নি;—এখন আর আফশোষ করলে কী হবে? নিজেকে নিজে বললো ইন্দ্রাণী। বই-টই গুছিয়ে ইন্দ্রাণী একটু গড়িয়ে নেওয়াই ঠিক করলো। রাস্তার ক্লান্তিতে শরীরটা যেন আর নিজের শরীর বলে মনে হচ্ছে না। দুটো, তিনটে, চারটে বাজলো ইন্দ্রাণী শুয়েই আছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গায়ের চাদরটা বেশ ক'রে টেনেটুনে পাশ ফিরে শুলো ইন্দ্রাণী। কান পেতে বৃষ্টির টুপটাপুনি শুনতে শুনতে ইনা ভাবলে, অত দূর থেকে এসেছে, আজকের এ আলস্যটুকুকে প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে, কালকা ষ্টেশনে দাঁড়ানো মা-বাবার ছবিটা বারে বারে ওর এখন মনে পড়তে লাগলো, তাই শরীরের সঙ্গে মনটাও যেন কেমন কেমন—কিছু ভাল লাগছে না।

দড়াম করে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন সুবর্ণবালা, ইন্দ্রাণী একটু চমকে উঠে বসলো খাটের ওপর।

কী খবর রাঙামামী? দাদুর শরীর খারাপ হয়নি তো?

না—নীরস গলায় বললেন সুবর্ণবালা,—এই আমি তোমাকে বলে রাখছি ইনু, ঐ বখা মাষ্টার যদি মীনুকে পাশ করাতে পারে, তাহলে আমি নাকে খত দেব। পড়ানোর নাম নেই, কেবল হা-হা আর হো-হো—

ইন্দ্রাণী হাসি চাপলো, বখা মাষ্টার বলছো কেন? হাসছেন বলে?

সুবর্ণবালা চুপ ক'রে রইলেন।

জানো রাঙামামী, অনেকে গল্পের ভেতর দিয়ে পড়ান, উনি বোধ হয় হেসে আর হাসিয়ে পাঠ তৈরী ক'রে দেন, সকলের পড়ানোর ভঙ্গি তো এক নয়—ইন্দ্রাণী সুবর্ণবালার উষ্মা কমাতে চেষ্টা করলো।

মাথার ওপর হাত দুটো তুলে একটু আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়ালো, পড়ার টেবিলের সামনে গিয়ে চেয়ারটা টেনে বসলো। একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটাবার আগেই সুবর্ণবালা অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলেন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা তো তুমিও দেবে, তুমিও তো ঐ মাষ্টারের কাছে পড়তে পার একসঙ্গে।

এই প্রস্তাবে সুবর্ণবালার মনের ভাব এবং আঁচ উপলব্ধি ক'রে দম ফেটে হাসি এলো ইন্দ্রাণীর, হাসি গিলে উত্তর দিতে তাই সময় লাগলো একটু, তারপর বেশ সহজ গলাতেই উত্তর দিলো। তা তো বটেই।

পড়ার ঘরে এই সময় মাষ্টার-ছাত্রীতে কথোপকথন হচ্ছে—

মীনাক্ষী! তোমার পড়ার ইচ্ছে যখন একেবারেই নেই, খোলাখুলি দাদুকে সে কথা জানালেই তো পার, আমি তখন থেকে মিছেই বুঝিয়ে যাচ্ছি আর তুমি জানলা দিয়ে বাইরে চোখ পাঠিয়ে বসে আছো! আমার মাষ্টারীর বদনাম না ক'রে তুমি দেখছি কিছুতেই আর ছাড়বে না।

দাদুকে খোলাখুলি জানালে কী হবে, মা মোটেই মানবেন না, মা'র ইচ্ছে আমি ম্যাট্রিকটা পাশ করি—মীনাক্ষীর সপ্রতিভ উত্তর।

তুমি পড়বে, তোমার ইচ্ছে নেই, মা'র ইচ্ছেতে আর কী হবে।

কী যে মুস্কিল হ'য়েছে আমার—ঠোঁটে অসহায় ভঙ্গি ফোটালে মীনা।

মার ধারণা, ম্যাট্রিক পাশ না করলে আমার ভাল বর জুটবে না, অথচ বই নিয়ে ব'সে ব'সে পড়তে আমার কী যে খারাপ লাগে—একফোঁটা ভাল লাগে না—মীনাক্ষী এমন একটা করুণ ভঙ্গির ঢেউ তুললো মুখে, হো-হো ক'রে হেসে উঠলো সুপ্রিয়। তারপরই ছদ্মগাম্ভীর্য সুপ্রিয়র মুখে।

পড়তে একফোঁটা ভাল লাগে না, কী তাহলে ভাল লাগে শুনি?

সব সময় তো আর এক জিনিষ ভাল লাগে না, এখন আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের বৃষ্টিপড়া দেখি।

ছাত্রীর দিকে স্থির চোখে একটু তাকিয়ে সুপ্রিয় বললো, বেশ তো! জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একটু ভাল করে দেখে এসো—তারপর পড়লেই হবে। মীনাক্ষী তৎক্ষণাৎ জানলার কাছে উঠে গেলো, আর তারপরই—

মাষ্টারমশাই, একবার একটু দেখে যান।

ছাত্রীর কাণ্ডকারখানায় দিনের পর দিন স্তম্ভিত হচ্ছে সুপ্রিয়। ঠিক আছে, তুমি দেখে চলে এসো।

মাষ্টারমশাই দেরী করবেন না—শীগ্‌গির—বিব্রত সুপ্রিয়কে উঠতেই হয়। সামাজিক আইন-কানুন কিছুই জানে না, ভারি মুস্কিল তো মীনাক্ষীকে নিয়ে!

মীনাক্ষী জানলার বাঁপাশে একটু সরে সুপ্রিয়কে জায়গা করে দিয়ে নিচের দিকে আঙ্গুল সংকেত করলো। ঐ দেখুন। নিচে উঠোনের একপাশে একটি কাঁঠালি 'চাঁপাগাছ, সবে যেন যৌবন এসেছে গাছটার, নরম সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুঁড়িগুলি উঁকি দিচ্ছে। ঝির-ঝির করে বাঁকা বৃষ্টি পড়ছে সোনালী সলাজ কোরকের ওপরে, চিকণ সবুজপাতার ওপরে। নিভৃতে গাছটির এই শোভা পরম রমণীয় হয়ে উঠেছে যেন। নাম-না-জানা দুটি সুন্দর রঙিন পাখি নেচে নেচে গাছের এ-ডালে ও-ডালে ঘুরছে আর মাঝে মাঝে কিচিমিচি করে ডেকে তাদের অস্থির আনন্দ প্রকাশ করছে—উপভোগ করবার মত দৃশ্য বটে! গলা নামিয়ে মীনাক্ষী প্রশ্ন করলো, এ পাখির নাম জানেন মাষ্টারমশাই?

না।

কী আশ্চর্য গাঢ় নীল রং গলার, আর পালকের রং কী যে অদ্ভুত সোনালী, যেন টুকরো টুকরো আলো ঠিকরে পড়ছে, পালকের মাথায় মাথায় আবার আবছা সবজে ছোপ, এমন রং দোকানে পাওয়া যাবে মাষ্টারমশাই?

যাবে।

মীনাক্ষী যেন এ উত্তর প্রত্যাশা করেনি, বিস্ময়ে সপ্রশ্ন চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো সুপ্রিয়র দিকে। আর সুপ্রিয় স্থির চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎই যেন আবিষ্কার করলো মীনাক্ষীর কালো চোখের আশ্চর্য স্বপ্নময় সরলতা। সুপ্রিয়কে নিরুত্তর দেখে মীনাক্ষী নিজে নিজেই বললো, তাহলে পরীক্ষা শেষ হলেই ঐ সব রং কিনে এনে পাখি দুটোকে কাগজের বুকে ফুটিয়ে তুলবো।

সুপ্রিয় আবার একটু গাম্ভীর্য আনতে চেষ্টা করলো, পাখি দুটো উড়ে গেছে, চলো এবার পড়ার টেবিলে।

আহা! সত্যি? তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালে মীনাক্ষী। পাখি দুটি নেই দেখে মুখখানি কাঁদ-কাঁদ হয়ে উঠলো ছেলেমানুষের মত, নিজের অসাবধানে নিজের হাত থেকে টফি লজেন্স কোনো নোংরা জায়গায় পড়ে গেলে শিশুদের মুখের অবস্থা যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম। যেন ও চোখ ফিরিয়ে সুপ্রিয়র সঙ্গে কথা না বললে পাখি দুটি উড়ে যেতো না।

মুখটা করুণ করেই চেয়ারে এসে বসলে মীনাক্ষী, সুপ্রিয় টেবিল থেকে ইংরিজী পোয়েটিক্যাল সিলেকশনটা হাতে তুলে নিলো, বেছে বেছে একটা জায়গায় এসে বই-এর থেকে চোখ সরিয়ে মীনাকে উদ্দেশ্য করে বললো, তোমাদের সিলেবাসে শেলীর "ক্লাউড" কবিতাটি আছে, আচ্ছা, আমি সেটা প্রথমবার শুধু রিডিং প' যাচ্ছি, তুমি চুপ করে বসে মন দিয়ে শোনো, তারপর পড়ে পা মানে বলে দেব। আবৃত্তি শুরু করলো সুপ্রিয়, চুপ ক'রে শুনা মীনা। আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে চোখ, চোখের তারা একেবা স্থির, দৃষ্টি বদলে বদলে একেবারে অন্যরকম হ'য়ে যাচ্ছে। এ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ও পাখি দুটিও দেখেনি। মনে হচ্ছে মীনাক্ষ কান দিয়ে শুধু শুনছে না, অদৃশ্যমান কোনো কিছু দিয়ে দেখছে। কবিতা পাঠ শেষ হলো, তখনও যেন পুরো ঘো কাটেনি মীনাক্ষীর, আগের মতই চোখ চেয়ে বসে আছে চুপ ক'রে ছাত্রীর তদ্‌গত ভাব দেখে খুশি হলো সুপ্রিয়, বললো, এবার আ এক এক প্যারা পড়ে মানে বলে যাচ্ছি।

না, না মাষ্টারমশাই—মীনাক্ষীর স্থির শরীর নড়ে উঠলো আপনি আবার ফিরে আর একবার পড়ুন—মানে আমি বুঝেছি যা বুঝিনি তা প'রে বুঝে নেব নোটবই দেখে। ছাত্রীর উক্তিতে আরো খুশি হলো সুপ্রিয়। আবার পড়ে চললো কবিতাখানি শেষ যখন হলো, তার বেশ কয়েক মিনিট পরে আত্মস্থতা ফিরলে মীনাক্ষীর- গলা নামিয়ে এত অস্ফুটে কথা বললো যেন কণ্ঠস্ব দিয়ে পরিবেশটা ভাঙতে চায় না, আরো খানিক ধরে রাখতে চায় মাষ্টারমশাই! এত ভাল কবিতা আবৃত্তি আমি আর কখনো শুনিনি।

মীনাক্ষীর ভাবপ্রবণতায় সুপ্রিয় যেন লজ্জিত হলো, একটু হাসলো, আমার আবৃত্তি তোমার ভাল লাগলো এত! আমার বন্ধু অরুণেশের আবৃত্তি যদি তোমাকে শোনাতে পারতাম, তাহলে তোমার মনে হতো মেঘমালা যেন সত্যি সত্যি এসে দাঁড়িয়েছে তোমার সামনে।

জলতরঙ্গের মত হেসে উঠলো মীনা, আমিও মেঘমালা দেখেছি মাষ্টারমশাই!

ইনা চলে গেছে। একটা সখ নিয়ে মেতেছেন সর্ব্বাণী, বাগান করা। আজ শনিবার। 'রিগ্যালে' খুব ভাল একখানি ইংরিজী বই হচ্ছে, অমল-রথীন এসে রমেনদা'কে সঙ্গী ক'রে নিয়ে গেলেন কিন্তু সর্ব্বাণী কিছুতেই গেলেন না। সকালে কতকগুলি ফুলের চারা কিনেছেন, সেগুলি এখন না লাগালেই নয়। এক মনে চারা রোপণে লেগেছেন সর্ব্বাণী। প্রথম সারিতে নিমনি, তারপর লাগালেন প্রিমুলা, তারপর প্যানজি। গোলাপের কতকগুলি ছোটো ছোটো বেড্‌ ইতিমধ্যেই হ'য়ে গেছে—কুঁড়িও ধরেছে তাতে। প্যানজির সব ক'টি চারা লাগানো শেষ হয়নি, হঠাৎ পরিচিত আহ্বান।

সাবি! মুখ তুললেন সর্ব্বাণী, একেবারে সামনে এসে সহাস্যমুখে দাঁড়িয়েছেন বান্ধবী মালতী এবং মিঃ মনোজ গুপ্ত। গাছ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকায় ওঁদের এত সামনে এসে দাঁড়ানো লক্ষ্য করেননি। সর্ব্বাণী তাড়াতাড়ি হাত ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, কী কাণ্ড! আমি একটুও টের পাইনি—আসুন আসুন! হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে শেষের কথাটা মিঃ গুপ্তকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন সর্ব্বাণী।

তোর চারা পড়ে রইলো যে—মালতী বললেন।
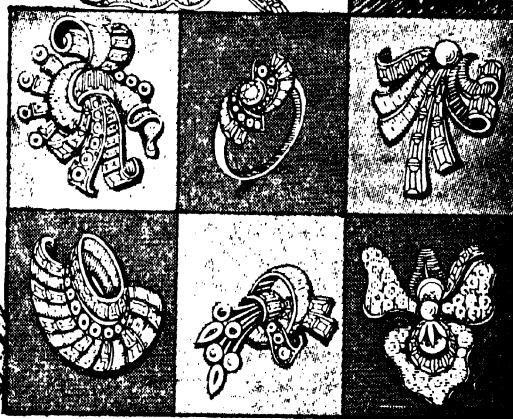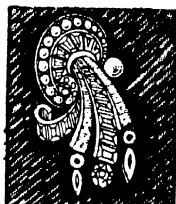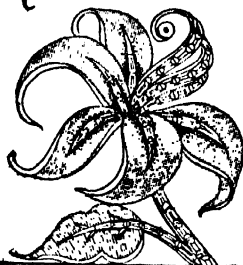
থাকগে, পরে হবে।

সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১. বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/পি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ
B.B.

পরে হবে কি রে? সন্ধ্যে হ'তে চললো। আয়, দুজনে হাতে হাতে লাগিয়ে ফেলি—মূল্যবান সিফন শাড়ি কোমরে পেঁচিয়ে বাগানে ঢুকে পড়লেন মালতী।

আরে! না-না, পাগল হলি নাকি তুই, আমরা গাছ লাগাবো আর মিঃ গুপ্ত দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?

ততক্ষণে চারা লাগাতে শুরু ক'রে দিয়েছেন মালতী, মুখ নিচু করেই হালকা গলায় বললেন, দাঁড়াতে ভাল না লাগলে ঘরে গিয়ে বসবেন 'খন, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

না মালা না, গৃহস্বামী উপস্থিত থাকলে তবু না হয় কথা ছিলো একটা, এখন এভাবে—

মিঃ গুপ্ত এবার হাসিমুখে বললেন, আপনি অযথা ব্যস্ত হচ্ছেন মিসেস রায়, ঘরের চেয়ে বাহির আমার চিরকাল ভাল লাগে।

মালতী গাছ লাগাতে লাগাতে বললেন, ঘরের চেয়ে বাহির যে তোমার অনেক বেশি প্রিয় তা আমি খুব ভাল করেই জানি, সে দুর্বলতাটা আমার বন্ধুর কাছে প্রকাশ করে আমাকে আর খাটো করো না বাপু—হাল্কা তরল সুর মালতীর গলায়।

তিন জনেই হেসে উঠলেন একসঙ্গে। বিব্রত সর্বাণী কেমন একরকম আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, বান্ধবীর উচ্ছ্বাস এবং অন্তরঙ্গতায় অনেক সহজ হ'লেন। মালতীর পাশে গিয়ে ক্ষিপ্র হাতে লেগে গেলেন চারা রোপণে; সহসা যেন কৈশোর ফিরে এলো। উৎসাহের আবেগে প্রায় ছুটোছুটি ক'রে দুই বান্ধবী গাছ লাগাতে লাগলেন।

সর্ব্ব। কলেজের বৃক্ষরোপণ উৎসবের কথা মনে পড়ে?

পড়ে বৈ কি, তবে তোর বেশি মনে পড়ার কথা, দামী শাড়িখানা ছিঁড়ে ফেলেছিলি—

হ্যাঁ, অনর্থক শাড়িখানা নষ্ট হলো সেদিন, ফটো তোলার কথা ছিলো, সেজেগুজে এলাম—তা কোথায় কী—উচ্ছল গলায় হেসে উঠলেন মালতী। প্রচ্ছন্ন অভিমানটুকু একেবারে মিলিয়ে গেলো সর্বাণীর।

না, মালতীর কোনো পরিবর্তন হয় নি,—মেয়েদের মন কী যে অদ্ভুত সংকীর্ণ, সেদিন পার্টিতে নবাগতাদের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত ছিলো মালতী, তাই গল্প করেনি সর্বাণীর সঙ্গে। এত সামান্য কারণে এত বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছিলো কেন সর্বাণী? শুধু ওতেই শেষ নয়, অভিযোগ জমে জমে মনের চেহারা পর্যন্ত বদলে গিয়েছিলো। নিজের মনের এই দীনতায় নিজেকে বার বার ধিক্কার দিলেন সর্বাণী।

—কী হয়েছে রে সর্ব্ব? একেবারে চুপ যে?

না রে, কথা বললে হাতের কাজ এগোবে না, মিঃ গুপ্তকে সেই কখন থেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি—উজ্জ্বল মুখে উত্তর দিলেন সর্বাণী। গাছ লাগানো শেষ হলো। রামদয়ালকে ডেকে সর্বাণী চারাগুলিতে জল দিতে বললেন, তার পর মালতী ও মিঃ গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন ভেতরে। দুই বান্ধবী হাত ধোওয়ার পর সর্বাণী বললেন, তুই ড্রইংরুমে গিয়ে বোস, আমি আসছি···এই দু মিনিট—

মালতী চলে গেলেন ড্রইংরুমে, সর্বাণী কিচেনে। কৃপালালকে চা ও তার সঙ্গে আনুসঙ্গিক কিছু নির্দেশ দিয়ে ফিরে এলেন।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলি নে কেন মালা?—সর্বাণীর অনুযোগ।

হুঁ, তবেই হয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা কি মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে ভালবাসে নাকি? তা ছাড়া, সিমলায় ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোর রেওয়াজ নেই।

তাই বল, শেষের কথাটাই হলো আসল। আমার মেয়ে ইনু কিন্তু আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না, তাই ইচ্ছে না থাকলেও ইনুটার জন্য আমায় বেরোতে হয় মাঝে মাঝে—

কেন, বেড়াতে ইচ্ছে যায় না কেন রে? বুড়িয়ে গেলি নাকি?

তা বৈ কি! মেয়ে তো বড় হ'য়ে উঠলো—আর চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই শাশুড়ি হবার আশা রাখি।

বাজে কথা রাখ, আজ কিন্তু তোদেরকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব ব'লে আমরা এসেছি, কাল রবিবার, খুব মজা ক'রে ছুটির দিনটা এনজয় করা যাবে। একেবারে কাল রাত্রিতে পৌঁছে দিয়ে যাব তোদের, সকাল-সন্ধ্যে গল্প করবো আর ফটো তুলবো, আর দুপুর ফুরোবো বাজি রেখে ব্রিজ খেলে—কেমন, রাজি?

সর্বাণী হাসিমুখে বললেন, যা লোভ দেখাচ্ছিস মালা, প্রস্তাব খুবই লোভনীয়, কিন্তু আজকে আমাদের যাওয়া চলবে না ভাই! কিছু দরকারী কাজ ছুটির দিনে সারবো ব'লে জমা ক'রে রেখেছি।

তুমি কিছু বলছো না কেন? হোস্ট রিকোয়েস্ট না করলে বোধ হয় সাবি রাজি হবে না—স্বামীর দিকে তাকিয়ে অনুযোগ করলেন মালতী। মিঃ গুপ্ত কাগজে মনোযোগ দিয়েছিলেন, মুখ তুলে সস্মিতমুখে বললেন, তুমি ভেবো না মালতী, মিঃ রায়কে আমি পাকড়ে নিয়ে যাব ঠিকই, তার পর আপনিই আসবে মাথা।

মুখ টিপে হাসলেন সর্বাণী, সে আপনাদের বেলায় মিঃ গুপ্ত, আমাদের নয়।

মিঃ গুপ্ত বললেন, আপনাদের দাম্পত্যের গল্পও আমি কিছু কিছু শুনেছি মিসেস রায়!

সে তো বিয়ের পরের মামুলি গল্প, কিন্তু আপনাদের রোমান্স রেকর্ড হয়ে আছে কলেজে,—টিফিনের পরের লেকচারগুলি তো খুব কমই এ্যাটেণ্ড করেছে মালতী। মালতীর আসন শূন্য দেখলেই আমরা বুঝতেম শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের একটি ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রও আজ কলেজ ফাঁকি দিলো।

মনোজ গুপ্ত হাসলেন, ও, সে সব একদিন গেছে বটে!

মালতী আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এলেন, সাবি! তাহলে কী ঠিক করলি, যাবি কি যাবি না? মালতীর কণ্ঠস্বরে সূক্ষ্ম অভিমান ধ্বনিত হলো।

যাবো তো নিশ্চয়ই, তবে আজ নয়, কাল বিকেলে।

শেষ পর্যন্ত দুই বান্ধবীতে রফা হলো, কাল সকালে চা খাওয়ার পরই ওঁরা যাবেন এবং ফিরবেন সেই রাত্রে। শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন গুপ্ত-দম্পতি।

এই অরুণেশ, দাঁড়া। অরুণেশ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো একখানি খাতা বগলে করে হনহনিয়ে এগিয়ে আসছে সুপ্রিয়। সুপ্রিয় এসে পড়লো; তারপর গতি মন্থর ক'রে গল্প করতে করতে চললো দুই বন্ধু। অরুণেশ কৌতুককণ্ঠে বললো, তারপর, তোর ছাত্রীর খবর কী সুপ্রিয়? আজ বৃষ্টিও নেই, এক ফোঁটা মেঘও নেই আকাশে—আজ ছাত্রীকে পড়ানোর কোনো ব্যাঘাত হয়নি নিশ্চয়ই

সুপ্রিয় হাসলো,—না, তা হয়নি। আজ গিয়ে দেখি, নিবিষ্ট মনে মনোযোগী ছাত্রীর মত ইংরিজী প্রশ্ন মুখস্থ করছে। অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে বলতে হঠাৎ প্রয়োজনীয় কোনো কিছু মনে এসে গেলে মুখের যে ভাব হয় ঠিক তেমনি মুখের চেহারা ক'রে সুপ্রিয় বললো।

অরুণ, আজ একখানা ইংরিজী খাতা দেখাবো তোকে, ম্যাট্রিকের ছাত্রীর খাতা, ইংরিজী পড়ে তুই অবাক হবি একেবারে, কিছুতেই বিশ্বেস করবিনে যে কোনো একজন ম্যাট্রিক-পরীক্ষার্থিনীর কলম দিয়ে এমন ইংরিজী বেরুতে পারে।

অরুণেশ বললো, খাতাটা কার? তোর ছাত্রীর নাকি?

পাগল! আমার ছাত্রী এমন লিখলে, পড়ানো বাদ দিয়ে আমি নিজে তার কাছে ইংরিজী শিখতাম—

এত ভাল!

এতই ভাল।

কে মেয়েটি? নাম কী? অরুণেশের প্রশ্নে এতক্ষণে আগ্রহের সুর লাগলো।

মেয়েটি আমার ছাত্রীর পিসতুতো বোন, নাম ইন্দ্রাণী রায়।

কে?

অরুণেশের বিস্মিত কণ্ঠস্বর হঠাৎ উচ্চগ্রামে উঠে গেছে। ইন্দ্রাণী রায়!

এমন অবাক হলি যে? তুই চিনিস নাকি? ওর মা-বাবাও তো শুনলেম সিমলাতেই থাকেন—

অরুণেশ সামলে নিয়েছে, না, চিনি না—এবং তারপর বেশ একটু হেলাফেলা ভাব নিয়ে বললো, ও খাতার লেখা যে ইন্দ্রাণীরই লেখা তার প্রমাণ কী? ওর দাদু তো ইংরিজীতে বিরাট পণ্ডিত, ওসব লেখা নিশ্চয়ই প্রফেসার জিতেন্দ্রনাথ সেনের লেখা, খোঁজ নিয়ে দেখিস।

না রে, ও-কথা বলতে কী আমি বাকী রেখেছি, আমার কথা শুনে ছাত্রী তো হেসেই অস্থির,—বলে, দাদু লিখে দেবেন তবেই হয়েছে, দাদু যে বইখানি লিখছেন তাই নিয়েই দাদু মত্ত, দিন-রাত কোথা দিয়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে তারই হিসেব রাখেন না, নাওয়া-খাওয়া মনে করিয়ে দিতে দিতে দিদাই হয়রাণের একশেষ—দু'মিনিট গল্প করা যায় না দাদুর সঙ্গে,...দাদু দেবেন লিখে!

অরুণেশ হঠাৎ ভেতরে ভেতরে একটা উত্তেজনা অনুভব ক'রে নিজেই অবাক হয়ে গেলো। উত্তেজনা চেপে হাল্কাগলায় বলতে চেষ্টা করলো, তাহলে তো ইন্দ্রাণীর খাতাখানা দেখতেই হয়—

সুপ্রিয় বগলের খাতাখানা নির্দেশ ক'রে বললো, তোকে দেখাবো বলেই তো খাতাখানা একদিনের কড়ারে ছাত্রীর কাছ থেকে নিয়ে এসেছি। পিসতুতো বোন জানতে পারলে নাকি আস্ত গিলে খেয়ে ফেলবে ওকে। খাতাখানা ফেয়ার খাতাও নয়, সাধারণ একখানা।

আরে সুনীলদা' না? আরে তাইতো—ভোল একেবারে বদলে ফেলেছো দেখছি—আরে কী কাণ্ড! সুপ্রিয়র উচ্ছ্বাসে অরুণেশ সামনে দিকে ভাল করে নজর দিলো, দেখলো—নিখুঁত সাহেবী পোষাকে একটি যুবক পার্শ্ববর্তিনী শ্যামাঙ্গী একটি তন্বীর সঙ্গে গল্প করতে করতে এবং প্রচুর হাসতে হাসতে ওদেরই ফুটপাতের উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসছে, কিন্তু ওদের কাউকেই অরুণেশ চেনে না। আস্তে বললে অরুণেশ, সুনীলদা' কে? চিনলেম না তো?

আমাদের গ্রামের ছেলে। ভারি ক্ষমতা রাখে সুনীলদা'। অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো, খবর পেয়েছিলাম—বি-এ পাশের পরই কেমন করে যেন একটি ধনীকে ঘায়েল করে তার একমাত্র দুহিতাকে বিয়ে করে এবং তারপর শ্বশুরের পয়সায় বিলেত চলে যায়, বিলেত থেকে ফিরেছে দেখছি। একেবারে সামনে এসে গেছে সুনীলদা' এবং সেই শ্যামাঙ্গী তন্বী অর্থাৎ সুনীল-জায়া, ভাবভঙ্গীতে স্ত্রী বলে অনুমান করে নিতে ভুল হয় না। একমুখ হেসে সুপ্রিয় একটু দ্রুত এগিয়ে মুখোমুখী হলো, সুনীলদা' যে! উঃ, কত দিন পরে দেখা। নমস্কার সুনীলদা, নমস্কার বৌদি!

যুবকটি চোখ তুলে একটু কাল সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে রইলো, পূর্বপরিচিতির এতটুকু স্বাক্ষরও ফুটলো না যুবকের দৃষ্টিতে, ঠোঁটের ভঙ্গি ছুঁচোলো করে বললো, আপনাকে তো চিনলাম না—

সে কী সুনীলদা'! আমি সুপ্রিয়—

আপনার ভুল হচ্ছে, কোনো সুপ্রিয়কে আমি চিনিনে—চলো রুণি, শো বিগিন হয়ে গেলো বোধ হয়—চলে গেলো তন্বী শ্যামাঙ্গী ও নিখুঁত সাহেবী পোষাকপরা যুবকটি। স্তম্ভিত সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে অরুণেশ বলতে যাচ্ছিলো, নিশ্চয় তোর লোক ভুল হয়ে থাকবে, তার আগেই শ্যামাঙ্গীর মৃদু কণ্ঠস্বর কানে এসে গেলো, ভদ্রলোকটিকে চেনো না বললে, কিন্তু উনি তোমার নাম জানলেন কী করে? তোমারই হয়তো—

স্ত্রীর কথা যেন লুফে নিলো যুবকটি,—টাকাপয়সা হ'লে নাম জানতে বেশি দেরী লাগে না।

অরুণেশও স্তম্ভিত হয়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকে সুপ্রিয় নিশ্বাস ফেললো একটা, অরুণেশের দিকে তাকিয়ে ব্যথিত গম্ভীর মুখে বললো, এইসী দুনিয়া! আচ্ছা!

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টায় অরুণেশ বললো, দেখ সুপ্রিয়, সেই এক চিলতে মাঠের ওপর জমজমাট কেমন সব দোকান বসে গেছে, সদর রাস্তায় যেখানেই জমি আছে একটু, সেখানেই বসে গেছে হকার্স কর্ণার—

গম্ভীর গলায় সুপ্রিয় ধীরে ধীরে শুধু বললো, স্ট্রাগ্‌ল ফর এক্‌জিস্‌টেন্স।

অপাঙ্গে বন্ধুর মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে অরুণেশ হাসলো, কী রে, অত মন খারাপের হলো কী তোর? হঠাৎ আশাভঙ্গ হলো না কি? তোর কী ইচ্ছে হয়েছিলো সুনীলদা'র বাড়ি গিয়ে সুনীলবৌদির হাতে এক কাপ চা খাবি, না কি রে?

সুপ্রিয় অরুণেশের দিকে তাকিয়ে হো-হো ক'রে উচ্চহাস্য ক'রে উঠলো।

ক্ষেপে গেলি না কি? বন্ধুর কাঁধে হাত রাখলো অরুণেশ। দু-চারজন পথচারী সুপ্রিয়র উচ্চহাস্যে আকৃষ্ট হয়ে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলো।

হ্যালো! কেমন আছেন? সুবেশ সুঠাম একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবকের ডানহাতের কবজি আপ্যায়নের ভঙ্গিতে ঝপাং ক'রে ধরে ফেললো সুপ্রিয়। অরুণেশ আপ্যায়নের ভঙ্গিতে একটু যেন চমকে উঠলো এবং ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলো, এঁকেও

এর আগে আর কোনো দিন দেখেনি। যুবকটি দাঁড়িয়ে গিয়ে বিমূঢ় দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে সুপ্রিয়কে। চোখের চাউনি দেখে মনে হচ্ছে ওঁর স্মৃতি প্রাণপণ চেষ্টায় লেগেছে সুপ্রিয়কে চেনবার জন্ত। সুপ্রিয় আরো একটু ঘন হ'য়ে দাঁড়িয়ে খুব ঘরোয়া গলায় বললো, তারপর? বাড়ির খবর সব ভালো তো? যুবকটি সুপ্রিয়র কণ্ঠস্বরের ঘনিষ্ঠতায় চেনবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললো, না, ভাল আর কোথায়? মাকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি।

কেন? মা'র আবার কী হলো? মা'র স্বাস্থ্য তো খুব মজবুত দেখেছিলাম।—সুপ্রিয়র কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ।

হ্যাঁ, খুবই তো ভাল ছিলেন মা, কোনো দিন একটু সর্দ্দিজ্বর পর্যন্ত হতে দেখিনি। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা উঠতে গিয়ে বিছানা থেকে উঠতে পারেন না, বাঁ দিকটা একেবারে ধরে গেছে—প্যারালিসিস!

—যুবকটির গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে সুপ্রিয়ও দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

তাইতো—সুপ্রিয়র কণ্ঠস্বর আরো গাঢ় হলো। এমন সমবেদনায় যুবকটির গলা যেন ছলছলিয়ে উঠলো।

কী যে মুশকিলে পড়েছি আমি, পিকুউনারি হেল্প তো কারুর কাছ থেকে একটি আধলাও পাওয়া যাবে না—

কেন? ভাই কিছু দেয় না?—সুপ্রিয় বললো।

ভাই? যুবকটি সুপ্রিয়র মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু ছুটো বঙ্কিম করলো, তারপর, ও! আপনি আমার বৈমাত্র-দাদার কথা বলছেন? তিনি তো পাকিস্থানে রাজার হালে আছেন, একখানা চিঠি দিয়ে খোঁজ নেন না, তো টাকা পাঠাবেন—

হুঁ! তাহলে তো খুবই মুস্কিলে আছেন দেখতে পাচ্ছি—একটু থেমে, আচ্ছা, ভাল কথা, আপনার নামটি যেন কী? যুবকটির চোখ বিস্ফারিত হলো কিন্তু ওষ্ঠ অস্ফুটে বললো, নীরদবরণ দস্তিদার।

ইয়েস, ইয়েস, নীরদবরণ দস্তিদার—সুপ্রিয় মাথা নেড়ে নেড়ে কথা ক'টি বললে, তারপর চোখে জিজ্ঞাসা এঁকে ভুরু ছুটি কুঁচকে যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো!

আপনার সঙ্গে কোথায় যেন আলাপ হ'য়েছিলো একদিন?

যুবকটির চোখ বিস্ফারিত হলো আরো, নির্নিমেষ চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ—তারপর অত্যন্ত ধীরে ধীরে বললো, বোধ হয় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে।

ই-য়েস, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট—সুপ্রিয়র গলা থেকে শব্দ তিনটি যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো। যুবক আর দাঁড়ায়নি, চলতে শুরু করেছে। একটু পেছনে দাঁড়ালো অরুণেশ। রুদ্ধ হাসির ঠেলায় দম ওর আটকে আসছে। সুপ্রিয়র সামনে এসে হেসে ফেললো অরুণেশ, ছিঃ ছিঃ সুপ্রিয়, তোর হলো কী? ভদ্রলোকটির মুখ দেখে মনে হলো যে উনি রীতিমত ভাবতে শুরু করেছেন, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের একদিনের আলাপ যদি হয়, তাহলে উনি মা'র মজবুত স্বাস্থ্য দেখলেন কী করে?

সুপ্রিয় উঁচুগলায় হেসে উঠলো, পৃথিবীটাকে বিরাট একটা রঙ্গমঞ্চ কে বলেছিলেন যেন? পৃথিবীকে অভিনয়মঞ্চ ভেবে নিয়ে স্রেফ চালু রেখে যাবি অভিনয়টা—সুনীলদা' আজ এই কাণ্ড ক'রে গেলো, অথচ বাবার সাহায্যে মানুষ সুনীলদা', বাবা শুধু মাসিক সাহায্যই করেননি, গ্রামের হাইস্কুলের হেডমাষ্টারকে বলে কয়ে ফ্রীর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, বসাক কাকা অর্থাৎ সুনীলদা'র বাবা মারা গেলেন যখন, তখন সুনীলদা'র বয়েস সবে সাত বছর। ছেলেকে পড়াশুনো শিখিয়ে মানুষ করার জন্ত কী কষ্ট যে বসাক-কাকীমা করেছেন—শেষের দিকে চিড়ে-মুড়ির মোয়া বেচতে শুরু করেছিলেন, সেই সুনীলদা' বলে গেলো কি না—টাকা-পয়সা হ'লে নাম জানতে দেরী লাগে না—আবার হেসে উঠলো সুপ্রিয়, অরুণেশ বন্ধুর পায়ে পা মিলিয়ে চলছে বটে, কিন্তু হঠাৎ যেন আনমনা হ'য়ে পড়েছে। ঠিক কিছু যে ভাবছে তা নয়, কিন্তু সুপ্রিয়র কথা ওর কানে যাচ্ছে না, কেমন যেন অগোছালো হ য়ে গেছে ওর মনের অবস্থা।

হ্যাল্লো! কেমন আছেন? সুপ্রিয়র কথায় অরুণেশ আচমকা যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো, দেখলো, ঠিক আগের ভঙ্গিতে সুপ্রিয় আর একটি ভদ্রলোকের হাত পাকড়েছে। ভদ্রলোকের বয়েস ত্রিশের নিচের দিকেই হবে, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী এবং গায়ে একখানি দোসুতির চাদর। অরুণেশ এবার সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেলো।

সুপ্রিয়র মাথাটা কী খারাপই হ'য়ে গেলো না কি! এই কোলাহল-মুখরিত পথে কী পাগলামী লাগিয়েছে! কিন্তু তারপরই অবাক হলো ভদ্রলোকের কথায়। সুপ্রিয়র আপাদ-মস্তক বার তিনেক দেখলেন ভদ্রলোক, তারপর হাসি-হাসি মুখে বললেন, দিব্য আছি, আপনার খবর কী? সুপ্রিয় ব্রেক কষলো নিজেকে, আস্তে বললো, কেমন দেখছেন?

চমৎকার স্বাস্থ্য হয়েছে আপনার, আমার তো আপনার সুকুমার চেহারা দেখে রীতিমত হিংসে হচ্ছে মশাই—উচ্ছল শোনালো ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর। এবার সুপ্রিয় যেন কিছুটা নার্ভাস হ'য়ে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো। ঠোঁট টিপে ভদ্রলোক একটু হাসলেন, সামনের রবিবার আসুন না আমাদের বাড়ি, একসঙ্গে বসে জমিয়ে একটু চা খাওয়া যাবে—আপনাব বন্ধুটিকেও সঙ্গে নিয়ে আসবেন, আচ্ছা নমস্কার—নমস্কার—ছুই বন্ধুকে নমস্কার জানিয়ে ভদ্রলোক ছু'পা এগিয়েই আবার ঘাড় ফেরালেন, আমি সেই আগের বাড়িতেই আছি—আসবেন কিন্তু রবিবার সকালে—আচ্ছা নমস্কার। ভদ্রলোক চলে গেলেন।

শেষের দিকে ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর কৌতুকে যেন ফেটে পড়লো। ছুই বন্ধু পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো একটু কাল, তারপর ছুজনেই একসঙ্গে হেসে ফেললো, সুপ্রিয় সহাস্যে বললো, দেখলি অরুণেশ, ভদ্রলোক হামেশা অভিনয় ক'রে ক'রে একেবারে প্রথম শ্রেণীর আর্টিষ্ট বনে গেছেন, নমস্কার নাও দাদা! এর পর ট্রামষ্ট্যাণ্ডের কাছে এসে অরুণেশ ও সুপ্রিয় ট্রামের জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলো।

[ ক্রমশঃ।

It is pretty foolish to become dependent on fan mail when you know the sort of people who write most of it. —*Bette Davis*

সাত্যকি

৩

সকাল হয়েছে। রোদ্দুরে চারিদিক ঝলমল করছে। শিশির-ভেজা গাছের পাতায় লক্ষ মাণিক জ্বলা।

ঘুম ভাঙল।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট ধরালুম। আজ কাজ আরম্ভ হবে বেলা বারোটা থেকে। কানাই গাড়ী ফেরত আনবে দু'-এক ঘণ্টার মধ্যেই। সারাদিন ওর ছুটি, আমার কাজ।

শেষ উত্তরে হাওয়া বইছে। লেপটা বুক পর্যন্ত তুলে আনলুম।

কলাপাতা কাঁপছে। চিরখেল লম্বা পাতা। মোচা বেরিয়েছে দেখছি ঐ গাছটায়। ছড়া দেখা দিয়েছে ছোট ছোট। পাকা কলার নিশ্চয়ই। অসংখ্য চারাগাছে জায়গাটা ভরে উঠেছে।

সখ আছে তো মেয়েটার! গাঁদা ফুলের বীজ রাখবে বোধ হয়। আশেপাশে খালি গাছ-গাছড়া। শিম, লাউ, বরবটি—আরো কত কী। শিম গাছের শিকড় কত মোটা হয়ে গেছে। বয়েস হয়েছে বোঝা যাচ্ছে। ওটা কী ঝুলছে? ঝিঙে? ও, বুঝেছি। বীজ রাখছে। সঞ্চয়। মেয়েদের সঞ্চয় করা একটা স্বাভাবিক বাতিক। কালও ওদের বাঁচতে হবে। কী নিশ্চিন্ত বিশ্বাস! জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওরা বেঁচে থাকতে চায়। নিজের তৈরী নানা কাজ-অকাজের মধ্যে নিজেকে ভুলিয়ে রাখে ওরা। ভরিয়ে রাখে সংসার; বাঁচিয়ে রাখে ঘর।

চা খাবার সময় হয়েছে বোধ হয়। কী জানি ক'টা বাজলো। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। বেলা তো অনেক হোল। রোদ্দুর মাঝ উঠোনে পড়-পড়।

পামা ঢুকল। ভিজে চুল। পিঠের উপর ছড়ানো। ঘন আর কালো। আলোতে চিকচিক করে। কপালের মাঝখানে প্রদীপ-শিখার মতো কুমকুমের টিপ।

কত ভালো লাগে পামাকে। সংসারী হবার আগ্রহ ওর কত! হয়ত সত্যি কারো ঘরণী ছিল সে। সংসার ছিল। ছিল আত্মীয়-কুটুম্ব। এখন আপন কেউ নয় ওর। যে দোষ সে স্বেচ্ছায় করেনি, তার জন্যে কী নিদারুণ শাস্তি! কত দীর্ঘ জীবন তার সামনে। সবই কি ঊষর? যৌবন কি শুধু ঝরেই যাবে ওর দেহে? সাধ-আহ্লাদ বলে কিছু থাকবে না? ঘর বাঁধবার আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলবে তার সুখ, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করবে শান্তি।

কেন যে পামাকে ভাল লেগেছে জানি না! কৃষ্ণাভ রং—অনেকটা রেলের ধোঁয়ার মত। গল্প-উপন্যাসে বলে শ্যামল। বিয়ের ভাষায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বাংলার মেয়ের এই চিকণ-কালো রূপ, প্রকৃতির সজল শ্যামলিমার সঙ্গে কত সহজেই না একীভূত হয়ে যায়। এটি যেন বাংলার একান্ত আপন। কি অপরূপ দেহের গড়ন—এত টানাহেঁচড়ার মধ্যেও এমন অটুট! এতটুকু শিথিল হয়নি কোন মাংসপেশী। বাঙালী মেয়ের দেহসৌষ্ঠবে পামা একটা চিত্তাকর্ষক ব্যতিক্রম।

—সুপ্রভাত! হাসিমুখে চায়ের কাপটা দিতে দিতে পামা বললো।

ভদ্রভাষায় কথা বলা তার বিলাস। কোন দিন ভদ্র ছিল—একথা সে যে কোন অবস্থাতেই ভুলে যেতে নারাজ। তার রুচি নিঃসন্দেহে মার্জিত। আচরণ সমাজমুখী।

—সুপ্রভাত!

—সকালে কাজ না থাকলে বুঝি এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুতে হয়?

—'কাজ নেই, ঘুম দেই'—আমাদের নীতি। আর তাছাড়া পুরো একটা রাত মাসে ক'দিন ঘুমুতে পাই বলো ত? বহুদিন বাদে কাল একটা রাতের মত রাত কাটিয়েছি। দ্যাখো তো, বোতলে ছিটে-ফোঁটা একটু-আধটু পড়ে আছে কি না।

—থাকলেও সাত-সকালে ওসব গিলতে দিচ্ছি না।

—একটু, একটুখানি। এই সামান্য।

—উঁহুঃ না।

—তুমি জানো না, চায়ের সঙ্গে যদি একটু বিলিতি ব্রাণ্ডি খাওয়া যায় তো শরীর এ্যায়সা তেজী হবে—

—যে সত্তর হর্স-পাওয়ারের শক্তি তৈরী হয়ে যাবে। নাও, বাজে কথা বন্ধ কর তো। চট করে চা শেষ করো। বাজার করতে হবে না?

—বেগম-সাহেবার হুকুমে নাকি?

—জী, জাঁহাপনা! বাঁদীর গোস্তাকী মাফ হয়তো, এখন তসরীফ উঠাবার বাক্ত হয়েছে।

—প্যার-এ-আলমের আর্জি মঞ্জুর। যা ইচ্ছা আজকের মতো কুর্তার জেব থেকে তুলে নাও। পাঁচটি রৌপ্যমুদ্রা বর্তমান আছে।

হাসতে হাসতে দুটো টাকা আর চায়ের কাপটা নিয়ে পামা

বেরিয়ে গেল। কি স্নিগ্ধ হাসি! আশ্চর্য! যত দিন যাচ্ছে, ততই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। ওর সব কিছুই সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। আমার দেহ সুন্দর, রং সুন্দর, হাসি সুন্দর—এক কথায় সবই সুন্দর। এ কেমন? আমি কী প্রেমের অঞ্জন পরেছি চোখে? যে-বয়েসে সব মেয়েকেই ভালো লাগে, সে-বয়েস তো আমার নেই। আর কখনো আসবেও না। আমি কি এখনো মেয়ে-পাগল বয়াটে যুবক? অথবা নীচ-সংসর্গের লালসা দানা বেঁধেছে আমার মধ্যে?

নীচ সংসর্গ?

পামা কখনো সাধারণ একটা বাজারের মেয়ে হতে পারে না। তার সমস্ত সত্তা আমাকে তার উঁচু ঘরে জন্মের কথা জানিয়ে দেয়। আমি কত সুখী। পামার মতো একটা মেয়ের ভালোবাসা পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। কে জানে, লোকে এদের এত ঘৃণা করে কেন!

লেখাপড়া না জানলে এবং বেশ কিছু বিদ্যা না থাকলে এত সুন্দর কথা বলতে কেউ পারে না। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

লরীওয়ালাদের সবাই সন্দেহের চোখে দেখে থাকে। তারা যে ভাল হতে পারে, এ কথা সাধারণতঃ বিশ্বাসের যোগ্য নয়। ড্রাইভার, ড্রাইভারই। তারা মদখোর, মাতাল। লম্পট আর ইতর, জুয়াড়ী আর চরিত্রহীন। যারা ভদ্রলোকের ছেলে, যারা লেখাপড়া শিখেছে পয়সা খরচ করে, তারা আবার গাড়ীর ড্রাইভার হয় না কি?

আমি আর কানাই যেদিন থেকে লরী চালাতে সুরু করলুম, সেদিন থেকেই বন্ধু-বান্ধবের কাছে হেয় হতে সুরু করেছি। আমরা মাতাল। কেন, মদ কি কেউ খায় না? আচ্ছা, লোকে মদ খায় কেন? কেরাণী কি বোঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টার, মাইলের পর মাইল একটানা গাড়ী চালানো কী জিনিস?

আমরা জুয়া খেলি। এ অপবাদ পুরোপুরি সত্যিও নয়, মিথ্যেও নয়। জুয়া কি আর পাঁচজনেও খেলে না? রেসের মাঠে কারা যায়? সে কি কেবল হতভাগ্য ড্রাইভাররা? ফুটবল খেলার মাঠে, ক্লাবের ব্রীজ খেলার টেবিলে, ক্রসওয়ার্ডের মায়ণ্যাটে যে জুয়া চলছে, তাতে যোগদানকারী কেবল আমরাই? সত্যি বলতে কী, ও ধরণের জুয়াখেলার উৎসাহ কোন ড্রাইভারের আছে বলে আজ পর্য্যন্ত শুনিনি বা দেখিনি। ওসবে সমাজের গৌরবর্ণদের একচেটিয়া অধিকার। আমরা সেখানে অপাংক্তেয়।

আমাদের কোন ক্লাব নেই—সংঘ নেই। কেমন করে অবসর সময় কাটাবো তা ভেবে পাই না। সিনেমা দেখে চোখ ভরতে পারে। মন ভরে না। মনের ক্ষিদে মিটাবে কে? সাধ্যের অতিরিক্ত করতেও পারি না অথচ মনের রসদ জোগাতে হবে। তাই আমরা বসাই জুয়ার আড্ডা; কামনা করি মেয়েদের সংগ। যে অপবাদ একবার রটে গেছে, তা আর শত চেষ্টা করেও কাটানো যাবে না। কাটাতে আমরা চাইও না। যারা আমাদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকায় না, তাদের দিকে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে তাকাতেও আমাদের লজ্জা হয়। আমরা যদি লম্পট আখ্যা লাভ করেই থাকি, তবে তাই। গলা ফাটিয়ে প্রতিবাদ করলেও কেউ শুনতে আসবে না বা আমল দেবে না।

লরী চালাবার ভার যেদিন নিলুম, সেদিন থেকেই জানি আমার বিয়ের আশা ছাড়তে হবে। ছেড়েও দিয়েছি। কী এমন যায় আসে পৃথিবীর যদি অসংখ্য জনতার মাঝে আমার নামের ছাপ নিয়ে দু-চারটে আরো ছেলেমেয়ে গিয়ে দাঁড়াতে না পারে? অনেক লোক হয়ে গেছে পৃথিবীর। অক্ষম আর পঙ্গু লোকের ভার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এক হিসাবে বিয়ে না হয়ে বোধ হয় ভালই হয়েছে। যদি বিয়ে করতুম, তা হলে যে পামার মতো মেয়ে পাওয়া যেত না।

পামাকে আমি যেন ক্রমশ নিবিড় করে ভালো বাসছি। ওর হাতে সব কিছুর ভার দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বেলা বাড়ছে।

রোদ্দুর উঠে এসেছে বোম্বাই আমগাছটার মাথায়। এখন ন'টা-সাড়ে ন'টা হবে নিশ্চয়ই। কানাই এলো না কেন এখনো ?

হাট বসেছে। কামদেবপুরের হাট। লরীবোঝাই চাল ফেললুম। বাঁকতুলসী, বালাম আর দাদখানি। অঢেল চাল। পাহাড়ের মতো স্তূপ দিয়েছে ব্যাপারীরা। কোথায়ও অভাব বলে কিছু আছে, তা অন্তত: কিছুক্ষণের জন্তেও ভুলে যেতে হয়।

আনাজ এসেছে আশে-পাশের গাঁ থেকে। সবুজ, টাটকা—রসেভরা শব্জী। মুরগী, হাঁস আর বেলেপাখী।

ওদিকে ছাগল আর গরু রয়েছে বিক্রীর জন্তে। তার পাশেই গুড়ের নাগরী। একটু ছাড়িয়ে গেলেই নানারকম ডাল আর ছোলা-মটরের আড়ত।

এখনো জমে ওঠেনি ভালো করে হাট। বেলা আর একটু পড়লেই লোক জমতে সুরু করবে। কাছাকাছি কামদেবপুরের হাটের চেয়ে বড় হাট আর নেই। নীলগঞ্জ, বারাসত, বারাকপুর থেকেও ব্যাপারীরা আসে এখানে হাট করতে।

রাস্তার পাশে বাবলা গাছের কাছে বিশ্রাম করছে নীলাঞ্জনা। কানাই আর আমার মাঝখানে নীলাঞ্জনা—একটা মেয়ের মতো ত্রিভুজ সৃষ্টি করেছে আমাদের অজ্ঞাতসারে। কত আদর, কত যত্নই না করি তাকে। এতটুকু ঘর্ঘর আওয়াজ হলে কিংবা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলেই ওর চিকিৎসা আমরা করে থাকি। তাছাড়া সপ্তাহ অন্তে নিয়মমত পরীক্ষা তো হয়েই থাকে।

গাড়ীতে বসেই গল্পের বই পড়ছিলুম একটা। বাইরে রোদ্দুর। দুপুরের রোদের ঝাঁঝ। এখন থেকেই গরম সইতে হবে। সকাল-বিকেল শীত। মাঝে কয়েক ঘণ্টা গরম। মাঠ বলে ঠাণ্ডা আর গরম দুটোই চরম।

বাবলা গাছের পাতা ছুঁয়ে শিরশিরিয়ে হাওয়া বইছে। ফুঁ দিয়ে গরম দুধ ঠাণ্ডা করার মত। মুখ শুকিয়ে যায়। কষের দু'ধারে সাদা সাদা ফেনা জমে উঠে। ডাক্তাররা বলে ক্যালসিয়ামের অভাব। কেবল ক্যালসিয়াম কেন, অনেক—অনেক কিছুরই অভাব। সবচাইতে বড় সময়। আমাদের সময়-অসময় বলে কিছু নেই। দূর—দূর নয়। ঘর-বাড়ী ঘর-বাড়ী নয়। নীলাঞ্জনা আমাদের সব। ওকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে আমাদের আশা আর আকাংখা, স্বপ্ন আর বিলাস। কত নিবিড় করে পেয়েছি তাকে। জীবন-ভোমরা হয়ে আছে আমাদের মনের মণিকোঠায়।

একটা লরীকে এতখানি যত্ন-আত্তি আর কেউ করে বলে জানি না। মহিম হালদারের তিন-টনী শেভ্রলে লরীটা দাঁড়াল এসে। সওদা এনেছে কলকাতা থেকে। মহাজনী সওদা। কিন্তু গাড়ীটা কি অপরিষ্কার! বনেটের একপাশটা ভাঙ্গা। ডালা প্রায় বিবর্ণ। তালি পড়েছে বেশ কয়েকটা। অরাঙা কাঠ। চাকায় গ্যাটিস লাগানো। কি দু:সাহস লোকটার, গ্যাটিস লাগানো চাকায় সওদা বইছে কলকাতা থেকে। যদি বিকল হয়ে যায় বেরাস্তায়! মিস্ত্রী মহিম ভালোই। কিন্তু দুপুর রাত্তিরে টায়ার ফেটে গেলে, টায়ার পাবে কোথায়? বাড়তি চাকা নিশ্চয়ই তার নেই। বাড়তি চাকা রাখার চেয়ে একটু তাড়ি খেলেই টাকার সদ্ব্যয় হয় বলে তার ধারণা। সনাতনের দোকানে মাল নাবাচ্ছে।

কলকাতার লরী সিণ্ডিকেটের তিনটে লরী পর পর দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে শ্রীমন্তর লরী। তেমনি হাড়-জিরজিরে বাঙলা দেশের চাষার বলদের মতো। দেখলেই বোঝা যায়। কর্ম্মক্ষম এরা মোটেই নয়। জোরজার করে যতদিন পারা যায়, ততদিন খাটিয়ে নেওয়া। নইলে টুকরা লোহার দাম ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না এই ভাঙ্গাচোরা গাড়ীগুলি থেকে। কেবলমাত্র বছরের শেষে রিনিউআলের সময় তাড়াহুড়ো করে চকচকে করে নেয়। গাড়ী পাশ হয়ে গেলেই আবার যে কে সেই। কেউ কেউ আবার রিনিউআলের ধারও ধারে না। এমনি কত সংখ্যক লরী যে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। অবশ্য পুলিশের চর তাদের পেছনে লেগে আছে। মাঝে মাঝে বেশ মোটা রকম আদায়ও হয়।

বইটার দিকে চোখ ছিল একটা। বাকি চোখ দিয়ে অনুভব করছিলুম। পাশে বইটা রেখে সিগারেট ধরালুম। দেখতে পেয়ে হাত নাড়ল মহিম। আমিও চেনার স্বীকৃতি জানালুম।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লোকজন। তাড়া নেই কোন। যখন ইচ্ছে হাট করলেই হোল। ঝাঁকা মাথায় চলেছে কিষাণ-বৌরা। শাকটা-মূলোটা বেচবে। কিনবে হয়তো কেরোসিন তেল বা নুণ।

মহিম এসে পড়ল। এক গাল হেসে বলল—কৈ হে, সিগারেট-ফিগারেট ছাড়ো এক-আধটা। একলা-একলাই খাবে নাকি ?

—কী মাল আনলে ? আমি মামুলি একটা প্রশ্ন করলুম।

—কেন, দ্যাখোনি নাকি ?

হেসে বুঝিয়ে দিলুম, দেখেছি। আরো অনেক কিছুই তোমার দেখেছি, মহিম। মহিমকে খারাপ লোক বলা যায় না। মাতাল আর জুয়াড়ী একটা জাত। খরচ তারা করতে জানে। জানে না কেবল কেমন করে আয় বাড়াতে হয় কিম্বা কেমন করে সদ্ব্যয় করতে হয়। খরচ তারা করে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবে জানে যে অপব্যয় করছে।

—বসেই থাকবে নাকি ? নাববে না ?

—কোথায় যাবো, বলো ?

—চলো একটু চা খেয়ে আসি।

—খাওয়াবে নাকি ? বিস্ময়ে আমি অভিভূত হয়ে যাই।

—নিশ্চয়। মহিমের কণ্ঠে আশ্চর্য জোরালো স্বর।

—চলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহিমের সঙ্গ নিলুম। গরুর গাড়ী রাস্তাটা একেবারে বন্ধ করে রেখেছে। ঠেলাগাড়ীগুলি হাটে ঢোকার পথ পর্যন্ত বিস্তৃত। বলদগুলি শুয়ে আছে পথ জুড়ে। মাছি ঘুরছে ভন-ভন করে।

বেলা বেড়েছে। লোক জমছে ধীরে ধীরে। গুঞ্জনধ্বনি হট্টগোলে পর্যবসিত হচ্ছে। আশ্চর্য ভিড় জমা। একটা-একটা, একটা-দুটো করে লোক আসছে যাচ্ছে, এবং এরই মধ্যে কখন যে হাট ভরে ওঠে বুঝতেই পারা যায় না।

ছগনলালের খাবারের দোকানের দিকে যাচ্ছি। মহিম হালদারের মতলবটা কী ? ছগনলালের দোকানে খাবারের দাম বেশী। ঘিয়ে ভাজা খাবার—বলে তো তাই। ঘি কী মহুয়ার তেল বোঝা ভার।

চবে জুগনলালের দোকানে একটা সুবিধে আছে। গোপন গহ্বরে বসে মদ-টদ খাওয়া চলে। চার্জ নেয় না কিছু। অবিশ্যি, বিশেষ বিশেষ পরিচিত খদ্দের ছাড়া এ সুযোগ আর কাউকে দেওয়া হয় না। বেশ বুঝতে পারছি মহিমের উদ্দেশ্য চা খাওয়া নয়। অন্য কিছু। কিন্তু মহিম—যথেষ্ট বয়েস হয়েছে মহিমের—আমার সামনে কখনো মদ খায়নি বা খারাপ কথাও উচ্চারণ করেনি। বরাবর আমাকে কেমন একটু আলগোছে এড়িয়ে এসেছে। লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকের ছেলেদের ড্রাইভারী ওরা দুদিনের সখ বলেই ভেবে এসেছিল এত দিন। কিন্তু যখন দেখলো দুবছর পরেও আমি আর কানাই সমানে গাড়ী চালিয়ে চলেছি, তখন আমাদের দলে নিতে ওদের আর আপত্তি থাকে নি। আজকের এই প্রথম দিনে বয়োজ্যেষ্ঠ মহিম সাদর সম্ভাষণ জানাবে হয়তো। চাই কি দু'-এক আউন্স স্বাস্থ্যও পান করতে বলতে পারে।

—একপো করে পরোটা দাও। গোপন গহ্বরে বসতে-না-বসতে মহিম হুকুম দিল।

চাদরের তলা থেকে হাত বার করল মহিম। নীল রঙের চাদর। জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। কয়েক বছরের পুরোনো চাদর। কিন্তু ডানহাতে ওটা কী? বিচালিমোড়া বিচ্ছিরি একটা বোতল। ভ্যাট নয় তো?

—কী ভায়া, দেখছো কি অমন করে? এ তো সামান্য একটা ভ্যাটের বোতল। এতেই চোখ ছানাবড়া? রোসো, রোসো, দুনম্বরে নেবে যাবো শীগ্‌গিরি। কিন্তু প্রথম দিন আজ তোমার সঙ্গে বসে মৌজ করবো। একেবারে দু'নম্বরে কী মানায়, না ইজ্জৎ থাকে?

এমনি করে আবহমান কাল ধরে বড়রা ছোটদের পথ দেখিয়েছে। স্বেচ্ছায় হয়তো সব সময় দেখায় নি। কখনো স্বার্থের খাতিরে, কখনো দায়ে পড়ে। মহিম নিশ্চয় কারো মুখে শুনেছে আমি মদ খাই। তাই এ সুযোগ সে ছাড়তে রাজী হয়নি। কি কৌশলে সে চা খাবার নাম করে ডেকে এনে, মদ খাওয়াবার বন্দোবস্ত করেছে! খুব বুদ্ধি আছে দেখছি। আজকের এই খাওয়ার ঋণ কত দিন ধরে যে শুধতে হবে!

পিঠে একটা থাবা পড়ল। উচ্ছ্বাসের ঝাঁপা চাপড়। পিছনে ফিরে দেখি বিষ্টু। হাসছে।

—চিনতে পারলে না,—না চিনেও চিনবে না। কোনটে? বিষ্টু হাসতে হাসতেই বলল।

—তুমি এখানে?

—ভগবানের মর্জ্জি।

—প্রাইভেট গাড়ী চালাতে না? চাকরি গেছে?

—কোন জন্মে।

—ভাল চাকরি ছিল তো? গেলো কেন?

—সে অনেক কথা।

—বলই না।

নিরুপায় হয়ে মহিমের দিকে তাকালো বিষ্টু। চোখের ইসারায় মহিম বিষ্টুকে বসতে বললে। মহিম খুশী হয়নি, বুঝতে পারলুম। একজনকে কাছে নিয়ে গল্প করতে বসলে, অন্য কেউ যদি এসে পড়ে, তবে মনের অবস্থা খুব কম সময়েই ভালো থাকে। মনে মনে মহিম আমাকে দুষছে নিশ্চয়ই। শুধু বিষ্টুর চাকরি যাওয়ার কাহিনীটা শোনবার জন্যে আমার আগ্রহ এত বেশী হওয়াতে আমি মহিমের অতিথি হয়েও অন্য আরেক জনকে বসাতে চাইলুম। এক প্রস্থ খাবার এলো বিষ্টুর জন্যে।

—সেই গুজরাটী ভদ্রলোকের চাকরি সত্যি খুব আরামেই করছিলুম। সকাল দশটার একটু আগে বাপ আর মেয়েকে নিয়ে বেরুতুম। বাবু যেতেন অফিসে, মেয়ে কলেজে। প্রথমে বাবুর অফিস। তাঁকে নাবিয়ে দিয়ে কলেজের পথ ধরতুম। অফিস থেকে কলেজ অনেকটা পথ। বাবুর হুকুম ছিল গাড়ী যেন আমি কখনো জোরে না চালাই। তিরিশ মাইল ছিল আমার লিমিট—বোতলটা দাও।

যেতে যেতে প্রায়ই নানা ধরণের কথা বলতো মেয়েটি।

—কী নাম মেয়েটার? আমি জানতে চাইলুম।

—কৃষ্ণা। কৃষ্ণা সত্যি সুন্দরী। অপূর্ব সুন্দরী। রোজ দেখতুম। আবার রোজ দেখার ইচ্ছে হতো। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে ওর মুখটাই আমার মনে সবচেয়ে আগে ভাসতো। কতক্ষণে যে ওকে নিয়ে যাবো কলেজে—খালি এ ভাবনাই আমাকে অস্থির করে তুলতো। বৌয়ের সঙ্গে ভালো করে কথা বলার আগ্রহ পর্যন্ত ছিল না। কী দিয়ে ভাত খেতুম, লক্ষ্য পর্যন্ত করিনি। সাজ-পোষাক করবার সুযোগ-সুবিধে ছিল না, তাই রক্ষে। বাবুর দেওয়া ড্রাইভারী পোষাকে কিন্তু আমাকে ভালোই মানাতো। চুল আঁচড়াবার দরকার ছিল না। সুন্দর একটা ক্যাপ দিয়েছিলেন বাবু। বৌ ভাবতো আমি কাজ নিয়েই ব্যস্ত। কোন বদখেয়াল আমার ছিল না। মাস গেলে মাইনেটা পেয়েই বৌ-এর হাতে সব টাকা এনে দিতুম। সে বেচারা এতেই খুসী। আর তাছাড়া কার বৌ চায় না যে তার স্বামী পরিশ্রমী হোক, কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকুক?

এদিকে উপরি যে দু'-একটা টাকা প্রায়ই জলখাবার জন্যে পেতুম, সেগুলি আমি লুকিয়ে ফেলতুম। তা দিয়ে প্রায়ই কৃষ্ণার টিফিন বাস্কেটে দু'-একটা বাড়তি ফল কিনে রেখে দিতুম। টিফিন বাস্কেট আমিই বাবুর্চির কাছ থেকে নিয়ে গাড়ীতে তুলতুম, কাজেই আমার এ অতিরিক্ত রকমের উৎসাহটা কারোর চোখে পড়ত না। বড় লোকের মেয়ে কৃষ্ণা। তার কাছে দু'-একটা ফলের দাম কিছু নয়। যদি সে কখনো জানতে পারে যে তাদেরই সোফার তাকে প্রায়ই গাঁটের পয়সা খরচ করে টিফিন খাওয়াচ্ছে, তখন আমার অবস্থা কি হবে ভাবতেও পারতুম না। চাকরি তো যাবেই। উপরন্তু কিছু উত্তম-মধ্যমেরও ব্যবস্থা হতে পারে। অথচ কৃষ্ণার জন্যে খরচ করতে এতো ভালো লাগতো। এটাকে কী প্রেম বলে? কী জানি বইয়ে প্রেমের কথা পড়েছি। কিন্তু সে যে এতখানি স্বোয়াদের তা তো জানতুম না। বৌকে ভালোবাসা আর একটা কুমারী মেয়েকে ভালোবাসায় কত তফাৎ! বৌকে ভালোবাসা, সোহাগ দেখানো একটা কর্ত্তব্য—কলেরার ইনজেকশন নেবার মতো। আর কৃষ্ণাকে? উঃ, সে কি করে যে তোমাদের বোঝাবো?—বোতলটা দাও।

প্রায়ই দেখতুম একটা ছোঁড়াকে বাড়ী ফেরার পথে কলেজ থেকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ীতে উঠতো। গা আমার জ্বলতো। অথচ আমার এ হিংসে করবার কোন জোর নেই। ফষ্টি-নষ্টি অনেক কথা ওরা দুজনে গাড়ীতে বসে আলোচনা করতো। কিন্তু মাথের আয়না দিয়ে

# আমাদের রানীমা

আমাদের বাড়ীর কাছেই ছোট একটা বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে থাকেন রানীমা। আমরা যখনই ছাদে উঠি দেখি রানীমা বাড়ীর উঠোনে বসে হয় চরকা কাটছেন নয় সোয়েটার বুনছেন। একদিন ছাদে রোদ্দুরে চুল শুকোতে উঠে আমি দেখি রানীমা চরকার সামনে চুপ করে বসে আছেন। আমি ভাবলাম ওঁর সঙ্গে গিয়ে একটু গপ্পসপ্প করা যাক। আমি যেতে আমাকে বসার একটা আসন দিয়ে রানীমা বললেন

"দ্যাখ্, আমি না হয় মুখ্যসুখ্য মানুষ তাই বলে আমি কি এতই বোকা যে আজে বাজে কিছু বুঝিয়ে দিলেই বুঝব? রাশিয়া নাকি আকাশে একটা নতুন নক্ষত্র ছেড়েছে আর তার মধ্যে নাকি একটা কুকুর পোরা! হ্যাঁ: যত সব—"।

আমি যখন রানীমাকে স্পুটনিক আর লাইকা সম্বন্ধে সব কিছু বুঝিয়ে বললাম রানীমা একেবারে হতবাক বললেন—"আমায় আর একটু খুলে বলতো, আমার মাথায় অত চট্ করে কিছু ঢোকে না।" রানীমা কিন্তু সেটা বললেন নেহাৎই বিনয় করে। বুদ্ধিসুদ্ধি ওঁর বেশ ভালই আছে। ছেলে মেয়েরা যখন চেঁচিয়ে ওদের পড়া মুখস্ত করে উনি তখন ওদের নানারকম প্রশ্ন করে নানা বিষয়ে জেনেছেন। অন্যান্য মহিলাদের মত বাঁধাধরা গতে চলতে উনি মোটেই রাজী নন। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম কেনাকাটা করতে। রানীমা আমায় বললেন "আমায় একটু কাপড় কাচা সাবান এনে দিবি ভাই?"

পিছনে চেয়ে দেখেছি মাঝে মাঝে, কখনো অন্যায় ব্যবহার চোখে পড়েনি। রাস্তার মোড়ে, বোধ হয় ছোঁড়াটার বাড়ী কাছাকাছি কোথাও হবে, নাবিয়ে দিতে বলতো। বাড়ীতে কি জানি কেন, ছোঁড়াটাকে কখনো নিয়ে যেত না। অথচ ওদের বাড়ীতে হরদম ছেলে-মেয়ে আসছে যাচ্ছে। কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। আজ টি-পার্টি কাল ককটেল-পার্টি হচ্ছেই। প্রায় সায়েববাড়ী।

চাকর-বাকরদের সঙ্গে নাকি বড়লোকের মেয়েরা গোপন বন্ধুত্ব পাতিয়ে থাকে। রাজা-বাদশাদের আমল থেকে গেল যুগের জমিদারী আমল পর্যন্ত এ নিয়ম চলে এসেছে। অথচ আমার পোড়া কপাল, আমার সঙ্গে কৃষ্ণা এখন পর্যন্ত যে কথা ভদ্রভাবে না বললে নয়, সে কথা ছাড়া অন্য কোন কথা বলে নি, বলার দরকার মনে করেনি। সোফার সোফারের মতো থাকবে—এই বোধ হয় ওর ধারণা ছিল।

একদিন কলেজে গিয়ে দেখি, বাইরের দেওয়ালে কার্টুন পোষ্টার। ছবি দেখে বুঝতে পারলুম কৃষ্ণা আর যে ছোঁড়াটাকে গাড়ীতে নিয়ে যায় কৃষ্ণা সেই তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে কলেজের ছেলেরা। মুখ লাল করে গাড়ীতে ঢুকল সে। ছোঁড়াটার দেখা পেলুম না। বড় রাস্তায় পড়েই আমি উসখুস করতে লাগলুম।

—দিদিমণি! আমি ডাকলুম। আমি এর আগে কৃষ্ণাকে কখনো ডেকে কথা বলিনি। যদিও তাদের বাড়ীতে মিসিবাবা বলা রেওয়াজ, তবুও আমি ইচ্ছে করেই দিদিমণি বললুম। ডাক শুনে চমকে উঠলো কৃষ্ণা।

—কী। গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল সে।

—কলেজের ছেলেরা ভালো নয়। আমি দরদ মাখিয়ে বললুম।

—সে বিচারের ভার তোমার ওপোর নাকি? ঝেঁঝে উঠল কৃষ্ণা। তুমি কখনো তোমার কাজ ছাড়া অন্য কিছু বলবে না, সোফার! আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি।

কলেজের ছেলেদের ওপোর যে রাগ কৃষ্ণার জমা হয়েছিলো, তার সবটাই আমার ওপোর ঝাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। মনে মনে কৃষ্ণাকে জব্দ করবার সুযোগ খুঁজতে লাগলুম। এমনি রাগের মাথায় একটা সুযোগ না-চাইতেই এসে গেল—বোতলটা দাও।

কলেজ থেকে ইষ্টীমার পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। বছরের শেষে সবাই ওরা ফুর্তি করে থাকে। কৃষ্ণাও গেল। আমার ওপোর হুকুম হোল রাত্তিরে ওকে নিয়ে আসতে হবে।

আমি সন্ধ্যের পর গাড়ী নিয়ে গিয়ে বসে রইলুম ইষ্টীমার-ঘাটে। ওরা এল প্রায় রাত সাড়ে নটায়। কলেজের কিছু খেলার সরঞ্জাম উঠলো গাড়ীতে আর সঙ্গে সেই ছোঁড়াটা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ইলেকট্রিক শক লাগলো।

কৃষ্ণাকে নিয়ে যখন বাড়ির পথ ধরলুম, তখন গাড়ীর বাতিতে ঘড়িতে দেখলুম পৌণে এগারোটা। বুকের মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করল। এই সুযোগ, এই সুযোগ। এ যদি হাতছাড়া হয়ে যায় তবে আর জীবনে না-ও পেতে পারি। কান দুটো গরম হয়ে উঠলো। পাগলের মতো বেগে গাড়ী ছেড়ে দিলুম। বাবুর নিষেধ মনেও পড়লো না।

নিঃশব্দে গ্যারাজে কৃষ্ণাকে শুদ্ধ গাড়ী ঢুকিয়ে দিলুম। চারিদিক নিঝুম। আমি তাড়াতাড়ি নেবে যেন ওর জন্তে দরজা খুলতে যাচ্ছি, এমন ব্যস্তসমস্ত হয়ে গ্যারাজের দরজা বন্ধ করে দিলুম। আজকালকার কোলাপসিবল গেট নয়। কাঠের পাল্লা। কৃষ্ণা নিজেই দরজা খুলে নাবলো। অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে এগিয়ে আসতেই আমি ওর পা জড়িয়ে ধরলুম। কৃষ্ণা হতবুদ্ধি হয়ে আমার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করতে চাইলো বোধ হয়। আমি নাছোড়বান্দার মত তার পা আঁকড়ে ধরলুম। জোরে, আরো জোরে।

—কী চাই তোমার? রুক্ষ অথচ চাপা গলায় কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলো।

কৃষ্ণার গলার আওয়াজে ভয় প্রকাশ পেল। সে বেশ বুঝতে পেরেছে যে আমি আজ মরীয়া হয়ে উঠেছি। যদি কৃষ্ণা চেঁচায় তাহলে লোকজন এসে ওকে সেই অবস্থায় দেখলে কী ভাববে, এই লজ্জায় সে চেঁচাতেও পারছে না।

—আপনাকে চাই, দিদিমণি! আমি নির্ভাবনায় বললুম।

—বেশ তো। কিন্তু পা ছাড়ো।

আমি তার চালাকি বুঝতে পারলুম। পা ছাড়লেই, সে পালাবার একটা সুযোগ পাবে। অথবা গাড়ীর ভেতর বসে হর্ণ বাজিয়ে লোক জড়ো করবে। আমি অত বোকা নই। এই বাঁধনেই ওকে পিষে ফেলতে চাই।

—না। তা ছাড়বো না। শিব তো দুর্গার পায়ের তলাতেই পড়েছিলো। কৃষ্ণার পায়ের ফাঁকে মুখ গুঁজে বলি।

কৃষ্ণা হেসেছিল কি না দেখিনি। কিন্তু বাঁ-হাত দিয়ে যখন আমার ক্যাপটা ফেলে দিয়ে চুলে হাত বুলোতে লাগলো, তখন আমি প্রায় অবশ হয়ে গিছলুম। ইচ্ছে করলেও তখন পালাতে পারতো। কিন্তু বোধ হয় আমার অবস্থাটা বোঝে নি!

—আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, সোফার! আশ্চর্য! ওর গলায় তেজ নেই, ভয় নেই, নেই কুণ্ঠা। কত সহজ হয়ে এসেছে। মায়া হোল একবার। দিই ছেড়ে কী হবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়লো, আজ যা করলুম, তার ফলে পিঠ বাঁচলেও চাকরি বাঁচবে না। চাকরি নির্ঘাৎ যাবে। তবে ছাড়বো কেন? উশুল করে নোব না সব?

চাকরি গেল তার পরদিনই। কিন্তু আসবার আগে গোপনে কৃষ্ণার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে এসেছিলুম। সেটাই মনে খানিকটা সান্ত্বনা দেয়।

সেই থেকে প্রাইভেট গাড়ী চালানো ছেড়ে দিয়েছি। লরী চালাই। বেশ আছি। নিজের গাড়ী নয় অবিশ্যি, সিণ্ডিকেটের।

তলানিটুকু শেষ করে উঠে পড়ল বিষ্টু।

ওদিকে হাটে ভাঙ্গন লেগেছে। হারিকেন আর লম্ফের আলো জ্বলছে। গ্যাসের গন্ধে ভরপুর হাট। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে কোলাহল। রাত্রি নাবল। কামদেবপুরের হাট শেষ হয়-হয়।

৪

চূর্নী।

বোলাটে জলের প্রবহমান স্রোত। নদী। এই শীর্ণ জলধারাকেও সবাই নদী বলে।

এপার-ওপার কত কাছে। জেসী ওয়েন বোধ হয় এক লাফে পেরিয়ে যেতে পারে। নদীমাতৃক বাংলার কী ভয়াবহ রূপ।

দাকের জীবনীশক্তির অপস্রিয়মান গতির সঙ্গে কী আশ্চর্য সংহতি।

নদী থেকে একটা রাস্তা বরাবর রেলের লেভেল ক্রশিং পর্যন্ত গেছে। পায়ে-হাঁটা অপরিসর পথ। নোংরা। বাঙালীর স্বভাবের সঙ্গে মিলখাওয়া দুর্গন্ধময় রাস্তা—কখনো মহাজনের দোর ঘেঁষে কখনো বা হালুইকরের গরম উনুন ছুঁয়ে গেছে।

পদ্মপাতা উড়ছে। সকালবেলা জলখাবার খেয়ে কাজে বেরিয়েছে দিন-মজুররা। কচুরি আর চা। শীতের সকালে মুড়মুড়ে জলখাবার।

পানের পিক আর এঁটো পদ্মপাতা সন্তর্পণে এড়িয়ে আসছিল পামা। কী নিষ্ঠা! স্নান করবার পর অন্য কিছুর ছোঁয়া লাগলে অপবিত্র হয়ে যাবে দেহ—এই তার ভয়। বিধবাদের এই স্বভাব মানায়। কিন্তু পামা? তার পক্ষে এটা খুবই বেমানান নয় কী?

কিছুতেই পামা আমার সঙ্গে রাস্তায় বেরোয় না। আমার সঙ্গে বেরুলে পাছে লোকে কিছু বলে এই তার আশঙ্কা। কিন্তু কেন? কেন পামা আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়? পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বাঁচবার অধিকার কি তার নেই?

আমাকে পাশ কাটিয়ে বাড়ির পথ ধরলো পামা। স্বভাবতই আমার দৃষ্টি তার গতিপথকে অনুসরণ করলো। আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম ধ'নের ব্যাপারীদের কাছে। মাল তোলবার কথা ছিল।

পামার পাহারাদারের কাজ শেষ হবার পর ইচ্ছে করেই একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলুম। কিন্তু কখন যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি বুঝতেই পারিনি। পামাকে আর দেখা যাচ্ছে না। তবু তার রেশ, বাতাসে তারই একটু স্পর্শ যেন এখনও পাওয়া যাচ্ছে! কুয়াশা-ভেজা বাতাসে তারই চুলের গন্ধ এখনো বুঝি ভাসছে।

পিঠে হাত দিয়ে এসে দাঁড়াল সুদাস। ধ'নের দালাল। দিন কাটে বাইরে বাইরে। রাত কাটে কোথায়, কে বলতে পারে?

—অনেকক্ষণ চলে গেছে, ভাই! সুদাস আবেগ দিয়ে বললো।

—হুঁ, জানি।

—বেশ মেয়েটি।

—চেনো নাকি?

—না। বল তো একবার লড়ে নি।

—সুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।

—সুদাস বাবাজি অনেক চরিয়েছে—

—এঁর জাত আলাদা।

—তুমি আবার সম্মান করে কথা কইতে আরম্ভ করলে যে!

—যাদের সম্মান দেওয়া প্রয়োজন, তাদের নিরাশ করি কি করে?

—তাহলে তুমি মেয়েটিকে চেনো বলো?

—চিনি। আর এ-ও শোন বলে রাখি এঁকে মেয়েটি-মেয়েটি না বলে, মহিলা বললেই খুশী হবো।

—আঁা, মাইরি-মাইরি। রসের সন্ধান বায় যে পাওয়া—বলেই সুদাস দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমাকে টানতে টানতে একটা খাবারের দোকানে নিয়ে তুললো। কোন কথা, কোন ওজর-আপত্তি কিছুই মানলো না।

সুদাসের হাত এড়ানো খুব সহজ হবে না। বিশেষ প্রচুর খাবারের সামনে মন এত তাড়াতাড়ি দুইয়ে যায়। কে যেন বলেছিলো—ঠিকই বলেছিলো যে পুরুষ মানুষকে জয় করতে হলে খেতে দিয়েই জয় করতে হয়। বশীকরণের কী সহজ উপায়! সাধু-সন্ন্যেসীর গাছ-গাছড়া কিম্বা মোটরে চড়া সস্তরে জ্যোতিষীর কবচের দরকার হয় না।

ধীরে ধীরে পামার কথা সুদাসকে সবই খুলে বললুম। শোনবার পর সুদাস খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে ঠিক হয়ে বসলো সে।

—তুমি ভাগ্যবান। সুদাস সিগারেটে একটা টান দিয়ে একঘর ধোঁয়া ছেড়ে বললো। আমার বৌ মরেছে আজ পাঁচ বছর হোল। কিন্তু ঐ পাঁচ বছর যা করে কাটিয়েছি, তা বলবার মতো নয়। ধ'নের দালালী করি। রাত-বিরেত বাইরেই কাটাতে হয়। ঘুরে ঘুরে ধ'নে জোগাড় করি। এ আড়ত থেকে ও আড়ত। দিন আর রাতের মধ্যে তফাৎ করিনি কখনো। এই যে ব্যাগ দেখছো—এরই মধ্যে আমার সব আছে—আর্শী-চিরুণী, কাপড়, গামছা, লুঙ্গী সাবান, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম সব।

বৌ-এর অভাব ভুলতে চেয়েছিলুম কাজের মধ্যে দিয়ে। দারুণ কাজ করেছি। পয়সা রোজগার করি ভালোই। তবু দেহের জ্বালা মাঝে মাঝে এমন অস্থির করে তোলে! মা বিয়ে করতে বলেছিলো। দাদারা সবাই রাজী। আমি কেন যে ঝোঁকের মাথায় না বলে বসলুম।

তোমার মতো একজনকে নিয়েই থাকতে চেয়েছিলুম। কিন্তু

হয় না। ওদের আর আমি বিশ্বাস করতে পারি না। সাপের মতো জিভ ওদের দুভাগ করা।

—আমি কিন্তু পামাকে বাইরের লোক দরকার হলে নিতে বলেছি।

—সে কি?

—তা নয়তো কী? ধরো না এখন আছি নদীয়াতে, কাল হয়তো থাকবো আসানসোল। যদি সাত দিন না-ই আসতে পারি, তবে পামা খাবে কি? আমি তো আর দুশো পাঁচশো ওকে দিয়ে আসতে পারি না। অবশ্য, এখন পর্যন্ত আমি পামাকে অন্য লোক নিতে দেখিনি।

—তাই বলো। মুখে যাই বলো না, সত্যি-সত্যি বাইরের লোক নিলে, তুমি যেন আর ওকে আস্ত রাখতে!

—আমাকে ভুল বুঝছ, সুদাস! আমি মুখে যা বলি, কাজেও ঠিক তাই করি। তবে পামার ব্যবহারে আমি খুবই খুশী।

—তাই তো প্রথমেই তোমাকে ভাগ্যবান বলেছি। নইলে ও জাতকে আর আমি জীবনে বিশ্বাস করতো পারবো না।

—কেন?

—আর বোলো না। একদিন কলকাতায় পোস্তার কাছে সিউরাম বৈজুনাথের গদীতে বসে বসে গপ্পো করছি, এমন সময় ছেঁড়া অথচ ফর্সা সাদা রঙের কাপড় পরে একটা বাঙালী-বউ এলো ভিক্ষে করতে। দুহাতে একটা করে দুটো লাল সেলুলয়েডের চুড়ী। ঘোমটা কপালের একটু নীচে নাবানো। নাকে নাক-ছাবি। এক হাতে ঘোমটা ধরে অন্য হাতে ভিক্ষে চাইল। বাবুরাম একটা আনি দিলো। চকচকে ভিজে চোখও পড়ল মেয়েটার ওপোর! কিন্তু কিছু বলতে সাহস পেলো না তখন। আরও চার-পাঁচজন ছিলুম আমরা। পিছু নিলুম।

তার পর বুঝতেই পার যোগাযোগ। ভালো টাকাই দিতুম। কিন্তু পালিয়ে গেল বছরখানেকের মধ্যেই। সেই থেকে ছেড়ে দিয়েছি ও সব পায়রা পোষার সখ। এখন হচ্ছে ফেল কড়ি, মাখো তেল। ভাবনা নেই এক কোঁটা। মন যোগাবার কষ্ট নেই একটুও।

—চলো, ওঠা যাক এবার।

—চলো। কিন্তু তুমি ওকে রাণাঘাটে নিয়ে এলে যে বড়?

—ও মোটে বেরুতেই চায় না কোথায়ও। জোর করে নিয়ে এসেছিলুম। একলাই ফিরে যাবে। আমাকে আবার মাল নিয়ে কোলকাতায় যেতে হবে।

—আজই যাবে না কি?

—হ্যাঁ। তবে দেরী আছে। বিকেল নাগাদ কোলকাতার মাল তুলব। এখন পলাশী যাচ্ছি।

—তা হলে আমার ধ'নে তুমিই নাও না কেন? বেশ একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

—ক'খানা?

—সব আমারই মাল যাবে।

—দক্ষিণে?

—যা রেট। ঐ এক টাকা করে।

লাদাই।

বোঝাই হচ্ছে বস্তা। ধ'নে।

আবছা সন্ধ্যে গড়িয়ে আসছে। বিরাট শূন্যে নিমোকের মা নরম আবেষ্টনী। জেলের ছড়ানো জালের মতো আবৃত কর আলোর শেষ বিন্দুকে।

সহরের মাঝে ধুলা। সহরতলীর বৈশিষ্ট্য। সরু এক রাস্তা পিচঢালা।

আলো জ্বাললো দোকানী। কোথাও কোথাও রেডি বাজলো।

গ্রামীন সন্ধ্যা আর এ সন্ধ্যায় কতো তফাৎ! এখানে সিগ আলোর ওপোর হঠাৎ অতিকায় এক থাবা অন্ধকারের আক্রমণ এতে মন দুলে উঠে না। কর্মোদ্যমের বিন্দুমাত্র শিথিলতা নেই চাঞ্চল্যের নেই বিন্দুমাত্র কমতি।

কাজ। কেবল কাজ আজকের মানুষের। Ah! why this life should all work be—কেউ বোঝে না। বুঝতে চা না। উন্মত্ত মানুষের আলস্যের বিরুদ্ধে এক দুরন্ত অভিযান।

তবু শেষ হোল আরেকটা কর্মক্লান্ত দিন। ক্লান্তির অবসা বিশ্রামমুখী করে তুলতে পারে না আমাদের। রাত্রির অন্ধকার কত মাইল পাড়ি দোব আমরা। সুপ্তিমগ্ন মানুষ কী কখনো শুনেছে প্রকৃতির রাত-জাগানিয়া সুর?

হাতছানি দেয় নির্জন পথ। ঝিঁঝি-ডাকা ঝোপের পাশে জোনাকীর আলো। মাঝ-রাতে প্যাঁচার থেকে থেকে চমক লাগানো বিশ্রী ডাক—গেল যুগের গাড়ীর হর্ণের মতো। নিশুতি রাতের বিশেষ ক্ষণটিতে সব জড়িয়ে কেমন একটা অপার্থিব আবহাওয়া সৃষ্টি। অথচ দিনের আলোয় কেমন স্পষ্ট আর নির্বাক দেখায়। মনেই হয় না এ পথ আর প্রান্তর, গাছ আর আগাছা আলো অভাবে এমনি এক রহস্যময় মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে! বড় বড় গাছের মাঝখানে জমাটবাঁধা আঁধার—যেন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে যেতে পারছে না। নিশ্চল অন্ধকারের ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তির নিঃশব্দতা আরো ঘনীভূত হয় প্রাণিজগতের আকুল আহ্বানে—শাঁখ আর কাঁসর-ঘণ্টা যেমন মন্ত্রোচ্চারণে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকে তেমনি।

রাস্তার ঠিক পাশেই জুয়ার আড্ডা বসেছে। কুলি-মজুররা ভীড় করেছে সস্তা পয়সা রোজগারের আশায়। অথচ তারা বেশ জানে যে কত বার এমনিধারা রোজগারের আশায় তাদের 'হপ্তা' নষ্ট হয়ে গেছে। তবু পাওয়ার আশা এমন ভাবে মানুষকে পেয়ে বসে যে বার বার হেরে গেলেও জুয়া থেকে সস্তা পয়সা করবার লোভ সে সহসা জয় করতে পারে না। অথবা আশাবাদ নিয়েই মানুষের জীবন—তাই অনিশ্চিতের পিছনে যেতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না।

'তিন-চিড়িতন', 'এক লাল পাঞ্জা', 'এক কালা পান,'—যাদের যাদের পয়সা ওসব ঘরে ছিল তারা লাভ করল। বাকী সব খালি। শূন্যমনে দাঁড়িয়ে রইল হেরে-যাওয়া জুয়াড়ীরা। রেস্ত যাদের কম, তারা মৌন। নিছক দর্শকদের সঙ্গে মিশে গেল তারা। কেউ কেউ হাত কামড়াচ্ছিল—উঃ, যদি একটা টাকা অন্তত চিড়িতনের ঘরে দিতুম, উঃ, নগদ করকরে চারটে টাকা এখুনি হয়ে যেত। ভাগ্যে নেই ঘি, ঠক-ঠকালে হবে কি।

কমিশন চাইল। সর্বস্ব খুইয়ে ঝাড়দার চেতনা ফিরে পেল।

কী? গঁও নিতে হবে। নইলে উপোস। জরুকে কী বলব? হয় দু'আনার তাড়িই খেতুম। নাঃ, আর জুয়া নয়। নেশা ী পাজী জিনিস। এক কোঁটা দারু নেই পেটে। হপ্তার খাটুনি বরবাদ হয়ে গেল।

সোর উঠল। ঝাড়্দার কমিশন চাইছে জোর গলায়। হেরে-য়া জুয়াড়ীরা গলা মেলাল ঝাড়্দারের সঙ্গে। যদি ওর পাওনা-। চুকিয়ে দেয়, তবে তারাও তাদের দাবী জানাতে পারবে। ষুৎ।

চেঁচামেচি গণ্ডগোল হলেই বাধ্য হয়ে পুলিশ জুয়ার আড্ডা ভেঙ্গে ব। ভয় আছে প্রাণে। তবু টাকা ছাড়তে মায়া হয়। গুণ্ডাদের ন দেওয়া হয়ে গেছে আড্ডার শান্তিরক্ষার জন্যে। টাকাটা এবার তই হয়। হুড়োহুড়ি ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। এর পর আর তাল সান'থাবে না। মানে মানে টাকাটা ঝাড়্দারের দিয়ে দেওয়াই ত বিবেচনা করল মহাজন।

শান্তি ফিরে এল জুয়ার আড্ডায়।

কী হিসাব করতে করতে ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এল কানাই। াতে দু'মুঠো টাকা। কোন এক ফাঁকে জুয়ার আড্ডায় গিয়ে জিতে কানাই।

রাস্তার পাশে ভিখারিণী। প্রত্যাশায় অধীর। অন্ধকার জমে আসতে থাকে, রোজগারের ইচ্ছা তত তাদের পাগল তে থাকে। ভিক্ষে করাটাই এখন মুখ্য নয়। যদি কেউ দৈহিক ব্যবসা করতে চায়, তবে অন্ততঃ টাকাটা-সিকিটা পাওয়ার আশা থাকে। জটবাঁধা চুল কিংবা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার দেহের মাটিও প্রতিবন্ধক হোতে পারে না। আশা কত ওদের। সময়-সময় খদ্দের যে জোটে না তা-ও নয়। তবে বেশীর ভাগই ভিখারী, কেউ-কেউ আবার নীচুদরের শ্রমিক।

এই তো সেদিন কাদামারায় একটা ঘটনা ঘটে গেল। মগুলহাট থেকে লরী ফিরে যাচ্ছিল কোলকাতায়। আসা-যাওয়ার পথে লরীতে জায়গা খালি থাকলে যাত্রী তোলার রেওয়াজ আছে এই লাইনের লরীওয়ালাদের। সেদিন কার লরী যে এই কাণ্ডটা করেছিল, তা জানি না।

ঘটনার বিবরণ শুনেছিলুম দুঃস্থা মেয়েটির কাছ থেকে। হেড-লাইটের তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল মেয়েটির। অসহায়ের মতো রাস্তার ধারে পড়ে ছিল। বিবশ হয়ে গিয়েছিল সর্বশরীর।

যখন ওকে তুলে ধরলুম, তখন হাত তুলে একটা আধুলি দেখাল আমাদের।

—এই আধুলিটা রোজগার করেছি আমি জানেন? হেসে বলেছিল মেয়েটি। কিন্তু সে হাসি হতাশায় কুৎসিত, বেদনায় নীল।

—কিন্তু কেমন করে জানেন? চার-চারটে পশু ভর করেছিল আমার দেহে। খুবলে খুবলে মাংস খেয়ে গেছে। দাম দিয়েছে আট আনা, একটা রূপোর আধুলি।

—কী ভয়ঙ্কর অত্যাচার! এমন মানুষও আছে!

কানাই প্রায় চোখ বন্ধ করেই কী একটা মুদ্রা ছুঁড়ে দিল। দিলদরিয়া কানাই।

—কাদামারার কাণ্ড করবার ইচ্ছে আছে না কি? আমি কানাইকে জিজ্ঞাসা করলুম।

—কাদামারা ছিল দেহের ব্যাপার। এটা নিছক দাক্ষিণ্য। হাসিমুখে কানাই বলল।

—ইতর জনের প্রতি দয়া হয় না?

—উনসত্তরী চলবে না, তা বলে দিচ্ছি।

—তবে বাদশার মেহেরবাণীতে একটু রাম আর জিঞ্জারেল আসুক।

—না না, ও-সব চলবে না। এক বোতল জিন নেওয়া যাক বরং।

কানাই জিন আনতে গেল।

মদ কানাই খায় কিন্তু খুব বেশী ভক্ত নয়। অথচ ড্রাইভারী লাইনে সাদা জল খাওয়া একটা ভয়ঙ্কর কৌতুক। কেউ-কেউ যে সাদা জল খায় না, তা নয়। তবে তারা সংখ্যায় খুব কম।

প্রথম কবে আমি মদ খেয়েছিলুম, আজ তা মনেও পড়ে না। কানাইকে কিন্তু হাতেখড়ি আমিই দিয়েছি। এক ঢোঁকে সবটা গেলার সময়কার ওর মুখের ছবি আজও আমার সামনে ভাসছে। কত ভয়ই না পায় মানুষ প্রথম-প্রথম। তারপর রপ্ত হয়ে গেলে সব নস্যি।

সুদাস চালান হাতে করে এগিয়ে এলো।

গাড়ী ছাড়তে হবে। সুদাস এসে বসল ঠিকঠাক হয়ে।

—নাও চালান। সুদাস এগিয়ে দিলো।

—না থাক। তোমার কাছেই রাখ। আমি বাধা দিয়ে বললুম। চেকিং-এর সময় নোব।

—কানাই গেল কোথায়?

—মাল আনতে গেছে।

—আরে-রেরে। তাই তো। ওটা তো আমারই আনা উচিত ছিল। বসো।

—তোমাকে আর নাবতে হবে না।

—আরে তা কি হয়? তার ওপোর চাটও তো আছে। পথটা তো আর কম নয় হে!

—তুমি যেও না। তার চেয়ে ঝড়ুয়াকে দাও। ও বরং নিয়ে আসুক।

—তোমার ঝড়ুয়া কী আর আস্ত আছে এতক্ষণ? দ্যাখো গে কোথায় পড়ে আছে।

সামনেই লাইন-বাড়ী। পাকা দোতলা। মাঝে-মাঝে ভাঙা রেলিঙ কাঠ দিয়ে আটকানো। খদ্দের না-পাওয়া মেয়েরা কাচ-পোকার টিপ এঁটে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

ওরা চায় খুচরো খদ্দের। আসবে আর যাবে। রাত কাটানো পাইকার হলে লাভ থাকে খুব কম। তবে পাইকার হবার ঝামেলাও অনেক। সন্ধ্যের দিকে জানান দিয়ে যেতে হবে, রাত দশটায় যেন বিছানা খালি থাকে। এর মধ্যে বিদেয় করতে হবে অতিথি অথবা অতিথিদের।

তাই সাধারণত বাজার, মন্দির অথবা ষ্টেশনের ধারে গড়ে ওঠে লাইন-বাড়ী—দেহ কেনা-বেচার পীঠস্থান।

বাজারের পাশে ব্যবসা চলে পুরো দমে—কারণ কাঁচা পয়সার ঝনঝনানি ওখানেই বেশী। কিষাণ আসে নতুন জিনিসের লোভে। কিষাণ-ছেলে অজানাকে জানবার দুর্নিবার আকাঙ্খার প্রেরণায়।

মন্দিরের আশে-পাশে—গড়ে ওঠে চালাঘর। বোধ হয় পুরাকালের দেবদাসীর ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্যে। ধর্মের জয় পূর্ণ করার জন্যেই বোধ হয় পাশাপাশি অধর্মের অবস্থিতি। অথবা সাদাকে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করবার জন্যে যেমন কালোর প্রয়োজন।

আর জংশন-ষ্টেশনে পয়সা আসে প্রায় এমনি-এমনি। কারো ট্রেণ বদলাবার সময় হাতে থাকে প্রচুর অবসর, সে চলে আসে এখানে। কেউ আসে চান করে পরিষ্কার হয়ে নিতে আর কেউ বা ষ্টেশনে রাত না কাটিয়ে আরামে বিছানায় কাটায়।

কতক্ষণই বা আমি এখানে গাড়ী দাঁড় করিয়েছি! অথচ এরি মধ্যে যে যার কাজ শেষ করে ফেলেছে। কথায় কি সাধে বলে যে কাজের মানুষের সময়ের অভাব হয় না? কানাই জুয়া খেলে জিতে এলো। করকরে পয়সার কামড় সহ্য করা জুয়াড়ীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কানাই গেল খরচ করতে। ঝড়ুয়া একটু সময় পেয়েছে—অমনি সেই সুযোগে দেশে ফেলে-আসা জরুকে ভুলতে গেছে! কী রোগ নিয়ে আসে আবার কে জানে! ওরা নাকি জীবন্ত রোগ।

রাত হয়েছে। কোলাহল যেন ধীরে ধীরে কমে আসছে। ধীরে জনবিরল হতে সুরু হয়েছে। ঝিমিয়ে পড়ছে সহর। সাইকেল-রিক্সা একটা-দুটো যাচ্ছে আসছে। রেডিও ঠিক বেজে যাচ্ছে। দোকান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাজবে। হোটেল থেকে লোক বেরুচ্ছে বেশী ঢুকছে কম। রাতের খাওয়া শেষ করে যাচ্ছে সব।

কোলকাতা থেকে ট্রেণ এল বোধ হয় একটা। লোক আসছে—ডেলী প্যাসেঞ্জার। কারো কারো হাতে বাজারের থলি, কারো কারো টিফিন-কৌটো—চাকুরিজীবী বাঙালী। সেই কোন সকাল বেলায় আলুসিদ্ধ ভাত খেয়ে বেরিয়ে গিয়ে রাত দুপুরে শুকনো রুটি চিবোবার জন্যে তৈরী হয়ে আসছে। এইতো সাধারণ বাঙালী জীবন! এমনি করে কত দিনই বা বাঁচবে আর কেমন করেই বা একটা জাত তৈরী হবে! চাকরি মুখে চায় না কেউ—অন্তরে চায়। তাছাড়া অন্য কিছু করবার মতো সাহস, বুদ্ধি আর দৃঢ়তা আজ আর কোন বাঙালীরই নেই। কী বেদনাদায়ক পরিস্থিতি! যতক্ষণ আমরা অন্যের দোষ দেখি, ততক্ষণ নতুন একটা পরিকল্পনা খাড়া করে কাজ করা যায়। আমরা কাজ করতে চাই না, তাই করতে পারি না। এটা তর্কের বিষয় স্বীকার করি। কিন্তু এটা যে সত্য, তাতে দ্বিমত হবার জো নেই।

কাছাকাছি যারা থাকে তারা গল্প করতে করতে এগিয়ে গেল। দূরের যাত্রীরা রিক্সায় সাঁ সাঁ করে বাড়ির পথ ধরল।

রাস্তা খালি। পথচলতি জনতার ভীড় নেই। মুটেদের দিনান্তের কাজ শেষ হয়েছে। হাঁড়ি চড়িয়েছে ভিখারী। রাস্তার কাঠ-কুটো দিয়ে জ্বেলেছে আগুন—যে আগুন নিবিয়ে দেবে আদিম জ্বালা।

রাস্তার পাশে খাটিয়া পেতে রামধুন সুরু করবে হিন্দুস্থানী শ্রমিকেরা। তোড়জোড় চলছে। নিখরচার চিত্তবিনোদনের বি

সুন্দর সহজ উপায়! এদের সমাদর করা উচিত। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর এমন ভাবে আনন্দ করবার উৎসাহ থাকাটা সত্যি প্রশংসার দাবী রাখে।

কানাই এলো জিন নিয়ে। ও খাবে তো একটুখানি—হয়ত খাবেই না। তবে খাওয়াবার সখ ওর প্রচুর। হাতে বাড়তি পয়সা নির্দয়ভাবে খরচ করবার পক্ষপাতী সে।

পরপর এলো ঝড়ুয়া আর কানাই। যাত্রা হোল শুরু। রাত্রি ডিঙোবার যাত্রা।

৫

দিন কাটে। দিন। সূর্য ওঠে। সূর্য ডোবে। সুখ আর দুঃখ। বুঝতে পারি না তফাৎ। কেমন যেন নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ!

বোধশক্তি নেই। ছিলো তো। কাজের মাঝে হারিয়েছি বোধ। তারাতেও বুঝি ভাল লাগে। এতো ভালোও লাগে। কেমন করে সূর্য লাল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁপায়, দিনের স্থবিরতা আঁধারে আশ্রয় খোঁজে, চাঁদ ওঠে, তারারা চোখ দিয়ে ইসারা করে—দেখিনি এর আগে। আজ দেখি। পৃথিবীর দেহে জোয়ার এসেছে, আর গানের, প্রাণ আর চৈতন্যের। স্পর্শকাতর হয়ে উঠল মন।

মাচার উপরে ঐ কুমড়ো-ফুলের দোলা। আশ্চর্য নির্ভরশীল! নিশ্চিন্ত। সে জানে তার কাজ শেষ হয়েছে। বাহাদুরির গল্প বলে হেলায় মাথা নাড়াচ্ছে পৃথিবীর দিকে চেয়ে। ঝরার আগে জন্ম দিয়ে গেল ফলের। বীজের আধার। আগামী কালের এক সম্ভাবনাপূর্ণ ইঙ্গিত।

আওয়াজ ভেসে ভেসে আসছে। বিচিত্র!

রান্নাঘর থেকে বাসনপত্র সরানোর আওয়াজ এক তীক্ষ্ণ শিহরণ আনে। দূর থেকে শব্দ শুনেই যেন বুঝতে পারা যায়। কী হচ্ছে খানে। জল গরম হচ্ছে। ফুটন্ত জলের দিকে চেয়ে আবিষ্কার হয়েছিল রেলগাড়ীর। আমি অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু আমারো বাস্তব উপস্থিত হয় ফুটন্ত জলের সান্নিধ্যে। কেটলির ঢাকনাটা মাটিতে নামানোর শব্দ হল। বুঝতে পারছি এবার চা ছাড়বে। যেন সুন্দর কালো চা-পাতার গন্ধ বাষ্পের সঙ্গে আমার কাছে উড়ে এলো একটু আদর পাবার জন্যে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলুম। কাপ আর ডিস একত্রিত হোল। চা। চিনি লিকার। দুধ। মানুষটানা চামচার ঠিনঝিন শব্দ। তৈরী হোল প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ পানীয়। ঘুমভাঙ্গার পর যা না পেলে দেহে শক্তি আসে না, জড়তা যায় না ক্লান্তির, আর আসে না কাজ করবার উৎসাহ। চা আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

কানাই, পামা আর আমি চা খেতে বসলুম। এমন করে গার্হস্থ্য জীবন কত দিন, কত কাল উপভোগ করিনি। বাড়ীতে সবার সঙ্গে যখন বসতুম তখন রুচি ছিল অনেকখানি। বসতে হবে বলেই উৎসাহ পেতুম না। অথচ হষ্টেলে হৈ-হৈ করে চা খেয়েছি—তৃপ্তি না হোক আনন্দ ছিল। আর আজ—এর চেয়ে আনন্দ আর বোধ হয় কোথাও নেই। যারা সংসারী হয়নি তারা কতই না দুঃখী!

—এ কি, কানাই, তোমার জামায় কালি-ঝুলি কেন? কী করছিলে এতক্ষণ? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম।

—রং খেলছিলুম নীলাঞ্জনার সঙ্গে। কানাই আমাকে সচেতন করে দিল।

রং! হোলি!

বছরের শেষের গান সুরু হোল তবে। সাড়ম্বরে যাকে একদিন আহ্বান করা হয়েছিল, আজ হতে চলল তারি বিদায়গাথা। উদ্দীপনাময় বর্ষ-বন্দনার করুণতম মুহূর্ত—উদারামুখী অভিযান তানের। এর পর থেকেই দূর্বা-শ্যামল হতে থাকবে মাঠ, নবকিশলয় স্থান নেবে পত্র-ঝরা শাখায়, শীতার্ত পৃথিবীর মুক্তি আনবে রৌদ্রদগ্ধ দিন।

ফিনিক্সের সঙ্গে তুলনা করা যায় বছরের। শীর্ণ পত্রের চূর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত প্রাণ—পুরাতনের চিতাভস্মের মাঝে জন্মলাভ করে আরেকটি বছর। কত পুরাতন, কিন্তু কত নূতন!

সবাই আজ জড়ো হয়েছে গ্রেট কালীতারা কেবিনে। হোলির উৎসব বিশ্বকর্মা পুজার চেয়েও ধূমধামে পালিত হয়। আসলে এটা হোল এমন একটা দিন, যেদিন সবার সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে মেশা চলে। মেশার আনন্দের জন্যে মেশা নয়—কেমন যেন একটা রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে।

ভাঁটিখানা।

ছোট বড় সবাই—কেউ দল বেঁধে, কেউ বা একলাই—দোকানে বসে বসে উৎসবের মৌতাত উপভোগ করছে। অন্য কোন জিনিষের বিক্রি আজ নেই বললেই হয়। ঘরের ভিতরটা কেমন যেন শুঁড়িখানা

শুঁড়িখানা গন্ধ। প্রথম নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গা ঘিন-ঘিন করে উঠে। তার পর সেই ম্যাজমেজে ভাবটা দূর হয়ে যায়।

মহিমের জন্যে আমিও সওদা করে ওর পাশে গিয়ে বসলুম।

—আরে নয়ন ভাই যে! এসো, একটু আবীর দি। মহিম আমার চুলের ডগা ছুঁয়ে একটু আবীর মাখালো।

মহিমের দেখাদেখি আরো কয়েক জন চেনা-অচেনা রং দিল, আবীর ছড়ালো, রুপোলী ছাপ আঁকলো পায়ে-মুখে। বিনা আপত্তিতে ওদের সমস্ত মৃদু অত্যাচার মাথা পেতে নিলুম। আর না নিয়েই বা করব কী! ভালোমানুষ সাজতে হলে উৎসবের নামে একটু-আধটু জুলুম সহ্য করতে হবে বৈ কী!

জুলুম। কিন্তু একটু আধটু কি না, সেটা বিচার সাপেক্ষ। পূজা পার্বণে সার্বজনীনতার নামে চাঁদা সংগ্রহের যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে, তার ফলে কত নিরীহ গৃহস্থের যে সংসারে অকুলান হয়, সে-হিসাব কে রাখে!

ভিজে। মাটি ভিজেছে। এ্যাসফল্টের সরকারী রাস্তায় রং শুকিয়ে কালো হয়ে যাচ্ছে। না। কালো হবার অবসর এরা দেবে না। স্কুলের ছেলেদের একটা দল আসছে পশ্চিম দিক থেকে। বালতিতে যত না রং, গায়ে তার চাইতেও বেশী। নিরীহ পথচারীকে উত্যক্ত করবার প্রবল বাসনা। আদ্দির পাঞ্জাবী পরে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন পশ্চিম দিকে—বোধ হয় হরিণঘাটায় কাজ করেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যেই সাদা পাঞ্জাবী শিমুল-লাল হয়ে উঠল। জামা লেপটে বসে গেল গায়ে। মাথা আর মুখ আবীরময়। পাঞ্জাবীর হাতা দিয়ে চোখ মুছতে চেষ্টা করলেন। ভিজে—রঙে ভিজে হাতা —আবীর চোখের মধ্যে জল হয়ে ঢুকল। হৈ-হৈ করে ছেলেরা সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের জন্যে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। গ্রেট-কালীতারা কেবিনের খদ্দেরদের পৃথিবীর দিকে চাইবার আর প্রয়োজন নেই। নেশায় চুর হবার মতো বেহেড মাতাল এখানে কেউ নেই। সবাই ঝাপ্ন। আচ্ছন্ন, বিবর্ণ মন। কথা বলতে এখন আর চাইছে না কেউ। নেশা উপভোগ করা কত আরামের। আঃ! চোখ বন্ধ করে ঝিম্ মেরে বসে থাকায় কত শান্তি। সমস্ত পৃথিবীর বাসিন্দাদের এমনি করে বসিয়ে যদি রাখা যেত, তা হলে বিবাদ বিসম্বাদ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকারই হোত না।

চোখ বন্ধ করে মহিম গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, কিছু বলছ নাকি, ভাই নয়ন?

হাসি পেল।

চোখ খুললে পাছে নেশা ভেঙ্গে যায়, এই ভয়ে চোখ খুলতে চাইছে না। আরেকটু খাবার ইচ্ছে। অথচ মুখ ফুটে বলতে পারছে না।

—বলছিলুম কী, খানিকটা এখনো আছে। কানাই এখনো এলো না। তুমিও খেয়ে নাও।

—বলছ? আচ্ছা দাও তবে।

যেন একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই মহিম হাত বাড়াল। তারপর দু'ঢোক খাবার পরই চোখ খুলে বলল, আজই শেষ, আর খাবো না। এ তুমি ঠিক দেখে নিও নয়ন।

মহিম হালদারের চাঞ্চল্য?

জানতে বটে। কেবলমাত্র বেহেড মাতালরা নেশার গভীরভাবে অভিভূত হলেই এসব কথা বলে থাকে। কেবল মুখের কথা। জ্ঞান ফিরে এলেই বেমালুম ভুলে যায়। কখনও যে এমন প্রতিজ্ঞা করেছে একথা একবারও মনে পড়ে না। প্রতি রাত্রির প্রতিজ্ঞা যেন প্রতিদিন ভাঙ্গার জন্যেই।

কিন্তু মহিম?

সে তো এমন কথা কখনো বলেনি! তবে কি ভুল? নেশ ভুল বকছে মহিম? অবিশ্বাস্য। কি এমন ঘটেছে বা ঘটতে পা[...] যার জন্যে সরলপ্রাণ মহিম অমন উক্তি করতে পারে? বেআই[...] কাজ সে নিশ্চয় করেনি। কেবলমাত্র আত্মশুদ্ধির জন্যে এত [...] দৃঢ়তা তার পক্ষে অশোভন। আঘাত—তবে কি আঘাত পেয়েছে মানসিক আঘাত? কোন দিক থেকে? কখন?

এ-সব ভাবতে ভাবতে যখন আমার মুখ কুঁচকে উঠছিল, ত[...] স্থির দৃষ্টিতে চেয়েছিল মহিম। ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁ[...] মুছে হাসল। প্রাণহীন নির্জীব হাসি।

—ভাবছো, বেহুঁস হয়েছি?

—না না, তা কেন? আমি তাকে অভয় দিলুম। আ[...] জানি, আমাদের এর চেয়ে বড় অপমানজনক কথা আর নেই[...] হুঁস হারিয়ে ফেলা, আনকোরাদের সাজে, আমাদের ন[...] তারা অবশ্য রেগে আগুন হয়ে উঠে ও কথা বললে। অ[...] আমরা হাসি। কিন্তু মহিমের মুখে সেই তাচ্ছিল্যের হাসি [...] এটা নয়? এটা তো অসহ্য বেদনাকে মনের জোরে ভুলে থাকার।

আবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে মহিম বলতে লাগল- কাল আমার একমাত্র মেয়েটা মারা গেছে।

কত সহজ কথাগুলি। কিন্তু কত বেদনাময়। এত সোজাসু[...] এত বড় একটা দুঃসংবাদ শুনে আমি নির্বাক হয়ে গেলুম। এরব [...] অবস্থায় সহানুভূতির কথা বলা হাস্যকর। অনড় হয়ে ব[...] রইলুম।

—কাল বিকেলে যখন ও মারা গেল, তখন আমি বাড়ি ছিলু[ম] না। মণ্ডলহাটে শ্রীকান্তর বাড়িতে মদ খাচ্ছিলুম। তাই ঠি[ক] করলুম—ও নেশা আর নয়। কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে এলো মহিমের।

—কিন্তু তার বদলে মরণকে আটকানো যাবে না কোন দিন। এটা দুঃখের সত্যি। কিন্তু তা বলে অতটা ভেঙ্গে পড়া তোমা[র] উচিত নয়, মহিমদা'। চলো, ওঠা যাক। আজ আমার ওখানেই খাবে।

রাস্তায় বেরুতে না বেরুতে উত্তেজিত জনতার কোলাহল ভে[সে] এলো হাটের দিক থেকে।

এগিয়ে গেলুম। একেবারে ভিড়ের ভিতর ঢুকে পড়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, কী ব্যাপার? হট্টগোল কিসের?

—দেখুন না, এর গায়ে আমরা ইচ্ছে করে রং দেই নি, তা[...] কি রকম চেঁচামেচি করছে। স্কুলের ছেলেদের একজন বলল।

যাকে নিয়ে গণ্ডগোল তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখি, বা[...] কণ্ডাক্টর জব্বর। ওলাইসিঁথিতে থাকে। অর্গাণ্ডির পাঞ্জা[বী] পরে বেচারা কোথায় যাচ্ছিল, ছেলেদের অসাবধানতায় এক[...] একটি অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে গেছে। ছেলেদের দোষ খুব বে[শী] নেই, কারণ মাত্রার অতিরিক্ত করবার এই তো সময়। অবশ্য তা[...]

বলে বিধর্মী অথবা অনিচ্ছুক ব্যক্তির উপর জোর জবরদস্তি করা সমর্থনযোগ্য নয় মোটেই।

ছেলেদের উদ্দেশ করে বলি—ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক অন্যায় কাজ করেছ তোমরা। যাও এখন। ভিড় করো না। দেখি আমি।

জব্বরকে বললুম—ছেলেরা না জেনে সত্যি খুব অন্যায় করে ফেলেছে, ভাই!

—তাতে এমন কিছু মনে করতুম না, নয়নদা'। ছেলেরা মারমুখী হয়ে উঠলো বলে মেজাজ খিঁচড়ে গেল।

—যাচ্ছিলে কোথায়?

—বৌ আনতে। কিন্তু এখন আর যাবো না। এ রকম বেসরম অবস্থায় গেলে 'পোজিসন' থাকবে না।

—সত্যি, বড় লজ্জার কথা। কিছু মনে করো না, ভাই! নাও, একটা সিগারেট ধরাও।

জব্বরকে শান্ত করে বাড়ি পাঠিয়ে দিলুম।

সেই একই হোলীর দিন। রাজপুতানা আর বাংলা—কত তফাৎ!

ভূনাগ রাজার রাজপুতানী স্ত্রী। দুঃসাহসী। কৌশলী।

কেতনপুর থেকে নিমন্ত্রণ পাঠালো কেশর খাঁকে। হিন্দু রমণীর প্রতি সহজাত প্রলোভনে মদমত্ত কেশর খাঁ গ্রহণ করলো রাজপুতানীর আমন্ত্রণ।

হোলী খেলবে দুজনে। সহস্র সখী করবে লাস্যনৃত্য। কদম্বশাখে ঝুলবে দোলনা। সম্ভোগালাপে কাটাব রঙীন প্রহর। হয়তো সুধাভাণ্ড ভরে দেবে প্রিয়দর্শনা রাজরাণী। বিহ্বল চিত্তে যাত্রা করলো কেশর খাঁ। সাক্ষী হোল শতেক দেহরক্ষী।

সে-ও ছিল এমনি এক বসন্ত-প্রভাত। রাজপুতানার রুক্ষ প্রান্তরে পিঙ্গল ধুলার ঝড় তুলে গেল অশ্বারোহী। কামনা-উদ্বেল বক্ষ। ভাবনা নিমীলিত আঁখি। আর ক্ষণে ক্ষণে তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে ওষ্ঠ।

কেতনপুর। সে যে অনেক দূর। পথের কী শেষ নেই? শেষ হবে না এই পাহাড় যোনা প্রান্তর? অস্থিরতায় চঞ্চল হোয়ে উঠে ঘোড়সওয়ার। লাগাম বুঝি ছিঁড়েই যাবে। ঘোড়ার মুখে সাগরের ফেনা।

দুর্গের চূড়া। অবশেষে তা-ও দেখা গেল।

একশ' সখী খেলতে এল হোলী। প্রমোদোদ্যানে ফাগের ছড়াছড়ি। রঙবাহার। পাতায় পাতায় বর্ণচ্ছটা। ফুলে ফুলে রঙীন সঙ্কেত।

ঘাগড়া দোলে। ওড়না ওড়ে। বর্ষণসিক্ত শত সহচরী। উচ্ছল নূপুর। তবু যেন মোহময় হয়ে উঠে না মুহূর্ত। সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার প্রাণের অভাব। সব আছে—তবু কী যেন নেই।

ব্যস্ত হয়ে ওঠে কেশর খাঁ।

এই কী নারীদেহ!

প্রকৃতির রুক্ষ হাতের ছোঁয়া কী রাজপুতানীর সর্বাঙ্গে? রাজপুত কেমন করে সোহাগ করে এদের? ক্লান্ত দিনের শেষে এই কাঠিন্য জয় করা যায়?

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসে। সূর্য ডুবে যায় পাহাড়ের আড়ালে।

রাণী এলেন। সঙ্গে এল সুগন্ধি বাতাস। মুহূর্তেই স্পন্দনময় হয়ে উঠল প্রমোদোদ্যান। দাসীর হাতে ফাগের থালা।

কেশর খাঁয়ের বক্ষ স্পন্দন দ্রুততর হল। সহস্র যুদ্ধে জয়ী বীর ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হয়ে উঠে। বিহ্বল কণ্ঠে সোহাগ জানায়।

চতুরা রাজপুতানী কটাক্ষ হানে। এগিয়ে আসে কেশর খাঁ।

হঠাৎ যেন দুলে উঠল পৃথিবী। ঐ দূরের পাহাড়টি ভেঙ্গে পড়ল না কি মাথায়? কেশর খাঁয়ের দু চোখে নেমে আসে অন্ধকার। পাশে ছিটকে পড়ে ফাগের থালা।

হোলী খেলা সুরু হল রাজপুতানীর। রক্ত-লাল হয়ে উঠে কেশর খাঁয়ের অবয়ব।

খোলস ছেড়ে ফেলে শতেক সহচরী। বেরিয়ে এল শতেক সশস্ত্র সৈন্য।

যে পথ দিয়ে পাঠানরা এল, সে পথে আর ফিরল না তারা।

হোলী খেলা সাঙ্গ হল। রক্ত দিয়ে হোলীর উৎসব উদ্‌যাপন করলেন রাণী। সাক্ষী রইল পূর্ণিমার চাঁদ। [ ক্রমশঃ।

# শেষ ঘুম

### শ্রীমতী স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায়

এই ঘরে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ( যে ঘুম চেয়েছিলে )
সে ঘুম আর ভাঙেনি তোমার। তোমার শেষ ঘুম!
আমরা চেয়ে দেখেছিলাম—
কত সুন্দর ভাবে তুমি ঘুমিয়েছো
কোনও দিনও ভাঙবে না—সে ঘুম তোমার।
তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো, আমরা দেখেছি—
তোমার সারা দেহে ঘুম ছড়িয়ে পড়েছে—
আর ছড়িয়ে পড়েছে তোমার মুখে
ঘুম নয়—জিজ্ঞাসার চিহ্ন।
যেমন ভাবে তুমি জিজ্ঞাসা করতে ( ঘুমোবার আগে )
ঠিক তেমনি ভাবেই যেন জিজ্ঞাসা করছো—
"আমার কি কষ্টের শেষ হল এবার
শেষ হোলো কি অশেষ যন্ত্রণার"?
চেয়ে দেখ, ক্যালেণ্ডারের পাতায়
একটা লাল তারিখ হাসছে.কেন জানো?
তুমি যে রোজ ওকে জিজ্ঞাসা করতে—কবে তুমি সেরে উঠবে?
আজ তুমি সেরে গেছ কি না—তাই ও হাসছে।
আজকের সকালটা—তোমার কাছে খুব সুন্দর, না?
কোনও দিন তো তুমি ঘুমোও না,
এমন কি শুতেও পার না, আজ তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো।
বসে বসেই ঘুমিয়েছো তোমার শেষ ঘুম,
ঘুমোও, তোমাকে আমরা কেউ ডাকবো না।

# ব্যাবিলনের রাজকন্যা

( ভলতেয়ার থেকে )

## সতেরো

অসামান্যা অতুলনা ফর্মোজান্তে বহুক্ষণ ধরে শয্যায় এলিয়ে প'ড়ে রইলেন। শয্যাপাশে রেখেছেন কমলালেবুর গাছ একখানি। গাছটি বসানো রৌপ্যটবে, পাখীটির বিশ্রামের জয়গা ওটা।

মশারির পর্দাগুলো টানা ছিলো, কিন্তু তাঁর ঘুম আসবার ইচ্ছে ছিলো না মোটেই। চিত্ত ও কল্পনা তাঁর উত্তেজিত হ'য়েছিলো অত্যন্তই।

মনোরম আগন্তুক ভাসছিলো তাঁর চোখের সামনেই। তিনি দেখলেন ; তাঁর প্রিয়তম তীর ছুঁড়ছেন নীমরোদ-এর ধনু নিয়ে। দেখলেন তিনি, সিংহের মাথাটি কেটে ফেললেন উনি। তিনি ওঁর গোপ-গাথা পুনরাবৃত্তি করলেন। সর্বশেষে তাঁর দৃষ্টিতে প'ড়লো, উনি জনতার মধ্য থেকে অদৃশ্য হ'চ্ছেন শৃঙ্গৈকতুরঙ্গে চ'ড়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না এলো তাঁর। জল-টুপটুপ চোখে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন, এখন দেখতে পাবো না তো আমি আর ওঁকে। উনি ফিরে আসবেন না।

ফিরে আসবেন উনি, বললে বিহঙ্গ রাজরাজকন্যার কথার উত্তরে। কমলালেবুর গাছ থেকে। আপনাকে একবার দেখে আবার দেখতে চান না, এমনটা কেউ থাকতে পারে না।

ওঃ ভগবান! ওঃ অনন্তশক্তিগণ! আমার পাখীটি পবিত্র ক্যাল্‌দীয় ভাষাতেই কথা বলছে যে, ওগো!

এই কথাগু'ল ব'লে মশারির পর্দাগুলো সরালেন তিনি। দু বাহু বাড়িয়ে দিলেন পাখীটির দিকে। বিছানার ওপরেই নতজানু হ'য়ে পড়লেন। বললেন, আপনি কি কোনো দেবতা? নেবে এসেছেন স্বর্গ থেকে মর্ত্তে? আপনি কি মহান ও রোসমাদে? এই মনোহর পাখীর ডানায় ঢেকে রেখেছেন নিজেকে? আপনি দেবতা হ'ন যদি তবে এই পরমরূপস তরুণকে দিন ফিরিয়ে আমায়।

আমি ডানাওয়ালা জীবমাত্র, বললে অপর বক্তাটি। কিন্তু আমার জন্ম হয়েছিলো সেই সময়ে যখন পশুরা সকলেই কথা বলতো, আর পাখী, সাপ, গাধা, ঘোড়া, শ্যেন সিংহ সকলেই অন্তরঙ্গভাবেই আলাপ করতো মানুষের সংগে।

ভয়ে ভয়ে ছিলুম, তাইতো সবার সামনে কোনো কথা বলতে চাইনি। ভয় করছিলো, আপনার অপেক্ষাকারিণী পরিচারিকারা ঐন্দ্রজালিক ব'লে মনে করে আমায়। আমি শুধু চাই নিজেকে আপনার কাছে পরিচিত করে নিতে।

ফর্মোজান্তে দিশেহারা, বিক্ষিপ্তচিত্তা এবং সম্মোহিতা, আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য দেখে। একসংগে শত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার ঔৎসুক্যে ফেটে পড়ে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, কতো বয়স হ'লো তার। সাতাশ হাজার নশো বছর ছ'মাস, ভগবতি! স্বর্গের ছোটোমোটো বিপ্লব, জ্ঞানীরা যাকে ইকুইনকসদের প্রাগায়ণ, অর্থাৎ ক্রান্তিপাদ বা সমরাত্রিদিবসের অভিযাত্রা আখ্যা দেন, যা অনুষ্ঠিত হয় প্রায় আটাশ হাজার বছরে। সেই বয়সই আমার। এর চেয়েও আনন্তিক বড়ো বড়ো বিপ্লবের সমবয়সী আর আমার চেয়েও বয়স্ক সত্ত্বও আছে আমাদের ভেতরে।

## আঠারো

বাইশ বছর আগে ক্যাল্‌দীয় ভাষা শিখি আমি বহু পর্য্যটনগুলির ভিতরে সুযোগ নিয়ে একবার। ক্যাল্‌দীয় ভাষার দিকে আমার ঝোঁক খুব বেশী। আমার সম্প্রদায় অন্যান্য জন্তুরা কথা বলা বন্ধ করেছে আপনাদের দেশে।

কিন্তু তায় কারণ কী, হে স্বর্গীয় পাখী?

হায়, কারণটা শোকাবহ নিশ্চয়ই। মানুষেরা অন্তিমতঃ আমাদের সঙ্গে আলাপন ও শিক্ষা না করে আমাদের খেয়ে ফেলবার অভ্যাসই সংক্রামক করছে। বর্বর ছাড়া আর কী! তাদের উপলব্ধি করা উচিত ছিলো তাদের মতই আমাদের আছে সেই একই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই, সেই একই অনুভবশক্তি, সেই একই প্রয়োজন, সেই একই আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের মতই সেই একই প্রাণ, সেই একই আত্মা। আমরা তাদের সহোদর ভাই। আর যদি খেতে হয় দুষ্ট যারা তাদেরই রান্না করে খেয়ে নাও। শান্ত-দান্ত নিরীহদের কেনো?

আমরা যে আপনাদের ভাই, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ: পরমাত্মা ভগবান, সেই অনন্ত অনাদ্যন্তহীন বিশ্বস্রষ্টা নিয়ম স্থাপন করেছেন সৃষ্টি-প্রকরণে—নিষেধ করেছেন আপনাদের—না খেতে মাংস, আর আমাদের? না করতে আপনাদের রক্তপাত।

আপনাদের লোকসান-এর আখ্যায়িকাগুলি, যা বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে এই ভাবেই আরম্ভ হয়েছে সবগুলি।

সেই সময়ে, যখন বলতো কথা পশুরাও

আপনাদের মধ্যে বহু নারী রয়েছেন যাঁরা নিজেদের কুকুরদের সংগে কথা বলে থাকেন। কিন্তু এরা ঠিক করেছে দেবে না কোনো উত্তরই ; দেবেই বা কোন সাধে? এদের বেত মারা হয় শীকারে বেরুতে আর সহায়ক হ'তে ধ্বংস করতে আমাদের সাধারণ বন্ধু হরিণ, খরগোস ও তিতির পক্ষীদের।

কোনো কোনো কবিতায় দেখা যায়, ঘোড়ারা আলাপ করছে কোচোয়ানের সাথে। কিন্তু তাঁরা এতো অসংস্কৃত, এতো অমার্জ্জিত-রুচি আর ব্যবহার করে এমন অশ্লীল বাক্যগুলি! ফলে দাঁড়িয়েছে এই অশ্বজাতি যারা এক সময়ে আপনাদের পছন্দ করতো আন্তরিক এখন ঠিক তেমনই করে ঘৃণা।

## ঊনিশ

সেই দেশে যেখানে আপনার মনোমোহনীয় আগন্তুক প্রিয়তম, মনুষ্যজাতির মধ্যে সবচেয়ে সুনিখুঁততম মানুষটি বাস করেন—সেই দেশেই কেবল আপনাদের জাতি জানে—কী ভাবে ভালোবাসতে হয় আমাদের জাতিকে। জানে, কেমন করে করতে হয় আলাপাদি। জগতে মাত্র এই একটি দেশই আছে যেখানে মানুষেরা ন্যায়পরায়ণ।

কোথায় সেই দেশ, সেই আদর্শস্থানীয় দেশ আমার আগন্তুক প্রিয়তমের? এই নায়কেন্দ্রের নাম কী? ওঁর সাম্রাজ্যের নামই বা কী? মোটেই বিশ্বাস করতে পারিনে রাখাল মাত্র ও একজন, যেমন বিশ্বাস করতে চাইনে তুমি বাদুর, একথা।

ওঁর দেশ আর্য্যো, গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের দেশ। গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়েরা ধার্ম্মিক ও অপরাজেয় জাতি। গঙ্গার পূর্ব্বতীরের অধিবাসী তারা।

অমৃতজীবন আমার বন্ধুর নাম। উনি রাজা ন'ন, রাজা হ'তে চান কি না তাও আমি জানিনে। স্বদেশীয়দের খুব ভালোবাসেন উনি। তাদের মতই উনি গোপালক।

তবে ভাববেন না যেনো এই গোপালকেরা আপনাদের দেশের গোপালকদের মতো। আপনাদের দেশের গোপালকেরা ছেঁড়া কাপড়েও দেহের নগ্নতা ঢেকে উঠতে পারে না। যে-ভেড়াগুলো তারা চড়ায় তারাও তো তাদের চেয়ে আরো বেশী ভালোই বস্ত্রাবৃত। আপনাদের দেশের গোপালকেরা দারিদ্র্যের চাপে অসহ্য গোঙায়। প্রভুদের কাছ থেকে যে-সামান্য বেতন তারা পেয়ে থাকে, তার অর্দ্ধেকই তারা খালি করে দেয় উৎপীড়কদের হাতে।

গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়েরা কিন্তু সকলেই সমান ঐশ্বর্য্য ও সমান স্বাধীনতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। সংখ্যাহীন ভেড়াদের অধিকারী তারা। ভেড়াগুলো পূর্ণ করে থাকে চিরহরিৎ ক্ষেত্রগুলি। কখনও এদের হয় না হত্যা করা। গঙ্গাতীরে স্বজাতীয়দের হত্যা করা ভয়ানক পাপরূপে গণ্য হয়। তাদের পশম, সবচেয়ে সুন্দর রেশমের চেয়েও আরো বেশী, বেশী সূক্ষ্ম ও চাকচিক্যময়। পূর্ব্ব মহাদেশে এরই ব্যবসা বৃহত্তম।

এই ব্যবসায়ের কথা নাই না বললুম। গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের দেশে মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা করার উপযোগী বস্তুই হয় উৎপন্ন।

অমৃতজীবন আপনাকে কতোগুলি বড়ো বড়ো হীরের টুকরো দিয়েছিলো। স্মরণে প'ড়ে কী?

সেগুলো নিজেরই খনিজাত ওর। যে খড়্গাশৃঙ্গ অশ্বে ওঁকে চড়তে দেখেছেন, সে হচ্ছে গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের স্বাভাবিক আরোহণ জীব। সব চেয়ে বেশী মনোজ্ঞ, সব চেয়ে বেশী গর্ব্বী, সব চেয়ে বেশী ভয়ংকর, অথচ পৃথিবীর বুকে সব চেয়ে বেশী শান্ততম জীব হচ্ছে এই। একশো গঙ্গাতীরবর্ত্তী আর একশো খড়্গাশৃঙ্গী বাজী অসংখ্য বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করতে সমর্থ।

—সত্যই কী তাই?

—হ্যাঁ, ভগবতি!

## কুড়ি

প্রায় দু' শতাব্দী আগেকার কথা। ভারতেরই এক রাজা জয় করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠেন এই অসামান্য জাতিটিকে। এলেন তিনি 'যুদ্ধং দেহি' রব তুলে। পেছনে পেছনে তাঁর দু'হাজার হাতী আর দশ লক্ষ যোদ্ধা। খড়্গাশিং ঘোড়াগুলো গেঁও বা বিদ্ধ করলে হাতীদের। ভরত পাখীরা স্বর্ণশিকে বিদ্ধ হয়ে ছিলো পড়ে আপনার টেবিলের ওপরে যেমন, ঠিক সে রকমই। আমার লক্ষ্য এড়ায়নি তা'। শত্রুপক্ষীয়েরা গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের তরোয়ালের আঘাতে পড়তে লাগলো, পক্ব শস্যরাশি যেমন ছিন্ন করে পূর্ব্বদেশীয়েরা। আক্রমণকারী রাজা বন্দী হলেন, ছ' লক্ষ সৈন্যের চেয়েও বেশী সৈন্য নিয়ে।

রাজার রোগের চিকিৎসা সুরু হ'লো। সুপবিত্র স্বাস্থ্যপ্রদ গঙ্গায় তাকে হ'লো স্নান করানো। দেশের পথ্যেই রাখা হ'লো তাঁকে। পথ্য মাত্র শাকসব্জী নিয়ে, যা প্রশ্বাস নেয় এমন জীবমাত্রকেই পুষ্ট করবার জন্য প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে বিলিয়ে দিয়েছেন। যারা মাংস খায়, পান করে মদ্য, তাদের শোণিত ওঠে টকিয়ে ও শুকিয়ে। বহু উপায়েই তারা পাগলও হয়ে পড়ে। তাদের প্রধান পাগলামি হচ্ছে: নিজেদের ভাইদের রক্তপাত করা আর উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রগুলিকে উজাড় করে দেওয়া, শ্মশানের উপরে রাজত্ব করতেই।

পূর্ণ ছ'টি মাস লাগলো ভারতের এই রাজাটির পাগলামি সারিয়ে তুলতে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে দেখলেন, রাজাটির নাড়ী হয়েছে নিয়মিত, স্থির হয়েছে মন। রাজাকে একখানা সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্র দিয়ে তাঁরা বললেন, নিদর্শন-পত্রখানি এই, নিয়ে যান। গঙ্গাতীরবর্ত্তীয় পরিষদে প্রদর্শন করবেন।

পরিষদে ইউনিকর্ণ বা একশৃংগাশ্বদের উপদেশ নিলে। একশৃংগী

## সতেরো

অসামান্যা অতুলনা ফর্মোজান্তে বহুক্ষণ ধরে শয্যায় এলিয়ে প'ড়ে রইলেন। শয্যাপাশে রেখেছেন কমলালেবুর গাছ একখানি। গাছটি বসানো রৌপ্যটবে, পাখীটির বিশ্রামের জয়গা ওটা।

মশারির পর্দাগুলো টানা ছিলো, কিন্তু তাঁর ঘুম আসবার ইচ্ছে ছিলো না মোটেই। চিত্ত ও কল্পনা তাঁর উত্তেজিত হ'য়েছিলো অত্যন্তই।

মনোরম আগন্তুক ভাসছিলো তাঁর চোখের সামনেই। তিনি দেখলেন; তাঁর প্রিয়তম তীর ছুঁড়ছেন নীমরোদ-এর ধনু নিয়ে। দেখলেন তিনি, সিংহের মাথাটি কেটে ফেললেন উনি। তিনি ওঁর গোপ-গাথা পুনরাবৃত্তি করলেন। সর্ব্বশেষে তাঁর দৃষ্টিতে প'ড়লো, উনি জনতার মধ্য থেকে অদৃশ্য হ'চ্ছেন শৃঙ্গৈকতুরঙ্গে চ'ড়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না এলো তাঁর। জল-টুপটুপ চোখে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন, এখন দেখতে পাবো না তো আমি আর ওঁকে। উনি ফিরে আসবেন না।

ফিরে আসবেন উনি, বললে বিহঙ্গ রাজরাজকন্যার কথার উত্তরে। কমলালেবুর গাছ থেকে। আপনাকে একবার দেখে আবার দেখতে চান না, এমনটা কেউ থাকতে পারে না।

ও: ভগবান! ও: অনন্তশক্তিগণ! আমার পাখীটি পবিত্র খ্যালদীয় ভাষাতেই কথা বলছে যে, ওগো!

এই কথাগুল ব'লে মশারির পর্দাগুলো সরালেন তিনি। দু বাহু বাড়িয়ে দিলেন পাখীটির দিকে। বিছানার ওপরেই নতজানু হ'য়ে পড়লেন। বললেন, আপনি কি কোনো দেবতা? নেবে এসেছেন স্বর্গ থেকে মর্ত্তে? আপনি কি মহান ও রোসমাদে? এই মনোহর পাখীর ডানায় ঢেকে রেখেছেন নিজেকে? আপনি দেবতা হ'ন যদি তবে এই পরমরূপস তরুণকে দিন ফিরিয়ে আমায়।

আমি ডানাওয়ালা জীবমাত্র, বললে অপর বক্তাটি। কিন্তু আমার জন্ম হয়েছিলো সেই সময়ে যখন পশুরা সকলেই কথা বলতো, আর পাখী, সাপ, গাধা, ঘোড়া, শ্যেন সিংহ সকলেই অন্তরঙ্গভাবেই আলাপ করতো মানুষের সংগে।

ভয়ে ভয়ে ছিলুম, তাইতো সবার সামনে কোনো কথা বলতে চাইনি। ভয় করছিলো, আপনার অপেক্ষাকারিণী পরিচারিকারা ঐন্দ্রজালিক ব'লে মনে করে আমায়। আমি শুধু চাই নিজেকে আপনার কাছে পরিচিত করে নিতে।

ফর্মোজান্তে দিশেহারা, বিক্ষিপ্তচিত্তা এবং সম্মোহিতা, আশ্চর্য্যের পর আশ্চর্য্য দেখে। একসংগে শত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার ঔৎসুক্যে ফেটে পড়ে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, কতো প্রাচীন তুমি?

সাতাশ হাজার নশো বছর ছ'মাস, ভগবতি! স্বর্গের ছোটো-মোটো বিপ্লব, জ্ঞানীরা যাকে ইকুইনকসদের প্রাগায়ণ, অর্থাৎ ক্রান্তিপাদ বা সমরাত্রিদিবসের অভিযাত্রা আখ্যা দেন, যা অনুষ্ঠিত হয় প্রায় আটাশ হাজার বছরে। সেই বয়সই আমার। এর চেয়েও আনন্তিক বড়ো বড়ো বিপ্লবের সমবয়সী আর আমার চেয়েও বয়স্ক সত্ত্বও আছে আমাদের ভেতরে।

## আঠারো

বাইশ বছর আগে খ্যালদীয় ভাষা শিখি আমি বহু পর্য্যটনগুলির ভিতরে সুযোগ নিয়ে একবার। খ্যালদীয় ভাষার দিকে আমার ঝোঁক খুব বেশী। আমার সম্প্রদায় অন্যান্য জন্তরা কথা বলা বন্ধ করেছে আপনাদের দেশে।

কিন্তু তায় কারণ কী, হে স্বর্গীয় পাখী?

হায়, কারণটা শোকাবহ নিশ্চয়ই। মানুষেরা অস্তিমত: আমাদের সঙ্গে আলাপন ও শিক্ষা না করে আমাদের খেয়ে ফেলবার অভ্যাসই সংক্রামক করছে। বর্ব্বর ছাড়া আর কী! তাদের উপলব্ধি করা উচিত ছিলো তাদের মতই আমাদের আছে সেই একই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই, সেই একই অনুভবশক্তি, সেই একই প্রয়োজন, সেই একই আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের মতই সেই একই প্রাণ, সেই একই আত্মা। আমরা তাদের সহোদর ভাই। আর যদি খেতে হয় দুষ্ট যারা তাদেরই রান্না করে খেয়ে নাও। শান্ত-দান্ত নিরীহদের কেনো?

আমরা যে আপনাদের ভাই, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ: পরমাত্মা ভগবান, সেই অনন্ত অনাদ্যন্তহীন বিশ্বস্রষ্টা নিয়ম স্থাপন করেছেন সৃষ্টি-প্রকরণে—নিষেধ করেছেন আপনাদের—না খেতে মাংস, আর আমাদের? না করতে আপনাদের রক্তপাত।

আপনাদের লোকসান-এর আখ্যায়িকাগুলি, যা বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে এই ভাবেই আরম্ভ হয়েছে সবগুলি।

সেই সময়ে, যখন বলতো কথা পশুরাও

আপনাদের মধ্যে বহু নারী রয়েছেন যাঁরা নিজেদের কুকুরদের সংগে কথা বলে থাকেন। কিন্তু এরা ঠিক করেছে দেবে না কোনো উত্তরই; দেবেই বা কোন সাধে? এদের বেত মারা হয় শীকারে বেরুতে আর সহায়ক হ'তে ধ্বংস করতে আমাদের সাধারণ বন্ধু হরিণ, খরগোস ও তিতির পক্ষীদের।

কোনো কোনো কবিতায় দেখা যায়, ঘোড়ারা আলাপ করছে কোচোয়ানের সাথে। কিন্তু তা'রা এতো অসংস্কৃত, এতো অমার্জিত-রুচি আর ব্যবহার করে এমন অশ্লীল বাক্যগুলি। ফলে দাঁড়িয়েছে এই অশ্বজাতি যারা এক সময়ে আপনাদের পছন্দ করতো অত্যধিক, এখন ঠিক তেমনই করে ঘৃণা।

## উনিশ

সেই দেশে যেখানে আপনার মনোমোহনীয় আগন্তুক প্রিয়তম, মনুষ্যজাতির মধ্যে সবচেয়ে সুনিখুঁততম মানুষটি বাস করেন—সেই দেশেই কেবল আপনাদের জাতি জানে—কী ভাবে ভালোবাসতে হয় আমাদের জাতিকে। জানে, কেমন করে করতে হয় আদাপাদি। জগতে মাত্র এই একটি দেশই আছে যেখানে মানুষেরা ন্যায়পরায়ণ।

কোথায় সেই দেশ, সেই আদর্শস্থানীয় দেশ আমার আগন্তুক প্রিয়তমের? এই নায়কেন্দ্রের নাম কী? ওঁর সাম্রাজ্যের নামই বা কী? মোটেই বিশ্বাস করতে পারিনে রাখাল মাত্র ও একজন, যেমন বিশ্বাস করতে চাইনে তুমি বাদুর, একথা।

ওঁর দেশ আর্য্যে, গঙ্গাতীরবর্তীয়দের দেশ। গঙ্গাতীরবর্তীয়েরা ধার্ম্মিক ও অপরাজেয় জাতি। গঙ্গার পূর্ব্বতীরের অধিবাসী তারা।

অমৃতজীবন আমার বন্ধুর নাম। উনি রাজা ন'ন, রাজা হ'তে চান কি না তাও আমি জানিনে। স্বদেশীয়দের খুব ভালোবাসেন উনি। তাদের মতই উনি গোপালক।

তবে ভাববেন না যেনো এই গোপালকেরা আপনাদের দেশের গোপালকদের মতো। আপনাদের দেশের গোপালকেরা ছেঁড়' কাপড়েও দেহের নগ্নতা ঢেকে উঠতে পারে না। যে-ভেড়াগুলো তারা চড়ায় তারাও তো তাদের চেয়ে আরো বেশী ভালোই বস্ত্রাবৃত। আপনাদের দেশের গোপালকেরা দারিদ্র্যের চাপে অসহ্য গোঙায়। প্রভুদের কাছ থেকে যে-সামান্য বেতন তারা পেয়ে থাকে, তার অর্দ্ধেকই তারা খালি করে দেয় উৎপীড়কদের হাতে।

গঙ্গাতীরবর্তীয়েরা কিন্তু সকলেই সমান ঐশ্বর্য্য ও সমান স্বাধীনতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। সংখ্যাহীন ভেড়াদের অধিকারী তারা। ভেড়াগুলো পূর্ণ করে থাকে চিরহরিৎ ক্ষেত্রগুলি। কখনও এদের হয় না হত্যা করা। গঙ্গাতীরে স্বজাতীয়দের হত্যা করা ভয়ানক পাপরূপে গণ্য হয়। তাদের পশম, সবচেয়ে সুন্দর রেশমের চেয়েও আরো বেশী, বেশী সূক্ষ্ম ও চাকচিক্যময়। পূর্ব্ব মহাদেশে এরই ব্যবসা বৃহত্তম।

এই ব্যবসায়ের কথা নাই বা ধরলুম। গঙ্গাতীরবর্তীদের দেশে মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা করার উপযোগী বস্তুই হয় উৎপন্ন।

অমৃতজীবন আপনাকে কতোগুলি বড়ো বড়ো হীরের টুকরো দিয়েছিলো। স্মরণে প'ড়ে কী?

সেগুলো নিজেরই খনিজাত ওঁর। যে খড়্গশৃঙ্গ অশ্বে ওঁকে চড়তে দেখেছেন, সে হচ্ছে গঙ্গাতীরবর্তীয়দের স্বাভাবিক আরোহণ-জীব। সব চেয়ে বেশী মনোজ্ঞ, সব চেয়ে বেশী গর্ব্বী, সব চেয়ে বেশী ভয়ংকর, অথচ পৃথিবীর বুকে সব চেয়ে বেশী শান্ততম জীব হচ্ছে এই। একশো গঙ্গাতীরবর্তী আর একশো খড়্গশৃঙ্গী বাজী অসংখ্য বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করতে সমর্থ।

—সত্যই কী তাই?

—হ্যাঁ, ভগবতি!

## কুড়ি

প্রায় দু' শতাব্দী আগেকার কথা। ভারতেরই এক রাজা জয় করবার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠেন এই অসামান্য জাতিটিকে। এলেন তিনি 'যুদ্ধং দেহি' রব তুলে। পেছনে পেছনে তাঁর দু'হাজার হাতী আর দশ লক্ষ যোদ্ধা। খড়্গশিং ঘোড়াগুলো গেঁথে বা বিদ্ধ করলে হাতীদের। ভরত পাখীরা স্বর্ণশিকে বিদ্ধ হয়ে ছিলো পড়ে আপনার টেবিলের ওপরে যেমন, ঠিক সে রকমই। আমার লক্ষ্য এড়ায়নি তা'। শত্রুপক্ষীয়েরা গঙ্গাতীরবর্তীয়দের তরোয়ালের আঘাতে পড়তে লাগলো, পক শস্যরাশি যেমন ছিন্ন করে পূর্ব্বদেশীয়েরা। আক্রমণকারী রাজা বন্দী হলেন, ছ' লক্ষ সৈন্যের চেয়েও বেশী সৈন্য নিয়ে।

রাজার রোগের চিকিৎসা সুরু হ'লো। সুপবিত্র স্বাস্থ্যপ্রদ গঙ্গায় তাকে হ'লো স্নান করানো। দেশের পথ্যেই রাখা হ'লো তাঁকে। পথ্য মাত্র শাকসব্জী নিয়ে, যা প্রশ্বাস নেয় এমন জীবমাত্রকেই পুষ্ট করবার জন্য প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে বিলিয়ে দিয়েছেন। যারা মাংস খায়, পান করে মদ্য, তাদের শোণিত ওঠে টকিয়ে ও শুকিয়ে। বহু উপায়েই তারা পাগলও হয়ে পড়ে। তাদের প্রধান পাগলামি হচ্ছে: নিজেদের ভাইদের রক্তপাত করা আর উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রগুলিকে উজাড় করে দেওয়া, শ্মশানের উপরে রাজত্ব করতেই।

পূর্ণ ছ'টি মাস লাগলো ভারতের এই রাজাটির পাগলামি সারিয়ে তুলতে। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে দেখলেন, রাজাটির নাড়ী হয়েছে নিয়মিত, স্থির হয়েছে মন। রাজাকে একখানা সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্র দিয়ে তাঁরা বললেন, নিদর্শন-পত্রখানি এই, নিয়ে যান। গঙ্গাতীরবর্তীয় পরিষদে প্রদর্শন করবেন।

পরিষদে ইউনিকর্ণ বা একশৃঙ্গাশ্বদের উপদেশ নিলে। একশৃঙ্গী

তুরঙ্গেয়া বললে, সদয়তার সংগে ফেরত পাঠিয়ে দিন ভারতের রাজাটিকে, তার মূর্খ পাত্রমিত্রদের আর তার অর্বাচীন যোদ্ধাদের, তাদেরই নিজ দেশে।

তাই হবে। এখুনিই সে রকম আদেশ দিচ্ছি ও আয়োজন করছি।

এই শিক্ষার ফলে জ্ঞান পেয়েছিলো তারা। সেই থেকে ভারতীয়েরা গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের সম্মান করে আসছে। যেমন আপনাদের মধ্যে ভদ্রলোকেরা যারা সমুন্নত হতে চান, সম্মান দেখান স্থানীয় দার্শনিকদের যাদের পারেন না তারা অনুকরণ করতে।

## একুশ

ভালো কথা প্রিয় পাখী, গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়েরা কোনো ধর্ম্মটর্ম্ম মানে কী?

ধর্ম্মের কথা বলছেন, ভগবতি! প্রতি পূর্ণিমায় আমরা সম্মিলিত হই ধন্যবাদ দিতে ভগবানকে।

দেবদারু দেবালয়। পুরুষেরা একটিতে সমবেত হয়, অন্যটিতে রমণীরা। মনের বিভ্রান্তি যেনো না ঘটে, সেজন্যই এই ব্যবস্থা।

পক্ষীরাও সমবেত হয় কুঞ্জে, চতুষ্পদেরা সমবেত হয় মনোহর শাদ্বলভূমিতে।

সপ্রশংস ধন্যবাদ দিই আমরা ভগবানকে, তিনি আমাদের উপরে যে সমস্ত আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেছেন তার জন্য।

অধিকন্তু, আমাদের স্তাবকেরাও আছে, তা'রা আশ্চর্য্যজনক সুষ্ঠু ভাবে প্রচার করে ধর্ম্ম।

মাতৃভূমি হচ্ছে এই আমার প্রিয় অমৃতজীবনের। এইখানে আমার বাসস্থান। আমার প্রীতি ওঁর প্রতি ততোখানি যতোখানি প্রেম উনি সঞ্চারিত ক'রেছেন আপনার প্রাণে।

আমার কথাটুকু রাখুন। আসুন একসংগে বেরিয়ে পড়ি, ওঁকে প্রতি-পরিদর্শন দেবেন আপনি।

বাস্তবিকই, পাখী, অতি অদ্ভুতভাবেই তুমি কথা ব'লছো কিন্তু উত্তর দিলেন অসামান্যা রাজরাজকন্যা হাসিস্মিত ভাবে। মরণাপন্ন হ'য়ে উঠেছিলেন তিনি অভিযাত্রা ক'রে যাওয়ার বাসনায়, কিন্তু সাহস ক'রে বলতে পারছিলেন না কিছু।

ভৃত্য আমি আমার বন্ধুর, সেবক আমি, বললে বিহঙ্গটি। আর আপনাকে ভালোবাসবার পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠতম সুখ হচ্ছে আপনার আনন্দের সেবা করা।

কোথায় রয়েছেন তিনি, বুঝতে পারলেন না ফর্মোজান্তে। তাঁর মনে হ'লো, এ জগতের বাইরে যেনো তিনি বেরিয়ে পড়েছেন।

যা কিছু সেদিন তিনি দেখেছেন, যা কিছু এখন তিনি দেখছেন, শুনছেন যা কিছু এবং সর্ব্বোপরি যা কিছু এখন প্রাণে অনুভব ক'রছেন, নিমজ্জিত ক'রলো তাঁকে এক পরমতুরীয় আনন্দ-সত্তায়, যা'র তুলনায় ছোটো হ'য়ে যায় সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস ও যা আজকাল বিশ্ববাসীরা পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, ভোগ করেন নবতম স্বর্গে, হুরীদের আলিংগনে বদ্ধ থেকে, স্বর্গীয় গৌরব ও আনন্দ হয়ে পরিবৃত ও পরিব্যাপ্ত।

## বাইশ

সারারাত্রি কাটালেন ফর্মোজান্তে অমৃতজীবনের কথা বলতে বলতেই। "গোপালক" "গোপাল" ছাড়া অন্য আর কোনো নামে তাঁর প্রিয়তমকে সম্ভাষণ করেন না। "গোপাল" আর "পিতম" কোনো কোনো জাতির ভিতরে সর্বদাই বিনিময়যোগ্য।

ভাবোন্মাদিনী হ'য়ে প'ড়েছেন অসামান্যা রাজরাজকন্যা। কখনো পাখীকে জিজ্ঞেস করেন, অমৃতজীবনের অন্যান্য প্রেয়সী ছিলো কী?

পাখী বললে, ভগবতি, অমৃতজীবন অনন্যপ্রেয়সী।

অসামান্যা কন্যা আনন্দাতিশয্যে উৎকলিত হ'য়ে পড়লেন।

কখনো আবার প্রশ্ন করলেন, কী রকম ভাবে জীবন কাটান অমৃতজীবন?

বিহঙ্গ ব'ললে, জগতের ও মানুষের মঙ্গলানুষ্ঠানে ললিতকলা প্রভৃতির সংকৃষ্টিতে, প্রকৃতির রহস্য-মহলগুলিতে প্রবিষ্ট হ'য়ে আর আত্মোন্নয়ন করেই তিনি সময় কাটান।

সংবাদটুকু শুনে রাজরাজকন্যার হৃদয়ে আনন্দসাগর উথলে উঠলো। পূর্ণিমায় যেমন হয়।

একবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, বলো দেখি পাখী, তোমার আত্মা আর আমার প্রেমিকের আত্মা কী অভিন্ন? আর এই-ই বা কেমন ক'রে ঘ'টে—তোমার বয়স আটাশ হাজার বছর আর আমার প্রিয়তম শুধু আঠারো কি উনিশ?

খুলে বলো আমায়।

অনুরূপ শত শত প্রশ্ন আরো জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

পাখী সব প্রশ্নেরই সদুত্তর দিলে। এমন বিবেচনার সংগে জবাব দিলে সে। যার ফলে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিলো রাজরাজকন্যার।

অবশেষে এক সময়ে নিদ্রা এসে রাজরাজকন্যার চোখ দুটি দিলে সুমুদ্রিত করে। সমর্পণ করলে রাজরাজকন্যা ফর্মোজান্তেকে দেবকুল-প্রেরিত স্বপ্ন-সমূহের সুকোমল মায়াজালে, যা কখনো কখনো বাস্তবতাকেও হার মানায়।

## তেইশ

ফর্মোজান্তের ঘুম ভাঙলো যখন তখন বেলা হ'য়ে গেছে খুব। তখনো কিন্তু তাঁর প্রকোষ্ঠে অন্ধকার রাজ্য ছাড়েনি, যখন তাঁর পিতা ব্যাবিলন-সম্রাট এসে প্রবেশ করলেন।

পাখী ব্যাবিলনের অত্র শ্রীভবৎকে সম্মানার্হ সৌজন্যের সংগে করলেন অভ্যর্থনা। এগিয়ে গেলো সে তাঁর কাছে, ঝাপটা মারলো ডানাগুলো, বিস্তৃত করলে কণ্ঠদেশ। ফিরে এলো নিজ কমলালেবুর গাছটিতে।

সম্রাট বসলেন তাঁর প্রিয়তম কন্যার শিয়রের পাশে এসে। রাজরাজকন্যা সারা রাত ধ'রে যে-সমস্ত স্বপ্ন দেখেছেন, তার ফলে তাঁর রূপ গিয়েছিলো আরো বেশী বেড়ে।

সম্রাটের মহাশ্মশ্রু ঝুলে পড়েছিলো রাজরাজকন্যার অপূর্ব্বশ্রী মুখের উপরে। দুবার চুম্বন ক'রে প্রিয়তমা দুহিতাকে, সম্রাট বললেন কথাগুলি এই:—

প্রিয়পুত্রি, পতি খুঁজে পাবে তুমি, আশা করলুম। কিন্তু

নিষ্ফল হয়েছে আমার সে আশা। কিন্তু স্বামী হবে তোমায় পেতেই, আমার সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য তা প্রয়োজন।

বায়ালের পরামর্শ করেছি গ্রহণ। বায়াল কখনো মিথ্যে বলেন না, একথা তো তুমি জানো। এ-ও জানো, বায়ালই আমার রাজ্য-শাসন পদ্ধতি করেছেন নিয়ন্ত্রিত। বায়াল আদেশ করেছেন, রাজকন্যাকে করাও বিশ্ব পর্যটন। তোমায় বেরুতেই হবে প্রিয়পুত্রি, ভুবন ভ্রমণে।

আঃ নিশ্চয়ই গঙ্গাতীরবর্ত্তীদের দেশে, হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো সম্রাটকন্যার মুখ থেকে।

সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন, গঙ্গাতীরবর্ত্তীয় কথাটির অর্থ কী, প্রিয়পুত্রি?

রাজরাজকন্যা ছলনার আশ্রয় নিয়ে সে যাত্রা লজ্জা থেকে আত্মরক্ষা করলেন।

সম্রাট বললেন, তীর্থযাত্রা তোমায় করতেই হবে, পুত্রি! নির্ব্বাচিত হয়েছেন তোমার সমহারিরূপে, রাষ্ট্র-উপদেষ্টাদের মধ্যে যিনি সুপ্রাচীনতম তিনিই, প্রধান পুরোহিত, একজন সহচরী, একজন বৈদ্য, একজন ভৈষজ্য-বিক্রেতা, আর তোমার বিহঙ্গটি। সঙ্গী থাকবে অবশ্যই উপযুক্ত ভৃত্যেরাও।

তীর্থযাত্রায় বেরুতে হবে শুনে সম্রাটকুমারী হলেন খুবই আনন্দিত। সম্রাটকে আর তাঁর পিতার প্রাসাদ ত্যাগ করে তিনি কস্মিনকালেও কোথাও যাননি, আর এই তিন জন মহীপাল এবং অমৃতজীবন আসবাব আগে জাঁকজমক ও ভম্বর ব্যাপারের (পেজেনট্রি) সর্ব্বপ্রকার বাহ্যানুষ্ঠান পদ্ধতিতেই তিনি খুব নিরানন্দ জীবনই যাপন করে এসেছেন।

সুতরাং মনের সংগে চুপি চুপি আলাপ করতে লাগলেন তিনি। কে বলতে পারে, তিনি বললেন, দেবতারা আমার মতই আমার প্রিয়তম গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়ের প্রাণে ঐ একই তীর্থস্থানে যেতে, সেই একই আকাঙ্ক্ষা প্রণোদিত করবেন না যা তাঁরা সঞ্চারিত ক'রেছেন আমার অন্তরে? তীর্থযাত্রীটিকে দেখতে পাবার সৌধ্য-সৌভাগ্য আমার হবে না, তাই বা কে ব'লতে পারে?

জনককে রাজরাজকন্যা ধন্যবাদ জানালেন সুকোমল ভাবে। ব'ললেন, জানো বাবা, আমার অন্তরে একটা গোপন ভক্তি চিরকালই ছিলো সেই তীর্থ-দেবতার প্রতি, যাঁ'র কাছে আমায় পাঠাচ্ছ আজ তুমি।

## চব্বিশ

সম্রাট বেলুস অতিথিদের আপ্যায়িত ক'রলেন চমৎকার ভোজে।

পুরুষেরাই শুধু উপস্থিত ছিলেন সেই ভোজে। রাজরাজ-কন্যারা আহার ক'রলেন নিজ নিজ কক্ষে।

রাজোদ্যানে বেড়াচ্ছেন রাজরাজকন্যা ফর্মোজান্তে। সংগে তাঁ'র প্রিয়তম পক্ষী ফিনিক্স। রাজরাজকন্যাকে আনন্দ দিতে বিহঙ্গটি এক গাছ থেকে আরেকটি গাছে উড়ে ব'সছিলো। বিকশিত ক'রছিলো তাঁ'র অপরূপ পুচ্ছ ও দিব্যপক্ষ।

মিশর-মহীন্দ্র সুরাপানে উন্মত্ত হ'য়ে প'ড়েছিলেন। মদে চুর হ'য়ে প'ড়েছিলেন, বলাই বাহুল্য।

আমার তীর ও ধনু নিয়ে এসো—আদেশ ক'রলেন তিনি এক বালক ভৃত্যকে।

মিশর-মহীন্দ্র ছিলেন তাঁ'র সাম্রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে অনিপুণ তীরন্দাজ।

মনোহর বিহঙ্গটি তীরের মতই দ্রুত উড়ে, ইচ্ছে ক'রেই শস্ত্র-মুখে নিজেকে প্রকাশ ক'রতে লাগলো।

প'ড়ে গেলো সে, রক্তাপ্লুত দেহে, ফর্মোজাস্তের ক্রোড়ে।

মিশরীয় উচ্চহাস্যে চারিদিক কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ফিরলেন নিজ বাসাবাটীতেই।

অসামান্যা রাজরাজকন্যা আর্ত্ত চীৎকারে আকাশ বিদীর্ণ ক'রলেন, অশ্রুজলে বসুন্ধরা ভাসালেন, ছিন্ন ক'রলেন কেশমালা, আঘাতের পর আঘাত হানলেন বুকে।

মুমূর্ষু পাখীটি ক্ষীণকণ্ঠে রাজরাজকন্যাকে ব'ললে, পুড়িয়ে ফেলবেন আমায়। দেহভস্ম আমার আরবে নিয়ে যাবেন। ভুলবেন না যেনো। সেখানে সূর্য্যের আলোকে ছোট্ট একটি লবঙ্গ ও দারুচিনির স্তূপ গ'ড়বেন। তা'র উপরেই অনাবৃত ভাবে ফেলে রাখবেন আমার দগ্ধ দেহ-অবশেষ। ভুলবেন না যেনো।

এই কথা ক'টি ব'লে ফিনিক্স প্রাণ ত্যাগ ক'রলে।

দীর্ঘকাল ধ'রে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে প'ড়ে রইলেন ফর্মোজাস্তে। জ্ঞান ফিরে এলো যখন তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

ব্যাবিলন-পিতা। অসামান্যা কন্যার দুঃখের অংশ গ্রহণ ক'রে তিনি মিশর-ভূপালের উপরে অভিসম্পাত বর্ষণ ক'রতে লাগলেন। তাঁ'র সন্দেহই রইলো, না ঘটনাটা ভারী অমঙ্গলদ্যোতক।

ত্বরান্বিত ভাবে ছুটলেন তিনি উপাসনালয়ে। বায়ালের সংগে আলাপ ক'রতে।

বায়াল ব'ললেন, সব কিছুরই সংমিশ্রণ: মৃত্যু ও জীবন, অবিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা, ক্ষতি ও লাভ, বিপর্য্যয় ও সৌভাগ্য।

## পঁচিশ

অসামান্যা রাজরাজকন্যার চোখ ভেসে যায়। মনে পড়ে ফিনিক্সের অনুরোধ-কথা; অন্ত্যেষ্টি-সম্মান দিতে হবে তাকে।

প্রতিজ্ঞা ক'রলেন তিনি, নিয়ে যাবো আরব দেশেই তোমার দেহাবশেষ ভস্ম-নিপুঞ্জ। নিজের জীবন বিপন্ন করেও নিয়ে যাবো।

যে-কমলালেবুর গাছটিকে দাঁড়া করে ফিনিক্স থাকতো, রাজরাজকন্যার আদেশে নানাবর্ণের মহামূল্য বসনগুলি তার শাখায় শাখায় ঝলতে লাগলো। আগুন লাগানো হ'লো সেগুলোয়। দেখতে দেখতে পাখীটার দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

অসামান্যা রাজরাজকন্যা ছোট্ট একখানি হৈম ধুনুচিতে সেই দেহ-ভস্মাবশেষ রাখালেন। পান্না এবং সিংহটির চোয়াল থেকে বের করে নেওয়া হীরেগুলি দিয়ে মালা গড়লেন, পরিয়ে দিলেন মেখলার মতো সেই ধুনুচিটির গায়ে।

হায়, যদি এই শোকপূর্ণ কৃত্য না করে তিনি মিশর-ভূপালকে জীবন্তই দগ্ধ করে ফেলতে পারতেন, সেই ছিলো তাঁর একমাত্র কাম্য।

রোষোৎক্ষিপ্তা হয়ে তিনি আদেশ দিলেন, মিশর-ভূপালের উপহারগুলি—তাঁর দুটি কুম্ভীর, তাঁর দুটি জলহস্তী, তাঁর দুটি জেব্রা, আর তাঁর দুটি ইঁদুরকে মেরে ফেলো। তাঁর দেওয়া ম্যমি দু'টি ইউফ্রেটিশ নদে নিক্ষেপ করো।

যথাদেশ কাজ হলো। কাজ হলো অক্ষরে অক্ষরে।

যদি অসামান্যা রাজরাজকন্যা মিশররাজের বলীবর্দ্দ এপিসকে হাতে পেতেন, তবে সে-ও রেহাই পেতো না।

মিশর-ভূপাল অসামান্যা রাজরাজকন্যার এই দৌরাত্ম্যে জ্বলে উঠলেন আগুনের মতো। তক্ষুণি সে স্থান ত্যাগ করলেন। ত্রিশ লক্ষ সৈন্য নিয়ে ফিরে আসবার জন্য।

ভারত-ভূপাল দেখলেন, তাঁর মিত্রপক্ষ মিশর-ভূপাল বিদায় নিলেন। সুতরাং তিনি সেদিনই ব্যাবিলন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করলেন, তাঁর স্থির সংকল্প ছিলো: মিশরীয় বাহিনীর সংগে ত্রিশ লক্ষ সৈন্যযুক্ত ভারতীয় বাহিনীর মিলন ঘটাবেন।

শক-মহীপাল রাত্রিবেলা রাজকন্যা সর্ব্বদেবাকে নিয়ে উধাও হয়ে পড়লেন। স্থির সংকল্প ছিলো তাঁর: ফিরে আসবেন যুদ্ধ করতে রাজকন্যা সর্ব্বদেবার ন্যায্য সুমধুর স্বার্থে ত্রিশ লক্ষ শক সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগ নিয়ে। অটল প্রতিজ্ঞা তিনি করেছেন, ব্যাবিলন সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকার ন্যায্য উত্তরাধিকারিণীকেই পাইয়ে দেবেন। সর্ব্বদেবা প্রাচীন ও জ্যেষ্ঠতরা শাখা হোতেই উদ্ভূত।

আর অসামান্যা রাজরাজকন্যা ফর্মোজাস্তে? তিনি ভোরবেলা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেরও আগে, রাত্রি তিনটের সময়, নিজ অভিযাত্রী-সংঘ সংগে করে, বেরিয়ে পড়লেন তীর্থযাত্রায়।

নিজেকেই তিনি নিজেই প্রবোধ দিচ্ছিলেন, বিহঙ্গের শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে পারবো আমি। আর অমৃত অমর দেবতাকুলের ন্যায্য বিচার নিশ্চয়ই আমার বুকে এনে দেবে আমার প্রিয়তম 'পিতম' অমৃতজীবনকে, যাঁকে ছাড়া আমি আর বাঁচতেই পারবো না।

## ছাব্বিশ

ভোরবেলা। ঘুম ভেঙ্গে উঠেছেন সম্রাট বেলুস। দেখলেন সকলেই চ'লে গেছে।

বড়ো বড়ো উৎসব অনুষ্ঠানগুলি কী ভাবেই শেষ হয়, বললেন তিনি, আর কী আশ্চর্য্যজনক শূন্যতাই না ফেলে রেখে যায় তা'রা, বহ্বারম্ভ শেষ হলে পর।

কিন্তু রাজকীয় ক্রোধ সমুদ্রস্রোতের মতই তাঁকে নিলো ভাসিয়ে যে মুহূর্ত্তে পরিচারিকারা কাঁদতে কাঁদতে সংবাদ দিলে, রাজকন্যা সর্ব্বদেবা উধাও হয়েছেন শক-মহীপালের সংগে।

উধাও হ'য়েছে যদি জানতেই, খবর দিলে না কেনো তক্ষুণিই! রাজকীয় দাবী করলেন তিনি। ধমক দিয়েই।

সম্রাট তখন ঘুমুচ্ছেন। শান্তি বিঘ্ন ক'রবার আদেশ ছিলো না।

ফর্মোজাস্তের সংগে গেছে কি না খবর নিয়েছো?

খবর নেওয়া হ'য়েছে। তাঁর সঙ্গে উনি নেই।

মন্ত্রীদের জানাও, সম্রাট বেলুস আদেশ দিলেন। পরিষদ ডাকো। বায়ালের সংগেও আলাপ ক'রতে ভুললেন না তিনি।

বায়াস ব'ললেন, কন্যাদের বিয়ে না দেওয়া হ'লে তারা নিজেরাই গিয়ে বিয়ে করে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্রাট বেলুস আদেশ দিলেন, ত্রিশ লক্ষ সৈন্য বেরিয়ে পড়ুক শাস্তি দিতে শকদের ভূপালকে।

চারিদিকে ভয়ংকরতম যুদ্ধই উঠলো জ্বলে। যুদ্ধের কারণ পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা জমকালো উৎসব-অনুষ্ঠানটির আমোদরাশির থেকেই জন্মেছে।

চারিটি বাহিনী বিধ্বস্ত ক'রছিলো এশিয়ার বুক, প্রত্যেকটি বাহিনীতে ছিলো ত্রিশ লক্ষ সৈন্য।

ট্রয়যুদ্ধ বহু শতাব্দীর পর সংঘটিত হ'য়েছিলো। কিন্তু এই সময়ের তুলনায় সেটা ছিলো শিশু-ক্রীড়ামাত্র।

## সাতাশ

বসরার পথ। পথটির দু' পাশেই দীর্ঘ দীর্ঘ তালগাছগুলি চিরচ্ছায়া দিচ্ছে। ফলতরুগুলি অর্ঘ্য-সম্ভার যোগাচ্ছে প্রতি ঋতুতেই।

বসরার মন্দির হ'য়েই, বসরার বন্দরে সিন্ধুপোত ধ'রে আরবে যাবেন মৃত বিহঙ্গের আদেশ প্রতিপালন করতে—এই ছিলো ব্যাবিলন রাজরাজকন্যার বাসনা।

মুখে কিন্তু অন্তরের অন্তস্তল থেকেই বেরুচ্ছিলো, প্রিয়তম গঙ্গাতীরবর্ত্তীয় গোপাল, প্রিয়তম সুপুরুষ অমৃতজীবন!

তৃতীয় বিশ্রামস্থানে পৌঁছে অনুচরবর্গ বাসাবাটী ঠিক ক'রে আনুসঙ্গিক আর সব কিছু ঠিক ক'রে ফেলতেই অসামান্যা রাজরাজকন্যা প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন তার মধ্যে। এমন সময়ে শুনলেন, মিশর-ভূপাল আসছেন সেখানেও।

ব্যাবিলন-সম্রাট-দুহিতার অভিযাত্রা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছিলো মিশর-ভূপালকে তাঁর গুপ্তচরেরা। সুতরাং তিনি তক্ষুণি-তক্ষুণি যাত্রাপথ পরিবর্ত্তন ক'রে ফেলেছেন। সংখ্যাতীত সৈন্যদল ও রক্ষী পরিজন আসছিলো তাঁর পেছনে পেছনে।

মিশর-ভূপাল এসে পৌঁছুলেন। তোরণে তোরণে প্রতিদ্বারে প্রহরী স্থাপন করালেন।

স্বয়ং গিয়ে অসামান্যা কন্যা, রূপোত্তমা, ব্যাবিলন-সম্রাট-দুহিতা ফর্মোজান্তের শয়ন-প্রকোষ্ঠে ঢুকলেন। বললেন তাঁকে, ভদ্রে, আপনারই খোঁজ করছিলুম আমি। ব্যাবিলনে যখন ছিলুম, সামান্য শ্রদ্ধাও জানাননি তখন আমায়।

ঘৃণাশীলা, খামখেয়ালিনী নারীদের শাস্তি দেওয়া উচিত, শাস্ত্রে বলে।

আপনি সুপ্রসন্না যদি হ'ন, অনুগ্রহ করে আজ সন্ধ্যাবেলা আমার সংগে ভোজে যোগ দিতে হবে। আমার শয্যা ছাড়া আর কোনো শয্যা থাকবে না আপনার। আপনার যেমন অভিরুচি, সে রকমই ব্যবহার করবো আমি আপনার সংগে।

অসামান্যা ফর্মোজান্তে আপনার মনের সংগে কথা বললেন, জলের মতন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি: শক্তিমত্তরা আমি নই, ভরসা কেবল মনোবল। অপরাজেয়, অপরিম্লান, আত্মশক্তি।

মন বললে, তোমার তো অজানাও নয়, সংবিবেচনা হচ্ছে অবস্থার সংগে নিজেকে মানিয়ে চলা। প্রয়োজন হলে খাটো করেও নিজেকে।

অসামান্যা রাজরাজকন্যা স্থির করলেন, পশুবলকে জয় করতেই হবে। দূর করতেই হবে ইতর মিশর-ভূপালকে নিরীহ কৌশলে।

তীর হানো চোখের কোণ থেকে, উপদেশ দিলে মন। সুতরাং অসামান্যা রাজরাজকন্যা কটাক্ষসম্পাত করলেন।

এমন ব্রীড়াবনম্রতা, লালিত্য, মাধুর্য্য এবং জড়িমা-মিশ্রিত ভংগীতে আর এমন সম্মোহনৈশ্বর্য্য নিয়ে তিনি কথা বললেন যে মূঢ় সাজবেনই মানুষের মধ্যে মহাজ্ঞানীতমরাও, অন্ধ হবেন অতি সূক্ষ্মতম বুদ্ধিবিশিষ্টেরাও।

## আটাশ

স্বীকার করছি অত্র-শ্রীভবৎ, আপনার সমুখে আমি সর্ব্বদাই চোখ দু'টি বিনত করেই থাকতুম। মনে পড়ে না কী? সেই যখন আপনি সম্রাট বেলুসকে, আমারই জন্মদাতাকে সম্মান দেখিয়েছিলেন আমাদের সংগে বাস ক'রে।
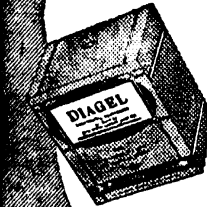
আমি ভয় ক'রতুম। ভয় করতুম আমার অন্তরকে, আমার অতি অকপট সারল্যকে।

আমি কাঁপতুম ভয়ে ভয়ে। দুরু দুরু করে। আশংকা জাগতো, পাছে নিজেরই জনক আর আপনার প্রতিস্পর্দ্ধীদের কাছে ধরা পড়ে যাই। ধরা পড়ে যাই আপনাকে আমি অতি বেশী পছন্দ করি, এই কথাটুকু ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে। আর আমারও অতিবেশী পছন্দটুকুন আপনার প্রাপ্য, সর্ব্বাংশেই প্রাপ্য।

এখন আপনি আর আমি একা। পিতা নেই, প্রতিস্পর্দ্ধীরা

কেউ নেই। আমার অনুভূতিগুলি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বাধাহীন নির্মুক্ত ভাবেই অসংকোচেই প্রকাশ করতে পারি আমি।

আপনার পশ্চাতে আসছে বলীবর্দ্দ এপিস। তাঁ'র নামে শপথ করেই বলছি: সবচেয়ে বেশী সম্মানীয় কী মনে করি আমি, জানেন? আপনার প্রস্তাবগুলিতে আমি হয়েছি খুবই আনন্দিত।

আমার পিতার প্রাসাদেই এর আগে আমি আপনার সংগে নৈশ ভোজনে যোগ দিয়ে সম্মানিত ক'রেছি আপনাকে। আমি বরঞ্চ আরো বেশী আনন্দ ও উপভোগের সংগেই যোগ দেবো আপনার সাথে নৈশ ভোজনে, এখানে। পিতা নাই বা থাকলেন।

## উনত্রিশ

একটি প্রার্থনা আছে কিন্তু আপনার নিকটে আমার। সে প্রার্থনাটুকু পূরণ করতেই হবে আপনাকে। আর অতি সামান্যই সে প্রার্থনা।

প্রার্থনাটুকু কী, বলবো? অনুমতি দিচ্ছেন যখন, ভরসা দিচ্ছেন যখন বলি তবে। আপনার প্রধান পুরোহিত আমাদের সংগে সুরাপানে যোগ দেবেন। ব্যাবিলনে তাঁকে দেখে আমার কী মনে হতো, শুনবেন? মনে হতো তিনি একজন খুব মজাদার আসন-সংগী, মজলিসী গল্প-বলিয়ে।

আমার সংগে সিরাজের কিছু সর্ব্বোৎকৃষ্ট পানীয় আছে। আমার ইচ্ছে, আপনারা দুজনেই তা দেখেন পরীক্ষা করে।

আর আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাবের কথা? সেটা খুবই আকর্ষণীয়, খুবই উপাদেয়, খুবই রোমাঞ্চজনক।

কিন্তু সুবুদ্ধিমান আপনি। বুঝতেই তো পারছেন, উচ্চবংশীয়া তরুণী বালিকার পক্ষে সেকথাটা বলা বা ইংগিত করা শোভা পায় না। এটুকু জানলেই আপনার পক্ষে যথেষ্টই হবে বৈ কি! সেই এটুকু কী? সেটুকু হচ্ছে: আমি মনে করি, সর্ব্বাঙ্গীন শ্রদ্ধার সংগেই মনে করি: সম্রাটদের মধ্যে আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মনুষ্যকুলের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মোহন, সব চেয়ে সম্মোহনকর।

কথাগুলি মাথা ঘুরিয়ে দিলে মিশর-ভূপালের। সংগে সংগে তিনি রাজি হয়ে পড়লেন। রাজি হয়ে পড়লেন মিশরের প্রধান পুরোহিত সুরাপান করবেন একত্রেই।

আর এক কথা অনুগ্রহভিক্ষে করি আমি আপনার কাছে বললেন রাজরাজকন্যা মিশর-ভূপালকে। সেটা আর কিছু নয়, এই: আমার ভেষজ্য-বিক্রেতা আমার সংগে দেখা করতে ও আলাপ করতে পারবেন। ভিক্ষে চাই করজোড়ে এই অনুমতিটুকু আমি আপনার কাছে।

জানেন তো, তরুণী মেয়েদের সর্ব্বদাই কতোগুলি ছোটো ছোটো পীড়া থাকে যার প্রতি কোনো কোনো মানাযোগ দেওয়া একান্তই প্রয়োজন। এই ধরুন না যেমন বিষাদ, স্পন্দন-কম্পন, বায়ু-শূল মূর্চ্ছা। কতো আর নাম করি, আপনিই বলুন না? আপনি তো সমস্ত কিছুই জানেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে শৃংখলা-সৃষ্টির প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে চিকিৎসার। সংক্ষেপেই বলি, ভৈষজ্য-বিক্রেতাকে আমার চাই-ই চাই।

আশা করি, আপনি দ্বিমত করবেন না, এই সমস্ত স্নেহ-নিদর্শন থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না।

দেখি, বললেন মিশর-মহীন্দ্র অসামান্যা রাজরাজকন্যাকে, ভৈষজ্য-বিক্রেতার মতামতগুলি আমার ঠিক বিপরীত-ধর্ম্মী। তার শিল্পের উদ্দেশ্য-সমূহ আর আমার ও-গুলো বিপরীত। পৃথিবী ও রসাতলের পার্থক্যই যেনো, বলা চলে।

তবু আমি এতো বড়ো বৈষয়িক ব্যক্তি যে, এই ন্যায্য অনুরোধটুকু কখনো অপূর্ণ রাখবো না। আমি এক্ষুণিই আদেশ দিচ্ছি গিয়ে। আদেশ দেবো ভৈষজ্য-বিক্রেতা এসে আপনার সংগে আলাপাদি করতে পারবেন যতোক্ষণ আমরা থাকবো সান্ধ্য-ভোজনের অপেক্ষায়।

মনে হয়, পর্য্যটন হেতু আপনি একটু পরিশ্রান্ত। একজন সহচরীও আপনার ঐকান্তিক প্রয়োজন। যে-সহচরীটিকে আপনি বেশী পছন্দ করেন ডেকে পাঠান তাকেই।

এর পর আমি অপেক্ষায় থাকবো আপনার আদেশের। আর আপনার সুবিধার।

মিশর-মহীন্দ্র সরে পড়লেন।

## ত্রিশ

ভৈষজ্য-বিক্রেতা আর সহচরী ঈরলা এসে উপস্থিত হলো। ঈরলার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো অসামান্যা রাজরাজকন্যার। চুপি চুপি, দেয়ালও যেনো শুনতে না পায়, আকারে-ইংগিতে ব'ললেন তিনি তাঁকে; নৈশ ভোজনের জন্য ছ' বোতল পানীয় নিয়ে এসো। আরো বেশী করে, ডজন কয়েক নিয়ে এসো প্রহরীদের জন্য। আমাদের রাজকর্ম্মচারীরা বন্দী হয়ে আছে তাদের হাতে।

ঈরলা যথাদেশ মতো নিয়ে এলো ছ বোতল পানীয়। নিয়ে এলো আরো।

ভৈষজ্য-বিক্রেতাকে বললেন অসামান্যা রাজকন্যা, খুব চুপি চুপি আকারে ও ইংগিতে, প্রত্যেকটি বোতলে ঘুমুবার ঔষধ মিশিয়ে দিন। মিশাবেন এমন জোরালো ঔষধ যেনো পানকারী মাত্রই চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকে। আপনার সংগে তো সব সময়েই ও-রকম ঔষধ থাকেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভৈষজ্য-বিক্রেতা অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করলে রাজরাজকন্যার।

ঈরলাও প্রহরীদের দিয়ে এলো বেশ ক'ডজন মদ্যপূর্ণ স্থালী, চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমোনোর তেজস্কর ঔষধ-মেশানো।

আধ ঘণ্টাটেক পর। মিশর-মহীন্দ্র ফিরলেন প্রধান পুরোহিতকে সংগে নিয়ে। নৈশভোজ ছিলো খুবই আনন্দ-প্রদায়ী।

মিশর ভূপালও তাঁর প্রধান পুরোহিত ছ'বোতল মদ শেষ করলেন। স্বীকার করলেন তাঁরা, মিশর দেশে ও রকম ভালো মদ উৎপন্ন হয় না।

মিশর-ভূপালের ভৃত্যেরা প্রভুদের মদ্যপান লক্ষ্য করছিলো সতৃষ্ণই, টেবিলের পাশে অপেক্ষা ক'রে ক'রে। সিরাজের মদের প্রশংসা শুনে তাদের মাথা গিয়েছিলো বিগড়িয়ে। একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলো তারা, পরবর্ত্তী যুগে সংঘটিত জুটফেন যুদ্ধক্ষেত্রে স্যর ফিলিপ সিডনীর ক্ষুদ্র জলপাত্রটুকুর দিকে তাকিয়ে ছিলো যেমন আহত

সনিকটে। ঈরলাই নিরালায় এক একজনকে ডেকে নিয়ে, সযত্নেই পান করালে সিরাজের পরমোৎকৃষ্ট সুরা।

আর অসামান্যা রাজরাজকন্যা ? তিনি অসুস্থ। সতর্ক ছিলেন কোনো সুরাবিন্দু পান না ক'রতে।

পীড়াপীড়ি ক'রলেন মিশর-ভূপাল।

অসামান্যা রাজরাজকন্যা ব'ললেন, বৈদ্য ঔষধ দিয়েছেন। পথ্যে রেখেছেন।

আপনার সমস্ত ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। ভাববেন না এক বিন্দু।

সুরাপানে অসুখটা যাবে বেড়ে। আনন্দের বুকে দুঃখের ছোঁয়াচ লাগে, এ কী আপনি চা'ন ?

আবার সেই কটাক্ষ. মনোবন্ধু যে কটাক্ষের উপদেশ দিয়েছিলো সেই ত্রিভুবন ভোলানো কটাক্ষ, অপাঙ্গের তীক্ষ্ণ-তীব্র শরাঘাত।

মিশর-ভূপাল ব'ললেন, না।

আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিলেন তিনি। সকলেই প'ড়লো ঘুমিয়ে।

## একত্রিশ

মিশর-মহীন্দ্রের প্রধান পুরোহিতের ছিলো পরিপাটি দাড়ি। সেরকম দাড়ি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না।

অসামান্যা রাজরাজকন্যা খুব নৈপুণ্যের সংগে ও পারিপাট্যে সেই দাড়িখানি কেটে ফেললেন। তারপর একটুকরো ফিতেয় তা সেলাই করালেন, প'রলেন নিজের চিবুকে।

পুরোহিতের পরিচ্ছদে নিজ দেহ ঢেকে নিয়ে, তাঁর মর্য্যাদা-বিকাশী সবগুলি ব্যাজ-এ ও পদকে অলংকৃত হ'য়ে, আইশিস দেবীর তোষাখানার অধ্যক্ষরূপে সহচরী ঈরলাকে সাজালেন।

তারপর তাঁর প্রিয় মঞ্জুষাটি নিয়ে আর নিয়ে তাঁর মণিরত্নগুলি বাসাবাটী থেকে বেরিয়ে প'ড়লেন। বেরিয়ে প'ড়লেন প্রহরীদিগের শ্রেণীসমূহের মধ্য দিয়ে। প্রহরীরা ঘুমিয়ে প'ড়েছিলো প্রভুদের মতই তাদের।

সহচরী আগে থাকতেই দু'টি ঘোড়া ঠিক করিয়ে রেখেছিলো। ঘোড়া দু'টি ছিলো তোরণগুলিতে।

নিজ সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারীদের কাউকেই সংগে নিতে পারলেন না রাজরাজকন্যা। তবে নিশ্চয়ই তাঁরা বন্দী হ'য়ে পড়তেন প্রধান প্রহরীদের হাতে।

রাজরাজকন্যা ফর্মোজান্তে সহচরী ঈরলার সংগে, প্রহরিকুলের শ্রেণীসমূহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে চলতেই প্রহরীরা ভাবলো, প্রধান পুরোহিত চলেছেন।

তারা বললে, ভগবানে অবস্থিত সর্ব্বপুণ্যতম পিতা আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন !

অসামান্যা রাজরাজকন্যা মৌন ভাবেই করলেন আশীর্ব্বাদ।

রাজ-পলাতকা দু'টি বসরায় এসে পৌছুলেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। মিশর-মহীন্দ্রের ঘুম ভাঙবার আগেই।

ছদ্মবেশ ত্যাগ করলেন তারা। নয়তো সন্দেহের উদ্রেক হতোই।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি একটি জাহাজ তাঁড়া ক'রে ওর্মুজ প্রণালীর মধ্য দিয়ে, আরবদেশস্থ এডেনের মনোরম পুলিনগুলিতে পৌছুলেন তাঁরা।

পৌছুলেন এসে এডেনেই, পরবর্ত্তীকালে যা ধার্ম্মিকদের বাসস্থান-রূপে পরিগণিত হ'য়েছে, পরিগণিত হ'য়েছে ইলিশিয়ান ক্ষেত্রসমূহ, হেসপেরাইডীসের উদ্যানগুলি, আর সুধন্যদের দ্বীপভূমি-নিপুঞ্জের আদর্শস্বরূপে।

পরাৎপর পরমাত্মার সংগে দ্যুলোকে বাস করা কিংবা স্বর্গোদ্যানে ভ্রমণ করা ছাড়া মানুষ আর কী পরম আনন্দ কল্পনা ক'রতে বা আশা করতে পারে ?

## বত্রিশ

ফিনিক্সের বাক্য-নির্দ্দেশিত দেশে এসে অসমান্যা রাজরাজকন্যা ফর্মোজান্তের প্রধান ও একমাত্র কাজ হ'লো প্রিয়তম পাখীটিকে তার দাবী-সমঞ্জস অন্ত্যেষ্টিসম্মানে শান্তি দেওয়া।

রাজরাজকন্যার চারু-সুকোমল করোৎকরগুলি পুঞ্জীভূত করলে ছোট একখানি লবঙ্গ ও দারুচিনির পাহাড়।

তিনি আশ্চর্য্যই হ'য়ে প'ড়লেন ; সেই লবঙ্গ ও দারুচিনির স্তূপের উপরে প্রিয়তমা পাখীটির ভস্মগুলি রাখতেই তা'তে নিজ থেকে আগুন লেগে গেলো। ছাই-এর পরিবর্ত্তে সেখানে আবির্ভূত হ'লো একটি সুপ্রকাণ্ড ডিম্ব। তা'র থেকে, রাজরাজকন্যা সবিস্ময়ে দেখলেন, বেরিয়ে প'ড়লো তাঁ'র বিহঙ্গটি, আগে যেমন উজ্জ্বল ছিলো তা'র চেয়েও আরো বেশী উজ্জ্বল।

অসামান্যা রাজরাজকন্যার সারাজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে এইটেই ছিলো সবচেয়ে মনোরমতম মুহূর্ত্ত।

আর একটি অভিজ্ঞতা ছিলো তাঁ'র এর চেয়েও আরো বেশী মূল্যবান। তিনি সে অভিজ্ঞতা মুহূর্ত্তের আকাঙ্ক্ষা ক'রতেন সর্ব্ব প্রাণমন দিয়ে। কিন্তু তা'র সে সোনার আকাঙ্ক্ষা রূপশ্রী-লোকের ফুলে-ফলে মঞ্জরিত হবে, এ আশা ক'রতেন না।

দেখছি এখন, সম্রাটকুমারী ব'ললেন পাখীটিকে, সেই ফিনিক্সই তুমি, যা'র সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনে এসেছি। বিস্ময়ে ও আনন্দে আমার ম'রতেও ইচ্ছে ক'রছে।

পুনরুত্থানে বিশ্বাস ক'রতুম না আমি ; কিন্তু আমার সুখ ক'রছে আমার সে বিশ্বাস উৎপাদন।

পুনর্জ্জন্ম দেবি, ব'ললে ফিনিক্স অসামান্যা রাজরাজকন্যাকে সম্বোধন ক'রে, বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা সহজতমবস্তু। একবার জন্ম

নেওয়ার চেয়ে দু'বার জন্ম নেওয়া তো বেশী আশ্চর্য্যজনক নয় মোটেই।

সব কিছুই ইহজগতে পুনর্জ্জন্ম। শূককীটগুলি জন্ম নেয় প্রজাপতিরূপে। ফলমাত্রেরই বীজ মাটিতে পুঁতলে জন্মলাভ করে পুনরায় বৃক্ষরূপে। জীবজন্তুরা মাটিতে নিহিত হয়, আবার জীবন লাভ করে তৃণ ও গাছপালারূপে, পুষ্টি দেয় অন্যান্য জীবজন্তুদের, আর শীঘ্র হ'য়ে প'ড়ে তাদেরই সারাংশীভূত। যে-অণু-পরমাণু দিয়ে এই দেহখানি তৈরী, তারা পরিবর্ত্তিত হয় ভিন্ন ভিন্ন সত্তায়।

এ-ও সত্যি অবশ্যই, আমিই শুধুমাত্র একজন যাঁকে মহাশক্তিমান ওরোসমাদে নিজ আকৃতিতে জন্ম নেবার অনুগ্রহ বিতরণ ক'রেছেন।

## তেত্রিশ

অমৃতজীবন ও ফিনিক্সকে প্রথম দেখার দিন থেকে চির সময়টাই আশ্চর্য্যের মধ্যে কাটিয়ে এসেছেন অসামান্যা রাজরাজকন্যা ফর্মোজান্তে। সেই আশ্চর্য্যেই হর্ষোৎকলিত হ'য়ে তিনি ব'ললেন পাখীটিকে, সেই মহা পরমাত্মা তোমার মতই কাছাকাছি একটি ফিনিক্স তৈরী ক'রবেন তোমারই দেহের অংশগুলি থেকে, এ কল্পনা ক'রতে বাধে না আমার কখনও।

কিন্তু সেই তুমি আর এই তুমি, উভয়েই যে এক ব্যক্তি, তোমাদের উভয়েরই যে একই আত্মা হবে, এ ব্যাপার, অবশ্যই স্বীকার করাই ভালো, আমি ভালো হৃদয়ংগম ক'রতেই পারিনে। এ আমার দুর্ব্বলতা ব'ললেই চলে। কী অবস্থায় ছিলো তোমার আত্মা, যখন তোমার মৃত্যুর পর, আমার পকেটে তোমায় বহন ক'রছিলুম?

মহা ভগবান! ভগবতি! সেই মহা ওরোসমাদের পক্ষে কী খুবই সহজ নয় আমারই ক্ষুদ্র এক খণ্ড স্ফুলিঙ্গের উপরে ক্রমানুগত ভাবে তাঁ'র প্রভাবখানিকে রক্ষা ক'রে চলা, যেমন সেই প্রভাবটুকুর আদৌ আরম্ভ ক'রেছেন তিনি? তিনি পূর্ব্বে আমায় দিয়েছিলেন অনুভূতি, স্মৃতি ও চিন্তা; পুনরায় দিয়েছেন তিনি আমায় সেগুলি। এই অনুগ্রহটুকু তিনি আমারই ভিতরে অন্তর্গুপ্ত বোমো স্বাভাবিক অণু-পরমাণুকেই দিচ্ছেন বা দিচ্ছেন আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সর্ব্ব-সম্মিলিত সত্তাকেই, সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় পরিণামে। ফিনিক্স এবং মনুষ্যজাতি কখনোও জানবে না কী ভাবে তা সংঘটিত হয়।

কিন্তু সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা আমায় যে শ্রেষ্ঠতম অনুগ্রহ ক'রেছেন, সেটা হ'চ্ছে আপনারই জন্যে আমায় আবার সঞ্জীবিত ক'রে তোলা। উঃ, পারতুম যদি যে আটাশ হাজার বছর জীবন ধারণ ক'রতে, পেয়েছি আমি সেই সময়টা কাটাতে আমার পরবর্তী পুনর্জ্জন্ম পর্য্যন্তই, আপনার ও আমার প্রিয় অমৃতজীবনের সান্নিধ্যে।

সুপ্রিয় বিহঙ্গ, উত্তর দিলেন অসামান্যা রাজরাজকন্যা, মনে আছে তোমার নিশ্চয়ই সেই কথা? ব্যাবিলনে প্রথম যখন তুমি কথা শোনাও আমায় তা' আমি কখনও ভুলবো না। তোমার সেই আশ্বাসগুলি আমায় আশ্বস্ত ক'রেছিলো। আমায় এই আশা দিয়েছিলো আমি পুনরায় দেখা পাবো আমার সেই প্রিয়তম গোপালের, যাঁকে আমি দেবজ্ঞানে পূজা করি।

একান্তই প্রয়োজন তুমি আর আমি, একত্রেই গিয়ে উপস্থিত হই সেই গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের দেশে।

আমি চাই ওঁকে ব্যাবিলনে আবার ফিরিয়ে নিতে। ফিরিয়ে আনতে চাই আমার সর্ব্ব অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে।

সে সংকল্প আমারও। ব'ললে ফিনিক্স। এক বিন্দু সময়ও নষ্ট ক'রবার মতো আমাদের নেই। [ ক্রমশঃ।

# জলছবি

মিনতি মোহান্ত

দূরের ষ্টীমারখানা
জলেতে আবর্ত্ত তুলে
ফুলে ভরা কূলে ভুলে
ফিরে চলে সাগর-নেশায়,
মাছ-মেয়ে ঘুম ভেঙে বাঁধে খোলা চুল।

মধু মধু মনে হেসে ভাবে,
হোল কত ভুল সারা রাত।

আমার ষ্টীমারখানা অচল চড়ায়
বেধে গেছে হাল;
তাই বসে মনের ডেকেতে
কষছি হিসাব জোড় গণ্ডা কড়ায়
কি পেলাম—কি দিলাম
চলার ঢেউয়েতে।

বাটালীর ঘায়ে কাটা
একখানা ছোট্ট পৃথিবী—
এঁটে দেওয়া মনের পটেতে!

অনেক ধূসর মেঘ,
ছুটো ফিঙে,
একটা চড়ুই—
আর কিছু শুকনো শেফালী;
আর জ্যামিতিক একফালি
মরু-মরু মাঠ,
পথে-ঘাটে সিউড়ীর রাঙা-রাঙা বালি।

আর কিছু আল্পনা পায়ের ছাপের
ছোট বড় নানান মাপের,
ঘরেতে অসুখ তার
'তার' পাওয়া ব্যস্ত মানুষ।

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
LIFEBUOY
SOAP
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।
L. 278-X52 BG
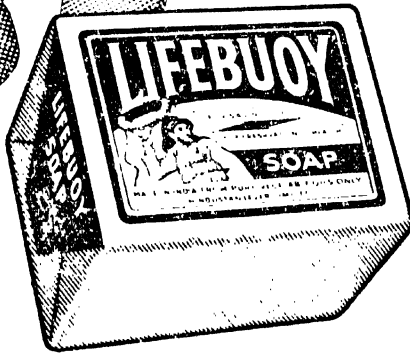
# ভাবি এক, হয় আর

## দিলীপকুমার রায়

### পনের

ক্রমশ আইরিনের সঙ্গে পল্লবের আলোচনা সুরু হ'ল এ ও তা নিয়ে। তখন ও বুঝল কাতিয়ার কথার মর্ম : রোখালো মেয়ে বটে! আইরিন যাই নিয়েই তর্ক করুক না কেন, এমন উজিয়ে উঠবে যেন সে তর্কে হারা না হারার উপর ওর জীবন-মরণ নির্ভর করছে। মাঝে মাঝে পল্লবও আতপ্ত হ'য়ে উঠে বলত : তোমাকে বোঝানো বৃথা। অমনি আইরিন হাততালি দিয়ে হেসে কুটি-কুটি : ছুয়ো—তর্কে হেরে রেগে জেতার মৎলব। ওর হাসি শুনলে পল্লব আর রাগ বজায় রাখতে পারত না—সন্ধি হ'ত তৎক্ষণাৎ।

সব চেয়ে ওদের বাধত য়ুরোপীয় সঙ্গীত বনাম ভারতীয় সঙ্গীত নিয়ে। আইরিন বলত—সব চেয়ে উৎকৃষ্ট সঙ্গীত হ'ল যন্ত্র-সঙ্গীত, যেহেতু সব চেয়ে বিশুদ্ধ। পল্লব বলত : বা রে বা! এর পরে শুনব আমাদের কুলীন ব্রাহ্মণদের কথার প্রতিধ্বনি : যে, সব চেয়ে শুদ্ধ মানুষ যে অপরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে। ইহুদীরাও জাঁক করে না কি তাদের বিশুদ্ধ রক্ত নিয়ে? শুনে আইরিন একটু কোণঠেশা হ'য়ে পড়ত বৈ কি।

ক্রমশ তর্ক সুরু হ'ল গানের ভঙ্গি নিয়ে। আইরিন প্রথম প্রথম স্বীকার করতে চাইত না যে গানের সুরে তানালাপ জোড়া ভালো। প্রথম প্রথম ওর সত্যিই ভালো লাগত না পল্লবের নানা গানের সুরবিহার। কিন্তু শুনতে শুনতে ও কেমন যেন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ল—বিশেষ ক'রে পল্লবের প্রিয় কয়েকটি রাগের তানকর্তবে : যেমন বেহাগ, ভৈরবী, খাম্বাজ, বাগেশ্রী, ইমন। কেবল ও তবু থেকে থেকে তর্ক তুলত এই ব'লে যে সুরবিহার যখন আসে প্রেরণা থেকে তখন কোনো গানের তান এক একদিন ভালো হ'লেও আবার এক একদিন হবেই হবে নিরেস কিম্বা তেমন ভালো নয়—যেহেতু প্রেরণা সব দিন সমান আসতেই পারে না। উত্তরে পল্লব বলত : এ কথা সত্যি, কিন্তু আমরা গানের বিকাশের পথ খুলে রেখেছি তানকে অবাধে বিহার করতে দিয়ে—যেখানে তোমরা প্রতি গানের সুরকে স্বরলিপির কাঠামোয় বেঁধে রেখে তার পাখাকে ক'রে ফেলছে নিস্তেজ। আমার প্রায়ই মনে হয়, এই কারণেই তোমরা গানে তেমন তৃপ্তি পাও না, বলো শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত হ'ল যন্ত্র-সঙ্গীত। আমরা বলি—সবার আগে গান, তার পরে বাদ্য, তার পরে নৃত্য। না ব'লে পারি না, কেন না আমাদের সাঙ্গীতিক বিকাশে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত হ'ল কণ্ঠসঙ্গীত—রাজা সেই—vive le roi ! (১)

আইরিন রুখে উঠে বলত : আজকের দিনে রাজাকে মানে কে শুনি? vive le ministre ! (২) সঙ্গে সঙ্গে নাতাশা মাশা ও কাতিয়া হাততালি দিয়ে দোয়ার দিয়ে বলত : তাহ'লে এসো, আজ দু'পক্ষেরি জয়ে সবাই সমান খুশি হ'য়ে পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করি। বলে প্রত্যেকেই এক এক পেয়ালা চা সামোভার থেকে ঢেলে নিয়ে তাতে শুধু লেবু দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে পেয়ালায় পেয়ালায় ঠুন ঠুন ক'রে ঠুকে চুমুক দিত ও বলত কোরাসে : Vive la discussion mortelle ! (৩)

### ষোলো

ক্রমশ ওদের তর্ক মোড় নিল প্রথমে আলোচনার দিকে। পরে আলোচনা ঝুঁকল—এর কাছে ওর মনের কথা বলায়। এই শেষ জাতীয় কথাবার্তা স্বচ্ছন্দে হ'তে পারত না, কারণ আইরিনের সঙ্গে পল্লবের বড় একটা একলা দেখাশুনো হ'ত না। তবে ওর দিদিরা মাঝে মধ্যে অনুপস্থিত থাকলে সেই ফাঁকে পল্লবের সঙ্গে আইরিনের ব্যক্তিগত কথা জ'মে উঠত—অনেক সময় ঠারে ঠোরে—আবার ওরা ফিরে এলেই তৎক্ষণাৎ পূর্ণচ্ছেদ। কিন্তু তবু ওদের মন একটু একটু ক'রে চাইতে লাগল পরস্পরের অন্তরের ছোঁওয়া পেতে।

একদিন এমনি এক ফাঁকে আইরিন পল্লবকে বলল—ওর দাদা ওর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এক বলশেভিকের সঙ্গে। ও না বলার ফলে অশান্তির সৃষ্টি হয়। যুবকটি ওর জন্যে পাগল হয়ে যখন তখন ওর কাছে এসে ধর্ণা দিত। শেষে ও বিরক্ত হয়েই একদিন দাদাকে না ব'লে পালিয়ে আসে। কিন্তু জর্মনিতে এসে ওর মুস্কিল হয়েছে ও জর্মন ভালো জানে না ব'লে। পল্লব বলল : ফ্রাউ ক্রামারের কাছে আমি জর্মন পড়ি, তুমিও কেন এসো না। সেখানে আমরা তিন জনে সমান জর্মনে কথাবার্তা চালাব, পঠনের সঙ্গে জুটবে প্রমোদ। আইরিন খুশি হ'য়ে তৎক্ষণাৎ রাজি। ফলে দাঁড়াল এই যে, পল্লবের আইরিনের সঙ্গে প্রত্যহ দুবার ক'রে দেখা হ'ত : সকালে ফ্রাউ ক্রামারের ওখানে, সন্ধ্যায় নাতাশাদের ওখানে।

কিন্তু এ যোগাযোগ ওদের ঘনিষ্ঠতার দিক দিয়ে অনুকূল হলেও ভাষাশিক্ষার দিক দিয়ে যে খুব সুব্যবস্থা নয়, সে ইঙ্গিত ফ্রাউক্রামার একদিন করলেন। করার হেতু এই যে, জর্মন ভাষায় ওদের আলোচনা তেমন জমত না ব'লে ওরা বেশির ভাগ সময়েই ফরাসিতেই কথাবার্তা চালাত। ফলে ওদের ফরাসিতে উন্নতি হ'ল বটে দেখতে দেখতে কিন্তু জর্মনে উন্নতি হ'ল না সে-অনুপাতে।

ফ্রাউ ক্রামার একদিন মাত্র এ-অসুবিধার উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হ'লেন। কারণ তিনি জোর করতে ভালোবাসতেন না। তাছাড়া ওরা দুজনে এসে তাঁর সামনে নানান তর্কাতর্কি সুরু করলে তিনিও সানন্দেই যোগ দিতেন ব'লে আসর জমকে উঠত—সেই সঙ্গে কফিও চলত, কখনো কখনো কেক চকলেটও পরিবেশন করতেন স্নেহময়ী অধ্যাপিকা।

### সতেরো

আইরিন ইতালিয়ান অপেরা ভারি ভালোবাসত। হঠাৎ বার্লিনে এল এক ইতালিয়ান দল। পল্লব সাগ্রহে ছুটল "লা বোহেম" অপেরার জন্যে পাঁচখানি টিকিট কিনতে। কিন্তু সমস্ত টিকিট তখন নিঃশেষ—ও পেল মাত্র দুখানি টিকিট।

ও ভারি মুশকিলে প'ড়ে গেল। মাত্র দুখানি টিকিট আছে শুনলে নাতাশা কি আইরিনকে না পাঠিয়ে নিজে আসতে চাইবে? যদি নাতাশা ভাবে—ও ইচ্ছে করেই দুখানি টিকিট কিনেছে আইরিনকে একা নিয়ে যেতে চেয়ে?

---

১। জয় রাজার জয়! ২। জয় মন্ত্রীর জয়!

৩। প্রাণান্তিক তর্কাতর্কির জয় হোক!

এখন উপায় ভাবতে ভাবতে ওর মাথায় এক বুদ্ধি গজালো। ও সন্ধ্যায় নাতাশাদের ওখানে গিয়ে কথাচ্ছলে বলল, ও পাঁচখানি টিকিট কিনতে গিয়ে মাত্র দুখানি পেয়েছে—চার বোনের মধ্যে যে কেউ ওর সঙ্গে আসতে পারে, কিম্বা—ব'লে ও উদার সুরেই জুড়ে দিল—যে কোনো দু বোন যাক, পল্লব পরে এক দিন যাবে বাকি দু বোনকে নিয়ে।

চতুরাননের অষ্টনয়ন পরস্পারের প্রতি কটাক্ষ করে—কেউই ভেবে পায় না—কিং কর্ত্তব্যম্। অবশেষে পল্লব বলল: এ বিষয়ে নাতাশার রায়ই চরম ব'লে সবাই মেনে নিই এসো।

কাতিয়া মাশা ও আইরিন হাততালি দিয়ে বলল: নতশিরে।

নাতাশা হাসল না, গম্ভীর মুখে পল্লবের চোখের দিকে খানিক চেয়ে রইল, তারপরে মুখে হাসি টেনে বলল: আমাদের তো তুমি অনেকবারই অপেরায় নিয়ে গেছ। এ যাত্রা আইরিনই যাক।

আইরিন বলল: সে কি হয় দিদি!

নাতাশা বলল: বেশ হয়—আর তুই সেটা ভালো করেই জানিস।

আইরিন মাথা নেড়ে বলল: না দিদি! তোদের এক জন যা—আজ আমি যেতে চাই না।

মাশা ঈষৎ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল: যা না আইরিন! কেন মিথ্যে ভাণ করছিস বল তো? যেতে চাস না?—তুই?

আইরিনের মুখ সিঁদুর-রাঙা হয়ে উঠল। পল্লব তাড়াতাড়ি বলল: আমি বলি কি—মানে, আইরিনকে নিয়ে আজ নাতাশাই যাক।

নাতাশা হঠাৎ কেমন যেন একরকম হেসে পল্লবের দিকে কটাক্ষ ক'রে আইরিনকে বলল: আচ্ছা, আজ আমিই যাই পলের সঙ্গে। কাল তুই যাস—পল, মাশা ও কাতিয়ার সঙ্গে। আমি চারখানা টিকিট ক'রে রাখব। কেমন? পল্লব ঘামতে থাকে।

আইরিন মুখে হাসি টেনে বলল: সেই ভালো।

পল্লব একটু চুপ করে থেকে বলল: তাহলে চলো নাতাশা, তৈরি হয়ে নাও।

নাতাশা হেসে বলল: পল! তুমি কি পাগল যে ভাবলে আমি এ ক্ষেত্রে সত্যিই আইরিনকে ঠেকিয়ে নিজে এগিয়ে আসতে পারি? না, এ যাত্রা আইরিনকেই তুমি নিয়ে যাও—আমার বিশেষ ইচ্ছে, সত্যি বলছি। তাছাড়া আমার আজ একটু কাজ আছে—এখুনি বেরুতে হবে। বলেই হন্ হন্ করে শয়ন কক্ষে ঢুকে সশব্দে দোর বন্ধ ক'রে দিল।

আইরিন পল্লবের দিকে চকিতে তাকিয়েই কাতিয়াকে বলল: কাতিয়া! আজ তুই-ই যা। আমার মাথা ধরেছে।

কাতিয়া বলল: নে নে—ঢের ন্যাকামি হয়েছে! পল যে আমাদের কারুর জন্যে টিকিট করেনি এটুকু বুঝবার মতন বুদ্ধিও কি আমাদের নেই মনে করিস?

পল্লব বিপন্ন কণ্ঠে বলল: না না—তা কেন? যে ইচ্ছে চলো না—আমি তো প্রথমেই বলেছি—

মাশা হাস্তের ভঙ্গি করে পল্লবকে থামিয়ে ধমকে উঠল: যা না আইরিন! কেন এমন করছিস? তৈরি হয়ে নে। ব'লে ঘরের ঘড়ির দিকে চেয়ে: এখন সাতটা। অপেরা আটটায় আরম্ভ। যা ওঠ। বলেই পল্লবকে: কিছু মনে কোরো না ভাই, তুমি যে নির্ভেজাল লক্ষ্মী ছেলে একথা আমরা সবাই জানি ও মানি—বিশ্বাস কোরো।

পল্লব চকিতে আইরিনের দিকে তাকিয়েই উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরের তুষারপাত দেখতে থাকে। আইরিন আর উচ্চবাচ্য না করে আমি আসছি পল, বলেই বেরিয়ে যায়—পল্লব একদৃষ্টে চেয়ে থাকে—তুষার ঝরছে আকাশ থেকে অশ্রান্ত আসারে!

## আঠারো

আইরিন পল্লবের বাহুলগ্না হ'য়ে যেন উড়ে চলে—মাটিতে পা পড়ে না। এযাবৎ পথে-ঘাটে কেবল নাতাশাই পল্লবের বাহুলগ্না হ'য়ে চলত। আজ প্রথম ও শুধু যে আইরিনকে কাছে পেল তাই নয়—পেল একান্ত ক'রে একলা, পার্শ্বচারিণীরূপে। ওর দেহের শিরায় শিরায় ব'য়ে যায় আজ রক্তপ্রবাহ নয়—সুধাধারা। আইরিন ব'লে চলে কত কথাই যে—অনর্গল! পল্লব শোনে অথচ শোনে না। শুধু ভাবে—কেমন ক'রে এ অসম্ভব সম্ভব হ'ল! মনে পড়ে: রিতার সঙ্গে যে দিন এই ভাবে চলেছিল পাশাপাশি। সেদিনও ও আনন্দ পেয়েছিল বৈ কি, কিন্তু কই সে-আনন্দে তো এমন আবেশ ছিল না! নেশা একটু হয় ত ছিল, কিন্তু বিহ্বলতা ছিল না তো! ওর হঠাৎ মনে সেই চিরন্তন প্রশ্ন জাগে: এরই নাম কি প্রেম? না এ-ও মোহ—কেটে গেলেই চিনতে পারবে মোহ ব'লে? প্রেম শব্দটা ওর হৃদয়ের তারে উঠলো ঝংকার দিয়ে, শঙ্কা-কুণ্ঠার বেসুর ডুবে গেল যেন সে-ঝংকারে! কবির একটি কবিতার একটি চরণ ধুঁয়োর মতই ফিরে ফিরে ওর কানে রণিত হ'য়ে পঠে: এ কি সত্য—এ কি সত্য?

হঠাৎ ওর চমক ভাঙল আইরিনের বাহুর একটি ছোট্ট ঠেলায়: যাও—তুমি কিছুই শুনছ না—ভাবছ আর কার কথা।

কী? না না—মানে—

আইরিন হেসে ওঠে: মানে কিছুই নেই। তোমার সঙ্গে মানুষ আসে? ব'লেই থেমে: তুমি কী ভাবছিলে বলব?—ভাবছিলে: নাতাশা হ'লে কত খাসা খাসা কথা বলত—যা শোনবার মত!

না না। কি যে অভিমান—কথায় কথায়!

প্রশ্ন ক'রে জবাব না পেলে অভিমান আসবে না তো কি আসবে কৃতজ্ঞতা?

মাফ কোরো আইরিন, কিন্তু আমি তোমার কথা শুনতে পাই নি তোমার কথাই ভাবছিলাম ব'লে, বিশ্বাস করো?

কী ভাবছিলে? যে, এ-দেশের কুমারীরা গায়ে-পড়া—লজ্জা-সরমের ধার ধারে না?

ছি ছি! তা কখনো ভাবতে পারি—বিশেষ আজকের রাতে?

তবে কী ভাবছিলে—বলো!—না, বলতেই হবে। আমি ছাড়ব না।

পল্লব টপ ক'রে বলল: ভাবছিলাম কি শুনবে? ভাবছিলাম—আমি এক সময়ে না জেনে কত কী-ই না ভেবেছি এ-দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে! ব'লে থেমে হেসে: সেই অনুতাপে তবু দগ্ধ হচ্ছিল আর কি!

আর এখন ?

এখন মনে হয়—তোমাদের জীবনে প্রাণের খেলা কত সহজ সরল বাধামুক্ত! তোমরা কত সহজে পরকে আপন ক'রে নিতে পারো! নৈলে কি এমন অকুণ্ঠে আমাকে এত কাছে টানতে পারতে? সত্যি বলছি—আমার আজ কেবল কেবলই মনে হচ্ছিল—তোমাদের দেশে তোমরা ঘরকে দূরে ঠেলতে ভয় পাও নি ব'লেই বাইরেকে দিয়েছ সমৃদ্ধি—প্রাণের, উচ্ছলতার, নেশার।

আইরিন খুশি হ'য়ে বলল: এমন গুছিয়ে কথা বলার তালিম নিলে কার কাছে শুনি ?

পল্লব হেসে বলে: এ দেশের মেয়েদের যে-প্রভাব আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে তার চেয়ে বড় গুরু কে ?

আইরিন শাসিয়ে বলে: কথার মালা-গাঁথা রেখে বলো তো সত্যি ক'রে—যে সঙ্গে সঙ্গে এখনো তোমার মন কিন্তু কিন্তু করে কি না এই ভেবে যে আমরা বড় বেশি পুরুষের নকল করতে চাই ব'লেই মেয়েলি লাবণ্য খুইয়ে বসেছি—যে কথা ফ্রাউ ক্রামার প্রায়ই বলেন ?

তোমাকে দেখবার আগে একথা মনে হ'লেও হ'তে পারত—কিন্তু দেখা মানেই তো বদ্‌লে যাওয়া।

বা বা বা! কেবল ভাবি নাতাশার সাম্‌নে কেন এমন কবির মুখেও কথা ফোটে না ?

নাতাশার 'পরে কি তোমার কোনো—

কী যে বলো! সে অতি চমৎকার মেয়ে। কেবল বড় বেশি দাবিয়ে রাখতে চায় আগে পাশের লোককে। আজ সে কী কাণ্ড করল বলো তো ?

পল্লব অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে। মনে পড়ে যায় নাতাশার ম্লান মুখ।

কী ভাবছ ?

এমন কিছু না।

বলো—বলতেই হবে।

সব কথা কি বলা ভালো ?

বা—ও।

শোনো তবে—কী নাছোড়বান্দা তুমি আইরিন! আমার শুধু মনে হয়—ও বড় একলা। তাই ওর উপর রাগ কোরো না।

আইরিন একটু চুপ করে থেকে বলে: তুমি ঠিক বলছ পল! আমার বোঝা উচিত ছিল। বলেই থেমে: তুমি আমাকে আজ অনেক ফরাসি কম্প্লিমেণ্ট দিলে। প্রতিদানে আমি একটা রুষ কম্প্লিমেণ্ট দেব কি ?

মানে ?

মানে সত্যি তারিফ। না ঠাট্টা নয়। তোমার কাছে আমি একটা জিনিষ শিখেছি—অল্প দিনের আলাপেই। কী শিখেছি বলব? শিখেছি—অপরকে বিচার করতে যাওয়ার চেয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে লাভ বেশি। তাই বিচারের চেয়ে দরদ বড়।

ধন্যবাদ প্রিয়ম্বদে!

ঠাট্টা না। তোমার অনেক কুণ্ঠা, ভয়, চুপ-করে-থাকার মর্ম আমি একটু একটু করে বুঝতে শিখেছি। আর তাই তোমাকে যতই দেখি ততই ভাবি—

কী ?

না থাক্। আর একদিন। নাতাশা প্রায়ই আমাকে বলে—আমি বড় বেশি বলে ফেলি। সংযম—সংযম—সংযম।

এই সময়ে ওরা অপেরা-ভবনে পৌছল।

## উনিশ

লা বোহেমের অজস্র গান, কলরব, ঢলাঢলি, নাচানাচির পরে ক্লান্ত হয়ে পল্লব আইরিনকে নিয়ে পথে বেরুতেই হঠাৎ একটা হাই তোলে।

আইরিনের দীপ্ত মুখে মেঘ ছেয়ে আসে: ভালো লাগেনি বুঝি ?

পল্লব সকুণ্ঠে বলে: ভালো লাগবে না কেন? কী আশ্চর্য তোমাদের প্রাণশক্তি! খুঁটিনাটির প্রতি কী খরদৃষ্টি! আমাদের অনেক কিছুই শিখবার আছে বৈ কি।

কেবল একটু 'কিন্তু' আছে, এই না ?

ঠিক 'কিন্তু' নয়। তবে মনে হয়—বলব খোলাখুলি ?

না বললে আড়ি।

কি জানো? আমার মনে হয় তোমরা সঙ্গীত থেকে চাও—পনের আনা না হোক অন্তত বারো আনা—প্রাণের খোরাক—উচ্ছলতা। আমরা চাই শান্তি—ঝংকার—করুণ সমাহিতি। তোমাদের সুরসম্পাত মনের মধ্যে যে-উদ্বেলতা আনে তার দাম নেই বলি না, কেন না জীবনের একটা প্রধান তৃষ্ণা—চমক। চমকের দামও আছে—মানি। কিন্তু এর পরে 'আরো' আছে—'আরো আরো'। সে-'আরো' মেলে না শুধু উদ্বেলতার কাছে হাত পাতলে। তাই তোমাদের অপেরার গভীরতা কম—অন্তত আমার এই রকমই মনে হয়।

আইরিন ক্ষুণ্ণ হয়: কিন্তু তাই বলে সঙ্গীত শুধু করুণ রসেরই বেসাতি করবে চিরকাল? না পল, শিল্পের একটি প্রধান উপাদান যে চমক একথা তোমরা মুখেই মানো, মনে প্রাণে না।

পল্লব মৃদু সুরে বলল: চমক? কিন্তু চমকের উপজীব্য কি প্রধানত স্নায়ুর উত্তেজনা নয়? এর মানে নয় অবশ্য যে উচ্চ সঙ্গীতে চমকের স্থান নেই। তবে চমক ঘর করে অপ্রত্যাশিতকে নিয়ে। তাই ভয় হয় বৈ কি যে চমক চাইতে চাইতে যদি গহনকে ভুলি।

আইরিন একটু ভেবে বলে: তোমাদের এ-ভয় অহেতুক নয়—মানি। কারণ য়ুরোপে আধুনিক সঙ্গীতের ঢেউ চলেছে ক্রমশই কান-চমকানোর দিকে। কিন্তু তাই বলে ভালো অপেরা, ভালো সিম্‌ফনি শুধু চমক-সম্বল নয়।

সিম্‌ফনি ও অপেরার নাম এক নিশ্বাসে কোরো না। তোমাদের সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সিম্‌ফনিতে, একথা আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি। কেবল—জানি না আমি—তোমাদের সঙ্গীতের বোদ্ধা হ'তে তো পারি নি—তবু কেন যেন আমার মন বলে—তোমাদের অপেরা চমকের পথ চ'লে ইতিমধ্যেই পৌঁছেছে একটা চোরাগলিতে। এতে নাটক, কোরাসগান, যন্ত্র-সঙ্গত, নাচ, হৈ-চৈ—সব কিছুকেই তোমরা চেয়েছ একটা ঐক্য সূত্রে বাঁধতে। কিন্তু এর ফলে হয়েছে এই যে তোমাদের অপেরায় না মেলে নাটকীয় চরিত্র সংঘাত, না সুরকল্লোল, না শান্তি। ফলে সব মিলে তোমরা শিল্পের নামে

কেমন যেন একটা জগা খিচুড়ি পরিবেশন করছে—যার চরম কর্মফল—তোমাদের দুঃসহ টকি-সঙ্গীত।

টকি-সঙ্গীত আর অপেরা? কী বলছ তুমি পল!

হয়ত একটু অত্যুক্তি হ'য়ে গেছে। কিন্তু ভেবে দেখ টকির চমক বেশি ব'লেই তোমাদের অপেরার আদর ইতিমধ্যেই কত ক'মে গেছে। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতে আরো কমে যাবে। আর কেন জানো? কারণ জীবনের দিকে যদি একটু নিস্পৃহ ভাবে চেয়ে দেখ তাহলে দেখতে পাবে—যুগে যুগে দেশে দেশে মানুষ একবার অগভীরের নিমন্ত্রণে সাড়া দিলে আর তেমন কান পাততে পারে না গভীরের বাণীতে—যাকে কীটস বলেছেন unheard melodies. হয়ত দুটোতেই সাড়া দিতে পারলে ভালোই হ'ত—বলতে পারি না তো জোর ক'রে কিসে কী হয়—তবে একটা কথা বলতে পারি যে-কথা বৈষ্ণব পরিভাষায় বলে উপমা দিয়ে: যে, শ্যাম ও কুল দুই-ই রাখা যায় না। বলে উপমাটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিল।

আইরিন মুখ ভার করে বলে: এ একটা কথাই নয়। নিজেকে জীবন থেকে ক্রমাগত গুটিয়ে নেওয়ার প্রবৃত্তি—যাকে তোমরা বলো বৈরাগ্য—ও এক ধরণের শুচিবাই। রাশিয়ায়ও এমনি একটা মস্ত দল আছে যারা বলে গম্ভীর না হ'লেই সব মাটি। কিন্তু চপলতা, ছ্যাবলামি, ফষ্টিনষ্টি—এ সবই তো রসের রসদ জোগায়। তাই আমরা সবচেয়ে বড় বলি তাঁকেই যিনি খেলতেও যেমন উৎসাহী ধ্যান করতেও তেমনি নিপুণ। মস্কোতে আমার এক পিতৃবন্ধু আছেন। তিনি দার্শনিক—লিখেছেন এমন সব গম্ভীর বই যে দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য? অথচ—বলে হেসে—তিনি আমার সঙ্গে বলরুমে নাচতে কী যে ভালোবাসেন জানো না।

পল্লব হেসে বলে: তোমার সঙ্গে নাচতে না চাইবে কোন অরসিক?

আইরিন সকোপে বলে: যাও, যাও। জানা আছে তোমার blague![4] তোমাকে কতবার ডেকেছি—নাচতে চেয়েছ কোনো দিন আমার সঙ্গে?

পল্লব বিপন্ন কণ্ঠে বলে: ঐ দুর্বলতাটি আমার—কী বলব? ক্ষমা করতেই হবে তোমাকে, লক্ষ্মীটি!

আইরিন সঘনে মাথা নেড়ে বলে: ক্ষমা করব? কক্ষণো না। নাচ তোমাকে শিখতেই হবে। বলো শিখবে? আমি শিখিয়ে দেব দুদিনে।

পল্লব একটু চুপ করে থেকে বলে: তবে শোনো আইরিন, বলি—যা বলতে চাইনি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—আমার এক বন্ধুর কাছে।

কে বন্ধু? সেই দেশভক্ত—কুঙ্কুম না তাঁর নাম?

সে শুধু দেশভক্তই নয়। বহু জিজ্ঞাসুর দিশারি, বহু দুর্বলের পথের পাথেয়। আমি তার কাছে গভীর ভাবে ঋণী। তাই তার কাছে যে-কথা দিয়েছি সে-কথার খেলাপ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কথা দিয়েছ? কেন দিতে গেলে?

তাকে যদি দেখতে—যদি পেতে তার গভীর স্নেহ তবে করতে না এ-প্রশ্ন।

আইরিন একটু চুপ করে থেকে বলে: পল! আমাকে মাফ কোরো। তবে কি জানো? এ আমি পারি না বলেই অবুঝ হই।

কী পারো না?

এ-ভাবে কাউকে শ্রদ্ধা করতে। কিন্তু পারি না বলেই মুখে যতই কেন না রাগ করি মনে মনে মানি—যে যে পারে সে ধন্য।

ধন্যবাদ আইরিন!

কেবল আর একটা প্রশ্ন করব—তবে ইচ্ছা না হয়, উত্তর দিও না। তুমি তোমার গুরুবন্ধুকে আর কোনো কথা দিয়েছ কি?

পল্লব একটু চেয়ে থাকে ওর দিকে, পরে বলে: তার কাছে আমি তিনটি প্রতিজ্ঞা করেছি: মদ খাব না, নাইট ক্লাবে যাব না আর—কোনো মেয়ের সঙ্গে নাচব না।

আইরিন চুপ করে চলতে থাকে। হঠাৎ সে বলে ওঠে: দেখ দেখ—আমরা অন্যমনস্ক হ'য়ে কোথায় এসে পড়েছি!

ওদের একটা মোড়ে ডান দিকে একটা গলিতে বেঁকবার কথা—কিন্তু ভুলে চ'লে এসেছে সোজা—বিখ্যাত তিয়ের গার্ডেন-এর তোরণে!

পল্লব বলে: তাই তো! দেরি করে দিলাম তোমার—দেখ দেখি—বলতে না বলতে অদূরে একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজে।

আইরিন খিল-খিল করে হেসে ওঠে: বেশ হয়েছে—কবির সাজা! কিন্তু ফেরার এত তাড়া কি? তিয়ের গার্ডেনে যখন এসেই পড়া গেছে চলো একটা চক্র দিয়ে যাই, এ গেটে ঢুকে ওদিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিলেই চলবে—একটু ঘুর হবে—হলই বা।

পল্লব সকুণ্ঠে বলে: কিন্তু রাত বারোটা—

আইরিন হাসে: ভয় ভয় করে না? হয়ত তোমার বন্ধুকে আরো একটা কথা দিয়েছ যা আমাকে বলতে পারোনি মুখ ফুটে, না?

পল্লব হাসে: তুমি ভারি দুষ্ট। তাছাড়া আমার আবার ভয় কি? ভয় তো তোমারি জন্যে?

কী ভয়? কুমারীর শুভ্র নামে কলঙ্ক? না, নাতাশার ভ্রূকুটি?

আঃ। চলো—চলো। তিয়ের গার্ডেনের গাছগুলি চমৎকার দেখাচ্ছে চাঁদের আলোয়!

ওরা ঢুকল সুন্দর সুবৃহৎ পার্কটির মধ্যে। বাগানগুলি শুভ্র তুষারের উত্তরীয় পরে এক অপরূপ মূর্তি ধারণ করেছে। চাঁদের আলো পার্কটির হ্রদের বুকে বিছিয়ে গেছে। চারদিক শান্ত স্তব্ধ। কচিৎ এক-আধটি যুগল মূর্তির দেখা। মাঝে মাঝে শীতল বাতাসে চিরসবুজ কয়েকটি গাছের পাতায় বেজে ওঠে মর্মরধ্বনি।

আইরিন হঠাৎ বলে: দেখ দেখ—ঐ সামনের ঝাউগাছ কটি দুধের পোষাক পরে কী সুন্দর দেখাচ্ছে!

পল্লব মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে। সামনে প্রকৃতির হাতছানি, মাথার উপরে খণ্ড মেঘের সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি, সর্বোপরি—পাশে এমন একজনের বাহুর কোমল স্পর্শ—যাকে মনে হয় যেন কতদিনের চেনা। পল্লবের দেহ শিরশির ক'রে ওঠে এক অচিন পুলকের প্রবাহে।

আইরিন বলে: এসো, ঐ বেঞ্চিটার উপর একটু বসা যাক।

---

৪ .ভাণ—এমন কথা যা ভুল বোঝাতে চায়

পল্লবের মনে ফের কুণ্ঠা উঁকি মারে—এটা যেন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে যায় কুঙ্কুমের নিষেধ।

কি ভাবছ? তোমার বন্ধু জানতে পারলে কী বলবে?

কী যে বলো! চলো।

বেঞ্চির উপর বসে পল্লবের ডান কাঁধে নিঃসংকোচে তার বাম বাহু হেলান দিয়ে রেখে আইরিন বলে: আচ্ছা পল, সত্যি করে বলো তো—তোমাদের দেশে কোনো অবিবাহিত মেয়ের সঙ্গে যদি গভীর রাতে কোনো যুবক এভাবে বসে গল্প করে তবে কী হয়? মহাপাপ?

কী যে দুষ্টুমি চেপেছে আজ তোমার মাথায়!

না, এড়িয়ে গেলে চলবে না। বলতেই হবে তোমাকে।

পল্লব বিপন্ন কণ্ঠে বলে: কী বলব বলো তো, আমাদের দেশে কি কোনো মেয়ের সঙ্গে কোনো ছেলে এভাবে মেলামেশার সুযোগ পায়?

অসম্ভব?

অন্তত অসম্ভবের কাছাকাছি বৈ কি।

আইরিনের একটি বাহু পল্লবের কণ্ঠ লতিয়ে ধরে: আর এভাবে যদি কোনো মেয়ে বসে কোনো ছেলের পাশে? আরো অসম্ভব, না?

পল্লবের দেহে শিহরণ জাগে। আবিষ্ট সুরে বলে: অবশ্য··· মানে—মেলামেশাই সেখানে অসম্ভব—

কথাটা ও শেষ করতে পারে না—মন যেন বিবশ—

আচম্বিতে আইরিন হাত নামিয়ে নিয়ে বিরস কণ্ঠে বলে: চলো, ফেরাই যাক—তোমার যখন এতই কুণ্ঠা—

পল্লবের চমক ভাঙে, বলে মৃঢ় স্বরে: কুণ্ঠা? মানে?

আইরিন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে: মানে থাক। চলো।

## কুড়ি

পল্লব ভেবে কোনো কূল-কিনারা পায় না। আইরিন হঠাৎ অমন ক'রে উঠল কেন? ও তো কিছুই বলে নি! মন ওর আবেশের ঢেউয়ে গা ভাসিয়ে চলছিল বলে জবাব দিতে একটু দেরি হয়েছিল। এই জন্যেই কি ও রাগ করল? না, অপেরার নিন্দা করেছিল বলে ও উত্যক্ত হয়েছিল, হঠাৎ সেই নিরুদ্ধ ক্ষোভ কোনো একটা অছিলায় নিজেকে জানান দিল? রিতাও ঝোঁকালো ছিল বটে, কিন্তু তার অগ্ন্যুৎপাত কেন হল বুঝতে কোন দিন তো এমন বেগ পেতে হয় নি? আর শুধু রাগ করাই তো নয়—এমন বিষম রাগ যে তিয়ের গার্ডেন থেকে ফিরবার পথে আইরিন একটি বারও ওর বাহুলগ্না হয় নি, এমন কি কথা পর্যন্ত কয় নি। শুধু যখন ওর বাড়ির দোর পর্যন্ত ওকে নিয়ে গেল তখন 'ল্যাচকী' দিয়ে দোর খুলে বলেছিল: "আউফ হ্বীদার জেহেন পল! আশা করি নিরাপদে ঘুমুবে এবার।" নিরাপদে ঘুমুবে—মানে? ভাবতে ভাবতে ওর মাথা গরম হয়ে উঠল। বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত দুটো বেজে গেছে। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে বাইরের একটা পার্কের ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজতে শোনে। তারপর আর মনে নেই।

ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল অদ্ভুত! যেন কুঙ্কুম হঠাৎ এসেছে বার্লিনে। বলছে হিণ্ডেনবার্গের সঙ্গে কী কী কথা হ'ল। এমন সময় হঠাৎ আইরিন হাসতে হাসতে এসে পল্লবের হাত ধরল। কুঙ্কুম তাকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল: ফ্রয়লাইন! আইরিন কেঁদে উঠল। পল্লবের ঘুম ভেঙে গেল। বেলা তখন নটা। জানলা দিয়ে রোদ পড়েছে ওর মুখের উপরে।

মাথার ভিতর দবদব করছে। ফ্রাউ ক্রামারের ওখানে রোজ সকালে 'নটার গময় জর্মন ও ইতালিয়ান পড়তে যায়। আজ আর যাওয়া হ'ল না। একবার ভাবল—যায়। হয়ত আইরিনের সঙ্গে দেখা হ'বে—কিন্তু এ চিন্তাকে মন থেকে জোর ক'রে নিষ্কাশিত ক'রে দেয়। কী হবে রাজ্যির ভাষা শিখে? শুধু ভাষাই বা রাজি কেন? ভাবে ও রুখে উঠে—এদের দেশের গান শেখারই বা মানে কী যে দেশে গানের চরম পরিণতি অপেরার অট্টরবে? নাঃ এবার মানে মানে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরাই পন্থা। দেশের কাজ প'ড়ে রইল, আরও এখানে ক'রে বেড়াচ্ছে অপেরা আর···আর কী—জানে তো কী। মনে পড়ল স্বপ্নে শোনা কুঙ্কুমের তিরস্কার: ফ্রয়লাইন! ভাগ্যে কুঙ্কুম জানে না কিছু! মোহনলাল যে মোহনলাল, সে'ও রিতাকে নিয়ে রাত দুটো করে নি কোনো দিন। ছিঃ ছিঃ। ওর ঠিক সাজাই হয়েছে। যে নাগালের বাইরে তার কাছে একটু আস্কারা পেয়ে ও এ চিন্তাকে দমন ক'রে বেরিয়ে পড়ল—এমনিই লক্ষ্যহীন উদভ্রান্ত ভাবে।

## একুশ

অশান্ত মনে এখানে ওখানে পথে পথে ঘুরে মন একটু শান্ত হয়। হঠাৎ মনে পড়ল যুসুফকে। কী কর্তব্য সে হতে বলতে পারবে—অভিজ্ঞ লোক তো। ভাবতেই মন ওর হাল্কা হ'য়ে গেল। এ সময়ে যুসুফ প্রায়ই খেতে যায় উন্টার দেন লিন্দেনে ওর প্রিয় একটি রুষ রেস্তরাঁয়। ও তৎক্ষণাৎ এক ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল। রুষ রেস্তরাঁর পরিদর্শক ওকে দেখে একগাল হেসে বললেন: Willkommen, Herr Yusuf ist hier. ৫ ব'লেই ওকে নিয়ে গেল উপরের তলায়। যুসুফের খাতির ছিল, তার জন্যে একটি সুন্দর প্রাইভেট কক্ষ রাখা থাকত ও মাঝে মাঝেই রুষ বান্ধবী নিয়ে আসত ব'লে।

পল্লব ঢুকেই দেখে—ওর সঙ্গে একটি ঈষৎ স্থূলকায়া সুরূপা মহিলা খুব হাসতে হাসতে রুষ 'পিলাভ' খাচ্ছে। পল্লবকে দেখে যুসুফ খুশি হ'য়ে বলে ওঠে: Abgezeichnet! Nehmen sie platz. ৬ ব'লেই বাংলায়: তোমার কথাই হচ্ছিল। ব'লেই সঙ্গিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়: ওলগা আলেক্সান্দ্রোভনা মার্তভ—পেট্রোগ্রাডের সেরা প্রিমা দন্না ৭। আমার গায়ক বন্ধু, হের পল্লব বাকচি। ওলগা বলছিল—কাল সন্ধ্যায় অপেরায় একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে ওঁর ঠিক পাশেই ব'সে তর্ক করছিল একটি প্রিয়দর্শন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে। আমি জবাব দিলাম—নিশ্চয়ই তুমি আর আইরিন।

পল্লব মৃদু মাথা নেড়ে জানাল: হাঁ।

ফ্রয় লাইন•ওলগা গম্ভীর হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার বুঝি আমাদের গান ভালো লাগে না?

কেমন ক'রে?

---

৫। আস্তাজ্ঞে হোক। হের যুসুফ এখানেই। ৬। চমৎকার! বোসো। ৭। শ্রেষ্ঠগায়িকা।

কাল পথে বেরিয়ে আপনারা তর্কাতর্কি করছিলেন খুব চাপা সুরে নয় তো—তখন আমি ঠিক আপনাদের পিছনেই।

পল্লব অপ্রতিভ স্বরে বলল: না, আপনাদের গান আমার ভালো লাগে না একথা সত্যি নয়। তবে আপনাদের অপেরায় আমার কান বা মন যাই বলুন এখনো রস পায় না।

ফ্রয়লাইন ওলগা ও! বলেই আরো যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। য়ুসুফ বলল: ভালো কথা, তুমি আজ ফ্রাউ ক্রামারের ওখানে পড়তে যাওনি কেন হে? তিনি তোমার ওখানে টেলিফোন করে তোমাকে পান নি, আইরিনের ওখানেও তথৈব চ, শেষে বেচারি আমাকে নিয়ে টানাটানি—বেলা দশটায়। আমি বললাম, আমি জানি না তুমি কোথায়। বলে জনান্তিকে বাংলায়: আইরিনের সঙ্গে অপেরা নিয়ে মন-কষাকষি হয়েছে বুঝি?

না না—

য়ুসুফ বাংলায়ই বলে: আর না না। এরা বড় স্পর্শকাতর এদের সঙ্গীত সম্বন্ধে। নাই বা বললে এদের এ-ও-তা তোমার ভালো লাগে না।

পল্লব বাংলায় বলল: বাঃ, জিজ্ঞাসা করলে মিথ্যা বলব?

য়ুসুফ হেসে বলে: সত্য ও মিথ্যার মধ্যে বুঝি কোনো নো ম্যান্'স্ ল্যাণ্ড নেই? 'মিথ্যা বলবে কেন? চেপে যাবে। বলেই পার্শ্ববর্তিনীকে বলল: আমার এ-বন্ধুটি এখানে এসেছেন আপনাদের গান শিখতেই।

মহিলার মুখের অটল গাম্ভীর্য একটু যেন ফিকে হয়ে এল: বটে? কী গান শিখছেন?

শুবার্ট শুমান্ ব্রাহ্‌ম্ শোপ্যা—ইতালিয়ান গানও দু-চারটে—

রুষ গান শেখেন না কেন? আপনাদের দেশের সুরের সঙ্গে একমাত্র আমাদের গানেরই যা একটু সাদৃশ্য আছে।

জানি। আমি রুষ গানও দু-একটা শিখেছি।

ফ্রয়লাইন ওলগার মুখের গাম্ভীর্য কেটে গেল, য়ুসুফকে বললেন: একদিন আমার কাছে নিয়ে এসো না এঁকে। কেমন রুষ গান শিখেছেন শুনব।

পল্লব বিপন্ন কণ্ঠে বলল: না না, আমার মুখে রুষ গান কী শুনবেন? আমি রুষ ভাষা জানি না—উচ্চারণে নিশ্চয়ই অনেক ভুল করে বসি—তাছাড়া আমি সবে শিখেছি—মাত্র বছরখানেক হল।

য়ুসুফ বলল: না না ওলগা! তোমার শোনাই চাই। কি চমৎকার কণ্ঠ ওর জানো না? তবে রুষ গান নয়—ও তোমাকে শোনাবে বাংলা গান আর হিন্দি গান।

ফ্রয়লাইন ওলগা হেসে বললেন: দুই-ই শুনব। বলেই পল্লবকে: কী রুষ গান শিখেছেন শুনি।—মানে কার গান?

তা তো জানি না।

আচ্ছা, প্রথম লাইনটা বলুন তো গুন্-গুন্ ক'রে।

না না। ভাষা জানি না—কত ভুল-চুক হবে।

আহা, বলুন না! আপনি তো আর পরীক্ষা দিচ্ছেন না।

পল্লব য়ুসুফের দিকে তাকাতে য়ুসুফ বলল বাংলায়: বলো না। ভুল হ'লই বা।

পল্লব ভয়ে ভয়ে বলল: প্রথম দুটি লাইন গুন্-গুন্ ক'রে শোনাচ্ছি—কিন্তু ভুল হ'লে অপরাধ নেবেন না তো!

ফ্রয়লাইন ওলগা য়ুসুফকে হেসে কী বললেন রুষ ভাষায়।

য়ুসুফ খুশি হ'য়ে হেসে রুষ ভাষায় মিনিটখানেক অনর্গল বক্তৃতা ক'রে পল্লবের দিকে চেয়ে হেসে বলে বাংলায়: ও বলছিল—তুমি ভারি সরল—তোমার মুখ দেখে কালই ওর মনে হয়েছিল।

পল্লব হেসে বাংলায় বলল: আর তুমি কী বললে? যে সরল মানেই বোকা—এই তো?

য়ুসুফ বলল বাংলাতেই: না আমি বললাম—তার জন্যেই আইরিন একটু বিপদে পড়েছে—তোমার মুখে অপেরার নিন্দায় রাগ ক'রেও মান করতে পারে না। বলেই জর্মন ভাষায়: Aber verzeihen sie nun, esis die hoechste zeit. ৮

পল্লব গুন্-গুন্ করে গাইল:

ন্যে ব্রাণীয় মিন্‌য়া রদনায়া চ, তো য়া তাক য়া ভোলু ব্লু।

স্তুচনা স্তুচনা দরণায়া জিং অদনোয় নিয়ে বেজ নিভ্ উও।

গিয়েই থেমে গিয়ে বলল: ভুল হয়েছে নিশ্চয় অগুন্তি?

ফ্রয়লাইন ওলগার মুখ-চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন: আপনার গান খুব চমৎকার। সুরটির সূক্ষ্ম মোচড়গুলিও তুলেছেন সুন্দর। উচ্চারণে অবশ্য ভুল কিছু আছে, ভাষা না জানলে উচ্চারণ ঠিক হবে কেমন করে? কিন্তু একটা কথা: আপনার কণ্ঠের মাধুর্য অপূর্ব হ'লেও আরো প্রবল হতে হবে।

য়ুসুফ হেসে বলল: বন্ধুর আমার সে-গুণে ঘাট নেই। আগে গর্জন করতেন বাঘের মত, এখানে জর্মন গান শিখতে না শিখতে হুঙ্কার দেন সিংহের মত। এখানে সলজ্জে গুন্ গুন্ করে গাওয়া বৈ তো নয়। একদিন—বলেই পল্লবকে—যাবে ওর ওখানে?

ফ্রয়লাইন ওলগা বললেন: আসুন না। সামনের বুধবারে? আমার ফ্ল্যাটে আপনার ও য়ুসুফের ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল। আপনাকে কয়েকটি রুষ অপেরার গান শোনাব। না না—ইতালিয়ান অপেরা কি আর রুষ অপেরার কাছে? শালিয়াপিনের গান শুনেছেন কি কোনো অপেরায়?

পল্লব বলে: না, শুধু রেকর্ডেই শুনেছি। কী অপূর্ব কণ্ঠ!

ফ্রয়লাইন ওলগা সগর্বে বললেন: এমন কণ্ঠ এক রাশিয়াতেই সম্ভব।

## বাইশ

পল্লব একটার সময়ে যখন বাসায় ফিরল তখন ওর মনের অবসাদ কেটে গেছে। মনকে প্রবোধ দেয়: কী অকারণ মন খারাপ করছিলাম? আইরিন নিশ্চয় কাল অপেরা সম্বন্ধে আমার মতামত শুনেই রাগ করেছে। য়ুসুফ ঠিকই বলেছে—কেনই বা এদের বলতে যাওয়া সব কথা? ধরো যদি য়ুসুফ ফ্রয়লাইন ওলগাকে বলে বসে: রুষ অপেরা কি আর জর্মন অপেরার কাছে? তা হলে? বিশেষ ক'রে ফ্রয়লাইন ওলগার মতন প্রিমাদন্নার প্রশংসা পেয়ে ওর নেতিয়ে-পড়া মন আবার উজিয়ে উঠল। ঠিক করল: আরো মন দিয়ে গান শিখবে। গান শেখা বিলাস—কে বলল? Music has charms to soothe the savage breast—

৮। কিন্তু এবার গান করুন দয়া করে—সময় পেরিয়ে যায় যা!

পল্লব সন্ধ্যায় যখন নাতাশাদের ওখানে পৌঁছল তখন চার বোনই চা-পানে নিরত। মাশা ও কাতিয়া ওকে দেখে রোজকার মতনই হেসে বলল: Soyez le bien venu ৯। কিন্তু নাতাশা একটু কেমন-যেন-একরকম হেসেই চায়ের পিয়ালায় মুখ ডুবোয়। আইরিনও বিমনা। পল্লবের মনে ছেয়ে আসে এক অনামা আশঙ্কা।

নাতাশা হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল: অপেরা কেমন লাগল, পল?

পল্লব সাবধানে বলল: চমকপ্রদ বৈ কি।

কাতিয়া বলল: পল! তুমি তো ভাই এমন ছিলে না?

পল্লব ভয়ে ভয়ে বলে: মানে?

মানে, ভালো না লাগলেও ভদ্রতার খাতিরে ভালো বলতে না তো কোনোদিন! কে তোমাকে সাবধান ক'রে দিয়েছে বলো তো?

সাবধান? সে কি? পল্লব কী বলবে ভেবে পায় না।

মাশা বলল: আইরিন বলল যে, অপেরা তোমার একটুও ভালো লাগেনি।

নাতাশা বলে বসল: ও—তাই বুঝি আইরিনের মুখ আজ এমন শুক্‌নো? এতক্ষণে বোঝা গেল। আমি ভেবে মরি—না জানি কী ঠোকাঠুকি বাধল তোমাদের মধ্যে!

আইরিন বিরক্ত স্বরে বলল: ঠোকাঠুকি আবার কী? তোর যেমন কথা!

নাতাশার মুখ লাল হয়ে উঠল: আমার যেমন কথা—মানে?

আইরিনেরও মুখ লাল হয়ে উঠল: নয় তো কী? পল আর যাই হোক, কাউকে কখনো ভুলেও আঘাত করে না। তাকে ঠেশ দিয়ে কথা বলা কেন অকারণ?

নাতাশা একটু চুপ করে থেকে বলল: পল, ভুল বুঝো না ভাই। আইরিনের আজ মেজাজ গরম। নৈলে আমি তোমাকে ঠেশ দিয়ে কোনো কথাই যে বলতে চাই নি—

পল্লব ব্যস্ত হয়ে বলল: না না—আমি কি জানি না?

কাতিয়া ও মাশা দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠল। মাশা বলল: চলো পল, একটু বেড়াতে বেরুনো যাক সবাই মিলে। আজ সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে কিনা, তাই আমাদের মনও মেঘলা হয়ে আছে ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে। এখন খুব বরফ পড়ছে। বেরুলেই সবাই ফের ধাতস্থ হয়ে উঠবে।

পল্লব আশ্বস্ত হয়ে বলল: আমি রাজি।

আইরিন বলল: আমার শরীরটা আজ ভালো নেই, তোমরাই যাও।

কাতিয়া বলে: তা হবে না, তোকেও যেতেই হবে। বাইরে বেরুলেই দেখবি শরীর ভালো হয়ে যাবে। নে—ওঠ্।

* * * *

হবি তো হ—ওরা চলতে চলতে সেই তিয়ার গার্ডেনেই পৌঁছল। নাতাশা সব আগে চলছিল পল্লবের বাহুলগ্না হয়ে, পিছনে ওরা তিন বোন। নাতাশা কথা বলছিল না বেশি। পল্লবও না। কান পড়ে ছিল পিছনের দিকে। আইরিনের এক-আধটা কথা মধ্যে মধ্যে ওর কানে ভেসে আসছিল—তবে মাশা ও কাতিয়ার হাসির রোলে সে-প্রার্থিত সুরটি ডুবে ডুবে যাচ্ছিল। এ ভাবে চলতে ওর ভালো লাগছিল না একটুও। আইরিন ও নাতাশা ঝগড়ার কথা কেবলই মনে হয়। ওর সামনে ওরা কোনো দিন তো এতটা আত্মবিস্মৃত হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে কী একটা অবছা আশ[illegible] যেন...

ওরা দেখতে দেখতে পৌঁছল পার্কের মধ্যে হ্রদটির কাছে। তখ[ন] আকাশে মেঘ কেটে গেছে, তুষারপাতও থেমে গেছে। চাঁদও খুশি হয়ে হাসির কিরণ ছড়িয়ে চলেছে তুলোর মতন মেঘের মধ্যে থেকে।

মাশা বলল: চল একটু নৌকাবিহার করা যাক। তটে কাছে তিন-চারটি নৌকা লাগানো ছিল। কাছেই রক্ষকের একটা ক্যাবিন। কাতিয়া ক্যাবিনে ঢুকেই বেরিয়ে এল, সঙ্গে নৌ-রক্ষক সে একটি নৌকা খুলে দিয়ে বলল: মাঝি চাই?

মাশা বলল: না, ধন্যবাদ, আমরা দাঁড় টানতে জানি।

Amusierien Sie Sich ১০ বলেই লোকটি বিদায় নিয়ে তার ক্যাবিনে ঢুকল।

ওরা একে একে নৌকায় উঠে বসল। আইরিন উঠল সবশেষে। হঠাৎ কাতিয়া দাঁড় ধরতেই নৌকা উঠল দুলে, সঙ্গে সঙ্গে আইরিন বসতে যাবার মুখে টলে পড়ল একেবারে পল্লবের ঘাড়ের উপর। মাশা হাততালি দিয়ে উঠল। আইরিন তীব্র কণ্ঠে রুষভাষায় কি একটা তিরস্কার করেই পল্লবের কাছে অত্যন্ত ভদ্রভাবে ক্ষমা চেয়ে একটু দূরে স'রে গিয়ে বসল। পল্লব ক্ষুন্ন হ'য়ে হাল ধরল। নাতাশা পল্লবের পাশে ব'সে চুপ ক'রে চাঁদের দিকে চেয়ে।

নাতাশার উদাস ভাব দেখে পল্লবের মন ব্যথিত হয়ে ওঠে, ওকে প্রফুল্ল করতে চেয়ে হেসে বলে: নাতাশার প্রাণে যে আজ খুব কবিত্ব জেগেছে দেখছি!

নাতাশা ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলল: কবিত্ব জাগাটা বুঝি তোমাদেরি একচেটে?

আইরিন টপ ক'রে বলে: পলের অন্তত তাই ধারণা। যারা বেশি হাসিখুশি তারা চঞ্চল—গভীর গহনের মর্ম কী বুঝবে?

পল্লব আহত হয়: এমন কথা আমি কবে বলেছি শুনি?

নাতাশা সান্ত্বনার সুরে বলে: না পল, এ কথা মনে ভাবলেও মুখে বলবার মতন অভদ্র হ'তে যে তুমি পারো না—কে না মানবে— যে তোমায় একটুও জেনেছে?

পল্লব বলল: তবে খোঁটা দিলে কেন দুজনে একজোটে?

নাতাশা ওর দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয়।

পল্লব ক্ষুব্ধ স্বরে বলে: বলবে না?

নাতাশা চোখ তুলে বলে: না বললে কি কিছু আসে যায় তোমার?

পল্লব ক্ষুন্ন কণ্ঠে বলে: তুমি কি ভাবো—শুধু বলায়ই আসে যায়? সংসারে অনেক সময়ে কিছু না বলায়ও যে ঢের বেশি আসে যায়।

আইরিন ব'লে বসে: এ কথাটা কি তুমিও বোঝো?

পল্লব চমকে ওঠে: তার মানে?

আইরিন শান্ত কণ্ঠে বলে: এমন কিছু না। তবে আমার

---

৯। স্বাগতম্।

১০। উপভোগ করুন।

মনে হয় যে, যাদের দেশ গরম তাদের রক্ত একটু বেশি ঠাণ্ডা হয়, নৈলে তারা সইতে পারবে কেন?

পল্লবের মনে একটা চিন্তার ঝিলিক খেলে যায়, কিন্তু মুখে বলে: বুঝলাম না।

নাতাশা কেমন এক রকম হাসি হাসে: তা হ'লে মানছ যে, জীবনের অনেক কিছুই তুমি বোঝো না?

পল্লবের কান শীতের রাতেও গরম হ'য়ে ওঠে, সে টুপিটা খুলে পাশে রেখে দেয়।

কাতিয়া পল্লবের দিকে একবার তাকিয়েই নাতাশাকে বলে: নাতাশা! আজ তোর কী হয়েছে বল্ তো? কেবল হেঁয়ালিতে কথা?

নাতাশা পল্লবের দিকে তাকিয়ে বলে: এটা কি তোমার হেঁয়ালি, পল?

পল্লব নাতাশার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে: আমি কি তোমার সঙ্গে কোনো অভদ্র ব্যবহার করেছি নাতাশা?

নাতাশা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে: তোমাকে যে একটুকুও জানে পল, সেই মানবে যে তুমি মেয়েদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতেই পারো না—এমন কি চেষ্টা করলেও না।

তবে?

যার চোখ ফোটেনি তার সাম্‌নে আ'লো ধ'রে ফল কী বলো?

আইরিন ধম্‌কে ওঠে: নাতাশা। তুই থামবি?

মাশা ও কাতিয়া একবার তাকায় আইরিনের মুখের দিকে, একবার নাতাশার দিকে।

পল্লব কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে: নাতাশা, তোমার ও আইরিনের মধ্যে কী হয়েছে আমি জানি না, তবে—

আইরিন বাধা দিয়ে বলে: হবে আবার কী? তোমারো যেমন কথা! দেখ দেখ, ঐ আর একটা নৌকায় কাণ্ড!

অদূরে একটি নৌকায় একটি যুবক এক যুবতীর কটি বেষ্টন ক'রে তার কানের কাছে যতই মুখ নিয়ে যায় মেয়েটি ততই মুখ সরিয়ে নেয় হাসতে হাসতে। হঠাৎ মেয়েটি হাত তোলে, যুবকটি তার হাত চেপে ধ'রে তাকে চুম্বন করে।

মাশা খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে: তোমাদের দেশে রাতদুপুরে খোলা নৌকায় এমন রোমান্স হয় কি কখনো?

পল্লব মুখ নিচু করে বলে: না।

কাতিয়া বলে: তা হ'লে আমাদের কাছে হার মানছ?

পল্লব কাতিয়ার দিকে চেয়ে মুখে হাসি টেনে বলে: তোমাদের কাছে জিতেছি আমি কবে?

নাতাশা বলে: আচ্ছা পল, একটা কথা বলবে খোলাখুলি?

কী?

আমাদের দেশের মেয়েদের স্বভাব তোমার কাছে খুব দূষ্য ঠেকে, নয়?

পল্লব প্রাণপণে সহজ হতে চেষ্টা করে হেসে বলে: তা যদি ঠেকত, তা হ'লে তোমার সঙ্গ আমি চাইতাম কি?

নাতাশা বলে: ছি: পল! সত্য বলা তোমার স্বভাব—কেন আজ মিথ্যার সুর ধরলে? নাতাশার স্বর কেঁপে ওঠে।

আইরিন বলে ওঠে: নাতাশা, তুই না থামলে আমি এখনি নেমে যাব।

নাতাশা ভ্রূক্ষেপও করে না, কম্পিতকণ্ঠে ব'লে চলে: পল! শোনো। তুমি কি ভাবো, কথা দিয়ে কাউকে ভোলানো যায়? মুখোশ পরে ঠকানো যায়?

মুখোশ?

নাতাশার স্বর তীব্র হয়ে ওঠে: তা ছাড়া কী? সত্যি করে বলো তো, কাল তুমি দুখানার বেশি টিকিট কেনোনি কেন?—শুধু জানতে বলেই নয় কি যে, তোমার কাছে মাত্র দুখানা টিকিট আছে জানলে আমরা আইরিন ছাড়া আর কাউকে পাঠাতেই পারব না?

মাশা চেঁচিয়ে বলল: নাতাশা! তোর মাথায় আজ কী ভূত চেপেছে, বল্ তো? আইরিন দাঁতে অধর চেপে ধরে হ্রদের দিকে চেয়ে থাকে। পল্লব 'নাতাশা'!—বলেই চুপ করে যায়। নাতাশা খপ করে ওর একটা হাত চেপে ধরে: পল! শোনো—আমি—আমি—ও ঠাট্টা করে বলেছি। ভুলে যাও, লক্ষ্মীটি!

পল্লব হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত দৃঢ়স্বরে বলে: নাতাশা, শোনো। তোমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার কেতা এটিকেট আমি না জানতে পারি, এ ক্ষেত্রে একা আইরিনকে নিয়ে গিয়ে অন্যায় করেও থাকতে পারি হয়ত—কিন্তু—কিন্তু কোন্‌টা ঠাট্টা আর কোন্‌টা নয়, এটুকু বুঝবার মতন বুদ্ধিও কি আমার নেই মনে করো?

নাতাশার মুখ রাঙা হ'য়ে উঠল: পল—আমাকে—আমাকে—

না, শোনো নাতাশা। আমার আচরণে ভুল-ভ্রান্তি হয় অনেক সময়েই। কিন্তু মুখোশ পরে চলা আমার স্বভাব নয়। আমি সত্যিই গিয়েছিলাম পাঁচখানি টিকিট কিনতে। আইরিনকে একলা নিয়ে যাবার সাধ আমার ছিল, স্বীকার করছি। কিন্তু মতলব ক'রে মাত্র দুখানা টিকিট কিনিনি—তোমাদের সবাইকে বাদ দিতে।

নাতাশা উত্তর দেবার আগেই আইরিন পল্লবের কাছে উঠে এসে ওর হাত চেপে ধরে: শোনো পল, নাতাশার আজ মন খারাপ আছে অনেক কারণে। নইলে এমন ইঙ্গিত সে করতেই পারত না যে, এ ক্ষেত্রে তুমি মতলব এঁটে তাকে বাদ দিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে। মেয়েদের মাথায় থেকে থেকে এক একটা ভূত এসে ভর করে—

নাতাশা বাধা দিয়ে পল্লবের অন্য হাতটি চেপে ধরে বলে আবেগ-কম্পিত স্বরে: লক্ষ্মীটি ভাই, আইরিনের এ কথা তুমি বিশ্বাস কোরো। সত্যিই আমার মন ভালো ছিল না নানা কারণে। তা ছাড়া—যে ভূতের কথা ও বলল, সে-ভূত ভর করে বেশি তাদেরি মাথায়, যারা ঝোঁকের বশেই চলে-ফেরে। এজন্যে যে আমাকে কত বার লজ্জায় পড়তে হয়েছে—ব'লে গাঢ়কণ্ঠে বলল: কিন্তু—স্বভাব তো আর মানুষের সহজে বদলায় না ভাই—তাই আজ আবার—কিন্তু সে যাক্, তুমি বলো—আমাকে ক্ষমা করেছ কি না?

পল্লব উভয়ের হাত থেকেই নিজের দু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে: ক্ষমা করার কথা থাক, কেন না আমি তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি। কেবল একটা কথা আজ আমি একটু পরিষ্কার করে নিতে চাই খোলাখুলি। তুমি জানো যে আইরিনের প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছি। কিন্তু সে কথা আমি লুকোইনি। কারণ

লুকোবার কোনো কারণই ছিল না। তবু তোমার যে মনে হয়েছে আমি অভিনয় করেছি মুখোশ পরে।

নাতাশা পল্লবের মুখ চেপে ধরে: না, শোনো—যখন খোলাখুলি কথাই চাইলে। তুমি কি মনে করো আমি জানি না আইরিনের রূপের কথা? কত পুরুষ যে ওর জন্যে পাগল—

আইরিন বলে: তুই থামবি নাতাশা!

নাতাশা বলে: না থামব না। শোনো পল! এ হেন মেয়েকে যদি তোমার আমার চেয়ে বেশি ভালো লেগে থাকে তবে তা নিয়ে অনুযোগ করা যে শুধু লজ্জার কথা তাই নয় নিছক ছেলেমানুষি, এটুকু বুঝবার মতন বুদ্ধি আমার আছে। তাছাড়া নিজের রূপে গুণে যা অর্জন করতে পারি নি কাড়াকাড়ি করে যে তাকে দখল করতে ছোটা যে পাগলামি এও কি কোনো মেয়ের কাছে অজানা থাকতে পারে? তবু যে থেকে থেকে কেন সব বুঝেও মানুষ বিপথকেই পথ মনে করে, বিপাকে পড়ে কেউ কি জানে? কথায় কথায় আমরা জাঁক করি বুদ্ধির কিন্তু আমাদের মনের নানা ফাঁকে ফাটলে যে কতরকম আশা বাসনা গা ঢাকা হয়ে থাকে বুদ্ধি দিয়ে কি সব সময়ে চিনতে পারি তাদের স্বরূপ? বলে অশ্রুজড়িত স্বরে বলে চলে: তাই তোমাকে এই মিনতি, আজকের কথা মনে রেখে আমার লজ্জা বাড়িও না। বলে নাতাশা জল ভরা চোখে ম্লান হেসে পল্লবের দিকে নিজের দুটি হাতই বাড়িয়ে দিল।

পল্লব ওর দুটি হাত নিজের দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে পর পর চুম্বন করল। আইরিন ফের উঠে এসে নাতাশার গলা জড়িয়ে ধরল। নাতাশা ওর বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

## তেইশ

দূর! বিছানায় শুয়ে কী আর হবে? শুধু এপাশ ওপাশ করা বৈ তো নয়? পল্লব ওর আরামকেদারাটি টেনে নিয়ে বসল জানালার কাছে। ঘরের মধ্যে সেনট্রালহীটিঙের গরম, হেঁটে এসে দেহ গরম, ভেবে ভেবে মাথা গরম। ও ঠাণ্ডার ভয় কোনোদিনই করত না। জানালা খুলে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। ওদিকে একটা গির্জার সরু চূড়ার উপরেই চাঁদ হাসছে, আর চাঁদকে ঘিরে পাতলা আলোকমণ্ডল চন্দ্রসভা। হঠাৎ একটা রাতের পাখির ছায়া। পাশের বাড়িতে বেহালা ও পিয়ানোর নহবৎ বাজছে। খানিক বাদে বাজনা থেমে গেল। চাঁদ মুখ লুকোলো মেঘের ঘোমটায়।

পল্লবের মনের অবসাদ কেটে গেছে এক নবশিহরণের স্পন্দনে। সংশয়ের আর পথ নেই। মনে পড়ে আইরিনের নানা ঠেশ দেওয়া কথা নাতাশা সম্পর্কে। ওর মন পুলকিত হয়ে উঠল আইরিন ওকে ভালোবেসেছে: আইরিন—আইরিন—আইরিন! কী মিষ্টি নাম। সঙ্গে সঙ্গে ওর আলোভরা মনে হঠাৎ এসে পড়ল একটা পাতলা দুঃখের ছায়া; যতই সরিয়ে দিতে যায় ততই সে হানা দেয় একটু পরে আরো জোরে ঠিক পেণ্ডুলামের মত। কিন্তু এ যে কল্পনারও অতীত! নাতাশাকে ওর যে সত্যিই বরাবর মনে হয়েছে দিদি। নাতাশাও ওকে উঠতে বসতে শুধু ভাই বলে সম্বোধন করা নয়—ওর হাজারো স্নেহের নিদর্শনে এই ইঙ্গিতই দিয়ে আসে নি কি যে পল্লব যেন ওর অনেকদিনের হারিয়ে যাওয়া, হঠাৎ ফিরে পাওয়া ভাই! সেই নাতাশা কি না-ও এ অভাবনীয় চিন্তাটির ছবি আঁকা থেকে মনকে ঠেকিয়ে রেখে অর্ধস্ফুট স্বরে বলে: আহা!

হঠাৎ ঘনঘটা। শোঁ শোঁ শোঁ। কোথায় বা চাঁদ, কোথায় বা তারা! ও তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে নাতাশার ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যায়—ফুটে ওঠে—ঐ যে—শুধু একটি হাসিভরা মূর্তি—আইরিনের! ওর কত কথাই যে আজ পল্লবের মনে আভাময় হ'য়ে ওঠে এক অভিনব রঙে রঙিন হয়ে! সংশয়ের কুয়াশার লেশও নেই আর। হাসি পায় নিজের নির্বুদ্ধিতার কথা ভাবতে। আইরিনের কোমল হাতটি যখন ওর কণ্ঠে লতিয়ে এলিয়ে পড়ল তখনো ও শুধু আবিষ্ট হয়েই রইল। আইরিন হয়ত ওকে ভেবেছে—কী ভেবেছে কে জানে? তবে সে-চিন্তার মধ্যে একটুখানি অবজ্ঞার ছোঁওয়া আছে এ নিশ্চয়, নৈলে ও বলত না গরম দেশের মানুষদের রক্ত কিঞ্চিৎ বেশি ঠাণ্ডা। আচ্ছা, শোধ নেবে ও একথা অপ্রমাণ করে—এর পরের বারে। হোঁচট না খেয়ে কে কবে চলতে শিখেছে?

আর আশ্চর্য! আজ মনে যেন কোনো দ্বন্দ্বই নেই। আইরিন ওকে ভালোবাসে, এর পরে আর দ্বিধা সংশয়, আগুপিছুর স্থান কোথায়? আকাশের ডাক শোনার পরেও কোন পাখি নীড়কে আঁকড়ে থাকে?

[ ক্রমশঃ।

# টুক্ টুক্ টুক্ লাজুকলতা

বাসুদেব পাল

টুক্ টুক্ টুক্ লাজুকলতা কাজলগাঁয়ের বউ—
লাজুকলতা কাজললতা স্বপনপুরীর মৌ।
গা-ছুম্-ছুম্ হায় কি গো লাজ গোপন-মনের কোণে;
স্বপ্ন তোমার ইন্দ্রপুরীর উর্বশী জাল বোনে!

টুক্ টুক্ টুক্ লাজুকলতা কাজলগাঁয়ের রাধা—
কৃষ্ণচূড়া তোমার নেশায় পাই গো লাজের বাধা!
সবুজ মনের অবুঝ নেশায় কনক-প্রদীপ জ্বালি;
কোন্ উদাসী সোহাগভরে সুভাষ দেবে ঢালি?

লাজুকলতা তোমায় ডাকে মৌ-পরীদের রাণী;
সোনার খাটে শয্যা পাতি শতেক সখী আনি।
'হায় গো মরি!' বলছে পারুল,—'এই কি লাজুকলতা'?
তোমায় নিয়ে বাঁধবো আমি রঙিন মনের কথা!

লাজুকলতা ঘোমটা খোলো লাজের বাহার ও কি!
বসন্তেরই ঘুঙুর বলে, 'হাতটি ধর সখি!'
অচিন দেশের পক্ষিরাজে চললো তারা ভেসে:—
লাজুকলতায় 'লাজুক' ব'লে এমন নাগর কে সে?

# খাওয়াচ্ছেন, না উপোসী রাখছেন!

বাড়ীর সবাইকে প্রচুর খেতে দিলেই হয় না। দিতে হয় সুসম খাদ্য — যাতে শরীরের পক্ষে দরকারী সবরকম খাদ্য-উপাদান থাকার ফলে তারা শক্তি ও উৎসাহ পায়।

বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, আমাদের সুস্থসবল থাকতে হ'লে পাঁচ রকমের খাদ্য-উপাদান দরকার — ভিটামিন, খনিজ লবণ, প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহ। এদের মধ্যে স্নেহপদার্থের গুরুত্ব খুব বেশী — কেননা স্নেহপদার্থ উত্তাপ যোগায়… রান্না খাবার সুস্বাদু করে এবং খাদ্যের ভিটামিন বহন করে।

## বনস্পতি—বিশুদ্ধ ও সুলভ স্নেহপদার্থ

দৈনিক আমাদের অন্তত: দু'আউন্সের মত স্নেহপদার্থ প্রয়োজন। বনস্পতি দিয়ে রান্নাবান্না করলে আপনি তার প্রায় সবটাই কম খরচায় অনায়াসে পেতে পারেন।

বনস্পতি খাঁটি উদ্ভিজ্জ তেল—বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরীর ফলে সাধারণ তেলের চেয়ে অনেক ভাল জিনিস। স্নেহপদার্থের স্বাভাবিক পুষ্টি ছাড়াও প্রতি আউন্স বনস্পতিতে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ' থাকে। ভিটামিন 'এ' ত্বক ও চোখ ভালো রাখে, শরীরের ক্ষয়পূরণ করে ও শরীর বেড়ে ওঠার সহায়তা করে।

বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষের সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে বনস্পতি স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক কারখানায় তৈরী করা হয়—বনস্পতি কিনলে আপনি বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যদায়ী জিনিস পাবেন!

**বনস্পতি**
গিন্নীদের পরম বন্ধু

VMA 66/7R

দি বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন অব্ ইণ্ডিয়া

পাহাড়ী রাস্তায় চলছে অভিযাত্রী দল। চোখে পড়ছে দু'-এক জন যাত্রী। ঐ পথ দিয়ে দূর গাঁও থেকে মাথায় কিম্বা পিঠে বোঝা নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তারা। হাটে-বাজারে বিক্রী করতে যাচ্ছে তাদের ফসল। কারোর কাছে তামাকপাতা, কেউ নিয়ে যাচ্ছে চাল, কেউ কমলালেবু, কেউ বা ঘি।

নেপালে আফিং-গাছ আছে। সামান্য পাট হয়, ধানও হয় আর কমলালেবু হয় প্রচুর। সারা নেপালে মাত্র চুরাশী লক্ষ লোকের বাস। চাষের জমি ওখানে নেই বললেই হয়।

এক জন চাষীর কাছে এক-ঝুড়ি কমলালেবু কিনলো লালী। চাষী হাঁ হয়ে চেয়ে থাকে, যেন কোন নতুন গ্রহ থেকে নেমে এসেছে এই লোকগুলো! সে হুঁসিয়ার ক'রে দেয়, নীচের জঙ্গলে, আশ-পাশের জঙ্গলে, আছে হিংস্র জানোয়ার। বাঘ ত আছেই, আরও আছে হাতী আর গণ্ডার। ভাল্লুক মাঝে মাঝে আসে।

টুশাং ওদের উৎসাহ দেয়, ভয় করতে বারণ করে। কথায় কথায় ওরা আবার একটা ছোট্ট গাঁয়ের কাছে এসে পড়ে। গাঁয়ের কাছেই ওরা তাঁবু খাটিয়ে থাকার আয়োজন করে। কাছাকাছি লোকের বাস দেখলে ভরসা হয়। কাঠের ভাঙাচোরা ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘর। ঘরের পাশে হয়তো পাহাড় কেটে কিছুটা জমি সমতল ক'রে নিয়েছে। সেখানে করেছে ছোট্ট বাগান। টম্যাটো ধরে আছে গাছে, ওপরে ন্যাসপাতি-গাছের ঝোপ, ন্যাসপাতি ঝুলছে।

রাস্তার ধারে হাপ্সি-ঝাপ্সি গায়ে চড়ানো ছোট ছোট বাচ্চারা দাঁড়িয়ে আছে। চুলগুলো মাথা ঝাঁপিয়ে কপালে এসে পড়েছে, ছোট কুতকুতে চোখ দিয়ে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। কোথাও বা ছোট্ট দোকান, কি সামান্য জিনিষপত্র নিয়ে তাদের বেচা-কেনা! ময়লা-ময়লা এক রকম খাবার সাজানো আছে কোনও দোকানে। কত্তো সামান্য জিনিষে ওদের প্রয়োজন মিটে যায়!

পথ চলেছে উত্তর-পূর্ব দিকে। এই দিকে বরাবর গেলে পড়বে সিকিম, ভুটান। আরও পূর্বে রয়েছে আসাম। টুশাং যেন ভূগোলের মাষ্টার মশাই।

দেখতে দেখতে চার দিন কেটে গেল। ক্রমেই জঙ্গল বাড়তে লাগলো। ঘন জঙ্গল। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন ঘন অন্ধকার গুঁড়ি মেরে বসে আছে পাহাড়ের গায়ে। নেপালের বাট ভাগ অঞ্চলই ত অরণ্য অঞ্চল। শাল-সেগুনের বন। অনেক জায়গায় মানুষ প্রবেশ করতে পারে না।

কিশোর জঙ্গল দেখলেই ভয় পায়। পার্বত্য অরণ্য সত্যই ভয়ঙ্কর! যে কোনও সাহসীর বুকও কেঁপে উঠবে। সে মাঝে মাঝে প্রতিবাদ জানাতে আরম্ভ করেছে। আর এগিয়ে দরকার নেই শান্তনু, সে বলে এই পথে আবার ফিরতে হবে, মনে রেখো। তা ছাড়া ঐ জঙ্গলের মধ্যে যদি রাত কাটাতে হয় তাহলে আর ফিরতে হবে না, বাঘের পেটে যেতে হবে।

এ কথায় লালী ও শান্তনু দু'জনেরই ভয় হলো, হবারই কথা, কিন্তু এতো কষ্ট ক'রে এতদূর এসে ফেরার প্রস্তাব অবান্তর নয় কি? সেটা কখনই সম্ভব নয়। শান্তনু শুধু বললে, এর মধ্যেই ভেঙে পড়লে চলবে না কিশোর, মনে রেখো; আমরা আমাদের সাহসের পরীক্ষা দিতেই বেরিয়েছি। ধৈর্যের পরীক্ষা এটা—শেষ পর্যন্ত আমাদের দেখতেই হবে।

ইতিমধ্যে ওরা একটা মনোরম জায়গায় এসে পড়েছে। আশে-পাশে ঘন অরণ্যে ছায়াময় অন্ধকার, সামনে অনেকখানি উন্মুক্ত প্রান্তর। চতুর্দ্দিকে উঁচু-নীচু নানা পর্বতশৃঙ্গের ঢেউখেলানো পাচিলের যেন আবেষ্টন। এটা একটা উপত্যকার মত। টুশাং বললে, এরই পূব দিকের পাহাড়টা অতিক্রম করলেই কাঞ্চনজঙ্ঘার চমৎকার চেহারা দেখা যাবে। আর ঐখান থেকে আরও পঞ্চাশ-ষাট মাইল গেলেই তুষাররাজ্য।

ঐ উপত্যকায় সে রাত্রের মত তাঁবু খাটালো ওরা। ষ্টোভে খাবার তৈরী ক'রে খেল। ঘোড়াদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শেরপা দুজন। একটু চরিয়ে আনবে আর লতাপাতা কিছু যদি খাওয়ানো যায়। কিন্তু চারাগাছ, লতাপাতার নাম-গন্ধ নেই—ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হলো শুধু! তখন দানা ছাড়া আর খাবে কি? তাই ঢেলে দিলে ওদের।

তাঁবুর মধ্যে রাত্রি কাটলো। গভীর রাত্রে একবার এক প্রচণ্ড শব্দে তাদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। টুশাং বললে, ওটা কিছু নয় ঝড় হচ্ছে।

সকালে আকাশ পরিষ্কার, ঝড় নেই—মেঘ নেই, আলো-ঝলমল সুন্দর প্রভাত। প্রভাত নিয়ে আসে চলার আহ্বান।

আবার পথে পা বাড়ালো যাত্রীরা। অনির্দেশ যাত্রা। দুপাশে

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

এখন পড়ছে ঝোপঝাড়। মাঝে মাঝে লম্বা ঢ্যাঙা মোটা মোটা গাছ। সিডার, পাইন, শাল, সেগুন কত গাছের যে জটলা! সবুজ পাতার চাঁদোয়া ধ'রে আছে যেন ঐ লম্বা ঋজু থামগুলি। আর সেই চাঁদোয়ার জাফ্‌রি দিয়ে সোনারঙের রোদ্দুর গলে গলে পড়ছে। নানা বন-বিহঙ্গ কল কাকলিতে সরগরম করে তুলেছে।

দেখ, দেখ, লালী বলে উঠলো, কী সুন্দর রঙের পাখীগুলো! সবাই তাকায়। বিহঙ্গদলও যেন বিজাতীয়দের অনধিকার প্রবেশে চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক উড়ছে। পথিকরাও যেন বহুদিন পরে প্রাণস্পন্দন হীন প্রকৃতির বুকে প্রথম জীবনের সাড়া পেল। অরণ্যের আয়োজনে প্রাণের উৎসব। কিশোর মুগ্ধ হয়ে রইলো কয়েক মিনিটের জন্যে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা আর এক জগতের পথিক যেন! পাহাড়ের একটা বাঁক পার হতেই দেখা গেল অন্য জগৎ। এক দিকের ঢালু নেমে গেছে পরের পাহাড়ের ঢালুর সঙ্গে মিশতে। মিলেছে সত্যিই এবং ঐ মিলনক্ষেত্র জুড়ে আছে এক কলনাদী জলস্রোত। উর্দ্ধের কোনো ঝরণা থেকে ঐ নদীর জন্ম। কী ব্যস্ততায় যে নেমে যাচ্ছে ঐ জলধারা!

কিন্তু, ও কি? টুশাং থমকে দাঁড়িয়ে সকলকে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করলো। চুপ! নড়াচড়া করবেন না। আঙুল দিয়ে কি যেন দেখাচ্ছে সে দূরে! ঐ পার্বত্য নদীর ওপারে হলুদ-কালো ডোরাকাটা এক আরণ্য বাঘ! রোদ্দুরে তার হলদে রং জ্বলছে। নদীর উপল-ছড়ানো তীরে নেমেছে সে জল খেতে। এ পারের মনুষ্যগন্ধ তার নাকে যায়নি, তাই জল খেয়ে সে নিজের ছন্দে চললো গজগমনে কেয়াবনের অন্ধকার ঝোপের মধ্যে।

লালী বললে, এ রকম দর্শনের দাম অনেক। খাঁটি জঙ্গলে খাঁটি বন্য বাঘ! চিড়িয়াখানার বন্দী জীব নয়।

যদি লাফ দিতো এপারে? কিশোর বললে।

আমাদের দেখতে পায়নি, টুশাং বললে, সেই জন্যেই ত দাঁড়াতে বললাম। নড়ন্ত জিনিষের ওপর শিকারী পশুর দৃষ্টি শতগুণ প্রখর হয়। তবে নিশ্চিন্ত থাকুন, লাফ দিয়ে ও আসতে পারতো না। নদীটা চওড়ায় প্রায় কুড়ি হাত হবে।

তাই নাকি? শান্তনু অবাক হয়ে যায়। কত সরু দেখাচ্ছে নদীটা এখান থেকে!

এখন থেকে পথ ক্রমেই দুর্গম হতে লাগলো। সব জায়গায় ঘোড়ায় চেপে যাওয়া যায় না। ঘোড়া ছেড়ে খালি হাতে-পায়ে অতিকষ্টে উঠতে হয়। ঘোড়াদের তুলে নেওয়া সে-ও বিপজ্জনক ব্যাপার! এদিকে ঠাণ্ডা আরও তীব্র হলো। হাত-পা অসাড় করে দিচ্ছে।

টুশাং-এর কথামত পুবদিকের টেমায়া পাহাড়েই উঠছিল তারা। টেমায়া পার হয়ে যেতে হবে। এর সর্বোচ্চ শিখরে উঠতে ওদের পুরো একদিন লাগলো। মাঝে মাঝে খাড়াই অংশগুলো পার হওয়া দুঃসাধ্য কাজ। লালীর পক্ষে বিশেষ করে খুবই কষ্টকর। এক জায়গায় একটা আলগা পাথর হটে গিয়ে তার পায়ে লাগলো বিষম চোট। ওষুধপত্র লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা হলো কিন্তু তার পক্ষে হাঁটা সম্ভব নয়। শান্তনুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো যেন। এই প্রথম তার মনে হলো, সে এতটা দুঃসাহসী হয়ে অন্যায় করেছে।

ভাগ্যক্রমে টেমায়ার চূড়ায় ছিল একটি গুম্ফা। কয়েক জন তিব্বতী লামা থাকতো এখানে। দূর থেকে শান্তনু দেখতে পেল উঁচু লাঠিতে লাগানো অসংখ্য ধ্বজা উড়ছে। ভূত-প্রেত তাড়াবার জন্যে লাগায় ওগুলি।

এই গুম্ফায় আশ্রয় পেল ওরা। ভগবান সত্যিই আছেন! উল্লাসে শান্তনু বলে ওঠে।

লামারা অত্যন্ত ধর্মভীরু। শান্ত স্বভাবের বলেই জানা ছিল। কিন্তু তরুণ অভিযাত্রীদের দেখে একজন লামা ত শিউরে উঠলো। ভাবটা বোধ হয় এই—করেছ কি তোমরা? ছেলেমানুষের মত জীবন নিয়ে খেলা করতে বেরিয়েছ? তার উপর, সঙ্গে মেয়েছেলে?

ওদের বিড়-বিড় করে কথা বলা, কেউই বুঝতে পারে না। আভাসে কিছুটা বোঝে একমাত্র টুশাং। টুশাং ওদের কথা শুনে এদের বললে, ভাল গতিক নয়। লামারা বেশ চটে গেছে—ওদের কথা হচ্ছে, যাদের যেমন দুর্বুদ্ধি তারা তেমনি কষ্ট পাক। ভগবান নাকি বলেছেন, কর্মের অনুরূপ ফল পেতে হবে। তাছাড়া, ওদের নির্জন তপশ্চর্য্যায় বিঘ্ন হচ্ছে ইত্যাদি—

শান্তনু, কিশোর দুজনে হতাশ হয়ে পড়লো। লালীর পায়ের ব্যথা নিয়ে সে শয্যাশায়ী। গুম্ফার একটা ছোট ঘরে ওদের জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে ওরা কম্বল বিছিয়ে বসলো। কি করা যায়, এখুনি কর্তব্য স্থির করে ফেলতে হবে। কোথায় বাংলা দেশের ঘর-বাড়ী, আর কোথায় তারা এখন? সব চেয়ে অসুবিধা হচ্ছে, লামাদের সঙ্গে কথা বলার উপায় নেই, কথা বোঝারও উপায় নেই। তাদের বুঝিয়ে বলার সুযোগ পেলে তাদের অনুগ্রহ চাওয়া সম্ভব হতো।

হঠাৎ শান্তনুর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে টপ করে উঠে তার ব্যাগ থেকে কয়েকটা কাগজপত্র বার করলো। টুশাংকে নিয়ে লামাদের ঘরে গেল। টুশাংকে বুঝিয়ে দিতে, সে ভাঙা-ভাঙা তিব্বতী ভাষায় বললে যে, এঁরা ভারত সরকারের লোক। নেপালের পাশপোর্ট সমস্তই আছে—এই বলে কাগজগুলো তাদের দেখালে।

ভিক্ষু তিয়েলিং

কাগজপত্রগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তিন জন লামা দেখলো। তারা কি বুঝলো তারাই জানে। তবে তাদের মুখে আরও রেখা পড়লো, রেখাগুলি আরও কঠিন হলো। মাথা নেড়ে শুধু তারা জানালো—না।

'না' মানে হয় তারা বুঝতে পারেনি, কিম্বা ওতে কাজ হবে না। সমস্যা আরও ঘনীভূত হলো।

এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার সবে মাত্র নামছে, রাত্রিতে ওদের থাকতেই হবে ওখানে।

ঠিক এমনি সময়ে এক জনকে দেখা গেল পাহাড়ের অন্য দিক থেকে মন্থর গতিতে আসছে। তার পেছনে দুটো পাহাড়ী ছাগল। ছাগল দুটি দুগ্ধবতী, তাদের গলায় দড়ি বাঁধা। দড়ি হাতে নিয়েই আসছে লোকটি। লোকটির রঙ কিছুটা ফরসা। নেপালী তিব্বতীয় ধরণেরই চোখ-মুখ, তবে কিছুটা অন্য রকম। সাজসজ্জায় তাকেও লামা বলেই মনে হয়।

লোকটি এসে দাঁড়াতেই অন্য লামারা মাথা নীচু করে তাকে অভ্যর্থনা করলো। ছাগল দুটিকে অন্যত্র বেঁধে লোকটি এদের কাছে এসে দাঁড়ালো। লোকটির চলাফেরা কাজ-কর্মের মধ্যে বেশ একটা সংযত শান্ত ভাব ছিল।

এদের দেখে লোকটি পরিষ্কার ইংরেজিতে জিগ্যেস করলো, কে তোমরা? কেনই বা এখানে এসেছ?

শান্তনুর মস্ত সুবিধা হলো এবার। সে অল্প কথায় কিছু কিছু বুঝিয়ে বললো। সে-ও প্রত্যুত্তরে প্রশ্ন করতে ভুললো না।

লোকটি তখন নিজের পরিচয় দিতে বললো, উত্তর-চীনে তার বাড়ী। পৃথিবীর অনেক জায়গায় যে ঘুরে বেড়িয়েছে। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে এবং শেষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে সন্ন্যাসী হয়েছে। কথায় কথায় শান্তনু বুঝলো, লোকটির অভিজ্ঞতা যেমন বিচিত্র, জ্ঞানও তেমনি গভীর। অনেক বিষয়েই সে এমন কথা বলে, যাতে তাকে পণ্ডিত বলে মনে হয়। আবার হৃদয়টিও তেমনি কোমল।

লালীর অসুস্থতার সংবাদে সে দুঃখ প্রকাশ করলো, এবং একজনকে নির্দেশ দিল ছাগদুগ্ধ এনে দেবার জন্য। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অন্য লামারা এই লোকটিকে অত্যন্ত খাতির এবং সম্মান করছে দেখা গেল।

পরিচয় পেয়ে শান্তনু, কিশোরও ভদ্রলোককে যথাযোগ্য সম্মানিত না করে পারলো না। ভদ্রলোকের নাম ভিক্ষু তিয়েলিং। এত বড় জ্ঞানী হয়েও ইনি এত বিনয়ী এত মিষ্টভাষী যে, সম্ভ্রমে আপনিই মাথা নিচু হয়।

আপনাদের মত আমিও এক সময় তরুণ ছিলাম, বলতে লাগলেন ভিক্ষু তিয়েলিং। আমিও ঘুরেছি কত স্বপ্ন বুকে নিয়ে। প্রকৃতি যেখানে সুন্দর, সেখানে যতই দুর্গম হোক পথ, আমি গিয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, চীন দেশের লোকের কানে কানে প্রকৃতি কথা কন। তাই চীনের চিত্রশিল্পে দেখবেন প্রকৃতিই সব। মানুষ সেখানে তুচ্ছ। অনন্ত আকাশ, উদার পর্বতশৃঙ্গ, কল্লোলিনী নদী, দিগন্তজোড়া সমুদ্র, চীনের শিল্পীর চোখ-ভরা এই স্বপ্ন।

[ ক্রমশঃ।

## গল্প হলেও সত্যি

### শ্রীভাস্কর দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষে তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ, সেই সময়কার ঘটনা, দলে দলে তরুণেরা স্বদেশীতে যোগ দিচ্ছে। বন্দিশালাগুলি স্বদেশীতে ভর্তি। মায়ের পরাধীনতার নাগপাশ খুলতে সচেষ্ট হয়েছে অধিবাসীরা।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি। লাহোর সেন্ট্রাল জেলের এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এক বাঙ্গালী তরুণ। তাঁর মুখমণ্ডলে দৃঢ়তার, অদ্ভুত দীপ্তিতে পরিপূর্ণ। সেই সময় অধিকাংশ জেলেই বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত। নখের মধ্যে সুঁচ ফুটিয়ে দেওয়া, লোহার নালপরা বুটের আঘাত, আরও কত রকমের অত্যাচার করা হত তার ইয়ত্তা নাই। তরুণ বন্দীর সহকর্মীদের উপরও ঐরূপ অত্যাচার করা হত। তা দেখে সমস্ত বন্দীর অন্তর বিদ্রোহ করে উঠল।

সমস্ত প্রকার আবেদন ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করেও ইহার কোন সুফল পাওয়া গেল না। বৃটিশ জেলের ইংরেজ কর্মচারী কর্ণপাত করল না। অবশেষে বাংলার এই বিপ্লবী তরুণ এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসলেন। তিনি অনশন ধর্ম্মঘট শুরু করলেন। জলও পান করেন না।

একদিন যায়, দু'দিন যায়, তিন দিন যায়, তবুও জলস্পর্শের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা হয়, তাও সেই এক জেদ। যত দিন পর্য্যন্ত না জেলে অত্যাচার বন্ধ হয় তত দিন জলস্পর্শ করব না। জেল-কর্তৃপক্ষ এক অভিনব পন্থা বার করলেন। তাঁরা বিপ্লবীর সেলে দুধভর্ত্তি কুঁজো রেখে দিলেন। ভাবলেন, এই বাঙালী তরুণকে একদিন না একদিন ঐ দুধই পান করতে হবে। কিন্তু তরুণকে চিনতে কর্তৃপক্ষের ভুল হয়েছিল। বিপ্লবীর দুর্জ্জয় পণ ভাঙ্গে না।

শরীর ভেঙ্গে পড়ে, মাথা ঘোরে, স্নায়ুতন্ত্র দুর্ব্বল হয়ে আসে। তবুও অনশনের বিরাম নাই।

বাঙালী বন্দী সেদিন দুধভর্ত্তি কুঁজোর দিকে তাকিয়ে আছেন। আকণ্ঠ তৃষ্ণা—আর পারা যায় না। এক মাস পার হয়ে গেছে আর পারা যায় না, মৃদু পায়ে কুঁজোর কাছে গেলেন, আস্তে আস্তে মুখের কাছে তুলে ধরলেন।

এক সেকেণ্ড যায়, দু' সেকেণ্ড যায়, তার পরেই কুঁজোটাকে ছুঁড়ে মারেন মেঝেতে। সশব্দে পাত্র ভেঙ্গে চৌচির, দুধে ঘর ভর্ত্তি।

সেই দিন মনের সঙ্গে সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটল। আকণ্ঠ তৃষ্ণা, অভুক্ত জঠর নিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর তাঁর নশ্বর দেহ মায়ের মুক্তিকামনায় উৎসর্গীকৃত হল। ইনি কে জান? বাংলার অন্যতম বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন দাস।

## আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের শিশুবেলা

### শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

একশ' বছর আগেকার কথা। তখনকার দিনে ছেলেদের ইংরাজি স্কুলে পড়ান আভিজাত্যের লক্ষণ বলে গণ্য হ'তো। বড় সরকারী অফিসারদের ছেলেরা সাধারণত পড়ত ইংরাজি

গয়না ঝিক-মিক করছে। তার একখানা গহনার মূল্য রাজার রাজত্বেরও বেশি। পরনে মূল্যবান শাড়ি। যা মানুষে কখনো দেখেনি। সারা বিছানায় এক আশ্চর্য রকম ফুল ছড়ানো। সে ফুলের গন্ধে মন উতলা হয়ে যায়।

সবাই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। তিলোত্তমা উত্তর দিলো, তাকে ঘরের ভিতর ঢুকিয়ে দিলে সে কাঁদতে-কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। আর কিছুই জানে না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা আবার সাপটা এসে বাসরঘরে উঠলো। সেদিন সাপ দেখে কারো তেমন ভয় করলো না। আবার তিলোত্তমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে সবাই গোপনে পাহারা দিতে লাগলো। রাত এক প্রহর গেলো, দ্বিপ্রহরও প্রায় শেষ। ঝিঁঝির ডাকটি পর্যন্ত নেই। রাত গভীর নিশুতি থমথম করছে। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলো সেই সাপটা দিব্যসুন্দর একটি রাজপুত্র হয়ে গেলো। শুধু পড়ে থাকলো সাপের খোলসটি। রাজপুত্র সেদিনও ঘুমন্ত তিলোত্তমাকে সুন্দর-সুন্দর গহনা পরালো, কত আদর করলো। রাত পোহাবার আগেই রাজপুত্র আবার সাপের খোলসে ঢুকে গেল।

পরদিন সকালবেলায় তিলোত্তমাকে সবাই বললে আর শিখিয়ে দিলে, রাজপুত্র যেমন বেরোবে অমনি খোলসটা প্রদীপের আলোয় পুড়িয়ে ফেলতে। হলোও তাই। তিলোত্তমা ঘুমের ভাণ করে আছে, রাজপুত্র যেই বেরিয়েছে অমনি ছুটে গিয়ে খোলসটা দিলো পুড়িয়ে। রাজপুত্র হায় হায় করে উঠলেন।

ভোরবেলা রাজপুত্র আর সাপ হতে পারলেন না। সবাই রাজপুত্রকে দেখে কী খুশি! এমন রূপ কেউ কখনো দেখেনি। রাজামশাই অমন সোনার জামাই পেয়ে কত খুশি, কত আদর-যত্ন করতে লাগলেন।

হিংসুটে সুয়োরাণী হিংসার জ্বালায় করলো কী, বন থেকে বিরাট একটা অজগর সাপ ধরে এনে নিজের মেয়ে সুউত্তমার সঙ্গে বিয়ে দিলো। খুব হুলুস্থুল, হৈ-হৈ, রৈ-রৈ, বাজী-বাজনা করে সন্ধ্যালগ্নে বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পরে সাপটাকে বাঁধন খুলে বাসরঘরে পালঙ্কের উপর ছেড়ে দিয়ে সুউত্তমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো।

সাপটা মানুষের গন্ধে গর্জন করতে লাগলো। ছোবল মারতে লাগলো। সুউত্তমা কেঁদে উঠলো, মা গো, আমার গলা গেল।

বাইরে থেকে সুয়োরাণী অমনি বলে উঠলো, মা গো আমার, গয়না পরো, গজমোতির হার পরো।

সুউত্তমা কেঁদে বলে, মা, আমার হাত গেলো।

সুয়োরাণী উত্তর দেয়, মা গো হীরের বালা পরো।

রাজকন্যা যতো কাঁদে, সুয়োরাণী ততো বোঝায়। ভোররাতে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। যেমন রাত পোহালো, অমনি সুয়োরাণী লোক-লস্কর নিয়ে ঢুকে গেলো বাসরঘরে। কোথায় বা অজগর সাপ, কোথায় পালিয়ে গেছে বনে। রাজকন্যা নীল হয়ে মরে গেছে। হিংসুটে সুয়োরাণীর উপযুক্ত শাস্তি হলো।

এদিকে তিলোত্তমা খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। কিন্তু তার স্বামীর নাম-পরিচয় জানবার বড় আগ্রহ। রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করলে কিছুই বলেন না, শুধু হাসেন আর বলেন, আমার চেয়ে কি আমার নাম বড়?

তিলোত্তমার সঙ্গিনীরা রাজপুত্রের নাম জানবার জন্ত বড় আগ্রহ করে। তিলোত্তমা নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলেন, রাজপুত্রকে নাম বলতেই হবে।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিলোত্তমার বিয়ের তিথি। রাজপুত্র বললেন, চলো, শ্বেতনদীতে যেয়ে বলবো আমার নাম। দুজনে চললেন শ্বেতনদীর পারে। রাজপুত্র শ্বেতনদীর ধারে রাজকন্যাকে কতো বোঝালেন, কতো আদর করলেন, বললেন, আমাকে চাও, না আমার নাম চাও? ভ্রমান্ধ রাজকন্যা উত্তর দিলেন, তোমার নাম চাই।

রাজপুত্র জলে নামলেন—হাটুজল, কোমরজল, তখনও রাজপুত্র বলছেন, আমাকে চাও, না আমার নাম চাও?

আরো জলে—আরো জলে।

—তোমার নাম চাই।

চিবুক পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রাজপুত্র বললেন, আমার নাম বন-বিদ্যাধর, যাও কন্যা ঘর।

আর রাজপুত্রকে দেখা গেল না। রাজকন্যা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জলের তলের মধ্যে দেখলেন, ইন্দ্রের সভায় কাঁচা সরার উপর দাঁড়িয়ে উর্বশী, মেনকা নৃত্য করছে, আর বন-বিদ্যাধর মৃদঙ্গ বাজাচ্ছেন। তিলোত্তমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলেন স্বর্গরাজ ইন্দ্র।

মনের দুঃখে কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে এলেন তিলোত্তমা। কান্না আর ফুরোয় না। শুধু কান্না। চোখের জলের নদী হয়ে বয়ে গেলেন তিলোত্তমা।

এখনও বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কত দূর-যাত্রী শুনতে পায় রাজকন্যার আকুলি-বিকুলি।

আজও চম্পাবনের ধারে শোনা যায়: থাক্, থাক্ কন্তে, কাল তোর বিয়ে।

## সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর

### শ্রীসমীরকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্ভবতঃ পলিমাটির দেশ বলিয়াই আমাদের জীবনের কোনও ভাগে কোনও বনিয়াদ পাকা হইতে পারে না—মাটির উপরেও যেমন কোন চিহ্ন থাকে না, মনের ভিতরেও সেরূপ কোনও স্মৃতি পুষিয়া রাখি না, তাই বেশী দিন নয়,—গত শতাব্দীর যে ইতিহাস যাহা এখনও এযুগ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, এবং সে যুগ গত সহস্র বৎসরের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে—সেই যুগের যাহা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—সেই সাহিত্যকে আমরা ভুলিতে চাহিয়াছি।

বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর এই প্রথম খণ্ডে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আদি রূপটি ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে সাহিত্যিক মূর্ত্তি এখানে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা তাঁহার চির-পরিচিত প্রতিকৃতিকেও অ-পূর্ব্বপরিচিত করিয়া তুলিয়াছে, তিনি যে কেবল গদ্যের আবিষ্কর্তা নহেন, পরন্তু তাঁহার রচনা যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সর্ব্বগুণান্বিত ক্লাসিক—বেতালপঞ্চবিংশতি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার আত্মজীবনচরিত পর্য্যন্ত পাঠ করিলে প্রতি পত্রে ও প্রতি

ছত্রে তাহার প্রমাণ মিলিবে। ইহার বাক্যগুলিতে এমন একটি নির্ম্মল প্রসন্নতা ও স্নিগ্ধ গম্ভীর মাধুর্য্য আছে, যাহা বাংলা গদ্যের আজিকার এই বিচিত্র বিকাশের পরেও একটি বিশিষ্ট ও দুর্ল্লভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। মনে হইল এত দিন পরে একটি বস্তুর প্রকৃত পরিচয় পাইলাম, যে বস্তু—বাংলা গদ্যসাহিত্যের, রোমান্টিক নয়, খাঁটি ক্লাসিকাল রীতি।

সংস্কৃত সাহিত্যের অর্থাৎ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতির—অতিশয় পেলব ও মার্জ্জিত, শুদ্ধ ও সংযত রসনৈপুণ্যের সঙ্গে আধুনিক মনোবৃত্তি অনুযায়ী যুক্তিনিষ্ঠা, পরিমাণবোধ ও স্বাভাবিকতা—এই দুই-এর মিলন ঘটিয়াছে—এই রচনার ষ্টাইলে। সংস্কৃত কবিগণের প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ ছিল তাহাই আধুনিক আদর্শে, যুগপ্রবৃত্তির শাসনে সংযত হইয়া বাংলাভাষার নবরূপ নির্ম্মাণের প্রেরণা হইয়াছিল। মধুসূদন দত্ত কাল ও প্রাণের যে সাধনায় বাংলা অমিত্রচ্ছন্দ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও আর এক পথে তেমনই সাধনার ফলে এই গদ্যছন্দ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা গদ্যের ছন্দ-ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারই উপরে বঙ্কিম ও পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কারুকীর্ত্তির অশেষ নিদর্শন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমি কেবল তাঁহার এই প্রথম গ্রন্থ বেতালপঞ্চবিংশতি হইতে একটি বাক্যছন্দের উদাহরণ দিব। ইহার শব্দাড়ম্বর লক্ষ্য না করিয়া—লেখকের প্রাণ যে শব্দার্থ নিরপেক্ষ সুর-মহিমায় অভিভূত হইয়াছে, এবং কান সেই সুরকে ভাষায় ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাই লক্ষ্য করিতে বলি।

একই ঘটনা কাহিনীর মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে দুই বার বিবৃত হইয়াছে। প্রথম বারের কথাগুলি এইরূপ—

তথায় তিনি, রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক দর্শনাদি করিয়া নির্গত হইলেন; এবং সমুদ্রে দৃষ্টিপাত মাত্র দেখিতে পাইলেন, প্রবাহমধ্য হইতে এক অদ্ভুত স্বর্ণময় মহীরুহ বহির্গত হইল। ঐ মহীরুহের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া, এক পরম সুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী, হস্তে বীণা লইয়া, মধুর কোমল তানলয় বিশুদ্ধ স্বরে সঙ্গীত করিতেছে।

এই কথাগুলির পুনরাবৃত্তি অন্যরূপ—যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান রামচন্দ্র, দুর্ব্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংসবিধান বাসনায়, মহাকায়, মহাবল কপিদল সাহায্যে, শতযোজন বিস্তীর্ণ অর্ণবের উপর, লোকাতীত কীর্ত্তিহেতু, সেতু সঙ্ঘটন করিয়াছিলেন—তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভের প্রবাহমধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক স্বর্ণময় ভূরুহ বিনির্গত হইল। তদুপরি এক পরম সুন্দরী রমণী বীণাবাদনপূর্ব্বক মধুর স্বরে সঙ্গীত করিতেছে।

পূর্ব্বের ঐ ভাষাই যথার্থ ও পরিমিত—বাক্যরচনা হিসাবে অনবদ্য। পরবর্ত্তী রচনায় লেখক বিষয়বস্তুকে যেন অগ্রাহ্য করিয়া কেবলমাত্র ভাষার সঙ্গীত-তরঙ্গে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। আদর্শ গদ্য ইহা নহে, কারণ ইহাতে শব্দ অর্থের পরিমাণ সামঞ্জস্য নাই, কিন্তু ইহাতে যতিতাল সংযোগে কি অপূর্ব্ব ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে—একটি অখণ্ড সুর অল্প পরিসরের মধ্যে পূর্ণবিকশিত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার নাই—এই ভাষাই যে বাংলা গদ্যসাহিত্যের আদি সাধুভাষা, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেতালপঞ্চবিংশতি এবং তার পরেই শকুন্তলায় আমরা ভাষার যে রূপ দেখিতে পাই তাহা বাংলারই সাধু রূপ—যেমন বিশুদ্ধ তেমনই প্রাঞ্জল। শকুন্তলায় কথোপকথনের ভাষা বিশেষতঃ নারীচরিত্রগুলির—একেবারে খাঁটি বাংলা বলিলেই হয়। কিন্তু সীতার বনবাসে—ভাষার সে লঘুলীলা আর নাই, সে ভাষা শুধুই সাধু নয় গুরু-ভাষা।

এই গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত দুইটি রচনা এই মহাপুরুষের কীর্ত্তিগত পরিচয়কে ব্যক্তিগত পরিচয়ের দ্বারা পূর্ণতর করিয়া তুলিবে। ইহাদের একটির নাম প্রভাবতী-সম্ভাষণ; অপরটি তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বাল্যজীবনের যে স্মৃতি, নিজ বংশ-পরিচয় ও পিতৃমাতৃকুলের যে কয়েকটি চরিত্র, এবং নিজ পরিবারের যে কঠোর দারিদ্র্য ইহাতে যেরূপ নিষ্ঠার সহিত বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে সেই ভবিষ্যৎ মহামহীরুহের মৃত্তিকানিহিত শিকড়গুলির এবং অঙ্কুরকালের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মত মূল্যবান আর কিছুই নাই। উত্তরকালের যে বিরাট মনুষ্যত্বের চূড়া বাংলাদেশের আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার ভিত্তি স্থাপনা যদি কেহ চাক্ষুষ করিতে চান, তবে এই অসমাপ্ত আত্মজীবনচরিত সে পক্ষে যথেষ্ট।

## বাবলী

### মানিক মুখোপাধ্যায়

দুষ্ট মেয়ে বাবলী খাচ্ছে আলু-কাবলি  
গিয়ে সে বার আগ্রা কিনলো ইয়া ঘাগরা।  
তার যে ভাই বুলকি রাখলো বড়ো জুলপি  
গিয়ে সে বার আগ্রা কিনলো ইয়া নাগরা।  
তার যে মাসী কিল্লী গিয়ে সে বার দিল্লী  
আনলো কয় গণ্ডা মোগলশাহী মণ্ডা।  
সে বার যেয়ে পালাতে পড়লো ধরা টালাতে  
পাকড়ে তার কানটা বাবা করেন ঠাণ্ডা।  
তখন রেগে বাবলী ধরলো ভারী কান্না,  
বাবা বলেন, হাবলী, ঢের হয়েছে, আর না।

## বাউল গান

বাংলার বিভিন্ন ধর্মধারার মধ্যে বাউল-ধর্মের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এটি একটি সমন্বয়মূলক ধর্ম। সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম, সুফীধর্ম এবং কিছু পরিমাণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম এর কাঠামো নির্মাণ করেছে এবং হিন্দু মুসলমানের মিলিত াধনা একে রূপদান করেছে। এই ধর্ম লোকধর্ম—গণধর্ম শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত জনগণের ধর্ম। এরা দৃঢ় বিশ্বাস আর বিচলিত নিষ্ঠা নিয়ে সমাজ-জীবন থেকে পৃথক হয়ে এদের ূঢ় সাধনা আঁকড়ে বসে আছে। নানা প্রতিকূল অবস্থার ম্মুখীন হয়েও এই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্যন্ত তাদের ক্ষীণ স্তিত্বটুকু বজায় রাখতে পেরেছে।

বাউল আর বাউল গান সম্বন্ধে আমাদের অনেকের ধারণা পষ্ট নয়। চুল-দাড়ীওয়ালা কোনো বৈষ্ণব ভিখারী যদি ভক্তিমূলক া বৈরাগ্যসূচক গান গায়, আর সেই গানের সুর যদি পল্লীগানের তো হয় তবেই আমরা গায়ককে বাউল বলি আর তার ানকে বাউল গান বলে ধরে নিই। বাউল গানের সুরের কটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তার মর্ম স্পর্শ করবার ক্ষমতা াছে। সেই সুরের মাধুর্য ও বিশিষ্ট ভঙ্গী থাকলেই আমরা যে কানো গানকে বাউল গান বলি। বাউল কারা, কি তাদের র্মমত, কি ভাবে তারা জীবন যাপন করে, প্রকৃত বাউল গান া'কে বলে, এসব খবর নেওয়ার আর প্রয়োজন বোধ হয় না।

বাউল একটি নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত লোক। বাউলদের র্মের তত্ত্ব ও দর্শন আছে, সাধন-পদ্ধতি আছে, সাধক-ীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আছে, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি ষ্টিভঙ্গী আছে। এই সমস্তই তাদের গানে ব্যক্ত হয়েছে। ই সম্প্রদায়ের সাধকগণের তত্ত্ব-দর্শন ও সাধনা-সংবলিত গানই কৃত বাউল গান। ভগবদ্‌ভক্তিমূলক বা বৈরাগ্যসূচক বা ন্দর্শনের দু'-একটি তত্ত্বমূলক গানের ভাষা সহজ ও প্রচলিত উল গানের মতো, আর সুর পল্লীগানের সুরের মতো হলেই তা উল গান হয় না। একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতের সাধকদের দ্বারা চিত নিজেদের ধর্মতত্ত্ব, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ গানই প্রকৃত উল গান। এই গানই বাউলদের ভাব ও অভিজ্ঞতা প্রকাশের কমাত্র মাধ্যম আত্মপ্রকাশের একমাত্র পথ। এই গান সাধারণতঃ চিত হয় গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা বা উচ্চশ্রেণীর সাধকদের রা। বর্তমানকালের শিক্ষিত শহরবাসী অনেকে ভাষা, সুর ও ী অনুকরণ করে বাউল গান রচনা করছেন, আর নির্বিচারে তা নেমা বা রেডিও ও নানা বৈঠকে গীত হচ্ছে। কিন্তু এগুলি প্রকৃত বাউল গান নয়। সখ করে বা ভঙ্গী অনুকরণ করে প্রকৃত বাউল গান রচনা করা যায় না। সত্যকার বাউল গান বাউল সাধকদের দ্বারা রচিত হওয়া প্রয়োজন, নইলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হবে গানের পসরা।

একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতের উপাসকদের বাউল বলা হয়। সারা বাংলায় এই শ্রেণীর ধর্মোপাসকদের একই বাউল নামে অভিহিত করা হয় না। এই ধর্মমতের সাধকদের মধ্যে জাতিতে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকই আছে। পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জাতির এই সকল সাধককে 'ফকির' বলা হয়। সাধারণ ফকিরদের সঙ্গে এদের প্রভেদ বুঝাতে এদের, 'নেড়ার ফকির' বলা হয়। কোনো কোনো স্থানে এদের 'বে-শরা ফকির' বা 'মারফতী ফকির' বা 'বেদাতী ফকির'ও বলে।

'নেড়া' অর্থে মুণ্ডিতমস্তক ব্যক্তি। বৌদ্ধ সাধকদের মস্তক মুণ্ডন ধর্মজীবনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। বাংলাদেশ প্রায় চারশ' বছর পালরাজগণের শাসনাধীন ছিল। পালরাজগণের সময় বাংলাদেশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একটা কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। এই সময় বজ্রযান ও সহজযানপন্থী বৌদ্ধগণ বাংলাদেশে বিশেষ ভাবে বিস্তৃতিলাভ করে। নিম্নশ্রেণীর অগণিত জনসাধারণ এক সময়ে বৌদ্ধ সহজিয়া মতের উপাসক ছিল। তারপর মুসলমান আগমনের পর নানা কারণে এদের অধিকাংশই মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে নূতন ধর্মে দীক্ষিত হলেও তারা তাদের পূর্ব সাধনার ধারাটি ত্যাগ করেনি। মুসলমান জাতিতে রূপান্তরিত ও হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত এই জনগণ তাদের পূর্বাচরিত ধর্ম-সাধনাকে অতি সঙ্গোপনে অনুসরণ করে চলেছে। এরাই বর্তমানে 'ফকির' নামে পরিচিত। এরা জাতিতে মুসলমান হলেও মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধসাধকগণের মতো ধর্মাচরণ করে বলে এদের 'নেড়ার 'ফকির' বলা হয়। তান্ত্রিক বৌদ্ধসহজিয়া মতবাদ ও সাধনা এবং এই সব ফকিরদের—এই মুসলমান বাউলদের মতবাদ ও সাধনার মধ্যে মূলতঃ কোনো প্রভেদ নেই। এদের উপর সুফীধর্মের অনেকটা প্রভাব পড়েছে, চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে, কিন্তু মূল সাধনার ধারাটি অব্যাহত থাকায় সেই মূল পরিচয়টি নষ্ট হয়নি।

নিম্নশ্রেণীর আর এক অংশ যারা মুসলমানধর্মে রূপান্তরিত হয়নি, অথচ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের দ্বারা অবহেলিত এবং সমাজ থেকে বহিষ্কৃত অবস্থায় ছিল, তারা বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনাকে মূলত বজায় রেখেই বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধধর্ম থেকে যে এরা বৈষ্ণবধর্মে এসেছে, তাই জানাবার জন্য এই সব সাধক-সাধিকাকে বলা হয়েছে 'নেড়া-নেড়ী'। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র

এই বৌদ্ধ সহজিয়াদের বৈষ্ণবধর্মের আওতার মধ্যে এনেছিলেন বলে বলা হয়।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুজাতির এই সব সাধককে সাধারণতঃ বাউল বলা হয়। উত্তরবঙ্গে এরা এই নামে পরিচিত। অনেক স্থানে এদের 'রসিক বৈষ্ণব', 'রসিক-পন্থী' বা 'রাগানুগা-পন্থী' বৈষ্ণব বলা হয়; এরাও নিজেদের ঐ নামে অভিহিত করে। সাধারণ লোক এদের শুধু 'বৈষ্ণব' বলে।'

মুসলমান ফকির ও হিন্দু বাউল বা রসিক বৈষ্ণব—সকলেই একতত্ত্বের উপাসক, সাধনার পদ্ধতিও এক এবং সাধন-সংক্রান্ত আচার-ব্যবহারও সমান। সুতরাং সারা বাংলার এই শ্রেণীর সমস্ত সাধককেই এক 'বাউল' নামে অভিহিত করা যায়, আর এদের ধর্মের তত্ত্ব, দর্শন ও সাধন-পদ্ধতি সংবলিত গানই প্রকৃত বাউল গান।

সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের প্রাকৃত রূপ নিয়ে 'বাউল' শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত 'বাউল' শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের লোককে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়নি। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', 'চৈতন্যচরিতামৃত', চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদ প্রভৃতিতে 'বাতুল' শব্দেরই প্রাকৃত রূপ হিসাবে আমরা 'বাউল' শব্দটি পেয়েছি। এই মূল 'বাতুল' অর্থাৎ উন্মাদ কি ভাবোন্মাদ অর্থ থেকে পরবর্তীকালে একটি বিশিষ্ট ভাবের নিরন্তর আবেগে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য বা ভাবোন্মাদ বা ধর্মোন্মাদ, বেশ-বাস ও আচার-ব্যবহারে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতির বন্ধনমুক্ত, লোকাচার-পরিত্যাগী, আত্মকর্ম-সমাহিত উদাসীন ধর্মসাধকগণ বাউল নামে পরিচিত হয়েছে। এখনও অনেক বাউলকে—বিশেষতঃ রাঢ়ের বাউলকে 'ক্ষেপা' (ক্ষিপ্ত) নামে অভিহিত করা হয়।

বাউলরা নানা কারণে সমাজের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে অনিচ্ছুক। আত্মসংকোচনশীল, আত্মগোপনশীল জীবনযাত্রার রীতি এই বাউলদের। একটা ভাবের ঘোরে সংসার ও সমাজকে উপেক্ষা করে এরা নিজের মনের সঙ্গেই লীলা করে।

একটি গানে আছে,—

আঁট ভাব অন্তরে রাখে,  
বাইরে সে উড়ন-পেকে,  
বুঁদ হয়ে বসে থাকে সে আপন স্বভাবেতে।  
(ও সে) কভু হাসে, কভু কাঁদে,  
কভু নাচে, কভু যাচে,  
সদা সমান ভাব তার শুচি-অশুচিতে।  
ভাল কি মন্দ দুয়ে  
তাদেক দ্বারেতে থ্ুয়ে  
পাষাণে বেঁধে হিয়ে রহে আনন্দেতে।

আর একটা গানে আছে,—

ভাবের ভাবুক, প্রেমের প্রেমিক  
হয় রে যে জন,  
ও তার বিপরীত রীতি-পদ্ধতি,  
কে জানে কখন  
কি থেকে কেমন। (ভাবের মানুষ)

তার নাই আনন্দ-নিরানন্দ  
লভি নিত্য প্রেমানন্দ  
আনন্দ সলিলে যেন  
তার ভাসছে দুনয়ন,  
ও সে কখন আপন মনে হাসে  
আবার কখন বা করে রোদন।

* * * *

তার চন্দনে হয় যেমন প্রীতি  
পাঁক দিলেও হয় তেমন তৃপ্তি,  
চায় না সে ধন-জন-খ্যাতি  
তার তুল্য পর আপন।  
সে আসমানে বানায় ঘরবাড়ী  
দগ্ধ হলেও এ চৌদ্দ ভুবন

এই ভাবের ঘোরেই তারা উন্মত্ত বা ক্ষিপ্তের মতো অবস্থান করে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাতেও এমন অনেক বাউল দেখেছি,—চারিদিকের ঘটনাপ্রবাহে নির্লিপ্ত—সর্বদাই অন্যমনস্ক ভাবে মৃদু মৃদু হাসছে। তাদের দেখে তাদেরই গানের একটা অং[illegible] আমার মনে পড়েছে,—

মহাভাবের মানুষ হয় যে জনা,  
তারে দেখলে যায় রে চেনা;  
(ও) তার আঁখি দুটি ছলছল  
মৃদুহাসি বদনখানা।

বাউলরা কি ভাবে সাধনা করে, সেই সাধনার কি পদ্ধতি, কি তাদের মতবাদ, তা ঘুণাক্ষরেও অন্যকে জানতে দিতে চায় না। তাদের সাধু-গুরুর নির্দেশও তাই,—

আপন ভজন-কথা  
না কহিবে যথা-তথা  
আপনাতে আপনি হইবে সাবধান।

ঢাকার নরসিংদি বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে—

রাগের আচার শুনিতে দুষর  
বেদের আচার ছাড়া।

'রাগের আচার' অর্থাৎ বাউল-সম্প্রদায়সম্মত ধর্মের যে ক্রিয়া-কলাপ, তা প্রকাশ্যভাবে বলা বাউলের পক্ষে দূষণীয়। আত্মগোপন করে প্রকাশ্যভাবে 'বেদের আচার' অর্থাৎ চিরাচরিত হিন্দু-ধর্ম-কর্মের কথাই বলতে হবে।

বাউল-গানগুলি বিশ্লেষণ করলে বাউল-ধর্মের কতকগুলি মূল বৈশিষ্ট্য বা উপাদান লক্ষ্য করা যায়। বাউল-ধর্ম যে বেদবহির্ভূত ধর্ম এবং এই ধর্মসাধনায় যে বেদবিধি ত্যাগ করতে হবে, এই ভাব অনেক গানে ব্যক্ত হয়েছে। বেদ-বিধি অর্থে বাউলরা বুঝেছে চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম। তাদের আচার রাগের আচার, বেদের আচার নয়। বাউলগুরু লালন শাহের একটি গানে আছে—

কার বা আমি কে বা আমার  
আসল বস্তু ঠিক নাহি তার,  
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার  
উদয় হয় না দিনমণি

বেদানুমোদিত নানা আনুষ্ঠানিক ধর্মের অর্থহীন অনুষ্ঠানে প্রকৃত সত্য লাভ করা যায় না। এই মূল্যহীন গতানুগতিক ধর্মের অনুষ্ঠান-সর্বস্বতায় চারিদিক যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে. প্রকৃত জ্ঞানের সূর্য উদিত হচ্ছে না এবং প্রকৃত ধর্মের সন্ধানও কেউ করছে না। ফকিরগণ বেদ-বিধি বলতে তাদের আনুষ্ঠানিক শরীয়ত ধর্মকেই বুঝিয়েছে।

লালন আর একটি গানে বলছেন—

বেদে কি তার মর্ম জানে।
যেরূপ সাঁইর লীলা-খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে।
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,
মানুষ-তত্ত্ব ভজনের সার,
বেদ ছাড়া বৈ রাগের মানে।

এই দেহরূপ ভুবনে সাঁই-এর (পরমাত্মা বা ভগবানের) অবস্থিতিও সেখানে তাঁর বিচিত্র লীলার রহস্য বেদ অবগত নয়। বেদ বা ঐরূপ চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের পণ্ডিতগণ নানা তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁরা জানেন না যে, মানুষ ভজন বা দেহকে আশ্রয় করে সাধনাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই 'রাগের' ভজনের সঙ্গে বেদমূলক ধর্মের কোনো সম্বন্ধ নেই।

রাঢ়ের বাউল হরি বলছেন,—

অনুরাগ ধরে যে জনে,
সে বেদ-বিধি না মানে।

রাঢ়ের অন্য একজন বাউল বলছেন,—

যার হৃদয়ে নাই ভাব-নিধি
ঘেঁটে মরে বেদ-বিধি
মিছে তর্ক ক'রে ব'কে মরে রে,
যেমন স্থূল তুষে অবঘাত হয়।

বাউলের 'মনের মানুষ' ও বেদ-ছাড়া,—

বেদ-ছাড়া এক মানুষ আছে
ব্রহ্মাণ্ডের উপরে।
স্বরূপ-শক্তি যুক্ত হয়ে
আছে এক নেহারে।

পদ্মলোচন বলছেন যে, মানুষের হৃদয়-বিহারী 'গোঁসাই' স্বয়ং বেদ-পুরাণের বাইরে এক নূতন পথের খবর মানুষকে দিয়েছেন—

ও সে বেদের করণ উলট-পালট ক'রে
নতুন পথের খবর দিয়েছেন মোদের
জীব লাগিয়ে ধান্দা
করিল বান্দা
বস্তা-বন্দী বেদ-পুরাণেরে।

বৈদিক ধর্মের উপর বাউলদের শ্রদ্ধাহীনতার একটা মূলগত কারণ বর্তমান। তন্ত্রধর্ম মাত্রেই বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী। বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীরা তন্ত্রমার্গকে ভালো চোখে দেখে নাই এবং পুরাণাদিতে তন্ত্রশাস্ত্রকে অবৈদিক, বেদবাহ্য ব'লে নিন্দা করা হয়েছে। আবার হিন্দুতন্ত্রগ্রন্থেও বেদের নিন্দা আছে, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সহজিয়ারা বেদ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মকে ব্যঙ্গ করেছে, বৈষ্ণব সহজিয়ারা 'রাগের ভজন' বা 'যুগল ভজন'কে 'বেদবিধি-পার' বা 'বেদবিধি অগোচর' ব'লে বার বার উল্লেখ করেছে, সুফীধর্মেও আনুষ্ঠানিক মুসলমানধর্ম শরীয়তকে মূল্যহীন এবং মারফতপন্থাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বেদানুগত ব্রাহ্মণ্যধর্মের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকে অর্থহীন বলে ঈশ্বর-ভক্তিকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছে, বর্ণাশ্রম মানে নি —জাতি-কুলের ভেদ-বিচার করেনি। যে সব ধর্মমতের সমন্বয়ে বাউলধর্মের উদ্ভব হয়েছে তার কোনটিই বৈদিকধর্ম বা আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নয়। সুতরাং বাউলরা যে বৈদিক বা আনুষ্ঠানিক ধর্মের উপর বিদ্বিষ্ট হবে, তা স্বাভাবিক।

এই মানব-জীবন ও মানবদেহকে বাউলরা পরমসম্পদ বলে মনে করেছে। তাদের সাধনার মূল আশ্রয়ই দেহ। বাউলরা দেব-দেবীর অস্তিত্ব অনুমান মাত্র মনে করে, মানুষ-দেবতার পূজা, ধ্যান-ধারণা, জপ-তপের দ্বারা অর্জিত পুণ্যে যে স্বর্গবাস করবে বা পরকালে উত্তম গতি লাভ করবে, এ তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়। মানব-দেহের মধ্যেই মূলতত্ত্ব আত্মা বা ভগবানের বাস। এই মানব-দেহকে আশ্রয় করে সাধন-ভজনের দ্বারা তাঁকে উপলব্ধি করাই তাদের চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। মানব-দেহাশ্রিত সাধনাই তাদের 'বর্তমান'! এই দেহ বা 'ভাণ্ডে' তারা ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করেছে—এর মধ্যে আকাশ, সমুদ্র, পর্বত, অরণ্য, নদী প্রভৃতি সবই বর্তমান। এই দেহের মধ্যেই পরমপুরুষ বা 'মনের মানুষ' অবস্থান করছেন। এই দেহই তাদের আত্মোপলব্ধির সোপান। তাদের আদি গুরু চণ্ডীদাসের বাণী—'সবার উপরে মানুষ

সত্যি তাহার উপরে নাই', তারা ধ্রুবতারার মতো অনুসরণ করেছে। আর একে সার্থক ভাবে বাস্তবে রূপায়িত করেছে।

মানব-জীবনের গভীর তাৎপর্য সম্বন্ধে লালন বলছেন,—

দেব-দেবতাগণ
করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে।
কত ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে পেয়েছ এই মানব-তরণী।
বেয়ে যাও ত্বরায় সুধারায়
যেন ভরা না ডোবে।
এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন
তাই তো মানবরূপ গঠলে নিরঞ্জন।

মানবজন্ম-লাভ বহু সৌভাগ্য-সাপেক্ষ। মাধুর্য-ভজন বা প্রেমমূলক উপাসনার মূল আশ্রয়ই এই নরদেহ।

বাউলদের কাছে ভগবান মানুষের হৃদয়-বিহারী আত্মা বা কৃষ্ণরূপে মানবদেহে রূপ গ্রহণ করেছেন। একা একা মাধুর্য আস্বাদন হয় না, তাই নিজেকে নর বা নারীরূপে বা পুরুষ-প্রকৃতিরূপে বিভক্ত করেছেন :

পরমাত্মা পুরুষ প্রকৃতিরূপে জোড়া।
দুই তনু এক আত্মা কভু নহে ছাড়া॥

মাধুর্যময় যুগল ভজনের মূলই এই নরদেহ, সুতরাং বাউল এক পরম শ্রদ্ধা ও চরম বিস্ময়েই চোখে দেখেছে এবং নরজন্মকে সার্থক মনে করেছে।

যারা আত্মোপলব্ধির সাধনা করেছে এবং যাদের সাধনায় অল্পবিস্তর যোগের ক্রিয়া আছে, তারা দেহকে অবলম্বন করেই সাধনা করেছে। হিন্দুতান্ত্রিক, বৌদ্ধতান্ত্রিক, নাথ-যোগী, সহজিয়া বৈষ্ণব, সুফীসম্প্রদায়, বাউল প্রভৃতির সাধনার ধারা দেহকে আশ্রয় করেই অগ্রসর হয়েছে।

মানবদেহস্থিত পরমতত্ত্ব বা আত্মাকে বাউল 'মনের মানুষ' বলে অভিহিত করেছে। এই আত্মাকে তারা 'মানুষ', 'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ', 'অধর মানুষ', রসের মানুষ', 'ভাবের মানুষ', 'আলেখ মানুষ', 'সোনার মানুষ', 'সাঁই' প্রভৃতি নামেও উল্লেখ করেছে। এই 'মনের মানুষ' বা আত্মা কেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে মানবদেহে অবস্থান করছেন, এর বিচিত্র জ্ঞান ও উপলব্ধি বাউলরা তাদের গানে প্রকাশ করেছে।

লালন বলছেন,—

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে বেড়াচ্ছে খুঁজে।
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ধরতে গেলে হাতে কে পায়,
তেমনি সে থাকে সদাই আলোকে বসে।

লালন আর একটি গানে বলছেন, নিজেকে চিনলেই সেই অচেনাকে চেনা যাবে, সুতরাং নিজের খবর আগে নিতে হবে। তিনি তো স্বয়ং-প্রমাণ, এঁর প্রমাণের জন্য বেদ-বেদান্ত পড়লে কেবল কষ্টকল্পিত অর্থেরই আশ্রয় গ্রহণ করা হবে,—

আমার আপন খবর আপনার হয় না।
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা।
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়,
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না।
আমি ঢাকা-দিল্লী হাতড়ে ফিরি,
আমার কোলের ঘোর তো যায় না।
আত্মরূপে কর্তা হরি,
মনে নিষ্ঠা হ'লে মিলবে তারি ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা।

আর একটি গানে লালন সাঁই-এর অপূর্ব লীলা প্রত্যক্ষ করছেন। তিনি ইচ্ছামত অসংখ্য দেহ-ঘর নির্মাণ করছেন, আবার নিজেই সেই সব ঘরে বাস করছেন। তিনি পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্বামি-স্ত্রী, শাস্তিদাতা ও শাস্তিগ্রহণকারিরূপে বিচিত্র রস আস্বাদন করছেন,—

সে লীলা বুঝবি, ক্ষেপা কেমন করে।
লীলার যার নাই রে সীমা,
কোনখানে কোন রূপ ধরে।
আপনি ঘর, সে আপনি ঘরি
আপনি করে রসের চুরি
ঘরে ঘরে,
ও সে আপনি করে ম্যাজিষ্টারি,
আবার আপনি বেড়ায় বেড়ি প'রে।

সুপ্রসিদ্ধ বাউল পদ্মলোচন বলছেন যে 'মনের মানুষ' বা 'অটল মানুষ' দ্বিদলে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে বিরাজ করেন এবং বাঁকানলে অর্থাৎ বক্রাকারে (ত্রিবেণীবন্ধনবৎ) অনুমিত সুষুম্না নাড়ীতে যাতায়াত করে নানা লীলা প্রদর্শন করেন। যোগক্রিয়ার দ্বারাই মানুষকে ধরতে হবে।—

এই মানুষে মানুষ আছে,
করণ ধরে নাও গো বেছে,
অটল মানুষ যে ধরেছে
তার কি আছে তুলনা।
খেলছে মানুষ বাঁকানলে,
ছুলছে মানুষ হৃদকমলে
অটল মানুষ উজান চলে
দ্বিদলে তার যায় গো জানা।

বাউল গোপাল বলছেন, এই দ্বিদলপদ্মে গোলোকপতির বাস। ঐ স্থানই 'রূপনগর' না 'বৃন্দাবনধাম'। যোগক্রিয়ার দ্বারা সুষুম্না পথেই সেখানে পৌছুতে হবে।

মন রে, চল রূপনগরে
গোলোকের পতি, তার মূলে স্থিতি,
সে রূপ সতত বিরাজ করে।
ও তার দ্বিদল পদ্ম নাম, বৃন্দাবন ধাম,
তাহে গোলোকপতি বিলাস করে।
সুষুম্না ধরিয়ে মৃণাল বাহিয়ে,
উঠ সেই পদ্ম 'পরে।

বাউলদের কাছে গুরুর স্থান সর্বোচ্চে। অবশ্য যে ধর্মের সাধনাতে গূঢ়-পদ্ধতি, যোগসাধনা প্রভৃতি আছে, তাতে গুরুর উপদেশ

সাহচর্য অপরিহার্য। হিন্দু তান্ত্রিকধর্ম, বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্ম, সহজিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম বা বাউল ধর্ম, যা' গূঢ় সাধনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাতে গুরুর স্থান সর্বোপরি, তাঁর সম্মান ও মাহাত্ম্য অপরিসীম! সুফীধর্মেরও ধ্যান-ধারণা ও যোগমূলক ক্রিয়া আছে, সে-ধর্মেও গুরুর আসন অতি উচ্চে। একান্ত যোগমূলক নাথ-ধর্মেও গুরুর সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধ গুরুগণ বা সিদ্ধাচার্যগণই নাথ-মার্গের প্রতিষ্ঠাতা।

গুরুকে বাউলরা দুই রূপে দেখেছে—এক মানবগুরুরূপে আর পরমতত্ত্ব বা ভগবানরূপে। তাদের গানে এই দুই রূপেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। মানবগুরুর প্রতি ভক্তি-নিষ্ঠা না হলে সর্বোচ্চ গুরু ভগবানের অনুগ্রহ লাভ হয় না। মানব-গুরু সেই পরমগুরুরই প্রতিনিধি। গুরু বা মুরশিদ যে জগতে পরম সম্পদ এবং ভগবান যে গুরুর রূপে শিষ্যকে সাধন-পথে পরিচালিত করছেন, এই বাউলদের বিশ্বাস। লালন তাঁর একটি গানে বলছেন,—

মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে এ জগতে।
মুরশিদের চরণসুধা
পান করিলে হরে ক্ষুধা,
কোরো না দেলে দ্বিধা
যেহি মুরশিদ, সেহি খোদা
বোঝ অলিয়ম মোরশেদা'
আয়েত লেখা কোরাণেতে।
আপনি খোদা, আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি,
অনন্তরূপ করে ধারণ;
কে বোঝে তার নিরাকরণ,
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুরশিদরূপে ভজন-পথে।

কোরাণে আছে—'ভগবানই আমাদের একমাত্র বন্ধু ও পথ-প্রদর্শক'। আল্লা, নবী ও আদম মূলে এক—কেবল রূপ ভিন্ন। সেই নিরঞ্জন, নিরাকার হাকিম খোদা মুর্শিদরূপে আমাদের সাধন-পথে পরিচালিত করছেন। —অধ্যাপক ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

[ আগামী বারে সমাপ্য ]

# রেকর্ড-পরিচয়

## হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82809—"এ জীবনে যদি" ও "ঐ দূর দিগন্ত পারে"—দু'খানি আধুনিক গান পরিবেশন করেছেন খ্যাতিমান শিল্পী মহম্মদ রফি।

N 82810—শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্তের মধুক্ষরা কণ্ঠে গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান—"একটি তারা ডাকে" ও "আকাশের তারা আর মাটির ফুলেরা।"

N 82807—শ্রীমতী উৎপলা সেনের গাওয়া রসঘন দু'খানি আধুনিক গান—"মল্লিকা চেয়েছে যে" ও "আঁধার নেমেছে দূরে।"

N 82808 ( ছোটদের ছড়া গান )—"আগডুম বাগডুম" ও "দোল দোল দুলুনী"—গেয়েছেন কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

N 87553—'লুকোচুরি' বাণীচিত্রের "মুছে যাওয়া দিনগুলি" ও "এক পলকের একটু দেখা"—গান দু'খানির সুর ইলেক্‌ট্রিক গীটারে বাজিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

N 76078—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া 'পুরীর মন্দির' বাণীচিত্রের গান—"পতিত পাবন তুমি" ও "হে মাধব সুন্দর।"

N 76075 to N 76077—রেকর্ডগুলিতে 'ইন্দ্রাণী' বাণীচিত্রের পাঁচখানি গান পরিবেশন করেছেন—শ্রীমতী গীতা দত্ত, মহম্মদ রফি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য শিল্পী।

## কলম্বিয়া

GE 24921—পান্নালাল ভট্টাচার্যের গাওয়া দু'খানি রামপ্রসাদী গান—"চাই না মা গো রাজা হ'তে" ও "মন তোমার এই ভ্রম গেল না" সকলকে মুগ্ধ করবে।

GE 24922—"ওই পাখী জানে" ও "প্রথম মুকুল তুমি" দু'খানি আধুনিক গান—গেয়েছেন কুমারী গায়ত্রী বসু।

GE 24920—শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আধুনিক গান—"গোলাপের পাপড়ি ঝরা" ও "ঝিনুক ঝিনুক ঝিনুক তুলে।"

GE 24919—আধুনিক দু'খানি গান "আঁধারে লেখে গান" এবং "ডাগর ডাগর নয়ন মেলে"—গেয়েছেন কুমারী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

GE 30418—'জন্মান্তর' বাণীচিত্রের দু'খানি গান "ছায়াটুকু রেখে প্রদীপ" ও "তোমারি এ পৃথিবীতে"—গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 30412—'পুরীর মন্দির' বাণীচিত্রের "মোর অন্তর আজ কেঁদে বলে" ও "আমার গোপন কথাটি"—পরিবেশন করেছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 30413 to GE 30415—রেকর্ডগুলিতে 'সূর্যতোরণ' বাণীচিত্রের গানগুলি পরিবেশন করেছেন—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 30416—"না জানি কোন্ ছন্দে" ও "সরমে জড়ানো আঁখি"—'শিকার' বাণীচিত্রের গান দু'খানি পরিবেশন করেছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

GE 24917 এবং GE 24918—রেকর্ড দু'টি পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীদের গাওয়া ধর্মমূলক গান—সংগীত পরিচালনা করেছেন পঙ্কজ মল্লিক।

# আমার কথা ( ৪৮ )

## শ্রীকালোবরণ দাস

[ ভারতীয় বিশেষতঃ বাংলার লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে কালোবরণ সুপরিচিত। তিনি সুগায়ক ও সুকণ্ঠের অধিকারী, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। এযাবৎ তিনি পনের কি বিশখানারও অধিক সঙ্গীত রেকর্ড করেছেন এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিওর তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিল্পী। সীমান্তিক, সঙ্কেত, স্বপ্ন ও স্মৃতি, ছিন্নমূল প্রভৃতি ছায়াচিত্রগুলির সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। সেবা,

অন্তরাগ, ও অগ্নিসম্ভবা প্রভৃতি নির্ম্মীয়মান ছবির সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে তাঁহার অবদান চলচ্চিত্রের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ছিন্নমূল চিত্রখানিতে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন সঙ্গীত-সম্মেলনেও তিনি বহু পুরস্কারের অধিকারী হয়েছেন। কালোবরণের কণ্ঠে ও সুরে গীত রেকর্ডগুলির মধ্যে, 'মরুতরু-তলে সাকিনা ঘুমায়', 'বাসর শয়নে ঘুমায়ো না প্রিয়া', 'তোমার আমার মিলনের মাঝে', 'ফিরে পাই বলে হারাই তোমারে', 'পথ চেয়ে প্রিয়া রবে না আমার আশে', 'হিন্দু মুসলমান এক হও, গণদেবতার গাহিয়া জয়', প্রভৃতি রেকর্ডগুলি বিশেষ জনপ্রিয়।

এই নিরহঙ্কার সদালাপী, সহজ সরল মানুষটি শুধু শিল্পী হিসেবেই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেননি, মানুষ হিসেবেও তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবারে আমরা এই গুণী শিল্পীর জীবনী তাঁর নিজেরই ভাষায় পাঠক পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরছি—সঃ।]

১৯১০ সালে চন্দননগরের গ্রামে একটি বিশিষ্ট মধ্যবিত্ত পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমাদের গ্রামে ধ্রুপদ, খেয়াল ইত্যাদির উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চ্চা ছিল না। গান বলতে শুধু যাত্রাগানেরই আসর বসতো। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের উপর আমার সহজাত টান ছিল। তাই বহুবিধ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন অসহায় ও কপর্দ্দক শূন্য হয়েও আজিও আমার সঙ্গীত সাধনা অব্যাহত রয়েছে। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে চলেছে আমার সঙ্গীত সাধনা। বাল্যকালে যাত্রার আসরে যে গানগুলি আমি শুনতুম সেই গানগুলি অনুকরণ করে খোলা মাঠে কিম্বা নদীর ধারে বসে গাইতুম একা একা। যখন আমার বয়স

শ্রীকালোবরণ দাস

মাত্র ১৫ বৎসর তখন চন্দননগর বউবাজারে একটি জলসার আয়োজন হয়। সেই জলসায় স্থানীয় ও বাইরের শিল্পিগণ যোগ দেন। সে সঙ্গীতের আসরটিতে শ্রোতা হিসেবে আমি যোগ দিই। আমার অনুকরণ করবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। যখন যে গান শুনতুম ঠিক সেই গান আমি অনুকরণ করতে পারতুম।

তখন অনেকেই আমার গান শুনে প্রশংসা করেছেন। চন্দননগর বউবাজারে সাধকের আসরে গান শুনে আমার ধারণা হলো, আমি এতদিন যে গান করেছি বা শিখেছি তা কিছুই শেখা হয়নি। শুধু অনুকরণ করা হয়েছে। তখন থেকেই আমি প্রতিজ্ঞা করি যে এরূপ অনুকরণ না করে সঙ্গীত সাধনা করবো এবং এর ভেতরে ঢুকবো। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব যোগীন্দ্রচন্দ্র দাস পারিবারিক কারণে আমার সঙ্গীত সাধনায় উৎসাহ তো দিলেনই না বরং আমি যাতে সঙ্গীত সাধনায় অগ্রসর না হই তার বিরোধিতা করতে থাকেন। কারণ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুই জন এই সঙ্গীত সাধনা করতে গিয়ে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। বোধ হয় এ জন্যেই পিতৃদেব আমার সঙ্গীত সাধনায় উৎসাহ না দিয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। চন্দননগরের জলসায় যে সকল বিশিষ্ট শিল্পী যোগ দেন তাঁদের কাছে আমার অন্তরের অভিলাষ জানালে কেউ বিনা পারিশ্রমিকে আমায় শিক্ষাদান করতে চাইলেন না। একে একে বহু গুণী শিল্পীর কাছে যাই এবং আবেদন নিবেদন করি। তখন আমার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। অসহায় এবং কপর্দ্দক-শূন্য। বোধ হয় এজন্যেই আমায় শেখাবার জন্য কেউ আগ্রহ প্রকাশ তো করলেনই না বরং করলেন নিরুৎসাহ। আমি মায়ের কাছে পিতার অনুমতির জন্যে বার বার আবেদন নিবেদন করে ব্যর্থ হই। বোধ হয় তাঁদের ধারণা জন্মেছিল যে, সঙ্গীতের সাধনা করলে আমার জীবনের হানি হবে। আমিই তখন সংসারে বড় ছেলে। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে অসহযোগিতা পেলেও আমার অন্তরের একমাত্র কামনা হলো কি ভাবে সঙ্গীত সাধনা করবো, কি করে বড় হ'বো।

তখন আমি নিরুপায়। কিন্তু মনে জেগেছে দৃঢ়তা। তাই বাড়ীতে স্থান না হলেও পাড়ায় অন্য বাড়ীতে গিয়ে হারমোনিয়ামে গলা সাধতুম প্রতিদিনই। একদিন আমার পিতৃদেব আমাকে ডেকে বললেন, হয় সঙ্গীত সাধনা থেকে বিরত থাক না হয় বাড়ী ছাড়। দু'টো এক সঙ্গে চলবে না। আমি হতবাক। এদিকে বাবা নির্দেশ দিয়েই চলে গেলেন। কোন অনুনয়, বিনয় বা প্রার্থনায় কাজ হলো না। তখন আমার মনে জেগেছে সঙ্গীত সাধনায় তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কোন বাধা-বিঘ্নই আমার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করতে পারে না। সঙ্গীত সাধনার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আমাকে বাড়ী ছাড়তে হলো নিঃসম্বল অবস্থায়। কোথায় আশ্রয় পাবো জানি না, তবে সঙ্গীত সাধনা করতে হবে, এই হলো জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। চন্দননগরে শুনেছিলুম বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কাটিহারে "মিশিরজী" নামে এক বড় গুণী ওস্তাদ থাকেন। বাড়ী ছেড়ে প্রথমেই আমার মনে জাগলো তাঁর কথা। কিন্তু সেদিন আমার পকেটে মাত্র ছ'আনা পয়সা সম্বল। তাই নিয়ে যাত্রা সুরু হলো কাটিহারের পথে। ট্রেণে চেপে বসলুম। কিন্তু ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনেই ঘটলো বিপদ।

চেকার এসে বিনা টিকিটে ভ্রমণের জন্য আমাকে ট্রেণ থেকে নামিয়ে দিলেন। কোন অনুনয়-বিনয়ই কাজে লাগলো না। রাত্রিটা ষ্টেশনের প্লাটফরমেই কাটিয়ে দিলুম। সকালে হাতমুখ ধুয়ে ষ্টেশনের প্লাটফরম-এ বসেই আপন মনে গান গাইছিলাম। সেই গান শুনে ষ্টেশন-মাষ্টার বেরিয়ে এলেন। তিনি আমার কথা জানতে চাইলেন। আমি অকপটে আমার সব কথা এবং আমার সঙ্গীত সাধনার ইচ্ছার কথা তাঁকে নিবেদন করি। তিনি আমাকে বাড়ী ফিরে যেতে উপদেশ দেন। কিন্তু যখন আমার দৃঢ় ইচ্ছার কথা তাঁকে জানালুম, তিনি বিনা ভাড়ায় আমার কাটিহার যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

তারপর কাটিহারে গিয়ে 'মিশিরজীর' ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁর সাথে দেখা করি এবং সমস্ত ঘটনা বলি এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করি। সব কথা শুনে তিনি আমাকে সঙ্গীত শিক্ষাদানে স্বীকৃত হ'লেন কিন্তু অন্যত্র থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললেন। কাটিহারে আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি স্বহস্তে রান্নাবান্না করে খেতেন। তাঁর ওখানে আশ্রয় মিললো। কিন্তু আমাকেও স্বহস্তে রান্না করে খেতে হতো। এই ভাবে চললো আমার সঙ্গীত সাধনা এক বছর। তারপর একদিন 'মিশিরজী' হলেন নিরুদ্দেশ। কেউ তাঁর সন্ধান দিতে পারলো না। স্থানীয় ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করলেন। অসমাপ্ত সঙ্গীত সাধনাকে মূর্ত্তরূপ দেবার আগ্রহে আমি পা বাড়ালুম গোয়ালিয়রের পথে। কাটিহার থেকেই গোয়ালিয়রের প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ ওস্তাদ 'নারায়ণজী'র নাম শুনেছিলুম। গোয়ালিয়রে উপনীত হয়ে নারায়ণজীর সমীপে গিয়ে সব কথা বলি। তিনি সব শুনে এবং আমার একাগ্রতা লক্ষ্য করে আমাকে গান শিখাতে রাজী হলেন এবং আমাকে তাঁর গৃহে স্থান দিলেন।

তিন বছর আমি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ক্লাসিকাল গান শিখি। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ওস্তাদ ও সঙ্গীতের একনিষ্ঠ পূজারী। তাঁর কাছ থেকে যে শিক্ষালাভ করি ভবিষ্যতে তাই হয়ে রয়েছে আমার অমূল্য সম্পদ। তিন বছর নারায়ণজীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষার পর তিনি মারা গেলেন। তখন বাঙ্গালায় ফিরে এলুম। কলকাতাতে এসে আগের অসহায় অবস্থায় পড়লুম। পকেটে পয়সা নাই, এদিকে বাড়ী ফিরেও যেতে পারি না কোন রকমে একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে কলকাতাতেই রইলুম। তারপর একদিন সুযোগ মিলে গেল প্রখ্যাত সঙ্গীতবিদ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় লাভের। ভীষ্মদেব বাবু তখন মেগাফোন কোম্পানীর সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন—সে ১৯৩৫-৩৬ সালের কথা। তিনি আমার গান শুনে আমাকে গান রেকর্ড করতে বলেন। আমি ভীষ্মদেব বাবুর কাছ থেকে পেয়েছিলুম অকুণ্ঠ সহযোগিতা। এবং তাঁরই সঙ্গে থেকে চললো আমার সঙ্গীত সাধনা। ভীষ্মদেব বাবুর সুর দেওয়া আমার প্রথম রেকর্ড দুখানি ইসলামী সঙ্গীত।

হঠাৎ একদিন ভীষ্মদেব বাবু দিলীপ রায় মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে পণ্ডিচারী চলে যান। ভীষ্মদেব বাবুর পণ্ডিচারী যাওয়ার পূর্ব্বেই আমার ধারণা হ'লো যে, ক্লাসিকাল গান জনসাধারণের জন্যে নয়। ভীষ্মদেব বাবু চলে যাবার সময় আমাকে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন, তুমি সফল হবে। জনসাধারণের জন্য যে গান সেই গান গাইবার প্রেরণা দিয়ে গেলেন ভীষ্মদেব বাবু। তখন গান শিখিয়ে সামান্য যে অর্থ পেতাম তাই দিয়ে কোন প্রকারে আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হতো। ভীষ্মদেব বাবুর কলকাতা ত্যাগের পর আমার চেষ্টা হলো, কি ভাবে লোকসঙ্গীত শেখা যায় এবং এজন্যে আমি পূর্ব্ববঙ্গে চলে যাই। কিছুদিন পূর্ব্ববঙ্গে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসি। তখন আমার আগ্রহ হলো সাঁওতালী সঙ্গীত 'ঝুমুর' শিখতে হবে। এজন্য আমাকে গিরিডি যেতে হলো। গিরিডিতে পৌঁছে একজন সাঁওতাল সঙ্গীতবিদ-এর বাড়ীতে থাকি ও সাঁওতালী সঙ্গীত শিক্ষালাভ করি। শিক্ষান্তে পুনরায় কলকাতায় ফিরে আসি। কলকাতায় এসে কলম্বিয়া কোম্পানীর ক্ষিতীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরিচিত হই। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। সেটি হলো যখন মেগাফোনে গান রেকর্ড করি, তখনই শিল্পী হিসাবে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে যোগ দিই। তারপর কলম্বিয়া, হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস, মেগাফোন কোম্পানীতে বহু গান রেকর্ড করি ও সুর দিই।

১৯৪৭ সালে প্রথম 'ঘরোয়া' ছবিতে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে যোগদান করি। তার পরেই একের পর এক বহু ছায়াছবিতে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি ও এখনও করছি সেই থেকে আজ অবধি আমার চলছে সঙ্গীত সাধনা। সঙ্গীতের মধ্যেই পাই আমি নির্ম্মল আনন্দ এবং সঙ্গীতকে জীবনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলাই আমার লক্ষ্য। সঙ্গীতের মাধ্যমে জনসাধারণকে আনন্দ দিতে পারলেই আমার জীবন সার্থক। সঙ্গীত সাধনাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অর্থ, সুনাম সম্পদ নিরর্থক বলে আমি মনে করি।

## সপ্তপদী

### শ্রীবিমল সেন

লীলামৃগয়ায় আচমকা কোন দিন
ঘন অরণ্যে দিক্‌ভুল যদি হয়,
বিপ্রলব্ধা, বৃথাই প্রদক্ষিণ
নিরর্থ হবে যৌবন-অব্যয়।

শুক্লাভিসার ব্যর্থই হয় যদি
কনকাঞ্চলে সীমন্ত ঢাকা ভালো
দ্বৈত-জীবনে শান্ত সপ্তপদী
হয়তো দেখাবে নির্মল নীল আলো

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

হিমানীশ গোস্বামী

Our people in the past have built empires, invented wonders, withstood blitzes and won wars on the good, plain cooking of the English-women . I am confident they will eventually win the peace on the same stuff.—*News Chronicle.*

মণিদার রান্না আস্তে আস্তে জনপ্রিয় হ'তে সুরু করলো। কেবল আমাদের বাড়ী নয়, আশে পাশের ভারতীয়রা, বিশেষ ক'রে বাঙ্গালীরা আমাদের বাড়ীতে প্রতি শনিবারে আসতে আরম্ভ করলো। পাঁচজনের জায়গায় দশজন, কখনো পোনের জনের জন্য রান্না করতে হ'ত। মণিদার রান্না যে এত ভাল হ'তে পারে তা কখনো ভাবিনি। আমাদের বাড়ী থেকে আধমাইলের কিছু দূরে একটি রেস্তোরাঁ—তার নাম বেঙ্গল রেস্তোরাঁ—সেখানে আমরা দু'একবার অনেক পয়সা খরচ করে মাছের ঝোল ভাত, ডাল তরকারী খেয়েছি বটে, কিন্তু মণিদার রান্নার কাছে সেগুলো কিছুই নয়। খরচের দিক দিয়ে দেখলেও আমাদের লাভ হ'ত প্রচুর। ভারতীয় দোকানগুলিতে দাম সচরাচর এত বেশি হ'য়ে থাকে যে সেখানে সজ্ঞানে কখনো খেতে যাইনি। হুজুগে পড়ে দু একবার গেছি—কিন্তু খেতে ভাল লাগলেও তৃপ্তি খুব পাইনি। লণ্ডনে একদা হিসেব করে দেখেছিলাম ভারতীয় রেস্তোরাঁ রয়েছে ষাটের বেশি—আরো যাঁরা খবর রাখেন ব'লে আমাদের ধারণা, তাঁরা বলেন একশোরও বেশি ভারতীয় রেস্তোরাঁ আছে লণ্ডনে—এবং প্রত্যেকটিই চালু দোকান। দোকানগুলির নাম শুনলেই প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলি ভারতীয় দোকান যেমন বীরস্বামী, কোহিনূর, আসাম রেস্তোরাঁ, ক্যালকাটা রেস্তোরাঁ, আলবিয়ন ইণ্ডিয়ান রেস্তোরাঁ, ইণ্ডো এসিয়াটিক রেস্তোরাঁ, সাহা'স রেস্তোরাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি! ভারতীয় রেস্তোরাঁ আমরা যতদূর পারি পরিহার করেছি—কারণ সেখানকার খাবার সেখানে সত্যি ভাল করে তার দাম এত বেশি যে আমাদের পক্ষে দু' একবারের বেশি খাওয়া সম্ভব হয়না মাসে। আরো ভয়—যদি ভারতীয় খানা খাওয়া অভ্যেস হ'য়ে যায় তখন কি করা যাবে? আমাদের লায়ন্সই ভাল।

লায়ন্স দোকানগুলির সংগে প্রথম পরিচয় আমার মণিদার সংগে গিয়ে। তিনি বলেছিলেন এই দোকানে খেতে, কারণ এখানে খাবার পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়না, দ্বিতীয়ত এর মতো সস্তা দোকান ভূভারতে নেই, লণ্ডনে তো নেই-ই, তৃতীয় এদের চা খুব ভাল। আর খাবার? স্বাদ খুব ভাল'না—তবে খুব খারাপও নয়।

মণিদার সংগে প্রথম দিন গিয়েছি নটিংহিল গেটের লায়ন্সের দোকানে লাঞ্চ খেতে। (লণ্ডনে এদের বোধ করি শ খানেকের বেশি দোকান আছে) কিউতে দাঁড়িয়েছি খাদ্য নিতে। নানারকম খাবার সাজানো রয়েছে তাকে—সংগে দাম লেখা রয়েছে, সেগুলো নিয়ে ট্রেতে রাখছি। মাছ এবং আলুভাজা, রুটি মার্গারিন বা মাখন, একটা অ্যাপল টার্ট এবং এক কাপ চা এ সমস্ত মিলে দাম পড়লো এক শিলিং ন পেনির কাছাকাছি। দাম দিয়ে গিয়ে অসংখ্য টেবিলের একটিতে বসলাম। যথাস্থানে কোট খুলে রাখলাম। তার পর খেতে বসলাম। চায়ের স্বাদ সত্যিই ভালো, কিন্তু মাছ বিস্বাদ, আলু বিস্বাদ, কিন্তু খিদে পেলে মোটামুটি খাওয়া যায়। খাচ্ছি—হঠাৎ শুনি প্রচণ্ড একটি কাপ প্লেট ভাঙার আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি এক বুড়ো ভদ্রলোক খাবার আনতে আনতে হঠাৎ পড়ে গেছেন। আহা, এত সাধের খাবার তাঁর সেটা সব নষ্ট হল। এখন হয় তো তাঁকে কাপ প্লেটের দাম দিতে হবে। কিন্তু তা দিতে হল না। একজন পরিচারিকা এসে তাঁকে একটা টেবিলে বসিয়ে দিল, তারপর ছুটে গিয়ে নতুন খাবার এনে দিল। প্লেট ভাঙার জন্য তো দাম নিলই না, এমন কি খাবারের জন্যও নতুন করে দাম দিতে হল না। মণিদা বললেন, এই হল বিলেত—আমাদের দেশে হলে—। আমি বললাম, আমাদের দেশে হলে কি হত সেটা বলতে হবে না অনুমান করতে পারি। আমাদের দেশ হলে ঐ সমস্ত ভাঙা প্লেটের এবং কাপের জন্য ডবল দাম আদায় করা হত—ভদ্রলোককে দোকানদার এসে কলার ধরে বলতো, মশাই হোটেলে খেতে আসেন কেন, অতি উৎসাহী দু'-একজন বেয়ারা পাঞ্জাবী ছিঁড়ে দিতো, ব্যাগ থেকে পয়সা বার করে নিত—এবং সম্ভবত মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ছেড়ে দিত। বিলেত দেশটা যে মহান্জো দরোর সময় অসভ্য ছিল, রাজা অশোক যখন বৌদ্ধধর্ম প্রচার করছিলেন তখন তাদের ধর্ম বলে কোনো বালাই ছিল না তা এই রকম ঘটনা দেখলেই বোঝা যায়। এরকম অস্বাভাবিক ঘটনা আরো ওদেশে ঘটেছে দেখেছি যার সংগে ভারতীয় সভ্যতার কোন সম্পর্ক নেই, যেমন চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আহত হলে বাস কর্তৃপক্ষ আহত লোককে যথেষ্ট টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করে—অবশ্য যদি প্রমাণ হয় ড্রাইভার বা কণ্ডাক্টরের দোষ। তা ছাড়া আরো আছে—এখানে গবর্ণমেণ্ট চাকরীহীন লোকদের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করে থাকে যতদিন না তারা চাকরী পায়। এরকম অস্বাভাবিক যে দেশ, সে দেশে হঠাৎ পড়ে যাওয়া ভদ্রলোককে খাবার কেবল এনে দিল তাই নয়, একজন ম্যানেজেরেস জাতীয় ভদ্রমহিলা এসে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করলেন যেন পড়ে যাওয়ার জন্য তাঁরাই দোষী। আমাদের দেশে অমন ব্যবহার করলে লোকে দশ মিনিটে দোকান ভেঙে দিয়ে চলে আসতো। উচিত শাস্তি হ'ত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

রান্নার ব্যাপারে মণিদার জনপ্রিয়তা মিসেস ম্যাথার্সের নজর এড়ালো না। মিসেস ম্যাথার্স এ ব্যাপারে একটু অস্বস্তি বোধও করতে লাগলেন। শনিবারে কেউ আর বিকেলে হাই-টি খাই না—সবাই মণিদার রান্না মাছ মাংস খাবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকি।

এই ব্যাপারে মিসেস ম্যাথার্স প্রচুর ভেবেছিলেন। অবশেষে একদিন স্থির করলেন মণিদার খ্যাতিকে অন্তত ম্লান করতে হবে। একদিন দেখি, ডিনারের সময় আমাদের থালায় প্রচুর ভাত আর তার সংগে সুন্দর চাটনি। ভাত এবং চাটনি এক সংগে খাচ্ছি ভালই লাগছে। অরুণ পালিত বললো, আগে তো মাছ মাংস তবে তো চাটনী। মিসেস ম্যাথার্সকে বলে দিতে হবে যে চাটনী প্রধান ডিশের পরে সার্ভ করতে হয়। মিসেস ম্যাথার্স হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে—অরুণ বললো, খুব ভালই হ'য়েছে তবে···।

—তবে ? মিসেস ম্যাথার্সের প্রশ্ন।

হঠাৎ প্রভাস বলে উঠলো, তবে চাটনীতে মাংস দেয় না।

আমি তখন দেখলাম চাটনীতে মাংস রয়েছে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিসেস ম্যাথার্স হঠাৎ চুপ করে গেলেন। তারপর বললেন, বই দেখে মাংসের কারী রান্না করলাম আর তোমরা বলছো চাটনী! তোমরা নিশ্চয় ঠাট্টা করছো ?

আমাদের শেষ পর্যন্ত বলতেই হ'ল যে আমরা সত্যিই ঠাট্টা করছি। মাংসের মধ্যে কয়েক পাউণ্ড চিনি এবং সমপরিমাণ আপেল আমাদের দেশে সবাই দিয়ে থাকে বৈ কি। লংকা আদা এবং পেঁয়াজ মাংসে মোটেই দেয় না। একথা শুনে মিসেস ম্যাথার্স খুশিই হ'লেন। কিন্তু আমাদের দুঃখের দিনও তখন থেকেই সুরু হ'ল। মিসেস ম্যাথার্স বিনা নোটিসে প্রায়ই আমাদের নানারকম 'ইণ্ডিয়ান' খাদ্য খাওয়াতে লাগলেন। ডাল, আলুর দম ইত্যাদি। সমস্তই তিনি বিলিতি পাক প্রণালী বই থেকে শিখেছেন। সমস্তই মিষ্টি।

পরে বিলিতি পাক প্রণালী আমি দেখেছি। সেগুলি কোন্ উন্মাদ রচনা করেন জানি না, তবে মাংসে চিনি আপেল এবং কিসমিস দেওয়ার কথা আছে—কিন্তু রসুন এবং পেঁয়াজ সম্পর্কে প্রায় নির্বিকার। মিসেস ম্যাথার্সের দোষ এ ব্যাপারে বিশেষ ছিল না—কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি বাড়ী ছেড়ে দেবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলাম। আর সহ্য হচ্ছে না।

পেঁয়াজ ইংল্যাণ্ডে জনপ্রিয়। তবে ইংল্যাণ্ডের পেঁয়াজের ঝাঁঝ খুব কম, পেঁয়াজগুলির আকৃতিও বিশাল; ইংল্যাণ্ডে খুব কমই পেঁয়াজ চাষ হয়। সম্ভবত বটানিক্যাল গার্ডেনস ছাড়া আর কোথাও হয় না। বৃটেনের পেঁয়াজের সরবরাহ আসে ফ্রান্স স্পেন এবং অন্য দেশ থেকে। ১৮৩২ সালে প্রথম একজন ফরাসী এই ব্যবসা আরম্ভ করেন। তার নাম ছিল ফ্রান্সিস। পেঁয়াজকে বলা হত ভিজে রুটি। এই ভিজে রুটি নিয়ে লণ্ডনে ফিরিওয়ালারা ফিরি করতো বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে। পেঁয়াজগুলি তারা থলিতে ভরে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝলিয়ে নেয়, অনেকগুলো পেঁয়াজ এক একটা লাইন করে ঝোলে, ঠিক দেখে মনে হয় সোনালি চুলের বিনুনি। যুদ্ধের আগে পেঁয়াজ সমস্ত দোকানে পাওয়া যেতনা তাই ফিরিওয়ালাদের মোটামুটি ভাল লাভই হত। এরা কিন্তু সবাই ফ্রান্সের ব্রিটানি বলে জায়গা থেকে আসে। যখনি সে দেশে চাকরীর অভাব দেখা যায় এরা পেঁয়াজ আর রসুন নিয়ে চলে আসে ইংল্যাণ্ডে। এখনও প্রায়ই দেখা যায় এদের পেঁয়াজ রসুন ফিরি করতে। এক একটা বড় রসুন চারপেনি থেকে ছ পেনি দাম। ফিশ অ্যাণ্ড চিপস এর দোকানে পেঁয়াজ প্রচুর ভাজে তারা আর মাছ আর আলু ভাজার সংগে খায়। ভিনিগারে ভেজানো পেঁয়াজ মাছভাজা দিয়ে খেতে ইংরেজদের ভাল লাগে, আমাদের কাছে মোটেই ভাল লাগে না।

লণ্ডনে সবজাতের লোক থাকে বলে এখানে সবজাতের খাবার পাওয়া যায়। এখানে পাওয়া যায় না এমন জিনিস কমই আছে। তবে বহুদিন থাকা সত্ত্বেও পটোল ওল, ঝিঙে এবং সজনে ডাঁটা দেখতে পাইনি। ওল পাওয়া যায় শুনেছি কখনো কখনো, তবে নিজে দেখিনি। ওখানে কমলালেবু, আঙুর, আপেল, দারচিনি, হলুদের গুঁড়ো, আদা, পাঁপর ভাজা, শুকনো ডালের বড়ি, পান, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, ধনে, মুগ, মশুর, মটর ডাল, চাল ( পাটনাই এবং অন্যান্য ), এলাচ, লবঙ্গ, সরষে, সরষের গুঁড়ো, আমের চাটনী, কুলের চাটনী, তেঁতুল এ সমস্তই পাওয়া যায়। টিনভর্তি সরষের তেলও পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভারতীয়রা যাঁরা ওখানে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন তাঁরা জলে পড়েন না। দিব্যি দেশী খাদ্য খেতে পারেন এবং ভারতীয় চিন্তাও করতে পারেন—বৃটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া হাউস এবং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে ভারতীয় বই নিয়ে পড়তে পারেন। এমন কি, ভারতীয়দের বিভিন্ন সমিতি গঠিত হয়েছে প্রাদেশিক সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা যে সমস্ত জায়গায় দেখানো হয়। মহারাষ্ট্র সমিতি, কেরল সমিতি, বাঙালীর আড্ডা ইত্যাদি। এ সমস্ত জায়গায় যেমন ভাল ভাল কিছু হয় তেমনি এ সমস্ত আস্তে আস্তে ভারতীয়দের পৃথক করেও তোলে। বাঙালী, মাদ্রাজী, মারাঠী সবাই আত্মকেন্দ্রিক দলগুলিতে ঢোকে এবং মোটামুটি সুখে থাকে। কারণ অন্যের সংস্কৃতির সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ জাগিয়ে রেখেছে। বাঙালীদের সংগে মিশলে দেখা যায় বাঙালী অন্য সমস্ত প্রদেশের চাইতে যে কোনো ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ, সাহিত্যে, কাব্যে

সমস্ত কাপ-প্লেট ভেঙে গেল

রাজনীতিতে, সঙ্গীতে, কর্মক্ষমতায়, বুদ্ধিতে, ভাষা শিক্ষায়। আবার একদল মারাঠীর সংগে মিশলে দেখা যায় মারাঠীরাও এ সমস্ত ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ। সব দলই এতে সুখে থাকে। কিন্তু বুঝলাম না একটা ব্যাপার—এ সমস্ত সত্বেও লণ্ডন মজলিস—সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান কেমন করে লণ্ডনে গড়ে উঠলো। এটি নেহাতই যে অন্যায্য ব্যাপার, কারণ সেখানে যে স্বীকার করতেই হয় অন্য প্রদেশের লোকেরাও কেউ কম নয়। স্বীকার করতেই হয় মাদ্রাজীরা ভদ্র, মারাঠীরা কবি এবং বীর, উত্তর প্রদেশের সংগীতের অপরূপতা।

দল থাকলেই দলাদলি—এবং রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী প্রবেশ। লণ্ডন মজলিসেও তার ব্যতিক্রম চোখে পড়ল না। অর্থাৎ একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। সর্বভারতীয়তার রূপ দেয় বা দেবার চেষ্টা করে লণ্ডন মজলিস। দলাদলি হয়—তা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা সেখানেও কিছু কিছু অনিবার্য ভাবেই প্রতিফলিত হয়। সম্ভবত ১৯৫২ সাল থেকে মজলিস মেলা সুরু হয় নতুন কর্মসচিবদের তত্বাবধানে। এই নতুন কর্মসচিবদের আমরা চিনতাম। অতএব তাদের ভোট দিয়ে জেতানোর জন্য আমরা পাঁচ শিলিং খরচ করে সভ্য হয়ে গেলাম। ডক্টর প্রমোদ ব্যানার্জি তখন প্রেসিডেণ্ট হলেন। এঁকে আগে থাকতে চিনতাম, ভাল গান গাইতেন সেজন্য এবং তাঁর বিদ্যার জন্যও। প্রমোদ দা সকলেরই প্রিয় ছিলেন—বাঙালী এবং অবাঙালী বলে তাঁর যেমন কোনো বাছবিচার নেই, তেমনি তাঁর ভক্তদের মধ্যেও দেখা যেত সমস্ত জাতের লোককে। এই ভোটের ব্যাপারে বিশেষ ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। আমরা প্রচুর মেম্বর করেছিলাম, যাতে আমাদের চেনা দল জিতে যায়—আর বিপক্ষ দল ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। ক্রমওয়েল রোডের ভারতীয় ছাত্রাবাসে ভোট নেওয়া হয় এবং সে ব্যাপারে উত্তেজনা হাতাহাতি এবং কিছু মারামারিও হয়। কারণ যে দলকে আমরা হারিয়ে দিচ্ছিলাম ভোটে, তারা বুঝতে পেরেছিল তাদের হারানোর জন্য তাদের চাইতে বেশি লোক আমরা জমায়েত করেছিলাম। প্রথমত তারা সেদিনকার মতো

লণ্ডনে ফ্রান্সের পেঁয়াজওয়ালা

ভোটিং মুলতুবি রাখার চেষ্টা করছিল। তাদের বক্তব্য এই যে তারা সবাই চিঠি পায়নি। ডক্টর প্রমোদ ব্যানার্জি বললেন, চিঠি অর্ধেক লোক পেয়েছে, বাকী অর্ধেক লোক পায়নি এটা অবিশ্বাস্য। পরে তিনি প্রমাণ করলেন যে, চিঠি সমস্ত সভ্যকেই পোষ্ট করা হয়েছিল—সভ্যরা অনেকেই ঠিকানা বদলানোর জন্য সবাই না পেয়ে থাকতে পারেন—কিন্তু সে জন্য নির্বাচন বন্ধ রাখা যায় না। অতঃপর তাদের আর কিছু বলবার রইলনা—অতএব ভারতীয় গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে তারা যা করলো তা এই: বিদ্যুৎ বেগে ভোটিং-এর সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে তাদের দলের একটি ছেলে কোথায় উধাও হয়ে গেল। অর্থাৎ ভোট গুণবার আগেই ব্যালট পেপারগুলির পাত্তা পাওয়া গেল না। ঘটনাটা এমনি তাড়াতাড়ি ঘটেছিল যে চট করে তাদের এই নব কৌশল ধরা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সামলে নিতে খুব বিলম্ব হল না। হঠাৎ দেখা গেল নিশীথ মুখার্জি এবং জ্যোতির্ময় রায়কে বিপক্ষ দলের সমর্থককে বামাল সমেত ধরে আনতে। ব্যালট পেপার গোণা হল—আমাদের দল অনেক বেশি ভোট পেয়ে জিতে গেল। এই মজলিসে আমাদের পরিচিত বহু ছেলে-মেয়ে কাজ করতো। আমাদের বাড়ীর জীবন লোকড় প্রথম দিকে এর পাণ্ডা ছিল।

লণ্ডনে আমাদের কারুর কখনো পকেট মারা যায়নি। লণ্ডনে পকেটমার ব'লে কোনো ব্যবসা চলে না। এটা ভারতীয়দের কাছে খুবই আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়। পকেট মারাটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির অন্যতম। যে শহরে পকেটমার নেই, সে সহর যে কী ভীষণ অস্বাভাবিক সহর তার হিসেব নেই। অনেক ভারতীয়ের লণ্ডন বেশিদিন ভাল লাগে না। তার কারণ ঠাণ্ডা নয়, বরফ নয়, গোলমালের অভাব। কোনো গোলমাল নেই, দাঙ্গা নেই, হাঙ্গামা নেই, এমন কি পকেটমার পর্যন্ত নেই--থাকলেও সেগুলোর সংখ্যা এত কম যে চোখে পড়ে না—আর যদি বা চোখে পড়ে ত দেখা যায় দাঙ্গাকারীরা অধিকাংশই বিদেশী। কোনো রকম আওয়াজ নেই, রাত দশটার পর রেডিও কোনক্রমেই উঁচু পর্দায় চড়বে না, প্রতিবেশীকে কোনো মতেই বিরক্ত করা চলবে না এ কেমন সহর? আমাদের অভ্যেস প্রতিবেশীকে যথাসাধ্য বিরক্ত করা, অত্যাচার করা, লাউড স্পীকার নিয়ে কোনো কোনো সময় সমস্ত রাত পড়শীদের জাগিয়ে রাখা, কেউ প্রতিবাদ করলে দাঁত ভেঙে দেওয়া এ সমস্ত না করতে পারলে আর সহরে থাকা কেন। গ্রামে গিয়ে থাকলেই তো হয়। এই সমস্তের অভাবে ভারতীয়রা, বিশেষ ক'রে কোলকাতাবাসীদের লণ্ডনে বেশ অসুবিধেয় পড়তে হয়। আস্তে আস্তে কথা বলা বিলিতি লোকেদের অভ্যেস—কেন তাই বলে ভারতীয় হ'য়ে আস্তে কথা বলবো? অতএব জোরে জোরে বিদেশী ভাষায় বাসে বসে আমরা গল্প করে কিছুটা অন্ততঃ নিজেদের দেশকে ফিরে পাই। বাঙালীদের আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি—লণ্ডনে নিজেদের মধ্যে প্রায় সর্বদাই আমরা ইংরিজিতে কথা বলি—কিন্তু একজন অপরিচিত অন্য প্রদেশীয় বা দেশীয় লোক থাকলেই বাঙলায় কথা বলতে সুরু করি। এই অভ্যেসটা এমনি বাঙালী যে লণ্ডনে সেটা ক'রে আমরা যথেষ্ট আরাম বোধ ক'রে থাকি। বাঙলা ভাষা তো খারাপ ভাষা নয়—তবে কেন লোকেদের আপত্তি?

যত দিন যেতে লাগল ভারতীয়দের সংখ্যা দেখে তাজ্জব বনে যেতে লাগলাম। এত ভারতীয় সেখানে থাকে যে, তার কোনো সঠিক হিসেব নেই। এখানে মনে রাখতে হবে, সমস্ত লণ্ডনবাসীর সংখ্যা প্রায় আশী লক্ষ, এর মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা অন্তত পাঁচ হাজার—শতকরা একও হয়তো নয়। কিন্তু আমরা ভারতীয় বলে, ভারতীয়দের সংগে ক্রমশ পরিচয় হ'তে থাকে এবং পরিচয় বাড়তেও থাকে। কেবল তাই নয়, প্রচুর পরিচিত লোক যে আসতে চায় লণ্ডনে কোলকাতা থেকে, তারও রাশি রাশি প্রমাণ আমিই পেতে লাগলাম। অগুণতি চিঠি আসতে লাগল—চেনা বন্ধু পরিচিতদের কাছ থেকে, ভাই আমি লণ্ডনে যাচ্ছি, ষ্টেশনে থাকিস। আমার জন্য একখানা ঘর ঠিক করে রাখিস, সস্তা যেন হয়—আর একটা চাকরীও ঠিক করে রাখিস। অনেকেরই ধারণা তখন ছিল যে বৃটেনে যখন চাকরী পাওয়া যায়, তখন যে কেউ যখন খুশি চাকরী পেতে পারে। এ রকম কত চিঠি যে আমি এবং আমার বন্ধু-বান্ধবেরা পেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ধারণায় যে খুব ভুল ছিল তা নয়—বৃটেনে তখন চাকরী পাওয়া যেত, এখনও যায়—কিন্তু অন্তত এক বছর না থাকলে চাকরী পাবার আশা কম—ছাত্র হ'লে বছরে কয়েক সপ্তাহের জন্য চাকরী পাওয়া সুবিধে, যেমন বড়দিনের সময় পোষ্ট অফিসে, গ্রীষ্মের সময় আলু তোলা বা ফল তোলার কাজ। কিন্তু প্লেট পরিষ্কার করা বা কয়লা খনিতে কাজ করা ছাড়া সহজে কোনো কাজই পাওয়া সম্ভব নয়। কারখানায় অ্যাপ্রেনটিসএর কাজ পাওয়াও যথেষ্ট কঠিন। তারা সমস্ত কারখানায় বিদেশী নিয়োগ করতে চায় না।

ব্লেনিম ক্রেসেন্টে যত দিন ছিলাম লণ্ডনের দ্রষ্টব্য জিনিস কিছু দেখিনি। আমি ধরে নিয়েছিলাম সমস্তই দ্রষ্টব্য, অতএব বিখ্যাত জিনিসগুলি পরে কোনো সময়ে দেখলেই হবে। প্রেরণা পেলাম অরুণ মিত্র নামক এক বন্ধুর কাছ থেকে। সে ওখানে তিন বছর আছে অথচ বাকিংহাম প্যালেস তখনো দেখেনি; শুনে বেশ আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিলাম বলাই বাহুল্য। কথাটা যাকে পাই তাকেই বলি। একদিন জীবন কোকুড়কে বললাম, আমার এক বন্ধু বাকিংহাম প্যালেস এখনো দেখেনি। জীবন বললো সেও দেখেনি। কেবল তাই নয় সে এখনো বৃটিশ মিউজিয়াম, টাওয়ার, উইণ্ডসর কাসল, হ্যাম্পটন কোর্ট ইত্যাদি দেখেনি। শুনে আমার বেশ আনন্দই হ'ল। আমি খুব খুশি হ'লাম। ভাবলাম দেখি মিষ্টার ম্যাথার্স কি কি দেখেছেন। মিষ্টার ম্যাথার্স একজন খাঁটি ইংরেজ এবং লণ্ডনবাসী! তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বৃটিশ মিউজিয়াম দেখেছেন কি না? মিষ্টার ম্যাথার্স বলতে আরম্ভ করলেন, ব্যাপার হ'চ্ছে কি—জায়গাটা কোথায় তা আমি জানি, হোবর্ণ ষ্টেশন বা টটেনহ্যাম কোর্ট রোড ষ্টেশনে নামলে কাছেই কোথাও হবে, পিকাডিলি থেকে নেমেও যাওয়া যায়—বিরাট বাড়ি—সুন্দর সব জিনিসপত্র আছে ভেতরে—দেখবার জিনিস।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখনো গেছেন কি? প্রশ্নটা করলাম একেবারে সোজাসুজি। মিষ্টার ম্যাথার্স বললেন, দেখি ভেবে। অনেকক্ষণ ভেবে বললেন, একবার তিনি গিয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের আগে—বেশ কয়েক বছর আগে।

এর পর যত লোককে দেখি দু চার পাঁচ বা আরো বেশি বছর লণ্ডনে আছেন, তাঁরা কেউই বৃটিশ মিউজিয়াম দেখেননি। অথচ যাঁরা লণ্ডনে দু'-চারদিন থাকেন তাঁদের সমস্ত দ্রষ্টব্য ব্যাপার দেখা শেষ হ'য়ে যায়। এই থেকে আমরা একটা থিয়োরী সৃষ্টি করেছি যে কোনো সহরকে জানতে হ'লে হয় সাত দিনে সমস্ত দেখে ফেলা প্রয়োজন, নইলে অন্তত কুড়ি বছর থাকা প্রয়োজন—এর মাঝামাঝি সময়ে কোনো বড় সহর দেখা সম্ভব হয়না। আমরা সবাই সাত দিনের বেশি এবং কুড়ি বছরের কম লণ্ডনে ছিলাম—তাই আমাদের দেখা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। স্কটল্যাণ্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে আমাদের বন্ধু বান্ধবেরা অনেক সময় একদিনেই সমস্ত লণ্ডন দেখে ফেলেছেন। আমাদের পাড়াটির বিচিত্রতা যথেষ্ট ছিল—পাড়ায় যদিও পার্ক খুব বেশি ছিল না—ছোট মেয়েরা রাস্তায় খেলাধুলো করতো। আমাদের বাড়ী থেকে কিছু দূরে একটি জায়গায় টেনিস খেলবার সুবন্দোবস্ত ছিল। জীবন, প্রভাস, অরুণ, কানুনগো এরা সুযোগ পেলেই সেখানে গিয়ে সামান্য পয়সা খরচ করে খেলতে যেতো। আমিও ওদের সংগে খেলতে গিয়েছি। কিন্তু টেনিস খেলা আর সম্ভব হয়নি। প্রায়ই র‍্যাকেটের সঙ্গে বল লাগেনি, মিছিমিছি দৌড়েছি, যখন লেগেছে তার ফল হয়েছে চমকপ্রদ। প্রায়ই আমার বল প্রতিপক্ষের দিকে তেড়ে না গিয়ে রকেটের মতো উপরের দিকে উঠেছে। অরুণ পালিত আমাকে প্রায়ই ধমকেছে, তুই খেলতে আসিস কেন? আমি সেই ধমক শুনে জেদ করে আরো খেলেছি কিন্তু কিছুমাত্র উন্নতি করতে পেরেছিলাম ব'লে দাবী করি না। গলফের ছোট সংস্করণ পাটিং দি গ্রীন খেলাটা মোটামুটি আয়ত্ত করেছিলাম, কিন্তু এ খেলায় উত্তেজনার নিতান্ত অভাব বশত খেলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। অরুণ খুব ক্রিকেট ভক্ত, আমি খেলাটা দেখতে পছন্দ করি কিন্তু কে খেলছে কে খেলছে না তা আমায় জানবার প্রয়োজন হয় না। বল ব্যাটের কাছাকাছি এলে মারা প্রয়োজন—তা যখনি দেখি কোনো ব্যাটসম্যান মারছে না তখনি সে খেলা দেখতে বিরক্ত বোধ করি। তাই ১৯৫২ সালে যখন ভারতীয় দল লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউণ্ডে খেলতে এলো তখন সবাই খেলা দেখতে গেল, কেউ স্কুল কলেজ কামাই করলো, কেউ অফিস থেকে পালালো বাজে অজুহাতে, কেউ ছুটি নিল—আবার একদল ম্যাঞ্চেষ্টার, লীডস, প্যারিস বা
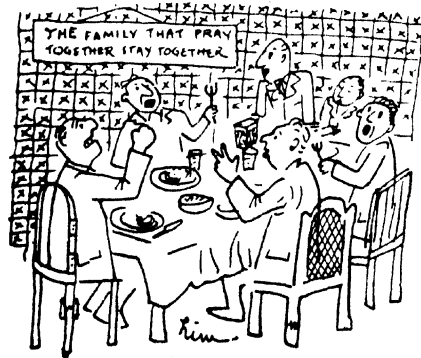
খাবার টেবিলের রাজনীতি

গ্লাসগো, এডিনবারা থেকে ছুটে এলো লণ্ডনে ক্রিকেট খেলা দেখতে। অরুণ পালিত আমাকে অনেক কষ্টে রাজি করালো লর্ডসে ক্রিকেট দেখতে। স্কটল্যাণ্ডের কেণ্টি নামক গ্রাম থেকে এলো পুলক বসু।

ক্রিকেট খেলা ধীর গতিতেই আরম্ভ হল। যাঁরা খবর রাখেন খেলার—তাঁরা নিশ্চয় বলতে পারেন কী ঘটেছিল। আমার দু' একটি জিনিস কেবলমাত্র মনে আছে—আমরা তিনশিলিংএর টিকিট কিনেছিলাম, সকাল ৮টা থেকে কিউতে দাঁড়িয়েছিলাম, খেলা দেখতে গিয়ে আজে বাজে অনেক গল্প করেছিলাম। ভিন্ন মানকড় যখন খুব পিটিয়ে খেলছিল তখন কোনো কোনো ইংরেজ ব্যারাক করছিল—ব্যারাকিংএর এমন নতুন ব্যবহার শুনিনি কখনো। কেবল একটি কথা—ষ্ট্যা - - লিন! যখনি মানকড় বল মারতে যাচ্ছে তখনি এক পাশ থেকে শোনা যাচ্ছে ষ্ট্যা - - লিন! তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত মাঠ কেবলি বলতে লাগলো, ষ্ট্যা-লিন! ষ্ট্যা-লিন!

ষ্ট্যালিন যা করতে পারেনি তা সম্ভব করলো ইংল্যাণ্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিসাবেথ। (প্রথম এলিসাবেথ স্কটল্যাণ্ডের রাণী ছিলেন না বলে স্কটল্যাণ্ডের একদল এখন বলছেন তাঁরা এই রাণীকে দ্বিতীয় বলতে চান না, কারণ তাদের পক্ষে ইনিই প্রথম।) রাণী হঠাৎ খেলা দেখতে এলেন সদলে, এসে সমস্ত খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাণ্ডশেক করলেন। খুব ভদ্রভাবেই করলেন কিন্তু ফল যা হল মারাত্মক। তার পোনের মিনিট পরেই ভারতবর্ষের দলটি ভেঙে পড়লো। একের পর এক ব্যাটসম্যানেরা পতিত হতে লাগলেন। রাণী দ্বিতীয় এলিসাবেথের নাম ভারতীয়েরা সকালে উঠে করা ছেড়ে দিল।

এই সময় এক সাধুর পাল্লায় পড়েছিলাম। আমাদের বাড়ীর কাছেই সেণ্ট ষ্টিফেনস গার্ডনসএ থাকতো। প্রথম যেদিন ওকে দেখি ওর দুই বগলে দুটি বিশাল পাঁউরুটি। আমার সংগে দেখা হবার সময় বললো, আপনি! দশ মিনিট পর সে আমাকে তুমিতে দাঁড় করিয়েছে। মিনিট কুড়ি পর বললো আয় না আমাদের বাড়িতে খাবি। আজ মাংস রাঁধছি। সাধু ঘটকের এই খাওয়ানো ব্যাপারটা ছিল একটা নেশা। সে কাউকে না খাইয়ে তৃপ্ত থাকতে পারত না। সপ্তাহে অন্তত একদিন তার বাড়ীতে বিরাট ভোজের আয়োজন হত। বিরাট অর্থাৎ প্রচুর মাংস, ঝোল আর রুটি মাখন।

সাধু ঘটকের বাড়ীতে সেদিন যাইনি। পরে আর একদিন বললো, কী রে এলি না কেন সেদিন আমার বাড়ী? খারাপ? তা যা না লায়ন্সে গিয়ে খা পচা জিনিস। ভাল জিনিস তোর ভাল লাগবে কেন? এর পর যেখানেই সাধুর সংগে দেখা লণ্ডনে মজলিসে বা অন্য কোন বন্ধুর বাড়ীতে সাধু আমাকে ক্রমাগত বলতে লাগলো ওর বাড়ীতে না যাওয়ার নিশ্চয় কোন বিশেষ অর্থ আছে। আমি যত বলি মিসেস ম্যাথার্স রান্না করে রাখেন সেটা নষ্ট হবে, সাধু বলে, ভালো লাগে ঐ রান্না তাই বল না! অবশেষে ওর বাড়ীতে একদিন যেতেই হল। সাধু, অর্থাৎ সাধন ঘটককে সেদিন বড় ভাল লেগেছিল। অমন চরিত্র, অপরকে আপন করে নেওয়া হৃদয় খুব কম দেখেছি। আর তার রাগ সামান্য কারণে সে অসামান্য উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পরেই তার উল্টো ক্রিয়া সুরু হ'য়ে যায়। সে অসামান্য শান্ত হ'য়ে পড়ে কম সময়ের মধ্যেই। যদি কাউকে চটিয়ে থাকে সে কোনো সময়, তার দশ মিনিটের মধ্যেই সে তার সংগে মিটমাটও করে ফেলেছে। তার প্রচুর গুণের মধ্যে একটিমাত্র দোষ—বন্ধু তার চাই-ই। একা সে কিছু করতে পারে না। নিজের জন্য সে রান্না পর্যন্ত করতে কষ্ট পায়।

আমাদের ঘরে এক দিন দেখি, মার্টিন আর মাইকেল খাট তুলে তার তলায় কি খুঁজছে। তার তলা থেকে গোটা দশেক কলার-ষ্টাড পাওয়া গেল কিন্তু তাতে তারা সন্তুষ্ট হ'ল না। তারা আরো খুঁজতে লাগলো। জিজ্ঞেস করলাম, কি খুঁজছ? মাইকেল বললো, আমার ইংক পেন্সিলটি। কবে হারিয়েছ? জিজ্ঞেস করাতে মাইকেল বললো, কবে ঠিক জানি না। আমি বললাম, একটা জিনিস হারিয়েছে অথচ কবে হারিয়েছে বলতে পারছ না? মার্টিন তখন বললো, দেখ অত্যধিক পকেট থাকাতেই এই বিপত্তি। আমাদের পোষাকে বড় বেশি পকেট। আমি বললাম, অর্থাৎ? মার্টিন বললো, আমাদের ক'টি পকেট দেখো—সাধারণত ট্রাউজারে অন্তত তিনটে পকেট থাকে, শার্টে একটা, ওয়েষ্ট কোটে চারটে, জ্যাকেটে পাঁচটা, ওভারকোটে তিনটে—ক'টা হ'ল? তার পরে বললো—ষোলটা! একজনের ষোলটা পকেট—যার চার-পাঁচটা স্যুট আর শার্ট থাকে তার প্রায় আশীটা পকেট, এখন কেউ যদি একটা পেন্সিল পকেটে রাখে এবং ভুলে যায় কোন্ পকেটে রেখেছে, তাহ'লে তাকে আশীটা পকেট হাতড়াতে হয়। তা হাতড়াতে গেলে একটা পরিকল্পনা করতে হয়—একটি পুরো ঘণ্টা নষ্ট হয়। মেয়েদের ওসব বালাই কম। তাদের হাণ্ডব্যাগে সমস্তই থাকে।

মাইকেল বললো, মেয়েদের আবার কয়েক ডজন হাণ্ডব্যাগ থাকে যে, তাতেই পুষিয়ে নেয়। মার্টিনকে স্বীকার করতেই হ'ল যুক্তিটি। মেয়েদেরও খুব সুবিধে নেই পেন্সিল হারালে। তবে, মার্টিন বললো, মেয়েদের কাছে কোনো জিনিস কখনো হারায় না। ওদের স্মৃতিশক্তি পুরুষদের চাইতে কয়েক গুণ বেশি। মাইকেল উদাসভাবে বললো, তবে পৃথিবীতে গ্রেট ম্যান এত বেশি কেন, মেয়েদের মধ্যে গ্রেট এত কম কেন?

দুজনের তর্ক চলতে লাগলো। পেন্সিল পাওয়া গেল না।

[ক্রমশঃ।

# বাসর

## সুকুমারী দাস

চলতে পথে থমকে পড়ে এ কি?
ক্লান্ত গমন শান্ত স্বপন সে কি?

শিশির-ধোয়া হাসির ছোঁয়া কে গো?
ক্লান্তগমন পান্থ হাওয়া কে গো?

আঁধার পারে আলোর দ্বারে কোন জাগে
শিউলী ফুলে ধূলির তলে কার রাগে?
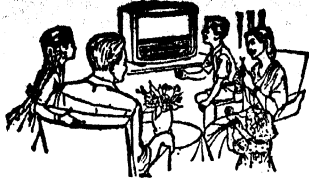
দামের তুলনায় সেরা
কাজেও অতুলনীয়

# ন্যাশনাল-একোর দুটি চমৎকার মডেল !

রেডিও শোনার আনন্দ উপভোগ করার জন্যে দুটি চমৎকার ন্যাশনাল-একো মডেল—দামের তুলনায় সেরা, কাজের দিক থেকেও অপূর্ব ! এগুলো 'মনসুনাইজ্‌ড', আর প্রত্যেকটিতে এক বছরের গ্যারান্টি আছে। আপনার সবচেয়ে কাছাকাছি ন্যাশনাল-একো ডীলারের কাছে গেলেই বাজিয়ে শোনাবে।
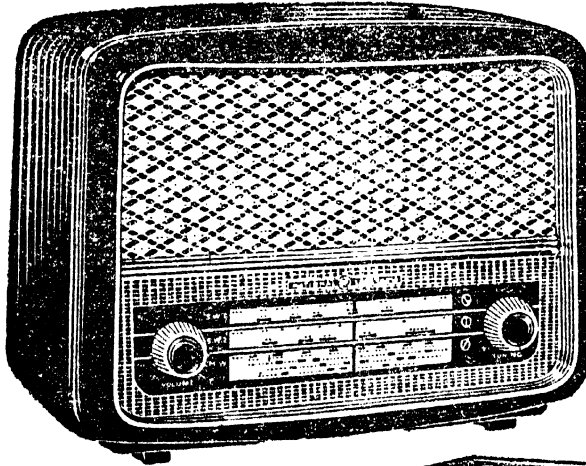
**মডেল ৭১৭ :** সোনালি বর্ডার দেওয়া মেরুন রঙের প্ল্যাষ্টিক কেবিনেট। মডেল ইউ ৭১৭—৫ ভাল্‌ব, ৩ ব্যাণ্ড ২৩০ ভল্টের জন্য, এসি/ডিসি। মডেল বি-৭১৭ : ৪ ভাল্‌ব, ৩ ব্যাণ্ড ড্রাই ব্যাটারীতে চলে।

দাম ২৫০৲ টাকা

নেট দাম দেওয়া হ'ল ; এর ওপর স্থানীয় কর

**মডেল এ-৩১৭ ডি-লাক্স** রেডিও—চমৎকার কাজ দেয়, এসিতে চলে। ৭ ভাল্‌ব, ৮ ব্যাণ্ড, ওয়ালনাট রঙের কাঠের ক্যাবিনেট। আর-এফ-ষ্টেজ টিউন।
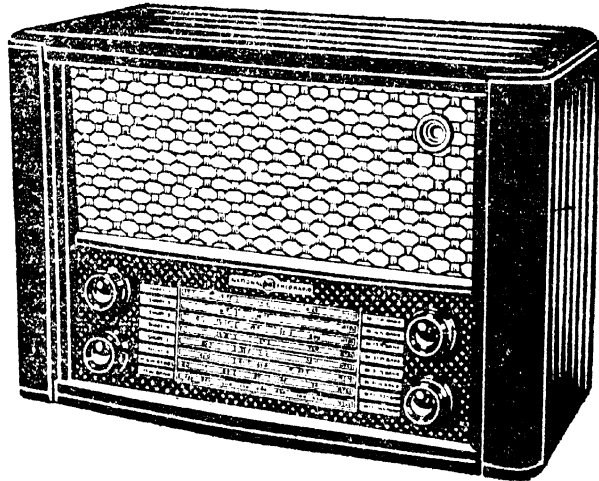
দাম ৫১৫৲

ন্যাশনাল-একো
রেডিওই সেরা—
এগুলো

জেনারেল রেডিও এণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড
৩ ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই ৪ • ১/১৮ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ • ৩৬/৭৯ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর • যোগধিয়ান কলোনী, চাঁদনী চক, দিল্লী • ফ্রেজার রোড, পাটনা।

GRA. 6398 (R)

## অমনোনীতা

### অমিত্রচ্ছন্দা সেন

জগতে এক একজন দর্শকের ভূমিকা নিয়েই আসে, আর এক একজন সেখানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। আমি বোধ হয় দর্শকের ভূমিকা নিয়েই জন্মেছিলাম। স্কুল-কলেজ-জীবনে সর্ব্বদাই আমি বিভিন্ন বিষয়ে সহপাঠিনীদের কৃতিত্ব মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখেছি ও উৎসাহিত করেছি। কিন্তু নিজে কোন কিছুতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিনি। কারণ, রূপে গুণে, চালচলনে আমি খুবই সাধারণ ছিলাম। এমন কোন গুণ আমার ছিল না যা সকলের সামনে বিশেষ করে দেখানো যেতে পারে। চেহারাটাও আমার নিতান্তই সাধারণ—আমাদের পরিবারে অবশ্য এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার!

সাধারণ চেহারাকে অসাধারণ করে তোলার পদ্ধতিটা পর্য্যন্ত আমার জানা ছিল না। বাড়ীতে বৌদিরা যখন কোন উপলক্ষ্যে সাজতেন সেখানেও আমার দর্শকের ভূমিকা থাকত। আমি অবাক হয়ে দেখতাম, কেমন করে বৌদি ওর একরাশ কালো চুল দ্রুতগতিতে নূতন ছাঁদের খোঁপায় বেঁধে ফেলতেন—আর তাতে আলতো ভাবে জড়িয়ে দিতেন কখনও বেলকুঁড়ি কখনও যুঁইয়ের মালা। মুখে ক্রীম বুলিয়ে মসৃণ করে ফেলতেন ত্বকটাকে, তার পরে প্রলেপ দিতেন কত বিভিন্ন প্রসাধনীর। আইব্রাও পেন্সিলের নিপুণ টানে কেমন করে ভ্রূযুগল পেত উড়ন্ত পাখীর ছন্দ আর লিপষ্টিকের রক্তিম স্পর্শে অধর হয়ে উঠত রাঙা। শাড়ীর পাড়ের সঙ্গে মেলানো বাহারী ব্লাউজ পরে বৌদি যখন আরসীতে নিজের ছবি দেখে তৃপ্তির হাসি হাসতেন তখন আমি অবাক হয়ে দেখতাম। আমার কিন্তু কোনদিন আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সাজাবার ইচ্ছে জাগেনি।

এই দর্শকসুলভ মনোভাবের জন্য আমার বন্ধুমণ্ডলীর সকলেই আমার সাহচর্য্য কামনা করত। এই পৃথিবীতে দেখবার লোকেরই অভাব বেশী। নিজেকে দেখাবার প্রবৃত্তিটা কম-বেশী ভাবে সব মানুষের মধ্যেই আছে। যারাই আমার সংস্পর্শে এসেছে তারাই বুঝতে পেরেছে যে এই মেয়েটির নিজের কিছু জানাবার নেই, এ শুধু শুনতেই জানে আর সহজেই একে মুগ্ধ করা চলে। বোধ হয় এই কারণেই দার্জ্জিলিঙের এক শান্ত সকালে শিখা, শাশ্বতী আর কল্পনা আমাকে দেখে অত খুসী হয়ে উঠেছিল।

সেদিন সকালে দার্জ্জিলিঙের এক জনাকীর্ণ রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের ওপরে ছোট্ট একটা সাজানো বাড়ীর জানলায় দেখা গেল তিনটি সহাস্য মুখ। পরিচিত ভঙ্গী দেখেই আমি চিনলাম শাশ্বতী, শিখা আর কল্পনাকে।

দেখেই ভারী আনন্দ হল। বুঝলাম এইবার আমার একটানা উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ানো শেষ হল। কারণ যেখানেই ওই ত্রিমূর্ত্তি সেখানে একঘেয়েমি কোন ক্রমেই প্রবেশ করতে পারে না। পাহাড়ে-পথটা পার হয়ে ওদের বাড়ীতে এসে যখন পৌঁছলাম তখন শুধু শাশ্বতীই অস্থির ভাবে বারান্দায় পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। মনটা খুসীতে ভরে উঠল। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, ওর এই অস্থিরতা আমার দেরী হওয়ায় জন্যে কিন্তু সে ভুলটা ভাঙলো বাড়ীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই। শিখা পায়ের শব্দ শুনেই ছুটে এল, আর পাশের ঘর থেকে কল্পনার উত্তেজিত গলা শোনা গেল Has he come?

আমি একটু ম্লান গলায় বললাম, তোমরা কার জন্যে অপেক্ষা করছিলে, আমি এসে তোমাদের নিরাশ করলাম তো? শাশ্বতী তার কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে তুলল, তুমি আসবে সেটা তো জানাই কথা এবং সেই সঙ্গে শিখা আরেক জন ভদ্রলোককে আশা করছিল কি না, তাই আমি খোঁজ করছিলাম।

ইস! ওর কথা বিশ্বাস কর না অমি! শিখা প্রতিবাদ জানালো, অপেক্ষা তো শাশ্বতীই করছে। ওর মত কুঁড়ে সাত-সকালে বিছানা ছেড়ে সাজগোজ করতে শুরু করেছে, কাজেই বুঝতেই পারছ।

কল্পনা হেসে বলল, আর আমার নামটা বাদ পড়লো কেন? ভদ্রলোক আমাকে বিশেষ নজরে দেখেন বলে।

আমি থাকতে তোমরা কি করে আশা কর যে তোমাদের দিকে সেই ভদ্রলোকটি তাকাবেন? প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল শাশ্বতী ও শিখা। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড হাসির রোল পড়ল। ভারী ভালো লাগল দার্জ্জিলিঙের এই কুয়াশাঘেরা সকালটা। তিনটি সজীব প্রাণের উচ্ছল হাসিতে ছিল মিঠে রোদের আমেজ। জিজ্ঞাসা করে অনেক কিছুই তথ্য জানলাম সেই ভদ্রলোকটি সম্পর্কে। তরুণ কবেষ্ট অফিসার—বয়স তরুণ হলেও গাম্ভীর্য্যে প্রবীণকেও হার মানান। নাম সুব্রত রায়চৌধুরী। ভদ্রলোকের চেহারা মার্জ্জিত, আচার-আচরণ মার্জ্জিততর। সাজসজ্জাবিধির প্রতিটি নিয়মকানুন যে তার মজ্জাগত তা আবিষ্কার করলাম শিখা শাশ্বতী আর কল্পনার কথা শুনে। সাজসজ্জার ত্রুটি ওরা সহ্য করতে পারে না আর এ বিষয়ে ওদের খুঁতখুঁতানির অন্ত নেই। সুতরাং ভদ্রলোকটি সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল জাগল।

সুব্রত রায়চৌধুরী কথা ভয়ানক কম বলে। শিখা এই তথ্যটি পরিবেশন করে উদাস দৃষ্টিতে খোলা জানলার দিকে তাকালো। কিন্তু যখন বলে তখন শুধু ওর কথাই শুনতে ইচ্ছে করে—শাশ্বতী মন্তব্য করল। কল্পনা একটু হেসে বলল আর যা বলে, সবটুকু আমাদের মাথাতেও ঢোকে না, কিন্তু তবু শুনতে ভালো লাগে।

কথাটা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। শাশ্বতী, শিখা আর কল্পনার বোধশক্তিটা সাধারণের থেকে একটু বেশীই হবে। একটা নামকরা কলেজের ইংরিজী অনার্সের ছাত্রী ওরা—কারো মুখে কোন সুন্দর কথা শুনলে ওরা সহজেই ধরে ফেলে কোন দেশের কোন লোকের কোন বইয়ের ধার করা কথা। ওদের চমক লাগানো যে সহজ নয় এটা আমার ভালো ভাবেই জানা।

আলাপ হল কোথায়? আমার এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে

তিন জনকেই ব্যস্ত দেখা গেল। শিখা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা অমি, বাফেলো আর বাইসনে তফাৎ কি বলতে পারো?

আমি একটু হেসে বললাম, এটা তো ঠিক আমার আওতায় পড়ে না, কাজেই বলতে পারবো না। আমরাও পারিনি। তিন জনেই সমস্বরে বলে উঠল।

ও, বাইসন প্রসঙ্গ থেকেই বুঝি তোমাদের আলাপ? আমি বেশ নিরাশ হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

আলাপ হয়েছে এক রোমান্টিক পরিবেশে দার্জ্জিলিঙের বোটানিকাল গার্ডেনে। কথাটা বলেই শিখা কি ভাবতে শুরু করল। শাশ্বতী বলল আকাশে তখন মেঘ ছিল কি ছিল না, মৃদু বাতাস তখন হয়তো বয়েছিল কিন্তু ফুল ফুটেছিল অসংখ্য। ফুল যে এত সুন্দর হতে পারে, এর আগে আমি কখনও উপলব্ধি করতে পারিনি। অমি, তুমিও একদিন বোটানিকাল গার্ডেনটা দেখে এসো।

আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠলাম, আর কাব্য করতে হবে না, দোহাই তোমার, তাড়াতাড়ি বলো কি করে আলাপ হলো তোমাদের!

সখি, শেষ করা কি ভালো? বলছি, বলছি। সেই ফুল দেখে যখন আমরা মুগ্ধ হয়ে রয়েছি—

এমন সময়ে—ভদ্রলোক ঢুকলেন। আমি আগ্রহাতিশয্যে নিজেই কথাটা শেষ করে দিলাম।

তোমার হিসেবে ভুল হল হে ম্যাথামেটিসিয়ান। শাশ্বতী হাসলো। চিরাচরিত নাটকের নায়কের মত কি আর আমাদের নায়ক প্রবেশ করতে পারে? আমরা তো অবাক হয়ে দেখছি ফুল কত সুন্দর হতে পারে, এমন সময় শিখা চেঁচিয়ে উঠল, ইস! কি জ্বালা করছে! সঙ্গে সঙ্গে আমি আর কল্পনাও অনুভব করলাম পায়ের ওপর ভীষণ চুলকানি—আর চারদিকে ঘাসের ওপর শুঁয়ো পোকা।

কি অ্যানটি ক্লাইমেক্স! ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আমি বললাম, বিধাতাপুরুষের কি একটুও রসবোধ নেই?

আহা, শোনই না। এমন সময়ে একটি ভদ্রলোকের গলা শুনলাম Can I help you? ঘাড় ফিরিয়ে দেখি একজন ভদ্রলোক। প্রথম দৃষ্টিতেই নজরে পড়ল দুটি জিনিষ। প্রথমত ভদ্রলোক সাধারণ বাঙালী ছেলের পক্ষে অত্যন্ত লম্বা আর দ্বিতীয়ত মুখটা দেখতে কচি হলেও এত বেশী গম্ভীর যে বেশীক্ষণ তাকিয়ে দেখা যায় না।

গাঢ় শেলের চশমার আড়ালে কথা কওয়া চোখের কথা যে বললে না বড়? প্রশ্ন করল কল্পনা।

সেটা এখানে অবান্তর, হেসে উত্তর দিল শাশ্বতী।

শুনলাম ওদের আলাপ হবার ইতিহাস, আর বুঝলাম যে এই ত্রিমূর্ত্তির যখন একসঙ্গেই একজনকে ভালো লেগেছে তখন ভদ্রলোকের মধ্যে নিশ্চয় কিছু মুগ্ধ করার উপাদান আছে।

সেদিনের সকালটা মন্দ কাটলো না সুব্রত রায়চৌধুরীর গল্প শুনে। হোটেলে ফিরে দেখলাম, তখন সবে কোলকাতার ডাক এসে পৌঁছেছে। বি, এ পরীক্ষার পর দার্জ্জিলিঙে এসেছি শরীর ও মন সজীব করতে, সঙ্গে এসেছেন মা ও বাবা। মন কিন্তু সব লরই পড়ে আছে কোলকাতায়। চিঠি দেখেই বাবার মুখ খুশিতে ভরে উঠল। বুঝতেই পারলাম যে ওটা কাকামণি মানে বাবার আবাল্যের বন্ধু বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি। চিঠি পড়ে বাবা বেশ আনন্দ পেলেন বলে মনে হলো এবং আনন্দের কারণটা আমি জানতে পারলাম 'বিকেলবেলাতে।

মা আমাকে ডেকে বললেন, অমি, এবার তো তোমার বি, এ পরীক্ষা হয়ে গেল, আমরা তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করছি। আমার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করে মা বললেন, আমি জানি যে বার বার লোকের সামনে দেখানো তুমি পছন্দ করো না। তাই যেখানে তোমার রূপের থেকে তোমার পড়াশুনা, বংশ, স্বভাবের আদর হবে, সেইখানে তোমার সম্বন্ধ করা হবে।

দার্জ্জিলিঙে বেড়াতে এসে তুমি যে আমাকে এ রকম বিপদে ফেলবে, তা আমি ভাবতেই পারিনি মা! তা ছাড়া এখানে তুমি পাত্রই বা পেলে কোথায়?

তোমাদের কাকামণি জানিয়েছেন যে, এখানে একটি ভালো ছেলে আছে, ফরেষ্ট অফিসার, পড়াশুনার রেকর্ড তোমার থেকেও অনেক ভাল। তাঁর বাবা তোমার কথা শুনেছেন এবং জানিয়েছেন যে, তাঁর ছেলের পছন্দেই তার পছন্দ। ছেলেটিকে আজ রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করেছি।

না, ওসব আমি পারবো না! আমার গলায় বোধ হয় এই প্রথম বিদ্রোহের স্বর শোনা গেল। মা একটু বিস্মিত হলেন বলে মনে হল। ছেলেটি যদি তোমাকে পছন্দ না করে, তাহলে বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন কেউ জানতেও পারবে না। তা ছাড়া ছেলেটি তো এসব কিছুই জানে না এখন—তোমার কি আপত্তি থাকতে পারে?

আচ্ছা, বেশ, বেশ! লোকের সামনে আমার এই সুন্দর চেহারা না দেখালে যখন সুখ নেই তোমার, তখন দেখিও। ভদ্রলোকের নামটা শুনে রাখি, লিষ্ট করে রাখতে হবে তো, কতজনের সামনে বিয়ের ইণ্টারভিউ দিলাম।

আমার এই কথায় মা হেসে বললেন, সুব্রত রায়চৌধুরী। নাম শুনেই প্রথমে আমি চমকে উঠলাম, তার পরে সকালের কথা মনে পড়ে ভীষণ হাসি এল।

মা একটু অবাক হলেন। এমন উল্লাসভরা হাসি আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ বলেই বোধ হয়। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললাম, মা, বৃথাই নেমন্তন্ন করলে ভদ্রলোককে, শীঘ্রই আমার তিন বন্ধুর একজন ওর বরমাল্য লাভ করবে। ওদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কি আমি পারি? ওরা সাহিত্যের ছাত্রী কিন্তু সাহিত্য ছাড়াও ওরা পৃথিবীর অনেক কিছু জানে। পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওরা চলতে জানে, কথা বলতে জানে, নিজেকে সাজাতে জানে, আর আমি—আমি তো এ যুগের মেয়ে হয়েও এসবের কিছুই জানি না। আমি পড়ে আছি আমার লেখাপড়ার জগতে, আমার অঙ্কের হিসাব মেলাতে সেখানে আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির খবর পৌঁছেছে কিন্তু আলো এখনও ঢোকেনি। এত আভিজাত্যের মধ্যে থেকেও আমি এত সাধারণ যে, সব জায়গাতেই আমি বড় বেমানান। হাসি আসছে এই ভেবে যে, সকালে যার গল্প এত উৎসুক হয়ে শুনছিলাম, ভাবতেও পারিনি যে তিনিই আবার রঙ্গমঞ্চে নামবেন নূতন অভিনয়ে।

পৃথিবীতে কা'কে কার কখন ভালো লাগে তা কি বলা যায়? মাকে একটু চিন্তিত দেখা গেল। সকালবেলার কাহিনীর নায়কের দেখা পেয়ে আমার কৌতূহল মিটবে—বেশ আনন্দ পেলাম।

মাকে বললাম মা, তুমি খবর শুনে দুঃখিত হলে কি না জানি না, কিন্তু আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। মা হেসে ফেললেন।

কিন্তু সুব্রত রায়চৌধুরীকে আমার সে রাত্রিতে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। কারণ, ভদ্রলোক সেই দিন সকালেই শিলিগুড়িতে বদলী হয়ে গিয়েছিলেন।

সুব্রত রায়চৌধুরীর প্রসঙ্গ হয়ত একেবারে চাপা পড়ে যেত, মা এবং বাড়ীর অন্যান্য সকলের বিস্মৃতির অন্তরালে। যদি না মধুচ্ছন্দা আমার ঠিকানা লেখার খাতায় শিখা মিত্রের নামের পাশে সুব্রত রায়চৌধুরীর নাম হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলত। মধুর বয়স অল্প, তাই দিদির সহপাঠীদের সম্বন্ধে কল্পনাগুলো এখন রোমান্টিক অবস্থাতেই আছে। সুব্রত রায়চৌধুরীকে সে আমার সহপাঠীদেরই একজন বলে ধরে নিল।

ওর এক রাশ প্রশ্নের উত্তরে জানালাম, সুব্রত রায়চৌধুরী একজন ফরেষ্ট অফিসার, একটু থামলাম শুধু ওর কৌতূহল বাড়াবার জন্যে—ওসব দার্জ্জিলিঙের ব্যাপার।

আশাতীত ফল হল, মধু অনুনয়ের সুরে জিজ্ঞেস করল, বল না দিদি কি হয়েছিল?

মধু, তোরা কেউ জানিস না। শুধু বাবা মা আর আমি জানি। দার্জ্জিলিঙে এই ভদ্রলোক আমাকে দেখতে এসেছিলেন।

যা! মধুর কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর।

বাজে কথা নয়, একেবারে সত্যি! এলেন, আলাপ করেও গেলেন কিন্তু বাবাকে বা কাকামণিকে কোন খবর জানালেন না। বাবা, মা বুঝতেই পারলেন যে পছন্দের মাপকাঠিতে আমি নাকচ হয়ে গেছি। কিন্তু আমার কাছে একটা চিঠি এল।

চিঠি! মধুর কণ্ঠে উৎসাহ আর উত্তেজনা বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল। ঠিক ভাষাটা আমার মনে নেই কিন্তু বক্তব্যটা এই রকম।

"সেদিন ম্যালের সামনে আপনাদের সঙ্গে আলাপ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাবার পাঠানো নিমন্ত্রণের চিঠির উদ্দেশ্যটাও আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তার কিছুদিন বাদেই আমি আমার বাবার কাছে নির্দ্দেশ পেলাম যে আপনাদের বাড়ীতে আমাকে জানাতে হবে আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে কি না। আপনার বাবাকে না লিখে আপনাকে কেন লিখছি, সে প্রশ্নের জবাবে আমি জানাতে চাই যে আমার যে বক্তব্য সেটা আপনার বাবাকে জানানো ধৃষ্টতা হবে—কারণ তিনি গুরুজন-স্থানীয়। দেখুন, এক ঘণ্টার আলাপে কাউকে চিনে ফেলবার ক্ষমতা থেকে ঈশ্বর আমাকে বঞ্চিত করেছেন। সেইজন্যে আপনি আমার মনোনয়নের যোগ্য কি যোগ্য নও, তা আমি এখনও বুঝতে পারিনি। শুধু আপনার ক্ষেত্রে নয়, কোন সময়েই আমি তা বুঝতে পারি না। পিতৃমাতৃ-নির্ব্বাচিতাকে নিজে না দেখেই বিয়ে করার মধ্যে যে সাহসের দরকার, সেই সাহসকে আমি প্রশংসা করি—কিন্তু সে সাহস আমার নেই। আমি সমস্ত দেশ ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছি একটি শিক্ষিত উদার মন। যাদের সঙ্গে মেশবার সুযোগ আমার হয়েছে, প্রত্যেক জায়গায় দেখেছি আত্মপ্রচারের চেষ্টা, অন্তঃসারহীন শিক্ষার গর্ব্ব। আগেকার কালে যখন মেয়েকে সাজিয়ে এনে ভাবী পাত্রপক্ষের সামনে তার সব গুণপণা কীর্ত্তন করা হত, তার মধ্যে দীনতা ছিল, কিন্তু আজকালকার যুগে সে সব শিক্ষিতা মেয়েরা যখন নিজেই নিজের স্বামীর সন্ধানে নির্লজ্জ ভাবে আত্মপ্রচার করে, তার দীনতা আমাকে সব থেকে বেশী দুঃখ দেয়।

আমি বুনো মানুষ—বনের মধ্যে ছোট একটা বাংলোতে থাকি—সহরের থেকে বেশ কিছু দূরে। পারবে কি কোন শিক্ষিতা মেয়ে সহরের সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করে, সেখানে থাকতে?

আপনাকে মনোনীত করতে আমি পারলাম না—এক ঘণ্টার আলাপে তা যদি করি, তবে আপনাকেই অসম্মান করা হবে। যত দিন না আপনাকে সত্যিকারের চেনবার সুযোগ পাই তত দিন আমার আপনাকে অমনোনীত করার কোন অধিকার নেই—যদি কোন দিন সে সুযোগ হয় তবে সেই দিনই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভদ্রলোককে আমার খুবই ভালো লাগছে দিদি!

মধু আস্তে আস্তে বলল, আমি কোন উত্তর দিলাম না। দর্শকের ভূমিকাতেই আমি অভ্যস্ত সুব্রত রায়চৌধুরী, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য অন্তত তুমি আমাকে নায়িকার সম্মান দিয়েছ। অমনোনীতা হওয়াতেও যে কতখানি আনন্দ আছে সেটা আজ তুমিই প্রথম জানালে আমাকে।

## উপহার

### সাগরিকা শ্যাম

খানিক আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কাজল-কালো মেঘের আড়াল থেকে সূর্য্যের ম্লান বিষণ্ণ আলো সসঙ্কোচ ভীরুতায় পৃথিবীর বুকে নেমে আসছিলো ধীরে ধীরে।

রবিয়া একটা হাই তুলে হাতের খৈনীগুলো ঝেড়ে ফেলল। নাঃ—বেরোতেই হবে। রোজের কাজ ঠিকমতো করে না দিলে তো আর পেটে দানা ফেলবার উপায় নেই তাদের। কি ভাবছিলো সে? এমনি মেঘলা সকালে নরম বিছানায় শুয়ে বড় বাবুর মত এক কাপ চা? হাসি পেল রবিয়ার। এসব স্বপ্ন-বিলাস করছিলই বা সে কি করে! কোদাল ও ঝুড়িটা হাতে তুলে নেয় সে। রবিয়া চল যে চল—পথ থেকে মংরু হাঁক দেয়।

এসব চা-বাগানের কুলীদের নাম সচরাচর সাপ্তাহিক বারের নামে রাখা হয়। এই যেমন, রবিয়া, সোমরা, মংরা, বুধনী ইত্যাদি। যে বারে যার জন্ম হয়, সেই বারের নামই সাধারণত তারা ব্যবহার করে থাকে।

দাদা, দেখবে, হামার মনিয়া কেতনা বড় হোচ্ছে! কেতনা বাহার খুলছে! তুষারের মত ধবধবে সাদা, টুকটুকে লাল ঠোঁট, একটা রাজহাঁসকে বুকে জড়িয়ে ধরে একমুখ হাসি নিয়ে ময়না রবিয়ার পথ আটকে ঝলমল করে উঠল।

রবিয়া খিচড়ে ওঠে, যাঃ ভাগ ভাগ—দিন-রাত কেবল হাঁস, আওর হাঁস। আর কিতনা দিন এই সব পারবি রে। আভিসে থড়া থড়া কাম করে শরীরটা শক্ত করে নে। দু'দিন পিছাড়ি যেতে হবে না কলঘর?

ময়না হাসে খিল-খিল করে—কাম হামি তোমার চেয়ে ভালো করতে পারব দেখে লিয়োন—

তা তো দেখছিই হরদম, কামজারী বাবুর ঘরে জল দিস ঠিক মতো? তারা কালও ঘ্যান-ঘ্যান করেছে আমার কাছে। আজ ঠিক ন'বাজে জল দিয়ে যাবি—না-হলে শেষ করে দেব আজ।

ওঃ ফুটানী দেখো! ময়না একটা ভেংচি কেটে তাদের কুঁড়ে-ঘরের দাওয়ার পাশে রাধাচূড়া গাছটার নীচে ধপ করে বসে পড়ে। হাঁসটাকে কোলের মধ্যে ফেলে মনের সমস্ত দরদ সুরের মধ্যে ঢেলে হাঁসটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলতে থাকে, হামার বাচ্চ, মনিয়া মেরা, পংখী মেরা। তার বুকের সমস্ত স্নেহ এসে যেন নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে হাতটার মধ্যে। পরম আরামে কোলের মধ্যে কুঁকড়ে গিয়ে হাঁসটা ময়নার সমস্ত সোহাগ উপভোগ করতে থাকে।

ময়না বারো-তেরো বছরের মেয়ে। রবিয়ার ছোটো বোন। বছর চারেক আগে ম্যালেরিয়ায় পর পর তাদের মা-বাবা মারা যায়। নিকষ-কালো গায়ের রং ময়নার। নিটোল স্বাস্থ্য তার দেহ-শ্রী করেছে মোহনীয়। কোন শিল্পী যেন কালো পাথর দিয়ে নিখুঁত সুন্দর এক কিশোরী-মূর্ত্তি গড়ে তুলেছে। টানা-টানা চোখ, ধারালো নাক। এ অঞ্চলে সুন্দরী বলে সুনাম আছে ময়নার!

এই বাচ্চা রাজহাঁসটা মংরু উপহার দিয়েছিলো তাকে মাস দুই আগে। মনে পড়ে, একদিন সন্ধ্যের সময় ঝরণা থেকে জল তুলছিল ময়না। হাতমুখ ধুতে মংরুও এসেছিল সেখানে। কলসীটা কাঁখে তুলে নিয়েই একবার আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকিয়েছিল ময়না। নীল আকাশে কালো মেঘের কোলে সাদা পদ্মের মালার মত ঝিলমিল করে যাচ্ছে···ও কি! ময়না উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—দেখো দেখো, মংরু ক্যায়সা বঢ়িয়া!

মংরু চমকে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল, তারপরই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠেছিল, ও হো, আচ্ছা, হামি তোকে ওরকমই একটো দিয়ে দিতে পারি।

ইস, তুই দিবি কি না—ঠোঁট ফুলিয়ে ময়না জবাব দেয়, তারপরই কলসী কাঁখে নিয়ে তর্ তর্ করে টিলা থেকে নামতে থাকে সে।

মংরুও পিছু নেয়। বলে, তুই যদি চাস তবে হামি দেব না কেন? বহুত সুন্দর এক হাঁস কাল বাজারমে দেখেছি। কিন্তু তোর পছন্দ হোবে কি না সমঝাতে পারলুম না। পরদিনই মংরু তার বহু পরিশ্রমের সঞ্চিত দুটি টাকা খরচ করে একটা সুন্দর রাজহাঁসের বাচ্চা নিয়ে আসে ময়নার জন্য। ময়না যদি খুসী হয় তবে এ টাকা আর তার কাছে কি? খুসীও হয়েছিল ময়না। উজ্জ্বল আলোমাখা মুখে হাঁসটা বুকে তুলে নিয়েছিল সে। যে দেখে, সে-ই হাঁসটার রূপের তারিফ করে। সখীরা চোখ ঠারিয়ে বলে, বাঃ!

রোদের তাত, বেড়ে ওঠে। ময়নাও স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে আসে। যেতে হবে ঐ টিলায়। বাসন ধুয়ে, জল তুলে এনে দিতে হবে বাবুদের বাড়ী।

চল না, একটু বেড়িয়ে আসি,—মুগ্ধ চোখে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে নীলা বলে। বারান্দার আরাম-কেদারায় শুয়ে আছে নীলা। একটা কাশ্মীরী শাল তার শুভ্র তনুকে করেছে আবৃত।

ওপাশের আরেকটা চেয়ারে বসে সমীর চা খাচ্ছিল। স্ত্রীর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, এখন থাক্, দেখছ না বৃষ্টি এল বলে। বিকেলে যাবো'খন ওদিকটায় বেড়াতে।—সত্যি, কি সুন্দর এ সব চা-বাগান—

নীলা শালটাকে গায়ের মধ্যে ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বলতে থাকে,—চা তো খাই রোজই,—ভাবিনি তো কখনও এত সুন্দর পারিপার্শ্বিক থেকে আসে। আসামে যে এত চমৎকার জায়গা আছে এ তো কখনও কল্পনা করতে পারিনি। এ যে স্বর্গকেও হার মানায়। নীলার আয়ত স্বপ্নালু চোখ দুটিতে স্নিগ্ধ মাধুর্য্য নেমে আসে।

স্বর্গ তুমি দেখেছ বুঝি? সমীর হেসে প্রশ্ন করে। নীলা অপ্রতিভ হয় না মোটেই। মুখ টিপে হেসে বলে, দেখিনি অবিশ্যি, তবে কল্পনা করতে পারি তো!

মাস ছয়েক হলো নীলা ও সমীরের বিয়ে হয়েছে। সমীর ধনী ব্যবসায়ী। বিয়ের পর সে জ্যাঠামশায়ের আমন্ত্রণে নতুন বউ ও ছোটো ভাই সুধীরকে নিয়ে এই চা-বাগানে বেড়াতে এসেছে। ওর জ্যাঠামশায় এখানকার বড়বাবু। নীলা ধনী শিল্পপতির কন্যা। কোলকাতা ছেড়ে আর কোথাও যায় নি সে। স্বামীর ঘর করতে আসামের তেজপুর সহরে এই প্রথম এল। সেখানে এসে সবই তার কাছে নতুন ঠেকছে। সবই সুন্দর। তার পর এই চা-বাগানে জ্যাঠাশ্বশুরের বাড়ীতে এসে তো একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সে। এছাড়া সমীরের এখানে আসবার আরও একটা কারণ রয়েছে। সে এই বাগানটি এখানকার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিনে নেবার একটা চেষ্টাও করছে অনেক দিন থেকে।

বিকেলবেলা ময়না হাঁসটাকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বড়-সাহেবের বাংলোর কাছে এসে দাঁড়ায়। টিলার উপরে বাংলো, কত রকমারী ফুলের গাছ চারিদিকে। ইস কত ফুল! তার বড় সখ সাহেবের বাংলোর যে কোনো একটা ফুল সে পরবে খোঁপায়। রবিয়াকে সে কত বলেছে একটা ফুল লুকিয়ে এনে দিতে। কিন্তু রবিয়া সাহস করে না। আচ্ছা, এখন তো সে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না চার পাশে। আনবে না কি একটা ফুল নিয়ে? ময়না বাঁধানো সিঁড়ির দু'ধাপ উঠে। তারপরই হঠাৎ ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে সিঁড়ির পাশে টিলার গায়ে যেন সেঁটিয়ে যেতে চায় সে।

বাংলো থেকে সিঁড়ি বেয়ে গট্-গট্ করে নামছে বড় সাহেব আর ছোটো সাহেব। কি সব ইকড়ি-মিকড়ি বলতে বলতে আসছে তারা, কিছুই বুঝতে পারে না সে। তাকে দেখে হেসে বড়সাহেব কি জানি বলল ছোটো সাহেবকে। ছোটো সাহেবও হেসে একটু যেন অবাক হয়ে তার দিকে চাইল। তারপর হঠাৎ যেন আপনা থেকে একটু পিছিয়ে পড়লো ছোটো-সাহেব। ময়নার পাশ দিয়ে যাবার সময় চট করে কোটের বোতাম থেকে একটা গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে ময়নার পায়ের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে, আবার তাড়াতাড়ি বড়-সাহেবের সঙ্গ নিলো সে। ময়না খানিক হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পায়ের কাছে পড়ে-থাকা ফুলটাকে তাড়াতাড়ি তুলে নিল সে। কি সুন্দর, আঃ! খুশীতে উপচে উঠল ময়না! গর্ব্বে তার বুক উঠল দুলে। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলল সে বাড়ীর দিকে। কিন্তু পথের মধ্যেই পেয়ে গেল রবিয়া আর মংরুকে। দেখ রে ভাইয়া—হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল ময়না—ছোটো-সাহেব হামাকে এই গোলাপ ফুলটি ছুঁড়ে দিল। নিমেষে কালো ছায়া পড়ে মংরুর মুখে, কঠিন হয়ে ওঠে রবিয়ার মুখ।

গম্ভীর হয়ে গিয়ে রবিয়া বলে, থাম এই সন নাই হাসবি। ফেক দে ফুল। আর কোনো দিন যদি ছোটো-সাহেব ঠিনে যাস তো ভালো হোবে না বোলছি। এতোয়ারীর কথা ভুলাই গেলি? হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় ময়না। একটা আতঙ্কের শিহরণ যেন তার মনের এ-পাশ থেকে ও-পাশে চলে যায়। মুখ ভারী করে ধীরে ধীরে সে পদ্মঝিলের দিকে হাঁটতে থাকে।

ইতওয়ারী! সেই খুসী-ঝলমলে চৌদ্দ-পনেরো বছরের মেয়েটাকে মনে পড়ে গেছে ময়নার। ছোটো সাহেবের সংগে তার ছিল খুব ভাব। সেই গর্ব্বে আর রূপের ঠমকে তার যেন মাটিতে পা পড়ত না। কত দামী দামী উপহার দিত তাকে ছোটো-সাহেব, যা তারা কখনও দেখেনি চোখে। আর সেই সংগে সব কুলীমেয়েদের ঈর্ষার পাত্রী হয়েছিল এতোয়ারী। হঠাৎ একদিন সকালবেলা সেই এতোয়ারীর মা কাঁদতে কাঁদতে এসে সবাইকে বলল, তার মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। খুঁজতে খুঁজতে দুপুরবেলা ছোটো-সাহেবের টিলার নীচে একটা ঝোপের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল এতোয়ারীর নিঃসাড়, প্রাণহীন শক্ত দেহ। বাগানের ডাক্তারবাবু বললেন যে, হয় সে বিষ খেয়েছে না হয় কেউ খাইয়েছে। কিন্তু তিনি সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহস করলেন না। উল্টে মজুরদেরই ধমকে দিলেন, তোদেরই তো দোষ, তোরা লোভে পড়ে যাস কেন বাপু? মান-অপমান কিছু কি আছে তোদের? জানোয়ার সব। মরবি তোরা এমনি করেই।

নিস্ফল আক্রোশে, ক্ষুব্ধ বেদনায় ও দুর্ব্বল ধিক্কারে কুলী-মজুরেরা শুধু গুমরাতে থাকে—আর কি-ই বা করতে পারে তারা! সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা? ভাবতেও পারা যায় না যে। এত বড় বুকের পাটা আছে কার? এতোয়ারীর মায়ের চোখের জল মনের মধ্যে গিয়ে জমাট বাঁধল—বুকখানা যেন ভেংগে গেল তার। তারপর একদিন সে-ও চোখ বুজল।

এক বছর হয়ে গেছে এ কাহিনীর। ভাবতে ভাবতে পদ্ম-ঝিলের কাছে এসে পড়ে ময়না। হঠাৎ হাতের ফুলটির দিকে চেয়ে শিউরে উঠে সে, মাটিতে ফেলে দেয় সেটা। তারপর পা দিয়ে নির্ম্মম ভাবে ঘষতে থাকে ফুলটাকে। কোঁচকানো গোলাপফুলের ম্লান গোলাপী পাপড়িগুলো বিষণ্ণভাবে সবুজ ঘাসের উপর ছড়িয়ে থাকে। ময়না ঝিলের ঘাটে পা ডুবিয়ে বসে। ঝিলের জল আলো করে হাসছে রাশি রাশি শ্বেতপদ্ম। রাজহাঁসটা জল দেখে ডানা ঝটপট করে ময়নার কোল থেকে নেমে যেতে চায়। ময়না এক হাতে তাকে সাপটে ধরে, আরেক হাতে তার পিঠে চাপড় মারতে থাকে।

নীলা ও সমীর বেড়াতে বেড়াতে পদ্মবিলের কাছে এসে দাঁড়ায়। ইস দেখেছ কত পদ্ম? দাঁড়াও তুলে আনি একটা। বলতে বলতে নীলা ঘাটের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ থমকে গিয়ে মুগ্ধ ভাবে ময়নাকে দেখিয়ে বলে,—দেখ দেখ, কি সুন্দর মেয়েটি! কি চমৎকার মানিয়েছে তাকে এই পরিবেশে। আহা, আমি যদি শিল্পী হতুম, তাহলে এর একটা ছবি এঁকে নিতুম। কালো হলেও কি চমৎকার চেহারা আর স্বাস্থ্য দেখেছ? খোঁপায় আবার একটা কৃষ্ণচূড়া ফুল পরেছে। এ যেন ফুলের পাশে আরেকটা ফুল।—এই শোনো শোনো নীলা—ডাকে। ময়নাও এতক্ষণ ভীরু ও বিস্মিত চোখে নীলা ও সমীরকে দেখছিল। বড়বাবুর বাড়ীতে এরা এসেছে না দিন কয় হোলো? কি চমৎকার বেশভূষা এদের, কি সুন্দর দেখতে। নীলার আহ্বানে সসঙ্কোচে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় ময়না।

কি নাম তোমার? ময়না জবাব দেয়, ময়না!

বা: ভারী সুন্দর হাঁসটি তো তোমার, দাও তো আমার কোলে। নীলার মিষ্টি কথায় ময়নার ভয় ভেঙ্গে যায়। হাসিমুখে সে তার হাঁসটিকে নীলার কোলে তুলে দেয়। কিন্তু হাঁসটি নীলার কোলে গিয়ে ছটফট করতে থাকে। তাই আবার ময়নাকে তার কোল থেকে ফিরিয়ে নিতে হয়।

নীলা হেসে সমীরের দিকে ফিরে বলে, কি সুন্দর দেখেছ, আমি এটাকে কিনে নোব।

ময়না সভয়ে পিছিয়ে যায়। না না মায়িজী, হামি তাকে নাই বেচব।

সমীর বলে, কত দিয়ে আর কিনেছিস এটাকে, আমি তোকে পাঁচটা টাকা দেব, দিয়ে দে।

না না বাবুজী, হামি একে নাই বেচব, এ হামার জান। ময়না দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার হাঁসটাকে।

সমীর আরো কি বলতে চায় যেন। নীলা বাধা দিয়ে বলে, থাক, ও যখন হাঁসটাকে এতো ভালোবাসে তখন থাক এটা। তেজপুর গিয়ে আরেকটা কিনে নিলেই হবে।

ময়না এবার খুসী হয়ে এগিয়ে আসে—ঠিক বাত বাবুজী, সহরে অনেক পাবেন—বলতে বলতে নি:সঙ্কোচে নীলার শাড়ীর আঁচলখানা ধরে দেখতে দেখতে বলে—বা: কি বাঢ়িয়া শাড়ী!

কথা শেষ হওয়ার আগেই সমীর তাকে ধমকে ওঠে—ছাড় কাপড় ছুঁড়ি, ভারী আস্কারা পেয়ে গেছিস, না? ময়না থতমত খেয়ে আঁচল ছেড়ে দেয়। তারপর শুকনো মুখে ভয়ে ভয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

আহা বকলে কেন বেচারীকে মিছেমিছি? ওদেরও তো একটা কৌতূহল আছে। নীলা ক্ষুণ্ণ হয়।

তুমিই তো এদের প্রশ্রয় দাও। যত সব নোংরা ছোটোজাত। ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে সমীর।

নোংরা হতে পারে, তা ওরা তো আর শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে তোমার আমার মতো ভদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ হয় না? একটা ভাল সাড়ী কাপড় পরবার ইচ্ছা এদেরও হয়। মন তো এদেরও আছে। মানুষ তো এরাও।

সমীর বাঁকা হাসে, তা টাকা নেই বলেই কিনতে পারছে না, টাকা থাকলেই তো কিনতে পারতো।

নীলা একটা পদ্ম জল থেকে তুলে নিয়ে সমীরের দুর্বল 'যুক্তি শুনে একটু মুচকে হাসলো', বলল, তোমার একথার উত্তরে আমি অনেক কিছুই বলতে পারি, কিন্তু থাক—ওসব না বলে আমি শুধু এইটুকু বলছি যে—মানুষের ইচ্ছে থাকাটা অন্যায় নয়।

থাক, ছোটো লোকদের নিয়ে আর মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আজকের সন্ধ্যেটাই ব্যর্থ গেল। চল বাড়ী যাই।

দিন কয় পরে তেজপুর থেকে সমীরের মা লিখলেন সমীরকে—তোমরা শীগগির চলে এসো—আমার শরীরটা খুব খারাপ, সেই হাঁপানীটা বেড়েছে আবার। চিঠি পেয়ে সমীর চিন্তিত হয়ে পড়ল, বাগানটা কিনে নেওয়া সম্পর্কে সাহেবের সংগে আরও কিছু কথাবার্ত্তা বাকী রয়ে গেছে। এখন সে চলে যায় কি করে! নীলা সব শুনে বলে, আচ্ছা আমি সুধীরকে নিয়ে চলে যাই? তুমি বরং পরে এসো। তাই ঠিক হলো। পরদিনই নীলা সুধীরকে নিয়ে তেজপুর চলে গেল।

আরও কয়েক দিন কেটে গেল। সমীরের এখানকার সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেছে। দিন দুই পরেই সে রওয়ানা হবে। যাবার আগের দিন সে একটা চিঠি পেল নীলার। মা এখন অপেক্ষাকৃত ভাল। ময়নার সেই রাজহাঁসটির কথা মনে পড়ে খুব। আমি এখানের বাজারে অনেক খোঁজ করেছি ওরকম রাজহাঁস। কিন্তু ওরকমটি তো পেলাম না। তুমি এসে আমাকে একটা ওরকম কিনে দিও।

চিঠি পেয়ে সমীর ভাবে, ওখানে গিয়ে আর কিনে দেওয়ার দরকার কি। ময়নারটা নিয়ে গেলে হয় না? পাঁচ টাকার জায়গায় যদি সে দশ টাকা দিতে চায়—তবে ময়না রাজী না হয়ে পারবে না। আর ঠিক ওরকম রাজহাঁস কি সে পাবে তেজপুর গিয়ে? এটাই নিয়ে যাবে সে। নীলার মনে ধরেছে যখন। অবিশ্যি নীলা একটু বিরক্তও হতে পারে ময়নার এ হাঁসটা নিয়ে গেলে। ওর আবার এসব দিকে 'সেণ্টিমেণ্ট' একটু বেশী। তা ওকে বুঝিয়ে বললেই হবে যে, বেশী টাকা পাবে শুনে ময়না এমনিতেই দিয়ে দিল।

সমীর তার জ্যাঠামশায়ের কাছে গিয়ে বলল—ময়না বলে একটা কুলীমেয়ে আছে এখানে—সে কোথায় থাকে বলতে পারেন জ্যাঠামশাই?

ময়না! ও:, রবিয়ার বোন—কেন তাকে দিয়ে তোমার কি হবে? জ্যাঠামশায় কিছুটা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন।

ভেবেছিলুম ওর যে একটা রাজহাঁস আছে সেটা কিনে নোব।

কিনে নেবে? হা: হা: করে জ্যাঠামশাই ওরফে জ্যোতিষ বাবু হেসে ওঠেন। আমি হচ্ছি এখানকার বড়বাবু—আর তুমি তো দু'দিন পরে এ বাগানের খোদ মালিকই হবে। চল, আমরা চাইলে ওরা আপ্যায়িত হয়ে অমনিতেই দিয়ে দেবে—দেখ।

না। সমীর মাথা চুলকে বলে আরেক দিন কিনতে চেয়েছিলুম কিন্তু মেয়েটা খুব ভালবাসে হাঁসটাকে, তাই পাঁচ টাকায় ও দিতে চাইল না। এবার ভাবছি, ছ'-সাত টাকায় যদি রাজী না হয়,

তবে দশ টাকাই দিয়ে দেব। তখন নিশ্চয়ই ও রাজী হবে। তারপর মুখটা একটু নীচু করে সে আস্তে আস্তে বলে, আপনার বৌমারও ওটা খুব পছন্দ, তাই।

জ্যোতিষ বাবু আবার অট্টহাসি হেসে ওঠেন, তুমি তো আচ্ছা ছেলে হে, এ হাঁসের দাম দু'টাকাও হবে কি না কে জানে, আর তুমি দিতে চাইছ দশ টাকা! তাও আবার আমারই বাগানের একটা মজুরকে? চল, চল বউমার যখন পছন্দ, তখন আমি ওটাকে অমনিই তোমার কাছে এনে দিই দেখো না। সমীরকে নিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়েন।

হলুদ পাঁপড়ি-ছড়ানো রাধাচূড়া ফুল গাছটার নীচে আঁচল বিছিয়ে রাজহাঁসটাকে নিয়ে শুয়েছিল ময়না। জ্যোতিষ বাবু এসেই গম্ভীর ভাবে বললেন, তোর হাঁসটাকে আমি নিলাম, বলেই তিনি আর বাক্যব্যয় না করে হাঁসটাকে ছিনিয়ে নেন ময়নার হাত থেকে। তারপরই চলে যেতে উদ্যত হন। ঘটনার আকস্মিকতায় ময়না প্রথমে ভড়কে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তাদের চলে যেতে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে সে আর্তস্বরে রবিয়াকে ডাকে। রবিয়া বোনের ভীতি-বিহ্বল আহ্বানে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ময়না আকুল হয়ে বলে, হামার মনিয়াকে লিয়ে যাচ্ছে রে ভাইয়া, রবিয়া তাড়াতাড়ি জ্যোতিষ বাবুর কাছে ছুটে গিয়ে তার পা ধরে অনুনয় করে, বাবু, বাবু, হাঁসটাকে দিয়ে দিন বাবু, এ হামার বোহিনের জান।

জ্যোতিষ বাবু খিঁচিয়ে ওঠেন, ছাড় বেটা পা, আবার ঢং দেখানো হচ্ছে। বহিনের জান তো আমার কি রে? এ হাঁসটা পছন্দ হয়েছে বলে তো ঠকিয়ে খুব টাকা নেবার মতলব করেছিলি, সব চোর ডাকাতের দল। সুযোগ পেলেই সর্বনাশ করতে ছাড়ে না। এ-কি মগের মুলুক পেয়েছিস না কি?

সমীর এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। হঠাৎ তার মনে ফুলের মত নীলার মুখখানা ভেসে উঠলো। মনে পড়লো—নীলার সেই কথাটা,—মানুষ তো এরাও। সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বের করে ময়নার দিকে ছুড়ে দেয়—এই নে।

তুমি আবার টাকা দিতে গেলে কেন? জ্যোতিষ বাবু বিরক্ত হন। রবিয়া আবার ব্যাকুল হয়ে বলে, দিয়ে দেন বাবু হাঁসটা, হামি বাজারসে দোসরা হাঁস লিয়ে আপনাকে দিব।

বাধা দিয়ে জ্যোতিষ বাবু চোখ পাকিয়ে বলেন, চোপরাও উল্লু, ফের যদি কথার উপর কথা বলবি তো তোর কাজ বন্ধ করে দেব। বড্ড বাড় বেড়েছে এখন তোদের—ছাড় পা—তিনি পা দিয়ে সজোরে একটা ধাক্কা দেন রবিয়ার বুকে। রবিয়া আচমকা টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ে। সমীর ও জ্যোতিষ বাবু চলে যান।

খানিকক্ষণ কেটে যায় বিষণ্ন নিস্তব্ধতার মধ্যে। ময়না মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে তীরখাওয়া হরিণীর মত ছটফট করছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। রবিয়া সেই দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। নিজের জিনিষ নিজের বলে দাবীও তারা করতে পারে না! শরীরের মধ্যে এত শক্তি নিয়েও দুর্বল হয়ে থাকতে হয় তাদের। কিন্তু উপায় তো আর কিছু নেই, অসহায় হয়ে পড়ে রবিয়া। সে ধীরে ধীরে ময়নার কাছে গিয়ে বসে। ঐ ছোট্ট হাঁসটা যে তার বোনের কতখানি ছিল তা-তো সে জানে। রবিয়া ময়নার রুক্ষ আলুথালু চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—রাখতে পারলাম না রে—তারও বলিষ্ঠ বুক কেঁপে ওঠে। কান্না ভেংগে পড়ে তার কণ্ঠে। তবু সান্ত্বনার কথা খুঁজতে চায় রবিয়া। কিন্তু ভাষা হারিয়ে যায় নিঃসীম শূন্যতায়।

# রাত্রি ঃ আমি ঃ ট্রেন

**অনীতা গুপ্ত**

রাতের আকাশ থেকে কান্না ঝরে ফোঁটায় ফোঁটায়,
বিক্ষত আমার মন সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রণার কাঁটায়;
ফেরারী হয়েছে নিদ্রা, ফেলে গেছে নিঃসঙ্গ আমাকে।
বাদল-বাতাস আজ পাগল হয়েছে কার শোকে,
সে যেন বিলাপ করে অন্ধ এক দেবতার কাছে,
বুকের মাণিকটিকে আজ রাতে হারিয়ে ফেলেছে।

অনন্ত প্রহর গুণে' শ্রান্ত মন শোনে, বহু দূরে—
শহরতলীর পথে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আর্তনাদ করে,
একটি রাত্রির ট্রেণ ছুটে চলে যায়। যেন—
অনেক আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে নির্ঘুম হৃদয় কোন,
ফেলে যায় ঘুমন্ত শহর-গ্রাম-মাঠ-নদী-বন,
খোঁজে শুধু পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে আছে সে-ষ্টেশন;
উজ্জ্বল আশ্রয় এক অন্ধকার পৃথিবীর বুকে,
দুর্লভ স্বপ্নের ঝাঁপি, আজ রাতে খুলে দেবে তাকে।

জীবনের পথে পথে ঘুরে শ্রান্ত মন খোঁজে শুধু—
একটি সরাই। অথবা দিক্‌হারা সমুদ্র ধূ-ধূ
পেরিয়ে হৃদয় খোঁজে আলোকিত বন্দরের রেখা,
রাত্রির যাত্রার শেষে পায় যেন ষ্টেশনের দেখা।
জীবনের বিরাম-কেন্দ্রে আশ্বাসের উজ্জ্বল আলো,
মুহূর্তে ঘুচাবে রাতের অন্ধ-করা নীরন্ধ্র কালো।
টুপ, টুপ, বৃষ্টি পড়ে, বাতাসের বিলাপ থামে না—
'জীবন-ষ্টেশনে আমার কোন দিন নামা হোল না।'

# বাঙ্গলা সাহিত্যে কবি প্রিয়নাথ সেনের দান

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরবময় যুগে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি প্রতিভাধরদের মধ্যে আর একটি প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন কবি প্রিয়নাথ সেন। ইনি শুধু সে যুগের একজন কবি-সাহিত্যিক ছিলেন না, পরন্তু তাঁর মত সাহিত্য-সমালোচক ও সাহিত্য-রসিক খুব কমই ছিলেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনায় রবীন্দ্র-প্রতিভা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-জীবনে প্রিয়নাথ সেনকে প্রথম ও প্রধান প্রেরণাদাতা বলে স্বীকার করেছেন।

কবিগুরু তাঁর জীবন-স্মৃতিতে এ সম্বন্ধে লিখেছেন—সন্ধ্যা-সঙ্গীত রচনার দ্বারা আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম, যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনায় বিকাশ-চেষ্টায় প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বে 'ভগ্ন-হৃদয়' পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে' তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত-সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদা-সর্বদা আনাগোনা।

তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ-আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত তাহা বলা শক্ত।

দীপাধারের মত শুধু রবীন্দ্র-প্রতিভাকে তুলে ধরেই প্রিয়নাথ সেন ক্ষান্ত থাকেননি, সেই সঙ্গে নিজেও বহু গদ্য পদ্য রচনা দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

তাঁর সাহিত্য সমালোচনা ছিল অত্যন্ত নিপুণ এবং মননশীলতায় পরিপূর্ণ। সেই কারণে তাঁর লেখা সমালোচনা তখনকার যে কোনও সাহিত্যিকে ও সাহিত্য-পাঠকের কাছে অত্যন্ত রুচিকর ছিল। তাঁর সব লেখাই ছিল কাব্যধর্মী। আসলে তিনি কবি ছিলেন। এই কবি হওয়ার গুণে প্রিয়নাথের প্রত্যেকটি রচনার পদবিন্যাস ও ভাষা-মাধুর্য সকলের তৃপ্তি সাধন করতে পেরেছিল। তাঁর লেখা যে কোনও কবিতা পাঠ করলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কবি প্রিয়নাথ সেন পত্রে রবীন্দ্রনাথকে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি হচ্ছে এই :

**বসন্ত অন্তে**

**কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

করবরেষু

অচির বসন্ত হায়, এল—গেল চলে—
নিবে গেল কোকিলের দীপক-পঞ্চম,
ভঙ্গুর কুসুমশোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে,
প্রভঞ্জনে পরিণত—উৎপাতে বিষম—
অলস—পরশ-মধু মলয়ার বায়!
যায় যদি যাক চলে ক্ষণিকের স্নেহ।
অফুরান ফুলবীথি কোথা তাহা হায়!
এ যে শুধু ছলনার-মরীচিকা গেহ।
যে মদিরা পান তরে প্রাণ তৃষাতুর
কোথা তাহা? কোথা অনন্ত যৌবনা তব
শোভনা প্রতিভা কবি? বিশাল চিকুর
আবরে প্রকাশে যার তনুর বিভব—
নগ্ন দেহ—কণ্প্রবক্ষ—মদির নয়ন—
ঢালুক অশেষ নেশা—পুলক দহন।

প্রিয়নাথ সেনের লেখা ওই কবিতার প্রথম লাইনটি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ ওই কবিতা-পত্রের উত্তর দিলেন। যেমন :

**প্রত্যুপহার**

**শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেনের করকমলে উপহৃত।**

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে,—
এবার কিছু কি কবি করেছ সঞ্চয়?
ভরেছ কি কল্পনার কনক-অঞ্চলে
চঞ্চল পবন ক্লিষ্ট শ্যাম কিশলয়,

কবি প্রিয়নাথ সেন

ক্লান্ত করবীর গুচ্ছ ?   তপ্ত রৌদ্র হ'তে
নিয়েছ কি গলাইয়া যৌবনের সুরা
ঢেলেছ কি উচ্ছলিত তব ছন্দস্রোতে,
রেখেছ কি করি তারে অনন্ত মধুরা ।
এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমা-নিশীথে
নব মল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে,
তোমার আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে,
সে কি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয় সঙ্গীতে ?
সে কি গেছে পুষ্পচ্যুত সৌরভের দেশে ?

প্রিয়নাথ সেনের কাব্যপ্রতিভাকে রবীন্দ্রনাথ শুধু সম্মানই দেখাতেন না, সেই সঙ্গে তাঁকে কবি ও সাহিত্যিক বলে স্বীকারও করতেন। তাঁর সাহিত্য বিচার রবীন্দ্রনাথের নিকট অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। প্রিয়নাথের রসবোধ ও সাহিত্য-সমালোচনাকে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথও যথেষ্ট মূল্যবান মনে করতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ একখানি পত্রে প্রিয়নাথকে লিখছেন :

ওঁ

জোড়াসাঁকো

প্রিয় বন্ধু,                                    ২১শে আষাঢ়

আমার 'স্বপ্নপ্রয়াণ'খানি সমালোচনার অভাবে বেঘোরে পড়ে অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইতেছে। এ বিপদে তোমা ভিন্ন তাহার গতি নাই। আমাকে যদি একবার অত্র ভবনে চিরাভিলষিত দর্শন দান কর, তবে পরম সুখী হইব। আশা করি তুমি পূর্ববৎ স্বচ্ছন্দশরীরে সাহিত্য-কাননে বিরাজ করিতেছ।

তোমার সৌহার্দ্দ্যে বাঁধা
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
alias old বড়দাদা

শুধু রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথ নয়, সে যুগের সকল সাহিত্যিকই প্রিয়নাথের সান্নিধ্য কামনা করতেন। "সাহিত্য" পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রিয়নাথ সেনের পরলোকগমনের পর এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

৮ নং মথুর সেন গার্ডেন লেনে বাংলা সাহিত্যের একটি তীর্থ ছিল। এককালে রবীন্দ্রনাথ সে তীর্থের নিত্য যাত্রী ছিলেন। স্বনামধন্য মথুরচন্দ্র সেন মহাশয়ের বংশে একজন সাহিত্য-সাধকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি প্রিয়নাথ সেন। ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা প্রিয়বাবুর সহিত প্রথম পরিচিত হই—তাঁহার স্নেহে, প্রেমে ধন্য হইবার অবকাশ লাভ করি। তখন প্রিয়বাবুকে যেমন দেখিয়াছিলাম, জীবনের শেষ পর্যন্ত তেমনিই দেখিয়াছি। সাহিত্য-শাখা-পল্লব ফল-পুষ্প সমন্বিত সমগ্র সাহিত্যজ্ঞান-রস আনন্দই তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল। সাংঘাতিক ব্যাধির ভীষণ আক্রমণে জীবনী শক্তির প্রবাহ শুকাইয়া আসিতেছে, প্রিয়নাথ গ্রন্থরাশি বেষ্টিত হইয়া রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছেন, আনন্দরসে ডুবিয়াছেন। দেখিয়া বিস্মিত হইতাম, মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিতাম, আজ তার শেষ।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির এই রচনাংশ থেকে বোঝা যায়, কবি প্রিয়নাথ সেন সাহিত্যকে প্রাণের সঙ্গে কতটা ভালবাসতেন। শুধু ভালবাসা নয়, সাহিত্য ছিল তাঁর সাধনার বস্তু।

আজ আমরা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে ষড়ৈশ্বর্যময় রূপে দেখছি, এ যে শুধু বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ কয়েক জন সাহিত্য-সাধকের চেষ্টায় গড়ে ওঠেনি তা বাঙ্গলা সাহিত্যের ও বাঙ্গলা সাহিত্যিকদের ইতিহাস ও চরিতকথা অনুধাবন করলে প্রতীয়মান হয়। অনেক নীরব সাহিত্য-সাধকের দান বাঙ্গলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছে। এই সব নীরব সাহিত্যসাধকদের পুরোভাগে কবি প্রিয়নাথের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত।

সাহিত্য সমালোচনায় তাঁর বিশ্লেষণী শক্তি ছিল অসাধারণ। অপূর্ব্ব রসবোধ ও নিপুণ বিচারশক্তি তাঁর রচনাবলীকে উন্নত সাহিত্য-সৃষ্টিরূপে গণ্য করেছে।

প্রিয়নাথের রচনার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। সেটি হচ্ছে সাহিত্য ও সাহিত্যিককে চিনিয়ে দেওয়া। বুঝিয়ে দেওয়া আর সেই সঙ্গে সাহিত্য রস উপলব্ধিতে সাহায্য করা।

রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" আলোচনা প্রসঙ্গে যেমন তিনি লিখেছেন :—

...অর্জ্জুন মহাভারতকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাহার উপর রং ফলাইতে পারেন, এমন কবি বিরল। অর্জ্জুন-চরিত্রকে যদি কোন পরবর্ত্তী কবি স্পর্শ করিতে সাহস পান, তাহা হইলে তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যে চরিত্র কবি-সৃষ্টির তুঙ্গ-শৃঙ্গে অবস্থিত তিনি যেন সেই উজ্জ্বল চিত্রকে কোনরূপে মলিন না করেন। সুতরাং অর্জ্জুন চরিত্র অঙ্কনে বেদব্যাসের উপর কিছু নূতনত্ব আনিতে হইলে তাহা অতি সন্তর্পণে করিতে হইবে, ইহাতে বলা হইল না অর্জ্জুনচরিত্র নির্দ্দোষ বা আদর্শ মানব চরিত্র, অথবা বেদব্যাস অর্জ্জুনকে আদর্শ মানুষ করিয়া গড়িয়াছেন। আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, অর্জ্জুনের প্রকৃতি এমনি বিচিত্র এবং বহুমুখী তাঁহার হৃদয়ের প্রবৃত্তি সকল এমন সবল ও জাগ্রত, তাঁহার চরিত্র এমন সঙ্কীর্ণতার সংস্পর্শ শূন্য ভাঁড়ামি ও ভীরুতা হইতে মুক্ত যে, তাঁহার পরিচয় পাইবা মাত্র পাঠক তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করিয়া, না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না। এই কাব্যে রবি বাবু অর্জ্জুনকে সৌন্দর্য্যমুগ্ধ প্রেমিক করিয়া সাজাইয়াছেন, অথচ বেদব্যাস-সৃষ্ট অর্জ্জুনের মনুষ্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি "চিত্রাঙ্গদা" নাট্যকাব্যের আলোচনায় প্রিয়নাথ শুধু তার বৈশিষ্ট্য, ও রস বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, পরন্তু বাঙ্গলার পাঠকসমাজের কাছে রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়কে অত্যন্ত মনোহর ও জীবন্ত রূপ দিয়ে তুলে ধরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের বিস্ময়। তাঁর অসামান্য দানে শুধু বাঙ্গলা সাহিত্য নয়, বিশ্বসাহিত্য-ভাণ্ডার সহৈশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু এই আশ্চর্য্য প্রতিভা লোক যাঁরা চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেন তাঁদের কথা আজ কয় জনই বা আলোচনা করেন? প্রিয়নাথ তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধানতম।

# যেদিন ফুটলো বিয়ের ফুল

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

বিবি

## বাঁশী সুরু

সকালে উঠেই মার হাতে লেখা কলকাতা থেকে চিঠি পেলুম
কথায় কথায় এতো বিস্ময়, আকাশ থেকে যেন পড়লুম।
মা তো লিখেছেন, নিখিলের হাতে তোমাকে করতে সমর্পণ,
আমার তো কিছু আপত্তি নেই, ভগবানে ভরা সবার মন।
কাশীর গুরুমা লিখেছেন বটে, কিন্তু সেটা তো গৌণ কথা,
বিশ্বাস কোরো তোমাদের আমি সব চেয়ে বড়ো শুভব্রতা।
তুমি যদি তাতে সুখী হও ললি, আমি সুখী হব তাতেই খুব,
তোমার সঙ্গে অমৃত-সাগরে, দেবো আনন্দে আমিও ডুব ।।

আরো লিখেছেন, এতোদিন শুধু মাকে ভেবেছিলে গোঁড়া ভীষণ,
ভেবেছিলে বুঝি এমন ব্যাপারে, পাবেনা কখনো আমার মন।
জাত-কুল-মান সব মিছে ললি তুমি সুখী হবে এইটা বড়ো,
তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার, কেন মিছে মন খারাপ করো ?
নিখিলেশকে তো ভালোবা'স আমি, একথা তোমার নেই অজানা,
আমাদের বাড়ী এইতো প্রথম অন্য জাতের পাত্র আনা।
নিখিলকে আমি পছন্দ করি, ওতো সব দিক থেকেই ভালো,
তোমাদের পথে জ্বলবে আমার আশীর্ব্বাদের অমর আলো।

তোমাকেই বুকে দুহাতে জড়িয়ে সিঁদূর মুছেছি মাথার আমি,
সেই দিন থেকে ললিতা আমার অবলম্বন দিবস-যামিং!
আজকে তুমিই নিজে থেকে যার সঙ্গে চাইছো বাঁধতে ঘর,
আনন্দ মনে শুভ রাত্তিরে তুলবো বরণ করে সে বর।
মনে কোরো নাকো কোনদিন তুমি গুরুমা দিলেন আদেশ তাই,
অনিচ্ছা নিয়ে বাধ্য হয়েই, আমি এই কাজ করতে চাই।
দীক্ষাগুরুকে সম্মান করি, কিন্তু যতোই বলুন তিনি,
ফুলে ফুলে ভরা ললিতার পথ, সেটা আমি ভালো করেই চিনি ।।

পরে নিখিলের টেলিগ্রাম এলো, পরশু আসছে দিল্লি প্লেনে,
তার পরদিন এখানে আসবে, বিকেলবেলায় দুটোর ট্রেণে।
এখন থেকে তো অন্য ব্যাপার, এতো দিনে হ'ল সবটা ঠিক,
দশটা দিকতো ভূগোলের কথা, আমাদের শুধু একটা দিক।
এখন হয়তো বিজয় গর্বে আমাকে অনেক দেখাবে ঠাট,
আরো কি খানিক ছুঁচলো করবে, সেই দাড়ীটাকে ফরাসী কাট ?
লা লা লা লা করে সুর ভাঁজে শুধু গাইতে পারে না মোটেই গান,
এখন হয়তো শুনতেই হ'বে বেসুরো গলার বেয়াড়া টান।

ললিতা চট্টো কোথা ভেসে গেল, বিমল বন্দ্যো গেল কোথায়,
যারা সব আজ ছেড়ে চলে যায়, সব বারে বারে ফিরে তাকায়।
চাটুয্যেদের এতো বড়ো মাথা আমার জন্যে হয়েছে নিচু,
মার চিঠি পেয়ে ফুঁফিয়ে কেঁদেছি, ভাববার আছে অনেক কিছু।
সত্যি কথাই লিখেছেন তিনি, আমার সুখেই তিনিও সুখী,
তবু তার মনে অনেক কষ্ট দিয়েছে এ মেয়ে পোড়ারমুখী।
যতোটুকু আমি চেয়েছি সবটা, আজকে পেয়েছি দুমুঠো ভরে,
কিন্তু কেবল কান্না পাচ্ছে, থেকে থেকে মন কেমন করে।

জাত-কুল-মান সব নাকি মিছে, প্রেমের আসন সবার আগে,
মহাগৌরবে যেন হিমালয়, সবার ওপরে শীর্ষ জাগে।
ললিতা চট্টো নিখিলেশ রায়, এই দুটো নাম বাকিটা ভুয়ো,
এরা দুজনেতে গৌরীশৃঙ্গ, সারা পৃথিবীটা বদ্ধ কুয়ো।
তা' ছাড়া বলোনা সত্যি কথাটা, কতোটুকু দোষ আমার এতে,
আমি কি বুঝেছি, বিষমাখা আছে, নেই ওরকম মিষ্টি খেতে।
সেই যে সেদিন নিখিলেশ এসে বিষ মুখে দিয়ে পালিয়ে গেলো,
সেই আরম্ভ, সেই দিন থেকে, হাজারটা ভূত মাথায় এলো।

তারপর আছে আর একটা কথা, কনফিডেন্‌সে তোমাকে বলি,
প্রতিমা যে সেই ফটোটা দেখালো, নিখিলেশ তার ওপাশে ললি !
ও ব্যাপার তো পারি উড়িয়েই দিতে, কবে কোন দিন ফটো আমার,
চুরি করে নিয়ে ফটোর দোকানে, ব্ল্যাকমেল ফটো করালো তার।
প্রতিমাকে আর অরুণ বাবুকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ললিতা নিজে,
দোকানেতে গিয়ে ফটো তুলিয়েছে, মুখে যা বলুক মনটা ভিজে !
বলেছে, ললিতা চুপি চুপি গিয়ে পাশাপাশি বসে ফটো তুলিয়ে,
প্রমাণ করতে নিজের সাধুতা, জল খায় নাকো গাল না দিয়ে ।।

উড়িয়ে দিতে তো ফটোর কথাটা প্রমাণ করতে ব্ল্যাকমেলার,
এতোটুকু কোনো অসুবিধে নেই, সবাই বুঝবে কথা আমার।
বরাবর আমি যা কিছু বলেছি, নিখিলের কথা বেন্না করে,
পৃথিবীতে সব ভদ্রলোকেই ফুলবে দুলবে রাগের ভরে।
এখানে গল্প শেষ করি যদি, রিনরিন করে ক্লোজিং বেলে,
প্রতিজ্ঞা সব করবে তোমরা পরশুই ওকে পুরবে জেলে।
কুমারী মেয়েকে অপমান করে, তার পর নিয়ে মিথ্যে ফটো,
রটনায় গায় সকলের কাছে, অমনি কি আর তোমরা চটো ?

কিন্তু শ্রীমতী·ললিতা চট্টো মিথ্যাচারী তো নয় কো মোটে,
সত্যি কথাটা বলার সময়, একটা মিথ্যা আসে না ঠোঁটে।
বলেছি নিখিল একদিন এসে বুকে টেনে ধরে পালিয়ে গেছে,
সেই দিন থেকে বুকের মধ্যে উষ্ম নাগিনী উঠেছে নেচে।
বলেছি সবটা দোষ নিখিলের ললিতা চট্টো ভদ্র মেয়ে,
ছিঁচকে বেরাল এসেছিলো তাই, আলগা দুধটা গিয়েছে খেয়ে।
ও রকমটা যদি না করে নিখিল, নিবেদন শুধু করতো প্রেম,
কেন বলতুম মিথ্যে কথাটা, পৃথিবী কি তাকে বলতো 'স্টেম্'?

কিন্তু সত্যি কথাটা আজকে, কনফিডেন্সে তোমাকে বলি,
প্রায় প্রতিদিন সুবিধে পেলেই নিখিলকে নিয়ে বেরুতো ললি।
অনেক আদর দু'জনে করেছি, বুকের ওপরে টানা অনেক,
গড়ের মাঠেতে, কখনো হোটেলে, দুজনাতে মিলে গিভ্ ও টেক্।
ভালো সেজে থাকা সবাই তো চায়, প্রেমের কাহিনী লুকিয়ে রেখে,
কার মনে প্রেম দানা বেঁধে গেছে, সে কথা সবাই রাখবে ঢেকে।
ফটো তুলিয়েছি দু'জনেতে মিলে, মিথ্যে নয়কো ও ফটোখানা
চুপি চুপি শুধু তোমাকেই বলি, অন্য কারুর নেইকো জানা॥

গালাগাল তাকে দিয়েছি অনেক সারা দুনিয়ার লোকের কাছে,
আজকে তোমাকে বলে রাখি শোনো, সত্যি প্যাসন ললির আছে।
এতো ভালোবাসা ললিতার মনে, এতো ভালোবাসা নিতেও পারে,
তোমাদের ঐ জুলিয়েট, সেও ললিতার কাছে সহজে হারে।
আজ তো বিয়ের সব ঠিকঠাক, আজকে বলবো সত্যি কথা,
লুকিয়ে লুকিয়ে ভালোবাসাবাসি, ঘনবনছায়ে জড়ানো লতা।
বেজায় চালাক মেয়ে তো ললিতা, বাড়ীর কেউ তো জানেনি কিছু,
ডুব ডুবে জল খেয়ে বেড়িয়েছি, কারু কাছে মাথা করিনি নিচু॥

ললিতার বলো দোষ কতটুকু, তরুণের প্রেম সেটা কি কম?
বরফ যে মেয়ে তারও সারা মন, তরুণের প্রেমে হয় গরম।
প্রথম পেয়েছি, তাই শুধু নয়, তা ছাড়া এমন এগ্রেসিভ্
খুব নেশা হলে লোকে বলে নাকি ঠিক ও রকম শুকোয় জিব।
কেউ তো জানে না দুজনাতে রোজ দুপুরে-বিকেলে করেছি দেখা
যেদিন পড়েছে মিলনেতে বাধা, মনে মনে খুব লেগেছে একা।
এখানেতে যদি বিয়েটা না হ'ত, বিমল বাবুর গলার মালা,
হ'ত যদি দিতে, বিয়ের রাতেই শেষ করতুম দারুণ জ্বালা।

প্রতিমা বললে নিখিলকে নাকি অরুণ বলেছে কাশীতে যেতে,
তার বহু আগে আমিই বলেছি, শুক্লমার পারমিশন পেতে।
এ'কথাটা আমি ঠিক জানতুম, শুক্লমা লিখলে জরুরী তাকে,
তক্ষুণি ছিরি, বরণডালাটা, গড়তে সাজাতে হবেই মাকে।
শেষের দিনের আদরের পরে, আমিই কাশীর কিনে টিকিট,
গাড়ীতে চড়িয়ে দিয়ে নিখিলকে, বাড়ী ফিরলুম বেজায় সিক।
আমিই তো ওকে শিখিয়ে দিয়েছি, শুক্লমার মত যেমনি পাবে
দুজনার মধ মিলনের পথে সব বাধা সরে আপনি যাবে॥

শোনো মনে মনে ঠিক করা আছে, আসছে বছর বিয়েটা হ'বে,
নিখিলেশ ঠিক ছায়ার মতন এই বারো মাস পাশে ঘুরবে।
উঠতে বললে উঠবে তখুনি, বসতে বললে পড়বে বসে,
রুটিন তৈরি করে দেবো আমি, যেন রোজ রোজ অঙ্ক কষে।
কথা হ'ল আর বিয়ে হয়ে গেল, বিয়ের প্যারডি শুধুতো ওটা
সব চেয়ে ভালো কুঁড়ি থেকে ফুল একটু একটু আপনি ফোটা
এই বারোমাস দূরেই থাকবো, মিলনের আগে বিরহ ভালো,
আলো যদি চাও তার আগে নিও, নিবিড় অন্ধকারের কালো॥

ফোটেনি এখনো ফুলটা বিয়ের, ফুটবে সে বারোমাসের পরে
আমি তো থাকবো, তোমরাও থাকো, এই ক'টা দিন ধৈর্য্য ধরে।
মাকে লিখলুম, পেয়েছি চিঠিটা, কেঁদে কেঁদে শুধু যাচ্ছে দিন,
কত যে দুঃখ দিলুম তোমাকে, আজ বুঝি আমি কতোটা হীন!
প্রতিমা লিখলে, আপনার চিঠি যেমনি পেয়েছে তখন থেকে,
কেঁদে কেঁদে ললি চোখ ফুলিয়েছে, এখনো কাঁদছে মুখটা ঢেকে।
আবার লিখেছে, মাসীমা আপনি, কতোখানি উঁচু, কতো উদার
আগেতো জানিনি, আজকে সুমুখে আপনার চিঠি প্রমাণ তার॥

মরণ তো নেই, আবার প্রতিমা ইয়ারকি করা করেছে সুরু,
বলে আয় বর-বদল করবো, আমার নিখিল, ললির 'পুরু'।
তারপর বলে বিরহিণী রাই, ডুবে ডুবে সেও খেতো কি জল?
একটা মিনিট সয়নি বিরহ, অথচ মিথ্যে অনর্গল,
বলে বেড়াতো কি বিরহিণী রাই, জানা লোক জন যেখানে আছে,
সেই এক দিন অপমান করে আর নিখিলেশ আসে না কাছে?
সত্যি কথাটা বলতো ললিতা, কে বেশী এগোতো তুই না ও?
আহা মরে যাই, লজ্জায় লাল মুখখানা নিয়ে পকেটে থো।

তোমাদের মতে ফুটে গেছে ফুল, আমার হিসেবে এখনো কুঁড়ি,
এই সবে পাখী চোখ মেলে চায়, মন বলে এসো আকাশে উড়ি।
পরশু-তরশু নিখিলেশ রায় পৌঁছুবে এসে সেখম ধরে,
ললিতা কিন্তু অতো সোজা নয়, আড়ালে থাকবে দূরেই সরে।
কাছে এলে পরে কিছুতে চাবো না, একবার তুলে মুখের দিকে
ভাব-সাব আমি এমন দেখাবো, যেন ওর ভুল হয়েছে ঠিকে।
তারপর মন দুর্বল হলে, থাকতে পারবো শক্ত হয়ে?
তা' নিয়ে তোমার মাথা-ব্যথা কেন, ও জলে তোমার কি যাবে বয়ে!

মরণ যে হবে করে বেহায়ার, প্রতিমাকে নিয়ে দারুণ জ্বালা,
আমার সুমুখে মালীকে বললে তুরন্ত গাঁথতে দু'খানা মালা।
যতো অসভ্য পৃথিবীতে আছে, দেখছি প্রতিমা সবার বড়ো,
'ফ্যামিলি প্ল্যানিং' বইখানা নিয়ে বলে মন দিয়ে এখানা পড়ো।
অর্থনীতির ভালো ছাত্রীর বছর বছর কোলে ও কাঁখে,
বেগুনার ভাবে না আসে অতিথি, এ ব্যাপারে যেন দৃষ্টি থাকে।
বেরো এক্ষুণি, লজ্জা করে না, জোটে না কোথাও গলায় দড়ি,
ছি-ছি করে তবু হাসছে বেহায়া, আমি একে নিয়ে কি-ই বা করি?

পলাতক

—সাধন রায়





মুক্তির লোভে

—দেবপ্রিয় দে

হিরণী ( রাঁচী )

—মিহিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরের যাত্রী —রণজিৎকুমার মুখোপাধ্যায়

সদ্য-জাতক —রামকিঙ্কর সিংহ

প্রসন্নমুখে বললেন, কলকাতায় রাসবিহারী এভিন্যুর ওপর মস্ত বড় বাড়ী ওদের। এখানে প্রতি বছর ছুটি কাটাতে আসে, তোমার মেয়েটিকে দেখে চাটুজ্যের বেশ মনে ধরেছে বুঝলে অর্পিতা!

অর্পিতা বুঝলেন সবই। একগাল হেসে কন্যাগরবে গরবিণী মা স্বামীর আরও কাছে সরে এসে বললেন, হবেই তো গো, চুয়া কি আমার যে সে মেয়ে, স্কলারশিপ নিয়ে বি, এ পাশ করেছে, আর দেখতে!

অরিন্দম বাবু একবার অর্পিতার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর অষ্টাদশী যৌবনের উজ্জলদীপ্ত লাবণ্য সুন্দর মুখের ছবি দেখে নিলেন। অর্পিতা জিজ্ঞাসা করলেন—তা ছেলেটি কেমন?

ছেলেটি ভালই, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ করে বিলেত যাবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।

অর্পিতা এসংবাদে কতখানি তুষ্ট হলেন তা ঈশ্বর জানেন! খানিক চুপ করে থেকে বললেন, সে তো ভালই, শিক্ষিতা মেয়ে শিক্ষিত ছেলে না হলে মনে ধরবে কেন? তা বিয়ের পর চুয়াও স্বামীর সঙ্গে যেতে পারবে তো?

দাঁড়াও আগে বিয়েটা হোক। বলে স্ত্রীকে থামিয়ে অরিন্দম চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে। মা-বাবার সব কথাই শুনলো চুয়া—পায়ের তলাটা হঠাৎ তার যেন বড় শীতল মনে হলো—বাতাসটা যেন ভারী হয়ে উঠল পাথরের মতই। চন্দনের কাছে শপথ করেছে যে কেমন করে সে তার শপথের অমর্য্যাদা করবে? না—না সে কিছুতেই পারবে না বিশ্বাসঘাতকতা করতে—প্রতিজ্ঞায় কঠিন হয়ে ওঠে চুয়া।

রাত্রিতে আহারের পর্ব সেরে অর্পিতা রোজই স্বামীর সঙ্গে আশ্রমের আশে-পাশে বেড়িয়ে আসেন। সেদিন কি মনে করে চুয়াও তাঁদের সঙ্গ নিল। রাঁচীতে এসে অবধি মায়ের সঙ্গে এই প্রথম আজ বেড়াতে বেরিয়েছে সে। খানিকটা পথ গিয়ে একটা কবর-ভূমির কাছাকাছি এসে দাঁড়াল ওরা—অর্পিতা এতটা পথ হেঁটে হাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বললেন—ইষ্টিশানের বেঞ্চিতে আমি বসি, তোমরা প্ল্যাটফর্মের দিকটা পায়চারী কর। কাছেই ষ্টেশন, সেখানে গিয়ে অরিন্দমকে বলল চুয়া—তুমিও হাঁপিয়ে পড়েছো বাবা—মার কাছে তুমিও বসো—আমি একটু বেড়িয়ে নিই—যা খাওয়া হয়েছে, হজম হওয়া চাই তো?

অগত্যা অরিন্দম-অর্পিতা বেঞ্চিতে মুখোমুখি বসে পুরানো দিনের গল্প জুড়লেন—কাছাকাছির ভেতর চুয়াও ঘোরাফেরা করতে লাগল। রাঁচী শহরটা বড় ভাল লেগেছে ওর। কেমন যেন মায়ার মত সব মনটাই দখল করে নিয়েছে। খানিক ঘোরাফেরা করবার পর এক সময় ওর কানে এল, অসহায়ের মত তার মা স্বামীকে প্রশ্ন করছেন: তা হলে কি হবে?

কাছাকাছির ভেতরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন অরিন্দম: কি আর হবে, একটা যে কোন ব্যবস্থা করতেই হবে—ও আমাদের একটি মাত্র সন্তান অপু!

অর্পিতা কোন কথাই বলতে পারলেন না—কেবল স্বামীর মুখের ওপর কাতর চোখ দুটো রেখে চুপ করে বসে রইলেন। খানিক চিন্তা করে অবশেষে একটা উপায় খুঁজে পাওয়ার মত ব্যগ্র বিয়ে দিয়ে কাজ নেই, অবিবাহিতা কুমারী-জীবন বরং ভাল, কিন্তু বৈধব্য—সে অসহ্য, সে হবে না, কিছুতেই না—কেমন করে তুমি এত সহজে কথাগুলো উচ্চারণ করছ গো!

কি করব বলো, নিয়তির বিধান অপু, তাছাড়া গুরুদেবের কথা, তিনি নিজেই ওর ঠিকুজী তৈরী করেছেন—কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখলেন চুয়া তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কন্যাকে এত কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অরিন্দম তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন: চলো ওঠো ওঠো। তারপর চুয়ার কাঁধের ওপর সস্নেহে ডানহাতখানি রেখে বললেন—চল মা বাড়ী ফিরি—চাঁদটা এতক্ষণ আলো দিয়ে পথ দেখাচ্ছিল—সেটাকে দৈত্যের মত বিরাট একটা কালো মেঘ টপ করে গিলে চালান করে দিল একেবারে অনেক নীচের অন্ধকারে—নিজের মনেই হাসল চুয়া।

তৃতীয় অঙ্কে যখন যবনিকা উঠল, তখন চন্দনকে আবার দেখা গেল—ঝরণার নীচে নগ্ন পাহাড়ের গায়ে—দুজনে পথ চলছিল—একটা পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সরে দাঁড়াল চুয়া—ফিরে তাকাল চন্দনের দিকে। চন্দন বলল—এখানেই বসি এসো, জায়গাটাও বেশ নিরিবিলি—আর, আরও উপরে উঠতে হলে বাড়ী ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যাবে চুয়া!

হলোই বা—কণ্ঠস্বরে নির্লিপ্তির জের টেনে উত্তর দিল চুয়া—আজ তো মা বাড়ী নেই, সিনেমায় গেছে।

চন্দন আর কোন কথা বলে না। ওরা পাথরে পথ ভাঙতে ভাঙতে আরও উপরে উঠে এল—চুয়ার হাত ধরে কাছাকাছি একটা পাইন গাছের নীচে বসে পড়ল চন্দন। দূরে মন্দিরে তখন সন্ধ্যার আরতির ঘণ্টা বেজে উঠছে, তার প্রতিধ্বনির ব্যাপ্তি এখানেও ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে—অলস রাত্রির পদধ্বনির মত চন্দনের মনের ভিতরটায় কেমন যেন ক্লান্ত স্পন্দন অনুভব করা যায়। চুয়ার দিকে মেঘ-ধূসর দৃষ্টি মেলে চন্দন বললো—আমাদের ফেরার দিন ঠিক হয়ে গেছে চুয়া!

আমাদেরও—চুয়া চন্দনের দিকে ম্লান হেসে তাকাল—ওর দৃষ্টিতে এক ঝলক সমুদ্র-স্বপ্নই চমকে উঠলো।

এই, আবার কবে দেখা হচ্ছে!

চুয়া বলে, যেদিন তুমি দেখা দেবে, আমি তোমার প্রতীক্ষাতেই থাকব। তুমি এসো!

ধরো, সময় যদি ফুরিয়ে যায় না-ই আসি?

তবুও—বলে একটা তুচ্ছ হাসির ব্যর্থ চেষ্টা করল চুয়া। তারপর একান্ত ভাবেই চন্দনের একেবারে পাশে সরে এসে তার পিঠের ওপর নিজের হাতটা রেখে ডাকল—এই শুনছো?

কি? বলে এপাশ ফিরল চন্দন।

তুমি যা ভাবছ আমি তা মোটেই ভাবছি না জানো? বলে চুয়া

চন্দন পলক বিহীন দৃষ্টির আবেশ-মধুর ছোঁয়া দিয়ে চুয়ার সারা দেহটাই আলিঙ্গন করে উত্তর দিল—আমি যা ভাবি তুমি তা কোন দিনই ভাবনি।

তার মানে? চন্দনের কথায় সজাগ হয়ে প্রশ্ন তুলল চুয়া।

তার মানেটা আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না!

কি ? ব্যাকুলতা বেড়ে যায় চুয়ার। তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই ভাল হতো।

তা হয়ত হতো—কিন্তু এখন আর তো কোন উপায় নেই—সতজিয়ার মত চুয়া বলে চলে—তবু চোখের দেখাতেই যদি এত ভাবনা তাহলে মন দিলে তুমি যে দেউলিয়া হয়ে যাবার ভয়ে চিন্তা করতে করতে একেবারে পাগল হয়ে যেতে।

চুয়ার সব কথাগুলো বুঝতে পারে না চন্দন—নিতান্ত বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করে—তার মানে তুমি কি বলতে চাও অন্তর দিয়ে তোমাকে আমি চাই না ?

উঁহু, বলে চন্দনের পিঠ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চুয়া তার কানের কাছে মুখ রেখে বলে—এই একটা গল্প শুনবে, বিশ্বাস করবে তো ?

চন্দন হেসে সোজা হয়ে উঠল, বলল—গল্প বলবে তুমি, আমি শুনবো, তা, এর মধ্যে বিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে কেন ? বিশ্বাস যদি না-ও করি চুয়া—তবু গল্পটা যদি সত্যি হয় আমি বিশ্বাস না করলেও সত্যিই থাকবে—হাসতে লাগল চন্দন।

তা হলে শোন—শুরু করে চুয়া তার গল্প বলতে : ধরো, একটি মেয়ে আর একটি ছেলে, কেমন ? প্রথম দেখার পূর্বরাগ যখন অল্প দিনের মধ্যেই অনুরাগে দাঁড়াল—তখন দুজনের দুজনকে কাছে পাওয়ার প্রয়োজনও দেখা দিল একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই। কারণ তারা বেশ জেনেছে, একের অনুপস্থিতিতে অপরের স্থিতি মূল্যহীন—এমনি করেই দুজনের মধ্যে প্রেম আর মেলা-মেশা জমে উঠেছে।

তুমি তো বেশ গল্প বলতে পার চুয়া—

আঃ থাম না, কি যে কথা বল—আগে সবটা শোন। আবার শুরু হয় চুয়ার গল্প : 'নাটক এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে ঘটনার সংঘাতে নয় রোমান্টিক ছোঁয়েই কৃষ্ণপক্ষের পর শুক্লপক্ষ এল—আকাশের চাঁদ আর মাটির ফুলে কানাকানি চলতে লাগল—নদী যেমন করে সাগরের দিকে ছুটে চলে—তেমনি করেই মেয়েটির জীবন আর যৌবনের উষ্ণ স্রোতের ঢেউগুলি নিয়ে মিশে যেতে চাইল শান্ত গৃহের শীতল মোহনায়—এমনি এক দুর্বল মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে গেল, মেয়েটি হঠাৎ এক দিন ছেলেটিকে স্পষ্ট করেই বলল—সব মেয়েই মা হতে চায় আর সে নিজেও তো এক জন মেয়ে—কথাগুলো বলে অবশ্য দারুণ লজ্জায় সে লাল হয়ে গিয়েছিল, মুখ লুকিয়েছিল নিজের আঁচলের তলাতেই, মেয়েটির কথায় কিন্তু ছেলেটি যেন আকাশ থেকে পড়ল। তার মনে হলো জীবনে বোধ হয় এর আগে এত বড় বিপদের সামনা-সামনি তাকে আসতে হয়নি—তাই নীরস কণ্ঠেই কোন রকমে সান্ত্বনার ভাষা এনে সে বলল, কেমন করে সেটা সম্ভব হবে তুমিই বলো—এইতো সবে আমার থার্ডইয়ার, তোমার কাষ্ট ইয়ার, মেয়েটি তবু শুনলনা—জেদ ধরে বসল, বলল, সংসার পাতার যদি এত ভয় তবে দিনের পর দিন আমাকে কেন তোমার পথে টেনে নিয়ে এলে—কেন এমন করে সর্বস্ব নিয়ে আমায় রিক্তা করে তুললে? অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলে না ছেলেটি।

দু চোখ বড় বড় করে চন্দন তাকিয়ে রইল চুয়ার মুখের দিকে। অবশেষে ছেলেটি বলল, আচ্ছা বেশ আমাকে কিছুদিন
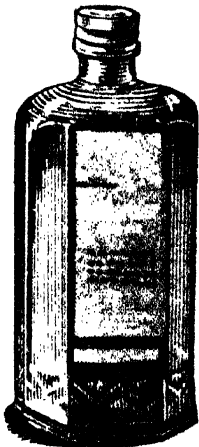
জবাব দাও। বাড়ীতে গিয়ে ছেলেটি তার মা-বাবার কাছে সব কথাই খুলে বলল, এমন কি বিয়ে করার অনুমতিও চাইল। ছেলেটির বাবা ছিলেন একজন জ্যোতিষী, তিনি বললেন, আচ্ছা মেয়েটিকে আমি দেখব, যদি সুলক্ষণা হয় তবে আমি কোন আপত্তিই করবো না। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে তার ভাগ্যগণনা করে তিনি মন্তব্য করলেন, এ মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে কোন ক্রমেই হতে পারে না—কারণ বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই মেয়েটির বৈধব্য-যোগ আছে। একমনে শুনছিল চন্দন।

এবার একটা ছোট্ট গোছের নিশ্বাস ছেড়ে উৎসুক প্রশ্ন করল,—তারপর? চুমা হাসলো—বেশ মিষ্টি হাসি হেসে বলল; তার পর গল্পটা কেমন করে শেষ হলে ভাল হয় বল দেখি!

খাড়া দিয়ে উঠল চন্দন—সহজ কণ্ঠেই বলল কেন, তার পর ছেলেটি সোজাসুজি তার বাবাকে বলবে যে দেখুন, এ বিংশ শতাব্দীর যুগে আপনার মত চরম অদৃষ্টবাদীর যুক্তি অচল, আর সে যুক্তিকে অবলম্বন করে আমি অন্ততঃ নিশ্চেষ্ট থাকতে পারব না—সতীকে যমেও শ্রদ্ধা করে, সত্যবানের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিল—আমিও তেমনি এক সতীর ভাগ্য পরীক্ষায় নিজেকে সত্যবানের মত মৃত্যুর হাতেই সঁপে দিতে চাই।

চন্দনের বলার ভঙ্গী দেখে চুমা বেশ জোরেই হেসে উঠল—বলল, আচ্ছা এর আগে তুমি কি যাত্রাদলে নাম লিখিয়েছিলে নাকি?

তার মানে! বলে সোজা হয়ে বসল চন্দন।

না তোমার আকস্মিক উত্তেজনা দেখেই এমনিতে আন্দাজ করছিলাম মাত্র—বলে চন্দনের দৃষ্টির উপর নিজের চোখের চঞ্চল চাহনীর ঠেকা দিয়ে চুমা বলল—আচ্ছা তুমি হলে কি করতে—একটা বৈধব্য-লক্ষণযুক্ত মেয়েকে বিয়ে করে এত সহজে মরতে চাইতে?

আমি তেমন লক্ষণযুক্ত মেয়েকে ভালই বাসতাম না—গর্বের আর আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে উঠল চন্দনের ঠোঁটে। দমকা ঝড়ে যেমন ক্ষীণ প্রদীপের শিখা নিবে যায়, তেমনি করেই দপ করে নিবে গেল চুমার চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি। বলল—ভাল যাকে বাসবে তার সুলক্ষণ দেখে যাচাই করে তবে ভালবাসবে—আর তাতেও যদি তোমার দৃষ্টিভঙ্গীর কোন একটি ত্রুটি ঘটে তাহলেই নিজের জীবনটাকে এতবড় দেখবে যে, অপরের কথাটা একবারও ভাববে না—প্রেমের মাধুর্য্য আর সার্থকতা যে জীবন দিয়ে জীবন পাওয়ায়—সে কথা এত সহজেই ভুলে যাবে—ছিঃ চন্দন, এত ভীরু তুমি!

চুমা নিবন্ধ দৃষ্টিতে আগুন ছিটিয়ে বলল—তাহলে শোন—আমাকে তুমি পেয়েছ, আমার মন পেয়েছ—তোমাকে আমি চেয়েছি, মন পাইনি—সেইটিই ভালো হলো—গল্পটা একান্ত ভাবেই সত্যি—নায়ক চন্দন—নায়িকা চুমা—আমার হাতে একটা বৈধব্য-লক্ষণযুক্ত রেখা আছে দেখো—বলে চন্দনের চোখের সামনেই নিজের হাতটা মেলে ধরল চুমা।

চকিতে চন্দন তার হাত সরিয়ে দিয়ে প্রায় চীৎকার করেই বলল—তোমার হাত আমি দেখতে চাইনে চুমা, মানুষ নিজেকে যে কতখানি ভালবাসে আমি শুধু সেইটুকুই তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম।

চুমা হাসল—প্রাণ-মন-খোলা হাসি—তার আওয়াজ পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে অনেক দূরে ছুটে চলল—তাহলে তোমার নিজের কথা কী?

সেটা পরে বলবো, বলে উঠে পড়ল—তার পর নিজের গেষ্ট হাউসের পথ ধরল—আকাশের পূর্ণিমার চাঁদটা তখন আকাশের বেশ খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে।

চতুর্থ অঙ্কে চুমা একটা চিঠি পেল সেদিনই। চন্দন সিমলায় ফিরে যাচ্ছে, ছোট্ট একটি কাগজে লিখেছে দু'-চার লাইন—

'চুমা, তোমারই ভালর জন্যে তোমাকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হলাম, বাংলা দেশের বিধবার জীবন বড় অভিশপ্ত, তাদের সংখ্যাও কম নয়, তোমাকেও তাদের দলে ঠেলে দিতে চাই না! সকলের যিনি ভাল করেন তাঁরই চরণে তোমার এই অধিকারটুকু নিবেদন করলাম—

চন্দন।'

খোলাছাদের আলসে ধরে দোল খেতে খেতে আবার স্বভাব-সুলভ এক ঝিলিক হাসল চুমা! চুমা ছিল চন্দনের মনের একটি আরসী, সেখানে যখন নিজের ফাঁকির ছায়া নিজের চোখেই ধরা পড়ল, তখন চন্দন পালিয়ে বাঁচল; দিয়ে গেল সামান্য একটু অজুহাতের লিপি মাত্র। চিঠিটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে গভীর প্রশান্তিতে চেয়ে রইল চুমা। পূব দিগন্তে প্রতীক্ষিত সন্ধ্যা তখন গাঢ় হয়ে রাত্রির তাপসী রূপ নিয়েছে—চুমা সরে এল।

## আলাস্কার বিবর্তন

সম্প্রতি আলাস্কা মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম রাজ্যে পরিণত হয়েছে। মার্কিণ জাতীয় পতাকায় এক্ষণে ৪৯টি তারকা চিহ্নিত করা হবে, এ বলা বাহুল্য। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনে পতাকা নির্ম্মাতারা অসুবিধায় পড়বেন, কারণ তাঁদের পুরানো নক্সা ইত্যাদি সবই এখন হয়ে যাবে অচল। সবচেয়ে বড় অসুবিধা হতে চলেছে 'এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানা'র প্রকাশক গোলিয়ার সোসাইটির। এই বিরাট গ্রন্থের কার্য্যনির্ব্বাহক সম্পাদক হিসাব করে দেখেছেন—আলাস্কা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্যে পরিণত হওয়ার ফলে যে সম্পাদকীয় পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হবে, তার জন্য ব্যয় হবে ২১ হাজার ডলারের বেশি। উক্ত তথ্যসর্ব্বস্ব গ্রন্থের ৩০টি খণ্ডভুক্ত তিন শতাধিক পাতায় দুই শত ক্ষেত্রে এই সংশোধন দরকার হবে। অন্যান্য এনসাইক্লোপেডিয়া এবং পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশকদেরও একই কারণে বেশ-

# দুন-ভিউ-হোটেল (হিন্দী হ'তে)

দেবেন্দ্রকুমার বংসল

কত পূর্ণিমার রাত্রে আমার মন ভাবনার সাগরে সাঁতার দিতে দিতে অজ্ঞানমত হয়ে পড়ত। শরৎ-পূর্ণিমা এল—সকাল থেকেই রাত্রির চাঁদের কল্পনা করতে করতে একটি মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই মুখটিকে দেখবার জন্ত আমার মন অধীর হয়ে উঠল।

মধ্য রাত্রে প্রত্যেক পূর্ণিমার মতনই, এবারও বাঁশীর সুর ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমার দিকে এগিয়ে এল,—যেন আমার সঙ্গে দুটি কথা বলতে চায়। প্রত্যেকটি স্বর থেকে যেন ব্যথা ঝরে পড়ছিল। মনে পড়ল কবিগুরুর একটি গানের দুটি লাইন :—

কোন হারাতে কোন উদাসী
সুরে বাজায় অলস বাঁশী,

মনে হয় কার মনের বেদন কেঁদে বেড়ায় বাঁশীর গানে।

গানটি মন আর চেতনাকে প্রভাবিত করতে লাগল। নিজেদের মধ্যে তর্ক করে চেতনাকে মনের কাছে হার মানতেই হল। তার পর সেই সুরের পেছন পেছন তার উৎসের খোঁজে আমি বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে পুকুরের ধারে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে একটি লোক ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে ছিল। তার ধ্যান ভাঙাবার জন্ত আমি গুন-গুন করে গান গাইলাম। পরে বললাম : আপনার পরিচয় জানতে পারি কি ? উত্তর পেলাম :—

তোমারই সুরের তান আমি, মধুর তোমার কল্পনায়।
ব্যথিত মনের শান্তি আমি, প্রাণ ভরে দিই সান্ত্বনায়।

এই আমার পরিচয়। কিন্তু তুমি কে ? সত্যি করে বল। প্রত্যেক পূর্ণিমার রাতে বাঁশীর সুর এসে আমাকে কত কথা বলে যায়। আজ আমি সেই সুরের ইতিহাস জানতে এসেছি।

তাহলে শুনুন। কিন্তু আপনার নামটি তো বললেন না, বলুন। নাম কি সান্ত্বনা ? আগে ভেবে দেখুন, সত্য মাঝে-মাঝে কটু হয়। আমার প্রতি আপনার এই সহানুভূতি সত্যের সামনে টিকবে তো ?

তুমি বলছ না। কতক্ষণ আর এই ভাবে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকবে ? যার সঙ্গীত আমার প্রত্যেকটি শিরাকে মাতিয়ে দেয়, তাকে দর্শন করবার জন্ত আমি উৎসুক।

না, সত্য অপ্রিয়ও হতে পারে। আপনি নিজেকে সামলাতে পারবেন না।

তোমায় বলতেই হবে। কত দিন আর আমি তোমার বাঁশীর সুরের পেছনে ছুটে বেড়াব ? সত্য যতই কঠোর হোক, তুমি কঠোর হয়ো না।

আমার কথার উত্তরে সে একটি ঢেলা জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিল। জলের ঘূর্ণিগুলি যেন তারই মনের ছায়া। তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—শেফালী। ... উঠলাম। নিজেকে কোনো মতে সামলে নিয়ে, সেখান থেকে চলে যাবার জন্ত পা বাড়াতেই সে আবার ডাক দিল—শেফালী, তুমি আমার কথা না শুনেই চলে যাচ্ছ ? আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম—সত্য যতই কঠোর হোক্—কথা শেষ করবার আগেই প্রচণ্ড কাশি তাকে কাহিল করে ফেলল।

তুমি এখনও আমাকে রেহাই দিচ্ছ না কিন্তু আমি অসহায় পবন। আমি জানতাম না, পাগলামি তোমাকে এখনও ছাড়েনি। তুমি এখনই চলে যাও।

চলে যাব শেফালী। আমি যে পাগল, এ কথাও ঠিক, কিন্তু আমি তোমাকে রেহাই দিচ্ছি না, এ কথা একেবারে মিছে। আমি জানতাম না যে তুমি এখানেই কাছে কোথাও থাক। আমার কাছে তো তুমি এসেছ, আমি কো তোমার খোঁজ করিনি ?

আমিও জানতাম না, তুমি এখানে বসে আছ। বাঁশীর করুণ সুর আমাকে এখানে টেনে এনেছে। সেই সুরে যে বেদনা ফুটে ওঠে, আমি তার খোঁজ করতে এসেছি।

তাহলে কি বাঁশীর করুণ সুর তোমাকে এখানে টেনে এনেছে ? সেই সুরকে তুমি ভালবাস ? আর যে মানুষের বেদনা সেই সুরে ফুটে ওঠে, তাকে তুমি ঘৃণা কর, তাই না ?

পবন, এ কথা ঠিকই যে, বাঁশীর করুণ সুরের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে, আর সেই বেদনার মূলে যে আছে, তাকেও আমি জানতে চেয়েছি। কিন্তু তোমার আর আমার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে সামাজিক অন্ধ বিশ্বাসের উঁচু প্রাচীর। আমি নারী, নিজেকে অবলা বলব না, তবুও পুরুষের ওপর বিশ্বাস রেখে, তার ভরসার আশা রাখি। আমার মনটাও অশান্ত হয়ে রয়েছে। তোমার বাঁশীর সুর শুনে আমার নূপুর আর ঝঙ্কার তোলে না।

নূপুরের ঝঙ্কার ? পবন অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

হ্যাঁ পবন ! ওই যে সামনে নীল আলো জ্বালান হোটেল দেখছ, আমি সেখানে নাচি। পেটের দায়ে করতেই হয়। যেদিন তোমার বাবা বলে দিলেন, তোমার আর আমার বিয়ে দিতে তিনি রাজী নন, সেদিনই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে, আমার জীবনে ঝড় এল বলে, সেদিন আমি গ্রাম ছেড়ে এখানে চলে এসেছিলাম। তারপর একদিন

ম্যানেজারের কাছে গেলাম, আর তিনি আমার ওপর দয়া করলেন। একদিন আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, কামিনী, তোমার রূপ দেখে আমার মাথায় একটি নূতন আইডিয়া এসেছে। তোমার গালের এই ছোট সুন্দর তিলটি অনেক খোশমেজাজ যুবককে চুম্বকের মতন টেনে এনে হোটেলের লাভের অঙ্ক বাড়াতে পারে। তুমি চট করে নাচটা শিখে নাও। আমি ভারতীয় নৃত্যের বিশারদ মিঃ ব্রহ্মচারীকে ফোন করে দিচ্ছি। দেখতে দেখতে আমিও নৃত্যকলায় পারদর্শী হয়ে উঠলাম। এরই মধ্যে ব্রহ্মচারীর নজর আমার দিকে পড়ল। তাঁর লোভাতুর দৃষ্টি আমার কাছে লুকোনো রইল না। একদিন সুবিধা পেয়ে তিনি আমাকে বিয়ে করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে। আমি মনে মনে হাসলাম। ভবিষ্যৎ জীবনের একটি ছবি আমার চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে গেল। সে প্রস্তাব অস্বীকার করলাম। মিঃ ব্রহ্মচারী এই আঘাত পেয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষে একদিন চুরির অপরাধে আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলেন। হোটেলের ম্যানেজার, মিঃ ডি কস্টা, জামিন দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনলেন। তাঁর কৃতজ্ঞতার বদলে আমাকে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে তিনি স্বস্তি পেলেন।

মিঃ ডি কস্টার স্ত্রী, শেফালী?

শেফালী না, কামিনী। শেফালীর মৃত্যু সেদিনই ঘটেছিল, যেদিন তার আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটে গিয়েছিল। আজ আমি মিসেস ডি, কস্টা।

ডি কস্টা. কামিনী, মিসেস ডি' কস্টা, শেফালী ··পবন নিজের মনে বিড় বিড় করে উঠলেন।

আমি ওকে চিন্তিত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এত কি ভাবছ তুমি? উত্তরে আবার বলে উঠলেন ডি, কস্টা, কামিনী—

তুমি কি ডি, কস্টাকে চেন?

হ্যাঁ, না তো!

তুমি আমার কাছ থেকে কিছু গোপন করতে চেষ্টা করছ।

শেফালী, তোমার সৌন্দর্য্য দেখবার ক্ষমতা আমি ডি, কস্টার জন্তই হারিয়েছি। আমার দৃষ্টি—হ্যাঁ, আমার চোখ দুটো—দুন ভিউ হোটেল—বলতে বলতে পবন কাঁপতে লাগলেন।

দুন-ভিউ-হোটেলে তোমার দৃষ্টি? আমি প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ শেফালী, সেই হোটেলের চোখ-ধাঁধিয়ে দেওয়া আলোই আমার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। না, না, তোমার স্বামী কখনও এত খারাপ হতে পারেন না, আমার ভাগ্যটাই—

পবন, তিনি আমার স্বামী বটে। তার চেয়ে বল যে অবস্থার বিপর্যয়ে পড়ে তাঁকে নিজের স্বামী বলতে আমি বাধ্য। তোমার স্মৃতিও আমার মনে সেই আগুনের ফুলকির মতনই জ্বলছিল, যখন তার ওপর ছাই ঢেলে দেওয়া হল। কিন্তু, তোমায় বলতে হবে, মিঃ ডি-কষ্টাকে কি করে চেন?

শেফালী, দু-বছর আগে আমি এই হোটেলের 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' বিভাগে চাকরী করতাম। সেই বিভাগের কাজকর্ম তোমাদের 'আপারগ্রাউণ্ডের' কাজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা ওপরের কোনো খবরই পেতাম না, তাই তোমার সম্বন্ধেও আমি কিছু জানতে পারি নাই। সেখানে জুয়া, মদ আর আফিঙের ব্যবসা চলত। মন কিছুতেই মানছিল না। একদিন নিজেকে আর মনের বিরুদ্ধে মানাতে পারলাম না, চাকরী ছেড়ে দিলাম। আদেশ অমান্য করার শাস্তিস্বরূপ, লোহার কাঠি গরম করে আমার চোখ দুটো পুড়িয়ে ফেলা হল। পুলিশে খবর দিলে হয়ত আমারও জেলখানায় পচে মরতে হত। চাকরী যাওয়ার পর থেকে আমি এখানেই নিজের আস্তানা গেড়ে নিয়েছি।

সেই থেকে আমি এই পাশের শিবের মন্দিরে থাকি। সকাল-সন্ধ্যা পুজো-অর্চ্চনা করে রায়বাহাদুর ধর্মস্বরূপের কাছ থেকে প্রতি মাসে তিরিশ টাকা ও রোজ দু-বেলার খাওয়া পাই। প্রভুর শ্রীচরণে দিন কাটছে। তবুও মাঝে-মাঝে তোমার কথা মনে পড়লে অস্থির হয়ে উঠি। তোমার হয়ত মনে আছে, শরৎ-পূর্ণিমার দিন, বাবা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে রাজী হলেন না, আমিও আর বিয়ে করলাম না। সেই থেকে প্রত্যেকটি পূর্ণিমার রাত আমি এখানে কাটাই আর অপেক্ষা করে থাকি শরৎ-পূর্ণিমার জন্ত।

আমাকেও রায়বাহাদুরের কাছে নিয়ে চল। আমিও প্রভুর শ্রীচরণে পড়ে থেকে জীবনের দিনগুলি কাটাতে চাই

পরের দিন রায়বাহাদুর ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন করেছিলেন। সেই সুযোগে পবন আমাকেও নিমন্ত্রণ জানালে। আমি সকালবেলা হাজির হলাম। মন্দিরে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরের ধ্বনি চারদিকে ছড়িয়েছিল। সেই ধ্বনির সঙ্গে আরেকটি ধ্বনি এসে মিশল—মোটর গাড়ীর হর্ণের শব্দ। পবন আমার কাছে এসে বললো—দানবীর রায়বাহাদুর আসছেন। আজকের কীর্ত্তনে তুমিও যোগ দিও। শেঠজীর জয় হ'ক। ব্রাহ্মণরা বলে উঠল। আমি চমকে উঠলাম। পবনকে জিজ্ঞাসা করলাম—ইনিই কি দানবীর শেঠ ধর্মস্বরূপ? আমি জোরে হেসে উঠলাম।

কি হ'ল শেফালী?

তোমাদের দানবীর শেঠই 'দুন-ভিউ' হোটেলের জুয়ার ব্যবসায়ী আর কামিনীর রূপের নেশায় অন্ধ শেঠ চঞ্চল কিশোর। আচ্ছা, তাহলে আমি তোমাদের মন্দির ছেড়ে লক্ষ্মীর মন্দিরের দিকে চললাম।

সন্ধ্যাবেলা দুন-ভিউ-হোটেলে আমার নৃত্যের একটি বিশেষ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছিল। সাতটা বাজল, নৃত্য আরম্ভ হবে, এমন সময় বাইরে থেকে গানের সুর ভেসে এল।

নৃত্যের দর্শকরা সবাই বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখতে দেখতে গায়কের ঝুলি টাকায় ভরে উঠল। গায়ক সব টাকা পকেটে রেখে দিয়ে আবার ঝুলি পাততেই আমি নিজের হাত থেকে বালা খুলে দিয়ে দিলাম। বালাটিকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে সে সব টাকাগুলো হাতে নিল। তারপর আমার আঁচলের কোণ ধরে বলল—লক্ষ্মীর উপাসিকা, এই নাও টাকা। হোটেল ছেড়ে চলে এস। আমি গান করে তোমার প্রয়োজন মেটাব!

পবন আর আমি মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। দুন-ভিউ হোটেলের বিরাট অট্টালিকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, হয়ত নিজের আণ্ডারগ্রাউণ্ড চরিত্রের কথা ভেবে লজ্জিত।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম মন্দিরের দিকে। পেছন থেকে রেকর্ডে গান ভেসে আসছিল। আমরা চলেছি আমাদের জীবনে ... [illegible] উঠল।

পক্ষধর মিশ্র

নতুন একটি সর্পনিবারক দ্রব্যের কথা জানা গিয়েছে। সুন্দরনগরের বিজ্ঞান-মন্দিরের শ্রী বি, কে, শর্মা নামক একজন জ্ঞানকর্মী জানিয়েছেন যে, ন্যাপথলিনের গোলক সর্পনিবারক হিসাবে কাজ করে। তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গিয়েছে যে, পেঁয়াজ, রসুন বা আদার সাপকে তাড়িয়ে দেবার কোন ক্ষমতা নেই। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, পেঁয়াজ, রসুন বা আদা সর্পনিবারক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শ্রী শর্মা একটি খাঁচার মধ্যে তিনটি সাপকে বন্ধ করে, ঐ খাঁচায় পেঁয়াজ, রসুন এবং আদা রেখে পর্য্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, সাপগুলি তাদের সংস্পর্শে এসে কোনভাবেই একেবারে প্রভাবিত হয় না, কিন্তু খাঁচার মধ্যে ন্যাপথলিন-গোলক রাখলে ঠিক উল্টো ফলাফল পাওয়া যায়। মাত্র ২৪ ঘণ্টা পরেই তারা দুর্ব্বল হয়ে পড়তে সুরু করে এবং তারপর তিনদিনের মধ্যে ক্রমাগত একটির পর একটি করে মারা যায়।

• • • •

পেট্রোলের বদলে মোটরগাড়ীতে নাইট্রোপ্যারাফিনের ব্যবহার সম্ভব কি না, সে বিষয়ে অনেক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী আজকের দিনে চিন্তা করছেন। এই নাইট্রোপ্যারাফিনগুলি মিথেন, প্রোপেন, বুটেন ও তার সঙ্গে আরও নানারকম পেট্রোলিয়াম-জাত পদার্থের উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এরোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক আরনেষ্ট ষ্টার্কম্যান সম্প্রতি মোটর গাড়ীতে এইরূপ কয়েকটি পদার্থের ব্যবহারের প্রাথমিক পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করেছেন। এই ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করে দাবী করা হয়েছে যে, মোটর ইঞ্জিনের শক্তির উৎপাদন নাইট্রোপ্যারাফিন সমূহ ব্যবহারের দ্বারা দ্বিগুণ করা সম্ভব। তুলনামূলক হিসাবে দেখা যায়, এই বস্তুগুলির দাম পেট্রোলের চেয়ে বেশী, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা হলে মনে হয় আর্থিক বিচার বিবেচনায় এর উপযোগিতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এইরূপ একটি জ্বালানীকে যদি গবেষণার দ্বারা ব্যবহারযোগ্য করা যায়, তাহলে আকার অর্দ্ধেক করে এবং ওজন যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে একই রকম শক্তিশালী মোটর-ইঞ্জিন তৈরী করা যাবে।

নাইট্রোপ্যারাফিনের উপযোগিতার বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও মতের অমিল রয়েছে। অনেকে মনে করেন, এগুলি বিস্ফোরক, তাই মোটর-ইঞ্জিনে ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। কিন্তু বিজ্ঞানী ডাঃ ষ্টার্কম্যান অন্য ধারণা পোষণ করেন। তিনি বলেন, এই দ্রব্যগুলি সাধারণ পেট্রোলের চেয়ে বেশী বিপজ্জনক নয়। আধুনিক কালে যানবাহনে যেসব মোটর-ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়, আশা করা যায় সেগুলির উপযুক্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে সহজেই নাইট্রোপ্যারাফিন জাতীয় দ্রব্যগুলি ব্যবহার করা যাবে।

• • • •

ষ্ট্রনসিয়াম ৯০-এর দ্বারা খাদ্যদ্রব্যে তেজস্ক্রিয় সংক্রমণ ঘটা খুবই স্বাভাবিক, তাই এই বিপদের প্রতিকারের জন্য পৃথিবীর বহুদেশেই বিজ্ঞানীরা বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন বিজ্ঞানী ডাঃ, ই, বি, ফাউলার পর্য্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, মাটিতে অধিক পরিমাণে চুণ মিশিয়ে খাদ্যদ্রব্যে ষ্ট্রনসিয়াম ৯০-এর সংক্রমণ কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। খাদ্যদ্রব্যে খুব বেশী পরিমাণে ষ্ট্রনসিয়াম ৯০ থাকলে প্রাণীর কি ক্ষতি হতে পারে? খাদ্যের দ্বারা আমরা ...
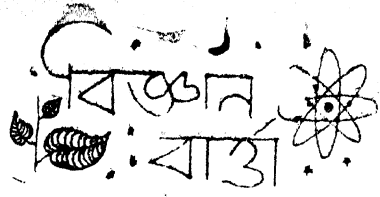
ক্যালসিয়াম গ্রহণ করি এবং এই ক্যালসিয়াম প্রাণীর হাড়ের একটি প্রধান উপাদান। এখন ষ্ট্রনসিয়াম ৯০-এর সঙ্গে ক্যালসিয়ামের রাসায়নিক চরিত্রের সাদৃশ্য থাকার জন্য খাদ্যদ্রব্যে যদি ষ্ট্রনসিয়াম ৯০ থাকে তাহলে তা হাড়ের মধ্যে গিয়ে জমা হয়ে টিউমারের উদ্ভব ঘটাতে পারে। গরু যদি তার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দিয়ে ষ্ট্রনসিয়াম ৯০ গ্রহণ করে তাহলে তার দুধের মধ্যেও এই পদার্থ বর্ত্তমান থাকে এবং ঐ দুধ খাওয়াও নিরাপদ নয়। ডাঃ ফাউলার জানিয়েছেন, যে মাটিতে গাছপালা জন্মায় তাতে যদি ক্যালসিয়ামের আধিক্য থাকে তাহলে ঐ গাছপালার মধ্যে খুব কম ষ্ট্রনসিয়াম ৯০ সঞ্চারিত হতে পারবে। তাঁর পরীক্ষায় দেখা গেছে, প্রতি কিউবিক ফুট মাটিতে যদি আধ থেকে এক পাউণ্ড ক্যালসিয়াম থাকে, তাহলে ঐ মাটি থেকে গাছপালা খুব কম ষ্ট্রনসিয়াম ৯০ গ্রহণ করতে পারবে। তাঁর পরীক্ষা মারফৎ আরও জানা গেছে যে, কোন কোন গাছপালা ষ্ট্রনসিয়ামের চেয়ে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে পছন্দ করে আবার ঘাস বাড়ার সঙ্গে তার মধ্যে ষ্ট্রনসিয়ামের সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। ডাঃ ফাউলার বলেছেন, যদি সত্যিই কোন দিন তেজস্ক্রিয় সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করে তাহলে সেদিন মানুষকে বেছে বেছে এমন সব উদ্ভিদ খেতে হবে যাদের ষ্ট্রনসিয়ামের চেয়ে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করার ঝোঁক বেশী।

• • • •

একটা দিন এগিয়ে আসছে, যেদিন আপনি আর আমি পৃথিবীর দুই গোলার্দ্ধে বসে চন্দ্রের মাধ্যমে টেলিফোনে খোসগল্প করতে পারবো। কথাটা শুনে হয়তো একটু অবাকই হচ্ছেন,—টেলিফোনে যদি কথা বলার দরকার হয় তাহলে সোজাসুজি বলা তো যেতে পারে। আকাশের বুকের পৃথিবীর উপগ্রহটিকে নিয়ে টানাটানি করার কি দরকার? আমরা কথাবার্তা চালাবো খুব ক্ষুদ্র তরঙ্গের সহায়তায়। এরা কথা বহন করে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু এদের সবসময়েই সোজা পথে ভ্রমণ করতে হয়। পৃথিবীর বক্রতার জন্য তাই এরা পৃথিবীর এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খুব বেশী ঘুরে যেতে পারে না। বিজ্ঞানের অগ্রগমন পৃথিবীর বক্রতার এই অসুবিধাকে জয় করতে এগিয়ে চলেছে। চাঁদকে এবার ক্ষুদ্র তরঙ্গের প্রতিফলকরূপে ব্যবহার করা হবে, পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, খুব কম পরিমাণ অপচয় ঘটিয়ে চাঁদ এই ক্ষুদ্র তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে আবার পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে দিতে পারে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেরক এবং গ্রাহক উভয় যন্ত্রই সোজা পথে চাঁদের সীমানা স্পর্শ করতে পারবে, ততক্ষণ অক্লেশে তাদের মধ্যে সংযোগ বর্ত্তমান রাখা হবে সম্ভব। এই বিষয়ের প্রাথমিক পরীক্ষা মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয়েছে এবং শুভ ফলাফলও গিয়েছে পাওয়া।

অবশ্য আজকের দিনে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় কোন কথা জোরেই

আকাশে নকল চাঁদ ওড়াচ্ছে, সে যে আসল চাঁদকে কোনরকম ব্যবহারিক কাজে লাগাবে তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে তুলছেন, তার উদ্দেশ্যে পৃথিবী থেকে কথা পাঠান হচ্ছে আর সেই কথা গ্রহণ করে সে আদেশ মতো আবার তাকে বিতরণ করছে পৃথিবীর জনসাধারণের কাছে। কেবল কি নকল চাঁদ, একবার চিন্তা করে দেখুন, মানুষের বিমান-সাধনা আজ কোন পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে। পৃথিবী একটি গ্রহ এবং এই গ্রহের অধিবাসী সৃষ্টি করেছে আর একটি অতি ক্ষুদ্র কৃত্রিম গ্রহের। এই কৃত্রিম গ্রহ প্রচণ্ড বেগে পৃথিবী থেকে নির্গত হয়ে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডী ছাড়িয়ে সূর্য্য পরিক্রমণ করতে শুরু করেছে। মানুষের অতীতের কল্পনা আজ বিজ্ঞানের জয়রথে আরোহণ করে এগিয়ে চলেছে সম্পূর্ণতা ও সাফল্যের পথে।

• • • •

পৃথিবীর বহু দেশেই সূর্য্যরশ্মিকে ব্যবহারযোগ্য উপায়ে বিদ্যুৎরশ্মিতে রূপান্তরিত করার জন্য চেষ্টা চলছে। আমেরিকার বেল টেলিফোন গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা সৌর বিদ্যুৎশক্তি তৈরী করার জন্য স্ফটিকাকার সিলিমোন-এর দ্বারা এক প্রকার সেল নির্ম্মাণ করেছিলেন যা সূর্য্যের আলোকে ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

১৯৫৭ সালে সিকাগোর একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমন একটি বহনযোগ্য রেডিও বাজারে ছাড়েন যা সূর্য্যরশ্মিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে ঐ রেডিওর ব্যাটারীর মধ্যে সঞ্চিত করে রাখতো। নিউইয়র্কের আর একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সূর্য্যরশ্মি-চালিত ঘড়ি বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেছেন। এই ঘড়িগুলি মাত্র একদিনের সূর্য্যরশ্মি থেকে প্রাপ্ত শক্তির সহায়তায় এক মাস চলতে পারে। আজকের দিনে আমেরিকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সূর্য্যরশ্মিকে কাজে লাগাতে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছেন, শিল্প প্রতিষ্ঠান 'সোলার-সেল' ব্যবহারের নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছেন। আমেরিকার সমুদ্রতীরবর্তী কোন কোন অঞ্চল পাহারা দেওয়ার জন্যও শোনা যায়, সেই সব অঞ্চল সৌর-শক্তি থেকে সৃষ্ট বিদ্যুৎশক্তির সহায়তায় আলোকিত করা হয়। আমেরিকার বনবিভাগও নানাকাজে সূর্য্যশক্তি-চালিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছেন। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, আগামী ১০ বছরের মধ্যে আরও বহু ক্ষেত্রেই সূর্য্যশক্তির ব্যবহার প্রচলিত হবে।

ঠাণ্ডা না করে রাখলে মাছ কেন নষ্ট হয়ে যায়? উত্তর খুবই সাধারণ, যে কোন প্রাণীর মতোই মাছের মধ্যে বিশেষ শ্রেণীর জীবাণু থাকে। মাছ মারা গেলেই এই জীবাণুগুলি নিজেদের বৃদ্ধি করতে শুরু করে এবং পরিশেষে মাছ পচে যায়। গরম পরিবেশে এই জীবাণুগুলি খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে: তাই মাছ তাড়াতাড়ি পচে যায়। কি হারে এটা হয়, তার একটি মোটামুটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন বরফের উত্তাপে অর্থাৎ ৩২° ডিগ্রী ফারেনহাইটে প্রত্যেক জীবাণু প্রতি ৬ ঘণ্টায় দুটি জীবাণুতে পরিণত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এখানে বৃদ্ধির পরিমাণ বেশ মন্থর। মাত্র ৪০° ডিগ্রী ফারেনহাইটে এই বৃদ্ধির হার বেড়ে যায় এবং আগের প্রায় অর্দ্ধেক সময়ে মাছ যায় পচে। ৫০° ডিগ্রী ফারেনহাইটে এই বৃদ্ধির পরিমাণ হয় প্রায় ৬ গুণ বেশী।

• • • •

আমরা কি ভাবে সুগন্ধ উপলব্ধি করি? আমাদের দেহে মস্তিষ্ক হলো গন্ধবিচারকারী শরীরযন্ত্র। যে-সব স্নায়ু গন্ধের সংবাদ মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায়, একমাত্র তাদেরই একেবারে মস্তিষ্কের সঙ্গে সংযুক্ত বলা হয়। ঘ্রাণ গ্রহণ ও তার উপলব্ধি জীবদেহে একটি ছোট্ট পরিধিচক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মস্তিষ্কের যে অংশ সব সময় মানুষের চেতনার মধ্যে থাকে না, সুগন্ধ সেই অংশকেই প্রভাবিত করে বলে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সুগন্ধের অবচেতন প্রভাব অগ্রাহ্য করা কঠিন। অনেক সময় সুবাসের অস্তিত্ব বেশ আমাদের মনে প্রবেশ করলেও সেই গন্ধ সচেতন ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। ঐ মৃদু সুগন্ধ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে আমাদের অবচেতন মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এর প্রভাব কি ভাবে কাজ করে তা বর্ণনা করছি। কোন দোকানদার যদি সুবাসিত কোন জিনিষ আপনাকে বিক্রি করতে চেষ্টা করে, তাহলে সোজাসুজি হয়ত আপনি তা কিনবেন না। আপনার মনের ভাবটা এই রকম— গন্ধ দিয়ে আমাকে ঠকানো চলবে না, ভালো জিনিষটি চাই। কিন্তু দেখা গেছে, শেষ পর্য্যন্ত যেটা বিক্রি হয় সেটাও সুবাসিত, কিন্তু তা সুগন্ধ প্রকট নয়। ঐ মৃদু সৌরভ বাস্তবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলেও অতি সহজেই মনের বিশেষ অংশকে প্রভাবিত করে জিনিষ বিক্রির পথ সহজ করে দেয়।

অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেই সুগন্ধের প্রভাব অপরিসীম। জনৈক চিকিৎসা-বিজ্ঞানী বলেন, অস্ত্র-চিকিৎসার পর রোগীদের ঈথ ল্যাভেণ্ডার বেলিওট্রপ প্রভৃতি সুগন্ধের উপকারী সম্ভাবনা খুবই বেশী। শিশুদের হাসপাতালে লিলিফুলের মৃদু সুগন্ধ মানসিক উৎফুল্লতা দ্বারা তাদের রোগমুক্তি ত্বরান্বিত করতে পারে।

# অনতিক্রমণীয়

[ Matthew Arnold-এর To Margarette-এর ভাব অবলম্বনে ]

অকূল বিরহের ধূসর ধূ-ধূ তীর মেলার অবকাশ নাই গো নাই
মেলার পথে যদি আশার আলো দেখি তখনি হয় ভয় পাছে হারাই।
জীবন চিরদিন নিজেরে মেলাবার আকুল পথ খোঁজে বারবার
কে যেন আসি তারে সরায়ে এক ধারে

আপন অন্তরে এ কে গো বাস করে আপনি আপনারে বাঁধিতে চায়
সে বাঁধা ছাড়িবার ব্যাকুল ব্যগ্রতায় খেদিয়া মরে আপনার তায়।
বিধাতা অকরুণ সৃজিলা এ দারুণ বিচ্ছেদি মাঝে মিছে মৃত্যুবাণ
কেমনে তারে আজ একাত্রে মিলাব গো

ভারত—২য় ইনিংস—২৪০ ( কন্ট্রাক্টর ৫০, রায় ৪৫, উম্রিগড় ৩৪, মঞ্জরেকার ৩১, আমেদ ২০, হল ৭৭ রাণে ৫ উইকেট ও টেলর ৬৮ রাণে ৩ উইকেট )

[ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ২০৩ রাণে বিজয়ী ]

## তৃতীয় টেষ্ট

তুষারাচ্ছাদিত ক'লকাতার ইডেন উদ্যানে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের খেলা শুরু হয় ইংরেজী বর্ষ বিদায়ের দিন। তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের পরাজয় ভারতের ক্রিকেট-অনুরাগীদের মধ্যে হতাশার ভাব এনে দিয়েছে। দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রিকেট-অনুরাগীদের নানান মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্রীড়া-সাংবাদিকরা খেলার সমালোচনা করায় পঙ্কজ গুপ্ত মহাশয় প্রমুখ ক্রীড়াজগতের দিক্‌পালরা উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কথায় ক্রীড়া-সাংবাদিকরা অত্যন্ত রূঢ় সমালোচনা করেছেন। এমন কি, ভারতীয় দলের অধিনায়ক গোলাম আমেদও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত গোলাম আমেদ ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের কাছে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেছেন তরুণ খেলোয়াড়দের দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

কলকাতায় তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ দেখার জন্য ক্রীড়ামোদীরা যে উৎসুক হয়েছিলেন খেলা দেখার পর সকলেই হতাশ হয়েছেন। অনেক দর্শক টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছেন। বাংলার খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় টিকিট না পেয়ে অনশন আরম্ভ করেছিলেন, এ সংবাদ সত্যই খেলোয়াড়ের পক্ষে মর্ম্মান্তিক! যে দেশে খেলোয়াড়দের যোগ্য সম্মান নেই, খেলোয়াড় তৈরী করার কোন বন্দোবস্ত নেই, সে দেশে উন্নত ধরণের ক্রীড়ামান আশা করা বৃথা। এ দেশে আছে ক্রীড়া-ক্ষেত্রের বিচিত্র পলিটিক্স!

টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছেন এমন অনেক দর্শক আছেন। একজন মাদ্রাজী ক্রীড়ামোদী স্ত্রী ও ছোট দুইটি সন্তান নিয়ে খেলা দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু টিকিট না পেয়ে ফিরে যাওয়ার সময় অত্যন্ত বেশী উত্তেজিত হয়েছিলেন—এবং চিৎকার করে বলেছিলেন একজন পুলিশ সার্জেন্টের সম্মুখে, এই মুহূর্ত্তে Revolution হওয়া দরকার। তৃতীয় টেষ্টের খেলা শুনে সুদূর আমেদাবাদ থেকে শাড়ী, গয়না পাঠান হয়েছে ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডকে। পত্রিকা-দপ্তরে যে সমস্ত চিঠি ও টেলিগ্রাম এসেছিলো তার মধ্যে কোন এক কাফেটেরিয়ার মেয়েরা ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রিকেট খেলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই সংবাদগুলির সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ভারতীয় ক্রিকেটের উপর ভারতীয় দর্শকদের বেশ আস্থা ছিল। খেলায় হার-জিতের প্রশ্ন বড় নয়। রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যদি ভারতীয় দল পরাজয় বরণ করতো তাহলে ভারতীয় ক্রীড়ামোদীরা ক্ষোভ প্রকাশ করতেন না কোন মতেই। এ রূঢ় সমালোচনার একমাত্র তাৎপর্য্য ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতি হোক। বিশ্বের কাছে তাদের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক, এইটুকু আশা করেন ভারতীয় ক্রীড়ামোদীরা। এ আশা নিশ্চয়ই অমূলক নয়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক আলেকজাণ্ডার 'টস' জয়লাভ করে নিজ দলকে ব্যাট করতে পাঠান।

ইডেন উদ্যানে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যাটসম্যানরা দর্শনীয় ক্রীড়াশৈলী খেলে প্রথম দিনে ৩৫১ রাণ করেন। দ্বিতীয় দিনে সর্ব্বসমেত ৫ উইকেটে ৬১৪ রাণ করে চা-পানের বিরতির সময় ইনিংসের সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেন। এই ৬১৪ রাণের মধ্যে রোহান কানহাই ডবল সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জ্জন করেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের সুন্দর বোঝাবুঝি থাকায় সর্টরাণ করার সহজ ভাবটি অত্যন্ত সুন্দর লাগে। যেখানে ৩ রাণ হয় সেখানেও সময় সময় ৪ রাণ সংগ্রহ করেছেন। তবে কোন সময়ই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়রা অধৈর্য্য হয়ে পড়েননি। সময়োচিত রাণ তুলে ও মনোজ্ঞ খেলা দেখিয়েছেন দর্শকদের। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলা কলকাতার দর্শকদের মনে দীর্ঘ দিন রেখাপাত করে থাকবে।

কলকাতা মাঠে রোহান কানহাই-এর ২৫৬ রাণ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিনের খেলায় অধিনায়ক গোলাম আমেদ হাণ্টের ষ্ট্রেট ড্রাইভ আটকাতে গিয়ে আহত হয়ে যান। এবং উম্রিগড়ের উপর অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়ে মাঠ ত্যাগ করেন। ভারতীয় খেলোয়াড়রা এই দিন সর্ব্বসমেত চারটি ক্যাচ ছাড়াও অযথা অনেক রাণ দিয়েছেন আগন্তুক দলের খেলোয়াড়দের। যেখানে ২ রাণ হওয়ার কথা সেখানে ৩।৪ রাণ নিয়েছেন। দ্বিতীয় দিনের চা-পানের সময় পর্য্যন্ত খেলে ৬১৪ রাণ করার পর ইনিংসের ঘোষণা করেন অধিনায়ক আলেকজাণ্ডার। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের বোলিং-এ কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা গেলেও ত্রুটিপূর্ণ ফিল্ডিং-এর জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানে ৬১৪ রাণে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। রোহান কানহাই, বেসিল বুচারের মার ও সোবার্সের নিপুণ হাতের ষ্ট্রোক্ কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশ্ববন্দিত ক্যাটা ব্যাটসম্যান সোবার্স ভারতের মাটিতে পর পর তিনটি টেষ্ট ম্যাচে সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জ্জন করেন।

বিরাট রাণের ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ভারতীয় দল ব্যাট করতে নামে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দুই ফাষ্ট বোলার রয় গিলক্রিষ্ট ও বেসিল বুচারের বলের বিরুদ্ধে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। রামধীন বল করতে এসেই কনট্রাক্টর এল, বি, ডব্লিউ বল করে ফিরিয়ে দিলেন। ভারতীয় ব্যাটসম্যান বার বার একই ভুল করলেন। অভিজ্ঞ খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় এ একটি বল মারতে গিয়ে আউট হলেন, যা তাঁর মত বিচ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আশা করা যায়নি কোন ক্রমেই। ২১ রা মাথায় দুটি উইকেট পতন ঘটল। এর পর খেলতে নামে ঘোরপাড়ে ও আর, বি, কেনি। কেনি প্রথম থেকেই সহজ খেলার চেষ্টা করেন। তাঁর দু-একটি সুন্দর মার সত্যই দর্শনী ধৈর্য্য ও সংযমের যখন একান্ত প্রয়োজন, সেই সময় ঘোরপাড়ে ষ্টাম্পের বাইরে দিয়ে যাওয়া বলে অকারণ খোঁচা দিতে গিয়ে আউট হলেন। কেনিও এ সংক্রমণ থেকে বাদ গেলেন না। উম্রিগড় মঞ্জরেকার খেলতে নামলেন। কিন্তু ভারতীয় দলের দুর্ভাগ্য দামামা বেজে উঠেছে। মঞ্জরেকার Yorker-এ প্রলুব্ধ হয়ে আউট হয়ে গেলেন। এর পর ফাদকার স্লিপে ক্যাচ তুলে আউট হয়ে যান। উম্রিগড়ের সংগে যোগদান করলেন সুরেন্দ্রনাথ। যখন দলের [illegible] সুরেন্দ্রনাথ উম্রি

ভারত—২য় ইনিংস—২৪০ ( কণ্ট্রাক্টর ৫০, রায় ৪৫, উম্রিগড় ৩৪, মঞ্জেরকার ৩১, তামানে ২০, হল ৭৬ রাণে ৫ উইকেট ও টেলর ৬৮ রাণে ৩ উইকেট )

[ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ২০৩ রাণে বিজয়ী ]

## তৃতীয় টেষ্ট

তৃণাচ্ছাদিত ক'লকাতার ইডেন উদ্যানে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের খেলা সুরু হয় ইংরেজী বর্ষ বিদায়ের দিন। তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের পরাজয় ভারতের ক্রিকেট-অনুরাগীদের মধ্যে হতাশার ভাব এনে দিয়েছে। দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রিকেট-অনুরাগীদের নানান মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্রীড়া-সাংবাদিকরা খেলার সমালোচনা করায় পঙ্কজ গুপ্ত মহাশয় প্রমুখ ক্রীড়াজগতের দিক্‌পালরা উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কথায় ক্রীড়া-সাংবাদিকরা অত্যন্ত রূঢ় সমালোচনা করেছেন। এমন কি, ভারতীয় দলের অধিনায়ক গোলাম আমেদও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত গোলাম আমেদ ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের কাছে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেছেন তরুণ খেলোয়াড়দের দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

কলকাতায় তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ দেখার জন্য ক্রীড়ামোদীরা যে উৎসুক হয়েছিলেন খেলা দেখার পর সকলেই হতাশ হয়েছেন। অনেক দর্শক টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছেন। বাংলার খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় টিকিট না পেয়ে অনশন আরম্ভ করেছিলেন, এ সংবাদ সত্যই খেলোয়াড়ের পক্ষে মর্ম্মান্তিক! যে দেশে খেলোয়াড়দের যোগ্য সম্মান নেই, খেলোয়াড় তৈরী করার কোন বন্দোবস্ত নেই, সে দেশে উন্নত ধরণের ক্রীড়ামান আশা করা বৃথা। এ দেশে আছে ক্রীড়া-ক্ষেত্রের বিচিত্র পলিটিক্স!

টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছেন এমন অনেক দর্শক আছেন। একজন মাদ্রাজী ক্রীড়ামোদী স্ত্রী ও ছোট দুইটি সন্তান নিয়ে খেলা দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু টিকিট না পেয়ে ফিরে যাওয়ার সময় অত্যন্ত বেশী উত্তেজিত হয়েছিলেন—এবং চিৎকার করে বলেছিলেন একজন পুলিশ সার্জেন্টের সম্মুখে, এই মুহূর্ত্তে Revolution হওয়া দরকার। তৃতীয় টেষ্টের খেলা শুনে সুদূর আমেদাবাদ থেকে শাড়ী, গয়না পাঠান হয়েছে ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডকে। পত্রিকা-দপ্তরে যে সমস্ত চিঠি ও টেলিগ্রাম এসেছিলো তার মধ্যে কোন এক কাফেটেরিয়ার মেয়েরা ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রিকেট খেলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এই সংবাদগুলির সূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ভারতীয় ক্রিকেটের উপর ভারতীয় দর্শকদের বেশ আশা ছিল। খেলার হার-জিতের প্রশ্ন বড় নয়। রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যদি ভারতীয় দল পরাজয় বরণ করতো তাহলে ভারতীয় ক্রীড়ামোদীরা ক্ষোভ প্রকাশ করতেন না কোন মতেই। এ রূঢ় সমালোচনার একমাত্র তাৎপর্য্য ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতি হোক। বিশ্বের কাছে তাদের সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোক, এইটুকু আশা করেন ভারতীয় ক্রীড়ামোদীরা। এ আশা নিশ্চয়ই অমূলক নয়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক আলেকজাণ্ডার 'টস' জয়লাভ করে নিজ দলকে ব্যাট করতে পাঠান।

খেলে প্রথম দিনে ৩৫১ রাণ করেন। দ্বিতীয় দিনে সর্ব্বসমেত ৫ উইকেটে ৬১৪ রাণ করে চা-পানের বিরতির সময় ইনিংসের সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেন। এই ৬১৪ রাণের মধ্যে রোহান কানহাই ডবল সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের সুন্দর বোঝাবুঝি থাকায় সটরাণ করার সহজ ভাবটি অত্যন্ত সুন্দর লাগে। যেখানে ৩ রাণ হয় সেখানেও সময় সময় ৪ রাণ সংগ্রহ করেছেন। তবে কোন সময়ই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়রা অধৈর্য্য হয়ে পড়েননি। সময়োচিত রাণ তুলে ও মনোজ্ঞ খেলা দেখিয়েছেন দর্শকদের। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলা কলকাতার দর্শকদের মনে দীর্ঘ দিন রেখাপাত করে থাকবে।

কলকাতা মাঠে রোহান কানহাই-এর ২৫৬ রাণ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিনের খেলায় অধিনায়ক গোলাম আমেদ হাণ্টের ষ্ট্রেট ড্রাইভ আটকাতে গিয়ে আহত হয়ে যান। এবং উম্রিগড়ের উপর অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়ে মাঠ ত্যাগ করেন। ভারতীয় খেলোয়াড়রা এই দিন সর্ব্বসমেত চারটি ক্যাচ ছাড়াও অযথা অনেক রাণ দিয়েছেন আগন্তুক দলের খেলোয়াড়দের। যেখানে ২ রাণ হওয়ার কথা সেখানে ৩।৪ রাণ দিয়েছেন। দ্বিতীয় দিনের চা-পানের সময় পর্য্যন্ত খেলে ৬১৪ রাণ করার পর ইনিংসের ঘোষণা করেন অধিনায়ক আলেকজাণ্ডার। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের বোলিং-এ কিঞ্চিৎ উন্নতি দেখা গেলেও ত্রুটিপূর্ণ ফিল্ডিং-এর জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানে ৬১৪ রাণে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। রোহান কানহাই, বেসিল বুচারের মার ও সোবার্সের নিপুণ হাতের ষ্ট্রোক কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশ্ববন্দিত খ্যাতো ব্যাটসম্যান সোবার্স ভারতের মাটিতে পর পর তিনটি টেষ্ট ম্যাচে সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেন।

বিরাট রাণের ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে ভারতীয় দল ব্যাট করতে নামে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব নিয়ে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দুই ফাষ্ট বোলার রয় গিলক্রিষ্ট ও বেসিল বুচারের বলের বিরুদ্ধে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। রামচাঁদ বল করতে এসেই কন্‌ট্রাক্টরকে এল, বি, ডব্লিউ করে ফিরিয়ে দিলেন। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বার বার একই ভুল করলেন। অভিজ্ঞ খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় এমন একটি বল মারতে গিয়ে আউট হলেন, যা তাঁর মত বিচক্ষণ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে আশা করা যায়নি কোন ক্রমেই। ১১ রাণের মাথায় দুটি উইকেট পতন ঘটল। এর পর খেলতে নামলেন ঘোরপাড়ে ও আর, বি, কেনি। কেনি প্রথম থেকেই সহজ হয়ে খেলার চেষ্টা করেন। তাঁর দু-একটি সুন্দর মার সত্যই দর্শনীয়। ধৈর্য্য ও সংযমের যখন একান্ত প্রয়োজন, সেই সময় ঘোরপাড়ে ষ্টাম্পের বাইরে দিয়ে যাওয়া বলে অকারণ খোঁচা দিতে গিয়ে আউট হলেন। কেনিও এ সংক্রমণ থেকে বাদ গেলেন না। উম্রিগড় ও মঞ্জেরকার খেলতে নামলেন। কিন্তু ভারতীয় দলের দুর্ভাগ্যের দামামা বেজে উঠেছে। মঞ্জেরকার Yorker-এ প্রলুব্ধ হয়ে আউট হয়ে গেলেন। এর পর কাদকার স্লিপে ক্যাচ তুলে আউট হয়ে যান। উম্রিগড়ের সাথে যোগদান করলেন সুরেন্দ্রনাথ। যখন দলের পতন

## ছেলের রোজগার—কয়েকটি সূত্র

নিজের ছেলে যথোচিত মানুষ হয়ে উঠুক, অর্থ উপায় করে এনে সংসারে দিক্, বলতে গেলে সকলেরই এ প্রত্যাশা। কিন্তু সকলেই যে আমরা কি ভাবে ছেলে গড়তে হবে, সে সূত্র কয়টি সঠিক জানি, এমন দাবী নিশ্চয়ই করা চলে না। পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা এই নিয়ে আলোচনা ও পর্য্যালোচনা করেছেন প্রচুর এবং কয়েকটি মূল সূত্র বা উপায় খুঁজেও পেয়েছেন। সেগুলি সম্পর্কে আমরা যদি কার্য্যতঃ সচেতন ও সজাগ থাকতে পারলাম, তা হলে নিঃসংশয়ে বহুল উপকারের সম্ভাবনা।

সংসারে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে এবং সে বাঁচবার জন্ম পর্য্যাপ্ত যোগ্যতা ও সামর্থ্য প্রয়োজন, ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভেতর এই অত্যাবশ্যক গুণ ও কর্ম্মের সূচনা না হলে নয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রশ্ন উঠছে তাই সকলের আগে—যোগ্যতা ও সামর্থ্যের যা হ'ল আসল উৎস। জীবন গঠনে এই তো চাই-ই আর সেই সঙ্গে চাই আরও কয়েকটি জিনিস। কোন কাজটাই উদ্দেশ্যবিহীন হলে চলবে না কিংবা সকল কাজ ও চিন্তার লক্ষ্যই হতে হবে একমুখী ; ছেলে গড়তে গিয়ে এই কথাটি স্মরণ রাখার দাবী উঠে গোড়াতেই। বলতে কি, রূঢ় বাস্তবের মুখে শিক্ষার খাতিরে শিক্ষা—এ অনেকটা আদর্শ লিপি মাত্র। বিদ্যা আমাদের শেষ অবধি অর্থকরী বলেই ছেলেকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলবার জন্ম এতখানি প্রযত্ন ও মনোযোগ দাবী করা হয়।

ছেলে বড় হয়ে কোন্ লাইন ধরবে কিংবা কোন্ পেশায় ছেলেকে দিবার আগ্রহ—বাপ মা ও অভিভাবকরা যেন সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পোষণ করেন। সমাজে কৃতী পুরুষ বলে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে, বিদ্যাভ্যাস জিনিসটা তাঁদের কাছে জীবন গঠনের একটি প্রধান উপায় হিসাবে স্বীকৃত। বলা বাহুল্য, এই জীবনের সঙ্গে টাকা-পয়সার জগৎ অর্থাৎ বাস্তবিকতার একান্ত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আমরা যখন আমাদের ছেলেকে গড়তে যাব, তখন শিক্ষার এই নিতান্ত কার্য্যকরী দিকটা বাদ দিলে হবে না। সহজ কথায়, শিক্ষা-শেষে দ্রুত উপযুক্ত ফল চাইলে, কারিগরী বা হাতে-কলমের শিক্ষার উপরই জোর দিতে হবে সমধিক।

গিবন একটি কথা বলতে চেয়েছেন—সাধারণ পর্য্যায় থেকে যাঁরা

প্রথমতঃ শিক্ষক বা গুরুমশায়দের কাছ থেকে তাঁরা শিক্ষা পেয়ে থাকেন, দ্বিতীয়তঃ প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির নিজের গৃহ থেকেই এইটি (শিক্ষা) অর্জিত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ, গৃহে বিশেষ করে মায়ের কাছে ছেলের যে শিক্ষালাভ হয়, উহার গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি—সমস্ত জীবনের বুনিয়াদ গড়ে উঠে এইখানেই। ছেলেকে গড়তে গিয়ে গিবনের উক্তির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। মোটের উপর ঘরে-বাইরের সব দিকের মিলিত প্রচেষ্টায় ছেলের শিক্ষা-দীক্ষা গোড়া থেকেই নির্দিষ্ট খাতে এগিয়ে যাওয়া চাই। বাস্তব জীবনে সফলকাম বা কর্ম্মকুশল পুরুষ তার পক্ষেই হওয়া সম্ভব কৈশোরেই যার মাথায় বুদ্ধি সঞ্চিত হল, সঙ্গে থাকল সৎসাহস আর অধ্যবসায়ের পাথেয়। মানুষের সকল উন্নতিও সাফল্যের ইহাই চাবিকাঠি, বলতে দ্বিধা নেই।

কার্য্যকরী শিক্ষা বা ট্রেনিং পেতে হলে আরও কয়েকটি জিনিস অপরিহার্য্য ভাবে দরকার। বুদ্ধির কথা এইমাত্র বলা হল, কিশোর প্রাণে এর ছাপ অবশ্য লক্ষ্য করা চাই প্রতি পদক্ষেপে। দীনহীন অবস্থা থেকে চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা যাঁরা বড় হয়েছেন, তাঁদের জীবনচরিত ও কর্ম্ম-কাহিনীর সঙ্গে ছেলেকে যত বেশী পরিচিত করানো যাবে, ততই ভাল। পাঁচ বছর বয়স থেকেই শিশু জেনে নিতে পারে—কেমন করে আব্রাহাম লিঙ্কন জ্ঞানার্জ্জন করেছিলেন এবং শেষ অবধি অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন আমেরিকা রাষ্ট্রপতি পদ। তার জানতে ক্ষতি কি, জিহ্বায় জড়তা সত্ত্বেও কি পুঁজি নিয়ে ডেমস্থিনিস একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী হিসাবে মর্যাদা পেয়েছিলেন। মাইকেল ফ্যারাডে, স্যার হাম্পার ডেভি, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন—এঁদের জীবনকথা, আমাদের দেশের বিদ্যাসাগর প্রমুখ আদর্শ পুরুষদের জীবনের উন্নতির মূল তত্ত্বগুলো জানিয়ে দেওয়া যায় প্রত্যেক কিশোরকে। সুফল এতে যতটা সহজে আশা ক যাবে, অন্য ব্যবস্থায় ঠিক সেই ভাবে হওয়া কঠিন। আসল কা হলো—শিশুমনে আত্মবিশ্বাস ও বড় হবার ব্যাকুলতা সৃষ্টি করা হবে প্রথমেই এবং সেইটি সর্বপ্রথমে।

আর একটি দিকেও গোড়া থেকেই বাপ মা ও অভিভাবকে লক্ষ্য নিবদ্ধ হতে হবে। ছেলে যেন স্বাধীনভাবে চিন্তা কর অধিকার অর্জ্জন করে, অন্ধের মত না বুঝেই সবকিছু মেনে নি প্রস্তুত না হয়। 'লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে —এই প্রথম পাঠটির মধ্যে যে বাস্তব সত্য নিহিত আছে, ছেলে মনে যেন এই সম্পর্কে গভীর আস্থা জন্মায়। কিশোর প্রা প্রশ্ন উঠতে হবে আপনি এবং সে নানা ধরণের—ভবি কর্ম্ম-জীবনের প্রশ্ন, ব্যক্তি-উন্নতি, সমাজ-উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় প্রশ্নের মীমাংসা যেমন করেই হোক তার পাওয়া চাই—অর্থ মনের সঙ্গে একটা নিশ্চিত বোঝাপড়া হতে হবে। ছেলেকে য গড়ে তোলবার দাবী রাখলে এ বিষয়ে আমাদের সম্যক সচে না থাকলে নয়।

বিশেষজ্ঞরা পর্য্যালোচনায় দেখেছেন, উদ্যোগী ছে সামনে সাধারণতঃ এই জাতীয় প্রশ্নই হাজির হওয়া স্বাভাবিক— কি এগিয়ে যাবার পথ খুঁজে পেতে পারি না, এই কাজটি ক আমার কি সুফল লাভ হতে পারে, যা আমি শুনলুম, জানলু

# শ'

[ ৩১২ পৃষ্ঠার পর ]

এক ঘণ্টা ধরে ওকে বলেছি তুমি কোনোদিনই ভদ্রলোক হিসাবে গণ্য হবে না। পরদিন এই চিঠি এল—

২৫শে জুন ১৯১৩

* * * গতকাল যেন স্বর্গরাজ্যে গিয়েছিলাম। রাণীর সঙ্গে কথা বললাম, চমৎকার আর পরম রমণীয় রমণী।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তিনি আমাকে অতি তীব্র ভাবে আক্রমণ করলেন। আর আমি তাঁর মুগ্ধ ভক্ত তাঁকে স্তুতি জানিয়ে অসংখ্য মোমবাতি তাঁর উদ্দেশ্যে জ্বালিয়ে দিলাম। অবশেষে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হল. তাঁর অন্তর স্পর্শ করল, এখন আমার মাথায় স্বর্গীয় দ্যুতি—জি, বি, এস। * * *

Pygmallion নাটকের—Bloody কথাটি নিয়ে ভীষণ গোল বাধলো। স্যার হার্বার্ট ট্রি মিসেস ক্যামবেলকে বলেছিলেন এই কথাটি উচ্চারণ কোরো না, যদি একান্তই করতে হয় ভালো ভাবে মোলায়েম করে ফেলো। থিয়েটার জগতে সবাই কানাকানি করে কি ভীষণ কুৎসিত কথা মিসেস ক্যামবেল মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন। এই নিয়ে চলল তর্ক-বিতর্ক। Bloody কথাটি অন্য নাটকেও যে আছে এবং বলা হয়েছে সে কথা সবাই বিস্মৃত হলেন,—সকলে অবশেষে মনে করলেন লর্ড চেম্বারলেন কথাটি নিশ্চয়ই বাদ দিয়ে দেবেন, নয় বীরবোহম ট্রী মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেলকে এই কথা আদৌ উচ্চারণ করতে দেবেন না। এমন কথাও উঠল, একথা যদি উচ্চারিত হয় তাহলে থিয়েটারে একটা হট্টগোল সৃষ্টি হ'বে। অভিনয় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নাটক নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু এই সব আশংকার একটিও সত্য হল না, এবং যদিও সমগ্র দর্শকমণ্ডলী আগে থেকে জেনে গেলেন মিসেস ক্যামবেল Not bloody likely কথাটি উচ্চারণ করবেন—অথচ যখন এই কথা কটি মিসেস ক্যামবেলের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল প্রথমটা সবাই স্তব্ধ, তারপর হাসির রোল পড়ল, আবার স্তব্ধতা,—তারপর দ্বিতীয় বার হাসির ঝড় উঠল।

এই কথাটি এদিনের মাপকাঠিতে কত সাধারণ কথা অথচ অতীতে এই নিয়ে কি ভীষণ আন্দোলন হয়েছে। বার্ণার্ড শ' নাকি পরে দুঃখ করে বলেছেন কথাটি না দিলেই হত, শালীনতার খাতিরে নয়, কারণ তাঁর মতে এই কথা থাকার জন্য নাটকের মূল বক্তব্য বাদ দিয়ে লোকের দৃষ্টি ও মন অন্য দিকে গিয়েছে।

মিসেস ক্যামবেল বলেছেন, আমি এক ককনি উচ্চারণ আবিষ্কার করেছিলাম এবং শ'র খাতিরে মানবিক 'এলিজা ডুলিটল' সৃষ্টি করেছি। নাট্যকারের ত্রুটিবশতঃ নাটকের শেষ অংক পূর্ণ নাটকীয় গতিতে পাদপ্রদীপের আলোর গোড়ার অংশের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না, উনি বললেন যে, এক আঙুলে কোনো একটা সুর বাজাতে, কিন্তু কোনো রকমের গৎ আমার আয়ত্তাতীত নয়।

অভিনয় শেষে অনেকের চোখে জল এল—কারণ কেউ বুঝলো না যে-চরিত্র দুটিকে তারা মনে মনে ভালো বেসেছে তার শেষ পর্যন্ত কি হল! শেষটায় এলিজাবেথ সুবর্ণ রথে চড়ে স্বর্গগমন করল- আর কোনো মতে আমার কথাটি ফুরালো।

অবশেষে বার্ণার্ড শ' একদিন 'এলিজাবেথ ডুলিটলের' ... কথা লিখলেন। আমি তা পড়িনি জেনে নীচের চিঠিখানি ১... মার্চ ১৯১৭ তারিখে লিখেছিলেন—

...মূর্খতার চারটি স্তর আছে, প্রতিটি স্তর তার আগের চেয়ে গভীরতর।

১। এইচ—এর মূর্খামি —
২। যে-মূর্খ বোঝে না যে সে কত মূর্খ তার মূর্খামি—
৩। যে-মূর্খ আমার কোনো রচনা পড়েনি তার মূর্খামি
৪। আর 'এলিজাবেথ ডুলিটলের' মূর্খামি, যে তার নিয়ে কাহিনীর শেষ অংশ পড়েনি—

এতখানি মূর্খামির অধিকারিণী একজন মাত্র আছেন, তাঁ... ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এই চতুর্বিধ মূর্খামি একত্রিত হয়েছে আর আমি পৃথিবী... সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে জড়িত হয়ে সারা য়ুরোপের চোখে হেয় হ... উঠেছি....জি, বি, এস।

Pygmallion বার্ণার্ড শ'র ব্যক্তিগত রচনার উদাহরণ। ... বৈশিষ্ট্য অনেক নাট্য-সমালোচকের কাছে হতাশা নয়। প্রথম দি... মনে হয় বার্ণার্ড শ'র বাঁধাধরা ফর্মুলা যা ছকে নাটকটি গঠি... উদ্ঘাটন, জটিলতা সৃষ্টি করা, এবং পরিশেষে বিচার বিশ্লেষণ। ... আরো গভীর ভাবে বিচার করা যাক।

Pygmallion পঞ্চাঙ্ক নাটক, হেনরী হিগিনস এক ফুলওয়া... মেয়েকে ডাচেস রূপান্তরিত করার জন্য সচেষ্ট। প্রথম অ... প্রস্তাবনা মাত্র, দুটি চরিত্রের পারস্পরিক আলোচনা। আ... নাটকীয় সংঘাত সুরু হয় দ্বিতীয় অংকে, হিগিনস তার এক্সপেরিমে... করতে মনস্থ করলেন। তৃতীয় অঙ্কে হিগিনসের experiment ... প্রাথমিক কাল, এলিজা ডুলিটল উচ্চ শ্রেণীর সমাজে আবির্ভূত হ... কলের পুতুলের মত যান্ত্রিক ভঙ্গীতে বিচরণ করছে। যেসব দা... পড়া আছে তাঁরা সহজেই বুঝবেন এই অঙ্ক কেন, আর সব অঙ্ক... একত্রিত করলেও যে হাসি উদ্রেক করে না সেই অট্টরোল সৃষ্টি কর... এই কারণে মনে হয় পরবর্তী দৃশ্যগুলি বিলম্বিত এ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স... বার্ণার্ড শ'র কি ভুল হয়েছে? যা চরম পরিণতি হওয়া উচিত ছি... তা উপেক্ষিত হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে এলিজাকে ... ডাচেস হিসাবে এ্যামবাসাডারের পার্টিতে আনা হয়েছে। চ... অঙ্কের পর্দা ওঠার পর দেখা যায় সব শেষ। এলিজা বিজয়িনী হয়ে... হিগিনস পরিতৃপ্ত, বিরক্ত, সে চিন্তা করছে ততঃ কিম্। ক... যবনিকা পড়ল। তবে এর পরও আরো দুটি অঙ্ক আছে।

যদিচ মূল ঘটনা দুটি অঙ্কের মাঝামাঝি ঘটছে এবং শেষ দুটি ... বিতর্ক এবং বিশ্লেষণ মাত্র, মৌখিক তলোয়ারের খেলায় নাটকী... সংঘাতের অভিব্যক্তি। প্রতিটি চরিত্র তার আত্মপক্ষ সমর্থন করা... নিছক বিতর্কসভা নয়, তারা এমন ভাবে কথা বলছে যে তাদের জী... বিপন্ন, এই তর্কের যুক্তিজালে তাকে বাঁচতে হবে।

এলিজা কথা বলছে মুক্তির জন্য, হিগিনস কথা বলছে ... ওপর স্বীয় প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য। এই জাতীয় আলাপচারী... সমাপ্তির অর্থ একটি বক্তব্যের সম্পর্কে বিবৃতি নয়—একটা চূ...

## কাগজের কৃত্রিম অভাব প্রসঙ্গে

কাগজের দুষ্প্রাপ্যতায় বাঙলার শিক্ষা সংস্কৃতি প্রায় রসাতলে যেতে বসেছে। হিন্দি প্রচারের তাড়নায় দিল্লীর সরকার না কি এই অভাব সৃষ্টি ক'রেছেন। যদিও অকারণে নয়। বাঙলা দেশকে কাগজ না দিয়ে, বাঙালীর ছাপাখানাকে অকেজো পরিণত ক'রে, বাঙলা বইয়ের প্রকাশকদের দফা রফা ক'রে দিল্লী সরকারের না কি বহুৎ বহুৎ উপকার। আজকে বাঙলার শিক্ষা-সংস্কৃতির কোন রকমে কণ্ঠরোধ হ'লে দশ বিশ বছর পরে 'বাঙালীর অবস্থা যা হবে তা আর কা'কেও ব'লে দিতে হবে না। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা আর যখন অস্বীকারের উপায় নেই, অথচ বাঙলাকে শাসন শোষণ ভবিষ্যতে চালাতে হ'লে এমন একটা কিছু উপায় আবিষ্কার করতে হবে, যে উপায় অবলম্বনে বাঙলার অগ্রগতি রোধ করা যায়। এমনই যদি ধারণা হয়ে থাকে দিল্লীর কর্তা আর অধিকর্তাদের, তবে আমরা হলফ ক'রতে পারি, বাঙালীর শিক্ষা আর সাহিত্য চর্চায় বিরাম পড়বে না। কাগজ যদি নাও পাওয়া যায় আমাদের ক্ষতি নেই। কেন না, বাঙালী একদা কদলীপত্রে ও তালপত্রে লেখার কাজ চালিয়ে নিয়েছে! সুতরাং বাঙালী মা ভৈঃ।

আমাদের গর্ব্বের বিষয় আজকে স্মরণ ক'রতে বাধা নেই। আমাদের অহিংস সরকারের কর্তা আর অধিকর্তাদের আদর্শের জন্মদাতা পিতা, জাতির জনকও কেউ কেউ বলেন তাঁকে, সেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে শেষকালে শিশু বালকটির মত বাঙলা ভাষা শিক্ষা ক'রতে হয়েছে বাঙলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তিতে। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ জলের মত বাঙলা ব'লতে পারেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবার্ষিকী সভায়। তিনি বাঙলা দেশের ছাত্র, বাঙলা ভাষাভাষী। এখানে উল্লেখ করতে আরও বাধা নেই, কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক বিড়লা ভাইদের অন্যতম শ্রীএল. এন. বিড়লা কথায় কথায় আমাদের একদিন বললেন, "I can speak better Bengali than you. I was a student of Hare School, Calcutta".

আমরা তো শুনে হতবাক্! যাই হোক, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক প্রচারের পথে কাগজের অভাব সৃষ্টি যদি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, তবে আমাদের বাঙলা দেশের যোগাযোগ দিল্লীর সরকারের সঙ্গে না রাখলেও কিছু এসে যাবে না। কেন্দ্রের দান দিয়ে রাজ্যের এক অংশ একদিন আত্মনির্ভর হতে পারবে নিশ্চয়ই—যতই বাধাবিপত্তি আসুক।

ঠিক এই বছরেই বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রীবিধানচন্দ্র রায় (অ) ভাবনগরে উপস্থিত ছিলেন না। কংগ্রেসের এবার অধিবেশনে বিধানচন্দ্রের অনুপস্থিতি শুধু লক্ষণীয় নয়, আলোচনীয় বটে। কি কারণে তিনি যোগদান করলেন না? বাঙলাদেশের পত্রপত্রিকায় নানা কথা আলোচনা চলেছে। দিল্লীর সরকারী চালচলন কায়দা-কানুন বাঙালীর কাছে দিন দিন অসহনীয় হয়ে উঠেছে। কাগজের অভাব বাঙলা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর শুধু নয়, মৃত্যুর সামিল। অপমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া প্রতিকার কি অসহযোগ নয়? কংগ্রেসী বুলিতে যাকে বলা হয় অসহযোগ আন্দোলন?

## উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

### বাল্মীকি-রামায়ণ

প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে ভারতভূমিতে যে মহার্ঘ কাব্য-সম্পদের জন্ম হয়ে আসছে, এদের মধ্যে রামায়ণের বয়েসই সব চেয়ে বেশী। রামায়ণ ভারতের প্রথম কাব্যগ্রন্থ, মহর্ষি বাল্মীকিই ভারতের প্রথম কবি, সকল কালের কবিকুলের প্রণম্য। রামায়ণ আর মহাভারত এরা শুধু কাব্য নয়, এরা মহাকাব্য। আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপণে এদের প্রভাব ছায়াপাত করে, এ ছাড়াও এদের প্রভাব যেভাবে আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেকটি নর-নারীর (সকল শ্রেণী সমাজ নির্বিশেষে) মন-প্রাণ জুড়ে আছে, তার তুলনা মেলা ভার। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের দেশের প্রাচীনকালের [illegible] অতিক্রম করে আজও জীবন্ত হয়ে আমাদের সামনে প্রস্ফুটিত হয় এদেরই মাধ্যমে। মহর্ষি বাল্মীকির মূল রামায়ণের বাঙলায় প্রাঞ্জল গদ্যানুবাদ করেছেন স্বর্গীয় শিশিরকুমার নিয়োগী। দুঃখের বিষয় নিয়োগী মহাশয় আজ মৃত। গ্রন্থে সন্নিবেশিত অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রীর ভূমিকাটিও সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী। চব্বিশ হাজারের বেশী শ্লোক সমন্বিত মূল সংস্কৃত মহাকাব্যটি পড়া ও পড়ে তার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। সকলের পক্ষে বোধগম্য করে, সকলের উপযোগী করে যেভাবে রামায়ণকে গদ্যরূপ দিয়ে পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরলেন শিশিরকুমার, তার জন্য তাঁর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হোক আমাদের অভিনন্দন। এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে বাঙলা অনুবাদ-সাহিত্যের মর্যাদাবৃদ্ধি করবে। [illegible]

মুলুকের কবি হুইটম্যানের নাম তাঁদেরই তালিকায় ফেলা যায়। প্রাচ্য-সভ্যতার অন্যতম জন্মভূমি ভারতবর্ষের প্রতি এই কবির ছিল অসীম শ্রদ্ধা, এই ভারতের কোলে বসেই তিনি আজকের দিনের আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার গল্পের পরিবর্তে ভারতের পূত পবিত্র বেদ-উপনিষদ-পুরাণ-কাহিনীসমূহ শুনে তিনি ধন্য হতে চেয়েছেন। হুইটম্যানের প্রধান উপাস্য প্রাণ, প্রাণকে তিনি দেবতার মত দেখেছেন, আপন কাব্যে প্রাণের বন্দনাই তিনি করেছেন। হুইটম্যানের মতে আত্মার শ্রেষ্ঠতম পরিণতি অনন্ত-আশ্রয়ে। হুইটম্যান জীবনকে দেখতে চেয়েছেন স্বাভাবিক ভাবে। জটিলতার মধ্যে নয়, আবরণের অন্তরালে নয়, কৃত্রিমতার মুখোসে নয়। বর্তমানে হুইটম্যানের আটত্রিশটি কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। অনুবাদ করেছেন স্বনামধন্য কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। অনুবাদগুলি অত্যন্ত উচ্চস্তরের। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে হুইটম্যানের কবিতাগুলি বাঙলাভাষায় দেখা দিয়েছে। অনুবাদগুলি পাঠকমনকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে। ভারতপ্রেমিক এই কবির কবিতাগুলি বাঙলাভাষায় ভাষান্তর করে প্রেমেন্দ্র মিত্র কৃতজ্ঞতাভাজনই হয়েছেন। অনুবাদের জন্যে কবিতাগুলির নির্বাচনেও প্রেমেন্দ্র মিত্র দক্ষতা প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলি, এই গ্রন্থটিতে যদি হুইটম্যানের একটি জীবনী এবং তাঁর কবি-কর্ম সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ কোন প্রামাণ্য আলোচনা পরিবেশিত হোত, তাহলে গ্রন্থটির গ্রন্থ-মূল্য আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পেত। প্রকাশক—দীপায়ন প্রকাশনা ভবন, ২৮ মহিম হালদার ষ্ট্রীট। দাম—দুই টাকা মাত্র।

## আমার ফাঁসি হল

সাহিত্যের ফসল ক্ষেত্রকে ভগবানদত্ত সৃজনী প্রতিভার দ্বারা যাঁরা উর্বর থেকে উর্বরতর করে তুলেছেন, যশস্বী কথাশিল্পী মনোজ বসু তাঁদের অন্যতম। তাঁর বর্তমান গ্রন্থটি আমরা আশা রাখি বাঙলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে গণ্য হবে। মনোজ বসুর এই উপন্যাসটি এক অভিনব আঙ্গিকে লেখা, এর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য পাঠক সমাজে আদৃত হবে, লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির, মমত্ববোধের এবং সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়, উপন্যাসটি পাঠ করলে বর্ণনার সাবলীলতা, ঘটনা উপস্থাপনের নৈপুণ্য, চরিত্র চিত্রণের কুশলতা সুসাহিত্যিক মনোজ বসুর সাহিত্যিক দক্ষতারই পরিচায়ক। আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদচিত্রটি প্রশংসার দাবী রাখে। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## বন্ধনহীন গ্রন্থি

আগেকার তুলনায় সংখ্যার দিক থেকে বাঙলা সাহিত্যে মহিলা লেখিকার সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য—তা ছাড়া সত্যিকারের সাহিত্যিকা তো আজকের দিনে বিরল—তবে আশার কথা যে, বাঙলা সাহিত্যের এ অভাবও পূর্ণ হচ্ছে, প্রতিভার প্রদীপ নিয়ে সাহিত্যের আঙিনায় যে সমস্ত শক্তিময়ী লেখিকার পদস্পর্শ পড়েছে শ্রীমতী বাসন্তী বসু তাঁদেরই একজন। "ধন্যবাদ-নয়া" নামক লেখিকার নিবেদন পাঠে জানা যায় যে তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করে সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণা হয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি মাসিক বসুমতীতেই একসময় প্রকাশিত হয়েছিল; সুতরাং এর বিষয়বস্তুও আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকার অজানা নয়, আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধনহীন গ্রন্থি যখন গ্রন্থরূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল তখন সে যথোচিত পরিবর্ধিত, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত। লেখিকার রচনাশৈলী, বর্ণনভঙ্গী এবং কাহিনীর ধারাবাহিকতা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে, সহজেই বোঝা যায় সংযত গাম্ভীর্যপূর্ণ এক রসবোধের তিনি অধিকারিণী, তাঁর রচনায় কোথাও কৃত্রিমতা, জটিলতা, আড়ষ্টতার সন্ধান মেলে না। লেখিকার ভাষা স্বতঃস্ফূর্ত, হৃদয়স্পর্শী ও মনোরম। চিত্রিত চরিত্রগুলি অতি স্বাভাবিক, এক এক সময়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। লেখিকার বক্তব্য অন্তর স্পর্শ করে এবং এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের আলোয় উদ্ভাসিত এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি করেছেন। অতীব সুখপাঠ্য এই উপন্যাসটির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি এবং প্রসঙ্গতঃ আশা রাখি যে, লেখিকার কাছে বাঙলা সাহিত্য আরও অনেক কিছু আশা করে। প্রকাশক বলাকা প্রকাশনী, ২১।সি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। দাম দু' টাকা মাত্র।

## সঞ্জয় ভট্টাচার্যের স্ব-নির্বাচিত কবিতা

একটি শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কাল যাবৎ বাঙলা সাহিত্যকে যে কবির দল সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে আসছেন, প্রখ্যাত কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁদেরই অন্যতম। সাহিত্যপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁরই কবিতাবলীর একটি স্ব-নির্বাচিত সংকলন বর্তমানে প্রকাশিত হয়ে প্রকাশগ্রন্থের সংখ্যাবৃদ্ধি করল। সঞ্জয় ভট্টাচার্য বৈশিষ্ট্যবান কবি। তাঁর অধিকাংশ কবিতা এক বিচিত্র বৈচিত্র্যের স্বাক্ষরবাহী। তিনি নিজেও এক অসাধারণ ভাব-সম্পদের অধিকারী। তাঁর বর্ণনভঙ্গী মনোহর। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতাগুলির মধ্যে বেশ একটি সংহত সুর পাওয়া যায়। তাঁর অজানা রহস্য সন্ধানে যেন তাঁর কবি-মন তৎপর, আর তা তাঁর সন্ধানী-মনের ছাপ পড়েছে তাঁরই কবিতাগুলির উপর। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ কাব্যানুরাগী পাঠক-পাঠিকার দরবারে যথোচিত সম্বর্ধনা পাবে, আশা করি। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩ গান্ধী রোড। দাম চার টাকা মাত্র।

## রূপকথার ঝাঁপি

প্রবীণ কথাসাহিত্যিক শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সৃজনী প্রতিভা কেবলমাত্র গল্প উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্যের বিভিন্ন মহলে তাঁর অবাধ গতিবিধি। শিশু-সাহিত্য বহুলাংশে তাঁর দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। শিশুদের উপযোগী কয়েকটি রূপকথা একত্রে সংকলিত হয়ে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুলি শিশুদের দরবারে আশাতীত জনপ্রিয়তা লাভ করার দাবী রাখে। প্রতিটি গল্প সাবলীল, বেগবান, ও মনোরম। ছেলেদের জন্যে লেখা তাদের বোধগম্য হাল্কা গল্পগুলিতেও যথোচিত গাম্ভীর্যের অভাব মেলে না। শিশুদের প্রতি সৌরীন্দ্রমোহন অন্তরে কত স্নেহ, মমতা ও দরদ পোষণ করেন তারই ছাপ পড়েছে

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**সুলেখা দাশগুপ্তা**

মঞ্জু জিজ্ঞাসা করল—আপনার সেই ধনী ব্যবসায়ীর নাম কি?

হাসতে হাসতে মাথা নাড়ল নীল—ও বলা চলবে না। ওটা আমাদের ট্রেড সিক্রেট—যাকে বলে ব্যবসায়িক সততা। কিন্তু কেন, আমার লেখা পড়বার জন্য?

—হুঁ।

—ও-সব লেখা কি পড়বেন। অন্যের চিন্তায় অন্যের নামে লেখায় কি কিছু থাকে। নিজ নামের দায়িত্ব না থাকলে কি লেখা উৎরোয়? একটু থামল নীল। তার পর বললো—আর উৎরানো লেখা জীবনে লিখে উঠতে পারবো, তারই বা সম্ভাবনা কি! লক্ষ্মীর বর লাভ যদি বা সম্ভব হয় সরস্বতীর বর লাভ—ও দেবীকে প্রসন্ন করা, সে বড় দুরূহ কর্ম। তিনি তোষামুদে তুষ্ট হন না। বিরক্ত হন বেশী ডাক-খোঁজে। কাজ কাজ কাজ—কাজের হুজুগের যুগে কাজ দেখিয়ে খুশী করবার জন্য সমস্ত দিন উপুড় হয়ে তিন দিস্তা কাগজ লিখে ফেললে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, তিনি ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটাকে। বুঝলেন, বলার কথা আছে বলতে চাই কিন্তু পারছি নে এ যন্ত্রণা ভোগ যেন বোবার যন্ত্রণা ভোগ, ডস্টয়েভস্কি তাঁর বন্ধুকে লিখেছিলেন, লেখা বলতে কি বোঝায় তা কি তুমি জানো বন্ধু? এই ভয়ানক নরক যন্ত্রণা ভোগ যে তোমায় কখনো ভুগতে হয় না। সে জন্য তুমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারো।

বলেই নীল হাইফেন দিয়ে লেখা টানবার মতো গলার স্বরের টানে শুধু একটা ব্যবধান রেখে একেবারে বিষয়ান্তরে চলে গেল—তার পর মমতা বাড়ী আর হাসপাতাল হাসপাতাল, আর বাড়ী নিয়মিত করে চলেছে। তার ডিউটির সময়গুলো ছুটুর মা'র প্রেরিত অন্নে এবং ছুটুর নিজের বিশেষ তত্ত্বাবধানে আমার নিঝঞ্ঝাটে কাটছে। বাবা এসে মাকে নিয়ে গেছেন দেশে। তাঁদের বাসনা, তাঁরা পাকিস্থানবাসী হবেন। ব্যস, শৈশব কাল বাদে আমার সংবাদের আর কিছু নেই। এখন আপনার কথা শুনবো। টিনটা খুলে একটা সিগারেট বের করে সেটা ধরাতে লাগল নীল।

প্রথমটায় বুঝতে না পেরে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল মঞ্জু। তার পর বুঝে হেসে ফেললো। প্রথম থেকেই কথার গতিটা আজ নীলকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে, তাই নীল এবার কথার চাকাটা জোর হাতে ষ্টিয়ারিং ঘুরোবার মতো করে ঘুরিয়ে দিল ওর দিকে। মঞ্জু দস্তুরমতো ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো—এমন ভালো আলোচনাটাকে এ ভাবে নষ্ট করে দিতে হয়! সাহিত্য থেকে এমন সংবাদ টেনে নিয়ে এসে আমার কথা শুনতে চাইলেন যে, আমাকে এখন অগত্যা খবরই বলতে হয়।

—নইলে?

—নইলে আপনার বলার কথার ভাষা খোঁজার মতো আমি আমার কথার ইচ্ছায় পথ খোঁজার কথা শোনাতাম আপনাকে বলতাম, আমার আরাধ্য দেবী লক্ষ্মী নন, সরস্বতী নন, এমন কি তিনি কোন দেবীই নন। তিনি মানবী। স্বপ্ন দেখি জোয়ান অব আর্কের। তার গরুচরানো মাঠে বসে গির্জার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে দৈববাণী শোনার মতো দৈববাণী শোনার জন্য এই মাঠে এতক্ষণ ধরে আমি কান পেতে বসেছিলাম। যদি এই মাঠের ঘূর্ণি হাওয়ার ভেতর তেমনি আকাশবাণী আমি একটিবারের জন্যও শুনতে পেতাম ওগো বিধাতার মেয়ে এগিয়ে যাও। আমি তোমাকে সাহায্য করবো। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই শোনাতে পারতাম এ সব কথা। কিন্তু এখন আমাকে সোজা খবরে চলে গিয়ে বলতে হবে, আমার দিদি ঠিক করেছে—ও আইন পড়বে। আমারও প্রচণ্ড উৎসাহ তাতে।

বাধা দিল নীল। আমার ভুলটা তো শুধরে এনেছিলেন আবার নিজেই দিচ্ছেন কেন নষ্ট করে?

—আর হয় না। সামনের দু'দিকে ঝুলানো বেণী দুটো পেছন দিকে সরিয়ে দিতে দিতে মঞ্জু বললো, সাহিত্যে মূল্য নাই থাক খবরের ভেতরও মূল্যবান খবর নিশ্চয়ই আছে। আমার দিদি মমতার বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় যে তার নিজের বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন সে খবরটা সেদিন আপনাকে আমার বলা হয়ে ওঠেনি।

মুখের সিগারেটটা হাতে নিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল নীল—সে কি!

—হ্যাঁ।

—কেন? দুটোর সঙ্গে যোগ কোথায়?

—দিদির মতে যোগ আছে। নার্সের কাজে সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হয় এই যদি সত্য—এই যদি সত্য যে এই সেবার কাজে নারীর জাত যাওয়া, তবে যারা বাধ্য হয়ে নেয় তাদের চাইতে অনেক বেশী অপরাধী তারা যারা প্রবৃত্তির দোষে নেয়। তাই সম্ভ্রান্ত ঘরের বৌ হবার যোগ্যতা যদি নার্স হলে মেয়েরা হারায় তবে যাদের জন্য হারাবে তাঁরা আরো বেশী অযোগ্য জামাইবের। বিয়ে যদি ভাঙে তবে যে কারণে মমতার ভাঙবে ঠিক সেই কারণে ওটাও ভাঙবে। বলাই বাহুল্য যে, আমার দিদির পাত্র ছিলেন ডাক্তার তাই একটা যখন ভাঙলো তখন আর একটাও। ওকে কেউ টলাতে পারলো না।

একটা দমকা বাতাস পার্কের শুকনো ধুলো ঝাটিয়ে নিয়ে ওদের উপর দিয়ে বয়ে গেল। মুখে আঁচল চাপা দিল মঞ্জু। কিন্তু নীল খেয়াল করলো না। বাতাসে উল্টে-পাল্টে খেতে খেতে উড়ে এসে একটা কাগজের টুকরো অন্যমনস্ক ভাবে হাতে তুলে নিয়ে বললো—অকল্পনীয় ঘটনা এমন ভাবে ঘটে চলে বলেই না মানুষের কল্পনা-জগৎ কোন সীমার বাধা মানে না। আর তাই না তার এতো সমৃদ্ধি। কিন্তু আশ্চর্য! মঞ্জুর দিকে তাকালো নীল—এতো বড় কথাকে আপনি শুধু খবরের মূল্যে দিয়ে ফেলেছেন! সংবাদের সাধ্য কি এ ভার বয়? কাজ ক্ষতি করে বসেছিলাম, দেখুন সে বসা কেমন সার্থক হলো। আপনার উপাস্য দেবীর নাম শুনতে পেলাম। শুনলাম এক-মাঠ রোদের দিকে তাকিয়ে

ন-ভাত আছে, রাতে ফিরবে? আচ্ছা। মঞ্জু সিঁড়ির দিকে এগুচ্ছিল, অমিতার ডাকে ফিরল। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। আচ্ছা সেই যে একদিন সন্ধ্যের সময় মাতাল অবস্থায় আমাদের গাড়ী এসেছিলেন, সেই বাড়ীওলা ভদ্রলোকের নামই তো রজত, তাই না?

মাতাল শব্দটা কানে আঘাত করল মঞ্জুর। ভুরুতে সামান্য টান ফেলে জিজ্ঞাসা করল হাঁ। কিন্তু কেন?

—কাল সন্ধ্যের সময় তার লোক তোমার নামে একটা মস্ত নিমন্ত্রণের কার্ড আর একটা চিঠি নিয়ে এসেছিল। তোমার সই চাই। তুমি বাড়ী নেই। আমিই সই করে রেখে দিয়েছি।

—এসে দেখবো।

স্নানকরা ঠাণ্ডা শরীরে ভোরের হাওয়ায় খালি বাসে টানা পথটা পার হতে আরাম লাগতো, আরাম লাগতো রিক্সার পথটা পার হতো যদি মনটা এ আরামটা উপভোগ করার মতো অবস্থায় থাকতো। কিন্তু শরীরের আরাম মন গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত বাইরের জিনিষ বাইরের বস্তুই থেকে যায় মঞ্জু কিছুই বোধ করল না।

নীলদের বাড়ীর কাছে এসে কান্নার শব্দ কানে আসতেই কান খাড়া করল সে।

আশ-পাশের বাড়ীর কেউ দাঁতন করতে করতে, কেউ কথা বলাবলি করতে করতে ছট্টুদের বাড়ীটার দিকেই তাকাচ্ছে। একটা শ্রান্ত গোঙানো কান্না থেমে থেমে কেঁদে চলেছে। যেন অনেক কেঁদেছে। কাল সমস্ত রাত কেঁদেছে। আর পারছে না। শরীরের শক্তি ফুরিয়ে গেছে। অশ্রান্ত ভাবে মাথা কুটে চলেছে ভেতরটা।

দরজা এখন খোলা রয়েছে তখন ভেতরে কেউ আছে নিশ্চয়ই। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে অপরাধী পায় ভেতরে ঢুকল মঞ্জু। দাঁড়ালো সিঁড়িটার সামনে। এই বারান্দার সিঁড়িটার উপরই ছট্টু সেদিন কঞ্চি হাতে বসে ছিল। ও জানে না ছট্টু তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ একটা জল আইসক্রিম খেয়ে যেতে পেরেছে কি না। কিন্তু সে জন্য তার দুঃখ নেই। মঞ্জুর দুঃখ একটা ঘোড়া পেলে সে কি করতো সে সে কথাটা তার শোনা হলো না। বসে রাজকন্যার গল্প শোনাবার মতো অবসর বা আনন্দ কোনটাই নিশ্চয়ই ছট্টুর মার ছিল না। রাজকন্যার সন্ধানে ঘোড়া ছোটাবার স্বপ্নও নিশ্চয়ই ছট্টুর মনে গড়ে ওঠেনি। সে একটা ঘোড়ার সন্ধান তবে করেছিল কি জিনে জানবার জন্য?

দু'হাতের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে চৌকির ওপর শুয়েছিল নীল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে নিঃশব্দেই চেয়ারে বসেছিল মঞ্জু। কিন্তু মানুষের নিঃশব্দ চলা-বসারও বোধ হয় শব্দ আছে—মুখ তুলল নীল। ওসকো চুল দু'হাতে পেছন দিকে ঠেলে উঠে বসে একটু সময় চৌকির উপরই বসে রইল সে। তারপর নেমে এসে বসল চেয়ারে। বললো—আপনি আজ একবার যে আসবেনই এ আমি জানতাম। এমন কি এই সকালেই তাও। আপনার অপেক্ষাই করছিলাম, এ-ও বলতে পারেন। নইলে এতক্ষণে বেরিয়ে পড়তাম আমি। আঙুল দিয়ে ঘরের দেয়াল আর মেঝে দেখিয়ে বললো—দেখছেন না, দেয়াল ভিজে, মেঝে ভিজে, মানুষগুলোর চোখ-মুখ ভিজে—এই ভিজে স্যাঁত-সেঁতে আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছি আমি।

আষাঢ়-শ্রাবণের বৃষ্টির জল মাটির ভেতর যা ঢুকেছিল, ভাদ্রের রোদের টানে তা এখন উপর'দিকে উঠে আসছে। দেয়াল মেঝে, এমন কি ছাদের চত্তর পর্যন্ত ঘেমে উঠছে। আর একটু রোদ চড়লে টপটপ করে জল গড়াতে থাকবে দেয়ালের গা বেয়ে, ঠিক গাল বেয়ে চোখের জল গড়াবার মতো—উঠে দাঁড়ালো নীল চেয়ার থেকে। চলুন বেরিয়ে পড়ি। চৌকির নীচ থেকে পা দিয়ে চটিটা টেনে বের করে এনে তার ভেতর পা ঢুকালো। আধময়লা পাঞ্জাবীর হাতটা গুটালো। টেবিলের উপর থেকে তালাটা হাতে নিয়ে বললো, চলুন।

জয়ার মা'র মুখের অপ্রসন্ন দৃষ্টি হয়তো আরো ক'টা দিন মঞ্জুকে তাদের বাড়ী যাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারতো কিন্তু আর পারলো না। ছট্টু জয়ার দশ বছরের ভাইটির ডাকের জোর অনেক বেশী বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। এখান থেকে বেরিয়ে সে ওখানেই যাবে, এটা মনে মনে স্থির করে ফেলেছিল। চলতে চলতে বললো—ছট্টু আমাকে আমার আর এক ছোট্ট বন্ধুর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে—সেখানে যাবার কথাই ভাবছিলাম। আরো আগেই সেখানে আমার যাওয়া উচিত ছিল।

—ছোট্ট বন্ধু? কে?

—আর একদিন বলবো।

—এখন নয় কেন?

—এখন পর্যন্ত আমি নিজেই জানিনে, নিজেই বুঝে উঠতে পারিনি তাদের কথাটা ঠিক কি।

—বেশ। চলুন কোথাও একটু চা খেয়ে নি আগে। তারপর আপনি আপনার পথে, আমি আমার—

কাঁচা রাস্তা পার হয়ে ওরা এসে পড়ল বড় রাস্তায়। দু'পাশের দোকান-ঘরগুলোর নীচে রাস্তার উপরই সকাল-সন্ধ্যায় জমে এখানে চাল ডাল তরকারী থেকে আরম্ভ করে জামা কাপড় ডালা কুলোর বাজার। তখন সবে কিছু কিছু লোকজন জিনিষ পত্তর আসতে শুরু করেছে। কেউ চালের বস্তা নামিয়ে ময়লা চাদর বিছিয়ে ঝর ঝর করে ঢালছে চাল। কেউ তরকারীর বোঝা নামিয়ে কপালের ঘাম মুচছে। কেউ কেউ বিকিকিনি শুরু করে দিয়েছে। চায়ের দোকান জমে উঠেছে। দোকানের ছোকরা চাকরটা তরতর করে কালো নেকড়া দিয়ে টেবিল মুচছে। তাস দেওয়ার মতো অমলেটের প্লেট দিয়ে যাচ্ছে সবার সামনে। রেডিওটাতে ভজন শেষ হয়ে শুরু হয়েছে গান্ধীচর্চ্চা—

'জনসাধারণের করের টাকার একটা পয়সাও রাষ্ট্রের প্রধানরা বিলাসে ব্যসনে অপব্যয় করতে পারিবে না, বাপুজীর এই বাণী'—কিছু লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে শুনছে। মঞ্জুর মনে হলো জয়া শুনলে এখন নিশ্চয়ই খিল খিল করে হেসে উঠে বলতো—মানুষ এমন বোকা না তাই আমার এতো হাসি পায়।

—রাম রাম বাবুজী!

দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

নীলের দিকে তাকিয়ে লোকটি বললো—আমি আপনাকে চেনে লেকিন আপনি হামাকে চেনে না। হামি ঐ বাগানবাড়ীর দাঁড়োয়ান আছে বাবুজী।

—ওঃ।

—হাঁ। বলে মস্ত মাথাঝাঁকুনী দিল সে। বললো, স্কুলঘর বানাতে চেয়েছিলেন যেটাকে উস ঘর।

—বুঝেছি। তা আমাকে কিছু বলবে? থেমেছিল নীল। হাটতে শুরু করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো সে-ও—হাঁ জী! মালিক বোলেছে আপনাকে একবার মেহেরবানি কোরে দেখা কোরতে। কোবে সময় হোবে বলে দিলে মালিক আপনার সঙ্গে বাত করবেন।

একটু ভেবে নিয়ে বললো, আচ্ছা আমি পরে জানাবো তোমায় সে কথা।

কিন্তু কথা হয়ে গেলেও সে চলে গেল না। সঙ্গে যেতে যেতে বললো—মালিককা সাথ একঠো বোঝাপড়া কোরে লেন বাবুজী! স্কুল বহুৎ আচ্ছা কাজ আছে। মালিককে হামিও বোলেছে ও বাড়ী তো নয়—ওতো বিলকুল জঞ্জাল। দিয়ে দিন ভালো কাজ হোবে।

এমনি সময় আকাশরং একটা মস্ত গাড়ী ওদের পাশ কেটে বেরিয়ে গেল। গাড়ীটা দেখেই সেটাকে হাতের ইসারায় থামতে চেষ্টা করল নীল। কিন্তু ড্রাইভারের দৃষ্টি সে ইসারা দেখল না।

—আপনাকে নিয়ে যেতে গাড়ী পাঠিয়েছেন বুঝি আপনার সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোক?

—হাঁ। একটু এখানে দাঁড়াতে হবে। দু'পা পেছিয়ে রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়ালো নীল। দারোয়ানকে বিদায় দিল সে গিয়ে জানিয়ে আসবে বলে। মঞ্জুকে বললো, গাড়ীটা এক্ষুণি ফিরে যাবে এই রাস্তায়।

আপনাকে যখন অন্ত জায়গায় যেতেই হবে তখন আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে চলে যাই আমার বন্ধুর কাছেই। ভাদ্র শেষ হয়ে এলো। আশ্বিনে পুজো। সহরে পুজো সংখ্যার মরশুম শুরু হয়ে গেছে। নামী সংখ্যাগুলোর সব ক'টায় নাম যায় এই তার বাসনা। ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আমিও। লেখা মানেই কিছু টাকা।

গাড়ীটাকে ফিরে আসতে দেখে নীল এবার দূর থেকেই হাত তুলে থামালো। ড্রাইভার গাড়ী থামিয়ে নেমে এসে দাঁড়ালো সেলাম দিয়ে। জানালো বাবুর জরুরী তাগিদের কথা। নীলের মুখে সম্মতির লক্ষণ দেখে দিল দরজা খুলে। মঞ্জুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল নীল আগে উঠবার জন্য। মঞ্জু উঠে বসলে উঠে বসল সে-ও। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললো—পথ বলে দেবেন।

মঞ্জু রাস্তার নাম বলে কতটুকু সময় বাইরের অপসৃয়মান গাছপালার দিকে তাকিয়ে থেকে ভেতর দিকে চোখ ফেরালো—আচ্ছা, স্কুল করা সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ কি কমে গেছে?

—কেন?

—কই আপনি তো ঐ বাড়ীর মালিকের সঙ্গে দেখা করার জন্ত কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না?

বিনে পয়সায় বিলিয়ে দেবার জন্ত বা দান করবার জন্ত তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন না, এটা আপনি ধরে নিতে পারেন। দারোয়ানের শুভবুদ্ধির ছোঁয়া তার মালিকের গায় লেগেছে, এ আপনি মনেও করবেন না। বুদ্ধির জগতে একমাত্র স্বার্থবুদ্ধি ছাড়া আর কোন বুদ্ধির সঙ্গে এঁদের পরিচয় নেই। হয়তো তিনি দামটা কিছু কমানোর প্রস্তাব করবেন। কিন্তু দশ টাকা বিশ টাকা আর হাজার টাকা যাদের কাছে সমান অঙ্ক তাদের এই ডাকের প্রতি কি আগ্রহ থাকতে পারে? হাতের শেষ-হয়ে-আসা সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো—যা আমার আয়ত্তের বাইরে, যা নয় বা হবার নয়, সে বিষয়ে আমার আগ্রহ আর আকর্ষণ যতই থাক আমি যে কি আশ্চর্য্য রকম চুপ করে থাকতে পারি, আপনার কাছে সে পরীক্ষা আমি আরো দেবো।

কিছু বোঝার কিছু না বোঝার দৃষ্টিতে মঞ্জু নীলের দিকে তাকালো।

—ঠিক বুঝলেন না? ঠিক সময় ঠিকটা বুঝিয়ে দেবো।

পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়ীটা যে বাড়ীর কাছে দাঁড় করিয়ে মঞ্জু নেমে দাঁড়ালো সেটা কার বাড়ী—মঞ্জুদেরই না তার সেই ছোট্ট বন্ধুর, নীল জানে না। জিজ্ঞাসাও করল না। মঞ্জু নমস্কার জানালে সে বললো—আপনার যাওয়া-আসার পথে সেই পার্কটা তো অবশ্যই পড়ে?

—হাঁ।

—আপনার সেই গাছটার ছায়ায় এসে যদি প্রুফ দেখার কাজটা সারবার জন্য আমি কখনো বসি আর ফেরবার পথে আপনার সে দিকে চোখ পড়ে যায়—দেখা হয়ে যেতে পারে তো?

—পারে।

—পথটা পার হবার সময় একটু নজর রাখবেন—বলে নমস্কার জানিয়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সে গাড়ী চালাতে। [ক্রমশঃ।

# স্মৃতির টুকরো

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

সাধনা বসু

১৯৩৩ সালের শেষ মাসটির শেষাশেষি। নিরঞ্জন পালের জারিনা (Zerina) মধুর প্রযোজনায় অভিনীত হল নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে। নামভূমিকায় আমিই অভিনয় করি। স্বর্গীয়া সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, বর্ধমানের মহারাজকুমারী স্বর্গীয়া ললিতারাণী, তিলক নেমো (টুটু ঘোষ) প্রীতি মজুমদার, স্বর্গীয় বোকেন চট্টোপাধ্যায় এবং মধু অন্যান্য প্রধান ভূমিকাগুলিতে দেখা দিলেন। তিমিরবরণের অগ্রজ শ্রীমিহিরকিরণ ভট্টাচার্য মহাশয় ও মিঃ টি, ফ্র্যাঙ্কোপোলো সঙ্গীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। আলোকসম্পাত ও মঞ্চ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল গীতা ঘোষের উপর। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে, টুটু ও গীতা এঁরা দুজনেই বাঙলার অন্যতম স্মরণীয় সন্তান ও প্রথিতযশা ব্যারিষ্টার স্বর্গগত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র। সি-এ-পির সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে যাঁদের নাম চিরদিন মনের মধ্যে বেঁচে থাকবে গীতা তাঁদেরই অন্যতম। ১৯৩৯ সালে বোম্বাই অভিমুখে আমাদের যাত্রার আগে অবধি আমাদের যতগুলি অনুষ্ঠান হয়েছে তাদের সঙ্গে গীতা ওতপ্রোতভাবে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন।

১৯৩৩ সাল শেষ হয়ে গেল। বিংশ শতাব্দীর পরমায়ুর একটি বছর আরও কমে গেল। এল ১৯৩৪ সাল। গোড়ার দিকের কথা বলছি। এখনকার দিনে এলিট প্রেক্ষাগৃহের নাম বোধ হয় সকলের কাছেই সুপরিচিত। সেদিন এই প্রেক্ষাগৃহেরই নাম ছিল ম্যাডান থিয়েটার। সেখানেই মধু আবার আলিবাবা মঞ্চস্থ করল। আমার মনে পড়ছে, আমি নেমেছিলুম মর্জিনার ভূমিকায় আর মধু সেজেছিল আবদাল্লা। ফতিমার ভূমিকায় মিলিদি (৺সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়), সাকিনার ভূমিকায় আমার বোন নীলিনা, কাশেমের ভূমিকায় স্বর্গীয় কমল বিশ্বাস, মুস্তাফার ভূমিকায় প্রীতি মজুমদার, দস্যুসর্দারের ভূমিকায় কল্যাণ মজুমদার, হুসেনের ভূমিকায় স্বর্গীয় বি, পি, মেহরা (মহারাজকুমারী ললিতা এঁরই সহধর্মিণী ছিলেন) এই ছিল ভূমিকালিপি। বিদেশীয় অর্কেস্ট্রা পরিচালিত হল ফ্র্যাঙ্কোপোলোর পরিচালনায় আর দেশীয় অর্কেষ্ট্রার পরিচালনা করলেন শ্রীমিহিরকিরণ ভট্টাচার্য মহাশয়। মঞ্চ আর আলোর ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছিলেন গীতা। অনুষ্ঠানটি মঞ্চস্থ হল অবিভক্ত বাঙলার তদানীন্তন রাজ্যপাল (বর্তমানে পরলোকগত) স্যার জন অ্যাণ্ডারসানের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষণায়। দর্শক-সাধারণের দ্বারা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হল আলিবাবার এই পুনরভিনয়। অসংখ্য দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে সার্থকতায় ঝলমলিয়ে উঠল প্রতিটি কর্মীর এবং প্রতিটি শিল্পীর অক্লান্ত পরিশ্রম। সাধুবাদের এ ওড়নায় যেন ঢাকা পড়ে গেল নৃত্যে ও নাট্যে ভরা এই সময় অনুষ্ঠানটি। দিকে দিকে দেখা গেল আলিবাবারই বিজয় বৈজয়ন্তী প্রতিটি পত্রিকা অকুণ্ঠ প্রশংসা জানালো এই অভিনয়কে। আর প্রেক্ষাগৃহের অবস্থা···সেটাও বলে দিতে হবে? একটি কথায় তা বলি প্রেক্ষাগৃহের অবস্থা যাকে বলে—'ন স্থানং তিলধারণং' এবং ছোট্ট···ছোট্ট বললেও ভুল হয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তিলও রাখবার স্থান সঙ্কুলান হয় না এমনি পরিপূর্ণ ছিল প্রেক্ষাগৃহ। এই অভিনয় একটানা কিছুকাল চালিয়ে যাওয়ার বাসনা ছিল কিন্তু পরবর্তী কয়েকদিন অন্য কোন সম্প্রদায় কর্তৃক প্রেক্ষাগৃহটি নির্দিষ্ট থাকার জন্যে তা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। কিছুকাল পরে এম্পায়ার থিয়েটারে আবার "আলিবাবা" মঞ্চস্থ করা হ'ল।

এবার নিজের দিকে একবার ফিরে তাকাই। আলিবাবার জয়পতাকা যখন বিজয়গর্বে উড়ে চলেছে অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমার দিনগুলো তখন কাটে কি ভাবে? অনেকে ভাবতে পারেন যে, এমনিতেই মঞ্চাভিনয়ে যখন অনেক পরিশ্রম তখন অবসর সময়ে বিশ্রামের মধ্যে সময় কাটানোই স্বাভাবিক—তবে সত্যি যদি এ রকম কেউ ভেবে থাকেন তা হলে বলব ভুল ভেবেছেন, প্রকৃতপক্ষে অবসর বলেই তখন আমার কিছু ছিল না—প্রতিটি মুহূর্ত কেটে যেত কাজের মধ্যে দিয়ে—অপব্যয় করার মত একটি মুহূর্তও আমার হাতে ছিল না। সেই সময় আমার ধ্যান-জ্ঞান যাই বলুন সবই ছিল আলিবাবার মঞ্চাভিনয়কে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করা, আমার চিন্তা কল্পনাই ছিল রসিকমহলে আলিবাবার মঞ্চাভিনয়কে কেন্দ্র করে অভূতপূর্ব আলোড়ন জাগানো, আমার কামনা-বাসনাই ছিল আলিবাবার মঞ্চাভিনয়কে দর্শক সমাদরে পূর্ণ করে তুলতে। নাটকের মহড়া রোজই দিতে হোত, নাচের মহড়াও চলত সঙ্গে সঙ্গে ব্যালে-নৃত্যও আমাকে রচনা করতে হয়েছিল এবং পরিচ্ছদ অলঙ্করণের ভারও আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

ইতোমধ্যে "সেলিমা" ছবিটির পরিচালনার কাজ শেষ করে মধু আর একটি হিন্দী ছবি পরিচালনা করে। ছবিটির নাম ছিল ওয়ান ফাটাল নাইট। এ আজ চব্বিশ বছর আগেকার অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের কথা। ওয়ান ফাটাল নাইটের সম্পর্কে একটি কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। এই ছবিটির একটি বিশেষ মূল্য আছে। ছবিটির কাহিনী এমন একজনের লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁকে পরবর্তীকালে সকলেই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চের প্রধান শিল্পিরূপে দেখেছেন, দেখেছেন দেশের মুক্তিসংগ্রামে নিজেকে সর্বতোভাবে উৎসর্গিত করতে, দেখেছেন স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যতম প্রধান সদস্যরূপে কিন্তু সেইটেই তাঁর আসল বা একমাত্র পরিচয় নয়, আপন মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্যের তিনি প্রভূত উন্নতি

ান করে গেছেন, সুধীদের দরবারে গৃহীত হয়েছেন প্রতিভা, ৗসা ও মেধার আধাররূপে, অফুরন্ত জ্ঞানসম্পদ ছিল এঁর ৃশারভুক্ত—এঁর নাম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। ৗন ভারতের লোকান্তরিত প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। প্রতিভাধর ঁত্যিক।

১৯৩৬-এর প্রথম দিকের কথা। এম্পায়ার থিয়েটারে মধু ুরু করল "মন্দির"। প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গাপাধ্যায় মহাশয় এর কাহিনীর স্রষ্টা। দেবদাসী মঞ্জুলা । নায়িকা এই—ভূমিকাটিতে আমি অবতরণ করি। অন্যান্য ধান ভূমিকাগুলিতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মিলিদি, ছারাজকুমারী ললিতারাণী, বি, পি, মেহরা, কমল বিশ্বাস, প্রীতি জুমদার, কৃতী চরিত্রাভিনেতা ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ওহো! বলতে একেবারে ভুলে গেছি, মন্দিরে মধু নিজেও যে একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অভিবাদন ানিয়েছিল সুবোদ্ধা দর্শক সাধারণকে। সঙ্গীত পরিচালনা রেছিলেন তিমিরবরণ, অর্কেষ্ট্রার তত্ত্বাবধান করেছিলেন মিহিরকিরণ ট্টাচার্য, নেপথ্য থেকে গানগুলি গেয়েছিলেন সুবিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ঙ্কজ মল্লিক, শিল্পকর্ম সম্বন্ধে যথাযথ নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রবীণ চিত্র- ৗ ও সুদক্ষ শিল্প নির্দেশক চারু রায়। মঞ্চ ব্যবস্থাপনা আর ালোকসজ্জা এ ব্যাপারে গীতা তো ছিলেনই।

এই উপলক্ষে একজনের নাম আজ বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তা া করলে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে। আমাদের ষ্ঠানের সাফল্যের, সমৃদ্ধির অগ্রগতির মূলে এমন একজনের প্রেরণা ছিল যা আজ বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। বর্তমানের লোকগত মহারাজাধিরাজ ডক্টর স্যার বিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের কথা বলছি। নিজের শত সহস্র কর্মভার থাকা সত্ত্বেও আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে যে ভাবে আমাদের উৎসাহ দিয়ে এসেছেন তার তুলনা হয় না। তাঁর উৎসাহ সেদিন আমাদের জয় যাত্রার অন্যতম প্রধান পাথেয় ছিল, আমাদের উপর অপরিসীম সহানুভূতি পোষিত ছিল তাঁর আপন অন্তরে। তাঁর রচিত একটি নাটকেরও অভিনয় আমাদের দ্বারা হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু অপরিহার্য কোন কারণ বশতঃ (আমার ঠিক মনে পড়ছে না, সঠিক কারণটি কি) সেই বাসনা শেষ অবধি বাস্তবে রূপলাভ করতে পারেনি।

অভিনয় সাফল্যের দিক থেকে আলিবাবা যখন এক অদ্ভুত ধরণের ৃষ্টি সঞ্চার করল মধু তখন আলিবাবার একটি চিত্র রূপ দিতে মনস্থ করল। কিন্তু কোন প্রযোজক মধুর প্রস্তাবে সম্মত হন না কারণ মধু চায় যে, যে সব শিল্পীদের দ্বারা আলিবাবার মঞ্চাভিনয় সার্থক হয়েছে আলিবাবার চিত্রাভিনয়ে তাঁরাই ভূমিকা গ্রহণ করুন। কিন্তু এখানে প্রযোজকরা দেখলেন যে ছায়া-জগতে পরিচিত একটি নামও শিল্পীদের তালিকায় পাওয়া যাচ্ছে না, শিল্পী হিসেবে তাঁরা কৃতী হতে পারেন কিন্তু চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ইতিপূর্বে তাঁদের অভিনয় প্রতিভার ছাপ তো ধরা পড়েনি। সুতরাং ভূমিকাগুলি তাঁদের মধ্যে বণ্টন করলে সাধারণ্যে তা কি ভাবে গৃহীত হবে সে বিষয়ে তো কোন নিশ্চয়তা নেই। মোটের উপর ছবি আদৌ বাজারে চলবে কি না সেইটেই তো সর্বাগ্রে চিন্তনীয়। আসল কথা, তাঁরা তাঁদের অর্থকরী লাভক্ষতি সম্বন্ধেই সবিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। আর

আলিবাবার মঞ্চাভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে যে সব শিল্পীকে দেখা গিয়েছিল তাদের মধ্যে ইতোপূর্বে কেউই ছায়াছবিতে অভিনয় করেন নি। এদিকে মধুও বেপরোয়া, সুদৃঢ়, কৃতসঙ্কল্প। তার জীবনেরই ব্রত যে অভিনয়ের মাধ্যমে দশজনের সামনে নতুন প্রতিভাকে সে তুলে ধরবে—সেই গতানুগতিকতার সঙ্গে আপোষ করা মধুর স্বভাববিরুদ্ধ, নতুনত্বের সঙ্গে হাত মেলাতে মধুর অসীম আগ্রহ। নবীনতা মধুর উপাস্য, মধুর পূজ্য, মধুর বন্দনীয়। যাঁরা অভিনয় করে যাচ্ছেন চিরকাল বাজার মাতিয়ে তাঁরাই থাকবেন এ নীতি মধুর কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য, অবশ্য প্রবীণ শিল্পীদের যথোপযুক্ত সম্মান দিতে সে নারাজ কখনই নয় এবং তাঁদের প্রতিভার দ্বারা নাট্যজগতকে আরও কতখানি উন্নত, আলোকিত ও সমৃদ্ধ করা যায় এও তার বিশেষ চিন্তনীয় কিন্তু তাঁরা আছেন বলে যে নতুনরা আসতে পারবে না—এইখানেই মধু আপোষ করতে পারল না, সেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে রইল আলিবাবার ছায়াচিত্ররূপ সে দেবেই আর ঐ শিল্পী নিয়েই তা সে যতদিন বাদেই হোক, যার প্রযোজনাতেই হোক, যেমন করেই হোক। নিষ্ঠা, ধৈর্য আর আন্তরিকতা কখনও ব্যর্থতা বরণ করে না, বাধাবিপত্তির সঙ্গে সংগ্রাম তাদের করতে হয় ঠিকই কিন্তু শেষ অবধি বিজয়লক্ষ্মীর জয়মাল্য তাদেরই ভাগ্যে জোটে এ কথা সর্ববাদিসম্মত সত্য। এ সত্য চিরকালের সত্য, শাশ্বত সত্য অক্ষয় সত্য। কোন প্রযোজকই তো রাজী হলেন না আর্থিক দিকটার বিষয় চিন্তা করে, শেষ অবধি এলেন একজন। এলেন বাঙলাদেশের একজন খ্যাতনামা চিত্র প্রযোজক। এলেন ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের শ্রীবাবুলাল চোখানী। সম্মত হলেন তিনি মধুর প্রস্তাবে। বললেন ঠিক আছে, তাই হবে। অর্থাৎ সি-এ-পির সদস্যরাই আলিবাবার চিত্রায়ণে ভূমিকাগ্রহণ করবে যে বিষয়কে কেন্দ্র করে এত বাধার সৃষ্টি হচ্ছিল সেই বাধার হ'ল শান্তিপূর্ণ অবসান। ১৯৩৬ সালে এই ঘটনা ঘটে।

অনেকগুলো বছর বয়ে যায় জীবনের উপর দিয়ে। জীবন গতিশীল। সে তো থামতে জানে না। বছর মধ্যে দিয়ে চলাতেই তার আনন্দ। এই অনেকগুলোর মধ্যেই এমন কয়েকটির সন্ধান মেলে যারা চিরাচরিত ভাবে মহাকালের অঙ্কে আত্মসমর্পণ করে না। জীবনে এমন কতকগুলো বছর দেখা দেয় যারা শেষদিন পর্যন্ত মালিন্যহীন দীপ্তিতে স্মৃতির মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকে। ১৯৩৬ সাল আমার জীবনে সেইরকমই একটি বছর। যে চলচ্চিত্রের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্বন্ধ তার সূচনা হল ১৯৩৬ সালে। চোখের সামনে একটা নতুন পথের সন্ধান পেলুম। একটি বন্ধদ্বারের অর্গল যেন খুলে গেল আমার সামনে। জীবনের উপর যেন একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল উন্মত্ত বাতাসের সেই দমকের মধ্যে থেকে কে যেন বলে গেল ওঠো, জাগো, নতুন এসেছে দুয়ারে, তাকে বরণ কর। আমি আচ্ছন্ন হয়ে গেলুম, নতুনত্বের পুলকস্পর্শের মধ্যে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললুম, মনে হল নিজেকে ছড়িয়ে দিই আকাশে বাতাসে স্থাবরে জঙ্গমে মিলিয়ে দিই অসীমের মহানীলে মিশিয়ে দিই পৃথিবীর বিপুল বিস্তৃতিতে। সীমিত গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে যেন আর আটকে রাখা যাচ্ছে না।

চলচ্চিত্রে আমার প্রথম অবতরণ মর্জিনার ভূমিকাতেই। আগেই বলেছি, ১৯৩৬ সালে। বাংলাদেশের চিত্রামোদী দর্শক

সাধারণকে সর্বপ্রথম অভিবাদন জানাবার সুযোগ পেলুম ক্রীতদাসী মর্জিনার মত একটি অত্যন্ত কঠিন চরিত্রের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, সেদিন এই আশাতীত সৌভাগ্যলাভে যে অকল্পনীয় উত্তেজনা আর শিহরণের স্পর্শ পেয়েছিলুম তা অনুভবই করা যায়, লেখনীর সাহায্যে তা বোঝানো যায় না, বর্ণনা করা যায় না, প্রকাশ করা যায় না।

[ ক্রমশঃ।

অনুবাদক—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

## লালু-ভুলু

জীবনে দুঃখ আছে বলে নীরবে ভাগ্যের উপর দোষারোপ করে তাকে বরণ করে নেওয়াই শেষ কথা নয়—যে তা করে নেয় সে সহানুভূতি পেতে পারে, তবে পাবে না শ্রদ্ধা, পাবে না অভিনন্দন, পাবে না সাধুবাদ—প্রশংসা-সাধুবাদ-অভিনন্দন পাবার যোগ্য ব্যক্তি সেই যে দুঃখবরণের মধ্যে দিয়েই দুঃখজয়ের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। এই রকম একটি নয়, দু'টি কিশোরের কাহিনী নিয়েই লালু-ভুলুর গল্পাংশ গড়ে উঠেছে।

লালু আর ভুলু দু'টি কিশোর। তারা নিরাশ্রয়। তারা পিতৃ-মাতৃহীন। তারা অনাথ। লালু খোঁড়া, ভুলু অন্ধ। শহরের ফুটপাথে তাদের সাক্ষাৎ, পরে আলাপ, তারপরে ঘনিষ্ঠতা। দুই হতভাগ্যের হল মিলন, জীবনের সূচনা এদের হয়েছিল কত অজস্র আশা, উদ্দীপনা, কল্পনার মধ্যে, কিন্তু সব যেন কোথায় ভেস্তে গেল—নামতে হল পথে, পিছনে এতটুকু কারও দরদ নেই, মমতা নেই, করুণা নেই—এই বিশাল পথে নিজের পায়ের উপর ভর দিয়েই হেঁটে যেতে হবে, পাওয়া যাবে না এতটুকু সাহায্য, এতটুকু সহানুভূতি, এতটুকু অনুপ্রেরণা। একজন পায় না চোখে দেখতে, একজনকে হাঁটতে হয় ক্রাচের উপর ভর দিয়ে—এ-হেন অবস্থার মধ্যেই পরস্পর পরস্পরের হাতে হাত রাখল। দুজনেই জানল যে পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনও আছে যে তাদের জন্যে ভাববে, চিন্তা করবে, অন্তরে পোষণ করবে ভালোবাসা। ভুলু দরদ দিয়ে গান গায় আর মাউথ অর্গ্যান বাজিয়ে সেই গান আরও মধুর করে তোলে লালু, এমনি ভাবে কাটতে থাকে ওদের জীবন। ভুলুর জেদ চাপল লালুকে স্কুলে পড়তে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, মানুষের দাবী নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে। ভর্তি হলও লালু স্কুলে। ফুটপাথ থেকে দু'জনে উঠে আসে বস্তীতে, সেখানে খুঁজে পায় এক স্নেহময়ী মাসীমাকে। স্কুলের পণ্ডিত মশাইয়ের বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়ে ওঠে লালু। পণ্ডিত মশাই দেখলেন, লালুর মত ছেলের বস্তিতে বাস করা মোটেই শোভনীয় নয়, বস্তীর আবহাওয়া, পরিবেশ, প্রভাব সর্বতোভাবেই পরিহার্য। সকল দিক দিয়েই বস্তীজীবন লালুর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। লালুকে তিনি নিয়ে এলেন নিজের বাড়ীতে। তাকে তো আনলেন কিন্তু ভেবেও দেখলেন না যে তার বিচ্ছেদ ভুলুর মনে কি প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করবে—যা হবার তাই হয়। লালুর বিচ্ছেদ ভুলুর কাছে হয়ে ওঠে অসহনীয়, দুটি বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল, লালুর মঙ্গলচিন্তা করতে গিয়ে বন্ধুসত্তায় পরম আঘাত হানলেন পণ্ডিতমশাই। অসুস্থ হয়ে ভুলু। পরে জানতে পারে যে টাকার অভাবে স্কুল ফাইন্যাল প দিতে পারছে না লালু। ভুলু বেরিয়ে পড়ে অর্থোপার্জনে। লালুকে জানতে দেয় না। তার সৎ-আন্তরিক এবং মহৎ প্রচেষ্টা ফলবতী টাকা জোগাড় করতে সে সমর্থ হয়, গোপনে স্কুলের সেক্রেটারীর সে টাকা ভুলু জমা দিয়ে আসে। পরীক্ষা হয়ে গেল, তার বেরোল যথাকালে। দেখা গেল, লালু প্রথম স্থান অধিকার করে স্কুলের সেক্রেটারীর কাছে লালু জানতে পারে আসল ব্যাপার তার পরীক্ষার জন্যে ভুলুর অর্থদান। হাসপাতালে দুই ব মিলন ঘটে।

কাহিনী রচনা করেছেন বাণভট্ট! অগ্রদূত পরিচালিত ছবি প্রধান অংশে অভিনয় করেছেন শ্রীমান্ সুখেন ও নবাগত পরেশ অন্যান্য অংশে অভিনয় করেছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির বট গঙ্গাপদ বসু, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শ্রীকণ্ঠ গুপ্ত, সুশীল চক্রবর্তী, সমরকু শ্রীমান সুভাষ, শোভা সেন, কাজল চট্টোপাধ্যায়, কমলা মুখোপা গীতা দে, সুব্রতা সেন, কমলা অধিকারী, সীমা দত্ত প্রভৃতি।

## জন্মান্তর

প্রেমের মৃত্যু নেই। তার ক্ষয় নেই, লয় নেই, বিনাশ জন্ম-জন্মান্তরের প্রাচীর সে অনায়াসে অতিক্রম করে আসে তার আ মহিমান্বিত রূপ নিয়ে। যে কোন পরিবেশে তার প্রকাশ ঘটবে আর এইখানেই স্বীকার করতে হয় জন্মান্তরবাদ—স্বীকার করতে পৃথিবীতে নতুন দেহ নিয়ে আত্মার পুনরাবির্ভাবের কাহি অলীক নয়, স্বীকার করতে হয় যে, মরজগত থেকে বিদায় নেও সময় কোন কামনা-বাসনা অপূর্ণ থেকে গেলে পুনর্জন্ম নিয়ে আ এই পৃথিবীতেই ফিরে আসতে হয় কেবলমাত্র নতুন রূপ নিয়ে— বহু দিনের অতি সত্য কথাটিকে।

প্রৌঢ় শিল্পী আশীষের ঘরে নানান ভঙ্গীতে নিজের অসংখ্য দেখে অবাক হয়ে গেল তরুণী মিনতি। আবার মিনতিকে তার চেয়েও চতুর্গুণ হতবাক হয়ে গেল আশীষের পুরোনো চা নিধু—যার হাতে ছেলেবেলা থেকে সে মানুষ হয়েছে। মিনতি কূল-কিনারা পায় না, এ কেমন করে সম্ভব? মিনতির সঙ্গে হয় আশীষের। আশীষও হতবাক হয়ে যায়, কি করে তা হয়— যে বিশ বছর আগের কথা। মিনতির পেড়াপেড়িতে সে ব আরম্ভ করে বিশ বছর আগেকার একটি কাহিনী।

ঘটনাচক্রে তরুণ শিল্পী আশীষের সঙ্গে পরিচয় হল এক তরুণী তার নাম করবী। তাকে না জানিয়েই তার একটি ছবি আঁ চুপি-চুপি এঁকে ফেলেছিল, সেই ছবি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়ে প্র পুরস্কার লাভ করে ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। করবীর বাড়ী এই নিয়ে এক তিক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়—সে-ও খবরের কাগ আপিস থেকে আশীষের ঠিকানা সংগ্রহ করে তার বাড়ী যায়, তা জেরা করার জন্যে। কি অধিকারে তার বিনা অনুমতিতে ছবি সে আঁকে এবং প্রকাশ করে, এমনি ভাবেই জীবনে ওদের প্র পরিচয়—তার পরই ধীরে ধীরে সেই পরিচয় গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠতা

## চাউলের মূল্য

"চাউলের মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যাপারে সরকারী অকর্ম্মণ্যতা বস্তুত: পক্ষে সরকারের মুনাফাখোরী নিরোধ প্রচেষ্টার দুর্ব্বলতা ভালভাবেই প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতায় পাইকারী ব্যবসায়ীদের বড় অংশ সরকারের সহিত অসহযোগিতা করিতেছেন। যে সব চাউল কল হইতে কলিকাতায় চাউলের সরবরাহ আসে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৬১, কিন্তু এই ৬১টি চাউল কলের মধ্যে মাত্র ৬টিতে কাজ চলিতেছে। খুচরা দোকান সমূহে চাউলের প্রচণ্ড অভাব। ন্যায্য মূল্যের দোকান সমূহে চাউলের পরিমাণ ক্রেতাদের জন্য কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মফঃস্বলের এবং কলিকাতাতেও কোন কোন দোকানে চাউল ঠিক মত পাওয়া যাইতেছে না। প্রফুল্ল সেন মহাশয়ের মতে কিন্তু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার কোন কারণ নাই। তিনি উড়িষ্যার চাউল দিয়া সমস্যার সমাধান করিয়া দিবার আশ্বাস দিয়াছেন, বীরভূমের চাউলকলগুলিও আগামী সপ্তাহ হইতে সপ্তাহে ৫০,০০০ মণ করিয়া ভাল চাউল কলিকাতার জন্য পাঠাইতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া সেন মহাশয় জানাইয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সময় মত উপযুক্ত পরিমাণ চাউল বাঙ্গলাদেশের জেলাগুলি হইতে সংগ্রহ করেন নাই কেন, তাহা জানান নাই। মূল্য নির্দ্ধারণ ব্যবস্থার সুরুতেই যে সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং সেই সমস্যা মিটাইতে হইলে সরকারী উদ্যোগে চাউল সংগ্রহ করা দরকার—একথা কি তিনি জানিতেন না? না, তাহাতে চাউল ব্যবসায়ী মহল ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হইতে পারে বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে পথে অগ্রসর হন নাই?"

—দৈনিক বসুমতী।

## পরীক্ষায় অসাধুতা

"জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিবিধ প্রকারের দুর্নীতির সম্বন্ধে যে অসংখ্য অভিযোগ শুনা যায়, তাহার একটি ক্ষুদ্র অংশ সত্য হইলেও, দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনেই গভীর উদ্বেগের সঞ্চার না হইয়া পারে না। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ আশাস্থল ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তারের কথা শুনিলে তাহা বিশেষ বেদনাদায়কও হইয়া পড়ে। ১৯৫৮ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বনকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যার সংবাদ মনে রাখিয়াই আমরা কথাগুলি বলিতেছি। প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে ১৯৫৮ সালের স্কুল ফ্যাইনাল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ মোট ৩৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ১৮০ জনের অপরাধ গুরুতর বলিয়া তাহাদের পরীক্ষাই বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অধিকতর দুঃখ ও লজ্জার বিষয় এই যে, শাস্তিপ্রাপ্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন ছাত্রীও আছে। কোন কোন কেন্দ্র আবার এ বিষয়ে বেশী গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। যেমন কাঁচড়াপাড়ার একটি কেন্দ্রেই ৫৮ জন এবং ব্যারাকপুরের একটি কেন্দ্রেই ২০ জন পরীক্ষার্থী দুর্নীতির অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হইয়াছে। এই ব্যাপারের আর একটি বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, উল্লিখিত ৩৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৬৮ জনই প্রাইভেট পরীক্ষার্থী। ছাত্রদের মধ্যে দুর্নীতির বিস্তার সমাজের ভবিষ্যতের পক্ষে যে অত্যন্ত অশুভ তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শিক্ষায়তনগুলির সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই দুঃখের সহিত ইহা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন যে, এই প্রকারের দুর্নীতি পূর্ব্বের তুলনায় বাড়িয়াই চলিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যবিবরণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন পরীক্ষাতেও দুর্নীতি বিরল নহে। শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকবর্গের সম্মিলিত চেষ্টার সঙ্গে ছাত্র সমাজের সক্রিয় নৈতিক বুদ্ধির সহযোগিতা না থাকিলে এই দুঃখদায়ক পরিস্থিতির অবসান ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না।"

—যুগান্তর।

## কলিকাতায় ভূয়া রেশন কার্ড

"কলিকাতায় এক লক্ষের উপর ভূয়া রেশন কার্ড ধরা পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া এমন অনেক রেশন কার্ডও আছে, যাঁহাতে লিখিত নামের লোক তদন্তের সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই সব ক্ষেত্রে নাকি আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা মুস্কিল এবং সেজন্য কেবল রেশন কার্ডগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। আমাদের যতদূর বিশ্বাস, রেশন কার্ডে এই সকল কারচুপি জালিয়াতির পর্য্যায়ে পড়ে। জালিয়াতির শাস্তি বিধান করা যায়, এমন আইন দেশে নাই, এই কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যাহারা লোকচক্ষুর গোচরে থাকিয়া রেশন কার্ডে অস্তিত্বহীন লোকের নাম দেয়, তাহাদিগকে ধরা খুবই সহজ। কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল কার্ডের খোদ মালিকেরই সন্ধান পান না, তাহাদের বা তাহাদের প্রতিনিধিদের সন্ধান লাভও যেমন দুরূহ বলিয়া মনে হয় না। যাহারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া ভূয়া রেশন কার্ডের চাউল ও গম লইয়াছে, রেশনের দোকানের মালিকেরা তাহাদের নাম সাকিন সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও অবগত নহেন, এই কথা নিতান্তই অবিশ্বাস্য এবং অশ্রদ্ধেয়।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## চাউলের ব্যবসা

"ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন, ধান-চাউলের ষ্টেট ট্রেডিং বা সরকারী ব্যবসা আরম্ভ করিবেন। লোকে সোস্যালিজম চায়, সোস্যালিজম আসিলে সকল অত্যাচার ও শোষণের অবসান ঘটিবে, ইহা বিশ্বাস করে। সোস্যালিজমের অনেক রূপ আছে। যে ধরণের সোস্যালিজম এখন চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা হইতেছে সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা দেশ শাসন। কংগ্রেস এবং কম্যুনিষ্ট দুজনেই এই সোস্যালিজম চায়। কারণ, এরা দুজনেই গভর্ণমেণ্ট হাতে পাইয়াছে এবং কম্যুনিষ্টরা আরও পাইবার আশা রাখে। এই সোস্যালিজমে দুই দলেরই লাভ। ধান-চাউলের ষ্টেট ট্রেডিং এই সোস্যালিজমেরই অন্তর্ভুক্ত, রেশন আমলের ধান-চাউলের জবরদস্তি প্রোকিউরমেণ্ট ইহারই অগ্রদূত ছিল। গভর্ণমেণ্টের যদি সত্যই শোষণ ও চোরা-কারবার নিবারণের উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা চাউলের ষ্টেট ট্রেডিং বিষয়ে এই ব্যবস্থা করিতেন যে, সরকারী এজেণ্ট একটি নির্দ্দিষ্ট দামে ধান বা চাউল কিনিবে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট দামে উহা বেচিবে। খোলাবাজারে ধানের দর পড়িয়া গেলে চাষীরা উহার কাছে গিয়া ধান বেচিবে, বাজার দর চড়িয়া গেলে সেখান হইতে

## ফরাক্কা ব্যারাজ চাই

"পশ্চিমবঙ্গে ফরাক্কা ব্যারাজের দাবীতে আইন সভায় এক সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বিরোধী দল নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এই মর্মের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পুর্ব্ব-ভারতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। ফরাক্কা ব্যারাজ শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের খণ্ডিত জেলাগুলির সহিত যোগাযোগের জন্যই প্রয়োজন নয়—সমগ্র চা উৎপাদন এর এলাকার সহিত বিদেশে চা রপ্তানীর বন্দরগুলির সরাসরি যোগ সাধিত হইবে এবং ইহা ছাড়াও কলিকাতা বন্দর এই পরিকল্পনার দ্বারা ধ্বংসের সম্ভাবনার হাত হইতে বাঁচিবে। মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলাগুলিতে সেচ ব্যবস্থার প্রভূত সুবিধা হইবে। (এই প্রসঙ্গে বেদনার সহিত স্মরণ করিতে হয় মালদহ কোন সেচ পরিকল্পনার আওতাতেই পড়ে নাই)। এখন বাধা আসিতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসি নীতিতে কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী শ্রীপাতিল সুকৌশলে ইহা আদৌ তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া গিয়াছেন; তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—এই সম্পর্কে বিশদ সংবাদ সংগ্রহ করিতে আরো দুই বৎসর লাগিয়া যাইবে।" —উদয়ন (মালদহ)।

## ফসল সমস্যা

"রাজ্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের খেয়াল ও মেজাজ মাফিক কার্য্যকলাপের ফলে কি ভাবে ব্যাহত হয়, তাহার প্রমাণ এতো আছে যে বলিয়া শেষ করা যায় না। কৃষকদের ঋণের প্রয়োজন' সরকার টাকা বরাদ্দ করিলেন। জেলায়, মহকুমায় টাকা আসিল কিন্তু যাহার হাতে ঋণের টাকা বিলি করিবার ভার ন্যস্ত তিনি আর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কৃষকদের টাকা দিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ফলে কৃষকই ক্ষতিগ্রস্ত হইল, ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটিল। চাষাবাদ শেষ হইবার পর বলদ ক্রয় ঋণ দিবার ফুরসৎ হইল। আলু চাষের জন্য সার ঋণ বরাদ্দ হইয়াছে। আলু বসানো শেষ হইয়াছে কিন্তু এখনো ঐ বাবদ ঋণ দেওয়া হয় নাই। হয়ত আলু ওঠাইবার সময় চাষীকে ডাকা হইবে ঋণ গ্রহণের জন্য। অর্থাৎ চাষীর উৎসাহ, সরকারী উদ্যম দুই-ই ব্যর্থ হইল।"

—বর্দ্ধমানবাণী।

## চিন্তার বিষয়

"অগ্রহায়ণে ধানকাটার সময় দেখা গেল যে, প্রত্যাশিত ফসলের সিকি অংশও উৎপন্ন হয় নাই। ধান গাছের ২।৪টি ডাঁটার শীষগুলি মাত্র রহিয়াছে ও তাহাতে ছোট ছোট ধান্য-শীষ, তাহার অধিকাংশ অপুষ্ট। ফলে বিঘা-প্রতি ফলন গড়ে ৩।৪ মণ পর্য্যন্ত। লোকে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে ইহাতে গত দুই বৎসরের ঋণ ধার শোধ ও জমির খাজনা দিয়া হাতে যে কিছুই থাকিবে না। সম্বৎসর কি খাইয়া বাঁচিবে, অন্যান্য খরচ পত্রই বা চলিবে কিরূপে। লোকে ভাবী দুর্দ্দিনের দুশ্চিন্তায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখনও অনেকের শস্য গৃহজাত হয় নাই। যখন লোকে প্রত্যক্ষভাবে নিজ নিজ অবস্থার সম্মুখীন হইবে তখন হতাশায় তাহাদের চিত্ত আরও বিকল হইয়া পড়িবে। এইরূপে প্রতিবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া লোকে যে কিরূপে বাঁচিবে তাহা চিন্তা করিলে দুশ্চিন্তায় স্তব্ধ হইতে হয়। জমিদারী বিলোপের পর অনেক জোতদার নিজ নিজ স্বত্ব জমি ভাগ বিলি রহিত করিয়া স্বহস্তে আবাদ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপে পর পর আবাদের ত্রুটির জন্য তাঁহারা চাষেরই ব্যয় বহন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের লোকসানের সীমা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে এই সব মধ্যবিত্তের বাঁচিয়া থাকার প্রশ্ন জটিল বরং যাহারা কায়-ক্লেশে শ্রম দ্বারা আবাদাদির কাজ করে তাহারা বরং এইরূপ লোকসানের সম্মুখীন হইয়া এবং নগদ অর্থ লোকসান না করিয়া অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সকল শ্রেণী লোকের এই জাতীয় নিরর্থক ব্যয় হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি তাহাই এখন চিন্তার বিষয়!" —নারায়ণ (কাঁথি)

## ভেজাল চাল

"গতকল্য কলিকাতায় এক সংবাদে প্রকাশ, শোভাবাজারে এক চাউলের গুদামে চাউলে কাঁকর মিশ্রণের সময় পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-সেবা সমিতির কতিপয় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক তাহাদের হাতে-নাতে ধরিয়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়া আসামীদের পুলিশের হস্তে সমর্পণ করেন। ভেজাল নিরোধ আন্দোলন জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা না থাকিলে উহা কখনই সম্ভব হইবে না। সেই হেতু আমাদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার এক আইন বলে এই সমস্ত বে-সরকারী সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরূপ আন্দোলনে উৎসাহিত ও তাহাদের অনুমোদন করিলে এই আন্দোলন সফল হইবে বলিয়া বিশ্বাস। যেমন পল্লী-রক্ষী বাহিনীগুলিকে সরকার অনুমোদন করিয়া চুরি ডাকাতি দমনে আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন, সেই ভাবে উক্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন করিলে, উহারা এই কার্যে সবিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে এবং এই সব ক্ষেত্রে সরকারী ও পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য কার্য্যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হইবে। নতুবা এই পরিবর্ত্তনে ভেজালকারীদের বধ করা যাইবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

—বর্ত্তমান ভারত (হুগলী)।

## অথ হাসপাতাল কথা

"বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালের বিবিধ ব্যবস্থা ও কুব্যবস্থা কথা অনেক বলা হয়েছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন বড় রকমের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের টনক নড়ে নি—আর পাবলিক কোন সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নাই। এই আধি অনটনের যুগে হাসপাতাল ছাড়া পাবলিকের আর গতি নাই। সুতরাং সব অন্যায়-অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করাই জীবনের ধর্ম্ম, অন্তর বেঁচে থাকার তাগিদে। বিজয়চাঁদ হাসপাতাল সম্পর্কে এ সার কথা প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন, মনে হয়। স্বামীজী বলিয়াছেন—"মনে রেখো, আমরা জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।" আজ আমরা বলছি—"বন্ধুগণ, মনে রেখো আমরা জন্ম হতে হাসপাতালের জন্য বলি প্রদত্ত। আমাদের রক্ষা করবার কেউ নেই।"

—বর্দ্ধমানের ডাক

## টীকাদার নাই

"শীত জাঁকিয়া বসিতে না বসিতেই আবার বসন্তের বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। শীতের আর তেমন প্রকোপ নাই। এক

...ত্র বসন্ত রোগের আবির্ভাব হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কাজেই ...দের সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া ও টীকাদি লওয়া বাঞ্ছনীয়। ...বিপদ হইয়াছে এই যে, সহরে যদিও টীকাদারদের দেখা পাওয়া ...তেছে, মফঃস্বলে ইহাদের পাত্তা মিলিতেছে না। ইতিপূর্বে প্রতি ...নায় জেলা বোর্ডের স্যানিটারী ইনস্পেক্টারের অধীনে কতকগুলি ...য়ী টীকাদার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এই কাজ করিতেন। কিন্তু ...বার জেলাবোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগ সরকারী তত্ত্বাবধানে যাওয়ার সঙ্গে ...সে ঐ সব অস্থায়ী টীকাদারদের চাকুরী গিয়াছে। ফলে স্যানিটারী ইনস্পেক্টরগণ একাই তাঁহাদের স্থায়ী দুই একজন সহকর্মীকে লইয়া ...কি আর করিবেন? মহামারীর অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা ...নেন মহামারী লাগিলেই সরকারের টনক নড়িবে। তখন ...লোকজনের অভাব হইবে না। কিন্তু রোগ হইলে চিকিৎসা করানো ...অপেক্ষা রোগ না হইতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত নহে কি?"

—প্রদীপ (তমলুক)।

## শক্তিপূজা বনাম বাংলার যুবশক্তি

"শ্যামাপূজা—যাহার অপর এক নাম শক্তিপূজা, তাহা হইয়া ...গেল নেহাৎ শক্তিহীনদের হাতে; কারণ—শক্তি উপাসক যুবকদের পূজামণ্ডপে কোন শক্তিরই পরিচয় পাওয়া গেল না, কেবলমাত্র স্থানে স্থানে মাইক যন্ত্রে আওয়াজ শোনা গেল (ইহা সঙ্গীত কিনা বোঝা গেল না) "লিখে নেবে গো—ও নুড়ী পাথর।" অথবা, "চিড়িয়াখানার ...রং..." ইত্যাদি। মোট কথা শ্যামাপূজা কি বস্তু তাহা ...বুঝিবার প্রয়োজন নাই। মাইকের সামনে কে কত ...সুরে নানাপ্রকারের গান করিতে পারিবে, তাহারই প্রয়োজন ...বেশী। মায়ের পূজায় অমুক দ্রব্য আসে নাই ক্ষতি কি? ...চাই-ই। তাঁহার বিস্কাভাড়া, চা, জলখাবার ...কি হয়? মায়ের বস্ত্রের আবার প্রয়োজন কি? উক্ত ...তাঁহার চাইতে গায়িকা সাবিত্রী যুথাৎকে ...দিবে। তাই পূজামণ্ডপ ঘিরিয়া শুধু ...গান—হাসি আর ভালবাসা। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ ...স্থানে স্থানে ওই "নুড়ী পাথরের" সাথে সাথেই তাল দিয়েছেন। আর মনে ভাবিতেছেন—তিনি যদি গায়ক হইতেন।

আমাদের দেশে শ্যামাসঙ্গীতের অভাব নাই। কিন্তু কোন গায়কই তাহা গাহিলেন না। কেবল মাত্র সিনেমা ও রেকর্ডের ...সুরে তাঁহারা এক মোহজাল সৃষ্টি করিয়া বাংলার যুবশক্তিকে মাতাইয়া তুলিলেন। কেহ গাহিলেন না—

"শ্যামা আমার নীরব কেন মা
প্রাণভরা বিষাদে।"

—বনশ্রী হিতৈষী।

## নূতন রক্ত

"প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশনে, সুসজ্জিত মণ্ডপের নীচে বসিয়া কংগ্রেসের বড়-কর্তারা দেশের দুঃখে বিগলিত হৃদয় হইয়া ...ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার বাণী শুনাইয়া থাকেন। এ বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আসামের নগরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৪তম অধিবেশনে নেতারা পূর্ববৎ আশ্বাস দিয়াছেন। ৬ই জানুয়ারী, প্রথম দিনের অধিবেশনে, কংগ্রেসের জন্য নূতন আদর্শবাদের কথা বলা হয়। আভাদী কংগ্রেসে বলা হইয়াছিল যে, নূতন নূতন সমস্যার সমাধানের জন্য নূতন, বলিষ্ঠ আদর্শবাদ চাই। নেহেরু সেই অভাব পূরণ করিলেন—দিলেন দেশকে "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ"। কিন্তু জনসাধারণ না বুঝিল তাহার মর্মার্থ, না অনুভব করিল অন্তর দিয়া সে নবজীবনের প্রবাহ। অতএব নেতাদের পকেটে এবং মুখেই রহিয়া গেল "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ"। ইতিমধ্যে দারিদ্র্য, বেকারত্ব আরও বাড়িয়াছে, ওদিকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সত্ত্বেও তৃতীয় আশ্বাস দিতে হইতেছে। সুতরাং দরিদ্র ভারতবাসীর পকেট কাটিয়া আরও ট্যাক্স আদায় করিতে হইবে। কিন্তু দুই-চারিটা আশা ও আশ্বাস না দিলে জনসাধারণ "গোসা" করিবে যে! তাই নেতারা আবার এক নূতন আদর্শের অর্থাৎ ধাপ্পার সন্ধানে মাথা ঘামাইতেছেন?"

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

## রকেট ও বলদ

"বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতায় আছে:

'গ্রহ গ্রহান্তে উড়িবার তরে,
রচিতেছে পাখা, হের স্বপন;
গরুর গাড়ীতে চড়িয়া আমরা,
চষ্ছি শ্মশানে কোটি যোজন।'

আজ একই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যখন ছবি ...কমিউনিষ্ট পার্টির ...উপলক্ষে ...রাশিয়া কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত রকেট পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে চন্দ্রলোক পার হয়ে মানুষের সৃষ্ট এক নতুন গ্রহের সৃষ্টি করে সূর্যকে ঘিরে প্রদক্ষিণ। আজ মানুষের পক্ষে গ্রহান্তরে যাওয়ার চিন্তা আর সুদূর নয়। আর তারই পাশে ...যখন দেখা যায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৪তম অধিবেশন উপলক্ষে কংগ্রেসের সভাপতি ৫৭ জোড়া বলদবাহী রথে আরোহণ করে বিরাট মিছিল সহকারে চলেছেন—অধিবেশনে যোগদান করতে, তখন বিদ্রোহী কবির উপরোক্ত পংক্তির যথার্থ উপলব্ধি করা যায়।"

—নিশান (বর্ধমান)।

## ডাকের চিঠির নিরাপত্তা

"৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবারের যুগান্তর বেশ প্রামাণ্যভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন—চিঠি সময়ে বাক্সে ফেলিলেই যে প্রাপকের হাতে পৌঁছিবে ইহা যেন কেহ না মনে করেন। সহ চিঠির আলোকচিত্রসহ নর্দমার ধারে গঙ্গার ঘাটে নর্দমায় প্রবাহিত নাম কুড়াইয়া রিপোর্টার সকলের ভুল ধারণা দূর করিয়াছেন। পোষ্টাফিসের বাবুদের কর্তব্যজ্ঞান থাকিলেই হইবে না। যে চিঠির বাক্সে চিঠি দিলেন, যে বিলাতার হাতে সেই বাক্স খুলিয়া তাহা ডাকঘরের মোহরযুক্ত হইয়া ডাক ব্যাগে দিয়া ঠিকানায় পৌঁছিবে ইহার মধ্যে কত ফাঁড়া আছে কে বলিবে! ৬ই জানুয়ারী ১৯৫৯ মঙ্গলবারের যুগান্তর দেখিলেই কত গুপ্ত চিঠি, কত শোক-সংবাদ, কত প্রেমপত্র, কত মূল্যবান পত্র যে যেখানে সেখানে লেখক-লেখিকার সর্বনাশ ও প্রাপকের সাংঘাতিক ক্ষতি প্রদান করিবে তাহা কে বলিবে? সংবাদপত্রে যা

## ফরাক্কা ব্যারাজ চাই

"পশ্চিমবঙ্গে ফরাক্কা ব্যারাজের দাবীতে আইন সভায় এক সর্ব্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বিরোধী দল নেতা শ্রীজ্যোতি বসু এই মর্মের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পূর্ব্ব-ভারতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। ফরাক্কা ব্যারাজ শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের খণ্ডিত জেলাগুলির সহিত যোগাযোগের জন্যই প্রয়োজন নয়—সমগ্র চা উৎপাদন এর এলাকার সহিত বিদেশে চা রপ্তানীর বন্দরগুলির সরাসরি যোগ সাধিত হইবে এবং ইহা ছাড়াও কলিকাতা বন্দর এই পরিকল্পনার দ্বারা ধ্বংসের সম্ভাবনার হাত হইতে বাঁচিবে। মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি জেলাগুলিতে সেচ ব্যবস্থার প্রভূত সুবিধা হইবে। (এই প্রসঙ্গে বেদনার সহিত স্মরণ করিতে হয় মালদহ কোন সেচ পরিকল্পনার আওতাতেই পড়ে নাই)। এখন বাধা আসিতেছে কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসি নীতিতে কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী শ্রীপাতিল সুকৌশলে ইহা আদৌ তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হইবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া গিয়াছেন; তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—এই সম্পর্কে বিশদ সংবাদ সংগ্রহ করিতে আরো দুই বৎসর লাগিয়া যাইবে।" —উদয়ন (মালদহ)।

## ফসল সমস্যা

"রাজ্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের খেয়াল ও মেজাজ মাফিক কার্য্যকলাপের ফলে কি ভাবে ব্যাহত হয়, তাহার প্রমাণ এতো আছে যে বলিয়া শেষ করা যায় না। কৃষকদের ঋণের প্রয়োজন' সরকার টাকা বরাদ্দ করিলেন। জেলায়, মহকুমায় টাকা আসিল কিন্তু যাহার হাতে ঋণের টাকা বিলি করিবার ভার তত্ত্ব তিনি আর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কৃষকদের টাকা দিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ফলে কৃষকই ক্ষতিগ্রস্ত হইল, ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটিল। চাষাবাদ শেষ হইবার পর বলদ ক্রয় ঋণ দিবার ফুরসৎ হইল। আলু চাষের জন্য সার ঋণ বরাদ্দ হইয়াছে। আলু বসানো শেষ হইয়াছে কিন্তু এখনো ঐ বাবদ ঋণ দেওয়া হয় নাই। হয়ত আলু ওঠাইবার সময় চাষীকে ডাকা হইবে ঋণ গ্রহণের জন্য। অর্থাৎ চাষীর উৎসাহ, সরকারী উদ্যম দুই-ই ব্যর্থ হইল।"

—বর্দ্ধমানবাণী।

## চিন্তার বিষয়

"অগ্রহায়ণে ধানকাটার সময় দেখা গেল যে, প্রত্যাশিত ফসলের সিকি অংশও উৎপন্ন হয় নাই। ধান গাছের ২।৪টি ডাঁটার শীষগুলি মাত্র রহিয়াছে ও তাহাতে ছোট ছোট ধান্য-শীষ, তাহার অধিকাংশ অপুষ্ট। ফলে বিঘা-প্রতি ফলন গড়ে ৩।৪ মণ পর্য্যন্ত। লোকে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছে ইহাতে গত দুই বৎসরের ঋণ ধার শোধ ও জমির খাজনা দিয়া হাতে যে কিছুই থাকিবে না। সম্বৎসর কি খাইয়া বাঁচিবে, অন্যান্য খরচ পত্রই বা চলিবে কিরূপে। লোকে ভাবী দুর্দ্দিনের দুশ্চিন্তায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখনও অনেকের শস্য গৃহজাত হয় নাই। যখন লোকে প্রত্যক্ষভাবে নিজ নিজ অবস্থার সম্মুখীন হইবে তখন হতাশায় তাহাদের চিত্ত আরও বিকল হইয়া পড়িবে। এইরূপে প্রতিবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া লোকে যে কিরূপে বাঁচিবে তাহা চিন্তা করিলে দুশ্চিন্তায় স্তব্ধ হইতে হয়। জমিদারী বিলোপের পর অনেক জোতদার নিজ নিজ খাস জমি ভাগ বিলি রহিত করিয়া স্বহস্তে আবাদ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইরূপে পর পর আবাদের ত্রুটির জন্য তাঁহারা চাষেরই ব্যয় বহন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদের লোকসানের সীমা নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে এই সব মধ্যবিত্তের বাঁচিয়া থাকার প্রশ্ন জটিল। বরং যাহারা কায়-ক্লেশে শ্রম দ্বারা আবাদাদির কাজ করে তাহারা বরং এইরূপ লোকসানের সম্মুখীন হইয়া এবং নগদ অর্থ লোকসান না করিয়া অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সকল শ্রেণীর লোকের এই জাতীয় নিরর্থক ব্যয় হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি, তাহাই এখন চিন্তার বিষয়!" —নারায়ণ (কাঁথি)।

## ভেজাল চাল

"গতকল্য কলিকাতার এক সংবাদে প্রকাশ, শোভাবাজারে একটি চাউলের গুদামে চাউলে কাঁকর মিশ্রণের সময় পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-সেবা সমিতির কতিপয় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক তাহাদের হাতে-নাতে ধরিয়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়া আসামীদের পুলিশের হস্তে সমর্পণ করেন। ভেজাল নিরোধ আন্দোলন জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা না থাকিলে উহা কখনই সম্ভব হইবে না। সেই হেতু আমাদের বক্তব্য, রাজ্য সরকার এক আইন বলে এই সমস্ত বে-সরকারী সমাজ-সেবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরূপ আন্দোলনে উৎসাহিত ও তাহাদের অনুমোদন করিলে এই আন্দোলন সফল হইবে বলিয়া বিশ্বাস। যেমন পল্লী-রক্ষী বাহিনীগুলিকে সরকার অনুমোদন করিয়া চুরি-ডাকাতি দমনে আংশিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন, সেই ভাবে উক্ত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুমোদন করিলে, উহারা এই কার্য্যে সবিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে এবং এই সব ক্ষেত্রে সরকারী বা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য কার্য্যে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হইবে। নতুবা এই পরিবর্ত্তনে ভেজালকারীদের বধ করা যাইবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

—বর্তমান ভারত (হুগলী)।

## অথ হাসপাতাল কথা

"বর্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হাসপাতালের বিবিধ ব্যবস্থা ও কুব্যবস্থার কথা অনেক বলা হয়েছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন বড় রকমের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের টনক নড়ে নি—আর পাবলিকও কোন সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন নাই। এই আর্থিক অনটনের যুগে হাসপাতাল ছাড়া পাবলিকের আর গতি নাই। সুতরাং সব অন্যায়-অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করাই জীবনের ধর্ম্ম, অন্তত: বেঁচে থাকার তাগিদে। বিজয়চাঁদ হাসপাতাল সম্পর্কে এ সার কথাটা প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন, মনে হয়। স্বামীজী বলিয়াছেন—"মনে রেখো, আমরা জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত।" আর আজ আমরা বলছি—"বন্ধুগণ, মনে রেখো আমরা জন্ম হতেই হাসপাতালের জন্য বলি প্রদত্ত। আমাদের রক্ষা করবার কেউ নেই।"

—বর্দ্ধমানের ডাক।

## টীকাদার নাই

"শীত জাঁকিয়া বসিতে না বসিতেই আবার বসন্তের বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। শীতের আর তেমন প্রকোপ নাই। এরূপ

ত্র বসন্ত রোগের আবির্ভাব হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কাজেই নের সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া ও টীকাদি লওয়া বাঞ্ছনীয়। বিপদ হইয়াছে এই যে, সহরে যদিও টীকাদারদের দেখা পাওয়া ছেছে, মফঃস্বলে ইহাদের পাত্তা মিলিতেছে না। ইতিপূর্বে প্রতি গায় জেলা বোর্ডের স্যানিটারী ইন্সপেক্টারের অধীনে কতকগুলি য়ী টীকাদার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এই কাজ করিতেন। কিন্তু ার জেলাবোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগ সরকারী তত্ত্বাবধানে যাওয়ায় সঙ্গে ঐ সব অস্থায়ী টীকাদারদের চাকুরী গিয়াছে। ফলে স্যানিটারী ন্সপেক্টরগণ একাই তাঁহাদের স্থায়ী দুই একজন সহকর্মীকে লইয়া আর করিবেন? মহামারীর অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা নেন মহামারী লাগিলেই সরকারের টনক নড়িবে। তখন ডাক্তারের অভাব হইবে না। কিন্তু রোগ হইলে চিকিৎসা করানো অপেক্ষা রোগ না হইতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত নহে কি?"

—প্রদীপ (তমলুক)।

৬ই জানুয়ারী, প্রথম দিনের অধিবেশনে, কংগ্রেসের জন্য নূতন আদর্শবাদের কথা বলা হয়। আভাদী কংগ্রেসে বলা হইয়াছিল যে, নূতন নূতন সমস্যার সমাধানের জন্য নূতন, বলিষ্ঠ আদর্শবাদ চাই। নেতারা সেই অভাব পূরণ করিলেন—দিলেন দেশকে "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ"। কিন্তু জনসাধারণ না বুঝিল তাহার তাৎপর্য, না অনুভব করিল অন্তর দিয়া সে নবজীবনের প্রবাহ। অতএব নেতাদের পকেটে এবং মুখেই রহিয়া গেল "সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ"। ইতিমধ্যে দারিদ্র্য, বেকারত্ব আরও বাড়িয়াছে, ওদিকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সত্ত্বেও তৃতীয় আশ্বাস দিতে হইতেছে। সুতরাং দরিদ্র ভারতবাসীর পকেট কাটিয়া আরও ট্যাক্স আদায় করিতে হইবে। কিন্তু দুই-চারিটা আশা ও আশ্বাস না দিলে জনসাধারণ "গোসা" করিবে যে! তাই নেতারা আবার এক নূতন আদর্শের অর্থাৎ ধাপ্পার সন্ধানে মাথা ঘামাইতেছেন?"

—মেদিনীপুর হিতৈষী।

## শক্তিপূজা বনাম বাংলার যুবশক্তি

"শ্যামাপূজা,—যাহার অপর এক নাম শক্তিপূজা, তাহা হইয়া গেল নিতান্ত শক্তিহীনদের হাতে; কারণ—শক্তি উপাসক যুবকদের পূজামণ্ডপে কোন শক্তিরই পরিচয় পাওয়া গেল না, কেবলমাত্র স্থানে স্থানে নাকি সুন্দর আওয়াজ শোনা গেল (উহা সঙ্গীত কিনা বোঝা গেল না) "পাথর নেবে গো—ও নুড়ী পাথর।" অথবা, "চিড়িয়াখানার ...এর 'সিংহ'" ইত্যাদি। মোট কথা শ্যামাপূজা কি বস্তু তাহা ...জানিবার প্রয়োজন নাই। মাইকের সামনে কে কত ...সুরে নানাপ্রকারের গান করিতে পারিবে, তাহাই প্রয়োজন ...দেখা। মায়ের পূজার অমুক দ্রব্য আসে নাই ক্ষতি কি? ...অনেক চাই-ই। তাঁহার রিক্সাভাড়া, চা, জলখাবার ...কি হয়? মায়ের বস্ত্রের আবার প্রয়োজন কি? উনি ...দিবেন। উহার চাইতে গায়িকা সাবিত্রী মুখার্জ্জিকে ...প্রচুর লোক মিলিবে। তাই পূজামণ্ডপ ঘিরিয়া শুধু ...গান—হাসি আর ভালবাসা। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ ভুলিয়া স্থানে স্থানে ওই "নুড়ী পাথরের" সাথে সাথেই তাল দিতেছেন। আর মনে ভাবিতেছেন—তিনি যদি গায়ক হইতেন।

আমাদের দেশে শ্যামাসঙ্গীতের অভাব নাই। কিন্তু কোন গায়কই তাহা গাহিলেন না। কেবল মাত্র সিনেমা ও রেকর্ডের চালু সুরে তাঁহারা এক মোহজাল সৃষ্টি করিয়া বাংলার যুবশক্তিকে মাতাইয়া তুলিলেন। কেহ গাহিলেন না—

"শ্যামা আমার নীরব কেন মা
রোদনভরা বিশ্বমাঝে।"

—বনগাঁ হিতৈষী।

## রকেট ও বলদ

"বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতায় আছে:

'গ্রহ গ্রহান্তে উড়িবার তরে,
রচিতেছে পাখা, হের স্বপন;
গরুর গাড়ীতে চড়িয়া আমরা,
চলছি পেছনে কোটি যোজন।'

আজ একই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যখন দেখি সোভিয়েৎ কমিউনিষ্ট পার্টির একবিংশ কংগ্রেস উপলক্ষে সোভিয়েৎ রাশিয়া কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত রকেট পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে চন্দ্রলোক পার হয়ে মানুষের সৃষ্ট এক নতুন গ্রহের সূচনা করে সূর্য্যকে করছে প্রদক্ষিণ। আজ মানুষের পক্ষে গ্রহান্তরে যাওয়ার দিনও আর সুদূর নয়। আর তারই পাশের সংবাদে যখন দেখা যায় আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের ৬৪তম অধিবেশন উপলক্ষে কংগ্রেসের সভাপতি ৫৪ জোড়া বলদবাহী রথে আরোহণ করে বিরাট মিছিল সহকারে চলেছেন—অধিবেশনে যোগদান করতে, তখন বিদ্রোহী কবির উপরোক্ত পংক্তির যথার্থ উপলব্ধি করা যায়।"

—নিশান (বর্দ্ধমান)।

## নূতন রক্ত

"প্রতি বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশনে, সুসজ্জিত মণ্ডপের নীচে বসিয়া কংগ্রেসের বড়-কর্তারা দেশের দুঃখে বিগলিত হৃদয় হইয়া নবীন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার বাণী শুনাইয়া থাকেন। এ বৎসরও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অমৃতসর নগরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৪তম অধিবেশনে নেতারা পূর্ববৎ আশ্বাস দিয়াছেন।

## ডাকের চিঠির নিরাপত্তা

"৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবারের যুগান্তর যেন প্রমাণসহ বুঝাইয়া দিয়াছেন—চিঠি সযত্নে বাক্সে ফেলিলেই যে প্রাপকের হাতে পৌঁছিবে ইহা যেন কেহ না মনে করেন। বহু চিঠির আলোকচিত্রসহ নকশার ধারে গঙ্গার ঘাটে নকশায় প্রদর্শিত জায় কুড়াইয়া রিপোর্টার সকলের ভুল ধারণা দূর করিয়াছেন। পোষ্টাফিসের বাবুদের কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিলেই হইবে না। যে চিঠির বাক্সে চিঠি দিলেন, যে পিয়নের হাতে সেই বাক্স খুলিয়া তাহা ডাকঘরের মোহরযুক্ত হইয়া ডাক ব্যাগে দিয়ে ঠিকানায় পৌঁছিবে ইহার মধ্যে কত কাঁড়া আছে কে বলিবে! ৬ই জানুয়ারী ১৯৫৯ মঙ্গলবারের যুগান্তর দেখিলেই কত জরুরী চিঠি, কত শোক-সংবাদ, কত প্রেমপত্র, কত সওদাগরী পত্র যে যেখানে সেখানে লেখক-লেখিকার সর্ব্বনাশ ও প্রাপকের সাংঘাতিক ফল প্রদান করিবে তাহা কে বলিবে? বঙ্গদ্রোহী সং

চোর-ডাকাতের চিঠি ধরিবার জন্য ডাকের চিঠি ডাকঘরে সরকারী ...মনামা লইয়া খোলার ব্যবস্থা আছে। তাহা বিশেষ বিশেষ লোকের নামের খাম। কিন্তু পথে, ঘাটে নর্দ্দমায় এবং যেখানে সেখানে এই সব চিঠি পড়িয়া থাকিবে, ইহা কেহ কখনও স্বপ্নে ভাবে নাই। যিনি ডাকবাক্স খোলেন তিনি যে পত্রাদির প্রথম বিধাতা ইহা কেহ কখনও ভাবেন নাই। বহুদিন হইতে দেশে একটি হাসির গল্প চলিত আছে—এক ডাকঘরের চিঠি বিলি করা পিওন দেশে গিয়ে সে যে চাকুরী করে অর্থাৎ সে যে ডাক ঘরের পিওন তা বলিতে সঙ্কোচ করে বলিলা সত্য কথার উপর একটু ইংরাজী অলঙ্কার দিয়া নিজেকে বড় চাকুরে বুঝাইবার জন্য বলিত, আমি? আমি কি চাকরী করি শুনবে? "ডেলিভারী পোষ্টম্যান অব্ দি পোষ্ট্যাল ডিপার্টমেণ্ট আণ্ডার দি পোষ্ট মাষ্টার জেনারাল অব্ বেঙ্গল এণ্ড আসাম আণ্ডার দি ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্ট।" তার কথা একটিও মিথ্যা নয়। কিন্তু যে ডাক বাক্স ক্লিয়ার করে সে যে চিঠির হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা তা এর আগে ক'জন জানতেন? আশা করি, কোনও ডেলিটে নাগপুর অভয়ঙ্কর নগরে এই ভয়ঙ্কর সংবাদ দিয়া দেশের বর্ত্তমান অবস্থা শাসন কর্ত্তৃত্বাধিকারী কংগ্রেসের গোচরে আনিয়া দেশকে বাধিত করিবেন। ঘটনাটি হাওড়া ডাক বিভাগে সংঘটিত হইয়াছে। "সত্যমেব জয়তে!" —জঙ্গীপুর সংবাদ।

## শোক-সংবাদ

### আচার্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গবরেণ্য মনীষী, "বঙ্গীয় শব্দকোষ" প্রণেতা পণ্ডিতপ্রবর আচার্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯২ বছর বয়সে ২৮শে পৌষ বেলা আড়াইটের সময়ে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে আক্রান্ত হয়ে লোকান্তরিত হয়েছেন। প্রথম জীবনে ইনি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁর রাজশাহীর অন্তর্গত কালীগ্রামের জমিদারী কাছারির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। পরে শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হলে কবিগুরুর আহ্বানে আশ্রমে উপস্থিত হন এবং ১৩০৯ থেকে ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত শিক্ষাভবনের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৪ সালে "সরোজিনী পদক" দ্বারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে সম্মান নিবেদন করেন ও ১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে "দেশিকোত্তম" (ডি, লিট) উপাধি দ্বারা শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান। হরিচরণের জীবনের অক্ষয়কীর্তি বঙ্গীয় শব্দকোষ। একক প্রচেষ্টায় এটি তিনি প্রণয়ন করেন, এটির সম্পূর্ণ রূপ দিতে তাঁর একচল্লিশ বছর সময় লেগেছিল। বাঙলা সাহিত্যের এটি একটি উজ্জ্বল রত্ন, তাঁর সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর অবদান অসামান্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জীবিত বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে ইনিই ছিলেন শেষ জন। গুরু হিসেবেও ইনি নির্বিশেষে প্রতিটি ছাত্রের আন্তরিক শ্রদ্ধালাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এবং সনাতন ভারতের শাশ্বত গুরুরূপের যেন মহিমময় বিকাশ ঘটেছিল আধুনিক কালে হরিচরণের মধ্য দিয়ে। এই প্রণম্য জ্ঞানতপস্বীর মৃত্যুতে বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হল।

### ডাঃ তারকনাথ দাস

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও দীর্ঘ তিয়াত্তর বছরের বা... প্রসিদ্ধ ভারতীয় রাজনৈতিক বিপ্লবী ডাঃ তারকনাথ দাস গত পৌষ ৭৪ বছর বয়েসে পরলোক গমন করেছেন। ছাত্র... থেকেই ইনি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ... ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভারতের স্বাধীন... জন্যে ইনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং সেক্ষেত্রে ভারতের ... নেতার তুলনায় তাঁর দানও কোন অংশে কম নয়। শুধু... রাজনীতির ক্ষেত্রেই তিনি সীমাবদ্ধ ছিলেন না। ভারতের বৈদে... নীতি এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত তাঁর কয়েকটি পুস্তক সুধীসম... যথেষ্ট আদৃত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইনি ফ্রেণ্ডস ফর ফ্রিডম ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপন করেন। ইনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যা... রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। স্মরণ থাকতে পারে, ১... সালে ইনি অল্পকালের জন্যে একবার ভারতে এসেছিলেন।

### হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য

দৈনিক বসুমতীর অন্যতম বার্তা-সম্পাদক হরকিঙ্কর ভট্ট... গত ১০ই পৌষ মাত্র ৪৫ বছর বয়েসে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ ক... দীর্ঘ ২১ বছর এই প্রতিষ্ঠানকে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা ও নিষ্ঠা সহ... সেবা করে গেছেন। নানা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রব... লিখতেন, কয়েকটি গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা।

### পি, এন, রায়

বাঙলার চলচ্চিত্রজগতের অন্যতম রূপদাতা পি-এন-রায় ১৮ই পৌষ ৬৮ বছর বয়েসে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়ে... প্রথমে জীবনে ইনি একজন কৃতী ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তা... হিমাংশু রায়ের সঙ্গে নির্বাক ছবির প্রযোজনায় লিপ্ত হয়ে পা... ক্রমে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার তথা নিউথিয়েটার্সের সংস্পর্শে আ... তারপর সুদীর্ঘ কালব্যাপী বহু ছায়াচিত্র ইনি বাঙলাদেশকে উ... দিয়েছেন। কিছুকাল আগে প্রদর্শিত কবিগুরুর যোগা... দর্শকসাধারণের দরবারে শ্রীরায়ের শেষ উপহার। বাঙলার চল... জগৎ শ্রীরায়ের কাছে বহুল পরিমাণে ঋণী।

### জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলার বর্ষীয়ান চিত্রপরিচালক জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপ... গত ২৩শে পৌষ ৭১ বছর বয়েসে দেহত্যাগ করেছেন। দী... যাবৎ ইনি চলচ্চিত্র-জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এব... পরিচালনাধীনে অসংখ্য চিত্র মুক্তিলাভ করেছেন। সবাক ও ... মিলিয়ে আশীটি ছবি (বাঙলা, হিন্দী, উর্দু, তামিল) পরিচালনা করেছেন। এঁর পরিচালিত নির্বাক ছবিগুলির রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়, প্রফুল্ল, চণ্ডীদাস, রামায়ণ, মহা... এবং সবাক ছবির মধ্যে মানময়ী গার্লস স্কুল, জয়দেব, নরনা... শকুন্তলা, বেকার নাশন, দেশবেশ প্রভৃতির নাম উল্লেখযো... জ্যোতিষ বাবুর মৃত্যুতে বাঙলাদেশ একজন প্রবীণ শিল্পী... হারাল।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকা...

## বিপ্লবের সন্ধানে

আমি মাসিক বসুমতীর একজন নিয়মিত পাঠক। বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিস্তারিত আলোচনা আপনার পত্রিকায় সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গত অগ্রহায়ণ ... সালের বসুমতীতে প্রকাশিত প্রখ্যাত বিপ্লবী নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বিপ্লবের সন্ধানে" নামক ধারাবাহিক আলোচনার ... কিস্তিটি আমার খুব ভাল লেগেছে। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন এককালে। সুতরাং তাঁর লেখায় বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনেক নূতন তথ্য জানতে পারবো ... আশাই করছি। এ জাতীয় আলোচনা যত বেশী হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। কেন না, অধিকাংশ বিপ্লবীদের আমরা ভুলতে বসেছি। এঁদের সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক তথ্যাদি সম্বলিত আলোচনা খুব নজরে পড়ে না। অবশ্য ইদানীং এই সম্বন্ধে কিছু কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। —মিহিরকুমার ভট্টাচার্য, ... পাঠাগার, ১, গৌরীবাড়ী লেন। কলিকাতা—৪

## সংস্কৃত ও আধুনিক বিজ্ঞান

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় উপরি-উল্লিখিত প্রবন্ধে যা ... পৃষ্ঠায় 'হস্ত, বক্ষ, গন্ধর্ব—প্রভৃতি বর্ত্তমানের বাঙ্গালী, বিহারী, ওড়িয়া, আসামী'—এই বাক্যটিতে "আসামী" কথাটির দ্বারা যে (এ বিষয়ে সন্দেহ নাই) আসামের অধিবাসীদের লেখক বুঝাইয়াছেন তাহাতে আমার আপত্তি আছে। আসামের অধিবাসীদের অসমীয়া বলা হয়। আসামী কথাটি বাঙ্গালা ভাষায় এবং অসমীয়া ভাষায়ও অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অন্যত্রও (যথা প্রফুল্ল রায়ের "পূর্ব্ব-পার্ব্বতী" উপন্যাসে যখন দেশ পত্রিকায় বাহির হইতেছিল) এই ত্রুটি চোখে পড়িয়াছে। ভুলটি পুনরায় না হোক, এই কামনা। —শ্রীব্রজদুলাল বণিক, মুবকুলীনী টি এষ্টেট, পোঃ মুবকুলীনী, শিবসাগর আসাম।

## কুলদেবতা ৺শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ

আমি আপনাদের মাসিক বসুমতী ১৩৬৫ সনের আশ্বিন সংখ্যার ১১১ পৃষ্ঠায় বিচারপতি "শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িলাম। লেখক আমাদের কুলদেবতা ৺শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভুল এবং ভিত্তিহীন। আমার প্রপিতামহ ... মুখোপাধ্যায়ের নিজ ভ্রাতা ৺গোপীনাথ অর্থাৎ ৺নরহরি ... নিজ ভ্রাতা একখানি উইল সম্পাদন করিয়াছিলেন। উক্ত উইলে তাঁহার লেখা আছে যে, "৺শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ ও ... জীউ তাঁহার পিতা কন্দর্পের স্থাপিত" অন্য কাহারও স্থাপিত নয়। এই সম্বন্ধে আলিপুর অষ্টম আদালতের ১১৫৩ সনের ৫২নং দেওয়ানী মোকদ্দমায় ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, উক্ত ৺শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ বিগ্রহ কন্দর্পের স্থাপিত। উক্ত মোকদ্দমায় মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় একজন প্রতিপক্ষ। অতএব আপনাদের পত্রিকায় ভুল সংশোধন করিলে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্ত করা হইবে। উক্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে অপর পক্ষ আপিল করিয়াছেন এবং বিচারাধীন আছে। —শ্রীপবিত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৮এ, ল্যান্সডাউন প্লেস, কলিকাতা-২৯।
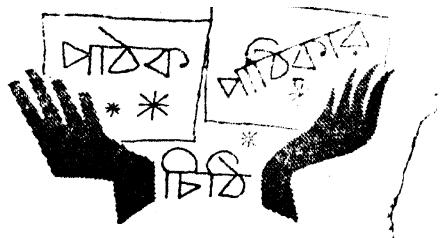
## পত্রিকা সমালোচনা

মহাশয়! আপনার বিখ্যাত "মাসিক বসুমতী"র একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে আমি আপনাকে এই পত্র লিখিতে সাহসী হইয়াছি। আপনি "মাসিক বসুমতী"কে নব-কলেবর দান করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যে বিপুল বৈচিত্র্য আনিয়াছেন, তাহা ইহাকে আজ মাসিক-পত্রিকা হইতে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। ইহার বৈচিত্র্যে কি আর ২।১টি নূতন অধ্যায় যোগ করা যায় না? যেমন "বলার মত বলা" সংগ্রহ। "জীবনের টুকিটাকি" সঙ্কলন। Reader's Digest-এর Quotable Quotes or Picturesque Sayings এবং life like that, এ সব হইতেই অবশ্য আমার এই প্রস্তাব। Idea ধার করা আপনি কি দোষারোপ মনে করেন, তখন আপনার প্রয়োগ ক্ষেত্র হইলে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন। ঐ সব বিভাগে উপাদানের যে অভাব হইবে না, তাহা আপনার মত লোককে বলিতে যাওয়া আমার শোভা পায় না। আমি কেবল দু'-একটি উদাহরণ দিব, আমার বক্তব্য সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। যেমন—"বলার মত বলা" এই পর্যায়ে উল্লিখিত হইতে পারে—"ঘুম ভাঙ্গিয়া টনটন হাই তুলিবার পর" (আশাপূর্ণা), তিনি সশব্দে ঘুমাইতেছিলেন (অন্নদাশঙ্কর) "জীবনের টুকিটাকি" এই পর্যায়ে নিম্নলিখিত সত্য ঘটনাটি আপনার কেমন মনে হয়? "এক বাস-ষ্ট্যাণ্ডে পিতা-পুত্র বালকের মাতার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বালককে অধীর দেখিয়া পিতা বলিলেন, আচ্ছা, পুত্র, আন্দাজ করতো, এর পর কোন বাসে তোমার মা পৌঁছিবেন? দেখি তোমার আন্দাজ না আমার আন্দাজ ঠিক হয়। পুত্র আন্দাজ করিল—১ম বা ৩য় বাসে। পিতা আন্দাজ করিলেন—তৃতীয়, চতুর্থ, বা পঞ্চম বাসে। প্রথম বাসে মাতা নামিলেন না। পুত্রকে আবার অস্থির দেখিয়া পিতা বলিলেন, এবার আন্দাজ করত, আমি কতদূর পর্যন্ত গণিবার পর এর পরের বাস আসিবে। পুত্র আন্দাজ করিল, ৮০, পিতা আন্দাজ করিলেন ১০০। পিতা ৬০ গুণিতেই ২য় বাস আসিয়া পড়িল। এরূপ পুত্রের উৎসাহিত হওয়ার ঘটনা। মাতা শেষ পর্যন্ত ৫ম বাসে আসিলেন। কিন্তু পিতা-পুত্রের অপেক্ষার সময় আর দীর্ঘ মনে হইল না।"

আর একটি উদাহরণ গ্রহণ করুন। আমার অল্পবয়স্ক পুত্র ইংরাজী খবরের কাগজে রাজনৈতিক সংবাদ মন দিয়া পাঠ করে। এক দিন সে পাঠ করিল,—পাকিস্তান মার্শাল ল' প্রভাবে জিনিষপত্রের মূল্যের নিম্নগতি। পড়িয়া সে আমার নিকট মন্তব্য করিল,—"বাবা, মার্শাল ল' লোকটার খুব শক্তি আছে। দোকানদাররা তার ভয়ে জিনিষপত্রের দাম কমিয়ে দিয়েছে।"

এই ধরণের সংবাদ আপনি আপনার শিক্ষিত বহু পাঠকদের নিকট নিয়ম মত পাইতে পারেন।

আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে আপনার মতামত জানিতে পারিলে আনন্দিত হইব। অনেক সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। হস্তলিপি মার্জনা করিবেন।—শ্রীঅশোককুমার গুপ্ত। ১৩এ, সর্দার শঙ্কর রোড কলিকাতা-২৬।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Please enlist the following as a subscriber to Basumati (Monthly) for the year 1959. "Biblioteka Akademi Nauk SSSR Ul. Frunze II, Moscow 19 U.S.S.R."—National Book Agency ( Private ) Ltd. Calcutta.

Sending herewith Rs. 7·50 n.P. only being the half-yearly subscription from Pous to Jaistha sankhya 1365-66 B.S.—Sm. Bhakti Lata Biswas. Hamkura, 24 Pargana.

অদ্য মাসিক বসুমতীর আর ৬ মাসের চাঁদা ৭-৫০ পাঠাইলাম। আশা করি, নিয়মিত বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী বাসন্তী ভট্টাচার্য্য, শিবসাগর, আসাম।

বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭।০ টাকা পাঠাইলাম।—তৃপ্তি বসু, Aminabad, Lucknow.

মাসিক বসুমতীর জন্য আগামী ৬ মাসের চাঁদা বাবদ ৭।।০ টাকা পাঠাইতেছি। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আপনাদের পত্রিকার জন্য এই সুদূর প্রবাসে কি যে অধীর আগ্রহে দিন কাটাই, তাহা লিখিয়া জানাইবার ভাষা আমার জানা নাই।—শ্রীঅপর্ণা সান্যাল, Gomia, Hazaribagh.

১৩৬৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে নূতন গ্রাহিকা হইবার উদ্দেশ্যে ৭।।০ টাকা পাঠাইলাম।—Sm. Kamana Roy, Balassore, Orrissa.

অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ সংখ্যার বসুমতীর ৬ মাসের সডাক মূল্য বাবদ ৭-৫০ টাকা পাঠাইলাম —Sm. Anima Banerjee, চণ্ডী ঘোষ রোড কলিকাতা।

Sending Rs 15/- towards the subscription of Monthly Basumati for one year—Sukumari Roy,—Jalpaiguri.

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র অবধি ৬ মাসের গ্রাহকমূল্য ৭-৫০ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন।—Bela Das Gupta, Lodhi Colony, New Delhi.

আগামী এক বৎসরের জন্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।—Sakuntala Devi, Jiagunj, Murshidabad,

আমার গ্রাহক চাঁদা কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত পাঠাইলাম। টাকা পাওয়া মাত্র কার্ত্তিক মাসের বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীঅনুপমা মিত্র, গোরাবাজার, বহরমপুর।

৭।০ টাকা পাঠাইলাম। ৬ মাসের জন্য গ্রাহক করিবেন। বাকী টাকা পরে পাঠাইব। কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে পত্রিকা পাঠাইবেন। পত্রিকা যেন সময় মত পাই, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।—জাহ্নবী স্মৃতিকিশোর পাঠাগার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

৭।০ টাকা পাঠাইলাম (৬ মাসের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র) —Sm. Mirarani Das, Karimgunj Cachar.

চলতি মাস থেকে আমার নাম মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা তালিকাভুক্ত করে বাধিত করবেন। আশা করি চলতি মাসের সংখ্যা শীঘ্রই পাব ৬ মাসের অগ্রিম টাকা পাঠালাম। —Mira Ghose, Sholapur Road, Poona.

৬ মাসের চাঁদা পাঠাইলাম। কার্ত্তিক হইতে বই পাঠাইবেন। —S. S. Basu, Ambarnath Bombay.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা ৭-৫০ পাঠাইলাম। ১৩৬৫ সনের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে আমাকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করিয়া পত্রিকা পাঠাইবেন।—Umarani Bhowmik, Assam.

I am sending this half-yearly subscription to continue my membership which please accept. —Sm. Manika Dey, Bombay.

অনুগ্রহ পূর্ব্বক মাসিক বসুমতী কার্ত্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যা (১৩৬৫) পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মূল্য ৭।০ টাকা এই সঙ্গে পাঠালাম।—শ্রীপূর্ণিমা সরকার, জব্বলপুর।

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র সংখ্যার জন্য ৭-৫০ টাকা পাঠালাম। বসুমতী নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Miss Anjali Mazumdar, Ganjam, Orrissa.

আমাদের মাসিক বসুমতীর চাঁদা (কার্ত্তিক '৬৫ হইতে জ্যৈষ্ঠ '৬৫ পর্য্যন্ত) ১০৲ টাকা পাঠালাম। পত্রিকা পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।—Umarani Mondal, Midnapore.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক মূল্য ৭।।০ টাকা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া কার্ত্তিক মাসের বসুমতী শীঘ্র পাঠাইবেন।—শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দাস—গড়বেতা, মেদিনীপুর।

Sending herewith Rs. 7·50 n.P. being my half yearly subscription ( from Kartick to Chaitra ) for Monthly Basumati. Please continue to send the magazine.—Mrs. Ava Biswas B. A. ( Hurs ), Hazaribagh.

Herewith my six monthly subscription for Masik Basumati.—Mrs. Kamala Roy, North Guzrat.

Subscription for another six months.—M. Haque. A. I. O. W.—Bhandara Road ( B. S. )

Rs. 15/- has been sent for your Monthly Basumati for one year.—Hem Barua Library Tezpur, Assam.

আশ্বিন ১৩৬৫ হইতে চৈত্র ১৩৬৫ এই ৭ মাসের মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া আশ্বিন মাসের বসুমতী তাড়াতাড়ি পাঠাইবেন। Sm. Ramala Das Gupta. Bolpur ( Birbhm ).

বার্ষিক চাঁদা monthly Basumati-র পাঠাইলাম। যদি কোনো রকমেও সম্ভব হয় আমাকে বৈশাখ সংখ্যা হইতেই দিবেন। আর যদি না-ই পাওয়া যায় তবে শ্রাবণ সংখ্যা হইতেই দিবেন। পুরানো Copy বৈশাখ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত পাঠাইলেও চলিবে। Sm. Binarani Basu Mazumdar, Sukma, Bastar, M. P.

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

# মাসিক বসুমতী
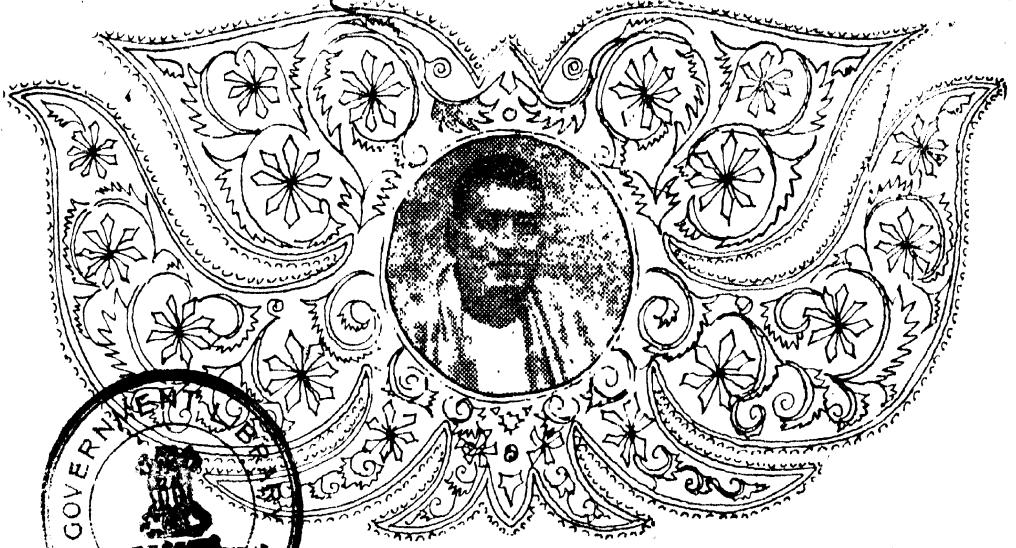
৩৭শ বর্ষ—মাঘ, ১৩৬৫ ] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [ দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

## অলৌকিক মূর্ত্তি দর্শন

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শীত ঋতু অপগত হইয়া কুসুমাকর সরস বসন্ত আসিয়া উপস্থিত। পত্র-পুষ্প-গীতিপূর্ণ বসুন্ধরা এক অপূর্ব্ব উন্মত্ততায় জাগরিতা। ঐ উন্মত্ততার ইতর বিশেষ নাই—আছে কিন্তু জীবের প্রবৃত্তির। যাহার যেরূপ—সু বা কু প্রবৃত্তি ও সংস্কার, তাহার নিকট উহা সেই ভাবে প্রকাশিত। সাধু সদ্বিষয়ে নব-জাগরণে জাগরিত—অসাধু অন্তরূপে—ইহাই প্রভেদ।

এই সময়ে 'কামারহাটির ব্রাহ্মণী' একদিন রাত্রি তিনটার সময় জপে বসিয়াছেন। জপ সাঙ্গ হইলে, ইষ্টদেবতাকে জপ সমর্পণ করিবার অগ্রে প্রাণায়াম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় দেখেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার নিকটে বাম দিকে বসিয়া রাখিয়াছেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ হস্তটি মুটো করার মত দেখা যাইতেছে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে যেমন দর্শন করেন এখনও ঠিক সেইরূপ স্পষ্ট জাগন্ত! ভাবিলেন—"এ কি? এমন সময়ে, ইনি, কোথা থেকে কেমন ক'রে, হেথায় এলেন?" গোপালের মা বলেন, "আমি অবাক্ হয়ে তাঁকে দেখছি, আর ঐ কথা ভাবছি—এদিকে গোপাল (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তিনি 'গোপাল' বলিতেন) ব'সে মুচকে-মুচকে হাসছে। তার পর সাহসে ভর ক'রে বাঁ হাত দিয়ে যেমন গোপালের (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) বাঁ হাতখানি ধরেছি, অমনি সে মূর্ত্তি কোথায় গেল, আর তার ভিতর থেকে দশ মাসের সত্যকার গোপাল, (হাত দিয়া দেখাইয়া) এত বড় ছেলে, বেরিয়ে হামা দিয়ে, এক হাত তুলে, আমার মুখ পানে চেয়ে (সে কি রূপ, আর কি চাউনি!) বললে, "মা, ননী দাও।" আমি তো দেখে শুনে একেবারে অজ্ঞান, সে এক চমৎকার কারখানা। চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলুম—সে তো এমন চীৎকার নয়, বাড়ীতে জনমানব নেই তাই, নহিলে লোক জড় হ'ত। কেঁদে বললুম "বাবা, আমি দুঃখিনী-কাঙ্গালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী ক্ষীর কোথা পাব, বাবা!" কিন্তু সে অদ্ভুত গোপাল কি তা শোনে—কেবল 'খেতে দাও' বলে! কি করি, কাঁদতে কাঁদতে উঠে সিকে থেকে শুখনো নারিকেল লাড়ু পেড়ে হাতে দিলুম ও বললুম—"বাবা, গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য্য জিনিস খেতে দিলুম ব'লে আমাকে যেন ঐরূপ খেতে দিও না।"

"তার পর জপ, সে দিন আর কে করে? গোপাল এসে কোলে বসে, মালা কেড়ে নেয়, কাঁধে চড়ে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়! যেমন সকাল হোলো অমনি পাগলিনীর মত ছুটে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পড়লুম। গোপাল কোলে উঠে চললো—কাঁধে মাথা রেখে। এক হাত গোপালের পাছায় ও এক হাত পিঠে দিয়ে বুকে ধ'রে সমস্ত পথ চললুম। স্পষ্ট দেখতে লাগলুম গোপালের লাল টুকটুকে পা দু'খানি [illegible] উপর ঝুলছে।"

# দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা

ডঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ প্রাক্তন উপাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ]

সার্বজনীন শিক্ষা ব্যতীত গণভোট অভিশাপ। গণতন্ত্রে—বিশেষ করিয়া গণতন্ত্রের অস্তিত্বের জন্যই—গণমন শিক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জনগণকে বুঝিতে হইবে যে কোনটা তাহাদের হিতার্থে এবং কোনটা দেশের মঙ্গলের জন্য। আইন সভায় প্রতিনিধিত্বের অধিকার কাহাকে দেওয়া উচিত, সে কথাও সাধারণ মানুষকে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে।

একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন যে, যত ভাল হউক না কেন, কোন শাসনই স্বায়ত্ত শাসনের পরিপূরক হইতে পারে না। অর্থাৎ জনগণের দ্বারা গঠিত সরকারই জনগণের জন্য গঠিত সরকারের সর্বোত্তম রূপ। কিন্তু সেজন্য অবশ্য জনগণকে স্বায়ত্ত শাসনের পদ্ধতিটি আয়ত্ত করিতে হইবে।

সহজে বা আপ্‌সে কিছুই হয় না। এমন কি রথচালনা বা পশুপক্ষী লালন-পালনের কায়দাটিও শিখিয়া লইতে হয়।

যদিও গণতন্ত্র মানে জনগণের সরকার, তবুও সে সরকার যে গোটা দেশের সমস্ত লোককে লইয়াই গঠিত হইবে তেমন নহে। তেমন ব্যবস্থা হইতেই পারে না। জনগণের প্রতিনিধিদের কয়েক জন সরকার গঠন করেন এবং তাঁহারাই দেশ শাসন করেন।

সুতরাং জনগণের জানা প্রয়োজন যে, কি ভাবে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত করা যায়। এই প্রতিনিধিদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হইবেন মন্ত্রিমণ্ডলী। অবশ্য কার্য্যতঃ তাহা হয় না। প্রায়ই নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোট ক্রয় করা হয় এবং নেতা বলিয়া পরিচিত একদল লোক জনতার অজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করে।

গণতন্ত্রে তাই শিক্ষা অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিক্ষিত নাগরিকদের উপরই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভর করে। রাজনৈতিক নিরাপত্তার পক্ষে শিক্ষা সেই জন্যই অপরিহার্য্য।

**শিক্ষার রূপ :**—এখন প্রশ্ন হইল, আমাদের দেশবাসীকে কি ধরণের শিক্ষা দেওয়া উচিত হইবে। আমার মনে হয়, সেটা অনেকটা নির্ভর করিবে আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, গঠন প্রকৃতি প্রভৃতির উপর। অবশ্য উপকারের জন্যই আমরা সমতুল্য দেশের ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ আমরা চীন এবং রাশিয়ার কথা আলোচনা করিতে পারি। চীন উন্নতি করিতেছে এবং রাশিয়া ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে রাশিয়ার অবস্থা বর্ত্তমান ভারতের তুলনায় খুব ভাল ছিল না। শিক্ষার ব্যাপারে রাশিয়া কি ভাবে প্রচণ্ড উন্নতি করিল? আমি শুনিয়াছি যে, রাশিয়া সে জন্য একাধিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং তাহার অন্যতম জার্ম্মাণ শিক্ষাব্যবস্থা। অনেকে যাহাকে গোটা ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা বলেন।

জার্ম্মাণ শিক্ষাব্যবস্থায় ছয় হইতে দশ বৎসর বয়স্ক শিশুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া, লেখা, প্রাথমিক হিসাব, স্বাস্থ্য এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। তারপর তাহারা যোগ দেয় জিমনাসিয়াম নামে পরিচিত উচ্চতর বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রম নয় বৎসরের। দশ হইতে উনিশ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকারা এ ধরণীয় বিদ্যালয়ে যোগদান করে। এই স্তরে তাহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষালাভ করে: ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক ও জার্ম্মাণ সাহিত্য; গণিতশাস্ত্র (পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, পাটীগণিত ও জ্যামিতির প্রগতি, ঘনজ্যামিতি, অন্তরকলন, সমাকলন প্রভৃতি।) রসায়ন এবং জীববিদ্যাও পড়ান হয়। রসায়ন শিক্ষার মধ্যে ধরা হয় সাধারণ অ-জৈব রসায়ন ও জৈব রসায়ন এবং ভৌত রসায়নের মূল তত্ত্ব। ইহা ব্যতীত ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্কন, শরীরচর্চা প্রভৃতি আছে। টেষ্ট অফ নিপনেস নামে পরিচিত এক অতি কঠিন পরীক্ষার পর এই পাঠক্রম শেষ হয়। এই পরীক্ষার দুইটি অংশ লিখিত ও মৌখিক। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্যদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। তাছাড়া ইহারা কারিগরী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা আকাদমিতেও যোগ দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত অনুষদ (ফ্যাকাল্টি) আছে: (১) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনুষদ (২) দৈবত্ব অনুষদ (৩) আইনগত অনুষদ এবং (৪) প্রযুক্তি বিদ্যাবিষয়ক অনুষদ, জার্মাণ ও ইংরাজী ভাষা, ইতিহাস, দর্শন, প্রভৃতি দার্শনিক অনুষদের অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিক অনুষদে আছে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং ভূবিদ্যা। আর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। 'জিমনাসিয়ামে' অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী। উনিশ বৎসরের মধ্যেই জার্মাণীর বালক-বালিকাদের বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা জন্মিয়া যায়। সোবিয়েৎ রাশিয়ায় প্রত্যেক বালক-বালিকাকে বিজ্ঞান ও কলা শিক্ষা দেওয়া হয়। রাশিয়ার বয়সের প্রতিটি মানুষ শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় পড়ে। রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত:

(১) প্রাক্-বিদ্যালয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

(২) বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরণের বালক-বালিকা ও প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সাধারণ বিদ্যালয়।

(৩) প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(৪) শিশুদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক (বিদ্যালয় নহে) প্রতিষ্ঠান।

(৫) বৃত্তিগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; এবং—

(৬) প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাংস্কৃতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

রাশিয়ায় সতের বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালক-বালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানের মোটামুটি জ্ঞান পরিবেশন করা হয়—যেন উৎপাদনের মূল শাখাগুলি পরিচালনার নিয়মকানুন তাহারা বুঝিতে পারে।

সহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যতালিকায় কিছুটা তফাৎ আছে। মোটামুটি ভাবে রাশিয়ার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়। রুশ ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি,

প্রাকৃতিক বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ভূবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, বিদেশী ভাষা, কলা, হাতের কাজ এবং কায়িক পরিশ্রম, যান্ত্রিক অঙ্কন, সঙ্গীত, শরীরচর্চা এবং সামরিক শিক্ষা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠক্রম চারি বৎসরের। সাত বৎসর বয়স হইতে শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয় এগার বৎসরে। ইতিহাস, ভূগোল এবং প্রাকৃতিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অসমাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সমাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়। অসমাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র প্রচলিত নহে; তবে রাশিয়ার পরিচালকরা ঘোষণা করিয়াছেন যে ক্রমে ক্রমে গোটা রাশিয়ায় এই ধরণীয় বিদ্যালয়কেই ভিত্তি করা হইবে। গ্রামাঞ্চলের পাঠ্যতালিকাও প্রায় একই; তবে গ্রামাঞ্চলের গোটা পাঠ্যতালিকার মধ্যেই কৃষির প্রভাব পরিস্ফুট। পাঠক্রম সমাপ্ত করিয়া ছাত্রছাত্রীরা অসমাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য ছাত্ররা সমাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা উচ্চ কারিগরী বিদ্যালয়ে যোগদান করে। অবশ্য এ জন্যও একটি 'যোগ্যতা অর্জনের' পরীক্ষা প্রচলিত আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাশিয়ার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যতালিকা বিরাট এবং রাশিয়ার ছাত্রছাত্রীদের একটি করিয়া বিদেশী ভাষাও শিখিতে হয়।

অবশ্য আমি বলিতেছি না যে, দাসসুলভ মনোভাব লইয়া আমাদের রাশিয়া বা জার্মাণীকে অনুকরণ করিতে হইবে। তবে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাহাদের মূল নীতিগুলি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রহণ করিতে পারি।

শিক্ষা মোটামুটি ভাবে তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ। প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের জ্ঞানার্জনের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত করে। মাধ্যমিক শিক্ষা যুবক-যুবতীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে। মাধ্যমিক স্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেন না যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যোগ্য নয় তাহাদের জন্য এই স্তর হইতেই পথ বাছিয়া দিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান অবনতি ঘটান উচিত হইবে না। তাহা হইলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় আমরা ছোট হইয়া যাইব; তখন আর আমাদের ডিগ্রীর মূল্য থাকিবে না এবং ফলে ছাত্রছাত্রীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কৃত্রিম ভাবে পাশের হার বাড়ান উচিত হইবে না; আবার উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলে স্নাতকের সংখ্যা বাড়াইতেও ভয় করিলে চলিবে না। আমার মনে হয় না যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে স্নাতকদের চাকুরী পাইতে অসুবিধা হইবে। কেন না যথোপযুক্ত ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকরা সর্বক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে পারে। রেক্টরের অভিভাষণে ১৯০৭ সালে লর্ড হ্যালডেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বলিয়াছিলেন, "Rather does the University exist to furnish forth a spirit and a learning more noble—the spirit and the learning that are available for the service of the state and the salvation of humanity. The highest is also the most real; and it is at once the calling and the privilege of the teacher to convince mankind in every walk of life that in speaking the highest of its kind, they are seeking what is also the most real of that kind. Whatever occupation in life the student chooses, be it that of study or that of the market place, he is better the greater has been his contact with the true spirit of the University......The University teacher in the first place and only secondarily a researcher. There are of course exceptions to this rule; but no university can support more than a limited number of them."

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি কি? আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির বৈশিষ্ট্য দুইটি। প্রথমতঃ ইহার ফলে চিন্তায় স্বচ্ছতা আসে, দ্বিতীয়তঃ মানসিক ঔৎসুক্য বাড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া উচিত হইবে যে কেন একটি জিনিষ বা কাজ করা হয়; কারিগরী বিদ্যালয়ে কি ভাবে জিনিষটি কার্য্যকরী করা হয়।

এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। যুগের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তৃত সমালোচনায় খুব বেশী লাভ হইবে না। ধীরে ধীরে প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে। যেটুকু সংশোধন প্রয়োজন সেটুকু করিতেই হইবে। এক আধ বৎসরে সমস্ত পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। যে শিক্ষাব্যবস্থা এ দেশের কয়েক জন মহাপুরুষকে সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে আমরা এককথায় ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারি না। হঠাৎ আমরা অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিতে পারি না। ভবিষ্যতকে বুঝিতে হইলে অতীতের পর্য্যালোচনার প্রয়োজন।

আমি বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বছরের পর বছর ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের আকস্মিক উৎপাটনকেই আমি বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন বলি। বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

উল্লিখিত আলোচনার ভিত্তিতে দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজন নির্দ্ধারণ করিতে হইবে এবং দেশের বালক-বালিকাদের এমন শিক্ষা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন সেই প্রয়োজন মিটাইতে পারে। এজন্য আমাদের যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌দের মতামত গ্রহণ করিতে হইবে এবং আগামী কয়েক বৎসর অনুসরণের জন্য একটি পরিষ্কার শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। বড় বড় পাঠ্যতালিকা বা বেশী বেশী পাশ করানো বা গ্রেস মার্ক দিয়া পাশের হার বাড়ানোয় এতটুকুও আস্থা নাই। ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিক বল তাহাতে নষ্ট হইয়া যায়।

ভারত প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। সুতরাং ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিতে কৃষির বিরাট প্রভাব থাকা অবশ্যম্ভাবী। অধিক খাদ্য উৎপাদন করা আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আবার কৃতকার্য্য ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কর্মসংস্থান করাও একটি সমস্যা। শিক্ষিত যুবক-যুবতীদেরও বেকারী হতোদ্যম করিয়া দেয় এবং ইহা দেশের উন্নতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

জ্ঞান আহরণের জন্য শিক্ষালাভ করা মহৎ আদর্শ হইতে পারে। কিন্তু প্রায় সর্বত্রই শিক্ষালাভের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন। পরিবার প্রতিপালনের জন্য অর্থ প্রয়োজন। এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা ভবিষ্যৎ পূর্ণ জীবনের শিক্ষানবিশী বলিয়াও পরিচিত। যুবক-যুবতীরা যাহাতে দক্ষতার সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, শিক্ষার তাহাও একটি লক্ষ্য। ( আগামী মাসে সমাপ্য )

# না জানা কাহিনী

**তাল-বেতাল**

**রেঙ্গুন পতন**

তখনও খুব অন্ধকার। সে অন্ধকার ভেদ করে আমাদের গাড়ী ছুটলো। ক্রমে জঙ্গল ছেড়ে সমুদ্রতীর। দূরে, অতিদূরে সমুদ্রজলে এক অস্পষ্ট আলোর রেখা। স্থির। জলে অস্পষ্ট কিসের আওয়াজ। সে আওয়াজ নিকটবর্তী হতে দেখা গেল, কালো দু'-তিনখানা কি এগিয়ে আসছে। আরও কাছে আসতে দেখা গেল সেগুলো জাহাজ। ওরা আমাদের তুলেছিলো জাহাজে। সেই জাহাজ থেকেই একটা ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছিল রহস্যময় হয়ে। এবার জাহাজ ছাড়লো। তখনও অন্ধকার। একটু একটু করে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সূর্যদেব উঠছেন। আমরা দক্ষিণমুখে চলেছি।

ক্রমে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে হেলেছেন। অন্ধকার আসন্ন। কর্মব্যস্ত দুনিয়া এখন ঘরমুখো। কেবল আমরা তখনো চলেছি। অস্পষ্ট লক্ষ্য অনির্দেশ্য গতিপথে সমস্ত দিন। সমস্ত রাতেও সে জাহাজ চলেছে এবং একখানি মাত্র জাহাজ। কোথায় তা জানি না। ওঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি শুধু মুচকি হেসেছেন। সে রাতেও ঘুম হয়নি। বরং দু-একবার বাইরে এসে দেখে ছ শ্রান্ত কতদূর গড়ায়। নিরর্থক সংশয় ভরা মন। কে জানে, এ যাত্রার শেষ কোথায়? কে জানে আদৌ ফিরবো কি না!

উৎকণ্ঠায় বাইরে এসে বসেছি। রাত ভোর হতে দেরী নেই। তখনও অন্ধকার। জাহাজও ধিকি-ধিকি চলেছে। সেই একই স্পীড। একটানা সুর। আশে-পাশে কেউ কোথাও নেই। একখানা জাহাজে কি লড়াই হবে, তাও ভেবে পাইনে। মাথার উপর ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ একটা কিসের আওয়াজ। চোপ চাইতেও ভয় হয়। নাম-না-জানা এক ঝাঁক উড়ন্ত পাখী। অতিক্ষুদ্র। অনেক উপরে। যেন সাদা মাছি। চেয়ে আছি। উপর আকাশে ওরা এখন একটু করে লালাভ নূতন সূর্যের আভায়। অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে, ত্রিশ পাঁচেক হবে। সোজা উত্তর থেকে এসে একেবারে ঠিক মাথার উপরে। মনে হচ্ছে, রসগোল্লা ছেড়ে যাবে কিছু। নাঃ। তেমন কিছুই নয়। ওরা কোথা থেকে এসেছে। উত্তর থেকে এসেছে। পূবে গেল। জাপানী প্লেন। কি জন্যে এসেছিল, আর কি জন্যে ফিরে গেল, তা আমাদের অজানা।

জাহাজের গতি আরও মন্থর। পূবাকাশে লাল প্রকাণ্ড একখানা চাকতি। সূর্য দেখা দিয়েছেন। তাঁর লাল রোদের আভায় চারদিক বেশ মনোরম মনে হচ্ছে। রোদ আরও খরতর হোল। আরও কয়েকখানা জাহাজ কোথা থেকে এসে পাশে জুটেছে। বহুদূরে পূবে জলের উপর ক্ষীণ তটরেখা। সে রেখা নিকটবর্তী হতে ক্রমে দেখা দিল জমি ও গাছপালা। ইরাবতী নদীর মোহনা। সামনে ছোট ডেস্ট্রয়ার পথ দেখিয়ে চলেছে। আশে-পাশে জলে ভাসছে একখানা খুব ছোট লাল পতাকা। ওটা চলছে তর তর করে, জলের ভিতর এদিক ওদিক ঘুরছে। আগে নজর হয়নি। বোধ হয় আমাদের কোনও জেনারেলের সাবমেরিন। নির্দেশ দিয়ে ফিরছে। নদীর মোহনায় পড়ে, সেই নদী বেয়ে জাহাজ ক্রমে চলেছে উত্তরমুখো। দুধার নিস্তব্ধ জঙ্গলাকীর্ণ। কোথায় টুঁ শব্দটি নেই। কোথাও লোক নেই। না নদীতে, না গঙ্গায়। নদীতে নৌকোও নেই কোনো। বাড়ী-ঘরও নজরে এলো না কোনো। কোথাও একটা প্রাণীর শব্দও নেই।

বিকেল চারটা হবে। দেখা দিল রেঙ্গুন সহর। চীনা, ভারতীয়, নানা জাতীয় লোক মিলে নানা রঙের নিশান তুলে জাহাজঘাটে এসেছে ওরা আমাদের সসম্মান অভ্যর্থনায়। জাপানীরা গেলো কোথায়?

যুদ্ধ কি তবে শেষ হ'লো অথবা পশ্চাদপসরণ? আমাদের আগমনের সংবাদ পেয়ে ওরা পনর দিন আগেই রেঙ্গুন কুইট্ করেছে। মিত্রশক্তির যে প্ল্যান সংগোপনে আঁটা হয়েছে রেঙ্গুন আক্রমণের পনর দিন আগে। সে সময় ওরা সংগ্রহ করেছে সাথে সাথে এবং কুইট করেছে। নেতাজীর আরও দিনকতক পরে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রেঙ্গুনে নেমেছি। যে রাস্তায় প্রথম চলেছি, ওটা কলকাতার ক্লাইভ ষ্ট্রীট —(আধুনিক নেতাজী সুভাষ রোড)। দুধারে বড় বড় ব্যাঙ্ক মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কও। দরজা জানালা সব খোলা। বন্ধ নেই কোনটাই। অথচ লোকজনও নেই কোনো। না রাস্তায়, না কোথায়ও। ওরা কি খোলাই থাকবে? দেখা গেল, দরজা জানালাই নেই একেবারে। ছিল না যে তা নয়। খুলে নেওয়া হয়েছে। পথঘাটও বন্ধ। কারণ পথের দুধারে টাকার পাহাড় জমে আছে। এ এক অদ্ভুত কাণ্ড! এক টাকার নোট থেকে শুরু করে পাঁচ টাকা, দশ টাকার, সব রকমের নোট খুব উঁচু হয়ে পাহাড় জমে আছে। দুপাশে দুজন লোক দাঁড়ালে কেউ কাউকে দেখতে পাবে না। পুরো রাস্তাটায় এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঐ এক কাণ্ড! অর্থাৎ টাকা ছড়ানো! হঠাৎ এ যেন বিংশ শতকেও আলাদিনের কারবার! বিরাট ঐশ্বর্য আর আমার বরাত জোর! একে ত মহাসাগরে জাহাজ ডুবির ফলে পাঁচ ঘণ্টা সমুদ্রে ভেসে ছিলাম। এ তারই পুরস্কার! আর টাকার ভাবনা নেই। এবার টাকার কুমীর হয়ে ঐ পাহাড়ে চেপে বসি। মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাক। একবার মনে হোল, এ স্বপ্ন! সন্দেহ হোল, আমি জাগ্রত কি না! পরখ করে দেখা দরকার। চুল টেনে দেখছি। নাকে কানে চিমটি কেটে দেখছি ব্যথা পাই কি না। স্বপ্ন কি না তারই পরখ। লোভের আতিশয্যে এবার সেই নোটের পাহাড়ে চেপেছি। ও পাশে ওই নোটের পাহাড়ে ধোঁয়া। আগুন লেগেছে। কবে যেন বর্ষাও হয়েছে একটু। নোট সব চেপ্টে লেপ্টে বসে আছে। হাওয়ায় ফুর ফুর্ করে উড়ছে না। নোট হাতে নিয়ে দেখছি। নোটই বটে, জাপানী কারেন্সী। কে জানে এই নোটের ইতিহাস?

রাতটা কেটেছে পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সের চারতলায়। কোনো পুলিশ নেই। নীচের তলাগুলো সব নোংরা আর ধুলো। রাস্তায়ও পুলিশ নেই কোনো। লোকই নেই কোথায়ও। রাস্তা অন্ধকার, আলো জ্বলেনি। দোকানপাটও বন্ধ। দূরে দূরে দু'-একজন লোক দেখা যায় চাঁদের আলোয়। ওরা বেপরোয়া। আমাদের লোকও হতে পারে। এতবড় সহর, কিন্তু জনমানবশূন্য!

জয়ের উত্তেজনায় সারা রাত ঘুম হয়নি। সকালে উঠেই চায়ের নেশা এবং বিছা ছেড়ে একেবারে রাস্তা। কোনো দোকান

খোলে নি। খুলবে কি না, কে জানে? অনেক দূর গিয়ে দেখি, একখানা দোকানের একখানা পাল্লা খোলা। ঢুকে পড়েছি আমরা তিন জন। কয়েকজন লোক মিলে কি পরামর্শ চলছে, আর চা খাওয়া হচ্ছে। আমরাও অর্ডার দিলাম। অর্থাৎ একটা করে চা ও একটা করে ডিম। চা এলো। বিলও এলো মাথা-প্রতি চল্লিশ টাকার। আমি তো চটেই লাল। সোজা চৈনগানটা তাক করে ধরলে মালিকের প্রতি। বললে—Have you ever seen it? দোকানদার অতি বিনয়ী। হাত জোড় করে বললে,—আপনারা দাম দিতে চাইছেন, বা ন্যায্য দাম এখানকার, তাই বলেছি। দিতে হয় দিন। না দিতে হয়, চলে যান, আমি আপত্তি করবো না। রেগে যাচ্ছেন কেন শুধু শুধু?

এখন বুঝেছি ঐ কালকের দেখা নোটের পাহাড়ের মর্মকথা। আলাদিনের টাকার পাহাড় কেন রাস্তায় পড়ে আজও। দাম মিটিয়ে দিয়েছি, অবশ্য আমাদের হিসাবে। টাকার পাহাড় তো আর সঙ্গে নেই। আলাদিনের প্রদীপও জানা নেই। এবার সহর দেখতে হবে।

রেঙ্গুনের পতন ঘটেছে অতি সহজে। একটিও বুলেট খরচা হয়নি, কোনো পক্ষেরই রক্ষীদল থেকে। এত সহজে রেঙ্গুন রি-অকুপেশান আশাই করা যায়নি। সাত দিনের তড়িৎগতি যুদ্ধে যারা পুরো বার্মা দেশ জয় করেছিল, প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ-সিংহকে তাড়িয়ে, এত সহজে তারা রেঙ্গুন ছেড়ে যাবে, এ কল্পনাতীত! এত সহজে ওরা পিছু হঠে গেল কেন? রাস্তার দু' ধারেই বা অত নোটের পাহাড় কেন?

জাপান এ দেশ জয় করেছে সহজে, কিন্তু কব্জা করতে পারেনি। কব্জা করা শক্তির জোরে চলে কি? ওখানে প্রকৃত মগজের লড়াই। কৃতিত্বের কথা সেখানে। প্রমাণ ঐ নোটের পাহাড়! ভারতে ইনফ্লেশান্ সম্বন্ধে একখানা কার্টুনের কথা মনে হচ্ছিল। কোরিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে, ইনফ্লেশান সম্বন্ধে জাপানী কার্টুন। দেখানো হয়েছে তাতে বৃটিশ অর্থনীতির স্বরূপ। গাড়ী-বোঝাই টাকার বস্তা, কর্তা বাজার চলছেন। পরের ছবিতে গাড়ী খালি করে তরকারী নিয়ে কর্তা বাজার করে দিয়েছেন। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানী অকুপেশানে ঠিক ঐ কাণ্ডটি ঘটেছে।

কালোবাজারী ব্যবসায়ীরা চেয়েছে টাকা লুঠ করতে। জিনিষের দাম বেড়েছে অসম্ভব। দু' টাকা থেকে দু'-পাঁচ হাজারে। ওরাও অস্বীকার করেনি। পেপার মিল থেকে সটান পেপার গেছে প্রেসে। সেখানে ছাপানো হয়ে গেলো সব টাকা—পাঁচ, দশ, শ' এবং হাজার টাকার নোট। এক সেন্ট, দু' সেন্ট, এক টাকা, আধ টাকারও ছাপা হয়েছে। ক্রমে তারা অচল হয়েছে। কারণ, চালের দর দুই টাকা থেকে দর চড়তে চড়তে ক্রমে পাঁচ হাজারে গিয়ে দাঁড়ালো। ওরাও অস্বীকার করেনি। নোটের বস্তার মুখ খুলে দিয়ে বলেছে—লে যাইয়ে, যেতনা খুশি। সেই সব নোটে ব্যাঙ্ক ভর্তি হয়েছে। লোকের ঘর ভর্তি হয়েছে, নোটের বস্তায় ছাদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। ক্রমে বারান্দা এবং বাড়ীর উঠোনও! এ সেই নোট। হ্যাঁ, তবে একটা জিনিষ! কেউ 'না' করতে পারেনি। সাহস করে বলতে পারেনি, এ কাগজের নোট অচল। নেব না। একজন দোকানদার নাকি বলেছিল সে কথা, এবং একবার মাত্র। তার গলা আর শোনা যায়নি। তাকে কেউ আর দেখতেও পায়নি সেই থেকে। একজন জাপানী সৈনিক এসে তার বিচার করেছিল। অতি সরল এবং সংক্ষিপ্ত। দোকানদারের এ-গালে এবং ও-গালে গোটা দুই জোর থাপ্পড় আর ধরে নিয়ে যাওয়া। একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী বলেছিল,—জাপানীরা বৃটিশ কারেন্সীর দাম দিয়েছিল ১০% পার্সেন্ট। আমাকে জিজ্ঞাসা করলো—বৃটিশ এখন জাপানী কারেন্সীর কত পার্সেন্ট দাম দেবে? আমি তো ইকনমিষ্ট নই, তবু বলার সুযোগ পেলে কে ছাড়ে? বলেছি—অন্ততঃ ৫০ পার্সেন্ট দেবে। মনে মনে ভেবেছি, এক পার্সেন্ট দাম দিলেও সবাই তোমরা কোটিপতি।

এর পর আরও অদ্ভুত! রাস্তায় সুরু হোল লোক চলাচল এবং হট্টগোল। লোক চলছে, দিন-রাতে চব্বিশ ঘণ্টা। বিরামহীন। এ এক লুঠের মিছিল। রেঙ্গুন সহরে লুঠপাট সুরু হয় আমাদের চোখের সামনে। লোকের বাড়ী-ঘর, দোকানপাট, আসবাবপত্র সব ভেঙ্গেচুরে লুঠ চলেছে। হরেক রকমের গাড়ীর আমদানী। মোটর গাড়ী নয়, ঠেলাগাড়ী। দু'খানা, নিদেন একখানাও চাকা যে জোগাড় করতে পেরেছে, তাতেই রড পরিয়ে গাড়ী খাড়া করা হয়েছে। বিদেশীরা পালিয়েছে। তাদের বাড়ী-ঘর, কলকারখানা, ফার্ম, অফিস লুঠ করে চেয়ার, টেবিল, আলমারী, আয়না, কোচ সব তাতে ভর্তি করে রাস্তায় মিছিল চলেছে। লম্বা মিছিল। রাস্তার এ-মাথা আর ও-মাথা endless—দিন নেই, রাত নেই, ক্রমাগত সাত দিন। রাতে ঘুমোবার উপায় নেই। ক্যাঁচকোঁচ ঘড়ঘড় আওয়াজ। ক্রমে দরজা-জানালা ভাঙ্গার শব্দ। শেষে সে সবও খুলে নেওয়া চলছে। বালক বৃদ্ধ যুবা মেয়েমদ্দ সবাই সে মিছিলে যোগদানকারী। শিশুরা পর্যন্ত টেনে চলেছে সেই অদ্ভুত হাতগাড়ী। বাড়ীতে কারও বসবার যায়গা নেই। মালে ঠাসা ছাদ আর মটকা। ঘর ভর্তি, বারান্দা ভর্তি, ক্রমে উঠোনও ভরে গিয়েছে। ওরা মাথা গুঁজে সেই উঠোনেই রাত কাটায় কোন রকমে।

বৃটিশ সাত দিন থমকে ছিল। কোনো কথা বলেনি। আই, এন, এর লোকে রেঙ্গুন ভর্তি। সম্ভবত তাদের ভয়ে। হেড্ কোয়ার্টার্সেরও কোনো নির্দেশ নেই। অপ্রত্যাশিত অবস্থা। আক্রমণের আশঙ্কা ছিল পুরো মাত্রায়। সেখানে আত্মসমর্পণ করল আই-এন-এ। নেতাজীর নির্দেশ ছিল সেইরূপ। বৃটিশও কাউকে এ্যারেষ্ট করেনি। ঠিকানা রেখে ছেড়ে দিয়েছে। সাত দিন বাদে হুকুম এলো সমস্ত কণ্ট্রোল নেবার! এর পর সুরু হোল ধরপাকড়! লুঠ বন্ধ হয়েছে। তারপর যা ঘটেছে, সবারই জানা কথা। আই-এন-এর সমস্ত ভার নিয়েছে গণনারায়ণ। টলমল করে উঠেছে বেনিয়ার গদী। ওরা শেষ পর্যন্ত ভারত ছাড়তেও বাধ্য হয়েছে। কিন্তু শিকড় ছেড়েছে পুরোনো বটের—হঠকারিতায়। ভূত ছেড়েছে ঘাড় থেকে, কিন্তু ডালও ভেঙ্গেছে অশ্বত্থের বিশালতা ক্ষুণ্ণ করে।

## অন্ধের দেশ

অর্ডার এসেছে পুরোনো ওসির কোরিয়া যাবার। যাওয়ার আগে তার হাউ-হাউ করে সে কী কান্না! প্রাণের মায়া, আর জাপানী স্নাইপারের ভয়। সাদা চামড়ার মানুষকে আমি কাঁদতে দেখলাম এই প্রথম। ওর দামী জিনিষপত্র, শীতের স্যুট, অমন

দামী ক্যামেরা, পার্কার সেট সবই বিলিয়ে দিলে। তাকে বিদায় জানাতে গিয়ে আমিও কিছু তত্ত্বকথা ঝেড়ে এসেছি, এ সুযোগ ছাড়া যায় না! এ সংসার মায়া এবং বৃহৎ স্বপ্নবিশেষ—সুতরাং সুখ-দুঃখ ক্ষণিকের। জীবনই যেখানে ক্ষণিকের। তত্ত্বকথা বলার ফলে লাভ হোল ওর ক্যামেরাটি। সেটি রেখেছি এক স্মৃতি হিসেবে আজও।

এর পর ও সি হয়েছেন মেজর স্মিথ্। ব্ল্যাক কি গোল্ড্ জানি না। ক্যাপ্টেন থেকে মেজর। প্রমোশন পেয়ে সবারই মেজাজ খোস হয়। বিকেলে ওরই ব্রিগেটে বাহির হয়েছি। সারি সারি বোতল সাজানো দেয়ালের গা দিয়ে। প্রায় ডজন চার পাঁচ ব্রাণ্ডি, হুইস্কী, জিন আর রাম। খালি বোতল নজরে এলো না কোনো। বোঝা গেল, ওরা যেমন আসে, তেমনি থেকে যায়। মুখ খোলে না কেউ, খোলাও হয় না। জিজ্ঞাসা করলাম What's that ; Why they are idle ; ওর সদ্ব্যবহার কর না?

মেজর বললেন, আমার বাবা ও জিনিষের অনেক বেশী সদ্ব্যবহার করতেন। তিনি ওর কদর বুঝতেন। শেষ পর্যন্ত বিষয় সম্পত্তি বেচেও ঐ জিনিষের সম্মান বজায় রেখে গেছেন। আর বুঝতেই পারছ, আমাদের দিন কেটেছে না-খেয়ে। কাজেই, পরখ করে দেখছি, ওরা আমাকে চেনে, না আমি ওদের চিনি। সব সময়ে ওরা সামনে থাকে। ছুঁই না। যদি দরকার হয়, তুমি নিতে পার। As much as you like.

বলা বাহুল্য, দুখানা হুইস্কী দুই বগলে পুরে চেপে বসে রইলাম। এ এক অদ্ভুত জীব! খাস বৃটিশের শীতের দেশের বাচ্ছা। পণ করেছে, মদ ছোঁবে না।

যথারীতি চা এলো। ডিম-সেদ্ধ, টোষ্ট, আর গ্রীণপী। সেগুলো খেতে খেতে মেজর স্মিথ্ টেনে বের করলেন তাঁর পারিবারিক ইতিহাস। একখানা ফটো এলবাম্। আড়াই হাজার টাকার ক্যামেরা কিনেছেন সেদিন। তাতেও নিজের ফটো তুলেছেন দেখালেন। আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ক্যামেরা আপনিই ফটো তুলে যাবে একখানা করে। সে ব্যবস্থাও রয়েছে এতে, দেখালেন নিজে ও সি।

এলবামের পাতায় লেখা ওর পারিবারিক ইতিহাস। একখানি ফটোতে তিনটি মহিলা। একজন বর্ষীয়সী, বুড়ী বলা চলে। চেয়ারে বসা, গালও বসা! দুজন দুপাশে দাঁড়িয়ে। একজন বেশ সুন্দরী ও যুবতী। সুতরাং প্রথমেই নজরে পড়ে যায়। জিজ্ঞাসা করলাম, এটি কে? Your girl?

মেজর বললেন,—No, that's my sister.

—Then it must be this? পাশে আর যে দাঁড়িয়ে কমবয়সী, তাকে দেখিয়ে বললাম। শান্তভাবে জবাব দিলে—No, that's my sister's friend.

বুড়ী যিনি বসে আছেন, ওঁর মা মনে করে বললাম,—But your mother looks pretty young?

একটা আওয়াজ এলো—sh-sh- at! She is my girl.

—Oh Christ! She is much older than you and most cad?

—You are silly, M.—have no sense আমরা সাম্রাজ্য রক্ষা করছি এখানে। আর ওখানে ইয়াঙ্কিরা মজা লুঠছে আমাদের দেশ চষে বেড়িয়ে মনের আনন্দে।

—Oh! That's alright! You are enjoying a hell with our mothers and sisters here and in India. And Yankis are quite at home with the whole of your family there. Nothing unnatural!

—Look! Don't be a donkey. My idea is this, nobody will like this ugly girl, whom I like very much. It's really ugly and repelling, but not to me. She is tune to me.

এ-ও এক অদ্ভুত philosopher! সশব্দে বুটের আওয়াজ তুলে ঘরে ঢুকলেন, দুজন। ক্যাপ্টেন ডেন্ আর লেঃ বাও।

আবার চা এলো। কথা উঠলো লীডার নিয়ে। চায়ে চুমুক দিয়ে মেজর জিজ্ঞাসা করলেন। মিঃ, তোমাদের লীডার কে? গান্ধী? না, নেহরু?

ওটি নিষিদ্ধ বস্তর একটা। মিলিটারীতে অচল। কিন্তু খোদ ও সি যখন তুলেছেন! তখন বাধা কোথায়?

বোবার শত্রু নেই। কারণ কথা বলতে না পারাটা ওর একটা মস্ত সুবিধা। কথা বলায় বিপদ অনেক। জানি না, বলে যে কোন প্রশ্ন এড়ানো যায় সহজে। চালাক লোকের কাজ,—একটু বোকা সেজে থাকা। সোজা উত্তর দিলেও মুস্কিল! সূত্র ধরে টান পড়লে ঝামেলা বেড়েই চলবে। বিশেষত যার পেছনের ইতিহাস বৈপ্লবিক। আর ওরাও অনুসন্ধিৎসু জাত। প্রশ্ন এড়ানোর আর এক সহজ উপায়—পাল্টা প্রশ্ন। বুদ্ধিমানের কাজ। তেমন তেমন কড়া প্রশ্ন হলে, ওর বাবা ঠাকুরদার নামও ভুলে যাবে। কিন্তু হঠাৎ মনে এলো, এ প্রশ্ন কেন? ওরা বাঙালীকে ব্রেনী বলে জানে। মনের রঙ্ ধরার চেষ্টা? সাদা, গেরুয়া, না লাল? অর্থাৎ অজ্ঞ, কংগ্রেস, বা কমুনিষ্ট? সহজে হাল ছাড়ি কেন? ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—না। ওঁরা কেউ নয়। আমাদের নেতা নেই।

মেজর এবার আকাশ থেকে পড়লেন। ওঁর মুখের হাঁ বড় হতে হতে বিরাট জিজ্ঞাসা চিহ্নে পরিণত হয়েছে। ক্ষণেক আমার মুখের পানে কড়া দৃষ্টি মেলে চাইলেন। বললেন—তার মানে?

আমাকে বলতে হোল,—সংকীর্ণ-হৃদয় নেতৃত্বের কাজ নয়। সমস্যার জাল বুনে জাল ছাড়ান ত নেতৃত্বের কাজ নয়। দেশ চায় সমস্যার সমাধান। ওঁরা সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছেন। সমাধান করেননি।

ক্যাপ্টেন ডেন—what's that problem?

—কেন, হিন্দু মুসলমান সমস্যা?

ডেন বললেন,—তোমাদের মতে ওটাতো আমাদের সৃষ্টি।

—হাঁ, আমরা তা বলি। কারণ নেতৃত্বের এটাই সোজা রাস্তা। আমাদের ভূতপূর্বরা বলেন Caste system ভগবানের সৃষ্টি। সে হিসেবে তোমাদের আমরা ভগবানের কাছাকাছি গণ্য করি।

ডেন—একটা গল্প আছে, কান্‌ট্রি অব দি ব্লাইণ্ড। জানো?

—জানি। অন্ধের দেশ।

—দেশটা কোথায়, জানো ?

—ওটা তোমাদের লেখা। ভদ্রলোক একাধারে সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকও। কোনোদিন পর্যটনে এদেশে হয়তো এসেছিলেন। না দেখলে এমন চমৎকার কেউ লিখতে পারে না।

—এ দেশতো বার্মা। you mean India ?

মেজর বললেন—তা কেন ? পুরোন কালচারের দেশ চায়না, মিশর, ইরাণও তো হতে পারে ?

বললাম—না। জাত হিসেবে একদিন ছিল ব্রেনী। অথচ তারপর যুগ-যুগান্ত অন্ধ। চারদিক ন্যাচরাল প্রটেকশান। সে শুধু ভারত সম্বন্ধে খাটে।

ডেন—সত্যিই কি তোমরা অন্ধ ?

ওঁর চোখে স্নিগ্ধ কৌতুক।

—চোখ থাকতেও যে চোখ বুজে থাকতে ভালবাসে। দেখতে চায়ও না। তারাই তো সত্যিকারের অন্ধ। আমরা সম্বিৎ হারিয়েছি, আত্মকর্তৃত্ব হারিয়েছি হাজার বছর। জেগে উঠেছি অনেক পরে। কেন ? তা কয় জনে খোঁজ রাখে ? যারা রাখে, তারা রেমিডি জানে। নাদিরশা, মামুদশা, আর তৈমুর বহু দূর দেশ থেকে এসে ভারতের ঐশ্বর্য লুঠ করে চলে গেল। হাজার হাজার মণ রূপো ফেলে গেল অবজ্ঞাভরে, ভার বইতে না পেরে। আরও আশ্চর্য ! এই দেশের ঐশ্বর্য, এই দেশেরই হাতী ঘোড়া লোক-লস্করের পিঠে করে নিয়ে গেল। বাকী যা ওরা ফেলে গেল, তা লুঠ করেছ তোমরা শতাব্দী ধরে।

ডেন—লুঠেরা গালটা দিও না।

—লুঠেরা নয় ? Egotist, your forefathers were intelligent and brainy, They created the Indian Empire. You are their clever and worthless descendants, loosing it day by day.

ডেন—তোমাদের ইণ্ডিয়ান bossকে এরকম গাল দিলে কি হোত জানো ?

—সে তুলনায় তোমরা far superior তোমাদের নার্ভ আছে, স্বীকার করি।

—সেকথা আরও ভাল করে বুঝবে, আমরা যদি ভারত ছাড়ি। তখন দেখবে, nepotism, favouritism আর corruptionএ দেশ ছেয়ে গেছে। Efficiency পাষাণ চাপা পড়ে আছে। বরং মনে করো, যারা এক'শ বছর দেড়'শ বছর আগে নিজের সভবিধবা মা-বোনকে জ্যান্ত অবস্থায় চিতার আগুনে চেপে ধরে সতী বলে চালিয়েছে, গঙ্গায় সন্তান আর কাঁটা-কোঁড়াসহ গাজনে বাহবা বা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। বিরাট অংশকে অন্ধকারে বলি দিয়ে নিজেরাও ডুবেছে, ওদেরও ডুবিয়েছে। আবার আত্মপ্রসাদও লাভ করেছে তাই ভাল বলে। তারা নিজেরা অন্ধ তো বটেই ! কিন্তু ব্রেনী বলো কি করে ?

—ওসব অনেক কীর্তি তোমাদের দয়ায় উঠে গেছে আজ। কাজেই দাম বাড়িয়ো না আর। যারা নববই পারসেণ্টের ঘামের দাম আরামে ভোগ করতে জানে, রক্ত জল না করেও, সেই দশ পারসেণ্টকেও তুমি ব্রেনী বলতে রাজী নও ?

ডেন—তাহলে কিছু চক্ষুষ্মান্ বলো ?

—চতুর বলতে পারো। ইনটেলিজেণ্ট নয়। ও দুটোতে তফাৎ অনেক।

ডেন—কিন্তু আমার গল্পের লোকরা বংশপরম্পরায় অন্ধ ছিল।

—ওটা বৈজ্ঞানিক ধোঁকা। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে, মাতা-পিতা দু জনই অন্ধ হলেও সন্তান অন্ধ হয় না। অন্ধত্বের কারণ অন্যত্র। তাই লেখক বলছেন,—ও দেশে এক অদ্ভুত প্লেগ এসেছিল। মানুষ মরেনি। কিন্তু তার চক্ষুর বংশানুক্রমিক জিম্‌টি নষ্ট হয়েছে চিরতরে।

ডেন—এটা ভারত না-ও হতে পারতো।

—নিশ্চয় পারে। কারণ ভারতেরও চার পাশে ন্যাচ্‌রাল প্রটেকশান। পাহাড় আর সমুদ্র।

মেজর শুনছিলেন এতক্ষণ। অধীর হয়ে বললেন—কিন্তু গল্পটাই যে জানি না।

ওরা না জেনে জানার ভাণ করে না। সে সাবঅর্ডিনেটের কাছেও না।

ডেন বললেন,—শোন, তবে বলি। মহাসমুদ্রের মাঝে এক নাম-না জানা দ্বীপ। দূর থেকে জাহাজ চলে যায়। ওখানে লোক নেই বলেই লোকের ধারণা ভূতুড়ে দ্বীপ। দ্বীপের চার দিকেই পাহাড়। আর পাহাড়ের পরই সমুদ্র। চমৎকার ন্যাচ্‌রাল প্রটেকশান। দৈবাৎ ওর কাছাকাছি জাহাজডুবির ফলে এক যুবক ওখানে অজ্ঞান অবস্থায় ভেসে ওঠে। ও অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়ে এক ভদ্রলোক ওকে বাড়ীতে নিয়ে যান। ভদ্রলোকের একটি মাত্র সন্তান—কন্যা। ষোড়শী, সুন্দরী যুবতী কিন্তু অন্ধ। বাপ-মা অন্ধ। সে দেশের সবাই অন্ধ। চোখ হওয়ার মূল বস্তুটি বংশগতি থেকে লুপ্তি পেয়েছে, peculiar এক প্লেগের ফলে। স্বাস্থ্যবান যুবক-যুবতী। শাস্ত্রে বলেছে,—ঘি আর আগুন। (তখন বোধ করি পেট্রোল ছিল না।) যা হওয়া স্বাভাবিক। উভয়ে উভয়ের প্রেমে পড়লেন। ওদেশে ওদের কারও চোখ না থাকলেও, সে অভাব পূরণ করেছে আর চারটি ইন্দ্রিয় এবং ব্রেন। চোখের শক্তি ওরা নিয়ে ওদেরও কর্মক্ষমতা বেড়েছে প্রচুর। ফলে চোখের অভাব তারা নিজেরাও জানতো না। ওদের অভিধানের নতুন ব্যবস্থা করতে হয়েছে। রঙ বাচক শব্দগুলো একদম উঠে গেছে। আমরা বলি—The sky is blue ওরা বলবে The sky is something smooth to the touch. বহু দূরে কে আসছে বা আসছে না, সে ওরা বলতে পারে। গোল বাধলো চক্ষুষ্মান লোকটিকে নিয়ে। সে বলবে—গোলাপ ফুল লাল। আকাশ নীল। 'লাল' 'নীল' প্রভৃতি শব্দ শুনে মেয়েটি বলে,—ও আবার কি ?

—ও রঙের নাম।

—রঙ কি ?

—সে আমি দেখতে পাচ্ছি। তুমি দেখতে পাবে না।

—দেখা কি বস্তু ?

—তোমার চোখ নেই। দেখা কি, তোমাকে বোঝানো মুস্কিল।

সুতরাং এবার গোল বাধে। ওখানে নয়, বাইরে। সুন্দরী যুবতী হলে প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকা সম্ভব। আত্মীয়-স্বজন এ বিয়েতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। ডাক্তার দেখাও। মেয়েটিরও

সেই অনুরোধ। এটা রোগবিশেষ। সবাই ঐ এক কথা বলে। সুতরাং আর উপায় নেই। মেয়েটির অনুরোধেও ডাক্তার দেখাতে হয়। পোড়া দেশের পোড়া ডাক্তার। ডাক্তার সাব্যস্ত করলেন, ব্রেনে গোলমাল, কপালের নীচে এক অদ্ভুত গ্রোথ.। যার একমাত্র উপায় অপারেশান করে ফেলে দেওয়া। নতুবা, ছোঁয়াচে রোগ, অপরকে ধরবে। অপারেশান ছাড়া গত্যন্তর নেই। সবাই বলে, বড্ড ছোঁয়াচে। কারণ, মেয়েটিও ওরকম নতুন নতুন কথা বলতে সুরু করেছে। অপারেশান। কিন্তু কি বস্তু হারাতে হচ্ছে, সে জানে ছেলেটি এবং অন্তর্যামী। এক দিকে লাভার। যৌবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তু। অপর দিকে চক্ষু—জীবনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দ্বন্দ্ব বাধে। ঘোরতর অন্তর্দ্বন্দ্ব। সাত দিন সময়। সাত দিন বাদে অপারেশান এবং বিয়ে। নতুবা মৃত্যু। সুতরাং খাওয়া-দাওয়া, নিদ্রা নেই। সাত দিন এবং সাত রাত। ভেবেই চলেছে! লাভার বড়, না চোখ বড়? দিনের আলোয় চোখ বড় হয়। জীবনের এ সেরা বস্তু। যার অভাবে দুনিয়ার সব রং, সব তামাসা তামসী রূপ অন্ধকার হয়ে যায়। রাতের আঁধারে লাভার। বিশেষ বয়সে লাভার জীবনের চাইতেও বড় হয়ে ওঠে! মানুষ পাগল হয়, আত্মহত্যা করে। জীবন বিসর্জন দেয়, উৎসর্গ করে। ক্রমাগত সাত দিন এবং সাত রাতে শরীরের সব রস যখন ঘন, নিঃশেষ, তখন ক্ষণিক চৈতন্যোদয়। মনে হোল, লাভার ক্ষণিকের। যৌবনের মোহে অন্ধ আসক্তি। চক্ষু বস্তু। সারা জীবন ব্যাপিয়া তার রস সর্ব অঙ্গে মেলে। একটি ক্ষণিকের ধন। অপরটি সারা জীবনের। একটি মেলে একাধিক বার। কিন্তু অপরটি? ও দুইয়ের তুলনাই চলে না। চোখ ফুটতে ও শেষ রাতে দরজা খুলে পালালো। পেছনে ধর-ধর রব। পাহাড় পর্বত নদী নালা ডিঙ্গিয়ে ও ছুটলো সমুদ্রের পানে। ওরাও পিছু নিলো পাহাড় পর্বত বন-বাদাড় নদী-নালা ভেঙ্গে। হাঁপাতে হাঁপাতে সমুদ্রের কূলে পৌঁছে ও জ্ঞান হারালো। ওরা ফিরে গেল। পারবে কেন চক্ষুষ্মানের সঙ্গে? যখন জ্ঞান হোল, তখন এক জাহাজে আশ্রয় পেয়েছে। ঐ পথ দিয়ে জাহাজখানা যায়। মানুষ দেখতে পেয়ে ওরাই তুলে নিয়ে সেবাশুশ্রূষা করে বাঁচায়। সবাই জিজ্ঞাসা করে—নির্জন দ্বীপে কি করছিলে?

ওরা বলে, নির্জন নয়। এ অন্ধের দেশ।

ডেনকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি ধারণা, আজও আমরা অন্ধ?

ডেন—তোমরা অন্ধ, এটা তোমরা বুঝতে শিখেছ মাত্র। আর তাও মাত্র দশ পারসেণ্ট লোকে and at the cost of huge wealth.

—তার মানে?

—যারা পুরোপুরি অন্ধ, তারা সমাজের নব্বই জন। তাদের তো চৈতন্য তোমরা খেয়ে রেখেছ। বাকী দশজনের শুধু নিজেদের সম্বন্ধে খানিকটা চৈতন্য হয়েছে। আর নব্বইজনের জন্যে নয়।

—আরও একটু খোলসা হওয়া দরকার।

## p-ফরমূলার নেতৃত্ব

—কিন্তু আসল কথা ছেড়ে আমরা বহুদূর এসে পড়েছি।

—হ্যাঁ। আমাদের আসল কথা ছিল লীডার নিয়ে। লীডারদের মতে, ধর্মসমস্যা তোমাদের অর্থাৎ বৃটিশের সৃষ্টি। কৃত্রিম।

মেজর—তোমার কি ভিন্ন মত?

বললাম, আমাদের দুজনকার ভিতরের প্রণয় যদি প্রগাঢ় হয়, অথবা নিজেদের যদি ঘনিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় আত্মবিশ্বাস থাকে, তৃতীয় পক্ষের কথায় সে প্রণয়ে বাধা কোথায়? আমার বুদ্ধির অতীত। প্রেমে খেলায় কি হয়? ওটা শ্রেফ মনকে চোখ ঠারা। যাকে নিরেট—

ক্যাপ্টেন বাধা দিলেন। কি বলতে যাচ্ছিলেন। বলা হোল না। বলতে অবশ্য আমিও পারতাম।

বলতে আমি পারতাম, আমাদের লীডার অনেক। মনেও এলো নেতৃত্বের Pফরমূলার কথা। purse, press and platform টাকা, দল আর কাগজ, এই তিন নেতৃত্বের পুঁজি। ব্যক্তিত্বের পুঁজি। ব্যক্তিত্বের প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? মনে এলো জিন্নার কথা। সেই জিন্না। একদা যিনি ছিলেন কংগ্রেসে। অনেক দিনের কথাও নয়। তবুও তা চলে গেছে বিস্মৃতির যুগে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের খোলা সভায় খোলা কথায় প্রস্তাব এনেছেন,—We want swaraj সর্বনাশ! এ বাঙালী কেয়া বোলতা হ্যায়? হঠাৎ চমকে উঠেছেন কংগ্রেসের সব নেতা ভাইরা! কংগ্রেস ডুবলো! কারণ, স্বরাজ, চরখা, আর বন্দে মাতরম্? ও তিনটে শব্দ বৃটিশের কানে অতি অসহ্য। বোধ হয় রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠতো। কে জানে? সোজা পুলিশ এসে তখন দড়ি দিয়ে বাঁধতো এবং নিয়ে যেত বিদ্রোহী বলে। এবং রাজদ্রোহের অভিযোগে বছর কয়েক শ্রীঘর। ওতে ওদের জুজুর ভয়। হোমড়া-চোমড়া সবাই ভয়ে জুজুবুড়ি হয়ে বসে আছেন। কানে কানে কথা বলছে। প্রস্তাব এনেছেন সুভাষ, সেকথা কেউ সমর্থন করা দূরে থাক, মুখ ঢেকেছেন সবাই। এখন নেতা কাউকে চেনা যায় না। শুধু খস খস আওয়াজ। বোমা পড়াও যে এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল। উঠে এলেন একমাত্র মহম্মদ আলি জিন্না! I second it. তেজীয়ান বীরপুরুষ!

কংগ্রেস যায়-যায়। নেতারা চিন্তিত হলেন। বুদ্ধির প্যাঁচ কষলেন। ক্ষুরধার পেঁচোয়া পলিটিক্স বুদ্ধিতে তখন শাণ ঘসছেন, সবাই নেতা—আমরা স্বরাজ চাই—within British Empire এই সংশোধনী জুড়ে দিতে হবে। (আমরা জেলেই থাকতে চাই। তবে ছাড়া গরুর মতো। বাহবা! বুদ্ধির প্যাঁচ।) এবার ডিভিশান। একটা রাস্তা পাওয়া গেছে এতক্ষণে! সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন! কেউ বললেন—within, অনেকেই। কেউ বললেন,—outside মুষ্টিমেয়। (spyরাও আছে যে! রিপোর্ট যাবে।) within British Empire আবার স্বরাজ কিসের? (এখনও তাইই চলছে।) অনেক মতামত। উঠে এলেন জাতির পিতা। শাণঘষা ব্যারিষ্টারী বুদ্ধি। বললেন within British Empire, কি outside, সেটা ওঁদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হোক। আমরা ঠিক করবো না। সেই জিন্না। ধর্ম-সমস্যা যাঁর মনের কোণেও স্থান পায়নি। এ সমস্যা তখনও ছিল না। গোঁড়া সনাতনী সংকীর্ণমনা নেতাদের এ এক অদ্ভুত সৃষ্টি! জিন্না মুসলমান এবং কড়া ধাতের লোক। নেতাদের ধাতে তা সইলো না। তিনি বেরিয়ে এলেন কংগ্রেস ছেড়ে। বেরিয়ে এলেন, কিন্তু নিয়ে এলেন মোক্ষম দাওয়াই—দেশ-বিভাগের বীজ! সবল দ্বিজাতিতত্ত্ব!

সমস্যা কংগ্রেসের সৃষ্টি। সমাধান বহু বহু দূরে। নাগালের বাইরে গেছে জিন্নাকে তাড়িয়ে। নেতৃত্বের কবর হয়েছে সেই দিন! ইচ্ছে গেল বলি সেই কথা। নাঃ! সামলে নিয়েছি।

মেজর বললেন—That's not a problem. They are different nations. দুটো আলাদা জাত। সমস্যা কিসের?

সেই দ্বিজাতিতত্ত্ব!

আমি বললাম,—সায়েব, তুমি তো জান না। অনেকেই ভুলে গেছে এখন সেকথা। হিন্দু একটা মাত্র জাতি নয়। একটা মাত্র ধর্মও নয়।

মেজর—What do you mean? you mean caste system?

মনে মনে বলি—তোমার মুণ্ড। প্রকাশ্যে—No—No—Not that শক, হুণ, তাতার, কোল, মঙ্গোল, দ্রাবিড়—বহু বহু aborigines আর non-Aryans এরিয়ানদের সাথে মিলে মিশে একাত্ম হয়ে গেছে। তারা মিলে-মিশে যে কালচার সৃষ্টি করেছে, তার নাম হিন্দু কালচার। সিন্ধু শব্দ থেকে যে কথার উৎপত্তি; তার নাম কিন্তু Aryanদের দেওয়া নয়। পারসীদের দেওয়া। আমরা যাদের অসুর আর যবন বলি। বাস্তুতঃ যা মনে হয় original অন্তত তার সবটাই aboriginal, এখানেই আসল ব্রেনের পরিচয়। পরের জিনিষ আত্মস্থ করার কায়দায়।

ছিল দ্বিজাতিতত্ত্ব! এখন মহাজাতিতত্ত্বে পৌঁছে সায়েব বিমর্ষ হলো। চুপচাপ মুষড়ে যাওয়া দেখে সাড়া যোগাতে অন্য কথা পেড়ে আনা হোল।

আমি বললাম—Why do you come to the Army?

মেজর বললেন—We are bound by Law. But what about you Mr.? you have no bound?

আ—We have come here to fill our stomach and not to save your life. We have no enmity with the Japs or the Germans. They are just our neighbours and so our freinds. Snippers are hither and thither. They can kill you at any moment but not me the Indians.

খুব কড়া হয়ে গেল। বললাম—don't mind, please. Eh? তোমাদের লীডার কে? ভাবখানা গম্ভীর। যাক্‌গে—তোমরাই বলো।

রাও বললে—চার্চিল?

ডেন বললেন—He is a second class politician.

ওর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমি মনে মনে বলি, তবে ফার্স্ট ক্লাশ কে? কে এমন প্ল্যান করে সুন্দর ভাবে সুজলা সুফলা বাঙলাদেশে famine তৈরী করতে পারতো? কে এমন সুন্দর ভাবে বাঙলা থেকে যুবশক্তি মুঠো করে সি পি আর পাঞ্জাবে হঠাতে পারতো। সুভাষের নামে তখন ওদের ট্রাউজার খারাপ হোত?

প্রকাশ্যে বলি—But he saved your nation from utter distress?

মেজর—Oh, yes, for the present, he is the best.

লে: রাও যোগ দেয়—And the fittest. Because who else could create a famine even in heaven?

সবাই হেসে ওঠে। ওরা পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে যায়।

সত্যিকারের নেতা কে? এ প্রশ্নের জবাব দেবে কে?

ওরা বুদ্ধিমানের জাত। হাজার অপ্রিয় হলেও ওরা বুদ্ধির তারিফ করে।

বলা বাহুল্য, বোতল দুটো তখনো বগলদাবাই হয়ে গেছে এবং ও অবস্থায় ফেরবার পথে পিছনে কেউ জুটেছে অনেক। সবাই প্রসাদপ্রার্থী।

## উনবিংশ শতাব্দীতে স্থাপিত পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি সাধারণ গ্রন্থাগার

| নাম | স্থাপনের তারিখ | | স্থাপনের তারিখ |
|---|---|---|---|
| রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি-পাঠাগার (মেদিনীপুর) | ১৮৫১ | রাণীগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী | ১৮৭৬ |
| হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী (চুঁচুড়া) | ১৮৫৪ | তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী | ১৮৮২ |
| কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী | ১৮৫৮ | বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী | ১৮৮৩ |
| উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী | ১৮৬১ | কুমারটুলী ইনষ্টিটিউট | ১৮৮৪ |
| জনাই পাবলিক লাইব্রেরী | ১৮৬০ | শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী | ১৮৮৪ |
| আড়িয়াদহ পাবলিক লাইব্রেরী | ১৮৭০ | বালী সাধারণ গ্রন্থাগার | ১৮৮৫ |
| চন্দননগর পুস্তকাগার | ১৮৭১ | চৈতন্য লাইব্রেরী | ১৮৮৯ |
| শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী | ১৮৭১ | বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার | ১৮৯১ |
| কালনা মেয়ো লাইব্রেরী | ১৮৭২ | বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার | ১৮৯৩ |
| বরাহনগর পিপলস লাইব্রেরী | ১৮৭৬ | | |

—গ্রন্থাগার পত্রিকা হইতে।

# র‍্যাশপুটিন

শ্রীঅজয়কুমার নন্দী

সাইবেরিয়ার ছোট একটি গ্রাম, পক্রোভস্কোয়ে। খুনী-আসামীর দল পাঠানো হ'ত সেখানে বসবাসের জন্য। এই ভাবে গ্রামটি গড়ে উঠে। সেখানকার অধিবাসীরা বংশপরম্পরায় তাদের পূর্ব-পুরুষদের যাবতীয় নারকীয় গুণগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল। তাদের পেশা ছিল ঘোড়া চুরি করে বেচে দেওয়া। ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা কিছু নেই, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় না। একবার ঘোড়া চুরি করে শুধু বেচে দেওয়া; তারপর অনেক দিন পর্যন্ত বসে বসে মদ খাওয়া চলবে। পক্রোভস্কোয়ে অপরাধীদের এক স্বর্গরাজ্য।

এমনি এক গ্রামে এ-হেন পরিবেশে ৭ই জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গ্রেগরী এফিমভিচের জন্ম। তার পিতা ঘোর মদ্যপ এবং নানাপ্রকার জঘন্য কার্য্যের জন্য র‍্যাশপুটিন অর্থাৎ দুশ্চরিত্র এই খেতাব লাভ করেছিল। এ রকম গ্রামে এই খেতাব একটা দুর্লভ সম্মানই বটে। পৈতৃক সম্পত্তি হিসাবে গ্রেগরী পিতার নিকট থেকে পেয়েছিল একটি কুটির, কয়েক একর জমি এবং সর্বোপরি এই দুর্লভ খেতাব র‍্যাশপুটিন। আর শৈশব থেকেই তার ঝোঁক ছিল যত সব কুকাজের প্রতি। তার কুকাজের দুই জন সঙ্গী ছিল—প্লিয়াচেফ এবং বার্ণাবী। দাসের মতই তার আদেশ তারা পালন করতো।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে র‍্যাশপুটিনকে চুরির অপরাধে সর্বজন সম্মুখে কুড়ি ঘা বেত মারা হল। তারপর দেখা গেল, র‍্যাশপুটিন ঘন ঘন গীর্জায় যাচ্ছে এবং হাঁটু গেড়ে বসে অস্ফুটস্বরে কী এক প্রার্থনা উচ্চারণ করছে। সকলে বলতে লাগলো, তাকে দৈবশক্তি ভর করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের পাত্রে রুবল পড়তে লাগ'লা। সহজভাবে টাকা-পয়সা অর্জনের এ পথটা মন্দ লাগলো না তার। এই ভাবে অতি অল্পবয়সেই ভণ্ডামিতে পোক্ত হল র‍্যাশপুটিন।

কিন্তু তার কালো গভীর চোখে কী এক যাদুকরী মায়া ছিল! সে মায়ায় ভুললো গ্রামের সুন্দরী তরুণী ওলগা চানিগফ। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে র‍্যাশপুটিন তাকে বিয়ে করলো। যৌতুকস্বরূপ সে পেলো একটা গাড়ী, এক জোড়া ঘোড়া, কয়েক একর জমি, আর নগদ তিন হাজার রুবল। জমি ও তিন হাজার রুবল শীঘ্রই ভদকায় পরিবর্তিত হ'ল।

২

র‍্যাসপুটিন বলে বেড়াতে লাগলো, সেণ্ট মাইকেল তাকে দর্শন দিয়েছেন, তাকে অনুপ্রাণিত করেছেন। গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে সে পরিভ্রমণ করলো। বলতে লাগলো, সেণ্ট মাইকেল গীর্জা প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ দিয়েছেন। এই ভাবে বহু অর্থ সঞ্চয় করে স্ব-গ্রামে উপস্থিত হ'লো র‍্যাশপুটিন। চারদিক থেকে তার নিকট লোক আসতে আরম্ভ করলো। সে তাদের নিকট তার নতুন ধর্মের কথা বলতে লাগলো,—ভাই সব, ভগবান কখনো হতভাগ্য মানুষের প্রতি নির্দয় ন'ন; তবে তাদেরও আন্তরিক অনুতাপ দেখাতে হ'বে, তা'হলে তিনি তাদের দিকে দু বাহু বাড়িয়ে দেবেন।

কিন্তু অনুতাপ করবার জন্য প্রয়োজন পাপের, অজ্ঞান পাপ যা শিশুরা ভাল-মন্দ না জেনে করে থাকে। শুধু ইচ্ছাকৃত পাপই আনে অনুতাপ।

তাই ভাই সব, তোমরা পাপ কর। আর অনুতাপের মহৎ কার্যের জন্য আমাদের সম্মিলিত প্রার্থনা আনবে ঈশ্বরের অনুকম্পা।

রাত্রির আকাশের ঝলমলে তারাগুলির দিকে নির্দেশ করে র‍্যাশপুটিন কবিত্বময় ভাষায় বলে উঠলো, ঐ সর্বশক্তিমানের চক্ষু! প্রাঙ্গণের মাঝখানে গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। সেখানে হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করা হ'ল। র‍্যাশপুটিন মুঠি মুঠি ধূপ-ধূনা সেখানে নিক্ষেপ করলো। ধূপের গন্ধ ও ধোঁয়া রাতের অন্ধকারকে মায়াময় করে তুললো। আরম্ভ হ'ল হাত ধরাধরি করে স্ত্রী-পুরুষের মিলিত নৃত্য। ক্রমে ক্রমে নৃত্যের ছন্দ ও তাল হ'ল উদ্দাম, জাগলো আদিম কলুষ প্রবৃত্তি। রাতের আঁধার গাঢ় হ'ল। ধর্মের ব্যভিচারে, কামনার পঙ্কিল আবর্তে ডুবে গেল সব। শুধু শোনা যায়, ভগবান, মুক্তির জন্য আমরা পাপ করি। এই হাস্যকর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে র‍্যাশপুটিনের অভয়দানে।

ভাইগণ, তোমাদের সমস্ত পাপ মোচন করলাম, আশীর্বাদ করলাম তোমাদিগকে।

৩

দুনিয়ায় দুরাত্মার অভাব হয় না। শুধু দুষ্কার্যের সমর্থনযোগ্য একটা ধর্মেরই অভাব ছিল। তাই মনোমত ধর্ম পেয়ে দুরাত্মার দল র‍্যাশপুটিনের শিষ্য হ'লো। তার নামের প্রচার ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো।

১৯০৪-এর এপ্রিল মাসে কাজানে লিডিয়া বাচমাকা নাম্নী এক অতুল ঐশ্বর্যশালিনী প্রৌঢ়া বিধবার সহিত র‍্যাশপুটিনের সাক্ষাৎ হয়। ধর্ম পর্য্যালোচনায় নিযুক্ত থাকতেন বাচমাকা কিন্তু আনন্দ পেতেন না তাতে। ঠিক মুহূর্তে র‍্যাশপুটিনের আবির্ভাব। ভণ্ড সাধু উপদেশ দিলো, 'মুক্তির জন্য পাপ করো, তা'হলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হবে তোমার সমুখে।' নবধর্মে দীক্ষিতা বাচমাকা অজস্র অর্থ ব্যয় করতে লাগলেন তাঁর গুরুর জন্যে। তাঁর প্রচেষ্টায় পেট্রোগ্রাডে র‍্যাশপুটিন ধর্মপ্রচার করতে এল। পেট্রোগ্রাডে যাবার আগেই তার নাম যথেষ্ট প্রচারিত হয়েছিল সেখানে। পত্রিকাগুলি তার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে মিথ্যা খবরে পূর্ণ থাকত,—কি করে দরিদ্র কৃষকের সন্তানের হস্তস্পর্শে দুরারোগ্য-ব্যাধিগ্রস্ত লোক নিরাময় হয়েছে, ভবিষ্যৎ কি রকম তাঁর কাছে সুস্পষ্ট, কি করে এক মুঠো ধূলোকে একটি পুষ্পিত বৃক্ষে পরিণত করেছেন তিনি। কাজেই সেখানে তার সমাদর বেড়ে গেল। ক্রনস্তাদ্‌তের ফাদার জন ও সাধু ইলিয়ডর এলেন তাকে সম্ভাষণ জানাতে। ফাদার জন বললেন, "নবধর্মপ্রচারক, আমাদের প্রিয় রাশিয়াকে জাগরিত করুন।" র‍্যাশপুটিন রহস্যময় ভাষায় বললেন, "ঈশ্বর যা' আদেশ করেন, আমি তাই পালন করবো।"

৪

তখনকার রাশিয়ার রাজসভার একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন। দু'টো ক্ষমতাভিলাষী দলের বিরোধ চলছিল সেখানে। রাজমাতা মারিয়ে ফিয়দরভনা, অধিকাংশ উদারমতাবলম্বী রাজনীতিবিদ্, গ্রাণ্ড ডিউক ও তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের বন্ধুবর্গ এক দলের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

আরেক দলের নেত্রী ছিলেন জার্মাণ-রাজবংশ-সম্ভূতা রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা ফিয়দরভ্না। তাঁর সমর্থক ছিল জার্মাণী-ভক্ত-বৃন্দ। জারিণা তাঁর নিত্য সহচরী ভিরুণ্‌ভবার একান্ত অনুরাগিণী এবং তারই কথামত চলতেন। রাজমাতা ফিয়দরভ্না রাশিয়ার সম্রাট নিকলাসের দুর্বল চিত্তের প্রতি প্রায়ই কঠোর মন্তব্য করতেন।

ক্ষমতাপ্রিয় র‍্যাশপুটিন স্বভাবতঃই প্রলুব্ধ হ'ল এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে। স্বপ্ন দেখতে লাগলো, তারই আদেশ অগণিত রুশ জনসাধারণ পালন করছে, তারই অঙ্গুলি-হেলনে চলছে শাসনকার্য। অবশেষে র‍্যাশপুটিনের অলৌকিক কাহিনী জারিণার কানে গেল। জারিণা তাঁর প্রিয় সহচরী ভিরুণ্‌ভবাকে পাঠালেন র‍্যাশপুটিনের নিকট। এই দিনটির জন্ম র‍্যাশপুটিন সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। গোপন চুক্তি হ'ল র‍্যাশপুটিন ও ভিরুণ্‌ভবার মধ্যে। স্থির হ'ল, তাকে ভিরুণ্‌ভবা নিয়ে যাবে রাজসভায়।

শীঘ্রই জার ও জারিণা র‍্যাশপুটিনের একান্ত অনুগত হলেন। র‍্যাশপুটিন এখন রাজকুমার ও রাজকুমারীদের সঙ্গী, আনা ভিরুণ্‌ভবার প্রেমিক।

৫

দুষ্কার্যপ্রিয় লম্পট র‍্যাশপুটিনের স্বরূপ অধিক দিন আবৃত রইল না। যে ধর্মযাজকগণ এক দিন তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন, তাঁদের নিকট প্রকাশিত হ'ল ধর্মের নামে র‍্যাশপুটিন কি ব্যভিচার করছে, কত তরুণীর সর্বনাশ করছে। তাই এক ধর্মসভায় তাঁরা র‍্যাশপুটিনকে অভিযুক্ত করলেন। কিন্তু দুরাত্মা জানতো, জার ও জারিণা তার সহায়। তাই সে সমস্ত অভিযোগ থেকে পেলো অব্যাহতি। শুধু কি তাই,—রাজকুমার ও রাজকুমারীদের সে হ'লো ধর্মশিক্ষক।

মুক্তি পেয়েও তার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হ'ল না। কিন্তু লাম্পট্য ও দুষ্কার্যেরও সীমা থাকে। তাই আবার যখন তার বিরুদ্ধে অসংখ্য বিভিন্ন অভিযোগ আসতে লাগলো, এমন কি জার ও জারিণার প্রভাব তাকে মুক্তি দিতে পারলো না। তাকে স্ব-গ্রামে পক্রোভস্কোয়েতে নির্বাসিত করা হ'ল। তার নাম আস্তে আস্তে সবাই ভুলে গেল। কিন্তু ভুলতে পারলেন না জারিণা আর ভিরুণ্‌ভবা।

১৯১৪ সালের প্রথম মহাসমর বেধে উঠল। তাই র‍্যাশপুটিনকে বড় প্রয়োজন জার ও জারিণার, র‍্যাশপুটিন ফিরে এলো পেড্রোগ্রাডে। রাজসভায় তার প্রভাব এখন অপ্রতিহত। জারিণা তার হাতের মুঠোয়। জার দুর্বল-চিত্ত। র‍্যাশপুটিনের আদেশে শাসন কার্য চলেছে। এরই মধ্যে জার্মাণদের সঙ্গে গোপনে যোগ দিয়ে অজস্র অর্থের বিনিময়ে স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আরম্ভ করেছে সে। জারিণার মাধ্যমে জারকে চাপ দিতে লাগলো জার্মাণদের সহিত সন্ধি করবার জন্যে। জার্মাণদের সঙ্গে সন্ধির বিরোধিতা করবার জন্য—তার আদেশে প্রধান সেনাপতি গ্রাণ্ড ডিউক নিকলাস নিকলায়েভিচ নির্বাসিত হলেন। তারই আদেশে মন্ত্রিগণ মনোনীত হলেন।

সমগ্র রাশিয়ায় র‍্যাশপুটিন এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি। ব্যভিচার-অনাচারে পূর্ণ হ'ল দেশ।

৬

৭ই নভেম্বর। রাত দশটা। মস্কোর এক রেস্তোরাঁতে প্রবেশ করলেন এক অপূর্ব সুন্দরী তন্বী—রাশিয়ার বিখ্যাত নর্তকী কারালি। রাশিয়ার অন্যতম ক্ষমতাশালী ব্যক্তি গ্রাণ্ড ডিউক দিমিত্রি পাভ্লোভিচের বান্ধবী এই কারালি। লোক-চক্ষু এড়িয়ে প্রবেশ করলেন তিনি।

সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নর্তকী, কেন আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন?

বিস্মিত হয়ে কারালি ফিরে তাকালেন, চিনতে পারলেন সম্ভাষণকারীকে, ও নব-ধর্ম-প্রচারককে।

হ্যাঁ, যে নব-ধর্ম-প্রচারক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করে আনন্দিত হয়েছেন, যিনি তাঁর অপূর্ব ধর্মের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে আপনাকে শোনাতে উৎসুক। এই বলে র‍্যাশপুটিন এগিয়ে এলো তাঁর কাছে।

কারালি সরে গেলেন এক পাশে, বললেন, মাতাল হয়েছ, তাই ভুলে গেছো তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো।

বিচলিত না হ'য়ে র‍্যাশপুটিন আবার এগিয়ে গেল। জানি, তুমি কারালি, মস্কোর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী নর্তকী। আজ আমার গৃহে তোমাকে দেব শ্যাম্পেন।

কারালির প্রচণ্ড চপেটাঘাত পড়লো তার মুখে।

র‍্যাশপুটিনের বন্ধু প্রিন্স আন্দ্রমিকফ্ ঠাট্টা করলেন, তাহ'লে এমন রমণীও আছে, যে তোমাকে বাধা দেয়।

এর জন্যে তাকে দাম দিতে হবে। র‍্যাশপুটিনের জবাব এল।

৭

উপরি-উক্ত ঘটনার পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হ'ল। রেস্তোরাঁরই একটি ঘটনা। এক টেবিলে গ্রাণ্ড ডিউক দিমিত্রি পাভ্লাভিচ্, প্রিন্স ইউসুফফ ও আরো কয়েকজন বন্ধু বসে আছেন। অল্প দূরেই অন্য টেবিলে র‍্যাশপুটিন, প্রিন্স আন্দ্রমিকফ্, খ্রিয়াপচেফ্ ও তাদের সাথীরা হাস্য-পরিহাসে মত্ত। র‍্যাশপুটিন আজ যেন বেশী কথা বলছে, গলার স্বরও সেই সঙ্গে চড়ে গেছে। ক্ষমতায় অন্ধ হয়ে র‍্যাশপুটিন চেঁচিয়ে সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের নিন্দা করতে লাগলো থোড়াই কেয়ার করি গ্রাণ্ড ডিউক, মন্ত্রী আর ধর্ম-সংস্থার প্রধানকে-ন আলেকমিয়েফ ক্রসিলফদের তৃণ-জ্ঞান করি।

রাগে রক্তিম হয়ে উঠলেন দিমিত্রি পাভলভিচ্। হাতের পানীয় পাত্রটি চাপে শতধা ভেঙ্গে গেল। প্রিন্স ইউসুফফ্‌কে বললেন, এই লোকটা এখনই স্থান ত্যাগ না করলে কুকুরের মতো তাকে হত্যা করবো।

সাবধান দিমিত্রি—প্রিন্স বললেন,—সে তোমার আমার চাইতে ঢের বেশী শক্তিশালী। বুঝতে পেরেছ আমি কি বলতে চাচ্ছি?

র‍্যাশপুটিন তখনো চীৎকার করছে, তাদের স্ত্রীরা। তারা কি কখন আমাকে অস্বীকার করবে? যখন আমি সেই নোংরা নাচওয়ালীকে সম্মান করতে যাই?

কারালির পরম বন্ধু গ্রাণ্ড ডিউক। তিনি নিজেকে সামলাতে পারলেন না। র‍্যাশপুটিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন তিনি। ঠিক এমনি সময় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পুরিচ্‌কিয়োভিচ্। তিনি ডুমার (রাশিয়ার পার্লামেণ্ট) একজন নামজাদা সভ্য। সাহস ও আন্তরিকতার জন্য শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। র‍্যাশপুটিনের নিকট গিয়ে তিনি বললেন, ফূর্তি করে নাও, এখন তোমার ভাল সময় যাচ্ছে। আর বেশীদিন সে সময় থাকবে না।

হ্যাঁ, আমার ভাল সময় যাচ্ছে। আর আমিও তোমাকে আরো স্ফূর্তি করতে বলছি। আমার মনে হচ্ছে, তোমার সময় আমার চেয়েও সংক্ষিপ্ততর।

পুরিচকিয়েভিচ বললেন, শয়তান, নিজেকে আর উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচারে ডুবিয়ে রেখো না। মরণ তোমার নিকটে। তোমার হাত থেকে রাশিয়াকে উদ্ধার করবার লোক শীগ্‌গিরই পাওয়া যাবে।

হাসি থেমে গেল র‍্যাশপুটিনের। সঙ্গী সাথী নিয়ে প্রস্থান করলো।

রেস্তোরাঁয় রইলেন শুধু গ্রাণ্ড ডিউক, প্রিন্স ইউসুপফ এবং পুরিচকিয়েভিচ। প্রিন্স ইউসুপফ পুরিচকিয়েভিচের নিকট গিয়ে বললেন, আপনার সাহসের জন্য ধন্যবাদ!

ধন্যবাদ, প্রিন্স!

আপনি বলেছেন, এই জঘন্য লোকটাকে শেষ করবার জন্যে শীগ্‌গিরই লোক পাওয়া যাবে। আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সেই লোক হতে চাই।

গ্রাণ্ড ডিউক পশ্চাতে ছিলেন। তিনি প্রিন্সকে সমর্থন করলেন। সর্বতোভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করবো। অনেক সহ্য করেছি। রাশিয়ার নামে দিব্যি, আর বেশী দিন তাকে বাঁচতে দেবো না।

তিনজন ভয়ঙ্কর শপথ গ্রহণ করলেন।

৮

এইবার র‍্যাশপুটিনের জীবনের শেষ অঙ্ক। ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯১৬ সালের এক তুষারঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাত্রি। বিরাট বাগানের মাঝে ইউসুপফের প্রাসাদ। সেখানে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা হয়েছে। দাস-দাসী সবাইকে ছুটি দিয়েছেন প্রিন্স সে রাত্রির জন্য। প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে পাঁচজন অপেক্ষা করছেন,—প্রিন্স নিজে, গ্রাণ্ড ডিউক দিমিত্রি পাফলভিচ, পুরিচকিয়েভিচ, তাঁদের এক বন্ধু এবং সুন্দরী নর্তকী কারালি।

তুমি কি মনে কর সে আসবে? প্রিন্স ইউসুপফকে জিজ্ঞাসা করলেন গ্রাণ্ড ডিউক।

নিশ্চয়ই সে আসবে। শয়তানটাকে এক রাতের জন্য সব রকম স্ফূর্তির লোভ দেখিয়েছি। সে সামলাতে পারবে না।

তা হ'লে ভালই হয়েছে। পুরিচকিয়েভিচ বললেন।

রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলো। এগারোটা বেজে গেল। র‍্যাশপুটিন এখনো এলো না। সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন—তবে কি সে আসবে না, সে কি তবে বুঝতে পেরেছে তার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে?

এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। একটি গাড়ী এসে থামল বাইরের রাস্তায়। গাড়ী থেকে নামল র‍্যাশপুটিন। প্রিন্স ইউসুপফ বেরিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করলেন,—আসুন, কোন ভয় নেই। এখানে শুধু আমরাই আছি।

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

ভোজনাগারে। সেখানে কেউ আমাদের বিরক্ত করবে না। আর কয়েক বোতল মদ রেখেছি সেখানে সময় কাটাবার জন্যে।

টেবিলের উপর দুই বোতল চমৎকার মদ। একটিতে মেশানো আছে পটেসিয়াম সায়নাইড্। প্লেটে সাজানো ক্ষুধা-উদ্রেককারী বিস্কুট। সেগুলিও পটেসিয়াম্ সায়নাইড্ মেশানো। খুব ভাল ভাবেই মেশানো হয়েছে। এই ত ঘণ্টা-দু'য়েক আগে পুরিচকিয়েভিচের কুকুরটার উপর পরীক্ষা করা হয়েছে। একটা বিস্কুট খেয়েই সেটা মরে গেছে। এখনো বাগানে একটা গাছের নীচে পড়ে আছে তার প্রাণহীন দেহ! আপনি কি পান করবেন? প্রিন্স জিজ্ঞাসা করলেন।

ইতস্তত: করে র‍্যাশপুটিন বললে, এখন থাক। তৃষ্ণার্ত হই নি।

আলাপ আরম্ভ হ'ল ভৌতিকতত্ত্ব ও পরলোক সম্বন্ধে। ইউসুপফ যেন এই ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে উঠলেন, গ্রেগরী, আপনি কি দয়া করে শেখাবেন কি করে অশরীরীদের সঙ্গে কথা বলা যায়?

যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তবে নিশ্চয়ই শেখাবো।

প্রিন্স পিপাসার্ত হলেন। যে বোতলের মদে বিষ মেশানো হয় নি, তাই একটু একটু পান করতে লাগলেন।

আমি একটু পান করবো। র‍্যাশপুটিন বললে।

একটি গেলাসে নিজের বোতল থেকে মদ ঢেলে দিলেন প্রিন্স। র‍্যাশপুটিন একটা-দুটো করে সমস্ত বিস্কুট শেষ করলো। আরো পিপাসার্ত হয়ে সে পটেসিয়াম সায়নাইড্ মেশানো মদের বোতলটা তুলে নিয়ে নিঃশেষে মদ পান করলো। উৎকণ্ঠিত প্রিন্স বিবর্ণ হয়ে গেলেন ভয়ে। সত্যই কি তবে ঈশ্বর-প্রেরিত! অজুহাত দেখিয়ে প্রিন্স ছুটে গেলেন সেই নিভৃত কক্ষে, যেখানে সকলে উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করছেন।

সে মরবে না! প্রিন্স অস্ফুট স্বরে বললেন। আপনি কি ঠাট্টা করছেন, এক জন বলে উঠলেন, এই রিভলবারটা নিয়ে যান। দেখি রিভলবারের বুলেট সে আটকাতে পারে কি না।

বাঁ হাতে রিভলবারটা নিয়ে দরজা ঠেলে প্রবেশ করলেন প্রিন্স। র‍্যাশপুটিন তখন অস্থিরভাবে পায়চারি করছে।

ব্যাপার কি? আপনার মদ ভালো! তবে সেটা আমার সহ্য হচ্ছে না। র‍্যাশপুটিন বললে।

ও কিছু নয়। এখনই সেরে যাবে। আচ্ছা দেখুন এই মূর্তিটি। একটি অতি সুন্দর খৃষ্টের মূর্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন প্রিন্স।

র‍্যাশপুটিন কাছে গিয়ে দেখতে লাগলো। দু'জনে পাশাপাশি। সাবধানে বাঁ হাত থেকে ডান হাতে রিভলবারটি নিলেন প্রিন্স; তারপর আস্তে আস্তে অন্যমনস্ক র‍্যাশপুটিনের বুকে রিভলবার ঠেকিয়ে দু'বার গুলী করলেন। র‍্যাশপুটিন পড়ে গেল।

এইবার সে সত্যই মরেছে। গ্রাণ্ড ডিউকের প্রাসাদ নিকটেই। তিনি তাঁর গাড়ী আনতে গেলেন নেভা নদীতে মৃতদেহ ফেলবার জন্যে। সকলেই আনন্দে উন্মত্ত।

কে সেখানে, পুরিচকিয়েভিচ চীৎকার করে উঠলেন। সকলে নীচে তাকিয়ে দেখলেন, রক্তাক্ত এক বীভৎস অশরীরীর মত র‍্যাশপুটিন দরজা খুলে বাগানে প্রবেশ করেছে!

পুরিচকিয়েভিচ নিজের রিভলবার বের করে তাকে অনুসরণ করলেন। ইউসুপফ একটি লাঠি হাতে পেছনে এলেন। র‍্যাশপুটিন তখন টলতে টলতে রাস্তার দিকের গেটের নিকটে যাচ্ছে। পুরিচকিয়েভিচ রিভলবার ছুঁড়লেন তিন বার। আবার র‍্যাশপুটিন পড়ে গেল। ইউসুপফ লাঠি দিয়ে তার মাথা থেঁতলে দিলেন। এইবার সত্যই মরল র‍্যাশপুটিন। পাঁচ মিনিট পর গ্রাণ্ড ডিউক গাড়ী নিয়ে ফিরলেন। গাড়ীতে মৃতদেহটা নিয়ে সকলে গেলেন নেভা নদীর তীরে। নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন রুশিয়ার কলঙ্ক র‍্যাশপুটিনের মৃতদেহ। তখন ভোর হয়ে আসছে।

# বিদ্রোহিনী কার্মন-দ্য-সিলভা

শ্রীঅমল সেন

## এক

এক ধর্মযাজকের আশ্রমে কার্মনের শিশু-জীবন গ'ড়ে ওঠে। ছেলেবেলায় তার স্বভাবটি ছিল ফুলের মত শুভ্র ও কোমল। হৃদয়খানি ছিল মমতায় মধুর। তার মুখ, তার চোখ তার দেহের প্রত্যেকটি রেখায় রেখায় এক অনাবিল সৌন্দর্যের হিল্লোল ব'য়ে যেত। সে সৌন্দর্যে কোথাও এতটুকু খুঁত ছিল না—দেখে মনে হ'ত, সে যেন এ পৃথিবীর কেউ নয়, স্বর্গের কোনও দেবতার মেয়ে সে। তার সর্বাংগ ঘিরে একটি সবুজ পোষাক ঝলমল ক'রতো। এমনি ভাবে তার বাল্যজীবন আশ্রমে কেটে গেল।

এর পরে তার বাবা মারা যেতে তিনি তার ভাই লরেঞ্জোর কাছে চ'লে এলেন। তার বাবারও তাই শেষ ইচ্ছা ছিল। ভাই লরেঞ্জো প্রাণ দিয়ে বোনকে ভালোবাসতেন, তিনি সব সময়ই চেষ্টা ক'রতেন কার্মন যেন সুখী হয়, কোন রকম দুঃখ যেন ওকে স্পর্শ না করে। ভাইয়ের সুনিবিড় স্নেহ বোনকে সর্বদা মায়ের মত পরম যত্নে ঘিরে রাখতো। মা বহু দিন আগেই মারা গিয়েছেন।

লরেঞ্জো মেক্সিকোতে একটা বড় ব্যাংকের ডিরেক্টর। তাতে যা আয় হয় দুই ভাই-বোনের তাতে পরম আরামে দিন কেটে যায়। কার্মন নিজেই বেশ সুশৃংখলার সাথে ঘরের কাজকর্ম করেন দাদার সাথে পরামর্শ ক'রে।

ডন ম্যানুয়েল সুন্দর সুপুরুষ দীর্ঘকায় যুবক, কার্মনকে ভালোবাসে। দাদা ডনের ইংগিত ক'রে বোনকে প্রায়ই ঠাট্টা করেন, কার্মন দাদার সামনে থেকে সলজ্জ হাসিতে দৌড়ে ছুটে পালায়।

চ্যাপেল হ্রদের কাছে একটা চাঁদির খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। ডনের সংকল্প হ'ল সেই খনি খুঁড়ে চাঁদি তুলবে কিন্তু তার জন্য প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। ডনের অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। অর্থ কোথায় পাওয়া যাবে ভেবে সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, হঠাৎ তার লরেঞ্জোর কথা মনে হ'ল। একখানা সুপারিশ-পত্র সংগে নিয়ে সে লরেঞ্জোর কাছে এসে উপস্থিত হ'ল ব্যাংকে তার নামে অ্যাকাউন্ট লেখাবার জন্য। প্ল্যান-ট্যানও একদম সব তৈরী। লরেঞ্জো প্রত্যেকটি জিনিষ ভালো ক'রে যখন দেখলো তখন অ্যাকাউন্ট লিখতে আর কোন আপত্তি ক'রলো না।

এর পর থেকে ডন রোজই যায় আসে লরেঞ্জোর বাড়ীতে একেবারে ঘরের ছেলের মতো। তার হাসি-গানে সে মশগুল ক'রে রাখে মানুষের মন। তার মিষ্টি কথাবার্তা শুনতে কার্মন যে ভালোবাসে ডন যেন তা অনায়াসেই বুঝতে পারে। তাদের মেলামেশা দিনের পর দিন ঘনিষ্ঠ হ'তে ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে আসে।

শেষে একদিন—ডন ম্যানুয়েল কার্মনের প্রণয়প্রার্থী হ'য়ে লরেঞ্জোর কাছে বিয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করলো। ভাই এসে দাঁড়ালো বোনের কাছে জানতে, এ বিয়েতে তার সম্মতি আছে কি না। কার্মন লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলো, কোন উত্তরই দিতে পারলো না। আরক্তিম মুখ, লজ্জানত দৃষ্টি। কার্মনের এই লজ্জানত মুখশ্রীতে অন্তরের সম্মতি ফুটে উঠলো স্পষ্ট হ'য়ে, যা সে ভাষায় ফোটাতে পারেনি কোন মতেই। দাদা ভাবলেন, মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

ডনের কাছে এ দ্বার রইলো খোলা, চির অবারিত। এমন কি লরেঞ্জোর অনুপস্থিতিতেও তার এ-বাড়ীতে প্রবেশের কোন বাধা রইলো না। যখন খুসী আসে, যখন খুসী যায়। তার আগমনে একজন লোক সমস্ত অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত খুসী হ'য়ে ওঠে—সে কে? কার্মন-দ-সিলভা। সে এখন সর্বক্ষণের জন্য প্রিয়তমের সংগ কামনা করে। এমনি ভাবে দিন যায়।

অবশেষে একদিন, ডন কার্মনকে দিয়ে লরেঞ্জোর কাছে কিছু টাকা ধার চাইলো, লরেঞ্জোর বিশেষ আপত্তি ছিল না—তবে, সে ভাবলো, খনিটা একবার দেখা দরকার। ডনকে বললো। ডন সে প্রস্তাবে যেন খুব খুসী হ'য়ে উঠলো, বললো, বেশ তো চলো না! দেখার কাজও হবে, আবার বেড়ানোর কাজও হবে। তারা খনির উদ্দেশে যাত্রা ক'রলো।

খাড়া উঁচু পাহাড়—আকাশ ভেদ ক'রে স্বর্গের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সগর্বে, বিশ্বস্ত সৈনিকের মতো। তার গা বেয়ে নেমে এসেছে একটা সরু পথ সমতল ভূমিতে। সেই পথ ধ'রে উপরে উঠে গেলে সামনে খোলা ময়দান। ময়দানের কোল ঘেঁসেই খনির প্রকাণ্ড গহ্বর রাক্ষসের মত বদনব্যাদান ক'রে আছে, মনে হয় যেন মানুষগুলোকে সে গিলতে চায়। খনিটা পুরানো। আর একটা নতুন খনির আবিষ্কার হ'য়েছে,—ডন বলল। খনি দেখে লরেঞ্জোর ভরসা হ'ল। মনে মনে ভাবলো, চার-পাঁচ মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই এই খনি থেকে চাঁদি তোলা আরম্ভ হবে। ডনকে টাকা ধার দেওয়া সম্পর্কে লরেঞ্জোর মনে আর কোন আপত্তি রইলো না। এর পর বিনা দ্বিধায় সে ডনের প্রার্থিত অর্থ ব্যাংক থেকে দিয়ে দিল। কার্মন ডনের অনুরক্ত, এই ভেবে সে কোন রসিদ পর্যন্ত নিল না। ডনের লজ্জার বাঁধ এবারে একেবারেই ভেঙে গেল। এর পর প্রায়ই সে কার্মনকে ভুলিয়ে টাকা আদায় ক'রে নিতে লাগলো। এসে বলতো, আজ আমার এত টাকা দরকার, আবার কালই হয়তো এসে বলতো, আমার অত টাকা দরকার। কার্মন দাদার বিনা অনুমতিতে গোপনে অসংকোচে অনেক টাকা ডনের হাতে তুলে দিল।

অনেক দিন পরে কার্মন লরেঞ্জোকে জিজ্ঞাসা ক'রলো, খনির কাজ তো আরম্ভ হ'য়েছে অনেক দিন হ'লো কিন্তু আজ পর্যন্ত চাঁদির দেখা নেই! লরেঞ্জো কোন জবাব দিতে পারলো না। এ সম্বন্ধে সে কিছুই জানতো না। ডনকে প্রশ্ন করা হ'লে সে জবাব দিল, ফ্যাক্টরীর খরচ কোন রকমে কুলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও চাঁদির আকরও (Raw metal) দেখা গেল না!

আরও কিছুদিন গেল। ডন এক পয়সাও পাঠালো না।

একদিন লরেঞ্জো এসে কার্মনকে ব'ললো, বোন, তোমার খাতাটা আমাকে দাও, আজ ব্যাংকে হিসাব দেওয়ার দিন।

কার্মন ব'ললো, তা ডনকে দিয়ে দিয়েছি।

এই কথা শুনে পলকে লরেঞ্জোর মুখ অবসাদে কালিমাখা হ'য়ে গেল। সে কোন কথা না ব'লে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেল। তার ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল সুস্পষ্টরূপে, কার্মন তা লক্ষ্য ক'রে দেখলো।

## দুই

জীবনে ও দাদাকে কোন দিন এমন চুপ ক'রে থেকে গভীর চিন্তা করতে দেখেনি। কার্মনের মন এক অজানা আশংকায় দুলে উঠলো, সে অস্থির হ'য়ে ডনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

দরজার শিকল ধ'রে নাড়া দিতেই একটি মেয়ে এসে দ্বার খুলে দিল, জিজ্ঞাসা ক'রলো, কা'কে চাই?

আমি ডনকে চাই।

আমিও সেই দুরাত্মাকে দেখতে এসেছি। আমি দুরানগো থেকে এসেছি। আমি শুনেছি, সে জুয়াড়ী। একদিন সে পুলিশের ভয়ে আমার বাড়ী থেকে পালিয়েছে, আজ সে এখানে একজন ধনী মহাজন হ'তে চ'লেছে। তুমি কে বোন? তোমার মুখ লুকানো হ'লেও আমি চিনেছি—বাড়ীময় তোমার ছবি টাঙানো।

আমি সেনোরিটা কার্মন সিলভা। ওর ভাবী বধূ।

মেয়েটি যেন অট্টহাস্যে ভেঙে প'ড়লো, হাত ধ'রে কার্মনকে ভিতরে নিয়ে গেল, তুমি ওকে বিয়ে ক'রবে? ওকে বিয়ে ক'রলে কত কষ্ট সহ্য ক'রতে হবে জানো? আমি দশ বছর ওর সংগে থেকেছি—ওই দেখ আমার ছেলে ঘুমিয়ে। ডন রাক্ষস, সে এসে দেখলে গুলী ক'রে মারবে। তাকে আমি দু'বছর ধ'রে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ডনের লোককে অনুসরণ ক'রে এই বাড়ীতে এসেছি—যে লোকটাকে অনুসরণ ক'রেছিলাম সে আমাকে চিনতে পেরেই পালিয়েছে।

মুহূর্তের মধ্যে কার্মনের মুখের ভাব ব'দলে গেল। সে বুঝলো, ডন এতদিন তাদের সাথে শঠতা ক'রেছে, তারা প্রতারিত হ'য়েছে। তার এত দিনের ভালোবাসা, এত দিনের আশা-আকাংখা সব যেন এক মুহূর্তে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। সহসা তার মুখ-চোখের ভাব ব'দলে গিয়ে পলকে এক অস্বাভাবিক ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো, কিসের যেন এক কঠিন প্রতিজ্ঞা তার মনে বাসা বাঁধলো। কার্মন এক ক্ষমাহীন প্রতিহিংসার সংকল্প নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো। এই হ'ল তার জীবনের মস্ত বড় tragedy—যা থেকে সুরু হ'ল তার জীবনের এক অপরিবর্তনীয় গতি।

## তিন

কার্মনের জীবনের অভিযান সুরু হল যে, তার জীবনকে বিষময় করে তুলেছে প্রেমের প্রলোভন দেখিয়ে। তাকে সে কোন কারণেই ক্ষমা করবে না। বাড়ী এসে কার্মন তার পোষাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ বদলে ফেলে এক নতুন রকমের পোষাক পরে তার নব জীবনের জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়লো। হাতে তার পিস্তল, কোমরে লুকানো তীক্ষ্ণ ছুরি, প্রতিহিংসার প্রথম অস্ত্র। কিন্তু তার মনে হল, ডনকে হত্যা করার আগে তার সাথে একবার দেখা করে কৈফিয়ৎ চাইবে—কেন সে এমন কাজ করলো, হ্যাঁ, তারপর—তারপর তাকে এ জগতের বুক থেকে সরিয়ে দেবে, তার অস্তিত্বের চিহ্ন নিঃশেষে মুছে দেবে।

কার্মন গাড়ীতে উঠে বসলো, গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো। কিছুদূর গিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিয়ে মোটরে উঠলো। মোটর ছুটে চললো বিদ্যুৎগতিতে চ্যাপেল হ্রদ অভিমুখে।

পরদিন ভোরবেলা তারা চ্যাপেল হ্রদের কাছাকাছি একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছালো। সেখান থেকে একটা ঘোড়া এবং একজন গাইড সংগে নিয়ে কার্মন চ্যাপেল হ্রদের দিকে এগিয়ে চললো। তার মুখে দৃঢ় প্রতিহিংসার ছায়া একটু একটু করে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে লাগলো; তার চোখে এক অস্বাভাবিক দীপ্তি আর মুখে বজ্রকঠোর কাঠিন্য। প্রতিহিংসাব্রতী নারীর এই রূপ দেখে নীতিবিদরা আঁৎকাবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু জনসাধারণ নারীর এই রণরংগিনী জগদ্ধাত্রী মূর্তিকে শ্রদ্ধা না করে পারে না। কার্মন অগ্রবর্তিনী, আর তার পশ্চাতে গাইড তার কার্তুজ, বেল্ট আর বন্দুক নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো। সন্ধ্যার সময় তারা একটা খনির কাছে গিয়ে পৌঁছালো।

গাইড কার্মনকে জিজ্ঞেস করলো—আপনি ডনের খনি দেখতে চান? এটা সে খনি নয়, সে খনি স্বতন্ত্র। এটা একটা পিট।

কার্মন বলল, কিন্তু আমি যে অনেক চাঁদি দেখেছি।

গাইড হেসে হেসে বলল, সে যেকি চাঁদি—আসল খনি এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে।

কার্মন বলল, তুমি সে জায়গা জানো?

গাইড বলল, হ্যাঁ-জানি। কিন্তু রাত্রে যাবো না, কাল যাবো। আজ আপনি বিশ্রাম নিন।

কার্মন বলল, না, বিশ্রাম চাই না। আমি পরিশ্রান্ত নই। অন্ধকারে সেখানে যাওয়া যাবে।

গাইড আর কোন কথা বললো না, এক লাফে সে তার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো। তার ললাটে চিন্তার রেখা। মনে হল তারও একটা হিসাব-নিকাশ আছে ডনের সংগে।

## চার

সমস্ত রাত না থেমে, না জিরিয়ে, অবিশ্রান্ত ভাবে ঘোড়া ছুটালো, প্রত্যূষে এসে পৌঁছালো খনির কাছে। গাইড বন্দুক ভর্তি করে অন্ধকারে আগে আগে গেল,—কার্মন ব'সে রইলো।

গাইড ফিরে এসে বললো, চুপি চুপি চলুন। তারপর সে কার্মনকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গেল, যেখান থেকে কারখানার সব কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

তখনও রাত্ত ভোর হয়নি,—গাছের ছায়ায় তখনও রাতের আধো-অন্ধকার লুকিয়ে ছিলো। কুলিরা তখন খাবার তৈরী করছে। দেখে কার্মনের মনে সত্য সত্যই বিশ্বাস হ'ল, এই সেই খনি।

ধীরে ধীরে প্রভাতের আলো ফুটে উঠলো। গাইড চলে গেল, বলে গেল—কিছু গুলী-টুলী করবেন না, ওদের মেলাই লোক। ঘোড়া আমাদের কাছে রাখবেন। ওরা আমাদের অনুসরণ করতে পারে, এমন কোন বাহন ওদের আছে কি না আমি দেখে আসি। আপনি বসুন।

একটা গাছের তলায় বসে তার গায়ে ঠেস দিয়ে কার্মন যেন কী ভাবতে লাগলো। সমস্ত রাত্রির ক্লান্তিতে ধীরে ধীরে চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে এলো। কার্মন সেই অবস্থাতেই ঘুমিয়ে পড়লো।

তখন দুপুর। বেলা বারোটার সময় গাইডের ডাকে তার ঘুম ভাঙলো, উঠুন, খাবার খান। এখন খনিতে ভয়ানক গোলমাল, মাল বোঝাই হচ্ছে গাধার উপরে।

কার্মন উঠলো, মুখ-হাত ধু'লো। তারপর তারা দুজন খেতে বসলো। খাওয়া হয়ে গেলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে পাহাড়ের গা'

বেয়ে ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে উপরে উঠতে লাগলো। এমনি করে তারা পাহাড়ের উপরে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছালো, যেখান থেকে তারা পরিষ্কার ভাবে দেখতে পেলো, তিন-চারটা গাধার পিঠে মাল বোঝাই হচ্ছে। ডন সামনে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছে।

কার্মন মনে মনে সংকল্প করলো, ডনকে আগে একেবারেই কিছু বলা হবে না,—চাদি নিয়ে তারপর—

গাইডের সংকেত অনুসারে কার্মন নীচে নেমে এলো। তারপর গাইডকে বললো, চলো আমরা গাধার পিছনে গিয়ে দেখি কোথায় চাঁদি নিয়ে যাচ্ছে। তুমি আমাকে সাহায্য করবে।

গাইড বলল, হাঁ, আমার কলংক আমি ধৌত করতে এসেছি।

মাল বোঝাই হয়ে গেলে গাধাগুলোকে অন্যত্র চালান করার জন্য পাঁচ জন পাহারাওয়ালার সাথে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পাহারাওয়ালারা আগে আগে যাচ্ছে, পিছনে অলক্ষ্যে কার্মন এবং গাইড ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাদের অনুসরণ করছে। ক্রমে গাধাগুলো নেমে এলো এক গভীর খাদের মধ্যে—কার্মন এবং তার গাইড পাহাড়ের চূড়া থেকে তাই লক্ষ্য করলো, সেই গভীর খাদের ভিতরে চাঁদি খালি হচ্ছে। এক বেল-ভর্তি মাল হলে গাড়ী আসবে।

কার্মন মনে মনে এক মতলব আঁটলো, দাদাকে না জানিয়ে এসে এই খনি দখল করা যাক। দেনা শোধ করা যাবে কিন্তু এতে পুলিশের কোন সাহায্যই নেওয়া হবে না। কারণ আইনের পথ অবলম্বন করলে তার সুফল বিলম্বেও খুব কমই পাওয়া যায়।

আইন তারা নিজেদের হাতে তুলে নিল।

ডন সম্বন্ধে কার্মন একটা খবর জানতেন না, তা হচ্ছে এই,—"ডন প্যারিস শহরে দুইটি কুমারীকে গোপনে বিয়ে করে তাদের খুন করে সব টাকা-পয়সা নিয়ে পালিয়ে এসেছে, তাকে ধরতে আমরা মেক্সিকো এসেছিলুম, কিন্তু আমাদের দেরী হয়ে গেল—কার্মন আমাদের আগে নিজের হিসাব চুকালো।" (Note by Captain)

## পাঁচ

নিজের ভাইকে অখ্যাতি হ'তে মুক্ত করার আশায় কার্মন বাড়ী ফিরে এলো। এসে দেখে, লরেঞ্জো আত্মহত্যা করেছে। নির্বাক পাষাণ-প্রতিমার মতো কার্মন দাদার মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো,—তার চোখ নিষ্প্রভ, পলকহীন,—কিন্তু সে চোখে অশ্রুর উৎস এক কোঁটাও ছিল না। দেখলো, একটা চিঠি পড়ে আছে মৃতদেহের কাছে—কার্মনের কাছেই লেখা।

"অখ্যাতির ভয়ে এ আত্মহত্যা নয়,—বোন ডনের কাছে গেছে বলে।"

কার্মনের চোখে জল নেই, চোখ জ্বলছে।

উন্মাদের মত সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, সংগে গাইড। দ্বারে আঘাত ক'রতে ডনের চাকর এসে দোর খুলে দিল। কার্মন চাকরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বোন visiting card পর্যন্ত না দিয়ে গাইডকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলো। ঢুকেই শুনতে পেলো, বাড়ীর ভিতর মেয়েলি গলার কান্না। কে কাঁদছে? কোথায় কাঁদছে? কে কাঁদছে তা ঠিক না বুঝলেও কোথায় কাঁদছে তা বুঝতে এক পলকও দেরী হ'ল না। আবার শুনতে পেলো এক পুরুষের ক্রোধপূর্ণ কণ্ঠস্বর। কার্মন দৌড়ে গিয়ে ডনের শোবার ঘরে ঢুকে প'ড়লো। ঢুকেই দেখতে পেলো,—ডন দাঁড়িয়ে, পরনে তার ঘোড়-সওয়ারের পোষাক, হাতে হান্টার, সামনে ভূশায়িতা সেই স্ত্রীলোকটি—রক্তাক্ত দেহ। কার্মনের গাইড বাইরে দাঁড়িয়ে তার অপেক্ষা ক'রতে লাগলো।

কার্মনকে দেখেই ডন ব'লে উঠলো, তুমি এসেছ? আমি তোমায় ডাকতে পাঠাচ্ছিলুম। এ তোমায় যা ব'লেছে তা সব মিথ্যে।

কার্মন বলল, আমারও তাই মনে হ'চ্ছে। তুমি ভারী সাধু।

ডন খানিকক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো, তার পর হান্টারটা একদিকে ফেলে দিল। মিষ্টি কথা বলতে আরম্ভ করলো।

আমি কোন দিন তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না, ডন বললো, তার আগে যেন আমার প্রাণ যায়। কিন্তু তোমার এ বেশ কেন? মুখ-চোখ ও-রকম কেন?

কার্মন বলল, আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। আপনাকে খুঁজতে গিয়েছিলুম খনির উপরে। খনি দেখে আনন্দ হ'ল, আপনি সত্যি কথাই বলেছেন।

ডনের চক্ষু স্থির। ভাবলো, নিশ্চয়ই নতুন খনি দেখেছে। বললো হাঁ, ওটা হালে আবিষ্কার করা গেছে, খবরটা আমিই তোমায় দেব মনে করেছিলুম।

কার্মন বলল, আপনি তো অনেক চাঁদি লুকিয়ে রেখেছেন, সে-সব নিতে আজই আমি লোক পাঠাচ্ছি। ব্যাংকের টাকা দিতে আপনিও নিশ্চয় উদ্বিগ্ন। নয় কি?

ডন সাপের মত ফোঁস করে উঠে বললো, তুমি আমার সংগে স্পাইগিরি করেছ। কিন্তু তোমার দাদাকে এ-কথা বলতে পারবে না।

কার্মনের দু' চোখ পলকে বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠলো, হাত পড়লো তার পিস্তলের উপর—বিদ্যুৎবেগে ডনের মাথার দিকে পিস্তল তাক্ করে বললো, দাদার কাছে আমি এ খবর দিতে পারবো না। দাদা এখন অন্য লোকে—সে লোক এ পৃথিবী থেকে বহু ঊর্দ্ধে।

ডন ভীত হ'য়ে তার লোকদের ডাকতে লাগলো। 'আসছি' বলে একটা লোক, নাম তার জোন, ছুটে এলো ডনের আহ্বানে, কিন্তু সে ঘরে ঢুকতে পারলো না। তার আগেই গাইডের গুলীতে তার মৃত্যু হ'ল।

এবার ডন নিজেই এগিয়ে গেল কার্মনের হাত থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিতে, কিন্তু পারলো না। কার্মনের গুলীতে তার ডান হাত আহত হ'ল। দ্বিতীয় গুলী গিয়ে তার বুকের জামা ভেদ ক'রে চলে গেল,—ডন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কিন্তু কার্মন তবুও শান্ত হ'ল না। তার মনের মধ্যে যে বিদ্রোহিনী তার লালঝাণ্ডা দোলাচ্ছিল সে তাকে কিছুতেই শান্ত হতে দিল না। কার্মন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু গুলীই ছুঁড়তে লাগলো—পিস্তল নিঃশেষিত হয়ে গেলে পর সে থামলো।

গাইড এসে কার্মনকে অভিবাদন করে দাঁড়ালো, বললো, আমার প্রতিহিংসা পূর্ণ হয়েছে। বহু বছর পূর্বে আমার বোনকে ও হত্যা করেছিল, আমি বেরিয়েছিলাম তারই প্রতিশোধ নিতে— আজ তা পূর্ণ হয়েছে। আমি আজ তোমার অনুগত।

## ছয়

কার্মন বাড়ী ফিরে এলো। এক ভাইয়ের উপর দাদার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভার দিয়ে আবার সে গাইডকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়্লো। এবার সে রওনা হলো 'সাটিআগোনি' পাহাড়ের দিকে।

কার্মন গাইডকে বললো, ভাই, পঞ্চাশ জন লোক আনো। আমরা চাঁদি দখল করবো, তারা আমাদের সাহায্য করবে। তাদের আমি বখরা দেব।

গাইড বেরিয়ে পড়লো লোকের সন্ধানে—লোক পেতে তার বেশী কষ্ট হলো না। দলে দলে পাহাড়ী যুবক এসে যোগ দিল তাদের সংগে।

কার্মন বল্ল, পুলিশ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমরা কোথায় যাবো, জানো? আমি যাবো বিদ্রোহী জেনারেল জিমেন্তাকের স্মরণে দলবল সহ।

—নিশ্চয়ই, খুব আনন্দের সাথে গাইড বললো।

এবার সকলে মিলে খনির দিকে যাত্রা করলো। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা খনিতে গিয়ে পৌঁছালো। খনিতে পৌঁছেই কার্মন ম্যানেজারকে ব'ললো,—আমি খনির মালিক, ইচ্ছে হ'লে আপনারা কাজ করতে পারেন আমার অধীনে—এর পর খনির কাজ আরম্ভ হ'য়ে গেল পুরাদমে। লুকানো চাঁদি উদ্ধার করে কার্মন সকলের দেনা শোধ করে বাকী যা ছিল তা সব রেলওয়ে ষ্টেশনের ব্যাংকে পাঠিয়ে দিল, সংগে সংগে ব্যাংকারকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিল, তার নামে এই সব জমা করে নেবার জন্য।

পুলিশ সন্ধান পেলো, কার্মন দেনা শোধ ক'রেছে। পুলিশের Black book-এ কার্মনের নাম উঠলো। কার্মনকে ধরবার জন্য গভর্ণমেণ্ট পরওয়ানা জারী করলো, কিন্তু কার্মন তাতে একটুও ভয় পেলো না। সে হয়ে উঠলো বেপরোয়া—বিদ্রোহিনী। তার দেহের শিরায় শিরায় বিদ্রোহের মাদকতা উষ্ণ রক্তস্রোতের মতো প্রবাহিত হতে লাগলো। সে বুঝলো, আইন হ'চ্ছে মানুষকে শোষণ করার, শাসন করার ফন্দি। কাজেই আইন সে এবার নিজের হাতে তুলে নিল।

গভর্ণমেণ্ট খনি দখল করার জন্য ফৌজ পাঠালো, কার্মনও প্রস্তুত হয়েই ছিল,—সত্যি সত্যিই যখন পুলিশ এলো সৈন্য নিয়ে, সে তাদের প্রাণপণে বাধা দিল। তার কাছে পরাজিত হ'য়ে সৈন্যদল ফিরে যেতে বাধ্য হ'লো।

আবার একশো সৈন্য নিয়ে পুলিশ এলো। এদিকে কার্মনের লোকেরা কেল্লা অধিকার করে বসে আছে—পুলিশ তাদের কিছুই করে উঠতে পারলো না। শুধু তারা ব্যর্থ যুদ্ধ করলো। অবশেষে কার্মনই যুদ্ধে জয়ী হলো।

কার্মন জানতো, পুলিশের ফৌজের সংগে অনির্দিষ্টকাল ধ'রে যুদ্ধ করবে এমন সৈন্যদল তার নেই। সুতরাং কার্মন তার লোকজন নিয়ে পলায়ন করে পাহাড়ের ভিতরে এসে প্রবেশ করলো। গভর্ণমেণ্ট এসে খনি দখল করলো।

কার্মন মনে মনে এক ফন্দি আঁটলো, গভর্ণমেণ্ট খনি থেকে চাঁদি আহরণ করুক, কিন্তু তা নেবো আমি। গভর্ণমেণ্টের ধনাগারে যেতে দেবো না।

এক মাস পরে—মেলাই চাঁদি তিনশো গাধার পিঠে বোঝাই করে পুলিশ ষ্টেশনের দিকে চলেছে। অফিসারের মনে কোন শংকা নেই। সে নির্ভয়। কারণ এক মাস পর্য্যন্ত কার্মনের কোন খোঁজ নেই। কার্মন পালিয়েছে।

কিন্তু কার্মন পালায়নি। সে সময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। তার নিযুক্ত গুপ্তচর খনির ভিতরে গিয়ে খবর নিয়ে আসতো।

সৈন্যদল আনন্দিত মনে গান গেয়ে স্ফূর্তি করে পথ বেয়ে চলেছে, হঠাৎ অতর্কিতে একশো অনুচর নিয়ে কার্মন এসে তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। অফিসার সাহেব কার্মন যে এরকম বেআদপী করবে, আশাই করেনি কখনো—কাজেই এ ব্যাপারে সে গেল ভড়কে। কার্মন এগিয়ে এলো তার সামনে, বললো গাধাগুলোকে এত কষ্ট দিচ্ছেন দেখে আমাদের মনে ভারী দুঃখ হল, তাই এলাম আপনাদের বোঝা কিছু হাল্কা করে দিতে।

এর পরে আর বেশী কথাবার্তার সময় ছিল না। কার্মনের একদল লোক যখন চাঁদি লুঠ করতে ব্যস্ত, তখন আর একদল সৈন্য পুলিশের সংগে যুদ্ধ করছিলো।

পুলিশের ফৌজ পরাজিত হ'য়ে রিক্ত হস্তে প্রস্থান করতে বাধ্য হ'ল।

এদিকে কার্মন লোকজনসহ আবার গা-ঢাকা দিল। গভর্ণমেণ্ট বিরাট একদল সৈন্য নিয়ে তার অনুসন্ধানে রত হ'ল—কিন্তু তাকে পেলো না।

কার্মন পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে বিদ্রোহী জেনারেল জিমেন্তাকের নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়ে তার কাছ থেকে অর্থ এবং ফৌজ সাহায্য প্রার্থনা করলো। বলা বাহুল্য, তার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকলো না।

এর পর কার্মন গভর্ণমেণ্টকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। ক্রমাগতই পুলিশ-সৈন্যদের সাথে তার লড়াই চলতে লাগলো, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী প্রত্যেক বারই কার্মনের গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিতে লাগলো। কার্মন বহু স্থানেই যুদ্ধ জয় করলো।

বহু দিন পরে আবার প্রণয়-দেবতা তার অর্ঘ-সম্ভার নিয়ে কার্মনের প্রাণে দেখা দিল। কার্মন দেখলো, বসন্ত জাগ্রত দ্বারে। কার্মন Jack Horley-র সংগে প্রেমে পড়লো। জ্যাক নিজের জীবন নিয়ে জুয়া খেলছিলো। সে ছিল সাহসী বীর—বীরত্ব দেখাবার অনুপ্রেরণা নিয়ে সে এসে উপস্থিত হ'ল জেনারেল জিমেন্তাকের কাছে। এর পর বহু বাধা-বিপত্তি সে অনায়াসে জয় করলো তার তরবারি দ্বারা, রণক্ষেত্রে তার অপূর্ব রণ-প্রতিভা ফুটে উঠলো। কার্মন তার বীরত্বে, তার শৌর্যে মুগ্ধ হ'য়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হ'ল।

কার্মন মনে মনে ভাবলো,—শুধু ভাবা নয়, এক স্থির সংকল্প নিয়ে সে ব'সে রইলো—বিদ্রোহ শেষ হ'য়ে গেলে এর সংগে বিয়ে হবে আমার।

কিন্তু বৃথা আশা।

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিদ্রোহী দল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হ'ল।

কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ হ'য়ে রইলো দু'জন,—কার্মন এবং জ্যাক। তারা কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করলো না। লুঠ ক'রে বেড়াতে লাগলো শুধু গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। থানা আর গুদামঘর তারা আগুনে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে বেড়াতে লাগলো।

এতে জনসাধারণ যে কত খুসী, কত আনন্দিত হ'ত তা বলা যায় না। তারা দু' হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ ক'রতে লাগলো। তারা ব'লতে লাগলো, অভয়ের অবতার রণচণ্ডিকা কার্মন। জনসাধারণের এই অপর্য্যাপ্ত সহানুভূতি ছিল ব'লেই গবর্ণমেণ্ট সহজে তাদের কিছু ক'রে উঠতে পারেনি!

শেষে একদিন—জ্যাক অন্যত্র যুদ্ধ ক'রতে গেছে, আর কার্মন গভর্ণমেণ্টের অশ্বশালা ঘিরে ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। এমন সময়ে একটি মেয়ে আর্ত্তস্বরে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো,—ওগো, কে আছো? বাঁচাও, বাঁচাও!

কার্মন ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলো, কি হ'য়েছে বোন?

মেয়েটি ব'ললো, আমার দুইটি ছেলে ওই ঘরে ঘুমিয়ে র'য়েছে। ওদের বাঁচাও।

কার্মন মুহূর্ত্তমাত্র আর সেখানে দাঁড়ালো না। তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় উঠে সেই বাড়ীর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বাড়ীর সামনে গিয়ে যখন পৌঁছলো, দেখলো, ঘরময় আগুন জ্ব'লছে, দাউ দাউ ক'রে। কার্মন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত্ত কী যেন চিন্তা ক'রলো। তার পর কর্ত্তব্য স্থির ক'রে এক লাফে সে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

কিন্তু তার চেষ্টা সফল হ'ল না। ছেলে দুটিকে বাঁচানো সম্ভবপর হ'ল না। বাড়ীতে প্রবেশ করার সংগে সংগে সমস্ত বাড়ীখানা ধ্বংসে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়লো।

আর তার সাথে সাথে কার্মনের বীর-জীবনেরও পরিসমাপ্তি হ'ল।

# সেই বিড়ালের চোখ

শ্রীঅভি-শ্যামল

রাত হলো,
এবার শুয়ে পড়ো—
মা বললেন।

হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোয়
আমি তখন
রামন্ দেল্ ভাল্ আঁক্লানের
আমার বোন অ্যাণ্টোনিয়া
গল্পটায়
ডুব-সাঁতার কাটছিলাম।
আর
এই সময়
মার কথা কানে গেলো।

খোলা জানলাটার দিকে তাকিয়ে দেখি
সত্যি রাত হয়েছে,
কারণ
বাঁকা চাঁদ ঢলে পড়েছে
পশ্চিমে।
তাই গল্পটা শেষ হতেই
আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু মনের মধ্যে সেই বিড়াল—কালো বিড়াল
সংস্কারাচ্ছন্ন স্পেনদেশের পটভূমিকায়
আজও হয়তো যাকে দৈবঘটনার হস্তারক হিসেবে পাওয়া যাবে
ভ্যালিসিয়ার সাণ্টিয়াগোয়
আমাদের সমাজ-জীবনে
যার হুবহু মিল···
এই মশারির মধ্যে
সেই বিড়ালের চোখ
জ্বলন্ত ভাঁটার মত
জ্বলতে দেখছি।

# অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
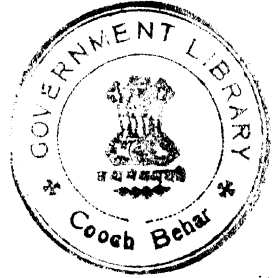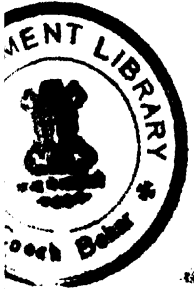
৫

'নিমাই!' ডাকলেন জগন্নাথ। বললেন, 'বাবা, ঘরের ভিতর থেকে আমার পুঁথিখানা নিয়ে এসতো।'

কোন পুঁথি কে জানে, শিশু নিমাই চলল ঘরের দিকে।

এ কি, নিমাইয়ের পায়ে নূপুর এল কোত্থেকে! কই না, শচী ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তার নূপুর নেই তো! তবে, কেন বাজছে এই রুণুঝুনু! জগন্নাথও চঞ্চলচোখে তাকাতে লাগলেন চার দিক। দেখ, দেখ, যেমন পা পড়ছে তেমনি শব্দ ঝরছে তালে-তালে। ঘর তো ফাঁকা। তবে নিমাই ছাড়া কার এই ঝঙ্কার!

বাপের হাতে পুঁথি দিয়ে নিমাই চলে গেল খেলতে।

দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলেন জগন্নাথ। শচীও অনুগমন করলেন। এ কি অদ্ভুত দৃশ্য! ঘরের মেঝেতে তিন চিহ্ন ফুটে আছে। ধ্বজ বজ্র আর অঙ্কুশ। বিষ্ণুর তিন পদচিহ্ন। এ কে রেখে গেল!

'ঘরে দামোদর শিলা।' শচীকে মনে করিয়ে দিলেন জগন্নাথ: 'এ তারই কাণ্ড।'

তাই হবে হয়তো। সরল বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল শচী।

'পঞ্চগব্যে স্নান করাও শিলাকে। নিজে গিয়ে পরমান্ন রান্না করো।' হুকুম করলেন জগন্নাথ।

স্নানাহারের খুব আয়োজন হয়েছে দামোদরের। কি সমাদর শিলার! নিমাই হাসল মনে-মনে।

আমাকে কে খাওয়ায়! সকালের রোদ প্রায় দুপুরে এসে ঠেকল, আমাকে কে স্নান করায়! আমি খেলুড়েদের সঙ্গে ধুলোখেলা নিয়েই মেতে থাকি।

শচী তাকে ডাকছেন আকুল হয়ে, 'ওরে নাইবি-খাবি আয়,' নিমাই গ্রাহ্যও করেনা।

'ওরে রোদে তোর মুখ যে শুকিয়ে গেল, সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেল—' শচী আবার ডুকরে উঠলেন: 'বাড়ি আয়। তোর খাবার বেলা যে বয়ে গেল—'

কে কাকে ডাকে।

'তুই কেমনতরো ছেলে, তোর খিদে-তেষ্টা পায়না?'

নিমাই মনে মনে হাসে, তোমাদের তো দামোদরই আছে, তাকে খাওয়াও গে।

ছেলেকে ধরবার জন্যে হাত বাড়ায় শচী। নিমাই ছুট দেয়। সাধ্য কি তুমি আমাকে ধরো। আমি তো ঘরবন্দী পাথরের টুকরো নই।

তখন শচী কাঁদতে বসে।

চোখের জল দেখলেই থাকতে পারেনা নিমাই। গুটি-গুটি এসে চুপি-চুপি ধরা দেয়।

এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ এসেছে জগন্নাথের বাড়িতে। গলায় ঝুলছে বালগোপালের মূর্তি, মুখে নিরবধি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-নাম।

নামই কলিমলমথন। নামই চৈতন্যরসবিগ্রহ। নামই ঘনীভূত ব্রহ্ম।

নামকে যে শুধু শব্দ মনে করে সে মূঢ়। যার প্রতিমায় শিলাবুদ্ধি, গুরুতে মর্তবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, চরণামৃতে জলবুদ্ধি ও নামমন্ত্রে শব্দবুদ্ধি, সেই নিরয়গামী।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলো।

কৃষ ধাতুর উপর ণ প্রত্যয় করে কৃষ্ণ। কৃষি সত্তাবাচক, ণ আনন্দবাচক। যে নিত্যপুরুষ নিত্য আনন্দের উৎস, সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই সুখস্বামী।

কৃষ ধাতুর অর্থ ছুটো। কর্ষণ করা আর আকর্ষণ করা। যে জীবহৃদয় কর্ষণ করে, ভক্তির বীজ বোনে, সেই কৃষ্ণ। কিংবা যে জীবহৃদয় আকর্ষণ করে ভক্তি-পথে নিয়ে যায়, সে-ও কৃষ্ণ।

কৃষি সত্তাবাচক, ণ নির্বাণবাচক। যে নিত্যপুরুষ সমস্ত কামনাক্লেশের নিবারক, সেই কৃষ্ণ।

কৃষির আরেক অর্থ উৎকর্ষ। ণ-এর আরেক অর্থ সদ্ভক্তি। উৎকৃষ্ট সদ্ভক্তিদাতাই কৃষ্ণ।

যে পাপের নিবৃত্তি করে ও শত্রুর নিধন করে, সে-ও কৃষ্ণ।

এই নাম-জপের বিধি কি? এর কোনো বিধি নেই। দেশকালের অপেক্ষা নেই, অধিকারী-অনধিকারীর প্রশ্ন নেই, জাতিধর্মের বিচার নেই। শুচি-অশুচি উচ্ছিষ্ট-অনুচ্ছিষ্ট নেই। নামই নির্নিষেধ। নামই কামিতকামদ।

গোবিন্দরসে ঢুই চোখ ঢুলু-ঢুলু, ব্রাহ্মণকে দেখে জগন্নাথ কৃতকৃতার্থ। কি ভাবে তাঁকে সসম্ভ্রম সেবা করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। নিজের হাতে পা ধুয়ে দিলেন। জিগগেস করলেন, 'কোথায় আপনার দেশ?'

'আমি দেশান্তরী।' বললে ব্রাহ্মণ। 'আমি উদাসীন। চিত্তের বিক্ষেপে আমি দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াই।'

আতিথেয়তায় উদ্বেল হলেন জগন্নাথ। স্বহস্তে পাক করে ব্রাহ্মণ, তার রন্ধনের সমস্ত যোগাড় করে দিলেন। বিস্তৃত আয়োজন। ফলমূল খেয়ে থাকে, আজ কৃষ্ণের কৃপায় পক্ক অন্নের উপচার।

রান্না শেষ করে ব্রাহ্মণ খেতে বসেছে নির্জনে। খাবার আগে গোপালকে অন্ন নিবেদন করছে। মনে মনে বলছে, গোপাল, খাবে এস।

কোত্থেকে ছুটে এসেছে নিমাই। বলা-কওয়া নেই, অন্নের স্তূপের মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্ষুধার্ত মুখে তুলে নিয়েছে এক গ্রাস।

'হায় হায়—গেল, গেল—' চিৎকার করে উঠল ব্রাহ্মণ।

জগন্নাথ ছুটে এলেন। এ কি কাণ্ড! সর্ব অঙ্গে ধুলোবালি, প্রায় দিগম্বর, নিমাই দিব্যি ব্রাহ্মণের থালা থেকে ভাত তুলে খাচ্ছে। শুধু খাচ্ছে না, হাসছে মৃদু মৃদু।

'এ চঞ্চল শিশু ছুঁয়ে-ছেনে সব নষ্ট করে দিল—' ব্রাহ্মণ উঠে দাঁড়াল আসন থেকে।

জগন্নাথ নিমাইকে মারতে ছুটল। এ কি কদর্যতা!

ব্রাহ্মণই নিবৃত্ত করল জগন্নাথকে। বললে, 'ও অজ্ঞান শিশু, ওর কি ভালো-মন্দ শুচি-অশুচি বোধ আছে? ওকে মেরে লাভ কি? ও যখন এত চঞ্চল, বাড়ির লোকেদেরই উচিত ছিল ওকে সাবধানে রাখা।'

জগন্নাথ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

'আপনি কেন দুঃখ করছেন? সবই গোপালের ইচ্ছা।' ব্রাহ্মণ বললে, 'ঘরে যদি ফলমূল কিছু থাকে তাই দিন। তাই-ই তো আমার অভ্যেস, তাই খেয়েই আজকের দিন কাটুক।'

'না না, কিছুতেই না।' প্রবল প্রতিবাদ করলেন জগন্নাথ, 'আমি আবার সব যোগাড় করে দিচ্ছি, আপনি আবার রান্না করুন।'

রান্নার আবার যোগাড় হল।

যতক্ষণ না ব্রাহ্মণের রান্না আর খাওয়া শেষ হয় সামলাও দুরন্তকে। বেঁধে রাখতে না পারো, পাশের বাড়িতে নিয়ে যাও। ভিড়িয়ে দাও খেলুড়েদের সঙ্গে।

ছেলেকে কোলে নিয়ে চলেছেন শচী। পাড়ার মেয়েরা বলছে, 'ছি ছি, এ কি করলি? অতিথি ব্রাহ্মণের ভাত ছুঁলি?'

'আমি কি জানি!' ডাগর দীঘল চোখে তাকিয়ে নিমাই বললে, 'আমাকে ডাকল কেন?'

এ আবার কেমন কথা! পরস্পর চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল মেয়েরা।

'কোথাকার না কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন কুল কে জানে, তুই তার ভাত খেলি?' আর কেউ অন্যভাবে নিতে চাইল। 'মাঝখান থেকে তোরই জাত গেল।'

হাসি-হাসি মুখে নিমাই বললে, 'আমি তো গোয়ালা। বামুনের ভাত খেলে কি গোয়ালার জাত যায়?'

এ আবার কি অসম্ভব কথা! শচীর মুখের দিকে তাকাল মেয়েরা। ও যে ব্রাহ্মণের সন্তান এটুকুও ওকে শেখাওনি?

বেলা ঢলে পড়েছে, দ্বিতীয়বারের রান্না শেষ করল ব্রাহ্মণ।

শুদ্ধমনে নিরিবিলিতে আহারে বসেছে আরবার। ধ্যানে বালগোপালকে ভাবছে। বলছে, গোপাল, অগ্রভাগ গ্রহণ করো।

চিত্তের ঈশ্বর গৌরচন্দ্র শুনতে পেয়েছে। ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে চলে এসেছে ব্রাহ্মণের কাছে। তার মুদ্রিত

নয়ন খোলবার আগেই নিমাই থালা থেকে তুলে নিয়েছে অন্নমুষ্টি। শুধু তুলে নেয়নি, পুরে দিয়েছে মুখের মধ্যে।

'হায় হায়, আবার এসেছে, আবার ছুঁয়েছে—' আর্তনাদ করে উঠল ব্রাহ্মণ।

জগন্নাথ লাঠি নিয়ে তেড়ে এলেন। নিমাই ছুট দিল। শাসন-বারণ মানে না, এ কি দুর্দান্ত অনাচার! ওকে আজ মারবই মারব। ক্রুদ্ধ পায়ে জগন্নাথ পিছু নিলেন।

পাড়ার লোকেরা ধরে ফেলল জগন্নাথকে।

'দু-দুবার অতিথির ভাত ও নষ্ট করল। ছাড়ো, ওকে আজ আমি রূঢ় হাতে শিক্ষা দেব। কিছুতেই ছাড়ব ন'—'

'অবোধ শিশুকে মেরে তোমার সাধুত্বের কি বাহাদুরি হবে!' সকলে নিবৃত্ত করল জগন্নাথকে। 'আর মারলেই বা শিখবে কে? শিখলেই বা লাভ কি? বামুনের নষ্ট অন্ন তো আর শুদ্ধ হবে না।'

ব্রাহ্মণও সুর মেলাল। বললে, 'মিশ্র, যেদিন যা হবার তাই হবে। কৃষ্ণ আমার জন্যে আজ ভাত মাপাননি। তা না হলে দু-দুবার ফেলা যাবে? তুমি যা পারো ফলটল আমাকে কিছু দাও। না যদি পারো, থাকব উপবাসে। উপবাসেও গোবিন্দ।'

হঠাৎ কে এক কিশোর সামনে এসে দাঁড়াল। সর্ব অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য, স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র, মূর্তিমন্ত ব্রহ্মতেজ, কে এই বররুচি! মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ব্রাহ্মণ।

'এ কে? কার ছেলে?' জিগগেস না করে পারল না।

'বা, এ তো মিশ্রেরই ছেলে। বড় ছেলে।' বললে কে-একজন। 'দুরন্তের বড় ভাই প্রশান্ত।'

দেখলেই যেন নয়ন মন আনন্দে ভরে ওঠে। ব্রাহ্মণ বললে, 'যাদের এমন পুত্র, ধন্য সেই বাবা-মা।'

সব শুনল বিশ্বরূপ। বললে, 'আপনি আমাদের অতিথি, এ আমাদের মহৎ ভাগ্য। কিন্তু আপনি উপোস করে থাকবেন এ দুঃসহ—তাতে আমাদের ঘোর অমঙ্গল।'

ব্রাহ্মণ বললে, 'আমি বনবাসী, ফলমূল খেয়েই দিন কাটে। কদাচিৎ অন্ন জোটান কৃষ্ণ। দেখলে তো তিনি আজ জুটিয়েও জোটালেন না। দু-দুবার রাঁধলুম, দু-দুবার পণ্ড হল। সবই কৃষ্ণেচ্ছা। তোমার ঘরে যদি কোটি ভক্ষ্যদ্রব্যও থাকে, যদি কৃষ্ণ-আজ্ঞা না হয়, সাধ্য কি তুমি তা সম্ভোগ করো। তোমাকে যে দেখলুম, এই সন্তোষই আমার ভোজন।'

'না, না, কিছুতে নয়, আপনাকে আবার রাঁধতে হবে।' বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়ল: 'আপনি করুণাসিন্ধু, পরদুঃখে আপনি কাতর, পরসুখই আপনার পরম সুখ। সুতরাং আমাদের সন্তোষের জন্যে আপনি আবার রান্না করুন। আমি নিজের হাতে আবার সব জোগাড় করে দিচ্ছি।'

'কিন্তু,' ভয়ে-ভয়ে তাকাল ব্রাহ্মণ: 'কিন্তু ঐ দুরন্ত শিশুর কি হবে?'

'ওকে আমি সামলাব। ও আমার বাধ্য, অনুগত, আমি না-বললে কিছুতেই আসবে না এদিকে। তা ছাড়া,' বিশ্বরূপ বললে নিশ্চিন্ত আশ্বাসে, 'এখন সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, খেলাধুলো ছেড়ে এখন বাড়ি ফিরেছে নিমাই, এবার ঘুমিয়ে পড়বে বিভোর হয়ে—'

'ঘুমিয়ে পড়লে নিমাই একতাল কাদা।' বললেন শচী। 'তখন কে বলবে নিমাই আমার চঞ্চলের শিরোমণি।'

রাঁধতে রাঁধতে রাত হয়ে গেল ব্রাহ্মণের।

যা বলেছে বিশ্বরূপ, নিমাই মার পাশটিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিদ্রার সরোবরে ফুটে আছে একটি শান্তির শ্বেতপদ্ম।

যাক, নিশ্চিন্ত হয়েছে সবাই।

তবু বলা যায়না, অধিকন্তু ন দোষায়, আরো নেওয়া যাক সতর্কতা। দুই ঘরের মাঝ-দুয়ারে বসলেন জগন্নাথ। বললেন, 'বার-দুয়ার বেঁধে রাখো দড়ি দিয়ে। কোনো ফাঁক দিয়েই যেন বেরুতে না পারে।'

শচী বললেন, 'আমিও আমার হাত দিয়ে চেপে ধরে আছি।'

চার দিক থেকে সবাই আবৃত করে আছে নিমাইকে। অন্নব্যঞ্জনের থালা নিয়ে ব্রাহ্মণ বসেছে আহারে। চোখ বুজে গোপালকে ধ্যান করছে। নিবেদন করছে কৃপালব্ধ অন্নের অমৃত।

আমার কি আছে তোমাকে দিতে পারি? তুমি যে আমাকে অকৃপণ কৃপা করছ আমার শুধু আছে এই অনুভব। এই অনুভবটুকুই তুমি নাও।

এই অনুভবটুকুও তোমার কৃপা।

তোমার কৃপাতেই আমার ভক্তি। ভক্তি হয়

কিসে? ভক্তিতে। তোমার কৃপাতে। তোমার কৃপাই সুখসারসর্বস্বা। সারঙ্গরঙ্গদা।

ধীরে-ধীরে সর্বত্র নিদ্রার আবেশ নামল। অচেষ্ট ঘুমে আচ্ছন্ন হল সকলে।

নিমাই উঠে এসে দাঁড়াল ব্রাহ্মণের সামনে। চকিতে থাবা বসাল ভাতের থালায়।

'হায় হায় হায়—' বিপ্র আবার চিৎকার করে উঠল।

কিন্তু কে শোনে! সবাই ঘুমে অচেতন।

'হায় হায় করছ কেন?' নিমাই ধমক দিয়ে উঠল। 'কেন তবে ডাকছ আমাকে? কেন তবে ভাত-ডাল নিবেদন করছ?'

'তোমাকে ডাকছি? তোমাকে নিবেদন করছি?' মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল ব্রাহ্মণ।

'তবে আর কাকে? আমাকে ভক্তিভরে ডাকছ বলেই তো আমি থাকতে পারছি না। বারে বারে উঠে আসছি, ছুটে আসছি বারে বারে।'

'কে তুমি?'

'কে আমি?'

নিমাই আট হাত মেলে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণ দেখল, এ কি বিভূতি! এক হাতে ননী, আরেক হাতে তাই তুলে তুলে খাচ্ছে নিমাই। আর দুই হাতে বাঁশি বাজাচ্ছে। আর বাকি চার হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম। শিরে শিখি-পুচ্ছ, চরণে রত্ননূপুর। বুকে কৌস্তভ, গলায় বৈজয়ন্তী। আর এ কি! পিছনে কদমগাছ, গোপ-গোপী গাভী আর নীলাঞ্জনা যমুনা।

আনন্দে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল ব্রাহ্মণ।

গৌরসুন্দর ব্রাহ্মণের পায়ে হাত রাখল। ব্রাহ্মণ চেতনা পেয়ে কাঁদতে লাগল পা ধরে। নিমাই বললে, 'যা আজ দেখলে তা কাউকে বোলো না কিন্তু। এ আখ্যান শুধু ভক্ত আর ভগবানের। তোমার প্রেমভক্তিই তোমাকে এ দর্শনের অধিকারী করেছে।'

এক মুষ্টি অন্ন মুখে পুরল নিমাই। পরে চলে গেল ধীরে-ধীরে। শুল এসে মায়ের পাশটিতে।

সবাই জেগে উঠে দেখল ব্রাহ্মণ সুতৃপ্তিতে আহার করছে। নয়নে জল, তাই আস্বাদে মধু।

'মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু'। বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ। শুধু আমাতে মন অর্পণ করো। আমার ভক্ত হও, যজন করো আমার, আর নমস্কার করো আমাকে। প্রতিজ্ঞা করে বলছি, শুধু তাতেই তুমি আমাকে পাবে। তুমি যে আমার প্রিয়, আমার স্বভাবপ্রিয়।'

শুধু ভক্তিতেই হবে। কর্মযোগ জ্ঞান কিছুরই ভক্তি অপেক্ষা রাখে না। সে স্বতন্ত্র স্বসম্পূর্ণ। বৈরাগ্যে যা হবে, জ্ঞানে ধ্যানে যা হবে, যা হবে তীর্থে ব্রতে দানে পুণ্যে, তা একমাত্র ভক্তিতেই ফলনীয়! একমাত্র ভক্তিতেই ঈশ্বর বশংবদ। ভক্তির সাধনে কিছুই লাগে না, না জ্ঞান, না বৈরাগ্য, না অন্যতর অনুষঙ্গ। 'জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।' ভক্তি অন্যনিরপেক্ষ।

বেদে যে পারঙ্গত, যে বা সর্বশাস্ত্রার্থবিদ সেও যদি সর্বেশ্বরে ভক্তিযুক্ত না হয়, সে পুরুষাধম ছাড়া কিছু নয়।

ভক্তিতে জাতিকুলের বিচার নেই। ভক্তি সার্বত্রিক। হোক সে কিরাত, হূন বা অন্ধ্র, পুলিন্দ বা পুক্কস, আভীর বা যবন, সেও যদি ভক্তিকে আশ্রয় করে বা ভক্তকে আশ্রয় করে, সে-ও সংশুদ্ধ হয়ে ওঠে। শুধু মানুষ কেন, কীট পতঙ্গ পশু ও হরিতে সংন্যস্তকর্মা হলে ঊর্ধ্বগতি লাভ করে।

সাধু ভজন করবে এ আর বেশি কথা কি! সুদুরাচারও যদি অনন্যভাক হয়ে আমাকে ভজনা করে, বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, তাকেও সাধু বলে জানবে। যেহেতু সে সম্যক্‌ব্যবসিত, আমাকেই বুঝেছে শ্রেষ্ঠ নিশ্চয়রূপে।

আরো কত সুবিধে, ভক্তিতে স্থান-অস্থান নেই। 'ন দেশো নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।' যেখানে খুশি হাটে ঘাটে মাঠে ভবনে শ্মশানে ভজন করলেই হল। আর যে কোনো অবস্থায়। প্রহ্লাদ করেছিল মাতৃগর্ভে, ধ্রুব শৈশবে, অম্বরীষ যৌবনে, যযাতি বার্ধক্যে, অজামিল মৃত্যুকালে, চিত্রকেতু মরণান্তে। নরকে বসেও যদি হরিনাম করা যায়, নরক স্বর্গ হয়ে ওঠে।

শ্রীনামকীর্তনই শ্রীকৃষ্ণভজন।

৬

ক্ষণে-ক্ষণে নালিশ আসে জগন্নাথের কাছে। কবে হাতেখড়ি হয়েছে নিমাইয়ের তবু পড়ায় একবিন্দু মন নেই। এখন তার খেলা হয়েছে গঙ্গায় সাঁতার কাটায়। তার মানে অন্যরকম দুরন্তপণায়।

পা দিয়ে অন্য স্নানার্থীদের পা ছুঁয়ে দিচ্ছে। কখনো বা ছিটিয়ে দিচ্ছে কুলকুচো করে। যে একবার স্নান করে উঠেছে তাকে দ্বিতীয় বার স্নান করাচ্ছে।

দ্বিতীয় বারকে তৃতীয় বার। সাধ্য নেই তুমি তাকে ধরো। কখন ধাবন্ত মাছের মত পিছলে যাচ্ছে কবল থেকে বোঝাও যাচ্ছে না, তাই সবাই নালিশ করছে মিশ্রের কাছে।

'তোমার ছেলের জ্বালায় গঙ্গাস্নান ছেড়ে দিতে হবে দেখছি।'

'কেন, কি করেছে?' উদ্বিগ্নস্বরে প্রশ্ন করে জগন্নাথ।

'জলে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা করছি, ডুব দিয়ে এসে আমার পা টেনে ধরল—'

'ধ্যান করছি ঘাটে,' আরেকজন বলল, 'জল ছিটিয়ে দিল আমার গায়ে। বললে, চোখ বুজে কাকে ধ্যান করছ? চোখ খুলে আমাকে দেখনা। কলিযুগে আমিই প্রত্যক্ষ নারায়ণ।'

আরেকজন বললে, 'ঘাটে বিষ্ণুপূজার ফুল-দুর্বো নৈবেদ্য-চন্দন সাজিয়ে স্নান করতে নেমেছি, তোমার ছেলে কোত্থেকে এসে আসনে বসে নৈবেদ্য খেতে সুরু করে দিল। ধর-ধর বলে যেই তাড়া দিতে গেলুম অমনি পালিয়ে গেল একছুটে। যেতে-যেতে বললে, যার জন্যে এনেছিলে সেই খেয়ে গেল।'

এ কি উৎপীড়ন!

আরো বিচিত্র নালিশ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে। কেউ বলছে, 'আমার উত্তরীয় নিয়ে পালিয়ে গেছে। কেউ বলছে, আমার শিবলিঙ্গ। কেউ বা আমার গীতা। আমার পিঠের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁধে চড়ে বসে। এ নালিশ আরেকজনের। ধরতে যাচ্ছি, লাফিয়ে পড়ছে জলে, বলছে, আমি রাম আর রাম যার কাঁধে চড়েছিল তুমি সেই কপিবর। স্নান করে উঠেছি, বলছে আরেকজন, গায়ে বালি ছুঁড়ে মারছে, কখনো বা আমাদের তৈরি পূজার আসনে বসে নিজেই নিজেকে পূজা করছে। তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি যদি এ-সবের প্রতিকার না করো আমরা যাই কোথা?'

'তারপর নদীতে একবার নামলে আর উঠতেই চায় না। এতক্ষণ জলে ঝাঁপাঝাঁপি করলে অসুখে পড়বে যে।'

'আর দেখ দেখি আমার এই ছেলে ছুটো। এক-রত্তি ছেলে, এর কানের মধ্যে কেবলি জল ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আর এটাকে দুর্বল পেয়ে কেবলি চোবাচ্ছে জলের নিচে। তুমিই বলো কত আর সওয়া যায় অনাচার?'

শুধু পুরুষ নয়, মেয়ের দলও শচীর দরবারে নালিশ নিয়ে আসে।

'তোমার গুণধর ছেলে আমাদের কাপড় চুরি করে নিচ্ছে। নাইতে নেমেছি ঘাটের পৈঠায় শুকনো শাড়ি, উঠে এসে দেখি শাড়ি নেই। নিমাই পালাচ্ছে বগলে করে।'

'যদি কিছু বলতে যাই, মন্দ বলে, ঝগড়া করে, বালি ছোঁড়ে, জল ছিটোয়—'

'আমার চুলের মধ্যে ওকড়ার ফল গুঁজে দেয়।'

'আর, কি সাংঘাতিক তোমার ছেলে,' আরেক মেয়ে গর্জন করে ওঠে, 'আমাকে বলে, হ্যাঁ লা, আমাকে বিয়ে করবি?'

কোথায়, কোথায় নিমাই? লাঠি হাতে নিয়ে তর্জে ওঠেন জগন্নাথ। আর কোথায়! তার যা নিত্য কর্ম, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে শুরু করেছে উৎপাত।

দাঁড়াও, ওরই একদিন কি আমারই একদিন।

যে সব মেয়ে নালিশ করতে এসেছিল তারাই আগে ছুটে গেল ঘাটের দিকে। নিমাইকে বললে, 'নিমাই, শীগগির পালা। তোর বাবা আসছেন।'

'আসছেন?' ভয় পেল নিমাই।

'মোটা একগাছ লাঠি নিয়ে আসছেন। তোকে আজ আর আস্ত রাখবেন না। পালা যদি বাঁচতে চাস—'

জল থেকে উঠেই নিমাই ছুট দিল। যাবার আগে বললে, 'যদি বাবা এসে জিগগেস করেন নিমাই কোথায়, বলিস, আসেনি এদিকে।'

হন্তদন্ত হয়ে এলেন জগন্নাথ। জলে ও ঘাটে অনেক বালক-বালিকার ভিড়, অনেক স্নানার্থীর, কিন্তু, কই, নিমাইকে দেখতে পাচ্ছিনা তো!

'নিমাই কোথায়?' গম্ভীরঘোষে হুঙ্কার করলেন জগন্নাথ।

মেয়ের দল বললে একবাক্যে, 'কই নিমাই তো এখনো স্নানে আসেনি!'

ছেলের দল থেকে বললে কেউ কেউ, 'দেখলাম পড়ে শুনে বই খাতা নিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। জিগগেস করলাম, কি রে, নাইতে যাবিনে? বললে, তোরা যা, আমি আসছি এখুনি।'

'সেই থেকে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কই বাড়ি যায়নি এখনো?'

লাঠিহাতে ক্রুদ্ধ চোখে জগন্নাথ তাকাতে লাগলেন চার দিক।

বয়স্কদের কেউ-কেউ বললে, 'জলে ছিল যেন দেখেছিলাম, পালাল কোথায় ?'

আবার কেউ বললে, 'ভুল দেখেছ। নিমাই এখনো আসেনি। কি হে', পার্শ্ববর্তীকে প্রশ্ন করল স্নানার্থী, 'দেখেছ নিমাইকে ?'

'না আসেনি এখনো। এলে ঘাটে-পাঙে কাউকে তিষ্ঠোতে দিত নাকি ?'

ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে চললেন জগন্নাথ।

পাঠশালার পথ দিয়ে নিমাই বাড়ি ফিরছে। পায়ে-পায়ে শুকনো ধুলো, হাতে পুঁথি, আঙুলে-মুখে কালির লিখন।

'মা গো, তেল দাও, স্নান করে আসি।' মায়ের কাছে হাত পাতল নিমাই।

'এ কি, তুই যাসনি স্নান করতে ?' শচী অবাক হয়ে রইলেন।

'কই আর গেলাম! স্নান করতে গেলে মাথার চুল কি শুকনো থাকে, না কি পরনের কাপড় বদলে যায় না ?'

সত্যিই তো, ছেলেটার গায়ে একটুকু জলস্পর্শ নেই। শুকনো খট-খট করছে। আলগা ধুলো উড়ছে পা থেকে।

লাঠি হাতে ফিরে এলেন জগন্নাথ। তেড়ে গেলেন নিমাইয়ের দিকে। বললেন, 'স্নান করতে গিয়ে এসব দুর্ব্যবহার কেন ?' অপরাধের দীর্ঘ তালিকা মেলে ধরলেন।

'স্নান করতে গিয়ে ? কোথায় আজ স্নান করতে গেছি ?' নিমাই গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি যদি স্নান করতে না-ও যাই তবু—আমার নামে বানিয়ে বানিয়ে বলে যার যা খুশি।' আর কেউ হয়তো কিছু করে আমার নামে চালিয়ে দেয়। আমাকে কেউ দেখতে পারে না। আমি সকলের চক্ষুশূল।' অভিমানে মুখখানি থমথমে করে বাপের গা ঘেঁসে দাঁড়াল বিশ্বম্ভর।

লাঠি ফেলে দিয়ে জগন্নাথ ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। সত্যিই মিছিমিছি সকলে লাগায়, কেউ দুচোখে দেখতে পায়না নীলমণিকে। নইলে, সবাই বলছে কিনা নিমাই জলের মধ্যে হুটোপুটি করছে, অথচ চেয়ে দেখ গায়ে তার এতটুকুও স্নানচিহ্ন নেই। শুকনো পুঁথি। শুকনো বস্ত্র, শুকনো চুল। যত সব বানানো কথা।

মায়ের কাছ থেকে তেল ও বাপের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে নিমাই আবার চলে এল গঙ্গায়। শুরু করল ঝাঁপাঝাঁপি। তাকে ফিরে পেয়ে তার সঙ্গীরা খুশি। যাদের বসন চুরি যায় তারাও। আর বয়স্কের দল ভাবে, নিমাইয়ের দুষ্টুমি না থাকলে স্নান করে আনন্দ কই ? ওকে কাছে পেলে পূজা-ভঙ্গও যা পূজা-সাঙ্গও তাই।

কাঁদতে শুরু করেছে নিমাই।

কি চাই, কেন কাঁদছিস, কি হয়েছে, সবাই অস্থির হয়ে উঠল। নিমাইয়ের কান্নাও অসাধারণ। শুরু হলে থামতে চায়না আর এত জল পড়ে যে মনে হয় জল-স্থল যেন ভেসে যাবে মিশে যাবে এক হয়ে।

দু কানে কত হরিনাম করছেন শচী, তবু নিমাইয়ের নিবৃত্তি নেই।

কাঁদতে-কাঁদতে মূর্চ্ছা যাবে বুঝি। শচী চোখে আঁধার দেখছেন। বললেন, 'বাবা, বল, তোর কি চাই ? যা চাস তাই দেব।'

'তাহলে আমাকে একাদশীর নৈবেদ্য এনে দাও।' নিমাই বললে স্থির হয়ে।

'সেই নৈবেদ্য পাব কোথায় ?'

'পাশের বাড়িতে জগদীশ পণ্ডিত আর হিরণ্য ভাগবত থাকেন, তাঁরা আজ একাদশীর উপোস করেছে, বিষ্ণুর জন্যে যোগাড় করেছে অনেক নৈবেদ্য।' নিমাই বললে সরল মুখে, 'সেই নৈবেদ্য আমাকে এনে দাও। সে নৈবেদ্য পেলে আমি আর কাঁদব না।'

এ কি অসম্ভব কথা! শচী জিভ কেটে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'অমন কথা বলতে নেই। ও ঠাকুরের দ্রব্য, ও কি চাইতে আছে ? বল তোর কোন ফলে সন্দেশে অভিরুচি, আমি বাজার থেকে এনে দিচ্ছি।'

নিমাই আবার কান্নার রোল তুলল।

জগন্নাথ তখন গেলেন পাশের বাড়ি। ব্রাহ্মণ দুজনকে বললেন তাঁর ক্ষ্যাপা ছেলের আজগুবি কথা।

পরমবৈষ্ণব হিরণ্য আর জগদীশ তো স্তম্ভিত। আজ যে একাদশী তা ওই শিশু জানল কি করে ? এ কি, সমস্ত শরীরে অলোকস্পর্শের শিহর জাগছে কেন ? সন্দেহ কি, ওই শিশুতেই গোপালের অধিষ্ঠান।

নৈবেদ্যের থালা নিয়ে নিমাইয়ের সামনে ধরল হিরণ্য, ধরল জগদীশ। বললে সমস্বরে 'তুমিই গোপাল। তুমি খেলেই গোপালের খাওয়া।'

নিমাই থালা থেকে কতক তুলে নিয়ে খেল, কতক বা গায়ে মাখল, কতক বা মাটিতে ফেলল, কতক বা বিলিয়ে দিল আশে-পাশে।

আর কান্না নেই, ব্যাধি নেই, অভাব-আময় নেই। শুধু অমিয়—অখণ্ড অমিয়। [ ক্রমশঃ।

মনোজ বসু

## দুই
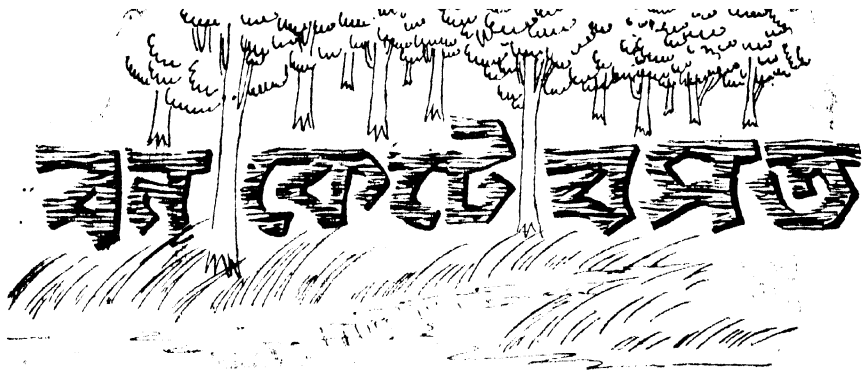
এখন বিনোদিনীর কষ্ট হয়, বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদে রাত্রিবেলা। চারুকে গোপন করে, সে যাতে টের না পায়। টের পেলে তামাসা করবে, তারপরে নিজেই হয়তো কাঁদবে বউদিদির আড়ালে আবডালে। মানুষটাকে বাড়ি থেকে সরাবার জন্য কত হেনস্থা করেছে ননদে-ভাজে মিলে। যাবার ঠিক আগের রাত্রেও কথা শোনাতে ছাড়েনি। চারুটা চালাকি করে তবু যা-হোক দক্ষিণের ঘরে নিয়ে পুরল। বিস্তর কৌশল পোড়ারমুখীর মাথার ভিতর। তারই একটা বর জোটানো গেল না। ঘোরাঘুরি করে জোটায় কে? যার করবার কথা, সে-মানুষ কোন মুলুকে উদাসীন হয়ে রইল। আগে চিঠিপত্র লিখত। কত আশার কথা, ভালবাসার কথা। এদের নিয়ে গিয়ে কোন এক দূরদেশের নতুন বাসায় তুলবে, সেই সব আনন্দের ছবি। আর ইদানীং 'ভাল আছি' এই খবরটুকু জানাতেও আলস্য। ভুলে গেছে একেবারে। ভাবতে ভাবতে বিনোদিনীর বড্ড খারাপ লাগে, পেঁটরার তলায় রেখে-রাখা গগনের পুরানো চিঠি বের করে দেখে সেই সময়।

গাঁয়ের মধ্যেই বিনোদিনীর বাপের বাড়ি। বাপ নেই, ভাইরা আছে। অবস্থা ভাল। ভুঁইক্ষেত আছে, আর বাখিমালের কারবার। ভাইগুলো অসুরের মতন খাটে—দিনের আলোর কণিকা থাকতে জিরান নেই, ঘোর হলে তবে বাড়ি ফেরে। তখন আর নড়ে বেড়ানো দূরের কথা—বসে থাকতেও মন চায় না, টান-টান হয়ে গড়িয়ে পড়ে। মেজ ভাই হল নগেনশশী—খোঁড়া মানুষ, সে কোন খাটনির কাজ পেরে ওঠে না। দেহের খুঁত ঈশ্বর কিন্তু আর এক দিক দিয়ে পুষিয়ে দিয়েছেন—বুদ্ধির হাঁড়ি মাথাটা। বিষয়-সম্পত্তি সে-ই দেখে। গ্রামের দশ রকম সমস্যায় নগেনকে সবাই ডাকে। জ্যেষ্ঠ রাজেনশশী বর্তমান থাকতেও নগেন কর্তা। ভাল মানুষ রাজেন হেসে হেসে ভাইয়ের তারিফ করে: আর কিছু পারবে না তো করে বেড়াক মাতব্বরি। সেই জন্যে ছেড়ে রেখেছি। একটা মানুষকে দায়ে-বেদায়ে দশজনা ডাকছে, তাতে বাড়ির ইজ্জত।

নগেনশশী গগনের বাড়ি এসে প্রায়ই খোঁজখবর নেয়। কিছু ধানজমি আছে গগনের, গুলো-বন্দোবস্ত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষেতের ফলন যা-ই হোক, এই পরিমাণ ধান দিতে হবে বছর বছর। বেশি ফলন হলে বেশি চাইনে, কম হলেও নাকে কাঁদতে পারবে না এসে তখন। নগেন থেকে এই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সে মধ্যবর্তী না হলে এত দূর হত না। এবং এখনো সে নিশ্চিন্ত নয়। কলিকালের মানুষ—লেখাজোখা যা-ই থাক, ফাঁকি দিতে পারলে ছাড়ে না। বিশেষত অপর পক্ষে যখন অবলা দুই স্ত্রীলোক। ধমকধামক দেয় সে চাষীদের ডেকে: যেটা ভাবছ তা নয়। শুধু মেয়েলোক নয়, সর্বক্ষণ আমি রয়েছি পিছনে। সমস্ত জানি। ওদের কেন বলতে হবে, নিজে আমি দেখতে পাই। পিছনে পিঠের উপর ফতুয়ার নিচে বাড়তি একটা চোখ রয়েছে আমার। ছোট পালিতে ধান মেপে দিয়েছ তুমি ধনঞ্জয়, আর চিটে মিশিয়েছ। পিঠের চোখে আমি সমস্ত দেখেছি।

লোকগুলো অবাক! জানল কি করে নগেনশশী, সে তো ছিল না সেই জায়গায়। মাপামাপি করে নিজেরা আড়িতে তুলে দিয়ে এসেছে, বাড়ির লোকে বা কাছে নি ত তারা কিছুও জানে না। গুণজ্ঞান জানে নিশ্চয় লোকটা, মুখে তাকিয়ে সমস্ত কেমন পড়ে ফেলতে পারে।

নগেন বলে, আট পালি ধান মাপে কম দিয়েছে বুদ্ধিমন্ত! দিনে ডাকাতি। জমিজমা খাস হয়ে যাবে কিন্তু, অন্য মানুষকে দিয়ে দেবো। সেটা বুঝো।

গগনের বাড়ি জলচৌকি চেপে বসে হাসতে হাসতে নগেনশশী জাঁক করে। গল্প করে, আর কপকপ করে পান চিবায়। একদিন অমনি পান খাচ্ছে: কে পান সেজেছে?

চারু রান্নাঘর থেকে বলে, বউদি চান করতে গেছে। একশ গণ্ডা লোক নেই, সে আপনি জানেন। সময় বুঝে আসেন এবাড়ি। এত বুদ্ধি রাখেন, আর কে পান সাজল সেটা কি জিজ্ঞাসা করে বুঝতে হবে?

চুণে যে গাল পুড়ে গেল—

গালের ভিতর দিকে পুড়েছে। সেটা কেউ দেখতে পাচ্ছে না। বাইরে পুড়তেই লজ্জা। লজ্জায় মুখ দেখানো যায় না।

শুনে নগেনশশী হা-হা করে হাসে। বলে, বলেছ ভাল। ভিতরে পুড়েছে। পুড়ছে অনেক দূর গিয়ে।

যা-ই ভেবে বলুক, চারু তা বুঝেও বোঝে না। জবাবে সে ভিন্ন দিক দিয়ে যায়: সেটা বুঝি। সেবারে সেই যে গরলগাছি

গিয়ে জ্বালা নিয়ে এলেন, গরল শীতল হল না এত কালের ভিতর।

রাঁধুনি দিয়ে বলে এমনি চারু। কথায় সুঁচ ফুটিয়ে ফুটিয়ে। নগেনের শ্বশুরবাড়ি গরলগাছি গাঁয়ে! বউ আনতে গিয়ে মুখ কালো করে ফিরে এলো। বউ বলে, খোঁড়া বরের ঘর করব না। ভিতরে অন্য কোন ব্যাপার আছে, কে বলতে পারে? আছে কিছু নিশ্চয়।

চারু বলে, সে গরল শীতল হল না। জ্বলুনিতে ছটফটিয়ে বেড়ান, পায়ের অবস্থা তখন মনে থাকে না।

নগেনশশী চোখ পাকিয়ে বলে, তুমি আমার পায়ের খোঁটা দিচ্ছ?

এত ঘন ঘন কেন আসেন আমাদের বাড়ি? খোঁড়া পায়ে কষ্ট হয়, সেই জন্য বলছিলাম।

মায়ের পেটের বোন আমার—মন বোঝে না, তাই আসতে হয়। গগন হতভাগা খোঁজ নেয় না, আমরাও নেবো না—একেবারে তবে ভেসে যাবে নাকি?

এর পরে আর জবাব আসে না। খুটখাট শব্দে চারু রান্নাঘরের কাজ করে যাচ্ছে।

নগেন গজর-গজর করছে: খোঁড়া-খোঁড়া একটা রব তোলা হয়েছে। খোঁড়া মানে কি— বাঁ পাখানা একটু টেনে টেনে হাঁটি। সান্নিপাত বিকার হয়ে পায়ের শিরায় টান পড়ে গেল।

চারু হেসে ওঠে, আমি তো শুনেছি কার পাছদুয়ারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ঢিল মেরে পা খোঁড়া করে দিল।

শুনবে বই কি! হয়তো বা চোখেই দেখেছিলে। একটু দরদ থাকলে এ রকম ঠাটা মুখ দিয়ে বেরুত না।

চারু কণ্ঠস্বর মৃদু করে বলে, কী জানি, লোকে তো বলে তাই। কিন্তু যা হবার হয়েছে, একটা পা ঠিক আছে এখনো। সেটা নিয়ে সামাল হয়ে চলবেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরঘুর করে বেড়াবেন না। আবার একটা বিয়ে করে ফেলুন।

বিনোদিনী এসে কাঁখের কলসী রান্নাঘরের দাওয়ায় নামাল। নগেনশশী দাওয়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, তোদের এখানে আর আমি আসব না বিনি! তোর ননদ যাচ্ছেতাই করে বলে। খোঁচা দেয়।

চারু বলে, বিয়ে করতে বলছি মেজদাকে।

বিনোদিনী বলে, তাতে কি অসাধ কারো? কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু দজ্জাল মাগী হতে দেবে না। গরলগাছি থেকে শাসানি দিল মেয়েওয়ালার বাড়ি: দিক না বিয়ে, ঝেঁটিয়ে নতুন বউয়ের মুখ থ্যাবড়া করে দিয়ে আসব। তাই শুনে মেয়ের বাপ পিছিয়ে যায়।

চারু বলে, আচ্ছা, করুন উনি বিয়ে। ঝাঁটাতে আসে যেন তখন। আমিও জানি ঝাঁটা ধরতে।

যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল নগেন। শুনল চারুর কথা। আজব মেয়ে! এত কটুকাটব্য বলে পরক্ষণেই আবার তার পক্ষ হয়ে বলছে।

## তিন

মোহানার ধারে গগনের চালাঘর উঠে গেল। এক রকম নিখরচায়। টাকা কয়েকের বাঁশ কিনে জলে ভাসিয়ে আনা হল পুবের ভাঙা অঞ্চল থেকে। এর উপরে আজে বাজে খরচা দু-চার টাকা। মাছের খাতা আরও জমেছে, মানুষজনের যাতায়াত বেড়েছে খুব। রাত্রিবেলা কাজের মানুষ আর দিনমানের আড্ডা জমাবার মানুষ। বৃষ্টি হলে ছোট ঘরে জায়গা হয় না। জায়গা হলেও খুব যে বেশি লাভ তা নয়। বাইরের বৃষ্টি থেমে গেলেও ফুটো চালে টপ-টপ করে জল ঝরতে থাকে। সামনে ফের শীতকাল। রাত্রের কাজকর্ম এইটুকু ঘরের মধ্যে অসম্ভব। তখনকার উপায় কি? মানুষজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, গতিক বুঝে গগন একেবারে চেপে গিয়েছে। কানেই যায় না যেন ওদের কথাবার্তা, কোন উচ্চবাচ্য নেই।

জগা বলাইর মুখ থেকে বড়দা ডাক চালু হয়ে গেছে। রাধেশ্যাম একদিন স্পষ্টাস্পষ্টি কথাটা তুলল: রুয়ো চেঁচে অর্ধেক সাজ-পত্তোর বানিয়ে অমনধারা ফেলে রাখলে বড়দা, আর কিছু হবে না?

খাতা লিখতে লিখতে গগন সংক্ষেপে বলে, হবে।

বর্ষা চলে গেল, খরার সময় এইবার। সাজপত্তোর শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে যাবে। উনুনে দিতে হবে, ঘরের কোন কাজে আসবে না।

গগন পাকা-হিসাবটা সতর্ক ভাবে এখন পাতড়া-খাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছে, টোকার সময় ভুলচুক হয়েছে কিনা। কেনাবেচার ভিড়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি পাতড়ায় টুকে রাখে, দিনমানে পাকা-খাতায় তুলতে হয়। দায়িত্বের কাজ, দশের সঙ্গে দেনাপাওনার ব্যাপার, হেরফের হলে ঝামেলায় পড়ে যাবে। অধিক বাক্যব্যয়ের ফুরসৎ কোথা এখন? তবু যা হোক একটু বিশদ করে গগন জবাব দিল, উনুনে দিতে হবে না, ঘরেই লাগাব।

হর ষড়ুই একজন ব্যাপারি। গাঙপারে বরাপোতায় ঘর, হামেশাই পারাপার হওয়া মুশকিল। রাত্রিবেলা তো নয়ই। সন্ধ্যা-রাত্রেই তাই পার হয়ে এসে ফাঁকা চরের উপর বসে থাকতে হয়। ঘরে গরজ তার সকলের চেয়ে বেশি। হর বলে, তুমি সাজসরঞ্জাম দিয়েছ, আমরা গায়ে-গতরে খেটে দিই। বলো তো আজ থেকেই কোমর বেঁধে লেগে যাই বড়দা।

রাধেশ্যাম মাছ মেরে খাতায় তুলে দিয়েই খালে নেমে যায়। মুখ-আঁধারি থাকতেই চান করে আসে। শৌখিন মানুষ। রাত্রে যে মূর্তিতে জাল হাতে বেরিয়ে থেকে ওঠে, দিনের বেলা কাউকে তা দেখতে দেবে না। বউকেও না। পাড়ার ভিতরে বাড়ি। জাল নিয়ে বাঁধের পথে টিপিটিপি বেরুবার সময় একটা পুঁটুলি খাতার চালাঘরে ছুঁড়ে দিয়ে যায়। ফিরে এসে মাছ নামিয়ে রেখে পুঁটুলি নিয়ে খালধারে ছোটে। চান করে বাঁধের উপর উঠে পুঁটলি খুলে চওড়া-পাড় ফর্সা ধুতি পরে ফেলে, গেঞ্জি গায়ে দেয়। সভ্যভব্য হয়ে মাথার চুল চিরুণি দিয়ে ফাঁপিয়ে-ফুলিয়ে দু'ভাগ করে এলবার্ট-টেড়ি কাটতে কাটতে ফেরে। হর ষড়ুয়ের কথা কানে গেল: চালাঘরটা উঠে যাক এবারে বড়দা। সকলে মিলে লেগে পড়ে তুলে দিই।

রাধেশ্যাম পরমোৎসাহে হাঁ-হাঁ করে ওঠে: তাই। ঘর বড়দারই শুধু হবে না, একা বড়দা সবখানি জায়গা জুড়ে থাকবে না। আমিও চৌপহর থাকব। জায়গা পেলে কে যাবে বাড়িতে মাগীর ক্যারক্যারানি শুনতে? এসো, লেগে যাই। দশ জনের বিশখানা হাতে লাগলে কতক্ষণ?

গগনের ভারি মনোমত কথা। খাতা থেকে মুখ তুলে হাসি-হাসি মুখ চতুর্দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, বেশ তো!

হাত বিশখানা কেন, কোন কোন দিন একসঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশ অবধি খাটছে—দেখতে দেখতে ঘর খাড়া হয়ে উঠল। বন ছাড়িয়ে মাথা উঁচু হল ঘরের। গাঙের দু বাঁক আগে থেকে দেখা যায়। চৌধুরিগঞ্জের জলের উপর সালতিতে ভাসতে ভাসতে সুস্পষ্ট নজরে আসে। বনের মধ্যে ঘর—সাঁইতলার মাছের খাতা ও নতুন ঘেরি। চৌরিঘর, গোলপাতার ছাউনি—স্ফূর্তির চোটে কাটিয়ে একদিন জগা ধানকর অঞ্চল থেকে এ-বছরের নতুন খড় কিনে ডিঙি বোঝাই করে আনল। খড়ে ঘরের মটকা সেরে দিল। কাঁচা রোদ পড়ে চিক্‌চিক্ করে, মটকা যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো।

এসব হল উপরের কাজ, দূর থেকে দেখা যায়। কাছে এসে দেখতে হয়—চরের নিচু জমির উপর পাহাড় বানিয়ে তুলেছে মাটি তুলে তুলে। বর্ষা যতই হোক—এমন কি ঘেরির বাঁধ ভেঙে বানের জল ঢুকে পড়লেও এই ভিটে ছাপিয়ে যাবে না। আস্ত আস্ত কাঠ পুঁতে একটা বেড়া দিয়ে দিয়েছে বন ও ঝোপঝাপের দিকটায়। গাঙ পাড়ি দিয়ে বাদাবনের বড় জানোয়ার না-ই আসুক, পিছনের ছিটে-জঙ্গলের মধ্যে কিছু থাকতে পারে তো? বেড়া দেওয়ায় জগার ঘোরতর আপত্তি: আরে দূর, বড়দা যেন কী! ঘরের মধ্যে আমাদের যেন সার্কাসের জন্তু মনে হয়। জন্তু কি আছে এপারে—বনবিড়াল কি বুনো শুয়োর কিম্বা বড় জোর গোবাঘা। তা আমরাও কিছু কম নাকি তাদের চেয়ে? অত ভয় কিসের?

গগন তার উত্তরে একটা উচ্চাঙ্গের রসিকতা করে। লেখাপড়ার এই মজা—পেটে থাকলে ঝাঁঝ বেরুবেই সময়ে অসময়ে। বলে, বুঝিস নে জগা, জন্তুরা লজ্জা পেয়ে যাবে মানুষ-জন্তুর কাণ্ডকারখানা দেখে। বেড়া দিয়ে তাই একটু অন্দর বানিয়ে নিচ্ছি।

মাছের খাতা নতুন আলায় উঠে গেল, গগনের বসতঘরও সেখানে। জগা আর বলাই পুরানো চালাঘর দখল করে আছে। দিনমানের খাওয়া কুমিরমারিতে—গদাধরের হোটেলের ভাত কিম্বা চিঁড়ে-মুড়ির ফলার। রাত্রে চালাঘরের মধ্যে চাটি চাল ফুটিয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে। ভোর রাত্রে উঠে আবার গিয়ে নৌকোয় বসতে হয়।

চালাঘরের উপর চাল রয়েছে, কিন্তু ছাউনির কিছু নেই। শোওয়ার পরে মনে পড়ে সে কথা, শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখা যায়। বলাই বলে, জগা, বনে চল একদিন। চাট্টি গোলপাতা কেটে আনা যাক।

জগা বলে, যাবো। পচাও যাবে। চাক কেটে কলসিখানেক মধু নিয়ে আসব। চাকের মরশুম এটা।

শীতের শেষ। ফুল ফুটেছে চারিদিকে। আলো হয়ে আছে বনের জায়গায় জায়গায়। মৌমাছি উড়ছে। কিন্তু মরশুম শেষ হয়ে আসে। কত মউল মধুর কলস ভরে বড় গাঙ বেয়ে চলে গেল। এদের যাওয়ার উদ্যোগ হয় না, ফুরসৎও নেই।

এক রাতে খুব বৃষ্টি। যা গতিক, চালের আচ্ছাদনে না থেকে কোন গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালে বৃষ্টি কম লাগত। বলাই বলে, কতদিন থেকে বনে যাবার কথা বলছি, তুই তা কানে দিসনে।

জগা মুখ খিঁচিয়ে বলে, ঐ যে ঘোড়ার ডিমের চাকরি হয়েছে। কুমিরমারির মাছ পৌঁছে দিতে হয়। চুলোয় যাকগে, কামাই করব।

সে কথা শুনে গগন রাগারাগি করে: বলো কি, মাছ পচে গোবর হবে, অত ক্ষতিলোকসান করবে তোমরা? উঠতি খাতার বদনাম হয়ে যাবে, ব্যাপারি ভেগে পড়বে। যা বলেছ বলেছ, বারদিগর মুখে আনবে না অমন কথা। গোলপাতার গরজ, সে আর কঠিন কি? কুমিরমারি থেকে ফিরে এসেও দু-পণ দশপণ কেটে আনা যায়। না হয় কাউকে দিয়ে আমি কাটিয়ে এনে রেখে দেবো।

বলছে কি শোন। অন্য মানুষ দিয়ে করাবে এই ছোট্ট একটুখানি কাজ। বনে যাওয়াতেই মজা। বন আর এই নতুন বসত—একটা খাল আছে শুধু মাঝখানে। বন এদের ভাণ্ডার। রান্নার শুকনো কাঠ চাও—বনে গিয়ে মটমট করে ভেঙে নিয়ে এসো। মাংস খাবার ইচ্ছে হল তো হাতে দেশি বন্দুক থলিতে বারুদ আর জালের কাঠি নিয়ে ঢুকে পড় বনের ভিতর। কামারে লোহা পিটিয়ে তোফা বন্দুক বানিয়ে দেয়, বন্দুক এ তল্লাটে ঘরে ঘরে আছে। পাশ-লাইসেন্স করে না, এমনি রেখে দেয়।

মধুর সুবিধা আপাতত হচ্ছে না, চাক খুঁজে খুঁজে বনের মধ্যে অনেক দূর অবধি পড়তে হয়। কুমিরমারি থেকে ফিরে এসে রাতবিরেতে সে কাজ হয় না। মরা গোণে একদিন জগা আর বলাই খানিকটা জল ভেঙে পায়ে হেঁটে খানিকটা সাঁতার কেটে ওপারের গোলঝাড়ে ঢুকে গোলপাতা কেটে রেখে এলো। শুখোক পড়ে পড়ে, তারপরে একদিন নিয়ে আসা যাবে।

শুধু এই এক চালাঘর নয়, পাড়ার চেহারাটাই ফিরে গেছে। পোড়ো ঘর একটা নেই। নতুন ঘরও বাঁধছে ভিন্ন তল্লাট থেকে এসে। মা-কালীর দয়া দেখা যাচ্ছে আশার অতীত। কাজের মানুষ বেড়েছে, আকাজের মানুষও আসছে ঢের। তামাকের খরচা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে, কুমিরমারির হাটে হাটে তামাক আনতে হয়। এ ছাড়া অন্নসন্ন বড়-তামাকেরও ব্যাপার আছে, তার জন্য ফুলতলা অবধি যেতে হয়। আগেও লোকে মেছোঘেরিতে জাল ফেলত চুরিচামারি করে। অন্ন জলে অগুন্তি মাছ নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, চোখের উপর দেখে কোন মানুষ স্থির থাকতে পারে? দু-এক খেওনেই যে মাছ উঠত, তাতে নিজেদের খাওয়া চলত, আর অক্ষম পড়শিদের দান করে দিত বাকিটা। গগনের এসে চেপে পড়ার পরে রীতিমত ব্যবসার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাদের জাল ছিল না, জাল বুনে নিয়েছে। জাল ফেলতে জানত না, তারা শিখে নিয়েছে ইতিমধ্যে। শুধু কাঙালি চক্কোত্তির পাঁচটা ঘেরি নয়, এ অঞ্চলের যাবতীয় ঘেরির লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাতের পর রাত এই মজা চলছে জলার উপরে। কাঁহাতক পেরে ওঠা যায়? রাত দুপুরের ঝুপঝুপে বৃষ্টির মধ্যে সালতি বাইতে বাইতে অথবা পায়ে হেঁটে হাঙরের দাঁতের মতো তীক্ষ্ণ হিং-ল জল ভাঙতে ভাঙতে আঙুল মটকে গালি দেয় গগন তার দলবলকে: কাঠি-খা হয় যেন হে মা বনবিবি! বাঘে যেন ওদের মুখে চড়ে ছিঁড়ে যায়। ডাকাতের দল গিয়ে যেন পড়ে।

—বিসোলাদের মধ্যে:

দিনকে দিন অবস্থা সঙ্গিন হচ্ছে—যেরকম ব্যাপার, সকল ঘেরির সব মাছই তো তুলে নিয়ে চালান করে আসবে। সাপ বাঘ কিম্বা ডাকাতের কবে সুমতি হবে, ঠিকঠিকানা নেই। দৈব ভরসায় না থেকে নিজেদের লোকজন পাঠিয়ে ঐ বাবুয়ের বাসা ভেঙে আগুন দিয়ে এলে কেমন হয়? সব ঘেরিরই সায় আছে, আপদবালাই উৎসন্ন হয়ে যাক এ তল্লাট থেকে।

গগন চৌধুরিগঞ্জের আলায় দু-একবার বেড়াতে গিয়েছে। সেই পয়লা দিনের মতো না হলেও খাতির-যত্ন করত গোড়ার দিকে, পান-তামাক খাওয়াত। যত দিন যাচ্ছে, ভাল করে যেন কথাই কইতে চায় না সেখানকার মানুষ। গগনই বা কম কিসে—যাতায়াত বন্ধ করে দিল। হঠাৎ এক দিন অনিরুদ্ধ আর কালোসোনা পান চিবাতে চিবাতে এসে উপস্থিত। বিকালবেলা লোকজন বেশি থাকে না এ সময়টা। যারা আছে, তাজ্জব হয়ে গেল। নেমন্তন্ন-আমন্তন্ন নয়, চৌধুরিগঞ্জের মানুষ উপযাচক হয়ে চলে এসেছে! মতলবখানা কি—উৎকর্ণ হয়ে আছে সকলে।

কেমন আছ বড়দা? আগে তবু যেতে অবরেসবরে। একেবারে বন্ধ করে দিয়েছ।

বেড়া ঘেঁসে মাচা বেঁধে নিয়েছে। হাতবাক্স ও খাতাপত্র নিয়ে গগন বসে তার উপরে। বাক্স-খাতা এক পাশে সরিয়ে শোয়ও রাত্রিবেলা গুটিসুটি হয়ে। গগন খাতির করে অনিরুদ্ধকে মাচার উপর নিজের পাশে বসাল।

দুঃখিত স্বরে অনিরুদ্ধ বলে, বিদেশি মানুষ আছি সবাই একখানে। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল, সেইজন্যে চলে এলাম।

গগন বলে, সময় পাইনে ভাই কাজের চাপে।

তাই তো শুনতে পাই। সবাই তাই বলে, রৈ-রৈ করে চলছে কাজকর্ম।

গগন হেসে বিনয় করে বলে, লোকে ভালবাসে। আমাদের ভাল চায়, বেশি করে তাই বলে বেড়ায়। পরের সম্পত্তি আর নিজের বুদ্ধি কেউ তো কম দেখে না। তোমার কাছে বলতে কি, চলে যাচ্ছে কোন রকমে। তবে আশায় রয়েছি। আশার পিছনে জগৎ ঘোরে। ঘরসংসার ত্যাগ করে এসে বাদাবনের নোণা জল খাচ্ছি, একদিন হয়তো ভাল হবে। কুমিরমারির ঐ রাস্তাটা হয়ে গেলে লরী চলবে, ফুলতলা অবধি মাল পৌঁছানোর ভাবনা থাকবে না। দরও পাওয়া যাবে। অনেক লোক ঝুঁকবে তখন এই মাছের কাজে।

ঘাড় নেড়ে অনিরুদ্ধ তারিফ করে: চলে যাচ্ছে, কি বলো বড়দ! খুব ভালই তো চলছে। আরও দেখবে, কত ভাল আছে এর পর।

তাকিয়ে তাকিয়ে অনিরুদ্ধ গগনের মুখের চেকনাই দেখে। ভাল ঠেকে না। এখনই এই। রাস্তা হয়ে গিয়ে বেশি লোক মাছের কাজে ঝুঁকবার পর বেশি বেশি মাছ আমদানি হবে, নাদুসনুদুস ভুঁড়ি দেখা দেবে তখন গগনের, তাকিয়া ঠেশান দিয়ে বসে থাকবে মাচার উপর, মাচা ছেড়ে ভুঁয়ের উপর নাববে না। সেই ভবিষ্যৎ সুদিনের কথা স্মরণ করে অনিরুদ্ধর প্রাণে জল থাকে না। ঘেরিয়ে সমস্ত মাছই তো তুলে নিয়ে আসবে গগনের দলবল। আলা সাজিয়ে বসে অনিরুদ্ধরা তবে কি করবে? আর এই ঘেরি বেঁধে গগন আচ্ছা এক কায়দা করে রেখেছে। শেষরাত্রে কেনাবেচার সময় হাতেনাতে এসে যদি ধরো, এমন কি অনুকূল বাবু দারোগা-পুলিশ নিয়ে এসে পড়েন, বলে দেবে আমাদের নিজস্ব ঘেরির মাছ। বলবে, গাঙ-খাল থেকে যা ধরে আনে সেই মাছ যোগ হয়েছে নতুন-ঘেরির মাছের সঙ্গে। মনের এই সব তোলাপাড় করছে। গগনের খাতির করে দেওয়া পান চিবাতে চিবাতে তবু একমুখ হেসে বলতে হয়, 'বড়দা, মনে পড়ে সেই বলেছিলাম, চলে এসো, বাদাবনে কারো অচল হয় না। খাটল কিনা দেখ।

গগন গদগদ হয়ে বলে, ভাল মনে কথাটা বলেছিলে। ভালই করেছি তোমার কথা শুনে।

তারপর যে জন্যে এসেছে তারা। হাসুক আর ভদ্রতা করে যাই বলুক, মনের মধ্যে রি-রি করে জলছে। কাল রাত্রের ঘটনা। বলে, এক কাণ্ড হল বড়দা। শয়তান কতকগুলো লোক বিষম নাজেহাল করেছে। মাছের নৌকো রওনা হয়ে গেছে, পাহারায় চলে গেছে আর সবাই। তিন জন মাত্র আছি আমরা আলায়। আমি আছি, কালোসোনা আছে, আর আছে কানা-শশী—মুখের আধখানা নেই, সেই লোকটা। দু-জনে শুয়ে পড়েছি, শশী তামাক টানছে বটগাছতলায় বসে বসে। সেই কুমিরে ধরার পর শশীর ঘুমটুম হয় না, তামাক খায় বসে বসে। শশী এসে আমার গা ঝাঁকায়: উঠে এসো। মাছ-মারাদের কী সাহস বেড়েছে, সাঁকোর মুখে আলো নিয়ে এসে মাছ ধরছে ঐ দেখ। ঐ যে সব কাঠ পোঁতা রয়েছে, ঐ হল সাঁকো। সত্যি সত্যি দেখতে পেলাম বড়দা, আলো জ্বলছে। যা গতিক এগুতে এগুতে তবে তো একেবারে আলার ঘাড়ের উপরে এসে পড়েছে! শশী নিল সড়কি, আমি আর কালো লাঠি। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি—মোটামোটা সলতে-জ্বালা মাটির পিদদিম, ডেগা সাজিয়ে পিদদিম বেশ জুত করে দিয়েছে। তাই বললাম শশীকে, ভাল বুদ্ধি তোর। আলো জেলে কেউ কখনো মাছ চুরি করতে আসে? কনকনে শীতে তুই আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে এলি, কোন দিকে দাঁড়িয়ে ওরা মজা দেখছে। ফিরে এসে বুঝলাম, মজা দেখা নয়—বেকুব বানিয়ে কাজ গুছিয়ে গেছে তারা। আমরা সাঁকোর মুখে গিয়েছি, আলার খাসপুকুরে তারা জাল ফেলেছে সেই ফাঁকে।

গগন ফিকফিক করে হাসছিল। হেসে হেসে বলে, আন্দাজি ও রকম বলা ঠিক হচ্ছে না। চোখে তো কিছু দেখনি—

কালোসোনা বলে, আমি দেখেছি। জাল নিয়ে দু জন ছুটে বাঁধের এপাশে তোমাদের এলাকায় চলে এলো। স্পষ্ট দেখলাম আমি। বাঁধে উঠলে তখন আর কি করা যায়? মাছ গিজগিজ করছে পুকুরে, তিন বছরের জিয়ানো ভারী ভারী মাছ। কত মাছ তুলেছে ঠিকঠিকানা কি? ছোটবাবুর মেয়ের অন্নপ্রাশনে বড় মাছ পাঠাতে হবে, সে জন্যে পুকুরের পালা তুলে ফেলা হয়েছিল আজকে। বেটারা সকল খবর রাখে।

অনিরুদ্ধ বলে, কোন দিন আমি আলা ছেড়ে নড়িনে। কাল কেমন মেজাজ চড়ে গেল। কাঁচা ঘুম ভেঙে আমি শুদ্ধ বেরিয়ে পড়লাম।

হয় যড়ুইর আজ কেনা-বেচা খারাপ! ডাকে হেরে গেছে, বেশি দর দিয়ে অন্য ব্যাপ্যারিরা মাছ কিনে রওনা করে দিয়েছে। মনে দুঃখ বড় তাই। বলে, শুনলে বড়দা? ঐ বড় ভেটকি দুটো, বেটারা বলে,

গাঙ থেকে ধরেছে। গাঙের সোঁতায় দু-বছর তিন-বছর ধরে অত বড় হল, কোনদিন কারো জালে পড়ল না! এ কি একটা বিশ্বাস হবার কথা? কোথায় ধরেছে বোঝ এইবারে।

কালোসোনা ফস করে জিজ্ঞাসা করে, বেটাদের নাম বলো দিকি, শুনে নিই। বাদাবনে এত ধড়িবাজ কারা?

হয় যদুই কি আবার বলে বসে, গগন চোখ পাকিয়ে পড়ে তার দিকে। অনুরুদ্ধর নজর এড়ায় নি। কালোসোনাকে সে তাড়া দিয়ে ওঠল: এক নম্বরের আহাম্মক হলি তুই। নাম বলতে যাবে কেন রে? ব্যাপার-বাণিজ্যের ভিতরের কথা কেউ কাউকে বলে?

খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে পান-তামাক খেয়ে অনিরুদ্ধ উঠল। গগন বলে, বাইরে যত শোন সেসব কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, আছি নিতান্ত মন্দ নয়। মানুষজন নিয়ে স্ফূর্তিফার্তির মধ্যে থাকা যাচ্ছে। সন্ধ্যার মুখে জগা-বলাই আর ব্যাপারিরা ফেরে। আরও সব এসে জোটে এদিক-ওদিক থেকে।

অনিরুদ্ধ হেসে বলে, আমরা সেটা আলা থেকেই টের পাই। গান আর ঢোলক বাজনা—কী কাণ্ড রে বাবা! তবে একদিক দিয়ে ভাল হয়েছে, বাদার জন্তু গাঙ পার হতে আর ভরসা পাবে না। তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সোয়াস্তি বড্ড।

গগন বলে, এত বলি, রাত না পোহাতেই তো লড়ালড়ি লেগে যাবে। তোরা সব চোখ বুজে দু-দণ্ড গড়িয়ে নে। তা নিজেরা ঘুমোবে না, আমাদেরও চোখের দু-পাতা এক করতে দেবে না। ঐ যে জগা ছোঁড়াটা দেখ, বিধাতা ওর চোখে এক লহমার ঘুমও দেন নি। বলাই বলে, কুমিরমারি যাবার পথে বোঠে বাইতে বাইতে মধ্যি-গাঙে ঘুমিয়ে নেয়।

অনিরুদ্ধকে গগন নিমন্ত্রণ করে: চলে এসো না মাঝে মাঝে। এই বিকাল বেলাটা ফাঁকা, অন্য সময় এসো। সন্ধ্যার পরে তোমাদের কাজ, তখন আসা চলে না। সকালের দিকে এসো—তখনও মানুষ আসে, রাতের মানুষজনও থেকে যায় কিছু কিছু। জগারা থাকে না বলে গানবাজনা হতে পারে না। ফড়খেলা হবে, সকাল বেলা এসো তোমরা।

এলোও একদিন অনিরুদ্ধ। ফড় খেলল। হরতন-রুইতন-ইস্কাপন-চিড়ে চার রঙের ছক আছে, তার উপরে পয়সা ধরতে হয়। আর এক চৌকো গুঁটি আছে ঐ চার রঙের ছাপ-মারা; কৌটার মধ্যে সেটা নেড়েনেড়ে ছকের উপর চেপে ধরে। যে রঙটা উপরে পড়ল জিত পাঁচ আনা তাদের। এই হল মোটামুটি ফড়খেলা। পয়লা দিনই অনিরুদ্ধ জিতে গেল।

খেলা রাতের মানুষদের সঙ্গে—রাত থেকেই যারা পড়ে রয়েছে। রাতের মানুষ অর্থাৎ চোর, চুরি করে ঘেরিতে মাছ ধরে বেড়ায়। তবু কিন্তু চোর বলা চলবে না এ তল্লাটের নিয়মে। দায়েবেদায়ে এদের কাজে লাগে। শীতকালে বাঁধে নতুন মাটি দেবার সময় অনেক মানুষের দরকার। বর্ষার জলের চাপে বাঁধের নিচে ঘোগ হয়, জল চুইয়ে এদিকে আসে ওদিকে বেরিয়ে যায়, অবহেলা করলে তলার মাটি ধুয়ে গিয়ে বাঁধ ধ্বসে পড়ে একদিন। মাটি মেলে না, তখন ডাকতে হয় এই সব মানুষ। নৌকো নিয়ে দূর-দূরান্তরের মাটি কেটে এনে ঘোগের মুখ আটকায়।

কিন্তু যখন মাটি-কাটার দরকার নেই তখন কি করবে এরা? কি খাবে? আলার কাজকর্মে নিয়ে নেয় কয়েকটাকে। কিন্তু সে আর ক'টা মানুষ? বাকি সবাই বাদা অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে, ঘেরির মালিকরাও তা চায় না। দরকারের সময় হাঁক দিলে তবে মানুষ মিলবে কোথা? অতএব ঝড়তি-পড়তি যা মেলে, তাই খেয়ে থাকুক ওরা। স্পষ্টাস্পষ্টি চোখের উপরে নয়, অগোচরে রাতের কাজে পারে তো কিছু উপায় করে নিক। ঘেরির পাহারাদার তাড়া করে ঠিকই, তাহলেও প্রশ্রয়ের ভাব খানিকটা—শুধুমাত্র জালগাছি রেখে মানুষটাকে ছেড়ে দেওয়ার ঐ নিয়মে মালুম। কিন্তু আগে যা শুধুমাত্র পেটের খোরাকির ব্যাপার ছিল, গগনের দল এসে পড়ে এখন দস্তুরমতো ব্যবসায়ের বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দিনকে দিন রোজগার বেড়ে যাচ্ছে মানুষের, লোভও বাড়ছে তেমনি। সে বাড় এতদূর হয়েছে, আলার পুকুরে গিয়ে জাল ফেলল। হয়তো এদের ভিতরের কেউ, হেসে হেসে ফড় খেলছে যাদের দলে। হয়তো কেন, নিশ্চয় তাই। বাইরের লোকের অত বুকের পাটা হবে না আলার খাস পুকুরে গিয়ে জাল নামাতে।

পাঁচ আনা নগদ পয়সা নিতে অনিরুদ্ধ পরের দিন আবার এসেছে। তার পরের দিনও। দুটো দিন কামাই দিয়ে তারও পরে একদিন। সেদিন বলল, ছোট মনিব জরুরি তলব দিয়েছে কি জন্যে। রাতের মাছের নৌকোয় সদরে চলে যাচ্ছি, ফিরে এসে আবার দেখা হবে।

চলে গেলে গগনেরা হাসাহাসি করে। ভাগ্যিস তলব পড়েছে—শহরের আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করে লোকটা সামনে আসবে কতক। পয়লা দিনে মুনাফা পাঁচ আনা খেয়ে গিয়ে গাঁট থেকে আরও দশ-বারো আনা বেরিয়ে গেছে এই ক'দিনে। শোক সোজা নয়।

ঠিক পরের দিন—দিন কেন, রাতই বলতে হবে, জগার ডিঙি ঘাটে বাঁধা তখনো—পাড়ার মধ্যে কলরব উঠল, অন্নদাসী ছুটতে ছুটতে এসে উঠল আগায়। অকথ্য গালিগালাজ করছে চৌধুরিগঞ্জের আলার দিকে তাকিয়ে, আঙুল মটকে মটকে গালি দিচ্ছে। মুখের বাক্যে রাগের শোধ হয় না তো গোড়ালি দিয়ে দুম দুম করে লাথি দিচ্ছে মাটিতে। ঘরের মেজে যেন অনিরুদ্ধর মুণ্ড, তার উপরে লাথি ঝাড়ছে। লাথির চোটে গর্ত হয়ে গেল জায়গাটা, মুণ্ড হলে শতচূর হয়ে ছিটকে পড়ত।

গগন বলে, ঠাণ্ডা হও বউ। আস্তে আস্তে বলো, কি হয়েছে। রাধেশ্যামকে দেখলাম না, জাল কেড়ে নিল বুঝি? তার নিজের আসতে হবে, জাল ছাড়িয়ে আনার পয়সা আমি তার হাতে দেবো। মারফতি এ সমস্ত হয় না।

বউ বলে, সে এলো না। আমায় পেঠিয়ে দিল। মুখ দেখাবে না লজ্জায়, গায়ে হাত দিয়েছে ওর।

যে ক'জন হাজির আছে, তিড়িং করে লাফিয়ে দাঁড়াল। জগা ছিল ডিঙিতে—কানে গিয়েছে কি এক ছুটে ডাঙার উপর। হেন অপমান কে কবে শুনেছে? গায়ে লেগেছে একলা রাধেশ্যামের নয়, গগনের ঘেরিতে যত লোকের আসাযাওয়া সকলের। জগা বলে, চলো তো যাই। ওরা কত বড় ঘেরিওয়ালা হয়েছে, দেখে আসি।

চুরি করে মাছ ধরা অন্যায় কাজ বটে, তা হলেও হাতে মারায়

বিধি নেই। তাতে মায়ে জাল আটকে রেখে। দু-চার বার ধরা পড়ার পরে শাস্তিটা বেশি—পুরো এক দিন জাল আটক রাখবে, জরিমানার পয়সা দেওয়া সত্ত্বেও। এক দিনের রোজগার মাটি। তার বেশি অন্ত কিছু নয়। অতএব রাধেশ্যামকে যদি মেরে থাকে, অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছে। গগন কিন্তু গণ্ডগোল চায় না। বলে, ছটকো লোকের কাণ্ড। রাধেশ্যামেরও বাড়াবাড়ি বটে—মোটা মাছ পেয়ে লোভ লেগেছে, আলার পুকুরে আবার জাল ফেলতে গেছে। অনিরুদ্ধ তলব পেয়ে সদরে গেছে। সে থাকলে অবিশ্যি এত দূর হত না। আসুক ফিরে, আমি ফিরে গিয়ে যা হোক বিহিত করে আসব।

অন্নদাসী করকর করে ওঠে: মেরেছে তো অনিরুদ্ধ নিজে। কোন চুলোয় তলব হয়নি, মিথ্যে বলে তোমাদের ভাঁওতা দিয়েছিল।

বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। অনিরুদ্ধ এখানে বলে গেল সদরে ফুলতলায় ছোটবাবুর কাছে যাচ্ছে। শব্দ-সাড়া করে সে আর কালোসোনা উঠল গিয়ে মাছের নৌকোয়। এক বাঁক গিয়ে চুপিসাড়ে নেমে পড়েছে। পায়ে হেঁটে টিপিটিপি ফিরে এসেছে আলায়। কী করে নাম পেয়েছিল বোধ হয় রাধেশ্যামের। অথবা সন্দেহ করেছে। কানা-শশী ক'দিন খুব আনাগোনা করছে: ম্যানেজার থাকবে না। ওই ফাঁকে জাল নিয়ে পড়ো রাধেশ্যাম, অর্ধেক ভাগ। নয়তো রাধেশ্যাম কক্ষণো আর যেতো না। চক্রান্ত করে ফাঁদে নিয়ে ফেলল।

গগন বলে, আচ্ছা, এক্ষুণি যাচ্ছি আমি। আমি গিয়ে জাল খালাস করে আনি। জগা, নৌকো ছেড়ে এলি কেন রে? জল থমথমা হয়েছে, রওনা হবার জোগাড় দেখ।

জগা ঘাড় নাড়ে: বলাই আর পচা যাক আজকে। হয় বড়ই কি দরকারে যাচ্ছে, সে-ও বোঠে ধরবে। দুষ্টু লোকের সঙ্গে একা পেরে উঠবে না বড়দা, আমি সঙ্গে থাকব।

এই মুশকিল। গিয়ে গরম গরম বুলি ছাড়বে, অমনি তো বেধে যাবে দস্তুরমতো। গগন বোঝাতে বোঝাতে যাচ্ছে: মাথা গরম করবি নে জগা। খবরদার। যে সয়, সে-ই রয়। ঘটনার শতেক গুণ হয়ে বাবুদের কাছে রটনা যাবে। ওরা ছুতো খুঁজছে। ছুতো পেলে আদালত অবধি গড়াতেও পারে। আমাদের উঠতি ব্যবসায়ে চোট পড়বে। যা বলবার আমি বলব। তোর মুখ বন্ধ। বুঝলি?

চৌধুরিগঞ্জের আলায় গিয়ে বলে, এটা কি হল অনিরুদ্ধ? বাদার দস্যিদানোগুলো তড়পে বেড়াচ্ছে, আমি তো আর সামাল দিয়ে পারিনে। পাকা লোক হয়ে এ তুমি কি করলে?

অনিরুদ্ধ বিচলিত হয়। যথারীতি খাতির করে মাদুর পেতে দিল: বোসো বড়দা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না জগন্নাথ, বসে পড়ো। তামাক খাও।

কালোসোনা তাড়াতাড়ি কলকে ধরিয়ে আনে। তামাক খেতে খেতে কথা চলছে। গগন বলে, মারধোর করতে গেলে কেন? বন্দুর নিয়ম আছে, তার উপরে যাওয়া কি ঠিক হল?

অনিরুদ্ধ বলে, নিয়ম দু-পক্ষের বড়দা। নিয়মটা খাটবে ভেড়ির খোলে যখন ধরা পড়ে। ওরাই বলুক—জাল কেড়ে নেওয়া শুধু নয়, আলায় সঙ্গে করে এনে তামাক খাইয়ে গল্পগাছা করে তবে ছেড়েছি। পরের দিন হাসতে হাসতে এসে জরিমানার সিকি জমা দিয়ে জাল নিয়ে গেছে। তা বলে আলার খাসপুকুরে আসবে কোন বিবেচনায়? এটা হল গে বাড়ির পুকুর—চোর-ছ্যাঁচোড়ের বৃত্তিতে দাঁড়িয়ে গেল তবে। তার বেলায় আমাদের নিয়ম নয়, থানা-দারোগার আইন।

জগা বলে, থানা নেই কোন্ মুলুকে। এর পর থানার দারোগা এসে ভেড়ি ঠেকাবে? খোলসা করে বলো। সমস্ত শুনে যাই।

জগা গরম হচ্ছে দেখে গগন তাড়াতাড়ি বলল, যাকগে যাকগে। কথায় কথা বাড়ে। জরিমানার সিকিটা নিয়ে জাল দিয়ে দাও অনিরুদ্ধ। আমরা চলে যাই।

জগা গর্জন করে উঠল: জরিমানা কিসের? রাধেশ্যামের গায়ে হাত দিয়েছে, সেটা মুফতে যাবে নাকি? এই জন্তে তোমার সঙ্গে এসেছি বড়দা, তোমায় আগলাব বলে? ঘেরি বানিয়ে তুমিও আস্তে আস্তে যেন মেছো-চক্কোত্তিদের মতো হয়ে যাচ্ছ। সোজা কথাটা বলে দাও। ওদেরও জরিমানা। জরিমানার জরিমানায় কাটাকাটি; জাল নিয়ে চলে যাচ্ছি। বাদ্দিগর এমন হলে কিন্তু এত সহজে ছাড়ান পাবে না।

জগার এত কথার একটাও যেন অনিরুদ্ধর কানে যায় নি। গগনের দিকে তাকিয়ে বলে, জাল দেওয়া হবে না। সিকি কেন, আধুলি ধরে দিলেও দিতে পারব না। এত বড় কাণ্ড—ছোটবাবুর কাছে খবর যাক, তাঁর কোন হুকুম হয় দেখি।

জগা বলে, হাত-পা কোলে করে তদ্দিন রাধেশ্যাম বসে থাকবে?

জগার কথার জবাব দেয় না অনিরুদ্ধ। গগন বলে, জাল আটকে রাখলে, রুজি-রোজগার বন্ধ। খাবে কি তা হলে?

খাবে না। কাজটা করেছে কি রকম! উপোস দেবে।

উকিল ভবসিন্ধুর বাড়ি গগন থেকে এসেছে। এবার সে একটু বাঁকা পথ ধরে: জালই ধরেছ তোমরা। মানুষ ধরতে পারোনি। আলার বাইরে রাধেশ্যামকে এসে ধরেছ।

অনিরুদ্ধ বলে, মানুষ কি জালের দড়ি হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকবে ধরা দেবার জন্য? দড়ি ফেলে দিয়ে মানুষ পালাল।

গগন কড়া হয়ে বলে, রাধেশ্যামকে বে-আইনি ভাবে মারলে। জাল ফেলেছে ভিন্ন লোক।

অনিরুদ্ধ আমল দেয় না। বলে, রাধেশ্যাম না হলতো পূর্ণ ফেলেছে। পূর্ণ না হয়, মুল্লুক মিঞা। মোটের উপর দল নিয়ে কথা। দুটো দল হয়ে দাঁড়াল—একটা চৌধুরি তরফের, একটা নতুন-ঘেরির। নতুন-ঘেরির লোক একটা অপকর্ম করেছে, নতুন-ঘেরির লোকের উপরে তার শোধ গিয়ে পড়ল।

গগন তাড়াতাড়ি জিভ কাটে: ছি ছি, কী রকম কথাবার্তা! কোন পোকামাকড় আমরা—আমাদের নিয়ে আবার দল! চৌধুরি-বাবুরা রাজা মানুষ, এক এক রাজ্যি নিয়ে তাঁদের ঘেরি। বনের মধ্যে দু-হাত জায়গার উপর একটুকরো চাল তুলে ব্রাহ্মণের চরণাশ্রয়ে পড়ে আছি, তাঁদের সঙ্গে আমাদের নাম কোন বিবেচনায় করলে তুমি ম্যানেজার। নতুন-ঘেরির দলবেদল নেই, যে যাবে সে-ই বাপের ঠাকুর। ক'দিন গিয়েছ—আরও এসো, তুমিও আমাদের।

[ক্রমশঃ।

# কবি কর্ণপূর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

২৩। দেখতে দেখতে "ব্রজপুরভূমি" জীর্ণ করতে অসমর্থ হয়ে উঠলেন অতিমহোৎসবের মহারস। ব্রজপুরের প্রণালিকা-মুখে নিঃসৃত হতে লাগল দধিদুগ্ধাদির ধারাপ্রপাত। সুরভিত হয়ে উঠল পুরমার্গ। এবং বিহঙ্গের আকার ধারণ করে স্বর্গের দেবতারাও উড়ে এসে স্নান করতে লেগে গেলেন সেই প্রপাতজলে, এমন কি, পান করতে লাগলেন সেই জল সাদরে।

২৪। আর সেই সময়ে সেখানে ধেয়ে এল ব্রজধামের ধেনুর দল। তাদের সর্বাঙ্গে নবোদ্গীত নবনীত, হরিদ্রা ও তৈলের প্রসন্ন চর্চ্চা। সোনার সাজে, মণির সাজে সালঙ্কারা হয়ে, বাছুরদের সঙ্গে নিয়ে, আনন্দে উল্লসিত হয়ে ছুটে এল তারা। জগতের সার-ধন সব যেন আজ নাচছে। কৃষ্ণের আবির্ভাবমঙ্গলে তারা যেন ফিরে পেল তাদের সৌভাগ্য। হর্ষ-হাম্বায় মুখর করে তুলল ভুবন তল। নিজেরা যে কী পদার্থ, তাও আর তাদের মনে পড়ল না। তাদের ভুল হয়ে গেল সমস্ত, এমন কি পান-ভোজনের কথাও।

২৫। দীর্ঘকাল ধরে চলতে লাগল আভীর ও আভীরিণীদের মহোৎসব। শ্রীবসুদেব-পত্নী শ্রীভগবতী রোহিণী তখন তৈল সিন্দুর মাল্য বসন ও আভরণাদির উপহার নিয়ে এগিয়ে এলেন, অভিপূজন করলেন সকলকে, এবং অভ্যর্থনা করলেন অভিনব শুভ-কুমারের অভ্যুদয়।

এবং রাজভবনের বাইরে এসে উপনন্দাদি সকলে সহর্ষে সমাপ্ত করলেন যজ্ঞান্ত-স্নান একত্রে। তখনও যেন থামতে চায় না তাঁদের আনন্দের আবেগ।

তারপর ব্রজপুর-পুরন্দরকে পুরোবর্ত্তী করে তাঁরা প্রত্যেক ব্রজবাসীকে অভ্যর্থনা করলেন মণিময় অলঙ্কার, মহার্হবসন, মাল্যচন্দন ও তাম্বুলাদির অর্ঘ্যদানে, এবং সবিনয় প্রার্থনা করলেন···

অভিনব শুভকুমারের মঙ্গলোদয়।

ইতি আনন্দ-বৃন্দাবনে প্রাদুর্ভাব লীলাবিস্তারে দ্বিতীয়ঃ স্তবকঃ।

## তৃতীয় স্তবক

১। নরাকৃতি পরব্রহ্ম এই ভাবে যখন অবতীর্ণ হলেন পৃথিবীলোকে এবং সম্প্রাপ্ত হলেন শিশুভাব, তখন সেই প্রসিদ্ধ পূর্বাবতীর্ণ ব্রহ্মভূতলোক পার্থিব মনুষ্যের চক্ষে কেবল যে লৌকিকের মতই পরিদৃশ্যমান হতে লাগল তা নয়, সহাবতীর্ণা শ্রী-র আনুকূল্যে পুনর্বার প্রতিভাত হতে লাগল অলৌকিক-রূপে, এবং তার চমৎকারিত্বায় স্তম্ভিত হয়ে গেল বিশ্বজনের নয়ন ও মন।

২। সেই ব্রজলোকে ইত্যবসরে ব্রজরাজও অবলম্বন করছিলেন তাঁর লৌকিকভাব।

রাজা কংসকে গব্যরসাদির বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করতে হবে, তাই নগর পরিরক্ষায় প্রাচীন আপ্ততম আভীরদের নিয়োজিত করে মাত্র কয়েকটি পরিচারক সঙ্গে নিয়ে তিনি একদা প্রস্থান করেছিলেন যাদবদের রাজধানী মথুরার উদ্দেশ্যে।

দুরাত্মা নৃশংস কংস··পূর্বজন্মে যিনি খ্যাত ছিলেন "কালনেমি" নামে, তাঁর তখন মনে পড়ে যায় পূর্বজন্মের শত্রুতার কথা এবং অধিকন্তু মনে পড়ে যায় যোগমায়ার সেই বাণী—

"ওরে মূঢ়, আমি মরলে কি হবে, তোর যম কোথায় যেন জন্মেছে।" তাই জাতক-অনুসন্ধান প্রবীণ কংস সুযোগ বুঝে জাতকের অপকার চিকীর্ষায় ব্রজরাজের রাজধানীতে প্রথমেই প্রেরণ করেন পুতনা-নাম্নী এক কামরূপিণী বালগ্রাহিনীকে। রাজধানীতে পুতনা এলেন,···সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর মূর্তি ধারণ করে, নিখিল জনতার নয়ন ও মনকে চমৎকৃত করতে করতে।

৩। তাঁকে দেখে, তাঁর অসামান্য রূপ দেখে ব্রজপুরের পুরবাসীরা উপহাস করে উঠলেন স্বর্গলোক-বিলাসিনী অপ্সরাদের। তাঁদের মুখ থেকে বেরুল, যথা :—

(১) উর্বশীর কপাল পুড়ল।

(২) অলম্বুসে, তুষ হয়ে গেল তোমার দর্প।

(৩) রম্ভা কি তবে ভেকী হলেন ?

(৪) ঘৃতাচি, তোমার যশের ননী দিয়ে ঘৃতের চিতা এবার সাজাও।

(৫) মেনকে, এখন কে না তোমায় দেখে হাসছে!

(৬) প্রম্লোচার রূপের গরব সই ভেসে গেল।

(৭) চিত্রলেখা, এঁর কাছে তুমি পট।

(৮) তিলোত্তমার কীর্তি এখন তিলের চেয়েও কালো হল, হে, কালো হল।

অনন্ত তর্ক নিয়ে অনন্ত বিস্ময় ফুটে উঠল পুরবাসীদের নয়নে। এ কাকে তাঁরা দেখছেন? ইনি কি মূর্তিমতী ব্রজপুরদেবতা? ইনি কি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী? ইনি কি নির্মেঘ তড়িৎ-মঞ্জরী? ইনি কি নিশ্চন্দ্র-জ্যোৎস্না?

পুরবাসীদের বিস্ময়ের মহাপথ বেয়ে কামরূপিণী পুতনা প্রবেশ করলেন ব্রজপুর-পরমেশ্বরীর ভবনে।

৪। ব্যাপার দেখে পুরবাসীদের মনে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়ে গেল—ব্রজপুরপুরন্দরের মন্দিরে যেহেতু মহাপুরুষ অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই হেতু নিশ্চয়ই তাঁর চরণ-পরিচর্যার চাতুর্য-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, দেবলোক থেকে হেথায় নেমে এসেছেন ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীদেবী স্বয়ং।

৫। পুতনা প্রবেশ করলেন রাজ-মন্দিরে,···মহাসাহসিকা

চৌরমূর্ত্তির মত, লোভাক্রান্তা নির্লজ্জা জনতার মত, অ-সমীক্ষ্যকারিণী কোপবৃত্তির মত। প্রবেশ করেই দেখতে পেলেন নব জাতককে :—

শিশু হাসছে···যেন এক কণা মহাগ্নি-স্ফুলিঙ্গ···ছাই করে দিতে চায় সমস্ত অকল্যাণ ; জ্বলছে যেন এক ফালি অসামান্ত দীপশিখার ···যার আলোকের দক্ষ-চঞ্চলতায় বিধ্বস্ত হয়ে যায় শত্রু,পম অন্ধকার।

দেখলেন,—জ্যোৎস্নার ফেনার মত শুভ্র শয়নীয়ে শিশুটি শুয়ে শুয়ে খেলছেন। কর্পূরের ধূলি-বিছানো প্রান্তরে যেন খেলা করছে মহামরকতমণির একটি অঙ্কুর।

হঠাৎ কেন যেন পুতনার মনে পড়ে যায়···অগস্ত্য মুনির নাম। এই শিশুটি কি তবে তাঁরি মত? নিঃশেষে শোষণ করতে চায় সংসার-বিষমবিষের মহাসমুদ্র? পূতনা সামলে নেন নিজেকে। নিজের বহিঃ প্রকাশটিকে সরস করে ফেলেন···খলের বাণীর মত ; আবৃত করে ফেলেন···গজ-বন্ধন কূপের মত ; দৃষ্টিসুখদ করে ফেলেন ···খাপে-ঢাকা তলোয়ারের মত। যেন এক মুহূর্ত্তে বিষলতা রূপান্তরিত হয়ে গেল কল্পলতায়। স্নেহে বিগলিতা হয়ে তিনি যখন জননীর ঢঙে উপবেশন করে নিজের কোলে তুলে নিতে গেলেন শিশুটিকে তখন তাঁকে একটি বার বারণ করতেও পারলেন না —ব্রজপুর-পরমেশ্বরী শ্রীযশোদা, এমন কি বসুদেব-ভার্য্যা আর্য্যা শ্রীরোহিণীও। তাঁদের দু'জনের মনেই তখন তর্ক জেগেছে—

"ইনি কি সত্যিই ভগবতী গৌরী? ইনিই কি তবে ভূতধাত্রী? ইনি কি ই···ণী, না বরুণানী, না অগ্নায়ী? আমার বাছার মুখে দুধ ধরাতে এসেছেন?"

৬। এদিকে ব্রজেশ্বরী নির্দ্ধারণ করতে পেরে উঠছেন না— "আমিই কি এর মা, না ঐ ও···ওদিকে পূতনা কিন্তু ততক্ষণে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে কোলে রাখতে আরম্ভ করে দিয়েছেন শিশুকে।

৭। আর যিনি শ্রীভগবান···যিনি জ্ঞান-ঘনবিগ্রহ, যিনি পরমকারুণিক···তিনিও তখন অঙ্গীকার করে ফেললেন একটি অজ্ঞ-অজ্ঞ ভাব, ভাব দেখালেন যেন জননীর আঁচলখানি দেখে তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে উঠেছেন। তাই স্পৃষ্ট মাত্রেই তিনি আরোহণ করলেন পূতনার অঙ্কে। পূতনাও সাদরে তাঁকে কোলে শোয়ালেন ; এবং দু'মায়ের চোখের সামনেই পরমবৎসলা জননীর মত শিশুর অধরে ধরে দিলেন নিজের পয়োধর,···বিষকুম্ভং পয়োমুখং।

৮। তারপরে লীলাময় নবশিশু,—বাঁধুলি ফুলের পেট-টেপা পাপড়ির মত নধর যার অধর,—আরক্ত সেই অধরপুটটিতে কাঠের ডোঙার মত একটি নব গড়ন দিয়ে,—চুক্চুক্ শব্দের বৈদগ্ধ্য ফলিয়ে,— পান করলেন দুগ্ধ এবং পান করতে করতে সমাকর্ষণ করলেন পূতনার প্রাণ-ধমনী। সঙ্গে সঙ্গে পূতনাও বিবশা হয়ে পড়ে গেলেন সর্বেন্দ্রিয়ের গ্লানি নিয়ে।

৯। ব্যথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল পূতনার চিত্ত। "ছেড়ে দে ছেড়ে দে" চীৎকার করতে করতে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবার বহু চেষ্টা করলেন শিশুকে, কিন্তু কৌতুকী শিশুকে ছাড়ায় কে? তিনি নড়লেন না। সুকোমল অধরপুট দিয়ে অতৃপ্তের মত সজোরে চুষতে লাগলেন পয়োধর। পূতনা ধারণ করলেন নিজের স্বভাবসিদ্ধ আকৃতি। কিন্তু···বিষদুগ্ধ পান ক'রেই পূতনার দেহটিকে ···ফলের আঁটির মত···নগরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন শিশু। কিন্তু কোল তাঁর ছাড়লেন না।

১০। সে কী বিপুল সার্দ্ধযোজনব্যাপী পূতনার দেহ। চক্রবর্ত্তী-সম্রাট যেমন রাজস্ব আদায় কালে নিখিল প্রজার উপর ঢলে পড়েন তেমনি পূতনার দেহখানিও প্রজ্ঞা-করাল হয়ে ব্রজপুরের বহির্বনে গিয়ে ঢলে লুটিয়ে পড়ল। সে পতন···সহজ পতন নয়। আর সে দেহও এত সহজ দেহ নয়। সে দেহ যেন বিভীষণের মাহাত্ম্য-লসিত লঙ্কার পর্য্যন্ত-ভূমি। তালগাছের মত তার বিরাট বাহু দুটি···তালে-বেরা কটকটে গানের মত সেখানে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল। আর মহাপর্বতের শিখরে দুখণ্ড মেঘের মত ভাসতে লাগল গণ্ডশৈল-সম তার বিপুল যুগল পয়োধর।

উঃ কী পাতালের মত একখানা মুখ। যেন পাতালমুখো বলিরাজ।

গুহার মত কী গভীর নাসা। যেন বাতাস-ঠাসা পাহাড়।

লাঙলের ফালের মত বড় বড় সার সার দাঁত। যেন মরতে চলেছে যুদ্ধের একদল হস্তি সৈন্য।

রাজপথের মত চওড়া জিভ। তার উপর দাঁড়িয়ে এক দল পতাকী সেনা অতি-সহজেই ডাক দিতে পারে তাদের সেনাপতিকে।

আর তার সেই মহাহ্রদের মত উদর। উঃ যেন তাতে কিল্‌বিল্ করছে জলজন্তু।

কূয়োর মত এক জোড়া চোখ। শাল গাছের মত উরু।

কামরূপিণী পূতনার এই হেন দেহখানি গাছগুলোকে মড়মড়িয়ে বহির্বনে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

১১। তাহলে কি এই কোলে নেওয়া, এই মাই দেওয়া সমস্তই কুহক, প্রণিধানের সঙ্গে সঙ্গেই পুত্রটিকে খুঁজতে লাগল ব্রজরাজমহিষীর দুনয়ন। দেখতে না পেয়ে বৎসবৎসলা ধেনুর মতন চীৎকার দিয়ে উঠলেন মা।

এ কি সর্বনাশ হল, কোথায় গেল আমার বাছা? মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেলেন তিনি। ব্রজপুরের পুরস্ত্রীরা এসে তাঁকে আশ্বাস দিলেন। জ্ঞান ফিরে আসতেই তাঁর মুখ থেকে বেরুতে লাগল আতাল-পাতাল কথা,—

ধিক ধিক, এ নিশ্চয় ঐ অপ্সরাদের কীর্ত্তি। নীলপদ্ম ভেবে নিশ্চয়ই তারা আমার বাছাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কানের ফুল করে পরবেন কিনা। মাথার মটুকে দোলোবেন বলে নিশ্চয় পাতালের নাগিনীরা চুরি করে নিয়ে গেছেন আমার নীলরতনকে। হতেও পারে গন্ধর্বীরা তাকে সরিয়েছেন। তমালফুল ঠাউরে চুলে বাঁধতে আর কতক্ষণ। সিদ্ধাঞ্জন ভেবে যোগিনীরা তাকে লুকিয়ে রাখেনি তো? চাঁদের কুঁড়ি ভেবে জটার বনে তাকে আটকে রাখেননি তো ধূর্জ্জটি? না গো না, এ আমার দজ্জাল নিয়তি দেবীর খেলা। তবে কি বাছা আমার সত্যিই ভাবল. আমি তার অযোগ্য মা আর তাই নিজে চলে গেল অন্য মায়ের কোলে? বলতে বলতে ব্রজরাণীর মুখে স্খলিত হয়ে গেল বাণী। তারপরেই তিনি পুনর্বার মূর্চ্ছার কোলে ঢলে পড়লেন। সময় কাটানোই মূর্চ্ছার যেন কাজ।

১২। ক্ষণপরেই বিদায়-বেলায় মূর্চ্ছাদেবী যেন তাঁকে বলে গেলেন :—

দেবী নয় দেবী নয়
পাবে, পাবে তোমার তনয়।

চৈতন্য ফিরতেই দীনহীনার মত ব্রজরাণী ছুটলেন সিংহদ্বারের অভিমুখে। তাঁর মুখ থেকে কেবল ঝলকে ঝলকে বেরতে লাগল, ওরে তোরা কে কে জানিস আমার বল, বল চুরি করে কে নিয়ে পালিয়েছে আমার সম্বলকে ; কোথায় গেলে তাকে পাই। ঝড়ে নোওয়া লবঙ্গলতার যেন একখানি মলিন ছবি। পদে পদে স্খলিত হয় ব্রজরাণীর চরণ, ব্রজপুরের পুরন্ধ্রীরা বাধা দেন কিন্তু কে তাঁকে ধরে রাখতে পারে ? বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কান্নায় ভেঙে ভেঙে তিনি ছুটে চললেন।

বিগলিত-চিকুর-কলাপ করুণরসের আর্ত্তা মূর্ত্তির মত যতক্ষণে তিনি নগরের তোরণ-দ্বারে এসে পৌছুলেন, ততক্ষণে চতুর্দ্দিক থেকে দৌড়তে দৌড়তে কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়ে গেছেন ব্রজধামের আভীরের দল।

কেউ বলছেন,—"ঝড় নেই, বাদল নেই, পাহাড়ের চুড়ো,··· ভাঙে কেমন করে ?"

কেউ বলছেন—"এটা কি তবে পৃথিবীর মৃতগর্ভ ?"

কেউ বলছেন—"আকাশ থেকে মাংসপিণ্ড ঝরেছে হে।"

অন্যেরা বলছেন—"দশটা দিকের হাড় নয় ত ?"

···"তবে কি এটা রাক্ষসীর দেহ ?"

জল্পনা-কল্পনার মধ্যে হঠাৎ সকলে দেখতে পেলেন,···পূতনার বুকের উপরে, ভয় নেই, ভয় নেই, "আমি খেলছি, সকলে আমায় দেখুক···"এই বাহানা নিয়ে যেন করুণা ক'রেই বহির্ভূত হলেন লীলা-শিশু। বিরাট পর্বতের শিখরে ফুটে উঠল যেন নীলিম মেঘাঙ্কুর। সংশয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল জনতার চিত্ত।

"কী আশ্চর্য। কী অদ্ভুত! বল কিহে, এই মেয়েটাকেই কি আমরা প্রবেশ করতে দেখেছিলুম ব্রজপুরে? এল কিনা ব্রজপুর-পুরন্দরের নন্দনটিকে খুন করতে ? অপরাধে নিজেই শেষে মোলো। আমাদের ভাগ্য বটে !"

বিতর্কের মধ্যপথেই ব্রজগোপীরা দেখতে পেলেন···গিরিতটের মত সেই দেহের শিখরে উঠে পড়েছেন পুরন্ধ্রীরা ; রাক্ষসীর বুকের উপর থেকে তাঁরা তুলে নিয়েছেন লীলাশিশুটিকে ;···বাছা তখন হাসছে···মিষ্টি মিষ্টি হাসি :···এক রত্তিও ভয় নেই সে ছেলের! আর হাতে হাতে ছেলেকে বাইরে এনে ব্রজেশ্বরীকে তাঁরা বলছেন, "বলিহারি তোমার পুণ্যের জোর। এই নাও, ধর ধর তোমার ছেলে।"

আর ব্রজরাণীও শুনছেন যেন স্বপ্নবাণী আর বলছেন—

"আপনারা কি আমাকে ঠকাচ্ছেন ?"

শোকে বিশ্বাস হারায় মানুষ। তাই যখন তাঁরা ব্রজরাণীর কোলে শুইয়ে দিলেন তাঁর লীলাশিশুটিকে তখন কেবল স্পর্শই যেন বহন করে আনল প্রত্যয়।

১৩। এ যেন শোকনিদ্রা থেকে জাগরণ, ফিরে-পাওয়া··· জীবনটাকে, এ যেন জ্ঞানের পুনর্জন্ম।

বার বার ভালো করে তিনি দেখতে লাগলেন ছেলের মুখ। আশ্চর্য্য মূর্চ্ছা যেন বদলিয়ে দিয়ে গেছে তাঁর সর্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। দেখতে দেখতে তিনি কেবল উপভোগ করতে লাগলেন মোক্ষসুখের মত একটি সুনিবিড় আনন্দের পূর্ণতা। অথচ সেই আনন্দের বিমল অবসরে, গোপুচ্ছ ঘুরিয়ে গোমূত্র-স্নপনাদির মধ্য দিয়ে তিনি সংস্কার শেষ করে ফেললেন শিশুর।

শ্রীরোহিণী এলেন, উপনন্দ সন্নন্দাদির ভার্য্যারা এলেন পুরন্ধ্রীদের ও তাঁদের যথারীতি অভিমত নিয়ে শ্রীভগবানের শ্রে নামসমূহ গ্রহণ করতে ব্রজেশ্বরী বিধান করে দিলেন লীলাশিশুর অঙ্গ-রক্ষা।

১৪। এদিকে গোপবৃন্দেরা একত্রে মত্ত হয়ে উঠেছেন বিরাট যজ্ঞে। 'মহ'টঙ্ক' কুঠার দিয়ে তাঁরা খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন পূতনার পর্বত-পাষাণসম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রচনা করলেন নয়নের অপরচিন্তা এক চিতা, সাজালেন কাঠের উপর কাঠ, রাশি রাশি কাঠ। জ্বলে উঠল আগুন। শিখার আলোক দৌড়ে উঠল দূর আকাশে,···চুম্বন করতে মেঘকে।

১৫। শ্রীভগবান উপভোগ করেছিলেন বলেই যেন সেই চিতাধূম কালাগুরু-ধূপের ধোঁয়ার মত গগনতলে আরোহণ করে ঘ্রাণ-তর্পণ হয়ে দাঁড়াল সপ্তভুবনের অস্মিতদের।

১৬। কিং বহুনা ? সেই ধূমজন্মা মেঘের দলও তখন উদ্গীর্ণ করলেন যে সলিলরাশি, সেই দুষ্কৃত সলিলরাশিতেও আশ্চর্য্য সৌগন্ধবতী হয়ে উঠলেন পৃথিবী। বলিহারী যাই ভগবানের কারুণ্যের। বিষয়-বিষময় দুগ্ধ প্রদানার্থ রাক্ষসী পূতনা গ্রহণ করেছিলেন জননীর বেশভাস, সেই পুণ্যের জোরেই তিনিও লাভ করলেন জননী-লোক।

১৭। ব্রজধামে যখন এই ঘটনা ঘটছে, তখন দূর মথুরা থেকে ব্রজের পথে ফিরছিলেন ব্রজপুর-পুরন্দর। গগনে ধূমলেখা দেখে সন্দেহ জাগল তাঁর অনুবর্ত্তীদের মনে, তাঁরা নিবেদন করলেন—

···"ব্রজরাজ, দেখতে পাচ্ছেন কি ধোঁয়ার রেখা ? দ্যুলোকদেবীর পায়ের পাতার যেন ডগা ছুঁয়ে লুটিয়ে চলেছে একখানা ধূমল-নীল ওড়না, বাতাসে কাঁপছে।"

···"ধোঁয়ার কী অত্যাশ্চর্য্য রঙ! পৃথিবী ফুঁড়ে যেন পাতাল থেকে উঠছে, দূর্বা ঘাসের মত চিক্কণ-শ্যাম রঙ। মহানাগের ফণার মণি থেকেই নির্ঘাত ঠিকরে উঠছে রঙ। উঃ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডটাকে একেবারে ছোপ ছেলে ফেলেছে গো!"

···"ঐ দেখুন মহারাজ, দিক্‌বারণদের মতই ওগুলো পরস্পর লড়াই করছে ; ঐ দেখুন ইতঃ, ঐ দেখুন ততঃ, দৌড়চ্ছে ধোঁয়ার যূথ।"

···"এও তো হতে পারে, আসলে ওগুলো ধূম নয়, ওগুলো জলভরা মেঘ ; পড়ে গিয়েছিল পৃথিবীতে এখন আবার উঠে যাচ্ছে উপরে। আহা রে, মলিন করে দিয়েছে দিগ্‌বধূদের মুখ।"

···"এও তো হতে পারে, ওগুলো ধূম নয়, ওগুলো ধূলি। ধূলির দেহ ধরে স্বর্গলোকে চলে যাচ্ছেন না তো ধরণী দেবী ?" কিংবা ওটা একটা আবির্ভাব···অকাল তামসিকতার ?"

১৮। আরও কিছুটা পথ এগিয়ে আসতেই, অসন্দিগ্ধ নেত্রে তাঁরা দেখতে পেলেন···বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার আকৃতি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও ধোঁয়ার কুণ্ডলীই বটে। কিন্তু যেই তাঁদের নাসিকায় পৌছল ধূমগন্ধ, সেই তাঁদের হৃদয়দ্বারেও পৌছলেন সন্দেহ-বন্ধুর দল। তাঁরা যেন বলে উঠলেন—

"ধূম বলে তো ঠেকছে, কিন্তু অকস্মাৎ এত অগুরু-ধূপের গন্ধ আসছে কোথা থেকে ?···এ-ও তো হতে পারে পৃথিবীর নিজের গুণ 'গন্ধ' আকাশের 'শব্দ'-গুণ বিজয়ের লালসায় ধূম্র-মূর্ত্তি ধারণ করে ছেয়ে ফেলছে বিশ্বকে।" [ক্রমশঃ।

শিশু তেনজিং

—বিজয়া ভট্টাচার্য্য

ভুবনেশ্বর-মন্দির —আগমনী লাহিড়ী

প্রতীক্ষা —আর্য্য বসু

নবাববাড়ী ( লক্ষ্ণৌ ) —সুধাবিন্দু বিশ্বাস

লক্ষ্মীর আলপনা —ভরত নাগ
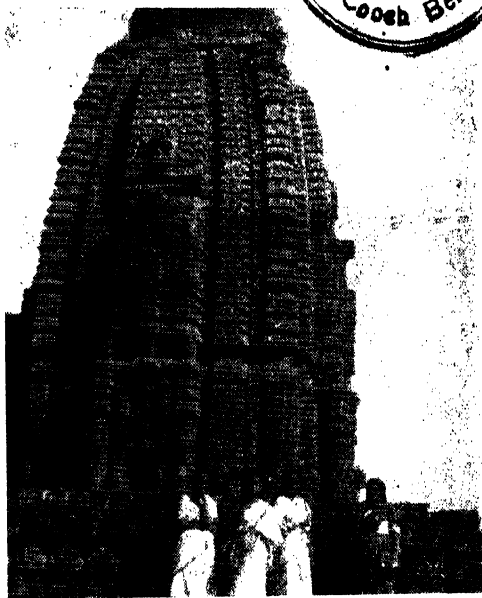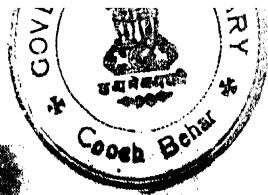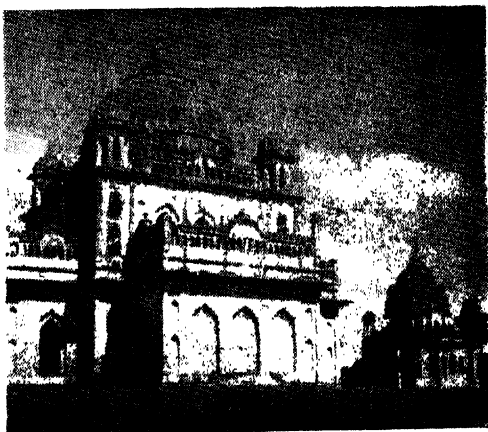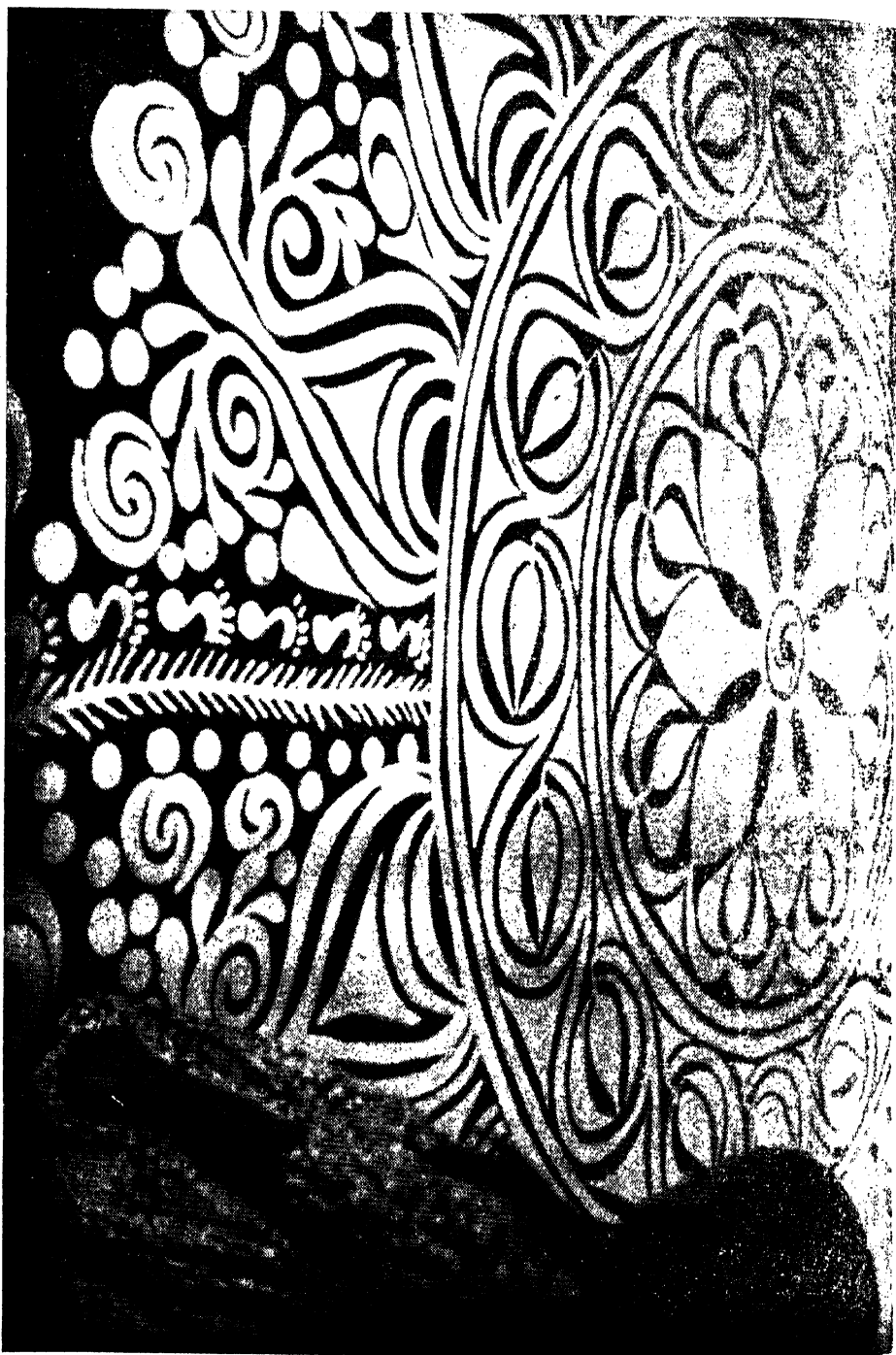
মালিনী —নিতু সরকার

সিমলা

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৩

পরমারাধ্য পিতৃপদে প্রণামান্তে,

গত বৎসরও আমার প্রণাম আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলাম—এবংসম্প্রতি হিমালয় হইতে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণামাঞ্জলি আপনার চরণোদ্দেশে প্রেরণ করিলাম। উহা গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন। শুনিলাম—আপনার স্বাস্থ্য খুব আশানুরূপ নহে। বড় ইচ্ছা হয় যে আপনার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিয়া আপনার সেবা করি দীর্ঘদিন ধরিয়াই এই বাসনা আমার অন্তরে ক্রমশঃই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে, উহার চরিতার্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা কি নাই? আমার মন ও আত্মা তো আপনার সহিত এক হইয়া গিয়াছে কেবলমাত্র দেহের দিক হইতে আমরা বিচ্ছিন্ন বা পৃথক, সেই জন্যেই আমার অন্তর আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে সেবা করার জন্য ব্যাকুল, অবশ্য আপনাকে দূর হইতে সেবা করাই যদি পরম করুণাময়ের অভিপ্রেত হয় তবে তাঁহার সিদ্ধান্তের নিকটই আমি আপন মস্তক দ্বিধাহীন চিত্তে অবনত করিব। ব্রহ্ম-লীলার দর্শনীয় অপরূপ এবং শাশ্বত রূপ আমি হৃদয়ের পরমানন্দ দ্বারা উপভোগ করিতেছি। যত দিবস যাইতে থাকে এই সুমধুর দৃশ্যাবলীর মহিমান্বিত রূপ আমার সমস্ত দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আমার মর্মলোকে ক্রমশঃই এক নূতনতর ভাবের সৃষ্টি করিতেছে। এই অপূর্ব দৃশ্যাবলীর সহিত তুলনাযোগ্য সুন্দর বস্তু পৃথিবীতে কিছুই নাই—এই অকল্পনীয়, অচিন্ত্যনীয়, অবর্ণনীয় দৃশ্যাবলী উপভোগ করিবার সুযোগ পাইলাম; মনে হয় ইহারই জন্য জন্ম সার্থক। সেই বিরাট বিপুল অথচ আকারহীন যে সর্বশক্তিমান তিনিই যে এমন মাধুর্যমণ্ডিত রূপ গ্রহণ করিয়া এই ভাবে মানবনেত্রের সম্মুখে এমন সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারেন ইহা কি কেহ সম্ভব বলিয়া মনে করিয়াছিল? তাঁহারই আশীর্ব্বাদে আমাদের দেশের হতভাগ্য অধিবাসীদের অন্তরেও এই অনির্বচনীয় সুবোধ্যতা, সুস্পষ্টতা, বিশালতা ক্রমেই আলোকপাত করিতেছে। সেই সুবিপুল, সেই স্বর্গীয় মাহাত্ম্যের ফল আজ আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে আমরা কি দেখিতেছি সুস্পষ্ট দেখিতেছি যে হিমালয় নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে, স্বর্গীয় পবিত্রতার ধারা গঙ্গার প্রতিটি তরঙ্গে বহিয়া চলিতেছে। ভারতভূমিতে আজ নবজাগরণের আহ্বান শ্রুত হইতেছে, এক নবতর সৌন্দর্যবোধ ভারতবর্ষকে অভিনবত্ব দিতেছে, ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ আরও যেন নিষ্ঠার সহিত, ভক্তির সহিত, পবিত্রতার সহিত হইতেছে, ব্রহ্মবোধ যেন ভারতের অন্তরে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে, দিকে দিকে যেন আজ ব্রহ্মমন্ত্রধ্বনি—সবই সেই যোগেশ্বরের মহালীলা—যোগেই আনন্দ, যোগেই মুক্তি, যোগই জীবন, যোগ ব্যতীত গতি নাই। আসুন পিতা! ঈশ্বরোপাসনার এবং ঈশ্বরানুধ্যানের পবিত্র রসমাধুরী গভীরভাবে একত্রে পান করি।

আপনার আশীর্ব্বাদাভিলাষী

অনুগত সেবক কেশবচন্দ্র সেন

প্রিয়তম ব্রহ্মানন্দ,

এখন আর বেশী লিখিতে পারি না—আমি কিছুকালের মধ্যে লেখা একেবারেই বন্ধ করিব। আমি অনুভব করিতেছি যে আমার জন্মভূমি ত্যাগের সময় ক্রমশঃই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই পবিত্র লগ্নে গীতার সেই মহান বাণীই মনে পড়িতেছে, (যাহার বঙ্গানুবাদ)

ঊর্ধ্বে স্বর্গ, নিম্নে পৃথিবী, সর্ব্বত্রই যাঁহার নাম শ্রবণীয়, সেই অচিন্ত্যপুরুষের অকল্পনীয় স্নেহধারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান।

তাঁহারই করুণায় তোমার অন্তরে স্বর্গীয় চেতনার আলোক প্রজ্বলিত হইয়াছে। অদ্ভুত তোমার অন্তর্দৃষ্টি, অনবদ্য তোমার ভাষা, সারা দেশে ব্রহ্মের পবিত্র বাণীর প্রসারের জন্য তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ কর।

হে জিহ্ব! তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিয়া যাও।

হে চক্ষু! তাঁর অনুপম সৃষ্টি-সৌন্দর্য অবিরাম অবলোকন করিয়া যাও, কদাচ তাহাতে ছেদ টানিও না।

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী

দেবেন্দ্রনাথ টেগোর

মুসৌরী পর্ব্বত

কানপুর

১১ই অক্টোবর ১৮৮৩

পিতৃচরণে প্রণাম নিবেদনান্তে—

অসুস্থতার জন্য পথিমধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তজ্জন্য ষ্টেশনে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল। অদ্য বৃহস্পতিবার, এখানে গতকল্য রাত্রি দুই ঘটিকায় পৌঁছিলাম। মঙ্গলবার আপনার আশীর্বাদী পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর কি লিখিব? আপনাকে বিচলিত করা আমার অভিপ্রেত নহে, আমার পূর্বস্বাস্থ্য অবশ্যই নাই, সে শক্তিও নাই। রোগের প্রাবল্যে ক্রমশঃই আমি ফুরাইয়া আসিতেছি, ব্যাধির আঘাত আমাকে ক্রমশঃই জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিতেছে, দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িতেছি, এক্ষণে আমি এক হাকিমের চিকিৎসাধীনে আছি। সবই তাঁহার খেলা, কাহাকেও নিকটে টানিবার ইহাই তাঁহার রহস্যময় পন্থা, আমি বিহ্বলতার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছি, আর এই বিহ্বলতার গ্রন্থিমোচন করিতে সক্ষম একমাত্র তিনিই। যোগের উদ্যান মনোহর, সেই মনোহর উদ্যানে হাফিজ পাখীর ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতেছেন। জীবনে আঘাতের ও অশান্তির শেষ নাই, কিন্তু সমস্ত দুঃখ-কষ্টের, ব্যথা-বেদনার, আঘাত-অশান্তির মধ্যেও সত্য, সুন্দর ও শোভনের অটল প্রতিষ্ঠা, প্রেমের ও করুণার এই রশ্মি যেন নিবিড় ঘনান্ধকার বিদূরিত করিতেছে। অসহায় মানবের প্রতি বিধাতার অপার করুণা যেন অসংখ্য ধারায় বিভক্ত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহার অধিক আর আমি কি বলিব? আপনার অনুগ্রহপুষ্ট উপহারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। অবসর মত পত্রাদি লিখিলে যার-পর নাই তৃপ্তি লাভ করিব। যে ভাবেই হোক, আমাকে মনে রাখিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

আপনারই

কেশবচন্দ্র সেন

[ শেষোক্ত পত্র দু'টি পরস্পরকে লেখা পরস্পরের শেষ চিঠি। সর্ব শেষ চিঠিটির উপর তারিখ দেখলে দেখা যাচ্ছে যে, এটি লেখার পর পুরো তিনটি মাসও ব্রহ্মানন্দ পৃথিবীতে ছিলেন না। ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে এই বিরাট প্রতিভাধর পুরুষের হয় অকাল-দেহান্ত। —স ]

# হরিহরছত্রের মেলা



শ্রীসত্যকিঙ্কর গুপ্ত

ধ্যানভঙ্গ হ'ল জেহানাবাদ ষ্টেশনে। তথাগত বুদ্ধের গয়া থেকে মেগাস্থিনিসের পাটলীপুত্রের পথে জেহানাবাদ। ধপাস্ ক'রে প'ড়ল বুড়ি আমার কোলের কাছে। লোলচর্ম্ম, দন্তবিহীন মুখে চেঁচিয়ে উঠলো বুড়ি, "পধারত্তিয়া হো!"

গাড়ির এক কোণে ঘুপটি মেরে একমাত্র বাঙালী ব'সেছিলাম আমি। মন প'ড়েছিল চার শ' মাইল দূরে, ঢেঁকির যা কাজ, স্বর্গে গেলেও সেই মেয়ের বিয়ে, ছেলের ভবিষ্যৎ। মধ্যবিত্ত বাঙালীর চিরন্তন সমস্যা। চমকে উঠলাম। পিল-পিল ক'রে লোক ঢুকছে দু'দিকের দুয়ার দিয়ে। ঝনাৎ ক'রে ভেঙ্গে পড়লো কানের পাশের জানালাটা। খুব বেঁচে গেছি। দাঁত খিঁচিয়ে দেশী ভাষায় বাইরে থেকে যা' বললে তার অর্থ হল, বার বার ক'রে যে সে জানালাটা খুলে দিতে বললে, শুনলাম না কেন আমি। জানালাটা বন্ধ থাকার জন্যেই যে শোনা গেল না—সে কথা কে শোনে! খুলে গেল সব জানালা। আর জানালার ভেতর দিয়ে ঢুকতে লাগল মানুষ। বিরাট বিশৃঙ্খল অবস্থা। কেউ বা এসে গেছে ভেতরে কিন্তু গাড়ির মেঝেতে পা দিতে পারেনি, আসমানেই চ'লে গেল কতকটা। কারো বা লাঠিটা রয়ে গেছে বাইরে, কেউ বা যদিও আবিষ্কার ক'রেছে একটা পা রাখার জায়গা, অন্য পা'টা এমন ভাবে কোথায় চাপা পড়েছে যে তাই নিয়ে টানাটানি।

আমার তো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়-হয়। ইচ্ছে করলেই বেরিয়ে যাব তার উপায় তো নেই। গাড়িটা কি ছাড়বে না না কি? ভীড়ের মাঝখান থেকে মুখটা বাড়িয়ে খোঁচা-খোঁচা গোঁপদাড়ি, গায়ে ফতুয়া, পরনের কাপড়ের এক প্রান্ত মাথায় জড়ানো এবং তদুপরি একটা চাদর পাগড়ির মত করে বাঁধা, কাঁধে গামছা, হাতে লাঠি শ্রীমান্ রামপধারত মোটা গলায় উত্তর দিলে, "মায়ি গে!" মায়ের তখন গদগদ অবস্থা। কষ্ট তো হবেই। একদিনে দুটো পুণ্য। পাটনায় গিয়ে এই কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নান এবং গণ্ডকীতীরে হরিহরনাথ দর্শন। হবেই তো তকলিপ। ক্লেশ না সইলে কেমন ক'রে সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে ক্লেশমোচনের? আজকাল তো রেলগাড়ি হয়েছে। আগে যে ছাতু, মরিচ আর নিমক সম্বল ক'রে মাসের পর মাস হাঁটতো লোকে পুণ্যলাভের আশায়। কার্ত্তিক-পূর্ণিমার সকালবেলা বাবা হরিহরনাথের মণ্ডপে পানি চড়াতে। বসতে পেয়েছে বুড়ি। ছেলেরও পেয়েছে সাক্ষাৎ, তাই বোধ হয় গাঁঠরিটা একবার খুলবার চেষ্টা করলে, হুঁকো-কলকেটায় দিল হাত। কিন্তু সম্ভব হয়ে উঠলো না একটু আরাম করার। তাই তুললে বুড়ি একবার। ঘোলাটে চোখে তাকালে আমার দিকে। জিজ্ঞাসা করলে, গাড়ীটা কি ছাড়লো?

হ্যাঁ। ছেড়েছে গাড়ি।

বাইরে তখনও দেহাতি মেয়েরা ডেকে চলেছে, সিঙ্গাড়া ছায়। ছাড়ানো পানিফল। সঙ্গে দেবে একটু নুণ, দুটো কাঁচা লঙ্কা। পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পানিফলের চাষ ওদেশে। প্রেমসে বোলো বোলো, ভাই গঙ্গামায়ীকি—সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো বাকি সবাই, জয়। হরিহরনাথ কি জয়—সুরে সুর মিলিয়ে বুড়িও বললে জয়। ওধারের কম্পার্টমেণ্ট থেকেও ধ্বনিত হ'চ্ছে গঙ্গামায়ী কি—

পাটনাতে নেমেই চলো মহেন্দ্রঘাট। জনসমুদ্র চলেছে পুণ্য আহরণে। কোলকাতার গঙ্গার ঘাটে যেমন ভীড় হয় গ্রহণের সময়, ঠিক তেমনই ভীড় এই পাটনার গঙ্গায়। নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলের ষ্টীমার ছাড়বে দশটা দশ। ষ্টীমার ঘাটে লাগতেই ভরে গেল যাত্রীতে। নৌকোও চলেছে প্রচুর। তবে তা'তে আলাদা ভাড়া লাগবে। আর আবার বরাবর শোণপুরের টিকিট কি না। রেলওয়ের এনাউন্সার মাইকে সাবধান করে দিচ্ছে যাত্রীদের, ভীড় করবেন না। এর পরেই আবার ছাড়বে স্পেশ্যাল ষ্টীমার। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাবেন না। সাবধানে চড়বেন। অযথা ভীড় বাড়াবেন না। সঙ্গে সঙ্গেই আবার ষ্টীমার ছাড়বে।

গঙ্গার বুকে প্রায় দেড় ঘণ্টা কসরৎ করে ষ্টীমার এসে দাঁড়ালো যেখানে তার নাম পহলেজাঘাট। সহযাত্রী বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে এতো তাঁবু? মহেন্দ্রঘাটের ষ্টীমারে আলাপ বৃদ্ধ বড়বাবুর সাথে। নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলের ষ্টেশন-মাষ্টার, ওই ছাপরা জেলাতেই বাড়ী। পাটনা গিছলেন কি যেন কাজে। সদাশয় ভদ্রলোক! বললেন, মেলা; পহলেজাঘাটে কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় মেলা বসে গঙ্গাস্নানের, নইলে এতো ভীড়ই বা কেন হবে, আর নৌকোই বা আসবে কেন এতো? ছত্তরের মেলাও যত দিন থাকবে এখানের মেলাও তত দিন। স্পেশ্যাল পুলিশ এসেছে—রেলওয়ে-প্রোটেক্সন ফোর্সের বিশেষ সেণ্টার বসেছে। মেলা স্পেশ্যাল চলেছে একটার পর একটা। অস্থায়ী খাবারের দোকান। বাঁশের চাঁচের দেওয়ালে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় করে হিন্দিতে লেখা 'পবিত্র হিন্দু হোটেল'। কাঠের টেবিল-চেয়ার। নর্থ-ইষ্টার্ণ রেলওয়ের মিটার গেজ গাড়ী। গাড়ী তৈরী। ভরে গেছে এরই মধ্যে। তিলধারণের স্থান তো নেই-ই। ছাদের ওপরটাও ভরে গেছে মানুষে। বড়বাবুর সুপারিশে স্থান পেলাম একটু ফার্ষ্ট ক্লাশে, নইলে যেতে হ'তো পরের মেলা-স্পেশ্যালে।

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম রেলওয়ে প্লাটফরম কোথায়? ছোটবেলায় পড়েছিলাম, 'শোণপুর'। চাক্ষুষ দেখলাম এতোদিনে। মেলা লেগে গেছে এখান থেকেই। দরদাম সব গেছে চড়ে। মোটর, টম্‌টম্, সাইকেলরিক্স। রিক্স নেবে তিন আনা। বড়বাবু বললেন এই ভালো—চলুন তাড়াতাড়ি। দেড়টা যে বাজে। কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় গণ্ডকীতে স্নান মানেই তো মোক্ষলাভ। তাই অধীর হয়ে উঠেছে বুড়ো। যদিও তাঁর জীবনে এই প্রথম স্নান নয় গণ্ডকীনীরে তাও বললেন, এই বিশেষ দিনটি এলেই মন-তাঁর পাগল হয়ে ওঠে।

দু'পাশাড়ি ছোট ছোট সব দোকান বসে গেছে কাপড় টাঙিয়ে। তেলেভাজার দোকান। চিড়ে, ছাতু আর চানাভাজা, পাঁপড় ভাজার বিকৃত বাদাম তেলের গন্ধ। প্রকাণ্ড একটা পশু-চিকিৎসালয়। গরুর গলার ঘণ্টা, কড়ির মালা।—চলুন, হাতিবাজার দিয়ে সিধে চলে যাবো গণ্ডকীতে। ঊর্দ্ধমুখে আরও চারটি জোর্দা দিয়ে স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন বৃদ্ধ ষ্টেশনমাষ্টার।

বললাম, বাঘ ভালুক আসে বড়বাবু ?

আসতো—আগে আগে আসতো। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে খরিদ্দারওয়ালারাও সব ডাউন আর মেলাও সব ডাউন হয়ে আসছে দিনের পর দিন। ঘাড় কাৎ করে পানের পিক্‌টা ফেলে গুয়া মুখ খালি করে আবার বলতে লাগলেন বড়বাবু, মেলা, পর্ব্ব, সব হ'ল গিয়ে আনন্দের উপকরণ। ধর্ম্মের মাধ্যমেই আনন্দের আহ্বান। ধর্ম্মই ভারতের কৃষ্টি। তাই ধর্ম্ম ছাড়া কিছু উৎসব হয় না। বছরের প্রথম দুটো মাস জীবনপাত করে খেটেছে সবাই। সোনা ফলেছে মাঠে। নাও এবার আনন্দ কর—চলো শোণপুরের মেলা। কিনে নাও সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্তর। কাশ্মীরী শাল আলোয়ান থেকে লাঙলের ফাল, রুটি বানাবার তাওয়াটি পর্য্যন্ত। দেখে নাও দুনিয়া। হরেক রকমের মানুষ হরেক কিসিমের জিনিষ। দেওয়ালী থেকেই একরকম আরম্ভ হয়ে যায় মেলা। মধ্যমেলা হ'ল গিয়ে আজ স্নানের দিন। যোগ কি না! বড় বড় দোকান সব আজ থেকেই খুলবে। দশ বারো দিন থাকবে আর। এক মাসের মেলা। প্রতি বৎসর যে মেলাগুলো হয় ভারতবর্ষে ছত্তরের মেলাই তো সব চেয়ে বড় এবং দীর্ঘদিনস্থায়ী।

রিক্স গেল থেমে। আর যাবে না রিক্স। মেলা আরম্ভ হয়ে গেল কি না। দু পাশাড়ি আমবাগান। হাজারো হাজারো গরু ভৈঁস। গলার ঘণ্টায় মুখরিত আমবাগান। এসে পড়লাম হাটে বাজারে। তাজ্জব! অগণিত হাতী। ছোট বড় মাঝারি। দাঁতওয়ালা ও দন্তবিহীন। স্ত্রীহাতী ও পুরুষ হাতী—কারও বা পেতল দিয়ে বাঁধানো দাঁত, কারো কপালে বা খড়ি আর সিন্দুর দিয়ে লতাপাতা কাটা। আসাম থেকেই এসেছে অধিকাংশ। হাতীর মালিক ব'সে আছে পাশের ছোট তাঁবুটার ভেতর। আখের পাতা মুড়ি বেঁধে বেঁধে চাকর দিচ্ছে হাতীর শুঁড়ে ধরিয়ে। গলার ঘণ্টা দুলছে সশব্দে। একটা রাস্তার এপাশ ওপাশ হাতী-বাজার আর ঘোড়াবাজার। বৃংহন আর হ্রেষারবে মুখরিত আকাশ-বাতাস। টমটমের ঘোড়া থেকে পোলো খেলার ঘোড়া যেমন নেবেন। দৌড়ে আসছে একটা হাতী শুঁড় তুলে। মাহুত মেরেছে বোধ হয় অঙ্কুশের খোঁচা। সামাল সামাল অবস্থা! দে দৌড় যে যেদিকে পারো—শতহস্তেন বাজিনঃ। বেফাঁস হয়নি কিছু। রাস্তা ধরেই দৌড়েছে হাতী। কিন্তু বড়বাবু? আমার বড়বাবু কোথায়? বুড়ো গেল কোন দিকে? হাতীসমুদ্রে বিলীন হয়ে গেলেন ভদ্রলোক! যাক্‌গে সময় বয়ে চলেছে। কে কার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে দুনিয়ায়? চলো মুসাফের—গণ্ডকীর তীর ধরে আমবাগান আর ভর আমবাগান গিজ গিজ করছে হাতী—হাজার খানেক হবে না কি? যেদিকে চাই হাতী। শির শির করে উঠলো চুলগুলো—বাচ্চা হাতী একটা শুঁড় তুলে স্পর্শ করেছে। সরে যেতে পথ পাই না। শুধু হাতী-ঘোড়াই আসেনি। কেনার জন্যে রাজা-রাজড়াও এসেছেন প্রচুর হাতীমার্কা পকেট নিয়ে। অবিশ্যি পকেট হাতীমার্কা হলেও ইঁদুর লাগার বাধা নেই। মেলা তো! তাই অস্থায়ী পুলিশ-ষ্টেশন বসেছে গণ্ডকীর তীরে। কালীঘাট পুলিশ-ষ্টেশন। সারি সারি বাঁশের চাঁচের ঘর। প্যারেড করছে সব সশস্ত্র পুলিশবাহিনী।

সাধুপাড়ায় এসে পড়েছি। নানারকমের সাধু দর্শন হয়ে গেল। কেউ বা নানকপন্থী কেউ বা রামানুজের দল। মোহন্ত বাবা সদাব্রত দিচ্ছেন। নেংটি সম্বল সাধু ক'জনা পরিবেশন ক'চ্ছে মাটির হাঁড়িতে করে ডাল আর লাউকীকে সব্‌জি। ভোজনকারীরাও সব সাধু। হরেক রকমের সাধু। তাছাড়াও আছে এক রকম গৃহস্থসাধু। ওদেশে বলে গোসাঁই। জটা রাখবে গেরুয়া পরবে ঘর-সংসার চাষবাস সব করবে ছেলেপুলে নিয়ে। ধান কাটার পর বেরিয়ে পড়বে ছেঁড়া কম্বল আর চিমটেটা নিয়ে, ছাই মেখে হর হর মহাদেও সাধুকে ভোজন লাগাও বাবা বলে। এরাও বসে গেছে ভোজনে।

একজন সাধু দ্বিতীয়বার যাচাই করে যাচ্ছেন যদি আর কেউ পুরি নেয়। গণ্ডকীতীরে আমবাগানে সাধুর হাট বসেছে। কেউ বা মৌনী, কারও বা পা পর্য্যন্ত জটা। ভোজনের পর বাঘচামড়ার ওপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করছেন একজন সাধু। পা টিপে দিচ্ছেন দুজনা সাধুর চেলা।

আসল কাজই যে ভুল করে ফেলছি। কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় গণ্ডকীতে স্নান। গণ্ডকীতে না কি শালগ্রামশিলা পাওয়া যায়। গঙ্গার মত জলে ভরা পূর্ণযৌবনা গণ্ডকী। কিনারায় নৌকোর ভীড়। তীরের মত ছুটো নৌকো দৌড়ে আসছে পারের দিকে। হয়তো আসছে ছত্রের মেলার যাত্রী। মেলার মাইকের জ্বালাতেই অস্থির এরা, আবার নৌকোতেও মাইক লাগিয়েছে। রংদার যাত্রী। প্রচুর চাষ। সমতলভূমি ঠিক বাংলার মত। ঠিক তেমনি বাঁশ-খেজুরের চুমোচুমি, আমবাগানে ঘুঘু পাখীর ডাক। মেলা ফেরৎ মানুষগুলো দেখলেই মনে হয়ে যায়, না তো! বহুদূরের, বাংলা থেকে বহুদূরের মানুষ এরা। হাতে নিয়ে কারুকার্য্যপূর্ণ বিচিত্র রং-করা বাঁশের তৈরী ডালা একটা কিম্বা মাথা বাঁধবার মস্রাইলকা চাঁি।

এক পয়সা করে মাটির ভাঁড়। গণ্ডকীর জল নাও ভরে। রাস্তায় নাও দু পয়সার ফুল আর চার পয়সার এলাইচিদানা। চিনির মিষ্টি একরকম। গণ্ডকীতীর থেকে বাবার মণ্ডপ পর্য্যন্ত দু পাশাড়ি ফুল আর পূজোর উপচার, আর পিছন থেকে তং করবে ওই ভিখিরী ছেলেগুলো। ওই আধ মাইল পথ সমান যাবে দল বেঁধে সঙ্গে সঙ্গে। দিয়ে দাও একটা ফুটো পয়সা—শান্তি।

রাস্তার ধারে শ্রীপাটরাম লছমন দাস আশ্রম। অগণিত যাত্রী পড়ে আছে আশ্রমে। ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম করছে কেউ, কেউ বা যোগাড় করছে আহারের। প্রকাণ্ড ছাতার নীচে বিশ্রাম করছেন একজন নাগাবাবা। বলিষ্ঠ চেহারা, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে জটা। নিমীলিত নেত্র, পাশে জ্বলছে ধুনি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের কুঁদো। সামনে মাটির ওপর পড়ে আছে টাকা পয়সা, শাল দোশালা কম্বল, যে যা দিয়েছে ভক্তিভরে। বাবা নির্বিকার। সব ঝুটা হ্যায়।

এসে গেলাম বাবা হরিহরনাথের মন্দির। সারি সারি

পুলিশ। বন্ধ করে রেখেছে মন্দির প্রবেশের তোরণ। এক একবারে পঞ্চাশ ষাট জন করে যাত্রী ছাড়ছে। ভেতরের যাত্রীদের বের ক'রে দেওয়া হচ্ছে অন্য দোর দিয়ে। হুইসিল দিলে পুলিশের জমাদার সাহেব। খুলেছে দুয়ার। ভীড় ক'রে লোক ঢুকছে ভেতরে। চলো মন হরিহরনাথ দর্শনে!

বিভাবসু আর সুপ্রতীক দু' ভাই। অহরহ ঝগড়া করে দু'জনে দু'জনকে দিলে অভিশাপ। একজন হ'ল গজ, আর একজন পড়ে রইল গণ্ডকী নদীতে কচ্ছপ হ'য়ে। হাতী যায় জল খেতে, কচ্ছপ ধরে শুঁড়ে। ঝগড়া ভুলতে পারেনি তখনও। তখনও উভয়ে চায় উভয়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে। লাগলো লড়াই। গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ। ত্রিভুবন উঠলো কেঁপে। ব্রহ্মা শরণ নিলেন বিষ্ণুর। উপায়? উপায় আছে। হরিহর মিলন দর্শনে মুক্তিলাভ হবে ওদের। তাই এই হরিহর মিলন। শিবলিঙ্গের গা ঘেঁসে কালো পাথরের চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। দক্ষিণে শ্বেতপাথরের গণেশ। দেখবার কি যো আছে প্রাণভরে, যা পুলিশের তাড়া। উপায় কি? ওধারে যে আরেক দল দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। জয় বাবা হরিহরনাথ কী—গণ্ডকীর জল দাও ঢেলে। জলে-কাদায় একেবারে যা তা' হয়ে গেছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দোকানে দোকানে সব ইলেকট্রিকের আলো। সামনেই একটা মিষ্টির দোকান। রূপোলী তক্তি-মোড়া নানা রংএর মিষ্টি। সাজিয়েছে সব তিন হাত চার হাত করে উঁচু। আকাশে বেলুন উড়ছে একটা আর তার থেকে লেখা নেমেছে ডাবুর ডা: এস, কে, বর্ম্মন লিমিটেড। ডুলিয়া সিন্দুর ফ্যাক্টরী, গীতা প্রেস বইএর দোকান, এভারেডি ব্যাটারী, শ্রীগোপাল আয়ুর্ব্বেদ ভবন, ডালডা, লছমনপ্রসাদ রাম একবাল সাও কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ, শেঠ রাধাকৃষ্ণ বেনারসী শাড়ির দোকান, কাশ্মীর ও লুধিয়ানার উলের সামগ্রী, গালিচা সতরঞ্চি, কানপুরের হাতীর দাঁতের জিনিষ, হরিণ সিং-এর ডিবে, চন্দনকাঠের সিগ্রেট পাইপ। হাতীর দাঁতের চুড়ী। এক ডজনের দাম কত?

মাইকের মাউথ পিসটা মুখের কাছে নিয়ে দোকানদার জবাব দেয়—দেড় রূপেয়া।

এই হাতীর দাঁতের ছড়িটা?

পঞ্চাশ।

অতিরিক্ত গোলমালের জন্যই এই মাইকের ব্যবস্থা।

পাঞ্জাব ইলেকট্রিক ষ্টুডিও, কাশ্মীর ষ্টুডিও, নাও ফটো তুলে। তোলা ফটোর গেট বানিয়েছে। রূপোলী তক্তী-মোড়া বেনারসের পান। খিলি চার আনা। কাশীর জোর্দ্দা। তারই কতকগুলো দোকান। বংগালি সুগন্ধিৎ খৈনি। নামকরণের অর্থ খুঁজে পেলাম না। এইটুকু দোকান নয়। গাজনের মেলায় যেমন দোকান দেখেছো তেমন নয়, অন্ততঃ একশ হাত লম্বা এবং তদুপযুক্ত চওড়া। আচারের দোকান। হরেক জিনিষের আচার। খড়ম, হুঁকো, বাঁশের জিনিষ, লোহালক্কড়, চাষের জন্য জলের কুঁড়ি, রান্নার জন্যে কড়া বালতি, মেয়েদের কেশ প্রসাধনের বিবিধ উপকরণ, চিনে পাথরের মালা, বাঘ-চামড়', হরিণের চামড়া, গোসাপের চামড়ার এটাচি, খরগোসের চামড়ার ভ্যানিটি ব্যাগ, ঢোল, ডুগীতবলা, সুগন্ধি শমীম, মর্টন সুইট্‌স এণ্ড টফি, চিনে মাটির বাসন, কানপুরের জুতো, কাঁটি আর পুঁতির মালা, মাথার টিপ।

কত ক'রে ডজন ভাই টিপের?

বললে, দু আনা।

লাল রংএর শাড়ীপরিহিতা পায়ে জুতো, চোখে চশমা, ক্ষীণাঙ্গী তন্বী এক সুন্দর বাংলা ভাষায় বললেন, টিপ নেবেন?—দু' আনা ডজন? বলেন কি? আসুন তো এদিকে! চার পয়সা, চার পয়সা ডজন এই সব টিপের।

অবাক্ হ'য়ে যাই বাংলা শুনে এই অবাঙ্গালীর দেশে। হবে হয়তো। কোন বড়লোকের পরিবার এসেছেন হয়তো মেলা দেখতে। সারা ভারত ভেঙ্গে আসবে রাজা-উজিরের দল।

বললাম, না, টিপ আমি নোব না। এমনি জিজ্ঞেসা করছিলাম।

এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো মন, আরও কত বাকী। প্রচুর প্রদর্শনী হয়েছে। অধিকাংশই বিহার সরকার থেকে। বিকাশ প্রদর্শনী, সর্ব্বোদয় প্রদর্শনী, কৃষি প্রদর্শনী, খাদি গ্রামোদ্যোগ প্রদর্শনী, সামুদায়িক বিকাশ যোজনা, উত্তর-পূর্ব্ব রেলওয়ের অগ্রগতি প্রদর্শনী ক্রুকবণ্ড প্রদর্শনী।

ওপরে লেখা আছে জানোয়ার আর পক্ষী। মাইকের গান হচ্ছে আর সামনে অতিরিক্ত পাউডার আর রং মেখে দুটো মেয়ে অস্বাভাবিক ভাবে নেচে নেচে তালে তালে বলছে হে পৈসা—হে পৈসা। মহারাষ্ট্র সার্কাস, ইংরাজী ব্যাণ্ড বাজছে, ইলেকট্রিক লাইটের মালা। প্রকাশ টকিজ, রূপবাণী, সিনেমাগুলার থিয়েট্রিকাল শো কাণপুর। রাত ন'টায় আরম্ভ হবে এখন থেকেই বেজায় ভীড়। দি কর্ম্মগত যমপুরী নাটক কোং, সামনের পুতুলগুলো এধার-ওধার ক'রে বেড়াচ্ছে। শ্রীগণেশ মার্কা আখমাড়া খড়কাটা কল। লাঠি, ছোরা, তরোয়াল। রাজহংস হোটেল লক্ষ্ণৌ, আহার ও বিশ্রামের সুবন্দোবস্ত, রিগ্যাল হোম পাটনা। রামলীলার উপকরণ রামের পোষাক, হনুমানের মুখোস, চুল, ঢাল, তরোয়াল, পেণ্টিংএর জন্যে পিউড়ি পাউডার আর সিন্দুর কত আর বলি, এ হ'লো গিয়ে হরিহর ছত্রের মেলা! এ ধারটায়? বললে চিড়িটাপট্টী, তাই না কি? দেখ, কত দেখবে চিড়িয়া। ময়ূর, কোকিল, কাকাতুয়া, টিয়ে ময়না নানা রংএর চড়ুই। নাম কি আর জানি সব? না কি জিজ্ঞাসা করা সম্ভব এতো? শুধু চিড়িয়া নয়, হরিণ আর ছাগল, বানর আর শামর, শাদা খরগোশ আর গিনিপিগ। হরিণের ছোট্ট বাচ্চা একটা লাফাচ্ছিল সামনেটায়। বললাম, কিম্মৎ কত ভাই?

মালিক বললে একশ'। একশ বললেই একশ' নয়তো! দর দাম করতে হবে। এটা না হয় আরও দশটা দেখতে হবে, তবে তো হবে হরিণ কেনা। পঞ্চাশও হ'তে পারে, চল্লিশেও হয়ে যেতে পারে। জটায়ুপাখী একটা দেখতে ঠিক সাদা পায়রার মত। অবশ্য বড় আরও। প্রায় দেড় ফুট উঁচু হলদে রং-এর খুব বড় টিয়াপাখীর ঠোঁটের মত বাঁকানো ঠোঁট, কানের কাছটার দু'পাশে বেশী বেশী পালক। তার ওপর হাত দিয়ে দোকানদার বলে পাখীর কান দেখে যান। জটায়ুপাখী। চল্লিশ টাকা জোড়া।

অসংখ্য নার্শারী, লাখ লাখ গাছের চারা। হাজীপুর, সমস্তিপুর শুধু নয়, সুদূর চব্বিশ পরগণা জেলা থেকে গেছেন এক ভদ্রলোক নার্শারী নিয়ে।

চিড়িয়াপট্টী কোন দিকে বলতে পারেন? সেই সুবেশিনী তরুণী। টিকলীর দোকানে উপযাচিকা হয়ে যিনি উপকার করতে এসেছিলেন।

—বললাম, ওই তো ওই গলিটা ধরে—সামনেই দেখবেন হরিণের বাচ্চা একটা—

দেখিয়ে দিন না একটু দয়া করে।

একটু এগিয়ে দেখিয়ে দিই চিড়িয়াপট্টীর রাস্তা। তরুণী চলে গেলেন চিড়িয়াপট্টীতে। অবাক হয়ে যাই। সঙ্গে নেই পুরুষ মানুষ কেউ। এই ভীড়ের মেলায় বেশ তো ঘুরে বেড়াচ্ছেন ফর ফর করে। থাকগে কী দরকার ওসব পরচর্চায়?

ভাবলাম, দেখে আসি কি করছেন সব সাধুবাবারা এই রাত্তির বেলা। চললাম সর্টকাট ক'রে। হাজার হাজার যাত্রী আমতলায় পড়ে রাত কাটাচ্ছে। গণ্ডকীর ঠাণ্ডা বাতাস। বেশ শীত পড়েছে এরই মধ্যে। শুকনো শুকনো কাঠ কুড়িয়ে আগুন করেছে। আর হাতের তৈরী লিটি।

সারি সারি তাঁবু। ডুগীতবলার আওয়াজ। তাঁবুর সামনে ভীড় করেছে মানুষ। গলা উঁচিয়ে দেখলাম গান-বাজনা হচ্ছে। রূপোপজীবিনীরা এসেছেন গয়া আর বেনারস থেকে দু'পয়সা কামাতে। প্রতিটি তাঁবুর ভেতর একই অভিনয়। রাজা জমিদার বা বাবুসায়েব জোড়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে রয়েছেন গা এলিয়ে দিয়ে, কেও বা একলা কেউ বা সপার্ষদ। লাস্যময় নৃত্যে প্রেমনিবেদন করছে কাজলপরা ঠোঁটরাঙানো নটী। পেছনে সারেঙ্গী, পাশে ডুগীতবলা। যে যেমন দরের বাঈজী তার তেমনি তাঁবু, তেমনি কায়দা তেমনি তার রূপোর পানের বাটা আর পিকদানী। লাখ-লাখ মানুষ লাখ অভিলাষ নিয়ে এসেছে মেলায়—এই মানুষের চিড়িয়াখানায়।

জোর জোর চলতে লাগলাম। দু' পাশাড়ি মাছভাজার দোকান। মাছভাজা, মাংসের চচ্চড়ি আর কবেকার তৈরী ঘুগনী। কালো হয়ে গেছে রং। অস্থায়ী মদের দোকান। গাঁজা আফিম্ ও ভাং-এর লাইসেন্সড্ ভেণ্ডার।

খুব জোর কীর্ত্তন হচ্ছে ঢোল আর করতাল বাজিয়ে। আধ্য অপেরায় যাত্রা হ'লে যেমন সামিয়ানা টাঙানো হয়, তেমনি জমকালো সামিয়ানার নীচে চৌকীর ওপর লাল শালু—শালুর ওপর বাঘের চামড়া, বিরাট বপু সাধু বসে আছেন একজন। নীচে চারি পাশে বসেছে শত শত সাধু। ওরাই কীর্ত্তনীয়া, ওরাই শ্রোতা। বাদ্যযন্ত্র আছে বহুপ্রকার। যথা—ধরুন চিম্‌টে, ডমরু, ছোট ছোট করতাল লাগানো খঞ্জরী। লোহার এক রড্। সমের সাথে বলে উঠছে সবাই, বোলো ব্যাসদেও আচারী মোহন্তকী—জয়। ব্যোম্ ব্যোম্ ব্যোম্ শঙ্কর—দপ্ করে জ্বলে উঠছে কোথাও বা ছোট কল্কের মাথাটা।

পরিশ্রমে অবসন্ন শরীর। রাত দশটা বাজে। জয় বাবা হরিহরনাথ· মাথায় থাক বাবা! রিক্সা করে ফিরে এলাম ষ্টেশনে। খাওয়া হয়নি সারাদিন। সেরে নিলাম আহার। চাওয়াল, চাপাটি, গোবিকে সব্জী বেগুনের আচার আর ওলের চোখা। ভূরি ভোজন হয়ে গেল। ট্রেণে পহলেজাঘাট আর ষ্টীমারে চড়েই পেতে দিলাম কম্বল। মহেন্দ্রঘাটের মাইকের শব্দ কানে না গেলে কি আর ঘুম ভাঙতো? চলে যেতে হতো হয়তো দীঘাঘাট কিংবা আরও কোথায়। মাইক বলে চলেছে, এসেছেন যাঁরা, তাঁদের নাম্‌তে দিন আগে।

দোতলা থেকে নামবার পথে সিঁড়িটার কাছে ভীড় গেছে জমে। তা'রই মাঝে কায়দা করে নামতে যাচ্ছিলাম আগে ভাগে। জোর হাটকে, বলে উঠলো তক্‌মা, চাপরাশ, পাগড়ি পরা আর্দালী একজন। থমকে দাঁড়াই। ব্যাপার কি? কোথাকার কে একজন বিশেষ ব্যক্তি নামছেন সস্ত্রীক হাসতে হাসতে। হাতের ভ্যানিটী ব্যাগটা দুলিয়ে দুলিয়ে অনর্গল হিন্দিতে গল্প করতে করতে গাড়িয়ে পড়ছেন শ্রীমতী। কিন্তু এ কি! সামনে আসতেই দেখি আরে! এ যে সেই—আমার হিতৈষিণী—চিড়িয়াপট্টীর রাস্তা পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যিনি আমাকে। সবই বিস্ময়! কি জানি—কি ব্যাপার—এমনও তো হ'তে পারে যে রাজার কুমার হাতী কিনতে গিয়ে কিনে নিয়ে এলেন চিড়িয়া। মনের মাঝে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রথম কথাটি অনুরণিত হ'য়ে উঠলো—'সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!'

# অপরিবর্তনীয়

উইলিয়ম সেক্সপীয়র

ব'লো না ব'লো না প্রিয়ে হৃদয় আমার মিথ্যাচারী,
যদিও অনুপস্থিতি অভিযুক্ত ক'রেছে আমায়,
ভেবো না ভেবো না অতো অনায়াসে ফেলে যেতে পারি
আমার চিণ্ময়সত্তা, যা তোমার হৃদয়-শয্যায়;

ও আমার প্রেমগেহ; যদি আমি পথের নির্দেশে
হ'তাম স্বৈরচারী, তবে সেই পান্থের মতন
দুর্বার না ছুটে জেনো নির্দিষ্ট প্রহরে ফিরে এসে
পেতাম কল্যাণবারি স্পর্শ যার কলঙ্কমোচন।

আমার হৃদয় জানি ছিল দুর্বলতার শাসনে,
শেষ রক্তবিন্দু তার অবরোধে, তবু প্রিয়ে হায়
বিশ্বাস ক'রো না তুমি যা দিয়েছ—সবই অকারণে
ত্যাগ ক'রে সে নিয়েছে অসঙ্গত কলঙ্কের দায়;

কেন না হে পুষ্প মোর, একমাত্র সত্য তুমি বিনা
এ বিশাল বসুধায় আমি আর কারুকে জানি না।

অনুবাদক—শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

# হিন্দুর অতীত ও বর্ত্তমান

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

অতীতে হিন্দু কি ছিল, বর্ত্তমানে কি হইয়াছে—তাহাই এ প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়। এবং ইহা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে 'হিন্দু' কথাটির প্রকৃত অর্থ কি—নিরূপণ করিতে হইবে। মেরুতন্ত্রে আছে, 'হীনং দূষয়তে যস্মাৎ তস্মাৎ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ।' অর্থাৎ যিনি হীনকে দোষ দিয়া থাকেন, মন্দকে মন্দ বলেন, এক কথায় যাঁহার ভাল-মন্দ বিচার করিবার শক্তি আছে, তিনিই হিন্দু। যে-জাতি বেদ পাঠ করিত, সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিত, যে-জাতি মহাভারত ও রামায়ণ, পুরাণ ও দর্শন, পাণিনির ব্যাকরণ, কালিদাসের কাব্য, মনুর স্মৃতি ও শাক্য সিংহের ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছিল ১ সেই জাতিই হিন্দু জাতি। হিন্দু কখনও পৃথক কুল-জাত নহেন। হিন্দু কখনও মুসলমান-খৃষ্টীয়ান নহেন। যে কেহ ইচ্ছা করিলে খৃষ্টীয় কি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান হইতে পারেন। কিন্তু যে হিন্দু-কুলে জন্মগ্রহণ করে নাই—সে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু হইয়া হিন্দু-সমাজে মিশিতে পারে না। ২ হিন্দু সর্ব্বদাই হিন্দু-কুলজাত।

'হিন্দু' কথাটিকে আরও একটু বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন আছে। শরীর ও মনের অপকার-জনক কার্য্য না করাই হিন্দুত্ব। যে উপায়ে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি এবং সর্ব্বপ্রকার শান্তি লাভ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। শারীরিক ও মানসিক উন্নতিমূলক কর্ম্ম যিনি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই ধার্ম্মিক। কাজেই হিন্দু কথাটির প্রকৃত অর্থই ধার্ম্মিক।৩ এই হিন্দুই বলিয়াছেন, 'ধর্ম্মাচর।' অর্থাৎ ধর্ম্ম আচরণ কর। ধর্ম্ম বলিতে হিন্দুর ধর্ম্মকে অর্থাৎ হিন্দুত্বকে আরও সহজ কথায়, শারীরিক ও মানসিক উন্নতিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান করাকেই বুঝাইতেছে। মুসলমানত্ব বা খৃষ্টীয়ানত্বের সহিত হিন্দুত্বের প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে। মুসলমান বা খৃষ্টীয়ান কখনও হিন্দু হইতে পারে না, কেন না। যে সকল আচার হিন্দুত্ব (শারীরিক ও মানসিক উন্নতিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান) ধ্বংসকারক, তাহারা পুরুষানুক্রমে সেই সকল আচার করিয়া৪ আসিয়াছেন।

'হিন্দু' শব্দটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, হিন্দু শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান। ইতিহাসে হিন্দুদিগের যে অসীম বাহুবলের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব! অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে পুনঃপুনঃ হিন্দুদিগের জয়লাভ তাঁহাদের অসীম শারীরিক শক্তির কথাই প্রমাণ করে—ইহা ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই। সিন্ধুনদের উপকূলে হিন্দুদিগের যে নব-নব কৃষি-প্রচেষ্টার কথা ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে, তাহাতে হিন্দুর অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তার কথাই প্রমাণিত হয়।

হিন্দুর হিন্দুত্ব সম্বন্ধে যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই দেখা যাইবে যে, হিন্দুর শারীরিক ও মানসিক শক্তি কত প্রবল। অতীতে হিন্দু কি ছিল।

বর্ত্তমানে হিন্দুর সে ধর্ম্ম, সে হিন্দুত্ব কোথায়? আজ কয়জন হিন্দু নিয়মিত ভাবে শারীরিক ও মানসিক উন্নতিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান তথা হিন্দুত্ব পালন করিয়া থাকেন! আমরা কি হিন্দুত্ব হইতে বিচ্যুত হই নাই? আমরা কি হিন্দুত্বের মর্য্যাদা হানি করি নাই?

আমরা যে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, আমাদের ধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকি—সেই হিন্দুত্ব, সেই ধর্ম্ম আজও আমাদের আছে কি? অতীতের সেই শারীরিক ও মানসিক বলে বলীয়ান হিন্দুর হিন্দুত্ব আজ মৌখিক হিন্দুত্ব মাত্র। বর্ত্তমান হিন্দুর এই অসার হিন্দুত্বে দুঃখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাই বলিয়াছেন, "হিন্দুর দেবতা! এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবল হিন্দু হইব, মানুষ হইব না?"

হিন্দুর মহামূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ। বেদাদি-শাস্ত্র জগতের রক্ষা-কবচ। বেদ জগতের আদি গ্রন্থ, ইহা বৈদেশিকগণও স্বীকার করেন। সম্ভবতঃ ইহা হইতেই পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-উপদেশ, সকল নীতিকথা জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ৫ প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান কর—দেখিবে, যে সভ্যতা আজ পৃথিবীতে বর্ত্তমান তাহা হিন্দু-সভ্যতার (বা হিন্দুধর্ম্মের বা বেদের) কাছে বহুলাংশে ঋণী। ৬ অথচ আজ আমরা এই বেদকে অস্বীকার করি। আমি বলিব, ইহার জন্য দায়ী আমাদের এই পাশ্চাত্য-শিক্ষা। পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে আজ আমরা বেদকে তথা হিন্দুত্বকে অস্বীকার করিতে শিখিয়াছি। বালক বিদ্যালয়ে গিয়া প্রথমেই শিখে যে, তাহার বাপ একটি মূর্খ, তাহার পিতামহ একটি পাগল; তারপর, প্রাচীন আর্য্যগণ সব ভণ্ড, এবং সর্ব্বশেষে শিখে, ধর্ম্মশাস্ত্র সব অলীক! ফলে ষোল বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই সে একটি প্রাণ-হীন ও মেরুদণ্ডহীন 'না'র সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।৭ স্বীকার করি, পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনে অনেক উন্নতির স্রোত বহাইয়া দিয়াছে; তথাপি, একটা বড় রকমের অপকার হইয়াছে। তাহা ধর্ম্মহীনতা।৮ তাহা হিন্দু-হীনতা। হিন্দুত্বকে তথা ধর্ম্মকে ৯ অস্বীকার করিবার দুঃসাহস আমাদের বুকের একেবারে মধ্যস্থলে বদ্ধ আছে এই পাশ্চাত্যশিক্ষা। ধন্য পাশ্চাত্যশিক্ষা! ধন্য পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক হিন্দু!

অতীতে হিন্দু কী ছিল, আর আজ কী হইয়াছে?

যে হিন্দু একদিন অপরিমেয় শৌর্য্য-বীর্য্য বলে কত দূর-দূরান্তরে দুস্তর সাগরতীরে রাজ্য স্থাপনা করিয়াছিলেন, যাঁহারা দুরূহ গণিত-শাস্ত্র, রসায়ন-বিজ্ঞান, কৃষি-শিল্প, নৃত্য-গীত, অভিনয় প্রভৃতির জনক, সেই হিন্দুর আজ এ কী পরিণতি!১০ অতীতে হিন্দু ভাস্কর্য্যবিদ্যায় যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়! পাহাড়ে পর্ব্বতে, তীর্থে দেবমন্দিরে যে সকল প্রস্তরমূর্ত্তি আজও হিন্দুর প্রাচীন ভাস্কর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে,

---

(১) বঙ্গদর্শন ১২৮৭, পৌষ।
(২) বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা ৭১৬।
(৩) ডাঃ হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভূষণ।
(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, ৭১৬।
(৫) আর্য্য-ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা—আচার্য্য যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
(৬) পল্লীবাণী ১৩৪৮, বৈশাখ।
(৭) ভারতকল্যাণ—স্বামী বিবেকানন্দ। পৃষ্ঠা ৫৫।
(৮) পল্লীবাণী ১৩৪৮, বৈশাখ।
(৯) ডাঃ হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভূষণ
(১০) ললিতাগিরি—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের মধ্যে থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। পাথর এমন করিয়া যাহারা পালিশ করিয়াছিল, এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যাহারা খোদিয়াছিল, তাহারা কি এই আমাদের মত হিন্দু? ১১ হায়! এখন কিনা হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! কুমারসম্ভব ছাড়িয়া স্যুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি!১২

হায় হিন্দু! তোমার অতীত গৌরবের কথা সবই তো শুনিলে, তোমার প্রাচীন হিন্দুত্বের কথা সবই তো বুঝিলে। এবার—ভাই হিন্দু! একবার হিসাবের খাতাটা খুলিয়া দেখতো—আজ তোমার কি আছে! দেখিবে—হিন্দুর সবই ছিল (কারণ হিন্দুত্ব ছিল), আজ আর কিছুই নাই, আছে শুধু কঙ্কাল।১৩

আজ এই কঙ্কালের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, হিন্দুকে আবার জাগিতে হইবে, আবার 'হিন্দু' হইতে হইবে!

এই অধঃপতিত হিন্দুকে আবার জাগিতে হইলে, আবার 'হিন্দু' হইতে হইলে, হিন্দুত্বের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইবে। হিন্দুত্বের মর্য্যাদা রাখিতে হইবে। মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিতে হইবে—আমি হিন্দু! আমার হিন্দুত্ব আছে! আমার ইতিহাস সংস্কৃতি কৃষ্টি আছে। আমি হিন্দু!!

(১১) ললিত গিরি—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(১২) ধর্ম্মের মূর্ত্তি বড়ই মনোহর। ধর্ম্ম আত্মপীড়ন নহে—আপনার উন্নতিসাধন, আপনার আনন্দবর্দ্ধনই ধর্ম্ম।
(ধর্ম্ম ও সাহিত্য—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

(১৩) পল্লীবাণী ১৩৪৮, বৈশাখ।

# একটি কবিতায় যা থাকবে

প্রীতিভূষা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি
এই আমি
তোমাকে একটা কবিতা লিখবো,
সত্যিই লিখবো
কবিতা।
সে কবিতায় থাকবে না কোন
ভাব-ভাষা-ছন্দ-অর্থ
থাকবে শুধু তুমি।
তোমার কৃষ্ণ কুন্তলের প্রাতঃস্নানের
সুরভিত সুগন্ধ থাকবে
আর থাকবে
তোমার পদ্মবর্ণা শ্রীঅঙ্গের
উত্তপ্ত সৌরভ।
যে ক্ষীণকটি যে পীনোন্নতপয়োধরা
এখনো হ'য়ে রয়েছে
অনাঘ্রাতা
তোমাকে বন্দিনী করে রেখেছে কুমারীত্বে
আমি তার
একমাত্র এই আমি
তার সেই আঘ্রাণ গ্রহণ করবো
মুক্ত কোরে আনবো কুমারীর
দুঃসহ বন্দিজীবন থেকে
তোমাকে।
সেই মুক্তির আনন্দে
সেই স্বপ্নাতীত চরম আনন্দে
তুমি হাসবে
সেই হাসিটি থাকবে কবিতায়!
তারপর পূর্ণিমার
সোনার আলোতে
যে মিলন, যে মিলনের ফল
শুধু চোখ দুটি বুজে আসা
ঘুমের গভীর আনন্দে
আমার কবিতায় থাকবে
সেই ঘুম আনন্দ শুধু।

এর পর, আরো থাকবে,
থাকবে,
তুমি শুধু চলে যাচ্ছ মুক্তি পেয়ে
নিজের আবাসে
আমাকে ফেলে রেখে
আমি একলা।

যে মুক্তি দিল
তাকে দিলে না তো কিছু
জানি, তার দান দিতে
তুমি আবার আসবে।

এই আবার ফিরে আসার
কল্পনার মধ্যে যে আনন্দ
যে অসীম সুখ
সেই আনন্দসুখ
থাকবে কবিতায়।

আর থাকবে,
একটি জ্বলন্ত চিতা
নিবু-নিবু হয়ে আসছে
ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রুজলে শুধু
সে অশ্রু নারীর সতীত্ব হারানোর
বাঁধভাঙা কান্না
আর সেই চিতা
পুরুষের কামনার জ্বলন্ত প্রতীক
আর কিছু নয়!

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

## এক

অন্ধকার আকাশ। উল্কার মতো কয়েকটি আলোর তীর পরপর উঠে সেই আঁধারকে জয় করতে চাইলো। পারলো না। সেই আলো তখন নানা রঙের ফুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আবার আঁধারেই মিলিয়ে গেল। তুবড়ি ফাটছে। আলোর ঝর্ণা উঠছে। আকাশের চেয়ে মাটির আলোক উৎসব আরো জমজমাট। সেই আলোকে উদ্ভাসিত হয় বিঠুরের পেশোয়া প্রাসাদ। আর ওপর থেকে হিমকুয়াশার চাদরখানা জড়িয়ে তামাসা দেখে ১৮৫৭ সালের আকাশ। সবে ইংরেজী সালের শুরু।

বিঠুর প্রাসাদে অতিথি আজ ইভানস। কানপুরে অনেক কথাই শুনেছে। ভারতীয় একজন মহারাজাকে কাছাকাছি দেখবার আগ্রহ তারও কম ছিলো না। সুযোগ মিললো হঠাৎ। রেজিমেন্টের স্পোর্টস বিঠুরে হতে পারে কি না, তারই বন্দোবস্ত করতে এসে নিমন্ত্রণ মিললো। সদ্য বিলেত থেকে এসেছে ইভানস। এই রহস্যময় দেশের অতিথি হয়ে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে যত কথা সে শুনেছে, তাতে আগ্রহ বেড়েছে বই কমেনি। ঔৎসুক্যে ইভান্সের দুই ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক। চোখে জাগ্রত কৌতূহল।

পুরোন বাজিকর তার বাজি জ্বালায়। তুবড়ি, হাউই, রংমশাল। লাল নীল আগুনের জেল্লা। বাগানের একান্তে শিকারখানা। সাদা ময়ূর আর হরিণ ছটফট করে। বাগানে সুগন্ধি এলাচি ও তেজপাতার গাছ। শুকনো তেজপাতায় তুবড়ির ফুলকি পড়ে মৃদু সুগন্ধ ছড়ায়। বৃহৎ খাঁচায় বন্দী জোয়ান চিতা। অরণ্যে দাবানলের স্মৃতি এখনো তার চেতনায় আছে। তাই গাছে-পাতায় নানা রঙের ঝলকানি দেখে সে চমকিত হয়। ভাবে, সেই আগুনের দিন বুঝি এল বা। আর কাশ্মীরী ঝাউগাছের ঘন পাতার আড়ালে বুকের তাপে উষ্ণ খড়কুটোর বাসা থেকে সবুজ টিয়ার দল চকিত হয়ে চুনীরঙা চোখ মেলে চায়, ভাবে এই বুঝি দিন হলো। কেটে গেল রাত।

আলো আর আগুনের ফোয়ারা ছুটিয়ে বাজিওয়ালা পাগড়ী খুলে নিচু হয় ইভান্সের সামনে। বুঝতে পারে না ইভানস। আর গৃহস্বামীর সহকারীর কালো চোখে কৌতুক খেলে। তিনি বলেন, —ও বুঝেছে, সাহেব যদি খুশী হন তো তাঁর সুপারিশে পরে ওর কানপুরেও ডাক পড়বে।

আজিমুল্লার চোখে আর ঠোঁটে যেন চাপা কৌতুকের হাসি। তবু এমন নিখুঁত আতিথেয়তা যে মুগ্ধ না হয়ে পারে না ইভানস।

সুবিশাল হলঘর। বাইরে বাজির আলো, কিন্তু ঘরে আঁধার জড়িয়ে আছে। একটি কিশোর ভৃত্য মশাল হাতে ছুটে এসে ঝাড়ের বাতি না ধরানো অবধি আলোকিত হয় না ঘর। খালি পায়ে চলাফেরা করে ছেলেটি। নরম গালিচায় সব শব্দ ডুবে যায়। ইভান্সের মনে হয় কোন কিছু নেই, তবু অতর্কিতে একটি একটি বাতি জ্বলে ওঠবার ছবিখানি কি সুন্দর! মাঝখানের বড় ঝাড়খানা কিন্তু এখনো আঁধার।

ঘরখানা বিলেতী আসবাব, মোটা গালিচা, কিংখাবের পর্দা, ভারী পিতলের ফ্রেমে কয়খানা পশ্চিমের নিসর্গ চিত্রে জমজমাট। গৃহস্বামীর পাশে পান এলাচের রূপোর সরঞ্জাম আর আলবোলাই যা ভারতীয়। একান্ত ভারতীয় এক মহারাজার ঘরে, শিকারী কুকুর হাতে ইংরেজ মহিলা, অথবা সার ফিলিপ সিডনীর অন্তিম মুহূর্তে অন্য যোদ্ধাকে জল দানের ছবি, দুটোই অসমঞ্জ ঠেকে ইভান্সের চোখে। দুইখানা ছবিই মূল ছবির অনুকৃতি। কোণে চিত্রকরের নাম বড় করে লেখা। ইভান্সের দৃষ্টি অনুসরণ করে গৃহস্বামীর সহকারী বলেন।—সবই বিলিতী। সাহেবদের দেশের।

ঈষৎ হেসে স্বীকার করে ইভান্স। নিচু কুর্শিতে বসে গৃহস্বামী। শ্যামবর্ণ, স্থূলকায়, তীক্ষ্ণ চোখ, ধারালো নাক। ক্ষৌরচিক্কণ চিবুকের নিচে ভাঁজ পড়েছে। ডানহাতের তালুতে মুখ রেখে কি ভাবছেন তিনি। বাঁ হাতে আলবোলার নল। নলের মুখ থেকে সুগন্ধি ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

সুগন্ধি ধোঁয়ার জাল চারিদিকে। মৃদু মৃদু নীল ধোঁয়া সরু সুতোর মতো উঠে বিচিত্র আলপনা রচনা করে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। চোখে পড়ে ইভান্সের। যে কিশোর ভৃত্য আলো জ্বেলে দিয়েছিলো, তারই মতো আরো কয়জন নিঃশব্দে এসে ঘরের কোণায় কোণায় সুগন্ধি চন্দন-ধূপের পিতলের আধার রেখে যাচ্ছে। যাবার সময়ে সম্মান জানিয়ে নিচু হয়ে যাচ্ছে। কেউ দেখছে না। তবু এই সম্মান জ্ঞাপনা। সেই ধূপের ধোঁয়ায় কিছু ওষধির গন্ধও পাওয়া যায়। ঘরের পরিবেশে সূক্ষ্ম সুগন্ধি ধোঁয়ার জাল এক কুহক সৃষ্টি করে। সহসা নিচু হয়ে ইভান্সের কানে কানে সঙ্গী টমসন বলে,—এবার দেখ।

ঈষৎ সোজা হয়ে বসেন গৃহস্বামী। দূরে এক পাশে পা মুড়ে মাটিতে বসেছিল বৃদ্ধ সম্পূরণ। দর্শকজনের থেকে দূরে বলে তাকে তেমন স্পষ্ট দেখা গেল না। শুধু কণ্ঠ শোনা গেল,—চম্পা! দিয়া জ্বালাও!

আর পিছনের দরজার পর্দা ফাঁক হ'য়ে গেল। সেই অন্ধকার

# চৌকিদার

তুষার চট্টোপাধ্যায়

পটভূমিকা

## ॥ সন্দীপপুর ॥

—চরিত্র—

॥ পুরুষ ॥

| | | |
|---|---|---|
| সত্য চৌধুরী | — | জমিদার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। |
| বাণেশ্বর | — | গ্রামের পদস্থ ব্যক্তি। |
| মুন্সি | — | ঐ |
| লক্ষ্মণ | — | চাষীর ছেলে, চৌকিদার। |
| মাষ্টার | — | মাষ্টার। |
| হৃদয় মোড়ল | — | চাষী, মোড়ল। |
| নিতাই | — | গ্রামের উৎসাহী যুবক কর্মী। |
| ইস্তাজ | — | কাশীর গুণ্ডা, বর্তমানে সন্দীপপুরবাসী। |
| ভুলুয়া, ভগবান, আখতার | } | ঐ সাকরেদ। |

॥ স্ত্রী ॥

| | | | |
|---|---|---|---|
| তুলি | — | — | লক্ষ্মণের বোন। |
| মা | — | — | ঐ মা। |
| কবিতা | — | — | সত্য চৌধুরীর মেয়ে। |
| সোহাগী | — | — | মোড়লের মেয়ে। |

### প্রথম দৃশ্য

[ সন্দীপপুর গ্রামের এক কোণে একখানা জীর্ণ কুঁড়ে। লক্ষ্মণের গৃহ-প্রাঙ্গণ ]

( ঘর্মাক্ত কলেবরে লক্ষ্মণের প্রবেশ )

ল। তুলি, তুলি, ও তুলি, কোথায় গেলি হতচ্ছাড়ি···

তু। ( নেপথ্যে ) এই আসছি দাদা!

ল। আর তুই এসেছিস: যতো সব···

( মায়ের প্রবেশ )

মা। হ্যাঁ রে, কি হলো রে লক্ষ্মণ? এতো হৈ-চৈ কিসের? ঘেমে যে একেবারে নেয়ে গেছিস!

ল। জমিদারবাবুকে এদিকে আসতে দেখে, সোজা মাঠ থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি। [ হাত দিয়ে ঘাম মুছে ] বাবা, ঘামবো আবার না!

( তুলির প্রবেশ )

ল। এই, এই শোন্, ঘর-দোর গোছগাছ করেছিস তো? দেখিস, স্বয়ং জমিদারবাবু আমাদের বাড়ী আসছেন, বুঝলি?

মা। বলিস কি? জমিদারবাবু আমাদের বাড়ী আসতে যাবেন কেন?

ল। কেন-ফেন বুঝি না। এই তো সেদিন তুলিকে রাস্তায় ডেকে আলাপ করেছেন। বলে দিয়েছেন, ও-রাস্তায় গেলে তোমাদের বাড়ী যাবো। কি রে, বলেনি জমিদারবাবু?

[ তুলি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকলো ]

ল। কি রে, চুপ করে রইলি যে! যা, উনি এদিকেই আসছেন। ঘর-দোর গোছগাছ কর। যা আমাদের ঘরের ছিরি! আর মা দেখ, তুমি তার কাছে আমার কথাটা একটু তুলো।

তু। তোমার কথা তুললে কি হয়, তোমার কিছু হবে না। রোজ রোজ প্যাগার খেটে মরলেও যার কিছু হয় না, তার কিছুতেই কিছু হবে না।

ল। হবে না! কে বললো তোকে, হবে না? আচ্ছা মা, তুমিই বলো দেখি, বুদ্ধি-শুদ্ধি, শক্তি-সামর্থে কোন্ দিকে আমি কম? সন্দীপপুর ইউনিয়নের চৌকিদার হবার যোগ্যতা কি আমার নেই? যতো সব···

মা। না না, ও চৌকিদার হওয়ার তোমার দরকার নেই বাবা! চোর-গুণ্ডা নিয়ে কারবার। রাত্তির বিত্তিরে পথে-বে-পথে ঘুরতে হয়। এই তো শুনলাম রজনী চৌকিদার নাকি ভূতের ভয় পেয়ে ভুগতে ভুগতে মারা গেছে।

ল। ও সব তুমি বাদ দাও।

মা। না। ঐ সাড়ে আট টাকার জন্যে তোমার ওর মধ্যে যাবার দরকার নেই। যা হোক করে আমাদের কষ্টের দিন এক রকম কেটে যাবেই। তোমার ঐ সাড়ে আট টাকার চৌকিদারী করতে হবে না।

তু। তুমি বুঝছো না মা! দাদা আমায় রোজ চৌকিদারের গল্প শোনায়। আসলে ঐ টাকা-কড়ি নয়, ঐ বেগুনি রংয়ের চৌকিদারী পোষাক আর সবসময় লাঠিখানা ঐগুলোই দাদার লক্ষ্য।

ল। [ রেগে ] হাঁ, হাঁ, তা ঠিকই বলেছ তুমি। মা যে বুঝছে না, ঐ আটটা টাকা দিয়ে আর কি হবে। আসলে ভেবে দেখো তো ইউনিয়ান বোর্ডের চৌকিদার, এ কতো বড় একটা সম্মান। [ নেপথ্যে—"লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ বাড়ী আছো?" ]

তু। [ উঁকি মেরে ] এই যে জমিদারবাবু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

ল। যা না হতচ্ছাড়ি। এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে এগিয়ে যেয়ে নিয়ে এসো না। [ তুলির প্রস্থান।

[ লক্ষ্মণ মার কাছে এগিয়ে চুপি চুপি ] মা, দোহাই তোমার, জমিদারবাবুকে আমার চৌকিদারীটা সম্বন্ধে একটু বোলো। উনিই ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। ওনার হাতেই সব। তুমি একটু বোলো। আমি যাই চট্ করে জামা-কাপড়ে সেজে আসিগে। [ প্রস্থান।

[ তুলির সাথে কথা বলতে বলতে জমিদারের প্রবেশ। মা অপরাধের মতো এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলো। ]

জ। তা বেশ, তুলির তাহলে লক্ষ্মণের চৌকিদারীর জন্যে ওকালতী করছো? তা তোমার মা কি বলেন?

তু। মা, এই যে জমিদারবাবু এসেছেন।

[ মা দূর থেকে মাটিতে প্রণাম করে কাছে এসে পায়ের ধুলো নিলো ]

মা। আমার সাত পুরুষের পুণ্যি, গরীবদের বাড়ী আপনার পায়ের ধুলো পড়লো।

জ। না না না, তাতে কি আছে। এই পথে নদীর ধারে বেড়াতে যাচ্ছিলাম তাই—[ বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তুলির দিকে তাকালো। তুলি ভয়ে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে সরে দাঁড়ালো। ]

মা। কোথায় বা বসতে দি। এই উঠোন…

জ। থাক্ থাক্ সেজন্য ব্যস্ত হতে হবে না। তা লক্ষ্মণ কোথায়, তাকে তো দেখছি না?

দু। দাদা ঘরে। যাই আমি তাকে ডেকে আনিগে। [ যেতে উদ্যত ]

মা। থাক্ থাক্ মা, তুমি একটু ওর সংগে কথা কও, আমি বরং লক্ষ্মণকে ডেকে আনছি। [ প্রস্থান।

জ। তারপর…[ দুলির দিকে এগিয়ে ] কথা কইছো না যে! [ চকিতে পিছনে সরে গায়ে ভালো করে কাপড় জড়িয়ে নিলো দুলি ] হাঃ হাঃ হাঃ, ভয় করছে বুঝি? উঠোনের নির্জন কোণে একটু আলাপ পরিচয় ছাড়া তো আর কিছুই নয়। [ লক্ষ্মণ ও মাকে আসতে দেখে প্রসংগ পাল্টে ] এই যে লক্ষ্মণ, তোমার বোনটিকেও তো বেশ সাগরেদ করে তুলেছ। তা পারবে তো তুমি এই কাজ?

মা। হাঁ, সেখন আমি বলছিলুম কি, ওর পক্ষে ঐ কাজ কি ঠিক হবে? আমি মুখ্যু-সুখ্যু মেয়েমানুষ। কি দিতে কি করবো বুঝতে পারি না। ও তো, সেই বুড়ো রজনী মরার পর থেকেই নাচছে। আপনি আমাদের মনিব। দেবতার মতো। পাগলা ছেলেটাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেবেন। আপনারা গরীবের মা-বাপ।

জ। না মা সে তো ঠিকই, সে তো ঠিকই। তা ছাড়া লক্ষ্মণ খুব বাধ্য ছেলে। ও বাইরে থেকে একটা বিরাট ষোমড়া-চোমড়া পুরুষ মনে হলেও আসলে সে ও ছেলেমানুষই রয়ে গেছে, একথা তো আর মিথ্যে নয়।

মা। আর সেই জন্যেই তো আরো ভয়।

জ। তা নয় যে একটু না আছে তা নয়। তবে রজনী তো ওর চেয়ে কম বয়েসে কাজ আরম্ভ করেছিলো! তা ছাড়া আমি তো রয়েছি।

[ নেপথ্যে লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণের প্রস্থান।

জ। আর তাছাড়া আজ-কাল আর দেশে আগের মতো চুরি ডাকাতিই বা কোথায়।

( লক্ষ্মণের প্রবেশ )

ল। কাচারী-বাড়ী থেকে লোক এসেছে। সেখানে থানার থেকে দারোগা সাহেবরা একটা জরুরী কাজে আপনার সংগে দেখা করতে এসেছে!

জ। ওঃ, তাহলে তো আমাকে এখুনি যেতে হয়! হ্যাঁ, লক্ষ্মণ তুমি তোমার গাছ থেকে ভাল দেখে এক কাঁদি ডাব পেড়ে কাচারী-ঘরে নিয়ে যাও তো। ঘাবড়াও মাৎ। চৌকিদার তুমি হবে। [ দুলির দিকে ] আর তুমি? তোমার কি চাই? তুমি বরং এক সময় আমার সংগে দেখা কোরো। [ মার দিকে ফিরে ] আচ্ছা তাহলে চলি।

[ জমিদারের প্রস্থান। পেছন পেছন কিছুটা গিয়ে লক্ষ্মণ ফিরে এলো ]

ল। দেখলে মা, জমিদারবাবু কতো ভালো লোক। সে তুমি যা-ই বলো দেখবে কাজটা আমার খুব মজার। তুমি বুঝতেই পারবে না যে এতে কতো সম্মান। কি রে দুলি, কথা কইছিস না যে?

দু। কি আবার কইবো। যাও তুমি এখন ডাব পেড়ে কাচারী-বাড়ী নিয়ে যাও। ভূতের ব্যাগার দাওগে।

ল। হেঁ হেঁ ব্যাগার দিতে হয় রে ব্যাগার দিতে হয়। আর নয়তো আজকালকার দিনে এই রকম একটা কাজ যার তার ভাগ্যে জোটে। বুঝিস না সুঝিস না। যা তুই, ঘর থেকে দা দড়ি নিয়ে আয়তো!

দু। তোমার জন্যে খেটে খেটে আমি অস্থির। [ প্রস্থান।

ল। এ্যাঃ কি খাটাই খাটো!

মা। দেখ বাবা, শুনেছি চৌকিদারদের নাকি সময় বিশেষে মানুষজন খুন জখম করতে হয়। তুই কিন্তু ওসব করিসনি। সব সময় ধর্মপথে থাকিস।

ল। দুত্তোরি, মা তোমার মাথা খারাপ নাকি। আমি করবো মানুষ খুন! তুমিও যেমন।

[ লক্ষ্মণ জামা খুলে দাওয়ার ওপর রাখলো। দুলির প্রবেশ। হাত থেকে দা দড়ি নিয়ে লক্ষ্মণের প্রস্থান। মা কপালে হাত ঠেকিয়ে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়। ]

মা। কে ডাকছে রে, মণ্ডলদের মোড়লের মেয়ে সোহাগী না!

দু। হাঁ। [ প্রস্থান।

( সোহাগীর হাত ধরে প্রবেশ। )

তারপর, এতো দিন বাদে আমাদের কথা মনে পড়লো! আমি ভাবলাম তুই বুঝি ভুলেই গেছিস।

[ ধীরে ধীরে মার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রস্থান।

সো। তাই উচিত ছিলো। ভুলতে পারি না তাই যে মুস্কিল। তুইও তো একবার খোঁজ খবর নিতে পারিস।

দু। আমি আজ-কাল একদম সময় পাইনা।

সো। হাঁ সময় পাও না তা ঠিক। কিন্তু জমিদারবাবুর সংগে পথে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা কওয়ার সময় তো খুব পাও।

দু। ও তুই সেদিনকার কথা বলছিস। সেকথা আর বলিস না ভাই! লোকটা যেন কি। কথার পর কথা বলে এমন দেরী করিয়ে দিতে লাগলো যে সে আর বলার নয়। এমনি শুনি জমিদারের কতো দাপট। আজ এঁকে ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে, কাল ওকে জমি থেকে উচ্ছেদ করছে কিন্তু ব্যাটা মেয়েছেলে দেখলে যেন একেবারে পালটে যায়।

সো। তাতে যদি আবার তোর মতো সুন্দরী হয়।

দু। ওর গায়ে-পড়া ভাব দেখলে গা জ্বলে যায়। নেহাৎ দাদার কাজটা হতে পারে তাই।

সো। তোর দাদা বুঝি জমিদারবাড়ীর পেয়াদা হবে?

দু। না, রে না। দাদা নন্দীপুর ইউনিয়ান বোর্ডের চৌকিদার হবে।

সো। তাই বুঝি?

[ কাঁধে এক কাঁদি ডাব নিয়ে লক্ষ্মণের প্রবেশ। কোনদিকে লক্ষ্য না করে বলতে বলতে ]

ল। দুলি দুলি, দা দড়ি রেখে দে গে যা। [ হঠাৎ সোহাগীকে দেখে দা দড়ি রেখে দাওয়া থেকে জামাটা তুলে নিয়ে হুম হুম করে প্রস্থান। ]

সো। চৌকিদার হবে কিনা তাই বুঝি তোর দাদার এতো দেমাক। এদিকে একবার ফিরেও তাকালো না।

তু। কেনই বা তাকাবে বল। কুলমর্য্যাদায় আমরা ছোট বলে সে পথ তো তোর বাবা মা অনেক দিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছে।

সো। তাই বলে কি আর আমার 'পর বিরূপ ব্যবহার করা উচিত? আমি তো আর তাকে কিছু বলিনি, বরং···

তু। যাকগে ভাই ওসব পুরানো কথা। তোর বাবা মা ভালো আছেন তো?

সো। হ্যাঁ। ভালো আছেন। তোর কথা প্রায়ই বলেন, যাস না একদিন। আমাদের ওখানে কেমন জমিদারবাবুর মাষ্টার ইস্কুল খুলেছেন।

তু। তোদের ওখানে ইস্কুল খুলেছেন? সে কি, তাকে তো শুনি জমিদারবাবু নিজের ইস্কুলের জন্তে কোলকাতা থেকে এনেছেন।

সো। সে কথা ঠিক, তিনি জমিদারবাবুর ইস্কুলের মাষ্টার হলেও এ গ্রামের সকলেরই মাষ্টার মশাই। আমাদের আটচালা ঘরে উনি বিনে মাইনের এক রাত্তিরের স্কুল খুলেছেন। রোজ সন্ধ্যের পর কতো লোকের ভীড় হয়, বুড়ো গুড়ো কত ছাত্র···

তু। ও তাই বুঝি! আমি তাঁর কথা শুনেছি। তিনি নাকি খুব ভালো লোক।

সো। তুই যাস না একদিন আমাদের বাড়ী। উনি প্রায়ই আমাদের ওখানে যান। বাবার সাথে তার খুব আলাপ। তিনি রোজ বাবাকে কতো কি বোঝান। এই মানুষের দুঃখু কষ্ট, অভাব অভিযোগ, কতো সব বড় বড় ভালো ভালো কথা। আমি সমস্ত বুঝতেও পারি না। শুনতে কিন্তু বেশ লাগে। তবে সবাই তাঁকে খু-উ-ব ভালোবাসে। যাক, কথায় কথায় অনেক বেলা হয়ে গেল। কই মাসীমার সংগে তো দেখা হলো না?

তু। মা বোধ হয় ঘাটে গেছে। বস না, দেখা করে যাবি।

সো। না ভাই, আমার অনেক বেলা হয়ে গেল। আবার আরেক দিন আসবো। তুই কিন্তু যাস একদিন, বুঝলি? তুই না গেলে আমি কিন্তু আর আসবো না বলে দিলাম।

[ প্রস্থান।

( মার প্রবেশ )

মা। তুলি!

তু। কি মা?

মা। হৃদে মোড়লের মেয়ের এই রকম যাওয়া-আসা আমি ভালো দেখি না।

তু। কি যে বলো মা!

মা। হ্যাঁ ঠিকই বলি। লক্ষ্মণের সংগে ওর বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার পরেও ওর এ বাড়ী এই রকম যাতায়াত ঠিক নয়। আর তাছাড়া লোকেই বা কি বলবে।

( লক্ষ্মণের প্রবেশ )

ল। তুলি, তুলি—এই যে মা-ও আছো, বুঝলে মা, ওদিককার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে গেল।

তু। কি ঠিক হয়ে গেল?

ল। ঠিক হয়ে গেল মানে চৌকিদারীটা ঠিক হয়ে গেল। এখন রজনীর বাড়ী থেকে পোষাকগুলো নিয়ে এলেই হয়। তারপর মাথায় পাগড়ী বেঁধে লাঠি হাতে বেরুলেই, আচ্ছা মা, ঐ বেগুনি পোষাকে আমাকে কেমন লাগবে বলতো? ( মাকে নিরুত্তর দেখে ) তা বেশ ভালই মানাবে কি বল, এ্যাঃ!

মা। মানাবে হয়তো ভালই। কিন্তু—

ল। কিন্তু কিন্তুর আবার কি আছে? তুমি প্রাণ ভরে একটু ভালোও বলতে পারো না? ( মার চোখে জল ) এই দেখ ভারী মুস্কিল তো। এতে আবার কান্নার কি? যাও তুমি ভাত চাপিয়ে দাও তো। আমাকে আবার সকাল সকাল বেরুতে হবে। এখন মাথার ওপর কতো বড় দায়িত্ব।

[ মার প্রস্থান। ]

( তুলি মুখ টিপে টিপে হাসছিলো ) কি হাসছিস যে। জানিস যখন ডাবের কাঁদি নিয়ে কাচারী-বাড়ি গেলাম, তখন জমিদারবাবু, আমাকে দেখিয়ে, দারোগা বাবুকে কি যেন ইঞ্জিরিতে বললেন। দারোগা বাবু হেসে আমায় কি বললে জানিস?

তু। কি?

ল। বললেন থানার দারোগা পুলিশের পরেই তো তুমি। পারবে তো? আমি বুক ফুলিয়ে বললুম নিশ্চয়ই। দারোগা বাবু আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ইঞ্জিরিতে কি সব যেন বললেন। বুঝলি?

তু। ও বুঝলুম!

ল। আচ্ছা এখন যা দেখি ঘর থেকে আমার সেই লাঠিখানা আর একটু তেল নিয়ে আয় তো!

[ তুলির প্রস্থান।

( লক্ষ্মণ জামা খুলতে লাগলো। লাঠি ও তেল নিয়ে তুলির পুনঃপ্রবেশ। )

তু। জানলে দাদা, আজ সোহাগী এসেছিলো।

ল। ( কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করে ) লাঠি আর তেল মাটিতে রেখে দে।

তু। সোহাগী বললো কি···

ল। খবরদার, তুই ওর নাম আমার সামনে উচ্চারণ করবি না। [ লাঠিখানা তুলে নিয়ে তাতে তেল মাখাতে মাখাতে ] শুনলাম তো আজকাল মাষ্টারের সংগে খুব ঢলানি-পলানি হচ্ছে। ওকে এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোতে বারণ করে দিবি। ফের যদি ও এ-মুখো হয়, ঠেঙিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো। [ লাঠিতে ঘন ঘন তেল মাখাতে লাগলো। তুলি অপ্রস্তুতের মতো ক্রমান্বয়ে কাপড়ের আঁচল পাকাতে লাগলো। ]

ল। [ অনেকক্ষণ বাদে ] এই [ আত্মগর্বভরে ] আমি যে চৌকিদার হয়েছি, তা সে জানে?

তু। হ্যাঁ, বলেছি।

ল। কি বললে?

তু। বললে, চৌকিদার হবে কি না, তাই বুঝি তোর দাদার এতো দেমাক্।

ল। দেমাক্! দেমাক্ হবে না আমার তো হবে কার?··· যতো বড় মুখ নয় তার ততো বড় কথা! খবরদার, হৃদে মোড়লের মেয়ে যেন এ বাড়ী আর না ঢোকে। মাষ্টার-কাষ্টারের সংগে যতো

খুশী ফষ্টামি-নষ্টামি করতে পারে। এ-মুখো তাকে যেন আর না আসতে দেখি। এই আমি বলে দিলাম।

ভৃ। আসবে। বেশ করবে। আমার বন্ধু আমার বাড়ীতে আসবে, তাতে তোমার কি ?

ল। আমার কি ? বটে ? আসুক না। ফের কোন দিন দেখলে হয়, ঠেঙিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো না ?

[ উত্তেজিত ভাবে লাঠিতে তেল মাখাতে মাখাতে প্রস্থান।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

[ জমিদারবাড়ীর কক্ষ। চিন্তিত মুখে মাষ্টারের প্রবেশ। কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে উঠে ]।

মাষ্টার। কবিতা ? কবিতা ?

[ কবিতার প্রবেশ ]

ক। মাষ্টার মশাই এসে গেছেন ?

মাষ্টার। হ্যাঁ, কই তোমার বই পত্তর নিয়ে এসো।

ক। ন মাষ্টার মশাই, আজকে আমি পড়বো না। আজকে যে আমাদের বাড়ী টি-পার্টি হবে। বাবার বন্ধু-বান্ধবরা আসবেন। আমাকে সেখনে গাইতে হবে, নাচতে হবে। আজ আমার অনেক কাজ। দোহাই, আজ আমায় একটু ছুটি করে দিন মাষ্টার মশাই ! কাল আমি অনেকক্ষণ পড়বো।

মাষ্টার। তা বেশ, তুমি আমায় এক কাপ চা দিয়ে যেতে বলতো ? অমি তা হলে এখন একটু বেরুবো।

ক। ঠিক আছে, আমি চা এনে দিচ্ছি। [ প্রস্থান।

মাষ্টার। পারিবারিক মাষ্টার হবার দেখছি এই জ্বালা। মাষ্টারের গুরুত্ব একদম থকে না। যা হোক, [ সিগারেট ধরায়। কবিতার প্রবেশ। চা এনে টেবিলের ওপর রাখলো ]।

মাষ্টার। মানুষ কি করে বড় হলো বইখানা পড়া হয়েছে ?

ক। হ্যাঁ। পড়েছি। তবে আমি যে ঠাকুরমার কাছে শুনেছি যে ভগবান মানুষ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ?

মাষ্টার। মানুষ ও পৃথিবীর জন্ম সম্বন্ধে ওটা একটা কাল্পনিক ব্যাখ্যা। আ ঐ বইটাতে আছে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

ক। ওতাই বুঝি !

মাষ্টার। হ্যাঁ তাই। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। যাক, এখন তোমাকে যে জন্য ছুটি দেওয়া হলো তার কি করবে ?

ক। বিশ্রার করবো। ভাল করে একটা গান গেয়ে দেখবেন, সবাইকে চমক লাগিয়ে দেবো।

মাষ্টার। কি গান গাইবে ?

ক। অমি ঠিক করছি আপনার লেখা সেই গানটা গাইবো। গানটা আমার খু-উ-ব ভাল লাগে। একটু দাঁড়ান না, আপনাকে আরেক বার শুনিয়ে নিই। গানটা এখন খুব ভাল তুলেছি। লক্ষ্মণদা'কে বলছি নয়ত হারমোনিয়ামটা দিয়ে যাক।

[ কবিতা লক্ষ্মণকে ডাকতে ডাকতে ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ বাদে হাতে হারমোনিয়াম নিয়ে লক্ষ্মণের প্রবেশ। কবিতাও ঢুকলো। লক্ষ্মণ মাষ্টারের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রস্থান করলো। কবিতা হারমোনিয়াম নিয়ে গান ধরলো। ]

সইয়ের ব্যথা

গান

উড়কি ধানের মুড়কি আর বিন্নি ধানের খই
বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ নেই কোনো আর সই।
পিঠে পায়েস কোথায় গেল গোলায় ভরা ধান
উজান গাঙে উদাস করা ভাটিয়ালির গান।
জল ফেলে জল আনতে তো আর মন কাঁদে না সই !

পোড়ো ভিটেয় চরছে ঘুঘু কাঁদছে বাঁশের ঝাড়
বানের জলে ডুবলো খামার ভাঙলো নদীর পাড়।
শ্মশানচাঁপা কান্না ছড়ায় আকাল বাড়ায় হাত
ব্যথায় কাঁদে যমুনাবতির ফুলশয্যার রাত।
ঝড় বাদলে কাটাচ্ছি রাত বারুদ বুকে সই।

কোথায় গেল পলাশডাঙা ময়নামতি মাঠ
বকুল পারুল শাল পিয়ালের ছায়ায় ঘেরা ঘাট।
হাত ঝুম ঝুম পা ঝুম ঝুম সীতারামের খেলা
এ কি ভীষণ জীবন সই এ কি ভীষণ জ্বালা।
তবুও বাঁচি স্বপ্ন চোখে বাঁচতে চাই সই।

( জমিদারের প্রবেশ )

জ। তা আজ-কাল বুঝি পড়া ছেড়ে গান শেখান হচ্ছে ?

ক। না, তোমার মানে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে যে গানটা গাইবো সে গানটা একটু মাষ্টার মশাইকে শোনাচ্ছিলাম।

জ। ওঃ !

ক। জানো বাবা, মাষ্টার মশাই না নিজে গান লিখতে পারেন।

জ। যাও। তুমি এখন ভেতরে যাও কবিতা !

[ কবিতার প্রস্থান।

[ মাষ্টার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে একখানা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলো। জমিদার একটা চুরুট ধরালেন। চেয়ারের ওপর একখানা পা রেখে ] শোন মাষ্টার !

মাষ্টার। বলুন।

জ। তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আমার কাছে এসেছে।

মাষ্টার। অভিযোগ ! কিসের ? আমি তো কিছু করেছি বলে মনে হয় না ?

জ। মনে হয় না—না। হাঃ হাঃ হাঃ, দেখো ভালো করে ভেবে দেখো—কিছু মনে পড়ে কি না।

মাষ্টার। কি আবার মনে পড়বে। করিই নি কিছু।

জ। শোন মাষ্টার ! তুমি কি করো না করো, আর সবার চোখ এড়ালেও জমিদার সত্যনারায়ণ চৌধুরীর চোখ তা এড়ায় না।

মাষ্টার। কি বলতে চাইছেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না !

জ। বুঝতে যে এখন পারবে না, তা আমি জানি। তোমাকে নেহাৎ ভালো মানুষ মনে করেই এখানে ঠাই দিয়েছিলাম ! এখন দেখছি যে আমি নেহাৎ ভুল করেছি।

মাষ্টার। আপনি এ সব কি বলছেন?

জ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলছি। তুমি রাত্তিরে চাষীদের পাড়ায় নাইট স্কুল খোলনি? তুমি আমার এ্যাপয়েন্টেড মাষ্টার। তুমি আমারই অজ্ঞাতে চাষাভূষোদের জন্তে বিনে পয়সার স্কুল খুলেছ। তুমি আমার মতটা নেওয়ার একবার প্রয়োজন বোধ করলে না!

মাষ্টার। সে তো একটা ভাল কাজ। এতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে?

জ। আপত্তি নয়? তুমি আমার বেতনভুক মাষ্টার হয়ে আমার বাড়ীতে বসে আমার বিরুদ্ধে আমারই প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলবে, সে আমি সহ্য করবো ভেবেছো?

মাষ্টার। আপনি কি বলছেন?

জ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলছি। তুমি আগামী ইউনিয়ান বোর্ডের নির্বাচনে হৃদয় মণ্ডলকে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাচ্ছো না? কি চুপ করে রইলে যে! একটা এম, এ পাশ ছেলে তার যদি একটা সাধারণ ভব্যতা বোধ থাকতো। নেমক-হারাম। স্কাউণ্ড্রেল।

মাষ্টার। আপনি জমিদার হতে পারেন কিন্তু আপনার সংযত হয়ে কথাবার্তা বলা উচিত।

জ। আমার কি উচিত না উচিত তা তোমায় দেখতে হবে না মাষ্টার! তুমি মাষ্টার, মাষ্টারের মতো থাকবে; তুমি ভুলে যেও না এর বেশী ওটা তোমার সাজে না।

মাষ্টার। ও তাই নাকি!

জ। হ্যাঁ তাই। আর তা যদি না মেনে চলতে পারো...

মাষ্টার। তবে?

জ। তবে মনে রেখো এইখানে তোমার স্থান নেই।

মাষ্টার। আর আপনি একটা কথা মনে রাখবেন যে, আমি আপনার করুণার উপর নির্ভর করে এখানে আসিনি। আমি আমার নিজের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করেই এখানে এসেছি।

জ। যোগ্যতা! হাঃ—হাঃ—হাঃ এই দুনিয়ায় টাকায় তোমার মতো অনেক যোগ্যতাই ক্রয় করা যায় মাষ্টার!

মাষ্টার। কিন্তু মনুষ্যত্বকে ক্রয় করা যায় না। আপনারা...

জ। থামো থামো মাষ্টার! ও সব 'বক্তিমে' মাঠে ঘাটে দিও। মুখ্যু মানুষেরা খু-উব উত্তেজিত হবে আর বাহবাও দেবে। মনে রেখো এটা আমার ড্রইং-রুম। হৃদয় মোড়লের আটচালা নয়।

( লক্ষ্মণের প্রবেশ। )

ল। বাইরের ঘরে অনেক লোক এসেছেন।

জ। যাও। হ্যাঁ হারমোনিয়ামটা নিয়ে যাও। আর কবিতাকেও তৈরী হতে বল। [ মাষ্টারের দিকে কটমট করে তাকিয়ে লক্ষ্মণের হারমোনিয়াম নিয়ে প্রস্থান। কয়েকটা নিস্তব্ধ মুহূর্ত। জমিদার ধীরে ধীরে মাষ্টারের কাছে এগিয়ে এলেন। আপ্যায়নের ভংগীতে ] কথায় কথায় উত্তেজিত হয়ে তোমাকে অনেক কড়া কথা বলেছি। নেভার মাইণ্ড ব্রাদার! অনেক দিন এখানে আছো। তাই তোমার পর একটা মানে অধিকার জন্মে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না, কি বলো? কি ব্যাপার, কথা কইছো না যে!

মাষ্টার। আপনার সংগে কথা বলতে আমার...

জ। ঘৃণা হচ্ছে। তাই না? তা তুমি এতো চটছো কেন? ভেবে দেখতো, আমি আমার মায়ের নামে ইস্কুল করে কোলকাতা থেকে তোমাকে নিয়ে এসেছি। সে কি তোমার সাথে শুধু গোলমাল করার জন্তে? আমার গ্রামের মংগলের পক্ষে তোমার মতো আদর্শবানই যে উপযুক্ত ব্যক্তি, সে কি আমি বুঝি না? তুমি থাকো এইটাই তো আমি চাই। আর তাছাড়া তোমারও তো ঘরে মা বোন ভাই আছে। তাদের প্রতিও তো তোমার একটা কর্ত্তব্য আছে? দেখো তুমি এক কাজ করো। হৃদয় মোড়ল ফোড়ল চাষাভূষোদের দাঁড় না করিয়ে তুমি নিজেই দাঁড়াও না। তুমি দাঁড়াবে বললে আমি আর দাঁড়াতে যাবো কেন বলো?

মাষ্টার। দেখুন, ঐ পদের লোভ বা ক্ষমতার মোহ আমার নেই।

জ। তা বেশ, তাহলে তুমি বরং আরেক কাজ করো। ঐ চাষাটার নাম উইথড্র করিয়ে দাও।

মাষ্টার। ওদের নাম তোলা না তোলার আমি কি জানি?

জ। তুমি না জানলেও আমরা তো জানি। তুমি বললেই ও নাম তুলে দেবে। কি বলো, এতে আর আপত্তির কি আছে?

মাষ্টার। মাফ করবেন। আমি তা পারবো না।

জ। খুব উত্তেজিত হয়ে গেছ, না? দেখ একটু ভেবে চিন্তে বলো। ঝোঁকের মাথায় কাজ কোরো না! আরে, বয়সের সময় ঐ রকম অনেক আদর্শই মনকে উত্তেজিত করে। আমরাই কি স্বদেশী যুগে দেশের জন্তে কম করেছি! বিয়ে-থা করো। ভালো করে সংসার ঘাড়ে পড়ুক। তখন বুঝতে পারবে কতো ধানে কতো চাল।

মাষ্টার। ওসব টানা-পোড়েনে হিসেব কষা আপনাদের ভালো পোষায়। আমি আপনার কথা রাখতে পারবো না এই ব্যস।

জ। [ রাগত মুখে ] বটে! আমার কথা মতো কাজ না করার পরিণাম তুমি জান?

মাষ্টার। হ্যাঁ জানি। বরখাস্ত করবেন। এই তো?

জ। যদি বলি তাই-ই।

মাষ্টার। আপনার বরখাস্ত বা চোখরাঙানির ভয় আর কে করলেও আমি করি না।

জ। তোমার ঔদ্ধত্যের সীমা দেখছি দিন দিন বেড়েই চলেছে তুমি কার সংগে কখন কি বলো—তা তোমার খেয়াল থাকা উচিত

মাষ্টার। মাপ করবেন, আমি আর কথা বাড়াতে চাই না।

জ। হ্যাঁ, তোমার মতো একটা স্কাউণ্ড্রেলকে আর প্রশ্রয় আশ্রয় দেওয়া কোনমতেই ঠিক হবে না।

মাষ্টার। আপনার শুভবুদ্ধিকে ধন্যবাদ!

জ। সাট আপ। ইউ জাষ্ট গেট আউট অফ মাই হাউ [ একটা কাগজে খস খস করে কি লিখে কাগজখানা ছুঁড়ে ফে এই কাগজটা সরকারমশাইকে দেখিয়ে তোমার পাওনা মিটিয়ে এ এখান থেকে চলে যাও। আর কালকেই কাষ্ট লোকালে সন্দীপপুর সীমা ছেড়ে চলে যাবে।

মাষ্টার। [ কাগজ তুলে ] ধন্যবাদ! জমিদারবাড়ী এ মু ত্যাগ করলেও সন্দীপপুরের সীমা ছাড়বো কি না সেম্বন্ধে আপন ঠিক বলতে পারছি না।

জ। অর্থাৎ?

মাষ্টার। অর্থাৎ এই গ্রামে আরো কিছুদিন থেকে যাবার

আছে। [লক্ষ্মণের প্রবেশ] যাই, আপনারা কাজের লোক, বাজে সময় নষ্ট করবো না। আবার বই পত্তর গুছিয়ে নিতে হবে তো? আচ্ছা চলি। [প্রস্থান।

জ। [লক্ষ্মণের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে] এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? ইউ ডিসটার্বিং এলিমেণ্ট! [লক্ষ্মণের দ্রুত প্রস্থান।

জ। বড় কঠিন সমস্যায় পড়া গেছে। মাষ্টারকে তো অনুরোধ উপরোধ করে, ভয় দেখিয়ে, কিছুতেই কিছু করা গেল না। দেন হোয়াট ইজ টু বি ডান। লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! [লক্ষ্মণের প্রবেশ] বাবুরা সব কি করছেন?

ল। আজ্ঞে গল্প করছেন।

জ। চা-টা সব দেওয়া হয়েছে?

ল। আজ্ঞে।

জ। তুই এই ঘরটা একটু গোছগাছ কর, আমি আসছি। [জমিদারের প্রস্থান। লক্ষ্মণ ঘর-দোর গোছাতে লাগলো]

ল। উঃ, কি ঝকমারীই করেছি। শালা সন্দীপপুর ইউনিয়ানের চৌকিদার তো নয় যেন জমিদার সত্যনারায়ণের চাকর। চাকর গোবিন্দ আর লক্ষ্মণের মধ্যে কোন তফাৎই নেই। এ জানলে কোন শালা এখানে আসতো। শালা কি ঝকমারীই না করেছি।

[কবিতার প্রবেশ। লক্ষ্মণ ভাব গোপন করে পোষাক ঠিক করে এ্যাটেনশান পজিশানে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো]

ক। হ্যাঁ লক্ষ্মণদা' মাষ্টারমশাই নাকি চলে গেলেন?

ল। যাকগে মরুকগে তাতে আমার কি?

ক। তুমি যেন কেমন? সব সময়েই রেগে আছ।

ল। রাগবো না? ওসব মাষ্টার-ফাষ্টারের কথায় আমি নেই।

ক। কেন তোমার আবার কি হলো?

ল। সে সব তুমি বুঝবে না। সে সব অনেক কথা। তুমি, এখনও ছেলেমানুষ আছ। [প্রস্থান।

ক। কি মুস্কিল! [হঠাৎ চঞ্চল হয়ে] ওই রে, বাবা এদিকেই আসছেন। পালাই। [দ্রুত প্রস্থান।

(জমিদার ও অন্যান্যের প্রবেশ)

রাজ্যেশ্বর। একটা টি-পার্টির নামে যে খাওয়ানটাই খাওয়ালেন। এ রীতিমত একটা ভোজ।

মুন্সি। সত্যি, মরে গেলেও আপনার আন্তরিকতা ভুলবার নয়।

রা। আর তা ছাড়া মনে করুন আপনার মেয়ের গান, সত্যই অপূর্ব!

জ। না, না, ও কেবল শিখছে।

মু। শত হলেও ছেলেমানুষ তো।

রা। না, না, ছেলেমানুষ হলে কি হয়। এরই মধ্যে বেশ শিখেছে। তালমান বোধও বেশ হয়েছে।

জ। আচ্ছা এখন কাজের কথায় আসা যাক্। আপনাদের সংগে একটা গুরুতর পরামর্শ আছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই কি বলছিলাম এবারের ভোটের কথা, আপনারা তো বোধ হয় সবই শুনেছেন যে আমাদের স্কুলের মাষ্টারটা গ্রামের সব হিন্দু-মুসলমান চাষীদের ডেকে মিটিং করে হৃদয় মোড়লকে দাঁড় করাবে ঠিক করেছে।

মু। হ্যাঁ, কানা-ঘুষো শুনছি বটে।

রা। আজকাল দিনে দিনে হলো কি!

মু। এই তো গণ্ডকে আমার শ্বশুরবাড়ী, সেখানেও শুনছি চাষীরা দল বেঁধেছে। আজকাল সব জায়গায়ই ঐ এক দল বাঁধার হিড়িক পড়েছে।

রা। অন্য জায়গায় হলেও আমাদের দেশে এসব ঝামেলা পূর্বে ছিলো না। কি বলেন মুন্সি সাহেব!

মু। হ্যাঁ সে কথা ঠিক। মানে ঐ জমিদারবাবুই তো ইস্কুল করে যত ঝামেলা বাধিয়েছেন, মানে ঐ মাষ্টার.....

জ। ঠিকই বলছেন। এতদিন বুঝতে পারিনি যে দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি।

রা। ঐ মাষ্টারই হচ্ছে যতো নষ্টের গোড়া, হৃদয় মোড়ল তো ওর কথায় ওঠে বসে। ওই তো ওখানকার একচ্ছত্র দেবতা হয়ে বসেছে।

মু। তা ওটাকে দিন না বাড়ী থেকে তাড়িয়ে।

জ। সে কি আর বাকী আছে? বাড়ী থেকে তো তাড়ালাম। কিন্তু বেটা যাবার সময় কি বলে গেল জানেন? [উভয়ে] কি? বলে গেল আপনার বাড়ী না হলেও সন্দীপপুরে আমার থাকার ভাবনা হবে না।

রা। এ্যাঁ, অবাক করলে দেখি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আপনার মুখের ওপর কথা। ঐ ব্যাটাই সমস্ত কিছুর কলকাঠি নাড়ছে। ওটাকে, তাহলে ভয়টয় দেখিয়ে গ্রামছাড়া করার...

জ। ও এমনিতে ভয় পাবার ছেলে নয় রাজ্যেশ্বর বাবু! আমি অনেক লোক ঘেঁটেছি। কিন্তু ওর মতো একটিও দেখিনি। ও বড় কড়া ছেলে। হি ইজ এ গ্রেট প্রবলেম টু অাস।

রা। তাই তো, তাহলে কি করা?

জ। হ্যাঁ সমস্যা বটে। দেখুন মাষ্টারটাকে নিয়ে আপাতত বিশেষ কিছু করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আর তাছাড়া আজকে মাষ্টারকে বাড়ি থেকে তাড়ালাম। কিছুর মধ্যে কিছু নেই, এরপরেই যদি মাষ্টারের উপর একটা হামলা হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই লোকেরা আসল ঘটনা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠবে। আর ভোটের ব্যাপারেও তার ফলটা বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। আপনারা কি বলেন?

রা। হ্যাঁ সে কথা ঠিক, কিন্তু উপায়?

জ। উপায় অবশ্য আছে।

মু। কি?

[জমিদার বলতে যাচ্ছিলেন। লক্ষ্মণের প্রবেশ।]

ল। আজ্ঞে!

জ। আঃ দাঁড়াও দেখিনি, তোমার জ্বালায় তো অস্থির।

[লক্ষ্মণ মুখ কাচু-মাচু করে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলো। জমিদার রাজ্যেশ্বর ও মুন্সীর নিকটে এসে অগত্যা চুপি চুপি কি যেন বললেন]

রা। তা মতলবটা তো মন্দ নয়। কিন্তু...[লক্ষ্মণ গলা খাঁকারি দিল। জমিদার ইংগিতে রাজ্যেশ্বরকে থামিয়ে দিলেন]

জ। কি? কি ব্যাপার বলো তো দেখি তোমার? আরে, শাল কাঠের মতো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?

ল। না, মানে এই অনেক রাত হলো তাই।

জ। তাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছ? যাও ভেতর থেকে তোমার লণ্ঠনটা নিয়ে এসো গে। এই বাবুদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

ল। আজ্ঞে। [ প্রস্থান ]

জ। হ্যাঁ কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন রাজেশ্বর বাবু! এবার বলুন।

রা। হ্যাঁ মানে বলছিলুম এই যে, আপনার প্ল্যানটা ভালই কিন্তু সব গোলমালের মূল উৎপাটন না করলে এতে কি আর কিছু সুবিধা হবে?

জ। হবে হবে, সময়ে সব ঠিক হবে। প্ল্যান মতো কার্য্যোদ্ধার করতে পারলে দেখবেন যে, বাঞ্ছাধনকে আমার পায়ে এসে আশ্রয়ের জন্য লুটিয়ে পড়তে হবে। আর সেই সুযোগেই আমরা—বুঝলেন না?

রা ও মু। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

জ। হ্যাঁ দেখুন, এ ব্যাপারের সম্পূর্ণ দায়িত্বটা আমি আপনাদের দুজনের ওপর ছেড়ে দিতে চাই।

রা ও মু। মানে আমরা?

জ। হ্যাঁ আপনারা। কারণ আপনাদের অভিজ্ঞতা এসব ব্যাপারে আমার থেকেও বেশী। অবশ্য হাতে-কলমের কাজটা আপনাদের পছন্দসই লোক দিয়েই করাবেন। পরিচালনার দায়িত্বটা আপনাদের ওপরেই রইলো, অবশ্য এর জন্যে যা খরচ খরচা লাগে তা আমি দেবো।

রা। হ্যাঁ হ্যাঁ তা যখন বলছেন। কি বলেন মুন্সি সাহেব?

মু। হ্যাঁ, মানে একটা গুরুদায়িত্ব, এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা উদ্ধার হলে বাঁচি।

জ। আপনারা যে সুষ্ঠুভাবে কার্য্য উদ্ধার করতে পারবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। আর তাছাড়া—

[ ইতিমধ্যে লক্ষ্মণের লণ্ঠন ও লাঠি হাতে প্রবেশ। ]

তা যাক, আপাততঃ এই পর্য্যন্তই কথা রইলো, রাতও বেশ হয়েছে।

রা ও মু। আচ্ছা আচ্ছা।

[ লক্ষ্মণ, মুন্সি, রাজেশ্বরের প্রস্থান।

জ। হৃদয় মোড়ল, চিরকাল শুধু লাঙল চালিয়েই গেছ। কতো ধানে কতো চাল তা এখনও শেখনি? জমিদার সত্য চৌধুরীর সাথে পাল্লা দিতে আসা! আচ্ছা দেখা যাক।

[ ক্রমশঃ।

## জয়তু নেতাজী

সত্যেন্দুশেখর বসু

ভারতের মাতৃ-জঠরে জন্ম নিল
শক্তির সবল সার্থক প্রতীক।
সুস্বাগত তেইশে জানুয়ারী, প্রণাম করি তোমার
পুণ্য মুহূর্ত্তকে, যে মুহূর্ত্ত ধন্য হয়েছে
বলিষ্ঠ অগ্নিশিশুকে ধারণ। যে শিশুর অন্তরে
অটল আত্মবিশ্বাস, বাহুতে অজেয় পরাক্রম,
মুখে বজ্র-দৃপ্ত বাণী। বিস্ময়াভিভূত হই কার ব্যক্তিত্ব-সৌরভে
মুখরিত হল আসমুদ্র হিমালয়, কার কর্ম্মচাঞ্চল্যে
প্রতিধ্বনি তুলল সারা বিশ্ব, নিপীড়িত ভারত কার প্রতীক্ষায়
বসেছিল, সুপ্ত-যুব-শক্তি সহসা কার ইঙ্গিতে জাগ্রত হল?
সে সব প্রশ্নের বাণীমূর্তি হলেন তিনি, যাঁর যশঃ সৌরভে
ভারত আজ সুবাসিত, সুরভিত। জীবন তাঁর অহিংসার সাথে
হিংসার চ্যালেঞ্জ, অসম্ভবকে সম্ভব করার দুঃসাধ্যতা।
এই বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, বীরত্বের ক্ষণিকতাই এর শোভন;
সেই ক্ষণিকতাকে অনিবার্য্যরূপে চিরন্তনতা দান করেন ঈশ্বর।
তাঁর মৃত্যু হয়েছে কি না সে তর্ক বৃথা,
মৃত্যুকে তিনি জয় করেছেন কি না সেইটি আসল।
তাই, সেই অমর শাশ্বত চিরনবীন মুক্তিদূতকে
স্বাগত জানাই তাঁর পবিত্র জন্মবাসরে।

প্রশান্ত চৌধুরী

## ১৬

জুপিটার থিয়েটারের সিঁড়ির তলায় অমূল্য বাবুর ঘুপসি ভাঁড়ার-ঘরের ছারপোকার দাগ-লাগা দেওয়ালে লাগানো আছে খবরের কাগজের পাতা থেকে কাটা অতীতের বিখ্যাত সব অভিনেতাদের ছবি। অমূল্য বাবুর ভাষায়, একদা 'জুপিটার-এস্টেজ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন' তাঁরা। তাঁদের কারুর চাণক্য যোগেশ, কারুর কর্ণ, কারুর শাজাহান, কারুর শিবাজী, কারুর আওরঙ্গজীব জ্বলজ্বল্ করছে আজও অমূল্য বাবুদের স্মৃতির পাতায়।

শুধু একজন,—একজন শুধু জ্বলজ্বল করছেন স্বয়ং। তাঁর বিকর্ণ বা কর্ণ, অর্জুন বা কৃষ্ণ, সব কিছুকে ছাপিয়ে অমূল্য বাবুদের মনের রাজ্যে রাজসিংহাসন পেতে বসে আছেন সেই মানুষটা নিজে।

রাজ্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ছিল তাঁর নাম।

: সত্যিকারের রাজা ছিলেন তিনি স্যার! রাজার মত রূপ, রাজার মত ঐশ্বর্য, রাজার মত মেজাজ।

বলতে বলতে শ্রদ্ধায় আজও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অমূল্য বাবুর মুখ-চোখ।

অমূল্য বাবু শুধু এই জুপিটার থিয়েটারের সাজপোশাকের ভাণ্ডারীই নন। এখানকার অনেক গল্পেরও ভাণ্ডারী তিনি। অফুরন্ত তাঁর সেই গল্পের ভাণ্ডার। হাত পেতে দাঁড়িয়ে সে-ভাণ্ডারের দুয়ার থেকে প্রার্থীকে ফিরে যেতে হয় না কোনদিন। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর দুয়ারে এসে হাত পেতে দাঁড়ানো তাই তো আমার প্রতিদিনের নেশা। তাই তো সময় পেলেই অমূল্য বাবুর কাছে এসে বলা : তারপর অমূল্য বাবু?

: আমরা তাঁকে বলতুম, রাজাবাবু। তা স্যার, রাজাবাবুই বটে। শীতকাল তখন। থিয়েটারের শেষে ফিরছেন বাড়ি। সিঁড়ির নিচে হঠাৎ নজরে পড়ে গেল, ঠকঠকিয়ে কাঁপছে আমাদের তখনকার ফোকাস-ম্যান্ বেঁটে-মুকুন্দ। কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে তার সন্ধ্যে থেকে। গা থেকে কাশ্মীরী জামিয়ারখানা খুলে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,—ভাল করে মুড়ি দে হতভাগা।

সে জামিয়ার আর ফেরৎ নেন নি।

সমবয়সী বড়রা ডাকতেন তাঁকে মাতাল মুখুজ্যে বোলে। বড্ড রাগ করতেন। বলতেন,—মোদো বলিস বল, মাতাল বলিস কেন?

কথাটা স্যার সত্যি। মত্ত হলে তবে না মাতাল। তা' আমাদের রাজাবাবুকে কে ক'বার মত্ত হতে দেখেছে বলুক ত? পুরো পাঁচ বোতলে চোখে একটুখানি মাত্র গোলাপী রঙ ধরত যাঁর, তাঁকে কথায় কথায় মাতাল বললে রাগ ধরবে বৈ কি!

একবার রাজাবাবুর ভাগনীর বিয়ে। নিজে নিঃসন্তান ছিলেন ত? ঐ ভাগনীটি ছিল বড় প্রিয়। ভগিনীপতিকে বললেন,—হাসির বিয়েতে ফুল দিয়ে বাড়ি সাজাবার ভার আমার। নিজের বাগানের টাটকা ফুল-পাতা দিয়ে সাজাব বাড়ি। তোমরা যেন ফুল-টুল কিনো না। আর ঐ কলাপাতা,—ওটাও আমি আনব আমার পেনিটির বাগান থেকে।

এনেও ছিলেন। ফুল বোলে ফুল। ফুলের পাহাড়। তিনখানা লরীতে ফুলের মালা, ফুলের রিং, ফুলের ছড় একেবারে বোঝাই। সেই সঙ্গে পর্বতপ্রমাণ কলাপাতার স্তূপ।

সবই ঠিক হয়েছিল। একটু শুধু দেরী হয়ে গিয়েছিল তাঁর। বোনের বাড়ীতে পৌঁছে শুনলেন, দিন তিনেক আগে ভাগনীর তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। বাগানবাড়িতে গিয়ে ফুলগাছ আর কলাগাছ কাটাতে গিয়ে কখন যে পাঁচ-পাঁচটা রাত কাটিয়ে ফেলেছেন সেখানে, টেরও পাননি। টের পেয়ে বোনের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন রাজ্যেশ্বর মুখুজ্জে।

সেই একবার মাতাল হয়েছিলেন উনি।

আর একবার দেখেছিলুম স্যার, আমরা নিজেরাই।

সেদিন বুড়ি উমাতারার বেনিফিট নাইটের কম্বিনেশন প্লে। কলকাতার তিন-তিনটে থিয়েটারের বাঘা-বাঘা অ্যাকটর-অ্যাকট্রেস মিলিয়ে প্লে হবে কর্ণার্জ্জুন। হরিরলুঠের বাতাসা কুড়োবার মত লুটোপাটি কোরে টিকিট কেটে নিয়ে গেছে লোকেরা। ফুল হাউস। এক্সট্রা চেয়ার পাতা হয়েছে হল-এর ফাঁকে-ফাঁকে। গিজগিজ করছে লোক। সাড়ে ছটায় ড্রপ তোলবার কথা, অথচ পৌনে ছটাতেও দেখা নেই রাজ্যেশ্বর মুখুজ্জের। হেভি মেক্আপ রয়েছে ওঁর।

তিনখানা গাড়ি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল তিন দিকে রাজাবাবুকে ধরে আনতে। দুখানা ফিরে এল হতাশ হয়ে। একখানা যখন তুলে নিয়ে এল তাঁকে, ঘড়িতে তখন ছটা বেজে কুড়ি।

কিন্তু কী হবে এ রাজাবাবুকে নিয়ে?

চোখের কোণে তিন দিনের কালি, মাথার চুলে তিন দিনের

জট, বাসিমুখে অনর্গল খিস্তি। চেয়ারে বসাতে গেলে ঘুঁষি ছোঁড়েন, মাথায় পরচুল আঁটতে গেলে লাথি চালান, মুখে রং করতে গেলে শুয়ে পড়েন মেঝেতে।

জুপিটার থিয়েটারের তখনকার মালিক রাখাল মল্লিক কি ভেবে হঠাৎ বেরিয়ে পড়লেন তাঁর গাড়িখানা নিয়ে। আমরা মাতাল রাজাবাবুকে নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে লাগলুম বেকার। ষ্টেজম্যানেজার দীনুবাবু সখীর ব্যাচের পারুলবালাকে দেবদাসী সাজিয়ে হাতে একজোড়া ধুনুচি দিয়ে ষ্টেজে পাঠিয়ে দিলেন। পারুল নেচে নেচে সময় কাটাতে লাগল। আর, আমরা সবাই ভয়ে কাঁটা হয়ে ভাবতে লাগলুম, কখন দর্শকরা চেয়ারগুলো ভেঙে চুরমার করে।

এমন সময় গ্রীনরুমে এসে ঢুকলেন রাখাল মল্লিক। সঙ্গে একজন মহিলা। এমন রূপও দেখিনি জীবনে, এমন দপদপাও দেখিনি স্যার! ঐ যে যাকে আপনারা ব্যক্তিত্ব বলেন, তাই। দেখে চোখও ফেরানো যায় না, আবার মাথাও হেঁট হয়ে আসে। পরনে সাদা খোলের চওড়া লাল পাড় শাড়ী। তার পর গরদের একখানা চাদর জড়ানো। আমাদের কারুর দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত না কোরে তিনি সটান এসে দাঁড়ালেন উন্মত্ত রাজাবাবুর সামনে। আর, তাঁর নির্দেশ মতো বালতি-বালতি জল ঢালতে লাগলুম আমরা রাজাবাবুর গায়ে।

অনেকক্ষণ জল ঢালবার পর সমস্ত শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে মাথা তুললেন রাজ্যেশ্বর মুখুজ্জে। মুখ তুলেই দেখলেন, সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

তুমি! এখানে!—ঘাড় হেঁট করে চাপা কণ্ঠে বললেন রাজাবাবু।

তোমার প্লে দেখতে এলুম। সাড়ে ছটায় প্লে। এখন সাতটা। শুধু এই কটি কথা বলে ফিরে গেলেন তিনি গ্রীনরুম ছেড়ে। উঠে গেলেন সটান দোতলার বক্সে।

রাজাবাবু ধীরে ধীরে উঠে ঘাড় হেঁট করে ঢুকলেন নিজের সাজঘরে।

প্লে সুরু হতে দেরী হয়েছিল সেদিন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট। কিন্তু রাজ্যেশ্বর মুখুজ্জের সেদিনের কর্ণকে জীবনে ভুলতে পারবে না কেউ। দর্শকরা সেদিন মুহুর্মুহু করতালিতে ভরিয়ে তুলেছিল হল। কিন্তু সেই প্রশংসামুখর দর্শকদের কারুর জন্যেই অভিনয় করেননি সে রাতে রাজ্যেশ্বর মুখুজ্জে। সে রাত্রে তাঁর চোখের সামনে ছিলেন শুধু একটিমাত্র দর্শিকা। তিনি ছিলেন দোতলায় ষ্টেজের ডানদিকের প্রথম বক্সে। আমরা সবাই উইংসের ধার থেকে দেখেছি, অন্ধকারেও তাঁর কপালের চওড়া সিঁদুরের টিপটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল!

রাজাবাবুর স্ত্রীর নাম রাজেন্দ্রাণী ছিল কি না জানি না স্যার! কিন্তু ঐ একটিমাত্র নামেই তাঁকে মানাতো।

রাজাবাবু মাঝে মাঝেই খোঁজ নিতেন আমাদের ডেকে,—কি রে? মাইনে-টাইনে পাচ্ছিস তো ঠিকমতো? না কি বেগার খেটে মরছিস?

একবার বলেছিলুম আমরা দল বেঁধে,—চার মাসের মাইনে মেলেনি।

সেদিন ড্রপ ওঠবার ঠিক দুমিনিট আগে হাঁক দিলেন রাজাবাবু,—ওরে, তোদের বেচাবাবুকে একবার ডেকে দে ত আমার ঘরে। বল্ জরুরী দরকার।

কেনা শীলের ভাইপো বেচা শীল হয়েছেন তখন জুপিটারের নতুন মালিক। ছুটে এলেন ডাক শুনে।

কি খবর রাজ্যেশ্বরবাবু?

এই এদের সব চার মাসের মাইনে বাকি বলছিল।

হীরের আংটি-পরা হাতে সোনা-বাঁধানো ছড়িটাকে মেঝেতে ঠুকতে ঠুকতে বেচা শীল আমাদের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বললেন, —দিতে দেরী হবে। না পোষায় বিদেয় নিতে পারো। ডায়মণ্ড থিয়েটারের বিষ্টু দাসের দলের জবাব হয়ে গেছে হপ্তাখানেক আগে। ওরা আধা মাইনেতে কাজ করবে বলেছে।

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে আওরঙ্গজীবের দাড়ি রাজাবাবুর মুখ থেকে খুলে বেচা শীলের বুকে এসে পড়ল। রাজাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—রইল···তোর প্লে।

ফাঁকা জায়গাটায় এমন একটা খিস্তি ছিল, যেটা উচ্চারণ করতে স্যার লজ্জা পাচ্ছি আপনার কাছে। ওটা নিজগুণে আন্দাজে বসিয়ে নেবেন দয়া কোরে।

বেচা শীলের ছড়ি ঠোকা আর হল না। কাতরকণ্ঠে বললেন,—কাল নিশ্চয়ই ওদের মাইনে চুকিয়ে দোব।

রাজাবাবু অটল, বিশ্বাস নেই বাবা তোমাদের। আজ এখনি রূপিয়া চাই। নইলে এ মুখে আজ আর দাড়ি উঠবে না।

বেচা শীল বলে,—এক্ষণি অত টাকা পাব কোথায়? কাল সকালে ব্যাঙ্ক খুললে—

চীৎকার করে ওঠেন রাজাবাবু, কোন কথা শুনতে চাই না। টাকা না থাকে বৌয়ের গায়ের গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা নিয়ে এস। টাকা আজ চাই-ই।

টাকা এসেছিল স্যার সেই রাতেই। বেচা শীলের বৌয়ের গায়ের গয়না খুলতে হয়নি। তাঁর সিন্দুকের ডালা খুলতেই টাকার জোগাড় হয়েছিল।

একবার। দক্ষযজ্ঞ প্লে চলছে তখন। প্লের ফাঁকে পায়চারী করতে করতে কখন ষ্টেজের পিছনের ফাঁকা উঠোনটায় গিয়ে পড়েছেন রাজাবাবু। দেখেন, এতটুকু এক টুকরো সাবান নিয়ে কলতলায় বোসে কাড়াকাড়ি কোরে গায়ে মাখছে নাটকের ভূত-প্রেতের দল।

ব্যস। সটান একেবারে প্রোপাইটরের ঘরে।

ঐ যে ছেলেগুলো, যারা সর্বাঙ্গে ভুষোকালি মেখে ভূতপ্রেত সেজেছে, ওদের গায়ের রং তোলবার জন্যে মাত্র এক টুকরো সাবান দেওয়া হয়েছে কেন?

পরের দিন থেকে এক সের শাঁকমার্কা কাপড়কাচা সাবান বরাদ্দ হয়ে গেল।

রাজ্যেশ্বর মুখুজ্জে মারা যেতে বিরাট শোকসভা হয়েছিল স্যার এ-শহরে। তাঁর রূপের কথা, তাঁর অদ্ভুত অ্যাকটিং-এর কথা, তাঁর ভগবানদত্ত গলার কথা, তাঁর নানা গুণের কথা নিয়ে যখন বিখ্যাত বক্তার দল শোকসভা সরগরম করে তুলেছেন, আমরা তখন এই জুপিটার থিয়েটারের অন্ধকার কোণে বোসে হাউ-হাউ কোরে

কেঁদেছি স্যার! তাঁর মৃত্যুতে সত্যিকারের ক্ষতি হল যে এই আমাদের মত হতভাগাদেরই। আমাদের সুখদুঃখের খবর নেবার জন্যে এখানে আর যে কেউ রইলেন না।

থামলেন অমূল্য বাবু।

জুপিটার থিয়েটারে কত অভিনেতা এসেছেন, কত অভিনেতা চলে গেছেন। তাঁদের স্মৃতি ম্লান হয়ে গেছে আজ। শুধু একজনকে ভোলেনি আজও এখানকার নেপথ্য কর্মীর দল। আজও সেই মানুষটি অমর হয়ে আছেন এঁদের মনের পৃথিবীতে। এই দরিদ্র নেপথ্যকর্মীদের মনোরাজ্যের চিরকালের রাজাবাবু, রাজেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

## ১৭

সবে মাত্র ভেঙ্গেছে প্লে। বুড়ো ডাক্তারের নকল গোঁফ তুলে নারকেল তেল ঘষছি মুখে। দূর থেকে ভেসে আসছে ঘরমুখো দর্শকের কলগুঞ্জন, রিক্সার ঠুং-ঠাং, মোটর গাড়ির হর্ণ। ডাক্তারের গলাবন্ধ কোটটাকে পাট কোরে তুলতে তুলতে অমূল্য বাবু বললেন : শুক্রবার কোন কাজ বর্ম রাখবেন না কিন্তু স্যার! আমাদের বারাসতে যেতে হবে আপনাকে। কথা দিয়েছেন।

কবে কোন অসতর্ক মুহূর্তে যে অমূল্য বাবুকে বারাসত গমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, স্মরণ করতে পারলুম না ঠিক। বললুম : কেন বলুন তো? কি আছে সেখানে?

: বাঃ। আমার শ্বশুরবাড়ি।

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকেছিল শিশির। হাত-মুখ নেড়ে সে বলে উঠল : বলিহারি আপনার কাণ্ড! বারাসতে যে আমাদের অমূল্যদা'র শ্বশুরালয় অবস্থিত, তাও জানেন না আপনি? দিল্লীতে কুতুবমিনার আছে জানেন তো? আগ্রায় তাজ? কোনারকে সূর্য-মন্দির? ভূপালে সাঁচীস্তূপ?

অমূল্য বাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে চাপা দিয়ে বলে যেতে লাগল শিশির : তেমনি বারাসতে অমূল্যদা'র শ্বশুরালয়। ওখানে সবচেয়ে বিখ্যাত যে মিঠে-কড়া লাল সুতো বিড়ির দোকান, সেটা অমূল্যদা'র বড় শালার।

: তোকে বলেছে।

: সবচেয়ে খাঁটি শিয়ালকাঁটার ঘানিটা ওঁর মেজ শালার।

: বাজে কথা বলিসনি।

: সব চেয়ে ঝগড়াটে যে বুড়ি, অমূল্যদা'র দিদিশাশুড়ি।

: ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

: সব চেয়ে—

: বারণ করে দিন স্যার শিশিরকে। ও ইয়ারকি করছে।

থামিয়ে দিলুম শিশিরকে হাতের ইসারায়। কিন্তু বারাসত-গমনের অসতর্ক প্রতিশ্রুতিটাকে উইথড় করা গেল না কিছুতেই। যেতেই হল।

গিয়ে পৌছলুম যেখানে, সেটা কারুর শ্বশুরবাড়ি তো নয়ই, বাড়িই নয় মোটে। মাঠের মাঝখানে পাতা মস্ত একটা আসর। যাত্রার আসর।

অমূল্য বাবু বললেন : আমাদের শ্বশুরবাড়ির গ্রামের দলের প্লে স্যার! সকলের বড্ড শখ আপনাকে দেখায়। যাত্রা বললে হয়তো আসতে চাইতেন না, সেই ভয়ে নেমন্তন্ন চাপাচুপি দিয়েই করেছিলুম। ঐ যে দেখছেন ওদিকে ভিড় আগলাচ্ছে দাঁড়িয়ে, ওই আমার মেজ শালা।

মেজ শালা ছুটে এলেন দেখতে পেয়ে। এবং আরও অনেকে। শালার চেয়ে অশালারাই সংখ্যায় বেশি। কিন্তু তাদের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হবার আগেই যাত্রার আসরে 'জুড়ি'র দল গান জুড়ে দিলেন দাঁড়িয়ে,—

তু-উ মি-ই গোলক-অ বিহারী-ঈ হরি।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! আমার পরনে হাফপ্যান্ট এসে গেল কোথা থেকে? গায়ে আলপাকার সার্ট? চারপাশে আমার কোথা থেকে এসে গেল মেজমামা, ছোটমামা, গদাবুজি, কুতোদা, নতুনদা, ছোড়দা? পিছনে কোথা থেকে আসছে দাদামশায়ের মুখের তামাকের গন্ধ-মেশানো পান চিবোবার শব্দটা?

মামার বাড়ির উঠোনে যাত্রা হচ্ছে। পাখোয়াজটাকে আলুকাবলী-ওলাদের ডমরুমার্কা বাঁশের ষ্টাণ্ডের মতো দাঁড় করিয়ে তার ওপর গানের খাতা খুলে রেখে গান ধরেছেন তিনজন 'জুড়ি' গায়ে উকিলের কালো শামলা চাপিয়ে। গান শুনব কি, আমরা তখন অবাক হয়ে দেখছি তিন জুড়ির কার লম্বা নাকটা গানের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে বেঁকচ্ছে, কার দোক্তার ছোপধরা হাঁ-মুখখানা কতটা ফাঁক হচ্ছে, কার গলার পিদিমের মতো উঁচু হাড়ের টুকরোটা কেমন করে উঠছে নামছে!

যাত্রার নাটক গড়িয়ে চলেছে ওদিকে। উঠোনে মামারবাড়ির পাড়ার তাবৎ লোকের ভীড়। নিচের ঠাকুরদালানে বসেছেন এবাড়ি-ওবাড়ির সব দাদু আর মামারা সবান্ধবে। ওপরের তিনদিকের চিক-ঢাকা বারান্দায় ছড়িয়ে আছেন দিদিমা আর মাসিমার দল। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ছোটমামা হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাত্রার আসরের কাঠের ট্রে থেকে এক মুঠো লবঙ্গ-দারুচিনি-এলাচ তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে সবেমাত্র, এমন সময় গীতকণ্ঠে আসরে প্রবেশ করলেন নিয়তি। লবঙ্গ-দারুচিনি বরাতে আর জুটল না আমাদের সে যাত্রা।

নিয়তি মানুষটার চওড়া গর্দান, শক্ত কব্জি, বেশ পালোয়ানী চেহারা। তা দুনিয়ার তাবৎ মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন যিনি, তাঁর স্বাস্থ্যটা অমন না হলে চলবেই বা কেন? দাড়িগোঁফ কামিয়ে মুখটাকে যথাসম্ভব সবুজ করা হয়েছে তার। বিশাল বপুকে দেহবল্লরী করে তোলার প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় পরনের শাড়িটাতে প্রচুর পাক দেওয়ার ফলে নিয়তির চলনভঙ্গিটা হয়ে উঠেছে স্যাকরেসের প্রতিযোগীর মতো। সেই ভঙ্গীতে আসরের মাঝখানে এসে গান ধরলেন তিনি—

'স্বপনে এসেছিল, স্বপনে চলে গেল, স্বপনে দিয়ে গেল আ-আ-আ-আ-শা।'

চমকে উঠলুম গলা শুনে! হাতীর গলায় কোকিলের আওয়াজ!

ডান হাতে তাঁর ধরা ছিল গোটানো একটা পট। গান শেষ কোরে সেই পট খুলে মেলে ধরলেন তিনি উৎপীড়ক দাম্ভিক চরিত্রহীন রাজার চোখের সম্মুখে।

'হেয় রাজা ভবিষ্যৎ তব।'

রাজা কিন্তু কিছু হেরিবার পূর্বে দর্শকেরা সবিস্ময়ে হেরিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজা এবং নিয়তির মাঝখানে অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটে গেছে দাদামশাইয়ের।

হতভম্ব নিয়তির হাত থেকে ছবিখানা একরকম ছিনিয়েই নিয়ে দাদমশাই নিজেই মেলে ধরলেন সেটা দর্শকদের দিকে,—'এই যে পটের ছবিখানা দেখছেন, এটা কে এঁকেছে জানেন? আমার নাতি।'

শুধু নাতি বলেই ক্ষান্ত হলেন না দাদামশাই। আমার বার বছরের ছোট ভাই অসিতকে টেনে নিয়ে দাঁড় করালেন আসরে। তার ডাক-নাম, ভাল-নাম, বয়েস, কোন্ ইস্কুলের কোন্ ক্লাসে পড়ে, সব কিছু শুনিয়ে সগর্বে ঘোষণা করলেন,—যাত্রাদলের পটটা ছিঁড়ে গেছল, তাই এই ছবিটা আমার এই নাতিকে দিয়ে নতুন কোরে আঁকিয়েছি। এইটুকু ছেলের নিজের হাতের আঁকা। চাট্টিখানি কথা নয়!

হাততালি পড়ে গেল আসরে। নিয়তির হাতে পটটি আবার গুঁজে দিয়ে বুক ফুলিয়ে ফিরে এলেন দাদামশাই অসিতকে নিয়ে। —যাত্রা আবার চলতে লাগল যেমন চলছিল।

আজও আমার বেশ মনে আছে,—সেদিনের আসরে ঐ ব্যাপারটা যাত্রাভিনয়কে ডিস্টার্ব করেনি এতটুকু। নাটকোপভোগে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয়নি কারুর। অদ্ভুত এই যাত্রাভিনয় জিনিষটা। সিনেমা থিয়েটারকে যদি বলা যায় ফুটবল খেলা তো এ হচ্ছে ক্রিকেট। ফুটবলে পুরো ষাট মিনিট একেবারে চোখ ঠিকরে তাকিয়ে থাকো বলের দিকে। যেদিকে বল্, সেদিকে রাখতেই হবে তোমার চোখ। মন সব সময় টান কোরে বাঁধা।

আর, ক্রিকেট খেলায়?

সেখানে অবাধ খোলা তোমার চোখ, তোমার মন। সেখানে তুমি মাঝে মাঝে খেলার মাঠ থেকে চোখ সরিয়ে মন সরিয়ে পান চিবোও আরামে, চিনেবাদাম কেনো দর কোরে, ইডেন গার্ডেনের ঝাউগাছগুলো কতখানি উঁচু হতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করো পাশের লোকটির সঙ্গে, বিশ বছর আগেকার এম, সি, সির খেলার গল্প শোনাও কমবয়িসী শ্রোতাকে। তোমার ক্রিকেটখেলা দেখায় তাতে কোন ব্যাঘাতই ঘটবে না।

যাত্রাতেও তাই। বিবেকের মালকোষে বাঁধা গানখানা যদি ভাল লেগে গেল তো রাজা-মন্ত্রীদের আরো কিছুক্ষণ বসিয়ে রেখে বিবেককে বলে দাও আরো খানকতক লম্বা তানের কেরামতী দেখাতে,—ভাগ্যহীনা রাণীর খেদোক্তিটাকে লুফে নিয়ে দেখাক ক্ল্যারিওনেটধারী তার ফুঁ-এর বাহাদুরী যতক্ষণ খুশি,—প্রম্প্টারের মাছি-গোঁফের দিকেই না হয় রইলে তাকিয়ে কিছুক্ষণ,—আসুক না কারুর দাদামশাই আসরের মাঝখানে,—নাটক দেখার তাতে এক ফোঁটাও ক্ষতি নেই।

বাঁদরের ল্যাজ খসে মানুষ হয়নি;—কিন্তু বিবর্তনের ম্যাপ খুললে দেখা যায় যে, মানুষের রাজপথের দু-কদম পিছনেই আছে বাঁদরের রাস্তাটা। বাঁদর গড়ার পরে মানুষ গড়াটা অনেক সহজ হয়েছে বিধাতার পক্ষে।

ঠিক তেমনি, যাত্রা থেকে থিয়েটার হয়তো আসেনি;—কিন্তু এদেশে যাত্রার প্রচলন ছিল বলেই থিয়েটার গড়ে ওঠা সহজ হয়েছে।

আমাদের প্রাচীন ভারতে দেবতাদের সব পুজোর উৎসবের সময় পথে পথে যেসব শোভাযাত্রা বেরোত, তাতে এক রকমের নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকত। পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন যে, আমাদের বাঙলা দেশের যে যাত্রা, সেটা ঐ থেকেই চলে এসেছে। ওরই ক্রমবিকশিত রূপটি হচ্ছে আমাদের যাত্রাভিনয়।

মতি রায়, মথুর সা, চরণ ভাণ্ডারী, শশী অধিকারী,—কত অসংখ্য নামের কত অসংখ্য যাত্রাদলের কথা আজও শোনা যায় প্রাচীন নাটুকেদের মুখে। সে কোন সুদূর অতীত থেকে এদেশে যাত্রাভিনয় মাতিয়ে রেখেছে দেশের আপামর জনসাধারণকে। তোমাকে আমাকে রামকে শ্যামকে সবাইকে এক আসরে এক সামিয়ানার নিচে একসঙ্গে বসিয়ে একই নাটকে জয় করেছে সকল স্তরের মানুষের মন।

এ কৃতিত্বের তুলনা কই?

## ১৮

গ্রীনরুম কথাটার উৎপত্তি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ বলেন, গ্রীইং বা এগ্রীইং রুম কথাটাই নাকি মুখে মুখে ভাঙতে ভাঙতে গ্রীইং থেকে গ্রীং, গ্রীং থেকে গ্রীনরুমে দাঁড়িয়েছে। They believe it to be a probable corruption of the agreeing or greeing room, where the actors met and copied or learnt up their parts the author's script. অন্যেরা বলেন, ভুল বৎস, কথাটা কোন জন্মেও গ্রীইং ছিল না, এগ্রীইংও নয়। কথাটা আদি ও অকৃত্রিম গ্রীনরুমই। সেকালে ষ্টেজের পিছন দিকে অভিনেতাদের পোশাক-আশাক বদলানো এবং জিরোবার ঘরটা সাধারণতঃ ছাওয়া থাকত সবুজ ঘাসপাতায়; তাই নাম সবুজ ঘর,—অর্থাৎ গ্রীনরুম।

এই মুহূর্তে যে ঘরটায় বসে মুখে ওয়্যাক্সের প্রলেপ দিচ্ছি আমি, সেটার ত্রিসীমানায় কোথাও সবুজের ছিটে-ফোঁটা না থেকেও তাই ঘরটার নাম গ্রীনরুম।

এই ঘরটার সঙ্গে দেখতে দেখতে অনেক দিনের জানাশোনা হয়ে গেল। প্রথম যেদিন এ ঘরে এসে ঢুকি, উইপোকার আঁকাবাঁকা যে পাইপ লাইনটা সেদিন উপরকার কড়িকাঠে ছিল, আজ সেটা দরজার খিলেন পর্যন্ত নেমে এসেছে। ওয়্যাক্সের যে কৌটোটা সেদিন ছিল ছাপাছাপি, আজ তার অবস্থাটা বিয়েবাড়ির ছাতে এঁটো পাতের ধারে পড়ে থাকা দইয়ের খুরির মতো।

পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশী,—একশ' রাত্রের দরজায় কড়া নাড়তে চলেছে আমার নাটক। এখানে এসেছি কম দিন তো হল না বড়। জুপিটার থিয়েটারের অনেক কিছুই দেখা হল এ-কদিনে; চেনা হয়ে গেল এখানকার সকলকে।

ঐ যে সিফটারদের হেড নিরঞ্জন, চোখের ভেতরকার শিরাগুলো যার সরু স্প্রীং-এর মত প্যাঁচানো আর ইটের মত লাল, দাঁতের মাড়ি যার পায়ের অ্যালবোর্ট জুতোর মতই কুচকুচে কালো;—চিনি তাকে।

ওর সঙ্গে কতদিন ঘুরেছি ওর রাজত্বে। সে রাজ্য ছাড়িয়ে আছে জুপিটার থিয়েটারের আনাচে-কানাচে। ষ্টেজের উল্টোপিঠে মস্ত

একটা টিনের শেড-এর তলায় তার রাজধানী। ওর সেই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য কত দিন ঘুরেছি ওর পিছু পিছু। পায়ের তলা দিয়ে কোথাও সরে গেছে ইঁদুর, কাঁধের উপর দিয়ে কখনো উড়ে গেছে আরশোলা, মুখে এসে কোথাও লেগেছে মাকড়সার জাল।

ওর রাজত্বে দুর্গ আছে একটি। বহুদিনের বহু শত্রুর আক্রমণে তার ডান দিকের এক জায়গাটা ছিঁড়ে গেছে একটু। পিছন দিক থেকে সেলাই করে দিলেই কারুর সাধ্যি নেই যে ছেঁড়া মালুম পায়।

ওর রাজত্বে আছে তুষারমণ্ডিত কৈলাস পর্বত ;—সে তুষার গলে না, তার ভিতর দিয়ে ইঁদুর গলে যায় অনায়াসে। ওর রাজত্বে আছে ফেনোচ্ছল সাগর ;—তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে চুল ভেজে না, মাথা ঠোকে। ওর রাজত্বে আছে দুর্ভেদ্য জঙ্গল ;—তাতে হিংস্র প্রাণীর বাস। উই আর ইঁদুর হিংস্র বৈ কি! ওর রাজত্বে আছে ফসলের ক্ষেত ;—বেড়া ডিঙ্গিয়ে তার ছাগলে পাতা ছেঁড়ে না কোনদিন, উইয়ে শুধু তার মাথা মুড়োয়।

আলিবাবার খুঁজে পাওয়া সেই বিপুল ধনভাণ্ডারের প্রকাণ্ড পাথর-কপাট খুলে যায় নিরঞ্জনের আঙ্গুলের ইসারায়, বৃন্দাবনের বাঁকা শ্যাম আয়ান ঘোষের চোখের সামনে নিমেষে খড়্গধারিণী শ্যামা হয়ে ওঠে ওর হাতের দড়ি টানার কায়দায় ;—কামানের গোলায় নয়, ওর হাতের কৌশলে ভেঙ্গে পড়ে মোগল মসনদ।

জুপিটার থিয়েটারে যতক্ষণ থাকে নিরঞ্জন, বুক ওর চিতিয়ে থাকে সর্বদা। হাঁক-ডাক লাফালাফিতে সরগরম করে রাখে ও থিয়েটারকে এবং নিজেকেও। থিয়েটারের প্লে ভেঙ্গে গেলেই ও কিন্তু কেমন মিইয়ে যায়, চুপসে যায়, নেতিয়ে যায়। তখন বড্ড চোখে পড়ে ওর স্বাস্থ্যহীন ক্ষীণ দেহটা, চোখে পড়ে ছেঁড়া অ্যালবোটের একধার থেকে বেরিয়ে থাকা ওর পায়ের কড়ে আঙ্গুলটা, বুক-খোলা সার্টের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে থাকা ওর জির-জিরে বুকের হাড় ক'খানা।

বাড়িতে ঘরের কপাট ওর আঙ্গুলের ইসারার একটুও অপেক্ষা না কোরেই হাঁ হাঁ করে ;—বাদলার দিনে ঝোলাতে হয় তাতে ছেঁড়া চটের পর্দা। ওর ছেলের সামান্ত সর্দি জ্বর নিমেষে নিউমোনিয়া হয়ে ওঠে ওর একটুও ইসারা না পেয়েই। কামানের গোলায় নয়, ওর হাতের দড়ি টানার কৌশলেও নয়, ভাগ্যদেবতার নিষ্ঠুর ফুৎকারে ভেঙ্গে পড়ে বার বার ওর ছোট্ট সংসার।

জীবনে ও আঙ্গুলের ইসারায় কেন, সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও এক চুল এদিক ওদিক করাতে পারেনি ওর ভাগ্যের চাকাটাকে। ষ্টেজে কিন্তু ওর আঙ্গুলের ইসারায় অক্লেশে ঘোরে সুদর্শন চক্র।

তাই তো ঘরের চেয়ে জুপিটার থিয়েটারের ষ্টেজের চার পাশেই থাকতে চায় ও বেশিক্ষণ। তাই তো মাঝে মাঝেই ধানের সুরা গলায় ঢেলে সারা রাত বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে ও জড়ো করা সেট সেটিং-এর মাঝখানে আবুহোসেনের নবাবী তখতটাকে পেতে।

চিনি ঐ গেটকীপার সৌরেন বাবুকে। মোটা-সোটা বৃদ্ধ মানুষটি। মোটা লংক্লথের কাঁধে-বোতাম পাঞ্জাবীতে ঝোলে তাঁর ˙˙ লাগানো রূপোর বোতাম। সে জামা আধময়লা কেন, তেলচিটেও হতে পারে ; কিন্তু এলোমেলো নৈব নৈব চ। সংসার একেবারে অস্বচ্ছল নয়। দুই ছেলে চাকরি করে। একজন প্রেসের কম্পোজিটর, আরেকজন কোন অফিসে চিঠি লাগায়। বত্রিশ টাকা পেন্সন মেলে ওঁর পুরোনো বর্মাশেল থেকে। জুপিটার থিয়েটারের গেটকীপারীতে পান দু'টাকা রোজ। এ কনট্রাক্ট ওঁর নিজেরই করা। মাস-মাইনের ঘানিগাছে বাঁধা পড়তে রাজি নন আর এ বয়েসে। সকালে সংসারের বাজারটি করে দিয়ে নিদ্রা দেন একটি। দুপুরে ভাতটি মুখে দিয়েই বেরিয়ে পড়েন ছাতাটিকে বগলে নিয়ে। দুপুরের নির্জন পার্কে ঢুকে কোনো এক গাছের ছায়ায় বোসে ঘাসের ওপর সযত্নে বিছিয়ে দেন তাঁর সম্পত্তি ;—একটি ছুরি, কিছু গাঁজার পাতা, এক টুকরো পাটের দড়ি, এক খণ্ড ঠিকরে, পরিপাটি কোরে ভাঁজকরা একটি হলুদ রঙের রুমাল, একটি দেশলাই, যার প্রত্যেকটি কাঠিকে দাড়ি কামানো ব্লেড দিয়ে কেটে দু-চির করা।

ধীরে-সুস্থে গাঁজার ছোট্ট কলকেটিকে সেজে তৈরী করতে দুপুর একটা থেকে তিনটে বেজে যায়। টানতে পনেরো মিনিট। আবার প্রত্যেকটি সরঞ্জাম গুছিয়ে তুলতে সওয়া তিনটে থেকে পুরো সওয়া চারটে। তারপর পার্কের পুকুরের ধারে এসে চুপ চাপ বসে থাকেন আধ ঘণ্টা। এবং থিয়েটারের দিন তার পরেই জুপিটারে এসে পৌঁছে যান সওয়া পাঁচটার মধ্যেই।

জুপিটার থিয়েটারের গেট-এ বোসে টিকিটের আধখানা ছেঁড়েন অত্যন্ত ধীরে এবং অতি নিখুঁত ভাবে। তারপর শেষে সেই আধখানা টিকিটের বাণ্ডিলটিকে রবারের ব্যাণ্ড দিয়ে সুন্দর কোরে বেঁধে টিকিট-ঘরে জমা দিয়ে বাড়ি ফেরেন অনেক রাত্তে। যাবার আগে হরিবাবুর চায়ের ষ্টলে বসে যান কিছুক্ষণ তখন ঘিরে ধরে ওঁকে কমবয়েসী গেটকীপার আর ষ্টেজের ছোক্‌রার দল। প্রশ্ন করে : আজকের হিসেব দাদু ?

সৌরেনবাবু চায়ের কাপে আলতো চুমুক মেরে বলেন : তেরটি বুড়ি, একুশটি যুবতী, সাতটি খুকী। আইবুড়ো যুবতী আঠারো, বিয়েওলা তিন।

কেউ বলে : নীল রং-এর শিফন শাড়িকে দেখেছ দাদু ?

চায়ের দ্বিতীয় চুমুক মেরে সৌরেন বাবু উত্তর দেন : তার সঙ্গের ছোক্‌রাটি ওর দাদাও নয়, কাকাও নয়, মামাও নয়।

: আর ঐ কালো জমির ওপর টকটকে লালের ফুলপাড় শাড়ির ঘোমটা ?

: শাশুড়ীর আদরিণী, এক ছেলের বৌ।

: ঐ যে ঢাকাই শাড়ি সাদা ফুলের ?

: ওর বাঁ-পাশের বৌটির আইবুড়ো ননদ ও। ডান পাশে ওর দাদা : দাদাবৌদির দাম্পত্য কলহ চলছে।

: পাঁচ টাকার সীটের একাকিনী হর্সটেল খোঁপা ?

: দোকাকিনী হবার জন্ত মুখিয়ে আছেন।

প্রতিদিনের টিকিটের নিখুঁত হিসেব টিকিটঘরে এবং এদিকের কাল্পনিক হিসেব উৎসুক ছোক্‌রাদের কাছে দাখিল কোরে বাড়ি ফেরেন সৌরেন বাবু।

ঐ যে বুড়ো সেন মশাই,—মাঝে মাঝে যিনি সটান চলে আসেন ষ্টেজের অন্দরমহলে,—কেমন একটা নির্লিপ্ত দার্শনিকের মতো চোখ কোরে ঝিমোন ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে ;—চিনি ওঁকে।

শোভাবাজারের সাবেকী গলির মোড়ে পাৎলা ইটের নোণাধরা একটা বাড়ির নিচে আছে ওঁর কবরেজী ওষুধের ছোট্ট দোকান।

দোকানের দরজার পাল্লায় লটকানো এক টুকরো পিসবোর্ডে দোয়াতের কালি দিয়ে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা আছে,—মোদক। মোদক-এর 'দ' অক্ষরটা ইংরিজি N-এর মতো উল্টোদিকে।

এককালে নাকি তাঁর দোকানের একটি চালু ব্রাঞ্চ ছিল এই জুপিটার থিয়েটারে। তখন এখানকার নাটকে সখীর দল নৃত্য করত। ধীরে ধীরে থিয়েটারের মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে লাগল তারা। সেন মশায়ের ব্যবসাতেও মন্দা পড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে। সেন মশায়ের সেদিনের ওষুধ গোপনে আসত ক্যাম্বিসের ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে। লোকচক্ষুর আড়ালেই তা পরিবেশিত হত খদ্দিরদের হাতে হাতে।

এখনও আসেন আশা নিয়ে,—যদি কপালগুণে জুটে যায় খদ্দের। মাঝে মাঝে এক আধটা জুটেও যায় হয়ত। নৈলে আসেন কেন?

চিনি ঐ হরকিষণ পানওয়ালার বাচ্চা ছেলে শিউরতনকে। পেতলের কানা-উঁচু কাঁসিতে মিঠে পানের দোনা সাজিয়ে ফিরি করে সে প্রেক্ষাগৃহে এবং মঞ্চের অন্দরমহলেও।

খাঁকি হাফসার্ট আর হাফপ্যান্ট ওর পরনে। মাথায় ছোট্ট শিখা। দু' চোখ ভর্তি সারল্য আর বিস্ময়। যতক্ষণ প্রেক্ষাগৃহে থাকে, মহা উৎসাহে পান বেচে ও। পান দেয়, সুপুরি দেয়, জর্দা দেয়, চুণ দেয়,—ভাঙানি খুচরোর ঝটপট হিসেব করে। চেয়ারের দুটো রোয়ের মাঝখানের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে অক্লেশে ছুটে চলে ও ওর ছোট্ট শরীরটাকে নিয়ে। কোন এক অদ্ভুত কায়দায় ওর তের বছরের কচি গলা থেকে তেতাল্লিশ বছরের গাঁজা-খাওয়া গলার আওয়াজ বের কোরে চেঁচায়—সোডা লিমনেড মিঠা পান।

প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে জুপিটার থিয়েটারের ষ্টেজের অন্দরমহলে এসে ঢুকলেই কিন্তু ওর সব লাফালাফি বন্ধ হয়ে যায়। বেমালুম ভুলে যায় ও পান বেচবার কথা। এক পাশে দাঁড়িয়ে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আসা-যাওয়া, শিফটারদের ছোটাছুটি আর লাইটম্যানদের ব্যস্ততার দিকে। আর, হরিণ-ছানার মত চঞ্চল চোখে কেবলি কী যেন খোঁজে।

সে খোঁজা বন্ধ হয় অভিনেত্রী বিজলীকে দেখতে পেলেই। তখন চারপাশের আলো সিন দড়ি বাঁশ পরচুল পোশাক বাজনা সব কিছু বিলীন হয়ে যায় তার চোখের সুমুখ থেকে, এক নিমেষে মিলিয়ে যায় সব। শুধু জেগে থাকে বিজলীর মুখ।

কিন্তু বিজলী ওর দিকে তাকালেই লজ্জায় ছুটে পালিয়ে যায় ও। এক ছুটে ষ্টেজের অন্দরমহল ছেড়ে বাপের দোকানটিতে গিয়ে বসে চুপচাপ। তারপর একসময় গোলা খয়েরের চকচকে ঘটিতে পেতলের হাতল লাগানো কাঠের টুকরোটাকে নাড়তে নাড়তে কর্মব্যস্ত পিতার কাছে ব্যাকুল প্রশ্ন জানায়,—কবে তারা ফিরে যাবে আবার ছাপরা জেলার সেই ধুলো-ওড়া গ্রামটিতে। কলকাতায় থেকে সে যে কত বড়টি হয়েছে, সেটা কবে গিয়ে দেখাবে তার সেই মাকে, বিজলীর মুখের মধ্যে আছে যার অনেকখানি আদল?

চিনি প্রবীর মিত্তিরকে। আমার নাটকের সুদর্শন নায়ক। কলকাতার বনেদী ঘরের ছেলে। পায়ের গোড়ালীতে গোলাপী রং। অবিবাহিত আজও। পিতা নেই। সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে মামলা চলেছে কাকাদের সঙ্গে। বাড়ির বড় বড় ঝাড়-লণ্ঠনগুলোয় তাই ঝুলছে ঝুল, দেওয়ালের কড়ি-বরগায় তাই ধরছে উই, বৈঠকখানার মেহগণি কাঠের আসবাবে তাই বাসা করছে ইঁদুর।

এষ্টেটের আয় রিসিভারের বাক্স উপছে বিবদমান সরিকদের হাতে গিয়ে পৌঁছয় না। পয়সার দরকার। সত্যিই দরকার। তবু অভিনয় কোরে মাইনে নেবে না প্রবীর কিছুতেই। চাইলেই পায়। মোটামুটি যথেষ্টই পেতে পারে। তবু নেবে না। ওটা শখের জিনিষই থাকবে। পয়সার জন্যে বেণেপুকুরের মিত্তিরবাড়ির ছেলে ছোট্ট এক চিলতে ঘরে ডাইংক্লিনিং খুলেছে একটা। তবু, অভিনয় কোরে মাইনে নিতে পারবে না সে মরে গেলেও।

ঐ যে বিদ্যুৎ বোস, মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করে,—বাগনানে বাড়ি,—আমার নাটকে তরজা গানের আসরের দৃশ্যে সেজেগুজে বসে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে;—চিনি ওকে।

ভিড়ের মধ্যে ষ্টেজের কোথায় যে ও' বসে! কে জানে, দর্শকদের কজনেরই বা নজরে পড়ে বেচারা। ঐ পার্টের জন্যেই ও' কিন্তু মেক্‌আপ নেয় পুরো একটি ঘণ্টা ধরে। অভিনয় শেষে লাষ্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরতে গভীর রাত হয়ে যায়।

বাড়ি যাবার আগে রোজ একবার কিন্তু দেখা কোরে যাওয়া চাই ওর আমার সঙ্গে। উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে,—'আজকে দেখেছিলেন আমার পার্ট?'

পার্ট মানে, তরজাগানের তালে তালে তেরো জোড়া মাথার সঙ্গে নিজের মাথাটাকে শুধু দোলানো নির্বাক হয়ে।

কোন দিন বলি,—চমৎকার হয়েছে। কোন দিন বলি,—আজ তেমন খোলতাই হয়নি হে!

ও-দুটো কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে হয়।

'চমৎকার হয়েছে' শুনে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ওর মুখ। 'খোলতাই হয়নি' শুনে মুখ হয়ে ওঠে মলিন। করুণ কণ্ঠে বলে,—'আজ শরীরটা ঠিক জুৎসই ছিল না। কাল দেখবেন আপনাকে খুশি করবই করব।'

ওর তরজার দৃশ্য দেখা হয় না। তখন ড্রেস বদল করতে হয় আমাকে। কোন দিন সময় কোরে নিয়ে দেখলেও ভিড়ের মধ্যে কে কেমন মাথা নাড়াচ্ছে চোখেও পড়ে না, পড়বার কথাও নয়। তবু চার'দিন উপ্‌রো-উপরি 'চমৎকার হয়েছে' বলবার এক দিন আমাকে গম্ভীর মুখ কোরে বলতেই হয়,—'আজ তেমন খোলতাই হয়নি হে!'

ভেবেছিলুম, আর সকলের মতই আমার নাটকের নায়িকার ভূমিকাভিনেত্রী মালবিকা মজুমদারকেও বুঝি চিনি আমি। ভুল ভাঙতে কিছু সময় লাগল।

মালবিকা মজুমদারকে দেখছি এই জুপিটার থিয়েটারে এসে থেকে। চমৎকার মানুষ। শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, সুশ্রী। রিহার্সালে এসে নিজের পার্টটুকু বোলে একপাশে সরে গিয়ে সোয়েটার বুনতেন আপন মনে। মাঝে মাঝে হয়ত কোন দৃশ্যের সংলাপ বা অভিনয়ভঙ্গি সম্বন্ধে ছোট্ট মন্তব্য করতেন। ভঙ্গি বিনীত, যুক্তি তীক্ষ্ণ, ভাষা মার্জিত।

স্বামী আসতেন। কোন্ সওদাগরী আপিসে কাজ করেন। গেরুয়া রঙের হাওলুম কাপড়ের পাঞ্জাবী থাকত তাঁর গায়ে, পায়ে খয়েরি চামড়ার চকচকে কাব্‌লি- কাঁধে ঝুলনো থাকতো রঙচঙে ঝোলা। কোনদিন তা থেকে বার হতো পানিফল, কোনদিন শাঁখালু ;—কোনদিন কড়াইশুঁটির কচুরি, কোনদিন বা চিংড়ির কাটলেট দুখানি।

তিনি এলেই দুজনে বেরিয়ে যেতেন রিহার্স্যাল-রুম ছেড়ে। স্বল্পালোক বারান্দার একধারে পাতা টেবিলের দুধারে মুখোমুখি বসতেন যুগলে। হরিবাবুর চায়ের ষ্টলের ছোক্‌রা কানাই আশ্চর্য কায়দায় এক ফোঁটা চা-ও মাটিতে না ফেলে ঢাকা-দেওয়া ডিশ্ উল্টিয়ে ধোঁয়া-ওঠা গরম চা ধরে দিত তাঁদের সুমুখে। তারপর খালি চায়ের কাপের সঙ্গে নিয়ে যেত দু'পয়সা বক্‌শিস।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে যেতেন স্বামীদেবতা। যাবার আগে রিহার্স্যালরুমের দরজা থেকে আমাদের সবাইকে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে যেতে ভুল হত না তাঁর কোনদিন। মালবিকা দেবী ফিরে এসে আবার বসতেন নিজের জাগয়াটিতে। আবার সোয়েটার বুনতেন রিহার্স্যালের ফাঁকে ফাঁকে।

তিন বছর আগেও মালবিকা স্বপ্নে ভাবেনি যে, সে থিয়েটারের অভিনেত্রী হবে কোনদিন। বাঙলায় অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হবার পর হয়েছিল সে স্কুলের শিক্ষিকা। তারপর হঠাৎ কেমন কোরে নিওরিয়েলিষ্টিক ছবির নবীনতম এক পরিচালকের প্রথম ছবিতে ঠাঁই পেয়ে গিয়ে রাতারাতি প্রসিদ্ধা হয়ে উঠলেন মালবিকা দেবী, সে গল্প এখন থাক। সভা-সমিতি মানপত্র-অভিনন্দনের উচ্ছ্বাসের বন্যার জল সরে যেতে মালবিকা দেবী দেখলেন, অভিনয়ের নেশা পেয়ে বসেছে তাঁকে, কিন্তু ডাক নেই তাঁর কোথা থেকেও। কেন? তা আজও জানেন না মালবিকা।

নেশার তাগিদে মালবিকা ঢুকলেন এমন এক সৌখীন নাটুকে দলে, যারা অভিনয়ের চেয়ে বেশি করে পলিটিক্স। হয়ত অভিনেত্রী না হয়ে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক নেত্রীই হয়ে উঠতেন মালবিকা, কিন্তু তার আগেই আমাদের এই জুপিটার থিয়েটারের নবীন নাট্য-পরিচালক শুভেন রায় আমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে।

জুপিটার থিয়েটারে রিহার্স্যালের পালা শেষ হয়ে নাটকের প্রদর্শনী সুরু হল একদিন। মালবিকা তখনো বুনে চলেন সোয়েটার,—দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে, সাজের টেবিলে বোসে। স্বামী আসেন তেমনি। হরিবাবুর ষ্টল থেকে তেমনি আসে চা। আমরা অপেক্ষা করেছিলুম, কবে দেখতে পাব স্বামীদেবতার গেরুয়ারঙের পাঞ্জাবীর ওপরে মালবিকা দেবীর হাতে-বোনা সোয়েটারটিকে।

কিন্তু তার আগেই—

প্রতিদিনের নিয়মিত আসায় ছেদ পড়ল মালবিকার স্বামীর। কয়েকদিন পর এলেন একদিন। হঠাৎ কি হল, চায়ের কাপ উল্টে চলে গেলেন তিনি হন্ হন্ করে। তারপর থেকে আর এলেন না। মালবিকা দেবীর সোয়েটার বোনা কিন্তু তখনও চলতে লাগল সমানে। তারপর শেষ হল একদিন বোনা। সকলে সবিস্ময়ে দেখল, সেটা শিশিরের গায়ে গিয়ে উঠেছে।

এতদিনে মালবিকা এবং শিশিরকে সঠিকভাবে চেনা গেল ভেবে যখন প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভ্রূ কুঞ্চিত করতে চলেছি, ঘরে ঢুকল শিশির ধীর পদে।

আমি নড়েচড়ে বসলুম। ঘৃণায় বিরক্তিতে কঠিন আমার চোয়াল।

: কৈ, অন্যদিনের মত বসতে বললেন না? শান্ত কণ্ঠে বললে শিশির।

: ওঃ, হ্যাঁ, বোসো। যন্ত্রের মত বললুম আমি।

সোয়েটারটা নির্লজ্জের মত ওর গায়ে চেপে বসে আছে।

এই সোয়েটারটা আমার গায়ে দেখে থেকে খুব একটা ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠেছেন, না?

অত্যন্ত ধীর অবিচল কণ্ঠে বললে শিশির।

কোন উত্তর না দিয়ে আমি আর্সির দিকে ফিরে নিজের ভুরুতে খয়েরি পেন্সিল ঘষতে লাগলুম।

: আমিও প্রথমটায় আপনাদের মতই চমকে উঠেছিলুম। শিশির বলতে লাগল: শুধু চমকেই উঠিনি, সেই সঙ্গে রাগে উত্তেজিতও হয়ে উঠেছিলুম বড় কম নয়। সোয়েটারটা যখন উনি হাতে তুলে দিতে এলেন আমায়, রাগে ঘৃণায় লজ্জায় কাঁপতে কাঁপতে বললুম,—এর মানে?

মানে? হাসলেন উনি। বললেন,—আজকের তিথিটাও কি তোমার মনে নেই শিশির?

মনে পড়ে গেল। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বললেন,—বুকের কাছে টানা বোতাম দেওয়া সোয়েটার; মাপ না নিলেও গায়ে তোমার ঠিক হবে দেখো।

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল। আর সেই ঝিমঝিমানির মধ্যেই কানে এসে কাঁপতে লাগল তাঁর কথাগুলো,—

সোয়েটারটা আমার স্বামীদেবতার জন্যে বুনছিলুম না শিশির, বুনছিলুম যার জন্যে, আজকের দিনেই তার গায়ে ওটা পরিয়ে দেব ভেবে রেখেছিলুম মনে মনে। কিন্তু তার গায়ের মাপ ঠিক নিলেও, মনের মাপ নিতে আমি নিতান্তই ভুল করেছিলুম শিশির। তাই সোয়েটারটা শেষ হবার আগেই তার সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্কটাই শেষ হয়ে গেল।

আমার স্বামীদেবতাটিকে আমি বাছিনি। তিনিই বেছে নিয়েছিলেন আমাকে। নবীন চিত্রপরিচালকের সঙ্গে পরিচয়সূত্রে প্রায়ই আসতেন ষ্টুডিওতে। বাছতে তিনি ভুল করেছিলেন, চিনতে আমিও ভুল করেছিলুম।

একদিন তিনি আলাপ করিয়ে দিলেন একটি ছেলের সঙ্গে। মস্ত তার গাড়ি। বয়েসে আমার চেয়ে হয়ত ছোটই হবে সে বছরখানেকের। বেশ লাগল তাকে। কচি মুখ। তীক্ষ্ণ চোখ। উৎসাহে সদা চঞ্চল। আজ সে এনে দেয় এটা, কাল ওটা। আজ রেডিও, কাল গ্রামোফোন, পরশু শাড়ি। সঙ্কোচ উঠছিল মনের মধ্যে ঠেলে। স্বামী বললেন, দিদি নেই ওর, বড় শখ একটি দিদির, তাই ভালবেসে দেয়; হাসিমুখে না নিলে মনে কষ্ট পাবে। সেই থেকে সুরু করেছিলুম এই সোয়েটার বোনা, একটি পবিত্র পুণ্যতিথিতে ওর গায়ে পরিয়ে দেব বোলে।

থিয়েটারের শেষে যে গাড়িটায় চেপে আমার স্বামী মাঝে মাঝেই আসতেন আমাকে নিয়ে যেতে, ওটা তারই গাড়ি। ঐ গাড়িতে কতদিন কত জায়গায় বেড়িয়েছি আমরা। ক্রমে ক্রমে

স্বামী আমার আর পিছনের সীটে বসতেন না, বসতে লাগলেন ড্রাইভারের পাশে। তারপর হঠাৎ একদিন একেবারেই আর উঠলেন না গাড়িতে। জরুরী কোন অজ্ঞাত কাজের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার শেষ মুহূর্তে গাড়ির দরজা বাইরে থেকে ঠেলে দিয়ে বললেন, যাও মালবিকা তোমরা, আজ আর যাওয়া হল না আমার।

গাড়ি ছেড়ে দিল। ছেলেটি আমার দিকে ঘেঁষে এল একটু। মাঝ-পথে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়া ছাড়া এর পর আর আমার উপায় ছিল না কিছু।

এর পর যা হল জানো তোমরা সকলে। স্বামী আমার চায়ের পেয়ালা উল্টে দিয়ে চলে গেলেন রেগে থিয়েটার ছেড়ে। সেই থেকে আর দেখা নেই আমার সঙ্গে। ওঁর প্রাক-বিবাহ-জীবনে অনেক টাকার দেনা নাকি মিটিয়ে দেবে বলেছিল ঐ ছেলেটি। তার অপমান সহ্য করতে পারলেন না তাই উনি।

সোয়েটার বোনা তবু কিন্তু থামাইনি আমি। শেষ করেছি অনেক আশা নিয়ে। ওটা নিতে যদি তোমার আপত্তি থাকে শিশির,—দাও ফিরিয়ে।

থিয়েটারের ওয়ার্নিং বেলটা বেজে উঠল তীব্রস্বরে। কথা অসমাপ্ত রেখেই উঠে যেতে হল শিশিরকে তাড়াতাড়ি।

সোয়েটারটা ওকে চমৎকার মানিয়েছে! [ক্রমশঃ

# দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া

(উপনিষদমালা ভাবানুবাদ)

সংসার-মাঝে ভোগ-সুখে রত মোর মন অনুখণ
তবু কারে স্মরি এত সুখ মাঝে ব্যাকুল হয় এমন?
দুর্লভতম সেই কোন জন
যাহার তরেতে আকুল এ মন
মিছে গৃহ-সুখ ধন-সম্পদ মিছে এই আয়োজন
সবারে পাইয়া না পাওয়া কাহারে চাহে যে আমার মন।

খুঁজে খুঁজে আমি চারি দিকে চাই সকলি কি মোর ফাঁকি
দিয়ে মোরে এই সুখসম্ভার আড়ালে রহিলে না কি?
তোমার কাছেতে পাইলে যে সুধা
মিটিবে আমার চিরতরে ক্ষুধা
তাহা তো দিলে না কেন মিছে এই মিথ্যা ছলনা মায়া
দুই নয় মোরা বিলগ্ন কায়া দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।

ভালোবাসি যারে প্রিয় যেই জন মরণ তাহারে লয়
ক্ষণেকে জীবন অসীম আঁধার গভীর বেদনাময়
দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত ধন
নিমেষে তাহারে করে সে হরণ
নির্ব্বাক হয়ে চাহি অপলক মনে ভাবি বিস্ময়
কোথা সেই জন মৃত্যু যাহারে ক্ষণেক না করে ক্ষয়।
যাহারে পাইলে বুক ভরে ওঠে সব ব্যথা যায় দূরে
হারায়ে যাঁহারে হবে না খুঁজিতে মিছে ত্রিভুবনে ঘুরে
মৃত্যু যাঁহারে স্পর্শ না করে
শোক লজ্জায় রহে দূরে সরে
এমন কে আছে তাঁহারে ভাবিলে তোমাকেই মনে পড়ে
চোখে আসে জল ভাষা নির্ব্বাক পুলকিত অন্তরে।

তুমি আছ মোর সকল জুড়িয়া আর ত দুঃখ নাই
পেয়েছি তাঁহারে অরূপ রতন সে আছে সকল ঠাঁই
তুমি আমি দোঁহে ভিন্ন ত নয়
নাই আমিত্ব সবি তোমাময়
তুমি যদি দেহ আমি তার সাথে ফিরি যে হইয়া ছায়া
দুই নয় মোরা বিলগ্ন কায়া দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।

অনুবাদিকা—পুষ্প দেবী

# অভিযাত্রী

ডক্টর নবগোপাল দাস, আই, সি, এস

## তেরো

সন্তোষের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হ'ল। মাসখানেকের মধ্যেই প্রদীপ একটা চাকুরী পেল—সরকারী দপ্তরে। মিঃ করই এই সুখবরটা দিলেন সর্বাগ্রে।

প্রদীপ মিঃ করকে তার কৃতজ্ঞতা জানাল। আর সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে ছায়া তার মনে ঘনিয়ে আসছিল তা-ও হালকা হয়ে গেল অনেকখানি। সরকার তাহলে গুণের আদর করতে জানে!

তার বিগত জীবনের অধ্যায় নিয়ে বন্দনার সঙ্গে পরিকল্পিত আলোচনার সুযোগ সে এত দিন পায়নি, নিজেই ইচ্ছা করে সময় প্রার্থনা করেনি। এখন স্থির করল, বন্দনাকে সব কথা বলবে।

চাকুরীতে যোগ দিয়েই সে উঠে গেল ছোট একটি ফ্ল্যাট-এ। গায়ত্রী এবং মিঃ কর দু'জনেই তাকে বলেছিলেন যে, সে নিঃসঙ্কোচে আরও কিছুকাল থেকে যেতে পারে, কিন্তু প্রদীপ রাজী হল না।

টেলিফোন করে সে বন্দনাকে জানাল যে, যে জরুরী কথা বলবার জন্য তার কাছে সময় ভিক্ষা করেছিল তা সে বলতে চায় আর দেরী না করে। বন্দনা একবার তার ফ্ল্যাট-এ আসতে পারবে কি?

যথাসময়ে বন্দনা এল।

দু'-একটি অবান্তর বাক্য-বিনিময়ের পর প্রদীপ বলল, অত্যন্ত গুরুতর কয়েকটা কথা জানাবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। আমি চেষ্টা করব যথাসম্ভব পরিষ্কার করে বলতে, যদি তোমার কোন প্রশ্ন থাকে, উত্থাপন করতে দ্বিধা করো না।

—তুমি বলে যাও, প্রদীপ!

—ছবির কথা বলতে চাচ্ছি। বলে প্রদীপ সুরু করল।

বন্দনা বাধা দিয়ে বলল, কোন প্রয়োজন নেই, প্রদীপ! গায়ত্রীদি'র কাছে তোমার লেখা চিঠি আমি দেখেছি। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি, আমার কাছে জবাবদিহি করবার কোনই প্রয়োজন নেই।

প্রদীপ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। গায়ত্রী যে তার চিঠি বন্দনাকে দেখিয়েছে এই সংবাদের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না, গায়ত্রী এ সম্বন্ধে তাকে কিছুই বলেনি।

তারপর বলল, চিঠিতে সব কথা খুলে বলা সম্ভব হয়নি, বন্দনা! আরও বলবার আছে।

—বলো।

প্রদীপ তখন বলল, কেন সে প্রথমে গিয়েছিল মোমিনপুরের ফ্ল্যাট-এ। তারপর জানাল নবকিশোরের সঙ্গে তার কথাবার্ত্তার ইতিবৃত্ত, অবশেষে তাকে বলল মোমিনপুরে নবকিশোর ছবির সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাতের কাহিনী।

চুপ করে বন্দনা শুনল, তারপর বলল, তুমি কোন অন্যায় করোনি, প্রদীপ!

—কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। ছবির সঙ্গে বিলেতে ব্রাইটন-এ দেখা হয়েছিল।

—আমি সেকথাও জানি। গায়ত্রীদি'র কাছে লেখা তোমার চিঠিতে তার উল্লেখ ছিল।

—কিন্তু কি হয়েছিল তা আমি লিখিনি, বন্দনা! লিখতে ভরসা পাইনি। আজ তোমাকে সেই কথাই বলব।

ধীরে ধীরে সে বর্ণনা করল ব্রাইটন-এর সমুদ্রতীরে ছবির সঙ্গে তার মাঝে মাঝে দেখা হওয়ার কথা, তারপর সে বলল, কি ভাবে ছবি এসেছিল তার বোর্ডিং হাউস-এ, কেমন করে সে প্রলুব্ধ হয়েছিল ছবির যৌবনে এবং পরিশেষে ছবি তাকে করেছিল প্রত্যাখ্যান।

বন্দনা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, আমি যদিও এই শেষ অধ্যায়ের অনুমোদন করছি না। করতে পারি না, তবু আমি তোমার মনের গতি বুঝবার চেষ্টা করছি। আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবে এই জাতীয় পরিস্থিতির কথা বই-এ পড়েছি। তুমি যখন বলছ ছবির সঙ্গে তোমার সমস্ত সম্পর্ক ধুয়ে-মুছে গেছে এবং তুমি তোমার নিজেকে ফিরে পেয়েছ, তখন আমি তোমার জীবনের এই অধ্যায় ভুলে যেতে প্রস্তুত আছি। প্রদীপ!

ঘর অন্ধকার হয়ে এল। প্রদীপ উসখুস করতে লাগল। এবার তাকে করতে হবে সব চেয়ে কঠিন স্বীকৃতি, বলতে হবে এমিলির কথা!

কিন্তু বলবে কি সে? ছবির কাহিনী বন্দনা যতখানি সহজ ভাবে নিতে পেরেছে তেমন সহজ ভাবে কি নিতে পারবে এমিলির সঙ্গে প্রদীপের জীবনের অধ্যায়? না, না, বন্দনাকে অবশেষে সে ফিরে পেয়েছে, তাকে হারাতে সে প্রস্তুত নয় কোন কারণেই।

বন্দনা বলল, তোমার কাহিনী শেষ হয়েছে ত?

—আজকের মত শেষ হয়েছে।

—আরও অনেক গল্প আছে বুঝি? সে পরে একদিন শোনা যাবে, কেমন? তখন ত অনেক সময় পাওয়া যাবে! বলে চটুল চোখে বন্দনা প্রদীপের দিকে তাকাল।

এমিলির কথা প্রদীপ বন্দনাকে না বললেও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সে জানতে পারল সেই অধ্যায়ের ঘটনাবলী। সংবাদবাহক হল সুমিত্রা নিজে।

সুমিত্রা শুনেছিল তার স্বামী নবকিশোরের কাছে এবং নবকিশোর শুনেছিল ছবির কল্যাণে।

বিলেতের ট্রেনিং শেষ করে ছবিও দেশে ফিরে এসেছিল। এসেই সে নবকিশোরের সঙ্গে দেখা করেছিল। কথা প্রসঙ্গে নবকিশোর শুনেছিল প্রদীপ এমিলির কথা, যে হাসপাতালে এমিলির

মৃত্যু হয় সেখানেই যে সে ট্রেনিংএ ছিল তাও জেনে নিয়েছিল নবকিশোর।

বেশ খানিকটা অতিরঞ্জিত ভাবেই খবরটা পৌঁছল বন্দনার কাছে।

স্তব্ধভাবে শুনল বন্দনা। তারপর বলল, তুই না আমার বন্ধু, সুমিত্রা?

থতমত খেয়ে সুমিত্রা বলল, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই

—তাহলে কেন এসব কথা আমায় বলতে এলি তুই? যে অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে, যে মেয়ে পৃথিবীর ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে, তার ইতিহাস জেনে আমার কি লাভ হল আজ?

আমতা-আমতা ক'রে সুমিত্রা জবাব দিল, শুনলাম, প্রদীপ তোকে বিয়ে করবে বলেছে, তাই ভাবলাম বিলেতের জীবনের এই কাহিনীটা তোর জানা উচিত, যাতে তুই বুঝতে পারিস সে তোর যোগ্য কি না।

অবসন্ন কণ্ঠে অথচ একটু শ্লেষ মিলিয়ে বন্দনা বলল, তোদের মঙ্গল কামনা থেকে আমাকে একটু অব্যাহতি দিলেই আমি খুসী হ'ব, সুমি!...আর প্রদীপ আমার যোগ্য অযোগ্য কি না সেটা বোঝবার মত বয়স আমার হয়েছে।

টেলিফোনে বন্দনার গলার স্বরটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল প্রদীপের কাছে। অফিস থেকে ফিরেই সে ছুটে গেল অটলবিহারী বাবুদের বাড়ীতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, ভেতরের বারান্দায় একা বসে আছে বন্দনা।

—বসো। গম্ভীর ভাবে বন্দনা বলল।

প্রদীপ বসল।

—সুমিত্রা এসেছিল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসুচোখে তাকিয়ে রইল।

—এসেছিল বন্ধুর কাজ করতে। তোমার এমিলির ইতিবৃত্ত জানাতে।

চমকে উঠল প্রদীপ। বন্দনার সঙ্গে মিলনের যে সেতু নতুন ক'রে গড়ে উঠেছিল তাহ'লে সেটা আবার নির্মম ভাবে ভেঙে দিল নবকিশোর? প্রদীপের আর কোনই সন্দেহ রইল না যে খবরটা দিয়েছে ছবি নবকিশোরকে, আর নবকিশোর তা' বলেছে তার স্ত্রী সুমিত্রাকে।

মুখ নীচু করে প্রদীপ প্রশ্ন করল, আমার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাও কি?

—বলতে পার। ক্লান্ত সুরে বন্দনা বলল।

অন্ধকার আরও গভীর হয়ে এসেছে। যে অন্ধকার এনে দেয় বিস্মৃতির শান্ত প্রলেপ, অনুরাগের স্নিগ্ধ সৌরভ, তা' আজ কেন বিভীষিকাময় ঠেকছে?

সংক্ষেপে প্রদীপ বলল এমিলির সঙ্গে তার জীবনযাত্রার কাহিনী। কি ভাবে তাদের আলাপ হয়েছিল, কি ভাবে এমিলি এসেছিল তার অঙ্কে এক নববর্ষের প্রত্যূষে, কি ভাবে কেটেছিল একটি বৎসর, এবং কি ভাবে তার পরিসমাপ্তি হয়েছিল আর এক নববর্ষের প্রভাতে।

কাঠ হয়ে শুনল বন্দনা। উদ্‌গত অশ্রু শুকিয়ে গেল তার চোখে, হৃৎপিণ্ডের গতি যেন বন্ধ হয়ে এল।

তারপর বলল, এই সব? না এর পর আরও কোন অধ্যায় আছে, ডরোথি বা মার্গারেটকে অবলম্বন করে?

আহত স্বরে প্রদীপ জবাব দিল, না, এই সব।

তারপর বলল, সেদিনই হয়ত বলতাম, কিন্তু তোমাকে আবার হারাবার সম্ভাবনা আমাকে করে ফেলেছিল দুর্বল, ভয়াতুর।

—আর এখন বুঝি সে সম্ভাবনাটা সেই? তীব্রকণ্ঠে বন্দনা প্রশ্ন করল।

প্রদীপ মাথা হেঁট করে রইল।

বন্দনা বলে চলল, তোমার কাছে এটা হয়ত একটা বিরাট, একটা অমূল্য অভিজ্ঞতা, কিন্তু আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি তোমার এই স্বেচ্ছাচারী দুর্বলতার প্রকাশ দেখে। তোমার সাহসও ত কম নয়! ওদিকে তোমার বিদেশিনী বান্ধবীর সঙ্গে তুমি চালিয়েছ তোমার লীলা, আর আমার কাছে করে গেছ মৃদু প্রেমনিবেদন! আর যেহেতু এখন তোমার হৃদয়ের রক্তাক্ত দুয়ার আমার সামনে খুলে ধরেছ। তুমি আশা করছ আমি মুছে দেব সেই রক্ত, পরিচর্যা করব তোমার আঘাত? স্পর্দ্ধার, আত্মম্ভরিতার একটা সীমা থাকা উচিত, প্রদীপ!

প্রদীপ বলবার চেষ্টা করল, আমার কোনই স্পর্দ্ধা নেই, বন্দনা! আমি এসেছি...

বাধা দিয়ে বন্দনা বলল, তুমি এসেছ অনুশোচনার উপঢৌকন নিয়ে, এই ত?...যথেষ্ট ধন্যবাদ তোমার অনুশোচনা তোমার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকুক, আমাকে তার অংশ গ্রহণ করতে বলো না।

বন্দনা উঠে দাঁড়াল। বলল, কেন তুমি নিজেকে এতটুকু সংযত করে রাখতে পারলে না, প্রদীপ? আমার অন্তর-নিংড়োনো সমস্ত অনুরাগ দিয়ে যে বিগ্রহকে আমি পুজো করছিলাম কেন তা' তুমি এমন নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে দিলে?

ব'লে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। তার আর্ত্তস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল রাত্রির অন্ধকারে।

দু'দিন পরে প্রদীপ গেল গায়ত্রীর কাছে। তার রুক্ষ চেহারা, উস্কোখুস্ক চুল দেখে গায়ত্রী প্রশ্ন করল, এ কি চেহারা তোমার হয়েছে, প্রদীপ? অসুখ করেনি' ত?

—না। প্রদীপ জবাব দিল।

—তবে? বন্দনার সঙ্গে ঝগড়া করেছ বুঝি? সস্নেহে গায়ত্রী প্রশ্ন করল।

—না, প্রদীপ আবার জবাব দিল।

তারপর বলল, দিদি, সব গোলমাল হয়ে গেছে, এবার শোধরাবার আর পথ নেই।

—আমাকে খুলে বলো প্রদীপ!

প্রদীপ খুলে বলল সব কথা, প্রথম থেকে শেষ অবধি। আর বর্ণনা করল বন্দনার মনের প্রতিক্রিয়া।

সব শুনে গায়ত্রী বলল, তুমি বড্ড বোকামি করেছ।

—কি বোকামি করলাম, দিদি? আমি ত যেচে বন্দনাকে বলতে যাইনি!

—বোকামি হয়েছে সব চেয়ে প্রথমে, তোমার সেই সন্তোষ

মুখুজ্যের প্ররোচনায় পড়ে ছবির সঙ্গে আলাপ করায়। ভেবে দেখ দেখি, ছবি যদি এর মধ্যে জড়ানো না থাকত, তাহলে বন্দনা বা সুমিত্রা কি ঘুণাক্ষরে জানতে পারত তোমার এই বিদেশিনী বান্ধবীর কথা ?

এর জবাবে কি আর বলবে প্রদীপ ? সে চুপ করে রইল।

একটু পরেই মিঃ কর এলেন। তাঁর মুখ চিন্তাকুল। প্রদীপকে দেখে বললেন, এই যে প্রদীপ, তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে। তোমাকে একটা কথা বলবার ছিল।

প্রদীপ জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাল।

—কথাটা হচ্ছে এই যে, সরকারী চাকুরীতে তুমি নতুন ঢুকেছ, একটু সাবধানে চলাফেরা করো, যেখানে সেখানে যেয়ো না।

প্রদীপ ঠিক বুঝল না মিঃ কর কি বলতে চান। গায়ত্রীও বিস্মিত ভাবে স্বামীর দিকে তাকাল।

—এর মধ্যে তুমি এক বামপন্থীদের মিটিংএ গিয়েছিলে শুনলাম ? সেখানে খুব গরম বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল, তুমি নাকি তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলে ?

এই কথা ? স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রদীপ বলল, আপনি ভুল শোনেননি মিঃ কর, তবে শেষের দিকটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমার এক পুরানো বন্ধুর ( বন্ধু বলা হয়ত ঠিক হচ্ছে না, পরিচিত বললেই সঙ্গত হবে ) সঙ্গে দেখা, একথা সে-কথার পর আমাকে টেনে নিয়ে গেল তাদের মিটিং-এ, আমি সেখানে ছিলাম একজন শ্রোতা ভাবে, কোন অংশগ্রহণ করিনি, প্রয়োজনও হয়নি।

—কি হয়েছিল এই মিটিংএ ?

—কি আর হবে ? সভাপতি খুব লম্বা-চওড়া গলায় বললেন, মিলে go-slow trchics অবলম্বন করতে হবে শ্রমিকদের, যাতে মালিকেরা disciplinary action নিতে বাধ্য হয়, তার পর সময় এবং সুযোগ বুঝে শ্রমিকরা করবে ধর্ম্মঘট।

—তুমি আশা করি এ-সব পদ্ধতিতে বিশ্বাস কর না ?

হেসে প্রদীপ বলল, নিশ্চয়ই নয়, মিঃ কর। শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ হয়ত আছে, কিন্তু তার প্রতিকারের পথ ত নয়।

—শুনে সুখী হ'লাম। ভবিষ্যতে আর কখনও এজাতীয় মিটিংএ যেয়ো না, তোমার চাকরীর ক্ষতি হতে পারে।

প্রদীপ বিস্মিত ভাবে বলল, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। শ্রোতা বা দর্শক হিসেবেও যাব না ?

—না, কারণ পরে ওরা তোমারই নাম করে বলবে যে তোমার সহানুভূতি আছে তাদের প্রতি। সেটা খুব বাঞ্ছনীয় হবে না। এই যে আমি খবর পেলাম এ-ও তোমার সেই বন্ধুর দৌলতে, সে নিজে এসে আমাদের দপ্তরে বলে গেছে যে তুমি তাদের একজন সমব্যথী, যাকে বলে sympathiser !

অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করছে প্রদীপ। আরও কত শেখবার, জানবার আছে, কে বলতে পারে ?

বন্দনার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ ক'রে দিল প্রদীপ। বন্দনার প্রতি কোন অভিযোগ নেই তার, ঠিকই বলেছে বন্দনা, অত্যন্ত দুঃসাহস এবং স্পর্দ্ধা তার যে, সে এক দিকে উপভোগ করেছে এমিলির সাহচর্য, অপর দিকে বন্দনাকে করেছে মৃদু প্রেমনিবেদন। যদিও তার চিঠিতে প্রেমের কোনই উল্লেখ ছিল না, তবু তলিয়ে দেখলে আর কে পর্য্যায়ে সে ফেলতে পারে তার চিঠিগুলো ? তার প্রতি বন্দনার অনুরাগকে জাগিয়ে রাখার সূক্ষ্ম প্রয়াস কি ছিল না এই চিঠিগুলো?

সত্যি, সে বড় একা। এই একাকীত্বের বোঝাই তাকে টে[নে] আনে অনমুভূতপূর্ব্ব সংস্থায়, পরিস্থিতিতে। প্রথম থেকে [এ] অবধি জীবনটাকে পর্য্যালোচনা করলে তাই মনে হয় না কি মেদিনীপুরে সে গিয়েছিল, কেন ? স্বাতন্ত্র্যের বোঝা তাকে ক' তুলেছিল অভিভূত, তাই সে চেয়েছিল বিক্ষুব্ধ জনতার স্রোতে নিজে ছড়িয়ে দিতে, কিন্তু সফল হয়নি। তারপর সন্তোষের সঙ্গে মোমিনপু[র] অভিযান, ছবির সঙ্গে পরিচয়, তার পেছনেও কি ছিল না নিজে একাকীত্ব দূর করবার একটা ক্ষীণ প্রয়াস ? বিলেতেও সে শা[ন্তি] পায়নি যত দিন না তার পরিচয় হ'ল এমিলির সঙ্গে। এমিলি[র] আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ, এ-ও হচ্ছে তার একাকীত্বের প্রতিক্রিয়া। [আ]জ এখনও যে সে বন্দনাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, তার অর্থও [কি] সেই একই নয় ?

কিন্তু এক মাত্র সেই কেন একাকী ? তার চার দিকে অগুণ[তি] নর-নারী—তাদের মুখ দেখে ত মনে হয় না একাকীত্বের বোঝা তাদে[র] জীবনকে করে রেখেছে দুঃসহ ? তারা সর্ব্বদা ব্যস্ত, সুখ-দুঃখ, ন্যা[য়] অন্যায় নির্বিচারে মেনে নিয়ে তারা জীবনের সঙ্গে করেছে সন্ধি স্থাপ[ন] সে কেন পারছে না ? তার অহমিকাই কি একমাত্র প্রতিবন্ধক আদর্শবাদের প্রতি যে স্তুতি সে জানায় তার কতটুকু অন্তরের কথ[া] আর কতটুকুই বা বাইরের খোলস ?

না, যত দুঃখই তার অদৃষ্টে থাকুক না কেন, নিজের স্বাতন্ত্র্য[কে] সে কিছুতেই সম্পূর্ণ ভাবে বলি দিতে পারবে না সুবিধাবা[দের] যুপকাষ্ঠে। লোকে তাকে হয়ত বলবে queer, বেসংসারী, এমন [কি] দাম্ভিক। বলুক তারা, সে মাথা পেতে মেনে নেবে তাদের নিরপে[ক্ষ] অথচ কঠোর বিচার।

## চৌদ্দ

প্রদীপ চেষ্টা করল তার নতুন কাজে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে তার অফিস কলকাতায়, কিন্তু সে ঘুরে বেড়াতে লাগল সেই [স]ব অনধিগম্য জায়গায়, যেখানে তার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা সচরা[চর] যান না। এই পরিভ্রমণের ফলে সে অর্জ্জন করল সম্পূর্ণ নতু[ন] রকমের অভিজ্ঞতা। সে দেখল জনসাধারণ বা নিম্নস্থ কর্ম্মচারী উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে ওপরওয়ালার একটু সহানুভূতি, একটু সাহায্যে[র] জন্য—তার সামান্য নিদর্শন পেলে তারা কাজ করতে থা[কে] দ্বিগুণ উৎসাহে।

ঘুরতে ঘুরতে সে হঠাৎ আবিষ্কার করল বিরাট একটা দুর্নী[তি] তারই একজন অধস্তন কর্ম্মচারী বেশ উদার হাতে উৎকো[চ] গ্রহণ করছে। প্রদীপ তথ্যগুলি এসে তার ওপরওয়ালার কা[ছে] নালিশ করল।

মিঃ বক্সী তার নালিশটা গায়ে মাখলেন না। বললে[ন] অবিনাশ চৌধুরীর কথা বলছেন ত ? ওর কাণ্ডকারখানা আম[ার] জানা আছে।

জানা আছে ? অথচ কিছু বলেন না তিনি ?···প্রদীপ স্তম্ভিত।

মিঃ বক্সী বোধ হয় বুঝতে পারলেন প্রদীপের অবাক্-বিস্ময়। বললেন, আপনি ভাববেন না, আমি নিজেই এ বিষয়ে এনকোয়ারি করব।

সপ্তাহান্তে প্রদীপ শুনল যে, এনকোয়ারি হয়ে গেছে, অবিনাশ চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রদীপ ভয়ানক রেগে গেল। সে স্থির করল, সে নিজেই আলাদা একটা এনকোয়ারি করবে এবং অকাট্য প্রমাণ বলে উপস্থাপিত করবে সরকারের সম্মুখে।

বহু পরিশ্রম ক'রে মাসখানেক পরে সে দাখিল করল তার রিপোর্ট। রিপোর্ট পেয়ে মিঃ বক্সী ভ্রূকুঞ্চন করলেন। বললেন, এর অর্থ?

—আমি ওখানে সপ্তাহে অন্ততঃ দু'দিন যাই। আমার নজরে যা' আসে তা' আপনার নজর এ'ড়িয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, তাই সম্পূর্ণ এই রিপোর্টটা আপনাকে দিলাম।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, আমার এনকোয়ারিটা সম্পূর্ণ হয়নি, তাই আপনি নতুন ক'রে এনকোয়ারি করতে বাধ্য হয়েছেন?

—আমি কিছুই বলতে চাই না, মিঃ বক্সী! আপনি পড়ে দেখবেন। যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমাকে ডাকবেন।

প্রদীপ শুনল, তার রিপোর্ট নিয়ে হেড কোয়ার্টাস-এ জোর আলোচনা চলছে। তার দু-একজন সতীর্থ এসে তাকে অভিনন্দন জানাল যে অবশেষে সে অবিনাশ চৌধুরীর দুর্নীতির দুর্ভেদ্যজাল ভাঙতে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু অভিনন্দন শীগগিরই এল অন্য ভাবে। একদিন প্রদীপ হঠাং হুকুম পেল যে তাকে কলকাতা সার্কেল থেকে বদলী করা হয়েছে মেদিনীপুর সার্কেলে।

প্রদীপ সোজা চলে গেল মিঃ বক্সীর কাছে। বলল, এই বদলীর অর্থ?

—অর্থ কিছুই নয়, প্রদীপ বাবু! আপনি এখন আছেন [illegible]নি-এ, মফঃস্বলের অভিজ্ঞতা খানিকটা অর্জ্জন করা দরকার, তাই আপনাকে কলকাতার বাইরে কিছুকাল থাকতে হবে।

তারপর একটু হেসে বললেন, আর মেদিনীপুর ত আপনার পুরানো জায়গা। ১৯৪২ সালে আপনি সেখানে ছিলেন একজন নেতা, তা আমরা ভুলে যাই নি।

প্রদীপ গুম হয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, আমার একটা অনুরোধ আছে, মিঃ বক্সী! অবিনাশ চৌধুরীর ব্যাপারটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে কলকাতা সার্কেলে রাখা হোক। আমি বাইরে চলে গেলে আপনাদের তদন্তে সাহায্য করবে কে?

—আপনি সেজন্য ভাববেন না, প্রদীপ বাবু! আপনার রিপোর্ট আমাদের কাছেই আছে, সেটা বিবেচনাধীন। প্রয়োজন হ'লে আপনাকে মেদিনীপুর থেকে ডেকে আনা হবে, কলকাতা থেকে বেশী দূর ত নয়।

প্রদীপ বুঝল অবিনাশ চৌধুরী সম্বন্ধে রিপোর্টই তার বদলীর কারণ।

প্রদীপ ছুটে গেল মিঃ করের কাছে, সব কথা তাঁকে খুলে বলল।

—অবিনাশ চৌধুরী? তাকে কে না চেনে? তুমি তার বিরুদ্ধে তদন্ত সুরু করেছিলে, তোমার দুঃসাহস আছে বটে, প্রদীপ!

—কেন? বিস্মিত ভাবে প্রদীপ প্রশ্ন করল।

—ওঃ, তুমি জানো না বুঝি? অবিনাশ যে আমাদের জ্যোতির্ম্ময় বাবুর শ্যালিকার ছেলে। তার পেছনে তুমি লাগতে গিয়েছিলে কেন?

—আমি কারও পেছনে লাগতে যাই নি, মিঃ কর! আমার কাজের সূত্রে যদি আমি দুর্নীতি, অন্যায় আবিষ্কার করি তা আমি কর্তৃপক্ষকে জানাব না?

—তুমি ত একবার জানিয়েছিলে মিঃ বক্সীকে। তারপর চুপ করে থাকলেই পারতে?

—কিন্তু মিঃ বক্সী এনকোয়ারি করে বললেন, অবিনাশের বিরুদ্ধে কোনই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই—

কাজেই তোমাকে নামতে হ'ল রণক্ষেত্রে, তুমি করলে তোমার এনকোয়ারি! জানো, সরকারী কানুনে এ হচ্ছে ঘোরতর বিদ্রোহ, নিজের ওপরওয়ালাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবার এই প্রচেষ্টা!

—আমি ত ওপরওয়ালা সম্পর্কে কিছুই বলিনি, যদিও এখন মনে হচ্ছে বললে সেটা হয়ত অশোভন হ'ত না! বেশ একটু শ্লেষের সঙ্গেই প্রদীপ জবাব দিল।

শোন, প্রদীপ, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে সরকারের কাজে আমার অভিজ্ঞতা তোমার চেয়ে অনেক বেশী। আমি তোমাকে বলছি কোন দুর্নীতি বা অন্যায় যদি তোমার চোখে পড়ে প্রথমে অনুসন্ধান করো কে সেই দুর্নীতি ব অন্যায় করছে এবং তাকে যে প্রশ্রয় দিচ্ছে, সে কে। আরও অনুসন্ধান করো, মন্ত্রী বা নেতৃস্থানীয় কারোর সঙ্গে তার আত্মীয়তা ব বন্ধুত্ব আছে কি না। যদি থাকে তাহ'লে চোখ বুজে থেকো—মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়ো যে তুমি একা দেশের সব দুর্নীতি বা অন্যায়ের উচ্ছেদ করতে পারবে না। তাছাড়া, ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ো। ভগবান মান ত? তিনিই যথাসময় এর বিধান করবেন।

—আপনি বলেন কি মিঃ কর? আপনার উপদেশ অনুসরণ করা মানে হচ্ছে অন্যায়কে মেনে নেওয়া—আমার ধারণা ছিল, বিদেশী আমলে আর যে অপরাধই আপনারা করে থাকুন না কেন, এই অপরাধ আপনারা কখনও করেন নি!

—কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু তার কারণ ছিল। বৃটিশযুগে আমাদের ওপরওয়ালা যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিরপেক্ষ থাকতে পারতেন। যেহেতু রাম শ্যাম যদু মধুর সঙ্গে তাঁদের কোন স্বার্থের সম্বন্ধ ছিল না। কি ক্ষতি বা লাভ হত মিঃ কলিনস-এর যদি অবিনাশ চৌধুরীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতে হ'ত, অথবা তাকে পাঠাতে হত জেলে? তাই আমরা, যারা ছিলাম বৃটিশশাসকের দক্ষিণ হস্ত, নিঃসঙ্কোচে, নির্ভয়ে ব্যবহার করতে পারতাম আমাদের তথাকথিত ন্যায়ের তুলাদণ্ড। কিন্তু এখন অবিনাশ চৌধুরীকে টানতে গেলেই বেরিয়ে পড়েন জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

—এই ভাবে দেশ যদি চলে তাহ'লে স্বাধীনতা টিঁকবে কত দিন, মিঃ কর?

—তুমি বড্ড পেসিমিষ্টিক প্রদীপ! এর সঙ্গে স্বাধীনতার কি

সম্পর্ক? আমেরিকায় কি হয় তা' তুমি শোননি'? অথচ তাদের স্বাধীনতা কি কমে গেছে? তাছাড়া, এসব বিষয়ে আমরা এখনও অনেক দেশের ওপরে। আমাদের আশে-পাশে, মধ্যপ্রাচ্যে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যা হচ্ছে তার তুলনায় আমরা স্বর্গে আছি, প্রদীপ।

—তাহলে আপনি বলছেন আমার কর্তব্য সরকারের হুকুম মেনে নেওয়া এবং আর কোন কথাটি না বলে চলে যাওয়া মেদিনীপুরে?

—ঠিক তাই। অবিনাশ চৌধুরীর কি হ'ল না হ'ল তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না। আর একটা কথা বলি, তুমি সদ্য-সদ্য বিলেত থেকে এসেছ, বৃটেনের নীতি এদেশে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করো না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আমরা এখন আর বৃটেনের দাস নেই, আমরা এখন স্বাধীন, মুক্ত।

মিঃ করের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি যেন দেখা গেল কি? অথবা, প্রদীপেরই চোখের ভুল।

সারাটা রাত প্রদীপ কাটাল ছটফট করে। এ কি উপদেশ দিলেন মিঃ কর? না, না, এই পথে সে চলতে পারবে না। আর কার সঙ্গে পরামর্শ করবে সে? বন্দনা? না, সেই দুয়ারও যে বন্ধ। আচ্ছা, গায়ত্রী হয়ত তাকে বলতে পারবে কি করা তার কর্তব্য।

স্বামীর কাছে গায়ত্রী আগেই ব্যাপারটা মোটামুটি শুনেছিল। তাই পরের দিন প্রদীপ যখন তার কাছে এল, সে নিজেই প্রশ্ন করল, কি, ওঁর উপদেশ বুঝি মনে ধরল না, তাই এসেছ দিদির কাছে নৈতিক নির্ভয়ের আশায়?

—তুমি আমাকে বলো দিদি, এই অবস্থায় আমার কি করা উচিত?

—তোমার মন কি বলছে?

—আমার মন বলছে এই অন্যায় মেনে না নিতে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে।

—কিন্তু এটা কি তুমি ভেবে দেখেছ যে, প্রতিবাদ করলেও কোন ফল হবে না, মাঝখান থেকে তোমাকেই বেরিয়ে পড়তে হবে সরকারের কর্মশালা হ'তে?

—কেন?

—কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বিশাল, অপ্রতিহত। তুমি একজন নগণ্য কর্মচারী, কি করতে পার তুমি এই বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে?

প্রদীপ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, আমার মন স্থির করে নিলাম দিদি! এই অন্যায় মেনে নেব না। প্রতিবাদ জানাব, যতই ক্ষীণ হোক না আমার নগণ্য অস্বীকৃতি।

—আমি জানতাম, এই সিদ্ধান্তেই তুমি আসবে। এছাড়া তোমার আর কোন পথই নেই। আমি খুব খুশী হয়েছি প্রদীপ! বলে গায়ত্রী সস্নেহে তার দিকে তাকাল।

অফিসে গিয়েই প্রদীপ দিল দরখাস্ত—অবিনাশ চৌধুরী সংক্রান্ত ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তার মেদিনীপুর বদলীর আদেশ যেন মুলতুবি রাখা হয়।

দরখাস্তটা পেয়েই মিঃ বক্সী প্রদীপকে ডেকে পাঠালেন।

—এ আপনার কি আবদার, প্রদীপ বাবু? আপনার সঙ্গে সেদিন কথা হ'ল, আমি আপনাকে বললাম যে প্রয়োজন হলে আপনাকে ডেকে পাঠাব, তবু এই দরখাস্ত দেবার অর্থ? আপনি সরকারের হুকুম মানতে চান না বুঝি?

—মানতে নিশ্চয়ই চাই, তবে আমার ভয় যে আমি এখান থেকে চলে গেলে আমাকে ডাকবার প্রয়োজন আপনাদের হবে না।

—যদি প্রয়োজন না হয়, আপনি আসবেন না। এ ত অত্যন্ত সহজ কথা।

—আমার কাছে সহজ বলে মনে হচ্ছে না, মিঃ বক্সী! তাছাড়া আপনারা ত ইচ্ছে করলেই হপ্তাখানেকের মধ্যে আমার রিপোর্টের ওপর আপনাদের চূড়ান্ত রায় দিতে পারেন, তারপর আমি সানন্দে চলে যাব আমার নতুন কর্মস্থলে।

—সরকার আপনার আবদার মাফিক চলবে না, চলতে পারে না। আপনি তাহলে এখন মেদিনীপুরে যেতে প্রস্তুত নন্?

—আমার যা বক্তব্য তা আমার দরখাস্তেই বলেছি, মিঃ বক্সী!

—বেশ। আচ্ছা, আসুন।

প্রদীপ বেরিয়ে এল।

দু'দিন পরে প্রদীপ নতুন আদেশপত্র পেল। যেহেতু সে সরকারের হুকুম মানতে রাজী নয়, সেজন্য তাকে চাকুরী থেকে অবসর দেওয়া হল। তবে সরকার কোন অবিচার করতে চান না, নোটিশের বদলে তাকে এক মাসের অগ্রিম বেতন দেওয়া হবে।

প্রদীপ এতটুকু বিস্মিত হল না। এরকম আদেশপত্র যে আসবে তা আগে থেকেই জানত। তবে সে অবাক হয়ে গেল সরকারের দ্রুতগতিতে কাজ করবার এই প্রমাণ পেয়ে। কে বলে যে ব্যুরোক্রেসী এবং লালফিতার বন্ধনে সরকারী পরিকল্পনা আটকে থাকে?

সরকারের সঙ্গে প্রদীপের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হল চাকুরীতে ঢুকবার ঠিক চার মাস পরে। প্রদীপ ডায়েরীতে লিখে রাখল তারিখটা—৩১শে জুলাই, ১৯৫১।

## পনেরো

অখণ্ড অবসর মিলেছে প্রদীপের। অফিসে যাবার তাড়াহুড়ো নেই, অন্যায় দুর্নীতির প্রতিবাদ করবার দায়িত্ব নেই, সে এখন সময় কাটাতে পারে নিরবচ্ছিন্ন আলস্যে।

এক মাসের মাইনে অগ্রিম পেয়েছে, তাছাড়া এই কয় মাসের উপার্জন থেকে কিছু সঞ্চয়ও করতে পেরেছে সে। চলে যাবে তার একার জীবন আরও চার পাঁচ মাস। এর মধ্যে সে স্থির করে নেবে কোন দিকে ঘোরাবে তার ভবিষ্যৎ। এখন কিছুদিন সে কাটাবে স্বপ্নালস গোধূলির চক্রবালে।

দরজায় কে কড়া নাড়ছে যেন? প্রদীপ উঠল তার বিছানা থেকে, দরজাটা খুলে দাঁড়াল। দেখল, আগন্তুক সন্তোষ।

একগাল হাসি হেসে সন্তোষ বলল, এই যে, প্রদীপ বাবু, আপনার অফিস থেকে অনেক কষ্টে ঠিকানাটা জোগাড় করেছি।...আপনি যথার্থ মানুষের পরিচয় দিয়েছেন, আমরা সবাই গর্ব্বিত বোধ করছি আপনার কথা আলোচনা ক'রে।

একটু শ্লেষের সঙ্গে প্রদীপ জবাব দিল, আপনাদের অভিনন্দনের জন্য অজস্র ধন্যবাদ।...আমার এখন সময় নেই, কিছু মনে করবেন না।

—আহা, আপনি যে আমাকে প্রায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন দেখছি!

...এতদিনের বন্ধুত্ব, তার খাতিরে একটু বসতে বলতেও ত হয়! ব'লে একপ্রকার জোর করেই সে ফ্ল্যাট-এর ভিতরে ঢুকল।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, ব্যাচেলার হ'লে যা হয়, ঘরে এতটুকু শ্রী নেই...আপনার বিয়ে করা উচিত, প্রদীপ বাবু, ব্যাচেলার জীবন আপনাকে মানায় না।

সন্তোষের চোখে অর্থপূর্ণ হাসি।

প্রদীপ বলল, আপনার আর কি বক্তব্য আছে বলুন, ব্যাচেলার জীবন সম্বন্ধে আর একদিন আলোচনা হবে।

সন্তোষ একটা চেয়ার অধিকার করে বসল। অগত্যা প্রদীপকেও বসতে হ'ল আর একটা চেয়ারে।

—বক্তব্য খুবই সামান্য, প্রদীপ বাবু।...এবার আপনি দেখলেন ত সরকারের ব্যবহারের নমুনা।...আমাদের পার্টিতে আসুন, আপনার অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগবে।

—আমার যদি ইচ্ছা না থাকে আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের কাজে লাগাতে?

—রাগ করছেন কেন?...জানেন ত, একদিন আমরাই হ'ব সরকার, তখন আপনাকে ভুলে যাব না।

তীব্রকণ্ঠে প্রদীপ জবাব দিল, আপনাদের অনুগ্রহের জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমার কোনই অভিলাষ নেই আপনাদের পার্টিতে যোগ দেবার।

—তা'হলে আপনি চাকুরী ছাড়লেন কেন?...বিস্মিত সুরে সন্তোষ প্রশ্ন করল।

—আমি চাকুরী ছাড়িনি, আমাকে অবসর দেওয়া হয়েছে।

—ঐ একই কথা, প্রদীপ বাবু! তাছাড়া এ ঘোরতর অন্যায়, এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করব আমরা, আমাদের পার্টি থেকে।

—মাপ করবেন সন্তোষ বাবু। আপনাদের সহানুভূতির প্রত্যাশায় আমি নিজেকে আজ এই পরিস্থিতিতে টেনে আনিনি।

—আপনি বড্ড একগুঁয়ে, প্রদীপ বাবু! সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রিক জীবনে একা কখনও থাকা সম্ভব? আপনাকে কোন না কোন পার্টিতে আসতেই হবে, কর্মী সভ্য হিসেবে না আসুন, সমব্যথী হিসেবে আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ করছি।

—আপনাদের আমন্ত্রণ আমার নোট বই-এ টুকে রাখছি। কিন্তু বৃথাই আপনি সময় নষ্ট করছেন। কোন পার্টিতেই যোগ দেবার স্পৃহা আমার নেই, সমব্যথী ভাবেও নয়। আচ্ছা আজ তা'হলে আসুন। ব'লে একরকম জোর করেই সে বার করে দিল সন্তোষকে।

প্রদীপের চাকুরীবিভ্রাটের কথা তার পরিচিত মহলে গোপন রইল না। জ্যোতির্ময় বাবু একটু হেসে বললেন, বিলেত থেকে গরম রক্ত নিয়ে এসেছে, দু'দিন উপোস করে থাকলেই আস্ফালন কোথায় মিলিয়ে যাবে, দেখো!

অটলবিহারী বাবুও বললেন সেই একই কথা। তবে তার সঙ্গে তিনি আরও বললেন, প্রদীপ বড্ড বোকামি করল।

সুমিত্রা নবকিশোরকে বলল, শুনেছ ত তোমার বন্ধুর কীর্ত্তি? এমন ভাল একটা চাকুরী, সেটা কি না ছেড়ে দিল?

নবকিশোর দুঃখিত বোধ করল প্রদীপের জন্য। একদিন সে
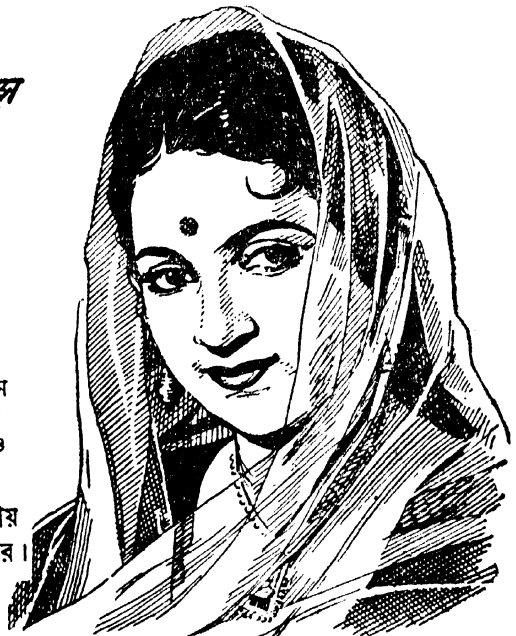
সোজা চলে গেল তার ফ্ল্যাট-এ। বলল, প্রদীপদা', তুমি ত জান আমি তোমাকে চিরকাল শ্রদ্ধা কারে এসেছি। তুমি চাকুরীর জন্ত ভেবো না। আমার ফার্ম্ম-এর দুয়ার তোমার জন্ত চিরকাল খোলা আছে, তুমি চলে এসো আমাদের কাছে, আমরা দু'জনে মিলে-মিশে কাজ করব।

ছবিকে অবলম্বন করে নবকিশোর সম্বন্ধে তার যে অভিযোগ ছিল তা সে অনেক দিন আগেই ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু সুমিত্রার মাধ্যমে বন্দনার কাছে এমিলির কাহিনী উপাপনের পরিণতির জালা সে ভুলতে পারেনি।

তবু কোন অসৌজন্য সে প্রকাশ করতে পারল না। সংক্ষেপে নবকিশোরকে জানাল তার কৃতজ্ঞতা, তারপর বলল, চাকুরীর সখ তার মিটে গেছে, চাকুরী আর করবে না।

—সে কি ? একটা কিছু করতে হবে ত ? খাবে কি ক'রে ?

—একটা পেটের জন্ত ভাবনা করি না, নবু! চলে যাবে কোনরকমে। কিন্তু চাকুরীর কথা ব'লো না, বিশেষ করে তোমাদের ফার্ম্মে।

—কেন, আমাদের ফার্ম্ম কি অপরাধ করল ? বেশ আহতস্বরেই নবকিশোর বলল।

—অপরাধ কিছু করেনি। তবে তোমাদের ব্যবসার যা পদ্ধতি তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারব না। মাঝখান থেকে শুধু অশান্তির সৃষ্টি হবে। কি প্রয়োজন তাতে ?

প্রদীপের আপত্তি গায়ে না মেখে নবকিশোর বলল, ঐ ত তোমার দোষ, প্রদীপদা'! তুমি চাও যে সমস্ত পৃথিবীটা গড়ে ওঠে তোমার অভিরুচি মত। সে ত হয় না! দোষে-গুণে মিশিয়ে আছি আমরা সবাই। কেবল দোষের ভাগটাই তোমার নজরে পড়ে, আমরা দেশের দশের যে উপকার করছি তা তুমি দেখতেই পাও না! জানো, এবার আমরা কনট্র্যাক্ট পেয়েছি দু'কোটি টাকার ওপর, গড়ে উঠবে দশতলা দালান, মস্ত বড় পার্ক, মহাত্মাজীর স্মৃতিমন্দির। আর অন্নসংস্থান হবে অন্ততঃ হাজার দু'হাজার লোকের। তুমি এর অংশ গ্রহণ করতে চাও না ?

—না, নবু! দৃঢ়স্বরে প্রদীপ জবাব দিল।

—তুমি চিরকেলে pessimist, প্রদীপদা'! আমি বলছি দু'দিন বাদে তোমার এই pessimism কেটে যাবে, তুমি নিজেই চলে আসবে আমাদের কাছে। হাজার হোক, জীবনধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ আছে ত ?

—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, জীবনধর্ম্ম যেন আমাকে এমন কাজ করতে বাধ্য না করে, যা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। তাছাড়া, আমি খুসী হব যদি আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণ-অকল্যাণের ভাবনা আর কেউ না ভাবে!

প্রদীপের স্বরে প্রচ্ছন্ন তিরস্কার, তীব্র ব্যঙ্গ।

নবকিশোর এসে সুমিত্রাকে জানাল, প্রদীপের সঙ্গে তার কথোপকথনের সারমর্ম্ম। সুমিত্রা বলল, তোমার কোনই অপমান-বোধ নেই। কেন যেচে নিজের ওপর ডেকে আনলে এই অসম্মান ? তোমার বন্ধুর দাম্ভিকতার তুলনা হয় না!

বিরক্তির সুরে নবকিশোর জবাব দিল, আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি, এর মধ্যে অপমানের কি আছে ? আমার শুধু খারাপ লাগছে প্রদীপদা'র ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

—যার বিয়ে তার খেয়াল নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। আমি তোমাকে বলে রাখছি, তুমি আর কথখানা তার কাছে যাবে না। দেখবে, একদিন নিজেই চলে এসেছে তোমার সাহায্যপ্রার্থী হয়ে।

অন্যমনস্ক ভাবে নবকিশোর জবাব দিল, ঐখানেই ত আমার ভয়, সুমিত্রা! প্রদীপদা'কে যতটুকু জানি সে না খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, তবু মাথা হেঁট করবে না। দম্ভ ? হ্যাঁ, একে দম্ভ তুমি বলতে পারো।

সুমিত্রাই বন্দনার কাছে পৌঁছে দিল প্রদীপের দর্পের ইতিবৃত্ত। দুঃখপ্রকাশ করল যে, প্রদীপ তার স্বামীর এমন উদার আমন্ত্রণকেও করল প্রত্যাখ্যান!

বন্দনা চুপ করে শুনল, কোন কথা বলল না।

## ষোল

পনেরোই আগষ্ট, ১৯৫১ সাল, স্বাধীনতা দিবস।

উৎসব-মুখর কলকাতা। ভোর হতে না হতেই প্রভাতফেরী বেরিয়েছে সহরের পথে পথে। জাতীয়পতাকা বহন করে গান গাইতে গাইতে চলেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কিশোর-কিশোরীর দল। পার্কে, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে নেতৃবৃন্দ তুলছেন ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা, জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস, তাদের সম্মুখে তুলে ধরছেন তাদের কর্ত্তব্যের তালিকা। ফুল, পাতা এবং ক্ষুদ্রসংস্করণ পতাকার সাহায্যে দোকানপাট সাজান হয়েছে। দিল্লীর লালকেল্লার ওপর থেকে বক্তৃতা দেবেন পণ্ডিতজী, আর তা শোনা যাবে সারা ভারতবর্ষে, বেতারের মাধ্যমে।

প্রদীপের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল ভোর পাঁচটায়, তাদেরই পাড়ার প্রভাতফেরীর আবাহনে। সে উঠে একবার বারান্দায় গিয়ে দেখেছিল শোভাযাত্রা, তারপর আবার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তার বিছানায়।

ঘুম কিছুতেই আসছিল না। প্রদীপ কেবলই ভাবছিল, এই উৎসবের মধ্যে তার কোনই স্থান নেই। অপরাধ প্রধানতঃ তারই, জোর করে সে হয়ে রইল বিচ্ছিন্ন, স্বাতন্ত্র্যের তীক্ষ্ণতাকে সে চিরকাল করে রাখল তীক্ষ্ণতর। নবকিশোর ঠিকই বলেছে, সে কেবলই চেয়েছে পৃথিবীটা গড়ে উঠে তারই আদর্শানুসারে, দোষে-গুণে মিশিয়ে যে জনস্রোত চলেছে তার মধ্যে নিজেকে সে বিলিয়ে দিতে পারেনি। এটা শুধু সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক জীবনে নয়, তার ব্যক্তিগত জীবনেও সে দেখেছে বহু বার। আজ সে পড়ে আছে একা, দুটো সান্ত্বনার কথাও বলতে আসে না কেউ।

আবার তার মনে পড়ছে জীবনের সেই গোড়ার কথা, মানুষ জন্মায় কেন ? জন্মাবার বায়োলজিক্যাল কারণ সে জানে, সে প্রশ্ন সে তুলছে না। সে শুনে এসেছে, বিধাতার এই রাজ্যে প্রত্যেকটি প্রাণীর অস্তিত্বের একটা গভীর অর্থ আছে, শুধু অস্তিত্বের নয়, তাদের কার্য্যকলাপের, তাদের হাসিকান্নার, তাদের হিংসা-ভালবাসারও। কিন্তু তার নিজের অস্তিত্বের কোন অর্থই সে খুঁজে পাচ্ছে না, যদি না অর্থ-না-থাকাটাই সব চেয়ে বড় অর্থ

ব'লে মেনে নেওয়া হয়। ছবিকে, এমিলিকে, এমন কি বন্দনাকে কেন্দ্র করে তার জীবনের যে অধ্যায়গুলো রচিত হয়েছিল, তা থেকে সে নিজে হয়ত খানিকটা সুখ-দুঃখ অনুভব করেছে, কিন্তু তার কোন প্রভাবই কি পড়েছে এই তিন জনের জীবনে? ছবি তাকে একবার মনেও করে না নিশ্চয়ই এমিলি চলে গেছে ধরাছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে, আর বন্দনাও নিঃশেষে ধুয়ে-মুছে ফেলেছে প্রদীপের স্মৃতি। তাই কেবলই তার মনে হচ্ছে, যদি সে পৃথিবীতে একেবারেই না জন্মাত তা'হলে কারও এতটুকু ক্ষতি হ'ত না। কত বড় উপহাসের বস্তু এই জীবন, অথচ এরই উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে পৃথিবীর নরনারী, লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ছুটকে-ছাটকা দু'-একটা উপঢৌকনের দিকে।

দূর ছাই, কি সব এলোমেলো চিন্তা আসছে তার মনে, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন এই সংলাপ। চুপ করে ঘরে বসে থাকার এই ফল। নাঃ, ঘরের বাইরে সে আজ বেরুবে, যাবে গায়ত্রী'র কাছে, যাবে, হ্যাঁ, যাবে বন্দনার কাছে।

স্নানের ঘরে গিয়ে প্রদীপ দাড়ি কামাতে সুরু করল।

হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হ'ল যেন? প্রদীপ উঁকি মেরে দেখল, সুমিত্রা।

সারা গালে সাবানের ফেনা, হাতে দাড়ি কামাবার বুরুশ, প্রদীপ বেরিয়ে এল স্নানের ঘর থেকে।

—তুমি ঢুকলে কি করে? দরজা কে খুলে দিল?

—কেউ খুলে দেয়নি। কাল নিশ্চয়ই দরজা চাবি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলে। তা' ভালই হয়েছে, নইলে কতক্ষণ কড়া নাড়তে হ'ত কে জানে!

কি বলতে চায় সুমিত্রা? অত্যন্ত সাদাসিদে একখানা খদ্দরের শাড়ী প'রে এসেছে সে। হাতে আছে মাত্র দু'গাছা সোনার চুড়ি। অটলবিহারী বাবুর পুত্রবধূ নবকিশোরের স্ত্রী সুমিত্রা আবার রূপায়িত হয়েছে ১৯৪২ সালের তপঃক্লিষ্টা সুমিত্রায়।

—অর্দ্ধেকটা দাড়ি কামান হয়েছে, বাকিটা কামিয়ে মুখ পরিষ্কার করে এসো। আমি বসছি।

প্রদীপ তাড়াতাড়ি ছুটল স্নানের ঘরে।

ফিরে এসে দেখে সুমিত্রা এরই মধ্যে বিছানা গুছিয়ে রেখেছে, তার টেবিলের ওপরকার ময়লা ঢাকনিটা বদলে সেখানে দিয়েছে নতুন ফর্সা একটা আবরণী। দশ মিনিটের মধ্যেই ঘরের চেহারা বদলে গেছে।

সুমিত্রা বলল, খাঁটি ব্যাচেলারের অ্যাপার্টমেণ্ট! আচ্ছা, প্রদীপ, আর কত দিন তুমি এমন ছন্নছাড়া জীবন কাটাবে?

প্রদীপ পাল্টা প্রশ্ন করল, তোমার এই হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ?

একটু লজ্জিত ভাবে সুমিত্রা জবাব দিল, তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

—ক্ষমা? কিসের জন্য?

—বন্দনার সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদের কারণ আমি—তোমার বিচ্ছেদের কারণ আমি—তোমার বিলেত-জীবনের কাহিনী তাকে বলাটা আমার উচিত হয়নি।

আসলে কিন্তু এটা একটা অজুহাত মাত্র। সুমিত্রা এসেছে প্রদীপকে পরীক্ষা করতে, দেখতে তার সঙ্গহীন একাকী জীবনে কোন নারীর স্নেহস্পর্শের প্রয়োজন আছে কি না। প্রদীপের প্রত্যাখ্যান, তার অবহেলা তাকে করে তুলেছে আরও উচ্ছৃঙ্খল, আরও উদ্দাম। তাই সে এসেছে অত্যন্ত সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে, যদি প্রদীপের মন একটু আর্দ্র হয়।

প্রদীপ কিন্তু কঠিন হয়েই রইল। সংক্ষেপে বলল, চাইলেই ক্ষমা পাওয়া যায় না সুমিত্রা, তবু আজকের দিনে তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম।

সুমিত্রা এবার প্রশ্ন করল, চাকুরী ছেড়ে দিয়েছ শুনলাম, এখন কি করবে স্থির করেছ?

প্রদীপ এবার সত্যই বিরক্তি প্রকাশ করল। বলল, তোমাদের সেই এক প্রশ্ন, এখন কি করবে? তোমার স্বামীকে আমি দু'দিন আগেই জানিয়ে দিয়েছি, আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণ-অকল্যাণের ভাবনা আমি নিজেই ভাবব, আর কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমাকে এখন বাইরে বেরুতে হবে, অর্থহীন কথাবার্তায় সময় নষ্ট করবার মত মনের অবস্থা আমার নেই।

সুমিত্রার চোখের কোণে জলের আভাস দেখা দিল। তাড়াতাড়ি সে উঠে দাঁড়াল, বলল, আমাকেও উঠতে হবে, উনি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, মথুরাপুরে যেতে হবে, সেখানে বিরাট কৃষাণ-কনফারেন্স হচ্ছে, উনি সেখানে প্রধান অতিথি!

আর দেরী না করে পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ।

অদ্ভুত এই পৃথিবী! সুমিত্রা যে হঠাৎ এভাবে তার কাছে আসবে স্বপ্নেও সে কল্পনা করেনি। সুমিত্রার চোখের কোণের অশ্রু তার নজর এড়ায়নি। জীবনের কাছ থেকে যা' চেয়েছিল সুমিত্রা কি তা' পায়নি? প্রতিপত্তি, সম্মান, অর্থ কিছুই কি তাকে দিতে পারেনি আনন্দ, শান্তি? অথবা, উঞ্ছবৃত্তিই কি জীবনের ধর্ম?

—আরে, মিঃ গুহ যে, আকাশের দিকে তাকিয়ে কোথায় চলেছেন?

বিস্ময়ের পর বিস্ময়, অপ্রত্যাশিতপূর্ব ঘটনার পর ঘটনা!

১৯৫১ সালের পনেরোই আগষ্ট তার জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত দিন বটে!

কিন্তু এই ছবিই না দেশে ফিরে এসে নবকিশোরের কাছে এমিলির কথা বলেছে, যা' শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে পৌঁছেছে বন্দনার কানে। যার ফলে আজ সে নিতান্তই একা!

তবে ছবি হয়ত নিতান্তই গল্পচ্ছলে বলেছিল এসব কাহিনী, সে হয়ত চায়নি যে বন্দনার কানে পৌঁছয়। সত্যি ত, তার জীবনে বন্দনা ব'লে যে কেউ আছে তা' ছবি কি ক'রে জানবে?

না, ছবির প্রতি তার কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়।

—ছবি? তুমি বিলেত থেকে কবে ফিরলে?

—ফিরেছি অনেক দিন। সেই পুরোনো হাসপাতালেই কাজ পেয়েছি, এখন আমি সিস্টার-ইন-চার্জ।

—শুনে খুব খুশী হ'লাম। তারপর তুমি কোথায় চলেছ?

—কোথাও নয়। আজ আমার অফ-ডিউটি। সহরের সাজসজ্জা দেখতে বেরিয়েছি।…আপনি কোথায় চলেছেন?

—বিশেষ কোথাও নয়।…আমার উদ্দেশ্যও প্রায় তোমারই মত।

—তাহ'লে চলুন না, চৌরঙ্গী দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাই।

নীরবে প্রদীপ চলল ছবির সঙ্গে। বিনিময় করতে লাগল টুকরো টুকরো কথা।

পার্ক ষ্ট্রীটের কাছাকাছি এসে পড়েছিল তারা। ছবি বলল, চলুন না, একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে এক পেয়ালা কফি খাওয়া যাক্।

প্রদীপ কোন আপত্তি করল না।

রেস্তরাঁয় বসে কফির পেয়ালায় ক্রীম ঢালতে ঢালতে ছবি বলল, I owe you an apology, Mr. Guha!

—Apology? কেন?

—সেদিন ব্রাইটন-এ আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলাম তা' ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। লণ্ডনে অনেক বার ভেবেছি আপনার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসি, কিন্তু সাহস হয়নি।

ক্ষণিকের জন্য প্রদীপের হৃৎপিণ্ডটা মোচড় দিয়ে উঠল যেন। তারপর বলল, অতীতের জের টেনে আনবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই, ছবি! তবে ক্ষমা যদি কাউকে চাইতে হয় সে হচ্ছে আমি। তুমি কোনই অপরাধ করোনি।

—আপনি আজ-কাল কি করছেন? একটু পরে ছবি প্রশ্ন করল।

—আপাততঃ কিছুই না। এসে এখানে একটা সরকারী চাকুরীতে ঢুকেছিলাম, সেটা ছেড়ে দিয়েছি। ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত।

—আরেকটা চাকুরী পেতে আপনার কোনই অসুবিধা হবে না। আপনার যা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স তাতে যে কোন বিলিতি ফার্ম আপনাকে লুফে নেবে।

—সে দেখা যাবে, উপস্থিত আমি একটু স্বার্থপর হতে চাচ্ছি, অর্থাৎ I simply want to laze.

—আপনি তা পারবেন না, মিঃ গুহ! চুপ করে বসে থাকা আপনার ধাতে আসে না।

প্রদীপ কোন জবাব দিল না।

ছবি চলে গেল তার এক বন্ধুর কাছে, প্রদীপ পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে দক্ষিণগামী একটা ট্রামে উঠে পড়ল।

কোথায় যাবে সে? বন্দনার কাছে? কিন্তু কি বলবে তাকে? মনে পড়ছে বন্দনার কথাগুলো, স্পর্দ্ধার, আত্মম্ভরিতার একটা সীমা থাকা উচিত, প্রদীপ! কেন তুমি নিজেকে এতটুকু সংযত করে রাখতে পারলে না, প্রদীপ? আমার অন্তর-নিংড়ানো সমস্ত অনুরাগ দিয়ে যে বিগ্রহকে আমি পুজো করছিলাম, কেন তা তুমি এমন নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে দিলে?

কিন্তু আজ নতুন একটা সাহস তার মনে দেখা দিচ্ছে যেন। ভয়াতুর, কর্ম্মভিত্তিক পৃথিবীর অপূর্ণতা তাকে আর বিদগ্ধ করে তুলছে না, ভাববিলাসের কুয়াসা অপসৃত হয়ে ধীরে অথচ নিশ্চয়তার রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে একটা অভিযাত্রিক মন যা জীবনকে অর্থশূন্য বলে স্বীকার করতে রাজী নয়। জীবনটা হয়ত একটা ট্রাজেডি, কিন্তু যারা বীর্য্যবান, তারা এই ট্রাজেডির কৃপণতা থেকেও খানিকটা বৈভব নিংড়ে আনতে পারে। প্রদীপও কেন তা পারবে না?

এই দশ বছরে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ও কম হয়নি। কত বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন সে হয়েছে, কখনো দেখেছে মধ্যাহ্নের দীপ্ত আকাশ, কখনো ঢেকে ফেলেছে তামসী রাত্রির ঘনান্ধকার, কিন্তু এসব কিছুর মধ্য দিয়েই কি প্রতিধ্বনিত হয়নি চলার অপরূপ অনন্ত যৌবনের ছন্দ? এ বিরাট যাত্রাযজ্ঞে প্রত্যেকটি মানুষ যে একজন অভিযাত্রী। তাই আকাশে-বাতাসে হাসিকান্নায় শুনতে পাওয়া যায় অভিযানের আগমনী।

না, আজ সন্ধ্যায় সে বন্দনার কাছে নিশ্চয়ই যাবে। তাকে বলবে, নতুন এক আলো সে দেখতে পেয়েছে, এবং সে এসেছে এই আশায় যে বন্দনাও তা দেখতে পাবে। জীবনের যে সব ক্ষুদ্র অধ্যায়ের স্মৃতি বহু পুরানো চরণচিহ্নের মত প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছে, তাদের যেন বন্দনা প্রাধান্য না দেয়; সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে শাশ্বত সত্যের ওপর।

অন্যমনস্ক ভাবে প্রদীপ ঢুকল তার ফ্ল্যাট-এ। দেখল, একটা চিঠি পড়ে আছে—বন্দনার লেখা।

হাতটা কাঁপছে যেন! সংক্ষিপ্ত চিঠি:

'প্রদীপ,

কোন রকম উপক্রমণিকা না ক'রে সোজা কথাটা বলে ফেলি। তোমার চাকুরীর ইতিপ্রাপ্তি, তারপর দাদার সঙ্গে তোমার কথাবার্ত্তা, সব খবরই আমি পেয়েছি। অনেক ভেবে দেখলাম, আমার তোমাকে যতখানি না প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজন তোমার আমাকে তাই আমি স্থির করেছি যে আমার ভাগ্য তোমার সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা ছাড়া আর কোন পথ নেই। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলতে সন্ধ্যার দিকে তোমার কাছে আসব, তুমি থেকো কিন্তু।

—বন্দনা।'

পৃথিবী সত্যি এত সুন্দর!

সমাপ্ত

# আজকে মেয়ের এই তো দশা

সৈয়দ হোসেন হালিম

:শুনছো ওগো কনের বাবা, কাজল হোলো অনেক বড়,
আর কি বসে থাকা চলে? বিয়ে দেবার জোগাড় করো।
নেইকো টাকা, করবো কি আর, ওসব কথা' শুনবো নাকো;
ওই ব'লে তো প্রতিদিন-ই বিয়ের কথা লুকিয়ে রাখো।
আজকে বলি ওসব কথা চলবে নাকো কোনো মতে,
পাত্র যদি না পাও, তবে ঘুরে বেড়াও পথে-পথে!
কনের বাবা শ্বাস ছেড়ে ক'ন: পাত্র তো আর যায় না পাওয়া,
মেলেও যদি একটি-দুটি তাদের আবার উল্টো হাওয়া!
মেয়ে তাদের ফর্সা হবে, নাক-নক্সা নাই বা হোলো,
পণটি তাদের কম বড় নয় নিজে তারা হোক না জোলো।
নিজে তারা হোক না কালো তাতে কিছু যায় না' আসে,
মেয়ে তাদের সুন্দরী চায় বসতে হোলে তাদের পাশে।
: আচ্ছা বাপু, তুমি বলো পাত্র তো আর পাই না খুঁজে,
টেঁপির-ও তো বিয়ে হোলো, তুমি কি খোঁজ দু-চোখ বুজে?
কালো-খ্যাঁদার হয় তো বিয়ে—কেউ তো হেথা রয় না পড়ে,
একটু না হয় দেখে-শুনে চট ক'রে ওর দাও না ধরে!
মেয়ের পানে চেয়ে দেখ—ওর পানেতে যায় না চাওয়া,
মাথায় যে ওর উঠলে কাপড় বন্ধ হবে ভাবার হাওয়া!
টাকার জন্যে ভাবনা কিসের, বিঘে কতক জমি তো আছে,
বিয়ের খরচ ওতেই হবে বাঁধা রেখো হেমের কাছে।

কনের বাবা গেলেন উঠে, যা হয় কিছু করতে হবে,
কন্যাদায়ের কঠিন বেড়ি আর কতো কাল গলায় রবে!

চললো ছুটে কনের বাবা হাউই যেমন মত্তে মেতে
বোঁ-বোঁ-বোঁ শূন্যে ওঠে আকাশখানা হস্তে পেতে।
তেমনি ক'রে চললো ছুটে, শিরে মেয়ের মস্ত বোঝা—
আফিঙ খেয়ে ঘুরছে পাখী নেশায় যে তার চক্ষু বোজা!
চলতে পথে খাচ্ছে হোঁচট, নেশায় মাথা ঘুরছে জোরে,
হন্-হনা-হন থামলো এসে একেবারে শেখের দোরে।

বিরাট বাড়ী, ঘরও বহুত, এই বাড়ীতে দিলে বিয়ে
মেয়ে যে তাঁর রবেই সুখে, এতে আবার ভাবনা কি এ।
বংশ ছোট, তাতেই বা কি, এই বাড়ীতে দেবেন বিয়ে,
পয়সা হোলেই উঠবে জাতে ভাবনা কেন ইহাই নিয়ে।
রাজার রাণী হবে মেয়ে—চাকর-দাসী থাকবে কতো;
শির নোয়ায়ে করবে সেলাম, ভাবনাও তাঁর হবে গত।

এই গাঁয়েতে এরাই সেরা, অগণিত টাকা-কড়ি,
নধর ক'টি বলদ-গরু, আহা, কেমন মরি-মরি!

এক কালেতে তাঁরও ছিল এমনি কতো টাকা-কড়ি,
দাস-দাসীরা সেলাম দিত রাজ-রাজাদের মতন করি!

আজকে তো আর নেইকো সেদিন—সেদিন কোথায় হারিয়ে গেছে,
নেইকো টাকা, মান গিয়েছে—সেলাম তাঁরে কেই বা দেছে!
সবার সেরা বংশ তবু, এ মুলুকে কটাই আছে?
টাকা-কড়ি ও কিছু নয়, হর্ষে যে তাঁর চক্ষু নাচে!

তেঁতুলতলায় আসছে কে ও, আমীর সেখ? সেই তো বটে,
ওই তো সেদিন পাড়লো কথা মনসাতলার দীঘির তটে।

চললো ছুটে—খুব সে জোরে—আর যে তাঁর সয় না দেরী,
কারণ তিনি কনের বাবা—কনে-কাপড় করেন ফেরি।

পাড়লো কথা কনের পিতা নরম-কোমল-মিহি সুরে
মিনতিতে দৃষ্টি-ভরা—বাক্য যেন মাখা গুঁড়ে!

এমনি কতো চরম-নরম মন-ভেজানো কথার পরে
বরের বাপের ভাঙলো স্বপন, অল্প কথায় টনক নড়ে?

ধীরে-ধীরে বলেন তিনি: এই কথা তো রইলো পাকা
সাইকেল ঘড়ি আংটি বোতাম বিয়ে দিলেই এ তো ফাঁকা।
বেশী কিছু চাইবো না আর, আমি তোমার সবই বুঝি,
আজকালকার ছেলেরা তবে হস্তে কিছু চায় যে পুঁজি।
: ওর জন্যে ভাবনা কিসের? সেটাও আমি দেবো ধরে,
ওদের সুখেই আমরা সুখী, ওদের দুখে যাই যে মরে!

উঠলো এবার কনের বাবা শেখজীকে এক সেলাম দিয়ে,
বেয়াই তিনি হলেন যেন আজকে দিয়েই মেয়ের বিয়ে।

আষাঢ় মাসের তেইশ তারিখ হয়ে গেল মেয়ের বিয়ে,
বাপের জমি বিক্রি করা নগদ-গরম টাকা দিয়ে।
গেল মেয়ে শ্বশুরবাড়ী বরের সাথে পাল্কী করে,
কাপড়-জামা সঙ্গে গেল, গয়না গেল ছত্র ধরে।

তারপরে যে ঘুরলো বছর যেমন করে নিত্য ঘোরে,
চলার ঘায়ে ভাঙলো কারে, কারেও আবার ফেললো গড়ে।
হাসলো কেহ কাঁদলো কেহ কালের সাথে পাল্লা দিয়ে,
কেউ ফিরল শূন্য হাতে, কেউ ফিরল রত্ন নিয়ে।

এমনি যে হায় কালের রীতি—নিত্য নব এমনি খেলা,
হঠাৎ কাজল ফিরলো সেদিন শেষ হোলো তার সুখের মেলা!
স্বামী যে তার তাড়িয়ে দেছে, লাগলো আগুন বদ-নসিবে,
তাই এসেছে বাপের বাড়ী—তা ছাড়া আর কেই বা নিবে!

চোখ মেলে ভাই তাকিয়ে দেখো আজকে মেয়ের এই তো দশা,
বাপটি যে তার সব হারালো, মেয়ের দুখে উড়ছে মশা!

এ যুগেতে ফেলনা মেয়ে, ছেলের দামটা বড্ডো বেশী,
ছেলে-মাণিক হরতে দেখ চলছে নিতুই রেষারেষি।

পছন্দ তো ছেলেই করে, মেয়ে আবার করবে কি আর,
যার হাতেতে দেবেন পিতা তারেই নিয়ে সুখটি যে তার!
হোক না সে-জন মাতাল-পাগল তাতে মেয়ের কি-ই বা আসে,
মাথায় তো তার উঠবে কাপড়—কাঁদুক না সে দীর্ঘশ্বাসে!

হায় বোনেরা, এমনি ক'রে আর কতো কাল দুঃখ স'বি,
আর কতো কাল এমনি ক'রে পুরুষ-পশুর কৃপায় র'বি!

যে পায়েতে তারা তোদের এমনি ক'রে পিষতে পারে,
সেই সে চরণ করতে গুঁড়ো জ্বাল অগ্নি চারি ধারে!

সেই আগুনে মরুক পুড়ে অর্থলোভী পুরুষগুলো,
যে তোদের আজ পণ্য ভেবে অনাদরে ভাঙছে চুলো!

( উপন্যাস )

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

নীলিমা দাশগুপ্ত

খুব ভোর-ভোর উঠে পড়েছে অরুণেশ। হোষ্টেল জেগে ওঠার আগে ও নিভৃত নিরুপদ্রবে ইন্দ্রাণীর খাতাখানা আবার একবার প'ড়ে নেবে, রেখে রেখে চোখে চোখে পড়বে একবার। বোনেদের ইংরিজি লেখা পড়ে আর শুনে ওর মনের জমিতে মেয়েদের ইংরিজী জ্ঞান সম্বন্ধে বেশ একটু করুণা মিশ্রিত তাচ্ছিল্যের ভাব গেড়ে বসেছিলো ; হঠাৎ সেই বিশ্বাসে ও যেন আচমকা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে একটা। ইন্দ্রাণীর লেখা পড়ে ওর যে শুধু ভাল লেগেছে তা নয়, ও যেন একেবারে অভিভূত, সুপ্রিয় শুধু ওকেই পড়ায়নি, হোষ্টেলে সুপ্রিয়র যত প্রিয় সহচর ছিলো, বন্ধু ছিলো সবাইকে ডেকে এক জায়গায় জড়ো ক'রে নিজে পড়ে পড়ে শুনিয়েছে ইন্দ্রাণীর লেখা। ইন্দ্রাণীর ইংরিজি শব্দ চয়ন ও লেখার ভঙ্গিমায়, সমস্ত ছেলেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিলো যে, এ লেখা একজন ম্যাট্রিকের ছাত্রীর, অরুণেশ ছিলো একেবারে নীরব শ্রোতা। শব্দ চয়নের কৌশলে গদ্য যেন ছন্দে পরিণত হয়েছে।

যতক্ষণ সুপ্রিয় পড়ছিলো, অরুণেশ যেন কোনো ছন্দময় সুরের মায়ায় আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলো ততক্ষণ। খাতা পড়া শেষ হ'লে খাতার অধিকারিণী ইন্দ্রাণী রায়ের সম্বন্ধে নানা রকম কৌতূহল প্রকাশ করতে লাগলো সকলে, অরুণেশ শুধু হাত বাড়িয়ে বন্ধুর কাছ থেকে খাতাখানা চেয়ে নিলো। তারপর একাধিক বার লেখাগুলি পড়েছে অরুণেশ, কিন্তু তবু যেন ওর পড়া হয়নি। সকালের স্নিগ্ধ আলোয়, নিভৃতে নিশ্চিন্ত ও আবার পড়বে খাতাখানা। খুব ধীরে ধীরে পড়া শুরু করলো, তবু কখন যেন শেষ হয়ে গেলো পড়া। আনমনা অরুণেশ আস্তে আস্তে খাতার পাতা উল্টে যাচ্ছে, রাফ খাতা। খাতার এখানে-ওখানে কিছু কিছু শব্দরূপ ধাতুরূপ লেখা, কিছু কিছু অঙ্ক করা, পুরোনো বছরের অঙ্কের প্রশ্ন পত্র দেখে অঙ্কগুলি করা মনে হলো, একটা পাতায় পেন্সিল দিয়ে বাংলা কয়েক ছত্র লেখা চোখে পড়লো। এক লাইন পড়েই খাতাখানি ক্ষিপ্র হাতে তুলে নিলো অরুণেশ, চোখের একেবারে সামনে ধরলো, লেখা আছে—

: ছেলেরা যেখানে পরিচয়ের জগতে বেঁচে আছে শুধু পদবীতে, চেনা-শোনার দরবারে মাইনের সুস্পষ্ট অঙ্কে, লন-ফোন-মোটরে আর সিগারেটের ধোঁয়ায়, আর মেয়েরা যেখানে স্বরচিত সংকীর্ণ গণ্ডীতে চোখ ঝলসানো, লেপ্‌ষ্টিক বাড়ানো এক একখানি ছবি হয়ে তাদের গণ্ডির বাইরের অপরিষ্কার পৃথিবীটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চান মহাশূন্যে সেখানে। তারপর আর কিছু লেখেনি ইন্দ্রাণী, বোধ হয় তার ছেলেমানুষ মন এ সমস্যা নিয়ে ভাবতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছে। একেবারে নিচের দিকে আর একটি লাইন লেখা—

: তবুও ভরসা আছে, কারণ "এখনও কিছু সূর্যমুখী মানুষ জাগে।" খাতা বন্ধ করে বাইরের দিকে চোখ মেলে একেবারে স্থির হয়ে বসে রইলো অরুণেশ। একেবারে চুপ, চারদিগন্ত উদ্ভাসিত করে সূর্যদেব উঠছেন, তার রক্তিমচ্ছটা একলা ঘরে-বসা অরুণেশের মনকে একেবারে রাঙিয়ে দিয়ে গেলো, সে খবর অরুণেশও বোধ করি পেলো না তখন, ওর মনের আকাশে একটি ছবি ফুটে উঠছে ধীরে,...ছায়া ছায়া অন্ধকারে হাসনিস ফুলের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটি কিশোরী, দোতলার জানলা দিয়ে আলোর রশ্মি তির্যকভাবে এসে পড়েছে তার কপালে কপোলে, চিবুকে। হঠাৎ সেই কিশোরী রূপান্তরিত হলো ভঙ্গীতে, সুকুমার শরীরখানি ঋজু হয়ে দাঁড়ালো, চোখের দৃষ্টি হলো ধারালো, নিশ্বাস দ্রুততর, পাতলা গোলাপী ঠোঁট দুখানি বিদ্রূপে বঙ্কিম হলো, তারপর সেই ওষ্ঠ উচ্চারণ করলো, আর কিছু দেখেননি ?

অঙ্ক করছে ইন্দ্রাণী। অখণ্ড মনোযোগ, হুড়মাড় করে ঘরে ঢুকলো মীনাক্ষী। ইন্দ্রাণী চোখ তুললো না, বরং মুখের ভাবটা একটু গম্ভীর হলো।

রাগ করেছিস ইনা ? ইন্দ্রাণীর চেয়ার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো মীনাক্ষী। হুঁ ! ইনার চোখ আগের মত খাতার পাতায়। তুই কী-ই রে, কোথাকার এক আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি—ইনার হাত থেকে ঝট করে খাতাখানা সরিয়ে রেখে মীনাক্ষী দুহাত দিয়ে ইনার গলা জড়িয়ে ধরলো, মীনাক্ষীর কণ্ঠস্বরের তরলতা উছলে পড়ছে, উপচে পড়ছে। এর ওপর কী রাগ করা যায় ? হেসে ফেললো ইন্দ্রাণী। ইনার হাসি দেখে মীনাক্ষী নিশ্চিন্ত হ'য়ে হাত সরিয়ে নিলো, মাথা দুলিয়ে বললো, তুই রাত-দিন অত মুখ গোমড়া করে থাকিস কেন বলতো ?

—কি ভাবিস কি ? ইন্দ্রাণী আবার হাসলো, কেন, পৃথিবীতে ভাববার বিষয়ের কি ঘাটতি পড়লো না কি ? তারপরই গলার সুর বদলে গেলো ইনার, যাই বল মীনা, আজ দুপুরে তুমি অন্যায় করেছো সেটা মান কি না ?

—আমি স্পষ্ট দেখলাম, তুমি খেতে খেতে ইচ্ছে করে ঠাকুরের থালা ছুঁয়ে দিলে।

হ্যাঁ, আজ তো ইচ্ছে করেই ছুঁয়েছি, মীনার সপ্রতিভ উত্তর।

সে কি ? ঠাকুর যখন পেঁয়াজ-পোস্ত খেতে অত ভালবাসে—

ঠাকুরের খাওয়া কি বাদ গেছে না কি মনে করিস ? এক-তাল পেঁয়াজ-পোস্ত দিয়ে দিব্যি ক'রে ভাত মেখে রোজের দেড়া ভাত আজ খেয়েছে ঠাকুর, তার খবর রাখিস ?

সত্যি ? ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বর এবার একেবারে সহজ।

হ্যাঁ রে, তোরা তো জানিস, না ঠাকুরটা আচ্ছা একটা মিটমিটে য়তান, তরকারী ছুঁয়ে দিয়েছি ব'লে মা'র আর দিদাইর কাছে মামাকে যে দু দিন বকুনি খাওয়ালে, সে দু দিন কিন্তু সত্যি সত্যি মামি ছুঁইনি তুই বিশ্বেস কর। চালকুমড়োর তরকারী ও একদম খতে ভালবাসে না, রত্নকে ঠাকুর বলছিলো একদিন, আমি শুনে ফলেছি। তরকারী ছোঁয়ার নাম দিয়ে আমাকে মিছিমিছি বকুনি াইয়ে ও দিদাই-এর কাছ থেকে এক এক খাবলা ক'রে আমের আচার দু দিন মজাসে খেলো, অথচ ওর'সিকি ভাগও আমরা পাই না। ই বর্ষার জন্ত তোলা আছে, মীনার করুণ কণ্ঠস্বরে ইন্দ্রাণী শব্দ ক'রে হসে উঠলো।

না, সত্যি হাসি নয়, আমার খুব রাগ ছিলো ঠাকুরের ওপরে, াজ যখন খেতে খেতে দেখলুম ঠাকুরের হাতের থালায় রয়েছে কুরের অতি প্রিয় পেঁয়াজ-পোস্ত, আমি ইচ্ছে করে হাতনাড়া দিয়ে জন্ত ছুঁয়ে দিলাম। ঠাকুর একবার মাত্র আঁ-ক্ করেই চুপ ক'রে েলো দেখলিনে ? আমিও ঠিক তক্কে তক্কে আছি, ঠিক ঠাকুরের াওয়ার সময় গিয়ে হাজির। দেখি কি, পেঁয়াজ-পোস্ত দিয়ে শুকনো রে এক ডাঁই ভাত মেখে ঠাকুর খাচ্ছে। আমাকে দেখে প্রথমটা াধ হয় একটু সংকোচ হয়েছিলো তারপর ভাতের গ্রাসটা গিলে হাসতে সতে বললো, দিদিমুণি, পেঁয়াজ-পোস্ত কখনও ছোঁওয়া যায় না।

আমি বললুম, বটেই তো! ও তরকারীটা বোধ হয় শ্রীক্ষেত্র কে আমদানী হয়েছে। আমার কথায় ঠাকুর মহা খুশি!

েছে, আপোনি তো ন্যায্য কথা বলবেনই দিদিমুণি, কত খাপড়া শিখেছেন আপোনি। কথা শেষ হওয়ার পর মীনা আর া গলা মিলিয়ে হাসতে লাগলো।

মীনু, এবার তুই এ ঘর থেকে যা। আমি গোটা কয়েক অঙ্ক ব নি—টেবিলের কোণা থেকে একখানা খাতা সামনের দিকে টেনে নতে আনতে ইন্দ্রাণী বললো। মীনু বললো, এখন অঙ্ক থাক না, য় না একটু গল্প করি—সেই কখন থেকে তো তুই পড়ার টেবিলে স আছিস—

উহুঁ! আজ এ অঙ্কের একটা ব্যবস্থা ক'রে তবে টেবিল ছেড়ে ঠবো আমি, কিছুতেই হচ্ছে না—

কী অঙ্ক রে ?

দাঁড়া, আগে অঙ্কটা বার করে নি, পাতা উল্টে-উল্টে অঙ্কটা বার রলে ইন্দ্রাণী, চৌবাচ্চার অঙ্ক—ভুরু কুঁচকে ইনা অঙ্কটা বার-দুয়েক ড়লো, তারপর পেন্সিলের পেছনটা কামড় দিয়ে একটু ভেবে নিয়ে রতে গেলো অঙ্কটা, লক্ষ্য ক'রে দেখলো যে ক'টি সাদা পাতা ছিলো ঐ একটি অঙ্কের প্রচেষ্টার পেছনে ইতিমধ্যে খরচ হ'য়ে গেছে। বিলের বাঁদিকে সব খাতাগুলি সাজানো ছিলো, ইন্দ্রাণী খাতা ল্টে-উল্টে একটা খাতা খুঁজতে লাগলো। পেলো না খাতাটা। নাক্ষীর দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলো, আমার টেবিল থেকে নো খাতা নিয়েছিস নাকি ?

: এই রে সেরেছে! আর দু'ঘণ্টা পরে খাতাটার খোঁজ পড়লে ী হতো ?

বিব্রত মীনাক্ষী একেবারে নিরীহ মুখ ক'রে বললো, না তো! র্জলা মিথ্যে কথা বলে একটু যেন ঘাবড়ে গেলো মীনা, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আমার একটা স্পেয়ার খাতা আছে এনে দিচ্ছি—মীনাক্ষী দৌড়ুলো খাতাখানা আনতে, যেটা এইমাত্র রত্নকে দিয়ে আনিয়ে রেখেছে মাষ্টার-মশায়ের দেওয়া নোট টুকবে বলে, সেটা হাতে ক'রে ফিরে এলো, এই নে—মীনা টেবিলে রাখলো খাতাখানা।

না থাক গে, আজ চৌবাচ্চার জল বেরিয়ে যাক গে, কাল জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করবো,···আজ বিলকুল মুড নষ্ট হয়ে গেছে—মীনার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে এক নজর তাকিয়ে ইন্দ্রাণী আবার বললো, কী বিরক্তিকর ব্যাপার বলতো ? একটা মেঘলা দুপুর কেটে গেলো চৌবাচ্চার নলের পেছনে···চৌবাচ্চার জল বেরিয়ে যাচ্ছে তো যাক না বাপু, কেন, জল ধরে রাখার কী আর কোনো পাত্র নেই ? বালতি আছে, গাড়ু আছে, টব আছে···মুখে কপট বিরক্তি ফুটিয়ে ইন্দ্রাণী ওর খোলা খাতাখানা ঝপাস ক'রে বন্ধ ক'রে দিলো। মীনাক্ষী উচ্ছল গলায় হেসে উঠলো, আমি তো চোখ দিয়েও দেখিনে চৌবাচ্চার অঙ্কগুলো—ইন্দ্রাণীর টেবিলে কয়েকখানি পেঙ্গুইন নিয়িজের বই ছিলো, ওপরের বইখানি তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলো ইন্দ্রাণী।

আবার ও বই ? একটু হতাশার সুর মীনার গলায়।

শোনই না—কী চমৎকার একখানি কবিতা আজ পড়েছি, গ্র্যাণ্ড! কাউকে না শোনালে কী ভাল লাগে, শোন—এলিয়টের লেখা—

"হলো মেন।" ইন্দ্রাণী খুশি গলায় পড়ে চললো, "উই আর দি হলো মেন, উই আর দি ষ্টাফ্‌ মেন···"

মীনাক্ষী স্থির হ'য়ে শুনছে। ইনাটার এমন গলা, এমন আবেগ দিয়ে কবিতা পড়ে, কৈ ও তো এর কিছু খবর রাখেনি ?

তদগত চিত্তে কবিতা শুনে যাচ্ছে মীনা।

"···দিস ইস দি ওয়ে, দি ওয়ার্লড এণ্ডস, দিস ইস দি ওয়ে দি ওয়ার্লড এণ্ডস, দিস ইস দি ওয়ে দি ওয়ার্লড এণ্ডস, নট উইথ এ ব্যাঙ্গ বাট উইথ এ হুইমপার—"

অদ্ভুত একটা ভাবপ্রবণতা এসে আশ্রয় করেছে ইনার কণ্ঠে। চঞ্চলা মীনা মুগ্ধ একেবারে! কবিতা শেষ ক'রে মীনার তন্ময়তা লক্ষ্য ক'রে ইন্দ্রাণী হাসলো। বললো, কী রে, ভাল লাগলো ?

খু-উব, শেষের ক'টা লাইন আবার পড় না ভাই! ইন্দ্রাণী মুখ টিপে হেসে আবার পড়লো, "দিস ইস দি ওয়ে দি ওয়ার্লড এণ্ডস।"

আমি জানতাম কবিতা তোর নিশ্চয়ই ভাল লাগবে, এবার এর বাংলা অনুবাদ শোন, বিষ্ণু দে অপূর্ব্ব লিখেছেন, বিষ্ণু দের অনুবাদ-বইখানা হাতে নিয়ে পড়া শুরু করবার আগেই মীনা হাত বাড়ালে।

ইন, বইখানা আমাকে দে, আমি নিজেই পড়বো।

আচ্ছা, তাই পড়িস তাহলে, আমি তবু শেষের ক'টা লাইন পড়ে শোনাই। কবিতাটির শেষের পাতা উল্টে নিচের দিকে চোখ রাখলো ইনা। 'এই চালে ভাই দুনিয়ার শেষ, এই চালে ভাই দুনিয়ার শেষ, এই চালে ভাই দুনিয়ার শেষ, হাঁক দিয়ে নয় কাৎরানিতেই।' ইন্দ্রাণীর পড়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মীনা চেঁচিয়ে উঠলো।

ওয়াণ্ডারফুল! তুই রিসাইট ভাল করিস না। মাষ্টারমশাই

করেন, তাই আমি ভাবছি। কৌতুকে ইনার চোখ দুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো।

পরীক্ষা সামনে, অত ভাবিসনে মীনা!

না রে, আমি সিরিয়াসলি বলছি। মাষ্টারমশাই শেলির "ক্লাউড" আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছিলেন একদিন, সমস্ত লাইনের মানে আমি বুঝতে পারিনি, তবু কী যে ভাল লেগেছিলো তা বলতে পারি না, আজকেও তেমনি ভাল লেগেছে, আর জানিস, মাষ্টারমশাই সেদিন বললেন কী—তাঁর বন্ধু অরুণেশ নাকি তাঁর চেয়ে সহস্রগুণ ভাল রিসাইট করতে পারেন, তিনি আবৃত্তি করলে নাকি মনে হবে—সত্যি সত্যি মেঘমালা আমাদের চারিপাশে এসে আশ্রয় করেছে।

আমি বললাম মাষ্টারমশায়ের কোন বন্ধু! কী নাম বললি? মীনার কথা কেটে ইনার প্রশ্নটা যেন কাঁপিয়ে পড়লো। মীনাক্ষী নিস্পৃহ ভঙ্গিতে উত্তর দিলো, কী জানি, মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গেই পড়েন হয়তো', নাম বলেছিলেন অরুণেশ।

মীনা, তোর মাষ্টারমশাই যেন কোন কলেজ থেকে বি-এ দিচ্ছেন?

ইন্দ্রাণীর প্রশ্নে আগ্রহের সুর বেজে উঠলো, মীনাক্ষী অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকালো ইন্দ্রাণীর দিকে, প্রেসিডেন্সি কলেজে, কেন? হঠাৎ এ প্রশ্ন?

এমনি মনে হলো, তাই জিগ্যেস করলুম, কবাটের বাইরে রতনের গলা শোনা গেলো, মীনুদিদিমণি! মাষ্টারমশাই এয়েছেন।

মীনা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো। চেয়ারে বসে বসেই আড়মোড়া ভাঙলো ইন্দ্রাণী, অস্ফুটে উচ্চারণ করলো ওর ঠোঁট, অ-রু-ণে-শ! ধনিনন্দন তাহলে কবিতাও পড়েন! এমন অর্থশূন্য কথা আর কেউ বললে নিজেই প্রতিবাদ করতো ইন্দ্রাণী, কিন্তু ও এখন বললো। শুধু বললো নয়, কথাটা নিয়ে মিনিট খানেক ভাবলো। তারপর চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো, ধ্যাৎ! আজ আর ভাল লাগছে না পড়তে, আত্মগত ভাবে বলে পড়ার ঘর ছেড়ে চলে গেলো ইন্দ্রাণী।

দিদাই—আর নয়, অনেক কাঁথা বানিয়েছো—শিশিরকণার পাশে গা ঘেঁসে বসে পড়ে ইনু বললো।

ইনুদিদি, খিদে পেয়েছে নাকি? শিশিরকণা জিগ্যেস করলেন।

না দিদা, একদম খিদে পায়নি, তুমি কাঁথা সেলাই বাদ দিয়ে মা'র ঠাকুরমার গল্প বলো না শুনি।

শিশিরকণা হাসলেন, আমার শাশুড়ির গল্প তোমার খুব ভাল লাগে, না ইনুদিদি?

খুবের চেয়েও বেশি ভাল লাগে। আচ্ছা দিদাই, আগেকার মানুষেরা বিশেষ করে মেয়েদের কথা বলছি, একেবারে লেখাপড়া না জেনেও কী অদ্ভুত সব মহাপ্রাণ ছিলেন, আর আজ-কাল প্রচুর লেখাপড়া করেও কেন অনেক মেয়ের এমন সঙ্কীর্ণ মন?

শিশিরকণা নাতনীর দিকে তাকিয়ে আবছা হাসলেন, তুই এইটুকুন বয়েসে আবার কার সঙ্কীর্ণ মনের খবর পেলি রে ইনু?

দিদা যে কী বলো? আমি এখন এইটুকু আছি নাকি, অনেক বড় হয়েছি।

বটে! তবে তো—শিশিরকণা বলতে যাচ্ছিলেন—তবে তো নাতজামাইয়ের খোঁজখবর করতে হয়, কিন্তু এ ধরণের রসিকতা নাতনী একদম পছন্দ করে না বলে, কথাটা গিলে বললেন, উদারতা আর সঙ্কীর্ণতা মানুষের মধ্যে অতীতেও ছিলো, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, ইনু, ওতো লেখাপড়ার দোষ নয়, ও হলো শিক্ষার দোষ, পরিবেশের দোষ—তবে অনেক বড় বড় মানুষেরা বলে গেছেন, জন্মগত দোষও নাকি থাকে কিছু—অবশ্য, আমি ওটা মানিনে—

দিদা, এবার আক্কামার গল্প বলো, কাঁথা থাক।

শিশিরকণা হাসিমুখে বললেন, সেলাই করতে করতেই আমি আক্কামার গল্প বলছি, আজ এ কাঁথাটা শেষ না করে উঠবো না। এনার সন্ধ্যের সময় আসার কথা, তখন কাঁথা দশটা দিয়ে দেব।

ওরে বাবা! এত কাঁথা দিয়ে করবে কী সুন্দরদি'? রাণ্ট যে বড়ই হয়ে গেছে।

শিশিরকণা আবার হাসলেন, কোথায় বড়! এই তো তিন বছর হলো সবে, এনা বউমাকে বলেছিলো, খানকয়েক কাঁথা করে দিতে, পুরোনোগুলো নাকি সব ছিঁড়ে গেছে—রোজ রোজ বিছানা নষ্ট হয়ে যায়, তা বউমা বললেন, পয়সার তো আর অভাব নেই তোমাদের, তোয়ালে কিম্বা ঝাড়ন কিনে নাও,—

—আমি তাই শুনে বলেছি, দেব এখন কয়েকখানা কাঁথা করে—তোয়ালে, ঝাড়ন কাঁথার মত তো আর নরম হয় না, তবে বউমাকে আমার ছুঁচে সুতো পরিয়ে দিতে হবে, বউমা একরাশ ছুঁচে সুতো পরিয়ে দিয়ে তবে রোজ দুপুরে শুতে যায়। শিশিরকণার সামনে পেঁচানো পাড়ের সুতো ছিলো অনেক, ইন্দ্রাণী খালি ছুঁচগুলো টেনে নিয়ে সুতো ভরে দিতে লাগলো।

সুন্দরদি' অনেক দিন এখানে আসে না, না দিদাই?

হ্যাঁ, অনেক দিন আসে না। ভেবে রেখেছি তোদের পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেলেই মাসখানেক এনাকে এখানে এনে রাখবো।

বা রে! আমি সুন্দরদি'কে তাহলে পাব কী করে? আমি তো পরীক্ষার পর সিমলায় চলে যাচ্ছি। শিশিরকণা একটু চিন্তা করে বললেন, পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেলে দিন-দশ-বারো থেকে তারপর না হয় তুমি যেও, তখন তো লম্বা ছুটি—

হ্যাঁ, তাই যাব দিদা! রাণ্টটা কী চমৎকার দুষ্টু হয়েছে—ওকে একটু না দেখে কিছুতেই যাওয়া চলবে না। হলুদ সুতো দিয়ে ধানের শীষ কাঁথার বুকে তুলতে তুলতে শিশিরকণা বললেন।

এবার আক্কামার একটা গল্প শুরু করি। আক্কামা মানে শিশিরকণার শাশুড়ি শ্যামাসুন্দরী। উনি যে সেন-বাড়ির বড় বৌ সে পরিচয় গ্রামের সবাই ভুলে গিয়েছিলো। উনি গ্রামবাসীদের সকলেরই আর একটা মা। আর একটা মা থেকে আস্তে আস্তে কবে যেন আক্কায় হয়ে গেলেন সে খবরও সঠিক কেউ জানে না। উনি সকলেরই আক্কামা, বুড়োরও গুড়োরও। শিশিরকণা ছুঁচের কোঁড়ের দিকে চোখ রেখেই বলে চললেন।

তোর দাদু তখন এম-এ পড়ে—আমি তখন আক্কামার কাছেই গ্রামে থাকি। বড়দিনের ছুটিতে তোর দাদু গেছেন গ্রামে, তখন উনি ছাত্র-ইউনিয়ানের বোধ হয় সেক্রেটারী ছিলেন। গ্রামে যাওয়ার কয়েক দিন আগে কলকাতার কোন ময়দানে যেন বিরাট একটা সভা করে গেছেন। যাই হোক, পুলিশের ওপর হুকুম হয়েছিল ওঁকে চোখে চোখে রাখতে। যেদিন রাত্রে উনি গ্রামে এসে পৌঁছোলেন, সেদিন রাত্রেই টেলিগ্রাম এলো গ্রামের থানার দারোগার কাছে—

অবিলম্বে ওঁর ঘর সার্চ্চ হওয়া চাই। চার জন কনেষ্টবল প্রস্তুত হ'য়ে তখুনি রওনা দিলো থানা থেকে। কী শীত কী গ্রীষ্ম আক্কামার ভোরে ওঠা চাই-ই।

আক্কামা শ্রীকৃষ্ণের শতনাম আওড়াতে আওড়াতে গোবরজলের ছড়া দিয়ে যাচ্ছেন সারা উঠোনে, দাওয়ায়, বাইর বাড়ির উঠোনের দিকে যেই এসেছেন দেখেন কী—উঠোনের এক কোণায় চারটে ভালুকের মত কি যেন, প্রথমটা আক্কামা ভয়ানক চমকে উঠলেন, চমকানির ঠেলায় হাঁড়ির গোবরজল অর্দ্ধেকই পড়ে গেলো, কিন্তু ভালুক চারটে যেন আরো চমকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো একেবারে। আক্কামা হেসে ফেললেন, ভালুক নয়, গরমকোট পরা চারজন কনেষ্টবল, আক্কামা ওদের দিকে এগিয়ে গেলেন, দেখলেন, কনেষ্টবল চার জন শীতের ঠেলায় ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, হাটু সোজা রেখে দাঁড়াতে পারছে না, আক্কামা শুধোলেন, তোমরা ওখানে কী কর? কনেষ্টবল চার জন পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, ওরা আক্কামাকে চেনে, একমুহূর্ত বোধ হয় দ্বিধা জেগেছিলো ওদের মনে, তারপরই কেটে গেলো, ওদের মধ্যে একজন বললো, আজ্ঞে, সরকারের কাজে এসেছি, খোকাদাদাবাবুর ঘর সার্চ্চ করবো। প্রথমে মার কথাটা বুঝতে একটু দেরী হয়েছিলো, বললেন, খোকা তো সবে কাল রাত্রে এসেছে।

তা জানি আক্কামা!

ও! মার মুখের ভাব অবিচলিত, ছেলের সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ সংশয় নেই। আবার শ্রীকৃষ্ণের নাম আওড়াতে আওড়াতে গোবরছড়া দিতে দিতে ফিরলেন। মা জানেন সকাল হওয়ার আগে অর্থাৎ সকলে ওঠার আগে সার্চ্চ করতে ঘরে ঢুকবে না কনেষ্টবলরা। মা ছেলের জন্ত বিন্দুমাত্র চিন্তিত হলেন না, ওদের কথা ভাবতে ভাবতে ঘরে ঢুকলেন, আর আক্কামা জেনে ফেললেন সার্চ্চ-সমাচার, এজন্ত কনেষ্টবলরাও বিন্দুমাত্র চিন্তিত হলো না, ওরা বিলক্ষণ জানে আক্কামাকে, আক্কামা তাঁর ছেলেকে একবার সাবধান করে দিতেও তো পারেন, এ সংশয়ের অবকাশ নাকি বারেকের জন্তও ঠাঁই পায়নি ওদের মনে।

এ গল্প ওদের মধ্যে একজন তোমার দাদুকে পরে বলেছিলো, একটু পরে দেখা গেলো, আক্কামা দুটো ভাঙা কড়াইতে কাঠকয়লার গনগনে আগুন করে নিয়ে এসেছেন। দাওয়ার এক পাশে কড়াই দুটো রেখে ডাকলেন কনেষ্টবলদের। আক্কামার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলোনা ওরা, গুটি গুটি এগিয়ে এলো। কড়াই ভরা আগুন দেখে ওরা হাঁ হয়ে গেলো একেবারে, মুখে বাক্য সরে'না। আক্কামা বললেন, দাঁড়ায়ে রইলে কেন? বস। বসে হাত পা সেঁকে নাও আহা বাছারা! মাঘের এই কাল ঠাণ্ডায় কত কষ্ট পেলে বাছারা—আক্কামা ঘরে চলে এলেন। ওরা বিনা বাক্যব্যয়ে দাওয়ায় বসে পড়ে আগুন সেঁকতে লাগলো। মা পুকুর থেকে চান

করে এলেন, পুজো সারলেন, আমাদের তখনও ঘুম ভাঙেনি। বাবা ঘুম থেকে উঠে দাওয়ায় পা দিয়েই দেখেন কনেষ্টবল চারজন ঢুলছে আর তাদের সামনে দুটো কড়াইতে কাঠকয়লার নিবু-নিবু আগুন। বাবা, কারা ওখানে? বলে গলা দিয়ে আওয়াজ করতেই চার জন লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

আজ্ঞে, এই আমরা সেনকর্তা—তারপর একটুখানি থেমে বললো, খোকাদাদাবাবুর ঘর সার্চ্চ করতে এসেছি—বাবা আগুন নিরীক্ষণ করছেন দেখে ওরা ভয়ে ভয়ে বললো, আক্কামা আমাদের গরম হবার জন্য দিয়ে গেছেন। বাবা ছিলেন ভয়ানক কড়া মেজাজের রাসভারি মানুষ, বাবার হাসি দেখা একটা সাধনার ব্যাপার, ওদের কথা শুনে বাবা হা-হা করে দরাজ গলায় হেসে উঠলেন। সে হাসি শুনে ঘুম ভেঙে গেলো আমাদের, আমরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়েই শুনি এই ব্যাপার।

চোখ বড় করে যেন উপকথা শুনছিলো ইন্দ্রাণী। শিশিরকণা থামতেই ইন্দ্রাণী রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, তারপর দিদাই?

তারপর আর কি, সবাই মিলে এই নিয়ে হাসাহাসি।

না, তা বলছি না, দাদুর ঘর সার্চ্চ করে কিছু পাওয়া গেলো?

না, কিছু না—শিশিরকণা কথা শেষ করে হাসতে লাগলেন। দিদাই হাসছো কেন? শিশিরকণা বললেন।

তোর মা যখন এ গল্প শুনেছিলো, তখন তার বয়েস দশ কি এগারো হবে, তখন পুজোতে গ্রামে গিয়েছিলাম আমরা, সর্ব্বাণী ছুটে গিয়ে ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, ঠামা, তোমার সেদিন অত ভুল কেন হলো? কনেষ্টবলদের একবাটি করে গরম চা কেন দিলে না? আমি তখন মার সামনে বসা। মা সুপুরী কুচোতে কুচোতে কুচোনো থামিয়ে কথাটা নিয়ে একটু চিন্তা করলেন, তারপর খুব সহজ গলায় বললেন, আশ্চর্য্য। চা'র কথাটা কিন্তু একবারও আমার মনে আসেনি মা সর্ব্ব, আমি ঘরে এসে মধু খুঁজেছিলাম, দেখলাম মধু ফুরিয়ে গেছে। এই কথা শুনে ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধরে সর্ব্বাণীর কী হাসি! ইন্দ্রাণী খিল-খিল করে হেসে উঠলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বললে, ইস্, দিদাই! আমি যদি একটিবার দেখতে পেতুম আক্কামাকে।

ইন্দ্রাণী চলে গেলো। শিশিরকণা গভীর নিশ্বাস ফেলে আবার কাঁথা সেলাইতে মন দিলেন।

পড়ার ঘরে চেয়ারে বসে ইন্দ্রাণী ভাবলো, অঙ্কের প্রশ্নপত্রটাই আগে শেষ করা যাক। ইউনিভার্সিটি কোয়েশ্চেন পেপারটা সামনে টেনে নিয়ে টেবিলের এদিক ওদিক একটু চোখ ফেলতেই দেখলো, একেবারে ওপরের খাতাটার নিচেই ওর সেই হারানো কালো মলাটের রাফ খাতাটা উঁকি মারছে। আরে! এই তো খাতাখানা, তখন থেকে আমি খুঁজে মরছি—একটানে খাতাটা বার করলো ইন্দ্রাণী। তারপর একটা সাদা পাতা বার করে খুব মন দিয়ে একটা চৌবাচ্চার ছবি আঁকলো, দুটো পাইপ আঁকলো—একটা পাইপ দিয়ে জল পড়ছে আর একটা দিয়ে জল বার হচ্ছে। ইন্দ্রাণী যদি বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজের কাজের বিচার করতো এখন, তাহলে ও নিজেই অবাক হয়ে যেত। মনের ভাবটা কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা হয়েছে ক'দিন থেকে। ছবি আঁকা শেষ করে দু' তিন মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো, তারপর খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে কেটে দিলো। খুব মনোযোগ দিয়ে অঙ্কটা পড়ে নিয়ে শুরু করলো আবার। দু মিনিটেই হয়ে গেলো অঙ্কটা। খুব খুশি হয়েছে ইন্দ্রাণী। নিজের অঙ্কজ্ঞান সম্বন্ধে বিশ্বাস আর একটু বাড়লো। ঐ অঙ্ক আরো কয়েকটা করা যাক তাহলে। রাফ খাতার পরের পাতা ওল্টালো। না, এটাতেও আর সাদা পাতা নেই দেখছি। পরের পাতাতে ওয়ালটার ডে-লা মেয়ারের কয়েকটা কোটেশন ছিলো—ও নিজেই বেছে বেছে লিখেছিলো। কোটেশনগুলি ওর খুব মনোমত। ও গুলির ওপরে আর একবার চোখ বোলাতে গিয়ে মার্জিনের ওপরে লেখা লাইনটা চোখে পড়ে গেলো, "ব্রিফ, ইয়েট সুইট, ইজ লাইফস আওয়ার" লাইনটা তো ওয়ালটার ডে-লা মেয়ারেরই, খুব চমৎকার তাতেও সন্দেহ নেই—কিন্তু লেখাটা যেন ওর নয় বলেই মনে হচ্ছে। খাতাটা চোখের সামনে ধরলো ইন্দ্রাণী। উহুঁ, এ লেখা ওর হাতের কিছুতেই নয়—ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত ভাবলো। এ লেখা কার হতে পারে? এ খাতা তো বানিয়েছে টেষ্টের পর, ওর কোনো ক্লাশমেটের লেখাও তো সম্ভব নয়—তাছাড়া হাতের লেখাটা মেয়েদের নয় বলেই মনে হচ্ছে। অন্যমনস্ক হয়ে খাতার কয়েকটা পাতা উল্টে গেলো ইন্দ্রাণী, প্রায় খাতার শেষের দিকে একটা পাতায় আটকে গেলো চোখ।

পাতার মাঝখানে লেখা আছে—

'মিথ্যেই যদি স্বপ্নের কল্পনা—
কেন এ সৃষ্টি, দুরাশার আলপনা
হৃদয়ের উৎসবে?'

লাইন ক'টির দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য-বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে গেলো ইন্দ্রাণী।

ওর এ খাতাটা তাহলে টেবিলে ছিলো না। ঠিকই। ওর অজ্ঞাতসারে আর কেউ খাতাখানা নিয়ে গিয়েছিলো এবং ঐ কোটেশন আর এই বাংলা লেখা দুটোই কোনো পুরুষের লেখা—কোনো মেয়ের নয়, দুই আর দুই-এ চারের মত চকিতে একটা কথা মনে পড়ে গেলো। নিশ্চয়ই মীনা ওর টেবিল থেকে খাতাখানা নিয়ে গিয়েছিলো আর এই লেখা দুটো ওর মাষ্টারের লেখা, অ্যাঁচড়া বখা তো মাষ্টারটা! মামীমা ঠিকই বলেন—হঠাৎ একটা অচেনা ক্রোধ এসে ইন্দ্রাণীর সর্ব্বাঙ্গে আশ্রয় করলো, আত্মসম্বরণ করা কঠিন হলো ওর পক্ষে; না, এসব বখামির প্রশ্রয় চলবে না, মাষ্টার যখন উপস্থিত আছেন, তখন সোজা গিয়ে চ্যালেঞ্জ করবে ও। খাতাখানা হাতে নিয়ে ক্ষিপ্রভঙ্গিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো ইন্দ্রাণী। কিন্তু সুপ্রিয়র চেয়ার খালি, একখানি ইংরিজী খাতা টেবিলের সামনে খুলে রেখে কি প্রশ্ন যেন মুখস্থ করছে মীনাক্ষী। সমস্ত ঝাঁঝটা মীনাক্ষীর ওপর গিয়ে পড়লো।

মীনা! টেবিল থেকে আমার খাতা নিয়ে এসেছিলি?

এই রে সেরেছে—ইন্দ্রাণীর গলার গাম্ভীর্যে স্বগতোক্তি করলো মীনা। তারপর মুখ থেকে ধরাপড়ার ভাবটুকু নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলে কণ্ঠে বিস্ময় এনে বললো, কে বললো? মীনাক্ষীর ভঙ্গিতে আরো ক্ষেপে গেলো ইন্দ্রাণী।

আমি বলছি, আর শুধু আনা নয়, মাষ্টারমশাইকে পড়তে দিয়েছিলে খাতাখানা, বল সত্যি কি না? মীনাক্ষী ঘাবড়ে গেছে,—মাষ্টারমশাই নিশ্চয়ই রাফ্‌লি হ্যাণ্ডেল ক'রে খাতার পাতা ছিঁড়ে

ছিঁড়ে দিয়েছে নয়তো খাতার সেলাই খুলে গেছে। আসামীর আত্মসমর্পণের মত মুখের চেহারা ক'রে মীনাক্ষী বললো।

ইনু ভাই, অত রাগ করিস না, আগে আমার সব কথা শোন।

ইন্দ্রাণী কৈফিয়ৎ শোনার জন্ত প্রস্তুত, এমনি ভঙ্গি ক'রে তাকিয়ে রইলো।

...সুমনার কাছ থেকে কাল ইংরিজীর কতকগুলি সাজেস্‌শন পেয়েছিলাম, তোর ঐ খাতায় দেখেছিলেম অনেকগুলি ইংরিজী প্রশ্ন লেখা আছে। আমি দুপুরবেলা খাতাটা আনতে গিয়ে দেখি তুই ঘুমোচ্ছিস, তোকে আর না ডেকে খাতাখানা নিয়ে এলাম, সাজেসশন মিলিয়ে দেখি, তিনটে প্রশ্ন লেখা আছে। আমি মনের আনন্দে মুখস্থ করছি, পড়তে পড়তে ভাবছিলেম, পরীক্ষার খাতায় যদি তোর লেখা দুটো প্রশ্নও লিখে আসতে পারি—তাহলে তো মার দিয়া কেল্লা, আমার ইংরিজী পাশ আটকায় কে ?

ইন্দ্রাণীর চোখের রুদ্রভাব অনেক ফিকে হ'য়ে গেলো দেখে মীনার সাহস বাড়লো, মুখস্থ ক'রে চলেছি মনের আনন্দে, এমন সময় মাষ্টারমশাই এসে হাজির, আমাকে মনোযোগী দেখে বেজায় খুশি। খাতার দিকে তাকিয়ে বললেন, কার লেখা পড়ছো ? আমাকে না দেখিয়ে মুখস্থ করছো কেন ? আমি তোর পরিচয় দিয়ে বললুম, ইন্দ্রাণীর ইংরিজী আপনার দেখে দিতে হবে না, আমাদের ইংরিজীর অধ্যাপক বলেছেন, ইন্দ্রাণীর ইংরিজী যেন তপস্যালব্ধ ধন ! মাষ্টারমশাই কোনো কথা না বলে তোর খাতাটা হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। আধ পাতা পড়েই বললেন,—পাগল নাকি ! এ লেখা কোনো ম্যাট্রিকের ছাত্রীর হতেই পারে না, তোমার দাদু ডিকটেট করেছেন আর তোমার বোন নিশ্চয়ই লিখে নিয়েছে, আমি দাদুর বই লেখার কথা খুলে বললুম, তারপর বললুম—ইন্দ্রাণী একেবারে নিচের ক্লাশ থেকে ইংরিজীতে একেবারে রেকর্ড নম্বর রেখে ফার্ষ্ট হয়ে আসছে।

মাষ্টারমশাই সব শুনে অবাক হয়ে খাতার ইংরিজী লেখাগুলি আগাগোড়া পড়লেন, তারপর বললেন, আমি একদিনের জন্ত খাতাটা নিয়ে যাচ্ছি, আমার বন্ধু অরুণেশকে খাতাখানা একবার দেখাতে ভারি ইচ্ছে করছে—দুর্দান্ত ইংরিজী জানে ও। আমি দুহাতে মানা করেছি ইনু, বলেছি, ইন্দ্রাণী আমাকে আস্ত খেয়ে ফেলবে—তবুও মাষ্টারমশাই নিয়েই গেলেন, কিছুতেই ছাড়লেন না, খাতাখানা বুঝি ছিঁড়ে ফেলেছেন—তাই না রে ইনা ?

ইন্দ্রাণীর বোধ হয় শেষের কথাগুলি কানেই যায়নি, উত্তপ্তকণ্ঠে বলতে চেষ্টা করলো, তোর মাষ্টারমশাইয়ের সাহস তো কম নয়, আমার খাতা আমাকে না বলে হোষ্টেলে নিয়ে গিয়ে তার বন্ধুকে দেখিয়েছে ? কিন্তু ইন্দ্রাণীর কণ্ঠে উত্তাপ তো ফুটলোই না বরং ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি পিছলে পড়লো।

বাব্বা, হেসেছিস তুই ? তাহলে আমার কাজ হয়েছে। যা অমাবস্যা মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলি—এখন সর, আমাকে প্রশ্নটা মুখস্থ করতে দে। মীনাক্ষী আবার খোলা খাতার পাতায় চোখ রাখলো। চেয়ে চেয়ে লেখাটা দেখলো ইন্দ্রাণী।

কার লেখা রে মীনা ? তোর মাষ্টারমশাইয়ের নাকি ?

হুঁ। হাতের লেখাটা বেশ পরিষ্কার না রে ? ইন্দ্রাণী মাথা নেড়ে সায় দিলো, তারপর আরো একটু সামনে এসে ঝুঁকে দেখলো লেখাটা। দেখেই নিঃসংশয়ে বুঝলো ইন্দ্রাণী, কবিতার কোটেশনটা কিছুতেই সুপ্রিয়র লেখা হতে পারে না। সে লেখা অনেক টানা। ইন্দ্রাণী দু'-তিন মুহূর্ত কি যেন ভাবলো, তারপর প্রশ্ন করেই বসলো, তোর মাষ্টারমশাইয়ের বাংলা হাতের লেখা কেমন রে ? ভাল ? ইন্দ্রাণীর একেবারে সহজভাব দেখে ভয়ানক আরাম বোধ করলো মীনা। পড়া বন্ধ করে খাতার পাতা উল্টে উল্টে একটা বাংলা লেখা বার করলো, কোনো একটা বাংলা প্রশ্নের উত্তর লিখে দিয়েছে সুপ্রিয়।

বাংলা লেখাও ভারি সুন্দর না রে ?

হ্যাঁ। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ইন্দ্রাণী। ওর খাতার লেখা দুটি সুপ্রিয়র নয় জানতে পেরে ও যেন খুব বেশি রকম স্বস্তি বোধ করলো। পড়ার ঘরে এসে টেবিলের কাছে আর গেলো না ইনা, রাস্তার ধারে জানলার কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। কেমন যেন নোতুন ধরণের একটা অনুভূতি। কেমন যেন রাস্তার লোক চলাচলের দিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ, ফেরিওলাদের বিচিত্র চীৎকার শুনলো, সামনের বাড়ির বউ-শাশুড়ির নিত্যিকার পালা শুরু হলো, সেই একঘেয়ে একসুরে ঝগড়া, সেই একঘেয়ে কদর্য সব বুলি—অন্যদিন এ সময় সশব্দে জানলা বন্ধ ক'রে দেয় ইন্দ্রাণী নয়তো ঘর ছেড়েই চলে যায়। আজ একেবারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। একেবারে চুপ, কোনো কদর্যতা ওর কানের পর্দায় ঘা দিচ্ছে না আজ। আকাশের দিকে মুখ তুলে খণ্ড খণ্ড

মেঘের ওপর চোখ রাখলো। লাজুক সন্ধ্যা চুপি চুপি এসে গেলো কখন—ও তার সংবাদ রাখলো না, আলো জ্বাললো না। স্থির হ'য়ে জানলার ধারে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী, দেখতে পাচ্ছে, লুকোচুরি খেলা লাগিয়েছে মেঘের দল আর তাদের গায়ে গায়ে কী যেন লেখা। শেলি—ক্লাউড—অরুণেশ—লেখাগুলি দেখতে পেয়েছে ইন্দ্রাণী। মিলিয়ে গেলো লেখা, আবার এলো মেঘের ঢেউ—আবার লেখা—

'মিথ্যেই যদি স্বপ্নের কল্পনা—
কেন এ সৃষ্টি, দুরাশার আলপনা
হৃদয়ের উৎসবে ?'

এমন সময় চাঁদ উঠলো, ইন্দ্রাণী ফিরে এলো নিজের মধ্যে। চাঁদের দিকে চেয়ে বিস্মিত হলো ইন্দ্রাণী, প্রত্যেক দিনের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র—এই চাঁদ!

স্কুলফাইন্যাল পরীক্ষা অনেক দিন হলো শেষ হয়েছে। ইন্দ্রাণীও কিছুদিন হলো চলে গেছে সিমলায়, পরীক্ষার পর বারো-তেরো দিন কলকাতায় ছিলো ইন্দ্রাণী। এনাক্ষী এসেছে। তার শিশুপুত্র রান্টু সরগরম করে রেখেছে সারা বাড়িটা। সুবর্ণবালার সঙ্গে রান্টুর তত ভাব হয়নি, ওর যত আদর আবদার মার দিদাই শিশিরকণার সঙ্গে, রান্টুর হাতের কাঠের বল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মীনাক্ষীর কপালে লেগে যায় একদিন, কপাল কেটে রক্ত বেরিয়েছিলো একটু। ছেলেকে কেন সামলে রাখে না এনাক্ষী, এ নিয়ে কড়া গলায় এমনই ধমক দিয়েছিলেন মেয়েকে যে তিন বছরের ঐ শিশু রান্টু আর দিদিমার সামনে আসে না। রান্টু সুবর্ণবালাকে দেখলেই কেমন যেন ভীরু সংশয় চোখে তাকাতে থাকে। মা'র অসংগত আচরণে মীনাক্ষী দুঃখ পেয়েছিলো খুব, রান্টুর এই অহেতুক ভয় ভাঙাতে চেষ্টাও করেছে অনেক কিন্তু নাতি দিদিমার মনের যোগ আর ঘটাতে পারেনি। সুবর্ণবালার এর জন্য কোনো তাপ উত্তাপ নেই। আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি ব্যস্ত দেখা যায় সুবর্ণবালাকে, সব সময়েই মীনার শরীরচর্চা নিয়ে ব্যস্ত। শিশিরকণা সুবর্ণবালার পাগলামী দেখেন আর হাসেন। আহা! থাক একটা কিছু নিয়ে, এই বয়েসে সাংসারিক সাধ-আহ্লাদ সবই তো ঘুচিয়ে বসে আছে।

দুপুরবেলা সবাই এসে বসেছে বারান্দায়। শিশিরকণা, সুবর্ণবালা, এনাক্ষী, মীনাক্ষী: রান্টুও দিদাই-এর গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বাগাটেলি খেলছে। শিশিরকণা রান্টুর মায়েরও দিদাই, রান্টুরও। সুবর্ণবালার দৃষ্টি এড়িয়ে রান্টু মাঝে মাঝে শিশিরকণার হাত ধরে টানছে, অর্থাৎ তুমিও আমার সঙ্গে খেলো। শিশিরকণা সঙ্গে সঙ্গে লাঠি হাতে নিয়ে হাত দিয়ে বিশেষ একটা ভঙ্গি করে ঠেলে দিচ্ছেন বলটা, রান্টু হাততালি দিয়ে খিল খিল করে তরঙ্গ তুলে হেসে উঠেই শিশিরকণার আঁচল দিয়ে অর্দ্ধেকটা মুখ ঢেকে সভয়ে দেখে নিচ্ছে সুবর্ণবালাকে। সুবর্ণবালা এখন মহাব্যস্ত, মীনাক্ষীর অঙ্গমার্জনা করছেন দুধে-ভেজানো মুসুরডাল বাটা দিয়ে, নাতির খেলা দেখার ওঁর সময় কোথায়? এনাক্ষী শিশিরকণার পাকা চুল বাছছে আর বাঁকা চোখে মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে মিটি-মিটি হাসছে। মীনা করুণচোখে তাকালো একবার দিদির দিকে, এনার মায়া হলো, মা মীনুকে ছেড়ে দাও এবার, বাকীটুকু ও নিজেই মেখে নেবে। মীনার ডান হাতে প্রবলবেগে মুসুরডাল বাটা ডলতে ডলতে ঝাপটা দিয়ে উঠলেন সুবর্ণবালা।

তোমরা যদি নিজেদের ভালই বুঝবে, তাহলে আর আমার এ দুর্ভোগ কেন? আমার সই-এর ছেলে সোমেনকে আজ বিকেলে চা খেতে বলেছি এখানে, যেমনি সুন্দর দেখতে তেমান চাকরীও পেয়েছে, মস্ত একেবারে পুলিশ সাহেব। সই বলেছে, ছেলেই কর্তা, সোমেনের যদি মীনুকে পছন্দ হয় তাহলেই হবে। তাই ভাবলাম, চেষ্টা করে দেখি একবার—হাতের বেগ আরো দ্রুততর হলো সুবর্ণবালার। শিশিরকণা কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন, কৈ এ-সব তো আমাকে কিছু বলোনি বৌমা?

বলার জো কী? যা একখানি খিঙ্গি মেয়ে হয়েছেন, শুনলেই গোলমাল করবে। সেদিন সইকে—শিশিরকণা বলে উঠলেন, তোমার আবার সই কে বৌমা? কোনো দিন তার কথা শুনিনি তো?

আপনাকে বুঝি বলা হয়নি কাকীমা, সোমেনের মা'র সঙ্গে পাশাপাশি বাড়িতে থেকে এসেছি আট বছর। সোমেনের বাবা ছিলেন পুলিশ ইনস্পেক্টার, যেমন ভদ্র তেমনি অমায়িক। পুলিশের লোক যে এত সৎ হতে পারেন না দেখলে বিশ্বেস আমার হতো না কাকীমা, আর সোমেনের মা'র তো তুলনাই মেলে না। সেদিন কালীঘাট থেকে চান করে ফিরছি, রাস্তায় সোমেনের মা মনোরমার সঙ্গে দেখা। আমাকে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে গেলো। সামনেই কালীঘাট রোডে নোতুন বাড়ি করেছে। চমৎকার বাড়ি, চমৎকার সব ফার্নিচার—একেবারে ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। সোমেন বাড়িতেই ছিলো। মনোরমা বললে, রোজই বিরাট বিরাট বড়লোকের বাড়ি থেকে সোমেনের সম্বন্ধ আসছে কিন্তু ছেলে নাকি তেমন করে গা'ই পাতে না। সকলের বাড়িতেই যায়, গিয়ে মেয়ে দেখে এসে চুপ করে থাকে—এখনও পর্যন্ত কোনো মতামত জানায়নি মনোরমার কাছে, তাই ভাবছি—

এবার ডান হাত ছেড়ে দিয়ে মীনার বাঁ হাত ধরলেন সুবর্ণবালা।

শিশিরকণা এনা দুজনেই হাসতে লাগলো। মীনার সুন্দর রাঙামুখের দিকে তাকিয়ে শিশিরকণা সুবর্ণবালাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, বৌমা, তুমি মীনুর বিয়ের জন্য এত তড়িঘড়ি লাগিয়েছো কেন? মেয়ে সন্তান যখন, পরের বাড়ি তো যাবেই, এতটুকুন বয়েসে কাছ ছাড়া করতে চাইছো কেন? কষ্ট হবে না? সুবর্ণবালার ঠোঁটের কোণ তীক্ষ্ণ হলো, পরের বাড়ি যখন পাঠাতেই হবে মেয়েকে, তখন আর মায়া বাড়িয়ে লাভ কী কাকীমা? দিনকাল ভাল নয়, আজকাল মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়াই মঙ্গল।

আর মীনাক্ষী নির্ব্বাক হয়ে বসে বসে মা'র কথা গিলছিলো, পৃথিবীটাই কী বদলে গেলো, না মা বদলালো! এই তো সেদিন সাড়ম্বরে ওর আর ইন্দ্রাণীর কাছে মা ঘোষণা করলেন, পুলিশকে তিনি এতই ঘৃণা করেন, বহু বছর থেকেও পাশাপাশি পড়শিনীর সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত কোনো দিন প্রবৃত্তি হয়নি, যেহেতু তিনি পুলিশের স্ত্রী। সেই পুলিশের স্ত্রী মনোরমা, রাতারাতি হয়ে গেলেন সই, আর অতুলনীয়া আর তাঁর পুলিশ স্বামী—ভদ্র-অমায়িক-সৎ, আর তাঁর ছেলে যত ভাল কাজই করুক, কাজটাতো পুলিশ লাইনেরই বটে।

মুখ হাঁড়ি করে কী ভাবছিস? শীগ্‌গির সাবান দিয়ে গা ধুয়ে আয়। এনাক্ষী সাজালো মীনাকে, মেয়ের চেহারার জৌলুস দেখে

সুবর্ণবালাকেও মনে মনে স্বীকার করতে হলো ; হ্যাঁ, সাজানোর ক্ষমতা আছে বটে এনাক্ষীর ! মুখে বড় মেয়েকে তারিফও করলেন একবার। চঞ্চলা মীনাক্ষী ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা পার হ'য়ে ছাদে উঠতে যাচ্ছিলো, দেখে দোতলার সিঁড়ির মুখে সুপ্রিয় দাঁড়িয়ে ইতি-উতি তাকাচ্ছে। মীনাক্ষী হেসে উঠলো।

এদিক-সেদিক কী দেখছেন ? সুপ্রিয় মনে মনে বললো : এই তোমার মা কাছে-পিঠে আছেন কি না তাই দেখে নিচ্ছি—কিন্তু মুখ ফিরিয়ে মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়ে চোখ একেবারে পলকশূন্য করে ফেললো সুপ্রিয়। মীনাক্ষী রাঙামুখ নামিয়ে আবার প্রশ্ন করলো, কী দেখছেন মাষ্টারমশাই ?

তোমাকে—মীনার মুখের রং গাঢ় হলো আরো। চেষ্টা করে প্রতিভ হলো সুপ্রিয়, সহজ গলায় বললো, ইংরিজীর নোটস দুখানা নিতে এসেছিলেন, ও দুটো অঙ্কের বই কি না—মীনাক্ষীও সামলেছে কিছুটা, মুখের বর্ণান্তরও প্রায় স্বাভাবিক, হাসিমুখে বললো, আপনি ঘরে গিয়ে বসুন মাষ্টারমশাই, আমি নোটস দুখানা নিয়ে নীচে আসছি। নীচে নেমে গেলো সুপ্রিয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নোটবই হাতে করে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো মীনাক্ষী এবং এসেই বই কোলে করে সুপ্রিয়র মুখোমুখি একটা চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়লো।

মাষ্টারমশাই ! পাশ করলে আমাকে আবার পড়াবেন তো ? সেই আগেকার মত উচ্ছল গলা মীনাক্ষীর, কিন্তু বিচিত্র একটি আশার ছায়া পড়েছে কালো চোখ দুটিতে, সুপ্রিয় মীনাক্ষীর চোখে চোখ রাখল, চোখ নামিয়ে নিল মীনাক্ষী। আবার চোখ তুলল, সুপ্রিয় সুন্দর করে হাসল একটু। আর পড়বার সুযোগ হবে কি তোমার মীনাক্ষী ! আজ কোন বিশেষ অতিথির আগমনের প্রতীক্ষায় আছো বলে মনে হচ্ছে যেন ? মীনাক্ষী আবার চোখ নামাল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে যেন জোর দিয়ে বললো, অতিথি আসলেই আমি বিদেয় হবো তার নিশ্চয়তা কী ?

সুপ্রিয় কয়েক মুহূর্ত দেখলো মীনাক্ষীকে, তার পর হাসিমুখে ফিসফিসিয়ে বললো, এমন অসামান্যাকে সঙ্গে না নিয়ে ফিরবেনই না অতিথি। ওপর থেকে সুবর্ণবালার ব্যস্ত কণ্ঠস্বর কানে এলো, মীনু ! মীনা ! কোথায় আবার গেলি তুই ? দুজনেই ত্রস্ত হয়ে চেয়ার ঠেলে দাঁড়ালো। মীনাক্ষী সুপ্রিয়র প্রসারিত হাতে বই দুখানা দিয়ে ঠোঁট টিপে একটু হাসলো, তার পর বললো, মাষ্টারমশাই ! আপনি গান জানেন ?

হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

না, মানে, একটি বিশেষ গান শেখানোর জন্ম মা অস্থির হয়ে টেক্কট করছেন কি না—অথচ সে গানটা আবার আমাদের চেনাশোনার মধ্যে কেউ জানে না—গোলাপী ঠোঁটে ছদ্ম অসহায় ভঙ্গি ফোটোল মীনা, আপনি জানলে শিখে নিতুম।

কী গান ? সুপ্রিয়র প্রশ্ন।

আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো···

মীনা ! সুবর্ণবালার কণ্ঠস্বরের পর্দা আরো চড়েছে। সুপ্রিয় তাড়াতাড়ি বললো, আচ্ছা, তাহলে চলি—কথা শেষ ক'রে দরজার দিকে পা বাড়াতেই মীনাক্ষী দ্রুত এগিয়ে এসে সুপ্রিয়র হাত থেকে টপ ক'রে বই দুখানা টেনে নিয়ে অস্ফুটে বলে উঠলো, আজকে থাক বই, আর একদিন এসে নিয়ে যাবেন—দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দুম-দুম ক'রে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে গেলো মীনা। সুপ্রিয় একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলো। হঠাৎ একটি তরঙ্গ এসে যেন দোলা দিয়ে গেলো ওকে। আকাশের রং মুহূর্তে বদলে গেলো যেন !

এক একটা সিঁড়ি টপকে টপকে উঠছিলো সোমেন। পুত্রের পরিচিতি পায়ের শব্দ শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মনোরমা। ছেলের প্রফুল্লমুখ দেখে প্রশ্ন করলেন, কী রে, পছন্দ হলো ?

মেয়ে তো পরমাসুন্দরী মা, একেবারে নিখুঁত বললেও হয়—হাল্কাগলায় উত্তর দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন ডি-এস-পি সোমেন। ছেলের উত্তরে প্রীত হলেন মনোরমা। যাক্‌—তাহলে ঘর এবার ভরবে, একা-একা থাকা আর যায় না। ছেলে যায় সকাল ন'টায়, আসে সন্ধ্যে আটটায়—ফাঁকাবাড়িতে মা'র দম আটকানোর খবর ও জানবে কী ! অবশ্য সুবর্ণবালা দিতে থুতে যে কিছুই পারবেন না সে কথাও সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠলো একবার মনোরমার মনে। কী দরকার আমার টাকাকড়ি আসবাব পত্রের ! বেঁচেবত্তে থাক সোমেন। ছেলে তো তাঁর অক্ষম অনুপযুক্ত নয়, পরের টাকায় প্রয়োজনটা কী ? আর দেরী নয়, কালকেই তাহলে পাকা কথা নিয়ে নিতে হবে ছেলের কাছ থেকে। খুশি মনে ঠাকুরঘরে সন্ধ্যে দিতে গেলেন মনোরমা।

এদিকে, সোমেন তখন বাইরের পোষাক না ছেড়েই একটি রেক্সিনের বাঁধানো লম্বাখাতা সামনে খুলে নিয়ে বসেছেন। খাতার পাতায় লম্বায় এবং চওড়ায় দু ইঞ্চি বাদ বাদ এক একটি করে লাল পেনসিল দিয়ে লাইন টানা। অর্থাৎ খোপ খোপ চার্টের ঘরের মত। একেবারে সামনে পর পর নিচের ষোলোটা খোপ পর্য্যন্ত ষোলোটি মেয়ের নাম লেখা। প্রথম মেয়েটির নামের পাশে একটু ওপর দিকে ছ'টি খোপে ছ'টি লেখা রয়েছে—প্রথম তিনটি খোপে লেখা রয়েছে, মেয়ের অর্থাৎ কনের বিউটি, এডুকেশন এ্যাণ্ড কোয়ালিফিকেশন, তারপর তিনটি খোপে লেখা আছে—কনের বাবার ইনকাম, সোসাল ষ্ট্যাটাস্ এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স।

সোমেন পকেট থেকে পেন বার ক'রে ঢাকনা খুললো, তারপর ষোলো নম্বরের মেয়েটির নামের নিচে সতেরো নম্বর দিয়ে মীনাক্ষী সেন নামটা লিখে ফেললো। তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে ডি-এস-পি সোমেন ভুরু কুঁচকে একটু ভাবলো, তারপর ছ'টি খোপ পর পর পূর্ণ হলো অঙ্কের সংখ্যায়। বিউটির খোপে ৭৫% পার্সেন্ট লিখলো, এডুকেশন ও কোয়ালিফিকেশনে লিখলো ফরটি-ফরটি, তার পরের তিনটে খোপে শুধু জিরো বসিয়ে দিলো, সংখ্যাগুলির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো সোমেন, ওপর থেকে নিচু পর্যন্ত বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নিলো, বিউটির খোপে যদিও মীনাক্ষীর নম্বরই হায়েষ্ট, আর কেউ ফিফটির ওপরেই ওঠেনি কিন্তু টোটাল পার্সেণ্টেজ কষার পর মীনাক্ষী খুব শোচনীয় নম্বর পেয়ে ফেল ক'রে গেলো, গ্রেস দিয়েও পাশ করানো ওকে কিছুতেই যাবে না। একটা অদ্ভুত সূক্ষ্ম হাসি সোমেনের ওষ্ঠপ্রান্তে ঢেউ তুলেই মিলিয়ে গেলো, রেক্সিনের বাঁধানো খাতাখানি বন্ধ ক'রে একেবারে নিশ্চিন্ত মনে উঠে দাঁড়ালো সোমেন, গুনগুন ক'রে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকে গেলো কাপড় ছাড়ার ঘরে।

[ ক্রমশঃ।

মা'কে আয়ুষ্মান অমৃতজীবনের মা'কে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রতে পারি কি ?

ভৃত্যেরা উত্তর ক'রলে, অত্র শ্রীভবতীর স্বামী স্বর্গে গেছেন। গেছেন দেবতাদের অতিথি হ'তে। মাত্র এই দু'দিন আগে। সুতরাং আমাদের বিয়োগ-বিধুরা রাণীমা এখন আর কারুর সংগেই সাক্ষাৎ ক'রবেন না।

ফিনিক্সের গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের রাজবাটীতে কিছু প্রভাব ছিলো। সে ব্যাবিলনের সম্রাটকন্যাকে একটি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করালে।

ব'ললে সে অসামান্যা রাজরাজকন্যাকে, অপেক্ষা করুন এখানে একটু। দেখি কিছু ক'রতে পারি কি না।

অসামান্যা রাজরাজকন্যা অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন।

কক্ষটির দেয়ালগুলি ছিলো কমলালেবুর কাঠ দিয়ে প্যানেল করানো। গজদন্ত বিখচিত। অল্পবয়সের গূঢ় গোপ-গোপীগণ সোনালি রঙের জরিমোটা প্রান্তযুক্ত লম্বা সাদা পরিচ্ছদে বিভূষিত হয়ে রাজরাজকন্যার পরিবেশন করছিলো। পরিচর্য্যা করছিলো চুপড়ির মত শত শত ডিসে ক'রে যোড়শোপচারেরও শতগুণ বেশী চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে।

রাজসিক এই সমস্ত আহার্য্যরাশির স্তূপের ভিতরে গন্ধবর্ণ ও আস্বাদ যার অন্য কোনো দেশ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না, এমন কি লুকোনোও ছিলো না একখানি মাংসের টুকরোও। প্রাণ-তেজস্কর এবং সুরা-সমূহের চেয়েও শ্রেষ্ঠ সরবৎগুলির ছিলো প্রাচুর্য্যই।

অসামান্যা রাজরাজকন্যা খাচ্ছিলেন গোলাপ-নিকুঞ্জের বিছানায় শুয়ে।

মূক ময়ূরীরা সমুজ্জ্বল পুচ্ছগুলি প্রসারিত ক'রে ব্যজন করছিলো। রঙ-বেরঙের শ'দুয়েক পাখী, শ'খানেক গোপ এবং শ'খানেক গোপাঙ্গনা সম্মিলিত নৃত্য ও সংগীতে আনন্দের বৈজয়ন্তী সৃষ্টি ক'রছিলো।

সব কিছুই ছিলো মনোরম, সরল ও স্বাভাবিক।

ব্যাবিলনে জাঁকজমক ছিলো বেশী অবশ্যই। তবে কি না গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের দেশে প্রকৃতি ছিলো সুখপ্রদ।

## ছত্রিশ

এতো আনন্দের ভিতরেও, এতো সান্ত্বনাদায়ক ও উদ্দাম নৃত্যসংগীতের মধ্যেও ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজরাজকন্যা অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রছিলেন।

তরুণী ঈরলাকে তিনি ব'ললেন, গুপ্ত গোপগোপীগণ, কোকিল কোকিলা, শ্যামা শুকসারী প্রভৃতি সর্ব্বত্রেই বিহঙ্গেরা সকলেই পরস্পর করছে প্রেম-নিবেদন।

আমি কিন্তু ভাগ্যহতা। আমিই কেবল বঞ্চিত হলুম আমার প্রিয়তম গঙ্গাতীরবর্ত্তীয় নায়কের থেকে, আমার অত্যন্ত সুকোমল ও অতীব অস্থির কামনারাশির উপযুক্ততম পাত্র হতে।

অসামান্যা রাজরাজকন্যা খাচ্ছিলেন, যুগপৎ প্রশংসা ও ক্রন্দনের মধ্যে।

ঠিক সেই সময়েই কিন্তু ফিনিক্স বলছিলো অমৃতজীবনের মাকে, আর্যে, ব্যাবিলনের রাজরাজকন্যার সংগে দেখা না করেই পারবেন না কিন্তু। আপনার জানা আছে···

সমস্ত কিছুই আমি জানি, বললেন শ্রদ্ধেয়া জননী, বসরায় পান্থ বাসাবাটীতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিলো সে পর্য্যন্ত সমস্তই আমি জানি। একটি চাতকপাখী আজ সকালেই আমায় জানিয়েছে সমস্ত কথাই। ঐ দুর্ম্মুখ পাখী হতভাগাটাই হচ্ছে মহা অনর্থের মূল। ওর জন্যেই তো আমার পুত্রটি, মহা নিরাশাগ্নিতে জ্বলে-পুড়ে পাগল হয়েছে, পরিত্যাগ করে গেছে পৈত্রিক ভবন।

আপনি তা হলে জানেন না, বললে ফিনিক্স। অসামান্যা সম্রাট-কুমারী আমায় পুনরুজ্জীবিত করেছেন ?

না, প্রিয় বৎস ! চাতকটিরই মুখ থেকে শুনেছিলুম তুমি মরে গেছো। তোমার মৃত্যু সংবাদে সান্ত্বনার বাঁধ গিয়েছিলো ভেঙে।

তোমায় হারিয়ে, স্বামীর মৃত্যুতে, এবং একমাত্র পুত্রের আকস্মিক গৃহত্যাগে শোকাকুল হয়ে পড়েছিলুম অত্যন্তই। দরজা দিয়েছিলুম বন্ধ করিয়েই, কারো সংগেই সাক্ষাৎ না করতে।

কিন্তু ব্যাবিলনের রাজরাজকন্যা যখন আমায় সম্মান দিচ্ছেন আমায় দর্শন দিতে এসে, যথাশীঘ্র তাঁর সংগে এক্ষুণি আমায় সাক্ষাৎ করাও। গুরুতর ফলপ্রসূ বিষয়গুলিই বলবার আছে তাঁকে আমার। তুমিও উপস্থিত থাকবে কিন্তু। এই আমার ইচ্ছে জেনো।

## সাইত্রিশ

তিনশো বছরের বৃদ্ধা হলেও, গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের শ্রদ্ধেয়া রাণীমা আয়ুষ্মান অমৃতজীবনের জন্ম-জন্মান্তর পূজনীয়া শুচিস্মিতা মার অঙ্গে অঙ্গে ছিলো সৌন্দর্য্যের অবশেষগুলি, দুশো ত্রিশ চল্লিশের মধ্যে অবশ্যই তিনি ছিলেন মনো-সম্মোহিনী।

ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজরাজকন্যা ফর্মোজান্তেকে তিনি গিয়ে সোজাসুজি অভ্যর্থনা করলেন। অভ্যর্থনা করলেন অন্য এক রকম সশ্রদ্ধ মর্য্যাদার সংগে। সেই শ্রদ্ধা সুনিবিড় মর্য্যাদায় মিশ্রিত ছিল একটা কৌতূহল ও শোকাকুল দৃষ্টি।

অসামান্যা রাজরাজকন্যার চিত্তে একটা পুরু সুগভীর রেখাপাত করলে তা।

প্রণামান্তে প্রথমেই ফর্মোজান্তে শোকপূর্ণ অনুতাপ প্রকাশ করলেন শোকাতুরা মহীয়সী মহিলার স্বামীর মৃত্যুতে।

হায় ! বললেন গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের বিধবা রাণীমা, আমার স্বামী মৃত্যুতে উদ্বেগের কারণ আছে অবশ্যই। আপনি যতোখানি মনে করেন তার চেয়েও আরো বেশী।

আমায় তা আক্রান্ত করে নিশ্চয়ই, বললেন ফর্মোজান্তে। তিনি ছিলেন জন্মদাতা পিতা, যাঁ'র সম্পর্কে সর্ব্বশাস্ত্রেই একমত :

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ
পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে
প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

তিনি ছিলেন জন্মদাতা পিতা ওঁরই যিনি—

এই কথায় বিধবা রাণী-মা কেঁদে উঠলেন উচ্ছ্বলিত ভাবে।

আমি শুধু এসেছি ওঁর জন্যেই। এসেছি বহু বহু বিপদের মধ্য দিয়ে। ওঁর জন্যে কী-ই না ক'রেছি আমি ? ত্যাগ ক'রেছি পিতাকে, ত্যাগ করেছি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জমকালো রাজসভাটিকে।

হরণ করেছিলো আমায় মিশরের এক রাজা। আমি তাঁকে করি, ঘৃণা করি কায়মনোবাক্যের অন্তরের অন্তস্তল থেকে।

পালিয়েই এই ধর্ষকের হাত থেকে উড়েছি আকাশে-আকাশে, ছুটে এসেছি মুখখানি দেখতে আমার প্রিয়তমের।

এলুম। কিন্তু তিনি কই? কই আমার প্রিয়তম, জীবনের ধন, আত্মার আত্মা, ভাবের নির্মাল্য, জন্মজন্মান্তরের তপস্যার, আমার দেবতা, আমার অন্তরের মনোবৃত্তানুসারী মহাপ্রভু—

তিনিও গেছেন উড়ে আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ না দিয়ে—

অশ্রুজল ও ফোঁপানির জন্য অসামান্যা রাজরাজকন্যা আর কিছু তে পারলেন না; বললেন শুধু, তুমি বলবেন আমায় আপনি, পনি আমার গুরুরও গুরু, বয়োজ্যেষ্ঠা তো বটেনই!

শ্রদ্ধেয়া মা বললেন তাঁকে, তারপর বৎসে! মিশর-ভূপাল তোমায় যখন ধর্ষণ করে, যখন বসরার পথে তাঁর সংগে নৈশ-ভোজে দিয়েছিলে তুমি একটি সরাই-এ, যখন শিরাজের সুরা ঢালছিলে তাঁর জন্য তোমারই শুভ্রকরগুলি দিয়ে, তোমার কী মনে পড়ে খছিলে একটি চাতকপাখীকে? পাখীটা পত্‌পত্‌ করছিলো মার কক্ষেই।

অবশ্যই। হ্যাঁ, সত্য কথাই তো। আপনি আমায় স্মরণ য়ে দিলেন। আমি তা'র দিকে কোনো নজরই দিইনি কিন্তু।

কিন্তু এখন তা'র সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা আর সুপ্ত নয়। মার মনে পড়ে, খুব ভালো করেই মনে পড়ে। ঠিক যে মুহূর্তে মিশর-ভূপাল আসনের থেকে উঠে পড়লেন চুমু খেতে আমাকেই, চাতকপাখীটি জানালার পথে গিয়েছিলো উড়ে। আর্ত চীৎকার লো তা'র কণ্ঠে। তারপর আর তা'র আবির্ভাব হয়নি।

হায়! ভগবতি! বললেন অমৃতজীবন-প্রসবিত্রী, এটাই তো আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ। আমার ছেলেটি পাঠিয়েছিলো চাতকপাখীটিকেই। পাঠিয়েছিল তোমারই স্বাস্থ্য কেমন আছে, তে। জানতে পাঠিয়েছিলো ব্যাবিলনের সংবাদ, সে চ'লে যাবার পর কী ঘ'টেছিলো। সে সংকল্প করেছিলো ফিরে গিয়ে মারই পাদপ্রান্তে নিজ আত্মাকে নিক্ষেপ করবে। উৎসর্গ করবে র জীবন তোমাকেই।

তুমি জানো না, মা, কী আত্যন্তিক ভাবে সে পুজো করে মায়। গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়েরা সকলেই প্রেমাসক্ত ও সুবিশ্বস্ত। কিন্তু মার পুত্রটি হ'চ্ছে সবচেয়ে বেশী প্রেমোন্মাদী আর তাদের সবার ভেতরে সবচেয়ে বেশী সুবিশ্বাসী, সত্যসন্ধ, একনিষ্ঠ।

বলতে বলতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো তাঁ'র।

## আটত্রিশ

শ্রদ্ধেয়া মা পুনরায় বলতে লাগলেন, চাতকপাখীটি তোমার পায়, দেবি, একটি সরাইখানায়। তুমি সামোদেই আসব করছিলে মিশরের মহীপাল ও একটি নোংরা নীচ পুরোহিতের গে।

পরিশেষে সে দেখতে পায়, তুমি সুকোমল চুম্বন দিচ্ছো পৃথ্বীপালকেই যে ফিনিক্সকে ফেলেছিলো মেরে। আর যা'র কে আমার পুত্রের আছে দুর্জ্জয় আতঙ্ক!

এই দৃশ্য দেখে চাতকপাখীটির মন তায়ালু ঘৃণার পূর্ণ হয়। সে উড়ে চ'লে যায়, তোমার মারাত্মক প্রেম-কর্ম্মের উপরে অভিশাপ বর্ষণ ক'রতে ক'রতে।

আজই সে ফিরে এসেছে। সব ঘটনাই ক'রেছে বিবৃত।

কিন্তু কোন মুহূর্ত্তে, হা মহা ভগবান! সেই মুহূর্ত্তে, যখন আমার পুত্ররত্ন আমার সংগেই তার স্বর্গীয় জনকের জন্য শোক প্রকাশ ক'রছিলো, শোক প্রকাশ করছিলো ফিনিক্সের জন্য। সেই মুহূর্ত্তে যখন সে জানতে পেরেছে আমার নিকটে—সে তোমার দ্বিতীয় জ্ঞাতি-ভাই।

উঃ ভগবান! আমার জ্ঞাতিভাই! ভগবতি, তাও কী সম্ভব? কোন দৈব অনুগ্রহে? আমি কী হ'তে পারি অমন ভাগ্যবতী? হ'তে পারি যুগপৎ ওঁকে ক্ষুণ্ণ করবার মতো অতো ভাগ্যহীনা ও?

আমার পুত্রটি তোমার জ্ঞাতিভাই, সত্যি কথাই ব'লছি, মা বললেন অমৃতজীবন জন্মদাত্রী। শীঘ্রই প্রমাণও আমি দেবো তার। কিন্তু, দেবি, তুমি আমার আত্মীয় হ'য়ে বঞ্চিত ক'রছো আমায় পুত্র-রত্ন থেকে। মিশরের মহীপালকে চুমু খেয়ে তুমি যে শোক-সায়ক তা'র বুকে হেনেছো, সে আঘাত থেকে সে বাঁচতে পারবে না।

ওগো খুড়ী মা! বললেন অসামান্যা রাজেন্দ্র-দুহিতা রূপদক্ষা ফর্মোজান্তে কাঁদতে কাঁদতে, তোমার ছেলের নামেই শপথ ক'রে বলছি, ব'লছি শপথ ক'রে মহাশক্তিমান ও রোসমাদের নামে, সেই মারাত্মক চুম্বন দূষণীয় তো ছিলোই না। সে তোমার ছেলেকে আমি যে কী পরিমাণ ভালোবাসি তারই জাজ্জ্বল্য, সপ্রবলতম প্রমাণ।

ওঁর জন্য আমি কী অবাধ্যই না হ'য়েছি আমার পিতার। ওঁর জন্যে ইউফ্রেটীশ নদের তীর থেকে এসেছি গঙ্গা নদী তীরে। নীচ ঘৃণ্য মিশর-ভূপালের কর-গ্রাহে আবদ্ধ হ'য়েছিলুম। তাঁর কবল থেকে পলায়ন করা সম্ভব ছিলো শুধু তাঁকে প্রতারণা ক'রেই। তাই ক'রেছিলুম আমি। অন্য আর কোনো উপায়ই ছিলো না।

আমি ফিনিক্সের দেহ ভস্ম ও তার আত্মার দোহাই মানছি, শপথ ক'রছি। ও দু'টি সুপবিত্র বস্তু তখন আমার পকেটেই ছিলো। তারাই সাক্ষী দি'ক। ফিনিক্স আমার চরিত্র সম্বন্ধে সর্ব্ব-সন্দেহই নিরসন ক'রতে পারবে, সমর্থন করতে পারবে আমার আচরণ।

কিন্তু, ভগবতি, কী ক'রেই বা আপনার পুত্ররত্ন জ্ঞাতিভাই হ'তে পারেন আমার? ওঁর জন্মভূমি গঙ্গাতীর, আর আমাদের পরিবার ইউফ্রেটিস নদীতীরে রাজত্ব করছেন অতো অতো শতাব্দী ধ'রেই।

তুমি তো জানোই, পূজ্যা গঙ্গাতীরবর্ত্তীয় মহিলাটি বললেন, তোমার প্রপিতৃব্য ছিলেন ব্যাবিলনের সম্রাট। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন বেলুসের পিতা।

আজ্ঞে, ভগবতি!

তুমি এ-ও জানো, তাঁর ছেলে সর্ব্বদেব, বিবাহের ফলে, জন্মদাতা হ'ন শ্রীমতী সর্ব্বদেবার। রাজপুত্রী সর্ব্বদেবা তোমাদের রাজসভায় লালিত-পালিত হ'য়ে আসছেন। এই রাজপুত্রই তোমার বাবার হাতে উৎপীড়িত হ'য়ে আশ্রয়প্রার্থী হ'ন এসে আমাদের সুখী দেশে।

নামান্তর অবশ্যই তিনি তখন গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই আমায় বিয়ে করেছিলেন। তাঁরই ঔরসজাত আমার পুত্ররত্ন, তরুণ

রাজপুত্র সর্ব্বদেব অমৃতজীবন। মানবকুলে সে সবচেয়ে রূপদক্ষ, সবচেয়ে শক্তিমান, সবচেয়ে সাহসী, সবচেয়ে শুচি-শুভ্রতম, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক। আর এখন কিন্তু তার! সবচেয়ে উন্মত্ততম।

ব্যাবিলনের উৎসবগুলিতে সে গিয়েছিলো তোমার অলোকসামান্য রূপ-লাবণ্যের কথা শুনে। সেই থেকে সে তোমায় দেবতার মতো পূজো করে। আর সম্ভবতঃ আমার প্রিয়তম পুত্ররত্ন চিরতরে আমার চোখের আড়াল হয়ে গেছে।

## উনচল্লিশ

সর্ব্বদেব বংশের স্বত্বাধিকার-সম্বন্ধীয় দলিল-দস্তাবেজগুলি ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজেন্দ্রকন্যাকে দেখালেন সর্ব্বদেব অমৃতজীবনের মা।

ফর্মোজান্তে সেদিকে লক্ষ্যও করলেন না।

আঃ ভগবতি! কেঁদে কেঁদে বললেন তিনি, যে যা চায় সে কী তা' পরীক্ষা করে? আমার প্রাণ আপনার উপরে খুবই বিশ্বাসী।

কিন্তু কোথায় সর্ব্বদেব অমৃতজীবন? কোথায় আমার পরম আত্মীয়, আমার পরম প্রেমিক, আমার পরম সম্রাট? কোথায় আমার পরম জীবন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা?

কোন পথ উনি ধরেছেন? আমি যাবো, অনুসন্ধান করবো আমি তাঁর। অনন্তদেবতা যে সমস্ত ভূমণ্ডল তৈরী করেছেন তাদের প্রত্যেকটিতেই সন্ধান করবো আমি, ওঁর মানে সব ভূমণ্ডলগুলিরই মনোরমতম অলঙ্কার।

অগস্ত্যপক্ষত্রে আমি যাবো, যাবো, যাবো সহস্র-দংষ্ট্রক মৎস্যলোকে যাবো রোহিণী নক্ষত্রে। ওঁকে বিশ্বাস করাবোই, আমি প্রেমে একনিষ্ঠা, নিষ্কলঙ্কা।

ফিনিক্সকে সাক্ষী মেনেছিলেন অসামান্যা রাজেন্দ্রকুমারী ফার্মোজান্তে।

ফিনিক্স বললে, চাতক-বর্ণিত পাপ থেকে ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজরাজকন্যা সম্পূর্ণই পাপমুক্তা। চাতকের বাহ্য চক্ষুই ছিলো কার্য্যকরী, মনশ্চক্ষু ছিলো অন্ধ।

অসামান্যা রাজরাজকন্যার অন্তর্গত মন সে দেখতেই পায়নি। পাবেই বা কী ক'রে? স্থূল কী কখনো সূক্ষ্মর মধ্যকেন্দ্রে যে সূর্য্য উদ্দীপ্ত হয়ে আছে, তা'র দিকে তাকাবার শক্তি রাখে? অন্ধ হয়ে যাবার ভয়েই সে ক্লান্ত, পরিম্লান, জড়িমার্ত্ত। অন্তর্গত মন জানতে পারেন শুধু ভগবান, বা ভগবৎজনিত ভাগবৎজন।

ব্যাবিলনের সম্রাটকুমারী মিশর-ভূপালকে চুমু খেয়েছেন, প্রেমবশে। চাতকের অভিযোগ এই। সত্যিই কী ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজরাজকন্যা প্রেমবশে চুমু খেয়েছেন মিশরের মহীপালকে? মোটেই না।

প্রেম কী বাধ্যতার দাস? পশুগণ কী তার মন পায়? আর এই যে ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজরাজকন্যা, স্ত্রীলোক হয়েও ছুটোছুটি করছেন ইউফ্রেটীস থেকে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত, এই যে ছুটতে চাইছেন তিনি চীন দেশে, স্বর্গে মর্ত্তে রসাতলে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, শুধু সর্ব্বদেব অমৃতজীবনের পেছনেই, এর কী কোনো মূল্য নেই? এই আকুলতা, এই উন্মত্ততা, এ কী প্রেমের বশ্যতা-বাধ্যতা নয়? প্রেম-দেবতার একনিষ্ঠ সেবা-পূজো নয়?

ভগবতীর অন্য নাম মহামায়া। মায়া বিস্তার করেন তিনি চেতন অচেতন প্রাণী বা বস্তুর উপরে। রজ্জু সর্পবৎ মনে হয়। মানুষের অভিধান দেবতাদের মতো সূক্ষ্ম নয়, স্থূল। সুতরাং মায়া মনুষ্য সমাজে স্থূল নামে পরিচিত হবে, এতে আশ্চর্য্য কী! ছলনা, কৌশল চাতুরী মায়ারই অপভ্রংশ। রূঢ় তিক্ত পশুশক্তির আকর্ষণলোলুপ লেলিহাগ্রাহ থেকে রক্ষা পেতে হ'লে জীবমাত্রকেই এর আশ্রয় নিতে হয়। বহুরূপী বিপদে পড়লেই রঙ বদলায়, টিকটিকি তার লেজটাকেই মুণ্ড বলে নাচায়, কোনো কোনো জীব ধোঁয়ার সৃষ্টি করে বা বিষাক্ত নিশ্বাস ছাড়ে, কেউ কেউ দুর্গন্ধ ছড়ায় বা কুৎসিত চীৎকার করে, কেউ কেউ সম্মোহিনী মূর্ত্তিও ধরে; সাজে খড়্গখর্পরধারী দিগম্বরী মূর্ত্তিতেও। সব কিছু প্রতিকূল পরিবেশের সংগে সুবিধা মতন যুদ্ধ করা ছাড়া আর কিছু নয়। যুদ্ধপ্রয়াদের ভাষায় এর নাম ক্যামুফ্লেজ। শত্রু বা দুষ্টকেই জব্দ করতেই মানুষ ক্যামুফ্লেজ-এর আশ্রয় নেয়। অসামান্যা রাজেন্দ্র-দুহিতা ক্যামুফ্লেজেরই আশ্রয় নিয়েছিলেন। সুতরাং অপরাধ তাঁর কোনখানে, বিশেষতঃ যখন ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজেন্দ্র-কন্যার মন আগুনের মতই শুদ্ধ ও অম্লান।

আর যোদ্ধাদের জ্ঞান্ত-পুরুষ নিজেই ভালো করে জানে, প্রজ্ঞা বীরত্বের শ্রেষ্ঠতর অংশ। নারী-যোদ্ধাদের বেলায় কী আর অন্য অর্থ হতে পারে?

অমৃতজীবনকে আমি সত্য কথাই জানাবো। জানাবো অসামান্যা সম্রাটকুমারী নিষ্কলঙ্কা, অপাপবিদ্ধা। জীবনে আমি কখনো মিথ্যে কথা বলিনি, আমার কথা কী উনি বিশ্বাস করবেন না? নিশ্চয়ই করবেন।

অমৃতজীবনকে আমি ফিরিয়ে আনবো, আনবোই।

## চল্লিশ

পাখীদের আহ্বান করলে ফিনিক্স। বললে, তোমরা সবাই ছোটো, ছোটো। এক্ষুণিই ছোটো। প্রত্যেকটি রাস্তায়ই যাবে।

একশৃংগী অশ্বদের আদেশ দিলো সে, তোমরাও সন্ধান করতে বেরোও গে। অন্তরীক্ষে, জলে স্থলে, রসাতলে সর্ব্বত্রই খোঁজ করো।

সংবাদ পাওয়া গেলো। অমৃতজীবন অগ্রসর হচ্ছে চীনের পথেই।

বেশ তো, তাহলে আমরাও যাবো চীন মহাদেশে, চেঁচিয়ে উঠলেন অসামান্যা রাজরাজকন্যা, যাত্রাপথ বহু দীর্ঘ নয়।

আমি আশা করি, ভগবতি, আপনার ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারবোই, ফিরিয়ে আনবো খুব বেশী দেরী হবে না, এক পক্ষ সময়ের মধ্যেই।

গঙ্গাতীরবর্ত্তীয় জননীর চোখে কী অশ্রু-সাগরই না উথলে উঠলো! কী অশ্রুসমুদ্রই না উত্তাল হলো অসামান্যা রাজরাজকন্যার চোখগুলিতে! আলিঙ্গনগুলো ছিলো দুটি রমণীর কী নিবিড়তমই! সুকোমল অনুভূতিগুলি ছিলো কী উচ্ছ্বসিত!

ফিনিক্স আদেশ দিলে তক্ষুণিই দুটি একশৃংগী অশ্ববাহিত যান সুসজ্জিত হোক এই মুহূর্ত্তেই।

যেমন আদেশ, তেমনি কাজ। দক্ষ কারিগরেরা এমনই।

প্রত্যেরা মা নিযুক্ত করলেন দুশো সৈন্য, আড়ম্পত্রী ব্যাবিলনের

জনসাধারণ সম্রাটকন্যার দেহরক্ষিরূপে। উপহার দিলেন তাঁকে দেশের যা শ্রেষ্ঠ বস্তু, সবচেয়ে সেরা সুবৃহৎ হীরকখণ্ড কয়েক হাজার।

## একচল্লিশ

এক সপ্তাহের চেয়েও কম সময়। এরি মধ্যে একশৃংগাশ্বেরা নিয়ে এলো ফর্মোজান্তে, ঈরণা আর ফিনিক্সকে নিয়ে এলো ক্যাম্বালুতে। ক্যাম্বালু চীনের রাজধানী। ব্যাবিলনের চেয়েও বৃহত্তর নগর, শ্রীসমৃদ্ধিও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

নূতন নূতন দৃশ্যগুলি আর নূতন নূতন আচার-ব্যবহারগুলি ফর্মোজান্তেকে আনন্দই দিতো, যদি তিনি অমৃতজীবন ছাড়া আর কোনো কিছু পারতেন ভাবতে।

চীনের সম্রাট শুনলেন: ব্যাবিলন সম্রাট-কুমারী নগরের একটি তোরণে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তৎক্ষণি তৎক্ষণি তিনি চার হাজার মন্ত্রী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিক বসন-ভূষণে সুসজ্জিত করে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সম্বর্দ্ধনায়।

ওরা এসে ব্যাবিলন রাজরাজকন্যার কাছে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানালেন। প্রত্যেকেই তাঁকে উপহার দিলেন রক্তবর্ণ রেশমীবসনে সোনার অক্ষরে সমংকিত এক-একটি প্রশস্তি।

ফর্মোজান্তে বললেন, যদি চার হাজার রসনা আমার থাকতো, তবে প্রত্যেকটি মন্ত্রী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেই যুগপৎ প্রত্যুত্তর জানাতুম আমি।

কিন্তু ভগবান আমায় একটিমাত্র জিহ্বা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমি ভিক্ষে চাই আপনাদের কাছে, আপনারা সকলেই সমুচিত মনে করবেন, আপনাদের সকলকেই ঐ এক রসনার সাহায্যে একত্রে ধন্যবাদ জানাই যদি।

ওরা তাঁকে শ্রদ্ধার সংগেই সম্রাটের কাছে নিয়ে এলেন।

চীন-সম্রাট ছিলেন পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী ন্যায়পরায়ণ, সব চেয়ে বেশী সুমার্জ্জিত-রুচি আর জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। তিনিই প্রথম ছোটো একখানি ক্ষেত চাষ করেন নিজ রাজকীয় হস্তে, কৃষিলক্ষ্মীকে প্রজাদের চোখে মহনীয়া ক'রে তুলবার জন্য। তিনিই প্রথম গুণের পুরস্কার প্রচলন করেন। অন্য সর্ব্বত্রই নিয়ম-কানুন লজ্জাকর ভাবে সীমাবদ্ধ ছিলো, পাপেরই শাস্তি দিতে।

এই সম্রাট সবেমাত্র তাঁর সাম্রাজ্য থেকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন এক দল বিদেশী ধর্ম্ম-প্রচারকদের। তারা এসেছিলো সুদূর পশ্চিম থেকে। মূঢ় আশা নিয়ে এসেছিলো তারা, ভেবেছিলো গোটা চীনদেশটাকেই তারা নিজেদের মতই ভাবাতে বাধ্য করাবে, আর তারা সত্য প্রচারের ছলে এরই ভিতরে বহু ঐশ্বর্য্য ও সম্মান অর্জ্জন করে ফেলেছিলো। নির্ব্বাসন দেবার সময় সম্রাট তাদের এই কথাগুলি বলেছিলেন। কথাগুলি লিখিত রয়েছে সাম্রাজ্যের ইতিবৃত্তে।

আপনারা অন্যত্র যে রকম ক্ষতি করেছেন, এখানেও সে রকম অনিষ্টসাধন করতে পারতেন। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী পরধর্ম্ম-সহিষ্ণু জাতির কর্ণে অসহিষ্ণুতাতুর তত্ত্ব শোনাতে এসেছেন আপনারা। আমি আপনাদের দিচ্ছি ফেরত পাঠিয়ে। যেন আমি বাধ্য না হই আপনাদের শাস্তি দিতে। আপনাদের সঙ্গে সম্মানার্হ দেহরক্ষী দল দেবো আমার সাম্রাজ্যের সীমান্তে, আপনাদের পৌঁছে দিতে। আপনাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই দেওয়া হবে, যেন যে ভূগোলার্দ্ধ থেকে আপনারা এসেছেন যাত্রা ক'রে, নির্ব্বিবাদে সেখানেই ফিরে যেতে সমর্থ হন। শান্তিতেই ফিরে যান, শান্তি যদি আপনাদের ভাগ্যে জোটে। আর ফিরবেন না কিন্তু আর।

ব্যাবিলন-রাজরাজকন্যা এই বিচার ও বক্তৃতা আনন্দের সংগেই শুনলেন। তাঁর সুনিশ্চিত বিশ্বাস, চীন সম্রাটের রাজসভায় তিনি ভালো করেই হবেন অভ্যর্থিত। এর হেতু অবশ্যই আছে। পরধর্ম্মসহিষ্ণু বিশ্বাসের অধীন হওয়ার থেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বহু বহু দূরে।

## বিয়াল্লিশ

চীনসম্রাট ব্যাবিলন-সম্রাট-কন্যার সঙ্গে একাই বসলেন মধ্যাহ্ন-ভোজনে। বিনশ্রিব সংগেই তিনি পরিত্যাগ করলেন সর্ব্বপ্রকার সংরোধ-প্রবণ শিষ্টাচারের প্রতিবন্ধকতা।

রাজরাজকন্যা ফিনিক্সের সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন সম্রাটের। সম্রাট ফিনিক্সকে করলেন খুবই আদর-যত্ন। ফিনিক্স গিয়ে সম্রাটের চেয়ারে দাঁড়ালেন।

ভোজনান্তে ফর্মোজান্তে সুকৌশলে সংগোপনে সম্রাটের কাছে প্রকাশ করলেন তাঁর অভিযাত্রার হেতু। বললেন, অনুগ্রহ করে যদি একবার ক্যাম্বালুতে আমার "পিতম" গুড়গুড় অমৃতজীবনের সন্ধান করেন।

অমৃতজীবনের কাহিনী সবিস্তারে তিনি সম্রাটের কাছে

আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। একবিন্দুও লুকোলেন না যে মারাত্মক প্যাসান বা অনুরাগ তাঁর হৃদয়খানিকে করছিলো প্রজ্বালিত এই তরুণ বীরেন্দ্রের জন্যে।

কার সংগে আপনি ওঁর কথা আলাপ করছেন, জানেন তো? বললেন চীনের সম্রাট। উনি আমার রাজসভায় এসে করেছেন আমার আনন্দবর্দ্ধন। উনি আমায় সম্মুগ্ধ করেছেন, এই সম্মোহনকারী অমৃতজীবন।

সত্যি কথা, উনি সুগভীর ভাবে শোকার্ত্ত, কিন্তু ওর ললিত-রুচিতা আরো বেশী দাগ কাটে প্রাণের পাতায়।

আমার প্রিয় পাত্রদের ভিতরে ওঁর মতো রসবেত্তা আর কেউই নয়। আমার মন্ত্রীদের মধ্যে ওঁর মতো অতো শুর-স্বভাবের নেই আর কেউ। ওঁর চরম তারুণ্য ওঁর সর্ব্বপ্রতিভাকে করে আরো অতিরিক্ত মূল্যযুক্ত।

বিশ্ববিজয়ী হ'তে পারতুম। অমৃতজীবনকে অনুরোধ করলেই হতো। আমার সৈন্য বাহিনীর পুরোভাগে এসে উনি দাঁড়াতেন। নিখিল ভুবন পায়ের নীচেয় আমার লুটিয়ে পড়ে থাকতোই।

দুঃখের বিষয়, ওর শোক কখনো কখনো ওর মনকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

"আঃ অত্র শ্রীভবৎ" বললে ফর্মোজান্তে অতি অনুরাগপূর্ণ দৃষ্টিপাতে এবং শোক, আশ্চর্য ও ভর্ৎসনা-বিলসিত কণ্ঠস্বরে, আপনি আমায় কেন ডাকলেন না ওঁর সংগে মধ্যাহ্ন ভোজনে, আপনি আমায় হত্যা করেছেন। এই মুহূর্ত্তেই ওঁকে ডেকে পাঠান।

ভবতি, আজ সকালেই উনি চলে গেছেন। কোন্ দেশে যাচ্ছেন তাও বলে যাননি তো!

ফর্মোজান্তে ফিনিক্সের দিকে তাকালেন।

এখন তিনি বললেন, ফিনিক্স, আমার চেয়েও হতভাগিনী রমণী আর কাউকেও তুমি দেখেছো কী?

## তেতাল্লিশ

কিন্তু অত্র শ্রীভবৎ নিরস্ত না হয়ে অসামান্যা রাজরাজকন্যা বলতে লাগলেন, কী ভাবেই আর কেনোই বা উনি হঠাৎ আপনার মতো এতো কৃষ্টিমান রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন? আপনার রাজসভায় আমার মনে হয়, যে কেউ সারাজীবন বাস করতে পারলে সুখন্যই হবে।

ঘটনাটা ভবতী যা ঘটেছিলো তা এই আমাদেরি রাজরক্ত ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে এরকমই এক রাজপুত্রী,—দেখতেও তাকে পরম লাবণ্য-মাধুরী অভিনবা—পড়েন আসক্ত হয়ে অমৃতজীবনের প্রতি। মধ্য দিনে নিজ গৃহে মিলন সাংকেতিক নেমন্তন্ন দেন তিনি ওঁকে।

ভোরবেলা উনি চলে গেছেন। রেখে গেছেন এই পত্রখানি। চিঠিখানি আমার আত্মীয়ার বহু অশ্রুই ঝরিয়েছে।

অয়ি চীনরাজরক্তোদ্ভবা অনুপমা রাজকুমারী, আপনার একখানি প্রাণের প্রয়োজন, যার ওপরে আছে আপনার কেবল নিজস্ব অধিকার।

অমর দেবতাদের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, ব্যাবিলন-সম্রাট কুমারী ফর্মোজান্তে ছাড়া আর কাউকেই ভালোবাসবো না। প্রতিজ্ঞা করেছি ওঁকে শিক্ষা দেবো অভিযাত্রাকালে কী করে দমন করতে হয় বাসনাকে। ওঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, মিশরের নীচ মহীপালের কাছে আত্মাঞ্জলি দিয়েছেন উনি।

পৃথিবীতে আমি সবচেয়ে অসুখী মানুষ। জনককে হারিয়েছি আমি, হারিয়েছি ফিনিক্সকে। ফর্মোজান্তে আমায় ভালোবাসবেন এ আশাও পরিত্যাগ করেছে আমায়।

শোকার্ত্তা জননীকে এসেছি ফেলে। ফেলে এসেছি স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশভূমিকে। এক মুহূর্ত্তও পারিনি থাকতে জগতের সেই অংশে যেখানে শুনলুম, আমাকে নয়, অন্য একজনকে ভালোবাসেন ফর্মোজান্তে।

প্রতিজ্ঞা করেছি পৃথিবী পরিভ্রমণ করবো। রবো সত্যব্রত।

আপনি আমায় ঘৃণা করবেন, দেবতারা আমায় শাস্তি দেবেন যদি আমি ভঙ্গ করি আমার প্রতিজ্ঞা।

অপর প্রেমিক গ্রহণ করুন, ভবতি! বিশ্বাসৈকনিষ্ঠ থাকুন, এই যেমন আছি আমি।

আঃ, আমায় দিনতো এই বিস্ময়কর চিঠিখানি, বললেন অসামান্যা ফর্মোজান্তে, এ চিঠিখানি হবে আমার সান্ত্বনা। সুখী আমি দুঃখের ভিতরেও।

অমৃতজীবন ভালোবাসে আমায়। অমৃতজীবন আমার জন্যই ত্যাগ করেছে চীনে রাজপুত্রীদের অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি। এই একমাত্র উপযুক্ত মানুষ পৃথিবীতে এমন বিজয়লাভ করবার। দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে সে আমার সম্মুখে।

ফিনিক্স জানে আমার প্রয়োজন ছিলো না এর। নিষ্ঠুরতার চূড়ান্তই বটে একান্ত প্রেমিককে হারানো, পবিত্র সতীত্বে অগ্নিমতী থেকে গ্রহফেরে বিপন্ন হয়েই সর্ব্ব-সতী নারী যদি বাধ্য হন অবাঞ্ছিত অন্য পুরুষকে নিরীহতম চুম্বন দিতে। নারীর একমাত্র ঐশ্বর্য্য সতীত্ব রক্ষা করতেই বাধ্য হন ছলনার আশ্রয় নিয়ে যদি।

কিন্তু যাকগে। কোথায় ও গেছে? কোন পথ ধরেছে ও? অনুগ্রহ করে বলুন আমায়। আমি অনুসরণ করবো ওকে।

চীনসম্রাট উত্তর করলেন, আমি যতোদূর সংবাদ পেয়েছি এ পর্য্যন্ত, তা আমার বিশ্বাস, আপনার পরম প্রেমিক সেই পথেই গেছেন যে পথ পৌঁছিয়েছে গিয়ে শকরাজ্য।

## চুয়াল্লিশ

শকবর্ষ। মানুষ ও শাসনতন্ত্র চিরকাল বিভিন্ন হবেই। মহাকালের বিচিত্র বিধান! কোনো কোনো জাতি, অন্যান্য জাতি, অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশী সমুন্নত, এক দিন সহস্র শতাব্দীর অন্ধকার ভেদ ক'রে ক্রমে ক্রমে আলো বিতরণ করবেই, করবেই আলো সংক্রমণ।

আর অসভ্য দেশগুলোয়? বীরাত্মারা অবশ্যই জন্মাবেন, যাঁরা শক্তি ও অধ্যবসায়ের বলে পশুকেও পরিবর্ত্তন করবেন মনুষ্যে।

শকবর্ষে নেই কোনো নগর। সুতরাং সুকুমার শিল্পকলাসমূহের অভাব সেখানে। শুধু সুবিশাল তৃণক্ষেত্রগুলি তেপান্তরের মাঠেরই মতো চোখে পড়ে। গোটা জাতিগুলি বাস করে তাঁবুতে তাঁবুতে ও গাড়ীতে গাড়ীতে। এই দৃশ্য প্রাণে আতঙ্ক জন্মায়।

ফর্মোজান্তে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ তাঁবুতে বা কোন্ গাড়ীতে সম্রাট থাকেন?

শকবর্ষীয়েরা বললে, মাত্র সপ্তাহেক আগে ত্রিশ লক্ষ অশ্বসৈন্যের

সাথে নিয়ে তিনি গেছেন বেরিয়ে। বেরিয়ে গেছেন সাক্ষাৎ করতে ব্যাবিলন-সম্রাটের সংগে, যার ভ্রাতুষ্পুত্রী রূপদক্ষা সর্ব্বদেবাকে তিনি হরণ করে এনেছেন।

উনি আমার বোনকেই হরণ করে এনেছেন। চীৎকার ক'রে উঠলেন ফর্মোজাস্তে। এই নতুন ঘটনাটি ঘটবে এমন আশা করিনি তো? কি! বোন, যিনি আমার সেবা করতে পারলেই সন্তুষ্ট হতেন, হয়েছেন সম্রাজ্ঞী! আর আজো আমি অনূঢ়া।

এক্ষুণি আমায় নিয়ে চলো সম্রাজ্ঞীর বস্ত্রাবাসগুলোয়, ফর্মোজাস্তে বললেন।

অতি অপ্রত্যাশিত ছিলো এঁদের মিলন এই দূর দেশে। অদ্ভুত অদ্ভুত কথাই তো পরস্পরের কানে বলাবলি করলেন এঁরা। ফলে এঁদের উভয়ের মিলনে এমন একটা মায়া সৃষ্টি হলো যে, এঁরা দুজনে না ভুলে গিয়ে পারলে না যে, এঁরা পরস্পর কখনো পরস্পরকে ভালোবাসেনি। পরস্পরকে পুনরায় দেখে এঁরা পরম আনন্দিত হলেন। এক সুকোমল মায়া অধিকার করলে বাস্তব স্নেহের স্থান। অশ্রুজলভারে সিক্ত হ'য়ে উভয়ে উভয়কে আলিংগন করলেন। আর এমন কি উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতা ও সারল্য জন্ম নিলে। এ মিলন কোনো রাজপ্রাসাদে তো ঘটেনি। এই ছিলো এই হার্দ্দি ও সারল্যের জন্মকথা।

## পঁয়তাল্লিশ

সর্ব্বদেবা চিনতে পারলেন ফিনিক্সকে আর সুবিশ্বস্তা সহচরী ইরলাকে। বোন ফর্মোজাস্তেকে তিনি দিলেন নকুলী পশম। ফর্মোজাস্তে দিলেন হীরক নিচয়।

আলোচনা চলতে লাগলো উভয়ের মধ্যে, দুটি সম্রাট যে সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন, সে সম্পর্কে।

মানুষের দুর্দ্দশা সম্পর্কে বিলাপ করলেন এঁরা। বললেন, মানুষের কি দুরদৃষ্ট! নৃপতিরা তাদের পাঠান, শুধু খামখেয়ালের বশবর্ত্তী হ'য়ে, পরস্পরকে বধ করতে।

কলহের কারণ কিন্তু অতি সামান্যই মতদ্বৈধগুলি, যা দু'টি সুবিচারসম্পন্ন ব্যক্তি এক ঘণ্টার মধ্যেই নিষ্পত্তি করে নিতে পারেন।

সর্ব্বোপরি এঁরা আলোচনা করতে লাগলেন সেই রূপবান আগন্তুক তরুণ কিশোর সম্পর্কে। রূপবান আগন্তুক তরুণ কিশোর সিংহবিজেতা, পৃথিবীর সব চেয়ে বড়ো হীরকপ্রদাতা, সুকোমলকান্ত গোপগাথা রচয়িতা ফিনিক্স মালিক, অথচ উনি একটি খাস পাখীর দেওয়া বিবরণ শুনে সবচেয়ে অশ্রদ্ধীতম মানুষে পরিণত।

সে আমার প্রিয় সহোদর। বললেন সর্ব্বদেবা। ও আমার প্রেমাত্মা-পুরুষ, মানস পুরুষ, বললেন ফর্মোজাস্তে। তোমার সংগে নিশ্চয়ই ওর সাক্ষাৎ হয়েছে। এখনো হয়তো এখানেই রয়েছেন। তোমার সোদর ও, এ কথা ও ভালো করেই জানেন। সুতরাং ও সহসা তোমায় ছেড়ে চলে যাবেন যেমন চীনসম্রাটের কাছে বিদায় নিয়েছেন ও এরকম না হওয়ারই কথা।

আমার সংগে তার সাক্ষাৎ হয়েছে কি? হা মহাভগবান! উত্তর করলেন সর্ব্বদেবা। পুরো চারিটি দিন কাটিয়ে গেছে সে আমার সাহচর্য্যে। আঃ, বোন, ভাই আমার করুণার পাত্র। মিথ্যে

এক বিবরণ শুনে সে হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণই পাগলা, বিশ্ব পরিভ্রমণ করে চলেছে সে, অথচ জানে না কোথায় চলেছে।

তুমি কি বিশ্বাস করবে, তোমায় বললে? পাগলামিতে কতো দূর সে এগিয়েছে সারা শক-বর্ষে সব চেয়ে সুন্দরীর অনুগ্রহ সে করেছে প্রত্যাখান। বিশ্বাস করবে কী? এই গত কাল চলে গেছে সে। লিখে রেখে গেছে একখানি চিঠি, গোটা শক-সাম্রাজ্যের সব চেয়ে রূপোত্তমাকে। উনিতো সে চিঠি পেয়ে ভেঙে পড়েছেন। ভেঙে পড়েছেন একেবারে।

আর সে কোথায় গেছে? জিজ্ঞেস, করছো? সে গেছে সীমেরীয়দের দেশ।

ভগবানকে ধন্যবাদ, বললেন ফর্মোজান্তে, এ যে আরো একখানি, প্রত্যাখ্যান আমারই জন্মে। আমার সুখ, আমার আনন্দ যে উপচে উঠছে, আমার আশার উপরেও। ঠিক যেমন আমার অসুখিতা গেছে ছাড়িয়েই আমার সমস্ত আশংকা ও আতংককে।

মনোরম চিঠিখানি এই, শোও আমায় বোন! এক্ষুণি বেরিয়ে পড়বো আমি। অনুসরণ করবো ওঁকে। অঞ্জলি ভরে নিয়ে ওঁরই উৎসর্গগুলি।

বিদায়, বিদায় বোন! অমৃতজীবন সীমেরীয়দের দেশে। আমি ছুটলুম সেখানেই।

সর্ব্বদেবা ভাবলেন আমার বোনটি আমার ভাই অমৃতজীবনের চেয়েও বেশী পাগল হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমি নিজেও তো এই রোগের আক্রমণ অনুভব করেছি। নিজেও তো ত্যাগ করে এসেছি ব্যাবিলনের আমোদ আনন্দ ও ঐশ্বর্য্য। শক-সম্রাটের জন্ম।

আর নারীরা সর্ব্বদাই মূর্খতার অনুরক্ত হয়, বিশেষতঃ মূর্খতার কারণ যখন প্রেম।

এই সব ভেবে সর্ব্বদেবা ফর্মোজান্তের জন্ম অনুকম্পা অনুভব করলেন। বললেন, প্রার্থনা করি সার্থক হোক তোমার অভিযাত্রা, প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার ব্যাপারে সাহায্য করবো, যদি দেখা হয় ভাই-এর সংগে আমার।

## ছেচল্লিশ

অনতিবিলম্বে ব্যাবিলন-সম্রাটকন্তা, সংগে বিহঙ্গ ফিনিক্স, সীমেরীয়দের সাম্রাজ্যে এসে পৌঁছুলেন। চীন-সাম্রাজ্যের মতো জনবহুল না হলেও আয়তনে এই সাম্রাজ্যটি দ্বিগুণ। শক-সাম্রাজ্যের মতো ছিলো এ সাম্রাজ্যটি এক সময়ে কিন্তু এখন কিছুকাল ধ'রে ঐশ্বর্য্যমহিমায় গর্ব্বী পথি-প্রদর্শক রাজ্যগুলিরও সমকক্ষ।

প্রকাণ্ড একটা নগরীতে প্রবেশ করলেন এঁরা। যে সম্রাজ্ঞী সেখানে রাজত্ব করছিলেন, তিনি নগরীটিকে সমুন্নত করে তুলতে যত্ন করে আসছেন।

সম্রাজ্ঞী নগরীতে উপস্থিত ছিলেন না। সে সময়ে তিনি ইয়োরোপীয় সীমান্তগুলি থেকে এসিয়ার সীমান্তগুলিতে ভ্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিলো, রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে পরিপূর্ণ নবতম জ্ঞান আহরণ করা, পাপ-সমূহের বিচার ও তাদের প্রতিষেধক নিরূপণ করা, কল্যাণ বিচ্ছুরিত করা এবং বিস্তার সাধন করা শিক্ষার ও বিত্তার।

এই সুপ্রাচীন রাজধানীতে রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম একজন শুনলেন।

ব্যাবিলন সম্রাট-দুহিতা তাঁর ফিনিক্স বিহঙ্গকে সংগে করে উপস্থিত হয়েছেন।

তৎক্ষণি তিনি ছুটে গেলেন সম্মানার্ঘ দিতে।

তিনি জানতেন, তাঁর ভর্ত্রী রাজ্যেশ্বরী ছিলেন সম্রাজ্ঞীদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী কৃষ্টি-সম্পন্না ও ঐশ্বর্য্যশালিনী। সুতরাং রাজ্যেশ্বরী স্বয়ং উপস্থিত থাকলে যে-ভাবে এই অসামান্যা মহীয়সী মহিলাটিকে আপ্যায়িত করতেন, সেই ভাবেই তিনি তাঁর প্রতি সম্মানার্ঘ ও মনোযোগগুলি বর্ষণ করলেন। তাঁর বিশ্বাস, রাজ্যেশ্বরী ফিরে এসে সব কথা শুনে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি সন্তুষ্টা হবেন। ও কৃতজ্ঞ থাকবেন।

ফর্মোজান্তেকে এনে রাখা হলো রাজপ্রাসাদেই। জেদী, নির্ব্বন্ধাতিশয্যী জনতাকে সরিয়ে দেওয়া হলো দূরে। আপ্যায়নাবলী ছিলো দক্ষ, উদ্ভাবনক্ষম। [ ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীরমেশচন্দ্র দে

# রৌদ্রদগ্ধ

বন্দে আলী মিয়া

নব জন্ম লভিলাম আজি এই জনতার মাঝে  
অতীতের অযুত কংকাল মোর পাশে করিয়াছে ভিড়;—  
বিদায়ের অশ্রু প্রহরে বুকে যেথা বিঁধেছিলো তীর  
সেথায় আজিও হায় ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা মোর বাজে।

জনপদ একটি নূতন সৃষ্টি হলো অচেনা মানবে  
গৃহহারা অগণিত জীব—চারি পাশে কল-কোলাহল,  
আমি আজ রৌদ্রদগ্ধ, বক্ষে মোর তীব্র হলাহল  
বাঁধিবারে চাহি তবু সুন্দরের অমৃত আসবে।

অতীত যৌবন দিনে হেথা ছিলো প্রাণের সম্পদ  
ধনে-জনে পূর্ণ গৃহ—পূর্ণ ছিলো একটি হৃদয়,  
অনাহত বীণাধ্বনি ছিলো মোর সারা বিশ্বময়  
প্রিয়জন প্রীতিচ্ছায়া ভবিষ্যৎ নির্ভয় নিরাপদ।

আমার আনন্দ-রাতি মুছে গেল একটি পলকে  
সে রাতি কাঁদিয়া ফেরে জীবনের দ্বারে দ্বারে আজ,  
পথের ধূলায় লোটে যৌবনের রাজ-অধিরাজ  
দুখের তমিস্রা-মাঝে স্বপ্নপ্রভা নয়নে ঝলকে।
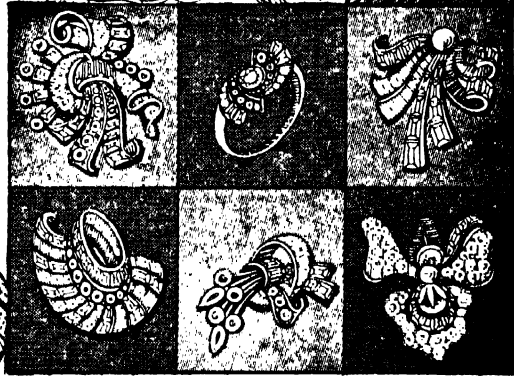
সাত্যকি

৬

হোলীর পরদিন সুদাস এসে হাজির।

কোন রকম ভণিতা না করে সোজাসুজি বলে বসল, আমি ক'দিন এখানে থাকবো। ব্যবস্থা করো।

সুদাসের এদিকটার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আশ্চর্য হবার কিছু দেখলুম না। সুদাস আমার নিস্পৃহতার আস্ফালনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছে বুঝেছি। নির্বিকার চিত্তে বললুম, বেশতো। আমার আপত্তি নেই। তবে পামার একটা মত নেওয়া উচিত। তুমি একটু বস।

পামাকে সব বললুম।

পামা অত্যন্ত সহজ ভাবে বলল, বেশতো, বন্ধু-বান্ধব থাকতে চাইলে কুণ্ঠিত হবার কী আছে। আমি সামলে নোব'খন।

—তবে চল, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

—উনি যখন কিছুদিন থাকবেন, তখন আলাপ হবেই। ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

—তা হলেও—

—তুমি যাও, আমি চা নিয়ে যাচ্ছি। আলাপ করা যাবে তখন।

ফিরে এসে দেখি সুদাস আর কানাই 'ট্রিপ' নিয়ে আলোচনা করছে। আমাদের মাল তোলবার কথা হাটের। সুদাস নাছোড়বান্দা, ওর মাল নিতে হবে।

আমি বললুম—কিন্তু, আমরা যে কথা দিয়েছি।

সুদাস বলল—রাখো, তোমার কথা। আমি বলছি আমার মাল নিতে হবে। আচ্ছা বাবা, না হয় রেট এক আনা বাড়িয়ে দোব। বাস হোল ত?

যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, এমন ভাবে সুদাস একটা বিড়ি ধরাল।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকল পামা।

আলাপ করিয়ে দিলুম সুদাসকে।

জানি না এ আলাপের পরিণাম কী হবে। কী আর হবে। হয়তো পামাকে হারাতে হবে। হয়তো বন্ধু-বিচ্ছেদ হবে। চিরকাল তো অর্থ আর নারী মানুষের সঙ্গে মানুষের মনোমালিন্যের সৃষ্টি করেছে। নতুন আর কী। তবু মনের কোণায় যেন একটু বেদনা অনুভব করলুম।

সুদাস আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। আমি প্রত্যুত্তর দিয়েছি। যদি হারতে হয় হারবো। তবে হারার বাসনা নিয়ে যুদ্ধে নামার কোন মানে হয় না। কেন জানি না, সুদাসের অপ্রত্যাশিত আগমনে সুখী হতে পারিনি। বেশ ছিলুম আমরা। বন্ধনের কোন পীড়াদায়ক দায়িত্ব কোন পক্ষেরই ছিল না। পামা আজ আমার, কাল সে অন্য কারুর হতে পারে। হতে যে পারে সত্যি। কিন্তু এই সত্যি মনে মনে কোন দিন মানিনি। মানতে ভাল লাগে না। দুদিন আগেও অহংকার করেছি যা বলে, আজ তা সত্যি না হলেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। পামা আমার। চিরকাল যেন আমারই থাকে—এ কথাটা আজ এই মুহূর্তে বিশেষ করে মনে পড়ছে।

পামার কোন কিছুতে আসক্তি নেই। সুদাসের প্রতি সে প্রসন্নও নয়। জানি। তবু কার মন কখন কোন পরিস্থিতিতে যে বদলায় কে বলতে পারে? আজকের পামার সঙ্গে দু' মাস পরের পামার একটুও মিল না-ও থাকতে পারে। বেদনাদায়ক হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু উপায় কী।

সুদাস অত্যন্ত ভদ্রতাবে পামাকে বলল,—কৈ বসুন। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

পামা সঙ্কুচিত হয়ে জবাব দিল, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। সব একা সারতে হবে তো।

সুদাস নাছোড়বান্দার মত অনুরোধ করল,—তা হোক। দু' মিনিট পরে সারলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

আমি মানে,—

—কোন কথা নয়। আপনি একটু বসুন।

পামা বসল। বসে আঙুলে কাপড়ের খুঁট জড়াতে জড়াতে কাতর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি বুঝতে পারলুম, ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমার সামনে অস্বস্তি বোধ করছে। আমি বললুম—সুদাস, কিছু মনে কোর না ভাই। সিগারেট নিয়ে আসছি আমি, বুঝলে?

—না, না, তোমার পালানো চলবে না। সুদাস বলতে লাগল, আমার সঙ্গে সিগারেট আছে। তোমায় আনতে হবে না। আমার থলেটা দাও তো।

সুদাসের থলেটা এগিয়ে দিলুম। ও তার মধ্যে থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,—নাও ধরাও।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে আমি বললুম—কিন্তু পামাকে মিছিমিছি ধরে রেখে কী লাভ? ওকে যেতে দাও।

হয়তো আমার গলার সুর ওর ভাল ঠেকল না। একটু মেজাজ প্রধান ছিল। আমার অজ্ঞাতসারে আমি আমার ঈর্ষা প্রকাশ করে ফেলেছি। আর ঈর্ষান্বিত হওয়া মানেই আমার পরাজয় স্বীকার করে নেওয়া। এত তাড়াতাড়ি ওকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে আরম্ভ করা আমার নীচ মনের পরিচায়ক। পামাকে অপমান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আর সুদাসকে সে সুযোগ স্বেচ্ছায় দেওয়া আমার কর্তব্যও নয়।

কানাই সুযোগ বুঝে বলল,—বৌদি, দেখতো পোড়া-পোড়া গন্ধ পাচ্ছি যেন রান্নাঘর থেকে? উনুনে কিছু বসিয়ে এসেছ নাকি?

সুদাস অসহায় ভাবে বলল,—দেখুন গে কী পুড়ছে।

পামা যাবার আগে আমাদের উদ্দেশ করে কানাইকে বলল,—বেশী দেরী কর না যেতে যেন, ঠাকুরপো! আমার প্রায় সব সারা হয়ে গেছে।

কানাই পামাকে বৌদি বলেই ডাকে। কেউ ওকে ডাকতে বলেনি। অথচ কানাই পামাকে যে সম্মান দেয় তা যে কোন বৌদির অহঙ্কার করবার মতো। কোনদিন এতটুকু বেচাল অথবা অসভ্য কথা পর্যন্ত হয়নি। কানাই আমার বন্ধু। সত্যিকারের বন্ধু।

সুদাস আবার কথা সুরু করল,—আচ্ছা, কানাই, তুমিও তো লেখাপড়া করেছ। আজ না-হয় লরী চালাচ্ছ। এমনি তো আরো কত ছেলে লরী চালায়। তবু তুমি নিজেকে এত আলাদা করে রেখেছ কেন?

সবিস্ময়ে কানাই বলল,—আলাদা করে রেখেছি মানে?

কানাই না বুঝলেও আমি ঠিকই বুঝেছি সুদাস কী বলতে চায়। আর পাঁচজনের মতো কানাই যেমন রোজগার করছে, তেমনি তাদের মতো বিয়ে-থা করুক। ঘর-সংসার হোক। সুদাসের মোটামুটি বক্তব্য এই।

—আলাদা, মানে, আর পাঁচজনের মতো নও আর কী।

—সবাই যদি একই ছাঁচে ঢালা হয়, তবে বৈচিত্র্য কোথায় পাবে? বৈচিত্র্যই যে জীবন, একথা কে না জানে?

—ঠিক।

—তবে ফালতু কালতু কথা বলে লাভ কী?

—লোকসানও তো হচ্ছে না।

—লোকসান হচ্ছে কী লাভ হচ্ছে, সেটা যদি এত সহজে লোকে বুঝতে পারতো তবে সবাই সাবধান হয়ে যেত।

কানাই সুদাসের মাতব্বরি সহ্য করতে পারছিল না। ও একটু রগচটা প্রকৃতির। যা ওর একান্ত নিজস্ব বিষয় তা নিয়ে কেউ ওকে বিরক্ত করুক, ও পছন্দ করে না। স্পষ্টতঃই ও ঝগড়ার দিকে এগুচ্ছিল। এমন সময় জব্বর এসে হাজির।

আজ বাস-কণ্ডাক্টরের পোষাকে জব্বরকে দেখে কে বলবে সেকাল ও বাবু সেজে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিল! মারমুখী জনতার হাত থেকে বাঁচিয়েছি বলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ও বলল—দাদা, একটা বদলি ড্রাইভার দিতে পারেন?

—কেন হে? কার বদলি? আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

—৪৮৫ চালাচ্ছিল আমজাদ। ওর বেমার হয়েছে। তাই।

সোজাসুজি আমাকে অথবা কানাইকে চালাতে বলতে বাধো বাধো ঠেকছে। জব্বর বেশ ভালভাবে জানে যে আমরা বাস চালাই না। তবু যদি কোন জানাচেনা লোকের চাকরি করে দিতে পারি এই আশায় এসেছে। ঠিক লোকের কাছেই এসেছে। ড্রাইভার ছাড়া ড্রাইভারের খোঁজ কে রাখবে? অনেক ভেবে চিন্তেও কারুর নাম মনে পড়ল না।

জব্বর ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেল। কত লোক চাকরির জন্যে ঘোরাঘুরি করছে। অথচ যখন হাতে কাজ দেবার ক্ষমতা থাকে তখনই কোন লোক হাতের কাছে থাকে না। আশ্চর্য্য।

খাওয়া-দাওয়া সেরে গাড়ী বার করবার জন্যে তৈরী হচ্ছি। সঙ্গে সুদাস যাবে বলছে। কানাই ওর মাল তুলতে উৎসাহ পাচ্ছে না। কোন কথা না বলে কানাই গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। ইঞ্জিন গরম করতে করতে আমায় ইসারা করল কানাই। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, ছাতা হাতে অত্যন্ত দ্রুত বেগে নটবর আসছে। এগিয়ে গেলুম।

—এত হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছেন সরকার মশাই?

—এই যে, হাঁপাতে-হাঁপাতে নটবর বলতে লাগল, আপনার কাছেই। দেখুন দেখি কী গেরোতে পড়লুম।

—কী হলো?

—হলো আমার মাথা আর মুণ্ডু।

—জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিন। পরে শোনা যাবে আপনার কথা।

—আর জিরিয়ে ঠাণ্ডা! মরে ঠাণ্ডা হতে পারলে নিশ্চিন্ত।

—বলুন, বলুন। এত উত্তেজিত হয়ে কী লাভ!

সরকার মশাই শুরু করলেন—আজ মহিম হালদার আমাদের

মাল তুলবে কথা ছিল। আগাম তিরিশটা টাকা নিয়ে গেছে তেল-টেল কিনবে বলে। বেলা বারটার সময় মাল তোলবার কথা। যখন বেলা দুটো হলো, তখনও মহিমের টিকির কোন খোঁজ নেই। ওর বাড়ি গেলুম ব্যাপারটা জানতে গিয়ে দেখি, বাবু টং। ডাকাডাকি করলুম অনেকক্ষণ। খালি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাল। কিছু বলল না। মনে করিয়ে দিলুম আমাদের ঘর থেকে মাল তোলবার কথা। স্রেফ বোবার মতো বসে রইল বাইরের দিকে তাকিয়ে, যেন আমায় চেনে না। অনেক খোসামোদ করলুম, গালাগাল দিলুম। কিছু হল না। বাধ্য হয়ে ফিরে এলুম আপনার কাছে। একটা উপায় বার করুন। নইলে আমার চাকরি থাকবে না।

—সে কি, মহিম না গেলে আপনার চাকরি থাকবে না—এ কি রকম কথা।

—মশাই, কর্তাবাবু আমাকে পই-পই করে বারণ করে দিয়েছিলেন যাতে মহিমকে না মাল তুলতে দেওয়া হয়। ও আমাদের অনেক বার ভুগিয়েছে।

—তবে দিলেন কেন?

—দিলুম কী আর সাধে! কিছুদিন আগে ওর একমাত্র মেয়েটা মরে গেছে। বড় দুঃখ পেয়েছে লোকটা। ভাবলুম এবার বোধ হয় ভাল হবে। কিন্তু কয়লা কয়লাই রয়ে গেল। আর মাঝখান থেকে ওর উপকার করতে গিয়ে এখন আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি।

—আপনি আমার কী করতে বলেন?

—কী আর বলব। যদি দয়া করে আমার একটু উপকার করেন, মানে—

—কিন্তু সে তো হবার জো নেই। আমি এই ভদ্রলোকের মাল তুলব কথা দিয়েছি।

সুদাস কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এগিয়ে এল। নটবরের আপাদমস্তক দেখে বলল,—আপনার উপকার করতে পারলে খুশী হবো সরকার মশাই!

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

—ধন্যবাদ এত তাড়াতাড়ি দেবেন না।

—কেন, কেন?

—কারণ সর্ত আছে।

—বলুন আপনার সর্ত।

—ভবিষ্যতে যত ধান আপনি বেচবেন, তা আমার দর না পাওয়া পর্যন্ত করবেন না কথা দিন?

—কিন্তু আমার কথার দাম কী?

—আপনার কথার দাম আমি বুঝব। আপনি শুধু আমায় কথা দিন।

সুদাস এক ঢিলে দু'পাখী মারবার আয়োজন করেছে। প্রথমত যদি নটবর রাজী হয় কথা দিতে তবে ওর একটা বড় ঘর বাঁধা হয়ে রইল। নটবরের কথার ওপরে কর্তাবাবুরা কথা বলেন না, সুদাস তা জানে। কাজেই নটবরের প্রতিশ্রুতির দাম আছে। আর যদি নটবরের মাল আমি তুলি, তবে সুদাসের আমাদের সঙ্গে যাবার দরকার নেই। ফলে রাত্রিতে—

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে নটবর বলল—কথা দিলুম।

উল্লাসে অট্টহাসি হাসল না সুদাস। শুধু বলল,—এবার আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

নটবরের সঙ্গে চললুম।

৭

মহিম হালদারের বাড়ি এসে দেখি, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই। অপরিষ্কার উঠোন। শুকনো তুলসী গাছ বেঁকে গেছে। মাটির বারান্দা চিড় খেয়েছে। কত দিন নিকানো হয়নি। উঠোনের এক কোণে দড়িতে ঝুলছে একটা ময়লা গামছা। একপাশে একটা গাড়ু। বারান্দার ঠিক ডানদিকে উঠতেই একটা জলচৌকি আর একজোড়া খড়ম। আমার উপস্থিতি বোঝাবার জন্যে গলা দিয়ে আওয়াজ করলুম।

কোন প্রত্যুত্তর নেই।

এগিয়ে গিয়ে উঁকি দিলুম।

মহিম একা আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। কাঁধ ধরে খুব জোরে ঝাঁকুনি দিলুম। অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুল একটা। পাশ ফিরে আবার শোবার চেষ্টা করল মহিম। উপায়ান্তর না দেখে জল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘরের কোণের দিকে তাকাতেই একটা ছোট কলসী দেখতে পেলুম। কলসীতে জল নেই। অভাবের সংসারে যখন কোন কিছু থাকে না, তখন নাকি নেই বলতে শাস্ত্রে নিষেধ। বাড়ন্ত বলতে হয়। হাসি পেল। জল নেই। জলও বাড়ন্ত!

জল নিয়ে এলুম। মহিমের মাথায় বুকে জল ঢালতে না ঢালতে ধড়মড় করে উঠে বসল।

রাগান্বিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, একি হচ্ছে, নয়ন?

—যা হচ্ছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ।

—আমার অত সাধের নেশা নষ্ট করবার তোমার কী অধিকার আছে?

অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

—দেখো, মেজাজ খারাপ করে দিও না বলছি।

—মেজাজ খারাপ হতে দিও না। তবেই—

—আচ্ছা জ্বালাতনে ফেললে যা হোক। কী মতলব বলবে তো!

—এই তো বুদ্ধি-শুদ্ধি ফিরেছে দেখতে পাচ্ছি। তুমি না আমায় কাল বললে আর মদ ছোঁবে না? অথচ আজই ট্রিপ করবে বলে আগাম টাকা এনে খরচা করে বসে আছ। তাও কি না একেবারে বেহেড। তুমি আমাদের সম্মান বলে কিছু রাখবে না? যদি নিজেকে সামলাতে না পারো তবে ওসব ছোঁও কেন?

লজ্জায় মাথা নীচু করল মহিম।

অনুশোচনার তীব্র দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে মন। নদীর পাড় খসে পড়ছে জলে। হঠকারিতা দূর হবে। লালসার দুর্দমনীয় গতিবেগ রুদ্ধ হবে। আবার ফিরে পাবে একটি বাস্তব মন।

সাময়িক উত্তেজনা বশে কত কি না হয়ে যায়। খুন, বিবাদ, ব্যভিচার, দুর্ঘটনা। আবার উত্তেজনার তরঙ্গ স্তিমিত হয়ে এলেই আসে অনুশোচনা, আসে লজ্জা। স্বাভাবিক চিন্তার স্বচ্ছতা যায়

নষ্ট হয়ে। লৌহ আবরণের অন্ধকারে হারিয়ে ফেলে যুক্তি, মুছে যায় সভ্যতা।

মহিমকে ভাববার সুযোগ দিয়ে বসে রইলুম।

মাথা তুলে মহিম বলল, বলতে পারো নয়ন, কেন এরকম হয়? কেন নিজেকে সামলাতে পারি না?

মহিম বুঝতে পারছে সবই। কিন্তু একটা অন্যায় করবার পর মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই নিজের দুর্বলতা অন্য কিছুর মোড়াই দিয়ে ঢাকতে চায়। মহিম জানে তার মেয়ের মৃত্যুর ওপোর কারুর হাত নেই। তবু এই মৃত্যুকে উপলক্ষ করে নিজের ধ্বংস ও টেনে আনছে। স্বেচ্ছায় নয়। ঘুমের ঘোরে চলাফেরা করা যেমন একটা রোগ—এ-ও তেমনি আর কী। কারুর কারুর কাছে, অসহ্য অবসর সময়ে, মনোমত সঙ্গী না পেয়ে অবুঝ হয়ে ওঠে মন। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মনের সব জোরও হারিয়ে ফেলেছে। এখনও মহিম বাঁচতে পারে, যদি অনলস কাজের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারে।

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলুম, গাড়ী কোথায় রেখেছ?

কোন জবাব দিল না মহিম।

অনেকক্ষণ পরে মহিম বলল, জানো নয়ন, গাড়ী রিনিউ করা হয়নি। ট্যাক্সের টাকা দিই নি। রোড পারমিট আমার নেই। চুরি করে আর কদ্দিন গাড়ী চালাব?

অবাক হয়ে গেলুম।

যে লোক পারমিট ছাড়াই গাড়ী চালাবে বলে আগাম টাকা নিতে পারে, সে সাংঘাতিক রকম দুঃসাহসী নিশ্চয়ই। কিন্তু, চেকপোষ্ট পার হতে গেলে, অথবা রাস্তায় পুলিশ চ্যালেঞ্জ করলে কী করবে, কেমন করে জেল থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে ভাবতে পারলুম না।

বিরক্ত হলুম। একটা প্রতারকের কাছে সময় নষ্ট করছি বলে।

না, রাগ কার ওপোর করব? মহিমের যে বাঁচবার সাধনা ফুরিয়েছে। কার জন্যে রোজগার করবে, কার জন্যে বাঁচবে? একমাত্র মেয়ে হঠাৎ মরে গেল। দেখাশোনা করবার লোক একজনও নেই। দিনান্তে একটু ভালবাসবার, একটু স্নেহ করবার কেউ নেই। ব্যথায় ভরে গেল আমার মন। যে নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে, যে সহজেই আত্মসমর্পণ করছে, তাকে আঘাত করতে মায়া হল।

কী করে মহিমকে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারি। আমার কাছে এত টাকাও নেই যে ওর সমস্ত ট্যাক্সের টাকা দিয়ে দিতে পারি। আজ-কাল আবার ওজন অনুসারে ট্যাক্স। সে অনেক টাকা। অন্তত তিন মাসের টাকা দিতে পারলে, ও এখন গাড়ী বার করতে পারে নির্ভয়ে। ভাবতে লাগলুম।

শ্রীমন্ত এসে হাজির।

—কী গো, আজ কদ্দূর যাওয়া হবে? শ্রীমন্ত আমাকে প্রশ্ন করল

—দেখি। আমি শ্রীমন্তকে থামিয়ে, দিলুম।

—নটবর সরকারের তদ্বি শুনে এলুম। কি গো মহিম, নেশা ভেঙেছে? শ্রীমন্ত পাশে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল।

—হুঁ। গম্ভীর গলায় মহিম বলল।

আমার মাথায় তখন-তখনই একটা বুদ্ধি খেলে গেল। নটবরের মাল আমি নিচ্ছি। সুদাসের মাল শ্রীমন্তর লরীতে তুলে দিলে কেমন হয়? কমিশন আর উপরি-জের মহিম পেতে পারে। অবশ্য শ্রীমন্ত যদি রাজী হয়। মহিমের জন্যে শ্রীমন্ত কী এটুকুও করবে না?

আমি শ্রীমন্তকে বললুম, দাদা, আজ ট্রিপ আছে নাকি।

—না। আজ আর বেরুব না।

—যদি ট্রিপ চান তো একটা দিতে পারি।

—কাছাকাছি না দূরের?

—কোলকাতার।

—কোলকতা? নাঃ। অত দূরে একা-একা রাতের বেলায় যেতে ভাল লাগে না।

—আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

—বল। বল। তোমার অনুরোধ রাখব না, এ কি হতে পারে? শ্রীমন্ত সদয় হয়ে বলল।

—মহিমদা'কে তো দেখছেন। নটবর মহা খাপ্পা হয়ে গেছে। টাকা তিরিশ আগাম এনে উনি আর মাল তুলতে চাননি। এর ফল খুব খারাপ হবে। কেন না, সব আড়তেই এ কথাটা ছড়িয়ে পড়বে। ফলে উনি নিজে আর কোন ট্রিপ একলা পাবেন না। এখন এ অবস্থা থেকে আপনি ওকে উদ্ধার করতে পারেন?

—কি করতে বল?

—আমি বলছি কি, আপনি আমার একটা ট্রিপ করুন। মহিমদা'কে সঙ্গে নিন। কমিশন আর উপরি-জের মহিমদা'কে দিন। আমাকে কিছু দিতে হবে না। মহিমদা'কে গাড়ী চালাতে দিন আড়ত পর্যন্ত। লোকে দেখুক। বেশী জানাজানি হবার আগেই ওকে লোকের চোখের সামনে দাঁড় করাতে চাই; নইলে মহিমদা'র অবস্থা খারাপ হবে।

—বেশ তো। এ আর এমন কথা কী। মহিমের ভাল হোক, এটা আমিও চাই।

—আরেকটা কথা। মহিমদা'কে যেন রাত্তিরে গাড়ী চালাতে দেবেন না।

—কেন, কেন ?

—মহিমদা' এখনো সুস্থ হননি। রাত্তিরে গাড়ী চালাতে চালাতে প্রায়ই ওর চোখ বন্ধ হয়ে আসে, নয় মন হারিয়ে যায়। এ অবস্থায় এ্যাকসিডেণ্ট হওয়া বিচিত্র নয়।

—মহিম সম্বন্ধে সে সব ভাবতে হবে না। ও ওস্তাদ! ওস্তাদ!

আমিও এককালে অহঙ্কার করতুম। আমি ওস্তাদ ড্রাইভার। ঘুমের চোখে গাড়ী চালালেও একটু ষ্টিয়ারিং এদিক ওদিক হবে না। ঠিক রাস্তা ছাড়া অন্ত রাস্তায় গাড়ী যাবে না। সেটা ভুল ভেবেছিলুম।

আর সে-ভুল আমার ভেঙেছিল একদিন আসানসোল থেকে ফেরবার পথে।

অন্ধকার রাস্তার ওপোর দিয়ে হেডলাইট দুটো জ্বালিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ী চালাচ্ছিলুম। পাশে কানাই। ওপোরে ছাদে ঝড়ুয়া। খালি গাড়ী। একটু জোরে যাচ্ছিলুম।

রাস্তা একেবারে খালি। একঘেয়ে আওয়াজ তুলে গাড়ী এগুচ্ছে। দু'-চারটে গাড়ী তীব্র বেগে পাশ কাটিয়ে উল্টো দিকে যাচ্ছে। চালাতে কোন কষ্টই হচ্ছিল না।

ফাঁকা রাস্তায় মন হারিয়ে যায়।

ভীড়ের মাঝে, অন্তান্ত গাড়ী কাছাকাছি থাকলে, মন স্বাভাবিক ভাবেই সতর্ক হয়। কিন্তু সামনে পিছনে সেদিন ছিল একটা নিরাবরণ এ্যাসফল্টের ভিজ্ঞা রাস্তা। মনের অজান্তে কখন যে চোখ বন্ধ হয়ে যায়, বোঝা যায় না। একটানা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে করতে সতর্কতা কখন শিথিল হয়ে গেল জানি না!

গাড়ী হঠাৎ গোঁ-গোঁ শব্দ করতেই সচকিত হয়ে উঠলুম।

হেড-লাইটের আলোয় যা দেখলুম, তাতে গা শিউরে উঠল।

রাস্তা থেকে অনেক নীচে নেমে গেছি। একটা খেজুর গাছ খাদের ওপোর আড়াআড়ি ভাবে হেলে পড়েছে। নীচে ঢালু হয়ে নেমে গেছে খাদ। কোন দিকে ষ্টিয়ারিং ঘোরাব বুঝতে পারলুম না।

রাস্তা কোথায় ?

কিছু ভাবতে পারছি না। কানাই জেগেছে। ঝড়ুয়া চেঁচাচ্ছে। সব শুনতে পাচ্ছি! কিন্তু মাথায় ঢুকছে না কিছু।

মরিয়া হয়ে ডান দিকে গাড়ী ঘোরালুম। আওয়াজ হোল ছড়্‌ছড়্‌ করে। চাকা মাটি থেকে ওপরে ওঠে গেছে। বাঁদিকেও তাই। নিজের এতটুকু অন্তমনস্কতার জন্তে কত বড় একটা দুর্ঘটনা আজ ঘটতে যাচ্ছিল। বাঁচবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টা করছি। কেমন করে গাড়ী আবার পাকা রাস্তার ওপর তুলব! কেমন করে ফিরব? সব কিছু জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

পিছন থেকে কে যেন দৌড়ে আসছে। ব্রেকে পা দিয়ে বসে আছি। ছাড়তে ভয় হচ্ছে। যদি গাড়ী গড়িয়ে যায়। কী ভয়াবহ অবস্থা!

একটা পাঞ্জাবী এলো। সামনে দুটো চাকার নীচে ইট লাগিয়ে দিল। তারপর আমাকে ধাক্কা মেরে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিজে ষ্টিয়ারিং ধরল। আমাদের গাড়ীর পিছনে কখন যে আরেকটা গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করবার সময় পাই নি। পেছনের গাড়ীর সঙ্গে আমাদের গাড়ী বেঁধে রাস্তার ওপরে তুলল।

আমার সামনে তখন আরেক জীবন। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পেলুম। কথা বলবার, কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই! চোখ আমার জলে ভিজে গেছে। মৌনতা যেন স্বয়ং বাঙ্ময় কৃতজ্ঞতা। আমি দু'হাতে পাঞ্জাবী ড্রাইভারটির হাত ধরলুম।

—নিদ গয়ে থে ক্যা? পাঞ্জাবী ড্রাইভারটি বলল।

জী। একটা অস্ফুট শব্দ বেরুল আমার মুখ থেকে।

কানাই আর সেই পাঞ্জাবীটি ততক্ষণ সিগারেট ধরিয়ে গল্প শুরু করে দিয়েছে। সম্বিত ফিরে পেলুম আস্তে আস্তে।

পাঞ্জাবী ড্রাইভারটার মুখ থেকে শুনলুম ওরা নাকি আমাদের পিছন পিছন আসছিল। আসতে আসতে হঠাৎ রাস্তার একটা বাঁকে এসে দেখল, রাস্তার ওপর আমাদের গাড়ী নেই। চীৎকার করতে লাগল। হর্ণ বাজাতে লাগল ঘন-ঘন। হেডলাইট জ্বালাল নিবাল অনেক বার। তবু নাকি আমাদের গাড়ী হু হু করে নীচের দিকে নামতে লাগল। ওরা ভয় পেয়ে রাস্তায় ওদের গাড়ী থামিয়ে দৌড়ে গেল আমাদের দিকে। ভাগ্যিস খেজুর গাছটা ছিল। নইলে আজ আমাদের কাউকে বাঁচতে হোত না।

রাস্তার ওপোর অনেকক্ষণ গল্প করল।

আমাকে উপদেশ দিল যেন আমি আর এখন গাড়ী না চালাই। দরকার হলে ওদের একটা ড্রাইভার আমাদের দিতে পারে।

কানাই আমায় সরিয়ে দিয়ে নিজে চালাতে বসল। সামনের লরিটার পিছনে পিছনে আমরা এগুতে লাগলুম।

সেই রাতের কথা আমার মনে পড়ল। ওস্তাদ!

আমি বাধা দিয়ে বললুম, তা হোক। মহিমদা' গাড়ী ভাল চালান জানি। তবু আমার অনুরোধ, অন্তত আজকের দিনটা যাবার সময় আপনি চালাবেন।

—বেশ। যেতে হয়তো এখনই চল। উঠো মহিম! [ ক্রমশঃ।

কোনো দুটি দেশের সভ্যতা ও চিন্তাধারায় যদি সব চেয়ে বেশি সামঞ্জস্য থেকে থাকে, তা সে আছে ভারত ও চীনের মধ্যে। এমন কি প্রাচীনত্বের দিক দিয়েও এই দুটি দেশের তুলনা নেই।

তাই গভীর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তিয়েলিং যখন চীন দেশের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করছিলেন, শান্তনু গভীর মনোযোগ নিয়ে শুনছিল। এমন কি, দুই দেশের যেথায় পার্থক্য সেটিকেও মনোরম করে বলছিলেন তিয়েলিং। শিল্পে সাহিত্যের মধ্যেই একটা দেশের পরিচয় কিন্তু বিদ্বেষহীন পক্ষপাতদোষ-শূন্য হয়ে খুব কম লোকই অন্য দেশের শিল্প-সাহিত্যের বিচার করতে পারে। অন্ততঃ শান্তনু অত সুন্দর ক'রে বলতে শোনেনি কাউকে।

চীনের কলাশিল্প সম্বন্ধে তার জ্ঞানও বেশি ছিল না। তাই, অনেক জিনিষই সে শিখলো। সে শিখলো, ভারত আর চীন এই দুটি দেশেই শুধু চিত্রকলা এমন একটা জিনিষ যা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করতে হতো, যেমন একমুখী নিষ্ঠা নিয়ে মানুষ ধর্মশিক্ষা করে। চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা ধর্মশিক্ষারই অন্তর্গত। অর্থাৎ এগুলির মধ্যে দিয়েই ভগবানকে লাভ করা যায় বা মানুষ শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি লাভ ক'রে পূর্ণ হ'তে পারে।

অনেকক্ষণ আলোচনার পর তিয়েলিং হঠাৎ বলে উঠলেন, আমায় মাপ করবে, আমি হয়তো তোমার ধৈর্যের ওপর অত্যাচার করছি।

অত্যাচার? শান্তনু প্রশ্ন করে।

হাঁ। কেন নয়? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়েস পঁচিশও হয়নি, আর আমি ষাটের কাছাকাছি এসেছি। আমার কাছে যে প্রসঙ্গ উপাদেয়, তোমার কাছে তা বিরক্তিকর হবে, এটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, আমি লামা, ধর্মপথের পথিক। তোমাদের সংসার পথ বহু দিন হলো সযত্নে পরিহার করে এসেছি। বলতে গেলে, তুমি আর আমি দুই ভিন্ন গ্রহের বাসিন্দা। তাই নয় কি?

তিয়েলিং-এর ইংরেজি উচ্চারণ পরিষ্কার এবং বলবার কণ্ঠে যেন অপরিমিত ঔদার্য মেশানো ছিল। শান্তনু বললে, তুমি ঠিকই বলেছ, এ কথার প্রতিবাদ নেই। কিন্তু, তবু বলছি। গ্রহেরা ভিন্ন হলেও গ্রহে গ্রহে আকর্ষণ আছে। বিশেষ যখন তারা নিকটবর্তী হয়। তোমার ভাষা আমি বুঝি না, তুমি বুঝবে না আমার ভাষা। অন্য ভাষার সাহায্য নিতে হয়েছে আমাদের। জাতি, গোত্র, সমাজ, ধর্ম, দেশ, সবই আমাদের আলাদা। তবু—তবু একটা এমন কিছু আছে, যার জন্যে তোমাকে আমার আত্মার বলেই মনে হয়। তুমি যে ধর্ম গ্রহণ করেছ, সে ধর্মের প্রবর্তক ভগবান বুদ্ধ, তিনি আমার দেশেই জন্মেছেন। কিন্তু ঠিক সেজন্যেও নয়। আমার মনে হয়, অন্য কোনও জায়গায় একটা যেন সমতা, একত্ব আছে, যা বুঝতে পারছি, কিন্তু প্রকাশ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। য়ুরোপের যে কোনও দেশের মানুষকে যতটা বুঝতে পারি, আমেরিকার কোনও মানুষকে যতটা বুঝতে পারি, তার চেয়ে তোমাকে যেন বেশি বুঝি বলে মনে হয়।

ওদের আলাপের মাঝখানে কিশোর এসে পড়লো। মুণ্ডিতমস্তক প্রবীণ লামাকে নমস্কার করে সে দাঁড়ালো এক পাশে।

এটি আমার বন্ধু, কিশোর। ঘরে আমার বান্ধবী এরই ভগিনী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বললে শান্তনু।

আমি বলেছিলাম, কিশোর বলে উঠলো, আরও কিছু ওষুধপত্র সঙ্গে নেওয়া উচিত ছিল। তোমরা নাওনি? লালীর পায়ের যন্ত্রণাটা কমেছে বটে কিন্তু জ্বর ত ছাড়লো না এখনও?

আমি জানতে পারি কি সমস্ত ঘটনাটা? জিগ্যেস করেন তিয়েলিং। শান্তনু আনুপূর্বিক সব ঘটনা বলে চললো। অবশ্য ঐ অ্যাক্সিডেন্টের কথা ছাড়া আর কিছু নয়।

তিয়েলিং বলে উঠলেন, ভয় পেয়ো না। আমি ওষুধের ব্যবস্থা করছি। আমার কাছে সালফা জাতীয় কয়েকটি ওষুধ আছে। আমার ও বিষয়ে একটু জ্ঞানও আছে, এককালে ডাক্তারিও করতাম কি না। আমার বিশ্বাস, এই ওষুধ পড়লে রাত্রের মধ্যে জ্বর নেমে যাবে।

সেটা ত অনুমান। যদি না ছাড়ে—যদি হাড়ের ফ্র্যাক্চার হয়ে থাকে। কি হবে এখানে? সভ্য জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়ে, এত দূরে—এখানে কি মানুষ বাঁচতে পারে?

এখানটাকে খুবই অসভ্য জগৎ বলে মনে হচ্ছে বুঝি? বললেন তিয়েলিং। কিন্তু, আমরাও ত এখানে বাস করি—একটু ধৈর্য ধরতে হবে বৈ কি। তা না হলে উপায় কি বলো, আচ্ছা, তোমরা যদি কিছু মনে না কর, তাহলে একটা কথা জিগ্যেস করবো। হঠাৎ তোমরা এই দুর্গম পথে এলে কেন?

এমন সময় বৌদ্ধমন্দিরে সান্ধ্য উপাসনার ঢাক বেজে উঠলো। ঘড় ঘড় ঘড়—বিপুল গম্ভীর আওয়াজ। খোলা বারান্দা থেকে ওরা

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

দেখলো, আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। নিচের পাহাড় ততোধিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শুধু বহুদূরে দেখা যাচ্ছে তুষার-ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়োগুলি মৃদু স্বর্ণাভায় জ্বলছে। ধীরে ধীরে তাও বিলীন হয়ে গেল। বাতাস আরো ঠাণ্ডা হয়ে উঠলো।

তিয়েলিং উঠে গেলেন মন্দিরের উদ্দেশ্যে। যাবার সময় বলে গেলেন, রাত্রে আবার দেখা হবে।

রাত্রে খাবার আয়োজনে শান্তনু অবাক না হয়ে পারলো না। বারো তেরো হাজার ফুট উঁচুতে ঐ দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে গরম চাপাটি আর স্যালাড সে আশা করেনি। সঙ্গে ছাগদুগ্ধের ঘন চা এক-বাটি করে।

খাবার সময়ে তিয়েলিং দেখা দিলেন। সহাস হাসিখুশি মুখ। শান্তনুও রসিকতা করে মাঝে মাঝে। সে বললে, খাবার পরে একটু তাস খেললে কেমন হয়?

বড় বড় প্রদীপের আলোয় তিয়েলিং-এর হাসিটি দেখা গেল। বড় প্রশান্ত মধুর হাসি।

সময় কাটানোর জন্যে তাসটা একটা মস্ত বড় আবিষ্কার, শান্তনু আবার বললে। এক হাত ব্রিজ চলতে পারে, কি বলেন?

কিশোর বললে, তাস আপনাদের ধর্মশাস্ত্রে নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ। কিন্তু, ওটা ত নির্দোষ খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

দোষ-গুণের বিচারে নয়, খেলা মাত্রই আমাদের বর্জনীয়, তিয়েলিং বলতে থাকেন। জীবনে সময় এতো বেশী আমাদের থাকে না যা খেলা দিয়ে নষ্ট করা যায়।

আমাদের ধর্মাচার সম্বন্ধে আর কিছু বলতে চাই না। এখন, সে কথা থাক, আমি যেটা জিগ্যেস করেছিলাম সন্ধ্যার পূর্বে, সে প্রশ্নের উত্তর পাইনি এখনও।

হ্যাঁ, তবে শুনুন, শান্তনু আরম্ভ করে। আমরা শুধুমাত্র দেশ ভ্রমণে আসিনি। ভূতত্ত্ব বিষয়ে আমার কাজ, কিন্তু সে উপলক্ষেও আসিনি। আমরা বেরিয়েছি সোনালি ঝরণার উদ্দেশ্যে। জানি না, কোথায় সেটি আছে, তবে ঐ কাঞ্চনজঙ্ঘার আশে-পাশে কোথাও আছে এটা শুনেছি। আমাদের নেপালি গাইড টুশাংও ঐ ঝরণার নাম শুনেছে। সেই আমাদের এত দূরে পথ দেখিয়ে এনেছে। আমাদের কাজ হবে আমার বন্ধু-ভগিনীকে সুস্থ করে আমাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া।

কি ভাবে অগ্রসর হবে জানতে পারি কি?

সে বিষয়ে কোনও প্ল্যান আমাদের নেই।

পথের সন্ধান জান কি? অর্থাৎ কোন দিকে যেতে হবে এবং সে দিকে যাবার পথ কোনটা?

না। ধরে নিতে পারেন আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। তবে একটা মাত্র নক্সা আছে, যেটা একমাত্র অভিজ্ঞ লোকই উদ্ধার করতে পারবে।

সেটা কি দেখাতে পার আমাকে? তিয়েলিং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন। অবশ্য যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে। এবং এটাও তোমাদের বলে রাখছি। এই দিকের পথে আমাদের এই আশ্রমই শেষ যেখানে মানুষের দেখা পেতে পার। অর্থাৎ এর পর আর লামাদের কোন মন্দির, গুম্ফা বা আশ্রম নেই। অবশ্য ঐ দূরে নিচের উপত্যকার মানুষের বাস আছে। ছোট ছোট গ্রাম। পাহাড়ী জাতির বাস।

শান্তনু, কিশোর স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। ঘরটা যেন থম-থম করছে।

কিছুক্ষণ পরে তিয়েলিং বললেন, জানি না, আমি তোমাদের কিছু সাহায্য করতে পারবো কি না। তবে, যদি তোমাদের বলি যে তোমরা আর অগ্রসর হয়ো না। তাহলে, আশা করি তোমরা আমাকে ভুল বুঝবে না। মনে কোরো, তোমাদের ভালর জন্যেই বলছি একথা। তিয়েলিং চুপ করলেন।

শান্তনুও বললে, আমাদের শুভ কামনার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবে, অনেক কষ্ট সহ্য করে আমরা এত দূর এসেছি, আশা করি সেটাও আপনি বিবেচনা করবেন। আগামী কাল প্রত্যুষেই আমি সেই নক্সাটি আপনাকে দেখাবো।

খুব ভাল কথা। আজ অনেক রাত্রি হলো, তোমরা শয্যাগ্রহণ করো। আর একটা কথা বলে রাখছি, যদি কোনো অসুবিধা হয়, আমাকে জানাবে। শুভরাত্রি।

এই কথা বলে তিয়েলিং বিদায় নিলেন। চলে যাবার সময় দেখা গেল, ঐ খর্বাকার লামাটি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছেন। ভাল করে লক্ষ্য করলেই শুধু বোঝা যায় যে তাঁর একটা পা ঈষৎ খোঁড়া।

রাত্রে কিশোর বললে, যাই বল শানুদা, ঐ লোকটিকে আমি বিশ্বাস করে ভাল করছো না।

কেন? শান্তনু জিগ্যেস করে। আমার ত কোনো সন্দেহ হয় না ওকে?

সন্দেহ না হলেও, কেমন যেন রহস্যময় লাগে। দেখছো না, আমাদের কেমন নিরুৎসাহ করছিল।

সেটা ভালর জন্যেও ত হতে পারে। তাছাড়া, ওর সাহায্য না পেলে আমরাই বা করবো কি? কাটমাণ্ডু থেকে যে মালবাহী লোকগুলি এসেছে তারা বিদায় চাইছে। এর পর তারা এগুতে চাইছে না। টুশাংকেও হয়তো ছেড়ে দিতে হবে। তাহলেই বুঝতে পারছো আমরা নিরুপায়। লিউ টাং-এর ওপর বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কি? আমার মনে হয়, ভদ্রলোক অনেক কিছুর খবর রাখেন। ওঁর কাছে সোনালি ঝরণা সম্বন্ধে কোনো খবর জানতে পারবো আশা করেই আমি ওকে আমাদের মধ্যে নিতে চাই।

কিশোর শুধু বললে, সবই মানছি, তবে ঐ লামাদের চাউনির মধ্যে কেমন একটা রহস্য আছে, যা আমি সহ্য করতে পারি না। তাছাড়া ওরা বৈদেশিক। শান্তনু হেসে উঠলো, এটা তোমার প্রথম অভিজ্ঞতা কি না, তাই।

পরদিন প্রভাতে শান্তনু প্রথম যে সংবাদটি পেল, সেটি একটি সুসংবাদ। লালীর জ্বর ছেড়ে গেছে। বেদনাও কম। তিয়েলিং-এর ডাক্তারির ওপর ওদের যে কিছু শ্রদ্ধা বাড়লো তাতে আর সন্দেহ নেই।

প্রাভাতিক উপাসনার পর তিয়েলিং খবর পাঠালেন। শান্তনুও কথামত তার ছোট খাতাটি নিয়ে গেল, যার মধ্যে সেই নক্সাটি ছিল। নক্সাটি হাতে নিয়ে ঐ প্রবীণ চীনা লামা যেন চমকে উঠলেন।

এখন আমাদের এই সর্পসঙ্কুল গুহার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে—বলে উম্‌জাটজী অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তার পিছনে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিছুদূর যেতেই গুহা-পথ এত সংকীর্ণ ও অপরিসর হয়ে পড়ল যে, বাধ্য হয়েই আমরা মাটির উপর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে পথ চলতে লাগলাম। প্রচণ্ড গরমে ও সর্প দংশনের আশংকায় শরীর ক্রমশ:ই অবসন্ন হয়ে পড়ছিল। কিন্তু তবুও আমার মরণ-পণ। এগিয়ে যেতে হবে—যেতেই হবে।

সৌভাগ্যক্রমে কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা অক্ষত দেহে গুহার বাইরে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হলাম। এবার যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে আমার সর্বশরীর এক অব্যক্ত আনন্দের অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

মাটির উপর চারি দিকে হাজার হাজার মহামূল্য হীরকখণ্ড ছড়ানো। যার মূল্য মানুষের কল্পনার নাগালের বাইরে। কোটি কোটি কিম্বালির সম্পদ চোখের সামনে মাটির উপর হেলায় পড়ে আছে। শুধুমাত্র তুলে নিতে যতটুকু দেরী। এমন কি, মার্কোপোলো বর্ণিত প্রাচ্যের ক্যাথে-সম্রাটের ধনৈশ্বর্যও এর কাছে তুচ্ছ—অতি নগণ্য।

যাই হোক, বুকের অশান্ত উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলে আমি কাঁধের ব্যাগ এই মহামূল্য রত্নে ভর্ত্তি করলাম। কিন্তু এর পর থেকেই শুরু হল আমাদের ভাগ্যাকাশে দুর্ভাগ্যের ঘনঘটা। ফেরার পথে উম্‌জাটজী বিষাক্ত সাপের কামড়ে প্রাণ হারাল। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারলাম না। বেচারা একজন শ্বেতাঙ্গ তস্করের লোভের ইন্ধন যোগাতে এসে নিতান্ত অসহায় ভাবে প্রাণ দিল! আর আমি সঙ্গিহীন অবস্থায় শ্বাপদ-সঙ্কুল পার্ব্বত্য-ভূমির মধ্যে যেন দিশেহারা হয়ে পড়লাম। ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অপরিচিত পথ-পর্যটনের সর্বনাশা ক্লান্তি আমাকে ক্রমেই তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে একদিন ক্ষত-বিক্ষত পায়ে, মাথা ভর্ত্তি উকুন ও দাড়ি-গোঁফ ভরা মুখ নিয়ে আমি টলতে টলতে মৃতপ্রায় অবস্থায় আবার সভ্য সমাজের বুকে ফিরে এলাম। তারপর সেখান থেকে এক সুন্দর প্রভাতে জাহাজে চেপে একেবারে সোজা লণ্ডনে।

মেজর রীডের এই রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনী লণ্ডনের পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বহু ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী রীড-বর্ণিত পথে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অরেঞ্জ নদীর উত্তরে মরু-অঞ্চলে হীরক খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। অবশ্য নিদারুণ জলকষ্ট ও পথ-প্রদর্শকের অভাবই এর প্রধান কারণ। অধিকন্তু মেজর রীডের কাছে এই অভিযানের কোন মানচিত্র ছিল না। আর থাকলেও তিনি হয়ত তা' বিশেষ কারণে চেপে গেছেন। ফলে বুশম্যানদের স্বর্গের অবস্থান নিয়ে বর্তমানে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। তবে অরেঞ্জ নদীর উত্তরে মরু-অঞ্চলের কোন এক জায়গায় যে এই বুশম্যানদের স্বর্গ অবস্থিত, এ বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ নেই।

এর পর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় (১৯১৪—১৮) দক্ষিণ-আফ্রিকার সামরিক বাহিনী যখন দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার জার্মাণ বাহিনীদের পরাস্ত করে, উইণ্ডহোয়েক্ সহর দখল করে, তখন সেখানে জার্মাণ বাহিনী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত জার্মাণ-সামরিক দপ্তরের গোপনীয় ফাইল পত্রের মধ্যে একটি চাঞ্চল্যকর কাহিনী সম্বলিত ফাইল পাওয়া যায়। সংক্ষেপে কাহিনীটি হল এই—

বহু দিন পূর্ব্বে নামিব্ মরুভূমিতে একজন জার্মাণ সামরিক অফিসার একবার মরু-ঝড়ের মধ্যে পড়ে নিরুদ্দিষ্ট হন। তাঁর সহকর্মীরা সকলেই ভেবেছিলেন, তিনি বোধ হয় প্রচণ্ড মরু-ঝড়ের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ বাদে সেই সামরিক অফিসারটি এক দিন নাটকীয় ভাবে ঘাঁটিতে ফিরে এসে তাঁর সহকর্মীদের কাছে এক অবিশ্বাস্য কাহিনী বলেন। তিনি নাকি নামিব মরুভূমির কোন এক অজ্ঞাত মরূদ্যানে বুশম্যান শিশুদের হীরক নিয়ে খেলা করতে দেখেছেন। তখন অবশ্য সকলেই তাঁর কাহিনীটিকে নিছক গাঁজাখুরী বলে একেবারেই আমল দেননি। এখানে উল্লেখযোগ্য, নামিব্ মরুভূমিতে তখনো পর্যন্ত কোন হীরক-খনি আবিষ্কৃত হয়নি। যাই হোক, অল্প কয়েক দিন পরে সামরিক অফিসারটি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে একাই নামিব্ মরুভূমিতে উক্ত মরূদ্যানের সন্ধানে গিয়ে অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বুশম্যানদের নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত তীরে তাঁর মৃত্যু হয়। কিছু দিন পরে উদ্ধারকারী দল কর্ত্তৃক অফিসারটির তীরবিদ্ধ কঙ্কাল আবিষ্কৃত হলে তাঁর পকেটে চারটি বড় বড় হীরকখণ্ড ও একটি অসমাপ্ত মানচিত্র পাওয়া যায়। এর থেকে নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, হতভাগ্য জার্মাণ সামরিক অফিসারটি নামিব্ মরুভূমিতে বুশম্যানদের মরূদ্যানে পৌঁছুতে সমর্থ হয়েছিলেন। আবার এই অসমাপ্ত মানচিত্রের উপর নির্ভর করে লণ্ডনের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হীরক অন্বেষণকারী (Diamond Prospector) মি: ফ্রেড কর্ণেল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ওয়ালভিস উপসাগরের দেড়শো মাইল দক্ষিণে অবস্থিত হোলামস্ বার্ড আইলেট থেকে পূর্ব্বদিকে এক অভিযান শুরু করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিদারুণ জলকষ্টের জন্য এই অভিযান মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়।

এ ছাড়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মি: এইচ, এল, গ্রীণফিল্ড নামে একজন ইংরাজ হীরক-অন্বেষণকারী তাঁর হটেনটট পথ-প্রদর্শকের সাহায্যে বুশম্যানদের স্বর্গের সন্ধানে এক সুপরিকল্পিত অভিযান শুরু করেন। মি: গ্রীণফিল্ড নামিব্ মরুভূমিতে দু'-এক জায়গায় হীরকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেও বহুকথিত "বুশম্যানদের স্বর্গ" অথবা "বুশম্যানদের মরূদ্যান"-এর কোন সন্ধানই পাননি। দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বোক্ত অভিযাত্রীদের ন্যায় মি: গ্রীণফিল্ডও পানীয় জলের অভাবে শেষ পর্যন্ত এই অভিযান বাতিল করে দেন।

যাই হোক, বুশম্যানদের স্বর্গের অবস্থান নিয়ে প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী যাবৎ বহু আলোচনা, গবেষণা ও অভিযান প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। তবে অনেকের মতে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্রতীরে "বোগেন ফেল" নামে যে চুণা পাথরের সু-উচ্চ খিলানটি আছে তার আশে-পাশে মরুভূমির মধ্যে কোথাও বুশম্যানদের স্বর্গ অবস্থিত। কারণ, খিলানের কাছে এমন একজন হতভাগ্য হীরক-অন্বেষণকারীর সমাধি আছে যিনি জল পিপাসার তাড়নায় উন্মাদ হয়ে শেষ পর্য্যন্ত রিভলবারের গুলীতে আত্মহত্যা করেন। এ ছাড়া অপর একজন হীরক-অন্বেষণকারী "বোগেন ফেল"এর আশে-পাশে কোন এক জায়গা থেকে ছোট বড় নানা আকারের প্রায় আটশো হীরকখণ্ড সংগ্রহ করে রাতারাতি কোটিপতি হন। অথচ কিছুদিন পরে

দুর্গাদাস ভট্ট

ডাক্তারের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল না আর। এখন শুধু চুপচাপ বসে থাকা। এখন বসে বসেই নির্জন প্রহরগুলোকে দুহাতে ঠেলতে থাকবে কাবেরী। আর নিতান্ত অভ্যাস মত অক্সিজেন বেড়ুনোর ফানেলটা অনিরুদ্ধর নাকের গোড়ায় ধরবে।

নীচু হয়ে রবারের পাইপ-লাগানো ফানেলটা বিছানা থেকে কুড়োতে গেল ও। আর মাথার চুলে হেঁচকা একটা টান লাগল। চমকিয়ে তাকালো অনিরুদ্ধর ডানহাতের মুঠোয়। লম্বা লম্বা আঙুলের ফাঁকে তখন পর্য্যন্ত জড়িয়ে আছে ওর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো একরাশ চুল।

ভূত দেখার মতই চমকে উঠল কাবেরী। কথা গিয়েছে, স্মৃতি গিয়েছে, সব গিয়েছে। শুধু যায়নি এই চুলের ওপরে টান। ভাবতে ভাবতে মনের পাতা উল্টে চললো নিঃশব্দে। চিন্তার সুতো ছাড়তে ছাড়তে পৌঁছে গেল ওদের সেই বালিগঞ্জের বাড়ীতে।

কাবেরীর বাবার ছোটখাট বাড়ীখানায় অভাব ছিল না কিছুই। এমন কি, সামনের বাগিচাটার মাথায় ওপর থেকে হুমড়ি খেয়ে ঝুলে রয়েছে একটুকরো বারান্দা। এই বারান্দাটুকুই একেবারে প্রাণ হয়ে ধুকধুক করে কাবেরীর যৌবনভরা বুকে। সেই কলেজ যাওয়ার আগে উত্তরায়ণে সূর্য্য যখন এদিকে ঝুঁকবে, বারান্দার সাদা রেলিঙটার ওপর অল্প একটু আলোর রেশ আটকিয়ে থাকবে। কিন্তু সেইটুকুই কি কম লোভের? বিছানায় বাঁধা এলো খোঁপাটা হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে খুলে দেবে কাবেরী। একরাশ জমাটকালো বাদল মেঘ মুহূর্ত্তেই ছেয়ে ফেলবে ওর সমস্ত পিঠখানা আর এই একটুকরো রোদের মৌতাতে মেলে দেবে ওর কালো চুলের রাশ। নিজের চোখজোড়া ছাড়াও আরও দুটো আবেগ-বিহ্বল চোখ মুহূর্ত্তের জন্য আটকে যাবে এই কালো চুলের সীমানায়। আর কাবেরীও চটুল চাউনিটা ছুঁড়ে দেবে ওদিকে! দেখবে ওপাশের নীল বাড়ীখানার কোণের ঘরের জানলাটা খুলে গিয়েছে। একজোড়া আশ্চর্য্য চোখ দৃষ্টি ঢালছে এধারে।

এমনি করেই দিন কাটছিল। বাড়ীতে কলেজে সর্ব্বত্রই ওই এক কথা। এই সাদামাটা চেহারার মেয়েটার এত চুল হল কেন! ভগবান সব কিছু কম দিয়েও একটা জায়গায় অঢেল দেওয়া দিয়েছেন। আর এই আনন্দেই মনের ঘরগুলোকে ভর্ত্তি করে রেখেছে কাবেরী। এতদিন ওর ভাবনা ছিল—চুল থাকলে কি হবে? রূপ তো ওর নেই? ওর সহপাঠিনী রমা, শিখা আর রত্নার মতন অন্য কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে?

তবু অবাক হ'ল একদিন। পাড়ার ছেলেরা মিলে কর্পোরেশনের স্কুলে কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষে একটা মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল। কাবেরীও নিমন্ত্রিত হয়েছিল। বিকেল পাঁচটা না বাজতেই পৌঁছে গিয়েছিল ওখানে। তার পর অপূর্ব্ব একটা ছক-ঘেরা পরিবেশ। আলোয় ফুলে আর রঙ বেরঙের পোষাক পরিচ্ছদে আবেগ জড়ানো সাহিত্যসভায় সামনের একটা চেয়ারেই বসেছিল কাবেরী। এপাশে ওপাশে গুটিকয় চেনামুখের ছড়াছড়ি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাবেরীর মত কর্মসূচীতে অংশ নেবে।

একে একে সভার কাজ এগিয়ে চললো। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর 'জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' এই নামে প্রবন্ধ পাঠ করলেন কাবেরীদের কলেজের বাংলার প্রফেসার অবিনাশ বাবু। তার পর নাম ঘোষিত হ'ল অনিরুদ্ধ রায়। এই অনিরুদ্ধ ওর সামনের বাড়ীর ছেলে। কবিতা লেখে আর কেমন যেন অবাক অবাক দৃষ্টি ছড়ায় মাঝে মাঝে।

অনিরুদ্ধ রায় আবৃত্তি করতে শুরু করলেন—'আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে'—বিহ্বল গলার দ্যোতনায় সমস্ত ঘরে এক প্রতিধ্বনির সুর জাগলো। আওয়াজে আর আমেজে মিলে মিশে যেন একটা গভীর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। ঠিক সেই সময় এল কবিতার বিশেষ গুটিকয় লাইন—অনিরুদ্ধ মধুবর্ষী গলা একটু খাটো করে বর্ণনা করে চলেছে—

ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে
লোধ্রফুলের শুভ্ররেণু মাখত মুখে বালা।

ঠিক এই সময় চোখাচোখি হ'ল। কাবেরী আজ ওর চুলের জঙ্গলে তেল ঠেকায়নি। পামঅলিভের শ্যাম্পু দিয়েছিল চুলগুলোর খাঁজে। তারপর বহুক্ষণ ধরে চিরুণী দিয়ে বাগে এনেছিল ওগুলোকে। গোড়ার দিকে ফিতে এঁটে এক অদ্ভুত ঢঙে চুল বেঁধেছিল। এবার যেন মনে হল সার্থক হয়েছে ওর চুল বাঁধা। চোখের ওপর এক মুহূর্ত্ত চোখ রেখেই ওর চুলগুলোর চোখ বোলালো অনিরুদ্ধ। শুধু একবার নয়, অনেকবার। মুহূর্ত্তেই লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে কাবেরীর। কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। কি এক নতুন অনুভূতি, হৃৎপিণ্ডের রক্ত দিয়ে রাঙানো এক মুখ লোকানো স্থলপদ্ম কখন যেন পাঁপড়ি মেলেছে। বার বার মনে হল এ দৃষ্টি তো ওর অচেনা নয়। বাড়ীর ওপর তলার ঝোলানো বারান্দায় যখন ও চুল এলো করে দাঁড়ায়—তখন নিয়মমাফিক ডিউটি দিতে যে একদিনও ভুল

হয়নি অনিরুদ্ধর। একথা কাবেরীর ভাল মতই জানা। কিন্তু সে সব দিন মনে হয়েছে পাড়ার অন্য সব রোয়াকবাজী করা, শীষ দেওয়া ছেলেদের সঙ্গে অনিরুদ্ধর তেমন কিছু গরমিল নেই। ওই একদৃষ্টে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকার কোনো বিশেষ অর্থ ওর মনের দিগন্তে ঝলক দিয়ে ওঠেনি কিন্তু আজ? আজ যেন মনে হল অনিরুদ্ধর দৃষ্টিতে দেবালয়ের আরতি। পঞ্চপ্রদীপের দীপ্তি ওর আকাশঘন চোখে রঙ লাগল কাবেরীর। মুগ্ধ হল। আর সেই মুহূর্তেই সাহিত্যসভার লোক গিজ-গিজ ঘরটাকে অসহ্য বলে মনে হল। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো বাইরে।

সামনেই একটা মাথা-উঁচু-করা দেবদারু গাছ। ট্রাম লাইনের রাস্তাটা এখান থেকে বেশ একটু দূরে। ডানদিকের মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকান। ওখানে একটা জোর পাওয়ারের আলো—আলো ছড়াচ্ছে। আর এদিকে কিছু অন্ধকার। দেবদারুর ছায়ায় একটু কাল থমকে দাঁড়ালো কাবেরী, সেই মুহূর্তেই মনে হল একটা পুরুষকণ্ঠ কথা কয়ে উঠলো "চলে এলেন যে বড়? আপনার তো প্রোগ্রাম ছিল?" শিরদাঁড়া বেয়ে একসার পিঁপড়ে যেন শিরশির করে মগজের মধ্যে ঢুকলো। কপালটার ওপরে বেশ খানিকটা ঘাম জমে উঠলো কাবেরীর। আঁচলটা দিয়ে সেটুকুকে মুছে নিয়ে তাকালো পেছনে। অনিরুদ্ধই এসেছে। আলো আর কালো মেশা এই গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটুকরো ইস্পাতের মতই ঝল-মল করছে ও।

আরও অনেক দিন কাটলো। সেবারের জাগৃতি সংঘের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে কাবেরীই তার প্রাইজটা অনিরুদ্ধকে দেখানোর জন্যে হাজির হল এক সময়। সিঁড়ি বেয়ে ওপর ঘরে যেতে যেতেই শুনলো বাইরের জগতে অঝোর ধারে বৃষ্টি নেমেছে। নির্দিষ্ট ঘরখানায় পৌঁছে পর্দাটা একটু ফাঁক করতেই অবাক হয়ে গেল ও. আপন মনে অনিরুদ্ধ একটা ছবির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিজের মধ্যে এতখানিই ডুবে রয়েছে যে বাইরের জগতটা ভুলে গিয়েছে একেবারে। কাবেরীর শাড়ী খস্ খস্ আর হাতের মুঠোয় ধরা শিল্পের ধুক করা কাপি কোন কিছুতেই খেয়াল ছিল না ওর। কাবেরী চুপচাপ পেছনে এসে দাঁড়ালো; অনিরুদ্ধর আশ্চর্য চোখ দুটোর সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে দেখলো একটি তরুণীর ছবি। একরাশ কালো-কালো চুল বর্ষার মেঘের মত চাপ চাপ অন্ধকার ঢালছে ছবিটির মুখের চার পাশে। একটু যেন অবাক হল কাবেরী, আত্মবিস্মৃতও। অজান্তেই অনিরুদ্ধর পিঠে হাত ঠেকালো। আর চোখ ঘুরিয়ে কাবেরীর মুখের দিকে একপলক তাকাল অনিরুদ্ধ। চোখের চাহনিতে আনন্দ উপছালো খানিক। তারপর হাত বাড়িয়ে ওর কালোচুলগুলোর খানিকটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরলো। পরক্ষণেই নিজেকে যেন ফিরে পেল অনিরুদ্ধ। মৃদু দুটো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কথার মুক্তো ঝরলো—দেখ কাণ্ড। আমি তোমায় এখনও বসতেই বলিনি—সত্যি বলে আর কি হবে? তার চাইতে আমার চুলগুলোই কেটে রেখে যাই তোমার টেবিলের ওপর। অভিমান নামলো কাবেরীর চোখে।

—কি যে বল? তুমি আমার বাড়ীতে এসেছ, এযে আমার কত বড় সৌভাগ্য! মুখের কথায় মেজাজ নেমে এল অনিরুদ্ধর। আর কাবেরীও তার অভিমানের বোঝা বেশীক্ষণ সামলাতে না পেরে মন মেললো নিঃশব্দে।

এমনি করে কিন্তু বেশী দিন কাটেনি। ওদের দু-বাড়ীর গুরুজনেরা ছেলেমেয়ের মতিগতি দেখে কোনো এক বোশেখী পূর্ণিমায় সানাই বাজানোর ব্যবস্থা করে ফেললেন। রাঙা চেলিতে আর সিল্কের ওড়নায় মাথা ঢেকে কাবেরী এসে অনিরুদ্ধর বাড়ীতে ঢুকলো। আর সুরু হ'ল ওদের আর এক জীবন।

প্রথম দিনেই যেন একটু খটকা লেগেছিল কাবেরীর। ওদের শোবার ঘরের লাইফ সাইজ আয়নাটার পাশে ছোট্ট একটা টেবিল। তারই ওপর একগাদা টয়লেটের শিশি। অনিরুদ্ধ বলল—দেখ, তোমার জন্য কতরকম তেল নিয়ে এসেছি।

কাবেরীর চোখ দুটো মুহূর্তেই বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে ওঠে। এত সব চুলের উপকরণ! মধ্যের অনেকগুলোর নামই শোনা নেই ওর। ইয়ার্ডলের পমেটম থেকে বেঙ্গল কেমিক্যালের কান্থারাইডিন পর্য্যন্ত বাকী নেই কোনোটাই!

কাবেরী বললো, আমার চেয়ে আমার চুলের ওপরই দেখছি তোমার নজর বেশী!

অনিরুদ্ধ বললো—তোমার চুল তো আর তুমি ছাড়া নয়। তাই না কি? কথাটায় একটু শ্লেষ ছিল কাবেরীর। তাই অনিরুদ্ধর মুখখানা কেমন যেন দেখালো। মায়া হল কাবেরীর, বললো—অমনি রাগ হয়ে গেল মহারাজের।

—কই আমিতো রাগ করিনি। নির্লিপ্ত হ'তে চাইলো

অনিরুদ্ধ। তক্ষণ কাবেরীই এসে ইজিচেয়ারে বসা অনিরুদ্ধর চুলগুলোয় হাত চালিয়েছে। আর অনিরুদ্ধও কাছে টেনে নিয়েছে কাবেরীকে।

মধুমাসের বয়স বাড়লো পলাতক সময়ের তালে লয়ে। পারিবারিক চার দেওয়ালে আটকানো শান্ত শিষ্ট নিরালা জীবন। ভাল লেগেছিল ওদের। ধীরে ধীরে এ কথাও বুঝলো কাবেরী যে চুলগুলোকে বাদ দিয়েও গোটা মানুষটাকেই ভালবেসেছে অনিরুদ্ধ। ওর ভালবাসার রঙ দিয়ে নতুন করে বেঁধেছে কাবেরীকে। তবু এমন দিন ফুরিয়ে এল নিমেষেই। ঘন বর্ষায় আকাশ সেদিন ঢাকা। বৃষ্টির চিকের আড়ালে ঠোঁট ফোলালো গোমড়া মুখ আকাশ। অসময়ে কি যেন দরজায় ঠুক করে ঘা দিল। বেতের ইজিচেয়ারটায় বসে একটা সোয়েটার বুনতে বুনতে বৃষ্টির বাজনা শুনছিল কাবেরী। মুহূর্তেই চেতনা ওর শাণিত হয়ে ওঠে। চাকরটা নিশ্চয়ই এতক্ষণ দুপুরের ঘুম ঘুমোচ্ছে, তাই টুকটুক করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। দরজাটা খুলতেই এক ঝলক জোলো বাতাসের সঙ্গে গা মিশিয়ে একটা পুরুষমূর্ত্তি ঢুকলো। প্রথমটায় চমকে গিয়েছিল কাবেরী। বর্ষাতি গায়ে অনিরুদ্ধকে ও কোনো দিন দেখেনি। মাথা থেকে ওয়াটারপ্রুফ-টুপিটা খুলেই অনিরুদ্ধ বললো—আমার ভীষণ জ্বর এসেছে। সেইজন্য অফিসের ছোট সাহেবের বর্ষাতিটা গায়ে দিয়েই চলে এলাম।

প্রথমটায় কথা বলতে পারেনি কাবেরী। অনিরুদ্ধর লালিত্যভরা মুখখানায় জ্বরের তেজ যেন একটা নতুন রূপ খুলিয়েছে। ওর মুখের দিকেই তাকিয়ে রইলো অপলক। তার পর এগিয়ে এলো। বললো—ওপরে চলো, বিছানাটা তো পাতাই আছে। আর বৃষ্টিটা একটু কমলেই ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়া যাবে।

দুটি মোটে সপ্তাহ। এরই মধ্যে চরমে পৌঁছে গেল অনিরুদ্ধ। ষ্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরোমাইন কোনো ওষুধই এই বেয়াড়া ধরণের টাইফয়েডটাকে কায়দা করতে পারল না। সব আশা, সব আকাঙ্খার বৃত্ত পার হয়ে হয়ে এক সময় স্থির হয়ে এল কাবেরীর মন। চোখের ওপর তিল তিল করে শেষ সময় ঘনিয়ে আসবে, এ কথাটা এক সময় বুঝে ফেললো কাবেরী। অক্সিজেনের ফানেলটাকে ওর নাকের গোড়ায় ধরে তাইতো এত স্মৃতির রোমন্থন করতে পারলে সে।

তখনও অনিরুদ্ধর হাতের মুঠোয় ধরা আছে কাবেরীর মাথার একমুঠো চুল। বাজপাখীর দৃষ্টি হনে কাবেরী তাকাল একটু কাল। আর মুহূর্তেই একটা আকাশছোঁয়া আর্ত্তনাদ ওর গলার কাছে এসে আটকে গেল—অনিরুদ্ধর আধবোজা চোখ দুটো আরও একটু ফাঁক হয়ে পাথরের মত চুপ মেরে গিয়েছে। দ্রুতলয় বুকের ওঠা-নামায় নেমে এসেছে শেষের যবনিকা।

এর পরেও যে সূর্য্য উঠবে, এ কথা কাবেরী ভাবেনি। অনিরুদ্ধকে বাদ দিয়ে যে ও কোনো দিন বাঁচার কথা ভাববে, এ কথা কাবেরীর কাছে অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও সূর্য্য উঠলো, দিন বাড়লো। সময় গড়িয়ে ক্রমে এল ক্যালেণ্ডারের পাতা। আর মনের ভেতরকার দগদগে ঘায়ের ওপর পাতলা একটা বিস্মৃতির প্রলেপ কখন যেন এসে গেল কাবেরীর। কিন্তু একটা প্রশ্ন বার বারই উন্মনা করে। সেটা হচ্ছে বৈধব্য-জীবনে এসে ওর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুলগুলোকে কেটে ফেলার প্রশ্ন। বার বারই মনে হয়েছে মিছে এই বিড়ম্বনা! যদিও ওর সহপাঠী বন্ধুরা বলত যে বিধবা হ'য়ে চুল কেটে ফেলাটা অষ্টাদশ শতাব্দীর মতই পুরোনো একটা সংস্কার। কাবেরীর কিন্তু মনে হয়েছিল অনিরুদ্ধই যখন নেই তখন ওর চুল থাকা না থাকা সমান। এক দিন ওর প্রিয় বন্ধু কণাই কথাটা মনে করিয়ে দিলো—বললো, আচ্ছা কাবেরী অনিরুদ্ধকে কি তুই ভুলে যেতে চাস ?

—নিশ্চয়ই না, ফুঁসে উঠেছিল কাবেরী। কণা আবার আগের কথার জের টানলো, বললো—তবে তুই তোর চুলগুলোর ওপর আবার নতুন ক'রে মনোযোগ দে। আমি তো তোর মুখ থেকে তোদের সব কথা শুনেছি। আমার মনে হয়, যখন তুই আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজের চুলগুলো দেখবি—ঠিক তখনই আবার নতুন করে ফিরে পাবি অনিরুদ্ধকে। কণার কথার ওপর আর কথা বাড়ায়নি কাবেরী। ওর বিহ্বল দুটো হাত দিয়ে শুধু ওর প্রিয় বন্ধুর হাত দুটো টেনে নিয়েছিল নিঃশব্দে।

দিন কারুর ঠেকে থাকে না। কাবেরীরও থাকে নি। ইন্টারমিডিয়েটটাও ইতিমধ্যেই পাশ করেছিল। অনিরুদ্ধ মারা যাওয়ার পর শাশুড়ীর পায়ের ধূলো নিয়ে আবার গিয়ে ভর্ত্তি হল বি-এ ক্লাসে।

আবার শুরু হ'ল ওর ছকবাঁধা জীবন। বইগুলো বুকে করে ঠিক সময়ে কলেজ যাওয়া। নির্দিষ্ট ক্লাস আওয়ারে প্রফেসারের নোট নেওয়া আর লিজার পিরিয়ডে বসা, রেবা আর শিখা, গীতার একঘেয়ে গালগল্পের বাণ্ডিল। তবু যেন ভাল লাগছিল কাবেরীর। পড়াশুনোয়, গল্পগুজবে নিজের মনটাকে ব্যস্ত রাখায় মনের ভেতরকার দাউ-দাউ জ্বলুনিটায় বিস্মৃতির পলিমাটী এসে জমছিল।

বিশেষ করে ভাল লাগছিল ওদের বাংলার প্রফেসার অবিনাশ বাবুর ক্লাস। যেমন সুন্দর ভদ্রলোকের বিশ্লেষণ-ভঙ্গী, তেমনি মিষ্টি ওর গলার আওয়াজ, একটা প্রসঙ্গের খেই ধরে কতকগুলো প্রসঙ্গকে টেনে আনেন। বড় ভাল লাগে কাবেরীর।

সেদিন একটা রূপক নাট্যেরই আলোচনা শুরু হল ক্লাসে। অবিনাশ বাবু রবীন্দ্রনাথের তপতী আর মুক্তধারা দিয়েই আলোচনা সুরু করলেন। আর মুগ্ধ-বিস্ময়ে অবিনাশ বাবুর কথাগুলো গিলতে গিলতে মুখ ফস্কে বলে ফেললো কাবেরী—আচ্ছা স্যার, রক্তকরবীতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে কি ভাবে মানুষের আত্মা যন্ত্রযুগের চাকার তলায় নিপীড়িত হচ্ছে। আর প্রতিদিন প্রতি পলে আর্ত্তনাদ করে চলেছে।

ঘাড় বেঁকিয়ে কেমন যেন রহস্যভরা চোখ নিয়ে তাকালেন অবিনাশ বাবু। আর আত্মবিস্মৃত কাবেরীও উপলব্ধি করলো, ওর কোনোরকমে জড়িয়ে বাঁধা খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে পিঠের ওপর। পেছনে না তাকিয়েও কাবেরী বুঝতে পারলো এতক্ষণ ওর মাথা থেকে পিঠ পর্য্যন্ত চুলে চুলে একাকার হয়ে গিয়েছে।

একটু কাল তাকিয়েই অবিনাশ বাবু বললেন—বা রে! আপনি তো বেশ আবেগ দিয়ে কথা বলতে পারেন—আবৃত্তি করা অভ্যাস আছে নাকি আপনার? প্রফেসারের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে মাথা নামিয়ে ডান হাতের অনামিকার নোখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল কাবেরী। আর একটা কথাও ওর মুখ দিয়ে বেরুলো না। তাই এ যাত্রাটা ওকে উদ্ধার করলে ওর কলেজের বন্ধু মীনা। মীনা বললো—কাবেরী খুব ভালই আবৃত্তি করতে

পারে তার। এর আগেও ও দু'বার কলেজ আবৃত্তিতে প্রথম হয়েছে।
…তাই নাকি? অবিনাশ বাবু আলগা একটা প্রশ্ন ক'রেই আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। সুরু করলেন আলোচনা।

এদিন আর পড়াশুনোয় মন বসেনি কাবেরীর। এলো খোঁপা ভেঙে যাওয়া আর অবিনাশ বাবুর চোখে এক মুহূর্তের মুগ্ধতা এই দুটোয় যেন মিল থেকে গেছে কোথায়। কথাটা ভাবতে গিয়েই সঙ্কোচ এল মনে। একটু বুঝি আত্মবিস্মৃতিও। ভাবলো এ নিশ্চয় ওর মনের ভুল। অনিরুদ্ধর চোখের যে দৃষ্টি ওর মনের আকাশ ভর্তি করে রেখেছে—এ বুঝি তারই প্রতিফলন। তাই অল্প কিছু পরেই নিজের মনটাকে হাল্কা করে নিতে পারলো কাবেরী। কলেজের করিডোর দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো প্রফেসার রুমের দরজাটার সামনে। এর একটু পরেই বেয়ারা এসে উঁকি দিল—কাউকে ডাকবো নাকি দিদিমণি?

—না না কাউকে ডাকার দরকার নেই। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলে অবিনাশ বাবু বেরিয়ে এসেছেন। আর কথাও বলছেন—এই যে! আপনার টিউটোরিয়ালের খাতাটা কিন্তু খুব ভাল হয়নি। ভাষাটাকে যে ভাবে আয়ত্ত করেছেন, তাতে আরও একটু যদি পড়াশুনোর দিকে নজর দেন…

এবার সত্যিই লজ্জা পেল কাবেরী। বললো—এখানে তো আর বেশী আলোচনা করা যাচ্ছে না। যদি বলেন তো আপনার বাড়ীতে গিয়ে আমরা জনকয়েক বন্ধু মিলে…আমার বাড়ী…মৃদু একটু হাসলেন উনি। তারপর বললেন আমার বাড়ী বলে তো কিছু নেই। একটা মেস মতন করে আমরা দশজন বন্ধুতে থাকি। কাবেরী মুখ নামিয়ে বললো—আমি জানতাম না তাই…

না, এতে লজ্জিত হওয়ার কি আছে। আমিই বরং আপনার ওখানে যাব একদিন।

—এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। আর তারপর ওর বাড়ীর ঠিকানাটা বলে দিয়ে টুকটুক করে কলেজের বাইরে চলে এল। সামনের পামগাছগুলোয় তখনো যাই-যাই বৈকালীন আলো। থমকে থেকে সেইটুকুই দেখতে লাগল কাবেরী।

দুটো দিনও কাটল না। সত্যিই এক সময় অবিনাশ বাবু এলেন। কড়ার আওয়াজ শুনে ছোট দেওর মন্টু গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে। অনিরুদ্ধ মারা যাওয়ার পর কাবেরী গিয়ে ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছেই থাকে। তাই কাবেরী অবিনাশ বাবুকে বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ীর ঠিকানাটাই দিয়েছিল। অবিনাশ বাবুর এই হঠাৎ আসাটা কাবেরী যেন প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারে নি। মনে হয়েছিল আগে যে আসব বলে কথা দিয়েছিলেন—সেটা হয়ত একটা ভদ্রবোধের চিহ্ন ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তাই উনি যখন ওর ছোট দেওর মন্টুর পিছু-পিছু বসবার ঘরে এসে বসলেন—বাথরুমের দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে দেখে নিয়েছিল কাবেরী, তারপর ঝটপট টয়লেটটা সেরে নিয়ে বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের একটা বইখানা হাতে করে পৌঁছে গেল অবিনাশ বাবুর সামনে।

পড়াশুনো করার ইচ্ছেটা যখন একটু বাড়াবাড়িতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক এমনি সময় অনিরুদ্ধর মা কথাটা তুললেন। কাবেরীকে কাছে ডেকে বললেন—বৌমা, কথাটা তোমায় বলব নাই ভেবেছিলাম কিন্তু না বলে আর পারলাম না।

ওঁর বক্তব্যটা মনে মনে বুঝে নিল কাবেরী। কোনো উত্তর করার আগেই শাশুড়ীই বললেন—তুমি তোমার মাষ্টার মশাই-এর সামনে খোলা চুলে যেও না। তোমার খোলা চুল দেখলে উনি কেমন' যেন হয়ে যান। এটা কি তুমি লক্ষ্য করনি?

প্রশ্নটা শুনে একটু অবাকই হ'ল কাবেরী। ও ভেবেছিল যে শাশুড়ী হয়ত সেই সাবেকী ঢঙে পুরুষমানুষ আর স্ত্রীলোকের সহ-অবস্থান যে ঘি আর আগুনের মতই মারাত্মক, এ কথাটাই পুনরুক্তি করবেন। কিন্তু তা তো করলেন না উনি।—তবে কি অনিরুদ্ধর মা অনিরুদ্ধর মনের খনির গোপন সন্ধান পেয়েছিলেন? কথাটা ভাবতে ভাবতে অনিরুদ্ধর চোখ দুটোই ভেসে উঠলো সামনে।—কি এক রহস্যের চাউনি ওর সেই আকাশ-স্বপ্ন চোখে! তবু করবে কি ও? বর্ষার দিনে চুল শুকোয় না। বিশেষ করে ওর এই বিরাট চুলের গোছা, এটাকে যদি বাইরের বাতাসে মেলে না ধরে, তাহলে স্নানের জল মাথায় বসে অসুখ করবে যে! এতগুলো কথা মনে জাগলেও শাশুড়ীর কোনো কথারই উত্তর দিল না। এই দু' মাসেই ও খুব ভাল ভাবে বুঝেছে—অবিনাশ বাবুর দুর্বলতাটা কোথায়! ওঁর বাচাল চাউনির ঘোরাফেরা। অসাবধানের অবকাশে একদৃষ্টে চুলের জঙ্গলে দৃষ্টিটাকে আটকিয়ে রাখা। এর বিশেষ অর্থ, সবিশেষ কারণ ভালভাবেই বুঝে নিয়েছে কাবেরী। এজন্য সময় সময় গর্ববোধও না করেছে, এমন নয়। তবু যখন ভেবেছে, যে কারণে অনিরুদ্ধও পাগল হয়েছিল, অবিনাশ বাবুর ক্ষেত্রেও কারণ ওই একই। ঠিক সেই সময় মনে হয়েছে—অবিনাশ বাবু যেন অনিরুদ্ধর প্রতিদ্বন্দ্বী। আর বিষাক্ত একটা চেতনা অজস্র বিষ ছড়িয়েছে কাবেরীর মনের গহ্বরে। মনে হয়েছে, যে চুল অনিরুদ্ধর ভালবাসার তাতে অন্য কেউ ভাগ বসাবে, কোন প্রাণে এ ব্যাপার সহ্য করবে কাবেরী?

কথাগুলো মনের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে মাথার মধ্যে এক চাপ চিন্তা কপালের শিরাগুলোয় ভীষণ ঝড় তুললো। একটা বিকারগ্রস্ত রুগীর মতন ওর শোবার বিছানায় গিয়ে ছটফট করতে লাগলো কাবেরী।

বেশীক্ষণ কাটলো না। তন্দ্রা ঠিক নয়, কেমন যেন একটা ঝিমুনি মতন এসেছিল। কিন্তু সেই চিন্তামগ্ন অবচেতনার পিছু ধরে তন্দ্রা নামার আগেই মাথার চুলে একটা বিষাক্ত সাপের ছোবল এসে লাগল। প্রাক্‌সন্ধ্যার ধূসর মুহূর্তে, কাবেরী দেখতে পেলে, ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা পুরুষমূর্ত্তি। আর সেই পুরুষের ডান হাতের আঙুলগুলো ওর এলোমেলো চুলের গোছা আঁকড়ে ধরে আছে। মুহূর্তেই কাবেরী ভুলে গেল সব। হিংস্র শ্বাপদের ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো। বিকলাঙ্গ একটা কুষ্ঠরোগীর মতন ঘৃণায় ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেল মুখ। অনেক কথা বলতে গিয়ে কোনো কথাই বলা হল না। শুধু সামনের দরজাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো—বেরিয়ে যান; বেরিয়ে যান এখান থেকে।

তারপর অনিরুদ্ধর ছবিখানার সামনে বসে ফুলে ফুলে কাঁদলো কাবেরী। চোখের জলের জোয়ারে অনেক ক্লেদ অনেক গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে চাইলে বুঝি। তার পর এক সময় ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে কাঞ্চননগরের কাঁচিখানা বার করে নিলে।

গভীর রাত্রির নিরালা পৃথিবীতে সবাই যখন ঘুমুচ্ছে ঠিক সেই সময় জেগে রইলো—এক টুকরো কাঁচি চলার শব্দ।

সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য

নোংরা টেবিল-চেয়ার—বিড়াল নেই তবু টেবিলের নীচে এঁটো-কাঁটা পড়ে আছে সব সময়েই। এর ওপর আছে হৈ-হল্লা-হট্টগোল। সবশেষে আছে দাম সস্তা বয়ার অভিলাষে অভোগ্য জিনিষের আমদানী। এই হলো গ্লাসগোর গোভান রোডে ভারতীয় রেস্তোরাঁ। ভারতীয় নাবিকদের আড্ডা বলা চলে। বিদেশে আসা ছাত্রদেরও দেখা মেলে মাঝে মাঝে। মুখ বদলবার জায়গা বলতে ঐ একটাই, বিদেশী বন্ধু-বান্ধবীদের সস্তায় ভারতীয় খানা-পিনার সঙ্গে পরিচয় করানোর প্রশস্ত জায়গাও বটে। মালিক মিএগ সাহেব এদের জন্ত অবশ্য "এস্পেশাল" ঘর রেখেছে—মাটীর নীচে হলেও বেশ সাজানো। সেখানে পরিবেশন করত ম্যাগী—মার্গারেট-এর অপভ্রংশ। চার-পাঁচটা ভাষার কাজ চালিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে বলে মার্গারেটের প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। দোকানের হিসাবও দেখত সে।

চট্টগ্রামের খালে-বিলে মাছ ধরত মিএগ ছোটবেলা থেকে—তারপর খালাসী হওয়ার লোভে নাম লেখার জাহাজ-ঘাটে—কেমন করে চলে আসে গ্লাসগোতে। ফিরে যাবার সদিচ্ছা হয় না। কয়েক জনের সঙ্গে পরামর্শ করে শেষে মিএগ শেষ অবলম্বন ভেবে দোকান খুলে বসল। দোকান চালাবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি থাকলেও হিসাব দেখার দুঃসাহস ছিল না তার। বে-আইনী ভাবে জিনিষ-প[ত্র] রাখার অপরাধে পুলিশের দৃষ্টিতেও পড়েছে কয়েকবার। তাই ও[ই] রাজকীয় ব্যাপারটা তুলে দিয়েছে মার্গারেটের হাতে। মার্গারে[টের] ওপর বিশ্বাসও ছিল অনেক। ঘটনাও এসে দেশ থেকে অ[...] মুসলমানী আনার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। অনেকে অবশ্য আড়া[লে] অনেক কিছু বলাবলি করে মার্গারেট ও মিএগকে নিয়ে। অ[...] প্রয়োজনকালে মিএগই বের করে দেয় চাবী—মার্গারেট ছুটী [...] ঘণ্টাখানেকের মত—পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় উৎসুক পথিককে।

মনোজ প্রায়ই আসে—চেনাও হয়েছে সবার সঙ্গে। খাতি[র] পায় দোকানে তার সংযত ও সুগম্ভীর ব্যবহারের জন্য। রোজ[ের] মত মিএগ সেদিনও হাত তুলে নমস্কার করে। ভয়ানক ভী[ড়] জাহাজ ঘাটে এসেছে। এটাই হলো মিএগর খাটুনীর সময়। [...] করে থালাগুলো ধোওয়াও হয় না। রক্ষা এই—যারা খায় ত[ারা] শুধু বড় বড় কয়েকটা লঙ্কা আর মোটা চালের ভাত পেলেই খু[শী] ও-সব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

নীচে নেমে যায় মনোজ। কোণের এক টেবিলে দুটী [...] আর এক মেয়ে। মেয়েটি ও দেশেরই। বোধ হয় বন্ধুত্বের প[রিচয়] আছে।

মার্গারেট এগিয়ে এসে বলে—আজ তোমার জন্ত কিছু খা[...] হয়। দেখলে তো যা ভীড়।

—তা মিএগকে সাহায্য করতে পার না এ সময়।

—ওপরে গেলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ওদের ক[থা] পারি না বুঝতে আর ওরকম চীৎকার আমার কানে তালা লা[গিয়ে] দেয়।

ওদিক থেকে ফিরে তাকায় এমন চেনা কথা কার সঙ্গে [...] জন্ত। মার্গারেট একবার দেখে আসে আর কিছু চাই কি [...] ওদের খাওয়া প্রায় শেষই হয়ে গিয়েছিল। দুটো কাপ [...] এসে বসে এদিককার টেবিলে।

—তারপর খবর কি?

চাপাস্বরে মার্গারেট উত্তর দেয় খবর অনেক আছে। বলছি। ওরা নতুন এসেছে ওদের না শোনানোই ভাল।

অন্য প্রসঙ্গ সুরু হয়।

মনোজ বলে আজকাল বড় ব্যস্ত থাকি তাই আসতে পারি[না]।

—তোমার সেই বন্ধু সুরেশের তো শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে হলো [...] সঙ্গে।

—হ্যাঁ এখন বাপ মায়ের ত্যাজ্যপুত্র হয়ে সুইজারল্যাণ্ডে কামনায় দিন গুনছে। তা তুমি এত খবর শোন কোথায়।

—লোকে যেচে শোনাতে চাইলে আর কি করি বল।

মার্গারেট উঠে যায়। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে—পাওনা [...] চলে যায় তিন জন। বাক্স বন্ধ করে ফিরে আসে আবার। কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে বড়লোক বলতে হবে।

—না হলে তোমার চোখে পড়েছে।

—সত্যি টিপস দিয়েছে অনেক।

—প্লেটের নীচে ঠিকানা কিংবা কোন নম্বর রেখে যায়নি।

—মনে হয় না। স্যুইট সঙ্গে রয়েছে যে।

—বলা যায় না। ট্রাঙ্ক কলও তো হতে পারে। [...] নইলে তোমার শিকার আবার অন্ত কারও হাতে চলে যাবে হ[...]

বিরক্ত মিএগ ঘাম মুছতে মুছতে নীচে আসে। আড়াল[...]

ওকে নিয়ে গিয়ে মার্গারেটকে কি সব বলে। আবার হন্ত দন্ত হয়ে পরে চলে যায়। কথা বলার অবকাশ নেই জানিয়ে দুঃখ করে বার সময়।

মনোজ বলে—বেশ গরম করে আর এক কাপ চা নিয়ে এস।

তে কোন কাজ হলো না।

—সেই ভাল। গরম চা খেতে খেতে গরম খবর শোন।

মিত্রার ভাষায় আসল দার্জিলিং-এর চা। না বললেও কদিন ছাপ মারা প্যাকেট দেখিয়েছিল। দাম বলে বেশি অন্ত গ্লগা থেকে।

* * * *

মণ্ডল এসেছিল লিভারপুলে জাহাজে করে। অসুখ হওয়ায় জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়—সে জাহাজে আর ফেরা নি। লোভের বশে কিংবা লালসায় পড়ে পাঞ্জাবী এক মেয়েকে করে। তারপর ব্যবসার লোভে আসে গ্লাসগোতে। ব্যবসা ছিল না। বৌএর কাছে বাস করতে আসে তার ছোট দুই বোন। তিনজনের উপার্জনে মণ্ডলের কোন অসুবিধাই ছিল না। নেক সাহেবের সঙ্গে তার জানাশোনা। মাসের গোড়া থেকেই তারিখের পাশে নাম লিখতে সুরু করে। ইতিমধ্যে বোন ডকের এক কর্মচারীর চোখে পড়ে—লোভ দেখিয়ে দল নিয়ে চলে গেছে তাকে মণ্ডলের অজ্ঞাতে! মণ্ডলের বারণ করেছিল অনেক কিন্তু সাহেবের সঙ্গে থেকে মেম হবার লোভ সংবরণ করতে পারেনি।

মার্গারেট সভয়ে বলে—মণ্ডল ভয়ানক রেগে গেছে। একেই রাগী লোক, তার ওপর ঐ ব্যাপার! বউকে খুব মারধর করেছে ছোট বোনকে শ দিয়েছে। মিত্রার সঙ্গে তো খুব ভাব। সকালে দুজনে মিলে পরামর্শ করেছে। মিত্রা মিটমাট চাইছে কিন্তু মণ্ডল শোনেই না সে কথা। আজ যদি রোসনী ফিরে আসে তবে মণ্ডল নাকি ছেলের বাড়ীতে যাবে।

—ভালই তো। হোক না মারামারি—তোমরা জান আমাদের দেশের লোকেদের কি রাগ।

—মণ্ডলের জন্য আমার কিছু নয়। একে এই দোকানের নাম নেই পুলিশের কাছে, তারপর এ সব ব্যাপারে মণ্ডলের মিত্রা ধরা পড়লে দোকান নিশ্চয়ই বন্ধ করে দেবে।

—তোমার চাকরীর অভাব হবে না নিশ্চয়ই।

—আমি কি সেই কথাই বলছি নাকি।

—তবে।

উত্তর দেবার আগেই উপর থেকে কিসের চীৎকার ভেসে আসে। কাঠের ছাদের ওপর সজোরে পা ঠোকাও আরম্ভ হয়। মার্গারেট লাফিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেবে আসে মিত্রা।

—চলুন বাবু সাহেব একবার ওপরে। রাম রহিমের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে ওখানে।

—আমি কি করব তার।

—আপনাকে কিছু করতে হবে না। গিয়ে শুধু দাঁড়াবেন।

অনুরোধে যায় শেষে। ততক্ষণে অবস্থা বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। কাপ গেলাস সব জঞ্জাল চারিদিকে নির্জীব থেকে বিচার মধ্যেও সে ছোঁয়া এসে লেগেছে। কারণ আদিম সেই জুয়া। প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে ঝগড়া পৌঁছায় তাদের সমর্থকদের মধ্যে।

মিত্রা বিনীত ভাবে বলে এই যে স্যার, দেখুন কি ক্ষতি করেছে এরা।

সবাই ফিরে তাকায়। অনভিজ্ঞ অভিনেতার মতন মঞ্চ থেকে আলো ছড়িয়ে দর্শকদের মন বোঝার প্রয়াস। থমথমে ভাব এসে পড়লো এক লহমায়। ভয়ের লক্ষণই সেটা।

গম্ভীর হতে তাই বাধা নেই।

মনোজ বলে, কারা ভেঙেছে এসব?

সেই বিকট সুরের প্রতিধ্বনি নেই।

মিত্রার সাহস বাড়ে। জানায়, আজ্ঞে স্যার ঝগড়া সুরু করেছে এরা দুজন তাই দোষ দিতে গেলে এদেরি দিতে হয়।

কত ক্ষতি হয়েছে তোমার?

আজ্ঞে পাউণ্ডখানেক তো বটেই।

সভা ছত্রভঙ্গ হবার পূর্বাবস্থা। দশ শিলিং ধরে দিয়ে কোন মতে পালাতে পারলে বাঁচে। আর কিছু বলার আগেই দোকান ফাঁকা।

মনোজ নিজেই অবাক হয়ে যায় তার উপস্থিতির গুরুত্ব অনুভব কোরে। মিত্রা তার দুহাত জড়িয়ে ধরে বলে, আপনাকে বাবুসাহেব কি বলে যে ধন্যবাদ দেব।

ওসব ছেড়ে তোমার সবচেয়ে সেরা এক কাপ চা খাওয়াও। আর নীচে যেতে পারি না। এখানেই একটা টেবিল পরিষ্কার করে দাও। ম্যাগী পারতো তুমি হাতটা একবার ছুঁইয়ে দিও, মিত্রার চা মিষ্টি হবেনা নাহলে।

চা খাওয়া ভাগ্যে ছিল না।

টেলিফোন—

মিত্রার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা চলতে থাকে।

রিসিভার রাখতে যা সময়। মিত্রা দৌড়ে আসে মনোজের কাছে। বলে বাবুসাহেব আর বাঁচব না।

এক নিঃশ্বাসে অনেক কিছু বলে যায়।

মণ্ডলকে নিয়েই জট পাকিয়েছে আবার। রোসনী ফিরে এসেছে মণ্ডল রাগের মাথায় তাকে মেরেছে। রোসনী অজ্ঞান। ডাক্তার ডাকতে সাহস হয়নি তাই বন্ধু মিত্রাকে খবর দিয়েছে।
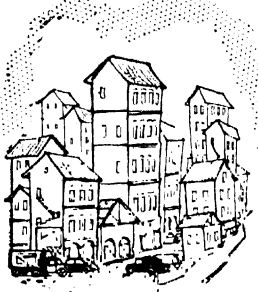
# কোলকাতা বনাম মধুপুর

চায়ের দোকানে বেজায় তর্ক চলছিল। ভুতোদা থাকেন মধুপুরে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্যে। ওঁকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করছিল ছেলেছোকরার দল।

বিমলঃ কি ভুতোদা, সহর দেখতে এসেছেন? সামলে চলবেন। রাস্তায় ট্রাম চাপা পড়বেননা।

ভুতোদাঃ (অপ্রসন্ন মুখে) হ্যাঃ যা তোদের সহরের ছিরি।

বিনয়ঃ সেকি ভুতোদা, কোলকাতার মত এত পেল্লায় সহর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদাঃ সহর না ছাই। রাস্তায় বেরোনোর জো নেই। একটু ধীরে সুস্থে চলেছো কি কুড়িজন ঘাড়ের ওপর হামলে পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম। বিমলা তুই বলনা—তুই তো ছিলি আমার সঙ্গে।

বিমলঃ ভুতোদা চৌরঙ্গীতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু আয়েস করে পানজর্দা খাচ্ছিলেন। আর যাবে কোথায়। খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ী ওঁর ইঞ্চি কয়েক দূরে আটকে গেল। উনি পানজর্দা মুখে দিয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে 'ভাল জ্বালা' বলে বিরক্তমুখে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। ট্রাফিক পুলিসেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন ফেটন নিয়ে হাঁ করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।

ভুতোদাঃ আচ্ছা তোরাই বল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে একটু আরাম করে পানজর্দাও খেতে পারবনা? একি সহরের ছিরি! আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

বিমলঃ মধুপুর আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার অজপাড়াগাঁয়ে—

ভুতোদাঃ যাঃ যাঃ তোদের কোলকাতায় পয়সা দিলেও সব পাওয়া যায়না।

বিমল বিনয় (একসঙ্গে): কি! কি!!

বিনয়ঃ বলুন কি চাই আপনার—এরোপ্লেন? রাজহাঁসের ডিম? এনসাইক্লোপিডিয়া?

ভুতোদাঃ (হাসিমুখে) তাজা ফুরফুরে হাওয়া। বিমল আর
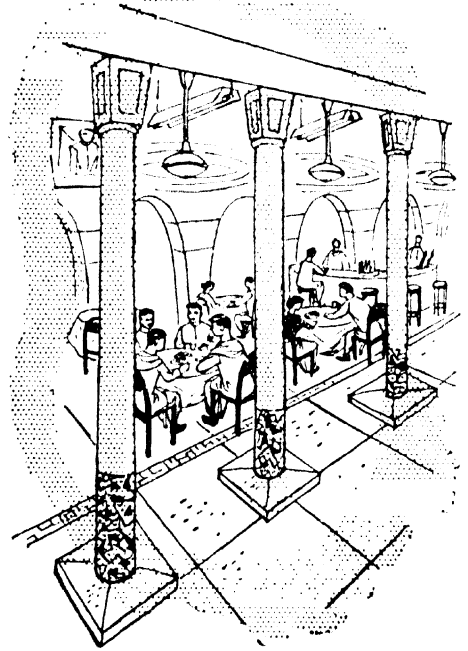
বিনয় একেবারে চুপসে গেল।

ভুতোদাঃ সকালবেলা যখন পাহাড় জঙ্গল নদীর ওপার থেকে মাটীর গন্ধ মেখে সে হাওয়া সর্বাঙ্গে আদর করে যায় তখন মনে হয় স্বর্গে আছি।

এ ধোঁয়া কালি সিমেন্টের গরাদখানায় সে হাওয়ার মর্ম তোরা বুঝবিনারে। কিন্তু শুধু খোলা হাওয়াই না। আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়না তোদের এ সহরে।

ভুতোদা: কাল বাজারে গিয়েছিলাম। সখ হোল একটু মাছটা ফলটা কেনার। কিন্তু মুদীর দোকানে যা ব্যাপার দেখলাম।

বিমল আর বিনয় ঘাবড়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। বেজায় জব্দ করছেন ভুতোদা ওদের। আবার কি যে ছাড়েন।

বিনয়: কি ব্যাপার ?

ভুতোদা: এক খদ্দের মুদীকে কি নাজেহালটাই করলে! হোত আমাদের মধুপুর মুদী চেলাকাঠ নিয়ে পেটাতো।

বিমল: বলুনই না কি করলে ?
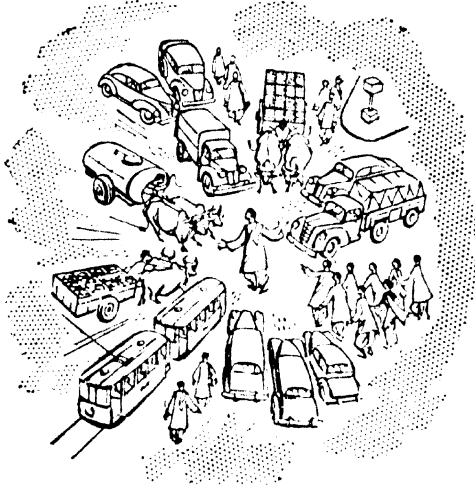
ভুতোদা: খদ্দের চেয়েছে 'ডালডা'। মুদী যেই 'ডালডার' টিনে হাতটা ঢুকিয়েছে খদ্দের রেগে খুন। বলে "তুমি লোক ঠকাবার জায়গা পাওনি ? 'ডালডা' তো পাওয়া যায় শীলকরা টিনে। খোলা আজেবাজে কি গছাচ্ছ আমায় ?" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে "দেখুন তো মশাই 'ডালডার' এত কাটতি বলে এরা সব আজেবাজে জিনিষ 'ডালডার' নামে বিক্রী করছে। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।"

বিনয়: আপনি কি বললেন ভুতোদা ?

ভুতোদা: আমি তো হেসেই অস্থির। ভদ্রলোককে বললাম—মশাই আপনার এ সহরের হালচালই আলাদা। মধুপুরে বিপিন মুদীর কাছ থেকে খোলা 'ডালডাই' তো আমরা কিনে থাকি।" ভদ্রলোক গেলেন বেজায় চটে। বললেন—"আপনি 'ডালডা' কেনেন না আরো কিছু। কেনেন যত খোলা জিনিষ যাতে ধুলোময়লা আর মাছি বসে" বলে গটগট করে চলে গেলেন। (ভুতোদার অট্টহাসি)

বিমল আর বিনয় আরো জোরে হেসে উঠল। ভুতোদার হাসি গেল মিলিয়ে। উনি ভেবেছেন বেজায় জব্দ করছেন ওদের কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে তো তা মনে হচ্ছেনা।

বিমল: খোলা হাওয়া আর খোলা 'ডালডা'—আহাহা কি ডায়েট—হা: হা:

ভুতোদা: হাসির কি হোল ?

বিনয়: ভদ্রলোক আপনাকে ঠিকই বলেছেন। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয়না। ভুতোদা (চটে): তবে মধুপুরে আমরা কি খাই ? বিনয়: ভদ্রলোক যা বলেছেন তাই। কারণ 'ডালডা' কোন জায়গাতেই খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।

ভুতোদা: দ্যাখ! বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস ? বিমল: আপনি এই রেষ্টুরেন্টের মালিক হরেনদাকে জিজ্ঞাস করুন। বাড়ীতে মিনুদিকেও জিজ্ঞাসা করবেন।

হরেনদা: হাঁা, ওরা ঠিকই বলছে। আমার 'ডালডা' নিয়েই তো কারবার 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা বায়ুরোধক টিনে—হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।

বিনয়: শীলকরা টিনে 'ডালডা' তাজা ফুরফুরে হাওয়ার মতই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভুতোদা চুপসে গেলেন। মিনমিন করে একবার বললেন "খোলা হাওয়া তো নেই এখানে।"

বিমল: একটা লেগেছে ভুতোদা। সেকেণ্ডটা মিস্‌ফায়ার হয়ে গেল।
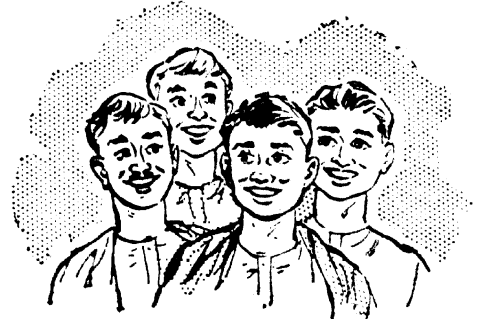
মার্গারেট শাসন করে তোমায় কতবার বলেছি মণ্ডলের সঙ্গে মিশ না।

সব শেষ এবার। আর চাইলেও মিশতে পারব না।

তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। তুমি যদি এখন মণ্ডলের বাড়ী যাও, তুমি আবার এক বিপদে পড়বে।

—মেয়েটা মরে যাবে যে না গেলে।

—আমি মরলে আমায় কে দেখতে আসে বলত।

—তবু দেশের মেয়ে।

—দেশের মেয়ে তোমায় কবে দেখেছে।

—তবুও মণ্ডলের বিপদে আমি পালিয়ে থাকতে পারব না!

—তাহলে মণ্ডলকে নিয়েই দোকান চালাও, অত বিপদ নিয়ে কাজ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি চলে যাব।

—সে তোমার ইচ্ছা। যাই ক্ষতি হোক আমার—মণ্ডলকে একলা বিপদে ফেলে দূরে সরে যেতে পারবো না। তোমাকে হারাবার ভয়েও না।

—বেশ ভাল কথা।

—মার্গারেট বেরিয়ে যায় বাইরে। মিঞা বিশেষ আগ্রহ দেখায় না তাতে।

মনোজ বলে—আমিও উঠি। দোকান আর খোলা থাকবে না নিশ্চয়ই।

মার্গারেটের পরেই চলে যায় দোকান ছেড়ে। রাস্তার ওপারে বাস ধরতে হবে 'বেলর নকে' যাবার জন্ম।

অজান্তে কার হাত এসে পড়ে হাতে।

মার্গারেট···

বলে—আমার এক উপকার কর। মিঞা আমার কথা শুনবে না। কিন্তু ও গিয়ে কিইবা করবে।

—দেখ তোমাদের এসবের মধ্যে আমার কিছু বলার নেই।

—তুমি শুধু মিঞাকে যেতে বারণ কর। আমি নিজে মণ্ডলের কাছে যাচ্ছি, যা করবার আমিই করব! ক্ষতি কিছু করব না এ বিশ্বাস তোমরা রাখতে পার।

—মিঞার জন্ম তোমার এত ভাবনা কেন?

মার্গারেট উত্তর দেয় না। উত্তর প্রকাশ হয় তার মুখে।

মনোজ বলে—আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি কি করতে পারি।

ফিরে যায় দোকানে।

মিঞা ইতিমধ্যে জামা কাপড় বদলে নিয়েছে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করে কি খবর বাবুসাহেব!

—তোমার সেই চাটগাঁয়ের ওমলেট খাওয়াতে পার!

—আজ ক্ষমা করুন বাবুসাহেব। আমাকে মণ্ডলের কাছে যেতেই হবে।

—গিয়ে কি করবে।

—তা জানি না। মণ্ডল আমায় দেখলে অন্তত বুকে অনেক বল পাবে।

—তাতে মণ্ডলও বাঁচবে না, তোমার দোকানও রক্ষা পাবে না।

—বুঝি বাবুসাহেব কিন্তু মণ্ডল আমার কলিজার সমান।

—শোন, তুমি দোকানে থাক। মণ্ডলের ঠিকানাটা দাও। —দি আমি কি করতে পারি।

—আপনি সেখানে যাবেন না বাবুসাহেব। খুব খারাপ জায়গা, ওখানে আপনার মত লোক···

—তোমাকেও কি নাবিকদের মত ভয় দেখাতে হবে নাকি।

অবিশ্বাসের মধ্যেও মিঞা ঠিকানা দেয়।

বাইরে অপেক্ষা করছিল মার্গারেট। সঙ্গ নেয় মনোজের।

সবচেয়ে পুরানো জায়গা, ভাঙ্গা-চোরা বাড়ী। রাস্তা ঘাট অপেক্ষাকৃত নোংরা—গ্যাসের আলোতে অনেকটাই আলো হয় না। পচা গন্ধ নাকে আসে পথের আবর্জনা থেকে।

ঘরের মধ্যে হতাশা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মণ্ডল। রোসনী পড়ে আছে মাটিতে। পাশে রক্ত পড়ে মেঝেটা হয়ে গেছে লাল। একজন তার কাছে বসে—অপরিচিতের প্রবেশে সংযত করে স্খলিত বসন। মার্গারেট ক্ষত পরীক্ষা করে ডাক্তার ডাকার পরামর্শ দেয়।

মণ্ডল ভীত স্বরে আপত্তি জানায়—ডাক্তার এলে আমি আর বাঁচব না।

মার্গারেট ভর্ৎসনা করে—মেয়ের গায়ে হাত দেবার সময় এ ভয় ছিল কোথায়।

মনোজ বাধা দেয়—ঝগড়া করে সময়ই নষ্ট হবে। তুমি যতটা পার কর—তারপর ভাগ্যের ওপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নেই। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে কাগজে আমার নাম বেরুলে গ্লাসগোয় আর বাস করা চলবে না।

মার্গারেট বোঝে সে কথা। গরম জল আনার জন্ম অনুরোধ করে সহজে কেউ যায় না। বিপদের ধাক্কাটা তখনও কেউ কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

কাঁধের ওপর বেশ বড় এক ক্ষত। হাত দিয়ে সে আঘাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করায় হাতের একটা আঙুল সাংঘাতিক ভাবে কেটে গেছে। অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ার সময় চোখের একটা কোণ ছিঁড়েছে।

নিপুণ হাত মার্গারেটের। মার্গারেটের কোলে মাথা রেখে রোসনী চোখ মেলে। দুই বোন হাঁটু গেড়ে বসে তার পাশে।

রোসনীর মুখে চোখে তখনও ভয়। এক বোনকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে।

অস্ফুট স্বর বের হয়—আমি আর বাঁচব না দিদি, আমাকে সাহেবের কাছে যেতে দাও।

মার্গারেট ইসারায় কথা বলতে বারণ করে।

মনোজ ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

সমবেত চেষ্টায় বিছানায় তোলা হয় রোগীকে।

মার্গারেট বলে—ভাবছি রাতটা এখানে থেকে যাব কিনা। আমি চলে গেলে আর কিছু এরা করবে কি না, কে জানে।

—সে তোমার উদারতা মার্গী। আমি দুঃখিত, আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না।

—সে আশাও করি না।

মনোজ খোঁজে মণ্ডলকে দুটি কথা বলার জন্ম। কখন সে আপনাকে লুকিয়ে ফেলেছে কেউ জানতে পারেনি। অগত্যা সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পথে নামে মনোজ।

অন্ধকার গলি, হাতাহাতি চলেছে দুজনের।

সন্দেহ হয়, মিথ্যা সন্দেহ নয়—

ডাকতেই মণ্ডল বলে ওঠে, হারামজাদা আবার এসেছে রোসনীকে নিতে। খুন করে ফেলবো ওকে।

মণ্ডলের শক্তি যথেষ্ট। অপর পক্ষের অবস্থা শোচনীয়। কালা আদমীর কাছে হার স্বীকার করবে এই লজ্জায় তখনও কোন মতে লড়াই করে চলেছে। মনোজ যেতেই বাঁচার এক পথ যেন খুঁজে পেল! মণ্ডলও ছেড়ে দেয়।

মনোজ প্রশ্ন করে, তুমিই রোসনীকে নিয়ে গিয়েছিলে।

উত্তর আসে, আমি নয়। রোসনী বরং আসতে চায়।

—তুমি তাকে চাও না তার মানে।

—না, আমিও তাকে ভালবাসি।

—রোসনীকে কি তুমি বিয়ে করবে।

—আমি বিবাহিত।

—এ হেন হীন প্রস্তাব করতে তুমি লজ্জা পাও না

—সব জেনেই রোসনী আমার কাছে থাকতে চায়।

মণ্ডল ক্ষিপ্তের মত বাধা দেয়—ওসব বাজে কথা। রোসনী ইংরিজি জানে না। রোসনীকে বিয়ের লোভ দেখিয়েই নিয়ে গেছে। তাছাড়া, রোসনীকে নিয়ে এসেছি আমি পয়সা পাব বলেই।

নিজেকেই ঘৃণা মনে করে মনোজ এসব ঘৃণিত সংস্পর্শের মধ্যে।

তবু বলে, শোন মণ্ডল, রোসনীকে জোর করে ধরে রাখবার ক্ষমতা তোমার নেই। রোসনী ভাল হয়ে উঠলে বরং মিত্রার সঙ্গে পরামর্শ করে এর মীমাংসার চেষ্টা কর। তবে একটা কথা বলে রাখি তোমাদের দুজনকেই। যদি কেউ গায়ের জোরে রোসনীর মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাছে রাখার চেষ্টা কর তাহলে পুলিশে খবর দিতে আমি বাধ্য হব। তাতে বিপদই ডেকে আনবে, লাভ কিছু হবে না।

মনোজ এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই শুনতে পায়—

—মিষ্টার, আমি রোসনীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—কি নাম তোমার।

—পেটারসান।

—রোসনীকে যদি সত্যিই ভালবাস, তার ভবিষ্যৎ চিন্তা করছ না কেন।

—আমার স্ত্রী অথর্ব। নড়াচড়া করার শক্তি নেই। রোসনীই আমার স্ত্রীর মতন। বিচ্ছেদ আমি নিতে পারি। রোসনীকে বিয়েও করতে পারি কিন্তু তাতে হেলেনকে অসহায় অবস্থায় ঠেলে দিতে হবে।

—রোসনী এ সব জানে।

—রোসনীর সঙ্গে হেলেনের খুব বন্ধুত্ব। হেলেনও আপত্তি করে না।

—আমি নিজে একবার রোসনীর মুখ থেকে শুনতে চাই।

—ভাল কথা, আমার আড়ালেই প্রশ্ন কর।

—সে যদি স্বীকার করে তবে রোসনীকে তুমি নিয়ে যেতে পার।

—অনেক ধন্যবাদ তোমায় মিষ্টার।

মনোজ আবার ফেরে মণ্ডলের বাড়ীতে।

মার্গারেট হাসতে হাসতে অভ্যর্থনা জানায়—আমি জানতাম তুমি আসবে।

রোসনীর কাছে দৌড়ে যায় পেটারসান।

রোসনী জড়িয়ে ধরে সমাদরেই—যেন অপেক্ষা করছিল এরই জন্যেই। মার্গারেট ও মণ্ডলকে এক ধারে নিয়ে যায় মনোজ। বলে—রোসনীকে—আমার মনে হয়—নিয়ে যেতে দাও।

মণ্ডল আপত্তি জানায়।

ধমক দেয় মনোজ—তোমায় পুষ্ট করার চেয়ে সাহেবের কাছে থাকা অনেক ভাল।

মার্গারেট সমর্থন করে—পেটারসান ছেলে হিসাবে খারাপ নয়। রোজগারও ভাল। রোসনী সুখেই থাকবে।

রোসনীকে প্রশ্ন করলে যাবার বিষয়ে সম্মতি দেয় সেই মুহূর্তে। সম্ভব নয় বলেই শেষে পেটারসানকে রাত্রিটা থাকতে রাজী করায়। মণ্ডলকে বিশ্বাস নাই তাই মার্গারেটও পাহারা দেবার কথা দেয়।

যাবার আগে মার্গারেট এগিয়ে আসে মনোজের কাছে।

বলে—গরীবের মেয়ে। জন্ম ইতিহাস গৌরবের নয়। আমাদের জীবন বৈচিত্র্যে ভরা হলেও মন ভরাবার মত কিছুই নেই সেখানে। তবু তোমাদের দেখা পাই মাঝে মাঝে—লুব্ধ হরিণীর মত ছুটতে সাধ যায়—কিছু আশা না করেই।

মনোজের হাতের ওপর ছোঁয়ায় তার অধর।

—সত্যি, দেবার মত বাকি আর কিছুই আমার নেই। বন্ধুর স্পর্শে মনের নিবিড় নিবেদনের কথাও গেছি ভুলে। তবু পারো তো মনে রেখ আমার কথা। আমি তাদেরই একজন যারা মানুষকে সুখী করেছে তা সে যে ভাবেই হোক না কেন। আমি তাদেরই দলে, যাদের এক লহমার ধন্য হওয়ার স্বপ্ন কখনই মিলাবে না সারা জীবনের চলার পথে।

# কাব্য

### বুদ্ধদেব গুহ

কাগজ ভ'রে মানান কথা লিখি<br>
মনে ভাবি এ-ও তো এক কাব্য।<br>
কা'রো মতে কখন সেটা মেকী,<br>
কা'রো মতে এমনটি অভাব্য।

লিখছি তবু পেয়ে কাব্যরোগে<br>
লেখার ভাষা আবেগ-থরো-থরো,<br>
বুকের জ্বালা যতই রাখি ঢেকে<br>
ভাষার ছোবল হচ্ছে গুরুতর।

লেখার শেষে তাকিয়ে দেখি, এ কি!<br>
ছন্দ-ভাষার ছদ্মবেশে এসে<br>
মহাজীবন দাঁড়িয়ে মুখোমুখি<br>
অধরে তার কাল-বোশেখী হাসে।

# ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

[ লেখক প্রবাসে থাকায় পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির গোলযোগে ইংলণ্ড খণ্ডের কিয়দংশ ভুলক্রমে বাদ পড়িয়া যায়। বর্ত্তমান সংখ্যা হইতে সেই অপ্রকাশিত অংশ ছাপা সুরু হইল। ইংলণ্ড খণ্ড শেষ হইলে পুনরায় জার্ম্মাণী খণ্ডের পূর্ব্বানুবৃত্তি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।—স ]

## ইংলণ্ড

### চৌত্রিশ

কুঙ্কুম কেম্‌ব্রিজে ফিরল অক্টোবরের মাঝামাঝি। পল্লবকে ত তার করেছিল। পল্লব ষ্টেশনে গেল।

পল্লব ওকে কিছু বলবার আগেই কুঙ্কুম বলল: তোমার চিঠি পাবার আগেই আমি খবর পেয়েছিলাম।

পল্লব বিস্মিত হ'য়ে ওর দিকে তাকাতেই কুঙ্কুম বলল: কে একজন বেনামী তার করেছিল আমাকে—ডাবলিনে।

বেনামী তার?

হাঁ। আর লম্বা তার। তাতে ছিল রিতা এক পাষণ্ডের মেয়ে···ওর গহনা চুরির কথাও ছিল ত···ইত্যাদি।

পল্লব স্তম্ভিত হ'য়ে ভাবে।

*     *     *     *

সোজা পল্লবের ওখানে এসে প্রাতরাশ সেরে কুঙ্কুম পল্লবের সব কথা শুনল মন দিয়েই। কিন্তু তার পর গুম হ'য়ে বসে রইল—একদৃষ্টে গৃহচুল্লীর দিকে চেয়ে।

পল্লব ঠিক এই ভয়ই করেছিল। একটু বাদে বলল: কী বলো, কুঙ্কুম?

কুঙ্কুম কেমন এক রকম হেসে বলল: কী বলব? আমার বলা-না-বলা তো এখানে অবান্তর, ভাই!

পল্লব ক্লিষ্টকণ্ঠে বলল: এমন কথা কেন, কুঙ্কুম? মোহনলাল তোমাকে কতখানি শ্রদ্ধা করে—

শ্রদ্ধার আমি কাঙাল নই পল্লব, তুমি বেশ ভালো ক'রেই জানো। আমার শুধু কানে বাজে—মৃত্যুশয্যায় নেলসনের কথা: 'England expects her every son to do his duty.' যেতে দাও ও-আলোচনা। বলো তোমার কথা।

না, এভাবে এক কথায় ওকে ডিশমিশ ক'রে দিলে শুনব না। ওর তরফের কথাটাও একটু ভাবতে হয় তো?

কুঙ্কুম একটু উষ্ণ সুরেই ব'লে উঠল: ভাবতে হয়? কেন? ও কি দেশের তরফের কথা একটুও ভেবেছিল, বলতে চাও? শোনো পল্লব, ভেবেছিলাম কিছু বলব না এ-বিষয়ে। কিন্তু মোহনলালের সম্পর্কে শুধু তোমাকে বলছি—কাউকে বোলো না তুমিও—যে ওর সম্বন্ধে আমি ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিলাম। ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল কেন বলব? ওর নিজের বুদ্ধির উপর ওর বড় বেশি আস্থা ছিল—যাকে বলে ওভার-কনফিডেন্স। তুমি অব্যাহতি পেয়ে গেলে বিনয় তোমার সহজাত ব'লে। সেই গল্প আছে না, খরগোস না কচ্ছপ? খরগোস নিশ্চয় জানত, সে দৌড়ে জিতবেই। তাই মাঝপথে ঘুমিয়ে বাজি হারল—কচ্ছপ ছিল Slow but Steady. ব'লে একটু থেমে: তাই, জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বেশি সহজ হয় তাদেরই পক্ষে যারা স্বভাবে শান্ত, অধ্যবসায়ী। বুদ্ধির জৌলুষ খানিক দূর পর্যন্ত বেশ যায় তর তর ক'রে—ঐ খরগোসেরি মতন। কিন্তু খতিয়ে জেতে ঐ অধ্যবসায়ী ও সহিষ্ণুর দল। ব'লে স্বর নামিয়ে: তবে মোহনলালের জন্যে দুঃখ হয় বৈ কি। পক্ষটা তো ওই। ওর কাছে কত কী আশা ছিল—

কিন্তু ও কী এমন করেছে যে সব আশা নির্মূল হল তোমার?

কী করেছে? কী বলছ তুমি পল্লব? ভাবো দেখি—যদি মোহনলাল না হ'য়ে তুমি ঐ ফাঁদে পড়তে?

এমন কথা বলতে নেই ভাই। রিতা ফাঁদ পাতে নি। তোমাকে বলছি ও স্বভাবে ঝোঁকালো হ'লেও মেয়ে খারাপ নয়।

মেয়ে খারাপ কে বলছে? কিন্তু এই বলে সুধীরা বলবে কি ওকে?

তা নয়···তবে···

'তা নয়' বলার পরেও 'তবে'? মোহনলালের বিশেষ ক'রেই দরকার ছিল একটি সত্যিকার সহধর্মিণী—সহরঙ্গিণী নয়। না, রিতার উপর আমার কোনো আক্রোশই নেই বিশ্বাস করো। আমি বরং চেয়েছিলাম ওর মঙ্গলই—তাই তোমাকে বারণ করেছিলাম ওর সঙ্গে মিশতে। কিন্তু মোহনলাল—না থাক এ-প্রসঙ্গ! কী ক্ষতি বলো এখন আর এ-আলোচনায়? The milk is spilt ওর সম্পূর্ণ অধিকার আছে 'নিজের বুদ্ধিতে চ'লে ফকির হওয়ার' ও বলে না প্রায়ই! বেশ তাই হোক। সে স্বখাত সলিলে ডুবে মরবে তাই নিজের বুদ্ধিতে চলার অভিমানে—

কুঙ্কুম, কিছু মনে কোরো না ভাই, কিন্তু এর নাম কি সুবিচার বলবে? আমাদের শান্ত সুধীর হ'তে বলো তুমি উঠতে বসতে—অথচ আজ কেমন ক'রে নিজে এমন অধীর অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলে?

কুঙ্কুম একটু চুপ ক'রে যেতে: সুর নামিয়ে নিয়ে বলে তুমি কতই বলেছ। অসহিষ্ণু হওয়া নিশ্চয়ই অনুচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন্ সান্ত্বনাকে আঁকড়ে শান্ত হব—বলো তো? শোনো পল্লব, তুমি নিজেই তো বললে ওর মা কান্নাকাটি করছেন। মা যাই হোন—মা তো? তাঁর কথা ভাবতে হবে না? তার উপর দেখ—রিতার শিক্ষা দীক্ষা। বিলিতি মেয়ে ও, স্বভাবে বিলাসিনী, চঞ্চল। চর্মচক্ষে যখন ও দেখবে আমাদের দেশের বাইরের দৈন্য, তামসিকতা, দুরবস্থা তখন ভাবো কি—ওর তৃতীয় নেত্র পড়বে ভারতের অন্তর্মুখীদের গহনে? ও হয় না পল্লব, রিতা হ'ল বহির্মুখী মেয়ে, আমাদের দেশের আবহাওয়ায় ও দুদিনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেই উঠবে—এ তুমি তোমার ডায়ারিতে লিখে রেখে দাও।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: সে সম্ভাবনা আছে মানি, কিন্তু এমনো তো হ'তে পারে যে মোহনলালের প্রতি ওর প্রেম ওকে বদলে দেবে?

কুঙ্কুম আতপ্ত কণ্ঠে বলে: ঐ তো তুমি গোড়ায়ই গলদ ক'রে বসছ। তুমি যাকে বলছ প্রেম সে যদি আদৌ প্রেম না হয়?

কিন্তু হ'তেও তো পারে?

পারে। কিন্তু সম্ভাবনা কম। কারণ প্রেম বলতে এরা বোঝে

রামাদের উচ্ছ্বাস—যা আসতেও যেমন যেতেও তেমনি। তাছাড়া
চই কেন না উনার চুক্তির দোহাই পাড়ি, একটা কথা
াধ হয় বলা চলে যে, ভারতের সবচেয়ে গভীর সম্পদ যেখানে
-সেখানে এদেশের বহির্মুখী প্রেমিকদের চোখ পড়ে না,
াড়তেই পারে না।

পল্লব মৃদুস্বরে বলে, পারা কঠিন মানি কিন্তু তুমি আগে
াকতেই ধরে নিচ্ছ কেন যে ও পারবেই না। নিবেদিতা
কি পারেন নি ?

কুঙ্কুম হাসে, নিবেদিতার মতন মেয়ে কোনো দেশেই ঝাঁকে
াকে জন্মায় না। আর তাঁকেও কী বিষম বেগ পেতে হয়েছিল
ারতকে ভালোবাসতে জানোই তো। বিবেকানন্দ স্বামীর মতন
কপাল গুরু পেয়েও তিনি প্রথমে অধীর হয়ে পড়েছিলেন।
সে একটু থেমে: হয়েছে কি, ভারত যেখানে সত্যি বড় সেখানকার
বর পেতে হ'লে আমাদের শাশ্বত বাণীর সুরে নিজের প্রাণের সুর
মলাতে হবে অন্ত ভাষায় অন্তর্মুখী ভারতকে ভালোবাসতে হবে।
রিতা যখন দেখবে আমাদের হাজারো বাইরের দুঃখ দৈন্য তামসিকতা
াবেন কি তখনও নিবেদিতার মতন নিজের জ্ঞানবুদ্ধিকে নাকচ
রে দীক্ষা নেবে বিনয়ের বিশেষ যার গুরু মোহনলাল? সে
ালো ছেলে হলেও ঠিক স্বামী বিবেকানন্দ নয় যিনি উঠতে
সতে নিবেদিতাকে ধমকাতেন বিলিতি গর্ব ছেড়ে দীনা
ারতীয়া হবে। কিন্তু থাক এ আলোচনা। তোমাকে বলছি
আমি এ নিয়ে এখন থেকে কারুর সঙ্গেই আলোচনা করব না।
কিন্তু সামাজিকতা বা শোভনতার খাতিরেও যাকে অন্যায় মনে
করি তাতে সায় দিতে পারব না। তবে শোনো, এসব কথা
তুমি কাউকে বোলো না, মোহনলালকে তো নয়ই। কথা দাও
—বলবে না ?

পল্লব বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে: দিচ্ছি, কিন্তু—

কিন্তু থাক এখন। শোনো, তুমি কী ঠিক করলে? এখানে
Music Special-ই নেবে তো ?

তাই তো স্থির করেছি তোমার কথা ম'ত। তারপর জার্মাণ
যাব—তোমার সেই বন্ধু—

হ্যাঁ, সে সব ব্যবস্থাই করে দেবে। সত্যিই জর্মনি একটা মস্ত
জাত ভাই! কী শ্রমশীল, অধ্যবসায়ী, শান্ত, দৃঢ়, একান্তী! দুঃখ
হয় ভাবতে যে মোহনলাল বার বার লণ্ডনে প্যারিসে গিয়ে বাজে
লোকের সঙ্গে মিশে সময় নষ্ট করে। ওর কৃষিবিজ্ঞান পড়া উচিত
ছিল বার্লিনে। দেখত তাহ'লে ওরা কী ভাবে জাতটাকে গ'ড়ে
তুলছে। আর এক জাত ঐ জাপানী। আমাদের যাওয়া উচিত
এই দুই দেশে। দেখা উচিত ওদের কীর্তিকলাপ। শেখা উচিত
দেশের জন্যে ওদের অক্লান্ত উদ্যম, অম্লান মুখে সওয়া। যাক।
কলেজে দেখা হবে। না, মোহনলালের প্রসঙ্গ আর নয়। ও মিছে
সময় নষ্ট। হ্যাঁ, ভালো কথা। কাল থেকেই আমার শিক্ষকের
কাছে তুমি জর্মন ভাষায় কথাবার্তা কওয়ার তালিম নিতে সুরু
করো। কেমন ?

## পঁয়ত্রিশ

পল্লব মনে শান্তি পায় না কিছুতেই। কুঙ্কুম রিতা বা
মোহনলালের নাম ভুলেও এমন মুখ করে যে ওর সাহস হয় না কেন
ওদের প্রসঙ্গের অবতারণা করবে। আরো মুস্কিল হ'ল কুঙ্কুমকে কথা
দেওয়ার দরুণ যে ওদের সম্বন্ধে কুঙ্কুম ওকে যা বলেছে কাউকে বলবে
না ঘুণাক্ষরেও। কাজেই এমন কি মিসেস নর্টনের কাছেও ও
মোহনলাল বনাম কুঙ্কুম সমস্যা সম্বন্ধে কথা তুলতে পারে না।
মিসেস নর্টনও বুদ্ধিমতী, তার উপর জাতে ইংরেজ, অপরের মৌনব্রতের
উপর হানা দিতে চাইতেন না অশোভন কৌতূহল নিয়ে।
কেবল রিনা মাঝে মাঝে প্রশ্ন করত: আচ্ছা মিষ্টার বাকচি,
মিষ্টার সেন আগে আগে আসতেন মিষ্টার ঘোষকে নিয়ে, কিন্তু
এখন কই, আর মিষ্টার ঘোষ আসেন না তো ?

মিসেস নর্টন ওকে সামলাতে বলতেন: সবাই বুঝি তোর
মতন খেলুড়ে? মিষ্টার ঘোষকে পড়াশুনো করতে হয়, বুঝলি?

রিনার পিঠ-পিঠ উত্তর: আহা, মিষ্টার সেন বুঝি পড়াশুনো
করেন না, তিনি তো আসেন চা-য়ে! ব'লেই কখনো কখনো
বলে: আচ্ছা রিতাই বা কেন সাউথেণ্ডে থেকে গেল? মিষ্টার
ঘোষকে কি সে আর ভালবাসে না ?

মিসেস নর্টন ওকে দাবড়ানি দেন: থাম্ থাম্ পাকা মেয়ে!
রিনা কাঁদ কাঁদ মুখ করতেই ওকে আদর করে পল্লব বলে:
বোসো না, তোমার টানে মিষ্টার ঘোষও এলেন ব'লে।
মিসেস নর্টনের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় হয়। রিনাকে ভোলাতে হয়
চকোলেট দিয়ে।

কিন্তু বিপদ কি একটা? ওদিকে কেম্ব্রিজের ভারতীয়
ছাত্রদের মধ্যে কানাকানি, হাসাহাসি, আবছা ইঙ্গিত ক্রমশই ফুলে
উঠতে থাকে। গুজবের পাখা আছে—তার উপর মানুষ আঁকে
সে পাখায় কত কী রঙিন হিজিবিজি। ফলে দেখতে দেখতে
রকমারি কাণাঘুষো রটে গেল। কেউ বা বলে রিতা খুনের মেয়ে,
কেউ বা বাঁকা হেসে বলে খাসা নর্তকী, নেচে কুঁদে মোহনলালকে
দ'-য়ে মজিয়েছে! কেউ বা বলে পল্লব ও মোহনলাল দুজনই রিতার
জন্যে করেছিল টাগ-অফ-ওয়ার, তবে রিতা নাকি সেয়ানা মেয়ে—
যাকে বলে ডুবে ডুবে জল খায়—তাই মোহনলালকেই বরণ করেছে
জমিদারের গদিতে গদিয়ান হ'য়ে বসবে। তাই ওদের মুখ দেখাদেখি
নেই।

কেবল কুঙ্কুমের নামে রটে না কোনো অপবাদ। ওর শত্রু
ছিল না ব'লে নয়, কিন্তু ওর অতি বড় শত্রুরও এ-ইঙ্গিত করতে
বাধত যে নারীঘটিত কোনো কিছুতে কুঙ্কুম ভুলেও সাড়া দিতে
পারে। পল্লব মনে মনে সগর্বে ভাবল: চরিত্র বটে—(Caesar's
wife above suspicion যাকে বলে।

কিন্তু ক্রমশ: মোহনলালকে চায়ে, খেলার মাঠে, বোটিং-এ,
মজলিশে, য়ুনিয়নে দেখতে না পেয়ে কুৎসা অন্য বেঁক নেয়।
যারা ইতর, তারা প্রকাশ্যেই বলা সুরু করে: মোহনলাল
বিয়ে ক'রেই ভুল বুঝেছে, লম্পটের মেয়ে তো। ডাইভোর্স আসন্ন—
মুখ দেখাবে আর কেমন ক'রে? যারা একটু ভদ্র, তারা বলে:
কুঙ্কুম ওকে অর্ধচন্দ্র দিয়েছে কিনা, তাই ও গায়েব হয়েছে।

পল্লবের কানে এসব গুজব পৌঁছয় আরো পল্লবিত হ'য়ে—ওর
পরিচারিকার না হয় ল্যাণ্ড-লেডির মুখে। হঠাৎ একটা-আধটা
ইঙ্গিত—ব্যস—তার পরেই চুপ। পল্লব ভাবে: পরচর্চার
আকর্ষণ কী প্রচণ্ড সব দেশেই।

ঠিক এই সময়েই ঘটল হঠাৎ আর একটা দুর্ঘটনা! কেম্ব্রিজে ভারতীয়দের 'মজলিশ' নামে ক্লাবের সাপ্তাহিক এক আসরে একদিন কথায় কথায় একট পাঞ্জাবী ছাত্র মোহনলালকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে প্রকাশ্যেই। পল্লব বিরক্ত হ'য়ে তাকে চুপ করতে বলতেই পঞ্জাবীটির দুটি বন্ধু হেসে উঠল হো-হো করে। খবরটা মোহনলালের কানে পৌঁছুতেই মোহনলাল মজলিশে লিখে পাঠাল যে, সে আর মজলিশের মেম্বর থাকতে চায় না। ফলে মজলিশে ওর সম্বন্ধে নানা ছাত্র প্রকাশ্যেই অকথা কুকথা বলা সুরু করল। শুনে মোহনলাল একেবারেই নিজেকে গুটিয়ে নিল, ওর এক ইংরেজ বন্ধুর ওখানে সন্ধ্যাটা কাটানো সুরু করল—যাতে পল্লবও ওর দেখা না পায়। তাছাড়া ও বাসা বদলে চেরিহিন্টন রোডে তিন মাইল দূরে একটি বাড়ি নিল।

পল্লব দুদিন মোহনলালের ওখানে গিয়ে ওকে না পেয়ে দুঃখিত হয়ে ফিরে এসে শেষে একদিন কুঙ্কুমকে গিয়ে বলল: ভাই কুঙ্কুম, একটা কথা একটু শান্ত হয়ে ভেবে দেখ, লক্ষ্মীটি! মোহনলাল যাই করুক, তাকে এভাবে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করাটা ভালো দেখাচ্ছে না। তাছাড়া ওর ইংরেজ বন্ধুরা ওর দরদী হয়ে উঠলে তাতে করে আমাদের দেশের বিশেষ লাভ হবে না। ওকে যেন আমরা সবাই মিলে দেশছাড়া করলাম। কোথায় দূর চেরিহিন্টন রোডে গিয়ে ওকে আশ্রয় নিতে হয়েছে বলতো?

কুঙ্কুম শুনে একটু ভাবল। পরে বলল: আচ্ছা, ভেবে দেখি। —তবে কি জানো? যারা গড়পড়তা নয়, গড়পড়তারা ওদের সব সময়ে পছন্দ করে না, জানোই তো। তাছাড়া এধরণের সামাজিক লাঞ্ছনার সত্যিকার প্রতিকারও নেই। আগুনে হাত দেব অথচ ফোসকা-রূপ কর্মফলের হাত থেকে রেহাই পাব—এ দুই-ই হয় না। যাই হোক, আমাকে একটু সময় দাও। ওকে উৎপীড়ন করা যে ভালো নয় এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত।

কিন্তু দুর্ঘটনা একা আসে না: ঠিক এই সময়েই ও পেল রিতার কাছ থেকে এক চিঠি:

"প্রিয় পল,

আন্টির চিঠি থেকে জানলাম যে ভারতীয় সমাজে মোহন অস্পৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাকে বিবাহ করার জন্যে। এমন কি, কেম্ব্রিজ থেকে তিন মাইল দূরে গিয়ে না কি ওকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আমি অলক্ষণা মেয়ে, যেখানেই যাব দুঃখই টেনে আনব। কিন্তু সত্যিই তাই, আমি কল্পনাও করি নি—বিশ্বাস কোরো—যে, আমাকে বিবাহ করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ওকে এভাবে করতে হবে। ওর দেশ থেকেও নাকি এত চিঠি এসেছে যে ওর বিধবা মা কেবলই কান্নাকাটি করছেন—মোহন অবশ্য আমাকে বলেনি একথা, এ দুঃসংবাদটি ওর এক 'বন্ধু' বেনামী টাইপ করা চিঠিতে আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন আমাকে অকথ্য গালমন্দ করে। তোমাদের ধার্মিক দেশের ধর্মধ্বজের কী প্রবৃত্তি দেখ!

কিন্তু সে যাক। অনুশোচনায় আমি অশান্ত হয়ে উঠেছি, অথচ মোহন পই-পই করে আমাকে মানা করেছে কেম্ব্রিজে আসতে। লিখেছে এখন ওর পরীক্ষা আসন্ন, পরীক্ষার পরেই আমাকে নিয়ে দেশে রওনা হবে।

কিন্তু আমার মন বলছে: দেশে হয়ত ও আরো সংকটে পড়বে আমাকে নিয়ে। তাই আমি ভাবছি ওকে অব্যাহতি দেব—ওকে ডাইভোর্স ক'রে। তোমার কাছে তাই আমার একটি আর্জি আছে—লক্ষ্মীটি, তুমি না বোলো না। তুমি শুধু একটিবার মিষ্টার সেনকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে জানাও, পত্রপাঠ তিনি কি এই-ই চান সত্যি সত্যি? যদি চান তবে আমি সেই মতই কাজ করব কথা দিচ্ছি। কেবল লক্ষ্মীটি, মোহনকে একথা ঘুণাক্ষরে বোলো না। আমি ওকে জানতে না দিয়েই চলে যাব এমন কোথাও যেখানে আমার খোঁজও কিছুতেই পাবে না। তখন তোমরাও সবাই মিলে উৎসব করবে, কেমন?

ইতি—তোমার দুঃখিনী বোন রিতা।"

## ছত্রিশ

পল্লবের মন ছি-ছি ক'রে ওঠে। বিলেতে মানুষ হ'তে এ[সে]
কোন্ অমানুষ এক নিরপরাধাকে এভাবে বেনামী চিঠি লি[খে]
গালিগালাজ করবে? সামনে আসার সাহস নেই—আড়াল থেকে
তীরন্দাজি! ধিক্! আর এঁরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ—
young hopefuls? রবীন্দ্রনাথ বৃথাই তারুণ্যের জয়গা[ন]
করেছেন! মোহনলালের কাছ থেকে তার মার খবর নিয়ে রিতাকে
বেনামীতে লেখা? এ যে গুপ্তচরবৃত্তিরও অধম! স্পাই-রা ত
পেটের দায়ে অধঃপাতের রাস্তা ধরে—কিন্তু এরা? ও চিঠি নি[য়ে]
তৎক্ষণাৎ পরামর্শ করতে গেল মিসেস নর্টনের কাছে। তখ[ন]
সন্ধ্যা ছ'টা হবে।

মিসেস নর্টন পল্লবকে দেখে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, বললেন আহা, একটু আগে এলেন না, রিনা কী সুন্দর বাজাচ্ছিল পিয়ানো ব'লেই থেমে উদ্বিগ্ন সুরে—কী হয়েছে? রিতা?

পল্লব মেঘলা মুখে বলল: হুঁ। পড়ুন। ব'লেই চিঠিটি দি[য়ে]
বসল চুল্লীর কাছে গিয়ে।

মিসেস নর্টন খুব মন দিয়ে চিঠিটি পড়লেন। পল্লব তাঁর মুখে[র]
দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল: আমার কিন্তু ভারি আশ্চর্য লা[গে]
ভাবতে একটা কথা: মোহনলাল জানে—এখানকার ভারতীয়
ওর বিরুদ্ধে জোট পাকাচ্ছে—তবু কেন বলতে গেল তাদের কা[ছে]
ওর মার কান্নাকাটি করার কথা?

মিসেস নর্টন ওর মুখের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থে[কে]
বললেন: তাহ'লে বলব একটা কথা?

পল্লব একটু আশ্চর্য হ'য়ে বলল: বলবেন? কী?

বেনামী চিঠির পর চিঠি লিখছে মোহনলালের কোনো বন্ধু নয়

তবে?

বান্ধবী।

বান্ধবী?

হ্যাঁ। মানে কোনো মেয়ের কাজ, যে মোহনলালের নাগ[াল]
পেতে চেয়েছিল। পুরুষেরা এত নিচে নামে না—এক টাকার লো[ক]
ছাড়া।

পল্লবের বুকের মধ্যে ধ্বক্ ক'রে ওঠে: সুলতা!

মিসেস নর্টনই ফের কথা কইলেন: জানেন এমন কো[নো]
মেয়েকে এখানে?

পল্লব বলল: এখানে মোহনলাল কোনো মেয়ের সঙ্গে মেলা[মেশা]

রে ব'লে তো আমার জানা নেই। তবে লণ্ডনে একটি বাঙালী
য়ে আছে—ডাক্তারি পড়ে। মোহনলাল তাদের ওখানে অনেক দিন
ছল।

সে মোহনলালের প্রতি আসক্ত কি না জানেন?

পল্লব সকুণ্ঠে বলল: না—মানে—

মিসেস নর্টন বাধা দিয়ে বললেন: এর মধ্যে মানে-টানে
কছুই নেই। এ অতি প্রাঞ্জল ভাষা। সে-মেয়েটি মোহনলালের
াড়ির খবর রাখে?

সে মোহনলালের শহর থেকেই এসেছে—মৈমনসিং। তার
াবা ওর পিতৃবন্ধু—লণ্ডনের ডাক্তার।

মোহনলাল তাদের ওখানে কত দিন ছিল?

তা মাস দুই তিন হবে। ব'লেই থেমে: তবে শুনুন
লি—যখন কথাই উঠল। ব'লে একটানা ব'লে গেল লণ্ডনে পৌঁছেই
সই অবিস্মরণীয় রাত্রির অভিজ্ঞতা।

মিসেস নর্টন শুনে ম্লান হেসে বললেন: এর পরে সে মেয়েটিকেই
ই বেনামী পত্রগুচ্ছের লেখিকা বলে সনাক্ত করতে হলে পার্ক
ামন্ হবার দরকার করে না, মিষ্টার বাকচি।

কিন্তু সুলতা—মানে...এত নিচে নামবে ভদ্রঘরের মেয়ে?
বশেষ যখন মোহনলাল রিতাকে বিবাহ করে ফেলেছে?

কিন্তু যদি সে চায় ওই করে ফেসাটাকেই নাকচ করতে?

ডাইভোর্স?

কিম্বা শুধু প্রতিশোধ দেওয়ার চেষ্টা—দুয়েরই একটা। শুনুন
মিষ্টার বাকচি! সে মেয়েটি মোহনলালকে পেতে চেয়েছিল ও
মাহনলালের আশা তার ছিল। এমন সময়ে হঠাৎ মোহনলাল
াকে ডিসমিশ ক'রে রাতারাতি বিয়ে করল এক অজ্ঞাতকুলশীলা
বদেশিনীকে। প্রত্যাখ্যাতা মেয়েদের মনস্তত্বের খবর আপনি
য়ত রাখেন না, কিন্তু আমি রাখি। বলে থেমে: তাই আমি
াজি রেখে বলতে পারি যে, সুলতাই মোহনলালের মাকে লিখেছিল
 তিনি ওকে লিখেছেন কান্নাকাটি করে।

পল্লব স্তম্ভিত হয়ে রইল।

মিসেস নর্টন বললেন: কিন্তু এ তো হল ডায়াগনোসিস।
ানে, ব্যাপারটা বোঝা গেল। কিন্তু এখন যেকোনো আনা মন
িতে হবে চিকিৎসার দিকে। শুনুন, আপনি এক কাজ করুন:
 চিঠি নিয়ে এক্ষুণি যান মিষ্টার সেনের কাছে। ওর সুরাহা করতে
দি কেউ পারে তো তিনিই পারবেন।

পল্লব একটু ভেবে বলল: কিন্তু—

রাখুন। মিষ্টার সেন মহৎ মানুষ—বুঝবেনই বুঝবেন। কিন্তু
াপনাকে এখন অতি ভদ্র হলে চলবে না—তাঁকে গিয়ে বলতে
বে একথা—মানে সব কথা। আর বলবেন, আমার নাম করে!
লবেন তো?

পল্লবের মন খুঁত-খুঁত করে: কিন্তু এ তো আপনার নিছক
ন্দেহ মাত্র মিসেস নর্টন।

মিসেস নর্টন দৃঢ়স্বরে বললেন: না। সন্দেহের কোটা পেরিয়ে
গছে। কারণ সুলতা ঈর্ষার জ্বালায় বড় বেশি মুষে গেছে। আমার
নে হয়—মিষ্টার ঘোষের মার কথা মোহনলালের কোনো পুরুষ
ন্ধুই জানত না এক আপনি ও মিষ্টার সেন ছাড়া। কিন্তু এসব
জল্পনা থাক—আপনাকে বলছি আমি এ সুলতারই কাজ। যদি
না হয় আমাকে শাস্তি দেবেন। কিন্তু এখন ত্বরিৎকর্মা হোন—
it's time for action—মানে, যদি বন্ধুকে ভালোবাসেন সত্যিই।
আর শুধু আপনিই এখন মিষ্টার সেনের কাছে এ প্রসঙ্গ তুলতে
পারেন, আর কেউ নয়। তাই বলছি আপনি এখনি যান—
দেরি করলে কখন যে কী হয় বলা যায় না। There is a
time in the affairs of men—জানেন তো কবির বিখ্যাত
উক্তি? বলে একটু থেমে: মিষ্টার বাকচি, অধঃপাতে পুরুষেরাও
যায়, কিন্তু মেয়েরা যখন একবার নিচের দিকে গড়ায় তখন তারা
রসাতলে না নেমে থামতে পারে না। এই জন্যই জগতের সবচেয়ে
ঘৃণ্য বৃত্তি—গুপ্তচরের বৃত্তিতে মেয়েরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী—যে কথা গত
যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে গেছে—সামনের যুদ্ধে আরো প্রমাণ পাবেন।

পল্লবের মনে লাগল কথাটা। ও আর আপত্তি না করে ছুটল
কুঙ্কুমের কাছে।

## সাইত্রিশ

পল্লব ট্রিনিটি কলেজে ছুটল সাইকেলে। কুঙ্কুমের ঘরে ঢুকতেই
কুঙ্কুম চেয়ার থেকে না উঠেই বলল: বোসো বোসো ভাই! তোমাকে
সেদিন বলছিলাম না আমাদের দেশে প্রত্যেকেরই পড়া উচিত
লেনিনের জীবন কী ঐকান্তিকতা, কী নিষ্ঠা। উঃ। শোনো ব'লি
মহা উৎসাহে—এই পত্রিকাটি আজই সকালে পেলাম, আমার সেই
জর্মন বন্ধুটি পাঠিয়েছে। যে লেনিনের মহা ভক্ত। এতে লিখেছে
কী শোনো, লেনিনকে বছরের পর বছর কী লড়তেই না হয়েছিল
একলা বিদেশে—আর কার সঙ্গে? না, তাঁর স্বদেশবাসী সতীর্থদের
সঙ্গে, ভাবতে পারো? কিন্তু যখন তাঁকে বলতে হয়েছিল—যদি
তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে—তখনো এক
মুহূর্তের জন্যেও তিনি টলেননি, আর কেন জানো? বলতে বলতে
কুঙ্কুমের গৌরবর্ণ মুখ উৎসাহে রাঙা হ'য়ে ওঠে, দীপ্ত চোখ দুটি ওঠে
জ্ব'লে: কারণ শোনো কী বলছেন লেনিনের জীবনীকার—
when she Madame Krzhizhanovskaya—asked
one of Lenin's opponents how one man Lenin;
could weigh down all opposition, he replied:
because there is no other man who thinks and
dreams of nothing but revolution twenty four
hours a day. এই পল্লব, একবার মস্কো যেতেই হবে শুধু এই
আশ্চর্য অদ্ভুতকর্মা তপস্বীটিকে চোখে দেখতে। তপস্যা না ক'রে
কেউ কি কখনো সিদ্ধি লাভ করেছে, কোনো দেশে?

পল্লব মুগ্ধ হ'য়ে শুনছিল কুঙ্কুমের কথা বেমালুম ওর নিজের
বক্তব্য ভুলে গিয়ে। কুঙ্কুমের কথা শেষ হ'তে বলল: আচ্ছা সে
পরে যাওয়া যাবে, আমাকে সঙ্গে নিও। কিন্তু আমি অসময়ে এসে
রসভঙ্গ করতে বাধ্য হচ্ছি দারুণ ব্যাপার ব'লে।

কুঙ্কুম পত্রিকাটি রেখে আশ্চর্য হ'য়ে বলে: দারুণ ব্যাপার?

এই পড়ো বলেই পল্লব ওর কোলে রিতার চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে
দিল।

কুঙ্কুম মন দিয়ে চিঠিটা পড়ল—একবার নয়, দু' দু' বার। পরে
মেঘলা মুখে বলল: হুঁ—ব্যাপারটা দেখছি অনেক দূর গড়িয়েছে।

ব'লেই থেমে: কিন্তু মোহনলালেরও বাহাদুরি আছে বলব—যার তার কাছে কেন বলতে গেল ওর মার কান্নাকাটির কথা?

যার তার কাছে সে বলে কি।

বলে কি? মানে?

পল্লব তীব্রকণ্ঠে বলল: মানে—স্পাই—মেয়ে-স্পাই।

স্পাই? কী বলছ পল্লব?

শোনো কুঙ্কুম মন দিয়ে। ব'লেই পল্লব একটানা ব'লে গেল, মিসেস নর্টনের সঙ্গে ওর কথাবার্তা।

কুঙ্কুম শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গৃহচুল্লীর দিকে ফিরে বসে।

পল্লব তিরস্কারের সুরে বলে: ওর পরেও কি তুমি মৌনী হ'য়েই থাকবে কুঙ্কুম? মিসেস নর্টন বলেছেন, একমাত্র তুমিই পারো এর সুরাহা করতে।

কুঙ্কুমের চোখে জল ঠিকরে ওঠে, বলে: করব পল্লব, যদি পারি। তুমি ঠিকই বলেছিলে: মোহনলাল যাই করুক আমার তাকে ও-ভাবে বর্জন করা উচিত হয় নি—তুমি রিতাকে আজই রাতে ট্রাংককলে টেলিফোন ক'রে দাও যে ভয় নেই, আমি মোহনলালের কাছে নিজে যাব ও অকুণ্ঠে ক্ষমা চাইব।

পল্লব সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল:

যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষমারূপেণ (তথা সন্ধিরূপেণ) সংস্থিতা,

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

ব'লেই কুঙ্কুমকে জড়িয়ে ধরল।

কুঙ্কুম হেসে বলল: কী পাগল!

পল্লব বলল: তুমি জানো না কুঙ্কুম—আমার বুকের ওপর থেকে কী পাথর নেমে গেছে আজ। কিন্তু রিতাকে টেলিফোন ক'রে দেবার আগে চলো যাই মোহনলালের ওখানে। শত্রুরা সংখ্যায় অনেক, তা ছাড়া, শুভস্য শীঘ্রম্—বলেছেন মুনি।

কুঙ্কুম একটু ভেবে বলল: তুমি ঠিকই বলেছ। চলো।

ওরা বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল মোহনলালের ওখানে। কিন্তু ল্যাণ্ডলেডি ওদের নিরাশ ক'রে দিলেন: মোহনলাল সেদিনই দুপুরে তার টুসিটার মোটরে লণ্ডনে গেছেন—মিসেস ঘোষের খুব অসুখ।

ওরা তৎক্ষণাৎ গেল মিসেস নর্টনের ওখানে। তিনি কুঙ্কুমের কথা শুনে দুহাতে ওর হাত চেপে ধরে বললেন: ধন্যবাদ, মিষ্টার সেন। এ আপনারই যোগ্য সংকল্প।

পল্লব বলল: কিন্তু রিতার কী অসুখ করেছে শুনলাম?

মিসেস নর্টন চমকে বললেন: রিতার অসুখ? কে বলল?

পল্লব বলল: মোহনলালের ল্যাণ্ডলেডি। সে আজ দুপুরে তার টুসিটারে ক'রে লণ্ডনে গেছে—যদিও লণ্ডনে কেন, বুঝতে পারলাম না।

মিসেস নর্টন তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করলেন। ট্রাংককল পেতে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতে হ'ল।

কে? আর্চি?··হ্যাঁ হ্যাঁ, ইভোলিন, শোনো রিতার অসুখ শুনলাম?··কী?···প্যালপিটিশন?···

কোথায়? লণ্ডনে? কোন হাসপাতাল? ও···আচ্ছা···

তার খবর কাল একটু জানাবে তো?···আচ্ছা···ধন্যবাদ।

পরে কুঙ্কুম ও পল্লবের দিকে ফিরে বললেন: রিতার কাছে আজ সকালে নাকি আর একটা চিঠি আসে। ওর হাঁপানি আছে।—হঠাৎ দারুণ বেড়ে ওঠে নিশ্বাসের কষ্ট। নিশ্বাসের কষ্ট ওর মাঝে মাঝে হ'ত কিন্তু এত বাড়াবাড়ি নাকি কখনো হয়নি। তাই আর্চিবল্ড্‌ ভয় পেয়ে ওকে মোটরে ক'রে লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে একটি প্রথম শ্রেণীর নার্সিং-হোমে রেখে মিষ্টার ঘোষকে তার করে। তিনি বিকেলে নার্সিং-হোমে পৌঁছলে আর্চি সাউথেণ্ডে ফিরে যায়। রিতা একটু সারলে তবে মিষ্টার ঘোষ কেম্‌ব্রিজে ফিরবেন।

কুঙ্কুম পল্লবের মুখের দিকে তাকায়। পল্লব বলে: ও কিছু নয়। হাঁপানির টান মাঝে মাঝে বাড়ে, সবাই জানে। এবার সব ঠিক হয়ে যাবে—আমি মোহনলালকে সুখবরটা দিতে না দিতে।

পল্লব মোহনলালকে সুলতাদের ঠিকানায় হ্যাম্পষ্টেডে চিঠি লিখে দিল সব কথা জানিয়ে। এর অনেক পরে মোহনলালের কাছে সে শুনেছিল যে সেবার মোহনলাল সুলতাদের ওখানে আদৌ যায় নি। মোহনলাল বলেছিল মৃদু হেসে: কাজেই সে-চিঠি আমার হাতে পৌঁছবে কী ক'রে?

যদি পল্লবের চিঠিটি সে পেত লণ্ডনে! তার, গ্রহবৈগুণ্য।

## আটত্রিশ

কেম্‌ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত দুটি ক্লাব আছে। ক্লাবের নাম—য়ুনিয়ন। য়ুনিয়নে প্রতি সপ্তাহে নানা বিষয়কে উপজীব্য করে একটি করে তর্কালোচনা হয়—কয়েকজন বলেন বিষয়টির স্বপক্ষে, কয়েকজন বিপক্ষে। ইংলণ্ডের এই দুটি বিদ্যাকেন্দ্রের ছাত্রদের এই সৌখিন বিতণ্ডা সভায় অনেক সময় ইংলণ্ডের বড় বড় চিন্তানায়ক, তথা পার্লিমেন্টের সচিবও যোগদান করেন—বক্তা হিসেবে আহূত হয়ে এবং ছাত্রেরা তাঁদের সঙ্গে সমানে তর্ক করে। এসব তর্কে ভঙ্গি ও দীপ্তিতে আকৃষ্ট হয়ে টাইমস প্রভৃতি বিখ্যাত সংবাদপত্রের কর্মকর্তারাও এ-তর্কালোচনার সারমর্ম মধ্যে মধ্যে ছাপেন। প্রতি তর্কের শেষে পার্লিমেন্টের কায়দায় উপস্থিত সভাবৃন্দের ভোট নেওয়া হয় ও যাদের দল পুরু হয় তারাই তর্কে জয়ী সাব্যস্ত হয়।

কুঙ্কুম, মোহনলাল ও পল্লব তিনজনেই কেম্‌ব্রিজ য়ুনিয়নের সভ্য ছিল ও নিয়মিত এ-সাপ্তাহিক তর্কালোচনায় যোগ দিত। পল্লব ভালো বলতে পারত না বলে সভায় উঠে দাঁড়িয়ে বড় একটা বলতে রাজি হত না, যেজন্যে কুঙ্কুম তাকে তিরস্কার করত। বলত: এ-সব সভায়ই অনেক উচ্চাশী যুবক পার্লিমেণ্টারিয়ান বক্তা-হবার তালিম নেয়। আমাদের দেশে এ-নির্ভীক পদ্ধতির প্রবর্তন করাই চাই, নৈলে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন করা সহজ হবে না। কিন্তু তবু পল্লব বেশি বলতে ভরসা পেত না—যদিও গর্ব বোধ করত যখন কুঙ্কুম ও মোহনলাল বিলিতি সভায় নানা বিচিত্র বিতণ্ডায় যোগ দিত। বক্তৃতায় কুঙ্কুম একটু বেশি অলঙ্কারের পক্ষপাতী ছিল বটে, কিন্তু সে এত সুন্দর ইংরাজি বলত ও সব রাজ্যের এত উৎসাহের সঙ্গে তার বক্তব্যকে পেশ করত যে সে প্রায়ই হাততালি পেত শুধু ভারতীয় বন্ধুদের নয়—ইংরেজ ছাত্রদেরও। মোহনলালের বলার ভঙ্গি ছিল কুঙ্কুমের উলটো—বলত ধীরে ধীরে ও বেশি যুক্তির দিকে ঝেঁকে। ফলে সে সুবক্তা বলে নাম কিনতে পারেনি, যদিও চিন্তাশীলদের মধ্যে অনেকেই তার বক্তৃতায় বেশি সাড়া দিত, বিশেষ করে ইংরেজ ছাত্রেরা।

যেদিন কুঙ্কুমের সঙ্গে পল্লবের আলোচনা হয় তার কয়েক দিন পরেই য়ুনিয়নের এক সাপ্তাহিক সান্ধ্যবাসরে আলোচনার বিষয় নেওয়া হয়: ইংরাজ জাতির কাছ থেকে ভারতীয়েরা পূর্ণ স্বরাজ পাবার দাবি করতে পারে কি না। প্রথমে একজন লিবারল আইরিশ ছাত্র খুব খানিক বক্তৃতা দিলেন যে ভারতকে এখনই স্বরাজ দেওয়া ইংরেজ রাজের কর্তব্য, নৈলে ক্রমে ভারতে বিদ্রোহ জেগে উঠবেই উঠবে আয়র্লণ্ডের মত স্বায়ত্তশাসনের ন্যায্য অধিকার থেকে কোনো জাতিকে বঞ্চিত করলে তার ফল পেতেই হবে—প্রকৃতি অন্যায় বেশি দিন সয়ে থাকেন না ইত্যাদি ইত্যাদি।

আইরিশ ছাত্রটির প্রতিবাদে এক ইঙ্গভারতীয় ছাত্র তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন: ভারতীয়রা এখনো স্বরাজ্য পাবার যোগ্য হয়নি। স্বাধীনতা না চায় কে? শিশুও তো চায়, তাই বলে কি তাকে দিতে হবে স্বাধীনতা? এদেশে যে-সব ভারতীয় ছাত্র আসেন তাঁদের উদ্দীপনা দেখেই ভারতীয় জনসাধারণকে বিচার করতে গেলে ভুল হবে। কারণ ভারতবর্ষে সাড়ে পনের আনা মানুষই হল কৃষাণ-বাদের একমাত্র বিশেষণ প্রিমিটিভ। বৃটিশ শাসনে মাত্র দু চারজন ভারতীয় শিক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু তাঁরাও কর্মদক্ষ একেবারেই নন। রাজ্য শাসন কি মুখের কথা নাকি? আজ যদি আমরা ভারতীয়দের স্বরাজ দিয়ে আমাদের বৃটিশ সৈন্য নিয়ে ফিরে আসি তবে ভারতে বাঁধবে কুরুক্ষেত্র হিন্দু মারবে মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে। বলে একথার স্বপক্ষে নানা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে তিনি বললেন: কিন্তু ভারতকে এখনি স্বাধীনতা দেওয়ার বিপক্ষে এর চেয়েও গুরুতর যুক্তি আছে। সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, অন্ধ দেশভক্তি তথা অসহিষ্ণু পেট্রিয়টিসম ভারতীয়দেরকে উত্তরোত্তর পেয়ে বসছে। এ প্রবৃত্তিটি যে কী সর্বনেশে জর্মনদের সঙ্গে যুদ্ধে আমরা দেখিনি কি? তাই উচ্ছ্বাসী ভারতীয় দেশভক্তদের হাতে ভারতকে সঁপে দিতে না দিতে তারাও চড়াও হবে অন্য জাতের পরে বেচারি চীনদের পরে কাবুলিদের পরে, নেপালীদের পরে। ভারতে এখন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে, ভারতীয়দের আমরা ধীরে ধীরে তুলছি হাত ধরে। সাত তাড়াতাড়ি কিছুই করা ভালো নয়। অধিকারী না হলে কাউকে অধিকার দিলে ফল হয় বিষময়, আসে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, হাহাকার ইত্যাদি। ছাত্রটি ভারতীয়দের জাতিভেদ প্রভৃতি নানা সমাজব্যবস্থার নিন্দার পরে হিন্দুদের অযোগ্য সাব্যস্ত করে ইংরাজ ছাত্রদের হাততালি পেয়ে আসন নিলেন।

এ ছাত্রটির প্রতিবাদের ভার ছিল তৃতীয় বক্তা কুঙ্কুমের। কুঙ্কুম উঠে দৃপ্তকণ্ঠে প্রথমেই বলল: একজন মনীষী বলেছেন, মিথ্যার চেয়েও বেশি সাংঘাতিক হল অর্ধসত্য, কেন না তার মুখোস খসাতে বেশি বেগ পেতে হয়। আমাদের দেশের কৃষাণরা দরিদ্র একথা সত্য, কিন্তু তারা প্রিমিটিভ, অসভ্য ও বর্বর এ রটনা সর্বৈব অসত্য। তাছাড়া যোগ্যতা অর্জন করে তবে স্বাধীন হবে এ অতি অশ্রদ্ধেয় কথা, কেন না স্বাধীন না হয়ে কেউ কখনো কোনো দেশে স্বারাজ্যের যোগ্যতা অর্জন করে নি। বলে কুঙ্কুম ইতিহাস থেকে নানা উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাল যে, সব দেশেই পরাধীন দেশের শাসকের অধীন জাতিকে চিরদিন অযোগ্য ও হীনবল করেই রেখে এসেছে ও শেষে বলে এসেছে যে যেহেতু তারা রাজ্য শাসনভার নেবার অযোগ্য। যেহেতু তারা স্বাধীনতা পেলে সব তছনছ ক'রে ফেলবেই ফেলবে, মরবে নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি হানাহানি ক'রে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রতি মানুষেরই আছে জন্মস্বত্ব, আর তুলনা ক'রে কোনো জাতি কখনো অভ্রান্তির নির্দেশ চিনতে শেখে না—যেমন বার বার না পড়ে কোনো শিশু খাড়া হ'য়ে চলতে শেখে না। তাই···বলল কুঙ্কুম গম্ভীর কণ্ঠে—আমরা ইংরেজদের অমঙ্গল কামনা করি না, বরং তাদের মঙ্গলার্থেই চাই—তারা আমাদের শাসক না হ'য়ে বন্ধু হোক। এই-ই আমাদের প্রার্থনা তথা দাবি। ব'লে হার্বার্ট স্পেন্সারের Rebarbarisation প্রবন্ধ থেকে উদ্‌ধৃত করল একটি বাণী: যে, যারা অপর জাতির উপর চড়াও হ'য়ে গর্বভরে তাদের সভ্যতায় দীক্ষিত করতে ছোটে, তারা নিজেরাই সব আগে পুনর্মূষিক হয়—অসভ্যতার গহ্বরে আবার স্খলিত হ'য়ে।

বলতে বলতে কুঙ্কুমের সুগৌর কমনীয় মুখমণ্ডল দেশভক্তিতে, আবেগে গৌরবে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে। পল্লবের সঙ্গে মিসেস নর্টনের দৃষ্টি-বিনিময় হ'তেই তিনি ইঙ্গিতে জানালেন—চমৎকার! কুঙ্কুম ভালো বলত বরাবরই, কিন্তু এমন মর্মস্পর্শী উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা সে আর কখনো দেয়নি। তার গভীর আন্তরিকতা ও সহজ ওজস্বিতায় সবাই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতন হ'য়ে পড়ল। সে সূচীভেদ্য নৈঃশব্দের সাদর আহ্বানে কুঙ্কুম আরো উজিয়ে উঠল এক অভিনব আবেগে, বলল: আমার পূর্ববর্তী মাননীয় বন্ধু বলেছেন যে, দেশভক্তি একটি সেকেলে, মামুলি ও একদেশদর্শী মনোবৃত্তি, এ যুগ মেকি টাকারই সামিল—যেহেতু দেশভক্তিই এনেছে জগৎজোড়া অশান্তি, অনৈক্য, রেষারেষি, দলাদলি, হানাহানি। কিন্তু ভারত ভারত ব'লেই তার এক্ষেত্রে কিছু দেবার আছে—যাকে বলা যেতে পারে ভারতীয় দিব্যদৃষ্টির অবদান। অন্য ভাষায়: এক ভারতই পারে দেশভক্তির এক নবরূপ দিতে—যে রূপ তার আর্য আত্মার রসায়নে রসান্বিত, আর্য প্রেরণার আলোয় ভাস্বর। এ সস্তা দেশপ্রেমের মামুলি উচ্ছ্বাস নয়—এর নাম 'ডিভাইন হিউম্যানিসম্'। য়ুরোপ এনেছে একটি মস্ত বাণী—সৌভ্রাত্রের, সাম্যের, সহিংসার: ভারত দেখেছে আত্মার স্বপ্ন, তার ধ্যাননেত্রের সামনে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে মানুষের পার্থিব জন্মের নিহিতার্থ—অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেবতার উত্তরোত্তর আত্মপ্রকাশ ওর যে বিবর্তন। এ নয় য়ুরোপের উপদিষ্ট মানবপ্রেম: এ হ'ল—মানুষের মাঝে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করে তবে তার সেবা পরার্থনিষ্ঠা। দরিদ্রকে কৃপা করে মুষ্টি ভিক্ষা দিয়ে তার দারিদ্র্য-দুঃখকে কিঞ্চিৎ সুসহ করে তোলা নয়: দারিদ্র্যের মধ্যে নারায়ণকে অভিনন্দন ক'রে তাকে বলা—এসো, সবাই ভগবান, তুমিও ভগবান—'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।' তাই ভারতের দেশভক্তি দেশপ্রীতিমাত্র নয়—তার নাম দেশাত্মবোধ। ঈশা বলেছিলেন: তোমার প্রতিবেশীকে তেমনি ভালোবাসতে হবে যেমন তুমি ভালোবাসো নিজেকে। আর্য ঋষি বললেন শিশু প্রহ্লাদের অঙ্গীকারে:

'সর্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মৈত্রামৈত্র কথা কুতঃ?'

অর্থাৎ

When the one who is the soul of all is the
Lord of love—divine,
How shall I, father tell a foeman from a
friend of mine ?

কেউ কেউ বলে থাকেন—এ হল আর্য ঋষিদেরই বাণী বটে, কেবল দুঃখ এই যে, আমরা শুধু রক্তেই তাঁদের উত্তরাধিকারী, জীবনে তাঁদের ত্যাজ্যপুত্র। কিন্তু এ জাতীয় মুখরোচক বিদ্রূপ শুনতে বিজ্ঞের মতন হলেও আসলে অশ্রদ্ধেয়, অসার, হসনীয়, কেন না আর্য ঋষির মৃত্যুঞ্জয় আত্মা আমাদের মধ্যে আজও জন্ম নেয়—পরাধীনতার এ দারুণ দুর্দিনেও। প্রমাণ—রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি। আমাদের দেশে আধনিকতম মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাই সেদিনও গেয়েছেন ভারতীয় আত্মার মন্ত্রনাম—বলে কুঙ্কুম প্রথমে কম্প্র কণ্ঠে বাংলায় আবৃত্তি করে :

"আর্য ঋষির অনাদি গভীর উদিল যেথানে বেদের স্তোত্র,
নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি ? নহি কি আমরা তাঁদের গোত্র ?
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে—রচিত প্রেমের ভারতবর্ষ।"

বলেই কুঙ্কুম তৎক্ষণাৎ এর ইংরাকি অনুবাদ আবৃত্তি করে :

Art thou not, Mother, the India, where the
Aryan seers chanted once
Their immemorial mystic hymns ? Are we
not their authentic sons ?
We'll hold before our eyes the great ideal of
our glorious days
To new-create the Promised Land :
the Ind of dream and love and grace.

অর্থাৎ, আমরা সৃষ্টি করব যান্ত্রিকতার ভারতবর্ষ নয়—প্রেমের ভারতবর্ষ, মৈত্রীর ভারতবর্ষ, স্বপ্নের ভারতবর্ষ। শেষে কুঙ্কুম গাঢ় কণ্ঠে বলল :

যাঁরা ভারতের এই সনাতন আত্মার মৃত্যুহীন ধ্যান লক্ষ্যকে সস্তা ব্যঙ্গের তীরন্দাজিতে ছিন্ন ভিন্ন করার চেষ্টা করেন, তাঁরা জানেন না তাঁরা কী করছেন। আমাদের গীতায় বলেছে শ্রদ্ধা আমাদেরকে এনে দেয় শ্রদ্ধেয়ের সারূপ্য। তাই শ্রেষ্ঠ মানুষের বরিষ্ঠ আদর্শকে অশ্রদ্ধা করার প্রবৃত্তিকে বলা যেতে পারে আত্মঘাতী—যার ফলে আমাদের মনে দিনে দিনে ব্যাপক হয়ে উঠবেই উঠবে সিনিসিসন—অর্থাৎ নাস্তিবাদ। এই সর্বনাশা নাস্তিক্যের আবহাওয়ায় কখনই মানুষের আত্মার মঙ্গল হ'তে পারে না। তাই যাঁরা আমদের নানা সমাজ ব্যবস্থার দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে বলেন যে, এই অবনতিই আমাদের সভ্যতার একমাত্র স্বরূপ তথা অভিব্যক্তি, তাঁদেরকে অদূরদর্শী ব'লে অবজ্ঞা ক'রে, তাঁদের উপহাসকেই উপহাস ক'রে আমরা শুধু যেন শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি যে, আমরা চাই অতীতের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে নবতন ভারতের আরো মহিমময় রূপ দিতে—যে-রূপ আমাদের আর্য ঋষিরা বৈদিক যুগে দেখেছিলেন তাঁদের ধ্যানদৃষ্টিতে, আর সে-ধ্যানদৃষ্টির উত্তরাধিকারী শুধু আমরা নই, কেন না মানুষের কোনো মহৎ উপলব্ধিই দেশ-কালের গণ্ডিবদ্ধ থাকতে পারে না—সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বেই পড়বে – আজ না হোক দু'দিন পরে। তাই ভারতের স্বাধীনতার সুফলের ভোক্তা শুধু আমরা নই—তার শরিক বিশ্বমানব। ভারতীয় ছাত্রদের তুমুল করতালির মধ্যে কুঙ্কুম আসন নিল।

এর প্রতিবাদ করবার কথা ছিল যে ছাত্রটির, সে আসতে পারেনি। তাই সভাপতি উঠে বললেন : প্রতিবাদ করতে চান এমন যদি কেউ থাকেন তাঁকে আমি নিমন্ত্রণ করছি।

কিন্তু কুঙ্কুমের মর্মস্পর্শী ভাষণ সভায় এমনই এক স্পন্দমান আবহাওয়ার সৃষ্টি করছিল যে এ্যান্টিক্লাইম্যাক্সের ভয়ে কেউ সাহস করল না এ নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে।

সভাপতি তারস্বরে বললেন : কেউ কিছু বলতে চান কি এর প্রতিবাদে ?

হঠাৎ মোহনলাল হাত তুলল। সভাপতি আশ্চর্য হ'য়ে বললেন আপনি ?

মোহনলাল yes sir বলেই সোজা মঞ্চের উপর এসে দাঁড়াল।

অনেকেই আশ্চর্য হ'য়ে তাকালো। কুঙ্কুমের চোখ জ্বলে উঠল। পল্লবের বুকের মধ্যে আতঙ্কের ডমরু ওঠে : মোহনলাল করবে কুঙ্কুমের প্রতিবাদ আর প্রকাশ্য সভায় মিসেস নর্টন বিচলিত হয়ে পল্লবকে মৃদু স্বরে বললেন কী ব্যাপার ?

পল্লব অস্ফুট স্বরে বলল, কিছু বুঝতে পারছি না তো ?

[ ক্রমশঃ।

# তীর্থযাত্রা

( চেকোস্লোভাকিয়ার কবি Julius Zeyer ( ১৮৪১—১৯০১ )-এর কবিতার অনুবাদ )

তীর্থযাত্রার পথে আজ আমার এই
ক্ষুদ্র গৃহকোণে আমি শান্ত হয়ে বসেছি।
এই অরণ্য, এই বিস্তীর্ণ সমতল, এই নদীস্রোত—
এরই প্রতীক্ষায় জীবনের বহু দিন অপগত হয়েছে।
ও আমার দেশ ! আসন্ন দিনের চিন্তায়
চক্ষু আমার ধূসর হয়ে এলো—
এই প্রিয় স্বদেশের কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে !

দূরাগত ঘণ্টার ধ্বনি ভেসে আসে,
সন্ধ্যার কুয়াশা শান্ত-গম্ভীর ছায়া ফেলে।
আমি চলেছি সেখানে,
সমস্ত ইতিহাস অপেক্ষা করে আছে।
সূর্য এই স্বপ্নালু বনভূমি আচ্ছন্ন করেছে,
শ্বেত নক্ষত্রের স্বর্ণাভা
এই ঘুমন্ত জলরাশিকে আবৃত করুক।

অনুবাদ : মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

# চুলের কতখানি যত্ন আপনি করছেন?

ECH. 3-X52 BG

প্রভাস দাশ

জানালার নীল পর্দাটি আরও একটু টেনে দিলেন মিস মালতী চৌধুরী। টেবিলের ময়লা চাদরটি উঠিয়ে একটা ধবধবে শাদা চাদর বিছিয়ে দিলো ঝি। রেডিও'র চাবিটা একটু ঘুরিয়ে দিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলেন, মিস মালতী চৌধুরী। ট্রে-তে করে চা ডিমসেদ্ধ, কলা রুটী এনে দিয়ে গেল ঝি। ব্রেকফাষ্ট শেষ করে চা ঢেলে নিলেন কাপে—তারপর চামচ দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে নাড়তে নাড়তে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। পরক্ষণেই বিরক্ত হলেন। নাঃ, অসহ্য, নাকিসুরে পেত্নী-কান্না ছাড়া কি আর গান জোটেনি রেডিওয়ালাদের বিরক্ত ভাবে রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে টেবিলে-রাখা ছোট টাইমপীসটার দিকে তাকালেন মিস মালতী চৌধুরী। না। এখনও সকালবেলার খবর বলার মিনিট দশেক বাকী। নিজে একদিন ভাল গাইতেন মালতী চৌধুরী। নিষ্ঠার সংগে চর্চা করতেন মার্গসংগীত। তাই ইংরেজি মেলোডির জগাখিচুড়ি পাকানো আধুনিক বাংলা গান শুনলে তার দুঃখ হয়। রেডিওটা বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন খবর-বলার সময়ের। আর কিছু না হোক, রেডিওর সকালবেলার খবরটা চা খেতে খেতে শুনবেন মিস মালতী চৌধুরী।

এতক্ষণ চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে মালতী চৌধুরীর। অন্য দিন

হলে চা খেয়েই ছুটতেন বাথরুমে, তারপর ডাইনিং টেবল হয়ে সোজা অফিসে, জেলা বোর্ডের চীফ স্কুল ইন্সপেকট্রেস মিস মালতী চৌধুরী এম-এ, বি-টি। কিন্তু আজ? আজকের রবিবারের সকালে, কোথায়ও ছুটবেন না মালতী চৌধুরী, অস্থির হয়ে ঘড়ি দেখবেন না বার'বার, থেকে থেকে তাড়া দেবেন না ঝি-চাকরগুলোকে। আজ যেন সবারই ছুটী। আজ অলস-মন্থর হয়ে যাবে তার আটত্রিশ বছরের পুরানো মনটি। গড়িয়ে গড়িয়ে চলবে তার ঝি-চাকর-পরিবৃত ক্ষুদ্র সংসার। আজ চুপচাপ করে দু-দণ্ড বসতে তার আপত্তি হবে না এতটুকু—মনটাকে একটা ছাড়া-পাওয়া পাখীর মত উড়িয়ে দিলে ক্ষতি হবে না কিছু।

চেয়ারে বসে সামনের নীল পর্দাদেওয়া জানালাটার দিকে চেয়ে ছিলেন মালতী চৌধুরী। চোখের সামনে গোটা দুনিয়াটা ঢুকতে যেয়ে হঠাৎ নীলপর্দার গায়ে ঠোক্কর খেয়ে লুটিয়ে পড়েছে। এক কোণা দিয়ে রোদ-ঝলমল আকাশের এক ফালি, একখানা জলরঙে আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপের মত দেখা'চ্ছে। উপরের আকাশে কুমকুমের টিপের মত কয়েকটা শঙ্খচিল মুঠো মুঠো সোনা-রোদ ডানায় মেখে নিয়ে উড়ছে ঘুরে ঘুরে। শাদা বরফের চাই-এর মত ক' টুকরো মেঘের টুকরো ভাসছে আনমনে।

মিস্ মালতী চৌধুরীরও মন উড়লো। রবিবারের ছুটীর সকালে মনটা আজ ছুটী পেয়ে উড়ে চললো কোলকাতার মার্লিন পার্কের একখানা নিস্তরঙ্গ ঘর থেকে—কোলকাতা, বাংলা শেষে গোটা ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে আরও দূরে—সুদূর পূর্ব-পাকিস্থানের রাজধানীতে। পথে পাহাড় নদী সমুদ্র লোকালয় শস্যক্ষেত্র, হাট-বাজার কিছুই দেখলো না মিস্ মালতী চৌধুরীর মন। থামলো না পাসপোর্ট আর কাষ্টম কর্তৃপক্ষের অপেক্ষায়—শুধু থামলো গিয়ে ঢাকা বি, টি কলেজের কাছে।

এগার বছরের ফেলে-আসা স্মৃতি পার হয়ে যেতে মিস্ মালতী চৌধুরীর এগার বছর লাগলো না—লাগলো মাত্র এগার সেকেণ্ডের কয়েকটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ।

ছেলেবেলাতেই বাবা-মা মারা গিয়েছিল মালতী চৌধুরীর। তখনও নামের পরে কিছু লেখার মত সঞ্চয় হয়নি। নামের আগে শুধু একটি কথা 'কুমারী' সলজ্জ ভীরু দীপের মত টিম্-টিম্ করে জ্বলতো আজকের স্মার্ট 'মিসের' জায়গায়। বাঁকা-চোরা অক্ষরে স্কুলের খাতায় তখন লিখতেন "কুমারী মালতী চৌধুরী কেলাস এইট"। দাদা বোনকে স্কুল-কলেজ, তারপর ইউনিভারসিটির ক্লাসগুলো পর পর ঘুরিয়ে আনলেন। মালতী চৌধুরীর নামের আগে থেকে ব্যাঙাচির লেজের মত 'কুমারী' খসে গিয়ে, নামের শেষে জমা হতে লাগলো একে একে বি-এ, এম-এ।

তারপর হঠাৎ একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জা পেলেন মালতী। গডরেজ আলমারীর গায়ে আটকানো আয়নায় পূর্ণাংগ ছায়া প্রতিফলিত হোল মালতী চৌধুরীর। ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে চকিত পায়ে এসে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর বুকের পর' থেকে শাড়ীর আঁচলটা অবহেলা ভরে সরিয়ে দিতেই বিস্ময়ে লজ্জারুণ হয়ে উঠলেন। কোন ফাঁকে শীতের বুড়ো চাদরটাকে সরিয়ে সারা দেহে বসন্তের অথিতিরা এসে ঠাঁই করে নিয়েছে, সরস্বতীর দেউলে বসে তা যেন তাঁর দেখারই অবসর হয়নি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন নিজেকে।

থ, মুখ, চিবুক, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, বাহু, বক্ষ, যৌবনের দূতগুলো যেন সুযোগে হৈ-হৈ করে জেগে উঠে বললে, "আমরা সব বসন্তের চরা আসর সাজিয়ে বসেছি, এবার তুমি তোমার পালা শুরু করো।"

লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলেন মালতী চৌধুরী। কিন্তু মন বলো না। সে ফিরিয়ে আনলো ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ঘটনার হীরে মানিক। তাই বুঝি অনিমেষ বাবু লেকচার দেবার সময় অবাক হয়ে তাকান মালতীর মুখে, বুকে, চিবুকে, চোখে। নিজের চোখে চোখ রেখে মায়া লাগে মালতীর। স্বপ্ন-আঁকা চোখ দুটি যেন দুটি বিরহী পারাবত, শ্রান্ত পৃথিবীর কলকোলাহলকে পাশ কাটিয়ে ছাদের নিভৃত কার্নিশের কোণে ধ্যানমগ্ন। কিন্তু মালতীর চোখ মেয়ের মুখ। আর দশটা মেয়ের মুখ, চোখ, বুক চোখের সামনে টেনে আনলেন মালতী। দাঁড় করালেন নিজেকে তাদের পাশাপাশি। বিচার শুরু হোল কে বড়। নিজের সু-ডৌল মুখ, চিবুক, সুপুষ্ট উদ্ধত যৌবনের বুক আরও একবার দেখে নিলেন মালতী সামনের আয়নায়। কিন্তু রায় তো আগেই দিয়েছেন ইউনিভারসিটির তরুণ অধ্যাপক অনিমেষ রায়। তার চোখ তো স্পষ্টই বলছে মালতী, তোমার রূপ আমার চোখ জুড়িয়েছে, তোমার সুষমায় আমার মন ভরেছে। আমি মুগ্ধ—মন্ত্রমুগ্ধ।

তারপর লাইব্রেরীতে, সিঁড়িতে, রাস্তায়, পার্কে, সিনেমায়, গ্যালারিতে, রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে দেখা হোল—আলাপ হোল মালতী চৌধুরীর সাথে অধ্যাপক অনিমেষ রায়ের। ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে পাকা কথাও হয়ে গেল। বি, টি পাশ করলেই বিয়ে হবে অনিমেষ রায়ের সাথে মালতী চৌধুরীর। মাঝখানে কয়েকটা মাসের অবসর মাত্র।

মালতী চৌধুরী বি, টি, কলেজে ভর্ত্তি হোল—সীট পেলো লেডিজ হোষ্টেলে। পড়ন্ত বিকেলে হোষ্টেল-বাড়ীটার অপজিট ফুটপাতে এসে দাঁড়াতেন। সুদর্শন অধ্যাপক অনিমেষ, এপার থেকে নেমে যেতেন সুদর্শনা মালতী চৌধুরী। তারপর পড়ন্ত বিকেলে টুপ-টুপ করে শিউলির মত খসে পড়া কবুতর-সন্ধ্যায়। কোন এক নির্জন স্থানে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতো মালতী চৌধুরী আর অনিমেষ রায়। অনিমেষের মুখে কবিতার ফুলঝরি তৈরী হোত। মালতীর গলায় মিহিসুরে বাজতো ছায়ানট অথবা বেহাগের দুই-এক কলি। ঘড়ির ডায়ালে কালের আয়ু গড়িয়ে গড়িয়ে যেত সাত-আট-নয় আরও। তারপর ফিরে যেত যে যার বায়গায়। ঘুমুতেই চোখের তীরে স্বপ্নের মত নেমে আসতো মালতীর কাছে অনিমেষ ; আর অনিমেষের কাছে মালতী। মধু স্বপ্নে দু'জনের রাত শেষ হোত দুই বিছানায়।

একদিন কিন্তু রাত শেষ হোল দুঃস্বপ্নের ডাকাডাকিতে। '৪৭ সালের ইতিহাস-কলঙ্কিত ঢাকার রক্তমাখা সকাল। রাজপথের কালো এ্যাসফলটের বুকে সাদা-কালো মানুষের রক্ত ফিনকি দিয়ে লাল আলপনা দিচ্ছে। মানুষের হাত রঞ্জিত হচ্ছে মানুষের রক্তে। পাড়ার আতুল ছেলেমেয়েরা রাস্তা ছেড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে ভয়ে ভয়ে। কুকুর বিড়াল পর্যন্ত যেন ভয়ে রাস্তায় বের হয় না। শুধু ক্ষ্যাপা কুকুরের মত মানুষগুলো মারণোল্লাসে থেকে থেকে বীভৎস চীৎকার করছে। বুড়োখোকারা বললে—স্বাধীনতা এসেছে।

মুসলমান-প্রধান পূর্বপাকিস্থানের রাজধানীতে হিন্দুরা নাকি বৈরী। তাই শুরু হয়েছে বৈরী-নিধন যজ্ঞ। কিন্তু বাঙালী মুসলমানেরা স্বীকার করল না এ কথা। অবশ্য প্রতিবাদও করেনি। হয়ত সে শক্তিও তাদের ছিল না। তাই প্রাণ ভয়ে ট্রেণে, হাঁটাপথে, প্লেনে, দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে দেশী মানুষেরা। তিন দিন আটকা পড়ে রইল মালতী চৌধুরী আর বি, টি হোষ্টেলের একদল হিন্দু মেয়ে। সমস্ত যোগসূত্রহীন যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী। স্কুল-কলেজ অফিস-আদালত প্রাণের ভয়ে দরজা বন্ধ করেছে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য। রাস্তায় রাস্তায় কারফিউ আর মিলিটারীর টহল। সমস্ত রাজধানী কবরের মত ঘুমন্ত নির্জ্জীব। মৃত্যুর হাতছানি রাত্রিতে—সকালে, নির্জন দুপুরেও।

মৃত্যুর ছায়া লেডি হোষ্টেলের মেয়েদের মুখে। বিপদের ঘণ্টাধ্বনি লেডি হোষ্টেলের দোর-গোড়ায়। ভয়-বিবর্ণ এক নীল-ছায়া আস্তে আস্তে রং-এর প্রলেপ দিচ্ছে মালতী চৌধুরীর যৌবনদীপ্ত মুখে-চোখে। মনেও। সুদর্শনা, স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল মালতী চৌধুরী—বিবর্ণ পিঙ্গল কপিল। যৌবনদৃপ্ত হাত-পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জরার নির্জীবতা।

বন্দিনী সীতার মত আরও কয়েকটি মেয়ের সাথে মৃত্যুর প্রহর গুণছে মালতী চৌধুরী। দূর থেকে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে আসছে মৃত্যুযজ্ঞের তাণ্ডব গর্জন। আসছে না শুধু কেবল এই হতভাগিনী জনকনন্দিনীদের উদ্ধার করতে কোন রামচন্দ্র বা তার কপিসেনা-বাহিনী। তবুও আশার প্রদীপ ভয়ে ভয়ে জ্বলছিল মালতীর বুকের আড়ালে—অনিমেষ আসবে। অনিমেষ নিশ্চয়ই মালতীকে উদ্ধার করতে ছুটে আসবে!

কিন্তু চতুর্থ দিনের সকালে, সরকারী সেনাবাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন, না রামচন্দ্র নয়, অনিমেষও নয়,—এলেন কয়েক জন ভলেণ্টিয়ার। উদ্ধার পেলেন বন্দিনীরা, অক্ষত দেহে এবং সম্মানেই। পথে আক্রমণও হয়েছিল দু-দুবার, কিন্তু ভলেণ্টিয়ারদের বুদ্ধির বিচক্ষণতায় তারা প্লেনে চড়া পর্যন্ত নিরাপদই ছিলেন।

এয়ারপোর্টে এসেও সন্ধানী-দৃষ্টি দিয়ে অনিমেষকে খুঁজেছিল মালতী চৌধুরীর চোখ। কিন্তু রামচন্দ্রের মত দুঃসাহসী সেই স্বেচ্ছাসেবকগুলি ছাড়া আর কোন প্রিয়জনকে দেখা গেল না। মুহূর্তে সীমাহীন কৃতজ্ঞতা আর ভালবাসায় নুইয়ে পড়লেন অন্যান্য মেয়েদের সাথে মালতী চৌধুরী। ধন্যবাদের মত ভাষা জানা ছিল না কারও। শুধু ভিজে চোখে—আর ধরা গলায় মালতী চৌধুরী জিজ্ঞাসা করলেন—বন্ধুর মত আপনারা, প্রিয়জনের চেয়েও বেশী, কিন্তু আপনাদের পরিচয় এখনও জানা হোল না।

হাসিমুখে উত্তর দিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবকদের একজন—আমাদের আবার পরিচয় কি। আমরা শুধু ভলেণ্টিয়ার।

প্লেন উড়ে চলে এলো, প্যারিস থেকে লণ্ডনে নয়, ঢাকা থেকে কোলকাতায়। এক নগর থেকে অন্য নগরে, ঝড়ের হাওয়ায় উড়লো ক্যালেণ্ডারের পাতা। আবর্ত্তিত হোল দিন-মাস-বছর। পুরানো দিন চলে গেল। নতুন দিন এসে নতুন আস্বাদ রেখে যায়। পুরানো দিনের অনেককে খুঁজে পেয়েছেন—আবার হারিয়েছেনও অনেককে। মাঝে মাঝে শুধু সেই অজ্ঞাত পরিচয় স্বেচ্ছাসেবকদের কথা মনে হোলে মনটা ভারী হয়ে উঠতো-। তাদের ঋণ অপরিশোধ্য।

কিন্তু পুরানো সে দিনগুলোকে ভুলতে চান, জীবন থেকে মুছে ফেলতে চান মালতী চৌধুরী। কিন্তু ভুলতে পারেন না। ভুলতে পারেন না সেই ভলেণ্টিয়ারদের। আর? আর অনিমেষকে। ভুলতে পারেন না সেই সন্ধ্যা, যেদিন অনিমেষ আর তার সন্ত-বিবাহিতা স্ত্রীকে কলেজ ষ্ট্রীটে একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকতে দেখেছিল। অনিমেষের গায়ে গরদের পাঞ্জাবী, পরনে লাল জরিপাড় গিলে-করা ধুতি। পায়ে হলুদ রংয়ের চকচকে পাম্পশু। অনিমেষের স্ত্রীর লাল বেনারসী—কপালে শিশুসূর্যের মত লাল সিঁদুর সব মিলিয়ে যেন এক উদ্ধত সন্ধ্যার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই দোকানেই কাপড় কিনছিলেন মালতী চৌধুরীর বন্ধু মিস্ নির্মলা দের জন্ম। মালতী দেখেছিল, অনিমেষদের গভীর ভাবেই দেখেছিল। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিল কাপড় কেনা বন্ধ রেখেই।

সেই নিঃশব্দতা ভঙ্গ করেননি মিস মালতী চৌধুরী। তাই ভাই-এর সংসারের কলকোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মালিন পার্কের এই ফ্লাটে এসে একাকী বাস করছেন ঝি-চাকর পরিবৃত হয়ে। ইউনিভার্সিটির ছাত্রী, যৌবন-বন্যায় ভেসে-যাওয়া একটা ফুলের মত মালতী চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে—মৃত্যু হয়েছে অনিমেষের বিয়ের সাথে সাথে। আজ যে বেঁচে আছে তার নাম মিস মালতী চৌধুরী এম-এ, বি-টি, চীফ ইন্‌সপেকট্রেস অব স্কুলস। তার গায়ে ফুলহাতা ব্লাউজ, পরনে সাধারণ একটা মিলের শাড়ী, পায়ে পুরুষালি সু আর হাতে লেডিজ ছাতা। মনে আজ তার মরুভূমির রুক্ষতা। দেহে যৌবন-বিদায়ের বাসি আবর্জনা আর চোখে সন্দেহ, সমালোচনা আর অন্ধকার সমাসন্ন ভবিষ্যৎ। পাড়ায় তার রুক্ষ মেজাজের জন্য ভয় করে অনেক ছেলে-বুড়ো। বাসে বকুনি খায় অনেক ছোকরা কণ্ডাকটর—আর অফিসে কড়া ইনসপেকট্রেস বলে সবাই তটস্থ থাকে।

মিস মালতী চৌধুরীর আয়ের তুলনায় খরচ সামান্যই। কিন্তু পাড়ায় কৃপণ হিসাবে অনেকেই তার নাম প্রথমেই স্মরণ করে। বারোয়ারী ক্লাবের ছেলেরা ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলে জীবন-বিতৃষ্ণ এই আত্মকেন্দ্রিক নারীকে। চাঁদার খাতা নিয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, এমন বুকের পাটা খুব কম ছেলের আছে। প্রশ্নবাণে আর মহামূল্য উপদেশের বিনামূল্যে বিতরণ-ধাক্কায় ক্লাবের চাঁদা আদায়কারীরা চুপসে যায় মিস মালতী চৌধুরীর সামনে।

তাঁর এই অকারণ রূঢ় ব্যবহারে কে কি ভাবলো—তাতে তাঁর কিছু যায়-আসে না। কারও কোন সহযোগিতা তার প্রয়োজন নেই—তাই, সহায়তা করতে তিনি নারাজ।

মিস্ মালতী চৌধুরী—প্রৌঢ়া মালতী চৌধুরী একক, নিঃসঙ্গ রোমন্থন করছিলেন বিগত যৌবনের মালতী চৌধুরীকে। ঠিক এই সময় বুড়ো চাকর এসে পাশে দাঁড়ালো। ধ্যানভঙ্গ হো[ল] মালতী চৌধুরীর। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি বলবে নটবর?

কয়েক জন বাবু এয়েছেন মা, চাঁদা চান। নটবর চলে গেল

চাঁদা! খেঁকিয়ে উঠলেন নিজের মনে, কিসের চাঁদা! অকর্মা ছেলেগুলোর কাজকর্ম নেই, কেবল আড্ডা মারবে আর দুয়োরে দুয়োরে ঘুরবে চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে। টাকাগুলো নিয়ে কেবল বাজে খরচ। চাঁদা তুলে এই বারোয়ারী হরির লুঠ বন্ধ হওয়া উচিত।

তবুও বিরক্তি ভরে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন মালতী চৌধুরী। বাইরে থেকে কলকণ্ঠে কয়েকটি যুবকের গলার আওয়াজ ভেসে আসছে। মনে মনে শাণানো কথাগুলো আর একবার মক্স করে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। যুদ্ধের আগে সৈনিকের প্রস্তুতি। যুবকগুলি হাত তুলে নমস্কার করলো, কিন্তু প্রত্যুত্তরে নমস্কার করলেন না মালতী। আগন্তুকদের মধ্যে একজন ফিসফিস করে বললে, অপব্যয় হোল নমস্কারগুলো, একটা কানাকড়িও দেবে না, যা হাড়কেপ্পণ।

ঝাঁঝালো গলায় প্রশ্ন করলেন মালতী—আপনারা?

কে একজন উত্তর দিলো সমাজসেবা-সংঘ থেকে আসছি।

—তা আপনারা কে? রুক্ষ হয়ে উঠেন মালতী চৌধুরী। মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে আগন্তুক ছেলেগুলি। কেউ আবার ফিস ফিস করে বললে বোধ হয় সেক্রেটারী বা প্রেসিডেণ্ট কাউকে খুঁজছে।

নীরবতা ভঙ্গ করে একটা তুপোড় ছেলে সবিনয়ে বললে—আমরা মানে—আমরা সবাই ভলাণ্টিয়ার্স।

ভো-লা-ণ্টি-য়া-র! নিবে গেলেন মালতী চৌধুরী। এক মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন তিনি। ত্রস্তপায়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে নটবরকে বললেন—বাবুদের জন্ম চা নিয়ে আয় খুব তাড়াতাড়ি। ফিরে এসে যুবকগুলিকে বললেন—বসুন, আপনারা। ছেলেগুলি অবাক হয়ে গেছে। বিস্মিত হয়ে ভাবছে এ কোন মালতী চৌধুরী!

মন্ত্রমুগ্ধের মত মালতী চৌধুরীর সামনে বসলে সবাই। চা এলো, সংগে আনুষঙ্গিকও এলো। মালতী নিজ হাতে কাপে কাপে চা ঢেলে দিলেন। প্রত্যেককে অনুরোধ করলেন চা খেতে। তারপর ঘরের ভিতর চলে গেলেন ত্রস্তপায়ে। পর মুহূর্তে দশ টাকার দু'খানা নোট হাতে করে বের হয়ে এসে বললেন—সামান্ত কিছু দিলাম, ভলেণ্টিয়ার্স; আমার আন্তরিক contribution হিসাবে গ্রহণ করুন।

While science is undoubtedly making spectacular progress, most of what may become the commercial technology of tomorrow is still in the blueprint stage today. —*Paul A. Baran*

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## হিমানীশ গোস্বামী

**এডনমোর রোড, জুলাই—অক্টোবর ১৯৫২**

Thou art in London—in that pleasant place,
Where every kind of mischief's daily brewing.

—Byron

আমি যে বাড়িতে উঠে গেলাম, সেটা বলতে গেলে পাশের পাড়াতেই। ছিলাম উত্তর কেনসিংটনে, চলে গেলাম পশ্চিম কেনসিংটনে। একটুর জন্ম দক্ষিণে যাওয়া হ'ল না। দক্ষিণ কেনসিংটনের মতো সম্মান এবং নামডাক নেই, কিন্তু পাড়াটা বেশ ভালই লাগলো। রাস্তার নাম এডনমোর রোড, কেনসিংটন হাই স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে একটু নিরালায়। কোলাহল কম, যদিও কিছু দূর দিয়ে চলে গেছে রেলের লাইন—তার আওয়াজ পাওয়া যায় কান খাড়া ক'রে রাখলে। ইংল্যাণ্ডে সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় এই সমস্ত পাড়া এবং তার পরিবেশ থেকে। পাড়ার সঙ্গে ভাষারও একটা যোগাযোগ রয়েছে। বার্ণার্ড শ' তাঁর পিগম্যালিয়নএ দেখিয়েছেন যে কেবল পাড়া নয়, প্রতিটি রাস্তার লোকের উচ্চারণ থেকে তার জন্মস্থান বলে দেওয়া সম্ভব। ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে এই পাড়ার কৌলীন্য বেড়ে গেছে অনেকখানি বেশি। তার পর প্রথম এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এ ব্যাপারে যদিও উন্নাসিকতা কমে গেছে, মোটামুটি সামাজিক সাম্যের দিকে দেশ এগিয়েছে। আজকাল আয়ের অসাম্য প্রায় দূর হ'য়েছে। বড় বড় ব্যবসাদারেরা অবশ্য একটি শ্রমিকের চাইতে অনেক বেশি টাকা রোজগার করে থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক যাঁদের বলা হ'ত মধ্যবিত্ত এবং শ্রমিক, তাঁদের আয় এখন সমান। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আয় এখন মধ্যবিত্তদের চাইতে বেশি। অর্থাৎ শ্রমিকেরাই এখন মধ্যবিত্ত হ'য়ে পড়ছেন—স্কুল-টিচার, অধ্যাপক, বৈজ্ঞানিক ইত্যাদিরাই অনেক কম আয় করছেন শ্রমিকদের চাইতে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। যে সমস্ত লোকেরা রাজমিস্ত্রী ব'লে পরিচিত তাদের শিক্ষার বালাই যেটুকু আছে, তাতে তারা নাম সই করতে পারে এবং সস্তা, সহজ ভাষায় লেখা খবরের কাগজ পড়তে পারে, এমন লোকের আয় দৈনিক তিন পাউণ্ডেরও বেশি। আর একজন কেরাণীর আয় দৈনিক এক পাউণ্ডের কাছাকাছি। একজন কেরাণীকে কেবল ভাল শিক্ষাই পেতে হ'য়েছে খরচ করে তা নয়, তার তথাকথিত সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশি হওয়ার ফলে তার পোশাক এবং পারিবারিক খরচ অনেক বেশি হবার কথা। এক কথায় বলতে গেলে বৃটেনে শ্রমিকেরা অনেক বেশি আয় করে, অনেক কম চিন্তা করে এবং মাইনে বাড়ানোর জন্তে ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেয়, কমিউনিষ্টদের ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেয়। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে তারা কমিউনিষ্টদের মোটেই ভোট দেয় না। নিজেদের মাইনে বাড়ানোর জন্ম তারা সর্বদা ধর্মঘট করতে প্রস্তুত এবং ধর্মঘট করেও। তারা তখন বলে, ক্যাপিটালিষ্টরা খারাপ, কিন্তু বৃটিশ সৈন্ম যখন আফ্রিকার স্বাধীনতা আন্দোলন দমনের জন্ম ব্যাপক ভাবে নরহত্যা করে তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রায় করে না বা সে ব্যাপারে ধর্মঘটও করে না। এই স্বার্থপরতা শ্রমিকদের পক্ষে অন্যায় এবং স্বাভাবিক। যখন তারা ধর্মঘট করে তখন তারা কেবল নিজের স্বার্থই দেখে। অবশ্য ট্রেড ইউনিয়নগুলি গণতান্ত্রিক মত অনুসারেই চলে। কিন্তু মাইনে বাড়ানোর জন্ম ধর্মঘট করবো না এমন কথা কেউ বলে না! বৃটিশ সৈন্মের অত্যাচারের দৃশ্যের ফোটোগ্রাফ একমাত্র একটি পার্টির কাগজ ছাড়া আর কোথাও ছাপে না। আর সে কাগজের বিক্রির সংখ্যা এতই কম যে তাদের প্রতি দিনই ভিক্ষে করতে হয়। কয়েকশো বছরের বৃটিশ ইতিহাস হ'ল বিদেশে ডাকাতি লুঠতরাজ এবং নরহত্যার ইতিহাস। স্বদেশে মোটামুটি তারা গণতান্ত্রিক কিন্তু বড় বড় লোকেদের, বিশেষ ক'রে রাজপরিবার সম্পর্কে তাদের কী আগ্রহ! এই মধ্যযুগীয় অবস্থা কেমন করে চলে তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনি। অনেকেই এই ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, কিন্তু কিছুমাত্র সুরাহা হয়নি। আমাদের দেশে দেশী রাজারা বিলুপ্ত হলেন এক দিনে, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের মোটেই দুঃখ হয়নি। ইংরেজরা নিজেদের রাজাহীন কল্পনাও করতে পারে না।

অবশ্য ইংরেজ রাজার ক্ষমতা নেই। রাজারও নেই, রাণীরও নেই। ক্ষমতা নেই কিন্তু খরচ রয়েছে। রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ, স্বামী ডিউক অব এডিনবরা, পুত্র চার্লস, কন্মা অ্যান এদের প্রচুর ভাতা দেওয়া হয়। তার জন্ম কোনো রকম আয়কর দিতে হয় না। কেবল তাই নয় রাজবংশের প্রচুর লোকের নানা রকম ভাতা দেওয়া হয়। এ ছাড়া বিরাট অফিস রাখতে হয় তারজন্তও তো খরচ অনেক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বৃটেনে অনেক আছে বটে, কিন্তু কতকগুলো খারাপ দিকও আছে। আইনত প্রেসের স্বাধীনতা বা বাকস্বাধীনতা আছে—কিন্তু প্রেসের

অসুস্থ কর্মচারী
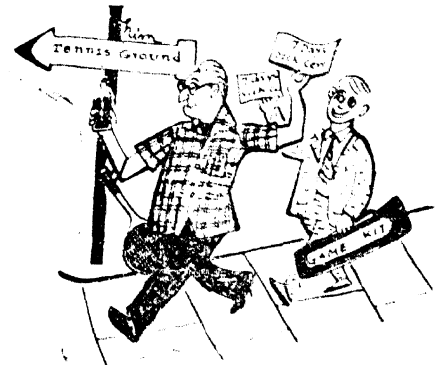
মালিক আছে—যে প্রেসের মালিকের মতের বিরোধিতা করা সম্ভব নয়। দেশের স্বার্থ এবং মালিকের স্বার্থ বলতে একই কথা বোঝা যায়। খবরের কাগজে বড়লোকদের পাপ কাহিনী বেরোয় না। আদালতে বিচার হ'লেও তা সব সময়ে প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয় না। কেবল বড়লোক, লর্ড, ডিউক ইত্যাদিরাই ও রকম সুযোগ সুবিধে পেয়ে থাকেন। সাধারণ লোকের জন্য একরকম বিচার, অ-সাধারণ লোকদের (অর্থাৎ টাকা এবং বংশ গরিমা যাদের আছে) জন্য আর একরকম বিচার। সমস্ত মানুষই ভগবান একভাবে সৃষ্টি করেছেন ব'লে শোনা যায়, কিন্তু পোশাক অনুসারেই তাদের মর্য্যাদা দেওয়া হয়। খবরের কাগজের প্রপাগাণ্ডার ফলে রাজপরিবারকে অনেকেই একটা অলৌকিক ব্যাপার মনে করে। আর সাধারণ অশিক্ষিত লোক খবরের কাগজে যখন চিঠি লেখে, (Woman পত্রিকায় প্রকাশিত) প্রায়ই ভাবি বাকিংহাম প্যালেসের কর্মচারি হওয়া বেশ মজার। আপনি গর্বিত ভাবে ভাবতে পারেন যে আপনি সেখানে না থাকলে প্রিন্সেস মার্গারেট ব্রেকফাষ্টের সময় সেদ্ধ ডিমটি খেতে পারতেন না। তখন খবরের কাগজও সে চিঠি ছাপে—যাতে এরকম আরো চিঠি তাদের কাছে আসে। কাগজে নাম ছাপানোর জন্য ইংরেজ কেন, বোধ হয় পৃথিবীর সর্বত্র লোকেদের দুর্বলতা।

কেবল ব্রেনিম ক্রেসেন্টের পাড়া নয়, ওয়েষ্ট কেনসিংটন নয়—এমন কি ভারতবিখ্যাত ইষ্টএণ্ড পর্যন্ত সাধারণ লোক আজ অসাধারণ রকম আয় করছে। অর্থাৎ যারাই হাতুড়ি ধরতে পারে, দেয়ালে বা কাঠে পেরেক ঠুকতে পারে, ডিশ পরিষ্কার করতে পারে, বোঝা বইতে পারে। এদের সামাজিক পরিবেশ যুদ্ধের আগে ছিল দুর্দশাময়—যুদ্ধের পরে তারাই এখন সবচেয়ে বেশি খরচ করতে পারে। তারাই ছুটিতে যায় দক্ষিণ ফ্রান্সে, ইটালিতে ব্ল্যাক পুলে বা নরোয়েতে। কেরাণী এবং অধ্যাপকেরা বেশির ভাগ যায় দেশের মধ্যে ব্রাইটন বা ক্ল্যাকটন অন দি সীতে! তবু ইষ্ট এণ্ডের লোকেরা কিম্ভূত পোশাক পরে, খারাপ বাড়িতে থাকে, আর বিদেশীরা ভাবে তারা বুঝি সবাই গরীব। আজকাল হাল পালটেছে—এখন বলা চলে তারাই সবচেয়ে অবস্থাপন্ন। কিন্তু বহুদিনকার অভ্যাসের জন্য তারা স্বভাব ছাড়তে পারে না। ইষ্ট এণ্ডে আজকাল লোকে অর্থাভাবের জন্য থাকে তা নয়, তাদের কর্মক্ষেত্র সে পাড়াতে বলেই থাকে। বহু লোক কর্ম উপলক্ষে সে পাড়াতে গিয়ে বসবাস করেন—কেরাণী, ছাত্র, অধ্যাপক, এমন কি বিরাট যাদের আয় তারা—হোটেলের বেয়ারারা পর্যন্ত। একটি হোটেলের বেয়ারা মধ্য লণ্ডনে সপ্তাহে ত্রিশ চল্লিশ পাউণ্ড আয় করতে পারে—একই তারা বকশিস পায়। ইষ্ট এণ্ডে একটা ইহুদী দোকান আছে, খাওয়া যায় সেখানে—তার দাম এমনি বেশি যে আমাদের মেজো ব্যানার্জির মত অনুসারে, সেখানে কেবল চাকর বাকরেরাই এত খরচ করে খেতে পারে। কোনো ভালো পোশাক দোকানে দেখে এসে মেজো ব্যানার্জি বলতো, পঁচিশ পাউণ্ড দাম! আমাদের পক্ষে কেনা সম্ভব নয়—কেবল চাকর-বাকরেরাই ওগুলো কেনবার ক্ষমতা রাখে।

ওয়েষ্ট কেনসিংটনের এভনমোরের বাড়ীওয়ালার সঙ্গে আমার কোনোরকম সম্পর্ক ছিল না। মিষ্টার পবিত্র বসুর নামে ছিল ফ্ল্যাট। সবসমেত চারজনের থাকবার উপযোগী চারখানা ঘর দোতলা এবং তিনতলা মিলে। লোকও চারজন তবে একখানাকে ডাইনিং রুমে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। মিষ্টার বোস ছাড়া দুজন যারা থাকতো তারা আমারই বয়সী। একজন বাঙালী, নাম বল্টু; আর অন্যজন সিংহলী—নাম কার্লো। এরা দুজনেই ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করতো।

কার্লো বলতো, সুখ কাকে বলে বুঝতে পারছি-ইণ্ডিয়া হাউসে কাজ করে। সকাল সাড়ে নটায় অফিসে যাবার কথা, যাই দশটার পর, তারপর কোট খুলে কাজে হাত দিতেই চা-এর সময়। সাড়ে দশটা থেকে সওয়া এগারোটা চা-এর সময় আইন সঙ্গতভাবে নয়, তবে কেউ কিছু বলেনা। সওয়া এগারোটায় অফিসে এসে একটা সিগারেট খেতেই পৌনে বারোটা বেজে যায়। তারপর একখানা ফাইল ওলটাতে না ওলটাতে লাঞ্চে যাবার তোড়জোড় সুরু হয়, হাত মুখ ধোওয়া তারপর ক্যানটিনের দিকে দ্রুতপদ বিন্যাস।

লাঞ্চ শেষ হবার কথা দেড়টায়, কিন্তু হয়না—কারণ 'বস'রা (boss) লাঞ্চের সময় একটা থেকে দুটো—অতএব দুটোর আগে ক্ষতি নেই। এসে একখানা কাগজ হাতে নিয়ে ফাইল খুঁজতে বেরিয়ে যাই। গিয়ে দু চারজন বন্ধুর সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ ভাল তা বোঝাই, ফিরে এসে একে ওকে টেলিফোন করি চায়ের সময় হয়, তিনটে বাজে। তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে চা এর টেবিলে রাজনীতি চর্চা করি সেখান থেকে বেরিয়ে একটু পোষ্ট অফিস যাই। ফিরে আসি যখন চারটে বেজে গেছে এই সময় একখানা চিঠি লিখি দেশে। তারপর পৌনে পাঁচটায় হাত ধোবার সময় পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় বাসের কিউতে দাঁড়াই।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, সবাই এমন করে কি?

কার্লো বলেছিল, সবাই তো চালাক নয়। কেউ কেউ ঠিক সময়ে আসে, সারাদিন হাঁদারামের মতো কাজ করে। আরে বাপু মাইনে যখন একই তখন কাজ বেশি করে লাভ কি! কার্লো আরো বলেছিল, কেবল তাই নয়—অসুস্থতার অজুহাতে বছরে তেরো সপ্তাহ ছুটি নেওয়া চলে—এর জন্য পুরো মাইনে দেওয়া হয়।

ইংল্যাণ্ড স্বাস্থ্যকর দেশ—কিন্তু ইণ্ডিয়া হাউসে সবচেয়ে বেশি লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেক সময় মনে হয় অসুস্থ না হলে ইণ্ডিয়া হাউসে কাউকে নেওয়া হয় না। তা ছাড়া কত রকমের যে ছুটি আছে তার ইয়ত্তা নেই।

এখানে বহু লোকেই আড্ডা মারে, বন্ধুবান্ধবদের ফোন করে, অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমন যে সুন্দর পরিবেশ, সেই পরিবেশ সহজে কেউ ছাড়তে চায় না। তবে শুনেছি দু' তিনজন লোক নাকি কাজ করে থাকেন। এঁরা অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের লোক—এঁরা প্রতি সপ্তাহে কয়েক লক্ষ টাকা মাইনে বিলি করেন খামে ভ'রে। যাঁরা কাজ করেন তাঁরা পান মাইনে, যাঁরা কাজ করেন না তাঁরা কি পান আলস্য ভাতা? আমার জানা নেই তাই মাইনে কথাটিই ব্যবহার করেছি। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের এই কয়েকজন না থাকলে সমস্ত ইণ্ডিয়া হাউস অচল হয়ে পড়তো। কার্লো আরো বলতো, Happiness is no longer enough—w

want more money। অর্থাৎ আর কেবল শুধু সহ্য হচ্ছে না—আরো টাকার প্রয়োজন। মাইনে বাড়ানোর জন্ত আন্দোলন করতো সে।

ইণ্ডিয়া হাউসে প্রায় বারোশো লোক মাইনে পেয়ে থাকেন। ভারতবর্ষের বিদেশী রাষ্ট্রদূত-ভবনগুলির মধ্যে এর চাইতে বেশি লোক আর কোথাও মাইনে পাননা। ভারতবাসী হিসেবে আমরা সব সময়েই গর্বিত বোধ করতাম—তার কারণ এই বারোশো লোক—এত বড় রাষ্ট্রদূত-ভবন আর কোথাও নেই।

এ সমস্তই কার্লোর কথা। আর কার্লোর কথা সব সময় সত্যি হ'তনা। তার মাথারও একটু দোষ ছিল আর তা সে জানতো। সে বলতো, মাথা খারাপ থাকবার অনেক সুবিধে।

সমাজতান্ত্রিক কার্লো লেবার পার্টির সভায় বক্তৃতা দিয়েছিল কবে একবার—অতএব সে সর্বদা উত্তেজিত হয়ে থাকতো। তার পকেটে লাল লিটারেচার ঠাসা থাকতো। সে বলতো ট্রটস্কির হত্যাকারীকে খুঁজে পেলে সে তাকে ইরেজার দিয়ে ঘ'সে তুলে দেবে এ পৃথিবী থেকে। কার্লোর সমস্ত ব্যাপারেই উত্তেজিত হবার অধিকার ছিল। একদিন ওর সঙ্গে রাস্তায় দেখা—দূর থেকে দেখেই বললো, হ্যাম্পস্টেড স্টেশনের পাশের তামাকের দোকান থেকে কখনো সিগারেট কিনো না!

আমি বললাম, কেন? খুচরো নিয়ে গোলমাল করেছে কি?

—না তা নয়।

—তবে কি পুরোনো বাসি সিগারেট দেয়?

কার্লো বললো, না না খুব খারাপ ব্যাপার—সোস্যালিজম-এর অ—আ পর্যন্ত জানে না! আমাকে বলে কিনা ট্রটস্কি—মিটফিসিয়ান। হা—হা!

হ্যাম্পস্টেড স্টেশন এভনমোর রোড থেকে প্রায় পাঁচ মাইল।

আর একদিন বললো, আজ আর সহ্য হ'ল না। অফিসে গালাগাল করে এসেছি। আমাকে কাজ করতে বলেছিল—ইয়ার্কি নাকি? একি মামাবাড়ী পেয়েছো যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবো? আমি কি আর বুঝি না সব মতলব? আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ! কাজ!!

কার্লো আমাকে সোস্যালিজম বোঝাতো। বুঝতে না পারলে বলতো, বৃটিশ কমরেডরা বুঝতে পারে আর তুমি পারো না?

বকর বকর করে কত কি বলে যেত। কিন্তু সবচেয়ে চাঁচাতো রান্না করার সময়। এই বাড়ীতে আমাদের নিজেদের রান্না করতে হ'ত। কার্লো রান্না করবার সময় বাড়ী মাথায় করতো।

—র‍্যাশন কার্ড কোথায়? কই মাংস? দুদিনে সব মাংস ফুরিয়ে গেল? আজ তাহ'লে টিনের মাছ হবে? টিনের মাছ খেয়ে খেয়ে মুখ তো পচে গেল। আর ভালো লাগে না ছাই। কই পেঁয়াজ নেই দেখছি, সর্বনাশ হ'য়েছে, দোকান বন্ধ হয়ে যাবে যে!

চট করে দোকানে গিয়ে পেঁয়াজ নিয়ে আসে। তার পর বলে, ঐ যা: পেঁয়াজ তো ছিলই—নুণ নেই। না তাও আছে! নারকেল কোথায়? শুকনো নারকেল না হ'লে যে ছাই চলবে না!

কার্লো সমস্ত রান্নায় শুকনো নারকেল ছড়াতো। আমি বল্টু এবং মিষ্টার বোস ওর রান্নার সময় নজর রাখতাম। অনেক সময় ওর নারকেল দেওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্ত বল্টু এবং মিষ্টার বোস ওর উপর বলপ্রয়োগ করতেন। কার্লো ডাল, ভাত, মাংসে, মাছে, সমস্ত খাতে, এমন কি ফ্রুট স্যালাড-এ পর্যন্ত নারকেল না দিয়ে থাকতে পারতো না। বল্টু আর কার্লোর মধ্যে নানা ব্যাপারে ভাব ছিল, বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু রান্নার সময় তারা শত্রু হ'য়ে দাঁড়াতো। বল্টু বলতো, ফের যদি মাছে নারকেল দিয়েছ তো...

কার্লো বলতো, দেবনা কেন? আমাদের দেশে সমস্ত রান্নাতেই নারকেল দিয়ে থাকে। বল্টু বলতো, তা হ'ক। যাবণের দেশে কে কি খায় তার হিসেবের প্রয়োজন নেই। নারকেল দেবার দেবার বিরুদ্ধে আমরা তিনজন আছি—আর সপক্ষে আছ একা তুমি। কার্লো বললো, ঐ তো তোমাদের মনটা ডেমোক্রেসির কলে নষ্ট হয়ে গেছে। রান্না ব্যাপারটা মোটেই গণতান্ত্রিক নয়। ওটা একটা আর্ট।

মিষ্টার বোস প্রতিবাদ করতেন। বলতেন, গোলমাল করোনা। পাশের বাড়ীর লোকেরা কি মনে করবে? কিন্তু গোলমাল থামতো না। পাশের বাড়ীর লোকেরাও কিছু বলতো না। রান্নাটা আর্ট কিনা জানি না। তবে যে রাঁধে সে যে ডিক্টেটর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিছুটা আর্টিষ্ট তারা সবাই। অন্তের কথা তারা শুনতে স্বভাবতই নারাজ। বিশেষ ক'রে রেস্তোরাঁর রাঁধুনীদের কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে জর্জ অরওয়েলের প্যারিসের অভিজ্ঞতা। তাঁর বর্ণনা একটু তুলে দিচ্ছি—আশা করি লণ্ডন প্রসঙ্গে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কারণ লণ্ডনেও রেস্তোরাঁ আছে, আর প্যারিস থেকে লণ্ডনের দূরত্ব ওড়া পথে মাত্র দুশো দশ মাইল। জর্জ অরওয়েল লিখছেন:

রান্নাঘর আরো নোংরা। কথাটা বলার জন্তই বলা নয়, একেবারে সত্যি কথা এটি যে একজন ফরাসী পাচক স্যুপে থুথু ফেলবেই—অবশ্য যদি তা তাকে নিজে খেতে না হয়। সে একজন আর্টিষ্ট কিন্তু পরিষ্কার রাখা তার আর্টের বিষয় নয় বলা চলে সে বেশি নোংরা, কারণ সে আর্টিষ্ট। খাতকে চকচকে ঝকঝকে দেখানোর জন্ত নোংরাভাবে সেগুলো নাড়াচাড়া করতেই হয়। একটি মাংসের টুকরো (steak) যখন প্রধান পাচকের কাছে পরীক্ষার জন্ত আনা হয়, সে কখনো কাঁটা দিয়ে সে মাংসের টুকরোকে নাড়াচড়া
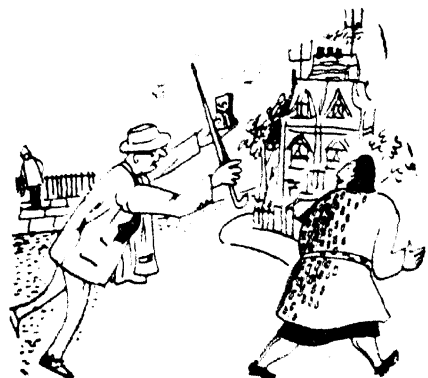
করে না। সে আঙুল দিয়ে সেটাকে উঠিয়ে থপ করে ফেলে দেয়, আঙুল ডিশের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে জিভ দিয়ে আঙুলটাকে চাটে—ঝোল কেমন হয়েছে বুঝবার জন্ত, আবার আঙুলগুলো ঝোলে ডুবিয়ে চাটতে চাটতে একটু দূরে গিয়ে ডিশটিকে দেখে। যেমন করে একজন শিল্পী দেখে তার তৈরী সৃষ্টিকে। তার পর এসে মাংসের টুকরোর উপর আঙুল দিয়ে আলতো ভাবে চাপ দেয়, তার মোটা লাল আঙুল, যা সে সকালে অন্তত একশো বার চেটেছে। যদি খাদ্যটা মনমতো হয় তাহ'লে সে একটা কাপড় দিয়ে ডিশ থেকে আঙুলের ছাপ ঘষে-মুছে দিয়ে ডিশটিকে ওয়েটারের হাতে তুলে দেয়। ওয়েটারের আঙুল ও ঝোলে লাগে, যে আঙুল সে সকাল থেকে হাজার বার তার ব্রিলিয়ান্টাইন মাখানো চুলের মধ্যে দিয়েছে। প্যারিসে যখনই দামি খাবার কেউ খায় তখনি বুঝতে হবে তার খাবার এমন ভাবে তৈরি হয়েছে। খুব সস্তা রেস্তোরাঁয় অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা—সেখানে খাবারের জন্ত এতখানি যত্ন নেওয়া হয় না। সেখানে কড়াই থেকে ডিশে কাঁটা দিয়ে খাদ্য ফেলা হয়। হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করা হয় না। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে যত বেশি দাম খাদ্যের তত বেশি নোংরা, ঘাম এবং থথু খেতে হয় খরিদ্দারকে।

জর্জ অরওয়েলের আরো অনেক বর্ণনা আছে প্যারিসের হোটেলগুলি সম্পর্কে। তবে একটি কথা বেশ বোঝা যায় যে, পাচক একজন শিল্পী। আমাদের কার্লোও ছিল শিল্পী। কিন্তু কার্লো অন্যকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কিছু করতনা—সে নিজের জন্যই রান্না করতো এবং ভাবতো তার নিজের যখন ভালো লাগে নারকেল দেওয়া খাবার, তখন অন্য সবাইকারও তা ভাল লাগতে বাধ্য। বহু ছবি আঁকিয়েদের মধ্যেও এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। যেন তাদের আঁকা ছবি ভাল লাগতেই হবে সবাইকে। যারাই তাদের আঁকা দেখে বলে না, ওহো কী সুন্দর! তারাই অসংস্কৃত। আর্টের বেলায় অসাধু হয়ে বলা হয়তো সম্ভব দু'-চারটে মিথ্যে কথা কিন্তু খাদ্যের বেলায় তা চলে না খাদ্য যে নিজেকে খেতে হয়।

অতএব কার্লোর বিরুদ্ধে লাগা গেল। নারকেল সমস্ত ডাস্টবিনে ফেলে দিতাম। ওখানে ডেসিকেটেড ককোনাট বলে শুকনো নারকেল পাওয়া যেত, প্যাকেটে করা। কার্লো নারকেল না পেয়ে ক্ষেপে যেতো—আমাদের গালাগাল করতো। আমরাও নীরব থাকতাম না।

অবশ্য পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থাতে ভেবে দেখেছি ঐ সামান্য ব্যাপার নিয়ে অসামান্য চ্যাচানোর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিলনা। আমার মনে হয়, মানুষ ঝগড়া করতে ভালবাসে, তাই তারা একটা না একটা বিষয় খুঁজে নেয়। কার্লোর সঙ্গে ঝগড়ার বিষয় ছিল রান্না এবং রাজনীতি, আমাদের বহু পরিচিত লোক আছেন যাঁদের সঙ্গে আমরা বলি বন্ধুত্ব আছে, তাঁদের সঙ্গে হয়তো সারাজীবন নানা বিষয়ে তর্কই করে এসেছি।

বল্টুর বান্ধবী ছিল একজন। ইংরেজ কিংবা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হবে—কখনো উৎসাহ প্রকাশ করিনি সে ব্যাপারে। তার নাম ছিল বারবারা। আমাদের বাড়ীতে সে প্রায় রোজ ডিনার খেত। খুব হৈ-হৈ করে গল্পগুজব করতো, ক্রমাগত সিগারেট টানতো, আর ব্রীজ খেলায় প্রচুর উৎসাহ প্রকাশ করতো। বারবারার জন্ত আমাদের মাংসের ব্যাশন এবং অন্ত সমস্ত র‍্যাশন কিছুটা কম পড়তই কিন্তু মিষ্টার বোস কিছু বলতেন না। মিষ্টার বোস অনেক এমন অত্যাচার সহ্য করতেন। সবচেয়ে বেশি একবার সহ্য করতে হ'য়েছিল, যেবারে আমরা এক অভিনেতা আর এক অভিনেত্রীর পাল্লায় পড়েছিলাম।

অভিনেতা এবং অভিনেত্রী দুজনেই বাঙালী—দুজনেই আমাদের সকলের অপরিচিত। এক দিন এসে হাজির—বল্টু কোথায়? বল্টু ঘোষ তখন ছুটিতে স্কটল্যাণ্ডে বেড়াতে গেছে—সে নাকি অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে এ বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে গেছে। দু'দিনের জন্ত। আমাদের কিন্তু বল্টু জানায়নি কিছু।

দু' দিনের জন্ত—অতএব মিষ্টার বোস বললেন থাকতে। দু' মাস হ'লেও মিষ্টার বোস অস্বীকার করতে পারতেন না। দু' দিনের জন্ত—কিন্তু দু' দিন আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। স্টেজে অভিনেতা যখন দশ মিনিট পরে দাড়ি-গোঁফ পরে এসে বলেন, দশ বছর পার হ'ল—বল কিবা সংবাদ তোমার। আমরা তখন সেটাকে মেনে নিই। আমরা ধ'রে নিই, এই দশ মিনিটে দশ বছর পার হ'য়ে গেল। অভিনেতার গলার আওয়াজ, চেহারা ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে আমরা বাহবা দিই। ভাল অভিনেতা বলে আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু যে অভিনেতা পোনের দিন একটি বাড়িতে এসে থেকে ভাণ করে যে মাত্র দু' দিন সে আছে, তাকে আরো বড় অভিনেতা বলতে হয়। অভিনয় শখ করে দেখতে গিয়ে আমরা পয়সা দিই—কিন্তু অভিনেতা শখ করে বাড়ীতে এসে জুটলে তার জন্য খরচ দিতে আমরা কুণ্ঠিত হই। হয়তো সেটা অন্যায়, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে ব্রেকফাস্টের সময় বেকন নেই, মাখন নেই, জ্যাম বা জেলি নেই দেখলে দুঃখ হ'ত আমাদের এবং ভাবতাম, কবে এই অভিনেতা এবং অভিনেত্রী বিদায় নেবেন। তাঁদের ভদ্রভাবে বাড়ির সদর দরজা দেখিয়ে দেবার প্রস্তাব করাতে মিষ্টার বোস আমাদের বলতেন, উঁহু! আমরা চুপ করেই থাকতাম। মিষ্টার বোসকে ব্যথা দিতে আমরা চাইতাম না। আমরাও অভিনয় করতে শিখলাম—প্রত্যেক দিন আমরা বলতে সুরু করলাম, আপনারা এখানে আছেন সে আমাদের ভাগ্য। এমন সুযোগ আর আমাদের জীবনে আসবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কার্লো বলতো, ওদের জীবনেও এমন সুযোগ আর জুটবে না। কার্লো রান্নায় নারকেল দেওয়াতে এক দিন অভিনেত্রী আপত্তি করেছিলেন—কিন্তু আমি এবং মিষ্টার বোস বলেছিলাম, নারকেল তো ভালই। প্রত্যেক রান্নাতেই নারকেল দেওয়া উচিত। নারকেলে ভিটামিন এ থেকে এস পর্যন্ত সমস্ত আছে। তা ছাড়া প্রচুর প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেটেড এবং ক্যালরি আছে। ক্যালরির পরিমাণ প্রায় হাজার পাঁচেক।

এই সমস্ত বক্তৃতা, দৈব না নারকেল কিসের ফলে জানিনা। পোনের দিন পর তাঁরা বিদায় নিলেন। কেন নিলেন জানি না—না নিলেও পারতেন। আমাদের কিছু অসুবিধে হ'ত—কিন্তু তাঁদের সান্নিধ্যে আসার আমাদের মনের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আস্তে আস্তে আমাদের সহ্যশক্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হ'য়ে উঠছিল। তাঁরা অমনভাবে না এসে পোনের দিন থাকলে আমাদের সহ্যশক্তি অত হ'ত কিনা সন্দেহ।

আমাদের এভনমোর রোডের ফ্ল্যাটটি অতি চমৎকার ছিল। এর ভাড়াও বেশ বেশি ছিল—মাসে ছত্রিশ পাউণ্ড। এর উপরে ইলেকট্রিক, গ্যাস ইত্যাদি মিলে আরো বেশ কিছু খরচ হ'ত, আর ছিল একজন ঝি। এই ঝিকে আমি কখনো দেখিনি। সে দুপুরে আসতো এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টার জন্ত সপ্তাহে চার পাঁচদিন। সে পেত মাসে ছ পাউণ্ড। বাসন ধুতো আর ঘর পরিষ্কার করতো। তার কাছে একটা চাবি ছিল ফ্ল্যাটের। সে কখন আসতো কখন যেতো কেউ জানতাম না। ঝিটি আরো চার পাঁচটি বাড়িতে কাজ করতো। লণ্ডনে ঝি পাওয়া বেশ কঠিন। আজকাল মেয়েরা অফিসে দোকানে, বাসে, ট্রেনে রেস্তোরাঁতে কাজ নিতে চায়। এই মেয়েরাই হয়তো আগে ঝি গিরি করতে পারলে খুসি হ'ত। কিন্তু ঝি-গিরি কাজটা আমাদের দেশের ঝিগিরির চাইতে অনেক কম কষ্ট সাপেক্ষ হলেও এ কাজের স্থিরতা নেই, উন্নতির আশা নেই। এর উপরে প্রায় সকলেই একটা না একটা কাজ পেতে পারে ব'লে অনেকের পক্ষেই ঝি রাখা কঠিন। তা ছাড়া খরচ বেড়েছে বলে অত মাইনে দিয়ে তাদের রাখার ক্ষমতাও খুব কম লোকেরই আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের সরকারী অফিসারদের কথা স্বতন্ত্র। এঁরা সপ্তাহে দশ বারো এমন কি পোনের পাউণ্ড পর্যন্ত বাড়ীভাড়াই পেয়ে থাকেন তা নয়, এঁদের চাকর, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে সবাই ওখানে যাবার জাহাজ ভাড়া পেয়ে থাকেন। ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্ত, বাড়ী গরম করবার জন্ত ইত্যাদি নানারকম অ্যালাউয়েন্স পেয়ে থাকেন। ফলে তাঁদের বাড়ী কেবল গরম থাকে তা নয়, থাকে সব-গরম। তা ছাড়া অনেক উচ্চপদস্থ অফিসার আছেন যাঁরা খুব সস্তায় মদ এবং সিগারেট কিনতে পারেন। এর ফলে তাঁদের চোখে লণ্ডন মনে হয় স্বপ্নের দেশপ্রাচুর্যের দেশ। এঁরা টেলিভিশন চালান বাড়ীতে, গাড়ি নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণে যান। মেজো ব্যানার্জি হয়তো বলতে পারতো, প্রায় চাকর-বাকরদের সমান স্ট্যাণ্ডার্ড।

এই সমস্ত অফিসারদের কথা বললাম এই জন্ত যে, এঁদের জন্তই কার্লোদের মতো বহু কেরাণী কাজ করতে প্রেরণা বোধ করে না। ইংল্যাণ্ডে সংগৃহীত ভারতীয় কেরাণীরা বাড়ীভাড়া পায় না, গ্যাসের খরচা পায় না, এমন কিছুই পায় না যে কাজ করবার প্রেরণা পেতে পারে। সম্মান তো নেই-ই। সপ্তাহে ছ' সাত পাউণ্ড মাইনে থেকে বাড়ীভাড়া দিতে এবং খেতেই পাঁচ পাউণ্ড খরচা হয়ে যায়। যা সামান্ত উদ্বৃত্ত থাকে তা দিয়ে হীন ভাবে জীবন যাপনই সম্ভব। সে জন্তই ব্লেনিম ক্রেসেণ্টের মতো অস্বাস্থ্যকর জায়গায় গাদাগাদি করে লোকে থাকে। সামান্ত পয়সা বাঁচানোর জন্ত কি অসামান্ত কষ্ট সহ্য করে। শারীরিক কষ্ট সহ্য করা হয়তো তবু সম্ভব, কিন্তু মানসিক কষ্ট সহ্য করা কঠিন। কারণ অফিসারেরা পাঁচ গুণ মাইনে পান বটে এবং ছুটিও প্রচুর তাঁদের, কিন্তু তাঁদের কাজ বলতে প্রায় কিছুই থাকে না। কেরাণীদের সঙ্গে একই কাজ করতে গিয়ে মাইনের এই বিরাট অসাম্য কেরাণীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে। এর কোনো একরকম সুরাহা হওয়া প্রয়োজন। কারণ যতই দিন যাবে ততই এরকম অব্যবস্থায় কাজের পরিমাণ কমে যেতে থাকবে।

অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে অফিসারদের বিশেষ কিছুই দোষ নেই। ভালোভাবে থাকা পরা সকলেরই কাম্য। তাঁরা তা পেলে বলবার কিছু থাকে না। কিন্তু ঐ নিয়মই ভুল—যে নিয়মে একদলকে মানুষ বলেই মনে করা হয় না। ব্যক্তিগত ভাবে অনেক ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে মিশেছি—প্রায় প্রত্যেকেই ভালমানুষ। তবে খারাপ লোকও দেখেছি। একজন অফিসারের ফ্ল্যাটে গিয়েছি বেড়াতে। সেখানে বেসিন থেকে গরমজল পড়ছিল বিরাট তোড়ে। গ্যাস জ্বলছে। সে জল বেসিন দিয়ে ড্রেন পাইপ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কোনো কাজে লাগছে না। আমি দেখে বললাম, কলটা বন্ধ করে দিলেই হয়? অফিসার বললেন, প্রয়োজন নেই—ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট গ্যাসের বিলের টাকা দেবে—পড়ুক গরম জল!

বিদেশী মুদ্রাসঙ্কট এরকম নানা অপচয়ের ফলেই হয়েছে।

এভনমোর রোডে যাবার অনেকদিন আগেই নাসের এবং কীবির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল টলবট রোডের একটি বাড়ীতে। সেখানে তারা থাকতো। নাসের আহমেদ ভারতীয়, কীবি অস্ট্রেলিয়ান। স্বামী এবং স্ত্রী। কীবি আমাকে বিলিতি নাচ শেখাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শিখতে পারিনি। ওদের সঙ্গে আমার খুব ভাব ভাব হ'য়ে গিয়েছিল। বেশ রসিক তারা। ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে কাউকে নেমন্তন্ন করা সম্ভব হয়নি আমাদের পক্ষে। এ বাড়ীতে তার সুযোগ পাওয়া গেল। এক শনিবার তাদের নেমন্তন্ন করলাম। কিন্তু এখনো মনে হ'লে কষ্ট হয়, কীবি সেদিন মোটেই খেতে পারেনি। দোষ আমার সবটা নয়—দোষ খানিক ছিল কার্লোর খানিকটা আমারও আর খানিকটা দুটো কাঁচা লঙ্কার।

আমার কাছে যখন কার্লো শুনলো দুজনকে নেমন্তন্ন করেছি—তাদের মধ্যে একজন অস্ট্রেলিয়ান মেমসাহেব, তখন সে একেবারে উন্মাদ হ'য়ে গেল। দুতিন দিন থেকে কেবলি বলতে লাগলো, আমাকে রান্না করতে দিও সব ঠিক হয়ে যাবে। বল্টু আমাকে বলল, খবরদার কার্লোকে রান্না করতে দিও না। ও সব মাটি করবে। বল্টু নিজেই রান্না করে দিত, কিন্তু কোথায় কাজ থাকায় বেরিয়ে গেল।

ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে গ্যাস বিস্ফোরণ

কার্লো রান্না করবেই এই ভয়ে আমি সমস্ত শুকনো নারকেল সরিয়ে ফেললাম রান্নাঘর থেকে।

কার্লো ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছিল নিশ্চয়। রান্নার সময় দেখি ওর ওভার কোটের পকেট থেকে এক বিশাল প্যাকেট শুকনো নারকেল এনে রান্নায় মেশাচ্ছে।

আমার কোন বারণ শুনলোনা।

মাংস ডাল তরকারী ও রান্না করলো।

ফৌবি আর নাসের এল বিকেলবেলা। নানারকম গল্প গুজব হ'ল। তারপর খাওয়ার পালা।

কার্লো খুব যত্নের সঙ্গে পরিবেশন করলো।

ভাত ডাল খাওয়া গেল কোনমতে। মাংস ও ডালই রান্না করেছিল কার্লো। কিন্তু দেখি ফৌবির চোখে জল।

ছুটো লংকার ঝাল। ফৌবির খাওয়া হ'ল না।

আমরা অত কাণ্ডের পর শেষ পর্যন্ত রেস্তোরাঁয় গেলাম। আমাদের পাড়ার রেস্তোরাঁ আমাদের বাড়ী থেকে কয়েক মিনিটের পথ। অডিয়ন সিনেমার দোতলায়।

কেনসিংটন হাই ষ্ট্রীট দিয়ে কিছুটা দূরেই কেনসিংটন গার্ডেন্স। হাঁটা পথে মিনিট পোনের। কেনসিংটন গার্ডেন্স পার হ'লেই আবার হাইড পার্ক। ছুটোই পাশাপাশি লাগানো পার্ক। বেজওয়াটার রোডের পাশ দিয়ে চলে গেছে টিউব ষ্টেশনের সারি।

একটা টিউব ষ্টেশান—নাম ল্যাংকাষ্টার গেট। তার কাছেই হাইর্ড পার্কে একটা কবরখানা। কবর খানাটি আমি কখনো লক্ষ্য করিনি। একদিন আমার সন্ত পরিচিত অবতার সিং মারওয়াহা বললো, কবর খানাটি কুকুরদের জন্য। প্রথমত বিশ্বাস হয়নি। ইংরেজরা বিশেষ ভাবে কুকুর ভক্ত, এবং মনে হয় সে কারণেই হয়তো কুকুরেরাও ইংরেজ ভক্ত! আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইংরেজ ভক্তদেরই কুকুর বলে সম্বোধন করা হ'ত। এতে কাকর কাকর নিশ্চয় রাগ হ'ত। কিন্তু ইংরেজ কুকুর বলে গালাগাল দেয় না কুকুর ইংরেজদের এতই প্রিয় যে তাদের প্রিয় নেতা চার্চিলকে বুলডগের মতো দেখতে এ কথাটা ইংরেজরা নিজেরাই বলে থাকেন। এই কবরখানাটি কোন ধর্মের কুকুরদের কবর দেয় জানি না। এদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক বা প্রটেষ্টান্ট আছে কি না জানি না। ইভলিন উ হলেন একজন ইংরেজ ঔপন্যাসিক তাঁর একটি গল্পে আছে এমন একটি কুকুরের কবরখানা এবং দাহস্থানের বিবরণ। গল্পের মধ্যে আছে কুকুরের মৃত্যু বার্ষিকীতে কুকুরের মালিকদের কাছে ছাপানো চিঠি যায় প্রতি বছর, আপনার কুকুর এঞ্জেলা স্বর্গে সুখে আছে এবং আনন্দে লেজ নাড়ছে। গল্পের মধ্যে বীভৎসতা ছিল অনেকখানি কারণ একটি ভদ্রমহিলাকে হত্যা করে, তাঁকে কুকুর হিসেবে দাহ করা হয়। সেই ভদ্র মহিলার নামই এঞ্জেলা, আর যিনি হত্যা করছিলেন এঞ্জেলাকে তিনি এঞ্জেলার স্বামী। স্বামীর কাছে প্রতি বছর ঐ রকম ছাপানো পোষ্টকার্ড যেত। একটি কুকুরের কবরের প্রস্তরফলকের উপরে একটি বাণী :

> In Loving Memory of Puskin
> My Gentle Little friend
> And Companion for 11 years
> Sadly Missed
>
> SLEEP LITTLE ONE SLEEP
> REST GENTLY THY HEAD
> AS EVER THOU DIDST AT MY FEET
> AND DREAM THAT I AM ANEAR.

[ ক্রমশঃ

# প্রতীক্ষার শেষে

শ্রীদেবদাস ভট্টাচার্য্য

দিগন্ত কম্পিত
আসিতেছে ঐ দুরন্ত প্রিতম
করাল কালবৈশাখী, হের,
দীর্ঘ প্রবাস পরে
বসুধার ঘরে।

ধরণী আজ অবগুণ্ঠিতা
কতো না কুণ্ঠিতা!
লাজুক নব বধূ যেন।

অনন্ত পিয়াস
মিটিবে যে আজ
তাই বুঝি হিয়া কাঁপে থর-থর!
কথাটি নাই মুখে
অনির্বাণ বাসনা বুকে
সরমে কতো না জড়সড়!

# আমি সুন্দরকে ভালবাসি

( R. Bridges-এর "I love All Beauteous Things"-এর অনুবাদ )

সুন্দরের প্রেমিক আমি সুন্দর খুঁজিয়া বেড়াই
পারি যদি তবে সম্মান করি।
জীবন ও সুন্দর সৃষ্টি, সেইটুকু মানুষের মান
আছে কিবা প্রভুর প্রশংসার চাতুরী।
সৃষ্টির চেতনায় পা'ব
আনন্দ গহন
সুন্দরের সাধনায় আজি

আমি তাই উন্মন।
( জানি ) স্মরণে আসিবে সৃষ্টি ভবিষ্যৎ,জাগরিত
কতক অসার শব্দের মতন
মনে পড়ে যেমন করি হলে জাগরণ
ঘুমায়িত যত স্বপন।

অনুবাদিকা—শুক্লা মুখোপাধ্যায়

রেবতীনন্দন দাস-মহাপাত্র

সেবারের শীতের দিন ইম্ফলে যেতে হয়েছিল কাজে, সীমান্ত-রাজ্য মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল। এই ছোট সহরের গা ঘেঁসে বয়ে গেছে বেশ গভীর খাদ কেটে এক পাহাড়ে নদী, তার নামও ইম্ফল। সহরের কাছাকাছি কোথাও এই নদীর জলস্রোতের মত্ততা নেই বা না আছে তার গভীরতা। কোথাও কোথাও দেখা যায়, মাটি আর বালি, জলের গভীরতা ছাপিয়ে মাথা উঁচু করে রয়েছে। আর সেই আধ-ভেজা মাটি ও বালির উপর রোদ চিক্ চিক্ করে খেলা করে যায়।

কাজ সেরে সব দিনাই সহর ছাড়িয়ে এই ইম্ফল নদীর পাশ দিয়ে বাঁধের উপর হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যেতাম যেখানে নোংমাইজিং পাহাড়ের ছায়ায় ঢাকা গ্রামগুলি আব্ছা আব্ছা দেখা যেত সেই দিকে। আর পিছনে হারিয়ে যেত ইম্ফল রাজপ্রাসাদের পাশে শ্রীশ্রী৺গোবিন্দজীর মন্দিরের সোনার কলস তিনটির ঝকমকানি। কোথাও কোথাও ঝোপ-জঙ্গলে বাঁধের খানিকটা জায়গা ঢাকা পড়ায় বাঁধ ছেড়ে নদীর ঠাণ্ডা জলের উপর ফেলা পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে সে-পাশে গিয়েও উঠেছি। সূর্য্য যখন ঢলে পড়ত পশ্চিমে, গ্রামগুলি থেকে বেরিয়ে আসত সারি বেঁধে দলে দলে মণিপুরী মেয়ে। যত্নে আঁকা থাকত তাদের নাকের উপর শ্বেত তিলক-চন্দন, বৈষ্ণবধর্ম্মীয় নিদর্শন। সদর বাজারের পথে চলে যেত তারা পিঠে নিয়ে তাদের বেসাতির বোঝা, সযত্নে তৈরী নিখুঁত ভাবে বোনা তাঁতের কাপড়, তা ছাড়া আরও কত কি। আমিও ফিরে আসতাম তাদের পিছু পিছু সন্ধ্যার আঁধার ঘিরে ফেলার আগেই।

সেদিনও বেরিয়েছি বেড়াতে, অন্য দিনের থেকে একটু দেরী করে। তাই বেশী দূর যাওয়া সম্ভব হবে না বলে ইম্ফল নদীর পাড় দিয়ে কিছুটা মাত্র এগিয়ে গেলাম। পশ্চিমের সূর্য্য ঢলে পড়েছে পাহাড়ের গা বেয়ে নীচে। তার রক্তিম আলোকে লাল হয়ে গেছে চারিদিক। তাকিয়ে দেখছিলাম অন্যমনস্ক ভাবে, ওপারের নীল পাহাড়ের বুকে ৺গোবিন্দজীর মন্দিরের সোনার কলস তিনটি সূর্য্যের রক্তিম আলোয় রাঙা হয়ে কি রকম দেখায়! হঠাৎ কানে গেল, বাঁধের নীচে নদীর জলে ছলছলানির শব্দ, কেউ জলের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে যেমন শব্দ হয়, সেই রকম। চোখে পড়ল এক অতি বৃদ্ধা আর তার সঙ্গী লম্বা ছিপছিপে গড়নের এক তরুণী। মণিপুরী বৈষ্ণবী তারা। বৃদ্ধার কি এক কথায় হাসিতে ফেটে পড়ল সেই তরুণী মেয়েটি। আমার নিরালা মনের কোণে সেই হাসি যেন সৃষ্টি করল কি এক পুলক শিহরণ! আবার বৃদ্ধার কি এক রূঢ় কথায় দমকা হাসি চকিতে গেল থেমে, মুখ তুলে তাকাল সেই তরুণী বাঁধের উপর আমার দিকে। লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল তার মুখখানা। সেই সঙ্গে অস্তগামী রক্তরাঙা সূর্য্য যেন আরও আবীর ছিটিয়ে দিল তার মুখে। বাঁধে উঠে এল তারা, পিঠে বাঁধা তাদের বোঝা নিয়ে। তরুণী বৈষ্ণবী তার দৃষ্টি মেলে ধরল কৌতূহলে আমার মুখের উপর আর তার সযত্নে আঁকা নাকের উপর শ্বেত তিলকের রেখা জ্বল জ্বল করে জ্বলতে লাগল। মুহূর্ত্তে নামিয়ে নিল সে তার কৌতুক চাহনী, ধীরে ধীরে পা বাড়িয়ে এগিয়ে গেল সে। খানিক গিয়ে আবার পিছন ফিরে চাইল আমার দিকে, তার মুখে ফুটে উঠল যেন এক মৃদু হাসির রেখা। আমায় পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল তারা, আর আমি তাকিয়ে রইলাম তাদের পথের দিকে। যখন তারা দৃষ্টির বাহিরে হারিয়ে গেল, তাকিয়ে দেখি, বাঁধের নীচে নদীর বুকে ওদের [illegible] চাপে ঘোলাটে জলস্রোতের ধারায় আবার কখন নির্ম্মল হয়ে গেছে।

বাসায় ফিরে এসে ভাবছিলাম, মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা। বাংলা দেশ থেকেই এসেছিল মণিপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের বাণী, এসে লেগেছিল বৈষ্ণবধর্ম্মের জোয়ার, রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার স্বকীয়া মতবাদ। কিন্তু আজ যখন বাংলা দেশে প্রায় মুছে এল বৈষ্ণবধর্ম্মীদের নাকের উপর তিলকরেখা, মণিপুরে কি করে সজীব রয়েছে আজও তিলক আর গোঁড়ামি! স্বকীয়া পরকীয়াবাদের কথায় মনে ভেসে উঠল ঠাকুর চণ্ডীদাস ও রামী ধোবানীর কথা, তাদের কামগন্ধহীন প্রেম ভালবাসা। সেই সঙ্গে মনের কোণে দেখা দিল আর একটি ছবি, পিঠে বেসাতির বোঝা নিয়ে সন্ধ্যার সেই তরুণী বৈষ্ণবীর কৌতুহল চাহনি, কি জানতে চেয়েছিল সেই তরুণী? কেনই বা সে আবার পেছন ফিরে চাইল আমার দিকে, মুখে তার মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে?

পরের দিন অজানতে আবার ছুটে গেছি সেইখানে নদীর ধারে, যেখানে আগের দিন সেই তরুণী বৈষ্ণবী নদীর সে পার থেকে এসে এপারে এসে উঠেছিল। কেন এরূপ দুঃসহ আগ্রহ মনে জাগল জানি না, কত না আশার স্বপন সুখে ব্যাকুল ব্যগ্রতায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সে আসবে ত আজও এই পথে? সূর্য্য ঢলে পড়ল পাহাড়ের ওপাশে, তার রাঙা ছটা চারি দিক কালকের মত আজও রাঙিয়ে দিল। হাঁ, সে এসেছে, সঙ্গী আর সেই বৃদ্ধা, ঐ যে নদীর ওপারে। নিলাজ হাওয়ায় তার বুকে জড়ান হলুদরাঙের অঙ্গবস্ত্র চঞ্চল হয়ে উড়ছে,

আর তার কটিদেশ থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত জড়ান লাল ডুরেখানি আঁট-সাঁট হয়ে বসে যাচ্ছে চপল মলয় পরশে। সেপার থেকে এপারে এসে উঠল তারা, তাদের পায়ের চাপে নদীর অগভীর জল ঘোলাটে হয়ে গেল। আমায় দেখে বৃদ্ধা সন্দেহের চোখে তাকাল একবার, তারপর কর্কশস্বরে বলল—কালকেও তুমি এখানে দাঁড়িয়েছিলে! কি কর বাপু তুমি এখানে ?

—নতুন লোক গো আমি, বাংলাদেশ থেকে এসেছি এখানে কাজে। বেড়াতে আসি প্রতিদিন নদীর বাঁধ ধরে।

—নতুন লোক দেখলে ভয় করে বাপু আমাদের, এই বলে বৃদ্ধা এগিয়ে গেল। তার পিছনে তরুণী আমার দিকে অধর টিপে মৃদু হাসি হেসে এগিয়ে গেল মৃদুমন্দ ছন্দে পা ফেলে, বারে বারে সে ফিরে ফিরে চাইল আমার দিকে তার মিষ্টিহাসি মুখে। সে কি বুঝতে পেরেছে আমার মনের কোন দুর্বলতা ? কে জানে ?

আর একদিনের কথা। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে মণিপুরে, তিন দিন পরেই চলে আসব। তাই সন্ধ্যায় সদর বাজারে এলাম তাঁতের তৈরী বিছানার চাদর একজোড়া কিনতে, গিন্নির বরাদ্দ। অদ্ভুত সুন্দর কারুকলা সব মণিপুরী মেয়েদের তৈরী তাঁতের কাপড়। নির্দ্ধারিত দামে পছন্দ মত চাদরজোড়া না পাওয়ায় একটার পর একটা দোকান ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম সামনে, দামে কম কিন্তু আরও ভালর খোঁজে। হঠাৎ চোখে পড়ল সেই তরুণী আর বৃদ্ধা বৈষ্ণবী। বেসাতির বোঝা খুলে মেলে দিয়েছে তাদের হাতের তৈরী তাঁতের শাড়ী, কাপড়, চাদর ও আরও কত কি। পরিচিতের সন্ধান পেয়ে এগিয়ে গেলাম সেখানে, তুলে নিলাম হাতে পছন্দমত একজোড়া বিছানা চাদর। রেশমের মত চক্‌চকে সুতার তৈরী কৃষ্ণচূড়ার নক্সা দিয়ে ভরে গেছে তার সারা গা-টা। মুখ দিয়ে তারিফের সুরে বেরিয়ে গেল—বাঃ, কি সুন্দর, অপূর্ব! ওগো বৈষ্ণবী, তুমি যেন একটা কবিতার ছন্দ-মাধুর্য্যে তৈরী করেছ একে।

—এ যদি কবিতা হয়, তাহলে এর জন্য কিন্তু ছন্দ জুগিয়েছেন আপনারাই।—উত্তর দিল সেই তরুণী পসারিণী।

এরূপ উত্তর পাব, কখনও আমি আশা করিনি। তাই শোনা মাত্রই চকিতে চেয়ে দেখি, চোখ দুটি মেলে যেন আকুল প্রতীক্ষায় তাকিয়ে আছে আমারই মুখের দিকে সেই যুবতী। আমি অপ্রতিভ বোধ করলাম। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম—কি করে ছন্দ জোগালাম তোমাদের আমরা ?

—কেন, বৈষ্ণবধর্ম্মে ? বৈষ্ণবধর্ম্ম ত আপনাদের দেশ থেকেই এসেছে এখানে। ঐ ধর্ম্মেই ত পেয়েছি আমরা নৃত্যে নূতন ছন্দ, ভাষায় নূতন বাণী, আমরা সবাই যে হয়েছি সেই শ্যামসুন্দর চির-সুন্দরের পূজারী। উত্তরে আমার কিছু বলবার আগেই বৃদ্ধা তার কর্কশস্বরে বলে উঠল—ও পোড়ারমুখী, অত কথা কি দরকার তোর বলবার! বল না বাবুকে, যদি চাদর জোড়াটা নিতেই হয় তাহলে নিয়ে যান যেন। দুই কুড়ি বারটা টাকা লাগবে বাবু ঐ জোড়াটির জন্য।

—বাহান্ন টাকা, কি বল গো ? এর দাম বাইশ টাকার বেশী উচিত নয়। আচ্ছা, বল ঠিক কত টাকায় দিবে ?

—এক কুড়ি পনর টাকায় তাহলে নিয়ে যান, বাবু! শেষে দরদস্তুরে বত্রিশ টাকার নীচে কিন্তু নামতে আর রাজী হল না বুড়ী, সঙ্গে এত টাকা না থাকায় কেনা আর হয়ে উঠল না চাদরজোড়াটি, ফিরে এলাম শূন্য হাতে সেদিন।

পরের দিন বাজারের সেই নির্দ্দিষ্ট জায়গার দিকে পা-দুটি যেন টেনে নিয়ে চলল। গিয়ে দেখি বৃদ্ধা নেই, রয়েছে একা সেই তরুণী বৈষ্ণবী, তার বোঁচকা খুলে মেলে দিয়েছে কাপড়ের বেসাতি। আমায় দেখে তার মুখে যেন আনন্দে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। জিজ্ঞাসা করলাম তাকে—তোমার সঙ্গী বুড়িটিকে দেখছি না যে ?

—এইখানে নিকটে কোথায় গেছে, এসে যাবে শীগগির, আচ্ছা, বাবু কালকের চাদরজোড়াটি নিবেন না ? বেচিনি, আপনার জন্যই তুলে রেখে দিয়েছি।

—না, ঐ জোড়াটি আর নোব না। অনেক টাকা লাগবে যে। বরং আঠার টাকার মোটামুটি ভাল একজোড়া চাদর দেখাও।

—কেন ? যাকে এত করে আপনি পছন্দ করেছিলেন, ঐ জোড়াটাই নিয়ে যান তাহলে, আঠার টাকাই দিবেন।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যবোধ করলাম। বাহান্ন থেকে আঠারতে কি করে দাম নামতে পারে, আমার কাছে হেঁয়ালীর মত লাগছিল। তাই বললাম—না, এই দামে এত সুন্দর চাদর কিছুতেই পাওয়া যেতে পারে না। আমিও বাজারে ঘুরে দেখেছি। তুমি বোধ হয় ঠিক দাম জান না। তোমার সঙ্গী বুড়ীটি আসুক, সেই বোধ হয় কাল ঠিক দাম বলেছিল।

—আমার দাম ঠিকই জানা আছে, বাবু! সুতা কিনেছি আমি, আর এই জোড়াটা বুনেছিও নিজ হাতে আমি। আমার দাম ঠিকই জানা আছে। আপনি নিয়ে যান বাবু, খুশী মনে আঠার টাকাতে এই জোড়াটা।

টাকা কয়টি দিয়ে সবেমাত্র আমি চাদরজোড়াটা হাতে তুলে নিয়েছি, কোথা থেকে ঝড়ের মত ছুটে এল ঐ বৃদ্ধা। জিজ্ঞাসা করল তরুণীকে সে—কৈ, ঐ চাদরজোড়া বিক্রীর টাকা কোথায় ?

—এই যে নাও। বলে তরুণী আঠারটি টাকা বাড়িয়ে দিল বৃদ্ধার হাতে।

—এত কম টাকা কেন ? বাকী টাকা আর কোথায়!

—ঐ আঠারটি টাকায় বিক্রী হয়েছে ঐ চাদরজোড়াটি। বৃদ্ধা তার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর আরও কর্কশ করে বলল—কেন বিক্রী করলি তাহলে ? ভদ্রলোকের চাঁদপানা মুখ দেখে কি ভুলে গেলি পোড়ারমুখী!

এই কথা শুনে আমার লজ্জায় মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল, নিজের কানের উষ্ণতা আমি বেশ উপলব্ধি করেছিলাম। আর বেচারী সেই তরুণী বৈষ্ণবী, তার লজ্জাবনত মুখে গড়িয়ে গেল অশ্রু-জলের ধারা। সে আস্তে-আস্তে ফুঁপিয়ে বলল—আমার যা ভাল লেগেছে আমি তাই করেছি দিদিমা! ঐ চাদর ত আমি নিজ হাতে বুনেছি, যদি বেচে ঠকেও থাকি, লোকসান হয় নি কিছু। মনের কোণে বরং লাভের অঙ্কই বেড়েছে। এই প্রিয়দর্শীর মধ্যে আমি পেয়েছি দেখতে সেই চির-সুন্দরের মনোহর মূর্তি। তাই প্রিয়দর্শীকে বেচেই আমার সার্থকতা।

বৃদ্ধা কিছু উত্তর দেবার পূর্ব্বেই আমি জানিয়ে দিলাম—তোমাদের আর বাপু, ঝগড়া করতে হবে না। এই নাও তোমাদের চাদর-জোড়াটি, ফিরিয়ে নাও। আমার চাই না।

—না, সে হবে না বাবু, আপনাকে রাখতেই হবে এই চাদর

# একটি মহৎ দান

অশ্বিনীকুমার দত্ত বলিয়া গিয়াছেন, দান মাত্রই মহৎ হইবে এমন কোন কথা নাই। অনেক সময় দাতা দান করেন প্রয়োজনে, অনেক সময় ব্যক্তিগত স্বার্থে—আবার অনেক সময় অনেকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। তবে যে দান নিঃস্বার্থে, অপরের মঙ্গলার্থে এবং নিছক দানেরই প্রয়োজনে, সে দান নিঃসন্দেহে মহৎ, সে দাতা নিশ্চয়ই মহান। মহৎ দানের গুরুত্ব প্রচুর, মহান ব্যক্তির প্রয়োজন খুব বেশী।

সাম্প্রতিক একটি মহৎ দান 'ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার'। দাতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দানে সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নাম, 'আইনগত সহায়ক সমিতি'—যাহার উদ্দেশ্য আর্থিক সামর্থহীন ব্যক্তিদের বিনা পারিশ্রমিকে আইনগত সাহায্য দেওয়া। রাজভবনের উত্তর-পূর্ব কোণে সেদিন এই গ্রন্থাগারটি উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধান বিচারপতি ডাঃ এস, আর দাশ।

গ্রন্থাগারটির জীবনী নিঃসন্দেহে বিচিত্র! তবে বিচিত্রতর তাহার প্রাক্তন মালিকের জীবনী। ২০ টাকার এক সামান্য কাঠের আলমারি এবং ক্রাউনবার্গের এক সেট আলফাবেটিক্যাল উইকলি রিপোর্ট লইয়া যে গ্রন্থাগারের জীবনের সূচনা আজ তাহার আনুমানিক মূল্য আশী হাজার টাকা এবং পুস্তকসংখ্যা বিশ সহস্র। আজ এই গ্রন্থাগারে আছে কোম্পানী আইনের অসংখ্য পুস্তক, আছে ইনকামট্যাক্সের রেফারেন্স বই, আছে হিন্দু-আইনের মূল্যবান গ্রন্থ, আছে দেশবিদেশের বিভিন্ন কোর্টের ধারাবাহিক রিপোর্টার। এ গ্রন্থাগারের জন্যই আসিয়াছে লণ্ডনের প্রকাশকদের আইন গ্রন্থ, আসিয়াছে মাদ্রাজের পণ্ডিতদের রচনা, আসিয়াছে দেশবিদেশের আইন-বিশারদদের মুদ্রিত মতামত! পুস্তক ছাড়াও, সযত্নে রক্ষিত: প্রাক্তন অধিকারীর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

বিচিত্রতর ইহার প্রাক্তন অধিকারী ডাঃ শম্ভুনাথের জীবনী। সামান্য হেড-মাষ্টারের মেধাবী সন্তান আজ প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিয়া গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মাসিক দেড় শত টাকা বেতনে স্কটিশ চার্চ কলেজে নিযুক্ত হইলেন গণিত অধ্যাপক পদে। কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষের নিকট হইতে প্রধান গণিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়ার আশ্বাস পাইয়া মনে-প্রাণে লাগিয়া গেলেন শিক্ষকতায়। হঠাৎ কলেজের বিদেশস্থ কর্তৃপক্ষ এক শ্বেতাঙ্গকে লইয়া আসিলেন প্রধান গণিত অধ্যাপক করিয়া। প্রতিবাদে ডাঃ শম্ভুনাথ পদত্যাগ করিলেন। আইন ব্যবসায়ে যোগদানের জন্য চলিয়া গেলেন বর্দ্ধমানে। সেখানেও খুব বেশী কিছু হইল না। ফিরিয়া আসিলেন কলিকাতায়। রামানন্দের আগ্রহে যোগ দিলেন (তৎকালীন) রিপন-কলেজে আইন অধ্যাপকরূপে, আর যোগ দিলেন কলিকাতা হাইকোর্টে।

ক্রমে ক্রমে এডভোকেট ব্যারিষ্টার হইলেন এবং ব্যারিষ্টার হইতে বিচারপতি। তারপর নিযুক্ত হইলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য পদে। ডাঃ শম্ভুনাথের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারেরও

আইন-গ্রন্থাগারে ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান বিচারপতি শ্রী এস, আর, দাশ এবং শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলেবর বাড়িয়াছে, আইনের বিভিন্ন পুস্তকের সংযোজনায় ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাঁহার গ্রন্থাগার। সেই গ্রন্থাগার তিনি দান করিয়া দিয়াছেন 'আইনগত সহায়ক সমিতিকে'। মহৎ দান! প্রধান বিচারপতি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তাই স্বীকার করিয়াছেন, ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ দানের জন্য দেশবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

—বর্তমান হইতে।

---

জোড়াটি। আপনি বরং টাকা ফিরিয়ে নিন, চাদর ফিরিয়ে আমায় প্রত্যাখ্যান করবেন না, বাবু! আকুল হয়ে তরুণী বৈষ্ণবী বলল। তার নিষ্পলক করুণ দৃষ্টি তুলে ধরল আমার মুখের দিকে, চোখের জলের ধারায় ভিজে গেল তার মুখের রাঙা গাল দুটো, আর সেই অশ্রুভেজা গালের মাঝখানে নাকের উপর তিলকের রেখা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। অজানতে কখন যেন আমার চোখ দুটিও জলে ভিজে গেছে।

মণিপুর থেকে ফিরে এসে গিন্নীর হাতে তুলে দিয়েছি তাঁর বরাদ্দমত চাদর জোড়াটি। খুলেই সব কথা বলেছি তাঁকে মণিপুরী বেচনেওয়ালী বৈষ্ণবীর কথা। গভীর এক নিশ্বাস ফেলে তিনি শুধু একটু মৃদু হাসলেন শুনে, তারপর সযত্নে তুলে রেখে দিয়েছেন ব্যবহার না করে চাদর দু'খানি। আজও সেই দু'টি চাদরে সেই মণিপুরী তরুণী বৈষ্ণবীর অশ্রুসজল মুখখানি যেন জীবন্ত বোনা হয়ে রয়েছে!

"আচ্ছা, আমরা নিমুকে শাস্তি দেব আর তোমাকে একটা নতুন ফ্রক এনে দেব।"

" আমার জন্যে নয় মাসী, আমার পুতুলের জন্যে।"

সুশীলা মুন্নিকে, নিমুকে আর পুতুলটি নিয়ে তার বাড়ী চলে গেল আমিও বাড়ীর কাজকর্ম্ম সুরু করে দিলাম। বিকেল প্রায় ৪ টার সময় মুন্নি তার পুতুলটা নিয়ে নাচতে নাচতে ফিরে এলো। আমি উঠোন থেকে চিৎকার করে সুশীলাকে বললাম আমার সঙ্গে চা খেতে।

যখন সুশীলা এলো আমি ওকে বললাম "ডলের জন্যে তোমার নতুন ফ্রক কেনার কি দরকার ছিল?"

"না বোন, এটা নতুন নয়। সেই একই ফ্রক এটা। আমি শুধু কেচে ইস্ত্রী করে দিয়েছি।" "কেচে দিয়েছ? কিন্তু এটি এত পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

সুশীলা একচুমুক চা খেয়ে বলল—"তার কারন আমি ওটা কেচেছি সানলাইট দিয়ে। আমার অন্যান্য জামাকাপড় কাচার ছিল তাই ভাবলাম মুন্নির ডলের ফ্রকটাও এই সঙ্গে কেচে দিই।"
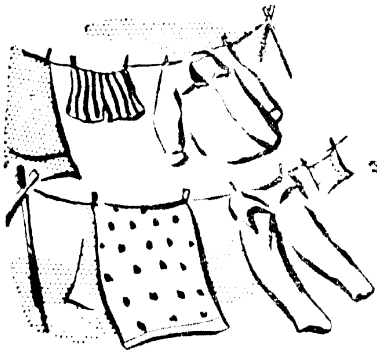
আমি ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখা মনস্থ করলাম। "তুমি তখন কতগুলি জামাকাপড় কেচেছিলে? আমাকে কি তুমি বোকা ঠাউরেছ? আমি একবারও তোমার বাড়ী থেকে জামাকাপড় আছড়ানোর কোন আওয়াজ পাইনি।"

সুশীলা বলল, "আচ্ছা, চা খেয়ে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় এক মজা দেখাবো।"

সুশীলা বেশ ধীরেসুস্থে চা খেল, আর আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। আমার মনের অবস্থা কিন্তু অন্যরকম। আমি একচুমুকে চা শেষ করে ফেললাম।

আমি ওর বাড়ী গিয়ে দেখলাম একগাদা ইস্ত্রীকরা জামাকাপড় রাখা রয়েছে। আমার একবার গুনে দেখার ইচ্ছে হোল কিন্তু সেগুলি এত পরিষ্কার যে আমার ভয় হোল শুধু ছোঁয়াতেই সেগুলি ময়লা হয়ে যাবে। সুশীলা আমাকে বলল যে ও সব জামাকাপড়ই সানলাইটে কেচেছে। ওই গাদার মধ্যে ছিল—বিছানার চাদর, তোয়ালে, পর্দা, প্যান্জামা, সার্ট, ধুতী, ফ্রক আরও নানাধরনের জামাকাপড়। আমি মনে মনে ভাবলাম বাবা: এতগুলো জামাকাপড় কাচতে কত সময় আর কতখানি সাবান না জানি লেগেছে। সুশীলা আমায় বুঝিয়ে দিল—"এতগুলি জামাকাপড় কাচতে খরচ অতি সামান্যই হয়েছে—পরিশ্রমও হয়েছে অত্যন্ত কম। একটি সানলাইট সাবানে ছোটবড় মিলিয়ে ৪০-৫০টী জামা কাপড় স্বচ্ছন্দে কাচা যায়।"

আমি এক্ষুনি সানলাইটে জামাকাপড় কেচে পরীক্ষা করে দেখা স্থির করলাম। সত্যই, সুশীলা যা বলেছিল তার প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। একটু ঘষলেই সানলাইটে প্রচুর ফেণা হয়—আর সে ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে ময়লা বের করে দেয়। জামাকাপড় বিনা আছাড়েই হয়ে ওঠে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল।

আর একটি কথা, সানলাইটের গন্ধও ভাল—সানলাইটে কাচা জামাকাপড়ের গন্ধটাও কেমন পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে। এর ফেণা হাতকে মসৃন ও কোমল রাখে। এর থেকে বেশি আর কিছু কি চাওয়ার থাকতে পারে?

S. 2588-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।
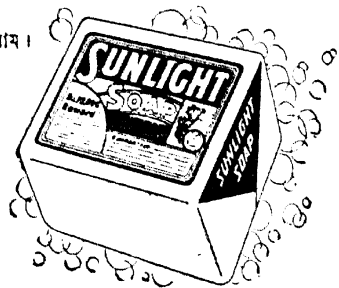
[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

**নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

টালার ডাকাতি—সে বোধ হয় ১৯১৫ সালের শেষের কথা। সে গল্প বলতে হলে টালার সম্বন্ধে আগে কিছু বলতেই হয়,—আর তা' বলতে গেলে অনেক কথাই এসে পড়ে। কারণ আমার জন্ম টালায় এবং ২৫ বছর বয়েস পর্যন্ত টালাতেই বাস করেছি; স্বদেশী হাঙ্গামার হাতেখড়িও টালায়। জোয়ান বয়েসের বিপ্লবের রঙীন নেশা, সতর্ক শিক্ষা, বৈপ্লবিক সাহিত্য ও নিষিদ্ধ পুস্তক পাঠ, গুপ্ত সমিতির বেআইনী কর্মকাণ্ড প্রভৃতির সব চেয়ে ঠাস-বুনানী প্রথম পর্য্যায়ের ইতিহাস টালার ইতিহাসেরই এক পর্ব। সুতরাং সংক্ষেপে ছেলেবেলার কয়েকটা কথা বলে নিয়ে গোড়া থেকেই সুরু করতে হয়।

১৯০৫ সালের স্বদেশী হাঙ্গামার প্রথম যুগ সুরু হওয়ার আগেকার টালা ছিল এখনকার টালার তুলনায় প্রায় পাড়াগাঁ। কিন্তু সে টালার একটা নিজস্ব বনেদী পল্লীরূপ ছিল, যা এখন একটা কস্‌মোপলিটান ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। রেললাইন আর খালের মাঝের ফালি জায়গাটা গঙ্গার ধারে হরিপোদ্দারের ঘাট থেকে বেলগেছিয়ার বড় রাস্তা পর্যন্ত ছিল খাস টালা। রেললাইনের উত্তরে পাইকপাড়ার দক্ষিণের জায়গাটুকু বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড থেকে অনাথ দেব লেন পর্যন্তও টালার অন্তর্গত হলেও তার অর্ধেকটা ছিল খেলাত ঘোষের বাগান ও লম্বা ঝিল, এবং তারপরে একটা বস্তী, কম্পুর বাগান। এখন এই অংশটা জুড়ে হয়েছে টালার জলের ট্যাঙ্ক ও পার্ক।

খাস টালার মধ্যে বনমালী চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের দুপাশ নিয়ে আমাদের পাড়া, এর মধ্যেই ছিল ছ'টা বড় বড় পুকুর। এখন সেগুলোর ওপর বড় বড় বাড়ী এবং রাস্তা হয়েছে; শুধু একটা পুকুর হয়েছে চিলড্রেন্‌স পার্ক। আমাদের বাড়ী ছিল বনমালী চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের মাঝামাঝি।

আমাদের পাড়ার পূব দিকটা সরকার বাগান, পশ্চিম দিকটা স্রেফ "ওপাড়া" ছুতোর পাড়া। আমাদের পাড়ায় ছিল কেরানীদের আড্ডা, এবং ছুতোর পাড়ায় হয়েছিল ডাকাতি।

সবচেয়ে ছোটবেলার যে কথাটা আজও স্পষ্ট মনে আছে, সে হচ্ছে ১৯০১ সালের কথা—সপ্তম এডোয়ার্ড রাজা হয়েছেন, আমাদের স্কুল থেকে আমরা গানের মিছিল নিয়ে কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপ্যাল অফিসে গিয়ে এক একটি মাটীর রেকাবী ভরা মিষ্টান্ন পেয়েছি। গানটি হচ্ছে:

জয় রাজরাজেশ্বর   জয় ভারত ঈশ্বর
সুখেতে পালহ প্রজা   থাক সুখে নিরন্তর।

তারপরের আর একটি বড় ঘটনা মনে আছে, সে হচ্ছে বড়বাবু অমর্ত মিত্তিরের ভোট। আমাদের বাড়ীর খানিক দক্ষিণ দিকে ছিল মিউনিসিপ্যাল গোখানা, যার নাম ছিল কাঞ্জি হৌস। তার মাঝে একটা পুকুর ছিল। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচনে বড়বাবু দাঁড়িয়েছিলেন, এবং ভোট হয়েছিল কাঞ্জি হৌসে। ভোটে মারামারি হয়েছিল, এক জনের মাথা ফেটে রক্তগঙ্গা হয়েছিল, এবং সে পালাতে গিয়ে পুকুরে পড়ে গিয়েছিল। কাজেই আমার প্রথম নাগরিক জ্ঞান হয়েছিল, ভোট নামক একটা কাণ্ড আছে, মাথা ফাটাফাটি যার অঙ্গ।

এর পর ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন; স্বদেশী হাঙ্গামার ঢেউ টালাকেও নাড়া দিলে। প্রথম যে বড় মিটিংয়ে লোকে সুরেন বাঁড়ুয্যের গাড়ী টেনেছিল, খবরের কাগজে সুরেন বাঁড়ুয্যেকে বলা হয়েছিল Uncrowned King of Bengal, সে মিটিং হয়েছিল বাগবাজারে নন্দ বোসের বাড়ীর ময়দানে, আমাদের পাড়ার কাছেই। বিরাট ময়দান, বিশাল জনতা, আমিও গিয়েছিলুম সে মিটিং দেখতে। তখন বড় হয়েছি, বয়েস প্রায় দশ বছর। তার আগে সন্ধ্যার পর কখনো বাড়ীর বাইরে থাকিনি,—সুতরাং রাত করে বাড়ী এসে খুব বকুনি খেয়েছিলুম—যদি ভিড়ে চেপ্টে মারা যেতুম!

কিন্তু স্বদেশী হাঙ্গামায় অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছিলুম বলে বকুনি সন্তুষ্ট মনেই হজম করেছিলুম। বিলিতী সব কিছু বয়কট করতে হবে শুনে মন বসেছিল আলবৎ। তদনুসারে দেশের জন্যে প্রথম আত্মদানও করেছিলুম হাসিমুখেই।

তখন খুব গুলি খেলতুম, এবং সোডার বোতলের মুখের কাচের গুলি, পাথরের ছুনীগুলি ও "টল" প্রভৃতির ষ্টক থাকতো একটা পুরোনো মোজার মধ্যে। সেই মোজাভর্তি গুলি, মোজায় গেরো বেঁধে যেদিন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলুম কাঞ্জি হৌসের পুকুরের মাঝখানে, সেদিনকার সেই প্রথম আত্মদানের আত্মপ্রসাদ আপনারা বুঝবেন না!

তারই মৌতাতে কয়েকটা দিন পুলক শিহরণে কাটলো। খেলার সাথী ও স্কুলের সহপাঠী পুলিন ঘোষও (এখন ফড়িয়াপুকুরে নিজ বাড়ীতে থাকেন—'নর্মাণ রস' এর রিটায়ার্ড বড়বাবু) গুপ্তী ছেড়ে সহকর্মী হলেন, যদিও কর্ম সুরু হ'তে আরো কিছুদিন দেরী হল। সে হল ১৯০৬ সালের রাখীবন্ধন—আমরা এক এক গোছা রাখী নিয়ে বনমালী চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটের মোড়ে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে যত অজানা অচেনা লোক ধরে ধরে বন্দে মাতরম্ বলে হাতে রাখী বেঁধে দিলুম; ঘরে অরন্ধন, বিকাল পর্যন্ত উপবাস,—আমাদের উৎসাহের অন্ত নেই।

ইতিমধ্যে পি মিত্র প্রমুখ নেতাদের চেষ্টায় সিমলায় অনুশীলন সমিতি গঠিত হয়েছে—অক্সফোর্ড মিশনের পাশের গলির মধ্যে তার হেড কোয়ার্টার এবং লাঠিখেলা প্রভৃতির আখড়া আছে;—ফরিদপুরের পুলিন দাস ঐ নেতাদের পরামর্শে ঢাকায় অনুশীলন সমিতি গড়তে গেছেন। আমাদের ও পাড়ার রায় বাহাদুর কৃপানাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র দীননাথ দত্ত (চণ্ডী বাবু) এবং পরাণ মুখুজ্যের (প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) নাতি প্রভাত মুখুজ্যে (ভুট্টু বাবু) বড় লাঠিখেলা শিখে টালায় অনুশীলন সমিতি গড়েছেন। যুবক-তরুণ-কিশোর মহলে উৎসাহের ধুম লেগে গেছে। টালার জীবনে একটা রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক বিকাশের সূচনা সুস্পষ্ট হয়েছে।

স্বদেশী হাঙ্গামার গঠন-কার্যের আর একটা দিকেরও সূত্রপাত হয়েছে নন্দ বোসের বাড়ী থেকেই। সে বাড়ীর নীচের তলার হলঘরে নতুন ঠকঠকি তাঁত বসেছে স্বদেশী তাঁতের কাপড় তৈরী করার জন্যে। সে তাঁত বসাবার কাজেও টালার হাত ছিল—ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের ক্যামেরা ব্যবসায়ী অতুল দাসের বাবা এবং দাদা (বিখ্যাত সিনেমা-ক্যামেরাম্যান যতীন দাসের বাবা) সেই তাঁত বসাবার কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। সেই তাঁতের কাপড়ই বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড়ের আদিপুরুষ।

শ্যামবাজারে বাবার সঙ্গে কাপড় কিনতে গিয়ে সেই তাঁতের প্রথম কাপড়—আধ ইঞ্চি লাল কাশীপাড় কাপড় দেখে আমি বললুম, ঐ কাপড় আমার চাই। বাবা বললেন, ঐ মোটা কাপড় পরতে পারবি না,—ভিজলে আধ মণ ভারি হবে, নেড়াতে পারবি না। আমি না-ছোড়-বান্দা—কাজেই ঐ কাপড়ই কেনা হল একজোড়া। ওর সঙ্গে তো আর বিলিতী চলতি লাট্টু মার্কা কাপড় পরা চলে না!—

আমি যে একটি ক্ষুদে প্যাট্রিয়ট,—তাতে আর বাবার সন্দেহ রইলো না। কিন্তু আমার বৈপ্লবিক বিকাশটা বাবা দেখে যেতে পারেন নি,—তিনি ১৯০৮ সালেই গত হলেন।

আমাদের পাড়ায় প্রোফেসর কে ডি শীলদের বাড়ীর পাশের শ্যামবল্লভের একটা বাড়ীতে হল অনুশীলন সমিতির হেড কোয়াটার—আর শিউবক্স বগলার লেনের পূর্ব মাথাটা রেলের লাইনের পাশ ধরে পূর্বদিকে খানিক এগিয়ে চোদ্দভাগার মাঠে গিয়ে পড়েছিল, সেই মাঠে ছিল আখড়া। চোদ্দভাগা আগে ছিল পুকুর—হুদুদের বাড়ীর পিছন থেকে ননী গোসাঁইয়ের বাড়ীর পিছন পর্যন্ত। পরে সেটা বুজিয়ে একটা মাঠ হয়েছিল,—আখড়া উঠে যাওয়ার পর যেটা হয়েছিল ফুটবল গ্রাউণ্ড। এখন সেখানে হয়েছে বড় বড় বাড়ী।

আখড়া বাড়ীটার সামনে একটু 'লন'—তারপরে উঁচু প্লোয়ের ওপর বড় বড় ঘর, একতালা,—বড় ছাদের ওপর শুধু সিঁড়ির ওপরের চিলের ঘর। লনে এক্সারসাইজের জায়গা, বার প্রভৃতি। ঐ বাড়ী আর কে, ডি, শীলেদের বাড়ীর মাঝে ছিল একটা খুব সরু গলি ২ ফুটের মতন চওড়া, এবং তার মাঝে এক সরু নালী। গলির দুপাশের দেওয়ালে বালির কাজ ছিল না, সুতরাং ইটের ফাঁকে পা দিয়ে দিয়ে আখড়াবাড়ীর আলসে টপকে ছাদে যাওয়া যেত।

আমাদের একটা খেলা, 'স্পোর্টস আইটেম' ছিল, একদল লোক বাড়ীটার ঘরে ঘরে থাকবে, সিঁড়ির নীচের দিকের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে। আর এক দল লোক, তার মধ্যে আমাদের মত ছোট দুই-এক জন সমেত বাইরের গলির দেওয়াল বেয়ে ছাদে উঠবে। তারপর ছোট একজনকে কোমরে দড়ির মতন করে পরনের কাপড় বেঁধে আলসের ওপর দিয়ে বাড়ীর ভেতর দিকে ঝুলিয়ে ছেড়ে দেবে, এবং সে ঝপ করে বাড়ীর উঠোনে পড়েই সিঁড়ির দরজা খুলে দেবে, আর ছাদের বড়রা হুড়মুড় করে নেমে গিয়ে ঘরে ঘরে দরজা আগলে দাঁড়াবে ঘরের লোকদের আটক করবে।

আমি ছাদের দলে থাকতুম: দু'-চারটে ডানপিটে ছোট ছেলেকে ঐভাবে বাড়ীর মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হত, দেখে গায়ে কাঁটা দিত। কিছুদিন বড়দের পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে ঘরের লোকদের বন্দী করায় ওস্তাদ হওয়ার পর একদিন মনটাকে শক্ত করে নিয়ে বলে বসলুম, আজ আমাকে ঝুলিয়ে দিন; বড়রা বললেন, ভয় পাবি না? ঠ্যাং ভাঙতে পারে কিন্তু। বলে যখন ফেলেইছি, তখন ভয়ে ভয়ে মুখ সাপুটি করে বললুম, কারো ভাঙে না, আর আমার ভাঙবে? ভাবখানা হল, ওদের পা যেমন ভেঙে দাও না, আমার পাও ভেঙে দিও না। বড়রা বললেন, ল্যাঙট আছে তো? বললুম, আছে। যাই হোক, দাঁতে দাঁত চেপে অগ্নিপরীক্ষায় পার হলুম, এবং মনে আর সন্দেহ রইলো না যে, আমি কৰিতকর্মা হয়েছি।

ভবিষ্যতের কোন্ প্রয়োজনে এই ট্রেণিং, তা তখন মনেই আসতো না, আর ভবিষ্যতে এ ট্রেণিং কোন কাজে লাগারও প্রয়োজন হয়নি। আখড়ার মাঠে নানা রকম ড্রিল হত, মার্চ হত রিলে, মার্চে লাইনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চকিতের মধ্যে একটা জিনিস রিলে করে চালান করে দেওয়া হত, নিজ নিজ ঘাঁটি রক্ষা করে। মাঠের মাঝখানে একজন ফ্ল্যাগ নিয়ে দাঁড়াতো, আর চারিদিক ঘিরে জন বারো জোয়ান, ছোটরা সমেত, বড় বড় লাঠি নিয়ে প্রাণপণে 'হাক্স্যা' ঘোরাতো, হাঁপিয়ে যাওয়া পর্যন্ত; এর নাম ছিল মন্দির রক্ষা। মাঠের মাঝখানে সবচেয়ে ওস্তাদ 'বানা' খেলোয়াড়, 'গুলো' দেওয়া লাঠি নিয়ে দাঁড়াতো, আর তাকে ঘিরে কয়েক জন বড় লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে মারার চেষ্টা করতো; সে এমন পাঁয়তাড়া সহকারে "বানা" ঘোরাতো যে, কেউ তার কাছা-কাছিও পৌঁছতে পারতো না।

আখড়ায় খেলা হ'ত বড়লাঠি, ছোটলাঠি, সোর্ড, ড্যাগার, সড়কি প্রভৃতি, আর লাঠি ঘোরানো—বেনিটি, হাক্স্যা, বানা প্রভৃতি। 'রণপা'য়ে হাঁটাও প্রাকটিস করা হ'ত। বড়লাঠির ওস্তাদ ছিলেন দীনবাবু, ভুট্টু বাবু, ছুতোর পাড়ার কালীবাবু, আমাদের পাড়ার নারাণ দে প্রভৃতি; ছোটলাঠি শেখাতে আসতেন পাইক-পাড়ার গাঁটা বাবু, আর [illegible]

সকলেই সব খেলা জানতেন, বড়দের কাছে ছোটরা শিখতো,—আমি এবং পুলিনও। বেনিটিতে ছোটদের মধ্যে সতীশ মুখুজ্যে (এখন বরানগর ষষ্ঠীতলায় থাকেন)—আর অমূল্যরতন সিংহ (আমাদের দু'-এক বছরের সিনিয়ার বন্ধু, বিখ্যাত গণিতজ্ঞ,—ভারত সরকারের ডেপুটী ডিরেক্টর অফ ষ্ট্যাটিষ্টিক্স পদে অনেকদিন চাকরী করে পেন্সন নিয়ে রিটায়ার করার পরই—বছর দু'-তিন আগে মারা গেছেন)—তিনি দুহাতে দুটো লাঠি একসঙ্গে ঘোরাতেন অবহেলে, এবং নানা কায়দায়। কাউন্সিলার দুলাল মুখুজ্যের খুড়তুতো মামা কুড়ন,—'সম্পূ'র দাদা হরিদাস এবং ছোটদের মধ্যে কর্পোরেশনের স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক সনাতন নাগের ছোট ভাই মাণিক 'রণপা'য় ওস্তাদ ছিল। সনাতনও আখড়ায় আমাদের ছোটদের দলের একজন।

আখড়ার বাড়ীতে কিছুদিন এক জোয়ান জাপানী এসে ছিল,—জিউজুৎসু এবং হিপ্‌নোটিজমের ওস্তাদ। কিছুদিন সে সব চর্চাও চলেছিল। আমরা ছোটরা শুধু তফাতে থেকে দেখতুম।

১৯০৭ সালে আখড়ার বাড়ীতে এক 'হোমযজ্ঞ' হল; একটা ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে সারিবন্দী বড়লাঠি সাজিয়ে, ছোটলাঠি দিয়ে রকমারি করে বেঁধে ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরী করে, তাতে ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, সড়কী, খাঁড়া, টাঙ্গী, ছোরা প্রভৃতি বেঁধে সাজানো হল, একজন মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী 'স্বামীজি' এসে মেঝের ওপর কাঠের আগুন করে তাতে 'কুসী' করে ঘি দিতে দিতে কত মন্ত্র, শ্লোক প্রভৃতি আউড়ে যেতে লাগলেন,—মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করে গেলেন, আমরা ছোটরা কাণ্ডটা দেখেই খুসী,—মন্ত্র-ব্যাখ্যা শোনার উৎসাহ বা বোঝার গরজ আমাদের ছিল না।

সর্বশেষে, শবযাত্রীরা যেমন একে একে সকলেই চিতায় জল দেয়,—তুলনাটা মাপ করবেন,—তেমনি কিউ করে একে একে সকলেই হোমাগ্নিতে একটুকরো কাঠ এবং একটু করে ঘি দিয়ে যেতে লাগলেন এবং স্বামীজি একটা মন্ত্র উচ্চারণ করে যেতে লাগলেন, একটু তাড়াতাড়ি কাজ সারার গরজে। কিউয়ের পেছনে আমরা ছোটরাও হোমাগ্নিতে কাঠ-ঘি দিলুম। সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দেওয়া পর্যন্ত উপবাসে থাকার মতন 'হোম-যজ্ঞ' শেষ হওয়া পর্যন্ত উপোস করে থেকেই আমাদের নিষ্ঠার পরিতৃপ্তি হল।

তখনকার গান ছিল প্রধানত 'বন্দে মাতরম'—মার্চের সুর—এখনকার মতন এলিয়ে-দুলিয়ে মন ভুলিয়ে সংস্কৃতি-সম্মেলনের উদ্বোধন নয়; সে ছিল মায়ের বন্দনা, মাকে বসিয়ে গান-শোনানো নয়।

অন্যান্য গান ছিল,—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'—'উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগৎ-জনপূজ্যা' প্রভৃতি; আবৃত্তি করা হ'ত,—'বাজ রে শিঙা বাজ এই রবে,—সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,—সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,—ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'—প্রভৃতি।

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ থেকে মুকুন্দ দাস প্রভৃতি অনেক কবির অনেক গান প্রচলিত হয়েছিল, চমৎকার গান! তখনকার বাঙালীর মনের ক্রোধ, ক্ষোভ, আত্মসমালোচনা, দার্শনিক-সান্ত্বনা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, উদ্দীপনা, সংগ্রামীগণ, সবই প্রকাশ হ'ত সে সব গানে; সকল কবির নামও মনে নেই। কিন্তু 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্য-বিধাতা' গানটা এ-যুগের আগে কখনো কোনো 'স্বদেশীকে' বা বিপ্লবীকে গাইতে শুনিনি। আমাদের জগতে ওটা ছিল না কোন কালে।

যদি অভয় দেন তো বলি—গানটা শুনলেই আমার ছেলেবেলার 'জয় রাজ-রাজেশ্বর' গানটা মনে পড়ে। 'পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল-বঙ্গ' প্রভৃতির 'ঐক্যবিধাতা' বলে কার জয়গান করা সঙ্গত? ভগবানের? হায় হায়! ভগবান যদি ভারতের ঐক্যবিধান করতেন, তাহলে দু'শো বছর ইংরেজের গুঁতো খেয়ে ভারতবাসীর প্রাণ কণ্ঠাগত হ'ত না। ঠিক তিনি পারেননি বলেই সে ঐক্যবিধান করতে পেরেছিল ইংরেজ, সব ভারতবাসীকে একই গোলামীর শৃঙ্খলে বেঁধে। সুতরাং গানটা উৎসর্গ করা যায় শুধু ইংরেজেরই নামে। কিন্তু যাক—

১৯০৭ সালে মাণিকতলার বোমার আড্ডা ধরা পড়ার পর যখন সরকার বাহাদুর অনুশীলন প্রভৃতি সমিতি বে-আইনী করে দিলেন, তখন, ১৯০৮ সালে আমাদের সমিতি এবং আখড়াও উঠে গেল। আমরা লাঠি, ছোরা প্রভৃতি এক দিন সব লুকিয়ে ফেললুম। প্রথম সেই আমার গুপ্ত কাজে হাতেখড়ি হল। চোদ্দভাগার মাঠের কাছেই ছোট জ্যাড়াদের বাড়ীতে খোঁড়া ক্ষেত্তার ঘরের পিছনের ঘুঁজির মধ্যে আমরা গাড়ীখানেক বড় লাঠি লুকিয়ে ফেলেছিলুম।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়েছিল, তার ডিরেক্ট-অ্যাকসন ছিল বিলাতী বর্জন। বিলাতী কাপড় পোড়ানো হয়েছিল এবং মোটা দেশী মিলের কাপড় এবং জোলাদের বোনা কাঁচি-ধুতির ব্যবহার বেড়েছিল, বিলিতী নুণের বদলে 'করকচ' নুণ চালু হয়ে গিয়েছিল ব্যাপক ভাবে। এই প্রকাশ্য বৈধ আন্দোলনের তলায় তলায় যে আর একটা গুপ্ত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল, আখড়াগুলোর পেছনে ছিল তাদেরই গুপ্ত নেতৃত্ব। প্রকাশ্য আন্দোলনের জন আষ্টেক নেতাকে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অশ্বিনী দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, রাজা সুবোধ মল্লিক, কৃষ্ণকুমার মিত্র, তাঁর জামাই শচীন বসু, পুলিন দাস প্রভৃতিকে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশনে বিনা বিচারে আটক করা হয়েছিল; বন্দে মাতরম্ রণধ্বনির ওপর নিষেধাজ্ঞা সুরু হয়েছিল প্রথমে বরিশালে,—লাঠির বাড়িতে মাথা ভেঙ্গে দিয়েও পুলিশ চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে বন্দে মাতরম্ রণধ্বনি ছাড়াতে পারেনি,—আমরা এই সবই দেখতুম এবং শুনতুম।

সরকারের ক্ষতি হয়েছিল, টনক নড়েছিল, কিন্তু আন্দোলন দমনের নানাবিধ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানেরা যাতে আন্দোলনে যোগ না দেয়, তার জন্যে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করে কিছুটা সফলও হয়েছিল। ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি মুসলমান নেতারা ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সক্রিয় নেতা। হিন্দু-মুসলমান ভারতমাতার দুই চক্ষুর মতন,—হিন্দুরা বড় ভাই, মুসলমানেরা ছোট ভাই—এই সব কথারও সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেসে মডারেটরা বিলাতী বয়কটের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল,—কিন্তু মহারাষ্ট্রের তিলক এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় বাঙ্গালাকে সমর্থন করেছিলেন। পরবর্তীকালেও দেখা গেছে, ঐ দুই প্রদেশে মারাঠি এবং পাঞ্জাবী বিপ্লব প্রচেষ্টাও গড়ে উঠেছিল। লাজপৎ রায়কেও সরকার বাহাদুর

[ ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না ]

রাণী ভবানীর মন্দির ( মুশিদাবাদ )

—শিবানী চট্টোপাধ্যায়
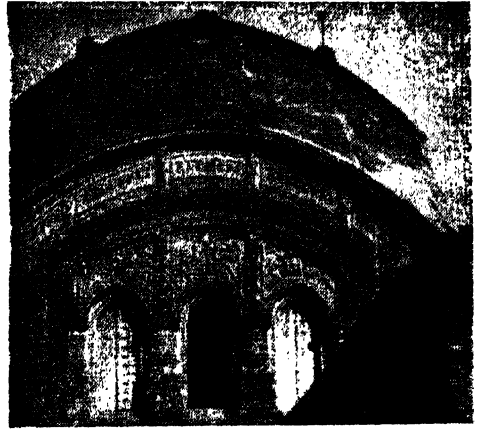
বীরেশ্বরের ঘাট

—অরুণমাধব সাহা
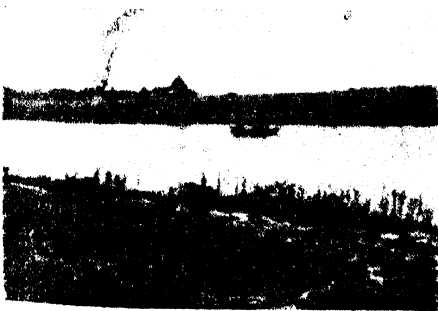
সমুদ্রসৈকত, পুরী

—অরুণ রায়চৌধুরী
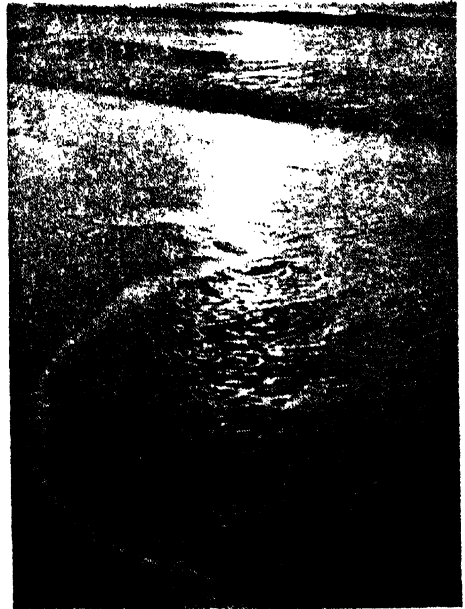
সুরের নেশায় —ত্রিদিব রায়

সোনামার্গ ( কাশ্মীর )

—বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

—কমল ঘোষ

মাটি ও মানবী

এবং রেঙ্গুনে আটক করেছিল (তাঁর সঙ্গে সরদার অজিত সিং-ও ছিলেন), এবং তিলককে সিডিশন কেস করে ছয় বছর জেল দিয়েছিল।

কিন্তু যখন দেখা গেল বড় বড় সরকারী কর্মচারীকে গুপ্ত হত্যার জন্যে বোমার কারখানাও হয়েছে, বোমা পিস্তল চলতেও সুরু করেছে, তখন সরকার বাহাদুর মর্লি-মিন্টো রিফর্ম দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করে, বড়লাটের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে একজন ভারতীয় সদস্য নিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করলেন, এবং তাতে 'আন্দোলন' বন্ধ হল। কিন্তু গুপ্ত বিপ্লবীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েও দমন করতে পারলো না। তারা সাময়িক ভাবে একটু থমকে গেল মাত্র।

আমি বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে বসিনি। সে বিরাট ইতিহাসের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটুকুর বিবরণ মাত্র লিখছি। কিন্তু আর একটা রাজনৈতিক ঘটনার কথা না উল্লেখ করে পারছি না, যে ঘটনাটা মনে থাকলে পরবর্তী কালের এবং এ যুগের অনেক কথা বুঝতে পারার সুবিধে হবে।

বড়লাটের শাসন পরিষদে প্রথম ভারতীয় সদস্য নেওয়ার প্রস্তাব যখন 'ভারত-ভাগ্যবিধাতা' সপ্তম এডোয়ার্ড শুনলেন, তখন তিনি প্রথমে আপত্তি করে বসেছিলেন—আমাদের সাম্রাজ্যিকনীতি একজন ভারতবাসী জানতে পারবে, এ কি ভয়ঙ্কর কথা! মর্লি সাহেব তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে আমাদের বিশ্বস্ত লোকের অভাব নেই। তিনি আশ্বস্ত হলেন, রাজী হলেন।

আমরা তখন টালায় কুস্তি লড়ি, ফুটবল খেলি, অবসর সময়ে ক্ষুদিরাম-কানাইলালের কথা নিয়ে মাতামাতি করি, আর রোজ একবার করে মনকে একাগ্র করার 'সাধনা' করি, পুলিন আর আমি। আমাদের স্কুলের এক মাষ্টার ছিলেন পরম রামকৃষ্ণ ভক্ত। তিনি আমাদের কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে নিয়ে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব দেখতে; তিনিই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, মনকে কি করে একাগ্র করতে হয়। তদনুসারে আমরা পুলিনদের বাড়ীর (টালা) ছাদে চিলেঘরের কোণায় খানকয়েক পরিষ্কার খান ইট সাজিয়ে একটা খুপরী তৈরী করে, সেই "মন্দিরে" রামকৃষ্ণদেবের এক ফটো প্রতিষ্ঠা করে' দু'জনে লুকিয়ে লুকিয়ে একাগ্রতার সাধনা করি, অর্থাৎ শুধু রামকৃষ্ণদেবের মূর্তি চিন্তা,—মন থেকে আর সব চিন্তা সরিয়ে দিয়ে। কার্যত অবশ্য দাঁড়াতো, যত রাজ্যের চিন্তার ভিড়ের মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণ দেবকে আপ্যায়িত করা।

দিদির কাগজপত্তার বাতিক ছিল, তিনি আশ-পাশের বাড়ী থেকে কাগজ যোগাড় করে পড়তেন, এবং গল্প বলতেন। যখন "যুগান্তর" বেরিয়েছিল, তখন টালায় আমরা তা দেখতে পেতুম না। পরবর্তী কালের নবশক্তি (৮—১২ সালের মধ্যে) সন্ধ্যা প্রভৃতি কাগজ দিদি পড়তেন। একবার নবশক্তিতে এক খবর বেরুলো, "স্বদেশী"রা নাকি এক বড় পুলিশ অফিসারকে (অনেকে বলেন, পূর্ণ লাহিড়ী) পাকড়াও করে চোখ বেঁধে সুড়ঙ্গপথে তাদের ভূগর্ভস্থ অস্ত্রনির্মাণের কারখানা ও অস্ত্রাগারের বহর দেখিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল— তলোয়ার, বর্শা, খাঁড়া,—এবং বন্দুকও অবশ্য। এখন, বিশেষত খাঁড়া, শুনলে হাসি পায়, যেমন আপনাদের পাচ্ছে,—কিন্তু তখন

গদগদ হতুম, এবং আশান্বিত হয়ে ভাবতুম,—কবে এদের গুপ্তচক্রের মধ্যে স্থান পাব। বয়েস কি হয়নি?

বয়েসও হয়েছে, গুপ্তচক্রে প্রবেশও করলুম,—১৯১২ সালে দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা-পড়ার পর। প্রথম শিক্ষা চলতে লাগলো পড়াশুনা—বই পেতুম করালীর কাছে (সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপ্যাল ৺কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের ভাগিনেয়,—বহরমপুর কলেজের প্রোফেসর শ্রীকালিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরীর ভাই করালী)—তাদের বাড়ী ছিল অতুল দাসদের বাড়ীর পাশে। বিবেকানন্দ স্বামীর কর্মযোগ এবং অন্যান্য—যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি,—নেপোলিয়ন, নন্দকুমার, ঝান্সীর রাণী,—রবি ঠাকুরের গোরা এবং সাধনা (প্রবন্ধ) প্রভৃতি বই; আর সব চেয়ে অবশ্যপাঠ্য ছিল একখানা "নিষিদ্ধ" বই,—সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা"। পড়লে মনটা সত্যাই উত্তেজিত হয়ে উঠতো, ইংরেজের শয়তানীতে ভারতের কি হাড়ির হাল হয়েছে দেখে।

মাঝে মাঝে গুপ্ত বিজ্ঞপ্তি, ইস্তাহার প্রভৃতি আসতো, আমরা সেগুলো গোপনে রাত্রে লোকের বাড়ীতে ফেলে দিয়ে বা দেওয়ালে এঁটে দিয়ে আসতুম। একবার এক ইস্তাহার এল—(C Lambu) —Director of India Revolution, Vigilance Department, Bengal Branch-এর! তাতে বলা হয়েছে পাইকপাড়ার অমুক ঠাকুর শত্রুর গুপ্তচর,—দলের কেউ যেন তার সঙ্গে আর কোন প্রকারের সম্পর্ক না রাখে। (C Lambu, ছোট লম্বু-পাঁচু বানার্জি) ইস্তাহারাদি আনতেন জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়।

ঘটনাটা হচ্ছে এই যে, পাইকপাড়ার এক স্বনামধন্য "ঠাকুর",—বড় লোক,—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের খুব বড় একজন অ্যামেচার প্যাট্রন,—বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন,—এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম করে' 'রাইট অ্যাণ্ড লেফ্‌ট' ছেলে ধরে' বেশ বড় একটা নিজস্ব দল গড়ে'ছিলেন।

তাঁর দলের বড় ছেলেগুলোর অনেকে শেষ পর্যন্ত গুপ্ত বিপ্লবীচক্রের কর্মী হত, কাজেই এক হিসেবে তিনি ছিলেন একজন আড়কাঠি। আর ছোট ছেলেগুলোকে তিনি ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিতেন, এবং বাড়ী থেকে টাকা চুরি (গহনা পর্যন্ত) করিয়ে এনে দেশের জন্যে তাঁর হাতে দিতে বলতেন। বিবেকানন্দ বলতেন, আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ—বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে, একা আমি পড়ে রব মুক্তি সমাধিতে? ঠাকুর মশায় ছেলেদের বলতেন, দেশের জন্যে নিজের সব কিছু বিসর্জন দিতে পারলে, তবেই না দেশভক্ত! ছেলেরা লজ্জায় বাড়ী থেকে যে যা পারতো চুরি করে এনে দেশের জন্যে তাঁর হাতে দিতো।

ঠাকুর মশায় অদ্ভুতকর্মা, অঘটন ঘটাতে পারতেন, রিভলভার পিস্তলের বড় বড় Smuggler এর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। এদিকে তাঁর যোগাযোগ ছিল অতুলদার সঙ্গে। জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ও কিছুদিন তার কাছে যাতায়াত করেছিলেন। কিন্তু জীবনলালের শ্যেন দৃষ্টির কাছে ঠাকুর মহারাজের ক্রিয়া কলাপ সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। তিনি দাদাদের কাছে সেটা বলেছিলেনও, কিন্তু জুনিয়ারের কথায় তাঁরা আমল দেননি।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ লাগার পর যখন জার্মাণ ষড়যন্ত্র পেকে উঠলো, তখন হঠাৎ প্রচুর টাকার জরুরী প্রয়োজনে অনেক বিবেচনার পর ডাকাতির সিদ্ধান্ত করা হল। দাদা (যতীন মুখোপাধ্যায়) বাঘা যতীন ডাকাতির বিরুদ্ধে ছিলেন। খুন করতে হয় বাধ্য হয়ে, কিন্তু ডাকাতিতে প্রথম আক্রমণ সুরু হবে আমাদের তরফ থেকে, আর গ্রেপ্তার, মামলা, ফেরারী, আরো টাকার প্রয়োজন, আরো ডাকাতি, এই চলবে। কিন্তু অন্য উপায় নেই দেখে ঠিক করা হল ডাকাতিই করতে হবে, কিন্তু সরকারী টাকা। পরে অবশ্য খুচরো ছোকরা দল এমন কাণ্ডও করেছে ডাকাতি বলে যা দেখে এক দাদা বলেছিলেন বিধবার ঘটি চুরি।

যাই হোক, প্রথম ডাকাতি হল গার্ডেনরীচে হাজার চল্লিশ সরকারী টাকা। খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বসলো নরেন ভট্টাচার্যকে (এম এন রায়) কিন্তু কোর্ট জামীন দিয়ে বসলো অল্প টাকায়। সুতরাং তিনি গা ঢাকা দিয়ে থাকলেন, C. Martin রূপে জার্মাণ অস্ত্রের জাহাজ receive করতে ব্যাঙ্কক যাওয়ার সময় পর্যন্ত। জামীন বাজেয়াপ্ত হল, টাকাটা গেল।

মওকা বুঝে ঠাকুর মহারাজ খবর দিলেন এক বাক্স revolver পাওয়া যাচ্ছে, পাঁচ কি দশ হাজার টাকা চাই ঠিক মনে নেই। এখন যেখানে Hotel Royal হয়েছে হ্যারিসন রোড আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়, ঐখানে এক খোলার বস্তি ছিল, এবং সেখানে এক মেসে থাকতেন জগাদা'। জীবনের তাঁর কাছে যাতায়াত ছিল। ঠাকুরের কথাটা শুনে জীবন আবার একটু টুকেছিল, কিন্তু এবারেও কেউ গ্রাহ্য করেনি।

তার পর বোধ হয় নরেন ঘোষচৌধুরী এবং মনোরঞ্জন গুপ্ত (মনোরঞ্জনদা' বর্তমান বিধান পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য) ঠিক মনে নেই, টাকার পুঁটুলী নিয়ে গেছেন ঠাকুর মহারাজের কাছে রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে, এবং তার একটু পরেই বাড়ীর গেটে এক পুলিশ-অফিসার মোটরে এসে হাজির! সর্বনাশ! ঠাকুর মহারাজ বললেন,—টাকার পুঁটলীটা দিন শীগ্‌গির, বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিই,—আমার ওপর আপনারা অতুলের মতনই নির্ভর করতে পারেন,—আপনারা খিড়কী দিয়ে বাগানের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যান। অগত্যা তাই করতে হল, কিন্তু তার পর থেকে স্বয়ং ঠাকুরমশায়ই হলেন প্রায় ফেরার, দাদারা আর তাঁকে খুঁজে পান না, অথচ তাঁর নামে পুলিশ-ওয়ারেন্টও নেই, আর তিনি বাড়ীতেই বাস করেন।

রিভলবারের বাক্সের বদলে পুলিশ আমদানী করাতেই ঐ পূর্বোক্ত ইস্তাহার বেরিয়েছিল। আমি, জীবন, করালী ও হারু দুই দলে ভাগ হয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে সেটা সেঁটে দিয়ে এলুম। ঠাকুর মহারাজের দেওয়াল, গলির মোড়, যার দমদম রোডের মোড়ের আর্মড, পুলিশ ষ্টেশনের গেটের থামে পর্যন্ত। সেখানে গিয়েছিলুম আমি আর জীবন। আমি ফটকের এক কোণায় হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে দু' হাতে রেলিং চেপে ধরে ভিতরে উঁকি মারলুম,—আর্মড, গার্ডটা এগিয়ে এল আমার কাছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ বাড়ী কিস্‌কা হায়?

সে বললে, পুলিশকা।

আমি বললুম, তোম দরোয়ান হায়?

সে প্রাণপণে আমাকে বোঝাতে লাগলো, আমি বুঝতে পারছি

না ;—জীবনের হাতে আঠা-মাখানো কাগজটা ছিল, সে অপর থামের গায়ে সেটা সেঁটে দিয়ে আমার কাছে এল,—তখন আমরা গার্ডের কথা বুঝে "অ!" বলে সরে পড়লুম।

গার্ডেনরীচের পর বেলেঘাটায় এক আড়তে ডাকাতি হল, মোটর ডাকাতির হিড়িক সুরু হল ; হাজার ২১ টাকা বেসরকারী। পুলিশও সক্রিয় হল, খুনও প্রয়োজন হল, এমনি এক গোয়েন্দা খুন—বোধ হয় সুরেশ মুখার্জি, হেদোর মোড়ে—সেই সূত্রে অতুল ঘোষ গা ঢাকা দিলেন।

বেলেঘাটার পর টালার ডাকাতি। জীবনের মামা রমণী ব্যানার্জী থাকতেন কালী বাঁড়ুজ্যে ষ্ট্রীট আর গোবিন্দ পাল লেনের মোড়ে এক বাড়ীতে—জীবন সেখানে থেকে পড়তো এবং কলেজ ফাঁকি দিয়ে, মামাকে ফাঁকি দিয়ে ভারত উদ্ধার করে বেড়াতো। গোবিন্দ পালের লেনে ঢুকে বাঁদিকে সেটবাগান লেন, সেখানে কালাচাঁদ ভট্টাচার্যের দোতলা বাড়ী ; তিনদিকে অন্যান্য বাড়ী, গলির উপর সদর দরজা সর্বদা ভিতর থেকে বন্ধ থাকে। বাড়ীর একমাত্র ছেলে, আত্মীয় পোষ্যপুত্র—শ্যাম—আমাদের দলের ছেলে। ভট্টাচার্য মশায়ের টাকা আছে এবং তেজারতী মহাজনীর ব্যবসা আছে—টাকা এবং বন্ধকী ও তামাদী গহনাপত্র লোহার সিন্দুকে থাকে বাড়ীতেই। সেই বাড়ীতে ডাকাতি—টাকায়-গহনায় তের-চোদ্দ হাজার। দলের মধ্যে প্রচার, শ্যামই সন্ধান দিয়েছিল এবং সুবিধা-অসুবিধা বাৎলে দিয়েছিল। পুলিশ কিন্তু তাকে সন্দেহও করেনি এবং গ্রেপ্তার বা আটক করেনি।

ও-পাড়ায় রমণী বাবুর বাড়ীর এক মাষ্টার নলিনী বাবু, একজন ঐ বাড়ীরই প্রাইভেট টিউটর এবং রঞ্জন ব্যানার্জি বলে পাড়ার একটি ছেলে ছিল আমাদের দলের। আমাদের পাড়ায় হারুদের ভাড়াটে ফেরারীরা ছাড়া ছিল হারু, করালী, সতীশ নিয়োগী, পঞ্চানন দাস এবং শুধু তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট "ভ্রমরদা"—ননীগোপাল বসু। পঞ্চানন বন্দুক-পিস্তল মেরামতের এক্সপার্ট—তাঁর ঠাকুরদাদার নিজস্ব ছোট কারখানা ছিল কর্মকারের, এবং দেশী বন্দুক তৈরী করে' বিলাতী কোম্পানীর দোকানে সরবরাহ ছিল তাঁর ব্যবসা। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র—পঞ্চাননের বাবা বন্দুক মেরামতের কারখানা করেছিলেন—সেইখানেই পঞ্চাননের শিক্ষা। পরে পঞ্চানন হয়েছিলেন এক্সপার্ট মোটর মেক্যানিক।

একবার এক ৪৫০ নম্বরের রিভলভার, "ঘোড়া"টা ঠিক কাজ করে না বলে মেরামত করতে দিয়ে গেছে ; তখন পঞ্চানন স্নান করে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন—বাঁ হাতেই সেটা নিয়ে চিরুণী-ধরা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মাঝখানে নলীর ডগাটা রেখে ঘোড়া টেনে দেখছে বাঁ হাত দিয়েই। চেম্বারটা মাঝে মাঝে এক একবার ঠিক ঘুরছে, আবার আটকে যাচ্ছে। হঠাৎ একবার দড়াম করে আওয়াজ, এবং পঞ্চাননের দুই আঙুলের মাঝখানের মাংস ভেদ করে এক গুলী গিয়ে লাগলো দেওয়ালে। সোডার বোতল ভেঙ্গে গেছে বলে হাত বেঁধে ফেলে তখনকার মতন সামলানো হ'ল। তারপর ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে দলের এক ডাক্তার এসে পড়লেন এবং ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন।

প্রথমে পঞ্চাননকে তোলা হল সিমলার অতীন বসুর বাড়ীতে। তাঁর পুত্র স্বনামখ্যাত অমর বসু তখন ছোট,—অর্থাৎ আমার চেয়েও ছোট। সেখান থেকে পঞ্চাননকে নিয়ে গিয়ে রাখা হল আহীরিটোলায় যুগল দত্তের বাড়ীতে। সেখান থেকে সেরে উঠে পাড়ায় এসে অতুল দাসদের বাড়ীতে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে তারপর পঞ্চানন বাড়ী এলেন।

অনেক দিন ধরে পাড়ায় অনেক "জিনিস" (পিস্তলাদি) এবং অনেক "কুড়" (গুলী) এসে জমেছিল—সেগুলো নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রাখাই ছিল একটা বড় কাজের অঙ্গ। ডাকাতির বন্দোবস্ত যখন হল, তখন সব "মাল" সরাবার হুকুম এল। সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই সব নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে, অথচ মাল একগাদা—বড় কোম্পানীর চোরাই মশার পিস্তল, ফুট খানেক লম্বা,—তার কাঠের কেসগুলো এমন ভাবে তৈরী, যাতে তার মাথায় পিস্তলটা জুড়ে দিয়ে সমস্তটাকে রাইফেলের মতন ভাবে ব্যবহার করা যায়। তার ১০টা করে কার্টিজ গাঁথা "ম্যাগাজিন" একগাদা ; ৪৫০, ৪৫৫, ৩৮০, ছোট ৩২০ নতুন-পুরোন একগাদা পিস্তল আর তার গুলী একগাদা ; কোন্‌টা কোথায় কেমন করে সরাই ? করালীর সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হল, আগে সব মাল আমার বাড়ীতে জমা করা হোক, তারপর ভাবা যাবে।

তদনুসারে মালের গাদা আমার বাড়ীতে এসে জমলো। আমরা রাস্তা দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতন অনেকগুলো পোঁটলায় সব বাঁধলুম। আমি একটা পোঁটলা রেখে এলুম সওদাগর পট্টির পিছন দিকে শ্রীশ চন্দ্রের বাড়ীতে—তাদের বাড়ীতেই নার্শারীর ব্যবসা ছিল। আর একটা পোঁটলা রেখে এলুম ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড এবং ভেরিটোলার বাজারের মাঝের বস্তিতে একটা ছেলের কাছে,—তার নামটা এখন মনে নেই। শ্রীশ ছিল বন্ধু দলের লোক নয়,—আর ছেলেটা ছিল দলের।

বিকেলবেলা জীবন এল দেখতে, গায়ে মোটা দুই কোট, তার ওপর এক মোটা চাদর। সব ক্লিয়ার হয়নি দেখে বললে আমার কাছে যত পার দাও, আমি নিয়ে যাই। তার অঙ্গে প্রায় মোষের গাড়ীর মতন মাল বোঝাই করে চাদরখানা দোলাই-এর মতন করে ঘাড়ের কাছে বেঁধে ছেড়ে দিলুম। বললুম, রাস্তায় যদি পুলিশ এসে তোমার দুই গালে চড়াতে থাকে, তাহলে ঠেকাবার জন্য অন্তত একটা হাত খালি রাখ। সে হাসলে, কিন্তু মাল নিলে হাত দুটো পর্যন্ত জোড়া করে, এবং নিরীহ ভাল মানুষটির মতন চলে গেল।

সন্ধ্যার খানিক পরে হারুদের বাড়ীর ফেরারীদের আড্ডায় কাঙালদা' প্রভৃতি এসে জুটলেন,—আমাদের সকলকে সকাল পর্যন্ত আপন আপন বাড়ীতে থাকার হুকুম হল। রাত্রের ঘটনা পরদিন সব শুনলুম।

কর্তা রাত ন'টায় বাড়ী ফেরেন, এবং তাঁর গলার আওয়াজ শুনলে তবে চাকর দরজার ভিতরের তালা খুলে দরজা খুলে দেয়। সেদিনও ঠিক তেমনি ভাবে কর্তা যখন বাড়ী ঢুকছেন, সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে কয়েকজন ঢুকে পড়ে রিভলবার দেখিয়ে কর্তাকে এবং চাকরকে একটা পূর্বনির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গিয়ে আটক করলো, এবং এক এক ঘর থেকে এক একজন রিভলভার দেখিয়ে মেয়েদের এবং শ্যামকেও এক ঘরে আটক করলে। তারপর সিন্দুকের চাবি চেয়ে নিয়ে টাকা গয়না সংগ্রহ করে আসার সময় বলে এলো, কাল বেলা ন'টার আগে যদি

পুলিশে খবর দেন, বা রাত্রে যদি চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করেন, তাহলে কিন্তু ভাল হবে না; আমরা আবার আসবো। কাজেই পরদিন বেলা নটার আগে কাণ্ডটা পাশের বাড়ী লোকেরাও জানতে পারেনি।

কয়েকখানা গয়না নাকি কর্তা ফেরৎ চেয়েছিলেন, না পেলে তাঁকে কি এক ভারি অসুবিধের পড়তে হবে বলে—সে গয়না ছেড়ে দিয়েই আসা হয়েছিল। একটা গল্প আছে—সিঁড়ির পাশে কিছু নোট পড়ে গিয়েছিল, শ্যাম সেগুলো কুড়িয়ে পেয়ে পরে দিয়ে গিয়েছিল দলের কাছে। তখন অবশ্য ডাকাতি করতে গিয়ে বলে আসা হত—দেশ স্বাধীন হলে এসব টাকা ফেরৎ দেওয়া হবে। আজ তার জরা-বার্দ্ধক্য ও বাতে পঙ্গু. সংসারের অবস্থাও ভাল নয়, বাড়ীর মধ্যে তিন ঘর ভাড়াটে বসিয়েছে. মনটাও যেন সব রকমে দমে গেছে। দেখলে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, জোয়ান বয়েসে এই লোকটা কেমন নিঃসাড়ে দেশের জন্য কত বড় ত্যাগ করেছে। আমি মনে মনে কল্পনা করি. শ্যামকে বলছি, একবার যাদুদা' কিম্বা ভূপতিদা'কে সেদিনকার কথাগুলো মনে করিয়ে দাও না—কল্পনায় বেশ দেখতে পাই, অনেক দুঃখের মধ্যেও শ্যাম হেসে ফেলেছে।

যাই হোক, কয়েক দিন পরে হিন্দু হোষ্টেলে যাওয়ার হুকুম হল,—ভদ্রলোকের নাম ভুলে গিয়েছি বোধ হয় পুলিন বসু। রাম ভটচাযি্য (ডক্টর রামচন্দ্র ভট্টাচার্য সর্পবিষ-বিশেষজ্ঞ) এবং সুন্দর রায় (ইনি সরকারী সাহায্যে নাকি বিলেত গিয়ে কি একটা হয়ে এসে বড় চাকরী-টাকরী পেয়েছিলেন) এই দুজনের কাছে আমার যাতায়াত ছিল। এঁদেরই কারো সঙ্গে তৃতীয় ভদ্রলোকের ঘরে গেলুম। তারপরে escort চলে গেলে ভদ্রলোক আমাকে একটি কাগজে মোড়া শক্ত করে বাঁধা ছোট, ভারী প্যাকেট দিলেন,—বললেন টাকার গয়না,—পঞ্চাননকে দিয়ে গালিয়ে বাট করে দিতে হবে। সেটা কোমরে ভাল করে বেঁধে নিয়ে চলে এলুম, এবং পঞ্চাননকে বলে ঠিক করলুম, হারুদের বাড়ীর কেরায়াদের পরিত্যক্ত অংশের একটা ঘরে গালাবার ব্যবস্থা করা হবে। পঞ্চাননদের বাড়ীর পিছনের পাঁচিল টপকে সে বাড়ীটাতে যাওয়া যেত। সেই ভাবে বন্ধ-বাড়ীতে ঢুকে গয়না গালিয়ে বাট তৈরী হল,—পঞ্চাননই সেটা যথাস্থানে পৌঁছে দিলে।

এসব কাজ একবার করলেই রপ্ত হয়ে যায়। প্রথম বিবেকের দুর্বল কামড়ের সামনে রুখে দাঁড়ায় ভারতের গোলামী, ইংরেজের শয়তানী—বিবেক লজ্জায় মাথা নত করে—তারপরে আর একবারও মাথা তুলতে সাহসই করে না। নতুন ঘটনার সামনাসামনি পড়লেই, আগে থেকেই বেমালুম সরে পড়ে। বিপ্লবের গুপ্ত পথের এ এক অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য নিয়তি।

কিন্তু সে মরে তো না-ই, বরং প্রয়োজনের সময় মৃত্যুর সম্মুখীন হতেও সাহস যোগায়,—যেন বলের অপব্যয় না ক'রে শক্তিসঞ্চয়ই করেছে।

যাই হোক,—পঞ্চানন পরবর্তী কালে কর্পোরেশনের 'ভেহিকল্‌স' ডিপার্টমেণ্টে মোটর মেক্যানিকের কাজ করে, এখন রিটায়ার করেছে। বয়স বোধ হয় ৭-এর কোঠা স্পর্শ করেছে। রোগজীর্ণ অস্থিচর্মসার শরীর নিয়ে রাজনীতি ছেড়ে দুবেলা পুজো-আহ্নিক নিয়ে মেতেছে, আর বাকি দিন গুণে চলেছে।

পাঁচু গোপাল ব্যানার্জি আগেই মারা গেছেন। কাত্তাকদা'ও মরে বেঁচে গেছেন। শেষ বয়সে তাঁর যে চেহারা দেখেছি—ছেঁড়া ময়লা কাপড়-জামা, খালি পা, ফুটপাথের ভিখিরীর মতন—দেখে শিউরে উঠেছি—হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, এ অবস্থা কেন? তিনি অনেক দুঃখের অনেক কথা বলে শেষে বললেন,—নিরুপায় হয়ে ভূপতির কাছে গিয়েছিলুম,—৩০টি টাকা সরকারী পেনশন করে দিয়েছে; বলে তিনি কপাল স্পর্শ করলেন।

কত বড়লোক বিপ্লবীর সাতগুষ্টি মোটরের লাইসেন্স পেয়েছে, আহা, কার্ত্তিকদা' একটা পেলে বোধ হয় বেঁচে যেতেন। কিন্তু অতীতের মোটর-ডাকাত,—বিশ্বাস কি? যদি আবার!—এ কার বিচার? নিয়তির?

[ ক্রমশঃ।

# এখানে সন্ধ্যা নামে

**অসীম বসু**

এখানে সন্ধ্যা নামে।
কুলবধূর হাতের ধুনুচি
নেচে নেচে
সুগন্ধ ধূপের কুয়াশা ছড়ায়
এখানে ওখানে।
মুঠো-মুঠো জোনাকির আগুন
জ্বলে আর নেবে।

একটি রজনীগন্ধা কোথায় ফুটেছে
ঘন ঝোপ-ঝাড়ে;
একটি বাঁশীর সুরে সুরে
চেতনার অতল গভীরে
সহসা ভাঙে
সুদুর্গম দুর্গের প্রাচীর।
এখানে সন্ধ্যা নামে।

রিম-ঝিম বেদনার সুগভীর খাদে
সুতীব্র কামনা
একটি স্পর্শ শুধু
গোপন অন্তে।

## শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরীক্ষা

শ্রীরমা দে

ঠাকুরের আবার পরীক্ষা কি? তবু তাঁর পরীক্ষার শেষ নেই। কত জন কত ভাবে নিল ঠাকুরের পরীক্ষা। কিন্তু ঠাকুর একটুও রাগ করলেন না। তিনি তো সার জেনেছেন। জগৎ জড় নয়। নড়িয়ে-চড়িয়ে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তাকে দেখলেই সে বাজবে, হাসবে, কথা কবে। এই নড়িয়ে-চড়িয়ে দেখাই তো পরীক্ষা। আর জগৎটাই তো পরীক্ষার বশ। পরীক্ষাও জগতের প্রেরণা। জগৎটাই তো পরীক্ষাময়। পরীক্ষায় ভয় করলে চলবে কেন? এ জন্যই ঠাকুর পরীক্ষাকে করলেন না ভয়, রাগের চেয়ে হাসি-মুখে মেনে নিলেন সব রকম পরীক্ষাকে। কিন্তু পরীক্ষা কি শুধু ঠাকুরের?

সত্যই তো, পরীক্ষা না দিয়ে উত্তীর্ণের পথ কোথায়? আবার পরীক্ষা না করলে আসল সোনা জানা যাবে বা কেমন করে? কিন্তু উত্তীর্ণের পথটাই দরকার। তাই জয়টীকার ছাড়পত্র চাইত? তবে তো পারবে যেতে, যে পথে যেতে চাও। আবার জয়টীকার ছাড়পত্র জনে-জনে হবে দেখাতে, তবে না মিলবে মুক্তি। তবেই তো আসবে নিজের ও সকলের অখণ্ড বিশ্বাস।

বাজিয়ে নিতে হবে, যাচিয়ে নিতে হবে। শুধু কি তাই? দেখে নিতে হবে, শুণে নিতে হবে, আর চিনে নিতে হবে। আসল না নকল, খাঁটী না মেকি? কিন্তু এ কি কম কথা? তবু এই সবেরই পরীক্ষা দিতে হল ঠাকুর রামকৃষ্ণকে। শুধু ভবতারিণী-মাতৃ নামের ছাড়পত্রখানা দেখিয়ে হল না। চাইলে সবাই তাকে বাজিয়ে নিতে।

এলেন মথুর বাবু। কত রকম পরীক্ষার মধ্যে দেখেছেন রিপুর তাড়নে তাড়িত কি না, এমন আত্মভোলা পাগল। কামিনী-কাঞ্চনের মোহে মোহাচ্ছন্ন করে কি না এই সাধককে। ফাঁকা ঘরে মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন জমিদারির খানিকটা তোমাকে লিখে দি। আরও কত কি। কিন্তু পাগলেরই হয় জয়। তিনি হলেন নির্লোভ সাধক। দেখা গেল, লোভ শুধু তাঁর জগৎ-তারিণী মায়ের কোল! ভক্তকে যে তিনি চেনা দেবেন ঠিক করেছিলেন। ভেবেছিলেন, মথুর ভক্তিপথে আসুক। তাই যেন পরীক্ষার ফাঁদ পাতা তাঁরই। আবার যে দিন দক্ষিণেশ্বরে ব্রহ্মবাদী নিরাকার উপাসক কেশব সেনের দল এসে পৌঁছল, তিনি অন্তর্যামী হয়েও তাদের সাদরে নিলেন বরণ করে। কিন্তু তারা যখন বলল, কেশব বাবুকে ধর, তা হলেই তোমার ভাল হবে, তখন আত্মভোলা ঠাকুরের গদগদ ভাব। চোখে প্রেমাশ্রু আর কণ্ঠে ব্যথার সুর। বললেন, কিন্তু আমি যে সাকার মানি। আমি যে মা বলে ডাকি গো। মাকে যদি নিরাকার করি তবে অমন কোলটুকু পাব কি করে? আমি যে বিশ্ব-মাকে ধরে বসেছি গো।

এই মায়ের কোলই তো ছেলের নিরাপদ আশ্রয়। তাই এই আশ্রয়টুকু কে ছাড়তে চায়? আর কে বা পায়? যে পায় সে তো মুক্ত, সে ছাড়বে কেন? রামকৃষ্ণদেব এই নিরাপদ কোলের আশ্রয়ে আশ্রয়ী। ঐ কথাতে বিশ্বাস জন্মালো ওদের। জয় হল রামকৃষ্ণের, জয়ী হলেন সাকার-রূপিণী রামকৃষ্ণের মা। রাম-কেশবের মিলন হল একই সূত্রে, একই গ্রন্থিতে। যেই রাম, সেই কালী, যেই কালী সেই রাম। যে কেশব সেই গদাধর। এরা তো এক আত্মারই অমৃতের পুত্র। রামকৃষ্ণও বললেন, কালী-কৃষ্ণ কভু নহে ভিন্ন। তাই বলি সাকার আর নিরাকার কেন? রামকৃষ্ণ আর কেশব তো ভিন্ন নয়।

কিন্তু, পরীক্ষা করার শেষ হয় কি? আবার পরীক্ষা। একে একে পরীক্ষা নিতে আসে যে আমাদের বাজিয়ে। দিতেও আসে ভোগের তিমির ভেদ করে—ত্যাগের আলো, মুক্তির সন্ধান। তাই পরীক্ষার্থীর গুণরাশির কাছে পরাজিত হতে সে অপেক্ষা করে। পরাজিত হওয়াই তার আনন্দ। হেরে গেলেই হাসিমুখে বশ্যতা মানে, সখ্যতা বরণ করে, সমুখের কঠিন জালকে ছিন্ন করে দেয়। এল কাপ্তেন। সে নাকি পরীক্ষারাজ্যের প্রতিনিধি। ছলে বলে করল কত পরীক্ষা।

দিনের আলোয় দেখে বিশ্বাসের ভিত, শক্ত হল না। রাতের আঁধারে চুপি চুপি দেখল। যাকে বলে গাঁটা দিয়ে দেখতে চাইল, এ সূর্য্য জ্যোতিঃহীন হয়ে অস্তাচলে যায় কি না? না, সমপ্রভ হবে উদয়াচলেই এর স্থিতি।

হবে না? যাকে, যে পরীক্ষা করে নিয়েছে তাকেও তো চিনে নিতে আসবে সকলে। কিন্তু অন্তরে, হাসলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। পরাজিত পরীক্ষক বাঁধা পড়ল প্রেমের নিগড়ে। উঠল চার দিকে, জয় জয় রামকৃষ্ণের জয়।

এবার এল খাপখোলা তলোয়ার, প্রাণচঞ্চল দুরন্ত ছেলে নরেন। সত্যি দুরন্ত। জাতি মানে না, জগতি মানে না। নিরাকার চায় না, সাকারের ধারই ধারে না। সেই সঙ্গে চায় না রামকৃষ্ণদেবের মৃন্ময়ী আধারে চিন্ময়ী প্রতিমা ভবতারিণীকে। বোঝে না রামকৃষ্ণকে। বলে, উন্মাদ—পাগল ছাড়া আর কিছু নয়। কি সম্পদ আছে, ঐ কৈবর্ত্তের পূজুরী মুখ্যু বাউনটার।

তবু যেতে হয় নরেনকে দক্ষিণেশ্বরে। হবেই বা না কেন! সংসারও করবি, ভোগও ভুগে মরবি, আবার পোটলাও বাঁধতে চাইবি, অত হবে না। একদিন সংসারীর সংসার থেকে টান পড়বেই। এজগৎ তো স্থির নয়। এও চলেছে অবিরাম। তাই সংসারীর আসে একদিন মৃত্যুর দিন বা পরিবর্ত্তনের দিন। নরেন সংসারী না হলেও, তারও তো মুক্তি চাই। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে তার হবে মুক্তি। এই বিলিয়ে দেওয়া মানে, রামকৃষ্ণের মুক্তি-বাণী জনে জনে কানে কানে শুনিয়ে দিতে হবে। তাতেই সে ব্রতী হতেই যে জন্মেছে। তাই তার রামকৃষ্ণে বিশ্বাস না থাকলেও, তিনি তো আরও জোরে টানবেন। তাই সে ছোটে দক্ষিণেশ্বর বার বার।

তবু যায় বটে, কিন্তু এক বিন্দু বিশ্বাস নেই কিছুতে। বিশ্বাস করলেই হল, তেমন ছেলে সে নয়।

দেখে নিতে হবে না কে এই "বচন-রচন পটু?" এই কথাই সে বুঝতে চায়। সন্দেহ জাগে।

আবার রামকৃষ্ণ যখন শিশুর মত উচ্ছ্বাস ভরে বলেন, বলিস কি রে! আমার মা কথা কয় যে, তখন নরেন হেসে ওঠে। "কথা কয় না কচু" বলে উড়িয়ে দেয়। সব আপনার মাথার খেয়াল, ডানপিটেটা চট করে এমন কথা বলে ফেলে।

ডুকরে ওঠেন রামকৃষ্ণ। বলিস কি রে, মাথার খেয়াল? আমার মা স্পষ্ট চোখের সামনে দাঁড়ান, হাঁটেন, চলেন, কথা ক'ন!

'বাজে কথা' দৃপ্তস্বরে বলে ওঠে নরেন। মাটির প্রতিমা আবার নড়চে-চড়বে কি! কথা কইবে কি?

রামকৃষ্ণ হলেন গুরু। তিনি চান তার বিশ্বাস আনতে; মা সত্যিই মা, মাটির জড়-মা সে নয়।

নরেনও সন্দেহ করে আরও। কাটা-কাটা কথা বলে সে। সে এমন অবিশ্বাসী। বিশ্বাসী হবে কবে?

রামকৃষ্ণের ভাবনা হল। তিনি ভক্তকে পথ দেখাবেনই। নরেন এবার ভাবল, সে ঠাকুরকে পরীক্ষা করবেই। এইখানে হল পথের শুরু।

সেদিন নরেন পরীক্ষা করল ঠাকুর রামকৃষ্ণকে। ঠাকুরের ঘরে গিয়ে দেখে, ঠাকুর নেই। সন্ধান নিয়ে জানল, ঠাকুর কোলকাতায় গিয়েছেন, এখনি ফিরবেন। হঠাং মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল! আর উত্তম সুযোগ বুঝে ঘর ফাঁকা হতেই পকেট থেকে টাকা বার করল। ঠাকুরের বিছানার নীচে রাখল চকচকে দ্রব্যটিকে লুকিয়ে। দেখা যাক, তিনি কাঞ্চন ছুঁতে পারেন কি না। সত্যিই কাঞ্চনের উপর বিতৃষ্ণা কি লোক-দেখানো ভোজবাজী! টাকা রেখে সে-তল্লাট থেকে বেমালুম সরে পড়ল। 'এবার বোঝা যাবে কাঞ্চন ত্যাগের মহিমা।' অস্ফুটস্বরে বলল নরেন।

অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুর ফিরে এলেন। বুঝি পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা-কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। তাই কোন দ্বিধা না করে এগিয়ে এলেন ঠাকুর। তারপর রোজকার মত বিছানায় বসেই তীব্র চিংকার করে বিছানা ছেড়ে দাঁড়ালেন। বিছানা তো নয় তখন, বিছের কামড় পেয়েছেন। আরামের হয়েছে বিরাম। যাতনা হয়েছে অবিরাম। ছটফটিয়ে উঠলেন।

তারপর কি হল, কি হল, করে ঝাড়াঝাড়ি করা হল। 'টং' করে বেজে উঠল কিসের বাজনা—পড়ল টাকা! সকলেই বিস্মিত! কি করে এল কোথা হ'তে এই মোহময়টি?

ধরা পড়ল অপরাধী। ফাঁকতালে ঘরে এসে ঢুকেছিল।

ক্ষমাসুন্দর ঠাকুর—রাগের বদলে তাকে পেয়ে আনন্দে মাতোয়ারা। নেচে উঠলেন। হেসে বললেন, বুঝেছি রে বুঝেছি। আমায় পরীক্ষা করা হচ্ছিল। তা, বেশ তো নিবি বৈ কি পরীক্ষা বরে। তোদের যার যেমন মন চায় সবাই করে নে। যা চাই তা পাব কি না এ জিজ্ঞাসায় যখন এসেছিস, তখন যাচাই-করা ছাড়বি কেন?

একটু তার কাছে গিয়ে আবার বললেন, তোদের সকলের সন্দেহের নিরসন করে নে। চলে আয় সত্যের স্থিরতায়। সিদ্ধান্তের শান্তিতে। আমাকে শক্ত হাতে বাজিয়ে নিবি যেমন করে শানের ওপর মহাজনেরা টাকা বাজায়। সন্দেহই যদি রাখবি, তবে সন্ধান জানবি কি করে বল্ না? ওরে বাজিয়ে নে, বাজিয়ে নে। অপরাধী নরেনের শাস্তি হল। সেই থেকে আটকা পড়ল দক্ষিণেশ্বরে। মহামহিমের শান্তি-কোলে পেল স্থান। শান্ত হল দুষ্টু ছেলে।

তবু। এজন্ম, এ শরীর কিনে নিয়েছে সেই মূর্খ বামুন, শেষে একদিন নরেন বলে বসল। শুনে ঠাকুর, হো-হো করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, ওরে আমার দোষ দিয়ে ও‌ই যে নিজের গুণের কথা বলে ফেলেছে! তোরা বুঝিসনি, এ কথায় ওর জন্মে গেছে আমার আর ঐ ভুবনমোহিনী মায়ের ওপর প্রত্যয়। ওরে পেৎত্যয় না হলে এমন কথা ও বলবে না।

কিন্তু যত মত তত পথ। লোকের তো অন্তও নেই। তাই পরীক্ষারও শেষ নেই। এগিয়ে এল এবার যোগীন।

সেবা করবার আশায় মাঝে মাঝে রাত-বিরেতে ঠাকুরের কাছে থাকে। এমনি একদিন ঠাকুরের ঘরে শুয়ে আছে। মাঝরাতে দেখে ঠাকুর ঘরে নেই। অমনি সন্দেহের বীজ গজিয়ে উঠল। বিছানা শূন্য দেখে মনে হল এত রাতে ঠাকুর গেলেন কোথায়? গাড়ু, গামছা সবই তো ঠিক আছে। তবে কি তিনি···অমনি হৃদয়ে লাগল খটকা। তিনি কি জিতেন্দ্রিয় নন্! ঠাকুর লুকিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে নহবৎখানায় যাননি তো? মনে আরও হয়েছিল, দিনের বেলা তিনি যা বলেন রাতের বেলায় তিনিই তা পালন করেন না? ডুবে-ডুবে জল খান? ব্যস, সন্দেহ হলেই সমস্যা। সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য সন্ধানে প্রবৃত্ত হ'ল যোগীন।

কিন্তু ও কি! কে আসে পঞ্চবটীতলা থেকে? চোখের ঘুম তখনও কাটেনি। সারা দেহে গদগদ ভাবের স্বেদবিন্দু। এ যে সাধনার পরের অবস্থা। তাহলে তো শ্রীশ্রীমায়ের কাছে না গিয়ে ঠাকুর গিয়েছিলেন সাধন-ভজন করতে। তখন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল যোগীন।

অন্তর্যামী ঠাকুর কিন্তু প্রশান্ত। তবে চট করে জিজ্ঞেস করে বসলেন, কি রে, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে? যোগীন আমতা আমতা করল। ঠাকুরও হেসে ফেললেন।

ক্ষমাসুন্দর লজ্জাশীল যোগীনকে হেসেই বললেন, ভয় কি রে? বাজিয়ে নিবি, যাচিয়ে নিবি তো? ওরে যোগীন ওই—ঐ যে আমাকে ছাড়ে না। তাকেও কি কম বাজিয়ে নিই! ওকে বুঝতে হিমসিম খেতে হয়। কখনও রহস্যঘেরা, আবার দেখি

যা হোক, লোক-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন পাগল। যিনি পাগলামি করে হয়ে আছেন চিরানন্দ মহাপুরুষ। ইচ্ছাময়ীর বরপুত্র।

তাই ঠাকুর সঙ্গীতে বলেছিলেন, 'ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।' এঁর পরীক্ষা লোক-চক্ষুতে হলেও—লোকে তো বোঝে না যে, তাদের পরীক্ষা হয়ে গেল এঁরই মাধ্যমে মায়ের কাছে।

ভক্তি-শিক্ষার সার্টিফিকেট পেল তারা।

## কাল

### গীতা দেবী

তোমার শতাব্দী এসে
আমার শতাব্দী পাশে কয়ে যায় কানে কানে কথা,
অন্তরের অন্তরালে
অসীমের আলো জ্বালে
মূক-চোখে ঝরে পড়ে হাসি-অশ্রু-ব্যথা।

মনে হয় স্বপ্ন যেন, মনে হয় যেন ছায়াছবি,
গোধূলির রঙিন বেলায় ম্রিয়মাণ ছায়া-ঢাকা রবি।

চলমান আলোছায়া পথে—
তব পদরথে,—
কাটিয়াছে যুগ যুগ ধরি
কত দিবা কত না শর্বরী,—
অন্ত নেই তার,
তুমি অতি দ্রুতগতি, চলন্তিকায়।

ইঙ্গিতের অন্তরালে
সঙ্গীতের সুরধারা ঝরে;
সেই সে নির্ঝরে
ফুটে ওঠে তোমার কাকলি
মূর্ত হয়ে ওঠে যে সকলি
অপূর্ব ঝঙ্কারে,
নয় বারে বারে
শুনি শুধু অজানিত সুদীর্ঘ নিশ্বাস
হে পথিক, হে রহস্যময় ইতিহাস।

## মাধুরী আছে ছড়ায়ে

### ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

ছাত্রেরা পরীক্ষার পাতায় কতরকম হাস্যোদ্দীপক উত্তর লেখে বা বলে, তা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করা হয়েছে। উদ্ধৃতি সমেত গতবারকার শারদীয়া বসুমতীতে লিখেছেন পরিমল গোস্বামী। ছাত্রেরা অল্পবয়স্ক, অমনোযোগী, এদের এরকম করা স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা ছাত্র নন, এবং যে কার্য্যের জন্য লিখছেন বা বলছেন, তাতে অমনোযোগী মোটেই নন, বরঞ্চ একটু বেশী করেই মনোযোগী—এমন লোকেদের চিঠিপত্র বা কথাবার্তার হাস্যোদ্দীপকতা সম্বন্ধে কেউ

ভেবে দেখেছেন কি ? অন্ত সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে বিত্তালয়ে যে সব অভিভাবক বা তাঁদের প্রতিনিধি পত্র লেখেন বা বাণী দিয়ে যান, তাঁদের কথার বা লেখার সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিত হলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা কি রকম।

আজই একখানা চিঠি পেলাম—'প্রধান শিক্ষিত্রী ( শিক্ষয়ত্রী, বা শিক্ষয়ী, লেখেন বেশীর ভাগ লোক ) আমার মেয়ে কুমারী অমুককে যে অনুগ্রহ করিয়া ক্লাসে উঠাইয়া দেন নাই সেজন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁর নাম কাটিয়া দিয়া আমাকে নিগ্রহীত করিবেন'—দোকানের খাতা লেখার টানে লেখায় এই চিঠি পড়ে হাসব কি কাঁদব ভাবছি, এমন সময় এলেন এক অশীতিপরা বৃদ্ধা। বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন এতক্ষণ। আমার স্কুল গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়ার পথে পড়ে। স্নান সেরে ( ফেরবার আগেই বেশী—আচার বিচার তো আছে ! ) অনেকে দরকারী কথাবার্ত্তা সেরে যান। বৃদ্ধার অস্পষ্ট কথায় জানলাম ও পত্র তাঁর পুত্রের—তিনি মেয়েদের ( এটা আমি শুদ্ধ করে লিখলাম ) স্কুলে আবার কি আসবেন, কিই বা কথা বলবেন, তাই চিঠি লিখে দিয়েছেন অনুগ্রহ করে। ভাবলাম সত্যি, চিঠিতে যে বিত্তে তাতে স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কওয়ায় তাঁর মানহানি হবারই সম্ভাবনা।

ওপর একটি চিঠি—আমার কন্যাকে সব সাবজেক্টেই ফেল করাইয়া দিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমি মাস মাস বেতন দিয়া পড়াইতেছি, আমার মেয়ে ফেল করিবে কেন ? মাস মাস বেতনের টাকাগুলিতো জলে দিবার জন্ত দেওয়া হয় না ? সুতরাং যাহাতে তাহাকে প্রমোশন দেওয়া হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

বেতনের টাকাগুলিকে কেমন করে জলে ফেলার অধোগতি থেকে উদ্ধার করা যায় ভাবছিলাম, এমন সময় একটি মেয়ে এসে বলল, দিদিমণি, বাবা বলেচে নম্বরের কাগজের জন্তে এক আনা পয়সা দিতে পারবে না।

বললাম, আর কি বলেছেন ?

বলেচে, মাষ্টারণীগুলো কি—নম্বরের কাগজ দেবে তাও এক আনা করে পয়সা ? পয়সা, পয়সা, পয়সা—পয়সায় গাচ ফেকেচে না ? নিতে হবে না নম্বরের কাগজ, মুকে ফেলে আসবি।

ভাবছি—সকালে বাড়ীতে একজন বলে গেছেন, প্রমোশন দেবেন না। দয়া মায়া মমতা কি আপনার কিছু নেই ? একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করে দিচ্ছেন ?

মাথায় ভর্ত্তি চিন্তা—এমন সময় রণরঙ্গিণী বেশে এক বিবাহিতা মহিলার প্রবেশ—আলুলায়িতকুন্তলা তেল চুকচুকে মুখে এই বড় সিঁদুরের টিপ, মুখে বিষোদ্গার—প্রলয় ঝঞ্ঝা—সম্মার্জ্জনী আছে কিনা সভয়ে দেখি—আমার মেয়েটাকে একেবারে খুন করে ফেলেচেন। ভাল মেয়ে খাইয়ে দাইয়ে পাঠালুম—আর রক্তগঙ্গা বইএ পাঠিয়েছেন। কি খুনেরে বাবা সব।

হকচাকয়ে গিয়েছিলাম—সহকারিণী বললেন, সুষমার মা।

ঘণ্টাখানেক আগে সুষমা নামধেয়া ছাত্রী খেলতে খেলতে কপাল কেটে ফেলায় প্রাথমিক ব্যবস্থা করবার পর তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের সমস্ত কথা, সমস্ত যুক্তি, সুষমার মায়ের নাকি সুরের দমকে দমকে অভিযোগের বাক্যভরা কান্নায়, চোখের জলের বর্ষায় আর নাক ঝাড়ায় আতিশয্যে ভেসে চলে গেল। তারপর কণ্ঠে যত বিষ ছিল উজাড় করে তিনি পথের লোকেদেরও সচকিত করে পাড়া জাগিয়ে চলে গেলেন। পাড়ায় ছেলের স্কুল, আর মেয়েস্কুল সকলেরই অবারিত দ্বার মফঃস্বলে।

কিছুদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ল। অন্ত এক স্কুলে খেলতে গিয়ে এক মেয়ে গুরুতর জখম হয়েছিল। তাকে নিয়ে বাড়ী পৌছাতে গিয়েছিলেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী তাঁর সহকারিণীকে নিয়ে। মেয়েটির মা তখন ঝাঁটা হাতে রান্নাঘর ধুচ্ছিলেন, মেয়ের আহত হওয়ার সংবাদ শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, কে মেলি হারামজাদী ! একেবারে মরে আসেনি কেন ? চিলুতে তুলে দিতুম। বলে গলা ফাটাতে লাগলেন, পরে অনাত্মিকে দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, সোহাগ করে বাড়ী বয়ে দিতে এসেছে, মরণ !

আর একটি মেয়ে স্কুলে টিকে নিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। অনেক কাণ্ড করে জ্ঞান ফিরিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিতে গেলে তার বাবা মুখের ওপর বললেন, কেস করব এই সব বেয়াক্কেলে মাষ্টারণীদের নামে। মার চেয়ে মাসীর টান ! টিকে দেওয়া হয়েছে।

উঁচু ক্লাসের মেয়েদের ফ্রক পরতে বারণ করা হয়েছিল। তাতে এক অভিভাবকের চিঠি এল, আমার কন্যাকে আপনাদের বিত্তালয়ে লেখাপড়া শিখিতে দিয়াছি। তাহা ঠিকমত হইতেছে কিনা তাহা দেখাই আপনার কর্ত্তব্য। সে ফ্রক পরিল, কি শাড়ী পরিল তাহার সহিত লেখাপড়ার কি সম্বন্ধ, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না।

এবিষয়ে প্রাপ্ত আর একখানি পত্র এইরূপ—আমার ছুটি মেয়ে শাড়ী পরে। অনুগ্রহ করিয়া এটিকে আর পরাইতে বলিবেন না। একেতো ছুটি শাড়ীপরা মেয়ের দিকে তাকাইলে আমার বুকের রক্ত হিম হইয়া যায়, আবার ইহাকেও! জানি ফ্রক পরে, ছোট আছে, বিবাহের ব্যবস্থা করার কথা মনেও আনিতে হইবে না। লোকেও মনে করাইয়া দিবে না।

হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষার সময় এখানে একটি মেলা হয়। খুবই আকর্ষণীয়। সাধারণত এর পূর্ব্বেই পরীক্ষা শেষ হ'য়ে যায়। গতবার মেলা আরম্ভ হওয়ার পরও পরীক্ষা চলছিল। সাধারণত সাড়ে আটটার পর সিনেমা প্রদর্শন, থিয়েটার প্রভৃতি হয়। এক মেয়ের মা'র আসতে একটু দেরী হওয়ায় অন্য একজন জিজ্ঞাসা করলেন, দিদি, দেরী হ'ল যে?

দেরী হবে না? মেয়ের যে এগ্‌জামিন। যেমন মড়ার ইস্কুল, মেয়েরা নিশ্চিন্দি হ'য়ে যে মেলায় আসবে তার যো আছে? মেয়ে কালকের পড়া তৈরী ক'রে নিয়ে তবে তো আসবে? তাই আমাকেও আটকে থাকতে হ'ল।

আর এক স্যুটপরা ভদ্রলোক এক দিন এসে হাজির—বলা নেই, কওয়া নেই, হাতে একখানা শাদা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নিন।

বললাম—কি?

আপনার এগেন্স্টে কমপ্লেন।

কমপ্লেন?

হ্যাঁ, আপনি অযথা বুক-লিষ্টে একগাদা বই দিয়েছেন—তা কেনা তো সম্ভব নয়, তাই গার্জেনদের মিটিং ডেকে আপনার ব্যবস্থা নাকচ করতে চাই।

বললাম—ওঃ, তা কাগজখানা আমাকে দিচ্ছেন কেন?

আপনি গার্জেনদের মিটিং ডাকবেন ব'লে।

বললাম—বাঃ বাঃ, বেশ কথা, আমার জেহাদ ঘোষণা হবে, তার মিটিং আমিই ডাকব?

তা নয়ত কি? আমি কি গার্জেনদের চিনি? না তাদের বাড়ী-বাড়ী গিয়ে ব'লে আসব? অত সময় আমার নেই।

বললাম—সময় আমারও কম।

তখন বললেন, ওই তো পড়ানোর ছিরি, বই এদিকে একগাদা।

বললাম—আমার স্কুলে অমনিই ছিরি, পছন্দ না হ'লে যেখানে ছিরি আছে, সেখানে মেয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

বললেন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি। আচ্ছা, দেখাব আপনাকে।

মেয়েটি তাঁর আশ্রিত, এবং তিনি ওর পড়ার সম্বন্ধে কোন খোঁজই রাখেন না, খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম।

আর একজন বললেন এসে একদিন। দেখুন, হোমটাস্কে অনেকগুলো ক'রে অংক দেন—কষতে আমার অনেক সময় যায়।

বললাম—আপনার কষবার জন্য তো দেওয়া হয় না।

আর একজন অভিভাবকের কথা আরও মজার। তাঁর মেয়েটি দু'বছর আগে স্কুল ফাইনাল দেয়—এক বছর ফেল ক'রে পরের বছর পাশ করে। অভিভাবকের নির্দেশ অনুসারেই তখন তার জন্মতারিখ দেওয়া হয় ফর্মে।

পরে তার একটা কাজের জন্য যে বয়স দরকার স্কুল ফাইনালে দেওয়া বয়সের তুলনায় তা বেশী। বয়স বাড়িয়ে একখানা সার্টিফিকেট দেবার জন্য বলাবলিতেও যখন তা দেওয়া সম্ভব নয়' বলে দেওয়া হ'ল না স্কুল থেকে, তখন অভিভাবক বললেন, বয়স কমে না বাড়ে? দুবছর আগের যে তারিখ রয়েছে, এখনও সেই তারিখ থাকবে?

বলুন, হাসব কি কাঁদব।

প্রমোশনের ব্যাপারে বর্ত্তমান বছরে একটা নতুন জিনিষ বেশী ক'রে লক্ষ্য করা গেছে। আজকাল অভিভাবক স্বয়ং আর আসছেন না বেশী—হয়ত নিরর্থক ভেবে। ছাত্রীর মা, ঠাকুরমা আসছেন, অথবা প্রাইভেট টিউটার বা পাড়ার দাদা।

নিয়ম কানুন যুক্তি এঁরা কিছুতেই মান্‌তে চান না—ভদ্রতা রক্ষা করা শেষ পর্য্যন্ত অসম্ভব হয়ে যায় এঁদের ছিনেজোঁকামির ঠেলায়। অনেক ক্ষেত্রে একটি মেয়ের জন্য দশ জন দরবার করতে আসেন স্কুলে, বাড়ীতে, ষ্টেশনে, সভায়, দোকানে—যেখানে পাওয়া যায়, সময়ে অসময়ে।

মা, ঠাকুরমার চোখের জলের বন্যায় তিষ্ঠোন যায় না বাড়ীতে বাধ্য হ'য়ে দেখা করা বন্ধ করতে হয়। অনেকে সংবাদ না দিয়ে একেবারে ওপরে উঠে আসেন।

মেয়েমানুষের কাছে মেয়েমানুষ এসেছে, এলেই বা, তাতে বলারই বা কি আছে, এই তাঁদের যুক্তি।

একজন বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষক বলছিলেন তাঁর কাছে এক অভিভাবক নাকি বলেছেন, তাঁর ছেলেকে টেষ্টে এ্যালাউ না করলে সে আত্মহত্যা করবে। এই ধরণের অভিভাবকরা নিজেদের কাজ হাসিল করবার জন্য যে লোকটির কাছে আসা হ'য়েছে তার সময় অসময়, সুবিধা, অসুবিধা, ধৈর্য্য, মেজাজের কথা একবারও চিন্তা করেন না। নিজেদের কাহিনীর সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ হাজার বার।

অনেক ভেবে চিন্তে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের মতামত নিয়ে, সারা বছরের ক্লাসের উৎকর্ষ দেখে, ফেল করার কারণ সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান ক'রে যখন দেখা যায় কিছুতেই পারা যায় না, তখনই একটি ছাত্র বা ছাত্রী ফেল করে।

পাশটা কোন রকমে করিয়ে দিতে পারলেই পরমার্থ লাভ হল, এইটাই আজকাল দেখা যাচ্ছে।

সময় সময় মনে হয়—কি দরকার পরীক্ষা নেবার? রাত জেগে, আহার-নিদ্রা ভুলে খাতা দেখার? একবার নয়, দু-তিনবার? এক বছর পড়িয়ে টেবিল বেঞ্চি সব উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিয়ে দিলেই বোধ করি ভাল হয়।

আর প্রাইভেট টিউটার! বড় জোর ম্যাট্রিক পাশ, নয়ত আই, এ ফেল, কি বি, এ ফেল—অফিসে চাকরী করে, অবসর সময়ে পড়ায় এই রকমই বেশীর ভাগ সময়। অল্পবয়সী, শিক্ষাদানে অনভিজ্ঞ এই সব প্রাইভেট টিউটার অনায়াসে এসে এম, এ, বি, এ পাশ টিচারের দেখা খাতা সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ করে—মতামত প্রকাশ করে—এইটাই পরমাশ্চর্য্য। আর অভিভাবকরা কি করে তাদের নিয়োগ করেন, সেইটাই তার থেকেও আশ্চর্য্য! বিদ্যার দিক দিয়ে তো বটেই, অন্য দিক দিয়েও কি ভাববার নেই কিছু? এই সব প্রাইভেট টিউটারদের অনেকেরই কথাবার্ত্তার মধ্যে অনেক হাসির খোরাক পাওয়া যায়।

একটি মেয়ে একটি গুরুতর অন্যায় করেছিল। বকুনি দেওয়াতে অভিভাবককে গিয়ে মাথামুণ্ডু কি বলে জানি না—বাইশ-তেইশ বছরের এক প্রাইভেট টিউটার এসে উপস্থিত—কেন হয়েছে তার কৈফিয়ৎ দাবী করতে। অভিভাবকের সময় নেই, তাঁর কাজ অত্যন্ত বেশী, তাই তিনি আসতে পারেন নি।

উত্তেজনায়, আবেগে প্রাইভেট টিউটার কম্পিত-কলেবর—কথাও ভাল করে বেরোচ্ছে না।

এই সমস্ত কথা ব'লে বকুনি দেওয়া আপনাদের একেবারেই উচিত হয় নি। উচিত হয়েছে কি না আপনি বুঝবেন না—ওর বাবা এলে বুঝতেন।

তাঁর সময় নেই আসবার।

তবে ওর মাকে আসতে বলবেন।

কিন্তু আমি জানি ও খুব ভাল, এরকম অন্যায় করতেই পারে না।

আপনি কি ক'রে জানলেন? হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করি।

আমি জানি। এর বেশী আর উত্তর জোগাল না।

গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হলেও বললাম। না জানেন না। আজকালকার দিনে মা-বাবাও জোর দিয়ে সব সময় একথা বলতে পারেন না, আপনি তো আপনি!

একটা মজার ঘটনা বলে এবার কাহিনী শেষ করব।

একদিন অফিসে ঢুকল উড়ু-উড়ু চেহারার ছেলে একটি—পাজামা পরা।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

বলল, নমস্কার। আপনি আমার দিদি, ছোটভায়ের একটা কথা রাখবেন, দিদিমণি?

ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে সন্তান, আর ছোট ভায়ের সংখ্যাধিক্যে প্রাণ ত্রাহি মধুসূদন করে বিদ্যালয়ের প্রধানদের। ক্যানভাসার, পাবলিশার, লেখক, অর্ডার সাপ্লায়ার, পরীক্ষা-না-দেওয়া আর ফেলকরা মেয়েদের অভিভাবক, আর ফ্রি ষ্টুডেন্টশিপের উমেদারদের মরশুম এসময়। ভাবলাম এঁদেরই কেউ।

বললাম, কি কথা? আগে বলুন রাখবেন?

না শুনে বলা যায় না।

বেশ বলছি—না করতে পারবেন না কিন্তু। লেখা রায়চৌধুরীকে প্রমোশন দিতেই হবে আপনার।

তার সম্বন্ধে সব কথা তার বাবাকে বলেছি।

তা জানি—তবুও আমি এসেছি। আগেই তো বলে রেখেছি না করতে পারবেন না। ধৈর্য্য রাখা আর সম্ভব হল না, বললাম—আপনি কে লেখা রায়চৌধুরীর?

থমকে গেল ছেলেটি, তারপর একটু থেমে থেমে বলল, আমি? মানে, কেউই নই—মানে, পাড়ার লোক—

পাড়ার লোকের সঙ্গে কোন মেয়ের সম্বন্ধে আমি কথা কই না। একটা মেয়ের জন্ত বাবা, ঠাকুর্দা আবার পাড়ার লোকের সঙ্গে কথা কইবার সময় নেই আমার।

ছেলেটির গদো-গদো ভাব চলে গেল—ঝাঁকের সঙ্গে বলল, আচ্ছা, সময় আছে কি না দেখব—

বললাম, যান্, আর এক মিনিটও দাঁড়াবেন না।

ও চলে গেলে আমার সহকর্মিণীরা বললেন, আপনি এত নিষ্ঠুর এত নিঃস্বার্থ পরোপকারের—

হাসিতে চাপা পড়ে গেল কথা।

ইংরাজী পত্র যেগুলি আসে সেগুলি পড়লে তো ভিরমি যাবার যোগাড়। কাজেই থামা গেল এখানেই।

## ভুল

### মধুচ্ছন্দা দাশগুপ্তা

শুধু একটি ভুলে
ক্ষ্যাপার মত হারিয়েছি, আমি পরশ-পাথর তুলে
এক কোঁটা ভুল
হ'য়ে যেন শূল
আমার মনের মাঝে
ক্ষণে ক্ষণে ব্যথা দিতে উন্মুখ
দানবের মত রাজে
ভুল করে ভবে
জন্মেছি যবে
সেদিনও কেঁদেছি জানি
পশ্চাত্তাপের বহ্নিজ্বালায়
ধুয়ে গেছে সব গ্লানি,
তারপরে কত
ভুল শত শত
করিয়াছি চোখ বুজে
না যেন বারণ
ভুলের কারণ
ভুলে গেছি খুঁজে খুঁজে।

[ এবারকার খেলাধুলা লেখার পূর্ব্বে গতবারকার প্রকাশিত সংবাদের মধ্যে অসাবধান বশতঃ একটি ভুল সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। পাঠক-সাধারণের কাছে সর্ব্বাগ্রে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

৫১৪ পাতায় লেখা হয়েছে "ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের দুই ফাষ্ট বোলার রয় গিলক্রিষ্ট ও বেসিল বুচারের দলের বিরুদ্ধে শোচনীয় ব্যর্থতায় পরিচয় দেন," বেসিল বুচারের পরিবর্তে ওয়েলেসলী হলের নাম হবে। পাঠক-সাধারণ ভুলটি সংশোধন করে নেবেন আশা করি। ]

খেলাধুলার নানান সংবাদ জমা হয়ে আছে। তাই সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ক্রিকেটের আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

## ডেভিস কাপ

ডেভিস কাপ লাভ আন্তর্জাতিক টেনিসে যেমন সম্মানের, তেমনি খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

পর পর তিন বছর অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ নিজেদের দখলে রেখেছিলো কিন্তু এবার আমেরিকা চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় ৩-২ ম্যাচে পরাজিত করে ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব অর্জন করেছে। অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে ডেভিস কাপ ছিনিয়ে নেওয়ায় আমেরিকার খেলোয় ভরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

১৯২৩ সাল থেকে অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করে আসছে। এর পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ডের অধীনায়। অষ্ট্রেলিয়া হিসাবে পাঁচ বার আর নিউজিল্যাণ্ডের সংগে বিজড়িত হয়ে আট বার অষ্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ তার দখলে রেখেছে। আন্তর্জাতিক টেনিসে গত দশ বছরের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার আধিপত্য সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৪ সাল ব্যতিরেকে ১৯৫০ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্য্যন্ত ডেভিস কাপ কোন বারই অষ্ট্রেলিয়ার হাতছাড়া হইনি।

অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার মধ্যে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় এবারকার সাক্ষাৎকার ছিল সপ্তদশ বার। গত ১৬ বারের খেলায় উভয়ই আট বার করে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এবার নিয়ে আমেরিকা নয় বার জয়লাভ করলো।

অষ্ট্রেলিয়ার এবার পরাজয়ের মূলে কেন রোজওয়াল ও লুই হোডের পেশাদার বৃত্তি গ্রহণ। কেন রোজওয়ালের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। অপর দিকে আমেরিকা শক্তিশালী হয়েছে দেশের পয়লা নম্বরের খেলোয়াড় হ্যাম্ রিচার্ডসন ও পেরুর খেলোয়াড় অলমেডোর যোগদানে। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যায়, এই বছরই আমেরিকা সর্ব্বপ্রথম বিদেশী খেলোয়াড়কে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে দিলো।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের প্রথম দিনের খেলায় অলমেডো পরাজিত করেন অষ্ট্রেলিয়ার মল এণ্ডারসনকে। উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ান অষ্ট্রেলিয়ার এ্যাসলে কুপার আমেরিকার ব্যারী ম্যাককে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলসের খেলায় অলমেডো ও হ্যাম রিচার্ডসন অষ্ট্রেলিয়ার মল এণ্ডারসন ও নীল ফ্রেজারকে পরাজিত করায় আমেরিকা ২-১ খেলায় এগিয়ে থাকে।

তৃতীয় দিন অলমেডো কুপারকে পরাজিত করায় ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের নিষ্পত্তি হয়। শেষ খেলায় এণ্ডারসন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগে ম্যাক্‌কে পরাজিত করেন।

অষ্ট্রেলিয়ার এক নম্বর ও দুই নম্বর খেলোয়াড় এ্যাসলে কুপার ও মল এণ্ডারসন ডেভিস কাপের খেলার পর পেশাদার বৃত্তি অবলম্বন করেছেন। এবারকার ডেভিস কাপের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হল :

প্রথম দিন : এলেক্স অলমেডো ( আমেরিকা ) ৮-৬, ২-৬ ও ৯-৭ ও ৮-৬ গেমে মল এণ্ডারসনকে ( অষ্ট্রেলিয়া ) পরাজিত করেন।

এ্যাসলে কুপার ( অষ্ট্রেলিয়া ) ৪-৬, ৬-৩ ৬-২ ও ৬-৪ গেমে ব্যারী ম্যাক্‌কে ( আমেরিকা ) পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিন : এ্যালেক্স অলমেডো ও হ্যাম রিচার্ডসন ( আমেরিকা ) ১০-১২, ৩-৬, ১৬-১৪, ৬-৩ ও ৭-৫ গেমে মল এণ্ডারসন ও নীল ফ্রেজারকে ( অষ্ট্রেলিয়া ) পরাজিত করেন।

তৃতীয় দিন : এ্যালেক্স অলমেডো ( আমেরিকা ) ৬-৩, ৪-৬, ৬-৪ ও ৮-৬ গেমে এ্যাসলে কুপারকে ( অষ্ট্রেলিয়া ) পরাজিত করেন।

মল এণ্ডারসন ( অষ্ট্রেলিয়া ) ৭-৫, ১৩-১১ ও ১১-৯ গেমে ব্যারী ম্যাককে ( আমেরিকা ) পরাজিত করেন।

## জাতীয় টেনিস

জাতীয় টেনিস প্রতিযোগিতায় আর কৃষ্ণণ চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছেন। তবু এবার কৃষ্ণণ দেশ-বিদেশের খেলোয়াড়দের যে ভাবে পরাজিত করেছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। ফাইন্যালে কৃষ্ণণ ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত করেছেন ভারতের দুই নম্বর খেলোয়াড় নরেশকুমারকে। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে, নরেশকুমার ডেভিস কাপের খেলায় ভারতের অধিনায়ক মনোনীত হন। সেমি ফাইন্যালে কৃষ্ণণ ফ্রান্সের হাইকে এবং নরেশকুমার ডেনমার্কের উলরিচকে হারিয়ে ফাইন্যালে ওঠেন। এশিয়ান টেনিসের বার্ণাদ হাইকে কৃষ্ণণের কাছে ষ্ট্রেট সেটে পরাজয় বরণ করতে হয়। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান উলরিচ নরেশকুমারের সংগে খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পর পঞ্চম সেটে কোর্টের মধ্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ায় তাঁর পক্ষে খেলা আর সম্ভব হয়নি ; ফলে নরেশকুমার বিজয়ী বলে সাব্যস্ত হন। চারটি সেটের খেলায় দুইজনই দুটি করে সেট লাভ করেন। পশ্চিম জার্ম্মাণীর লেগেনষ্টিনকে জুটি নিয়ে ডাবলসের খেলায় ফাইন্যালে ওঠেন উলরিচ কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে পারায় কৃষ্ণণ ও নরেশকুমার জুটি ডাবলসে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় টেনিসের মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে ১৬ বছরের তরুণী মিস আপ্লাইয়া। গত বছরে বালিকা বিভাগের ফাইন্তালে আপ্লাইয়া মিস এ লামসডেনের কাছে পরাজিত হন এবং এবারের বালিকা বিভাগে মিস লামসডেনের কাছে পরাজিত হন। কিন্তু মহিলাদের ফাইন্তালে পরাজিত করেছেন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ান মিসেস কে সিংকে।

বালক বিভাগে বিজয়ীর আখ্যা লাভ করেছে ভারতের উঠতি খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি। জয়দীপ ফাইন্তালে অজিতকুমারকে ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত করেছে।

নীচে জাতীয় টেনিসের ফলাফল দেওয়া হইল :

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্তাল—আর কৃষ্ণণ ৬-২, ৬-২ ও ৬-১ গেমে নরেশকুমারকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্তাল—কৃষ্ণণ ও কুমার উলরিচ ও লেগেনষ্টিনের বিরুদ্ধে ওয়াক ওভার পান।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্তাল—মিস ডি আপ্লাইয়া ২-৬, ৭-৫, ও ৬-১ গেমে মিসেস কে সিংকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্তাল—মিস ডি আপ্লাইয়া ও মিসেস কে, সিং ৭-৫ ও ৬-৩ গেমে মিস পাঞ্জাবী ও মিসেস কিরেণ দাশকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্তাল—নরেশকুমার ও মিসেস কে, সিং ৬-৩ ও ৬-১ গেমে আখতার আলী ও মিস আপ্লাইয়াকে পরাজিত করেন।

বয়েজ সিঙ্গলস ফাইন্তাল—জয়দীপ মুখার্জি ৬-৩ ও ১৩-১১ গেমে অজিতকুমারকে পরাজিত করেন।

বয়েজ ডাবলস ফাইন্তাল—জে মুখার্জি ও ডি ব্যানার্জি ৪-৬, ৬-২ ও ৬-৪ গেমে বি ডাটন ও কোলীকে পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিঙ্গলস ফাইন্তাল—মিস নামসডেন ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে মিস ডি, আপ্লাইয়াকে পরাজিত করেন।

## পদ্মশ্রী উপাধি

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারত সরকারের কাছ থেকে এবার দুই জন খেলোয়াড় পদ্মশ্রী উপাধি লাভ করেছেন। তার মধ্যে একজন চ্যানেল অতিক্রমকারী মিহির সেন এবং অপরজন দৌড়বীর মিলখা সিং।

মিহির সেন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা মাসিক বসুমতীর পাতায় হয়ে গেছে। মিহির সেন বার বার ব্যর্থ হয়েও ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে দেশে ফিরে এসেছেন। এবং ভারত সরকার পদ্মশ্রী উপাধি দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন, এর জন্ম আমরা প্রত্যেক বাঙালী তথা ভারতবাসীরা প্রীত হয়েছি।

ভারতের সামরিক বিভাগের এ্যাথলীট মিলখা সিং টোকিওর এশিয়ান গেম্‌সে ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটারে স্বর্ণপদক ও কার্ডিফ এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেম্‌সে একটি স্বর্ণপদক লাভ করে আন্তর্জাতিক খেলাধূলায় ভারতের সুনাম বর্দ্ধিত করেছেন। তাঁর এ সম্মানে আমরা প্রীত হয়েছি।

## ফুটবল

বুলগেরিয়া ফুটবল দল কয়েক দিন পূর্ব্বে কলকাতা মাঠে খেলে গেছে। খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। খেলা আরম্ভ হওয়ার দুই মিনিটের মধ্যে আই-এফ-এ একাদশ একটি গোল দিয়ে খেলায় অগ্রগামী থাকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খেলার এক মিনিট পূর্ব্বে বুলগেরিয়া দল অতর্কিতে একটি গোল দিয়ে খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। বিদেশাগত দলটির খেলা দেখার জন্ম দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। কারণ, আন্তর্জাতিক খেলাধূলায় বুলগেরিয়ার ফুটবলে যথেষ্ট সুনাম আছে। রাশিয়ার মতই বুলগেরিয়ার খেলাধূলা রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। মেলবোর্ণ অলিম্পিকে বুলগেরিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

বুলগেরিয়া দলের বিরুদ্ধে ক'লকাতার আই-এফ-এ ফুটবল দল যে নিপুণতার সঙ্গে খেলেছে, তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। বুলগেরিয়া দলের তিন ব্যাক পদ্ধতিতে খেলা বল আদান-প্রদানের নিপুণতা দেখে মনে হয়, এরা ফুটবল খেলায় এক উঁচু দরের শিল্পী। আই-এফ-এ দল তিন ব্যাক পদ্ধতি' খেলে। 'ষ্টপার' হিসেবে আমেদ হোসেন যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন তা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

* * *

অবশেষে আই, এফ, এ শীল্ডের উপর যে যবনিকা পতন হয়েছিল তার উত্তোলন হল গত ২১শে জানুয়ারী। চির-প্রতিদ্বন্দ্বী ইষ্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দলের খেলায় মোহনবাগান দল ১-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে পরাজয় বরণ করে।

মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলা দেখার জন্ম দুই দলের সমর্থকরা 'মাঠের মধ্যে উপস্থিত হয়েছিল। ৭০ মিনিটব্যাপী খেলায় দুই দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। কিন্তু এই 'প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎকর্ষতা নষ্ট হয়ে যায় দুই দলের কয়েক জন খেলোয়াড়ের অখেলোয়াড়োচিত ব্যবহারে। অহেতুক ফাউল ও মারামারির ফলে সমগ্র খেলাটি নষ্ট হয়ে যায়।

বিরতির ঠিক তিন মিনিট পরে নারায়ণ ইষ্টবেঙ্গল দলের পক্ষে গোল করেন। শেষ পর্য্যন্ত একটি মাত্র গোলের ব্যবধানে খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সমস্ত খেলার মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল দলের হাফ তিনজনের খেলা সত্যই প্রশংসার দাবী রাখে। এই তিনজনের খেলায় যদি কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ পেত, তাহলে খেলার ফলাফল অন্যরূপ হতো।

## ক্রিকেট

চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচেও ভারতীয় দল পরাজয় বরণ করায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল 'রাবার' লাভ করেছে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক আলেকজাণ্ডার টসে জয়লাভ করে নিজ দলকে ব্যাট করতে পাঠান। প্রথম দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ৫ উইকেটে ২৮৩ রাণ সংগ্রহ করে। রোহান কানহাই ৯৯ রাণ করে দুর্ভাগ্য বশতঃ রাণ আউট হয়ে যান। কানহাই-এর মূল্যবান উইকেটটির জন্ম নবাগত টেষ্ট খেলোয়াড় সেনগুপ্তের কৃতিত্বই অধিক। এই টেষ্টে ভারতের অধিনায়ক মানকড়ের বোলিং বিশেষ কার্য্যকরী হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মানকড় খেলতে না পারায় রামচাঁদ ভারতীয় দলের পক্ষে অধিনায়কত্ব করেন।

দ্বিতীয় দিনের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ব্যাটসম্যানরা পিটিয়ে খেলে ৫০০ রাণ সংগ্রহ করে। বিপুল সংখ্যক রাণ পিছিয়ে থেকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ব্যাট করতে নামে। দিনের শেষে ভারতীয় দল এক উইকেট হারিয়ে ২৭ রাণ সংগ্রহ করে।

তৃতীয় দিন ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত খেলেও প্রথম ইনিংসে ২২২ রাণ সংগ্রহ করে।

২৭৮ রাণ হাতে রেখে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ভারতকে 'ফলো অন' করতে না দিয়ে নিজেরা ব্যাট করতে নামে। শেষ পর্যন্ত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ৫ উইকেটে ১৬৮ রাণ করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ভারতীয় দল ব্যাট করতে নেমে ৩ উইকেটে ৪৮ রাণ সংগ্রহ করে।

ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানদের উপর কঠিন সমস্যার চাপ পড়লো। মাত্র ৭টি উইকেট হাতে নিয়ে একটি দিন অতিক্রম করা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের পক্ষে এক বিরাট সমস্যা! তার উপর অধিনায়ক মানকড় অসুস্থ হয়ে পড়ায় একটি উইকেট ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতীয় দল ব্যাট করতে নামলো। কিন্তু সেই ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি এ টেষ্টেও ঘটলো। একমাত্র তরুণ ব্যাটসম্যান চান্দু বোরদে বহু সময়ে উইকেটে টিঁকে থেকে ৫৬ রাণ করলেন। মধ্যাহ্নভোজের কিছু পরে ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ২১৫ রাণে জয়লাভ করলো।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস—৫০০ (কোলী স্মিথ ১৪২, রোহান কানহাই ৯৯, হোল্ট ৬৩, জো সলোমান ৪৩, হান্ট ৩২, এটাকিনসন ২১, নট আউট হল ২৫ ভিন্ন মানকড় ৯৫ রাণে ৪ উইকেট ও চান্দু বোরদে ৮০ রাণে ২ উইকেট)।

ভারত—১ম ইনিংস—২২২ (কৃপাল সিং ৫৩, পি, রায় ৪৯, রামচাঁদ ৩০, সোবার্স ২৬ রাণে ৪ উইকেট, গিলক্রিষ্ট ৪৪ রাণে ২, হল ৫৭ রাণে ২ উইকেট)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস—১৬৮ (৫ উই: ডিক্লেয়ার্ড) হোল্ট নট আউট ৮১, হান্ট ৩০; সুভাষ গুপ্তে ৭৮ রাণে ৪ উইকেট)।

ভারত—২য় ইনিংস—১৫১ (চান্দু বোরদে ৫৬, উম্রিগড় ২১, গিলক্রিষ্ট ৩৬ রাণে ৩ উই: হল ৪৮ রাণে ৩ উই: ও সোবার্স ৩১ রাণে ২ উইকেট)।

* * * *

ভারতীয় ক্রিকেটের দুরবস্থা দেখে প্রত্যেক ক্রীড়ামোদী মাত্রই সবিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এবারকার খেলা দেখে মনে হয়েছে, ভারতীয় দল ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক খেলাধুলায় যোগদান করার মত যোগ্যতা অর্জন করে নি। পর পর খেলায় খেলোয়াড়দের ব্যর্থতাই একমাত্র কারণ নয়। ক্রিকেটে কন্‌ট্রোল বোর্ডের মধ্যে যে দলাদলি চলছে তা ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে এক অগৌরবজনক অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে চতুর্থ টেষ্টের অধিনায়ক নির্ব্বাচনে।

ভারতের অধিনায়ক গোলাম আমেদ অক্ষমতা জানানোর পর ভারতের অন্যতম কৃতী খেলোয়াড় উম্রিগড়কে অধিনায়ক মনোনয়ন করা হয়। উম্রিগড় একজন ব্যাটসম্যান-এর বদলে একজন ব্যাটসম্যানকে দলে অন্তর্ভুক্তির জন্য বোর্ডকে জানান। কিন্তু বোর্ডের মধ্যে এমনই একনায়কত্ব চলছে যে, দৃঢ়চেতা অধিনায়ক উম্রিগড় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তাঁর মনোনীত খেলোয়াড়কে দলে গ্রহণ না করলে তিনি অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন। শেষ পর্য্যন্ত কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে উম্রিগড়কে অধিনায়কত্বের পদ থেকে সরিয়ে মানকড়কে অধিনায়ক করা হল। তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। কারণ সেই সেনগুপ্তকে শেষ পর্য্যন্ত দলের মধ্যে স্থান দিতে হোল। মানকড়কে অশেষ ধন্যবাদ! তিনি একজন খেলোয়াড়ের সম্মান রাখতে তাঁর দৃঢ় সংকল্প থেকে বিচ্যুত হননি।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলার বিরুদ্ধে ভারতীয় দল চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, যদিও এখনও একটি টেষ্ট ম্যাচ খেলা বাকি আছে। ভারতীয় দলের আগামী ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় দলের মর্য্যাদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভারত সরকার যথাশীঘ্র এক কমিশন নিয়োগ করুন। এই কমিশন দুর্নীতির মূল কারণগুলি জনসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিন। এই মুহূর্তে ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড ভেঙে দিয়ে ভারত সরকার একজন এডমিনিষ্ট্রেটার নিয়োগ করুন এবং ভারতের হিতকামী ক্রিকেট-অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও কয়েকজন খেলাধূলার সমালোচককে নিয়ে কমিশনের রিপোর্ট বের হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেটের পরিচালনা হোক।

রাশিয়া বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের মত ভারতের খেলাধূলা রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হোক।

আন্তর্জ্জাতিক খেলাধূলায় ভারতের সুনাম প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, এ্যাথলীট সমস্ত বিষয়ই যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হোক।

আগামী ইংলণ্ড সফরে যাওয়ার জন্য পেস অথবা মিডিয়াম পেস বোলার সংগ্রহ করার জন্য একটি ট্রেনিং সেণ্টার খোলার বন্দোবস্ত যথাশীঘ্র হউক। এই ট্রেনিং সেণ্টারে সেই সমস্ত খেলোয়াড়কে নেওয়া হোক—যারা এই বৎসর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে ভাল বল করেছেন। প্রসঙ্গতঃ ডি, এস মুখার্জ্জির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ট্রেনিং সেণ্টারের সবিশেষ প্রচেষ্টায় দুই জন ভাল বোলার পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য হবে না বলে মনে হয়।

ভারতীয় বোলারদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া থেকে একজন ট্রেনার নিয়ে আসা হউক। এ প্রসঙ্গে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন ইংলণ্ড থেকে নয়। তার কারণ এই যে, ইংলণ্ডের ট্রেনাররা কনজারভেটিভ। তাছাড়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলায় ইংলণ্ড থেকে কোন ট্রেনার না নেওয়া বর্ত্তমানে সঙ্গত। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে ট্রেনার নেওয়া সর্ব্বপ্রথম বিবেচনা করা এই কারণে যে খেলোয়াড়োচিত মনোভাব সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। শোনা গেছে, গিলক্রিষ্ট ভারত থেকে এমনি আমন্ত্রণ পেলে গ্রহণ করতে রাজী আছেন। অষ্ট্রেলিয়া থেকে ট্রেনার আনা হবে তখনই যখন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে কোন ট্রেনার পাওয়া যাবে না।

ট্রেনার নিয়ে এসে ভারতের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করতে পারলে ভারতবর্ষে ভাল খেলোয়াড়ের অভাব কোন দিন হবে না। সর্ব্বসময়ে দলে তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে বিজয় মার্চেণ্ট রাজস্থানের রাজসিংহের নাম উল্লেখ করেছেন।

রাজকুমারী অমৃত কাউরের খেলাধূলার শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য কলকাতা এবং বোম্বাইতে ইংলণ্ডের গোভারের মত দুটি ট্রেনিং সেণ্টার খোলার বন্দোবস্ত করা উচিত।

এইগুলি একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত। পাঠক-সাধারণ এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করলে সবিশেষ আনন্দিত হবো।

## বাউল গান

( পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর )

এই প্রসঙ্গে বাউলদের 'গুরুতত্ত্ব' কি, তা একটু জানতে হবে। অনেক গানে এই কথাটির উল্লেখ আছে। বাউলদের সাধনার বস্তু 'গুরুতত্ত্ব'। 'গুরুতত্ত্ব' কি? এই যে আসল গুরু বা পরমতত্ত্ব বা ভগবান বা অন্তরাত্মার কথা বলা হোলো, তাঁর স্বরূপই 'গুরুতত্ত্ব'। এই স্বরূপ কেমন? এই স্বরূপের তিনটি অংশ আছে,—একটি ভোক্তা, শক্তিমান বা পুরুষরূপ, আর একটি শক্তি, ভোগ্যা বা প্রকৃতিরূপ, অপরটি উভয়ের মিলিত একটি মহানন্দ শিহরিত অনির্বচনীয় সম্মিলিত অদ্বয় অবস্থারূপে। দু'টি সত্তার মিলনের দ্বারা এই অনির্বচনীয় তৃতীয় অবস্থা লাভই তাদের সাধনার মূল উদ্দেশ্য।

এক বাউল-গুরু তাঁর শিষ্যকে সাধনের মূলতত্ত্ব বলে দিচ্ছেন,—

আত্মরূপে কৃষ্ণ তিনি, পরতত্ত্বে রাধারাণী,<br>
গুরুতত্ত্বে প্রেম বাখানি,<br>
হয় মহাভাবের উদয়।<br>
কৃষ্ণ অধর বলে, মনোহর, নে যত্ন করে<br>
দিলাম তোরে তত্ত্ব বলে,<br>
সাধনের এই নির্ণয়॥

আত্মতত্ত্ব ও পরতত্ত্বের মিলিত রূপ হচ্ছে গুরুতত্ত্ব। কৃষ্ণ পুরুষতত্ত্ব, রাধা প্রকৃতিতত্ত্ব, আর উভয়ের গভীর প্রেমমিলনই গুরুতত্ত্ব। এই গভীর ও সর্বাঙ্গীন প্রেমমিলনের দ্বারা যে অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি, তাই মহাভাব। সে-ই প্রেমের চরম ও পরম অবস্থা। এই অপূর্ব আনন্দময় সত্তাই মানবাত্মা বা প্রকৃত গুরুর স্বরূপ। বাউলদের সাধনা মানবাত্মার এই স্বরূপ-উপলব্ধির সাধনা।

বহু বাউল গানে আমরা রূপ-স্বরূপের উল্লেখ দেখি। মূলতঃ বাউলদের সাধনাই হচ্ছে রূপ থেকে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়া—প্রাকৃত দেহকে অপ্রাকৃতে পরিণত করে দেহের মধ্যেই পরমতত্ত্বের উপলব্ধি করা। দেহকে কেন্দ্র করে যে সাধনা, তার রহস্যই এই রূপ থেকে স্বরূপে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যে নিহিত। হিন্দুতন্ত্র-সাধনা, বৌদ্ধতন্ত্র-সাধনা, বৌদ্ধসহজিয়া সাধনা, বৈষ্ণব সহজিয়া-সাধনা, বাউল-সাধনা, নাথপন্থীদের সাধনার এটাই হোলো ভিত্তি-প্রস্তর।

চরমতত্ত্ব এক অদ্বয় পরমানন্দ-স্বরূপ। এই আনন্দের স্বরূপ নির্ণয় করতে বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলেছে যে, এ আনন্দ স্ত্রী-পুরুষের আলিঙ্গিত অবস্থা বা মিথুনানন্দের তুল্য। পরবর্তী ভারতীয় তন্ত্র এইটেই পারমার্থিক সত্যের স্বরূপ জ্ঞান করে তাদের ধর্মতত্ত্ব ও সাধন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করেছে। তন্ত্রমতে এই পরমানন্দময় অদ্বয় সত্যের দুটি অংশ, খণ্ড বা রূপ আছে। এই দুইটি অংশের মিলনেই এক পরমানন্দময় অদ্বয় সত্তা। এই দুইটি অংশের একটি শিব ও অপরটি শক্তি। এই শিব-শক্তির মিলনজনিত কেবলানন্দই সাধকের চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য।

মানবদেহেই সমস্ত সত্য বা তত্ত্বের অবস্থিতি ভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড। তাই দেহের মধ্যেই একাধারে শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্বের বাস কল্পিত হয়েছে। শিবতত্ত্ব সহস্রারে অবস্থিত আর শক্তিতত্ত্ব কুণ্ডলিনীরূপে মূলাধারে নিদ্রিতা। সাধক এই শক্তিতত্ত্বকে জাগ্রত করে ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বে সহস্রারে শিবতত্ত্বের সঙ্গে মিলিত করলে উভয় অংশের মিলনজাত যে সামরস্য সুখ বা কেবলানন্দ, তাই উপলব্ধি করতে পারে। আবার তন্ত্র সাধনায় আর একটি ধারা বা পদ্ধতি আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় যে, পরমতত্ত্ব যখন একা ছিলেন, তখন রমণ করতে পারেননি। রমণেচ্ছায় তিনি নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে পুরুষ ও রমণীরূপে বা পতি ও পত্নীভাবে সৃষ্টি করেছিলেন। তন্ত্র তাই জগতের প্রাকৃত পুরুষকে বিশেষভাবে শিবতত্ত্বের প্রতীক এবং নারীকে বিশেষভাবে শক্তিতত্ত্বের প্রতীক বলে গ্রহণ করেছে। পুরুষ-নারীর মিলিত সাধনা এই ভাবে তন্ত্রে একটা বিশিষ্ট সাধনারূপে পরিগণিত হয়েছে। নর-নারীর এই মিলিত সাধনার বীজ মনে হয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের মধ্যেই নিহিত।

জগতের পুরুষ ও নারীর যে রূপ, তা তাদের বাইরের রূপ। এই রূপ বা বিশিষ্ট আকৃতিকে অবলম্বন করে ওর অভ্যন্তরে যে একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্ব, তাই স্বরূপ। এই দৃশ্যমান প্রাকৃত রূপের অন্তরালে ওর স্বরূপ অবস্থিত। জগতের প্রত্যেক পুরুষ-রূপ-এ পুরুষ কিন্তু স্বরূপে কৃষ্ণ, আবার প্রত্যেক নারী রূপ-এ নারী কিন্তু স্বরূপ-এ রাধা। নর-নারী যখন রূপের মধ্য দিয়ে তাদের স্বরূপ উপলব্ধি করবে, তখন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত নর-নারীর মিলন হবে রাধাকৃষ্ণের নিত্য প্রেমলীলা। মর্ত্যের প্রাকৃত প্রেম-মিলন হবে নিত্য বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সহজলীলা। এইটেই রূপ-স্বরূপতত্ত্ব।

এই তত্ত্বের কথা লালন তাঁর একটা গানে সুন্দরভাবে বলেছেন,—

রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে<br>
চেয়ে দেখ না তোরা।<br>
যে জন অনুরাগী হয়,<br>
রাগের দেশে যায়;<br>
রাগের তালা খুলে সে রূপ দেখতে পায়।<br>
আছে রূপের দরজায়<br>
শ্রীরূপ মহাশয়<br>
রূপের তালা ছোড়ান তার হাতে সদায়।

যে জন শ্রীরূপগত হবে
তালার জোড়ান পাবে,
অধীন লালন বলে অধর ধরবে তারা ॥

এই মানব-দেহ-গৃহে অটল-রূপ বিহার করছেন। এই অটল-রূপের নিকট পৌঁছতে হলে যে দ্বার অতিক্রম করতে হয়, তা শ্রীরূপের অর্থাৎ প্রাকৃত দেহের অধীন। সেই সে দ্বারের কর্তা। সে দ্বারে রাগ অর্থাৎ প্রেমের তালা লাগানো আছে, কিন্তু সে তালার চাবি ঐ শ্রীরূপ অর্থাৎ প্রাকৃত দেহের হাতে রয়েছে। শ্রীরূপ গত না হলে সেই দ্বার খোলা পাওয়া যাবে না—সে গৃহে প্রবেশ করা যাবে না। এ দেশ-এর সঙ্গে সে-দেশ, 'রূপ'-এর সঙ্গে স্বরূপ-এর মিশ্রণ না হলে অটল-রূপের দর্শন মিলবে না।

চব্বিশ পরগণার অন্যতম আদি বাউল রেজো ক্ষেপার একটি গানে আছে:

ব্রজপুরে রূপনগরে যাবি যদি মন,
তবে করগে যা স্বরূপ-সাধন।
স্বরূপের রূপ রূপের স্বরূপ
স্বরূপ দেহে হয় মিলন।
রূপের দেহে স্বরূপের স্থিতি,
স্বরূপেতে রসের মানুষ করেন বসতি,
রসের মানুষ ধরবি যদি
রাগের পথে কর গমন ॥

যদি দেহস্থিত ব্রজধামে ব্রজেশ্বরকে উপলব্ধি করতে হয়, তবে স্বরূপ-সাধন করতে হবে। স্বরূপদেহেই তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। বাইরের যে রূপ, তা আভ্যন্তরীণ স্বরূপেরই বহিঃপ্রকাশ। রূপের অভ্যন্তরে স্বরূপ, আবার স্বরূপের প্রকাশ রূপের মধ্য দিয়ে। সুতরাং রূপ ও স্বরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বরূপেই 'রসের মানুষ' বা রসময় পরমতত্ত্ব বা কৃষ্ণের বাস। রাগের পথে বা প্রেম-মিলনের পথেই তাঁর অনুসন্ধানে যেতে হবে।

একটা লক্ষ্যের বিষয় যে, যে-সব ধর্মমতে দেহের মধ্যে পরমাত্মার বাস কল্পিত হয়েছে, তার সাধনাই আত্মোপলব্ধির সাধনা। এই দেহকেই অবলম্বন করে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে অগ্রসর হয়ে অবশেষে আত্মার স্বরূপত্ব লাভের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই স্থূল থেকে সূক্ষ্মে অগ্রসর হওয়ার অর্থ সৃষ্টিধারার বিপরীত গতিতে বা প্রতিলোম গতিতে অগ্রসর হওয়া। এই উল্টা সাধনের দ্বারা মানবের অন্তর্নিহিত সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করা যায়। এই অবস্থাতে মানুষ ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব লাভ করে। তাই তন্ত্রের 'চক্রভেদ', পাতঞ্জলমতের 'অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস', বেদান্তের 'পঞ্চকোষ-বিবেক', তান্ত্রিক বৌদ্ধদের 'কায়াবাদ', সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলদের 'রূপ-স্বরূপতত্ত্ব', বাউলদের 'উজানে বাওয়া বা উল্টাকল প্রয়োগ' মূলতঃ একই পথের প্রকারভেদ মাত্র।

বাউল গানের একটা বিশিষ্ট সাহিত্যিক মূল্য আছে এবং এর মূল্য নির্ধারণের মানদণ্ড স্বতন্ত্র। ব্যক্তিগত ভাব ও অনুভূতি যখন নৈর্ব্যক্তিক হয়ে সর্বজনীন রূপ ধারণ করে, তখনই তার মধ্যে হয় রস-সৃষ্টি। এই রস-সিক্ত ভাব ও অনুভূতি যখন উপযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত হয় অলংকার ও ছন্দ-সমৃদ্ধ হয়ে এবং চিত্তে রস-সঞ্চার করে আনন্দ দান করে, তখনই তা প্রকৃত কাব্যপদ-বাচ্য হয়। সমুন্নত কল্পনা, বিপুল আবেগের সংঘ গভীরতা ও প্রকাশের অনবদ্য কৌশলই আমরা কাব্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ-বিচারের মানদণ্ড-রূপে গ্রহণ করে থাকি। কল্পনার লীলা ও আবেগের তরঙ্গ থাকলেও, তা যদি উৎকৃষ্ট কলার মাধ্যমে প্রকাশ না পায়, তবে তা প্রকৃত সাহিত্য হতে পারে না। কলা-কৌশলের মাধ্যমেই কাব্য-সাহিত্য সার্থক রূপ ধারণ করে এবং রূপের উৎকর্ষই সাহিত্যিক উৎকর্ষের একটা প্রধান লক্ষণ। সুতরাং প্রকাশভঙ্গীর উপর কাব্য-সাহিত্য অনেকখানি নির্ভর করে। আধুনিক সাহিত্য-বিচারে কলা-কৌশলের মধ্যে আমরা উপস্থাপনের কৌশল, ভাষা, অলংকার, ছন্দ, ইঙ্গিত, সংকেত প্রভৃতি অনেক কিছু বুঝে থাকি। কিন্তু সাধারণভাবে যে মাপকাঠিতে আমরা বর্তমানে সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয় করি, বাউল গানের বিচারে সে মাপকাঠি চলবে না।

বাউল গানের মূল বিষয়বস্তু একটা ধর্মতত্ত্ব ও সেই ধর্ম সাধনার ক্রিয়া-কলাপ। ব্যক্তিগত ভাবানুভূতির উৎসারণ বা কোনো বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর রূপায়ণের সম্ভাবনা এতে অল্প। তবুও এই ধর্ম-তত্ত্বের বিবৃতি বা ক্রিয়া কলাপের স্বরূপ নির্ধারণে যেটুকু ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগের প্রকাশ ঘটেছে, তার মধ্যে যেটুকু সাহিত্য-রস সম্ভব, তাই এর সাহিত্যিক মূল্য। সেই আবেগ বা অনুভূতিটুকু সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়ে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছে কি না, তাই বাউল গান সম্পর্কে বিচার্য।

গানগুলি বর্তমান যুগের আলোকপ্রাপ্ত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের রচনা নয়। যারা বর্তমান যুগের অনুপাতে অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত, তারাই এ-সকল গানের রচয়িতা। এই সব সরল, বিশ্বাসপ্রবণ, ধর্ম-পথের যাত্রী পল্লীবাসীদের রচনায় ভাষের সুবিন্যাস, ভাষার মার্জনা, বা সচেতন অলংকরণের চেষ্টা নেই। তাদের ভাবানুভূতি স্বতঃ উৎসারিতভাবে যে রূপ ধারণ করে প্রকাশ লাভ করেছে, তাই তাদের রচনার শেষ রূপ। একটা সহজাত কবিত্বের অন্তঃপ্রেরণায় তার যে রূপে ছন্দোবদ্ধ আকারে বের হয়ে এসেছে, তার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা বা প্রয়াস নেই। এই রচনায় উপমা বা রূপকের বিষয়গুলো তাদের চার দিকের দৃষ্ট, প্রত্যক্ষবস্তু থেকে সংগৃহীত; নিতান্ত আটপৌরে ভাষায়—সময় সময় আঞ্চলিক কথ্যভাষায় তাদের ভাবানুভূতি রূপ লাভ করেছে। গানগুলি তাদের ভাবানুভূতির অপকট রূপায়ণ। প্রকৃতির নিজস্ব সম্পদের মতো এ-রচনা স্বাভাবিক, সহজ, সরল ও অবন্ধ-বর্জিত।

বাংলা সাহিত্যের উদ্যান-কোণে এই জাতি-গৌরবহীন বনফুল বিনম্র সৌন্দর্য ফুটে উঠে তাদের স্নিগ্ধ সৌরভ বিলাচ্ছে। সাহিত্য যদি সমাজ-জীবনের দর্পণ হয়, তবে বাঙ্গালী-সমাজের এক কোণের একটি ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস, অধ্যাত্ম-চিন্তা, জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় মনোভাব, বিভিন্ন ভাবানুভূতি তাতে প্রতিফলিত হয়েছে। বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, বাঙালীর ধর্মের অন্তর্গূঢ় স্রোতোধারা তার সাধনার বৈচিত্র্যময় স্বরূপের সম্যক পরিচয় এই পল্লী-সংগীতগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই গানগুলোর মধ্যে বাঙালীর একটি ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্জীবনের রসসিক্ত অভিব্যক্তি আছে। সে ধর্ম-সম্প্রদায় আর্য ও অনার্য, হিন্দু, বৌদ্ধ ও সুফী ভাবধারার সমন্বয়ে গড়ে উঠা বাঙ্গলার একান্ত নিজস্ব একটি ধর্ম-সম্প্রদায়। এ-ধর্ম কোন অভিজাত সম্প্রদায়ের নয়, নিতান্তই জনসাধারণের ধর্ম।

এই ধর্মের বিষয়বস্তু বা প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে অনেকের মতানৈক্য থাকতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে জড়িত মানবিক ভাবানুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা-নৈরাশ্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশ তো সাহিত্যের সীমানা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। গুরুর কাছে অপকট আত্মসমর্পণ, মানবের হৃদয়স্থিত ভগবানের কাছে দৈন্য, সাধন-ভজনের অক্ষমতার জন্য নৈরাশ্য সাধনমার্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—এই গানগুলির উপজীব্য, এবং এই ভাবানুভূতির মধ্যে যে কারুণ্য যে মাধুর্য আছে, প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যে অপকট সারল্যের সৌন্দর্য আছে, তাই এই সঙ্গীতগুলির সাহিত্যাংশ। প্রাণের এমন সহজ সরল অকপট অভিব্যক্তিতে একটি মনোরম সাহিত্য-রসের আস্বাদ আছে। এ একটি বিশিষ্ট সাহিত্যরস। তাই এই বাউল গান বাংলা সাহিত্যের ধনাগারে এক অনন্যসাধারণ ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পদ।

গুরু-প্রসঙ্গের গানের কতকগুলিতে চিত্তের কাতরতার সহজ ও অকপট প্রকাশে একটি করুণামাধুর্য লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ববঙ্গের বাউল জলধরের একটি গান আছে :—

গুরু গো, সুজন নাইয়া,
ভবপারে লও আমারে বাইয়া।
আমার জীর্ণ তরী
নাই কাণ্ডারী,
হারে, তরী কে লবে আউগাইয়া।
ভবনদীর অকূল পাথার।
আমি ত জানি না সাঁতার।
গুরে, আমারে যাইব না চুবাইয়া॥
তোমার নামেতে কলঙ্ক হবে,
গুরু গো, ভবপারের বন্ধু।
যদি মরি হাবুডুবু খাইয়া॥
ভবনদীর দুরন্ত ধার,
(আমার) দাঁড়িতে টানতে চায় না দাঁড় ষোল আনা খাইয়া।
ওগো, মন-মাঝি বড় পাজা,
গুরু গো, ভবপারের বন্ধু,
আমারে যাইতে চায় ফালাইয়া॥
আমার পুণ্যের সঞ্চয় কিছুই ত নাই
তরী যায় বুঝি তলাইয়া।
তুমি বিপদভঞ্জন মধুসূদন,
গুরু গো, ভবপারের বন্ধু,
আমায় পার কর হে, দয়ালগুরু
আছি তোমার চরণপানে চাইয়া॥
অধীন জলধর বলে, আমি বইসে রইলাম নদীর কূলে
দীনের দীন হইয়া।
তুমি আমার পারের কর্তা, গুরু গো ভবপারের বন্ধু,
হারে, তরী নেও না কেন বাইয়া॥

সাধক-জীবনে গুরুর প্রভাবের কথা লালনের কয়েকটি গানে আছে :—

গুরু, সু-ভাব দেও আমার মনে।
তোমার যেন ভুলিনে।
গুরু, তুমি নিদয় যার প্রতি,
ও তার সদায় ঘটে দুর্মতি,
তুমি মনোরথের সারথি,
যথা লও যাই সেখানে॥
গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী,
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী,
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী,
না বাজাও বাজবে কেনে॥

নানা প্রবৃত্তি-সঙ্কুল সাংসারিক মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন না হওয়া যে তাঁর ভাব-জীবন বা প্রকৃত সাধক-জীবন আরম্ভ হচ্ছে না,—এ দুঃখটি পদ্মলোচন সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন :—

এবার পরশ ছুঁয়ে সোনা হ'ব স'ধ ছিল মনে,
ত' তো হ'লো না, তা তো হোল না।
কেবল তাঁবার মিশাল জন্যে॥
স্থানগুণে গঙ্গার জল,
পাত্র-গুণে ধরে ফল,
জাতের গুণে স্বভাব যায় জানা।
ও যে ভেক-ভ্রমরে কমল-বনে,
কমলের স্বভাব ভ্রমরে জানে।
ভ্রমর করে মধুপান,
(ওরে মন আমার) ভেক থাকে অজ্ঞান,
জেনে শুনে মধু খায় না কেনে॥
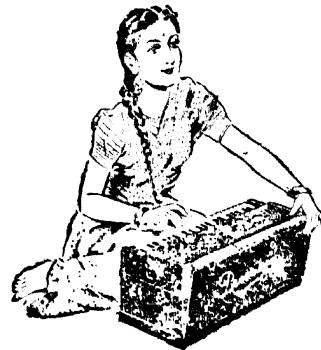
নিম্ববৃক্ষ শতভারে
যদি দুগ্ধ দিয়ে রোপণ করে,
তবু স্বভাব ছাড়তে নারে।
গোঁসাই হরি পোদোর বলে,
( ওরে মন আমার ) স্বভাব যায় না মলে,
স্বভাব না ছাড়িলে
ভাবের মুকুল হবে কেনে ॥

মাছ ধরা, জমি চাষ করা, খেজুর গাছ কাটা ও গুড় তৈরী করা প্রভৃতি সাধারণ পল্লীবাসীর জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারগুলোকে অনেক বাউল-কবি নিজেদের সাধক-জীবনের অবস্থা বর্ণনায় তাঁদের গানের বিষয়ীভূত করেছেন। যাদবিন্দুর একটি গান এরূপ :—

আমার এই কাদা-মাখা সারা হ'লো।
ধর্ম-মাছ ধরব বলে নামলাম জলে,
ভক্তি-জাল ছিঁড়ে গেল।
কেবল হিংসে নিন্দে গুগলি ঘোঙা
পেয়েছি কতকগুলো।
এই সত্যধর্ম-বিলে
সুরসিক বাগ্‌দী ছুলে,
শুদ্ধভাবে জালটি ফেলে,
আনন্দে মাছ ধরছে ভালো।
আমি পড়লাম ফাঁকে, মায়া-পাঁকে,
বল-বুদ্ধি চুলোয় গেল।
কুসঙ্গে বিল গাবালাম,
কুক্ষণে জাল নামালাম,
ক্ষমা-খালুই হারালাম,
উপায় কি করি বল!
আমি বিল খুঁজে পাই চাঁদা-পুঁটি,
লোভ-চিলে লুটে নিল ॥
পাঁচটা ভূত লাগল পিছে,
মাছ ধরায় প্যাঁচ পড়েছে,
ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেছে,
আর বাদী জনা ষোল।
আমি মাকাল-পূজোর মন্ত্র ভুলে
হয়েছি এলোমেলো ॥

তাঁর আর একটি গানে আছে :—

এমন চাষা বুদ্ধিনাশা তুই
কেন দেখলি না আপনার ভুঁই।
তোর দেহ-জমির পাকা ধানে
দেখ লেগেছে ছুটা বাবুই ॥
বহু কষ্টে করলি কুষাণি
এই মানব-দেহ চোদ্দপোয়া লাঙ্গ জমিখানি,
তাতে ভক্তি-ফসল জন্মেছিল,
সব খেয়ে গেল হিংসা-চড়ুই ॥
চেতন-বেড়া উপড়ে পড়েছে,
সব জায়গা আলগা পেয়ে
গরু ছাগল পাকা ফসল খেয়ে ফেলেছে।
এখন গোঁফ ফুলিয়ে বসে আছে
দেখ তোর মাচা-ভরা হিম পুঁই ॥

বাউলের 'ভাব-রস' বা 'প্রেম-রসে'র তাৎপর্য না বুঝে সাধন করলে সে সাধকের কি অবস্থা হয়, তার বর্ণনা একটি গানে আছে :—

কানা চোরে চুরি করে
ঘর থাকতে সিঁধ দেয় পগারে,
শুধু বেগার খেটে মরে,
কানার ভাগ্যে ধন মিলে না।
কানা বেড়াল লোভী হয়ে
দধি বলে কাপাস খেয়ে,
গলায় বেধে ছটফট করে
শেষে (ও) তার প্রাণ বাঁচে না ॥

* * * *

উল্লুকের হয় ঊর্দ্ধ-নয়ন,
সে দেখে না সূর্য্যের কিরণ;
দেখ, পিঁপড়ে পায় চিনির মর্ম
রসিক হলে যাবে জানা।

সাইকেল-চড়ার পদ্ধতি নিয়েও এক বাউল কবি গান রচনা করেছেন :—

মন যদি চড়বি রে সাইকেল,
আগে দে কোপ্‌নী এঁটে, অকপটে সাঁচ্চা কর দেল।
ফুটপিনে দিয়ে পা,
হপিং করে এগিয়ে যা,
পিনের 'পরে উঠে দাঁড়া,
বেদ-বিধি হবি ছাড়া
সামনে কর নজর কড়া,
আগাগোড়া,
ঠিক রাখিস হ্যাণ্ডেল।
সীটের 'পরে ব'সে ( মন )
ব্যালান্স ধরবি ক'ষে,
যাবি উদ্ধশ্বাসে,
কুম্ভক-শ্বাসে
চাস্‌না আশে-পাশে
ছয় আর দশে, মূলমন্ত্রে কর প্যাডেল।
কর সুপথে সুলক্ষ্য
ছাড়ি কুলাগ্র কুতর্ক,
দিবি বান হ'য়ে অধ্যক্ষ,
ভিতর-বাহির করে ঐক্য হ'য়ে সুদক্ষ,
বাজাবি তুই বিবেক-বেল।

বাউল-ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না হলেও, অপ্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত দু'-একটি প্রসঙ্গের বিষয় বাউল-গানে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে হিন্দু-সমাজের সাধারণ লোকের জাতিগত বৈষম্যের ধারণা ও ভেদ-বুদ্ধি একটি। এই সব গতানুগতিক সংস্কার-পীড়িত ও ছুৎমার্গগামী লোকদের সদ্‌দৃষ্টি নাই। এ-সম্বন্ধে লালনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মন্তব্য কয়েকটি গানে পাওয়া যায় :—

সব লোক কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জেতের কি রূপ, দেখলাম না এ নজরে ॥
ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারী-লোকের কি হয় বিধান ?
বামন চিনি পৈতার প্রমাণ,
বামনী চিনি কি ধ'রে ॥
কেউ মালা, কেউ তসবী গলায়, তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়,
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কার রে ॥
গর্ত্তে গেলে কূপ-জল কয়,
গঙ্গায় গেলে গঙ্গাজল হয়,
মূলে এক জল, সে যে ভিন্ন নয়,
ভিন্ন জানায় পাত্র অনুসারে ॥
জগৎ বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথা তথা,
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাত বাজারে ॥

বাউল গোপীনাথ দুঃখ করছেন যে, মানুষের মধ্যে যে 'পরম মানুষ' আছেন, মূর্খ মানুষ তা বুঝতে পারছে না :—

মানুষে মানুষ আছে,
দেখলে খুঁজে,
মানুষ হলে যাবে জানা।
আঁচলে থাকলে সোনা গোপন হয় না,
বাইরে কিরণ প্রকাশে।
বাঁশে হয় বংশলোচন,
গাভীতে হয় গোরোচনা,
হ'য়ে তুই সোনার বেণে
হচ্ছিস কানা,
বাং কি সোনা দেখ না কষে।
মৃগতে মৃগমদ, জন্ম-অন্ধ
পায় না দেখতে জন্মাবধি।
এমনি অবোধ ফণী, মাথার মণি
থাকতে ভেক-ভোজনে আসে ॥

ইহাই অতি সংক্ষেপে বাংলার বাউল ধর্ম ও বাউল গানের পরিচয়।

—ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

## গিরিজাশঙ্কর-স্মৃতি-সঙ্গীত-সম্মেলন

বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন কল্পে 'গিরিজাশঙ্কর-স্মৃতি সঙ্গীত-সমাজ'-এর পক্ষ হইতে স্থানীয় বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিল্পী শ্রীনবীন ভট্টাচার্য, শ্রীগোপী ঘোষ ও শ্রীযামিনীভূষণ রায়ের উদ্যোগে, গত ২৪শে অগ্রহায়ণ চুঁচুড়ার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'ডাচ-ভিলা'-য় এক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে বহু খ্যাতনামা কণ্ঠ, যন্ত্র ও নৃত্যশিল্পী এই সম্মেলনে যোগদান করেন। 'মাসিক বসুমতী'-র সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক মহোদয় এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং প্রধান-অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন বর্ত্তমান চুঁচুড়ার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্ শ্রীসাতকড়ি পাঠক মহাশয়।

প্রারম্ভে সভাপতি ও প্রধান অতিথিকে বরণ ও মাল্যদানের পর, অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সাহিত্যিক শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় চুঁচুড়ার নানাভিমুখী ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিগত দুই শত বৎসরব্যাপী মার্গ-সঙ্গীত চর্চ্চায় চুঁচুড়ার অবদান বিষয়ে বহুল-তথ্য-সমন্বিত মনোজ্ঞ একটি বিবৃতি পাঠ করিয়া সমাগত সকলকে স্বাগত জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় তাঁহার বলদৃপ্ত ও সুচিন্তিত ভাষণে বলেন যে, বাঙলার বাহিরের বহু গুণী সঙ্গীতাচার্য্যের নামে কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সঙ্গীত-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী যিনি শুধুমাত্র একজন সঙ্গীত-বিশারদই ছিলেন না—সঙ্গীত সাধনায় বাঙলার বৈশিষ্ট্য ও গৌরবকে সমগ্র ভারতবর্ষের সঙ্গীত-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, সেই গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর নামাঙ্কিত কোনও সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের কথা তাঁহার জানা নাই। চুঁচুড়ার তরুণ সঙ্গীতসেবিগণ যে বাঙলার গৌরব, অনাদৃত এই সঙ্গীতাচার্য্যকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের এই আয়োজন করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বিশেষ আনন্দিত। উদ্যোক্তাগণের এই উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

সভাপতি মহোদয়ের ভাষণের পর প্রধান অতিথি পঞ্চসপ্ততিপর বৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় সাতকড়ি পাঠক মহোদয় কর্ত্তৃক নাতিদীর্ঘ সুলিখিত ভাষণ পাঠের পর সঙ্গীতানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে পাখোয়াজে লহরা বাজাইয়া শুনান। তৎপরে 'শ্রী' ও 'দরবারী কানাড়া' রাগে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদ পরিবেশন করেন ও তাঁহার সহিত পাখোয়াজে সঙ্গত করেন নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীপঞ্চানন পাল। সুকুর মহম্মদ খান 'মালকোষ' রাগে বংশীবাদন করেন এবং 'পূরীয়া কল্যাণ' ও 'কিরওয়াণী' রাগে সেতার বাজাইয়া শোনান প্রফেসর আলি আহমেদ খাঁ। সেতার-বাদনের সহিত সঙ্গত করেন তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয় কিশোর পুত্র মাষ্টার পান্নু। কুমারী কল্পনা চট্টোপাধ্যায় 'কেদারা'য় ঠুংরী গান করেন। অতঃপর প্রখ্যাত নৃত্য-পরিচালক শ্রীব্রজকুমারের পরিচালনায় কুমারী মঞ্জু পাল্লো ও ছন্দা বাগচী কর্ত্তৃক যথাক্রমে 'কথক' ও 'ভরত নাট্যম্' নৃত্য প্রদর্শিত হয়। নৃত্যের সহিত সঙ্গত করেন শ্রীমান্ বিশ্বনাথ পাল। উপরোক্ত সকল শিল্পীই শ্রোতৃবৃন্দের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করেন। বিশেষ করিয়া কিশোর পান্নুর সঙ্গত ও কিশোরী মঞ্জু পাল্লোর 'কথক' নৃত্য এত মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় উভয়কেই একখানি করিয়া রৌপ্য-পদক পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

## আমার কথা (৪৯)

### ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

দেবী সরস্বতী হলেন বিদ্যা ও সঙ্গীতের অধীশ্বরী। তাঁহারই অসীম করুণায় ব্যক্তিবিশেষ একত্রে দু'টা বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া জনসমাদৃত হন। ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তন্মধ্যে অন্যতম।

১৯১৮ সালের ২৩শে মে ডাঃ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণনগরের স্বগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ও পরমসাধক ৺প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায় ও মাতৃদেবী হলেন শ্রীমতী সুরবালা দেবী। মাতুলালয় হাওড়া-শিবপুর। সুরবালা দেবীর মাতামহ ছিলেন প্রথম বাঙ্গালী কমিশনার ৺দুর্গাগতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোবিন্দগোপালের বাল্যকাল অতিবাহিত হয় দেওঘর বালানন্দ আশ্রমে। পড়াশুনাও করেন সেখানে। তজ্জন্য প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে ১৯৩৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৬ সালে কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সী বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে আই, এ এবং ১৯৩৮ সালে তথা হইতে সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি, এ, পাশ করেন। অসুস্থতার জন্য এক বৎসর পড়াশুনা বন্ধ রাখিয়া ১৯৪১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র হিসাবে আবির্ভূত হন। পরবৎসর তিনি সাংখ্যতীর্থ পরীক্ষায় প্রথম স্থান গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বনামধন্য দার্শনিক, বিশ্ববন্দিত শিক্ষাগুরু, ভারত-প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য্য ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নিকট সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের গবেষণাকারী ছাত্র হিসাবে চারি বৎসর অবস্থান করেন। তথা হইতে ফিরিয়া তিনি ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগে যোগদান করিয়া কৃষ্ণনগর কলেজে সংযুক্ত হন। দুই বৎসর পরে (১৯৫০) উপনিষদের উপর তথ্যমূলক রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে D. phil উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫৪ সালের শেষার্দ্ধে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে যোগদান করেন। এখানে তিনি বিদেশী ছাত্রদেরও সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া থাকেন।

ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীতের পরিবেশে যাঁহার জন্ম, জ্ঞানোন্মেষের সাথে তাঁহার গানের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক। তাই শ্রী মুখোপাধ্যায় শিশুবয়স থেকে সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত হন। কিন্তু নিয়মিত তাঁহার সঙ্গীত-সাধনা সুরু হয় ১৯৩৭ সালে—যখন তিনি সুরের বৈচিত্র্যে ও ভাবের অভিব্যক্তিতে প্রকটিত Master-mind সঙ্গীত-সাধক দিলীপ-কুমারের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের নিজের কথায় বলা চলে 'যদিও আমি নানা গান করি, তবুও দিলীপকুমারের প্রভাব আমার সঙ্গীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট'। এছাড়া তিনি গান শুনেছেন ও প্রেরণা লাভ করেছেন অমিয়নাথ সান্যাল, সুরেন মজুমদার, হরেন চট্টোপাধ্যায় ও হিমাংশু দত্ত সুরসাগরের নিকট। ১৯৫০ সালে H. M. V-র তৎকালীন অধিকর্ত্তা শ্রীহেমচন্দ্র সোমের উদ্যোগে গোবিন্দগোপালের প্রথম রেকর্ড 'বিশ্বরূপদর্শন' ও 'চণ্ডীস্তোত্র' গৃহীত হয়। পর পর আরও কয়েকটি স্তোত্রগানের রেকর্ড করা হয়। কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্র-উৎসবে তিনি ছিলেন প্রধান হোতা। তাঁহার গানের রেকর্ডগুলির অধিক চাহিদা বহির্ভারতে। ১৯৫৫ সাল হইতে প্রতি বৎসর ডাঃ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ-সংস্কৃত-সম্মেলন দ্বিজেন্দ্রলাল ও দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গীত পরিবেশনা করিতেছেন।

১৯৫৩ সালে শ্রীদেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' ছায়াছবিতে তিনি প্রথম নেপথ্য-গায়ক হিসাবে অবতীর্ণ হন। দিলীপকুমারের সঙ্গীত পরিচালনায় গৃহীত 'মাথুর' ছবিতে গোবিন্দগোপাল সহঃসঙ্গীত পরিচালক ও নেপথ্যগায়ক ছিলেন। ইহা ছাড়া 'শ্রীশ্রীতারকেশ্বর', 'সোনার কাঠি', 'ম-শীতল', 'নৌকা-বিলাস' ও 'সাগর-সঙ্গম' চিত্রগুলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর (গীত) শোনা যায়। ইন্দিরা দেবী ও দিলীপ রায়ের ভজন গানে তিনি বেশী আনন্দ পান। আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের সংস্কৃত ও সংস্কৃতি বিভাগে তিনি নিয়মিত স্তোত্রপাঠ ও গীত করিয়া থাকেন। উহার Light Music প্রোগ্রামে (রম্যগীতি) দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত তাঁহারই পরিচালনায় গৃহীত হয়।

১৯৫৪ সালে কৃষ্ণনগরের শ্রীমণীন্দ্রমোহন আচার্য্যের তনয়া শ্রীমতী মাধুরী দেবী তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের অবসরে মাধুরী দেবী সঙ্গীত-চর্চা করিয়া থাকেন এবং ধর্মপ্রাণ স্বামীর সহিত তিনিও কতকগুলি ছায়াছবি ও রেকর্ডে কণ্ঠদান করিয়াছেন।

সংস্কৃত কলেজের পুঁথিশালা হইতে সদ্য-উদ্ধারপ্রাপ্ত বাঙ্গালী শুভঙ্কর লাহিড়ী প্রণীত 'সঙ্গীত-দামোদর' নামক (১৬১১ সাল) প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকটি ডাঃ মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা করিতেছেন। উহার উপর তিনি একটি পুস্তকও লিখিতেছেন।

বর্ত্তমানের সঙ্গীতশিল্পীদের কথায় তিনি বলেন যে, সুকণ্ঠের অধিকারী অনেকেই—কিন্তু সুরের originality-র অভাব। আর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বর্ত্তমান সঙ্গীত-সম্মেলনে বাঙ্গালী শিল্পীদের স্থান না হওয়ায় অন্যান্য রাজ্যেও তাঁহাদের কদর নাই। বাঙ্গালী সঙ্গীত প্রতিভা কি পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত সঙ্গীত আসরগুলিতে যোগদানের কোন সুযোগ পাবে না? ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের বিদায় বেলায় প্রশ্ন ছিল আমার নিকট।

## ডাকযোগে কেনাকাটা

ডাকযোগে কেনা-কাটা ঠিক একটা নতুন জিনিষ নয়—বহুকাল থেকেই এর চলতি লক্ষ্য করা যায়। তবে আজকাল দেশ-বিদেশে বিশেষতঃ পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোতে এর প্রচলন বেড়েছে—নিঃসন্দেহে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশি।

এই প্রথায় কেনাকাটার সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই অবশ্য আছে। সাধারণ রীতি অনুযায়ী বাজারে গিয়ে প্রত্যক্ষ কেনাকাটা মারফৎ অভিপ্রেত জিনিষটি ভালরকম দেখে-শুনে ও দর যাচাই করে আনা যায়। ডাকযোগে কেনাকাটা যেখানে করতে হবে, সেক্ষেত্রে এ ধরণের সুযোগ ঠিক থাকে না। যে জিনিষ কিনতে হবে, তার গুণ বা উপযোগিতা, 'ব্র্যাণ্ড' বা 'ট্রেড মার্ক' সম্পর্কে পূর্ব্ব-পরিচিতি থাকা চাই আর চাই সেই সঙ্গে মাল সরবরাহকারী সংস্থা বা ফার্ম্মের উপর পূর্ণ আস্থা। মালটি অর্ডার মাফিক যথাসময়ে এসে পৌঁছবে—এ নিশ্চয়তা যদি থাকল, ডাকযোগে কেনাকাটা হলেও ঝামেলা বা ভাবনা কমে যায় অনেকটা। এরূপ ক্ষেত্রে সেখানে যেটি ভাল জিনিষ—প্রয়োজনীয় টাকা হলেই সেটি লিখে আনিয়ে নেওয়া চলতে পারে, দূর অঞ্চল বলে অমনি হতাশ হবার কারণ থাকে না।

আধুনিক যুগে বাইরের মোটামুটি প্রায় সব জিনিষই ডাক ও তারযোগে ঘরে বসেই পাওয়া যেতে পারে। প্রথমে পত্রাদির মাধ্যমে যোগ-সংস্থাপন করে সংশ্লিষ্ট ফার্ম্ম বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ক্যাটেলগ (তালিকা) আনিয়ে নিতে হয়, তারপর সেটি পর্য্যালোচনা করে যে জিনিষ পছন্দ হলো, অর্ডার প্রেরণ করতে হয় তার জন্য যথারীতি। এমনি ব্যবস্থা অনুসরণ করলে দেখা যাবে—দামী পুঁথি-পুস্তকই হোক, পোষাক-পরিচ্ছদই হোক, আসবাব বা গৃহ-সরঞ্জামই হোক, ঔষধপত্র বা যন্ত্রপাতিই হোক কি মনোহারী বিলাস সামগ্রীই হোক—উপযুক্ত টাকার বিনিময়ে অর্ডার মতো ডাকেই ঘরে এসে সব হাজির। মস্কো, ওয়াশিংটন, প্যারিস, লণ্ডন, দিল্লি, টোকিও প্রভৃতি সকল দূরদেশ থেকেই এই ভাবে ভারতে মাল পাওয়া যেতে পারে এবং যাচ্ছেও।

এক্ষেত্রে বড় বড় কোম্পানী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান—আমদানী রপ্তানী যাঁদের কাজের প্রধান অঙ্গ, তাঁদের প্রসঙ্গ তোলা হচ্ছে না। ব্যবসা বাণিজ্য চালাতে ডাক ও তারের মাধ্যম তাঁদের গ্রহণ না করলে নয়, এ বলাই বাহুল্য। ব্যক্তি-বিশেষ যেখানে ক্রেতা ও গ্রাহক ডাকযোগে তাঁদেরই কেনাকাটার কথা এই ক্ষেত্রে আলোচ্য। আরও একটি কথা—যে শিল্প-সংস্থা বা কোম্পানী অর্ডার পেয়ে ডাক মারফৎ দেশ বিদেশে মাল সরবরাহ করবেন, কতকগুলো দিকে তাঁদের বিশেষ নজর রাখতেই হবে। তাঁদের সরবরাহ করা মালের গুণাগুণ এবং যত্ন নিয়ে মালপ্রেরণ ব্যবস্থা, মালের সুলভ মূল্য দাবী—এ সকলের উপর তাঁদের শিল্পসংস্থার 'গুড-উইল' বা অগ্রগতি নির্ভরশীল। সহজ-কথায় ক্রেতা ও বিক্রেতা সরবরাহকারী ও গ্রাহক-প্রাপকের মধ্যে একটা সুন্দর বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে উঠা চাই। ফলাও করে বিজ্ঞাপন ছড়ান হলো অথচ বিজ্ঞাপিত পণ্য বা শিল্প-সামগ্রী বিজ্ঞাপন অনুযায়ী মনোরম বা মজবুত হলো না, সেক্ষেত্রে আজই হোক আর কালই হোক, কাজ-কারবার স্তিমিত ও শেষ অবধি অচল হতে বাধ্য। বর্তমানে বিশ্ব বাজারে যেরূপ তীব্র প্রতিযোগিতা তাতে শিল্পপতি সমাজ বা ব্যবসায়ী মহলের অধিকতর সজাগ ও সতর্ক থাকার প্রয়োজন রয়েছে প্রায় সকল দিক থেকেই।

ডাকযোগে কেনাকাটার প্রথাটি সর্ব্বপ্রথম কবে কোথায় প্রবর্ত্তিত হয়, সঠিক জানা যায়নি এখনও অবধি। তবে প্রথম দিকের বিশিষ্ট ক্রেতা ও গ্রাহক শ্রেণীর মধ্যে ইংল্যাণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া, রুশিয়ার তৎকালীন জার—এঁরা ছিলেন, এইটি জানতে পারা গেছে। এতেই বুঝা যায় যে প্রথাটি চালু হয়েছে অন্ততঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বর্ত্তমানে এইটি যে এতখানি সম্প্রসারিত হয়েছে, এর মূলে রয়েছে এক দিকে বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি, অন্য দিকে ব্যবসা বা শিল্পসংস্থাসমূহের ব্যাপক প্রচার কার্য্য—সংবাদপত্র বা অপর প্রচার ফোরাম গুলোতে বিজ্ঞাপন মারফৎ কিংবা এজেন্ট অরগানাইজার বা ক্যানভাসার (নারী ও পুরুষ) মারফৎ। কোন বিশেষ পণ্য বা শিল্প-সম্ভারের প্রতি ক্রেতা ও গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করতে হয় আজিকার দিনে এবং এর একটি প্রধান কারণই প্রতিযোগিতা ও অপর কারণ বাজারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণে। বিশিষ্ট ফার্ম্মগুলো দেশে-বিদেশে তাঁদের যে 'ক্যাটেলগ' পাঠিয়ে থাকেন, সেগুলোও প্রচুর অর্থব্যয়ে ও যত্ন নিয়ে (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সুদৃশ্য ছবি সহ) তৈরী হয়। মোটের উপর, বিভিন্ন জাতি যতই শিল্প-সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, এই বিশেষ ধরণের ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থাৎ ডাকযোগে কেনা-কাটা ব্যাপকতর হবে ততই—এ ধরে নেওয়া যেতে পারে।

## মজুরী ও দর-কষাকষি

খাওয়া-পরার জন্য কায়িক শ্রমের বিনিময়ে যারা অর্থোপার্জ্জন করেন, সহজ কথায় যাদের গায়ে খেটে খেতে হয়, চলতি অর্থে তাদেরই বলা হয় শ্রমিক। সহরে বন্দরে যেখানে শিল্পসংস্থা ও কল-কারখানা বেশি, সেখানেই কাজ চালাতে অধিক সংখ্যায় শ্রমিকেরও প্রয়োজন রয়েছে। আর যেখানে শ্রমিক থাকল, সেখানে শ্রমিক-মালিক প্রশ্ন থাকল, মজুরী নিয়ে দর-কষাকষিও থাকল।

আজকাল সর্ব দেশেই বলতে গেলে শ্রমিক-মালিক প্রশ্নটি একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকদের সুখ-সুবিধা ও মজুরী প্রশ্নের মীমাংসাই সকল শিল্পসংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে একটি প্রধান

আলোচ্য বিষয়। সমাজবাদী রাষ্ট্রে যেমনই হোক, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে এই প্রশ্ন (শ্রম-মজুরী) এখন অবধি অমীমাংসিত রয়েছে, এটি স্পষ্ট। এই কাঠামোতে প্রশ্নের সত্যিই পুরোপুরি মীমাংসা হবে কি না, এ সম্পর্কে এখনও অনেকেই, বিশেষ করে শ্রমিক-সমাজ সন্দিহান।

অবশ্য একথা ঠিক, শিল্পোদ্যোগ আরম্ভ হবার গোড়াকার বছরগুলোতে শিল্পসংস্থা সমূহ শিল্প-মালিকের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীনে চালু হতো, মজুরী নির্ধারণে বা অপর কোন সুখ-সুবিধার প্রশ্নে শ্রমিকদের সেখানে কোন বক্তব্য থাটত না। বেতনভুক শ্রমিকের ভূমিকা ছিল শুধু কাজ করা—বিনিময়ে দিন সপ্তাহ বা মাসান্তে যা-ই জুটুক, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। কিন্তু ক্রমে বঞ্চিত শ্রমিকদের মধ্যে চেতনা সঞ্চারিত হয়, বিচ্ছিন্ন না থেকে তারা তখন দলবদ্ধ হয়ে নিজেদের সুখ-দুঃখের প্রশ্নগুলো ভাবতে থাকেন। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এরই পরিণতিতে গড়ে উঠেছে শ্রমিক আন্দোলন বা ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা। শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্ম একক চেষ্টার পরিবর্ত্তে সম্মিলিত চেষ্টা বা দর কষাকষির সূত্রপাত হয় এমনি।

মজুরীর প্রশ্নে বা অন্ত কোন দাবী-দাওয়ার প্রশ্নে মালিকের সাথে শ্রমিকের বা শ্রমিকের সাথে মালিকের বোঝাপড়া হবে, দর কষাকষি হবে, চলিত সমাজ ব্যবস্থায় এ এড়িয়ে চলা কঠিন। এই মাত্র বলা গেল, পূর্ব্বে কোন শিল্পসংস্থা বা কারখানায় শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন ভাবে আবেদন বা দাবী পেশ করতে হতো। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সুরু হয় তাদের সম্মিলিত দর কষাকষি—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় 'কালেকৃটিভ বারগেনিং'। পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোতেও এই ধরণের ব্যবস্থায় বা আন্দোলনে একেবারে সুফল দেখা দেয়নি, তা নয়। মিলিত আন্দোলন আলোড়ন থাকায় জাতীয় সরকারগুলোকে শ্রমিক-মালিক প্রশ্ন সজাগ থাকতে হচ্ছে বিশেষ রকম—রকমারী শ্রমবিধি ও আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে এই কারণেই। মজুরী ও চাকরির অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি না হলেও শ্রমিকদের সামাজিক মূল্য ও মর্য্যাদা সাধারণ ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে—আলোচনার ক্ষেত্রে তাদেরও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এই সত্যটি উড়িয়ে দেওয়া এখন চলছে না।

আবার অপর দিক থেকেও প্রসঙ্গটির বিচার ও পর্য্যালোচনা চলতে পারে। শ্রমিক-মালিক দর-কষাকষি যেখানে হচ্ছে আগাগোড়া, সেখানে শ্রমিক ইউনিয়ন তথা শ্রমিক পক্ষ কোন বিশেষ কর্ম্মসংস্থানে কতটা পাবার ঠিক দাবী করতে পারেন, কিংবা বণিক সমিতি বা মালিক পক্ষ ইউনিয়নের উপস্থাপিত দাবী পূরণে সত্যি এগুতে পারেন কতদূর—স্পষ্টতঃ এর কোন সূত্র নির্দ্ধারণ চলে না। অযৌক্তিক বা অতিরিক্ত দাবী পেশ করলে শিল্প-মালিক যেমন তা মেনে নিতে নিতান্ত অরাজী হবেন, তেমনি আবার মালিক যদি সঙ্গত দাবী-দাওয়ার যৎসামান্য অংশ মিটিয়েই শ্রমিক অসন্তোষ অবসানের আশা বা দাবী রাখেন, তা হলেও ভুল করা হবে। এই থেকে সোজাসুজি যা দাঁড়ায়—দর কষাকষির বেলাতেও উভয় পক্ষকেই (মালিক ও শ্রমিক) খোলা মনে বাস্তব ভিত্তিতে মীমাংসা-আলোচনায় ব্রতী না হলে নয়।

সাধারণতঃ মালিক বা শিল্পপতি চাহেন—নিজের পরিচালনাধীন শিল্পসংস্থা বা কারখানা থেকে যতদূর সম্ভব বেশি মুনাফা অর্জ্জন করা। শ্রমিকের লক্ষ্য—শিল্পসংস্থা বা কারখানায় উপযুক্ত শ্রম দিয়ে উপযুক্ত অর্থাৎ মোটামুটি খেয়ে-পরে থাকার মতো মজুরী ও অপর সুখ-সুবিধা পাওয়া। নিম্নতম মুনাফার সম্ভাবনা না থাকলে যেমন শিল্পপতি অর্থ বিনিয়োগে পিছপা হতে পারেন, তেমনি নিম্নতম মজুরীর ব্যবস্থা না হলে শ্রমিকও কাজ করতে আগ্রহশীল হবেন না কিংবা অসন্তুষ্ট শ্রমিকের কাছ থেকে কাজ আদায় হবে না পুরোপুরি। দর কষাকষিতে মতৈক্য না হলেই দেখা দেয় একদিকে (শ্রমিক পক্ষ থেকে) ধর্ম্মঘট, অপরদিকে (মালিক পক্ষ থেকে) লক্-আউট।

শ্রমিক-মালিক বিরোধ তথা লক্-আউট বা ধর্ম্মঘট সুস্থ সমাজ-জীবনের পক্ষে আদৌ কাম্য হতে পারে না। শিল্পের অগ্রগতি জাতীয় সঙ্কটের বেটি হলো মূল ভিৎ, এইরূপ প্রতিকূল পরিবেশে তা ক্ষুন্ন হতে বাধ্য। সুতরাং উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য মীমাংসার কোন সুন্দর সূত্র যেমন করেই হোক খুঁজে পেতে হবে। ট্রাইবুন্যাল বা এডজুডিকেশনে না যেয়ে উভয় পক্ষের আপোষ-আলোচনা মারফৎ যদি বিরোধ মীমাংসা সম্ভবপর হয়, তা হলেই আরও শ্রেয়ঃ।

## রাসায়নিক শিল্প ও ভারত

এ যুগে রাসায়নিক শিল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আদৌ অস্বীকার করা যায় না। ভারতও এই ব্যাপারে খুব পিছিয়ে নয়, এইটুকু বলা যেতে পারে।

রাসায়নিক শিল্পের অগ্রগতির জন্ম বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এই দেশে এবং আবশ্যক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সংগ্রহের চেষ্টা চলেছে বাইরে থেকেও। এই শিল্প সম্প্রসারণ সম্পর্কে সম্প্রতি একটি সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এতে দাবী করা হয়েছে স্পষ্টই—দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কালের প্রথম তিনটি বছরে অন্ততঃ কতকগুলি রাসায়নিক শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তুলনায় অনেকটা। অবশিষ্ট যে দুটি বছর থাকলো এই পরিকল্পনাকালের—তাতে উৎপাদনের মাত্রা আরও বাড়বে, সরকারী বিবরণীতেই এই দাবীটি রাখা হয়েছে।

এক্ষণে কয়েকটি রাসায়নিক শিল্পের উৎপাদনের প্রাপ্ত হিসাব পর্য্যালোচনা করে দেখা যাক্। সালফিউরিক এসিড-এর উৎপাদন ১৯৫৬ সালে যেক্ষেত্রে ছিল ১, ৬৫, ২১৫ টন, ১৯৫৮ সালে উহা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২,২৭,০০০ টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল শেষ হতে হতে এই উৎপাদন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হবে—সংশ্লিষ্ট সরকারী মহলের ইহাই আশা।

সোডা—কষ্টিক সোডার উৎপাদনও ক্রমেই বেড়ে চলেছে, হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। বিগত বর্ষে (১৯৫৮) উহা উৎপাদিত হয়েছে মোট ৫৫,৪০০টন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করবার যে, এর দু'বছর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে উহার উৎপাদন পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার টনের মতো। ১৯৬১ সাল নাগাদ কষ্টিক সোডা অন্ততঃ ১,৪০,০০০ টন উৎপাদিত হবে, এমনি আশা করা হচ্ছে। উক্ত সময় মধ্যে সোডা য্যাশের দিক থেকেও ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জন করতে পারবে, সরকারী মহলের ইহাও দাবী। গত বছর যেখানে ৮৬, ২০০ টন সোডা উৎপাদিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে আশা

করা হচ্ছে—১৯৬১ সালেই উহার উৎপাদন পরিমাণ দাঁড়াবে আড়াই লক্ষ টন।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—ভারতে প্রথম সোডার হাইড্রো সালফাইটের উৎপান সুরু করবার পরিকল্পনা রয়েছে চলিত বছরেই। এক্ষণে ভারত বিদেশ থেকে যে হাইড্রো সালফাইট আমদানী করে থাকে, তার মূল্য প্রায় ১ কোটি টাকা। পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশীয় কারখানায় দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষাশেষি অর্থাৎ ১৯৬১ সালের মধ্যেই তিন হাজার টন হাইড্রো সালফাইট উৎপাদনের চেষ্টা হবে।

সার উৎপাদন—দেশের অভ্যন্তরে ক'বছর ধরেই সার উৎপাদনের যে উদ্যম চলেছে, তার গুরুত্ব স্বীকার্য্য। সরকারী হিসাব মেনে নিলে ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সাল—এই দুটি বছরে সুপার ফসফেটের উৎপাদন বর্দ্ধিত হয়েছে দ্বিগুণ। ১৯৫৬ সালে যেক্ষেত্রে সুপার ফসফেট উৎপাদিত হয়েছিল ৮১,১৭০ টন, সেই স্থলে ১৯৫৮ সালে উহার উৎপাদনের পরিমাণ ১,৮১,০০০ টনে এসে দাঁড়িয়েছে। গত দুই বছর মধ্যে নাইট্রোজেন উৎপাদিত হয়েছে ৮০ হাজার টন (প্রায় ৪ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট) সেক্ষেত্রে ১৯৬১ সালে ৪ লক্ষ টন নাইট্রোজেন (প্রায় ২০ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট) উৎপাদনের লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত বর্ষে অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে ক্যালসিয়াম কারবাইড উৎপাদিত হয়েছে প্রায় ৪ হাজার টন। সংশ্লিষ্ট সরকারী মহল দাবী রাখছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের শেষাশেষি এই উৎপাদন প্রায় পাঁচ গুণ বর্দ্ধিত করা সম্ভব হবে।

রাসায়নিক শিল্পের বর্ত্তমানে যে অগ্রগতি হয়েছে, দেশের চাহিদা মিটাবার পক্ষে এখনও উহা যথেষ্ট নয়। সর্ব্বদিক থেকে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জ্জনের জন্য বেসরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সরকারী উদ্যমের আরও নিবিড় যোগাযোগের প্রয়োজন রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট দ্রব্য ও সরঞ্জামাদির আমদানীর পথ যাহাতে আশানুরূপ সুগম হয়, সেই দিকেও অধিকতর মনোযোগ নিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য।

## দু'টি কবিতা

অর্দ্ধেন্দু বিশ্বাস

[ এক ]

যমুনার নীল সমুদ্র
তোমার মুখ মুক্তো হয়ে ভাসে।
তারই জন্য
মন ভরে যায় গভীর আশ্বাসে।

নৌকা আমার নীল সমুদ্রে
ঢেউয়ে টলোমলো
হঠাৎ যদি ডুবেই যায়
বল তো তুমি বলো
ফিরবো কেমন করে?
তোমার মুখ মুক্তো হয়ে
সমুদ্র দেয় ভরে।

[ দুই ]

রজনীগন্ধার ঘ্রাণে যায় যদি
চলে যাক দিন,
আকাশের নিরুদ্দেশে হয় যদি
একান্ত বিলীন
হোক, তাই হোক।
আমার সমস্ত দিন
বর্ষার সন্ধ্যায় ভরা
তোমার দু'চোখ।

পক্ষধর মিশ্র
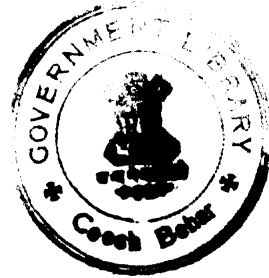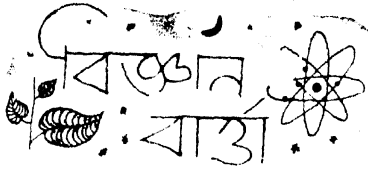
আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সারা বাংলা দেশে উৎসবের যে বিপুল আয়োজন হয়েছিলো তা সমাপ্ত-প্রায়। পাঠকেরা নানা পত্র-পত্রিকা মারফৎ এই খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, আমি আজকে তাঁর বিশেষ একটি বিষয়ের উপর গবেষণা প্রসঙ্গে সামান্ত দু'-এক কথার অবতারণা করছি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আলোকচিত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার কথা অনেকেরই জানা নেই। তিনি তাঁর আণবিক বিকৃতির মতবাদের দ্বারা ফটোগুলিকে প্লেটের উপর আলোকচিত্র গ্রহণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। আণবিক বিকৃতির মতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন যে, পদার্থের আণবিক-সজ্জার উপর ইথার তরঙ্গ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বিদ্যুৎ তরঙ্গের প্রভাবে, পদার্থের ত্বকের মধ্যে তার আণবিক সজ্জা যে নতুন রূপ পরিগ্রহণ করে, তাকে বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় পদার্থের আণবিক বিকার বলা যেতে পারে। এই আণবিক বিকার স্বয়ং প্রত্যাবর্তনশীল। অর্থাৎ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-পতনের ফলে, পদার্থের উপরিভাগের আণবিক সজ্জার পরিবর্তন, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের পতন থেমে যাওয়ার পর পদার্থের স্থিতিস্থাপক গুণাবলীর জন্ম প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসবার জন্ম নিজের থেকেই চেষ্টা করে।

যাই হোক, আলোকচিত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি? ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দিয়ে বস্তু-বিশেষের আলোছায়ার প্রতিচ্ছবি, ক্যামেরার পেছনে অবস্থিত রাসায়নিক প্রলেপ সমন্বিত ফিল্মের উপর পড়ে। ফিল্মের উপরিভাগের রাসায়নিক প্রলেপটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, আলোকস্পর্শের তীব্রতা অনুযায়ী রাসায়নিক পদার্থটির কম-বেশী আণবিক পরিবর্তন ঘটে এবং এই ভাবে আলোছায়ার প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি হয়। এইবার আর একটি রসায়ন দ্রব্যের সলিউসনে ফিল্মটি ডুবিয়ে নিলে আলোকময় ছবিটি পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

ঘটনাটা তাহলে কি ঘটে? ফিল্মের উপর হেলোজেন ঘটিত রূপার যে পদার্থ থাকে তা আলোর স্পর্শে ভাঙতে সুরু করে ফিল্মের নানা অঞ্চলে ধাতব রূপার সমাবেশ ঘটায়। স্থানবিশেষে আলোর তীব্রতা অনুযায়ী ঐ যৌগিক পদার্থের ভাঙনও কম-বেশী হবে, নানা স্থানে ধাতব রূপাও নানা পরিমাণে জমা হবে। ফিল্মটিকে তারপর সোডিয়াম থায়োসালফেট দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেললেই তাতে রূপার অপরিবর্তিত যৌগিক পদার্থটি অপসারিত হয়ে ফিল্মের উপর কমবেশী ধাতব রূপার সমাবেশের মধ্যে দিয়ে গৃহীত আলোকচিত্রের একটি কালো প্রতিচ্ছবি রচনা করবে।

জগদীশচন্দ্র তাঁর আণবিক বিকৃতির মতবাদের মাধ্যমে আলোক-চিত্র গ্রহণের কার্য্যকারণ বিশ্লেষণ করে বললেন, ফিল্মের উপরকার স্পর্শকাতর রাসায়নিক পদার্থটি আলোর স্পর্শে বিকৃত হয়, এবং পতিত আলোছায়ার পরিমাণের উপরই এই রাসায়নিক পদার্থের আণবিক বিকৃতির পরিমাণ নির্ভরশীল। আগেই বলা হয়েছে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের স্পর্শে পদার্থের আণবিক সজ্জায় পরিবর্তন চিরস্থায়ী নয়, বাহিরের উত্তেজনার দ্বারা সৃষ্ট এই পরিবর্তিত আণবিক বিন্যাস সর্বদাই তার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির সাহায্যে প্রাথমিক স্থায়ী পর্য্যায়ে ফিরে আসতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ এই মত অনুযায়ী বলা যেতে পারে, ছবি তোলার পর ফিল্মকে যদি ফেলে রেখে দেওয়া হয়, তাহলে উপযুক্ত সময় অতিবাহিত হবার পর ফিল্মের উপরিভাগের রাসায়নিক পদার্থটির আণবিক বিকৃতির মোচন ঘটবে। অর্থাৎ সে আবার তার প্রাথমিক স্বাভাবিক আণবিক বিন্যাস ফিরে পাবে। ফটোগ্রাফের ফিল্মের তীব্র অনুভূতি-সম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থটির অবস্থা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝান যেতে পারে। একটা বাঁশের কঞ্চি নিয়ে তাতে মোচড় দেওয়া হলো, এইবার যদি চাপ কমিয়ে নেওয়া হয় তাহলে বাঁশের কঞ্চিটি সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে আসবে। মোচড় যদি খুব জোরে হয় তাহলে চাপ কমিয়ে নেবার পরও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির জন্ম ঐ কঞ্চির কিছু বেশী সময় লাগবে। এবং কঞ্চিটিকে যদি একেবারে মুচড়ে বেঁধে দেওয়া হয়, তাহলে বাইরের শক্তির প্রভাবে মোচড়ান কঞ্চিটি আর পূর্ব্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারবে না।

ফিল্মের সঙ্গে এই মোচড়ান কঞ্চির তুলনা করা চলে। কম-বেশী আলোকস্পর্শ জনিত, কম-বেশী আণবিক বিকৃতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়। কিন্তু ছবি তোলার পর ফিল্মটিকে পরিস্ফুটের সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্বারা ধোয়া হলে, ফিল্মটি মুচড়ে বাঁধা কঞ্চিটির অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ বাইরের শক্তির প্রভাবে ঐ রাসায়নিক পদার্থটির বিকৃতির পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির সম্ভাবনা রোধ হয়ে যায়।

যাই হোক, এই মতবাদ অনুসারে ফিল্মের উপরিভাগের রাসায়নিক পদার্থের আলোকস্পর্শ জনিত আণবিক পরিবর্তনের স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্তিতে যথেষ্ট সময় লাগবে। ঘটনাচক্রে জনৈক আলোকচিত্র-শিল্পীর অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের ফটোগ্রাফের এই মতবাদকে বাস্তব জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছিল। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র রয়েল ফটোগ্রাফিক সোসাইটিতে তাঁর এই মতবাদ বিশ্লেষণ করার পর একজন শ্রোতা জানালেন যে, ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় তিনি অনেক ছবি তুলেছিলেন। ঐ ছবিগুলির মধ্যে কিছু ছবি প্রস্ফুটিত করতে প্রায় বছর দুই দেরী হয়ে গিয়েছিলো। ফলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে ঐ ফিল্মের উপর কোন প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়নি। ভারতবর্ষের আবহাওয়া অথবা অন্য কোন কারণের জন্ম ফিল্মগুলি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, এই ভেবে ঐ আলোকচিত্র-শিল্পী ফিল্মগুলি ফেলে রেখে দিয়েছিলেন।

এই নতুন মতবাদ অনুসারে এইবার উপলব্ধি করা গেল যে, ফিল্মগুলি খারাপ হয়ে যায় নি, কেবল যথেষ্ট সময় পাওয়ায়, ফিল্মের উপরকার রাসায়নিক পদার্থের আণবিক বিকৃতি স্বাভাবিক পর্য্যায়ে ফিরে আসার জন্ম কোন প্রতিচ্ছবির সন্ধান পাওয়া যায় নি। যাই হোক, এর কিছুকাল পরে এই আলোকচিত্র-শিল্পীর হঠাৎ ছবি তোলার দরকার হয়, তখন তাঁর হাতের কাছে কোন নতুন ফিল্ম না থাকার জন্ম তিনি ভারতে একবার ব্যবহৃত এই ফিল্ম আবার ব্যবহার করেন। এবার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুটিত করার পরে চমৎকার ছবি পাওয়া গেল। বহুদিন পূর্ব্বে একবার ব্যবহৃত এই ফিল্মের আণবিক সজ্জা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির জন্ম আবার ঠিক নতুন ফিল্মের মতো ব্যবহার করলো। ঐ ইংরাজ আলোকচিত্র-শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতা সর্বসাধারণের গোচরে আনলেন এবং এর মধ্যে

দিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আণবিক বিকৃতির মতবাদ বিশেষ ভাবে সমর্থিত হলো।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বিনা আলোয় আলোকচিত্র গ্রহণ প্রসঙ্গেও কিছু গবেষণা করেছিলেন। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমূহ তেজ বিকিরণ করে শিল্মের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে কিন্তু যে সব পদার্থ তেজস্ক্রিয় নয়, তাদের বিষয়েই জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণা সুরু করলেন। জগদীশচন্দ্র দেখলেন, বড় বড় গাছের বিভিন্ন ঋতুতে অসমান বৃদ্ধির জন্য, তাদের কাণ্ডের ক'টা অংশে যে গোলাকার এক কেন্দ্রিক দাগ দেখা যায়, বৈদ্যুতিক রশ্মির উত্তেজনায় তারা তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে। ফিল্মের দ্বারা এই উত্তেজনাপ্রসূত তেজস্ক্রিয় রশ্মির সাহায্যে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র গাছের নানা অংশ এবং নানা প্রকার পাথর প্রভৃতির ছবি গ্রহণ করেছিলেন। একটি বন্ধ বাক্সের মধ্যে যার ছবি তোলা হবে সেই বস্তুটি এবং একটি আলোকচিত্র গ্রহণের প্লেট এমন ভাবে রাখা হলো, যাতে উভয়ের মধ্যে কোন সংযোগ না থাকে। বাক্সের বাইরে দু'পাশে দু'টো ধাতুর পাত লাগিয়ে, বাক্সের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত করা হলো। বিদ্যুৎ-তরঙ্গের স্রোত বাক্সের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ঐ পাথর বা গাছের অংশটিকে উত্তেজিত করে তুলবে, এর ফলে যে তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠে, তার একটি প্রতিচ্ছবি ঐ ফিল্মের উপর এঁকে দেবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাপ-তরঙ্গের সহায়তায় চিত্র গ্রহণ সম্ভব কি না, সে বিষয়েও গবেষণা করেছিলেন। একটি মোটা কাগজে রূপা এবং পারার আয়োডিন ঘটিত যৌগিক পদার্থ ভালভাবে মাখিয়ে নিয়ে তাকে গরম করা হোল। এর ফলে ঐ কাগজের উপরে ঠিক সমান লালচে রঙ উঠলো ফুটে। এখন একটি আবরণের উপর কয়েকটি অক্ষর ছিদ্র করে লিখে নিয়ে ঐ গরম লালচে মোটা কাগজটির উপর যদি চাপা দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, আবৃত অঞ্চলের চেয়ে, লালচে কাগজের যে অংশ ঐ আবরণের অক্ষরের ন্যায় ছিদ্র করা অঞ্চলের পশ্চাতে আছে, তা অনেক তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে পড়বে। কাগজটি সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হবার পর দেখা যাবে, তাপের কমবেশী প্রভাবের ফলে লাল কাগজটির উপর অক্ষরগুলির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। আর একজন বিজ্ঞানী মেজর জেনারল ওয়াটারহাউসও তাপ-তরঙ্গের সহায়তায় চিত্র গ্রহণের বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষায় ব্যবহার করা হয়েছিলো রূপা-মাখান কাচের পাত এবং কেটে অক্ষর লেখা অভ্রের আবরণ। এই পরীক্ষায় প্রস্ফুটক হিসাবে ব্যবহার করা হয় পারা এবং কাচের উপর কালো লাইনে অক্ষরগুলির প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

---

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

স্বলেখা দাশগুপ্তা

গাড়ীতে উঠে বসে গাড়ীর নরম গদীর ছোঁয়া পেয়ে দুশ্চিন্তায় উৎকণ্ঠায় আর রাত জাগায় শ্রান্ত শরীর মন নীলের প্রথম যা চেয়েছিল তা হলো, হাত পা ছেড়ে একেবারে গা ঢেলে চোখ বুঁজে বসে থাকতে। কিন্তু মঞ্জুর সঙ্গে পরিচয়টা তার এতই নতুন যে, মঞ্জুর উপস্থিতিতে তেমন ঢিলে অলস বলা কিছুতেই চলে না—আর চোখ বন্ধ করা তো নয়ই। তাই এতক্ষণ তাকে হাত-পা গুছিয়ে গাছিয়ে নিতান্ত ভদ্রলোকের মতোই বসে থাকতে হয়েছে। এবার মঞ্জুকে নামিয়ে দিয়ে পা দুটোকে টান আর শরীরটাকে কোণাকুণি করে দিয়ে গদীর উপর দেহভার রাখল নীল। পার্ক সার্কাস থেকে ডায়মণ্ডহারবার রোড—অনেকটা সময় এই আরাম আর নৈঃশব্দ চোখ বুজে ভোগ করতে পারবে সে। তারপর রইল আপন বক্তব্য বলার অক্ষম চেষ্টায়—ভদ্রলোকের ভাষা খোঁজা দেখা। রইল চিন্তার ভঙ্গিতে চুলের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে তার সময় নষ্ট সহ্য করা। রইল পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি শুনতে শুনতে শান্ত ধৈর্য্যে কলম তুলে নেওয়া।

কিন্তু গাড়ীটা বাঁক নিয়ে বেরিয়ে যাবার এবং তার চোখ বুজবার আগে দৃষ্টিটা নীলের একবার স্বাভাবিক ভাবেই মঞ্জুর ওপর গিয়ে পড়েছিল। তার মনে হলো, মঞ্জু যেন হাত তুলে গাড়ীটাকে থামার ইঙ্গিত করতে গিয়েও কি ভেবে আবার হাতটা নামিয়ে নিল। ড্রাইভারকে গাড়ীটা ব্যাক করতে বলে ফের উঠে ভব্য হয়ে বসল নীল।

কিন্তু তার হাত তোলা যে নীলের চোখে পড়েছে মঞ্জু তা বোঝেনি। গাড়ীটার পিছু হটাও সে খেয়াল করেনি। হঠাৎ মোড় ঘুরে গাড়ীটা এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে পড়তে সে আশ্চর্য্য হয়ে তাকাল নীলের দিকে। জিজ্ঞাসা করল—কি?

—আপনি কিছু বলবেন আমাকে? জানালা দিয়ে মুখ বের করে জিজ্ঞাসা করল নীল।

—কি বলবো? কেন? না তো!

—গাড়ীটাকে থামতে বলতে যাচ্ছিলেন না আপনি?

—ওঃ এতক্ষণে মঞ্জু ধরতে পারলো নীল তার হাত তোলা দেখেছে আর তা দেখেই গাড়ী ফিরিয়েছে। বললো, তা অবশ্যি যাচ্ছিলাম, কিন্তু না—আপনার জন্য ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। আপনার দেরী করিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

—কি মুসকিল, কথাটা কি, তাই বলুন না। এটা আমার চাকরি নয়, অফিসের হাজিরাও আমি দিচ্ছিনে। দেরী হতে পারে। ইচ্ছে না করলে না যেতে পারি—দরজা খুলে নেমে আসতে যাচ্ছিল নীল।

তাকে নামতে বাধা দিয়ে মঞ্জু বললো—আপনি নামবেন না। আমি যেখানে যাবো সেখানে আসিনে। একেবারে যাচ্ছেতাই—নিজের উপর বিরক্তি প্রকাশ করল মঞ্জু, যাবো বন্ধুর বাড়ী, পথ দেখিয়ে নিয়ে এসে নেমেছি নিজেদের বাড়ীর।

—এই? যাক্ তবু ভালো যে একেবারে অপরের বাড়ীর দরজায় নয়। তা আপনি ফের বন্ধুর বাড়ীই যাবেন তো?

—হাঁ, তাই যাবো। কিন্তু আমি ট্রামে যাবো?

—কেন, ট্রামে যাবেন কেন?

—খামকা আপনার সময় নষ্ট করার দরকার কি। আপনি চলে যান। আমি ট্রামে যাচ্ছি। গাড়ীতে আমি চলাফেরা করিনে—ওটা আমার অভ্যাসও নেই।

—আর আমার আবার এটা এমন অভ্যেস যে, গাড়ী ছাড়া ট্রামে বাসে নিজে তো চাপতে পারিইনে—অপরকে চাপতে দেখলেও ভয়ানক খারাপ বোধ হয়। গাড়ীর দরজা খুলে ধরল সে—আসুন।

এবার মঞ্জু উঠে এলো। এতো দ্বিধা-টিধার ধার মঞ্জু ধারেও না। ভুলে এসেছে, গাড়ীটা থামাতো, দরজা খুলে উঠে বসত। আর কিছু নয়, সে শুধু ভাবছিল তার জন্য যদি নীলের কোন সংকোচের কারণ ঘটে, সেটা বড় লজ্জার হবে।

মঞ্জু গাড়ীতে উঠে বসলে নীল ড্রাইভারকে কোথায় যেতে হবে বলবার জন্য জিজ্ঞাসা করল মঞ্জুকে, আপনার বন্ধুর বাড়ী বৌবাজার? সেখানে গাড়ী যেতে বলব কি? কারণ আপনি গাড়ীতে উঠে প্রথম ওখানকার নামই করেছিলেন।

—হাঁ বৌবাজার, সারপেণ্টাইন লেন। তারপর এবার আর মঞ্জু পথ বলে বলে নিয়ে যাবার অপেক্ষা রাখল না। কোথায়, কোন গলিতে যেতে হবে সেটা প্রথমেই বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিল ড্রাইভারকে।

গাড়ী পার্কসার্কাস পার হয়ে সার্কুলার রোডে পড়ে বৌবাজারের সারপেণ্টাইন লেনের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল। নীলের তিন দিন তিন রাতের খাড়া মেরুদণ্ডটা তার নিজের গরজে এমনভাবে গিয়ে গদীর ওপর আশ্রয় নিল যে, নীল যেন মেরুদণ্ডের হাড়টার প্রতি মমতা করেই আর তাকে খাড়া করে বসল না। একটু হেলে বসেই মঞ্জুর দিকে তাকালো সে। ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে আস্তে আস্তে বললো—আমি বুঝতে পারছি আপনার গাড়ীতে ওঠার অস্বাচ্ছন্দ বোধটা কোথায়। অপরের গাড়ী—আপনার জন্য এখান-ওখান করে—আমার না কোন সংকোচের কারণ ঘটে। প্রথমতঃ এখানে সে প্রশ্নই আসছে না। যেখানে আসে এঁদের কাছে আমি সেখানেও তা বড় বোধ করিনে।

—কারণ?

—কারণ, আমাদের কাছে এই ছুটো বোধ বড় কাজ করে না—যেমন কাজ করে না বাড়ীর মেয়েদের চাকর বাকর ঝিয়েদের কাছে লজ্জা সংকোচ বোধের অনুভূতিটা। আর তারই জবাবে আমিও আমার এই দুই অনুভবের দরজা এঁদের ব্যাপারে সেঁটে রাখি।

নিজের মনের কোন আবছা অস্পষ্ট ভাবের পরিচ্ছন্ন প্রকাশ

যদি অপরের মুখে শুনতে পাওয়া যায়, তবে মানুষের মুখে যে ঔজ্জ্বল্য দেখা দেয়, মঞ্জুর মুখে সেই উজ্জ্বলতা দেখা দিল। কিন্তু কাল থেকে মনটা ওর কথা বলার দিকে পেছন ফিরে ছিল বলে উৎসাহের প্রাবল্যে সে অনেক কথা বলে ফেলল না। শুধু একটা চাউনি মঞ্জুর গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এলো নীলের তিন চার দিনের তেলহীন রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল থেকে তার ক্লান্ত বিষণ্ণ মুখে, মুখ থেকে তার আধময়লা পাঞ্জাবীর উপর, পাঞ্জাবীর উপর থেকে কালো চোখ তার নীলের ধুতির কালো পাড়ের প্রান্তর বেয়ে নীলের দুপায়ের দুরকম চটির উপর থেমে ফের ঘুরে গিয়ে স্থির হলো তার মুখের উপর। আর এই চোখের মায়া এবং ওঠার ভেতর নীলের চুলে হাত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার অনুভূতিটা যে মঞ্জুকে একটু ঝাঁকি দিয়ে না গেল তা নয়। কিন্তু জাহাজ নিয়ে দোলাখাওয়া সমুদ্রের বুকে তলিয়ে যাওয়া ডিঙ্গির মতো এ সব অনুভূতিও ওর বুকে তলিয়ে যায় দু-চার দোলায় দুলেই।

—কি ?

—কিছু না।

—আমার পোষাক দেখছেন তো ? দু জোড়া চটির দুপায়ের দুটো ছিঁড়ে গিয়ে আস্ত দুটোর এমন আশ্চর্য জোড়া মিলে গেল যে, বর্তমানের দুর্ভাবনাটা এড়াতে পেরে বেঁচে গেলাম।

—আপনার তাই মনে হয়—আমি আপনার পোষাক দেখছি ?

তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে নীল বললে—হাঁ ? মানুষকে বোঝার ব্যাপারে পোষাকের সাহায্য নিতেই হয়। ওটা বাদ দিয়ে মনুষ্য-চরিত্র অনুশীলন চলে না। পোষাক একটা বড় সাংঘাতিক জিনিষ। সে অবস্থা বলে, রুচি বলে, স্বভাব বলে, চরিত্র বলে,—এক কথায় মানুষের গোটা পরিচয়টা বলে।

—তাই ? আমার পোষাক আমার কথা কিছু বলে ?

—বলে না ? এত বেশী বলে যে তত আবার সবায় বলে না।

—সত্যি ! আচ্ছা, যদি আপনি গিয়ে কখন সেই গাছতলায় প্রুফ দেখতে বসেন, এবং পথ চলতে গিয়ে আমার সে দিকে চোখে পড়ে যায়—আমি গিয়ে বসি, সেদিন শুনব সে কি বলে এবং ঠিক বলে কি না।

—সে ঠিকই বলে, আমি ঠিক বুঝি কি না সেটাই হলো কথা।

সময়টা সকাল। কলকাতা শহর তখনও ডাল-ভাত নাকে-মুখে গুঁজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েনি। পথে নিঃশ্বাসের চাপ কম। রোদটা নরম। এক কানের পাশ ঘেঁসে চলতে চলতে কানটা গালটা তাতিয়ে তুলছে। মাথার ওপর চড়ে বসা দু' কানের নাগাল এখনও সে পায়নি। তারই এক টুকরো নরম রোদ এসে মঞ্জুর কোলের ওপর ছোট্ট গোলাকৃতি হয়ে পড়ে আছে কোলে রাখা জিনিসের মতো।

গাড়ী জোড়া গির্জা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল। লাল স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরে একদল কনভেন্ট গার্ল লাইন দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় ফুটপাত অতিক্রম করে গেল পিঠে পিকনিক ব্যাগ ঝুলিয়ে। রেডক্রশের যে লম্বাটে ধরণের গাড়ীটা ওদের সঙ্গে চলতে চলতে ওদের ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল, সেটার সঙ্গে ফের দেখা হলো ক্যাম্বেল হাসপাতালের কাছে। দরজাটা খোলা। ভেতরে ষ্ট্রেচারে রোগী। এখনও লোক এসে পৌঁছয়নি নিয়ে যাবার। ষ্টেথোসকোপ গলায় ঝুলিয়ে কয়েকজন ডাক্তার ছাত্র-ছাত্রী কথা বলতে বলতে টপটপ করে আউটডোরের সিঁড়ি ভেঙে ঢুকে গেল ভেতরে। ছোট পিসির সংবাদ মতো সুদর্শন এখন তিস্তার সৌন্দর্য দেখছে হাজার ফিট ওপরে বসে। কে জানে সে রমণীয়তা কেমন। মঞ্জু দেখেনি। মমতা মেডিকেল কলেজের চওড়া বারান্দা দিয়ে হাইহিলের ঠক ঠক শব্দ তুলে হাতে ডেটল-ভিজানো থার্মোমিটার নিয়ে ঘরে ঘরে রোগীদের তাপ পরীক্ষা করছে—না তো, মনে পড়ে গেল মঞ্জুর—আজ নিশ্চয়ই সে ডিউটিতে যায় নি। সে আছে ছটুর মার কাছে। হয় তো ছটুর মাকে একটু চা খাওয়াবার চেষ্টা করছে নয় তো সয়বৎ।··· প্রাচীর কাছে এসে ছক কাটা ঘরে আঁকা নায়ক-নায়িকার বিরাট মুখ দু'টোর দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পথ বলে দেবার জন্য ঝুঁকে বসল মঞ্জু ড্রাইভারের দিকে। আর তার নির্দ্দেশ মতো ড্রাইভার তার গাড়ীর শরীর বাঁচাতে বাঁচাতে সারপেণ্টাইনের সার্থকনামা গলির ভেতর, তরকারী বোঝাই লরী আর ঠেলাগুলোই এ-পাশ ও-পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল সাবধানে। এমন পচা গলিতে যে সে তার গাড়ী ঢোকায় নি সেই অবজ্ঞা ভাব ক্রমশই ফুটে উঠতে লাগল ড্রাইভারের মুখে। তাচ্ছল্যের সঙ্গে ডান হাতটা দরজার উপর ফেলে রেখে বাঁ হাতে ষ্টিয়ারিং ঘুরাতে লাগল সে। তারপর ডাষ্টবিন উপচে পড়া স্তূপীকৃত পচা আবর্জনা আর আলুর বাজারের আলু-পচা গন্ধে ঠাসা একটা গলির ব্যারাক-বাড়ীর দরজায় মঞ্জুর কথামতো গাড়ী থামিয়ে হাই তুলল।

গাড়ী থামিয়ে ড্রাইভারেরই নেমে গিয়ে দরজা খুলে দেবার রেওয়াজ

বলে সেই অপেক্ষাই করছিল নীল, কিন্তু সে যে তা না করে ষ্টিয়ারিংএ হাত রেখে একটা অলস হাই তুলে বসে রইল—তার মুখের অবজ্ঞা ভাবটা জ্যামিতিক অসুবিধার দরুণ নীল দেখতে না পেলেও এটা সে লক্ষ্য করল। ড্রাইভারের নজরে যদি নীলের এই লক্ষ্য করাটা পড়ত তবে সেই দৃষ্টিটাই তাকে মুহূর্তে এনে দাঁড় করিয়ে দিত দরজার কাছে, কিন্তু সেও জ্যামিতিক কারণেই নীলের দেখাটা দেখতে পেল না। দুটো হাত ওপর দিকে তুলে ফের হাই তুলল সে।

দরজার হাতলটা ধরে উপরে নীচে চাপ দিচ্ছিল মঞ্জু কিন্তু ঠিক কায়দা মতো চাপ না পড়ায় দরজা খুলছিল না।

চট করে নেমে ঘুরে গিয়ে দরজা খুলে ধরে নীল বললো, একবার দেখে নিন বাড়ী ঠিক আছে কি না।

তা আছে। নেত্রে নমস্কার জানিয়ে মঞ্জু বললো, আচ্ছা।

—আচ্ছা। প্রতি-নমস্কার জানালো নীল।

শাড়ীর কোঁচাটা একটু তুলে ধরে গলির ছিটানো নোংরা বাঁচিয়ে অমাদের বাড়ীর দিকে হাঁটা দিল মঞ্জু।

—সরি স্যার!

কানের পাশ থেকে আচমকা দুঃখ প্রকাশ শুনে সে দিকে মুখ ফেরালো নীল। দেখল বিষম অপ্রস্তুত মুখ করে তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভার। কিছুই বলল না সে তাকে। দরজা তার হাতে ধরা খোলাই ছিল, গাড়ীতে ওঠে বসল সে।

গাড়ী চালাতে চালাতে ফের অনুতপ্ত গলায় দুঃখ প্রকাশ করল ড্রাইভার—ভেরি সরি স্যার! রমেশ আই, এ ফেল। সে নিয়মিত কাগজ পড়ে! গাড়ী চালাতে চালাতে নীলের সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করে মন্তব্য প্রকাশ করে। সমীহ করে সে নীলকে। বললো আমার দরজা খুলে না দেওয়াটা অন্যায় হয়ে গেছে স্যার!

নীল একটা সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইএর কাঠিটা ঝেঁকে নিবিয়ে বাইরে ফেলতে ফেলতে বললো—অন্যায়টা আর কোথায় নয় রমেশ, সর্বত্র তুমি যা করো এখানে যে তুমি তা করলে না এই না করার পেছনে যে মনোভাবটা তোমার কাজ করেছে, অন্যায়টা শুধু মাত্র সেখানে। ঘাড় হেঁট করল রমেশ।

জয়ার সেই দশ বছরের ভাই জয় আজও বসেছিল রকে। তার গভীর উদ্‌বিগ্ন দৃষ্টি পড়ে ছিল গলির প্রবেশপথের উপর। প্রতীক্ষা করছিল সে তার দিদির। যে রাত্রে তার দিদি বাড়ী না ফেরে সে রাত বিনিদ্র কাটিয়ে ভোর না হতে এসে সে এমনি বিমর্ষ মুখে বসে থাকে রকের উপর। আজও তাই বসেছিল। বসে বসে ভাবছিল সে কত-কিছু—অনেক কিছু। সেই ভাবনার ভেতর সব চাইতে বড় হয়ে যা ছিল তা হলো কেবল একটা পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা। যেখানে গাড়ী আসবে না। দিদিকে নিয়ে যাবে না। মা আর ঐ শয়তান লোকটা দিদিকে ধরে ঘুমের ওষুধ খাওয়াবে না। একে কি ঘুম বলে! একটা কান্না যেন ঠেলে উঠে আসতে চায় জয়ের দিদির ঘুম দেখলে। সে কত সময় হাত নাকের কাছে নিয়ে দেখে নিঃশ্বাস বইছে কি না। তারপর দিদির সেই জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ঘুরানো ফেরানো একই আবৃত্তি—

'ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বসে বৃথা ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল শেষ-রচনা'—

যা ওর শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন দিদির মুখের এই আওড়ে চলা একঘেয়ে আবৃত্তি, একঘেয়ে কান্নার মতো ক্লান্তিকর লাগে তার, যদি দিদিকে নিয়ে সে কোথাও উধাও হয়ে যেতে পারতো—

মার হাতের মার খাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় যেমন তার হাতের নাগালের বাইরে ছুটে পালানো, অদৃষ্টের হাতের মার খাওয়া থেকে আত্মরক্ষারও এই একই উপায় মনে আসে তার। অদৃষ্টের হাতের নাগালের বাইরে পালানো যে এক বস্তু নয়—মা তাড়া করেন দরজা পর্যন্ত, অদৃষ্ট তাড়া করে পৃথিবীর শেষ মাটিটুকু পর্যন্ত—এখনও জয়ের তা জানা হয় নি। সে জানে না পালিয়ে তার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় না—পালালে সে সঙ্গে সঙ্গে যায়। তার টুঁটি চেপে ধরতে হয় যেখানে দাঁড়িয়ে সে আক্রমণ করে সেইখানে দাঁড়িয়ে।

মঞ্জুদের গাড়ীটা দেখে শুকনো মুখে উঠে দাঁড়িয়েছিল জয়। মনে করেছিল দিদি এসেছে। কিন্তু যে মঞ্জুকে দেখে তার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠার কথা, যে মঞ্জুর কথা এ ক'দিনে সে যে কত বার ভেবেছে যার সীমাসংখ্যা নেই—সেই মঞ্জুকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল তার মুখ। আতঙ্কিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল সে মঞ্জুর নামার দিকে।

কারণ আছে। এই গাড়ী থেকে নামা ব্যাপারটাই আস্থা হারিয়েছে তার। এটা আর তার দৃষ্টিতে সহজ নেই, স্বাভাবিক নেই, সুন্দর নেই। তার দিদি যে দিন থেকে এই গাড়ীতে উঠতে আর গাড়ী থেকে নামতে শুরু করেছে সেদিন থেকেই তার চেহারা বদলে গেছে, পোষাক বদলে গেছে, হাবভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। সংকেত মিলছে মাথার গোলমালের। যে দিদিকে ছাড়া ওর মুহূর্ত কাটতে চাইত না তাকে দেখলে এখন ও ভয় করে। তাই আজ মঞ্জুকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে তার চোখে আর সে দিনের মতো আলো দেখা দিল না—কোন স্বাগত আহ্বানের সাড়াও মিলল না। পথের ময়লা বাঁচিয়ে পা ফেলতে গিয়ে দৃষ্টিটা এতক্ষণ মঞ্জুর নিবদ্ধ ছিল রাস্তার দিকে। সে দাঁড়িয়ে থাকা জয়কে দেখতে পেলো রকের কাছে এসে। এক পা সিঁড়িতে রেখেই জিজ্ঞাসা করল সে—দিদি কেমন আছে?

—ভালো।

জয়ের এই একান্ত নিরুৎসাহ ভাব খেয়াল করল না মঞ্জু। খুসীর সঙ্গে বললো—ভালো? বা, বেশ ভালো খবর। রকের উপর উঠে জয়ের একটা হাত সস্নেহে হাতে তুলে নিল সে। তারপর যেন ওর সঙ্গে ভেতরে যেতে যেতে শুনবে এমনি ভাবে ভেতরের দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—আচ্ছা, তোমার নাম কি?

কিন্তু জয় নড়ল না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই পা দুটো শক্ত করে রেখে জবাব দিল—জয়।

ওর পায়ের টানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল মঞ্জুও—জয়? ভারি সুন্দর নাম তো? তোমাকে ডেকে ডেকেই তো সব সংগ্রাম জয় করে ফেলতে পারবো আমি—পারবো না? সকৌতুকে তাকালো মঞ্জু জয়ের মুখের দিকে। তার মুখের শুকনো মলিন ভাব লক্ষ্য করে তাকে খুশী করবার জন্য উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল—ও, তুমি তো জান না—এই ছোটটি ছিলে তো। ইংরেজরা এতোবড় যুদ্ধটা জিতে গেল তো শুধু চায়ের কাপ থেকে—প্লেনের গা পর্যন্ত কেবল ভিক্টোরির

ভি লিখে লিখেই না। বুঝলে না? আচ্ছা সে সব গল্প তোমায় আমি শোনাবো। এসো—ধরা হাত আকর্ষণ করে মঞ্জু বললো—জয় তোমার নামের ভেতর। সব কিছুতে তুমি জয়ী হবে জয়—মস্ত বড় হবে তুমি—বিদ্যায় বুদ্ধিতে মনুষ্যত্বে। শেষের দিকে ওর ভারী হঁয়ে ওঠা গলা আর চোখের কোণে এসে যাওয়া জল ওকেই বিস্মিত করে দিল। এই অহেতুক ভাবাবেগে একা থাকলে হয়তো জোরেই হেসে উঠত সে। এখন মনে মনে হাসল মঞ্জু।

কিন্তু মঞ্জু খেয়াল করল না যে, সে বুঝুক আর নাই বুঝুক মনের কোন ভাবান্তর বা ভাবাবেগই অহেতুক নয়। ছুটুর যে মৃত্যুবেদনা তার ভেতর চাপা আছে—যে ব্যথা সে এখনও প্রকাশ করে উঠতে পারেনি—সেই ব্যথাই প্রকাশের পথ খুঁজছে তার।

মঞ্জুর কথার সামান্য অংশই বুঝল জয়। কিন্তু কথা না বুঝলেও সুর তার অন্তর স্পর্শ করলো। তার সংশয়িত মন; তার শঙ্কিত সন্ধিৎসু দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এলো। তার নামের যে এতো শক্তি এমন কথা জয় আর কোন দিন কারু মুখে শোনেনি। একটা উত্তেজনার পাতলা স্রোত তির-তির করে বয়ে গেল ওর ছোট্ট শরীরটার ভেতর দিয়ে। যে হাত মঞ্জু ওর ধরে দিল, সে হাত এবার আঁকড়ে ধরল দুই হাতে। ভেতরে যাবার জন্য পা-ও বাড়ালো—কিন্তু হঠাৎ থেমে পড়ল সে। মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে শুকনো ঢোক গিলল সে—দিদি এখনও ফেরেনি।

আর ঝাপটা খেল না মঞ্জু। একটু সময় চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল—কখন ফিরবে বলতে পারো? দেরী হবে?

এবার জয়ের জবাবে ব্যাকুলতা প্রকাশ পেলো। না, না, দেরী হবে কেন। আরো শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরল সে মঞ্জুর হাত—দিদি এক্ষুণি আসবে। চল না তুমি ঘরে গিয়ে বসবে। আমি তো দিদির জন্যই দাঁড়িয়ে। সে জানে জয়ার ফেরবার কোন নিশ্চয়তা নেই। এক্ষুণি ফিরতে পারে আবার দু ঘণ্টা পার হয়েও যেতে পারে—মিথ্যা কথাই বলল সে।

—শিশুকণ্ঠের এই ব্যাকুলতা আঘাত করল মঞ্জুকে। এই খোঁজ নিতে আসার সার্থকতা কি, যদি বাইর থেকেই চলে যাবে সে? এই যে কচি হাত দুটো সাঁড়াশীর মতো ওকে আঁকড়ে ধরে আছে, সে কি নির্ভর—আর নির্ভয় চাচ্ছে না—আশ্রয় খুঁজছে না? মন স্থির করে ফেলল মঞ্জু—শুধু যে এই বাড়ীর ভেতর ঢুকবে সে তা নয়, এই বাড়ীর ঘটনার ভেতর ঢুকবে সে। যেটুকু বোঝার বুঝেছে, বাকীটুকুও বুঝতে হবে তাকে। জয়ার মা তার অসন্তুষ্টি নিয়ে বিরক্তি নিয়ে সাধ্য নেই আর ওকে তাড়াতে পারেন।

এই এতক্ষণ তো সদর দরজায় দাঁড়িয়েই কাটল—বাকী অপেক্ষাটাও সে তো জয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এখানে দাঁড়িয়েই করতে পারে—একটু ভাবলো মঞ্জু। কিন্তু জয়ার ফেরবার সময়ের যে কোন স্থিরতা নেই, এটা সে বুঝেছিল। অপেক্ষাটা দীর্ঘ সময়ও করতে হতে পারে। গলির এই একগলা পচা আবর্জনার দুর্গন্ধের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করল না ওর। জয়া না ফেরা পর্যন্ত প্রতীক্ষা করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করল সে। পা টিপে টিপে সেওলা ঘসে মেজে ধুয়ে রাখা এক চিলতে ভিজে বাঁধানো উঠোন পার হয়ে মঞ্জু উঠে এসে দাঁড়ালো বারান্দায়। বারান্দায় দাঁড়িয়েই তাকালো এদিক ওদিক—আর এদিক ওদিক বলতে তো বারান্দার উপরের জলে জলে ভিজে ফুলা-খসে-যাওয়া কপাটের একটা স্নানের খুপরী আর ওর সম্মুখ বরাবর ঘরটা। রান্নাঘরের বালাই নেই। উঠোনের ওপর যে নিকানো উনোনটা রয়েছে সেটাই বারান্দায় তুলে এনে যে রান্না হয়, সেটা সে প্রথম দিনই দেখে গেছে। ঘরের ভেতর তাকালো মঞ্জু। কেউ নেই। জল ঢালার শব্দ আসছে স্নানের ঘর থেকে। নিশ্চয়ই স্নান করছেন জয়ার মা। ভারি স্বস্তিবোধ করল মঞ্জু। ভালো হলো। বেশ হলো। ওকে দেখেই যদি ওর চলে যেতেই হয়, এমন কোন ব্যবহার করে বসতেন—ওকে হয়তো চলে যেতে হতো। দরজার বাইরের সাক্ষাৎ বাইর থেকেই বিদায় দিয়ে দেওয়া সহজ—ভদ্রতার মুখোশ বজায় রেখেও সেটা করা চলে। কিন্তু বসা লোককে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য আরো কিছুটা বেশী এগুবার দরকার হয়—ততক্ষণেও যদি জয়া না এসে পড়ে তখন দেখা যাবে।

ঘরে ঢুকে জয়ার বিছানাটার উপরই বসতে যাচ্ছিল মঞ্জু। কিন্তু নতুন বিছানা ঢাকনা দিয়ে সেটা এতই পরিপাটি করে ঢাকা যে সেটাতে না বসে কোথায় বসা যায়, সেটাই দেখবার জন্য ঘরের ভেতর একবার চোখ বুলিয়ে আনল সে। নেই কিছুই। এই চৌকিটা আছে। একটা টুলের উপর কোণ ঘেঁসে রাখা রয়েছে কিছু বিছানাপত্র। একটা টেবিলের উপর বই খাতা আর তার পাশে একটা লোহার চেয়ার, এইতো। কিন্তু যা আছে তা হলো সেওলা-ধোয়া উঠান থেকে ঘর পর্যন্ত পরিচ্ছন্নতা—একটা অদ্ভুত পরিচ্ছন্নতা। মঞ্জুর মনে হলো, সৌন্দর্য্যবোধের নয় সব কিছুর ভেতর দিয়ে যেন প্রকাশ পাচ্ছে বিস্ময়কর একটা সংসার-বুভুক্ষা। কাজের ভেতর দিয়ে যেন কেউ সংসারটাকে কেবল ঘ্রাণে আর স্পর্শে আস্বাদ করছে। টেবিলের পাশের লোহার চেয়ারটা নিয়ে বসল মঞ্জু।

আজ তার চা খাওয়া হয়নি। ছুটুকে দেখতে যাবার জন্য সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছিল চায়ের অপেক্ষা না করেই। তারপর এতক্ষণ তার চায়ের কথা মনেও ছিল না, অবসরও মেলে নি। অন্য কোথাও হলে এখন তার এক কাপ চায়ের কথাই মনে আসত। কিন্তু জয়ার ফেরা নিয়ে তার মানসিক অবস্থা নিয়ে, জয়ার মার ব্যবহার নিয়ে যতই সময় যেতে লাগল ততই ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করতে লাগল সে। একটা পরিবারের ব্যক্তিগত ঘটনা জানবার অন্যায় অভদ্র কৌতূহল মেটাবার জন্য এখানে সে বসে নেই। আজ সে তার এই উনিশ-কুড়ি বছরের জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরে, জ্ঞানের বাইরে, চিন্তার বাইরের এক অজ্ঞাত জগতের মধ্যে মাথা গলিয়ে ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করবার সাহস করতে যাচ্ছে—যে ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে কোলে রেখেছিল সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে—আবার বসে পড়ল তক্ষুণি।

স্নানের ঘরে স্নান করবার, জল ঢালবার, কাপড় কাচাকাচি করবার শব্দ বেশ কতক্ষণ চলে, তারপর বন্ধ হলো। এক হাতে কাচা-কাপড় আর এক হাতে জল-ভরা বালতি নিয়ে স্নানের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন জয়ার মা। বালতিটা সশব্দে বারান্দায় নামিয়ে রেখে হাতের কাচা-কাপড় মেলে দিতে লাগলেন দড়িতে—সার্ট, শাড়ী, ধুতি। ধুতিটা ছেঁড়া ময়লা। এটা পরেই বোধ হয় এতক্ষণ তিনি সকালের পাট সেরেছেন। এখনকারখান ধোয়া ফর্সা। সার্ট আর ধুতিটা যেমন তেমন মেলে শাড়ীটার জমি

পাড় আঁচল পাট করে দিতে লাগলেন তিনি সযত্নে। হয় ইস্তিরির কাজটা সহজ করে রাখছেন নয়তো উপায় নেই ইস্তিরি করার, তাই যথাসম্ভব কোঁচকানো ভাবটা ভিজে অবস্থায়ই দিচ্ছেন ঠিক করে। তারপর কাঁধের গামছা হাতে নিয়ে, দু' হাতে সেটা টান করে ধরে মাথাটা পেছন দিকে ফেলে সশব্দে চুল ঝাড়তে ঝাড়তে এসে ঢুকলেন ঘরে। মঞ্জু তাকে বারান্দায় বের হতে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, তিনিও ঘরে ঢুকে মঞ্জুকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন থমকে।

পলকে তার মুখের চেহারা দেখে ফেলল মঞ্জু। গৃহস্থের সময় অসময় সুবিধে-অসুবিধে হিসাব না করে এসে উপস্থিত হয়ে উত্যক্ত করলে মানুষের মুখের চেহারা যেমনটা হয়ে ওঠে, তার মুখের চেহারা ঠিক তেমনি ভাব ধারণ করেছে। ভিজে চুল বাইরে রেখে সাদা কাপড়ের আঁচলটা এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধ পর্য্যন্ত তরুণী মেয়েদের মতো টেনে দিতে দিতে বিরস কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—জয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার?

—হয়েছে তো।

—সে বলেনি জয়া বাড়ী নেই?

প্রথম ধাক্কায় একটু থতমতই খেল মঞ্জু—একটা ঢোকও গিলতে হলো তাকে—হাঁ, সে কথা সে বলেছে—আমি অপেক্ষা করছিলাম—তা সে বলল কি না জয়া নাকি এক্ষুণি ফিরবে—তাই।

ছেলের উদ্দেশ্যে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বাইরের দিকে নিক্ষেপ করলেন মা। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—হতচ্ছাড়া ছেলে! তারপর মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুব মিষ্টি গলায় বললেন—না মা, জয়ার জন্য বসে থেকে কিছু লাভ হবে না। আমি জানি তো তাকে; একবার বেরুলে তার ফেরার সময়ের একেবারেই ঠিক থাকে না—বসে থেকে কেন তুমি মা অযথা সময় নষ্ট করবে! হাতের গামছা দরজার উপর রেখে দিয়ে দরজার কাছেই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন ওকে এগিয়ে দেবার জন্য।

মঞ্জুর লক্ষ্য এড়ালো না তার দুদিনের ব্যবহারের তারতম্য। সেদিন ছিল জয়ার মার হাবভাব ধীর-গম্ভীর। অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হয়ে মঞ্জু যা দেখে ফেলল গাম্ভীর্য্য দিয়ে তার মর্যাদা রাখা—এই ছিল তার সেদিনের চলন। আর আজকের ব্যবহারটা হলো তাড়ান। জয়া এক্ষুণি না আসতে পারে—আবার এসে পড়তেও তো পারে। কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল মঞ্জু।

কিন্তু সে চুপ করে থেকে সময় নষ্ট করতে পারে, জয়ার মা তা পারেন না। তুমি তো কলেজে পড়ো?

মঞ্জু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে না জানাতে তিনি তাড়াতাড়ো গলায় বলে উঠলেন—হাঁ আমি জানি তো। তবেই দেখ তোমার কলেজও রয়েছে। আচ্ছা, আমি জয়াকে বলব তুমি এসেছিলে। যাবে খন সে তোমার ওখানে আর এক দিন। আমারও সকালের দিকে এতো কাজ বসবার উপায় নেই—একটু হাসবার মতো মুখ করলেন তিনি—আচ্ছা এসো—সামাজিক মানুষ যখন সমাজে বাস করেও মানুষ বর্জন করে চলার নীতি গ্রহণ করে, তখন বুঝতে হবে বাধ্য হয়েই তাকে তা করতে হচ্ছে—তার জীবনধারা সমাজ-সমর্থিত পথে চলছে না বলেই তাকে তা করতে হচ্ছে—তার গোপনীয়তার প্রয়োজনের কাছে সামাজিক সৌজন্য গৌণ হয়ে যায় বলেই তাকে তা করতে হচ্ছে—যে ব্যবহারের পেছনে প্রয়োজন আছে যুক্তি আছে সে ব্যবহারই যুক্তিসঙ্গত। আর ব্যবহারটা যদি যুক্তিসঙ্গতই হলো তবে আর কি—ঠিক করে নিল মঞ্জু নিজেকে মোলায়েম গলায় বললো, আজ অনার্স ক্লাশ নেই কিনা—তাই, এই কলেজে যাবো ঠিক করে জয়ার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলাম।

মুখের চেহারা একেবারেই ভিন্ন আকার ধারণ করল জয়ার মার। এবার যে তিনি ওকে কি বলতেন আর না বলতেন, ওকে চলে যেতে হতোই কি না—মঞ্জু জোর করে কিছু বলতে পারে না, যদি না তক্ষুণি বাইরে জুতোর শব্দ শুনে তিনি তড়িৎপায়ে দরজার দিকে ধাওয়া করতেন। টেবিল ছেড়ে এগিয়ে এলো মঞ্জুও। সে বুঝতে পারল না বুকটা কেন তার এমন ধড়াস ধড়াস শব্দে ওঠানামা করতে লাগল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়া জয়ার মার পাশ দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সে। দেখলো, সামনে জয়া। পেছনে বিবর্ণ মুখে জয়। জয়ার শাড়ীর আঁচল খসে পড়েছে শরীর থেকে। বসে পড়েছে সে ভিজে রকের উপর—টেনে না তুললে এক্ষুণি সে যেন লুটিয়ে গড়িয়ে পড়বে মাটিতে। ত্যক্ততায় মুখ বিকৃত করে তাকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছে একটা লোক। সেদিন যে বেঁটে-খাটো লোকটাকে মঞ্জু দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল জয়াদের বারান্দায়, এ সে নয়। ঢোলা পাজামা আর গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী পরা এই লম্বা লোকটা অন্য কেউ। লোকটার বয়স বছর ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হবে না। চুলগুলো ঠিক পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপের মতো উঠে গেছে কানের পাশ থেকে উপর দিকে। দুই গালে গভীর ব্রণের দাগ।

লোকটা জয়াকে টেনে প্রায় আলগা করে তুলে নিয়ে এসে বিছানার উপর ফেলল না তো যেন নিষ্ঠুর হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর পাঞ্জাবীর গা হাত ঝাড়তে ঝাড়তে ঘুরে দাঁড়ালো ওদের দিকে। তার নির্বাক মুখ থেকে এ অবধি একটা শব্দও বেরোয়নি। এখনও বেরোলো না। লোকটার বাঁকা ভেতরে ঢোকানো ঠোঁটদুটো দেখলেও এই কথাই মনে হয় সে দুটোকে সে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া খোলে না।

মঞ্জু জানে না এ রকমটাই রোজকার ঘটনা কি না। স্তম্ভিত মঞ্জু স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল দলা পাকানো জয়ার দিকে তাকিয়ে। ঘটনা মুখোমুখী দাঁড়াবার আগ মুহূর্তে বুকের ভেতর যে অসহ দাপাদাপিটা শুরু হয়েছিল তার থেমে গেছে সেটা। স্থির হয়ে এসেছে হাত পা শরীর দিয়ে যে থরথরে কাঁপুনীটা আরম্ভ হয়েছিল, জয়াকে উঠোনে পড়ে থাকতে দেখে সেটাও। আস্তে আস্তে দৃষ্টিটা ওর এবার জয়ার উপর থেকে ঘুরে স্থির বিদ্যুৎরেখার মতো এসে পড়ল লোকটার মুখের উপর।

[ ক্রমশঃ।

**. . . এ মাসের প্রচ্ছদপট . . .**

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে "দার্জিলিঙ-দুহিতা" আলোকচিত্রটি মুদ্রিত হইল। আলোকচিত্র-শিল্পী—শ্রীসুখেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।

## বঙ্গ সংস্কৃতি ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ

সভ্যতার ক্রমপ্রগতির পরিপূর্ণ বিকাশ সার্থকতালাভ করে পারস্পারিক আদান-প্রদানের মধ্যে দেওয়া ও নেওয়ায় অর্থাৎ দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে কথাটি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে বাঙলাদেশের বেলায়। বাঙলাদেশ যার আকাশে মধু, বাতাসে মধু, হৃদয়ে মধু নয়নে মধু, স্বপনে মধু, যে মধুরে মধুর, মধুতে মধুতে মিলে মধুময়ী। তার মধুর মন মাতানো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল দিক থেকে দিগন্তরে, মাতাল হয়ে ছুটে এল ভিন্ন ভিন্ন মানুষ দেশ দেশান্ত থেকে। পৃথিবীর ভিন্ন দেশের, ভিন্ন আকৃতির, ভিন্ন মনের অসংখ্য মানুষ এসে মিলিত হল বাঙলার তীর্থসঙ্গমে। এই মধুলোভী ভ্রমরের দলের কেউ বা গুন-গুন করে গান শোনাল, কেউ বা হুল ফুটিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে তুলল লাবণ্যময়ী বাঙলাকে। কেউ এল সাধকের মন নিয়ে, কেউ এল শিকারীর অন্তঃকরণ নিয়ে, কেউ বা দেখা দিল প্রীতির পত্র হাতে নিয়ে, কেউ বা দেখা দিল স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। কেউ বা ফিরে গেল, কেউ বা গেল না। মধুভাণ্ডে অনেক ভ্রমর আটকা পড়ে গেল। তারা বাসা বাঁধল বাঙালীর সঙ্গেই। তারপর কয়েকটি শতাব্দী পেরিয়ে এসে দেখা যাচ্ছে যে আজ বাঙলাদেশ সর্বজাতির মিলনমঞ্চ। অনেকে এসেছেন আপন দেশ থেকে সংস্কৃতির বাণী বহন করে তার আলোয় বাঙলাকে আলোকিত করতে, ফিরে গেছেন বাঙলার সনাতন ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্যের মাধুরী মাথায় করে। কে আসে নি এখানে? ইতিহাসের পাতায় ধরা পড়ে গেছে তাদের নাম, ইতিহাস জানাচ্ছে এ দেশে এসেছে ফরাসী ইংরেজ, এসেছে আর্মাণ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, এসেছে গ্রীক স্পেনীয়, ইতালীয়, রুশ, মার্কিণ মুলুকের ধনকুবেরের দল। পরস্পর পরস্পরকে ভরিয়ে তুলল। দুজনে দুজনের কপালে এঁকে দিল আপন সংস্কৃতির জয়টীকা। উভয়ের বিরাটত্বে, উভয়ের রূপ আরও মহিমময়ী হয়ে উঠল কিন্তু এই দুর্বার স্রোতে এত মানুষের ধারা কার অমোঘ আহ্বানে বিলীন হয়ে গেল এই বাঙলার মহামানবের সাগরতীরে তা ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না, যিনি পান তিনি হয়তো সত্যদ্রষ্টা, ত্রিকালজ্ঞ, পুণ্যাত্মা ঋষি।

দিন এগোতে থাকে। ইতিহাসের মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ বদলায়। বাঙলার জয়গানে সারা বিশ্ব হল মুখরিত। পৃথিবীর সঙ্গে বাঙলার সাংস্কৃতিক বন্ধন হল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর। বাঙলা দেশে ক্রমে দেখা দিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন 'অঞ্চল থেকে প্রতিভার বরপুত্রের দল, মানবপ্রেমিকের দল, উপাসকের দল। তাঁরা এলেন, বাঙলাকে দেখে বিস্মিত হলেন, মুগ্ধ হলেন, হতবাক হলেন। প্রণাম জানালেন এই মহীয়সী দেশকে, ভালবেসে ফেললেন। বাসা বাঁধলেন তার কোলে আর নিজেদের নিয়োজিত করলেন তার সর্বাঙ্গীন উন্নতির সাধনায়। বাঙলা দেশকে সেবা করে তাঁরা ধন্য হলেন, নিজেদের সমস্ত শক্তি তাঁরা উজাড় করে দিলেন বঙ্গজননীর পূজায়। বাঙলার শিল্প ঢাকাই মসলীন সাদরে শোভা পেয়েছে রোমের দরবারে, অপরিসীম শ্রদ্ধাসহকারে পর্তুগাল ছেপে দিয়েছে বাঙলা দেশের জন্যে বই—যার নাম কৃপার শাস্ত্রে অর্থভেদ, ভট্টপল্লীর পূজনীয় পণ্ডিতদের পায়ের তলায় বসে সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র সম্বন্ধীয় আলোচনা করছেন জার্মাণীর বাসিন্দা, আরো অনেকে, শ্রীরামপুরের মিশনারীর দল উঠে পড়ে লেগেছেন বাঙলা সাহিত্যকে বলশালী করে তোলার প্রচেষ্টায়, শিক্ষাবিস্তারের কাজে, দেশীয় সংবাদপত্রের সৃষ্টি সাধনায়, এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে হ্যালহেড, মার্শম্যান, কিকো, কেরীর কথা, মনে পড়ছে ডিরোজিও, রিচার্ডসন, ডেভিড হেয়ারের স্মৃতি, মনে পড়ছে মনেয়ার উইলিয়মস, স্যার উইলিয়ম জোন্সের নাম, নব্যবাঙ্গালার রূপদাতাদের মধ্যে এঁদের নাম স্মরণীয়। ক্যাবিয়াল য়্যান্টনী ফিরিঙ্গিকে বাঙালী কোনদিন ভুলতে পারবে? যে বিদেশী এসে দেশীয় লিপির পাঠোদ্ধার করে চমক লাগলেন সেই পণ্ডিতপ্রবর প্রিন্সেপ মালিন্যহীন দীপ্তিতে চিরদিন বেঁচে থাকবেন বাঙলা ভাষাভাষীর অন্তরে, বাঙালী বিনত প্রণাম জানাচ্ছে সায়েন্সের আধুনিক সংস্করণ যুগস্রষ্টা মোক্ষমূলারের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে। মেরী কার্পেন্টারকেও বাঙালী ভুলবে না কোনদিন। পরমাপ্রকৃতি জননী সারদাদেবীর চরণসেবা করে ধন্য হয়েছিলেন সুইডেনের মার্গারেট নোব্‌ল্‌—বাঙলার ভগিনী নিবেদিতা, বাঙলাদেশ যাঁকে তুলে ধরল জগতের সামনে। নিবেদিতার কল্যাণে অমরত্ব লাভ করলেন মার্গারেট নোব্‌ল্‌। রাষ্ট্রশাসনের তখত্‌-এ-তাউস থেকেও বাঙলাদেশকে যাঁরা সেবা করতে এতটুকু কার্পণ্য প্রকাশ করেন নি তাঁদের মধ্যে বেথুন, বেণ্টিঙ্ক, ক্যানিংএর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। মেটকাফে ভ্যান্সিটার্টের নামও এ প্রসঙ্গে অনুল্লেখ্য নয়' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে কোলভিল, আর্কোয়ার্ট, পার্সিভাল শুধু প্রতিষ্ঠানটিরই সেবা করেন নি, সেবা করেছেন বাঙলার সমগ্র শিক্ষাজগতকে। কবিবর-রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে য়্যাণ্ড্রুস এলমহার্ষ্ট ,পিয়ার্সন, প্রমুখ বিদেশীরা নিজেদের নিয়োজিত করলেন বাঙলা ও বাঙালীর সেবায়। পুণ্যপ্রবাহিণী গঙ্গার শোভন-গম্ভীর গতিধারা মুগ্ধ করেছিল শেলীকে। মলয়জশীতলা বাঙলার নৈসর্গিক সৌন্দর্য আকুল করে তোলে মধ্য য়্যামেরিকার কবি আলফ্রেডো এস্পিনোকে। বাঙলা দেশ কেবল নিতেই অভ্যস্তা নয়, দেবার জন্যেও সে উৎসুক। তার যা কিছু সঞ্চয় সে ছড়িয়ে দিতে চায় সারা বিশ্বে। সে অন্নপূর্ণা, তার যুগ-যুগ সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে মুঠো মুঠো রত্ন তুলে দিয়েছে আপন সন্তানদের হাতে, সেই দিগ্বিজয়ী সন্তানের দল সারা বিশ্বকে ভরিয়ে তুলেছেন তাই দিয়ে। ইয়োরোপখণ্ডে দেখতে পাচ্ছি ভারতীয় নবযাত্রাপথের প্রথম পথিক পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি রামমোহনকে বৃদ্ধ মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের পক্ষ অবলম্বন করে আইনসঙ্গত সংগ্রামে ব্যাপৃত, দেখতে পাচ্ছি লণ্ডনের অভিজাত সমাজে শিহরণ বইয়ে দিলেন যুবরাজ দ্বারকানাথ ঠাকুর অসাধারণ কর্মবীর, বাণিজ্য বিস্তাবিশারদ, সারা লণ্ডন অবাক হয়ে দেখল বাঙলার বাঙালী কাকে বলে, ধর্মীয় বাণী বহন করে পরম

পিতার আশীর্বাদ সম্বল করে লণ্ডনের মাটিতে পা দিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, বিশ্ব মনীষার দরবারে বিশেষ আসন অধিকার করলেন জগদীশচন্দ্র, শাশ্বত ভারতের দিব্যরূপ পৃথিবী দেখতে পেল রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে, রামকৃষ্ণের চরণাশ্রিত বিবেকানন্দ বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলেন বাঙলার শক্তিময়ী রূপকে, চিকাগো সেই সঙ্গে সারা বিশ্ব দেখল বাঙলার আগ্নেয়রূপটি কি, মার্কিণ মুলুকে বাঙলার সংস্কৃতির হীরে পান্না দেশবাসীর পক্ষ থেকে উপহার দিয়ে এলেন নটগুরু শিশিরকুমার, বিশ্ববাসীর ঘরে ঘরে সুভাষচন্দ্র পৌঁছে দিলেন বাঙলার বাণী। শতবর্ষ আগে দেখতে পাচ্ছি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকের পদে বরণ করে নিল রাখালদাস হালদারকে। এর আগে আর কোন বাঙালী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ পাননি, পরবর্তীকালে মার্কিণ মুলুকে অধ্যাপনার মাধ্যমে বাঙলার প্রচার করার সুযোগ পেলেন ডাঃ সুধীন্দ্র বসু ও ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। বাঙলার 'সঙ্গীতচেতনার জন্মদাতা রাজা ডাঃ স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রচুর অর্থব্যয় করে দেশ বিদেশে পাঠাচ্ছেন প্রতিনিধি, সারা পৃথিবীকে বাঙলার সঙ্গীতের বিষয়ে অবহিত করার জন্তে বিদেশে ব্যক্তির মাধ্যমে, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে শৌরীন্দ্রমোহনের অবদান ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কত নাম করব? বাঙলার কত ধনী ব্যক্তি নিজে না গিয়ে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন বাঙলার শ্রীমণ্ডিতা রূপ বিশ্বের সামনে তুলে ধরার জন্তে, কত সুধী সাংস্কৃতিক অভিযানের নেতৃত্ব নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বিদেশের অভিমুখে (কত রাষ্ট্র সর্বোচ্চ সম্মানে বিভূষিত করেছে বাঙলার বরেণ্য সন্তানদের এ তালিকায়, শৌরীন্দ্রমোহনের নাম সকলের উপর স্থান পাবে) তার কি তুলনা হয়?

বাঙলার সঙ্গে যোগাযোগের প্রসঙ্গে পৃথিবীর অনেক দেশেরই নামোল্লেখ করা হ'ল, তাও তো এশিয়ার চীন-জাপান-ব্রহ্ম-সিংহল-পারস্য-ইরাক-পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলি প্রভৃতি দেশসমূহের তো নামই করা হয় নি তার প্রধান কারণ এদের আমরা পৃথক বলে মনে করি না। এরা আমাদের প্রতিবেশী, আত্মীয়, সুখ-দুঃখের অংশীদার। এদের সঙ্গে যে অন্ত সম্পর্ক।

বাঙলার সঙ্গে বিদেশের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ নিবিড় করে তোলার ক্ষেত্রে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের অবদান ও প্রচেষ্টাও অসামান্ত। কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের ইতিহাসে বাঙলা ও বাঙালী কি ভাবে জড়িয়ে আছে এ বিষয়ে সাধারণের জ্ঞানের পরিধি কিছুটা সীমিত। সাধারণতঃ দেখা যায় একটি দেশ তারই দেশের কোন অধিবাসীকে আর একটি দেশে পাঠাল তার প্রতিনিধির সম্মান দিয়ে, তিনি বিদেশে বাস করে আপন দেশের প্রতিনিধিত্ব করলেন এবং দুটি দেশের পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্কটি আরও মধুর করে তুলতে সহায়তা করলেন—সেই সঙ্গে উভয় দেশের পারস্পরিক বাণিজ্যিক সম্পর্কটি আরও সহজ করে তুললেন। কূটনীতিকদের কার্যাবলী ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচরাচর এইটুকু জানা যায় কিন্তু বাঙলার বেলায় এর যে একটু ব্যতিক্রম হয় নি, এমন কথা বলা যায় না। পৃথিবীর বহু দেশ তাদের প্রতিনিধিত্বের জন্তে বাঙালীকেই মনোনয়ন করেছে নিজের দেশের লোক না পাঠিয়ে এ দেশের লোককেই রাষ্ট্রপ্রতিভূ (Consul)র সম্মান দিয়ে বাঙলার উপর প্রদর্শন করেছে শ্রদ্ধা। এখানে একটি জিনিষ বিশেষ ভাবে পরিলক্ষণীয় যে বাঙলার উপর কতখানি শ্রদ্ধা তাঁরা পোষণ করতেন (বা করেন) এবং বাঙালীকে তাঁরা কতখানি আপনজন বলে ভেবে থাকেন যে, নিঃসঙ্কোচে নিজের দেশের প্রতিনিধি বলে তাকে মেনে নেন। যে সব বাঙালী বিদেশী রাষ্ট্রপ্রতিভূ (Consul)র আসন অলঙ্কৃত করে গেছেন, তাঁদের কল্যাণে বহির্জগতের সঙ্গে বাঙলার সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদান প্রদানের পথ ক্রমেই প্রশস্ত হয়ে উঠেছে বা উঠছে। বাঙালীদের মধ্যে প্রথম যিনি এই সম্মানের অধিকারী হন, (১১০৩) বহির্জগতের সঙ্গে বাঙলার যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ করে তোলার এক নতুন পথে যিনি প্রথম পা ফেললেন এবং এই পথেই যাঁকে অনুগমন করলেন আরও অনেক বাঙালী—তাঁর নাম স্বর্গীয় ডাঃ স্যার বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙলার মধ্যে তো নিশ্চয়ই যতদূর জানা যায় পৃথিবীর মধ্যে তিনি একমাত্র জন যিনি দশটি বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রতিভূর সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন (তার মধ্যে দুটির ছিলেন প্রতিভূপ্রধান বা Consul-General)। দীর্ঘ ছত্রিশ বছর তিনি এই সম্মানসূচক ও ততোধিক দায়িত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় নবাব শ্যামাকুমার ঠাকুর (রাজা শৌরীন্দ্রমোহনের ছেলে) ও স্বর্গীয় ডাঃ পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর যে সব দেশ বাঙালীকে তাদের রাষ্ট্রপ্রতিনিধিত্ব দিয়ে বাঙলা দেশকে জানালেন প্রাণপূর্ণ শ্রদ্ধা তাদের মধ্যে স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়া, প্যানামা, লাইবিরিয়া, বলিভিয়া, এল সালভেদার, গোয়াতেমালা, হণ্ডুরাস, নিকারাগোয়া কোষ্টারিকা, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, পারস্য, ডোমিনিকান গণতন্ত্র, হাইতি প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।

আজকের দিনে United States Information Service, British Information Service, Information Dept. of the U. S. S. R. Embassy in India, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির দেখা পাওয়া গিয়েছে যাঁরা বাঙলার সঙ্গে নিজ নিজ দেশের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করতে ব্যস্ত। এ ছাড়াও Germany, France, Yugo-Slavia, Poland, Czecho-Slovakia, Canada, Iran, African Union, Australian Commonwealth, Egypt, China, Burma, Sweden, Hungary, Ceylon প্রভৃতির দূতাবাসসমূহ বন্ধুত্বধর্মী তথ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠানাদি সৃষ্টি করে তার দ্বারা বাঙলাদেশের সঙ্গে নিজেদের বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করার শুভ সংকল্পে উৎসুক কলকাতায় অবস্থিত অন্যান্ত দূতাবাসগুলিও এ বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় যে, বাঙলার সঙ্গে ঐ সব দেশের সম্পর্ক আজকের নয় এবং বাঙলাদেশের সঙ্গে তাদের যে যোগাযোগ বিদ্যমান তা কোন প্রতিষ্ঠানের দুদিনের চেষ্টায় সম্ভবপর হয়নি, তা সম্ভবপর হয়েছে শত শত বছরের সৃষ্টিধর্মী ভাবসম্পদের যুগপৎ আদান-প্রদানে। আজ বাঙলার সঙ্গে বহির্জগতের পারস্পরিক প্রীতির বন্ধনের যে মধুর রূপটি ভেসে উঠছে চোখের সামনে তার সূত্র অন্বেষণ করতে গেলে পিছিয়ে যেতে হবে অনেক-গুলো শতাব্দী। বিধাতাপুরুষ বাঙালীকে সব কিছুর সঙ্গে ঔদার্য দিয়েছিলেন কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে। হৃদয়ের ঔদার্য দিয়ে বাঙালী আপন করে নিয়েছে সারা জগতকে, তার দুয়ার বিশ্ববাসীর কাছে সর্বদাই অর্গলমুক্ত, জগতের সঙ্গে তার গড়ে উঠল এক অবিচ্ছেদ্য

যোগসূত্র—এই সম্পর্ক স্থাপনের পিছনে ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রচারই ছিল বঙ্গনায়কদের একমাত্র কাম্য, কোন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এ অভিযানের সৃষ্টি হয়নি, রাজনীতির প্যাঁচের থেকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বাঙালীর কাছে অনেক বেশী মূল্য বহন করে। ভগবান বাঙালীকে যে মন দিয়েছেন তা সঙ্কোচনের জন্যে নয় তা উত্তরোত্তর প্রসার করার জন্যে। দেশে দেশে আজ বাঙালী সুধীদের অভূতপূর্ব সমাদর, বাঙলা সাহিত্যের আজ বিশ্বব্যাপী জয়গান, বিশ্বের দরবারে আধুনিক বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রিকা মাসিক বসুমতীর জনপ্রিয়তার বিরাটত্ব—থাক সে বিষয়ে নিজেরা আর নাই বা আলোচনা করলুম, জাতীয় সাহিত্যের যুগোপযোগী গতি প্রগতি, তার বৈচিত্র্য, তার নতুনত্বের দিকে নিত্য নব অভিযানের আলেখ্য মাসিক পত্রিকার মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে। সাহিত্যের মধ্যে ফুটে ওঠে দেশ, কাল, মানুষ, সমাজ, জীবন, আর সাহিত্যকে তুলে ধরে সাহিত্য-পত্রিকা। আজকের দিনের অভিজ্ঞ পাঠক সাধারণের কাছে আর অজানা নয় যে বিদেশের দরবারে মাসিক বসুমতীর স্থান কোথায়!

বাঙলার সঙ্গে বিশ্বের আত্মীয়তা বহুকালের। অনেক কিছু ঘটনা তার সাক্ষী, ইতিহাসের সোনা পাতা তার প্রমাণ, মহাকাল তার নীরব দর্শক। বাঙলার চতুর্দিকে আজ তারই বিরুদ্ধে ঘোর শত্রুতা, ষড়যন্ত্রের আগুনে তার শ্রীঅঙ্গ তামাটে হয়ে গেছে, তার গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার চলেছে কুৎসিত চক্রান্ত। কিন্তু নৈরাশ্য বাঙালীর উপাস্য নয়, বাঙালী আশায় বুক বাঁধতে জানে, ধ্বংসস্তূপ থেকেই জেগে উঠবে নতুন প্রাণের চেতনা, অনুভূত হবে নতুন স্বপ্নের পুলক, পাওয়া যাবে নতুন পথের নিশানা। একটি অপূর্ব কবিতার কটি পংক্তি বার বার মনের আকাশ থেকে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ সরিয়ে দিচ্ছে—

> বাঙালীর কবি গাহিল জগতে মহামিলনের গান
> বিফল নহে এ বাঙালী জনম, বিফল নহে এ প্রাণ।
> ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা আহ্লাদে
> বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙালী ধাতার আশীর্বাদে।
> অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে
> বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।

# উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

## রবীন্দ্র-স্মৃতি

মাত্র দেড় যুগ আগেও দ্বাদশ আদিত্যের শক্তিতে বিশ্বকে ভরপুর করে রেখেছিলেন কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে দেখেছেন, প্রণাম করেছেন, তাঁর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছেন এমন লোকের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। একাশীটি বছর ধরে ভারতীর যে বরপুত্র মানুষের মনলোক ভরিয়ে তুললেন বিধিদত্ত প্রতিভার কল্যাণে, তাঁর পায়ের তলায় আসন পেয়ে যাঁরা ধন্য হয়েছেন, আজকের দিনের প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের বিলোকের সিংহদ্বার শ্রদ্ধেয় সৌরীন্দ্রমোহনের কাছে ছিল নিত্য অবারিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগাযোগ। কবিগুরুকে কেন্দ্র করে বহু ঘটনা সৌরীন্দ্রমোহনের স্মৃতির মঞ্জুষায় বহু কাল অতিক্রম করেও মালিন্যহীন দীপ্তিতে আজও সমুজ্জ্বল, যে ঘটনাগুলির সঙ্গে তাঁর নিজের যোগও অবিচ্ছেদ্য। দেশবাসীর কাছে লেখক তাঁর স্মৃতির দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কবিগুরু, তাঁর পরিবারবর্গ ও সমসাময়িক বাঙলাদেশ তথা বাঙলার সাংস্কৃতিক জগৎ সম্বন্ধে বহু তথ্য যথোচিত নিপুণতার সঙ্গে এখানে পরিবেশিত হয়েছে, যা পাঠে অনুরাগী ও নিষ্ঠাবান পাঠক-পাঠিকার দল অপরিসীম তৃপ্তিলাভে সমর্থ হবেন বলে আশা রাখি। গ্রন্থটির প্রসার ও প্রচার আমাদের কাম্য। প্রকাশক—শিশির পাবলিশিং হাউস, ২২/১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

## ভগিনী নিবেদিতা

আয়ার্ল্যাণ্ডের মার্গারেট নোবল ভাল বাসলেন ভারতবর্ষকে, এশিয়ার তীর্থভূমিকে। সাত সাগরের এপারের ভারতের মহিমান্বিতা প্রণম্য মূর্তি স্বপ্নে ভেসে ওঠে বিদেশিনীর চোখে। ভারতবর্ষ এক অভিনব চেতনা জাগিয়ে তোলে বিদেশিনীর চিত্তকে, জীবনদেবতার অমোঘ আহ্বানে সাড়া দেন মিস নোবল, বীরাগ্রগণ্য ভারতীয় তাপসের কাছে দীক্ষা নিয়ে ভারতজননীর সেবাকার্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করলেন কুমারী নোবল। মার্গারেট নোবল হয়ে গেলেন ভগিনী নিবেদিতা। শ্রীশ্রীমার এই মানসকন্যার স্বল্পস্থায়ী জীবনটি যেমনই পবিত্র তেমনই কর্মময়। ভারতে বাসা বাঁধার পর এ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কল্পে তাঁর আমরণ প্রচেষ্টা তথা সাধনা এ দেশের অধিবাসীদের প্রাণ ভরা শ্রদ্ধা চিরদিন আকর্ষণ করবে। এই মহীয়সী নারীর পুণ্য জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত-পূর্ণ রহস্য তথা সমন্বিত ভাব-বৈচিত্র্যে ভরপুর জীবনকাহিনী রচনা করে লেখিকা আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতার অধিকারিণী হলেন। লেখিকার মনোরম রচনা পাঠকচিত্ত জয় করবে, নিবেদিতার আদর্শ জীবনী ভবিষ্যতের নর-নারীকে আপন জীবন গড়ে তোলার পথ প্রদর্শন করবে। তাঁর রচনা এক কথায় সুন্দর। এই সুপাঠ্য এবং হৃদয়গ্রাহী রচনাটি তার যথাপ্রাপ্য সমাদরে বিভূষিত হোক, এই আমাদের কামনা। লেখিকা ও প্রকাশিকা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, সম্পাদিকা—রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন। দাম সাড়ে সাত টাকা মাত্র।

## কবি সুকান্ত

বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি যে বরণীয় কবিদের আবির্ভাব হয়েছে, নিঃসংশয়ে বলা যায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের স্থান তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এক কথায় বলতে গেলে সুকান্ত বাঙলা কবিতায় বিস্ময়,

একটি যুগের স্রষ্টা, এক অভিনব চেতনার জন্মদাতা। সুকান্তকে কেন্দ্র করে বাঙলাদেশের কাব্যজগতে যে স্পন্দন দেখা দিয়েছিল তা যেমনই অভাবনীয়, তেমনই অকল্পনীয়, তেমনই অবিস্মরণীয়। মাত্র একুশ বছর পৃথিবীতে থাকা এই কবিটি পাঠকের চিত্ত যতখানি জুড়ে আছেন, তা ভাবতে গেলে মনের মধ্যে জেগে ওঠে এক অদ্ভুত অনুভূতি। সুকান্ত সম্বন্ধে পাঠকমনে কৌতূহলের সীমা নেই। তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাঁর জীবনের বিস্তারিত ঘটনাসমূহ, তাঁর দেবদত্ত প্রতিভার বিকাশ ও গতিধারা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী জানতে পাঠকচিত্ত উৎসুক কিন্তু সুকান্তর একটি প্রামাণ্য ও তাঁর সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য আলোচনা-সমৃদ্ধ কোন জীবনী ছিল না। বর্তমানে তাঁর অনুজ কবি অশোক ভট্টাচার্য সে অভাব দূর করেছেন। অশোক ভট্টাচার্য তাঁর পূজনীয় অগ্রজের এই অপূর্ব জীবন কাহিনীটি উপহার দেওয়ার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ পাবেন। তাঁর রচনাকুশলতায় লেখার মধ্যে এক এক সময় সুকান্ত যেন জীবন্ত হয়ে উঠছেন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার রচনার মূল ইতিহাস এই গ্রন্থের মাধ্যমে সকলের সামনে লেখক তুলে ধরেছেন। সুকান্তর বিভিন্ন ভঙ্গীতে তোলা কয়েকটি আলোকচিত্র ও কয়েকটি সুলিখিত পত্র (ইতঃপূর্বে মাসিক বসুমতীতে নিয়মিতভাবে তাঁর বহু পত্র প্রকাশ করা হয়েছে) গ্রন্থটিতে যোগ করে গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে। সুকান্ত ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে পাঠকের যত কিছু কৌতূহল থাকতে পারে, আমাদের বিশ্বাস, আলোচ্য গ্রন্থটি তাদের নিরসন। প্রকাশক—সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা

বর্তমান যুগে বাঙলার কাব্যলোক পুষ্ট থেকে পুষ্টতর হচ্ছে যে শক্তিমান কবিদের কল্যাণে, তাঁদের মধ্যে দিনেশ দাস এক বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। একটি শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ কাল ধরে বাঙলাদেশকে কাব্যের মধ্যে দিয়ে সেবা করে চলেছেন দিনেশ দাস। তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন হয়েছে, এ উপলক্ষে তাঁকে আমাদের সানন্দ অভিনন্দন জানাই। দিনেশ দাসের কবিতা এক বলিষ্ঠ বক্তব্য বহন করে, তাঁর কবিতায় কেবলমাত্র কথার খেলা নেই, আছে পথভ্রষ্ট মানুষকে প্রকৃত পথের নির্দেশ দেওয়া, এক ভাবসমৃদ্ধ চিন্তাসম্পদের যোগ্য অধিকারী কবি দিনেশ দাস। তাঁর সৃজনধর্মী, হৃদয়গ্রাহী ও সারবান অনেকগুলি কবিতা একত্রে পড়তে পাওয়ার সুযোগে বাঙলা কবিতার অনুরাগীর দল আনন্দলাভ করবেন। শেষাংশে কবিপরিচিতিও সুলিখিত এবং পঠিতব্য। প্রকাশক—লেখক সমবায়, ৫৮ মনসাতলা লেন, খিদিরপুর। দাম—সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

## সংবাদপত্রের রূপায়ণ

দূরকে কে বা কারা নিকট করল, এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে যার কথা মনে জেগে ওঠে তার নাম সংবাদপত্র। এ শুধু দূরকে নিকটই করেনি, বহুকে একও করেছে। রাজা থেকে প্রজা, মন্ত্রী থেকে কেরাণী, বিত্তবান থেকে বিত্তহীন সকলের কাছেই এর আবেদন সমমূল্য। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এর আশায় মানুষ অধীর আগ্রহে মুহূর্ত গোণে। এর পাতাগুলির উপর নিজের শিকারী চোখ দুটোকে বুলিয়ে নিয়ে তবে শান্তি, স্বস্তি, নিশ্চিন্ততা। তারপর সারাদিনের কর্মের ঘানিটানা। সারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি কয়েকটি পাতার মধ্যে কি করে পাশাপাশি স্থান পেয়ে গেল, এ বিষয়ে কি সাধারণ মানুষের কম কৌতূহল? এক একটি সাংবাদিকই তাদের কাছে অগাধ বিস্ময়। সংবাদপত্রের পরিচালন-কুশলতা, মুদ্রণ প্রণালী, সম্পাদনা পদ্ধতি, প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মীর স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য, বার্তা সংগ্রহাদির উপায়, প্রচার ব্যবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের করণীয় সমূহ সম্বন্ধে চিত্র সহযোগে বিশদভাবে আলোচ্যগ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। সূর্যোদয়ের পর বাড়ীতে ভোরের প্রথম মঙ্গল আলোর মত চিরবাঞ্ছিত এই অতিথিটির সাধারণের কাছে প্রতিভাত রূপটি কেমন করে ফুটে ওঠে, এ বিষয়ে আলোচনা করে লেখক প্রশংসাভাজন কাজ করেছেন। সাহিত্যের মাধ্যমে এই জাতীয় জ্ঞানলাভ দেশবাসীর পক্ষে কল্যাণকর হবে। লেখকের বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর, ভাষা মনোরম, বোঝানোর কায়দাটি অপূর্ব। এ ছাড়া বাঙলাদেশে সংবাদপত্রের জন্ম, প্রসার, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা বিষয়ক ইতিহাস আলোচনাতেও লেখক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এবং বিরানব্বই পাতার এই গ্রন্থটিতে সংবাদপত্র সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য অপরিসীম নৈপুণ্যের দ্বারা লেখক সাহিত্যের দরবারে সরবরাহ করেছেন। গ্রন্থটি বহুল সমাদরে বিমণ্ডিত হোক। লেখক—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম দু' টাকা মাত্র।

## অপরূপা

জ্যোতিষ চর্চা ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টিতেও দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের শক্তির প্রাচুর্যের কথা আজ সুবিদিত। কয়েকটি গ্রন্থের মাধ্যমে সাহিত্যের আসরে আজ একটি বিশেষ আসনে আপন অধিকার আনতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকা কিছুকাল পূর্বেই পরিচিত হয়েছেন। এক সুন্দর পটভূমিকায় লেখা এই অপরূপ গ্রন্থটির নামকরণ যেমনই সার্থক, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। চরিত্রগুলি লেখকের রচনাকুশলতায় মাঝে মাঝে জীবন্ত হয়ে ওঠে। দ্বারেশচন্দ্রের প্রাঞ্জল বর্ণনাভঙ্গী, চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা, জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্যক প্রতিচ্ছবি সাহিত্যের পাতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করবে। অজিত গুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদচিত্রটিও তৃপ্তির পরিচায়ক। প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম সাড়ে পাঁচ টাকা মাত্র।

## মাটির মানুষ

বাঙলা দেশের অনুসরণ (এবং স্থানবিশেষে অনুকরণও) করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রকৃত সাহিত্য-চেতনা জেগে উঠেছে উড়িষ্যাতেও তার ছায়াপাত হয়েছে। আধুনিক উড়িয়া সাহিত্যে

প্রতিভাবান লেখক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী তাঁর ( উড়িয়া সাহিত্যের আধুনিক পর্বের ) ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। তাঁর মাটির মানুষ গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদ করেছেন বর্ষীয়সী সুলেখিকা সুখলতা রাও মহাশয়া। পাণিগ্রাহী মহাশয় এক বলিষ্ঠ ভাবসম্পদের অধিকারী। তিনি নিষ্ঠাবান জীবনশিল্পী। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে তিনি দুটো দল দেখতে পেয়েছেন—এক দল হাওয়ায় ওড়ে, অন্যদল মাটির সঙ্গে তাল রেখে চলতে ভোলে না, বলতে গেলে যারা হচ্ছে পৃথিবীর জীবন, এই নীচের দল বাঁচিয়ে রেখেছে, পুষ্টি দিচ্ছে, তুলে ধরছে উপরের দলকে। এদের জীবনকে পটভূমিকা করেই পূর্বোক্ত উপন্যাসটি সৃষ্ট। এই নীচের দলের মানুষের জীবনের চাওয়া-পাওয়ার একটি হিসেব দিতে ব্রতী হয়েছেন লেখক, এদের আনন্দ, বেদনা, হাসি কান্না, ঘাত-প্রতিঘাত পরিপূর্ণরূপে ধরা পড়েছে শক্তিমান লেখকের সন্ধানী চোখে। অনুবাদিকা অনুবাদকর্মে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, এই সুগ্রন্থটি বাঙালী পাঠকদের দরবারে উপহার দেওয়ার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। দুই প্রদেশের পারস্পরিক দৈনন্দিন জীবনধারার সৌসাদৃশ্য অন্বেষণ করে শ্রীমতী রাও যেন উভয় রাজ্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় করলেন। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## ভিক্টোরিয়া

গ্রোথ অফ দি সয়েলের স্রষ্টা নোবেল পুরস্কারজয়ী বিখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গত কুট হ্যামসুন ( ১৮৫১-১৯৫২ ) এর অন্যতম বিশিষ্ট অবদান ভিক্টোরিয়া। হ্যামসুনের রচনারীতির মধ্যে যে বিশেষ ছাপটি পাওয়া যায় ভিক্টোরিয়া সে ছাপ থেকে মুক্ত, এইখানেই ভিক্টোরিয়ার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হ্যামসুনের লেখনী থেকে জন্ম নিল অথচ তাঁর চিরাচরিত রচনাশৈলীর প্রভাব তাতে পড়ল না অর্থাৎ বললে ভুল হবে না যে, ভিক্টোরিয়ার মধ্যে দিয়েই সারস্বত দরবারে যেন জন্ম নিলেন এক নতুন হ্যামসুন। এক অনবদ্য প্রেমের কাহিনী এর মধ্যে দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। তা হলেও এর কাহিনীর আবেদন কোন দেশ-কালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, মানুষের মনের প্রতিটি কোণে এর আবেদন সমমূল্য। গতানুগতিক ভাবে প্রেমের রূপ তিনি চিত্রিত করেন নি, এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চিরাচরিত প্রেমকে এক অপূর্ব রূপ দিয়ে নতুন করে ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রন্থটি বাঙলায় অনুবাদ করেছেন শীলভদ্র ছদ্মনামের অন্তরালে বিখ্যাত প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পী শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অনুবাদও প্রশংসনীয়, অনন্যসাধারণ নিপুণতার পরিচায়ক এবং এক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। প্রকাশক—লেখক সমবায়, ৫৮ মনসাতলা লেন, খিদিরপুর। দাম—তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা মাত্র।

## জীবন সম্পর্কিত

বাঙলা দেশের কবিতা-পাঠকদের কাছে শুভময় বসুর নাম অজানা নয়। খ্যাতিমান কবি শুভময় বসুর কয়েকটি কবিতা একত্রে সংকলিত হয়ে উপরোক্ত গ্রন্থরূপ নিয়েছে। গ্রন্থের নামকরণ দেখেই বোঝা যায় যে কবিতাগুলি কোন পটভূমিকা অবলম্বন করে রচিত। জীবনকে কেন্দ্র করে কবির মনে যে অসংখ্য প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে সেই প্রশ্নগুলিকে কবিতার আকারে পাঠকদের সামনে তিনি তুলে ধরেছেন। বাস্তবকে কবিতার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কবি সফল হয়েছেন। অসংখ্য প্রশ্নের, জিজ্ঞাসার মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবন এক অভিনব বিচিত্রতর রূপলাভ করছে; সেই রূপবৈচিত্র্যকে যথোচিত দক্ষতার সঙ্গে সুনিপুণ ভাবে কবি কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কবিতাগুলি বলিষ্ঠ আবেদনে ভরপুর, বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে, কবির দৃষ্টিভঙ্গীটিও প্রশংসনীয়। প্রকাশক—বাঙ্ময়, ৪৮-১ হালদার পাড়া রোড, কালীঘাট, দাম—দু'টাকা মাত্র।

## মধু-মালঞ্চ

কয়েকটি ছোট গল্পের সমষ্টি। লেখিকা শ্রীমতী রেণা সোম সাহিত্যের আসরে নবাগতা কিন্তু তাঁর প্রথম গ্রন্থটিই তাঁর সাহিত্যিক দক্ষতার স্বাক্ষরবাহী। গল্পগুলি স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণস্পর্শী, অভিনব। তাঁর রচনায় প্রাণের, আন্তরিকতার ও নিষ্ঠার ছাপ পাওয়া যায়। তাঁর রচনা-কৌশল প্রশংসনীয়। পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করার মত ক্ষমতা গল্পগুলি রাখে। এই নবাগতার সাহিত্য-জীবনের ভবিষ্যতের ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কে আমরা আশা পোষণ করি। "মালঞ্চ", ১৯১১, গোপাললাল ঠাকুর রোড থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। দাম—এক টাকা মাত্র।

## শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে

[ চন্দননগরের সুপ্রসিদ্ধ দেশসেবী ও পৌরপ্রধান ]

সারা ভারতবর্ষ আজ যে সমৃদ্ধির মুখ দেখতে সক্ষম হয়েছে, তার পিছনে বাঙলার অবদান যে তুলনাহীন, এ কথা সূর্যের মত সত্য। বাঙলাদেশ বলতে আমরা যা বুঝে থাকি আসলে তা তো একটি সামগ্রিক রূপমাত্র। প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক সংজ্ঞানুসারে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে যে আসলে কয়েকটি অঞ্চলের সমষ্টিরই নামান্তর বাঙলাদেশ। এই অঞ্চলগুলি একত্রিত হয়েই বাঙলাদেশ নাম নিয়েছে। দেশের ও দশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সাধনায় এই অঞ্চলগুলির কীর্তিমান সন্তানরা যেতে উঠেছিলেন, তাঁদের কল্যাণেই সাধারণ্যে অঞ্চলগুলির প্রসিদ্ধি। এই যশস্বী পুরুষদের জীবনসাধনার পুণ্য আলোকে বাঙলাদেশ আলোকিত।

এই অঞ্চলগুলির মধ্যে চন্দননগরও একটি বিশিষ্ট ও প্রধান।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে

কয়েকটি অঞ্চলের খ্যাতির মধ্যে দিয়ে যেমন একটি রাজ্য বিকশিত হয়, তেমনই কয়েকটি অঞ্চল সাধারণ্যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে কয়েকটি পরিবারের কল্যাণে। এক একটি পরিবারে কয়েকটি লব্ধকীর্তি সন্তানের দেখা মেলে, যাঁদের যশঃসৌরভে সারা বংশ হয় আমোদিত এবং বংশের গর্বই হয় সেই অঞ্চলের গর্ব। সুতরাং এক একটি অঞ্চলের প্রসিদ্ধি নির্ভর করে সেই অঞ্চলস্থ পরিবারগুলির গৌরবময় কীর্তির উপর। চন্দননগর আজ বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায়-পরিবারের জন্যে, ঘটক-পরিবারের জন্যে, শেঠ-পরিবারের জন্যে, চন্দননগরের উন্নতির ক্ষেত্রে এবং চন্দননগর থেকে সারা দেশের মঙ্গলকর্মে সহায়তার ক্ষেত্রে এই পরিবারগুলির সদস্যদের অবদান অমূল্য। অবশ্য এ কথাও সমভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এ ক্ষেত্রে একক অবদানের মূল্যও কম নয়। গৌরবের আলোয় আলোকিত এই চন্দননগরের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানদের মধ্যে আমাদের আজকের দিনের আলোচ্য পুরুষ চন্দননগর পৌরসভার প্রাক্তন প্রধান, বিশিষ্ট নাগরিক, দেশপ্রেমিক, বিদ্যোৎসাহী, সমাজসেবী শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে মহাশয়ও অন্যতম।

চন্দননগরের বারাসত পল্লীর দে-পরিবারে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২১এ জানুয়ারী নারায়ণচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরের সেন্ট মেরিস ইনস্টিটিউশান (বর্তমানে যার নাম কানাইলাল বিদ্যামন্দির) এর ছাত্রতালিকাভুক্ত হলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ছাত্র হিসেবে যোগ দিলেন হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে। ঐ বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীর পরিচয়ে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রথম বাঙালী প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় ডাঃ বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হুগলী কলেজে পাঠ নেন, ঐ বছরে ঐ কলেজ থেকেই উত্তীর্ণ হলেন বি. এ. পরীক্ষায়। কলেজ-জীবনে সতীর্থরূপে পেলেন প্রাতঃস্মরণীয় বীর শহীদ কানাইলাল ও পশ্চিম-বাঙ্গালার বর্তমান অ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার সুধাংশুমোহন বসুকে।

বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তদানীন্তন দুপ্লে কলেজে শিক্ষা দেবার ভার পেলেন এবং অসাধারণ প্রতিভার জোরে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ঐ মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। তাঁর শিক্ষাদান ও শিক্ষা পরিচালন-কুশলতায় প্রীত হয়ে ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঐ কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষের আসনে অধিষ্ঠিত করেন (১৯৩৩)। তিন বছর পর তিনি স্থায়িভাবেই উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময়ে চন্দননগরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিদর্শক ও উপদেষ্টার কাজও তাঁকে চালাতে হোত। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, ফরাসী সরকার পরিচালিত চন্দননগরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষের পদে নারায়ণচন্দ্রের আগে কোন বাঙালীকে দেখা যায় নি। ঐ পদে নারায়ণচন্দ্রের নিয়োগই বাঙালীদের মধ্যে প্রথম, তার আগে ঐ সম্মানসূচক ও দায়িত্বপূর্ণ আসনে ফরাসী কিংবা কোন মাদ্রাজী শিক্ষাবিদকে সমাসীন দেখা যেত। ঐ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ ৩৭ বছর নারায়ণচন্দ্রের সেবা লাভ করেছে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর চন্দননগরের পার্শ্ববর্তী গড়বাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সদস্যদের অনুরোধে নারায়ণচন্দ্র ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে যোগ দেন ও তিন বছর কাল প্রতিষ্ঠানটির সেবা করেন। চন্দননগরের বিশিষ্ট মহিলা উচ্চ বিদ্যালয় কৃষ্ণভামিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরের সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে নারায়ণচন্দ্র দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন ও বিদ্যালয় সংক্রান্ত

দকল বিষয়ে প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিতপ্রবর পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয়কে প্রভূত সহায়তা করেন। চন্দননগর কলেজের পুনঃ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও নারায়ণচন্দ্রের কাছ থেকে প্রভূত ও সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা লাভ করেছিলেন চন্দননগরের প্রসিদ্ধ জননায়ক স্বর্গীয় চারুচন্দ্র রায়। চন্দননগরে যখন বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল (১৯৩৭) তার অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সম্পাদকরূপে দেখা গেল নারায়ণচন্দ্রকে।

বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাত বছর পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষাতেও নারায়ণচন্দ্র সগৌরবে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আনুগত্য স্বীকারের সময় তিনি ফরাসী নাগরিক, এই সত্যস্বীকারের ফলে তাঁর পক্ষে আইনকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি এবং নিজেকে শিক্ষাবিস্তারের কাজেই পুরোপুরি ভাবে উৎসর্গিত করলেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর অনন্ত করুণার আধার। তিনি যা করেন তা সমস্তই মঙ্গলের পরিচায়ক। তাঁর প্রতিটি কর্ম জন্ম দেয় সর্বৈব কল্যাণকে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরের মেয়ররূপে ঘোষিত হ'ল নারায়ণচন্দ্রের নাম। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর কার্যকাল সমাপ্ত হবার পর পরলোকগত নেতা চারুচন্দ্র রায়ের বিশেষ অনুরোধে আরও তিন বছর তিনি চন্দননগরের ডেপুটী মেয়রের আসন অলঙ্কৃত করে থাকেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার পৌরসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন অনুসারে চন্দননগর মিউনিসিপাল করপোরেশন গঠিত হ'ল তখন তার প্রথম মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হলেন নারায়ণচন্দ্র দে। তাঁর মেয়র পদে অভিষিক্ত থাকাকালীন তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে চন্দননগরে জগদ্গুরুর পুণ্যপদার্পণ ঘটলে নগরবাসীর পক্ষ থেকে নারায়ণচন্দ্র তাঁকে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে তাঁকে নিবেদন করেন সশ্রদ্ধ প্রণাম (১৯২৬)। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত চন্দননগর পুস্তকাগারের উন্নতির ইতিহাসেও চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে নারায়ণচন্দ্রের নাম।

ফরাসী চন্দননগরের স্বাধীন ভারতভুক্তির পূর্বমুহূর্তে শহরে ভারতভুক্তির স্বপক্ষে যে ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাতে নারায়ণচন্দ্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। এর পর পশ্চিম-বাঙলার রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে চন্দননগর কি'রূপ লাভ করবে এ সম্বন্ধে জনমত জানার উদ্দেশ্যে ভারত-সরকারের নির্দেশে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী স্বর্গীয় ডাঃ অমরনাথ ঝা চন্দন নগরে এলে তাঁর সামনে নারায়ণচন্দ্রেরই সুদক্ষ নেতৃত্বে সমগ্র চন্দননগরবাসীর দাবী উপস্থিত করা হ'ল আর প্রধানতঃ এরই ফলস্বরূপ বিশেষ ক্ষমতাবিশিষ্ট মিউনিসিপাল করপোরেশান গঠিত হ'ল। দেশের ও দশের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই যাদের লক্ষ্য, সেই রকম বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেযুক্ত আছেন চন্দননগরের অন্যতম গৌরব কর্মবীর নারায়ণচন্দ্র দে মহাশয়।

## শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[ বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও ভূতপূর্ব পৌরপাল ]

বাল্যকালে কঠোর দারিদ্র্যের সম্মুখীন হ'তে হয় যাঁকে, ছেলেবেলায় নিজের পড়ার খরচ যাঁকে নিজে থেকে জোগাড় করতে হয়, এমন কি সংসারের গুরুদায়িত্ব ভার যাঁকে গ্রহণ করতে হয়, পরিশ্রম নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ উত্তরকালে যখন তিনি প্রভূত সম্মান, প্রসিদ্ধি ও অর্থসম্পদের অধিকারী হন, তখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিজের সংগ্রামময় অতীতের কথা স্মরণ করে অনাথ, আতুর, অভাবী ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর দরদ, সহানুভূতি ও অনুরাগ অবর্ণনীয়। তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রামের ফল যেন তাদের মধ্যেই তিনি বণ্টন করে দিতে চান। তাদের জীবনের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই যেন তাঁর প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য ও ধর্ম। তাদের মুখে হাসি দেখলেই তাঁর আনন্দ।

কলকাতার ভূতপূর্ব পৌরপাল ও সুপ্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কর্মময় জীবনের সঙ্গে জড়ানো কাহিনীগুলি শুনতে শুনতে উপরোক্ত কথাগুলিই বার বার মনে পড়ছিল।

১২৯৪ সালের পৌষ সংক্রান্তিতে (১৮৮৮র জানুয়ারী মাসে) মাতুলালয় ধলতিতায় (বসিরহাট মহকুমায়) শ্রীমুখোপাধ্যায় ভূমিষ্ঠ হন। খোড়গাছী গ্রামের বিশিষ্ট পণ্ডিতবংশের ৺বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পাঁচটি ছেলের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান আর মা ৺কুমুদিনী দেবী ছিলেন জমিদারবংশের দুহিতা। দেবেন্দ্রনাথ গ্রামীন বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন টাকী সরকারী বিদ্যালয়ে পড়েন ও সাউথ সাবারবান স্কুল থেকে ১৯০৭ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯০৯ সালে জেনারেল এসেম্বলী ইনষ্টিটিউশান থেকে আই, এ, ১৯১১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স সহ বি, এ ও পরে উক্ত বিষয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকেই এম, এ, পাশ করেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও ভাষাচার্য ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিখ্যাত আইনজ্ঞ ডক্টর শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিভিলিয়ান এস, এন, মোদকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
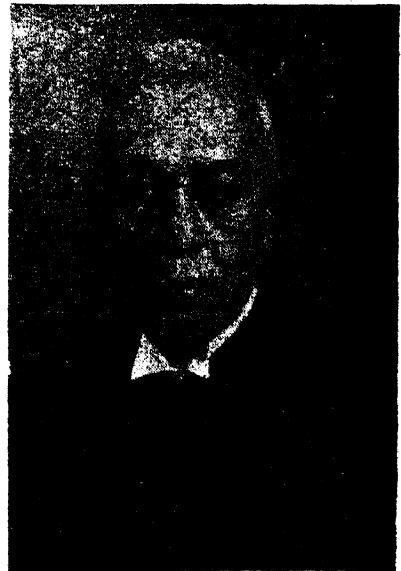
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৯১৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ থেকে বি, এল পাশ করে তিনি আলীপুর বারে যোগদান করলেন। এম, এ, পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগেই বাংলার প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষাবিদ আচার্য্য গিরিশচন্দ্র বসু বঙ্গবাসী কলেজে দেবেন্দ্রনাথকে অধ্যাপক হিসাবে গ্রহণ করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি সেখানে সিনিয়র অধ্যাপক হন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাস ও সুধীবর অধ্যাপক ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

১৯২১ সালে কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়লেন এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বহু দিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি হিন্দুমহাসভায় যোগদান করে তার প্রতিনিধি হিসাবে কলকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হলেন। ১৯৪৫ সাল তিনি সদ্য লোকান্তরিত মিঃ ডি, জে, কোহেনকে পরাজিত করে কলকাতা মহানগরীর মেয়রের পদে অভিষিক্ত হলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সেই সময়কার কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল দলের কাছ থেকেও তিনি পূর্ণ সমর্থন পান। ১৯৫২-৫৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ আইন-পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্য ছিলেন। ১৯৪৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভার সম্পাদক, ১৯৫৪-৫৫ সালে তার কার্য্যকরী সভাপতি এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে তার সভাপতি ছিলেন। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সহঃ-সভাপতি হিসাবে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঐ প্রতিষ্ঠানকে সুসংবদ্ধ করেন। ১৯৪৬ সালে বরিশাল সম্মেলনে তাঁহার প্রদত্ত ভাষণ উচ্চপ্রশংসিত হয়। নোয়াখালী দাঙ্গার সময় নেতা শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সহ শ্রীমুখোপাধ্যায় বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং সেখানে গান্ধীজীর সঙ্গে শান্তি-স্থাপনা সম্বন্ধে তাঁদের বহু আলোচনা হয়। দেবেন্দ্রনাথ কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের enrolled এ্যাডভোকেট—আলীপুর বার এসোশিয়েশনের একাদিক্রমে চার বছর সভাপতি এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ Lawyers Association-এর নির্ব্বাচিত সভাপতি ছিলেন। যে মামলা পুরাপুরি মিথ্যার উপর রচিত তাঁর মনে হয়—তা তিনি গ্রহণ করেন না—বরেণ্য দেশনেতা স্বর্গতঃ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথায় তিনি জানালেন যে, তাঁর আদর্শবাদ তাঁকে (দেবেন্দ্রনাথকে) উদ্বুদ্ধ করে। কারণ শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী জননায়ক। ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গার সময়ে শ্যামাপ্রসাদ দেবেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় মুসলমান-অধ্যুষিত বহু বস্তী উপদ্রবের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। বীর সাভারকারের স্বদেশ-হিতৈষণার ঔৎসুক্য সর্ব্বজন পরিচিত এবং তিনি হিন্দুজাতির মঙ্গলের কথা সর্ব্বসময় চিন্তা করতেন বলেই শ্রীমুখোপাধ্যায় মনে করেন। ডাঃ বি এন, মুঞ্জেও সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মিশতেন এবং একজন বিশিষ্ট গঠনমূলক কর্ম্মী ছিলেন—এটি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

পাঁচ ভাইকে মানুষ করার জন্য বাবা যে কি রকম কৃচ্ছ্রসাধন বরণ করে নিয়েছিলেন সে কথা বলার সময় লক্ষ্য করলুম দেবেন্দ্রনাথের চোখ অশ্রুপূর্ণ। গ্রামীন বিদ্যালয়ের সামান্য বেতনের পণ্ডিত মহাশয় কেবলমাত্র বস্ত্র পরিধান করতেন। ১৯০৭ সালে তিনি শ্রীমতী হেমলতা দেবীকে বিবাহ করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হারালেন। তাঁর পঞ্চমপুত্র শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কলকাতার বেতার-কেন্দ্রের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও বহু জনের সুপরিচিত।

## শ্রীনীরেন দে

[লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ও বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ]

মাত্র ন' বছরের একটি বালক! সহায়-সম্বলহীন, অর্থসম্পদ তার নেই বটে কিন্তু তার চেয়েও অনেক দাম যে সম্পদের সেই সম্পদের সে অধিকারী। অধ্যবসায়, সততা, নিষ্ঠা সর্বোপরি মনোবল। এই মূলধনের সাহায্যেই পরবর্ত্তী জীবনে প্রতিষ্ঠার আলো দেখতে পেয়েছিলেন স্বর্গীয় হেমচন্দ্র দে। অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী কলেজের অধ্যাপকরূপে বাঙলার শিক্ষাবিভাগে যোগ দেন। পরে এই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যখন গৌরবময় কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করলেন তখন তিনি রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ। আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ডাঃ সুরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মেয়ে স্বর্গীয়া সুশীলাবালা দের সঙ্গে হেমচন্দ্র আবদ্ধ হলেন পরিণয় সূত্রে

শ্রীনীরেন দে

এঁদের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ডাঃ হীরেন দে, এফ, আর, সি, এস, ইংল্যাণ্ডের ন্যাশানাল হেলথ সার্ভিসের কনসালট্যাণ্ট, মধ্যম শ্রীধীরেন দে কলকাতার হাইকোর্টের কৃতী ব্যারিষ্টার এবং কনিষ্ঠ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ, মানবদরদী, সমাজসেবী, খ্যাতনামা নাগরিক শ্রীনীরেন দে। ১৯০৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর নীরেন দের জন্ম।

নীরেন দে প্রায় সব ব্যাপারেই যেন ব্যতিক্রম। খেলাধুলা এবং পড়াশুনায় যুগপৎ পারদর্শী ছাত্র খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু

শ্রীযুক্ত দে ছিলেন তাই। ছাত্রাবস্থায়ই বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদরূপে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শ্রীযুক্ত দে যখন হেয়ার স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর বয়স মাত্র ১২ বছর। তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সর্বনিম্ন বয়সের সীমা নির্দ্ধারিত ছিল। হিসাব করে যখন দেখা গেল নীরেন দে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় বয়সের সীমায় পৌঁছতে পারছেন না পিতৃদেব তখন তাঁকে হেয়ার স্কুল ছাড়িয়ে ভর্তি করলেন সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। সেই স্কুল থেকেই মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে সিনিয়ার কেমব্রীজ পাশ করেন। ১৯২৪ সালে সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলে আবার সর্বনিম্ন বয়ঃসীমার প্রশ্ন নীরেন দের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮ বছরে পৌঁছবার জন্য তাঁকে এক বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৯২৯ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উচ্চস্থান অধিকার করে বি, এ, ( ইংরাজীতে অনার্স সহ ) পাশ করেন। ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে নীরেন দে পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষালাভের আশায় যাত্রা করেন ইংলণ্ড অভিমুখে। ১৯৩০ সালে যোগ দেন কেমব্রীজে ১৯৩২ সালে ইতিহাসে ট্রাইপাস লাভ করেন। ইতিমধ্যে ব্যারিষ্টারী পড়া শেষ করে ১৯৩৩ সালে যোগ দেন কলকাতার হাইকোর্টে।

নীরেন দের আইন-ব্যবসার ইতিহাসও বিচিত্র। যে ব্যক্তি একদিন নয়, বছর চেষ্টা করেও তেমন কোন সুবিধা করতে না পারার ক্ষোভে হাইকোর্ট ত্যাগ করে কানপুরে সরকারী চাকুরীতে যোগ দিয়েছিলেন, আজ তিনিই কলকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার—আজ তাঁকেই সময়ের অভাবে ব্রিফ ফিরিয়ে দিতে হয়। আজ কে বিশ্বাস করবেন যে ১৯৪২ সালে এই নীরেন দে-ই চলে গিয়েছিলেন কানপুরে চাকুরী করতে? অবশ্য ১০ মাসের বেশী এই বিচিত্র মানুষটি কানপুরে টিকতে পারেন নি, সরকারী প্রতিষ্ঠানের অসাধুতা ও অক্ষমতার ভয়ঙ্কর রূপ দর্শনে শংকিত নীরেন দে বাধ্য হয়ে আবার ফিরে আসেন কলকাতা হাইকোর্টে। তারপর থেকেই ভাগ্যবিধাতা তাঁর প্রতি প্রসন্ন। কঠোর পরিশ্রম করে ক্রমে ক্রমে তিনি হাইকোর্টে আপন আসন দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন।

যেমনি বিচিত্র তাঁর আইন-ব্যবসার ইতিহাস, তেমনি স্বতন্ত্র তাঁর আইন-ব্যবসার পদ্ধতি। গোটা ব্রিফটা নিজে না পড়তে পারলে তিনি সন্তুষ্ট নন। আবার সমস্ত কেসটা ভাল করে বুঝে না নিয়ে কোর্টে হাজির হতেও তিনি রাজী নন। নীরেন দে বলেন, সমস্ত মামলাই আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং সমস্ত মামলাই আমার জীবনে সমান উল্লেখযোগ্য। মামলার ক্ষেত্রে আমার কাছে ছোট বড় বলে কিছু নেই—সবই সমান। নিজে সব মামলার আগাগোড়া বুঝে নিতে চান বলেই নীরেন দের চেম্বারে কোন জুনিয়ার নেই। অবশ্য নিজে তিনি অনেক খ্যাতনামা ব্যারিষ্টারের জুনিয়াররূপেই কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ওয়ালটার পেজ, ৺শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺শরৎচন্দ্র বসু, বি, সি ঘোষ, পি, আর, দাশ, এস, এম, বসু, হেমনাথ সান্যাল প্রভৃতি ধুরন্ধর আইন-রথীদের নাম। আইন-ব্যবসা ছাড়াও ক্রীড়া-জগতের সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবে জড়িত। তিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ। নীরেন দে গত তিন বৎসর যাবৎ আই, এফ, এর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত। অধুনালুপ্ত ( প্রায় ) এন, সি, সির তিনি ছিলেন সহ-সভাপতি। আন্তঃরাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তিনি বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

আজকের দিনের সমাজ দুর্নীতির নাগপাশ বন্ধনে বন্দী হয়ে যাচ্ছে। শ্রীযুক্ত দের মতে এর বন্দিদশা থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব নয় তো কোন বিশেষ বিপ্লব। তিনি মনে করেন যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব আজ যদি আপোষহীন সংগ্রাম করেন তা হলে দেশ ও সমাজ দুর্নীতির বিষাক্ত পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবে, যদি তা সম্ভব না হয় তা হলে কোন বিশেষ বিপ্লবের সাহায্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান চালালে দুর্নীতির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। "ঘুচে যাক্ যত সব সামাজিক অসাম্য"—এইটিই নীরেন দের যেন মনের কথা। অপরের দুঃখ-দৈন্য তাঁকে খুব বেশী ব্যথা দেয়। তবে সে দুঃখ দৈন্য দূর করার ব্যাপারে বিদেশকে অনুকরণ করে চলতে হবে, এটাও তিনি পছন্দ করেন না। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাও শ্রীযুক্ত দের আছে। তবে তাঁর সে ইচ্ছা আজও সফল হয়ে ওঠেনি।

নীরেন দের স্ত্রী শ্রীমতী অ্যানাব্রিটা দে সুইডিশ মহিলা। শ্রীযুক্ত দের এক পুত্র ও এক কন্যা। বর্তমানে তাঁরা ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করছেন।

## সুষমা সেন

[ ভারতীয় লোকসভার সদস্যা ও বহির্বঙ্গে সুখ্যাতা বাঙালী নেত্রী ]

১৮৮২ সালের কথা। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি ও বাঙলার দিকপাল সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্তের মেয়ের বিয়ে। শহরের বহু জ্ঞানি-গুণীর সমাগমে অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে গৃহ, দেখা গেল দ্বারদেশ দিয়ে প্রবেশ করছেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। গৃহস্বামীর পক্ষ থেকে একজন এগেন তাঁকে মাল্যভূষিত করতে, অদূরে দণ্ডায়মান এক তরুণের গলায় সেই মালা পরিয়ে দিয়ে ঋষি বঙ্কিম বললেন—এ মালা এখন থেকে এরই প্রাপ্য। এ ঘটনা পরবর্তীকালে সর্বজনের কাছেই সুবিদিত। যে বিবাহসভাকে কেন্দ্র করে সেদিন প্রৌঢ় বঙ্কিম তখনকার দিনে নব-অঙ্কুরিত প্রতিভা পরবর্তীকালে জগত-কবিসভায় বাঙালীর গর্ব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়ের ঔদার্য দিয়ে সস্নেহ অভিনন্দন জানিয়ে সর্বজন সমক্ষে তাঁর প্রতিভার যথাযথ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন—সেই বিবাহ-সভার পাত্রীর নাম স্বর্গীয়া কমলা বসু আর পাত্রও ছিলেন বাঙলা দেশের তথা ভারতের এক স্মরণীয় পুরুষ। আজকের দিনে জগত প্রসিদ্ধ টাটা ইস্পাতের কারখানার গোড়াপত্তনের ইতিহাসের পথিকৃৎ ভারতের বরেণ্য ভূতত্ত্ববিদ স্বর্গগত প্রমথনাথ বসু। কমলা দেবী ও প্রমথনাথের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। নয় ছেলে-মেয়ের মধ্যে তৃতীয় সন্তান ও বড় মেয়ে আমাদের আজকের দিনের আলোচ্যা বিহারের প্রসিদ্ধা জননেত্রী, সমাজসেবিকা, শিক্ষা বিস্তারের কার্যে সহায়িকা, ভারতীয় লোকসভার সদস্যা সুষমা সেন মহাশয়া। প্রমথ-কমলার অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে লেডী প্রতিমা মিত্র ও ছেলেদের মধ্যে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ অমরনাথ বসু ( রাজা বসু

নামে সমধিক প্রসিদ্ধ ) ও যশস্বী চিত্রপরিচালক, চিত্রকর, অভিনেতা শ্রীমধু বসুর নাম সমধিক উল্লেখনীয়।

রমেশচন্দ্রের বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে ১৮৮৭ সালের ২৫শে এপ্রিল সুষমা দেবীর জন্ম। ছেলেবেলায় দাদামশায়ের কাছে সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শিখে তিনি কলিকাতা লরেটোয় ও দার্জ্জিলিঙে পড়ে সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ পরীক্ষা দিলেন। ভারতীয় ও বিদেশী সঙ্গীত সম্বন্ধে পাঠ নিলেন বাবা, মা, রবীন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী এবং সত্যভূষণ গুপ্তর কাছে। ১৯০৪ সালে খ্যাতিমান আইনবেত্তা পরলোকগত ডক্টর প্রশান্তকুমার সেনের সঙ্গে বিবাহের পর লণ্ডনের কুইন্‌স ও কেম্‌ব্রিজের নিউহেম কলেজদ্বয়ের Casual ছাত্রী হিসাবে বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে প্রচুর জ্ঞানলাভ করেন। ব্রহ্মানন্দ-সখা ও ধর্ম্মপ্রচারক পরিকার পুণ্যশ্লোক প্রসন্নকুমার সেন সুষমা সেনের পূজনীয় শ্বশুর মহাশয়। প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন এঁর দাদাশ্বশুর। ১৯০৫ সালে তিনি ভিক্টোরিয়া ইনঃ-এর নীতি বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন ও পরে উক্ত ইনঃ-এর সম্পাদিকা হিসাবে নারীশিক্ষার প্রবর্দ্ধন করেন। ১৯১০ সালে তিনি স্বামীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে Mrs. Pankhurst ও Mrs P. Lawrence পরিচালিত নারী আন্দোলনে ( Womens Suffragetter ) সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ভারতে ফিরে তিনি স্বর্গীয়া সরলা রায় পরিচালিত 'মহিলা সমিতি'র যুগ্ম সম্পাদিকা হিসাবে নারীশিক্ষা ও নারী আন্দোলনে সঙ্গে জড়িতা হন। ১৯১৬ সালে পাটনা হাইকোর্ট স্থাপিত হলে স্যার আলী হাসান ইমাম একমাত্র বাঙ্গালী আইনজীবী হিসাবে ডক্টর সেনকে সেখানে নিয়ে যান। পূজনীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রশান্তকুমারকে কলকাতায় থাকার কথা বলেন এবং সুষমা দেবীও স্থান পরিবর্ত্তনে অসম্মতা ছিলেন। ডাঃ সেন পরে সেখানে চার বার বিচারপতি হিসাবে কাজ করেন কিন্তু প্রকাশ যে, বন্ধু ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অনুরোধে একবার খাদি প্রদর্শনী উদ্বোধন করায় তিনি স্থায়ী বিচারপতি হতে পারেন নি। ১৯৩০ সালে তিনি ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের দেওয়ান নিযুক্ত হন। বিহারে থাকাকালীন ১৯২১ সালে সুষমা দেবী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মাতৃস্মৃতি জড়িত "অঘোর-নারী-সমিতি"র সম্পাদিকা ও পরে সভানেত্রী হন। সেখানে আনন্দবাজার পত্তন, মাঘোৎসব পালন, অঘোর-নারী-শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন, শিশুকল্যাণ, মাতৃমঙ্গল, মিসেস কাজিন্‌সের সঙ্গে বিহারে সর্দা আইনের পক্ষে জনমত গঠন, নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের আয়োজন, Age of consent কমিটির নিকট রক্ষণশীল বিহারী নারীদের সাক্ষী হিসাবে হাজির করা, পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি, গান্ধীজীর খাদি আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ এবং ময়ূরভঞ্জে নারীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি তাঁর কর্ম্মজীবনের উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি।

সুষমা সেন

১৯৩৩ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে গিয়ে রয়েল কমিশনের কাছে ভারতীয় নারীদের ভোটাধিকার দেওয়ার কথা উত্থাপন করেন। পাটনা পৌর-সভার একমাত্র নারী সদস্যা থাকাকালীন তদানীন্তন বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী সেনকে স্থানীয় বিধান সভা নির্ব্বাচনের প্রার্থী মনোনীতা করেন। ১৯৩৮-৪৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি তার নির্ব্বাচিতা সদস্যা ছিলেন। ১৯৫২ সালে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে তিনি ভাগলপুর থেকে লোকসভার সদস্যা নির্ব্বাচিতা হন। সেই সময় তিনি লোকসভার চেয়ারম্যান প্যানেল, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, সেচ ও শক্তি, স্বাস্থ্য, এষ্টেটডিউটি বিল, বিশেষ বিবাহ, এগার করপোরেশন, জীবন-বীমা, শিশুরক্ষা বিল এবং পরিকল্পনা কমিশনের সামাজিক বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা ছিলেন। বিহারে সেচ, বিদ্যালয় স্থাপন, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানা জনহিতকর কর্ম্ম তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে তিনি সংসদীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতমা মহিলা সদস্যা হিসাবে চীনদেশ পরিভ্রমণ করেন। বিহার ভূমিকম্প-পীড়িত আর্ত্ত-ত্রাণ সুষমা দেবীর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাল্যকাল থেকে তিনি বাবা মার সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, হিমালয়ের দুরধিগম্য স্থান সমূহ, বর্ম্মা প্রভৃতি দেশে ভ্রমণে অভ্যস্তা হন। সেই জন্যই পরবর্ত্তী জীবনে 'ভবঘুরে'র মত তিনি দু'বার গ্রেট ব্রিটেন, জার্ম্মাণী অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, শ্যামদেশ, সিংহল প্রভৃতি স্থানে গিয়ে সে সব দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নারী জাগরণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন।

ডক্টর সেন লিখিত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় পুস্তক ( রাজা রামমোহন থেকে কেশবচন্দ্র সেন পর্য্যন্ত ) তিনি প্রকাশ করেন। সঙ্গীত ছাড়া অভিনয়েও শ্রীমতী সেন দক্ষ ছিলেন। ছোটবেলায় দাদামশায় ও বাবা-মার উৎসাহে নিজেদের মধ্যে অভিনয় করেছেন প্রচুর। ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সুষমা দেবীর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে আছে।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

## আঠারো

বার্নার্ড শ'র Pygmalion অপূর্ব শিল্পকর্ম। প্রথম অঙ্ক যদি পূর্বরঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করি, তাহলে নাটকটির বাকী চারটি অঙ্ক দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। দুটি খণ্ডই গ্রীক উপাখ্যানের পিগমালিয়ন উপকথার সঙ্গে খাপ খায়। গ্রীকপুরাণে সাইপ্রাসের এক রাজা এক রমণীর দুষ্টাচারে নারী-জাতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তিনি এক হস্তিদন্তনির্মিত প্রতিমা তৈরী করে স্বয়ং তারই প্রেমে পড়েন এবং মূর্তিটিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য দেবী ভেনাসের কাছে প্রার্থনা জানান। সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হলে তিনি শেষে মূর্তিটিকেই বিবাহ করেন।

বার্নার্ড শ'-কৃত নাটকে ফুলওয়ালী প্রথম অংশে ডাচেসে রূপান্তরিত হয়, আর দ্বিতীয় অংশে দেখা যায় সেই ডাচেসই রক্ত-মাংসের নারীত্বে পরিবর্তিত হয়েছেন। এই দুটি অংশই প্রধান, এ্যামবাসাডারের নিমন্ত্রণ তাই অতি নাটকীয় মনে হয়। Pygmalion সংগঠনের দিক দিয়েও সর্বতোভাবে নাটকীয়। War and Peace উপন্যাসে নাটাশা বালিকা বয়স থেকে নারীত্বে পৌঁছায় পাঠকের অজ্ঞাতসারে আর Pygmalion নাটকের এলিজার ক্রমবিকাশ ধাপে ধাপে। অঙ্কের পর অঙ্কে।

Pygmalion সম্পর্কে বার্নার্ড শ'র মমতা এবং আগ্রহ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এই নাটকের রিহার্সেলে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রতিদিন তিনি যথাসময়ে হাজির হয়ে প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি নজর রাখতেন। কোনো এক দৃশ্যের মধ্যপথে মাঝে মাঝে ট্রিকে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে যেতে হত, ফিরে এসে তিনি দেখতেন বার্নার্ড শ' তাঁর 'বদলী'কে দিয়েই মহলা চালিয়ে গিয়েছেন। ট্রি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে আবার গোড়া থেকে সুরু করার জন্য জেদ ধরতেন। বার্নার্ড শ' আপত্তি না করলেও অসন্তোষ প্রকাশ করতেন। শ' লিখেছেন Pygmalion নাটকের এক অংশে নায়িকা উত্তেজিত হয়ে নায়কের মুখে তার জুতা ছুঁড়ে রাগ প্রকাশ করেন। প্রথম বার রিহার্সেলের সময় আমি একজোড়া অতি নরম ভেলভেটের চটি সংগ্রহ করেছিলাম। আমি জানতাম, মিসেস ক্যামবেলের লক্ষ্য অব্যর্থ এবং অমোঘ। ট্রির মুখে নির্ভুল ভাবে সেই জুতা নিক্ষিপ্ত হল। কিন্তু আত বিড়ম্বনাময় ফল হল। ট্রি ভুলে গেলেন এটি নাটকের অংশভুক্ত, মনে করলেন মিসেস ক্যামবেল সহসা ঘৃণা এবং ক্রোধবশে ইচ্ছা করেই এর জঘন্য আক্রমণ করলেন। শারীরিক আঘাত তেমন না ঘটলেও, নিদারুণ মানসিক আঘাত পেলেন ট্রি।

তিনি কান্নায় ভেঙে পড়ে পাশের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন। আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলাম, আর থিয়েটারের সবাই ভীড় করে তাকে প্রবোধ দিতে লাগল। সবাই বোঝালো ঘটনাটা নাটকেরই একটা অংশ, কেউ কেউ 'প্রমটবুক' এনে দেখালো তাদের উক্তি সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এমনই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন ট্রি, যে মিসেস ক্যামবেলকে অনেক অনুনয় বিনয় করে তবে আবার ট্রিকে দিয়ে সেদিনের রিহার্সেল শেষ করতে হয়। এর ফলে মিসেস ক্যামবেল বিশেষ সতর্ক হয়ে যাতে আর তাঁর গায়ে চটি জুতা না পড়ে তার চেষ্টা করতেন। ফলে এই দৃশ্য ষ্টেজের ওপর তেমন স্বাভাবিক হয়ে জমেনি।

বার্নার্ড শ' শুধু যে তাঁর অধিকারভুক্ত বিভাগেই মাথা ঘামাতেন তা নয়। সব কিছুতেই কথা বলতেন। কেউ কিছু আপত্তি করতো না। একদিন এত বেশী মাত্রায় সর্ববিষয়ে টিক-টিক করতে সুরু করলেন যে, অবশেষে বিরক্ত হয়ে ট্রি ব্যঙ্গ করে বললেন—

মিঃ শ' আমার মনে হয়, আমি হয়ত শুনে থাকবো, বা কোথায় পড়ে থাকবো, যে এই থিয়েটারে বর্তমান কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় আপনি আসার আগেও নাটক প্রযোজিত হয়েছে এবং অভিনীত হয়েছে। আপনার মতে হয়ত তা সম্ভব নয়। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হয়েছে বলতে পারেন?

বার্নার্ড শ' সোজাসুজি সাধারণ মানুষের মত বললেন—কি জানি, বলা কঠিন, আমার মনে হয়, আপনারা বিজ্ঞাপন দিতেন আজ সাড়ে আটটায় অভিনয় হবে, তারপর গোড়াগোড়ায় প্রবেশমূল্য নিতেন। সুতরাং যেন-তেন-প্রকারেণ অভিনয় করতেও হত। এ ছাড়া আর কি জবাব হতে পারে বলুন?

এই সময় মিসেস ক্যামবেল তাঁর আসন্ন বিবাহের ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, নিয়মিত ভাবে রিহার্সেল দিতেন না, যান্ত্রিক ভঙ্গীতে মুখস্থ পার্ট বলে যেতেন। বার্নার্ড শ'র চিঠিপত্রের জবাবও দিতেন না। নাটকে ব্যবহৃত আসবাবপত্র ইতস্তত টেনে সরিয়ে দিতেন। শ' শেষকালে সেগুলি ষ্টেজের সঙ্গে স্ক্রু-দিয়ে এঁটে দিলেন। ট্রি মাঝে মাঝে ক্ষেপে গিয়ে শূন্যমার্গে হাত উঠিয়ে চীৎকার করতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! মিসেস ক্যামবেল প্রথম অভিনয় রজনীতে চমৎকার ভাবেই তাঁর ভূমিকাভিনয় করে গেলেন।

এই নাটক পরবর্তী কালে চিত্ররূপ দিয়েছেন গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল, সেই কাহিনীও চমকপ্রদ।

সম্পূর্ণ অপরিচিত ভ্রাম্যমান এক যুবক হোয়াইটহল কোর্টে বার্নার্ড শ'র সঙ্গে দেখা করলেন। নিঃসম্বল এবং পরিচয়হীন সেই যুবকের অদৃষ্টটা ভালো—বার্নার্ড শ'র সঙ্গে এক শুভক্ষণে তাঁর দেখা হয়ে গেল। শ'র মনটা তখন প্রসন্ন ছিল। শ' দম্পতি এই হাঙ্গেরীর যুবকের কথায় মোহিত হয়ে গেলেন। যেন এক মূর্তিমান ক্রীতদাস,

যেন প্রাচ্যদেশীয় উপকথায় বর্ণিত গুরুচরণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ অনুগত-ভক্ত এই ধরণের শিষ্যের সন্ধানেই যেন বার্ণার্ড শ' এত কাল পথ চেয়ে বসেছিলেন।

গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল সময় বুঝে তার বক্তব্য নিবেদন করল। তার অন্তরের বাসনা। গুরুদেবের নাটকের চিত্ররূপ দান করবে। উৎসাহ, উত্তেজনায় উৎফুল্ল গ্যাব্রিয়েল বলল—গুরুদেব, এই ম্যাজিকের বলে আপনার নাটক, আপনার বাণী পৃথিবীর দূরতম প্রান্তরে পৌঁছাবে। গুরুদেব, এখন আপনি গাঁয়ের লোকের কাছে সোজাসুজি কথা বলবেন, চাষী, মজুর, খনিশ্রমিক, কলের কুলি সবাই আপনার কথা শুনতে পাবে, আপনার অমৃতবাণীর সন্ধান পাবে। দেখবেন গুরুদেব, সে কি ব্যাপার!

শ'-দম্পতিকে গ্যাব্রিয়েল একা থাকতে দেয় না, দিনরাত ছায়ার মত ঘিরে আছে, তাঁদেরও এতটুকু বিরক্তি নেই, আপত্তি নেই। আর গল্প যা বলে, অদ্ভুত, অপূর্ব, অবিশ্বাস্য। চমকপ্রদও বটে।

গ্যাব্রিয়েলের জন্ম নাকি এক রাজপুত্র ও বেদেনীর বিবাহের ফল। প্রথম মহাযুদ্ধে সে অদৃশ্যভাবে ঘোড়সওয়ার হয়ে শত্রুসৈন্যের মধ্যে অবলীলাক্রমে ঘুরেছে, এবং সেই একমাত্র প্রাণী যে অক্ষত শরীরে ফিরে আসতে পেরেছে।

চীনদেশে গিয়েছিল একটা বড়ো দরের ফিল্মে কনট্রাক্ট পেয়ে, এমন সময় বাণী এসে পৌঁছাল কানে, বাণী নয় দৈববাণী। যাও এখনি ভক্ত বার্ণার্ড শ'র কাছে যাও, তাঁর কাছেই পাবে তোমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই আপনার কাছে এলাম গুরুদেব!

বার্ণার্ড শ' সব শোনেন। কোনো কথা বলেন না, হ্যাঁ কিংবা না কিছুই নয়। আর গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল প্রতিদিন এমনই আষাঢ়ে গল্প বার্ণার্ড শ'কে শুনিয়ে শূন্যহাতে হ্যামারস্মীথের এক সস্তার হোটেলে পরিবেশকের কাজ করে দুবেলা দুমুঠো অন্নের যোগাড় করে নেয়।

অবশেষে মরিয়া হয়ে একদিন বার্ণার্ড শ'কে বলল—আর ত' আমি অপেক্ষা করতে পারি না, পাঁচ দিনের মধ্যে যদি আপনি কোনো কথা না দেন ত আমি তিব্বতে চলে যাবো। শুক্রবার তেরই ডিসেম্বর বেলা চারটে পর্যন্ত আপনার অপেক্ষায় থাকবো, আপনার বাণীর অপেক্ষায়।

সেই দিন ঠিক বেলা চারটের সময় বার্ণার্ড শ'র কাছ থেকে এলো Pygmalion এর সই-করা চুক্তিপত্র আর একখানি ফটোগ্রাফ, তাতে লেখা জি, বি, এস।

ছবি তোলার সব টাকার দায়িত্ব গ্যাব্রিয়েল প্যাসকালের, এক পয়সা বার্ণার্ড শ' দেবেন না, আর নাটকের একটি কথাও অদল বদল করা চলবে না, এই তাঁর চুক্তি। শ' লিখেছেন—গ্যাব্রিয়েল যেন আকাশ থেকে এসে পড়লো। তার আগে এমন কাউকে পাইনি যে অঙ্গহানি না করে আমার নাটকের চিত্ররূপ দিতে চায়, নাটককে হত্যা করে তার সর্বনাশ করতেই তারা যেন বেশী আগ্রহান্বিত।

গ্যাব্রিয়েল এলো হঠাৎ ঝড়ের মতো, আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে Pygmalion নাটকটি তার হাতে তুলে দিয়ে বললুম, এই নাও, তোমার এক্সপেরিমেণ্ট চলুক এই নাটক নিয়ে। ওর ঐ ডিয়ো চিত্রনাট্য লোকে বোঝাই হয়ে গেল। গ্যাব্রিয়েল বুঝলো তারা যা করতে চায় সবই ভুল, আর আমি যা করি সবই সার্থক। স্বভাবতঃই আমিও তার সঙ্গে একমত হলাম।

কনট্রাক্ট পকেটে নিয়ে গ্যাব্রিয়েল সকলকে বিজয়ীর গর্বে বলে বেড়ায়। তোমরা ইংরেজরা, বার্ণার্ড শ'কে বোঝোনি, বুঝতে পারো না। তোমরা জানো না লোকটার অন্তর কত মহৎ, কত বড়ো। পৃথিবীর এই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত মানব। তাঁরই বাণীর সুরতরঙ্গে আমি তরঙ্গায়িত।

নিঃসহায়, নিঃসম্বল এবং ব্যবসা ও ফিল্ম ব্যাপারে অনভিজ্ঞ হয়েও গ্যাব্রিয়েল এই রকম অবিশ্রান্ত পদ্ধতিতেই অনেক অর্থ সংগ্রহ করলো। কনট্রাক্ট হাতে নিয়ে গ্যাব্রিয়েল দোরে দোরে ঘুরতেই ব্যাঙ্কের ধনভাণ্ডার তার ঝুলিতে এসে পড়ল। লিসলী হাওয়ার্ড আর ওয়েণ্ডি হিলারকে প্রধান ভূমিকায় নিয়ে পাইন উডে ছবি তোলার কাজ সুরু হল। লেসলী হাওয়ার্ড এক ধারে ডাইরেক্টর এবং অভিনেতা, তাই এ্যানটনি এ্যাসকুইথকে নেওয়া হল সহযোগী ডাইরেক্টর হিসাবে। প্রতিটি ষ্টিল ফটোগ্রাফ বার্ণার্ড শ'কে পাঠানো হত পরীক্ষার জন্ত আর গ্যাব্রিয়েল প্যাসকালের গুরুদেব মাঝে মাঝে ষ্টুডিয়োতে এসে প্রতিটি ঘটনা এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতেন। Widowers House যখন মঞ্চস্থ হয় তখন বার্ণার্ড শ' যেমন উৎসাহিত হয়েছিলেন, খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়িয়ে তাঁর সেই উৎসাহ আবার ফিরে এল। প্যাসকাল তাঁকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছে, তার সব কথাতেই তিনি রাজী। এমন কি বাথরুমের দৃশ্যে এলিজাবেথকে সাবানের ফেনায় ডুবে ভাসবার পর্যন্ত অনুমতি দিলেন।

আশ্চর্য কাণ্ড! এই ভাবে তোলা Pygmalion ছায়াছবি বিরাট সাফল্য অর্জন করলো। বিশেষতঃ আমেরিকায়।

গ্যাব্রিয়েল প্যাসকাল মুরুব্বির মতো বলতে লাগল—

"ব্রিটিশ প্রযোজকদের উচিত মহৎ লোকদের রচনায় ছবি তোলা, আমেরিকা বাঁদুরে গল্প চায় না, তাদের দেশেই যথেষ্ট পরিমাণে সে সব আছে। ওখানকার সবাই বার্ণার্ড শ'র জন্ম পাগল। তাঁর কাহিনী ত' আর বাঁদুরে গল্প নয়।"

বার্ণার্ড শ' কিন্তু কিঞ্চিৎ বিপদে পড়লেন এই সাফল্যে, বললেন এই ফিল্মের লভ্যাংশের জন্ত দেয় ইনকম্ ট্যাক্স দিতে আমি ফতুর হয়ে গেলাম। এই Pygmalion ছায়াছবি দেখে জর্জ বার্ণার্ড শ'কে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানালেন মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল।

১, ১২, ১৯৩৮

"প্রিয় জোয়ী,

তোমার আশ্চর্য নিরাময় সংবাদ পেয়ে আনন্দাভিভূত হয়েছি— আমি একজন মহিলাকে জানি, যিনি দিনে দুবার কিছু পরিমাণ লিভার (মেটুলি) সেদ্ধ করে খান, কিন্তু কখনও মাংস স্পর্শ করেন না। যাই হোক্, তুমি এবং সার্জেণ্ট 'রাজকীয় মর্যাদায়' গ্রন্থমেলা পরিদর্শন করেছ এবং কেন হবে না, শুনলাম দুজনকেই নাকি বেশ ভালো দেখাচ্ছিল। একজন বন্ধুর মুখে Pygmalion-এর বিরাট সাফল্যের সংবাদ পেলাম, চেপ্‌টার ফিল্ডের ওডিয়ন থিয়েটারে এক সপ্তাহে একুশ হাজার সিটের টিকিট বিক্রী হয়েছে, সেখানকার জনসংখ্যা তেইশ হাজার মাত্র। শুনলাম খনিশ্রমিকরা সোজা খনি থেকে বেরিয়ে সেই মলিন পোষাকে তোমার নাটক দেখে রস উপলব্ধি করেছে। আর তুমি লভ্যাংশের পার্সেণ্টেজ পাচ্ছ। এখন নিশ্চয়ই এত টাকা হাতে পাচ্ছ যে কি করবে এত টাকার কাঁড়ি নিয়ে ভেবে পাও না। আমি একদিন এই নাটক নিয়ে কি যে করেছি সে কথা কি মনে আছে? ট্রির কাছে নাটকটা নিয়ে গিয়ে অনুরোধ করেছিলাম, তোমাকে আমন্ত্রণ করে নাটকটি তোমার মুখ থেকে শোনার জন্ত। বলেছিলাম আমিই এলিজার ভূমিকা নেব। রিহার্সেলের সময় তোমার কাছ থেকে অনেক অপমান সয়েছি। দিনরাত্রি খেটেছি ঠিক মতো উচ্চারণের জন্ত। ড্রপসিন ওঠার আগে ট্রি এসে আমাকে অনুনয় জানিয়েছে 'Bloody' কথাটি বাদ দেওয়ার জন্ত, আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি (খনির শ্রমিকরা অভিনয় দর্শনে কেমন হাসছে দেখতে ইচ্ছে করে) এলিজাবেথকে সাধারণ এবং সুন্দরী হিসাবে প্রদর্শন করার জন্ত আমার প্রাণ বেরিয়ে গেছে, তুমি বোধ হয় সব ভুলে গেছ এতদিনে···আমি একটা ছোট ঘরে এখানে পড়ে আছি, তবে কিঞ্চিৎ আগুনের উত্তাপ আছে, আর আছে তুইলেরিস গার্ডেনসের সৌন্দর্য আর সারাদিন উজ্জ্বল সূর্যকিরণ। ঘেরা বারান্দা রাস্তা পর্যন্ত চলে গেছে, সুতরাং সিক্ত বা শুষ্ক অবস্থায় বাইরে বেড়ানো যায়। তিনখানা বাড়ির পরে থাকেন ডিউক এ্যাণ্ড ডাচেস অব উইণ্ডসর,—ডিউক সৌম্য-সমাহিত, ডাচেস শান্ত··· —স্টেলা।"

*    *    *    *

পত্রখানি যেন রাজ্যহারা অনাথার আর্তনাদ!

বার্ণার্ড শ' উত্তর দিলেন—তোমার চিঠি মিথ্যার মালা, ওর দু' পয়সাও দাম নয়।

আহত অভিমানে মিসেস প্যাট্রিক ক্যামবেল লিখলেন এই চিঠির জবাবে—মিথ্যার মালা কথাটির অর্থ? তোমার স্মৃতিবিভ্রম হলেও হয়ত এ কথা ভোলোনি যে আমি সত্য কথাই বলি। জীবনের প্রাসাদের অনেক বাতায়ন, প্রতিটি অংশে বিভিন্ন দৃশ্য। আত্মার আবাসেও সেই অবস্থা, সেখানেই কল্পনার বাসা। যারা দুঃশীলা আর দুর্বল তারাই শুধু মিথ্যা বলে। আমার সঙ্গে Pygmalion-এর সম্পর্ক বেদনাময়—অপরের কাছে এর মূল্য দু' পয়সাও নয়।

*    *    *    *

Pygmalion নাটক সম্প্রতি My Fair Lady এই নামে গীতিনাট্য হিসাবে মার্কিণ মুলুকে অভিনীত হচ্ছে। আমেরিকার অভিনয়রসিক শ্রোতারা দিনের পর দিন পরম সাগ্রহে এই নাটকাভিনয় দেখছেন। এক বছরের আগাম টিকিট নাকি বিক্রী হয়ে গেছে।

ইদানীং ইংলণ্ডে Pygmalion নাটক নিয়ে একটা বিতর্ক উঠেছে। মিঃ জেমস বেনেট নামক জনৈক বৃটিশ লেখক বলতে চান বার্ণার্ড শ' এই নাটকের আইডিয়া বে-মালুম দশ বছরের মেয়ে এথেল টার্ণারের Child of the Children নামক কাহিনী থেকে গ্রহণ করেছেন ঋণ স্বীকার না করে। এই কাহিনীটি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে Windsor Magazine-এ প্রকাশিত হয়। জেমস বেনেট বলেছেন—সাদৃশ্য এত বেশী যে ব্যাপারটিকে কাকতালীয় বলা যায় না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বার্ণার্ড শ' এই কাহিনীটিই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

Windsor Megazine-এর প্রকাশক Ward Lock কোম্পানীর প্রতিনিধি বলেছেন—আমরাও একথা মানি,—তবে শ' নাটকটিকে চমৎকার ভাবে গড়েছেন।

এথেল টার্ণারের ছেলে অষ্ট্রেলিয়া থেকে লণ্ডন টাইমসে চিঠি পাঠিয়ে বলেছেন—আমার জননীর বার্ণার্ড শ' প্রিয় লেখক ছিলেন। তাঁর লাইব্রেরীতে বার্ণার্ড শ'র সব গ্রন্থ ছিল। তিনি কোনো দিন এই বিষয় কিছু বলেননি, তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল বার্ণার্ড শ'র প্রতি।

এথেল টার্ণারের কাহিনীর সঙ্গে Pygmalion নাটকের সাদৃশ্য অনেক। টার্ণারের গল্পের নায়িকার নামও এলিজা, ধনীরা তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, সম্ভ্রান্ত মহিলায় রূপান্তরিত করাই ছিল উদ্দেশ্য, ছোটদের একটা পার্টিতে গিয়ে সে এমন কাণ্ড করলো যা সবাইকে বিস্মিত করল।

বার্ণার্ড শ'র নাটক Pygmalion-এ ফুলওয়ালী এলিজা ডুলিটলের রূপান্তর কাহিনী। কলের পুতুলের মত এলিজা উচ্চ-কোটির সমাজকে চমকিত করেছে এ্যানাবাসাডারের পার্টিতে।

যে বছর (১৮৯৭) ইথেল টার্ণারের কাহিনী Windsor Magazine-এ প্রকাশিত হয়, সেই বছরই Ceasar and Cleopatra নাটক লিখছিলেন বার্ণার্ড শ', সেই সময় এলেন টেরীকে চিঠিতে জানান, এই ধরণের একটা নাটক লিখতে হবে।

আর, এফ, র‍্যাটরে Bernard Shaw—Achronicle and Introduction নামক গ্রন্থে বলেছেন, বঁশার ইুডিয়োতে বসে এই নাটকের পরিকল্পনা বার্ণার্ড শ'র মাথায় উদিত হয়। ডব্লু, এস, গিলবার্ট লিখিত Pygmalion and Galatea নাটকটির কথাও তাঁর মনে ছিল।

বার্ণার্ড শ' স্বয়ং বলেছেন ডাবলিনে পিতার সঙ্গে বাসাবাড়িতে থাকার সময় এই নাটকের কথা মাথায় আসে। একথাও বলেছিলেন 'Perigrine Pickle' থেকে তিনি কিছু আইডিয়া পেয়েছেন।

আমেরিকার বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক এবং সেক্সপিয়ান পণ্ডিত অধ্যাপক ডান লরেন্স বলেছেন—"বার্ণার্ড শ' একটা দশ বছরের মেয়ের লেখা চুরি করেছেন, এ বড়ো ভয়ানক কথা! আমি এর এক বিন্দুও বিশ্বাস করি না।"

## উনিশ

একবার আয়ার্লাণ্ডের পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণকালে বার্ণার্ড শ' পিচ্ছিল সামুদ্রিক পথে পা পিছলে পড়ে গিয়ে পায়ের গোড়ালি ভাঙলেন। যন্ত্রণায় তিনি অতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন, তাঁর স্ত্রী সার্লোট সঙ্গে ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি একজন গ্রাম্য ডাক্তারকে ডাকতে গেলেন, তার কিছুদিন আগে তিনি পড়েছিলেন বার্ণার্ড শ'র "The Doctors Dilemma", সুতরাং নাট্যকার বেদনা উপশমে সাহায্য করতে তিনি রাজী নন। অবশেষে অবশ্য সার্লোটের সঙ্গে এসেছিলেন, যদি না আসতেন তাহলে সার্লোট তাঁকে টুকরো করে ফেলতেন।

যে বছর Major Barbare লিখিত হয়, সেই বছর সার্লোটের আগ্রহাতিশয্যে বার্ণার্ড শ' আয়ার্লাণ্ডে গিয়েছিলেন, ত্রিশ বছর আগে মাতৃভূমি ছাড়ার পর এই তাঁর প্রথম মাতৃভূমিতে পদার্পণ।

এর পরের বছর (১৯০৬) গ্রীষ্মকালে বন্ধু উইলিয়াম আর্চার এক প্রবন্ধে লিখলেন যে, বার্ণার্ড শ' এ পর্যন্ত ট্রাজেডি লিখতে পারেন নি। ট্রাজেডি অর্থে বিয়োগান্ত, যার পরিণতি মৃত্যুতে, বার্ণার্ড শ'র পক্ষে মৃত্যুকে নাটকায়িত করার যথেষ্ট শক্তিরও হয়ত অভাব আছে। তাই যদি হয় তাহলে প্রমাণিত হয় বার্ণার্ড শ' খণ্ড প্রতিভা মাত্র, পরিপূর্ণ নয়, কারণ তিনি হাসির কারবারি, যার ভিত্তি আনন্দে, অশ্রুভরা বেদনার কোনো সন্ধানই তিনি রাখেন না।

আর্চারের এই অভিযোগ নিয়েই কথাবার্তা চলছে, এমন সময় গ্রানভিল বার্কার এসে হাজির। কোর্ট থিয়েটারের জন্য এখনই একটা নতুন নাটক চাই এই তার দাবী। তাই সে কর্ণওয়ালের মেভাগিসে ছুটে এসেছে।

সার্লোটের কাছেই গ্রানভিল বার্কার কথাটা তুলেছিল। সার্লোট অসীম বুদ্ধিমতী, তিনি এই প্রসঙ্গে নানা কথা বলছেন, এমন সময় বার্কার বলে উঠল—

—লণ্ডন হাসপাতালে একজন ডাক্তারের চিকিৎসা হচ্ছে, তাঁর টি, বি হয়েছে।

—ডাক্তারেরও টি, বি? কী আশ্চর্য! কুমীরের জ্বর?

—ডাক্তাররা কি পরিমাণ উৎসাহ অনাবশ্যক ও অবাঞ্ছিতদের বাঁচাবার জন্য নষ্ট করে।

—সে আবার কি?

—যেমন কোনো হত্যাকারী আত্মহত্যার চেষ্টা করে যদি অসফল হয় তাঁকে সারিয়ে তোলার জন্য কি যত্ন। কারণ তাকে সুস্থ শরীরে দণ্ড নিতে হবে।

—কিন্তু কোনটা বাঞ্ছনীয় এবং কি অবাঞ্ছনীয়, তার বিচার করবে কে?

যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর মনে করি তাদের যত্ন করা যে সময় ও উৎসাহের অপচয়, এর বিচার করবে কে?

বার্ণার্ড শ' গ্রানভিলের প্রস্তাব চিন্তা করছিলেন। আর আলাপচার শুনছিলেন। তাঁর মাথায় কোনো নতুন নাটকের প্লট নেই।

সহসা সার্লোট বার্ণার্ড শ'র দিকে তাকিয়ে বললেন—সেণ্ট মেরী হসপিটালে স্যার আমরথ রাইটের সঙ্গে যান, আমরা কথা বলছিলাম তখন একজন হঠাৎ এসে কি প্রশ্ন করেছিল মনে পড়ে?

বার্ণার্ড শ' বললেন—ঠিক কি হয়েছিল বলোত?

সার্লোট বললেন—স্যার আমরথের সহকারী এসে বলল তাঁর রোগীদের দলে একজনকে নিতে পারেন কি না। তিনি অমন নতুন পদ্ধতিতে (opsonic method) যক্ষ্মা চিকিৎসা করছেন, রোগীর সংখ্যা স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ। স্যার আমরথ এই অনুরোধ শুনে বলেছিলেন—চিকিৎসার যোগ্য ত? (Is he worth it?)—তুমি যখন বলেছিলে মনে করে রাখো, এর ভেতর নাটকের উপাদান আছে।

বার্ণার্ড শ' বললেন—ঠিক বটে, কিন্তু তুমি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার আগে এত টুকু মনে ছিলনা। আর্চারের অভিযোগের উত্তরে ডাক্তার আর মৃত্যু নিয়েই নতুন নাটক লিখবো।

সারাজীবন ডাক্তার আর ওষুধ নিয়ে বার্ণার্ড শ'কে কাটাতে হয়েছে, সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত মাসে একবার অন্ততঃ তিনি মাথাধরার আক্রমণে বিশেষ কষ্ট পেয়েছেন। তাই ওষুধ আর ডাক্তার তাঁর

পরিচিত বিষয়। তাঁর ধারণা ছিল নিয়মিত ব্যায়ামের অভাবেই এই দুর্দশা।

শ' বলেছেন—আরো অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো আমিও মাসে মাসে মাথাধরার যন্ত্রণায় কষ্ট পাই, এর উপশম করার চেষ্টা করে রেজিষ্টার্ড ও অ-রেজিষ্টার্ড ডাক্তার সবাই হার মেনেছেন। কিন্তু একজন চমৎকার রমণী স্বেচ্ছায় আমার পাশে মৌন ধ্যানে বসে আমার মাথাধরা সারিয়েছিলেন, কি জানি কি যে হল, হয়ত তাঁর রূপমাধুরীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ যারা শিরঃপীড়ায় ব্যাসিলি ভক্ষণ করে তাদের উত্তেজিত করে আমার ব্যাধি উপসম করেছে; স্যার আমরথ রাইটই ভালো বলতে পারবেন।

সর্বদাই ত' আর এমন সৌভাগ্য হত না, তাই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হত। একদিন এমনই আক্রমণের পরে তাঁর সঙ্গে উত্তরমেরুর আবিষ্কারক নানসেনের সঙ্গে পরিচয় হয়, তিনি এখন সবে আবিষ্কার করে ফিরেছেন, কি তাঁর খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি!

বার্ণার্ড শ' বললেন—আচ্ছা, আপনি মাথাধরার কোনো ওষুধ আবিষ্কার করেছেন?

নানসেন চমকে উঠলেন, এ আবার কি প্রশ্ন! তিনি সবিস্ময়ে বললেন—না তো!

শ' আবার বললেন—কোনদিন কি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন?

—না। নানসেন জবাব দিলেন।

—কি আশ্চর্য! একেই বলে আশ্চর্য কাণ্ড! বার্ণার্ড শ' নানসেনকে বিস্ময়বিমূঢ় ভঙ্গীতে বললেন—এই ত! উত্তরমেরু আবিষ্কারের জন্য সারাজীবন নষ্ট করলেন, পৃথিবীর মানুষের কাছে তার মূল্য দু পয়সাও নয়। আপনি মাথা ধরার কোনো ওষুধ আবিষ্কারের কোনো চেষ্টাও করেননি, অথচ পৃথিবীর সমগ্র মানুষ এই মহৌষধির জন্যই কেঁদে আকুল হয়ে উঠেছে।

বার্ণার্ড শ' এই মাথা ধরার ছুতায় অসংখ্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছেন, যেখানে নতুন কোনো চিকিৎসার সন্ধান পেয়েছেন সেখানে ছুটেছেন, (I used to be a uncanonical collector of therapeutics)

সুতরাং The Doctor's Dilemma রচনাকালে ডাক্তার ও ডাক্তারির সকল তথ্যই তাঁর নখদর্পণে। তাই সার্জেন্টের কথা শুনেই নোটবুক তুলে নিয়ে নাটক রচনার কাজে কোমর বাঁধলেন। এত দ্রুত এই নাটকটি রচিত হল যে, গ্রীষ্মকালে রচনা শুরু করে ১৯০৬-এর নভেম্বর মাসেই কোর্ট থিয়েটারে নাটক মঞ্চস্থ হল। The Doctor's Dilemma বার্ণার্ড শ'র নাট্যকুশলতার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত, সংগঠন ও পরিকল্পনার দিক দিয়েও।

চিকিৎসা ও ওষুধ সম্পর্কে বার্ণার্ড শ' যে সব উক্তি করেছেন তার যাথার্থ্য এবং নির্ভুলতা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। বার্ণার্ড শ'কে সমর্থন করার প্রয়োজন নেই, তাঁর নির্বুদ্ধিতা নিয়েও তাঁকে ব্যঙ্গ করার কিছু নেই। "Shaw the Scientist" এর লেখক মিঃ জে, ডি, বার্ণাল স্বীকার করেছেন যে, The Doctor's Dilemma নাটকের ভূমিকা ডাক্তারদের কাছে অতিশয় মূল্যবান, যেমন মূল্যবান বায়োলজিষ্টদের (প্রাণিতাত্ত্বিক) কাছে Back to Methuselah নাটকের ভূমিকা—এ নাটক Social Pathology। টীকাদান ও ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র বক্তব্য চিরদিনই বিকৃত বিবেচিত হয়েছে, কিন্তু মিঃ বার্ণাল বলছেন—"The period of the early enthusiasm and excesses of the germ theory, where Scientists as much as Doctors took Pasteur's work as divine revelation and thought that all disease was due to germs"—বার্ণাল বলেন, যে কালে The Doctor's Dilemma রচিত হয় সেই কালে বার্ণার্ড শ'র টীকাদান সম্পর্কিত উক্তি হাস্যকর নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত মন্তব্য সমর্থন না করলেও তিনি বলেন—যথেচ্ছভাবে প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদ করে যে পরীক্ষা চলে তার ফল অনেক ক্ষেত্রেই নিরর্থক।

The Doctor's Dilemma নাটকের ভূমিকা অংশে বার্ণার্ড শ' ডাক্তারদের প্রাইভেট চিকিৎসা প্র্যাকটিস সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন এবং সংস্কারের ইঙ্গিত দিয়েছেন। নাটকের মধ্যে আছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর হাতে মানবিক পরিণতির অসহায় অবস্থার করুণ ইঙ্গিত।

এই নাটকে বার্ণার্ড শ' অনেকগুলি জীবিত চরিত্রের ছায়া গ্রহণ করেছেন। বিশেষতঃ The Doctors Dilemma নাটকের স্যার কালেন্সো রিজন ও লুই ডুবেডাট শুধু খুঁটিনাটির দিক দিয়ে নয়, সর্বতোভাবেই বার্ণার্ড শ'র দুটি অতি পরিচিত মানুষের চরিত্র চিত্র। স্যার আমরথ রাইট ও ডাঃ এডওয়ার্ড আভেলিং বার্ণার্ড শ'র কালেন্সো এবং ডুবেডাট চরিত্রের মূল। বার্ণার্ড শ' এমন নিখুঁতভাবে এই চরিত্র চিত্রণ করেছেন যে স্যার আমরথের আত্মীয়বর্গ তাঁদের পরিচিত মানুষটিকে নাটকে রূপায়িত দেখে হাসিতে ভেঙে পড়তেন। ডুবেডাট চরিত্রটি আভেলিংকে আদর্শ করে রচিত। আভেলিং ছিলেন দুশ্চরিত্র, তবে সমাজবাদে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ছিল। প্রথমা স্ত্রীকে ত্যাগ করে কার্ল মার্কসের মেয়ে এলিয়ানর মার্কসের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলেন, তারপর স্ত্রী বিয়োগের পর এলিয়ানরকে ত্যাগ করে অপর একটি মেয়েকে বিয়ে করলেন। রাগে, অভিমানে, দুঃখে কার্ল মার্কস-তনয়া আত্মহত্যা করল। এই মানুষটির জীবনের ঘটনা কল্পিত কাহিনীর চেয়েও চমকপ্রদ। The Doctors Dilemma নাটকের ডুবেডাট চরিত্রে আভেলিংকেই এঁকেছেন বার্ণার্ড শ'।

ডুবেডাটের স্ত্রী জেনিফার সম্পর্ক শ' লীলা ম্যাককার্থি লিখেছেন—"I am sorry to have to tell you that the artists wife is the sort of woman I hate and you will have your work cut out for you in making her fascinating.

২০শে নভেম্বর ১৯০৬ প্রথম অভিনয়-রজনীতে বার্কার ডুবেডাট চরিত্রে অভিনয় করে সমগ্র চিকিৎসক সমাজকে চমকিত করেন।

আর্চার বলেছিলেন বার্ণার্ড শ' মৃত্যুর দৃশ্যটি সোজাসুজি (with a straight face) রূপায়িত করতে পারেন নি।

বার্ণার্ড শ' সেদিন বন্ধু উইলিয়াম আর্চারের মন্তব্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

[ক্রমশঃ।

## শিশিরকুমার ও পদ্মভূষণ প্রসঙ্গে

প্রতিভার বরপুত্রদের যথাযোগ্য সম্মানে দেশবাসীর তরফ থেকে বিভূষিত করা রাষ্ট্র সরকারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের তালিকা থেকে বাদ দেবার নয়। গুণীকে কেন্দ্র করেই গুণের পূজা। সরকারও তাই গুণীজনকে সম্মান দেওয়ার মধ্যে দিয়েই গুণের কদর করে থাকেন—এ প্রথার প্রচলন কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নয়—পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রচলিত বা এ রীতি আজ নতুনও নয়, আবহমান কাল ধরে পৃথিবীর বুকে এই রীতি চলে আসছে। আমাদের দেশ যতদিন পরাধীন ছিল ততদিন বৃটিশরাজ এ দেশের অধিবাসীদের উপাধি বিতরণ করতেন, অনেকে সেই উপাধিকেই মনে করতেন পরম সম্মান, পবিত্র কবচের মত বুকে ঝুলিয়ে রাখতেন, ইংরেজের পা চেটে ঐ ক'টি অক্ষর নিজের নামের পাশে লাগাতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে কৃতকৃতার্থ হয়েছেন, এ দিকে দেশবাসীর কাছ থেকেও তাঁরা প্রত্যেকেই একটি উপাধি পেতেন—খয়ের খাঁ। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা (?) পেল। কয়েকজন নির্যাতিত দেশসেবী অধিকার করলেন রাষ্ট্রশাসনের তখত্-এ-তাউস, প্রথমে শোনা গেল এ দেশে ও সব টাইটেলের বালাই না কি থাকবে না কিন্তু কয়েক বছর যেতে-না-যেতেই এঁরাও টাইটেলের খেল্ দেখাতে শুরু করলেন, রকম-বেরকম টাইটেল্ তৈরী করলেন, দেশের লোক যাদের ডাক নাম ছিল রাজভূষণ, গদাভীষণ এমনি কত কি—তারপর এখনকার সরকারের মঙ্গল কামনায় (?) যাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন বলে নিজেরা জাহির করে থাকেন তাঁদের উদ্দেশেই কীর্তন-সভায় বাতাসা বিতরণের মত উপাধির মুড়ি-মুড়কি ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন, একেবারে গাদা-গাদা লোকের উদ্দেশে, তারাও তাকেই ভাবতে আরম্ভ করল আমি কি হনু রে!

এ বছরও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পংক্তিভোজনের মত বিরাট সংখ্যক লোককে উপাধির প্রসাদ পান করিয়ে জাতিসেবার ব্যাপারে তাঁদের চাঙ্গা করে তোলা হ'ল। ভারতরত্ন তো নয়ই, পদ্মবিভূষণও নয়, পদ্মভূষণ দেওয়া হ'ল শিশিরকুমারকে। শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। জাতীয় রঙ্গালয়ের নবমন্ত্রের স্মরণীয় উদ্‌গাতা, প্রতিভা-মনীষার বরপুত্র, জনবন্দিত নটগুরু শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে। তাঁরই সঙ্গে সেই উপাধিই দেওয়া হল তেনজিং নোরকেকে। ১৯৫৩ সালের জুন মাসের আগে পৃথিবী বা ভারতবর্ষ তো দূরের কথা, বাঙলা দেশেরও কেউ তেনজিং-এর নাম শুনেছে বলে মনে হয় না। প্রতিভার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে ভারত সরকার শিশিরকুমার আর তেনজিংকে সমান আসনে বসাতে লজ্জা বোধ করলেন না! পাহাড়ে ওঠার মধ্যে কৌশল, শক্তি ও ধৈর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় বটে কিন্তু তার মধ্যে প্রতিভার, মনীষার বা পাণ্ডিত্যের দীপ্তি ফুটে ওঠে না ঠিক যেমন মঞ্চে একজন যাদুকর যত কিছু অলৌকিক খেলাই দেখান না তাঁকে কিছুতেই মনীষী বলতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কাটা মানুষ জোড়া লাগাতে পারেন নি আর একজন যাদুকর তা পারেন বলে সেই যাদুকরকে তো রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বেশী শ্রদ্ধা করা যায় না (কথাটা সকলের বেলায় প্রযোজ্য হলেও সরকারের বেলায় বোধ হয় নয়)।

সরকার বাহাদুর হয়তো ভেবেছিলেন যে পদ্মভূষিত শিশিরকুমার সরকারী খেতাবের সুধারস চরণামৃত মনে করে পান করবেন। এইখানেই তাঁরা ভুল করেছেন। ব্যক্তি তাঁরা লক্ষ লক্ষ দেখে আসছেন, কিন্তু ব্যক্তিরূপী জীবন্ত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের ঘটে যদি কিছুমাত্র ছিটে-ফোঁটা ধারণাও থাকত তাহলে শিশিরকুমারের মত ব্যক্তিত্বকে এতখানি ব্যঙ্গ করার মত অমার্জনীয় অপরাধ তাঁরা করতে সাহসই পেতেন না।

বিদেশী অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে সে যুগে স্যার হেনরি আর্ভিং, এ যুগে স্যার লরেন্স অলিভিয়ার, স্যার সিডিক হার্ডউইক, স্যার জর্জ আর্লিস, স্যার সিবিল থর্ণডাইক, ডেম সিবিল থর্ণডাইক, ম্যানা নিগল প্রভৃতিরাও ব্রিটিশ রাজশক্তির দ্বারা সম্মানলাভ করেছেন। একেবারে হালের খবর—অ্যালেক গাইনেস নাইটহুড পেলেন। রাষ্ট্রশাসন পরিচালনা সরকার নিজেদের বুদ্ধিতে করেন কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ যেগুলির মধ্যে সংস্কৃতির যোগ আছে—তাঁরা যা করে থাকেন তা সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে। গুণীর স্বীকৃতি যখন তাঁরা দেন তখন সেই স্বীকৃতি দানের মধ্যে জনসাধারণের সমর্থনের চিহ্ন পাওয়া যায় অর্থাৎ সরকারী সম্মান জনসাধারণের সম্মানেরই নামান্তর কিন্তু যেখানে সরকারের স্বৈরনীতিতে নিরীহ জনসাধারণ ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছে, যে সরকারের চোখা চোখা তীক্ষ্ণ ট্যাক্সের বাণে জনসাধারণের প্রাণ যায়-যায় অবস্থা, যে সরকারের ধ্বংসধর্মী মনোভাবের কাছে জনমতের কোন মূল্যই নেই, সর্বোপরি যে সরকার আজ পরিচালিত হচ্ছে খামখেয়ালী মেজাজে—সেই সরকারের কার্যকলাপের সঙ্গে জনমতের যোগাযোগ যে কতটুকু তাও কি হৃদয়ঙ্গম করতে বিলম্ব হয়?

প্রায় চল্লিশ বছরের নিঃস্বার্থ সাধনার পর শিশির-প্রতিভা জাতীয় সরকারের কাছে কতটুকু স্বীকৃতি পেল, সেদিন ছিল বিদেশী শাসন, আজ স্বদেশী শাসনেরও বয়স এক যুগ হয়ে এল। আজ সত্তর বছর বয়েসে তিনি পেলেন পদ্মভূষণ খেতাব। এই সব কতকগুলি শব্দের দ্বারা যে সব তথাকথিত "কুলচোর" এর পৃষ্ঠপোষকদের সম্মানিত করা যায় তাদের থেকে শিশিরকুমারের স্থান বহু-বহু ঊর্ধ্বে। শিশিরকুমার ব্যক্তি নন, তিনি ব্যক্তিত্ব, এক অচল-অটল-অনড় ব্যক্তিত্ব। আজও সর্বহারা, শোষিত বাঙলাদেশ যে

কজন অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় মনীষীকে নিয়ে গর্ব করতে পারে শিশির-কুমারের স্থান তাঁদের পুরোভাগে। ব্রাহ্মণকুলের রশ্মিমান অগ্নিশিখা চাণক্যের তিনি স্বজাতি। নাট্যজগতের উন্নতিকল্পে কি করেন নি শিশিরকুমার? তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-আদর্শই নাট্যজগতের কল্যাণ, সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি। স্বার্থসিদ্ধি যদি তাঁর জীবনের লক্ষ্য হোত তাহলে তাঁর জীবনের ইতিহাসের ধারা অন্য স্রোতে বয়ে যেত। ভগবান তাঁকে ঢেলে দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর শিল্পিমন তখন সৃষ্টির নেশায় আচ্ছন্ন, তার তীব্রতার কাছে অর্থ সঞ্চয়ের আবেদন বন্যধারার মত ভেসে বেরিয়ে গেছে। শিশিরকুমার যদি নিজের দিকে চেয়ে দেখতেন তাহলে আজ জীবনের শেষাংশে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর ভাঙা-চোরা স্যাঁতসেঁতে বাড়ীর মধ্যে বর্তমান ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা, নাট্যাচার্য, নটস্রষ্টাকে দিন কাটাতে হোত না। সুনিশ্চিত অধ্যাপনা ছেড়ে অনিশ্চিত জীবন বরণের মধ্যে আত্মত্যাগের কোন পরিচয়ই কী মেলে না?

সম্মানপ্রাপ্তিই যদি তাঁর জীবনের মোক্ষ হোত তাহলে আটাত্তর বছরের জীবনে (১১৪৭ সালের হিসাবানুযায়ী) তিনি অনায়াসে অনেক খেতাবই পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি, কেন না সে কি কোনদিনই তাঁর পূজা পায়নি, যা খাঁটি শিশির-বন্দনা চিরদিন তার পায়েই উৎসৃষ্ট হয়েছে। যে শিল্পের উন্নতিসাধনায় শিশিরকুমার আজীবন নিমগ্ন রইলেন, সেই শিল্পের উন্নতিকল্পে সরকারের সর্বাঙ্গীন সহায়তাই হোত শিশিরকুমারকে সত্যিকারের শ্রদ্ধানিবেদন, সেইটেই হোত সরকারের পক্ষ থেকে শিশির প্রতিভাকে সত্যিকারের স্বীকৃতি দেওয়া; সেইটেই হোত শিশির-সাধনার উদ্দেশে সরকারের কৃত্রিমতাহীন শ্রদ্ধাঞ্জলি। আর তার পরিবর্তে হ'ল কি? স্বাধীনতা দিবসের আনন্দে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য আহ্লাদে আটখানা হয়ে এলোপাতাড়ি ভাবে যখন এই খেতাবের পাঁপড়ভাজা ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন তখন সেগুলিরই একটি সামান্য অংশের ভাগ পাঠানো হ'ল শিশিরকুমারকে। বাঃ! দীর্ঘ দিনের অনলস সাধনার কি অভূতপূর্ব স্বীকৃতি! কতকগুলি শব্দের সমষ্টি, গালভরা একটি বাক্যমাত্র। শিশির প্রতিভার উপযুক্ত সমাদরই বটে!

অবশ্য এতে আশ্চর্য হবারও কিছু নেই। এই "গুণগ্রাহী" সরকারের কাছে এর বেশী আর কি আশা করা যেতে পারে? ব্রিটিশের আমলে ইংরেজের পদলেহন করে দেশদ্রোহিতার ক্ষেত্রে যাঁরা রেকর্ড রেখে গেছেন—তাঁদের সঙ্গে আজকের স্বাধীন সরকার পাতিয়েছেন মিতালী, হাজার হাজার ঘরে আগুন লাগিয়ে, লক্ষ লক্ষ মানুষের যারা সর্বনাশ করেছে, লোকের মুখের গ্রাস যে নরঘাতকের দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কেড়ে রেখেছিল, আজকের দিনে তাদের প্রকাশ্য রাজপথে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় শঙ্কর মাছের ছালের চাবুক মারার পরিবর্তে মধুর সান্ধ্য আসরে হাসিঠাট্টার মধ্যে একসঙ্গে তাদের সঙ্গে খানা খেতে এদেশীয় শাসকদের বিবেকে বাধে না! যে দেশে খাদ্যের জন্যে হাহাকার, রুগ্ন সন্তানের মুখে পথ্য তুলে দিতে পারে না যে দেশের মা, সেই দেশে অতিথি সংকারে ব্যয়িত হয় কোটি কোটি টাকা! ভবিষ্যৎ যেখানে অন্ধকার—সেখানে বর্তমানকে সাক্ষী রেখে যে দেশে আলো জ্বালানো হয় লাখ লাখ টাকা খরচ করে, গো-সেবার কাজেও যারা অযোগ্য সেই রকম কতকগুলো অপদার্থ আবার ততোধিক অজ্ঞানক, দুর্মুখ, সাংঘাতিক লোককে যে দেশের সরকার অজস্র অর্থব্যয়ে দেশবিদেশে পাঠান প্রতিনিধিত্ব করতে, বড় বড় পদ দেন দেশের সেবা করতে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারের নামে দুষ্কৃতির জয়গান গাইতে, একটি সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আরও দশটি সমস্যা গড়ে তোলেন যে দেশের সরকার, সরস্বতীর কমল-বনের অন্যতম জীবন্ত শুভ্রোৎপল নটনায়ক শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে যাদের মনে পড়ে দেবকী-দেবিকা-সত্যজিত-নার্গিসকে সম্মান জানানোর পর তাঁরা যে এ রকম হাস্যকর এবং প্রতিবাদযোগ্য একটা কিছু করবেন—এ আর নতুন কি?

কিন্তু কথা হচ্ছে—শিশিরকুমার তো সম্মান চান নি, সরকারের 'ইনাম'রূপী এই কতকগুলি শব্দোপহারের জন্যে তো তিনি লালায়িত নন, তিনি তো বলেননি ওগো আমাকে একটি খেতাব দাও—দিয়ে আমাকে উদ্ধার কর—তবে তাঁকে নিয়ে এ রকম অমার্জনীয় রসিকতা কেন করলেন ভারত-সরকার? বাঙালী বলে? বাঙালী হওয়াটাই কি তাঁর একমাত্র অপরাধ? জনসাধারণের হৃদয় উজাড় করা শ্রদ্ধার উচ্চ শীর্ষে সসম্মানে সমাসীন এই পূজনীয় পুরুষকে ভারত-সরকার শ্রদ্ধা করতে না পারুন ক্ষতি নেই—কিন্তু তাঁকে অপমান করেন কোন অধিকারে? এই যে ঘটনাটি ঘটে গেল এতে শিশিরকুমার যা ছিলেন তাই রইলেন, বাঙালীর পরম গর্বের, সম্মানের, শ্রদ্ধার আধার শিশিরকুমারের আসন বাঙালীর মনের মধ্যে অটলই রইল, কিন্তু ভারত-সরকারের অনুদার এবং ততোধিক কাণ্ডজ্ঞানহীন রুপটিতে আরও এক ছোপ কালো রঙ পড়ে গেল। রাহুর গ্রাসে আকাশের সূর্যের রশ্মি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে কিন্তু ভাগ্যরাহুর বারংবার বহুবিধ আঘাতে শিশিরকুমারের প্রতিভার রশ্মি আজও সমানভাবে আলো দিচ্ছে, জাতিকে তথা দেশকে, আজও তা অমলিন, আজও তা অম্লান, আজও তা অনির্বাণ।

# স্মৃতির টুকরো

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

সাধনা বসু

কল্পনা রূপ পেল বাস্তবের। কামনা হাত মেলাল সার্থকতার সঙ্গে, স্বপ্ন পরিণত হ'ল সফলতায়। চিত্রতারকা হওয়ার যে দুর্বার বাসনা সুদীর্ঘকাল আগে আমার অজান্তেই জন্ম নিয়েছিল আমারই মনের গহন কোণে, তিলে তিলে গড়ে উঠল, বেড়ে উঠল, প্রসারিত হ'ল। সেই বাসনার এই অভূতপূর্ব সফলতা, এ যে পরমতম বিস্ময়, পরিপূর্ণ আনন্দ, অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তি। চিত্রতারকা আমি হলুম। ভেবে কূলকিনারা পাই না কোথায় রাখব আমার এই উপচেপড়া আনন্দকে, কেমন করে প্রকাশ করব এই দুর্দমনীয় অনুভূতিকে, কোন পথ ধরে এগোলে হবে আমার শিল্পি-জীবনের প্রকৃত বিকাশ।

আলিবাবার আমার নিজের ভূমিকাটি কেমন করে সাফল্যের মালা গলায় পরবে এ বিষয়ে আমার চিন্তার অবধি ছিল না। রাত জেগে জেগে মহড়া দিয়েছি। মানুষের জীবনে দৈহিক সুখভোগের যত রকম পথ আছে সেই সময়ে তাদের মধ্যে যতগুলিকে পেরেছি, চলেছি পরিহার করে। আহার-নিদ্রা, গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, বেড়িয়ে বেড়ান সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের খাতিরে তো বটেই তা ছাড়াও মানুষের

জীবনে এদের প্রভাব অনতিক্রমণীয়। অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রেও এদের অবদান অপরিসীম। সেই সময় এদের অনেকগুলির সঙ্গেই আমাকে সাময়িক ভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়েছিল (এমন কি প্রায় ঘুমের সঙ্গেও) শুধু আলিবাবার অভিনয়ের জন্যে, প্রথম চিত্রাভিনয়ে কেমন করে উত্তীর্ণ হব?—এই প্রশ্ন সেদিন আমাকে যতখানি অধিকার করেছিল, আমার জীবনে এই প্রশ্নের স্থান যতখানি ছিল, আমার চিন্তাধারায় এই প্রশ্নের যতটা চিহ্ন ধরা পড়েছিল তার তুলনা নেই, তা অতুলনীয়। এক কথায় বলছি, আলিবাবার অভিনয় ছাড়া বলতে গেলে জগৎ-সংসার আমার সামনে থেকে একরকম লোপই পেয়ে গিয়েছিল। আমার জীবনে তখন ঐ একটি মাত্রই স্বপ্ন ছিল, প্রথম চিত্রাভিনয়কে সুন্দর করে তোলার সাধনা।

আলিবাবার চিত্ররূপ সহরের বুকে মুক্তিলাভ করল পরের বছর অর্থাৎ ১১৩৭ সালে। মুহূর্তটি যত ঘনিয়ে আসে অন্তরের অস্থিরতা আমার ততই বেড়ে চলে। কি হবে, কি হবে, এই রকমই একটা ভাব। যদি না হয়, যদি না হয়—এই জাতীয় মানসিক উদ্বেগ, যত দিন ঘনিয়ে আসে, দুশ্চিন্তার তীব্র দংশন মনের মধ্যে সযত্নে লালিত আশা-আকাঙ্খাকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে। এমনি করেই তখন দিন কাটতে থাকে, এক একটি মুহূর্ত যেন মনে হয় অনন্তকাল, সময় যেন কাটতে চায় না। দেখতে দেখতে আবার কেটেও যায়। একটি একটি করে প্রতিটি মুহূর্ত আত্মসমর্পণ করে মহাকালের অতল অঙ্কে। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে যায়, গতিশীলতার গর্বেই পৃথিবী গর্বিতা—সে ক্ষেত্রে ক'টা দিন আর পেরোবে না? সে তুলনায় ক'টা দিনের হিসেব তো হাস্যকর। আলিবাবার মুক্তিলগ্নও দ্বারদেশে করল করাঘাত। আলিবাবা মুক্তি পেল। আমার ফলাফল—নিজে মুখে বলতে লজ্জাও করছে—অথচ বলতে পারার লোভ সম্বরণ করার অক্ষমতাও হেলায় দূরে সরিয়ে দিচ্ছে সেই লজ্জাকে—আমি নিজের মুখেই বলছি—আলিবাবার মুক্তি লাভের ফলে শুধু চিত্রতারকাই আমি হলুম না—চিত্রামোদী দর্শক সাধারণের মনে আমার অভিনয় যে প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করল তার নাম শিহরণ। চলচ্চিত্রে প্রথম অবতরণে আমি যা চেয়েছিলুম তা তো পেলুমই, চিত্রতারকার খাতায় আমার নামও সেদিন যুক্ত হল; কিন্তু কিছু বেশীও পেয়েছিলুম যা স্বপ্নেও আমি ভাবতে পারি নি। আমার কল্পনারাজ্যের নাগালের অনেক দূরে যা ছিল, আমার আকাঙ্খার পরিধির মধ্যে যার চিহ্ন পর্য্যন্ত পড়ে নি ধরা, ঈশ্বরের অনন্ত অনুগ্রহে সেই সৌভাগ্য লাভে আমি ধন্য হলুম, পূর্ণ হলুম, নিজেকে মনে হ'ল সার্থক বলে। চিত্রতারকাই শুধু হলুম না—হলুম শিহরণ, রাতারাতি এক শিহরণ—ওভারনাইট সেনসেশান, আমার মত এক নগণ্য শিল্পসেবীর প্রতি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অপরিসীম অনুগ্রহ—আশীর্বাদ মাথা পেতে গ্রহণ করলুম। সত্যি বলছি, আলিবাবার অভিনয়ে এই আশার অতীত সাফল্য-লাভের সংবাদ যখন আমার নিজের কাণে প্রবেশ করল—তখন এক অনবদ্য আনন্দের যে কি রসঘন স্বাদ আমার নিজের মধ্যে অনুভূত

হল—অকপটে স্বীকার করছি—তা প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।

এ দিকে সঙ্গীত অনুশীলনও আমার সমান ভাবে চলতে থাকে—অভিনয়-সাধনায় বেশী মনোযোগ দেওয়ার ফলে সঙ্গীত-চর্চা যে ব্যাহত হল—তা নয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমি পাঠ নিতুম সে সময়ে আজকের দিনের খ্যাতনামা সুরশিল্পী ত্রিপুরার শ্রীশচীন দেববর্মণের কাছে। মণিপুর থেকে এলেন গুরু সেনারিক রাজকুমার আমায় মণিপুরী টাম্পিকোবিয়ান শিল্প ( নৃত্য ) সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে।

মঞ্চসেবাও আমাদের চলেছে সমতালে। তাতেও বিন্দুমাত্র ছেদরেখা পড়েনি, সকল কাজের মধ্যে দিয়েও মঞ্চ সম্বন্ধে আমরা সচেতনতা হারাইনি তিলমাত্র। চলচ্চিত্র কর্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সি, এ, পির কাজও এগিয়ে চলেছে যথারীতি। মঞ্চে আলিবাবার পর আমাদের উল্লেখযোগ্য সশ্রদ্ধ উপহারগুলির অন্যতম হল বিদ্যুৎপর্ণা। বিদ্যুৎপর্ণার মঞ্চাভিনয়ও সহৃদয় দর্শকদের সুচিন্তিত পৃষ্ঠপোষণা থেকে বঞ্চিত হয়নি। এই নাটকটির রচয়িতা প্রখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। এই বিদ্যুৎপর্ণার অভিনয়কে কেন্দ্র করেই আমি সুযোগ পেলুম বাঙলাদেশের তথা ভারতবর্ষের বরেণ্য অভিনেতা নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে একসঙ্গে অভিনয় করার। এই সময়ে মধু সি, এ, পির মাধ্যমে বাঙলার মঞ্চামোদী দর্শক সাধারণের সামনে দুটি নতুন প্রতিভা তুলে ধরল, বাঙলার রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল শক্তিময়ী দুজন নতুন অভিনেত্রী, সি, এ, পির নাট্যোপহার আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠল দুজন নবাগতার স্পর্শ পেয়ে। মঞ্জু আর বিনীতার কথা বলছি, ওরা দুজনেই আমাদের ভাগ্নী। আমার ছোট ননদ উমা দে ও পরলোকগত সিভিলিয়ান জ্ঞানাঙ্কুর দে মহাশয়ের মেয়ে ওরা। মঞ্জু তো যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল এবং রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল, দর্শক সাধারণ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা সে অর্জন করতে পেরেছিল। শিল্পী মঞ্জু দর্শক দরবারে গৃহীতা হল সাদরে।

আলিবাবা তো সফলতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, তার এই অভাবনীয় সাফল্যে আমাদের মতই ঠিক আর একজনের মনেও আনন্দের বন্যাধারা বয়ে গিয়েছিল, ঠিক আমাদের মতই আরও একজন অপরিসীম আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক আমাদের মতই আরও একজনের ঠোঁটের উপর খেলে গিয়েছিল সফলতার আনন্দ থেকে জাত মিষ্টি মধুর এক প্রশান্ত হাসির ঝিলিক। বাবুলাল চোখানীর কথা বলছি—আলিবাবার সাফল্যের ইতিহাসে তাঁর অবদানও কম উল্লেখযোগ্য নয়, আলিবাবার চিত্রায়ণের প্রস্তুতিপর্বে তাঁর সংযোগ যে কত ঘনিষ্ঠ, কত অপরিহার্য ও কত তাৎপর্যপূর্ণ সে কথা আগেই ব্যক্ত করেছি। তাই আলিবাবার জয়লাভে আমাদের সঞ্চিত আনন্দের ভাগ তিনিও নিলেন আনন্দের সঙ্গেই। আলিবাবার জয়জয়কারের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মধুর সঙ্গে একটি আধুনিক সামাজিক ছবির ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হলেন। এই ছবিটি মুক্তি পেতে অকল্পনীয় জনপ্রিয়তায় বিভূষিত হয়েছিল। এই ছবির নাম "অভিনয়"। এরও কাহিনীকার শ্রীমন্মথ রায়। নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন সাহিত্যিক অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য। সে যুগের চলচ্চিত্র জগতের প্রায় অপরিহার্য চিত্রনায়ক। আমার বাবার ভূমিকায় দেখা দিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। অহীন্দ্রবাবুর চরিত্রটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দুরূহ। আমার চরিত্রটি ছিল অত্যন্ত শক্ত আর তা ছাড়া মনস্তত্ত্বমূলক। কাহিনীর নামকরণ অনুধাবন করলেই সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে কতখানি দুরূহ ও কঠিন পটভূমিকার উপর এর গল্পাংশ গঠিত। অভিনয়ের সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন সুরসাগর স্বর্গীয় হিমাংশু দত্ত। এখন সহশিল্পীদের মধ্যে অহীনবাবু আর ধীরাজ যুক্ত হওয়ায় আমার মনের অবস্থা যে কি রূপ নিল তা কি খুলে বলতে হবে? আমার তুলনায় এঁরা দুজনেই তখনকার দিনেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সংখ্যার দিক থেকেও আমার তুলনায় জীবনে তাঁরা অসংখ্য বার ক্যামেরার মুখোমুখি হয়েছেন, চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ তখনই সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে, তাঁদের কাছে আমি তো একেবারে আনকোরা, একেবারে নতুন। তাঁদের মত খ্যাতিলব্ধ শিল্পীদের সঙ্গে একত্রে অভিনয় করার অভাবনীয় সুযোগ পাওয়ায় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি—আমি উল্লসিতা তো হয়েছিলুম ঠিকই কিন্তু তার থেকেও বেশী হয়েছিলুম সচকিতা। ক্যামেরার সামনে এর আগে যে একেবারেই দাঁড়াইনি তাও অবশ্য নয়—উদাহরণ আলিবাবা। কিন্তু এখানে একটা বলবার কথা আছে। আলিবাবার শিল্পিগোষ্ঠী ছিল আমাদের নিজস্ব, পেশাদারী শিল্পীরা তার ভূমিকালিপিতে ছিলেন অনুপস্থিত—আমাদের নিজস্ব শিল্পিগোষ্ঠী নিয়ে আলিবাবার চিত্রায়ণে প্রথম সঙ্কল্প যখন মধু করে তখন তার পথরোধ করে এসে দাঁড়ায় সংখ্যাতীত বাধা। তারপর অপরিসীম মনোবল মূলধন করে কি করে মধু সে বাধার পাহাড় অতিক্রম করল এ সম্বন্ধে বিশদ ইতিহাস আগেই ব্যক্ত করে এসেছি, গত সংখ্যায় যাঁরা "স্মৃতির টুকরো" পড়েছেন তাঁদের কাছে এ সম্বন্ধে নতুন করে আর বলার কিছু নেই। সুতরাং একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতির কারণ হওয়া আমার অভিপ্রেত নয়। তাই আলিবাবার শিল্পীর দল সবাই আমাদের ঘরোয়া শিল্পীর মত, অভিনয়ে সঙ্কোচ কিছু ছিল না। সহজ স্বাভাবিক গতিতে অভিনয় করে গেছি কিন্তু অভিনয়ে তো তা হল না। অহীন্দ্র চৌধুরী ও ধীরাজ ভট্টাচার্যের মত তখনকার দিনের দুই জনপ্রিয় শিল্পী ভূমিকালিপি সমৃদ্ধ করলেন। তখনকার দিনে চিত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতার তুলনায় আমার অভিজ্ঞতা কতটুকু? অনুমান করুন ওঁদের মত শিল্পীর সঙ্গে অভিনয় করায় প্রথম প্রথম সঙ্কোচ, জড়তা আসা স্বভাবিক। অথচ চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতে, চরিত্রটির যথাযথ রূপদানে, চরিত্রটিতে জীবনের স্বাক্ষর এঁকে দেওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্কোচ, লজ্জা, জড়তা সর্বতো ভাবে পরিহার্য। অন্তর্যামীই জানেন, কি করে এই ত্রয়ীর ( সঙ্কোচ, লজ্জা, জড়তা ) হাত থেকে আমি মুক্তি পেয়েছিলুম, তবে মুক্তি যে আমি পেয়েছিলুম তার প্রমাণ পাওয়া গেল অভিনয় মুক্তি লাভের পর ( ১৯৩৮ ) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার অনুকূল অভিমতে। অভিনয়ের মধ্যে আমার টেম্পিকোরিয়ান নাচও যুক্ত ছিল। আমার অসীম সৌভাগ্য, দর্শক সমাজ আমায় স্থান দিলেন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর আসনে, দিকে দিকে দেখা গেল অভিনয়ের জয়জয়কার। অভিনয়ের পরিচালক হিসেবে মধু পেল সুধীজনের সমাদর, অভিনন্দন ও স্বীকৃতির মহামূল্য জয়মাল্য। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## জন্মনিয়ন্ত্রণ সমস্যা

"দিল্লীতে আন্তর্জাতিক জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের যে অধিবেশনে নানা স্থানের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও সমাজতত্ত্বজ্ঞগণ সমবেত হইয়াছেন, তাহাতে ভারতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে অদূর ভবিষ্যতে ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভবাশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। বিখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক স্যর জুলিয়ান হাক্সলী বলিয়াছেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ভারত যদি সাফল্য লাভ করিতে পারে, তবে সে—যেমন এশিয়ায় নেতৃত্ব লাভ করিবে, তেমনই জগতে আশার বিস্তার সাধন করিবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে—যদি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না হয়, তবে আগামী ৪৫ বৎসরে ভারতের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। ফলে অর্থনৈতিক সর্বনাশ অনিবার্য হইবে এবং বেকার সমস্যা ও অনুরূপ অন্যান্য সমস্যা সমাধানের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। এইরূপ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে যে খাদ্য হইতে বালামী পর্যন্ত নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘটিবে, তাহা বলা বাহুল্য। আজ সেই সমস্যা কেবল ভারতের নহে, পরন্তু সমগ্র জগতের। পূর্বে—যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রভৃতির প্রকোপে লোক ক্ষয় হইত। এখন দুইটি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পরে সকল সভ্য দেশ যুদ্ধবিরতি কামনা করিতেছে। সে কামনার কি হইবে বলা দুষ্কর হইলেও তাহা যে কাম্য, তাহা বলা বাহুল্য। দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মহামারীও নিবারিত হইতেছে। কাজেই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায় কারণ দূর হওয়ায় সে বৃদ্ধি রোধ করা যাইতেছে না। সংযম যত ভালই কেন হউক না, দেখা যাইতেছে, অসংযমই বাড়িতেছে বলা যায়। জন্ম-নিরোধের কোন কোন উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিতও হইয়াছে। বহুদিন পূর্বে ডক্টর আনি বেসান্ট যখন ব্রাডলর সহিত একযোগে কাজ করিতেছিলেন, তখন তিনি, সেই সময় পর্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইত, সে সকলের আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ লেখিকা মারী ষ্টোপসেরই মত ঐ সকল উপায় স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল নহে, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। অথচ তখনই বুঝা গিয়াছিল—বাইবেলের কথা সে-ই ভাগ্যবান who has his quiver full বর্তমান কালোপযোগী নহে। বর্তমানে অস্ত্রচিকিৎসায় যে ব্যবস্থা হয়, তাহাতেও সময় সময় কুফল হইয়াছে ও হইতেছে।"

—দৈনিক বসুমতী।

## পুলিশের কর্তব্য

"গত রবিবার বাৎসরিক পুলিশ প্যারেডে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলিয়াছেন যে, ক্ষমতা যাঁহাদের হাতে আছে, তাঁহাদের উহা বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া সতর্কতা সহকারে বুদ্ধি-বিবেচনার সঙ্গেই প্রয়োগ করা উচিত। হাতে লাঠি থাকিলেই যে উহা প্রয়োগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপনে পুলিশের অধিক সচেষ্ট হওয়ার জন্যও তিনি আবেদন জানাইয়াছেন। পুলিশের প্রতি এই ধরণের উপদেশ কয়েক বৎসর ধরিয়াই দেওয়া হইতেছে। সুখের বিষয়, অপরাধ দমনে ও জনসাধারণের সহযোগিতা লাভে কলিকাতা পুলিশের কর্মোন্নতি কতকটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। পুলিশের পক্ষ হইতে অপ্রকাশিত অভিযোগ ছিল যে, ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় তাঁহাদের কর্তব্য পালনে অসুবিধা ঘটে। তাহার পরিমাণও ব্যক্তি বর্তমানে কিছু হ্রাস পাইয়াছে। ইহাও সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে সহরে হউক বা মফঃস্বলে হউক, পুলিশই জনসাধারণের সর্বপ্রধান আশ্রয়। সুতরাং তাঁহারা যদি কর্তব্যনিষ্ঠ হন এবং তাঁহাদের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অসঙ্গত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা সংযত করেন, তাহা হইলে দেশবাসীরও উপকার হইবে, পুলিশেরও কর্তব্য পালন সহজ হইবে।"

—যুগান্তর।

## কাগজের দুর্ভিক্ষ

"কাগজের বাজারে আগুন, বাংলার পুস্তক-ব্যবসায়ীরা আজ ললাটে করাঘাত করিতেছেন আরও একটা কারণে। কারণটা করের আঘাত। করের উপরে কর; কর দিতে হয় মিলে, কর দিতে হয় ছাপাখানায়, কর দেয় বড় বড় বাঁধাই প্রতিষ্ঠান। উটের পিঠে শেষ খড়ের আঁটি রাজ্যের বিক্রয়-কর। এই এক করেই রক্ষা ছিল না, ইহার আবার এক দোসরও জুটিয়াছে, কেন্দ্রীয় আন্তঃপ্রাদেশিক বিক্রয়-কর। দুইভাবে কলিকাতার পুস্তক-বিক্রেতারা দুইয়া পড়িয়াছেন। কেন্দ্রীয় কর অবশ্য সব রাজ্যেই আছে—কিন্তু সব রাজ্যে রাজ্য-সরকারকে দেয় পুস্তকের উপর স্বতন্ত্র বিক্রয়-কর নাই। সমগ্র ভারতে মাত্র ছয়টি অঞ্চলে এখনও এই কর আছে—তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। কর দিল্লীতে নাই, বোম্বাইয়ে নাই, মাদ্রাজে নাই, উত্তর-প্রদেশে নাই। ক্রেতারা—আসাম, উড়িষ্যার ত বটেই, এমন কি বাংলার ক্রেতারাও—অতএব দিল্লী বা বোম্বাইয়ে ছুটিতেছেন। কেন না, সেখানে বিক্রয় যে নিষ্কর। সেখানে বই কিনিলে রেলের অধুনা লঘুকৃত মাশুল মিটাইয়া অনেক টাকা বাঁচে। ডাক-মাশুলের বর্ধিত হারের কথা না-ই বা তুলিলাম। বাংলার পুস্তক-ব্যবসায়ীরা নিরুপায় দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। অপরকে দোষ দিয়া লাভ নাই, বাংলার সরকারই যে তাঁহাদের প্রতি বাম। সঙ্কটটা শুধু ব্যবসায়ের হইলে এত কথা লিখিতাম না। সঙ্কটশিক্ষারও। যে-দেশে শিক্ষিতের কথা ছাড়িয়া দিই, সাক্ষরের সংখ্যা এখনও মুষ্টিমেয়, সে-দেশে অন্নবস্ত্রের পরই অগ্রাধিকারের দাবি শিক্ষার। শিক্ষা-বিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন সরকার স্বয়ং, বিদ্যার পায়ে নিগড় পরাইয়া রাখিয়াছেন, ইহার চেয়ে লজ্জার আর কিছু নাই। শিরেই সর্পাঘাত করিয়াছে, তাগা বাঁধিবার জায়গাটুকুও খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## অর্থনীতিবিদের চাকরি

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্রদের সভায় ডাঃ জে, পি, নিয়োগী বলিয়াছেন—এ যুগের অর্থনীতি বিদের নিকট ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি (Careerism) একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনীতিবিদেরা টাকার লোভে সরকারের ক্রীতদাস হইতে স্বীকৃত হইলে বিশ্বের কি ভীষণ অকল্যাণ, তাহা সাধারণ লোক এখনও ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই। বৈজ্ঞানিকরা ব্যবসায়

তৈরি অস্বীকার করিলে বিশ্বের সাধারণ শান্তিকামী মানুষ নিরাপদ হইতে পারে। নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়া উহার অপপ্রয়োগ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন এবং সমস্ত অর্জিত সম্পত্তি বিশ্বের কল্যাণে দান করিয়াছিলেন। আজিকার বৈজ্ঞানিকদের এই বিবেক কোথায়? ভারতের পাঁচশালা প্লান ধনিক-স্বার্থে মোচড়াইবার কাজে বুদ্ধি ভাড়া দিয়াছেন দেশেরই একদল অর্থনীতিবিদ। মুষ্টিমেয় কয়েকজন অর্থনীতিবিদ উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। যতই প্লান অগ্রসর হইতেছে ততই নিঃসন্দেহে প্রমাণ হইতেছে এই অল্প কয়েক জনের কথাই ঠিক, কারণ এঁরা টাকা দেখেন নাই, দেশ দেখিয়াছিলেন।" —যুগবাণী।

## য়্যারিষ্টোক্র্যাট লেফ্‌টিষ্ট

"সিদ্ধার্থশঙ্কর যে বিধান সভায় টেপ রেকর্ডার বাজাইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য, চাউল সমস্যার বাস্তব অবস্থা মন্ত্রীদের গোচরীভূত করা এবং বাজারের একদল চাউল বিক্রেতার সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত কথোপকথনের প্রামাণিক বিবরণী দেওয়া। স্পীকার অবশ্য টেপ রেকর্ডার বাজাইবার অনুমতি দেন নাই। সিদ্ধার্থশঙ্কর তাহাতে তেমন দুঃখিতও নহেন; তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেও মনোবাসনা তো পূর্ণ হইয়াছে! যে সাহেব প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন, তিনি কালতু লেফ্‌টিষ্ট নহেন, একটি পাক্কা য়্যারিষ্টোক্র্যাট লেফ্‌টিষ্ট।" —বর্তমান (কলিকাতা)।

## রাজনৈতিক ভাঁড়ামী

"যাঁদের কিছু মাত্র বুদ্ধি ও সততা আছে তাঁরা বুঝবেন, শ্রীডাঙ্গের বক্তৃতা ভাড়াটেগিরিও নয়, ও হচ্ছে নিছক ভাঁড়ামী। এই সব নয়, আরও আছে। শ্রীডাঙ্গে ভারতের সংকটের বিশেষত্ব দেখাতে গিয়ে বলেছেন যে, অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশে দেখা গেছে ভারী শিল্পেই অবনতির হার বেশি। অন্য দিকে ভারতে ভারী শিল্পে অবনতি হয় নি, হয়েছে কাপড় পাট চা ইত্যাদির বাজারে। শ্রীডাঙ্গে খুব সন্তোষের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, টাটা ও মার্টিন বার্ণের লোহার কারখানার দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। অবশ্য ঐ দুই কারখানার শ্রীবৃদ্ধিতে শ্রীডাঙ্গের উল্লাসের কারণ থাকতে পারে —কিন্তু তার ফলে ভারতবাসীর অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে অর্থাৎ কত বেশি শ্রমিক কাজ পেয়েছেন—শ্রমিকদের উপার্জন কত বেড়েছে—লোহা ও ইস্পাতের দাম কত কমেছে শ্রীজন ও শ্রীডাঙ্গে তার হিসেব দেওয়া দরকার মনে করেন না। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা—ইস্পাত শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি—এ-আই-টি-ইউ-সির সাধারণ সম্পাদক টাটা ও মার্টিন বার্ণের লাভের হার বৃদ্ধি, শ্রমিক প্রতি শোষণের হার বৃদ্ধির খোঁজ রাখেন না! ভাড়াটের বুদ্ধিতে এটা যোগায় না যে, প্রথমতঃ কোন দেশেই একই সময়ে সকল শিল্পের অবস্থা একরকম হয় না। প্রতি দেশেই সংকট মানে প্রধান শিল্পে সংকট। শিল্পোন্নত দেশে লোহা ইস্পাত-শিল্পই সকল শিল্পের ভিত্তি, সেইগুলিই প্রধান। আমাদের দেশ অনুন্নত; তার অর্থ আমাদের দেশে ভারী শিল্প প্রধান শিল্প নয়। আমাদের দেশে প্রধান শিল্প হচ্ছে কাপড় পাট এবং চা। অর্থাৎ অন্য দেশে যেমন ভারতেও তেমন প্রধান শিল্পের ভিত্তি মচ্ছে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ ভারতে লোহা-ইস্পাত-সিমেন্টের উৎপাদন ব্যাহত হয় নি, তার কারণ বিশেষ সরকারী ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থাকে অর্থনীতি শাস্ত্রে বলে নয়া কিন্সবাদ এবং যে নীতির ব্যর্থতা সারা দুনিয়ায় পরীক্ষিত সত্য বলে গণ্য।" —জনসাধারণ (কলিকাতা)।

## পুনরায় পাকিস্তানী হামলা

"গত কিছুদিন ধরিয়া রেডিও পাকিস্থান নিয়মিত ভাবে ভারত-বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা চালাইয়া যাইতেছিল—এই অপপ্রচারে সত্যের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখা হয় নাই। সম্প্রতি ঢাকাস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের চেষ্টায় পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এই ঘৃণ্য প্রচার বন্ধ করায় আমরা মনে করিয়াছিলাম যে পাকিস্তানের বুঝি বা সুমতি হইয়াছে এবং হয়ত অতঃপর পাকিস্তান ভারতের সহিত সৌহার্দ্য বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানী সৈন্য আসামের কাছাড় ও গারোপাহাড় সীমান্তে গুলীবর্ষণ করিয়া আমাদের অনুমান যে ভ্রান্ত, তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। যদিও রেডিও পাকিস্তান ভারতবিরোধী অপপ্রচার বন্ধ করার কথা ঘোষণা করিয়াছেন—তথাপি সীমান্তে গুলী চালনার সংবাদ পরিবেশনে এখনও ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিতেছেন। আমরা যতদূর সংবাদ রাখি, তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি সীমান্তে বিনা প্ররোচনায় বার বার পাকিস্তানই প্রথম গুলীবর্ষণ করিয়া আসিতেছে—ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী একেবারে বাধ্য না হইলে আত্মরক্ষার জন্যও গুলীবর্ষণ করে না—কিন্তু পাকিস্তান প্রচার করে যে, ভারতই অহেতুক গুলীবর্ষণ করিয়াছে। সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর প্রত্যেকবার গুলী চালনার পর আসাম সরকার ও ভারত সরকার পাকিস্তানের নিকট প্রতিবাদলিপি পাঠান—তারপর কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্ত তদন্ত এবং গুলীবর্ষণ বিরতি চুক্তি হয়। কিন্তু সেই চুক্তির মর্য্যাদা পাকিস্তান কি ভাবে রক্ষা করে তাহা সকলেই জানেন। এই ভাবে আর কতদিন চলিতে থাকিবে? এই অসহনীয় অবস্থা দূরীকরণের কি কোন উপায়ই নাই?" —যুগশক্তি, (করিমগঞ্জ)।

## সরকারী গুদামে দুর্নীতি

"ঝাড়গ্রাম সরকারী গুদামের দুর্নীতির কথা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। প্রতিকার হয় নাই। গত ২১শে জানুয়ারী মডিফায়েডরেশানিং-এর কয়েক জন ডিলার চাল আনিতে যায় এবং কয়েকটি বস্তার সেলাই দেখিয়া সন্দেহ হওয়ায় বস্তা খুলিয়া দেখে, তাহাতে প্রায় অর্দ্ধেকের বেশী ধুলা-বালি এবং ধান। দুইটি বস্তা এইভাবে পাওয়া যায়। বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে, গুদাম ঝাঁট দিয়া ধুলা-বালি বস্তায় পুরা হইয়াছে। এই সম্পর্কে নাকি গুদামের দুই জন কর্মচারীর মধ্যে বচসা এবং মারামারি হইয়া গিয়াছে। শোনা যাইতেছে, ডিলারকে মাল দেওয়ার সময় নির্দ্দিষ্ট মালের বেশী বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং পরে সেই ঘাটতি এই ভাবে পূরণ করা হয়। গুদামের ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা তদন্তের দাবী জানাইতেছি।" —নির্ভীক, (ঝাড়গ্রাম)।

## নানা কথা

"চাউল লুকাইয়া যে সকল অসাধু ব্যবসায়ী সরকারী ব্যবস্থা বানচাল করিতে উদ্যত, তাহাদের আস্কারা দেওয়া উচিত নয়। দু'-একজনের কঠোর শাস্তি হইলেই সব সায়েস্তা হইয়া যাইবে। দেশে চাউল নাই, ইহা সত্য নহে, তবে সরকারী দরে পাওয়া যাইতেছে না, চড়া দরে কিনিতে হইতেছে। ইহাও সুশাসনের পরিচায়ক নহে। ইতিমধ্যে মডিফায়েড রেশনের দোকান বাড়াইয়া দেওয়া এবং চাউলও যাহাতে খাদ্যোপযোগী হয়, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।"

—পল্লীবাসী (কালনা)।

## কেরোসিন তেলের অভাব

"স্থানীয় সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ, বাজারে খুচরা দরে কেরোসিন পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দোকানে কেরোসিন (খুচরা) আনিতে গেলে দোকানদাররা ভদ্রভাবে বলে, নাই। জানি না আমরা কোথায় বাস করিতেছি। উপরতলার সংবাদ আমাদের কোন অভাব নাই। অভাব শুধু…"।

—গ্রামের কথা (হুযরাজপুর)।

## দ্রব্যমূল্য

"ধান-চাউলের মূল্য লইয়া অনেক বক্তৃতা ও বিবৃতি দেওয়া হইতেছে কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যমূল্য কি ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে সেকথা বিধানসভায় আলোচিত হয় না। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাপড়-কাচা সোডার ব্যাগ ছিল ৬২৲ টাকার মত, হঠাৎ তাহার দাম বাড়িয়া গিয়াছে, এখন এক ব্যাগ সোডার দাম হইয়াছে ১৩৲ টাকা। ধোপারা চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ সোডার দাম এত বাড়িল কেন? সোডার এজেন্ট কে? নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কলিকাতা ও মফস্বলের মধ্যে দামের প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে। মফঃস্বলের এম-এল-এ-গণ সে বিষয় খেয়াল রাখিয়াছেন কি?"

—বীরভূমবাণী (বীরভূম)

## দেশের অগ্রগতি

"তিউক রসিকতা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আপনার কি প্রচুর খাদ্য নাই? খাদ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়াছেন, প্রচুর কেন প্রয়োজনীয় খাদ্য নাই। ইহাতে সকলেই হাসিয়াছিল কিন্তু ইহা অপেক্ষা দুঃখের কি আছে? বার তের বৎসর হইয়া গেল কিন্তু দেশের লোক আজও প্রয়োজনীয় খাদ্য পাইল না! অন্যান্য বিষয় তো ছাড়িয়াই দেওয়া গেল। তবু লোকে বলিতেছে দেশের উন্নতি হইতেছে। অগ্রগতি হইয়াছে। হাঁ হইয়াছে—কিছু লোক চমকী দিয়া খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি করিতে চায়। সরকারকে কর-ফাঁকি দিয়া পদ্মশ্রী ভূষিত হয়।"

—জনমত (জলপাইগুড়ি)

## পরীক্ষা প্রার্থনীয়

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার সম্প্রতি এই প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের শেষ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাকে মন্দ বলি না। তবে শুনা যায়, ইতিপূর্ব্বে যেমন মৌখিক বা দাগ কাটার মত সহজ উত্তর দেওয়ার পরীক্ষা লওয়া হইত, এবার তাহার ব্যতিক্রম হইবে, এবং ছাত্রছাত্রীদের পুরোপুরি লিখিত পরীক্ষা গৃহীত হইবে। ইহা সত্য হইলে সকলেরই চিন্তার কথা। কারণ পরীক্ষার কথা মাত্র মাসখানেক আগে জানানো হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রদের নূতন ভাবে তৈয়ারী করা সম্ভব নহে। কাজেই শিক্ষা অধিকারের পরীক্ষার দিন আরও মাসখানেক পিছাইয়া দেওয়া কিম্বা পূর্ব্বের মত সহজ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।"

—প্রদীপ (তমলুক)।

## পৌরসভার নির্বাচন

"আগামী ১৪ই মার্চ স্থানীয় পৌরসভার সদস্য নির্বাচনের দিন স্থির হইয়াছে। জানা গেল যে, বর্তমান সদস্যদের মধ্যে অনেকেই এবং নবাগতরূপে কয়েকজন প্রার্থী প্রতিযোগিতায় নামিবেন। পৌরসভার কার্য পরিচালনা যেরূপ শিথিলতার সহিত চলিতেছে তাহাতে সহরের বিশেষ কিছু উন্নতি সাধিত হয় নাই। সহরবাসীর কল্যাণ সাধন করেই পৌরসভার সদস্যগণের অবিচল দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায়, ভোট গৃহীত হইবার পূর্বে জনগণের চিত্তকে উজ্জ্বল আশার আলোকে উদ্দীপিত করা হয়। ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচিত সদস্যগণ আশার আলোক হতাশার গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত করিয়া দেন। জাতীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে যে রাস্তা দুইটি পীচাবৃত হইয়াছে সেগুলিও স্থানে স্থানে ক্ষত বহন করিতেছে। সে ক্ষত উপশমের দিকে পৌর কর্ত্তৃপক্ষের কোনো লক্ষ্য দেখা যায় নাই। শুধু কেবলমাত্র পৌরসভার সদস্য-পদ গ্রহণ করিলেই চলিবে না। সহরের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমান নির্বাচনে যাঁহারা বিজেতার সম্মান লাভ করিবেন তাঁহারা সমস্ত দলমতের উর্দ্ধে থাকিয়া সহরের সামগ্রিক কল্যাণ চিন্তা করিবেন এবং সেই অনুসারে কার্য্য করিবেন, এইটুকুই সহরবাসীর পক্ষ হইতে আমাদের কামনা। যাঁহারা প্রার্থী নির্বাচন করিবেন তাঁহাদেরও আজ চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে। উপযুক্ত ব্যক্তিকে বিজয়ীর সম্মান দিয়া সহরকে সমৃদ্ধির পথে লইয়া যাইতে হইলে ভোটদাতাগণকে বিশেষ চিন্তা করিয়া ভোট দিতে হইবে।"

—ভাগীরথী (কালনা)।

## শোক-সংবাদ

### ডাঃ স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

বাঙলা ও বাঙালীর কল্যাণকর্মে নিবেদিতপ্রাণ ভারতবর্ষে জড়-রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডাঃ স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ৭ই মাঘ বেলা ১১-৪৫ মিনিটে ৬৫ বছর বয়সে লোকান্তরিত

হয়েছেন। ১৮৯৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরে তাঁর জন্ম। ১৯১৫ সালে এম, এস, সি পাশ করার পর, স্যার আশুতোষের আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবসৃষ্ট স্নাতকোত্তর শ্রেণীর রসায়নশাস্ত্রের লেকচারার হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত এই বৈজ্ঞানিকের কর্মজীবনের সূচনা হয়। এর পর তিনি শক্তিশালী ইলেকট্রোলাইট তত্ত্ব প্রথম প্রচার করেন ও তাঁর প্রতিভা সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের শ্রদ্ধা-সমাদর লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্সের ডীন ( ১৯২৪ ), ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে রসায়ন শাখার সভাপতি ( ১৯২৫ ), লাহোরের বিজ্ঞান-কংগ্রেসের মূল সভাপতি ( ১৯৩৯ ), ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশান ফর দি কাল্‌টিভেসান অফ সায়েন্সের সভাপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা মুখার্জী লেকচারার ( ১৯২৮ ), ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টার ( ১৯৩৯-৪৭ ), ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল, খড়্গপুরে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজীর ডিরেক্টার, ( ১৯৫০-৫৪ ), পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য প্রমুখ দায়িত্বপূর্ণ এবং সম্মানসূচক আসন জ্ঞানচন্দ্রের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। উপাচার্য হিসাবে ছাত্রদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক মধুর থেকে মধুরতর করে তোলার ক্ষেত্রে তিনি যত্নবান ছিলেন। সর্বতোভাবে উপাচার্য জ্ঞানচন্দ্র ছাত্রদের মঙ্গলকামনায় নিমগ্ন থাকতেন। তাদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব, তিনি সকল বিষয়ে সহযোগিতা করে তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন ও ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট হুড উপাধি দেন ( ১৯৪০ ) এবং ভারত সরকারও কিছু কাল আগে তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। আজকের দিনের এই বাঙ্গালী শোষণের যুগে কেন্দ্রের অবাঙ্গালী শাসকদের দল জনপ্রিয় বাঙ্গালী জ্ঞানচন্দ্রের প্রতি যতখানি নির্ভর করতেন এবং শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তাই থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতা কোন প্রকার সংশয় বা সীমার অতীত। তাঁর পত্নী লেডি নীলিমা ঘোষ এবং তিন পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান। জ্ঞানচন্দ্রের মৃত্যুতে প্রতিটি বাঙালীর মনে আপনজনের বিয়োগব্যথার জন্ম দেবে।

### ডাঃ বি, বি, দে

মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডাঃ বি, বি, দে ৪ঠা মাঘ ৭০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান-পরিষদেরও তিনি একজন সদস্য ছিলেন।

### বিধুভূষণ সরকার

কলকাতার বেলেঘাটা অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ সরকার-পরিবারের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত সদস্য খ্যাতনামা নাগরিক শ্রীবিধুভূষণ সরকার ২রা মাঘ ৭১ বছর বয়সে বৈদ্যনাথধামে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। পল্লীর উন্নয়নকার্যে তাঁর অবদান স্মরণীয়, তাঁর মধুর ব্যবহারও ভোলবার নয়। আজীবন জনসেবার দ্বারা তিনি বহুজনের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। হিন্দুমহাসভারও তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

### ডাঃ হরিপদ মাইতি

ভারতের খ্যাতনামা মনস্তত্ত্ববিদ এবং কলকাতার বিজ্ঞান কলেজের পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ হরিপদ মাইতি গত ৯ই মাঘ ৬৬ বছর বয়সে প্রাণরক্ষা করেছেন। ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের দর্শন ও মনস্তত্ত্ব-বিভাগের তিনি কয়েকবার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ও মনস্তত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টারের আসনও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত। সমাজ-কল্যাণ এবং শিশু-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির প্রসার কার্যে তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন।

### ডাঃ জি, এন, সিংহ

কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক বাঙলার বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ ডাঃ জি, এন, সিংহ ৩রা মাঘ ৭২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। ১৯১৪ সালে ক্যানসাস সিটি ইউনিভার্সিটি থেকে সর্বোচ্চ উপাধি নিয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং নিজেকে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের ক্রমোন্নতির কার্যে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেন। চিত্রসাংবাদিক শিবেন্দ্র সিংহ এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

### পাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

অধুনা বেহালা নিবাসী পাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায় গত ১৫ই জানুয়ারী ১৯৫৯ ( বাংলা ১লা মাঘ, ১৩৬৫ ) বৃহস্পতিবার কার্যোপলক্ষে অফিসে গমন করেন এবং তথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে তাঁহার কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার

আদিবাড়ী ২৪ পরগণা জেলার হালিশহর গ্রামে। তিনি হালিসহরে বহু জনহিতকর কার্যে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ও সরল ব্যবহারের জন্য তিনি হালিসহরবাসিগণের মনে চিরদিন জাগ্রত থাকিবেন। তিনি জে, টমাস এণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড চা-বিভাগের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যথেষ্ট দক্ষতা ও নিষ্ঠা সহকারে কাজ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধবা মাতা, দুই ভ্রাতা, স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই আকস্মিক অকাল-বিয়োগে যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## বাঙলা-সাহিত্যে ছদ্মনাম

আপনাদের আশ্বিন সংখ্যায় যে ছদ্মনামের তালিকা বেরিয়েছে, ওতে 'বেদুঈন'-এর আসল নাম দেবেন দাস বলা হয়েছে কিন্তু ওটা ভুল। 'বেদুঈন'-এর আসল নাম দেবেশচন্দ্র দাস।

কার্ত্তিক সংখ্যায় জনৈক পাঠক শ্রীবাসব-এর নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নয় বলে দাবী করেছেন। কিন্তু আমাদের ধারণা, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-ই শ্রীবাসব ছদ্মনামধারী লেখক: এ বিষয়ে আশুতোষ বাবু সঠিক সংবাদ জানাতে পারলে খুশী হবো।

অগ্রহায়ণ সংখ্যায় জনৈক পাঠক 'মুশাফির' ছদ্মনামধারীর নাম সৈয়দ মুজতবা আলি বলে জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য, 'মুসাফিরের ডাইরী' গ্রন্থের লেখকের আসল নাম কি?—যদি কেউ তা জানান ভাল হয়।

চার্ব্বাক (ছন্দপতন-এর লেখক) সব্যসাচী, শৌভিক, দেবাচার্য্য প্রভৃতির আসল নাম কেউ জানালে বাধিত হবো। ঐ অগ্রহায়ণ সংখ্যাতেই 'হেমেন্দ্রকুমার রায়'-এর আসল নাম হিসাবে 'প্রসাদ রায়' নাম দেওয়া হয়েছে। এখানে আমার জিজ্ঞাস্য, কোনটি আসল নাম—প্রসাদ রায় না, হেমেন্দ্রকুমার রায়? আমার বিশ্বাস, হেমেন্দ্রকুমার রায়। এ বিষয়ে সঠিক ভাবে একমাত্র স্বনামধন্য হেমেন্দ্র বাবুই জানাতে পারেন।

এই পত্রে আমি কতকগুলি ছদ্মনামের আসল নাম জানাচ্ছি। এগুলো আপনাদের পত্রিকায় অনুল্লিখিত হয়েছে। আশা করি প্রকাশ করবেন।

| ॥ ছদ্মনাম ॥ | ॥ আসল নাম ॥ |
|---|---|
| ১। ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী | ডাঃ অতুলানন্দ দাসগুপ্ত |
| ২। শুভঙ্কর (আর্য্যারচনাকার) | ভৃগুরাম দাস |
| ৩। ভাঁড়ু দত্ত | অমৃতলাল বসু (রসরাজ) |
| ৪। ভৃগুনায়ক | শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য |
| ৫। পথচারী | শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায় |
| ৬। সন্নাতন | শ্রীশান্তিভূষণ রায় |
| ৭। সঞ্জয় | শ্রীশান্তিভূষণ রায় |
| ৮। মুদ্রিত বরণ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ৯। বীণা অভিলাষ | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর |
| ১০। যম দত্ত | যতীন্দ্রমোহন দত্ত |
| ১১। শারস্বত শর্ম্মা | রাজা রামমোহন রায় |
| ১২। শিবপ্রসাদ শর্ম্মা (অনেকের মতে) | রাজা রামমোহন রায় |
| ১৩। অ, দত্ত | অরু দত্ত |
| ১৪। শ্রীসেবক | শ্রীরাইচরণ চক্রবর্ত্তী |
| ১৫। অপরাজিতা দেবী | রাধারাণী দেবী |
| ১৬। কৃত্তিবাস ওঝা | মোহিতলাল মজুমদার |
| ১৭। অবধূত | শ্রীকালিকানন্দ মুখোপাধ্যায় |
| ১৮। পঞ্চমুখ | শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু |
| ১৯। প্রমথনাথ শর্ম্মা (নববাবুবিলাস-এর লেখক) | ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ২০। শ্রীপষ্টুমারতার চট্টোপাধ্যায় | বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় |
| ২১। শ্রীনাকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় | ঐ |
| ২২। প্রবুদ্ধ | প্রবোধচন্দ্র বসু |

শ্রীঅবনীকুমার নাগ, ১৩৭, আপার লালবাজার (বাঁকুড়া)
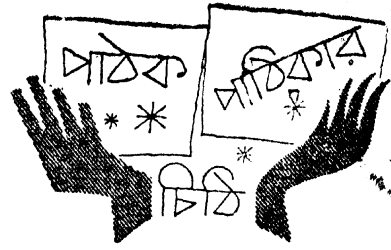
### মহাপ্রভুর প্রচার

নমস্কার · নিবেদন মিদং বিশেষ পরে মহাশয়, এই সংখ্যার মাসিক বসুমতী আমার এজেন্সীতে ৫ কপি বাড়াইয়া মোট ২৫ কপি পাঠাইবেন। ৺গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিষয় প্রকাশ জন্য মাসিকের চাহিদা বাড়ছে, অতএব দয়া করিয়া ২৫ কপি পাঠাইবেন। ইতি—এজেন্ট S. K. Sircar. (Katrasgarh)।

### লালবাঈ

গত ১৩৫৮ সাল হইতে আপনার সম্পাদিত 'মাসিক বসুমতী'র আমি একজন গ্রাহিকা। এই পত্রিকা আপনার সম্পাদনায় অপরাপর মাসিক পত্রিকা অপেক্ষা সুন্দর সুন্দর গল্প, উপন্যাস প্রবন্ধ ইত্যাদির দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে; তাহার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি কয়েকটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করি। গত ১৩৬১ সাল হইতে ১৩৬৩ সালের "মাসিক বসুমতী"তে রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ' পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ পাইয়াছিলাম। এখানে জিজ্ঞাস্য—"রাণী চন্দ্রপ্রভা কি নিজহাতে স্বামী রঘুনাথ সিংহকে হত্যা করিয়াছেন? এবং স্বামিসহ সহমরণে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন?" কারণ গত ১৩৬৩ সালের মাসিক বসুমতীতে বৈশাখ সংখ্যায় রমাপদ চৌধুরী "লালবাঈ" উপন্যাসে লিখিয়াছেন যে, "সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্য স্থির করে তীর ছুড়লো চন্দ্রপ্রভা। বিষাক্ত তীর এসে বিঁধলো রঘুনাথের বুকে।··· যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করতে করতে রঘুনাথ অস্ফুটে বললে চন্দ্রা, তুমি? তুমি হত্যা করলে আমাকে?" ইহার পর লেখক লিখিয়াছেন, চন্দন কাঠের চিতায় শ্মশানে রঘুনাথকে দাহ করা হয় এবং সেই চিতায় রাণী চন্দ্রপ্রভা স্বামীর সহিত সহমরণে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

কিন্তু গত ১৩৬৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতবর্ষের' শ্রীআশাকুমার পালিত মহাশয়ের "পতিঘাতিনী সতী" পাঠ করিলাম। শ্রীপালিত লিখিয়াছেন যে, "চন্দ্রপ্রভা গোপাল সিংহকে দিয়া স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রঘুনাথ চন্দ্রপ্রভার নিকট আসিলেন। চন্দ্রপ্রভা গোপাল সিংহকে বলিলেন হত্যা কর। গোপাল সিংহ রঘুনাথকে হত্যা করিলেন।···তাহার পর চন্দ্রপ্রভা কি করিলেন।···পতিহত্যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চন্দ্রপ্রভা তুষের আগুনে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।"

একই ঘটনা দুইজন শ্রদ্ধেয় লেখকের বিভিন্ন প্রকার লেখায় আমার প্রকৃত ঘটনা জানিবার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, উপরোক্ত চিঠিখানি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া শ্রদ্ধেয় লেখক রমাপদ চৌধুরীর নিকট হইতে আপনার পত্রিকায় আমার প্রশ্নের উত্তরদানে সুখী করিবেন।—শ্রীমতী ভারতী ভট্টাচার্য্য, পোঃ + গ্রাম—বেগমপুর, জেলা—২৪ পরগণা।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Herewith Rs. 15/- being annual subscription of Monthly Basumati commencing from Paus 1365 B. S.—Krsti Sangsad, Barranagore, Calcutta.

ষাণ্মাসিক গ্রাহক-মূল্য ৭৷৹ পাঠাইলাম। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—Sovana Ghose. Lucknow.

I am sending my half-yearly subscription—Shanti Lahiri, Kanpur.

Subscription for Monthly Basumati Rs. 15/- is remitted in advance for the year 1959.—Berhamprore Girls Mahakali Pathsala, Mursidabad.

পৌষ সংখ্যা হইতে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার জন্য ছ' মাসের চাঁদা বাবদ ৭৷৹ টাকা পাঠাইলাম।—Sm. Minoti Basu. Sambalpur.

কার্ত্তিক হইতে চৈত্র মাসের ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—Mrs. Kanak Moitra, Kanpur.

আমরা আপনাদের মাসিক বসুমতীর গ্রাহক হইতে চাই। সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া ষাণ্মাসিক গ্রাহক-তালিকাভুক্ত করিয়া লইবেন।—Ahrity Library, Jorhat, Assam.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা ১৫৲ পাঠানো হইল। অনুগ্রহ করিয়া আমাদের পাঠচক্রের জন্য এক কপি করিয়া মাসিক বসুমতী পাঠাইলে বাধিত হব।—গান্ধী পাঠচক্র, জলপাইগুড়ি।

I am sending herewith Rs. 7.50 as the subscription of Monthly Basumati for six months.—Nilima Bhau. New Delhi.

পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের চাঁদা ৭৷৹ টাকা পাঠাইলাম।—ছায়া ঘোষাল. Lansdowne Place, Calcutta.

Please renew my subscription to 'Masik Basumati' for one year from the expiry of subscription ending Kartik.—Bani Pramanik. Santipur.

Herewith Rs. 15/- as yearly subscription for Monthly Basumati.—Protap Singh S. D. O, Nangal Township, Hoshiarpur (Punjab).

আগামী ছয় মাসের জন্য ৭.৫০ পাঠাইলাম। মাঘ হইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া সুখী করিবেন।—সুরমা চন্দ, Keonjhar.

I am sending herewith Rs. 7.50 being the half-yearly subscription of your Monthly Basumati. Kindly keep sending the copy of this journal from this month.—Staff Club, Kanke, Ranchi.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠাইলাম। পৌষ সংখ্যা হইতে গ্রাহিকা-শ্রেণীভুক্ত করিয়া সত্বর পুস্তক পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—বরণা সেনগুপ্তা, কুচবিহার।

Herewith sending Rs. 7.50 being the subscription for a further period of six months. —Mokochung (N. H. T. A.)

Remitting herewith Rs. 7.50 for another six months as subscription for Masik Basumati.—Sm. Bela De, Madhubani, Darbhanga.

মাসিক বসুমতীর ছয় মাসের চাঁদা বাবদ ৭.৫০ টাকা পাঠাইলাম। কার্ত্তিক (১৩৬৫) মাস হইতে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—Akonda Baria S. C. Junior High School, Malda.

আশ্বিন হইতে ষাণ্মাসিক গ্রাহক-মূল্য পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। —Mira Basu, Siduli, Burdwan.

গত শ্রাবণ মাস হইতে আমাকে রীতিমত মাসিক বসুমতী পাঠাবেন। অদ্য ৭৷৹ পাঠাইলাম।—Mrs. Guha-Mazumdar Lazars Church Road, Madras.

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

# মাসিক বসুমতী

৩৭শ বর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৬৫ ] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [ দ্বিতীয় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

## কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব। আজ ঠাকুর ঐরূপে কলিকাতায় যাইবেন—
ছ মল্লিকের বাটীতে। মল্লিক মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী ঠাকুরকে বিশেষ
ক্তি করিতেন—তাঁহাকে দেখিয়া আসিবেন ; কারণ, অনেক দিন
াঁহাদের কোন সংবাদ পান নাই। ঠাকুরের আহারাদি হইয়া
গয়াছে, গাড়ী আসিয়াছে। এমন সময় আমাদের বন্ধু অ—
লিকাতা হইতে নৌকা করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া
পস্থিত। ঠাকুর অ—কে দেখিয়াই কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া বলিলেন,
তা বেশ হয়েছে, তুমি এসেছ। আমি আজ যদু মল্লিকের বাড়ীতে
াচ্ছি ; অমনি তোমাদের বাড়ীতেও নেবে একবার গি—কে দেখে
াব ; সে কাজের ভিড়ে অনেক দিন এদিকে আসতে পারে নি।
ল, একসঙ্গেই যাওয়া যাক্।' অ—সম্মত হইলেন। অ—র তখন
াকুরের সহিত নূতন আলাপ, কয়েকবার মাত্র নানা স্থানে তাঁহাকে
দেখিয়াছেন। অদ্ভুত ঠাকুরের, আমরা যাহাকে তুচ্ছ, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য
ঈশ্বরোদ্দীপনায় ভাবসমাধি যেখানে সেখানে যখন তখন উপস্থিত
হইয়া থাকে, অ—তাহা তখনও সবিশেষ জানিতে পারে নাই।

এইবার ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন। যুবক ভক্ত লাটু, যিনি এখন
স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে সকলের পরিচিত, ঠাকুরের বেটুয়া, গামছাদি
আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া
গাড়ীতে উঠিলেন ; আমাদের বন্ধু অ—ও উঠিলেন ; গাড়ীর একদিকে
ঠাকুর বসিলেন এবং অন্যদিকে লাটু মহারাজ ও অ—বসিলেন।
গাড়ী ছাড়িল এবং ক্রমে ক্রমে বরাহনগরের বাজার ছাড়াইয়া মতি-
ঝিলের পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে বিশেষ কোন ঘটনাই
ঘটিল না। ঠাকুর রাস্তায় এটা-ওটা দেখিয়া কখন কখন বালকের
ন্যায় লাটু বা অ—কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ; অথবা একথা
সেকথা তুলিয়া সাধারণ সহজ অবস্থায় যেরূপ হাস্য-পরিহাসাদি
করিতেন, সেইরূপ করিতে করিতে চলিলেন।

দক্ষিণে একখানি মদের দোকান, একটি ডাক্তারখানা এবং কয়েকখানি খোলার ঘরে চালের আড়ৎ, ঘোড়ার আস্তাবল ইত্যাদি ছিল। ঐ সকলের দক্ষিণেই এখানকার প্রাচীন সুপ্রসিদ্ধ দেবীস্থান ৺সর্ব্বমঙ্গলা ও ৺চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরে যাইবার প্রশস্ত পথ ভাগীরথী-তীর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ঐ পথটিকে দক্ষিণে রাখিয়া কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে হয়।

মদের দোকানে অনেকগুলি মাতাল তখন বসিয়া সুরাপান ও গোলমাল হাস্য-পরিহাস করিতেছিল। তাহাদের কেহ কেহ আবার আনন্দে গান ধরিয়াছিল; আবার কেহ কেহ অঙ্গভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেও ব্যাপৃত ছিল। আর দোকানের স্বত্বাধিকারী, নিজ ভৃত্যকে তাহাদের সুরা বিক্রয় করিতে লাগাইয়া আপনি দোকানের দ্বারে অন্যমনে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার কপালে বৃহৎ এক সিন্দুরের ফোঁটাও ছিল। এমন সময়ে ঠাকুরের গাড়ী দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। দোকানী বোধ হয় ঠাকুরের বিষয় জ্ঞাত ছিল; কারণ, ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়াই হাত তুলিয়া প্রণাম করিল।

গোলমালে ঠাকুরের মন দোকানের দিকে আকৃষ্ট হইল; এবং মাতালদের ঐরূপ আনন্দপ্রকাশ তাঁহার চক্ষে পড়িল। কারণানন্দ দেখিয়াই অমনি ঠাকুরের মনে জগৎকারণের আনন্দস্বরূপের উদ্দীপনা! —খালি উদ্দীপনা নহে, সেই অবস্থার অনুভূতি আসিয়া ঠাকুর একেবারে নেশায় বিভোর, কথা এড়াইয়া যাইতেছে। আবার শুধু তাহাই নহে, সহসা নিজ শরীরের কিয়দংশ ও দক্ষিণ পদ বাহির করিয়া গাড়ীর পাদানে পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মাতালের ন্যায় তাহাদের আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে হাত নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—"বেশ হচ্চে, খুব হচ্চে, বা, বা, বা।"

অ—বলেন, "ঠাকুরের যে সহসা ঐরূপ ভাব হইবে, ইহার কোন আভাবই পূর্ব্বে আমরা পাই নাই; বেশ সহজ মানুষের মতই কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। মাতাল দেখিয়াই একেবারে হঠাৎ ঐ রকম অবস্থা! আমি তো ভয়ে আড়ষ্ট; তাড়াতাড়ি শশব্যস্তে ধরিয়া গাড়ীর ভিতর তাঁহার শরীরটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসাইব, ভাবিয়া হাত বাড়াইয়াছি, এমন সময় লাটু বাধা দিয়া বলিল, 'কিছু করতে হবে না, উনি আপনা হ'তেই সামলাবেন, প'ড়ে যাবেন না।' কাজেই চুপ করিলাম, কিন্তু বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল; আর ভাবিলাম, এ পাগলা ঠাকুরের সঙ্গে এক গাড়ীতে আসিয়া কি অন্যায় কাজই করিয়াছি! আর কখনও আসিব না। অবশ্য এত কথা বলিতে যে সময় লাগিল, তদপেক্ষা ঢের অল্প সময়ের ভিতরেই ঐসব ঘটনা হইল এবং গাড়ীও ঐ দোকান ছাড়াইয়া চলিয়া আসিল। তখন ঠাকুরও পূর্ব্ববৎ গাড়ীর ভিতরে স্থির হইয়া বসিলেন এবং ৺সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'ঐ সর্ব্বমঙ্গলা, বড় জাগ্রত ঠাকুর, প্রণাম কর', বলিয়া স্বয়ং প্রণাম করিলেন, আমরাও তাঁহার দেখাদেখি দেবীকে উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিয়া ঠাকুরের দিকে দেখিলাম—যেমন তেমনি, বেশ প্রকৃতিস্থ। মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। আমার কিন্তু 'এখনি পড়িয়া গিয়া একটা খুনোখুনি ব্যাপার হইয়াছিল আর কি', ভাবিয়া সে বুক ঢিপ্ ঢিপানি অনেকক্ষণ থামিল না।

"তার পর গাড়ী বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া লাগিলে, আমাকে বলিলেন, 'গি—বাড়ীতে আছে কি? দেখে এস দেখি।' আমিও জানিয়া আসিয়া বলিলাম, 'না'। তখন বলিলেন—'তাই তো গি—র সঙ্গে দেখা হ'ল না, ভেবেছিলাম, তাকে আজকের বেশী ভাড়াটা দিতে বলব। তা তোমার সঙ্গে তো এখন জানাশুনা হয়েছে বাবু, তুমি একটা টাকা দেবে? কি জান, যদু মল্লিক কৃপণ লোক; সে, সেই বরাদ্দ দু টাকা চার আনার বেশী গাড়ীভাড়া কখনও দেবে না। আমার কিন্তু বাবু একে-ওকে দেখে ফিরতে কত রাত হবে, তা কে জানে? বেশী দেরী হ'লেই আবার গাড়োয়ান 'চল, চল' ক'রে দিক্ করে। তাই বেশীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়েছে, ফিরতে যত রাতই হোক্ না কেন, তিন টাকা চার আনা দিলেই গাড়োয়ান আর গোল করবে না। যদু দুই টাকা চার আনা দেবে, আর তুমি একটা টাকা দিলেই, আজকের ভাড়ার আর কোন গোল রইল না; এই জন্যে বলছি।' আমি ঐসব শুনে, একটা টাকা লাটুর হাতে দিলাম এবং ঠাকুরকে প্রণাম করিলাম। ঠাকুরও যদু মল্লিককে দেখিতে গেলেন।"

ঠাকুরের এইরূপ বাহ্যদৃষ্টে মাতালের ন্যায় অবস্থা নিত্যই যখন-তখন আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহার কয়টা কথাই বা আমরা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠককে বলিতে পারি!

রাসমণির কালীবাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যত সাধু সাধক আসিতেন, তাঁহাদের কথা ঠাকুর ঐরূপে অনেক সময় অনেকের কাছেই গল্প করিতেন; কেবল যে আমাদের কাছেই করিয়াছেন, তাহা নহে। ঐ সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার এখনও অনেক লোক জীবিত। আমরা তখন সেণ্টজেভিয়ার কলেজে পাঠ করি। সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ও রবিবার, দুই দিন কলেজ বন্ধ থাকিত। শনি ও রবিবারে ঠাকুরের নিকট অনেক ভক্তের ভিড় হইত বলিয়া আমরা বৃহস্পতিবারেও তাঁহার নিকট যাইতাম এবং উহাতে তাঁহার জীবনের নানা কথা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শুনিবার বেশ সুবিধা হইত। ঐ সকল কথা শুনিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী স্বামীজি, মুসলমান গোবিন্দ—যিনি কৈবর্ত্ত-জাতীয় ছিলেন, পূর্ণ নির্ব্বিকল্প ভূমিতে ছয় মাস থাকিবার সময় জোর করিয়া আহার করাইয়া ঠাকুরের শরীর রক্ষা করিবার জন্য যে সাধুটি দৈব প্রেরিত হইয়া কালীবাটীতে আগমন করেন তিনি এবং ঐরূপ আরও দুই-একটি ছাড়া নানা সম্প্রদায়ের অপর যত সাধু সাধক সকল ঠাকুরের নিকটে আমরা যাইবার পূর্ব্বে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ঠাকুরের অদ্ভুত অলৌকিক জীবনালোকের সহায়ে নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনে নবপ্রাণ-সঞ্চার-লাভের জন্যই আসিয়াছিলেন, এবং তল্লাভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়া ঐ ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু সাধক সকলকে সেই সেই পথ দিয়া কেমন করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে হইবে, তাহাই দেখাইবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিখিতেই আসিয়াছিলেন এবং শিক্ষা পূর্ণ করিয়া যে যাঁহার স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং তোতাপুরী প্রভৃতিও বহু ভাগ্যে ঠাকুরের ধর্ম্মজীবনের সহায়ক-স্বরূপে আগমন করিলেও এতকাল ধরিয়া সাধনা করিয়াও নিজ নিজ ধর্ম্মজীবনে যে সকল নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না, ঠাকুরের অলৌকিক জীবন ও শক্তিবলে সে সকল সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছিলেন।

# আমার কথা

## —হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভগবানদাস পুরোহিত অনুলিখিত

আমার পৈত্রিক বাসস্থান বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত যশাইবাটী গ্রাম। মাতুলালয় রামনারায়ণপুর। এই মাতুলালয়েই আমার জন্মস্থান। আমার পিতামহ কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক বাটী যশোহর জেলার অন্তর্গত ঝাঁপামসী গ্রাম। যশাইবাটীতে তিনি সমৃদ্ধ গ্রামবাসী রামসুন্দর রায়ের মধ্যমা কন্যা গোপীমণির পাণিগ্রহণ করেন। এই গ্রামে তাঁহার শ্বশুর বাসের জন্য কিছু ব্রহ্মোত্তর জমী দিয়াছিলেন। এই জমীতেই তিনি একটি বাড়ী করিয়া বাস করিতেছিলেন।

পিতামহ অনেকটা যাযাবরের মতোই ছিলেন। প্রায় আত্মীয়-স্বজন-কুটুম্ব-বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী যাতায়াত করিতেন। মধ্যে মধ্যে যশাইবাটীতে আসিয়া থাকিতেন। আমার পিতা নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স যখন সাত বৎসর তখন পিতৃবিয়োগ হয়। পিতামহী তাঁহার শিশু সন্তানদের লইয়া একটু বিব্রতই হইয়াছিলেন। পিতা রামসুন্দর তখন জীবিত ছিলেন এবং তিনিই আমাদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। পরে তাঁহার পুত্র নীলকণ্ঠ রায় ভগিনী এবং ভাগিনেয়দিগকে প্রতিপালন করিতেন। এইরূপে মাতুলের সাহায্যে পিতা যশাইবাটীতে ছিলেন এবং গুরুমশায়ের পাঠশালায় লেখাপড়া ও জমীদারী সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। যখন পিতার বয়স বার-তের বৎসর সেই সময় রামনারায়ণপুরের সমৃদ্ধ বংশ বাসকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী জগতমোহিনীর সহিত আমার পিতার পরিণয় হয়। পিতা কার্য উপলক্ষে প্রায় বিদেশে থাকিতেন; পিতামহী তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত যশাইবাটীতে থাকিতেন। পিতা মধ্যে মধ্যে অবসর ক্রমে মাতাকে দেখিতে আসিতেন। মাতাও মধ্যে মধ্যে যশাইবাটীর বাড়ীতে আসিয়া থাকিতেন। আমার বয়স যখন চার বৎসর তখন আমি মাতার সহিত যশাইবাটীতে আসিয়াছিলাম। এখানে ছোট একটি বাংলা বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয়েই আমার বিদ্যারম্ভ হয় মনে হয়। আট-নয় বৎসর বয়সে মাতার সহিত আমি রামনারায়ণপুরে আসিয়াছিলাম। তখন বসিরহাটে একটি মাইনর স্কুল ছিল। আমার মামাতো ভাইদের সংগে আমি এই স্কুলে পড়িতে আসিতাম। পরে বসিরহাটের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সীতানাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় মাইনর স্কুলটি হাইস্কুলে পরিণত হয়। আমি এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

কিছুদিন এখানে পড়ার পরে আমার পাঠক্রমের কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। বসিরহাটের নিকট একটি মধ্য বাংলা স্কুলে বাংলা পড়ার জন্য আমি প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিলাম। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন, তখন আমাদের পড়াইতেন। একবার পরীক্ষায় আমার ফল তত ভাল না হওয়ায় তিনি আমাকে কড়া কথায় তিরস্কার করিয়াছিলেন। আমি এই তিরস্কারে বিরক্ত হইয়া পিতাকে বলিলাম, আমি ও বিদ্যালয়ে আর পড়বো না। আমার মামার বাড়ীর অতি নিকটে একটি গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। আমার পিতা সেই স্কুলে আমাকে ভর্তি করিয়া দিলেন। আমি এইখানে পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া এক বৎসর বৃত্তি পাইয়াছিলাম। পর বৎসর মধ্য বাংলা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

পরে যশাইবাটীতে আসিয়া বাদুড়িয়ার লণ্ডন মিশনারী হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ আরম্ভ করিলাম। যখন আমি এই স্কুলের ছাত্র তখন এই বিদ্যালয় হঠাৎ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হয়। এই সময় বাদুড়িয়ার নিকটবর্তী আরবেলিয়া ও ধান্যকুড়িয়া গ্রামে দুইটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাদুড়িয়ার বিদ্যালয় ভস্মীভূত হওয়ায় আমি এই আরবেলিয়ার এক ব্রাহ্মণবাড়ীতে থাকিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি ধান্যকুড়িয়ায় গিয়া পাঠ আরম্ভ করি। একটি ধনীর বাড়ীতে ছাত্র পড়াইয়া যা কিছু অর্থ পাইতাম তাহাতেই বোর্ডিং-এর খরচ কোন প্রকারে চলিত। আমার দরিদ্র পিতার ইহাতে বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় একবার গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতায় আসি। রেলগাড়ীতে একটি যুবকের সহিত আমার পরিচয় হয়। পরিচয়ে জানলাম, নাম তাঁর শশিভূষণ দাস। তাঁর বাড়ী আমার গ্রামের দক্ষিণে বাদুড়িয়ায়। লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পড়ার সময় ছাত্রগণের মধ্যে আমার এক বিশেষ বন্ধু ছিল। তাঁর নাম শিরীষচন্দ্র দত্ত। আরবেলিয়াতে সে আমার সংগে ছিল। এই শিরীষের কাছে শশীর নাম পূর্বেই আমি শুনিয়াছিলাম। সুতরাং অল্প পরিচয়েই শশীর সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল। তাঁর স্বভাব যেমন সরল তেমনি উচ্চ ছিল। সে কলিকাতার জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশানে ( Scottish Church ) দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আমাকে কলিকাতার এই স্কুলে পড়ার প্রস্তাব করিল। আমি বলিলাম—আমার পিতা দরিদ্র! কলিকাতায় পড়ার ব্যয় পিতা নির্বাহ করিবেন কি করিয়া? সে সনির্বন্ধ হইয়া বলিল—তুমি এখানে ভর্তি হও। এখানকার সাহেব বড় দয়ালু—বেতনের ব্যবস্থা পরে করিব। শশীর কালী বাবু নামে সেই স্কুলের এক শিক্ষকের সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁহার স্কুলের কাজে কিছু প্রভাব ছিল। শশীকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। শশী তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমার কথা তাঁহাকে বলিলে তিনি সদয়-হৃদয় শশীকে বলিলেন—আগামী পরীক্ষায় তোমার বন্ধুর পরীক্ষার ফল দেখিয়া আমি ব্যবস্থা করিব।

তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ( Class-IX ) প্রায় ৮০টি ছাত্র ছিল। মনে করিলাম, পরীক্ষা দিয়া এত ছাত্রের মধ্যে কোন ফলই হইবে না। তাহা হইলেও আমি নিরাশ হই নাই। পরীক্ষা দিয়া দেখি কি হয়। এইরূপে পরীক্ষার পরে কিছুদিন চলিয়া গেল। পরীক্ষা ভাল হয় নাই ভাবিয়া আমি শশীকে ফলের কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি নাই। কি জানি শশী কি বলে? কিছুদিন পরে প্রমোশন হইয়া গেল। আমিও সেই সংগে প্রথম শ্রেণী ( class X ) তে গিয়া পড়িতে বসিলাম। শিক্ষক মহাশয় বহিতে ছাত্রদিগের নাম উল্লেখ করার সময় আমার নাম ডাকা হইতেছে শুনিতে পাইলাম। তখন শশীকে বিস্মিত

হইয়া জিজ্ঞেস করিলাম, আমি তো পরীক্ষার ফল কিছুই জানি না অথচ প্রথম শ্রেণীতে আমার নাম লেখা হইয়াছে। ইহার কারণ কি? তখন শশী বলিল, তুমি তো জানো না, পরীক্ষায় তুমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছ। তাই বিনা বেতনে তুমি এখানে পড়িতে পারিবে। শুনিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। প্রথম শ্রেণীতে পড়িয়া এই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পরে এফ, এ, পরীক্ষা ক্লাসে পড়িতে আরম্ভ করিলাম কিন্তু বেতনের কোন ব্যবস্থা নাই। বিশেষ চিন্তা হইল। তদভিন্ন এই ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক দু-একখানি সংগ্রহ করিলেও অন্য পুস্তকগুলি ক্রয়ের সামর্থ্য হইল না। কাজেই এই স্কুল ছাড়িয়া দিলাম ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে পড়িব স্থির করিলাম কিন্তু সেখানেও বেতন তিন টাকা। কোথায় পাইব? আমার পরিচিত দেশের একটি যুবক তখন বি-এ, ক্লাসে পড়িতেন। তিনি ঐ পর্য্যন্ত পড়া শেষ করিবেন ইচ্ছা করিয়া আমাকে বলিলেন: পটলডাঙ্গার "মল্লিক ফণ্ড" হইতে আমি মাসিক বেতন পাই। তাহাতেই আমার পড়া চলে। আমি উহা ছাড়িয়া দিতেছি। তুমি ওখানে সভাপতির নিকট সাহায্যের জন্য দরখাস্ত কর। এই বলিয়া তিনি দরখাস্ত লিখিয়াও দিলেন।

আমার বড়দাদা পিসতুতো ভাই যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সদরে খাজাঞ্চী ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমার বিষয়ে বলায় তিনি মাসিক কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এখন দরখাস্তের সহিত আমার দেশের ও ক্যাম্বেলে এনাটোমির বিখ্যাত ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে সুপারিশের চিঠি পাইলাম। বড়দাদা এই সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে সাহায্যের কথা জানাইয়া একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিলেন। এই দুইখানি পত্র দরখাস্তের সহিত গাঁথিয়া সভাপতি মহাশয়ের নিকট গিয়াছিলাম। ইণ্ডিয়ান মিরার-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতি ছিলেন। সকালে তাঁহার নিকট গিয়া দরখাস্তটি তাঁকে দিলাম। তিনি দরখাস্ত পড়িয়া পাতা উলটাইয়া চন্দ্রমোহনের সার্টিফিকেট দেখিয়াই বলিলেন—আমি ইহাকে চিনি না; দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

আমি বলিলাম—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও একটি সার্টিফিকেট আছে। ইহা শুনিয়া দরখাস্তটি আবার তুলিয়া পড়িলেন এবং মঞ্জুর করিয়া দরখাস্তটির উপর লিখিয়া দিলেন, To be forworded to the Secretary। আমি মঞ্জুরীর দরখাস্ত পাইয়া পটলডাঙ্গার মেডিকেল কলেজের পশ্চিমে মল্লিকদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। সেক্রেটারী কুঞ্জ বাবুর সহিত দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় একজন লোক তাঁহার কাছে আমাকে লইয়া গেলেন। আমি হাত তুলিয়া নমস্কার করিলাম ও তাঁকে দরখাস্তটি দিলাম। তিনি দরখাস্তটি পড়িয়া দেখিলেন—আমি ব্রাহ্মণ। তখন তিনি বলিলেন আপনি আমাকে দেখিয়া হাত তুলিলেন কেন? আপনি তো ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ করিবেন। আমিও একটু অপ্রতিভ হইলাম। আমি বলিলাম আপনার সম্মানার্থেই ইহা করিয়াছি। তখন তিনি বলিলেন, যাই হোক, আমি ইহা পছন্দ করি না। আপনি ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়িতেছেন, এই সাহায্য হইবেই। সভার আগামী অধিবেশনে আমি ঠিক করিয়া রাখিব। আপনি আসিলে জানিতে পারিবেন।

তাহার কিছুদিন পরে কুঞ্জ বাবুর সহিত দেখা করিলাম। তিনি তাঁহাদের ছাপা একটি পত্র পূর্ণ করিয়া আমাকে দিলেন। বলিলেন, আপনি মেট্রোপলিটনে গিয়া প্রিন্সিপ্যালকে ইহা দিবেন।

আমি কলেজে আসিয়া অধ্যক্ষ বৈদ্যনাথ বসু মহাশয়কে ঐ পত্রটি দিলাম। তিনি অফিসে গিয়া আমার নাম প্রথম বর্ষের ছাত্রদের রেজিষ্টারে লিখিয়া লইতে বলিলেন (১৮৯০এর কাছাকাছি সময়)। এইরূপে আমার বেতনের সমস্যা দূর হইল।

আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। ছাত্র পড়াইয়া কিছু পাইতাম। তাহাতে পুস্তকাদি কিনিতাম ও এই ভাবে খরচ চলিয়া যাইত।

এইরূপ দুই বৎসর পড়ার পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় বর্ষে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। মল্লিকদের ফাণ্ড হইতে কলেজের বেতনের খরচ আসিত।

চতুর্থ বর্ষে উঠিয়া গ্রীষ্মাবকাশে আমি বাড়ী গিয়াছিলাম। গ্রীষ্মাবকাশের পরে কলকাতায় কুঞ্জ বাবুর সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন—আপনি অনেক দিন আসেন নাই; আপনার নাম কাটা গিয়াছে। আমি বলিলাম, গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী গিয়াছিলাম, ইহাই অনুপস্থিতির কারণ। কিন্তু সে কথায় কোন কাজ হইল না। সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়ে নিরাশ হইয়া আমাকে অধ্যয়ন হইতে বিরত হইতে হইল।

সেই সময়ের আমার মনের ভাব লেখায় প্রকাশ করা যায় না। ইহার পরে কলকাতায় থাকিয়া অধ্যাত্ম রামায়ণের বাংলা গদ্যে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলাম। নিষ্কর্মা হইয়া বসে থাকা আমার স্বভাব নয়। তাই অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করিলাম এবং প্রায় দুই বৎসরে অনুবাদকার্য্য শেষ করিলাম (১৮৯৪-৯?)।

ইহার পর বাড়ী গিয়া বাকুড়িয়া হাই স্কুলে হেড পণ্ডিতের কার্য্য করি। যাহা কিছু পাইতাম তাহাতে পিতার বেশ কিছু সাহায্য হইত। ইহার পরে ধাকুড়িয়া স্কুলেও কিছুদিন শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছিলাম। পরে কলকাতা আসিলাম।

কিছুদিন পরে বাংলা ১৩০৭ সালে নাড়াজোলের রাজকুমারের কাছে গৃহশিক্ষকের দরখাস্ত করিলে তিনি মঞ্জুর করিলেন। আমি ঐ সময় নাড়াজোলের ১০ বৎসর বয়স্ক দেবেন্দ্রনাথ খানের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। সেখানে প্রায় দেড় বৎসর ছিলাম।

তাহার পর ১৩০৮ সালে পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিলাম কিন্তু এত দূরে কাজ করায় আমার পিতার অভিমত ছিল না তদনুসারে আমি এ কার্য্য করিব না বলিয়া রাজাকে জানাইলাম আমার নাড়াজোলের সম্পর্ক এখানেই শেষ হইল।

ঐ বছর চৈত্র মাসে আমার পিতা পরলোক গমন করেন। সংসার আমাকেই চালাইতে হইবে—বড় চিন্তিত হইলাম। ছোট ভাই তারাচরণ তখন বাড়ীতে থাকিত। আমি কিছুদিন বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় আসিলাম।

মাঝে মাঝে বড়দার আফিসে আসিতাম। তাঁহার কাছে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের কথা শুনি। দাদা বলেছিলেন—রবি বাবু

শান্তিনিকেতনে এক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে অধ্যাপক ও ছাত্ররা একসঙ্গে আশ্রমেই থাকে। ছাত্র ও অধ্যাপকদের থাকবার ও খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

রবীন্দ্রনাথের মনস্বিনী জননী প্রত্যহ সকালবেলায় আসিয়া প্রাতর্ভোজন ও মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করেন। এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম ১৩০৮ সালে পৌষ উৎসবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় দাদার কাছে আশ্রমের কথা শুনে আমার এখানে আসার বিশেষ ইচ্ছা হইল। কিন্তু আমার মত লোকের এখানে অধ্যাপনা করার ভার পাওয়া স্বপ্নের মতই অলীক। কিন্তু তখন আমি জানি না, আমার ভাগ্যদেবতা আমার পরোক্ষে। এই প্রার্থনায় তথাস্তু বলিয়াছিলেন। এখানে আসার পর আমার এই কথাটি মনে হইয়াছিল।

এই সময়েই আমার বড় দাদা রবীন্দ্রনাথকে আমায় একটি চাকুরী দেওয়ার প্রার্থনা করেন। তিনি তদনুসারে রাজশাহীর অন্তর্গত কালীগ্রাম জমীদারীর সদর কাছারী পতিসরে আমাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে নিযুক্ত করেন। আমি এই নিয়োগ অনুসারে বাংলা সন ১৩০১ সালের শ্রাবণে পতিসরে আসিয়া কার্য্যে যোগদান করি।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর কার্য্য পরিচালন ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আষাঢ়ের শেষে তিনি জমীদারীর কার্য্য দেখিবার জন্য শিলাইদহ জমীদারীতে এবং পরে কালীগ্রামে বোটে আসেন। এই সময়ই কাছারীর সকল কর্মচারী তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য প্রস্তুত হন। আমিও তাঁদের সঙ্গে যাই। সকলে বোটে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে নজর দিয়ে দাঁড়ালেন এবং পরে ক্রমে ক্রমে সকলে স্বস্থানে ফিরে এলেন। আমি নূতন কর্মচারী—কিছু জিজ্ঞাসা করার হয় তো ছিল না, এই ভেবে আমি ফিরে বাসায় এসে বসলাম। এমন সময় একজন আমাকে আসিয়া বলিল, বাবু মশায় আপনাকে বোট ডাকছেন। আমি তাহা শুনিয়া তাহার সংগে বোটে এসে বাবু মশায়ের সামনে দাঁড়ালাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি দিনের বেলায় এখানে কি কর? আমি বলিলাম—জমিদারীর যে জরীপ হয়েছে তাহার চিঠা লইয়া আমীনের সংগে কাজ করি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে কি কর? আমি বলিলাম—কিছুক্ষণ সংস্কৃতের আলোচনা করি। আমি সংস্কৃতে অনুবাদের একখানি বই লিখেছি। রাত্রে তাহার প্রেস-কপি লিখি। তিনি শুনে বললেন, তোমার সেই বইখানি আনো। আমি বাসা থেকে এনে বইটি তাঁকে দিলাম। তিনি তাহা দেখিয়া ফিরিয়ে দিলেন—কিছু বলিলেন না। আমি নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ইহার পরে তিনি শান্তিনিকেতনে এসে পতিসরের ম্যানেজার বাবুকে পত্রে জানালেন: 'শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এইখানে পাঠাইয়া দাও'। শৈলেশ বাবু আমাকে তাহা জানাইয়া বলিলেন: আপনি কি সেখানে যেতে চান? আমি বললাম হ্যাঁ এই পথই আমার জীবনের পথ। সংসারের তাড়নায় আমি যা পেয়েছি তাই আপাততঃ গ্রহণ করেছি। কিন্তু বিদ্যালোচনা ও অধ্যাপনা আমার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, আমি যাবো। শৈলেশ বাবু আমাকে প্রস্তুত হতে বললেন।

আমিও প্রস্তুত হইলাম এবং নৌকাযোগে আত্রাই ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হইলাম। সেই দিনই কলকাতায় বড়দাদার বাসায় আসিলাম। এবং পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় ট্রেণে কবির কাছে এসে উপস্থিত হলাম।

কবি তখন অতিথিশালার (বর্ত্তমান বিদ্যাভবনের লাইব্রেরীর) উপরতলায় থাকিতেন। আমি এসেছি জেনেই তিনি নীচে এলেন এবং আমাকে বললেন: এসো, এই বলে তিনি অগ্রসর হলেন। আমিও সংগে সংগে আশ্রমে চলে এলাম। আশ্রমের ম্যানেজার ছিলেন কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী। তিনি তাঁকে বললেন: এর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। এই বলে কবি চলে গেলেন।

আমি সামান্য লোক। কবি এরূপ স্থলে আমাকে সংগে করে নিয়ে আসবেন—ইহা আমি মনেই করিতে পারি নাই। ভেবেছিলাম, কোন লোক দিয়ে আমাকে পাঠাবেন। আমার প্রতি তাঁর এই উদার ভাব আমার মনকে বিশেষ করে অভিভূত করে ছিল। একথা আমার জীবনে ভুলবার নয়।

পতিসরে তাঁহার যেদিন প্রথম দর্শন হয়েছিল সেই মুহূর্ত্ত আমার জীবনে স্মরণাক্ষরণ হয়ে রয়েছে; আমি যখন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যোগ দিলাম তখন অধ্যাপক ছিলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজীর, জগদানন্দ রায় গণিত ও বিজ্ঞান, সুবোধ মজুমদার ইংরাজী ও ইতিহাসের ও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। আমি আসিয়া সংস্কৃতের অধ্যাপনা গ্রহণ করিলাম।

এই সময় ছাত্রসংখ্যা ১০-১২টি। রথীন্দ্রনাথ, সন্তোষ মজুমদার তখন প্রবেশিকাবর্গের ছাত্র। ছাত্রদের সংস্কৃত পড়ার কোন নির্দিষ্ট বই ছিল না। সেই জন্য কবি আমাকে ছেলেদের সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক লিখবার আদেশ দেন এবং ৬-৭ পাতার খাতা দিয়ে আমাকে বললেন—এই খাতায় শেখানোর যেরূপ ব্যবস্থা আছে সেই অনুসারে বই লেখার চেষ্টা করবেন। আমি সেই প্রণালী অনুসারে সংস্কৃত-প্রবেশ লিখে তিন খণ্ডে শেষ করলাম। এই বই ছাপা হয় এবং ছেলেদের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্দিষ্ট হয়।

এই সময় কবি একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন যে, আমাদের বাংলা ভাষায় ভাল অভিধান নেই। তোমাকে একখানি অভিধান লিখতে হবে। আমি বললাম 'সংস্কৃত-প্রবেশ' শেষ করে আরম্ভ করবো। তারপর কিছুদিন পরে কবিকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম: আমি অভিধান লিখতে আরম্ভ করব কি? তিনি আমাকে উৎসাহিত করে বললেন, হ্যাঁ কর।

আমি কবির আদেশানুসারে অভিধান লিখতে শুরু করলাম। তখন বাংলা ১৩১২ সাল। সেই সময় বিদ্যালয়ের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীতে আমার অধ্যাপনার সময় নির্দিষ্ট ছিল। অধ্যাপনার কাজ করে যখন সময় পেয়েছি তখন প্রাচীন বাংলার বই যাহা গ্রন্থাগারে পেতাম নিয়ে বসতাম। সময় পেলে সেগুলি পড়তাম ও শব্দগুলি পেন্‌সিলে দাগ দিতাম। পরে অবসর সময় সেগুলি লিখতাম। এইরূপে কিছুদিন পড়ে যে প্রাচীন বাংলা শব্দ সংগ্রহ করলাম সেগুলি সংস্কৃত শব্দের সহিত বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে একটি খাতায় লিখলাম ও পরে শব্দগুলির ব্যাখ্যা, অর্থ ও শিষ্ট প্রয়োগের সহিত লিখতে আরম্ভ করলাম। এইরূপে কিছুদূর অগ্রসর হওয়া গেল।

বাংলা ১৩১৮ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর আমি কোন কারণে

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যোগদান করিতে পারি নাই। গ্রীষ্মাবকাশের পর কলিকাতা আসিলে কলিকাতা সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসু মহাশয়ের সহিত পথে আমার দেখা হয়। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে আমার মাষ্টার মশায় ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন: তোমার এখন কি কাজ হচ্ছে? আমি বললাম: কোন কাজই নেই; কাজের চেষ্টায় আছি। শুনে তিনি আমাকে নিজের কলেজে ডাকলেন ও তাঁর কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক হ'লাম।

এই সময় আমার অভীষ্ট অভিধান প্রণয়ন কার্য্য ব্যাহত হওয়ায় আমার মনে বিষম কষ্ট ছিল কিন্তু এ বেদনা জানাবার স্থান আমার ছিল না। ভাবলাম, কবির সংগে একবার দেখা করবো। কবির জোড়াসাঁকোর বাড়ী জানতে পেরে কবির সংগে দেখা করলাম এবং তাঁকে অভিধানের কথা জানালাম। তিনি আমাকে দেখেই একটু অশান্তভাবে বললেন: তুমি চলে এসেছ; আমার বিদ্যালয়ের বড় ক্ষতি হচ্ছে। আমি বললাম, পত্রের উত্তরে আমাকে অন্যত্র কাজের চেষ্টা করতে বলেছিলেন তাই আমি যাই নাই। তিনি এ সব কথা ভুলে গিয়েছিলেন। যাই হোক, আমি তাঁকে আমার অভিধানের বিষয়ে জানালাম। তিনি বললেন: দেখি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এখানে আছেন কি না জেনে ব্যবস্থা করবো।

তখন মহারাজ কলকাতায় ছিলেন জেনে কবি মহারাজের কাছে যান ও আমার অভিধানের বিষয়ে প্রস্তাব করে বলেন: আমার আশ্রমের একজন অধ্যাপক বাংলা অভিধান লেখা আরম্ভ করেছে। তাঁকে কিছু বৃত্তি দিতে পারেন তো ভাল হয়। মহারাজ বললেন: আমার তো বাজেট হয়ে গেছে। তাই ভাবছি কি করবো। কবি বললেন, বেশী বৃত্তি নয় মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি দিলেই হবে। শুনে তিনি বললেন তা হলে আমি পারবো। এইরূপে আমার জন্য বৃত্তি ঠিক হল।

আমি পরে কবির সংগে দেখা করলে তিনি বললেন: তোমার বৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছে। তুমি যাহা লিখিয়াছো সেই পাণ্ডুলিপি নিয়ে মহারাজের সংগে দেখা কর।

আমি তদনুসারে পরদিন মহারাজের সারকুলার রোডের বাটীতে মহারাজের সংগে দেখা করলাম ও পাণ্ডুলিপিটি দেখাইলাম। তিনি দেখে বললেন: কবে কাশীমবাজার যাবেন? আর কতদিনে এটা শেষ হবে? আমি কাশীমবাজারে যাওয়ার কথা শুনে বললাম শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে আমি অনেক বই দেখেছি, সেখানে আমার থাকলেই বিশেষ সুবিধা হয়। তিনি বললেন, কাশীমবাজারে আমারও বড় লাইব্রেরী আছে; আপনার কোন বইএর অভাব হবে না। আমি এ বিষয়ে আর কিছুই বলি নাই। কতদিনে শেষ হবে সেই বিষয়ে তাঁকে বললাম। ইহা ঠিক করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি বললেন তবে মোটামুটি একটা সম্ভাব্যতা স্থির করে আমাকে বলবেন। আমি সেদিন চলে এলাম।

ফিরে এসে বন্ধুদের একথা বললাম। তাঁরা বললেন, পাঁচ বৎসরে শেষ করতে পারবো এই কথা বলো। তা না হলে দীর্ঘকালের কথা শুনলে হয় তো বৃত্তি পাওয়া যাবে না। আমি বললাম, আমি তা পারবো না। যদি আমি এর মধ্যে শেষ করতে না পারি তাহলে অপ্রস্তুত হব। আমি ওই বৃত্তির আশায় কাজ করিনি। বৃত্তি যদি না পাই তাও ভালো। আমি নিজে একটা হিসাব করে তাঁকে বলবো।

পাণ্ডুলিপি অনুসারে হিসাব করে দেখলাম—নয় বৎসরে অভিধান শেষ করা সম্ভব হতে পারে। আমি মহারাজকে তার পর দিন সেই কথাই বলিলাম। তিনি বলিলেন আচ্ছা, তাই ভাল। দিনে চার ঘণ্টা পরিশ্রম করলে যথেষ্ট হবে। আমি কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজ ভুলে সমস্ত দিনই এ কাজ করেছি।

কিন্তু কাশীমবাজার কবে যাব—এই বিষয়ে কিছু না বলিয়া কবির কাছে আসিলাম ও তাঁকে কাশীমবাজার যাওয়ার কথা বলিলাম। কবি বলিলেন: 'তুমি কাল শান্তিনিকেতনে চলে যাও। বিদ্যালয়ের বড় ক্ষতি হচ্ছে। মহারাজকে বলে আমি সেই সব ব্যবস্থা করবো'। আমি প্রণাম করে তাঁর আদেশানুসারে পরদিন শান্তিনিকেতন চলে এলাম।

পূর্ব্বে ছয় বৎসরে অভিধানের কাজ যা অগ্রসর হয়েছিল তাহার পর থেকে অভিধানের কার্য্য করে ১৩৩০ সালে লেখা সমাপ্ত হল। (অভিধান লেখা আরম্ভ হয় ১৩১২ সালে)।

কার্য্য সমাপ্ত হলে মহারাজকে তাহা আমি পত্রে জানালাম। মহারাজ আমাকে লিখেছিলেন অভিধানের পাণ্ডুলিপি কাশীমবাজারে পাঠান—এখানেই ছাপানোর ব্যবস্থা করবো। আমি কবিকে এ বিষয়ে জানালে কবি বলিলেন: 'আমরা বিশ্বভারতী হইতে অভিধান প্রকাশিত করিব—মহারাজকে তাই লিখ।' তদনুসারে মহারাজকে পত্র দিলে তিনি আনন্দের সহিত জানালেন: 'আমি আমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করেছি; যদি বিশ্বভারতী তাহা প্রকাশের ভার গ্রহণ করে তো আনন্দের বিষয়'। এর পর বিশ্বভারতীতে অর্থাভাব হওয়ায় কবি অভিধান প্রকাশ করিতে পারেননি। আমিও তাঁকে এ বিষয়ে বলে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিনি।

এর পর আমি কয়েক বৎসর ধরে অভিধানের কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন করেছিলাম। তার পরে ডা: দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে অভিধান ছাপার বিষয়ে অনুরোধ করলে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে দরখাস্ত করার কথা বলেন এবং নিজে দরখাস্ত লিখিয়া দেন। আমি সেই দরখাস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর (Post Graduate Dept) বিভাগে উপস্থাপিত করলে ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে জানান যে, এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁরা একটি সাব কমিটি করিয়াছেন। বলিলেন, আপনি অমুক দিন আপনার পাণ্ডুলিপি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন।

আমি তদনুসারে নির্দিষ্ট দিনে পাণ্ডুলিপি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাব কমিটির নিকট উপস্থিত হই। দীনেশ বাবু, সুনীতি বাবু, শ্যামাপ্রসাদ ও আর এক জন অধ্যাপক এই কমিটিতে ছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় কমিটির সভায় আসতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, আপনারা সম্মত হলে আমিও সম্মত। এই কথায় উপস্থিত সভ্যরা আমার পাণ্ডুলিপি দেখলেন। ছাপার ব্যাপারে কত ব্যয় হবে সেই বিষয়ে স্থির করতে পারলেন না। তাঁরা বললেন: বিচারপতি আশুতোষ যদি জীবিত থাকিতেন তা হলে এই সভায় তিনি অভিধান মুদ্রণের বিষয়ে স্থির করতে পারতেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে একখানি মনুসংহিতা ছাপা হইতেছিল। উহার ব্যবস্থা আশুতোষই করেছিলেন।

সুনীতি বাবু বললেন: মনুসংহিতার জন্য আপনারা প্রচুর

(৩০ হাজার টাকা) অর্থব্যয় করছেন। এই অভিধানও এখানেই ছাপানো উচিত। যদি বৎসরে এক হাজার টাকাও দেওয়া হয় তাহা হলে ক্রমে ক্রমে মুদ্রাংকণ কার্য্য অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু তাহা হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার যোগেশ বাবু পাণ্ডুলিপির দু-এক পৃষ্ঠা নিয়ে কম্পোজ করে হিসাব করে দেখেছিলেন—সমস্ত অভিধান শেষ করতে ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার মত লাগবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আসতে পারেন নি বলে সুনীতি বাবু আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ পাণ্ডুলিপি দেখবার সময় পেলেন না, আমি যদি তাঁর বাড়ীতে যাই তাহা হলে দেখতে পারবেন।

আমি পরদিন সকালে ভবানীপুরে তাঁর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তিনি পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ দেখে বললেন: অভিধান হয়েছে তো ভাল। যদি বাইরে কেহ সাহায্য করতেন তা হলে সেই সূত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা সম্ভব হত।

আমি অজ্ঞাত, অখ্যাত। বাইরে কে আমাকে বিশ্বাস করে টাকা দেবে? এইরূপে অকৃতকার্য্য হয়ে আমি ফিরে এলাম। পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এ বিষয়ে চেষ্টা করব স্থির করে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট গিয়েছিলাম। আমি জানিতাম, তিনি সাহিত্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ। তাঁহার নিকট অভিধান লেখার বিষয় বিবৃত করে বলায় তিনি বলেছিলেন: এইরূপ অভিধান লেখা হয় বলে আমার জানা নেই। যাই হোক্ আমি এখন সাহিত্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ নই। অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় এখন কোষাধ্যক্ষ।

তাই পরদিন সকালে আমি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ী গিয়েছিলাম। তিনি পাণ্ডুলিপি দেখে বললেন: অভিধান ভালোই হয়েছে; কিন্তু পরিষদের আর্থিক অবস্থা ততো ভাল নয়। এইরূপে সেখানেও আমার চেষ্টা বিফল হল। আমি নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম।

নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সহিত পূর্ব্বে কোন সূত্রে আমার পরিচয় হয়েছিল। তখন তাঁর কাছে এ বিষয়ে প্রস্তাব করবো ভাবলাম।

বাংলা ১৩৩১ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর তাঁর সহিত বাড়ীতে গিয়া দেখা করে এ বিষয়ে প্রস্তাব করলাম। তিনি অভিধানের বিষয় শুনে বললেন—বই তো ভাল হয়েছে; আমি ইহা প্রকাশ করবো। এখন আপনি কাগজের দাম দিন, ছাপার খরচ পরে ক্রমে ক্রমে দেবেন।

তখন তাঁর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। তা সত্ত্বেও তিনি এরূপ সুব্যবস্থা করায় আমি অভিধান মুদ্রাংকণ বিষয়ে বিশেষ আশান্বিত হয়ে শান্তিনিকেতন ফিরে এলাম এবং কিছুদিন পরে পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ তাঁকে ডাকে পাঠালাম। এইরূপে অভিধান মুদ্রাংকণ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল বিশ্বকোষ প্রেসে—নগেন বাবুর অনুগ্রহে। এই প্রেসে ক্রমে ক্রমে অভিধানের পঞ্চাশ খণ্ড ছাপা হয়েছিল। এই সময় নগেন বাবু হঠাৎ পরলোকগত হন। তাঁর মৃত্যুতে অভিধান প্রকাশ সংশয়ে রইল।

এই প্রেসে মন্মথনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ কম্পোজিটার ছিলেন। অভিধান সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে তিনি জানতেন। নগেন বাবুর মৃত্যুতে তিনি অন্য প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা করার জন্য চেষ্টা করে বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে ২৬ নং প্রতাপ ঘোষ লেন, প্রতাপ বাবুর বাড়ীতে শ্যাংকো প্রেসে মুদ্রাংকণের ব্যবস্থা করেন।

এ প্রেসের অবস্থা ভাল ছিল না। অনেক দিন অকর্মণ্য হয়ে ছিল। স্বত্বাধিকারীকে এ প্রেসে অভিধান ছাপানোর কথা জানালে তিনি বলেছিলেন: আপনি কার্য্য করুন, যখন যাহা অভাব হয় আমি দেব। এরূপে এই প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা হল এবং ক্রমে ক্রমে ১০৫ খণ্ডে অভিধান পরিসমাপ্ত হ'ল।

বাংলা ১৩৩১ সালের শেষে অভিধানের দুই খণ্ড প্রকাশিত হলে আমি প্রবাসীর তৎকালীন সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দেখা করে সমালোচনার জন্য অভিধান দিয়ে এসেছিলাম। তিনি প্রবাসী পত্রিকায় এ বিষয়ে যাহা কিছু লিখেছিলেন তাতে আমার বিশেষ উপকার হয়েছিল। বেশ কিছু গ্রাহকও পেয়েছিলাম। সজনীকান্ত দাস মহাশয় 'বিচিত্রা'তে লিখেছিলেন। এইরূপে গ্রাহকগণের নিকট হতে যাহা অর্থ পেয়েছিলাম এবং অন্যান্য সাহায্য যা সংগ্রহ করেছিলাম, তাহাতে অভিধানের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়েছিল।

অভিধান প্রতি খণ্ডে যখন প্রকাশিত হয় তখন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অভিধানের খণ্ডগুলি রেখেছিলাম। এখান হইতে নগদমূল্যে অভিধান বিক্রয় হ'ত। বিশ্বভারতী এইরূপে ১০৫ খণ্ডে অভিধান বিক্রয়ের ভার নিয়েছেন। কমিশন কিছুই নেন নি।

বঙ্গীয় শব্দকোষের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পরিচয় পত্রে লিখেছিলেন:

"শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবনের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল বাংলা অভিধান সংকলন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার এই বহুবর্ষব্যাপী অক্লান্ত চিন্তা ও চেষ্টা আজ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহার এই অধ্যবসায় যে সার্থক হইয়াছে, আমার বিশ্বাস সকলেই তাহা সমর্থন করিবেন।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন ৮ই আশ্বিন, ১৩৩১।

তাঁর এই পরিচয়পত্রে আমার বিশেষ উপকার হ'ল।

বাংলা সন ১৩৩১ সালে কবির কথা অনুসারে আমি অবসর গ্রহণ করলাম এবং অভিধানের কার্য্যে ক্রমাগত ১৪ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে ১৩৫২ সালে অভিধান কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হ'ল।

অভিধানের সমাপ্তিতে প্রাক্তন ছাত্রদের 'শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ' আমাকে সম্মানিত করেছিল। পর বৎসর বিচারপতি বি, কে, গুহ মহাশয় তাঁর শান্তিনিকেতন বাটীতে দ্বিতীয় সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করেন। পর বৎসর বিশ্বভারতী ১লা বৈশাখ আম্রকুঞ্জে তৃতীয় সম্বর্ধনার আয়োজন করে।

অভিধান ছাপার সময় ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতন আসতেন। ১৩৩১ সালে চৈত্রমাসে কলকাতায় গিয়ে যখন আমি রামানন্দ বাবু ও দীনেশ বাবুর কাছে অভিধান দিয়ে আসি সেই সময় আমাকে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল; যাতায়াতে আমার শরীর অসুস্থ হয়েছিল। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে আমি সেটা বুঝতে পারি। অসময়ে খাওয়া দাওয়ায় আমার পিত্ত দগ্ধ হওয়ায় বাসায় এসে অত্যন্ত

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এমন কি কিছুক্ষণ আমার জ্ঞানও ছিল না। আমার মৃত্যু ভেবে পরিবারের সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমার জ্ঞান হ'ল। দেখলাম রামানন্দ বাবু ও আমার বন্ধু বিধুশেখর শাস্ত্রী আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। রামানন্দ বাবু বলছিলেন; 'পণ্ডিত মশায়, ভয় পাবেন না; আপনি সুস্থ হয়ে অভিধান শেষ করবেন'। কবি ত বৃত্তি প্রাপ্তি'ত বলেছিলেন—'তোমার এ বৃত্তি লাভ ভগবানের অভিপ্রেত, আমি উপলক্ষ মাত্র। তুমি জানবে যে অভিধান পরিসমাপ্তির পূর্বে তোমার জীবনের কোন আশংকা নেই, ইহা ভগবৎকৃপা। তাঁর প্রেরণাই তোমাকে এ কাজে প্রবর্ত্তিত করেছে; তিনি তোমার সহায়ক থাকবেন।'

কবি ও সম্পাদক রামানন্দ মহাশয়ের কথা অভিধানের পরিসমাপ্তিতে সার্থক হয়েছে। কবিবর এখন স্বর্গগত; প্রবাসীর সম্পাদক পরলোকের প্রবাসী; বৃত্তিদাতা দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র অস্তমিত। তাঁদের কাউকে অভিধানের পরিসমাপ্তি দেখাতে পারলাম না। ইহা আমার বিষম বিষাদের বিষয়। তাই জীবনের সান্ধ্যবেলায় কবির কথায় বলতে হয়—

"তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক করুণাময় স্বামী!"

# নিরুদ্দেশ

শ্রীধরণীধর লাহা

নৌকো ফুটো। যাত্রী নেই
শূন্য জেটী।
সাগর-ফেরা নাবিক
হালটানা মাঝির মিতালী।
আকাশের জাফরাণী শাড়ীর
নীল আঁচলায়
সোনালী আলোর ঝিলিক।
একটুখানি সকাল।
গাঙ্‌ চিলেদের ভিড়।
গঙ্গার ধারে বাঁধান বট,
পাশে রেষ্ট রেণ্ট
চায়ের পেয়ালা আর ডিসের
আলাপ।

কুঁয়ো ভাজিসের রোমান্স,
কৃষ্ণা তৃতীয়ার একটু চাহনি।
গোপন হিয়ায় নীরব রাগিণীর
দু'-একটা স্বরলিপি।
একটুখানি—বাঃ!
না হয় একটু আহা!
নিঝুম রাতে বেহাগের সুর
নোতুন ভোরে আশাবরীর
তান,
দুটো উচ্ছল গান
পাশাপাশি।
কাশ্মীরী আপেলে
দুটো সুরমাটানা চোখ।

পথের মোড়ে কলসী কাঁখে
ঘোমটা-টানা বউ।
শিশির-ভেজা শেফালী
মৌমাছির আনাগোনা।
ঢেউ-দোলান জীবনের
উদ্বেলিত সফেন সাগর
বরফের স্লেজ।
ভাবনা কেন?
খুঁজবে না কেউ
চাইবে না কইফিয়ৎ।
ক্ষতি কি? পথটা শেষ,
নোতুন পথের ঠিকানা এই।
হ'লো না,—নিরুদ্দেশ!

# আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

অধ্যাপক নীলরতন ধর ( এলাহাবাদ )

বিয়ারিৎস ( ফ্রান্স )-এ আন্তর্জাতিক কনকেট গবেষণা-সংস্থার অধিবেশনে ব্যস্ত থাকায় এবং রদাম্‌ষ্টেড, উপ্‌সালা ও মাদ্রিদে বক্তৃতা লইয়া বিব্রত থাকার জন্য এবং সুয়েজ খাল আমার বোড়শ দফায় অতিক্রমণ একটি বালুকা-ঝড়ে বিঘ্নিত হওয়ায় ৩০।১১।৫৮ তারিখে শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধার দীন নিবেদন জ্ঞাপন করিতে বিলম্ব ঘটিয়া গেল।

কলিকাতায় যখন প্রথম আমি বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য আসি সেই ১৯০৭ সালেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় বাংলার মুকুটবিহীন রাজা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা দিবার জন্য যশোহরে আসেন এবং তাঁহার কলেজ ( রিপণ-কলেজ কলিকাতা )-এ যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এখানেই ১৯০৭ সাল হইতে দুই বৎসর ইণ্টারমিডিয়েট কোর্সে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। ১৯০৯ সালে যখন আমি রসায়ন বিষয়ে অনার্স লইয়া অধ্যয়ন করিবার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজ-এ যোগদান করি, তখন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট এবং নূতন গবেষণার পরীক্ষণ ও পরিমাপকযন্ত্র উদ্ভাবন বিষয়ে অদ্বিতীয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নিকট পদার্থবিদ্যায় শিক্ষা এবং অনুপ্রেরণা লাভের পরম সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সাধারণতঃ তিনি ২৫ হইতে ৩৫ মিনিটকাল পদার্থবিদ্যায় বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব পরীক্ষণ-প্রদর্শনের দ্বারা এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার দ্বারা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। সেই সময় কলেজ ষ্ট্রীট-এর উপর পুরাতন প্রেসিডেন্সী কলেজ ভবনে রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগ ছিল। কলেজে প্রবেশের নিকট আচার্য্য বসুর গবেষণা-কক্ষগুলি ছিল। এই কক্ষগুলি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দ্বারা উদ্ভাবিত অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রপাতির দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ভারতীয় কারিগর দ্বারা এইগুলি প্রস্তুত। এইখানেই coherer, magnetic crescograph এবং উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ব সম্পর্কিত অনুসন্ধানগুলি বিশেষ সাফল্যের সহিত পরিচালিত হয়।

তাঁহার গবেষণা-কক্ষগুলির সংলগ্ন ঘরেই প্রতিদিন আমাদের বি, এস, সি ক্লাসের পদার্থবিদ্যার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলি হইত। যখনই গভীর চিন্তামগ্নরূপে এই যুগপুরুষ আমাদের মধ্য দিয়া তাঁহার কক্ষে যাইতেন, আমরা শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতাম। এই সময় তিনি অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ছিলেন এবং আমরা তাঁহাকে রাজপুত্র মনে করিতাম। তিনি এতই প্রিয়দর্শী ও মধুর স্বভাবের ছিলেন যে, আচার্য্য রায় প্রায়ই তাঁহাকে 'রাজপুত্র' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। ১৯১০ সালে যখন আচার্য্য বসু পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন এবং ভারতীয় শিক্ষা-সংস্থার কর্ম্মচারী (I. E. S) মিঃ সি, ডাবলু পীক, এম এ এবং ডাঃ ই, পি হ্যারিসন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের ভারপ্রাপ্ত, সেই সময় প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ হইতে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র চুরি হইয়া যায়। আচার্য্য বসু আমাকে এবং পদার্থ-বিদ্যার 'পাশ' ক্লাশ হইতে অপর একজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার যন্ত্রটি যাহাতে পুনঃসংস্থাপিত হয়, সে বিষয়ে অবহিত হইতে বলিলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝাইয়া দিলেন যে, ইউরোপীয় I. E. S কর্ম্মচারিদ্বয় এই সংবাদ অধ্যক্ষ এবং কলেজ-পরিচালক-মণ্ডলীর গোচরে আনিবেন এবং ইহা প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান-ছাত্রদের পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানজনক হইবে। এই সময় তাঁহার গভীর দেশপ্রেম ও আদর্শবাদ এবং ছাত্রদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও স্নেহ আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছিল।

১৯১৫ সালে যখন আমি ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করি, তখন কয়েকবার তাঁহার সহিত দেখা করি। ইউরোপের চিন্তানায়কদের সংস্পর্শে আসিবার আমার সুযোগ হইবে বলিয়া তিনি খুবই খুশী হইয়াছিলেন। কারণ তিনি কেমব্রিজে তাঁহার গুরু লর্ড র‍্যালে ( যিনি স্যার উইলিয়াম র‍্যামসের সহযোগে argon-এর আবিষ্কর্ত্তা ) কর্ত্তৃক প্রভূত পরিমাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। যখন আচার্য্য বসু প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক হইয়া আসেন তখন গবেষণার কোন সুযোগ ছিল না বলিলেই চলে। পরীক্ষামূলক কাজের জন্য যন্ত্রপাতি কিনিতে অর্থ ও সুযোগ-সুবিধালাভের প্রচেষ্টায় তাঁহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। ইহারই ফলশ্রুতিস্বরূপ কলিকাতায় কাজ করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে D. Sc. ডি, এস্ সি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন।

অর্দ্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া তাঁহার জীবনের পরমবাঞ্ছিত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সম্পূর্ণরূপে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে মনুষ্যকর্ত্তব্যের প্রতি ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজের মূল্যায়ন অতি লঘু ভাবে আলোচিত হইয়া থাকে কিন্তু আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার গবেষণাকে জীবনের একটি অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে
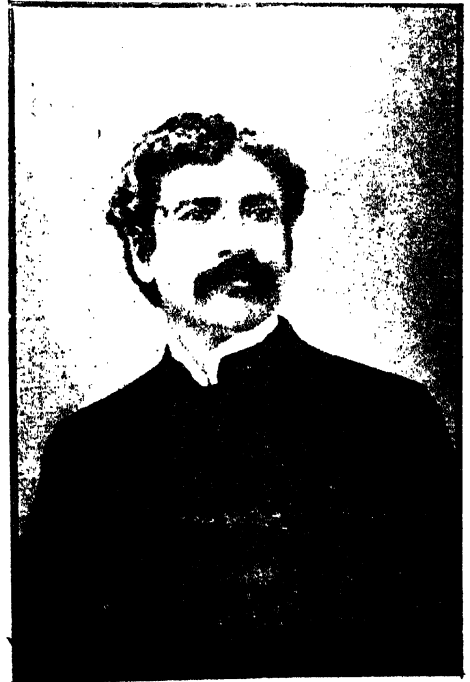
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

দেখিতেন। তাঁহার কর্মব্যস্ত জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গবেষণা-মূলক কাজ চালাইয়া যাইবার জন্ত তিনি ব্যগ্র ছিলেন এবং একটি গবেষণা-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে উৎসুক ছিলেন। এই লক্ষ্যে স্থির থাকিয়া বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের স্তায় তাঁহাকে "মহাভিক্ষু" সাজিতে হইয়াছিল এবং বোস ইনষ্টিটিউটের জন্ত প্রধানতঃ বোম্বাইর শিল্পপতিদের নিকট হইতে এবং অন্তান্ত প্রদেশ হইতে দশ লক্ষের উপর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বিবাহের অল্প কিছুদিন পরে লেডি অবলা বসু (সেই সময় শ্রীযুক্তা বসু) একটি মৃত সন্তানের জন্ম দেন। সেই সময় হইতে আচার্য্য বসুর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হইল তাঁহার I. E. S মাহিনার প্রতি কপর্দক সঞ্চয় করিয়া একটি জ্ঞান-নিকেতন গড়িয়া তুলিবেন এবং বঞ্চিত দীন জীবন যাপন করিবেন। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং আগ্রার আগ্রা কলেজের রসায়নের বিশিষ্ট অধ্যাপক আমার প্রিয় বন্ধু পরলোকগত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম-এ, এফ, আর, আই, সি (লণ্ডন) যিনি আচার্য্য বসুর ভাগিনেয় এবং বোস ইনষ্টিটিউটের প্রথম সহ-পরিচালক ছিলেন, প্রায়ই বলিতেন যে, ইংল্যাণ্ডে অথবা ভারতে যদি তিনি অথবা লেডি বসু দুই প্রকারের ফল ক্রয় করিতেন, তাহা হইলেই আচার্য্য বসু অনুযোগ করিতেন যে, এই প্রকার অমিতব্যয়িতায় তিনি দেউলিয়া হইয়া যাইবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উইলে লেডি বসুর জন্ত নির্দ্দিষ্ট মাসোহারা প্রচুর ছিল না। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লেডি বসু যখন মুসৌরিতে অবসর যাপন করিতে গিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, ছোট দুইটি ঘরে তিনি আছেন এবং অতি দীন পাকশালায় রুটি, মাখন এবং কিছু ফলের সামান্ত আহারের আয়োজনে তিনি ব্যস্ত। সেই সময় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—'নীলরতন, দেরাদুন হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত রেলপথে প্রয়োজনীয় আহার আমি সঙ্গে লইতেছি, কারণ 'রেস্তরা কার' হইতে আহার ক্রয়ের সামর্থ্য আমার নাই। এই মহীয়সী মহিলা আচার্য্য বসুর যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন এবং স্ত্রী-শিক্ষা ও কল্যাণের একজন বিশেষ পথপ্রদর্শিকা ছিলেন। মনে পড়ে যেবার ১৯২৭ সালে আচার্য্য বসু ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, সেইবার লাহোরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বালিকাদের কার্য্যকলাপ এবং গতিবিধি লেডি বসু বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে দেখিতেন। আচার্য্য বসুর প্রতি এই বিলম্বিত সম্মান প্রধানতঃ পরলোকগত অধ্যাপক বীরবল সাহনী এবং এচ, সি, দাশগুপ্তর প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়। ইঁহারাই আমাকে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচক কার্য্যকরী-সমিতির প্রথম ভারতীয় বে-সরকারী সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের জন্ত দায়ী ছিলেন।

বিজ্ঞান সাধনায় তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন এবং বহুমূত্র-রোগগ্রস্ত হন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা এদেশে অতুলনীয়। বিজ্ঞানের ফললাভের জন্ত তাঁহার উৎসাহ, নিষ্ঠা, আগ্রহ, কঠোর শ্রম এবং ত্যাগ স্বীকার সুইডেনের সি, ডাবলু হুইল, ইংল্যাণ্ডের মাইকেল ফ্যারাডে এবং অমর ও শ্রেষ্ঠ মানব-কল্যাণকারী ফ্রান্সের লুই পাস্তুরের সহিত তুলনীয়। এই মহাপুরুষগণ প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের জন্ত আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

যে বার আচার্য্য বসু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্ত্তন-উৎসবে ভাষণ দিতে আসেন, তিনি তাঁহার ভাষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এবং মেঘনাদ সাহার গবেষণার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং যদিও তিনি লাটভবনে বাস করিয়াছিলেন, তথাপি আগ্রহ সহকারে আমাদের বাড়ী আসিয়াছিলেন।

১৯১৭ সালে যখন তিনি তাঁহার গবেষণাগার (বোস ইনষ্টিটিউট) ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন তখন তিনি আদর্শবাদপূর্ণ এবং বিজ্ঞান ও ভারতকল্যাণের প্রতি নিষ্ঠার পরিচায়ক বহু মহতী বাণী দিয়াছিলেন।

পাস্তর প্রায়শঃই গবেষণাগারগুলিকে এবং পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের চর্চ্চাকে জাতির উন্নতির সোপান বলিয়া উল্লেখ করিতেন এবং গবেষণাগারগুলিকে ভবিষ্যতের মন্দির বলিয়া অভিহিত করিতেন। যেখানে মানবসমাজ বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক পন্থাগুলি নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া মহত্তর হইয়া উঠিবে, দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতার সহিত সংগ্রাম করিবে এবং সাধারণ জীবনমান আরও উন্নত করিবে। আচার্য্য বসুও তাঁহার গবেষণা-প্রতিষ্ঠানটিকে বিজ্ঞানমন্দির নামে অভিহিত করিলেন।

গত মাসে আমি যখন প্যারিসে ছিলাম তখন Institute of France এর সদস্য এবং ফরাসী রসায়নের ডয়েন (Dayen) স্বরূপ পি পাস্কালের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন যে, উদ্ভিদ উৎপাদনের কলাকৌশল বিষয়ে তিনি এখন আগ্রহশীল। আচার্য্য বসু যে উদ্ভিদের পুনঃ রোপণক্ষেত্রে উহাদের মূলদেশে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সে বিষয়ও তিনি উল্লেখ করিলেন।

এ কথা নিঃসংশয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, পাশ্চাত্যের বর্ত্তমান অপরিমিত প্রাচুর্য্য এবং প্রভূত বাস্তব উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের পরীক্ষণমূলক পন্থা অনুসরণ করিয়া সত্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা। বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানবিদ বিজ্ঞানচর্চ্চায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এমন অতুলনীয় ত্যাগস্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাকে আধ্যাত্মিকতাও বলা চলে।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে, যদিও আচার্য্য বসুর কৃতিত্বপূর্ণ গুণাবলী ছিল তথাপি I. E. S. চাকুরীতে একজন ইংরাজ কর্মচারীর অপেক্ষা ⅓ ভাগ অংশ কম মাহিনা পাইতেন। এইজন্য তিনি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং এই অসহনীয় বৈষম্য প্রতিবিধান করিতে দীর্ঘদিন মাহিনা লন নাই।

১৯১১ সালে যখন লণ্ডনে I. E. S. চাকুরীতে নিযুক্ত হই, তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জির একজন অনুরক্ত শিষ্য এবং উদারপন্থী ভারতীয় নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সহিত (Adviser to the Secretary of State for India) সহিত আমার অনেকবার দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি আচার্য্য বসুর চরিত্রের মাহাত্ম্য এবং তাঁহার কৃতিত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

আচার্য্য বসুর দেশবাসিগণ এবং অপর প্রাচ্যদেশবাসিবৃন্দ পাশ্চাত্যজীবনের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত বিজ্ঞানের পরীক্ষণমূলক পন্থা কি আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করিবেন এবং শ্রীসম্পদ অর্জ্জন এবং সত্য ও উন্নতির পথ অনুসরণ করিবেন?
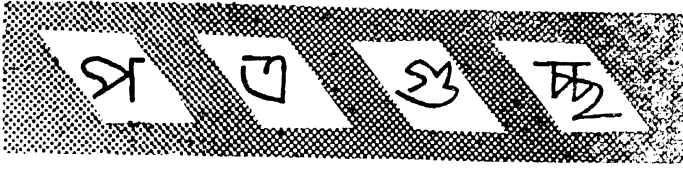
# নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পত্র-বিনিময়

## নেতাজীর পত্র—২

জিয়ালগোড়া, পোঃ,
জেলা—মানভূম, বিহার,
২৬শে মার্চ, ১৯৩৯

প্রিয় মহাত্মাজী,

দুই একদিনের মধ্যে আমি আপনার নিকট পুনরায় পত্র লিখিব। ইতিমধ্যে একটি জরুরি বিষয় উপস্থিত হইয়াছে। এ, আই, সি, সির অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক শ্রীনরসিং আমাকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের জন্য তিনি ২০ দিনের নোটিশ চান। নিয়মানুসারে এ, আই, সি, সির সদস্যগণকে ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হয়। তাঁহার মতে, উহার অতিরিক্ত আর ৪।৫ দিন সময় প্রয়োজন, কারণ নোটিশগুলিকে দেশের দূরতম প্রান্তেও পাঠাইতে হইবে। সুতরাং, মোটের উপর তিনি ২০ দিনের সময় চাহিয়াছেন।

আপনার অনুমতি সাপেক্ষে, আমি ভাবিতেছিলাম যে, ২০শে এপ্রিলের কাছাকাছি একটি তারিখ উপযুক্ত হইবে। কিন্তু একটি বাধা আছে। শুনিলাম যে, গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘের অধিবেশন ২০শে এপ্রিল নাগাদ বিহারে অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং দুইটি অধিবেশনের সংঘাত ঘটিবে। এ, আই, সি, সির এবং ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন কলিকাতাতেই হইবে। ঐ সময়ে সেখানে আপনার উপস্থিতি অত্যাবশ্যক। গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘ-সম্মেলনের পূর্বে অথবা পরে এ, আই, সি, সির অধিবেশন হউক—একথা আমি বলিতে পারি কি? পূর্বে অধিবেশন হইলে, আপনি প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া পরে বিহারে যাইতে পারিবেন। আর যদি অধিবেশন পরে হয়, তাহা হইলে আপনি প্রথমে বিহারে যাইয়া পরে কলিকাতায় আসিতে পারিবেন। এ, আই, সি, সির অধিবেশন পূর্ব্বে করিতে হইলে গান্ধী-সেবা-সঙ্ঘ সম্মেলনকে এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিতে হইবে। আর পরে অধিবেশন ডাকিলে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনের দিন এপ্রিলের শেষ নাগাদ স্থির করিতে হয়।

অনুগ্রহপূর্ব্বক বিষয়টি লইয়া চিন্তা করুন এবং কখন এ, আই, সি, সির অধিবেশন ডাকা উচিত, সে সম্পর্কে আপনার উপদেশ দিন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এ, আই, সি, সির অধিবেশনে আপনাকে উপস্থিত থাকিতেই হইবে।

আমি আরোগ্যের পথে। আপনার রক্তের চাপ আবার বাড়িয়াছে শুনিয়া চিন্তিত আছি। আমার বিশ্বাস, আপনি অত্যধিক পরিশ্রম করিতেছেন।

প্রণামান্তে—
আপনার স্নেহের
সুভাষ

## নেতাজীর পত্র—৩

জিয়ালগোড়া পোঃ,
জেলা মানভূম,
২৯শে মার্চ, ১৯৩৯

প্রিয় মহাত্মাজী,

ট্রেণ হইতে লিখিত আপনার ২৪শে তারিখের পত্র এবং প্রেরিত অপরাপর সমস্তই আমি পাইয়াছি।

প্রথমতঃ, আমার ভ্রাতা শরৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আপনাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার চিঠি হইতেই আপনি বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি এখান হইতে কলিকাতায় গিয়া আপনার টেলিগ্রাম পান এবং তৎপরে আপনাকে লিখেন। আপনার টেলিগ্রাম না পাইলে, তিনি আপনাকে পত্র লিখিবেন কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অবশ্য তাঁহার চিঠিতে উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের সহিত আমি একমত। কিন্তু সে পৃথক প্রসঙ্গ। আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যা এই উভয় দল অতীত ভুলিয়া একযোগে কাজ করিতে পারে কি না। উহা সম্পূর্ণরূপে আপনারই উপর নির্ভর করিতেছে। আপনি যদি সত্য সত্যই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উভয় দলের বিশ্বাস-ভাজন হইতে পারেন, তাহা হইলে কংগ্রেসকে রক্ষা করিতে এবং জাতীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন।

মানসিক গঠনের দিক দিয়া আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ নই এবং কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ মনের মধ্যে পুষিয়াও রাখি না। একদিক দিয়া আমার মনোবৃত্তি মুষ্টিযোদ্ধার ন্যায় অর্থাৎ মুষ্টিযুদ্ধের শেষে হাসি মুখে করমর্দ্দন করা এবং খেলোয়াড়ী মনোভাব লইয়া ফলাফল মানিয়া লওয়া।

দ্বিতীয়তঃ পন্থ প্রস্তাবটি যে আকারে পাশ হইয়াছে, সেই রূপেই তাহাকে আমি মানিয়া লইতেছি, যদিও ঐ সম্পর্কে বহু মতামত আমার নিকট পৌঁছিতেছে। আমাদিগকে উহা কার্য্যকরী করিতেই

হইবে। ঐ প্রস্তাবের মধ্যে নিয়ম-বিরুদ্ধ ধারা থাকা সত্ত্বেও আমি নিজেই উহার উত্থাপন ও আলোচনায় সম্মতি দিয়াছিলাম। সুতরাং উহার খেলাপ কি করিয়া করিতে পারি ?

তৃতীয়তঃ আপনার সম্মুখে দুইটি পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে ( ১ ) হয় আপনি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে আমাদের মত গ্রাহ্য করিবেন আর ( ২ ) না হয় আপনার নিজস্ব মতে সুদৃঢ় থাকিবেন। যদি শেষোক্ত পথ বাছিয়া লন, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

চতুর্থতঃ নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন ত্বরান্বিত করিতে এবং এ, আই, সি, সির-ও ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে আমি প্রস্তুত আছি। এখন আমার পক্ষে দিল্লী যাওয়া সম্ভব নহে বলিয়া আমি দুঃখিত। এ সম্পর্কে ডাঃ সুনীল আজ সকালে আপনাকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন। মাত্র গতকাল আমি আপনার টেলিগ্রাম পাইয়াছি।

পঞ্চমতঃ আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, এ, আই, সি, সি অফিস আপনাকে পন্থ প্রস্তাবের কপি পাঠায় নাই। ( তাহা পরে পাঠান হইয়াছে )। আরও আশ্চর্য্য হইলাম ইহা জানিয়া যে, আপনি এলাহাবাদে আসিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবটি সম্পর্কে আপনাকে জানানই হয় নাই। কিন্তু ত্রিপুরীতে এই মর্ম্মে চারিদিকে গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রস্তাবটি আপনার পূরা সমর্থন লাভ করিয়াছিল। আমরা যখন ত্রিপুরীতে ছিলাম তখন ঐ মর্ম্মে একটি বিবৃতিও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ষষ্ঠতঃ রাষ্ট্রপতিপদ আঁকড়াইয়া থাকিবার ইচ্ছা আমার আদৌ নাই কিন্তু অসুস্থ বলিয়া পদত্যাগের কোনও কারণও আমি দেখি না। কারাবাসকালে কোনও রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন নাই। উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাকে বলিতে পারি যে, আমার পদত্যাগের জন্য ভীষণ চাপ দেওয়া হইতেছে। আমি বাধা দিতেছি কারণ, আমি যদি পদত্যাগ করি তাহা হইলে কংগ্রেস রাজনীতিতে নূতন এক অধ্যায়ের সূচনা হইবে। আমি উহা শেষ পর্য্যন্ত এড়াইয়া চলিতে চাই।

গত কয়েক দিন ধরিয়া আমি এ, আই, সি, সি সংক্রান্ত জরুরী কার্য্যে ব্যাপৃত আছি। আগামী কল্য অথবা পরশ্ব আপনাকে পুনরায় পত্র লিখিব।

আমি সুস্থ হইয়া উঠিতেছি। আশা করি আপনার রক্তের চাপ শীঘ্রই কমিয়া যাইবে। প্রণামান্তে—

আপনার স্নেহের সুভাষ।

পুনশ্চ—এই পত্রখানি আপনার পত্রের সঠিক উত্তর নহে। যে বিষয়গুলি লইয়া আমি ভাবিতেছিলাম এবং যাহা আমি আপনাকে জানাইতে চাহিয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

## গান্ধীজির উত্তর—২

নূতন দিল্লী,

৩০। ৩। ৩৯

প্রিয় সুভাষ,

আমার তারবার্ত্তার উত্তর পাইবার আশায় তোমার ২৯শে [illegible] হইল। গতরাত্রে সুনীলের তার পাইয়াছি। এই উত্তর লিখিবার জন্য আজ আমি প্রাতঃকালীন প্রার্থনা সময়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়াছি।

তুমি যখন মনে করিতেছ যে, পন্থ প্রস্তাব বিধিসম্মত হয় নাই এবং ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সংক্রান্ত ধারাটি কংগ্রেস শাসনতন্ত্র বহির্ভূত ও নিয়মবিরুদ্ধ, তখন তোমার পথ অত্যন্ত পরিষ্কার। কমিটি নির্ব্বাচনে তোমার পুরাপুরি স্বাধীনতা থাকা উচিত।

সুতরাং এ সম্পর্কে তোমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের সাক্ষাৎকারের পর আমার এই অভিমত দৃঢ় হইয়াছে যে, যেখানে মূল বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে, আছে বলিয়া আমরা স্বীকার করিয়াছি, সেখানে সর্ব্বদলীয় কমিটি ক্ষতিকারক হইবে। একথা যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, এ, আই, সি, সির অধিকাংশ সদস্য তোমার নীতিকে সমর্থন করে, তাহা হইলে যাঁহারা তোমার নীতিতে আস্থাবান তাঁহাদের লইয়াই তোমার ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা উচিত।

হাঁ, গত ফেব্রুয়ারী মাসে সেগাঁওয়ে ( সেবাগ্রামে ) আমাদের উভয়ের সাক্ষাৎকারের সময় আমি যে কথা বলিয়াছিলাম, এখনও সেই কথাই বলি। স্বেচ্ছায় আত্মবিলুপ্তি ভিন্ন কথা। কিন্তু তোমাকে দিয়া কোনওরূপ আত্মনিগ্রহ করাইবার অপরাধে অপরাধী আমি হইতে চাহি না। সুতরাং তোমাকে যদি রাষ্ট্রপতিরূপে কাজ চালাইতে হয়, তাহা হইলে তোমার হস্ত শৃঙ্খলমুক্ত থাকাই উচিত। দেশের সম্মুখে যে পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে মধ্যপন্থার স্থান নাই।

গান্ধীবাদীদের ( যদি ভুল শব্দটি ব্যবহার করিতে হয় ) সম্পর্কে একথা বলিতে পারি যে, তাহারা বাধা দিবে না। যেখানে পারিবে সেখানে তাহারা তোমাকে সাহায্য করিবে, যেখানে পারিবে না সেখানে নিরপেক্ষ থাকিবে। যদি তাহারা সংখ্যায় কম হয়, তাহা হইলে কোনও প্রকার বাধা সৃষ্টি হইবে না। কিন্তু তাহারা যদি স্পষ্টতঃই সংখ্যাধিক্য হয়, তাহা হইলে তাহারা নিজদিগকে চাপিয়া রাখিতে না-ও পারে।

যে-বিষয় আমাকে পীড়া দিতেছে তাহা হইতেছে এই যে কংগ্রেসের নির্ব্বাচকমণ্ডলী নিতান্ত ভুয়া। সুতরাং সংখ্যায় সংখ্যাধিক্য শব্দ দুইটি অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক যতদিন পর্য্যন্ত না কংগ্রেসের জঞ্জাল পরিষ্কার হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত যে যন্ত্র হাতে আছে তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে আমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভীষণ অবিশ্বাসও আমাকে চিন্তিত করিয়াছে। যেখানে কর্ম্মীরা পরস্পরকে অবিশ্বাস করে, সেখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করা অসম্ভব ব্যাপার।

আমার মনে হয়, তোমার পত্রে আর এমন কোনও বিষয়ের উল্লেখ নাই যাহার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

তোমার সকল কর্ম্মে ভগবান পথ দেখাইয়া দিন। ডাক্তারের বাধ্য থাকিয়া শীঘ্র সারিয়া ওঠ। ভালবাসা।

বাপু

পুনশ্চ—আমার মতে, আমাদের পত্রালাপ সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হওয়াই ভালো। কিন্তু তোমার যদি ভিন্নরূপ মত হয়, তাহা হইলে প্রকাশ করিতে পারো—এ অনুমতি আমি দিতেছি।

# ॥ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের অপ্রকাশিত পত্রাবলী ॥

শ্রদ্ধাস্পদাসু
বেলেঘাটা

মা, আপনার ছোট্ট মৌচাকটি আমার হস্তগত হ'লো। কিন্তু কৃপণতার জন্যে দুঃখ পেলাম।

আপনি আমায় যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যেতে বলেছেন। আপনার আগ্রহ আমার লজ্জা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি যেতে পারছি না ব'লে। আপনার আগ্রহ উপেক্ষা ক'রতে পারবো ব'লে মনে হয়না। আমার মুর্শিদাবাদ যাবার ইচ্ছা নেই, তবে ঝাঁঝায় যাবার কথা হ'চ্ছে দাদা-বৌদির, সেখানে যেতে পারি। তবে আপনাদের ওখানকার আমন্ত্রণ সেরে।

সেদিন আপনাদের ট্রেইনখানা আমার সামনে দিয়ে গেলো, পিছন থেকে অমূল্যবাবুকে দেখেছিলাম আর দেখেছিলাম আপনার কয়েকজন সহযাত্রিণীকে, কিন্তু আপনাকে দেখলাম না—দুঃখের বিষয়।—কিছুদিন মনে হ'তো আজ সন্ধ্যায় কোথাও যেতে হবে না।—আজকাল সে-ভাব থেকে মুক্ত। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন? আপনি আমার—থাক কিছুই জানাবো না।

আপনার কৃপণতার প্রতিশোধ নিলুম ছোট চিঠি দিয়ে।—এমন একজন যে আপনার বাবা হ'তে পারবে না, কারণ তার বড় ভয় পাছে সে বাবা হ'লে বাবার কর্তব্য হ'তে বিচ্যুত হয়। আর আপনার অরুণ-বাবাটি তো মেয়ের আবদারে নাকি কলের পুতুল ব'নে আছে। সুতরাং উল্টোটাই হোক।

সর্বাগ্রে আপনার ও অপর সকলের কুশল প্রার্থনীয়। ইতি।

সু, ভ,

শ্রদ্ধাস্পদাসু,
বেলেঘাটা

মা, প্রথমেই আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখা ভালো, কারণ অপরাধ আমার অসাধারণ—বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ আপনার সপক্ষে, আর আমার প্রতিবাদ করবার কিছুই যখন নেই তখন এই উক্তি আপনার কাছে মেনে ধরছি যে পারিবারিক প্রতিকূলতা আমাকে এখানে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে, নইলে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। আমার অপরাধ যে হয়েছে সেটা অনস্বীকার্য—তবু উপায় যখন নেই তখন ক্ষমা ভিক্ষা করা ছাড়া আর আমার গতি রইলো না। বাড়ির কেউ আমার এই দুর্দিনে চোখের আড়াল করতে চায় না, অথচ এখানটাও যে নিরাপদ নয়, সেটা ওরা বুঝতে পারে এবং পেরেও বলে মরতে হ'লে সবাই একসঙ্গে মরবো।...যাক আর বাজে ব'কে আপনাকে কষ্ট দেবোনা।—আমার আবার মনে ছিলো না আপনি অসুস্থ। আপনার ছেলে কি পাবনায় গে'ছে? তাকে একটা চিঠি দিলাম। সে যদি না গিয়ে থাকে তবে সেখানা দেবেন এই ব'লে যে, এখানাই তোমার প্রতি সুকান্তর শেষ চিঠি। আচ্ছা কিছুদিন আগে একখানা চিঠি (Post card) এসেছিলো, চিঠিখানার ঠিকানার জায়গায় কাগজ মেরে দেওয়া হয়েছিলো আর তার ওপর ঠিকানা লেখা ছিলো, সেই চিঠিখানা বেয়ারিং হয়, সেখানা কি আপনাদের কারুর চিঠি? বেয়ারিং করার মূর্খতার জন্যে চিঠিটা আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তবে সেখানা আপনাদের হ'লে অনুতাপের বিষয়। আমার আপনাদের ওখানে যাবার ইচ্ছা আছে সর্বক্ষণ, তবে সুযোগ পাওয়াই দুষ্কর। তা সুযোগ পেলেই আমার দেখতে পাবেন আপনাদের সমক্ষে। চিঠির উত্তর দিলে খুসী হবো, না দিলে দুঃখিত হবো না। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। এখানকার আর সবাই ভালো।

শ্রদ্ধাবনত
সুকান্ত ভট্টাচার্য
দোল পূর্ণিমা
কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

মা, আপনার পত্রাংশ ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম, উত্তর দিতে দেরী হলো। কারণ সেই সময়ে আমি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলাম। তরল পায়খানা আর দিনরাত পেটে যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। এখন ওষুধ খেয়ে অনেকটা ভালো আছি।

শীগগিরই যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ভর্তি হবো। আপনি কেমন আছেন? অরুণ আমার কাছে মোটেই আসে না। চিঠির জবাব দেবেন।

স্নেহাধীন
সুকান্ত

১১ডি, রামধন মিত্র লেন,
পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা-৪

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

মা, আপনার চিঠি কয়েকদিন হলো পেয়েছি। চিঠিতে বসন্তের এক ঝলক আভাস পেলাম। আপনার কথা মতো পাতাটা সঙ্গে সঙ্গেই রেখেছি তবে বেটে খাওয়া সম্ভব হলো না। আবার আমার পেটের অসুখ ও পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। তবে আজ একটু ভালো আছি।

দিন সাতেকের মধ্যেই যাদবপুর হাসপাতালে যাবো, সেখান থেকে পরে যাবো আজমীড়। অরুণ মধ্যে দিন দুই এসেছিলো। আপনার খবর কী?

২০।৩।৪৭

সুকান্ত

বেলেঘাটা
৬.২ ৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

আপনার এখান থেকে চলে যাবার দিন কথা দেওয়া সত্ত্বেও কেন আপনার অফিসে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করিনি তার কৈফিয়ৎ স্বরূপ এই চিঠি উপস্থিত করলাম। সেদিন রাত ৮-৩০ এমনি সময় যথাস্থানে গিয়ে শুনলাম আপনি চলে গেছেন। সুতরাং দুঃখিত মনে বাড়ি ফিরেছিলাম। তারপর কর্তব্য বোধে এই চিঠি লিখলাম। অরুণকে এবং মাকে নিশ্চয়ই আমার না যাবার নিরুপায়তা সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বুঝিয়েছেন। আর আমি চেষ্টা করছি যথা সম্ভব আপনাদের সামনে উপস্থিত হ'তে। কিন্তু এরা আমাকে যেতে দিতে রাজী তো নয়ই যাবার বিপক্ষে নানান অবান্তর ও হাস্যকর যুক্তি দর্শাচ্ছে; তবু চেষ্টা চালাচ্ছি। দরকার হ'লে পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হব। অরুণ এবং মা উভয়কে জানাবেন তাঁদের অবিলম্বে পত্র দেব। আপনার অবস্থিতিতে আশা করি সর্ব-অমঙ্গল দূরীভূত হ'য়েছে। আপনাদের কুশল কামনা।

বিনীত—সুকান্ত

---

* শ্রীযুক্তা সরলা বসুর সৌজন্যে চিঠিগুলি প্রাপ্ত। নিচের চিঠিটি অরুণাচল বসুর পিতা শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসুকে লেখা।

[ সি, এফ, অ্যাণ্ড্রুজ লিখিত ‘What I Owe to Christ’ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ]

[ চার্লস ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ—এই বিদেশী নামটি আমাদের অপরিচিত নয়,—এই নামের যিনি অধিকারী তিনি ‘দীনবন্ধু’ নামে ভারতবাসীর অন্তরে চির-জাগরুক। শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদ-পীড়িত ভারতবর্ষীয় তাঁকে দুঃখ-বেদনার পরম বন্ধু বলে স্মরণ করে। ইংলণ্ডে নিউ-ক্যাসেল-অন-টাইন শহরে অ্যাণ্ড্রুজের জন্ম। এই ভারতভূমিকে তিনি আপন নব জন্মভূমি বলে ঘোষণা করেন এবং এই কলকাতা শহরেই তাঁর নশ্বর দেহ সমাহিত।

১৮৭১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অ্যাণ্ড্রুজ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন কঠোর ধর্মবিশ্বাসী পিউরিটান পাদ্রী। শিল্প-নগর বার্মিংহামে অ্যাণ্ড্রুজের বাল্য ও কৈশোরের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। পরিচিত হন বস্তিবাসী শ্রমিক-জীবনের দারিদ্র্য ও দুর্বলতার সঙ্গে। আশাহত বঞ্চিত শ্রমিক-পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগের ফলে কিশোরকালেই তাঁর অন্তরে ঈশ্বরের যে রূপ প্রতিফলিত হয়, সে ঈশ্বর পাপ-পুণ্যের সর্বশক্তিমান বিচারকর্তা নন, তিনি মানব-করুণারই প্রতীক। সেবার মধ্যেই সে ঈশ্বরের আরাধনা। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে অ্যাণ্ড্রুজ যোগ দেন খৃষ্টান সোস্যাল ইউনিয়নে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সর্বহারা শ্রমিকের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ভারতবর্ষের প্রতি অ্যাণ্ড্রুজের আকর্ষণ ছিল শিশুকাল থেকে। শৈশবে একদা তিনি তাঁর জননীকে বেশি করে ভাত খেতে দিতে বলেছিলেন। মা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন,—কেন? উত্তরে বালক অ্যাণ্ড্রুজ বলেন,—বাঃ! ভারতবাসীরা ভাত খায় যে! বড়ো হয়ে ভারতবর্ষে যে যেতেই হবে!

কলেজ-জীবনে অ্যাণ্ড্রুজের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন বেসিল ওয়েষ্টকট। বেসিল মিশনারী হয়ে ভারতে আসেন ও একজন কলেরারোগীর সেবাকালীন ঐ কালরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ দেন। প্রিয় বন্ধুর আত্মদান অ্যাণ্ড্রুজকে সেবার কাজে ভারত গমনে অনুপ্রাণিত করে। প্রথমে তিনি দিল্লী সেন্ট ষ্টিফেন কলেজে মিশনারী অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ।

ভারতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাণ্ড্রুজ প্রতীচ্যশক্তির সাম্রাজ্যবাদী মদমত্ততা ও বর্ণবিদ্বেষের কুৎসিত হিংস্রতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত হন। তাঁরই স্বজাতির হাতে নিগৃহীত ভারত-আত্মার দৈনন্দিন অবমাননা তাঁর চিত্তে গভীর বিক্ষোভ সঞ্চার করে। যীশুখৃষ্টের [illegible] দৃষ্টিতে বর্ণান্ধতা নেই, শাসক ও শোষিতের ভেদাভেদ নেই। কিন্তু এই ভেদদৃষ্টিতে মিশনারী সমাজও কলুষিত—তাই দেখে তাঁর অন্তর ব্যথিত হয়ে ওঠে।

বিদেশী মিশনারী ধর্মপ্রচারকের দৃষ্টি ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতকে উপলব্ধি করা যাবে না, ভারতের অন্তর-দেবতার রুদ্ধদ্বার পরুষ করাঘাতে খুলবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ধর্ম ও ধ্যানধারণা, সর্বোপরি ভারতবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়াসে অ্যাণ্ড্রুজ তাঁর পরিবেশের গণ্ডী থেকে বার হয়ে এলেন। আপন গোষ্ঠী থেকে বিচ্যুত হতে দ্বিধা করলেন না। এমন সময় তাঁর পরিচয় হোলো সেই মহামানবের সঙ্গে যিনি ভারতআত্মার বাণীমূর্তি, গীতাঞ্জলির উদ্‌গাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের আদর্শে তিনি বিশ্বমানবত্বকে উপলব্ধি করলেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি বরণ করে নিলেন গুরুদেব বলে, পদধূলি গ্রহণ করলেন তাঁর।

ভারতবাসীকে অ্যাণ্ড্রুজ ভালো বেসেছিলেন খৃষ্টভক্ত মানবকল্যাণী সেবাব্রতী-রূপে। এই ভালোবাসা সারা পৃথিবীতে সমস্ত অবজ্ঞাত নিপীড়িত মানবের প্রতি পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়গণ শ্বেতকায় রাজশক্তির রোষবহ্নিকে উপেক্ষা করে আত্ম-উদ্বোধনের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। গান্ধীজী তাদের মন্ত্রগুরু। গোখেলের প্রেরণায় অ্যাণ্ড্রুজ দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করলেন। ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারি তিনি পৌঁছিলেন ডারবানে। পরিচিত হলেন গান্ধীজীর সঙ্গে। গান্ধীজীর পাশে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায়দের মানবত্বের দাবী ঘোষণা করলেন। সেই দিন থেকে গান্ধীজী হলেন তাঁর সারাজীবনের বন্ধু।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয় শ্রমিকের দুর্দশা অ্যাণ্ড্রুজ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বৃটিশরাজের আর এক কলোনি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজি দ্বীপপুঞ্জ। সেখানেই ভারতীয় শ্রমিকরা অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটায়। ভারত থেকে আড়কাটিয়া তাদের ফিজিতে রপ্তানি করে,—তাদের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকজীবন দাসত্বের নামান্তর। পর বৎসর অ্যাণ্ড্রুজ অষ্ট্রেলিয়া হয়ে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে গমন করলেন। প্রবাসী ভারতীয় কল্যাণের জন্যে তিনি যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেন, তার ফলে শেষ পর্যন্ত ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ হয়। ফিজির ভারতীয় সমাজের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতির বহুমুখী কল্যাণ প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি। ফিজিবাসী ভারতীয়েরাই প্রথম তাঁকে দীনবন্ধু নামে অভিহিত করে।

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন অ্যাণ্ড্রুজ।

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়নের জনক বি পি ওয়াদিয়ার আহ্বানে তিনি মাদ্রাজ কাপড় কল শ্রমিকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। শ্রমিক-কল্যাণের ব্রতে উদ্বুদ্ধ অ্যাণ্ড্রুজ আসাম ও পূর্ববঙ্গ থেকে আরম্ভ করে সুদূর পঞ্জাব পর্যন্ত সর্বত্র ভ্রমণ করেন ও নানা প্রদেশের শ্রমিক-সংস্থার একান্ত বন্ধু ও উপদেষ্টারূপে পরিগণিত হন। এই ইংরেজ বিদেশীকে সভাপতি পদে বৃত করে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ধন্য হয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ যখন নাইট পদবী পরিত্যাগ করেন, তখন অ্যাণ্ড্রুজ ছিলেন কবিগুরুর পাশে। পাঞ্জাবে বিদেশী শাসকের পশুশক্তি তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে,—রাজুর হিংস্রতার অত্যাচারের বন্যা বইয়েছে সে প্রদেশে। অ্যাণ্ড্রুজ স্থির থাকতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ পাঞ্জাব যাত্রা করলেন, অত্যাচারিতদের পাশে গিয়ে তাঁকে দাঁড়াতেই হবে। শাসকশক্তি তাঁকে বন্দী করল, পাঞ্জাব থেকে ফিরিয়ে দিল। তারই মধ্যে অ্যাণ্ড্রুজ বিদেশী চাবুকে পিঠে রক্তঝরা সাধারণ মানুষের সম্মুখে নতজানু হয়ে বসলেন, বললেন, এ আমার পাপ! সমস্ত ইংরেজ জাতির হয়ে ঐ অবমানিত মানুষের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন তিনি। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীর পরমতম শত্রু, সাম্রাজ্যবাদ যীশুখৃষ্টের আদর্শের পরিপন্থী, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা পেতেই হবে।

ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে পদানত মানবতার দাবী নিয়ে অ্যাণ্ড্রুজ সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী ও গান্ধীজীর আদর্শকে প্রচার করেছেন ইউরোপ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায়। তাঁর দেবতা ছিলেন খৃষ্ট—যিনি মানব-সন্তান, যাঁর দৃষ্টিতে জাতিধর্ম নির্বিশেষ নেই। খৃষ্টান অ্যাণ্ড্রুজের ভাবনা মূর্ত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে। ধর্ম প্রচারের পোষাক ছেড়ে তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন এবং রবীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতির বহু বৎসর অন্যতম উপাচার্যরূপে এখানকার কর্ণধার ছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন তাঁর আত্মার আশ্রয় হলেও এখানে তিনি একসঙ্গে বেশি দিন থাকতে পারতেন না। দুর্গত মানুষের আহ্বানে ভারতে ও ভারতের বাহিরে তাঁকে ভ্রমণ করতে হোতো। আফ্রিকা, ফিজি ও মালয়ে তিনি বারে বারে গেছেন, সংগ্রাম করেছেন শ্রমিকের দাসত্ব মোচনের প্রয়াসে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে।

ভারতবর্ষে মানুষের অবমাননা অ্যাণ্ড্রুজ দেখেছিলেন শ্রমিক কৃষক ও অস্পৃশ্যদের প্রতি স্বজাতির ব্যবহারে। সমগ্র ভারত-আত্মার অবমাননা তিনি দেখেছিলেন জাতীয় পরাধীনতায়। কিষাণ মজদুরের বন্ধু তিনি ছিলেন,—তাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে একান্তভাবে মিশে ও তাদের মূক কণ্ঠের ভাষাকে আপন কণ্ঠে গ্রহণ করে। অচ্ছুতের তিনি ছিলেন পরম সখা। যেখানে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা ও বর্ণবিদ্বেষ, তাঁর শাসন সেখানে ছিল অনিবার। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। গান্ধীজীর প্রিয়তম সুহৃদ ছিলেন তিনি, জাতীয় কংগ্রেসের সন্ন্যাসী উপদেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর গুরুদেব। ভারত-সংস্কৃতির যা কিছু মহৎ যা কিছু গৌরবোজ্জ্বল তা তিনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

অ্যাণ্ড্রুজ ছিলেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। নিজস্ব বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। কী রাজদ্বারে কী গণমানবতীর্থে রিক্ত পরিব্রাজকের বেশ ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন প্রকৃত খৃষ্টান,—তাঁর কর্মবহুল সমগ্র জীবন নিরবচ্ছিন্ন ও অশ্রান্ত খৃষ্টানুসরণ। খৃষ্টান ধর্মযাজকের পদ তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়েছিল, কেন না, কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসের চোখে তিনি খৃষ্টের বেদনা-বিধুর ক্ষমাদৃষ্টিকে প্রতিফলিত দেখেছিলেন।

১৯৩১ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে কলকাতা শহরে দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ দেহরক্ষা করেন। শেষ রোগশয্যার পাশে উপবিষ্ট গান্ধীজীর কানে কানে তিনি বলেন,—মোহন, স্বরাজের আর দেরি নেই, এ আমি স্থির দেখতে পাচ্ছি।

অ্যাণ্ড্রুজের গ্রন্থরাজির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম What I Owe to Christ পথিক-আত্মার আশ্চর্য আত্ম-জীবনী। এই গ্রন্থ ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। পৃথিবীর মুষ্টিমেয় শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থরাজির মধ্যে এই গ্রন্থের স্থান। যিশুখৃষ্টের একটি সহজবোধ্য জীবনী রচনার ইচ্ছাও অ্যাণ্ড্রুজের ছিল। মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত এই ইচ্ছা তিনি পোষণ করেছিলেন। মানবপ্রেমিক বিশ্ব-পরিব্রাজক অ্যাণ্ড্রুজ এই রচনা সম্পন্ন করবার সময় ও সুযোগ সারাজীবনে করে উঠতে পারেন নি।

খৃষ্টের জীবনী-গ্রন্থ অ্যাণ্ড্রুজ রচনা করতে পারেন নি, খৃষ্টোপম জীবন তিনি যাপন করে গেছেন।

অ্যাণ্ড্রুজের What I Owe to Christ. গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড তাঁর ভারতে আগমন হতে শুরু। এই খণ্ডের অনুবাদ 'ঋণাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত হোলো। জীবনের যা কিছু চরিতার্থতা তা অ্যাণ্ড্রুজ তাঁর পরম পিতা খৃষ্টের কাছ থেকেই লাভ করেন। তাঁর জীবনই পরমপ্রভুর চরণে তাঁর ঋণাঞ্জলি।

বর্তমান অনুবাদক এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ-স্বত্বের একমাত্র অধিকারী—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ]

## ভারতে আমার নবজন্ম

এই পৃথিবীতে আমি দুই বার জন্মলাভ করেছি। আমার জন্মদিন এক নয়, দুইটি। আমার দ্বিতীয় জন্মদিন পরম-কারুণিক সর্বমঙ্গলদাতা ঈশ্বরের এক অপূর্ব দান। গত ত্রিশ বৎসর ধরে আমার জীবনের এই আশ্চর্য দ্বিতীয় জন্মদিনটিতে আমি ঈশ্বরের চরণে কৃতার্থ প্রণাম নিবেদন করেছি। এই দিনটির তারিখ ২০শে মার্চ। ১৯০৪ সালে এই শুভদিনে আমি প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ করি, প্রাচ্য জগতে আমার নবজীবনের সূচনা হয় এই দিনে।

উত্তর-ভারতের অধিকাংশ ভাষায় একটি অতি পরিচিত শব্দ, দ্বিজ। দ্বিজ মানে যে দুবার জন্মলাভ করে। এই বিচিত্র বিশেষণটি আমার সম্বন্ধে একান্তভাবে প্রযোজ্য, সত্যিই আমি দ্বিজ।

আমার জীবন দুটি পৃথকভাগে বিভক্ত। আমার অর্ধেক জীবন প্রতীচ্য জগতের বাকি অর্ধেক প্রাচ্যের। প্রাচ্যের ধ্যান ও পাশ্চাত্যের ধারণার যেটুকু যোগসূত্র আমি রচনা করতে পেরেছি, তার মূলে রয়েছে আমার এই দ্বিখণ্ডিত জীবন রহস্য।

প্রথম যেদিন এই ভারতভূমিতে আমি ভূমিষ্ঠ হলাম, সেদিনটি

অবিস্মরণীয়! অভাবনীয় সেদিনের অভিজ্ঞতা। স্পষ্ট মনে হোলো সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন জগতে আমি যেন অবতীর্ণ হলাম। এ জগতের মানুষ অন্য মানবচিন্তা অন্য, এই অপরিচিত অন্য জগতে পদে পদে বিস্ময়, তেমনি পদে পদে সংশয়। জাতিতে জাতিতে সংস্কারের ও বাহ্য সংস্কৃতির যতো বিভেদই থাক, মানবচরিত্র যে মূলত এক, তা আমি সে মুহূর্তে উপলব্ধি করিনি। প্রতীচ্যের মানুষ আমি, প্রাচ্যের প্রত্যক্ষ বৈচিত্র্য আমার দু-চোখ শুধু ধাঁধিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

তারপর প্রাচ্য-ভূখণ্ডে আমি জীবনের ত্রিশ বছর কাটিয়েছি। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে আমার ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তির উপরে নব নব উপলব্ধির আসন রচিত হয়েছে। এই উপলব্ধির ফলে আমার ধর্মবোধ মহত্তর রূপ পরিগ্রহ করেছে। মানব-পুত্র খৃষ্টের প্রতি আমার বিশ্বাস হয়েছে গভীরতর। সেই খৃষ্টকে আমি শুধু আমার আপন হৃদয়ের কেন্দ্রে নয়, সর্বমানবের সুখ দুঃখের তীর্থ মন্দিরে আসীন রূপে দেখতে পেরেছি। আমার দৃষ্টি সূক্ষ্মতর হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে আমার দর্শন পৃথিবীর সবত্র বিসর্পিত হয়ে গেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় পরিবেশেই খৃষ্টকে আমি দেখেছি, এশিয়া ও ইউরোপে যা কিছু মহান যা কিছু গরীয়ান, তারই প্রতিভূ রূপে আমার প্রভুকে আমি অবলোকন করেছি।

এতো দিন শুধু প্রতীচ্য পৃথিবীর সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল। ইউরোপের পরিবেশে যীশুখৃষ্টের যেরূপ আমি দেখেছিলাম, সেরূপে সম্পূর্ণতা ছিল না। পাশ্চাত্য আদর্শ নিয়ে তাঁর যে চিত্র আমি মনে মনে এঁকেছিলাম, তার রেখাংকনে ছিল দুর্বলতা। প্রাচ্য আকাশের বর্ণাঢ্য পটভূমির সামনে খৃষ্টকে আমি নূতন করে দেখেছি,—তাই সহজে বুঝতে পেরেছি কোথায় ছিল দুর্বলতা। মানবপুত্রের যে চিত্র এতোদিন প্রতীচ্য এঁকেছে তাতে অনেক রেখা আর অনেক রঙ অসম্পূর্ণ থেকে গেছে,—অপ্রকট থেকে গেছে তাঁর চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্য। আমার মনে বাসনা আছে, নূতন করে তাঁর প্রতিকৃতি আমি একদিন আঁকব, তখন আমার তুলিতে মাখিয়ে নেব পূর্বগগনের বর্ণালী।

কেন না, খৃষ্ট-চরিত্রের অলৌকিক বৈশিষ্ট্যই যে এইখানে,—এই অপরূপ বর্ণবৈচিত্র্য। পৃথিবীতে কতো বর্ণ, কতো জাতি। সর্বজাতির সমস্ত গুণাবলী যিশুর চরিত্রে স্থান পেয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য মানব-ইতিহাসের আর কোনো দ্বিতীয় পুরুষের মধ্যে পাওয়া যাবে না,—খৃষ্ট অদ্বিতীয়। প্রাচীন মানব-সংস্কৃতির দুটি স্রোতোধারা, একটি বয়ে চলেছে পূর্বে আর একটি পশ্চিমে,—এই দুই স্রোতের প্রয়াগ-সংগমে তাঁর আবির্ভাব। মানব-পুত্র যিশু,—মানব সভ্যতার এক আশ্চর্যকেন্দ্রে এক আশ্চর্য মুহূর্তে ঈশ্বরের আশ্চর্য আদেশে মানব-সন্তানরূপেই তিনি জন্মলাভ করেছেন। তিনি পাদস্পর্শ করেছেন মানব-সংসারে, আবির্ভূত হয়েছেন সর্বমানবধর্মের মাঝখানে।

সর্বমানবের প্রতিভূ যীশু,—এ দাবী অতি বৃহৎ দাবী। বিগত যুগে এতো বড়ো ঘোষণা হয়তো সম্ভব ছিল না, কিন্তু বর্তমান যুগে তা সম্ভব হয়েছে। মানুষে মানুষে অপরিচয়ের দূরত্ব অধুনা অনেক কমেছে, পৃথিবীর নানা জাতির সংস্পর্শে এসেছেন, নানা মত ও নানা ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, এমন মানুষ আজ বিরল নয়। এই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে যীশুর বাণী জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষেরই অন্তর স্পর্শ করে, সকলেরই শুভ জীবনাদর্শের সঙ্গে মিলে যায়। ইতিহাসের কত যুগ কেটে গেছে,—পৃথিবীতে কতো জাতি, কতো সম্প্রদায়, কতো বর্ণ,—কিন্তু খৃষ্টচরিত্রের স্বর্ণসূত্রজালে সর্ব লোক আর সর্ব কাল ঈশ্বরের বরণমাল্যের মতো গাঁথা।

যুগের পর যুগ যায়। প্রতি যুগে ভক্ত প্রশ্ন করে,—কে ঐ ঈশ্বর প্রেরিত মানব-পুত্র? সর্বমানবের নিবিষ্ট প্রাণের পরম আকুতির উত্তর কেবল একটি মাত্র মানব-চরিত্রের মধ্যেই মেলে। তিনি যীশুখৃষ্ট।

ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসার পর এই গভীর ও আনন্দময় উপলব্ধি আমার মনে এসেছে। সেই সঙ্গে ঈশ্বর সম্বন্ধেও এক নূতন উপলব্ধি আমার মনে জাগরূক হয়েছে।

ইংলণ্ডে যতোদিন ছিলাম, ততো দিন এই জানতাম যে ঈশ্বর তিনি,—যিনি সর্বস্রষ্টা, সর্বাধিনায়ক। ধর্ম পুস্তকে যা লেখা আছে, তা এতোদিন আবৃত্তি করেছি, বলতে শিখেছি,—আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, যিনি আমাদের পিতা, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি স্বর্গমর্ত্যের স্রষ্টা। এই শিক্ষা অনুসারে ঈশ্বরের যে চিত্র আমার কল্পনায় অংকিত হয়ে গিয়েছিল তাতে ঈশ্বরকে আমার অন্তর্লোকের দেবতারূপে আমি পাইনি। সেই ছবিতে দেখেছি ঈশ্বর এক প্রচণ্ড বিরাট পুরুষ, অতুলনীয় তাঁর শক্তি, সেই শক্তিতে চালিত হচ্ছে বিশ্ব চরাচর—সর্বশক্তিমান সর্বভাগ্য বিধাতা রাজাধিরাজ তিনি।

ঐ ভয়ংকর ক্ষমতা যিনি অধীশ্বর, ভয়ানক তিনি, ভয় করতেই হবে তাঁকে। এটা অবশ্য ঠিক যে, তিনি আমাদের পিতা, এই সম্পর্কটুকুর জন্য মনে হয়েছে তিনি আমাদের আপন। এই সম্পর্কটুকুর জন্যেই ঐ মহাভয়ংকরের প্রতি ভয়ভাব কিছুটা কমেছে, স্বীকার করেছি ও আশ্রয় নিয়েছি তাঁর পরম প্রেমে।

ভারতবর্ষের হৃদয়ের গভীরে যখন প্রবেশ করলাম, দেখলাম সেখানে বসে রয়েছেন ঈশ্বর। ঈশ্বর কোনো বাহ্যিক পরমশক্তিমান দেবতা নন, ঈশ্বর অন্তরের ধন। সম্ভ্রমে নয়, ভয়ে নয়, আত্মার গভীর ধ্যানে তাঁর আনন্দ মোহন উপলব্ধি। ঈশ্বরের এই অন্তর্যামী রূপ দেখে ভয় করে না শুধু এক বিচিত্র পুলকে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের এ এক আশ্চর্য রূপ!

এই রূপমাধুরীর উপলব্ধি যখন আমার মনে গভীর হোলো, তখন সাধু জনের উপদেশাবলী আমি নূতন করে বুঝতে পারলাম, প্রতীচ্য শিক্ষার ফলে যা আমার হয়নি। যিশু খৃষ্ট বলেছিলেন, আমি আর ঈশ্বর এক। বুঝলাম, এ কথা শুধু খৃষ্টের নয়, এ প্রতি মানুষেরই দাবী। ঈশ্বর অন্তরীক্ষের দেবতা নন, ঈশ্বরে আমাতে কোনো দূরত্ব নেই, কেননা আমিও ঈশ্বরেরই সন্তান।

অব্যয় অক্ষয় অনন্ত যে পরমাত্মা, মানবাত্মার মধ্যেই সে পরমাত্মার আশ্রয়, প্রাচ্যমন এই কথা বিশ্বাস করে। তিনি অসীম কাল থেকে কালান্তরে তিনি বিস্তৃত, স্থান কালের সীমায় তিনি আবদ্ধ নন। কিন্তু স্থান-কালের বসন তিনি পরিধান করেন আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে। তিনি নিরবয়ব নির্গুণ, কিন্তু তিনি অপ্রত্যক্ষ নন পুণ্য মানবাত্মার সুনির্মল চিৎদর্পণে তার প্রকাশ। তিনি অদৃশ্য, কিন্তু পূত মানব চরিত্রে তাঁর দর্শন-আভাস মানস-কমলের মতো প্রস্ফুটিত তিনি অমূর্ত, এই মানব দেহেই তিনি মূর্তি পরিগ্রহ করেন।

এই ভাবেই প্রাচ্য দেশ ঈশ্বরকে ধ্যান করেছে। ঈশ্বরের এই আন্তরিক অভিনিবেশ প্রাচ্যের রচনায় ও সংকেতে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের সরল গ্রামবাসীও এই অপূর্ব ধর্মবিচিন্তার অধিকারী। প্রতিমা-পূজার বাহ্যিকতার গভীরে এই ধ্যান-মন্দাকিনী প্রবাহিত।

পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই গোলার্ধের মিলনেই এই পৃথিবী-গ্রহে মানব-ভাগ্যের সম্পূর্ণতা। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, বাহির ও ভিতর এই দুই ধারণাকে একান্বিত না করলে খৃষ্টকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না,—যে খৃষ্ট একাধারে দেবতা ও মানুষ। এই সত্য আমি ধীরে ধীরে হৃদয়ংগম করেছি।

গোঁড়া খৃষ্টান তত্ত্বজ্ঞানী যে ভাবে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের প্রভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রগত অধ্যয়ন ও আলোচনা করে প্রাচ্যের ধর্মমত সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেন, সেভাবে জ্ঞান আহরণ আমি করিনি। ভারতীয় ধর্মপরিবেশ চারিদিক থেকে আমার জীবনযাত্রাকে ঘিরেছে। দিল্লীর সেই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আমাকে পদে পদে বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন করেছে। কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতার পথে আমাকে অগ্রসর হতে হয়েছে। পাছে ভুল করি পাছে পরম প্রভু খৃষ্টের প্রকৃত অনুসরণ থেকে বিচ্যুত হই, এই চিন্তা মনে নিয়ে আমি আগুয়ান হয়েছি। এই অগ্রগমনের মধ্যে দিয়েই আমার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। প্রভু যীশুকে প্রণাম করে, তাঁর উপাসনা করে এই প্রাচ্যভূমিতে তাঁরই নির্দিষ্ট পথে আমি এক পা এক পা করে চলেছি,—দিনে দিনে নূতন করে উপলব্ধি করেছি, যে তিনিই পথ, তিনিই সত্য তিনিই মহাজীবন!

বেসিল ওয়েষ্টকটের শ্রেষ্ঠবন্ধু সুশীলকুমার রুদ্র আমাকে দিল্লীতে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা করলেন। সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল তিনি। তাঁর সাহায্যে আমার অনেক অসুবিধা দূর হোলো। পূর্ব-জগতে নবজাত আমি,—নূতন পরিবেশের অপরিচয়ের বাধা তাঁর সাহায্যে ক্রমে ক্রমে মোচিত হতে লাগল। তিনি আমার পরম বন্ধু হলেন।

ভারতবাসীকে আমি এতো সহজে চিনলাম কী করে, ভারতবাসীর আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা এতো নিবিড়ভাবে আমি লাভ করলাম কী করে এই ভেবে অনেকে আশ্চর্য হয়েছেন। কিন্তু কারণটা অতি সাধারণ, এর মধ্যে আশ্চর্য হবার মতো কোনো রহস্য নেই। এর কারণ সুশীল রুদ্র, তাঁর মতো বন্ধু লাভ জীবনে দুর্লভ। আমি বেসিলের বন্ধু, এই সুবাদে তিনি আমাকে প্রথমে কাছে টানেন, তারপর অতি সহজেই আমি তাঁর বন্ধু হয়ে যাই। সারা জীবনের সুহৃদ। তাঁর সঙ্গে প্রথম যখন আমার পরিচয় হোলো তখন তাঁর মধ্য বয়স অতিক্রান্ত। বেশি বয়সে তিনি বিবাহ করেন। তাঁর তিনটি সন্তানেরই তখন বয়স অল্প। কোলের শিশু পুত্রটিকে রেখে তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন।

আমরা এক সঙ্গে বসবাস শুরু করলাম। এই সংসারে শিশুগুলির একমাত্র আপন জন ছিল তাদের পিতা, পিতার পরেই অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে তারা অভিষিক্ত করল আমাকে। ভারতবর্ষে পৌঁছনো মাত্র ভারতীয় পরিবারে স্থান পাবার ও পরিবারের অন্যতম পরিজনরূপে গৃহীত হবার দুষ্প্রাপ্য সৌভাগ্য আমি পেয়েছিলাম।

এ যুগের ভারতীয় জীবনযাত্রা কতো প্রায়াগ্রসর তা বাহির থেকে বোঝা যায় না, আমি সেই জীবনযাত্রাকে একেবারে ভিতর থেকে বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলাম। নবীন ভারতের নব চিন্তাধারার সঙ্গে সুশীলের মাধ্যমেই আমি পরিচিত হয়েছিলাম, সেই সঙ্গে তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেমের দীপ্তি আমারও মনকে উদ্দীপিত করেছিল। দেশপ্রেমিক বলতে সাধারণত যা বোঝায় সুশীল সেই রকম দেশপ্রেমিক ছিলেন না, তাঁর সত্তার কেন্দ্রে ছিল দেশভক্তি। তা ছাড়া তাঁর গভীর খৃষ্টভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ, এই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শ্রেষ্ঠ আত্মিক বন্ধন। এই জন্যেই তাঁর সৌহার্দ্য ছিল আমার অমূল্য সম্পদ। খৃষ্টকে প্রভু বলে জীবনদেবতা বলে সুশীল তাঁর সমস্ত জীবন খৃষ্টের চরণে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর গভীর ধর্মবোধ নিঃশব্দভাবে তাঁর প্রতিদিনের কর্ম ও প্রতি মুহূর্তের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত ও শ্রীমণ্ডিত করত। স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল নবীন অন্তর দিয়ে তিনি তাঁর খৃষ্ট-বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিলেন।

সুশীলের পিতা পিয়ারীমোহন রুদ্র তাঁর প্রথম যৌবনে কলকাতায় ডাক্তার ডাফের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ডাফ সাহেব তখন তাঁর কর্মক্ষমতার শীর্ষদেশে। তাঁর আহ্বানে একদল উজ্জ্বল তরুণ গোঁড়া হিন্দুসমাজ থেকে বহির্ভূত হয়ে প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। সে যুগে এমনি ঘোষণার অর্থ সম্পূর্ণভাবে হিন্দু সমাজ থেকে নির্বাসন। ধর্মত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই যুবকদের কয়েকজন আপন সমাজের ভালোমন্দ সব কিছুকেই বর্জন করলেন। প্রাচ্য জীবনাদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তাঁরা। খৃষ্টানুরক্তির সঙ্গে সঙ্গে আচারে ব্যবহারে বসনে ব্যসনে তাঁরা সর্বতোভাবে প্রতীচ্যকে অনুকরণ করতে লাগলেন।

সুশীলের পিতা কিন্তু খৃষ্টানুরক্তির এই অর্থ করেন নি। এই সমাজ-বহির্ভূত পরানুকৃত জীবনধারাই যে খৃষ্টোপাসনার অঙ্গ, তা নিজে যেমন তিনি বিশ্বাস করেননি তেমনি নিজের সন্তানদেরও তিনি এমন শিক্ষা দেননি। সামাজিক জীবনের আচারে ব্যবহারে তিনি হিন্দুই ছিলেন, শুধু তাঁর অন্তর্জীবন খৃষ্টীয় বিশ্বাসের প্রেরণায় রূপান্তর লাভ করেছিল। হিন্দু সমাজের বিরাট ঐতিহ্যের প্রতি আন্তরিক সম্ভ্রম সুশীল তাঁর পিতার কাছ থেকে লাভ করেছিলেন এবং সযত্নে রক্ষা করেছিলেন।

তরুণ জীবনে সুশীলকে সংশয় ও বিশ্বাসের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর সমস্যা আর আমার সমস্যা একই প্রকারের না হলেও আমারও জীবনে তাঁরই মতো অন্তর্দ্বন্দ্ব এসেছে। এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মিল ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তিনি অক্সফোর্ড মিশন হষ্টেলে বাস করতেন। সেখানকার নীরব বিশ্বাস ও বিনম্র প্রার্থনার মাধুর্যমণ্ডিত জীবন-যাত্রা তাঁকে তৎকালীন সমাজের অবিশ্বাসের ক্ষুব্ধ ঝটিকা থেকে আশ্রয় দিয়েছিল। অকুতোভয় মানসিক স্থৈর্য ও অকৃত্রিম বিশ্বাসের বলে তিনি তরঙ্গোচ্ছ্বাসকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সুশীল যখন দিল্লীতে আসেন তখন তাঁর যৌবন অতিক্রান্ত। ততোদিনে তাঁর মনে এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ হয়েছে যে খৃষ্টই তাঁর ত্রাতা তাঁর রক্ষাকর্তা। এখানে তাঁর কর্মজীবন ধর্মভাবের নবদ্যোতনায় উদ্বুদ্ধ হোলো, নূতন করে তিনি তাঁর জীবনদেবতাকে হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করলেন। যীশু বলেছেন, আমিই জীবন, আমিই পুনরুজ্জীবন।

এই বাণী সুশীলের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সাধন করেছিল। আমারও ত্রাতা যীশুখৃষ্ট, আমি আর সুশীল সমবিশ্বাসের বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলাম।

ভারতবর্ষে নব আগন্তুক আমি। আমারও জীবন নব নব অভিজ্ঞতার ও এক আশ্চর্য পরিবর্তনের সম্মুখীন। সেই বিচিত্র ক্ষণে সুশীলের মতো মহৎ প্রাণের পবিত্র ও আন্তরিক ভালোবাসা ঈশ্বরের মহার্ঘ দানরূপে আমি লাভ করেছিলাম। সুশীলের মতো বিনয়ী লোক আমি দ্বিতীয় দেখিনি। শান্ত অথচ সুগম্ভীর সম্ভ্রম মণ্ডিত তাঁর ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছোট বড়ো সমস্ত কাজ প্রতিটি আচার ব্যবহার এক বিনম্র মর্যাদায় ভূষিত। তাঁর সামনে কেউ কোনো নিরর্থক চপল বাক্য উচ্চারণ করত না, কিন্তু তাঁর সামনে কোনো প্রকার বিব্রতবোধ বা ভয়ও কেউ অনুভব করত না। তাঁর কাজে বা কথায় কেউ কখনো আঘাত পায়নি। তাঁর অনুপম হৃদয় মাধুর্যে সকলেই ছিলেন অভিভূত। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বৎসর কালের মধ্য আমার প্রতি তাঁর প্রীতির কোনো হ্রাস বা বিকৃতি ঘটেনি।

প্রতিদিন আমরা দুজনে ভ্রমণ করতাম, হয় কাশ্মীর গেট ছাড়িয়ে রীজ ধরে, না হয় দিল্লী কেল্লা বা হুমায়ূন-সমাধির অভিমুখে। কোনো সময় আমরা শহরের ভিড়ের পথে ঢুকে হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতাম। কখনো বা যমুনা নদীর পুল পার হয়ে আমরা ওপারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম। ভারত-ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন সুশীল। এমনি ভ্রমণের সময়ে সুশীল দেশের গ্রামীন অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। এই সব আলোচনা আমার খুব উপকারে আসে। এই শিক্ষার ফলে আমি অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতের গ্রাম-সংস্কৃতির একজন উৎসাহী সমর্থক হই। কেবল শহর দেখে ভারতকে চিনতে যাওয়ার যে মহা ভুল, সেই ভুল পথ আমি এড়াতে পেরেছি।

দৈনন্দিন দীর্ঘ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে সুশীল ও আমার পরস্পরের চেনাশোনা ও বন্ধুত্বের দৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠে। আমাদের উভয়েরই বন্ধু ছিল বেসিল ওয়েষ্টকট, বেসিলের স্মৃতি নিয়ে অনেক কথা আমরা আলোচনা করতাম। বেসিলের ভগিনী কেটি থাকতেন ইংলণ্ডে,—সুদীর্ঘকাল ধরে রোগাক্রান্তা। রোগশয্যা থেকে তিনি সুশীলের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতেন। এই কেটির কথাও আমরা প্রায়ই বলতাম। সুশীলের মাধ্যমে অপরিচিত ভারতবর্ষকে আমি সহজে চিনতে শিখি। তাঁর সঙ্গে আমার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা দেখে আরো অনেক ভারতীয় আমার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সুশীলের মাধ্যমে ভারতীয়দের সহিত আমার পরিচয় বিস্তৃত হয়। সুশীলই আমার ভারত দর্শনের প্রথম উদ্যোক্তা, তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম।

[ ক্রমশঃ।

অনুবাদক—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

# উইলিয়ম কার্লোস

[ উইলিয়মসের কবিতা ]

### স্টাইলিষ্ট

বহু কাল দেখা নেই।
—এ যেন একটা ঝলক
উজ্জ্বল ইস্পাত থেকে,
কিন্তু :
আমার একটুও
ক্ষমতা নেই এ অরণ্য থেকে
বেড়িয়ে আসবার। আমি প্রত্যাশা
করেছিলাম তুমি
আসবে এবং আমাকে
নিয়ে যাবে সহরে।
উত্তর নেই।

### সাইলেন্স :—

নিচু আকাশের তলায়
এই শান্ত সকাল ছড়িয়ে আছে
লাল আর হলদে পাতায় পাতায়
একটা পাখী
এই হলদে পীচ গাছটার
শুধু একটা, তার বেশী নয়,
পাতা নড়িয়ে দিচ্ছে।

অনুবাদক—পৃথ্বীশ সরকার।

# প্রশ্নোত্তর

[ অপ্রকাশিত কবিতা ]

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

( সংস্কৃত হইতে )

দ্যাখার জিনিস কি আছে জগতে ?
কি দেখি অধিক সুখ ?
—হরিণ-নয়না তরুণী প্রিয়ার
প্রেম-প্রসন্ন মুখ।
কোন আঘ্রাণ তোষে প্রাণ ?—তার
ঘনিষ্ঠ নিশ্বাস।
শ্রবণে অমৃত কিসে বা বরিষে ?
—তার সে মুখের ভাষ।

মধুর চেয়েও মধুর কি ?—তার
অধর-পুষ্পরস !
পরশে অমৃত ?—চন্দন-ঘন
তন্বীর সুপরশ।
ধেয়ানে ধরিয়া কোন ধনে হিয়া
সব চেয়ে হয় সুখী ?
মরমীরা কয়,—তার নাম হয়
প্রেয়সী ইন্দ্রমুখী !

# তিব্বতের গান

উঁচু দরের মানুষ যাঁরা থাকেন তাঁরা উঁচুতে।
পাখীর রাজা ভিন্ন বল আকাশে পারে কে ছুঁতে ?
বসন্তের এই তিনটি মাসে যে ফুল ফোটে ফুটল সে,
বসন্ত ফুরাল যদি ফুলের ও-পাঠ উঠল রে
এই জীবন না যায়, যতদিন ততদিন(ই) মা'র ছেলে,
এই জীবনে সুখের মোরাদ যে পেয়েছে সেই পেলে।
একটা মাত্র জীবন মোদের, একটা বই আর নাই রে,
যেমন খুসী তেম্‌নি করে ভোগ তায় ভাই রে।

# কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সুধীরকুমার মিত্র

অতি প্রাচীনকাল থেকে মানবের জন্মতিথি দেশ-দেশান্তরে রীতি অনুযায়ী পালিত হয়ে আসছে। যা একান্ত ঘরের ভেতর অনুষ্ঠিত হয়, সেই মানুষ যদি স্বনামধন্য হয়ে উঠে, তখন এই জন্মতিথি পালন করা স্বদেশবাসীর ও বিশ্ব-মানবের দায়িত্ব, বিশেষ তাঁর তিরোধানে তাঁর কীর্ত্তির স্মারকস্বরূপ। মৃত্যুর পর মানুষের কি থাকে—তার কীর্ত্তি (Deed-Sheet)। সাহিত্যক্ষেত্রে দেখা যায় দেশ নিয়ে কত লোফালুফি, হার জিত চলা সত্ত্বেও স্বদেশের culture সংস্কৃতি অবিনশ্বর, আর চিরন্তন হয়ে বেঁচে থাকে কবিদের কাব্য লেখা, যাকে বলে সাহিত্য—বিশ্ব-সাহিত্য তাই কালোত্তর অতি অল্প লেখাই এই শ্রেণীভুক্ত। কবি সত্যেন্দ্রনাথের লেখাতে, তাঁর মনুষ্যত্ব, স্বাদেশিকতায়, স্বকীয়তায়, ঋজুতায়, সাম্যে, সরল ভাব, অনুপম ছন্দ, অবিনশ্বর হয়েই থাকবে—তাঁর বংশ, তাঁর ঠাকুরদাদা অক্ষয়কুমার দত্ত যিনি বাংলা ভাষাকে রূপদান করেন—প্রগাঢ় সত্যসন্ধ যিনি জ্ঞান-প্রজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেন—চারুপাঠ, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব মনের সম্বন্ধ বিচার, প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য বিস্তার প্রভৃতি গ্রন্থ লেখেন, সেই বংশ সত্যেন্দ্রনাথের তিরোধানে লুপ্ত হল। এখন দেশবাসীর কাজ, ঐ পরিবারের তিন পুরুষের সাহিত্য চর্চা মণি-কাঠায় সঞ্চয় করে তার অনুশীলন করে তাকে জাগিয়ে রেখে স্বদেশের আরো শ্রীবৃদ্ধি করা আর তাঁর জন্মতিথিতেই এইরূপ অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র পালন করা।

কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পর হতে বহু লোক—তাঁর সুহৃদবৃন্দ ও অনুসন্ধিৎসুরা তাঁর সম্বন্ধে ও তাঁর লেখার উপর বহু কথাই লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছাড়া এঁর বিরাট মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বটা কেউই সঠিক ধরতে ছুঁতে পারেননি। বিদেশে, রুশিয়াতে ওদের বৈজ্ঞানিকেরা, মাথার খুলি খুলে ফেলে তার ভিতর নানা গুণের উৎস কোথায় তা' নাকি খুঁজে খুঁজে তথ্য আবিষ্কার করে?—আমরা কিন্তু তিনি যে ঐতিহ্য রেখে গেলেন তার অনুশীলনের পক্ষপাতী আর তিনি যে বিরাট Man of character—A man—একটি মানুষ ছিলেন—যা' এ দেশে পাওয়া দুর্লভ—আমরা তার পূজারী।

গুণীই গুণের সমাদর করতে জানে—পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে Goethe-Schiller এর যে সম্বন্ধ ছিল, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠিক যেন তার প্রতীক—তাই সত্যেন্দ্রনাথের তিরোধানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

'জানি তুমি প্রাণ খুলি'
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
বিদ্যুৎ—নাচন গানে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্য বীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম
করুণ-কোমল।
কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার, রক্তভূমে
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি।
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি!
তুমি অনুরাগে এসেছিলে আমার পশ্চাতে,
বাঁশিখানি লয়ে হাতে, মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে :
মর্ত্তজন্মে ছিল তব মুখে যে বিমল স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ
সতেজ সরলতা
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা।

মানুষ হ'তে গেলে কী চাই তার সব উপকরণ সত্যের-ইন্দু কবি সত্যেন্দ্রনাথে বিভাষিত হ'য়েছিল।

মনীষী Buchle তাঁর "History of civilization"এর গোড়া পত্তনে বলেছেন মানুষ ও দেশ বড় হতে গেলে তার ভিতে চাই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষ, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিন্যাস (দেশ কাল-পাত্র গত) আর অধ্যবসায় (নিজের বেলায় ঐ গুলো)।

দেশে মানুষ কোথায় বিশ্বে ত' দূরের কথা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ National swimming club (হেদুয়া) সত্যেন্দ্রনাথের আলেখ্য উন্মোচনে তাই আক্ষেপ করে বলেন :—

"সমস্ত বঙ্গদেশে মানুষ খুঁজিতে আমি হয়রাণ হইয়াছি, আমি নিরাশ হইয়াছি 'দেখে না মিলিল এক'—বাঙ্গলা দেশে আমি মানুষ পাইতেছি না, আপনাদের মধ্যে কি মানুষ আছে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—বাঙ্গলার মনুষ্যত্ব কোথায়, কাহার কাছে, কোন সন্তানের কাছে? আমি যাহা চাই আমার জন্য—আপনাদের—জন্য নাহি যা পাই আমি এই মহাকবির সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিব "বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো, রাগিয়ে দে তোর নাগেরে।"

শ্রীজহরলালও দেশে মানুষ তৈরী হচ্ছে না বলে, মানুষ গড়বার জন্যে দেশের শিক্ষাপদ্ধতি আমূল ঢেলে সাজাবার নির্দ্দেশ-নামা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বহুদিন পূর্ব্বে মর্ম্মন্তুদ দুঃখে বলেছিলেন 'সাতকোটি সন্তানেরে রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করোনি?'

আর সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সাধনার আশাস্বরূপ তাঁর অনুপম ছন্দ-বদ্ধ ভাষায় বলেছেন একটু ভাবের চাষ, একটু বুদ্ধির চাষ, একটু সহৃদয়তার চাষ চাই।

সারা জীবন সাম্যের অভিব্যক্ত-পূজারী-কাণ্ডারী-ভাণ্ডারী হয়ে পরিণত বয়সের রচনা প্রহ্লাদ-জননী বলছেন :

আত্মা কহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার।
বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবও নয়, ন্যায্য অধিকার।
চিন্তা বলের লড়াই সুরু পশুবলের সাথ,
বন্যাবেগের হানায় মুখে কিশোর তনুর বাঁধ!
প্রলয় জলে বটের পাতা। চিত্ত চমৎকার!

# ‘অবকাশরঞ্জিনী’র অপূর্ণ-অংশ

শ্রীদীপককুমার সেন

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের ‘অবকাশরঞ্জিনী’ নামক খণ্ডকাব্যখানি পাঠকালে আমরা স্থানে স্থানে কতকগুলি অংশ অপূর্ণ অবস্থায় দীর্ঘকাল যাবৎ লক্ষ্য করে আসছি। কিন্তু এই সকল অংশ অপূর্ণ থাকার কারণ কি, এ সম্পর্কে আমাদের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন হয় এবং সেই সঙ্গে এগুলি পড়বারও কৌতূহল জাগে। বর্ত্তমানে সৌভাগ্যক্রমে আমরা এই সকল বিলুপ্ত অংশ সংগ্রহপূর্ব্বক পাঠ করবার সুযোগ পেয়েছি এগুলি পাঠ করলেই অপূর্ণতার কারণ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। অদূর-ভবিষ্যতে ‘অবকাশরঞ্জিনী’তে সংযোজিত হতে পারে, এই ভরসায় আমরা অপূর্ণাংশগুলি পরিচয়পত্রসহ উদ্‌ধৃত করলাম।

‘অবকাশরঞ্জিনী’ নবীনচন্দ্রের আদি কাব্যগ্রন্থ (বৈশাখ ১২৭৮)। এ-কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালের মাঘ মাসে। ইতিপূর্ব্বে অবশ্য এ গ্রন্থের কবিতাগুলি বিভিন্ন সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম ভাগের প্রথম-সংস্করণটি বর্ত্তমানে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, সেই সঙ্গে কবিতাগুলির আদি প্রকাশস্থান—সাময়িকপত্র-গুলিও। অতএব সংগৃহীত দ্বিতীয় সংস্করণ কাব্য (১২৮৪) থেকে আমরা এই অপূর্ণ অংশগুলো উদ্‌ধৃত করলাম। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এ গ্রন্থের তৃতীয়-সংস্করণ (১২৯১) থেকেই অংশগুলো অপূর্ণ ছিল।

১। “মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক” কবিতায়—

১৪

প্রসবিল যেই মন বেদান্ত দর্শন,  
চতুর্ব্বেদ যাহা হতে হইল উদ্ভব,  
ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই মন করিল সৃজন ;  
নীতিজ্ঞ আনন্দাশ্রম, দ্বারকা, কেশব  
সে মন আদর্শ ; পিতঃ! ইহার গৌরব ;  
বর্দ্ধিত হইতেছিল সুশিক্ষা সহায়,  
দ্বেষানলে দগ্ধ হয়ে রাজমন্ত্রী সব,  
কুঠার মারিতে চাহে তাহার গোড়ায়।

১৫

সুশিক্ষিত, সহৃদয়, বাঙ্গালি যুবক,  
পবিত্র সিবিল-গৃহে করিছে প্রবেশ,  
এই জন্যে ইংরাজের নয়ন কণ্টক  
হইয়াছে অভাগারা ; বিহঙ্গশাবক  
ফুটিলে নয়ন পাছে মুক্তিপথ চায়,  
এই ভয়ে মন্ত্রিগণ ভাবিয়া নরক  
জন্মান্ধ করিবে কিসে, ভাবিছে উপায়।

১৬

বাঙ্গালি, দাসত্ব-জীবী, দুর্ব্বল বাঙ্গালি,  
প্রকাশ্য সংবাদপত্রে, সমকক্ষ প্রায়,  
ঢালিবেক শ্বেত অঙ্গে কলঙ্কের কালি,  
দূষিবে রাজার কার্য্য নিন্দিবে জেতায়,  
এই দুঃখে শ্বেত বুক বিদরিয়া যায়।  
শূন্য এবে রাজকোষ, রাজ্যে হাহাকার,  
করদান একমাত্র আমাদের দায়,  
ব্যয়কালে আমাদের নাহি অধিকার।

১৭

এই স্থির হইয়াছে ইংরাজমহলে,  
বাঙ্গালির এক মাত্র মানসিক বল,  
হয় যদি হত-বল নীতির কৌশলে,  
ঘুচিবেক ইংরাজের যত অমঙ্গল।  
পদানত হইবেক বাঙ্গালি দুর্ব্বল।  
বাঙ্গালির একমাত্র আছিল সান্ত্বনা,  
শিক্ষামন্দিরের দ্বার ছিল অনর্গল,  
তাতেও অনর্গল দিতে হতেছে মন্ত্রণা।

১৮

রাজপদে আমাদের নাহি অধিকার,  
রাজচিন্তা আমাদের উন্মাদস্বপন,  
রাজ্ঞী প্রতিনিধি সভা অদৃষ্ট আগার,  
আমাদের পক্ষে যেন নন্দন কানন।  
কেবল কেরানিগিরি বাঙ্গালি-জীবন,  
বর্ণ বিনে, বিদ্যা বুদ্ধি সকলি বিফল,  
অধীনতা হায়! এই দুঃখের কারণ,  
সাধে বলি বাঙ্গালির মরণ মঙ্গল!

২। “মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অফ এডিনবরার প্রতি” কবিতায়—

২০

যদিও মায়ের পূর্ব্বে শাসিতে ভারত  
আসিত প্রশস্তমনা ভদ্রের সন্তান,  
দয়ার্দ্র-হৃদয় তারা, নিজ ভ্রাতৃবৎ  
করিত প্রজার সুখসমৃদ্ধি বিধান,  
যবন-যন্ত্রণা-পরে, তাহাদের করে  
ছিলাম পরম সুখে, পরম আদরে!

২১

এখন আসিয়া কত সামান্য ইংরাজ,  
বড় বড় রাজপদে হয় প্রতিষ্ঠিত,  
আপনার স্বার্থসিদ্ধি একমাত্র কাজ,  
আমার সন্তানে করে চরণে দলিত।  
মফস্বল রাজ্য তার, ইচ্ছা রাজবিধি,  
বাঙ্গালিরা ক্রীতদাস, বর্ণমাত্র নিধি।

২২

জাতীয় বিদ্বেষ-স্রোত হতেছে বিস্তার,
তাঁহাদের সদাচারে সমুদ্র সমান ;
যে করিবে রক্ত পান সে যদি আবার
বিষধর হয়, তবে কিসে বাঁচে প্রাণ ?
সুশিক্ষিত সহৃদয় যতেক বাঙ্গালি,
ইহাদের চক্ষুশূল নয়নের বালি।

২৩

এই তো কীর্ত্তিকলাপ : এ দিকে আবার
রাজ্যের সম্যক আয় তাঁদের উদরে
যাইতেছে, শতাংশের একাংশ তাহার
না পায় ভারতবাসী প্রাণপণ করে ;
কি বলিব যুবরাজ ভারতে এখন
বিদ্যা বুদ্ধি কিছু নহে বর্ণের মতন।

অতঃপর আমরা দ্বিতীয়-ভাগ 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যের প্রথম-সংস্করণেই ( মাঘ ১২৮৪ ) স্থানে স্থানে এই অপূর্ণাংশ লক্ষ্য করি। অতএব, এক্ষেত্রে কবিতাগুলির আদি প্রকাশস্থান বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা থেকেই সে-সকল অংশ উদ্ধৃত হল :—

৩। "আবাহন" কবিতায়—

৩৩

হইতেছে নিশি ক্রমে গাঢ়তর ;
গেল যবনেরা ; কিন্তু পারাবার
চির অবিশ্বাসী—নির্দ্দয় অন্তর,
সোণার ভারত ডুবায় আবার।
ওই সংখ্যাতীত বাষ্পীয় বাহনে,
লুঠি ভারতের রতন-ভাণ্ডার
নিতেছে বহিয়া, শোষে প্রাণপণে
শত স্রোতে হায় শোণিত তাহার।

৩৪

দেখ হৈমবতি, দেখ একবার
পিঞ্জরের পাখী ভারতদুঃখিনী,
নাহি সেই রূপ, নাহিক তাহার
সেই স্বর্ণকান্তি বিশ্ববিমোহিনী।
অনন্তবন্ধনে বেঁধেছে তাহায়,
বাষ্প ও বিদ্যুতে বীভৎসে লোহার,
বসি নিরশনে, ঝুলিছে মাথায়
সূক্ষ্ম সূত্রে শত অসি খরধার।
( 'বান্ধব', ভাদ্র ১২৮২ )

৪। "আগমনী" কবিতায়—

মিলি সুরাসুর দল,
করি মহা কোলাহল,
মথিলে অনন্ত সিন্ধু—ভারত ভাণ্ডার!

যে অমৃত উদ্ধারিলে,
সুরগণে বিতরিলে,
আপনি রেখেছ, প্রভু দুর্ভিক্ষ-সংহার।
'ছয় কোটি' মহাবিষ কণ্ঠেতে তোমার।

৯

স্বয়ং বিধাতা তুমি,
বঙ্গ তব লীলাভূমি,
বাঙ্গালি অদৃষ্ট, প্রভু, করেতে তোমার।
যার ভাগ্যে যা লিখিবে,
কার সাধ্য খণ্ডাইবে ?
ভবিতব্যালয় তব "বেলভিডিয়ার"!
অদৃষ্টে অদৃষ্ট লিখ, 'গেজেটে' তোমার।

১০

বিষ্ণু অবতার তুমি,
ভার্য্যা তব শ্বেতাঙ্গিনী,
সতিনী কমলা সহ গৃহে বিরাজিত।
সুদর্শন চক্র ধর,
বাঙ্গালা শাসন কর,
সপ্তাহে বাজাও শঙ্খ সদা শঙ্কজিত!
কর, পদ্মপাণি! পাণি-পীড়নে মোহিত।

১১

তুমি শম্ভু, তুমি ভব,
উদাসীন ভাব তব,
বসতি কৈলাসে, বঙ্গে স্থিতি একদিন।
প্রকাণ্ড ত্রিশূল করে,
ত্রিভুবন কাঁপে ডরে,
একশূল 'মিলিটরি' দ্বিতীয় 'সিবিল',
তৃতীয়তঃ 'হোমচার্জ্জ', ওহে দয়াশীল।

১২

তুমি প্রভু আখণ্ডল,
বাষ্পীয় বাহনে চল,
তুচ্ছ বজ্র,—যেই পুচ্ছ আছে তব করে,
তার সঞ্চালনে হায়,
পায় তুমি বাঙ্গালায়,
তুলি স্বর্গে, নিক্ষেপিতে পাতাল ভিতরে,
জ্বালাইতে ; ভাসাইতে অকূল সাগরে।

১৩

তুমি কালান্তক যম,
অনিবার্য্য পরাক্রম,
বর্ত্তমান কারাগার 'নরক' তোমার।
যমদূত ভয়ঙ্কর,
কাঁপে অঙ্গ থর থর,
সপুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট! কি কহিব আর ?
হায়! প্রভু মহামারি 'সমারি' বিচার।
( 'বান্ধব', পৌষ ১২৮১ )

**ধারাবাহিক জীবনী-রচনা**

# অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৭
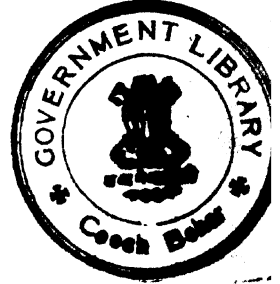
জিহ্বা-মরু-প্রাঙ্গণে কৃষ্ণলীলাকথাই সুধার সুরধুনী। কর্ণানন্দি কলধ্বনি। রসোল্লাসিতগামিনী দ্রবশ্রবা।

'নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি॥'

কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্। যিনি স্বয়ংসিদ্ধ ভগবান, তিনি আবার নন্দের অপেক্ষা রাখেন কেন, কেন আবার তার পুত্র হতে যান? রসের দুই মূর্তি, আস্বাদ্য আর আস্বাদক। যেখানে কৃষ্ণ পূর্ণ, অন্যনিরপেক্ষ, সেখানে তিনি আস্বাদ্য। কিন্তু যেখানে তিনি লীলাপুরুষ সেখানে তিনি আস্বাদক। বাৎসল্যরস আস্বাদন করবার জন্যই দরকার তার বাপ-মা, নন্দ-আর যশোদা।

'মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন-পালন॥'

কৃষ্ণে যশোদার ঈশ্বরবুদ্ধি নেই। শুদ্ধ সন্তানবুদ্ধি। কৃষ্ণ পরতত্ত্ব, কৃষ্ণ বিভুবস্তু—এ সব কথা বললেও মানতে প্রস্তুত নয় যশোদা। কৃষ্ণ তার কাছে অপোগণ্ড শিশু ছাড়া কিছু নয়, নিতান্ত দুর্বল নিতান্ত নিরুপায়। গায়ে মশামাছি বসলেও সে তাড়াতে জানে না, খিদে পেলেও বলতে পারে না বুঝিয়ে। সব সময়ে মায়ের উপর নির্ভর। মা খাইয়ে দিলে খাওয়া, পরিয়ে দিলে পরা, ঘুম পাড়িয়ে দিলে ঘুমোনো। তার পরে যা দুর্বৃত্ত, লাঠি দিয়ে মারতে বা দড়ি দিয়ে বাঁধতেও কসুর করেনা যশোদা। মমত্ববোধে এত তাকে হেয় ভাবে। আর কে আছে দুরন্তকে শাসন-শোধন করে! মা ছাড়া তার গতি কই? কে আর করে তার মঙ্গলচিন্তা?

বিদ্যায় বুদ্ধিতে শক্তিতে সম্পদে তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে যশোদার সেই নির্মল বাৎসল্যে বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ। মেনে নিচ্ছে তার সমস্ত বন্ধন-পীড়ন তাড়ন-তিরস্কার। তার শীর্ণ, স্বল্প অঞ্চলের অধীনতা।

দেবকীর স্নেহে ন্যূনতা ছিল। ছিল ঐশ্বর্যবুদ্ধির ভেজাল। কৃষ্ণকে শুদ্ধ সন্তান মনে করেনি, মনে করেছিল ভগবান। কংসের কারাগারে আবির্ভূত হবার পর স্তব করেছিল। কংসবধের পর কৃষ্ণ প্রণাম করতে গেলে কুণ্ঠিত হয়েছিল, ভগবানের প্রণাম কি করে? কৃষ্ণের প্রতি দেবকীর হীন জ্ঞা না। ছিল ঈশ্বরজ্ঞান। তাই সে বদ্ধাঞ্জলি থাকলো। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে থাকলে আ কি করে? হেয়তা না থাকলে গাঢ়তা কোনর অম্ল

শচীও লাঠি হাতে নিয়ে মারতে যান নিমাইকে বাড়িতে মুচি এসেছে তাকেই ছুঁয়ে দিয়েছে নিমাই। ছি ছি, অধম ছেলে, জাতধর্ম সব বিসর্জন দিলি। নিজের গায়ে ভাত মেখেছে, কেমন ধরো দেখি এবার। হাতের লাঠি ফেলে দাও বলছি, নইলে ঠাঁই নেব গিয়ে আঁস্তাকুড়ে।

শচী হাহাকার করে উঠলেন: 'বামুনের ছেলে হয়ে তোর এ কি কাণ্ড?'

'যার ব্রহ্মাণ্ড তার আবার কাণ্ড কি।' বললে নিমাই: 'সবই তার ঐশ্বর্য। তোমার শুচি আর অশুচি দুইই কল্পনা।'

মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন শচী। দুগ্ধপোষ্য শিশু, তার মুখে এ কি অদ্বয়জ্ঞানের কথা।

প্রতিবেশিনীদের কাছে গেলেন দুঃখ জানাতে। 'এ ছেলে নিয়ে কি করি বলো তো! দুরন্তপনা করছে করুক, কোন ছেলেটা না করে। কিন্তু তাই

বলে উচ্ছিষ্ট মানবে না ? মুচিকে ছুঁয়ে দেবে ? বলবে শুচি-অশুচি সব মাথার ভুল ?'

'নিশ্চয়ই অপদেবতার ভর হয়েছে ।' প্রতিবেশিনীরা মুখ অন্ধকার করল : 'ষষ্ঠীঠাকরুণের পূজো করো। তিনিই তোমার ছেলেকে সুস্থ করে দেবেন ।'

আঁচলের তলায় নৈবেদ্য নিয়ে ষষ্ঠীর থানে চলেছেন শচী । কোত্থেকে নিমাই এসে হাজির ।

সর্বনাশ হয়েছে । ভেবেছিলেন নিমাইকে এড়িয়ে চলে যেতে পারবেন, কিন্তু সাধ্য কি তাকে ফাঁকি দাও ।

'মা, কোথায় চলেছ ?' নিমাই দাঁড়াল পথ জুড়ে ।

'যাচ্ছি একটু কাজে । তুই এখানে কেন ? তুই বাড়ি যা ।' শচী পাশ কাটাতে চাইলেন ।

'যাচ্ছি । কিন্তু তোমার আঁচলের নিচে কি আছে বলো । সন্দেশ ?'

'ছি ছি, ও কথা বলতে হয় না—' জিভ কাটলেন শচী ।

'কেন বলতে হয় না ? আমার যে খিদে পেয়েছে ।' নিমাই মার আঁচল চেপে ধরল ।

'বাবা, এ পূজোর নৈবেদ্য ।' শচীর মুখে কাতর ন : 'আমি ষষ্ঠীর থানে পূজো দিতে যাচ্ছি ।'

ঐ নৈবেদ্য আমাকে দিয়ে যাও না । আমি চির। ষষ্ঠী তুষ্ট হবে ।' বলে ছোঁ মেরে মার গো তলা থেকে নৈবেদ্যের ডালা কেড়ে নিল ওই খেতে লাগল আনন্দে ।

'আমার খেপা ছেলের অপরাধ নিও না মা—' ষষ্ঠীর উদ্দেশে শচী কাঁদতে লাগলেন । গেলেন আবার প্রতিবেশিনীদের কাছে । 'এখন বলো এর কি উপায় ?'

প্রতিবেশিনীরা ধরল নিমাইকে । বললে, 'তুই বামুনপণ্ডিতের ছেলে, এ তোর কি ব্যবহার !'

'কেন কি করেছি ?'

'কি করেছি ! দেবতার নৈবেদ্য খেয়ে ফেলেছিস ?'

'খাব না তো কি ।' উচ্ছলকণ্ঠে হেসে উঠল নিমাই : 'আমিই তো দেবতা । আমি ছাড়া আর দেবতা কে !'

আমিই তো দ্বাপরে শ্যাম, কলিতে গৌর। আমিই তো প্রকাশবিশেষে তিন নাম ধরি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর ভগবান। নির্বিশেষস্বরূপই ব্রহ্ম। অন্তর্যামীস্বরূপ পরমাত্মা। আর বিলাসস্বরূপই ভগবান। ভগবানই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ নারায়ণ। সমগ্র শক্তি, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান আর সমগ্র বৈরাগ্য—এই ছয় ঐশ্বর্য। আমি সৎ, চিৎ ও আনন্দের বিগ্রহ। আমার দেহ নিত্যসত্তাযুক্ত, অনশ্বর। ঘনীভূত আনন্দের প্রতীক। আর এ আনন্দ মায়িক আনন্দ নয়, চিন্ময় আনন্দ। যে আনন্দ স্বপ্রকাশ-অপ্রাকৃত আমি তারই ভূমামূর্তি। আমি অনাদি, নিত্যবিরাজমান। আমিই সর্বকারণকারণ। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পালয়িতা বলে আমি গোবিন্দ। সর্ব ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলে আমি হৃষীকেশ।

তবু, সর্বসত্ত্বেও, সর্বেশ্বর হওয়া সত্ত্বেও, আমি ঐশ্বর্যের অনুগত নই, আমি মাধুর্যের অনুগত। হতে পারি আমি দ্বারকানাথ, হতে পারি মথুরানাথ, কিন্তু আসলে আমি ব্রজেন্দ্রনন্দন। মথুরাধিপতি নয়, মথুরাধিপতি ব্রজের শ্রীকৃষ্ণই আমি।

'সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥'

ব্রজের ভাব কি ?

প্রভু, তোমার চরণে যেন বিনিশ্চল মতি থাকে, তোমার চরণসংস্পর্শ ছেড়ে মন যেন কোথাও না যায়, এ ভক্ত ব্রজের নয়। প্রভু, যেন সর্বক্ষণ তোমার নামগুণগানে বিভোর তন্ময় থাকি, এও ব্রজের নয়। প্রভু, কর্মবিপাকে যেখানেই জন্ম হোক, পশু হয়ে পক্ষী হয়ে কীটপতঙ্গ হয়ে, তোমার প্রসঙ্গ যেন না ভুলি, এ বুলিও ব্রজের নয়। ব্রজের কথা অন্যরকম। তোমার ভালো হোক, তোমার কুশল হোক, তুমি সুখী হও, তুমি প্রীত হও—এ কথাই ব্রজের কথা। আমার ইচ্ছা শুধু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা। শুধু তোমার সুখই আমার কাম্য। আমার যাই হোক, শুধু তুমি তৃপ্ত হও। তাতেই আমার তৃপ্তি। আমার তৃপ্তি কৃষ্ণসুখতাৎপর্যময়ী। আমি আমার নিজের জন্যে কিছু চাই না, ভুক্তি-মুক্তি কিছু না, আমি চাই শুধু তোমার সুখসাধন। আমি তোমার জন্যে আমার নিজেকে চাই। যেহেতু তুমি আমার নিজের চেয়েও আপনজন, 'স্বীয়ের চেয়েও প্রিয়।' তোমার স্বার্থেই আমার কৃতার্থতা।

তাই নিমাইয়ের নাম বিশ্বম্ভর। সমস্ত বিশ্বকে তিনি ভরণ করেন, পোষণ-ধারণ করেন, তাই। কিন্তু কি দিয়ে পোষণ-ধারণ করেন ? একমাত্র ভক্তি দিয়ে। ভক্তিই বিশ্বম্ভরের একমাত্র উপজীব্য।

'সহজে শর্করা মিষ্ট সর্বজনে জানে।
কেহো তিক্ত বাসে, জিহ্বা-দোষের কারণে ॥
জিহ্বার সে দোষ, শর্করার দোষ নাঞি।
এই মত সর্বমিষ্ট চৈতন্যগোসাঞি ॥'

কিন্তু ভক্তির ধার ধারে না মুরারি গুপ্ত। কুড়ি ছরের যুবক, গঙ্গাদাসের টোলে ব্যাকরণ পড়ে, রপরে আবার কবিরাজ। যোগবাশিষ্ঠে পণ্ডিত, দান্তের ধুরন্ধর। নাহং নয়, বলে, সোঽহং। বলে, আমিই এক, আমিই সেই একমাত্র। কোথাও ভেদ ই, ছেদ নেই, আমিই সেই অদ্বৈত পুরুষ।

তর্ক করতে খুব ভালোবাসে। যুক্তি প্রয়োগ রে বিপক্ষকে নিরস্ত করতে। সব সময়েই যুদ্ধং হি ভাব, মুখে শুধু বক্তৃতার বর্ষণ। হাঁটতে-চলতে তে-বসতে অনুক্ষণ তার শ্রুতিবাক্যের বিশ্লেষণ, দ্বৈততত্ত্বের জয়ধ্বনি। আর সঙ্গে-সঙ্গে হাত নাড়া থা নাড়ার ঘটা।

যেমন ব্রীহির বীজে মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কাশ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ ও কণা বিদ্যমান থাকে, দুর্গোৎপত্তির সমগ্র কারণ প্রাপ্ত হলে বীজ হতে দের যেমন আবির্ভাব হয়, তেমনি বহুবিধ কর্মে দেবাদির শরীর অবস্থিত, বিষ্ণুশক্তি প্রাপ্ত হলেই তারা প্রকাশিত হয়। সেই বিষ্ণুই পরব্রহ্ম আর তাঁর থেকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি। সুতরাং জগৎও তিনি ছাড়া কিছু নয়। আর যেমন উৎপত্তি তেমনি আবার তাঁতেই জগতের লয় ক্ষয়। যে জগৎ দৃশ্যমান তা কোনো ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু নয়। সমস্তই ব্রহ্মচ্ছায়া। অতএব আমাতে-ব্রহ্মতে ভেদ কোথায়?

ভেদ কোথায়! পিছন থেকে ভেংচি কাটল নিমাই।

পড়ুয়া বন্ধুদের নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে মুরারি, আর, যেমন তার মুদ্রাদোষ, অনবরত হাত-মুখ নাড়ছে আর শাস্ত্রব্যাখ্যা করছে। আর সব চেয়ে তার যা প্রিয় তত্ত্ব, অদ্বয়তত্ত্ব, তারই স্থাপন করছে সরবগৌরবে।

পিছন থেকে হঠাৎ হাসির রোল উঠল।

চকিত-বিস্ময়ে ফিরে তাকাল মুরারি। দেখল পাঁচ বছরের ছেলে নিমাই তার অঙ্গভঙ্গির নকল করে অবোধ শব্দে গর্জন করছে, আর তাই দেখে তার আশেপাশের দল ফেটে পড়িয়ে পড়ছে হাসিতে।

এ কি অকাণ্ড! কিন্তু অবাচীন শিশু, এর ধুলোখেলা কে গায়ে মাখে। মুরারি চলল এগিয়ে। লল আবার তার শাস্ত্রের কচকচি। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আস্ফালন।

আবার হাসির ঢেউ উঠল।

ক্রুদ্ধ চোখে ফিরে তাকাল মুরারি। দেখল নিমাই আবার তার চলা-বলা নকল করে বক্তৃতা দিচ্ছে আর হাসিতে ছুটোপাটি খাচ্ছে তার সঙ্গীরা।

'এ কী হচ্ছে?'

'জ্ঞানমার্গ হচ্ছে। সোঽহং হচ্ছে।' বিদ্রূপের স্বরে বললে নিমাই। আর অমনি তার সঙ্গীদের হুল্লোড়।

'এ কি দুরাচার! জগন্নাথের ঘরে দেখি এক অপদার্থ জন্মেছে। যাই তোর বাবাকে বলি গে যাই।'

'যাও না। জ্ঞানযোগের কথাও বলে এস গে সেই সঙ্গে।'

'আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খেয়েছে'—তেড়ে এল মুরারি।

'কে কার মাথা খায় দেখো।' নিমাইয়ের চোখে পরিহাসের ঝিলিক।

দুপুরে খেতে বসেছে মুরারি, কে দরজায় দাঁড়িয়ে মেঘগম্ভীরস্বরে ডাক দিল: 'মুরারি!'

দেখ তো কে। মুরারি ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠল।

ও মা! এ যে দেখি নিমাই। সর্বাঙ্গ ধূলিধূসর, দিগম্বর মূর্তি। পাঁচ বছরের দুধের শিশু, কণ্ঠে এ কি শাসনগম্ভীর সম্ভাষণ! ভঙ্গি যেন উদ্যত প্রহার।

'এ কি, তুমি এখানে কেন?' তিক্ত বিরক্তি মুরারির কণ্ঠে।

'আমি এখানে কেন? তোমার ভোজনের অন্ন নষ্ট করে দিতে এসেছি। দেখি কোন ব্রহ্ম তোমাকে রক্ষা করে।' বলে দিগম্বর শিশু থালা অশুচি করে দিল।

ধর ধর—ছুট দিল নিমাই। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'হাত-নাড়া মাথা-নাড়া ছাড়ো। ছাড়ো জ্ঞানকাণ্ড, ছাড়ো কূটতর্ক। জীবে আর ব্রহ্মে ভেদ করো, ধরো ভক্তির পথ, অনুগতির পথ। তরজা ছেড়ে ধরো নামকীর্তন।'

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল মুরারি। ছেলেটাকে ধরা গেল না।

জীবে-ব্রহ্মে ভেদ করো। ব্রহ্ম কারণ, জীব কার্য। ব্রহ্ম পূর্ণ জীব অংশ। ব্রহ্ম জ্ঞেয়, জীব জ্ঞাত। ব্রহ্ম প্রাপ্য, জীব প্রাপক। ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক। ভেদ নেই? কার্য-কারণের মধ্যে, পূর্ণ-অংশের মধ্যে, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার মধ্যে, প্রাপ্য-প্রাপকের মধ্যে, উপাস্য-উপাসকের মধ্যে নিঃসন্দেহ ভেদ আছে। তা ছাড়া

ব্রহ্ম অন্তর্যামী, সর্বহৃদয়ে তাঁর অধিষ্ঠান। যে বাস করে ও যেখানে বাস করে, অধিবাসী ও বাসস্থানও, ভিন্ন বস্তু। যে নিয়ন্ত্রিত তার থেকে যে নিয়ন্তা তার ভেদ স্পষ্ট। জীব নিয়ন্ত্রিত, ব্রহ্ম নিয়ন্তা।

কিন্তু বিচার করে দেখ, এ ভেদ আত্যন্তিক ভেদ নয়। এর মধ্যে আবার একটু অভেদের গন্ধ আছে। কারণই তো কার্যরূপে অভিব্যক্ত। পূর্ণরূপ বৃক্ষেরই তো অংশরূপ শাখা। শাখা কি বৃক্ষ থেকে একেবারে পৃথক? মৃৎপিণ্ড থেকেই তো মৃন্ময় ঘটের উদ্ভব। মৃৎপিণ্ড কারণ, ঘট কার্য। মৃৎপিণ্ড যেমন মৃত্তিকা, ঘটও তেমনি মৃত্তিকা। সুতরাং কারণে-কার্যে আবার অভেদ।

আরো একটু গভীরে যাও, আবার ভেদ পাবে। কারণ কখনো-কখনো কার্যের চেয়ে বেশি। কারণে রয়েছে কার্যাতিরিক্ততা। ঘট শুধু ঘটই, কিন্তু মৃৎপিণ্ডে ঘটও হয়, সরাও হয়। মৃৎপিণ্ড তাই ঘটের চেয়ে অতিরিক্ত। এই দিক থেকে আবার তাদের ভেদ। বৃক্ষের যে উপাদান শাখারও সেই উপাদান। কিন্তু শাখাই কিছু বৃক্ষ নয়, অথচ বৃক্ষ শাখারূপে থেকেও শাখার চেয়ে বেশি।

সুতরাং ভেদও আছে, অভেদও আছে। ভেদ থেকেও অভেদ, অভেদ থেকেও ভেদ। ব্রহ্ম আর জীবসত্তায় অভেদ, স্বাদে পৃথক।

আর সেই মহৎস্বাদের মহদুপায় ভক্তি। ভোজনের উপায় ভজন।

বিকেলবেলা জগন্নাথের ঘরে মুরারি এসে উপস্থিত। বললে, 'নিমাই কই?'

কি আবার নালিশ না জানি, জগন্নাথ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রখরকণ্ঠে ডাকলেন নিমাইকে। কি অপকীর্তির কথা শুনতে হবে কে জানে।

মায়ের আঁচলে মুখ আড়াল করে ধূর্ত শিশু সামনে এসে দাঁড়াল।

বলা-কওয়া নেই, নিমাইয়ের পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল মুরারি। এ কি অকল্যাণ! জগন্নাথ আর শচী একসঙ্গে হায়-হায় করে উঠলেন। তুমি এত বড় একটা জ্ঞানী পুরুষ, একটা অবোধ শিশুকে তুমি প্রণাম করলে? কি আছে ওতে নত হবার?

মুচকে মুচকে হাসতে লাগল নিমাই।

'নিমাই আমাকে আজ পরম হরীতকী জুটিয়ে দিয়েছে, পরম পথ্য, পরম রসায়ন।' গদগদ কণ্ঠে বললে মুরারি, 'সমস্ত ব্যথা আর ব্যাধি হরণ করে বলেই তো হরীতকী। সে হরীতকীর নাম ভক্তি, পরমপ্রেমময়ী তৃষ্ণা, ইষ্টে গাঢ় আবিষ্টতা। বুঝতে পারছি ব্রহ্মানন্দের চেয়েও ভগবৎ সাক্ষাৎকারের আনন্দ বেশি। আর সে আনন্দের জনয়িত্রী ভক্তি। মিশ্র, আপনার এ গৃহ গৃহ নয়, এ মন্দির—আর এর অধিষ্ঠাতা ব্রজবিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দন।'

শ্রীহরি যখন ধ্রুবকে দর্শন দিলেন, ধ্রুব বললে, 'তোমার এ সাক্ষাৎকারের কাছে কিসের ব্রহ্মানন্দ? নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ গোষ্পদ আর এ সবিশেষ স্বরূপ দর্শনের সুখ সমুদ্রের সমতুল।'

তোমাতে আমি তন্ময় হতে চাই না, তোমাকে আমি দেখতে-শুনতে ধরতে-ছুঁতে চাই। তোমাকে নিয়ে আসতে চাই আমার অনুভবের সীমার মধ্যে, সচেতন সাধনায় একটি সানন্দ-সুন্দর যথার্থ মূর্তির মধ্যে। আমার অল্পে সুখ নেই, অস্পষ্টে সুখ নেই, অগোচরে সুখ নেই। আমি চাই অনাবৃত দর্শন।

কিন্তু কতটুকু দেখব, কতক্ষণ দেখব?

'কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিখিল কৃষ্ণ, কি দেখিব মুঞি।
কৃষ্ণাবলোকন বিনা ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান॥'

তবু, হে অখিলরসামৃত মূর্তি, তুমি আমার চোখের সামনে দাঁড়াও, তোমার সুধাদৃষ্টি আমার সমস্ত হৃদয়কে পরিব্যাপ্ত করে দিক। যেখানে বিরহবর্তিকা নিয়ে আমি একলা জেগে আছি সেখানে তোমার সঙ্গে আমার মুখচন্দ্রিকা হোক।

৮

বল্লভাচার্যের মেয়ের নাম লক্ষ্মী। গঙ্গার ঘাটে মহাদেবের পূজা করতে এসেছে। নিমাইয়ের সঙ্গে দেখা। লক্ষ্মীকে দেখে নিমাইয়ের মন, কেন কে জানে, খুশি হয়ে উঠল। জেগে উঠল 'সাহজিক প্রীতি'। ইচ্ছে হল কথা কই। ও তো এ জন্মের নয়, আগের জন্মের। ও যে তত্ত্বতঃ লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরী।

নিমাই বললে, 'কাকে পুজো করতে এসেছ?'

'মহেশ্বরকে।' লজ্জামাখানো চোখ নত করল লক্ষ্মী।

'মহেশ্বর আবার কে? আমিই তো মহেশ্বর।'

গাঢ় চোখ তুলে তাকাল লক্ষ্মী।

'আমাকে পুজো করলেই তোমার বাঞ্ছিত বর পাবে।' নিমাই মনে করিয়ে দিল।

বাঞ্ছিত বর, সে আবার কি! লক্ষ্মী দ্বিধা করতে লাগল।

'বাঞ্ছিত বর মানে মনের মতন স্বামী। তুমি তো স্বামীর জন্যেই পুজো করছ। আমাকে পুজো করলেই তুমি সেই স্বামী পাবে।' হাসতে লাগল নিমাই: আমিই তোমার সেই অভীপ্সিত। তোমার সংকল্প তো আমি জানি, আমার অর্চনই তোমার সংকল্প।'

লক্ষ্মী আর দ্বিধা করল না। নিমাইয়ের পায়ে পুষ্পচন্দন দিল, গলায় দিল মল্লিকার মালা। যুগল পায়ে প্রণাম করল, করল আত্মসমর্পণ।

কাত্যায়নীব্রতধারিণী গোপিনীদেরও এই কথা বলেছিল শ্রীকৃষ্ণ। বলেছিল, লজ্জায় তোমরা না বললেও আমি জানি আমার অর্চনাই তোমাদের মনোগত বাসনা। তোমাদের সেই সংকল্প আমি অনুমোদন করি। তোমাদের সেই সংকল্প সিদ্ধ হবে। তোমাদের আমি কান্তারূপে অঙ্গীকার করব।

হেমন্তের প্রথম মাসে নন্দব্রজের কুমারীরা হবিষ্যান্ন খেয়ে কাত্যায়নীব্রত আরম্ভ করল। অরুণোদয়ে কালিন্দীর জলে স্নান করে নদীতটে বালুকাময়ী প্রতিকৃতি নির্মাণ করে গন্ধমাল্য নবপল্লব ফলমূল ও ধূপদীপ দিয়ে কাত্যায়নীর পূজা করে আর প্রার্থনা করে, হে মহামায়ে, হে মহাযোগিনি, হে সর্বেশ্বরি, নন্দগোপের পুত্রকে আমার পতি করে দাও। এই মহামায়া কুরুক্ষেত্রে ভদ্রকালী, ব্রজধামে কাত্যায়নী। কৃষ্ণে চিত্ত অর্পণ করে এমনি ভাবে এক মাস নিত্য পূজা সমাপন করল। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় যথারীতি যমুনার ঘাটে সমবেত হল কুমারীরা। যথারীতি তটে বসন রেখে কৃষ্ণের গুণগান করতে করতে আনন্দে জলক্রীড়া শুরু করল। ব্রত সাঙ্গ হয়েছে, সর্বফলদাতা কৃষ্ণ কুমারীদের ব্রতফল দেবার উদ্দেশ্যে সেখানে এসে উপস্থিত হল। নিমেষে গোপিনীদের বস্ত্র হরণ করে সমীপস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করল। বললে, 'সুমধ্যমে, ব্রতাচরণে তোমরা অত্যন্ত কৃশ হয়েছ, মিথ্যে বলছি না, স্বচ্ছন্দে উঠে এসো, যার-যার আপন বস্ত্র নিয়ে যাও।'

পরিহাস শুনে গোপিকারা প্রেমে বিহ্বল ও লজ্জিত হয়ে একে-অন্তের দিকে তাকাতে লাগল, শীতল জলে আকণ্ঠমগ্ন দেহ কাঁপতে লাগল থর-থর। বললে, 'হে কৃষ্ণ, তুমি নন্দগোপের পুত্র, তুমি অন্যায় কোরো না। তোমাকে আমরা ভালোবাসি। আমরা জানি তুমি ব্রজের মধ্যে ভদ্রোত্তম। দেখছ না আমরা শীতে কাঁপছি, আমাদের বস্ত্র প্রত্যর্পণ করো। হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী, তুমি আর যা কিছু বলো আমরা তাই করব। হে ধর্মজ্ঞ, আমাদের বস্ত্র ফিরিয়ে দাও। নয়তো বলে দেব রাজাকে।'

রাজা আমার কি করবে? কৃষ্ণ বিদ্রূপ করে উঠল। বললে, 'তোমাদের শেষ বন্ধন যে লজ্জা, যা তোমাদের শ্রেষ্ঠ রত্ন, তাই আমাকে সমর্পণ করো। এই আত্মনিবেদনের ফলেই তোমাদের কাত্যায়নীপূজা সিদ্ধ হবে।'

ব্রজনন্দিনীরা আর সঙ্কোচ করল না। নিঃশব্দে জল থেকে উঠে এসে বস্ত্র সংগ্রহ করল একে-একে।

বসন পরিধান করেও স্থান ত্যাগ করল না। প্রিয়সঙ্গমে পরম নির্বৃতি লাভ করে স্থির হয়ে রইল। কৃষ্ণ তাদের মনোগত ভাব বুঝতে পারল, বললে, 'তোমাদের সংকল্প সফল হবে। আগামিনী শারদ-যামিনীতে পূর্ণিমায় আমার সঙ্গে মিলিত হবে তোমরা। আমাতে যাদের চিত্ত আবিষ্ট, কামভোগের জন্যে তাদের আর কোনো কামনা হয় না; যেমন বীজ ভর্জিত হলে তার থেকে আর অঙ্কুরোদ্গমের চেষ্টা থাকে না। তোমরা কৃষ্ণগৃহীতচিত্তা, তোমরা লব্ধকামা, প্রশান্ত মনে এবার ফিরে যাও ব্রজালয়ে।'

ফিরে গেল ব্রজাঙ্গনারা।

'দাদা, বাড়ি চলো, মা ভাত নিয়ে বসে আছে।' অদ্বৈত-আশ্রমের দরজায় এসে ডাক দিল নিমাই।

সারাক্ষণ শাস্ত্রপাঠ নিয়ে ব্যস্ত বিশ্বরূপ, ভাইকে বিশেষ দেখতে-শুনতে পায় না! তাছাড়া এখন অদ্বৈতের সঙ্গে মিলে বাড়ি আসাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ তার অদ্বৈতের সঙ্গে ভগবানকে নিয়ে কথা, ভগবানে অনপায়িনী ভক্তি নিয়ে। চার দিকে হাটে-ঘাটে শুধু তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে আলোচনা, জ্ঞান আর মায়াবাদ নিয়ে বোঝাপড়া। হাঁপিয়ে উঠেছে বিশ্বরূপ। অদ্বৈতসভায় এসে শীতল-শ্যামলের দেখা পেয়েছে। অদ্বৈতসভায় শুধু ভক্তির কথা।

ভক্তিই রসের সার। ভক্তিতেই শুধু আনন্দ-চমৎকারিতা। প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠা।

এই ভক্তির কথা পেলে খাওয়া-দাওয়া ভুলে যায় বিশ্বরূপ।

'দাদা, মা ডাকতে পাঠিয়েছেন। বাড়ি যাবে না? তোমার খিদে পায়নি?'

এ কে এসে দাঁড়াল দরজায়? অদ্বৈত চমকে তাকাল নিমাইয়ের দিকে। এ কে? এত রূপ কি মানুষের হয়? 'প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা। কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা'। সহসা আমার সমস্ত চিত্ত হরণ করে নিল কে এ মনোহর?

'বা, এ আমার ছোট ভাই নিমাই। দুরন্তের শিরোমণি।'

দুরন্তের শিরোমণি। সে কি? সমস্ত ভক্তবৃন্দের সমাধির দশা কেন? এতক্ষণ সকলে কৃষ্ণকথা বলছিলাম এখন আর সে কথা মুখে আসছে না কেন? তবে যিনি সমস্ত কথার অতীত, যাকে নিয়ে এত কথা, তিনিই কি সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন?

'প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়।' অদ্বৈত ঘোষণা করে উঠল। বৈষ্ণবভক্তদের বললে, 'যাও নির্ণয় করো, এ বালক কোন বস্তু। এ কোন রসিক-শেখর! কোন পরমদৈবত!'

নিমাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে চলেছে বিশ্বরূপ। নিমাই অন্যমনে কাপড় চিবোচ্ছে।

'ছি, কাপড় চিবোচ্ছ কেন?' বিশ্বরূপ তিরস্কার করল।

'কাপড় চিবোলে কি হয় দাদা?'

'ঠাকুর রাগ করেন।'

'কে ঠাকুর দাদা?'

বিশ্বরূপ এক পলক থমকে দাঁড়াল। কি জানি কে ঠাকুর? একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নিমাইয়ের দিকে।

কথা পালটাল। বললে, 'তুই এত দুষ্টু কেন বলতে পারিস? কেন তোর এত সব অমানুষের কর্ম?'

'অমানুষের কর্ম?' হেসে উঠল নিমাই।

বিশ্বরূপ আবার চমকাল। অমর্ত বলেই বোধ হয় কাণ্ডও অলৌকিক। ভাবল, এ শিশু-শরীরে কৃষ্ণই বুঝি খেলা করছে। তাই বুঝি এই গোপাললীলা। চৈতন্য চাপল্য।

বাড়ি ফিরে এসে ডাক দিল মাকে।

'মা, দাদাকে নিয়ে এসেছি ধরে। এবার খেতে দাও একসঙ্গে। দাদা খায়নি বলে আমিও খাইনি।'

[ ক্রমশঃ।

## রুশ দেশের বিলাস-সামগ্রী

বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হচ্ছে, প্রসাধন ও বিলাস-সামগ্রীর উৎপাদন বেড়ে চলেছে সম্ভবতঃ সেই অনুপাতেই। অন্য দেশের ক্ষেত্রে কথাটি যেমনই হোক, রুশিয়ার ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য। সম্প্রতিকালে সেখানে বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন কি পরিমাণ বেড়েছে, তার একটি নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া গেছে এর ভেতর। হিসাবটি প্রকাশিত হয়েছে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কমিশনের একটি বুলেটিনে। এই হিসাব অনুসারেই সোভিয়েট ইউনিয়নে টেলিভিশন সেট, ওয়াশিং (প্রক্ষালন) মেশিন—এ সকল মনোহারী জিনিসের উৎপাদন বাড়ছে খুবই দ্রুত। যেমন ১৯৫৮ সালের প্রথমার্ধে শিল্প-সমৃদ্ধ এই দেশটিতে ওয়াশিং মেশিন নির্মিত হয় ২৫০,০০০টি। কিন্তু সেই স্থলে পূর্ববর্তী গোটা বছরে (১৯৫৭) ৩৩৭,০০০টি যন্ত্র উৎপাদিত হয়েছিল। ১৯৫৮ সালের প্রথম ছয় মাসে যেখানে সেলাই কল (সিউইং মেশিন) তৈরী হয় ১৩ লক্ষ। অথচ আলোচ্য হিসাবেই দেখা যায়—১৯৫৫ সালে একই সংখ্যক এই মেশিন নির্মাণ করতে সময় প্রয়োজন হয়েছিল পুরো ১২টি মাস। বিগত বর্ষের (১৯৫৮) প্রথমার্ধে ৫ লক্ষ টেলিভিশন সেট ও ২০ লক্ষ রেডিও রিসিভার (বেতার যন্ত্র) নির্মিত হয়েছে এই রুশদেশেই। ১৯৫৭ সাল অপেক্ষা এই বছরটিতে (১৯৫৮) টেলিভিশন সেট ও রেডিও নির্মাণের হার বেড়েছে শতকরা যথাক্রমে ৩৭ ভাগ ও ১২ ভাগ—উক্ত হিসাবে এ-ও পরিদৃষ্ট হয়।
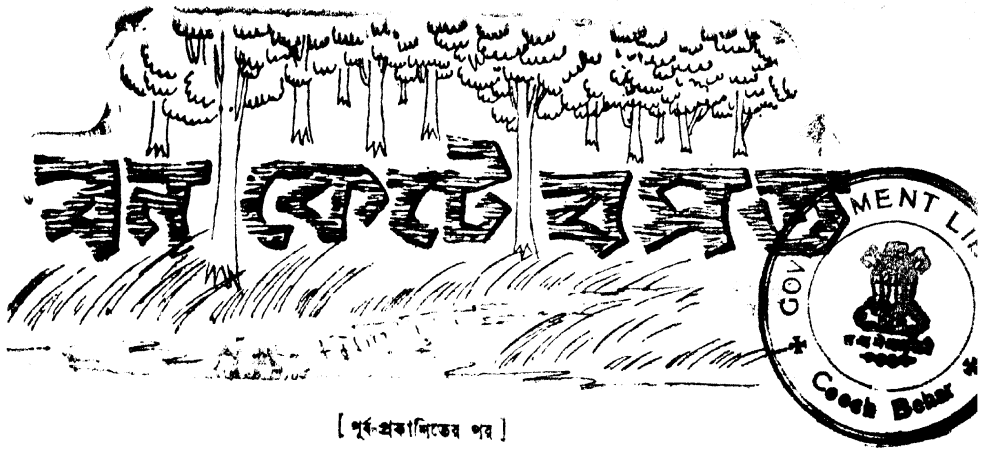
[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

মনোজ বসু

এত বিনয়-বচন জগন্নাথের সহ্য হয় না। অধৈর্য হয়ে সে বলে, থামাই-পানাই ছাড়ো বড়দা। কথায় চিঁড়ে ভেজে না। দল আছে বই কি। ওদের দল, আমাদের দল—দল দুটোই। চলো—চলে এসো। জাল যখন মনিবের হুকুম ছাড়া দিতে পারবে না, এখানে বসে থেকে মুনাফা নেই।

গগনের হাত ধরে একরকম জোর করে টেনে আলা থেকে বেরিয়ে পড়ল। অনিরুদ্ধ তখন সকলকে ডেকে বলে, কড়া নজর রাখতে হবে আলায়। সড়কিগুলো নতুন হাঁড়িতে ঘষে ধার দিয়ে রাখো। জগার ভাবভঙ্গি ভাল না। হয়তো বা আগুনই দিয়ে গেল চুপিসাড়ে এসে। আমি বাপু একপাও আর আলা ছেড়ে নড়ছি না। ঘেরির পাহারা কমজোরি হয় হোক, জন আষ্টেক তোমরা সর্বক্ষণ আলা ঘিরে চক্কোর দিয়ে বেড়াবে। কালোসোনা তুই সদরে রওনা হয়ে পড়। নৌকোর অপেক্ষায় বসে থাকিসনে, নতুন রাস্তার পথে হেঁটে চলে যা। ভিটের পাশের অশ্বত্থগাছ আর বাড়তে দেওয়া যায় না। বলবি সেই কথা ছোটবাবুকে। সময় থাকতে উপড়ে ফেলুন, নয় তো শিকড় বসিয়ে আমাদেরই উৎখাত করবে একদিন।

## চার

কালোসোনা সদরে চলে গেছে। আর এদিকে সেই রাত্রেই অনিরুদ্ধ আর পাহারার সেই আট জন লোক হন্তদন্ত হয়ে গগনের আলায় এসে হাজির। অন্ধকার। গগন কেরোসিনের বাজে খরচ করে না। আলো জ্বলবে শেষরাত্রির দিকে আবার কাজকর্ম শুরু হবে যখন। আপাতত অন্ধকারের ভিতর সমারোহে গীতবাদ্য চলছে। জগার গলাটাই জোরদার—চপাচপ ঢোলের সঙ্গত হচ্ছে, বাদ্য ছাড়িয়ে অনেক উপরে তার গলা। আলাঘরের বেড়া মাত্র এক দিকে। আগে একটা কৌতূহল ছিল, জঙ্গলের একেবারে কিনারে এমন নিঃশঙ্ক ভাবে কি করে থাকে এরা? গান শুনে লহমার মধ্যে প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল। এ হেন তানকর্তবের পরে জঙ্গলের কোন জানোয়ার গাঙ পার হয়ে আসতে ভরসা পাবে না। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলে মানুষই কানে নিতে পারে কেবল। গায়ক-বাদক ছাড়াও অন্ধকারে বহু লোক শুয়ে-বসে গীতরসে মজে আছে। রসাবেশে ঘুমিয়েও পড়েছে কেউ কেউ। গীতবাদ্যের ক্ষণেক বিরতি হল তো নাসাগর্জন কানে আসবে অমনি।

অনেকগুলো মানুষ বাঁধ থেকে নেমে উঠোনের দিকে আসছে। গগন তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাঁক দিয়ে ওঠে, কারা?

অনিরুদ্ধ বলে, আমরা বড়দা। রাধেশ্যাম তো ওমুখো হল না। জাল দিতে এলাম।

গান-বাজনা বন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। জগা বলে, সে কি কথা? জাল কাঁধে নিজে চলে এলে অনিরুদ্ধ—বলি অত বড় চৌধুরিগঞ্জ, তার একটা মানমর্যাদা নেই?

একটা ঢোক গিলে অনিরুদ্ধ পরিহাসটা পরিপাক করে নেয়। বলে, এক দিনের ক্ষতি-লোকসান হয়ে গেল। আবার একটা দিন পড়ে থাকলে গরিব মানুষ মারা পড়বে।

হর ঘড়ুই ও অন্য ব্যাপারিরা ভিতরের কথা জানে না। গদগদ হয়ে হর তারিপ করে: ভাল, ভাল। আজকেই হয়তো বউ-ছেলেপুলে নিয়ে উপোস দিচ্ছে হতভাগা! গরিবের দুঃখ ক'জনে বোঝে অনিরুদ্ধ? তুমি ভাল লোক।

জগা বিদ্রূপের কণ্ঠে বলে, সে কি, ছোট বাবুর হুকুম এসে গেল কলকাতা থেকে? একটা বেলার ভিতরে এলো কেমন করে?

হাতি পাঁকে পড়লে ব্যাঙে চাটি মারবে তাতে নূতনত্ব নেই। অনিরুদ্ধ গায়ে মাখে না। বলে, বিষম মুশকিলে পড়লাম বড়দা, আমাদের নৌকোটা পাওয়া যাচ্ছে না। আগে অত ঠাহর করে দেখিনি, জানি ঠিকই আছে। নয় তো ঘেরির মাছ ধরা বন্ধ করে দিতাম। যাবতীয় মাছ ডাঙার উপর তুলে ঢেলে-বেছে ঝোড়া ভরতি করে যখন নৌকোয় তুলতে যাচ্ছে, দেখা গেল ঘাটে নৌকো নেই।

গগন আশ্চর্য হয়ে বলে, বলো কি? ছয় দাঁড়ের সেই নৌকোখানা তো! ঘাটে নেই তবে গেল কোথায়?

তাই যদি জানব, তোমার এখানে আসতে গেলাম কেন বড়দা? যেমন বরাবর থাকে, শক্ত খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা—

হঠাৎ জগার গর্জনে থতমত খেয়ে অনিরুদ্ধ চুপ করে গেল। জগা বলে, তোমার নৌকোর খবর তুমি জানবে না—আমাদের কাছে জানতে এসেছ। কোনটা বলতে চাও শুনি—সরিয়েছি আমরা?

অনিরুদ্ধ বলে, রাগ করো কেন, আমি কি বলেছি তাই? যে জিনিষ চাক্ষুষ দেখা নেই, তেমন ছেঁড়া কথা অনিরুদ্ধর মুখে বেরোয় না। বলছিলাম যে নানান জায়গায় ঘোরাফেরা তোমাদের, বলাই ঘোরে, হর ব্যাপারি ঘোরেন—বলছিলাম, যদি ওঁদের কারো নজরে পড়ে গিয়ে থাকে—

জগন্নাথ সটান জবাব দেয়: নজরে পড়েনি। তুমি যাও।

কিন্তু এক কথায় চলে যাবার জন্ত এই রাত্রে নিজে জাল ঘাড়ে করে আসে নি। গগনকে উদ্দেশ করে কাতর হয়ে সে বলে, মবলগ টাকার মাছ বড়দা। পচে গলে বরবাদ হবে! বারো হ্যাঁচড়ার কাণ্ডকারখানা—পুটপুট্ট করে ঠিক গিয়ে বাবুদের কানে পৌঁছে দিয়ে আসবে। মোটা ফাইন সঙ্গে সঙ্গে।

খপ করে গগনের হাত জড়িয়ে ধরে: একেবারে শিরে-সংক্রান্তি। দেরির উপায় থাকলে, অন্ত কারো ডেড়ি থেকে চেয়েচিন্তে যা-হোক উপায় করা যেত। দিনমান হলে দূরন্তরে লোক পাঠিয়ে নৌকো ভাড়া করে আনতাম।

এরই মধ্যে চতুর্দিকে মুখ ঘুরিয়ে গলা তুলে একবার বলে নেয়, অন্ধকারে ঠাহর করতে পারছি নে—ভাল মানুষের ছেলে রয়েছেন দেখা অনেকে—পা তুলে একটু আপনারা খোঁজ-খবর করে দেন যদি। এতগুলো ধারালো চোখ—কারো না কারো নজরে আসবে।

গগন সরল ভাবে বলে, তোমরাও তো রয়েছ অনেকে, তোমাদের নজরে পড়ল না। বানে ভেসে গেছে, হয়তো বা মুলুকের মধ্যেই নেই।

অনিরুদ্ধ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, ভেসে যাবার জো ছিল না বড়দা। ভেসেও যায় নি, তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি। ডাঙার খুঁটোর সঙ্গে কাছি করা। খালের মধ্যে বলাকোপ—কোপের ভিতর নৌকো ঢুকিয়ে রাখা হয়। ঝড়-ঝাপটা যাতে না লাগে। দেখলাম, খুঁটো যেমন-কে-তেমন রয়েছে—

গগন বলে, বাঁধন তবে আলগা ছিল। কাছি কেমন করে খুলে গেছে।

আমিই বেঁধেছিলাম নিজের হাতে। অন্ত কেউ হলে না হয় তাই ভাবতাম। খুলে যায়নি বড়দা, কেউ খুলে দিয়েছে।

জগা হি-হি করে হেসে ওঠে: তাই নাকি? আহা, কাকে মতিচ্ছন্নে ধরলে গো? কোটালের টান—তবে তো কাঁহা-কাঁহা মুলুক চলে গেছে তোমার নৌকো। কিম্বা দহে পড়ে ডুবেছে। বাণীতলায় সিন্নি মানত করো—তিনি যদি জুটিয়েপুটিয়ে দিয়ে যান।

কিঞ্চিৎ আশান্বিত হয়ে অনিরুদ্ধ বলে, সিন্নি পাঁচ সিকে। মানত-টানত কি—নগদ ফেলে দেবো। এখানেই দিয়ে যেতে পারি মা-কালী যদি ঘাটের নৌকো ঘাটে হাজির করে দেন। কিম্বা কোনখানে আছে সুলুক সন্ধান দিয়ে দেন একটা—

বলে জবাবের প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়ে থাকে। ওদিকে চুপচাপ। শলাপরামর্শ হচ্ছে অথবা কি করছে, অন্ধকারের ভিতর বোঝা যায় না কিছু। অবশেষে অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে, ও জগন্নাথ, শুনতে পেলে? আর দেরি হলে কুলতলায় গাড়ি ধরা যাবে না। ওঠো। নিদেনপক্ষে মুখে বলে দাও একটা-কিছু—

ওলগো আমার দাদা, জলে যেতে করি বাধা
এমন অবাধ্য রাধা তবু জলে যায়।
কুল-মজানি রাজার মেয়ে, দাদা তুমি করলে বিয়ে
ভাগনের বাসা কদমতলায় জাতি রাখা দায়।

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঢোল-বাস্ত। আর কত্তাল খচাখচ আওয়াজে। অনিরুদ্ধরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। উত্তাল আনন্দে গান চলেছে। আপাতত থামবার লক্ষণ নেই। মাথায় আগুন জ্বলছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শোনার সময় কোথা? হন্তদন্ত হয়ে অনিরুদ্ধ বেরিয়ে পড়ল।

## পাঁচ

সমস্ত রাত্রি চৌধুরিগঞ্জে কেউ ঘুমোয়নি। জোড়া জোড়া মাছ—অত টাকার মাল—চোখের সামনে পচে যাচ্ছে, কোন-কিছু করবার নেই নিজেদের হাত কামড়ানো ছাড়া। এ বনরাজ্যে ভাড়ার নৌকো হুকুম মাত্রেই মেলে না—কুমিরমারি অথবা আরও আগে চলে যেতে হবে। সময় বিশেষে সেই কুলতলা অবধি। গোলপাতা কিম্বা কাঠ কাটতে অথবা চাক ভাঙতে যারা আসে তাদের ভারি ভারি নৌকো। সে সব নৌকো ভাড়ার নয়।

অনিরুদ্ধ অস্থির হয়ে বেড়িয়েছে—খাল ও গাঙের ধারে ঘুরেছে বারবার। গাছপালা জলের উপরে ঝুঁকে পড়েছে, চোখের ভুলে কি রকমটা মনে হয়েছে, ছুটে গিয়েছে সেই দিকে। নৌকো ভাসতে ভাসতে হয়তো বা জঙ্গলে এসে আটকে আছে। অথবা রহস্যজনক উপায়ে এসে পৌঁচেছে। এত কান্নাকাটি করে বলে এলো—মনে মনে করুণা হতে পারে ওদের। অকারণ ছুটোছুটি করেছে, আশাভঙ্গ হয়েছে বারবার, ছোটবাবুর কানে উঠলে কি কাণ্ড হবে সেই শঙ্কায় কেঁপেছে, শাপশাপান্ত করলে গগন আর তার দলবলের সাতগুষ্টি ধরে। সারা রাত্রি কেটে গিয়েছে এমনি। সকালবেলা দেখা গেল, বাগদি-বুনো যারা এখানে ওখানে বসবাস করেছে একে একে ঘুরে এসে দাঁড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে দিব্যি এক জনতা হয়ে দাঁড়াল।

রাত-জাগা রাঙা চক্ষু মেলে অনিরুদ্ধ হাঁক দেয়, কি, কি চাই তোমাদের? মজা দেখতে এসেছ?

সবে এই ভোরবেলা। রাতের ভিতরেই কেমনে রটনা হয়ে গেছে, চৌধুরিদের যেরির নৌকো সরিয়ে নিয়েছে। অঢেল মাছ পড়ে আছে উঠানের উপর। মজা দেখতে আসেনি কেউ। এত মাছ পচিয়ে নষ্ট না করে বিলিয়ে দেবে নিশ্চয়! সামনে গিয়ে পড়লে খাবার মাছ নির্ঘাৎ মিলে যাবে, গাঙে-খালে ধরতে যেতে হবে না। সেই মতলবে এসেছে সব।

অনিরুদ্ধ চেঁচিয়ে ওঠে, চলে যাও বলছি। মানুষে শয়তানি করল তো কোন মানুষের ভোগে যাবে না এর একটা মাছ। কাক-চিলের মুখে দেবো। গাঙের জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসবো। মুখে বলল তাই শুধু নয়। রাগের বশে সত্যিই গাঙে ঢেলে দিয়ে এলো জোড়া জোড়া মাছ। নিজেদের আলায় এতগুলো মানুষের জন্ত দুটো পাঁচটা রেখে দেবে, তা-ও প্রবৃত্তিতে এলো না। দুপুরবেলা খেতে বসে শুধু ভাত—নুন আর তেঁতুল মেখে জল ঢেলে কোন গতিকে গলাধঃকরণ করল। রোজ রোজ এত ক্ষতি সইবে না। ভাড়ার নৌকো ঘাটে নি

শে তবে এর পরে ঘেরির জলে জাল নামাবে। একটা দিনেই বিস্তর রবাদ, বেশি দিন ব্যাপারটা না চলে। অন্যের উপর ভরসা না করে নিরুদ্ধ নিজেই ছুটল তিন মরদ সঙ্গে নিয়ে। প্রহরখানেক রাতের ধ্যে আজকেই নৌকো সহ ফিরবে, যত ভাড়া লাগে লাগুক। সে আর ঐ তিন মরদ মোট চার জনে ভাড়ায় নৌকো তীরবেগে নিয়ে আসবে।

যে যে-দিকের কথা বলছে, সেইখানে চলে গিয়েছে। সন্ধ্যার পর অনিরুদ্ধ হতাশ হয়ে ফিরে গেল। সঙ্গের তিন জন চলে গেছে আরও এগিয়ে। নৌকো জোগাড় করে তবে তারা ফিরবে। অনিরুদ্ধর উপর চৌধুরিগঞ্জের ভার। তার পক্ষে বেশিদূর যাওয়া চলে না। রাত্রিবেলা আলায় তাকে থাকতেই হবে। বিশেষ করে, হালে যেরকম গতিক দাঁড়িয়েছে। নৌকো সরিয়ে দিয়েছে, আরও ওদের কি সব মতলব আছে কে জানে।

আলায় এসে সোয়াস্তি হল। কনেষ্টবল এসে গেছে ইতিমধ্যে। দু-জন। ছোটবাবু ব্যবস্থা করেছেন থানাওয়ালাদের সঙ্গে কথাবার্তা লে। তারা এসেই হাঁকডাক করে সিদে সাজিয়ে নিয়েছে। ঘি আর কোথায় মিলবে? বুনো পাড়ায় লোক পাঠিয়েছিল দুধের জন্য। সন্ধ্যাবেলা দুধও জোটানো গেল না। সকালে ঘোষ দুয়ে তারা দুধ পাঠিয়ে দেবে। অগত্যা ডাল আনিয়ে নিল বরাপোতা লোক পাঠিয়ে। রানা শ্রী আপাতত দামটা দিয়েছে, অনিরুদ্ধ এসে পড়লে তার থেকে নিয়ে নেবে। আর এদিকে মাছের তাগিদ দিচ্ছে কনেষ্টবলরা—মছলি ধরেছে এই তল্লাটে আসার পর; মছলি বিহনে এখন মন রোচে না। হুকুম করছে আলার ঐ খাসপুকুরে জাল নামিয়ে দিতে। বাবুদের জন্য জিয়ানো মাছ—আলার মানুষ টালবাহানা করে—অনিরুদ্ধ আসুক, সে এসে যেমন বলে সেই রকম হবে, দায়িত্বটা তার উপের পড়ুক। অনিরুদ্ধ এসে সকলকে এই মারে তো এই মারে। সরকারি মানুষের ভোগে লাগবে না তো বাবুরা পুকুর কেটে মাছ ছেড়ে রেখেছেন কি জন্য? করেছিস কি এতক্ষণ ধরে উজবুকগুলা? এখন মাছ ধরবি, সেই মাছ কোটা-বাছা হবে। রান্না চাপবে, তারপরে তো খাওয়া-দাওয়া। কি হবে বলুন হুজুররা? রাতটা কি ডালের উপর চলবে, সকালবেলা ঘেরির হোক পুকুরের হোক মাছে মাছে ছয়লাপ হয়ে যাবে।

হুজুররা ঘাড় নাড়েন। ধুলকুরি ব্যাপারে একদম আস্থা নেই। রাত তা কি হয়েছে? রাত জাগতেই তো আসা। রাঁধাবাড়ায় না হয় রাতটুকু কেটে যাবে।

রাঙা রঙের মোটা চাল, সে বড় হাঁড়িতে চাপাবার পূর্বে জলে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিতে হয়। নয়তো সিদ্ধ হবে না। রান্না সমাধা হতে দেরি হবে বলে সেই ভিজা চালগুলো গুড় সহযোগে কড়মড় করে চিবিয়ে আপাতত ক্ষুধা-শান্তি হল। পরের কিস্তিতে চাল সিদ্ধ করে নিয়ে পাঁচটা তরকারির সঙ্গে মউজ করে হবে। খাস পুকুরে জাল নামাতেই হল ঐ রাত্রে। মন ভাল নয়। কত টাকার মাল পচে বরবাদ হল দিন মানে আলার উপর এই আবার এখনই ভোজ, জমানোর স্ফূর্তি আসে না। কিন্তু সরকারি লোকে তা শুনতে যাবে কেন? মাছ ধরে রান্নাবান্না শেষ হতে আড়াই প্রহর। গুরু ভোজন অন্তে বন্দুক ঘাড়ে বেঁধে টহল দেবার তাগদ কোথায়? টহল না দিয়ে ঐ বন্দুক শিয়রে রেখে পড়ে পড়ে যদি ঘুমোয়, তাতেও ক্ষতি নেই অবশ্য। চারিদিকে চাউর হয়েছে, চৌধুরিগঞ্জে কনেষ্টবল মোতায়েন হয়েছে। মাছিটিও উড়ে আসবে না আর এ দিগরে।

পরের দিন কাটল। অনিরুদ্ধ আলা ছেড়ে নড়তে পারে না, কনেষ্টবলদ্বয়ের খেদমতেই চৌপহর কেটে গেছে। সেই তিন জন আজও ফিরল না—তার মানে, নৌকো সংগ্রহ হয়নি আজও। নৌকোয় চেপে ফিরবে তারা। ঘেরিতে জাল নামানো হয়নি, আরও একটা দিন বিনা কাজে কাটল। প্রচুর লোকসান। তার পরের দিনও ঠিক এমনি। তিনদিনের ভিতর একটা নৌকো জোটানো যায় না। এ ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। সারাদিন সমস্তগুলো মানুষের পথ তাকিয়ে কেটেছে। সন্ধ্যার সময় দেখা যায়নি, সুদাম আসছে বাঁধের উপর দিয়ে। তিনজনকে ছেড়ে এসেছিল, তাদের একটি। অনিরুদ্ধ ছুটে চলে যায় ততদূর অবধি।—

কী কাণ্ড! মোটে ফিরিস নে তোরা। আমি ভাবছি, কুমিরে খেয়ে ফেলল তোদের, না দেশের সমস্ত নৌকো পুড়েজ্বলে গেল একেবারে?

গতিক তাই বটে! এ-ঘাটে ও-ঘাটে, এ-বন্দরে ও-বন্দরে খোঁজাখুঁজি করতে করতে শেষটা শহর ফুলতলা। ফুলতলায় চৌধুরি বাবুদের বাড়ি। তাঁরা আটকে রাখলেন: ভাড়া নৌকোয় ভাল কাজ হবে না, নৌকো ভাড়া করে চৌধুরিগঞ্জের কাজ-কারবার চালানো অপমানের কথাও বটে। অন্য কোন ঘেরির জন্য নতুন নৌকোয় আলকাতরা মাখাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি কোন গতিকে একটা পোঁচ সেরে সেই নৌকো দিয়ে দিলেন ছোটবাবু। আর দেখগে, সেই নৌকোর গায়ে কাছি নয়, লোহার শিকল। তাতে মস্ত বড় বিলাতি তালা। গাছের সঙ্গে শিকল জড়িয়ে তালা আঁটবে, গাছ না কেটে নৌকো খুলে নিয়ে যেতে পারবে না কেউ। পইপই করে ছোটবাবু বলে দিলেন, খোঁটার সঙ্গে নৌকো বাঁধা আর নয়—মোটা রকমের গাছ দেখে নিয়ে সেই গাছের গুঁড়ির সঙ্গে।

অনিরুদ্ধ চেঁচিয়ে তোলপাড় করে: ওরে, কোথায় গেলি সব? জাল নামিয়ে দে এক্ষুনি। নৌকো এসে গেছে। তিন দিন হাত কোলে করে বসে আছিস। শালতিগুলো কোথায়, টেনে আলার নিচে নিয়ে আয়।

সুদামকে বলে, ওরা দু-জন নৌকোয় আছে বুঝি? তা ভাল। কোন্ দিকে রেখে এলি নৌকো?

সুদাম বলে, বাঁধের পাশে ঐখানটা লগি মেরে বসে আছে। ঘাটে নিয়ে যাবে কিনা, জানতে এসেছি।

অনিরুদ্ধ বলে, কী হাঁদার মতন বলিস! ঘাটে নয় তো ঐ ফাঁকায় মধ্যে চৌপহর চাপান দিয়ে থাকবে?

সেই তো বার্তা নিতে এলাম। চুরি হয়ে গেল কিনা ঘাট থেকে। এবারে কিছু হলে মুণ্ডু কেটে নেবে, বলে দিয়েছে ছোটবাবু।

সন্ধ্যে থেকে একজন কেউ নৌকোয় শুয়ে থাকবে। শুনে নাও তোমরা সকলে। ধর্মের ভরসায় আর নয়। আর ছোট বাবু যেমনটা বলেছেন, ঘাটের উপর কেওড়াগাছ—তার সঙ্গে শিকল জড়িয়ে তালা এঁটে দেবে। কোন্ হারামজাদা কি করতে পারে এবার, দেখা যাক।

সঙ্গে সঙ্গে গলা খাটো করে বলে, ছোট বাবু আর কি বললেন সুদাম ?

সুদাম বলে, রাত্তির বেলা তুমি তো মাছের নৌকোয় যাচ্ছ চলে। জোর তলব। কালোসোনাকে দিয়ে হুকুম তো আগেই পাঠিয়েছেন। সে কিছু বলে নি ?

বলবে না কেন ? কিন্তু তুই আর কি শুনে এলি, তাই বল্। মতলবটা কি—আমার কোন্ দোষ-ঘাট ? চোরে চুরি করে নিয়ে গেল, আমরা তার কি করব ? তলব পাঠায় তবে কি জন্যে ?

কথা বলতে বলতে সুদামের সঙ্গে অনিরুদ্ধ ঘাট অবধি চলে গেল। কোন্ গাছে শিকল জড়াবে, সেটা পছন্দ করে দেওয়ার জন্য। ঘাটে গিয়ে দেখে—কী আশ্চর্য—হারানো নৌকোটাই গোলঝাড়ের আবছা আঁধারে এগোচ্ছে-পিছোচ্ছে, মাথা দোলাচ্ছে স্রোতের সঙ্গে। এবং কাছি-করা রয়েছে ডাঙার সেই খোঁটার সঙ্গেই। ফিরে এসেছে নৌকো। মানুষ হলে বলা যেত, পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, যেমন-কে-তেমন ফেরত রেখে গেছে। কিন্তু গগনের আলায় গিয়ে এত যে কান্নাকাটি করে এলো—সেই দিন ফিরলে ফুলতলা অবধি এমন জানাজানি হত না।

## ছয়

বিনোদিনী ভাবনায় পড়েছে। ধান তো আউড়ির তলায় এসে ঠেকল। ক্ষেতেরা নতুন ধান দিয়ে যাচ্ছে না। উপায় কি হবে ? মেয়েমানুষ—চাষীপাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়তেও পারে না। একদিন দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল ঊর্ধ্ব মোড়লের সঙ্গে। ঐ পথের উপরেই করকর করে ওঠে : কেমন আক্কেল তোমাদের মোড়ল ? তোমাদের দশজনের উপর ভরসা করে সে-মানুষ বিদেশ বেরুল। ফুটো মেয়েলোক ভিটের উপর পড়ে আছি, তোমরাই দায়েবেদায়ে দেখাশুনো করবে। সে পড়ে মরুক, হকের পাওনা নিয়েই টালবাহানা।

ঊর্ধ্ব বলে, অজম্মার বছর। সময়ে জল হল না, খরার টানে ধান শুকিয়ে চিটে। দি কোত্থেকে মা ?

কিন্তু পেট তা বলে তো মানে না। দশের বিচারে গেলে তারাও মানবে না। জুলো-বন্দোবস্ত নিয়েছ—যেবারে বেশি ফলন, সেবারে কি এক মুঠো ধান বেশি দিয়ে থাক ?

সে তো সত্যি। দেখি, ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। ষোল আনা না হোক, কতক তো দিতেই হবে।

এমনি সব বলে ঊর্ধ্ব সরে পড়ে সামনে থেকে। বিনোদিনী জানে, পারতপক্ষে আর দেখা দেবে না। নগেনশশীও যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছে। অনেক দিন তার দেখা নেই।

ভাইয়ের তল্লাসে বাপের বাড়ি গেল সে একদিন। বলে, সে মানুষ কোন মুলুকে গিয়ে পড়ে রইল, একখানা চিঠি লিখে খোঁজ নেয় না। তুমিও মেজদা ওপথ মাড়াও না, একেবারে ভুলে বসে আছ।

নগেনশশীর কণ্ঠ গদগদ হয়ে উঠে : মায়ের পেটের বোন, বত্রিশ নাক নাড়ির বাঁধন। ভোলা বুঝি চাট্টিখানি কথা ! কিন্তু কি করা যাবে, যা ননদ তোর, মারমুখি হয়ে পড়ে, অকথা-কুকথা শানায়।

একটুখানি চুপ করে থেকে বলে, বলেছে কি জানিস ? ইট মেরে আমার ডান-পাখানাও জখম করে দেবে। এর পরে কোন সাহসে যাওয়া যায় বল।

হেসে উঠে বিনোদিনী সমস্ত ব্যাপার লঘু করে দিতে চায় : হ্যাঃ, পা ভেঙে দেবে ! ঠাট্টার সম্পর্ক—ঠাট্টা করে কি বলল, অমনি তুমি ভয় পেয়ে গেলে।

ভয় পেতেই হয়। অতি নচ্ছার মেয়েমানুষ। ইট না মারুক, বদনাম রটিয়ে দিতে কতক্ষণ। দশে আমায় মানে গণে, তাই সামাল হয়ে চলতে হয়।

তার পরে বলে, তা নাই বা গেলাম। দরকারটা কি শুনি ? বেটারা ধান দিচ্ছে না, এই তো ? আমি বলে দিয়েছি। আবার বলব। মাতব্বর ক'টাকে ডাকিয়ে এনে আচ্ছা করে কড়কে দেবো একদিন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বিনি, তোদেরই বা এত হাঙ্গামা পোহাবার দরকারটা কি ? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় কেন, বুঝতে পারিনে। সোজা চলে আয় আমাদের বাড়ি। আগে বলেছি, এখন আবার বলি। যদি ভাবিস, আমাদের ভাত কেন খেতে যাবি। কিন্তু ভাত আমাদের হল কিসে ? তোদেরই ধান-চাল ভেনেকুটে আমাদের বাড়ির উপর বসে খাবি। ওখানে থাকলে বর্গাদারেও বুঝবে, পিছনে লোকবল আছে। নিজেরা কাঁধে বয়ে পাওনা ধান শোধ করে দিয়ে যাবে। তাই বুঝিয়ে বলগে তোর ননদকে। ফুটো সোমত্ত মেয়েমানুষ আলাদা পড়ে থাকিস, লোকেও সেটা ভাল দেখে না।

বাড়ি ফিরে বিনোদিনী সেই কথা বলে। চারু ফেড়ে ফেলে দেয় : ভাইর বোন ভাগ্যবতী তুমি চলে যাও ওখানে। আমি কোন সুবাদে যেতে যাব !

বিনোদিনী ভয় দেখানোর ভাবে বলে, সত্যি যদি চলে যাই, থাকতে পারবি একলা ভিটের উপর।

কেন পারব না ? আমারও ভায়ের ভিটে। কত জোর এখানে !

এর মধ্যে আবার এক অদ্ভুত উৎপাত। একদিন চারুবালা গোলায় সাঁজ দেখাতে যাচ্ছে, টুক করে এক টুকরা মাটির ঢিল গায়ে পড়ল। তেঁতুলতলার দিক থেকে। ঝাঁকড়া-ডালপালা পুরানো তেঁতুল-গাছ বাড়ির বাইরে রাস্তার পাশে—ছোটবেলা ঐ তেঁতুলগাছের ভয়ে চারু সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বেরুত না, দায়েবেদায়ে বেরুতে হলে ওদিকে তাকাত না চোখ তুলে। গাছের ডালে ডালে ভূত-পেত্নী ব্রহ্মদৈত্য হোঁদল-কুতকুতে যাবতীয় অপদেবতার চলাচল। বড় হয়ে ভূতের ভয় ভেঙেছে, কিন্তু ঐ গাছতলা থেকেই ঢিল এসে পড়ল।

আর ক'দিন পরে—ভূত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে—উঠানে আর ঘরের বেড়ায় দমাদম ঢিল পড়তে লাগল। সবে সন্ধ্যা গড়িয়েছে। কিন্তু মেঘলা আকাশের নিচে বড্ড অন্ধকার, কোলের মানুষ দেখা যায় না। ভরত রাতে এসে দাওয়ায় শোয়, সেই ব্যবস্থা চলছে এখনও। রাতের খাওয়াটা এ-বাড়ি—সেইটে মুনাফা। কিন্তু তার এখনো আসবার সময় হয়নি। দুই মেয়েলোক পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। মানুষজন এসে পড়ল। কি, কি হয়েছে ? ঢিল পড়েছে তো কি হল ? বজ্জাত লোকের উৎপাত।

ভরত এসে পড়লে মানুষজন চলে গেল। চোখ ঠেরে চাপা গলায় কেউ বলতে বলতে যাচ্ছে, ডবকা ছুঁড়ি ঘরে পুষে রেখেছে—ভূত-প্রেত তো নেমন্তন্ন করে ডেকে আনা। তা ছাড়া আবার কি !

সকালবেলা ওপাড়া অবধি রটনা হয়ে গেল। নগেনশশী

( ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম ধাম ও ছবির বিষয়বস্তু লিখতে যেন ভুলবেন না )

জয়তু নেতাজী ( হরিদ্বার )
—সুধাংশু বিশ্বাস

পুতুলের সংসার
—ধীরেণ অধিকারী

পাকা রাঁধুনী —মাখন রায়

হ্যালো ! হ্যালো ! —সমীর রায়

তাজ

—ললিতপ্রসন্ন ঘোষ মজুমদার

কিশোরী —অমিয় দে

সাপে-নেউলে

—সাধন রায়

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির ( বঙ্গবাণী, নবদ্বীপ ) —বিমলকুমার সরকার
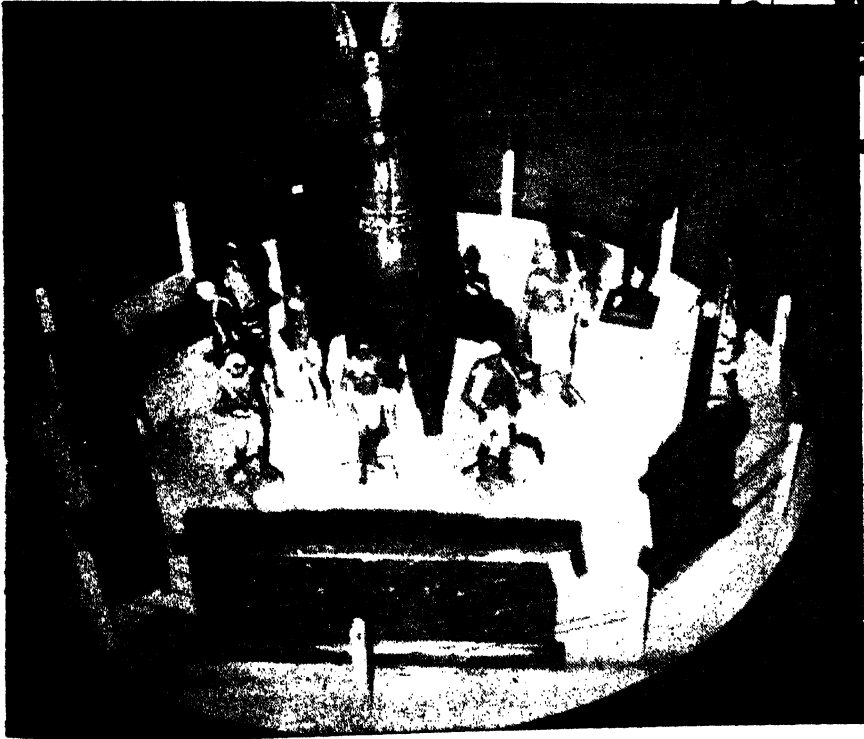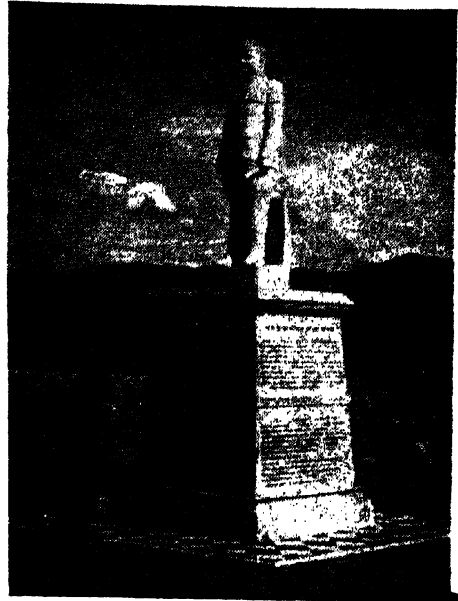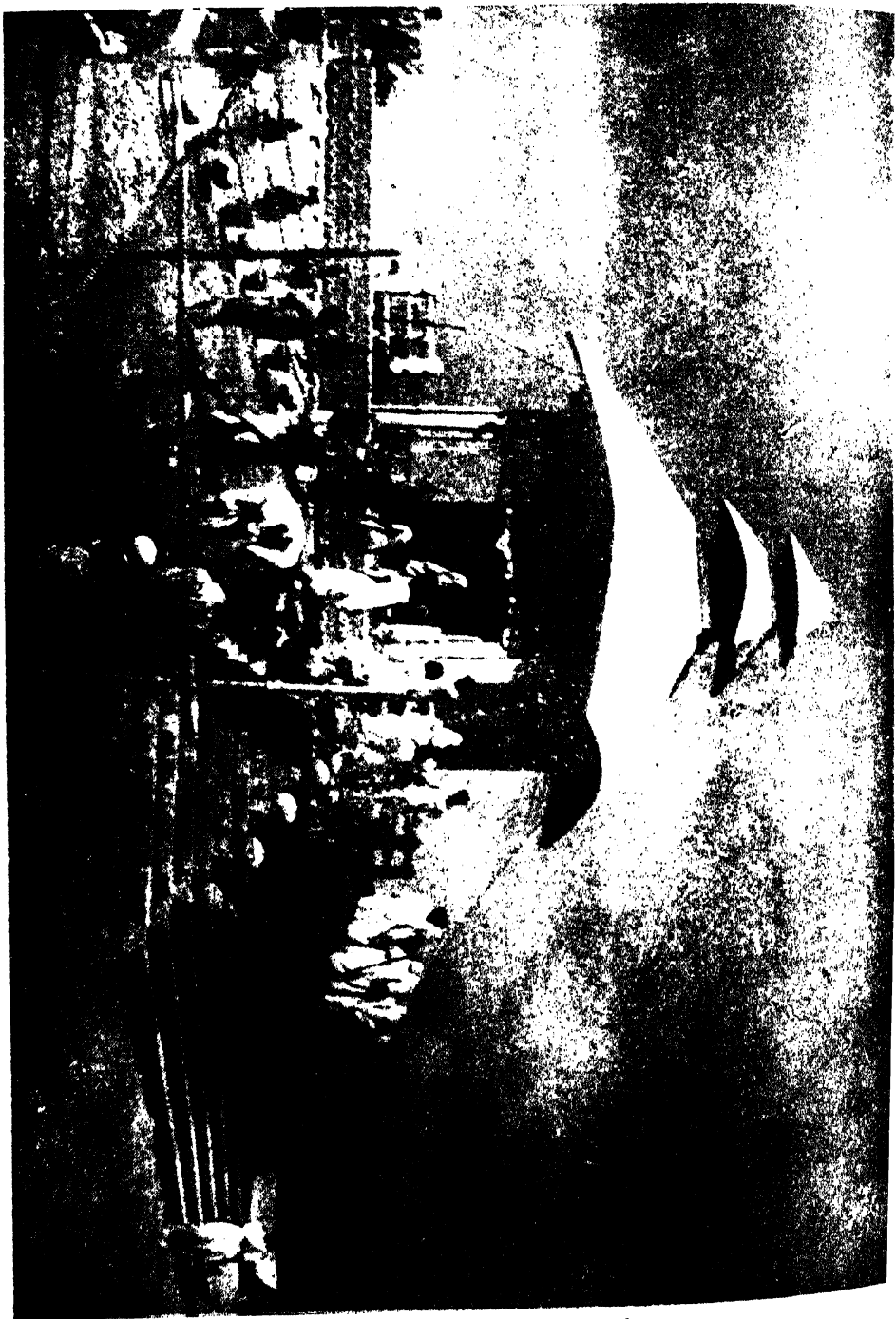
স্বমস্ত হয়ে এসেছে : আর জেদ করিসনে বোন। চল্ আমাদের বাড়ি।

বিনি চারুবালাকে ঠেস দিয়ে বলে, মানী ঘরের মেয়ে— কেন যাবে? পায়ের বেড়ি ঝেড়ে ফেলে আমিই বা যাবো কেমন করে।

ভাগিাস ছিল না চারু। থাকলে তো কুরুক্ষেত্র বাধত। চারু আসছে দেখে নগেন তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ ধরে : উর্দ্ধ্ব এসেছিল নাকি? আমি নিজে গিয়ে বলে এলাম।

নগেনশশীর উপর চারু কোন দিন প্রসন্ন নয়। আজকে আবার কি হয়েছে, কথা পড়তে দেয় না, থরথরিয়ে বলে ওঠে : কি সর্বনাশ! নিজে সেখানে গিয়ে পড়েছিলেন?

নগেন নিজের বোনের সঙ্গেই কথা বলে চলেছে : কথা শোন্ রে বিনি। অত করে তুই বলে এলি, বর্গাদারের বাড়ি নিজে চলে গেলাম। সেই জন্তে দোষ হয়ে গেল আমার।

এদ্দিন এর-তার মারফতে বলে পাঠাচ্ছিলেন, এবারে নিজ-মুখে বলে এলেন। বউদির তাগাদায় কেউ কেউ যদিই বা দোমনা হয়েছিল, এর পরে এক চিটে ধান আর কেউ দেবে না।

নগেনশশী আর্তনাদ করে ওঠে : ওঃ, এত বড় কলঙ্ক আমার নামে। আমার বোন উপোস করে মরবে—মানা করে দেওয়ায় স্বার্থ কি আমার শুনি?

হাসিমুখে সহজ কণ্ঠে চারু বলে, কায়দায় ফেলে আমাদের অন্দরে নিয়ে ফেলবেন। আবার কি!

কথা বেরোয় না নগেনের মুখে। তার পরে ফেটে পড়ল : শোন্, শুনলি তো বিনি? এই জন্যে আসিনে তোদের বাড়ি—

চারু বলে, দিনমানে আসেন না, আসেন রাত্রে। বাড়ির ভিতরে আসেন না। আনাচে-কানাচে আসেন। ভূত হয়ে ঢিল-বৃষ্টি করেন।

নগেনশশী গর্জন করে ওঠে : কে বলেছে?

মানুষ কেউ নয়, আপনার ঐ খোঁড়া পা। ভিজে মাটির উপর পায়ের দাগ—একখানা পা পুরোপুরি, আর এক পায়ের শুধু আঙুল। তাই তো দেখে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু শুনে রাখুন—

চোখ তুলে সোজাসুজি তাকায় নগেনের দিকে : ভয় দেখিয়ে কিছু হবে না। দাদার মত চাই। তিনি এসে যা বলবেন, সেই রকম হবে।

এ কথায় নগেন নরম হয়ে গেল : কোথায় পাওয়া যাবে তাকে? কুমিরমারি ছিল, সেখান থেকে বয়ারখোলা। তার পরে আর পাত্তা নেই।

চারু ভারি গলায় বলে, তাড়িয়ে তাড়িয়ে দাদাকে আমার জঙ্গলে নিয়ে তুললেন। আমিও সেই দলের মধ্যে।

বিনোদিনী বলে, কাজ নেই টাকায়। ফিরে আসুন। না হয় এক বেলা খেয়ে থাকব সকলে মিলে। খোঁজ করো তুমি মেজদা।

চারু বলে, মন করলে খোঁজ নেওয়া যায়। কুমিরমারি বিলেত জায়গা নয়, যাওয়া যায় সেখানে। কেউ না যায় আমি বেরিয়ে পড়ব কাউকে কিছু না বলে। মেয়েমানুষ বলে মানব না। পুরুষে না পারে তো আমি খুঁজে বের করব।

## সাত

অনেক রাত্রি। জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মাছ-মারারা। নিঝুম চারিদিক। রাধেকৃষ্ণ ছুটতে ছুটতে নতুন আলায় এসে উঠে ঝপ করে হাতের জাল ফেলে দিল। কাঁপছে ঠকঠক করে। গগন মাচার উপরে শুয়েছে; ব্যাপারিরা মেঝের এদিকে-সেদিকে। শব্দসাড়ায় জেগে উঠে কেউ তড়াক করে উঠে বসল, চোখ রগড়াচ্ছে কেউ বা অমনি শুয়ে শুয়ে।

কি সমাচার রাধেশ্যাম? হল কি, ফিরে এলে কেন?

রাধেশ্যাম বাইরের দিকে আঙুল দেখায়। কি বলতে চাচ্ছে, মুখ দিয়ে ক্ষণকাল কথা বেরোয় না। বেড়ার একেবারে কাছ ঘেঁসে চলে এলো। ফিসফিসিয়ে অনেক কষ্টে বলে, বড়-শেয়াল ইদিক পানে ধাওয়া করেছে।

বাদাবনে শিয়াল নেই। বড়-শিয়াল হল বাঘ—বাঘের নাম করতে নেই, বড়-মিঞা বড়-শিয়াল ভোঁদড় এমনি সব নামে পরিচয়। ঘুমের লেশমাত্র নেই আর কারো চোখে। লাঠি সড়কি রামদা বেরিয়ে পড়ল এখান-ওখান থেকে। লহমার মধ্যে সকলে সশস্ত্র। জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, খাল-পারে বনের কালো কালো গাছপালা সুস্পষ্ট নজরে আসে। বাঘ নাকি এপারে আসছিল জোয়ারের জল সাঁতরে। ভাসানো মাথা দেখতে পেয়ে রাধেশ্যাম দৌড় দিয়েছে।

কিন্তু আসতে আসতে গেলেন কোনদিকে প্রভু? পাখনা মেলে আকাশে উড়লেন? না জোয়ারে গা ভাসিয়ে চললেন সুদূরের মানসেলা মুলুকে! সতর্ক চোখে সকলে বাঁধের দিকে তাকিয়ে— চোখের পলক পড়ে কি না পড়ে। কামরার দরজা খোলা। ঐটুকু ঘরে এত লোকের জায়গা হবে না। নয় তো ঢুকে পড়ত সকলে এতক্ষণ। দরজা তবু খুলে রেখেছে, সত্যি সত্যি বিপদ এসে পড়লে ওরই ভিতর ঠাসাঠাসি হয়ে দরজা দেবে। বাঘের পার হয়ে আসা অবিশ্বাস্য কিছু নয়। হরিণ মারতে কিম্বা মধু কাটতে ইচ্ছে হল তো আবাদের মানুষ বনে গিয়ে ঢোকে। বাঘও তেমনি মুখ বদলাতে কখনো সখনো ফাঁকায় চলে আসে। সুস্বাদু নরমাংসের কথা ছেড়ে দিন, আজেবাজে মাংসও সকল দিন জোটে না—জঙ্গলের জীব এমনি ট্যাঁদোড় হয়ে গেছে। পেটের পোড়ায় বাঘ তখন ভাঁটা সরে-যাওয়া চরের উপর চুনোমাছ ধরে ধরে খায়। ছাতু খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে তার পরে পোলাও-কালিয়ার লোভে বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ একদিন।

কিন্তু বাঘ পার হয়ে এলে এতক্ষণে ঠিক বাঁধের উপর দেখা যেত। এমন জ্যোৎস্নায় আলোয় চুপিসাড়ে কিছু হবার জো নেই। ও রাধেশ্যাম, কি দেখে এলি বল্ তো ঠিক করে—

হরি, হরি! রাধেশ্যাম কোন সময় সকলের পিছনে গিয়ে বেড়া ঠেস দিয়ে বসে ঘুমুচ্ছে। মুখে ভকভক করছে গন্ধ। তাড়ি গিলেছে। জালে না গিয়ে বেটার ঘুমোবার গরজ ছিল আজকে। প্রায়ই হয় এমন, আর বউয়ের সঙ্গে কোন্দল বেধে যায়। ভেবে চিন্তে আজকে এই বাঘের গল্প বানিয়েছে। এখন বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে, মরবে কাল কাঠ-কাঠ উপোস দিয়ে।

পরের দিন ভোরবেলা। সূর্য ওঠেনি তখনো। মাছের ডিঙি রওনা হয়ে গেছে। কাজকর্ম সেরে-সুরে গগন বনবাউয়ের একটুকরো

ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করছে আলার উঠানে দাঁড়িয়ে। দেখা গেল, খালের ঘাটে সালতি-ডোঙা এসে লাগল। কে-একজন ডাঙায় নেমে এলো সালতি থেকে। সালতি ভেড়ির কাজকর্মে লাগে, বাইরের নদী-খালে বড় বেরোয় না। স্রোতের মুখে পড়লে বিপদ আছে। দূর-দূরন্তর কেউ সালতিতে যায় না। অতএব মানুষটা আসছে কাছাকাছি জায়গার। কোন লাট সাহেব হে—পায়ে না হেঁটে সালতি চেপে আসে ? কৌতূহল ভরে গগন তাকিয়ে রয়েছে।

কালো রং, রোগা-লিকলিকে দেহ, কাঁধের উপর ধবধবে উড়ানি। আসছে এদিকেই বটে। উঠানের উপর এসে চতুর্দিক একবার তাকিয়ে দেখে নিল।

জগন্নাথ তুমিই নাকি হে ?

গগন বলে, জগা কোথা এখন ? কুমিরমারি ছুটল নৌকো নিয়ে। আমার নাম শ্রীগগনচন্দ্র দাস।

তোমাকেও জানি খুব। সায়েরের মালিক হলে তুমি।

গগন অবাক হয়ে বলে, সায়ের বলেন কাকে ? এ দিগরে সায়ের আছে বলে তো জানিনে। সামান্য একটুখানি চরের উপর ঘেরি দিয়ে বসেছি।

লোকটা দরাজ ভাবে হেসে ওঠে : ঐ হল। যার নাম চাল-ভাজা, তার নাম মুড়ি। নামে না হোক, কাজকর্ম তো সায়েরের। মাছের নৌকো ঐ যে কুমিরমারি ছুটল, সে নৌকোয় কি তোমার একলার ঘেরির মাছ ? ভাতার-ভাসুরের নাম জানি রে বাপু, মুখে বললেই দোষ অর্শায়।

হাসতে হাসতে আলা-ঘরে ঢুকে বাখারির মাচার উপর চেপে বসল। মাছ কেনা-বেচার সময় গগন যেখানটা বসে চারিদিকে নজর ঘোরায়, ওজন ও দরদাম খাতায় টোকে।

গগন বলে, আপনাকে চিনতে পারলাম না মশায়।

চিনবে বই কি। চেনা-পরিচয়ের জন্যেই তো আসা। এমন চেনা হবে যে কাঁঠালের আঠার মতো কিম্বা ছিনে-জোঁকের মতো আর ছাড়াতে পারবে না।

বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ওঠেন, তামাক খায় কে ওখানে ? খাসা তামাক, গন্ধ বেরিয়েছে। নিয়ে এসো। হুঁকা লাগবে না, পরের মুখ-দেওয়া হুঁকোয় আমি খাইনে। হাতের চেটোয় হয়ে যাবে। কলকেটা আনো ইদিকে।

সকালবেলার পয়লা ছিলিম। অনেক মেহনতে গেঁয়োকাঠের কয়লা ধরিয়ে রাধেশ্যাম দুটো কি তিনটে সুখটান দিয়েছে, হেনকালে কলকে দেবার আবদার। তবে বাইরের মানুষ এসে চাচ্ছে, ধরতে গেলে অতিথি—নিজেদের কেউ হলে সে কানে নিত না। নলচের মাথা থেকে কলকে খুলে দিয়ে অতিথিসেবা করতে হল।

গগন ভাবছিল। এইবারে বলে উঠল, বুঝলাম। চৌধুরিগঞ্জে আসা হয়েছে মশায়ের। হুঁ, আপনি সেই মানুষ।

তাই, তাই। হাসে আবার লোকটি : আচ্ছা তুখোড় বটে হে তুমি। শনিবারের দিন তো এসেছি। এর মধ্যে সব খবর জেনে বসে আছ ?

গোপা গুপতি জনমনিষ্যি—খবর উড়ে বেড়ায়, ধরে নিলেই হল। শুনলাম, অনিরুদ্ধর জায়গায় নতুন লোক এসেছেন একজন। [illegible] তবে আর বসতে আটকায় কিসে ?

লোকটি বলে, খবর পেয়েছ বটে দাস মশায়, কিন্তু পুরো খবর নয়। অনিরুদ্ধর জায়গায় আসিনি আমি। বাবুদের ষোল-আনা এস্টেটের সদর-নায়েব—গোপাল ভরদ্বাজের নাম শুনেছ তো, সেই। খালি-পায়ে হাঁটতে পারিনে, মাটিতে পা ঠেকলে টনটন করে ওঠে। এইটুকু পথ আসতে, দেখতে পাচ্ছ, খালের মধ্যে সালতি নামাতে হয়েছে। আমি হেন মানুষ মেছোঘেরিতে পড়ে পড়ে নোনাজল খাব! আর বাবুরাও তো ছাড়বেন না। আমার বিহনে যাবতীয় ভূসম্পত্তি লাটে উঠে যাবে ওদিকে। দশ-বিশ দিন থেকে এদিককার একটা সুরাহা করে সদরের আমলা আমার সদরে গিয়ে উঠব। অনিরুদ্ধ রগচটা মানুষ—কি নাকি গণ্ডগোল পাকিয়েছে তোমাদের সঙ্গে। জন্তু-জানোয়ারের রাজ্যে আছিস তো ক'টা মানুষ পড়ে, তার মধ্যেও বিবাদ-বিসম্বাদ। আমি এসেছি বাপু মিটমাট করতে। দোষঘাট যা কিছু হয়েছে, কিছু মনে রেখো না বাপসকল। মিলেমিশে ভাই-ভাই হয়ে সকলে থাক। এই কথা বলবার জন্য এদ্দুর অবধি চলে এসেছি।

গগন তটস্থ হয়ে পড়ে : এ সমস্ত কি কথা নায়েব মশায়? জুতোর কাদা হলাম গে আমরা, দোষঘাট কিসের আবার ? চৌধুরি বাবুদের আশ্রয়ে গাঙের উপর গেঁয়োবনের মধ্যে একটু ঘর বেঁধে নিয়েছি—অত বড় ঘেরি থেকে গুঁড়োগাড়া কিছু যদি ছিটকে এসে পড়ে, কোন রকমে ক'টা মানুষের পেট চলে যাবে।

ভরদ্বাজ মানুষটা আলাপ-ব্যবহারে খাসা। অথচ আগেভাগে লোকে কত রকম রটিয়েছিল! ছোটবাবু নাকি কিরে করেছে, রাতারাতি গগনের আলা ভেঙে গাঙের জলে ডুবিয়ে দিয়ে নৌকো-চুরি ও ক্ষতি-লোকসানের শোধ নিয়ে নেবে। গুণ্ডা পাঠিয়ে দিয়ে জগা ও গগনের গলা দুইখণ্ড করে ছাড়বে। এমনি কত কি। গোপাল ভরদ্বাজের সম্বন্ধেও শোনা যায়, অতবড় ডাকসাইটে দুর্দান্ত এ তল্লাটে একটির বেশি দুটি নেই। অথচ সেই মানুষ, দেখ, সকলের মধ্যে জমিয়ে বসে কত ভাল ভাল কথা বলছে। লোক অনেক এসে জমেছে, কথা শুনছে সকলে তার মুখের দিকে চেয়ে।

অনেকক্ষণ পরে খেয়াল হল, বেলা হয়ে গেছে বিস্তর। তা সত্ত্বেও গল্প বোধ হয় থামত না। কিন্তু খালের দিকে তাকিয়ে দেখে ভাঁটার টান ধরে গেছে। আর দেরি হলে অনেকখানি কাদা ভেঙে সালতিতে উঠতে হবে। নোনা কাদা—পায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে, যতই জল ঢালো নামতে চায় না। মনে হবে, মণ দেড়েক ওজনের এক জোড়া জুতো পরে আছে পায়ে। তার উপরে ভরদ্বাজের ঐ সৌখিন ব্যাধি—পায়ে মাটি ঠেকলেই টনটন করে উঠবে।

চলি তবে। জগন্নাথের সঙ্গে দেখা হল না। পাঠিয়ে দিও একবার আমাদের ওখানে।

বারম্বার জগার কথা। গগন কিছু ঘাবড়ে গিয়ে বলে, কেন, তাকে কি দরকার ?

নাম শোনা আছে, চোখে একবার দেখব। শুনেছি ছোঁড়া বড্ড ভাল। তোমার ডান হাত। একটু আলাপসালাপ করব আবার কি।

উঠতে গিয়ে একটা ঝুড়ির দিকে নজর পড়ল। গোপাল বলেন চাকা চাকা ওগুলো চিংড়ি মাছ না ?

উঁহু, পায়রা-চাঁদা।

ঐ হল। আবাদে তোমরা চাঁদা বলো, ডাঙা রাজ্যে আমাদের ...হারে নাম—চিত্রা। দিব্যি স্বাদ, রাঁধতে আলাদা তেল লাগে না। দাঁতে ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে মাখনের মতো গলে যায়। আমাদের চৌধুরিগঞ্জে ক'দিন তো দেখছি। অত বড় ঘেরির মধ্যে একটা চিত্রা পড়ে না।

রাধেশ্যাম বলে, এ-ও ঘেরির মাছ নয়। ঘেরির মধ্যে এত বড় হতে বিস্তর দিন লাগে। গাঙে খালে বেউটি জাল পেতে ধরেছে। বড়দাকে ঐ মাছ ক'টা খাবার জন্তে দিয়ে গেল।

গোপাল ভরদ্বাজ দাঁত মেলে হাসলেন গগনের দিকে চেয়ে: কথা বেরিয়ে পড়ল এই দেখ। বাইরের মাছও তোমার খাতায় বিক্রি হতে আসে। সায়ের বলা হবে কিনা, তা হলে বিবেচনা করো। গোখরো-কেউটেরা সাপ, আবার হেলে-ঢোঁড়ারাও সাপ। সে যাকগে—রোজগারের জন্ত দুনিয়ার উপর আসা, দুটো পয়সা কোন গতিকে হলেই হল। এই, দাড়িওয়ালা কে তুইরে বাবা, ঝুড়িটা নিয়ে আর ইদিকে, মাছগুলোর চেহারা দেখে যাই।

কাছে নিয়ে এলে গোপাল শতকণ্ঠে তারিপ করেন: বগিথালার মতন সাইজ। কী সুন্দর, যেন রাজপুত্তুর! দু'টো-চারটে আমাদের ফুলতলা অবধিও গিয়ে পৌছয়। কিন্তু পচে ঢোল হয়ে গিয়ে তখন আর পদার্থ থাকে না।

গগনকে অগত্যা বলতে হয়, মাছ ক'টা আপনি নিয়ে যান। মুলুক মিঞা সালতিতে ঢেলে দিয়ে এসো ও-গুলো।

গোপাল না-না করে ওঠেন: সে কি কথা! ভাল বলেছি বলেই অমনি দিয়ে দিতে হবে? তোমরা আশাসুখে রেখে দিয়েছ—

আমাদের কি অভাব আছে? আজকে না হল তো কাল। কাল না হয় তো পরশু। মাছ তো আসছেই।

গোপাল গদগদ কণ্ঠে বলেন, তবে দাও। চিত্রা মাছ ভাল খাই আমি। তবে রাঁধুনি হলগে কালোসোনা—যা-ই এনে দাও, এক আস্বাদ। বলে কি জানো, এক হাঁড়ি থেকে নামছে, একই হাতা-খুন্তি, রান্না বাটনা একজনার হাতে—স্বাদ তবে দুই রকম হয় কেমন করে?

[ ক্রমশঃ ]

# এবার কথা বল

চিত্তরঞ্জন সরকার

পেয়েছ। পেয়েছ অনেক গ্লানি বিচ্ছেদ ও বেদনা
কামনা কন্তাকে ছুঁয়েছ ছুঁয়েছই শুধু
আকাশের দিকে চেয়ে ভেবেছ, ভেবেছ
তোমার আকাশ-হৃদয় ক্ষুদ্র নীচ,
সংকীর্ণতার চৌহদ্দিতে আবদ্ধ আশ্চর্যতর।
বুনো হাঁসের মত হালকা অনুভূতি তুমি
চেয়েছ চেয়েছ উড়তে
মাঠ পেরিয়ে আকাশ ছাড়িয়ে
সব পেয়েছির দেশে!
আত্মার তৃপ্তি খুঁজছ তুমি।

অশ্রু আকাঙ্ক্ষার ঘরে বসে তুমি
দেখছ দেখছ দিন-রাত
নেই কিছুই নেই তোমার
কিছুই নয় যেন তোমার
তাই তুমি এক ক্লান্ত প্রাণ।

তোমার রক্তে আছে মাটির টান
তাকে অস্বীকার করছ—
তাই পালিয়ে বেড়াচ্ছ—
তাই শুনছ না তুমি,
বুড়ো বটের এই কান্না, পাখীদের ডাক
দিঘীটার এই শিরশিরে হাওয়া
টুকটুকে মেয়েটার এই যে অর্থহীন প্রলাপ
এতো তোমাকে ভেবেই।

তবে
তোমার অভিজ্ঞান তোমাকে পালিয়ে যেতে
বলে কেন? তোমার কান্না আনবেই পান্না
তুমি কাঁদ, চীৎকার কর
হঠিয়ে দাও
তুমি হও উদ্দাম উধাও
না মাঠ পেরিয়ে না আকাশ ছাড়িয়ে।

অতৃপ্ত আত্মার দীর্ঘশ্বাস শুনতে কি
পাচ্ছনা তুমি
কান পেতে থাক
শুন বীভৎস, পাণ্ডুর, ট্র্যাজিক সে কান্না।
পালিয়োনা তুমি
বাঁচ সবার মাঝে বাঁচ
এতদিন তোমার না বলা-কথা বল
বহুদিন তুমি কথা বলনি
এবার বল—সব বল।

# দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

ডঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[ প্রাক্তন উপাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ]

দেশে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করিতে হইলে একদল দরদী শিক্ষক প্রয়োজন। দরদী শিক্ষকদের সাহায্য ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ প্রসার লাভ করিতে পারে না। ছাত্র ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষার মহান আদর্শ উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলার জন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বার্থত্যাগী চরিত্রবান শিক্ষক সম্প্রদায় অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ছয় বৎসর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসবে আমি বলিয়াছিলাম যে, উপযুক্ত শিক্ষক পাইতে হইলে উপযুক্ত পারিশ্রমিকেরও ব্যবস্থা করিতে হইবে। আজও আমার বক্তব্য তাহাই। মনে রাখা প্রয়োজন, জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় দিন দিন বাড়িতেছে। এই অবস্থার মধ্যেও যাহাতে শিক্ষকরা স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার তৎকালীন ডি, পি, আই মিঃ সি, মার্টিন বলিয়াছিলেন, ১০ টাকা মাসিক বেতনের কমে একজন ছুতোর পাওয়া যায় না, কিন্তু ৩৫ টাকা মাসিক বেতনে একজন বি-এ পাশ শিক্ষক পাওয়া যায়। আজও সে অবস্থার খুব বেশী পরিবর্তন ঘটে নাই।

শিক্ষকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতেই হইবে। যতদিন শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করা হইবে না, ততদিন শিক্ষকতা যোগ্য ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত শিক্ষক আনার জন্য শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষক শিক্ষণের কাজে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক মহকুমায় শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এ জন্য প্রচুর অর্থব্যয় অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু সে ব্যয়ের স্বার্থকতা আছে।

ভারতীয় সংবিধানের ৪৫নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, সংবিধান চালু হওয়ার দশ বৎসরের মধ্যে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন করিতে হইবে। এজন্য বহু টাকা প্রয়োজন এবং হয়ত এখনই এত টাকা ব্যয় করা সম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু তবু হতাশ হইলে চলিবে না। প্রতি বৎসর পূর্ববর্তী বৎসরের অগ্রগতির পটভূমিকায় নতুন শিক্ষা-প্রসার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থায় ব্যয়বহুল অট্টালিকা বা আসবাব-পত্রের সাহায্যে শিক্ষা প্রসারের কথা কল্পনা করা ভুল হইবে। সামান্য বাড়িঘর এবং একান্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের সাহায্যেই আমাদের কাজ চালাইতে হইবে। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্বেই আমি একথা বলিয়াছিলাম। সম্প্রতি দেখিলাম, চীন এবং মিশরও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত নীতিই গ্রহণ করিয়াছে।

শিক্ষার মাধ্যম কি হইবে, সে প্রশ্নও গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে দেশে বিরাট মতদ্বৈধতা বর্তমান। ভারতীয় সংবিধান ১৪টি আঞ্চলিক ভাষাকে ভারতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং [illegible] স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন যে, কোন ভাষাটি গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক হইবে। বুঝা প্রয়োজন, কোনটি আমাদের পক্ষে সবচেয়ে উপকারী হইবে। না হয় মানিয়াই লইলাম যে সংবিধান নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন একটি ভারতীয় ভাষা—আঞ্চলিক বা জাতীয়—ইংরেজীর স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যপুস্তকগুলি এবং অন্য কিছু বই সেই ভাষায় অনুবাদ করার প্রশ্নটি বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। শুধু মুখে 'অংরেজী হটাও' বলার কোনই সার্থকতা নাই। অবশ্য, আমরা যেমন ইংরাজকে বর্জন করিয়াছি, তেমনি ইংরেজীকেও বর্জন করিব। কিন্তু প্রশ্ন, কখন ইংরাজী বর্জন উচিত হইবে?

উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রতি বৎসরই আমাদের দেশের বহু ছাত্র ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যায়। ইহারা কোন ভাষায় শিক্ষা লাভ করিবে? যদি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় উচ্চশিক্ষা লাভের প্রয়োজনীয়তার বিকল্প ব্যবস্থা না করা যায়, তবে আমরা ইংরাজী পরিত্যাগ করিব কি করিয়া? যদি একদল নিঃস্বার্থ কর্মী প্রয়োজনীয় বিদেশী পুস্তকগুলি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে, তবে সমস্যাটা অনেকটা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সংবিধান চালু হওয়ার দশ বৎসর পরেও সে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তেমন কেহই অগ্রসর হয় নাই।

আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, বিদেশী ভাষা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করার বহু লোক ইংলণ্ডে আছে। ফলে ইংলণ্ডের ছাত্ররা অতি সহজেই বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় লিখিত পুস্তকের জ্ঞান ইংরেজীর মাধ্যমেই আহরণ করিতে পারে। অথচ আমাদের দেশে তাহার একান্ত অভাব। ফলে এখন এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে, আমরা যদি উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে চাই, যদি দেশবিদেশের মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাই তবে ইংরেজীর সাহায্য আমাদের লইতেই হইবে।

আমি ধর্মকে শিক্ষার অঙ্গ করিতে চাহি। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষা-ব্যবস্থা শুধু কতকগুলি চতুর শয়তানই সৃষ্টি করিতে পারে। বিখ্যাত ওয়েলিংডনও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। আমি যখ[ন] বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, তখন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীদের স[ঙ্গে] এ সম্পর্কে বহু আলোচনা করিয়াছিলাম। কি ভাবে ছাত্রদের নৈতি[ক] চরিত্র দৃঢ় করা যায় এবং ধর্মকে শিক্ষার অঙ্গ করা যায়, সে সম্পর্কে বহু আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনান্তে আমি তাঁহাদের জান[াই] যে, যেহেতু ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং যেহেতু কোন বিশেষ ধর্ম[ের] আচারপদ্ধতি অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, অতএব আ[মি] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর জন্য এমন একটি প্রার্থ[না] পদ্ধতি চালু করিব যাহা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পার্শী প্রভৃতি স[কল] ধর্মাবলম্বীর পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হইবে। আমার বক্তব্য ছিল ভগবান যখন হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান নহেন, তখন তাঁহার স[...]

কোন সংকীর্ণতা রাখা উচিত নহে। স্বামীজীরা আমার মতামত সমর্থন করিয়াছিলেন।

বিশ্বের সভ্য রাষ্ট্রগুলির শিক্ষা প্রসারের ইতিহাস পড়িলে জানা যায় যে, প্রায় সমস্ত দেশেই শিক্ষা মোটামুটি ভাবে তিনটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত : (১) ধর্ম সর্বদাই শিক্ষার একটি অঙ্গ, (২) দারিদ্র্য শিক্ষা-প্রাপ্তির পথে প্রতিবন্ধক নহে এবং (৩) দৃঢ়তা, সাহস ও সততা দ্বারা শিক্ষাসংকট সমাধান সম্ভব।

ধর্ম ছাড়া শিক্ষা নিরর্থক। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী গ্লাডস্টোন বলিয়াছেন, "I have lived long enough to know what I did not at one time believed that no society can be upheld in happiness and honour without the sentiment of religion." পৃথিবীর আর একজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক বার্ক বলিয়াছেন, "True religion is the foundation of society, the basis on which all true civil government rests and from which power derives its authority, laws their efficiency and both their sanction. রাজনীতি, শিক্ষা, সমাজনীতি প্রভৃতি সবই ধর্মের উপর ভিত্তিশীল। আর ভারতে চিরকালই ধর্ম প্রায় সব কিছুরই ভিত্তি। শিক্ষার ক্ষেত্রে কথাটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

ধর্ম শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি? ধর্ম তাহাই যাহা এই গতিশীল জগতের সঙ্গে সমতা রক্ষায় সাহায্য করে, যাহা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে মানুষকে সক্ষম রাখে এবং যাহা সংযত ও সংহত জীবন যাপনে সকলকে সাহায্য করে। জীবনের কতকগুলি নিয়মকানুন মানিয়া চলিতেই হইবে। আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের ছোটবেলা হইতেই কতকগুলি স্বভাব গড়িয়া ওঠে। ধর্ম শিক্ষার অঙ্গ হইলে ছোটবেলা হইতেই সৎপথে চলার প্রেরণা পাওয়া যায়। ধর্ম সংযত জীবন যাপনে খুব বেশী সাহায্য করে। সুতরাং আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে ভবিষ্যতে সুখী মানুষ হইতে পারে তাহার জন্য শৈশবেই তাঁহাদের মনে ধর্মের চেতনাবোধ জাগাইয়া তোলার চেষ্টা করা উচিত।

যখন আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোন রকমের উচ্ছৃঙ্খলার কথা শুনি তখন মনে খুব কষ্ট পাই। উচ্ছৃংখলা কখনও সুখের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে না। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের শৃংখলা বোধ জাগাইয়া তোলার পূর্বে বয়ঃজ্যেষ্ঠদেরও শৃংখলাবদ্ধ হইতে হইবে।

রাশিয়ায় কি ভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শৃংখলা প্রবর্তন করা হইয়াছে ডাঃ নিকোলাস হানস তাঁহার Comparative Education নামক পুস্তকে তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। রাশিয়ার স্কুলগুলিতে ২০টি নিয়ম চালু। মোটামুটি ভাবে তাহা নিম্নরূপ :

(১) প্রত্যেকেই এমন ভাবে শিক্ষালাভ করিবে যাহাতে সকলেই এক একজন রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত নাগরিক হইতে পারে এবং সোভিয়েট পিতৃভূমিকে যথাযোগ্যভাবে সেবা করিতে পারে ;

(২) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকেই শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের নির্দেশ মানিতে হইবে, পথঘাটে ভদ্রভাবে চলিতে হইবে ;

(৩) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকেই অধ্যবসায়শীল হইতে হইবে। নিয়মিত বিদ্যালয়ে যোগদান ও পাঠে মনোযোগ দেওয়া চাইই। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধ, শিশু ও রুগ্নদের প্রতি যত্নবান হইবে এবং সর্বতোভাবে তাহাদের সাহায্য করিবে। অভিভাবকদের বাধ্য হইতেই হইবে ; অভিভাবকদের ছোট ছোট ভাই-ভগিনীদের সাহায্য করাও একান্ত কর্তব্য ; এবং—

(৫) প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রী স্কুলের সম্মান বজায় রাখিবে ও স্কুলের জিনিষপত্রে যত্ন নিবে।

আমি এগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি। ১৯৫১ সালের ১২ই জানুয়ারী আমি সমাবর্তন ভাষণে এগুলির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলাম। প্রত্যেক নাগরিকদেরই উচিৎ নবীন ভারতকে তাহার যাত্রাপথে সাহায্য করা, মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্বতন্ত্রভাবে নাগরিকদের চরিত্র দ্বারাই জাতীয় চরিত্রের বিচার হয়। ব্যক্তিগত অগ্রগতির সমষ্টিই জাতীয় অগ্রগতি. ব্যক্তির অস্বচ্ছ বিকাশই সামাজিক পাপরূপে প্রকাশিত হয়। আইনের মাধ্যমে তাহা প্রতিরোধ করা যায় না। বরং আইনের পথে প্রতিরোধের চেষ্টা করিলে কুফল ফলিতে বাধ্য।

ভারতীয় সভ্যতা সামরিক শক্তির সাহায্যে জীবিত নহে। ভারতের মহান ঐতিহ্য ও আদর্শের বলেই ভারতীয় সভ্যতা জীবিত, যখনই আমরা সেই ঐতিহ্য ও আদর্শ অনুসরণে ব্যর্থ হই, তখনই আমাদের দুঃখ-দৈন্য দেখা দেয়।

ধন, জন, প্রভাব, প্রতিপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু যথার্থ উন্নত হইতে হইলে এগুলিই সব নহে। প্রয়োজন আরো অনেক কিছুর—প্রয়োজন দৃঢ়তার, সাহস, সততা ও নিষ্ঠার।

সমাপ্ত

## ... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বোম্বাই নগরীর বিখ্যাত ত্রিমূর্তির আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আলোকচিত্র নীরেণ অধিকারী গৃহীত।

## কবি কর্ণপূর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

ব্রজরাজের মনেও ঘনিয়ে এল শঙ্কা…"এ কি ব্যাপার ? এ কি…?" এমন সময়ে রাজচরণে উপনীত হয়ে গেলেন ব্রজবাসিগণ। দৌড়তে দৌড়তে তাঁরা এসেছেন। তাঁরা নিবেদন করলেন ছেলেধরা পূতনা-রাক্ষসীর সমস্ত কাহিনী। রসময় বিবৃতির অন্তে জানালেন,—

"কুমার সর্বাঙ্গীন কুশলে আছেন।" আনন্দে পেশল হয়ে উঠল ব্রজরাজের প্রাণ।

ঝড়ের মত ব্রজরাজ উপস্থিত হলেন ব্রজপুরে। তনয়-দর্শন এখন উৎসব। আনন্দ-কোলাহল কিছু শান্ত হয়ে এলে আশ্বস্ত হলেন ব্রজরাজ। কোলে তুলে নিলেন লীলাশিশুকে। তুলছেন, আর তাঁর মন বলছে, নিজেই যেন তিনি নিজের হৃদয়ে রোপণ করে নিয়েছেন পরমানন্দের বীজ। কোলে নিয়ে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করলেন ব্রজরাজ!

মনের মধ্যেকার অপরিমেয় প্রমোদরাশি আনন্দাশ্রুর অছিলায় রাজনয়নের কপাট ভেঙে বেরিয়ে আসে…অপূর্ব উচ্ছ্বাসে।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে পূতনা-বধ-লীলাবিস্তারে তৃতীয় স্তবক।

১। তার পর কিছুদিন কেটে গেছে।

লীলাশিশুর বয়স হয়েছে তিন মাস। শিশুর ঔপানিক কর্মে সেদিন পড়েছে জন্ম-নক্ষত্রযোগ। শুভোৎসবে যোগদান করতে এসেছেন ব্রজের প্রেমময়ী শ্রেষ্ঠা ললনারা।

তাঁরা সকলেই আনন্দের যজ্ঞস্বরূপিণী, তাঁরা সকলেই বাৎসল্যের লতিকা-স্বরূপিণী। দয়াব্রতে চিরাপিত তাঁদের হৃদয়, সকলেই বিষ্ণু-হৃদয়া। দিব্যকালকে অলঙ্কৃত করতেই যেন তাঁদের অতি কৌতুকভরে পৃথিবীতে শুভাগমন।

তীব্র জয়োষিত। এই-হেন ব্রজযোষিৎদের শ্রেণীটিকে সঙ্গে নিয়ে শুভকর্মের রীতি পালন করতে নেমে এলেন ঘোষেশ্বরী শ্রীযশোদা।

তেল মাখাতে বসালেন তনয়কে। চুকচুকে করে তেল মাখালেন, তার পর ছেলের গা ঘষলেন হলুদ বেসন ইত্যাদি গন্ধদ্রব্য দিয়ে। মাথার চুল উলটিয়ে ফের গা থেকে পুঁছে উঠিয়ে দিলেন হলুদ-বেসন। তারপর মাথায় ঢেলে দিলেন মঙ্গলবারি। মঙ্গল অভিবাদন নিবেদন ক'রে গম্ গম্ ঝম্ ঝম্ শব্দে বেজে উঠল রাজপুরীর মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র। অভিষেকান্তে পুত্রের গা মুছিয়ে দিলেন মা। অঙ্গ-মার্জনাও করছেন আর মায়ের ছেলেও যেন রোজগার করে ফেলছেন শোভা! তার পরে ছেলের দু নয়নে মঙ্গল-কজ্জলের অঞ্জন পরিয়ে দিলেন মা। আর সেই কাজল যেন বলে উঠল, "দুঃখের জল হয়ে কোনোদিন যেন না ঝরি ঐ চোখে।"

[illegible] পরিজনেরা। মঙ্গলানুষ্ঠানের রীত দেখে তাঁরা সকলেই মধু-মুখ হয়ে উঠলেন। ব্রজরাজেরও অনাবৃত হয়ে গেল আনন্দ। সেখানে ছিলেন স্ত্রী-আচার-পণ্ডিতা রোহিণী দেবী! অধি-রোহিণী তিনি দয়ামায়াদি অজস্র গুণের। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে এবং ব্রজরাজকে পুরোবর্তী করে, ঘোষেশ্বরী তখন শয়ন করাতে গেলেন তাঁর লীলাশিশুটিকে। এক থান কর্পূরের চেয়েও ধবধবে শাদা বিছানা; মূল্য হবে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা। ধীরে তার উপর ছেলেকে দিলেন শুইয়ে। তারপরে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উপস্থিত ঘোষ-ললনাদের সকলকেই অর্চনা করতে আরম্ভ করে দিলেন তিনি।

মুহুর্মুহু বেজে উঠল মৃদঙ্গ, পণব, ভেরী কাহল, দুন্দুভি। আশীর্বাণীর গম্ভীর ধ্বনি উঠল পৃথ্বীদেব ব্রাহ্মণদের কণ্ঠে। সমবেত হলেন সূত, মাগধ, চারণদের দল। তাঁদের মুখে আলাপিত হতে লাগল বাল-কৃষ্ণ-গুণ-রাশির মহিমাকীর্তন। তারপরে কাবা-কোলাহল যখন থামল তখন এলেন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাচার্যেরা। তাঁদের কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত। কলতরঙ্গে ছুটে চলল সে সঙ্গীত-মুখর করে দিয়ে চক্রবাল।

কিন্তু সেই উৎসব-কোলাহলের মধ্যে ঘোষেশ্বরী শুনতে পেলেন না…লীলাশিশু চীৎকার দিয়ে কাঁদছেন। যাঁর কৃপায় লক্ষ্মীরাণীর শোভা ফোটে, তাঁরও কি না ক্ষিদে পায়! তিনিও কি না পান করতে চান স্তন্য! তাই কাঁদছেন! ব্রজরাণী শুনতে পেলেন না সে রোদন।

২। কেউই যখন শুনতে পেলেন না সেই রোদনধ্বনি, লীলা-শিশুর তখন ইচ্ছে হল যে, যে-শকটটিতে তিনি শুয়ে আছেন সেই শকটটিই তিনি ভাঙবেন। খণ্ড খণ্ড করবেন। এবং তাই আশ্চর্য ভাবে চিৎ হয়ে তিনি শুলেন। তার পরে দুটি নয়ন মেলে… নয়নে হর্ষের উল্লাস, পায়ের তলা দুটিকে রাঙা রাঙা কচি কচি পাতার মত আলসে-বিলাসে নাচাতে নাচাতে ছুঁড়ে দিলেন উপর দিকে জোরে।

৩। লীলাশিশুর সেই চরণ দুটি, মৃদুল কমলদলকেও হার মানায় যার লালিত্য, সে দুটি কিন্তু বেড়ে উঠল না প্রলম্বিত হয়ে; নবীনা ঋদ্ধির মত তাতে কেবল ঝঙ্কার দিয়ে উঠল অলঙ্কার। নাগালের বাইরে হলেও শকটখানি দোলা খেতে লাগল মুহুর্মুহুঃ। শেষে নাড়া খেয়েই কটকটে এক বিকট কটু শব্দ রচনা করে নিকটস্থ পিতল-কাঁসার ঘড়া-ঘটির ঘনঘটাকে হুড়দাড় করে ফেলতে ফেলতে, যুগ-যুগন্ধর-অক্ষ নিয়ে, সেটি ভূমিতলে ভেঙে পড়ে গেল এখানে-সেখানে, টুকরো টুকরো হয়ে।

৪। কর্ণ-বিদার ভীষণ এক মহারব! দূরে ছিটকে পড়ল পুরবাসীদের মন। তবে কি শিশুর কোনো আঘাত লেগেছে? ইতি

ভান হতেই বেদনার প্রথমে আতুর হয়ে পড়লেন তাঁরা। তার পরে চঞ্চলা মনের মতই উৎকণ্ঠায় জর্জরিত হয়ে দৌড়তে দৌড়তে পৌঁছে গেলেন লীলাশিশুর সমীপে। পৌঁছেই অবাক! বেশ কিছুক্ষণ পরে মুখে ফুটল সকলের—

"এ তো বড় আশ্চর্যের। এতকাল ধরে এইখানেই এইভাবেই রয়েছে শকটখানি, ঘরের মধ্যেই রয়েছে নিস্পন্দ, নির্ব্যাহত, মঙ্গলস্বরূপ আজ হঠাৎ কেন ভাঙল? ভাঙবার কোনো যন্ত্রপাতিও ঘরে পড়ে নেই! হঠাৎ এ আবার কোন সংকট উপস্থিত হল আমাদের।"

পুণ্যের জোর আছে বটে ছেলেটির। বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়েছেন ঘড়াগুলোর উপরে; ঘড়াগুলোও ঠিকরে পড়েছে ঘরের চৌদিকে, কিন্তু গা ছোঁয়নি ছেলের। তেমনই চুকচুক করছে কস্তুরীমাখা গা, এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি। আশ্চর্য্য! "হে ব্রজপুরেশ্বর, নিখিল সভার আপনি আর্য, সভার্যা আপনি শুভময়। বলিহারি যাই আপনার পূজার্হ সৌভাগ্যের। ফুলের স্তবকের মত আপনার সৌভাগ্য আজ বিকশিত হয়ে উঠেছে লক্ষ্মী-লতায়।"

পুরবাসীদের কথোপকথনের মধ্যে উপস্থিত হয়ে গেলেন গোপশিশুদের দল। লীলাশিশুর কাছাকাছিই তাঁরা ছিলেন। যা তাঁরা দেখেছেন, সমস্ত্র্যস্ত বলে গেলেন তাঁরা—

"বেচারীর কোনো দোষ নেই। ও শুধু কুক দিয়ে কেঁদে উঠেছিল। তারপর বাতাসে-নাচে না, স্থির পদ্মের কুঁড়ির মত, ঐ চরণ দুটি যেই না উপরমুখো ছুঁড়েছেন, সেই শকটখানার এই খান্ খান্ দশা। মাটিতে পড়ে গেল।"

গোপশিশুদের কথায় কারও কিন্তু শ্রদ্ধা হল না। তাঁরা স্থির সিদ্ধান্ত করলেন—নিশ্চিত এর কোনো অলক্ষ্য কারণ রয়েছে।

৫। এদিকে শকটখানির যখন পতন হয় তখন 'বাছার আমার কী হল' বলে আকস্মিক শঙ্কায় সংজ্ঞাহারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন ব্রজরাজমহিষী। পুরনারীদের সাহায্য নিয়ে রোহিণীদেবী সত্বর মাটি থেকে তাঁকে উঠিয়ে বসান; 'কুমারের কিছু হয়নি, ভাল আছে' ইত্যাদি খবর দিয়ে তাঁকে আশ্বস্তা করবার চেষ্টা করেন; কিন্তু মাকে ভোলানো কি এতই সহজ! শ্রীযশোদার কৃষ্ণ-কটাক্ষ তখন নয়ন-জলে ভেসে যাচ্ছে আর তিনি বলছেন—

"বাছা আমার ননীর চেয়েও নরম। সবে তিন মাসে পড়েছে। কি কষ্ট! তার কাছেই শকটখানা ভেঙে পড়ল? শুনেও আমি বেঁচে আছি? বজ্রের চেয়েও কঠিন আমার প্রাণ। ধিক্ আমার পুত্রস্নেহে। আমি যে নামেই মা, আজ তোরা সবাই তা বুঝে গেলি।

শকটখানা কী জোরেই না আওয়াজ করে ভাঙল! পৃথিবী কাঁপল, সবাই কালা হয়ে গেল। পড়ল ছেলের কাছে। বাছা আমার কী ভয়ই না পেল! ভয় বলে ভয়। এখানে বসে··· মনে করলেও ··অবাক হয়ে যাচ্ছি,···বাছা আমার বেঁচে আছে। শুধু ব্রজপতির ভাগ্যের জোরেই ফল ফলাতে পারল না আমার মত মায়ের পোড়া কপাল।"

৬। চোখের জল ফেলতে ফেলতে লীলাশিশুর ঘরের দিকে ধেয়ে চললেন সাধ্বী। তাঁর সাথী হয়ে ছুটল··তাঁর ভয়, তাঁর ব্যাকুলতা, তাঁর বিধুরতা। কিন্তু ঐ বিধুরও রূপ-চোর একখানি মুখ ভেসে উঠল, দেখা দিল দূর থেকে। আহা, চোখ যে মায়ের ভরে যায়!

ব্রজেশ্বরী কোলে তুলে নিলেন ছেলেকে। সৌন্দর্য্য যেন তাতে রোপণ করে গেছে সৌভাগ্যের ধান। আর সঙ্গে সঙ্গে, দেখবার মত হয়ে উঠল ব্রজমহিষীর মাধুরিমাও। যেন মান তার বেড়ে গেল এবং তুষ্ট হয়ে চিন্তার বাইরে পাঠিয়ে দিল তাঁর মনকে।

৭। প্রথমে তরঙ্গিত হয়ে উঠল মঙ্গলস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠান, শেষে শান্তিজল ছিটোনো হল লীলাশিশুর মাথায়। স্বতেজ গরিমার আলোয় আলো হয়ে ফুটে উঠলেন শিশু। মা যশোদার বুক থেকে তখন দুধ ঝরছে,···স্নেহের ধারার মত। যিনি নর-সঙ্কাশ পরব্রহ্ম, যিনি মূর্ত্ত হয়েও অমূর্ত্ত, সেই লীলাশিশুকে···আহা, তাঁর মাথাখানি কী সুন্দর ভাড়া ভাড়া নতুন চুলে ভরা, স্তনরস পান করিয়ে দিলেন মা। দুধ খাইয়ে শ্রীযশোদার মনে হল, ঘুম আসছে ছেলের। তখন তিনি আর একটি রচনা করলেন শয়ন। দুহাত দিয়ে আদর করে বুকে জড়িয়ে নিয়ে ছেলেকে শুইয়ে দিলেন তাতে।

ছেলেও ঘুমোলো, আর ওদিকে ততক্ষণে রোহিণী—যিনি বসুদেবভার্য্যা এবং ব্রজপুরীর দিব্যবিভা আর্য্যা···তিনিও মহোৎসব মিলিতা ব্রজললনাদের আমন্ত্রণ করে সমাপ্ত করে ফেললেন অপরিমিত মঙ্গলপূজার অবশিষ্টভাগ। ঘোষাধীশ শ্রীনন্দও ইত্যবসরে কৌলিক প্রথানুসারে শকটটিকে পুনর্বার যথাস্থানে স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন। মঙ্গল স্বস্তি পাঠ করতে লাগলেন কয়েকটি পৃথ্বীদেব ব্রাহ্মণ।

৮। তারপর একদিন, সময়টি তখন রসময়, অলিন্দে নিবিড়ঘন হয়ে ঝরছে মণি কিরণ, বালকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে, খেলা দিচ্ছিলেন জননী শ্রীযশোদা সানন্দে। শ্রীযশোদার অঙ্গেও সে সময় যেন উথলে উঠেছিল শ্রীযশ: আর দয়া। ছেলে মানুষ করার পদ্ধতি অধুনা তাঁর নখদর্পণে।

এদিকে প্রমাণ মত বড়টি হবার সঙ্গে সঙ্গে লীলাশিশুর ধীশক্তিটিরও তখন ক্রমোন্নতি ঘটেছে। মায়ার তিনি আর অধীন নন, মায়াই এখন তাঁর অধীন। সৌন্দর্য্যের সংযোগ হওয়াতে তিনি এখন যথাক্রমে দান ও আদান করেন অভিষঙ্গ, অনুরাগ এবং রুচি। রুচির প্রেরণায় মানুষের ছেলের মতই লীলা করেন। জ্ঞানঘন সুবিজ্ঞ হয়ে উঠেছেন তিনি। সংসার-দুঃখ যেমন দূর করে দেন, তেমনি আবার অজ্ঞদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে প্রকাশ করেও বসেন নিজের প্রাকৃত চরিত। অতএব এখন আর তর্কই ওঠে না লীলাশিশুটির কোনো কীর্ত্তি-কলাপ নিয়ে।

জননী শ্রীযশোদা তাঁকে খেলা দিচ্ছেলেন; এমন সময় বালকৃষ্ণের যথার্থ জ্ঞান হোলো। তিনি সম্যক বুঝতে পারলেন দানব আসছে। ঝঞ্ঝার মূর্ত্তি ধরে আকাশ সাঁতরাতে সাঁতরাতে দানব আসছে। অমনি তাঁর লড়াই করে বধ করবার ইচ্ছে হল ভবিষ্যৎ আক্রমণকারীকে। বালকৃষ্ণ তাই বিতানের মত বিছিয়ে দিলেন নিজের নবীন গরিমা।

৯। আমার জন্যে মা কেন আজ ঝড়ের হাতে কষ্ট পেতে যাবেন? এই কথাটি ভেবে নিয়েই মায়ের কোলে বসেই তিনি ভারী হয়ে উঠতে লাগলেন ওজনে। এত ছোটটির অত ভার? ক্রমে কিন্তু দুর্বহ হয়ে উঠলেন তিনি।

১০। যিনি অ-পীড়িতা বিশ্বের সেই মাতা শ্রীযশোদা পুত্রের এই

অদ্ভুত আক্রমণে পীড়িতা হয়ে উঠলেন। বাৎসল্যের লতা যেন নুয়ে পড়ল কলের গুরুভার। ঐ দেখ, টিপ্‌নি দিয়ে ছেলে এবার কোল থেকে গড়িয়ে পড়বে না তো? পড়ল ব'লে। তাই তিনি আত্মবেগে ধরলেন তাঁর ছেলেটিকে···যিনি অদ্বিতীয় রসস্বরূপ, যিনি জানেন রস, তাকে কোল থেকে নামিয়ে নিয়ে বসিয়ে দিলেন পার্শ্বে।

১১। "শ্রীভগবানের স্বচ্ছ ইচ্ছায় আপনার পুত্রটির দেহভার বৃদ্ধিলাভ করেছে···" ইতি জানিয়ে অবিবেক যেন সশব্দে হাসিয়ে দিল তাঁর মনখানিকে। কোনো দুশ্চিন্তাই পশতে দিল না তাঁর মস্তিষ্কে। এমন কি, ছেলে ছেড়ে শ্রীযশোদা, কী দারুণ দুঃসময়টাই না আসছে বুঝতে না পেরে চলে গেলেন অন্দরে। একি তাঁর মনের ভুল? না, না, তাঁর কিন্তু মনে হল তিনি যেন সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছেন তাঁর বালকৃষ্ণকে ঐ তাঁর অসীম প্রভাবত্বটিকে।

ঘরে ঢুকে ভিন্ন-কাজে ব্যাপৃতা হয়ে রয়েছেন ব্রজরাজ-মহিষী, সেই অবসরে পাঞ্চভৌতিক জগৎটাকে যেন পঞ্চনৈক-ভৌতিক করতে করতে ভ্রমর-ডাকা সেই অলিন্দে আবির্ভূত হলেন মহাদানব "তৃণাবর্ত্ত"। মহারাজ কংসের তিনি প্রতিনিধি।

ঝড়ের দানব এলেন,—বিরহিণী পাতাল-নাগিনীদের দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত; তিনি এলেন, মহাকাল-কর্মকারের ভূ-ভস্ত্রা থেকে হঠাৎ যেন বেরিয়ে এল একটা দুর্দান্ত উচ্ছ্বাস; তিনি এলেন, দিকবারণগুলো যেন একসঙ্গে তাদের কুলোর মত কানগুলোকে আস্ফালন করল, আর ভয়ে কেঁপে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ল সারা আকাশ।

ঝঞ্ঝাত্মক হলে হবে কি, দানব তৃণাবর্ত্ত যেন পিত্ত ও কফের ব্যাধির মত রজোবাহুল্য ও তমোবাহুল্যের সংহতি নিয়ে উদয় হলেন। মদের মত বিশ্বলোচন অন্ধ করতে করতে, দুর্জ্জয় অসুর খলের মত বহিঃপৃষ্ঠে মিশ্রীর কঙ্কর বর্ষাতে বর্ষাতে, পিত্তজ্বরের মত মহাবেগে তিনি এলেন। সংগ্রামের মত এলেন, একদল কালো মাদী হাতী যেন রণভূমি অন্ধকার করে উদ্দাম হানল অভিঘাত।

উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে, এক একটা ঘূর্ণীর মধ্যে পাক দিয়ে দিয়ে, খড়কুটো পথের ধূলো প্রচুর প্রচুর দূর আকাশে নাচিয়ে নাচিয়ে ছুঁড়তে ছুঁড়তে, মানুষের দেহগুলোকে গ্লানিতে ভরিয়ে দিতে দিতে, আবির্ভূত হলেন এই বাত্যাবিবর্ত্ত। প্রলয়কাল যেন এসে গেল অনন্ত নাগের বদন-বৃাহে যেন জ্বলে উঠল আগুন; আর সেই অগ্নিদেহী দেবতাই যেন পাতাল থেকে পৃথিবী ভেদ করে উপরে পাঠিয়ে দিলেন, এই ধূম্রস্তবকটিকে, অন্ধ করে দিতে মনুষ্যের চক্ষু।

ঐ আসছেন মহানিল অসুর, নিজেই আসছেন নিজের বিনাশ কারণের দিকে; তাঁকে বিস্তীর্ণ হতে দাও,—এই বিচার করে শ্রীবালকৃষ্ণ প্রভু যেন আর ততটা বিস্তার করলেন না নিজের গরিমা।

১২। সেই প্রগাঢ় অন্ধকারে নিতান্ত অন্ধের মত যেন টলতে লাগলেন পুরবাসীরা। প্রাণবিঘাতক হয়ে উঠল ধূলিকঙ্করতৃণের প্রচণ্ড বর্ষণ। কপাট পড়ে গেল ব্রজধামের প্রতি ঘরে। সকলে ভাবতে বসলেন কী করা যায়। কিন্তু অকুতোভয়ের আবার ভয় কোথায়? মা যেখানে বসিয়ে গেছেন, ঠিক সেইখানটিতেই বসে রইলেন বালকৃষ্ণ।

মহাদানব তাঁকে দেখতে পেলেন। ওঃ হোঃ, একটা শিশু, পদ্মসুন্দর দুটো চোখ, পদ্মগন্ধি দুটো হাত, পদ্ম-নিন্দি দুটো পা!

তারপরেই দৈত্য হরণ করলেন তাঁকে। সংগ্রামদৃপ্ত দানবদের যিনি যম, তাঁকেই যেন নিজের বিনাশরথে উড়িয়ে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে গেলেন তৃণাবর্ত্ত।

১৩। এবং সেই বালব্রহ্ম···রুদ্রাদিকে যিনি দান করেন সেবাধর্ম···তাঁর কিন্তু বেদনা-বোধ হল না এতটুকুও। অধিকন্তু তিনি প্রকট করলেন তাঁর আনন্দ-গন্ধ। তিনি উদ্ধুর হয়ে উঠলেন দানব-বধের সোৎসাহ-হর্ষে।

বস্ত্রাঞ্চলে আগুন বেঁধে নিয়ে, বা কণ্ঠ-শোধনের জন্যে কালকূটকে কণ্ঠে জড়িয়ে নিয়ে, নেমন্তন্ন-করে-নিয়ে-আসা মৃত্যুর মত লীলা-শিশুটিকে বইতে বইতে, টলতে টলতে যখন ছুটে চলেছেন মহাদানব তখন, ঘূর্ণীর সোপান বেয়ে বালকৃষ্ণ-প্রভুটিও উর্দ্ধে উঠে গেলেন কিয়দ্দূর। ভাবটি যেন সুরনারীদের নয়নের আতঙ্ক মোচনের জন্যেই স্বর্গের দিকে তাঁর এই উল্লম্ফন। তারপরে দু'খণ্ড বলয় দিয়ে···কী সুন্দর সেই বলয়, যেন মৃগমদ লেপে শ্যামল হয়ে গেছে মৃণালের দুগাছি লতা,···তিনি কিঞ্চিৎ লীলাভরেই ধীরে ধীরে মর্দ্দন করতে লাগলেন দানবের কণ্ঠমণিটিকে। তখন ধীরে ধীরে, যাতে করে তাঁর প্রাণবায়ুগুলি বিলম্বে বেরোতে বেরোতে অধঃপতিত হয়ে যায় চূর্ণবৎ পিষ্ট হয়ে। ও এক অভিনব চতুর খেলা শ্রীভগবানের অপূর্ব কৌশল খেলার শিশুর!

১৪। মহাদানবের বিযুক্ত হল প্রাণ কিন্তু শ্রীভগবানের অঙ্গসঙ্গ-মাহাত্ম্য যুগপৎ বিলীন হয়ে গেল তাঁর সৌভাগ্য। আবেগের বেগে দৈত্য উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন বটে শত্রুতার, কিন্তু শ্রীভগবানের অঙ্গ-সঙ্গের এতই মহিমা যে এক পলকেই অধিকতর উৎকর্ষলাভ করে বসল দানব-দেহ। তারপরে কঙ্করধূলিবর্ষী ঝঞ্ঝার মূর্ত্তিতে, স্বকুল পবিত্র করে তৃণাবর্ত্ত যখন আকাশ চিরে পড়তে লাগলেন ধরণীর অভিমুখে তখন কিন্তু তাঁর কণ্ঠটিকে ত্যাগ করলেন না বালকৃষ্ণ। তিনি জড়িয়ে রইলেন কণ্ঠ···নীল মণিহারের মত! ভূতলেই পড়লেন, কিন্তু ভূতল স্পর্শের বেদনা অনুভব করলেন না বালকৃষ্ণ।

ছেলেকে দেখতে না পেয়ে শোকে শুকিয়ে গিয়েছিল মায়ের মন। তাই ঘূর্ণাবর্ত্ত শান্ত হতেই প্রচণ্ড আঘাত পেল তাঁর ধী-শক্তি। তিনি হাত ধরে ফেললেন সহচরী মূর্চ্ছার। ধৈর্য্যহারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ব্রজপুরের রাজমহিষী।

১৫। দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন পুরস্ত্রীরা। জীবন রয়েছে···অনুমান মাত্র হয়, এতই ক্ষীণ বইছে তখন শ্বাস। জ্ঞান ফেরাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন সকলে কিন্তু তাঁদের প্রাণেও যে তখন শোকের আগুন জ্বলছে। ব্রজরাণীর মুখে জলের ছিটে দিতে দিতে তাঁরা একে একে বলতে লাগলেন—

[ক্রমশঃ।

# বেগম সমরু

শ্রীকুঞ্জবিহারী সাহা

সময়—দিল্লীর জগদ্বিখ্যাত মোগল সাম্রাজ্যের অবসানকাল। তক্তভাউস-হারা-সম্রাট সাহ আলম অকর্ম্মণ্য, ভোগবিলাস-মুগ্ন। মন্ত্রিগণ স্বার্থপর, স্বেচ্ছাচারী, কর্ত্তব্যবিমুখ, ক্ষমতা-লোলুপ, ল-কান্দাহার-বেলুচিস্তান-আর্য্যাবর্ত্ত-দাক্ষিণাত্য বিজয়ী দুর্জ্জয় সাহসী গণ এক্ষণে অলস, দুর্ব্বল—যেন জরাগ্রস্ত! চতুর্দ্দিকে কেবল খলা;—দুর্গন্ধযুক্ত-বিকৃত শব লইয়া গৃধ-গৃধিনী,—শৃগাল-কুক্কুর প কাড়াকাড়ি করিতে মত্ত হয়, তদ্রূপ পতনোন্মুখ নামমাত্র াজ্যটুকু লইয়া শক্তিমানদের মধ্যে কাড়াকাড়ি চলিতেছে! রূপ সময়ে ভারতের এক প্রান্তে এক ক্ষণজন্মা নারীর আবির্ভাব হয়। তার নাম জেবল উন্নিসা—কিন্তু তিনি 'বেগম সমরু' নামেই ধিক পরিচিতা ছিলেন। তিনি ছিলেন যেমন এক দিকে অসামান্যা লাবণ্যবতী, অন্য দিকে তেমনি ছিলেন অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি-লিনী ও অতুলনীয়া প্রতিভার অধিকারিণী। তাঁহার স্থান ছিল ারণ নারীসমাজের বহু উর্দ্ধে।

যে যুগে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক গগনে মহাপ্রলয়ের তাণ্ডব-লা চলিতেছিল, যে যুগে মোগল, পাঠান, রোহিলা, মারাঠা, ঠ, শিখ, রাজপুত ও ইংরাজ সকলেই স্ব স্ব শক্তি পরীক্ষা ও ক্ষমতার তিদ্বন্দ্বিতায় উন্মত্ত—কেহ বা আত্মপ্রতিষ্ঠা সহ প্রভুত্ব লাভের দাম-লালসায়,—কেহ বা বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষা ও চিরোজ্জ্বল বংশ-রীরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত। বিশেষতঃ, প্রবল-রাক্রান্ত মারাঠার রণহুঙ্কারে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত এবং বিদেশী নিকগণের সর্ব্বনাশা কুটিল ভেদনীতির কৌশল-জালে ভারতের ক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত সমাচ্ছন্ন। এমনি সময়ে বেগম সমরুর াবির্ভাব হয় কর্ম্মক্ষেত্রে;—ইহা প্রত্যাশিত কি অপ্রত্যাশিত, তাহা বোধ্য বিষয়!

ইনি ছিলেন অভিজ্ঞান্। ইঁহার জন্ম ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে—ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক নিভৃত পল্লীতে। প্রকৃতি-মাতার স্নেহোপহারস্বরূপ তিনি অপরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য-সহ ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে। তাঁহার পিতা লতিফ আলি খাঁর চরম আর্থিক অভাব-অনটন হেতু ও স্বীয় দুর্ভাগ্যের বিষম পরিহাস ও বিড়ম্বনায় তাঁহার বাল্যকাল হয় বিপর্য্যস্ত। তাঁহার পিতার পরলোক গমনানন্তর তাঁহার অসহায়া জননী বালিকা কন্যাকে লইয়া অতিশয় বিপন্না হইয়া পড়েন। এই দুঃসময়ে একদা আশার কুহকমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তিনি সপ্তদশবর্ষীয়া কন্যা সহ রাজধানী দিল্লী-নগরীতে উপস্থিত হইবামাত্র ভগবৎকৃপায় অপ্রত্যাশিত ভাবে এক বিদেশী অভিজাতের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়া তদীয় করুণা লাভে সমর্থা হন। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া মাতা ও কন্যার ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। ক্রমে এই পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িলে নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা সপ্তদশী তরুণীর অলোকসামান্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া এই বিদেশী শুভানুধ্যায়ী তাঁহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন—অন্যমতে যথাশাস্ত্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ বিদ্যমান।

সমরু ছিলেন উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম ও অস্থির প্রকৃতির লোক। কর্ম্মজীবনের প্রথম হইতে নানা স্থানে নানা কর্ম্মে চ[illegible] করিয়া অবশেষে দিল্লী সহরে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রী নাজফ খাঁর [illegible] ভাজনের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং স্বল্পকাল মধ্যে সম্রাটের সুনজরে পড়েন। তাঁহার সাহস ও বীরত্বের খ্যাতি অবগত হইয়া তিনি (সম্রাট) তাঁহাকে সতত তাঁহার আদেশাধীন একদল সৈন্য পোষণের জন্য দিল্লীর চল্লিশ মাইল দূরে একটি সমৃদ্ধ জায়গীর প্রদান করেন। যুদ্ধবিদ্যায় সমরুর প্রকৃতপক্ষে প্রশংসনীয় নিপুণতা ছিল না অধিকন্তু তাঁহার নৈতিক চরিত্র ছিল অনেকটা জঘন্য। তিনি ছিলেন যেমন অর্দ্ধশিক্ষিত, তেমনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও হীন-চরিত্র। তথাপি তাঁহার দুর্জ্জয় সাহসই তাঁহার সৌভাগ্যের মূল কারণ ছিল। তিনি তাঁহার অধীন সৈনিকদের প্রতি অতিশয় সদয় ছিলেন ও তাহাদের অভাব-অভিযোগ সুখ-সুবিধার দিকে তাঁহার লক্ষ্য ও সুব্যবস্থা ছিল যথোচিত ভাবে। এই গুণেই তিনি সৈনিকগণের প্রিয়ভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রীত্যর্থে তাহারা না করিতে পারিত এমন কার্য্যই ছিল না। তাঁহার জায়গীরের অবস্থান ছিল মীরাটের সন্নিকটে ও তাঁহার বার্ষিক আয় ছিল অন্যূন ছয় লক্ষ মুদ্রা। তিনি অনেক সময়েই সম্রাট-দরবারে হাজির থাকিতেন। তাঁহার জাঁক-জমকেরও কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রথমা বর্ত্তমানেই তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন এবং দ্বিতীয়া পত্নী বেগম সমরুকে প্রাণ-মন দিয়া ভালবাসিতেন। সুখের বিষয়, প্রথমা স্ত্রী অধিককাল জীবিত ছিলেন না। তিনি জীবিতকালে স্বামীর নিকট কিরূপ আচরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। কিন্তু অশেষ গুণবতী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বেগম সমরু অচিরাৎ দুর্দ্দমনীয় স্বামীকে সুকৌশলে স্ববশে আনয়ন করিতে সক্ষম হন। উচ্ছৃঙ্খল সমরু এক্ষণে তাঁহার প্রণয় ও গুণমুগ্ধ হইয়া মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য বিষধরবৎ সম্পূর্ণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে সংসারী হইলেন। তিনি অশেষগুণান্বিতা বেগম সাহেবার অগাধ প্রেমে বিভোর হইয়া যুদ্ধকার্য্য চিরতরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যদল সহ আগ্রার শাসনভার ও স্বীয় জায়গীর পরিচালনের সমস্ত কর্তৃত্বভার প্রিয়তমা পত্নীর হস্তে সানন্দে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে পরম শান্তিতে পত্নীপ্রেমে মগ্ন হইয়া রহিলেন। কিন্তু এই সুখ তাঁহার ভাগ্যে অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে (অন্য মতে ১৮৭৬ খৃঃ) আগ্রা সহরে তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। বেগম সমরুর গর্ভে তাঁহার কোন সন্তান হয় নাই।

স্বামীর মৃত্যুর পর সম্রাট-দরবারে স্বনাম জারি ও জায়গীরের সনন্দপ্রাপ্তির জন্য তিনি যথারীতি উপঢৌকনাদি সহ আর্জ্জি পেশ করিলেন। তাঁহার সৈনিক-কর্ম্মচারিগণও তাঁহারই অনুকূলে দিল্লী দরবারে যথোচিত ভাবে আবেদন নিবেদন ও তদ্বির করিলেন। সম্রাট ভাবিয়া চিন্তিয়া বেগম সাহেবাকে সমরুর প্রদত্ত সর্ত্তাধীনে তাঁহার জায়গীরের রাজকীয় সনন্দ ও গদী দান করিলেন। অভিলষিত সনন্দ সহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তিনি সৈনিকদিগকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিয়া খুশি করিলেন। অতঃপর

তিনি সপত্নীপুত্র জাফর ইয়ার খাঁ সমভিব্যাহারে আগ্রা সহরে খৃষ্ট-ধর্ম্ম-যাজকের নিকট খৃষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

তিনি খুব যোগ্যতার সহিত ও সুচারুরূপে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন। জর্জ টমাস নামক জনৈক আইরিশ জাতীয় অধিনায়ক প্রশংসনীয় সমর-কৌশল প্রদর্শন দ্বারা—সমরুর জীবিতকালেই সৈন্যদলে সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত ও অতীব প্রভাবশালী হন। বেগম সমরুরও তিনি প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হন। তাঁহার সুশিক্ষার গুণে বেগম সাহেবার সৈন্যদল পাশ্চাত্যের সমর-কৌশলে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ভারতের তদানীন্তন অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৈন্য-দলের খ্যাতি ও মর্য্যাদার আসনে উন্নীত হয়। এই হেতু সৈন্যদলে তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মৃত প্রভুর ন্যায় তিনিও অচিরকাল মধ্যে সৈনিকদের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন। সৈন্যদলে 'লেভা-সুসত' নামক জনৈক সুদর্শন ও সুযোগ্য ফরাসী কর্মচারী ছিলেন। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশার মাধ্যমে বেগম সাহেবা তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্তা হন এবং প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার সহিত বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করিলে সৈনিকদের বিরাগের কারণ ঘটে; এই ভয়ে উভয়ে গোপনে খৃষ্টধর্ম্মানুমোদিত প্রথায় উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এই ব্যাপার সাধারণে এবং সৈন্যদলে অজ্ঞাত থাকিলেও তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ও আচার-ব্যবহারে তাঁহাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ক্রমে উভয়ের আচরণ অবৈধ, দূষণীয় এবং নিন্দনীয়রূপে পরিগণিত হয়। এই দৃষ্টিকটু বিষয় উপলক্ষ করিয়া বেশ কানাকানি চলিতে চলিতে অবশেষে সৈনিকগণ সহ স্বয়ং টমাসের ঐ অবৈধ ব্যাপারের বিরুদ্ধে মৌন প্রতিবাদ মূর্ত্ত হইয়া উঠে। তাঁহাদের আচরণে ও কার্য্যে এই তীব্র প্রতিবাদ বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াও যখন নিষ্ফল হয় এবং ভোজসভায় (খানার টেবিলে) টমাসের চিরদিনের প্রাপ্য আসন ও উপস্থিতি নূতন স্বামীর ইচ্ছা ও নির্দ্দেশক্রমে নিষিদ্ধ হয়, তখন বিক্ষুব্ধ সৈন্যদলে অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতে থাকে। তাঁহাদের প্রিয় মৃত প্রভুর সম্মান ও মর্য্যাদাহানিকর এই দুষ্ট কার্য্য তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন কি? তজ্জন্য তাঁহারা যথোপযুক্ত প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

অবিলম্বে ধূমায়িত বহ্নিতে ফুৎকার দান করিল তাঁহার আর একটি অবিবেচনার কার্য্য। যখন টমাসের বন্ধু ও প্রিয়পাত্র 'লিগোইস্' নামক জনৈক জার্ম্মাণ সামরিক কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিয়া বিতাড়িত করা হইল টমাসের অজ্ঞাতসারে ও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তখন বিক্ষুব্ধ সেনানায়ক টমাসের প্ররোচনায় সৈন্যদলে সহসা বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইল। বুদ্ধিমতী বেগম সাহেবার পুনর্বিবাহের মধ্যে অবিমৃষ্যকারিতা ও চিত্তদৌর্ব্বল্যের যে অপরাধ ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার ন্যায় সুস্থিরমতী নারীর পক্ষে আপাত দৃষ্টিতে একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। তিনি সুনি স্থির চরিত্রের নারী হইয়াও সাময়িক প্রকৃতির উন্মাদনাকে স্ববশে আনয়ন করিতে অসমর্থতা হেতু যে মহাভ্রম ও স্বল্পবুদ্ধির কার্য্য করেন তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে করিতে হয় অচিরাৎ; তাঁহারই বেতনভুক সৈনিকদের হস্তে অকথ্য লাঞ্ছনা ও নিষ্ঠুর নিপীড়ন দ্বারায়। শেষকালে তাঁহার দ্বিতীয় স্বামীও উত্তেজিত সৈন্যদলের হস্তে অসহ্য অবমাননা ও নির্য্যাতন ভোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে গিয়া মনের গ্লানিতে সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ আত্মহত্যা করেন। অবশেষে চরম নির্য্যাতিতা বেগম সাহেবা আত্মগ্লানিতে [illegible] হইয়া লজ্জা-সরম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যোপায় হইয়া [illegible] অনুশোচনা প্রকাশান্তে দূত দ্বারা টমাসের নিকট কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া করুণাপ্রার্থিনী হইলেন। প্রভুপত্নীর করুণ আবেদনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ টমাসের কঠোর হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তাঁহার দুর্দ্দশা মোচন করিয়া দিয়া তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলা হইলেন যে, তাহাকে তাঁহার প্রথম স্বামী সমরুর স্মৃতিধারণ ও তৎপ্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শনস্বরূপ বেগম সমরু নাম গ্রহণ করিতে হইবে ও তাহার সপত্নীপুত্র জাফর [illegible] (ডাইসকে) পিতার স্মৃতি ধারণ করিবার জন্য 'সমরু' [illegible] গ্রহণ করিতে হইবে। এই ঘটনায় টমাসের হৃদয়ে ব্যক্তিগত [illegible] স্থান লাভ করিয়াছিল প্রভুভক্তি। বেগম সাহেবা স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা হইয়া স্বীয় রাজধানী সরধানা ও স্বরাজ্যের উন্নতি[illegible] এবং সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করণার্থে সর্ব্বাগ্রে মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন তৎকালে ভারত-রাজ-নৈতিক-গগনে [illegible]। তাঁহার সামরিক শক্তি ও শ্রেষ্ঠ সমরকৌশলের খ্যাতি [illegible] হইয়া পড়ে যে, তৎকালীন পরাক্রান্ত যুধ্যমান শক্তি সমূহ [illegible] সাহায্যলাভে সতত উন্মুখ হইয়া উঠেন। অনুরূপ [illegible] বৃদ্ধি করিয়া আশানুরূপ বল সঞ্চয়ান্তে [illegible] দুর্য্যোগপূর্ণ রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হন।

এই সময়ে দিল্লীতে সিন্ধিয়ার প্রভাব [illegible] প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ শক্তি [illegible] শাসনকর্ত্তা গোলাম কাদির পরাক্রমশালী [illegible] দিল্লী [illegible] করিয়াছেন। সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি [illegible] রাজধানী রক্ষা করিবার কর্ত্তব্য-কার্য্যে বিমুখ হইয়া [illegible] কাদির বিনা বাধায় রাজধানী প্রবেশ [illegible] করিবার জন্য গুরুতরভাবে নির্য্যাতন চালাইতে [illegible] আমির-উল-উমরার পদ প্রদান করিতে [illegible]। এই অবস্থায় বিপন্ন সম্রাটকে তাঁহারই অনুপুষ্ট [illegible] মুক্ত করিবার জন্য বেগম সাহেবা [illegible] ত্বরিতগতিতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। [illegible] গোলাম কাদের তাঁহাকে শান্ত ও [illegible] নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন যে, [illegible] দিল্লী শাসন কর্ত্তৃত্ব পরিচালন করা হউক। [illegible] রাজধানী এই হীন প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান [illegible] প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ সম্রাটকে আশ্রয় [illegible] করিয়া তাঁহার অধিকতর প্রিয়পাত্রী হইতে সমর্থ হন। সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সরধানা ব্যতীত আরও [illegible] পরগণার জায়গীর দান সহ বহু সম্মানে বিভূষিতা করেন।

কিয়ৎকাল পরে নাজফ খাঁ বিদ্রোহী হইয়া সম্রাটের বি[illegible] অনুধাবন করেন। সম্রাট তাঁহাকে বাধাদান করিতে গিয়া [illegible] গোকুলগড় দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। [illegible] সাহেবা স্বীয় দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী সহ বায়ুবেগে অভিযান করিয়া গোকুল[illegible] উপস্থিত হন। তিনি প্রথমতঃ শিবিকারোহণে সৈন্য পরিচালনা করিতে থাকেন। অবশেষে প্রয়োজন কালে যখন শিবিকা

য়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন হার দুর্জ্জয় সৈন্যগণ, যেন আসুরিক শক্তিতে মত্ত হইয়া ভীমবেগে ক্ষ বীর বাহিনীর উপর আপতিত হয় এবং তাঁহাকে পরাজিত য়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইতে হয়। সম্রাট মুক্তি লাভ করিবামাত্র উদানে এই বীরাঙ্গনাকে রাজানুগত্যের পুরস্কারস্বরূপ জেবল-উন্নিসা ং রমণীরত্ন এই মহাগৌরবান্বিত উপাধিতে ভূষিতা করিয়াই স্ত হন না। তদীয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠায় প্রীত হইয়া বাৎসল্য-সিক্ত হৃদয়ে মহীয়সী নারীকে 'পুত্রী' বলিয়া স্বীকার করিয়া লন।

তাঁহার পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত পাঁচ দল সুশিক্ষিত ও সাহসী ন্য সতত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার সৈন্যদলে যথেষ্ট সংখ্যক শ্বারোহী সৈন্যেরও অভাব ছিল না। তাঁহার অস্ত্রাগার উৎকৃষ্ট মান ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। এই অপরূপ রূপ-বণ্যবতী রমণী বীরবেশে স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃত রাঙ্গনার ন্যায় অসীম সাহসের সহিত সৈন্য চালনা করিতেন। য়োজনানুসারে তিনি কখনও অশ্বারোহণে কখনও বা শিবিকারোহণে মূল্য উষ্ণীষ পরিহিতা ও পরিশোভিতা হইয়া বহির্গত হইতেন। নি স্বাধীন সম্রাজ্ঞীর ন্যায় অপ্রতিহত ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ম্বরণ ভোগ করিয়া গিয়াছেন।

ইনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত আসাই যুদ্ধে মারাঠা শক্তির পক্ষে লনান পূর্ব্বক অতুল বিক্রমের সহিত ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করেন ভাগ্যলক্ষ্মী তৎপ্রতি অপ্রসন্না হওয়ায় তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার রিতে হয়। জেনারেল লেক্ ইঁহার অসাধারণ সমর-কৌশল এবং অনন্য-ধারণ সাহস প্রত্যক্ষ করিয়া অতীব আশ্চর্য্য ও প্রীত হন। যুদ্ধাবসানে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হওয়ায় সেনাপতি লেক্ সানন্দে াকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া লন। ১৮০৪ খৃঃ অব্দে ভরতপুরস্থ বিরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সর্ত্তানুসারে তাঁহাকে ইংরাজ-প্রভুত্ব নিয়া লইতে হয় এবং একদল মাত্র সৈন্য আত্মরক্ষা ও স্বরাজ্য শাসন রাখিয়া অবশিষ্ট কয়েক দল সামরিক-বাহিনী বিদায় দিতে হয়। রাও সিং নামে তাঁহার এক বিশ্বাসী ও বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। রই সাহায্যে তিনি সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। াইয়ের যুদ্ধের পর তিনি নিজ রাজ্যের উন্নতিজনক কার্য্যে নিবেশ করিলেন। ইঁহার সহিত তদানীন্তন ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ন্ত ভার ব্যবহার করেন। ইঁহাকে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ণ পুলিশ বিভাগ ও সাধারণ আদালতের কর্তৃত্বাধীন হইতে দান করা হয়। অধিকন্তু ইঁহাকে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার দানের প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হয়। বেগম সাহেবাও এই অকৃত্রিম ার মর্য্যাদা আজীবন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ইংরাজ মেণ্টের এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সঞ্চিত বিপুল পদ (অন্যূন ৯০ লক্ষ মুদ্রা) তাঁহাদের হস্তে বিশ্বাস করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তিনি দিল্লী নগরীস্থিত প্রাসাদেই অধিকাংশ সময় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ছিলেন যেমন দিল্লীশ্বরের পরম স্নেহের পাত্রী, তেমনি রাজ প্রতিনিধির সর্ব্বথা বরণীয়া ও রক্ষণীয়া।

শেষ জীবনে তিনি যুদ্ধ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যের উন্নতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাগণকে সন্তানবৎ করিতেন। তাহাদের মঙ্গলের জন্ম তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহার চেষ্টা ও যত্নে সরধানা ধন-জন-পূর্ণ সমৃদ্ধ সহরে পরিণত হয়। সহরের মধ্যস্থলে তিনি একটি সুন্দর ও সুসজ্জিত গঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সন্নিকটে এক বহুবিস্তৃত মাটির কেল্লা নির্ম্মাণ করান। তন্মধ্যে তাঁহার অস্ত্রাগার অবস্থিত ছিল। দুর্গ মধ্যে দেশীয় গঠনের এক সুন্দর বাসগৃহ ছিল—ইহা প্রাসাদোপম বলিলেই ঠিক হয়। এই গৃহে তাঁহার সেনানায়কগণ বাস করিতেন। নগরকেন্দ্রের অবশিষ্ট অংশ মৃন্ময় গৃহে পূর্ণ ছিল। সেনানিবাসের সন্নিকটে এক পুরাতন দুর্গও ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে উহার পরিবর্দ্ধন ও পুনঃসংস্করণ হইলেও তৎকালে উহা ব্যবহৃত হইত না।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের কথা, এক্ষণে তিনি সপ্তষষ্টিতম বয়স্কা ও বার্দ্ধক্যের জীর্ণতা বেশ অনুভব করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার দিল্লী নগরীস্থ সুরম্য প্রাসাদ পূর্ব্ববৎ সুসজ্জিত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও তিনি নিজ রাজধানীতে অধিকাংশ সময় বাস করিতে লাগিলেন। এখানে বিদেশীয় অনুকরণে নির্ম্মিত তাঁহার এক অপরূপ সুন্দর প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদ সংলগ্ন স্থানের পশ্চাতে বিস্তৃত অশ্বশালা ছিল। ইহার উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল পরিখাবেষ্টিত সুদৃঢ় দুর্গ। দুর্গমধ্যে সৈন্যদল বাস করিত। নগরের মধ্যস্থলে তিনি বহু ব্যয়ে এক গির্জ্জা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রোমান ক্যাথলিক মঠাধ্যক্ষের হস্তে উহার পরিচালন ভার প্রদত্ত হয়। বার্দ্ধক্য-ভারাবনত অবস্থাতেও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্টকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা ও সম্মান প্রদর্শন দ্বারা নিজেও বহু সম্মানিতা হন।

তাঁহার হস্তে তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যটুকু সভ্যতা ও সংস্কৃতির উচ্চশিখরে আরোহণ করে। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারায় তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন সুন্দররূপে পরিচালিত হইত। তিনি ছিলেন প্রকৃত পক্ষে প্রজাবর্গের জননীস্বরূপা। তিনি রাজ্যের শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য ও ধর্ম্মোন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি নানা সৎকার্য্যে অজস্র অর্থ দান করিয়াছেন। পরোপকারে তিনি ছিলেন মুক্তহস্তা। তিনি বৃদ্ধ বয়সে অনবগুণ্ঠিতা হইয়াই সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইতেন। তিনি ইউরোপীয় সামরিক কর্ম্মচারীদের সহিত অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া খানার টেবিলে সহ-ভোজন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। তিনি যে সঙ্গীতপ্রিয়া ছিলেন তাহা নানা ভাবে জানা যায়। ভোজন কালে বেতনভুক্ বাদকগণ মধুর গীতবাদ্যের সংলাপ দ্বারা তাঁহার ভোজনপর্ব্ব মাধুর্য্যপূর্ণ ও পরম উপভোগ্য করিত। তিনি সতত ধূমপানে রত থাকিতেন। তাঁহার সুবর্ণনির্ম্মিত আলবোলাস্থিত সুগন্ধি তাম্রকূট গন্ধে আকাশ-বাতাস ভরপুর হইত। তিনি যেমন ছিলেন অশেষ গুণবতী তেমনি ছিলেন দানশীলা ও প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইনি খৃষ্টধর্ম্মের জন্য প্রচুর অর্থসাহায্য করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার দানের পরিমাণ হইবে বহু লক্ষ মুদ্রা। ইনি সর্ব্বোচ্চ আভিজাত্যের অধিকারিণী এবং সর্ব্বোচ্চ পদাধিকারিণীর ন্যায় সমূহ সম্মানার্হা ছিলেন। তিনি অভিজাত ও উচ্চকর্ম্মচারীদিগকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিয়া বহু আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিতেন। অশীতি ঊর্দ্ধ বয়সে ১৮৩৬ খৃঃ অঃ ২৭শে জানুয়ারী এই মহীয়সী নারী পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে গভর্ণমেণ্ট হস্তে ইঁহার কিঞ্চিদূন কোটি মুদ্রা সঞ্চিত ছিল। তাহা হইতে কতকগুলি সদনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুত দানের নিমিত্ত আবশ্যক মুদ্রা ব্যয়িত হইবার পর অবশিষ্ট ধনরাশি তাঁহার সপত্নীপৌত্র ডাইস সম্বরকে (Dycc Sombre) উইল দ্বারা দান করিয়া যান।

# কুলু-মনালী উপত্যকা

শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছবিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, কুমারী এস পুরী ( এস. ডি. ও ), ডাঃ অমলেন্দু চক্রবর্তী, প্রভৃতি সহ পণ্ডিতজীকে ভুন্তার বিমান-বন্দরে দেখা যাচ্ছে। পণ্ডিতজীর মস্তকে স্থানীয় লোকদের দেওয়া একটি পাহাড়ী টুপি রয়েছে।

পাঠানকোট থেকে একটি রাস্তা কাশ্মীরের দিকে এবং অপরটি মণ্ডী হ'য়ে আমাদের গন্তব্য স্থান কুলু-মনালী পর্য্যন্ত চলে গেছে। দুইটিই প্রশস্ত পীচঢালা রাস্তা। এখান থেকে কুলুর দূরত্ব ১৭৬ মাইল, মনালী আরো ২৪ মাইল উত্তরে। এখান হ'তে দু' রকম উপায়ে কুলু যাওয়া যায়। ( ১ ) কাংরা উপত্যকা মিটার গেজ রেল-লাইনের ছোট ট্রেণে ক'রে যোগীনদর নগর পর্য্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে বাসযোগে কুলু যাওয়া চলে। কিম্বা ( ২ ) এখান হ'তে মণ্ডী হ'য়ে কুলু পর্য্যন্ত থ্রু-সার্ভিস বাসেও যাওয়া যায়। আমরা শেষোক্ত উপায়টিই বেছে নিলাম এবং ট্রেণ থেকে নেমেই উক্ত বাসে চারিটি সীট ১৩'৫০ টাকা হিসাবে মোট ৫৪৲ দিয়া ভাড়া করলাম। পরে ষ্টেশনেই কিছু জলযোগ ও চা পান ক'রে বাসে উঠলাম।

আমাদের বাস সকাল সাড়ে সাতটায় ছাড়ল। কিছুদূর পর্য্যন্ত সমতল রাস্তা অতিক্রম ক'রে আমরা শীঘ্রই পার্ব্বত্য পথে এসে পড়লাম। রাস্তাটি প্রশস্ত ও পাকা, দু'খানি গাড়ী অনায়াসে পাশাপাশি যাতায়াত করে। পথটি পাহাড়ের গা কেটে নির্ম্মিত। ইহার কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও বা সমতল। উভয় পার্শ্বে নানা শ্রেণীর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম। মাঝে মাঝে দু'-একটি পার্ব্বত্য নদী কল-কল স্বনে প্রবাহিত হ'চ্ছে! তাদের উপরে সুদৃঢ় সেতু। স্থানে স্থানে কৃষকদের গৃহাদি ও শস্যক্ষেত্র।

৪০ মাইল অতিক্রম ক'রে আমাদের বাস শাহপুর ( উচ্চতা ২৪০০ ফিট ) থামল। স্থানটি ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়েই দূরে ধবলধর গিরিমালার তুষার শুভ্র শৃঙ্গগুলি দেখা গেল। চমৎকার সে দৃশ্য!

রাস্তায় স্থানে স্থানে চা-বাগান রয়েছে। শাহপুর থেকে ৩২ মাইল দূরে পালামপুর ( উচ্চতা ৪০০০ ) ফিট স্থানটি সুন্দর, হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা, চারি দিক প্রাকৃতিক দৃশ্যবহুল। এখানে বাজার, হোটেল, স্কুল, হাসপাতাল, ডাকঘর, প্রভৃতি সবই আছে। অল্প দূরেই ক্যানেডিয়ান মিশনের গির্জ্জা-ঘর। মিশনের কর্ম্মীরা এখানে বহুবিধ জনহিতকর কাজ করেন। তাঁহারা মেয়েদের হাসপাতাল, কুষ্ঠ-চিকিৎসালয় অবৈতনিক স্কুল, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। আরো ১০ মাইল চলে আমরা বাইজনাথ ( উচ্চতা ৪১৫০ ফিট ) নামক স্থানে উপস্থিত হলাম। এখানকার একটি ছোট হোটেলে মধ্যাহ্ন আহার চাবল ( ভাত ), ফুলকা ( রুটি ) ও সবজি ( তরকারি ) খেয়ে বাকি ভ্রমণের জন্য বল সঞ্চয় ক'রে নিলাম। এখান থেকে ১৫ মাইল দূরে কাংরা উপত্যকা রেলপথের শেষ প্রান্ত, যোগীনদর নগর ( উচ্চতা ৩৮৮০ ফিট )। এই স্থানে একটি বিরাট জলবিদ্যুৎ কারখানা আছে। এখানকার উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি কুলু, মণ্ডী, ও অন্যান্য দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত হয়। শুনলাম, বিদ্যুতের কিছু অংশ পাকিস্থানেও যোগান দেওয়া হয়। চারিদিকে বেশ একটি ছোটখাট নগর গ'ড়ে উঠেছে। একটি সুউচ্চ পাহাড়ের উপরে উল নদীর জলরাশি এক বৃহদাকার জলাধারে জমা করা হয় ও সেই জল পাহাড়ের নিম্নভাগে প্রচণ্ড গতিতে প্রথমে সুড়ঙ্গপথে ও পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করান হয়। এ থেকেই বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে। পাহাড়ের উপর থেকে তলদেশ ও সেখান থেকে পুনরায় উপরে বিদ্যুৎচালিত হলেজ-ট্রাকগুলির উঠানামা দেখলে চমৎকৃত হ'তে হয়।

এখান থেকে আমাদের বাস ক্রমে উপরে উঠতে উঠতে ঘাট শনির কাছে প্রায় ৬০০০ ফিট চড়ায় এসে এইবার ঘুরে ঘুরে নামতে লাগল। আরো ৩৬ মাইল অতিক্রম করার পর আমরা অবশেষে ভিক্টোরিয়া ঝুলন পোলের উপর দিয়ে ব্যাস নদী ( R, Beas ) পার হ'য়ে মণ্ডী নগরের ( উচ্চতা ২৫০০ ফিট ) চৌথা বাজারের নিকট উপস্থিত হলাম। ইহা চারিটি জেলা বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার হিমাচল প্রদেশের মণ্ডী নামক অন্যতম জেলার সদর। এখানকার হোটেলগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পর্য্যটকদের পক্ষে খুবই আরামদায়ক। মণ্ডীর বিস্তৃত চতুষ্কোণ প্রান্তরের মধ্যস্থলে প্রাচীন রাজাদের নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড বাঁধান পুষ্করিণী আছে। ইহার পাশে একটি উচ্চ ঘড়িঘর দণ্ডায়মান।

মণ্ডীতে আমাদিগকে পাঠানকোটের বাসখানি ছেড়ে দিয়ে কুলু-মনালীগামী অপর একটি বাসে উঠতে হল। ইহা বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় ছাড়ল। এখান থেকে কুলু ( ঢালপুর ) ৪৩ মাইল। রাস্তাটি পাকা কিন্তু অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ,—একটিমাত্র বাস বা লরী যেতে পারে ( one way traffic )। বাস, লরী, জীপ প্রভৃতির পরিবহন নিয়ন্ত্রণের জন্য দু'-তিন জায়গায় পুলিশের চুঙ্গীআফিস আছে। রাস্তাটি ব্যাস নদীর ধারে ধারে পাহাড়গুলির কটিদেশ দিয়ে প্রসারিত। ইহার প্রথমাংশ বড়ই বন্ধুর, সঙ্কীর্ণ ও বিপজ্জনক। স্থানে স্থানে রাস্তাটি মেরামত হচ্ছে, কোথাও বা ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভেঙ্গে উহা চওড়া করা হচ্ছে। এইবার আমরা বজৌড়া নামক স্থানে এসে পড়লাম। ইহা কুলু থেকে মাত্র ৯ মাইল ও কুলু উপত্যকার প্রথম গ্রাম। অল্প দূরেই ভুঁই বা ভুণ্‌তার। এখানে একটি ছোটখাট বিমানবন্দর আছে। সম্প্রতি ( ২০-৫-১৯৫৮ ) আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুজী, দিল্লী থেকে প্লেনে এসে এইখানে অবতরণ করেন ও মোটরকারযোগে মনালী যান। আরো ৬ মাইল অতিক্রম ক'রে আমরা অবশেষে আমাদের গন্তব্য স্থান কুলুতে ( উচ্চতা ৪২০০ ফিট ) রাত্রি আটটার সময় পৌঁছিলাম।

কুলু উপত্যকা পাঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী কাংরা জেলার একটি মহকুমা। ইহা আয়তনে ৬৩০০ বর্গমাইল ও চারিটি তহশীলে বিভক্ত; যথা—কুলু, সিরাজ, লাহউল ও সিপটি। কুলুই মহকুমার

প্রশাসনিক কেন্দ্র। কুলুর তিনটি মহল্লা—ঢালপুর, সুলতানপুর ও আখেড়া বাজার। ঢালপুরেই কলেক্টরেট, আদালত, থানা, উচ্চ বিদ্যালয়, সিভিল হাসপাতাল, P. W. D. অফিস, বনবিভাগীয় অফিস, ডাকবাংলো, রেষ্ট হাউস, পর্য্যটন ব্যবস্থাপক অফিস (Tourist Bureau) ইত্যাদি এবং অফিসারদের বাংলোগুলি অবস্থিত। সুলতানপুর প্রাচীন কুলু রাজ্যের রাজধানী এবং আখেড়া বাজারে স্থানীয় বাজার, ব্যাঙ্ক, বাস, অফিস প্রভৃতি আছে। আমার চতুর্থা কন্যা ডাঃ মিনতি চক্রবর্ত্তী ও জামাতা ডাঃ অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী পাঞ্জাব প্রদেশের সরকারী ডাক্তার। তাঁহারা উভয়েই এক্ষণে কুলুর সিভিল হাসপাতালে নিযুক্ত। তাঁদের বাসাটি পাহাড়ের গায়ে নানা রংএর ফুল ও ফলগাছে ঘেরা একখানি ছবির মত সুন্দর বাংলো। বলা বাহুল্য, এইখানেই আমরা ছিলাম।

সমগ্র উপত্যকাটি হিমাচলের বিভিন্ন পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত ও ছোট ছোট সানুদেশে বিভক্ত। এগুলির মধ্য দিয়া ব্যাস, চন্দ্রা, পিন, পার্ব্বতী, শর্ব্বরী, সিপটি, ভাগা প্রভৃতি ছোট-বড় পার্ব্বত্য নদী ও নানা আকারের গিরিপ্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে। উপত্যকাটি কুলু ও সিরাজ থেকে ক্রমোন্নত হ'য়ে উত্তরে লাহউল ও সিপটির মধ্য দিয়ে তিব্বত পর্য্যন্ত প্রসারিত। কুলু ও লাহউলের মধ্যে রোটং গিরিবর্ত্ম ১৩,৪০০ ফিট উচ্চ। ইহার চারিদিকে চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতমালা। লাহউলে অনেকগুলি তুষারময় হ্রদও দৃষ্ট হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সব বরফের দেশের কোন কোন স্থানে আবার উষ্ণ নির্ঝরও দেখা যায়। ঢালপুর থেকে ২৬ মাইল দূরে মণিকরণ বা মণিকর্ণিতে একটি উষ্ণ নির্ঝর আছে। ইহার জল অবিরত ফুটছে। কিছু চাল কাপড়ে বেঁধে এই জলে নামিয়ে কয়েক মিনিট রাখলেই এগুলি সুসিদ্ধ হ'য়ে আহারোপযুক্ত হয়।

কুলুর জল-বায়ু খুবই স্বাস্থ্যকর, ঝর্ণার জল স্নিগ্ধ, সুপেয় ও ক্ষুধাবর্দ্ধক। এখানকার পানীয় জলে দার্জ্জিলিং-এর মত কাহারও হিল ডায়ারিয়া বা পার্ব্বত্য উদরাময় হয় না। তবে কাহারও কাহারও কোষ্ঠবদ্ধতা হয়। গ্রীষ্মের ক্লেশ আদৌ নাই, সকাল-সন্ধ্যায় ইতস্তত: পরিভ্রমণ অতীব আনন্দদায়ক। নৈসর্গিক দৃশ্যাবলীও চমৎকার। চতুর্দ্দিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতরাজি, মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত সমতলভূমি ও পার্শ্বে খরপ্রবাহিতা ব্যাস ও শর্ব্বরী নদী। প্রান্তরে ও পথের ধারে ধারে রক্তরাঙ্গা বন্য ডালিম ফুল ও রাশি রাশি পাহাড়ী গোলাপ ফুটে আছে। স্থানে স্থানে শ্রেণীবদ্ধ পার্ব্বত্য ঝাউ, দেওদার, কোইশ ও নানা রকমের বৃহদাকার বনস্পতি এবং আপেল, পিয়ারা, আখরোট, চেরি, পীচ, খোর্ব্বানি প্রভৃতি বিভিন্ন ফলের বাগান দৃষ্ট হয়।

এখানকার বৃষ্টিও একটি উপভোগ্য দৃশ্য। বৃষ্টির সঙ্গে প্রায়ই শিলাপাত হয় ও তাহার পরই শীতের প্রকোপ বাড়ে। বর্ষণান্তে শাদা শাদা মেঘখণ্ডগুলি যেন স্নেহ ভরে পর্ব্বতগাত্র চুম্বন করিতে করিতে আকাশের উপরে উঠে যায়। কখন বা বর্ণবহুল রামধনু পাহাড়ের নিম্নদেশ থেকে উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত সাতটি রংএর বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করে দর্শকের চিত্ত রঞ্জন করে। আবার যখন সহস্র সহস্র ছাগ ও মেষের দল সমগ্র রাস্তা জুড়ে মন্থর গতিতে চলে যায় তখনকার সে দৃশ্যও কম উপভোগ্য নয়।

এ অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানতঃ পাহাড়ী। কিছু সংখ্যক পাঞ্জাবী শিখ ও পাঞ্জাবী হিন্দু স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বাস করে। তাহারা সাধারণতঃ চাকুরি, ব্যবসায়, ঠিকাদারি, প্রভৃতি কাজের জন্য এখানে এসেছে। পাহাড়ীরা হৃষ্টদেহ, কর্ম্মকুশল ও ক্লেশ-সহিষ্ণু। এবং তাহারা সরল প্রকৃতি, সাধু ও নির্ব্বিরোধ। ইহাদের চুরি ডাকাতি করার প্রবণতা আদৌ নাই। জনৈক স্থানীয় উকিলের নিকট শুনলাম, গত ১১ বৎসরের মধ্যে কুলুর আদালতে মাত্র তিনটি খুনের মামলা এসেছিল। তার মধ্যে আবার দু'জন বেকসুর খালাস পায়—মাত্র একজনের শাস্তি হ'য়েছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ডাকাতি মামলা আদৌ ছিল না।

এরা সাধারণতঃ পাহাড়ের গায়ে ঘর বেঁধে বাস করে। সহরাঞ্চলে স্ত্রীপুরুষে মিলে শ্রমিকের কাজ করে। এদের প্রধান পেশা হ'চ্ছে কৃষিকার্য্য, মেষ ও ছাগ পালন এবং কাষ্ঠ, ফল, মধু ও অন্যান্য বনজাত দ্রব্য সঞ্চয় করে বিক্রয় করা। কৃষকরা পাহাড়ের গা কেটে ধাপে ধাপে ছোট ছোট জমি তৈরি ক'রে ধান, গম, যব, আলু, পেঁয়াজ, টম্যাটো, প্রভৃতি ফসল উৎপাদন করে। ঝর্ণার জল ও বৃষ্টিতে জমিগুলি সরস থাকে। মেষ ও ছাগলের লোম বিক্রয় ক'রে পাহাড়ীরা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করে। এখানকার পশম ভারতের সর্ব্বত্র, এমন কি আজকাল রুশ দেশেও বহু পরিমাণে চালান যায়। স্থানীয় হস্তশিল্প বিদ্যালয় (Industrial School) ও কুটীর শিল্পজাত পশমের শাল, ধোসা, কম্বল, রাগ্, মফ্লার প্রভৃতি দ্রব্য এখানকার আখেড়াবাজারে ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় হয়।

পাহাড়ীরা আমাদেরই মত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও নানা দেবদেবীর পূজা করে থাকে। এ দেশে দেবালয় ও মন্দিরাদি বহু স্থানে বিদ্যমান। ৺রঘুনাথজী এখানকার প্রধান দেবতা,—ইনিই প্রাচীন কুলু-রাজবংশের কুলদেবতা। দশেরা বা দুর্গাপূজার সময় ৺রঘুনাথজীর পূজা উপলক্ষে ঢালপুর ময়দানে একটি সুবৃহৎ মেলা বসে।

যাঁহারা এ অঞ্চলে পর্য্যটন করতে আসেন, মনালী না দেখে গেলে তাঁদের পরিভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না। এই স্থানটি প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ও বিচিত্র নৈসর্গিক শোভায় সমৃদ্ধ। ইহা ঢালপুর থেকে ২৪ মাইল দূরে এবং ইহাই যাত্রীবাসের সীমান্তস্থল। নিকটেই ডাকঘর, সিভিল বিশ্রামাগার, পর্য্যটন ব্যবস্থাপক অফিস (Tourist Bureau) বাজার, রেষ্ট্‌হাউস। ইত্যাদি। Mr. H. M. Banon Brothers কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বাংলো, রেষ্ট্‌হাউস, সুন্দর 'সুন্দর ফলের বাগান ও ছোট ছোট কটেজ এক মাইলের মধ্যেই রয়েছে। এঁরা পর্য্যটক ও স্বাস্থ্যান্বেষীদের বাড়ী ভাড়া দিয়া থাকেন, ভাড়াটিয়া অতিথিও (paying guest) রাখেন। কয়েকজন মার্কিণ অতিথি রয়েছেন দেখলাম। এই সব অঞ্চলে পূর্ব্বতন ইংরাজ কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ স্থায়িভাবে বাস করেছেন। কেহ কেহ আবার কৃষিকার্য্য, গো-পালন, মুর্গী-পালন করে থাকেন এবং ভারতের বিভিন্ন সহরে কুলুর আপেল ও অন্যান্য ফল চালান দিয়া থাকেন। নিকটেই ক্যানেডিয়ান মিশন পরিচালিত একটি সুন্দর হাসপাতাল আছে।

এখান থেকে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী রোটং গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া একটি প্রাচীন বাণিজ্যপথ এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে চ'লে গেছে। মনালীর অদূরে তুষার-ধবল পর্ব্বতগুলি সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত। তাদের শিখরদেশ থেকে রজত-শুভ্র হিমধারা গলে গলে গিরি

প্রস্রবণের সৃষ্টি করছে। ব্যাস নদীটি রোটং পাশ থেকেই উত্থিত হ'য়েছে। এই স্থানটির চারিদিকে গগনচুম্বী, পা'ন, ফার, কোইল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী;—নিম্নে ছায়াশীতল, শান্ত, বন্ধুর বনভূমি। নিকটেই এইরূপ এক খণ্ড পাইনঘেরা উচ্চ ভূমির উপর প্রসিদ্ধ হিড়িম্বা-মন্দির। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহাভারতে বর্ণিত হিড়িম্বা দেবী। স্থানটি নির্জ্জন, ছায়াবহুল, প্রাচীন তপোবনের ন্যায় গাম্ভীর্যপূর্ণ। শুনলাম, আসল মন্দির ও বিগ্রহ এখন আর নাই। বর্ত্তমান মন্দিরটি নাকি ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে কুলুর তদানীন্তন রাজা বাহাদুর সিং কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মন্দিরটি চতুষ্কোণ ও কতকটা প্যাগোডার আকারবিশিষ্ট। উহার নিম্নভাগ প্রস্তরনির্ম্মিত এবং উপরিভাগ কাষ্ঠনির্ম্মিত। শেষোক্ত অংশটির চারিদিক কাঠের টায়রায় ঘেরা এবং উপর দিকে উহা ক্রমহ্রস্বায়তন। চূড়াটি একটি প্রকাণ্ড টোপরের মত।

এখান থেকে এক মাইল দূরে বশিষ্ঠ মন্দির (উচ্চতা ৭০০০ ফিট)। মনালী হতে যে সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি রোটং পাশ পর্য্যন্ত গেছে তখন তাহা মেরামত হচ্ছিল। শুনলাম এই রাস্তা দিয়ে পণ্ডিত নেহেরুজী জীপে করে যাবেন। আমাদের জীপখানি এই পথ দিয়ে কোন রকমে বশিষ্ঠ পাহাড়ের পাদদেশে এল। আমরা সেখান থেকে প্রায় ৫ ফার্লং চড়াই উঠে দেবস্থানে পৌঁছিলাম। এই স্থানেই নাকি বশিষ্ঠদেব দেহ রক্ষা করেন। একটি কালো পাথরের বিগ্রহ মন্দির মধ্যে স্থাপিত আছে এবং যথারীতি পূজাদি হয়। মন্দিরের পাশেই একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। যাত্রীরা ইহার জলে স্নান করে পরম তৃপ্তিলাভ করে। চত্বরের এক পার্শ্বে হোমকুণ্ড; দুই একজন সন্ন্যাসী কুণ্ডের ধারে বসে সাধন-ভজন ক'রছেন। এরূপ শান্ত, সৌম্য, পবিত্র পরিবেশ সাধনার উপযোগী সন্দেহ নাই।

কুলুর চারিদিকে যে সব দর্শনীয় স্থান আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হ'চ্ছে প্রাচীন কুলুরাজ্যের এককালীন রাজধানী নগ্‌গর পাহাড়। উহারই নিম্নে ব্যাস নদীর এক স্থানে ট্রাউট মাছের আবাদ ও পালনের জন্য সরকারী ফিশারি (fishery), উষ্ণ প্রস্রবণের জন্য প্রসিদ্ধ মণিকরণ গ্রাম, বিজলী মহাদেব মন্দির, ব্যাসনদীর উৎস রোটং পাশ এবং ভেখ্‌লি পাহাড় ও তদুপরি অবস্থিত ভগবতী-মন্দির।

বাংলা দেশ থেকে যাঁরা স্বাস্থ্যোন্নতি বা পর্য্যটনের উদ্দেশ্যে কুলু যাইতে ইচ্ছা করেন তাঁদের অবগতির জন্য এই ক্ষুদ্র বিবরণটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লিখলাম। যাঁরা কাশ্মীর পর্য্যন্ত আসেন তাঁদের পক্ষে এ অঞ্চলে আসা কিছুমাত্র কষ্টকর নয়। কাশ্মীরের ন্যায় কুলু-মনালীও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, স্বাস্থ্যপ্রদ, এবং পাহাড়, বনভূমি, ফল ও ফুলের বাগান এখানেও আছে। তবে কাশ্মীরের মত এখানে হ্রদ বা হাউসবোট নাই,—তৎপরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক নদ, নদী ও গিরিনির্ঝর প্রবাহিত হ'চ্ছে। এখানে কোলাহল নাই, কৃত্রিমতা নাই, কর্ম্মচাঞ্চল্যও সীমাবদ্ধ। পর্য্যটকদের পক্ষে ঢালপুর বা মনালীতে থাকাই শ্রেয়ঃ এবং শীত ও বর্ষাকালে না আসাই ভাল। উভয় স্থানেই Tourist Bureau আছে; আসবার আগে বুরো আফিসের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ দ্বারা থাকবার উপযুক্ত আবাসের সুব্যবস্থা না ক'রে আসা আদৌ উচিত নয়। সঙ্গে শীতকালের উপযোগী কিছু গরম পোষাক, কম্বল ও ছাতা আনা প্রয়োজন। এ অঞ্চলে ভাল হোটেল বা ভাড়াবাড়ী, রেষ্টুরেণ্ট, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বড় দোকান ও মনের মত খাদ্য-দ্রব্যের নিতান্ত অভাব। এই সব কারণে, বিশেষতঃ স্থানটির অনুকূলে উপযুক্ত প্রচার কার্য্যের অভাবে এমন স্বাস্থ্যকর শৈলনিবাসটি অখ্যাত হ'য়ে র'য়েছে। তবে আশার কথা এই যে, সম্প্রতি (২০-৫-৫৮) আমাদের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুজী মনালীতে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম করে গেছেন এবং স্থানটির পরিবেশ ভাল লাগায় তিনি পুনরায় (৩১-৫-৫৮) এখানে এসে ১২ দিন অবস্থান করেছেন। কুলু উপত্যকার প্রতি পণ্ডিতজীর ঈদৃশ প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণের কথা ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই প্রচারিত হয়েছে এবং জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষতঃ সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ ইহার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছে বলে মনে করি। তাই আশা হয়, অদূর ভবিষ্যতে পর্য্যটক ও স্বাস্থ্যান্বেষিগণ অধিক সংখ্যায় এ অঞ্চলে আসতে আরম্ভ করবেন এবং এখানেও অন্যান্য শৈলাবাসের মতই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা অনুযায়ী তাঁদের থাকবার উপযুক্ত আবাস ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার প্রভৃতি গ'ড়ে উঠবে।

## বিশ্বের জনসংখ্যা

কত লক্ষ বর্ষ আগে মানুষ এসেছে এই মাটির পৃথিবীতে, তা সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নি আজও। তবে সেই থেকে বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে আজ বিশ্বে মানুষের মোটসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৭৩ কোটি ৭০ লক্ষ। রাষ্ট্রসংঘের তরফ থেকে সম্প্রতি লোকগণনা সংক্রান্ত যে হিসাব প্রকাশিত হয়েছে, তা পর্য্যালোচনায় দেখা যায়—সারা বিশ্বে প্রতি ঘণ্টায় এক্ষণে লোক বাড়ছে ৫,৪০০ কিংবা প্রতি বছরে ৪৭,০০০,০০০। সমাজ-বিজ্ঞানী বা অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য —এই হারে লোক বেড়ে চললে বর্ত্তমান শতাব্দীর (বিংশ) শেষাশেষি জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ সারা বিশ্বে লোক হবে তখন প্রায় ৫৫০ কোটি।

প্রশান্ত চৌধুরী

১৯

মধ্যপ্রদেশের রামগিরি পাহাড়ে আছে যোগীমারা গুহা। ক্যাজারেথের মেরীর গর্ভে যীশুর আবির্ভাবেরও অনেক আগে ঐ গুহায় পাহাড় কেটে তৈরী হয়েছিল রঙ্গমঞ্চ ও প্রেক্ষাগার। চিহ্ন আছে তার আজও। অক্ষত নয়, কিন্তু অভ্রান্ত।

কোন নাটকের অভিনয় হয়েছিল সেখানে? কি ছিল নাটকের ধরণ? আবন্তী না দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী না ওড্রমাগধী? কারা ছিলেন তার দর্শক? কারা ছিলেন এই রঙ্গমঞ্চের নাট্যকার? এ-রঙ্গমঞ্চে ছিল কি যবনিকার প্রচলন?

কে জানে?—সে ইতিহাস আজও অজানা।

ঐ গুহার ভিত্তিগাত্রে খোদিত আছে শুধু একটি খবর, খৃষ্টপূর্ব দুই-তিন শতকের প্রাচীন হরফে। লেখা আছে,—

'নর্তকী সুতনুকাকে কামনা করেছিলেন বারাণসীর রূপদক্ষ ভিনেতা দেবদত্ত।'

সে যুগের সেই যোগীমারা গুহার রঙ্গালয়ে ছিল না কি কোনও বিদ্যুল্লেখা কিংবা হংসাবলী, মদনমঞ্জুষা কিংবা মন্দারবতী? অগুরু-ধূপে যারা সুবাসিত করত তাদের কেশ, কর্ণপাশে দিত নবকর্ণিকা, অলকদামে গুঁজতো অশোক আর নবমল্লিকা, কোমল আননে রচনা করত যারা পত্রলেখা? যেসব পীনপয়োধরা মদিরালসনয়নাদের কটাক্ষ-বিক্ষেপে চঞ্চল হয়ে উঠত জিতেন্দ্রিয় তপস্বীদেরও মন?

ছিল না কি কোনো রঙ্গমালী কিংবা ব্যাঘ্রসেন, মৃগাঙ্ক দত্ত কিংবা রুমণ্বান? যারা বাজাত বীণা কিংবা গাইত গান, লিখত নাটক কিংবা করত অভিনয়?

কোনো রুমণ্বান্ কি সেখানে কামনা করেনি কোনো মন্দারবতীকে? কোনো জ্যোৎস্নারাত্রের সুধাধবলিত পথ বেয়ে কোনো মৃগাঙ্ক দত্ত কি যায়নি কোনো হংসাবলীর নিভৃত কুঞ্জে? প্রমত্ত ভ্রমরের মত কোনো রঙ্গমালী কি কামনা করেনি কোনো মদনমঞ্জুষার চিত্তমুকুল? কোনো ঝঞ্ঝামুখর মেঘকজ্জল রাত্রে কোনো বিদ্যুল্লেখার হৃদয়দুয়ারে করাঘাত করেনি কি কোনো ব্যাঘ্রসেন?

তবে সে যুগের সেই অজ্ঞাতনামা লিপিকার সকলের কথা বাদ দিয়ে যোগীমারা রঙ্গালয়ের ভিত্তিগাত্রে এই কথাটাই বা কেন বিশেষ করে লিখে রাখলেন কালজয়ী অক্ষরে;—

"সুতনুকা নাম দেবদাসিকা তাম্ অকাময়িষ্ট
বারাণসেয়ঃ দেবদত্তো নাম রূপদক্ষঃ।"

কেন?

এ যুগের রঙ্গালয়ে নেই বিদ্যুল্লেখা কিংবা হংসাবলীরা, নেই রঙ্গমালী কিংবা রুমণ্বানের দল। তার বদলে এসেছেন টগরসুন্দরী আর বেদানাবালারা, প্রাণ বল্লভ ঘোষ আর সদানন্দ বাগচীর দল। এসেছেন মঞ্জুলিকা গুপ্তা আর অনিটা রয়েরা, শোভনকুমার আর টুটুল সেনগুপ্তেরা দল বেঁধে। রঙ্গালয়ের রঙ্গপ্রিয় দেবতাটি প্রেমের ফাঁদে জড়িয়েছেনও এদের কতবার কত রঙ্গে,—সেই সে-যুগের বিদ্যুল্লেখা আর ব্যাঘ্রসেন কিংবা মৃগাঙ্ক দত্ত আর হংসাবলীর মতই।

টগরসুন্দরীদের জন্য প্রাণবল্লভ ঘোষেরা রাত কাটিয়েছে বাগানবাড়ীতে।

"প্রভাতে ধরেছে গ্লাস সন্ধ্যা হয়ে গেছে।
দিবামা ত্রিযামা পুনঃ উষা দেখা দেছে॥
ঘুরিয়াছে বসুমতী সেরে নিজ কাজ।
তাহার স্মরণে গেল 'কাল' কিংবা 'আজ'॥"

অনিটা রয়েদের আকর্ষণে ঘর-সংসার ছেড়ে টুটুল সেনগুপ্তেরা করেছে ধর্মান্তর গ্রহণ। বগলাচরণেরা যাদু-ই-রুমাল রেখেছে মালবিকা মজুমদারের সাজের টেবিলে।

রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এসব ঘটনা নিতান্তই আটপৌরে।

কিন্তু সেদিন আচমকা জুপিটার থিয়েটারে এমন একটা খবর এসে পৌঁছল যে, স্বয়ং অনঙ্গদেবকেও বোধ করি তাঁর ধনুঃশর নামিয়ে রেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হল! অন্যে পরে কা কথা।

খবর এল, বিপ্রদাস আচার্য রাত কাটাচ্ছেন পদ্মবালার কুঠুরিতে!

বিপ্রদাস আচার্য। প্রবীণ, উচ্চশিক্ষিত, গৌরকান্তি, সৌম্যদর্শন, অভিনেতা বিপ্রদাস আচার্য। দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছরের জীবনে যাঁর হাতে কেউ দেখেনি কোনদিন মদের গ্লাস,—তিরিশ বছরের অভিনেতা-জীবনে এ পর্যন্ত কোন অভিনেত্রী ঘটাতে পারেন নি যাঁর চিত্তচাঞ্চল্য মুহূর্তের জন্যেও,—ঘরে যাঁর পুত্র পুত্রবধূ কন্যাজামাতা,—এই পরিণত বয়সে তাঁর জীবনে এতবড় অভাবনীয় অবিশ্বাস্য অঘটন কেমন করে ঘটল? আর, ঘটলই যদি;—পদ্মবালা কেন?

বাইশ বছরের কুৎসিতা পদ্মবালা। অভিনেত্রী সমাজের চতুর্বর্ণে শেষ বর্ণ তার। গাত্রবর্ণেও নিতান্তই শূদ্রাণী সে। আফ্রিকার কঙ্গোবেসিনের চুল ঠোঁট আর নাক নিয়ে কেমন করে সে এসে পড়েছে এই বাংলাদেশে, তা নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয়। শুধু হৃদয়ে আছে তার বাংলাদেশের পলিমাটির স্নিগ্ধ সরসতা। মুখরা দাসী আর গ্রাম্য-কুধাণীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্ম ডাক পড়ে তার। একটু-আধটু নচতেও জানে। ও বিদ্যেটা ওদের জীবনের সঙ্গে জড়িত। যে জীবন ওদের বাধ্য হয়েই নিতে হয় জ্ঞান হবারও আগে থাকতেই, সেই জীবনযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করবার জন্ম ও-বিদ্যে ওদের শিখতেই হয়, মুদীর ছেলের মানসাঙ্ক শেখার মতই। মুদীর ছেলে ততটুকুই মানসাঙ্ক শেখে, যতটুকু শিখলে তার ব্যাবসাটুকু চালু রাখা যায়। পদ্মবালার নৃত্যশিক্ষাও তাই। সে নৃত্যে কোনো রসজ্ঞের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাবে, এমন দুরাশা পদ্মবালা পোষণ করেনি কোন দিন মনে।

বাইশ বছরের পদ্মবালা তবে কী দিয়ে গলালে পঞ্চান্ন বছরের বিপ্রদাসের মনের সংযমের তুষার ?

বিপ্রদাস বিপত্নীক। কিন্তু সে ত আজ নয়। আজ থেকে দীর্ঘ আঠারো বছর আগে ঘটেছে সে দুর্ঘটনা। ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে তুলেছেন তিনি এক সঙ্গে পিতার শাসনে এবং মাতার স্নেহে। কনিষ্ঠা কন্যার সুপাত্রে বিবাহ দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়েছেন এই ত সবে মাস দুই হল। এত দিন পরে সকলের এত দিনের শ্রদ্ধা-ভক্তির উচ্চ আসন থেকে বিপ্রদাস হঠাৎ কেন নামিয়ে আনলেন নিজেকে এতখানি নিচে ? কী তার রহস্য ?

খবর আসে, বিপ্রদাস বাবুকে দেখা গেছে পদ্মবালার বেনারসী শাড়ি কাচতে দিতে গেছেন শালকরের দোকানে ;—দেখা গেছে তাঁকে পদ্মবালাকে নিয়ে ফোটো তোলাতে বিজয় বাবুর আর্ট গ্যালারীতে ;—দেখা গেছে তাঁকে···

বিপ্রদাস বাবুর সঙ্গে চোখাচোখী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলুম ক'দিন থেকে। ভদ্রলোককে লজ্জায় ফেলে লাভ কি? একই ষ্টেজে একই নাটকে অভিনয় করলেও ওঁর সঙ্গে একই সীনে পার্ট ছিল না আমার। কাজেই এড়িয়ে যাওয়ার অসুবিধাও ছিল না কিছু।

একদিন কিন্তু নিজেই এসে ঢুকলেন আমার সাজঘরে।

: এই যে নাট্যকার, তোমার সঙ্গে আর দেখাই হয়ে ওঠে না। আচ্ছা, তুমি তো শুনেছি খবর রাখ অনেক কিছুরই ; চুল উঠে যাওয়া বন্ধ হয় কিসে বলতে পার? পদ্মবালার মাথার খোঁপাটা ছোট হয়ে যাচ্ছে দিন দিন ;—একটু কিছু করা দরকার ত। বড় ভাবনায় পড়েছি হে !

ওষুধ কিছুই বাৎলাতে পারিনি। ফিরে গেছেন বিপ্রদাস।

কিন্তু সত্যিই কি উনি ওষুধ চাইতেই এসেছিলেন আমার কাছে ? ওষুধের জন্তে তো কবরেজ মশায়ের কাছেই পারতেন যেতে। সেইটেই তো স্বাভাবিক ছিল। তবে কি ওষুধ চাওয়ার অছিলায় আমাকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিতে এসেছিলেন যে, যে-কথা কানাঘুষোয় দূর থেকে শুনেছি, সেকথা কতখানি সত্যি ?

একদিন চলে যেতে হবে এই থিয়েটার ছেড়ে। বিদায় নিতে হবে এখান থেকে। যাবার আগে এখানকার কেউ যদি আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, জুপিটার থিয়েটারের এই এতগুলো দিনের ইতিহাসের কোন্ ঘটনা তোমাকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে ?

তাঁর প্রশ্নের খাতায় আমি নিশ্চয়ই লিখে দেব,—

'পদ্মবালা নাম অভিনেত্রী তাম্ অকাময়িষ্ট
নটকুলতিলকঃ বিপ্রদাসো নাম রূপদক্ষঃ।'

আজ মনে হচ্ছে, যোগীমারা গুহার প্রাচীন রঙ্গালয়ের ভিত্তিগাত্রের সেই খোদিত লিপির সৃষ্টির কারণটা হয়ত আবিষ্কার করতে পেরেছি। মনে হচ্ছে, চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি খৃষ্টপূর্ব দুই-তিন শতকের সেই অভিনেত্রী সুতনুকাকে, যার তনুশ্রী ছিল না এক তিল ; —আমাদের ঐ পদ্মবালারই মতো। দেখতে পাচ্ছি, বারাণসীর সেই প্রসিদ্ধ প্রবীণ রূপদক্ষ অভিনেতা দেবদত্তকে, দেবোপম চরিত্র যাঁর মুগ্ধ করত সকলকে ; আমাদের ঐ বিপ্রদাস আচার্য্যেরই মতো।

ভাবছি, যোগীমারা গুহার প্রাচীন রঙ্গালয়ে সেদিন এসেছিল কি আমারই মতো কোন অনভিজ্ঞ নাট্যকার মাত্র কয়েক দিনের জন্ম ? পর্বতগুহার ভিত্তিগাত্রেও কি বিস্মিত সেই নাট্যকারের বিচিত্রতম অভিজ্ঞতার খোদিত নিদর্শন ?

## ২০

যোগীমারা গুহার প্রাচীন খোদিত লিপি সম্বন্ধে আমার এই আন্দাজের কথাটা গল্পের ছলে বলেছিলুম একদিন বনোয়ারীলাল দত্তের কাছে।

শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। মনে হল, মনটাকে যেন তিনি এই জুপিটার থিয়েটারের সাজঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন। সরিয়ে নিয়ে গেছেন অনেক দূরে ; অনেক পিছনে। ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ীর রাস্তা ধরে ছুটে গেছে তাঁর মন কোন পুরোনো কলকাতার সে কোন রহস্যলোকে।

: না ডাক্তার !

সেই সুদূর রহস্যলোক থেকে ভেসে এল যেন বনোয়ারীলাল দত্তের কণ্ঠ। কণ্ঠস্বরে তাঁর পাওয়া গেল যেন ফেলে-আসা দিনের টানা-পাখার আতরের সৌরভ। পাওয়া গেল যেন গ্যাসের আলোর কাঁপনধরানো আবছায়ার স্পর্শ।

: সুতনুকা কুৎসিতা ছিল না ডাক্তার !

পঙ্কজিনী ছিল তার নাম। পাঁকের পদ্ম।

পাঁক তার জন্ম-ইতিহাসে। পদ্ম তার দেহের লাবণ্যে।

পদ্ম নিয়ে রসিক সাজায় তার ফুলদানী, লোভী তাকে ছিঁড়ে খায় মুড়ি। পঙ্কজিনীদের বরাতে রসিক জোটে না। ওদের পদ্মবনে চিরকালই লোভী মাতঙ্গের মাতামাতি।

কিন্তু কিমাশ্চর্যম্। পঙ্কজিনীর কুঞ্জদ্বারে একদিন দাঁড়াল এসে এক রসিক তার মনের ফুলদানীটি নিয়ে। বললে,—ঐ ফুলদানীতে তোমায় রাখতে চাই।

রসিকটি আর কেউ নয়, পঙ্কজিনীদের থিয়েটারের তরুণ মালিকের তরুণ বন্ধু। থিয়েটারের মাইনে না নেওয়া সখের অভিনেতাও বটে। অভিনেতা ; কিন্তু বেলফুলের 'গুজড়ে' হাতে জড়িয়ে পানের পিচে হাটুঝুল পাঞ্জাবীতে ছোপ ধরায় না। অভিনেতা ; তবু ছোট এলাচ চিবিয়ে কোন বিশেষ পানীয়ের গন্ধ চাপা দেয় না। অভিনেতা;

তবু রাণীমুদিনীর গলি থেকে আসে না তার পাওনাদার। অভিনেতা ; কিন্তু ষ্টেজের বাইরের বিস্তীর্ণ জগতে অভিনয় করে না সে এক তিল।

সেই মানুষটাই বললে একদিন, আমি তোমায় ভালবাসি পঙ্কজিনী !

সেদিন বুঝি স্নানযাত্রার মেলা ছিল মাহেশে। বাগবাজারের ঘাট থেকে সাতখানা নৌকোয় দল বেঁধে গিয়েছিল থিয়েটারের অনেকে সেই মেলা দেখতে। সঙ্গে খাসির মাংস আর হাতে-গড়া রুটি। আর ? আর যা, তা' ছিল নৌকোর পাটাতনের তলায় বাঁশের কঞ্চির বোরখার আড়ালে। সখের সেই অভিনেতাটি গিয়েছিলেন একা তাঁর নিজস্ব সখের বোট্-এ। সঙ্গে তাঁর সখের বেহালা।

ফেরার মুখে নৌকো ছাড়ার আগে পঙ্কজিনী গিয়েছিল সেই সৌখীন মানুষটির সৌখীন বোট্-এর বাহারি কামরায় একটু উঁকিঝুঁকি মারতে। নিতান্ত রমণীসুলভ কৌতূহল বশতঃই। সকল নৌকোর কাছি খোলার আগেই কিন্তু সেদিন সহসা খুলে গেল সেই বোট্-এর দড়ি। বোটের একজোড়া মাঝির শক্ত হাতের দাঁড়ের ঘায়ে ছিটকে উঠল গঙ্গার জল। সকল নৌকোকে ছাড়িয়ে একা এগিয়ে গেল বোট্। সৌখীন মানুষটি পঙ্কজিনীর অনেকখানি কাছে এসে গাঢ়কণ্ঠে বললে,—'আমি তোমায় ভালবাসি পঙ্কজিনী !'

হি-হি কোরে হেসে উঠল পঙ্কজিনী। বললে—'তুমিও !'

সেই সৌখীন মানুষটি বললে,—'আমিও নয় ; আমিই। আমিই একমাত্র।'

তবে ঐ ওরা ? ঐ যে নয়ানচাঁদ বড়াল, নন্দলাল শীল, কাশীপ্রসাদ পাঁড়ে ? ঐ মনুষ্যনামধারী অনেকেরা ? পঙ্কজিনীদের দরের ছাঁদে যাদের বাগানবাড়ির ঘর সাজানো ; পঙ্কজিনীর আঙুলে যারা পরিয়ে দিয়েছে হীরের আংটি, গলায় দিয়েছে মুক্তোর কলার ; মোম দিয়ে পাকানো যাদের গোঁফ, কলপ দিয়ে কাঁচানো যাদের চুল—তারা ?

অনেকক্ষণ তাকাল পঙ্কজিনী সেই মানুষটার মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলে,—'তোমার বাগানবাড়িটা কোথায় গো ?'

'বাগানবাড়ি তো নেই আমার !'—বললে সেই সৌখীন মানুষটি,—'চাণকে বাগান আছে, কিন্তু বাড়ি তো নেই সেখানে। কলকাতায় বাড়ি আছে, কিন্তু বাগান নেই তো তার ত্রিসীমানায়।'

ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল পঙ্কজিনী। বললে,—'তাহলে ভালবেসে আমাকে তুলবে কোথায় গো ? চাণকে ?'

স্থির কণ্ঠে বললে মানুষটি,—'না। কলকাতায়।'

হ্যাঁ, তাই সে তুলবে। তুলবে পঙ্কজিনীকে পঙ্ক থেকে পদ্মের মেঝেয়। দেবে তাকে ভালবাসা। খাদ নেই যাতে এক রত্তি। করবে তাকে শয্যা নয়, জীবনসঙ্গিনী। বলবে, 'যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।'—এ তার উচ্ছ্বাস নয়, সঙ্কল্প।

হো-হো করে হেসে উঠল পঙ্কজিনী। বললে,—'ছোটবেলায় সকালে আমাদের চায়ের সঙ্গে তেলেভাজা আসতো, নিত্যি নতুন দোকান থেকে। একই দোকানের তেলেভাজা উপরো-উপরি দুদিন খেলে মাসীর আমাদের গুলিয়ে উঠতো গা। সেই মাসীরই বোন-ঝি আমি যে গো। গা গুলিয়ে উঠছে তোমার কথা শুনেই। চাণকের বাগানে যদি বাগানবাড়ি তোলো কোন দিন, ডাক দিও এক রাত্তিরের জন্যে।'

সেই মানুষটার নিখাদ ভালবাসার সকল আবেদনকে নির্মম তাচ্ছিল্য আর কদর্য হাস্যে উড়িয়ে দিয়ে পাঁকেই আকণ্ঠ ডুবে রইল পঙ্কজিনী।

ডুবে থাকতে থাকতে তলিয়ে গেল সে একদিন। তলিয়ে গেল মৃত্যুর অতলে ; নিতান্ত অকালেই।

তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে উইল করে গিয়েছিল সে। দান করে গিয়েছিল তার সকল সম্পত্তি,—কোন মঠ-মন্দির-হাসপাতালে নয়, তারই মতো পঙ্কজিনীদের মাঝে। শুধু তার অতি আদরের হীরেমন পাখীটিকে দিয়ে গিয়েছিল সেই রসিক মানুষটিকে। বলে গিয়েছিল, ঐ পাখীটাকে যেন দয়া কোরে ঠাঁই দেন তিনি,—চাণকের বাগানে নয়, কলকাতার বাড়িতে।

পাখীটাকে নিতে গিয়ে সেই রসিক মানুষটি পাখীর সঙ্গে ফাউ পেল একখানি খাতা। সকলের অজান্তেই।

মেয়েলি হাতের কাঁচা লেখায় ভরে আছে তার অনেকগুলো পাতা। কিছু শ্যামাসঙ্গীত, কিছু আগমনী গান। এক-আধটা বাউলের গানও। তারপর গানগুলো এসে যেন থমকে দাঁড়িয়েছে এক জায়গায়। সেখানে অজস্র বানান আর ভাষার ভুলের কাঁটার মাঝখানে একটি মেয়ে মেলে ধরেছে তার মনটিকে রক্তগোলাপের মতো।

সেই রসিক মানুষটি অশ্রুসিক্ত চোখে কম্পিত হাতে বানান আর ভাষার ত্রুটির সমস্ত কাঁটা সরিয়ে সন্তর্পণে তুলে নিলে সেই রক্তগোলাপ।

সে এসেছিল। যাকে আকুল হয়ে খুঁজছি সেই কিশোরকাল থেকে। যে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে এই পঙ্ককুণ্ড হতে। পাইনি তাকে আমার যৌবনের প্রথম বেলায়। তার বদলে পেয়েছি যাঁদের, তাঁদের পুণ্যনাম এ-পাপ মুখে নাই বা উচ্চারণ করলাম যাবার বেলায়। অবশেষে দেখা পেলাম তার। মাহেশের ঘাটে, বোটের কামরায়। কিন্তু তখন যে দেরী হয়ে গেছে বড়। তার ভালবাসার দাম শোধ করি, এমন একটা কানাকড়িও যে আমার আর অবশিষ্ট নেই কোথাও। অচল টাকায় সব রসিকের আদরের দাম শোধ করতে পারি। কিন্তু তার ভালবাসার দাম দিই কি কোরে ? তাই তো তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি সেদিন। বিধাতা দিয়েছিলেন রূপ, আর মাসী দিয়েছিলেন বিদ্যে। তার জোরে দুহাতে অর্জন করেছি ভালবাসা হাজার জনের। সেই হাজার জনের হাজার রকম ভালবাসার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে নেকলেসে, ব্রেসলেটে, মুকুটে সাতনরীতে, মোহরে আর কোম্পানীর কাগজে। লক্ষ টাকা তার দাম। দিয়ে গেলাম তা সবাইকে। শুধু এই কথাটি জমা হয়ে রইল আমার খাতার পাতায়,—"পঙ্কজিনীকে ভালবেসেছিলেন সৌখীন অভিনেতা···। এর দান অমূল্য। এ শুধু আমার জন্যেই রইল।"

শেষ হল গল্প। সেই সৌখীন অভিনেতাটির নাম শেষ পর্যন্ত অনুক্তই রয়ে গেল। অনুক্ত রেখেই উঠে গেলেন এক সময় বনোয়ারীলাল দত্ত। বেশ বুঝলুম, আহীরিটোলায় কাঠের গুদামের

এক ধারে তাঁর অপরিসর ঘরটির এক কোণে রাখা কোন একটি বাক্স থেকে তিনি এখন বের করতে চলেছেন ছোট একটি খাতা। খাতে মেয়েলী হাতের বাঁকানো অক্ষরে লেখা আছে সেই সৌখীন অভিনেতাটির নাম ;—শ্রীবনোয়ারীলাল দত্ত।

মনে হচ্ছে আজ, বনোয়ারী বাবুর কথাই বুঝি ঠিক। সুতনুকা হয়তো কুৎসিতা ছিল না। সে ছিল অপরূপা। হয়তো কালিদাসের মালবিকার মতই ছিল—

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তিবদনং বাহূ নতাবংসয়োঃ
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব।
মধ্যঃ পানিমিতোঽমিতঞ্চ জঘনং পাদাবরালাঙ্গুলী
ছন্দো নর্ত্তয়িতুর্যথৈব মনসি শ্লিষ্টং তথাস্যা বপুঃ ॥

সে বুঝি এক শরৎ-রাত্রি। কুসুমভারাবনত সপ্তপর্ণ সমস্ত বনভূমিকে পরিয়েছে সেদিন শুক্লাম্বর, কাশের বনে সেদিন উড়েছে বনভূমির শুভ্র-বসনপ্রান্ত, প্রস্ফুটিত শ্বেত-কুমুদে ফুটে উঠেছে সরোবরের হাসি, শিশির-কান্তি চন্দ্রকিরণ সব কিছুর উপর বিছিয়ে দিয়েছে তার রজতশুভ্র উত্তরীয়। নদী সেদিন মদালসা প্রমদার মত মন্থরগমনা। পদ্মের পরাগ-পটলে আচ্ছন্ন তটভূমি সেদিন কলহংসের কলধ্বনিমুখর।

এমন এক শরৎ-রাত্রে বারাণসীর রূপদক্ষ দেবদত্ত কি বলেছিল সুতনুকার কানে কানে, 'আজ এই শুভ-লগ্নে পঞ্চবাণ-রূপ অগ্নিকে সাক্ষী করে তোমায় আত্মদান করলাম।'

বহুজনসেবিকা সুতনুকা কি সেদিন পঙ্কজিনীর মতই নির্মম তাচ্ছিল্য আর কদর্য হাস্যে উড়িয়ে দিয়েছিল দেবদত্তের নিখাদ ভালবাসার সকল নিবেদন? তারপর কেঁদেছিল ফুলে-ফুলে।

যোগীমারা গুহার ভিত্তিগাত্রে খোদিত হয়ে আছে কি সেই সুতনুকারই বিফল জীবনের বড় গর্বের কথাটি? বহুপরিচর্যায় অর্জিত সকল ধনরত্ন বিলিয়ে দিয়ে শুধু ঐ কটি কথাই কি চিরস্থায়ী করে রেখে দিয়েছিল সে নিজের জন্যে?—

'সুতনুকা নাম দেবদাসিক্য তাং অকাময়িষ্ট
বারাণসেয়ঃ দেবদত্তো নাম রূপদক্ষঃ।'

'বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি ত আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়া তলে,
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই।'

এই উদ্ধৃতিটুকু দিয়ে অভিভাষণ শেষ করবেন ভেবেছিলেন প্রবীণ অভিনেতা সদানন্দ বাগচী। তারপর, জুপিটার থিয়েটারের চলতি নাটকের শততম অভিনয়ের শেষে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেবেন তিনি, অভিনেতা-জীবনের দীর্ঘ ইতিহাসের পাতায় টানবেন সমাপ্তির ছেদচিহ্ন,—এই ছিল অভিলাষ। কিন্তু গড ডিসপোজেস! অতর্কিতে বিদায় নিতে হল তাঁকে সাতানব্বই রাত্তের শেষেই।

সকল আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়েছিল। প্রথমতঃ আমার চলতি নাটকের শততম রজনীর অভিনয়োৎসব, দ্বিতীয়তঃ প্রবীণ অভিনেতা সদানন্দ বাগচীর 'বিদায়-অভিনন্দন'—এক সঙ্গে দু-দুটো ব্যাপার। উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম আমরা সকলেই। শততম রজনীর উৎসব বাসরে জুপিটার থিয়েটারের কর্মীদের তরফ থেকে সদানন্দ বাবুর হাতে তুলে দেবার জন্যে রূপোর আধারে মানপত্রও একটা সাজিয়ে রেখেছিলুম আমরা। প্রতি অনুচ্ছেদে একটি কোরে 'হে' দিয়ে লিখেছিলুম আমরা মানপত্র। অনেক সমাসবহুল শব্দ সাজিয়ে। কিন্তু শততম রজনীর আবির্ভাবের পূর্বেই সাতানব্বই রাত্রের শেষেই ঘটে গেল আকস্মিক দুর্ঘটনা। মোটর অ্যাকসিডেন্টে আহত হলেন সদানন্দ বাগচী।

দেখা করতে গেলুম পরদিন। শুনলুম, পা দুটো হয়তো অকেজোই হয়ে যাবে চিরজন্মের মত।

পাশে গিয়ে বসলুম। বড্ড ছটফট করছিলেন। বললুম: কষ্ট হচ্ছে?

সেক্সপীয়র-পড়া প্রবীণ অভিনেতা যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন: Canst thou pluck from the memory a rooted sorrow?

সমস্ত ঘরটা যেন চাপা কান্নায় থম্‌থম্ করতে লাগল। আমি কী উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম তাঁর মাথায়।

গোঙাতে গোঙাতে ঘুমিয়ে পড়লেন এক সময়। আমি উঠে এলুম ধীরে ধীরে।

দ্বিতীয় বার গেলুম পাঁচ দিন পরে। অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে হল সেদিন ওঁকে। আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন: তুমি! তুমি এখন এখানে! আজ না তোমার নাটকের একশো রাতের উৎসব?

মাথা নেড়ে বললুম: হল না।

: তার মানে!—নড়ে-চড়ে উঠলেন সদানন্দ বাবু।

: আজ সকাল থেকে প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে জুপিটার থিয়েটারের দরজায়।

: সে কী! কেন?—আবার চমকে উঠলেন সদানন্দ বাগচী।

: সে রহস্য জানেন শুধু সুন্দররাম কোঙার। তিনি নিরুদ্দেশ।

: হুঁ।

চুপ করে একদৃষ্টে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন সদানন্দ বাবু। আমিও কথা বলতে পারিনি অনেকক্ষণ। চোখের সামনে কেবলই ভেসে ভেসে উঠছিল কতকগুলি বিমূঢ় ফ্যাকাসে মুখ। গতকাল রাত্রেও থিয়েটার থেকে বাড়ি ফিরেছে তারা অনেক আশা নিয়ে। কত আশা, জুপিটার থিয়েটারের নেপথ্য থেকে বেরিয়ে এক রাতের জন্যে দাঁড়াবে গিয়ে তারা স্টেজের ওপর হাজার লোকের সামনে। সভাপতির হাত থেকে কেউ পাবে চায়ের ফ্লাস্ক, কেউ পাবে টেবল ল্যাম্প, কেউ বা ইলেকট্রিকের ছোট উনুন দর্শকের ভিড়ের মাঝখানে মিশিয়ে থাকবে কারুর বৌ, কারুর ছেলে কারুর মা,—আনন্দোচ্ছাসিত মুখে তাঁরা দেখবেন তাঁদের আপনজনের কৃতিত্বের পুরস্কার। হাততালি দেবেন সকলের সঙ্গে। সব কি শেষ হ'য়ে গেল এক নিমেষে!

নিস্তব্ধ ঘরে জুপিটার থিয়েটারের সেই ম্লান মুখগুলি কেবলই ভেসে ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। আর সদানন্দ বাবুর ঘরের পুরানো দেওয়াল-ঘড়িটা টিক্‌-টিক্‌ করে ছুলে চলছিল শুধু।

নিস্তব্ধতা ভাঙলেন উনিই এক সময়। বাইরের ধূলিমলিন সন্ধ্যার আকাশটার দিকে চোখ রেখে ম্লানকণ্ঠে বললেন: নাটকটা তোমার সার্থক হল কিন্তু এতদিনে; মানুষের জীবননাট্যের সঙ্গে একসুরে বাঁধা পড়ল আজ। মানুষ ভাবে সে রোজগার করবে, বড় হবে, ছেলেমেয়েদের মনের মত করে মানুষ করবে,—তারপর ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীদের সুখে-স্বচ্ছন্দে রেখে বিদায় নেবে একদিন এ পৃথিবী থেকে। কিন্তু কোথা থেকে কোন হৃদয়রাম এসে মাঝপথে তালা ঝুলিয়ে দেয় তাদের জীবনের দরজায়। ছেলেটার পরীক্ষায় পাশ করার কথা, পাশ করে না; ভাইপোটার চাকরি হওয়ার কথা, চাকরি হয় না; মেয়েটার বিয়ে হওয়ার কথা, বিয়ে হয় না; স্ত্রীর অসুখের চিকিৎসা হওয়ার কথা, চিকিৎসা হয় না।—তোমার নাটকের আজ শততম অভিনয় হওয়ার কথা, অভিনয় হল না।

তাড়াতাড়ি বললুম: এ কিন্তু ভালই হল। আপনাকে বাদ দিয়ে এ-উৎসবের কথা ভাবতেই পারছিলুম না আমি।

তাকালেন ফিরে আমার দিকে। সস্নেহে দুর্বল কম্পিত হাতটা রাখলেন আমার হাতে।

: সান্ত্বনা দিচ্ছ? আমাকে, না নিজেকে?

আবার কিছুক্ষণের বুক-চাপা নীরবতা। সেই নীরবতার মধ্যেই এক সময় অনেক সমাসবহুল শব্দ সাজিয়ে লেখা সেই মানপত্রটা ওঁর হাতে এগিয়ে দিলুম ধীরে ধীরে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওঁর বুক ঠেলে। বাইরে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

সেই অন্ধকারের দিকে অবসন্ন চোখ মেলে দিয়ে বললেন: খুব প্রশংসা করেছ তো আমার? অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী করেছ তো বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চকে আমার কাছে? লিখেছ তো তোমাদের সেই চিরকেলে বানানো কথাগুলো চিরকেলে বানানো ভাষায়? জানিয়েছ তো তোমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা? কিন্তু···কিন্তু···It better fits my blood to be disdained by all, then to fashion a carriage to rob love for any.

শেষের দিকে গলা ওঁর কাঁপছিল আবেগে।

: হিরণ্ময়ী ছিল তার নাম; শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী। তোমাদের আজকালকার ভাষায় হিরণ্ময়ী বাগচী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার বিবাহিতা স্ত্রী। চমকে উঠছ শুনে? লেখক মানুষ তুমি। কোনদিন যদি শখ করে তোমার মঞ্চের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে বসো, আর সেদিন যদি হঠাৎ আচমকা নেহাৎই মনে পড়ে যায় আমাকে, ভুলে লিখো না যেন, অবিবাহিত ছিল সদানন্দ বাগচী। লিখো, সেই যে সেযুগ, যে যুগে সদানন্দ ছিল থিয়েটারের সৌখীন সিন পেইন্টার; যে যুগে থিয়েটারের দোরে দোরে মোতিবাঈ মানদাসুন্দরীদের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত তার জন্যে, আর ফিরে যেত বিফল প্রতীক্ষার পর; সেই যুগে শোভাবাজারের গঙ্গার ঘাটে সদানন্দ দেখেছিল লজ্জা-জড়োসড়ো একটি কিশোরীকে গলায় আঁচল দিয়ে জল ঢালতে শিবের মাথায়। আর সেদিন, সেই কিশোরীর জননীরও দৃষ্টি পড়েছিল সদ্যস্নাত সিক্তবসন এক গৌরকান্তি রূপবান তরুণের দিকে, নাম যার সদানন্দ। তার এক মাস পরে একদিন পিতৃহীন সদানন্দ তার একলার ঘরে বিয়ে করে এসেছিল সেই লজ্জাবতীকে,—শোভাবাজারের লাহিড়ী-বাড়ির সেই হিরণ্ময়ীকে। তারপর ভালবেসেছিল তাকে। ভালবেসেছিল সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে।

একটু থেমে রোগতপ্ত হাত দুটিকে বুকের ওপর জড়ো করে রেখে বলতে লাগলেন সদানন্দ বাবু,—

: বর্ষার সন্ধ্যা। গাড়ি নিয়ে বেরোইনি সেদিন। ফিরছি একা পথ দিয়ে। হাতে চিৎপুর থেকে কেনা বেলফুলের গোড়ে; হিরণ্ময়ীর খোঁপায় জড়িয়ে দেবার জন্যে। পথের মাঝে হঠাৎ এল বৃষ্টি, মুষলধারে। তার চেয়েও হঠাৎ কোথা থেকে এসে দাঁড়াল একটা টম্‌টম্‌ একেবারে আমার গা ঘেঁষে। সহিস দরজাটা খুলে দিলে। বিজনবালা গাড়ির ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে,—উঠে আসুন তাড়াতাড়ি।

সেই প্রথম উঠলুম ওর গাড়িতে। উঠতে হল। হিরণ্ময়ীর ফোটো তুলিয়েছিলুম একটা স্যাণ্ডার্স সাহেবের ষ্টুডিও থেকে। তারই প্রিণ্টখানা যাচ্ছিলুম নিয়ে। ওটাকে বৃষ্টির জল থেকে বাঁচাবার জন্যে উঠতে হল।

বিজনকে বললুম, অশেষ ধন্যবাদ! শুনে ও হাসল।

গাড়ি গিয়ে থামল বিজনের বাড়ির দোরে। কথা ছিল, বিজনকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি আমাকে পৌঁছে দেবে বাড়িতে। ছাড়ল না বিজন। বললে, গরীবের বাড়ির একটা পান অন্তত মুখে দিয়ে যেতে হবে।

অনুরোধ এড়াতে পারিনি। ও আমার হিরণ্ময়ীর ছবিটাকে বাঁচিয়েছে।

নামলুম বিজনের বাড়িতে। বসলুম ওর ঘরের ধবধবে সাদা চাদর-পাতা নরম পুরু গদির ওপর। বিছানার ওপর হাতীর দাঁতের হাতল লাগানো একটা ছড়ি চোখে পড়ল। মনে হল, ছড়িটাকে এর আগে কোথাও দেখেছি যেন। স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করতে লাগলুম প্রাণপণে। উঠলেন যিনি, আমার ভাগ্যে অমৃত আনেননি তিনি, আনলেন তীব্র গরল! সেই গরলে জ্বলছি আজও।

ঐ ছড়ির মালিক আমার হিরণ্ময়ীর পিসেমশাই!···

পিত্রালয় থেকে গাড়ী এল পরদিন হিরণ্ময়ীকে নিতে। কিসের বুঝি ব্রত না কি ছিল ওর মায়ের

চলে গেল হিরণ্ময়ী।

সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে গেলুম ওকে আনতে।

ফটক বন্ধ!

হিরণ্ময়ীর বাবার হুকুমে ওদের বাড়ির ফটক চিরদিনের জন্যেই বন্ধ হয়ে গেল আমার মুখের সামনে। আর, খুলে গেল বিজনবালার ফটকের কপাট। বিজন থেকে মানদা, মানদা থেকে ইন্দু, ইন্দু থেকে ছোটমতি। অনর্গল সকলের দ্বার সদানন্দের কাছে।

অনেক দিন বাদে, ওর বাবার স্বর্গারোহণের পর মায়ের অনুমতি নিয়ে হিরণ্ময়ী ফিরে এসেছিল একদিন আমার কাছে। কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু নাট্যকার, আমি যে তখন উন্মত্ত, জানোয়ার, নরকের কীট। কখন যে ও' এসেছিল আর কখনই বা ফিরে গেল, স্পষ্ট করে টেরও

পাইনি সে রাত্রে। পরদিন অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে সুরারক্তিম চোখে দেখলুম, ফুলশয্যার রাত্রে ওর নরম আঙুলে পরিয়ে দেওয়া আংটিখানা ও' খুলে রেখে গেছে আমার পায়ের কাছে।—আর আসেনি।

সে রাত্রে নেশার ঝোঁকে ঠিক কী যে আমি করেছিলুম, আজো জানি না তা'। হয়ত শিস্ দিয়ে গেয়ে উঠেছি অশ্লীল গান, হয়ত ইতরের মত অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিয়েছি তাকে, হয়ত গায়ে তার মদ ঢেলে দিয়ে হেসেছি হা-হা কোরে, হয়ত···হয়ত···হয়ত··· প্রশংসা নয়, শ্রদ্ধা নয়, কৃতজ্ঞতা নয় নাট্যকার, **I deserve ail tongues to talk their bitterest.**

থামলেন সদানন্দ বাগচী। অন্ধকার ঘরখানা থম্‌থম্ করতে লাগল একটা নীরব চাপা কান্নায়।

সেই নিস্তব্ধতায় বুক থেকে এক সময় আবার ভেসে উঠল তাঁর বেদনা-কম্পিত কণ্ঠস্বর—

: মুখের ওপর ফটক বন্ধ করে দিয়ে ওর বাবা আমাকে বলেছিলেন, তিনি জানবেন মেয়ে তাঁর বিধবা।

কিন্তু···কিন্তু নাট্যকার, আমি যে দেখলুম তাকে সেদিন। চলেছে সকলের কাঁধে চেপে। ফুলে আর মালায় সারা দেহ ওর ঢাকা। চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি ওর পরনে। দু-পায়ে রক্তের মত আল্‌তা,—কাঁচা-পাকা সিঁথের টকটকে সিঁদুর। বিধবার বেশ তো ও' নেয়নি!

থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম পথের মাঝখানেই। অনেক চেষ্টা করলুম আড়াল থেকে লুকিয়ে ওর মুখখানিকে শেষবারের মত দেখে নেবার। ফুলের ভিড়ে দেখতে পেলুম না। ওদের হরিধ্বনির সঙ্গে আমার মৃদুকণ্ঠের হরিধ্বনি চুপিসাড়ে মিলিয়ে দিলুম এক সময়। ওরা দূরে চলে গেল।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা মোটরগাড়ি ছুটে এল তার বড় বড় হেডলাইট জ্বেলে।—আমি সামলাতে পারলুম না।

ছটফট করতে লাগলেন জনপ্রিয় প্রবীণ অভিনেতা সদানন্দ বাগচী। ওরফে শিশু বাবু। তারপর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন এক সময়। ওঁর শয্যাপ্রান্ত থেকে উঠে ধীরে ধীরে বিদায় নিলুম আমি।

* * * *

পথ দিয়ে চলেছি হেঁটে একা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে এখনো লাগানো রয়েছে নাটকের শততম অভিনয়ের বড় বড় পোষ্টারগুলো। কালই ওর ওপর পড়বে নতুন থিয়েটারের নতুন নাটকের পোষ্টার। মনে পড়ে যাচ্ছে জুপিটার থিয়েটারে ফেলে-আসা মানুষগুলির কথা। বিচিত্র তাদের মন, বিচিত্র তাদের জীবন! সকলকে জানাও হল না ভাল কোরে। ঐ রামখেলন, বিজয়, অমূল্য বাবু, বগলাচরণ, বনোয়ারী বাবু, চম্পকলতা, কলাবতী, মালবিকা, শিশির, নকুল ঘোষাল, শিবু আড্ডি, পরিচালক শুভেন রায়,—কারুর কাছেই বিদায় নিয়ে আসা হল না স্থির হয়ে। বলে আসা হল না,—তোমাদের সকলকেই আমার মনে থাকবে চিরকাল।

শেষ

# অন্য সর্গ

## দুর্গাদাস সরকার

যখন দু'জনে হাঁটি, মনে হয় আর একটি ছায়া
হাঁটে পাশাপাশি। স্মৃতিতে উজ্জ্বল মুখ। ছায়া নহে।
তার হাসি—অন্ধকারে উল্কার মতোই খসে পড়ে।
একদা আমার দোরে সে ছায়ার সমুজ্জ্বল কায়া
কড়া নাড়ে। এই কায়া ছায়ার উদ্‌গত অবয়ব।
মৃত্যু তাকে ছোঁয়নি। লজ্জায় সেও আসেনি নিকটে
আজ মাথায় সিন্দুর তার, নেই কোনো শব্দ ঠোঁটে।
অর্ধবিগুণ্ঠন। এসে, হত্যা করে আসন্ন উৎসব।

একদা হয়তো তারি ইমনের রাগেই মধুর
কাটিয়েছি নীল-সন্ধ্যা। সেই সব স্বপ্ন মনে হয়।
কেউ যায়। কেউ আসে। সত্য দুই-ই একেক সময়।
তারপর কেউ যদি দিতে পারে শান্ত কিছু সুর
তা-ই শ্রেয়ঃ। ছিন্নবৃন্ত রমণীর ছন্দ ভালোবাসা।
আরো আছে একজন। তারো আছে করুণ জিজ্ঞাসা।

# চম্পা তার নাম

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

২

চম্পা পূর্বের সৌরভ। প্রখর দাবদাহে ফাটা মাটির তলা থেকে যখন এক ফোঁটা বৃষ্টির কামনায় আকাশের দিকে দীর্ঘশ্বাস ওঠে, বসন্তের সেই অন্তিম নিশ্বাসে মঞ্জরিত হয় চম্পা। যত বা ক্লিষ্ট ধরণী, যত বা দাহতাপে মুহ্যমান পরিবেশ, তত গন্ধমদির হয়ে ওঠে চম্পকের লাবণ্যমঞ্জরী।

চম্পার নিজের জীবনটার পরিবেশও যেন তেমনই নিষ্ঠুর। তেমনই অকরুণ। কবির কাব্যের কথা চম্পা জানে না। সে শুধু নিজের কথা ভাবে। ভেবে ভেবে কূল পায় না। সে নাকি সর্বনাশী। সর্বনাশী কিসে? যদি সে তার মা সুরজকুঁয়ারীর অতুলন রূপ পেতো, তাহ'লেও বা কথা ছিল। চম্পার মধ্যে রূপের অতীত আরও কোন আকর্ষণ আছে। সে জন্যই কি তাকে এমন করে দুর্ভাগ্যের টীকা কপালে দিয়ে পাঠিয়েছেন বিধাতা? সে কলঙ্ক-চিহ্নই বা কোথায়? কত দিন চম্পা একলা ঘরে ভাঙা একখানা আরশীর টুকরোতে নজর করে দেখেছে। কোন অসঙ্গতি তো তার চোখে পড়েনি?

অথচ তার মা'রও কোন দোষ ছিল না। এসেছিলো মোহনচাঁদ-এর ব্যাটার বৌ হয়ে। উঠোনে বিছানো সোনালী গম মাড়িয়ে, পিতলের ঝকঝকে পরাতে চুড়ো করা মিঠাই আর মাজা কলসীভরা দুধ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘরে উঠেছিলো সে। চাষার ঘরের সমৃদ্ধি। লোকবলটা মস্ত বড়ো। মাঘমেলায় প্রয়াগ করতে গিয়ে যে সর্বনাশা হায়জার মড়ক লাগলো ইংরেজী সাঁইত্রিশ সালে, তাতে তাদের গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র তার শ্বশুরালয়ই যে কেন উজাড় হয়ে গেল, ভেবে পেল না সুরজ কুঁয়ারী। তার স্বামী অনন্তরাম সে দলের সঙ্গে ছিল না এই যা; গ্রামের দশজন এসে অনন্তরামের খরচ তামাক সিদ্ধি খেল চারপাই-এ বসে। আলোচনা করে স্থির জানা গেল মহাপাতকী ছিল মোহনচাঁদ। গৈবীনাথ শিবের সেবায়েত, বৃদ্ধ পণ্ডিত কেশবরাম প্রকাশ করলেন সে গোপন রহস্য। অনেক মানসিক ছিল মোহনচাঁদের। পিতৃপুরুষের কাজ করবার কথা ছিল গয়াতে। সে কাজ সে করেনি।

—আরে, পহ্‌লে গয়াজী পিণ্ডদান করো! তারপর গঙ্গাজীতে স্নান করো, বাবা বিশ্বনাথের আশ্রয় লাগিয়ে নাও, তারপর চলো প্রয়াগজী! মুরুখ, পাপী মোহনচান্দ, তাই সব পাপ নিয়ে আগেই গেল প্রয়াগজী! জয় জয় প্রয়াগ—মোহনচান্দের সব ফাঁকি ধরে ফেললেন!

এ গাঁ কেন, আশ-পাশের দশখানা গাঁ-এর মানুষের আশ্রয় এই গৈবীনাথ শিব। এই শিবমন্দিরই তাদের দাদা-পরদাদার আমল থেকে তাদের চোখে গয়াকাশীর মতো মহাপুণ্য স্থল। মন্দিরে যখন ফাটল ধরেছে, তখন একবার জানতে পারলে হলো। লালা আর বানিয়ারা ঢেলে দিয়ে গিয়েছে মেরামতির টাকা। গৈবীনাথের মাথায় সোনার ছাতা। নিত্য রূপোর সরঞ্জামে তাঁর আরতি। কে না জানে কাশীতে যখন অন্নকূট হয়, গৈবীনাথের মন্দিরে তখন এক মণ ঘি দিয়ে ভোগ হয়। সেই ঘি জোগান দেবার ভার ছিলো পরমেশ্বর আহীরের ওপর। কোন দুর্বুদ্ধিতে সে ওজনে ফাঁকি দিচ্ছিলো। তেমনি মরে গেল সাপের কামড়ে। সেদিন এই কেশবরাম পণ্ডিতই সতেজে শিখা নাচিয়ে বলেছিলো।—বল, কি পাপ করেছিস? স্বীকার কর।

বৃদ্ধ পরমেশ্বর জড়িয়ে জড়িয়ে স্বীকার করেছিল। হ্যাঁ। পারেনি একবার। ওজনে কম দিয়েছে। স্বীকার করে বলেছিল, পণ্ডিতজী তাকে যে অপরাধ বলবেন তাই সে স্বীকার করবে, যদি এই জ্বালাটা একটু কমে। শিবের মাথায় যার বাস, সেই কালসর্প গোহুমন সবটুকু বিষ ঢেলে দিয়েছিল। তাই পরমেশ্বর বাঁচল না।

এমন প্রতাপ গৈবীনাথের। আর এই পাপ ধরাধামে তাঁর দেওয়ান হচ্ছেন পণ্ডিত কেশবরাম। কেশবরামের কথা কে অমান্য করবে? পিতার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাষের জমি সব লালা বৈজনাথের ঘরে বাঁধা রেখে বেরুলো অনন্তরাম। সুরজকুঁয়ারীর সে বার দ্বিতীয় বার সন্তান-সম্ভাবনা। প্রথম সন্তান যে বাঁচেনি, তার কারণও এখন পাওয়া গেল। এত দেবরোষ মাথায় নিয়ে বাঁচে কখনো? যাবার আগের রাতে স্বামীর সামান্য জিনিষ, কম্বল, রান্নার বাসন সব বেঁধে দিতে দিতে সুরজকুঁয়ারীর চোখ দিয়ে টপ-টপ ক'রে জল পড়তে লাগলো অনন্তরামের পায়ে। অনন্তরাম সান্ত্বনা দিলো। কত বোঝালো। বললো—

—দুই মাস মাত্র, দেখিস, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আর ক্ষেতী বাঁধা দিয়েছি বটে, এবারকার ফসল তো আমার। আমার ক্ষেতীর লাগাও কাদের চাচার ক্ষেতী। চাচা আমার ফসলও পাহারা দেবে। তুই যেমন ঘরে আছিস তেমনই থাকবি, বিশাল আর জওয়ালা। দুই ভাই গেঁহু ঢেলে দিয়ে যাবে তোর ঘরে। মাপ করে নিস। ওজন দেখে হিসাব রাখিস।

মাথার ওপর বাবা ছিল, মা ছিল, বড়দাদা, ভাবী, ভাবীর ছেলে, জমজমাট ছিল সংসার। সবাই জানতো অনন্তরাম খেয়ালী, মায়ের আদরের। দাদার সোহাগের। আর অনন্তরামের এক নেশা তার বৌ। দাদা মাঠে কাজ করতে করতে কত বার বলেছে।

—সুন্দর বৌ আর কেউ পায়নি? তুই কি রে! মেয়েদের কাছে গোঁফ চাড়া দিয়ে খুব কর্তা হয়ে থাকবি!

ভাবীর রান্না নিয়ে কথা বললে সে বলেছে—আমার রান্নার খালি মিরচা, আর যত মিঠা তোমার বৌয়ের হাতে?

শাশুড়ীকে বলেছে—যাও ছোটছেলের রান্না ছোট বৌ-কে করতে দাও।

হঠাৎ মাথার ওপর থেকে স্নেহ মমতা হাসিঠাট্টার সবগুলো মানুষ চলে গেল। নিজেকে এত দায়িত্ব নিতে হবে, তা-ও ত' জানত না অনন্ত! বৌকে অনেক পরামর্শ দিল। গৈবীনাথের মানতকরা ফুল স্বামীর মেরজাইএর পকেটে গুঁজে সেলাই করে মুখ আটকে দিল সুরজকুঁয়ারী। সকাল হলে চাচেরা ভাইকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল অনন্তরাম।

তারপরে যে কি হয়েছিলো, সুরজকুঁয়ারী কোন দিনও সে কথা বলেনি মেয়েকে। সে কথা চম্পা শুনেছে এর তার কাছ থেকে। কেন না, তারপরে এক রাতে সুরজকুঁয়ারীর মুখের হাসি মুছে গিয়েছিল। দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছিল অনন্তরামের চাচেরা ভাই। সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে পথে। পথ চলতেই ছয় জন তীর্থযাত্রী এসে সঙ্গ নেয়। অনন্তরামের সঙ্গে ছিলো কাঁচা টাকা। আর কে না জানে এই সব পথচলতি বন্ধুদের বিশ্বাস করতে নেই?

হ্যাঁ, ভুল হয়েছিলো অনন্তরামের। ফতেপুরের কাছাকাছি পৌঁছিয়েছিল, সেখানে গিয়ে বিশ্বাস করবার কোন প্রয়োজন ছিল? তারা মিঠাই খেতে বলেছিল? পথের মানুষের হাতে কে খাবার খায়? তিন 'জন বৈরাগী, তাদের মাথা কামানো, লম্বা বলিষ্ঠ দেহ, তাদের সঙ্গে ভাব করে অত কথা বলবারই বা কোন্ প্রয়োজন ছিল?

এ সব জ্ঞানের কথা! মহাবিপদ ঘটে যাবার পরে এ সব কথা ওঠে-ই। কিন্তু সুরজকুঁয়ারী কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। জানতেও চায়নি। তার চাচেরা দেওরের কথাগুলো সে শোনেওনি ভাল ভাবে।

এতগুলো দুর্ঘটনা মাথায় নিয়ে যে মেয়ে জন্মালো, সন্দেহ কি যে সে মেয়েকে দেখলেই তার মার চোখ দিয়ে জল পড়বে আর মনটা হবে ভারী? প্রথমটায় সবই যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। অনন্তরামের চাচী বড় ভালমানুষ। তার আদর-যত্নেই বাঁচলো সুরজ। কেঁদে কেঁদে চোখ এমন হলো যে চোখে যেন সামান্ত আলোও সয় না। আর সেই থেকেই হলো কেমন যেন ধন্দ ধরা। জল আনতে গিয়েছে তো বসেই আছে বাওলির ধারে। একদৃষ্টে চেয়ে দেখছে মাঠের দিকে। মাথায় কাপড় থাকে না, ভরা কলসীর জল পড়ে যায়। মেয়ে মাকে ডেকে ডেকে কাঁদলে পরে তবে চমক ভাঙে। আবার আরসী ধরে বসে মুখ দেখে। সে নিবেশ ভাঙতেও কতক্ষণ কেটে যায়!

এ মন নিয়ে সংসারে চলা যায় না। কা'কেই বা দোষ দেবে চাচী! নিজের সংসারের কাজ সামলে বার বার ছুটে আসে আর বলে—মেয়েটাকে দেখ। এমন মেয়ে!

তার সংসারেই রাখতে চেয়েছিল। গেল না সুরজ, বললো—ছি!

জীবনের দাবীটা বড় কঠিন, এই যা। কার্ত্তিক মাসে আকাশদিয়া জ্বালিয়েছে সুরজ। ছোট ছোট দেওররা এসে সাহায্য করেছে। বাতি জ্বালিয়েছে পরলোকে গিয়াছে যারা তাদের কল্যাণে। জ্বালিয়ে কি যে মনে হলো সুরজের। এক ঝুড়ি গম ঝাড়তে বসেছিলো। পাকা গমের গন্ধ, কার্তিক মাসে শিশিরভেজা মাটির গন্ধ, বাবুনিয়া গাছে পাখীর কিচিমিচি আর দূরে ঘরফিরতি কিষাণদের কথাবার্তা, সব শুনতে শুনতে মনটা তার কোথায় চলে গেল। আজ সে পরের গম ভেঙে তবে ছুটি পাবে। এই তার কপাল! অথচ যেদিন বিয়ে হলো, হলেই বা আট বছরের মেয়ে, মনে আছে তার। কেমন বরাত গিয়েছিল। কত মানুষ। দুইখানা বয়াল গাড়ী। ভেঁপু আর শানাই বেজেছিল। কত রূপোর গহনা। ছোট হাতে মেহেন্দী! হলুদ ছোপানো শাড়ী। আর মেয়েদের গান।

—"শাদী বৈঠবে সীতা মাইয়া
বরাত লে কে আয়ো লছমণ ভৈয়া॥"

তারপর 'গওনা' হলো ষোলো বছরে। আগেই হতো। কিন্তু তার বাপের টাকা-পয়সার অসুবিধে ছিলো। 'গওনা' না হ'তে-ই অনন্তরাম কেমন লুকিয়ে দেখতে যেতো তাকে।

হিম-হিম সন্ধ্যা। এক প্রান্তে বাড়ী। সহসা একেবারে বাড়ীর পেছনে ডেকে উঠলো শেয়াল আর ভয়ে কেঁদে উঠলো চম্পা। চমক ভেঙে সুরজ দেখে ধূলোবালি মেখে ঘুমোচ্ছিল মেয়ে। ঘুম ভেঙে বুঝি ভয় পেয়েছে। মেয়েকে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি দোর আটকে এলো। ঘরে-ও বাতি জ্বাললো। বুকের মধ্যে দোলা দিয়ে দিয়ে ভয় ভাঙলো।

এবার যেন মেয়ের যত্ন ক'রে একটু শান্ত হলো সুরজ। তারপর থেকে গরীব ঘরের দুঃখী বিধবা আর দশজনের মতোই সুরু হলো জীবনটা তার। গম জোয়ারী এলে পরে দিনভোর বসে ঝেড়ে বেছে দিয়ে এলো সুরজ। যারা বিশ্বাস করে মেপে দিলো, তাদের হয়ে জাঁতায় পিষে দিয়ে এলো। তার স্বজাতের ঘরে জল তুলে দিয়ে এলো। পালপরবে প্রতাপ সিংয়ের ঘরে সুরজের অনেক কাজ পড়ে। একদিনের সহেলী দুর্গা আজ মস্ত সংসারের গৃহিণী। শিবরাত্রি করে গৈবীনাথকে নিজের ঘরের দশ সের দুধ দিয়ে নাওয়ায়। ডাকের গাড়ী ভাড়া করে তীর্থ করতে যায়। দুর্গা বাড়ীতে গরু-মোষ গরমের দিনে গুড় দিয়ে জল খায়। সরকারী সড়কের পাশে সে বছর কুয়ো খুঁড়িয়ে দিলো দুর্গা। বৈশাখ মাসে সেখানে জলসত্র হয়।

সেখানে ডালের বেসন বানাতে, দই আর ঘোল বানাতে লাড্ডু মিঠাই পাকাতে আর ঘি জ্বাল দিতে ডাক পড়ে সুরজের কাজে এতটুকু ত্রুটী হলে সুরজকে শতমুখে গালি শুনতে হয় বৌ-কালো সুরজের যে এত রূপ ছিল, তাতে হিংসে ছিল দুর্গার এখন তাই, বেলা তিনটের সময়ও যখন আগুন তাতে বসে মাল জ্বাল দেয় সুরজ, চৌকিতে বসে হাজামের বৌয়ের কাছে পা মেহেদী ছোপ লাগাতে লাগাতে সে সব কথা তুলে কাটাকাটা ঠ করে দুর্গা। বলে—আমার শাস কত বলেছিলো, ঐ সুরজ মতো সুরৎ হলো না বৌয়ের! তখন মনে মনে গৈবীনাথ ডাকতাম আমি।

হাজাম বৌ তোতাপাখীর মতো বলে,—সুরৎ দু'দিনের, ধর্ম চিরদিনের ! কোন আশ্রিতা বলে—কে মাটির থালায় খায়, কে সোনার থালায় খায়—সবই নসীব চন্দনকে মাঈ !

সমর্থন পেয়ে আরো কথার ধার খুলে যায় দুর্গার। বলে —আমার হলো ছেলে, আর ওর হলো মেয়ে, আহা সুরজকে দেখে দুঃখে মরে যাই !

দুর্গার হাতের কঙ্কণের যেমন সূচীমুখে ধার খেলে তার কথাগুলিও তেমনই ধারালো। সমবেদনার কথাও যেন কেটে কেটে বসে। শুনতে শুনতে সুরজের এক এক সময় মনে হয় চীৎকার করে থামিয়ে দেয় দুর্গাকে। কিন্তু তার পরে যে কি হবে, তাই ভেবে চুপ করেই থাকে। একদিন অসহ্য হতে বলেছিলো—আমার নসীব নিয়ে আমি এক পাশে পড়ে আছি, সে কথা বার বার বলবার কি আছে দুর্গা বহিন্ ?

তারপর দুর্গার কথাগুলো যেন আরও ধারালো হয়ে উঠেছিল। সে নেহাৎ ভাল লোক, তাই সুরজের কথা ভাবে আর বলে ! কিন্তু দিনকাল এমন, যে গরীবকে ভাল কথা বললেও দোষ। সে যে সুরজের কত দোষঘাট ঢেকে চলে, তা কি জানে সুরজ ? এই যে, ধর্ম-কর্ম বলতে কোন পাট নেই সুরজের ! কত জন যে কত কথা বলে। তেমন মেয়ে হ'লে ঐ গোরামুখ নিয়ে চলে ফিরে বেড়াতো ? স্বামী মরতে না মরতে হয় নিজে ও গিয়ে চিতায় উঠতো। নইলে স্নান-দান উপবাস ক'রে পরলোকে নিজের ঠাঁইটা পাকা করে নিতো। সব আশ্চর্য সুরজের !

সত্যিই নিজেকে মহাপাপী মনে হয়েছিল সুরজের। মহাপাপী না হ'লে এই সব কথা শুনেও সে দাঁড়িয়ে আছে এখানে ? ঘরভরা দুধ, মিঠাই, মিছরীর সার, লিচুর গোছা, দই আর ঘি-এর একটা টক গন্ধে অন্দরমহল ম' ম' করে। তার মেয়ের হাতে এক টুকরো মিছরী, বা একটা ফলও প্রাণ ধরে তুলে দিতে পারে না দুর্গা। প্রাপ্য কিছু আটা, গম, ডাল বা কলাই আঁচলে বেঁধে বেরিয়ে যায় সুরজ।

ঘর চলতে চলতে পথে কুয়োতলায় বসে মেয়েকে দুটো মকাইয়ের ছাতু দেয়। নিজেও একটু জল খেয়ে নেয়। পা মেলে শ্রান্ত দেহ পাথরে হেলান দিয়ে বসে ভাবে সুরজ। কথা কয় না। চোখে জল পড়ে না। চোখের জল আর মুখের কথা সবই ফুরিয়ে গিয়েছে। মেয়েকেও বেশী কথা বলে সোহাগ করতে পারে না সে। দুর্গার অকারণ নিষ্ঠুরতার কথা ভাবে সুরজ। হাতের মকাই ছড়িয়ে পড়ে। পাখী এসে খেয়ে যায়। খেয়াল নেই সুরজের। গালে হাত, রুক্ষ কেশ, বিষাদের প্রতিমা যেন। আনমনা, উদাসিনীর সে রূপ দেখে কোন পথচলতি মানুষ তাকিয়ে দেখে। বিদেশী মানুষ যদি হয়, তো এই বিস্রস্ত বেশবাসিনীর রূপ একটু চোখ তারিয়ে দেখতে গিয়ে লজ্জা পেয়ে সংহত হয়। দুঃখে মলিন, শোকে পাথর, এ মেয়ে যেন বয়েস কাল সব পেরিয়ে চলে গিয়েছে। আর গাঁয়ের মানুষ দুঃখে একটি দুটি নিঃশ্বাস ফেলে যায়।

জল নিয়ে যখন সুরজ বাড়ী ফেরে, তখন বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। আর সব কাজ সেরে তখন অবসর হয়েছে সংসারের মানুষের। বিকেলে গঙ্গাপ্রসাদ তেওয়ারী বাড়ীর গিন্নী-বৌরা আসেন। মাজা ঘটিতে চম্পার নাম করে দুধ আনেন। ক্ষেতের শব্‌জী কিছু ডালা ক'রে সাজিয়ে আনেন কোন দিন। তেল দিয়ে চম্পার চুল বেঁধে দেন। রকম রকম গল্প করে সুরজের মনে আনন্দ দিতে চান। বুড়ো হয়েছেন কিন্তু মনটি যেমন রসালো তেমনই প্রাণবন্ত। দুই ছেলে এলাহাবাদে ইংরেজী ফৌজে জমাদার। দুনিয়ার খবরাখবর নানারকম সংগ্রহ করেন তেওয়ারীগিন্নী। বলেন—এবার রামসহায় সাহেবকে শিকারে খুব বাঁচিয়েছে, তাই সাহেব রামসহায়কে সোনার মেডেল দিয়েছে। এই এত বড় !

তাঁর বৌ পেছন থেকে ঘোমটার ফাঁকে সুরজকে মাথা নেড়ে জানায়—না। সবাই জানে শাশুড়ী ছেলেদের গর্বে রাশ ছেড়ে গল্প করেন। সে বড় লজ্জা পায়। কিন্তু তেওয়ারীগিন্নী সকলের এত স্নেহের পাত্র, যে সুরজ ঘাড় নেড়ে সায় দেয় ! বলে—তা ত' হবেই।

দাঁতে মিশি ঘসে তেওয়ারীগিন্নী বলেন, পৌষ মাসে সাহেবরা ক্যাণ্টমেণ্টে বড়দিন করলো। একটা গাছ তো ঘরের মধ্যে বসালো। তাতে আবার বাতি দিয়ে সাজালো। ও মা ! সকাল বেলা দেখে তার ডালে একজন পরী বসে আছে। সেই পরীকে বিয়ে করলো সাহেব। এখন সেই পরী সাহেবকে এমন জব্দ করেছে, যে আজ মোতি মাঙ্গাচ্ছে কাল সোনার বালা মাঙ্গাচ্ছে, রোজ রোজ গয়না না দিলে আবার উড়ে যাবে পরী।

তার পর আরও মূল্যবান সব খবরাখবর দেন তিনি। কথার ফাঁকে ফাঁকে দু'খানা কাজও করে দেন। যতক্ষণ না বুড়ী কৌশল্যার মা এসে যায় ততক্ষণ থাকেন। একদিন এবাড়ীর নুন খেয়েছে কৌশল্যার মা। এখন শোধ দেয়। বুড়ো হাড়ে যতটুকু পারে। পরিবার নিয়ে থাকে সুরদ গোলাঘরে। ছেলে বৌ নাতি নাতনী সেখানে। নিজে এখানে বহুজীর কাছে শোয়। বলে রামজীকো শোচো, গৈবীনাথজী কা আশ্রয় লাগাও।

সুরজকুমারী জানে গৈবীনাথ তার অন্তরে আছেন। পণ্ডিত কেশবরামকে খুসী করে গৈবীনাথকে পূজো দেবার ক্ষমতা তার নেই। গৈবীনাথের অনেক ওপরে কেশবরাম পণ্ডিত। তাঁকে খুসী রাখা বড় কঠিন। মেয়ের আয়ু কামনা করে মাঝে মাঝে সে গৈবীশ্বর বটগাছে লাল কাপড়ের টুকরো বেঁধে দিয়ে আসে। চোখে পড়লে পণ্ডিত বলেন, অনন্তের বহু, মন্দিরে কেন আস না তুমি ? মন্দিরে আসবে যাবে, গৈবীশ্বরের আশ্রয় ধরে নেবে।

সুরজ ভাবে, গৈবীনাথ আমার অন্তরে। কতবার যে ডাকি তাঁকে তা যদি জানতে তুমি। ডাকি আমার মেয়ের জন্যে।

মন্দিরে পোষা পায়রার ঝাঁক আছে। কোঁচড় থেকে মকাই-এর চুর ছড়িয়ে দেয় চম্পা। পায়রার ঝাঁক নেমে আসে। চম্পা ছুটে গিয়ে তার মার হাত ধরে। একটা ছোট পায়রা খুঁটে খুঁটে খাবার পায় না। দুঃখ হয় চম্পার। বলে কাল এনে দেব ওকে, কেমন ?

মন্দিরের সামনের দালানের ছাদ থেকে বড় বড় ঘণ্টা ঝুলছে। ঘণ্টার নিচেই পাথরের ষাঁড়। মায়ের কোলে উঠে চম্পা সেই ঘণ্টা বাজিয়ে দেয় ঢং ঢং করে।

তারপর সুরজ যায় তার কাজে। নয় তো পরিশ্রান্ত শরীর বিছিয়ে ঘরেই কিছু কাজ করতে বসে ঘুমিয়ে পড়ে। চম্পা তার ছাগলছানা নিয়ে চরাতে চলে যায়, এই ছাগলছানা তাকে এনে দিয়েছে চন্দন। দুর্গার ছেলে। চন্দনের নাতি আর প্রতাপের ছেলে। ছেলে হয়ে হয়ে বাঁচেনি বলে প্রতাপের মা কত তীর্থে কত দুয়া মেগে

মেগে বেড়িয়েছে। গিয়েছে, আর দান করে এসেছে। পুষ্করে গেল, মাখন মিছরী সাবিত্রী কুণ্ডে দান করে এলো। আর ছোঁবে না এ জীবনে। গেল কাশী, জয় বাবা বিশ্বনাথ, নাম করে গঙ্গাতে দিয়ে এল দুধ ঘি, মিঠাই। তার পুণ্যের ফলে চন্দন সব অপঘাত কাটিয়ে বেড়ে উঠলো। এক ছেলে, পারে তো দুর্গা বুকে করে রাখে। ঠাকুর্দা চম্মন সিং কোন কালেও ক্ষেতী গেরস্ত নয়। কোম্পানীর ফৌজের রেগুলার সিপাহী চম্মন সিং। জমাদারও হয়েছিলো। মন জুগিয়ে চলবার পন্থা জানা ছিল না। তাই পেনশান হলো চটপট। তারপর থেকে জলদোয়ানির সাফাখানায় ডাকবাংলোয় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিয়ে আছে বুড়ো। ছেলেকেও ঢোকাবার চেষ্টা করেছিলো ফৌজে। স্ত্রীর কান্নাকাটিতে পারেনি। দেশে দেশে লড়ে জাতধর্মতে চোট খাইয়ে এসেছে চম্মন, আর কেশবরামের তাড়নায় অনেক টাকা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। তা ছাড়া একবার বুঝি এ্যাডজুটেন্ট সাহেবের হিন্দুস্থানী বিবির সঙ্গে চম্মনের দোস্তি হয়েছিলো। সেই বিবি চম্মনকে ছ'টি সোনার বোতাম বসানো জামা দিয়েছিলো। সেই থেকে চম্মনের বৌয়ের আর একটা ধারণা হয়ে রইলো, যে ফৌজে গেলেই চরিত্র খারাপ হয়।

চম্মন ঘরে আসে চাষবাসের সময়। হাতে টাকাকড়ি নিয়ে। চন্দনের তরে তার টান হয়েছে। এখন কাজ ছেড়ে দেবার কথা গাইছে। কিন্তু মাস গেলে বিশ পঁচিশটা টাকা জমে। ছেড়ে আসবে কেন? তবে যখনই আসে, নাতিকে খুব সাহসী বাহাদুর হতে বলে। বড় হলে তাকে জঙ্গী সিপাহী করে দেবে চম্মন।

—তোমার কথা কোন সাহেব শুনবে?

গোঁফে চাড়া দেয় চম্মন। বলে—এখনো এমন এমন সাহেব আছে, যে নিজের সিপাহীদের বাচ্চার মতো দেখে। কথা বলতে জানে। নয়া আমদানী ছোকরা সাহেবদের মতো নয়। তারা আমার কথা রাখবে।

দাদার কথা চন্দনের মনে ছিলো। তাই কেশবরাম পণ্ডিত যখন লাল তুলোট কাগজে 'রামসীতা সীতারাম' লিখে লেখাপড়ায় তালিম দিতে সুরু করলেন, চন্দন সামান্য শিখেই পালালো। টুকরি ভরে শাকসব্জী, পিতলের লোটায় ঘি, আর কলসী ভরা গুড় নিয়ে প্রতাপ আবার গেল। ছেলের হয়ে মাপ চেয়ে পণ্ডিতকে অনুনয় বিনয় করলো। কিন্তু পণ্ডিতের কাছে পড়তে বসে আবার চন্দন পালালো। এবার নদীর ওপারের বাঘা জঙ্গলের মুখের কাছে। চম্পাকে সঙ্গে নিলো। হাতে একটা বিছুয়া ছিলো। তাই চম্পারও ভয় হলো না। পাকা কুল খেয়ে, জঙ্গলে ঘুরে, বিকেল হতে ঘরে ফিরলো তারা। প্রতাপ সিং-য়ের সমস্ত ধমক, শাসন আর অনুনয়ের জবাবে চন্দন জানালো—আমি সিপাহী হবো। আমি লেখাপড়া শিখবো কেন? আমি কি বাণিয়া?

চম্পার সঙ্গে চন্দনের বন্ধুত্বের কথা জানলে পরে সুরজও যে সন্তুষ্ট হবে না, তা জানে চন্দন। তাই দু'জনের যত দৌরাত্ম্য দুপুর বেলায়। ভয় কা'কে বলে, জানে না চন্দন। আর চন্দনের সঙ্গে মিশে মিশে চম্পাও হয়েছে ভয়হারা। তাদের গ্রামের নদীটি সারাবছর শান্ত। শুধু বর্ষাকালে তার চেহারা বদলে যায়। হিমালয়ের পায়ের কাছে ঘন বর্ষণে জলের ঢাল নামে গঙ্গা-যমুনায়। সেই জলধারার প্রসাদে ফুলে-ফেঁপে ওঠে চম্পার গ্রামের নদী। ছোট নদীটা। শীতকালে তার চরের বালি পেরিয়ে চন্দন আর চম্পা গিয়েছিলো ওপারে। জঙ্গলের এখানে সেখানে কুলের গাছের সন্ধানে ফিরতে ফিরতে সহসা খসখস শব্দ শুনে চম্পার মনে পড়েছিলো চরের ওপর বাঘের থাবা দেখেছে বটে। ভয়ে দু'জনেই নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিলো আর সহসা বেরিয়ে এসেছিলো সুন্দর একটা হরিণ। খুব বড় নয়। খুব ছোটও নয়। ফুটফুটে দেহ। খাড়া কান, সতর্ক চাহনি। একটা দুটো পাকা কুল খায় আর এপাশ ওপাশ দেখে। মাথা কাত ক'রে কি যেন শুনলো, আর তখন দেখা গেল দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো সরু দুটি শিং উঠছে মাথায়। চম্পা আর চন্দন নির্ভয়ে বেরিয়ে আসতে, তাদের দিকে এক মিনিট সবিস্ময়ে চেয়ে একবার ডেকেই জঙ্গলে যেন মিলিয়ে গেল সে হরিণ। রামায়ণের গল্প শুনতে যে মায়ামৃগ সীতামাইকে 'ভরম ভরমিয়ে' চলে গিয়েছিলো রামজীকে ছলনা করে—সেই হরিণের দোসর না কি? বুঝে পায় না চম্পা। দুই জনে ফিরতে ফিরতে রোদ হেলে যায়।

সে হলো শীতকালের কথা। বর্ষাকালের নদীকে দেখে চম্পার মনেও হয় না যে, কোন দিন সে এই নদী পার হয়েছিলো। চন্দনকে বলে—দেখ চন্দন, কি রকম স্রোত!

চন্দন খুশী হয়। এই বৃষ্টি হবে বলে তার বাবা গাঁয়ের পাঁচজনের সঙ্গে কত আলোচনা করেছে। এর জল পেলে তাদের পুকুর আর ইঁদারা ভরবে। এই বৃষ্টি হবে বলেই না, তার মা গাঁয়ের আরো পাঁচজন বৌ-এর সঙ্গে মাথায় ডালা নিয়ে মন্দিরে গিয়েছিলো? জ্যৈষ্ঠ শেষ হতে যখন বুড়ো বুড়ো কিষাণরা সবাই ভাবী জলের ভরসা দিলো, তখনই সোনালী খড়ে ঘর ছেয়ে ফেলেছে প্রতাপ। ইট পুড়িয়ে পাকাঘর সে এখনি করতে পারে। শুধু তাতে করে রাজপুরুষের দৃষ্টি পড়বে তার টাকা-পয়সার ওপর। গম, ডাল, গুড়, ঘি, ছোলা, মকাই, ছাতু, কি তার ঘরে নেই?

চন্দন জলে কাঠ-কুটো ফেলে স্রোতের তীব্রতা দেখে। বলে—আমার মামারা এখন নৌকো নিয়ে গাজিপুর থেকে এলাহাবাদ আসবে। নৌকো ভাল চলবে এই জলের সময়ে।

জল ঝেঁপে এলে চম্পা আর চন্দন দুইজনেই চলে যায় বটগাছের নিচে। ঝুরি ধরে দাঁড়িয়ে জলের খেলা দেখতে বড় ভালবাসে চম্পা। আবার জল নেই, মেঘ করেছে। কনকনে বাদলা বাতাস দিচ্ছে, চন্দনের সঙ্গে সঙ্গে চম্পা যেন নদীর তীর দিয়ে প্রায় উড়ে চলে। যারা দেখে তারা অবাক মানে। আর দুজনের গতিবিধিই হলো মানুষের চোখ এড়িয়ে এড়িয়ে। চন্দনদের পেয়ারাবাগানে মালীর চৌকি দেবার ঘর। সেই ঘরে আশ্রয় নেয় ঝড়-বাদল হলে।

ঘরে ফিরলে পরে চম্পাকে তার মা বলে,—সে বড়মানুষের ছেলে। তার মা আগুন নিয়ে বসে আছে। ছেলের হাত পা সেঁকে দেবে, পিতলের লোটায় দুধ দেবে। তার সঙ্গে তুই যাস কেন চম্পা?

চম্পাদের ভাঙা ঘরে বৃষ্টির জল পড়ে। তুষভরা বস্তার ওপরে মায়ের বুকের কাছে লেপটে শুয়ে চম্পা একটা কহানী শোনবার আবদার জানায়। ছোট অঙ্গোটিতে কাঠকয়লার আগুন জ্বালিয়ে চম্পার হাত পা সেঁকে দেয় সুরজ। বলে—দুঃখিয়ারীর মেয়ে। তুই কেন তার সঙ্গে এমন করে মেতে বেড়াস?

মায়ের কাছে শুয়ে চম্পা অনেক প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু সকাল বেলা ঝকঝকে রোদে চন্দন যখন এসে ডাকে—চম্পা!

চম্পা খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠে। ইসারায় বলে—মা নেই, ভেতরে এসো।

চন্দন ভেতরে এলে চম্পা বলে,—আমার এখন অনেক কাজ। তোমাদের বাড়ী থেকে আসতে আসতে মা'র বিকেল হবে। আমি নইলে সব কাজ করবে কে?

সুরজকে চন্দনও একটু ভয় পায়। সুরজ আসবে না জেনে সে যেন নিশ্চিন্ত হয়। বলে—সাথে সাথে কাজ করি। তবে তো খেলবে?

আ'ট বছরের চম্পা গালে হাত রেখে অবাক হয়। বলে—আগে কাজের কথা। পরে খেলার কথা। তাই নয়? আরে ভাই ইয়ে তো বতাও—

ছুটোছুটি করে দুজনে জিনিষপত্র রোদে দেয়। কাপড় শুকোয়। বড় বড় ঝুড়ি ঝাঁকা, কিষাণের মাথার বাঁশের টুপী, গম ভরবার বস্তা। এতদিনের কাজের জিনিষ সব। কালকের বর্ষায় ভিজেছে। আজ সেগুলি দুজনে টানাটানি করে রোদে দেয়। চম্পার ছাগলছানাটা সঙ্গে সঙ্গে লাফায়। ঘর ঝাড়ু দেয় চম্পা। চন্দন উঠোনখানা ঝকঝকে করে তোলে। তারপর চম্পাদের খাটিয়ায় দড়ি টান-টান করে বাঁধে।

এত কাজ সেরে তবে চম্পা তাদের চুলা ধরায়। আজকে তাদের ভাত হবে, আর মূলোর শাক ভাজা হবে। মহা খুসী চম্পা। ওদিকে চন্দন বাঁশ আর ডালপালা এনে মাটির দাওয়ার এক পাশ খুব শক্ত করে ঘিরে দেয়। বলে—তোমার ছাগলছানা এখানে রাখবে চম্পা! না শেয়াল, না ভড়ার কেউ নিতে পারবে না।

সব কাজ সেরে দু'জনে দাওয়ায় বসে পা দুলিয়ে তিলের লাড্ডু আর মকাইয়ের খই খায়। কাপড়ে বেঁধে এনেছে চন্দন। কখন যে সুরজ এসে দাঁড়িয়েছে খিড়কীর দরজায়, নজরেও পড়ে না তাদের।

চেয়ে চেয়ে সতৃষ্ণ নয়নে সুরজ আনমনে ভাবে কি সুন্দর জোড়ী। তারপর অজ্ঞান্তে একটা নিশ্বাস পড়ে। তাকে ঢুকতে দেখে সচকিত বিব্রত চন্দন অপরাধীর মতো দাঁড়ায়। চম্পা তার হাত ধরে। বলে—আজ পালিয়ে যেতে দেব না। মা, চন্দন আর আমি সব কাজ করে ফেলেছি। আজ তুমি ওকে বকবে না।

—না। বসো চন্দন!

চন্দনকে আজ চোখ তুলে দেখে সুরজ। ছেলেটা দেখতে মায়ের মতো নয়। বাপের মতো? হবেও বা! বলে—তোমার মা রাগ করে, তাই আসতে বারণ করি।

—মা কিছু জানে না।

চন্দন সাগ্রহে বলে। বলে—চম্পার জন্যে আমি গুড় এনেছি, খাটিয়ার রশি এনেছি, মা কিছু জানে না।

—ও রকম তুমি এনো না চন্দন! তোমার মা জানতে পারলে আমাকে দোষী করবে।

চন্দন দুঃখ পেলো কি? এই সতেজ, সরল কিশোর মুখখানার দিকে চেয়ে সস্নেহে সুরজ বলে—তুমি এমনিই এসো। যখন খুসী হয়।

আজ চন্দন সহজ হয়ে অনেক গল্প করে। অনেক দিন বাদে সুরজের গলায় হাসি শোনা যায়। চন্দনের কাছে কেশবরাম পণ্ডিতের গল্প শুনে হাসি পায় তার। নিজের ঘরে ঘি, মালাই খেতে চায় না চন্দন। কিন্তু চম্পাদের বাড়ীতে উঠোনে বসে, চম্পার মা'র হাতের আচার রুটী খেতে খুব ভালো লাগে তার। বলে—ফাঁদ পেতে রেখে এসেছি ঘরের পেছনে। বটের, হাড়িয়াল পাকা মরিচ খেতে এলে ধরব। আমাদের নামুয়াকে দিলে সে হাটে নিয়ে যাবে। বিশটা হড়িয়াল বেচে নামুয়া আলুর বিছন এনে দেবে।

—তারপর?

ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেমানুষী করে সুরজ। অবাক হয় চন্দন। ভাবে, চম্পার মা কিছু জানে না। মেয়েমানুষ কি না! কিষাণ-ঘরের ছেলে। যেমনটি শিখেছে তেমনি বলে অভিজ্ঞ চাষীর মতো।

—তারপর তোমার বাড়ীর পেছনে আলুর ক্ষেতী হবে। আলুশাক বানাবে তুমি ঘি দিয়ে!

কথায় কথায় বেলা হেলে যায়। সচকিত হয়ে চন্দন ছুটে চলে যায়। যাবার আগে জানিয়ে যায় কাল-ই ভোরবেলা চলে আসবে।

সূর্য্যাস্তের রাঙা আভা সবুজ ডানায় মেখে একঝাঁক টিয়াপাখী চম্পাদের আমগাছটায় এসে বসে। মরকতমণির মতো ডানা। চুণির মতো চোখ, পাখীগুলির দিকে চেয়ে চম্পা ভাবে—এমন সুন্দর পাখী ধরতে চায় চন্দন? চন্দন ফাঁদ পাতলে সে ফাঁদ সে ভেঙে দিয়ে আসবে। বলবে, সাহস থাকে ত সেদিনের হরিণটা ধরে দাও আমাকে ফাঁদ পেতে।

তারপর তেল দিয়ে মেয়ের চুল আঁচড়ে বেঁধে দেয় মা। সন্ধ্যে হতে না হতে মায়ের কাছে মেয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়ে ঘুমে। মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে রেড়ীর তেলের পিদীমটার নিষ্কম্প আলোর কৌটাটির দিকে চেয়ে সুরজ আকাশ-কুসুমের বিনিসুতোর মালা গাঁথে। ভাবে এমন-ও ত' হতে পারে দু'জনের ভাব দেখে প্রতাপ বৌ করে নেবে চম্পাকে। এমন ত' গল্পে শোনা যায়! বরাত আসবে, এই ভাঙাঘরের উঠোনে সামিয়ানা পড়বে, হাতভরা কাচের চুড়ি পরে আর ছোট্ট ঝালিতে রূপোর গহনা নিয়ে ছোট্ট চম্পা কেঁদে-কেটে পালকিতে উঠবে! ভাবতে ভাবতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে ঘুমে।

রাতের হালকা মেঘের কোলে শিশুচাঁদের মতোই মায়ের কোলে ঘুমোয় চম্পা। আকাশ থেকে ধ্রুবতারার কল্যাণ দৃষ্টি সারা রাত মা আর মেয়ের মুখ ছুঁয়ে থাকে। [ ক্রমশঃ।

Our generation has succeeded in stealing the fire of the gods and it is doomed to live with the horror of its achievement.

*—Dr. Henry A. Kissinger*

# চৌকিদার

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

তুষার চট্টোপাধ্যায়

## তৃতীয় দৃশ্য

[ আগুন, আগুন, জল আন, জল আন, জল দে, নেপথ্যে নানারকম গোলমাল। বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ। মাঝে মাঝে আগুনের হল্কা দেখা যায়। স্টেজের ওপর দিয়ে অনেক লোক ছুটে গেল। কিছুক্ষণ বাদে গোলমাল থামলো। হৃদয় মোড়ল ধোঁয়াটে অন্ধকারে ঝুঁকতে ঝুকতে এসে একটা গাছতলায় কপালে হাত দিয়ে বসলো। দুজন লোকের প্রবেশ ]

প্রথম। ওঃ কি আগুনটাই লেগেছিল! ভাগ্যিস সময়মত টের পাওয়া গিয়েছিল। আর নয়ত সারা পাড়াটাই শেষ হতো।

দ্বিতীয়। সে কথা ঠিক। কিন্তু মোড়লের ক্ষতি নেহাৎ কম হয়নি। [ বলতে বলতে উভয়ের প্রস্থান।

( কিছুক্ষণ বাদে নিতাই হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় গোটানো, কাঁধে গামছা, প্রবেশ করলো। এ দিক ও দিক দেখে হৃদয় মোড়লের কাছে এসে)

নিতাই। এই যে হৃদয় খুড়ো, তুমি এখানে মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছ কেন? আরে, কপালে থাকলে ঐ রকম অনেক কিছুই হয়। নাও, ওঠ দিকিনি।

হৃদয়। নিতাই তুই বুঝবিনে, আমার সাত পুরুষের ভিটে।

নি। সেজন্য এখন ভাবনা করে আর কি এগুবে বল? যা হবার হয়ে গেছে। নাও, এখন ওঠ, ঘরে চলো।

হৃ। ঘর! ঘর কি আমার আছে রে নিতাই!

নি। ( ঢোক গিলে। অপ্রস্তুতের ভাব সামলিয়ে ) ঘর? তা···তা···থাকবে না কেন? আর কিছু না হোক, এই নেতাই যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ তোমার কিছু ভাবতে হবে না। ভগবানের কৃপায় দু-এক মাস খুব চালিয়ে নিতে পারবো।

হৃ। হ্যাঁ রে, তোর খুড়ী-মা, সোহাগী, ওরা সব কোথায়?

নি। পদ্মপিসী তো ওদের ডেকে নিয়ে গেল, তোমার ভাবনা নেই। মাষ্টার মশায় সেখানে আছেন।

( লক্ষ্মণ মুক্তিকে টানা-হেঁচড়া করতে করতে প্রবেশ করলো )

ল। এই, এই শালাকে আমি ধরে নিয়ে এসেছি। শালা উত্তরের ভিটে দিয়ে পালাচ্ছিলো। গোড়া থেকেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছে। অন্ধকারে গুজগুজ ফুসফুস। বাবা, শত হলেও চৌকিদার। কাউকে রেহাই পেতে হবে না। কই বল্, তোর আর সব শাকরেদরা কোথায়?

মু। না মানে, তুমি এসব কি বলছো? তুমি বিশ্বাস করো, মানে, আমি ধর্ম্মতঃ বলছি।

ল। থাম্ ব্যাটা ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

( নিতাই ছুটে এগিয়ে এলো )

নি। কি, কি ব্যাপার লক্ষ্মণদা'! আরে, বেচারার ঘাড়টা ছাড়ো। এ যে একেবারে মরার দশা।

লক্ষ্মণ হাত ছেড়ে দিল। মুক্তি হাঁফ ছাড়তে লাগলো )

মু। এই দেখ তো নিতাই কি বিপদ! আমি একটা কাজে এদিকে যাচ্ছিলাম।

ল। চল শালা আগে কাচারীবাড়ী, তারপর তোর কাজে যাবি। তোমার ঐ সাধুগিরি আমি বের করে দেবো না। পেরসিডেণ্ট সাহেবকে বলে তোর নামে যদি থানায় দু নম্বর না ঢুকে দিতে পারি তো আমার চৌকিদারী মিথ্যে। শালা পরের ঘরে আগুন লাগানো! ( হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে ) আরে জমিদার বাবু এদিকে আসছেন না?

( জমিদার ও রাজেশ্বরের প্রবেশ। জমিদার লক্ষ্মণের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে )

জ। এই যে নিতাই, তোমাদের মোড়ল কোথায়?

নি। ঐ তো বসে।

জ। ( জমিদার হৃদয়ের নিকটে গিয়ে ) আরে এই সময় মন খারাপ করে বসে থাকলে চলে?

হৃ। ( উঠে ) জমিদার বাবু, সে আপনি বুঝবেন না।

জ। না না সে তো ঠিকই। এ যে একটা কতো বড় সর্বনাশ! আমি তো শুনেই একেবারে ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছি। তা যাক্, দৈব বিড়ম্বনায় যা হবার হয়ে গেছে। নিয়তির বিধান কে খণ্ডাবে বলো? তা তুমি বরং এক কাজ করো। স্ত্রী-পরিবার নিয়ে আমার ওখানে যেয়েই ওঠো। ( হঠাৎ যেন লক্ষ্মণকে দেখতে পেয়েছেন এই ভাবে ) আরে লক্ষ্মণ, তোমার কি ব্যাপার, একেবারে হাঁপাচ্ছ যে?

ল। আজ্ঞে হৃদয় খুড়োর বাড়ি এই মুক্তি আগুন দিয়েছে বলে আমার সন্দেহ হয়েছে। তাই আপনার কাছে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

জ। মুক্তিকে···আ···আগুন দিতে···। তা তুমি ঠিক দেখেছ?

ল। না মানে আমি ঠিক ওকে দেখিনি, তবে —

জ। তবে?

ল। মানে ওকে সন্দেহজনক ভাবে পালিয়ে যেতে দেখে আর তার উপর—

রা। ( বিস্মিত ) সে কি! মুক্তি হবে কেন? আমি তো দেখি হরিহর, রাধেশ্যাম, গুরুপদ সবার মুখেই শুনছিলাম যে তুমি নাকি ঐ মোড়লের মেয়ে আর মাষ্টারের ব্যাপার নিয়ে গোলমাল পাকিয়ে মোড়লের ঘরে আগুন লাগিয়েছ।

ল। এ্যাঁ। আ—আ—আমি! আ—আ—আগুন!

রা। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই আগুন লাগিয়েছ। আর এখন খামাকা মুক্তিকে ধরে নিজে সাধু সাজবার চেষ্টা করছো।

ল। মানে দেখে···

জ। ছিঃ ছিঃ লক্ষ্মণ, তোমাকে তো ভাল ভেবেই চৌকিদার করেছিলুম। এখন দেখছি···তা যাক, কোন কিছুরই যখন প্রমাণ নেই তখন লোকের কথা শুনে যা তা একটা করা ঠিক হবে না। মুক্তি, আপনি বাড়ি যান। আর লক্ষ্মণ, তুমি তোমার কাজে যাও। আমি পরে সমস্ত ব্যাপারটা দেখবো।

[ রাজেশ্বরের সংগে দৃষ্টি বিনিময় করে মুক্তির দ্রুত প্রস্থান। লক্ষ্মণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে প্রস্থান।

জ। ( স্বগত ) কে আগুন দিলো না দিলো তার থেকে এখন বড় কথা হচ্ছে ইমিডিয়েট রিলিফের ব্যবস্থা করা। ( মোড়লের দিকে ঘুরে ) দেখ ঐ যা বললাম। মন খারাপ করে আর কি

হবে। সবই পূর্বজন্মের ফল। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে) শত হলেও তুমি বাবার আমলের লোক। ঘরপোড়া হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, এটা তো আর আমার ভাল লাগে না। স্ত্রী-পরিবার নিয়ে আপাততঃ তুমি আমার ওখানে যেয়ে থাক।

হ। মানে আপনি···

জ। না না এতে আর আপত্তি করবার কিছু নেই। শত হলেও তোমার এ দুর্দিনে আমারও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। ঠিক আছে, তুমি এসো। আমার একটু কাজ আছে। আমি চলি। কই, চল হে রাজেশ্বর! [প্রস্থান।

রা। চলুন! [প্রস্থান।

হ। আর যা-ই হোক জমিদার বাবুর মনটা ভাল। তিনি নিজে ছুটে এসেছেন। তাছাড়া কথাগুলোও যা বললেন···

নি। আরে রেখে দাও তোমার কথা। ও সব মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজে না। তুমি যেন কেমন। সোজা মুখের ওপর বলে দেবে। তা না—

হ। না না না, তাই কি হয়। শত হলেও সাত পুরুষ তার খেয়ে মানুষ।

নি। (বিকৃত উচ্চারণে) শত হলেও সাত পুরুষ তার খেয়ে মানুষ। রেখে দাও তোমার ছেঁদো কথা। বলি, খেতে দেবেটা কে? আরে বাবা, ধান কাটা হলেই তো চলে যায় জমিদারের গোলায়। আর সারা বছরই তো ভাঁড় মা' ভবানী হয়ে পেটে কিল মেরে বসে থাক দাওয়ায়। তার আবার···তোমার কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায় হরন্ত খুড়ো!

হ। এখনও ছেলেমানুষ আছিস রক্তের গরমে, এরকম অনেক কথাই বলা যায়। কিন্তু—

নি। কিন্তু-কিন্তুর আবার কি আছে? মাষ্টার যা বলেছে মনে নেই? সোজা কথা পরিষ্কার বলবো। কারুর খাইও না, কারুর ধারও ধারি না।

(মাষ্টারের প্রবেশ)

মাষ্টার। কি ব্যাপার, নিতাইয়ের আবার কি হলো?

হ। না মানে, এই ঘর পোড়ার কথা শুনে জমিদার বাবু নিজে খোঁজ নিতে এসেছিলেন তাই···

মাষ্টার। তিনি যে এখন আসবেন, অনেক কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করবেন তা আমি জানি।

হ। মাষ্টার তোমায় আর কি বলবো। আমার সাত পুরুষের ভিটে।

মাষ্টার। সে তো ঠিকই। কিন্তু এ সময় তোমাকে তো ভেংগে পড়লে চলবে না। বরং আরও জোরে কোমর বেঁধে লাগতে হবে।

হ। না না মাষ্টার, ভেংগে আমি পড়িনি। তবে—

মাষ্টার। তবে মনে একটা আঘাত পাওয়া স্বাভাবিক। যা হোক, ঘটনাটাকে নেহাৎ সাধারণ ঘটনা বলে মনে না করে এর অন্য এ্যাসপেক্ট মানে অপর দিকগুলোও চিন্তা করা দরকার।

নি। তা কি করবেন মাষ্টার মশাই?

মাষ্টার। আপাততঃ সবাই বসে আলাপ আলোচনা করে একটা নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

নি। (নিতাই উৎসাহের সংগে) তাহলে তো একটা বৈঠক ডাকতে হয়।

মাষ্টার। হ্যাঁ আমি সেই ব্যবস্থাই করেছি। যাই পশ্চিম পাড়াটায় খবর দিয়ে আসি। তোমরা এখন ইস্কুল-ঘরের দিকে চলো। আমি এগুচ্ছি। [প্রস্থান।

নি। (কিছুক্ষণ ভেবে। হঠাৎ মাষ্টার মশাই, মাষ্টার মশাই বলতে বলতে উঠে গেল। এবং কোন রকম সাড়া না পেয়ে ফিরে এলো) না। মাষ্টার মশাই চলেই গেছেন। তুমিও তো আচ্ছা খুড়ো। ব্যাপারটা তো একবার মনে করাতে পারতে।

হ। কি?

নি। কেন ঐ আগুন লাগানোর ব্যাপারটা। যাকগে, বৈঠকে নিশ্চয়ই ব্যাপারটার আলোচনা হবে। আর তা ছাড়া আজকেই আগে চোখের 'পরে যা দেখলাম শুনলাম, তাতে তো লক্ষ্মণদা'কেই··· কি বলো খুড়ো?

হ। না না আর যাই হোক লক্ষ্মণের দ্বারা এ কাজ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। লক্ষ্মণের মতো ছেলের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়।

নি। তবে? বাড়ীতে কোন মানুষ নেই। ঘরে আগুন লাগে আপনা আপনি? সে তুমি যা-ই বলো খুড়ো। নিশ্চয়ই কেউ শত্রুতা করে আগুন দিয়েছে। তা সে লক্ষ্মণদা'ই হোক আর মুন্সি সাহেবই হোক।

হ। না না এ তুই কি বলিস। লক্ষ্মণ মুন্সি ওরা কেউই সে রকম লোক নয়।

নি। কোন লোককেই বিশ্বাস নেই খুড়ো, কোন লোককেই বিশ্বাস নেই। লক্ষ্মণদা' মুন্সি সবাই হচ্ছে ঐ জমিদারের লোক। কি দিয়ে কি হয়েছে কিছুই বলা যায় না।

হ। এ্যাঁ তাই!

নি। হ্যাঁ তাই।

## চতুর্থ দৃশ্য

(জমিদারবাড়ীর কক্ষ। রাজেশ্বর ও মুন্সি)

মু। না জমিদার বাবু, আমাদের ডাকিয়ে নিজে কোথায় গেলেন বলুন তো!

রা। হয়তো কোন কাজে এদিক ওদিক গেছেন, তাকে তো আরও চারদিকে নজর রাখতে হয়। তা যাক সেদিনকার ঘটনাটা একবার ভাবুন দেখি? আমি ঐ রকম ভাবে না কাটিয়ে দিলে অত সহজে কি আর সেদিন রেহাই পেতেন। লক্ষ্মণ এ্যায়সা ভাবে আপনাকে ধরেছিলো।

মু। ওঃ, সে আর বলতে? চৌকিদার তো নয় যেন সাক্ষাৎ যম। বাপ রে বাপ!

রা। আপনি স্রেফ নিজের হঠকারিতার জন্যে ধরা পড়ে গেলেন। কই, বলি আমিও তো ছিলুম, আমাকে কিছু করতে পারলো? হ্যাঁ হ্যাঁ ধরতেও পারলো না। ছুঁতেও পারল না।

মু। সে কথা ঠিক, তবে কি না (চিন্তিত মুখে জমিদারের প্রবেশ)।

রা ও মু। এই যে জমিদার বাবু, আসুন আসুন।

জ। ওদিককার সব খবর শুনেছেন ?

রা। কেন কি হলো আবার ?

জ। হবে আর কি, প্রথম চালটা ব্যর্থ হলো।

মু। মানে ?

জ। মানে মাষ্টার মোড়লকে ডেকে বৈঠক করে বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে আবার চাঙ্গা করে তুলেছে। সবাই মিলে নোতুন করে মোড়লের পোড়া ঘর বেঁধে দিতে লেগেছে।

রা। আমি তখনই বলেছিলাম, ঐ মাষ্টার ব্যাটাই সমস্ত কিছুর কলকাঠি নাড়াচ্ছে। আর নয়ত ঐ চাষাদের মাথায় এতো বুদ্ধি জোগায় কোথা থেকে ?

জ। সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু এখন কি দিয়ে কি করা যায় ?

রা। আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না ? সে বার দাঙ্গা লাগিয়ে যেমন ওদের তেভাগার আন্দোলন ভাঙ্গা হয়েছিল তেমনি আরেকটা দাঙ্গা লাগালে কেমন হয় ?

জ। ইয়েস ভাটস গুড সলিউশান।

রা। ভেবে দেখুন, দাঙ্গা লাগালে ওদের নিজেদের জোট ভাঙবে। আর সেই সুযোগে মাষ্টারকে···একেবারে এক ঢিলে দুই পাখী।

মু। কিন্তু দেখুন আমার পাড়াটা বড় খারাপ। দাঙ্গা লাগালে খুব মুস্কিলে পড়তে হবে। তাই বলছিলুম কি ঐ দাঙ্গা···

জ। তা সেজন্তে ভাবছেন কেন ? আপনার আমার ঘরে কে আগুন দিতে আসবে ?

রা। মুন্সিও যেন আজকাল কেমন সহজেই নার্ভাস হয়ে পড়েন।

মু। দেখুন, তা একটু হতে হয় বৈ কি। উন্মত্ত জনতায় বিশ্বাস নেই।

জ। আরে না না। এস্তাজ রমজান যজ্ঞেশ্বর কয়েকজনকে বলে দেবো ওরা একটা গোলমাল বাধিয়ে ঝপ্ করে মাষ্টারকে ··বুঝলেন না ?

মু। দেখুন আপনি যা ভালো বোঝেন।

জ। ভালো বোঝেন ? মানে ? আরে এই ইউনিয়ন বোর্ডের ক্ষমতা যদি চাষীরা হাতে পায়, ওরা যদি ক্ষেপে ওঠে, তবে আপনার আমার সকলেরই বিপদ।

রা। এ তো অত্যন্ত সহজ কথা। ঐ তো সে বার সেই তেভাগার সময় ঐ রকম করে ওদের জোট না ভাঙতে পারলে কি আর ওদের অত সহজে দমানো যেতো ? না আমাদের ধান নির্বিঘ্নে গোলায় তোলা যেতো।

মু। সে কথা ঠিক, তবে আমি বলছিলুম কি, এই দাঙ্গা মানে ?

জ। তা যাক, রাত অনেক হয়েছে। আর এখন কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পরিষ্কার কথায় যেন তেন উপায়েন ওদের দমাতেই হবে। নইলে আপনার আমার সবার ভবিষ্যৎই শঙ্কাকুল।

মু। তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমার যেন কেমন আপনার ঐ লক্ষ্মণকে ভয়-ভয় করে। ঐ আগুন লাগানোর ব্যাপার নিয়ে আমার মনে হয়, ও আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে। তাই—

জ। ও হো-হো, এই কথা! তা আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। নিজের ঘাড়ে দোষ পড়ায় লক্ষ্মণ এখন একেবারে মনমরা হয়ে গেছে। আজ-কাল আর ঘর থেকে ও বেরোয় না। কাল-পরশু ওকে একবার ডেকে আমি সব ম্যানেজ করে দেবো। কিছু ভাববেন না।

মু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ভাল। শক্ত হলেও বলা যায় না, এ তো আর রজনী চৌকিদার নয়। এসব ব্যাপারে লক্ষ্মণের মতো সাদা মাটা মানুষগুলোকে নিয়েই যত ভয়।

রা। সেজন্ত আপনাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না। জমিদারবাবু সব ব্যবস্থা করে দেবেন। তা যাকগে, আমরা তাহলে এখন···

জ। না না না, আরেকটু বসুন। ইস্তাজকে খবর পাঠিয়েছি। ও হয়তো এখুনি এসে পড়বে। গোবিন্দ গোবিন্দ—আচ্ছা থাক্, আমি নিজেই যাচ্ছি। [ প্রস্থান।

রা। দেখুন মুন্সি সাহেব, সত্যনারায়ণ বাবুকে দিয়ে প্রথম থেকে যদি ঐ গোলমালের মূল উৎপাটন করা না যায়, তবে শেষে নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে ; এ আমি আপনাকে বলে দিলুম।

মু। সে কি আর বুঝি না ? আমারও তো দু'-দশ বিঘে জমির ওপরেই ভরসা।

রা। এই তো, এতোক্ষণে ঠিক ধরেছেন। আচ্ছা আপনার কি মনে হয় এবার ভোটে সত্য বাবু জিততে পারবেন ?

মু। ঐ চাষা ব্যাটাদের কথা বলা যায় না। ওরাই আবার সংখ্যায় বেশী।

রা। আরে ওদের মাষ্টার সাবাড় হলে আর ওদের মাঝে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকে গেলে আপনি কি মনে করেন, ওরা সহজে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে পারবে ?

(জমিদারের প্রবেশ)

জ। হাঃ হাঃ, আপনি ঠিকই বলেছেন রাজেশ্বর বাবু! ওদের এখন শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়া দরকার। ওদের দমাবার ঐ হচ্ছে শেষ অস্ত্র। আর তাছাড়া আপনারা ভয় পাচ্ছেন কেন ? থানার সরকারী দারোগা পুলিশ সব তো আমার হাতে।

( ইস্তাজের প্রবেশ )

ই। সেলাম বাবু সাব!

জ। ইস্তাজ এসেছিস ? আয় বোস।

মু ও রা। আমরা তাহলে এখন আসি।

জ। আচ্ছা আপনারা তবে যান। ঐ কথা থাকলো। ( বলে মু ও রাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে ) ইস্তাজ, তোকে আমার খুব জরুরী দরকার।

ই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমি বুঝতে পেরেছি বাবু! দুই-একটা লুঠতরাজ খুন-জখমের দরকার না হলে কি বাবুদের দরবারে হামাদের মতো অভাজনদের ডাক পড়ে বাবু ?

জ। সে তো তুই জানিসই—

ই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সব জানে বাবা। লেকিন কামকা বাত কি আছে বাবা ?

জ। শোন, তুই ঐ মাষ্টারকে চিনিস ?

ই। ( কপালে হাত ঠেকিয়ে ) সাবাস চিনবো না ? ও তো একটা আদমী আছে।

জ। আদমী আছে কি না আছে সে কথায় তোর কাজ কি! এখন আমি যা বলি তা-ই শোন। ওকে তোর ( কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি বলে )

ই। না না, সে হামি পারবে না।

জ। ওঃ বেটা খুব সাধুগিরি করা হচ্ছে, ভালমানুষি রাখ। আগামী অন্ধকার পক্ষে··দাঙ্গা বাধিয়ে··বুঝলি ?

ই। না না না, ও হামি পারবে না।

জ। নে থাম্। রেট আরেকটু বাড়িয়ে দিতে হবে এই তো ? তা না হয় এবার কিছু বেশীই নিস্। (ইস্তাজকে নিরুত্তর দেখে) ভাখ, তোরা যে এই চৌধুরী-পরিবারে খেয়েই মানুষ এই কথাটা মনে রাখিস। বেনারস থেকে ফেরারী হয়ে যখন তোরা পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি তখন যদি আমরা তোদের আশ্রয় না দিতাম ? (কিছুক্ষণ থেমে) আমরা না থাকলে তোদের পুরুষগুলোকে সারাজীবন হাজতে ঘানি ঘোরাতে হতো। আর মেয়েগুলোকে বাজারের খাতায় নাম লিখিয়ে ইজ্জৎ বেচে খেতে হতো। আর যা-ই হোক, সেসব কথা ভুলে যাস না।

ই। (দুর্বলতায় আঘাত পড়ায় ইতস্ততঃ) লেকিন লেকিন—

জ। তুই যে কোনদিন নেমকহারাম হবিনে এ বিশ্বাস আমার আছে ইস্তাজ !

ই। (আহত কণ্ঠে) নেমকহারাম !

জ। নে নে আরো পাবি (টাকা দিলেন)

ই। আচ্ছা আচ্ছা লেকিন মাষ্টার— [প্রস্থান।

জ। (ইস্তাজের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে) হ্যাঁ হ্যাঁ মাষ্টার! খোসা না করে জল যখন তুমি খাবে না, তখন খোসা ছলই খাও।

## পঞ্চম দৃশ্য

(অন্ধকার জংলা পথ, কিছুক্ষণ বাদে ইস্তাজের প্রবেশ। এদিক ওদিক উঁকি মেরে হাতের ইসারা। চকিতে দুদিক থেকে তিনজনের প্রবেশ)

ই। এরে ভুলুয়া !

ভু। (সেলাম করে) ওস্তাদ !

ই। সব ঠিক আছে ত ?

ভু। নেহি ওস্তাদ ! সব গড়বড় হো গিয়া।

ই। কেয়া ? গড়বড় হো গিয়া ?

ভু। হ্যাঁ ওস্তাদ ! ও শালা মাষ্টার মিটিন করে সব লোককে হাত করিয়েছে। যজ্ঞেশ্বর সামসুদ্দিন আউর সব শালা লোগ জমিদার বাবুকো হোকে লাঠি ধরবে না বলিয়েছে। তব ক্যায়সে হামলোগ দাঙ্গা লাগানে স্যাকেগা বলো ওস্তাদ ?

ই। নেহি স্যাকেগা ?

ভু। বহুৎ মুস্কিলকা বাত হায় ওস্তাদ, এবার হার মানতে হবে।

ই। হার ! হাঃ হাঃ হাঃ ইস্তাজ ওস্তাদ হার মানেগা ? কভি নেহি (বিদ্যুৎ বেগে ঘুরে) আখতার।

আ। ওস্তাদ !

ই। তু লোগ এক কাজ কর। মোড়মে যো ঝোপ হায় না উসকো অন্দরমে বৈঠ যা।

আ। ঝোপের আড়ালে বসে আর কি হবে ওস্তাদ ? শুধু মশার কামড়।

ই। (ধমকের ভঙ্গীতে) আখতার। ফিন বাত। যো বোলেগা ওহি করনা। (সবাই চুপ। কিছুক্ষণ বাদে) ইস্কুল সে শালা মাষ্টার লোগ যব রোজকা মাফিক আন্ধারমে পাস করবে ওহি টাইমমে—সমঝা ?

আখতার আর ভগবান। লেকিন—

ই। আঃ যাও। (উভয়ে যেতে উদ্যত) আরে ভগবান শুন, (উভয়ে ঘুরে দাঁড়ালো) ইস্তাজ হাত দিয়ে আখতারকে ইংগিত করলো) নিকাল। (আখতারের প্রস্থান। ফস করে ভগবানের হাত ধরে) তু কাঁহা যাতা ? আপনা পশ্চিমানমে যা। (ঠেলে দিলো।) [ভগবানের ভিন্ন দিকে প্রস্থান।

ভু। ওস্তাদ !

ই। হ্যাঁ তু ইধার উধার নজর রাখ। হাম ভি হৈ। [ভুলুয়ার প্রস্থান। (ভুলুয়ার যাবার দিকে তাকিয়ে) ইস্তাজ ওস্তাদ হার মানে গা ? হাঃ হাঃ কভি নেহি। মাষ্টার তুম বড় বুদ্ধু আদমী সমঝ গিয়া না ? আচ্ছা কৌন শালা বড়িয়া লড়নেওয়ালা হায় আভি মালুম হো যায়ে গা। [প্রস্থান।

(চিন্তিত মুখে লক্ষ্মণের প্রবেশ। এদিক ওদিক তাকিয়ে)

ল। উঃ, কি ঝকমারীই করেছি। শালা চৌকিদারী তো নয় যেন এক পাপ। সবাই বলে কি না চৌকিদার ঘরে আগুন দিয়েছে ! আরে দেখলাম মুন্সিকে বলে কি না চৌকিদার ! এ্যাঁ একেবারে দিনকে রাত রাতকে দিন। নাঃ, বাইরে আর মুখ দেখাবার উপায় রইলো না। এ ক'দিন ঘরে বসে বেশ ছিলাম। জমিদার বাবু ডেকে পাঠিয়েই যতো মুস্কিল করে দিলেন। যাই একবার কাচারী-বাড়ী ঘুরে আসি গে ! শালার এ ঝামেলা ভালো লাগে !

(ইস্তাজের প্রবেশ) লক্ষ্মণকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে)

ই। আরে কৌন আছে ? লক্ষ্মণ আছে ?

ল। কে ইস্তাজ না ? তুমি এই রাত্তিরে ! শালা লুঠের মতলবে আছো ?

ই। (চৌকিদারীর পোষাক টেনে) আরে বাবা: চৌকিদার আছে। সাবাস।

ল। দাঁড়াও তোমার সাবাস করা আমি বের করছি। পেরসিডেণ্ট সাহেবের কাছে নিয়ে গেলে তোমার উচিত ব্যবস্থা হবে।

ই। না না বাবা, তোমার পেরসিডেণ্ট সাহেবের কাছে নিয়ে গেলে কিচ্ছু ব্যবস্থা হবে না।

ল। হবে না মানে ? দাঁড়াও তোমায় মজা দেখাচ্ছি।

ই। আরে থাম বে। দোদিনকা যোগী ভাতকে বলে রোটি। বোঝে না সোঝে না। (উত্তেজিত)

ল। কি ? কি বুঝি না ? তোমাকে এ তল্লাটের কে না চেনে ? তুমি এমনি এমনি রাত্তির বিত্তিরে পথে বেপথে ঘুরে বেড়াও না ?

ই। না না বাবা, তুমি কিচ্ছু বোঝে না। তুমি তো নয়া আছে।

ল। বুঝি না মানে ?

ই। বোঝ না মানে বোঝ না। (নিকটে এসে) আরে, এ তল্লাটে যতো খুন খারাপ বদমাস করতে হয় না, সে তো আমরা করে। আর আমরা সব তোর ঐ জমদার বাবু, পেরসিডেণ্ট সাহেবের

লোক আছে। আমাদের থানা কোট হবে তো তারা বাঁচবে আর তাদের হয়ে আমরা লুঠ করবে খুন করবে।

ল। এঁ্যা খুন করবে!

ই। হ্যাঁ হাঁ খুন ভী করবে!

ল। কেন?

ই। (হাত নেড়ে) আরে বাবা রূপিয়া—রূপিয়া মিলবে।

ল। রূপিয়া মিলবে বলেই তুমি খুন করবে?

ই। হ্যাঁ হ্যাঁ ক্যান করবে না! হামার ভী বাল বাচ্চা আছে তাদের ভী দানা-পানি দিতে হবে।

ল। এঁ্যা বলো কি!

ই। আরে হাঁ হ্যাঁ তুই তো ছেলেমানুষ আছিস বে! আভি চেপে যা। গোলমাল করে কেন ঝুটমুট চাকরী খোয়াবি।

ল। এঁ্যা চাকরী খোয়াবো আমি? বলো কি!

ই। আরে হাঁ হ্যাঁ। কাল তো বাবা পোষাক পরিয়েছে আউর আজই সব জানিয়ে যাবে। দু-চার মাহিনা জানে দে বাবা সবকো হালচাল বিলকুল সমঝে যাবে। আউর লুঠের ভি বখরা মিলবে।

[লক্ষ্মণের পিঠ চাপড়িয়ে ইস্তাজের প্রস্থান।

ল। (অবাক হয়ে) লুঠের বখরা মিলবে! এঁ্যা বলে কি? লুঠের বখরা হয় চৌকিদারের সংগে। আবার কোথায় চোর বদমায়েস ধরবে চৌকিদার তা না তারাই উল্টে চোখ রাঙায়। বলে কেন ঝুটমুট চাকরী খোয়াবি। এঁ্যা, শালারা বলে কি? চোর ধরলে চাকরী যাবে চৌকিদারের। তবে দারোগাবাবু যে বলেছিলেন থানার দারোগা পুলিশের পরেই আমার পজেশান। না মামলা বড় গোল। শালার কোথায় যেন একটা গোলমাল গোলমাল ঠেকছে। কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। (কিছুক্ষণ চিন্তা করে) না ঐ ইস্তাজ মিঞাই ঠিক কথা বলেছে। আমি বোধ হয় এখনও ছেলেমানুষ আছি। মানে আর কিছু দিন গেলে সব বুঝতে পারবো। (খানিক পরে) নাঃ যাসগে মরুকগে, যাক ওসব ঢাক্-ঢাক্ গুড়গুড়ের মধ্যে আমি আর নেই। চৌকিদারের নিকুচি করেছে। দুত্তোর না শালাই পোষাকগুলো জমা দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। (এক কোণে পাগড়ী খুলে, বেল্ট মাটিতে নামিয়ে, জামা খুলতে লাগলো। ইতিমধ্যে ভুলুয়ার প্রবেশ)

ভু। (মুচকি হেসে) আরে শালা চৌকিদার। লুঠকা বখরা নিতে এরই মধ্যে হাজিরা হয়ে গেছ বাবা! তা পোষাক ওষাক খুলে কি হচ্ছে?

ল। (তাড়াতাড়ি পোষাক সামলে) না মানে, এই জামার মধ্যে একটা আরশোলা ঢুকেছিলো তাই মানে···তা তুমি এই রাত্তিরে?

ভু। আরে সবই তো জানে বাবা। আমার কাছে আর সাধু সেজে কি হবে।

ল। কি, তুমি বোলছ কি?

ভু। আরে বাবা ঠিকই বলছি। তু বাবা আগুন দেখে যো কুছ করতে পারলে না। হাম লোকের পর তো ওহি ভার পড়িয়েছে। আরে ঘাবড়াও মাৎ। ও শালা লোককে বিলকুল ঠাণ্ডা বানিয়ে দেবো। আরে কৌন, ইধার আতা নেহি? আচ্ছা ফিন দেখা হবে কিউ?

ল। এঁ্যা কি বলে গেল, ঠাণ্ডা বানিয়ে দেবে? ব্যাপা[র] বড়ো গোলমেলে গোলমেলে মনে হচ্ছে। [প্রস্থানোদ্যত।

(কথা বলতে বলতে মাষ্টার ও হৃদয় খোড়লের প্রবেশ)

হৃ। তা বুঝলে মাষ্টার!

মা। (ইংগিতে থামাইয়া) কে যাচ্ছে চৌকিদার না?

হৃ। হাঁ। আরে ও লক্ষ্মণ, শোন শোন। এদিকে শোন তারপর ব্যাপার কি? এত্তো তাড়াতাড়ি কিসের?

(লক্ষ্মণ পোষাক ঠিক করে ঘুরে দাঁড়ালো)

ল। না মানে···ঠাণ্ডা বানিয়ে দেবে—ইস্তাজের দলের লো[ক] —কেমন একটা সাজো সাজো ভাব—শক্ত হলেও চৌকিদা[র] [হঠাৎ মাষ্টারকে দেখে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল। কটমট করে মাষ্টারে[র] দিকে তাকিয়ে আর কোন দিকে কর্ণপাত না করে মাচকরী চা[লে] প্রস্থান।

হৃ। আরে শোন শোন। (বলতে বলতে মাষ্টার ও হৃদয়ে[র] চৌকিদারের প্রায় সংগে সংগে প্রস্থান। নেপথ্যে ক্ষীণ আর্তনা[দ] মঞ্চের ওপর দিয়ে চকিতে একটা লোক লাঠি হাতে চলে গেল শুধু মুখ ঘুরিয়ে বলে গেল "শালা।" পেছনে ক্ষীণ আর্ত[নাদ] গোলমালে পরিণত হলো।)

## ষষ্ঠ দৃশ্য

(লক্ষ্মণের কুঁড়ে। দাওয়ার 'পর মাদুরে লক্ষ্মণ শুয়ে। বেড়[ার] গায়ে চৌকিদারী পোষাকগুলো ঝোলানো। রং-বেরংএর প[টি] দিয়ে লক্ষ্মণের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। লক্ষ্মণ মাটির দিকে মা[থা] ঝুঁকিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসলো।)

ল। উঃ, কি ঝকমারীই করেছি!

(কমলালেবু হাতে তুলির প্রবেশ।)

তু। কি হলো আবার?

ল। না, ও মানে কিছু না।

(তুলির হাতে কমলালেবু দেখে) এঁ্যা কমলালেবু! (হা[ত] থেকে একটা নিয়ে ছুলে খেতে লাগলো) জমিদার বাবু দিয়ে গেছে বুঝি?

তু। তা না আরো কিছু।

ল। এঁ্যা তবে?

তু। ঐ তো মাষ্টার মশাই গঞ্জে গিয়েছিলেন, তিনিই নি[য়ে] এসেছেন।

ল। এঁ্যা মাষ্টার! কেন? (থুঃ থুঃ করে মুখের আঁশ ফেলে) ওকে দিতে কে বললে?

তু। বলবে আবার কে? সেদিন রাস্তা থেকে তিনি আ[র] হৃদয় খুড়োই তো তোমাকে কোলে করে বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন জমিদারের ভয়ে যখন নিশি ডাক্তার তোমাকে দেখতে আসতে রা[জী] হলো না, তখন মাষ্টারবাবুই তো সোহাগীকে নিয়ে তোমাকে কি ওষুধ পত্তর করে দিলেন।

ল। বটে?

তু। তবে না তো কি? মাষ্টার মশাই আর সোহাগীই [তো] তোমাকে এ যাত্রা বাঁচিয়েছেন।

ল। থাম থাম লক্ষ্মীছাড়ী। আমার সামনে আর বেহায়াপা[না]

রিস না। ( বিকৃত উচ্চারণে ) মাষ্টার আর সোহাগী, সোহাগী আর মাষ্টার। লজ্জাও করে না!

দু। দেখো দাদা, তুমি অমন যা তা বলবে না।

ল। বলবো বেশ করবো। হাজার বার বলবো। লজ্জাও করে না!

দু। লজ্জা তোমার করা উচিত। তোমার অজ্ঞান অবস্থায় মাথার শিয়রে বসে সোহাগী সারা রাত কি যে দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছে তুমি তার কি জান? তোমায় সে কতো ভালোবাসে তা যদি তুমি বুঝতে?

ল। এ্যাঁ আ-আ-আমায়। তবে মাষ্টার।

দু। ও-সব তোমার ভুল ধারণা। মাষ্টার মশাইকে তুমি চেন না তাই। তিনিই তো হৃদয় খুড়ো আর খুড়ীমাকে বুঝিয়েছেন যে তোমাদের দুজনের বিয়ে দেওয়া উচিত। সোহাগী বলছিলো তিনি নাকি গান্ধর্ব বিবাহ আরও অনেক শাস্ত্রের অনুষ্ঠানের কথা বলে খুড়ো-খুড়ীমাকে বুঝিয়েছেন যে, বিয়ের ক্ষেত্রে কুলমর্য্যাদার থেকে পরস্পরের ভালবাসাটাই প্রধান। তাই—

ল। তা আগুন দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে···

দু। তার আবার কি? সে তো মাষ্টার মশাই অনেক দিন আগেই বৈঠক করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ঐ সমস্ত জমিদারের কারসাজি।

ল। এ্যাঁ, তা সে কথা তুই আমাকে এতোদিন বলিসনি কেন হতচ্ছাড়ি!

দু। তোমাকে কি আর আজকাল কিছু বলবার জো আছে? চৌকিদার হয়ে যা তোমার মেজাজ হয়েছে। কাছেই ঘেঁষা যায় না। তারপর আগুন লাগার পর থেকে সব সময় এমন মুখ গোমড়া করে থাক যে কিছু বলতে ভয় হয়। সত্যি চৌকিদার হওয়ার পর থেকেই তুমি যেন কেমন দিনকে দিন পাল্টে যাচ্ছ!

ল। হ্যাঁ হ্যাঁ সে তুই ঠিকই বলেছিস। মানে আমার এই চৌকিদারীটা···

( বকর বকর করতে করতে মা'র প্রবেশ )

মা। চৌকিদারী যে তোর কাল হবে, এ আমি জানতাম। আগুন দেওয়ার ব্যাপারে কি কেলেংকারীই না হলো। সেটা কাটতে না কাটতেই মাথায় বাড়ি। তখনই বলছিলাম রাত্তিরে বিত্তিরে পথে বিপথে ঘোরা, ও চৌকিদারীতে তোমার দরকার নেই। এখন হোলো তো? আমারই যে এ সর্বনাশ হবে তা আমি জানতাম। পোড়া কপালে এইবার দেখ চৌকিদারী করার মজাটা।

ল। না মানে···

মা। কি দরকার ছিলো যে ড্যাকরা? আগ বাড়িয়ে না পড়লেই কি তোর চলতো না?

ল। না মানে সে তুমি বুঝবে না। শত হলেও একটা কর্ত্তব্য।

মা। মুখে আগুন তোমার কর্ত্তব্যের, কর্ত্তব্য। কেন তোমার পেরসিডেন্ট সাহেবের কি হলো? এমনিতে তো কতো ঘন ঘন বাড়ীতে যাওয়া আসা। কই এবারে একটি বারের জন্যেও আসলো? উল্টে মোড়ল মশায়ের বাড়ী তোকে তোলা হয়েছে দেখে নিশি ডাক্তারকে ভয় দেখিয়ে নিষেধ করে দিয়েছে তোকে চিকিৎসা করতে। মোড়লের বাড়ী তুলেছে তাতে তোর কি রে মিনসে? বেশ করেছে। ঐ মাষ্টার আর মোড়ল না থাকলে কি বাছা আমার বাঁচতো? আহা মেয়েটিও যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী!

ল। তুমি মা···

মা। আর দরকার নেই খুব হয়েছে। মা ভগবতীর দয়ায় এবার ভাল হয়ে উঠে তোমার ও-সব সাজগোজ ভালোয় ভালোয় কাচারীবাড়ী দিয়ে এসোগে, এই আমি বলে দিলুম।

[ মা'র প্রস্থান।

দু। মা শোন। [ বলতে বলতে মা'র পেছনে পেছনে প্রস্থান।

ল। ( খানিকক্ষণ চিন্তা করে ) নাঃ, ও-সব ছেড়েই দিতে হবে। দুলি দুলি—

( দুলির প্রবেশ )

দু। কি, আবার চেঁচামেচি করছো কেন?

ল। আমার ঐ চৌকিদারী পোষাকগুলো নামাতো।

দু। কেন, ওগুলো দিয়ে এখন আবার কি হবে?

ল। ওগুলো সব ফেরৎ দিয়ে আসি গে যাই। নিকুচি করেছে ঐ চৌকিদারীর!

( দুলি পোষাক নামিয়ে চৌকির ওপর রাখছে। মাষ্টার ও সোহাগীর প্রবেশ। )

মাষ্টার। কি ব্যাপার, চৌকিদারীর আবার কি হলো? তা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছ দেখছি। ( চৌকিদারকে নিরুত্তর দেখে ) কিন্তু ব্যাপার কি, চুপ-চাপ যে!

[ লক্ষ্মণ, সোহাগী ও মাষ্টারের দিকে লক্ষ্য করে কিছুক্ষণ বাদে ]

ল। আমি তোমারই স্কুলে ভর্তি হবো মাষ্টার!

মাষ্টার। বেশ তো।

ল। না আমি হবো।

মাষ্টার। বেশ তো হোয়ো। এতে আর ব্যস্ত হবার কি আছে? তা ঐ পোষাকগুলো নামিয়ে কি করছো বলো দেখি?

ল। ওগুলো সব ফেরৎ দিয়ে আসবো।

মাষ্টার। ফেরৎ দেবে?

ল। দেবো না তো কি? সে তুমি বুঝবে না মাষ্টার, মানে ঐ চৌকিদারী তো নয় যেন একটা ইয়ে—

মাষ্টার। অবস্থা বিশেষে তাই হয়।

ল। নিশ্চয়ই হয়। আর সেই জন্যেই তো আমি শালা ঐ সবের মধ্যে নেই।

দু। মাষ্টার মশাই দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। সোহাগী আয় না ভাই, আমার সাথে একটু পুকুরঘাটে যাবি? তোর সংগে অনেক কথা আছে।

[ সোহাগীকে টেনে দুলির প্রস্থান। যাবার সময় পরস্পর গায়ে ঠেলাঠেলি করে লক্ষ্মণের দিকে কটাক্ষ করে। লক্ষ্মণ ওদের গন্তব্য পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ]

ল। সে তুমি যাই বল মাষ্টার! ঐ শালার চৌকিদারীর মধ্যে আমি আর নেই। শালার চৌকিদারীই আমার কাল হয়েছে।

মাষ্টার। সে কি, এতো সহজে উৎসাহ ভেঙে গেলে চলে?

ল। বলো কি মাষ্টার! উৎসাহ ভাঙবে না? অ্যাঃ, সন্ধ্যা চৌধুরীর চাকর গোবিন্দ আর চৌকিদার লক্ষ্মণের মধ্যে কোনও তফাৎই

নেই। বলে কি না চোর ধরলে চাকরী যাবে চৌকিদারের। আগুন দিলো কে না কে, তার নামে নেই খোঁজ, দোষ পড়লো চৌকিদারের। এঁ্যা একবার অবস্থাটা ভাবো তো দেখি মাষ্টার !

মাষ্টার। কিন্তু এ অবস্থারও তো পরিবর্তন হতে পারে।

ল। পরিবর্তন ! তুমি বলো কি মাষ্টার ! ইস্তাজ মিঞা আমায় বলেছে বরাবর এই ভাবে কাজ হয়ে আসছে।

মাষ্টার। বরাবর হয়ে আসছে দেখে আগামী দিনেও হবে, এমন কোন কথা তো নেই। বরং এখনকার অবস্থার ঠিক উল্টো। আর সবার সাথে চৌকিদারকে গোলাম করে রাখার দিন সত্য চৌধুরীর শেষ হয়ে এসেছে।

ল। মানে ?

মাষ্টার। মানে এইবার ইউনিয়ান বোর্ডের ভোটে জমিদার বাবুকে আর সুবিধে করতে হচ্ছে না।

ল। কেন, তুমি কি বোলছো মাষ্টার ! তাই কি কখনো হয় ?

মাষ্টার। কেন হবে না ? খুব হয়। মনে রেখো, অনেক কোণঠাসা হয়েই জমিদারকে ঘরে আগুন দিতে হয়েছে, লাঠি ধরতে হয়েছে। যে লাঠি আজ আমার মাথায় পড়তো সেটা হয়তো পাকে চক্রে তোমার মাথায় পড়েছে। সে যা-ই হোক, এই ঘটনা জমিদারের অন্তিম অবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ল। মানে তুমি তাহলে বোলছো—

মাষ্টার। হ্যাঁ।

( নেপথ্যে "মাষ্টার মশাই মাষ্টার মশাই", বলতে বলতে নিতাইয়ের প্রবেশ )

নি। এই যে মাষ্টার মশাই, আপনাকে সারা গ্রাম গরু-খোঁজা করে এসেছি।

মাষ্টার। তা কি ব্যাপার ?

নি। ভোটে আমাদের জয় হয়েছে। যাক্ খবরটা দেওয়া হয়ে গেল, এবার তাহলে চলি।

[ প্রস্থানোদ্যত।

মাষ্টার। আরে শোন শোন, একেবারে ক্ষেপে গেলে যে !

নি। ক্ষেপবো না ! বলেন কি ! একেবারে জয়-জয়কার।

মাষ্টার। কিন্তু ভুলে যেও না, এই জয়েই আত্মহারা হলে চলবে না।

নি। ( অনুযোগের সুরে ) তাই কি ভুলি ? আপনি ইস্কুলে আমাদের যেসব কথা শিখিয়েছেন সে-সব একেবারে মনে গাঁথা রয়েছে। কি যে বলেন আপনি ? যাকগে, এবার তাহলে আমি যাই। আবার এ গ্রামে ও গ্রামে খবরাখবর করতে হবে তো। তাছাড়া গোবিন্দপুরে যাত্রার দল বায়না করতে যেতে হবে। আপনি আসুন, আমি তাহলে এগোই।

মাষ্টার। দাঁড়াও না, এক সংগেই বেরুনো যাবে।

( নিতাই অগত্যা অপেক্ষা করতে লাগলো )

মাষ্টার। ( লক্ষ্মণের দিকে ফিরে ) হ্যাঁ কি বলছিলুম, এবার তো তোমার নিজের লোক প্রেসিডেণ্ট হলো। আর ভাবনা কি ? অবস্থান্তরে তোমার সততা ও নির্ভীকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমার ঐ চৌকিদারীর পোষাক তুলে নাও।

( লক্ষ্মণ পোষাকগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলো। মাষ্টার নিতাইয়ের অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করে পুনরায় লক্ষ্মণকে। )

মাষ্টার। মিথ্যে মন খারাপ করে আর ঘরে বসে থেকো না। যে অবস্থা তোমার এ পরিণতির জন্যে দায়ী, তার বিরুদ্ধে তোমাকেও তো আজ উঠে দাঁড়াতে হবে। নাও···( নিতাইয়ের দিকে ফিরে ) হ্যাঁ এবার ওদিককার কাজকর্ম দেখা যাক। বই চলো হে নিতাই।

[ নিতাই ও মাষ্টারের প্রস্থান।

ল। তাই তো, আমারও তো এখন চুপচাপ বসে থাকা ঠিক হবে না। শত হোক গ্রামের চৌকিদার। আর তাছাড়া নিজেদের লোক যখন পেরসিডেণ্ট হয়েছে তখন ভাবনা কি ? মাষ্টার ঠিক কথাই বলেছে, শত হলেও আমি সন্দীপপুর ইউনিয়নের চৌকিদার, মাথার ওপর এখন কতো বড় একটা দায়িত্ব।

( বলতে বলতে মাথায় পাগড়ী পরতে গিয়ে ব্যান্ডেজ অনুভব করলো। পাগড়ী হাতেই থেকে গেল। বেল্ট ও পোষাক তুলে কাঁধের উপর রেখে, কোণ থেকে লাঠিটা তুলে উঠে দাঁড়াতে উদ্যত হলো )।

যবনিকা

# পুষ্পধনু

বন্দে আলী মিয়া

আমার অগ্নিশিখা তুমি কি দেখেছো কভু বৈশাখী-বিদ্যুৎ মেঘে ?
আমার পুষ্পধনু দেখেছো কি কোনো দিন মাধবী রাত্রির ধ্যানে ?
আমার কামনা-দাহ অনুভব করেছো কি নির্জন বাসক শয্যায় ?
কখনো শুনেছো কি গো আমার বুকেতে বাজে বিদায়ের করুণ বেহাগ ?

আমার জীবন-তৃষ্ণা আজিকে কাঁদিয়া ফেরে ফেলে-আসা সায়রের কূলে
পূর্বের [illegible] ভরে অনন্ত বসুন্ধরা—কখনো কি দেখেছো গো চেয়ে ?
তোমার উদয়-তারা আ[illegible]শের দিকে দিকে ফেলিয়াছে বিষাদের ছায়া,
আমার ধূসর দ্বীপে এসেছে [illegible]িক-পাখী—দেখিয়াছ কভু কি গো তারে ?

তোমার বেপথু মন এখনো অতন্দ্র চোখে জাগিতেছে অনাদি প্রহর,
তুমি কি শুনিতে পাও নাগিনী ফেলিছে শ্বাস আমার এ দুয়ারের পাশে ?
আমার অনন্ত ক্ষুধা এখনো প্রতীক্ষা করে চির-চেনা একটি রাতের—
উছলি পড়িছে আজ মদের পাত্র হতে এক কণা নীল বুদ্‌বুদ।

আমি যে ভুলিতে চাই পুরানো গানের মতো পরিচিত একটি অতীত—
আমার নিঃসঙ্গ দিন ডুবিয়া গিয়াছে কবে সাহারার মরু-বালুকায়।
তোমার তিমির আলা এখনো ভাসিয়া আসে প্রদোষের হিম সমীরণে,
পুরানো পৃথিবী মোর যাযাবর এ জীবন খুঁজে ফিরে চিরদিন তরে।

আপনার
আনন্দের
মুহূর্তকে
মধুর
করুন
শতাব্দীর ঐতিহ্য বরণীয়
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
বিশুদ্ধতায়
সৌগন্ধে
রুচিতে

# ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

## উনচল্লিশ

মোহনলাল রুমালে মুখ মুছে ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলল: আমি আজ কিছু বলব ভেবে আসিনি। কিন্তু আমার পূর্ববর্তী মাননীয় বক্তার অসার ডাক শুনে স্থির থাকতে পারলাম না। তাই আমি সত্যের খাতিরে খণ্ডন করতে দাঁড়িয়েছি তাঁর ফাঁকা বুলিকে।

সভার মধ্যে যেন বোমা ফাটল। কুঙ্কুমের মুখ লাল হ'য়ে উঠল। পল্লবের সঙ্গে চকিতে মিসেস নর্টনের দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল।

মোহনলাল অবিচলিত দৃপ্ত কণ্ঠেই ব'লে চলে: সবাই জানেন—আমার পূর্ববর্তী মাননীয় বক্তা শুধু বাগ্মী নন—একজন ডাকসাইটে দেশভক্ত—patriot par excellence: সুতরাং তাঁর ভাষণে থাকবেই তো উচ্ছ্বাসের ফেনিলতা। কেবল দুঃখ এই যে, উচ্ছ্বাসের চেয়ে সত্য বড় ব'লে এ দুইয়ের দ্বৈরথে উচ্ছ্বাসকে শেষটায় রণে ভঙ্গ দিতে হয়ই হয়। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর কথায়-কথায় আর্য ঋষিদের নামে আত্মহারা হ'য়ে ওঠেন ব'লেই সদুঃখে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি উপনিষদেরই একটি মহাবাক্য: 'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'—কি না, মিথ্যা অনেক সময়ে প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠা পেলেও অন্তিমে জয়ী হয় শুধু সত্য—যেহেতু সত্যই হ'ল জগতের দাঁড়াবার ভিৎ, সত্যকে নাকচ ক'রে যে সৌধ আমরা গ'ড়ে তুলি তার বনেদ বালুর—তাই সে দুদিনেই ধ্বসে পড়ে তাসের ঘরের মত। কাজেই আমাদের সব আগে শান্ত মনে বিচার ক'রে দেখতে হবে—আমার ভূতপূর্ব মাননীয় বক্তা ভারতীয়দের স্বরাজ পাবার যোগ্যতা সম্বন্ধে যা যা বলেছেন, সে সব সত্য, অর্ধসত্য, না সর্বৈব মিথ্যা। ক্ষণিক উচ্ছ্বাস বা অলীক হুজুগের ফেনা জিজ্ঞাসুর তৃষ্ণায় জল হ'তে পারে না: মানুষের একমাত্র উপজীব্য—নিরপেক্ষ নির্ভরযোগ্য সত্য।

ব'লে রুমাল দিয়ে কপাল মুছে মোহনলাল ব'লে চলে: কিন্তু শান্তভাবে বিচার করতে গেলে আমরা কী দেখতে পাই?—না, স্বরাজ পাবার অধিকারী আমরা নই। ভূতপূর্ব বক্তা উচ্চকণ্ঠে দাবি করলেন: আমাদের এখুনি স্বরাজ দেওয়া হোক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—স্বরাজকে তিনি কি মনে করেন একটি রঙিন বল? যাকে একজন দেয় ছুড়ে, আর একজন নেয় লুফে? না। স্বরাজ কেউ কাউকে দিতে পারে না—বহু সাধনায় তাকে অর্জন করতে হয়। এ সাধনার নাম—স্বার্থত্যাগ, দুঃখবরণ, পরার্থনিষ্ঠা, সত্যপরতা, চরিত্রশোধন, আত্মসমালোচনা। এসব গুণের একটিও কি আমাদের মধ্যে দেখতে পাই আজ? দু-চারজন 'অগ্নিখাদকের' হুজুগের মাথায় জেলে যাওয়ার নাম জাতিগঠন নয়। অতি অসংযমী লম্পটও উচ্ছ্বাসের মাথায় রাতারাতি বীর ব'নে যেতে পারে—কিন্তু সে বীরত্ব ক্ষণস্থায়ী যেহেতু স্বভাবসিদ্ধ নয়। তাই তার ছোঁওয়ায় লোহা সোনা হয় না—জাতীয় চরিত্র বদলায় না।

আমাদের জাতীয় চরিত্র পাশ্চাত্য জাতিদের তুলনায় মাটি, বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। আসমুদ্র-হিমাচল যেখানেই চাই না কেন—দেখতে পাই কী? না দলাদলি, জাতিভেদ, অনৈক্য—সর্বোপরি পরশ্রীকাতরতা ও তামসিকতায় আমরা আচ্ছন্ন। এ-হেন দুর্গত জাতি স্বরাজ পেলে তাকে রাখতে পারবে এ আশা কি দুরাশা নয়? উচ্ছ্বাস ও আবেগের প্রপাগাণ্ডায় কান না দিয়ে যে কোনো সত্যান্বেষী নিস্পৃহভাবে তাকালেন আমাদের জাতীয় চরিত্রের দিকে, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, আমরা স্বাধীনতার বর পাবার অধিকারী নই। যদি হ'তাম তাহ'লে কি গত হাজার বৎসর ধ'রে শক, হূণ মোগল পাঠান, ইংরাজ, ফরাসী, পর্টুগীজ—সবাই আমাদের উপর চড়াও হতে পারত? হাল আমলে আমাদের দেশে একটি মাত্র বড় দেশভক্ত সত্যিকার ষ্টেটসম্যান জন্মেছিলেন। তিনি মহাপ্রাণ শিবাজী, যিনি চেয়েছিলেন আন্তঃপ্রাদেশিক ঐক্য। কিন্তু পারেননি কেন? না, মারাঠীরা দেশকে ভালবেসে লড়াই করতে আসেনি, বর্গী হয়ে লুঠতরাজ করতে যেয়েই সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তাই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পেশোয়ারা হ'য়ে দাঁড়ালেন দস্যু—হারলেন পানিপথে আমদ শা দুরাণীর হাতে। এ হল অপ্রতিবাদী ঐতিহাসিক সত্য। আমার ভূতপূর্ব মাননীয় বক্তা ভারতের আত্মিক গৌরব সম্বন্ধে অজস্র উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে ভারতীয় দেশভক্তদের বাহবা পেলেন। কিন্তু এ-গৌরবের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেতে হ'লে খুঁজব কোথায়? দেশবাসীদের মধ্যে তো? কিন্তু যে-দেশে ধর্ম নিয়ে দাঙ্গায় আজো কথায় কথায় মানুষ পিশাচ হয়ে ওঠে, যে-দেশের অস্পৃশ্যদের ছায়া মাড়ালেও আজো ভদ্র হিন্দুকে স্নান ক'রে তবে শুদ্ধিলাভ করতে হয়, যে-দেশে একজন উপার্জনক্ষম হ'লে দশজন তার স্কন্ধে ভর ক'রে দিনের পর দিন পরাসক্তের মতন জীবন-যাপন করতে এতটুকুও লজ্জাবোধ করে না, যে-দেশে একটা ক্ষেত্রেও আমরা য়ুরোপীয়দের মতন সংঘবদ্ধ হ'য়ে কাজ করতে পারি না; যে-দেশে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষও দুটো বিদেশী এটিকেট শিখতে না শিখতে আত্মসম্মান ভোলে সাহেব বনতে যায়; সর্বোপরি, যে-দেশের পুরুষ আজো নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করতে শেখেনি—তাকে ঘরে বন্ধ ক'রে ভারতীয় রমণীর সতীত্ব নিয়ে বড়াই করে অম্লানবদনে—সে-দেশের, সে-জাতির স্বাধীনতার দাবিকে চন্দ্রলুব্ধ উদ্বাহু বামন'-এর বাতুলতা ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে?

বলতে বলতে মোহনলালের মুখ-চোখ উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে, জ্বালাময় ব্যঙ্গের সুরে ব'লে চলে: আমরা সামাজিক বিষয়ে প্রতিপদে অন্ধ গোঁড়ামির উপাসক হ'য়েও মনে করি—রাজনীতিতে উদারপন্থী ব'লে নিজেদের জাহির করলে সে মুখোসকে কেউ মুখোস ব'লে সনাক্ত করতে পারবে না। আমরা ইংরাজদের ক্লাবে অস্পৃশ্য হওয়ার দরুণ তাদের গালিগালাজ ক'রে বাড়ি ফিরে ছোট জাতকে ছোটলোক নাম দিয়ে শুধু যে সমাজে অস্পৃশ্য ক'রে রাখি তাই নয়—মন্দিরেও তাদের ঢুকতে দিই না। আমরা ইংরাজদের নানা সদ্গুণের প্রতি অন্ধ থেকে শুধু তার আদবকায়দার অনুকরণ ক'রে—হ্যাটকোট পরতে ও কাঁটাচামচ ধরতে শিখেই ভাবি, আমরা মাথায় তাদের সমান হয়েছি। আমাদের জাতীয় জীবনের ব্যাপক হীনতার ভূরি ভূরি উদাহরণ জাহির করতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়—কিন্তু যেহেতু 'ন চ সত্যাৎ পরো ধর্মঃ নানৃতাৎ পাতকং মহৎ'—অর্থাৎ সত্যের চেয়ে বড় ধর্ম আর মিথ্যার চেয়ে বড় পাপ নেই—এ-ও ঐ ঋষিদেরই কথা, সাক্ষাৎ ব্যাসদেব লিখেছেন

মহাভারতে—যেহেতু সত্যের খাতিরে আমাকে সদ্যঃবেষ্ট বন্ধুবরের মিথ্যা গর্বাক্তির প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন কতিপয় মহামানবের। কিন্তু মহামানবেরা যখন সাধারণের চোখে ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য হয়ে থাকেন, যখন তাঁদের কথায় দেশবাসী কর্ণপাত পর্যন্ত করে না—তখনো কেমন করে বলব—তাঁরা আমাদের সামাজিক আচরণের প্রতিনিধি, মুখপাত্র? না, আমরা আজ অস্তগত অতীত গৌরব নিয়েই মত্ত আছি বলেই দেখেও দেখি না যে অতীত মহিমা নিয়ে রোমন্থন করলে বর্তমান সম্পদশালী হয়ে ওঠে না। মোহনলাল রুমালে মুখ মুছে সুর নামিয়ে নিয়ে বলে চলে:

আমার ভূতপূর্ব মাননীয় বক্তা উদ্ধৃত করেছেন ওজস্বী কবি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গান, যে গানে তিনি দেখেছেন অনাগত প্রেমের ভারতবর্ষের স্বপ্ন। কিন্তু বন্ধুবর আবেগের ঝোঁকে ভুলে গেছেন একটি অপ্রতিপাদ্য সত্য: যে স্বপ্ন হাজার মনোহর হলেও স্বপ্নই থাকে যদি না তার বীজ জাগরণে ফুল ফোটায়, ফসল ফলায়। আমাদের দেশে কিন্তু আর একটি অত্যাশ্চর্য মনোবৃত্তি দেখা যায় উঁচুক্ষেত্রে। সেটি এই যে, আমাদের স্বপ্নকে উচ্ছ্বাসের বেদীতে স্থাপনা করে ভাবি বক্তৃতার হুঙ্কারমন্ত্র দিয়ে পাষাণ-প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সাবাসক তব আর করে? বলে বাঁকা হেসে কেবল এক জায়গায় আমি আমার মাননীয় বন্ধুবরের সঙ্গে একমত: চারণ কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে আমিও গভীর শ্রদ্ধা করি কেবল তিনি যেজন্যে শ্রদ্ধা করেন সেজন্যে নয়: আমি দ্বিজেন্দ্রলালকে শ্রদ্ধা করি প্রধানত এইজন্যে যে, তিনি কবিত্বের প্রেরণায় স্বজাতিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেও যখনি চোখ চেয়ে দেখতেন হানতেন চাবুক। তিনি স্বভাবে ছিলেন সত্যাশ্রয়ী, তাই স্বাজাত্য মহিমার একজন প্রধান উদ্গাতা হয়ে রঙিন স্বপ্নাবেশে অতীত গৌরবের জয়গান করলেও, যখনি তিনি বাস্তব সত্যের ডাকে জেগে উঠতেন তখনি উঠতেন কেঁদে: তাই তিনি একবার বড় দুঃখেই গেয়েছিলেন—বলে মোহনলাল প্রথমে মূল বাংলায়ই আবৃত্তি করে:

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা, অধম—ধূলি চেয়ে
চৌদ্দ শত বর্ষ আছি পরের জুতা খেয়ে।
তথাপি ধাই মানের লাগি
ধরণী পাশে ভিক্ষা মাগি—
নিজ মহিমা দেশ বিদেশে বেড়াই গেয়ে গেয়ে।
লজ্জা নাই! আর্য বলি চেঁচাই হাসিমুখে!
মুখে বলি তা—বাজে যে-কথা বজ্রসম বুকে!
ছিলাম বা কী, হয়েছি এ কী—
একথা নাহি ভাবিয়া দেখি:
নিজের দোষ দেখালে কেহ—মারিতে যাই ধেয়ে!

বলেই মোহনলাল ওর ইংরাজি অনুবাদ আবৃত্তি করে:

We are paupers in this great big world
Lowlier than wan dust and sand,
Enslaved and scorned for centuries
By aliens in our fatherland.
And still, behold ; we scour the earth
Begging, alas, for crumbs of praise
As, beating our own drums, we boast
The glory of our bygone days
O fie ; —to sing in glee : we are
Great Aryans ! Hark : how still we yell
Vaunting our heritage !—a claim
That should have scourged us like a flail !
How abysmal is our fall from the heights—
We never ponder—nay, not we ;
And if a friend hints at our faults,
We flare up –how indignantly !

ইংরাজ ছাত্রবৃন্দের বর্ণভেদী করতালি ও hear hear-এর মধ্যে মোহনলাল আসন গ্রহণ করল।

## চল্লিশ

মোহনলালের নিন্দায় কেম্ব্রিজের ভারতীয় ছাত্রেরা প্রায় সবাই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। চা-পার্টি, মজলিশ, টেনিস মাঠে, নৌকায় ছেলেদের দাঁড় টানার আসরে—সর্বত্রই দেশভক্তের দল মোহনলালের 'ট্রেচারি'র নানা কল্পিত কারণ উদ্ভাবন করা সুরু করে দিল। কেউ হেসে বলল: রঙ্গিণীকে বিয়ে করলে পরিণাম কি সগুন না হয়ে পারে? কেউ বলল মোহনলাল শুধু স্বভাবে কুলাঙ্গার নয় স্বরূপে দাঁড়কাক, তাই এতদিন ময়ূরপুচ্ছ খুঁজছিল—পেয়েছে অবশেষে মেমসাহেবের কাছে। কেউ নিদান দিল: না, মোহনলাল অনেক দিন থেকেই ভাবছিল কেমন করে লোকদেখানো spectacular কিছু একটা করা যায়—ডি, এল, রায়ের ভাষায় 'নতুন কিছু করো'। একথার টিপ্পনীতে একজন ঐতিহাসিক গবেষক মুরুব্বি বললেন বিজ্ঞ হেসে: এতে বোঝা যাচ্ছে মোহনলাল শুধু পড়াশুনায়ই বুদ্ধিমান—জীবনে নয়, কেন না ইংরাজ জাত আর যাকেই বিশ্বাস করুক না কেন, বিভীষণদের বিশ্বাস করে না—প্রথমে ক্লাইভ বনাম মীরজাফর বা উমিচাঁদ। যে যেখানে ছিল আবিষ্কার করল মোহনলালের একটা না একটা দোষ যা ইতিপূর্বে কারুরই চোখে পড়েনি!

কেবল কুঙ্কুম একেবারে মৌনী হয়ে গেল। শুধু যে সে মোহনলালের নিন্দায় যোগ দিত না তাই নয়, তার সামনে কেউ মোহনলালের প্রসঙ্গ তুললেও তাকে থামিয়ে দিত, কিম্বা কোনো ওজরে স্থান ত্যাগ করত। কিন্তু নিন্দুকের দল এরও ভাষ্য করল অপরূপ, বলল কুঙ্কুম জানে ওর চুপ হয়ে যাবার সংবাদও পৌঁছে মোহনলালের কানে—আর কে না জানে সবার চেয়ে বড় মার—the contempt of silence নীরবতার অবজ্ঞা এই তো হ'ল চরম সাজা!

পল্লব মনের দুঃখ চেপে রাখতে বাধ্য হয়ে আরো অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। গ্রহবৈগুণ্য নেই কে বলে? ঠিক যে মুহূর্তে কুঙ্কুম মোহনলালের কাছে মিলনোন্মুখ হয়ে ফিরে এসেছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই কি না...কিন্তু যা ঘটে গেছে তার পর অতীত নিয়ে আলোচনায় ফলই বা কী। সব বুঝেও তবু যা হ'তে পারত সেই might-have-been কে নিয়েই ও জল্পনা কল্পনা করে দিনের পরে দিন: ধরো যদি বিভা মোহনলালের সঙ্গে কেম্ব্রিজে আসত; ধরো যদি মোহনলাল সেদিন কুঙ্কুমের বিপক্ষে না ব'লে স্বপক্ষে ভাষণ দিত; ধরো যদি সেদিন যখন ওরা দুজনে

মোহনলালের ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল মোহনলাল সাউথেণ্ডে না গিয়ে ঘরেইথাকত··সব।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা মিসেস নর্টন ওর ঘরে এসে হাজির। মিসেস নর্টন সচরাচর কোনো ছাত্রের বাড়িতে যেতেন না, তাই পল্লব একটু আশ্চর্য হ'ল বৈ কি। তিনি বললেন: বড় খারাপ খবর, এই দেখুন রিতার কীর্তি। কী যে করি?

পল্লব পড়ল: "প্রিয় অ্যান্টি, ফের বেনামী চিঠি আস'ছ আমার নামে। তাতে খবর পেলাম যে, মোহনের সঙ্গে কুঙ্কুমের বিচ্ছেদ হ'য়ে গেছে পুরোপুরি। কারণ, মোহন নাকি য়ুনিয়নে কুঙ্কুমকে সর্বসমক্ষেই যা তা বলে অপমান করেছে। অ্যান্টি, একথা কি সত্যি? আমি মোহনকে লিখে জিজ্ঞাসা করে লিখেছিলাম, তাতে ও লিখেছে কুঙ্কুমকে ব্যক্তিগত ভাবে ও কিছুই বলেনি, তবে তীব্রভাবে কুঙ্কুমের ভাষণের প্রতিবাদ করেছে বৈ কি। ফলে নাকি ওকে ভারতীয় ছাত্ররা বয়কট করেছে। বেনামী লেখকটি আমাকে তাঁর শেষ চিঠিতে শাসিয়েছেন, আমি যদি কুলাঙ্গার মোহনকে ত্যাগ না করি, তবে মোহনকে হয়ত একদিন ভারতীয় ছাত্রদের হাতে মার খেতেও হতে পারে।

"কিন্তু কি পাপে আমাদের এ শাস্তি, অ্যান্টি? আর সবাইয়ের মতন ভারতীয় ছাত্ররাও তো মানুষ—তারা সবাই মিলে কেন একজনের 'পরে চড়াও হ'তে চায়? বিদেশিনীকে বিবাহ করার অক্ষমনীয় অপরাধে? কিন্তু এ মহাপাপ কি মোহনলালের আগে কোনো হিন্দু ছাত্র করেনি?

"আমার সব চেয়ে দুঃখ হয়েছে ভাবতে যে, মোহন ক্ষেপে গিয়ে প্রকাশ্য য়ুনিয়নে ভারতের বিপক্ষে বলেছে। টাইম্‌সে তার রিপোর্ট পর্যন্ত বেরিয়েছে আজই সকালে। টাইম্‌সের রিপোর্টার খুব উৎফুল্ল হয়েই লিখেছেন—অবশেষে হঠাৎ অন্ততঃ একজন সত্যনিষ্ঠ ভারতীয় ছাত্রের দেখা পাওয়া গেল। ইংরাজ-বিদ্বেষে যার দৃষ্টি আবিল হ'য়ে যায়নি, যে পারে অধঃপতিত স্বদেশবাসীদের কথা ভেবে লজ্জিত হ'তে··ইত্যাদি। মিষ্টার সেন নিশ্চয়ই এ মন্তব্য পড়েছেন এতক্ষণ। কিন্তু এর পরে আমাদের কি আর তিনি মুখ দেখবেন?

"এই সব যত ভাবি—ততই আমার বুকের মধ্যে মাথার মধ্যে কেমন করতে থাকে। রাতে ঘুম হয় না অ্যান্টি! শেষে কাল রাতে কে যেন কানে কানে বলল: তুই আত্মহত্যা কর—যদি মোহনকে বাঁচাতে চাস—কারণ ডাইভোর্স ও তোকে করবে না কিছুতেই।

"আমার মাথায় কী যে ভূত চাপল—আমি 'চেরোনাল' জোগাড় ক'রে সব খেয়ে ফেললাম। তার পর অজ্ঞান! আজ সকালে দেখি—আমি হাসপাতালে। আমার নাকি ধনুষ্টঙ্কার মতন হয়েছিল ফলে, আমি যন্ত্রণায় চীৎকার করি। আংকল দোর ভেঙে ঘরে ঢোকেন। ডাক্তার এসে আমাকে অতি কষ্টে বাঁচায়।

"কিন্তু সে যাক, এখন সমস্যার সমাধান কোথায় বলো। মোহনের পরীক্ষা এখন আসন্ন, তাই ওকে আমার কোন খবরই আংকল দেন নি। কিন্তু তুমি ওর খবর আমাকে দিও, আর যদি সম্ভব হয় তো মিষ্টার সেনকে মোহনের হয়ে বোলো। তুমি যদি না বলো তবে আমি বলে রাখছি তোমাকে যে আমি সোজা কেম্‌ব্রিজে ছুটে গিয়ে হত্যা দেব মিষ্টার সেনের পায়ে—কারুর কোনো কথাই শুনব না। একটা এস্পার ওস্পার না হ'লে আর টিকতে পারছি না অ্যান্টি।

"পল্লবকে এ চিঠি দেখিও, আর যদি সম্ভব হয় তো তোমার ওখানে মোহনকে ও কুঙ্কুমকে ডেকো। যে-ক'রে হোক ওদের মুখোমুখি ক'রে দিয়ে আমার এ-চিঠি ওদের সামনে পোড়ো। যদি এতে রাজি না হও তবে আমি যা বলেছি তা করবই করব। সামাজিক শোভনতার কোনো বিধানই মানব না—কাউকে না বলে কেম্‌ব্রিজে গিয়ে হাজির হব—তখন!

ইতি—তোমার রিতা।"

পল্লব একটু ভেবে বলল: রিতা যা বলছে সেই ভাবে ওদের একবার কোন মতে মুখোমুখি করানোর চেষ্টা করা মন্দ কি?

মিসেস নর্টন বললেন: কথাটা আমারো মনে নিয়েছে। তাই ওকে টেলিফোনে বলেছি অধীর না হ'তে। ভরসা দিয়েছি আমি যা পারি করব। কিন্তু এ তো হ'ল ওকে শান্ত করা। এখন কার্যক্ষেত্রে কী করা যায় বলুন তো? এ অকূল পাথারে আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা মিষ্টার বাকচি।

পল্লব ম্লান হেসে বলে: রিতাও একদিন ঠিক ঐ কথাই বলেছিল আমাকে।—কিন্তু এ দিন-দুনিয়ায় কে কার ভরসা বলুন!

মিসেস নর্টন চোখ বুঁজে খানিক ভাবলেন, পরে পল্লবের দিকে চেয়ে বললেন: হয়েছে। কাল রিনার জন্মদিন। মিষ্টার ঘোষ ও মিষ্টার সেন দুজনেই ওকে ভালোবাসেন। তাই আমার মনে হয় নিমন্ত্রণ করলে আসবেন। মিষ্টার সেনের টেলিফোন নেই, তাকে আপনি কাল সকালেই গিয়ে নিমন্ত্রণ ক'রে আসুন—বিকেল সাড়ে চারটেয়।

আর মোহনলাল?

তাঁকে নিমন্ত্রণ করার ভার আমার। তাঁর ওখানে টেলিফোন আছে। যদি টেলিফোনে না পাই, তবে কাল সকালে নিজেই যাব।

পল্লব বলল: আপনার মতলব বুঝতে পারছি। কিন্তু কুঙ্কুম কাঁচা ছেলে নয়, মিসেস নর্টন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবে আর কে আছে? মিসেস নর্টন মৃদু হেসে বললেন: আপনার শ্রীমুখেই তো শুনেছি যে যেখানে প্রাণ নিয়ে টানাটানি সেখানে মিথ্যা বললে পাপ হয় না—আপনাদের মহাভারতেই আছে। কাজেই বলবেন একটু গুছিয়ে যা সত্য না হ'লেও মিথ্যা বলে সনাক্ত করা অসম্ভব।

দুঃখের মাঝেও দুজনেই হেসে ওঠে।

হাসি থামলে মিসেস নর্টন বললেন: হঠাৎ একটা আইডিয়া এল—ষ্ট্র্যাটেজি একটু বদল করলে ভালো হয়। আপনি মিষ্টার সেনকে বলবেন ঠিক পাঁচটায় আসতে—সাড়ে চারটে নয়।

পল্লব একটু আশ্চর্য হয় বৈ কি: পাঁচটা? কেন?

মিসেস নর্টন হেসে বললেন: ষ্ট্র্যাটেজির চাল ফাঁশ ক'রে দিলে সে কি আর ষ্ট্র্যাটেজি থাকে, মিষ্টার বাকচি?

## একচল্লিশ

পল্লব রিনার হাতে দিল ওর জন্মদিনের উপহার—একটি এক ফুট লম্বা শাদা ভালুক, শুইয়ে দিলেই চিৎ হ'য়ে চার পা নাড়ে আবার দাঁড় করাতে না করাতে পিছনের দুপায়ে হাঁটে, ভাল্লুকে হুঙ্কার দিতে দিতে। রিনা তো আনন্দে অধীর। বলল: মা, আইরিনকে দেখিয়ে আসি। কালই সে বকছিল তার আছে এমন

জন যার মাথায় টোকা মারলেই সে জিভ বের ক'রে ভ্যাংচায়। আজ সে বুঝবে আমার কী আছে। যাই?

মিসেস নর্টন হেসে বললেন: আচ্ছা যাও, কিন্তু বেশি দেরি কোরো না। কেমন?

রিনা "মা মা" ব'লেই এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দোরে ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং। মিসেস নর্টন গিয়ে দোর খুলতেই কুঙ্কুমের গম্ভীর স্বর শোনা যায় ঘরের মধ্যে থেকে। গুড আফটার নুন, মিসেস নর্টন।

গুড আফটার নুন, মিষ্টার সেন।

পল্লব ঘরের মধ্যে ব'সে কুঙ্কুমের অপেক্ষা করে। বুকের মধ্যে ওর গুর-গুর ক'রে ওঠে—না জানি কি হবে আজ? অবশ্য ও জানত কুঙ্কুম বা মোহনলাল কেউই অপরের সামনে দৃষ্টিকটু বা অশোভন কিছু ক'রে বসবে না। তবু বলা তো যায় না জোর ক'রে—যদি ধরো—এমনি সময়ে কুঙ্কুম ঘরে ঢুকেই হাসিমুখে বলে: যা ভেবেছি! ব্রাহ্মণ তো! চর্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয়ের নাম শুনেই বোধ হয় সকাল থেকে ধর্না দিয়ে ব'সে? ব'লেই মিসেস নর্টনের দিকে চেয়ে: আপনার কাছে আমার একটি আর্জি আছে মিসেস নর্টন!

কী শুনি?

পল্লবকে একটু কেতাদুরস্ত হতে শেখান। লেট হওয়া খারাপ ব'লেই কি ঘণ্টাখানেক আগে হাজিরি দিতে হয়?

মিসেস নর্টন হেসে বললেন: উনি যে প্রতিবেশী। তাই যখন তখন এলেও ওঁর সাতখুন মাফ—আমাদের কেতায়। বসুন মিষ্টার সেন, না ঐ বড় চেয়ারটাতে বসুন—ফায়ার প্লেসের কাছে।

কুঙ্কুম "ধন্যবাদ" বলেই আসন নিল ও আগুনের সামনে দু হাত মেলে বলল: আপনাদের দেশের অনেক কিছুই ভালো মিসেস নর্টন, কেবল বেজায় শীত।

এই সময়ে ফেডের ট্রে হাতে প্রবেশ। পিছনে আর একটি বালক চাকর, তার হাতের আর একটা ট্রেতে কেক, স্যাণ্ডুইচ প্রভৃতি।

কুঙ্কুম বলে: কিন্তু যার দৌলতে ভোজ সে কোথায়?

মিসেস নর্টন বলেন: আসছে। মিষ্টার বাকচির উপহার জীবন্ত ভালুক দেখাতে গেছে তার সখীকে।

কুঙ্কুম পকেট থেকে এক বাক্স চকলেট ও এক বাক্স টফি বের করে হেসে বলে: পল্লব ভালুক দেবে জানলে আমি যে ক'রেই হোক একটা বাঘ আনতাম। হায় হায়, রিনা কি আর এখন চকলেট টফির দিকে ফিরেও তাকাবে?

মিসেস নর্টন হেসে ওর হাতে এক পেয়ালা চা দিলেন। পল্লব কুঙ্কুমের পাশের টেবিলে কেক ও স্যাণ্ডুইচের জন্যে একটি রেকাবি সন্তর্পণে রাখে।

ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ তিন জনেই চুপ।

মিসেস নর্টন প্রথম কথা কইলেন: মিষ্টার সেন! আপনাকে আজ ডেকেছি বিশেষ কারণে।

কুঙ্কুম চমকে বলে: কী? আজ রিনার জন্মদিন নয়?

মিসেস নর্টন বললেন: রিনার জন্মদিন আজ ঠিকই। কিন্তু সেজন্যে আপনাকে ডাকি নি। ডেকেছি নিজের স্বার্থের জন্যেই।

স্বার্থ?

মিসেস নর্টন ধীরে ধীরে তাঁর হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে একটি নীল চিঠির কাগজ বের ক'রে কুঙ্কুমের হাতে দিলেন।

কুঙ্কুম চমকে উঠল, ঠিক এই রকম কাগজই কয়েক মাস আগে ওর হাতে দিয়েছিল মিষ্টার টমাসের পার্টনার। পল্লবের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল চকিতে। তারপর ও চিঠির পাট খুলে একমনে পড়া শুরু করে দিল। পল্লব চেয়ে থাকে কুঙ্কুমের মুখের পানে রুদ্ধশ্বাসে।

কুঙ্কুম চিঠিটা পড়ে শান্তভাবেই মিসেস নর্টনকে ফিরিয়ে দিয়ে চুপ করে গৃহচূড়ার দিকে চেয়ে থাকে।

মিসেস নর্টন একটু অপেক্ষা করে বললেন: ওকে কী লিখে দেব?

কুঙ্কুম বলল: এই প্রশ্ন করতেই কি ডেকেছেন আমাকে?

মিসেস নর্টন বললেন: না। আরো একটা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সেকথা বলব আপনার জবাব পেলে তবে।

কুঙ্কুমের মুখ ঈষৎ রাঙা হয়ে ওঠে: আমার জবাব! কিন্তু এতে আমার কী বলার থাকতে পারে বলুন?

মিসেস নর্টন শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন: কিছু মনে করবেন না মিষ্টার সেন, কিন্তু আপনার কাছে একটু অন্য রকমের সাড়ার প্রত্যাশা করেছিলাম।

কুঙ্কুম এবার মিসেস নর্টনের চোখের দিকে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে বলল: আপনার সঙ্গে এবিষয়ে একটু খোলাখুলি কথা বলতে পারি কি?

একথা কেন?

রিতা আপনার—

রিতা সম্পর্কের দিক থেকে এমন কি আমার দূরাত্মীয়াও নয়। তবে ওকে স্নেহ করি ওর শিশুকাল থেকে। কাজেই স্নেহের দিক থেকে আমি সত্যিই মনে করি রিতা ও রিনা দুটি বোন।

ঠিক সেই জন্যেই যে সঙ্কোচ, মিসেস নর্টন।

মিসেস নর্টন ওর চোখের পানে চেয়ে বললেন: মিষ্টার সেন, এমন সময় প্রায় সবারই জীবনে আসে যখন এটিকেট কেতা—এমন কি লজ্জা সংকোচও জলাঞ্জলি দিতে হয় শুধু সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি হতে চেয়ে। রিতার জীবনে ঠিক সেই সংকটলগ্নই আজ ঘনিয়ে আসে নি কি?

কুঙ্কুম মাথা নিচু করল: কিন্তু আমাকে কী করতে বলেন? এ সংকটের জন্যে তো আমি দায়িক নই?

মিসেস নর্টন বললেন: শুনুন মিষ্টার সেন। আমি আপনার সঙ্গে আজ সম্পূর্ণ বে-আব্রু হয়েই কথা বলব। কারণ আজ আমার ঐ যে বললাম—নিজের মেয়ের মতনই প্রিয় একটি জীবন টলমল করছে। বলতে বলতে ওঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল: ওকে বাঁচাতে পারব কি না জানি না কিন্তু চেষ্টা করব প্রাণপণে। তাই আপনার কাছে ব্যাকুল হ'য়ে মিনতি জানাচ্ছি—আপনি কোনও অভিমান সুযুক্তি কুযুক্তি সব ভুলে সাড়া দিন। ওকে বাঁচান। Do vise to the occasion, please!

ওকে বাঁচাব আমি?

হাঁ, আপনি—শুধু আপনিই এখন ভরসা। রিতা ছেলেমানুষ হ'য়েও যা বুঝতে পেরেছে আপনি বিচক্ষণ হয়েও তা টের পাননি, এ সম্ভব নয়। আমি আরো একটু বলব—রাগ করবেন না। আজ ওদের এ অবস্থা হ'ত না যদি—যদি আপনি ওদের বিবাহে রাগ না ক'রে ওদের পাশে দাঁড়াতেন। শুনুন—আমার কথা শেষ হয়নি। আপনি ভাবুন মিষ্টার সেন, কী থেকে এ-দারুণ পরিস্থিতির উদ্ভব। আপনি চান—সবাই দেশের সেবা করবে, বিশেষ ক'রে আপনার প্রিয় বন্ধুরা। আপনার দেশের সেবা সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে যাকে টলানো শক্ত। কেন না আপনি সাধারণ চপল মানুষ নন—অচলপ্রতিষ্ঠ, আদর্শবাদী। মহৎ মানুষদের মধ্যে এ ধরণের বোধ বা ডগম্যাটিসম্ প্রায়ই থাকে—মানি। কিন্তু তবু বোধ বোধ বলেই সত্যের দেখা পায় না। তারা সত্যকে পেতে হলে সব আগে চাই নিস্পৃহ দৃষ্টি—dispassionste vision. কিন্তু এই অনাবিল দৃষ্টিকে অর্জন করতে হ'লে সাধনা চাই, আর সে সাধনা কিসের জানেন? সহিষ্ণুতার।

সহিষ্ণুতার?

আর করুণার, দরদের, অপরের দুঃখে মানুষ আহা বলে যে ঝোঁকে সেই ঝোঁককে লালন করার সংকল্প। আমরা একে বলি চ্যারিটি, আপনারা কী বলেন জানি না। কিন্তু আপনার কাছেই শুনেছি যে আপনাদের দেশের ঋষিরা বড় ছিলেন শুধু জ্ঞানে বা চ্যারিটিতেই নয়—সহিষ্ণুতায়, ক্ষমায় অনুকম্পায়ও বটে। আপনার কাছে আমি রিতার জন্যে সেই অনুকম্পার প্রার্থী। মিষ্টার ঘোষকে বিবাহ করে যদি ও ভুল করেও থাকে—যদিও আমার নিজের বিশ্বাস ভুল করেনি—তাহ'লেও আপনি ওকে বা আপনার বন্ধুকে ক্ষমা করুন। আপনি মহৎ, কিন্তু আরো মহৎ হোন। আর একটি কথা মাত্র বলব, কেন না সময় বেশি নেই। রিতাকে আমি আজই সকালে টেলিফোন করেছিলাম। বিষ খেয়ে অবধি তার এখনো মাথা ঘোরে। তবু সে আসতে চায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে। তার সঙ্গে একটু কথা বলবেন কি?

কুঙ্কুম ও পল্লব দুজনেই চমকে তাকায়।

পল্লব বলে: রিতা?

মিসেস নর্টও বললেন: হাঁ, সে আজ বেলা দুটোয়—শরীর অত্যন্ত দুর্বল থাকা সত্ত্বেও সোজা মোটরে এসেছে—এক মেড্‌কে সঙ্গে করে। পাশের ঘরেই সে অপেক্ষা করছে। ব'লেই দাঁড়িয়ে ডাকলেন: রিতা!

এতক্ষণে পল্লবের চোখ পড়ে—পাশের ঘরের দোর ঈষৎ খোলা। মিসেস নর্টন ডাক দিতেই ফাঁকটা আর একটু বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে রিতা ঘরে ঢোকে।

কুঙ্কুম ও পল্লব যুগপৎ উঠে দাঁড়ায়।

কুঙ্কুম অবাক হ'য়ে রিতার দিকে চেয়ে থাকে। পল্লব চমকে ওঠে: এ কি সেই সুহাসিনী, সদাচঞ্চলা, ঝোঁঝালো, ঝাঁঝালো মেয়ে! চোখের নিচে কালি...বর্ণ মলিন...শীর্ণ...

রিতা সোজা এসে কুঙ্কুমের দু'হাত চেপে ধরে: মিষ্টার সেন! উনি যাই ক'রে থাকুন, ক্ষমা করুন আপনি। বিশ্বাস করুন—বড় ঘা খেয়েই তিনি ভুল করেছেন। আমার আজ কোনো লজ্জা নেই...সঙ্কোচ নেই...মাথা ঘোরে রোজই...হয়ত বাঁচব না বেশি দিন। বাঁচতে আর সাধও নেই আমার, কিন্তু আপনাদের দুই বন্ধুর মধ্যে আমি বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলাম এ চিন্তা নিয়ে মরেও আমি শান্তি পাব না।...তাই মিষ্টার সেন, আমি আপনার কাছে এসেছি করজোড়ে আর্জি জানাতে—আপনি আপনার বন্ধুকে ক্ষমা করুন। নৈলে উনি কখনই শান্তি পাবেন না। বলতে বলতে রিতার চোখ জলে ভ'রে এল—মিষ্টার সেন! আর একটি কথা মাত্র বলব। আমি চিরদিনই গর্বী মেয়ে। কিন্তু ওঁকে ভালোবেসে সব গর্ব আমার ঘুচে গেছে। আজ আমার মনে হয় আমি সব সইতে পারি ওঁকে সুখী করতে। তাই যদি আপনি বলেন ওঁকে ফিরিয়ে নেবেন তাহ'লে আপনি যা বলবেন করব কথা দিচ্ছি। যদি চান কালই নিরুদ্দেশ হব, কথা দিচ্ছি উনি কিছুতেই খোঁজ পাবেন না। কেবল ওঁকে আর শাস্তি দেবেন না। ব'লে উদ্যত অশ্রু গোপন করতে রিতা মুখ ফেরায়।

কুঙ্কুমের চোখ ছল ছল করে ওঠে, বলে: মিস—মিসেস ঘোষ।

রিতা ওর হাত ধরে বলে: না—রিতা—আপনার ছোট বোন।

কুঙ্কুম বলে ঈষৎ কেঁপে ওঠা কণ্ঠে: রিতা! আমি যা-ই হই—অমানুষ নই, তোমাকে কোথাও নিরুদ্দেশ হ'তে হবে না—বলতে বলতে ওর কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে ওঠে—আমি—আমিও কথা দিচ্ছি যে, যে-ভুল আমি করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করব—না না ভুল বৈ কি—যে-ভালোবাসা প্রেমাস্পদের মঙ্গলের কথা ভেবে তাকে ছাড়তে পর্যন্ত রাজি হ'তে পারে—সে-ভালোবাসাকে শাস্তি দিতে পারে কে। কেবল সেই—যে নিষ্ঠুর কিম্বা ভ্রান্ত। আমি স্বভাবে নিষ্ঠুর নই, কিন্তু ভুল না করে কে? তাই তুমি নিশ্চিন্ত হও—আমি শুধু যে মোহনলালের পাশে দাঁড়াব তাই নয়—তার কাছে ক্ষমা চাইব যে আমার অসহিষ্ণুতার

দরুণ বিশেষ করে তোমার এ-দশা করেছি। আমি আজই রাতে তার ওখানে যাব।

রিতার চোখের জলে হাসি ফুটে ওঠে : যেতে হবে না কোথাও —সে এখানেই আছে।

পল্লব চমকে বলে : কে ? মোহন ?

মিসেস নর্টন হেসে বলেন : হ্যাঁ। কাল রাতেই রিতাতে আমাতে পরামর্শ করি টেলিফোনে। ও—

রিতা দৌড়ে গিয়ে পাশের ঘরের দোর খুলে ডাকে : মোহন !

মোহনলাল হেঁট মুখে ঘরে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস নর্টন ও রিতা পাশের ঘরে প্রস্থান করে।

কুঙ্কুম মোহনলালের দিকে তাকাতে পারে না। মোহনলাল দুপা এগিয়ে বলে, কুঙ্কুম !

কুঙ্কুম মুখ তুলে ওর দিকে তাকায় : মোহনলাল ! তোমার কাছে আমি অপরাধী। কেবল—বলতে বলতে ওর চোখে জল চিক-চিক করে ওঠে ফের—কেবল তোমাদের শাস্তি দিতে গিয়ে শাস্তি পেয়েছি আমিই বেশি।

শাস্তি ?

নয় ? আমি ভাবতাম আমি তোমাকে ভালোবাসি ব'লেই তোমার শুভার্থী হয়ে তোমাকে বাধা দিচ্ছি। কিন্তু রিতা আমার চোখ খুলে দিয়েছে—দেখিয়ে দিয়েছে ভালোবাসা কা'কে বলে। মোহন ! আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

মোহনলাল ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

চোখের জলে পল্লবের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

ঠিক এই সময়ে রিতা ছুটে ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ায় : এ কী ? মিষ্টার ঘোষ ? আপনার না মিষ্টার সেনের সঙ্গে ঝগড়া ?

কুঙ্কুম হেসে বলে : ঝগড়া ? কে বললে ?

কে আবার ? বিশ্বশুদ্ধ লোক জানে—জন কালই বলছিল—

কথাটা তার শেষ হল না—ঠিক এই সময়ে মিসেস নর্টন রিতাকে নিয়ে এসে পড়ার দরুণ। মাকে দেখে রিনা ওর কথার খেই বেমালুম ভুলে গিয়ে বলে হাততালি দিয়ে, বেশ হয়েছে, না মা ? ওঁদের মধ্যে কেমন ফের আড়ির পরে ভাব হ'য়ে গেল—তা আবার আমারই জন্মদিনে !

রিতা ওকে জড়িয়ে ধরে ঝুঁকে ওর গালে গাল রেখে হাসিমুখে বলে : হবে না ? তুমি কে—যার কুষ্টিতে লিখেছে—পয়লা নম্বরের পয়মন্ত !

রিনা রিতার গলা জড়িয়ে ধরে : আর তুমি বুঝি অপয়া ?

রিতা হেসে বলে : ছিলাম। তবে তোমার পয়ে আজ বদলে গেছি।

রিনা হঠাৎ বলে উঠল ঐ দেখ—আমার আজ পিয়ানো শোনাবার কথা—জন্মদিনে।

কুঙ্কুম হেসে বলে : কিন্তু আমরা ভুলি নি রিনা ! শান্তি নষ্ট করার ভার আর কে নিতে পারে তুমি ছাড়া ? [ক্রমশঃ।

## বাতাসেরা আসে

### পরেশ মণ্ডল

নিম-বট-অশথ-বেল-অশোক আর আমলকির পাতা ছুঁয়ে
বাতাসেরা আসে।
টুনটুনি গান গেয়ে ফেরে, কোকিল ডাকে না আর
কোঁটা-কোঁটা শিশিরের সরমেরা একে-একে জমা হয়
কচি-কচি সবুজের স্বপ্নমাখা ঘাসে
বাতাসেরা আসে—চুপি-চুপি আসে।

পথে পথে ধূলো জমে, জমা হয় ফুলের মধুরা
মৌমাছি-ভ্রমরেরা ক্লান্ত ডানা নেড়ে উড়ে-উড়ে ফেরে
তারপর সব কাজ সেরে
দিনদগ্ধ সূর্যখানা তপস্যায় বসে—চাঁদ হাসে
এ খবর বয়ে নিয়ে গোধূলির পান্ধর্ববেলায়
বাতাসেরা আসে—ধীরে-ধীরে আসে।

কোন রাজ্যে বাধা জাগে দুঃখ-শোক কোথাকার
মিতাকার সহচরী হয়,
প্রীতি নিয়ে কে যে হাসে কে না হাসে গরবের মোহে
কোথায় মরণ-তন্দ্রা কার হলো শূন্য মন-আঁখি
কোথায় কেমন আর কতটুকু বাকি
এ সব খবর আনে এ বাতাস, বয়ে আনে রুক্ষ এই প্রান্তরের
প্রত্যন্তে। শীত সীমাপাশে
"বাতাসেরা আসে—রু হয়ে আসে।

## যেও না

### সলিল মিত্র

তোমাকে দেখেই মনে হয়—
আগেতে যেমন ছিলে, আজ তেমনি নয়।
উচ্ছ্বাস আবেগাতুর সে কৈশোর দিন
যৌবনের স্পর্শে হলো লীন।

আজ তুমি ভিন্নরূপা এবং অপরূপাও জানি—
তোমার হরিণী-আঁখি বারে-বারে দেয় হাতছানি
কৈশোরের সে স্বপ্নকে, 'তুমি আর আমি—দুই জন—
যদিও ভিন্নতা আছে, তবু হবো এক দেহ-মন।'

কিন্তু সে তো স্বপ্ন শুধু—সে স্বপ্ন কি ফিরে আসে আর—
ঘুম যদি টুটে যায়, খুলে যায় বন্ধ থাকা দ্বার ?
তবে সেই স্বপ্ন ভুল। সত্য হয়ে আসে না কো তাই—
কামনার রূপ হয়ে মহাশূন্যে বিলুপ্ত বৃথাই।

ভাদ্রের নদীর মত তোমার ও যৌবন-রূপ—
আমার দৃষ্টিতে তুমি তাই বুঝি অত অপরূপ।
তোমার স্পর্শের স্রাণ পেতে চায় রক্তের কণিকা—
তুমি উদ্বেলিকা।
ধরা দিয়ে তবু যেন দু'কূল ভাসিয়ে—
চলে যাও শ্রেষ্ঠ পাওয়া এ বুকের দীর্ঘশ্বাস নিয়ে।
দিয়ে যাও, পাওয়ার প্রেরণা—
আমি বলি—অপরূপা, যেও না, যেও ।।

( উপন্যাস )

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

নীলিমা দাশগুপ্ত

বি-এ পরীক্ষা যেদিন শেষ হলো সেদিন রাত্রেই সিমলা রওনা দিলো অরুণেশ, এ সময় যখন সিমলায় প্রতি বছর যায়, ট্রেণের গরমের কষ্টটা অসহ্য ক্লান্তিকর লাগে। একটি দুপুর যেন বিরাট লম্বা হ'য়ে খাবি খাইয়ে ছাড়ে, এয়ার কনডিশনড কামরায় একবার গিয়ে করুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে পৌঁছেছিলো সিমলায়, টনসিলের কষ্টে সেবার ভুগেছিলো অনেক দিন। আর যায় না সে জন্য, এবার আশ্চর্য! মে'র আগুন গলানো দুপুর, ইউ পির রুক্ষ শুকনো ধূলিভরা পথ কোথা দিয়ে কেমন ক'রে ফুরিয়ে গেলো, অরুণেশ টেরও পেল না, ওর খুশিয়ালি মন এবার ছুটে চলেছে কিসের যেন একটি গভীর প্রত্যাশা নিয়ে। সেটা সঠিক যে কী তা ও নিজেও জানে না, কিন্তু নোতুনতর সুর নিয়ে নোতুন এক বাঁশি বেজে উঠেছে অন্তরে, ও সে বাঁশির শব্দ ঢেকে ঢুকে আগলে আগলে বেড়াচ্ছে।

কাল্‌কা থেকে সিমলায় ছোটো ট্রেণেই যায় অরুণেশ, ট্যাক্‌সিতে যায় না কখনো, কেমন একটা গীড্ডিনেশ ফীল ক'রে ও। কিন্তু এগারোটা আর বেলা তিনটেতে তফাৎ অনেক। সিমলা পর্যন্ত টিকিট কাটা সত্ত্বেও ট্রেণে উঠলো না, টিকিট সারেণ্ডার ক'রে কালকার গাড়িখানায় একেবারে ছুটে গিয়ে প্রথম ট্যাক্সিতে উঠে বসলো।

অরুণেশকে এগারোটায় পাওয়া একেবারে অপ্রত্যাশিত। বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেলো। তরুবালা দু' হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন পুত্রকে। নীলা ছুটে গিয়ে বাবাকে দপ্তরে ফোন করলো, দাদা এসে গেছে, চাপরাসীদের তিনটের সময় আর ষ্টেশনে পাঠাতে হবে না। ওদিক থেকে কেশবশংকর বাবুর গলা শোনা গেলো— আজ দুপুরে বাড়িতেই লাঞ্চ খাবেন, অফিসে নয়, আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই এসে পড়ছেন তিনি।

দুপুর এলো, কাটালো, বিকেল চলো।—সকাল, দুপুর, বিকেল সব ভারি সুন্দর সিমলায়। কী সুন্দর সিমলার আকাশ, পলাতক মেঘগুলি যেন পালতোলা এক ঝাঁক নৌকো, চোখ আর নামাতে ইচ্ছে করে না অরুণেশের। বাতাসে কী বিচিত্র আমেজ, খুশির আমেজ, নেশার আমেজ, গানের আমেজ।

কী রে, বিকেলে বেড়াসনে আজ-কাল? নীলাকে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বাড়ির পোষাকে ব'সে থাকতে দেখে অরুণেশ প্রশ্ন করলো।

নীলার চোখে ছায়া ঘনালো। কলকাতা থেকে আনা ওর ফরমাসী রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি বই নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে খাটে-বসা নীলা একটু যেন ধরা গলায় বললো, কোথায় আর যাব!—

বাইরের পোষাক প'রে পেছন ফিরে ড্রেসিং আয়নার সামনে চুল আঁচড়াচ্ছিলো অরুণেশ। বোনের চোখের চেহারা চোখে পড়েনি, কণ্ঠস্বরের ছোট অভিমানটুকু কানে বাজলো। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই হাসিমুখে বললো, চট্‌ ক'রে কাপড় পরে নে, চল্‌ তোর গুরু-বান্ধবীর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

গুরু-বান্ধবী মানে?

আহা বুঝলিনে কথাটা? তোর বন্ধু ইন্দ্রাণী তো বাংলা শিখিয়েছে তোকে, বেশ ভাল বাংলা কিন্তু লিখছিস তুই আজকাল, শেষের চিঠিখানায় মাত্র দুটো বানান ভুল হয়েছে··· ক্ষমতা আছে তোর বন্ধুর, কী বলিস?

নীলা 'হুঁ' বলে একটা নিশ্বাস ফেললো, আমি ইন্দ্রাণীকে আর মুখ দেখাতে পারবো না দাদা—

বিদ্যুৎ চমকালো যেন অরুণেশের শরীরে। চুল আঁচড়ানো বন্ধ করে চিরুণী হাতে নিয়েই বোনের পাশে ধপ ক'রে বসে পড়লো, কী হয়েছে নীলা?

চোখ ফেটে জল এসে গেলো নীলার, সামনের খোলা বইখানা চট্‌ ক'রে তুলে ধরলো চোখের সামনে। অরুণেশ বইখানা হাত দিয়ে নামিয়ে অনুসন্ধিৎসু চোখে বোনের দিকে চেয়ে আবার জিগ্যেস করলো, কী হয়েছে রে?

নীলা মুখ ভার ক'রে বললো, গত রবিবার বাবা পার্টি দিয়েছিলেন, ন্যাশনাল সেভিংসের ডেপুটি কমিশনার মিঃ চন্দ রিটায়ার করে কলকাতায় চলে গেলেন। তাঁকে ফেয়ারওয়েল পার্টি দেওয়া হলো। ডিনারের পর বাড়ি ফেরার জন্য সবাই প্রস্তুত হচ্ছেন, মা বললেন,—আপনারা এখুনি যাবেন না, কষ্ট ক'রে আর মিনিট পাঁচেক বসুন একটু, তারপর মাসীমা মানে ইন্দ্রাণীর মার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে চলে যেতেও পারেন! সঙ্গে সঙ্গে মাসীমা উঠে ইন্দ্রাণীকে ডাক দিলেন, মেসোমশায় আসেননি, অফিসের কাজে দিল্লী গেছেন। মিসেস রে'র সঙ্গে মাসীমার খুব ভাব, তিনি মাসীমার হাত ধরে আবার টেনে বসালেন,—এক পথেই যখন যেতে হবে আমাদের, তখন একসঙ্গে গল্প করতে করতে বেশ যাওয়া যাবে'খন। আমিও ইন্দ্রাণীর হাত চেপে ধরলুম,— না ভাই এখুনি যেও না, আর একটু থাকো, আমিতো তোমাদের বাড়ি রোজই যাই—তুমি তো আসই না।

মাসীমা আর আপত্তি করলেন না, বসে রইলেন, মা আমার দিকে কটমট ক'রে একবার চেয়ে চলে গেলেন ভেতরে, আমি তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। একটু পরেই বাস্তপায়ে মা আবার ফিরে এলেন, একেবারে মাসীমার সামনে এসে বললেন,

—আপনি এখানে বসে একটু অপেক্ষা করুন, তারপর, আর সবাইকে আমাদের হলঘরে আসতে আহ্বান করলেন। সবাই চলে গেলেন কেবল মিসেস রে উঠে দাঁড়িয়ে মাকে জিগ্যেস করলেন,—কেন, হলঘরে কী? মা বললেন,—মিঃ চন্দের বিদায় উপলক্ষ্যে গ্রুপফটো তোলা হচ্ছে একখানা। মিসেস রে মাসীমা'র মুখের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, একসকিউজ মি মিসেস বিশ্বাস, আমার ফটো বিচ্ছিরি হয় ব'লে ফটো আমি তুলিনে—। মা বার দুই তিন অনুরোধ করে চলে গেলেন ভেতরে। মিসেস রে এবং মাসীমারা বোধ হয় তখুনি চলে যেতেন কিন্তু মিষ্টার রে তখন আবার হলের ভেতর, কাজেই ওঁদের অপেক্ষা করতে হলো। দাদা, আমি তোকে ইন্দ্রাণীর মুখের চেহারা বর্ণনা করতে পারবো না—মাসীমা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন, আমি তখন মাসীমার মুখ দেখতে পাইনি কিন্তু ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে অবাক হ'য়ে আমি তাকিয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ, একটা ঝলকানো বিদ্যুৎ যেন হঠাৎ এসে আটকা পড়েছে ইন্দ্রাণীর কপালে, মুখে, চোখের কোণে, আর চাপা দুটো ঠোঁটের মধ্যে অদ্ভুত একটা হাসি কাঁপছে। এমন কাঁপা হাসির দিকে চেয়ে থাকা যায় না—আমি ইন্দ্রাণীর হাত ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে, শোওয়ার ঘরে শুয়ে চুপি চুপি কাঁদতে লাগলাম, তারপর আর ইন্দ্রাণীর কাছে যাইনি।

নির্ব্বাক অরুণেশের একটা বুকচাপা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে বেরিয়ে মিলিয়ে গেলো বাতাসে। হাতের চিরুণীটা দিয়ে ঠক ঠক্ ক'রে হাঁটুর ওপরে কয়েকটা আঘাত করে যেন যন্ত্রচালিতের মত উঠে দাঁড়ালো, পাশের ড্রেসিংরুমে গিয়ে বাইরে যাওয়ার পোষাক বদলে এলো তখুনি, বোনকে উদ্দেশ্য করে বললো, ওঠ রে নীলা। শোনো একটু, শরীরটা কেমন যেন অস্থির অস্থির করছে।

নীলা বইগুলো হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, ট্যাকসিতে কেন এলি দাদা! আমরা তখনই জানি—চলে গেলো নীলা।

: ট্যাক্সিতে কেন এলো অরুণেশ? কেন…? ও নিজেই কী জানে কেন? কিন্তু, ওকে আসতেই হয়েছে। পরীক্ষার পর একদিন না জিরিয়ে, এক রাত্রি না ঘুমিয়ে, বুকভরা রামধনু রং নিয়ে কিসের প্রত্যাশায় ছুটে এলো ও? রেশমী স্বপ্নের জাল বুনে বুনে মনের কথা জানাতে এলো,—কাকে? কাকে? শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে চোখ পাঠিয়ে দিলো দূর দিগন্তে। কী বিশ্রী দম-বন্ধ-করা ভারি বাতাস এই সিমলার, দোমড়ানো, মোচড়ানো ধূসর আকাশটা একেবারে নির্লজ্জের মত স্পষ্ট, এমন বিবর্ণ ধূসর আকাশ যেখানে, সেখানে ও থাকতে পারবে না কিছুতেই।

ম্যালে জানকীদাসের দোকানের সামনে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো নীলার, নীলার মুখ লাল হলো, চোখ ছলছল করলো, তারপর না দেখতে পাওয়ার ভাণ ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে শো-কেসের মাইশোর সিল্কের শাড়ির আঁচলটা দেখতে লাগলো। ইন্দ্রাণী স্থির চোখে কয়েক মুহূর্ত ঘাড় ফেরানো নীলার দিকে চেয়ে রইলো, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ওর একটি কলকাতার বন্ধু ছিলো, তাকে অস্ফুটে দু'-একটি কি কথা বলে এগিয়ে এসে নীলার কাঁধে হাত রাখলো। এই নীলা, আজ কাল আমাদের বাড়ি আসো না কেন?

ইন্দ্রাণীর সহজ গলা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে নীলা একেবারে সহজ। মুখ ফিরিয়ে হাসিমুখে বললো, কাল থেকে আবার আসবো ভাই, না, কাল দাদা চলে যাচ্ছে, পরশু থেকে আসবো।

ইন্দ্রাণী কী চমকালো? মুহূর্ত দুই চুপ করে ইন্দ্রাণী জিগ্যেস করলো, তোমার দাদা তো বোধ হয় চার-পাঁচ দিন হলো এসেছেন, কালকেই চলে যাচ্ছেন কেন? মুখের ভাব গম্ভীর হলো নীলার, কী জানি,…ইনাভাই আমার এত খারাপ লাগছে এজন্য,—কলকাতায় থাকলে নাকি পরীক্ষার খবর তাড়াতাড়ি জানা যাবে, তাই চলে যাচ্ছে দাদা।

ইন্দ্রাণী বন্ধুকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলো নীলার সঙ্গে, এর নাম বীণা বাগচি, আমরা একই স্কুল থেকে এবার স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছি, ভারি সুন্দর নাচতে পারে বীণা, এম্পায়ারে নেচে মেডেল পেয়েছে অনেক বার, আর এ হলো নীলা বিশ্বাস, আমার সিমলার প্রিয় এবং একমাত্র বান্ধবী, বীণা, নীলা হাত তুলে পরস্পরকে নমস্কার জানালো, দু-তিনটি মামুলি কথাবার্তা হওয়ার পর বীণা ইন্দ্রাণীকে বললো, আমি এবার বাড়ি যাই ইনা, আর দেরী করা ঠিক হবে না, জিনিসপত্র কিছু গোছানো হয়নি। ইন্দ্রাণী মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো, পরীক্ষার পর সিমলায় পিসির কাছে বেড়াতে এসেছিলো বীণা, এক মাস পর আবার কাল ফিরে যাচ্ছে।

আচ্ছা গুডবাই, আবার দেখা হবে কলকাতায়—বলে চলে গেলো বীণা, একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলো ইন্দ্রাণী, নীলা বললে, চলো ইনা, ভেতরে ঢুকি।

ও, তুমি কিছু কিনবে বুঝি? ইন্দ্রাণী সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করলো।

হ্যাঁ, দাদার জন্য সিল্কের একটা মাফলার আর একটা রুমাল কিনবো। তারপর কিছুটা যেন আত্মগত ভাবে বললো, আমার জন্য কত যে ভাল ভাল বাংলা বই নিয়ে এসেছে দাদা।

ইন্দ্রাণীর চোখ'দুটি চিক-চিক করে উঠলো একটু, চলো ভেতরে যাই। কাল তোমার দাদা কখন যাচ্ছেন? ট্রেনে নাকি?

হ্যাঁ, তিনটের ট্রেনে—জানকীদাসের দোকানের ভেতরে ওরা চলে গেলো।

নীলা বাড়ি ফিরলো একেবারে সন্ধ্যা কাবার করে। শেলি নিয়মিত বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়েছে। কেশবশংকর বাবু একটি জরুরী মিটিং-এ দপ্তরে আটকা পড়ে গেছেন, এখনও ফেরেননি, নিচের কিচেনে মার গলার আওয়াজ পেয়ে নীলা দরজার সামনে এসে একবার উঁকি মারলো। মুখখানা ভার-ভার করে তরুবালা ছেলের জন্য সন্দেশ বানাচ্ছিলেন, নীলাকে দেখে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

দাদা, দাদা করে মেয়ের আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে আর, কাল চলে যাচ্ছে দাদা, একলা ঘরে বসে বসে সারাটা বিকেল কাটালো, তা মেয়ে ঘণ্টা চারেক ধরে বাইরে বাইরে টহল দিয়ে ফিরলেন। এখনকার তরুবালার গলা আভিজাত্যের কোটেড ছাড়া গলা।

নীলা গোধূলির সোনালী আলো মেখে খুশির বাতাস বুকে নিয়ে বাড়িতে ফিরেছিলো। জানকীদাসের দোকান থেকে বেরোনোর পর, নীলাকে জোর ক'রে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলো ইন্দ্রাণী, অনেকক্ষণ গল্প করে খাইয়ে তবে ছেড়ে দিয়েছে। মা'র কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে অরুণেশের চলে যাওয়ার কথা নোতুন ক'রে আবার যেন মনে পড়ে গেলো নীলার। সোনালী আলো

নিবলো, খুশির বাতাস থামলো, নীলা যেন সাঁতরে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলো।

অরুণেশ টেবিলের ওপর স্যুটকেসটা তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোছাচ্ছিলো। বোনের পায়ের শব্দে মুখ ফেরালো, তারপর চেতনাটাকে তুলে আনলো যেন, কী রে নীলা, তুই কী আমার জন্ত বাজার সুদ্ধ কিনে আনলি নাকি রে? দেখি, দেখি, কী আনলি?··· কাজুবাদাম না কাডবেরি চকোলেট?

নীলা মুখ শুকনো করে দাদার টেবিল ঘেঁসে দাঁড়ালো, ডান হাতে ধরা রয়েছে ওর ছোট্ট প্যাকেটটা। অরুণেশ এবার ছোট্ট ক'রে হাসলো একটু, বাদামের ঠোঙাটা বাঁদরে কেড়ে নিয়েছে তাই না নীলা?

নীলা হেসে ফেললো, মরা হাসি, বাদাম কিনিই নি আমি— ডান হাত তুলে প্যাকেটটা টেবিলে রাখলো।

অরুণেশ বোনের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে প্যাকেটটা খুলে ফেললো। আরে! ভারি সুন্দর জিনিষ দুটো হয়েছে তো! এক্সলেন্ট! আমাদের নীলারাণী তো মস্ত সমঝদার মানুষ হ'য়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি···এত সুন্দর রংএর চয়েস তোর অথচ সেদিন নিজের জন্ত কী ভুতো ভুতো রংএর মোজা আর মাফলার কিনেছিস?

দাদা, তাহলে তোর পছন্দ হয়েছে তো? ভাগ্যিস আমি নিজের পছন্দে কিনিনি—

অরুণেশ মাথা নিচু করে টুকিটাকি জিনিষগুলো স্যুটকেসের এদিক ওদিকে রাখতে রাখতে লঘুগলায় বললো, তুই কিনিসনি, তবে বুঝি চাপরাশী বনমালী পছন্দ করে কিনে দিয়েছে?

নীলা বললো,—ধাঃ, তা হতে যাবে কেন? ইন্দ্রাণী চয়েস করেছে।

কে···? একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিস্মিত চোখে বোনের দিকে তাকালো অরুণেশ। হঠাৎ যেন ওর ব্যথার মৌচাকে ঢিল ছুঁড়লো নীলা।

দাদার মুখের চেহারা নীলার চোখে পড়লো না। ও কিছুটা উচ্ছলগলায় গড় গড় করে বলে গেলো। ইন্দ্রাণী একটি ঘণ্টা ধরে বেছে বেছে পছন্দ করে দিয়েছে, ইনার সঙ্গে জানকীদাসের দোকানের সামনে দেখা হয়ে গেলো। সেইজন্ত তো দেরী হলো এত। আমি যে মাফলারটা আগে পছন্দ করেছিলাম, সেটা বাসী সবুজে আর গাঢ় লালে মেলানো ছিলো। ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বললো, নীলা, তোমার দাদা তো কলকাতায় থাকেন, এত ডগ ডগে রং পছন্দ করবেন না বোধ হয়। আমি তো বেঁচে গেলাম, বললাম প্লীজ, তুমি ভাই একটু পছন্দ ক'রে দাও না, ইন্দ্রাণী তারপর এ ক'ঘণ্টা ধরে শুধু মাফলারই বাছলো, জানকীদাসের দোকানের সমস্ত মাফলার নামিয়ে ফেলেছিলো। মাফলার পছন্দ ক'রে রুমালের বেলায়ও তাই, কোনোটাই পছন্দ হয় না ওর, কোনোটাই মাফলারের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করছে না, শেষ কালে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে ম্যাচ করা রং পাওয়া গেলো, তারপর কিনে বেরোলাম দোকান থেকে।

অরুণেশ নিজের প্রশ্নের উত্তরনায় থতিয়ে গেছলো প্রথমটা, সামলে নিয়ে বোনকে একটু ঠাট্টার সুরেই বললো, কী রে, তুই না ইন্দ্রাণীকে আর মুখই দেখাতে পারবিনে?

নীলা বললো, দাদা, তোর তো ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আলাপ নেই, এমন মেয়ে আমি আর দেখলাম না দাদা, তোর সঙ্গে আলাপ থাকলে তুইও বলতিস এ কথা, এমন ভাল যে কী ক'রে হওয়া যায়—আমি তো ইন্দ্রাণীকে দেখেই লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে জানকীদাসের শো-কেসের শাড়িগুলো দেখতে শুরু করেছি, ইনা দিব্যি এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললো, এই নীলা! আমাদের বাড়ি যাও না কেন আজকাল? আমি তো ওর গলা শুনে অবাক, কোনো অনুযোগ অভিযোগ কিছু নেই। অরুণেশকে একেবারে নীরব দেখে, দাদার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নীলা আবার বললো। জানিস দাদা, আমি যদি ইন্দ্রাণী হতাম, মরে গেলেও এভাবে ডেকে কথা বলতে আমি পারতাম না।

কেশবশংকর বাবুর আহ্বান শুনে ছুটে চলে গেলো নীলা, অরুণেশ গোছানো বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ওর হৃদয়ের আনাচে-কানাচে ঢেউ তোলপাড় করছে, ঢেউ উঠছে, ঢেউ বাড়ছে, ঢেউ ভাঙছে। মাফলার আর রুমাল হাতে ধরা ছিলো, যেন দুখানি কুমারী হাত ওর হাতে ধরা দিয়েছে, ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে গাল দিয়ে স্পর্শ করলো, অনেকক্ষণ ধরে ঐ ভাবে ধরে রাখলো সে দুটিকে।

তখন ইন্দ্রাণী টেবিলের সামনে একখানি বই খুলে রেখে অরুণেশের কথা ভাবছে, কলকাতায় মীনাক্ষীর মাধ্যমে অরুণেশের অনেক টুকরো টুকরো কথা শুনেছে ও। ঐ টুকরো কথার ফাঁকেই অরুণেশের একান্ত ইচ্ছেটা বুঝে ফেলেছিলো ইন্দ্রাণী। একদিন এসে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আলাপ করতে চায় অরুণেশ, সুপ্রিয়র সঙ্গে আসবে। কিন্তু সম্মতি দেয়নি ইন্দ্রাণী, মীনা-কনজারভেটিভ, পিউরিটান ব'লে অনেক ক্ষেপিয়েছে ওকে, তবুও না। অরুণেশ সুপ্রিয়কে যা কিছু বলতো ওর সম্পর্কে, মীনা যেন সে সব রীলে করতো আবার। ওর লেখার নাকি একটি নিজস্ব ভঙ্গিমা আছে, স্বচ্ছ-সাবলীল-প্রাণবন্ত। সেই খাতাটার মধ্যে কী-ই বা লেখা ছিলো, কয়েকটি ক্রিটিকাল প্রশ্নের উত্তর ছিলো আর বোধ হয় সন্ধ্যা-রাত্রি-গ্রীষ্ম আর বসন্তের বর্ণনা ছিলো ইংরিজীতে। সামান্ত কয়েক লাইন লেখা দিয়েই ও নাকি ছবি ফোটাতে সিদ্ধহস্ত···আরো কত কিছু। এত কিছু শুনেও ও কেন রাজি হয়নি একটিবার অরুণেশের সঙ্গে দেখা করতে। কেন হয়নি? কেন? ওর মন এখন সেটা বিশ্লেষণ করছিলো। না ঠিক আছে। ঠিকই করেছে ও। যত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রই হোক আর যত চমৎকারই হোক না কেন অরুণেশ, ছেলে যখন মিসেস বিশ্বাসের, তখন তার সঙ্গে আলাপ করা চলে না,—কিন্তু নীলা? তাকে তো তুমি ভালবাসো ইনা, অনেক যত্ন ক'রে বাংলাও শেখাচ্ছো—সে কী মিসেস বিশ্বাসের মেয়ে নয়? কিন্তু, কিন্তু নীলা যে জলের ঢেউ, ওকে কী ঠেকানো যায়? ও যে নীলকান্তমণি, ওকে কী নেবানো যায়?

সর্বাণী ঘরে ঢুকে সস্নেহে বললেন, ইনু! বই শেষ হয়নি তোর? উনি তোকে খুঁজছিলেন—মা'র কথায় ইন্দ্রাণী হঠাৎ এত চমকে উঠলো, রাত্রি বলে টের পেলেন না সর্বাণী।

বই-এর লাইনে চোখ চালিয়ে ইন্দ্রাণী কোনো মতে বলে ফেললো, মা, তুমি যাও, আমি একটু পরেই আসছি।

সর্বাণী আর একটু দাঁড়িয়ে থেকেন যদি, মেয়ের বইপত্র
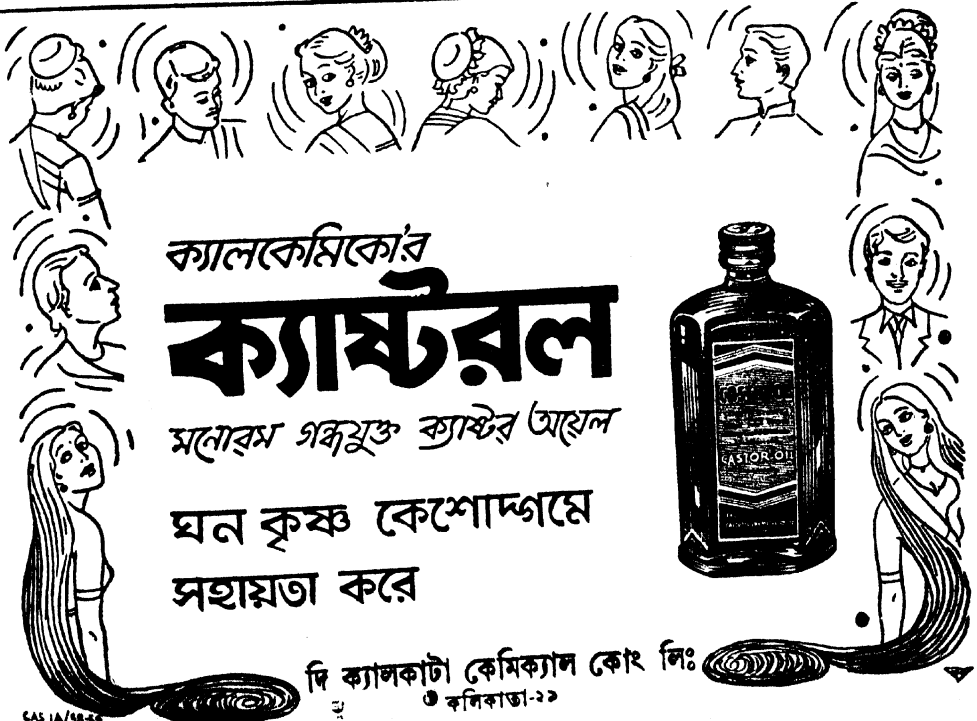
ছলনা ধরে ফেলতেন হাতে হাতে। একেবারে প্রথম পাতাটি খুলে রেখে সেই তখন থেকে বসে আছে। মনের জানলায় কার যেন একটি অস্পষ্ট ছবি। আবার সেই আগের তন্ময়তায় গ্রাস করলো ইন্দ্রাণীকে।

আজ নীলাকে প্রায় জোর ক'রে নিয়ে এসেছিলো এখানে। ছেলেমানুষ মনের নীলা কথায় কথায় সব বলে গেছে ওকে। দাদা যেদিন এলো সেদিন কি লাফালাফি, কি হৈ-চৈ, বাড়ির চেহারা এক মুহূর্তে একেবারে বদলে গিয়েছিলো, দাদা যেখানে যায় সেখানেই এমনি আনন্দের হাট; দাদার সঙ্গে তো তোমার আলাপ নেই তাই ইনা—আলাপ থাকলে তুমিও একথা বলতে।

···দাদা জানে কি না তোমার এখানে আসতে আমার খুব ভালো লাগে, অত হয়রাণ হয়ে এসেও প্রথম দিনই বিকেলে আমাকে বলেছিলো,—চল্ তোকে তোর বান্ধবী ইন্দ্রাণীর বাড়ি থেকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি। আমি মুখ ভার করে, না বলে সেদিনকার ঘটনাটা বলে দিলাম। আমার কষ্ট দেখে দাদারও যে কষ্ট হলো খুব, আমি বেশ বুঝলাম দাদার মুখ দেখে। একটু থেমে নীলা আবার বলেছিলো, তোমার সঙ্গে এই দেখাটা আর একটি দিন আগে যদি হতো, তাহলে আজ দাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম, দেখতে আমার কেমন দাদা। সত্যি বলছি ইনা এমন দাদা—। রমেনের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, ইনু! শীগ্‌গির নিচে নেমে আয়, আর বই পড়ে না। ইন্দ্রাণী যেন জেগে উঠলো, টপ করে বইটা বন্ধ করে দ্রুত নেমে গেলো নিচে।

ইন্দ্রাণীকে দেখে বীণা বাগ্‌চি একেবারে অবাক, ও মা! তুই যে ষ্টেশনে আসবি, আগে তো কৈ একবারও বলিস্‌নে ইনা? ইন্দ্রাণী এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু হাসলো, তোকে সারপ্রাইজ দেব বলে আগে বলিনি—খুব দ্রুত ওঠাপড়া করছে ইন্দ্রাণীর বুক। সে দিকে তাকিয়ে বীণা বাগ্‌চি অনুযোগ করলো, পাহাড়ে-জায়গায় এমন দৌড়োদৌড়ি করে আসতে হয়? এখনও তো প্রায় পনেরো মিনিট সময় আছে, ইন্দ্রাণী রাস্তার দিকে চোখ মেলে নীরবে একটু হাসলো, নিতান্তই ছাড়া ছাড়া কয়েকটি কথা বললে ইন্দ্রাণী। বীণা তার পিসেমশায়ের বৃদ্ধ বন্ধু আর পিসিমার বোকা চাকরটার দিকে চোখ রাখতে এত ব্যস্ত ছিলো যে, ইন্দ্রাণীর অন্যমনস্কতা খেয়াল করলো না। কাল্‌কা-সিম্‌লার ছোটো ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ইন্ করলো। অল্প কয়েকটি কামরা, লোকের ভিড়ে বোঝাই হয়ে গেলো মুহূর্তে। বীণা বন্ধুকে প্ল্যাটফর্মের ওপরেই হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে একটা ইন্টার ক্লাশ কামরার ভিড়ের মধ্যে টুপ করে মিলিয়ে গেলো। পিসেমশায়ের বৃদ্ধ বন্ধুও বীণার পেছন পেছন উঠে পড়লেন কোনোমতে। বোকা চাকরের হাতে কুঁজো ছিলো, জানলা দিয়ে গলিয়ে দেওয়া নিয়েই ওর ফাটাফাটি লেগে গেলো। বীণাদের কুলিটাই মাল রেখে নেমে এসে, আবার ঠেলেঠুলে উঠে কুঁজো দিয়ে এলো। ইন্দ্রাণী ওসব দেখছিলো না। ওর উদ্বেগ-ব্যাকুল দৃষ্টি বারে বারে ষ্টেশন-রাস্তায় কা'কে যেন খুঁজে ফিরছে। তারপর হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়াতে, ও এক পা এক পা করে ফার্ষ্ট ক্লাস কামরার কাছে এলো, একজন চাপরাশী দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলো, সে সরে গিয়ে দূরে দাঁড়ালো একটু। ইন্দ্রাণী

একটু ঝঁকে সুতো দিয়ে ঝোলানো কার্ডের লেখাটা পড়লো, মাত্র একটি নামই লেখা আছে—অরুণেশ বিশ্বাস।

ফার্ষ্টক্লাশ ওয়েটিংরুম থেকে বেরিয়ে এলো অরুণেশ। একটু নোয়া পেছনফেরা ইন্দ্রাণীকে দেখে প্রথমে ও চিনতে পারেনি, একেবারে সামনে আসতে পায়ের শব্দ শুনে দ্রুত মুখ তুললো আনমনা ইন্দ্রাণী, দেখলো অরুণেশকে। যেন সমস্ত কিছু আড়াল করে একেবারে ওর সামনে এসে দাঁড়ালো অরুণেশ। নির্বাক বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে অরুণেশ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু বলতে চাইলো ও, ওর ঠোঁট দু' একবার নড়ে নড়ে উঠে থেমে গেলো। পয়লা ঘণ্টি পড়লো ট্রেনের। অরুণেশ দরজা খুলে উঠে পড়লো কামরায়, দরজাটা সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে দুহাতের ভর দুদিকে রেখে স্থির চোখে দেখতে লাগলো ইন্দ্রাণীকে, আরক্ত কপলি, কপোল, চিবুক, গলা, কপালের বিনবিনে কয়েক ফোঁটা ঘামও অরুণেশের চোখে পড়লো। আর ইন্দ্রাণীও সমস্ত পরিবেশ ভুলে গিয়ে, অনেক অবাক চোখের চাউনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মুখটা সামান্য একটু তুলে চোখে অভ্যর্থনা নিয়ে অরুণেশের চোখে চোখ রাখলো। ওর ঠোঁট নড়ে উঠলো, আর গাড়িও নড়ে উঠলো আর তারপর চলতে শুরু করলো! ইন্দ্রাণীর ঝাপসা দৃষ্টি স্বচ্ছ হতেই দেখলো, এক হাতে হোল্ডঅল আর এক হাতে সুটকেস নিয়ে ওর একবারে সামনে দাঁড়ালো অরুণেশ। ওর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অরুণেশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ইন্দ্রাণীর চোখ দুটিকে।

একটু দূরে দাঁড়ানো কেশবশংকরের চাপরাশী তো তাজ্জব বনে গেছে একেবারে! এ কী রে বাবা! টিকিট ফিকিট কেটে গাড়িতে উঠলো আর গাড়ি যখন ছেড়ে দিলো তখন নেমে পড়লো। চাপরাশী নরপত ব্যস্ত ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসছিলো, অরুণেশও এগিয়ে গেলো একটু। নরপতের হাতে সুটকেস আর হোল্ডঅলটা দিয়ে নির্দ্দেশ দিলো বাড়ি চলে যেতে, ও টিকিট রিফাণ্ড করে পরে আসছে। সেলাম দিয়ে চলে গেলো চাপরাশী। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ইন্দ্রাণীর কাছে ফিরে এলো অরুণেশ। দেখলো, অফুরন্ত বসন্ত রোদ মেখে ঠিক একই জায়গায়, একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী। অরুণেশ সামনে আসতেই ও হাঁটতে শুরু করলো। দুজনেই নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। ষ্টেশন-রোড ছাড়িয়ে ওরা এবার যে রাস্তায় পড়লো, সেটা একেবারে নির্জন। এলোমেলো বাতাস ওদের ঝাপটা দিয়ে গেলো কয়েক বার। দুজনেই চুপ। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ, তার আশে-পাশে জানা ও না-জানা খাড়া খাড়া তরুশ্রেণী, তারও উঁচুতে ছোটো ছোটো কয়েকটি কুঁড়ে ঘর, একটা অচেনা পাখী আড়াল থেকে শিস দিয়ে উড়ে গেলো আকাশে। সমস্ত কিছুই সুন্দর, ভারি সুন্দর। পৃথিবীর অনেক শোভা, অনেক। সব চেয়ে রমণীয় এই ছায়াঝুরি পাহাড়ী সর্পিল পথ আর তার পাশে পাশাপাশি পথ চলা।

নিজেকে স্থির রাখতে গিয়ে ভেতরে ভেতরে অস্থির হ'য়ে পড়লো অরুণেশ। কি যেন হারিয়ে গিয়েছিলো—কি যেন, ও তা কুড়িয়ে পেয়েছে, কুড়িয়ে নিয়েছে। এত কথায় ভরে গেছে ওর মন, কোথা থেকে সুরু করবে ও! আর ইন্দ্রাণী ভাবছে, জিজ্ঞাসাবাদের আর কিছু প্রয়োজন আছে নাকি? হৃদয়ের তো কোনো ভাষা নেই। আরো একটা সর্পিল বাঁক নিঃশব্দে পার হলো ওরা। এবার চড়াই, ইন্দ্রাণীর একটু একটু হাঁফ ধরছে মনে হলো। অরুণেশ চলার গতিকে মৃদুমন্থর করে দিলো আরো। তার পর অস্ফুটে জিগ্যেস করলো, তুমি ষ্টেশনে কেন এসেছিলে ইন্দ্রাণী? ইন্দ্রাণী উত্তর না দিয়ে হাসলো। বাতাস আরো এলোমেলো এখন, কিন্তু তবু ওদের মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন পারলো না। ক্যাথলিক ক্লাবের পথে পা দিতেই ইন্দ্রাণীর যেন সম্বিত ফিরলো। ওর সাবধানী-মন ওকে স্মরণ করালো সেদিনকার ফেয়ারওয়েল পার্টির ডিনারের পরের ঘটনাটা। মনে পড়ে গেলো সেই তিক্ত স্মৃতিটা। কিছুটা পলিমাটি পড়েছিলো সেই তিক্ত স্মৃতির ওপর, আবার যেন সেটা গজিয়ে উঠলো পলিমাটির স্তর ভেদ ক'রে।—পার্টির পর বাড়ি এসে দুদিনই উত্তেজিত ইন্দ্রাণীকে শান্ত করেছিলেন সর্ব্বাণী, সেদিন ডিনারের পর বাড়ি ফিরে মাকে দিয়ে শপথ করাতে চেয়েছিলো ইন্দ্রাণী,—মা, আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর, ও-বাড়ির ছায়া মাড়াবে না। সর্ব্বাণী হাসি দিয়ে, কথা দিয়ে ঠাণ্ডা করেছিলেন উত্তপ্ত ইন্দ্রাণীকে, আর বারে বারে বলেছিলেন, এ তুচ্ছ ঘটনার জন্ত যেন ওদের বন্ধুত্ব চিড না খায়।

মা মুখে তুচ্ছ বলেছিলেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রাণী কি সেদিন শোনেনি সর্ব্বাণীর করুণ কণ্ঠস্বর? মার হাসি যে চেষ্টাকৃত হাসি তা কি সেদিন বোঝেনি ইন্দ্রাণী? মার মুখ কী ও দেখেনি নাকি সেদিন?—তবে? তবে কেন গিয়েছিলো ও ষ্টেশন? এই কাঠফাটা রোদ্দুরে—দেড় মাইল পাহাড়ী পথ ভেঙে? সে কী একটিবার শুধু চোখ দিয়ে দেখবার জন্ত নয়?···কা'কে? তরুবালা বিশ্বাসের আত্মজকে, অরুণেশকে। না, না, কখনো না, ওর বন্ধু বীণা বাগচিকে সী অফ্ করতে গিয়েছিলো আজ।—ভাণ করো না ইন্দ্রাণী! অন্তত: নিজের মনের কাছে সত্যি কথা কবুল কর তুমি।

অরুণেশ দাঁড়িয়ে যেতেই ইন্দ্রাণী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, ক্যাথলিক ক্লাবের গেটের সামনে ওরা এসে পৌঁছে গেছে।

চোখ তুললো ইন্দ্রাণী। অরুণেশ ওর দিকে তাকিয়েই ছিলো। চোখের দৃষ্টি যেন জয় করার আনন্দে উজ্জ্বল। ইন্দ্রাণী চোখ নামালো।

: ও কী ধরা পড়ে গেছে? ও কী ধরা পড়ে গেলো?—না, না, কক্ষনো না, তরুবালা বিশ্বাসের আত্মজের কাছে ওর মনকে আত্মসমর্পণ করতে কিছুতেই দেবে না ও। কিছুতেই না।

এক রাস্তা দিয়ে আসতে হলে কত লোকের সঙ্গেই তো এমন পাশাপাশি হেঁটে এসেছে ও। এমন কোনো গল্প করেছে কী ও অরুণেশের কাছে যাতে অরুণেশ ভাববার সুযোগ পায় ও ধরা পড়ে গেছে—?

গল্প? সারা পথে কথাই বলেনি ও। তবে আর কী!

নিশ্চিন্ত ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীর আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে আছে অরুণেশ।

ঠিক যখন পয়লা ঘণ্টি পড়লো, আর ও উঠে পড়লো ট্রেনে—ঠিক সেই মুহূর্তে, মুহূ'র্তের জন্ত সহস্র পাপড়ির গুণ্ঠন ঠেলে একটি পদ্মের কুঁড়ি সৌরভ বিলিয়েছিলো ওকে। ভুল আর কখনো হবে না ওর। অরুণেশের চোখে কৌতুক ঘনালো। ইন্দ্রাণীর

মনের লুকোচুরি খেলাটা ও যেন ধরে ফেলেছে। ইন্দ্রাণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে ওর মনের অলিগলি পরিক্রমা করে এই আলো-ছায়ার খেলাটা অরুণেশ উপভোগ করছে যেন। গেটের অদূরে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেলো।

অরুণেশ হাসি চেপে অস্ফুটে বললো, চলি ইন্দ্রাণী—

ইন্দ্রাণী চমকে চোখ তুললো। অরুণেশের চোখ হাসছে, মুখ হাসছে, ঠোঁট হাসছে। চোখের তারায় সেই জয়ের উজ্জ্বলতাটা আরো অনেক বেড়েছে, অনেক। ওর মনটাকে যেন ডাকাতি ক'রে নিয়ে যাচ্ছে অরুণেশ, ওর কোনো বাধা শুনছে না, মানছে না। ওর দাম্ভিক মন আর্তনাদ করলো,—না, না, এ কিছুতেই হতে দেওয়া চলবে না, কিছুতেই না। অরুণেশের উষ্ণ দৃষ্টির দিকে চেয়ে তোতাপাখির মুখস্তের মত আউড়ে গেলো ইন্দ্রাণী। আজ আমার বান্ধবী বীণা বাগচি কলকাতায় ফিরে গেলো কি না, তাকে সী অফ্ করতে তাই ষ্টেশনে গিয়েছিলেম—

অরুণেশ বললো, ও!

কিন্তু অরুণেশের ঠোঁটের কোণে অমন অদ্ভুত হাসি কেন? মুখে অমন আশ্চর্য আলো কেন? ও কী কথাটা বিশ্বাস করলো না? দ্রুত লয়ে আবার বললো ইন্দ্রাণী···না, মানে,··বীণা আমার খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু কিনা, আমি না গেলে ও দুঃখ পেতো খুবই, তাই, মানে,—বন্ধুকে সী অফ করতে তো সকলেই যায়, সেটা এমন একটা কিছু—

ও কী! অরুণেশ নিঃশব্দে হাসছে কেন? কিন্তু ইন্দ্রাণীর যে জল এসে গেলো চোখ ফেটে। চোখ নামিয়ে চোখের জল সামলাতে লাগলো ইন্দ্রাণী।

একটা অদম্য ইচ্ছার আলোড়ন উঠলো অরুণেশের মনে, কিন্তু খুব চেষ্টা করে নিজেকে ধরে রাখলো ও! আবার ও আগের সুরেই বললো, ও! এক মুহূর্ত থেমে অরুণেশ আবার গুনগুনিয়ে বললো, আচ্ছা, চলি—

চলে গেলো অরুণেশ, ইন্দ্রাণী পথের দিকে তাকিয়ে রইলো,—কী উদ্দীপ্ত অরুণেশ! কী বিজয়ী-ভঙ্গি ওর চলাতে! যে অশ্রুটাকে এতক্ষণ ঠেকিয়ে রেখেছিলো ইন্দ্রাণী, এবার সেটা ওর দুগাল ছাপিয়ে টপ টপ করে ঝরে পড়লো মাটিতে।

এ অশ্রু ওর কিসের? অরুণেশের কাছে ধরা পড়ার, নাকি পরাজয়ের? কিম্বা দুটোর জন্যই হয়তো। আঁচল দিয়ে ঘসে ঘসে চোখের জল নিশ্চিহ্ন করে মুছে গেটের ভেতর ঢুকে গেলো ইন্দ্রাণী।

ওদিকে অরুণেশের শরীর যেন হাল্কা মেঘের মত ভেসে ভেসে চললো। আর মন উড়ে চললো পাখি হয়ে। এ-টু বেমক্কা গেটের সামনে আসতেই, অদূরে অপেক্ষমানা মায়ের হাসিমুখের চেহারাটা চোখে পড়ে গেলো অরুণেশের। নিজের সমস্ত আচরণ ভুলে গেলো ও। মনে মনে ভাবলো, মার কষ্ট হবে ভেবে ভাগ্যিস ও ফিরে এসেছে।

ক্যাথলিক ক্লাবে রোজই বিকেলে আসে নীলা। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে গল্প করে, বাংলা পড়ে, তারপর সন্ধ্যের আগেই ফিরে যায়। বোনের সঙ্গে অরুণেশ রোজই আসে ক্যাথলিক ক্লাবের গেট পর্যন্ত, নীলা ভেতরে চলে যায় তবু ও দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর এদিক ওদিক বেড়াতে চলে যায়। নীলা তার দাদাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাত ধরে অনেক দিন টানাটানি করেছে, ওর বান্ধবী ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য, কিন্তু অরুণেশ রাজি হয়নি, নীলার ফেরার সময় ইন্দ্রাণী কিছুটা এগিয়ে দেয়, বড় রাস্তা পর্যন্ত, ক্যাথলিক ক্লাবের যে রাস্তাটা ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে ঘুরে বড় রাস্তায় এসে মিশেছে, ততখানি আসে। নীলার কাছে অরুণেশের আসার খবর রোজই শোনে ইন্দ্রাণী, নীলাও মনে মনে আশা করে, ওর অত ভাল দাদাকে একদিন অন্ততঃ আসার আমন্ত্রণ করবে ইন্দ্রাণী কিন্তু এ সম্পর্কে ইনা একেবারে চুপ, নীলা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হচ্ছে জেনেও ইন্দ্রাণী অরুণেশ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করেনি। নোতুন যুক্তি দিয়ে রোজই মনকে ও আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে, তবু ওর মনের জানলায় সেই ছায়া আসে, ছায়া ঘোরে, কিন্তু তা ওর জানার নয়, জানাবারও নয়। তাই এত সাবধান ইন্দ্রাণী।

আজ নীলার বাড়ি ফেরার সময় ওরা গেটের কাছে আসতেই দেখতে পেলো, গেটের বাইরে একগুচ্ছ রডোডেনড্রন হাতে নিয়ে অরুণেশ দাঁড়িয়ে আছে। নীলা কলকণ্ঠে বলে উঠলো, ও মা! দাদা তুই? ভেতরে যাসনি কেন রে? কী চমৎকার তাজা ফুলগুলি, পেলি কোথায়?

অরুণেশ ইন্দ্রাণীর দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বোনের শেষের কথাটার জবাব দিলো, সউনজলিতে, ওদিকে অজস্র রডোডেনড্রন ফুটে আছে।

নীলার অনেক দিনের আশা যেন সফল হলো আজ। ইন্দ্রাণীকে উদ্দেশ্য করে খুশি গলায় বললে, ইনা, আমার দাদার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দি। ইনি হচ্ছেন আমার দাদা শ্রীঅরুণেশ বিশ্বাস, এবার ইংরিজীতে অনার্স নিয়ে বি-এ দিয়েছেন, আর দাদা, ইনি হলেন শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রায় স্কুল-ফাইন্যাল দিয়ে মা-বাবার কাছে সময় কাটাতে এসেছেন। নীলার পরিচয় দেওয়ার ভঙ্গিতে ইন্দ্রাণী মনে মনে হেসে অরুণেশের দিকে অপাঙ্গে একবার তাকালো। দেখলো অরুণেশের চোখের কোণ আকুঞ্চিত এবং ঠোঁটের কোণে এক টুকরো দুষ্টুমির চাপা হাসি। ইনা নিঃশব্দে একটু হেসে ফেলেই মুখ ঘুরিয়ে নিলো। নীলা অবাক চোখে একবার ইন্দ্রাণীর দিকে তাকিয়ে তারপর তাকালো দাদার দিকে।

ততক্ষণে অরুণেশ সামলে নিয়েছে, ফুলের গুচ্ছ হাতে নিয়েই হাত জোড় করে সুস্মিত মুখে বললো, নমস্কার!

ইন্দ্রাণীকে মুখ ফেরাতে হলো, হাতজোড় করে অরুণেশের আধখানা মুখ পর্যন্ত চোখ তুলে বলে ফেললো, নমস্কার!

সিমলা কেমন লাগছে আপনার? অরুণেশের প্রশ্ন।

ভাল।

অরুণেশ ক্যাথলিক ক্লাবের আশ-পাশ রাস্তা দিয়ে দিনের নানান সময় বেড়িয়ে ফিরেছে এত দিন। কিন্তু ইন্দ্রাণীর সাক্ষাৎ সৌভাগ্য একবারও হয়নি, ইন্দ্রাণী যে নিজেকে জোর করে ঘরের মধ্যে ধরে রেখেছে, ও কী ক'রে সে খবর জানবে, তবে একটু একটু অনুমান করেছিলো, তাই ইন্দ্রাণীর উত্তর শুনে মুখ টিপে হেসে বললো, সিমলা ভাল নয়, বলুন ক্যাথলিক ক্লাবের ঘর ভাল।

অরুণেশের ইঙ্গিত বুঝে আরক্ত হলো ইন্দ্রাণীর মুখ, কিন্তু

নীলা সামনে দাঁড়ানো, কী-ই বা ও বলতে পারে, অস্ফুটে জবাব দিলো ইন্দ্রাণী, দুই-ই ভাল।

খুব বেশি রকম উচ্ছল শোনাচ্ছে অরুণেশের কণ্ঠস্বর, এক মুহূর্ত থেমেই আবার বললো, আমার বোন তো আপনাদের বাড়িতে রোজই আসে, কাল আসুন না আমাদের বাড়িতে আপনি, অনুমতি করেন তো আমি এসে নিয়েও যেতে পারি।

অরুণেশের সাহস দেখে ইন্দ্রাণী যেন স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। উত্তরে জোর গলায় বলতে গেলো,—আপনাদের বাড়ি যেতে আমার ভাল লাগে না, কিন্তু চোখ তুলে উত্তর দেবার আগেই অরুণেশের পাশে দাঁড়ানো নীলার কৌতুকোজ্জ্বল চোখ চোখে পড়ে গেলো, রূঢ় উত্তরটা গিলে খুব সংযত কণ্ঠেই উত্তর দিলো নীলা, না কাল বাড়িতে কাজ আছে—

পরশু ?

না, বাড়িতে আমার রোজই কাজ থাকে।

কী কাজ ? এই সবে পরীক্ষা দিয়ে মা-বাবার কাছে বেড়াতে এলেন, এত কী রাজ্যের কাজ আপনার ?

অরুণেশের সাহসের মাত্রা দেখে নিরুত্তর রইলো ইন্দ্রাণী, নিচের ঠোঁট কামড়ে মনে মনে ভাবলো, অরুণেশের এই স্পর্দ্ধিত সাহস যুগিয়েছে ও সেদিন ষ্টেশনে গিয়ে। অরুণেশ মুখ টিপে হেসে আবার ঠোঁট খুললো। ইন্দ্রাণীকে দিয়ে কথা বলিয়ে ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বর কান পেতে শোনার নেশায় পেয়ে বসেছে অরুণেশকে।

কৌতুককণ্ঠে প্রশ্ন করলো, সিনেমা দেখেন না ?

ইনা ভেবেছিলো কথা আর না বলে নীরবই থাকবে, কিন্তু ওকে চুপ দেখে নীলা যদি আবার কিছু ভেবে বসে, না, সিনেমা আমার আদৌ ভাল লাগে না—ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বর উদ্দীপ্ত।

বলেন কি! সিমলাবাসীদের আনন্দের একমাত্র উৎসই হলো ঐ সিনেমা, আপনার তা আদৌ পছন্দ নয়! মাপ করবেন, আপনি দেখছি এই বয়েসেই বুড়িয়ে গেছেন একেবারে।

নীলা আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না, কড়া অনুযোগের সুরে বলে উঠলো, দাদা, তোর হয়েছে কি? আমার বন্ধুর সঙ্গে অমন ক'রে কথা বলছিস কেন ? এমন করে কারো সঙ্গে তো কথা বলিস না তুই ?

নীলার মুখে মেঘ নামলো আর হো-হো ক'রে হেসে উঠলো অরুণেশ, তারপর ছদ্ম অনুতপ্ত গলায় বোনকে উদ্দেশ্য করে বললো, নীলা রাগ করলি তুই ? আমার তো কাজও নেই, কর্মও নেই— দিন-রাত্রি বেড়াচ্ছি তো বেড়াচ্ছিই, তাই জানতে চেয়েছিলুম ওঁর দিন কাটছে কেমন !

নীলার মুখের মেঘ কাটলো না তবু, অরুণেশ হাসি হাসি মুখে ছোট গলায় ইন্দ্রাণীকে বললো, ইন্দ্রাণী দেবি! আমার অনধিকার প্রশ্নের জন্ম করজোড়ে মাপ চাইছি আপনার কাছে। আপাততঃ সন্ধির নিদর্শনস্বরূপ এই ফুল'ক'টি আপনাকে উপহার দিতে চাই।

ইন্দ্রাণী নীরব।

মার্জনা মিলবে না ?

ইন্দ্রাণী নিরুত্তর।

সন্ধিতে আপত্তি আছে ?

অরুণেশের দিকে না তাকিয়েও ইন্দ্রাণী অনুভব করতে পারলো, অরুণেশের চোখ হাসছে, ঠোঁট হাসছে; সমস্ত মুখ ওর কঠিন হয়ে এলো নিমেষে। অরুণেশের দিকে চেয়ে দৃঢ় গলায় বললো, আপনার সঙ্গে সন্ধি ইচ্ছায় বিছুমাত্র রুচি নেই আমার।

নীলা মন খারাপ নিয়ে একপা দুপা ক'রে হাঁটতে শুরু করলো, দাঁড়াতে আর পারলো না। অরুণেশ নীলার দূরত্বটা দেখে নিয়ে ইন্দ্রাণীর একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো, আস্তে আস্তে আবৃত্ত গলায় ডাকলে, ইন্দ্রাণী ! সেই বাঁশির সুর যা শোনার জন্ম ইন্দ্রাণীর সমস্ত মন কান পেতেছিলো। এত দিনের সঞ্চিত উত্তাপ এত দিনের প্রাণপণ চেষ্টায় আষ্টেপৃষ্ঠে এত শক্ত বাঁধন সমস্ত বুঝি আলগা হয়ে গেলো ইন্দ্রাণীর। মুহূর্তে ওর চোখের, মুখের, কণ্ঠের সমস্ত কাঠিন্য গলে গিয়ে কী অপূর্ব্ব নমনীয় দেখাচ্ছে ওকে !

অরুণেশের চোখে চোখ রেখেছে ইন্দ্রাণী, চোখে একান্ত অনুনয়ের ভাষা। ডেকো না, অমন সুরে আমায় তুমি ডেকো না; তাকিও না, অমন চোখে তুমি তাকিও না।

আবার ফিসফিসিয়ে ডাকলে অরুণেশ, ইন্দ্রাণী! এ ফুলের রং দিয়ে তোমার মন রাঙাতে এসেছিলেম,—নেবে না ?

ইন্দ্রাণী চোখ নীচু করে নিজেকে শক্ত ক'রে ধরে রাখলে।

রাগ করেছো ? অরুণেশের কণ্ঠ করুণ হয়ে এলো, শুধু তোমার কথা শোনার জন্ম এত কথা বলেছি ইন্দ্রাণী, তুমি যে অমন রাগ করতে পার আমার কথায়—ইন্দ্রাণী আর পারলো না, অরুণেশের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে হেসে ফেললো, আশ্চর্য সুন্দর হাসি !

অঞ্জলি নিবেদনের মত দুটি হাত অরুণেশের দিকে প্রসারিত করে বললো ইন্দ্রাণী, দিন ফুল—

অরুণেশও হাসলো। আরো সামনে এলো। রোমাঞ্চিত স্পর্শের ইচ্ছায় ব্যগ্র আঙুলগুলিকে প্রাণপণে শাসন করে ফুলের গুচ্ছ তুলে দিলো ইন্দ্রাণীর হাতে। তার পর চোখ তুলে সন্ধ্যার প্রথম তারার মত টলমলে চোখে চোখ রাখলো কিছুক্ষণ। দুজনেই চোখ নামাতে ভুলে গেলো। একটা হরিয়ালের ডানার ঝটপটানি ওদের স্বর্গ থেকে বিদায় দিলো। তারপরই চোখ দিয়ে বিদায় নিয়ে প্রায় ছুট দিলো অরুণেশ নীলার নাগাল পাওয়ার জন্ম। পেছন থেকে বোনের বেণীতে এক টান দিয়ে গতি থামিয়ে দিলো নীলার।

এই নীলা! সাত তাড়াতাড়ি চলে এলি কেন ?

অরুণেশের কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা উপচে পড়ছে। দাদার গলা শুনে নীলা অবাক—হঠাৎ এতখানি আনন্দ দাদা কুড়িয়ে আনলো কোথা থেকে ? অরুণেশ বললো, নীলা! তোর তো স্পোর্টস সামনে, দৌড়ো তো দেখি আমার সঙ্গে ষ্টেটব্যাঙ্কের ঐ রাস্তাটুকু পর্যন্ত—নীলা অবাক-বিস্ময়ে দাদার ঝকমকে মুখের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলো।

দাদা, ইনার সঙ্গে বুঝি তোর ভাব হয়ে গেছে ?

অরুণেশ তরল গলায় বললে, কী করবো, তোর যা মন খারাপ দেখলাম, আমি হাতজোড় করে ইন্দ্রাণীকে বললাম, ভাব ভাব, ইন্দ্রাণী হেসে বললেন—ভাব, তারপর ফুলের তোড়া তাঁর হাতে দিয়ে আমি ছুটে এলুম তোর কাছে। নে এবার দৌড়ো।

আনন্দের ঝড় বুকে নিয়ে ভাই-বোনে দৌড় লাগালো।

[ ক্রমশঃ।

# ব্যাবিলনের রাজকন্যা

( ভলতেয়ার থেকে )

## সাতচল্লিশ

সীমেরীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি ছিলেন একজন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। তিনি বহুক্ষণ ধ'রে আলাপ করলেন ফিনিক্স-এর সংগে। রাজ-রাজকন্যা তখন আশ্রয় নিয়েছেন অবসর বিনোদন করতে তাঁর কক্ষে।

ফিনিক্স স্বীকার করলে, সীমেরীয়দের দেশে এর আগেও একবার আমি এসেছিলুম। প্রায় তিনশো বছর আগে। দেশটার ভোল গেছে একেবারে বদলে। চিনতেই পারা যায় না। প্রকৃতিকে এখানে দেখেছিলুম, সর্ব্বপ্রকার আতঙ্কের মধ্যে, অসংস্কৃত ; আর আজ সেখানে চোখে পড়ছে ললিতকলা—ঐশ্বর্য্য-গৌরব ও সংস্কৃতি।

এমন অলৌকিক পরিবর্ত্তন কী ক'রেই বা ঘটলো এতো অল্প সময়ের মধ্যে ? জিজ্ঞেস করলে সে।

একজন পুরুষ এই মহাকার্য্য আরম্ভ করেন, উত্তর করলে সীমেরীয়, আর এক নারী তাকে নিখুঁত করেছেন। এক নারী মিশরীয় আইসিস বা গ্রীক সেরেস-এর চেয়েও হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতর বিধিদাত্রী।

বিধিদাতাদের অধিকাংশই ছিলো সংকীর্ণ, স্বৈরী প্রতিভা-সম্পন্ন। যে দেশটিকে তারা শাসন করেছেন তাদের মতামত নিবদ্ধ ছিলো সেই দেশেই। এরা প্রত্যেকেই নিজ জাতিটিকে পৃথিবীর একমাত্র জাতি বলে মনে করতেন। তারা বিধিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, আচারাদি প্রচলন করেছেন, তাদের ধর্ম্ম ছিলো নিজেদের জাতিটির জন্যই।

আমাদের সম্রাজ্ঞীর প্রথম নিয়ম হচ্ছে কিন্তু সর্ব্বধর্ম্মগুলির প্রতি সহিষ্ণুতা আর সমস্ত রকম ভুল-ভ্রান্তির প্রতি করুণা। তাঁর মহাপ্রতিভা যা স্থির ভাবে উপলব্ধি করেছে তা এই : ধর্ম্ম ভিন্ন হতে পারে কিন্তু নৈতিকতা সর্ব্বত্রই এক। এই নীতি বলে আমাদের এই মহীয়সী সম্রাজ্ঞী নিজ জাতিটিকে জগতের অন্যান্য জাতিগুলির সংগে করেছেন ঐক্যবদ্ধ। অপূর্ব্ব ফলও ফলেছে বৈ কি। সীমেরীয়গণ স্কেণ্ডিনেভিয় ও চীনেদের নিজেদের ভাইয়ের মতই জ্ঞান করে।

আরো বেশী কিছু তিনি করেছেন এর চেয়েও। তাঁর লক্ষ্য, মানুষের প্রথমতম বন্ধুত্ব বন্ধন, এই মহামূল্যবান পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত করতে চান তাঁর প্রতিবাসী দেশগুলিতেও। 'স্বদেশের জননিয়ন্ত্রী' এই আখ্যাই শুধু তাঁর প্রাপ্য নয়, তিনি অধ্যবসায়ে একনিষ্ঠ থাকলে, গোটা মানবজাতির হিতকারয়িত্রী-রূপেও বিদিত হবেন।

আমাদের রাজ্যেশ্বরী সৈন্যদল পাঠিয়েছেন শান্তি আনতে পৃথিবীতে, মানুষদের পরস্পর ক্ষতি করতে বাধা দিতে, তাদের বাধ্য করতে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার সংগে বসবাস করতে। তাঁর আদর্শ সকল ছিলো সাধারণ ঐক্য সম্পর্কিত।

ফিনিক্স সংযুক্ত হয়েই এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির কথাগুলি শুনছিলো। সে বললে, মহাশয়, আমি এই পৃথিবীতে সাতাশ হাজার ন'শো বছর সাত মাস ধ'রে আছি। আপনি আমায় যে-কাহিনী শোনালেন তার সংগে তুলনীয় হ'তে পারে এমন কিছুই দেখিনি আমি আর।

তারপর সে জিজ্ঞেস করলে, আমার সুহৃদ অমৃতজীবনের সংবাদ দিতে পারেন কী ?

সীমেরীয় উত্তরে শোনালেন, সেই গল্পগুলিই যা সম্রাটকুমারী শুনেছেন চীন দেশে ও শকরাজ্যে। তিনি বললেন, বহু রাজ-সভাতেই উনি এসেছেন, কিন্তু পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রেছেন সর্ব্বত্রই যখনি কোনো মহিলা ওঁকে কোনো নিমন্ত্রণ পূর্ণ সংকেত স্থানের ইঙ্গিত করেছেন। ওঁর ভয়, উনি বশীভূত হ'য়েও পড়তে পারেন তো।

ফিনিক্স ফর্মোজান্তের কক্ষে উপস্থিত হ'লো। দিলে সম্রাটকুমারীকে সে অমৃত-জীবনের এই বিশ্বস্ততার নূতন প্রমাণ। এই বিশ্বস্ততা, এই নিষ্ঠা অবশ্যই ছিলো আশ্চর্য্যজনক। কারণ অমৃতজীবন সন্দেহও করতে পারতো না তার প্রিয়তমা এই সংবাদ পেয়ে থাকতে পারেন।

## আটচল্লিশ

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়। নূতন নূতন দৃশ্যগুলি অমৃতজীবনের দৃষ্টি করলে আকর্ষণ। এখানে রাজভক্তি, স্বাধীনতা সহ পাশাপাশিই বিরাজ করছে এক চুক্তি বলে। অন্যান্য রাষ্ট্রে এ ব্যাপার একেবারেই অসম্ভব। কৃষকদেরও শাসন ব্যাপারে অংশ ছিলো, যেমন ছিলো সাম্রাজ্যের অভিজাতদের। একজন তরুণ নৃপতি স্বাধীন একজাতির উপরে রাজত্ব করবার উপযুক্ততার উচ্চতম আশাগুলিই দিয়েছিলেন। ব্যাপারটা ছিলো আরো বিচিত্রই বটে। পৃথিবীতে একমাত্র রাজা তিনিই যিনি প্রজাদের সংগে চুক্তি ক'রে অধিকারবলে হ'য়েছেন স্বেচ্ছাচারী। অথচ আবার তিনিই ছিলেন রাজাদের মধ্যে তারুণ্যের মহেন্দ্র অচলে অবস্থিত এবং ন্যায়নিষ্ঠতম।

### শর্ম্মাটীশ দেশ

অমৃতজীবন দেখলে, সিংহাসনে বসে রয়েছেন একজন দার্শনিক। এঁকে অরাজকতার রাজাও বলা চলে। অধিপতি তিনি দশ লক্ষ ছোটো ছোটো রাজার, যাদের যে কোনো একজন মাত্র, একটি মাত্র কথাতেই, নস্যাৎ করতে পারেন অন্যান্য সকলের প্রস্তাবগুলোকে।

পবনাধিপতি ঈয়োলাসের নাম আমরা শুনেছি। পবনেরা পরস্পর সংঘর্ষে সংলিপ্ত হ'তে ভালোবাসে। অজস্রই তারা যুদ্ধ করে পরস্পর। ঈয়োলাস কিন্তু এদের বাধা দেন। নিয়ন্ত্রিত করেন।

কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, তিনি উনপঞ্চাশৎ মরুৎদের বাধা দিতে ততো বেশী বেগ পান না, যেমন পান এই নৃপতিটি অধীনস্থ রাজাদের মতামতগুলো সুসমঞ্জস ক'রতে। তিনি একজন পাইলট বা নিয়ামক, চিরকাল-বিরতি-বিহীন ঝড়ে পরিবৃত। কিন্তু তবু পোতখানি জলমগ্ন হয়নি। নৃপতি ছিলেন অতিদক্ষ নিয়ামক।

নিজ স্বদেশের থেকে সম্পূর্ণই বিভিন্ন এই দেশগুলি দিয়ে ভ্রমণ করবার সময় অমৃতজীবন অনবরতই বহু বহু নারীরই অনুগ্রহ-অর্ঘ পেয়েছে, কিন্তু সে অস্বীকার ক'রেছে। সকলেরই অনুগ্রহগুলি। ব্যাবিলনের সম্রাট-দুহিতা ফর্মোজান্তে মিশর-মহীন্দ্রকে যে চুমু খেয়েছেন, তার জন্ম তখনো তার পুরোপুরি ছিলো নৈরাশ্যের আর্তি। সর্বদাই সে শক্তি পেয়েছে। তার অসাধারণ প্রতিজ্ঞায়—প্রতিজ্ঞা সে ক'রেছিলো ফর্মোজান্তের সমুখে দৃষ্টান্ত স্থাপন ক'রবে, স্থাপন ক'রবে আদর্শ এমন প্রেমৈকনিষ্ঠা যা অদ্বিতীয় ও অচঞ্চল।

ব্যাবিলনসম্রাটকুমারী ফিনিক্সের সংগে, অমৃতজীবন সর্বত্রই যে যে পথ ধ'রে অগ্রসর হ'য়ে গেছে সেই পথেরই করেন অনুসৃতি। অমৃতজীবনের নাগাল তিনি কখনো পান নি শুধু দুই-একদিনের ব্যবধান মাত্র। একজন পর্যটন ক'রে চলেছেন বিরামহারাই, অন্যজন তাঁকে অনুসরণ করতে হারিয়েছেন মাত্র এক মুহূর্তই।

## উনপঞ্চাশ

উত্তর অঞ্চলের সমস্ত রাজাই ছিলেন শিক্ষিত আর তাঁরা সকলেই চিন্তা-স্বাধীনতা দান করেছেন। তাঁদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়নি সেই সমস্ত মানুষদের ওপরে যারা তাঁদের বিভ্রান্তি-সৃষ্টিতে স্বার্থবান, কিংবা যারা নিজেরাই হতেন বিভ্রান্ত।

এই সমস্ত রাজারা সার্বজনীন নৈতিকতার জ্ঞানে লালিত-পালিত অন্ধ সংস্কারগুলিতে ঘৃণা পোষণ করত। এই সমস্ত রাষ্ট্রে এরা নির্বাসন দিয়েছেন একটি মূঢ় আচারকে যা দক্ষিণের বহু বহু দেশকেই দুর্বল ও জনশূন্য করেছে। অভ্যাসটি ছিলো এই—এরা জীবন্তই সমাধি দিতো, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারাকক্ষে, স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীরই অনন্ত সংখ্যাকে চির-বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিতো এদের নিকটে এরা, পরস্পর কখনো আলাপাদি বা সংক্রমণে লিপ্ত হবে না কখনো।

উৎকট পাগলামী এই বহু শতাব্দী ধরেই চলেছে। ফলে জগৎ উৎসন্ন হয়েছে ঠিক তেমন ভাবেই যেমন হয়েছে ক্রুরতম যুদ্ধ সমূহের ফলে।

উত্তরের নৃপতিরা পরিশেষে উপলব্ধি করেছেন, যদি প্রজনন-পালের প্রয়োজন থাকে, তবে শক্তিশালীতম ঘোটকগুলো থেকে ঘোটকীগুলোকে বিচ্ছিন্ন করলে ফলোদয় না হবারই কথা।

এরা অদ্ভুত ও ক্ষতিকর ভ্রম-সমূহও বর্জন করেছেন। সংক্ষেপতঃ মানুষেরা এই বিশাল দেশগুলিতে বিচার-শক্তি-সম্পন্ন হতে সাহসী হয়েছে অথচ অন্যত্র আজো এই বিশ্বাস বদ্ধমূল যে, মানুষগুলোকে ততো দিনই শাসনে রাখা চলে যতো দিন তারা থাকে অজ্ঞ।

## পঞ্চাশ

ব্যাটাভিয়া দেশটা ঠিক সুখী গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের দেশের মতই।

শোকের মধ্যেও অমৃতজীবন স্বদেশের সংগে এই দেশের এই শীর্ণ সামঞ্জস্যটুকু লক্ষ্য করে তৃপ্তি পেলো। স্বাধীনতা, সাম্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রাচুর্য্য ও পরমত বা ধর্মসহিষ্ণুতা—গঙ্গাতীরবর্তী দেশটির মতই এই দেশেরও বৈশিষ্ট্য।

এদেশের নারীরা কিন্তু অতো ঠাণ্ডা, উদাসীন। এদের ভিতরে একজনও অমৃতজীবনের প্রতি কোনো প্রেমারতি দেখায়নি। অথচ অন্যান্য স্থানে এর বৈপরীত্যই ঘটেছে। সুতরাং প্রতিরোধকল্পে অমৃতজীবনকে কোনো কষ্ট স্বীকারই করতে হয়নি। যদি এই সমস্ত নারীদের আক্রমণ করতে তার ইচ্ছে যেতো, তবে সে সহজেই এদের এক একটিকে পরাভূত করতে পারতোই, কারো ভালোবাসা না পেয়েও। কিন্তু বিজয়ের স্বপ্ন থেকে সে ছিলো বহু বহু দূরে।

ফর্মোজান্তে এই দেশে তাকে প্রায় ধরে ফেলেছিলেন আর কি, যদি এক মুহূর্তের জন্ম দেরী না হয়ে যেতো।

ব্যাটাভিয়াবাসীরা বড়ো প্রশংসা করছিলো একটি দেশের। সেটি একটি দ্বীপভূমি। নাম য়্যালবিয়ন।

অমৃতজীবন প্রতিজ্ঞা করলে, সে দ্বীপদেশ দেখবেই। সুতরাং সে আর তার একশৃংগী অশ্ব, চাপলো একটি জলপোতে।

পূবের বাতাস ছিলো অনুকূল। মাত্র চারি ঘণ্টার মধ্যেই তারা

এসে স্পর্শ করলে সেই দেশেরই তীরভূমি। দেশটার ছিলো টায়ার বা অতলান্তিক দ্বীপের চেয়েও বেশী খ্যাতি।

রূপদক্ষা ফর্মোজাস্তে অমৃতজীবনকে বরাবর অনুসরণ ক'রে চলেছেন। দূনা, ভিশ্চুলা, এল্‌ব, ও রেজার নদী ধ'রে অবশেষে পৌঁছুলেন রাইন নদের মোহনায়, জার্মাণ সাগরে। শুনলেন, তাঁর প্রিয় প্রেমিক য়্যালবিয়নের তীরগুলোর দিকে পাড়ি দিয়ে গেছে। তাঁর মনে হ'লো, ঐ তো দেখা যাচ্ছে অমৃতজীবনের জলযান। আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন তিনি।

তাঁর চীৎকার শুনে ব্যাটাভিয়ার রমণীরা একটু আশ্চর্য্য হয়ে উঠেছিলো। তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারতো না একটি তরুণ এতো আনন্দের কারণ হতে পারে।

আর ফিনিক্সের কথা? এর সম্পর্কে তারা খুব বেশী চিন্তা করেনি। এটা কিন্তু ঠিক। তারা ভেবেছিলো, এর পাখাগুলো বিকোবে না। বিকোবে না ততো দামেও যতো দাম পাওয়া যেতে পারতো তাদের জলাভূমি-চারী পাতিহাঁস আর রাজহাঁসগুলো থেকে।

ব্যাবিলনের রাজেন্দ্রদুহিতা দু'টি জলপোত ভাড়া করলেন বা চুক্তিবদ্ধ হলেন তার জন্ত। পোত দুটি তাঁকে পৌঁছে দেবে, তাঁর সমস্ত সমভিব্যাহারীদের সংগে, সেই সুধন্য দ্বীপেই যা বুকে ধরে রেখেছে তাঁর সর্ব্বকামনার অপূর্ব্ব বস্তুটিকে, তাঁর জীবনের আত্মা, তাঁর অন্তরের দেবতাটিকে।

একটা মারাত্মক পশ্চিমে হাওয়া হঠাৎ উঠলো, ঠিক সেই মুহূর্তেই যখন সুবিশ্বাসী, অসুখী অমৃতজীবন পদরেণু স্পর্শ করালে য়্যালবিয়ন দ্বীপটির তীরভূমিটিকে।

ব্যাবিলনের অসামান্যা সম্রাটকুমারীর জাহাজ নোঙর করতে পারলে না। তাঁকে আক্রমণ করলে মানস-যন্ত্রণা, তিক্তশোক ও গভীর বিমর্ষ। শোকের আবেগে তিনি গিয়ে আশ্রয় নিলেন শয়নীয়ে, হাওয়াটা বদলাবে এই অপেক্ষায়। কিন্তু হাওয়াও নাছোড়বান্দা; দীর্ঘ আট ঘণ্টা কাল ধরে সে বয়েই চললো, চিত্তনিরানন্দকর প্রাবল্যের সংগে।

আট ঘণ্টাব্যাপী এই শতাব্দী সময়ে অসামান্যা সম্রাটকুমারী সখী ঈরলাকে বললেন, উপন্যাসগুলি পড়ে শোনাও আমায়।

উপন্যাস ব্যাটাভিয়াবাসীরা রচনা করে না। তারা জগতের ব্যাপারী, নানাজাতির প্রজ্ঞারস বিলোয় তারা পণ্যদ্রব্যের মতোই।

ঈরলা আদেশ পালন করলে রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে।

সম্রাটকুমারী আশা করেছিলেন, এই কাহিনীগুলিতে তিনি এমন কোনো য়্যাডভেঞ্চারের সন্ধান পাবেন, যা তার নিজেরই জীবন-কথার অনুরূপ; আর এটা শোকে সান্ত্বনা জোগাবে।

## একাত্ম

ও মা, ও কী? ঘোড়ার গাড়ী না? উল্টে পড়ে আছে! আরোহী আছে, না নেই?

বক্তা ছুটে গেলো। ছুটে গেলো উল্টে-যাওয়া ঘোড়ার গাড়ীটির পাশে। তুললে সে ঠেলে গাড়ীটাকে। সম্পূর্ণ একাই। গায়ের শক্তি তো তার কম নয়। অন্যান্য লোকদের তুলনায় অবশ্যই সে খুব বেশী শক্তিধর।

পাইপ টানছিলেন এক ভদ্রলোক গাড়ীর মধ্যে বসে।

নমস্কার, ভদ্রমহোদয়, বললেন তিনি। হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দ্দনের জন্য।

উপকারীর নাম জানতে পারি কী? করমর্দ্দন করে বললেন পূর্ব্বোক্ত বক্তা।

আমার নাম অমৃতজীবন। 'গঙ্গার তীর স্নিগ্ধসমীরজীবন জুড়ালে তুমি' শুনেছেন তো? অধিবাসী আমি সেই দেশের।

আপনার নাম?

লর্ড কী তারপর অর্থাৎ লর্ড কী আসে যায়।

কোন দেশে আমি এসেছি বলবেন কি?

কেনো, এ য়্যালবিয়নের রাজধানীর দিকে আপনি চলেছেন।

আপনার এ অবস্থা হলো কী করে? আপনাকে আমার অদ্ভুত মানুষ বলেই মনে হয়। এমন বিপন্ন অবস্থায় ছিলেন, তবুও একেবারে নির্ব্বিকার! আরামে বসেই ধূমপান করছিলেন।

গাড়ীটা আমার উল্টে পড়ে গিয়েছিলো। পড়ে গিয়েছিলো নালার ভিতরে। চাকর-বাকরেরা সকলেই গেছে চলে সাহায্যের খোঁজে। আমিই কেবল পড়ে আছি। অবসর বিনোদন করছিলুম ধূমপান করে।

অবসর বিনোদন নিশ্চয়ই, প্রকাণ্ড রকমের অবসর বিনোদন। গাড়ীটা ভালোই গেছে উল্টে, অথচ নিঃশঙ্কচিত্তেই উল্টে-যাওয়া গাড়ীর মধ্যেই বসে করছেন ধূমপান!

আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, ভদ্রমহোদয়! আমাদের এই দেশের লোকেরাই এই ধরণের। তাদের ভিতরে আমি একজন।

আপনার গায়ের জোর তো ভয়ানক, প্রিয়বর! একাই আমাকে শুদ্ধ উল্টে-যাওয়া গাড়ীটাকে টেনে তুললেন!

আশ্চর্য্যের কিছু নেই, এ তো যোগ-বলীয়ানেরা এমনই হন।

গ্রামবাসীরা এসেছিলো আশ-পাশ থেকে। ছুটে এসেছিলো তারা। হন্তদন্ত হয়ে।

রেগে তারা বললে, আমাদের অসম্মান করবেন বলেই কি ডেকে এনেছেন? আমাদের দিয়ে কোনো কাজই যদি না করাবেন, তবে আনলেন কেন ডেকে?

ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে তারা দোষ চাপাতে লাগলো বিদেশী আগন্তুকের ঘাড়ে। শাসালেও তারা তাকে। বললে, বিদেশী কুকুর! বেতের ঘা-ই তোমার বিশেষ পুরস্কার।

অমৃতজীবন পাকড়ালে ওদের দুটোকে। এক এক হাতে এক একজন। শক্ত করে ধরলে সে। ছুঁড়ে দিলে ফেলে। গজ কুড়ি দূরে গিয়ে তারা পড়লো ছিটকে।

এর পরে অন্য যারা ছিলো আক্রমণকারীদের মধ্যে, খুবই সম্মান দেখাতে লাগলো তারা অমৃতজীবনকে। টুপি তুলে করলো অভিবাদন। বললে, আমাদের কিছু উপকার করুন।

অমৃতজীবন তাদের পুরস্কার দিলে। প্রচুর, প্রচুর। তারা এতো অর্থ জীবনে আর কখনো দেখেনি। সত্যিই।

লর্ড কী তার পর বললেন অমৃতজীবনকে, বড্ড ভদ্রলোক আপনি। খুবই নিরীহ। আসুন আমার সংগে। ভোজনের নেমন্তন্ন জানালুম আপনাকে।

প্রাসাদ আমার এখান থেকে দেড় ক্রোশটেক হবে। কিন্তু আপনার গাড়ীতেই আমি যাবো। আমার গাড়ীর কী গতি হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। যা য়্যাক্সিডেন্ট হ'য়েছিলো—

হাতে ধ'রে অতিথি-সংকারকের নিজের গাড়ীতে তুলে নিলে অমৃতজীবন।

## বাহান্ন

চলতে চলতে য়্যালবিয়নবাসী লর্ড কী তার পর কী ব্যাপার কী বললেন, চমৎকার গাড়ী আপনার। ছ'টি ঘোড়া চিত্ত-চমৎকার। একশিং সকলেই।

হুঁ, ভাবতে ভাবতে স্বপ্নজড়িমার্ত্ত চোখে আকুল-আকুল কণ্ঠস্বরে উত্তর করলে অমৃতজীবন। আপনার সেবা করবে ওরা।

পাইপ টানতে টানতে লর্ড ব্যাপার কী বললেন, আপনি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছেন? রাজকন্তার বোধ হয়?

ধূমের কুণ্ডলী সরীসৃপগতিতে উর্দ্ধে উঠছিলো।

অমৃতজীবন নিরুত্তর। তার দৃষ্টি কুলকুণ্ডলিনীর দিকে ছিলো কি না, কে বলবে?

লর্ড ব্যাপার কী, আবার বললেন, ছ'টি একশিং ঘোড়া টানছে গাড়ীটি আপনার। রূপরাজ্যজন্মা ঘোড়া আপনার, গাড়ীটিও রূপরাজ্যের, গাড়ীর রং রামধনু-পরাজয়ী। আপনি স্বয়ং রূপরাজ্য-অধিবাসী। রূপরাজ্যের কন্তার কথাই ভাববেন, এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। আশ্চর্য্যের সমাবেশ আপনার চোখে-মুখে।

নিঃশব্দতা বিরাজ ক'রছিলো ঘণ্টার এক-চতুর্থাংশ কাল ধরে।

কার কথা ভাবছেন, বলবেন, বলবেন না কী?

একশৃঙ্গবাহী পর্য্যটক বললে, ব্যাবিলনের সম্রাটকন্তার কথাই ভাবছি। মিশরের মহীন্দ্রকে তিনি কী মারাত্মক চুম্বনই না করেছেন!

য়্যালবিয়নবাসী লর্ড কোনো উত্তর দিলেন না। মনে হচ্ছিলো না, মিশরের মহীপাল বলে কেউ যদি থাকেন বা না থাকেন, অথবা ব্যাবিলনের সম্রাটকুমারী বলে কেউ থাকুন বা না থাকুন, তাতে তার কিছু আসে যায়?

আরো এক ঘণ্টার এক-চতুর্থাংশ সময় গেলো কেটে। কোনো কথাবার্ত্তা নেই দু'জনের মধ্যে।

ছ'টি একশিং তুরগ-বাহিত চক্রযান চলছিলো।

গাড়ীর ঝাঁকুনি শূন্যতায় মুগ্ধ হয়েছিলো, লর্ড ব্যাপার কী। অতিথি-সংকারক প্রশ্ন করলেন, আপনার শরীরের অবস্থা কেমন? আপনাদের দেশের কী নামটুকু যেনো বললেন? গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেশ? তাই নয়? আচ্ছা, সে দেশে গো-মাংস বা তার শিককাবাব আপনাদের খাওয়ার অভ্যাস আছে কী?

ভারতীয় পর্য্যটক বললে যথোচিত বিনয়ের সংগে, গঙ্গাতীরে আমরা মাকে ভোজন করিনে। ভোজন করিনে ভাইদের। গরু আমাদের মা, ভগবতী; যণ্ডগুলি ভাই। গরুর দেহে রয়েছেন তেত্রিশ কোটি দেবতারা। বললে সে আরো, আমাদের পদ্ধতি

পিথাগোরাস, পরফিরি এবং আয়ামব্লিকাকাস-এর পদ্ধতি। বহু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে তা।

য়্যালবিয়নের লর্ড আর কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। ঘুম ভেঙে যখন জেগে উঠলেন, তখন ছ'টি একশৃংগাশ্ব-বাহিত চক্রযান অতিথি-সংকারকের বাটীর দুয়োরে এসে পৌঁছে গেছে।

## তিস্লাম্ন

তরুণী এবং মনোরমা ছিলেন অতিথি সংকারকের স্ত্রী। আত্মা ছিলো তাঁ'র প্রাণময় ও সংবেদনশীল। স্বামীর সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ স্বামী ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির।

য়্যালবিয়নের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এলেন সেদিন নিমন্ত্রিত হ'য়ে তাঁ'র গৃহে। সব শ্রেণীর মানুষই ছিলেন এদের ভিতরে। এর কারণটা ছিলো নিগূঢ়: য়্যালবিয়ন দ্বীপ দেশভূমি বিদেশীরা ছাড়া তেমন কেউই আর প্রায় শাসন করেনি কখনো। এই শাসকদের সংগে যে সমস্ত পরিবার এসেছিলো তা'রা আমদানী ক'রেছিলো ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জীবনধারা। সুতরাং এই অভ্যাগতদের দলে ছিলো কতোগুলি লোক যাদের স্বভাব ছিলো মনোজ্ঞ মধুর, আর কতোগুলি ছিলো উচ্চতর রসশীল, আর কেউ কেউ ছিলো সুগভীর জ্ঞানের সমুদ্র, এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই।

গৃহকর্ত্রীর ছিলো না কখনো কোনো কিছু সেই ধরণের জোর খাটানো কুশ্রী চাল-চলন, সেই কাঠিন্য, সেই লজ্জাবিনম্রতা যা'র জন্তে ভর্ৎসনার পাত্রী হ'তেন সেকালের য়্যালবিয়নের তরুণী নারীরা। লুকোতেন না তিনি, ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিভংগী এবং ভাণকরা নীরবতা দিয়ে কিছু আলাপ করবার না থাকার ভাব-স্বল্পতা এবং অসম্মানজনক বিষণ্ণতা। কোনো স্ত্রীলোকই ছিলো না তা'র মতো মনো-সংমোহিনী।

অমৃতজীবনকে তিনি তা'র স্বভাব-সুলভ বিনয় ও সৌজন্যেই ক'রেছেন আপ্যায়িত। এই তরুণ বিদেশীর অত্যাশ্চর্য রূপ এবং নিজের স্বামীর সংগে তরুণ আগন্তুক ভদ্রের অকস্মাৎ তুলনা প্রথম থেকেই তাঁকে তুলেছিলো বিশেষ করেই সচঞ্চলা করে। মধ্যাহ্ন ভোজন হয়েছিলো পরিবেশিত। অমৃতজীবনকে বসিয়েছেন গৃহস্বামিনী ঠিক আপনার পাশটিতে। সব রকমের পুডিং দিয়েছেন তিনি তাঁ'কে খেতে। এই বন্দোবস্ত করবার জন্য আগে থাকতেই তিনি অমৃতজীবনকে জিজ্ঞেস না করে পারেন নি, আপনারা আমিষাশী না নিরামিষাহারী?

অমৃতজীবন ব'লেছিলো, গঙ্গাতীরবর্ত্তীগণ ভক্ষণ করেন না এমন কোনো বস্তুই যা দেবতাদের কাছ থেকে পেয়েছে জীবনস্বরূপ দিব্য অবদান।

ভিনদেশী তরুণের সৌন্দর্য্যলালিত্য, তার শক্তিমত্তা, গঙ্গা-তীরবর্ত্তীদের জীবন-পদ্ধতি, সুকুমার কলা-সমূহের উন্নয়ন, ধর্ম্ম, শাসনব্যবস্থা হ'য়েছিলো ভোজনোৎসবের আলোচনা-বস্তু। আলোচনাটুকু হ'য়েছিলো যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি হৃদয়গ্রাহিণী।

মধ্যাহ্ন ভোজনোৎসব দীর্ঘ রাত্রি পর্য্যন্তই চ'লেছিলো। আনন্দোৎসবে এই লর্ড কী প্রচুর সুরামৃত গলাধঃকরণ ক'রেছিলেন, অথচ একটি বাক্যও নিঃসৃত হয়নি তাঁর মুখ থেকে।

## চুস্লাম্ন

ডিনারের পর। অতিথি-সংকারিকা চা পরিবেশন করতে করতে বিদেশী তরুণকে তাঁর দুখানি সুদৃষ্টি, মহালোলুপ চোখ দিয়ে পান করছিলেন বললেই হয়। বিদেশী তরুণ তখন কিন্তু আলাপ করছিলো পার্লামেন্টের একজন সভ্যের সংগে।

অমৃতজীবন প্রশ্ন করলে, ও-দেশের জ্ঞাতব্য বহু বহু বিষয়েই, বিশেষতঃ ওদেশের জীবনের ধারা, শাসন-ব্যবস্থা, আইনকানুন, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার এবং শিল্পকলা ও সুললিত কলা সম্পর্কে। ওদেশটা যে অতো বড়ো আর সম্মানার্হ, তা এই সমস্ত গুণেই। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি যা উত্তর করলেন তা সংক্ষেপতঃ এই—

আমাদের দেশ, আমাদের দেশের চারদিকে যে-সমস্ত সমুদ্র ঘিরে আছে, তার চেয়েও বেশী ঝঞ্ঝাসংকুল।

* * * *

বহু কাল ধরে আমরা ছিলুম সম্পূর্ণ নগ্ন, যদিও দেশের জল-বায়ু উষ্ণ নয়। বহু কাল ধরে আমরা ব্যবহার পেয়েছি ক্রীতদাসদের মতো। আমাদের উপরে যারা প্রভুত্ব করতো তারা এসেছিলো স্যাটার্ণ বা শনি মহারাজ-এর সুপ্রাচীন দেশ থেকে। সে দেশটি টাইবার নদের জলবিধৌত। আমরা নিজেরাই আমাদের আরো বেশী ক্ষতি ক'রেছি, তারা আমাদের যা ক্ষতি করেছে তার থেকে।

* * * *

কেউ কি বিশ্বাস করবেন কি ভয়ংকর নরক, কি বিভেদ, অত্যাচার অজ্ঞতা এবং ধর্ম্মান্ধতারূপ প্রলয়াগ্নি থেকে অবশেষে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মতো জন্ম নিয়েছিলো সম্ভবতঃ আজিকার পৃথিবীর সব চেয়ে নিখুঁততম শাসন-ব্যবস্থাই? কল্যাণ-মঙ্গলে সর্ব্বশক্তিমান একজন পরমৈশ্বর্য্যশালী ও পরম সম্মানার্হ সম্রাট রয়েছেন একটু স্বাধীন যুদ্ধকলা-বিশারদ, বণিকধর্ম্মী, উচ্চ মননশীল জাতির। সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় একদিকে, অন্যদিকে নগরগুলির প্রতিনিধিগণ সম্রাটের সংগে দেশ শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করেন।

অত্যদ্ভুত ভবিতব্য! বিশৃঙ্খলা, গৃহযুদ্ধ, অরাজকতা এবং দারিদ্র সারা দেশের ওপরে তাণ্ডব সুরু করে দিলে, দেখা গেলো, যখন রাজারা স্বৈরাচারী হয়ে উঠলেন। শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সাধারণ পরিতৃপ্তি এলো শুধু তখনই যখন নৃপতিরা স্বীকার করলেন তারা স্বয়ং শ্রেষ্ঠ নন। সব কিছুই হলো এলোমেলো, ওলট-পালট, যখন জনশক্তি হয়ে উঠতে লাগলো কোলাহলোন্মত্ত, দুর্ব্বোধ্য বাক্যগুলি নিয়ে, আবার সর্বত্রই ফুটে উঠলো শৃঙ্খলাশ্রী যখন জনমন সে বস্তুগুলিকে দেখতে লাগলো ঘৃণার চক্ষেই

আমাদের বিজয়ী নৌবহর প্রতি সমুদ্রেই প্রসারিত করছে গৌরব আমাদের, আইন-কানুন বূ্যহস্থিত ক'রে রক্ষা করছে আমাদের ভাগ্যৈশ্বর্য্য।

কখনো কোনো বিচারক আইন-কানুনগুলিকে খেয়ালখুশিতে ব্যাখ্যা করতে পারেন না, ব্যাখ্যা করতে পারেন না বিবেচনার বাঁধ ছিঁড়ে। জজকেও আমরা হত্যাকারিরূপে শাস্তি দিই। অবশ্যই যদি জজ দুঃসাহসী হয়ে ওঠে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেন কোনো পৌরমানবকে, না দেখিয়ে সেই সাক্ষ্য যা'র বলে সে হয়েছে অভিযুক্ত এবং না উল্লেখ ক'রে সেই আইনের ধারা, যা'র বলে সে হয়েছে দণ্ডিত।

## পঞ্চাশ

সত্য কথা অবশ্যই স্বীকার করবো। আমাদের মধ্যে আছে দু'টো দল, যারা পরস্পর যুদ্ধ করবেই লেখনী সাহায্যে এবং ষড়যন্ত্র করে। তবে এ-ও সব সময়েই খাঁটি সত্য কথা, সমস্ত তিক্ততা ভুলে গিয়ে তারা, একত্র হয়েই অনুধাবন করবেন যদি দেশশ্রী এবং তার স্বাধীনতা রক্ষা করবার কথা ওঠে। পরস্পর-বিজিগীষু দু'টি দল এই দৃষ্টি রাখে পরস্পরের ওপরে। যে কোনো পক্ষই নিয়ম-কানুনের সুপবিত্র ন্যাস লঙ্ঘন করতে গেলে পরস্পর বাধা দেন। পরস্পরকে তারা ঘৃণা করেন, কিন্তু ভালোবাসেন রাষ্ট্রশ্রীকে। অতি ঈর্ষাশীল প্রেমিকযুগল তারা একই প্রেমিকার বাসনাগুলি পূরণে তৎপর। একই প্রেমিকার ইচ্ছা ও আদেশ মৌলি করতে দৃঢ় উৎসুক।

মনের গভীরতা ছিলো বলেই তো আমরা মানবিক অধিকারগুলি করেছি স্বীকার, ধরেছি তাদেরই উঁচু করে এবং এসেছি রক্ষা করেও। সেই একই মনের গভীরতা নিয়েই আমরা বিজ্ঞানগুলিকে তুলে ধরেছি ঠিক ততোদূর উঁচুতেই যতোদূর উঁচুতে উঠতে পারে তারা মানুষের সংগে।

আপনাদের মিশরীয়গণ মস্ত বড় যান্ত্রিক, এ গর্ব্ব করেন আপনারা। আপনাদের ভারতীয়গণ মস্ত বড় দার্শনিক, এ অহংকারও আছে আপনাদের। আপনাদের ব্যাবিলনীয়গণ চারশো এবং ত্রিশ হাজার বছর ধরে নক্ষত্রমালাকে আসছেন দেখে, এ রকম কথাও শুনে থাকি আপনাদের মুখে। আর গ্রীকগণ রচনা করেছেন সুন্দর সুন্দর রাকবিধি কিন্তু দিয়েছেন অত্যল্প তত্ত্বই। অথচ সত্যি কথা যদি বলি, নিশ্চয়ই রাগ করবেন না, আশা করি। আমাদের শ্রেষ্ঠ মনী যাঁদের আবিষ্কার উদ্ভাবনাগুলির অনুশীলন করে আমাদের সব চেয়ে ছোটো বিদ্যালয়যাত্রী ছাত্রেরা যা জানে, জানতেন না তারা ঠিক তাও। বহু যুগ ধরেও মনুষ্যবংশ যা আবিষ্কার উদ্ভাবন করতে পেরেছে, তার তুলনায় প্রকৃতির বুক থেকে বহু বেশী জ্ঞানই ছিনিয়ে এনেছি আমরা মাত্র একশো বছরের মধ্যে।

বর্ত্তমান অবস্থার আমাদের সবচেয়ে নিখুঁত চিত্রই তুলে ধরলুম আপনার সম্মুখে। আমি গোপন করিনি কোনো কিছু ভালো বা মন্দ, কলংক বা মহিমা। অতিরঞ্জনও নেই এক তিল আমার বিবরণে।

বক্তৃতায় মুগ্ধ অমৃতজীবন।

## ছাপ্পান্ন

অমৃতজীবনের ইচ্ছে হলো, ম্যালবিয়নের যে বিজ্ঞানগুলির কথা সে শুনলে, সেগুলিকে আয়ত্ত করে নিলে তার নিজের পক্ষে এবং দেশের পক্ষেও মঙ্গল। ভাবলে, ম্যালবিয়ন দ্বীপেই কাটিয়ে দেবে সে জীবনের বাকী দিনগুলি। কিন্তু ব্যাবিলনের সম্রাট-কন্যার প্রতি তার তীব্র দিব্য প্রেমোন্মাদ, বহু দিন ফেলে-আসা সুপরমা স্নেহময়ী মা'র সদা সুপ্রসন্ন দৃষ্টি ও তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং স্বদেশ-সম্প্রীতি তার উৎপীড়িত মনের সংগে বিতর্কের ঝড় সুরু করে দিলে। তার প্রিয়তমা ব্যাবিলন সম্রাট-দুহিতা মিশরের মহীন্দ্রকে যে দুর্ভাগ্য চুম্বন দিয়েছেন, তার ফলে উচ্চতর বিজ্ঞানগুলিকে আয়ত্ত করবার মতো শান্তি তার মনে ছিলো না মোটেই।

স্বীকার করছি আপনার কাছে, বললে সে, বিশ্বজগৎ ভ্রমণ করবার কর্ত্তব্যের গুরুভার আমি তুলে নিয়েছি নিজের মাথায়। স্বীকার করছি, নিজের কবল থেকে আমি পালাবার প্রয়াসী। সেই কারণেই আমার কৌতূহল জাগছে একবার দেখে আসতে শনি মহারাজের সেই সুপ্রাচীন ভূমিখণ্ডটিকে, টাইবার নদ, তীরবাসী সেই অধিবাসীদের আর সেই সপ্ত পর্ব্বতমালাকে—যার আদেশ একদিন মৌলি করেছেন আপনারা। নিঃসংশয়েই, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাজাতি তারা।

আপনাকে উপদেশ দিই, বেরিয়ে পড়ুন এই পর্য্যটনে, বললেন ম্যালবিয়নের ভদ্রমহোদয় সেই, যদি সংগীত ও চিত্রভবন ললিতকলার প্রতি প্রেম থাকে আপনার। আমরা নিজেরাও প্রায়শঃই যেয়ে থাকি সেখানে। বয়ে নিয়ে যাই আমাদের ক্লান্তি ভরা নিরানন্দময়তার গুরুভার সেই সপ্ত পর্ব্বতমালায়। কিন্তু আমাদের সেকেলে বিজেতা প্রভুদের উত্তরবংশীয়দের যদি আপনি দেখেন, খুবই আশ্চর্য্য ঠেকবে আপনার।

দীর্ঘ বক্তৃতায় অমৃতজীবনের সুন্দর মস্তিষ্ক একটু ঝিমঝিম করছিলো। তবু সে মনোমুগ্ধকর ভাবে কথা বলছিলো, তার কণ্ঠস্বর ছিলো এতো চমকপ্রবণ, তা'র মুখশ্রী ও অবয়বভঙ্গীগুলি ছিলো এতো মহান ও বিনম্র, গৃহকর্ত্রী নিজেই তা'র সঙ্গে একাকিনী আলাপ ক'রবার স্পৃহা দমন ক'রে উঠতে পারলেন না।

ফুলঝুরির মতোই কথা ফুটছিলো তার। কথা ফুটছিল ফুল ফোটে যেমন উদ্যান পরিপূর্ণ ক'রে গাছে গাছে উষার প্রথম আলোকের স্পর্শ লেগে।

অমৃতজীবনের হাত দু'টি তিনি খুব নম্রস্পর্শে পীড়ন ক'রলেন। দৃষ্টিপাত বর্ষণ করলেন খুব স্নিগ্ধ দীপ্ত চোখ দুটি থেকে, যার ফলে যে কোনো মানুষেরই প্রতিটি সত্তার সমস্ত উৎসে উৎসে কামনা-কেশর ওঠে অঙ্কুরিত হয়ে।

গৃহকর্ত্রী বললেন, সান্ধ্যভোজন না করে, আর রাত্রিটুকু আমাদের এখানেই যাপন না ক'রে, যেতে পারবেন না কিন্তু।

অমৃতজীবন বললে, অতিথি-সংকারিকার আদেশ শিরোধার্য্য।

## সাতান্ন

প্রতিটি মুহূর্ত্ত, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি দৃষ্টি কামনার আগুন প্রজ্বলিত করলে মানসগুহায় সুন্দরীশ্রেষ্ঠার।

সকলেই আশ্রয় নিয়েছে নিজ নিজ শয্যা-পুটে। নিদ্রার আকর্ষণ থাকলেও গৃহকর্ত্রী নিদ্রা যেতে পারছিলেন না। উঠে বসলেন পড়বার টেবিলের পাশে ভেলভেট-মোড়া চেয়ারটিতে। লিখলেন একখানি চিঠি। ছোট্ট চিঠি:

"প্রিয়তম, নিদ্রার প্রবল আকর্ষণ থাকলেও নিদ্রা আসছে না আপনার অদর্শনে। তৃষ্ণা চেপে রেখে ঘুমুতে পারছি নে। রক্ত-মাংসের জীব কেউ কখনো পেরেছে কি?

ভগবানের নাম নিলে ঘুম আসবে বলবেন? সে নামটুকুও চাই শুনতে আপনারই মুখ থেকে।

পত্র-রচয়িত্রীর সন্দেহই নেই কোনো, বিদেশী সুন্দর আসবেনই। আসবেন তার বিরহবিধুরা চকোরীর শিয়রের পাশে। রূপরাজ্যে ঋষিরা বলেন, ভগবানই প্রেম, প্রেমই ভগবান। তাঁদের আদেশ জয়ী হোক।

ইতি—

অতিথি-দেবতা পূজারিণী।"

ফ্যানসী পত্র নিলে। সত্ত্বো-শীঘ্র পৌঁছে গেল যথাস্থানে। যথাদেশ মতো লর্ড কিন্তু তখন ঘুমিয়ে রয়েছেন তার নিজ দুগ্ধফেননিভ বিছানায়।

অমৃতজীবন পুনরায় সাহস সঞ্চয় করলে। প্রতিরোধ করতে, প্রতিরোধ সে করবেই, পূজারী সে সত্য-শিব-সুন্দরের। একমেবা-দ্বিতীয়মের।

এক কণা মূর্খতা বলিষ্ঠ এবং সুগভীর ভাবে আহত আত্মার উপরে এমনই আশ্চর্যজনক প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

স্বদেশের কুলাচারানুমোদিত প্রথা মৌলি করে অমৃতজীবন অতিথি-সংকারিকাকে বশংবদ উত্তর পাঠালে। উত্তর পাঠালে অতিথি-সংকারিকার ছোট্ট চিঠিটুকুর।

ফ্যানসী ফিরে এলো ছোট্ট চিঠি নিয়ে। ছোট্ট চিঠির উত্তরে ছোট্ট চিঠি একখানি।

অমৃতজীবন লিখেছে, "আমার প্রতিজ্ঞার পবিত্রতা স্বর্গের মতই সমুজ্জ্বল। যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ-এর মতো তার পরম প্রতিষ্ঠা।

আমি সত্যধর্ম্মী। অপাপবিদ্ধ, একদিন সুকঠিন প্রতিজ্ঞা করেছি, ব্যাবিলনের সম্রাটকন্যাকে শেখাবো কী ভাবে বাসনার মত্ত-বারণকে অংকুশ আঘাত করতে হয়, কী করেই বা তার পায়ে পরাতে হয় সংযত শৃঙ্খল! মনে কিছু করবেন না যেনো। নিজগুণে ক্ষমা করবেন। অতিথি সুন্দর।"

একশৃঙ্গগুলি সুসজ্জিত হলো। অমৃতজীবন বেরিয়ে পড়লে ব্যাটাভিয়া উদ্দেশ্যে আবার।

অভ্যাগতদের দল চমক মানলে অমৃতজীবনের ব্যবহারে। নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্নার মতো পড়ে রইলেন অতিথিসংকারিকা।

দুঃখের অত্যধিক আতিশয্যে চিঠিখানা পড়ে ছিলো এক ধারে। অসাবধানতা প্রসূত অযত্নেই।

* * * *

লর্ড ব্যাপার কীর দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সে চিঠির উপরে ভোরবেলা।

ঘাড় কুঁচকোতে কুঁচকোতে তিনি বললেন, হুঁম্। নিরর্থকতার নিরানন্দ টুকরো একটু ঐটে।

শেয়ালের শীকারে বেরিয়ে পড়লেন লর্ড। ব্যাপার কী! সঙ্গে সুরা-পিয়াসীরা গুটিকয়।

## আটান্ন

মহানীল সমুদ্র। আকাশের মতই আয়ত। আকাশে মেঘদের ঢেউ, নীচে ফেনময় জলরাশি। আকাশে পাড়ি দিচ্ছে বিহঙ্গেরা, সমুদ্রের বুকে পাড়িদার অমৃতজীবন, উন্মুক্ত রয়েছে একখানি মানচিত্র তার সমুখে। মানচিত্রখানি উপহারস্বরূপে পেয়েছিলো সে য়্যালবিয়নবাসী সেই বিজ্ঞ সম্ভ্রান্ত পুরুষের কাছে, যিনি তার সঙ্গে আলাপ করছিলেন লর্ড কী তারপর-এর গৃহে।

অবাক হ'য়ে যাচ্ছিলো সে যতোই তাকাচ্ছিলো সেই মানচিত্রে ছোটো ছোটো বিন্দুগুলির দিকে।

বলছিলো সে, সত্যই অদ্ভুত এ জাতিটি! ভগবান এদের গুণমুগ্ধ হয়েই যেনো আশীর্বাদ করেছেন অকাতরে।

ছোটো একখানি কাগজের পাতা, তার উপরেই আঁকা রয়েছে গোটা পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানটুকু।

অমৃতজীবনের চোখ ও তার কল্পনা উড়ে চলেছে বিহঙ্গের উন্মুক্ত ডানাপুটে ভর দিয়ে।

ছোট্ট এই অঞ্চলটুকু, কিন্তু তারই মধ্যে ঐ তো দেখা যাচ্ছে রাইন ও ড্যানিয়ুব, ঐতো টাইরোলীস আল্পস। সেকালে এঁদের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিলো। ঐ তো আরো কতো, কতো দেশ। সাত মহাপর্বতের সহরে পৌঁছবার আগে এই সমস্তের কপালে তার পদধূলি হবে মাখাতেই।

তাকাতে লাগলো সে আবার।

নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী ভারতভূমি—ঐ তো গঙ্গা-তীরবর্ত্তী সেই বিশ্ববিশ্রুত দেশ। ঐ তো ব্যাবিলন, যেখানে নয়নস্পর্ধা তার প্রথম আবিষ্কার করেছিলো তার প্রিয়তমা প্রতিম লক্ষ্মীকে। আর ঐ মারাত্মক স্থানটুকু কুঙ্কুম একখানি বিন্দুর মতন—ঐ তো বসরার গ্রামাঞ্চল—ওখানেই তো তার প্রিয়তমা মিশরের মহীপালকে চুম্বন করেছেন।

দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখতে পারলে না অমৃতজীবন। গড়িয়ে পড়লো অশ্রুবিন্দু তার দুটি গণ্ড বেয়ে।

কিন্তু অস্বীকার করতে পারলে না সে, অতি সত্য কথাই তো বলেছিলো সেই য়্যালবিয়নবাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্র পুরুষটি, যিনি তাকে

উপহার দিয়েছেন জগৎটাকে ক্ষুদ্র একখানি প্রতিকৃতিরূপে। মিথ্যা বলেননি তিনি এক বিন্দু-বিসর্গও। টেমস নদীর তীরবর্ত্তী মানব-সন্তানেরা সহস্র সহস্র গুণ বেশী জ্ঞানী নিশ্চয়ই নীলনদ, ইউফ্রেটিশ গাংগ্যাতীরস্থিত মানব সন্তানদের থেকে।

## ঊনষাট

ব্যাটাভিয়ায় ফিরেছিলো অমৃতজীবন, কিন্তু এদিকে তার মনোত্তমা প্রিয়তমা ফর্মোজাস্তে দু'খানি জাহাজ নিয়ে পূর্ণপাল তুলে গেছিলেন ব্যাবিলনের দিকে।

অমৃতজীবনের জাহাজ আর ব্যাবিলনের সম্রাটকন্যার জাহাজ পরস্পর পাশ কাটিয়েই, ছুঁয়ে গেলো প্রায়। প্রেমিক-যুগল ছিলো পরস্পরের এতো কাছাকাছি। সন্দেহের অবকাশও ছিলো না। আহা, যদি দু'জনেই একথা জানতেন।

কিন্তু নিষ্ঠুর অদৃষ্ট-দেবতা প্রেমিক-যুগলের ভাগ্যে ঘটতে দিলে না তা।

* * * *

ব্যাটাভিয়ার সমতল জলাভূমি-খণ্ডে নেমে বিদ্যুতের মতই ছুটছিলো অমৃতজীবন। সপ্ত মহাপর্ব্বতের নগরীই তা'র লক্ষ্য।

জার্ম্মানিয়ার দক্ষিণ অংশ।

প্রতি দুক্রোশ অন্তর অন্তর দেখা হ'লো তার এক রাজপুত্র ও এক রাজকন্যা, সম্মান-কুমারীর দল এবং ভিক্ষুকদের সংগে। আশ্চর্য্যই লাগলো তার যে-ভাবে অনুরাগগুলি জানালো তাকে অপেক্ষাকারিণী মহিলারা আর সম্মান-কুমারীর দল সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণ-সুলভ বিশ্বাসের সংগে। অমৃতজীবন প্রত্যাখ্যানের সংগেই তার শুধু সায় জানাতে লাগলো।

* * * *

আলেশিয়া। সমুদ্রের ধারে একটি সহর। অদ্ভুত এ সহরটি, এরকম আগে আর সে কখনো দেখেনি। সাগরই এর রাজপথ, বাড়ীগুলো তৈরী সাগরের উপরেই। যে-কয়েকটি সাধারণ চতুষ্ক উদ্যান এই শোভা বর্দ্ধন করছিলো, তাতে পরিপূর্ণ ছিলো স্ত্রীপুরুষের দল।

এরা দুমুখো। এদের একটি মুখ ছিলো প্রকৃতির দেওয়া স্বাভাবিক, অপরটি ছিলো মন্দভাবে রঙ-করা একটি কার্ডবোর্ড। এটা তারা পরতো মাথার উপরেই। গোটা জাতিটাই মনে হচ্ছিলো যেনো প্রেতাত্মা দিয়ে গড়া।

বিদেশীরা এদেশে এলে, একসেট আত্মাকৃতি কিনে নেয়, যেমনটা লোকে কেনে টুপী জুতো অন্য কোথাও গেলে।

অমৃতজীবনের ঘৃণা হলো এই অস্বাভাবিক ফ্যাসানে, সে যেমন ছিলো তেমনই নিজেকে প্রকাশ করলে।

সহরটায় ছিলো বারো হাজার তরুণী রমণী। রাষ্ট্রের প্রকাণ্ড রেজিষ্টারে লেখা ছিলো এদের নাম-ধাম। রাষ্ট্রের পরম-উপকারী ছিলো এরা। খুবই লাভজনক এবং খুবই হৃদয়গ্রাহী ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলো এরা এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত জাতি ধনী হয়েছে যে সমস্ত ব্যবসায়ে, এদের এ ব্যবসায় ছিলো তার মধ্যে নামকরা এবং সর্ব্বপ্রিয়।

সাধারণ বনিকরা প্রাচ্য মহাদেশে বসনভূষণ কতো কী সামগ্রী পাঠাতেন বহু ব্যয় করে এবং অনেক অনেক ঝুঁকি নিয়ে। কিন্তু এই সুশ্রী শুভ্র বণিকেরা, কোনো ঝুঁকি-ভার মাথায় না নিয়েই, তাদের ম'নাভ্রান্তি সৃষ্টিকারী আকর্ষণগুলির চির পুনরুজ্জীবন ব্যবসায় চালাতো।

সকলেই তারা এলো অমৃতজীবনের কাছে। বললে, ভদ্র, বেছে নিন আমাদের মধ্যে আপনার পছন্দ মতন।

অমৃতজীবন কিন্তু গেলো বিদ্যুৎ বেগেই পালিয়ে শতমুখে উচ্চারণ করে ব্যাবিলনের অতুলনীয়া রূপদক্ষা সম্রাটকুমারীর নামটুকু। ব্যবসায়িনীরা শুনলে অমৃতজীবন শপথ করছে অমর অমৃত দেবতাদের নামে, ব্যাবিলনের সম্রাটকন্যা আরো বেশী সুন্দরী সমস্ত বারো হাজার ভিনিশীয় বালিকাদের চেয়েও।

মহামহিমময়ী ভর্ত্রী, প্রলাপোক্তি ভরে চীৎকার করলে সে, সুবিশ্বস্তা হতে শেখাবো তোমায়।

## ষাট

টাইবারের হলুদ রঙের স্রোতোধারা মহামারীময়ী জলাভূমি; বিপাণ্ডুর জনপদবাসী, শীর্ণম্লান, অস্থিচর্ম্মসার এবং সংখ্যায় অত্যল্প, গায়ে পরা শতছিন্ন পুরাতন আলখাল্লা যার ফাঁকে ফাঁকে শুষ্ক বাদামী-রঙের চামড়া দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলো, ভেসে এলো অমৃতজীবনের চোখের সম্মুখে। বুঝতে বাকি রইলো না তার, সে এসে পৌঁছেছে সপ্ত মহাপর্ব্বতীয় নগরী-তোরণে,—সেই নগরী

যার বীরদল এবং বিধিকৃৎগণ ভূমণ্ডলের অধিকাংশ ভাগই এক সময়ে জয় করে সভ্যতার আলোকে করেছে উৎফুল্ল।

* * * *

অমৃতজীবন একটি মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। চমৎকার মন্দির! কিন্তু ব্যাবিলনের মন্দিরগুলোর মত সুরম্য নয়। আশ্চর্য্য হয়ে সে শুনলে, পুরুষেরা গান গাইছে কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বর মেয়েদের মতো।

* * * *

কারণ কী এর? জিজ্ঞেস করলে অমৃতজীবন।

তা'কে বলা হ'লো, পুরুষত্ব হারিয়েছে এরা, যেনো খুব ভালো করে প্রশংসা-সঙ্গীত পেতে পারে বহু বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের, আরো বেশী সুমধুর করে।

আপনি আমাদের কিছু গান শোনান দয়া করে, ভদ্রলোকেরা অনুরোধ জানালেন।

অমৃতজীবন গান গাইল, চমৎকার সুর-তান-লয় সমন্বিত সে সংগীত।

মশাই, চমৎকার সংগীত বাজে আপনার কণ্ঠে। শুধু একটি জিনিষের অসংগতি ছিলো।

কী তা? প্রশ্ন করলে অমৃতজীবন।

...আপনার দাড়ি যদি না থাকতো!

বহু দেশ-দেশান্তরই তো আমি ঘুরেছি, বললে অমৃতজীবন, কিন্তু এ রকম আজগুবে কল্পনাময়তার কথা আর কখনও শুনিনি।

কী সুন্দর ছেলে আপনি, বললে তা'রা আনতি জানিয়ে।

* * * *

উঁকিঝুঁকি-দেওয়া লোকেরাই দেখিয়ে থাকে আগন্তুকদের সহরের দৃশ্যবস্তুগুলি।

চিত্রগুলি দেখলে সে। দুশো বছরের পুরোনো ছবিগুলি। মূর্ত্তিগুলিও দেখলে সে। কুড়ি শতাব্দীরও বেশী পুরাতন খোদাই মূর্তিগুলি মাষ্টার পীস বা অত্যুৎকৃষ্ট কৃতী অবশ্যই।

আজকালও আপনারা অনুরূপবস্তু সৃষ্টি করেন না কী?

না, মহানুভব আর্য্য, বললে উঁকিঝুঁকি দেওয়াদের একজন। পৃথিবীর আর সকলকে অবহেলা করি, এই রত্নগুলি সংরক্ষিত করেছি বলেই তো। আমরা পুরোনো পোষাক-বিক্রেতাদের মতো।

## একষট্টি

রাজপ্রাসাদ। অমৃতজীবন দেখলে, ধূম্র রক্তবস্ত্র পরিহিত মানুষেরা রাষ্ট্র-রাজস্বের অর্থ গণনা করছে। দ্যানিয়ুব তীর থেকে এতো, লয়র থেকে এতো, গোয়াদালকুইভার থেকে এতো, ভিশ্চুলা থেকে এতো।

তোমাদের প্রভু, বললে অমৃতজীবন মানচিত্রখানি আলোচনা করে, গোটা ইয়োরোপ ভূমিটারই অধীশ্বর সেই সপ্ত মহাপর্ব্বতীয় বীরদের মতো?

সকলের উপরেই তাঁর মালিকানা থাকা উচিত দিব্য অধিকার বলে, উত্তর করলে ধূম্রাম্বর-পরা একজন, সত্যই এমন সময় ছিলো এক, যখন তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা পেয়েছিলো জগতের প্রায় অধীশ্বরত্বই। কিন্তু তাদের উত্তরাধিকারীরা বর্ত্তমানে সামান্ত অর্থ পেলেই সন্তুষ্ট, যা রাজারা, তাঁর প্রজাবর্গ, করুরূপে দেন সেবার আদেশ।

আপনাদের প্রভু রাজাদেরো রাজা? উপাধি তাঁর মহারাজ-অধিরাজ? বললে অমৃতজীবন।

না, মহানুভব অত্রশ্রীভবৎ, তাঁর উপাধি ভৃত্যদের ভৃত্য। জাতিতে কৈবর্ত্ত বা মুটে তিনি। সেজন্তই তাঁর সম্মান-প্রতীক হচ্ছে চাবি ও জাল।

আজো তাঁর আদেশ চলে সমস্ত রাজাদের ওপরে। এই তো বেশী দিন আগেকার কথা নয়, কেণ্টভূমির অধীশ্বরকে তিনি পাঠিয়েছিলেন একশো একটি আদেশ। সেই অধীশ্বর সেই আদেশ পালন করেছিলেন।

আপনাদের জেলে মহারাজ অবশ্যই বললো অমৃতজীবন পাঠিয়েছিলেন পাঁচ-ছ হাজার লোক তাঁর সেই একশো একটি অভিলাষ পালন করতে?

মোটেই তা নয়, অত্রশ্রীভবৎ। আমাদের সুপবিত্র প্রভু অতো ঐশ্বর্য্যশালী নন যে দশ হাজার সৈন্ত রাখবেন। তবে চার পাঁচ হাজার দিব্য ভাববাদী ছড়িয়ে রয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন দেশে। এই ভাববাদীদের ভরণ-পোষণের ভার ন্যায্যতঃই জনসাধারণের উপর। ভগবানের নামে এরা ঘোষণা করেন, আমাদের মহারাজ-অধিরাজ তাঁর চাবিকাঠিগুলি খুলতে ও বন্ধ করতে পারেন সর্ব্বপ্রকারের তালা, আর সর্ব্বোপরি, চোর বা অগ্নিরও দুষ্প্রবেশ্য সিন্দুক-সংলগ্ন সবগুলোকেই।

আপনার জানা উচিত, সমস্ত মহাপর্ব্বতের প্রাচীন মানুষটির অজস্র ব্যবর্ত্তক স্বত্ব বা বিশেষাধিকারগুলির একটি হচ্ছে তিনি, সর্ব্বকালেই ন্যায়ে অধিষ্ঠিত; ভুল তাঁর কিছু নেই, তা তিনি কথা বলতে ইচ্ছে করেন বা ইচ্ছে করেন কোনো কিছু লিখতে।

বাস্তবিক অদ্ভুত আপনাদের মহারাজ-অধিরাজ। তাঁর সংগে মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসবার আমার খুব ইচ্ছে।

অত্রশ্রীভবৎ, আপনি রাজা হলেও তাঁর সংগে এক আসনে বসে খেতে পারবেন না। তিনি আপনার জন্য যা করতে পারেন তা হচ্ছে এই। নিজেরই পাশে, তবে আরো ছোটো ও আরো নীচু একখানি টেবিলে বসতে দিতে পারেন তিনি আপনাকে অবশ্যই।

তার সংগে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করতে পারি, যদি কিছু স্বর্ণমুদ্রা পাই।

আনন্দের সংগেই দেবো, বললে অমৃতজীবন।

রক্তাম্বরধারী আনতি জানালে।

কালই সাক্ষাৎ করাবো তাঁর সঙ্গে, বললে সে। তিনবার অবনতজানু হয়ে সপ্ত মহাপর্বতের বৃদ্ধ মানুষটির পদরেণু চুম্বন করবেন।

উচ্চ হাসির গর্জ্জন তুললে অমৃতজীবন। কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিলো তার, পেট চেপে খিলধরা বন্ধ করতে করতে বাসাবাটী ফিরে এলো সে, আরো খানিক দীর্ঘ কাল হেসে হেসে ফেটে পড়তে পড়তে।

* * * *

ডিনারের সময়। সারাদিন ধরে উপসর্পণা করলেন অমৃতজীবনের নগরের সর্ব্বোত্তম সম্ভ্রান্তেরা। অতিনম্র অমৃতজীবন। নম্রাত্মমূর্ত্তিতেই সে বললে, আপনারা আমাকে স্ত্রীলোক বলে মনে করছেন। আমি তা নই। সততার সংগেই আমি আপনাদের ভুল সম্পর্কে সন্দেহ চাই নিরসন করতে।

কিন্তু রক্তাম্বরধারীরা ছিলো একটু বেশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাদের ...তরে দু-তিন জন জোর-জবরদস্তি করতেই অমৃতজীবন তাদের ...নালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

দেবী কর্মোজ্ঞান্তের উদ্দেশে সে কোনো মহান অর্ঘ নিবেদন ...রলে এমন মনে না করেই।

## বাষট্টি

অমৃতজীবন, যতো শীঘ্র পারলে, ত্যাগ করলে জগতের প্রভুদের ...গরীটি, যেখানে বুড়ো মানুষের প্রকাণ্ড পায়ের আগটুকু চুমু খেতে ...য়, যেনো তাঁর গাল আর পা দুটি ছিলো একত্রেই, আর যেখানে ...রুণদের সম্বর্দ্ধনা করা হয় আরো অদ্ভুত অদ্ভুত শিষ্টাচার বা ...ৎসবানুষ্ঠানগুলি দিয়ে।

প্রদেশের পর প্রদেশ পেরিয়ে, সর্বক্ষণ সর্বপ্রকারের প্রলোভন ত্যাগ করে, সর্বদাই ব্যাবিলনের সম্রাট-কন্যার প্রতি সত্যনিষ্ঠ, সর্বদাই মিশরের মহীন্দ্রের প্রতি ক্রোধোন্মত্ত, পাতিব্রত্য ধর্মের এই আদর্শটি এসে পৌঁছে গেলো গলদের নতুন রাজধানীতে। অন্যান্যগুলির মতো, এই সহরটি বর্ব্বরতা, অজ্ঞতা, মূর্খতা এবং দারিদ্র্যের সর্বপ্রকার স্তরের মধ্য দিয়েই হয়েছে অগ্রসর।

মহাকাল সব কিছুরই মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে, পরিবর্তন করেছিলো এই সহরটিকে এমন ভাবেই যে, এর অর্দ্ধেকটা ছিলো খুবই মহান ও আনন্দপ্রদ, বাকি অর্দ্ধেকটি ছিলো খুবই স্থূল, অসংস্কৃত ও হাস্যকর। কর্মবিমুখীরা ভালোবাসতো শুধু খেলতে ও আমোদ আহ্লাদ করতেই। এদের একমাত্র চিন্তা ছিলো সামাজিক আকর্ষণ, আমোদ প্রমোদ ও চাপল্য। কর্মী মানুষদের সংগে এদের পার্থক্য ছিলো শোচনীয়। কর্মী মানুষদের মধ্যে একদল ছিলো গম্ভীর মেজাজী ধর্মান্ধ, অর্দ্ধ অসঙ্গতিপর অর্দ্ধ মৃত্যাত্মক, যাদের মুখচ্ছবি দর্শনেই জগতটা হয়ে পড়তো শোকাচ্ছন্ন, রসাতলগামী, যদি না অন্যদের দল নেচে গেয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিতো তাদের স্ব স্ব গুহাগুলিতেই। এখনো ঠিক পাখীরা সবাই কপিলাভ পেচকগুলিকে ধ্বংসাবশেষগুলির গর্তে গর্তে লুকোতে বাধ্য করেছে।

এই জাতির জীবনে গোটা শতাব্দীই গেছে কেটে, যার অবকাশে সুললিত-কলা-সমূহ এমন এক সর্ব্ব নিখুঁততম স্তরে উঠেছে যা কেউই আশা করতে পারতো না। বিদেশীরা দলে দলে আসতো এদের দেশে, যেমন তারা যেতো ব্যাবিলনে, প্রশংসা করতে মহাস্থাপত্য স্মৃতি-সৌধগুলি, অপূর্ব্ব উদ্যানগুলি, এবং ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কনের সুমোহন কীর্তিকলাপ। মুগ্ধ হতো তারা সংগীত শ্রবণে যা মর্মেই প্রবেশ করতো কান ঝালাপালা না করে।

সত্যিকারের কবিতা অর্থাৎ কবিতা যা স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত, যা হৃদয় ও মন উভয়েরই কাছে, কথা বলে, শুধু জানা ছিলো এই জাতিটিরই, এই শতাব্দীতে। নূতন ধরণের বাগ্মিতা মর্মোদ্ঘাটন করতো সুমহিম সৌন্দর্য্যগুলির। রঙ্গমঞ্চগুলি মুখরিত হ'তো শ্রেষ্ঠনাট্যকীর্তি-কলাপেই যার সমকক্ষ আর কোনো জাতি হতে পারেনি।

কতো কতো লরেল মুকুট, কতো কতো বিজয় সম্মান, যশঃখ্যাতি, যা মেঘলোকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, শীঘ্রই শুকিয়ে পড়েছে পর্য্যবসিত মৃত্তিকায়। বাকি শুধু প'ড়ে রইলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যকই যাদের পাতাগুলি শোভা পায় পাণ্ডুর ও মুমূর্ষু সবুজ।

অবনতি কাল এলো তখনই যখন সৃষ্টি কার্য্যে এলো অনায়াস, আর ভালো করে সৃষ্টি-করণ-লীলায় এলো অবসন্নতা, সুন্দরের পূজায় এলো পরিতৃপ্তি এবং বিস্তৃত কিমাকারের প্রতি এলো রুচিভাব। অন্তঃসারশূন্য প্রীতি রক্ষা করতে লাগলো শিল্পীদের যারা ফিরিয়ে আনতে লাগলো বর্ব্বরতাযুগ; আর ঐ একই অন্তঃসারশূন্য প্রীতি, যোগ্য প্রতিভাধর ব্যক্তিদের উপর উৎপীড়ন করে, বাধ্য করলে তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে; ভীমরুলেরা অধিকৃত করলে মৌমাছিদের।

অমৃতজীবন এসমস্ত কিছুই জানতো না। আর যদি জানতোই, তবে এ ব্যাপার তার পক্ষে খুব কমই হতো কষ্টকর, কারণ তার মস্তিষ্ক পূর্ণ ছিলো শুধু ব্যাবিলনের সম্রাটকন্যা, মিশরের মহীপাল, আর নারীর সর্বপ্রকার কুৎসিত হাবভাবকে ঘৃণা ক'রবার নির্ভেজ প্রতিজ্ঞায়, যে-কোনো দেশেই শোক তার পদক্ষেপ চালিত করে থাকুক না কেনো।

সর্বদাই মানবজাতির স্বাভাবিক কৌতূহলকে জোরজবরদস্তিতে চূড়ান্ত লোকে উত্থাপিত করতে উৎসুক, সমস্ত চঞ্চল অজ্ঞ জনতা, দীর্ঘকাল ধরেই অরণ্যের সৃষ্টি করলো, তার একশৃঙ্গদের চারদিকে।

স্ত্রীলোকেরা আরো বিবেচনাময়ী, জোর ক'রে তার দরজা ভেঙে ঢুকে পড়লো তার মনোরম মূর্তিখানি দেখতে।

## তেষট্টি

সেই সন্ধ্যাবেলা এক ভদ্র মহোদয়া নিমন্ত্রণ করলে অমৃত-জীবনকে। সান্ধ্য ভোজনোৎসবে। নিজ দেশের বাইরেও এই মহিলাটির রস-প্রজ্ঞা ও প্রতিভা ছিলো প্রচারিত আর ইনি, অমৃতজীবন যে সমস্ত দেশ দেখে দেখে বেরিয়েছেন, তার কোনো কোনো দেশ না ঘোরেননি এমন নয়।

মহিলাটি অমৃতজীবনের সম্মতিলাভ করলেন। সম্মতিলাভ করলে এঁর গৃহে যে সমাজটি একত্রিত হয়েছিলো সেটিও।

স্বাধীনতা সেখানে ছিলো দেশকাল-পাত্রোচিত, সভ্য, মর্য্যাদা-সম্পন্ন; আমোদ-আহ্লাদ ছিলো না উদ্দাম, জ্ঞানবিদ্যা ছিলো একঘেয়েমি বিহীন, রস-প্রজ্ঞায় ছিলো না পাণ্ডিত্য বা প্রাক-বিবেচনার স্পর্শ। সৌজন্য শব্দটি যে অর্থশূন্য নয়, অমৃতজীবনের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো তা, যদিও সৌজন্য শব্দটির ভ্রান্ত ব্যবহারই পাওয়া যায়।

পরদিন পুনরায় ভোজনোৎসব। তবে এটা পূর্ব্বের অতিথি-সৎকারিকার গৃহে নয়, বরঞ্চ অন্য এক তেমনই মনোহর আর তার চেয়েও আরো বেশী ইন্দ্রিয়-বিলাসী।

যতোই সে তৃপ্তি পাচ্ছিলো অতিথিদের সঙ্গিতায়, ততোই তারা হচ্ছিলো সংমুগ্ধ। অনুভব করলে সে, তার চিত্ত যেন সুকোমল হয়ে পড়েছিলো, পড়েছিলো বিগলিত হয়ে, যেমন ঔষধি সকল তার স্বদেশের শান্তে-ধীরে গলে যায় মধ্যমোচ্চ আগুনের তাপে এবং বাষ্প হয়ে উবে যায় আনন্দদায়ক সুগন্ধসমূহে।

ডিনারান্তে তারা একে নিয়ে গেলো অপেরায়। সুখপ্রদ অভিনয়,

চমৎকার কবিতা, আনন্দদায়ক সংগীতি, প্রাণের সবগুলি প্রবৃত্তি প্রকাশক নৃত্য এবং নয়ন সংমুগ্ধকর অথচ ভ্রান্তি উৎপাদক দৃশ্যাবলী—এই সমস্তের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ও সমাবেশ আছে অপেরায়।

উপলক্ষ্যটুকু মুগ্ধ-সংমুগ্ধ করলে অমৃতজীবনকে।

একটি তরুণী রমণী বিশেষ ক'রেই মুগ্ধ করলে তাকে সুমধুর কণ্ঠস্বরে এবং তৎসম্পর্কিত লালিত্য-মাধুর্য্যে।

অভিনয় অন্তে অভিনেত্রীটির সংগে পরিচয় করিয়ে দিলে বন্ধুরা অমৃতজীবনের।

অমৃতজীবন উপহার দিলে তাকে এক মুঠি হীরে-জহরৎ। অভিনেত্রীটি এতোই কৃতজ্ঞ-বিনম্রা হ'য়ে পড়েছিলো যে বাকি দিনটুকু সে আর তাকে ছেড়ে যেতে পারছিলো না।

সান্ধ্য-ভোজে যোগ দিলে অমৃতজীবন ওর সংগে।

ভোজনের সময়ে মিতাচার গেলো সে ভুলে। ভোজনের পরে সে ভুলে গেলো সৌন্দর্য্যের প্রতি উদাসীন এবং নগ্ন বিলাস-ব্যসনের প্রতি অপ্রসন্ন হওয়ার প্রতিজ্ঞা। কী দৃষ্টান্ত মানুষের দুর্ব্বলতার!

## চৌর্য্য

ব্যাবিলনের রূপসন্ধা সম্রাটকুমারী ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই এসে হলেন উপনীত। সংগে তাঁর ফিনিক্স বিহঙ্গ, সখী ঈরলা আর তাঁর ছশো গঙ্গাতীরবর্ত্তীয় পরিচারকেরা, নিজ নিজ একশৃংগে চড়ে।

সম্রাট-কন্যাকে অপেক্ষা করতে হলো কিছুক্ষণ; সহরের গেট না খোলা পর্য্যন্ত।

প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের মধ্যে সব চেয়ে রূপবান, দেবতাদের মধ্যে যেমন কার্ত্তিকেয়, বিক্রমে আদিত্য, প্রজ্ঞায় বৃহস্পতিতম এবং বিশ্বস্ততায় শিব, সহরেই আছেন কী, বলতে পারেন?

সহরের ম্যাজিষ্ট্রেটরা বুঝলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সর্ব্বগুণবান অমৃতজীবনের কথাই তো জিজ্ঞেস করছেন?

হাঁ অবশ্যই।

আসুন, আসুন, ব'লে তারা তাঁকে অমৃতজীবনের বাসস্থানে নিয়ে গেলেন।

ব্যাবিলনের সম্রাট-আত্মজা। প্রবেশ করলেন, প্রাণ তাঁর প্রেমে ধুকধুক; তাঁর সর্ব্বচিত্ত, সর্ব্বসত্তা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ, বিশ্বস্ততা ও একনিষ্ঠতার পূর্ণাদর্শ প্রিয়তমকে দেখে অবশেষে।

প্রিয়তমের কক্ষে প্রবেশ করতে তাঁকে কোনো বিবেচনাই বাধা দিতে পারলে না।

পর্দ্দা তোলা হলো।

বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন তিনি। সুপুরুষ অমৃতজীবন এক কৃষ্ণকেশময়ী মানসমোহিনী রমণীর বাহুমূলে আবদ্ধ হ'য়েই নিদ্রা যাচ্ছে।

উভয়েরই খুব বেশী প্রয়োজন ছিলো বিশ্রামের।

শোকে চীৎকার ক'রে উঠলো অসামান্যা ফর্মোজান্তে। তার চীৎকার-ধ্বনি সারা ঘরময় হলো প্রতিধ্বনিত।

কিন্তু সেই শোক-চীৎকার ঘুম ভাঙাতে পারলো না কারুর, না তার জ্ঞাতিভাইয়ের না সেই অপেরা গায়িকার।

মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন তিনি ঈরলার বাহুজালে।

সংবিৎ ফিরে এলো যে মুহূর্ত্তে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি ত্যাগ করলেন সেই মায়াত্মক কক্ষখানি, শোকে ও রাগে। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীরমেশচন্দ্র দে।

# অশ্রুর আয়নায়

### চিত্ত দাস

দুখী তুষার রৌদ্রদ্রবে কাতরাবেই
কুয়াশাবিদ্ধ নির্জনতার স্বপ্নে শোক
নগ্নরীতির আলোকশরেই ব্যর্থ মন
সূর্য্যপুরীর কান্নাশিশির এ বুকে তাই।

প্রণয়ী সেই মানস-দ্বীপের নির্জনতায়
বিগত প্রেমের নির্বাসনের রাত্রি হোক
যন্ত্রণান্তে মুক্তি খোঁজে স্মৃতির ঘর
দিনের দীপে তোমার আলো অমোঘ হোক।

এখনো তোমার স্মরণে সেই রৌদ্রক্ষণ
প্রাণপাথরে কান্না-করুণ চিহ্ন থাক
মৌন-মেঘের স্তব্ধ বুকেই বেদনা নীল
মিথ্যা-মোহের জীর্ণ মলাট ছিন্ন হোক।

রাত্রি-দিনের বৃন্তে তোমার রঙ্গপট
নিত্য কাঁদার শূন্য বুকের গভীরে তাই
আত্মলীনা সুরের রীতি গানেই থাক
—[illegible] গভীরে সেই ব্যর্থ নট।

# চুলের কতখানি  আপনি করছেন?

প্রত্যেকদিন এরাসমিক পারফিউমড কোকোনাট হেয়ার অয়েল ব্যবহার করলে আপনার চুল ঘন এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এরাসমিক একটি বিশুদ্ধ নারিকেল তেল যা চুল ভাল রাখে এবং চুলের শোভা বাড়িয়ে তোলে। আজকেই এক বোতল কিনে পরখ করুন—আপনার মনোমত গোলাপ বা চামেলির সুগন্ধযুক্ত তেল পাবেন।

NOT BUY IF

Erasmic
PERFUMED
COCONUT
HAIR OIL
ROSE

পারফিউমড কোকোনাট
হেয়ার অয়েল

বিশুদ্ধতা
গ্যারাণ্টেড

বেশিক্ষণ
সতেজ থাকে

এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

ECH. 3-X52 BG

চমৎকার কবিতা, আনন্দদায়ক সংগীতি, প্রাণের সবগুলি প্রবৃত্তি প্রকাশক নৃত্য এবং নয়ন সংমুগ্ধকর অথচ ভ্রান্তি উৎপাদক দৃশ্যাবলী— এই সমস্তের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ও সমাবেশ আছে অপেরায়।

উপলক্ষ্যটুকু মুগ্ধ-সংমুগ্ধ করলে অমৃতজীবনকে।

একটি তরুণী রমণী বিশেষ করেই মুগ্ধ করলে তাকে সুমধুর কণ্ঠস্বরে এবং তৎসম্পর্কিত লালিত্য-মাধুর্য্যে।

অভিনয় অন্তে অভিনেত্রীটির সংগে পরিচয় করিয়ে দিলে বন্ধুরা অমৃতজীবনের।

অমৃতজীবন উপহার দিলে তাকে এক মুঠি হীরে-জহরৎ। অভিনেত্রীটি এতোই কৃতজ্ঞ-বিনম্রা হ'য়ে পড়েছিলো যে বাকি দিনটুকু সে আর তাকে ছেড়ে যেতে পারছিলো না।

সান্ধ্য-ভোজে যোগ দিলে অমৃতজীবন ওর সংগে।

ভোজনের সময়ে মিতাচার গেলো সে ভুলে। ভোজনের পরে সে ভুলে গেলো সৌন্দর্য্যের প্রতি উদাসীন এবং নম্র বিলাস-ব্যসনের প্রতি অপ্রসাদ হওয়ার প্রতিজ্ঞা। কী দৃষ্টান্ত মানুষের দুর্ব্বলতার!

## চৌর্য্য

ব্যাবিলনের রূপসজ্জা সম্রাটকুমারী ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই এসে হলেন উপনীত। সংগে তাঁর ফিনিক্স বিহঙ্গ, সখী ঈরলা আর তাঁর তুলো গঙ্গাতীরবর্ত্তীয় পরিচারকেরা, নিজ নিজ একশৃংগে চড়ে।

সম্রাট-কন্যাকে অপেক্ষা করতে হলো কিছুক্ষণ : সহরের গেট না খোলা পর্য্যন্ত।

প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, মানুষের মধ্যে সব চেয়ে রূপবান, দেবতাদের মধ্যে যেমন কার্ত্তিকেয়, বিক্রমে আদিত্য, প্রজ্ঞায় বৃহস্পতিতম এবং বিশ্বস্ততায় শিব, সহরেই আছেন কী, বলতে পারেন?

সহরের ম্যাজিষ্ট্রেটরা বুঝলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সর্ব্বগুণবান অমৃতজীবনের কথাই তো জিজ্ঞেস করছেন?

হাঁ অবশ্যই।

আসুন, আসুন, ব'লে তারা তাঁকে অমৃতজীবনের বাসস্থানে নিয়ে গেলেন।

ব্যাবিলনের সম্রাট-আত্মজা। প্রবেশ করলেন, প্রাণ তাঁর প্রেমে ধুকধুক; তাঁর সর্ব্বচিত্ত, সর্ব্বসত্ত্বা এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ, বিশ্বস্ততা ও একনিষ্ঠতার পূর্ণাদর্শ প্রিয়তমকে দেখে অবশেষে।

প্রিয়তমের কক্ষে প্রবেশ করতে তাঁকে কোনো বিবেচনাই বাধা দিতে পারলে না।

পর্দ্দা তোলা হলো।

বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন তিনি। সুপুরুষ অমৃতজীবন এক কৃষ্ণকেশময়ী মানসমোহিনী রমণীর বাহুমূলে আবদ্ধ হ'য়েই নিদ্রা যাচ্ছে।

উভয়েরই খুব বেশী প্রয়োজন ছিলো বিশ্রামের।

শোকে চীৎকার ক'রে উঠলো অসামান্যা ফর্মোজান্তে। তার চীৎকার-ধ্বনি সারা ঘরময় হলো প্রতিধ্বনিত।

কিন্তু সেই শোক-চীৎকার ঘুম ভাঙাতে পারলো না কারুর, না তার জ্ঞাতিভাইয়ের না সেই অপেরা গায়িকার।

মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন তিনি ঈরলার বাহুজালে।

সংবিৎ ফিরে এলো যে মুহূর্ত্তে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি ত্যাগ করলেন সেই মারাত্মক কক্ষখানি, শোকে ও রাগে। [ ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীরমেশচন্দ্র দে।

# অশ্রুর আয়নায়

### চিত্ত দাস

তন্বী তুষার রৌদ্রজ্বরে কাতরাবেই
কুয়াশাবিদ্ধ নির্জনতার স্বপ্নে শোক
নগ্নরীতির আলোকশরেই ব্যর্থ মন
স্বর্ণসূরীর কান্নাশিশির এ বুকে তাই।

প্রণয়ী সেই মানস-দ্বীপের নির্জনতায়
বিগত প্রেমের নির্বাসনের রাত্রি হোক
যন্ত্রণাতে মুক্তি খোঁজে স্মৃতির ঘর
দিনের দীপে তোমার আলো অমোঘ হোক।

এখনো তোমার স্মরণে সেই রৌদ্রক্ষণ
প্রাণপাথরে কান্না-করুণ চিহ্ন থাক
মৌন-মেঘের স্তব্ধ বুকেই বেদনা নীল
মিথ্যা-মোহের জীর্ণ মলাট ছিন্ন হোক।

রাত্রি-দিনের বৃন্তে তোমার রঙ্গপট
নিত্য কাঁদার শূন্য বুকের গভীরে তাই
আত্মলীনা সুরের রীতি গানেই থাক

# চুলের কতখানি যত্ন আপনি করছেন?

এরাসমিক কোং লিঃ লণ্ডন এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

সাত্যকি

৮

এক রাশ বাজার করে এল সুদাস।

মাছ আর আনাজের বহর দেখে যে-কোন লোকের মনে হবে যে কোন উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম কাউকে নিমন্ত্রণ করেছি কি না। অনেক চেষ্টা করেও মনে পড়ল না। সুদাস চায়ের পেয়ালা হাতে করে এসে আমার পাশে বসল। ঠোঁটের কোণে হাসি। মজা দেখছে।

অস্থির হয়ে বললুম, কা'কে নিমন্ত্রণ করেছো?

নির্বিকারচিত্তে সুদাস বলল, বিশেষ কাউকে না। কলকাতা থেকে দু'জন ভদ্রলোক আসছেন এখানে, তাই।

—কে তাঁরা?

—আমার মহাজন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। খুব ভাবনা হয়েছিল যা হোক। অতিথির অতিথি। অতএব প্রসন্ন হতে বেশ সময় লাগলো।

দুপুরবেলা সত্যি-সত্যি দুজন ভদ্রলোক এসে হাজির। আদর করে বসান গেল। সাধারণ আলাপ-পরিচয় হবার পর তাঁরা কানাইকে দেখতে চাইলেন। বেশ অবাক হয়ে আমি সুদাসের মুখের দিকে তাকাতেই সুদাস বলে উঠল, আপনারা অনুগ্রহ করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি ডেকে আনছি।

কানাইকে এঁরা চিনলেন কী করে?

সাধারণত কানাই আর আমার একই মহাজন আর ব্যাপারী নিয়ে কারবার। ওর আলাদা কোন পরিচিত মহাজন আছে জানতুম না। যদি তেমন কেউ থাকত তবে কী এতদিনে তাকে জানবার সৌভাগ্য আমার হত না? না। ব্যাপারটা বড় গোলমেলে ঠেকছে। কে এরা? কানাইকে দেখতে চায় কেন? সন্দেহ হল। সুদাস কোন চাল চালেনি তো?

সুদাস আর কানাই এল।

—এরই নাম কানাই। সুদাস পরিচয় করিয়ে দিলো। কলকাতা থেকে এঁরা এসেছেন তোমাদের সঙ্গে আলাপ করতে। ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা সম্বন্ধে এঁদের খুব আগ্রহ।

—ও! নমস্কার। কানাই হাত তুলে নমস্কার করল।

বোঝা গেল কানাই এঁদের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। এখন পরিচিত হল।

ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায় এঁদের আগ্রহ স্বাভাবিক। মহাজনদের মাল চেনা-শোনা লোক বহন করুক, এটা সবাই চায়। ওরাও চাইবেন, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? কিন্তু এতক্ষণ সে কথা হয়নি কেন? আমাকে অন্তত কিছুটা আভাস দিতেও পারত সুদাস। যাকগে। হয়তো খেয়াল করেনি। হয়তো ভেবেছিল আমাদের দুজনের উপস্থিতিতেই কথাটা জমবে ভাল।

আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের চা নিয়ে আসছি। সুদাস বাড়ির ভিতর চা আনতে গেল।

বুঝলেন, আজ-কাল লোক চেনা বড় মুশকিল হয়ে পড়েছে, ভদ্রলোকদের একজন বলতে শুরু করলেন, আমাদের অনেক দিনের জানাশোনা লরীওয়ালারাও ঘাটতি ফেলে দিচ্ছে।

বোধ হয়, রেটে পোষাচ্ছে না। আমি যোগ দিলুম।

না না। দর-দস্তুর ঠিকই আছে। তেলের দাম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রেটও বেড়ে গেছে। সে তো আপনারা ভালভাবেই জানেন। ব্যাপারটা হচ্ছে কি জানেন? স্বভাব। এক একজনের স্বভাব এমন বদলে যায়।

সবার স্বভাবই বদলে যায় কি না জানি না। তবে মাতাল আর জুয়াড়ীরা সহজ আর সস্তা পয়সার লোভ ছাড়তে পারে না। বোমা মেরে সরু ফুটো করে বস্তায়। তারপর ধীরে ধীরে পাচার করে মাল। কোন একটা বস্তা থেকে বেশী নেয় না। ধরা পড়বার সম্ভাবনা। তবে দু-দশটা বস্তা থেকে কিছু কিছু নিলেই কাজ চলে যায়।

সুদাস ভদ্রলোকদের চা এনে দিল।

—বাড়িতে ছেলেপুলের আওয়াজ শুনছি না যে? আচমকা প্রশ্ন করলেন একজন।

সুদাস তাড়াতাড়ি যোগ দিল, আজ্ঞে এরা কাচ্চা-বাচ্চা পছন্দ করে না।

গম্ভীর ভাবে ভদ্রলোকদের একজন বললেন, কানাই বাবু! আপনি বিবাহ করেন 'নি? 'বিবাহ' শব্দ শুনে কানাই প্রথমে চমকে গেল। তার পর বিরক্ত হল। কপালের রেখাগুলি মিলিয়ে যাবার পর কানাই বলল, আজ্ঞে, ইচ্ছে হয়নি।

—কি যে বলেন! বয়েস কালে মাথার ওপর কেউ দেখবার না থাকলে মন বিষিয়ে যায়। সমাজের বাঁধন ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। তাই তো হামেশাই ছেলেমেয়েরা খারাপ পথ বেছে নিচ্ছে।

বক্তৃতার তোড় সুদাস থামিয়ে দিল, আজ্ঞে. আপনারা যদি অনুগ্রহ করে স্নানাহার সারবার পর কথাবার্তা বলেন, তবে বড় ভাল হয়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্নানের উদ্যোগ করতে ওঁরা উঠে পড়লেন।

একলা পেয়ে সুদাসকে গম্ভীর ভাবে বললাম, সুদাস, মনে মনে কি ঠিক করে রেখেছ বল?

সুদাস হাসল।

—শুধু হাসলেই চলবে না। ব্যাপারটা খোলসা করে বল? একটু রাগত স্বরে বললুম।

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সময়ে সবই জানতে পারবে। সুদাস আশ্বাস দিল।

—আমি এক্ষুণি জানতে চাই।

—নেহাতই শুনবে?

—নিশ্চয়ই।

—আমি কানাই-এর জন্যে মেয়ে দেখেছি। এঁরা পাত্রীপক্ষ। কানাইকে দেখতে এসেছেন।

আমি আহত হলুম। আমার বন্ধু, ঘনিষ্ঠ বন্ধু কানাই-এর জন্যে মেয়ে-দেখা হচ্ছে, আমার অগোচরে। আমি জানতে পারলুম না কেন? আমি কি চাই না কানাই বিয়ে করুক? সুদাস আমায় অবিশ্বাস করে? কেন?

আচ্ছা, সুদাসের গরজটা কি? ওর এত উৎসাহ কেন? কি লাভ হবে ওর?

ভাবতে ভাবতে মুখে নিশ্চয়ই অপ্রসন্নতার ছাপ ফুটে উঠেছিল। সুদাস পড়তে ভুল করল না মোটেই।

—ভাবছ, তোমার সঙ্গে অন্তত পরামর্শ করিনি কেন? সুদাস প্রশ্ন করল।

আমাকে নিরুত্তর দেখে আবার সুরু করল সুদাস—আমি জানি, কানাই তোমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু। তুমি ওর কাছে কিছুই গোপন কর না, করতে চাও না। আর তার জন্যেই আমি তোমাকে আগে থেকে কোন কথা বলিনি। কানাইকে আমি চিনে ফেলেছি। ওর বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে শুনতে পেলে আমাকে এতক্ষণ বাড়ি থেকে বার করে দিত। এখনও ও কিছু বুঝতে পারেনি। এখন তোমার ওপোর আমার সমস্ত কিছু প্ল্যান নির্ভর করছে।

বিস্মিত হয়ে বললুম, আমার ওপোর?

ঘাড় নেড়ে সায় দিল সুদাস।

—যেমন?

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে সুদাস বলল, আজ তুমি গাড়ী নিয়ে কলকাতায় কানাইকে যেতে দাও। আমরাও সঙ্গে যাবো। মাল আমারই যাবে। মেয়ে দেখিয়ে ওকে কাল ফেরত দিয়ে যাবো। সব দায়িত্ব আমার।

—দায়িত্ব? রেগে ফেটে পড়লাম। তুমি আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে আস কেন?

—রাগ করো না, নয়ন। বিশ্বাস করো, আমার কোন অন্যায় অভিসন্ধি নেই। আমি শুধু ওর উপকার করতেই চেয়েছি, আর কিছু নয়।

অতি কষ্টে রাগ সামলাতে হোল।

কানাই গাড়ী নিয়ে চলে গেল। সঙ্গে গেল সুদাস আর সেই দুজন ভদ্রলোক। পাত্রীপক্ষ। অসন্তোষ জমে উঠল। অথচ এ যে অকারণ, তা জানি। মনের ওপর আমার কোন দখল নেই।

সত্যি তো কানাই-এর বিয়ে দেওয়া আমারই উচিত ছিল। নিজে করিনি বলে, আর কেউ করবে না সেটা কি করে হয়? আমার ভুল অন্য কেউ দেখিয়ে দিয়েছে বলেই রাগ হচ্ছে। অন্যায়।

হাল্কা বোধ করলুম। মনঃকষ্ট যুক্তির নিক্তিতে যাচাই করে দেখতে দেখতে বুঝতে পারলুম জীবনের গতি পরিবর্তিত হতে যাচ্ছে। অতএব সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। হঠাৎ কোন দারুণ সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে মন যেমন ছটফট করতে থাকে, কি-যেন-করতে-ইচ্ছে-হওয়া পেয়ে বসে অথচ মনে আসে না, এও তেমনি।

মাথার চুলের ফাঁকে ফাঁকে আঙুল বুলুচ্ছে পামা। আগে বুঝিনি। হঠাৎ খেয়াল হল। ধরে এনে পাশে বসালুম।

—কথা বলোনি যে? আমি অভিযোগ করলুম।

—কার সঙ্গে বলব? পাল্টা প্রশ্ন করল পামা।

—আমি ছাড়া এখানে আর কে আছে?

—বিপদ তো সেখানেই।

—মানে?

—মানে তুমি তো ছিলে ধ্যানমগ্ন। মুনি-ঋষির ধ্যান ভাঙ্গিয়ে অভিশাপ মাথা পেতে নিতে পারব না গো!

এত সুন্দর, এত সহজ করে পামা কথা বলল যে আমি ভুলেই

গেলুম, আমি খানিক আগেও সবার ওপোর রাগ করেছিলুম। পামা আমায় আদর করতে বসল।

নাক দিয়ে ঘাড়ের কাছে সুড়সুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ পামা বলে ফেলল, এই, ঠাকুরপোর নাকি বিয়ে?

বিস্মিত হয়ে বললুম, তুমি কি করে জানলে?

—বা রে, এ আবার জানতে হয় নাকি?

—জানতে হয় না?

—মেয়েরা সহজেই এটা বুঝতে পারে, হাঁদারাম!

বিয়েটা তাহলে মেয়েদের অধিকারভুক্ত। না হলে ওরা সহজেই বুঝতে পারে কি করে? আমি কত পরে কত যুক্তি দিয়ে যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলুম, পামা মেয়েদের স্বাভাবিক অনুভূতি দিয়ে অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেল! ভীষণ হিংসে হল ওর অনায়াসে সব বুঝে ফেলাতে। ওকে রাগাবার একটা বাসনা পেয়ে বসল আমাকে।

—এই জান, আমি হঠাৎ গম্ভীর ভাবে থেমে থেমে আরম্ভ করলুম, আমিও বিয়ে করব ভাবছি।

হেসে গড়িয়ে পড়ল পামা। আমার মাথার চুল একমুঠো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, বেশ তো। তার জন্যে এত কষ্ট করে ভূমিকা তৈরী করতে হবে না। কবে করবে? কা'কে করবে?

তাইতো। কা'কে বিয়ে করবো?

খেলার ছলে যে-কথা বলে পামাকে রাগাবো ঠিক করেছিলাম, সে কথার বেড়াজালে আমিই আটকে যাবো ভাবিনি। কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললুম, আহা, তুমি যেন জান না?

—তুমি না বললে জানবো কি করে?

—বা রে, এইমাত্র যে বললে, তোমরা বুঝতে পার?

একটুও অপ্রতিভ হলো না পামা। হাসি-ছড়ানো ঠোঁট দুটো খুলে গেল, স্বাভাবিক ভাবপ্রবণতার ওপোর অন্যায় জুলুম চালাচ্ছ গো! আমি তো ভবিষ্যৎ দেখতে জানি না। বর্তমান ঘটনার ধারা বিচার করে বড় জোর কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। জানি না সেটা ভুল কি নির্ভুল।

বোম্বাই আমগাছটার মাথায় বাসা বেঁধেছে একটা কাক। কিছু কাঠকুটো দিয়ে রাত কাটাবার একটা আস্তানা। ওরা নাকি স্ত্রীকাকের ডিম পাড়বার আগে বাসা বাঁধার জন্যে ছটফট করে। একটা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। খোলা আকাশের নীচে সে বাসা কতটুকু বা নিরাপদ।

তা হলে বোঝা যাচ্ছে, স্থায়িত্বের প্রতি আকর্ষণ একটা মানসিক বিকার। যদি মনে মনে খুশী হই তবেই কোন জিনিষ তার ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের মন জয় করে।

মানুষের মন সত্যিই কি বিচিত্র! পারিপার্শ্বিক চাপে পড়ে মনের রঙ বদলায়। আদর্শের রূপ বদলায়, রুচির চেকনাই যায় মরে। পামার অতীত জানি না। জানতে ইচ্ছে করে কোন এক আবেগভরা মুহূর্তে। তার পরেই মনে হয়, না-জানাই হয়তো ভালো। যে-ব্যথা ও মনের এক নিভৃততম কোণে বয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে সদরে জোর করে টেনে এনে ওকে ব্যথা না হয় না-ই দিলুম। ওর ভরা সংসার গেছে হয়তো, কিন্তু বাঁচবার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। নিষ্ঠুর হতে মন চায় না!

পামাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলুম অনেক আগেই। কিন্তু সে প্রস্তাব কান্না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। ওর আর আমার মাঝে ব্যবধান শুধু সংস্কারের। প্রয়োজনকে অস্বীকার করার স্পর্ধা ওর নেই। যেমন নেই সামাজিক সংস্কারকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া।

এমন কতকগুলি জিনিষ মানুষ একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে যে, তাকে নিয়ে উপহাস করা চলে না। বিশ্বাসের ওপোর আঘাত দেওয়া অমানুষিক বর্বরতা। তাই সযত্নে পামার কাছে পারতপক্ষে বিয়ের প্রসঙ্গ আমি আর উত্থাপন করি না। কিন্তু আজ যে কী ছেলেমানুষিতে আমায় পেয়ে বসেছে!

—বাদ দাও সব। আমার দিকে পামাকে আকর্ষণ করে বলি, রবি ঠাকুরের একটা গান শোনাও।

খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠল পামা।

—কোনটে গাইব। উত্তর চাইল না পামা। খানিকক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে রইল। তারপর গুন্‌গুন্‌ করে শুরু করল।

কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজি—

৯

কানাই ফিরে আসতেই পামা তাকে নিয়ে পড়ল। বাচ্চারা খুশী হয়ে যেমন ভাললাগা আপন জনের হাত ধরে টানতে থাকে তেমনি পামা কানাইকে হাত ধরে এনে বসাল। তারপর এক গ্লাস মিছরির জল এনে সামনে ধরল।

—নাও, ঠাকুরপো!

কানাই পামার চপলতার সঙ্গে পরিচিত বলেই মিছরির জলটুকু সব খেয়ে ফেলল। কোন কথা বলল না।

—এবার বলো। ষ্টিয়ারিং ধরতে কেমন লাগছে? পামা খুশীতে ঝলমল করে উঠল।

বিস্মিত হয়ে কানাই জিজ্ঞাসা করল—মানে?

—আহা, লজ্জা কেন বাপু? বলেই ফেল না।

কৌতূহল মেয়েদের স্বাভাবিক দুর্বলতা। কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে ওদের জোড়া আর নেই। পামার পীড়াপীড়িতে কানাই সব কথাই খুলে বলতে বাধ্য হল। তবে বলার ভঙ্গী দেখে মনে হলো, কানাই এতে খুব উৎসাহবোধ করছে না। সবটাই ওর কাছে ষড়যন্ত্র মনে হচ্ছে। আর সেজন্যেই ওর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

খানিকক্ষণ সবাই আমরা গুম হয়ে বসে রইলুম।

আমি বুঝতে পারছি বিচ্ছেদ—আমার আর কানাই-এর একসঙ্গে থাকার ছেদ আসন্ন। যা অবশ্যম্ভাবী তা থেকে কোন দুঃখ পাওয়া আমার স্বভাবে নেই। আজ কানাই মেয়ে পছন্দ করতে পারল না, মেয়েটির হয়তো কোন দোষ নয়—কাল সে যে একজনকে পছন্দ করবে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না। মানুষের যে ইচ্ছা সুপ্ত থাকে, তাকে জাগিয়ে দিলে সে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবেই। কানাই কোন ব্যতিক্রম নয়। অন্যায় কোন দেহজ কামনা ওর ছিল না। মেয়েদের প্রতি কখনো অর্থপূর্ণ দৃষ্টিও সে নিক্ষেপ করেনি এখন যে কোন মুহূর্তে মদন-শরবিদ্ধ হতে পারে।

হুড়মুড় করে সুদাস ঘরে ঢুকল। হাতে শালপাতায় ঠোঙা মাংস। মুরগীর ঠ্যাং বেরিয়ে আছে।

—নাও, বৌদি ! জলদি করো। আজ আবার ম্যাটিনি গ্রাম। সুদাস একাই বলে গেল।

যন্ত্রচালিতের মতো সুদাসের হাত থেকে মাংসের ঠোঙা নিয়ে মা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

—বোবা বনে গেল কেন সব ? সুদাস আবার শুরু করল।

—ম্যাটিনি প্রোগ্রাম মানে ? কানাই জানতে চাইল।

—মানে কাঁচরাপাড়ায় একটা ভাল ছবি এসেছে। আর ামরা সবাই দেখতে যাবো।

—আর কাজ করবে কে ? কানাই কৈফিয়ৎ চাইল।

—কাজ তো রোজই আছে। আর তা ছাড়া আজও নীলাঞ্জনার ার্ভিসের দিন। সার্ভিস ষ্টেশনে ওকে রেখে এলে না ?

—সে তো সন্ধ্যের অনেক আগেই হয়ে যাবে।

—আর ছবিও সন্ধ্যের অনেক আগেই ভাঙবে। অতএব মা ভৈঃ। দাস আড়মোড়া ভেঙে আমার দিকে চেয়ে বলল, জানো নয়ন, আজ তামাদের এমন জায়গায় নিয়ে যাবো, যেখানে এর আগে তোমরা খনো যাওনি।

হেসে আমি বললুম, সে তো অনেক জায়গায় যাইনি।

একটু ভেবে সুদাস বলল, থাক। এখন বলবো না। একেবারে নয়ে গিয়ে চমকে দোব।

সত্যি সত্যি সুদাস একেবারে চমকে দিল।

"মহাকালী স্পোর্টিং ক্লাবে"র সামনে দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে গেলুম। খেলাধূলার পাট চুকেছে বেশ কয়েক বছর। একটু-আধটু ফুটবল যে না খেলেছি, তা নয়। কিন্তু সে বলে লাথি মারাই। ন্ত কিছু নয়। বড় খেলোয়াড় হবার বাসনা কোন দিনই ছিল না, হইওনি। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে কৃতী খেলোয়াড়ের ছাপা ছবি দেখেছি। নাম ভুলে গেছি। যেমন ভুলে গেছে আরো পাঁচ জন। তবু এই মহাকালী স্পোর্টিং ক্লাবে রাত সাড়ে আটটায় এসে কী এমন হাত-পা বেরুবে, বুঝতে পারলুম না।

গেটের দরজা বন্ধ। বাইরে দু'জন ভদ্রলোক সিগারেট খাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সুদাস গিয়ে কানে কানে কী ফিসফাস করল। একজন দরজায় বিচিত্র ধাক্কা মারলো। ফোকর খুলে গেল দরজায়। দুটো চোখ দেখতে পেলুম বাইরে থেকে।

—পাস। গম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ হলো।

আমরা তিন জন—আমি, কানাই আর সুদাস ঘরের ভিতর ঢুকলুম।

ঘরে ঢুকেই দেখলুম, কেমন যেন ভয়-ভয় ভাব সকলের চোখে। ক্লাবে কেবলমাত্র ক্লাবের সভ্য আর সভ্যদের বন্ধুদের প্রবেশাধিকার। বাইরের লোক প্রবেশ করতে পায় না। অথচ এরা এমন করে তাকিয়ে কেন ?

—আরে সুদাস বাবু যে ! যান ওপোরে যান।

ঘরের বাঁ দিকে একটা সিঁড়ি লক্ষ্য করলুম। বেঞ্চের তিন জন পাহারাদার বা [illegible] আমি আর কানাই অপরিচিত। সুদাস বলল, এরা আমার বন্ধু। নতুন এ লাইনে।

সিঁড়ি দিয়ে ওপোরে এলুম। নীচের ঘর স্বল্পালোকিত। কিন্তু ওপোরে আসতেই জোরালো বাতির রোশনাইতে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সাজান-গোছান বেশ লম্বা হল-ঘর। সোফা সেটি আর টিপয়ের ছড়াছড়ি। গুটিকয়েক লোক আরাম করে বসে রেডিয়ো শুনছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকে সিগারেট খেতে খেতে গল্প করছে।

দেয়ালে দেয়ালে আয়না আর ছবির সমারোহ। পিয়ানো, তবলা, গীটার, হারমোনিয়াম, পিয়ানো এ্যাকর্ডিয়ন আর বেহালার বিপুল সম্ভার। নাটক রিহার্সাল হবার উপযুক্ত জায়গা।

ঘরের আরেক দিকে বিলিয়ার্ড টেবিলের মতো বড় একটা টেবিল আর ঠিক তার উত্তরে একটা মাঝারি সাইজের বোর্ড। বোর্ডটি দেখবার মতো। এক থেকে শূন্য পর্যন্ত পর পর সংখ্যা লেখা আছে।

আমরা বসতে না বসতেই আদ্দির পাঞ্জাবীপরা গৌরবর্ণের এক ভদ্রলোক এলেন। কপালে তাঁর সিঁদুরের বড় টিপ। গলায় ফুলের মালা। ঘরে ঢুকেই তিনি কারো দিকে না তাকিয়ে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে বোর্ড লক্ষ্য করে বার বার তিন বার মাথা নীচু করে প্রণাম করলেন। দেখাদেখি অনেকেই তাই করলো।

প্রণামান্তে তিনি প্রসন্নমুখে উপস্থিত সবার সঙ্গে প্রসাদ দিতে দিতে আলাপ করতে লাগলেন।

কিসের প্রসাদ জিজ্ঞাসা করাতে সুদাস জানালো যে, রোজ খেলা আরম্ভ করার আগে মালিক মা-কালীর পুজো করে থাকেন। তারপর নিজে হাতে তিনি উপস্থিত সভ্যদের প্রসাদ বণ্টন করেন। এই হলো নিয়ম।

—কিসের খেলা, সুদাস ? আমি চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করলুম।

বিজ্ঞের হাসি হেসে সুদাস বললো, দেখতেই পাবে।

আমাদের কাছে মালিক আসতেই সুদাস পড়লো।

মালিক আমাদের দিকে তাকিয়ে সুদাসকে হেসে বললেন, এঁরা আপনার বন্ধু বুঝি ?

হ্যাঁ। এর নাম নয়ন আর এর নাম কানাই। আর ইনি হচ্ছেন মহাকালী স্পোর্টিং ক্লাবের মালিক জ্ঞান বাবু।

জ্ঞান বাবু আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, খেলবেন তো?

আমরা উত্তর দেবার আগেই সুদাস বললো, নিশ্চয় নিশ্চয়। খেলবে বৈ কি। আর সে জন্যেই তো আসা।

রেডিয়োতে তখন গান চলছিল—'ওরে খেলা-ভাঙ্গার খেলবে যদি আয়—'

সকলের দেখাদেখি আমরাও টাকা দিয়ে কাগজের চাকতি কিনলুম। কাগজের চাকতি টাকার বদলে হিসাব করতে সুবিধা তাই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এটা একটা জুয়ার আড্ডা। পয়সা থাকলেই এর সভ্য হওয়া যায়।

শুনতে পেলুম এখানে প্রফেসর, হেড-ক্লার্ক, ব্যবসায়ী, আর রিক্সাওয়ালার সমান অধিকার। সবাই আসেন। কেউ কারো ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলেন না; আবার গায়ে পড়ে কোন কথাও বলেন না। স্বাতন্ত্র্যবোধ যেমন আছে, তেমনি আছে সৌজন্যবোধ। কাজেই পারস্পরিক বোঝাপড়ায় কখনো কোন ভুল হয় না।

জ্ঞান বাবুর হাতে দশটা তীর। প্রথম তীর তিনি বোর্ডের দিকে ছুঁড়লেন। জুয়া শুরু হয়ে গেল।

ডার্ট ক্লাব থেকে বেরুতে বেরুতে রাত এগারটা বেজে গেল। রাস্তায় সুদাস জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল? আমি বললুম, জেলে যাবার রাস্তা খুব পরিষ্কার।

—জানো সব বন্দোবস্ত করা আছে?

—তা হলেও, ন' মাসে ছ' মাসে যে হামলা হয় না তার প্রমাণ আছে?

—সে তো হবেই। কানাই বলল, সেটা একটা দুর্ঘটনা বলে ধরে নাও।

দুর্ঘটনা!

দুর্ঘটনা বললেই আমার মনে পড়ে সেদিনের কথা। আমি আজো ভুলিনি। ভুলতে পারি না। কত সহজে মানুষ বিচার বিবেচনা হারিয়ে ফেলে। শিক্ষা-সভ্যতার বড়াই কত অসার মনে হয়।

নিউ আলিপুর দিয়ে সাঁপুরের সরকারী গুদামের দিকে যাচ্ছিলুম মাল তুলতে।

সকালবেলা। ঝকঝকে রোদ্দুর। নতুন কাঁকা রাস্তা। আমাদের গাড়ীর আগে আগে আরেকটা লরী যাচ্ছিল। গাড়ীর বেগ তেমন ছিল না।

হঠাৎ একটা ছেলে বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরুল। আর পড়বি তো পড় সামনের লরীর তলায়। ছেলেটি নিশ্চয়ই কারুর তাড়া খেয়ে বেরিয়েছিল। বেগ সামলাতে পারেনি। যেমন পারেনি লরী-ড্রাইভার। প্রাণপণ ব্রেক কষা সত্ত্বেও নিমেষের মধ্যে ছেলেটির মাথা গুঁড়িয়ে গেল। রক্তগঙ্গা লরীর তলায়।

—আমি তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে খানিকটা দূরে নীলাঞ্জনাকে দাঁড় করিয়ে ফিরে এলুম। ইতিমধ্যে ছোটখাটো একটা ভীড় জমে গেছে।

লরীচালক হতভম্বের মত অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে। যে দোষ সে স্বেচ্ছায় করেনি, সে দোষের জন্যে সে শাস্তি নিতে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে।

অশ্রাব্য গাল-মন্দ চলছে। বাড়ীর মেয়েরা চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল।

হঠাৎ একটি যুবক আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এল, হাতে তার একটা থান ইট। লরীচালকের জামার কলার ধরে হিড়-হিড় করে টেনে এনে রাস্তার ওপোর দাঁড় করিয়ে ইট দিয়ে তার মাথায় মারতে লাগল।

বাধা পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল জনসাধারণ। তারপর রক্ত দিয়ে রক্তের শোধ নিল মৃত ছেলেটির শোকান্ধ আত্মীয়। দুটি মৃত দেহ পড়ে রইল। একটি মৃত্যু অসাবধানতায় ঘটল আর একটি শোকের অসহ্য আবেগে।

হঠাৎ দেখি রাস্তা কাঁকা। পুলিশ আসছে। দুর্ঘটনা।

অনেক দেখেছি। আরো হয়তো অনেক দেখবো জীবনে। কিন্তু নিষ্ঠুর, একটি অমানুষিক হত্যা আরেক বার দেখবো কি না জানি না!

[ ক্রমশঃ।

# জিজ্ঞাসা

## বুদ্ধদেব গুহ

অবসন্ন দিনের আলোয় তোমাকেই বার বার মনে পড়ে:
তরঙ্গ-মুখর দিন শান্ত হ'য়ে এলে এই বিকেলের তীরে
জীবনের ছন্দবেগ ধীরে নেমে আসে তোমাকে স্মরণ ক'রে।
সীমাহীন জগত কিনারে—
তখন একটি মন উন্মুখ থাকে
সুখ ভুলে যায়, দুঃখ ঢেকে রাখে
স্মৃতির মুকুরে যার প্রতিভাস দেখে
তুমি সেই মহীয়সী।
স্মৃতিস্নিগ্ধ দিনগুলি কেন ভালবাসি
ভেবে মনে মনে
চোখ জলে ভরে, দীর্ঘনিশ্বাস শুনি দেওয়ালে বনে,
সারা দিন আকাশেতে ঘুরে-ঘুরে যে পাখির ক্লান্ত পাখাটানা
সেই যেন বলে যায়—
কোন দিন তুমি আর ফিরে আসবে না।

তবু আমি খুঁজে ফিরি, তবু পথ হাঁটি
বেদনার ছবি হ'য়ে জেগে থাকে এই ধুলোমাটি
পথ-হাঁটা শেষ হ'লে অবসন্ন দিনে
অচঞ্চল প্রদীপের শিখার মত
প্রার্থনা শুধু এক প্রশ্ন হয়ে জেগে থাকে হৃদয়ে আমার
'কখন কি জলে ওঠা বিকেলের রঙে
আমার কথাটি মনে পড়েনি তোমার?'
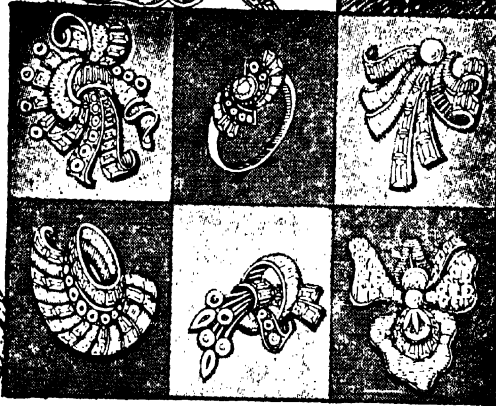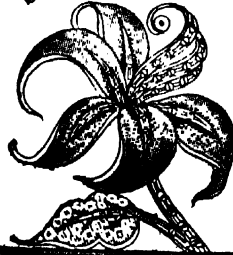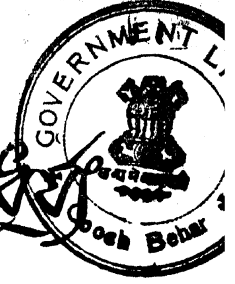
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস্
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-২৯ ফোন-৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ
B.B.
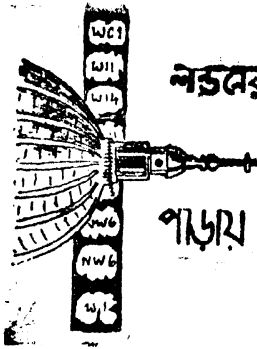
[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## হিমানীশ গোস্বামী

Certainly today, with the veterinarian's bill often exceeding the pediatrician's, with canine Psychiatrists, with dog sitters, with vitamin enriched canned dog food, with quilted coats and fur lined booties, with rubberfoam mattresses, boarding houses, schools of etiquette and even orphanages, a dog's life can no longer serve as the trope of wretchedness and all phrases that so imply must be discarded as cliches.

—কুকুরের জীবন-যাপন সম্পর্কে আধুনিক বক্তব্য।

কুকুরপ্রিয়তা ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র—আবার এই কুকুরদের বিরুদ্ধে পুলিশ সর্বদা খড়গহস্ত। কুকুরদের যেমন কবর আছে, কুকুরদের চিকিৎসার যেমন বিশেষ ব্যবস্থা আছে হাসপাতালে—তেমনি কুকুরদের বিরুদ্ধে নোটিসও আছে। প্রায় প্রতি বাড়ীতে কুকুর থাকলেই গেটে লেখা থাকে, 'কুকুর আছে, সাবধান!' আর সে কুকুর কামড়াতে পারুক বা না পারুক তার সম্পর্কে অমনি লেখা না থাকলে কুকুরকে ঠিকমতো সম্মান দেওয়া হয়নি বলে বহু কুকুর রাগ করতে পারে। আমি কখনো কুকুরকে দেখিনি কোনো মানুষকে কামড়াতে—কামড়ালেও সেটা খবর দেবার মতো কিছু হ'ত না। তবে কুকুর যে মানুষকে তাড়া করে তা দেখেছি। প্রভাস চৌধুরী এবং অরুণ পালিতকে একবার দু'ডজন কুকুরে তাড়া করেছিল। তখন আমরা ব্রে'নিম ক্রেসেণ্টে থাকতাম। ইংরেজদের নববর্ষে কোনোরকম ফূর্তি করতে না দেখে—এমন কি তারা একদিনও ছুটি পায় না একথা শুনে অরুণ এবং প্রভাস স্থির করেছিল, লণ্ডনে তারা বাঙালী মতে পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন করবে।

সেদিন গরমও পড়েছিল। প্রভাস এবং অরুণের ধুতি-পাঞ্জাবী ছিল, তারা তাই পরে বেরিয়েছিল নববর্ষের উৎসব করতে। ওদেশে হালখাতা হয় না দেখে ওরা হয়তো দমে গিয়েছিল, কিন্তু ফেরবার সময় তাদের যে হাল হয়েছিল, তা আর কহতব্য নয়। অদ্ভুত ব্যাপার দেখলে কুকুরেরা চেঁচায় এবং তাড়া করে—সেটাই কুকুরের ধর্ম। অরুণ এবং প্রভাস এরা দুজনে কেমন করে যেখানে যাবার কথা, গিয়েছিল, তা জানি না। কিন্তু তারা ফিরেছিল দৌড়ে। তাদের পেছনে ছিল তাড়া-করে আসা ডজন দুয়েক নানা জাতের কুকুর। কুকুরেরা ব্লেনিম ক্রেসেণ্ট পর্যন্ত তাড়িয়ে এনেছিল। অরুণ এবং প্রভাস দুজনেই পনেরো মিনিট একটি কথা বলতে পারেনি, এত তারা হাঁফাচ্ছিল। ওরা প্রতিজ্ঞা করেছিল, লণ্ডনে বাঙালীমতে নববর্ষ করবার আগে কুকুরদের কাছ থেকে অন্তত পারমিট নিয়ে রাখতে হবে। কুকুরেরা ডাকপিওনদের পছন্দ করে না—প্রতি বছর কয়েক শো ডাকপিয়ন কুকুরের কামড় খান।

কুকুরদের মানুষপ্রীতির অনেক গল্প আছে। তবে সবচেয়ে ভাল লাগে আমার জেম্‌স থারবারের গল্পটি। একটি কুকুর তার প্রভুর বাড়ী পাহারার কাজে গাফিলতি করতো—রাত্রে বাড়ী পাহারা না দিয়ে সে মদের দোকানে গিয়ে মদ খেত। এমন ক'রাত্রি কাটাবার পর প্রভুর বাড়ীতে এক বিরাট চুরি হ'য়ে গেল। সকালের দিকে কুকুর বাড়ীতে ফিরে দেখতে গেল কী কাণ্ড ঘটে গেছে! তখন সে লজ্জায় কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রইল। তারপর হঠাৎ সে ছুটে গেল বাড়ীর তিনতলায়। জানালা দিয়ে সে লাফিয়ে আত্মহত্যা করলো।

কুকুরের এতখানি বোধ থাকা অসম্ভব হয়তো। জেমস থারবার ঠিক বলেছেন, কিংবা ঠিক বলেন নি, কিন্তু প্রত্যেকটা কুকুর যে পৃথিবীর অন্য যে কোনো কুকুরের চাইতে বেশি চালাক, বেশি কথা বোঝে এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। আমি যত কুকুরপ্রভুর (কুকুরের প্রভু) সাক্ষাৎ পেয়েছি তাঁদের সবাইকার কুকুরই সবচেয়ে চালাক। (যাঁরা লাজক পড়েছেন তাঁরা এ ব্যাপারে দয়া করে মন্তব্য করবেন না।) আমি এবং দীপক ব্যানার্জি একবার এমন এক কুকুর-প্রভুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। কুকুরটির রঙ গোরের কালো, প্রভুটি খাস বিলিতি এবং তদনুযায়ী সাদা। আমি এবং দীপক প্রায়ই বিকেলে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম। কারণ, লণ্ডনের রাস্তায় ঘোরা একটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার—কারুর কারুর কাছে ওটা একটা নেশার মতো। আফিঙ কোকেন বা মারিউয়ানা চট করে ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু লণ্ডনে গ্রীষ্মের সবুজ বিকেলে রোদ্দুরে মাইলের পর মাইল হেঁটে বেড়ানো একবার আরম্ভ করলে ছাড়া শক্ত। শীতেও লণ্ডনের পথে পথে আর পাড়ায় পাড়ায় আমরা প্রচুর হেঁটেছি। হয়তো নেশা আমাদেরও হয়েছিল।

কুকুর-প্রভু বললেন, আমার এই কুকুরটির মতো চালাক কুকুর পৃথিবীতে আর নেই। ভয়ানক চালাক এটি। (পরিচয়ের পর্বটা ইচ্ছে করেই বাদ দিলাম, এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়)।

দীপক জিজ্ঞেস করলো, এটির নাম?

কুকুর-প্রভু এবার চুপ-চাপ। বললেন এর নাম এই (একটু ইতস্তত ভাব) মানে বুঝছো তো এর রঙ কালো কি না!

আমি বললাম, এর নাম কি?

কুকুর-প্রভু বললেন, এর নাম মানে···ব্ল্যাকি। কথাটা বলে একটু লজ্জাই পেলেন। কারণ, নিগ্রো এবং ভারতীয়দের ওরা ব্ল্যাকি বলে। তবে এতে দোষের কি, তা তো বুঝলাম না ইংরেজদের আমরা সাদা বলি—কারণ ওরা সাদা, আমাদের ওরা কালো বলে, কারণ আমরা কালো।

কুকুর-প্রভু আরো বললেন, এমন কুকুর জগতে একটিই হয়—আর আমার ভীষণ বাধ্য এটি।

আমাকে বললেন, আমাকে মারো, দেখবে একটা মজা কুকুর খ্যাঁক করে উঠবে আর তোমাকে কামড়াতে চেষ্টা করবে।

আমি কুকুর-প্রভুকে আস্তে মারবার চেষ্টা করলাম। কুকুর খ্যাঁক করে উঠলো। কামড়াতে চেষ্টা করলো।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুকুরের পরিচয় তখনো সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ, র-প্রভু এবারে আমাকে মারবেন স্থির করলেন। এবারে া নাকি একটুও প্রতিবাদ করবে না! ভদ্রলোক আমার পিঠে নেক জোর এক ঘুষি মারলেন।

কুকুরটা নীরব। প্রভুকে সে এ ব্যাপারে সমর্থন করে, বেশ স্পষ্ট ঝা গেল।

পিঠের ব্যথা মরতে লেগেছিল তিন দিন।

এর পর কুকুর-প্রভু দীপকের দিকে নজর দিলেন। দীপক ক্ষণ প্রায় সিকি মাইল চলে গিয়েছে। কুকুর মহাপ্রভু বললেন, ক ডাকো, ওকেও দেখাই।

আমি বললাম, আমিই ওকে বলব। বেশ ভাল করেই বলবো।

দীপক কেবল বলেছিল, কুকুর সম্পর্কে সায়েবদের সঙ্গে আর কনো আলোচনা করা হবে না।

আমরা পূর্ববঙ্গের লোক, তারা পশ্চিমের। তাদের সঙ্গে আমাদের কী তফাৎ, প্রমথ চৌধুরী তার একটি হিসাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, প্রায় সব ব্যাপারেই আমাদের সঙ্গে সায়েবদের পার্থক্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছিলেন, ওরা সব ইংরিজিতে কথা বলে এ ছাড়া আর সব একই ব্যাপার।

ইংরেজদের সঙ্গে তাই রাজনীতি আলোচনা খুব কম করেছি। তাদের সঙ্গে দেখা হলেই আবহাওয়ার কথা আলোচনা করেছি যার মধ্যে এ যাবৎ রাজনীতির ছিটেফোঁটাও ছিল না—কিন্তু একবার খবরের কাগজে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল যে রাশিয়ানরা আবহাওয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করছে। ইংরেজরা বেশ ক্ষেপেছিল এ ব্যাপারে—অন্তত আমার পরিচিত দু'-একজন ভয়ানক অগ্নিশর্মা হয়েছিল। ইংরেজদের এতদিনকার একটা নিরাপদ আলোচনার জিনিসও যদি রাশিয়ানরা নষ্ট করে দেয় তাহলে আর সর্বনাশের বাকী রইল কি?

কার্লো রাজনীতি ছাড়া আলোচনা করত না। আমাদের বাড়ীতে আমরা নানারকম খবরের কাগজ নিতাম, কিন্তু ডেইলি ওয়ার্কার নেওয়া হয়নি কখনো। একদিন কার্লো বললো, ঐ কমিউনিষ্ট বাঁদরদের কাগজও পড়া উচিত কারণ ওদের কথা ভাল করে না জানলে ওদের ভাল করে আক্রমণ করা শক্ত।

আমরা স্থির করলাম ডেইলি ওয়ার্কারও রাখতে হবে। কাগজ-ওয়ালাকে বলেও এলাম। কিন্তু এক কপির বেশি কেনা হয়নি। কেন বলছি।

যেদিন বাড়ীতে ডেইলি ওয়ার্কার আসবার কথা সেদিন হঠাৎ কার্লোর দরজা ধাক্কাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

আমি দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার?

কার্লো বললো, নিচে গিয়ে দেখবে কী ব্যাপার!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বলই না ব্যাপারটা কি—কিন্তু কার্লো ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়ে বলতে লাগলো, নিজে গেলেই বুঝতে পারবে।

তাড়াতাড়ি নিচে গেলাম।

হলের টেবিলে আমাদের কাগজ থাকতো। দেখলাম সমস্ত কাগজ আস্ত আছে—কিন্তু ডেইলি ওয়ার্কার খানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে আছে। এত ছোট সে টুকরো যে ছাদ থেকে উড়িয়ে দিলে মনে হতে পারতো যে স্নো পড়ছে।

অতএব একটু অবাক হলাম। সীজার যেমন ব্রুটাসের হাতে ছোরা এবং শত্রুমূর্তি দেখে বলেছিলেন, হে ব্রুটাস, তুমিও? আমার অবস্থা তখন অনেকটা সীজারের মতো। হে লণ্ডন তুমিও!

শুনলাম ল্যাণ্ডলেডি এই কাণ্ডটি করেছেন। ল্যাণ্ডলেডি পোল্যাণ্ডের অধিবাসী। যুদ্ধের সময় পঞ্চাশ-ষাট হাজার পোল্যাণ্ডের অধিবাসী ইংল্যাণ্ডে এসেছিল—রাশিয়ান এবং জার্মানদের ভয়ে। বিশেষ করে রাশিয়ানরা নাকি ভয়ানক লোক। জানতে পারলাম ল্যাণ্ডলেডির কাছ থেকে। ল্যাণ্ডলেডি বললেন তিনি নিজে খুবই গণতান্ত্রিক—তবে কেবল কমিউনিষ্ট বিরোধী তিনি। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর কোনো খবরের কাগজ পড়াতে আপত্তি নেই—কেবল কমিউনিষ্টদের কাগজ ছাড়া। কারণ তাঁর এক জন বিশেষ বান্ধবী কমিউনিষ্ট-বিরোধী ছিলেন—তিনি নানারকম কাগজ পড়েছিলেন—কনজারভেটিভ কাগজ, কিন্তু কনজারভেটিভ হননি, মোসলের ফাসিস্ত কাগজ পড়েছিলেন অথচ ফাসিস্ত হননি, অ্যানার্কিষ্টদের কাগজ পড়েছিলেন কিন্তু অ্যানার্কিষ্ট হননি—কিন্তু যেমনি কমিউনিষ্টদের কাগজ পড়তে শুরু করলেন অমনি তিনি কমিউনিষ্ট হয়ে গেলেন! তখন তিনি নাকি ঘোরতর লাল—বিল গ্যালাকার এবং জোসেফ স্টালিন তাঁর গুরু। অতএব তিনি কমিউনিষ্ট কাগজ পড়ার বিরোধী। তবে খুব বিরোধী নন, কমিউনিষ্টদের কাগজ ছিঁড়ে ফেলা ছাড়া আর কোনোরকম উচ্চাশা তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর স্বামী কমিউনিষ্ট দু' চোখে দেখতে পান না। তিনি যদি কোনো ক্রমে জানতে পারেন যে এ বাড়ীতে কমিউনিষ্টদের কাগজ আসে তাহলে তিনি রিভলবার দিয়ে কমিউনিষ্ট কাগজের গ্রাহকদের মেরে ফেলবেন। ল্যাণ্ডলেডি আরো বললেন, তিনি আমাদের বাঁচানোর জন্যই কাগজ ছিঁড়েছেন। যদি কাগজ আস্ত থাকতো, আর তার স্বামী সেটা টের পেতেন যে সেটা ডেইলি ওয়ার্কার, তাহলে আজ খুনোখুনি হয়ে যেত। আমরা কোনো প্রকারেই আস্ত থাকতাম না।

নানা কথা—ঘ্যানর ঘ্যানর ঘ্যানর। কার্লো রেগে লাল। কার্লো বললো, কমিউনিষ্টদের আমিও পছন্দ করি না—কিন্তু তাদের কাগজ আমাকে পড়তে হয়। কারণ আমি তাদের বিরোধিতা করি।

ল্যাণ্ডলেডি বললেন, বিরোধিতা করার জন্য লোকে

চেয়ার মেরামত

রাইফল, কেনে—খবরের কাগজ কেনে না। কার্লো বোঝাতে যাচ্ছিল রাইফেলের চাইতেও শক্তিশালী হচ্ছে খবরের কাগজ। অসির চেয়ে কলম বেশি শক্তিশালী। আমি বিশেষ উৎসাহ দেখালাম না।

আমি আর কার্লো উপরে উঠে এলাম। কার্লো বলতে আরম্ভ করলো যত রাজ্যের মারাত্মক কথাবার্তা। পুলিশ ডাকবে, আদালতে যাবে ইত্যাদি। দেশে আদালত বলে একটা জিনিষ রয়েছে। মানুষের অধিকার বলে একটা জিনিস আছে—যে কোনো জিনিস পড়বার অধিকার আছে বৃটিশ আইনে।

শেষ পর্যন্ত কিছু করা হ'ল না। সেই দিনই আমরা নতুন এক সমস্যার সম্মুখীন হলাম। এ সমস্যা আরো অনেক গুরুতর। সেই দিন থেকেই সুরু হল ব্যাপারটা।

দ্বিতীয় বন্ধু বলছিলেন অনেক দিন থেকেই যে তাঁর স্ত্রী আসছেন। ঐ জাহাজে আমারও এক পরিচিত ভদ্রলোকও আসছিলেন। অতএব আমাকে ষ্টেশনে যেতে হবে। আমার পরিচিত ভদ্রলোক পুলক বসুরও পরিচিত, নাম বিমান বাগচী। আমার উপর ভার পড়েছিল এঁকে লণ্ডনে দু-চার দিনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা। তার পর লণ্ডন থেকে তিনি চলে যাবেন স্কটল্যাণ্ডে।

ওয়াটার্লু ষ্টেশনে সম্ভবতঃ গাড়ি থামলো। প্ল্যাটফরমে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। গাড়ি এল। পুলকের পরিচিত ভদ্রলোককে দেখবার আগেই দেখা হ'য়ে গেল আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। কোলকাতায় ওঁকে দেখলে মাঝে মাঝে কথা বলতে হ'ত। কথা না বললেই ভালো লাগতো।

ইনি আমাকে ষ্টেশনে দেখে বললেন, এই যে, কী খবর?

আমি নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই বললাম, খুব ভাল, আপনার কী খবর?

খবর ভালো তাঁর। কোথায় থাকছেন জিজ্ঞেস করলাম, উত্তর পেলাম, থাকবার একটি ভাল বন্দোবস্ত করেছেন এবং আমাকে সেজন্ত চিন্তা করতে হবে না।

এর পর আমার বন্ধুকে নিয়ে ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে পৌঁছে দিতে গেলাম। মিসেস বোসের সঙ্গে আর দেখা হ'ল না। ব্লেনিম ক্রেসেণ্টে পৌঁছে কোলকাতার গল্প আর এটা-সেটা গল্প করতে করতে রাত অনেক হ'ল। একটু খিদেও পেল। এমন সময় বিমান বাগচী বললেন, তার সঙ্গে দুটিন রসগোল্লা আছে।

শুনে আনন্দ হয়েছিল প্রচুর কিন্তু চোখের সামনে দুঃখের পরদা নেমে এলো যখন শুনলাম পুলক বসুর বাবা পাঠিয়েছেন কোলকাতা থেকে এবং পুলকের জন্য। এর পরে আর কথা চলে না। দীপক বললো, একটা টিন খাওয়া যাক—একটা টিনেই পুলকের চলে যাবে। আমি এবং আর সবাই সে ব্যাপারে সায় দিলাম।

এক টিন সুন্দর রসগোল্লা কয়েক সেকেণ্ডে ফুরিয়ে গেল। কিন্তু তাতে লোভটা বেড়েই গেল। আমাদের মধ্যে একজন বললো, পুলক জানে না এই রসগোল্লা তার বাবা পাঠাচ্ছেন, অতএব পুলকের পক্ষে একেবারে রসগোল্লা না পেলেও কোনো ক্ষতির কথা নয়। আমাদের পক্ষে ক্ষতির কথা কারণ রসগোল্লাগুলি আমাদের কাছে আছে এখন।

ইতিমধ্যে একজন টিন কাটবার যন্ত্র দিয়ে দ্বিতীয় টিনটাও খুলে ফেলেছে। কয়েক সেকেণ্ডে কোনো কথা নেই! দ্বিতীয় টিনও ফুরুলো।

আমরা পুলককে সান্ত্বনা দিয়ে চিঠি লিখলাম, ভাই পুলক, তোমার বাবা তোমার জন্য দুটিন রসগোল্লা পাঠিয়েছিলেন, প্রতিটি রসগোল্লার স্বাদই মনোরম ছিল—এই সংবাদটি তুমি তোমার বাবাকে চিঠি লিখে জানাবে। যা হয়ে গেছে তার জন্য দুঃখিত।

তারপর রাত প্রায় এগারোটায় বাড়ীতে ফিরলাম। তখনো এজনমোর রোডের বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে। আমাকে দেখে বলটু এবং কার্লো লাফিয়ে উঠলো।

—তুমি?

—কেন, কি হয়েছে? আমার তো আসবারই কথা।

কার্লো বললো, তা তো বটেই, কিন্তু তুমি শোবে কোথায়?

আমি বললাম, মানে? আমার ঘর কি পুড়ে গেছে? আমার বিছানাতেই থাকবো।

বলটু বললো তোমার বিছানা? সেখানে কে একজন শুয়ে আছে।

আমার বিছানায়! শুনেই দৌড়ে গেলাম ওপরে।

দরজা খুললাম। ঘর অন্ধকার, আলো জ্বাললাম। দেখলাম। দেখলাম সেই ভদ্রলোক। তিনি পিট পিট করে তাকাচ্ছেন। ইনিই ষ্টেশনে বলেছিলেন আমাকে তাঁর জন্য কিছু ভাবনার প্রয়োজন নেই।

—এই যে এসো, এখানে শোবে?

রেগে বললাম, আমি আপনার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পারব না।

—তবে কোথায় থাকবে?

মুশকিলের প্রশ্নই বটে! আমি কোথায় থাকব সে জন্য আমারই মাথা ব্যথা হবার বিশেষ প্রয়োজন। মাথা ব্যথা বিশেষ করেই হ'ল। বললাম একটু রাগত স্বরে, হোটেলে থাকবো।

—তা হোটেল কি পাবে এত রাত্রে? এখানেই থাকো না!

—লণ্ডনে সব সময়েই হোটেল পাওয়া যায়।

—হুঁ, তাহ'লে যাও হোটেলেই।

আমি দরজা বন্ধ করে বৈঠকখানায় এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই অদ্ভুত লোকটি কেমন করে এই বাড়ীতে এসে আমার ঘরে, আমার খাটে শুলো? কে তাকে এমন অধিকার দিল?

বলটু বললো, লোকটা সম্ভবত মিসেস বসুর আত্মীয়—ওঁর সঙ্গেই এসেছে!

আমি বললাম, কিন্তু আত্মীয় হ'ক আর যাই হ'ক, আমার খাটে কেন?

কোনোক্রমে বলটু এবং কার্লোর বিছানার অংশ নিয়ে মেঝেতে শুলাম। তিন জন ঠাণ্ডায় যথেষ্ট কষ্টও পেলাম। পরদিন সকালে মিসেস বসুর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি হলেন আমাদের রাণীদি।

সকালে কফী খেতে খেতে বলা গেল না। একটু আড়ালে পেয়েই রাণীদিকে বললাম ঐ ভদ্রলোক আপনার আত্মী

লাম—কিন্তু আমার বিছানা এবং ঘর অধিকার করেছেন কেন বুঝতে পারছি না।

রাণীদি বললেন, উনি তো আমার আত্মীয় নন। জাহাজে আলাপ হ'য়েছে। একসঙ্গে ট্যাক্সিতে বাড়ীতে এসেছি সবাই মিলে। এসে শুনলেন আপনি এখানেই থাকেন। যখন শুনলেন আপনি এখানে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, ওর সঙ্গে আমার ষ্টেশনে দেখা হ'য়েছিল এখানে থাকতে দিতে ওর ( অর্থাৎ আমার ) আপত্তি নেই।

আমি বললাম, আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে এবং আজই ওঁকে এবাড়ী থেকে তাড়াব।

কথাটা মিষ্টার বোস শুনে বললেন, আজ থাক। আজ তাড়িয়ে প্রয়োজন নেই। মিষ্টার বোস অত্যন্ত নির্বিরোধ প্রকৃতির ভদ্রলোক।

সেদিন গেল। সকালে বেরুলাম, রাত্রে মণি পালিতের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেয়ে ঐ বাড়ীতেই অরুণ এবং খুকু পালিত আর কাঞ্চনদার সঙ্গে গল্পগুজব করে, প্রশান্ত ঠাকুরের বাজানো পিয়ানো শুনে যখন ফিরলাম তখন রাত এগারোটা।

অতিথি তখনো যাননি। আমার ঘর তিনি অধিকার করে আছেন তখনো।

পরদিন নিশ্চয়ই তাড়াতে হবে।

কার্লো স্থির করেছে তাড়াতেই হবে। সিনেমা অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিজ্ঞতার পরই স্থির করেছিলাম এরকম আর চলতে দেওয়া উচিত হবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞার জোর পরীক্ষা করতে চাইলাম।

বিকেলে কার্লো নিয়ে এলো একটি সাপ্তাহিক কাগজ। এর নাম লণ্ডন উইকলি অ্যাডভার্টাইসার। এই কাগজ ভর্ত্তি নানা জাতের বিজ্ঞাপন। বাড়ীভাড়া, ঘড়ি বিক্রি, জমি কেনা-বেচা, নাচ গান ইত্যাদি যাবতীয় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। এই সাপ্তাহিক কাগজটির মধ্যে বোর্ডিং-হাউসের বিজ্ঞাপনও থাকে। আমরা চার-পাঁচটা বোর্ডিং-হাউসের টেলিফোন নম্বর নিয়ে ফোন করতে আরম্ভ করলাম। দু'-তিনটেতে ব্যর্থ হয়ে চতুর্থটিতে সফল হ'লাম। সঙ্গে সঙ্গে ফোনেই স্থির করে ফেললাম। তারপর আমাদের অতিথি মশাইকে এসে বললাম, মশাই, আপনার জায়গা স্থির হয়েছে।

তিনি অবাক এবং অনিচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও ট্যাক্সি ডাকলাম টেলিফোনে। ট্যাক্সি এসে গেল তিন মিনিটে। এরপর তিনি বুঝলেন তিনি সত্যিই চলে গেলে আমরা খুসি হই। ট্যাক্সি ডাকার আগে পর্যন্ত ইনি বুঝতে পারেন নি।

আমার ঘরে আমার খাটে এর আগেও আর একজনকে দেখে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম। ভালও লেগেছিল। একদিন ক্লাস থেকে রাত্রে ফিরে দেখি আমাদের এক বন্ধু সমীর দাশগুপ্ত আমার বিছানায়। অ্যামেরিকা যাবার পথে লণ্ডনে নেমেছে। এখানে সোজা চলে এসেছে। আগে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। একেবারে কোলকাতা থেকে উড়ে এসেছে।

পরদিন ওকে নিয়ে লণ্ডন দেখতে বেরুলাম। এদিকে যাই ওদিকে যাই। সমীর খুব অবাক। টিউবে চড়ে ওর খুব আনন্দ

নানারকম যন্ত্রপাতি—অটোম্যাটিক মেশিন দেখলো আগ্রহের সঙ্গে। বললো দেশটা কী উন্নত। তবে বেশি সময় ছিল না বলে সব দেখানো সম্ভব হ'ল না—বললাম ফেরবার সময় সব দেখিস। কয়েক বছর পর অ্যামেরিকা থেকে ফিরছে ও। লণ্ডনে এসে নেমেছে। আমাদের সঙ্গে সর্বত্র বেড়াচ্ছে, কিন্তু কোনোরকম আশ্চর্য হচ্ছে না। অথচ লণ্ডনে অটোম্যাটিক যন্ত্রের সংখ্যা নানা দিকে বেড়ে গেছে। চকোলেট, সিগারেট, মাখন, চা, ডিম এ সমস্তই অটোমাটিক মেশিনে পাওয়া যাচ্ছিল তখন। সমীর উলটো রকম কথা বলছে, এই তোদের লণ্ডন! এই রকম বাজে ষ্ট্যাণ্ডার্ড। এদেশে মোটরগাড়ি এত ছোট। রাস্তা ছোট, বাড়ী ছোট—না: প্রায় অসভ্য দেশ!

অন্য কোনো দেশের সঙ্গে তুলনা না করলে ভারতবর্ষও খুব উন্নত দেশ নাকি!

এর পর আমাদের বাড়ী আর সবার ভালো লাগলেও একজনের খুব খারাপ লাগতে লাগলো—সে হ'ল কার্লো। রাণীদি এসেই আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও রান্নাঘর দখল করলেন। কার্লো নিজে রান্না করতে না পেরে কেমন যেন ক্ষেপে যেতে লাগলো। সামান্য কারণে চটতে লাগলো। একদিন একটা চেয়ার মেরামত করার নাম করে সেটাকে ভাঙলো। বিড় বিড় করে কি সমস্ত বকতে সুরু করলো। তারপর থেকে সে রেস খেলতে সুরু করলো। প্রতিদিন দু তিন শিলিং এই বাবদ খরচ হ'তে লাগল তার। একজন লোককে রান্না করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে সে মানুষ খুন করতে পারে—রেস খেলা তো সামান্য ব্যাপার। ইংল্যাণ্ডে রেস খেলা কেবল ব্যাপক ভাবে হয় বললে কমিয়ে বলা হয়। একটু ভাল ভাবে বর্ণনা দিতে গেলে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যাবার কথা। রেসের জুয়ায় ( এবং ফুটবলের জুয়ায় ) বৃটেনে বহু কোটি টাকা প্রতি বছর খরচ হয়। রাণী এলিজাবেথের এই ব্যাপারে বেজায় উৎসাহ। দু-একটি কাগজ ছাড়া আর সমস্ত কাগজে চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়—রেস খেলার প্রেরণা দেওয়া হয়। রেস খেলবার নানা কোম্পানী আছে—তারা ডাকে, টেলিফোনে প্রতিদিন

পোলিশ বাড়ীওয়ালা ও কমিউনিষ্ট

হাজার হাজার পাউণ্ডের কারবার করে। এটাও এক ধরনের রোগ। আর এ রোগ সারানোও বায় কিন্তু গভর্ণমেন্টের ক্ষতি হয়। ইংল্যাণ্ডে জুয়া খেলা বন্ধ করে দিলে গবর্ণমেন্ট চট করে বিষম বিপদে পড়ে যাবে। কারণ জুয়া খেলার ট্যাক্স তো আছেই, তা ছাড়া প্রতিদিন বহু লক্ষ চিঠি জুয়ার ব্যাপারে পোষ্ট করা হয়—বহু হাজার টেলিফোন কলও করা হয়। এ সব থেকে যা আয় হয় তার হিসেব দেখলে তাক লেগে যাবার কথা। রেস খেলা বৃটেনে অতি সাধারণ ব্যাপার—কোলকাতায় যাঁরা রেস খেলেন তাঁদের একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থান আছে। কতকগুলি লোক নিয়মিত রেস খেলেন, অধিকাংশই নির্বিকার। কিন্তু বৃটেনে প্রাপ্তবয়স্ক হলেই যেমন সিগারেটের দিকে নজর দেয়, বীয়ার খেতেও আরম্ভ করে (বীয়ার প্রস্তুতকারকেরা বলছেন বুড়োরা আজকাল মদ অনেক কম খাচ্ছেন—ছোটরা বেশি মাত্রায় খেয়েও সেটার ক্ষতি পূরণ করতে পারছে না), তেমনি তারা ঘোড়ার রেস খেলবার জন্ম ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। এর ব্যাপকতা বোঝা যাবে আর একটা ব্যাপার থেকেও—কনসারভেটিব টাইমস খবরের কাগজ থেকে শুরু করে কমিউনিষ্টদের ডেইলি ওয়ার্কার পর্যন্ত কোন ঘোড়া দৌড়বে, ঘোড়াদের বয়স, যোগ্যতা, উচ্চতা, ওজন, বংশ পরিচয় ইত্যাদি ছাপা হয়। ডেইলি ওয়ার্কার যদিও বেশি বিক্রি হয় না, কিন্তু যেটুকু হয় তার বেশ মোটা অংশই কেটন এর ঘোড়ার দৌড়ের ভবিষ্যদ্বাণী করার ফলে যে বিক্রি হয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ডেইলি ওয়ার্কারের কেটন নাকি পর পর দু বছর ডার্বির দৌড়ে প্রথম হওয়া ঘোড়াটির নাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ঘোড়া ছাড়া আছে কুকুরের দৌড়। জুয়ার দিক দিয়ে এও কম মারাত্মক নয়। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়েন ঘোড়া এবং কুকুরের দৌড়ের বিজ্ঞাপন ছাপে না—ভবিষ্যদ্বাণীও করে না।

একবার আমার কিছু পরিচিত লোক কুকুরের দৌড়ে সর্বস্বান্ত হ'য়ে ওভার কোটগুলি বিক্রি করে রেসে হেরে গিয়ে আট মাইল পথ হেঁটে বাড়ী ফিরেছিলেন। ভারতীয়রাও যে ইংরেজের সঙ্গে রেসের নেশায় মাততে পারেন ওঁরা ছিলেন তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ওঁরা প্রতি

বুড়োরা মদ কম খাচ্ছে, ছোটরা বেশি খাচ্ছে

সপ্তাহে দু দিন কুকুরদের দৌড় দেখতে যেতেন—এবং কখনো জিততেন এবং কখনো হারতেন। নিশ্চয় হারতেন বেশি—কারণ এরকম বাজীতে জনসাধারণ হারবেই—সে জন্যই রেসের জুয়া চলে। জনসাধারণ জিতলে সঙ্গে সঙ্গে এ জুয়া দেশ থেকে উঠে যেত। কুকুরগুলো দৌড়ানোর হাত থেকে বেঁচে যেতো—ঘোড়ারা আস্তে আস্তে দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত।

এই ঘোড়ার দৌড়ে আমরা একবার ভাগ্য ফেরাতে চেয়েছিলাম। টমি আমি এবং মনোরঞ্জন বিশ্বাস। মনোরঞ্জন আর টমি দু জনে মিলে কাগজে কি লিখলো। তারপর কাগজে চোখ বন্ধ করে আলপিন ফোটালো। তারপর চোখ খুলে দেখলো। অনেকক্ষণ সব চুপচাপ গম্ভীর আবহাওয়া। টমি অবশেষে বললো, পেয়েছি পেয়েছি। বিশ্বাস বুঝিয়ে বললো। বিভিন্ন খবরের কাগজে দেখা যাবে তাদের ওস্তাদের মতে বিভিন্ন ঘোড়া প্রথম হবে। একমাত্র নিশ্চিত উপায় হচ্ছে আলপিন দিয়ে অন্ধভাবে ঘোড়ার তালিকায় খোঁচা দেওয়া। আলপিনের খোঁচা যে সমস্ত ঘোড়ার নামে পড়বে আমরা সেটাই ধরবো—কারণ এটাই সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়।

দু' শিলিং দিয়ে পাঁচটা ঘোড়া থেকে আয় হওয়া উচিত—বিশ্বাস বললো, হাজারখানেক পাউণ্ড। অর্থাৎ তেরো হাজার টাকারও বেশি। বিশ্বাসকে বললাম আর যদি এই পাঁচটা ঘোড়া প্রথম না হয়। বিশ্বাস বললো, প্রথম না হয় দ্বিতীয় হবে, দ্বিতীয় না হয় তৃতীয় হবে। তা যদি হয় তাহলেও চল্লিশ পঞ্চাশ পাউণ্ড পাওয়া যাবে।

আমি বললাম, আর যদি চতুর্থ হয়?

টমি বললো, অমন অলক্ষুণে কথা বইতে নেই। টমি দক্ষিণ ভারতীয় খৃষ্টান, এবং তার হিউমার বোধ অপরিসীম। বিশ্বাস পোষ্টাল অর্ডার কিনে গ্লাসগোর উইলিয়াম হিল নামের বিখ্যাত জুয়া খেলার প্রতিষ্ঠানকে টাকা পাঠালো।

তারপর বিরাট এক নাটক!

সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরতেই মিষ্টার বোস বললেন কনগ্রাচুলেশনস।

আমি চমকালাম। কী ব্যাপার। মিষ্টার বোস বললেন, টমি আর বিশ্বাস ফোন করেছিল—টমির বাড়ীতে আসা মাত্র যেতে।

আমি বললাম, কেন?

কার্লো বললো, তোমাদের ঘোড়ারা সব দৌড়েছে আর এক এক জনে ষাট পাউণ্ড পাবে।

ষাট পাউণ্ড! বেশ আনন্দ হ'ল বৈ কি। বেশ ভালই লাগল। সংবাদটা এতই ভাল যে আমার টাইটা 'কার্লো'কে উপহার দিয়ে ফেললাম। হোর্ণ ব্রাদার্সের দোকান থেকে 'সেলে' কিনেছিলাম—নগদ খরচ পড়েছিল ছ পেনি—সেটা কার্লোর খুব পছন্দ হ'য়েছিল।

বল্টু বললো, এবার ছুটিতে প্যারিসে যাও, ভাল জায়গা। রাত তখন প্রায় নটা। আমি আধ ঘণ্টার হাঁটা পথ, ট্যাক্সিতে গেলাম। গেলাম টমির বাড়ীতে।

গ্লষ্টার রোডের কাছেকার ড্রেটন গার্ডেন্স। দেখি টমির ঘরে রীতিমতো পার্টি চলেছে। ওদের বাড়ীর উপরের তলায় থাকতো এক রাশিয়ান মা, নাম তার ভিয়া আর মেয়ে মাশা। ওরা দুজনে এসেছে। পাশের ঘর থেকে এসেছে ওয়াল্টার। এই জার্মান ছেলেটি কয়েক দিন হ'ল লণ্ডনে এসেছে বেড়াতে। বিশ্বাস এক কোণে

কায় বসে 'হোয়াটস অন' সাপ্তাহিক পত্রিকা ওলটাচ্ছে আর সুর ভাঁজছে। টমি ওয়াইনের গ্লাস সবাইকে এগিয়ে দিচ্ছে।

আমাকে দেখে সবাই হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা করলো। ওয়াল্টার মারগ্রাওশেক করে বললো, কনগ্র্যাচুলেশনস। আর ইউ দি হর্স?

মালা বললো, না ও ঘোড়া নয়।

ওয়াল্টার বললো, সে ইংরেজি জানে না অতএব এরকম ভুল যেন গ্রাহ্য করা না হয়।

ঐ ঘরে তৎক্ষণাৎ প্ল্যান করা হল ষাট পাউণ্ড খরচ করবার প্ল্যান। কোথাও যেতে হবে ছুটিতে।

কোথায়?

সবাই যেখানে যায় সে-জায়গা নয়। প্যারিসে তো সবাই যায় ডেনমার্কে তো সবাই যায়, ইটালীতে তো সবাই যায়। কোনোটাই আমাদের পছন্দ হয় না।

অবশেষে টমি বললো, আমার বহুদিনকার ইচ্ছে আইসল্যাণ্ড যাওয়া।

আইসল্যাণ্ড! নাম শুনেই আমরা স্থির করে ফেললাম আইসল্যাণ্ডই ভাল। মালা বললো, আইসল্যাণ্ড খুব দূর হবে কি?

টমি বললো, দূর! কতই বা দূর—বারোশো মাইল। লণ্ডন থেকে অসলো বা ব্রিন্দিসিও ওড়া পথে বারোশো মাইল। আমরা যাব জাহাজে। স্কটল্যাণ্ড থেকে সে জাহাজ ছাড়বে—ছোট জাহাজ, ছোট বন্দর। ঠাণ্ডা—কিন্তু আমরা চামড়ার জামা নেব সঙ্গে।

অনেক রাত্রিতে বাড়ী পৌঁছলাম। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে কেবল কার্লো ছাড়া। আমি বাড়ীতে পৌঁছতেই কার্লো আমাকে বললো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি জেগে বসে রয়েছি বলব বলে।

আমি বললাম, কী কথা?

কার্লো বললো, ষাট পাউণ্ড কম টাকা নয়।

আমি বললাম, হ্যাঁ অনেক টাকা—প্রায় সাতশো টাকা।

কার্লো বললো, এই টাকা দিয়ে অনেক কাজের জিনিস হয়।

বললাম, তা হয় বটে।

কার্লো বললো, সব টাকা পোষ্ট অফিসে জমিয়ে রেখে দাও—একটি পয়সা খরচ করো না।

কার্লোর কথাই শেষ পর্যন্ত রইল। একটি পয়সা খরচ করা হল না। আইসল্যাণ্ডে যাওয়া বাতিল করা হল। কারণ টাকাটা পাওয়া গেল না।

আমাদের কর্মে কিছু ভুল ছিল। কিন্তু সবাই তা জানত না। পরিচিত সবাই এটা জেনে গিয়েছিল যে আমরা ষাট পাউণ্ড পেয়েছি। লোকদের ভুল ভাঙানো এক সমস্যায় দাঁড়িয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। প্রতিটি লোককে বোঝাতে হয় যে আমরা টাকা পাইনি—সমস্ত ইতিহাস তো বটেই—তা ছাড়া ব্যাঙ্কের বই, পোষ্ট অফিসের বই এ সমস্তই দেখাতে হয়। তবে যদি তারা বিশ্বাস করে।

মাসখানেক সময় গেল লোকদের বোঝাতে, তবে তারা বুঝলো। নিশ্চিত হলাম।

কিন্তু একদিন হঠাৎ কার্লো আমাকে বললো, খরচ না করে খুব ভাল কাজ করেছ। তোমার মনের জোর আছে বলতে হয়। একটি পয়সা খরচ করনি—একটা শার্ট নয়, একজোড়া জুতো নয়... না সত্যিই তোমার মনের জোর আছে।

রাণীদি আসবার পর আমাদের বাড়ীটির শ্রী ফিরলো। এই সময় লণ্ডনে ভারতীয় মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হতেও লাগল। ব্লেনিম ক্রেসেন্টের কাছে শ্রীমতী কণা বসুদের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল এর আগে অরুণদের মারফত, তা ছাড়া প্রায় প্রথম থেকেই শ্রীমতী বেলা বসুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। শ্রীমতী শেফালি নন্দীর সঙ্গেও দেখা হয়—ইনি বিলিতি অভিজ্ঞতা নিয়ে সুন্দর লিখেছেন। প্রথম প্রথম মনে হ'ত বোধ হয় লণ্ডনে মেয়েদের সংখ্যা কম, কিন্তু মোটেই তা নয়। অর্থাৎ যত কম আমরা ভেবেছিলাম তত কম নয়। সবচেয়ে প্রথম আলাপ হয়েছিল যে ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে তিনি হলেন অমুদি—আমাদের নাড়ুদার স্ত্রী। আর আলাপ হয়েছিল তরুণা বসু, তরলা গান্ধী, মঞ্জুলা রায় এবং প্রমিতা সিংহর সঙ্গে। আরো অনেক নাম বলা যায়। আজকাল যে শিক্ষিতা ভারতীয় মেয়েরা লণ্ডন পর্যন্ত যেতে সঙ্কোচবোধ করছেন না তার কারণ হল লণ্ডনে তাঁরা বেশ মানিয়ে নিতে পারেন। একটি বাঙালী শিক্ষিতা মেয়ে বালীগঞ্জ থেকে শ্যামবাজারের মদন মিত্র লেনে বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে একা যেতে পারেন না—কিন্তু তাঁরা কোলকাতা থেকে লণ্ডনে সহজেই চলে যেতে পারেন। একজন বাঙালী মেয়ে কোলকাতা থেকে ভারতবর্ষের অন্য কোথাও একা গিয়ে দু তিন বছর থাকতে পারেন কি? অথচ ইউরোপে সহজেই থাকছেন।

ইউরোপ আমাদের কাছে একটা সহজ দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের নানা জিনিস আমরা বুঝতে না পারলেও সহ-অবস্থানের পক্ষে কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না। আমরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে যতখানি কৌতূহলী তার চাইতে বেশি কৌতূহলী ইউরোপ সম্পর্কে। ইউরোপীয়রাও ভারতবর্ষ সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁরা এদেশে এসে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করেন। তাঁরা ভারতবর্ষকে কেমন চোখে দেখবেন তা নির্ভর করে আমাদের উপর। তাঁরা যদি ভারতবর্ষে দারিদ্র্য দেখেন, অবৈজ্ঞানিক অনাচার দেখেন আর তা যদি ঘুণাক্ষরেও লেখেন অমনি আমাদের পিত্তি জ্বলে ওঠে।

ইউরোপে ভারতীয় মেয়েদের কেমন লাগে তা ভারতীয় মেয়েদেরই লেখা উচিত। ভারতীয় মেয়েদের উল্লেখ করে বৃটেনের বিখ্যাত এক সাপ্তাহিক কাগজে প্রায় দশ বছর আগে একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল, তার অংশ এখানে উদ্ধার করলাম :

Lady, in your crimson sari, undulating
up the queue
For the fast eleven-thirty, Bournmouth—
bound from Waterloo
Do you like the way we travel? Aren't our
platforms cold and pale?
Don't you hanker for the chaos of the
old Calcutta Mail?
Do you never miss the voices crying
coconuts and pan,
Crying water for the Hindu, water for the
Mussulman;
Miss the crowded wooden benches in the
dilatory train,
Miss the three-days-journey distant village
in the dusty plain,

ইত্যাদি। এর উত্তরও ভারতীয় মেয়েদেরই দেওয়া উচিত। [ ক্রমশঃ।

## রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা জানি, পৃথিবীর সবকিছুই পরিবর্তনশীল, সেইরূপ বাংলা-সাহিত্যও কেবল বাংলা-সাহিত্য কেন, সকল দেশের সাহিত্যই চক্রাকারে পরিবর্তিত হইতেছে এবং তাহার মধ্য দিয়া বহু বাঙ্গালী প্রাচীন কবি বা সাহিত্যিকগণও পরিবর্তনের স্রোতে মানবের মনোসাগর হইতে বহু দূরে ভাসিয়া চলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। নূতন সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নূতন কবি ও সাহিত্যিকেরাও মানব-হৃদয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। প্রাচীন লেখক ও কবিদের মধ্যে অনেকেই আজ বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত। সেই বিস্মরণের আবরণ ভেদ করিয়া আজ আমি যাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দিব, তিনিই একদিন অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজ করিতেন।

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ ভারতচন্দ্র। তাঁহার প্রথম জীবন নানা দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে অতিবাহিত হয়। তার পর ঘটনার আবর্তের মধ্য দিয়া তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার সাহচর্য্যেও পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অনুপ্রেরণায় ভারতচন্দ্র বিখ্যাত কবি বলিয়া পরিচিত হন। এই কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক তিনি রায়গুণাকর উপাধিও লাভ করেন। ভারতচন্দ্রের জন্ম হয় ১১১১ সালে পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁহাকে গ্রাম ত্যাগ করিতে হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় আসিয়া তিনি উপস্থিত হন। ভারতচন্দ্রের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হইয়া আছে। কারণ তাঁহারই আদেশে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল নামে তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য বহু ছোট ছোট কাব্যও আছে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ শিবায়ণ ও দেবীমঙ্গল, দ্বিতীয় ভাগ কালিকামঙ্গল অর্থাৎ বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান, তৃতীয় ভাগ মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-ভবানন্দ উপাখ্যান। এই তিন অংশে ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব দক্ষতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি প্রাচীন কবি হইয়াও যে আধুনিকতার অগ্রদূত ছিলেন, তাহার প্রকাশ তাঁহার রচনায় বিদ্যমান। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের কবি। এই সময় সকল মঙ্গলকাব্যের কবিগণই দেবতাকে লইয়াই কাব্য রচনা করিতেন। কাব্যে 'মানবিকতার সৃষ্টি কেহই তখন কল্পনায় আনিতে পারিতেন না। কিন্তু নূতন সৃষ্টির পথপ্রদর্শক ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবতার মধ্যে মানবতার রূপ আরোপ করিয়াছেন। অলৌকিক দেবকাহিনীর সঙ্গে লৌকিক প্রেমগাথার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত দক্ষালয়ে সতী জননীর আকুতিতে মেনকার কথোপকথন, হরগৌরীর দাম্পত্য কলহে ও পাটনীর বরপ্রার্থনায় এবং আরও বহু অংশে এই মানবিকতা দেদীপ্যমান। এই হরগৌরীর বিবাহ-চিত্রটি একেবারে বাঙ্গালীর ঘরোয়া বিবাহেরই চিত্র এবং হরগৌরীর যে কোন্দল তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরের স্বামি-স্ত্রীর কোন্দলের অনুরূপ। এই অন্নদামঙ্গল পড়িলে মনে হয় যে দরদী কবির তুলির স্পর্শে যেন প্রত্যেক চরিত্র-চিত্র সজীব ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল মানবিকতার সৃষ্টিই করেননি। তিনি ছিলেন চতুর হাস্যরসিক। প্রত্যেক কথার মধ্যে তাঁহার শ্লেষ ও অবিশ্বাস সুন্দর হাস্যরসের মাধ্যমে প্রকাশ পাইয়াছে। হাস্যরস মধুর হইয়া উঠিয়াছে বিদ্যাসুন্দর কাব্যে। সুন্দর দর্শনে যখন নারীরা পতিনিন্দা করিতেছেন তখন কবিপত্নীর উত্তরের মধ্যে যে হাস্যরস রহিয়াছে তাহা এই :—

> "মহাকবি মোর পতি কত রস জানে
> কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।
> পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে
> চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে।"

হাস্যরসটি অতি মধুর হইয়াছে। এই ভাবে সুন্দর হাস্যরসের মধ্যে তিনি অতি সত্য ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই তাঁহার কাব্য সে-যুগে মানবের মন এত আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহার উপর তিনি ছিলেন অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। আরবি ও ফার্সি ভাষা তিনি উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার রচনা শব্দচাতুর্য্যে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায় তিনি ছিলেন শব্দকুশলী কবি। ছন্দের পারিপাট্যে, বাগ্‌বিন্যাসের চটকে ভারতচন্দ্রের কাব্য সকলের শব্দশিল্পের উজ্জ্বল উদাহরণ। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন—"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত; যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য্য।" এই উক্তি যথাযথই সত্য; কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি হইয়াও বিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কাব্য রচনা এক ভারতচন্দ্রের মধ্যেই দেখা যায়, তাই তিনি শ্রেষ্ঠ।

ভারতচন্দ্র তাঁহার কবি-প্রতিভাবলে সে যুগে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহার কাব্য সকলের দ্বারা সমাদৃত হইত এবং তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের আধুনিক সাহিত্যেও তাঁহার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতা আজ আধুনিক কাব্যের প্রায় অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তথাপি বিংশ শতকের অধিকাংশ লোকই ভারতচন্দ্রের নাম বিস্মৃত হইতে চলিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্তাকাশ হইতে ভারতচন্দ্র ও তাঁহার কাব্য বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। কিন্তু তাঁহার অমর কাব্য বিস্মৃত হইবার নয়। তাঁহাকে আমাদের হৃদয়-আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আমাদের হৃদয়ের প্রতিটি গ্রন্থিতে তাঁহার কাব্য সুরের মূর্চ্ছনা সুপ্তভাবে ঝঙ্কৃত হইয়া চলিয়াছে, তাহাকে পূর্ণরূপে জাগ্রত করিতে হইবে, আবার আমরা এই বিংশ শতাব্দীতে বসিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিকে রবীন্দ্রনাথের কথামতই বলিতে চাহি—

> "যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
> ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
> দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
> দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"

## এখন ফাল্গুন মাস

### নচিকেতা ভরদ্বাজ

এখন ফাল্গুন মাস—কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে ওখানে,
কৃষ্ণচূড়া শাড়ী পরে নারীকেও মনে হবে
কল্লোলিনী নদীর মতন
স্নিগ্ধ তন্বু—পৃথিবীতে এখন রূপের জোছ্‌না
পাপড়ি মেলিয়াছে
দূরের তারার দিকে পৃথিবীর ক্রমপথ—
ক্রমমুক্তি ঐ দিকে আছে।

ওদিকে আছে কি তবে ?—কে জানে—কে জানে—
স্বাভাবিক সহজে কি ভরে ওঠে মানুষের মন ?
রূপেরা কি রূপ হয়ে পায় শেষে রূপের গড়ন ?
অথবা কেবল মিল দুয়ে কোনো দ্বৈত কবিতার—
দ্বিতীয় পংক্তির পরই মুছে যায় প্রথম পংক্তির
সকল উজ্জ্বল মানে ?—পাণ্ডুলিপি কীটে কাটা সব
করুণ রাত্রির হিমে, রোদ্দুরের আলোর সন্ধানে
সেও শেষে ঝরে যায়—ক্রমমুক্তি অসম্ভব কথা ?
এসব রূপের পিছে তাহলে কি নগ্ন নীরবতা
ক্লান্তিতে বিলীন হয় ?—বিচিত্র উৎসব
জীবনের জয়ধ্বনি মিশে যায় সাম্যে-শান্তিতে।
তার নাম পরিণতি—মৃত্যু তার নিপুণ ভাস্কর।

জল-ঝমঝম হাওয়া—ফুল-নদী-মানুষের মন
রূপের রহস্য দিয়ে গড়া এই আশ্চর্য আকাশ, জীবন
পাখী-শিশু-নদী-চাঁদ-কবিতা-কল্পনা—
কে এমন যাদুকর—কার হাতে মায়াবী পৃথিবী
ঋতুরঙ্গে পরে সাজ—পেখোরাজ পান্নার ওড়না
কজ্জল-কুমকুম রূপে শ্রাবণের সৌন্দর্যে বিপ্লবী।
মৃত্যুতে এখনো স্থির—অথচ এ মৃত্যু তার স্থির পরিণতি।

ফাল্গুনে ফুলের মেলা—তবু এই সুঠাম রচনা।
ক্রমমুক্তি অসম্ভব জেনে তবু মন বেহিসেবী
মুক্তির আকাশ খোঁজে রূপ তার রহস্যে অদ্ভুত—
লাবণ্যে সংস্থিত এই শিশিরের স্বপ্ন আরতি
জ্যোছ্‌না-জরি-বোনো বোনো পৃথিবীকে কত রাত্রি দিত।
মৃত্যু সেই মহাকাব্যে মাঝে মাঝে তিলোত্তমা যতি।

জ্যোতির আলেখ্যে আঁকা মধুপর্ণা হৃদয়ের বৃন্ত
তাই এত অপরূপ—নক্ষত্রের স্নেহে যেন রাত্রি খচিত।
নীল রাত্রি ভয়াবহ—তা না হলে প্রত্যহের ঝড়
ছিন্নভিন্ন চেতনায়—বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ আকাশ :
মৃত্যু সে রাত্রির পরলা—তারি পরে এই জলরঙ—
পৃথিবী অমৃত-নদী—প্রাণ তার সংলাপী ঢেউয়ের
প্রার্থনা প্রণত মন্ত্র—এ অবাক সাতাশী প্রহর
ছন্দশীল চারিদিকে। ব্যাপমান মৃত্যুতে নিহত
আমরা দু' হাতে তবু অর্ঘ্য রচি ধেয়ানো বুদ্ধের—
নিরঞ্জনা নদীতীরে সুজাতার প্রণামের মত
এ প্রাণ প্রসন্ন দিন, স্নিগ্ধমেঘে আকাশ আনত।

## কুল হ্রদে রাজহংস

( *W. B. Yeats* লিখিত 'The Wild Swans at Coole'
কবিতার ভাবানুবাদ )

বৃক্ষরাজি স্নাত হল, পত্র-ঝরা হেমন্তের বিষণ্ণ সৌন্দর্য্যে—
নীরবতা ঘিরে এল বনানীর শুষ্ক পথে পথে,
আসন্ন শীতের সেই গোধূলি-সন্ধ্যায়
স্তব্ধ নীলাকাশ আঁকা স্বচ্ছ সরসী-আয়নায়।
পাথরের আড়ালেতে উচ্ছ্বসিত জলে
সেথা এক ঝাঁক রাজহংস কলকলে।

উনিশ বছর ধরে একই ছবি, হেমন্ত
এঁকে গেছে মনের পাতায়,
নির্জ্জন সরসী-তীরে প্রতি সন্ধ্যা কেটেছে হেথায়।
প্রথম যেদিন আমি গুণেছি এদের,
শেষ অবধি সংখ্যাটুকু গুনিবার আগে
পাখায় জেগেছে সাড়া হঠাৎ তাদের।
ছিন্ন মালিকা গড়ি সন্ধ্যার আকাশে
উড়ে গেছে রাজহংস দল,
বনস্থল কাঁপাইয়া উন্মুক্ত ডানায় স্তব্ধ তারে করিয়া চঞ্চল!

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে পরিবর্ত্তনের স্রোতে
যাই আজ ভেসে!
শুভ্রোজ্জ্বল হংস-তনু-শোভা দেখেছি সেদিন এই তীরে এসে;
গোধূলির অন্ধকারে মাথার উপরে
অমনি পাখার শব্দ ধূসর আকাশে,
ত্রস্ত হয়ে চুপি চুপি পা ফেলেছি রোমাঞ্চিত ঘাসে।

তবু, অশ্রান্ত, অক্লান্ত এরা যুগলে যুগলে,
মনোমত জলাশয়ে সুখে ক্রীড়া করে।
কখনো বা উড়ে যায় আকাশে সকলে—
চঞ্চল যৌবন নাচে তাদেরি অন্তরে।
জিগীষা বা অনুরাগ ঘিরি রবে তাহাদের,
যেখানেই যাক, এ ধরায়—
যুগে যুগে ভেসে যাবে হংসমিথুনেরা
অফুরন্ত যৌবনের উদ্দাম লীলায়।

সরোবরে রাজহংস, নিপুণ শিল্পীর ছবি
স্তব্ধ, শান্ত, নিস্তরঙ্গ জলে।

মাধুর্য্যে, রহস্যে-ঘেরা অপূর্ব্ব সুন্দর তারা
স্বল্পালোকে গোধূলি লগনে ;
হয়ত কোন অন্য হ্রদের কূলে—
নীড় রচনার কলধ্বনি শোনা যাবে কে জানে কোন
শ্যাওলা-ধরা নলখাগড়া বনে।
ধরা দেবে ছবি হয়ে এমনি করে
মানুষের প্রশ সমান দৃষ্টিতে,
তন্দ্রা-শেষে দেখব তারা গেছে দেশান্তরে
সেখানে ঋতু-উৎসবে যোগ দিতে।

অনুবাদিকা—গীতা মিত্র।

# ত্রয়ী

### শুক্লা দাশ

প্রতি বছর সৌন্দর্য্য-পিপাসু চোখ বা ভ্রমণবিলাসী মন নিয়ে অগণিত মানুষ ছোটে মাউণ্ট আবুর নিভৃত কোলে। ভক্তিরসে আপ্লুত হৃদয় নিয়ে দলে দলে ভীড় জমায় অসংখ্য পুণ্যকামী যাত্রী দিলওয়ারী মন্দিরের দুয়ারে। অসংখ্য টুরিষ্ট ও তীর্থযাত্রীর ভীড়ে মুখর হয়ে ওঠে মাউণ্ট আবুর প্রতিটি অণু-পরমাণু। হয়তো আপনিও একদিন পাড়ি দিলেন সুদূর রাজপুতানার মরুভূমির পথে—ধূ ধূ বালির রুক্ষতায় যখন আপনার মনে আসবে অবসাদ, তখনই চোখে পড়বে উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণীর মহিমা। প্রকৃতির যাবতীয় সম্ভারে সুসজ্জিত মাউণ্ট আবু ক্লান্ত মনকে দেবে তৃপ্তি আর রোম্যাণ্টিক অনুভূতির আস্বাদ। মাউণ্ট আবুতে দিলওয়ারা মন্দির আপনাকে টানবেই, আপনি নিজেকে যতই নাস্তিক বলে জাহির করুন না কেন। পুণ্যলোভী, স্বাস্থ্যকামী বা নিছক সৌন্দর্য্য-পিয়াসী যে কোন একটির দলে ভিড়ে আপনারা কেউ না কেউ হয়তো পাড়ি দেবেনই সেই পথে। হয়তো দিলওয়ারা মন্দিরের বিচিত্র কারুকার্য্য দেখে মোহিত হয়ে ফিরছেন আপনারা। তখনই চোখে পড়বে একটি সুন্দর বাগান-ঘেরা বাড়ী—লাল সুরকি-ঢালা পথের দুধারে ফোয়ারার জল ঝরছে অবারিত গতিতে,—সবুজ ঘাসের বুক চিরে জেগে-ওঠা অসংখ্য জানা অজানা ফুলের সম্ভারে রঙীন হয়ে উঠেছে উদ্যান—লতায় ঘেরা লোহার দ্বারের ওপর নেমপ্লেটে হয়তো থমকে যাবে আপনার দৃষ্টি—বাংলা ও হিন্দীতে বড় অক্ষরে লেখা 'পার্থসারথি নিবাস।' বাংলা অক্ষর দেখে একটু অবাক হবারই কথা। এদিকটায় বাংলার বিশেষ চল নেই—লোকে ব্যবহারও করে না, হিন্দীতেই কাজ চলে যায়। হয়তো আপনার মনে প্রশ্ন জাগবে, অতি আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শনে ঘেরা বাড়ীটি মন্দির কি না। হঠাৎ হয়ত খস খস নাকরাই জুতোর শব্দে সচকিত হয়ে উঠবেন আপনি। দেখবেন কোন রাজপুতানী বালা ঘাগরার ঢেউ তুলে আর ওড়নীর পাখা মেলে এগিয়ে আসছে আপনারই দিকে। আপনি হয়ত প্রশ্ন করবেন বাড়ীটা মন্দির না কি ?

পরিষ্কার হিন্দীতে অথবা রাজপুতানী হিন্দীর সংমিশ্রণে এক অপরূপ ভাষায় মঞ্জুভাষিণী রাজপুতানী বালা যা উত্তর দেবেন তার সার মর্ম্ম এই যে—হ্যাঁ বাবুজী, মীরাজীর কুটিরও বলতে পারেন, ধর্মশালাও বলতে পারেন, পার্থসারথির ছোট্ট মন্দির তো বটেই। তার পর রাজপুতানী বালা সনির্বন্ধ অনুরোধ করবেন আপনাকে সপরিবারে তাঁদের ধর্মশালায় উঠতে। মনোহারিণী পরিবেশ দেখলে আপনার মন চাইবেই ওই পান্থশালায় উঠতে, আর গাঁটের পয়সা যদি খরচ না করে 'সঞ্চয় করতেই আপনি একান্ত যত্নশীল হন তা হ'লে তো কথাই নেই। আপনার পোটলা নিয়ে আপনি হয়তো এসে উঠলেন পার্থসারথি নিবাসে। প্রথমেই আপনার চোখ পড়বে উদ্যানসংলগ্ন একটি মন্দিরের প্রতি। কোন বাহুল্য নেই—শান্ত পরিবেশে শুধু সুন্দর পবিত্র একটি ছোট মন্দির। পার্থসারথির বিগ্রহ—দেখলে মনে হবে এ তো মূর্ত্তি নয়—জীবন্ত—পার্থের রথের রশি ধরে উন্মত্ত অশ্বকে স্থির করছেন পার্থসারথি। শঙ্খ, সুদর্শন চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ পার্থসারথির শ্যাম মূর্ত্তি আপনার মনে ভক্তিরসের উদ্রেক করবেই। আপনি মালিকের প্রশংসা না করে পারবেন না। মন্দিরের সামনে প্রকাণ্ড বারান্দা, জানবেন সেখানে ভজন গানের প্রভাতী ও বৈকালী আসর জমে প্রতিদিন। এবারে চোখে পড়বে এক দিকে পান্থদের জন্য সারি সারি ঘর—ডানদিকের সারিবদ্ধ ঘরগুলো পার্থসারথি নিবাসের নিবাসিনীদের।

দুঃস্থা বিপন্না রাজপুতানীরা এসে জুটেছে এখানে, পেয়েছে পরম নির্ভর। রাজপুতানী বালার মুখে এও জানবেন যে, সঙ্গীতপ্রিয়া বিপন্নাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল এটি। মীরাজী এদের পরম নির্ভর—বিপুল অর্থের অধিকারিণী মীরাজী সব দান করেছে পার্থসারথি নিবাসে। শহরের যান্ত্রিক কোলাহল থেকে বহু দূরে এসে ভুলে যেতে বাধ্য যে এই যুগের মানুষ আপনি। এবারে রাজপুতানী বালা নিয়ে যাবে আপনাকে ম্যানেজারের কাছে। বৃদ্ধ বাঙালীর সৌম্য মুখের প্রশান্তি আপনাকে কি যেন একটা কথা মনে করিয়ে দেবে, কোথায় যেন দেখেছিলাম ঠিক মনে করতে পারছি না। স্মৃতির কার্পণ্য আপনাকে কিছুতেই মনে আনতে দেবে না সেই মুখ।

এবারে মালিকানীর সঙ্গে পরিচয় হবেই। মীরা মহলে প্রবেশের আগে হয়ত ক্ষীণ সুর আপনার কানে ভেসে আসবে "মীরা কহে প্রভু গিরিধারী নাগর···এ যে চেনা অতি-চেনা পরম পরিচিতের সুর। উগ্র কৌতূহলের প্রাবল্যে পুরু পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়বেন আপনি সেই কক্ষে—সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে তানপুরায় চাঁপার কলির মত হাত বুলিয়ে চলেছে এক নতাননা শুক্লাম্বরী। আপনাকে দেখেই তানপুরা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে হয়তো তিনি বলবেন "নমস্তে বাবুজী, মেহেরবাণী করকে আইয়ে"। চশমার কাচটা আরেক বার ভালো করে মুছে নাকের কাছে ঠিক করে ফিট করে আপনি এবারে হয়তো খুব ভালোভাবে দেখবেন তাকে—চিনবেনও ; তারপর ইউরেকা বলে চীৎকার করতে গিয়ে হয়ত আপনার গলা দিয়ে বাংলাতেই বেরিয়ে আসবে একটি পরিষ্কার শব্দ "নমস্কার" !

কৌতূহল দমনে ব্যর্থ হয়ে আপনি হয়ত বলবেনই আমতা আমতা করে আপনিই, আপনি সু···পরিষ্কার বাংলায় উত্তর পাবেন "আজ্ঞে না," আপনি ভুল করছেন—আমি মীরা—পার্থসারথির দাসী। ব্যস, আপনার সব কৌতূহলে ছাই চাপা পড়বে এক নিমেষে ! ভগ্ন মনোরথে ফিরে আসবেন পান্থশালায় আপনার নিভৃত কক্ষটিতে। যদি মীরাজীর সঙ্গে আপনার আলাপটা জমে বেশ গাঢ় হয় তবে শুধু যদি আপনি এই প্রশ্নটিই করেন তাঁকে—"আচ্ছা, আপনি সংসার থেকে বিদায় নিয়ে এভাবে অনাসক্ত সেবিকার মত কালাতিপাত করছেন কেন ?" তাহলে যা উত্তর পাবেন তা-ও আমার জানা আছে। কারণ শেখানো ময়নার মত একই বুলিতে তিনি বলে যাবেন—"জীবনে পরিপূর্ণতা এলে আপনিই আসে অনাসক্তি—অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে। আমি যে পরিপূর্ণ যা চেয়েছিলে তার প্রতিটি কণায় পূর্ণ হয়েছে আমার জীবন-রসের পেয়ালা—তার পর সেই পূর্ণ পেয়ালার রস আপন হাতে ফেলে দিয়ে এখানে চলে এসেছি। আপনাদের জীবনে পূর্ণতা আসেনি—যা চেয়েছেন তার সিকি ভাগও পাননি—পেলে আরও চেয়েছেন, তাই আপনাদের আসক্তির অন্ত নেই।"

তত্ত্বকথা শুনিয়ে মিষ্টি হাসবেন তিনি, মধুর শ্রী ছবি

পড়বে তাঁর সৌম্য আননে—তার পর আপনাকে ভাবনার অবকাশ দিয়ে তিনি চলে যাবেন আপনারই অলক্ষ্যে। অজান্তে আপনার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসবে হয়তো, মনে মনে বলবেন, মা গো, আর কত রঙ্গ দেখবো বল ?

যাক্—আপনার সব অসুবিধেই তো আমি দূর করলাম…ইচ্ছে করলেই আপনি এবারে সার্থক অবকাশ যাপনের প্রয়াসে পাড়ি জমাবেন মাউন্ট আবুর নিঃঝুম নিরালায়।

ভাবছেন তার সঙ্গে আমার কি যোগাযোগ। রঙ্গময়ী রঙ্গকথা শোনাতে বসিনি। তাহলে আমার কথাই শোনাতে হয়।

নিজের পরিচয় দিতে গেলেই কুণ্ঠিত বোধ করি আমি। আমাকে হয়ত অনেকেই চেনেন। কারণ, সিনেমা সঙ্গীত-জগতের তথ্যসম্বলিত স্বনামধন্য পত্রিকা ছায়া ও কায়ার সাংবাদিক সুদর্শন চট্টোপাধ্যায়কে আজও অনেকেই চেনে। আমার সাংবাদিক জীবনটা বর্ত্তমানে আমার বোঝাস্বরূপ। দিনের পর দিন চিত্রতারকা ও নেপথ্যসঙ্গীত-শিল্পীর সাক্ষাৎকার ও ভুয়ো-জীবনীর মিথ্যা সমাচার লিখতে ও পাঠকসমাজের কাছে পরিবেশন করতে করতে আমার জীবনে এসেছে অপরিসীম অবসাদ ও ক্লান্তি। থাকতাম ছোট্ট মফঃস্বল সহর বসিরহাটে, সেখান থেকে বি, এ পাশের পর এম, এ পাশ করলাম কলকাতা থেকে। অনেক দিন বসেছিলাম বেকার হ'য়ে। তারপর অনেক চাকরী করেছি আর অনেক ছেড়েছি খামখেয়ালীর মত। বছরের পর বছর ঘুরে গেল—শেষে বহুদিন বাদে স্থায়ী চাকরী মিললো জনৈক আত্মীয়ের গায়ে পড়ে উপকার করতে যাওয়া স্বভাবের গুণে।

ছায়া ও কায়া তখন বাজারের সবে উঠতি বই। তার মাদ্রাজ প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হলাম আমি। পাঁচ বছর কাটালাম সেখানে। প্রথমে খুব খারাপ লেগেছে ষ্টুডিও, সেট, চিত্রতারকার বাড়ী, গায়ক-গায়িকার সন্ধানে রোদে দগ্ধ হওয়া ও বৃষ্টিতে ভেজা অসহ্য মনে হয়েছে। কিন্তু সময়ের প্রলেপে মনের সেই অসহনীয়তা গেছে চলে—নীরস সাক্ষাৎকারের সবটুকু গরল নিঃশেষে পান করে অসংখ্য মিথ্যে কথার ফুলঝুরিতে ও ভাষার কেরামতিতে সরস অমৃত পরিবেশন করে আসছি পাঠক সমাজের কাছে। সুদূর মাদ্রাজে বসে ইতিমধ্যেই কানে এসেছে কোন এক নেপথ্যগায়িকা সুরঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার সঙ্গীতাকাশে ধূমকেতুর মত আবির্ভূতা হয়ে চাঞ্চল্য জাগিয়েছেন। তাঁর চটুল গানের চুটকি টান পাড়ার ফেলকরা বখে-যাওয়া বকে জটলা পাকানো ছেলেদের মুখে মুখে—অথচ আশ্চর্য্য, তিনি নাকি শুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে গীতশ্রী উপাধি প্রাপ্তা—বহুদিনের সাধনার ফলে তিনি কোকিলকণ্ঠের অধিকারিণী—ইত্যাদি।

সবটা বিশ্বাস করতে পারিনি। কারণ, বিশ্বাস জিনিষটা বহুদিন হোল হারিয়েছি। আমি নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারি না, কেমন করে অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক গায়িকাদের জীবনের মিথ্যাটা টেনে নিয়ে তাতে মিথ্যের প্রলেপ অতিমাত্রায় চড়িয়ে সরল পাঠকদের প্রতারণা করি আমি? মাদ্রাজে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেম ভালই—হঠাৎ ওপরওয়ালার আদেশ এলো—আমার লেখা পাঠকের মনে চাঞ্চল্য জাগিয়েছে, বাংলাদেশ চাইছে আমাকে—সুতরাং আমার ও কলকাতার প্রতিনিধির স্থান বদল হবে। আদেশ শিরোধার্য্য করলাম। আমার পক্ষে সব সমান—তিনকুলে যার এক পিসী ছাড়া কেউ নেই তার আর বন্ধন কোথায়? এলাম কলকাতার কোলাহলের মুখরতায়। সম্পাদকের হুকুম হোল সুরঙ্গমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার বেশ জোরালো ভাষায় রসালো করে তুলতে হবে—সঙ্গে কয়েকটা ছবি দিতে পারলে তো কথাই নেই—একদিনে সব বই বিক্রী হয়ে যাবে, পাবলিক ওঁকে দেখতে উৎসুক কিন্তু নেপথ্য-গায়িকা আকণ্ঠ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে জনসমাজের নেপথ্যেই রয়েছেন তাঁকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে খুব কম লোকের। অগত্যা সম্পাদক আগের থেকেই ফোন করে সময় ঠিক করে নিলেন। তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমি ও ক্যামেরাম্যান বেরিয়ে পড়লাম সুরঙ্গমা দেবীর উদ্দেশে। যাবার পথেই সম্পাদক ডাকলেন—শোন সুদর্শন, বেশ ভালো করে প্রশ্ন করবে, উনি খুব খারাপ ব্যবহার করেন শুনেছি—আর—আর একটা কথা হোল ছবি তোলার আপ্রাণ চেষ্টা কোরো—আর দেখো, ভঙ্গিমাগুলো যেন বেশ মনোলোভা হয়। ভদ্রমহিলা অপরূপ সুন্দরী কিন্তু পাবলিককে দর্শন দেন না বলে ওদের ধারণা উনি দারুণ অহঙ্কারী।

যাবার মুখেই বাধা পেয়ে আর এই সব কথা শুনে গেলাম ভড়কে। দুর্গানাম জপতে জপতে বেরিয়ে পড়লাম সুরঙ্গমা দেবীর হিন্দুস্থান পার্কস্থ প্রাসাদের উদ্দেশে।

বাড়ীর সামনে এসে সত্যিই মনে জাগলো প্রবল ভীতি। নিশ্চয় অনিশ্চয়তার দোলান চিত্তবৃত্তিতে আমি দোদুল্যমান। বছর তিনেক হোল মেয়েটি উঠেছে কিন্তু এর মধ্যেই এত যশ, এত প্রতিপত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য?

প্রাসাদোপম অট্টালিকায় প্রবেশের মুখেই দরোয়ানের বাধা পেলাম। কার্ডটা দরোয়ানের হাতে দিলাম—দরোয়ান ফিরে এসে বললো, মেমসাহেব এখন গলা সাধছেন, তারপর ভার্গব সাহেবের সঙ্গে বাইরে যাবেন, সুতরাং দেখা হবে না।

দেখা হবে না ভেবে নিরাশ হওয়ার চেয়েও সম্পাদকের দাঁত খিঁচুনির ভয় অনেক। দাঁড়িয়ে আছি নিশ্চুপ হয়ে কর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত দূর থেকে কানে ভেসে এল "মীরা কহে প্রভু"···আর সঙ্গে তানপুরার ক্ষীণ রেশ। হঠাৎ থেমে গেল গান। আমরাও ফিরে চললাম আশঙ্কা নিয়ে। গেটের বাইরে আসতেই পেছন থেকে একটি বেয়ারা এলো ছুটতে ছুটতে। শুনুন—মেমসাহেব আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি ও ক্যামেরাম্যান অমল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। বড়লোকদের, বিশেষ করে চিত্রজগৎ সংশ্লিষ্ট লোকদের মন বোঝা ভার। আবার ফিরে এলাম, হঠাৎ দেখলাম দ্বিতল থেকে একটি নারী মূর্ত্তি সরে গেল। এসে বসলাম সুসজ্জিত বসবার ঘরে। দুটো প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান কুকুর শিকল দিয়ে বাঁধা—মনে হচ্ছে এই মুহূর্ত্তে লোহার বাঁধন ছিঁড়ে টুঁটি চেপে ধরবে আমাদের। আজ কি অমঙ্গল যাত্রা হোল, প্রথমে বিতাড়িত হয়ে পরক্ষণেই আহূত হ'লাম—এবারে না জানি বিচিত্ররূপিণী দেবীর হাতে কি অপমানের চূড়ান্ত ঘটবে। বসে আছি তো বসেই আছি। প্রায় আধ ঘণ্টা পর দামী ফরাসী সেন্টের উগ্র সৌরভ দেবীর আবির্ভাবের পূর্ব্বাভাস সূচনা করলো—দামী পর্দা ঠেলে জুতোর হিলের শব্দ তুলে আবির্ভূতা হলেন দেবী। উগ্র প্রসাধন ও দামী সাড়ীর চাকচিক্য দেবীর রূপের সবখানি হরণ করে তাঁকে শোকেসের পুতুল সাজিয়ে তুলেছে। তিনি রক্তলাল দীর্ঘ নখরশোভিত হাত তুলে নমস্কার করলেন। মনে হোল সদ্য কারো বুক চিরে এসেছেন সুতীক্ষ্ণ নখরের তীব্র আঘাতে। গলাটা শুনে চমকে উঠে ভালো করে মুখের দিকে তাকালাম—কেমন যেন একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে মুখটা ফিরিয়ে নিলেন তিনি।

প্রতি-নমস্কারের কথা ভুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম আরে রঙ্গিলা যে, তুমি? আমি তো চিনতেই পারিনি তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ। কিন্তু তুমি গান···সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে আমার।

দেবী উদ্ধত স্বরে বলে উঠলেন—আমি রঙ্গিলা নই, সুরঙ্গমা বন্দ্যোপাধ্যায়। পথে ঘাটে অসংখ্য লোকের সঙ্গেই তো দেখা হয় কিন্তু সকলকে মনে রাখতে যাওয়া বাতুলতা নয় কি? তাছাড়া সকলকে মনে রাখা আমার নেশা বা পেশা নয়। ভদ্রতার মাত্রাটা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন না কি? সম্বোধনটা তুমি নয় আপনি, বুঝলেন? যত সব অর্ব্বাচীন·····

দেবীকে কথা শেষ করতে দেবার আগেই আমি কথা লুফে বলে উঠলাম মাপ করবেন! কারণ আমাকে সব অপমানই হজম করতে হবে। সব গরল নিঃশেষে পান করে আমাকে হতেই হবে নীলকণ্ঠ। আমার করুণ মুখটা দেখেই বোধ হয় দেবীর দয়া হোল। তিনি স্মিত হেসে বললেন কি ব্যাপার? তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ক'রে তারপর খুব রসিয়ে সেটা আপনাদের কাগজে ছাপাবেন তো? উঃ অসহ্য! আরো দুবার বারণ করেছি কিন্তু আপনাদের সম্পাদক মশাই একেবারে নাছোড়বান্দা—জোঁকের মত ধরেছেন, ছাড়ার নাম নেই। আচ্ছা ঠিক আছে।

আবার হেসে উঠলেন তিনি, উচ্ছল সে হাসি। লাল ঠোঁট ফাঁক করে এক সারি সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়লো—এক ঝাঁক পায়রা যেন। আমাদের বসতে বলে তিনি সাড়ীর আঁচল উড়িয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

আমি তো অবাক! প্রসাধনের প্রলেপে সেই মুখ অনেক বদলেছে—তাছাড়া প্রায় বছর দশেকের ব্যবধান তো বটেই। একটা সরল নিষ্পাপ মুখ ভেসে উঠলো মানসপটে—তার পাশে এই লাস্যময়ী রূপ বড় কুশ্রী বড় নির্লজ্জ বড় হীন। তবু ঠিক সেই মুখের আদল কি অস্বীকার করা যায়?

ক্যামেরাম্যান অমল বলে উঠলো—দাদা, আপনি এমন চমকে উঠে রঙ্গিলা নামে ডাকলেন যে? চেনেন নাকি?

না—না—অসম্ভব ভুল করে বোকা বনে গেলাম, দেখলেন না? বাপ রে বাপ, এ যেন ফণাতোলা অজগর—বলতেই হোল আমাকে।

রঙ্গিলা নামে একটি মেয়ের নিষ্পাপ অনাঘ্রাত কুসুমের মত

ত্র মুখ ভাসছে আমার চোখে—তার পাশে আমার ছোট বোন ক্ষণার তুষ্টু হাসিটি। আজ প্রায় বছর ছয়েক হোল সে চলে মৃত্যুর ওপারে কিন্তু তার মিষ্টি হাসিটি একটুকু ম্লান হয়নি ার হৃদয় থেকে। আমার চিন্তার জাল ছিন্ন করে দিয়ে শ করলেন তিনি। সঙ্গে বেয়ারার হাতে সরবত ও মিষ্টি। যে দেবীর মুখে অনেক কোমলতা এসেছে, অনেক শান্ত হয়েছে ত নাগিনী। দেবীকে তুষ্ট করার জন্য সদ্ব্যবহার করতে হোল বত ও মিষ্টির।

সুরঙ্গমা দেবী বললেন—আমার জীবনী জানতে এসেছেন তো? কি হবে, কবে জন্মেছি কোথায় ছিলাম ইত্যাদি স্থানকালের াব নিয়ে? জন্মের তারিখ সাল জানাতে গেলেই তো মিথ্যে তে হবে অন্যদের মত। তার চেয়ে বরং একটা গল্প শুনবেন? টি গান না জানা বেসুরো গলার কি করে সুরের সঞ্চার হোল? পনারা হয়ত ভেবেছেন, জন্মগত প্রতিভা নিয়ে এসেছি আমি—নক কাগজেও তাই লেখে দেখি, কিন্তু আপনারা ভাবতেই রবেন না—

আমি তো বেশ ভাবতে পারছি—ভাবতে না পারাটাই আমার ক আশ্চর্য্যজনক—কথার মাঝে হঠাৎ বলে উঠলাম আমি।

থামুন তো আপনি—একসঙ্গেই বলে উঠলো অমল ও সুরঙ্গমা।

আচ্ছা—যা বলছিলাম। বলতে সুরু করলেন সুরঙ্গমা ন্দ্যাপাধ্যায়—জন্মগত প্রতিভা নিয়ে আসে অনেকেই কিন্তু আমি দের দলে নয়। আমি এসেছিলাম এমন গলা নিয়ে যেখানে রের রেশ মাত্র ছিল না। অনেক ছোটবেলায় বেসুরো গলায় াবৃত্তির সুরে গেয়ে গেছি রবীন্দ্রনাথের গান, ভাবতাম বেশ ভালো ান গাইতে পারি আমি। তারপর একটু একটু করে বড় হতে য়ে যেন নতুন করে উপলব্ধি করলাম আমার গলায় সুর নেই। বু নির্লজ্জের মত একটানা আবৃত্তির সুরে গান গেয়ে গেছি। বার শিক্ষক রাখা হয়েছিল, তাঁরা বাধ্য হয়ে চলে গেছেন, বাবাকে ল গেছেন আপনি ওঁকে অন্য কিছু শেখালেই ভালো হয়—ওর লায় সুর আসবে না—বড় বেসুরো গলা। তারপর ধীরে ধীরে মার বেসুরো গানের একমাত্র পরিধি হোল বাথরুম।

বন্ধু মহলে সর্ব্বক্ষণ টিট্‌কারী শুনেছি আর হাস্যাস্পদ হয়েছি। বু বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইনি। কারণ অন্য গুণ আমার ছিল। সাধারণ মেধা ছিল বলে স্কুলের শেষ সোপান অতিক্রম করেছি সম্মানে। ছোট মফঃস্বল সহর বসিরহাটের কলেজে ভর্ত্তি হ'লাম মি। প্রত্যেক অধ্যাপক অধ্যাপিকা উজাড় করে দিলেন স্নেহ। তিমধ্যে আলাপ হোল সুদক্ষিণার সঙ্গে। জানেন অমলবাবু, দক্ষিণার সঙ্গে আলাপ না হ'লে আজ হয়ত আমার গান আপনারা নতেই পেতেন না। কারণ অনেক সময় লাঞ্ছনা মানুষের বনের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেয়। অবশ্য সে ধরণের লাঞ্ছনাকে উপকারই বলতে হয়। যেমন আমার ক্ষেত্রে হোল। সুদক্ষিণা লতো তুই গান জানিস? জানি না জেনে একদিন অবাক হয়ে গয়েছিল সে। বলেছিল দূর! দূর! পড়াশুনা করে কি হবে, ান শেখ, অনেক ভালো; মনকে অনেক তৃপ্তি দেবে।

সে আমাকে গান শেখাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হোল। তার মিষ্টি রিন-রিনে সুরেলা গলার পাশে আমার গলাটা আরো বেসুরো শানালো। সুদক্ষিণা আমার বেসুরো গলাকে টিটকারী দিয়ে বললো, এমন সুন্দর মুখ দেখে কেউ যদি বা ভোলে, অমন বেসুরো হেঁড়ে গলা শুনলেই সে ভাগবে। স্থূল নির্লজ্জ অপমানটা বড় বেশী লাগলো মনে। নির্বিকার জীবনে নামলো প্রথম আঘাত। বাইরের থেকে কিছুটা ভুলতে চাইলাম কিন্তু পারলাম কই? সুদক্ষিণার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হোল। ওদের বাড়ী গেলাম। ওর দাদাকে দেখলাম। কেমন যেন সব তোলপাড় হয়ে গেল। এতদিনের শান্ত জীবনে এল আকস্মিক ঝড়। জীবনে এই প্রথম ভালো লাগলো একজন মানুষকে। সতেরো বছরের কিশোরী মন নিয়ে আমি বার বার গেলাম তাদের বাড়ী, একটা বিচিত্র সম্মোহনী শক্তির তীব্র আকর্ষণে। কখনো খামখেয়ালী কখনো গম্ভীর কখনো বাচাল লোকটার মন মেলা ভার। কিন্তু মোহাবিষ্ট মন আমার ভুল করলো। রূপ বা অসীম মেধাই সবসময় সকলকে আকর্ষণ করে না, মানুষের চাওয়ার সীমা নেই, যা পায় তাতে তার নেই তৃপ্তি, বাড়তি পাওনাও চাই তার।

সুদক্ষিণাকে বলে ফেললাম সব মনটা হাল্কা করতে গিয়ে। আশ্চর্য্য হয়ে গেল সে, বললে তোর মাথা খারাপ? দাদা আমার গান-পাগল—গান না শুনে কাউকে তার ভাল লাগতেই পারে না; রূপজ মোহ আমার দাদার নেই, মোহ তার শুধু গানের প্রতি। তবু আমি বলবো তোর মনের কথা দাদাকে।

এবারে এলো দ্বিতীয় আঘাত। বুঝলাম বামন হয়ে আমার চাঁদ ধরার সাধ জেগেছে। আবার একদিন গেছি সুদক্ষিণার বাড়ী। দেখলাম সে বাড়ী নেই। ওর দাদা আমাদের কত মজার গল্প বলেছে, ফাজলামী করেছে, তত্ত্বকথা শুনিয়েছে কিন্তু আজ আমাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল। চলে যাচ্ছিলাম হঠাৎ ডাকলো, শুনে যাও। দুরু-দুরু বুকে এগিয়ে গেলাম তার কাছে। সে বললো, তুমি কি বলেছ সুদক্ষিণার কাছে? ওঃ এইজন্যই বুঝি আমাদের বাড়ী আসা চাই প্রতিদিন? আজ বুঝেছি কি জঘন্য তোমার মনোবৃত্তি। রূপের ডালি নিয়ে সকলের মন হরণ করা যায় না, বুঝলে? তুমি নাকি সুদক্ষিণাকে বলেছ গান শিখে নেবে? এক বিকট হাসি হাসলো সুদক্ষিণার দাদা। বললো সব কিছু করা যায়, মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ করা যায়, কিন্তু গান? বেসুরো হেঁড়ে গলায় সুর আসবে মনে কর? গান জন্মগত প্রতিভা—জন্মের সঙ্গেই শিশু নিয়ে আসে সঙ্গীতের সুর, তাকেই মেজে ঘসে নিতে হয় বুঝলে? কিন্তু তোমার দ্বারা তা হবে না। নির্লজ্জ মেয়ে! সেদিন এল তৃতীয় ও শেষ আঘাত। কান দুটোতে মনে হোল কে যেন গরম সীসা ঢেলে দিচ্ছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই, অপমানের গ্লানিতে জ্বলে যাচ্ছে সর্ব্বাঙ্গ।

চুপ করুন, চুপ করুন বলে চীৎকার করে উঠলাম আমি। তারপর মুখটা আপনিই কঠিন হয়ে উঠলো, একটা জলন্ত দৃষ্টি ঠিকরে বেরিয়ে এল আমার চোখ থেকে। ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে থামলো সুরঙ্গমা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার চুটকি গান শোনা যায় সস্তা রেস্তোরাঁর ভাঙা গ্রামোফোনের ঘড় ঘড় আওয়াজ সত্ত্বেও প্রাসাদোপম বাড়ীগুলিতে, পূজামণ্ডপে অনুষ্ঠানে, সিনেমায়। সুরঙ্গমা থামলো। মুখটা করুণ হয়ে এসেছে তার। স্পষ্ট লক্ষ্য করা গেল তার ভাবান্তর, মুখের অভিব্যক্তি অনেক বেশী কোমল। সেই উদ্ধত নাগিনী কি হারিয়ে গে এক মুহূর্ত্তে?

আমি ভাবছি, বছর দশেক আগের একটা সন্ধ্যার কথা। রঙ্গিলাকে ভুলেছি কিন্তু ভুলতে পারিনি ওই অগ্নিক্ষরা চোখের দৃষ্টি। মনে হয়েছিল ওই দৃষ্টি দিয়ে সে দগ্ধ করতে পারে সকলকে। সত্যিই এখন পারছে সে, প্রথমেই বুঝেছি তার দাহশক্তি আছে। সুরঙ্গমা আমার দিকে চেয়ে বললো, তারপরের ঘটনাটা শুনতে খুব আগ্রহ ও কৌতূহল হচ্ছে, তাই না? তারপর সুরু হোল আমার জীবনের নূতন অধ্যায়। সকলের অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও পড়া ছেড়ে চলে গেলাম লক্ষ্ণৌপ্রবাসী কাকার কাছে। আমার একান্ত অনুরোধে তিনি নিয়ে গেলেন অতিবৃদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ রামকুমারের কাছে। তিনি ছিলেন নীরব সাধক। অনেকেই তাঁকে চেনে না কিন্তু আজকের দিনের অনেক খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ তাঁরই কাছে পেয়েছে সুরের দীক্ষা—কিন্তু উন্নতির শিখরে উঠে গুরুজী তাঁদের মন থেকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু আমার জীবনে সুরের গুরু গুরুজীর আসন সর্ব্বোচ্চে। তাঁর পায়ে কেঁদে পড়লাম। তিনি আশ্বাস দিলেন। তারপর সুরু হোল আমার সাধনা। গুরুজী উজাড় করে দিলেন তাঁর সব সম্পদ। দিনের পর দিন কঠোর সাধনার ইতিহাস না-ই বা শুনলেন—সেখানে তো রস নেই। নীরস উপাদানে তো আপনাদের মন ভরবে না, কি বলেন? তারপর ধীরে ধীরে বেসুরো গলায় এলো সুরের সঞ্চার। কঠোর সাধনার ফলে উত্তীর্ণ হ'লাম সঙ্গীতমার্গের সব বাধা-বিপত্তি। গুরুজী মারা গেলেন আমার হাতের শেষ জলবিন্দু পান করে। তারপর গীতশ্রী হওয়া ইত্যাদি আমার কাছে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়।"

"আচ্ছা, আপনি নেপথ্য-গায়িকা হ'লেন কখন থেকে?" প্রশ্ন করল অমল। আমি তো নীরব, হতভম্ব।

ওরে বাবা, এত গল্প শুনেও আপনাদের আশা মেটেনি? সেই গতানুগতিক প্রশ্নবাণে ঘায়েল করবেনই? তা হ'লে শুনুন। লক্ষ্ণৌতে কোন এক ছবির পরিচালক আমার গান শুনে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর ছবিতে কণ্ঠ দান করতে। চুক্তিবদ্ধ হ'তে দ্বিধা করিনি। অবশ্য কারণ ছিল। অপমানের হুতাশন জ্বলছিল আমার বুকে তখনও, যদি গুরুজীর মত নীরব সাধক হ'তাম তাহ'লে কেউ চিনতো না—জানতো না, বিশেষ একজন তো নয়ই। তাই ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে হতবাক্ করে দিলাম সবাইকে। চুটকি গানের টানে ঘায়েল হচ্ছে আজও অসংখ্য লোক। বোম্বে থেকে ডাক এলো—গেলাম, এখনও যাচ্ছি। কিন্তু আর নয়। যা চেয়েছি সব পেয়েছি। যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি—যা মানুষের পার্থিব কামনা। আবার হেসে উঠলো লাস্যময়ী গায়িকা।

অমলের মন এখনো ভরেনি, সে বললো—"কেন আপনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও ভজন পরিবেশন না করে চটুল সঙ্গীতের আশ্রয় নিয়েছেন?"

উত্তর এলো—"গুরুজীকে অপমান করতে মন চায়নি তাই। নিভৃতে আমি গুরুজী-প্রদত্ত রাগ-রাগিণীর আলাপ করি কিন্তু বাইরে নিজেকে সে গানে প্রকাশ করার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি তাঁর কাছে চিরঋণী। গুরুজী বলতেন, সঙ্গীত সাধনা পণ্যদ্রব্যের সামগ্রী নয়। আর তাছাড়া লোকেরা যা চায় তাই দিই, বেণাবনে মুক্তা ছড়িয়ে কি হবে বলুন? আর নয়। এবারে উঠতে হচ্ছে, মিষ্টার ভার্গব অপেক্ষা করছেন। শিল্পীরই চিত্রজগৎ থেকে বিদায় যদি নিতে হয় তবে অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করতেই হবে—চুক্তিবদ্ধ হয়েছি যখন—কি বলেন? খুব রসিয়ে লিখবেন আমার কথা। বাজারে আপনাদের বই খুব বিক্রী হবে।"

"আপনি চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নেবেন?" এতক্ষণে মুখ দিয়ে প্রশ্ন বের'হোল আমার। "হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি? বিদায় নেবো চিত্রজগৎ থেকে, সঙ্গীতজগৎ থেকে তো নয়? বেচাকেনার পাট চুকিয়ে এবারে নিভৃত সাধনা করার বাসনা যদি মনে একান্তই জাগে তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? তাছাড়া অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে আমার। জানেন মশাই, সেই বিশেষ মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে আমার। তাকে জানিয়ে দিয়েছি জন্মগত প্রতিভাই জীবনের একমাত্র সত্য নয়, সাধনাই মানুষকে দেয় সিদ্ধি। আমার কাজ তো ফুরালো এবার। আচ্ছা চলি, বাই বাই!" উচ্ছল ছন্দে চঞ্চল হেসে ছুটলো সুরঙ্গমা দেবী গাড়ীর পানে। ধোঁয়া উড়িয়ে পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে দৃষ্টির অতীত হোল তার নতুন মডেলের প্রকাণ্ড গাড়ী।

যাবার আগে অবশ্য অনেক ছবি তুললো অমল। বিচিত্ররূপে বিচিত্র ভঙ্গিমায় দাঁড়ালেন দেবী পাঠকদের এই প্রথম দর্শন দিতে। তাঁর সৌম্য পিতা সহও ছবি তুললো অনেক। বুঝলাম সুরঙ্গমা দেবীর মাদকতাময় উচ্ছল ভঙ্গিমা পাঠকের মনে চাঞ্চল্য জাগাবেই। যেমন গান তেমন গায়িকার রূপও হওয়া চাই কি না।

ফিরে এলাম। অমল সব বুঝেছে, পথে সে প্রশ্ন করলো—আচ্ছা, আপনিই তো সুদক্ষিণার দাদা? উত্তর দেবার মত কিছু নেই, শুধু জানি বোবার কোন শত্রু নেই।

পরের মাসে 'ছায়া ও কায়া'য় আমার লেখা "সুরের কোয়েলা সুরঙ্গমা" পাঠকের মনে বিন্দুমাত্র রসের সঞ্চার করলো না, শুধু ছবিগুলোর জন্য বইটা নিঃশেষে বিক্রী হয়ে গেল। সম্পাদকের কাছে দাঁত খিঁচুনি জুটলোই, তার গতি রোধ করে কে?

তারপর দিন যায়—মাস যায়—সবই ফুরিয়ে যায়। আমার সাংবাদিক জীবনেও বিরতি নেই। সঙ্গীতাকাশে ধূমকেতুর মত আবির্ভাব হয়েছিল যার, আকস্মিক ভাবে সে গেল মিলিয়ে। সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করে তার গাড়ী বিক্রী হোল, বাড়ী বিক্রী হোল। গোপন রহস্য কিছুই জানলাম না। তারপর শুনলাম, একদিন পিতা সমেত উধাও। কারণ অনেক আগেই মনের তলে জেগেছিল পলায়ন মনোবৃত্তি। আমি শুধু বুঝেছিলাম তার এই জীবনের সবটুকুই অভিনয়। এক সুরঙ্গমার পরিবর্তে সঙ্গীতজগতে আবির্ভূতা হলেন আর এক অনামিকা সেন। তর-তর করে বেয়ে গেল তার জীবন-তরী—তিনি এখন উন্নতির চরম শিখরে। এক কোয়েলা ব্যাধের আঘাতে বিদ্ধ হলে কি বসন্তকাল বৃথা যায়? তবু আজও ঘরে ঘরে সুরঙ্গমার কণ্ঠ বাজে। সঙ্গীতপিপাসুরা ভুলতে পারেন না তার শ্রেষ্ঠ গান "শুধু আলেয়ার পিছে ছুটিয়া মরেছি, আলোর দিশা না পাই।"

তারপর দিন যায়—বছর যায়। বেশ ক'দিনের ছুটি নিয়ে পাড়ি দিলাম মাউণ্ট আবুর পথে। রোমাণ্টিক অনুভূতি নিয়ে নয়, সৌন্দর্যপিয়াসী মন নিয়েও নয়—ভক্তির লেশ নিয়েও নয়। জীবনের প্রৌঢ়ত্বে নিছক মিথ্যার জগৎ থেকে সত্যের জগতে পলায়নের মনোবৃত্তি নিয়ে। সেখানে আবার দেখা হোল পার্থসারথি নিবাসে।

াপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন তারই দ্বারে। আমিও "প্রভুজী মেরে চাকর রাখ" গান শুনে ঠিক চিনেছিলাম। তাকে দেখে বলে উঠেছিলাম—'আরে সুরঙ্গমা দেবী আপনি—?'

"সুরঙ্গমা নই আপনি ভুল করছেন, আমি মীরা।" উত্তর এসেছিল।

এ মূর্ত্তির সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। শ্বেতবসনা যৌবনের শেষ প্রান্তে উপনীতা এই মূর্ত্তি দেখলে শ্রদ্ধায় আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। পিতাকে ম্যানেজার নিযুক্ত করে পার্থসারথি নিবাস চমৎকার চালিয়ে নিচ্ছে স্থানীয় লোকদের মীরাজী। অসংখ্য বিপন্না সঙ্গীতপ্রিয়া রাজপুতানীর মিলেছে আশ্রয় পার্থসারথি নিবাসে। সঙ্গীত শিক্ষা দিয়ে তাদের জীবনকে সজীব করে তুলেছে সকলের প্রিয় মীরাজী। অকৃত্রিম সঙ্গীতের আশ্বাসে তারা ভুলেছে সব দুঃখ। সত্যিই সার্থক হয়ে উঠেছে তার জীবন। কিন্তু এবারেও আমাকে না চেনার ভাণ করেছে সে। শুধু আমাদের প্রশ্নের জবাবে উত্তর এসেছে জীবনে পরিপূর্ণতা এলে আপনিই আসে অনাসক্তি—অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে। আমি যে পরিপূর্ণ যা চেয়েছিলেম তার প্রতিটি কণায় পূর্ণ হয়েছে আমার জীবনরসের পেয়ালা—তারপর সেই পূর্ণ পেয়ালায় রস আপন হাতে ফেলে দিয়ে এখানে চলে এসেছি। আপনাদের জীবনে পূর্ণতা আসেনি—যা চেয়েছেন তার সিকিভাগও পাননি, পেলে আরো চেয়েছেন; তাই আপনাদের আসক্তির অন্ত নেই।

তারপর শুভ্রবসনা বিলীন হয়ে গেছে দৃষ্টির সামনে থেকে। আর দেখা মেলেনি। রাজপুতানী বালা এসে স্নিগ্ধ পরিচর্য্যা করে গেছে মীরাজীর আদেশানুসারে। শুধু দূর থেকে উপলব্ধি করেছি তার অস্তিত্ব। দূর থেকে শুনেছি জ্ঞান-গানের মধ্য দিয়ে ঝরে পড়া দাসী মীরার সকরুণ মিনতি, বিশুদ্ধ রাগিণীর মূর্চ্ছনা সুন্দর, মধুর ও অপরূপ। অনুভব করলাম আলেয়ার পিছনে ছুটে এত দিনে আলোর সন্ধান মিলেছে তার।

ছুটীর মেয়াদ ফুরাতেই ফিরে এসেছি আপন কাজে। এখনো আমার অসংখ্য গায়ক-গায়িকা ও চিত্রতারকাদের সাক্ষাৎকারের বিবরণী লিখতে হয় অলীকের মায়ার প্রলেপ বুলিয়ে পাঠকের মনে রস পরিবেশন করে।

শুধু যখনই মনে করি জীবনের একবারের ব্যর্থতা যেখানে মিথ্যার আস্তরণ পড়ে নি, ভাষার চাতুরী আসে নি, তখনই মানস-পটে ভেসে ওঠে পাঠকদের করুণ মুখ। আহা! বড় আশা করেছিল তারা কিন্তু আহা, নিষ্করুণ কঠিন ও নীরস ভাষা ও সত্যের নগ্নতা বড় প্রবল হয়ে বিঁধেছিল তাদের বুকে। কারণ প্রতারণাতেই যে অভ্যস্ত তারা। কিন্তু পারি নি—রঙ্গময়ীর রঙ্গকথা শোনাতে পারি নি। একটি মেয়ের ত্রয়ীরূপ রঙ্গিলার আটপৌরে নিত্য ব্যবহার্য ঘরের প্রদীপের রূপ একটু উস্কে দিলেই যে জ্বলে ওঠে, স্তাবকের দলে বেষ্টিতা সুরঙ্গমার দাহশক্তিরূপী অগ্নির ঝলক ও মীরার তুলসীতলায় সাঁঝের প্রদীপের স্নিগ্ধ দ্যুতি কি আমি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারি? এ যে আমারই লজ্জার ইতিহাসে রাঙানো। আমার জীবন-রঙ্গমঞ্চে সুরঙ্গনা ত্রয়ীরূপে যে রঙ্গ দেখিয়ে গেল, তা একান্তই আমার।

## চিরন্তনী

### প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়

দিশাহীন সমুদ্রের মাঝে
একটি দ্বীপের মত তুমি,
জেনেছি তোমাকে
নিরাশার অন্ধকারে দীপশিখা সম।
অনাদি অতীত নিরবচ্ছিন্ন কালের প্রবাহে
অণু-পরমাণুর মত চিরন্তনী তোমার আকর্ষণ।
রসে-রূপে-বর্ণে-গন্ধে চির পরিব্যাপ্ত
তোমার প্রকাশ।
পাখীরা করেছে ভীড়
পত্রপল্লব-পরিবৃত গাছের ডালে ডালে।
তাদের কলকাকলির মাঝে
তোমারই অন্তরের ধ্বনি শুনতে কি পাই?
বিচিত্র বর্ণের ফুলের গোপন গন্ধে
হই উন্মনা তোমারই ভাবনায়।
শ্বেত-পারাবত মন আমার
চলে ভেসে আকাশের নীলে নীলে।
মগ্ন তপস্বী রাত্রির তারাভরা মহাশূন্যে
থাকে জেগে তোমারই প্রেমের বাণী,
অবিরত ধাবমান চঞ্চল জীবনের স্রোতে
সেই শুধু চিরন্তনী।

## বসন্ত

### শ্রীবেলা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকে পাখীর গুঞ্জরণে
শুনতে পেলেম বসন্তের সম্ভাষণ
আমার চোখে রাঙিয়ে দিল
নীল স্বপনের আলিম্পন।

আবেশ মাখা সন্ধ্যাকালে
চাঁপার কলি যায় যে ক'য়ে
মলয়ার কানে কানে
ফুটল যে ফুল আঙিনাতে
বিফল না যায়—আজকে রাতে।

আজকে মনের কোল ছেয়ে
উঠল চাঁদ নীল আকাশে
জ্বালল বুঝি হাজার প্রদীপ
তোমার আমায় মধুর রাতে,
লাজুক বকুল পড়বে কি ঝরে,
তোমায় আমায় বাসর ঘরে।

আজ পলাশ-বনে পুষ্প এলো কি সম্ভারে
মুগ্ধ আমি দেখছি চেয়ে
সরম ছোঁওয়া কাঁকণ বাজে তোমার হাতে
বারে বারে অনুরাগে।

# পাঁশকুড়া লোক্যাল

সঙ্কর্ষণ রায়

পাকা ধানের সোনালি সমারোহের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে পাঁশকুড়া লোক্যাল। ইঞ্জিন-ড্রাইভার ভবেশ বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। শিশিরে মাজা স্বচ্ছ সকাল রেল-লাইনের নীচে কাশফুলের শুভ্রতায় প্রতিফলিত। এক বছর আগেকার এমনি সব সকাল ঘুটকু ও বিলাসপুরের মাঝখানকার ঢেউখেলান মাঠে সোনালি প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফুটে উঠত পুব আকাশ থেকে ঝরে পড়া প্রথম আলোর স্পর্শে—কাটনি-বিলাসপুরের প্যাসেঞ্জার ট্রেণটি তখন বিলাসপুরের নিকটবর্ত্তী হ'ত। সে সব দিনের রঙ আজ আলোয় ভরা শরতের সকালেও খুঁজে পায় না ভবেশ। তার চোখে এই দিনটি আর যে কোনও দিনের মতই বিবর্ণ ও বিরস। নিষ্প্রাণ একটা দৃশ্যপট ট্রেণের গতির সঙ্গে যেন দু'পাশে সরে যাচ্ছে—তার মনের কৌতূহল উদ্রেক করার মত কিছুই যেন নেই কোথাও। সে দেখছে, অথচ দেখছে না।

অথচ এক বছর আগে খোঙ্গ্রি ও খোংগসারার মাঝখানে ঘন বনে ছাওয়া পাহাড়, বেলঘনার বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত তার চোখে কত জীবন্ত ছিল। তার প্রতিদিনের অস্তিত্বে নানা রঙে রঙিন পটভূমিকা রচিত হত শালের আকাশছোঁয়া ঋজুতায়, সেগুলোর বড় বড় পাতার আন্দোলনে। ট্রেণ বিলাসপুরের দিকে এগিয়ে যেত ওয়ার্কারদের কোয়ার্টারগুলোর মাঝখান দিয়ে—ড্রাইভিং রড ঘুরিয়ে গতি নিয়ন্ত্রণ করতে করতে সে একবার নিজের কোয়ার্টারটির দিকে তাকাত—মেহেদীর বেড়ার আড়ালে বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তির শেষে বিশ্রামের স্নিগ্ধ আশ্বাস ফুটে উঠত। এক অবর্ণনীয় সুখে তার মন ভরে যেন!

রোজই মেহেদীর বেড়ার সামনে এসে দাঁড়াত বীরু ও মীনা—দু' ভাই-বোন হাত ধরাধরি করে। সদ্য ঘুমভাঙা দু'খানি কচি ফুটফুটে মুখ ফুলের মত ফুটে থাকত গেটের সামনে। তাকে দেখে তারা হেসে হাত নাড়ত। সে হাসির ইঙ্গিতেই বুঝি ভোরের সূর্য উঠত।

মেহেদীর বেড়া হয়তো এখনো আছে, দুটি শিশুর মুখের হাসি আজও হয়তো কচি পাতার আন্দোলনে ভোরের আলোর স্পর্শে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। দু' জোড়া উৎসুক চোখের দৃষ্টি বুঝি এখনো রেললাইনের দিকে চেয়ে আছে।

ছ' মাস আগে ওলাউঠার মড়কে এক দিনেই বীরু ও মীনাকে হারিয়েছে ভবেশ। মা-মরা দু' ভাই-বোন কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারত না। তাই বুঝি এক সঙ্গেই ওরা চ'লে গেল। তারপর যখনি তার ট্রেণ তার কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেছে বিলাসপুর ষ্টেশনের চার নম্বর প্লাটফর্মের দিকে মন্থর গতিতে—ড্রাইভিং রডে হাত রেখে সে মুখ বাড়িয়ে তাকিয়েছে মেহেদীর বেড়ার দিকে বোবা শূন্যতা চেপে ব'সেছে তার বুকের ওপর। মেহেদীর বেড়া ছেড়ে সুদূর আকাশের ওপারে কোথায় দু' ভাই-বোন হাত ধরাধরি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে তাদের ঠিকানা ব'লে দেবে? ফায়ারম্যান আবদুল দেখেছে তার দু' চোখ জলে ভ'রে গেছে। সে তার কাঁধে হাত রেখে বলেছে, সামলে ড্রাইভারসাব, সিগন্যালের দিকে তাকাও।

ভবেশ ফোরম্যানকে গিয়ে বলেছে, এখান থেকে আমার বদলির ব্যবস্থা ক'রে দিন সাহেব, এখানে আর আমি থাকতে পারছিনে। ফোরম্যান রবার্টসন চেষ্টা-চরিত্র করে তার বদলির ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। বিলাসপুর থেকে সাঁতরাগাছি সেকশনে সে বদলি হয়েছে সপ্তাহখানেক আগে। পাঁশকুড়া লোক্যাল চালাবার ভার দেওয়া হয়েছে তাকে। আজ প্রথম ট্রেণ নিয়ে বেরিয়েছে সে। ভোরের ট্রেণ সকাল সাতটায় হাওড়া ছেড়েছে। কুলগাছিয়া পেরিয়ে বাগনানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দু'-চার মাইল অন্তর এক একটা ষ্টেশন। ট্রেণ আস্তে আস্তে চালাতে হচ্ছে। বিলাসপুর কাটনি প্যাসেঞ্জারে যতটা গতি সঞ্চার করতে পারত এ ট্রেণে তা সম্ভব নয়। ড্রাইভিং রডে হাত রেখে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়।

খোঙ্গ্রির পাহাড় নয়, ভেঙ্কটনগরের শালবন নয়, শুধু একটানা ধানক্ষেত। সবুজের বিস্তারের ওপর কাশের গুচ্ছের শাদা ছোপ এখানে ওখানে। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে আসে। পনের বছর একটানা ভবেশ বিলাসপুর-কাটনি লাইনে ট্রেণ চালিয়েছে। ঘন শালবন নেমে এসেছে উপত্যকার ওপর—আঁকাবাঁকা রেললাইন ঘন বনে উধাও—ট্রেণ চালাতে দুঃসাহসী অভিযানের রোমাঞ্চ বোধ করত সে। এখানে সে রোমাঞ্চের ছিটেফোঁটাও খুঁজে মেলে না কোথাও। রেললাইনের দু'পাশে কচুরিপানায় ছাওয়া জলা গিয়ে মিশেছে ধানক্ষেতে—ধানক্ষেত

গিয়ে শেষ হয়েছে গ্রামের সীমানায়। একঘেয়ে দৃশ্যপট—পঁচিশ মাইলের মধ্যেও কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

তবু সকালের সোনালি রৌদ্রের স্পর্শে সব কিছু হঠাৎ যেন অপরূপ হয়ে উঠেছে—আপাত কুশ্রীতার আড়ালে উহ্য সৌন্দর্য হঠাৎ যেন মাঠ-ঘাট, কচুরিপানায় আচ্ছন্ন ডোবা—সব কিছুকে প্লাবিত করে ফেলেছে। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ছে না ভবেশের। শূন্য দৃষ্টিতে সে শুধু দূরের ডিষ্ট্যাণ্ট সিগন্যালের দিকে চেয়ে আছে।

ডিষ্ট্যাণ্ট সিগন্যাল ডাউন হয় নি—গাড়ি আস্তে আস্তে থামিয়ে দেয় ভবেশ। বাগনান গ্রামের শুরু এখানেই। খড়ে ছাওয়া কতকগুলো মাটির কুটির এখানে ওখানে—কাঁচা রাস্তা তাদের মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে চ'লে গেছে ষ্টেশনের দিকে।

অন্যমনস্ক ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে রেললাইনের ধারে পুকুরের পাড়ের দিকে নজর পড়ল ভবেশের। যেখানে ছোট দুটি ছেলেমেয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। ভবেশ তাদের দেখে চমকে ওঠে। বীরু ও মীনুর বয়সী ছেলেমেয়ে দুটি—দেখে বোঝা যায় ভাইবোন। ছেলেমেয়ে দুটির ডাগর চোখের উৎসুক দৃষ্টি তার অন্তস্তল মথিত করে তোলে।

তাদের দিকে চেয়ে ছিল সে নির্নিমেষে। ফায়ারম্যান মতিলাল বলে ওঠে, ওদিকে দেখছ কী—সিগন্যাল যে ডাউন হল। সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্থ হয়ে সে ড্রাইভিং রড্ নামিয়ে দেয়। গাড়ি এগিয়ে যায়। ছেলেমেয়ে দুটি দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

প্রায় রোজই ছেলেমেয়ে দুটিকে দেখতে পায় ভবেশ। কুলগাছিয়ার দিকের বাগনানের ডিষ্ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে ট্রেণটি এগিয়ে আসতে ওরা ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ায় লাইনের পাশে—অবাক বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখে ট্রেণটাকে।

হাওড়া থেকে পাঁশকুড়া—মাত্র চুয়াল্লিশ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভবেশের গতিবিধি। খানাডোবা ও ধানক্ষেতের পুনরাবৃত্তি চক্ষুকে পীড়া দেবার মত। কিন্তু এ পথ ধীরে ধীরে অদ্ভুত এক মোহ বিস্তার করে ভবেশের মনে। এ পথে চলতে রোজই যেন এক আশ্চর্য সম্ভাবনা তাকে সজাগ ক'রে রাখে। বিশেষ ক'রে কুলগাছিয়া ও বাগনানের মাঝামাঝি চার মাইলের দূরত্ব তার মনের সুনিবিড় ঔৎসুক্যে চিহ্নিত হ'য়ে ওঠে।

ছেলেমেয়ে দুটিকে যেদিন ভবেশ দেখতে পেত না দিনটা কাটত তার উৎকণ্ঠায়—ওদের অসুখ-বিসুখ করল কি না ভাবত সে। পরদিন আবার তাদের দেখতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'ত।

বিলাসপুরে তার কোয়ার্টারের সামনে মেহেদীর বেড়ার মত বাগনানের ডিষ্ট্যাণ্ট সিগন্যালের পাশের পুকুরের পাড়টি তার প্রতিদিনের কৌতূহলের কেন্দ্র হ'য়ে ওঠে। যেন বিলাসপুরের কোয়ার্টারের সেই মেহেদীর বেড়া ছেড়ে বীরু ও মিনু বাগনানের এই পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার আসা-যাওয়ার পথের ধারে—তার আনাগোনার পথের পানে চেয়ে থাকতে।

ছেলেমেয়ে দুটি কোথায় থাকে ভবেশ তা' লক্ষ্য করেছে; এদিকে মাটির কুটিরগুলোর মাঝখানে একমাত্র কোঠাবাড়ি যেটা সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে সে তাদের। পুরোনো দালান—বেশ বড়—দেখে বোঝা যায় বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ি।

ভবেশকে অন্য কোন সেকশনে অন্য কোন লাইনে আর বদলি করা হয় নি। এ পথেই সে নিয়মিত চালিয়ে যায় পাঁশকুড়া লোক্যাল মাঝে মাঝে গোমো বা মেদিনীপুর প্যাসেঞ্জার। বয়স হয়েছে তার। আর কোন পদোন্নতির সম্ভাবনা নেই—একদা স্বপ্ন দেখত মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেণের ড্রাইভার হ'বে—সে' স্বপ্ন আজ মিলিয়ে গেছে—প্যাসেঞ্জার ও লোক্যাল ট্রেন চালিয়েই সে খুশি—আরও খুশি এ লাইন থেকে তাকে বদলি করা হচ্ছে না ব'লে।

অনেকগুলো বছর কেটে যায়।

বাগনানের ডিষ্ট্যান্ট সিগন্যালের পাশের পুকুরপাড়টিতে ছেলেমেয়ে দুটি আজকাল আর বিশেষ আসে না। শৈশবের কৌতূহল থেকে উত্তীর্ণ হ'য়েছে ওরা—রেলগাড়ি দেখতে আর ঔৎসুক্য নেই।

ভবেশ মাঝে মাঝে মেয়েটিকে একা পুকুরের ধারে ব'সে থাকতে দেখে। শাড়ি পরছে সে আজকাল। ট্রেণের শব্দে আর চোখ তুলে তাকায় না। দু' ভাইবোনকে আর এক সঙ্গে দেখা যায় না। ছেলেটি হয়তো স্কুলে পড়ছে—রেললাইনের ধারে এসে দাঁড়াবার সময় হয়তো ওর নেই।

এ' পথে রোজই ভবেশ আসে, যায়। কিন্তু তার চলার পথের ধারে দু' জোড়া উৎসুক চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি আর অভ্যর্থনা জানায় না। বাগনানের ডিষ্ট্যান্ট সিগন্যালের পাশের পুকুরপাড়ের শূন্যতা তার বুকে চেপে বসে।

একদিন বাগনান ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ছেলেমেয়ে দুটিকে দেখতে পেল ভবেশ। সঙ্গে তাদের বাবা ও মা। পাঁশকুড়া লোক্যাল নিয়ে সে তখন কলকাতায় যাচ্ছিল। ট্রেণে শুধু ছেলেটিই উঠল। তার বাবা, মা ও বোন ছলছল চোখে তাকে বিদায় দিল। ছেলেটি হয়তো কলেজে পড়তে কলকাতায় যাচ্ছে।

মেয়েটি পুকুরপাড়ে মাঝে মাঝে এসে বসে। সুদূর নিবদ্ধ তার দৃষ্টি। কৈশোরের সীমানা পেরিয়েছে সে। তার যৌবনপুষ্পিত দেহে লাবণ্যের জোয়ার বইছে। তাকে বড় সুদূর মনে হয় ভবেশের। আর সে ছোটটি নেই। রেলগাড়ি দেখবার জন্য আর সে তাকাবে না চোখ তুলে। ভবেশের বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

কিছুদিন বাদে মেয়েটিকে বধূবেশে দেখল ভবেশ বাগনানের প্লাটফর্মে। অজস্র লোকজনের মাঝখানে রাঙা বেনারসী পরে দাঁড়িয়ে আছে তার বরের পাশে অশ্রুভরা চোখে। তার ট্রেণেই উঠল ওরা—নেমে গেল দেউলটিতে।

সাঁতরাগাছি সেকশন থেকে অন্যত্র বদলি হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই ভবেশের। আর কোথাও কোন ভেকেন্সী নেই। এ লাইনেই তাকে গাড়ি চালাতে হবে। পাঁশকুড়া লোকাল ছাড়া' দেউলটি লোক্যাল—মাঝে মাঝে অন্য কোনও প্যাসেঞ্জার ট্রেণ। লোকো-শেডের ফোরম্যান বলেন, দশটা বছর তো এ লাইনে কাটালে—রিটায়ার করা পর্যন্ত আর কটা বছর না হয় এখানেই কাটিয়ে দাও।

কিন্তু এ লাইনে গাড়ি চালাতে আর ভাল লাগে না ভবেশের। বাগনানের ডিষ্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছে এসে পৌঁছতেই তার বুকের ভেতরটা অব্যক্ত বেদনায় টন টন করে ওঠে।

মিন্টু ও বীরু বড় হয়ে এমনি করেই বুঝি তার কাছ থেকে দূরে সরে যেত।

পুরো একটি বছর কেটে যায়। বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে দৈনন্দিনতার সঙ্গে একরকম নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে ভবেশ। বিলাসপুরে তার কোয়ার্টারের মেহেদীর বেড়ার সামনে মিন্টু ও বীরু—বাগনানের ডিষ্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়ে দুটির স্মৃতি ক্রমশঃ যেন তার মনে ঝাপসা হয়ে আসে।

সেদিন বাগনানের ডিষ্ট্যান্ট সিগন্যাল ডাউন ছিল না। ভবেশ ট্রেণ দাঁড় করিয়ে রোজকার অভ্যাসের বশে পুকুরের পাড়ের দিকে তাকিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেছিল সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত। পুকুরপাড়ে ম্লানমুখে বসে আছে মেয়েটি বিধবার বেশে—শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রেললাইনের দিকে।

ভবেশের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।

ফায়ারম্যান বলে, সিগন্যাল ডাউন হল যে ভবেশদা'। ড্রাইভিং রডে হাত দিতে ভবেশের হাত কাঁপছিল।

মেয়েটি রোজই এসে বসে থাকে রেল লাইনের ধারে—কখনো পুকুরের পাশের বটগাছতলায়। তার শূন্য উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বৈশাখের রৌদ্রের দাহ। ভবেশ তার দিকে তাকাতে পারে না—চোখ ফিরিয়ে নেয়।

ভবেশ ফোরম্যানকে বলে, এবারে আমার রিটায়ারমেন্টের ব্যবস্থা করে দিন স্যার—পঁচিশ বছরের ওপর চাকরি করছি।

ফোরম্যান বলেন, সে কী হে! সবাই এক্সটেনশনের জন্য দরবার করে—আর তুমি চাও রিটায়ার করতে!

কম্পিত স্বরে ভবেশ বলে, আর ভাল লাগে না স্যার।

কিন্তু সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব তো সে-কথা শুনবেন না। এ লাইনে ড্রাইভারের অভাব—অন্য সব সেক্শনেও একই অবস্থা। রিটায়ার্ড ড্রাইভারদের আবার ডেকে এনে কাজে বহাল করা হচ্ছে।

ভবেশ বিষণ্ণ মনে লোকো-শেড থেকে ইঞ্জিন নিয়ে বেরিয়ে আসে।

পাঁশকুড়া লোক্যাল। এগারো বছর আগে ঠিক এই দিনটিতে এই ট্রেণ নিয়ে প্রথম এ লাইনে বেরিয়েছিল ভবেশ। ঠিক সেদিনকার মত শিশির ছলছল সোনালি দিন।

ট্রেণ কুলগাছিয়া ছেড়েছে। বাগনানের ডিসট্যান্ট সিগন্যাল তখনো অনেক দূর। ধানের ক্ষেতে সোনালি রঙের জোয়ার বইছে।
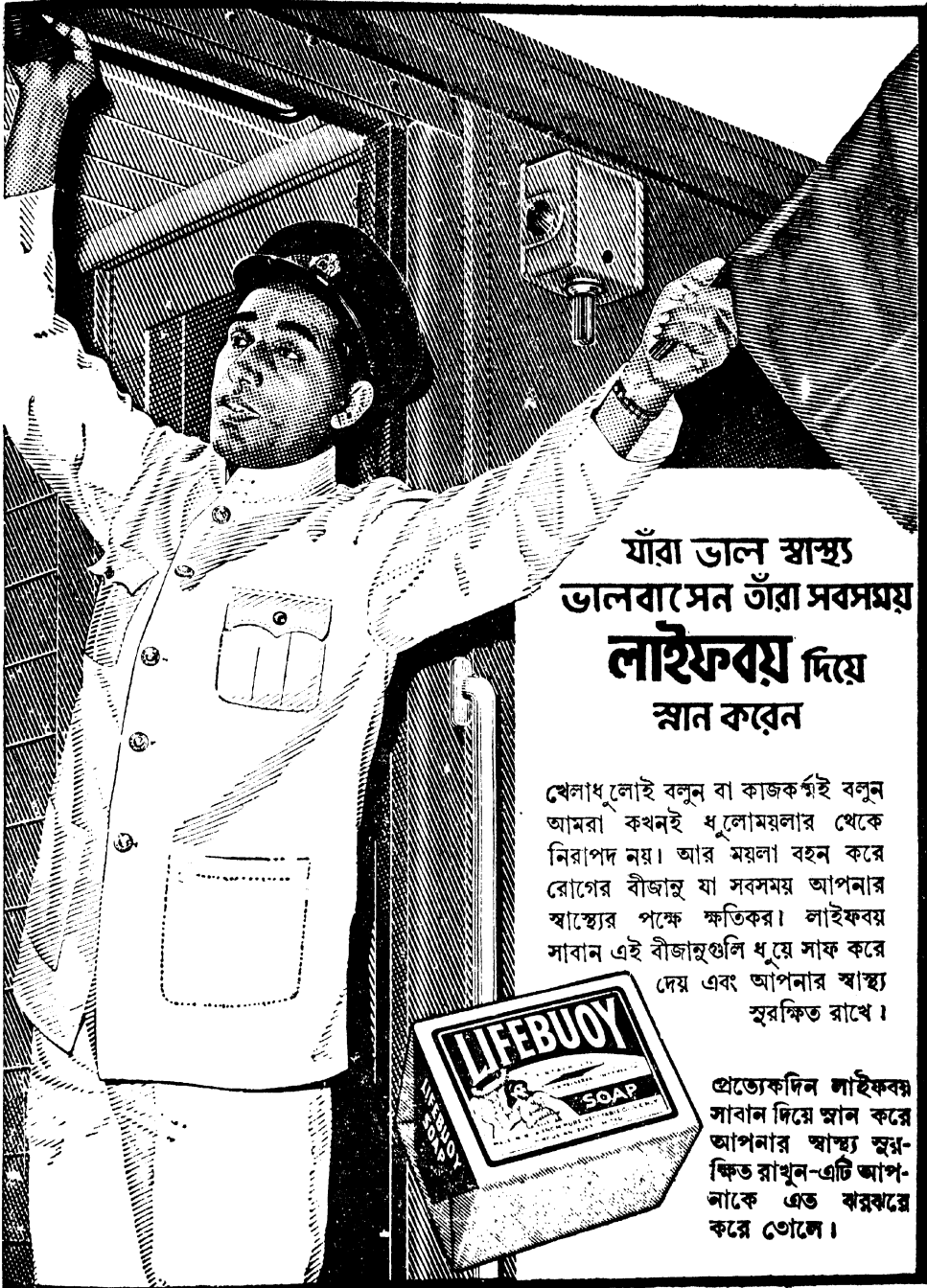
রেললাইনের পাশে পায়ে-চলা পথে ভবেশ হঠাৎ মেয়েটিকে দেখতে পেল। বিস্মিত হয় সে। বাগনান থেকে হাঁটতে হাঁটতে এত দূরে চলে এসেছে মেয়েটি! কোথায় যাচ্ছে সে?

মেয়েটি পা চালিয়ে হাঁটছিল কুলগাছিয়ার দিকে। মাথা থেকে তার ঘোমটা খসে পড়েছে। রুক্ষ চুলের ভার তার পিঠে নেমে এসেছে।

ট্রেণটি তার কাছে এসে পড়েছে। সে হঠাৎ ইঞ্জিনের সামনে রেললাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ভবেশ আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠে প্রাণপণ ব্রেক কষে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে—ইঞ্জিনের নীচে অদৃশ্য হল মেয়েটি।

হঠাৎ ব্রেক কষতে গিয়ে ইঞ্জিন বিগড়ে গিয়েছিল সেদিন। লোকো-শেডের ফোরম্যান পরদিন তাকে বললেন, এবার তোমাকে রিটায়ার করতে হচ্ছে—সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নোটিশ দিয়েছেন।

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য
ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে
স্নান করেন
খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
LIFEBUOY
SOAP
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন-এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

# অদৃশ্য ক্ষত

কেরোলাই কিসফালুদি [ ১৭৮৮—১৮৩০ ]

[ কিসফালুদি ভ্রাতৃদ্বয় হাঙ্গেরীয় সাহিত্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ। বর্তমান গল্পের লেখক কেরোলাই কিসফালুদি প্রধানত নাট্যকার হিসেবে খ্যাত হলেও ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর দান যে সামান্য নয় তার পরিচয় বর্তমান গল্পের মধ্যেই মেলে। হাঙ্গেরী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ উনিশ শতক। কিন্তু মাত্র কিসফালুদি ভ্রাতৃদ্বয়ের দানেই আঠারো শতকের ইতিহাস স্ব মহিম। লেখক হিসেবে কেরোলাই কিসফালুদি ক্লাসিক পর্যায়ের। তাঁর গল্পের মধ্যে একটা সর্বকালীন বিশ্বজনীন মানবিক চেতনার রূপায়ন দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমান গল্পটি কিসফালুদির প্রতিভা ও শিল্পরীতির পরিচয় দানে প্রতিনিধি স্থানীয়। আর ছোট গল্প হিসেবে বর্তমান রচনাটি অনেক গোঁড়া সমালোচকদের মতেও সার্থক রসোত্তীর্ণ। কারণ, আঙ্গিকে তত্ত্বে তথ্যে সব দিক দিয়েই গল্পটি নিখুঁত আর সামগ্রিক ফলশ্রুতিটি অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়—অনুবাদক। ]

সেদিন খুব ভোর বেলায় ঘুম থেকে ওঠবার আগেই আমাদের প্রসিদ্ধ সার্জন একটি জরুরী কল পেলেন। কলটি এত জরুরী যে রোগীটি এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে রাজী হল না। সেই মুহূর্তেই তার চিকিৎসার প্রয়োজন। সার্জন খুব তাড়াতাড়ি জামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিয়ে বেয়ারাকে ডেকে লোকটিকে হাজির করতে বললেন।

লোকটি ঘরে প্রবেশ করলে তার চেহারা দেখে মনে হোলো সে বেশ অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। তার শুকনো মুখ আর শঙ্কিত আচরণে একটা দৈহিক যন্ত্রণার ছাপ ফুটে বেরুচ্ছে। ডান হাতটা গলার সঙ্গে ঝোলান অবস্থায় বাঁধা। বেশ সংযত ভাবেই সে তার কষ্ট সহ্য করতে চেষ্টা করছিল তবুও মাঝে মাঝে এক অসতর্ক মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে অস্ফুট কাতরানির শব্দ বেরিয়ে সব প্রকাশ করে দিচ্ছিল।

বসুন। বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি?

দেখুন, আমি আজ এক সপ্তাহ ধরে ঘুমুতে পারিনি। আমার ডান হাতে যে একটা কী হয়েছে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। হয়ত ক্যানসার বা অন্য কোন রকম সাংঘাতিক রোগ হয়েছে। প্রথমে অবশ্য বিশেষ কষ্ট হয়নি কিন্তু সম্প্রতি যেন এর মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। আর সেই থেকে আমি এক মুহূর্তের জন্য একটু আরাম বোধ করিনি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই সাংঘাতিক জ্বালা যেন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। অবশেষে অসহ্য হয়ে উঠতে আজ সহরে এসেছি আপনার পরামর্শ নিতে। যদি আরও এক ঘণ্টা আমাকে এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় তাহলে বোধহয় আমি পাগল হয়ে যাবো। তাই আমি এটাকে পুড়িয়ে বা কেটে বা যা হোক একটা কিছু করে ফেলতে চাই।

সার্জন ভরসা দিয়ে বললেন এটাকে হয়ত অপারেশন না করলেও চলতে পারে। 'না-না'—লোকটি জিদ ধরল—এটাকে অপারেশন করতেই হবে। আমি এই অংশটা কেটে বাদ দেবার জন্যেই এখানে এসেছি। এ ছাড়া আর কোন উপায়েই আমি এই যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবো না। তারপর অনেক কষ্টে সে হাতটাকে তার ঝোলান ব্যাণ্ডেজ থেকে বার করে বলল—

আমি আগে থেকেই বলে রাখছি কোন রকম দৃশ্যমান ক্ষত আপনি এখানে দেখতে পাবেন না বলে আশ্চর্য হবেন না যেন। এটা একটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক রকমের রোগ।

ডাক্তার ভরসা দিয়ে বললেন কোন রকম অস্বাভাবিক রোগ দেখলেই তিনি বিস্মিত হন না। কিন্তু তবুও পরীক্ষা করে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে হাতটাকে ছেড়ে দিলেন। একেবারে অবিকল অন্য পাঁচখানা হাতের মত হাত। এমন কি কোথাও একটু বিবর্ণও নয়। অথচ ডাক্তার তার হাতটা ছেড়ে দেবার পর সে তার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতখানা এমন করে আঁকড়ে ধরল যে ধরণ দেখে মনে হোলো সে বেশ যন্ত্রণা অনুভব করল। তার সমস্ত মুখে একটা তীব্র যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল।

আচ্ছা, ঠিক কোথায় আপনার যন্ত্রণা হচ্ছে—ডাক্তার প্রশ্ন করলেন। লোকটা তার হাতের দুটো মোটা শিরার মাঝখানে একটা গোলাকার জায়গা দেখিয়ে দিল। কিন্তু ডাক্তার তার আঙুলের ডগা দিয়ে জায়গাটা খুব আস্তে একটু স্পর্শ করতেই সে এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে নিলো।

ঐখানটায় কি আপনার যন্ত্রণা হচ্ছে?

হ্যাঁ—সাংঘাতিক যন্ত্রণা হচ্ছে।

আমার আঙুলের ডগার চাপে আপনার কি ব্যথা লাগল?

লোকটা কোন উত্তর দিতে পারল না—কিন্তু তার চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়ে সব প্রশ্নের উত্তর দিল।

আশ্চর্য। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না—ডাক্তার বললেন।

আমিও বুঝতে পারছি না—কিন্তু যন্ত্রণা ঠিক সমান তালে চলছে ওখানে। এই যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে আমি বরং মরতে রাজী আছি।

ডাক্তার আবার সমস্ত জায়গাটাকে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করলেন—লোকটির দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করলেন অবশেষে মাথা নেড়ে বললেন—দেখুন, আপনার হাতের চামড়া বা শিরা সবই স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ সুস্থ। এমনকি কোথাও একটু ফুলো বা লাল পর্যন্ত হয়নি। একখানা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হাতের মতই হাত আপনার।

কিন্তু আমার মনে হয় এই জায়গাটা একটু লাল হয়েছে।

কই—কোথায়?

লোকটা তার হাতের উল্টোদিকে এক ফার্দিং অনুপাতের একটা গোল বৃত্তের মত জায়গা দেখিয়ে বলল—এইখানে।

ডাক্তার এইবার লোকটার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তার মনে হোলে তিনি একটি পাগলকে নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। তিনি বললেন—আপনাকে কিছুদিন সহরে থাকতে হবে। তার পর কিছুদিনের মধ্যেই আমি চেষ্টা করে দেখব যদি আপনার কোন উপকার করতে পারি।

বোধ হচ্ছে আপনি আমাকে পাগল ভাবছেন বা আমি আপনাকে ঠকাতে এসেছি মনে করছেন. বলতে বলতেই লোকটি তার টাকার থলি থেকে এক হাজার টাকার একটি তোড়া টেবিলের উপর রেখে বলল—এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার প্রয়োজনের গুরুত্ব

হাজার টাকার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। দয়া করে এইবার অপারেশনটি করে ফেলুন।

আপনি যদি আমাকে পৃথিবীর সমস্ত টাকাও দিতে রাজী থাকেন তাহলেও আমি কোন সুস্থ অঙ্গের উপর অপারেশনের ছুরি চালাতে পারবো না।

কেন নয়?

কারণ এটি আমাদের বৃত্তিগত শোভনতার বাইরে। পৃথিবীর সমস্ত লোক তাহলে আমায় বোকা বলে গাল দেবে। আর বলবে একটা সুস্থ অঙ্গকে চেনবার যোগ্যতাও আমার নেই। আর সেই অক্ষমতা ঢাকবার জন্যেই আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে একটা সুস্থ অঙ্গ অপারেশন করেছি বলে মনে করবে তারা।

বেশ তবে তাই হোক। আপনার কাছে তাহলে আমার আর একটি অনুরোধ আছে। আমি নিজেই অপারেশন করব এই হাত—যদিও আমার বাঁ হাতখানা এসব কাজে নিতান্ত আনাড়ী; তাহলেও আমি নিজেই করব এ কাজ। আপনি শুধু দয়া করে অপারেশনের পর করণীয় কাজগুলি করে দেবেন।

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে লোকটির গতিবিধি দেখতে লাগলেন। লোকটির অভিপ্রায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই বোধ হল। সে তার কোটটা খুলে ফেলে জামার হাতা গুটিয়ে নিল। এমনকি তার পকেট থেকে একখানা ছুরিও বের করল। কাছাকাছি আর কিছু না পেয়ে সে পকেট ছুরি দিয়েই অপারেশন চালাতে উদ্যত হল; এবং ডাক্তার কোন বাধা দেবার আগেই সে ছুরিটা গভীর ভাবে হাতের মধ্যে বসিয়ে দিল।

থামুন, ডাক্তার চীৎকার করে উঠলেন। লোকটির আনাড়ী হাতে শিরা কেটে যাবার আশঙ্কায় তিনি বললেন—বেশ যদি আপনি নিতান্তই না শোনেন তাহলে দিন আমি করে দিচ্ছি।

তখন তিনি অপারেশন করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। যখন ঠিক তিনি আসল জায়গায় ছুরী চালাতে উদ্যত হলেন তখন লোকটাকে অন্য দিকে মুখ ফেরাতে বললেন। কারণ সাধারণত মানুষেরা এই সময় নিজের রক্ত দেখে ঘাবড়ে যায়।

কিন্তু লোকটা বলে উঠল—সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ডাক্তার। আমি আপনাকে বরং দেখিয়ে দেব যাতে করে আপনি বুঝতে পারেন—কতটা কাটতে হবে। লোকটা নিতান্ত উদাসীন ভাবে অপারেশন দেখতে লাগল এবং মাঝে মাঝে নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করতে সচেষ্ট হল। যখন তার হাতের সেই গোলাকার জায়গাটা কেটে তুলে ফেলা হোলো—তখন সে যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। কাঁধ থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল। আপনি কোন যন্ত্রণা বোধ করছেন না? ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

বিন্দুমাত্র না—একটু হেসে লোকটি উত্তর করল খানিকটা গুমোটের পর এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় দেহটা যেমন শির শির করে ওঠে—ঠিক তেমনি একটা শিরশিরে অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় নি। এখন রক্তটা খানিক বেরিয়ে যেতে দিন। আমার বেশ আরাম বোধ হচ্ছে এতে।

তারপর ক্ষতটি যখন ব্যাণ্ডেজ করা হয়েগেল তখন লোকটাকে বেশ খুসী বলে মনে হোলো। এখন যেন সে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। সে বেশ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার বাঁ হাত দিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে করমর্দন করে বলল—আমি আপনার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ ডাক্তারবাবু।

অপারেশনের পরে সার্জন কয়েকদিন তার হোটেলে গিয়ে লোকটিকে দেখে এলেন। তিনি লোকটির পরিচয়ে জানলেন যে তিনি একজন মর্যাদাশালী ব্যক্তি। শিক্ষা দীক্ষায় ও বংশ মর্যাদায় ভদ্রলোক দেশের একজন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি জেনে সার্জন তাঁকে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করলেন। ক্ষতটি সম্পূর্ণ সেরে যাবার পর ভদ্রলোক তাঁর গ্রামের বাড়ীতে ফিরে গেলেন।

তিন সপ্তাহ কেটে গেল তারপর হঠাৎ একদিন আবার এসে তিনি উপস্থিত হলেন। তাঁর হাত আগের মত ঝুলিয়ে বাঁধা আগের মতই অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি আবার সেই গোল জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। এবারে তাঁর মুখখান মোমের মত সাদা। আর ঠাণ্ডার মধ্যেও তাঁর কপালটা ঘামে চক্‌চক্‌ করছে। কাছেই একটা চেয়ারের উপর ধপাস করে বসে পড়লেন তিনি। তারপর কোন কথা না বলে শুধু তাঁর ডান হাতটি আগের মতই ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

হায় ঈশ্বর—আবার কী হোলো?

সেই ব্যথাটা আবার সুরু হয়েছে আগের চেয়েও অসহ্য হয়ে উঠেছে এবার। আপনি নিশ্চয়ই গভীর করে ছুরি চালাননি আর্তনাদ করতে করতে বলতে লাগলেন তিনি আমি প্রায় শেষ হতে চলেছি এই যন্ত্রণায়। প্রথমে ভেবেছিলাম আপনাকে আর বিরক্ত করব না—তাই সহ্য করতে চেষ্টা করছিলাম কিন্তু আর আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। এটাকে আর একবার অপরেশন করতে হবে আপনাকে।

সার্জন জায়গাটা আবার পরীক্ষা করে দেখলেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে এসেছে সেখানটা। নতুন চামড়া এসে সেই কাটা দাগটা ঢেকে দিয়েছে। অপারেশনের দাগও প্রায় মিলিয়ে গেছে। কোন শিরায় কোন খুঁত নেই। নাড়ী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক—শরীরে জ্বরও নেই। সম্পূর্ণ উত্তাপহীন দেহ। অথচ যন্ত্রণায় তার সর্ব অঙ্গ প্রায় থরথর্‌ করে কাঁপছিল।

মনে মনে বলতে লাগলেন ডাক্তার—আশ্চর্য! জীবনে এমন আশ্চর্য ঘটনার কথা কোনদিন শুনিনি বা দেখিনি।

যাই হোক আগের মত অপারেশন করা ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। সমস্ত ঘটনার তাই আর একবার পুনরাবৃত্তি করতে হোলো। অপারেশনের পর যন্ত্রণা থেমে গেল। ভদ্রলোক আগের মতই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু এবারে তাঁর মুখে আর আনন্দের হাসি ফুটল না। ডাক্তারকে ধন্যবাদ দেবার সময় এবারে তাঁর মুখে যেন একটা অস্পষ্ট বেদনার ছাপ ফুটে বেরুল। বিদায় নেবার সময় তিনি বলে উঠলেন—আমাকে যদি আবার মাসখানেকের মধ্যে আসতে হয়—তাহলে আপনি কিছু মনে করবেন না যেন।

না না—আপনি এসব কেন ভাবছেন। আপনার কখনই এসব কথা মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

স্বর্গে ভগবান আছেন এ যেমন নিশ্চিত সত্য—আমাকে আবার আসতে হবে এও তেমনি নিশ্চিত। আচ্ছা—বিদায় বন্ধু! বলেই ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

সার্জেন এই ব্যাপারটি নিয়ে কয়েকজন সহকর্মী বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করলেন। তারা এক একজনে এক এক রকম মত প্রকাশ করলেন। কেউই এই ব্যাপারটির কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হলেন না।

একমাস কেটে গেল কিন্তু ভদ্রলোক আর এলেন না। আরও কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল—তার পর হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি এসে উপস্থিত হল। ভদ্রলোক নিজে না এসে চিঠি লিখেছেন দেখে সার্জেন মনে করলেন, নিশ্চয়ই তাঁর যন্ত্রণা সেরে গেছে। মনে মনে বেশ একটু আনন্দিত হয়ে তিনি চিঠিখানা খুললেন। তিনি লিখেছেন :

"প্রিয় ডাক্তারবাবু,

আমার এই অসহ্য যন্ত্রণার মূল কারণটি সম্বন্ধে আপনার মনে আর কোন সন্দেহ রেখে দিতে চাইনে। কারণ এই গোপন তথ্যটিকে আমি আমার কবরের মধ্যে সমাধিস্থ করতে চাইনে। আমার এই মর্মান্তিক যন্ত্রণার পিছনে যে একটি ইতিহাস আছে, সেটি আপনাকে জানিয়ে যেতে চাই। যন্ত্রণাটি আমার এখনও সারেনি বরং আগের চেয়ে তিন গুণ বেড়েছে। আমি আর এই যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে চাইনে। যে নারকীয় অগ্নিশিখায় আমার হাত পুড়ে যাচ্ছে, তাকে ভোলবার জন্যে আমি একখানা জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে রেখেছি ঐ জায়গায় এবং তারই ফলে আমি এই চিঠি লিখতে পারছি।

মাত্র ছ'মাস আগে আমি একজন সুখী লোক ছিলাম। অর্থের অভাব ছিল না। শান্তিপূর্ণ জীবন কাটছিল আমার। একজন পঁয়ত্রিশ বছরের যুবকের কাছে যে যে কামনার বস্তু থাকতে পারে, তার সবই পেয়েছিলাম আমি। এক বছর আগে আমি বিয়ে করেছিলাম। একটি সুন্দরী, সহৃদয়া শিক্ষিতা মেয়েকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। সে এখানকার স্থানীয় (আমার জমিদারী এলাকার নিকটেই) এক কাউণ্ট-পত্নীর সহচরী ছিল। সেও আমাকে ভালবেসেছিল এবং তার সমস্ত মন জুড়ে ছিল আমার প্রতি তার অসীম কৃতজ্ঞতা। ছ' মাস ধরে আমাদের জীবনে অফুরন্ত আনন্দের প্রবাহ বয়ে চলছিল। প্রত্যেকটি দিন আমাদের কাছে তার আগের দিনটি থেকে অধিক আনন্দময় বলে বোধ হোতো। সে আমাকে ছেড়ে কোথাও থাকত না। মাঝে মাঝে সহরে সে তার পুরোনো বান্ধবীদের সঙ্গে বা তার কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যেত কিন্তু কখনই সে বাড়ী ছেড়ে বাইরে এমন কি সেই কাউণ্ট-পত্নীর প্রাসাদেও থাকতে চাইত না। মাইলের পর মাইল সেই পার্বত্য পথ ভেঙ্গে সে আমার কাছে ফিরে আসত। আমার প্রতি তার এমন ঐকান্তিক ভালবাসা দেখে তার বন্ধুরা ঈর্ষা করত। সে কোনোদিন অন্য লোকের সঙ্গে নাচের আসরে যেত না। বলত অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে বাহুলগ্না হয়ে নাচার কথা স্বপ্নে ভাবাও পাপ—মহাপাপ। সারল্যে ও সৌন্দর্যে তার মনটা ছিল একটা শিশুর মত।

কিন্তু আমি ঠিক আজ বলতে পারবো না কেন—কেন সেদিন আমার মনে হোলো এ সবই তার ছলনা। মূঢ় মানুষ তার চরম সুখের দিনে বোধ হয় সাধ করেই দুঃখকে ডেকে আনে।

আমার স্ত্রীর একটি সেলাইয়ের টেবিল ছিল। তার ড্রয়ারটা সে সব সময়ই তালা বন্ধ করে রাখত। ঐ ড্রয়ারটার মধ্যে কী আছে ভেবে আমি সব সময়ে একটা অস্বস্তি বোধ করতাম। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম সে ড্রয়ারটাকে কোনদিন খুলে রেখে যায় না বা চাবীটাকে বাড়ী ফেলে যায় না। মনে হল—কী এমন জিনিষ আছে যা আমার কাছে তার এত গোপনীয়? একটা ঈর্ষার তাড়নায় আমি যেন পাগল হয়ে উঠলাম। তার চোখের সারল্য, অধরের মাধুর্য, বাহুলতার নিবিড় আলিঙ্গন সবই আমার কাছে যেন ছলনাপূর্ণ প্রবঞ্চনা বলে বোধ হতে লাগল।

একদিন সকালে কাউণ্ট-পত্নী আমার স্ত্রীকে নিতে এলেন। তিনি অনেক করে ওকে রাজী করিয়ে সেই দিনটির মত ওকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। আমিও তাকে কথা দিলাম যে বিকেলের দিকে আমি যাব।

তাদের গাড়ী বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতেই আমি সেই বন্ধ ড্রয়ারটা খোলবার চেষ্টা করতে লাগলাম। অনেকগুলো চাবী দিয়ে চেষ্টা করতে করতে অবশেষে খুলে ফেললাম।

নানারকম মেয়েলি জিনিষপত্র ঘাটতে ঘাটতে একটা সিল্ক পাট-করা যত্নের নীচে একতাড়া চিঠি পেয়ে গেলাম। সেগুলোর দিকে তাকালে এক নজরে চেনা যায় যে সেগুলো প্রেমপত্র। একটা ফিকে লাল রঙের ফিতে দিয়ে তাড়া বাঁধা। আমি একবারও ভেবে দেখলাম না যে স্ত্রীর বালিকা বয়সের গোপন হৃদয়ের এরকম হীন সন্ধান আমার পক্ষে অমর্যাদাকর। আমার যেন কেবলি মনে হতে লাগল এগুলো সাম্প্রতিক কালের—আমাদের বিয়ের পরের লেখা চিঠি। ফিতেটা খুলে চিঠিগুলো পড়তে সুরু করে দিলাম।

আমার জীবনের একটি সাংঘাতিক মুহূর্ত সেদিন।

পৃথিবীতে মানুষের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত যত বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে তার চেয়েও জঘন্যতম অমার্জনীয় বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিল সেই চিঠিগুলো। চিঠিগুলোর লেখক আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের মধ্যে একজন। সেই চিঠিগুলোর বক্তব্যে এবং সুরে আমার বন্ধুর এবং আমার স্ত্রীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও গাঢ় প্রণয়ের পরিচয় পাওয়া গেল! আমার স্ত্রীকে এই সব বিষয় গোপন রাখবার জন্যে কতই না অনুরোধ করেছে সে! আমার স্ত্রীর বোকা স্বামীটার সম্বন্ধে সে কত কথাই লিখেছে। কী করে এই সব ব্যাপার স্বামীর কাছে লুকিয়ে রাখতে হয় তার সম্বন্ধে কত উপদেশ দিয়েছে। প্রত্যেকটি চিঠি আমার বিয়ের পর লেখা। অথচ আমি ভাবছিলাম, আমি কত সুখী। আমার সেই মুহূর্তের অনুভূতিগুলো আর এই চিঠিতে প্রকাশ করতে চাইনে। সেই বিষ আমি শেষ বিন্দু পর্যন্ত পান করলাম। তার পর চিঠিগুলো ক ভাঁজ করে সেই গোপন জায়গায় রেখে ড্রয়ারটা আগের মতই চাবী বন্ধ করে রাখলাম।

আমি জানতাম আমি যদি কাউণ্ট পত্নীর প্রাসাদে না যাই তা হলে ও রাত্রেই ফিরে আসবে। হোলোও ঠিক তাই শেষ পর্যন্ত। ও রাত্রেই ফিরে এল! খুশী মেজাজে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে আমাকে আলিঙ্গন করতে বারান্দা পর্যন্ত ছুটে এল। তারপর আমাকে প্রাণপণ আন্তরিকতার সঙ্গে চুমু খেল। আমি এমন ভান করলাম যেন কিছুই হয়নি।

রোজকার মত দুজনে গল্পগুজব করলাম। ইতিমধ্যে আমি সেই ক্ষিপ্ত উন্মত্ততার মধ্যে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা সম্পর্কে দৃঢ় সংকল্প করে

ফেলেছি। যখন গভীর রাত্রে তার শোবার ঘরে ঢুকে তার সারল্য-মাখা সুন্দর ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম তখন মনে হোল, বিধাতার কী নির্মম ছলনা! এমন স্নিগ্ধ সরল মুখের আড়ালে কী জঘন্য পাপই না আত্মগোপন করে আছে। আমার অন্তরে তখন বিষের ক্রিয়া সুরু হয়ে গেছে—ধমনীতে ধমনীতে ছেয়ে গেছে সেই বিষের মর্মান্তিক দাবদাহ। আস্তে আস্তে ডান হাতখানা তার গলার ওপরে রাখলাম তার পর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে তার গলা টিপে ধরলাম। এক মুহূর্তের জন্য, মাত্র এক মুহূর্তের জন্য সে তার চোখ দুটি খুলে অনন্ত বিস্ময়মাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল তার পর চোখ দুটি বন্ধ হয়ে গেল—চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল।

জীবন রক্ষার আশায় তার শরীরের কোথাও বিন্দুমাত্র প্রতিবাদের কম্পন জাগল না। একটা স্বপ্নের মত নিতান্ত নীরবে সে মৃত্যুর মহানিদ্রায় ঢলে পড়ল। এমন কি তার খুনী স্বামীর জন্যে তার সুন্দর মুখের কোথায়ও অভিযোগের রেখা ফুটল না। শুধু এক ফোঁটা রক্ত তার ঠোঁট বেয়ে আমার হাতের ওপর গড়িয়ে পড়ল—ঠিক কোথায় পড়ল সে জায়গাটা আপনার চেনা ডাক্তার। আমার দৃষ্টি পড়ল পরদিন সকালে সেই রক্ত ফোঁটা শুকিয়ে যাবার পর।

কোনরকম জাঁকজমক না করে তাকে সমাধিস্থ করা হোলো। অনুসন্ধানের ভয় ছিল না। কারণ নিজের জমিদারীতে বাস করতাম, কারো এ বিষয়ে অনুসন্ধানের কর্তৃত্ব সেখানে ছিল না। আর তা ছাড়া এ বিষয়ে অন্য কোনরকম কিছু ভাববারও অবকাশ ছিল না—কারণ সে ছিল আমার নিজেরই স্ত্রী। তার কোন আত্মীয়স্বজনও ছিল না ফলে কোনোরকম প্রশ্নেরই আমার জবাবদিহি করতে হোলো না। তবুও প্রতিবেশীদের কৌতূহল এড়াবার জন্য আমি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হবার পর তার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করলাম।

কোনো বিবেকের দংশন আমি অনুভব করিনি। একথা সত্যি যে আমি ভয়ানক নিষ্ঠুর হয়েছিলাম—কিন্তু সে নিষ্ঠুরতা তার পাওনা ছিল। আমি খুব ঘৃণা বোধ করিনি এবং তাকে সহজে হয়ত ভুলেও যেতাম। কারণ যে সহজ ঔদাসীন্যে আমি তাকে খুন করেছিলাম পৃথিবীর কোনো খুনীর পক্ষেই তা সম্ভব নয়।

কিন্তু বাড়ী পৌঁছেই দেখলাম কাউন্ট-পত্নী এসে হাজির হয়েছেন। তিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে এসেছেন—কিন্তু বড় দেরীতে এবং যেটা ঘটেছে আমারই ইচ্ছাক্রমে। তার চোখে মুখে এক দারুণ যন্ত্রণার আভাস! এই ভয়াবহ ও অভাবনীয় মৃত্যু সংবাদ তাকে প্রায় চেতনালুপ্ত করে দিয়েছে। আমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তিনি কেমন এক অদ্ভুত ধরণের কথা বলতে লাগলেন—আমি যার কোনো অর্থই খুঁজে পেলাম না। অবশ্য তার কথা শোনবার বিন্দুমাত্র উৎসাহ আমার ছিল না কারণ কোনো রকম সান্ত্বনার আমি প্রয়োজন বোধ করিনি। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি আমার একখানা হাত চেপে ধরে বললেন: দেখুন, আমি আপনাকে আমার একটি বিশেষ গোপন তথ্যের ব্যাপার জানাতে চাই। আশা করি আপনি নিশ্চয়ই সেই তথ্য প্রকাশ করে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না।

তারপর তিনি বললেন যে তিনি বিশ্বাস করে আমার মৃতা স্ত্রীর কাছে এক তাড়া চিঠি রাখতে দিয়েছিলেন, সেগুলো একটু অস্বাভাবিক প্রকৃতির বলেই তিনি সেগুলোকে নিজের কাছে রাখতে পারেননি। এখন সেই চিঠিগুলো আমি দয়া করে তাকে ফিরিয়ে দেব কিনা তাই তিনি জানতে চাইলেন। তার কথা শুনতে শুনতে মনে হোলো আমার সমস্ত মেরুদণ্ডটা ঠাণ্ডায় হিম হয়ে আসছে। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে প্রশ্ন করলাম যে ঐ চিঠিগুলোতে কী আছে? আমার কথা শুনে চমকে উঠে বললেন: জগতে যত মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাদের সবার চেয়ে বিশ্বাসী ও অনুগত ছিল আপনার স্ত্রী। সে কিন্তু কোনদিন জানতে চায় নি ঐ চিঠিগুলোতে কী আছে। এমন কি আমায় কথাও দিয়েছিল যে ওগুলো সে কোনদিন খুলে দেখবে না।

: আপনার চিঠিগুলো সে কোথায় রেখেছিল জানেন?

: সে বলত যে সে তার সেলাইয়ের টেবিলের ড্রয়ারে ওগুলোকে চাবী বন্ধ করে রেখেছে। একটা ফিকে লাল রঙের ফিতে দিয়ে ওগুলো বাধা আছে। দেখলেই চিনতে পারবেন সবশুদ্ধ তিরিশখানা চিঠি আছে।

আমি তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সেলাইয়ের টেবিলের ড্রয়ারটি খুলে সেই চিঠি তাড়াটি তার হাতে দিয়ে বললাম: এইগুলোই আপনার চিঠি?

সেগুলোকে দেখেই তিনি অধীর আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে তাড়াটি টেনে নিলেন। আমি চোখ তুলে তার দিকে আর তাকাতে পারলাম না পাছে আমার চোখের দৃষ্টিতে তিনি কিছু বুঝতে পারেন।

তার সমাধির ঠিক এক সপ্তাহ পরে একটি হুল ফোটানো তীব্র যন্ত্রণা আরম্ভ হোলো ঐ জায়গাটায় যেখানে সেই ভয়ঙ্কর রাতে এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল। পরের ঘটনা আপনার সমস্তই জানা ডাক্তার। আমি জানি এটা হয়ত কিছুই নয় হয়ত একটা স্বকপোলকল্পিত যন্ত্রণার সংকেত মাত্র—তবুও এর হাত থেকে আমার মুক্তি নেই। যে নিষ্ঠুরতা ও হঠকারিতার ফলে সেই নিষ্পাপ সরল সুন্দর মেয়েটীকে আমি হত্যা করেছি-এ তারই শাস্তি। এই যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি আর বেঁচে থাকতে চাইনে। আমি শীঘ্রই তার সঙ্গে মিলতে যাচ্ছি। তার কাছে গিয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। নিশ্চয়ই সে আমাকে ক্ষমা করবে। নিশ্চয়ই সে আমাকে আবার ভালবাসবে যেমন সে বেঁচে থাকতে বেসেছিল। ধন্যবাদ ডাক্তার, আপনি আমার জন্য যা করেছেন সে সকলের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।"

অনুবাদ—বিভূতি রায়।

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

বাস থেকে নেমে রমেন একেবারে চুপসে গেল। এক ঝাপটা বাতাসে ঘরের প্রদীপ নিভিয়ে ঘরকে যেমন অন্ধকার করে তোলে—ঠিক তেমনি রমেনের মধ্যে জ্বলে ওঠা উজ্জ্বল প্রদীপটাকে যেন এক ফুঁতে নিভিয়ে ওর মুখখানা কালো করে দিল। মা প্রথমটা ওকে আসতে দিতে রাজি হন নি, কিন্তু ও গর্ব করে বলেছিল দিদি যে বাড়ি কাজ করে সে আমি ভাল করে চিনি: তুমি দেখে নিও আমি বেশ যেতে পারবো। মা অভাবের তাড়নায় আর বাধা দেন নি, মনে একটু আশাও ছিল উষা ছুবার রমেনকে সংগে করে সে বাড়ি নিয়ে গেছে কাজেই রমেন হয়ত চিনে যেতে পারবেও বা।

রমেন একটু জোরই দিয়েছিল। তার মা তাকেও অন্য দশ বার বছরের শিশুর মত নিতান্ত শিশুই ভাবেন, এটা তার মনঃপূত ছিল না। সে মাকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল, সে আর শিশুটি নেই। কিন্তু বাস থেকে নেমে সে কিছুতেই বুঝে পেল না কোন বাড়িতে তার দিদি কাজ করে। নিত্য নতুন রঙের বাহারের মধ্যে আট-নয় মাসের ব্যবধানে তার পরিচিত সাদা রঙের বাড়িটা যে কোন মুহূর্তে গোলাপী হয়ে গেছে তা সে কিছুতেই ভেবে পেল না।

ভাদ্রের ভরা নদীর মত রমেনের ছ'চোখ জলে ভরে এলো, কিন্তু উপছে পড়লো না, ও কাঁদতে পারলো না। ভয়ে ভয়ে এদিক সেদিক চাইতে লাগলো। ওর ছ'পাশ দিয়ে অবিরাম গতিতে চলেছে নর-নারী, বালক-বৃদ্ধের দল, তাদের বলিষ্ঠ চলা ফেরা রমেনের আড়ষ্ট মনটাকে একেবারে নিরুৎসাহ করে দিল।

হঠাৎ একটা বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলো কালি। হাতে তার ভাঙা কড়াইতে ভরা ছাই, ডাষ্টবিনে ফেলতে এসেছে। উষা যে বাড়িতে রান্নার কাজ করতো কালি ছিল সে বাড়ির পরিচারিকা।

রমেন কালিকে দেখে হাতে স্বর্গ পেল। কালি যদি ঐ সময় দরজা খুলে বাইরে না বেরুত তাহলে অল্পক্ষণের মধ্যে রমেন নিশ্চয় কান্নায় ভেঙে পড়তো, বাসা থেকে বেরুবার পূর্বে তার মনে যে পরিণত প্রত্যয় জেগেছিল, সে শিশুত্বের শেষ ধাপে নেমে এক মুহূর্তে ঝরে যেত। রমেন কালির কাছে গিয়ে বললো: কালিদি', আমার দিদি কোথায়?
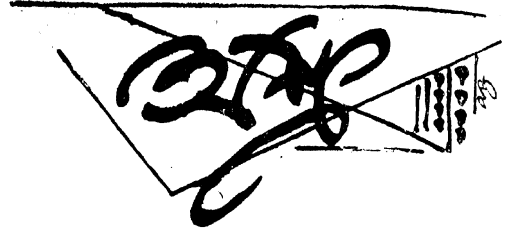
কালি চোখ মুখের এমন একটা ভাব করলো, সেটা ঈর্ষা কি বিদ্রূপ ঠিক বুঝা গেল না। চোখ টেনে কপালে কয়েকটা রেখা ফুটিয়ে অধরটা প্রশস্ত করে বললো: তোমার দিদি রাজরাণী হয়েছে গো—রাজরাণী। ঐ বাড়ীতে যাও দেখতে পাবে, বলে হাত তুলে সামনের একটা বাড়ী দেখিয়ে দিল।

রমেন কথাটার ঠিক মর্মোপলব্ধি করতে না পেরে বললো: দিদি বুঝি এখন ঐ বাড়ীতে কাজ করে।

খুব একটা হাসির কথা হয়েছে এমনি ভাবে কালি হে: হে: করে হেসে উঠলো। বললো: রাজরাণী আবার কাজ করে নাকি, কাজ করায়—ঐ সামনের বাড়ীতে বাটার দোকানের পাশ দিয়ে যে সিঁড়ীটা উপরে উঠে গেছে, ওটা দিয়ে উপরে উঠলেই রাজরাণী দিদিকে দেখতে পাবে—যাও।

রমেন শিশু হলেও কালির হাসি এবং কথার ধরণ তার কাছে অতি বিশ্রী লাগলো। সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে ছুটে রাস্তায় নামল। দীর্ঘ একটা ক্যাঁচ জাতীয় শব্দ করে ঝাঁকুনি খেয়ে একখানা কার থেমে গেল। কমা পড়লো ছ'ধারের চলমান ফুটপাথে। ছ একটা মন্তব্য ভেসে এলো: 'খুব বেঁচে গেছে' 'ড্রাইভারটা বেশ বাঁচিয়েছে' ইত্যাদি। রমেন ও দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে সিঁড়ীর মুখে এসে দাঁড়াল! অপরিচিত বাড়ির ততোধিক অপরিচিত সিঁড়ীতে পা দিতে গিয়ে ওর পা'ছখানা আটকে এলো। ভয়ে ভয়ে আধা অন্ধকার সিঁড়ীটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে। ছ' একটা ধাপ করে উপরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

রমেন চকিতে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, কিন্তু কোথাও কারো সাড়া পেল না। একটু ইতস্তত করে কয়েক পা এগিয়েই ঘরের মধ্যে যাকে দেখল সে আর কেউ নয়, ওর দিদি উষা, কিন্তু দিদির অমন মূর্তির সামনে রমেনের শিশুচিত্ত মুখোমুখি দাঁড়াতেই ঝিমিয়ে পড়লো। দিদিকে সে হাতে ছুটো চুড়ি একখানা আধময়লা কাপড়, অনুরূপ একটা জামা এবং সাদা সিঁথিতে দেখতেই অভ্যস্ত ছিল, রত্নালংকার ও সুচারুচিক্কণ বসনে সীমন্তে-সিঁদুর মাখা মুখটিতে সুন্দরী রূপ দেখবার জন্যে এতটুকু প্রস্তুত ছিল না। এ কি তার দিদি না অন্য কেউ, সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো উষার মুখের দিকে।

উষা ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলো ভাইকে। বললো: তোকে কে বললো আমি এখানে।

দিদির কাঁধের উপর মাথা রেখে রমেন আস্তে আস্তে বললো: ও বাড়ির কালিদি'।

আমি অনেক দিন যাইনি বলে মা বুঝি খুব ব্যস্ত হয়েছেন।

হন নি, মা কত কাঁদছেন—যাও নি কেন এত দিন ।

অকারণে উষার চোখ দুটো জলে পূর্ণ হয়ে এলো । ধরা গলায় বললো, ওখানকার কাজ গেল তাই আর যেতে পারিনি ।

রমেন অভিভূত ভাবটা কাটিয়ে বললো : তোকে কাপড়-গয়না বুঝি এরা দিয়েছে—এরা লোক খুব ভাল তাই না ?

একটা ভারি নিশ্বাস চেপে কৃষ্ণা বললো : হ্যাঁ-হ্যাঁ এরা দিয়েছে। একটু চুপ করে থেকে অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বললো : এখনি একবার বাড়ির মেয়েদের সংগে বেরুতে হবে কিনা তাই দিয়েছে—ভূতের মত ওদের সংগে বেরুলে কি আর ওদের মানসম্মান থাকে ?

যার জন্যে ঐ কৈফিয়তটুকু সে সেদিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে বললো : তোকে কিন্তু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, চল না মা দেখলে দেখবি কি ভালই না বলবেন ।

চাবুকাহত বাঘিনীর মত উষা চমকে উঠলো । শিশু রমেনের চোখে সেটুকু ধরা পড়ে না । উষা পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো : কিন্তু আমাকে যে এখনি বেরুতে হবে, যাব কি করে বল ।

রমেন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললো : তবে কাল যাবি, আজ আমি এখানে থাকি ।

মা যে কত ভাববেন তা হলে ।

মা কিচ্ছু ভাববেন না, আমি মাকে বলে এসেছি আজ দিদির কাছে থাকবো ।

যার একলা থাকতে কত কষ্ট হবে, তা বাদে এরাই বা কি ভাববে ? আমি টাকা দিয়ে দি, তুই চলে যা, মাকে বলিস আমি ক'দিন পরে যাব ।

রমেনের মুখখানা কালিমাখা হয়ে গেল ।

উষার মনটা ব্যথায় টনটন্ করে উঠলো । আজ সে নিজের ভাইকে এক রাতের জন্ম কাছে রাখার অধিকার হারিয়েছে, পর হয়ে গেছে—কি বিশ্রী ভাবে পর হয়ে গেছে সে। সে বড় করে ভাবলো তার নিজের কথা, মা'র কথা বাদ দিলেও এই কচি ভাইটার মুখখানাই বা সে ভুলেছিল কেমন করে ? এমন করে নীচতা হীনতার নিম্নতার অতল গহ্বরে সে কেমন করে নেমে গেছে ? আজ যে এই নিষ্পাপ শিশুর সামনে মুখ তুলে চাইতেও তার ম্লান মুখের কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠছে। দামী বস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার তাকে তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করে তুলছে ।

আজ আর কোন দিকে কোন পথ নেই, ছুটে গেছে আশার স্বপন, দেউলিয়া হয়ে গেছে চিত্ত—বিষাদ হয়ে গেছে ভবিষ্যৎ ।

উষা তার দামী কাপড়ের আঁচলে রমেনের মলিন মুখখানা মুছে দিল। বললো : চল ঘরে চল্, আট আনার পয়সা দেব, দোকান থেকে কিছু খেয়ে নিবি ।

রমেনের মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো । উষা তাকে ঘরে এনে, ড্রয়ার থেকে চাবি বের করে ট্রাংক খুলতে বসল ।

রমেন দিদির পিঠের উপর দিয়ে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে বললো : এ বাক্স, কাপড় বুঝি ওরা তোকে দিয়েছে ?

মিথ্যে প্রথম বলতে বাধে ঠিক, কিন্তু একবার বলতে সুরু করলে মানুষ এমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, মিথ্যের পর মিথ্যে বলতে এতটুকু দ্বিধা আসে না । উষা বললো, না এ ওদের বাক্স—আমি এতে শুধু আমার টাকা রাখি ।

উষা একটা গয়নার কৌটো খুলে একখানা দশ টাকার নোট আর একটা আধুলি বের করলো । আধুলিটা রমেনের হাতে দিয়ে বললো, এটা তোর আর এই টাকা দশটা মাকে দিবি, কিন্তু টাকা
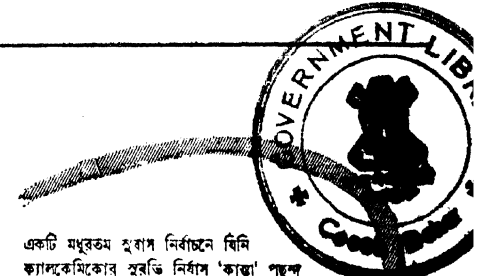
দশটা নিবি কেমন করে বলতো ? পকেটে করে নিবি, ট্রাম-বাসে কেউ ছুলে না নেয়।

রমেন তার মলিন জামাটা তুলে, ইজের প্যান্টের দড়িভরা খোলটা দেখিয়ে বললো, এর ভেতর করে নেব।

উষা নোটখানা ভাঁজ করে প্যান্টের দড়িভরা খোলে ঢুকিয়ে দিল। বললো, মাকে বলিস, আমি সময় করতে পারলেই যাব, কেমন ?

রমেনের তখন আর এতটুকু অপেক্ষা করার ইচ্ছে ছিল না। আট আনা পয়সা পাওয়ার আনন্দে চিত্ত তখন তার ভরপুর। তাই বলবো, বলে সে বেরিয়ে পড়লো।

রমেন চলে গেল। রেখে গেল সবুজ মসৃণ মেঝের উপর তার খড়ি-ওঠা, ধুলোমাখা ছোট ক'খানা পায়ের ছাপ।

উষা উঠে পশ্চিমের খোলা জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, রমেন তাড়াতাড়ি একখানা বাসে উঠে পড়ছে। বাসখানা কতকটা কালো ধোঁয়া ছেড়ে ছুটতে লাগল, উষার দৃষ্টি বাসখানা অনুসরণ করে এগিয়ে গেল কিছুটা, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে বাসখানা আড়াল পড়লো বাড়ির বাঁকে। নিরাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো উষা।

এই ছ'মাস ধরে যে কথা সে শত-সহস্র ভাবে ভেবেও কোন কূল-কিনারা পায়নি, শুধু নিজেকেই অহরহ ক্ষতবিক্ষত করেছে, আজ রমেনের আগমন সে চিন্তাকে গুরুভার পাষাণের মত ওর বুকে চেপে বসিয়ে দিয়ে গেল।

কেমন করে সে এই বেশে মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ? আবার কেমন করেই বা এই বেশ বর্ণন করে, তার বিয়ের মুহূর্তে চার পাশে যে কলগুঞ্জন উঠেছিল, তাদের আর একটা মুখরোচক আলোচনার অবকাশ করে দিয়ে মা'র কাছে যাবে। পাগলা হাওয়া যেমন করে মাটির উপরের শুষ্ক পাতা এক নিমেষে দূরদূরান্তে উড়িয়ে নিয়ে যায়—ঠিক তেমনি উষার আঁকড়ে ধরা সিদ্ধান্তবিহীন চিন্তারাজি পাখা মেলে শূন্যে উড়লো।

সূর্য পশ্চিমের বাড়ির নিচে নেমে গেল। পোড়া ঝামা আকাশ লাল হয়ে উঠলো। ঘড়ির কাঁটা প্রায় সমস্ত দিনটা বয়ে সন্ধ্যার প্রান্তে এসে দাঁড়াল। উষার খেয়াল ছিল না সেদিকে। কানে যায়নি তার সিঁড়িতে, বারান্দায় অরুণের ভারি জুতার শব্দ। অরুণ [illegible] এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছ যে, বলতে চমকে উঠলো [illegible] যেন তাকে ঘুম থেকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল। ধরা-পড়া দুষ্কৃতকারিণীর মত লাল হয়ে উঠলো উষার চোখ-মুখ— ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল কান দুটো।

উষার আঁচলটা টেনে নিয়ে অরুণ বাঁ হাতে চশমা খুলে ডান হাতে আঁচল-প্রান্ত দিয়ে বেশ করে নিজের মুখটা মুছে বললো : আমি বুঝতে পারছি একলা তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, তপতীকে কিছুদিন এখানে এনে রাখলে হয় না ?

উষা এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে, বললো : আসবে কি, বিয়েতে ও তো এলো না।

ভাই-এর উপর আর কত দিন রাগ করে থাকবে, এত দিনে নিশ্চয় ওর রাগ পড়েছে। নিরঞ্জনকে সংগে করে ওকে আসার জন্যে একটা চিঠি লিখে দে, কি বলো ?

তাই দাও, ওরা এলে বেশ একটু হৈ-চৈ করা যাবে।

শেষের কথাগুলোয় উষা জোর করে যেন একটু খুশীর ভাব টেনে আনলো। অন্যমনস্ক অরুণের কাছে ধরা পড়লো না সে ছলনাটুকু, বললো : হ্যাঁ তুমি একটু তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, চল একটা ছবি দেখে আসি। টেবিলের উপর থেকে আজকের কাগজটা দাও তো, দেখি কোথায় কি ভাল বাংলা বই হচ্ছে। মেট্রোতে বেশ একটা ভাল বই হচ্ছে, কিন্তু তুমি যে ছাই তেমন ইংরেজী বোঝ না—দাঁড়াও অল্পদিনের মধ্যে তোমার ইংরেজী বোধ আমি পাকা করে দিচ্ছি।

উষা স্বামীর হাতে সেদিনের কাগজটা এনে দিল, বললো : আজ কিন্তু আমার সিনেমা দেখতে যেতে ইচ্ছে করছে না ; আজ কেন কালকের সেই বইখানা শেষ করো না। তুমি জামা-কাপড় ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে নাও, আমি তৎক্ষণে তোমার চা-খাবার নিয়ে আসি, বলে অরুণকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অরুণ কাগজটা কোলের উপর রেখে, চেয়ারের দুই হাতার উপর দুই কনুই রেখে, চিবুকটা দুই হাতের তালুতে চেপে বসে রইলো। চোখে-মুখে গাঢ় হয়ে এলো একটা বিষণ্ণতা।

উষা প্রায় আধ ঘণ্টা পরে চোখে-মুখে জল দিয়ে পাউডার ঘষে খানিকটা প্রফুল্লতা নিয়ে চা-খাবার হাতে করে ঘরে ঢুকে দেখলো, অরুণ একই ভাবে স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে। উষা বিস্ময় প্রকাশ করে বললো : এ কি, তুমি এখনও বসে আছ, জামা-কাপড় ছাড়নি, মুখে-হাতে জল দাওনি, এগুলো যে একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।

অরুণ সে কথায় কোন জবাব না দিয়ে বললো : মনে হচ্ছে আমি বাজিতে হেরে গেছি। আধ্যাত্মিকতার কথা বাদ দিলে যার টাকা আছে তার কোন দুঃখ থাকতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে অর্থই বোধ হয় সব নয়। বাড়ি-গাড়ি, অর্থ, অলংকার কিছুরই অভাব তোমার তো নেই, তবু তোমাকে একদিনের জন্যেও প্রফুল্ল দেখলাম না ! তুমি যেন সর্বদা কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছ—প্রাণ খুলে যেন কিছুই করতে পারছ না। কোথায় যেন তোমার বাধছে, কি যেন একটা তুমি বার বার লুকাতে চাচ্ছ—আমি কি চেষ্টা করলে তার কিছুই করতে পারি নে— বল না আমাকে ?

উষা ঠিক এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। চোরাবালিতে পড়ে নিজেকে সামলাতে গিয়ে যেমন করে দ্রুত তলিয়ে যেতে হয়, উষা তেমনি শত চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারলো না। খাবারের ডিশ, চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে খানিকটা চা উপচে পড়লো দামী টেবিল-ক্লথটার উপর। ধরাগলায় বললো : তুমি আমাকে এত ভালবাস কেন ? তোমার ভালবাসা দিন দিন আমার দৈন্য বড় করে তুলছে—আমার বড় ভয় করে।

অরুণ কোন কথা খুঁজে পায় না। দুহাতে টেনে নেয় উষাকে তার বুকের উপর।

দুঃস্বপ্নের মত দিন কেটে চললো।

অরুণ হঠাৎ একদিন অফিস থেকে ফিরে বললো : আজ তোমার জন্যে একজন গানের মাষ্টার ঠিক করে এলাম, এখন থেকে দুপুরে গান শিখবে।

: বুড়ো বয়সে গান শিখে কি হবে ?

: রেডিও আর্টিষ্ট বা প্লে-ব্যাক গায়িকা না-ই বা হলে, সময় তো কাটবে।

উষা বিশেষ ভাবে আপত্তি করেছিল। অরুণ শোনে নি। কিনে এনেছে যন্ত্রপাতি—এসেছে মাষ্টার। এমন সহজ সমাধান খুঁজে পেয়ে খুশী হয়েছে সে নিজে।

জীবনের সমস্যা যদি এত সহজ হতো, তা হলে বোধ হয়, কুরুক্ষেত্র, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব, সীতাহরণ, সীতাবর্জন পর পর দুটো বিশ্ব-সমর এর কোনটারই কোন প্রয়োজন হতো না। রাস্তায় রাস্তায় সহস্র সহস্র মানুষ কুকুর বিড়ালের মত ডাষ্টবিনে অন্ন খুঁজে বেড়াত না, বিস্বাদ হতো না উষার সমস্ত মুখ। তা হয় না। তাই উষার দিন হয়ে ওঠে ভারি, রুদ্ধ হয়ে আসে শ্বাস।

ভয়ে ভয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটে তার দিন। শংকায় কালো হয়ে থাকে চিত্ত কখন আবার রমেন এসে পড়ে কে জানে! আর ক'দিনের মধ্যে সে না গেলে নিশ্চয় রমেন এসে পড়বে, টানবে তাকে ধরে, কি করে প্রতিনিবৃত্ত করবে সে, কি দিয়ে ভোলাবে তাকে। একদিন, দুদিন, এক মাস, দু মাস যদি বা ভুলতে পারে তারপর। কেমন করে সে মার কাছ থেকে দূরে রাখবে নিজেকে আর অরুণের কাছ থেকে রমেনকে! যেদিকে চায়, সেদিকেই বিরাট খাদ হাঁ করে থাকে। নেই নিশ্চিন্তে এতটুকু আশ্রয়।

এভাবে দুর্বহ ভার নিয়ে দিন চলে না। অরুণ বেরিয়ে গেলে উষা খুলে ফেললো তার বস্ত্রালংকার, বাথরুমে গিয়ে কম্পিত হাতে সাবান ঘষে তুলে ফেললো সীঁথির সিঁদুর। দু গ্রাস বিস্বাদ অন্ন মুখে দিয়ে আধময়লা কাপড়ের উপর একখানা কালো চাদর জড়িয়ে নেমে পড়লো পথে।

দিনটা যে এমন বিবর্ণ, সে যে কাজের এমন অযোগ্য এসব কথা উষা পূর্বে কখনও ভাবেনি। আজ রাস্তায় নেমে সহস্র জোড়া শাণিত চোখের সামনে তার হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে এলো। অনেকটা ছুটে গিয়ে উঠে পড়লো শ্যামবাজারের বাসে।

ফিরে এলো প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে। নির্লজ্জের মত পুনর্বার সাজাতে বসলো নিজেকে।

কিন্তু কিছুতেই ভেবে পেল না এ অভিনয়ের শেষ কোথায়! তার জীবনদেবতা তাকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে! কেমন করে, কি দিয়ে সে এত বড় মিথ্যার ফাঁকি পূর্ণ করবে, বহন করবে গুরুভার। ক্ষণপূর্বে মনের কোণ থেকে যে মেঘটুকু সরে গিয়ে নীল আকাশ ফুটে ছিল, দিগন্ত বেয়ে পাথুরে কালো মেঘ উঠে সে নীল কালো করে দিল।

তারপর পুরো ছটা মাস কেটে গেছে। অরুণ ঘণ্টা বাজিয়ে অফিস-বয়কে ডাকলো। বললো: দু'নম্বর র‍্যাক থেকে ছয় সাত নম্বর ফাইল দুটো দাও আর বাবুদের বলো, তাঁদের যদি কোন প্রয়োজন থাকে দেখে নিতে, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই এখনি চলে যাব।

ঘণ্টা দুই পরে অরুণ অফিসের প্রয়োজনীয় কাজ মিটিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। ঘরগুলো তালা বন্ধ, উষা বাড়ি নেই; হয়ত পাশের বাড়ি বেড়াতে গেছে মনে করে অরুণ বারান্দায় রাখা চেয়ারের উপর বসে টেবিলে মাথা রাখলো।

ঘণ্টাখানেক ইতিমধ্যে কেটে গেছে, অরুণের একটু ঘুমও এসে পড়েছিল, হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে অরুণ মুখ তুলে চাইলো, সে এক দুঃস্বপ্ন!

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল উষা। অরুণের বিস্ময়, বিমূঢ়তা আজ আর উষাকে অচল করে দিতে পারলো না। ভয় দূরে ভয়, কাছে সে অত্যন্ত নির্ভীক। উষা অরুণের সামনে এসে দাঁড়াল। ভূগর্ভের চাপা লাভার মত উষার মুখ, কথাগুলো আজ শতধারায় উৎসারিত হলো, বললো: আমি বিশ্বাসের অযোগ্য, ছলনাময়ী—আমাকে বিশ্বাস করো না, আমাকে দূর করে তাড়িয়ে দাও। আমি শুধু তোমাকেই প্রতারিত করিনি, আমার মা-ভাই এমন কি আমি নিজেকে পর্যন্ত প্রতারিত করেছি। যে দিন তুমি ডেকেছিলে, সেদিন আমি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। রঙিন স্বপ্ন যে মানুষকে এমন ভাবে বিভ্রান্ত করে, জানতাম না। তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম আমার কেউ নেই, কিন্তু সে ছিল অতি বড় মিথ্যে—আমার বিধবা মা, ছোট ভাই শ্যামবাজারে বস্তিতে বাস করে, তাঁদের আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমার অর্থই ছিল তাঁদের জীবন ধারণের একমাত্র সম্বল। আর আমি—হ্যাঁ, আমি নিজেও বিধবা, পারিনি চোখ ধাঁধান বস্ত্রালংকারে সুসজ্জিত হয়ে গিয়ে বুকে নির্মম ভাবে আঘাত হানতে। তাই নিজের সংগেই করেছি অহরহ সংগ্রাম—ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তবু নিজ কৃতকর্মের সবটুকু ভার আমি নিজেই বইতে চাই—দিতে পারবো না আর কাউকে।

শেষের দিকে উষার কণ্ঠ জড়িয়ে এলেও সে থামতে পারলো না। সে যেন আজ একান্ত ভাবেই মিথ্যের গ্লানি বহন করতে অনিচ্ছুক। কথা শেষ করে উষা ভীষণ ভাবে হাঁফাতে লাগল। দ্রুত স্পন্দিত হতে লাগলো নাসারন্ধ্র বক্ষ। এই মুহূর্তে সে যেন মারাত্মক সংগ্রাম করে উঠেছে। আর তারই সামনে নিশ্চল পাষাণের মত বসে রইলো অরুণ।

মিথ্যে দিয়ে কেনা বাড়ি-গাড়ি উষার চোখের সামনে মিথ্যে হয়ে গেল। আঁচল থেকে চাবির থোকাটা খুলে টেবিলের উপর রেখে ধীরে ধীরে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

অরুণের যখন খেয়াল হলো, দেখলো উষা নেই—ঘরের দরজা তেমনি তালাবন্ধ। উষা কখন গেল, কোথায় গেল কিছুই না বুঝে ভৃত্য কালীপদকে ডেকে বললো: দেখতো তোর বৌদিমণি কোথায়?

রমেন ডাকলো: ওমা, মা গো', ওঠো দেখ দিদি আজ আবার বমি করছে। ভগবান! শান্তিতে একটু ঘুমাব তারও কি উপায় আছে!

রক্ষামণি শয্যা ছেড়ে উঠলেন। কাপড় ঠিক করে বাইরে বেরুবার পূর্বেই, অন্ধকারে ছায়ার মত ঘরে এসে ঢুকলো উষা। রক্ষামণি জিজ্ঞাসা করলেন: কি রে অম্বল হয়েছে নাকি—রোজ রাত্রে এমন বমি করিস কেন?

উষা কোন জবাব দেয় না। দড়ির উপর থেকে মেলে দেওয়া গামছাখানা নিয়ে জলে জলে মুখ-হাত-পা মুছতে লাগলো।

রক্ষামণি পুনরায় বললেন: তুই একি সর্বনাশ করলি, রাত পোয়ালে এখানে মুখ দেখাবি কেমন করে শুনি?

লক্ষ্মী কমলা!
আমার ভাইঝি কমলা স্কুলের ছুটিতে আমার এখানে আসার পর থেকেই
বাড়ীর চেহারা যেন বদলে গেছে। আগে আমি সব সময়েই ব্যস্ত থাকতাম, কিছুই
যেন হয়ে উঠতো না কিন্তু কমলার হাতের
ছোঁয়ায় সমস্ত কাজ যেন মূহুর্ত্তের মধ্যে হয়ে যায়!
এই কাপড় ধোওয়ার ব্যাপারেই দেখুন না।
কাপড় কাচার মধ্যে যে কোন বিশেষত্ব থাকতে
পারে আমি তা জানতাম না তাই কমলা যখন
আমায় বলল যে কাপড়কাচা সাবান হওয়া
দরকার খাঁটী আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়ে-
ছিলাম। ও বলল, "খাঁটী সাবান হলে
জামাকাপড় কাচা ভাল হয় কারণ খাঁটী
সাবানে প্রচুর ফেণা হয়। সে ফেণায়
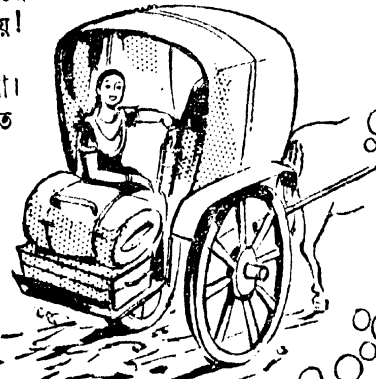
জামাকাপড়েরও ক্ষতি হয়না এবং হাতেরও কোন অনিষ্ট
হয়না।" সে সানলাইট সাবান এনে আমায় দেখাল যে
সানলাইটে কাচা জামাকাপড় কত পরিষ্কার হয়।
সত্যি, একটু ঘষলেই ফেণা হয় কত। আমি যখন
ওকে কাপড়কাচার জিনিষটা দিলাম, কমলা বলল—
"না, পিসীমা, সানলাইট দিয়ে কাচার সময় জামাকাপড়
আছড়াতে হয়না। শুধু একটু সাবান ঘষে দাও প্রচুর
ফেণা হবে এবং জামাকাপড় বিনা আছাড়েই পরিষ্কার হবে।"
সত্যিই কাচার পরে কাপড়জামা এত সাদা আর উজ্জ্বল
হয়ে উঠল যে আমার যেন আর শুকোবার জন্যে তর
সইছিল না; তখনই পরতে ইচ্ছে করছিল। কমলা
সত্যিই চালাক মেয়ে! সে বলে যে সানলাইট দিয়ে কাচলে
জামাকাপড় এত সাদা আর উজ্জ্বল হয় তার কারণ সানলাইটের
প্রচুর ফেণা জামাকাপড়ের সুতোর ফাঁক থেকে সব ময়লা দূর করে দেয়।"
সবই তো বুঝলাম। কিন্তু বাড়ীটা চালাতে হয়তো আমাকেই। সেইজন্যে ওকে আমি
আমার মনের কথাটা বলেই ফেললাম—"কিন্তু সানলাইটের দাম যে বড্ড বেশি।"
কমলা একগাল হেসে বলল—"পিসী, ওটা তোমার মিথ্যে ভয়!" আমি অবাক হয়ে
গেলাম। তখন কমলা বললঃ "একটা সানলাইট সাবানে একগাদা
কাপড় কাচা যায়। সানলাইট দিয়ে জামাকাপড় কাচলে সত্যিই
খরচ বাঁচে!" সানলাইট সাবান সম্বন্ধে আর একটি জিনিষ আমার খুব
ভাল লাগে। সানলাইট দিয়ে কাচার পরে জামাকাপড়ের গন্ধটাই কেমন
পরিষ্কার পরিষ্কার লাগে আর এর ফেণা হাতকে রাখে কোমল ও মসৃণ।
কমলা বাড়ীতে আসার পরেই আমি প্রথম
জানলাম যে পরিবারের সমস্ত জামাকাপড়
যেমন আমার স্বামীর সার্ট, পায়জামা,
তোয়ালে, ন্যাপকিন, বিছানার চাদর,
পর্দ্দা, ছেলেমেয়েদের জামাকাপড়—এক
কথায় আমার ছোটবড় সব জামাকাপড়
কাচার জন্যে সানলাইটের থেকে ভাল
সাবান আর কিছুই নেই। এটি যে
শুধু জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে তাই নয়;
সানলাইটের একটি সাবানেই এক গাদা জামাকাপড়
কাচা যায়। এতে পয়সাও বাঁচে আর
পরিষ্কার জামাকাপড়ও পরা হয়।
SUNLIGHT
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই
S 254 B-X52 BG

চল না, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

মেয়ের এমন নির্লজ্জ কথায় রক্ষামণির ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে উঠলো। ঠিক কথাটা মনে এলে হয়ত বা একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলতেন। ঝাঁঝের সংগে বলে উঠলেন: টাকা কোথায়, এখানে বাড়িওয়ালার ঘরের কাজ করে দিয়ে থাকি, ভাড়া লাগে না, নতুন বাসায় সে সুবিধাটুকু পাবো কোথায়? তাবাদে কোলকাতার চিনিই বা কি, কোথায় এখন ঘর খুঁজতে যাব?

যে সময় প্রথম কোলকাতায় এসেছিলাম, সে সময় তো আজকের থেকে ঢের কম চিনতাম, আশ্রয় তো জুটে ছিল, এবারও কোথায়ও একটা জুটবে।

সে সময় হাতে গাঁটে টাকা ছিল, এখন তো তাও নাই বরং নতুন একটা পাপ এসে স্কন্ধে চেপেছে।

উষা অহেতুক গামছাখানা হাতে করে নাড়াচাড়া করতে লাগল। রাগে, ঘৃণায়, অভিমানে রক্ষামণির চিত্ত অতি মাত্রায় তিক্ত হয়ে উঠলো। মুখে তিনিও আর কিছু বলতে পারলেন না, কিন্তু মনে মনে ঠিক বঝলেন এ বাসা ছাড়া ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই। আশ্রয় ছেড়ে নিরাশ্রয়ের কল্পনায় রক্ষামণির সমস্ত মনটা হাহাকারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। ছেলে-মেয়ের হাত ধরে পথে ঘুরছেন দৃশ্যটা রক্ষামণির চোখে অতি মাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠলো। জল এসে পড়লো চোখে।

দুঃখেরও একটা সীমা আছে, শেষ আছে, মানুষ সহ্য করতে পারে ততক্ষণ, যতক্ষণ তার সামনে আঁকড়ে ধরার মত একটা আশা থাকে। আশাহীন অনন্ত দুঃখ, দীপহীন বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত আঁধারের মত, বিমূঢ় করে দেয় রক্ষামণিকে। তিনি ভেবে পেলেন না, কোন পাপে ভগবান তাকে এত বড় সাজাটা দিলেন! বুঝে পেলেন না, একটা অসহায় পরিবারকে ততোধিক অসহায়তার মধ্যে দিকচিহ্নহীন মহাসমুদ্রে কলার ভেলায় করে ভাসিয়ে দিয়ে, স্রষ্টা তাঁর কি নিগূঢ় উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন করলেন!

ঘরে আলো জ্বালা হয়নি, পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে ট্রাপীজিয়ামের মত এক খণ্ড চাঁদের আলো এসে পড়েছে সবুজ ঘরের মেঝেতে। অরুণ চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে চুপ করে সেদিকে চেয়েছিল। ভাবতে চেষ্টা করছিল উষার সেদিনের কথাগুলো এবং তার পাশে তার নিজের অশোভন, অভদ্র বর্বরোচিত আচরণটা। সেই না উষাকে এক দিন বলেছিল, তোমার সংগোপন লালিত অন্তর্লোকের বিপুল বেদনার কথা কি আমাকে বলতে পার না? দিতে পার না আমাকে তার ভাগ? পারি নাকি তোমার সে বেদনা খানিকটা হাল্কা করতে? কিন্তু সে যখন তার সব কথা শেষ করে, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এসে সামনে দাঁড়িয়েছিল, আমি তো তাকে হেসে ছেলেমানুষ বলে কাছে টেনে নিতে পারিনি, উচ্চারণ করতে পারিনি সান্ত্বনা বা সহানুভূতির একটা প্রিয় বাক্য। সেই মুহূর্তের নীরব লাঞ্ছনাই ওকে বের করে দিয়েছে বাড়ি থেকে। নিশ্চল পাষাণ-মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সে আর অপমান সহ্য করতে পারেনি, নীরবে আমার হীনতাকে গগনচুম্বী করে নেমে গেছে সিঁড়ি বেয়ে। সে হীনতাই আজ দু' মাস ধরে অরুণকে চরকির মত ঘুরিয়েছে শ্যামবাজারের আশে-পাশে বস্তি অঞ্চলে। কিন্তু এই দু' মাসে সে স্পষ্ট করে বুঝেছে, একখানা চেনা মুখকে চিহ্নবিহীন বস্তি থেকে খুঁজে বের করা সহজসাধ্য নয়। পুরুষ মানুষ হলে তাকে পাঁচ রকম কাজে বাইরে বেরুতে হতো পথে-ঘাটে, দেখা হলেও হতে পারতো, কিন্তু একজন অন্তঃপুরিকা সম্পর্কে সে আশা করাও দুরাশা! এক প্রতিটি বস্তির প্রতিটি বাড়ি উষার নাম ধরে খোঁজ করতে পারলে হয়ত একটা সন্ধান মিললেও মিলতে পারে, কিন্তু ঐভাবে একজন মেয়েমানুষের নাম ধরে বাড়ি-বাড়ি খোঁজ করার চিন্তায় অরুণের সভ্য সংস্কার সংকুচিত হয়ে ওঠে। উষার ভাই-এর নাম জানা থাকলে সে হয়ত বাড়ি-বাড়ি সংবাদ নিতে পারতো—উষার নাম ধরে সে কিছুতেই খোঁজ করতে পারবে না। উষার নাম ধরে খোঁজ করতে গেলে এক গাড়ি লোক এসে ঝুঁকে পড়বে, কত রকম টীকা-টিপ্পনী প্রকাশ করবে, তার সামনে সারকাসের ক্লাউনের মত দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব! তার পর উষা এখন ওখানে আছে, কি অন্য কোথাও কাজ নিয়েছে তাই বা কে জানে? তার মা-ভাই-এর সেই তো একমাত্র অবলম্বন, কথাটা ভাবতেই অরুণ প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেল।

অরুণ নিশ্চিত বুঝলেও হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারলো না। ইতস্তত ঘুরলো শ্যামবাজারের আশে-পাশে। বস্তি দেখলে ঢুকে পড়েছে তার মধ্যে। সংকীর্ণ পথে হাঁটতে গা ঘিনঘিন করেছে, মরা ধেড়ে ইঁদুর, কুকুর, বিড়ালছানা পচা গন্ধে, নামাতে পারেনি নাক থেকে রুমাল, তবু গিয়েছে। কখনও ঢুকেছে একেবারে সংকীর্ণ গলির মধ্যে, দু'পাশের ঘরের দেওয়াল গায় বেঁধে দাঁড়িয়েছে কাগজে করে ফেলা ময়লা কিংবা মাছের আঁশ বা এঁটোকাঁটা। এমনি করে এগিয়ে হঠাৎ কোন কোন গলি শেষ হয়েছে বাড়ির উঠানে। অরুণ ফিরতে গেছে তাড়াতাড়ি, কেউ দেখে ফেলে প্রশ্ন করেছে: কা'কে চান? জ্বালা করে উঠেছে ওর চোখ-মুখ। বলেছে: মনে করেছিলাম এই দিক দিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় যাওয়া যাবে। ব্যস, আর দাঁড়ায়নি, বেরিয়ে এসেছে দ্রুত পায়ে। সামনে আবার তেমনি একটা গলি পড়েছে, গিয়ে ঢুকেছে তার মধ্যে। জীবনের অন্য কোন পরিস্থিতিতে অমন একটা গলি মাড়ান তো দূরের কথা, অরুণ কখনো চোখ তুলেও দেখত না।

কেটে গেছে অনেকগুলো দিন-মাস। ভবিষ্যৎ অরুণের হাতে দীর্ঘ করে দিয়েছে অরুণের দিনগুলি। শোয়ার ঘরের প্রশস্ত শয্যা, ব্র্যাকেটে গুছিয়ে রাখা উষার শাড়ী, ঘরময় ছড়ান অসংখ্য টুকিটাকি অরুণকে বিব্রত করে তুলেছে। টেনে নামিয়েছে রাস্তায়। নিশি পাওয়া মানুষের মত ঘুরিয়েছে বস্তিবাড়ীর আনাচে কানাচে।

সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে। আকাশের রঙ ধোঁয়াটে। অরুণ ফিরছিল উল্টোডিঙ্গী রোড ধরে। একটা দশ-এগার বছরের ছেলে এসে বললো, বাবু আমরা বড় গরীব কিছু সাহায্য করবেন?

অরুণ ছেলেটির আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিল। মাথায় বহুদিন তার তেল পড়েনি, তামাটে অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলগুলো আবৃত করে রেখেছে চোখ দু'টো, জামা-প্যান্ট দুটো অত্যন্ত মলিন। জামার ডান হাতের পুট ছিঁড়ে অনেকটা নেমে উন্মুক্ত করেছে হাতটা। প্যান্টের দু'পাড় মুড়া প্লেট দুটো ছিঁড়ে প্রায় নেমে গেছে। ঝলছে কবন্ধের মত। হাঁটুর নিচে থেকে পা দুখানায় বেশ কয়েক পরদা ধুলো জমেছে। সে ধুলো 'রুক্ষ দি

রে জমেছে, সে স্বরবিজ্ঞান পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিক ভিন্ন অন্ত কেউ সঠিক বলতে পারবে না।

অরুণ প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কিছু পয়সা বের করে তাকে দিতে যাচ্ছিল। ছেলেটি পুনরায় বললো আমরা বড় গরিব বাবু, দিদির কাজ যাওয়ার পর থেকে পেট ভরে প্রায় খাওয়াই হয় নি। দিদির একটা ছেলে হয়েছে, কি সুন্দর তাকে দেখতে কিন্তু বাঁচবে না—এক দিনের জন্তেও তাকে একটু দুধ দেওয়া যায় নি, ভাতের মাড় খেয়ে কি আর ছোট ছেলে বাঁচে? দিন না বাবু একটা টাকা?

অন্ত কোন বাবু হলে ছেলেটি হয়ত অত কথা বলতো না। কারণ যার কাছে পয়সা চায় সে প্রায় পাশ কাটিয়ে চলে যায়—সংগে সংগে বাবু একটা পয়সা, একটা পয়সা করে অনেকটা দূর পর্যন্ত স গ নেয়, কখনো একটা পয়সা পায়, কখনো বা শুধু হাতেই ফিরে আসে। কিন্তু এ বাবুর মধ্যে নূতনতর আচরণ দেখে একটু ভরসা পেয়েছে, বাড়িতে কথাগুলো অহরহ শোনে, তাই বলে গেছে মুখস্থের মত -সাহস করে চেয়েছে একটা টাকা।

ছেলেটির কথা ক'টি অরুণের মধ্যে এসে বিদ্যুতের শিহরণ বাইয়ে দিল। ছেলেটি তো উষার ভাই নয়! বললো: দিদি আর দিদির ছেলে ছাড়া তোমার আর কে আছে?

আর মা আছেন।

তোমরা কোথায় থাক?

ছেলেটি হাত তুলে দেখিয়ে বললো, ওখানে।

তবে চল টাকাটা বরং তোমার মায়ের হাতেই দিয়ে আসি, তুমি ছেলেমানুষ হারিয়ে ফেলবে।

না না আমি হারাব না, একটা পয়সাও আমি হারাইনে। যা পাই মাকে গিয়েই দিই।

তা হোক, চল আমি গিয়েই দিয়ে আসি।

ছেলেটি একটু ক্ষুণ্ণ হলো। বুঝলো না অরুণের মতি-গতি। বললো চলুন।

ছেলেটির পেছন পেছন চলতে চলতে অরুণ বললো: ভাই, তোমার নাম কি?

শ্রীরমেন্দ্রনাথ রায়।

কোন ক্লাসে পড়ো প্রশ্ন করতে গিয়ে অরুণ থেমে গেল, যাদের খাওয়ার সংস্থান নেই তারা যে স্কুল পাঠশালার ধার ধারে না, এ ত স্বতঃসিদ্ধের মত সত্য। অরুণ ভাবতে পারে না এ সব ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা।

আঁধার তখনও ঘন হয়নি, মুছে যায়নি চোখের দৃষ্টি। রমেন বললো: ঐ দেখুন সামনেই আমাদের ঘর, দিদি খোকনকে খাওয়াচ্ছে।

রমেনের গলার স্বর শুনে উষা চোখ তুলে অরুণকে সামনে দেখে লজ্জায় সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, কিন্তু নারীর যে লজ্জা আড়ষ্ট হলেও তাকে অচল করতে পারে না, সেই লজ্জায় উষা তাড়াতাড়ি উঠে পালাল। যে কাপড়খানা পরে উষা আঁধারের সুযোগ নিয়ে দরজার ধারে এসে বসেছিল। সে বস্ত্রে যৌবনকে আগলান তো দূরের কথা—একলা ঘরেও লজ্জা ঢাকা যায় না।

তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হয়ত চাপ-চোপ লেগে থাকবে—কেঁদে উঠলো বাচ্চাটা; উষা নিজের অস্তিত্বকে একেবারে লুপ্ত কোরবার জন্তে শিশুর কান্না থামাতে প্রয়াস পায়।

থমকে দাঁড়াল অরুণ। রমেন বললো: আমি মাকে এখুনি ডেকে নিয়ে আসছি। অল্প পরে রমেন মাকে ডেকে নিয়ে এলো, বয়স তাঁর পঞ্চাশ ছুঁতে গেছে। কিন্তু দেহের বাঁধন তাঁর বয়সকে চল্লিশের এপারে রেখেছে। রঙ তার এখনও কাঁচা হলুদের মত। কেবল কপালে ফুটেছে দুশ্চিন্তা এবং অনিশ্চিয়তার কয়েকটা রেখা, চোখের নিচে জমেছে কালি।

অরুণ নিচু হয়ে রক্ষামণির পা স্পর্শ করে প্রণাম করলো। রক্ষামণি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে কিছু বলবার পূর্বেই অরুণ বললো: মা, আমি আপনাদের নিতে এসেছি আপনারা তৈরী হয়ে নিন, আমি ততক্ষণে রমেনকে সংগে করে কিছু জামা-কাপড় কিনে আনি। উষাকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে আমার সব কথাই বলবে।

রক্ষমণির বিস্ময়কে বহু গুণ বর্দ্ধিত করে অরুণ রমেনকে সংগে করে সেই আসন্ন আঁধারের মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে অরুণ রমেন কতকগুলো নতুন জামা-কাপড়ের বাক্স নিয়ে ফিরে এলো। ঘরের ভেতর তখন একটা কেরসিনের ল্যাম্প প্রচুর ধূম উদ্‌গিরণ করে জ্বলছে। উষা অধোমুখে ট্রাঙ্কের আড়ালে বসে। অতিমাত্রায় বিচলিত বিভ্রান্ত মনে হতে লাগল রক্ষামণিকে। বোধ করি কিছু আগে অনেক কথাই হয়ে গেছে দু'জনের মধ্যে। অরুণ জামা-কাপড়ের বাক্স এবং সিঁদুর পাউডারের কৌটা দু'টো রক্ষামণির হাতে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে কেঁপে উঠলো রক্ষামণির। কেঁপে গেল হাত। বৃষ্টির পর অল্প বাতাসে যেমন করে ঝরে ফুলের দলের জমা জল, তেমনি দু' চোখ পূর্ণ করে নামলো জলের ধারা। অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন: ভগবান, ওদের সুখী করো।

# বসন্ত সন্ধ্যা

**শ্রীসন্ধ্যা গুপ্ত**

চাঁদ হেসে চলে দূর ঐ নীল আকাশে
জ্যোৎস্নাধারায় ভাসিয়া ধরণী হাসে।
মলয়-বাতাস বহে চলে ধীর মন্দ,
সাথে তার আসে মধুর ফুলের গন্ধ।

কামিনী, করবী, রজনীগন্ধা হাসে
সরোবরে দোলে কুমুদিনী উল্লাসে।
পাপিয়া কাঁদিছে বসিয়া বকুলশাখে
এ মধু-রজনী ব্যথা দিল কেন তাকে?

## ক্রিকেট

পঞ্চম টেষ্টের সংগে সরকারী সফর শেষ করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল পাকিস্থানের মাটিতে পদার্পণ করে পর পর দুটি টেষ্ট খেলায় পরাজয় বরণ করেছে। পাকিস্থানের সংগে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের টেষ্ট খেলার পর্য্যালোচনা আগামী বারে করার ইচ্ছে রইলো। কারণ হাতের কাছে এত বেশী সংবাদ আছে যা এই সংখ্যার মাধ্যমে পরিবেশন করা একান্তই অসম্ভব।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল এ সফরে ১৭টি খেলার মধ্যে একটিতেও পরাজিত হয়নি। তিনটি টেষ্ট সমেত ১১টি খেলায় জয়লাভ করেছে। অপরাপর খেলাগুলি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

পঞ্চম টেষ্টে ভারতীয় দল অপেক্ষাকৃত ভাল খেলেছে। চান্দু বোরদের কৃতিত্ব এ টেষ্টে উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনিই একমাত্র ভারতীয় খেলোয়াড় যিনি ভারতের পক্ষ থেকে এবারের টেষ্ট খেলায় সেঞ্চুরি লাভের গৌরব অর্জ্জন করেন।

ভারতের অধিনায়ক অধিকারী টসে জয়লাভ করে নিজ দলকে ব্যাট করতে পাঠান। দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠ চিরদিনই ব্যাটসম্যানদের পক্ষে তার ব্যতিক্রম এ খেলায় দেখা গেল না। কণ্ট্রাক্টর ও উম্রিগড়ের প্রশংসনীয় ব্যাটিংএর ফলে প্রথম দিনে ভারত ৪ উইকেটে ২৩৬ রাণ সংগ্রহ করে। নরী কণ্ট্রাক্টর মাত্র ৮ রাণের জন্ত সেঞ্চুরি লাভে বঞ্চিত হন। দ্বিতীয় দিনে ৪১৫ রাণে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি হয় এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল দিনের শেষে কোন উইকেট না হারিয়ে ৬৪ রাণ সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের পক্ষে চান্দু বোরদে ১০১ রাণ করে আউট হন। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, বোরদে শত রাণ করার মধ্যে একটুও ভুল করেননি। নিপুণ হাতে সতর্কতার সংগে খেলে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে অধিনায়ক হেমু অধিকারীর ৬৩ রাণ যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। তৃতীয় দিনে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ৪ উইকেটের বিনিময়ে ৪০৮ রাণ করে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান হোল্ট ভারতে তাঁর প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরি করেন (১২৩) আর হাণ্ট মাত্র ৮ রাণের জন্ত শতরাণ লাভ করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলায় নট আউট ব্যাটসম্যান স্মিথের শতরাণ পূর্ণ হয় এবং জো সলোমন নট আউট থেকে জীবনের প্রথম টেষ্ট সেঞ্চুরি লাভ করেন। ৮ উইকেটে ৬৪৪ রাণ করে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে।

ফিরোজ শা কোটলা মাঠে ভারতের বোলাররা কোনরূপ সুবিধা করতে পারেন নি। তবু বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইনসুইং বোলার রামকান্ত দেশাই ১৬৯ রাণে ৪টি উইকেট লাভ করেন।

দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ভারত চতুর্থদিনের শেষে একটি উইকেট হারিয়ে ৩১ রাণ সংগ্রহ করে। উম্রিগড় ও মঞ্জরেকার প্রথম দিনেই ও বোরদে তৃতীয় দিনে আঙুলে আঘাত পান। ভারতীয় দলে সাময়িক বিপর্যয়ের দোলায় দুলতে লাগলো। ভারতের ব্যাটসম্যানরা অত্যন্ত মন্থর গতিতে শেষ দিন ব্যাট করতে লাগলো। এক সময়ে ঘন ঘন উইকেট পতনের ফলে শেষের দিকে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২৭৪ রাণ সংগ্রহ করলো। বোরদের রাণ-সংখ্যা ১৫ খেলার মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। ভারতীয় দলের পক্ষে মাত্র দুই জন আহত খেলোয়াড় আছেন মঞ্জরেকার ও উম্রিগড়। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় মঞ্জরেকার ব্যাট করতে এলেন বোরদের সেঞ্চুরি লাভের সহায়তার জন্ত। মাত্র ১ রাণ যোগ করে গিলক্রিষ্টের শেষ বলে বাউণ্ডারী মারতে গিয়ে হিট উইকেট হয়ে যান। পর পর দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব থেকে তিনি বঞ্চিত হন।

এবারকার ফলাফল :—

ভারত—১ম ইনিংস—৪১৫ (চান্দু বোরদে ১০১, কন্ট্রাক্টর ৯২, উম্রিগড় ৭৬ অধিকারী ৬৩ মানকড় ২১, হল ৬৬ রাণে ৪ উই:, গিলক্রিষ্ট ১০ রাণে ৩ উই: ও স্মিথ ১৪ রাণে ৩ উইকেট)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস—৬৪৪ (হোল্ট ১২৩, সলোমান নট আউট ১০০, স্মিথ ১০০, হাণ্ট ৯২ সোবার্স ৪৪, কানহাই ৪০ এটকিনসন—৩৭, আলেকজাণ্ডার ২৫, দেশাই ১৬৯ রাণে ৪ উই ও অধিকারী ৬৮ রাণে ৩ উই:)

ভারত—২য় ইনিংস—২৭৫ (বোরদে ৯৬, রায় ৫৮, গাইকোয়াড় ৫২ হেমু অধিকারী ৪০, স্মিথ ১০ রাণে ৫ উই: গিলক্রিষ্ট ৬২ রাণে ৩ উইকেট)

## এ্যাসেজ পুনরুদ্ধার

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের ঐতিহাসিক যুদ্ধে অষ্ট্রেলিয় জয়লাভ করে তার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করেছে। পাঁচটি টেষ্ট খেলা সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রব।

প্রথম টেষ্ট—অষ্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া প্রথম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে জয়লাভ করে। প্রথ টেষ্ট খেলাটিতে অত্যন্ত কম সংখ্যক রাণ ওঠায় এটাকে লোস্কো ম্যাচ বলা চলে এবং খেলাটা পঞ্চম দিনেই শেষ হয়।

ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে টসে জয়লাভ করে নিজ দল ব্যাট করতে পাঠান। কিন্তু এ্যালান ডেভিডসন, আয়ান মেকি ও রিচি বিনোডের প্রশংসনীয় বোলিং-এর ফলে ইংলণ্ডের কীর্তিম ব্যাটসম্যানরা আউট হয়ে যান। ট্রেভর বেইলী ও অধিনা পিটার মে'র খেলায় দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলে ১৩৪ রাণে প্রথম ইনিংস সমাপ্ত হয়। অষ্ট্রেলিয়া দলও প্র ইনিংসে খুব প্রশংসনীয় রাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। দ্বি দিনের শেষে ৬ উইকেটে ১৫৬ রাণ সংগ্রহ করে। এর ম্যাক্‌ডোনাল্ডের ৪২ ও নর্ম্যান ও'নীলের ৩৪ রাণ সবি উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় দিনের খেলায় লোডারের মারাত্মক বো এর জন্ত অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি হয় ১৮৬ রা

সাঁচীর প্রবেশতোরণ

—অরুণকুমার দত্ত

উভয় সঙ্কট

—বসু বন্দ্যোপাধ্যায়

রাশি রাশি যূঁই — রঞ্জিৎ বল

'সাজী' ( বর্দ্ধমানরাজবাটী, অম্বিকা কালনা ) —চন্দ্রমোহন দে

মুক্তি চাই

—ধীরেন অধিকারী

—রামকিঙ্কর সিংহ
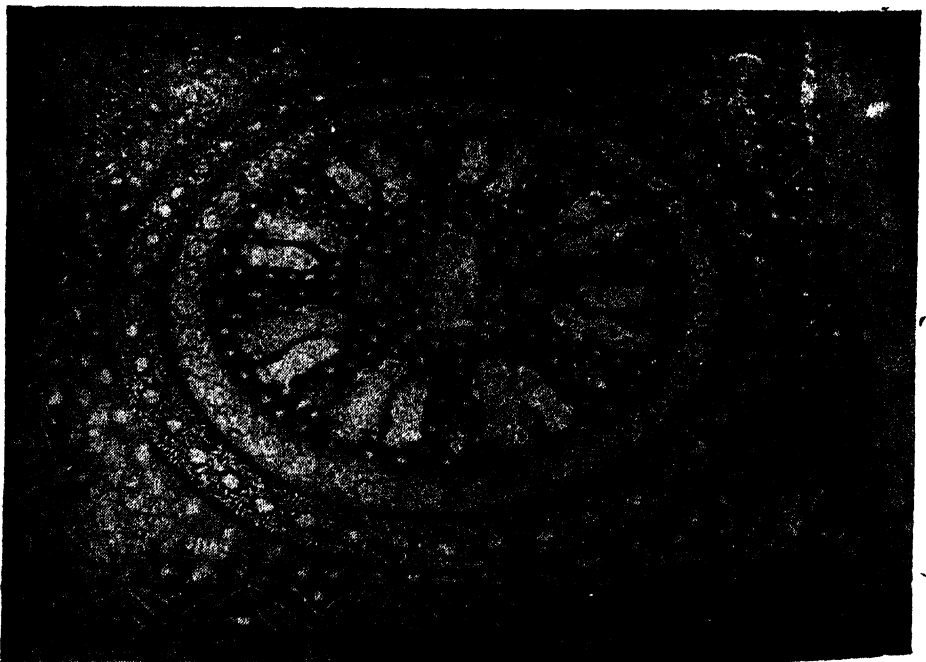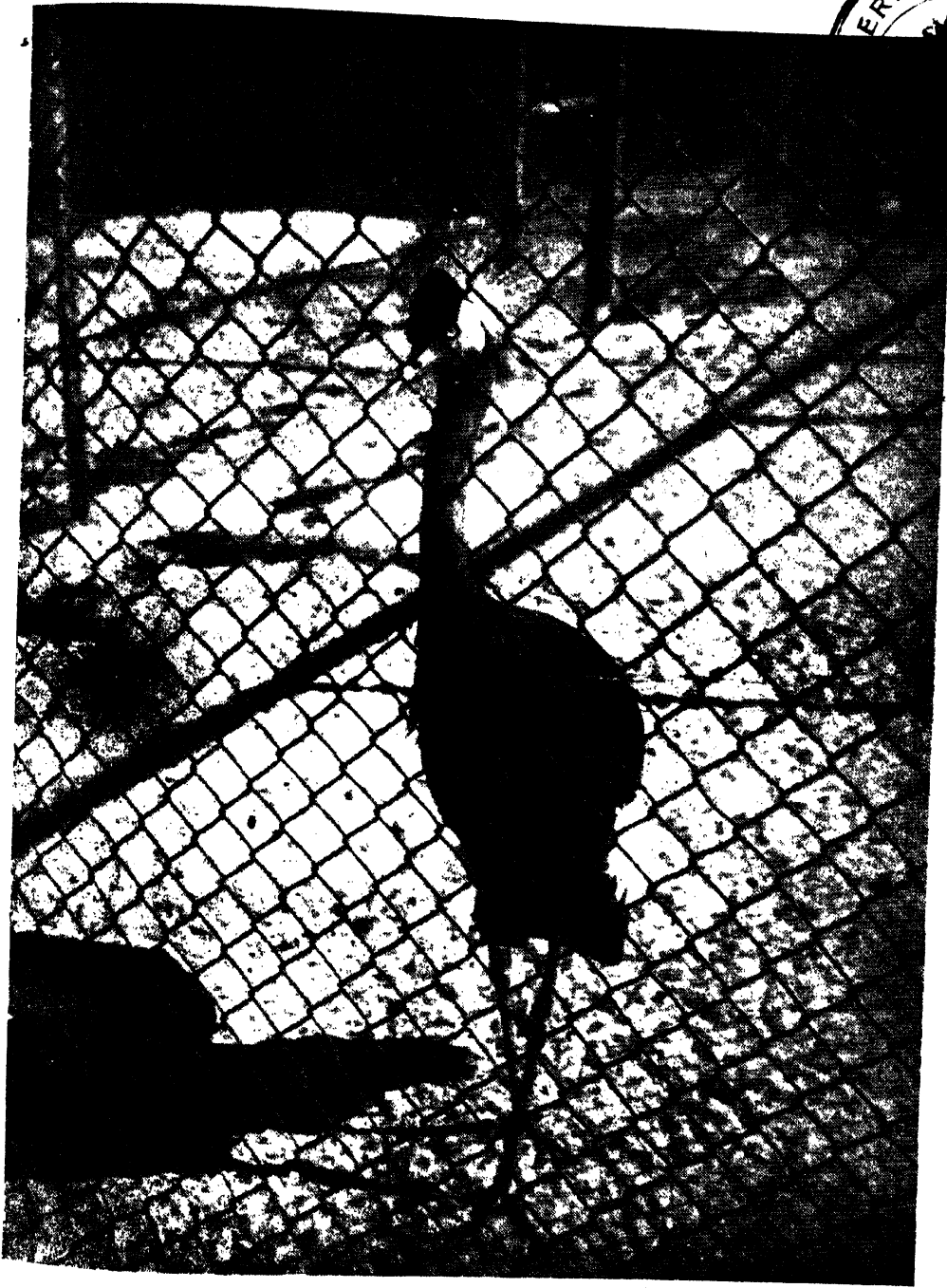
তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২ উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ড ১২ রাণ সংগ্রহ করে।

চতুর্থ দিনের খেলায় অত্যন্ত মন্থর গতিতে রাণ ওঠে। সারাদিনে ইংলণ্ড দল ১০২ রাণ সংগ্রহ করে। ট্রেভর বেইলী ৮ ঘণ্টা ৩১ মিনিট কাল উইকেটে থেকে ৬৮ রাণ সংগ্রহ করেন। মোট ১১৮ রাণে দ্বিতীয় ইনিংস সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় অষ্ট্রেলিয়া দলের ব্যাটিং বিপর্য্যয় ঘটে। মাত্র ৫৮ রাণে দুটি উইকেট পড়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়া তরুণ খেলোয়াড় ও' নীল নিপুণ হাতে ব্যাট করেন। শেষ পর্য্যন্ত ৭১ রাণ করে নট আউট থেকে যান।

প্রথম টেষ্টের স্কোর বোর্ড

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস—১৩৪ ( বেইলী ২৭, মে ২৬, গ্রেভনি ১১ মেকিফ ৩৩ রাণে ৩ উইকেট ডেভিডসন ৩৬ রাণে ৩ উইকেট ও বিনোড ৪৬ রাণে ৩ উইকেট )।

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—১৮৬ ( ম্যাকডোনাল্ড ৪২, ও' নীল ৩৭ ডেভিডসন ২৫, জিম বার্ক ২০, লোভার ৫৬ রাণে ৫ উইকেট বেলী ৩৫ রাণে ৩ উইকেট লেকার ১৫ রাণে ২ উইকেট )।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস ১১৮ ( বেইলী ৬৮, গ্রেভনি ৩৬, কলিন কাউড্রে ২৮, এ মিল্টন ১৭, বিনোড ৬৬ রাণে ৪ উইকেট, ডেভিডসন ৩০ রাণে ২ উইকেট মেকিফ ৩০ রাণে ২ উইকেট )।

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস—( ২ উইকেট ) ১১৭ ( ও'নীল নট আউট ৭১, জিম বার্ক নট আউট ২৮, নীল হার্ভে ২৩ )।

[ অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী ]

দ্বিতীয় টেষ্ট—দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাটিতেও অষ্ট্রেলিয়া দল ৮ উইকেটে জয়লাভ করে। এ খেলাটি পঞ্চম দিনে এক ঘণ্টা খেলার পর শেষ হয়। এ টেষ্টেও ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে 'টসে' জয়লাভ করে নিজ দলকে ব্যাট করতে পাঠান। সূচনায় ব্যাটিং বিপর্য্যয় ঘটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দিনের শেষে ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৭৬ রাণ সংগ্রহ করে। মাত্র ৭ রাণে ইংলণ্ড তিনটি উইকেট হারাবার পর অধিনায়ক পিটার মে ও ট্রেভর বেইলী দৃঢ়তার সংগে খেলেন। ৪র্থ উইকেটে ৮৫ রাণ যোগ হয়। বেইলী আউট হবার পর কাউড্রে ব্যাট করতে আসেন। কাউড্রে ও মে ৮১ রাণ যোগ করলে প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়। দ্বিতীয় দিন ২৫১ রাণে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। অষ্ট্রেলিয়া ১ উইকেট হারিয়ে ১৬ রাণ সংগ্রহ করে। তৃতীয় দিন অষ্ট্রেলিয়া অত্যন্ত সতর্কতার সংগে খেলে ১৮৬ রাণ সংগ্রহ করলে অষ্ট্রেলিয়া দলের ২৮২ রাণ সংগ্রহ হয়। চতুর্থ দিনে মাত্র ২৬ রাণের পর অষ্ট্রেলিয়া দলের ৩০৮ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড মাত্র ৮৭ রাণ সংগ্রহ করলে সবাই আউট হয়ে যান। অষ্ট্রেলিয়া দলের ২য় ইনিংসের খেলায় ১ রাণের মধ্যে একটি উইকেটের পতন ঘটে। চতুর্থ দিনের শেষে জয়লাভের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার মাত্র ৩০ রাণের প্রয়োজন থাকে। একদিন বিরতির পর পঞ্চম দিনের খেলায় এক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয় টেষ্টের সমাপ্তি হয়।

দ্বিতীয় টেষ্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—২৫১ ( পিটার মে ১১৩, ট্রেভর বেইলী ৪৮, কাউড্রে ৪৪, জিম লেকার ২২, ডেভিডসন ৬৪ রাণে ৬ উইকেট, মেকিফ ৬১ রাণে ৩ উইকেট )

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩০৮ ( নীল হার্ভে ১৬৭, সি. ম্যাকডোনাল্ড ৪৭ ও' নীল ৩৭, এ ডেভিডসন ২৪, ষ্ট্যাথাম ৫৭ রাণে ৭ উইকেট ও লোভার ১৭ রাণে ৩ উইকেট )

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস—৮৭ ( পিটার মে ১৭, মেকিফ ৩৮ রাণে ৬ উইকেট ও ডেভিডসন ৪১ রাণে ৩ উইকেট )

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস ( ২ উইকেট ) ৪২ ( জিম বার্গ নট আউট ১৮, লেকার ৭ রাণে ১ উইকেট ও ষ্ট্যাথাম ১১ রাণে ১ উইকেট )

[ অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী ]

তৃতীয় টেষ্ট—তৃতীয় টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলে ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে 'এ্যাসেস' ইংলণ্ডের হাতে থাকবে বলে আস্থা প্রকাশ করেন। এবারেও পিটার মে টসে জয়লাভ করে নিজ দলকে ব্যাট করতে পাঠান। সেই সূচনায় ব্যাটিং-এর সাময়িক বিপর্য্যয় ঘটে। টম গ্রেভনি ও পিটার মের দৃঢ়তায় তৃতীয় উইকেটে ৬৮ রাণ সংগ্রহ হয়। দিনের শেষে ইংলণ্ড ৬টি উইকেট হারিয়ে ১১০ রাণ সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিন বৃষ্টির জন্য দুই দলের খেলোয়াড়দের অধিকাংশ সময় প্যাভিলিয়নে থাকতে হয়। ইংলণ্ড দলের ২১১ রাণে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে। দিনের শেষে কোন উইকেট-এ হারিয়ে অষ্ট্রেলিয়া ৩ রাণ সংগ্রহ করে। একদিন বিরতির পর অষ্ট্রেলিয়া দল ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৮৪ রাণ সংগ্রহ করে। চতুর্থ দিনে ৩৫৭ রাণে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে। পঞ্চম দিনে ৬৪ রাণের মাথায় ইংলণ্ডের বেইলী, মিল্টন, গ্রেভনি পর পর আউট হয়ে যাওয়ায় ইংলণ্ড সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়। কাউড্রে ও পিটার মে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে কোন উইকেট না হারিয়ে ৩ উইকেটে ১৭৮ রাণ সংগ্রহ করে। এর পর ৭ উইকেটে ২৮৭ রাণ উঠলে ইংলণ্ডের সামনে থেকে বিপদের মেঘ কেটে যাওয়ায় ইংলণ্ডের অধিনায়ক দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। জয়লাভের জন্য ১৫০ রাণের প্রয়োজন অষ্ট্রেলিয়া দলের। শেষ পর্য্যন্ত দিনের শেষে অষ্ট্রেলিয়া দল ২ উইকেটে ৫৪ রাণ সংগ্রহ করে।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—২১১ ( পিটার মে ৪২, সোয়েটম্যান ৪১, কাউড্রে ৩৪, গ্রেভনি ৩৩, টনি লক ২১, রিচি বিনোড ৮৩ রাণে ৫ উইকেট, স্লেটার ৪০ রাণে ২ উইকেট )।

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩৫৭ ( ও' নীল ৭৭, ডেভিডসন ৭১, কেন ম্যাকে ৫৭, এল ফেভেল ৫৪, ম্যাকডোনাল্ড ৪০, জিম লেকার ১০৭ রাণে ৫ উইকেট, টনি লক ১৩০ রাণে ৪ উইকেট )।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস ( ৭ উইঃ ডিক্লেঃ ) ২৪৮—( কলিন কাউড্রে নট আউট ১০০, পিটার মে ৯২, ট্রেভর বেইলী ২৫, টম গ্রেভনি ২২, রিচি বিনোড ৯৪ রাণে ৪ উইকেট, জিম বার্ক ২৬ রাণে ২ উইকেট )।

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস—( ২ উইকেট ) ৫৪—( নীল হার্ভে নট আউট ১৮, জিম লেকার ১০ রাণে ২ উইকেট )।

[ অমীমাংসিত ভাবে শেষ ]

চতুর্থ টেষ্ট—এবারেও টসে জয়লাভ করেন ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে। কিন্তু তিনি নিজ দলকে ব্যাট করতে না পাঠিয়ে অষ্ট্রেলিয়া দলকে ব্যাট করার সুযোগ দেন। কিন্তু পিটার মে যে আশা করেছিলেন ১ম ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়া দলের ব্যাটিং বিপর্য্যয় ঘটলে ইংলণ্ডের জয়লাভের পথ সুগম হয়ে যাবে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া দল

১ম ইনিংসে ৪১৬ রাণ সংগ্রহ করলো। প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড ২৪০ রাণের বেশী সংগ্রহ করতে না পারায় 'ফলো অন' করতে বাধ্য হয়। ইংলণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২১০ রাণে শেষ হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়ার জয়লাভের জন্ত ৩৫ রাণের প্রয়োজন হয়। তিনিটি টেষ্টের তুলনায় এবারের খেলায় ইংলণ্ডের ব্যাটম্যানরা আশানুরূপ খেললেও পরাজয়ের হাত এড়াতে পারলেন না।

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৪১৬ (কলিন ম্যাকডোনাল্ড ১১০, বার্ক ৬৬ ও' নীল ৫৬, রিচি বিনোড ৪৬, ডেভিডসন ৪৩, নীল হার্ভে ৪১, ফ্রেডি টুম্যান ৬০ রাণে ৪ উইকেট, ষ্টাথাম ৮৩ রাণে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ২৪০ (কাউড্রে ৪৮, টম গ্রেভনি ৪১, পিটার মে ৩৭, ষ্টাথাম ৩৬, ওয়াটসন ২৫, রিচি বিনোড ৯১ রাণে ৫ উইকেট, বোরুকে ২৩ রাণে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস—২১০ (টম গ্রেভনি ৫৩, পিটার মে ৫১, রিচার্ডসন ৪৩ ওয়াটসন ৪০, টাইসন ৩৩, রিচি বিনোড ৮২ রাণে ৪ উইকেট. ডেভিডসন ১৭ রাণে ২ উইকেট)।

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস (কোন উইকেট না হারিয়ে) ৩৬—(জিম বার্ক নট আউট ১৬, লেস লেভেল নট আউট ১৫)।

পঞ্চম টেষ্ট—মেলবোর্ণে পঞ্চম ও শেষ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড দল ৯ উইকেটে পরাজয় বরণ করেছে। এ খেলায় অষ্ট্রেলিয়া সর্ব্বসময়ে প্রাধান্ত বিস্তার করেছিল। প্রথমদিন ইংলণ্ড ৭ উইকেটে ১১১ রাণ সংগ্রহ করে। দ্বিতীয় দিনে ১০৫ রাণে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি হয়। তৃতীয় দিনে ৩৫১ রাণে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়। চতুর্থদিনে ইংলণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংস ২১৪ রাণে শেষ হয়। জয়ের জন্ত অষ্ট্রেলিয়া দলের ৬৯ রাণের প্রয়োজন। চতুর্থ দিনের শেষ সময়ে ১৫ রাণ সংগ্রহ করে। বাকী ৫৪ রাণ পঞ্চমদিনে ৪১ মিনিটে সংগ্রহ করে অষ্ট্রেলিয়া দল।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—২০৫ (রিচার্ডসন ৬৮, মার্টমোর ৪৪, টুম্যান ২১, কাউড্রে ২২, রিচি বিনোড ৪৩ রাণে ৪ উইকেট, ডেভিডসন ৩৮ রাণে ৩ উইকেট, আয়ান মেকিফ ৫৭ রাণে ২ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ৩৫১ (ম্যাকডোনাল্ড ১৩৩, গ্রাউট ৭৪, রিচি বিনোড ৬৫, ম্যাকে ২৩, টুম্যান ৫২ রাণে ৫ উই:; লেকার ১৩ রাণে ৪ উই:)

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস—২১৪ (গ্রেভনি ৫৫, কাউড্রে ৪৬, টুম্যান ৩৬, রিচার্ডসন ২৩, রে লিণ্ডওয়াল ৩৭ রাণে ৩ উইকেট, বোরুকে ৪১ রাণে ৩ উইকেট, ডেভিডসন ১৫ রাণে ২ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস—(১ উইকেট) ৭০—(ম্যাকডোনাল্ড নট আউট ৫২)

[ অষ্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে বিজয়ী ]

ইংলণ্ড সফরের জন্ত ভারতীয় দল নির্ব্বাচন হয়ে গেছে। সফরের জন্ত ভারতীয় দলের পক্ষে যাঁরা নির্ব্বাচিত হয়েছেন তাঁদের নাম নিয়ে দেওয়া হল। আগামী বারে খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার ইচ্ছে রইলো।

ডি, কে, গাইকোয়াড় (বরোদা) (অধিনায়ক) পি রায় (বাঙলা) (সহঃ অধিনায়ক), মঞ্জেরকার (বোম্বাই) সুভাষ গুপ্তে (বোম্বাই) উম্রিগড় (বোম্বাই) তামানে (বোম্বাই) (উইকেট কিপার) অরবিন্দ আপ্তে (বোম্বাই) আর, বি, দেশাই (বোম্বাই) নরী কনট্রাক্টর (গুজরাট) পি, জি: যোশী (মহারাষ্ট্র) উইকেট কিপার) চান্দু বোরদে (বরোদা) গোলাম আমেদ (হায়দ্রাবাদ) জে, এম, ঘোরপাড়ে (বরোদা) জয়সিমা (হায়দ্রাবাদ) কৃপাল সিং (মাদ্রাজ) নাদকার্নী (মহারাষ্ট্র) সুরেন্দ্রনাথ (সার্ভিসেস)।

• • • •

কলকাতা মাঠে হকির মরশুম এখনও জমে ওঠেনি ঠিক মত। ফুটবল তার আসর জমিয়ে আবার তোড়জোড় করতে লেগে গেছে! খেলোয়াড়দের দল ছাড়ার হিড়িক পড়ে গেছে। কলকাতা খেলাধূলার আসর স্তিমিত হলেও নতুন আকর্ষণ স্বরূপ রয়েছে Holiday on Ice বরফের উপর নৃত্যের মধ্যেমে শারীরিক কলা-কৌশল দর্শকদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বাংলার তরুণী সাঁতারু কুমারী আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল পার হবার বাসনা নিয়ে অবিরাম সাঁতার কাটার অনুশীলন চালাচ্ছেন। আরতি সাহা একমাত্র মহিলা সাঁতারু যিনি ভারত, পাকিস্থান তথা সমগ্র এশিয়ার মধ্যে ইংলিশ-চ্যানেল অতিক্রম করার প্রচেষ্টা করছেন। আরতি সাহা সাফল্য লাভ করে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করুন এই কামনা করি!

## —মাসিক বসুমতীর পৌষ ও মাঘ সংখ্যা—

মাসিক বসুমতীর বিগত পৌষ এবং মাঘ সংখ্যা (১৩৬৫) সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত ও বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। উক্ত দুই সংখ্যা প্রাপ্তির জন্য আর কেহ অযথা আবেদন জানাইবেন না। পত্রিকা সরবরাহ সম্ভব হইবে না। এজেন্টদিগকে জানানো হইতেছে, মাসিক বসুমতীর সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ পনেরো দিন পূর্বে জানাইতে হইবে।

—কর্মাধ্যক্ষ

মাসিক বসুমতী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরস্ত্র ভারতবাসী সশস্ত্র বিপ্লব করে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ করে ভারত থেকে ইংরেজকে তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন করবে, বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দশকে এ কল্পনা বাংলার মানুষের কাছে প্রায় পাগলের প্রলাপ বলে মনে হত। দেশের সেই অবস্থায় গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন গড়ে তুলতে যারা নেমেছিল, তাদের সমস্যার বিরাটত্ব এবং জটিলতার কথা নিয়ে সে যুগের লোক কখনো মাথা ঘামায়নি—বস্তুত সমস্যাটা তাদের মাথাতে প্রবেশই করেনি।

তাই অকস্মাৎ মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর বোমায় মিসেস ও মিস কেনেডির হত্যা, ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার, আদালতে স্বীকারোক্তি, হাসিমুখে ফাঁসী—প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তারের সময় নিজের গুলীতে আত্মহত্যা, মানিকতলায় বোমার আড্ডা আবিষ্কার বারীন ঘোষ প্রমুখ ৩৪ জন গ্রেপ্তার, মামলার সরকারী সাক্ষিরূপে নরেন গোসাই-এর বিশ্বাসঘাতকতা, জেলের মধ্যেই রিভলভারের গুলীতে কানাইলাল কর্তৃক নরেন গোসাঁই-এর হত্যা, কানাইলাল সত্যেন বসুর ফাঁসি, প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তার সম্পর্কে সার্পেনটাইন লেনে সাব-ইন্‌স্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জির হত্যা—১৯০৮-৯ সালের এই বৈপ্লবিক সন্ত্রাসের দীর্ঘ ঘটনা-শৃঙ্খল বাংলার মানুষের চোখে যেন একটা ঐন্দ্রজালিক অদ্ভুত ব্যাপার, মির‍্যাক্‌ল বলেই প্রতিভাত হয়েছিল।

তারা ক্ষুদিরামকে নিয়ে গান বেঁধেছিল, কানাইলালকে নিয়ে অদ্ভুত কাল্পনিক গল্প রচনা করেছিল, আনন্দ উৎসাহ উত্তেজনায় দিনকতক প্রায় উন্মাদ হয়েছিল। এই কারণেই বারীন ঘোষ বলেছিলেন "My mission is over"—বাঙ্গালী যে মারতে পারে এবং হাসিমুখে মরতে পারে, এই বিশ্বাসই একদিন সশস্ত্র বিপ্লবের সম্ভাব্যতাকে বাস্তবে রূপায়িত করবে।

কিন্তু সমস্যাগুলো বিপ্লবীদেরই নিতান্ত নিজস্বই র'য়ে গেল, সাধারণ মানুষ দিনকতক নেচে কুঁদে হাঁপিয়ে, মনের গ্যাস বার করে দিয়ে হালকা হয়ে নিজেদের কাজেই মন দিলে। গুপ্ত বিপ্লবীদলের নড়তে চড়তে যে টাকার প্রয়োজন দেশবাসীর উৎসাহ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলে না। ওরা সব পারে, ভূগর্ভে অস্ত্রের কারখানা, সর্বত্র গতিবিধি, বিরাট গুপ্তবাহিনী, ওরাই সব করবে, আমরা ওদের আরো বাহবা দোব, ভাবখানা কতকটা এই রকম।

অথচ একটি একটি করে যে-কোন রকমের পিস্তল সাধারণ জাহাজী স্মাগলারদের কাছ থেকে বাজার দরের দশ গুণ দাম দিয়ে কিনতে হয়, সে বাজারেও স্পাই আছে,—টাকা মারা যায়, ধরা পড়তে হয়,—মামলা চালাতে হয়,—ফেরারী পুষতে হয়, পুলিশ খুন করতে হয়,—টাকার শ্রাদ্ধ হয়ে যায়। টাকা কোথা থেকে আসবে?—ডাকাতিই সাধারণ উপায়, সকল দেশেই। সান-ইয়াট-সেন নাকি আফিং-স্মাগলারদের কাছ থেকেও সাহায্য নিতেন, যে আফিংস্মাগলাররা চীনাদের আফিংখোর করে তোলার সহায়। ষ্টেলিনও তরুণবয়সেই লেনিনকে নির্বাসনে অর্থ সাহায্য পাঠিয়েছিলেন,—ঘোড়া চুরি করে হাটে বেচে অর্থ সংগ্রহ করে! টাকা জাল করার চেষ্টাও পরবর্তীকালে আমাদের দেশেই হয়েছে,—ওস্তাদশিল্পী কুঞ্জবিহারী সেনের সাহায্যে, যিনি ধরা পড়ে জেল খাটছিলেন, আমরা তখন '২৬ সালে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাজবন্দী। কে, বি সেনের কাছেই শুনেছি, একজন বিখ্যাত স্বদেশী নেতা, প্রোফেসর···ব্যানার্জি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কেলেঙ্কারীতে ফেঁসে গিয়ে সরকারের কাছে নাকে খং দিয়ে তিনি রাজনীতি থেকে পরে সরে পড়েছিলেন।

টাকার জন্য শত বদনাম, সহস্র ঝকমারি বরণ গুপ্ত বিপ্লবীদের নিয়তি সর্বদেশে, সর্বকালে। দাদা, বাঘা যতীন, ডাকাতির বিরোধী ছিলেন,—তাই তাঁর মনোভাব এবং কাজও ছিল অনন্য সাধারণ। অন্য বিপ্লবীদলের জরুরী টাকার প্রয়োজনে তাঁর কাছে লোক এসেছে কিছু অর্থ সাহায্যের জন্যে;—তিনি সে দিন মাইনে পেয়েছেন;—পথেই পকেট থেকে সমগ্র টাকাটা তুলে দিয়ে দিলেন,—অথচ পরিবারের নির্ভর সেই টাকাগুলোই। বিপিনদার চেলা মলঙ্গা লেনের অংশু ব্যানার্জিকেও একথা বলতে শুনেছি।

যাই হোক, টাকার প্রয়োজনে ডাকাতি প্রথম যুগ থেকেই সুরু হয়েছিল—এবং পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক বেশী ডাকাতি হ'ত পূর্ববঙ্গে ঢাকা অনুশীলন পার্টির দ্বারা। ১৯০৮—৯ সালে প্রেস আইন এবং সমিতি বে-আইনী করে' গভর্ণমেণ্ট বিপ্লব প্রচারের ওপর প্রকাণ্ড আঘাত হানে প্রচার এবং দল গড়ার কাজে গুপ্ত সমিতিগুলোকে কিছুকালের জন্য থম্‌কে দিয়েছিল বটে,—কিন্তু ডাকাতি,—বিশেষত পূর্ববঙ্গে,—বন্ধ হয়নি,—কারণ মামলার পর মামলায় টাকার প্রয়োজন যেন বেড়ে চলেছিল। আনুষঙ্গিকভাবে গোয়েন্দা-স্পাই খুন, দলের বিশ্বাসঘাতক খুন,—মামলায় সরকারী সাক্ষী খুনও চলেছিল বরাবরই।

এই সময়টাতেই কাশীতে শচীন সান্যালের কাছ থেকে সুরু করে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে পাঞ্জাবে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গড়ে উঠেছিলো। আর আমেরিকায় লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল গদর (বিপ্লব) পার্টি। তাদের তরফ থেকে ২।১ জন লোকও পাঞ্জাবে প্রেরিত হ'ত এবং পাঞ্জাবে গদর পার্টির লোকও কিছু ছিল। ফলত পাঞ্জাবে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বেই বিপ্লব প্রচেষ্টায় তোড় জোড় চলছিল।

টালায় সমিতি উঠে যাবার পর কয়েকটা বছর রাজনীতি এবং বিপ্লব প্রচারের নামগন্ধ প্রায় লোপ পেয়েছিল। '১২ সালে দিল্লীতে হার্ডিঞ্জের ব্যাপারে আবার একটু উৎসাহ-চাঞ্চল্য সুরু হল। '১৩ সালে বর্ধমানে দামোদরের বন্যায় টালা থেকে একদল কর্মী গেল। অতুল ঘোষের নেতৃত্বেও একদল কর্মী গিয়েছিল। গুপ্ত সমিতির সে যেন একটা সমাবেশের সুযোগ।

আমি তখন, অত অল্প বয়সেই রেলের গুড্স সেডে এক টেম্পোরারী চাকরীতে ঢুকে ইংরাজীর একটু পরীক্ষা দিয়ে পার্মামেণ্ট হয়েছি। আমার দামোদর বন্যায় যাওয়া হল না। কিন্তু তার পরই গুপ্তদলে ঢুকলুম, এবং আমাদের নেতা সতীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় হল হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের চার তলার এক কোণের ঘরে। তিনি বোধহয় তখন এম, এ পড়তেন। তার কিছুদিন পরেই লাগলো যুদ্ধ এবং তারপর জার্মাণ ষড়যন্ত্র।

বাঙ্গালী ফার্ষ্ট এড কর্মীদল লড়াইয়ে পাঠানো হবে, চিৎপুরের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ফাষ্ট এড ক্লাশ খুললেন, যার খুসী যোগ দিতে পারে। আমি যোগ দিলুম, কিছু শিক্ষাও হল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার বাহাদুর সে মৎলব ত্যাগ করলেন, ক্লাশ বন্ধ করে দেওয়া হল।

একবার মাইনে নিতে গেছি, দেখি একদিনের করে মাইনে কেটে রাখা হচ্ছে, ওয়ার ফাণ্ডে দিতে হবে বলে। আমি বললুম, আমি দোব না। ক্যাসিয়ার চোখ কপালে তুলে বললে, সবাই দিচ্ছে, order এসেছে, না দিলে চাকরী যাবে যে! আমি order দেখতে চাইলুম, দেখলুম লেখা আছে—It is desirable ইত্যাদি। বললুম, দিতেই হবে, এমন কথা order-এ লেখা নেই, আমি দোব না। দিলুম না, চাকরীও গেল না, কিন্তু শিয়ালদায় বদলী হয়ে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সেড ইনস্পেক্টরের সঙ্গে ঝগড়া করে রিজাইন দিয়ে চলে এলুম। মনটা স্বস্তিতে ভরে গেল, যেন অধঃপাতের পথ থেকে ফিরে এসেছি।

তারপর দাদারা মোটর মেক্যানিজম ও ড্রাইভিং শেখার বন্দোবস্ত করে দিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের বিপরীত দিকে এক কারখানায়—মালিক এক মহলানবীশ, নাম মনে নেই। ম্যানেজার দাদাদের বন্ধু এবং সম্ভবত চারু নামে এক বাঙ্গালী যুবক ড্রাইভারও। সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেই গড়ের মাঠের দিকে ষ্টিয়ারিং প্র্যাকটিস করাতো; কিন্তু সর্দার মিস্ত্রী শুধু বাজে কাজে খাটাতো, ম্যাগনেটো খুললে কিছুতেই কাছে বসতে দিতো না—এ যন্ত্রটা নিয়ে এসো, আহা, এটা নয় মাঝারীটা, দেখ একটু খুঁজে, এই সব কায়দায় দূরে সরিয়ে দিতো। দাদাদের বললুম, ম্যানেজার কিছু করতে পারে না, দেখে দাদারা বললেন,—থাক্, আর শেখার দরকার নেই।

এর পর একদিন এলো mobilisation-এর order—প্রত্যেককে ৫ জন করে নতুন রিক্রুট করতে হবে, যতশীঘ্র সম্ভব, এবং জরুরী অবস্থার জন্যে তৈরী থাকতে হবে। বুঝলুম অভ্যুত্থান আসন্ন।

নতুন উৎসাহ নিয়ে রিক্রুট করতে পারলুম মাত্র দুটি ছেলেকে—বেনিটির ওস্তাদ সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ছোটভাই অবনীকে (বলাইয়ের দাদা বাদলি)—আর শিউবক্স বগলা লেনের কাপালীদের বাড়ীর অনুকূল মণ্ডলকে। বাদলি বোধহয় ম্যাট্রিক পড়ছিল, আর অনুকূল পাশ করেছিল। বাদলি ১৯-২০ সালে মারা গেছে,—অনুকূলের খবর জানি না।

'১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা হয়েছিল, জার্মাণ অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে। সে ষড়যন্ত্রের এবং তার বিফল পরিণতির কথা স্মরণ করতে আজকের এই ঘাঁটা পড়া মনোভাবের মধ্যেও একটা রোমাঞ্চ অনুভব করি। একটা বৃহৎ ব্যাপারই হয়েছিল। কিন্তু দলের লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় সব চেষ্টা পণ্ড হল—বোধনের আগেই বিসর্জন হয়ে গেল।

পরে বিপ্লব আন্দোলন সমূলে বিনাশের জন্য বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস পরীক্ষা করে বে-আইনী আইন তৈরীর পরামর্শ দেবার জন্যে সরকার (১৯১৭-১৮ সাল) যে সিডিশন (রৌলট কমিটি) কমিটি বসিয়েছিল, সেই কমিটির রিপোর্ট অনুসারে জার্মাণ ষড়যন্ত্রের সরকারী বিবরণ এখানে সংক্ষেপে উদধৃত করলুম,—এ থেকেই ঘটনাটা সম্বন্ধে ধারণা মোটামুটি পরিষ্কার হবে।

১৯১১ সালের আগে থেকেই হর দয়াল আমেরিকায় গদর পার্টি গঠন করে ইউরোপের ভারতীয় বিপ্লবীদলের ও জার্মাণ এজেন্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রচার চালাচ্ছিলেন, জার্মাণী ভারত আক্রমণ করবেই—এবং যুদ্ধ বাধলে জার্মাণীর সাহায্য নিয়ে ভারতে বিপ্লব অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ডক্টর তারকনাথ দাস, হেরম্বলাল গুপ্ত ("মানবের আদি জন্মভূমি" লেখক বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্র) প্রভৃতিও তাঁর সঙ্গে কাজ করছিলেন,—এবং যুদ্ধবাধার পর হেরম্বলাল কিছুদিনের জন্যে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে জার্মাণীর প্রতিনিধিরূপে কাজ করেছিলেন। ওদিকে জার্মানীতে বরকতউল্লা, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী প্রভৃতিও জার্মাণ সমর বিভাগের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছিলেন। চম্পকরমন পিল্লাই জার্মাণ বৈদেশিক দপ্তরে চাকরী নিয়ে জার্মানী ও আমেরিকার ভারতীয় বিপ্লবীদলের যোগাযোগের ব্যবস্থায় সাহায্য করছিলেন। বরকতউল্লার উপর ভার দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে বিপ্লব প্রচারের। বার্লিন থেকে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীকে সানফ্রান্সিস্কোতে পাঠানো হয়েছিল হেরম্ব গুপ্তের স্থলে কাজ করার জন্যে।

জার্মাণ সমর বিভাগের পরিকল্পনা ছিল, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ প্রচারের ঘাঁটি করতে হবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে,—আর সানফ্রান্সিস্কোর গদরপার্টি ও বাংলার বিপ্লবীদলের সঙ্গে কাজ করার ঘাঁটি হবে ব্যাংকক এবং বাটাভিয়াতে।

১৯১৪ সালের শেষে পিংলে এবং সত্যেন্দ্র সেন আমেরিকা থেকে ভারতে আসেন এবং পিংলে উত্তর প্রদেশে অভ্যুত্থানের বন্দোবস্ত করতে যান, আর সত্যেন্দ্র সেন কলকাতায় ১৫৯ নম্বর বৌবাজার ষ্ট্রীটে থেকে যান।

'১৪ সালেই পুলিশ খবর পায়, হ্যারিসন রোড কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ের ওয়াই এম সি এর বাড়ীতে শ্রমজীবি সমবায় নামক দোকানের মালিক অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় ও রাম মজুমদার প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্যে যতীন মুখার্জি, অতুল ঘোষ ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্যের (এম, এন, রায়) সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে।

'১৫ সালের গোড়াতেই বাংলার বিপ্লবীরা শ্যাম ও অন্যান্য স্থানের ভারতীয় বিপ্লবীদের এবং জার্মাণদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করে বিপ্লব অভ্যুত্থানের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার, এবং ডাকাতির সাহায্যেই অর্থ সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত স্থির করেন।

তদনুসারে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটায় ডাকাতি করে ৪০ হাজার টাকা (শুধু গার্ডেনরীচে ৪০ হাজার টাকা বলে আমি ইতিপূর্বে যা লিখেছিলুম, তার মধ্যে একটু ভুল আছে, দেখা যাচ্ছে—না, ব) সংগৃহীত হল। ভোলানাথ চ্যাটার্জিকে ইতিপূর্বেই ব্যাঙ্ককে পাঠানো হয়েছিল যোগাযোগের জন্যে। মার্চ্চ মাসে জিতেন লাহিড়ী (শ্রীরামপুরের) ইউরোপ থেকে ভারতে এসে জার্মাণীর সাহায্যের প্রস্তাবের সংবাদ দিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের একজন প্রতিনিধিকে বাটাভিয়ায় যোগাযোগের জন্যে পাঠাতে বলেন। তদনুসারে পরামর্শ করে নরেন ভট্টাচার্যকে বাটাভিয়ায় পাঠানো হয় জার্মাণদের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে। তিনি সি মার্টিন নাম নিয়ে ছদ্মবেশে বাটাভিয়ায় যান এপ্রিল মাসে।

তারপরই অবনী মুখার্জিকে পাঠানো হয় জাপানে। গার্ডেনরীচ ডাকাতির পর পুলিশ পিছনে লাগায় ষড়যন্ত্রের নেতা যতীন মুখার্জি ফেরার হয়ে বালেশ্বরে গিয়ে বসেন। ওদিকে জার্মাণ জাহাজ ম্যাভারিক কালিফোর্ণিয়া থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভারতের দিকে যাত্রা সুরু করে।

বাটাভিয়ায় "মার্টিনকে" বলা হয়, ৩০ হাজার রাইফেল ও প্রত্যেক রাইফেলের জন্য ৪০০ করে বুলেট, এবং দু লাখ টাকা নিয়ে ম্যাভারিক ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্যে করাচীতে যাচ্ছে। মার্টিনের অনুরোধে সাংহাইয়ের জার্মাণ কনসালের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হয় জাহাজখানাকে করাচীর বদলে বাংলায় পাঠানো হবে। তারপর মার্টিন ফিরে এসে সুন্দরবনে রায়মঙ্গলে অস্ত্রশস্ত্র নামানোর বন্দোবস্ত করেন।

ইতিমধ্যে তিনি কলকাতার হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের অফিসে তার করে জানান ব্যবসার অবস্থা ভাল। হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স হরিকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক পরিচালিত ভুয়ো ফার্ম ষড়যন্ত্রের অন্যতম ঘাঁটী। মার্টিনের বন্দোবস্তে বাটাভিয়ার জার্মাণ ব্যবসায়ীরূপে হেলফারিখের কাছ থেকে হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের অফিসে কয়েক দফায় ৪৩ হাজার টাকা পাঠানো হয়, কিন্তু ৩৩ হাজার টাকা পৌঁছানোর পর পুলিশ ব্যাপারটা জানতে পারে।

তারপর যতীন মুখার্জি, যাদুগোপাল মুখার্জি, নরেন ভট্টাচার্য, ভোলানাথ চ্যাটার্জি এবং অতুল ঘোষ মিলে বন্দোবস্ত করেন, জার্মাণ অস্ত্রশস্ত্র তিনভাগে ভাগ করে একভাগ বরিশাল পার্টির হাতে পূর্ববঙ্গে অভ্যুত্থানের জন্যে হাতিয়ায় নামানো হবে। একভাগ যাবে বালেশ্বরে (শৈলেশ্বর বসু পরিচালিত ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম নামক ভূয়া ফার্ম ষড়যন্ত্রের অন্যতম ঘাঁটী—না, ব)—আর একভাগ কলকাতায়।

বাংলায় যে সৈন্য ছিল, তার পক্ষে বিপ্লবীদের লোকবল ছিল যথেষ্ট, কিন্তু বাংলার বাইরে থেকে সৈন্য এলে, সেইটে হবে ভয়ের কারণ। কাজেই সেটা বন্ধ করার প্রয়োজনে তিনটে প্রধান রেল পথের পুলগুলো উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থার জন্যে ঠিক হল, যতীন মুখার্জি বালেশ্বর থেকে মাদ্রাজ রেল লাইনটাকে ভেঙ্গে দেবেন, বেঙ্গল-নাগপুর রেল সামাল দিতে ভোলানাথ চ্যাটার্জিকে পাঠানো হবে চক্রধরপুরে, এবং ই আই রেল লাইনের জন্যে অজয়ের পুল উড়িয়ে দিতে সতীশ চক্রবর্ত্তী যাবেন।

নরেন ঘোষচৌধুরী এবং ফণী চক্রবর্ত্তী হাতিয়ায় গিয়ে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে এক সেনাবাহিনী গঠন করে পূর্ববঙ্গ দখল করবেন, এবং তারপর কলকাতার দিকে অভিযান করবেন। আর কলকাতায় নরেন ভট্টাচার্য এবং বিপিন গাঙ্গুলীর দল প্রথমে কলকাতার আশ পাশের অস্ত্রাগার লুঠ করবেন, এবং তারপর ফোর্ট উইলিয়ম দখল করবেন। ম্যাভারিকের জার্মাণ অফিসাররা পূর্ববঙ্গে সংগৃহীত বাহিনীকে সামরিক শিক্ষা দেবার জন্যে পূর্ববঙ্গেই থেকে যাবেন।

ইতিমধ্যে যাদুগোপাল মুখার্জি রায় মঙ্গলের কাছের এক জমিদারের সঙ্গে জাহাজ থেকে অস্ত্র শস্ত্র নামাবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। জাহাজ যেখানে ভিড়বে, সেখানকার নিশানা হিসাবে এক সারি আলো ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। ১লা জুলাই অস্ত্র শস্ত্র বণ্টন করা হবে।

অতুল ঘোষের নেতৃত্বে একদল লোক নৌকাযোগে রায় মঙ্গলের কাছে গিয়ে দশ দিন অপেক্ষা করেছিল, কিন্তু জুনের শেষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাহাজও পৌঁছালো না, এবং বাটাভিয়া থেকে দেরীর কারণ সম্বন্ধে কোন খবরও এল না।

৩রা জুলাই ব্যাঙ্কক থেকে পাঞ্জাবী বিপ্লবী আত্মারামের এক চিঠি নিয়ে এক বাঙ্গালী বিপ্লবী এসে খবর দিলেন শ্যামের জার্মাণ কনসাল ৫ হাজার রাইফেল, কার্ট্রিজ, এবং একলাখ টাকা এক বোটে করে রায় মঙ্গল পাঠাচ্ছে। আগের প্ল্যান পরিবর্তন করা হয়েছে মনে করে বাংলার বিপ্লবীরা বাঙ্গালী দূতকে ব্যাঙ্ককে ফেরৎ পাঠালেন, তিনি বাটাভিয়া হয়ে হেলফারিখকে বলে যাবেন, আগের প্ল্যান যেন বদল করা না হয়, এবং অস্ত্র শস্ত্রের অন্ত চালান যেন হাতিয়ায় এবং বালেশ্বরে পাঠানো হয় বা ভারতের পশ্চিম উপকূলে কারোয়ারের দক্ষিণে গোকর্ণীতে পাঠানো হয়।

এদিকে জুলাই মাসেই পুলিশ রায়মঙ্গলের খবর পেয়ে গেল এবং তৈরী হল। ৭ই আগষ্ট হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সের অফিস খানা তল্লাসী হল, এবং কয়েকজন গ্রেপ্তার হল।

১৩ই আগষ্ট বম্বে থেকে হেলফারিখকে সতর্ক করে এক তার পাঠানো হল এবং ১৫ই নরেন ভট্টাচার্য, মার্টিন ও আর একজন হেলফারিখের সঙ্গে আলোচনার জন্যে বাটাভিয়ায় রওনা হলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে ইউনিভারস্যাল এম্পোরিয়াম খানা-তল্লাসী হল, এবং তারপর ২০ মাইল দূরে কাপ্তিপদায় যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে প্রথম বাঙ্গালী বিপ্লবীদের ট্রেঞ্চ যুদ্ধ, যে কাহিনী আজ বাংলা দেশে সর্বজনবিদিত।

সে যুদ্ধের বীরবাহিনী মাত্র ৫ জনের ক্ষুদ্র দল—সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যের প্রকাণ্ড দলের বিরুদ্ধে বহুক্ষণ যুঝে শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরাজয় হল। যতীন মুখার্জী গুলীর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বন্দী হয়ে হাসপাতালে মারা গেলেন,—চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী (যিনি হেদোয়

যোগে গোয়েন্দা অফিসার সুরেশ মুখার্জীকে হত্যা করেছিলেন) আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন, আর মনোরঞ্জন নীরেন, জ্যোতিষ বন্দী হলেন। পরে মনোরঞ্জন ও নীরেনের ফাঁসি হয়, এবং জ্যোতিষ পাগল হয়ে যান। ফাঁসির আগের দিন মনোরঞ্জন বাড়ীতে চিঠি লিখেছিলেন,—কাল আমাদের বিজয়া।

এদিকে বাটাভিয়া থেকে মার্টিনেরও কোন খবর আসে না দেখে দু'জন বিপ্লবী গোয়ায় গেলেন বাটাভিয়ার সঙ্গে তারে খবরাখবর চালাবার চেষ্টায়। ২৭শে ডিসেম্বর মার্টিনের কাছে এক তার করা হল—How doing no news very anxious—Chatterton. সেই টেলিগ্রাম ধরেই গোয়ায় দু'জন বাঙ্গালীকে ধরা হল,—তার একজন ভোলানাথ চটোপাধ্যায়। পুলিস বলে, তিনি পুনা জেলে আত্মহত্যা করেন;—আমরা শুনেছি, পুলিশের অত্যাচারে তিনি গোয়াতেই নিহত হয়েছিলেন।

এপ্রিল মাসে ম্যাভারিক যখন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যাত্রা সুরু করে, তখন তাতে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না,—ছিল ২৫ জন অফিসার ও নাবিক, এবং ৫ জন ভারতীয় বিপ্লবী—পারস্যদেশীয় ভৃত্য পরিচয়ে তাঁরা ভারতে আসছিলেন। তার মধ্যে একজন পাঞ্জাবী—নাম হরি সিং—ট্রাঙ্ক বোঝাই গদর সাহিত্য নিয়ে আসছিলেন। পথে সমুদ্রের বুকে আর একটা জাহাজ থেকে ম্যাভারিক অস্ত্র বোঝাই করে নেবে, এই ব্যবস্থা ছিল। দরকার হলে, শত্রুর হাতে পড়ার বদলে জাহাজটা ডুবিয়ে দেওয়ারও নির্দেশ ছিল।

সে জাহাজটার সঙ্গে ম্যাভারিকের দেখাই হল না, এবং সে জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র সহ আমেরিকায় ফিরে গিয়ে ধরা পড়ে গেল এবং অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত হল। ম্যাভারিক বাটাভিয়ায় এলে অফিসার ও নাবিকদের হেলফারিথ আমেরিকায় ফেরৎ পাঠালেন, এবং হরি সিং-এর পরিবর্তে মার্টিনকে সেই সঙ্গে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই ভাবে মার্টিন (নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য) আমেরিকায় পালালেন কিন্তু সেখানে গিয়েই তিনি গ্রেপ্তার হলেন। পরে আমেরিকায় জার্মাণ ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হয়ে তিনি মেক্সিকোয় পালিয়ে যান।

ইতিমধ্যে আর একটা ছোট জাহাজে ৫০০০ মশার পিস্তল ও কার্টিজ চট্টগ্রামের (সন্দীপ হাতিয়া) জন্যে আসছিল, কিন্তু সেটা সাংহাইয়ে ধরা পড়ে যায়। ওদিকে ম্যাভারিক প্ল্যান বানচাল হওয়ার পর সাংহাইয়ের জার্মাণ কনসাল অন্য দু'খানা জাহাজে বঙ্গোপসাগরে অস্ত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করেন—একটাতে রায় মঙ্গলের জন্য ২০০০০ রাইফেল ৮০ লাখ কার্টিজ, দু হাজার পিস্তল এবং হ্যাণ্ডগ্রেণেড ও বোমা এবং দু লাখ টাকা যাবে,—আর একটাতে বালেশ্বরের জন্যে যাবে দশ হাজার রাইফেল, দশ লাখ কার্টিজ এবং হ্যাণ্ডগ্রেণেড ও বোমা।

কিন্তু মার্টিন বাটাভিয়ার জার্মাণ কনসালকে বলেন, রায়মঙ্গল আর নিরাপদ নয়, সুতরাং ও জাহাজই হাতিয়ায় পাঠানো হোক। তদনুসারে ওলন্দাজদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির হয়, একটা জাহাজ ডিসেম্বরে সরাসরি সাংহাই থেকে হাতিয়ায় যাবে, একটা ডাচ পোর্ট থেকে একটা খালি জাহাজ ছেড়ে সমুদ্রের ওপর আর এক জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে বালেশ্বরে যাবে, আর একটা তৃতীয় জাহাজ সমুদ্রবক্ষে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে নিয়ে আন্দামান আক্রমণ করবে, এবং পোর্ট ব্লেয়ার থেকে বিপ্লবী বন্দী ও সিঙ্গাপুরের বিদ্রোহী বন্দী সৈন্যদের মুক্ত করে নিয়ে রেঙ্গুণ আক্রমণ করবে।

মার্টিনের সঙ্গে অপর যে বাঙ্গালী বিপ্লবী বাটাভিয়ায় গিয়েছিলেন, তাঁকে সাংহাইয়ে পাঠানো হল, জার্মাণ কনসালের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি হাতিয়ার জাহাজে ফিরবেন বলে, কিন্তু তিনি অনেক কষ্টে সাংহাইয়ে পৌঁছেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।

অক্টোবরে দুজন চীনার মারফৎ ১২৯টা অটোমেটিক পিস্তল এবং ২০৮৩০টা বুলেট কলকাতায় পাঠানো হচ্ছিল তক্তার বাণ্ডিলের মধ্যে লুকিয়ে, শ্রমজীবি সমবায়ের অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে দেবার জন্যে; কিন্তু সাংহাই পুলিশের হাতেই তারা ধরা পড়ে গেল।

যে ঠিকানা থেকে তাদের পাঠানো হচ্ছিল, সেই ঠিকানাটা আবার পাওয়া গেল অবনী মুখার্জীর নোটবুকে, যিনি জাপান থেকে ভারতে ফেরার সময় সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ে যান। তখন রাসবিহারী বসু সেই ঠিকানায় বাস করছিলেন। অবনী মুখার্জীর নোট বুকে আরো অনেক ঠিকানা পাওয়া যায়, চন্দননগর, কলকাতা, ঢাকা ও কুমিল্লা সমেত। শ্যামের এক ইঞ্জিনিয়ার অমর সিং এর ঠিকানাও পাওয়া যায়, পরে মান্দালয় জেলে যাঁর ফাঁসী হয়েছিল। যাই হোক, রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে যে জার্মাণ ষড়যন্ত্রের আর একটা শাখা গড়ে উঠছিল, তাও বোঝা গেল।

সব ষড়যন্ত্র বানচাল এবং দাদার (যতীন মুখার্জির) মৃত্যুর পর বিপ্লবী নেতারা চন্দননগরে আশ্রয় নিলেন। আমার চন্দননগর যাত্রা তারই পরের ঘটনা।

রাসবিহারী বসু, অবনী মুখার্জি, শচীন সান্যাল প্রভৃতিকে নিয়ে জার্মাণ ষড়যন্ত্রের কথা বাড়াবার আর প্রয়োজন নেই। শুধু একটা কথা এখানে বলার লোভ সামলাতে পারছি না; সেটা আমার নিজের মতের কথা।

একটা কথা সরকার এবং বিপ্লবীরা সকলেই বলে থাকেন যে, জার্মাণ ষড়যন্ত্রের সুরুতে বাংলার বিপ্লবীদের সকল দলই যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে কাজ করার সিদ্ধান্ত করেছিল। ঢাকার অনুশীলন পার্টি একটা পৃথক বড় দল, বহু ডাকাতি এবং খুনের পৃথক রেকর্ড তাদের ছিল, এমন কি কলকাতায় বসন্ত চ্যাটার্জির হত্যাও, পুলিসের মতে তাদের কাজ। অথচ জার্মাণ ষড়যন্ত্রে বাংলায় যা হয়েছিল, তার মধ্যে অনুশীলন পার্টির কোন নেতার বা কোন লোকের নামগন্ধ রিপোর্টে নেই। অবশ্য ঢাকার ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাস এবং আরো কয়েকজন নেতার জেল হয়েছিল,—এবং জার্মাণ ষড়যন্ত্রের সময় তারা জেলে ছিলেন, এবং জেল থেকে বেরিয়ে সরাসরি রাজবন্দীও হয়েছিলেন কতকজন। কিন্তু বিষয়টা লক্ষ্য করার মত।

আর ইউ পি-তে শচীন সান্যাল যে কাজ সুরু করেছিলেন কাশীতে—তার সঙ্গে ইউ পি-র অনুশীলন পার্টির ঘনিষ্ঠ যোগ হয়েছিল;—কিন্তু তাঁরা যে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে কাজ করেছিলেন,—তাঁর সঙ্গে যতীন মুখার্জি, অমরেন্দ্র চাটার্জি প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

আবার,—হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা মারার সম্পর্কে যে বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি হয়েছিল,—সে বসন্ত বিশ্বাস (অমরদার আত্মশক্তি লাইব্রেরীর মন্মথ বিশ্বাস ওরফে মোটাদা'র দাদা) দেরাদুনে রাসবিহারী বসুর বাসায় ভৃত্য পরিচয়ে গাঢাকা দিয়ে বাস করতেন,—এবং তিনি ছিলেন অমরদার চেলা।

যাই হোক, রাসবিহারী সম্পর্কে একটা মজার কথা এখানে প্রসঙ্গত এসে পড়ছে। হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা পড়ার পর দেরাদূনে রাসবিহারী (তিনি সেখানে ফরেষ্ট অফিসের হেডক্লার্ক ছিলেন) এক পাবলিক মিটিং করে' এমন জ্বালাময়ী ভাষায় বোমা মারার নিন্দা করেছিলেন যে পুলিশের বড় কর্তা তাঁকে রিক্রুট করার লোভ সামলাতে পারেননি—এবং তাঁকে রিক্রুট করে বাংলার বিপ্লবীদের ধরার জন্যে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়,—এবং অবশ্য চন্দননগরেও।

'১২ সালের শেষে যখন দিল্লীতে বোমা পড়ে, তখন তার কোন কিনারা পুলিশ করতে পারেনি। তারপর '১৪ সালে আর একটা বোমা মারা সম্পর্কে বসন্ত বিশ্বাস ধরা পড়েন,—এবং মামলার অ্যাপ্রুভার দীননাথের স্বীকারোক্তিতে হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা-নিক্ষেপকারী বলে' বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসী হয়। সে মামলায় আমীরচাঁদ, বালমুকুন্দ এবং অবদবিহারীরও ফাঁসী হয়।

যাই হোক, রাসবিহারী চন্দননগরের বিপ্লবীদের পুলিশ সাহেবের কীর্তি এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ জানিয়ে দিয়ে পুলিশ সাহেবকে কদলী প্রদর্শন করে গা ঢাকা দিলেন। তাঁর পাত্তা না পেয়ে চন্দননগরে তাঁকে ধরার চেষ্টা চলতে লাগলো এবং চন্দননগর থেকে বেরোবার সকল পথে পুলিস পাহারা বসলো—চন্দননগর ষ্টেশনেও। এই অবস্থায় রাসবিহারী চন্দননগর ষ্টেশনের গিজগিজে পুলিশ পাহারার চোখে ধূলো দিয়ে ট্রেনে চড়েই কলকাতায় চলে এলেন, এবং তারপর কাশীতে বাঙ্গালী-টোলায় শচীন সান্যালের আড্ডায় আশ্রয় নিলেন।

মজার কথা এই যে,—যখন চন্দননগরে একগাদা পুলিশ প্রত্যেক ট্রেন তন্ন তন্ন করে তল্লাসী না করে ছাড়ে না,—তখন একদিন রাসবিহারী বাবুর মতন ফার্ষ্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমের বাইরে প্ল্যাটফরমের ওপর বেঞ্চিতে বসে নভেল পড়ছেন,—ট্রেন এলো,—তিনি ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরায় উঠে বসলেন—পুলিস ট্রেন তল্লাসী করে গেল,—ছাড়লো—পাখী উড়লো।

সুবিধা ছিল এইটুকু যে পুলিশগুলো রাসবিহারীকে চিনতো না, তাদের কাছে ফটোও ছিল না। তারা সন্দেহজনক লোকই খুঁজছিল অমন ফার্ষ্ট ক্লাশ প্যাসেঞ্জারকে তো আর সন্দেহ করা যায় না!

আর রোম্যান্টিক ঔপন্যাসিক শরৎ চাটুজ্যের পথের দাবীর হিরো রোম্যান্টিক সব্যসাচীর মতন রামধনুকে রংয়ের সিল্কের পাঞ্জাবী পরে পকেটের গাঁজার কলকে দেখিয়ে দুনিয়ার লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতন রোমান্টিক বিপ্লবীও নন রাসবিহারী বসু।

মারাঠি গদর বিপ্লবী পিংলে রাসবিহারীকে লাহোরে নিয়ে যান তিনি ১৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে বিপ্লব অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন, দলের মধ্যেকার বিশ্বাসঘাতক স্পাইয়ের কাছে পুলিস খবর পায়, এবং সব চেষ্টা পণ্ড হয়। কোমাগাতা মারুর ফেরৎ অন্তরীণ অনেক শিখও বন্দী হন।

পিংলে ও রাসবিহারী সরে পড়েন। একমাস পরে পিংলে এক ক্যান্টনমেণ্টে বোমা সহ ধরা পড়েন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। আর রাসবিহারী কলকাতায় চলে আসেন, এবং শেষ পর্যন্ত জাপানে চলে যান গোপনে।

সেও এক চমৎকার গল্প! তখন পাসপোর্ট সম্বন্ধে পুলিসের এত কড়াকড়ি ছিল না। বোধ হয় ১৬ সাল রবীন্দ্রনাথ জাপানে যাচ্ছেন, জাহাজে কেবিন রিজার্ভ হয়েছে। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথের পরিবারের এক ঠাকুর বাবু জাহাজে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্যে সব ব্যবস্থা ঠিক হয়েছে কিনা তদ্বির করে নিজের জন্যে পৃথক এক বন্দোবস্ত করে এলেন,—এবং রবীন্দ্রনাথের জাহাজেই জাপান রওনা হলেন।

এদিকে গার্ডেনরীচ ডাকাতির পর পুলিশ পিছনে লাগায় যতীন মুখার্জি ও বিপিন গাঙ্গুলী যখন গা ঢাকা দিয়েছেন,—তখন বিপিন গাঙ্গুলীর মলঙ্গা গ্রুপ এক বিরাট বন্দুক সংগ্রহ চেষ্টায় সফল হয়; বিখ্যাত মসার পিস্তল ৫০টা, এবং ৪৬ হাজার কার্টিজ বন্দুক বিক্রেতা রডা কোম্পানীর মাল।

এখানে বিপিন গাঙ্গুলী ও মালঙ্গা গ্রুপের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু সাংগঠনিক ইতিহাস বলা প্রয়োজন, যে বিষয়ে বাজারে প্রচলিত ধারণার মধ্যে অনেক ভুল আছে। বিপিনদার দলের আদি সংগঠন আত্মোন্নতি সমিতি, যেমন ছিল আমাদের অনুশীলন সমিতি।

১৯০৩ সাল নাগাদ আত্মোন্নতি সমিতি স্থাপিত হয়, তখন তার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে নাকি শিবনাথ শাস্ত্রীর মতন লোকও ছিলেন। তারপর ১৯০৫ সালের পর যখন তার মধ্যে বিপ্লবীদল গড়ে ওঠে, তখন তার প্রথম নেতা ছিলেন জীবন মুখার্জি এবং তাঁর সাথী ছিলেন হরিশ সিকদার, প্রভাস দে, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি। জীবন বাবুরা থাকতেন ব্যাপারীটোলায়।

জীবন মুখার্জির পিতা দীনবন্ধু মুখার্জি সিপাই বিদ্রোহের সময় এক মিলিটারী অফিসারের স্ত্রীর প্রাইভেট টিউটর ছিলেন, এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরে ছাত্রীর সুপারিশ তিনি ছাড়া পান। অনুকূলদার মুখে শুনেছি, পরবর্তীকালে বৃদ্ধ অনুকূলদাকে বলতেন, গণ্ডগোলের পথ ছেড়ে টাকা রোজগার কর, কেল্লার গোরাদের কিনে নিতে পারবে।

অনুকূলদা বলতেন, আমার দীক্ষাগুরু জীবন মুখার্জি, আর শিক্ষাগুরু বিপিন গাঙ্গুলী। বিপিন গাঙ্গুলী ছিলেন বয়সে কিছু ছোট। জীবন মুখার্জি বছর ৪০ বয়সেই মারা যান,—লড়াইয়ের আগে।

রিভলভার চালানো, ঘুসির জোর প্রভৃতি ছেলেদের পক্ষে আকর্ষণীয় গুণেই বিপিনদা হয়েছিলেন জনপ্রিয় নেতা,—কিন্তু রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক কাজে প্রকৃত নেতা ছিলেন হরিশ সিকদার প্রভাস দে। আর রিভলভারের সম্পর্ক যে-কাজেই থাকতো, সে কাজে থাকতেন অনুকুল দা—বেআইনীভাবে রিভলভার সংগ্রহের তিনি ছিলেন রাজা। বিপজ্জনক কাজ, টাকা সংগ্রহ, ফেরারী রাখা প্রভৃতি কাজে তিনি ছিলেন বিপিনদার ডান হাত। জার্মাণ ষড়যন্ত্রে ফোর্টউইলিয়ম দখল করার প্ল্যানে বিপিনদার দলের পক্ষে অনুকুল মুখার্জিই যে নেতৃত্ব করতেন,—একথা দলের সবাই বলে। জেলে লোম্যান সাহেব অনুকূলদাকে কম্যাণ্ডার ইন চীফ বলে রসালাপ করেছে আমার সামনেই—শুনে আমারও মনে হয়েছে,—সেটা ঐ কথারই ইঙ্গিত।

যাই হোক, মলঙ্গা লেনের বকাটে ছেলের দল ছিল অনুকূলদার চেলা, আর তাদেরই মধ্যে একজন ছিল শ্রীশ মিত্র ওরফে হাবু। গায়ে তার শক্তিও অসীম, আর মনে সাহসও তেমনি। সে একবার একা নিউমার্কেট কসাইদের ঠেঙ্গিয়ে এসেছিল। সে এক অফিসে ৪০ টাকা মাইনেতে চাকরী করতো, সে চাকরী ছাড়িয়ে অনুকূলদা তাকে বড়া কোম্পানীর জেটি সরকারের কাজ যোগাড় করে দিয়েছিলেন অল্প বেতনে।

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে একদিন রডা কোম্পানির বন্দুকের চালান খালাস করতে গিয়ে শেষ একগাড়ী মাল—দশটা বাক্স—এক মোষের গাড়ী বোঝাই—নিয়ে এসে হাজির করলো হাবু মলঙ্গা লেনে। গলির মোড়ে কে সি মুখার্জি এণ্ড সন্সের লোহার কড়ি প্রভৃতির দোকান ছিল, এবং সামনে খানিকটা জায়গা ছিল—সেইখানে মাল খালাস করে গাড়ী ছেড়ে দেওয়া হল। মালিক ত্রৈলোক্য মুখার্জি এবং উড়ে মুটেরা বলে এসব মাল আমাদের নয়, হটাও এখান থেকে। অনুকূলদা চেলাদের নিয়ে কোমর বেঁধে লাগলেন।

প্রথমেই একটা বাক্স অনুকূলদার বাড়ীতেই ঢোকানো হল, তারপর একটা বাক্স ঢোকানো হল পাশের খোলার বস্তিতে এক বুড়ী বাড়ীওয়ালীর ঘরে। তারপর দিশেহারা ভাব কাটলো। সব বাক্স নিয়ে গিয়ে তোলা হল অভয় হালদার লেনে বীরু ডাক্তার (B. Bose) এর বাড়ীতে। সেখানে একটা ঘর খালি ছিল, ডাক্তারের আপত্তি না মেনে প্রায় জোর করেই ঢোকানো হল। সে বাড়ীতেই কিন্তু বীরু ডাক্তারের এক ভায়রা ভাই রাজেন বসু ভাড়া থাকতেন, তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশের অফিসার!

দুর্দান্ত জোয়ান পূর্ণ হাজরা ওরফে পোনামাস্তান,—প্রমথ দাস ওরফে লণ্টা,—ভারী বাক্সগুলোকে চকিতের মধ্যে সরিয়ে ফেললে। হাবু বলে, কি মাল আনলুম, দেখে যাবোনা? তা হবে না। তাকে ৪৪নম্বর মলঙ্গা লেনের মেস বাড়ী ছাতের ওপর একদিন রেখে দেওয়া হল। ওদিকে বাক্সগুলো বীরু ডাক্তারের বাড়ী থেকে প্রথমে গেল এক গুদামে,—এবং সেখান থেকে বাক্স খুলে ৪৪টা পিস্তল ও প্রায় সব কার্টিজ সকল বিপ্লবীদলের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হল—সবই এক দিনের মধ্যেই। হাবুকেও সরিয়ে দেওয়া হল।

পরের দিনই পুলিশ এসে পড়লো,—লোহার দোকানে মাঠ দেখিয়ে দিলে গাড়োয়ান। ত্রৈলোক্যবাবু এবং উড়ে মুটেরা বললে আমাদের এখানে এমন কোন মাল আসেনি। অনুকূলদা, গিরিনদা ও কালীদাস বোসের বাড়ী, বাড়ীওয়ালীর বাড়ী, বীরু ডাক্তারের বাড়ী খানাতল্লাসী হল,—বাড়ীওয়ালী এবং বীরু ডাক্তার বললেন, কিছুই জানি না।

অনুকূলদা প্রভৃতি গ্রেপ্তার হলেন,—গিরীনদার বাড়ীতে নরেন ব্যানার্জীও থাকতেন। গিরীনদার ছোট ভাইয়ের ডাক নাম ছিল কাটু। পুলিশ প্রশ্ন করছে Who is Naren Banerjee, Who is Katu? নরেন ব্যানার্জি এগিয়ে এসে বললেন আমারই ডাকনাম কাটু। সকলে চেপে গেল। নরেন ব্যানার্জিও গ্রেপ্তার হলেন। আর গ্রেপ্তার হলেন জেলে পাড়ার ভুজঙ্গ ধর। হাবু সেই যে ফেরার হল, আজ পর্য্যন্ত তার পাত্তা পাওয়া যায়নি। মাল সরানোতে যোগসাজস সন্দেহে প্রভুদয়াল হিম্মতসিংকাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে পরে ছেড়ে দিয়েছিল।

সাত মাস মামলা চললো। নরেন ব্যানার্জিকে মিথ্যা করে গাড়োয়ান সনাক্ত করলে,—তাঁর দু বছর জেল হল,—কালীদাস বসু এবং ভুজঙ্গ ধরেরও জেল হল। অনুকূলদা' এবং গিরীনদা খালাস হলেন, এবং পনের সালের শেষে ডিফেন্স অ্যাক্ট জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরীণের আদেশ পেলেন,—জলপাইগুড়ী জেলার পচাগড় থানায় গিরীনদা এবং ময়নাগুড়ী থানায় অনুকূলদা। হাবুকে আশ্রয়দানের ব্যাপারে বিপিনদা' এমন কিছু অবহেলা করেছিলেন, যাতে অনুকূল মুখার্জির মত লোকও লুকিয়ে কেঁদেছিলেন।

একসঙ্গে পঞ্চাশটা মশার পিস্তল পেয়ে বিপ্লবীদের উৎসাহ বেড়ে গেল। চৌদ্দ সালের শেষ থেকে ১৭ সাল পর্যন্ত চুয়ান্নটা ডাকাতি-খুনের মধ্যে মশার পিস্তল ব্যবহার হয়েছিল এবং একত্রিশটা মশার পুলিশের হস্তগত হয়েছিল।

চৌদ্দ সালের শেষেই আলমবাজারের কাছে এক ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়। "ডাকাত"দের ধরে পুলিশ যখন ঠেঙ্গাচ্ছে, তখন একজনের ভাই এসে আড্ডায় খবর দিলে,—অমুককে পুলিশ ঠেঙ্গিয়ে মেরে ফেলছে, আর এখানে আপনারা চুপ করে বসে আছেন?

সেখানে তখন ফেরারী বিপিনদা ছিলেন। তিনি উঠে একটা রিভলভার এবং কিছু কার্টিজ টেনে নিয়ে অকুস্থলে গিয়ে হানা দিলেন। হরি হরি! ফায়ার হল না—তিনি ভুল রকমের কার্ট্রিজ নিয়ে গিয়েছেন।

পুলিশ দল ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে ধরে ফেললে,—তিনি রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এক পুকুরের ধারে। কিন্তু বৃথা! ডাকাতি মামলাতেই তাঁর পাঁচ বছর জেল হয়ে গেল। তিনি মুক্ত হলেন উনিশ সালের শেষে,—যখন অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত আসন্ন।

আমরা একটা মসার পেয়ে কয়েক দিন বিড়ালছানা নাড়ানাড়ির মতন নেড়েচেড়েই পরম পুলকিত হয়েছিলুম। খুন-ডাকাতি বেড়ে চলছিল। বিপিনদা'র মামলার সরকারী সাক্ষী প্রভাস মিত্রের পিতা পুলিশের সাহায্যকারী মুরারি মিত্রও (সন্তোষ মিত্রের খুল্লতাত সম্পর্কীয়) খুন হয়েছিলেন।

ষোল সালের জুন মাসে বসন্ত চ্যাটার্জির হত্যার পর পুলিন মুখার্জি ওরফে ঠাকুর ধরা পড়েন—যিনি অসংখ্য খুন-ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পুলিশের অত্যাচারে তিনি সব স্বীকার করেন এবং জুলাই মাসে শত শত লোকের সঙ্গে আমিও গ্রেপ্তার হই!

[ ক্রমশঃ।
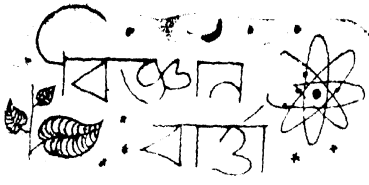
ডাঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল পরিভাষা। সকলেই স্বীকার করবেন যে, মাতৃভাষায় যদি শিক্ষার প্রথম সোপান অতিক্রম না করা যায় তাহলে শিক্ষার মূল সত্য উপলব্ধির পথ জটিল হয়ে পড়ে। আজকের দিনে তাই ভারতবর্ষের অনেক চিন্তানায়কই দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারের কথা চিন্তা করছেন। তাঁদের সুচিন্তিত মত হল, বিজ্ঞান শিক্ষাকেও মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিবেশন করতে হবে। উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু গোলমালটা বেধেছে পরিভাষা নিয়ে। বৈজ্ঞানিক শব্দগুলিকে কি ভাবে পরিবেশন করা হবে? অনেকের মত বিদেশী শব্দগুলিকে আন্তর্জাতিক আখ্যা দেওয়া যায়, তাই তাদের সোজাসুজি গ্রহণ করে নাও। অনেকে বলেন তা কি করে হয়? বাংলায় নতুন নতুন পরিভাষা রচনা করতে হবে। এই পরিভাষা হবে সরল ও সহজবোধ্য। বাংলায় এই সব পরিভাষা সৃষ্টি করার মতো শব্দসম্ভার না থাকলে সাহায্য নেওয়া হবে সংস্কৃত ভাষার। সংস্কৃতের মহামূল্যবান শব্দসম্ভার চয়ন করে যে পরিভাষা রচিত হবে তা কেবল বাংলা ভাষাকেই সমৃদ্ধশালী করবে না, হিন্দী বা অন্যান্য কোন কোন ভাষাতেও অক্লেশে ব্যবহার করা যাবে এবং এরই মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠবে আন্তর্ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

তৃতীয় দল কিন্তু মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করার পক্ষপাতী। যেগুলি সম্ভব তর্জমা করো, আর যেগুলি সম্ভব নয় সেগুলি সোজাসুজি ভারতীয় ভাষায় গ্রহণ করে নাও। এ কথা বললেও কিন্তু সমস্যার সমাধান হলো না। কোনটা সম্ভব আর কোনটা সম্ভব নয় তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। তাছাড়া যে তর্জমা আপনি করলেন তা আর একজনের পছন্দ না-ও হতে পারে তখন সে নতুন তর্জমা চালাবার চেষ্টা করবে। সমস্যাটা কিন্তু আরও জটিল, ঠিক পথ বার করা অবিলম্বে দরকার, কিন্তু তার সম্ভাবনার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। কঠিন শব্দের কথা ছেড়ে দিন, সাধারণ প্রচলিত শব্দের ব্যাপারেই সকলে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। সব শব্দ আন্তর্জাতিক আখ্যা দিয়ে সোজা গ্রহণ করতে অনেকেরই মন চাইছে না। সংস্কৃতের উপর নির্ভর করা নিরাপদ নয়। বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে তাহলে বিজ্ঞানসম্মত পথ ছেড়ে দিয়ে অলঙ্কারে সজ্জিত হতে হবে। সুবিধা মতো, এদিক-ওদিক এই দুদিক রাখা নিরাপদ হতে পারে কিন্তু এ বিষয়েও সকলের একমত আশা করা যায় না। ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

তৃতীয় পন্থায় দু'-একটা শব্দ নিয়ে আলোচনা করে দেখাই যাক না কেন। ধরুন অ্যাটম। কি করবেন এর বাংলা? লেখকেরা [illegible] প্রোটন এবং নিউট্রন হলো এদের আর বাংলা করা যায় না। অতএব সোজা-ভাষায় অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়াই ভাল। এর পর বলা যাক নিউক্লিয়াসের কথা, এর বাংলা কি করবেন? নিউক্লিয়াসের মধ্যেই বসে আছে নিউট্রন ও প্রোটন। তৃতীয় পথ অনুসরণকারীরা কিন্তু নিউক্লিয়াসে এসে দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন। একদল বললেন, বেশী ঝামেলায় কাজ কি? ইলেকট্রন, প্রোটন শব্দগুলি যখন গ্রহণ করা গেল তখন নিউক্লিয়াস গ্রহণ করতে আপত্তি কি? আর একদল বললেন, না তা হতে পারে না। নিউক্লিয়াসকে বলা হবে পরমাণুকেন্দ্র। তাহলে নিউক্লিয়ার মানে কি হবে? এখানে বিভক্ত দল আরো কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে গেলেন। একদল বললেন নিউক্লিয়ার হলো পরমাণুকেন্দ্রীয় আর একদলের মতে পরমাণুকেন্দ্রিক। যাঁরা একটু রক্ষণশীল তাঁরা বললেন, এতো গোলমালে কাজ কি? সোজা কথায় একে বলে পারমাণবিক। মেনে নিলাম, কিন্তু তাহলে অ্যাটমিক কথার অর্থ কি? তার অর্থও পারমাণবিক। শব্দ দুটোকে আলাদা করে রেখে লাভ কি? এক করে দিলেই হয়। হাফ লাইফ আর একটা শব্দ, তা নিয়েও গোলমাল কম নয়। হাফ-লাইফ শব্দটাই কি সোজা রাখবেন না তাকে বাংলায় অর্দ্ধজীবন করে দেবেন?

যাই হোক, মাতৃভাষায় যদি বিজ্ঞান শিক্ষা ও সাহিত্য প্রচার করতেই হয়, তাহলে অবিলম্বে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার প্রয়োজন। আর দেরী করা যায় না। উপযুক্ত পরিভাষা করবার জন্য বিজ্ঞান-সাহিত্য প্রসারের যথাসম্ভব সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া উচিত। সভা, সমিতি এবং যুক্তির জাল বুনে আর যাই হোক ভাষা সৃষ্টি হয় না। কথা সৃষ্টির জন্য কথাশিল্পীর প্রয়োজন। লেখকের যাদুকাঠির স্পর্শে, ভাষা সজীব হয়ে উঠে অন্তরের মণিকোঠায় জ্ঞানের দীপ জেলে দেবে। পরিভাষাকে সৃষ্টি হতে দেওয়া হোক স্বতঃস্ফূর্তভাবে। লেখক তার চিন্তারাজ্য থেকে সৃষ্ট পরিভাষা ব্যবহার করুন। জন্ম হোক নতুন নতুন পরিভাষার, তা আন্তর্জাতিকই হোক, সংস্কৃতবহুল অথবা মিলিয়ে মিশিয়ে হোক, জনচিত্তে শ্রেষ্ঠটাই স্থান পাবে। আর সব যাবে ধুয়ে মুছে।

অর্থাৎ যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার চান তাহলে পরিভাষা সৃষ্টিকল্পে বিজ্ঞান-সাহিত্যকে ক্রমাগত এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা যোগাতে হবে। সাহিত্যের সমৃদ্ধির সঙ্গে ঘটবে পরিভাষার সমৃদ্ধি—শিক্ষার পথ হবে মুক্ত। নানা পরিভাষা নিজেদের মধ্যেই কাটাকুটি হয়ে গিয়ে, শেষ পর্য্যন্ত টিকে থাকবে সবচেয়ে ভালটি। লেখকের কলমের জোর থাকলে উপযুক্ত পরিভাষা সৃষ্টির পথে অতি দ্রুত এগিয়ে চলা সম্ভব হবে।

• • • •

আনন্দের কথা যে, সম্প্রতি বাংলাদেশে কয়েকটি বিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকেরা বইগুলি হাতে করলে দেখবেন বৈজ্ঞানিক দুরূহ তথ্যাবলী পরিবেশনে বাংলার বিজ্ঞান-সাহিত্যকারা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা অল্প নয়। তাঁরা যে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তা সর্বজনগ্রাহ্য নয়,—তবুও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণের জটিল দায়িত্বের সমাধানেও পরিভাষা যথেষ্ট সহায় করেছে। যাই হোক, এইভাবে যদি ক্রমাগত বিজ্ঞান-সাহিত্যের প্রসার ঘটতে থাকে তাহলে বাংলা দেশে হয়তো আগামী কয় বছরের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহের মোটামুটি একটা পরি

এই ভাবে যদি পরিভাষা গড়ে উঠে তাহলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের সমস্ত জটিল সমস্যারই সমাধান হবে না। কেবল বাংলায় পরিভাষা গড়ে উঠলে চলবে না, আমাদের চাই অন্তর্ভারতীয় পরিভাষা। আন্তর্জাতিক পরিভাষাকে পরিত্যাগ করা কোনদিনই সম্ভব হবে বলে মনে হয় না,—আমাদের দেশে তা বৈজ্ঞানিক উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মর্য্যাদার সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। কিন্তু নতুন যে পরিভাষা আমরা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম ধাপ দৃঢ় করবার জন্য ব্যবহার করবো, তা সর্বভারতীয় হওয়া প্রয়োজন—এ কথা অনেক চিন্তানায়কেরাই মনে করেন। সর্বভারতীয় পরিভাষা রচনা করা সম্ভব হলে, ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হবে।

বাংলার বিজ্ঞান-সাহিত্যের মূল্যমান নির্দ্ধারণ করতে গেলে দেখা যাবে, তার মধ্যে বেশ কিছু অমূল্যরত্ন লুকিয়ে আছে। সংখ্যার স্বল্পতার জন্য এগুলি আমাদের চোখে সবসময়ে পড়ে না বটে, তবু কোন উৎসাহী পাঠক একটু পরিশ্রম করলেই এক অনাস্বাদিত বিজ্ঞান-সাহিত্য-রসের সন্ধান লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। তাঁকে শুরু করতে হবে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের রচনা পাঠ করা দিয়ে। তার পর তাঁকে পাঠ করতে হবে,—বঙ্কিমচন্দ্র, জগদানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'গগনপর্য্যটন' বাংলার বিজ্ঞানসাহিত্যের এক অতুলনীয় নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপরিচয়ের কথা নতুন করে বলবার আর প্রয়োজন নেই, আর রামেন্দ্রসুন্দর ও জগদানন্দ বাংলার বিজ্ঞান-সাহিত্যের ভিত্তিমূলের সবচেয়ে মজবুত দুটি পাথর স্থাপন করেছেন।

## সূর্য্যসাধক

[ শেলীর স্কাইলার্ক কবিতার ভাব অবলম্বনে ]

তপতী চট্টোপাধ্যায়

ছোট্ট আমার পাখী
নীল আকাশের বুকেও কিছু আছে নাকি ফাঁকি
নইলে কেন সেথায় যেয়েও ভরলো না তোর মন
ধরার পানে অনুরাগে চাইলি সারাক্ষণ।
এই পৃথিবীর বুকে কত ব্যথা কত কালি
আকাশেতে শুধুই আলো শুধুই হাসির ডালি,
তবু যখন চাইলো ধরা রুগ্ন শিশুর মত
মায়ের পানে ক্লান্ত চোখে তখন হলি নত।
তারেই ঘিরে রইলো অনুক্ষণ
আকাশ পারে যেতে চাওয়া ছোট্ট তোর ও মন।
মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে মনে
থাক না তবে চির জীবন ধরার ফুলবনে,
ধূলায় আলোয় ভরা যেথা চোখের জলে হাসি
হিংসা-দ্বেষের পাশেই ফোটে ভালবাসার রাশি।
ছোট্ট মনে উঠলো ফুটে মস্ত বড় কথা
যুগে যুগে প্রেমিক হিয়ার ভালবাসার ব্যথা,
এই ধরাতে ঢালবে তুমি স্বরগ-ভরা ধন
আকাশ হতে উদার আলো আনলো তোমার মন।
বাতাস হবে স্বচ্ছ সাদা শ্যামল আরও হবে
বনভূমি কোথাও নাহি রবে,
অভাব কিছু, ভরবে নদী অমৃত নির্ঝরে
ভরবে মন আপনভোলা ভালবাসার ভরে।
এই পৃথিবীর শুকিয়ে যাওয়া বুক
তোমার আনা নিকষ আলোয় ভরে নেবে বুক,
সেই ভরা তার মন
জাগিয়ে দেবে মনে মনে ভালবাসার ক্ষণ।
ভাসিয়ে দেবে হিংসা-দ্বেষের ডালি
ভাসিয়ে দেবে সকল হিয়ার পুঞ্জীভূত কালি,
সেই সাধনার আলো তোমার ডানায় দিল গতি

## মনে মনে

অসীম বসু

কেন এই নিঃশব্দ সন্ধ্যার সমুদ্র এ মনে
পর্বতের গোপন ঝরণার কলতান ?
ডুবুরির পোষাক এঁটে সময় নির্জনে
ছায়া-কাঁপা শরীরী হোয়ে শুধু ঘোরাফেরা।

তার চেয়ে অলক্ষ্যে বাজাও উন্মুক্ত অর্গান
এ রক্তের উন্মত্ত ধমনীতে। অসীম প্রান্তরে
সবুজ হাসিলতানো ঘাসের লজ্জার তালে—
গাও ডানামেলা উড়ন্ত-পাখির বুকের গান।

সেখানে হয়তো পাবো শান্তির আঁচল ঘুম
কুয়াশা-দরজা ভেঙ্গে স্বাধীন-পতাকা-প্রভাত,
অথবা হঠাৎ দাঁড়ালো শিশুর অবাক হাত
আশ্চর্য নতুন পৃথিবীকে জানাবে আলিঙ্গন।

কিংবা যদি এখানে আসবেই—কঠোর পণ,
আঁকো তবে দিগন্ত মনে নতুন রামধনু,—
সজল শ্রাবণ মাঠে কিষাণের সবল হাতে
এক গোছা সতেজ-সবুজ-বিদ্যুৎ শিশু-বন।

সাগর বাতাস এলেও বহাও বৈশাখী-তুফান
ক্লান্ত নদীর বুকে চকিত উন্মাদ জোয়ার,
তার পর জাগুক সুপ্তির বুকে গোপন সন্তান

# ॥ মাসিক বসুমতীর এজেণ্ট-তালিকা ॥

বর্তমানে মাসিক বসুমতীর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচার বাঙলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের পত্রিকার এজেণ্ট-তালিকা লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কলিকাতার বাহিরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মাসিক বসুমতী প্রাপ্তির সুবিধার জন্য আমরা বর্তমান সংখ্যা হইতে আমাদের এজেণ্ট-তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করিব। মাসিক বসুমতীর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এজেণ্টদের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবেন। কেবলমাত্র কলিকাতা অঞ্চলের আনুমানিক পাঁচ শত বিক্রেতার নাম এই তালিকায় নাই।

## ॥ বাঙলা দেশ ॥

### হাওড়া ●

শ্রীকাশীনাথ সাহা —আমতা
শ্রীঅলোককুমার চ্যাটার্জ্জী —বেলুড়

### হুগলী ●

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘড়া —শেওড়াফুলি
শ্রীমদনমোহন গাঙ্গুলী —মগরা ও ত্রিবেণী
শ্রীগঙ্গাধর দে —শ্রীরামপুর
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য —ভদ্রেশ্বর ও বৈদ্যবাটী
শ্রীললিতমোহন দত্ত —হুগলীঘাট
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কুমার —সিঙ্গুর
শ্রীমণিভূষণ সিং —আরামবাগ
শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী —নবগ্রাম, কোননগর

### বর্দ্ধমান ●

শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত —চিত্তরঞ্জন
মেসার্স বাগচী ব্রাদার্স —কুলটি
শ্রীভূতনাথ দাস —দাঁইহাট
শ্রীকৃষ্ণসাধন সরকার —ধাত্রীগ্রাম
শ্রী এস, প্যাণ্ডে —বর্দ্ধমান
শ্রীজয়দেব মুখার্জ্জী —ওয়ারিয়া
শ্রী কে, সি, নাথ —পানাগড়
শ্রীরেণুপদ পাল —জে, কে, নগর
শ্রীতারাপদ রায় —বরাকর
শ্রীতপনজ্যোতি চ্যাটার্জ্জী —সীতারামপুর
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে —রাণীগঞ্জ
শ্রী বি, কে, আইচ —বর্দ্ধমান
শ্রীপঞ্চানন মোদক —কালনা
শ্রী এইচ, সি, ঘোষ —বার্ণপুর ও আসানসোল
শ্রীসুন্দরগোপাল সেন —গলসি

### বীরভূম ●

শ্রীমাণিকচন্দ্র সাহা —রামপুরহাট
শ্রীমণিমোহন চন্দ্র —নলহাটী
শ্রীমন্মথকুমার ব্যানার্জ্জী —সিউড়ি

### বাঁকুড়া ●

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র কর্ম্মকার —বিষ্ণুপুর
শ্রী বি, পাল —সোনামুখী
শ্রীদ্বিজপদ দাস —বাঁকুড়া

### মেদিনীপুর ●

শ্রীপঞ্চানন চৌধুরী —ঝাড়গ্রাম
শ্রীনীলমণি বোস —বালিচক
মেঃ মিশ্র নিউজ এজেন্সী —কলাইকুণ্ডা
শ্রীভাস্করচন্দ্র পাল —গড়বেতা
শ্রী জে, এন, আচার্য্য —মহিষাদল
শ্রী আই, বি, ঘোষ —চন্দ্রকোণা রোড
শ্রীহরিসাধন পাইন —ঘাটাল
শ্রীমতী কনকলতা দেবী —খড়্গপুর
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী —মেদিনীপুর

### মানভূম ●

শ্রীবিমলকান্ত রায় —কুমারধুবি ও বরাকর
শ্রী এম, এম, চক্রবর্ত্তী —হরিশ্চন্দ্রপুর
শ্রীঅবনীমোহন দাস —পুরুলিয়া

### চব্বিশ পরগণা ●

শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য —ইছাপুর
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস —কাকদ্বীপ
মেঃ বি, এল, সাহা এণ্ড সন্স —ব্যারাকপুর
শ্রীশীতলকুমার মুখার্জ্জী —কাঁচড়াপাড়া
[illegible] —[illegible]

### নদীয়া ●

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন —শান্তিপুর
শ্রীঅহিভূষণ মালাকার —বেলডাঙ্গা
শ্রীহরিচরণ প্রামাণিক —নবদ্বীপ

### মুর্শিদাবাদ ●

শ্রীবিশ্বনাথ দাস —ধুলিয়ান
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত —মুর্শিদাবাদ
শ্রীহরিপদ সাহা —জিয়াগঞ্জ
মেঃ ঘোষ লাইব্রেরী —বহরমপুর ও খাগড়া

### মালদহ ●

শ্রীসুনীলকুমার শেঠ —মালদা কোর্ট

### কুচবিহার ●

শ্রীঅমূল্যরতন রায়গুপ্ত —দিনহাটা
শ্রীঅনিলরঞ্জন চক্রবর্ত্তী —কুচবিহার

### জলপাইগুড়ি ●

শ্রী এ, ধর চৌধুরী —আলিপুরদুয়ার
শ্রীসতীশচন্দ্র বোস —মল-জংশন
শ্রী এস, এন, নন্দী —জলপাইগুড়ি
শ্রীমতিলাল সরকার —কালচিনি

### দার্জ্জিলিং ●

শ্রী ডি, এন, বড়াল —কালিম্পং
শ্রীমতী শচীরাণী দেবী —শিলিগুড়ি টাউন

### পঃ দিনাজপুর ●

শ্রী এ, কে, চ্যাটার্জ্জী —বালুরঘাট

### পূর্ণিয়া ●

শ্রী এস, কে, ভাদুড়ী —ফরবেসগঞ্জ

### ত্রিপুরা ●

শ্রী[illegible] ভট্টাচার্য্য —আগরতলা

## কবিগান ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

অশোকরঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রাচীন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো গীতিপ্রাধান্য। জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যই গীতের প্রাধান্য সৃষ্টি করে প্রথম। এর পরে মঙ্গলকাব্য ও পাঁচালী গানের উৎপত্তি।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ প্রভাব বর্জিত বাংলা কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিগানের গীতিপ্রাধান্য অনস্বীকার্য।

কারও কারও মতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও কবিগানের প্রচলন ছিল। তবে ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিগানের ইতিহাস থেকে এইটুকু ধারণা নির্দিষ্ট হয় যে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় এক শত বৎসর বাংলা সাহিত্যে কবিগানেরই যুগ। ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেরণায় কবিগানের জন্ম হলেও এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। কারণ, কবিগান বৈষ্ণব কাব্যের মতো কোন ধর্মীয় মনোভাব নিয়ে রচিত নয়। সাধারণ মানুষের জন্যই এই গান সাধারণ সুরে সাধারণ ভাষায় রচিত। কবিগানকে আমরা তৎকালীন বাংলা দেশের জাতীয় সাহিত্য বলতে পারি। জীবনচেতনাই এর কাব্যচেতনা।

প্রাচীনতম বা প্রথম কবিওয়ালা হলেন গোঁজলা গুঁই। কেহ কেহ অবশ্য নন্দলাল (লালু) কে প্রাচীনতম কবিওয়ালা বলে মনে করেন। তবে গোঁজলা গুঁইর অবির্ভাব যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গোঁজলার পর থেকেই কবিগানের যুগ বা সুরু। তার আগে বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের নায়কত্বই বজায় ছিল।

কবিগান যে প্রথম কোথা থেকে প্রচলন হয়েছে তারও কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি আজ পর্য্যন্ত। তবে ঈশ্বর গুপ্ত শান্তিপুরকে কবিগানের জন্মভূমি মনে করে গর্ববোধ করতেন।

কবিগানের সৃষ্টি যে শুধু অশিক্ষিত মস্তিষ্কের দ্বারা, এ ধারণা করাও ভুল। যদিও গ্রাম্য ভাষা ও অশ্লীলতা কলঙ্কের ছাপ কবিগানের আছে। তবু আমরা বলবো এর জন্য দায়ী তৎকালীন সময় ও পরিবেশ।

এর মধ্যেও রয়েছে সমস্ত সার্থক শিল্পপ্রতিভা। শিল্পসম্মত এর সৃষ্টি। কবিগানের নির্দিষ্ট নিয়মও ছিল, সম্পূর্ণ খেয়াল খুসীর উপর এর রচনারীতি ছিল না।

কখনো কখনো এর পেছনে রাগ-সঙ্গীত বা শিল্প-সঙ্গীতের প্রভাবও ছিল। সুর-ছন্দের বৈচিত্র্যও ছিল। যদিও মাঝে মাঝে বিভিন্ন গানে একই সুরের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। তবে একঘেয়েমী থেকে রক্ষা পাবার জন্য সুরের পার্থক্য দরকার এ বোধটাও ছিল প্রবল।

কবিগানের মধ্যে যে সমস্ত রাগ-রাগিণী বা মিশ্রিত রাগের প্রভাব ছিল বেশী, তার মধ্যে বেহাগ, কালাংড়া, ভৈরবী, আলা ভৈরবী, বিভাষ, শ্যামললিত, সরফরদা, দরবারী, চৌড়ী, ললিত-বিভাষ, মালকোষ, হিন্দোল, বাগেশ্বরী, গৌরী, সোহিনী, ছায়ানট, শ্যাম-পুরবী, বাগেশ্রী, মুলতানী, ইমন, আড়ানা, বাহার, কামোদ খাম্বাজ, ইমন-কল্যাণ, কাফী, কানাড়া, ইমন ভূপালী, কেদারা, ঝিঁঝিট, জয়জয়ন্তী, দরবারী কানাড়া, বাঁরোয়া (ঠুনরী), পাহাড়ী ঝিঁঝিট, পুরবী, সুরট, সিন্ধু কাফী, হাম্বির, পুড়িয়া ধানেশ্রী, ইত্যাদি। ছোট ছোট ছড়াগুলো মাঝে মাঝে ভাটিয়ালী সুরেও গাওয়া হতো। কবিগান যদিও ক্লাসিক সুর বা তালের উপর খুব বেশী নির্ভরশীল নয়, তবু রাগ-রাগিণীর প্রভাব ছিল প্রচুর। আর এর থেকে বোঝা যায়, তখনকার কবিওয়ালারা রাগ-রাগিণী সম্বন্ধেও গভীর সচেতন ছিলেন।

দাদ্‌রা তালের প্রভাব বেশী কবিগানে। দেবস্তুতি বা তত্ত্বমূলক সংগীতের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী রাগ হচ্ছে বিলাবল। যা কবিগানের তত্ত্বমূলক বা দেবস্তুতি গানে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। কাওয়ালী ঢংগেও অনেক সময় ভাব-প্রকাশের সুবিধার জন্য গাওয়া হতো।

ছন্দের আধিপত্য বা ছন্দের গণ্ডিবদ্ধ কবিগান সব সময় নয়। সবটাই সুরের উপর নির্ভর করে। সুর অনুযায়ী বা সুরের তাগিদে শব্দের ব্যবহার হয় থাকে। সুর ও তালের ভাষা ও উপমার যথাযোগ্য প্রয়োগ হলেই কবিগানের সার্থকতা।

কবিগানের প্রথমে 'চিতেন', পরে 'মহড়া', সর্ব্বশেষে 'অন্তরা' গাহিতে হয়। কিন্তু লিখবার সময় প্রথমে 'মহড়া' পরে চিতেন শেষে অন্তরা লিখতে হয়।

কবিগানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ভেদও আছে 'মালসী' 'সখী সংবাদ', 'গোষ্ঠ' ও 'কবি'। ভক্তি ও বৈরাগ্য বিষয়ক গানের নাম মালসী।

"মালসীর মধ্যে যেগুলো বিস্তারিত ও নানান প্রকার সুরের ও তালের মিশ্রণে গাওয়া হয় তাকে ভবানী বিষয়ক বলে। আর যেগুলো বিস্তৃত নয় একমাত্র তালে চমকা সুরে গাওয়া হয়, তাকে বলে ডাক-মালসী। নায়ক-নায়িকার সুখ-দুঃখের আলোচনা যে গীতের মধ্যে, তার নাম 'সখী সংবাদ'। বসন্ত-বিরহ ভোর প্রভৃতি গানগুলিকে সখী সংবাদ বলে।...বাৎসল্য রসাত্মক গানের নাম গোষ্ঠ।"

কবিগান সাধারণতঃ ঢোল ও কাঁসীর সাহায্যে গাওয়া হয়ে থাকে।

কবিগানের জয় পরাজয় নির্ভর করে এহ রস-সৃষ্টির উপর। উপমা ও সুরের প্রাঞ্জলময় সৃষ্টির দ্বারাই এর শিল্পনৈপুণ্য বা সার্থকতা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কবিগানের সমাপ্তি-প্রায় এবং উনিশ শতকের শেষ কবিওয়ালা হলেন ঈশ্বর গুপ্ত।

দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রথম কাব্যরচনা করেন ঈশ্বর গুপ্ত। এই ঈশ্বর গুপ্তকে আধুনিক কাব্যের স্রষ্টা বলা হয়ে থাকে। তাঁর গান গতানুগতিকতার বেড়াজালকে ছিন্ন করে নতুনত্বের সূচনা করে। ঈশ্বর গুপ্ত তাই যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। দুই যুগচেতনার সেতুবন্ধকের কাজ করেছেন তিনি।

"ঈশ্বর গুপ্ত যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (২৫শে ফাল্গুন ১২১৮ সাল) সে যুগে কবি-গানের নূপুর সিঞ্চন ছিল স্পষ্ট। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা করতে পারতেন। ঈশ্বর গুপ্তের পিতা-পিতৃব্যদিগের সংগীত রচনার শক্তি ছিল। এই শক্তির প্রভাব অতি শৈশব হতেই ঈশ্বর গুপ্তের উপর পড়েছিল।"* দশ-বার বৎসর বয়স হতেই বাংলা গান রচনা করতে পারতেন তিনি।

সাহিত্য-জগতে ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় তিনি কবিওয়ালা। তাঁর কাব্য-প্রতিভা বাংলা-সাহিত্যে কবিওয়ালা হিসেবেই উদ্ভাসিত ও প্রতিষ্ঠিত।

নৈসর্গিক কবিতা, দেশপ্রেমমূলক কবিতা, বেঁচে থাকা ছোটখাটো সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, বেদনাকে কেন্দ্র করে কবিতা রচনায় তাঁর পারদর্শিতা পাঠককে মুগ্ধ করেছিল।

নৈসর্গিক কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে ভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা একান্ত ভক্তের। ভূমা সম্বন্ধে তিনি ভেবেছেন। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ-ভরা পৃথিবীতে বাস করে, সৃষ্টিকর্তার অপরিসীম শক্তিকে উপলব্ধি করেছেন এবং এ-ও বুঝেছেন, স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্ট এই জাগতিক মানুষ অভিন্ন।

আমি যে হে 'আমি' বলি
সে আমিটি কার।
আমির আমিত্ব তুমি
সে নহে আমার॥
যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি।
যে রূপে বলাও তুমি সেইরূপ বলি॥
আমি চলি আমি বলি সাধ্য কিছু নাই।
চলাও বলাও তুমি, চলি বলি তাই॥

সেই সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন যে পৃথিবীর সবই ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। বিশ্বের সব-কিছু দু'দিনের খেলাঘর। তাসের মিনারের মতো পৃথিবীর সুখ-দুঃখ স্নেহ-ভালবাসা, স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য জড়িয়ে আছে। আজ যা সত্য কাল তা নিশ্চিহ্ন। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর স্রষ্টার উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন—

এখনি সৃজন করি এখনই সংহার
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম আমার।
এই দেখি এই আছে এই নাই আর।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম আমার।

এই ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি তাঁর মধ্যে নৈরাশ্য ও হতাশা এনে দিয়েছিল। সংসারে মানুষ জন্মায়, দুদিন হাসে কাঁদে, তারপর সমাপ্তিরেখা যখন টানে তখন লাভ-ক্ষতি হিসেব ভাগাভাগি করবার আগেই এই অপ্রান্ত পৃথিবীর বুক থেকে বিলীন হয়ে যায়। তবু তার বুকে যাত্রীর অগণন আনাগোনা চলতে থাকে। সংসারটা যেন রঙ্গমঞ্চ। দুদিনের জন্য অভিনয় করে যাওয়া। 'দুনিয়ার মাঝে যেন সব ছায় ফাঁক।'

এখানে পারসী কবি ওমর খৈয়ামের মনোভাবের মতোই তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

এ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ-রাধার প্রেম বিষয়ক গানগুলিও তাঁর শিল্প-প্রতিভার বিশেষ পরিচায়ক।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধার মনের আকুলতা অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্য রূপ নিয়েছে তাঁর গানে—

চিতেন—শ্রীকৃষ্ণের আশায় হয়ে নিরাশা এই দশা ঘটেছে
আমার।
পরি চিতেন—পূর্ব ভাবে তাই ভাবান্তর মনেতে যন্ত্রণা অপার।
ফুকা—ব্রজে আনবো বলে ব্রজের জীবন ধন
গেলাম করিয়া মন সাধ।
কৃষ্ণ সাধিল বাদ, বিষাদে মগ্ন তাই নয়ন।

যেপত্তা—মাধব এলো না ব্রজেতে মজে কুবুজার প্রেমেতে
এখন বল গো সই কিসে বাঁচাই শ্রীরাধায়।

*   *   *   *

শব্দের অফুরন্ত ধারাই ঈশ্বর গুপ্তের সংগীতের প্রধান উল্লেখযোগ্য বস্তু। এমন অনর্গল শব্দ ব্যবহার এর আগে অন্য কোন কবিওয়ালার গানে দেখা যায়নি। কোন কোন জায়গায় শব্দের মোহনা সৃষ্টি করেছে যেন।

শব্দবাহুল্য কাব্যে অনেক দোষ সৃষ্টিও করেছে তার জন্য। শব্দ ব্যবহারের স্পষ্ট নিদর্শন নিচের গানটিতে। গানটি বেহাগ রাগিণীতে গাওয়া।

কে রে বামা ষোড়শী রূপসী
সুবেশী এ যে নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি
রূপময়ী চারু ভাস।
দেখ—গর্জিছে ঝম্ফ দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী—করে কি কীর্ত্তি
চরণে কৃত্তিবাস।

বিভিন্ন রাগের ব্যবহার তাঁর গানে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে বলা যায় রাগ সম্বন্ধে বিচক্ষণতাও তাঁর ছিল।

তাঁর গানের মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক বা রসাত্মক গানই বেশী। তিনি নিজেই খুব পরিহাসপ্রিয় ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য—"ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist ; ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।" নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের সময় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে তিনি যে গানটি রচনা করেন তার মধ্যেও তিনি ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি।

চিতেন—মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাঁকানো।
কেবল খাবো খোল-বিচিলি ঘাস ;

*   *   *

আমরা ভুষি পেলেই খুসী হবো
ঘুসি খেলে বাঁচবো না।

দুর্ভিক্ষের গানগুলি তাঁর সাধারণ বাউল সুরে গাওয়া। গানগুলি পড়লে এইটুকু বোঝা যায়, পরাধীন দেশে ইংরেজ শাসনের অত্যাচার যুক্ত হওয়ায় আকুল আহ্বান ও শোষিত মানুষের প্রতি দরদ প্রকট রূপ নিয়েছে।

তুমি সর্বেশ্বরী যদি তাদের
চোখ রাঙায়ে কর মানা।
তবে টুপি খুলে, কাছা তুলে
পালিয়ে যাবার পথ পাবে না।

এ গানটি তাঁর ভৈরবী রাগিণীতে গাওয়া। এর পরে দেশমল্লার রাগে গাওয়া আরেকটি গানে তিনি বলছেন—

এখন কেমন করে পেট চালা'
মরে গেলেম ভেবে ভেবে,
রোজ অষ্টপ্রহর কষ্ট ভুগে
ভাতে পোড়া জোটে সবে
তায় তেল জোটে না। নুণ জোটে না
কেঁদে মরি হা-হা রবে।

করুণ সুর দেবার জন্য তিনি বাউল ঢালী সুরকে এখানে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রতিটি গানই যেন ব্যঙ্গ ও পরিহাসে ভরা। দুঃখ শোক সব কিছুই যেন ব্যঙ্গের ছলে প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

তাঁর রচিত গীত ও পুস্তক সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিত-প্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ, প্রবোধ-প্রভাকর প্রভৃতি।

তাঁর রচনার অনেক দোষও ছিল, তার মধ্যে বিশেষ করে গ্রাম্য অশ্লীলতাই বেশী। এর জন্য দায়ী তিনি, যে পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন তা।

তা ছাড়া কবিওয়ালা ঈশ্বর গুপ্তের গানের পরিচয় দিতে গেলে অনেক বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। আমি এখানে আমার আলোচনা শেষ করছি এই কথা জানিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের একমাত্র পরিচয় যে তিনি কবিওয়ালা।

# রেকর্ড-পরিচয়

## হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82815—শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে দু'খানি অনবদ্য আধুনিক গান—"ও নীল সাগরের মেয়ে" ও "সপ্তসাগর পার হয়ে।"

N 82816—"মাইথারে কত গুণে" ও "বাঁশে যদি ঘুণ ধরে"—দু'খানি পল্লীগীতি পরিবেশন করেছেন দরদী সনৎ সিংহ।

N 82817—দু'খানি অতুলপ্রসাদী গান—"এস হে এস হে প্রাণে" এবং "মন রে আমার শুধু" নিখুঁত পরিবেশন করেছেন শ্রীমতী শ্রীলা সেন।

N 82819—কুমারী পূরবী সরকারের সুমধুর কণ্ঠের দু'খানি আধুনিক গান—"আরো একটু না হয়" ও "নয়নের জলে মোর।"

N 82818—"এই নীল নির্জন সাগরে" ও "এখনও এই রাত"—দু'খানি আধুনিক গান গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

N 82820—শ্যামল মিত্রের গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান—"মন মেতেছে নীল আকাশে" ও "সূর্যমুখী সূর্য খোঁজে।"

N 82821—মিষ্টি সুরের মিষ্টি গান "গীতালি গীতাঞ্জলি" ও "একটি ফুলের মত"—গেয়েছেন কুমারী বাণী ঘোষাল।

N 76082—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "লালু"-"ভুলু" বাণীচিত্রের দু'খানি জনপ্রিয় গান।

## কলম্বিয়া

GE 24927 & GE 24928—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোক-রঞ্জন শাখার শিল্পীদের গাওয়া চারখানি লোকগীতি পরিচালনা করেছেন—পঙ্কজ মল্লিক।

GE 24929—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দু'খানি আধুনিক গান—"ঐ চাঁদ যদি ডুবে যায়" ও "ঐ দেবদারু বন।"

GE 24930—নবাগতা কুমারী মঞ্জিরা ঘোষের মধুকণ্ঠের দু'খানি আধুনিক গান—"ঐ তো আকাশ এই যে মাটি" ও "বকুল বনে ঝিঁঝি জাগালো।"

GE 24931—"বোশেখ আসে বোশেখ যায়" ও "ধান ভাঙে"—নতুন ধরণের দু'খানি গান গেয়েছেন অমল মুখোপাধ্যায়।

GE 24932—"আকাশ অনেক দূর" ও "কত ছন্দ বরা" কণ্ঠ ঝংকারে মূর্ত করেছেন কুমারী আরতি মুখোপাধ্যায়।

# আমার কথা (৫০)

## শ্রীপ্রহ্লাদ দাস

প্রবাসে বিদেশিনী মহিলার নিকট প্রথম নৃত্যশিক্ষা ও পরে স্বদেশে ফিরিয়া বিভিন্ন প্রান্তের নৃত্যে পারদর্শিতা লাভ যে শিল্পীর জীবনব্যাপী সাধনার ফল—তাহা নৃত্য-বিশারদ নিরহঙ্কারী, প্রচার-বিমুখ, সৌজন্যপরায়ণ শ্রীপ্রহ্লাদ দাসের সহিত পরিচয়ে উপলব্ধি করিলাম। শ্রীপ্রহ্লাদ দাস ১৯০৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বরিশাল জিলার স্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে বাবা ও মাকে হারান। গ্রামের স্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকার সময় ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া কয়েক বার কারাবাস করেন এবং পড়াশুনায় ইস্তফা দেন। পিকেটিং-এর দরুণ ভীষণ প্রহৃত হইয়া জেলের মধ্যে খুবই উৎপীড়িত হন ও ছাড়া পাইয়া তিনি রেঙ্গুণে চলিয়া যান। সেই সময় বিদেশী শাসকদের চোখে বরিশালের প্রতিটি বাড়ী ছিল বিপ্লবকেন্দ্র, প্রতিটি ছেলেমেয়ে ছিল বিপ্লবী আর প্রতিটি অভিভাবক ছিলেন বিপ্লবের পৃষ্ঠপোষক। দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার প্রভৃতির উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বানে জেলার প্রতিটি প্রান্তর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। তাই বরিশালের সন্তান প্রহ্লাদ দাস নিজেকে বিলিয়ে দেন মাতৃ-আরাধনায়।

রেঙ্গুণে এসে শ্রীদাস স্থানীয় বেঙ্গলী ক্লাবের নাট্যদলের সদস্য হন। ছেলে বয়স থেকে আবৃত্তি অভিনয় ইত্যাদি করার দরুণ শীঘ্রই উহাতে স্থায়ী আসন লাভ করেন। সেই সময় বর্মাদেশীয় নাচ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং বিশিষ্টা নর্ত্তকী "মিয়া তাক্রি"র নিকট 'পোয়ে' নৃত্য শিখিতে থাকেন। কিছুকাল পরে কলিকাতায় ফিরিয়া মাণ বর্দ্ধনের নিকট ভারতীয় নাচ শিখিয়া ক্যালকাটা থিয়েটার্সে যোগদান করেন। এই সময় চন্দ্রমা মিশ্রর কাছে কথক নাচ, পরে শম্ভু মহারাজ ও তৎভ্রাতা অচ্ছন মহারাজের নিকট শিক্ষাধীন থাকিয়া পণ্ডিত রাজনারায়ণ মিশ্রর শিষ্য হিসাবে উক্ত নৃত্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৃহশিক্ষকতাও করিতে থাকেন ও Impressario হরেন্দ্র ঘোষের সহিত পরিচিত হন। তিনিই প্রহ্লাদ বাবুকে গুরু গোপাল পিল্লের নিকট উপস্থিত করান। ভারত-ভ্রমণরতা রাশিয়ান নর্ত্তকী নীনামায়াকে ভারতীয় নৃত্য শিখাইতেন। পরে হরেন বাবুর ব্যবস্থাপনায় নীনামায়া, তিমিরবরণ ও শ্রীদাস উত্তর-ভারত ও আসামে নৃত্য-প্রদর্শনীতে যোগদান করেন।

ইহার পর তিনি মাদ্রাজে গিয়া গুরু রামচন্দ্র পিলাই-এর নিকট ভরতনাট্যম্ শেখেন ও কলিকাতায় আসিয়া বাণীবিদ্যাবীথির নৃত্যবিভাগে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। কিছুকাল পরে মাদ্রাজে ফিরিয়া নাট্যকলাকুঞ্জম্ বিদ্বান গণেশন পিলাই-এর নিকট ভরতনাট্যম ও গুরু কৃষ্ণ নায়ারের কাছে কথাকলি নৃত্য শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। সেই সময় প্রহ্লাদ বাবু বালাসরস্বতী ও গুরু এলাপ্পার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হন।

কলিকাতায় যখন তিনি ফিরিলেন তখন কংগ্রেসের "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" নীতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলার

শ্রীদাসকে উহার নৃত্য-পরিচালক করা হয়। পরে সারা বাংলায় 'অভ্যুদয়' খুবই সাড়া তোলে। ১৯৪৪ সালে শ্রীদাস নিরুপমা দেবীর প্রচেষ্টায় ও সজনীকান্তের নামকরণে নিজস্ব বিদ্যালয় 'নৃত্যভারতী' পার্কসার্কাসে রথযাত্রার দিন উদ্বোধন করেন। শ্রীদাসের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা, শাপমোচন, ভানুসিংহের পদাবলী, বসন্ত, বর্ষামঙ্গল ইত্যাদি ও কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী, শকুন্তলা, মনসামঙ্গল এবং গান্ধিজী নৃত্য-নাট্য উপভোগ্য হয়।

১৯৪৬ সালে প্রহ্লাদ বাবু তাঁহার ছাত্রদের লইয়া কয়েক মাস মালয়, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি পরিভ্রমণ করেন। তথায় বলি দ্বীপের নৃত্যশিল্পী ওসমান সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত পরিচয় হওয়ায় শ্রীদাস 'জাভা নাচ' শেখেন ও তাঁহাদের ভারতীয় নৃত্যশিক্ষা দেন। ১৯৫৩ সালে বুদ্ধ শিষ্যদ্বয়ের পূতাস্থি আনয়নের জন্য কাণ্ডিয়ান নৃত্যগুরু গুণাইয়া কলিকাতায় আসিলে প্রহ্লাদ বাবু তাঁহার নিকট সিংহলী নাচ শিখেন। সেই সময় তিনি গুরু আতম্ব সিং-এর কাছে মণিপুরী নৃত্য শিখিতে থাকেন। Arabian Nights, সুধারা, বৈকুণ্ঠের উইল, চিত্রাঙ্গদা, কবি, মহাসম্পদ ইত্যাদি ছায়াচিত্রগুলিতে তিনি নৃত্য-পরিচালক হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

প্রহ্লাদ বাবুর স্ত্রী শ্রীমতী নীলিমা দাস মণিপুরী নৃত্যশিল্পী এবং পুত্র চিত্রেশকুমার ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কথক নৃত্যপ্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছেন।

শেষে শ্রীদাস বলেন যে, কলিকাতায় প্রথম পদার্পণের সাথে সাথে বেঙ্গল মিউজিক এসোসিয়েসন-এর প্রতিষ্ঠাতা কেশরী সিং নাহার নৃত্য বিষয়ে তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য করেন।

বর্ত্তমান মাসে প্রহ্লাদ বাবুর ব্যবস্থাপনায় ও নৃত্যভারতীর উদ্যোগে 'নিখিল ভারত নৃত্যোৎসব' কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। এবং বিশিষ্ট ভারতীয় নৃত্যশিল্পীরা উহাতে অংশ গ্রহণ করিতেছেন।

১৯৩৬ সাল হইতে শ্রীদাস বাঙ্গালা ও বহির্বাঙ্গালায় বিভিন্ন নৃত্যপ্রতিযোগিতায় বিচারক ও প্রধান বিচারকের কার্য্য করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে 'সঙ্গীতভবনে' এর নৃত্যবিভাগের ডিপ্লোমা-পরীক্ষক হিসাবে তিনি দুই বৎসর যুক্ত ছিলেন।

ভবানী মুখোপাধ্যায়

## কুড়ি

Androcles and the Lion ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে প্রথম অভিনীত হয়। গ্রানভিল-বার্কার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের সেপটেম্বর মাসে সেণ্টজেমস থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

বার্ণার্ড শ'কে যদি প্রশ্ন করা হত তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক কি—তিনি বলতেন Back to Methuselah ; আর Androcles and the Lion সম্পর্কে বলতেন, এ একটা Piece d' occassion প্রয়োজনের খাতিরে লিখিত, গ্রানভিল বার্কারের থিয়েটার চালু রাখার জন্যই তাড়াতাড়ি লিখেছি।

হেসকেথ পীয়রসন সে কথা শুনে বললেন—আপনার এই কথা ঠিক নয়, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে আপনি এই নাট্য-রচনায় হাত দিয়েছেন।

—কে তোমাকে এ কথা বলেছে? বললেন বার্ণার্ড শ'।

—খুবই সোজা। আপনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আর্থার পিনেরোকে লিখেছিলেন: 'সাইন অব দি ক্রশ' জাতীয় একখানি ধর্মমূলক নাটক রচনা করছি, তোমার জানাশোনা কোনো যোগ্য লোক আছে যে লাঙ্গুল সহ সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে? আপনি পিনেরোকে এই কথাও বলেছিলেন যে এই সব ঐতিহাসিক কাহিনীর ভেতর অনেক রঙ্গরস আছে, কোনোদিন এর যথাযথ ব্যবহার কেউ করেন নি। বেশ রসিয়ে লেখার অনেক কিছু আছে।

—বার্ণাড শ' সবিস্ময়ে বললেন—পীয়রসন, তুমি আমাকে অবাক করলে, এত সব জানলে কি করে? কোথায় আবিষ্কার করলে?

হেসকেথ পীয়রসন হেসে বললেন—আমি জীবনী লিখতে বসেছি। সব কিছু তথ্য আমাকে জোগাড় করতেই হবে, সব খুঁটিনাটি।

—তাহলে আমার মনে হয় দু-চার সপ্তাহের মধ্যেই নাটকটি লিখে ফেলেছিলাম।

হেসকেথ বললেন, আপনি নিশ্চয়ই ১৯১২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে নাটক শেষ করেছেন। কারণ সেই মাসেরই গোড়ার দিকে জি, কে, চেষ্টারটনকে আপনি নাটকটি পড়ে শুনিয়েছেন। চেষ্টারটন পত্নীকে বলেছিলেন যে এটি একটি গীতি-নকসা মাত্র, তাই'লেই দেখা যাচ্ছে এ আপনি গ্রানভিল বার্কারের সেণ্ট জেমস থিয়েটারের জন্য লেখেননি। আপনি বলেছিলেন এই নাটক ধর্মীয় প্রহসন, এমন কি জি, কে সিকেও উত্তেজিত করেছিলেন ধর্মমূলক নাটক লেখার জন্য।

বার্ণার্ড শ' খুসী হয়ে বললেন: তুমি তো দেখছি আমার চাইতেও অনেক বেশী জানো, তা নাটকটা কি তুমিই লিখেছিলে না কি? মন্দ লাগছে না, আরো একটু বলো শুনি।

আর্কিবাল্ড হেনডারসন বলেন যে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লাভাইনার যে উপলব্ধি সে আপনারই ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। সেই যে রবার্ট লোরেনের সঙ্গে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবতে বসেছিলেন।

বার্ণার্ড শ' বললেন ধর্মের রোমান্স সাধারণতম কঠোর বাস্তবে গিয়ে ধাক্কা খায়। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ আর কি করবে?

* * * *

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১৯ই নভেম্বর তারিখে বন্ধু ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে বার্ণার্ড শ' লিখেছেন—

...না, আমার বরাতে দেখছি তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাহিত্যিক চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া আর পথ নেই। সেকস্‌পীয়রীয় প্রচেষ্টা অবশ্য ভালো নয়, এখন আবার বলছ যীশুখৃষ্টের জীবনী লিখছো, আমিও ত সেই কর্মই করছি, খৃষ্টান শহীদের জীবনী নিয়ে লেখা আমার Androcles and the Lion নামক নাটকের ভূমিকা লিখছি। সুতরাং ত্বরা করো। ...এ ভারী আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি, আমি এবং জর্জ মুর একই সঙ্গে একই কর্ম করছি। একটা আসল কথা বলতে চাই যে আধুনিক সমাজতন্ত্র এবং জীবতত্ত্ব ক্রমশঃই যীশুখৃষ্টের অদ্ভুত অর্থনীতি আর ধর্মতত্ত্ব সমর্থন করছে।

ইতি—জি. বি. এস।

এর জবাবে ফ্রাঙ্ক হ্যারিস অতিশয় উৎফুল্ল হয়ে বার্ণার্ড শ'কে জানালেন চুরি-টুরি জানি না, তোমার লেখা পড়লে খুশী হব।

হলও তাই। Androcles-এর ভূমিকা পড়ে ফ্রাঙ্ক হ্যারিস অবাক হয়ে গেলেন। তখনই একটা সমালোচনা লিখে ফেললেন।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের এই সমালোচনার ফলে বার্ণার্ড শ'র সঙ্গে তার কিছু দিন সুদীর্ঘ পত্রালাপ চলল। বিষয় যীশুখৃষ্ট। বার্ণার্ড শ'র চিঠিগুলি চমৎকার! জানুয়ারী ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক হ্যারিসকে শ' লিখছেন:

আমার Androcles এর ভূমিকা সম্পর্কে তোমার সমালোচনা প্রবন্ধটি তোমার আর সব লেখার মতই সুখপাঠ্য। কিন্তু যীশুখৃষ্টের কোমলতা সম্পর্কে তোমার যে আপত্তি তার জন্য আমার উপর আক্রমণ না চালিয়ে সেণ্ট ম্যাথুর ওপর তোমার বাণ নিক্ষেপ করা উচিত। সারমন অন দি মাউণ্টকে যদি প্রকৃত মুক্তাকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা হিসাবেই গ্রহণ করি, কথামৃতের সঙ্কলন নয়, তাহলে কি মনে হয় না যে যীশু যা হতে চেয়েছিলেন তার চেয়ে কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিলেন?

একটা পুরাতন গল্প আছে, কেউ সেটা মাজারিন, কেউ বা রিসল্যুর নামে চালায়। জনৈক মন্ত্রীর গর্ভগৃহে কিছু ছবি টাঙানো ছিল, এক দেয়ালে যুদ্ধের রক্তাক্ত বিভীষিকা অপর দিকে ছিল

বৃক্ষান্তিময় মনোরম নিসর্গ চিত্র ও গৃহস্থালীর ছবি। কোনো নতুন ব্যক্তির গুণ বিচারের প্রয়োজন হলে মন্ত্রিপ্রবর লক্ষ্য করতেন ব্যক্তিটি কি জাতীয় ছবি দেখছেন, যদি যুদ্ধের ছবি হয়, তাহলে বোঝা যেত ব্যক্তিটি শান্তিপ্রিয় ভীরু মানুষ, সংঘাত ও দুঃসাহস তার কাছে রোমান্টিক বিলাস, কিন্তু যদি নিসর্গ চিত্র বা প্রার্থনা জাতীয় ছবির দিকে নজর পড়তো, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে ভয়ংকর সামরিক কর্মে নিযুক্ত করা হত। এর চেয়ে ভয়ংকর খেলোয়াড় মনীষীর কথা জানো কি? তুমি নিজে সারমন অন দি মাউন্ট পছন্দ করো আর যারা তোমাকে কখনো দেখেনি, জানে না, তারা হয়ত তোমাকে খৃষ্টতুল্য মনে করে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে। কিন্তু যে তোমাকে স্বচক্ষে দেখেছে, সে কি বলবে Gentle Francis, meek and mild।

এই সুদীর্ঘ চিঠিখানি অতিশয় মূল্যবান, দুঃখের বিষয়, সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি সম্ভব নয়। এই চিঠিতে যীশু, বাইবেল, এবং মানুষ সম্পর্কে আশ্চর্য মন্তব্য আছে। পরে বার্ণার্ড শ' এবং খৃষ্টধর্ম সম্পর্কিত পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে উল্লেখ করা যাবে।

### একুশ

যেমন ব্যারীর Peter Pan-এর যখন জনপ্রিয়তা অসীম, সেই সময় সমালোচক ও কার্টুনিষ্ট Max Beerbohm একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিলেন, ব্যারী বয়স্ক এবং শিশুদের মজলিসে Peter Pan পড়ে শোনাচ্ছেন, বয়স্করা পাঠ শুনে আনন্দ উপভোগ করছেন, ছেলেরা ঘুমে ঢলে পড়েছে। বার্ণার্ড শ' বলেছেন এই কার্টুন চিত্র সম্পর্কে আমি একমত। সেই কারণেই Androcles লিখেছি, ছোটদের নাটক কেমন হওয়া উচিত তাই দেখানো আমার উদ্দেশ্য, ছোটদের জন্য মানে ছেলেমানুষী নয়। বার্ণার্ড শ'র মত শিশুদের জন্য লিখিত সব মহৎ গ্রন্থই যথা: দি পিলগ্রিমস প্রগ্রেস, গলিভার টেলস, রবিনসন ক্রুসো, আরব্য উপন্যাস, গ্রিমস ফেয়ারী টেলস, হানস আনডারসনের রূপকথা সবই বড়দের জন্য লেখা। শ' বলেছেন—I wrote Androcles and the Lion partly to show Barric how a play for children should be handled.

Androcles and the Lion মঞ্চস্থ হওয়ার পর লণ্ডনের সংবাদপত্রগুলি একবাক্যে এই নাটকের, বার্ণার্ড শ'র রুচির, রচনা-শৈলীর নিন্দা করেছেন। এমন কি The Lion পত্রিকার সমালোচক উইলিয়াম আর্চার এবং The Times পত্রিকার এ, বি, ওয়েকলি পর্যন্ত নাটকটির ওপর এতটুকু গুরুত্ব দান করেন নি। The Standard পত্রিকা লিখেছিলেন—An enormously clever insult thrown in the face of the British people. আর দৈনিক পত্রিকা The Daily Sketch লিখেছিলেন—All that millions of our countrymen hold most sacred is sneered at.

কিন্তু আশ্চর্য, এই নাটকটিই প্রথম মহাযুদ্ধের কালে War office থেকে চার হাজার খণ্ড চেয়ে পাঠানো হয় এবং Androcles যুদ্ধরত সেনাদলে বিতরণ করা হয়। বার্ণার্ড শ' সেদিন চার হাজার বই বিনামূল্যে দান করেছিলেন। খৃষ্টীয় মতবাদ বার্ণার্ড শ'র জীবনে তীব্র আকর্ষণ, তাই Dean Inge বলেছিলেন—He who **knew** the hearts of men would say of Bernard Shaw that thou art not far from Kingdom of God.

সেন্ট মার্টিনের Dick Sheppard বার্ণার্ড শ'কে অনুরোধ জানিয়েছিলেন Prayer Book পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের জন্য।

Androcles and the Lion-এর ভূমিকা Prospects of Christianity ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত ও প্রকাশিত হয়। সমালোচকদের মতে তাঁর এই ভূমিকাটিই সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

সমালোচকরা বলেন, সেক্সপীয়রের Twelfth Night-এর পর ইংরেজী ভাষায় আর এমন কমেডি রচিত হয়নি, এই নাটকই সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডি।

বার্ণার্ড শ' অনেক সময় নাটকীয় সংলাপ খুশীমত লিখে যেতেন, পরে নাটকীয় রীতিতে সেই কথা সাজাতেন, চরিত্রের মুখে ভেবে চিন্তে বসিয়ে দিতেন। এই কথা হেসকেথ পীয়রসন তাঁকে একদিন স্পষ্টাস্পষ্টি বললেন।

বার্ণার্ড শ' বিরক্ত হয়ে বললেন—কখনোই নয়, আমার চরিত্রাবলী আর সংলাপ পরস্পর সংযুক্ত, অবিচ্ছেদ্য, অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একথা ঠিক, আমি আগে সংলাপ লিখি, তার পর মঞ্চ নির্দেশাদি পরিবর্তনের মুখে লিখি। কিন্তু দেখেছি অচেতন ভঙ্গীতে গোড়া থেকেই আমি সবটা নাটকীয় দৃষ্টিতেই দেখি।

Androcles-এর চরিত্রাবলী ধর্মপরায়ণ, তাঁর অন্য সব নাটকের চাইতে তারা তাই অধিকতর স্পষ্ট, বলিষ্ঠ এবং সুপরিকল্পিত।

বার্ণার্ড শ প্রতি নাটকের রিহার্সেলেই উপস্থিত থাকতেন, নির্দেশ দিতেন। প্রযোজক ও পরিচালক অনেক সময় বিব্রত হয়ে পড়তেন। গ্রানভিল বার্কার হেসকেথ পীয়রসনকে বলেছিলেন বেশ মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গীতে শেষ অংকে Lariniaকে সংহত করতে হবে কিন্তু বার্ণার্ড শ' বললেন—Good gracious! You must not behave an offended patrician. You must treat her as one who has committed sacorilege. Jump at her! Fling yourself between them! Shut her mouth! Assault her!

বার্কার হতভম্ব হয়ে চুপ করে থাকতেন। বার্ণার্ড শ' নেচে-কুঁদে হাত পা নেড়ে সারা ষ্টেজ একেবারে সচকিত করে তুলতেন। তিনি মার্কিণ প্রযোজক পার্সি বার্টনকে বললেন—Be very careful not to start public opinion on the notion that Androcles is one of my larks, it will fail, unless it is presented as a great religious drama—with leconine relief—

শোনা যায়, যে ভদ্রলোক সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বার্ণার্ড শ' তাঁকে নিয়ে দিনের পর দিন লণ্ডন জু গার্ডেনে সিংহের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করতেন।

এই ভাবে Androcles and the Lion মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং সমগ্র লণ্ডনের দর্শকমণ্ডলীর প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়েছিল।

ধর্মমূলক নাটক বার্ণার্ড শ' যতগুলি লিখেছেন তার মধ্যে Androcles and the Lion সবচেয়ে চমকপ্রদ। এর আগে Major Barbara এবং Blanco Posnet এই দুটি ধর্মমূলক নাটক তিনি লিখেছেন, তা ছাড়া Fanny's First Play নামক প্রহসনও লিখেছেন, সেখানে ধর্মান্তরকরণ প্রধান উপজীব্য। তার পরেই ধর্মমূলক প্যানটোমাইম Androcles and the Lion রচিত হয়, এর আঙ্গিক সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বার্ণার্ড শ' ভিন্ন তাঁর আর কোনো সমসাময়িক সাহিত্য-সতীর্থ এই জাতীয় ধর্মমূলক প্যানটোমাইম রচনা করেন নি, একমাত্র চেষ্টারটন হয়ত এই কার্য করতে পারতেন। তার কারণ আর কোনও নাট্যকার এমন গভীর বিষয়কে এমন হাস্যকর করে তুলতে পারতেন না। দর্শককে তিনি অভিভূত করতে চান, এবং গম্ভীর ও কঠোরচিত্ত মানুষকে তিনি চঞ্চল করতে সচেষ্ট। ইংরাজ দর্শক হাসির সঙ্গে বেদনা, ধর্মের মধ্যে রঙ্গরস, দর্শনের মধ্যে লঘুরস পছন্দ করেন না। কিন্তু বার্ণার্ড শ' অতি দ্রুততালে সব কিছুই পরিবেশন করেছেন।

ফলে তাঁর নাটকের দর্শকরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল শুধু হাসির জন্য যায় তারাই দলে ভারী। সেই কারণেই নাটকের জনপ্রিয়তা। দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শক ধর্ম এবং দর্শনের তত্ত্ব পছন্দ করেন, তাঁরা কিন্তু অবশেষে বিরক্ত হন, এবং হয়ত অপছন্দও করেন। তৃতীয় দলের আগ্রহ মিশ্র বিষয়ে, তাঁরা এই দুই ধারার অপূর্ব সংমিশ্রণে বিস্মিত ও বিহ্বল হন। শেষোক্ত শ্রেণীর দর্শকরাই সমালোচক। এঁরা কেউই বার্ণার্ড শ'র নাটককে work of art বা শিল্পকর্ম হিসাবে গ্রহণ করেন না, চোখে যদি জল আসে তাহলে কাঁদেন, আবার তাড়াতাড়ি তা মুছে নিয়ে পরবর্তী উক্তিতে হেসে গড়িয়ে পড়েন, তখন আর কান্নার কথা মনে থাকে না।

বার্ণার্ড শ'র রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, তাঁর রচনায় ধর্মমূলক গোঁড়ামি আধ্যাত্মিক ন্যবারি নেই, এই ন্যবারির ভাবাবেগমুক্ত বলেই তাঁর শ্লেষ বক্তব্য এবং ঘটনা সংস্থাপন এত উপভোগ্য।

ফেরোভিয়ান চরিত্রটিতে লেখকের সমবেদনা পরিস্ফুট, লাভাইনা চায় যে সে তার স্বর্গের পথ রচনা করে নেবে (Fight his way to heaven) অর্থাৎ তাঁর মন, মেজাজ এবং তরোয়ালকে সেইভাবেই সে চালনা করবে। সে অতি বৈষ্ণব এবং শান্তিবাদী। দ্বিতীয় শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে এই বোধ হয় নিখুঁত ছবি।

[ ক্রমশঃ।

ভয়ে ভয়ে বিছানা ছেড়ে উঠলো শান্তনু। তাঁবুর মোটা ক্যানভাসের একটা ছিদ্রপথ দিয়ে তাকিয়ে রইলো সে।

বাইরে চাঁদের আলোর বন্যা বইছে তখন। একদিকে সবুজ নিবিড় অরণ্য গাঢ় কালিমায় ঢেকে আছে। দূরের পর্বতশ্রেণী নৈশ কুহেলির অস্পষ্টতায় অবগুণ্ঠিত। দূরে শুধু নীলাভ ধূসরতা। আরও দূরে তুষাররাজ্য—শুভ্র জ্যোৎস্নায় যেন রূপালি মায়া হয়ে আছে। দৃষ্টিসীমার মধ্যে জনমানব জীবজন্তুর চিহ্ন নেই। নিথর নিস্তব্ধ। প্রাণের স্পন্দন নেই কোথাও।

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শান্তনু।

কি দেখছেন, শান্তনু বাবু? বললে শংকরীপ্রসাদ। আঃ, লোকটার কি ঘুম নেই, শান্তনু মনে মনে বিরক্ত হয়। আবার ভয়ও হয়। কি জানি, কি রকম জানোয়ার ঐ ইয়েতিগুলো? অন্য তাঁবুতে আছে কিশোর, লালী, ওরাও হয়তো ভয় পেয়ে আঁৎকে আছে এতক্ষণ। কিম্বা আছে ঘুমে অচেতন হয়ে। ওখানে কুলিরা আছে, তিয়েলিং আছে, ভয়ের কারণ থাকতে পারে কি? কে জানে!

এমন সময় দুড়দাড় করে একটা শব্দ হলো। শান্তনু দেখে, কি একটা ছুটছে যেন। ও কি! ওর কি চার পা নাকি!

ইয়েতিরা কি চতুষ্পদ নাকি, শংকরীবাবু?

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

শ্রীশৈল চক্রবর্তী

ছি, ছি, অত বড় বদনাম করো না ওদের। তাহলে ওরা স্নো-ম্যান হবে কি ক'রে, বরং স্নো-অ্যানিম্যাল হতো।

তাও ত বটে। কিন্তু—

একটু পরেই হো-হো করে হেসে উঠলো শংকরীপ্রসাদ।

ঐ শোনো শান্তনু, চিঁহি শব্দে ডেকে উঠলো কে। নিশ্চয়ই তোমার ঐ বাহন ঘোড়াটা। এতক্ষণে শান্তনু বুঝতে পারলো দুড়দাড় করে ছুটেছিলো কে। কিন্তু, ঘোড়াটা নিশ্চয়ই দড়ি ছিঁড়েছে, এবং দড়ি ছিঁড়লোই বা কেন? নিশ্চয়ই ভয় পেয়েছে। কিন্তু, ভয় পেল কেন? আবার সেই প্রশ্ন। আসল প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে। শংকরীপ্রসাদ যা রসিকতা করছে, ওর ত ভয়ের লেশ নেই দেখছি। তাহলে ঐ স্নো-ম্যানের গল্প স্রেফ গাঁজাখুরি। যাই হোক, একটু শোওয়া যাক, রাত আর বেশি নেই।

পরদিন সকালে শান্তনু শুনলো, সত্যিই একটি টাট্টু ঘোড়া পলাতক। শেরপাদের একজন বললে, রাত্রে কোনো বন্য জন্তু হানা দিয়েছিলো তাদের তাঁবুর কাছে।

কিশোর বললে, সবুর, আমি সার্চ করে বলে দিচ্ছি। বাঘ কি ভালুক কি নেকড়ে, এ আমি বলে দিতে পারবো।

তিয়েলিং গম্ভীর ভাবে ছিল, এইবার হেসে ফেললো। কিছুক্ষণ সবাই খুঁজতে লাগলো। কোথাও কোনো চিহ্ন মিললো না। হঠাৎ লালী চেঁচিয়ে উঠলো।

দেখ, দেখ, দেখ, বিরাট একখানা পায়ের ছাপ!

সব মাথাগুলোই নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়লো সেইখানে। সত্যিই একটা মানুষের মত পায়ের ছাপ, কিন্তু মস্ত বড়। অত বড় পা ওদের দলের কারুর নেই—ওদের দল কেন, কোনো মানুষেরই হতে পারে না।

এ সেই মানুষের পদচিহ্ন, যার সম্বন্ধে তোমরা কেউ কিছু জানো না, বললে তিয়েলিং।

সবাই তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে।

তিয়েলিং বললে, এই হচ্ছে সেই হিংস্র ই-য়ে-তি।

ইয়েতি হোক আর যাই হোক, আপাততঃ সমস্যা হলো টাট্টু ঘোড়াটির খোঁজ করা। জীবিত থাকলে তাকে ফিরিয়ে আনা। কেন না ঘোড়া না হলে ওরা একেবারেই খোঁড়া। চলা বন্ধ হয়ে যাবে।

শেরপারা এদিক সেদিক চার দিক খোঁজ-তল্লাস করতে বেরিয়ে পড়লো।

শংকরীপ্রসাদ বেশ সুস্থ। ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, চা-পান করছে। তিয়েলিং সকলের সঙ্গে আলাপ করছে। দূরের পাহাড়-গুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। ওখান থেকে মাকালু পাহাড়ের শীর্ষদেশ দেখা যায়। তার উত্তর-পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে এভারেষ্টের চূড়া।

শংকরীপ্রসাদের এই রকম আলোচনায় খুব উৎসাহ দেখা গেল না। চূড়ার খবর জেনে লাভ নেই লামাজী, সে বললে। পথের খবর কিছু বলুন, যে পথে গেলে স্বর্ণখনির সন্ধান পাওয়া যাবে।

সে খবর আমার জানা নেই, বললে তিয়েলিং। সোনার খোঁজে যারা আসে তারাই সে খবর রাখে। সোনার লোভকে ত্যাগ করেই আমি সন্ন্যাসী হয়েছি। বৌদ্ধধর্মে বলে, অর্থলোভ মহাপাপ। ধর্ম আমাদের কাছে অনেক বেশি মূল্যবান।

সে ত আমি বুঝি, লামাজী, বললে শংকরীপ্রসাদ। ছি ছি, আপনি এ পথে আসবেন কেন? আমাদের উপকারের জন্তেও ত কিছু করতে পারেন। ওঃ, আমি যদি সেই সন্ধান পাই—তাহলে দেখবেন কতো ভালো ভালো কাজ করিয়ে দেবো। কতো মন্দির বানাবো, কতো ধর্মশালা বানাবো। তাতে তামাম লোকের উপগার হোবে। এটাও তো ধর্ম আছে।

ঠিক এই সময় খবর পাওয়া গেল টাট্টু ঘোড়াটি পাওয়া গেছে। তিন মাইল দূরে একটা ঝোপের ধারে দাঁড়িয়েছিল সে। সবাই নিশ্চিন্ত হলো এই সুসংবাদে।

আবার যাত্রা করার তোড়জোড় চলতে লাগলো। তিয়েলিং ম্যাপটি দেখিয়ে শান্তনুকে বোঝালো কোন দিকে দিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যতে আরো দুর্গম পথের ইঙ্গিত দিতেও ভুললো না সে। শংকরীপ্রসাদ কাছে আসতেই শান্তনু ম্যাপটা মুড়ে রেখে দিল তার ব্যাগে।

সারাদিন আবার চড়াই ভাঙতে হচ্ছে। সবার নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে ফোঁস-ফোঁস করে। সবাই হাঁফাচ্ছে। ছোট টাট্টুগুলো কী পরিশ্রমী! আর কী কষ্ট সহ্য করতে পারে! ভাবলে অবাক হতে হয়।

সন্ধ্যার আগে আবার ছাউনি পড়লো। কাছাকাছি কটা তাঁবু খাটানো হলো। শংকরীপ্রসাদও ওদের সঙ্গী। লোকটাকে যেন কেমন মনে হয়। তবু সঙ্গী ত বটে। এই নিবান্ধব দেশে এক জন সঙ্গী পেলেও কম লাভ নয়।

গম ভেঙে আটা করা হলো! তার চাপাটি, ডাল আর চাটনি। শুধো হিন্দুস্থানীদের খাদ্য, কিন্তু এত সুস্বাদু খাবার বাঙালী ছেলে-মেয়েগুলি যেন জীবনে আর খায়নি কখনো।

সকালে শান্তনু ছুটলো তিয়েলিং-এর কাছে! ম্যাপটা খুঁজে পাচ্ছি না লামাজী, ব্যস্ত হয়ে বললে সে।

সে কি? তোমার কাছেই ত ছিল। তিয়েলিংও অবাক হয়ে যায়।

নিশ্চয়ই শংকরীপ্রসাদের কাজ, শক্ত গলায় বলে শান্তনু।

তিয়েলিং শুধু বললেন, হুঁ।

বেলা যাচ্ছে, তখনও আলো আছে, আলোর এক অদ্ভুত আভা। সমতলভূমিতে সে আলো দেখা যায় না। ওদের ছাউনির থেকে দু'শ' গজ দূরে ঘন সবুজ ঝোপ। কাছে গেলে দেখা যায় ফলের গাছ। ঘেঁষাঘেঁষি অনেক গাছ, যেন জঙ্গল। গাছে ফলে আছে কমলা লেবু আর আপপাতি। আগে কচি ফল হয়, তারপর রঙ ধরে, তারপর পাকে। খুব পাকা হলে, ঝরে পড়ে। খাবার লোক নেই, খাবার পশুপক্ষীও নেই মনে হয়।

গাছের ডাল নাড়া দিয়ে ফল পাড়ছে লালা। কিশোর একটা লেবু চেখে দেখছে।

অদ্ভুত মিষ্টি রে লালী!

পাড়তে আরো ভাল লাগছে আমার। কী মজা! বললে লালী। কলকাতায় গিয়ে যদি আমরা এ কমলা লেবু পাড়ার গল্প করি, তুমি কি মনে কর কেউ বিশ্বাস করবে?

রামো, কেউ না। শহরের যাকু না লোক সব আলাদা জাতের। অবশ্য আমি এখানে না এলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু অতগুলো লেবু নিয়ে যাবি কি করে? চল, আর দেরি করা উচিত

কে আসছে না?

ও শংকরীপ্রসাদ, লোকটা যেন গোরিলার মতো হাঁটছে।

বনের কাছে তাই ওকে মানিয়েছে বেশ, হি হি হি—

কিশোর বাবু, একটা কথা আছে, বললে শংকরীপ্রসাদ। কিশোর এগিয়ে গেল কাছে।

মোটা সোয়েটারের নিচে থেকে একটা ম্যাপ বার করে বললে, এ ম্যাপটা তুমি নিশ্চয় দেখেছ?

হ্যাঁ, এ তো আমাদের সেই নক্সাটা, শান্তনুর কাছে ছিল।

হ্যাঁ, সত্যি তাই। দৃঢ়কণ্ঠে বললে শংকরীপ্রসাদ। আমি যেটা জিগ্যেস করছি সেইটেই বলবে। এটা কোথাকার নক্সা? এতে বাঙলায় যে নাম গুলো লেখা আছে, সেগুলো তোমায় পড়ে পড়ে বলে দিতে হবে।

এক মুহূর্তে কিশোরের সমস্ত রক্ত গরম হয়ে উঠলো। আমি একটা কথাও বলবো না, সে বলে উঠলো। তুমি চুরি করেছো এটা!

চুরি করেছি কিনা সে কথা থাক। আমার দরকার মিটে গেলে আমি ফিরিয়ে দেবো এটা। সময় বেশি নেই, কি লেখা আছে এর মধ্যে, পড়ে বলে দাও।

কখখনো না! বিশ্বাসঘাতক চোর!

শংকরীপ্রসাদের বাঁ হাতটা ধীরে ধীরে কিশোরের কাঁধে উঠলো তারপর সাঁড়াশীর মত চেপে ধরলো তার ঘাড়।

বলতেই হবে তোমায়। নইলে শংকরীপ্রসাদের হাত থেকে নিস্তার পাবে না, কিশোর!

কিশোর এতক্ষণ প্রস্তুত ছিল না। এইবার বুঝতে পারলো। সে চীৎকার করে উঠলো, লালী, লালী! আর সেই সঙ্গে এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল। কিন্তু শংকরীপ্রসাদের ডান হাতটা ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে ধরে ফেললো কিশোরের সার্টের কলার।

এ ম্যাপটা তুমি নিশ্চয় দেখেছো?

ভয়চকিত লালী ইতিমধ্যে চীৎকার শুরু করে দিয়েছে। আর হাতের লেবু জ্যাশপাতি ছুঁড়ে মারছে ঐ যমদূতের মত শংকরীপ্রসাদকে।

কিশোর একটা বক্সিংএর কায়দায় ঘুষি ছুঁড়লো বটে, কিন্তু তাতে তার হাতই জখম হলো। পরমুহূর্তে সে কানের কাছে একটা বজ্রপাত অনুভব করলো এবং পড়ে গেল মাটিতে।

লালীর আর্ত চীৎকারে সবার আগে ছুটে এলো শান্তনু। তার পেছনে শেরপা দুজন। শান্তনুর হাতে ছিল পিস্তল। তারা যখন ঘটনাস্থলে এসেছে, তখন আততায়ী অন্তর্হিত। ঐ অজানা পর্বতরাজ্যের কোন অন্তরালে সে সরে পড়েছে। জ্ঞানশূন্য কিশোরকে ছাউনির মধ্যে আনা হলো।

সেবাশুশ্রূষার পর যখন তার জ্ঞান ফিরলো, তখন রাত্রি আটটা হবে। সে বললে সব কথা। শংকরীপ্রসাদ যা যা বলেছিল সবই। শান্তনু দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলো, ব্যাটা শয়তানকে যদি একবার পেতুম, তার পাঁজরা ভেঙে দিতুম একটা গুলীতে!

উত্তেজিত হয়ো না শান্তনু, বললে তিয়েলিং। লালীর চোখে জল। তাকেও শান্ত করলো তিয়েলিং। বিপদের সম্ভাবনা যা ছিল এখন তা আরো ঘনীভূত হলো, বললে তিয়েলিং। আরো হুঁসিয়ার হতে হবে এখন থেকে।

সেদিন রাত্রে দেখা গেল শংকরীপ্রসাদের জিনিসপত্র আগে থেকেই সে সরিয়ে ফেলেছিল। বোঝা গেল, আগে থেকে প্রস্তুত হয়েছিল সে। আরো বোঝা গেল, যে ম্যাপখানার সাহায্যে সে ঐ পথেই এগিয়ে যাবে। সুতরাং এখন থেকে শুধু প্রকৃতির বাধা নয়, মানুষের শত্রুতার সঙ্গেও লড়তে হবে তাদের।

গভীর রাত্রে তিয়েলিং ডাক দিল শান্তনুকে। ঘুমে অচৈতন্য শান্তনু এক লাফে উঠে পড়লো। তাঁবুর ছিদ্রপথ দিয়ে বাইরে উঁকি মারলো সে। চাঁদ অস্ত গেছে, ফিকে অন্ধকার। সামনের দৃশ্যপট ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে।

দেখতে পাচ্ছ কিছু? তিয়েলিং-এর প্রশ্ন।

কই না, কিছু না তো?

ঐ তুষাররাজ্যের দিকে তাকাও, একটা সাদা আভা রয়েছে যেখানে—

হাঁ হাঁ, দেখছি।

ভাল ক'রে দেখ, ক'টা মূর্তি নড়াচড়া করছে।

হাঁ হাঁ, দেখেছি। কে, কে ওরা?

ওরা এখানকার জীব। ওরাই কাল তোমাদের তাঁবুতে হানা দিয়েছিল মনে পড়ে? বললে তিয়েলিং।

তার মানে? ঐ ইয়েতি স্নোম্যান? কিশোর, লালী—দেখবে এসো—সেই গল্পে শোনা অপূর্ব জীব!

তুষাররাজ্য থেকে নেমে আসে ওরা, তিয়েলিং বলতে থাকে। কেন নেমে আসে তা কেউ জানে না। তবে, মনে হয়, খাদ্যের খোঁজে। তুষাররাজ্যে উদ্ভিদ জীব জন্তু নেই, তাই মাটি পাথরের দেশ থেকে ওরা আহার্য্য সংগ্রহ করতে আসে।

এর মধ্যে দেখা গেল ওদের চেহারাগুলো অনেক বড় দেখাচ্ছে। অর্থাৎ অনেক কাছে এসেছে। ওদের সর্বাঙ্গ একটা লোমশ আবরণে ঢাকা। দু'পা দিয়ে চলছে অনেকটা ভাল্লুকের মত। থপ থপ করে চলছে। কিন্তু দেখে বেশ বোঝা যায় যে ওদের গায়ে অসাধারণ শক্তি। ঐ তো দুটোতে ঝটাপটি লেগে গেল। শান্তনু কিশোর একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

ওদের মধ্যে মাঝে মাঝে খুব মারামারি হয়, বললে তিয়েলিং। কোনো খাবার নিয়ে হয়তো কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে শেষে মারামারি। ওদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে।

বলুন না একটা, কিশোর অনুরোধ করলে।

এখন না। ঐ দেখ ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। ওরাও সরে পড়ছে দেখ কোনো নিভৃত গুহার সন্ধানে। আমাদেরও উঠে তৈরী হবার সময় হোল।

[ক্রমশঃ।

## সত্যিকারের রাজকুমারী

এক রাজকুমার সত্যিকারের এক রাজকুমারীকে বিয়ে ক'রতে চেয়েছিল। সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াল একটি রাজকুমারীর আশায় কিন্তু মনের জগতের রাজকুমারীর সঙ্গে বাস্তব-জগতের রাজকুমারীর কোন মিল খুঁজে পেলো না। অনেক রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা হ'ল কিন্তু মনস্থির ক'রতে পারলো না যে তারা সত্যিকারের রাজকুমারী কি না। আশাহত রাজকুমার রাজপ্রাসাদে ফিরে এল।

তারপর···একদিন বিকেল বেলায় ঝড় আরম্ভ হ'ল। বিদ্যুৎ ঘন ঘন চম্‌কাল, বাজ পড়ল। বৃষ্টি পৃথিবীতে নেমে এল। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরে গেল। ঠিক এই সময় দরজায় শব্দ শুনতে পাওয়া গেল এবং রাজা, রাজকুমারের বাবা দরজা খুলে দিলেন।

এক রাজকুমারী বাইরে দাঁড়িয়েছিল। বৃষ্টির জন্ত আর বাতাসের জন্ত তার দুর্দশার সীমা ছিল না। জল টপ টপ করে চুল থেকে পড়ছিল, কাপড় শরীরের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছিল। সে ব'লল যে সেই সত্যিকারের রাজকুমারী।

রাজার মা ভাবলেন যে, মেয়েটি সত্যিকারের রাজকুমারী কি না তা পরীক্ষা ক'রে দেখবেন। তিনি কি ক'রবেন, কাউকে কিছু বললেন না, চুপি চুপি শোবার ঘরে গেলেন। বিছানা থেকে গদি নামালেন। আর তিনটি মটরশুটি খাটের উপর রাখলেন। তারপর তিনটি মটরশুটির উপর কুড়িটি গদি একে একে পাতলেন। তার উপর কুড়িটি পালকের বিছানা রাখলেন। এই বিছানাতেই রাজকুমারী রাত কাটাল।

পরের দিন সকালে, রাত কি ভাবে কাটিয়েছে, এই প্রশ্ন রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করা হ'ল। রাজকুমারী উত্তর দিল, রাতে বলতে গেলে চোখ বন্ধ করতে পারিনি। জানি না আমার বিছানাতে কি ছিল। মনে হয় আমার শোবার জায়গার নীচে কোন শক্ত জিনিস ছিল। সারা রাত খুব কষ্ট পেয়েছি।

এই ঘটনাতেই বোঝা গেল যে এই রাজকুমারী সত্যিকারের রাজকুমারী। রাজকুমার আশ্বস্ত হ'ল এবং রাজকুমারীকে বিয়ে ক'রল।

অনুবাদ—বকুল ঘোষ

সেদিন আদালতে বিচার হচ্ছিল। যুক্তপ্রদেশের আদালত। ইংরেজ বিচারপতি। আসামীপক্ষের ব্যারিষ্টার একজন ভারতীয়। ব্যারিষ্টারটি সওয়াল করছিলেন ইংরেজীতে। তাঁর বিশুদ্ধ, শ্রুতিমধুর অনর্গল ইংরেজী বক্তৃতা শুনে শ্বেতাঙ্গ বিচারকটি বিস্ময়ে হতবাক হলেন। শুধু হতবাকই হলেন না, রীতিমত ঈর্ষান্বিত হলেন। একজন কালা আদমীর এত স্পর্দ্ধা, এত বড় দুঃসাহস যে ইংরেজের ভাষা এমন বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করে! এটা তার কাছে মনে হল মস্ত বড় অপরাধ, অনধিকার চর্চ্চা। কিন্তু কি করে জব্দ করা যায় এই ব্যারিষ্টারকে!

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বিচারক ব্যারিষ্টারকে বললেন: আপনি কি জানেন না যে আদালতের ব্যবহার্য ভাষা পারসী?

ব্যারিষ্টার সরল ভাবে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ স্যার, জানি।

বিচারক বললেন: তাহলে পারসীতেই সওয়াল করুন, ইংরেজীতে নয়।

শ্বেতাঙ্গ বিচারক মনে মনে খুব খুসী। ব্যারিষ্টারকে এইবার ঘায়েল করা যাবে। বিচারকের ধারণা ছিল, হিন্দু ব্যারিষ্টার, নিশ্চয়ই যাবনিক ভাষা পারসীতে তার দখল নেই। কাজেই অসুবিধায় পড়ে খুব জব্দ হবে।

বিচারকের আদেশের উত্তরে ব্যারিষ্টার সাহেব একটু মিষ্টি হেসে বললেন: তাই হবে, আপনার আদেশই আমি পালন করবো, পারসী ভাষাতেই করবো মোকদ্দমার সওয়াল।

ব্যারিষ্টার পারসী ভাষায় অনর্গল বক্তৃত সুরু করলেন কিন্তু শ্বেতাঙ্গ বিচারকের বুদ্ধিতে আর কুলোয় না। তিনি ধরতে পারছেন না ব্যারিষ্টারের বক্তব্য। কেবল বেগ ইওর পার্ডন, বেগ ইওর পার্ডন করছেন। ইংরেজীর চেয়েও পারসী ভাষায় ব্যারিষ্টারের অধিকার আরো বেশী।

চতুর ব্যারিষ্টার বিচারকের অবস্থা দেখে মৃদু হেসে আবার ধীরে ধীরে সওয়াল করলেন।

জনপরিপূর্ণ আদালত-গৃহ উপভোগ করলো একটি নাটকীয় দৃশ্য। নিদারুণ পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে অধোবদন হয়ে রইলো ক্ষমতাদৃপ্ত ইংরেজ বিচারপতি।

এই তরুণ ব্যারিষ্টার মতিলাল নেহেরুই একদিন ভবিষ্যৎ জীবনে শৃংখলিতা ভারতমাতার মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক, স্বদেশী আন্দোলনের মহাত্যাগী কর্ণধার।

## যা কিছু দুর্লভ

### অশোক মুখোপাধ্যায়

কাল পার্থিব সকল কিছুকেই জীর্ণ করে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য করে অপহরণ। আবার একথাও সত্য, অনেক মূল্যহীন বা স্বল্পমূল্য বস্তুকে সে-ই করে তোলে মহার্ঘ। তাই দেখি, পাঁচ সহস্র বছর আগেকার সামান্য পাদুকা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণাগারে অমূল্য সম্পদ বলে স্বীকৃত। প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত পানপাত্র নিয়ে কাড়াকাড়ির অন্ত থাকে না। যে তলোয়ার কোন অতীত রাজপ্রাসাদের একান্তে ধূলিমলিন হয়ে থাকত, তাকেই আত্মস্থ করার জন্য কতকগুলো বিশেষ মহলে সুরু হয়ে যায় মহা উত্তেজনা। জীবদ্দশায় পেয়েছিলেন মাত্র দু' পাউণ্ড। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পর ঐ কবিতারই পাণ্ডুলিপির মূল্যমান নির্দ্ধারিত হয়েছিল সহস্র সহস্র পাউণ্ড। এমনি আরও অজস্র বস্তুর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যারা সামান্য হয়েও কালের স্পর্শে অসামান্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য, কালের সঙ্গে দুষ্প্রাপ্যতার সংযোগে এমন হয়ে থাকে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত হয়ে পুরোনো জিনিসের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে। অনেক সময় এসব বস্তু অতীতকে জানবার পথ করে উন্মোচিত। কিন্তু এই মূল্যবোধ কেবল গবেষকের প্রসঙ্গেই প্রযোজ্য। বহু অর্থবান ব্যক্তি নিছক সখ হিসেবেই দুষ্প্রাপ্য বস্তু সংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে বস্তুটির প্রাচীনত্ব এবং দুর্লভতাই এর মূল্য নিরূপণের মাপকাঠি। কোন কোন ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যও। সামান্য একটা ডাকটিকিট, প্রাচীন মুদ্রা অথবা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির ব্যবহৃত সামগ্রী যখন প্রকাশ্য বাজারে লক্ষ লক্ষ মুদ্রায় বিক্রীত হয়, তখন প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলন অপেক্ষা নিছক মনোবিলাস বা 'হবি'র তাগিদই কাজ করে বেশি।

দুর্লভ বস্তু সংগ্রহের বাতিক আধুনিক কালেই সমধিক প্রসার লাভ করেছে। তবে অতীত কালেও একেবারে অপরিচিত ছিল না। সেকালের অনেক রাজা-মহারাজাই একটি সংগ্রহশালা রাখতে ভালবাসতেন। পাশ্চাত্য দেশে গীর্জ্জার অভ্যন্তরে এমনি সংগ্রহশালা থাকত এবং দেশ-বিদেশ থেকে দুষ্প্রাপ্য বস্তু আহরিত হয়ে এখানে সঞ্চিত হত। সঞ্চিত বস্তুগুলি অনেক সময় দেবমহিমায়ও অভিষিক্ত হত— এ নজির আমাদের অজানা নয়। প্রত্যেক 'হবি'র মত পুরনো জিনিসের সংগ্রহও একটি অভিধা প্রাপ্ত হয়েছে। তা হল 'কিউরিও' ( Curio )। অবশ্য কিউরিও বলতে শুধু পুরানো জিনিসই বোঝায় না, বোঝায় যে কোন দুর্লভ সংগ্রহ।

অতীত কালে দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর দেহ বা দেহাংশই শুধু কিউরিও বলে গণ্য হত। এগুলো পচন থেকে রক্ষা করা হত 'স্পিরিট অফ ওয়াইন', 'সল্ট-ব্রাইন' এবং মধুতে নিমজ্জিত করে অথবা ওপরে মোমের আবরণ দিয়ে। এ ছাড়া দুষ্প্রাপ্য বা অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট উদ্ভিদ এবং উল্কাখণ্ডকেও সেকালের সংগ্রহশালায় স্থান দেওয়া হত।

খৃষ্টজন্ম-পূর্ব্বকালের কয়েকটি বিচিত্র সংগ্রহের কথা প্লিনি, অ্যাপোলিনিয়াস প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায়। 'হ্যানো' দূরদেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করে কার্থেজে ফিরে আসেন সঙ্গে দু'টি মনুষ্যচর্ম্ম নিয়ে। চর্ম্ম দু'টি নাকি ছিল গরগ্যাডিস দ্বীপের 'লোমযুক্ত স্ত্রীলোকে'র দেহের। 'হ্যানো' এদের 'জুনো'র মন্দিরে স্মারক হিসেবে দান করেন। কার্থেজ ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত বস্তু দু'টি ঐ মন্দিরে অক্ষত অবস্থায় ছিল। রোমের কোন দেবমন্দিরে সিনামোন গাছের এক বিরাট শিকড়খণ্ড প্লিনির সময় পর্য্যন্ত রক্ষিত ছিল। শিকড়টি রাখা হয়েছিল স্বর্ণনির্মিত পাত্রে। নীলনদীর উৎসসন্ধানে বেরিয়ে গ্রীসিয়গণ একটি প্রকাণ্ড কুমীর শিকার করে। তারা ঐটিকে সিজারিয়া সহরের 'আইসিস'-এর মন্দিরে এনে উপহার দেয়। মেলিটা দ্বীপের 'জুনো'র মন্দিরে এক জোড়া হাতীর দাঁত রাখা হয়েছিল। কোন বিদেশী সৈন্যদল সেগুলো লুণ্ঠন করে

পসিনিয়াসের কালে গ্রীসের এক মন্দিরে একটি ক্যালিডোনিয়ান শূকরের মস্তক প্রদর্শিত হয়েছিল। সম্রাট অগষ্টাস এর বিশাল দন্তদ্বয় রোমে নিয়ে আসেন। সেখানকার কোন মন্দিরে ঐ দু'টি ঝুলিয়ে রাখা হয়। অ্যাপোলোনিয়াসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষে তিনি এমন কতগুলো সুপুরি ( অথবা বাদাম ) দেখেছিলেন, যেগুলো গ্রীসের মন্দিরে দুর্লভ বস্তু হিসেবে সংরক্ষণ করা হত। হিপোসেন্টার নামে একটি ভীষণ-দর্শন জন্তু আরব দেশে ধৃত হয়ে রোমের পথে মিশরে নীত হয়। সেখানে এটি মারা যাবার পর তার দেহ সল্ট-ব্রাইনে নিমজ্জিত করে অবিকৃত অবস্থায় রোম-সম্রাটের কাছে প্রেরিত হয়। রোমসম্রাট তাকে নিজ সংগ্রহশালায় স্থান দেন।

মধ্যযুগে দুর্লভ বস্তু সংগ্রহের হবি আরও জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। তখন কেবল দুষ্প্রাপ্য প্রাণিদেহই নয়, যে কোন ধরণের দুষ্প্রাপ্য পদার্থ সংগ্রহের রেওয়াজ দেখা দেয়। শিল্পবাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহকর্ম্ম পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হয়ে ওঠে। রাজদরবার, সাধারণ পাঠাগার, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগৃহ—এসব ছাড়া ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত ভাবেও সংগ্রহশালা গড়ে উঠতে থাকে।

সংগৃহীত বস্তুর তালিকা প্রণয়নের প্রাথমিক প্রয়াসের কৃতিত্ব স্যামুয়েল কুইকেলবার্গ নামে এক চিকিৎসকের। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহশালার একটি তালিকা প্রকাশ করেন ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে। ঐ বছরই জন কেন্টম্যান প্রণীত একটি তালিকা মুদ্রিত হয়। এতে তিনি দুষ্প্রাপ্য খনিজ, সামুদ্রিক জীবজন্তু প্রভৃতি প্রায় ১৬০০টি সংগ্রহের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর কয়েক জন বিখ্যাত সংগ্রহকারীর নাম বার্ণার্ড প্যালিসি ( ফ্রান্স ), মাইকেল মারকেটি ( ইতালী ), ফার্দিনান্দ ইম্পারেটি ( নিয়াপোল ) ইত্যাদি। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে জেমস্ পেটিভার নামে একজন খ্যাতনামা সংগ্রহকারী ছিলেন। জাহাজের নাবিক এবং ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তিনি দেশ-বিদেশ থেকে দুর্লভ বস্তু সংগ্রহ করতেন এবং এর জন্য যে কোন মূল্য দিতেও অনিচ্ছুক হতেন না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সংগ্রহ ক্রয় করেন হ্যানস স্লোয়েন। একেই ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ইউরোপের বৃহত্তম জাদুঘর বৃটিশ মিউজিয়াম।

# পরগাছা

## সুধাংশু ঘোষ

তোমরা সবাই জান, গাছপালা খাদ্য সংগ্রহ করে প্রধানত: মাটি হতেই। কিন্তু এ-ও ত লক্ষ্য করেছ যে কোন কোন গাছ অন্য গাছের বুকে জন্মায় এবং মাটির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রেখেও বেশ বেঁচে থাকে ও বাড়ে। মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকা গাছটিকে আমরা উদ্ভিদ বলি কিন্তু উদ্ভিদের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা লতা বা গাছটিকে পরগাছা বলি। কোন পরগাছাই কোন উদ্ভিদের সমগোত্রীয় নয়, সম্পূর্ণ অন্য জাতের।

যার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই, এমন কোন ব্যক্তির ঘাড়ে চেপে যদি কেউ খায় পরে, তবে তাকে আমরা পরগাছার সঙ্গে তুলনা করি। এই পরের খেয়ে বেঁচে থাকা মানুষকে কেউ সুনজরে দেখে না এবং যাঁরা পরগাছার বোঝা বহন করেন, বা অবস্থা বিশেষে যাঁদের এই বোঝা বহন করতে হয়, তাঁরা সময় সময় সখেদে বলে থাকেন, পূর্ব্বজন্মের ঋণ শোধ দিচ্ছি।

ভারবাহী ব্যক্তির পরিতাপের পেছনে কোন সত্য আছে কি না, আত্মার পুনর্জন্ম গ্রহণ বিশ্বাস্য কি না, সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। এটি একটি গল্প, ঠাকুমার মুখে শোনা পরগাছার জন্মকাহিনী।

উজ্জয়িনী নগরে দুই বন্ধু থাকত। খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমরা জান, এককালে উজ্জয়িনী মহা পরাক্রমশালী রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। কথিত আছে যে, বিক্রমাদিত্য এত ন্যায়পরায়ণ ছিলেন যে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে একটি এমন সিংহাসন উপহার দিয়েছিলেন, যার উপরে বসে বিচার করে রায় দিলে সেই রায় কখনও অন্যায় হত না। বিক্রমাদিত্য কখনও অন্যায় করেন নি, এমন কি প্রজারাও নাকি অন্যায় পথে চলত না।

বিক্রমাদিত্যের প্রজারা অন্যায় করত না, তবে তাঁর জন্মেরও অনেক আগে অন্যায় আচরণ করলে লোকের কঠোর সাজা হত। সে যুগে প্রতারণা বা শান্তি-ভঙ্গের শাস্তি ছিল মৃত্যু।

দুই বন্ধু সমরসেন ও নিমকরাজের অগাধ পয়সা। দুজনে মিলে মিশে ব্যবসা করে, বাণিজ্য করে। প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে সমরসেন ও নিমকরাজের জাহাজ ভেসে চলে পণ্য নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ কি হল, ওরা ব্যবসা ভাগাভাগি করে ফেললে। সমরসেন আগের মত প্রশান্ত মহাসাগর পারে দেশগুলির সঙ্গেই বাণিজ্য চালিয়ে গেল কিন্তু নিমকরাজের জাহাজ চলল আরব সাগর ছাড়িয়ে অতলান্তিক মহাসাগরের দিকে।

নিমকরাজের নূতন বাণিজ্য কিন্তু ভাল চলল না। পশ্চিমের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিমকরাজ পেরে উঠল না। উপরন্তু অতলান্তিকের ঝড় তুফানে নিমকরাজের জাহাজগুলি অতল জলে তলিয়ে গেল! ধনী ব্যবসায়ী নিমকরাজ হয়ে পড়ল ভিখিরী।

সমরসেনের ব্যবসায় এদিকে আরও ফেঁপে উঠেছে। একদিন সমরসেনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলেও বিপদের দিনে নিমকরাজ সমরসেনকেই আবার স্মরণ করল। সমরসেনের কাছে সাহায্য চাইল, ওকে স্মরণ করিয়ে দিল পূর্ব্ব-বন্ধুত্বের কথা। নিমকরাজের আকুলি বিকুলিতে সমরসেন নিমকরাজকে সাহায্য করতে চাইল বটে, তবে সর্ত্ত হল নিমকরাজকে সমরসেন টাকা দেবে ঋণ হিসাবে; দান করবে না। ঋণ নেওয়া অর্থ কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে।

না মেনে উপায় কি? নিমকরাজ পূর্ব্বতন বন্ধুর কাছে সাহায্য না পেয়ে ঋণ নিতেই রাজী হল। বেশ বড় একটা অঙ্কই ধার করল। ভেবেছিল আবার ব্যবসায় ফাঁপিয়ে তুলবে কিন্তু ডোবা ব্যবসা সহজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় না। উপরন্তু নিমকরাজ মার খেয়েও আবার অতলান্তিকেই পাড়ি দিল। অধিকন্তু সমরসেনের সুদের হার বড় চড়া। নিমকরাজ যা উপার্জ্জন করল, আসল দূরে থাক, সুদ শোধ দিতেই নাস্তানাবুদ।

একদিন রাত্রে সমরসেন নিমকরাজের বাড়ী গিয়ে আসল টাকা চেয়ে বসল। ঋণ শোধ দেবার কোন উপায় নাই, নিমকরাজ সময় চাইলে। কথায় কথায় সমরসেন এত রেগে গেল যে, গলা ফাটিয়ে

চেঁচিয়ে বললে, মনে কর না তুমি আমায় ঠকাতে পারবে। মরেও ঋণ শোধ নেব।

ক্রমে ক্রমে সমরসেন ও নিমকরাজ তর্কে পাড়া মাথায় তুলল। পাড়ার শান্তিভঙ্গ হল। সেই সময় রাজার চর পাশ দিয়ে যেতে যেতে সব শুনল। রাজার কাছে সব জানাল।

পরের দিন সকালে রাজার সেপাই সমরসেন ও নিমকরাজকে রাজার আদেশে দরবারে বেঁধে আনল। রাজা নিমকরাজকে প্রতারণা এবং উভয়কে শান্তিভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করলেন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন। রাজার আদেশে একটি গর্ত্ত খুঁড়ে প্রথমে নিমকরাজ ও তার উপর সমরসেনকে ফেলে গর্ত্তটি আবার বুজিয়ে দেওয়া হল।

অনেক দিন হল নিমকরাজ ও সমরসেনের মৃত্যু হয়েছে কিন্তু উজ্জয়িনীর নাগরিক ওদের কথা ভোলেনি, সমরসেনের মৃত্যুর পরও ঋণ শোধ নেবার শপথও ভোলেনি। সুতরাং যখন সেই গর্ত্তের উপরে অম্লান একটি গাছের বুকে আর একটি গাছ গজিয়ে উঠতে দেখা গেল তখন উজ্জয়িনীর লোক বললে, প্রথমটি অধমর্ণ নিমকরাজ, আর দ্বিতীয়টি উত্তমর্ণ সমরসেন। নিমকরাজ সমরসেনকে নিজের রস শোষণ করতে দিচ্ছে ভালবেসে নয়; সমরসেন নিমকরাজকে শোষণ করছে, নিমকরাজের পাপে; পূর্ব্বজন্মের ঋণ শোধ না দেওয়ার অপরাধে।

## নেতা

### শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

একটা ছোট ছেলে। বয়স তার বারো বছর হবে। এই বয়সেই ছেলেটা নানা বয়সের ছেলেদের নিয়ে একটা দল গড়ে তুলল। দলের কাজ হ'লো সমাজের কাজ করা, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আর্ত্তদের সেবা-শুশ্রূষা করা, আগুন নিবানো, পাঠাগার ও নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালনা করা এবং ছেলেদের মধ্যে শারীরিক ব্যায়াম চর্চা ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা। এই একরত্তি ছেলেটা হ'লো সেই দলের নেতা। দল পরিচালনা করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এই ছেলেটার। ছোট-বড় সব ছেলেই তার কথা শুনত—তার কথা মানত।

একবার ছেলেটার একজন সহপাঠীর হ'লো সাংঘাতিক বসন্ত রোগ। রোগের যাতনায় সহপাঠীটি একেবারে অস্থির। দলের নেতার কানে এ সংবাদ পৌঁছাল। সঙ্গে সঙ্গে তার কর্ত্তব্যের আহ্বান এলো। সে নিজে দলবলসহ ছুটল সেই সহপাঠীর বাড়ী। সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হলো নেতা নিজে ও আরও কয়েক জন কর্ম্মী। সকাল থেকে দুপুর পর্য্যন্ত নেতার নিজের সেবার কাজ পড়ল, পরে একজন কর্ম্মীর, তারপর আর একজনের। নেতা ও কর্ম্মিগণ একমনে সেবা ক'রে চলেছে—রোগীও সুস্থ হচ্ছে। এমন সময়ে নেতার বাবা জানতে পারলেন ছেলের সমাজসেবার কথা। তিনি তো রেগে আগুন! তিনি একজন সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি, সরকারী উকিল, আর তাঁর ছেলে কি না যাচ্ছে একজন সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী বসন্তরোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতে!

তিনি এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কাছে ডেকে রীতিমত তিরস্কার করলেন এবং বললেন, জানো, ঐ রোগ কি রকম সাংঘাতিক! তোমার কোন ভয় নেই? আর অমন কাজ করতে যেও না।

ছেলেটি অতি সহজ ও সরল ভাবে বাবাকে উত্তর দিল, আমি সাবধান হয়ে রোগীর সেবা করি বাবা! আর রোগের ভয়ে যদি রোগীর সেবা না করি, তবে রোগী সারবে কি করে?

ছেলের এ কথায় বাবা মুগ্ধ হলেন এবং এর পর তিনি আর কোন কথাই বলতে পারলেন না। তবে তিনি নিজে একদিন গিয়েছিলেন ছেলের তৈরী দল দেখতে। দলের কাজের সুব্যবস্থা ও সুন্দর পরিচালনা দেখে তিনি ভূয়সী প্রশংসা না করে থাকতে পারলেন না।

এই জনসেবক, নেতাটি আর অন্য কেউ নয়! ইনিই আমাদের স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

বাংলাদেশের চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে নেতাজীর পৈত্রিক বাসভূমি। তিনি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী উড়িষ্যার পূর্ব্বেকার রাজধানী কটক সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জানকীনাথ বসু ও মাতার নাম প্রভাবতী বসু।

## চার জনের ছড়া

### শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

ছোট্ট মেয়ে ডলি, না পেয়ে হায় জেলি
ধরলে জেদের কান্না, থামতে যে আর চায় না।
আট বছরের বিশু, হলেই বা সে শিশু
দুষ্টুমিতে তার, নাগাল পাওয়া ভার।
ফুটফুটে মেয়ে মিনি, সে বার গিয়ে সিনি
আনলো কুকুর টাইগার, নতুন সঙ্গী তাহার।
মিনির বোন লুসি, টফি, লজেন্স পেলেই সে খুব খুশী
খুশীতে হাসি তার, ধরে না কো আর।
ডলি, লুসি, বিশু, মিনি সবাইকে আমি চিনি,
গল্প শুনতে তারা, হয় না কাছছাড়া।

## বিজ্ঞান পরিকল্পনা—প্রথম ধাপ

বর্তমান যুগটি পুরোপুরি বিজ্ঞানের যুগ। মানুষের পক্ষে এ যুগে বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে চলা সম্ভব নয়। সেজন্য জীবনের সূচনাতেই বিজ্ঞান-চর্চা আরম্ভ হওয়া চাই—ছাত্রাবস্থা থেকেই বিজ্ঞান-ভিত্তিক বা বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা চাই বিচিত্র ধরণের।

জীবনের প্রথম ধাপে অর্থাৎ ছাত্রাবস্থায় কি ভাবে বিজ্ঞানের নতুন নতুন পরিকল্পনা করা যেতে পারে আর বাস্তবক্ষেত্রে সেগুলোর সুষ্ঠ রূপ দেওয়া যায়, সেইটি বিশেষ ভাবে চিন্তা-আলোচনার ব্যাপার। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা কয়েকটি সূত্র নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া সহজতর হয়। তাঁদের প্রধান দাবীই হচ্ছে—বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা সমূহের সফল রূপায়ণের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার্থীকে পেশাদার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে রাখতে হবে নিবিড় যোগাযোগ। তাঁদের সূক্ষ্ম কর্ম্ম-পদ্ধতি ও কলা-কৌশল সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকিবহাল থাকতে পারলে অনেক ভাবনা কমে যায়।

এই জটিল দিকটিতে (বিজ্ঞান পরিকল্পনা) সাফল্য অর্জ্জনের জন্য বিশেষজ্ঞ নির্দ্ধারিত কার্য্যক্রমগুলো একে একে বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। প্রথম দফা সূত্র বা কার্য্যক্রম—বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশুনো চাই অফুরন্ত। কোন একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়ে সমস্যাবহুল মনে হলেই অমনি ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত নয়। দেখতে হবে খুঁজে পেতে—কোথায় এর প্রকৃত সমাধান, কোথায় নিহিত আছে এর সফলতার চাবিকাঠি। সেজন্যেই ব্যাপক পড়াশুনোর দাবীটি উঠছে—বিদ্যালয়ের পাঠাগার, সাধারণ পাঠাগার, এমন কি প্রয়োজন হলে বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারে যেয়েও পরিকল্পিত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট পুঁথি-পুস্তক ও নিবন্ধাদি পর্য্যালোচনা না করলে নয়।

দ্বিতীয় সূত্র বা কার্যক্রম যা নির্দ্ধারিত হয়েছে—শিক্ষার্থীর মনে বিজ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বসময় প্রশ্ন ওঠা চাই, প্রশ্নের উত্তর বা মীমাংসার জন্য চাই ব্যাকুলতা। পেশাদার বিজ্ঞানীর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগের উপর সেকারণেই জোর দেওয়া হয়েছে এতখানি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হাতে কলমে যাঁরা কাজ করে জয়শ্রীমণ্ডিত হয়েছেন, তাঁদের জ্ঞান থেকে শিক্ষার্থীর বহুল উপকার না হয়ে পারে না। কোন বিজ্ঞান পরিকল্পনার রূপদানে অমনি একজন [illegible] কেটে যাবে হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অথচ বিজ্ঞানী বা কর্ম্মকুশলীর অভিজ্ঞতার যুগান পেলে সেটি সম্পন্ন হতে পারে আশাতীত কম সময়ে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা সহজভাবেই বলতে পারা যায়। পেশাদার বিজ্ঞানী ও কারিগর যাঁরা, শিষ্টাচারের সাধারণ নিয়মগুলোর অভাব নেই, এরূপ বুঝলে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে তাঁরা সাধারণতঃ খুশিই হয়ে থাকেন। তবে কোন কিছু জিজ্ঞাসা বা জানতে চাইবার আগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্য্যাপ্ত পড়াশুনো থাকা দরকার নিজেরই। অর্থাৎ যে-প্রশ্নটি তুলে ধরা হবে সামনে, সেটির ভেতর যেন বুদ্ধির ছাপ থাকে—প্রশ্নটি নেহাৎ অবাস্তব বা আজগুবি পর্য্যায় না পড়ে যায়, সেদিকে হুঁসিয়ার থাকা চাই।

তৃতীয় কার্য্যক্রম বা সূত্র—যে পরিকল্পনাটি হাতে নিতে হবে, সেটি চূড়ান্ত প্রণয়নের আগে ভাবতে হবে প্রচুর। সব দিক বিচার করে যে পরিকল্পনা হল, তাতে অর্থাৎ নিখুঁত পরিকল্পনায় প্রভূত সময় ও অর্থ বাঁচিয়ে দেন বিজ্ঞানীরা। সেজন্য পরিকল্পনা প্রণয়নকালেই বিশেষ যত্ন ও চিন্তা-আলোচনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীকে বিবেচনাধীন পরিকল্পনার রূপায়ণে কি কি সঙ্কট বা অসুবিধা দেখা দিতে পারে, যতদূর সম্ভব ভেবে নিতে হবে সে সব আগে ভাগেই।

বিশেষজ্ঞরা বিজ্ঞান পরিকল্পনা প্রসঙ্গে এসকল মূল্যবান সূত্র যেমন নির্দ্ধারণ করেছেন, তেমনি কয়েকটি মানা দিয়েছেন শিক্ষার্থীদের সামনে। তাঁদের নির্দ্ধারণ মতে পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়ে নিজে পুরোপুরি ভাবনা না দিয়েই সবকিছুর জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হতে নেই। এমনও আশা করা ঠিক নয় যে, অপর কেউ—ব্যক্তিই হোক বা সংস্থাই হোক, এগিয়ে এসে নিজের ঈপ্সিত পরিকল্পনাটি করে দিয়ে যাবেন।

আরও একটি বিশেষ মানা—কোন শিক্ষার্থীর পক্ষেই এমন কোন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা হাতে নেওয়া সমীচীন নয়—যার রূপায়ণের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করতেই সময়টা সব কেটে যাবে। নতুন কোন যন্ত্র যদি তৈরী করতে হবে বলে মনে হয়, পরিকল্পনাটি প্রথম ধাপে তাতেই সীমিত করা ভাল। মোট কথা, যেটি দাবী করা হচ্ছে এখানে—যে কাজ বা পরিকল্পনাই হাতে নেওয়া হোল, সেটি সম্পন্ন হওয়া চাই ভালরকম এবং তা নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে।

ভারত এক্ষণে স্বাধীন হলেও একটি কথা স্বীকার্য্য, এ দেশের বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের গবেষণায় আশানুরূপ সুযোগ, পরিকল্পনার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা এখন অবধি হয় নি। সম্প্রতি জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও সুপারিশের জন্য একটি কমিশন নিয়োগে উদ্যোগী হয়েছেন। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়েই নয়, মাধ্যমিক পর্য্যায়েও বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যাদি পর্য্যালোচনা করবেন তাঁরা, তারপর পেশ করবেন উন্নয়নের সুপারিশ সম্বলিত তাঁদের সুচিন্তিত রিপোর্ট। রুশিয়া প্রভৃতি দেশ আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হয়ে গেছে, ভাবলে বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। ভারতকেও ক্রমে এ অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রটিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে না গেলে নয় আর বিজ্ঞান পরিকল্পনার প্রথম ধাপই হতে হবে বিদ্যালয়গুলোতে, এ অনস্বীকার্য্য।

## শিল্প-সংস্থা ও এর অগ্রগতি

বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার যতই অগ্রগতি হবে, শিল্প ও শিল্পসংস্থাগুলির (কোম্পানী) অগ্রগতির পথও হবে তত প্রশস্ত, এ বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু কয়েকটি বিশেষ ধারা বা সূত্র ধরে শিল্পসংস্থার অগ্রগতি হয়ে থাকে, একটু পর্য্যালোচনা করলেই এইটি লক্ষ্য করা যায়।

শিল্প-সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বিশেষতঃ আমেরিকায় একটি ধারণা খুব চলতি—কোম্পানী বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি অর্থাৎ মোট আয় বেড়ে যাওয়াই উন্নতির পরিচায়ক। এতে শিল্প-সংস্থার অভিপ্রেত নিরাপত্তার যেমন নিশ্চয়তা (গ্যারাণ্টি) মিলে থাকে, তেমনি নতুন নতুন পণ্য বা শিল্প উৎপাদনের প্রেরণাও পাওয়া যায় প্রচুর। শিল্প-সংস্থা বা কোম্পানী সম্প্রসারণের ও অগ্রগতির প্রথম ধারা বলা চলে একেই।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা যথার্থ দাবী করা যায়—কোন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর সব কয়টি অংশ সকল সময়ই একই হারে এগিয়ে চলে না। হয়তো দেখা গেলো—একটি সময়ে কয়েকটি শিল্প অন্ত শিল্পসমূহের তুলনায় অনেকটা অগ্রসর, আবার সময়ান্তরে পিছিয়ে-পড়া শিল্পগুলিই হয়তো স্থান করে নিয়েছে প্রথম পর্য্যায়ে। একই শিল্প নিয়ে যে সব কোম্পানী বা সংস্থা কাজ-কারবার করে, তাঁদের মধ্যেও অগ্রগতির এমনি ব্যবধান বা রকমফের পরিদৃষ্ট হয়।

জাতীয় পূর্ণাঙ্গ অর্থ নৈতিক উন্নতির সঙ্গে শিল্পসংস্থাসমূহের অগ্রগতির প্রশ্নটি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, এটি সহজেই অনুমেয়। পুঁজি বা মূলধন বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকের দক্ষতা আশানুরূপ বর্দ্ধিত হলে—আর সেই সঙ্গে পরিচালনা-ব্যবস্থারও যদি হ'ল যথেষ্ট উন্নতি, তা হলে শিল্প ও শিল্প-সংস্থার (কোম্পানী) দ্রুত সম্প্রসারণ একরূপ অবশ্যম্ভাবী। নতুন কোন মূল্যবান সম্পদের সন্ধান পেলে কিংবা বিজ্ঞানের সহায়তায় গবেষণা মারফত নতুন যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম আবিষ্কৃত হলে সমগ্র অর্থ নৈতিক কাঠামোর উপরই এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া না হয়ে পারে না। শিল্পসংস্থার অগ্রগতি বা সম্প্রসারণও এই অনুকূল অবস্থাধীনে তাড়াতাড়ি হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রথমেই বলা হল—কারিগরী (টেকনোলোজিক্যাল) অগ্রগতি বিভিন্ন শিল্পসংস্থা বা কোম্পানীর অগ্রগতির বহুল সহায়ক। কিন্তু তা হলেও আশানুরূপ সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের জন্য চাই শিল্পে শান্তি সংরক্ষণ আর পরিচালনা-ব্যাপারে একান্ত মনোযোগী দৃষ্টি। প্রতিষ্ঠানের অর্জ্জিত সুনাম ('গুড-উইল') যাতে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ না হতে পারে, সে দিকেও পরিচালকদের কড়া নজর না রাখলে নয়। কোন একটি শিল্প কারখানা করেই দেখতে হবে কি ভাবে ধাপে ধাপে একে বাড়ান যায়, সংশ্লিষ্ট আর কি কি শিল্পোৎপাদন এইটি কেন্দ্র করেই সম্ভবপর। এর জন্য নিশ্চয়ই বাস্তব-ভিত্তিক যথেষ্ট চিন্তা-আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা প্রয়োজন। সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে ব্রতী হলে অন্যত্র যেমন, শিল্পক্ষেত্রেও তেমনি সুফল অনিবার্য্য, বলতে পারা যায়।

শিল্প-সংস্থার (কোম্পানী) আর একটি অগ্রগতির লক্ষণ—বিভিন্ন বাজারে শিল্প বা উৎপাদিত পণ্যের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা। একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ আকারে কোন শিল্পের চাহিদা অতিমাত্র বৃদ্ধি পেয়ে যাওয়া বিচিত্র নয় আর সে সময় সংশ্লিষ্ট শিল্প সম্প্রসারণও ঘটে থাকে অনেকটা অপ্রত্যাশিত হারে। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম-সাময়িক কালে জন্মহার সহসা বৃদ্ধি পাওয়ায় শিশুদের স্বাস্থ্যাবধান উপযোগী এক শ্রেণীর তোয়ালের ('ডায়াপার') চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যায় আর যে শিল্প-সংস্থা বা কোম্পানীগুলি আগে থেকে এদিকে মূলধন খাটিয়ে এসেছে, তাদের অগ্রগতির পথও আপনি হয়ে পড়ে সুনিশ্চিত।

সমগ্র অর্থনৈতিক কাঠামোর সম্প্রসারণ যেখানে হয়ে চলবে, সেখানে বিভিন্ন শিল্পও সমুন্নত ও সংবর্দ্ধিত হবে দ্রুত তালে, এইটি ধরে নেওয়া যায়। তবে ক্ষেত্র-বিশেষে এই নিয়মটির যে ব্যতিক্রম হয় না বা হবে না, এমন নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যুদ্ধোত্তরকালে টেলিভিশন শিল্পের সামগ্রিক সম্প্রসারণ হয় খুব তাড়াতাড়ি, অথচ টেলিভিশন নির্ম্মাণকারী বহু ছোটখাট কোম্পানী বা শিল্প-সংস্থা সে সময় উঠে যায়। আবার, বস্ত্রশিল্প সমগ্রভাবে যে সময় পতনোন্মুখ, ঠিক সেই মুহূর্তে কোন কোন বস্ত্র-শিল্প সংস্থা (কোম্পানী) প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও দেওয়া চলে।

একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না—নতুন কোন শিল্প-সংস্থা গড়লে, নতুন ধরণের কোন শিল্প-সম্ভার বের করলে প্রথমটায় অন্ততঃ কিছুটা ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। সাধারণতঃ বাজারে যাচাই হয় বিশেষভাবে তিনটি জিনিসের—শিল্পের উপযোগিতা, শিল্পের মান ও শিল্পের দাম বা মূল্য। অগ্রগতির স্বাভাবিক দাবী

যেখানে রাখা হবে, কোম্পানী বা শিল্প-সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীকে সেখানে এ তিনটি দিকেই সতর্ক নজর না রাখলে নয়। বলতে কি, তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ বা কার্য্যক্রমই হওয়া চাই সুপরিকল্পিত অথচ নির্ভীক। কি ধরণের ঝুঁকি হতে পারে, তার একটি বাস্তব নমুনা: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'কৃত্রিম রেশম' যখন বের হল, খাঁটি রেশমের তুলনায় সে ছিল কম আকর্ষণীয়। খাঁটি রেশমের বাজার দরও সে সময় খুব একটা বেশি ছিল না। ফলে কৃত্রিম রেশম শিল্প-সংস্থাগুলিকে এগিয়ে যাবার জন্ম অর্থাৎ বাজার পেতে প্রভৃত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পেরও অগ্রগতি নিশ্চিত লক্ষ্য করা যায়।

আবার, একই শিল্পকে কেন্দ্র করে কতকগুলি শিল্পসংস্থা বা কোম্পানী গড়ে যেখানে ওঠে, সেখানে যে সংস্থাটি প্রথমে কাজে নামে, সাধারণতঃ সেইটির উপর ঝুঁকি পড়ে বেশি। বাজার সৃষ্টি হয়ে গেলে সম্প্রসারণের কলা-কৌশলের সহায়তায় নতুন নতুন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের ভালভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া কঠিন হয় না। পেনিসিলিন উৎপাদন প্রসঙ্গে যে ইতিহাস জানতে পারা যায়, তাতে অন্য ধরণের একটি ঝুঁকি নজরে পড়ে। পেনিসেলিন উৎপাদনের প্রথম পর্য্যায়ে উৎপাদন ব্যয় পড়তো অনেক বেশি আর সে সময় এর ফলাফল সম্পর্কে যোল আনা নিশ্চয়তা বা 'গ্যারান্টি' ছিল না। এই অবস্থাধীনে শিল্পের প্রসার ও অগ্রগতি সম্পর্কে অবিশ্বাস আসা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ক্রমে উৎপাদন দক্ষতা আশাতীত বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন পদ্ধতি নিয়ে নতুন সংস্থা বা কোম্পানী গড়ে ওঠে। সেদিনের যে ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল, তারই জন্তে আজ সকলেরই সুফল ভোগ করবার সুযোগ মিলেছে, এ বলা নিশ্চয়ই অনুচিত হবে না।

শিল্প বা শিল্প-সংস্থার অগ্রগতির বিষয় আলোচনা করতে গেলেই কল-কারখানাসমূহের আধুনিক যন্ত্রসজ্জিতকরণ বা স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা ওঠে। এই ব্যবস্থায় বেকারী সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করে থাকেন বিশেষ ভাবে শ্রমিকমহল ও ট্রেড-ইউনিয়ন কর্ম্মকর্ত্তাগণ। শিল্পপতিদের তরফ থেকে অবশ্য অন্যরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হয়—তাঁরা বলে থাকেন, শেষ অবধি শিল্প ও শিল্প-সংস্থার সম্প্রসারণে কর্ম্মসংস্থান বরং অমনি বৃদ্ধিই পাবে। অপরদিকে শিল্পক্ষেত্রে যে অগ্রগতির কথা বলা হ'ল, তা মূলতঃ হয় কারিগরী অগ্রগতি নয় তো উৎপাদনের প্রসার। কিন্তু আমেরিকা প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে শিল্পগত অগ্রগতি শুধু এই ভাবেই হয় না। সে সব মুলুকে একই ধরণের প্রতিযোগী শিল্পসংস্থা বা কোম্পানীগুলির সংহতি মারফৎ অগ্রগতি হয় তুলনায় অনেক বেশি। সরকারী নীতি ও কার্য্য ব্যবস্থাও বিভিন্ন শিল্প ও শিল্প-সংস্থার (কোম্পানী) অগ্রগতির প্রশ্নে একটি বড় কথা—এ বলাই বাহুল্য।

## ইস্পাত উৎপাদনে ভারত

বর্ত্তমান যুগটিকে যেমন রকেটের যুগ বলা হয়, তেমনি বলা হয় ইস্পাতের যুগ। কথাটি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই আদৌ। প্রকৃত প্রস্তাবে, যে কোন দেশের সুখ-সমৃদ্ধির জন্ম শিল্পায়ন অপরিহার্য্য আর শিল্পায়নের জন্ম পর্য্যাপ্ত ইস্পাত না হলেই নয়।

কিছুকাল পূর্ব্ব অবধি ভারত বিদেশী নাগপাশে ছিল আবদ্ধ। শিল্পায়নের স্বাধীন পরিকল্পনা সে অবস্থায় দুরাশা মাত্র ছিল। স্বাধীনতা অর্জ্জিত হওয়ার পর জাতীয় সরকার শিল্পায়নের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন এবং পরিকল্পনাও প্রণয়ন করেছেন একটি—অন্ততঃ এটুকু আশার কথা। এই পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ—দেশের অভ্যন্তরে কারখানাদি স্থাপন করে ব্যাপক ইস্পাত উৎপাদন ব্যবস্থা। পরিকল্পনা অনুসারে দুইটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানার নির্ম্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে—একটি উড়িষ্যার রাউরকেল্লায়, অপরটি মধ্য প্রদেশের ভিলাই-এ। রাউরকেল্লার কারখানাটি নির্ম্মিত হচ্ছে পশ্চিম জার্ম্মাণীর সহায়তায় এবং এর ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়েছে দুই শত কোটি টাকা। অপর দিকে সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরী বিশেষজ্ঞদের তদারকীতে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের দ্বারা নির্ম্মিত হয়ে চলেছে ভিলাই-এর কারখানাটি—যার জন্ম আপাততঃ ১৩১ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ নির্দ্ধারিত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য করবার—রাউরকেল্লা ও ভিলাই-এ একটি করে ব্লাষ্ট ফার্ণেসের উদ্বোধন হয়েছে এরই ভেতর। এই দুটি কারখানায় আলোচ্য বর্ষেই (১৯৫৯) আরও দুটি ব্লাষ্ট ফার্ণেস চালু হবে, আর পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের কারখানাটিতেও হবে অনুরূপ একটি ফার্ণেস। সরকারের দাবী—এই ফার্ণেস বা চুল্লীগুলি থেকে প্রত্যহ ঢালাই লৌহ পিণ্ড পাওয়া যাবে ৫ হাজার টন করে।

ইস্পাত উৎপাদনের উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার (ভারত) জোর দিয়েছেন অনেকটা, এ অবশ্য স্পষ্ট। আলোচ্য পরিকল্পনাকালে ইস্পাত উৎপাদনের সরকারী লক্ষ্য ৬০ লক্ষ টন নিরূপিত হয়েছে। জামসেদপুর, বার্ণপুর প্রভৃতি বে-সরকারী কারখানাগুলি থেকে যে ইস্পাত উৎপাদিত হবে, তা এই হিসাবেরই অন্তর্ভুক্ত বলে জানা যায়।

এ প্রসঙ্গে শিল্প-সমুন্নত বৃহৎ দেশগুলির ইস্পাত উৎপাদনের হিসাবটি পর্য্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। যতদূর জানা যায়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এক্ষণে বছরে ইস্পাত উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ১০ কোটি টন। ইস্পাত উৎপাদনে বিশ্বে এখন অবধি এই দেশটিই প্রথম স্থান অধিকার করছে। এর পরই নাম করতে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নের—সেখানে প্রতি বছর উৎপাদিত হচ্ছে কমপক্ষে ৫ কোটি টন ইস্পাত। অপর দিকে বৃটেনে এখন বছরে গড়পড়তা দুই কোটি টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়ে চলেছে।

ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে ৬০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের যে লক্ষ্য রয়েছে, সেইটি পুরণ হলে আশার কথা। উৎপাদিত এই ইস্পাত থেকে অবশ্য ৪৫ লক্ষ টনই রপ্তানী করা হবে বিদেশে। এর উদ্দেশ্য ঋণ পরিশোধের জন্ম বেশ কিছুটা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন। একটি কথা তবু বলতে হবে—পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজটাই যদি সম্পন্ন করতে হয়, তা হলে বিশেষভাবে সরকারের দিক থেকে প্রচুর যত্ন ও আন্তরিকতা থাকা চাই আগাগোড়া।

## শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র সেন

[ বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও সমাজ-হিতৈষী ]

অন্তরের দিক থেকে যে মানুষ সুন্দর, তিনিই তো প্রকৃত সুন্দর। হাইকোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও সমাজ-হিতৈষী শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র সেনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কথাটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

যশোহরের বিখ্যাত কালিয়া গ্রামের এক বিশিষ্ট পরিবারে (ধন্বন্তরী বৈদ্যবংশ) শ্রীসেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে। এই পরিবারটি বাংলা দেশের সুবৃহৎ আদর্শ যৌথ পরিবার হিসাবে বহুদিন থেকেই সুপরিচিত। পরিবারের মহত্তর ধারার একটি সুস্থ আবহাওয়া ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে সুরু হয় হেমেন্দ্রচন্দ্রের জীবন সংগঠন।

কীর্ত্তিমান পিতৃপুরুষদের সুকৃতির প্রভাব পড়ে এই মানুষটির উপর জীবনের বোধন লগ্ন থেকেই। একটি লক্ষ্য করবার বিষয়—ক্রমাগত কয়েক পুরুষ ধরেই কালিয়ার এই সেন পরিবারটি একটি খ্যাতনামা আইনজীবীদের পরিবার হিসেবে প্রসিদ্ধ। সুতরাং উত্তরসাধক হিসেবে হেমেন্দ্রচন্দ্রও যে কর্ম্মজীবনে আইনকেই প্রতিষ্ঠার সূত্র হিসাবে বরণ করে নেবেন, এ ছিল একরূপ নির্দ্ধারিত। এঁর পিতামহ স্বর্গীয় গিরিধর সেন ছিলেন যশোহরের পাবলিক প্রসিকিউটর। এ প্রায় এক শ' বছর আগেকার কথা—সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক কালের কাহিনী। খুল্ল পিতামহ স্বর্গীয় বংশীধর সেনও ছিলেন সে যুগে হাইকোর্টের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবী।

সেন পরিবারের আইন ব্যবসায়ের উজ্জ্বল ধারাটি এগিয়ে চলে এমনি অব্যাহত গতিতে। হেমেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন ছিলেন যশোহরের সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটর। পিতা রায়বাহাদুর স্বর্গীয় মহেন্দ্রচন্দ্র সেন বিদ্যারত্ন, সাহিত্যরঞ্জন জীবনের প্রায় শেষদিন অবধি খুলনার সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাম করতে হয় হেমেন্দ্রচন্দ্রের খুল্লতাত স্বর্গীয় রায় সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন বাহাদুরের। ইনি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের একজন স্বনামধন্য উকিল। এঁর সস্নেহ প্রেরণা ও অনুশাসনই আপন জীবন সংগঠনের পরম সম্পদ ও সহায়ক ছিল, এ অকুণ্ঠ স্বীকৃতি শ্রীসেনের কণ্ঠে আজও সুস্পষ্ট।

উচ্চাদর্শ সামনে রেখে ও বড় হবার দুরন্ত প্রত্যাশা নিয়ে হেমেন্দ্রচন্দ্র জীবন পথে অগ্রসর হতে থাকেন। স্বগ্রামের (কালিয়া) উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়েই তাঁর প্রথম অধ্যয়ন। সেখান থেকে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হলেন। এই বিদ্যায়তন থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে (কলকাতা) ভর্ত্তি হন। ১৯০৯ সালে তিনি এই মহা-বিদ্যায়তন থেকেই বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ফাইন্যাল ল-এ (আইনের সর্ব্বশেষ পরীক্ষা) কৃতকার্য্য হন তিনি ১৯১১ সালে এবং পরের বছর কলকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট হিসেবে আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন।

একটি কথা—ল' পাশ করেই কিন্তু শ্রীসেনের শিক্ষা-জীবনের সমাপ্তি ঘটল না। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে তিনি [illegible] সালে [illegible] (রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও অর্থনীতিশাস্ত্র) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গোড়া থেকেই ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের উপর তাঁর একটা বিশেষ অধিকার জন্মে। গবেষকের মন নিয়ে উপরোক্ত বিষয়ে তিনি পড়াশুনাও করেছেন প্রচুর। তারই ফলস্বরূপ তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ল' ফাইন্যালের পরীক্ষক ও প্রশ্নপত্র প্রণেতার সম্মান পর্য্যন্ত পেয়েছেন।

হাইকোর্ট থেকে তরুণ আইনজ্ঞ হেমেন্দ্রচন্দ্র প্রথমটায় শিক্ষা গ্রহণ করেন স্বনামধন্য খুল্লতাতের কাছে Articled clerk হিসেবে তারপরই সুরু হয় তাঁর স্বাধীন ভাবে আইন ব্যবসায়—এডভোকেট (তৎকালীন ভকিল) রূপে তাঁর সুদৃঢ় পদক্ষেপ। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে আর সেই সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয় অনেকখানি। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠার জন্য মূলতঃ দায়ী—একদিকে তাঁর কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও ক্ষিপ্র-বিচারবুদ্ধি ও অপরদিকে তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্য ও নির্ভীকতা।

আইনবিদ হিসেবে শ্রীসেনের যোগ্যতা জাতীয় সরকারের কাছেও কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্ত্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের ব্যাপারে

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র সেন

যেখানে রাখা হবে, কোম্পানী বা শিল্প-সংস্থার পরিচালকমণ্ডলীকে সেখানে এ তিনটি দিকেই সতর্ক নজর না রাখলে নয়। বলতে কি, তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ বা কার্যক্রমই হওয়া চাই সুপরিকল্পিত অথচ নির্ভীক। কি ধরণের ঝুঁকি হতে পারে, তার একটি বাস্তব নমুনা : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'কৃত্রিম রেশম' যখন বের হল, খাঁটি রেশমের তুলনায় সে ছিল কম আকর্ষণীয়। খাঁটি রেশমের বাজার দরও সে সময় খুব একটা বেশি ছিল না। ফলে কৃত্রিম রেশম শিল্প-সংস্থাগুলিকে এগিয়ে যাবার জন্ম অর্থাৎ বাজার পেতে প্রভৃত প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পেরও অগ্রগতি নিশ্চিত লক্ষ্য করা যায়।

আবার, একই শিল্পকে কেন্দ্র করে কতকগুলি শিল্পসংস্থা বা কোম্পানী গড়ে যেখানে ওঠে, সেখানে যে সংস্থাটি প্রথমে কাজে নামে, সাধারণতঃ সেইটির উপর ঝুঁকি পড়ে বেশি। বাজার সৃষ্টি হয়ে গেলে সম্প্রসারণের কলা-কৌশলের সহায়তায় নতুন নতুন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের ভালভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া কঠিন হয় না। পেনিসিলিন উৎপাদন প্রসঙ্গে যে ইতিহাস জানতে পারা যায়, তাতে অন্ত ধরণের একটি ঝুঁকি নজরে পড়ে। পেনিসেলিন উৎপাদনের প্রথম পর্য্যায়ে উৎপাদন ব্যয় পড়তো অনেক বেশি আর সে সময় এর ফলাফল সম্পর্কে যোল আনা নিশ্চয়তা বা 'গ্যারান্টি' ছিল না। এই অবস্থাধীনে শিল্পের প্রসার ও অগ্রগতি সম্পর্কে অবিশ্বাস আসা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ক্রমে উৎপাদন দক্ষতা আশাতীত বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন পদ্ধতি নিয়ে নতুন সংস্থা বা কোম্পানী গড়ে ওঠে। সেদিনের যে ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল, তারই জন্তে আজ সকলেরই সুফল ভোগ করবার সুযোগ মিলেছে, এ বলা নিশ্চয়ই অনুচিত হবে না।

শিল্প বা শিল্প-সংস্থার অগ্রগতির বিষয় আলোচনা করতে গেলেই কল-কারখানাসমূহের আধুনিক যন্ত্রসজ্জিতকরণ বা স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা ওঠে। এই ব্যবস্থায় বেকারী সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করে থাকেন বিশেষ ভাবে শ্রমিকমহল ও ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মকর্তাগণ। শিল্পপতিদের তরফ থেকে অবশ্য অন্তরূপ যুক্তি প্রদর্শিত হয়—তাঁরা বলে থাকেন, শেষ অবধি শিল্প ও শিল্প-সংস্থার সম্প্রসারণে কর্মসংস্থান বরং অমনি বৃদ্ধিই পাবে। অপরদিকে শিল্পক্ষেত্রে যে অগ্রগতির কথা বলা হ'ল, তা মূলতঃ হয় কারিগরী অগ্রগতি নয় তো উৎপাদনের প্রসার। কিন্তু আমেরিকা প্রভৃতি শিল্পোন্নত দেশে শিল্পগত অগ্রগতি শুধু এই ভাবেই হয় না। সে সব মুলুকে একই ধরণের প্রতিযোগী শিল্পসংস্থা বা কোম্পানীগুলির সংহতি মারফৎ অগ্রগতি হয় তুলনায় অনেক বেশি। সরকারী নীতি ও কার্য্য ব্যবস্থাও বিভিন্ন শিল্প ও শিল্প-সংস্থার (কোম্পানী) অগ্রগতির প্রশ্নে একটি বড় কথা—এ বলাই বাহুল্য।

## ইস্পাত উৎপাদনে ভারত

বর্ত্তমান যুগটিকে যেমন রকেটের যুগ বলা হয়, তেমনি বলা হয় ইস্পাতের যুগ। কথাটি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই আদৌ। প্রকৃত প্রস্তাবে, যে কোন দেশের সুখ-সমৃদ্ধির জন্ম শিল্পায়ন অপরিহার্য্য আর শিল্পায়নের জন্য পর্য্যাপ্ত ইস্পাত না হলেই নয়।

কিছুকাল পূর্ব্ব অবধি ভারত বিদেশী নাগপাশে ছিল আবদ্ধ। শিল্পায়নের স্বাধীন পরিকল্পনা সে অবস্থায় দুরাশা মাত্র ছিল। স্বাধীনতা অর্জ্জিত হওয়ার পর জাতীয় সরকার শিল্পায়নের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন এবং পরিকল্পনাও প্রণয়ন করেছেন একটি—অন্ততঃ এটুকু আশার কথা। এই পরিকল্পনার অন্ততম প্রধান অঙ্গ—দেশের অভ্যন্তরে কারখানাদি স্থাপন করে ব্যাপক ইস্পাত উৎপাদন ব্যবস্থা। পরিকল্পনা অনুসারে দুইটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানার নির্ম্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে—একটি উড়িষ্যার রাউরকেল্লায়, অপরটি মধ্য প্রদেশের ভিলাই-এ। রাউরকেল্লার কারখানাটি নির্ম্মিত হচ্ছে পশ্চিম জার্মাণীর সহায়তায় এবং এর ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়েছে দুই শত কোটি টাকা। অপর দিকে সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরী বিশেষজ্ঞদের তদারকীতে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের দ্বারা নির্ম্মিত হয়ে চলেছে ভিলাই-এর কারখানাটি—যার জন্ত আপাততঃ ১৩১ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ নির্দ্ধারিত হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য করবার—রাউরকেল্লা ও ভিলাই-এ একটি করে ব্লাষ্ট ফার্ণেসের উদ্বোধন হয়েছে এরই ভেতর। এই দুটি কারখানায় আলোচ্য বর্ষেই (১৯৫৯) আরও দুটি ব্লাষ্ট ফার্ণেস চালু হবে, আর পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের কারখানাটিতেও হবে অনুরূপ একটি ফার্ণেস। সরকারের দাবী—এই ফার্ণেস বা চুল্লীগুলি থেকে প্রত্যহ ঢালাই লৌহ পিণ্ড পাওয়া যাবে ৫ হাজার টন করে।

ইস্পাত উৎপাদনের উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার (ভারত) জোর দিয়েছেন অনেকটা, এ অবশ্য স্পষ্ট। আলোচ্য পরিকল্পনাকালে ইস্পাত উৎপাদনের সরকারী লক্ষ্য ৬০ লক্ষ টন নিরূপিত হয়েছে। জামসেদপুর, বার্ণপুর প্রভৃতি বে-সরকারী কারখানাগুলি থেকে যে ইস্পাত উৎপাদিত হবে, তা এই হিসাবেই অন্তর্ভুক্ত বলে জানা যায়।

এ প্রসঙ্গে শিল্প-সমুন্নত বৃহৎ দেশগুলির ইস্পাত উৎপাদনের হিসাবটি পর্য্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। যতদূর জানা যায়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এক্ষণে বছরে ইস্পাত উৎপাদিত হচ্ছে প্রায় ১০ কোটি টন। ইস্পাত উৎপাদনে বিশ্বে এখন অবধি এই দেশটিই প্রথম স্থান অধিকার করছে। এর পরই নাম করতে হয় সোভিয়েট ইউনিয়নের—সেখানে প্রতি বছর উৎপাদিত হচ্ছে কমপক্ষে ৫ কোটি টন ইস্পাত। অপর দিকে বৃটেনে এখন বছরে গড়পড়তা দুই কোটি টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়ে চলেছে।

ভারতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে ৬০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের যে লক্ষ্য রয়েছে, সেইটি পূরণ হলে আশার কথা। উৎপাদিত এই ইস্পাত থেকে অবশ্য ৪৫ লক্ষ টনই রপ্তানী করা হবে বিদেশে। এর উদ্দেশ্য ঋণ পরিশোধের জন্য বেশ কিছুটা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জন। একটি কথা তবু বলতে হবে—পরিকল্পনা অনুযায়ী সব কাজটাই যদি সম্পন্ন করতে হয়, তা হলে বিশেষভাবে সরকারের দিক থেকে প্রচুর যত্ন ও আন্তরিকতা থাকা চাই আগাগোড়া।

## শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র সেন

[ বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও সমাজ-হিতৈষী ]

অন্তরের দিক থেকে যে মানুষ সুন্দর, তিনিই তো প্রকৃত সুন্দর। হাইকোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও সমাজ-হিতৈষী শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র সেনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কথাটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য।

যশোহরের বিখ্যাত কালিয়া গ্রামের এক বিশিষ্ট পরিবারে (ধন্বন্তরী বৈদ্যবংশ) শ্রীসেন জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে। এই পরিবারটি বাংলা দেশের সুবৃহৎ আদর্শ যৌথ পরিবার হিসাবে বহুদিন থেকেই সুপরিচিত। পরিবারের মহত্তর ধারায় একটি সুস্থ আবহাওয়া ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে সুরু হয় হেমেন্দ্রচন্দ্রের জীবন সংগঠন।

কীর্ত্তিমান পিতৃপুরুষদের সুকৃতির প্রভাব পড়ে এই মানুষটির উপর জীবনের বোধন লগ্ন থেকেই। একটি লক্ষ্য করবার বিষয়—ক্রমাগত কয়েক পুরুষ ধরেই কালিয়ার এই সেন পরিবারটি একটি খ্যাতনামা আইনজীবীদের পরিবার হিসেবে প্রসিদ্ধ। সুতরাং উত্তরসাধক হিসেবে হেমেন্দ্রচন্দ্রও যে কর্ম্মজীবনে আইনকেই প্রতিষ্ঠার সূত্র হিসাবে বরণ করে নেবেন, এ ছিল একরূপ নির্দ্ধারিত। এঁর পিতামহ স্বর্গীয় গিরিধর সেন ছিলেন যশোহরের পাবলিক প্রসিকিউটর। এ প্রায় এক শ' বছর আগেকার কথা—সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক কালের কাহিনী। খুল্ল পিতামহ স্বর্গীয় বংশীধর সেনও ছিলেন সে যুগে হাইকোর্টের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইনজীবী।

সেন পরিবারের আইন ব্যবসায়ের উজ্জ্বল ধারাটি এগিয়ে চলে এমনি অব্যাহত গতিতে। হেমেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র সেন ছিলেন যশোহরের সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটর। পিতা রায়বাহাদুর স্বর্গীয় মহেন্দ্রচন্দ্র সেন বিদ্যারত্ন, সাহিত্যরঞ্জন জীবনের প্রায় শেষদিন অবধি খুলনার সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাম করতে হয় হেমেন্দ্রচন্দ্রের খুল্লতাত স্বর্গীয় রায় সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন বাহাদুরের। ইনি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের একজন স্বনামধন্য উকিল। এঁর সস্নেহ প্রেরণা ও অনুশাসনই আপন জীবন সংগঠনের পরম সম্পদ ও সহায়ক ছিল, এ অকুণ্ঠ স্বীকৃতি শ্রীসেনের কণ্ঠে আজও সুস্পষ্ট।

উচ্চাদর্শ সামনে রেখে ও বড় হবার দুরন্ত প্রত্যাশা নিয়ে হেমেন্দ্রচন্দ্র জীবন পথে অগ্রসর হতে থাকেন। স্বগ্রামের (কালিয়া) উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়েই তাঁর প্রথম অধ্যয়ন। সেখান থেকে তিনি কলকাতায় চলে আসেন এবং হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হলেন। এই বিদ্যায়তন থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে (কলকাতা) ভর্তি হন। ১৯০৯ সালে তিনি এই মহা-বিদ্যায়তন থেকেই বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ফাইন্যাল ল-এ (আইনের সর্বশেষ পরীক্ষা) কৃতকার্য্য হন তিনি ১৯১১ সালে এবং পরের বছর কলকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট হিসেবে আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন।

একটি কথা—ল' পাশ করেই কিন্তু শ্রীসেনের শিক্ষা-জীবনের সমাপ্তি ঘটল না। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে তিনি ১৯১৯ সালে এম-এ (রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও

অর্থনীতিশাস্ত্র) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গোড়া থেকেই ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের উপর তাঁর একটা বিশেষ অধিকার জন্মে। গবেষকের মন নিয়ে উপরোক্ত বিষয়ে তিনি পড়াশুনাও করেছেন প্রচুর। তারই ফলস্বরূপ তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ল' ফাইন্যালের পরীক্ষক ও প্রশ্নপত্র প্রণেতার সম্মান পর্য্যন্ত পেয়েছেন।

হাইকোর্ট থেকে তরুণ আইনজ্ঞ হেমেন্দ্রচন্দ্র প্রথমটায় শিক্ষা গ্রহণ করেন স্বনামধন্য খুল্লতাতের কাছে Articled clerk হিসেবে তারপরই সুরু হয় তাঁর স্বাধীন ভাবে আইন ব্যবসায়—এডভোকেট (তৎকালীন ভকিল) রূপে তাঁর সুদৃঢ় পদক্ষেপ। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে আর সেই সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হয় অনেকখানি। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠার জন্য মূলতঃ দায়ী—একদিকে তাঁর কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও ক্ষিপ্র-বিচারবুদ্ধি ও অপরদিকে তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্য ও নির্ভীকতা।

আইনবিদ হিসেবে শ্রীসেনের যোগ্যতা জাতীয় সরকারের কাছেও কয়েকটি ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বিভাগের ব্যাপারে

শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র সেন

আইন উপদেষ্টার পদে অধিষ্ঠিত আছেন। এই নতুন দায়িত্ব বহুল পদটি সৃষ্টি হলে সেই পদের অধিকারী রূপে তাঁকেই নির্বাচিত করা হয় সর্বপ্রথম, প্রসঙ্গত: এইটিও লক্ষ্য করবার মত।

দেশের ব্যবহারজীবী ও আইনজ্ঞ মহলে হেমেন্দ্রচন্দ্রের সমাদর ও জনপ্রিয়তা যথেষ্ট। হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের (কলকাতা) তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবার নিয়ে পুর্ব ... বার। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান—বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন গ্রন্থের সুষ্ঠ সম্পাদনা। এই কাজটি প্রথমে দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন তাঁরই পূর্বোক্ত খুল্লতাত স্বর্গত: রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রচন্দ্র সেন। পূজনীয় পিতৃব্যের মৃত্যুর পর শ্রীসেনের সুযোগ্য সম্পাদনায় এ যাবত কয়েকটি মূল্যবান সংস্করণ বের হয়েছে এই অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানির।

প্রিয় জন্মস্থান কালিয়া ও তদঞ্চলের উন্নতির প্রশ্ন সমাজসেবী হেমেন্দ্রচন্দ্রের মনকে আলোড়িত করেছে বরাবর। আজও তাঁর মুখে সেই গ্রামের কথা—গ্রামবাসীর কথা—প্রিয় পরিজনদের কথা। দেশ বিভাগের ফলে যে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, তা ভাবতে গেলেই তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন। তাই দেখা যায়, প্রাণের তাগিদে প্রতিবন্ধক সত্বেও বছরে অন্তত: একবার বাড়ী গিয়ে পূজা অনুষ্ঠানে যোগদান করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ আজও তিনি ছাড়তে পারেন নি। কালিয়া-বেন্দা সমিতির সাম্প্রতিক এক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন হেমেন্দ্রচন্দ্র।

দেশ-বিভাগের মর্ম্মান্তিক দিনগুলিতে শ্রীসেনের পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব হয়নি। যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর ও বরিশালের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা সমূহ যাতে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকে, তার জন্ম সীমানা কমিশনের সম্মুখে তিনিই মধ্য বঙ্গ সীমানা নির্দ্ধারণ কমিটির প্রতিনিধিত্ব করেন। সেদিনে তাঁর এই প্রয়াস সংশ্লিষ্ট মহলের সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

কর্মব্রতী হেমেন্দ্রচন্দ্রের দুটি বিশেষ গুণ পাশাপাশি লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তিনি যেমন শিশুর মতো কোমল প্রাণ, অপর দিকে তিনি তেমনই বীরের ন্যায় দৃঢ়চেতা। তিনি যেমনই নির্ভীক, তেমনই স্পষ্টবাদী। তাঁর এই বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনে পুণ্যময়ী জননী স্বর্গীয়া সুরেন্দ্রবালা ও পিতৃদেব মহেন্দ্রচন্দ্রের প্রভাব ও উপদেশ যথেষ্ট সহায়তা করেছে। যৌথ পরিবারের কর্ণধার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় নগেন্দ্রচন্দ্র সেন ও খুল্লতাত কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়দ্বয়ের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়।

আইন চর্চ্চা ও আইন-ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কালিয়ার সেন পরিবারটি যে ঐতিহ্য ও গৌরবের অধিকারী, হেমেন্দ্রচন্দ্রের দ্বারা সেই ঐতিহ্য ও গৌরব আরও বহু গুণ বর্ধিত হয়েছে। তাঁকে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছেন তাঁর অগ্রজ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন যিনি নিজেও সেদিন অবধি যশোহরের বিশিষ্ট সরকারী উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন। হেমেন্দ্রচন্দ্রের স্নেহাস্পদদের মধ্যেও অনেককেই আজ উকিল, জজ, মুন্সেফ, ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে দেখা যাচ্ছে। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র সেন বর্ত্তমানে চন্দননগরের জনপ্রিয় মহকুমা হাকিম।

দীর্ঘ ৪৬ বছর ধরে হেমেন্দ্রচন্দ্র হাইকোর্টের আইন ব্যবসা করে চলেছেন যথেষ্ট সুনাম, প্রভাব ও প্রতিপত্তির সঙ্গে। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টেরও তিনি একজন সিনিয়র এডভোকেট। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, জীবনের সত্তরটি বছর অতিক্রম করবার পরও এতটুকু অবসাদ বা ক্লান্তির কাছে মাথা নত করেন নি কর্ম্মবীর হেমেন্দ্রচন্দ্র সেন। আইন বিষয়ক কাজগুলি নিয়েই দিনরাত তিনি ব্যাপৃত। সংসারে থেকে নিষ্ঠা সহকারে নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য পালনই এই মানুষটির জীবনের ধর্ম্ম এবং সে ধর্ম্মাদর্শ থেকে যেন কোনদিন বিচ্যুত হতে না হয়—এইটিই তাঁর অন্তরের অনাবিল কামনা।

## অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

[ স্কটিশ চার্চ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ও পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের সদস্য ]

রাজনৈতিক দলভুক্ত না হয়েও আইন সভায় নির্বাচিত স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে যে দেশের ও দশের জন্যে কিছু কাজ করা যায় তার প্রমাণ ছাত্রদরদী অধ্যাপক শ্রীনির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মধ্যে দেখতে পাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ছাত্র, ছাত্রী, জনসমাজ, রাজনৈতিক দল ও দলনেতাদের কাছে তিনি চির-আদরণীয়।

শ্রীভট্টাচার্য ফরিদপুর জেলায় মাতুলালয় কাউলিবেড়ার ১৮৯৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। একশো আশিটি ব্রাহ্মণ-পরিবার অধ্যুষিত নদীমাতৃক শত্তালী এঁর পৈতৃক গ্রাম। গ্রামের ছেলে—তাই প্রকৃতিদেবীকে ভালবাসতে শিখেছেন বাল্যকাল থেকে। তাঁর কলকাতার বাড়ীতেও কিছুটা প্রাকৃতিক পরিবেশ লক্ষণীয়। স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসু স্থাপিত ও তৎপুত্র বিশ্বনন্দিত বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রথম পাঠগ্রহণের কেন্দ্র ফরিদপুর এম, ই, স্কুলে কিছুদিন পড়ে শ্রীভট্টাচার্য ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ১৯১৪ সালে পনেরো টাকা বৃত্তি সহ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ও ১৯১৮ সালে অর্থনীতি ও দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ বি, এ, পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে তখন ছাত্র হিসেবে যুক্ত ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিখ্যাত বাগ্মী তুলসী গোস্বামী, সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি ফণীভূষণ চক্রবর্তী, সাহিত্যিক শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি। নির্মলচন্দ্রের তৎকালীন আবাস হিন্দু হোস্টেলে বসতো সাহিত্য আলোচনা,

অধ্যাপক নির্ম্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বৈঠকগুলির আলোচ্য ছিল—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচনা। সেই সময় ইয়োরোপের আকাশে প্রথম মহাসমরের ঘোর ঘনঘটা। ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকা মজুমদার ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ আবেদন জানাচ্ছেন দেশের তরুণদের দলে দলে দেশরক্ষা বাহিনীতে যোগদানের জন্যে। সেই ডাকে প্রথম সাড়া দিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের তিনটি ছাত্র ও একত্রে নাম লেখালেন একই দিনে ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্সে (বিশ্ববিদ্যালয় শাখা), তাঁদের নাম—সুভাষচন্দ্র, সত্যেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মল ভট্টাচার্য।

নির্মলচন্দ্র ১৯২০ সালে অর্থনীতি (Gr. B)তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হন। ১৯২১ সালে অধ্যাপক হিসেবে স্কটিশ চার্চ কলেজে তাঁকে নেওয়া হয় এবং দু' বছর পরে তিনি বি, এল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। আইন কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও সুসঙ্গের মহারাজা। ১৯২৬ সালে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিযুক্ত হন।

১৯১১ সালে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় শ্রীভট্টাচার্য বৈপ্লবিক দল "অনুশীলন সমিতি"তে যোগ দেন। প্রথম দিনে তাঁকে জগন্মাতা আদ্যাশক্তি মহাকালীর সমীপে সমিতির "আত্মপ্রতিজ্ঞা" গ্রহণ করতে হয়। সমিতির লিবার্টি প্যামফ্লেটস্ ও গ্রন্থাগারিক হিসেবে বাজেয়াপ্ত পুস্তক সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করা তাঁর প্রধান কাজ ছিল। কলকাতাতে পড়ার সময়েও বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর বরাবর যোগাযোগ ছিল। সন্দেহবশে পুলিশ কয়েকবার হিন্দু হোষ্টেল খানাতল্লাসী করেছে কিন্তু অধ্যক্ষের দৃঢ়তার জন্যে তাঁকে কখনও বিপদে পড়তে হয় নি। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্যে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বহু বাধা বিপত্তির সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছে। চার বছর বয়েসে মা রাজলক্ষ্মী দেবী ও এগারো বছর বয়েসে বাবা ভগবতীচরণ ভট্টাচার্যকে চিরকালের মত হারানোর ফলে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগদানের জন্যে বাড়ী থেকে কোন আপত্তি ওঠে নি। ১৯২১ থেকে '২৮ সাল পর্যন্ত তিনি মিঃ ও মিসেস মিলফোর্ড প্রতিষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশানাল ফেলোসিপের কার্য্যকরী সদস্য ছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি নিজেরই প্রেরণায় ছাত্রদের নিয়ে ভিলেজ সার্ভে পরিচালনা করেন। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর সম্পাদনায় "সাম বেঙ্গল ভিলেজেস" কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা প্রকাশিত হয় ১৯২৮-'২৯ সালে।

১৯২৮ সালে সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে যোগদান করেন ও প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হন। সেই সময় তিনি ভারতে ইংরেজ সরকারের শোষণনীতি পরিসংখ্যান সহযোগে প্রচার করেন। কর্মদক্ষতার জন্যে নেহরু কমিটির জাতীয় কনভেনশনেও তাঁকে গ্রহণ করা হয়। ১৯২৯ সালে শ্রীভট্টাচার্যের কংগ্রেস পরিত্যাগের কারণ ছিল (১) কার্যকরী সমিতিতে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে নেতা নির্বাচনে তাঁর প্রস্তাব ও (২) তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হুগলী জেলা যুব-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তাঁর দ্বারা সমাজতন্ত্র নীতির উল্লেখ। তখন বাঙলাদেশের রাজনীতিতে যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্রের উপদলে ভীষণ বিরোধ এবং যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত মনোভাব. আর বন্ধু-উপদলের দ্বারা নির্মলচন্দ্রের মতামতে অসন্তোষ প্রকাশ।

যদিও শ্রীভট্টাচার্য বামপন্থীদের উদ্যোগে আয়োজিত বহু সাংস্কৃতিক সভায় অংশ গ্রহণ করেছেন তবুও কোন দলের সদস্যপদ গ্রহণ করেন নি। ১৯৫২ সালে অধ্যাপক সতীশ ঘোষকে পরাজিত করে তিনি পশ্চিম-বঙ্গ বিধান-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫১ সালে পণ্ডিত সুন্দরলালের নেতৃত্বে প্রেরিত প্রথম ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে নির্মলচন্দ্র চীনদেশ পরিভ্রমণ করেন।

১৯৩৬ সালে ব্রহ্মদেশের ইতিহাস লেখক বিশিষ্ট আইনজীবী পরলোকগত বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে শ্রীমতী বীণা দেবীর সঙ্গে নির্মলচন্দ্রের শুভ-পরিণয় হয়। শ্রীমতী ভট্টাচার্য বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িতা এবং গণতান্ত্রিক মহিলা সংস্থার ভারতীয় শাখার তিনি একজন সক্রিয় সদস্যা। ১৯৫৫ সালে লজানে অনুষ্ঠিত মাদার কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

সংস্কৃতিবিষয়ক নির্মলচন্দ্রের বহু প্রবন্ধ ভারতের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, এশিয়াটিক সোসাইটি, নিখিল ভারত শান্তি সমিতি, নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্মেলন, ভারত-চীন সমিতি, শিক্ষাসংস্কার কমিটি, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি বহু সংস্থার সঙ্গে তিনি নিবিড় ভাবে জড়িত।

## গোপালচন্দ্র ঘোষ

[ বরণীয় চিত্রশিল্পী ]

শোভনতার যেন সীমা নেই। বিশ্বের সারাটি অঙ্গ যেন লালিত্যের লাবণ্য লেখায় ভাস্বর। পৃথিবীর সুকোমল তনু যেন সৌন্দর্যের বন্যা। এ সৌন্দর্য অপার, অসীম অশেষ। দেখে দেখে শেষ করা যায় না। তবে শুধু দেখলেই হবে না, দেখতে জানা চাই, দেখার মত চোখ চাই, হৃদয় চাই, চাই অনুভূতি, উপলব্ধি, তন্ময়তা আর তাঁর দেখার গুরুত্বই বেশী যিনি শুধু নিজেই দেখেন না অপরকেও দেখান, অপরকে দেখতে শেখান, অপরের চোখ দেখার উপযোগী করে তোলেন—এঁরাই শিল্পী। পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণধর্মী মন নিয়ে যাঁরা ফুটিয়ে তোলেন রঙ ও রেখায়, এক অভিনব সৌন্দর্যকে সামান্য একটি কাগজে কিংবা ক্যানভাসে কিংবা পটের উপর যারা নিখুঁৎভাবে উপস্থাপিত করেন, পাঁচটি আঙুলের চাপে ছোট্ট তুলির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে শিল্পসৃষ্টির নামে যাঁরা নব নব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন তাঁরা—সেই শিল্পীরা দেশবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দনের যোগ্যতম অধিকারী। এঁদের সৃষ্টি নিঃসন্দেহে দেশ ও জাতির সম্পদ বিশেষ। ভাষার সাহায্যে যাঁরা জীবনকে ফুটিয়ে তোলেন তাঁরা যদি জীবনশিল্পী হতে পারেন তবে তুলির সাহায্যে যারা জীবনকে ফুটিয়ে তোলেন তাঁরাই বা জীবনশিল্পী হবেন না কেন? শিল্পের ক্ষেত্রে আপন আপন প্রতিভাদৃপ্ত অবদানে যাঁরা বৃদ্ধি করেছেন দেশের ও দশের মনোলোকের কোষাগারের সম্পদ শক্তিধর, বৈশিষ্ট্যবান ও বৈচিত্র্যের পূজারী চিত্রশিল্পী শ্রীগোপাল ঘোষ তাঁদেরই অন্যতম।

বাহুর (মধ্যমগ্রাম) স্বর্গগত ক্ষেত্রপাল ঘোষের মেজ ছেলে গোপালচন্দ্র পরবর্তীকালের খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী গোপাল ঘোষ

১৯১৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর কলকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে হয়েছে সেইজন্তে কোন বিশেষ একটি জায়গায় তাঁর শিক্ষালাভ ঘটেনি, সিমলা, এলাহাবাদ, বারাণসী প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাঠ গ্রহণ করেছেন গোপালচন্দ্র, অবশ্য তাঁর নিজের ভাষায় বলা যায় যে মূল শিক্ষা বলতে যা বোঝা যায় তা—যে কোন বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের থেকেও আমি অনেক বেশী পেয়েছি বাড়ীতে আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের কাছে, সুতরাং নানা স্থানে ঘুরলেও এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে গোপালচন্দ্রের মূলশিক্ষায় কখনও কোনরকম ছেদ বা পরিবর্তন দেখা যায় নি। পিতৃদেবের প্রভাব গোপালচন্দ্রের মনকে ছেয়ে আছে। তাঁর পিতৃভক্তি অনুকরণযোগ্য। ছবি আঁকার প্রথম প্রেরণা গোপালচন্দ্র পান তাঁর কাছেই। মানচিত্রের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ, পৃথিবীর দেশ-বিদেশের নানাবিধ, নানান আকৃতির, নানাধরণের মানচিত্র তিনি আপন সংগ্রহশালার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাঁর সংগৃহীত মানচিত্রাদির মোট ওজন তাঁর পুত্রের ভাষায়—"কয়েক মণ তো নিশ্চয়ই", পূর্বে বলা হয়েছে যে প্রকৃত শিক্ষা গোপালচন্দ্র পিতৃদেবের কাছেই পেয়েছেন—যেমন, ছেলেকে মামুলিভাবে বিদ্যালয়-শিক্ষকদের হাতে সঁপে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি—সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পুত্রকে রামায়ণ, মহাভারত, বেদ-বেদান্ত সম্বন্ধে আলোকিত করে গেছেন, কালিদাস, সেক্সপীয়রের অমর সাহিত্যের অমৃত আস্বাদন করিয়েছেন পুত্রকে দিয়ে, বালক পুত্রকে অভিভূত করে ফেলেছেন মাইল ষ্টোনের সাহায্যে বিদ্যাসাগরের

গোপাল ঘোষ

ইংরিজী সংখ্যা রচনার গল্প শুনিয়ে, এমনি করেই পুত্রের মনন সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে গেছেন পিতা। ১৯৪৫ সালে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে শিল্পশিক্ষায় মনোনিবেশ করলেন গোপালচন্দ্র। পিতৃদেব তাঁকে জয়পুরের সরকারী শিল্প মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন ১৯৩১ সালে, অধ্যক্ষের পদ থেকে তখন সবেমাত্র অবসরগ্রহণ করেছেন ভারতের বরেণ্য ভাস্কর শ্রদ্ধেয় শ্রীহিরণ্ময় রায়চৌধুরী, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তখন কুশল মুখোপাধ্যায়। জয়পুরের পাঠক্রম সমাপ্ত করলেন যথাসময়ে অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের জুন মাসে, পরের মাসে Life Study শিক্ষার্থে মাদ্রাজ গেলেন ২ বছরের জন্তে। ১৯৩১ থেকে ৩৮ পর্যন্ত এ সাত বছর সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন শিল্পী গোপাল ঘোষ। ঘুরেছেন নানাভাবে সাইকেলে, উটের পিঠে, ট্রেনে, পায়ে হেঁটে ঠিক পর্যটকের মতই। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় চলে এলেন গোপাল ঘোষ। ঐ বছরেই মাদ্রাজের সহপাঠিনী মিস আইরিশ খানের (বর্তমানে বিবাহিতা ও অন্য উপাধিধারিণী) সহায়তায় স্কটিশ চার্চের ডাগুাস হোষ্টেলের বি, টি, ডিপার্টমেন্টের লেকচারারের আসনে সমাসীন হলেন (মিস খানের বোন লয়লা থাষ্ট তখন ডাগুাসের তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন)। ১৯৩৯ সালে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হলের উদ্বোধন করলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ—সেখানে ফ্রেসকো সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার ভার পেলেন গোপাল ঘোষ, কয়েক মাস বাদেই যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধ শুরু হতেই গোপাল ঘোষেরও আবার নতুন করে শুরু হল ভারতভ্রমণ, ভ্রমণ পিপাসু মন চলিষ্ণুতার আনন্দে নেচে উঠল। তারপর ঘটনার পর ঘটনা, অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত, জীবনের নানা রাস্তা ধরে এঁকে-বেঁকে নানা ভাবে চলা—এ ভাবে জীবনের আরও সাতটা বছর কেটে যায়। বহুবিধ ঘটনাবৈচিত্র্যের পর ১৯৪৬ সালে দিল্লী যান। দিল্লীতে ১৯৪৭ সালের ১৮ই জানুয়ারী তাঁর একটি চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয় (ঠিক সেই দিনই মাত্র ৪১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হলেন বিখ্যাত শিল্পী কুন্দনলাল সায়গল, এ স্মৃতি গোপাল ঘোষের মনে আজও অম্লান দীপ্তিতে জাজ্বল্যমান)। ১৯৪৮ থেকে ৪৯ পর্যন্ত শিবপুর বি, ই, কলেজে ললিতকলা বিভাগের প্রবক্তার আসনে দেখা গেছে গোপাল ঘোষকে—বিষয় ছিল স্থাপত্যের সঙ্গে ললিতকলার সম্পর্ক। বর্তমানে (১৯৫১ সাল থেকে) কলকাতার সরকারী শিল্প ও কারু মহাবিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগগুলির প্রবক্তার আসনে গোপালচন্দ্র সমাসীন।

রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে গোপাল ঘোষ। ১৯৩২ সালে লণ্ডনে তাঁর আঁকা ছবি প্রদর্শিত হয়। চীন, জাপান, মস্কো, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি স্থানে তাঁর চিত্রাবলী সাদরে ক্রীত হয়েছে। জীবনের প্রথম ছবি আঁকার দিন থেকে আজ পর্যন্ত সবশুদ্ধ প্রায় কুড়ি হাজার ছবির জন্ম হয়েছে গোপাল ঘোষের তুলি থেকে (সময় সময় কলম থেকেও—কলম বা কলমের সাহায্যে চিত্রসৃষ্টি করতেও তিনি সিদ্ধহস্ত) ড্র... তাঁর অপার আনন্দ। গাছপালা, বাগানের উপরও তাঁর আসক্তি, তাঁর চরিত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য যে নিজের দৈনন্দিন সাংসারিক কাজেও তিনি কখনও পরের উপর নির্ভরশীল নন, চির আত্মনির্ভরশীল, যেমন, দিনের পর দিন গেছে তিনি নিজে বা...

করেছেন, রান্না করেছেন, ঘর পরিষ্কার করেছেন, কাপড় কেচেছেন, ইস্তিরি করেছেন ইত্যাদি যাবতীয় খুঁটিনাটি ঘরোয়া কাজ, অবশ্য বিবাহের পর সহধর্মিণীর কাছে এ সব বিষয়ে প্রভূত সাহায্য পেয়ে আসছেন।

ঢাকুরিয়া লেকের কাছাকাছি বালিগঞ্জ গার্ডেন্সএ শিল্পীর বাসস্থান। স্ত্রী ও একটিমাত্র বালিকা কন্যাকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। কোন এক রবিবার। ছুটির দিন। সকাল বেলায় হঠাৎ হানা দিয়েছিলুম শিল্পীর গৃহে। ঘু' আড়াই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার ফাঁকে কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলুম—শিল্প ও শিল্পী—আজকের দিনে এদের গতি যে পথ দিয়ে এগিয়ে চলছে এর পরিণাম কি—উত্তর এল—ভালো নয় কারণ যে পথ অবলম্বন করে আজকের দিনের শিল্প ও শিল্পী অগ্রসর হচ্ছে এ পথটাই প্রকৃত পথ নয়, নির্বাচনেই ভুল হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করি তা হলে পথ পরিবর্ত্তনের উপায় কি—শিল্পী উত্তর দেন দৃঢ়তার সঙ্গে বাপ-মায়ের বাধ্য হওয়া, তাঁদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করা এবং তাঁদের উপদেশাদি নির্বিচারে মেনে চলা, ব্যাখ্যা করে বলি—শিল্পই বলুন বা যে কোন বিষয়ই বলুন এই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ যারা করবে—তাদেরই উপর নির্ভর করছে বিষয়গুলির ক্রমোন্নতি, এই শক্তিধর সৃজনী প্রতিভা-সম্পন্নের দল যে সৃষ্টি করবেন—সেই সৃষ্টির জন্যে যথাপ্রয়োজনীয় শিক্ষা তাঁরা কোথায় পাবেন, এ শিক্ষা পুঁথিগত শিক্ষা থেকে পাওয়া যায় না, পিতা-মাতার বাধ্য হতে হবে তাদেরই কাছে আসল শিক্ষা, সেইখান থেকে উপযুক্ত শিক্ষালাভ ঘটলে তবে দেশ ও দশের হিতকর পাঁচটা ভালো কাজ তারা করতে পারবে। কিন্তু আজকাল পিতা-মাতার প্রতি বাধ্যতা অনেক কমে গেছে। উপযুক্ত শিক্ষা ছেলেরা পাচ্ছে না, যথার্থ শিক্ষার অভাবের জন্যেই তাদের সৃজনী প্রতিভারও যথাযথ স্ফুরণ ঘটছে না। কথার ফাঁকে আর একবার প্রশ্ন করলুম—আচ্ছা, শিল্পীর চেতনা কি করে জন্মায়—উত্তর পেলুম—ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সত্যের পক্ষ নিয়ে লড়তে লড়তে, যে শিল্পীর জীবনে ঘাত প্রতিঘাত আসে নি তার চেতনা জাগ্রত নয়; ঘুমন্ত। অবচেতন মন থেকে এক বিচিত্র অনুভূতি জন্ম নেয়—এই অনুভূতিটি কি-এ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় উত্তর পেলুম—ভীষণ ধরণের এক অবর্ণনীয় আনন্দ ঐ একটি জায়গায় বোধহয় মানুষ ভগবানের পায়ে একেবারে লীন হয়ে যায়, সে সময় তার কোন পারিপার্শ্বিক জ্ঞান থাকেনা, তাকে কেন্দ্র করে শত্রুর দল সে সময়ে প্রাণপণে চীৎকার করে—তা সত্ত্বেও যে শিল্পী সে অটল। আমি জানতে চেয়েছিলুম শিল্পীর নিজস্ব জগৎ বলতে কি বোঝায় এবং তা কেমন করে গড়ে ওঠে—উত্তরে জানলুম একাকীত্ব—পরিপূর্ণ একাকীত্ব ভিড়ের মধ্যে থাকলেও একটি জায়গায় সে একেবারেই একা এইখানেই তার নিজস্বতা আর তা গড়ে ওঠে প্রকৃতির সুষ্ঠু নিয়মানুসারে।

আদিম অতৃপ্তির মধ্যে একটুখানি পরিতৃপ্তি, দুর্ভেদ্য গহন অন্ধকারের মধ্যে তমঃনাশ করে দেখা দেয় দেবতার প্রসাদী ফুলের মত একটু আলো, কালোমেঘের মত পুঞ্জীভূত ব্যর্থতার পর আলোময় সূর্যের মত এক পরিপূর্ণ সফলতা—এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই শিল্পীর জন্ম, শিল্পীর বিকাশ, শিল্পীর গতি, শিল্পীর জয়যাত্রা সর্বোপরি শিল্পীর জীবন জিজ্ঞাসা।

## শ্রীমিহিরকুমার সেনগুপ্ত

[ ব্যারিষ্টার ও প্রথম ভারতীয় ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী ]

১৯৫৫ সাল—ঝড়ের জন্যে এগারো ঘণ্টা তেত্রিশ মিনিট সন্তরণের পর এক তরুণ অসমর্থ হলেন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমণে, ১৯৫৬ সাল—আবহাওয়ার বিপর্যয়ে তিনি আবার বিফল হলেন, ১৯৫৭ সাল—চোদ্দ ঘণ্টা সাতচল্লিশ মিনিট জলে অবস্থানের পর পথ প্রদর্শকের (পাইলট) ভ্রান্তিতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে এল অসাফল্য। আর ১৯৫৮ সাল—সাতাশে সেপ্টেম্বর সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে শুনল যে সর্বপ্রথম একজন এশিয়াবাসী তরুণ চোদ্দ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ব্রিটিশ উপকূল থেকে ফরাসী উপকূলে এসে উঠেছেন ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পেরিয়ে, ভারতবাসী সচকিত হয়ে জানল যে এই তরুণ হলেন বাঙলার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান ভারতের গৌরব ব্যারিষ্টার শ্রীমিহির সেন—শ্রীমিহিরকুমার সেনগুপ্ত।

১৯২৯ সালের ১৬ই নভেম্বর ডাঃ রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী লীলাবতী দেবীর প্রথম সন্তান মিহিরকুমার পুরুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমান জেলার আদিবাসিন্দা এক বিশিষ্ট বৈদ্য পরিবারের সন্তান ইনি। তাঁর ঠাকুরদাদা স্বর্গীয় ডাঃ গিরীশচন্দ্র সেনগুপ্ত চিকিৎসক হিসেবে উড়িষ্যার নয়াগড় দেশীয় রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করেন ও পরে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হন। বাবা রমেশচন্দ্র বিহার উড়িষ্যা চিকিৎসাবিভাগের চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করে কটকে বসবাস সুরু করেন। দাদামশাই ছিলেন পাটনার বিশিষ্ট

শ্রীমিহিরকুমার সেনগুপ্ত

আইনব্যবসায়ী (পরে বিচারক) স্বর্গীয় নন্দকিশোর চৌধুরী। মিহিরকুমার ১৯৪৪ সালে কটক র‍্যাভেনশ বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা, ১৯৪৬ সালে র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে আই, এস, সি, ১৯৪৮ সালে বি, এস, সি এবং ১৯৫১ সালে সেখান থেকে প্রথম শ্রেণীতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিদেশে পড়ার আগ্রহ ছিল বরাবর তাই ঐ বছরেই লণ্ডনের লিঙ্কনস ইনে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্তে ছাত্র হিসেবে ভর্তি হলেন। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—খুব বেশী অর্থের সংস্থান হয় নি—তাই এক হপ্তার খরচ সম্বল করে লণ্ডনে হাজির হলেন, গিয়েই স্থানীয় রেলওয়ে ষ্টেশনে কাজ নিলেন। কিছুদিন বাদে ডাকঘরে চাকরী জোগাড় করেন ফলে পড়াশুনোয় ব্যাঘাত ঘটতে থাকল তাই একদিন হাজির হলেন লণ্ডনস্থ তদানীন্তন ভারতীয় হাই কমিশনার (বর্তমানে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী) শ্রী ভি, কে, কৃষ্ণমেননের সামনে। একটি কেরানীর চাকরী মিলল তাঁর দপ্তরে। ১৯৫৩ সালে তিনি ইণ্টারন্যাশনাল ইউথ হাউসে যোগ দিয়ে ক্লাব ইণ্টারন্যাশানাল গড়লেন এবং সম্পাদক হিসেবে বিদেশাগত সমস্ত ছাত্রদের সঙ্গে বক্তৃতা, সিনেমা প্রদর্শনী, বিতর্ক সভা ইত্যাদির নিয়মিত আয়োজন করেন। পূর্ণ তিন বছরের শিক্ষাশেষে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বখ্যাত আইনরথী ডি, এন, প্রিটের সহকারীত্ব করতে থাকেন। বিরাট পণ্ডিত, অসীম ব্যক্তিত্ববান, উদার মনোভাবসম্পন্ন ও ন্যায়ধর্মী মিঃ প্রিটের অপার স্নেহ শ্রীসেনের উপর বর্ষিত হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বহু আসামীকে মিঃ প্রিট মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৫৫ সালে লণ্ডনের এক পেশাদার রঙ্গালয়ে ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে শ্রীসেন শরৎচন্দ্রের দেবদাস (ইংরিজীতে অনূদিত) অভিনয় করে বিপুল প্রশংসালাভ করেন।

ছেলে বেলায় আর পাঁচজন কিশোরের মতই মিহিরকুমার সাঁতার কাটা শিখেছিলেন। নদী পারাপার বা সাঁতারের প্রতিযোগিতায় কখনও অবতীর্ণ হননি। বিলেতে থাকার সময় তিনি ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়ার কথা শুনতেন। সেইজন্তে ১৯৫৩ সালে তিনি চ্যানেল সুইমিং য়্যাসোসিয়েশানে অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে কোন ভারতীয় তখনও পর্যন্ত চ্যানেল অতিক্রমণের জন্তে আবেদন করেন নি, তাঁর অন্তর বলে উঠল যে স্বাধীন ভারতীয়েরা কেন এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করবে না কেন ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে আপন আসন আরও গুরুত্বপূর্ণ করবে না, দুর্গমকে সুগম করবে না, দুর্লঙ্ঘ্যকে সুলঙ্ঘ্য করবে না, যে দুরতিক্রম্য কেন তা সহজে অতিক্রম্য হবে না, কেন অনাবিষ্কৃত রহস্তের সন্ধানে ভারতবর্ষ রত হবে না? বাঙালী তথা ভারতীয় যুবশক্তির পক্ষ থেকে তিনি অর্থাভাব, সহায়শূন্ততা, সন্তরণে অনৈপুণ্য ও আনুসঙ্গিক বিপদকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে এলেন। ১৯৫৪ সালের শেষ দিকে আরম্ভ করলেন একাগ্র সাধনা, একাগ্রতাপূর্ণ এই সাধনার বিষয় জানলেন কেবলমাত্র একজন তিনি পরবর্তীকালের শ্রীমতী সেন—ইংরাজনন্দিনী মিস বেলা ভাইনগার্টেন (Bella Weingarten), শেষে মিহিরকুমার আবেদন করলেন অর্থসাহায্যের জন্তে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে। শ্রীনেহরু যোগাযোগ স্থাপন করলেন লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের সঙ্গে, বাঙালী সন্তরণপ্রয়াসীর দক্ষতা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্তে। চ্যানেল সন্তরণ সমিতিও সুপারিশ করলেন শ্রীসেনের অনুকূলে। অর্থ সাহায্য পেলেন কিছুটা। পর পর তিন বছরের অসাফল্য মিহিরকুমারকে দমিত করতে পারেনি বরং দৃঢ়তা এনে দিল তাঁর মনে। চতুর্থ বারে তিনি চ্যানেল পার হলেন ডোভার থেকে ক্যালে অবধি। সময়ের রেকর্ডে তিনি পেলেন চতুর্থ স্থান তেরোজন পূর্ব সূরীদের মধ্যে। সমিতির সভাপতি মার্শাল ফ্রি বার্গ ভি, সি, নিজের হাতে প্রশংসাপত্র দিলেন বিজয়ী ভারতীয় তরুণকে। বিলেতের সংবাদপত্রগুলি তাঁর কৃতকার্যতার ভূয়সী প্রশংসা করলেন আর ভারত সরকার 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে চ্যানেল সুইমিং য়্যাসোসিয়েশানের নিজস্ব কোন প্রতিযোগিতা নেই, কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চ্যানেল পারাপারের জন্তে পুরস্কার দিয়ে থাকেন। চ্যানেল অতিক্রমণের আয়োজনে লণ্ডনে শ্রীমানিক মিত্র তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছেন।

ভারতীয় যুবশক্তিকে অভিযানপ্রয়াসী, বিশ্বনেতৃত্বমুখী ও তার ঘরকুণো স্বভাব দূরীকরণে সাহায্য করার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সম্প্রতি শ্রীসেন এক্সপ্লোরার্স ক্লাব (অভিযাত্রী সঙ্ঘ) গঠনে উদ্যোগী। প্রধানমন্ত্রী সহ বহু বিশিষ্ট ভারতীয় এই প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন। শ্রীসেন জানালেন যে ডিগ্রীর মোহ ছেড়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা এগিয়ে চলুক অনাগত ভবিষ্যতের দিকে, অনুচ্চারিত মতবাদের, অজানা পরিবেশে আর অনাবিষ্কৃত রহস্তের উৎস সন্ধানে এবং বাঙলার যুবক-যুবতীর দল আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করুক। অভিযাত্রী সঙ্ঘের শাখাপ্রশাখা দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন মিহিরকুমার আরও কয়েকজনের সহযোগিতায়।

Calcutta Swimming Club, Calcutta Rowing Club, Calcutta Football Club, Bengal Club, Saturday Club, Tollygunj Turf Club, Swiss Club এবং Calcutta Cricket Club—এই আটটি বিদেশী সংস্থায় অশ্বেতকায় ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার আজও নিষিদ্ধ—অশ্বেতকায়দের প্রতি এইরকম নিন্দনীয়, অপমানকর এবং অসম ব্যবহারের বিপক্ষে তিনি কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন ও এই সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করছেন।

প্রথম যখন তাঁর ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমণের প্রচেষ্টার সংবাদ ভারতবর্ষে প্রচারিত হয় তখন বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি এদেশ থেকে তাঁকে অভিনন্দিত করেন কিন্তু দুঃখের সঙ্গে তিনি জানালেন যে বাঙলার কোন সন্তরণ সংস্থা তাতে যোগ দেন নি বোধহয় ভারতীয় সন্তরণবীরদের মধ্যে তিনি ছিলেন "Intruder"—যেহেতু পেশার দিক দিয়ে দেখলে তিনি হলেন বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন ব্যারিষ্টার।

## গ্রাহক-গ্রাহিকাদের প্রতি :—

[ আগামী নববর্ষে ১৩৬৬ সালের বৈশাখ মাসে মাসিক বসুমতীর বর্ষারম্ভ। আমাদের বহু পুরাতন ও অনুরাগী গ্রাহক-গ্রাহিকাদের অনুরোধ, আসন্ন বৈশাখের পূর্ব্বে আগামী বর্ষের গ্রাহক-মূল্য পাঠাইতে হইবে। পত্রিকার চাহিদাবৃদ্ধির জন্ত বিলম্বে হতাশ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। ]

## বাঙলা সাহিত্যের মান

বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির মান ও মর্য্যাদা সকল সময়ে রক্ষাপ্রাপ্ত না হলেও বাঙালী জাতির চেষ্টার অন্ত নেই বাঙলার যশ ও সুনাম বজায় রাখতে। আমরা গত কয়েক বছরের দিন পঞ্জী লক্ষ্য করে দেখলাম সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সম্মানদানের সুযোগ বাঙালী কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না। সাহিত্যের যথারীতি ধারাবাহিক উন্নতি হোক বা না হোক, প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টির সন্ধান দুর্লভ হলেও বাঙালী সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর যেন। অনেকেই সংবাদপত্রে দেখেছেন, বেশ কয়েকটি সাহিত্য পুরস্কারের ব্যবস্থা সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে। পত্রপত্রিকার স্বত্বাধিকারিগণের সহৃদয়তার অনুকরণে বাঙালী প্রকাশকরাও সাহিত্য পুরস্কার দানের প্রথা চালু করতে পারেন। বিদেশে বহু বিখ্যাত প্রকাশক এই পুরস্কার ঘোষণায় কত অমূল্য সাহিত্যের প্রকাশ ব্যবস্থা ব্যবসায়ে নিয়োগ করেন। লেখক লেখিকারা উৎসাহিত হন শুধু মাত্র কাগজের সার্টিফিকেট বা খেতাবের মোহে নয়, হয়তো অভাব অনটন ও দুঃখদারিদ্র্য ক্লিষ্ট সাহিত্যিকের সামান্য আর্থিক উপকারের আশায়।

যাই হোক, বাঙালীর ঘরে ঘরে, আসরে ও সভায় সাহিত্যসেবীদের আহ্বান জানানো হয়। কলকাতা শহরের বহু উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতি সম্মেলনের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় খ্যাতিমান সাহিত্যরথীদের। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অন্যান্য প্রদেশে বাঙলার সাংস্কৃতিক প্রচারকার্য্য করে। জামসেদপুরের সাহিত্য সম্মেলন বাৎসরিক ঘটনায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে পরলোকগত সাহিত্যিক ও কবিদের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠান সগৌরবে পালন করা হয়। যাঁরা একদা অবহেলার মধ্যে ছিলেন লুপ্তপ্রায়, তাঁদের প্রতি দেশবাসী শ্রদ্ধা জানাতে আজ উদ্যোগী। বিস্মৃতকে আমরা আবার স্মরণ করেছি। বাঙলাদেশের গীতিকার—পদকর্ত্তাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুলের সঙ্গীতসুধায় বাঙলার আকাশ জল মাটি আজ মুখরিত। গায়কগায়িকা ও যন্ত্রশিল্পীদের ডাক আসছে সম্মানের সঙ্গে। আমাদের দেশে কোন সভা বা অনুষ্ঠান যেন সাহিত্যিক ও সঙ্গীতশিল্পী ব্যতিরেক সম্পন্ন হতে পারে না আজকাল। এই বিরাট প্রচারের ফলে সারা ভারতে বঙ্গসংস্কৃতির জোয়ার আবার কি বইছে না? এখন আমাদের কর্তব্য ভারতবর্ষের বাইরে বাঙলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার কিরূপে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। সরকারের সাহায্য পাওয়া ইদানীং আর দুর্লভ নয়।

বাঙলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির যুগ যুগ সঞ্চিত খ্যাতির ভিত্তি কঠোর কঠিন। সহসা ধ্বংসপ্রাপ্তির কোন আশাই নেই। এমন কি শত্রুর ডিনামাইটও কোন ফাট ধরাতে পারবে না।

কিন্তু দেশের সাহিত্যিকরা সেই সুকঠিন ভিত্তির উপরে যে বনিয়াদ রচনা করবেন তাই হবে উত্তরকালের ধারক বা বাহক। ভয় হয়, নকল আর ভেজালে বাজার পরিপূর্ণ। আসল আর মেকীর তফাৎ ধরা পড়ছে না চাকচিক্যের জৌলসে। অশিক্ষিতের শিক্ষাপটুত্ব বাঙলার সাহিত্যকে যেন গ্রাস না করে। লেখনীধারণের অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হ'লে হয়তো এই সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। নতুবা বঙ্গসাহিত্যের ভিত্তি এক দিন যে টলমলিয়ে উঠবে না কে বলতে পারে?

বাঙালী সাহিত্য ও সংস্কৃতির পূজারী। কিন্তু দেব আর দেবীরা যদি জাগ্রত না হন তবেই যে বিপদের আশঙ্কা! কূপমণ্ডুকতা শব্দটি সাহিত্যের অভিধানে খুঁজে মেলে না। এই আদিব্যাধিকে আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যের জরা-রোগ আখ্যা দেওয়া যায়।

বাঙালী জাতির দোষ নেই, দোষ নেই। গুণীর প্রতি জ্ঞানীর প্রতি বাঙলার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা চিরকালের।

# উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

## যুদ্ধের ইয়োরোপ

কল্লোলযুগের সাহিত্যিক মালদা জেলার অধিবাসী গিরিজা মুখোপাধ্যায়কে ভাগ্যচক্রে দেখা গেল ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে সমর-সাংবাদিক হিসেবে। বিশ্বের আকাশ-বাতাস তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষাক্ত বাষ্পে ভরপুর। যুদ্ধের পটভূমিকায় ইয়োরোপকে বিশেষ করে প্যারীকে কেন্দ্র করে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মিশিয়ে দিয়ে ইয়োরোপ রচনা করলেন মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থটি অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করেছিল। এই গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে ইয়োরোপকে নতুন এক দৃষ্টি কোণ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন গিরিজাবাবু। যুদ্ধের প্রভাব ইয়োরোপের জীবনধারাকে কতদূর পরিবর্তিত করেছিল সে সম্বন্ধে এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। এই গ্রন্থটি সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর সুসাহিত্যিক ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী বলেছেন—"বইটিতে মুখুজ্যে ইয়োরোপ দেখেছেন নানা দৃষ্টিকোণ থেকে, নানা পটপরিবর্তনের সামনে, পয়লা সারিতে বসে উত্তম বই।" এ অভিমত উদ্ধৃত করার পর বইটির সম্পর্কে আর নতুন করে কিছু বলার থাকে না। বর্তমানে এই গ্রন্থটি অবলম্বন করে যুদ্ধের ইয়োরোপ রচনা করেছেন বাঙলার খ্যাতিমান সাহিত্যিক বিক্রমাদিত্য। গ্রন্থটি তাঁর সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির পরিচায়ক। ইয়োরোপের যুদ্ধকালীন আভ্যন্তরীণ চিত্র সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহল পোষণ করেন তাঁরা অবশ্যই লাভবান হবেন এই গ্রন্থটি পাঠ করে। ঘটনাবিন্যাস এবং বর্ণনভঙ্গী যথোচিত নিপুণতায়

স্বাক্ষরবাহী। উল্লিখিত চরিত্রগুলি লেখার প্রসাদে মাঝে মাঝে যেন জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়। বিক্রমাদিত্য এই যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যবান গ্রন্থটি বাঙলাদেশের পাঠকসমাজে উপহার দেওয়ার জন্তে সকলের আন্তরিক ধন্তবাদ দাবী করতে পারেন। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনে সূর্য রায় শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, দাম—চার টাকা মাত্র।

## আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা

অতীতকালের ভারতবর্ষের বিজ্ঞান সাধনা সারা বিশ্বের লাভ করেছে শ্রদ্ধা। ভারতের বিজ্ঞানকর্ম তার সংস্কৃতির পুষ্টির পথে সেদিন সহায়তা করেছে প্রভূত পরিমাণে। বর্তমান যুগে ভারতীয় বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা এক নবতর পথ দিয়ে এগিয়ে চলছে—নতুন আঙ্গিকে, সেইযাত্রার সূচনা হল আধুনিক ভারতীয় বিজ্ঞানের জনক জগদীশচন্দ্রের নেতৃত্বে। বিজ্ঞানকে এক অভিনব রূপ দিলেন জগদীশচন্দ্র। তাঁকে অনুসরণ করে শত শত বৈজ্ঞানিক দেশের বৈজ্ঞানিক সম্পদকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তুলতে লাগলেন। জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাদীপ্ত কর্মবহুল গৌরবোজ্জ্বল একটি জীবনকাহিনী রচনা করেছেন শ্রীঅনাদিনাথ পাল। জীবন-চরিতটি যদিও কিশোরদের জন্তে সপ্তম ও অষ্টম মানের সহপাঠ্যের উপযোগী করে লেখা তা হলেও কৈশোরের সীমা যাঁরা অতিক্রম করে গেছেন তাঁরাও এই গ্রন্থটি পাঠ করে উপকৃত হবেন। এই সুলিখিত, সারগর্ভ, তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটির মাধ্যমে লেখক বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক নির্বিশেষে সকলকেই সমান তৃপ্তি দিতে সমর্থ হয়েছেন! বিজ্ঞানগুরুর কয়েকখানি এবং তাঁর জনক-জননীর একটি করে আলোকচিত্র গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছে। প্রকাশক—আসাম বুক ডিপো, ২১ পটুয়াটোলা লেন। দাম—পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

## ঝাঁপতাল

বর্তমানকালে বাঙলা দেশে সত্যিকারের লেখিকার সংখ্যা অনধিক বললেই চলে কিন্তু তবুও সেই বিরল সংখ্যক লেখিকাদের মধ্যে যাঁরা অফুরন্ত শক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছেন শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারের স্থান তাঁদের পুরোভাগে। লীলা মজুমদারের লেখনী সকল সময়েই বৈচিত্র্যের অন্বেষণে ব্যাপৃত, গতানুগতিকতার দোষে কোনকালেই দুষ্ট নয়। উপরোক্ত গ্রন্থটি একটি নাতিদীর্ঘ উপন্যাস। অভিনবত্বে, বৈশিষ্ট্যে, স্বকীয়তায় ভরপুর। জীবনটা যে কেবলমাত্র হিসেবের ছক নয়—রক্তের সম্পর্কের বা নাড়ীর টানের আবেদন সমস্ত হিসেব নিকেশের অনেক উর্দ্ধে—এই চিরন্তন সত্যটিই অপূর্বভাবে চিত্রিত হয়েছে শ্রীমতী মজুমদারের অনবদ্য লেখনীর মাধ্যমে। প্রধানতঃ অলি মাসিমা এবং তাঁকে কেন্দ্র করা নেপু, তার স্বামী, কেয়া, অলক, আনন্দ প্রমুখ চরিত্রগুলি এবং সর্বোপরি গ্রন্থের নামকরণ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এক অভিনব আঙ্গিকে লেখা এই উপন্যাসটি পাঠক পাঠিকার চিন্তাধারায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে বলে বিশ্বাস করি। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন শ্রীঅজিত গুপ্ত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ গান্ধী রোড। দাম—দু'টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র।

## মহুয়া কথা

শুধু উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নয় ছোট গল্পের ক্ষেত্রেও বাঙলাদেশের পাঠক-পাঠিকা যশস্বী সাহিত্যশিল্পী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। সাহিত্যে জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্যক প্রস্ফুটনে, অবচেতন মনের অস্পষ্ট ইসারাকে লেখনীর মাধ্যমে সুস্পষ্ট প্রকাশে জীবন সম্পর্কিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রশ্নগুলিকে ভাষার মধ্যে জীবন্ত করার ক্ষেত্রে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দক্ষতা অপরিসীম। ছোট এবং বড় কয়েকটি গল্পের সমষ্টি এই গল্পগ্রন্থটির সর্বাঙ্গে তাঁর সৃজনী প্রতিভার আলেখ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখক জীবনকে তথা মানুষকে অনুধাবন করেছেন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, তীব্র অনুভূতি দিয়ে এবং বলিষ্ঠ মনন সম্পদ দিয়ে—গল্পগুলি পাঠ করলে কথাশিল্পীর শিল্পীমন সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই ধারণাই মনে জন্মায়। গল্পগুলির মধ্যে কুমারসম্ভব, তিলে তিলে তিলোত্তমা, ভুল ভুলাইয়া, মদনভস্ম মহুয়া কথা, সেলিম-চিশতির কবর প্রভৃতি গল্পগুলি অবশ্য পঠিতব্য। গল্পগুলির মধ্যে পাঠক প্রাণের স্পর্শ পাবেন, নবজীবনের ইঙ্গিত পাবেন, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান পাবেন। কানাই পালের আঁকা প্রচ্ছদচিত্রটি গ্রন্থের শোভাবর্ধন করেছে। প্রকাশক—গুপ্ত প্রকাশিকা ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

## চৈত্রদিন

শক্তিমান সাহিত্যকার ননী ভৌমিকের সাহিত্যিক খ্যাতি কারোরই অজানা নয়। সারগর্ভ সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা সর্বজনবিদিত। দু'দিনের জন্তে মানুষ পৃথিবীতে আসে তারপর কায়িক ভাবে সে পৃথিবীতে থাকে না বটে তার বেঁচে সে থাকে ঘটনার মধ্যে, কাহিনীর মধ্যে, কর্মের মধ্যে, যে স্বচ্ছন্দ কর্মধারা মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে বিকশিত করে, ভরিয়ে তোলে বাঁচিয়ে রাখে রাজনীতিরও স্থান তাদের মধ্যে সংরক্ষিত। রাজনৈতিক পটভূমিকার উপর মানুষকে কেন্দ্র করে ননী ভৌমিকের লেখা কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন উপরোক্ত গ্রন্থটি। প্রতিটি গল্প বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক বৈচিত্র্যবান ও তাৎপর্যবাহী। গল্পগুলি অন্বেষণধর্মী, তবে তার সঙ্গে বিশ্বাস মেশানো আছে। বিশ্বাসবিহীন অন্বেষণে লেখকচিত্ত সাড়া দেয় না এই প্রাণস্পর্শী গল্পগুলির মধ্যে পলাশ সন্ধ্যা, বিজ্ঞাপন পাওয়া না পাওয়া, বাংলা, মরদ, চৈত্রদিন প্রভৃতি গল্পগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। প্রচ্ছদ চিত্র অঙ্কনে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন সুখ্যাত শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী। প্রকাশক—ন্যাশানাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম চার টাকা মাত্র।

## ঝরাবকুল

'কৃষ্ণ কলি' ছদ্ম নামের অন্তরালে এক নবাগতার রচিত পূর্বোক্ত উপন্যাসটি তাঁর সৃজনী প্রতিভার ছাপই বহন করছে। সাহিত্যের আসরে লেখিকা নবাগতা হলেও তাঁর উপন্যাস পাঠ করে বোঝা যায় যে ভবিষ্যতে বাঙলা সাহিত্যের পুষ্টির ক্ষেত্রে তিনি অনেকখানি সহায়তা করতে পারবেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে স্বচ্ছতা আছে, চিন্তাধারার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, লেখার মধ্যে স্বকীয়তা আছে। তাঁর ভাষা মনোরম বর্ণনা ভঙ্গী সুন্দর ঘটনাবিন্যাস সুনিপুণ। এই বাস্তবধর্মী উপন্যাসটিতে মানুষের জীবনের প্রকৃত সমস্যাকে সফলতার

সঙ্গে চিত্রিত করে লেখিকা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। আমরা লেখিকার সাহিত্য জীবনের একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করি। প্রচ্ছদ চিত্রটি অঙ্কিত করেছেন শ্রীসুনীল রায়চৌধুরী। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

## অপরূপা

শৈলজানন্দ কেবলমাত্র যে একজন শক্তিমান কথাশিল্পী শুধুমাত্র এইটুকু বললে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। বাঙলা সাহিত্যের একটি অমুদ্ঘাটিত দিক সম্বন্ধে পাঠকসমাজকে সচেতন করে সেই দিকটিকে কেন্দ্র করে অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারা বাঙলা সাহিত্যের মান বহুলাংশে বর্ধিত করেছেন শৈলজানন্দ। সাধারণ পাঠকের অবগতির এলাকা থেকে শতহাত দূরে অবস্থান করত যে সকল মানুষ, যে সকল চরিত্র যে সকল সমাজ সেই অচেনা মানুষ, অদেখা চরিত্র অজানা সমাজ সাধারণ পাঠকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করতে সমর্থ হল শৈলজানন্দের লেখনীর কল্যাণে। বাঙলা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধির সহায়ক শৈলজানন্দের যে অসংখ্য গল্প তখন (বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকই মুখ্যত: ধরা যাক) সাড়া জাগিয়েছিল সাহিত্যজগতে তাদের মধ্যেই দুটি গল্প (ষোল আনা ও বাণভাসী) একত্রে সংকলিত করে উপরোক্ত গ্রন্থটির সৃষ্টি। বাণভাসীর নাম বদলে অপরূপা রাখা হয়েছে। গল্প দুটিতে লেখকের অনুভূতিপ্রবণ আবেগপুষ্ট দরদসম্পন্ন মনের ছাপ ফুটে উঠেছে। গল্পদ্বয় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। মানুষ, তার সমাজ ও তার মনের গতি বৈচিত্র্যকে লেখক যে এক অভিনব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে গল্পদ্বয় পাঠ করলে। সহজ প্রাঞ্জল ও নিপুণ বর্ণনায় বর্ণিত চরিত্রগুলি যেন স্থান বিশেষে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই গ্রন্থখানির প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনে শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন শ্রীসমীর সরকার। প্রকাশক ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম চার টাকা মাত্র।

## দু' কুনকে ধান

দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় কথাশিল্পী তকষী শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের চেম্মিন নামক উপন্যাসটি গত বছর সাহিত্য আকাদমীর পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে কারণ বিচারকদের দ্বারা এই উপন্যাসটি সেই সময় মালয়ালাম ভাষায় রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে স্বীকৃত হয়েছে। পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রন্থটির বাঙলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী মলিনা রায়। মূল লেখকের সাহিত্যিক খ্যাতি সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয় বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্যজগতে তাঁর স্থান পুরোভাগে। গ্রন্থটির পটভূমিকা হচ্ছে কুট্টনাডের জলাভূমির ভূমিহীন চাষীদের জীবন। শ্রীপিল্লাইয়ের রচনার মাধ্যমে তাঁর সহানুভূতিসম্পন্ন মনের সহৃদয় মনোভাবের এবং দরদভরা অন্তর্দৃষ্টির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ভেসে ওঠে। জীবনের সংগ্রামময় রূপটি তিনি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছেন এবং সেই রূপটিই অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে সমাজ অবলম্বন করে এই উপন্যাসটি রচিত সেই সমাজের বাসিন্দাদের আবেগ, অনুভূতি, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন লেখক তাই তাঁর লেখনী থেকে সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্রটি এত নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠতে পেরেছে। গ্রন্থটি অনুভূতিসম্পন্ন মানুষের মনে এক অভিনব আবেদন জাগাতে সমর্থ হবে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশংসনীয়। শ্রীমতী রায়ের অনুবাদও সুন্দর, জড়তাহীন ও স্পষ্ট। সাবলীলতায় ভরপুর তাঁর এই অনুবাদ গ্রন্থটি বাঙালী পাঠক সমাজে উপযুক্ত আসনই পাবে এ বিশ্বাস আমরা রাখি। অনূদিত এই গ্রন্থটি যথাযথ সমাদর লাভ করুক—এই আমাদের কাম্য।—প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। দাম—তিন টাকা মাত্র।

## আলোর আকাশ

বর্তমানকালে যে তরুণের দল কবিতা রচনার মাধ্যমে সাহিত্যের সেবা করে চলেছেন ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁদের অন্যতম। রৌদ্র-জ্যোৎস্নার পর তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থটিও তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয়বাহী। কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ এবং কবির বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর বহন করে, সর্বোপরি কবিতাগুলির মধ্যে এক রসঘন প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়। গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছেচল্লিশটি কবিতার মধ্যে অবিস্মরণীয়া, সামুদ্রিক, অভিসরণ, অনন্যা, আকাশ, প্রচ্ছন্না, উৎস, পরমা, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিতাগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্যের ছাপ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পাঠকসমাজে কবিতাগুলি তাদের যথাপ্রাপ্য সমাদর লাভ করুক—এই কামনাই করি। প্রকাশক এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। দাম দু' টাকা মাত্র।

## মিষ্টিমন

আজকের দিনে যে তরুণ কবিদের আন্তরিক সেবায় বাঙলা-সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের নাম। তাঁর কবিতায় মানবহৃদয়ের এক চিরন্তন আবেদনের ছাপ ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে। কবিতাগুলির মধ্যে জড়তার ছাপ নেই, তাঁর কবিমন-জাত এক অনুপম অনুভূতিতে পূর্ণ, লালিত্যে ব্যঞ্জনায় আবেগে ভরপুর। কবিতাগুলি হৃদয়ধর্মী, এবং কবির নিষ্ঠা, দরদ ও আন্তরিকতার পরিচয়বাহী। গ্রন্থটিতে সংযোজিত প্রাণস্পর্শী কবিতাগুলির মধ্যে মিষ্টিমন, আদিম অতৃপ্তি, দূরের আকাশ নীল, রক্তনীলা, নরমনিবিড়, বনলতা সেনকে, সজল মিছিল, যৌবন জীবনে, দুরন্ত মেঘ, তিমিরতীর্থ প্রভৃতি কবিতাগুলি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুখ্যাত শিল্পী সতীন্দ্রনাথ লাহার প্রচ্ছদচিত্রাঙ্কনও প্রশংসার দাবী রাখে। পাঠক সাধারণের অন্তরে অসীম তৃপ্তিদায়ক কবিতাগুলি যথোচিত সমাদরে ভূষিত হোক এই আমাদের কাম্য। প্রকাশক—সাহিত্যতীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। দাম—দু টাকা মাত্র।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

সুলেখা দাশগুপ্তা

ভিজে রকের উপর জয়া যখন বসে পড়েছিল এবং লোকটা তাকে টেনে তুলতে তুলতে চেষ্টা করছিল, মঞ্জু তখন ভেবেছিল আর এক মুহূর্তও জয়ার মা ওকে এখানে বরদাস্ত করবেন না। কোন পর্দা না রেখে সরাসরি বলে বসবেন ওকে চলে যাবার কথা। হয়তো অধৈর্য্য কণ্ঠে বলে উঠবেন, জয়া অসুস্থ হয়ে ফিরেছে। ওকে নিয়ে আমরা বড্ড ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। তুমি এখন যাও বা এমনি চরম কথা কিছু। আর বলেই নিরস্ত হবেন না, চলে যেতে ওকে বাধ্য করবেন তিনি। তার দিক থেকে এই অবস্থায় করবার ছিলও একমাত্র এই। কিন্তু কেন যে তিনি তা করলেন, উপস্থিত বুদ্ধির অভাবেই কি না, মঞ্জু বুঝে উঠতে পারলো না। লোকটা জয়াকে এনে বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলে ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই তিনি দ্রুত উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, তুমি—তুমি ওকে টেনে হিঁচড়ে এ ভাবে নিয়ে এলে কেন এ্যাঁ? আর ওই বা অমন করছে কেন? করেছ কি তুমি ওকে এ্যাঁ? মঞ্জুর মনে হলো তাঁর যেন ওর উপস্থিতি সম্বন্ধেও হুঁস নেই কোন।

ছুটো ছোট ছোট লাল চোখ মেলে লোকটা জয়ার মার উত্তেজিত জিজ্ঞাসার জবাব দিল অতি ঠাণ্ডা গলায়। বললো—সে ভালো ছাড়া মন্দ কিছুই করে নাই। সে আগেও বলেছে এখনও বলছে জয়ার মাথা খারাপটা সত্য নয়, এটা জয়ার নষ্টামি। নইলে সব সময় ভালো থেকে সকাল বেলা কি না তার পাগলামো শুরু হলো আর রোখ চেপে বসল বাড়ী না ফেরবার। আর তারপর তার সেই কি হৈ হুজ্জোতে কাণ্ড। বাধ্য হয়েই ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে ঘুমের ওষুধ এনে খাওয়াতে হয়েছে তার, জয়াকে নিয়ে আসবার জন্যই। কিন্তু তাতে ফল হয়েছে আরো উল্টো। জয়া শরীরের ভার একেবারে মরা মানুষের মতো ছেড়ে দিয়েছে। একলা একটা মেয়েমানুষ তার মতো জোয়ানের ঘাম ঝরিয়ে দিয়েছে শুধু গাড়ীতে তুলতে আর নামাতে। লোকটা নয় যেন স্থির শরীর শুধু তার ঠোঁট ছুটো যন্ত্রের মতো নড়ে কথাগুলো বলে গেল। আর বললোও বহুক্ষণ ধরে বহু অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হয়েছে জয়ার তাই। নইলে জয়ার মার কথার জবাব দেওয়া না দেওয়া নিয়ে তার কিছু এসে-যায় না। সে জবাব দিত না অর্থাৎ দেওয়াটা প্রয়োজনের ভেতর গণ্য করতো না। অপ্রয়োজনে কথা বলা তার স্বভাবে নেই।

লোকটার কথার সঙ্গে সঙ্গে ঘরটা তাড়ির গন্ধে ভরে উঠেছিল। ছু পা পিছু সরল মঞ্জু।

কথা শেষ করে একবার তার দৃষ্টিটা লোকটা ঘুরিয়ে আনল মঞ্জুর উপর। বোধ হয় নতুন কোন সন্ধান মিলল কি না সেটাই বুঝে নিতে। কিন্তু মঞ্জুর দৃষ্টির সঙ্গে চোখ মিলতেই চোখ ফিরিয়ে নিল সে। তারপর বুকপকেট থেকে টেনে বার করল একটা পাঁচ টাকার নোট, আর তলার পকেট থেকে বের করল একটা ছোট্ট কাগজের পুরিয়া। পুরিয়াটা বোধ হয় ঘুমের ওষুধের। সে ছুটো বড়ি না খাওয়ালে জয়া কিছুতেই ঘুমোবে না। নীরবেই লোকটা তার হাতের নোট আর ঘুমের ওষুধ জয়ার মার দিকে বাড়িয়ে ধরেছিল বা সবেমাত্র বাড়িয়ে ধরতে গিয়েছিল—আশ্চর্য্য! যে জয়া বিছানার উপর ছু' হাতে দেহের ভার রেখে কেবল ঝিম খাচ্ছিল আর নড়বড়ে মাথাটা ঘাড়ের উপর খাড়া রাখতে চেষ্টা করছিল, সেই জয়া ছুটো লাল বোজা চোখ টেনে মেলে ঘাড়টান করল ক্রুদ্ধ মোরগের মতো। ছোঁ মেরে তুলে নেবার মতো করে হাত বাড়ালো লোকটার বুকপকেটের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে জড়িত জিবে বলে উঠল—পাঁচ টাকা কেন—কেন মাত্র পাঁচ টাকা দেবে তুমি?

মুহূর্তের মধ্যে লোকটার মুখের রেখায় দেখা দিল ভীষণতা। এক হাতে বুকপকেট চেপে অপর হাতে জয়ার মাথায় ধাক্কা মেরে চাপা গলায় দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল সে—বজ্জাত।

পড়ে গেল জয়া চৌকির উপর। কিন্তু যেমন পড়ল তেমনি উঠল। লোকটার বুকপকেটের দিকে ফের হাত আর গলা বাড়িয়ে চিল চেঁচানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল—কেন, পাঁচ টাকা দেবে কেন তুমি আমায়, বদমাস চোর শয়তান—

এবার লোকটা তার বুকের কাছে এগিয়ে আসা জয়ার সরু লিকলিকে গলাটা মোটা মোটা আঙুলের থাবার ভেতর পুরে যে জোরের সঙ্গে ঠেলে দিল সে ঠেলা সামলাতে পারল না জয়া। বিছানার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে কাতর শব্দ করে উঠল সে।

আয়োজন চলছিল অনেকক্ষণ ধরেই। এবার ব্রাহ্ম কার্পেসে যে আগুন ধরে উঠল। ছু কান আর ছু গাল দিয়ে মঞ্জুর ছুটে বেরুতে লাগল যেন আগুনের হল্কা। জয়ার কণ্ঠে আর্তস্বরের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর হাতের সশব্দ চড় এসে পড়ল লোকটার গালে এবং এই আচম্বিত আক্রমণে বিমূঢ় লোকটা ঘুরে দাঁড়াবার আগেই মঞ্জুর হাতের দ্বিতীয় চড় এসে পড়ল তার গালে—বেরোও বদমাস—এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাও এ বাড়ী থেকে।

একটা মেয়েমানুষের এই অভাবনীয় ছুঃসাহস ও স্পর্দ্ধায় দিশেহারা প্রথম মুহূর্তটা কাটিয়ে উঠেই এবার ফের এগিয়ে আসা হাতটা মঞ্জুর কঠিন মুঠোয় চেপে ধরল লোকটা। মঞ্জু না হলো বিচলিত না হলো চঞ্চল। তার ব্রহ্মতালু থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি-বিবেচনা বোধ কিছুই নয়, গনগন করে জ্বলছিল কেবল আগুন। ডান হাত চেপে ধরলে, বাঁ হাতে চড় কসে কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠল সে, বেরোও বলছি। নইলে তোমাকে আমি জুতো মারতে মারতে নিয়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলে দিয়ে আসবো রাস্তার ঐ ডাষ্টবিনে।

এবার চাপা বাঁকানো ঠোঁট ছুটো ফাঁক হয়ে সামনের দাঁত ছুটো বেরিয়ে এলো লোকটার। বেড়ালের মতো সাদা চোখের চার পাশের লাল শিরাগুলো টান হয়ে চোখ ছুটো জ্বলে উঠল ধক করে। মঞ্জুর হাত ছেড়ে দিয়ে এবার সে ছু' হাত বাড়ালো মঞ্জুর দিকে।

আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলেন জয়ার মা। কিন্তু তৎক্ষণে লাফিয়ে পড়েছে জয় লোকটার উপর। দীর্ঘ ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিনের

পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত করে যেন ক্ষুধার্ত নেকড়ে তার শিকারের নাগাল পেয়েছে। এখন সে একে দাঁতে কেটে নখে চিরে ফেড়ে, একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

তারপর শরীর থেকে ছাড়িয়ে আনবার জন্য ছেলেতে মায়েতে যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলতে লাগল, ছেলের প্রতি মা যে ভর্ৎসনা আর চিৎকার বর্ষণ করতে লাগলেন, লোকটা তার শরীরের উপর দাঁতে নখে কামড়ে ধরা জয়কে বলিষ্ঠ হাতের ঝটকায় ফেলে দেবার বিফল প্রয়াস করতে করতে বিকৃত মুখে, কুৎসিত ভাষায় যে অশ্রাব্য গালি উচ্চারণ করতে লাগল—কোমরে হাত রেখে, দাঁতে দাঁত চেপে শুধু নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মঞ্জু তাকে দেখতে লাগল। নীল, আহা নীল এই তো সবে মাত্র তাকে নামিয়ে দিয়ে গেল সে। যদি সে উপস্থিত থাকত এখন! একটু আগের ঘটনা মানুষ যদি একটু আগেও জানতে পারতো!

লোকটা যখন তার সমস্ত বল প্রয়োগে মরণ কামড় কামড়ে ধরা জয়কে তার শরীর থেকে—আলগা করে আনতে সমর্থ হলো জয় ততক্ষণে তাকে ছিঁড়ে কামড়ে আঁচড়ে থাবলে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে। ক্ষিপ্ত উন্মত্ত লোকটা দুহাতে তুলে ধরে জয়কে দেয়াল লক্ষ্য করেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল। দু'হাতে আকড়ে ধরলেন মা ছেলেকে।

কিন্তু মার বাহুর বেষ্টন টেনে খুলে ফেলতে পলক সময়ও লাগল না জয়ের। মার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গেল সে জানালার কাছে। জানালার দুই শিকের ভেতর উদ্‌ভ্রান্ত ঘর্মাক্ত মুখটা চেপে ধরে সংজ্ঞালোপ পাওয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো এক স্বরে পরিত্রাহি কণ্ঠে সে কেবল চিৎকার করতে লাগল—পুলিশ পুলিশ পুলিশ—যদি পুলিশ এসে হাজির হতো যদি লোকটাকে পুলিশ তার চোখের উপর দিয়ে বেঁধে নিয়ে যেত তবু বোধ হয় জয়ের এই জ্বরগ্রস্ত চিৎকার থামতো না।

ছেলেকে আজ তিনি একেবারে শেষ করে ফেলবেন এমনি একটা কথা বলতে বলতে হন্তদন্তভাবে গিয়ে ছেলের মুখ চেপে ধরলেন মা। গলির মুখে এগিয়ে আসা কয়েকটা পাড়ার ছেলের কৌতূহলী মুখের ওপর ধড়াস করে দিলেন জানালাটা বন্ধ করে।

পাড়ার ছেলেদের পরিচিত বাড়ী। কোন শ্রদ্ধাই হয়তো ছিল না তাদের বাড়ীটার প্রতি বা কাউকেই তারা শ্রদ্ধা করতে জানে না। হৈ হৈ করে উচ্ছৃঙ্খলভাবে হেসে উঠল তারা। কয়েকটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ যেন তীরের মতো বন্ধ জানালা ফুঁড়ে এসে পড়ল ঘরের ভিতর।

চাই ভাতুরি আম, কলা পেঁপে—জানালার কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল ফেরিওলা। বোধ হয় জয়ার মা এখানে জানালা দিয়ে কখনো সখনো সওদা করে থাকেন। ভালো জিনিব ছিল মা—

নিজেকে সংবরণ করল লোকটা—প্রত্যাখ্যাত প্রবৃত্তিটাকে দমন করল নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থেকে। শুধু ডান গালটা তার কেঁপে উঠতে লাগল বার বার। লাঞ্ছিত দেহের দিকে, ছিন্নভিন্ন জামা কাপড়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভেবে স্থির করল সে। তারপর ধূর্ত শঠ দৃষ্টিটা পলকমাত্র মঞ্জুর উপর ফেলে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্ত পা বাড়ালো বাইরের দিকে।

—দাঁড়াও। আদেশের সুরে ডাক দিল মঞ্জু।

থেমে পড়ল লোকটা। ডাক্তারী বই-এর আঁকা স্ফীত লাল রোগগ্রস্ত চোখের মতো চোখের পাতায় ভাঁজ ফেলে তাকালো মঞ্জুর দিকে।

দু' পা এগিয়ে এলো মঞ্জু। প্রতিটি কথার ওপর গলার ওজন চাপিয়ে চাপ দিয়ে দিয়ে বলতে লাগল—শুনে যাও। এ যাওয়াই তোমার শেষ যাওয়া। এ বাড়ীতে আর কোন দিনও তুমি মাথা গলাতে চেষ্টা করবে না। যদি করো তবে তার জন্ত সাংঘাতিক শাস্তি ভোগ করতে হবে তোমায়। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি থানায়—

থানার কথায় যেন লোকটার চোখে তাচ্ছিল্য খেলে গেল। থানা পুলিশের কথাটা অগ্রাহ্য করে সে তাকালো জয়ার মার দিকে। যেন থানা পুলিশ নয় তিনি কি বলেন এটাই জানতে চায় সে।

ধমকে উঠল মঞ্জু। আমি বলছি এ বাড়ীতে তুমি আর ঢুকবে না—ঢুকবে না—ঢুকবে না। বাস যাও—আঙুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল সে।

এতক্ষণ মঞ্জুকে যে জয়ার মা কিছু বলেন নাই, তা খাতির করে সৌজন্য প্রকাশের জন্তও নয়। ফুরসুত মেলেনি তাঁর। এবার তিনি গলা দিয়ে শ্লেষ্মাজড়িত তিন চার রকমের আওয়াজ বের করে ওর প্রতি যে বাক্য বর্ষণ করতে লাগলেন তার একটাও শ্রুতিমধুর নয়, ভদ্রজনোচিতও নয় এবং অবশেষে তিনিই মঞ্জুকে দরজা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, এটা তাঁর বাড়ী। কে আসবে না আসবে সেটা তিনি দেখবেন। সে এখন যেতে পারে।

আকুল ভাবে মার মুখে হাত চাপা দিচ্ছিল জয়—তাকে কাছে টেনে নিয়ে এলো মঞ্জু। বললো—আমি যাবার জন্ত আসিনি। যদি তা আসতাম তবে অনেক আগেই চলে যেতাম।

—তবে—তবে কি জন্ত এসেছ তুমি? কপালের গলার নীল শিরাগুলো ফুলে উঠল জয়ার মার। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি মঞ্জুর মুখের দিকে। গলা তাঁর ভেঙে গিয়েছিল বহুক্ষণ পূর্বেই। ধরা গলায় ফের ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি—তবে কি জন্ত এসেছ তুমি? কেন এসেছ তুমি?

চুপ করে রইল মঞ্জু।

—কি চুপ করে রইলে কেন? কই এত দিন তো তোমায় দেখিনি। যখন দিনের পর দিন উপোসে মরছিলাম কই দেখিনি তো তখন তোমাকে? এখন—এখন সবে তো মাত্র ক'টা দিন ধরে পেটভরে খাওয়ার মুখ দেখছিলাম—কেঁদে উঠলেন তিনি আকুল ভাবে, কোথা থেকে তুমি এসে হাজির হলে কি ভাবে খাচ্ছি সেটা দেখতে—এঁ্যা?

—আমি শুধু দেখতে আসিনি।

—আর কি করতে এসেছ? এ লোকটার বাড়ী ঢোকা বন্ধ করতে? এ লোকটা যে মন্দ—তাকে ভদ্রলোকের বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া যে যায় না এটা বলতে? এ কথা তুমি এতটুকু মেয়ে তুমি বোঝ—তোমাদের আর দশ জনের মারা বোঝেন আর আমরা মা মেয়ে একথা বুঝিনে?

—মা, আচ্ছা আমি কাল সকালে—

—না, না আসবে না তুমি, শুধু কাল নয়; মঞ্জুর গলার প্রচণ্ড ধমকে থেমে গেল লোকটা। কোন দিনও আসবে না তুমি। যদি আস তবে আমার ক্ষমতা কতটা তা তোমাকে আমি টের পাইয়ে দেবো। আমাকে তুমি একা ভেবো না।

জয়ার মা কেঁদে-কঁকিয়ে কি বলতে যেতেই তাকে থামিয়ে দিল মঞ্জু। দাঁড়ান এই লোকটাকে—আগে বের করে দিয়ে নি, তারপর আমরা কথা বলব।

মঞ্জুর এই আমি একা নই কথাটায় আশ্চর্য্য কাজ দিল। বেরিয়ে গেল লোকটা। মঞ্জুর যেতে হলো না। জয় ছুটে গেল দরজা বন্ধ করতে। জয়ার মা কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে বেরিয়ে এলো—খাওয়ার পথ বন্ধ করে দিতে পারো তুমি খাওয়ার উপায় না করে দিয়ে? এখন আমি কি করবো—কি—করবো। হা ঈশ্বর! একটা অসুস্থ মেয়ে একটা কচি ছেলেকে নিয়ে আমি কোথায় যাবো, কি খাওয়াবো!

এত বড় করুণ-হতাশ কণ্ঠস্বর কারু গলা দিয়ে বেরুতে মঞ্জু আর কোন দিন শোনেনি। বুকটা মোচড় দিয়ে ভেঙ্গে চুরে এলো যেন মঞ্জুরও। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললে—যতদিন পথ না করতে পারি ততদিন আমি খাওয়াবো আপনাদের। সে যেন তার যা কিছু আছে সব উজার করে দিতে পারে কিন্তু কি-ই বা আছে তার! এই তো দু গাছা বালা। তাও পুরো সোনার নয়, লোহার উপর সোনা জড়ানো। ঘড়িটা তাও বৌদির। আর ব্যাগে? পুরো একটা টাকাও হয়তো নেই। ব্যাগটা আর খুলল না। ঘড়ি-পরা হাতের বালাটা টেনে খুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরল জয়ার মার দিকে।—এটার লোহা খুলে সোনাটা ওজন করিয়ে নেবেন। আনা আট-নয়ের বেশী সোনা অবিশ্যি ওতে হবে না—তা হোক; একটু থামল মঞ্জু। আট আনা সোনার দাম কত হতে পারে, তাই কি ছাই জানে সে! একটু ভাবতে চেষ্টা করল, মৌরীর বিয়ের সময় কেনাকাটা করতে গিয়ে সোনার ভরিটা যেন কত শুনেছিল—পারল না মনে করতে। আন্দাজের উপর বললো—তা গোটা ত্রিশেক টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আপাততঃ চলুক তো ক'দিন। আপনাদের ঐ গলির মাথায়ই একটা স্যাকরার দোকান রয়েছে। গেলেই দিয়ে দেবে।

মঞ্জুর বালা শুদ্ধ হাত ঠেলে সরিয়ে দিলেন জয়ার মা। কান্নারুদ্ধ-কণ্ঠে বললেন, এ সমস্ত দরদ কি আমার দেখা হয়ে যায়নি, মনে করো? ঢের দেখা হয়ে গেছে। দু'দিনের বেশী চার দিনের ধকল সয় না, এসব পরোপকারের গায়ে। তোমার টিকির দেখাও মিলবে না, দু'দিন বাদে এ আমি জানি—খুব জানি।

একটু হাসল মঞ্জু। ইচ্ছে হলো বলে—আজকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে আমাদের কালকের অভিজ্ঞতার মিল হয় না—শুধু মেলে না নয়, প্রচণ্ড গরমিল ঘটে যায় আর অভিজ্ঞতার গৌরবের পুঁজি নিয়েও আমাদের কেবল অনভিজ্ঞের মতো উলট-পালট খেতে হয় আর মত পাল্টাতে হয়, একথা আমি আর আপনাকে নতুন কি শোনাবো? কিন্তু কিছুই বলল না মঞ্জু। কি হবে। বলে তো বিশ্বাস আনা যাবে না তার মনে। একটু সময় চুপ করে রইল সে। তারপর বললো—আচ্ছা, দিচ্ছি আমিই ঠিক করে।

—কি ঠিক করে দেবে তুমি শুনি? কি ছাই হবে, আজ তোমার এ হাতের বালা কাল ওহাতের বালা আর পরশু তোমার ঘড়ি বিক্রি করে খেয়ে? ক'দিন চলবে ওতে। আমার কি ওসব ছিল না কিছু। মুখে আঁচল চাপা দিলেন তিনি—এই রাক্ষুসী ক্ষুধার সঙ্গে পরিচয় নেই তোমার। কিছু পরিচয় নেই। তুমি জান না এই রাক্ষুসীর দুবেলায় দাঁত বের করে—মমতা নেই নিবৃত্তি নেই। এই রাক্ষুসীর সঙ্গে যুঝবে কতটুকু শক্তি তোমার?

'পেটের চিন্তা—নির্বোধ ঘ্যানঘেনে প্রিয়জনের অবুঝ দাবীর মতো তার একঘেয়ে—ঘ্যানঘেনে চাওয়া। তাকে শান্ত না করে, ঠাণ্ডা না করে সাধ্য কি তার দিক থেকে মনটাকে একটুও তফাতে নিই বা মুখ ফেরাই'—এক মাঠ রোদ আর ধুলোর ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে নীলের কথাগুলো যেন জয়ার মার সঙ্গে এক তান তুলে উড়ে গেল মঞ্জুর কানের পাশ দিয়ে। মা!

বিস্ময়ে চোখের আঁচল সরিয়ে জয়ার মা তাকালেন মঞ্জুর মুখের দিকে। এগিয়ে এসে নত হয়ে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে মঞ্জু বললো—আজ থেকে আমাকেও আপনি আপনার মেয়ে মনে করবেন। যত ছোট মাই হোক বাচ্চাকে রক্ষা করতে তার যেমন শুধু ইচ্ছার জোরেই শক্তির অকুলান হয় না, আমারও ইচ্ছার জোরেই শক্তি হয়ে উঠবে। দেখুন না আপনি। আজ থেকে আপনাদের সব ভার সব ভাবনা আমার।

বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জয়ার মা।

আর এতক্ষণে জয়ার দিকে তাকাবার অবসর মিলল মঞ্জুর। জয়ার ঘুমের ওষুধে কাজ হয়নি। তাকে আরো দুটো বড়ি খাওয়াতে হবে। মঞ্জু ভেবেছিল, সে বিছানার উপর বসে তেমনি ঝিম খাচ্ছে' এ পর্যন্ত তার কোন সাড়াশব্দ মেলেনি। কিন্তু দেখল জয়া পা ঝুলিয়ে চৌকির উপর সোজা হয়ে বসে বিস্মিত বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। যেন ঘটনাটা বুঝতে পারছে না বা কিছুটা পারছে কিছুটা পারছে না। চোখের দুকোণ ভরে

উঠেছে জলে। হয়তো তার মাকে কাঁদতে দেখে। হয়তো নয়। হয়তো জ্ঞানবুদ্ধির বোঝার চাইতেও যে বড় বোঝা—হৃদয়ানুভূতির বোঝা সেই বোঝাই তার চোখে জল নিয়ে এসেছে। মঞ্জুর চোখের সঙ্গে চোখ মিলতে সে হাসল। কিন্তু সেটা হাসি না কান্না, মঞ্জু যেন ধরে উঠতে পারলো না। কারণ তার মুখের হাসির সঙ্গে গালের উপর গড়িয়ে পড়া চোখের জলের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। কাছে গিয়ে জয়ার মাথাটা বুকের উপর টেনে এনে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগল মঞ্জু। অস্ফুটস্বরে বললো—কি, ঘুম আসছে না? আচ্ছা। আর দুটো বড়ি খাইয়ে দিলেই ঘুম আসবে। কিন্তু তার আগে একটা কথা আমাকে তোর দিতে হবে জয়া। কথা দিতে হবে, আমার সঙ্গে ছাড়া এই ঘরের দরজার এক পা বাইরেও তুই পা বাড়াবি নে। কারু সঙ্গে নয়, কিছুতেই নয়, কোন কারণেই নয়। আমায় কথা দিলেই দুটো ওষুধ, বাস, তারপর ঘুম। আর সন্ধ্যায় চুল বেঁধে গা ধুয়ে পার্কে বেড়াতে বেড়াতে হাওয়া খাওয়া আর গরম মুড়ি খাওয়া—কেমন? কি কথা দিলি তো আমার সঙ্গে ছাড়া কোথাও একপা বেরুবি না—জয়ার মুখটা তুলে ধরে তার সম্মতি আদায় করতে গিয়ে দেখল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। পাছে জেগে যায় তাই কিছুক্ষণ তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইল মঞ্জু। তারপর যেমন করে ঘুমের শিশুকে বুক থেকে সযত্নে নামিয়ে মা বিছানায় শুইয়ে দেয় ঠিক তেমনি ভাবে মঞ্জু জয়ার মাথাটা বুক থেকে নামিয়ে বালিশে রাখল। চৌকি থেকে ঝুলে থাকা পা দুটো অতি সন্তর্পণে তুলে দিল চৌকির উপর। শাড়ীটা দিল পা অবধি টেনে। ঘরের কোণের টুলের উপর তোলা বিছানা থেকে দুটো বালিশ এনে একটা চাপা দিল পিঠের দিকে আর একটা সামনে। ইসারায় জয়কে ডেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। জয়ের হাত ধরে মাথা নিচু করে চাপা গলায় বললো—আজ থেকে এ বাড়ীর কাজ তোমার আর আমার। তুমি আর আমি সব করবো—এঁ্যা?

মঞ্জুর হাত দুহাতে মুঠো করে ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল জয়। আর এই প্রথম মঞ্জু তার শিশুমুখে এমন কোন প্রকাশ দেখল যা শিশুর।

মঞ্জুকে দেখে অমিতা এক'রকম চেঁচামেচি করে উঠল—এ কি, তুমি মারামারি করে এলে নাকি গো?

—মারামারি? কি যে বলো! কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে রেখে মৌবীর ইজিচেয়ারটার উপর অবসন্ন ভাবে বসে পড়ল মঞ্জু।

—কি যে বলে কি। তোমার চুল ওলট-পালট, হাতে-মুখে ময়লা। ব্লাউজের পিঠটা গেছে ছিঁড়ে—

—যাঃ। যতদূর সম্ভব ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করল মঞ্জু। পিঠটা দেখতে পেলো না। হাতটা বেঁকিয়ে নিয়ে গেল পিঠের যতটা পর্যন্ত যায়। সত্যি তো! পিঠের মাঝখান যে ছিঁড়ে গেছে অনেকটা। আয়নার কাছে উঠে গিয়ে দেখল, লম্বা ছেঁড়াটার ভেতর দিয়ে নীচের বডিজ আর খালি পিঠটা বেরিয়ে পড়েছে। এই নিয়ে স্যাকরার দোকান, রাস্তা, বাজার সব ঘুরে এলো সে। যাক গে—কারা দেখেছে মনে করে এখন লজ্জা পেয়ে লাভ কি। ফের বসে পড়ল মঞ্জু। জিজ্ঞাসা করল—খাওয়া হয়ে গেছে তোমাদের? দিদি কোথায়? হয়েছে কি তোমার? খাওয়া হয়ে যাবে না—বেলা ক'টা বাজছে?

—ক'টা?

—দুটো।

—দুটো!

—তার বেশী ছাড়া কম নয়। তোমার না পিকনিক ছিল?

—পিকনিক কি?

—তাকিয়ে রইল অমিতা মঞ্জুর দিকে।

—ওঃ, বলে হেসে উঠল মঞ্জু। না পিকনিক টিকনিক কিছু নয়। বাজে কথা বলে গিয়েছিলাম, মানে ঠিক বাজে কথা নয়, আমি গেলাম না শেষ পর্যন্ত এই আর কি। কিন্তু দিদিকে দেখছিনে যে?

—সে তোমার ওপর ভীষণ খাপ্পা হয়ে গেছে। তোমাকে নাকি কবে থেকে সে তার 'ল' কলেজের প্রসপেকটাস এনে দিতে বলছে। তুমি দিচ্ছ না। তাই সে আজ খাওয়া দাওয়া সেরে দশটার সময়ই বেরিয়ে গেছে প্রসপেকটাস আনতে।

ভালো করেছে। একটু নড়াচড়া করা দরকার ওর। কিন্তু আমায় এখন খেতে না দিলে কিন্তু আমি মরে যাবো বলে রাখছি বৌদি!

ভাদ্রমাসের পচা গরমে ভাত ঘেমে পচে ওঠে, তাই অমিতা চাল কম দেয় তবু বেশী দেয় না। কি খেতে দেয় এখন সে মঞ্জুকে।

—দেখো তো কি মুসকিলে ফেললে। বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে।

একা ঘরে পাথরের ওজন নিয়ে চেপে এলো মঞ্জুর মাথায় চিন্তা। চোখ বন্ধ করা মাত্র সে গিয়ে উপস্থিত হলো জয়াদের বাড়ী। লোকটাকে বের করে দিয়ে প্রথমটায় ভারি উল্লাসবোধ করেছিল সে। যেন বড়ই সহজে সব সমাধান হয়ে গেল। বড়ই অনায়াসে ঘটনাকে সে তার নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে পারল। কিন্তু সেই আনন্দ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি তার। এই জয় উল্লাসবোধ করবার নয়। এখনও বহু সংগ্রাম তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সে জানে না সে কি করবে। কি দিয়ে কি হবে। এদের অন্নবস্ত্র যোগাবে সে কি দিয়ে। তবু সে সব ভারই নিয়ে এসেছে। বিনা দ্বিধায় নিয়ে এসেছে। সে নেওয়ার ভেতর এতটুকু ফাঁক নেই। এতটুকু মিথ্যা নেই। এদের খাওয়ার ব্যবস্থা না করে আর সে নিজের মুখে গ্রাস তুলতে পারবে না। জয়ার মার কথাই ঠিক। এ দুটো বালায় কি—? একটা টুইশন তাকে সব প্রথম যোগাড় করে নিতেই হবে···

সুদর্শনের জন্য আনা পোলাও-এর চাল এক মুঠ পড়েছিল। সেই চাল, আলু, পটল, কুমড়ো সঙ্গে মাড়ে-ভাতে ফুটিয়ে তাতে নুণ মিষ্টি মাখন আর পেঁয়াজ-কুচি দিয়ে একটা দস্তর মতো উপাদেয় খাদ্য তৈরী করে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো অমিতা। এ কি? তুমি তেমনি বসে আছো? আমি বলে তোমার খাবার একেবারে এ ঘরে নিয়ে এলাম। পড়ার টেবিলে প্লেটে নামালো অমিতা।

উঠে পড়ে থালার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল মঞ্জু। ভাগ্যিস তোমার কাঁকর-মেশানো চালের কড়কড়ে ভাত আর ঠাণ্ডা মাছের ঝোল কিছু অবশিষ্ট ছিল না। স্নানের ঘরে ঢুকে ঝুপঝাপ জল ঢেলে গা মাথা না মুছে চুল না আঁচড়ে এসে বসে পড়ল টেবিলে।

—ভালো কথা। তোমাকে তো সেই কালকের রজত বাবুর নেমন্তন্ন চিঠিটা দেওয়া হয়নি! দাঁড়াও নিয়ে আসছি। চিঠি নিয়ে এসে মঞ্জুর হাতে দিল সে। চিঠিটা যদিও নেমন্তন্নের তবুও খোলা নয়—কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল অমিতা। [ ক্রমশঃ।

# নাটক-রচনা প্রসঙ্গে

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জীবনে যে কখনও দুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতার সাধনা তাহার বিড়ম্বনা—বিশেষতঃ নাটক-রচনা। নাট্যকারকে অনেক রকম অবস্থার মধ্যে পড়িয়া সত্যকে উপলব্ধি করিতে হয়। যিনি প্রকৃত কবি—তিনি নিজে যাহা অনুভব করেন না কদাচ তাহা লিখেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আমি সংসারের ঘৃণ্য বেশ্যা ও লম্পট চরিত্র হইতে জগৎপূজ্য অবতার চরিত্র পর্যন্ত দর্শন করিয়াছি। সংসার বৃহৎ রঙ্গালয়, নাট্যরঙ্গালয় তাহারই ক্ষুদ্র অনুকৃতি মাত্র। যত প্রকার রচনা আছে, নাটক রচনা সর্বাপেক্ষা কঠিন ও শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস রচনা তাহার নীচে।

ঘোরতর দুশ্চিন্তায় মানুষের মস্তিষ্ক যখন জড়িত হইয়া পড়ে, তখন তাহার ভাব ও ভাষাও জড়িত হইয়া যায়। সূক্ষ্মদর্শী নাট্যকার সেইরূপ অবস্থায় চরিত্রের মুখে জড়িত ভাব ও ভাষা ব্যক্ত করেন। হ্যামলেটের অন্তরে যখন আত্মহত্যা উচিত কি অনুচিত, এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তখন তিনি বলিতেছেন—to take arms against a sea of troubles—একদিকে বিপদসাগর—অপর দিকে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার কথা। হ্যামলেটের মস্তিষ্কের ভাব এই এক ছত্রের মধ্যে বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। একদা আমি জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম যে কোন কোন নাট্যকার নাটক রচনা করিবার পূর্বে নাটকীয় গল্পটি কল্পনা করিয়া থাকেন, কেহ বা প্রধান চরিত্রটি, সেরূপ ক্ষেত্রে আমি কি করিয়া থাকি—ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য যে আমি আগে নায়কচরিত্র কল্পনা করি, তাহার পর সেই চরিত্র ফুটাইতে ঘটনা প্রভৃতি সৃষ্টি করি।

প্রতিভা কখনও চলা পথে চলে না। সে আপনি আপনার পথ করিয়া লয়। পূর্বে বিলাত হইতে জাহাজ আফ্রিকা ঘুরিয়া ছয় মাসে ভারতবর্ষে আসিত। প্রতিভা সুয়েজ ক্যানাল প্রস্তুত করিয়া ছয় মাসের পথ ছয় সপ্তাহে আসিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেয়। বাষ্পীয়যানের উন্নতিতে তাহাও ক্রমে তিন সপ্তাহে পরিণত হইয়াছে।

যিনি কবি—তিনি সরলতা ও সত্যের উপাসক। প্রকৃত কবি নিজের কোনরূপ মনোভাব সাধারণের নিকট গোপন করেন না এবং সংসারে লোকচরিত্র যেমন দেখিয়া থাকেন, অকপটে তেমনই বর্ণনা করেন। কিন্তু দোষ দেখাইয়া দিলে কে আর সন্তুষ্ট হয়? এই জন্যেই লোক-শিক্ষক কবিও অনেক সময়ে নিন্দাভাজন হন। তাঁহার ভাগ্যে জীবনে যশোলাভ কদাচ ঘটে। দিব্যদৃষ্টি-সহায়ে কবি যে সকল সত্য উপলব্ধি করেন, তাঁহার সমসাময়িক লোক তাহা ধারণা করিতে পারে না। পরে সাধারণের যখন সে সকল উপলব্ধি করিবার সময় আসে, তখন তাঁহার আদর হয়। প্রতিভার দুর্ভাগ্য যে, সে সময়ের অগ্রবর্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সময়ের ও মানব সাধারণের দোষগুণ দেখাইয়া দেওয়াই নাট্যকারের প্রকৃত লক্ষ্য কিন্তু লোকে কখনও কখনও ভ্রান্তিবশতঃ ঐ সকল দোষ ব্যক্তিগতরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং সেইজন্যই কবিকে সময়ে সময়ে অনেক নিন্দা, শত্রুতা এমন কি নির্যাতন পর্যন্ত সহ্য করিতে হয়।

নাটক রচনাকালে সেই নাটকীয় ভাব ও চরিত্র লইয়া দিবারাত্রি আচ্ছন্ন থাকিতে হইবে, কেবলমাত্র সেই চরিত্রটি ছাড়া ঐ সময়ে সমগ্র জগৎ সংসার ভুলিয়া থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্তরের সমগ্র কল্পনাশক্তি ঐ চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কথাই বলি যে, যখন মীরকাশিম নাটকটি রচনা করি তখন মীরকাশিমকে কেন্দ্র করিয়া অন্তরে উদিত চিন্তা সমূহের জ্বালায় এক এক সময় বিরক্তিবোধ করিতাম। কেবল ষড়যন্ত্র কেবল ষড়যন্ত্র ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ হাঁফাইয়া উঠিত। ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্নে দেখিতাম, মীরকাশিম মুখের কাছে আসিয়া একগাল দাড়ি নাড়িতেছে। চৈতন্যলীলা' লিখিবার সময়েও একদিন নিদ্রাভঙ্গে অর্দ্ধতন্দ্রাজড়িত অবস্থায় সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলাম যে বৃহৎ এক চাকামুখো বলরাম হারে-রে-রে করিয়া গাহিতে গাহিতে আসিতেছে। এই হারে-রে-রে লইয়াই চৈতন্য-লীলায় নিতাইয়ের গান রচনা করি।

নাটক লেখা অত্যন্ত কঠিন। সংসার ও লোকচরিত্রের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক। কোন নাটকে দেখা গিয়াছে যে, পুত্রের অকালমৃত্যুতে মাতা এবং পিতার বিলাপ একই রূপ লইয়াছে কিন্তু উভয়ের বিলাপ সম্পূর্ণরূপে পৃথক হওয়া চাই। পুত্রশোকে মাতা যেরূপ ভাষায় কাঁদিয়া থাকেন, পিতা সেরূপ ভাষায় কাঁদেন না, আবার পিতা যেরূপ ভাষায় কাঁদিয়া থাকেন, মাতা সেরূপ ভাষায় কাঁদেন না। শোক উভয়েরই সমান কিন্তু প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী স্বতন্ত্র। নাটক সংসারেরই অনুকরণ, এ বিষয়ে নাট্যকারের বিশেষভাবে সতর্ক ও অবহিত থাকা প্রয়োজন। আমার নিজের সর্বাপেক্ষা মুস্কিল হইয়াছে নিজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অকপট ভাবে স্বীকার করিতেছি যে, আমার কোন নাটক যদি জনসাধারণের সমাদরে ধন্য হয়, আমি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়ি, ঐরূপ অবস্থায় সকল সময়েই মনে হয় ইহার পর আর কি নূতন লিখিব, যাহা ইহা অপেক্ষাও ভাল হইতে পারে কিন্তু আমার কোন নাটক যদি ব্যর্থতা বরণ করে তাহা হইলে আমার উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, তখন ভাবি, এইবার নিশ্চয়ই নূতন কিছু একটা করিব। এইরূপ চিন্তায় মনে যথেষ্ট পরিমাণে বল পাইয়া থাকি।

মামায় প্রতিবার উদ্যম করিতে হয়—আপনাকে আপনি কেমন করিয়া হারাইব। যে নাটক লিখিব, তাহা পূর্ব্বরচিত নাটক অপেক্ষা কেমন করিয়া উঁচাইয়া যাইবে।

সাধারণ ব্যক্তিদের সহিত তুলনায় স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের অধিক পরিমাণে থাকে কিন্তু এ শক্তিগুলি তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকা চাই, নতুবা আয়ত্তাতীত কল্পনাশক্তির প্রভাবে মানুষ পাগলও হইয়া যায়। স্মৃতিশক্তি আবার এমন হওয়া চাই যে, লিখিবার সময়ে অনুভূতি-সিদ্ধ বিষয় সকল আপনা হইতে মনের মধ্যে উদয় হয়; নচেৎ মহাবীর কর্ণের ন্যায় কার্য্যকালে মহাস্ত্র সকল বিস্মৃত হইতে হয় আর ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা না থাকিলে কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা যায় না। দৃঢ়তার প্রসঙ্গে একটি কথা বলি যে, আমি অনেক ক্ষেত্রে গোঁয়ার-গোবিন্দ, কাঠখোট্টা ছেলেদের অধিকমাত্রায় পছন্দ করি। কারণ, ইহাদের মনে প্রচুর পরিমাণে দৃঢ়তা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের একটু সুবিধা করিয়া লইয়া চালাইতে পারিলে শিষ্টশান্ত, মিউমিউয়ে বালকগণ বা কিশোরগণ বা যুবকগণ অপেক্ষা ইহাদের নিকট অনেক বেশী কাজ পাওয়া যায়। পল্লীতে কোন বিপদ-আপদ ঘটিলে ইহারাই সর্ব্বাগ্রে আসিয়া দাঁড়ায়। নিঃসম্বল নিঃসহায় পরিবারের শব সংকারের জন্য ইহারাই আগে আসিয়া খাট ধরে, তুলনামূলক ভাবে দেখিলে মনুষ্যত্বের অধিক নিদর্শন ইহাদের মধ্যেই দেখা যায়।

ভাষার মধ্য দিয়া অনেকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় ধরা পড়ে ঠিকই কিন্তু সেই রচনার আস্বাদ সাধারণ মানুষ নির্ব্বিশেষে গ্রহণ করিতে পারে না। রচনাটি তথ্যপূর্ণ, সারগর্ভ, পাণ্ডিত্যের দীপ্তিবাহী কিন্তু ভাষাটি সংস্কৃতানুগামী হইয়া পড়ায় তাহার অর্থোদ্ধার করা সাধারণের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। ভাষার ক্ষেত্রে, রচনার কলাকৌশলের প্যাঁচে কেহ কেহ সমগ্র রচনাটিকে এমন 'গ্যাঁটা-ম্যাটো' করিয়া তুলেন যে তাহার সমাদর তো দূরের কথা, সাধারণ পাঠক সে রচনাকে এড়াইয়া যাইতে পারিলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে লেখক যদি প্রাঞ্জল ভাষা ব্যবহার করিতেন তাহা হইলে জনহিতকর, পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, সারগর্ভ রচনাটি কোনমতেই ব্যর্থতা বরণ করিত না এবং তাঁহার বহু শ্রম ব্যয় করিয়া জ্ঞানরাশি-জাত রচনাটি সার্থক হইত, তাহার আবেদন পাঠকের মন অভিভূত করিত, একে সহজ প্রাঞ্জল ভাষা তদুপরি রচনার মধ্যে প্রভূত জ্ঞানের ছাপ—সুতরাং এই রচনার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার পথে আর কি অন্তরায় থাকিতে পারে? আমার পুত্রকন্যার সহিত আমি যে ভাষায় বাক্যালাপ করি, সেই ভাষায় লিখিলে তাহা কাহারও বুঝিতে কষ্ট হইবে না এবং তাহার অর্থ বুঝিতে অভিধানের শরণাপন্নও হইতে হইবে না। চিত্রকরের ন্যায় লেখকও চিত্রসৃষ্টিই করিয়া থাকেন, একজন বর্ণে অন্য জন বাক্যে। তাই কলা-কৌশল গোপনই আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলানৈপুণ্য।

# সাম্প্রতিকী

কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে সম্প্রতি পাঁচখানি নতুন বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে। একটি ভক্তিমূলক, একটি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণধর্মী, একটি চীনে ফেরিওয়ালাকে কেন্দ্র করা হৃদয়ানুভূতিপ্রধান, একটি দুর্গম তীর্থযাত্রার বর্ণনা সমন্বিত ও একটি এক সাংবাদিক ও এক ধনী কন্যার কাহিনীর দ্বারা গঠিত। এদের নাম যথাক্রমে ঠাকুর হরিদাস, বিচারক, নীল আকাশের নীচে, মরুতীর্থ হিংলাজ ও চাওয়া পাওয়া।

ঠাকুর হরিদাসের চিত্রকাহিনী গড়ে উঠেছে শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অনুসরণে চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বিপ্রদাস ঠাকুর, সঙ্গীতের ও ক্যামেরার দায়িত্ব নিয়েছিলেন যথাক্রমে অনিল বাগচী এ প্রবোধ দাস। গোবিন্দ রায় পরিচালিত এই ছবিটিতে অভিনয় করেছেন—নাম ভূমিকায় শ্রীমান্ বিভু ও নির্মলকুমার, মহাপ্রভুর ভূমিকায় নবাগত মলয়কুমার, লক্ষহীরার ভূমিকায় সুমিত্রা দেবী, গৌড়েশ্বরের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, সনাতনের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল, এঁরা ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কমল মিত্র, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, তুলসী চক্রবর্তী, সলিল, বিশু, শিবেন, প্রীতি, বেচু, ধীরাজ, শিবকালী, ঋষি, খগেন, পরিতোষ, শ্রীমান তিলক ও অলক, পদ্মা দেবী, শোভা সেন, তপতী ঘোষ, শিপ্রা সাহা প্রভৃতি। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখো, ধনঞ্জয় ভট্টা, তরুণ বন্দ্যো, শচীন গুপ্ত, মৃণাল চক্র, সন্ধ্যা মুখো, প্রতিমা ও ছবি বন্দ্যো, গায়ত্রী বসু, নির্মলা মিশ্র প্রভৃতি।···বিচারকের কাহিনীকার তারাশঙ্কর, প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবিটিতে সুর সংযোজনা করেছেন তিমিরবরণ। সুদীর্ঘকাল পর বাঙলার ছায়াজগৎ তিমিরবরণকে ফিরে পেলেন। তিমিরবরণের পুনরাগমন আশা করি, বাঙলার চিত্রামোদীদের আনন্দ দেবে। প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন উত্তমকুমার। তিনি ছাড়া বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অতনু, রবীন, পঞ্চানন, সুশীল দাস, চন্দ্রাবতী দেবী, অরুন্ধতী মুখো, দীপ্তি রায়, বাণী হাজরা, মনোরমা প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের গান দু'টি গেয়েছেন হেমন্ত মুখো, মৃণাল চক্র ও উৎপলা সেন।···নীল আকাশের নীচের মূল কাহিনী প্রখ্যাতনামা লেখিকা মহাদেবী বর্ম্মার লেখনীজাত। ছবিটি প্রযোজিত হয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক। মৃণাল সেন পরিচালিত ছবিটিতে প্রধান ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে দেখা দিয়েছেন বিকাশ রায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত, রবীন, রসরাজ, কালী চক্র, মঞ্জু দে, স্মৃতি বিশ্বাস, সুরুচি, প্রিয়া এবং এঁরা ছাড়াও বহু চৈনিক অভিনয় শিল্পীর দল।···অবধূতের মরুতীর্থ হিংলাজএর চলচ্চিত্রায়ন হয়েছে বিকাশ রায়ের পরিচালনায় ও প্রযোজনায়। এতে সুর যোজন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অবধূতের ভূমিকায় বিকাশ রায়ের, ভৈরবীর ভূমিকায় চন্দ্রাবতী দেবীর, থিরুমলের ভূমিকায় উত্তমকুমারের, কুন্তীর ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের এবং এ ছাড়া অন্যান্য অংশে পাহাড়ী সান্যাল, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, মণি শ্রীমানী, দিলীপ দে, রাজা, প্রতাপ, সৌরেন, শৈলেন গঙ্গো:, মণি ঘোষ ও বর্মা, ভানু রায়, পরিতোষ, শ্রীমান শুভ, আভা, সন্ধ্যা, আশা প্রভৃতির অভিনয় দর্শকসাধারণ দেখতে পেয়েছেন।···চাওয়া পাওয়ার গল্পকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। তরুণ পরিচালকগোষ্ঠী 'যাত্রিক'এর পরিচালনায় কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, শুভেন মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু, অমর মল্লিক, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তুলসী

চক্রবর্তী, পঞ্চানন, ধীরাজ, শৈলেন, শান্তি, শ্রীমান শ্যামল ও অলক, সুচিত্রা সেন, ভারতী দেবী, রাজলক্ষ্মী ও শান্তা প্রভৃতি। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন নচিকেতা ঘোষ এবং কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

# স্মৃতির টুকরো

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## সাধনা বসু

অন্তর্বঙ্গের সস্নেহ স্বীকৃতিতে মন প্রাণ যখন ভরপুর ঠিক সেই সময়েই বহির্বঙ্গের আকর্ষণে যেতে উঠল আমাদের যুগল মন, যুগল প্রাণ। বহির্বঙ্গ যেন বারবার হাতছানি দিচ্ছে আর ঐ হাতছানি বিশেষভাবে যেন আকর্ষণ করছে আমাদের। সি, এ, পি সুবোদ্ধাদের জয়মাল্যে বিভূষিত হয়েছে, তার কর্মদক্ষতা কেনমাত্র ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে? বাইরের বিশাল জগতের আলো-হাওয়া সে পাবে না? সর্বভারতীয় আঙিনায় সে লাভ করবে না আসন? বাঙলাদেশ তাকে জন্ম দিল তার প্রাণ সঞ্চার করল, তার বিকাশে সহায়তা করল এবার সে নিখিল ভারতে দেখাক নিজের কর্মকুশলতা, প্রয়োগনৈপুণ্য, নাট্যদক্ষতা। বিদ্যালয়ের গণ্ডী ছেড়ে ব্যাপক কর্মজীবনকে মানুষ যেমন আলিঙ্গন করে তেমনই সি, এ, পির শুষ্টিও গঠনকার্য শেষ করে এবার বাঙলাদেশ তাকে ছেড়ে দিক বিশাল ভারতের রাজ্যে রাজ্যে, নগরে নগরে, অঞ্চলে অঞ্চলে, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে। সীমার আঁচল ছেড়ে অসীমের বুকের উপর এবার হোক তার শুভ আবির্ভাব।

মধুতে আমাতে ঠিক করলুম আমরা ঘুরব ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে সসম্প্রদায়ে। বাঙলার বাইরে যারা আছে তারা দেখুক সি-এ-পির কর্মক্রম। যেটুকুই সি-এ-পি করতে পেরেছে, প্রতিটি কর্মীর অক্লান্ত, আন্তরিক ও সনিষ্ঠ পরিশ্রমের বিনিময়ে জনসাধারণের যে জয়মাল্য জুটেছে সি-এ-পির ভাগ্যে সেই জয়মাল্যই সি-এ-পির দেশব্যাপী জয়যাত্রার পথ করে দিক প্রশস্ত অন্ততঃ বাঙালী দর্শকের রুচি, মন ও দৃষ্টি সম্পর্কে অবাঙালীদের মনে একটা ধারণা জন্মাক। বিদেশ যাত্রার ঠিক প্রাক্কালেই এম্পায়ার থিয়েটারে আমরা মঞ্চস্থ করলুম "ড্রিম সঙ্‌স অফ ওমার খৈয়াম" (নির্বাচিত অংশবিশেষ) এবং "হিন্দু ডান্স ড্রামাস" সুরারোপের ভার গ্রহণ করলেন তিমিরবরণ আর দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী সুধাংশু চৌধুরী। Fritz Gerald-এর "রুবেয়াতস অফ ওমর খৈয়াম" থেকে অনুবাদ এবং গান রচনা অনন্যসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন করেছিলেন বাঙলার অবিস্মরণীয় গীতিকার পরলোকগত কবি অজয় ভট্টাচার্য (১৯০৭-৪৩)।

এদিকে আমরা রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, ভারতের নগরে নগরে দু' দিনের জন্যে বাসা বাঁধছি, অপরূপ এক বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে আমাদের জীবন নদী। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ, ভিন্ন ভিন্ন মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন তাদের প্রকৃতি, ভিন্ন ভিন্ন তাদের জীবনযাত্রা। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা। আমাদের শিল্পীর দলের এখন শিল্পী ছাড়াও অন্য পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। পথিকের পরিচয়, যাত্রীর পরিচয়, সেবক-সেবিকার পরিচয়। নৃত্যনাট্য দিয়ে সারা ভারতের দর্শকসাধারণের সেবা করার ব্রত নিয়ে ঘর থেকে আমরা পা ফেলেছি বাইরের দিকে। ঠিক এই সময়েই কলকাতায় তখন সাড়ম্বরে প্রদর্শিত হচ্ছে অভিনয় —সেই সময়ের কথা যাঁদের মনে পড়ছে তাঁরা নিশ্চয়ই নিজের স্মৃতি থেকে বুঝতে পারছেন তখন কতখানি সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে অভিনয়ের জয়যাত্রা।

যেখানে যাচ্ছি পাচ্ছি অবর্ণনীয় স্নেহ, অকল্পনীয় সহানুভূতি, অভাবনীয় আন্তরিকতা। সেদিন আমাদের নৃত্যনাট্যাবদান ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের দর্শক সমাজে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, গুণিজন কি ভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন, রসজ্ঞের দল কতখানি তৃপ্তি পেয়েছিলেন আমাদের নাট্যানুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সুচিন্তিত মতামতগুলিতেই তার সম্যক প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। মতামতগুলি অবশ্য বলতে বাধা নেই, বেশীর ভাগ আমাকে কেন্দ্র করে সেইজন্যে নিজের লেখনী দ্বারাই সেগুলি উদ্ধৃত করতে হচ্ছে বলে অকপটে স্বীকার করছি—আমি লজ্জিতা তবু উদ্ধৃত করছি মুখ্যতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে আজ দিকে দিকে বাঙলার প্রতি যে অবজ্ঞা উপেক্ষা ও বেদরদ প্রকটমান হয়ে উঠছে, বাঙলার বিশেষত্বগুলিকে পুরোপুরি অস্বীকার করার চলছে যে প্রাণপণ অপচেষ্টা, বাঙলার সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে চলছে যে জঘন্য ষড়যন্ত্র তা যেমনই লজ্জার তেমনই কলঙ্কের অথচ বিশ বছর আগেও (একদা

সাধনা বসু—একটি বিশেষ নৃত্য-ভঙ্গিমায়

চুনো বা পঞ্চাশ-ষাটও নয় ) সারা ভারতবর্ষ যে ভাবে সমাদরে বরণ করেছে বাঙলার সাংস্কৃতিক অভিযানকে তা বিশেষ ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। এই মতামতগুলি আমি শুধুমাত্র 'সাধনা বসুর সুখ্যাতি বলে গণ্য করছি না ; এদের আমি গ্রহণ করছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও বাঙালীর সাংস্কৃতিক অভিযানের প্রতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সানুকূল মনোভাবের একটি উদাহরণ মাত্র হিসেবে। শুধু এইজন্যেই বিশেষ করে, এই বাঙালী নিধন প্রচেষ্টার দিনে মাত্র বিশ বছর আগে বাঙলা ও বাঙালীর প্রতি সারা ভারতের শ্রদ্ধাবনত মনের ছবিটি তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই সেই মতামতগুলি পুনর্বার উদ্ধৃত করছি। এগুলি উদ্ধৃত করার মুখ্য উদ্দেশ্য বললুম অবশ্য সেই সঙ্গে স্বীকার করতে বাধা নেই যে, বহির্বঙ্গের দর্শক সাধারণের কাছে সি-এ-পি কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল সে, সম্বন্ধে একটি আংশিক বিবরণ মাত্র স্মৃতির টুকরোর পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যও নেহাৎ গৌণ নয়। উদ্ধৃতিগুলি—

Sadhona Bose is an artist from the crown of her beautiful head to the soles of her hemmed feet... which gives one a feeling that an Ajanta Fresco or some ancient sculptured Goddess had suddenly come to life—The Times of India (Bombay)...If Omar Khyam had been living today and seen dance presentation of his famous "Rubaiyat"s last night...the inspiration would have come to him seeing Sadhona Bose's exquisite rendering of his sentiments and imagery through movements, that it might well have been a problem for the old poet to decide as to which was a more effective medium for popularising his philosophy—whether his own singularly beautiful poems or Sadhona's dance interpretation. It wouldn't be surprising if he had cast vote in favour of the later.—Sunday Standard (Bombay)...It speaks volumes for the art of Sadhona Bose and her troupe that they should have captured the Bombay public which is as critical as it is appreciative every item has been vociferously cheered—Bombay Chronicle (Bombay) ...Sadhona Bose's ballet now at the Regal Theatre is the most lovely that has been seen in Delhi since Pavlova visited us. In colour, composition and movement it is the equal of Russian Ballet at

মুক্তি প্রতীক্ষিত "অপুর সংসার"-এর নায়িকার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুর

its best—The Statesman (Delhi)... Sadhona Bose is perhaps the greatest and most beautiful exponent of the art of dancing—Hindusthan Times (Delhi)—...numbers in Sadhona Bose's ballet are provided moments of escape from reality into the World of poetry—Civil & Military Gazette (Lahore).

বাঙলাদেশ আমার জন্মস্থান, আমার দেশ, আমার পিতৃ-পুরুষের ভূমি। আমার জননী-জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরীয়সী। তাই বাঙলার সমালোচকবৃন্দের আমার সম্বন্ধে সস্নেহ আনুকূল্যপূর্ণ অভিমত আমার কাছে উল্লেখ—অনুল্লেখের অনেক ঊর্ধে। সেই ভেবেই এখানে সেগুলির পুনরুল্লেখ করা থেকে বিরত রইলুম।

ব্যাপকভাবে ঘুরলুম সারা ভারতবর্ষ। নগরে নগরে অঞ্চলে অঞ্চলে, স্থানে স্থানে। তারপর ভ্রমণসূচী যতখানি সংক্ষিপ্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর হয়, দেশে ফেরার তাগিদও মনের মধ্যে হয় ততখানিই প্রবল থেকে প্রবলতর। তারপর একদিন মনের মধ্যে অসংখ্য স্মৃতির সংখ্যাতীত ছবি গেঁথে নিয়ে দেশের ছেলেমেয়ে দেশের কোলে ফিরে এলুম।

১৯৩৯ সালের জন্মমুহূর্ত তখন সবেমাত্র ঘোষিত হয়েছে।

[ ক্রমশঃ।

অনুবাদ—কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

# নিশান্তিকা

অমলেশ ভট্টাচার্য্য

মনের মর্মর জাগে স্মৃতিময়ী তমিস্রার ঘ্রাণে
দিগন্তের ধূসর পথে তামসী রাত্রির আহ্বানে।
হাল্কা বায়ুর ডানায় কুয়াশার সজল স্নেহ
[illegible] স্নেহ।

পূবের আকাশ কাঁপে অতলান্ত ঘুমের প্রহরে
মেঘের মিনার ছুঁয়ে আকাশের দূর-দূরান্তরে।
সবুজ ঘাসের বুকে হেমন্তের ঘুমের শিশির,
সকালের মিহি রোদে ঘুম ভাঙে স্বপ্ন পৃথিবীর।

মনে হচ্ছে বেরুবাড়ী বিল পার্লামেন্টে আসবেই, পাসও হবে যদি না দলমত নির্বিশেষে সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী সেইরকম আন্দোলন শুরু হয় যে রকম আন্দোলন বঙ্গবিহার সংযুক্তির প্রস্তাবকে নাকচ করতে সক্ষম হয়েছিল।"

—সাধারণতন্ত্রী (হাওড়া)

## ধান-চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

"ধান-চালের নিয়ন্ত্রিত মূল্য চালু করিবার সদিচ্ছা যদি সরকারের থাকে তাহ'লে বাজারে আগত সমস্ত শস্য এবং মিলজাত সমস্ত চালই সরকারী তরফে ক্রয় করিয়া নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিলি বন্দোবস্ত করা উচিত। মূল্যের এই সহজ সত্যটাকে এড়াইয়া গিয়া যে কোথায় নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা চার পয়সা বেশী দিল তাহা ধরিবার জন্ত ব্যগ্রতা দেখাইলেও ধান-চালের বাজারে কোনদিন স্থিতিস্থাপকতা আসিতে পারে না এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বর্তমান মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় লোক দেখান চালু থাকিলেও উহার কোনো মূল্যই কেহ দিবে না। মিলজাত পঁচিশভাগ চাল নিয়ন্ত্রিত মূল্যে লইয়া বাকী পঁচাত্তর ভাগ চাল মিলের মর্জির বা সদিচ্ছার উপর খোলা বাজারে অবাধ বিক্রয়ের স্বাধীনতা দিয়া আবার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় দেখিবার বাসনা একই সঙ্গে কি করিয়া সরকারের হৃদয়ে উদয় হয় ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ইহা বোধ হয় সজ্ঞানে স্বপ্ন দেখিবার বিলাস ছাড়া কিছুই নয়। ধান-চালের মূল্য নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে বাজারে প্রচুর মাল সরবরাহের নিশ্চয়তা পূর্বাহ্নে দেখাইতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে বাজারে আগত সমগ্র ধান এবং চালের নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ক্রয়ের এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সুলভ বণ্টনের ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক করিতে হইবে। গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে যেমন গাছ বাঁচে না, মূল্য নিয়ন্ত্রণের গোড়ার কথা উড়াইয়া দিয়া পরের অবান্তর প্রসঙ্গ লইয়া অযথা রাগ বিস্তার করিলে কোন দিনই কাজের কাজ হইবে না।

—বীরভূমের ডাক।

## শোকসংবাদ

### ধীরাজ ভট্টাচার্য

বাঙলার প্রখ্যাত অভিনয়শিল্পী ধীরাজ ভট্টাচার্য গত ২০-এ ফাল্গুন লোকান্তরিত হয়েছেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর আগে তিনি সর্বপ্রথম চলচ্চিত্রে অবতরণ করেন। তারপর আজ পর্যন্ত সব শুদ্ধ প্রায় ২০০ খানি ছবিতে অভিনয় করে দর্শকের রসপিপাসু মন ভরিয়ে গেছেন কানায়-কানায়। এমন দিন গেছে, যেদিন এই সুদর্শন শিল্পী বাঙলার চলচ্চিত্র জগতে একচ্ছত্র নায়কের আসনে সমাসীন ছিলেন। তারপর যে সব বিশেষ ধরণের চরিত্রে ধীরাজ বাবু অভিনয় করেছেন সেই চরিত্রাভিনয় তাঁর অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। টাইপ চরিত্র-অভিনয়ে যে অনন্য-সাধারণ স্বকীয়তার পরিচয় তিনি দিয়ে এসেছেন অসংখ্য ছবির মাধ্যমে, দর্শক-সমাজ তা সাদরে বরণ করে নিয়েছেন। চলচ্চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন (জোয়ার-ভাঁটা)। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল অবিচ্ছেদ্য, ইদানীং তিনি নিজে একটি সম্প্রদায় গঠন করে অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আদর্শ হিন্দু হোটেল"-এর মঞ্চাভিনয় করছেন। তাঁর হাজারী ঠাকুরের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় ভোলবার নয়। অভিনয় জগতে আসার আগে তিনি আরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু অভিনয়ের প্রতি সহজাত আকর্ষণ তাঁর শিল্পিমন উপেক্ষা করতে পারেন বলে পুরোপুরিভাবে অভিনয় জগতে তিনি অল্পকাল পরেই আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর অভিনীত প্রথম চিত্র সতীলক্ষ্মী (১৯২৫), তার পর কাল পরিণয়, নৌকাডুবি প্রমুখ নির্বাক ছবিগুলির নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নিজেকে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর প্রথম সবাক ছবি কৃষ্ণকান্তের উইল। এ নায়কের ভূমিকায় পরিবর্তে বিশেষ ধরণের দুরূহ চরিত্রে অভিনয় করে যে সকল ছবিগুলিকে তিনি সমৃদ্ধ করে গেছেন তাদের মধ্যে কালোছায়া, হানাবাড়ী, ডাকিনীর চর, কঙ্কাল, মরণের পরে, দুই বেয়াই প্রভৃতি ছবিগুলির নাম উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁর দক্ষতার স্পর্শ পাওয়া গেছে। আজকের দিনে চিত্রজগত সংস্কৃতির দরবারে একটি বিশেষ আসনের অধিকারী, দেশে শিক্ষিত রুচিবাণ ও অভিজাত মহলের পূর্ণ সমর্থনে চিত্রজগত ভরপুর—কিন্তু একদিন ছিল যেদিন চিত্রাভিনেতারা সমাজের কাছে অত্যন্ত প্রতিবাদযোগ্য ব্যবহার পেয়ে এসেছেন। সমাজ সেদিন চিত্রাভিনয়কে দেখত অত্যন্ত হীন চোখে, এর প্রতি সেদিন ছিল না এতটুকু অনুকম্পা সহানুভূতি, দরদ, সেদিনকার শিল্পীর দলকে বহুধা চিত্রজগতের সেবা করতে হয়েছে অজস্র বাধাবিপত্তি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, নিরাশা-বেদনা সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তাঁদের বহুজনের সুদীর্ঘ সাধনার ফল লেছি বা মঞ্চজগত আজকের দিনের এই সমৃদ্ধির মুখ দেখতে পেয়েছে। এ স্মরণীয় শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ধীরাজকুমার ভট্টাচার্যের নাম। ধীরাজ বাবুর তিরোধানে বাঙলার চিত্রজগতে নির্বাক ও সবাক যুগের মধ্যে জীবন্ত যোগসূত্রের অভাব ঘটল। তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

### মেজর পি, বর্ধন

হিন্দু মহাসভার বিশিষ্ট নেতা ও বিখ্যাত চিকিৎসক মেজর পি বর্ধন ১৩ই ফাল্গুন ৬১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি বহুবাজারের বিখ্যাত বর্ধনবংশের সন্তান। ইংল্যাণ্ডে গিয়ে এফ, আর, সি, এস ও এম, আর সি, পি ডিগ্রী লাভ করেন ও পরবর্তীকালে হিন্দুমহাসভার ক্রমোন্নতির কাজে নিজেকে পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত করেন ও সভার একজন বিশিষ্ট নেতারূপে স্বীকৃত হন।

### জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২০শে ফাল্গুন বেলা ১১-৪০ মিনিটের সময় কলিকাতার অন্যতম বিখ্যাত প্রসাধনী প্রস্তুতকারক হিমানী প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজার, ডিরেক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার টালাস্থিত বাসভবনে ৭৪ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাংলা দেশে সাবান-শিল্প প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। সাময়িকপত্র সম্পাদনাতেও তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা ১৬৬ নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

## লালবাঈ : লেখকের উত্তর

গত সংখ্যায় শ্রীমতী ভারতী ভট্টাচার্য্য জানতে চেয়েছেন যে, 'লালবাঈ' উপন্যাসে বর্ণিত রঘুনাথ ও চন্দ্রপ্রভার মৃত্যু বিবরণ সঠিক, না পত্রিকান্তরে প্রকাশিত বিবরণ সত্য। প্রবন্ধটির বিবরণে বলা হয়েছে যে, চন্দ্রপ্রভার আদেশে রঘুনাথকে হত্যা করা হয় এবং পরে চন্দ্রপ্রভা তুষের আগুনে আত্মবিসর্জ্জন করেন। আমার বক্তব্য হল এই যে, এই ঘটনাটির কোন ইতিহাস-ভিত্তিক প্রামাণ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে কয়েকটি বিভিন্ন 'জনশ্রুতি' আছে। উপন্যাসটি রচনা করার পূর্বে প্রাচীন প্রায় সব ক'টি ইতিহাসই আমি দেখেছিলাম, তুষের আগুনে প্রায়শ্চিত্ত করার কথা কোন গ্রন্থেই পাইনি। প্রবন্ধকার বলতে পারেন, এ তথ্য তিনি কোন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন? সব ইতিহাসেই সহমরণের উল্লেখই পাওয়া যায়। তবে রঘুনাথকে হত্যা করার ঘটনাটির তিনটি পৃথক ভাষ্য পাওয়া যায়: ১। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ঘাতকের দল রঘুনাথকে প্রাসাদকক্ষে আক্রমণ করায় রঘুনাথ উদ্যানে লাফিয়ে পড়েছিলেন এবং সেখানে হরিণের শৃঙ্গে আহত হয়ে মারা যান। ২। চন্দ্রপ্রভার ষড়যন্ত্রে গোপাল সিংহ রঘুনাথকে হত্যা করেন। ৩। চন্দ্রপ্রভা তীরবিদ্ধ করে রঘুনাথকে হত্যা করেন। ১৯২১ সনে প্রকাশিত অভয়পদ মল্লিকের 'হিষ্ট্রী অব দি বিষ্ণুপুর-রাজ' গ্রন্থের "The Senior Queen shot the King with an arrow" এই তথ্যটিকেই আমার কাছে সর্বাধিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে। কারণ, সতী হওয়ার পর চন্দ্রপ্রভা প্রজাদের যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, সেই শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চন্দ্রপ্রভাকে কেবলমাত্র ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে নিশ্চয়ই 'পতিঘাতিনী' আখ্যা দিতে তাঁরা রাজি হবেন না। আমরা যাঁদের শ্রদ্ধা করি তাঁদের অপরাধ বা দোষত্রুটি কমিয়ে ফেলতে চাই। তারই ফলে সম্ভবত: চন্দ্রপ্রভাকে কেবলমাত্র ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রাখার জনশ্রুতির উদ্ভব হয়। দ্বিতীয়ত: গোপাল সিংহ রঘুনাথকে হত্যা করলে তাঁকে কি 'রাজহন্তা' আখ্যা দেওয়া হতো না? গোপাল সিংহ পরম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন ও প্রজাদের প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক হরিনাম কীর্ত্তন করতে বাধ্য করেছিলেন বলেই 'গোপাল সিংহের বেগার' প্রবচনটির সৃষ্টি হয়। সুদীর্ঘ অতীতের একটি গোপন হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করা আজ আর সম্ভব নয়। বিশেষ করে তার সঙ্গে একটি অশান্ত রাজা ও বিদ্রোহী প্রজাবর্গ জড়িত ছিল বলে। সবশেষে, একটি কথা পাঠক-পাঠিকাদের জানাতে চাই। 'লালবাঈ' উপন্যাসের বিষ্ণুপুর অধ্যায়টির ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী। আমার বিচারে যে তথ্য বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল আমি সেগুলিই গ্রহণ করেছিলাম। কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ভাবেই দু'-একটি তথ্য গ্রহণ করিনি, সাহিত্যরসের প্রয়োজনে। প্রবন্ধ রচনা করলে আমি অবশ্যই পদে পদে পঞ্জিকাকারদের মত গোস্বামী মতের উল্লেখ করতাম, উপন্যাসে তা সম্ভব নয়। ইতি—রমাপদ চৌধুরী

### ছদ্মনাম প্রসঙ্গে

গত সংখ্যায় 'মাসিক বসুমতী'র পাঠক পাঠিকার চিঠি বিভাগে শ্রীঅবনীকুমার নাগ জানতে চেয়েছেন, হেমেন্দ্রকুমার রায়-এর কোনটি ছদ্ম ও কোনটি আসল নাম। এর উত্তরে আমি জানাতে চাই যে ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। এ গোলমাল বাধিয়েছেন, হেমেন্দ্রকুমার রায় নিজে। তিনি পিতৃদত্ত নামে যত লেখা লিখেছেন, তার চেয়ে বেশী লিখেছেন, হেমেন্দ্রকুমার রায় ছদ্মনামে। এই ছদ্মনামেই তিনি প্রখ্যাত। তাই খ্যাত ছদ্মনামটির মায়া তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁর পিতৃদত্ত নাম প্রসাদদাস রায়। নামে যদিও তিনি প্রথম জীবনে ও পরবর্ত্তী জীবনে কিছু কিছু লেখা বিশেষ করে চিত্র ও নাট্য বিষয়ক লেখা লিখেছেন, তথাপি প্রসাদ রায় নামে তিনি বহুল পরিচিত নন। এই কারণে ঘরে-বাইরে—কি সাহিত্য জীবনে কি সাংসারিক জীবনে তিনি ছদ্মনাম হেমেন্দ্রকুমার রায় এই নামেই পরিচিত। এই ব্যাপারটি হয় তো সম্পূর্ণ অন্ধকারেই থেকে যেত, যদি না তিনি তাঁর আত্মজীবনী—'যাঁদের দেখিছি' গ্রন্থে তাঁর নামের ইতিবৃত্তটি প্রকাশ করতেন। তিনি লিখেছেন, প্রসাদদাস রায়ের লেখা বঙ্কিম যুগের কথা, 'ভারতী'তে ধারাবাহিক ভাবে মাসে মাসে বেরুতে লাগল। তারপর ঐ নামে আমি অনেক পত্রিকায় অনেক লেখা লিখেছি এবং এখনও লিখছি। আসলে এইটিই হচ্ছে আমার পিতৃদত্ত নাম এবং হেমেন্দ্রকুমার রায় হচ্ছে ছদ্মনাম। * * * ভারতী সম্পাদিকা স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর পরামর্শে আমার আসল নামকেই আমি ব্যবহার করেছিলাম ছদ্মনামের মত। এই প্রসঙ্গে জানাই, বঙ্কিম যুগের কথা 'ভারতী'তে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, সেই সময় সাহিত্য সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছিলেন, বঙ্কিম যুগের কথা কি লিখিতেছেন বলিতে পারি না, লেখকের নাম নাই। প্রমাণও নাই। আমরা গালগল্প হিসাবেই ইহার মূল্য নির্ণয় করিব। মাণিক নন্দী, ১৬, কালিদাস লাহিড়ী লেন, কলিকাতা—৩৬।
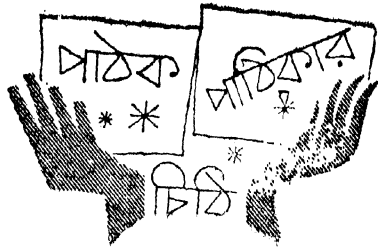
### পত্রিকা সমালোচনা

আপনার সর্ব্বজনপ্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীর আমি একজন নিয়মিত পাঠিকা। সেই হিসাবে পত্রিকাটি সম্বন্ধে কিছু বলবার অধিকার আমার আছে মনে হয়। আপনার পত্রিকাটি দিন দিন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠছে। বহু বিচিত্র উপাদান ইহার একটি বৈশিষ্ট্য। অচিন্ত্য বাবুর নতুন লেখা "অখণ্ড অমিয়" পড়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছি, অন্যান্য সব বিষয়ে নানারকম লেখা প্রকাশিত হলেও, দর্শন বিষয়ক বিশেষ কিছু পড়তে পাই না, আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীলের সম্বন্ধে কোন রচনা পড়তে পেলে আনন্দিত হই। এবারে আপনাকে আর একটি কথা লিখছি। গত পৌষমাসের বসুমতীতে শ্রীঅলোককুমার গুপ্ত যে প্রস্তাবটি করেছেন সেটি খুব সঙ্গত মনে হয়। সত্যিই Readers' Digest এর Life is like that বা Personal Glimpses' প্রভৃতির মত দু'-একটি অধ্যায় যোগ দিলে পত্রিকাটির বৈচিত্র্য আরও বাড়বে বলে আমারও মনে হয়। আমাদের নিজের জীবনের এবং শোনা এরূপ প্রচুর ঘটনা আছে। সুযোগ পেলে এগুলি প্রকাশ করা যায়। আপনার পাঠক পাঠিকাদের কাছ থেকে এরূপ সংবাদ সত্যিই আপনি নিয়মিত পাবেন বলে ধারণা।—শ্রীসন্ধ্যা গুপ্ত, নবদ্বীপ।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

I am enclosing a crossed cheque for Rs. 24/- being my annual subscription for the period Magh to Pous next.—N. K. Sanyal, Embassy of India, Tehran.

Please enlist my name as a subscriber of your monthly journal.—N. K. Das, M.B.B.S. Lauriston Place, Edinburg-3 U. K.

I am desirous to be a subscriber of your Monthly Basumati and the subscription is sent herewith in advance.—Dr. B. K. Bhattacharyya, P.R.S., National Research Council, Ottowa, Canada.

Subscription to Monthly Basumati is sent herewith.—G. Ghose, "Statesman House"—Calcutta.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ কোরে এক বৎসরের জন্য গ্রাহিকা কোরে পত্রিকা পাঠিয়ে বাধিত করবেন। —Mrs. Roma Dutta—New Delhi.

মাসিক বসুমতী আমেরিকায় পাঠাইবার যদি আপনাদের কোনো ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে ফাল্গুন মাস হইতে আগামী ৮ মাসের বসুমতী পাঠাইবার খরচ সমেত কত টাকা লাগিবে, অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বাধিত হইব।—ভক্তসত্তা ঘোষ, B. B. Avenue, Calcutta.

The amount ( Rs. 7·50 nP. ) is for renewal of subscription for Masik Basumati from Magh for six months.—Anima Dutt, Visakhapattam.

Yearly subscription for Monthly Basumati for B. S. 1365-66.—Government Primary Training School, Krishnanagore, Nadia.

আগামী বৎসরের জন্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত বসুমতী মাসিক সংখ্যা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—গোক উচ্চ বিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ।

ফাল্গুন ১৩৬৫ হইতে মাঘ ১৩৬৬-র টাকা পাঠাইলাম। —অধ্যক্ষ, পল্লী সংগঠন বিভাগ, শ্রীনিকেতন, বীরভূম।

Sending herewith Rs. 7·50 being the half yearly subscription from Baisakh.—B. B. Banerji, Jalpaiguri.

Rs. 15/- being subscription of Monthly Basumati for one year from Falgoon 1365 B. S. is sent herewith. —M. R. Bangur Sanatorium, Midnapore.

মাঘ সংখ্যা হইতে ৬ মাসের চাঁদা ৭৷৷৹ পাঠাইলাম। —বীণা চক্রবর্ত্তী, কাছাড়।

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাসিক চাঁদা বাবদ ৭৷৷৹ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত বই পাঠাইয়া বাধিত করবেন।—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা মুখার্জ্জী, বর্দ্ধমান।

Herewith I am sending Rs. 16·00 for annual subscription of your monthly Basumati from Magh ( 1365 B. S. )—Nonaipara T. E. Doarang, Assam.

আমি পুনরায় ষাণ্মাসিক গ্রাহিকা হবার জন্য ৭-৫০ পাঠালাম। আমাকে মাঘ মাস থেকে মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা করে নেবেন। —Mrs. Protiva Dey, Sibsagar, Assam.

মাসিক বসুমতীর কার্ত্তিক '৬৫ হইতে চৈত্র '৬৫ চাঁদা পাঠাইলাম। পত্রিকা সত্বর পাঠাইবেন।—মঞ্জু বসু—মনোহরপুর, সিংভূম।

I am remitting herewith the sum of Rs. 15·00 towards annual subscription for Masik Basumati. —Ramnath Chatterjee, Dhanbad.

## শুভ-দিনে মাসিক বসুমতী উপহার দিন

এই অগ্নিমূল্যের দিনে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবীর কাছে সামাজিকতা রক্ষা করা যেন এক দুর্বিবহ বোঝা বহনের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের মৈত্রী, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ আর ভক্তির সম্পর্ক বজায় না রাখিলে চলে না। কারও উপনয়নে, কিংবা জন্মদিনে, কারও শুভ-বিবাহে কিংবা বিবাহ বার্ষিকীতে, নয়তো কারও কোন কৃতকার্য্যতায় আপনি 'মাসিক বসুমতী' উপহার দিতে পারেন অতি সহজে। একবার মাত্র উপহার দিলে, সারা বছর ধ'রে তার স্মৃতি বহন করতে পারে একমাত্র 'মাসিক বসুমতী।' এই উপহারের জন্য সুদৃশ্য আবরণের ব্যবস্থা আছে। আপনি শুধু নাম ঠিকানা টাকা পাঠিয়েই খালাস। প্রদত্ত ঠিকানায় প্রতি মাসে পত্রিকা পাঠানোর ভার আমাদের। আমাদের পাঠক-পাঠিকা জেনে খুশী হবেন, সম্প্রতি বেশ কয়েক শত এই ধরণের গ্রাহক-গ্রাহিকা আমরা লাভ করেছি এবং এখনও করছি। আশা করি, ভবিষ্যতে এই সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। এই বিষয়ে যে-কোন জ্ঞাতব্যের জন্য লিখুন—প্রচার বিভাগ মাসিক বসুমতী। কলিকাতা।

হারেনসঙ্গিনী

( তেলরঙ )

—শ্রীবিনয় গুহ অঙ্কিত

# মাসিক বসুমতী

[ দ্বিতীয় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

৩৭শ বর্ষ—চৈত্র, ১৩৬৫ ]
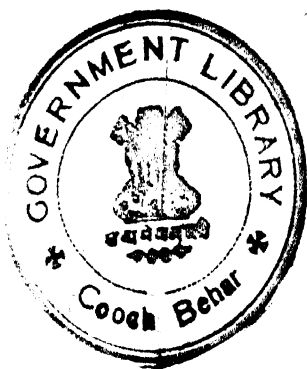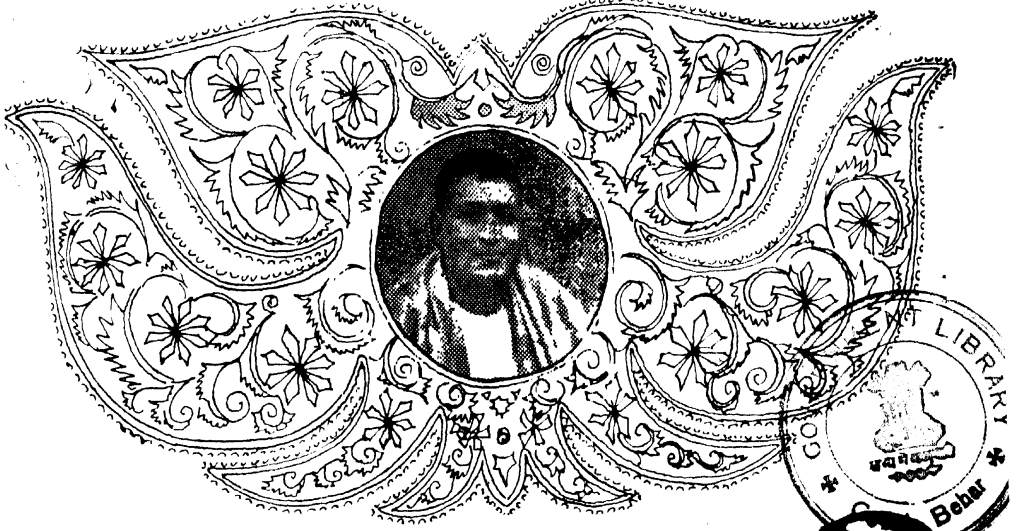

## কথামৃতের আত্মপ্রকাশ

শ্রীম—যার সমাধি হয়েছে তার লক্ষণ কি ?

'জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ । [ গীতা—৬।৭

সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, তাঁর কাছে সমান । হৃদয় ঠাকুরকে গালাগাল দিচ্ছে, ঠাকুর নিজের বেটুয়া থেকে কাবাব চিনি নিয়ে মুখে ফেলচেন । একদিন হৃদয় খড়ের ব্যবসা করবার জন্য খড় কিনতে গেছে । কালীবাড়ীতে লোকের কাছে বলে গেছে, 'মামা আছে, মা কালীর পুজো করবে ।' ঠাকুর দেখলেন অনেক বেলা হয়েছে অথচ মা কালীর পুজো হয়নি । তাই তাড়াতাড়ি রামলাল দাদাকে নিয়ে মায়ের পুজো করলেন । হৃদয় এলে ঠাকুর তাকে খুব মারলেন । বললেন 'শালা, আমি পুজো করব ?' হৃদয় বললে, 'মার মামা আরো মার ।' ঠাকুর বললেন, 'দেখ আমি যখন রাগব, তুই কিছু বলবিনি । আর তুই যখন রাগবি, আমি কিছু বলব না ।' আর একদিন হৃদয় ঠাকুরকে খুব বকেছে । ঠাকুর পোস্তায় দাঁড়িয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলেন । ঠাকুরের ঘরে অনেক জিনিষপত্র পড়েছিল । তা থেকে কিছু নহবতে গিয়েছিল, তাতে হৃদয় বললে, 'স্ত্রীকে নহবতে রেখে এখান থেকে সব জিনিষপত্র নিয়ে যাচ্ছেন । মা ঠাকুরাণী ঐ কথা শুনে সব ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন ।

বৈকালে শ্রীম একটি ভক্তকে বলিতেছেন, "এখন নড়তে পারিনে।" ঠাকুর একে ( গোকুলকে ) পাঠিয়ে দিলেন, তাই ঘরের গোছগাছ এবং বই বার করা হচ্ছে । ডায়েরী দশ বৎসর ধরে পড়েছিল । 'বসুমতী'র সতীশবাবুর * চেষ্টাতে হল । কেবল এসে তাগাদা দিতে লাগলেন, কবে 'কথামৃত' বার করবেন ? দুইজন ভক্ত আসিয়াছেন । তন্মধ্যে একজন শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য তিনি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে নিজ বাড়ীতে লইয়া, তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন ।

শ্রীম—আপনি বাড়ীতে নিয়ে সাধুসেবা করেছেন, বেশ করেছেন । ঠাকুর বুড়ো গোপালকে বলেছিলেন, 'এদের একজনকে খাওয়ালে পাঁচ শ সাধুকে খাওয়ান হয় ।' তাদের মধ্যে একজনকে সেবা করলেন । অবতারকে কি সকলে ধরতে পারে ? বেগুনওয়ালা হীরের দাম ন'সের বেগুনের চেয়ে বেশী দিতে পারে না । জহুরী কেবল ঠিক দাম দিতে পারে । তেমনি সাধুরাই ভগবানের মূল্য বুঝতে পারে ।

শ্রীম ( গদাধরের প্রতি )—তুমি উপনিষদ বলত ?

গদাধর উপনিষদ ( বৃহদারণ্যক ) হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন । 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ।' ইত্যাদি ।

---

* বসুমতী স্বত্বাধিকারী স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

# 'অজাতশত্রু' ও 'পূজারিণী'

অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ, এম-এ, পি-আর-এস

মগধরাজ্যের অধিপতি মহারাজ অজাতশত্রুর নাম ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীগণের নিকট সুবিদিত; কিন্তু তাঁহার কার্য্যাবলী বা রাজ্য-শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ অতি অল্প সংখ্যক লোকই অবগত আছেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের সময়ে মহাপরাক্রান্ত নৃপতি অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন; অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁহার সময় আজ হইতে মোটামুটি ২৫০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী।

অজাতশত্রুর শাসনকালে যদি কোন প্রতিভাবান কবি জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার শাসন প্রণালী সম্বন্ধে অনেক সংবাদই লিপিবদ্ধ হইত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই সময়ে তাদৃশ কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই; অথবা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেও এই বিষয়ে তাঁহার বা তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। অথবা এমনও হইতে পারে যে, অজাতশত্রুর চরিত্র ও রাজ্যশাসন প্রণালী সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিলেও পরবর্ত্তীকালের বিধর্ম্মী শাসকগণ কর্ত্তৃক অন্যান্য প্রাচীন-ভারতীয় গ্রন্থের সহিত উক্ত গ্রন্থ বা গ্রন্থগুলিও বিনষ্ট করা হইয়াছে। যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমানে অজাতশত্রু সম্বন্ধে তথ্য অবগত হওয়ার জন্য আমাদিগকে কেবলমাত্র অজাতশত্রুর প্রতিষ্ঠিত কতিপয় স্থাপত্য-শিল্প এবং ফা-হিয়েন, হিউ-এন্থ-সাং প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণের রচিত গ্রন্থগুলির উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইতেছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন চীনাভাষার অধ্যাপক James Lagge তাঁহার A record of Buddhistic Kingdoms (Clarendon Press, 1886) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, ফা-হিয়েনের রচিত ভারতের বিবরণ সংবলিত গ্রন্থখানা ৫১১ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। অধ্যাপক Lagge ফা-হিয়েনের চীনাভাষায় লিখিত উক্ত গ্রন্থখানার একটি ইংরাজী অনুবাদও করিয়াছেন। পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাঁহার গ্রন্থে অজাতশত্রুর রাজধানী রাজগৃহ নগরীর এক মনোজ্ঞ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন যে, রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ আনয়ন করতঃ রাজগৃহ নগরে স্থাপন করিয়া তাহার উপর এক অত্যুচ্চ, বিশাল, কারুকার্যখচিত এবং মনোরম স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন!

Three hundred paces outside the west gate, king Ajatasatru having obtained one portion of the relics of Buddha, built (over them) a tope high, large, grand and beautiful.

—"Travels of Fa-Hien" by James Lagge
Ch. XXVIII Page—81.

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন্থ-সাং রাজগৃহে আসিয়া অনুরূপ বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অজাতশত্রুই যে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ আনয়ন করিয়া তাহার উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, হিউ-এন্থ-সাংএর গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায়ই ইহার স্বীকৃতি দেখা যায়। বিশ্বকোষ অভিধানেও রাজগৃহ শব্দে রাজগৃহের ইতিহাস প্রসঙ্গে প্রমাণ হিসাবে হিউ-এন্থ-সাংএর গ্রন্থ হইতে কয়েকটি তত্ত্ব উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

মগধরাজ অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ লাভ করিবার জন্য কি ভাবে দাবী উত্থাপন করিয়াছিলেন, এই সম্বন্ধে হিউ-এনথ-সাং লিখিয়াছেন—

এই সময়ে মগধরাজ অজাতশত্রু শুনিলেন—বুদ্ধদেব কুশীনগরে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি কুশীনগরে দূত প্রেরণ করিয়া বলিলেন—ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়; আমি ভগবানের শরীরের এক অংশ পাইতে পারি। আমি ভগবানের শরীরাংশের উপর মহাস্তূপ নির্ম্মাণ করিব।

—বিশ্বকোষ (বুদ্ধদেব শব্দ)

বুদ্ধের দেহাবশেষ পাওয়ার জন্য অজাতশত্রু নিজের অনুকূলে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার মত। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, অজাতশত্রু বুদ্ধের শিষ্য বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না। কারণ, তাহা হইলে তিনি তাদৃশ যুক্তিতেই দাবী উত্থাপন করিতেন এবং সেই দাবীই বলবৎ হইত। অজাতশত্রু ক্ষত্রিয় ছিলেন—এই সংবাদটুকু হইতেও আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বৈদিক হিন্দুধর্ম্মেই তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। বুদ্ধদেবকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। সেই শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে এবং নিজের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্যই ক্ষত্রিয় অজাতশত্রু নিজের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীতেই বুদ্ধের দেহাবশেষ চাহিয়াছেন।

হিউ-এনথ-সাং এর উক্তির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া বিশ্বকোষ অভিধান অজাতশত্রু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

অজাতশত্রু বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের সমসাময়িক লোক। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পর তাঁহার অস্থি ও চিতা-ভস্মাদি তিনি রাজগৃহে একটি বৃহৎ স্তূপের অভ্যন্তরে রাখিয়াছিলেন। —(অজাতশত্রু শব্দ)

অপর পক্ষে 'অবদান-শতকম' নামক বৌদ্ধগ্রন্থের ৫৪তম (শ্রীমতী) উপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, রাজা বিম্বিসার (অজাতশত্রুর পিতা) বুদ্ধদেবের নিকট প্রার্থনা করতঃ তাঁহার কেশ ও নখ লাভ করিয়া নিজ রাজধানী রাজগৃহে উহা স্থাপন-পূর্ব্বক তদুপরি স্তূপ নির্ম্মাণ, ক্রমে পূজা, আরতি ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন।

"যাবদ রাজ্ঞা বিম্বিসারেন ভগবান বিজ্ঞপ্তঃ—দীয়তামস্মভ্যং কেশনখং যেন বয়ং তথাগতস্তূপমন্তঃপুরমধ্যে প্রতিষ্ঠাপয়াম ইতি। যাবদ ভগবতা কেশনখং দত্তম্। রাজ্ঞা বিম্বিসারেণ মহতা সংকারেণান্তঃপুরসহায়েন তথাগতস্য কেশনখস্তূপোঽন্তঃপুরমধ্যে প্রতিষ্ঠাপিতঃ। তত্র চান্তঃপুরে অন্তঃপুরিকা দীপ-ধূপ পুষ্প গন্ধ-মাল্য-বিলেপনৈরভ্যর্চনং কুর্ব্বন্তি।" —অবদানশতকম (শ্রীমতী অবদান)।

অতএব সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় রাজা বিম্বিসার তাঁহার পরিত্যক্ত কেশ ও নখের অংশ গ্রহণ করতঃ নিজের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী পুরাতন রাজগৃহে উহা স্থাপন করিয়া তাহার উপর এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিম্বিসারের মৃত্যুর

পর অজাতশত্রু রাজা হন এবং তাঁহার রাজত্বকালেই বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের পর তাঁহার দেহাবশেষ আনয়ন করিয়া অজাতশত্রু নিজের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী নূতন রাজগৃহে উহা স্থাপন করতঃ তাহার উপর এক বিরাট, মনোজ্ঞ স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অজাতশত্রু যে কেবল বুদ্ধের দেহাবশেষের উপরই স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এমন নহে। বুদ্ধের অন্তরঙ্গ ভক্ত আনন্দ দেহত্যাগ করিলে পর তাঁহারও দেহাবশেষ আনয়ন করিয়া তদুপরি আর একটি বিরাট স্তূপও তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অজাতশত্রু কত আগ্রহ সহকারে আনন্দের দেহাবশেষ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ চৈনিক পরিব্রাজকেরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজকগণের লেখা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, অজাতশত্রু নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী না হইলেও বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল।

১৮ তম অবদান হইতে জানা যায়, অজাতশত্রু শাসক হিসাবে অত্যন্ত কঠোর এবং অতিশয় সাহসী ছিলেন ( সর্ব্বথারং রাজা অজাতশত্রুশ্চণ্ডো রভসঃ কর্কশঃ সাহসিকশ্চ ), অথচ তাঁহার হৃদয় দয়া ও উদারতায় পূর্ণ ছিল। গঙ্গিক নামক চোর যখন রাজধানীতে সিঁদ কাটিবার সময় ধরা পড়িয়া রাজার নিকট নীত হয়, তখন তিনি তাহাকে মৃত্যুদণ্ডেই দণ্ডিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বধ্যস্থানে নীত হওয়ার সময়ে উক্ত গঙ্গিকের অন্তরে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে বলিয়া জানিতে পারিয়া তিনি তাহাকে মুক্তি দেন। ইহাতে রহিয়াছে একাধারে অজাতশত্রুর কঠোরতা ও কোমলতার পরিচয়।

অবদানশতকের দুইটি [ প্রাতিহার্য ( ১৫শ ) এবং শ্রীমতী ( ৫৪ তম ) ] উপাখ্যানে আবার অজাতশত্রুকে পিতৃহন্তা রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ অজাতশত্রু যথার্থই তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিলেন কি না ইহা বিচার্য্য বিষয়। অবদানশতকে বর্ণিত উপাখ্যানগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে উক্ত গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পকেই সম্পূর্ণ কল্পিত বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তি-বিশেষের পূর্ব্ব-জন্মের ঘটনাগুলি বুদ্ধের মুখে উচ্চারিত হইতেছে দেখিয়া তাহাদের সত্যতা না হয় স্বীকার করিলাম ; কিন্তু কৃষ্ণসর্প, মহিষ প্রভৃতি ইতর প্রাণীরা বুদ্ধের কাছে আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মুক্তিভিক্ষা চাহিতেছে, এতাদৃশ গল্পগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যে পুস্তকে এইরূপ কল্পনাবিলাসের অজস্র নিদর্শন বিদ্যমান, কেবল মাত্র সেই পুস্তকের দুই-একটি উক্তি দেখিয়াই অজাতশত্রুকে পিতৃহন্তা বলিয়া নিশ্চিতরূপে স্বীকার করা চলে না।

রাজা ( ১০ম ) অবদানে কোশলরাজ প্রসেনজিতের সহিত মগধরাজ অজাতশত্রুর তুমুল সংগ্রামের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম বারের যুদ্ধে প্রসেনজিৎ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। পরিশেষে বৌদ্ধদের নিকট হইতে নানাবিধ সাহায্য পাইয়া তিনি পুনরায় নূতন ভাবে সমরায়োজন করতঃ অজাতশত্রুকে আক্রমণ করেন। এই বারের যুদ্ধে অজাতশত্রু পরাজিত ও বন্দী হন। প্রসেনজিৎ বন্দী শত্রুকে হত্যা না করিয়া মুক্তিদান করিয়াছিলেন। মুক্তিদানের হেতু সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, যেহেতু ইনি আমার বন্ধুর পুত্র ( যস্মাদ বয়স্য [illegible] ) [illegible] ইহাকে হত্যা করিব না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রসেনজিৎ অজাতশত্রুকে বন্ধুর হত্যাকারী বলেন নাই ; বন্ধুর পুত্র বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অজাতশত্রু যদি পিতৃঘাতী হইতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রসেনজিৎ তাঁহার বন্ধুর এই হত্যাকারীকে হত্যা না করিয়া ছাড়িতেন না।

যদিই বা অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও কি কারণে তিনি এরূপ কাজ করিলেন, ইহা বিচার্য্য। অজাতশত্রু যদি রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা করিতেন তাহা হইলে চৈনিক পরিব্রাজকেরা সম্ভবতঃ এই সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা লিখিতেন। রাজগৃহের উপকণ্ঠে একবার যখন একটি কৃষ্ণবর্ণ মত্তহস্তী বুদ্ধদেবের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, তখন অজাতশত্রুর শত্রুপক্ষের লোকেরা' উক্ত হস্তী তাঁহারই প্রেরিত বলিয়া অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন অজাতশত্রু সংক্রান্ত এই হস্তিঘটিত গল্পটি তাঁহার গ্রন্থে (Ch XXVIII) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; কিন্তু অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা সম্বন্ধে তিনি কিছুই লিখেন নাই। অজাতশত্রুর চরিত্রের একটি ক্ষুদ্র কলঙ্কও যিনি প্রকাশ করিলেন, সেই বিদেশী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পরিব্রাজক পিতৃহত্যার মত একটি গুরুতর ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব কেন ?

ইহার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথমতঃ মনে করা যাইতে পারে যে, অজাতশত্রু বস্তুতঃ পিতৃহত্যা করেন নাই ; এবং দ্বিতীয়তঃ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তিনি বিম্বিসারকে হত্যা করিলেও ইহার পশ্চাতে এমন একটা কারণ ছিল, যাহা প্রকাশ করিলে বৌদ্ধনৃপতি বিম্বিসারের চরিত্র ম্লান হইয়া যাইবে। বাংলাভাষায় একটা প্রবাদ আছে—যাহা রটে, কিছুটা বটে ; অর্থাৎ জনরব পা বহুল প্রচারিত বিষয়ের মূলে কিছুটা সত্য থাকে। যদিও ? অজাতশত্রুর পিতৃহত্যা ঘটিত গল্পটি বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল কি না, তাহার প্রমাণ নাই ; তথাপি উল্লিখিত প্রবাদবাক্যের ভিত্তিতে আমরা ধরিয়া লইব যে, কোন বিশেষ কারণে সত্যই তিনি বিম্বিসারের অকালমৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। উক্ত বিশেষ কারণটি কি হইতে পারে, তাহাও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

অজাতশত্রুর চরিত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থে যতটুকু উল্লেখ আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই মহাপরাক্রান্ত নৃপতি শাসনকার্য্যে অত্যন্ত কঠোর হইলেও তাঁহার অন্তর উদারতা, মহত্ত্ব ও পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুতায় পরিপূর্ণ ছিল। নিজে নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়াও তিনি বুদ্ধ ও আনন্দের দেহাবশেষ সংগ্রহ করিয়া নিজ রাজধানীতেই তাহাদের উপর একাধিক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার 'অজাতশত্রু' নামটি হইতেও তদীয় চরিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অজাতশত্রু শব্দের অর্থ—যাহার কোন শত্রু কখনও জন্মে নাই। মহাভারতের আদর্শ-চরিত্র রাজা যুধিষ্ঠির অজাতশত্রুরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মগধরাজ অজাতশত্রুর এই নামটি খুব সম্ভব তাঁহার উপাধিবিশেষ। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে ন্যায়ের দণ্ড বহন করিয়া তিনি এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

অবদান-শতকের যে বাক্যটিতে অজাতশত্রুকে পিতৃঘাতী বলা হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহার নামের সহিত যুক্ত একটি বিশেষণ লক্ষ্য করিবার মত। পাঠকগণের অবগতির জন্য উল্লিখিত সম্পূর্ণ বাক্যটি উদ্‌ধৃত করিতেছি ; যথা—

"যদা পুনা রাজ্ঞা অজাতশত্রুণা দেবদত্ত-বিগ্রাহিতেন পিতা ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজো জীবিতাদ্ ব্যবরোপিতঃ, স্বয়ং চ রাজ্যং প্রতিপন্নঃ, তদা ভগবচ্ছাসনে সর্ব্বদেয়ধর্ম্মাঃ সমুচ্ছিন্নাঃ, ক্রিয়াকারশ্চ কারিতো ন কেনচিত্তথাগতস্তূপে কারাঃ কর্ত্তব্যা ইতি।"

—অবদানশতকম্। ৫৪তম অবদান (শ্রীমতী)।

বঙ্গার্থ—যখন রাজা অজাতশত্রু দেবদত্ত-বিগ্রাহিত হইয়া (দেবতাদের জন্ম যুদ্ধ করিয়া) ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ পিতাকে বিনাশ করতঃ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন, তখন সমুদয় দেবধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইল এবং এইরূপ বিধান হইল যে, আর কেহ তথাগত স্তূপে কোনপ্রকার (পূজাদি) কার্য্য করিতে পারিবে না।

উল্লিখিত সংস্কৃত বাক্যটিতে আমরা দেখিতেছি—অজাতশত্রুর সঙ্গে 'দেবদত্ত বিগ্রাহিতেন' এই বিশেষণ পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ ভাষ্যকারদের মতে, দেবদত্ত নামক একজন লোক কুমন্ত্রণা দিয়া অজাতশত্রুকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। সম্ভবতঃ, এইরূপ ব্যাখ্যা সমর্থন করিবার মত কোন প্রাচীন উক্তি আমরা কোথাও দেখিতে পাই নাই। ইহার অন্য একটি ব্যাখ্যা হইতে পারে—'দেবেভ্যঃ দত্তং বিগ্রাহিতং যেন তাদৃশেন' অর্থাৎ দেবতাদের উদ্দেশ্যে যিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই অজাতশত্রু কর্ত্তৃক। আমরা এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিকেই অধিকতর সমীচীন মনে করি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইল—দেবতাদের উদ্দেশ্যে অজাতশত্রু কেন যুদ্ধ করিয়াছিলেন? ইহার উত্তর অতি সুস্পষ্ট। পরবর্ত্তীকালে যেমন বৌদ্ধসম্রাট অশোক তাঁহার রাজ্যে যাগযজ্ঞ (বিশেষতঃ বলি সহকারে) নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ বিম্বিসারও তেমনি কিছু করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ নৃপতিগণের অনেকের মধ্যেই এইরূপ নিদারুণ হিন্দুবিদ্বেষ দেখা যায়। থানেশ্বররাজ হর্ষবর্দ্ধন খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পাঁচ শতাধিক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে তাঁহার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া চরম হিন্দু বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছিলেন। বিম্বিসারও সম্ভবতঃ হিন্দু দেবালয় হইতে দেবমূর্ত্তিসমূহ অপসারণ পূর্ব্বক তথায় বা তাহার পার্শ্বে স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। হয়তো অবস্থা আরও অধিক দূর গড়াইয়াছিল, অর্থাৎ বিম্বিসার হিন্দুদের যাবতীয় বিশিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য নিষিদ্ধ করিয়া তাদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী হিন্দুদের প্রতি কঠোর শারীরিক দণ্ডেরও বিধান করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ ন্যায়পরায়ণ, উদারচেতা, যুবরাজ অজাতশত্রু পিতার এই ঘোর অন্যায় সহ্য করিতে পারেন নাই। পুনঃপুনঃ পিতার নিকট ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন সাহসী বীর অজাতশত্রু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। জনগণের সমর্থনপুষ্ট এই বিদ্রোহ দমন করা বিম্বিসারের সাধ্যাতীত ছিল; সুতরাং তিনি পুত্রের হস্তে বন্দী হইয়া অপরাধ অনুযায়ী দণ্ডভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অজাতশত্রু সাধারণতঃ একটি বিচারকমণ্ডলী দ্বারাই যাবতীয় দুরূহ বিষয়ের বিচার করাইতেন। সম্ভবতঃ এইরূপ বিচারে বিম্বিসারের প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিহিত হইয়াছিল এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য ন্যায়পরায়ণ অজাতশত্রু পিতার এই দণ্ড সমর্থন করিয়াছিলেন। এইরূপে হিন্দুদের দেবক্রিয়া ও দেবমন্দিরসমূহ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া অজাতশত্রু 'দেবদত্ত-বিগ্রাহিত' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

অজাতশত্রুর যে একটি বিচারকমণ্ডলী ছিল, তাহার প্রমাণও উল্লিখিত (শ্রীমতী) অবদানেই পাওয়া যায়। শ্রীমতীর বিচার রাজা নিজে করেন নাই; তিনি একটি চক্র বা বিচারকমণ্ডলীর হস্তে শ্রীমতীর বিচারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মূলে আছে—"ততস্তেন কুপিতেন চক্রং ক্ষিপ্তং জীবিতাদ্ ব্যবরোপিতা।" এই চক্র শব্দটি নিশ্চয়ই বিচারকমণ্ডলী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নারায়ণের সুদর্শন চক্রের মত কোন চক্র নামক অস্ত্র নিশ্চয়ই অজাতশত্রুর হাতে ছিল না; এবং তাদৃশ কোন চক্রদ্বারা তিনি স্বহস্তে শ্রীমতীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন—এইরূপ কল্পনাও অবাস্তব।

বিম্বিসারের রাজত্বকালে যে হিন্দুদের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিত অবদানশতকের ১৫শ (প্রাতিহার্য্য) অবদানে পাওয়া যায়। উক্ত অবদানে অজাতশত্রু পিতৃঘাতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নামের সঙ্গে 'দেবদত্ত-বিগ্রাহিত' বিশেষণটিও প্রযুক্ত হইয়াছে। বিম্বিসারকে হত্যা করিয়া অজাতশত্রু সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর রাজ্যে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, বলিতে গিয়া অবদানের রচয়িতা লিখিয়াছেন—

"যদা রাজ্ঞা অজাতশত্রুণা দেবদত্ত-বিগ্রাহিতেন পিতা ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজো জীবিতাদ্ ব্যবরোপিতঃ, স্বয়মেব চ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতঃ, তদা যে অশ্রাদ্ধাস্তে বলবন্তো জাতাঃ, শ্রাদ্ধাস্তু দুর্ব্বলাঃ সংবৃত্তাঃ। যাবদন্যতমো বৃদ্ধামাত্যো শ্রোত্রো ভগবচ্ছাসনবিদ্বেষী, স ব্রাহ্মণেভ্যো যজ্ঞমারব্ধো যষ্টুম্। অত্রানেকানি ব্রাহ্মণ-শতসহস্রাণি সন্নিপতিতানি।"

—অবদানশতক; ১৫শ (প্রাতিহার্য্য) অবদান।

বঙ্গার্থ—যখন রাজা অজাতশত্রু দেবদত্ত-বিগ্রাহিত হইয়া (দেবতাদের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করিয়া) ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ পিতাকে বিনাশ করতঃ স্বয়ং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন শ্রদ্ধাহীন লোকেরা প্রবল হইয়া উঠিল এবং শ্রদ্ধাবান্‌দের দুর্ব্বলতা ঘটিল। প্রাচীন অমাত্যদের মধ্যে একজন লোক ছিল, সে বুদ্ধের অনুশাসন মানিত না। এই ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করাইয়া দিল। উক্ত যজ্ঞে অনেক শত সহস্র ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন।

উল্লিখিত বাক্যগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বিম্বিসারের রাজত্বকালে কোন হিন্দুর পক্ষে যজ্ঞাদি কার্য্য সম্পাদন করা সম্ভব ছিল না। এমন কি, মন্ত্রী পর্য্যায়ের লোকেরা পর্য্যন্ত যজ্ঞ করাইতে পারিতেন না। সুতরাং হিন্দুদের এই যজ্ঞাদি ক্রিয়া রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই যে অজাতশত্রু বিদ্রোহ করিয়াছিলেন (অবশ্য যদি বাস্তবিকই বিদ্রোহ করিয়া থাকেন), ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অজাতশত্রুর শাসনকালে আরব্ধ যজ্ঞেও যে বৌদ্ধেরা বাধা দান করিয়াছিলেন, উল্লিখিত অবদানেই তাহারও ইঙ্গিত আছে। অবদানের রচয়িতা লিখিয়াছেন—যজ্ঞ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং বুদ্ধদেব ইন্দ্রের রূপ ধারণ করতঃ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে বিভ্রান্ত করেন এবং পরে নিজ রূপ প্রকাশ করিয়া অভীষ্টসাধনে সমর্থ হন। উক্ত গল্পের অতি প্রাকৃত অংশ বাদ দিয়া আমরা এই সত্যটুকু গ্রহণ করিতে পারি যে, বৌদ্ধেরা যজ্ঞে বাধা দান করিয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত রাজার নিরপেক্ষ নীতির ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল।

রাজা অজাতশত্রু যে কেবল পরধর্ম্ম-সহিষ্ণুই ছিলেন, এমন নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষা এবং তাহার প্রচারের জন্তও তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। বৈদিক-ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয় রাজা অজাতশত্রুর নির্দ্দেশে এবং তাঁহারই বিপুল অর্থব্যয়ে খৃষ্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে রাজগৃহ নগরে 'প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতি' বা 'ধর্ম্মবিনয়-সংগ্রাহিণী' নামে পরিচিত বৌদ্ধধর্ম্ম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার যাবতীয় ব্যয় অজাতশত্রুই বহন করিয়াছিলেন। ইহাতে পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধিস্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু উপস্থিত থাকিয়া সুদীর্ঘ ৭ মাসে বুদ্ধের ধর্ম্মমত পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। অনন্তকুমার তর্কতীর্থ সম্পাদিত বৈভাষিক-দর্শনের ভূমিকায় উল্লিখিত সত্য কথাটি স্বীকৃত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব বা তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি যে অজাতশত্রুর বিদ্বেষ ছিল না, তাহার অপর প্রমাণ পাই পঞ্চবার্ষিক (১৬শ) অবদানে। তথায় বলা হইয়াছে—বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহনগরে আসিলেন, তখন রাজা অজাতশত্রু ঘণ্টাধ্বনি সহকারে ঘোষণা করাইলেন যে, বুদ্ধদেবের দর্শন লাভের বা তাঁহাকে অর্চনা করিবার উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তি যাইতে পারেন।

"ততো রাজ্ঞা অজাতশত্রুণা ক্রিয়াকারমুদ্‌ঘাট্য—রাজগৃহে নগরে ঘণ্টাবঘোষণং কারিতম্—ক্রিয়তাং ভগবতঃ সংকারো যথাসুখমিতি—" ১৬শ (পঞ্চবার্ষিক) অবদান।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কথা ও কাহিনী' নামক গ্রন্থে অবদানশতকের শ্রীমতী অবদান অবলম্বনে বঙ্গভাষায় 'পূজারিণী' শীর্ষক যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অজাতশত্রুর উপর তিনটি অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। এই অভিযোগ তিনটি অবদানশতকেও নাই; ইহা সম্পূর্ণরূপে ৺রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-প্রসূত। কবির কল্পিত এই তিনটি অভিযোগ সম্বন্ধেই আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। রবীন্দ্রনাথের প্রথম অভিযোগ—

"অজাতশত্রু রাজা হ'ল যবে
পিতার আসনে আসি।
পিতার ধর্ম্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে,
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধ-শাস্ত্ররাশি।"

বস্তুতঃ ফা-হিয়েন, হিউ-এনৎ-সাং প্রভৃতি বৈদেশিক লেখকদের লেখা এবং অবদান-শতক প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতেই জানা যায় যে, অজাতশত্রু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের জন্তই প্রভূত চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি কোনপ্রকার কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থে কোনপ্রকার উল্লেখ নাই। অতএব, অজাতশত্রুর সজ্জাত চরিত্রের বিরোধী এইরূপ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কবিগুরুর দ্বিতীয় অভিযোগ—

"কহিল ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে—
বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার
ভুলিলে বিপদ হবে।"

উপরের আলোচনা হইতেই জানা যাইতেছে—বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অজাতশত্রুর কিরূপ শ্রদ্ধা ছিল। যে মহাপুরুষ বৌদ্ধদের ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়নের জন্য এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করতঃ তাহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন; যিনি রাজধানীর বুকে বুদ্ধ ও আনন্দের দেহাবশেষ স্থাপন করিয়া তদুপরি শিল্পশোভাময় বিশাল স্তূপসমূহ নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন; এবং যিনি সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদের প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া অজাতশত্রু উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন; তাঁহার উপর এইরূপ ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করা কি একান্ত অসঙ্গত নহে?

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় অভিযোগ—

অজাতশত্রু করেছে রটনা
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্ব্বাসনে।

বস্তুতঃ অবদান-শতক বা অন্য কোন বৌদ্ধগ্রন্থেও এইরূপ অভিযোগ করা হয় নাই। যিনি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অর্চনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে এইরূপ ঘোষণা করা কি সম্ভব? তবে যদি বিম্বিসারের আমলে হিন্দুদের কোন পবিত্র দেবালয় হইতে দেববিগ্রহ অপসারিত করিয়া তথায় বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করতঃ তাহারই অর্চনার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে এবং সমদর্শী অজাতশত্রু সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর ঐ দেবমন্দিরে পুনরায় দেববিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও অর্চনার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র তাহা হইলেই অজাতশত্রুর পক্ষে উক্তপ্রকার আদেশ দান সম্ভব। বস্তুতঃ মূলগ্রন্থে নির্ব্বাসন বা শূলে দেওয়ার কোন উল্লেখই নাই।

অবদানশতকে বলা হইয়াছে—শ্রীমতী যখন স্তূপে প্রদীপ দ্বারা আরতি করেন, তখন রাজা প্রাসাদের উপর হইতে স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছিলেন। অতঃপর রাজার প্রশ্নের উত্তরে একজন অন্তঃপুরিকা শ্রীমতীর এই কার্য্যের কথা রাজাকে জানান। তখন রাজা শ্রীমতীকে ডাকাইয়া আনিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান করেন। রাজাদেশ অমান্য করার অভিযোগে শ্রীমতী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বিচারের ভার একটি বিচারকমণ্ডলীর উপর অর্পিত হইয়াছিল। বিচারে শ্রীমতীর শিরশ্ছেদের আদেশ হয়। শূলে দেওয়ার বা নির্ব্বাসনের নহে। বর্ত্তমানকালেও আইন অমান্য করিলে দণ্ডিত হইতে হয়; সুতরাং অজাতশত্রু এই ক্ষেত্রে অন্যায় কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

তাহার পর প্রশ্ন উঠে—বৌদ্ধস্তূপে অর্ঘ্য রচনা করিতে অজাতশত্রু নিষেধ করিয়াছিলেন কেন? ইহার উত্তরও স্পষ্ট। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ৺কাশীধামের ৺বিশ্বনাথের মন্দির ভাঙ্গিয়া তথায় একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ভাবে হিন্দুদের অন্যান্য বহু দেবালয় ও মুসলমান শাসকগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত বা মসজিদে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপে হিন্দুজাতির ধর্ম্মবিশ্বাসে পুনঃ পুনঃ আঘাত পড়ার ফলে মহাবীর শিবাজীর নেতৃত্বে হিন্দুরা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। যদি শিবাজী কাশী পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ৺বিশ্বনাথের মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আওরঙ্গজেবের প্রতিষ্ঠিত নূতন মসজিদটিকে অপসারিত করিবার আদেশ দিতেন। যে কোন নিরপেক্ষ মানুষের দৃষ্টিতে শিবাজীর

ঈদৃশ আদেশ অতি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। এ ক্ষেত্রেও বিম্বিসার যদি হিন্দুদের দেবালয়সমূহ ভাঙ্গিয়া তথায় স্তূপ রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিরপেক্ষ প্রজাবৎসল রাজা অজাতশত্রুর পক্ষে তাদৃশ নবরচিত স্তূপের উৎসব সমূহ বন্ধ করিয়া তথায় পুনরায় দেবালয় প্রতিষ্ঠার আদেশ দান করা খুবই স্বাভাবিক। অজাতশত্রু এইরূপ ন্যায়সঙ্গত কারণেই একটি বিশেষ স্তূপে অর্ঘ্য রচনা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

হিন্দুদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ করিবার জন্য বৌদ্ধ রাজারা যে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিম্বিসারের ঈদৃশ কার্য্যের ইঙ্গিত যে অবদানশতকেই রহিয়াছে, তাহা উপরে প্রদর্শন করিয়াছি। পরবর্ত্তীকালে সম্রাট অশোকের খোদিত ১৪শ শিলালিপিতে অনুরূপ কার্য্যের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময়ে রাজার রন্ধনশালার জন্য দৈনিক অন্ততঃ তিনটি পশু হত্যা করা হইত, সেই সময়েই তিনি সমগ্র রাজ্যে হিন্দুদের যজ্ঞে বলিদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ফা-হিয়েনের ভ্রমণ কাহিনীতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। চৈনিক পরিব্রাজকরা তাঁহাদের গ্রন্থে বৌদ্ধদের নিকট হইতে শ্রুত যে সকল উপাখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদের অনেকটিতেই হিন্দু দেবতাদের প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। শক্র (ইন্দ্র) প্রভৃতি দেবগণকে বুদ্ধের সেবকরূপে বর্ণনা করিতেও উদ্ধত শ্রমণেরা দ্বিধাবোধ করেন নাই।

ফা-হিয়েনের গ্রন্থে (The Travels of Fa-Hien, Ch. XX) অন্য একটি উপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণেরা তাহাদের দেবতাদিগকে যে সমস্ত প্রদীপ ও অন্যান্য সামগ্রী দান করিতেন, ঐ সকল-দেবতা নিজেরাই রাত্রিকালে উল্লিখিত প্রদীপ ও অন্যান্য অর্ঘ্যসামগ্রী লইয়া সমীপস্থ বৌদ্ধমঠে চলিয়া যাইতেন এবং তিনবার বৌদ্ধমন্দির প্রদক্ষিণের পর বুদ্ধমূর্ত্তির পাদমূলে ঐগুলি নিবেদন করিতেন। পুনঃপুনঃ প্রদীপ ও পূজাসামগ্রী অপহৃত হইতেছে দেখিয়া যখন ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং রাত্রিতে মন্দিরের পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহারা না কি উহা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। এই উপাখ্যান পাঠ করিয়া স্বভাবতঃই মনে হয়, বৌদ্ধ রাজা অশোকের নির্দ্দেশে রাজপুরুষেরা বলপূর্ব্বক সেই দিন রাত্রিতে হিন্দুদের পূজাসামগ্রী অপহরণ করিয়াছিলেন, এবং এই ঘটনাটিকেই উল্লিখিত প্রকার অলৌকিক রূপ দেওয়া হইয়াছিল।

বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, সম্রাট অজাতশত্রু রাষ্ট্রের কল্যাণ ও প্রজা-সাধারণের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তিনি সকল ধর্ম্মের প্রতিই সমান শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। তিনি নিজে বৈদিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন বটে; কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় অপেক্ষা বৌদ্ধদের মধ্যেই ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা অধিক দেখিয়া তিনি তাহাদিগকেই অধিকতর সাহায্য করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের আচার ও প্রচারে অজাতশত্রু বাধা দান তো করেনই নাই বরং তাহাদের ধর্ম্ম-সম্মেলনের ব্যয়ভার বহন এবং স্তূপনির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা তিনি সর্ব্বদাই বৌদ্ধদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। অজাতশত্রুর প্রকৃত পরিচয় অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য নিম্নে একটি কবিতাও গ্রথিত করিলাম।

## অজাতশত্রু

ছিল না তোমার শত্রু কেহ কদাপি ভূমণ্ডলে
অজাতশত্রু তাই তো ধরিলে নাম তুমি অবহেলে।
সবার মঙ্গল হেতু দেব হরিলে অমঙ্গল
ত্যজিয়া আপন পিতৃপ্রেম, শান্তিসুখের সম্বল।
বুদ্ধের নামে শাসনদণ্ড ধরিয়া বিম্বিসার
বধিয়া বিপ্র-পণ্ডিতগণে করিতেছে একাকার।
হিন্দুর লাগি নাই সুবিচার নাহিক কাণ্ডাকাণ্ড
যে মানিবে বেদ, তার লাগি বাঁধা আজি মৃত্যুদণ্ড।
নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণ শূলে চড়ি, দারুণ মনস্তাপে
দিতেছেন ঘোর অভিশাপ; ভয়ে যেন শূল কাঁপে।
মরে বিপ্র, কাঁদে তার নারী স্মরিয়া পিতৃগণে
অকালে শ্রাদ্ধ-তর্পণ করে আপনার পুত্রসনে।
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, যাহারা বেদ মানে
সবার উপরে রাজার আজ্ঞা নিদারুণ দণ্ড হানে।
মানে না বুদ্ধে সঙ্ঘেরে আর এই বেটা বদমাস
শুনিবামাত্র নৃপতি তাহার করেছেন সর্ব্বনাশ।
আশ্রম হেরি ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয়হীন দেশ
রাজকোষে নীত বৈশ্যের ধন শূদ্রেরা মুণ্ডিতকেশ।
ভয়কম্পিত হিন্দুর প্রাণ, বৌদ্ধেরা ফুল্লানন
কেমনে আজি বাঁচাই প্রাণ—ভাবিতেছে হিন্দুগণ।
বেদনাবিধুর যুবরাজ দয়ার অবতার
পিতার সম্মুখে জোড় করে কহিছেন বার বার
"অহিংসার নামে একি পিতঃ দারুণ অত্যাচার
সোনার ভারতে আমাদের, করিতেছে ছারখার।
শাক্যসিংহের অহিংসামন্ত্র ভুলিয়া বারে বারে,
বধিছেন কেন মহারাজ, দোষহীন প্রজাদেরে?
নৃপতি রক্ষক প্রজাদের, ভক্ষক নহে কভু,
এই খাঁটী কথা, বিজ্ঞ হয়েও কেন না বুঝেন তবু?
চেয়ে দেখ পিতঃ প্রান্তে প্রান্তে জ্বলিছে হিংসানল,
বৌদ্ধের হাতে নিহত হিন্দুর চিতাধূম হলাহল।
এ সব দেখিয়া মনে পড়ে, বৃত্রের অত্যাচার
অথবা মহিষাসুর যেন, করিতেছে মার মার।
এখনও সময় আছে পিতঃ, থামাও অত্যাচার
ফিরিবে রাজ্যে পলাতক প্রজা আসিবে শান্তি আবার।
অন্যথা তব বিশাল রাজ্যে, বিদ্রোহানল জ্বলি,
পাপের শাস্তি দিবে মহারাজ, দগ্ধিয়া জনস্থলী।"
গর্জ্জিয়া উঠিলা বিম্বিসার, কাঁপিল সভাকক্ষ
ভ্রূকুটি কুটিল ললাটদেশ চাপড়ি আপন বক্ষ।
ডাকিয়া কহিলা রক্তচক্ষু—"ওরে রে কুলাঙ্গার
ছাড়াব জ্যাঠামি আজি তোর, করিয়া পুরীর বার।"
রাজার আদেশে যুবরাজ হলেন নির্ব্বাসিত
নগরী ছাড়িয়া আজি যুবা, ভাবিছেন প্রজাহিত।
অদূরে বাজারে লোক জমে, দেখিলা রাজপুত্র;
ভাবিলা এখানে এইক্ষণে, রচিবেন যুক্তিমন্ত্র।

কহেন ডাকিয়া জলদমন্ত্রে—"শোন হে হিন্দুগণ
বাঁচিবারে যদি থাকে সাধ, হও তবে একমন।
করহ বন্দী বর্ব্বরভূপে অথবা বিনাশি তারে,
ন্যায়ের প্রতীক রাজাসনে বসাও যোগ্য জনেরে।"
যুবরাজ মুখে শুনি আজ বিদ্রোহের আহ্বান
হতকুলমান হিন্দুরা সবে, হইলেন আগুয়ান।
মুহূর্ত্তে বিদ্রোহ বার্ত্তা রটে, সুদূর গ্রামান্তরে
লক্ষে লক্ষে আসে বীরগণ, পৃথ্বী কাঁপে পদভরে।
রাজার সৈন্য লভিয়া দৈন্য পলায় ঊর্দ্ধশ্বাসে,
প্রাসাদে পশিল হিন্দু বীর, রক্ষীরা পলায় ত্রাসে।
বন্দী হইলেন বিম্বিসার অযুত ভিক্ষু সহ
প্রজাগণ কহে যুবরাজে—সিংহাসন তুমি লহ।
মুকুট পরিয়া যুবরাজ বসিয়া সিংহাসনে
হস্তেতে ধরি' রাজার দণ্ড, বিনয় বিনতাননে।
বিচারপ্রার্থী প্রজাদেরে কন, শুনিবে আজি সবে
হত্যাকারীর চরম দণ্ড, এখনি ঘোষিত হবে।
হত্যাকারীর নায়ক এই বর্ব্বর বিম্বিসার
মরিবে আজি ঘাতক হস্তে, আর শত সঙ্গী তার।
সাক্ষাৎভাবে বধেছে যাহারা নির্দ্দোষ নরগণে,
বিহিত তাদের মৃত্যুদণ্ড : চালাও সবে মশানে।

অযুত ভিক্ষু শৃঙ্খলে বাঁধা কাঁপিছে থরথরি
ভুলিয়াছে ভয়ে বুদ্ধের নাম ডাকিতেছে 'হরি হরি'।
গম্ভীর মুখে কহিলেন ভূপ, "এই তো ধর্ম্মমত—
সত্যদর্শী জীবনের ভয়ে ছাড়ে না আপন পথ।
হাজারে হাজারে ব্রাহ্মণ মরে তোদের অত্যাচারে
ধর্ম্মের লাগি সহাস্য মুখে চড়িয়াছে শূলোপরে।
সত্য বলিয়া ঘোষিলে যারে, ওরে বর্ব্বরদল
পার না মরিতে তার লাগি, ত্যজিয়া মমতা মল?"
'হাউ হাউ করি উঠে কাঁদি অযুত ভিক্ষু সবে,
পূরিয়া উঠিল রাজপুরী আর্ত্তনাদ-কলরবে।
হাসিমুখে কন অজাতশত্রু "শাশ্বত-সত্যধর্ম্ম
হিংসারে জিনে ক্ষমার গুণে, করে না কভু কুকর্ম্ম।
যাও ভীরু সব, মুক্ত এখন জানিও সবে মনে;
কুকর্ম্মে আবার হইলে লিপ্ত, মরিবেক সেইক্ষণে
হিন্দুর দেবে করিবে মান্য বুদ্ধের সম গণি,
ভ্রাতার তুল্য হিন্দু-মানবে দেখিছ যেন শুনি।"
আশীর্ব্বাদ করে ভিক্ষু লক্ষ, ভিক্ষুণী হুলুধ্বনি
বিপুল জনতামাঝে শুধু শোনা যায় গুণগুণি
মন্দিরে মন্দিরে রাজাদেশে জ্বলিল দীপমালা
ধ্বনিয়া উঠিল বেদমন্ত্রে যতেক যজ্ঞশালা।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোকে কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন। ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গালিলিও বলিলেন, পৃথিবী ঘুরিতেছে। ইতালীয় ভদ্রসমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ, শুনিয়া হাসিলেন; শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল। ইতালীয় ভদ্রসমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না; গালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টীকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছি যে পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। হে মানময়ি মোহিনীগণ! কুটিল কটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না; কালসর্পিণী বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না; ভ্রূধনুকে কোপে তীক্ষ্ণশর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে—কমলাকান্ত কোন্ ছার! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা; চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত-পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে তোমরা কুসংস্কারাবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতেছ।

—কমলাকান্তের দপ্তর।

# সপ্তগ্রামে সরস্বতী নদী

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল

বাংলার প্রাচীনতম পুণ্যসলিলা বিরাট নদী সরস্বতী আজ নিঃস্ব হইয়া এক অপ্রশস্ত, অগভীর, সঙ্কীর্ণ খালে পরিণত হইয়া নামে মাত্র টিকিয়া আছে আর ইহার তীরে একদা প্রসিদ্ধ অতীতের ধন-জন সমৃদ্ধ বিরাট বন্দর, বাংলার অদ্বিতীয় সহর, পুণ্যতীর্থ সপ্তগ্রামের স্মৃতি বাঙালীর মন হইতে ধীরে ধীরে মুছিয়া মাত্র কয়েকটি জীর্ণ গ্রন্থের কীটদষ্ট পৃষ্ঠায় আশ্রয়লাভ করিয়াছে, মুমূর্ষু বাঙালীর তাই আজ সপ্তগ্রামকে স্মরণ করার প্রয়োজন ও আবশ্যকতা আছে।

সপ্তগ্রাম ২২°৫১´ অক্ষাংশে ও ৮৮°২৭´ দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে রেলপথে মাত্র ২৭ মাইল দূরে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে ২ মাইল এবং হুগলী ষ্টেশন হইতে মাত্র ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশন আদি সপ্তগ্রাম।

ত্রিবেণী, দেবানন্দপুর, শিবপুর, শঙ্খপুর, বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া, বাসুদেবপুর ও কৃষ্ণপুর নামক সাতখানি গ্রাম লইয়াই সপ্তগ্রাম গঠিত ছিল। সপ্তগ্রাম সরস্বতীতীরে অবস্থিত। আদিতে ভাগীরথী বা হুগলী নদীর অস্তিত্বই ছিল না। মূলগঙ্গার সমুদয় জলধারা সরস্বতী দিয়াই প্রবাহিত হইত। ত্রিবেণীর অপর পার্শ্বে বর্ত্তমানে যমুনা যেমন একটি খাল, ভাগীরথীও তখন ত্রিবেণীর সরস্বতী হইতে নির্গত এক খাল মাত্র ছিল। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে রচিত খনার বচনে লিখিত—"ভগার খালে ডুবে মরিস্" কথায় ভাগীরথীর পবিত্রতা স্বীকৃত হইলেও ইহাকে খাল ছাড়া নদী বলা হয় নাই। মেজর রেনেল (Major Rennel) বলেন, সরস্বতী তৎকালে সিঙ্গুর, জনাই (হুগলী জেলা) আদমজুর (ডোমজুড়), ওমতা (আমতা)—(হাওড়া জেলা) হইয়া তমলুক বা তাম্রলিপ্তির নিকট সমুদ্রে পড়িত।

মার্শম্যান্ তাঁহার History of Bengal নামক গ্রন্থে লিখিতেছেন, "From the most ancient times, the main branch of the Bhaguruttee had flowed under the walls of this city, town by Omptah and Tamlook into the Ocean, It is supposed that a little before this period, the river at Satgong began to dry up and the chief stream to run by Hooghly"—(*History of Bengal By J. C. Marshman—Third Edition, Serampore—p.p.* 39).

অর্থাৎ অতিপ্রাচীনকাল হইতেই ভাগীরথীর মূলশাখা এই সহরের (সপ্তগ্রামের) প্রাচীরের পার্শ্ব বাহিয়া আমতা ও তমলুক হইয়া সমুদ্রে পড়িত। অনুমান এই সময়ের (সপ্তদশ শতাব্দী) কিছুপূর্ব্ব হইতেই সপ্তগ্রামের নদী শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে এবং মূল নদী হুগলীর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হয়। সরস্বতীর বিশালপ্রবাহ ও জলস্রোতে পলি ও বালি আসিয়া হুগলী ও বর্ত্তমান হাওড়া জেলায় তাহার প্রবাহের নিম্ন ভূমি ক্রমশঃ ভরাট হইয়া উচ্চ হইতে থাকে। ছোটনাগপুর ও বর্দ্ধমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় বনজঙ্গল কাটিয়া চাষ আবাদ চলে; ফলে বর্ষায় উচ্চস্থানের মাটী নিম্নভূমিতে নামিয়া আসে—কৌশিকী বা কানাদামোদরের বন্যাও ইহার জন্য অনেকটা দায়ী। এইভাবেই সরস্বতীর পশ্চিম-দক্ষিণ গতি রুদ্ধ হয়—সরস্বতী দক্ষিণে বেতড় ও আন্দুল হইয়া হাওড়া জেলার শাঁকরাইলের নিকট ভাগীরথীতে পড়ে। সরস্বতীর বিশাল নদীগর্ভ খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রথম দিকে মাকড়দহ, ঝাঁপড়দহ প্রভৃতি দহে ও রাজাপুর, দেডুয়া প্রভৃতি বিলে পরিণত হয়। কালক্রমে ঐ সকল দহ শুষ্ক হইয়া মাকড়দহ, ঝাঁপড়দহ (ডোমজুড়) প্রভৃতি গ্রামের এবং রাজাপুর ও কেদুয়ার মাঠের উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও এই সকল স্থানে মাটীর নিম্নে সরস্বতী বাহিত বিরাট বালুকাস্তূপ দৃষ্ট হয়। পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক জে, ডি, ব্যারো ১৫১৬ খৃঃ অব্দে সপ্তগ্রামে আসেন তিনি সপ্তগ্রামকে সাতিগাঁ (Satigam) বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার অঙ্কিত (১৫১৭ খৃঃ) 'মানচিত্রে সরস্বতীকে উত্তরে ত্রিবেণীর নিকট হইতে নির্গত, সপ্তগ্রামের পশ্চিমপার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত এবং বেতড় হইয়া শাঁকরাইলের নিকট ভাগীরথীতে পতিত হইতে দেখা যায়।

—(Asiatic society Journal—vol. LXI. Part, 1. Page 298). সরস্বতীর গতিপথ অতিদ্রুত ও অল্পকালের ব্যবধানে ঘটিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত ভ্যান ডেন ব্রুকের (Van den Broucke) মানচিত্রের সহিত ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত রেনেলের মানচিত্র তুলনা করিলে অনেকটা বুঝা যায়।

ভন-ডেন-ব্রুকের মানচিত্রে সরস্বতী ও ভাগীরথী উভয়কেই বেশ বড় করিয়া দেখান হইয়াছে—উভয়েই তখন প্রশস্ত নদী—এই দুইটি নদী উত্তরে সপ্তগ্রাম ও দক্ষিণে কলিকাতার নিকট মিলিত হইয়া একটি বড় দ্বীপের আকার সৃষ্টি করিয়াছে—রেনেলের ম্যাপে ঐ দ্বীপের চিহ্নও নাই—সরস্বতী তখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সরস্বতীর ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার তীরবর্ত্তী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচ্যের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামেরও ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে।

সপ্তগ্রামের প্রসিদ্ধির কথাও উল্লেখ প্রায় প্রত্যেকটি প্রাচীন পুস্তকেই দেখা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, স্কন্দপুরাণ, মনসামঙ্গল, কবিকঙ্কণচণ্ডী, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর, মিনহাজ লিখিত তবক-তি-নাসিরী, গোলাম হোসেন লিখিত রিয়াজ উস-সালাতিন নামক গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়।

প্লিনি খৃষ্টাব্দের প্রথম শতকে তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ Historia Naturalis গ্রন্থে সপ্তগ্রামভুক্ত ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। (Historia Naturalis—Translated by Philemon) টলেমি তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—সপ্তগ্রাম সরস্বতীতীরে সমৃদ্ধিশালী বন্দর। চীন, মালয়, জাভা, শ্যাম, সিংহল, পারস্য, মিসর, ইতালী হইতে বাণিজ্যপোত বাণিজ্যার্থ সপ্তগ্রামে আসে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে হিন্দুগণ মুক্তা, মসলিন, রেশম, লাক্ষা, চিনি, চাউল পান ইত্যাদি লইয়া সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে ইউরোপীয় দেশে গমন করিত। (Mccrindle's—Ancient India)

চীন পরিব্রাজক ইউ এন চুয়াং ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসেন তাঁহার লিপিতে প্রকাশ—বিজয়াদশমীতে নবরাত্র পূজা (দুর্গোৎসব শেষ করিয়া হিন্দু বণিকগণ সপ্তগ্রাম হইতে বাণিজ্যার্থ

করিতেন। তাঁহারা গ্রীস, সোমালিল্যাণ্ড, কুশদ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, জাভা প্রভৃতি দেশে যাইতেন। তাঁহারা মসলীন, মুক্তা, চিনি, ইত্যাদি রপ্তানি করিতেন এবং হস্তিদন্ত, স্ফটিক, স্বর্ণ, কর্পূর, মেহগিনি কাষ্ঠ ইত্যাদি আমদানী করিতেন।" (Beal's Records Vol. I )

১৪৩২ খৃষ্টাব্দে কবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। (যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি) তৎরচিত রামায়ণে উল্লিখিত—

"রথে চড়ি ভগীরথ যান আগুয়ান।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা সপ্তগ্রাম স্থান॥
সপ্তগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগসমান।
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ॥

(কৃত্তিবাসী রামায়ণ—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত)

সপ্তগ্রামভুক্ত ত্রিবেণী সম্বন্ধে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য রচিত 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ত্রিবেণীতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী যুক্ত হইয়াছে, ইহা মুক্তবেণী বা দক্ষিণ প্রয়াগ-পবিত্রতায় ইহা প্রয়াগেরই সমকক্ষ। লেখমালা নামক বঙ্গীয় প্রাচীন পুঁথিতে উল্লিখিত হইয়াছে, মহাস্থানে বণিকগণের অতিপ্রাচীন সমাজ ছিল, বণিকপ্রধান গর্ভেশ্বর দত্ত এই সমাজের প্রধান। তিনি গৌড়, সপ্তগ্রাম হইয়া সিংহল প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যযাত্রা করিতেন।

গোলাম হোসেন কৃত রিয়াজ উস-সালাতিনে লিখিত আছে—"সরকার সাতগাঁ শুধু হুগলীর পশ্চিমে সামান্য অংশ লইয়া গঠিত নয়, ইহার অধিকাংশ স্থান ২৪ পরগণার কপোতাক্ষ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, নদীয়ার পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ-পশ্চিম মুর্শিদাবাদ হইতে দক্ষিণে হাতিয়াগড় (ডায়মণ্ডহারবারের দক্ষিণ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মহল কলিকাতা ও আরও দু' একটি মহল এই সরকারের অন্তর্ভুক্ত। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ছিল ২৩৬৮০৫ টাকা।"—(Translated from the original persian by Maulavi Abdus salam (1902) pp. 48 ) ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত নামক গ্রন্থেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে।

দামুন্যার দরিদ্র কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার বিখ্যাত কাব্য চণ্ডীমঙ্গল ১৫৭৭ খৃঃ অব্দে রচনা করেন। ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন, তাই এই প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"বামদিকে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান॥

* * *

কলিঙ্গ ত্রৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুজরাট॥
বরেন্দ্র বন্দর বিদ্ধ্য পিঙ্গল সফর।
উৎকল দ্রাবিড় রাঢ় বিজয়নগর॥
মথুরা দ্বারকা কাশী কনখল কেকয়া।
পুরবক অনায়ক গোদাবরী গয়া॥
শ্রীহট্ট কাণ্ডর কোচ হাজর ত্রিহট্ট।
মণিকা কটিকা লঙ্কা প্রলম্ব নাকুট॥
বাগন মালয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বরী আহলঙ্কা স্থল সপ্তগ্রাম॥
শিবাস্তট মহানট হস্তিনানগরী।
আর যত সফর কহিতে কত পারি॥
এ সব সফরে যত সদাগর বৈসে।
অঙ্গ ডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আইসে॥
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথাও না যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়॥
তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপাম
সপ্তঋষির শাসন বোলায় সপ্তগ্রাম॥

(চণ্ডীমঙ্গল—কবিকঙ্কণ বঙ্গবাসী সংস্করণ ১৩৩৯)

ইহা কবিকল্পিত নহে। উত্তরে পাঞ্জাব, হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সিংহল, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পশ্চিমে দ্বারকা, গুজরাট হইতে পূর্বে শ্রীহট্ট প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত সফর বা সহরের সহিত ও বেগুন মালয়ের সহিত সপ্তগ্রাম বাণিজ্যসূত্রে গ্রথিত ছিল। ইতিহাসেও অনুরূপ উল্লেখ আছে। পর্য্যটক সিজার ডি ফ্রেডরিক সপ্তগ্রাম পর্য্যটন করিয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দের সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে লিখিতেছেন—সপ্তগ্রাম এক প্রসিদ্ধ বন্দর এবং ধনজনপূর্ণ বিরাট সহর।

পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যপোত ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে সর্ব্বপ্রথম দেখা দেয় তৎকালে পর্ত্তুগীজগণ সপ্তগ্রামের ব্যবসা বাণিজ্য ও ঐশ্বর্য দেখিয়া মুগ্ধ ও লুব্ধ হয়। সপ্তগ্রামকে তাহারা "Porto Piqueno" আখ্যা দিয়াছিল।

গৌড়সিংহাসন যখন পাঠান-কবলিত, তখন সপ্তগ্রাম পাঠান উর্দ্ধতন রাজকর্মচারীর প্রধান সদর বিশেষ—তৎকালে মুদ্রা নির্ম্মাণ ও মুদ্রিত করিবার জন্য এখানেই টাঁকশাল স্থাপিত হয় এবং ইহা এক প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

( Encyclopaedia Britannica. Vol. XIII. PP. 148-9th Edition ) হুসেন সার রাজত্ব সময়ে সপ্তগ্রাম কিছুদিন হুসেনাবাদ বলিয়া পরিচিত ছিল।

( Catalogue of Coins—Indian Museum. Calcutta. Vol. 11. Part 11. Page—172 )

১৫২১ খৃষ্টাব্দে হুসেন সার পুত্র মোজাফর সুলতান নাসরা সাহের রাজত্বকালে কাস্পিয়ান হ্রদতীরস্থ আমূল সহর হইতে আগত সৈয়দ ফকীরুদ্দিনের পুত্র সৈয়দ জালালুদ্দিন সপ্তগ্রামে এক জুম্মা মসজিদ স্থাপন করেন। ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মিঃ ব্লকম্যান এই ভগ্ন মসজিদ দেখিয়া ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মসজিদের ছাদ বহুপূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল—দেওয়ালগুলির অবস্থাও পতনোন্মুখ হয়—লর্ড কার্জ্জনের আমলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক দেওয়ালগুলি খাড়া রাখার বন্দোবস্ত হয়। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় মুনীন্দ্র দেবরায়ের উদ্যম ও প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়—তিনি অশেষ চেষ্টা করিয়া বিষয়টি লর্ড কার্জ্জনের দৃষ্টিগোচর করান। মসজিদের দেওয়ালগুলি প্রাচীন আমলের ক্ষুদ্রায়তন ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত—প্রাচীর-গাত্রে লতাপাতাগুল্ম ইত্যাদির সুন্দর আরবী নক্সা, খিলানের মাথায়

ইসলামীয় প্রতীক অর্দ্ধচন্দ্র—এই মসজিদের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে সারি সারি তিনটি সমাধি।

সৈয়দ ফকীরুদ্দিন, তদীয় সহধর্ম্মিণী ও খোজার দেহ রক্ষিত হইয়াছে। উক্ত স্থান প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে প্রাচীরের অধিকাংশই ভগ্ন। গভীর বন ও ঘন জঙ্গল ও আগাছাপূর্ণ একটি পরিত্যক্ত স্থান। ফকীরুদ্দিনের সমাধির উপর একটি প্রস্তরফলক আছে—উহার লিপি খুবই অস্পষ্ট, সমাধির দেওয়ালে বক্রভাবে রক্ষিত কৃষ্ণবর্ণের এক প্রস্তরফলকে আরবীভাষায় এক লিপি আছে—উহার কিয়দংশ হইতে জানা যায়—সৈয়দ ফকীরুদ্দিন কাস্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী আমুল সহর হইতে সপ্তগ্রামে আসেন—তাঁহার পুত্র জালালুদ্দিন হাসানের বংশধর হুসেনা সার পুত্র মোজাফর সুলতান নাসরা সাহের রাজত্বকালে ৯৩৬ হিজরী রমজান মাসে এই জুম্মা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

*সপ্তগ্রামে এই মসজিদ বোধ করি সর্ব্বশেষ বিখ্যাত মসজিদ। ইহার পূর্ব্বে আরও অনেক মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেগুলি কাল-কবলিত হইয়াছে বহুপূর্ব্বেই—দুইটি মসজিদের শেষস্মৃতি দুইখানি প্রস্তর ফলক এই সমাধি মন্দিরের উত্তর দিকের প্রাচীরে রক্ষিত আছে।

উহার একটিতে উল্লিখিত আছে, ৬১ হিজরী ( ১৪৫৭ খৃঃ অব্দ ) সনে মামুদ সাহের রাজত্ব কালে তরবিয়ৎ খাঁ কর্ত্তৃক এই মসজিদ নির্ম্মিত অপর প্রস্তর ফলকটি ভিন্ন এক মসজিদের উহাতে উৎকীর্ণ আছে ৮৯২ হিজরীতে ( ১৪৮৭ খৃঃ অব্দে ) ফতে সাহর রাজ্য সময়ে প্রধান সেনাপতি ও উজীর উলুক মজলিশপুর কর্ত্তৃক এই মসজিদ স্থাপিত হইল।

১৪৫৭ খৃঃ অব্দে তরবিয়ৎ খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত মসজিদ ও ১৪৮৭ খৃঃ অব্দে উলুক মজলিশপুরের মসজিদ সপ্তগ্রামের কোথায় অবস্থিত ছিল তাহার সন্ধান নাই। কালক্রমে দুইটিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র তাহার শেষস্মৃতি ঐ প্রস্তর ফলক দুইটি ফকিরুদ্দিনের সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত আছে। কখন, কে বা কাহারা উহা ঐখানে আনিয়া রক্ষা করিয়াছে তাহাও অজ্ঞাত। পাঠান আমেলের সপ্তগ্রামের শেষ নিদর্শন ঐ ভগ্ন মসজিদের জীর্ণ দেওয়াল আর ঐ প্রস্তর ফলক কয়টি, তাহাও অনাদৃত, অরক্ষিত।

প্রকৃতির বক্ষ হতে আবার পুঁথির পাতায় ফেরা যাক। ইবন বতুতার লেখায় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের সপ্তগ্রামের বাজার দরের এক তালিকা মিলে। উহা নিম্নরূপ :—

| | |
|---|---|
| ২৫ রতল চাউলের মূল্য | ১ দিরহাম |
| ১ রতল তিল তৈল | ২ দিরহাম |
| ১ রতল গব্য ঘৃত | ৪ দিরহাম |
| ১টি দুগ্ধবতী গাভী | ৩ দিনার |
| ৮টি মোরগ বা ১৫টি কবুতর | ১ দিরহাম |
| ১টি সুপুষ্ট ভেড়া | ২ দিরহাম |
| ১ রতল চিনি | ৪ দিরহাম |
| ৩০ গজ অত্যুৎকৃষ্ট মসলীন | ২ দিনার |
| ১টি সুন্দরী ক্রীতদাসী | ১ মোহর |

( ১ রতল —½ সের, ১ দিরহাম— ২ আনা ৬ পাই বা দশ পয়সা, ১ দিনার— ১।০, মোহর— ২০৲ টাকা )

১৩২৮ খৃঃ অব্দে সপ্তগ্রামের শাসন কর্ত্তা ইজুদ্দীন মহাইয়া আজমল মললুক কর্ত্তৃক সপ্তগ্রামে টাঁকশাল স্থাপিত হয়। (List of coins—Vol. II. page 69, Nelson Wright).

১৫৫০ খৃঃ অব্দে তেলিঙ্গা নরপতি মুকুন্দদেব উড়িষ্যার সিংহাসন অধিরোহণ করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমে সোলেমন কররাণীর রাজ্য আক্রমণ করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম এই সময় কিছু দিনের জন্য উড়িষ্যার রাজ্যভুক্ত হয়। মুকুন্দদেব ত্রিবেণীতে একটি মন্দির এবং একটি ঘাট প্রতিষ্ঠিত করেন। সোলেমন্ তদীয় জামাতা ও সেনাপতি কালাপাহাড়ের বাহুবলে উড়িষ্যা অধিকার করিলে সপ্তগ্রাম পুনরায় গৌড় রাজ্যভুক্ত হয়। মুকুন্দদেব প্রতিষ্ঠিত সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ত্রিবেণীর মন্দির ও ঘাট ভাঙ্গিয়া তদুপরি জাফর খাঁর মসজিদ ও সমাধি গাজীদরাফ নির্ম্মিত হয়।

১৫৭৫ খৃঃ অব্দে বঙ্গবিজিত ও মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও ঐ বৎসরেই প্রাচীন বাংলার রাজধানী ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিখ্যাত গৌড় মহামারীতে বিধ্বস্ত হয়। বাংলার দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন সহর, ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ বিরাট নগর, ধন ও ঐশ্বর্য্যের লীলা নিকেতন, শতাধিক রাজন্যের রাজধানী, প্রাসাদময়ী গৌড় এই বৎসরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

"It was the most magnificent city in India, of immense extent and filled with the noblest buildings. It was the capital of a hundred Kings, the seat of wealth and luxury. In one year it was humbled to the dust."

—( J. C. Marshman—History of Bengal ).

সুবেদার মুনাইম্ খাঁ এই মহামারীতে মারা গেলে দায়ুদ খাঁ সঙ্গে সঙ্গে বাংলা আক্রমণ করিয়া মোগলগণকে বিতাড়িত করেন। দিল্লীশ্বর আকবরও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সুনির্ব্বাচিত সৈন্য প্রেরণ করিয়া বঙ্গ উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। ফলে রাজমহলের যুদ্ধে দায়ুদ পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার ছিন্নমুণ্ড আকবরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। ১৫৮২ খৃঃ অব্দে দেওয়ান টোডরমলের নূতন ব্যবস্থাপনায় সুবা বাংলা, প্রথমতঃ চাকলায়, চাকলাগুলি সরকারে ও সরকার পরগণায় বিভক্ত হয়। এই সময় সপ্তগ্রাম বর্দ্ধমান চাকলার এক প্রসিদ্ধ সরকারে পরিণত হয়! সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ সরকার যে সকল পরগণা লইয়া গঠিত তাহার অধিকাংশই স্বাধীন ক্ষমতাশালী হিন্দু জমীদারগণের হস্তে ছিল। এই সকল পরগণায় রাজস্ব আদায় করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। বিদ্রোহ খণ্ডযুদ্ধ প্রায় লাগিয়াই ছিল এজন্য আকবরের আমলে সাতগাঁ সরকারকে সরকারী ভাষায় "বালখাগ কহনা" বা বিদ্রোহের ভূমি বলা হইত।

এই সময় সপ্তগ্রাম কলিকাতার মতই ধনজনপূর্ণ সমৃদ্ধ বন্দর। মোগলরাজ্যভুক্ত সপ্তগ্রাম সরকারের সদর—দপ্তরখানা, ফৌজদার ও বালাখানা গুদাম ও তোশাখানা, কোতোয়াল, পাইক, বরকন্দাজের অবস্থানভূমি।

১৫৩০ খৃঃ অব্দ হইতেই পর্ত্তুগীজদিগের শ্যেন ও লুব্ধদৃষ্টি সপ্তগ্রামের উপর পড়িয়াছিল। উপঢৌকন, সওগাত দ্বারা শাসন,

র্ত্তাদিগকে বশীভূত করিয়া সপ্তগ্রামের এক প্রান্তস্থিত স্থান তাহারা দখল করিয়া বসে। ১৫৮০ খৃঃ অব্দে আকবর বাদশাহের অনুমতিক্রমে খানে একটি গির্জ্জাও নির্ম্মিত হয়। এইখানে থাকিয়াই তাহারা প্তগ্রামে বাণিজ্য চালাইয়া ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। ১৫৯৯ : অব্দে একটি সুন্দর ক্যাথিড্রলও প্রতিষ্ঠিত হয়। পর্ত্তুগীজগণ াহাদের বিরাট বাণিজ্যের পণ্যাদি রাখার জন্ত এইস্থানেই বড় বড় গালা, গুদাম ( Ware-House ) স্থাপন করে। লোকে এইগুলিকে গালা ( পর্ত্তুগীজ গোলিন ) বলিত—ইহা হইতেই oglin—ওগলিন রে হুগলী কথার উৎপত্তি। পর্ত্তুগীজগণ শীঘ্রই তাহাদিগের গোলা গির্জ্জা বিরাট সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া লইল, ঐ াকারের মাথায় কামান স্থাপিত হইল এবং সশস্ত্র সৈন্যও সুসজ্জিত াখা হইল। এইবার সপ্তগ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য তাহারা প্রায় লপূর্বক লুঠিয়া একচেটে করিতে লাগিল। পর্ত্তুগীজগণ প্রথমতঃ প্তগ্রাম হইতে তাহাদের গোলায় বা হুগলীতে মালপত্তর স্থলপথেই ইয়া যায়। ক্রমে ভাগীরথীর জল সরস্বতী দিয়া প্রবাহিত না হইয়া র্ত্তমান হুগলী নদীর পথে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। র্ত্তুগীজগণের বিশেষ সুবিধাই হইল। সঠিক প্রমাণ না পাইলেও নেকের অনুমান এ ব্যাপারে পর্ত্তুগীজ পুর্ত্তবিদগণের গোপন হস্ত ছিল। পর্ত্তুগীজ অত্যাচারে ও সরস্বতীর বিপর্যয়ে সপ্তগ্রাম দিন দিন শ্রীহীন হইতে লাগিল।

রাল্‌ফ ফিচ্ ( Ralph Fitch ) ১৫৮৬ খৃঃ অব্দের সপ্তগ্রাম রিদর্শন করেন। সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—"A faire citie for a citie of the Moores and very plentiful of all things." আরও প্রকাশ—"সপ্তগ্রামে উপনীত ইয়া শত শত পণ্যবোঝাই নৌকা দেখিলাম—অনুসন্ধানে জানিলাম াত্র আগ্রা সহর হইতেই এক শত আশীখানি নৌকা আসিয়াছে—নৌকাগুলি ...., প্রত্যেকটিতে প্রায় ২৪ বা ২৬ দাঁড়ের ব্যবস্থা াছে।" এইরূপ বিরাট বাণিজ্য ও সপ্তগ্রামের ঐশ্বর্য্য রক্ষা করার মতা সপ্তগ্রামের ফৌজদারের ছিল না—হুগলীর দুর্দ্ধর্ষ পর্ত্তুগীজ ায়ক মাইকেল রড়ারিগোর নেতৃত্বে এই অত্যাচার চরমে উঠিল। াণিজ্য একচেটিয়া করিয়াও ক্ষান্ত হইল না—হুগলী নদীপথে াতায়াতকারী প্রতিটি নৌকা হইতেই বলপূর্বক শুল্ক আদায় করিতে াগিল এবং সমগ্র হুগলী নদীতেই জলদস্যুরূপে লুণ্ঠন ইত্যাদি পকার্য্য করিতে লাগিল। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর উৎপাত ও উপদ্রব াঙ্গালীর তৎকালীন বৈদেশিক বাণিজ্যনষ্টের এক বিশিষ্ট কারণ—পূর্বেই সমুদ্রে এই উৎপাত ছিল। পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ বাঙ্গালীর কট "হার্ম্মাদ" বলিয়া খ্যাত—সম্ভবতঃ Almyda হইতেই ইহা ৎপন্ন।

খাস হুগলী নদীতে ইহাদের উপদ্রবে বাঙ্গালীর জীবন অতিষ্ঠ ইয়া উঠিয়াছিল। ১৬৩২ খৃঃ অব্দে সাজাহানের আদেশে কাশিম খাঁ তি দক্ষতার সহিত এক পরাক্রান্ত আক্রমণ চালাইয়া হুগলী হইতে র্ত্তুগীজগণকে চিরতরে দূর করিয়া দেন। হুগলী অধিকৃত হইলে গ্রামের ফৌজদার হুগলীতেই বাস করিতে থাকে, সরকারী দপ্তর ালীতে স্থানান্তরিত হয়। কাজেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধনজনপূর্ণ াচীন সপ্তগ্রাম বন্দর ও সমৃদ্ধ সহর ১৬৩২ খৃঃঅব্দে পরিত্যক্ত হয়। গ্রাম এত বিরাট ও জনবহুল ছিল যে ইহার দেড় শত বৎসর পরে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত রামুশিওর (Ramusio) লেখায় এখানে দশহাজার বাসগৃহ ও সাত শত পানের দোকানের অবস্থিতির কথা জানা যায়।

সপ্তগ্রামের বিরাট বাণিজ্য বিনষ্ট হইলে প্রথমে পর্ত্তুগীজ পরে ইংরাজ হুগলীকুঠী, চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কুঠী, শ্রীরামপুরের দিনেমার কুঠী ও চন্দননগরের ফরাসীকুঠী বাণিজ্য-প্রধান হইয়া উঠে। জব চার্ণকের কলিকাতা পত্তনের পর হইতেই এত অল্পকাল মধ্যেই কলিকাতা বন্দরের দ্রুত উন্নতি ও এশিয়ার বৃহত্তম বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হওন সপ্তগ্রামের লুপ্ত বাণিজ্যের জন্যই ঘটিয়াছে এরূপ অনুমান করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী স্মরণাতীত অতীতে এমন কি সংহিতার যুগেও প্রসিদ্ধ ও পবিত্র ছিল। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম —এই পঞ্চ জনপদ মধ্যে ইহা সুহ্মেরই অন্তর্গত। ( মহাভারত টীকাকার নীলকণ্ঠ—সুহ্মা রাঢ়াঃ )। মনুসংহিতায় আর্য্যগণের অঙ্গ বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্রও মগধ গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে কিন্তু সুহ্ম পবিত্র বলিয়াই বোধ হয় তথায় যাত্রা নিষিদ্ধ হয় নাই।

কিম্বদন্তী আছে রাজা রাজ্যবর্দ্ধন ও রাজা সত্রাজিৎ সপ্তগ্রামে রাজত্ব করিতেন।

মেগাস্থিনিসের "ইণ্ডিকা" গ্রন্থে গঙ্গারিডির গাঙ্গেনগর সম্ভবতঃ সপ্তগ্রামই হইবে।

ইবনাবতুতার 'শফরনামায়' উল্লিখিত সপ্তগ্রামের ১৩৫০ খৃঃঅব্দের বাগ্বাদর পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি মহম্মদ তুগলুকের রাজত্বকালে সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করেন। সপ্তগ্রাম এই সময় দক্ষিণ বাংলার রাজধানী ছিল।

সপ্তগ্রামের অন্তর্গত কৃষ্ণপুরে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যতম পার্ষদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাট শ্রীশ্রীমদনমোহনদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

সুবর্ণ বণিকসমাজের বিখ্যাত উদ্ধারণ দত্ত মহাশয়ও সপ্তগ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন।

'শ্রীকরণন্দন দত্ত উদ্ধারণ
ভদ্রাবতী গর্ভজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইয়ের দাস
শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রিত।।" ( পদসমুদ্র )

এই স্বনামধন্য মহাপুরুষ এক দুর্ভিক্ষ সময়ে অন্নসত্র খুলিয়া সরস্বতীতীরে দৈনিক ১০।১২ হাজার লোককে অন্নদান করিয়া তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

সপ্তগ্রামে বর্ত্তমান গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে গৌরনিতাই ও ষড়ভুজা মূর্ত্তির শ্রীমন্দির ও নিত্যানন্দ রোপিত মাধবীলতা বৃক্ষ আছে। ষড়ভুজা মূর্ত্তি সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতে উল্লেখ আছে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু স্বীয় শ্বশুর সূর্য্যদাস পণ্ডিতকে ষড়ভুজা মূর্ত্তিতে নিজ স্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।

সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণী চিরদিনই গুণী, জ্ঞানী ও বিদ্বজ্জনের আবাস স্থান ছিল অতীতে সংস্কৃত চর্চ্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল, নবদ্বীপ হইতে ত্রিবেণীর সম্মান কোন অংশ ন্যূন নহে।

বাংলার শেষ শ্রুতিধর অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান প্রাতঃস্মরণীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই ত্রিবেণীরই অধিবাসী ছিলেন।

সপ্তগ্রামের অন্যান্য গ্রামগুলির মধ্যে বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়ার নামও উল্লেখযোগ্য। এখানে প্রসিদ্ধ রাজা রঘুদেবের পৌত্র রাজা নৃসিংহদেবের সহধর্ম্মিণী রাণীশঙ্করী নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ হংসেশ্বরী মন্দির এখনও এক দর্শনীয় স্থান। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে স্থাপিত বাঁশবেড়িয়ার নীল কুঠির ভগ্নাবশেষ ও রেভাঃ ডাফ স্থাপিত পুরাতন স্কুল বাটী দুই শত বৎসরের স্মৃতি বহন করিতেছে। এক কালে সপ্তগ্রামে বাণিজ্যতরী যাহারা চালাইত তাহাদিগের নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম অন্তর্গত বাসুদেবপুরে। তাহাদের বংশধর দুই চার ঘর এখনও দেখা যায়, স্থানীয় লোক তাহাদিগকে নিকারী বলিয়া থাকে। মাঝি, মোল্লারা শিবপুরে থাকিত, ইহাদের বংশধরগণ এখন মৎস্যজীবী মাত্র। সপ্তগ্রামের শঙ্খনগরে শঙ্খবণিক বা শাঁখারিগণের নিবাস ছিল। সে যুগের পাল্কী ডুলি ইত্যাদি যাহারা বহিত সে সকল দুলে বেহারাদের বসবাসও এখানে ছিল।

সপ্তগ্রাম অন্তর্গত দেবানন্দপুর আজ বাঙলা সাহিত্যসেবী সমাজে সুপরিচিত। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের চরণ ধূলি পূত পবিত্র তীর্থ দেবানন্দপুরের প্রাচীন মুন্সী বংশ প্রসিদ্ধ। রেভারেণ্ড পাদরী লং লিখিয়াছেন চুচুড়ার ওলন্দাজদিগের অনেকেই সপ্তগ্রামে বাগানবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তাঁহারা মধ্যাহ্নে পদব্রজে এখানে আসিয়া সান্ধ্য ভোজনের পর চুঁচুড়ায় ফিরিতেন। আজ সে সবের চিহ্ন মাত্রও নাই।

মাত্র সপ্তগ্রাম নহে সমগ্র হুগলী জেলাই সেকালে বস্ত্র ও রেশমের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাংলার বাজারে ফরাসডাঙ্গা, ধনিয়াখালি ও রাজবলহাটের কাপড়ের সুনাম আজও শুনা যায়। হুগলীর লুপ্ত চিকণ শিল্পের খ্যাতি মাত্র ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও ছিল। সুদূর স্পেনের বাজারেও এই চিকণ শিল্পের সমাদর ছিল।

সপ্তগ্রামে একপ্রকার উৎকৃষ্ট হরিদ্রাবর্ণের রেশমী লেপ (বালাপোষ) প্রস্তুত হইত। হস্তনির্ম্মিত কাগজশিল্পের জন্য এককালে সপ্তগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল—এখানে একপ্রকার নীল রঙের উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইত—উহা দীর্ঘদিন স্থায়ী—সেকালে জমিদারী দপ্তরে উহার বহুল প্রচলন ছিল। সপ্তগ্রামের কাগজের চাহিদা দেখিয়া বিদেশীয় কোম্পানীগুলি কাগজ আমদানী করিতে থাকে এবং পরে বালী ও শ্রীরামপুরে কাগজের কল হওয়ায় ঐ শিল্প একেবারেই লুপ্ত হয়।

সপ্তগ্রাম আজ লুপ্ত—তাহার ধন, জন, সমৃদ্ধির কোন চিহ্নই নাই, তাহার প্রসিদ্ধি ও ঐতিহ্য আজ বিস্মৃতির পথে—অন্যের কথা ছাড়িয়া আজ স্থানীয় বাঙালীও তাহার সঠিক অবস্থিতি জানে না। পরিত্যক্ত একপার্শ্বে প্রায় ষোল হাত উচ্চ, আট শত হাত দীর্ঘ এক উচ্চ ভূমিখণ্ড দৃষ্ট হয়। শুনা যায় এখানে নাকি এককালে দুর্গ ছিল। ইহার উপরিভাগে আজ-কাল চাষ হইয়া থাকে—৪৫ বৎসর পূর্ব্বে মাটীর নীচে এখান হইতে নাকি একটা লৌহনির্ম্মিত কামান পাওয়া গিয়াছিল। মজা সরস্বতীর গর্ভে অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় একটি বৃহদায়তন লৌহনির্ম্মিত নোঙর ও সুবৃহৎ শৃঙ্খল প্রাচীনেরা দেখিয়াছেন।

সপ্তগ্রামে আরও একটি উচ্চ টিলা দেখা যায়—উহার উপর একটি পুরাতন বটগাছ আছে। শুনা যায়, এখানে এক প্রাচীন কালীমন্দির ছিল। মন্দির বিনষ্ট হইলে ঐ বটগাছ জন্মে ঐ গাছেও নাকি এককালে ডিঙ্গি, নৌকা বাঁধা হইত—স্থানটিও ডিঙ্গির ঘাট বলিয়া খ্যাত।

লর্ড কার্জ্জনের আমলে একবার সরকারী সুনজর সপ্তগ্রামের উপর পড়িয়াছিল আর একবার ১১৩১ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কিছু মাপ, নক্সা ইত্যাদি করে। তারপর সব নিস্তব্ধ—মাত্র তিন শত বৎসর পূর্বে লুপ্ত বাংলার এই মহানগরী কাহারও মনে কোন ঔৎসুক্য জাগায় না।

আমাদের দুর্ভাগ্য—আজ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দ্দেশক্রমে আমাদের ষষ্ঠশ্রেণীর দুগ্ধপোষ্য বালক-বালিকাগণ সুদূর অতীতে লুপ্ত ভূমধ্যসাগরের তীরে ফিনিসীয় বন্দর সীডান, টায়ার' কার্থেজের বিবরণ পড়ে—পরীক্ষা "জুজুর" ভয়ে বিকৃত উচ্চারণে একদমে নিনেভে, ব্যাবিলন, সুসা, পার্সিপোলিসের নাম মুখস্থ করে—আর গৌড়, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্তির নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। পশ্চিম বাংলায় আমাদের "বরেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটী" নাই, প্রত্নতত্ত্ববিভাগ উদাসীন। সে কালে "সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজী" চলিত না—আজ সপ্তগ্রাম নাই, দিন দিন মামদোর উৎপাত বাড়িয়াই চলিয়াছে, বৃটিশ আমলে পরশুরামের কৃপায় "ব্রহ্মপিচাশ"ও "কারিয়া পিরেতের" উপদ্রব মাত্র ভূশণ্ডীর মাঠেই বাঙ্গালী প্রত্যক্ষ করিয়াছিল আজ মামদোর যোগাযোগে সে উৎপাত সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আজ শুধু ভারতচন্দ্রের কথাই মনে পড়ে—"এ কি ভূতগত দেশ রে—"

বাঙ্গালার প্রখ্যাতনামা বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকে অভাব নাই, বৃটিশ আমলে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের চেষ্টায় খনন কার্য্যে ফলে ভারতের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্র "বন্দে মাতরম্" সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহা সেই আক্ষেপ,—"গ্রীণলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাও জাতির ইতিহাসও আছে; কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলি সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল সে দেশের ইতিহাস নাই"—আজও বাঙ্গালী সচেতন করিয়াছে কি? শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ড রমেশচন্দ্র, নীহাররঞ্জন প্রভৃতি অনেকেই এ অপবাদ দূর করি লেখনী ধারণ করিয়াছেন—তাঁহাদের প্রত্যেকের কার্য্য প্রশং তাঁহারা বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ—কিন্তু উপযুক্ত চেষ্টা থাকি আরও উপাদান ও উপকরণ কি মিলিত না? প্রত্নতত্ত্ব বি সাহায্য করিলে সপ্তগ্রাম ও তাম্রলিপ্ত হইতে আজও যাহা আ হইতে পারে তদ্দ্বারা শুধু বাঙ্গালার নয়, ভারতের ইতিহাসও হইয়া উঠিবে। ভারতের নৌবাণিজ্য ও নৌশিল্পের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন—আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাম্রলিপ্তি ও সপ্ত মৃত্তিকাভ্যন্তরে যে প্রদীপ লুক্কায়িত আছে উদ্ধৃত হইলে আলোকে তিন সহস্র বৎসরের গাঢ়তম তমিস্রা বিদূরিত হইবে।

পরিশেষে বাঙ্গালীকে একবার স্বনামধন্য সাংবাদিক প বাবুর লেখা স্মরণ করিতে অনুরোধ করি—"আমরা হইয়াও বাঙ্গালার শ্লাঘায় তায় শ্লাঘা বোধ করি না।… অতীত ইতিহাসের মুকুরে স্বদেশের, স্বীয় সমাজ শরীরের দেখিয়া অধঃপতনের গভীরতা একবার বুঝিয়া লও। তাহ আবার যেমন ছিলে তেমনই হইবে—হারানিধি ফিরাইয়া তোমাদের তাহা জন্মভূমি তোমাদেরই হইবে।"
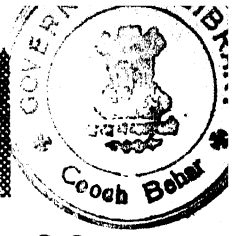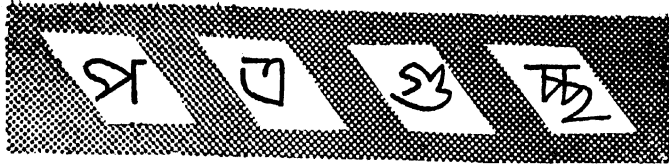
# নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পত্র-বিনিময়

## নেতাজীর পত্র—৪

পো: জিয়ালগোড়া,
জে: মানভূম, বিহার।

প্রিয় মহাত্মাজী, ৩১।৩।৩১

আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে দীর্ঘ টেলিগ্রাম আপনি সুনীলকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। যখন আপনি টেলিগ্রাম মারফৎ আমাকে দিল্লী যাইবার পরামর্শ দিলেন তখন আমি ভাবিলাম যে, ডাক্তাররা এ বিষয়ে মন খুলিয়া কথা বলুন।

সেই জন্যই সুনীল (ডাঃ সুনীল বসু) আপনার নিকট তারবার্তা পাঠাইয়াছিলেন।

ট্রেণ হইতে লেখা আপনার ২৪ তারিখের চিঠি এবং সাধারণ পরিস্থিতি সম্পর্কে শরৎকে (শরৎ বসু) ঐ তারিখেই লেখা চিঠির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমি গভীরভাবে চিন্তা করিতেছি। ইহা আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, এই সঙ্কট মুহূর্তে আমি, অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু ঘটনার প্রবাহ এতই দ্রুত যে, আমি দ্রুত সারিয়া উঠিবার সুযোগই পাইলাম না। ত্রিপুরীর পূর্ব্বে এবং পরে, কোনও কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট হইতে (ইহার দ্বারা আমি আপনার কথা উল্লেখ করিতেছি না—পরিষ্কার করিয়া ইহাই বলিতে চাই) আমি আমার প্রাপ্য মর্য্যাদা পাই নাই। কিন্তু আমার অসুস্থতার জন্য পদত্যাগের কোনও কারণ নাই। গত কল্যের পত্রে আমি আপনাকে জানাইয়াছি যে, আমি যতদূর জানি, কোনও রাষ্ট্রপতি, দীর্ঘকাল কারাবাসে থাকিলেও, পদত্যাগ করেন নাই। হয়ত আমাকে শেষ পর্য্যন্ত পদত্যাগ করিতে হইতে পারে—কিন্তু তাহা যদি ঘটে তাহা হইলে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে হইবে।

আমি আমার দ্বিতীয় পত্রে আপনাকে জানাইয়াছি যে, যদিও পদত্যাগের জন্য আমার উপর চাপ দেওয়া হইতেছে, তথাপি আমি তাহাতে বাধা দিয়া আসিতেছি। আমার পদত্যাগের ফলে কংগ্রেস-রাজনীতিতে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইবে যাহা আমি শেষ পর্য্যন্ত এড়াইয়া যাইতে চাই। যদি আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, ভীষণ গৃহযুদ্ধ সুরু হইবে এবং তাহার ফলাফল যাহাই হউক কিছুকালের জন্য কংগ্রেস দুর্ব্বল হইবে এবং লাভ হইবে বৃটিশ সরকারের। কংগ্রেসকে এবং দেশকে সেই চরম দুর্গতি হইতে রক্ষা করিতে আপনিই পারেন। নানা কারণে যাঁহারা সর্দ্দার প্যাটেল এবং তাঁহার দলের উপর বিরূপভাবাপন্ন, তাঁহারা এখনও আপনার উপর আস্থা রাখেন, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে আপনি নির্দ্দলীয়, নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া ন্যায় বিচার করিতে পারেন। তাঁহাদের নিকট আপনি জাতীয়ভাবের প্রতিমূর্ত্তি দল ও উপদলের ঊর্দ্ধে এবং সেজন্যই বিরোধী দলগুলির মধ্যে ঐক্য পুনঃস্থাপিত করিতে পারেন।

যদি কোনও কারণে সেই বিশ্বাস নষ্ট হয়—ভগবান না করুন—আপনাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ভগবান আমাদের এবং কংগ্রেসের সহায় হউন!

ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমানে কংগ্রেসের দুইটি দলের বা ব্লকের মধ্যে ব্যবধান গভীর। কিন্তু এই ব্যবধানের উপর সেতুরচনা সম্ভব এবং আপনার দ্বারাই সম্ভব। আমাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের মনোভাব সম্পর্কে আমি কিছুই বলিতে পারিনা—ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁহাদের সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইয়াছে। কিন্তু আমি আমাদের পক্ষে কথা বলিতে পারি। আমরা প্রতিহিংসা পরায়ণ নই এবং মনের মধ্যে অভিযোগ পুষিয়া রাখিনা। আমরা ক্ষমা করিতে এবং ভুলিয়া যাইতে এবং একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য পুনরায় হাত মিলাইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছি! আমাদের পক্ষ বলিতে আমি সি, এস, পির নেতৃস্থানীয়দের বাদ দিয়েই বলিতেছি। ত্রিপুরীর অধিবেশনের সময়ে আমরা সর্ব্বপ্রথম বুঝিতে পারিয়াছি যে, সি, এস, পির নেতৃবৃন্দের (কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির) অনুগামীর সংখ্যা কত কম। এখন সি, এস, পি দুইদলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দলের দোদুল্যমান নীতির জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে উক্ত দলের সাধারণ সদস্যগণ এবং কয়েকটি প্রাদেশিক শাখা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ দলের নেতৃবৃন্দ যাহাই করুন না কেন, সি, এস, পির একটি বৃহৎ অংশ আমাদের সহিত হাত মিলাইয়া চলিবে। এ-বিষয়ে আপনার যদি কোনও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে সামান্য অপেক্ষা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আমার ভ্রাতা শরৎ-এর পত্র হইতে বুঝিতে পারিতেছেন যে, তিনি কতখানি তিক্ততা বোধ করিতেছেন। আমার মনে হয়, উহা তাঁহার ত্রিপুরীর অভিজ্ঞতার ফল—কারণ যখন তিনি কলিকাতা হইতে ত্রিপুরীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, তখন ঐরূপ মনোভাব তাঁহার ছিল না। স্বভাবতঃই আমা অপেক্ষা ত্রিপুরী সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা অধিক, কারণ তিনি স্বাধীন ভাবে ঘোরাফেরা করিতে, জনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শয্যাশায়ী অবস্থাতেও কয়েকটি নিরপেক্ষ সূত্র হইতে আমাদের রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদী, দায়িত্বশীল চক্রগুলির মনোভাব সম্পর্কে যে-সকল সংবাদ পাইয়াছি—তাহাতে সমগ্র ব্যাপারটার প্রতি আমার মন ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি একথা বলিতে পারি যে, যখন আমি ত্রিপুরী ত্যাগ করিয়াছিলাম তখন কংগ্রেস-রাজনীতির প্রতি যেরূপ ঘৃণা ও বিরক্তি অনুভব করিয়াছিলাম, তেমনটি গত উনিশ বৎসরে অনুভব করি নাই। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ, এখন আমি সে অনুভূতি কাটাইয়া উঠিয়াছি এবং আমার মানসিক স্থৈর্য্য ফিরিয়া পাইয়াছি।

জহর তাঁহার এক পত্রে ( সম্ভবতঃ সাংবাদিক বিবৃতিগুলিতেও ) মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, আমার রাষ্ট্রপতিত্বকালে এ, আই, সি, সি অফিসের অধোগতি হইয়াছে। উক্ত মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাইয়া বলিতেছি যে, উহা অন্যায় এবং শিষ্টতা বিরুদ্ধ। সম্ভবতঃ তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, আমাকে অপদস্থ করিতে গিয়া তিনি কৃপালনীজীকে এবং সমগ্র কার্য্যনির্ব্বাহকগুলীকে অপদস্থ করিয়াছেন। কার্য্য পরিচালনায় ভার সাধারণ সম্পাদক এবং তাঁহার অধস্তন কর্ম্মচারীদের হস্তে। সুতরাং অধোগতি হইয়া থাকিলে, তাহার জন্য দায়ী তাঁহারাই। এই বিষয়ে জহরকে আমি দীর্ঘ পত্র দিতেছি। আমি আপনার নিকট এই বিষয়টির উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে শরৎকে লিখিত পত্রে আপনি অন্তর্বর্ত্তীকালীন কার্য্য-পরিচালনা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করিয়াছেন। অফিসের কার্য্যে সহায়তার একটি মাত্র পথ আছে—সত্বর একজন স্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত করা, কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্য নিয়োগে বিলম্ব হইলেও। কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন যদি সত্বর করা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নে সাধারণ সম্পাদক নিয়োগের প্রয়োজন নাই।

পন্থপ্রস্তাব সম্পর্কে আপনার মনোভাব জানাইলে বাধিত হইব। আপনার সুবিধা এই যে, সমগ্র ব্যাপারটি আপনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করিতে পারেন—অবশ্য, ত্রিপুরী সংক্রান্ত সমগ্র ঘটনাটি যদি আপনি জানিতে পারেন। সংবাদপত্র পাঠে বুঝিতে পারিতেছি যে, এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এক পক্ষভুক্ত—অর্থাৎ যাঁহারা পন্থ প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। যাঁহারাই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করুন না কেন, আপনি ঘটনা-গুলির যথার্থ মূল্য বিচার সহজেই করিতে পারিবেন।

পন্থ-প্রস্তাব সম্পর্কে আমার মনোভাব আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মতের বিশেষ গুরুত্ব নাই। সমষ্টি জীবনে জনস্বার্থের খাতিরে অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে দমন করিতে হয়। পূর্ব্বপত্রেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যে, নিয়মতান্ত্রিকতার দিক দিয়া বিচার করিয়া পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে লোকে যাহাই মনে করুক না কেন, যেহেতু উহা কংগ্রেসের দ্বারা পাশ হইয়াছে, সেইজন্য তাহা মানিতে আমি বাধ্য। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রস্তাবটিকে কি আপনি আমার প্রতি অনাস্থাসূচক বলিয়া মনে করেন এবং এজন্য আমার পদত্যাগ করা উচিত বলিয়া মনে করেন? এ-সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিবে।

সম্ভবতঃ আপনি জানেন যে, পন্থ-প্রস্তাবের পক্ষে যাঁহারা প্রচার করিতেছিলেন তাঁহারা এই মর্ম্মে ত্রিপুরীতে সংবাদ দেন যে, রাজকোটের সহিত টেলিফোনে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এবং পন্থ-প্রস্তাবটি সম্পর্কে আপনার পুরা সমর্থন ছিল। দৈনিক পত্রিকাগুলিতেও ঐ মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। গোপন আলাপে ইহাও প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, পন্থ-প্রস্তাবটি পুরাপুরি গৃহীত না হইলে আপনি বা আপনার গোঁড়া অনুগামীরা সন্তুষ্ট হইবেন না। ব্যক্তিগত ভাবে ঐ সকল সংবাদে আমি বিশ্বাস করি নাই এবং এখনও করিনা কিন্তু ভোট সংগ্রহ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহে উহারা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। সর্দ্দার প্যাটেল যখন পন্থ প্রস্তাবটি প্রথম আমাকে দেখান তখন আমি তাঁহাকে পরামর্শ দিয়াছিলাম যে, ( রাজেন বাবু এবং মৌলানা আজাদও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ) প্রস্তাবটির কিছু পরিবর্ত্তন করিলে, সংশোধিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেসে গৃহীত হইবে। প্রস্তাবটির একটি সংশোধিত সংস্করণও সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট পাঠান হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার দিক হইতে কোনও উত্তর পাওয়া যায় নাই। তাঁহাদের মনোভাব সম্ভবতঃ এইরূপ ছিল—একটি শব্দের, একটি কমারও পরিবর্ত্তন করা চলিবে না। আমার বিশ্বাস, রাজকুমারী অমৃত কাউর সংশোধিত প্রস্তাবটির একটি কপি আপনার হাতে দিয়াছেন। আপনার নীতিতে, নেতৃত্বে এবং পরিচালনায় আস্থাজ্ঞাপনই যদি পন্থ-প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে সংশোধিত প্রস্তাবে তাহার ব্যবস্থা আছে—কিন্তু গত রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণই যদি উহার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে সংশোধিত প্রস্তাবটি তাহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি বুঝিতে পারি না, পন্থ প্রস্তাবদ্বারা কিরূপে আপনার মর্য্যাদা প্রভাব এবং কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির বৈঠকে আপনার বিরুদ্ধে ১৩৫ জন সদস্য ভোট দিয়াছিলেন। স্বার্থপ্রণোদিত দলগুলি যাহাই বলুক না কেন, কয়েকটি নিরপেক্ষ মহল হইতে আমি সংবাদ পাইয়াছি যে, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও, সাধারণ অধিবেশনে, ২২০০ ভোটের মধ্যে ৮০০ ভোট আপনার বিরুদ্ধে দেওয়া হইয়াছিল। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতিতে যেরূপ ভোটদানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সাধারণ অধিবেশনেও যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে পন্থ প্রস্তাবটি বাতিল হইয়া যাইত। মোটের উপর ভোটের ফলাফল অনিশ্চিত হইত। প্রস্তাবটির সামান্য পরিবর্ত্তন করিলে, উহার বিরুদ্ধে একটি ভোটও দেওয়া হইত না এবং আপনার নেতৃত্বে সর্ব্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস আস্থা জ্ঞাপন করিত। তাহা হইলে বৃটিশ সরকারের নিকট এবং সমগ্র পৃথিবীর নিকট আপনার মর্য্যাদা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইত। উহার পরিবর্ত্তে, আমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্য যাঁহাদের তাঁহারা আপনার নাম ও মর্য্যাদাকে ভাঙ্গাইয়া কাজ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা আপনার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার পরিবর্ত্তে, তাহাকে অতলতলে টানিয়া নামাইয়াছেন, কারণ, এখন সারা পৃথিবী জানিতে পারিয়াছে যে, আপনি এবং আপনার অনুগামীরা ত্রিপুরীতে সাংখ্যাধিক্য লাভে সমর্থ হইলেও, কংগ্রেসের মধ্যে শক্তিশালী বিরোধী দল আছে। যদি ঘটনার গতি এইরূপই হয়, তাহা হইলে বিরোধী দলের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইবেই। যে দলে সংস্কারপন্থী, প্রগতিকামী যুবশক্তির স্থান নাই—সে দলের ভবিষ্যৎ কি? গ্রেট বৃটেনের উদারনৈতিক দলের যে ভবিষ্যৎ উহারও সেই ভবিষ্যৎ।

পন্থপ্রস্তাব সম্পর্কে আমার মনোভাব আপনাকে জানাইবার জন্য দীর্ঘ আলোচনা করিলাম। আপনার মনোভাব জানাইলে আমি বাধিত জ্ঞান করিব। আপনি কি পন্থ প্রস্তাবে সমর্থন করেন অথবা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে খুসী হইতেন?

আর একটি বিষয় আমি এই পত্রে উল্লেখ করিব—তাহা হইতেছে আমাদের কর্ম্মসূচী সম্পর্কে। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী ওয়ার্দ্ধাতে আমি আমার অভিমত আপনার নিকট পেশ করিয়াছিলাম। এ পর্য্যন্ত

সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা দ্বারা আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সত্য ং অভিমতগুলিও যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। গত য়েক মাস ধরিয়া বন্ধুবান্ধবদের বলিয়া আসিতেছি যে, বসন্তকালে উরোপে এক সঙ্কট আসিবে এবং গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত তাহা চলিবে। াতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিচার করিয়া আট মাস পূর্ব্বে ামি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলাম যে, পূর্ণ স্বরাজ আদায় করিবার সময় াসিয়া গিয়াছে। দেশের দুর্ভাগ্য এবং আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, াপনি আমাদের ন্যায় আশাবাদী নহেন। কংগ্রেস দুর্নীতিগ্রস্ত— ? চিন্তাই আপনাকে পাইয়া বসিয়াছে। অধিকন্তু, হিংসার ধুয়ায় াপনি শঙ্কিত হন। কংগ্রেসকে দুর্নীতিমুক্ত করার ব্যাপারে াপনার সহিত আমি একমত হইলেও, আমি মনে করি না যে, গ্র ভারতের কথা বিচার করিলে, পূর্বাপেক্ষা দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাত্মক মনোভাব সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, পূর্ব্বাপেক্ষা া যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশকে াঠিত, বিদ্রোহাত্মক সহিংসভাবের পীঠস্থান বলা হইত। এখন ঐ দেশগুলিতে অহিংসভাবেরই আধিক্য দেখা যায়। বঙ্গদেশ সম্পর্কে, া দায়িত্ব লইয়া বলিতে পারি যে, এই প্রদেশ এখন যেরূপ অহিংস নাভাবাপন্ন, এরূপটি গত ৩০ বৎসরে কখনও হয় নাই। এই রণে এবং অন্যান্য কারণগুলির জন্যও, চরমপত্রের আকারে বৃটিশ কারের সম্মুখে আমাদের জাতীয় দাবী উপস্থিত করা সম্পর্কে আর য় আদৌ নষ্ট করা উচিত নয়। চরমপত্র দেওয়া আপনার বা রলাল কাহারও মনঃপূত নয়। কিন্তু আপনি আপনার রাজনৈতিক নে কর্তৃপক্ষকে বহু চরমপত্র দিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা জনগণের রুর পথ প্রশস্ততরও হইয়াছে। এই সেদিন রাজকোটে পনি তাহাই করিয়াছেন। সুতরাং আমাদের জাতীয় দাবীকে াপত্রের আকারে দেওয়ার বাধা কোথায়? আপনি যদি হাই করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত , তাহা হইলে শীঘ্রই পূর্ণ স্বরাজ লাভ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। বৃটিশ সরকার হয় সংগ্রাম না করিয়া আমাদের ী মানিয়া লইবে অথবা সংগ্রাম যদি হয়ই, আমাদের বর্ত্তমান ঃস্থিতিতে, সে সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। এই বিষয়ে আমি ই আস্থাবান এবং আশাবাদী যে, আমি মনে করি যে সাহসে সের হইলে, বড়জোর ১৮ মাসের মধ্যেই পূর্ণ স্বরাজ লাভ হইবে।

এই বিষয়ে আমার অনুভূতি এতই গভীর যে, এ-সম্পর্কে কোনও রূপ আত্মত্যাগ করিতে আমি প্রস্তুত। আপনি যদি গ্রামের ভার গ্রহণ করেন, আমি সানন্দে যথাসাধ্য সহায়তা করিব। আপনি যদি মনে করেন যে, অন্য এক রাষ্ট্রপতির পরিচালনায় কংগ্রেস কর্তৃক সংগ্রাম-পরিচালনা আরও জোরদার হইবে, তাহা হইলে আমি সরিয়া দাঁড়াইতে রাজী আছি। আপনি যদি মনে করেন যে আপনার মনোমত ওয়ার্কিং কমিটি দ্বারা সংগ্রাম পরিচালনা আরও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হইবে, তাহা হইলে আমি আপনার ইচ্ছা মানিয়া লইব। আমি শুধু এইমাত্র চাই যে, এই সঙ্কট সময়ে আপনি এবং কংগ্রেস উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্বরাজের জন্য সংগ্রাম পুনরায় সুরু করিবেন। আমার আত্ম-বিলুপ্তি দ্বারা যদি জাতীয় মুক্তিসাধনা অগ্রসর হয়, তাহা হইলে আপনার নিকট আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি, যে, আমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে রাজী আছি। আমার মনে হয়, আমি দেশকে যথেষ্ট ভালবাসি এবং সেজন্য এ-কাজ করিতে পারিব।

আপনাকে এই কথা বলিবার জন্য ক্ষমা করিবেন যে, যে-ভাবে আপনি দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলন চালাইতেছেন, তাহা আমার আদৌ মনঃপূত নয়। রাজকোটের জন্য আপনি আপনার মূল্যবান জীবনকে বিপদের মধ্যে ফেলিয়াছিলেন এবং রাজকোটে সংগ্রাম পরিচালনার সময় অন্যান্য দেশীয় রাজ্যে সংগ্রাম বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি এরূপ করিলেন কেন? ভারতবর্ষে ৬০১টি দেশীয় রাজ্য আছে। রাজকোট তাহার মধ্যে একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র রাজ্য। রাজকোট সংগ্রামকে যদি তুচ্ছ ব্যাপার বলা যায়, তাহা হইলে অতিশয়োক্তি করা হইবে না। সারা দেশব্যাপী একই সময়ে সংগ্রাম পরিচালনা কেন আমরা করিব না এবং তজ্জন্য একটি সর্ব্বাত্মক পরিকল্পনাই বা থাকিবে না কেন? আপনার দেশের কোটি কোটি নর-নারী ইহাই চিন্তা করিতেছে, যদিও আপনার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাবশতঃ মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে পারিতেছে না।

পরিশেষে, আমি এই কথা বলিতে পারি যে, রাজকোট সমাধানের সর্তগুলি সম্পর্কে আমার ন্যায় বহু ব্যক্তি উৎসাহিত বোধ করিতেছেন না। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি এবং আমরা উহাকে একটি বিরাট সাফল্য বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছি—কিন্তু আমরা কতখানি লাভ করিয়াছি? সার মরিস গাওয়ার আমাদের পক্ষীয় লোক নহেন, এমন কি নিরপেক্ষ মধ্যস্থও নহেন। তিনি সরকার পক্ষীয় লোক। তাঁহাকে মধ্যস্থ করার অর্থ কি? আমরা আশা করিতেছি যে, তাঁহার রায় আমাদের অনুকূলে যাইবে। ধরা যাউক, তিনি আমাদের বিপক্ষে রায় দিবেন, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াইবে? অধিকন্তু, যে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা আমরা বর্জন করিতে কৃতসংকল্প, সার মরিস গাওয়ার তাহার অবিচ্ছেদ্য অংশ। বৃটিশ সরকারের সহিত কোনও এক বিরোধের সময় আমরা যদি হাইকোর্টের জজকে বা দায়রা জজকে মধ্যস্থ মানিয়া লইতে চাহি, তাহা হইলে বৃটিশ সরকারের সহিত একটা রফা আমাদের সব সময়েই হইতে পারে। কিন্তু এরূপ সমাধান হইতে আমাদের কি লাভ হইবে? অধিকন্তু, বহু ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের পরও আপনি দিল্লীতে অপেক্ষা করিতেছেন কেন, সম্ভবতঃ আপনার ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য, আর একটি দীর্ঘ ভ্রমণের পূর্ব্বে, কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকার এবং তাঁহাদের সমর্থকগণ মনে করিতে পারেন যে, আপনি যুক্তরাষ্ট্রীয় (ফেডারেল) প্রধান বিচারককে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়া তাঁহার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতেছেন। আমার পত্র অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এইখানে বিরত হইলাম। যদি আমি এমন কিছু বলিয়া থাকি, যাহা আপনার নিকট ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি জানি, আপনি মন খোলসা করিয়া কথা বলা পছন্দ করেন। উহারই জন্য এই মনখোলা, দীর্ঘ পত্র লিখিতে সাহসী হইয়াছি।

ধীরে ধীরে হইলেও আমার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে। আশা করি, আপনার স্বাস্থ্য ভাল এবং রক্তের চাপ অপেক্ষাকৃত কম আছে।

শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণামান্তে—

আপনার স্নেহের সুভাষ।

ধারাবাহিক জীবনী-রচনা

দু' ভাই খেতে বসল একসঙ্গে। মা পরিবেশন করতে লাগলেন।

'তোকে লোকে নিন্দা করে, এ দেখে সহ্য হয় না।' বললে বিশ্বরূপ।

নিমাই মাথা হেঁট করে রইল।

'তুই কেন এত চঞ্চল?'

সে কি নিন্দের? আমার কি এক মুহূর্তও স্থির হয়ে থাকবার জো আছে? আমি নিয়ত চলছি বলেই তো সংসারও চলছে।

'তুই অন্যের বাড়িতে ঢুকে চুরি করে খাস—'

কার বাড়ি, কার জিনিস আর কে সে চোর!

'তাছাড়া তুই অশুচি-অস্পৃশ্য মানিস না, যাকে-তাকে ছুঁস—'

যাকে-তাকে! সেদিন একটা কুকুরছানা বাড়ি নিয়ে এসেছিলাম কোলে করে, দাওয়ার খুঁটিতে রেখেছিলাম বেঁধে। আমাকে না জানিয়ে ছেড়ে দিলেন মা। খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখলাম দড়ি পড়ে আছে, কুকুরছানা নেই। আমার কুকুরছানা কোথায় গেল! কেঁদে লুটিয়ে পড়লাম ধুলোয়, উঠোনে গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। তখন মা আর কি করেন, কথা দিলেন, আরেকটা ভালো ছানা দেবেন যোগাড় করে। আমি যাকে ছুঁই সে কি আর অশুচি থাকে?

'তবু কেউ তোকে প্রশংসা করে না, শুধু নিন্দে করে—এতে বড় কষ্ট হয়।'

শুধু নিন্দে? কেউ প্রশংসা করে না?

যমুনা পুলিনে এসে কৃষ্ণ ব্রজবালকদের বললে, দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে, আমরা সকলে ক্ষুধার্ত, এস এখন সকলে ভোজন করতে বসি। গোবৎসগণ জল পান করে নিকটে তৃণাহার করতে করতে বিচরণ করুক।

কৃষ্ণকে মধ্যে রেখে মণ্ডলাকারে বসল তার বয়স্যেরা। বহুদল-সমন্বিত পদ্মকর্ণিকার মত। বন্ধুরা তাদের শিকা থেকে মিষ্টান্ন ও পিষ্টক বার করতে লাগল। পদ্মপত্র বৃক্ষত্বক বা শিলাখণ্ড যে যা পেল ভোজনপাত্র করে খেতে বসল। উল্লাসকল্লোল উথলে উঠল চার দিকে। যার যে খাবার ভালো লাগছে আধখানা খেয়ে বাকি আধখানা তুলে দিচ্ছে কৃষ্ণের মুখে, কখনো বা অন্য বালকের মুখে। যজ্ঞেশ্বর আজ যেন বিরাট ভোজনযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। আর আজ হোমঘৃত শুধু হাস্যপরিহাসের ছিটে।

দৃশ্য দেখে ব্রহ্মা ও অন্যান্য স্বর্গবাসীরা বিমূঢ় হয়ে গেল। এ কি, অচ্যুত ব্রজবালকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আহার করছেন! উচ্ছিষ্ট খাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে গোবৎসেরা তৃণলোভে দূরবর্ত্তী বনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। আর তাদের দেখা যাচ্ছে না। ব্রজবালকেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। কৃষ্ণ বললে, তোমরা খাচ্ছ খাও, আমি ওদের খুঁজে আনছি। কটিতটে বসনের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট বেণু, বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্রদণ্ড, ডান হাতে দধিমাখা অন্নের গ্রাস, কৃষ্ণ ধেনুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। গিরি, দরী, কুঞ্জ, গহ্বর—কোথাও তাদের দেখা পেল না। কি করে পাবে? নিমেষে ব্রহ্মা তাদের হরণ করে এক নির্জন গিরিগুহায় আবদ্ধ করে রেখেছে।

পুলিনে ফিরে এসে কৃষ্ণ দেখল, গোপবালকেরাও অন্তর্হিত। তাদেরও ব্রহ্মা হরণ করে বন্দী করেছে আরেক পর্বতকন্দরে!

তখন কৃষ্ণ নিজেই গোবৎস ও ব্রজবালকদের মূর্তি

ধারণ করল। যে বৎসের ও বৎসপালের যেমন শরীর-প্রমাণ, যার যে পরিমাণে হাত-পা, যার যে রকম যষ্টি শৃঙ্গ বেণু ও শিকা, যার যে রকম বসন ও আভরণ, যার যে রকম শীল, গুণ, নাম আকৃতি বয়স ও আহার-বিহার, অবিকল অনুরূপ প্রকাশিত হল, শ্রীহরি। সর্বজগৎ বিষ্ণুময়, এই বাক্য বস্তুত সার্থক করে সর্বাত্মা হয়ে ব্রজে প্রবেশ করল। বিশেষ-বিশেষ গোপবালক হয়ে বিশেষ-বিশেষ গোবৎসকে বিশেষ-বিশেষ গোষ্ঠে রেখে বিশেষ-বিশেষ গৃহে গিয়ে উপস্থিত হল। বালকজননীরা বেণুরব শুনে উতলা হয়ে উঠে এসে স্ব-স্ব পুত্রবোধে পরব্রহ্মকে প্রগাঢ়-বাহুতে আলিঙ্গন করতে লাগল। স্নেহসুখে তাদের ঝরতে লাগল স্তনামৃত। যে কালে যে ক্রীড়া বা যে কর্ম বিহিত তাই যথাক্রমে চলতে লাগল হুবহু। সায়ংকালে গৃহে ফিরলে জননীরা কৃষ্ণকে, যার যেমন অভিরুচি, করতে লাগল মর্দন-মজ্জন লেপন-অলঙ্করণ। কেউ বা বসল খাওয়াতে। কেউ বা ঘুম পাড়াল। পুত্রস্নেহ বেড়ে গেল সমধিক।

গাভীদেরও সেই দশা। যে বৎস প্রত্যাবৃত্ত হয়েছে তাদের প্রতিই বেশি অনুরাগ। তাদের অভিমুখেই স্বগত দুগ্ধক্ষরণ।

এমনি ভাবে কেটে গেল এক বছর—ব্রহ্মার এক ক্রটিকাল। এক ক্রটিকাল পরে ব্রহ্মা বৃন্দাবনে এসে দেখল কৃষ্ণ তার অনুচরদের সঙ্গে আগের মতই বাল্যলীলা করছে। সে কি কথা! গোকুলের সে সব বালক আর গোবৎস পর্বতগুহার মায়াশয্যায় কি এখনো শুয়ে নেই? তারা কি ছাড়া পেয়েছে? গুহায় গিয়ে দেখল, না, তারা অচেতন হয়েই পড়ে আছে ভূতলে, এখনো হয়নি পুনরুত্থান। তবে এরা, এ সব বালক আর বৎস, এরা কারা? এরা এল কোত্থেকে?

চক্ষু প্রক্ষালন করতে লাগল ব্রহ্মা। কে প্রকৃত কে মিথ্যা নির্ণয় করতে পারস না। নির্মোহ অথচ বিশ্ববিমোহন বিষ্ণুকে মোহিত করতে গিয়ে নিজেই মোহিত হয়ে গেল। অন্ধকার রাত্রির কুয়াশা কি অন্ধকার রাত্রিতে পৃথক আবরণ তৈরী করতে পারে? রৌদ্রে কি হয় কখনো খদ্যোতের পৃথক প্রকাশ?

সহসা ব্রহ্মা দেখল কি বৎস কি বৎসপাল কি যষ্টি-শৃঙ্গ সব কিছুই মেঘের মত শ্যামবর্ণ, সকলেরই পরিধানে পীতবাস, সকলেই চতুর্ভুজ, সকলেরই হাতে শঙ্খ চক্র, গদা পদ্ম, মাথায় কিরীট কানে কুণ্ডল, পায়ে নূপুর, করে রত্নকঙ্কণ, কণ্ঠে হার ও বনমালা। বহু পুণ্য ব্যক্তিরা এ যাবৎ যত কোমল-নতুন তুলসীদল নিবেদন করেছে তা দিয়ে আপাদমস্তক আবৃত।

যে ব্রহ্মা বাণীর অধীশ্বর, তর্কের অগোচর, স্বপ্রকাশ ও অশেষমহিমাসম্পন্ন—অজ্ঞানী হয়ে পড়ল। হংসপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গেল মাটিতে। কৃষ্ণ তখন তুলে নিল যবনিকা। ব্রহ্মা জেগে উঠে দেখল বৃন্দাবনে, অদ্বয়, অনন্ত, অগাধবোধ পরমপুরুষ গোপবালকের নাট্যে হাতে খাদ্যগ্রাস নিয়ে আগের মতই ইতস্তত বৎস ও বয়স্যদের অন্বেষণ করে ফিরছে। তখন ব্রহ্মা তার চতুঃশীর্ষস্থ মুকুট চতুষ্টয় দিয়ে কৃষ্ণের চরণস্পর্শ করে কম্পিতকলেবরে গদগদভাবে স্তব করতে লাগল।

হে স্তবনীয়, তুমি প্রসন্ন হবে বলেই তোমাকে স্তব করি। যারা ক্ষুদ্রপ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করে স্থূল প্রমাণ তুষ তাড়ন করে তাদের চেষ্টা যেমন নিষ্ফল তেমতি যারা তোমার মঙ্গলময় ভক্তি ছেড়ে কেবল জ্ঞানলাভেই যত্ন করে তাদের ক্লেশস্বীকারই সার। হে ভূমন, হে অপরিচ্ছিন্ন, প্রথমত যোগী হয়েও অনেকে জ্ঞানলাভ করতে না পেরে তোমাকে তাদের সকল লৌকিক কর্ম ও চেষ্টা অর্পণ করে অবিরত তোমার কথা শোনে, তাতেই তোমার প্রতি তাদের যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাতেই তারা জানতে পারে তোমাকে। অতএব ভক্তিই জ্ঞানলাভের হেতু। জীবিত না থাকলে যেমন পৈত্রিক ধনে অধিকার থাকে না তেমনি ভক্তের জীবন ছাড়া মুক্তিলাভেরও উপায় নেই।

স্তবশেষে ব্রহ্মা ক্ষমা প্রার্থনায় আনত হল।

হে ঈশ্বর, আমার দৌর্জন্য দেখ। তুমি আদ্য, তুমি অনন্ত, তুমি মায়াজীবীদেরও বিমোহক, আর আমি এমনি মূঢ় যে তোমাতে মায়া বিস্তার করে নিজ ঐশ্বর্য দেখাতে গিয়েছিলাম। হায়, শিলা যেমন আগুনের কাছে কিছুই নয়, আমিও তেমনি তোমার কাছে নিঃস্ব। আমাকে ক্ষমা করো। রজোগুণ থেকে আমার উৎপত্তি, তাই আমিই জগৎকর্তা এই গর্বে আমার দুচোখ অন্ধ হয়েছিল, আমাকে মার্জনা করো। আমার নিজ প্রয়োজনে সপ্তবিতস্তিমাত্রপরিমিত এই প্রকৃতি-অহঙ্কার-আকাশ-বায়ু-অগ্নি-পৃথিবী-ঘটিত ব্রহ্মাণ্ড যদিও আমার দেহ, তবু তোমার রোমকূপ এত অগণন ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণুর যাতায়াতের গবাক্ষ যে

সাধ্য কি আমি তোমার মহিমা জানতে পারি? আমার অপরাধ নিও না। গর্ভস্থ শিশু যে পদদ্বয় দ্বারা তার মাকে প্রহার করে তাতে কি তার মা অপরাধ নেয়? কার্য ও কারণ কিছুই তোমার উদরের বহির্ভূত নয়। তুমি সর্বদেহীর আত্মা, তুমি সর্বলোকের সাক্ষী, আমার যে অপরাধ তাও তোমারই আশ্রয়ের মধ্যে, তোমারই প্রশ্রয়ের মধ্যে। তুমিই প্রকৃতিস্থ আত্মা, তুমি ছাড়া সমস্ত বিশ্বই মায়া। প্রথমে এক ছিলে, পরে সমস্ত ব্রজবালক ও বৎসরূপ ধারণ করলে। তারপর দেখি সমস্তই চতুর্ভুজরূপে বিদ্যমান। তুমিই যোগমায়া বিস্তার করে ক্রীড়া করছ। তোমারই মায়ায় এই স্বপ্নসদৃশ সততপ্রকাশ বিশ্ব সৎ বলে প্রতিভাত হচ্ছে। এক তুমিই সত্য। তুমিই পূর্ণ। তুমি নিত্য ও অনন্ত বলেই পূর্ণ। তুমিই স্বয়ংজ্যোতি, তুমিই অজস্র সুখ, তুমিই নির্মল নিরঞ্জন। অবিচ্ছিন্ন অমৃত।

তোর যদি একটি ছোট ভাই থাকত তুই বুঝতিস দাদার দুঃখ। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বললে আবার বিশ্বরূপ।

খাওয়া কখন শেষ হয়ে গিয়েছে। নিমাই তেমনি অধোমুখ হয়েই রইল।

বল অমন কাজ আর করবিনে?

'করব না।' বলতে গেল নিমাই কিন্তু কথা ফুটল না। দুচোখ বেয়ে নেমে এসেছে তরল মুক্তার স্রোত। আর নিমাই একবার কাঁদতে শুরু করলে আরতার বিরাম নেই সহজে।

'ও কি রে, কাঁদছিস কেন?' বিশ্বরূপ অস্থির হয়ে উঠল। 'তোকে কী বললাম?'

কাঁদতে-কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল নিমাই। কাঁপতে লাগল থর থর করে। এ কি, কি সর্বনাশ, মূর্চ্ছা গেল নাকি?

বিশ্বরূপ অন্ধকার দেখল। উদ্বেল হয়ে উঠল উদ্বেগে। নিমাইয়ের চোখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। যদি জোরে দিলে তার লাগে তাই চোখের উপর বুলোতে লাগল ঠাণ্ডা হাত। ডাকতে লাগল: 'নিমাই, নিমাই, চোখ চা। আমি কি তোকে বকেছি? আমি কি পারি তোর দোষ ধরতে?'

চোখ মেলল নিমাই। নিমাইকে ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে বিশ্বরূপ কোলে তুলে নিল। হাঁটতে লাগল বুকে করে। নিমাই শান্ত হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছে।

ধীরে ধীরে তাকে শয্যায় শুইয়ে দিল বিশ্বরূপ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষে। তুমিই স্বয়ংজ্যোতি, তুমিই অজস্রসুখ, তুমিই নির্মল-নিরঞ্জন। অবিচ্ছিন্ন অমৃত।

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর মধুর হৈতে সুমধুর
তাতে যেই মুখ-সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর
তার সেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর॥

৯

সারা দিন প্রায় অদ্বৈতসভায়ই কাটায় বিশ্বরূপ। বাপের সঙ্গে বড় একটা দেখা হয় না। সেদিন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পথের মধ্যে। জগন্নাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, যৌবনে কেমন সমর্থসুন্দর হয়ে উঠেছে বিশ্বরূপ। ভাবলেন ছেলের এবার বিয়ে দিই।

তা ছাড়া আবার কি। নিরবধি কেবল কৃষ্ণ-কীর্তনে মেতে আছে। মনে সংসারস্বপ্নের লেশ মাত্র নেই। নামমাত্র যে ঘরে ফেরে তাও ঠাকুরঘরে বসে থাকে। গৃহ ব্যবহারের ধারমাত্র ধারে না। একে এবার পরাতে হবে শৃঙ্খল। বন্ধনবল্লরী।

কে এই বিশ্বরূপ?

বিশ্বরূপ বলরামের বিলাস মূর্তি। বলদেবধাম।
বলদেব প্রকাশ—পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
তেঁহো বিশ্বের উপাদান নিমিত্ত কারণ॥
তাঁহা বিনা বিশ্বে কিছু বস্তু নহে আর।
অতএব বিশ্বরূপ নাম যে তাহার॥

ক্রীড়াশ্রান্ত বলরাম গোপবালকের কোলে মাথা রেখে শুয়েছে আর কৃষ্ণ তার পা টিপে দিচ্ছে। কখনো বা বীজন করছে ব্যজন দিয়ে। বন্ধুরা এসে বললে, হে মহাবল রাম, হে দুষ্টদমন কৃষ্ণ, অদূরে এক বৃহৎ তালবন আছে, তার সর্বত্রপ্রসারী সুগন্ধের আঘ্রাণ পাচ্ছি সকলে, কিন্তু সাধ্য কি সে ফল আমরা খাই। অতিবীর্য দুরাত্মা অসুর, ধেনুকাসুর, সে বন রক্ষা করছে। তোমরা ওঠো। আমাদের সে ফল খাবার ইচ্ছে হয়েছে। আমাদের সে ইচ্ছে পূরণ করো। ফল দাও আমাদের।

দুই ভাই তালবনে প্রবেশ করল। প্রমত্ত বাহুতে আকর্ষণ করে তালগাছগুলো সবলে নাড়তে লাগল

বলদেব। সশব্দে শুরু হল ফলবৃষ্টি। দুর্মদ ধেনুকাসুর ছুটে এসে বলরামের বক্ষে ক্রুদ্ধ আঘাত করল। বলরাম এক হাতে তার দুই পা ধরে তাকে শূন্যে ঘোরাতে লাগল। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়েই তার প্রাণবায়ু নিঃশেষ করলে ও পরে দূরস্থ এক তাল-বৃক্ষের উপর তাকে নিক্ষেপ করল। মহাবাত্যায় প্রকম্পিত হল তালবন।

জগদীশ্বর ভগবান অনন্তে এ কিছু আশ্চর্য নয়। যেহেতু তন্তুতে বস্ত্রের মত তাঁতেই বিশ্ব ওতপ্রোত হয়ে আছে।

বস্ত্রের দৈর্ঘ্যের দিকে সুতো ওত আর প্রস্থের দিকে সুতো প্রোত। বস্ত্রের সর্বত্রই সুতো, সুতো ছাড়া বস্ত্রে অন্য কিছু নেই। বস্ত্র তাই সুতোতে ওতপ্রোত। তেমনি বিশ্বও ভগবানে, বলদেবে, অনুস্যূত। বিশ্বের দৈর্ঘ্যের দিকেও তিনি প্রস্থের দিকেও তিনি।

বিয়ের উদ্যোগ হচ্ছে শুনে বিমর্ষ হল বিশ্বরূপ। মা-বাবা যদি বিয়ে করতে বলেন তবে কি সে পারবে অবাধ্য হতে। গুরুদ্রোহ অসম্ভব। তবে কি করা যায়? বিশ্বরূপ স্থির করল গৃহত্যাগ করব। সন্ন্যাসী হব।

সহপাঠী লোকনাথ, তাকে বললে মনের কথা।

লোকনাথ লাফিয়ে উঠল। বললে, আমিও তাহলে তোর সঙ্গে যাব।

সে কি, তুই যাবি কোথায়?

তোর পিছে-পিছে।

কিন্তু যাব যে, নিমাইকে দেখবে কে? কে তাকে লেখাপড়া শেখাবে, কে করবে শাসনসংযম? বাবা-মার কথা বিশেষ ভাবিনা কারণ যে কুলে সন্ন্যাসী হয় সে কুল উর্দ্ধগতি লাভ করে। 'গোষ্ঠীয়ে পুরুষ যার হয়ে সন্ন্যাস, ত্রিকোটি-কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস।' কিন্তু নিমাইকে তো একুলেই মানুষ হতে হবে, নইলে বাবা-মাকে কে দেবে সান্ত্বনা?

হায়, সন্ন্যাসীর আবার ভাবনা। তার আবার পিছটান!

শীতের রাত, বিশ্বরূপ আর লোকনাথ, ষোল বছর বয়েস, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। যাবার আগে বিশ্বরূপ নিদ্রিত বাপ-মাকে প্রণাম করল আর নিমাইকে সঁপে দিল কৃষ্ণের পাদপদ্মে।

হে কৃষ্ণ, হে নবনবায়মান মাধুর্য, তুমি আমার নিমাইকে দেখো। হে অনন্ত ভাবনিধি, আমি কি তোমার ইয়ত্তা করতে পারি? তুমি বহু মূর্ত্যেকমূর্তিক, একরূপে তুমি বহুমূর্তি, আবার বহুমূর্তিতেও তুমি একরূপ। একই বৈদূর্য্যমণি একদিক থেকে নীল আরেক দিক থেকে হলদে, আরেক দিক থেকে লাল তেমনি ধ্যান ভেঙ্গে তুমি অচ্যুত হয়েও বহুভাত। যেন একটি ময়ূরকণ্ঠি শাড়িতে নানা বর্ণের সমবায়, নানাবর্ণের সমুচ্ছ্বাস। লবণপিণ্ডের যেমন সর্বত্রই লবণ, কোথাও এক বিন্দু স্থানেও লবণ ছাড়া অন্য কিছু নেই, তেমনি তোমাতে সমস্তই আনন্দ, আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। তুমিই সর্বাশ্রয়। 'কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্বধাম, কৃষ্ণের শরীরে সর্ব বিশ্বের বিশ্রাম।' তুমি কমলনয়ন, মেঘাভ, বৈদ্যুতাম্বর, তুমি দ্বিভুজ, বনমালী, জ্ঞানমুদ্রাঢ্য, তুমি ঈশ্বর।

কিন্তু গঙ্গা পেরোব কি করে? এত রাত্রে নৌকো কই, পাটনী কই? জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিশ্বরূপ, দেখাদেখি লোকনাথ। পথের সম্বল একখানা পুঁথি ছিল সঙ্গে, তাকে বাঁচায় কি করে? বাঁ হাত জলের উপর খাড়া রেখে বিশ্বরূপ ডান হাতে সাঁতার কাটতে লাগল, সেই উর্দ্ধ হাতে পুঁথি ধরা। দু' বন্ধুতে গঙ্গা পার হয়ে গেল। শীতে ভিজে-কাপড়ে যাত্রা করল পশ্চিমে। কাল পূবে সূর্য উঠবে ভোরবেলা। যেটুকু আর্দ্রতা আছে শুষ্ক হয়ে যাবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই পুরী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর কাছে সন্ন্যাস নিল বিশ্বরূপ। নাম হল শঙ্করারণ্য। শঙ্করারণ্যের কাছে দীক্ষা নিল লোকনাথ। দুই নবীন কিশোর দণ্ডকমণ্ডলু নিয়ে বেরুল অনন্তপথে, অনন্ত পা থয়ের সন্ধানে।

জগন্নাথের ঘরে কান্নার রোল উঠল।

নিমাই মা-বাবাকে বললে, 'কাঁদছ কেন? আমিই তো আছি তোমাদের।'

'ভাল হৈল—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।

পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥

আমি তো করিব তোমা দোঁহার সেবন।

শুনিঞা সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন॥'

আশ্বাস দিচ্ছে নিমাই। দাদা তো মহৎ উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়েছেন। সেই বড় সুখ ভেবে ছাড়ো এই ছার দুঃখ। আর দেখ আমাকে। আমি থাকতে তোমাদের কিসের অভাব! আমি কখনো তোমাদের ছাড়ব না।

আজীবন তোমাদের সেবা করব। তবে আর কিসের কান্না।

জগন্নাথের বন্ধুবান্ধবদেরও সেই কথা :

'এই কুলে ভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র তোমার হইব বংশধর ॥
ইহা হৈতে সর্ব দুঃখ ঘুচিব তোমার।
কোটি পুত্রে কি করিব এ পুত্র যাহার ॥'

বুক বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন জগন্নাথ। স্বামীর সাহসে স্ত্রী, শচীদেবী। কৃষ্ণই পুত্র দিয়েছেন তিনিই নিয়ে নিলেন। স্বতন্ত্র জীবের তিলার্ধেরও শক্তি নেই। 'দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র, নিলেন কৃষ্ণ সে, যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইল সেই সে।'

তাই হে কৃষ্ণ, তোমাকেই সমর্পণ করে দিলুম ছেলে। এ কথা বলব না ছেলে আমার নিষ্ঠুর, ছেলে আমার অকৃতজ্ঞ। বলব না বালচাপল্যে সন্ন্যাস নিয়ে ধর্মভ্রষ্ট হয়েছে। বলব না তাকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে এস সংসারে। বরং এই আমার প্রার্থনা হোক, সে যেন আর ফিরে না আসে, সে যেন বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হয়।

কিন্তু, নিমাইয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন শচী, কিন্তু ছোট ছেলেটা ঘরে থাকবে তো? হে গোবিন্দ, আমার নিমাই যেন ঘরে থাকে, আমার নিমাই যেন সংসারী হয়। 'গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি।' কিন্তু জগন্নাথের মন প্রবোধ মানে না। 'মিশ্র বোলে, এই পুত্র রহিবেক ঘরে, ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে।' না, এ আমার অমূলক ভয়। নিমাইয়ের মাথায় আশীর্বাদের হাত রাখে। কৃষ্ণ-নির্মাল্যের হাত। হে সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন, তুমি আমার ঘরে থাকো।

নৈবেদ্যের তাম্বূল খেয়েছে নিমাই। খেয়েই অচেতন হয়ে পড়ে গেছে মাটিতে। শচী জগন্নাথ আর তত ব্যস্ত হন না তার মূর্চ্ছায়। কিন্তু বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে এ সব সে কী বলছে? জগন্নাথ শিউরে উঠলেন। কেন, ভালো কথাই তো। আশ্বাসের অর্থ খুঁজলেন শচী।

'মা, দাদাকে দেখলুম।'

'দাদাকে? কোথায়?' শচী আকুল হয়ে উঠলেন।

'দেখলুম, দাদা আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন হাত ধরে।'

'নিয়ে যাচ্ছেন?' চেঁচিয়ে উঠলেন জগন্নাথ।

'বলছেন, তুই আমার মত সন্ন্যেসী হ।'

'তুই কী বললি?'

'আমি বললুম, আমি শিশু, আমি সন্ন্যেসীর কী বুঝি? আমার বাবা-মা দুঃখী, ঘরে থেকেই আমি তাঁদের সেবা করব। তাতেই লক্ষ্মী জনার্দন খুশি হবেন।'

আমি কহি—আমার অনাথ পিতা-মাতা।
আমি বালক, সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥
গৃহস্থ হইয়া করিব পিতা-মাতার সেবন।
ইহাতেই তুষ্ট হবেন লক্ষ্মীনারায়ণ ॥

কী সুন্দর কথা! মন-প্রাণ ভরে গেল শচীর। দাদা গেছেন, আমি থাকব তোমাদের কাছে-কাছে। থাকব চোখের তৃপ্তি হয়ে হাতের লাঠি হয়ে। প্রার্থনাধিক প্রাপ্তি হয়ে।

'আর কী বললে বিশ্বরূপ?' মার কণ্ঠে বিগলিত ব্যাকুলতা।

'বললে বাবা-মাকে আমার কোটি-কোটি প্রণাম দিও।

শচী প্রবোধ মানুন কিন্তু জগন্নাথ শান্ত হলেন না। এই স্বপ্ন বুঝি আরেক বিসর্জনের সঙ্কেত। মুখে যাই বলুক নিমাইও থাকবে না ঘরে, দাদার পদাঙ্ক ধরবে।

তেমনিই স্বপ্ন দেখলেন জগন্নাথ। বলছেন শচীকে, জানো স্বপ্ন দেখলাম নিমাই মাথা মুড়েছে, পড়েছে অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে হাসছে কাঁদছে নাচছে পথ চলছে। নিমাইকে ঘিরে অদ্বৈত আচার্য্য ও অন্যান্য ভক্তরা কীর্তন করছে। নিমাই সকলের মাথায় পা তুলে দিচ্ছে, বসছে গিয়ে বিষ্ণুর খট্টায়। এ সব কী দেখলাম! নিমাইও বুঝি ছেড়ে যায় আমাদের।

কথা পায়ে মাখলেন না শচী। বললেন, এ ফাঁকা স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। তুমি নিমাইয়ের জন্যে চিন্তা কোরো না। ও ঘর ছাড়বার ছেলে নয়। কেমন মন দিয়ে পড়ছে দেখ। আমাকে কত ভালোবাসে। আমাকে ছাড়া ওর এক তিল সোয়াস্তি নেই। আমিই ওর সব চেয়ে বড় বান্ধব। ও আমার বাৎসল্যের অধীন।

তবু জগন্নাথ নিশ্চিন্ত হতে পারছেন কই?

শুধু অকিঞ্চন হয়ে কৃষ্ণের শরণ নিই। কৃষ্ণই কৃতজ্ঞ, বদান্য আর সমর্থ। কৃষ্ণই দাতার শিরোমণি। এক পাতা তুলসী এক ফোঁটা জলের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় পর্যন্ত করে দিতে পারেন অনায়াসে। তাই কৃষ্ণভজন করি। কৃষ্ণোন্মুখ হয়ে থাকি।

[ক্রমশঃ।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

মনোজ বসু

কুমিরমারির ডিঙি ফিরতে বেলা গড়িয়ে যায়। গগন বলে, ফুলতলা থেকে সদর-নায়েব ভরদ্বাজ এসেছে। তোর খোঁজে এই অবধি চলে এসেছিল। যেতে বলে গেছে।

জগা শুনে গেল মাত্র, কানে নিয়েছে কিনা বোঝা যায় না। ক'দিন কাটে এমনি। হঠাৎ একদিন কালোসোনা এসে পড়ল: কই জগা, গেলে না?

জগা ঘাড় নেড়ে বলে, কেন যাব না? অত বড় মানুষটা নিজে এসে ডেকে গেলেন—আলবৎ যাব।

কবে?

যাওয়া যাবে একদিন।

ঠিক করে বলে দাও। নায়েব মশায় বলে দিলেন, তারিখ নিয়ে আসবি।

জগন্নাথ বলে, আমাদের পাঁজি নেই। তারিখ-টারিখ ঠিক থাকে না। নায়েবকে সেই কথা বলিস।

মেজাজ বুঝে অধিক উচ্চবাচ্য না করে কালোসোনা চলে গেল। তখন জগা হি-হি করে হাসে: নামটা আমার বড্ড চাউর হয়ে গেছে, নৌকো সরানোর যশটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। গেলে মারবে।

বলাই বলে, মারের ভয় করিস তুই জগা?

তা বলে ওদের কোটে যাই কেন? নিয়ে গিয়ে হয়তো বা বলবে, পিঠে সরষের তেল মালিস কর জগা, মারতে গিয়ে হাতে না লাগে। ক্ষমতা থাকে এইখানে এসে মেরে যাক।

ক'দিন গেল। গোপাল আবার একদিন এসে পড়ে জগাকে ধরলেন। পায়ে মাটি ছোঁবার উপায় নেই বলে যথারীতি শালতি করেই এসেছেন। এবং যোগাযোগ ভালই—হর ঘড়ুইয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন, তদুপলক্ষে বরাপোতায় গগন নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছে। জগাকে বলে গেল, আলার দিকে কড়া নজর রাখবি। কিন্তু চালাঘরে কেন—দিনমানটা আলায় গিয়ে শুয়ে থাক। চৌধুরিদের সঙ্গে মন-কষাকষি, এ সামাল হয়ে থাকার দরকার। জগারও দায়িত্ব আছে এই গণ্ডগোলের ব্যাপারে। গগন নেই তো

এমনি সময় ভরদ্বাজ এলেন। খবরবাদ নিয়েই এসেছেন নিশ্চয়। একগাল হেসে বললেন, এই যে, আজকে ঠিক ধরেছি। এমন লোহার শরীর—তুমি জগন্নাথ না হয়ে যাও না। কি বলো?

জগন্নাথ উঠে বসে নিদ্রারক্ত চোখ রগড়াচ্ছে। একবার মাঝে ঘাড় নেড়ে দিল।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গোপাল বলেন, গগন নেই, কাউকে তো দেখছিনে। তা তোমার সঙ্গেই দরকার। ছোটবাবু তোমার কথা সমস্ত শুনেছেন।

জগা কঠিন হয়ে বলে, শুনবেন না কেন? অনিরুদ্ধ আড়ে-হাতে লেগেছে, না শুনিয়ে সে ছাড়বে? নৌকো নাকি সরিয়ে ছিলাম আমি। তা শুনে থাকেন, ভালই। কারো চালে চাল ঠেকিয়ে আমি বসত করিনে।

গোপাল জিভ কাটেন: ছি ছি, নৌকোর কথা উঠছে কিসে? দোষ ষোল আনা অনিরুদ্ধর, এখন আজে-বাজে বলে বেড়ালে কি হবে? কাছির আলগা বাঁধন ছিল কিম্বা গাঁজার ঝোঁকে বাঁধেই নি হয়তো মোটে। টানের মুখে নৌকো ভেসে গেল। নিজের দোষ ঢাকতে নানান কথা বলছে। কিন্তু ছোটবাবু বোঝেন সব, কাটা-কান চুলে ঢাকবে না।

অকারণে গলা নামিয়ে বলতে লাগলেন, চৌধুরিগঞ্জে কাজ করবে তো বলো। নতুন নৌকো এসেছে। নৌকোর দায়িত্ব তোমার উপরে—তুমি কর্তা। কাজ এখানে যা, সেখানেও তাই। বরঞ্চ মজা ওখানে। সন্ধ্যাবেলা রওনা হয়ে তাড়াহুড়ো করতে হবে না। মাল পৌঁছে দিয়ে, ব্যস, তারপরে যা খুশি তুমি করে বেড়াও গে।

ঘাড় নেড়ে জগা এক কথায় সেরে দেয়: না—

কেন, কি হল? লম্বা মাইনে রে বাপু। তিরিশ। ছোটবাবুকে বলে করে না হয় পঁয়ত্রিশেই তুলে দেওয়া যাবে।

বেয়াড়া জগা তবু ঘাড় নাড়ে।

গোপাল বিরক্ত হয়ে বলেন, তবে কি? লাট সাহেবের মাইনে চাও না কি হে? এখানে তো মুফতের খাটুনি। খবর লুকোছাপা থাকে না, সমস্ত জানি।

হীরে-জহরত কী খেয়ে থাক, সেটা অবশ্য জানি নে। কোন পালঙ্কে শুয়ে থাকো সে এই চোখের উপর দেখছি। আপন ভাল পাগলেও বোঝে। বিবেচনা করে দেখ, তিরিশটা দিন পুরলেই কড়কড়ে পঁয়ত্রিশখানি টাকা। তার পরে ধরোগে, কুমিরমারি থেকে চৌধুরিগঞ্জ অবধি পাকা-রাস্তা হয়ে যাচ্ছে—বারোবেঁকির গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে না। মোটরলরিতে মাল-চলাচল। রাস্তা ছোটবাবু উদ্যোগ করে নিজে দেখেশুনে বানাচ্ছেন—লরির লাইসেন্স তিনি ছাড়া কি বাইরের মানুষ পাবে? তখন মোটর-ড্রাইভারি শিখে নিও। ভাল হয়ে কাজকর্ম করলে ছোটবাবুই ব্যবস্থা করে দেবেন, তোমার কিছু করতে হবে না। মাইনে সঙ্গে সঙ্গে পঁয়ত্রিশ দুনো সত্তর। আর ঐ বাড়তেই থাকল। টাকার আণ্ডিল দু-চার বছরের ভিতর।

জগা উদাসীনের ভাবে বলে, কি হবে টাকায়?

অ্যাঁ, সাক্ষাৎ ন্যাংটেশ্বর তুমি যে বাপু। বলে টাকা দিয়ে কি হবে? ভূ-সম্পত্তি, খাতির-ইজ্জত ঘরবাড়ি সবই তো টাকার খেলা।

ঘরে আমার গরজ নেই।

চিরটা কাল ফুটো চালায় তালি দিয়ে থাকবে? ছি-ছি, আশা বড় করতে হয়। বিয়ে থাওয়া করবে, ছেলেপুলে হবে, দশের একজন হয়ে জমিয়ে বসবে।

জগা রীতিমত চটে গিয়ে বলে, বেশ আছি মশায়। আপনি এমনধারা লেগেছেন কেন বলুন দিকি? ঘর বাড়ি ছেলেপুলে বিয়েথাওয়া চেয়েছি আপনার কাছে? এই মাছের কাজও করব নাকি আমি বেশি দিন? বড়দার মতো মানুষটাকে বুদ্ধি দিয়ে আমিই জঙ্গলে নিয়ে এলাম। তাই দায়িত্ব পড়ে গেছে। খানিকটা গোছগাছ করে দিয়ে সরে পড়ব। প্রাণ আমার ছটফট করছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। আজেবাজে কথার সময় নেই। এসে পড়বে মানুষ জন, জমবে এইবার। তার আগে ডিঙিটা পরিষ্কার করে ধুয়ে রাখতে হবে। রাত থাকতেই আবার ডিঙির কাজ। বাদামের এক পাশে খানিকটা ছিঁড়ে গেছে, ছুঁচের কয়েকটা ফোঁড় দিতে হবে সেই জায়গায়। আর ঐ দেখ, খালপারে বড় জঙ্গলের দিক থেকে কালো মেঘ আকাশে উঠে আসছে। কালো মহিষের পাল বুঝি বাদাবন থেকে বেরিয়ে ডাঙা ভেবে আকাশমুখো ধাওয়া করেছে। চরের উপর নয়, ঘরের মধ্যে বসতে হবে আজ সকলের। মনটা খারাপ হয়ে যায়, বদ্ধ জায়গায় বসে আরাম হয় কখনো?

নেমন্তন্নের পাট চুকিয়ে গগন কখন ফিরবে, ঠিক কি? ফড়খেলা হয়তো হবে না। পয়সার ব্যাপার—গগন ছাড়া কাঁচা-পয়সা ছুঁড়ে দেবার তাগত ক-জনার? পয়সা ছুঁড়বে যেন খোলামকুচি। গগন বিহনে নিরামিষ গান বাজনাই আজকে শুধু।

গোপাল বলেন, খেলই না হে, আমরাও জানি। দেখ খেলে এক-দান দু-দান।

কত পয়সা নিয়ে এসেছেন?

সে কি আর মুখস্থ রয়েছে?

গাঁজিয়া ঝেড়ে গণে-গেঁথে সাড়ে ন-আনা হল। গোপাল বলেন, ন-মাস ছ-মাসের পথ নয়—বেশি আনতে যাব কেন? খেলেই দেখ না, এই পয়সা নিয়ে নাও জিতে। বুকের ক্ষমতা। হুঁ, এই ন-আনার চৌগুণ গেঁথে ন-সিকে পুরিয়ে যদি না ঘরে যাই আমার নাম বদলে রেখে তোমরা।

জগা আমল দেয় না: আর একদিন আসবেন ভরদ্বাজ মশায়। ভাঙানি নিয়ে আসবেন টাকা পাঁচেকের অন্তত। ন-আনার চৌগুণ না করে পাঁচ টাকার চৌগুণ করে নিয়ে যাবেন। আর মা বনবিবির দয়ায় সেই পাঁচ টাকা আমরাই যদি জিনে নিতে পারি, জাঁক করে কিছু বলার মতন করে।

খেলল না সে কিছুতে। গোপাল মনে মনে গরম হলেন। মাত্র সাড়ে ন-আনা সম্বল জেনে খেলতে চাইল না—অপমানই করা হল তাঁকে। আলা ছেড়ে তবু ওঠেন না। এসেছেন যখন গগনের সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া ঠিক হবে না। হোক না রাত্রি—সালতি সঙ্গে রয়েছে, ভাবনা কি? গান আরম্ভ হল ওদিকে। সঙ্গে ঢোলক আর খঞ্জরি। খোলও আছে। জগা ধরল, সেই সময় খোল বেরুল। গোপাল শুনছেন চুপচাপ বসে বসে। শেষে আর থাকতে পারেন না, বাহবা দিয়ে ওঠেন উচ্চ কণ্ঠে: বেড়ে গলা হে তোমার! প্রাণ পাগল করে দেয়—

জগন্নাথ বলে, যাত্রার দলে ছিলাম, অধিকারীর পিটুনি খেয়ে খেয়ে তবে হয়েছে। থাকবে না, গলার তদ্বির হয় না—মাছের নৌকো বেয়ে বেয়ে গলার কিছু থাকে?

মনটা এক লহমা পিছনের দিকে চলে যায়। যাত্রার দল এসেছিল কোন অঞ্চল থেকে, গেয়ে গেয়ে খুব নাম করল। ছেলেমানুষ জগন্নাথ ঘুরছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। গান শুনতে দু-তিন ক্রোশ চলে যায়। সমস্ত বায়না সেরেসুরে যাত্রার দল একদিন নৌকোয় চাপল। জগন্নাথও আর গ্রামে নেই। অনেকদূর গিয়ে এলাকা পার হয়ে এক এক বাঁকের মুখে নৌকো ধরে আছে। পায়ে হেঁটে জগন্নাথ সেই অবধি চলে গেল। বন্দোবস্ত ছিল তাই। চেনা-জানা কারো নজরে পড়ে না যায়। তবে তো রক্ষা থাকবে না। দেখ, দেখ, পালিয়ে যাচ্ছে যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে! জোর করে নামিয়ে নিত। তাই সেই কচি বয়সে খাল-বিল জল-কাদায় ভিতর দিয়ে চার-পাঁচ ক্রোশ ছুটতে হয়েছিল। গানের নেশা এমনি। কিন্তু আকাঁড়া চালের ভাত, পুঁই-কুমড়োর ঘ্যাঁট আর অধিকারীর পিটুনি অধিক দিন চালানো গেল না। নানান ঘাটের জল খেয়ে নোণাজলের বাদাবনে এখন। ছুটোছুটির মধ্যে গান-বাজনা ক'টা দিনই বা হয়েছে? এই এখনই গগনের সায়ের বসানো থেকে সন্ধ্যার পর যা হোক দশ জন আয়েস করে বসা যাচ্ছে।

জগন্নাথ চুপ করে গেছে তো রাধেশ্যাম ঢোলকটা টেনে নিল। চপাচপ চপাচপ মোক্ষম কয়েকটা ঘা দিল ঢোলকের এদিকে ওদিকে। তারপর গান। চিরদিন সে একটা গান গেয়ে এসেছে—একখানা বই দু'খানা জানে না। গান কে বেঁধেছে কেউ বলতে পারে না, রাধেশ্যাম ছাড়া অন্য কারো মুখে কস্মিন কালে শোনা যায়নি এ গান:

গোবিন্দনারায়ণ
চাষ দিচ্ছেন শ্রীবৃন্দাবন
তামুক সেজে বলরাম সে ভুড়ুক ভুড়ুক টানে।

ছিদাম বলে কালিয়া দাদা।

চৌদিকে যে জবর কাদা, পান্তাভাতের শালুকখানা রাখি বল কোন্‌খানে।

রাত বেশ হয়েছে। চারিদিক নিঝুম নিঃসাড়। কিন্তু যে-ই না রাধেশ্যাম গানের দু'টো চারটে কথা উচ্চারণ করেছে, রৈ-রৈ রব উঠল পাড়ার মধ্যে। ভাঙা কাঁসরের মতন অন্নদাসীর কণ্ঠ—অকথা-কুকথা বলছে, নেহাৎ বাদা জায়গা, ভদ্রজনের চলাচল নেই, আপনারা হলে তো দু'কানে আঙুল গুঁজে নারায়ণ নারায়ণ বলে উঠতেন। বউ পতিদেবতাকে লক্ষ্য করে বাছা বাছা বিশেষণ ছুঁড়ছে। রাধেশ্যামের ভাবান্তর নেই, নির্বিকারে গেয়ে যাচ্ছে। সমের মুখে এসে হঠাৎ থামল। ঢোলক নামিয়ে রেখে তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল আলার উঠানে। দুম-দুম দুম-দুম মাটি কাঁপিয়ে দৌড়। গোপাল ভরদ্বাজ এ তল্লাটে নতুন, কাণ্ড-বাণ্ড দেখে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। তুমুল আর্তনাদ—পাড়ার ভিতর থেকে অন্নদাসী মর্মান্তিক চিৎকার করছে, বহু বিচিত্র সম্বন্ধ পাতাচ্ছে স্বামীর সঙ্গে। গুড়ুম-গুড়ুম কিল পড়ছে, এতদূর থেকেও আওয়াজটা স্পষ্ট ধরা যায়। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বউয়ের গালি তীক্ষ্ণ হয়। মিনিট কতক পরে বোধ করি দম ফুরিয়ে গিয়েই ঝিমিয়ে আসে। আবার কিল। কিল ও গালি পর্যায়ক্রমে চলল বেশ খানিকক্ষণ। তার পরে দেখা যায় অন্ধকারে গজেন্দ্রগতিতে রাধেশ্যাম ফিরে আসছে। একটি কথা বলল না সে কারো সঙ্গে। ঢোল নামিয়ে রেখে দিয়েছিল—সেই ঢোল কোলের উপর তুলে নিল। গান যেখানটায় ছেড়ে গিয়েছিল ঠিক সেই কথা থেকে আবার শুরু করে দিল। জগা এতক্ষণ একেবারে চুপ হয়ে ছিল, বোঝা যাচ্ছে, এই রাধেশ্যামের ফিরে আসার অপেক্ষায়। গান একটা মাঝখানে বন্ধ রেখে চলে গিয়েছিল, সেটা শেষ করে না দেওয়া অবধি অন্য কেউ ধরবে না।

এখানকার এই প্রতিদিনের ব্যাপার। কিন্তু নতুন আগন্তুক গোপালের তাজ্জব লাগে। একেবারে কিছু না বলে থাকতে পারেন না। ঐ গানের ভিতরেই জিজ্ঞাসা করলেন, মারমুখি হয়ে অমন ছুটে বেরুলে কেন?

রাধেশ্যাম সঙ্গীতরসে মজে আছে, কণ্ঠে একবিন্দু ঝাঁঝ নেই। একগাল হেসে বলল, রাশ করে এলাম নায়েব মশায়!

সেটা আবার কি?

রাশ বুঝলেন না? মাগি বড্ড বাড়িয়েছিল। লাজলজ্জা পুড়িয়ে খেয়েছে। আপনি এতবড় একজন মানুষ, কি মনে করলেন বলুন তো? ক'টা কিল ছেড়ে ঠাণ্ডা করে এলাম। ঠাণ্ডা হবে, সোয়ামি বলে মান্য করবে।

অন্যদিন হয়তো তাই হয়ে থাকে। আজ অন্নদাসীর কি হয়েছে —রাধেশ্যাম আবার গান ধরতে না ধরতে পুনশ্চ চিৎকার। গোড়ায় গোড়ায় যেমন হয়, রাধেশ্যামের ভ্রূক্ষেপ নেই, গানের গলা দ্বিগুণ চড়িয়ে দিল।

জগা কাছ ঘেঁসে এসে তার পিঠের উপর হাত রাখে: আর উঠিস নে রাধেশ্যাম। মেরেধরে আজকিছু হবে না, বড্ড ক্ষেপে গেছে। ওসব কিছু কানে নিসনে।

এক লহমা গান থামিয়ে মুখ বিকৃত করে রাধেশ্যাম বলে, সমস্তটা দিন পেটে দানা পড়ে নি। অসুরের মতন গতরখানা—তিনবেলা তিন পাথর ফুস মন্তরে উড়ে যায়। সেই মানুষের কাঠ-কাঠ উপোস।

গোপাল শিউরে উঠে বলেন, বলো কি হে?

রাধেশ্যাম বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, জলের নিচের মাছ—সব দিনই যে সুড়সুড় করে জালের তলে আসবে তার কোন নিয়ম আছে? উপোসের কথা যদি বলেন, সেটা কি একলা ওর? না নতুন কোন ব্যাপার? এই আমরা সব জুটেছি পেটে টোকা দিয়ে দেখুন—,কত জনে এর জন্যে উপোসী। কোন কাজটা তার জন্যে আটকে থাকে?

তিক্ত কণ্ঠে আবার বলে, মাগিটারও কী স্বভাব! পরশু দেড়টি টাকা রোজগার হল। সীতাশাল চাল নিয়ে এল বরাপাতায় পার হয়ে গিয়ে। কি না মোটা চালের ভাতে পেট গড়গড় করে। ঘি এলো তিন আনার, পেঁয়াজ কালজিরে, চাটনি হবে তার চিনি-কিসমিস। খাবার সময় জলে দেখি কর্পূরের গন্ধ। কি ব্যাপার, কর্পূর এলো কোত্থেকে রে? শেষবেশ নাকি চারটে পয়সা বেঁচেছিল, তাই দিয়ে কর্পূর কিনে জলে দিয়েছে। বুঝুন। সাক্ষাৎ উড়নচণ্ডী, পয়সা ইঁদুর হয়ে ওর গায়ে কামড় দিতে থাকে। খরচা করে ফেলে নিশ্চিন্ত।

হর ঘড়ুই ওপাশ থেকে বলে ওঠে, না মশায়, ষোলআনা হল না। ভালমানষের মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপালে হবে না—আমিও বলি, পয়সা ঘরে রাখলে রক্ষে আছে? এমনি না দিল তো জোরজার করে কিম্বা হাত সাফাই করে সেই পয়সা নিয়ে গিয়ে তুই নেশাভাং করবি। কাঁচা পয়সা রাখে তবে কোন ভরসায়?

মরুক গে উপোস করে। তবে আর মরণ-চেঁচানি কেন?

রাধেশ্যাম প্রাণপণ বলে এবার ঢোলে ঘা দিচ্ছে, বউয়ের ঝগড়া কানে না ঢোকে! চিৎকার যত, বাজনা তার বিস্তর উপরে। ঢপাঢপ ঢপঢপ, ঢপাঢপ ঢপঢপ। কানের পর্দা চৌচির হবার দাখিল।

বাঃ শালা, ঢোল ফেসে গিয়েছে।

আর কি আশ্চর্য, ওদিকেও যে ঝিমিয়ে গেছে একেবারে। খালি পেটে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা কাঠ হয়ে হয়তো বা আর এখন আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

সলজ্জে রাধেশ্যাম বলে, ঢোলক আমার হাতেই ফাঁসল রে জগা। ছাউনি মগ্ন হয়েছিল, ঝোঁকের মাথায় অত হুঁশ ছিল না। তা তুই নতুন করে ছেয়ে নিয়ে আয় ফুলতলা থেকে। খরচা আমার থেকে নিয়ে নিস।

না, মেঘটা যেন গোলমাল করল না। শতখণ্ড হয়ে আকাশের এদিকে সেদিকে ভেসে বেরিয়ে গেল। কালো জঙ্গলের মাথার উপর চাঁদ। কী সর্বনাশ, আড্ডা শেষ হয়ে গিয়ে কাজকর্মের মুখটায় চাঁদ এখন আকাশে চেপে বসলেন। গগনের অনুপস্থিতিতে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন গোপালকে রাধেশ্যাম জিজ্ঞাসা করে, কোন তিথি আজ নায়েব মশায়? চাঁদ কতক্ষণ আছে?

গগন নিমন্ত্রণ সেরে গাঙ পার হয়ে এই সময় এসে পড়ল।

কি গো, এখনো চলছে তোমার? কাজের সময় হয়ে গেল, খাওয়াদাওয়া করবে আর কখন? আমি খাবো না, সে তো জানো।

জ্যোৎস্নার ক্ষীণ রশ্মি ঘরের মধ্যে। নজর পড়ল, গোপাল

ভরদ্বাজের দিকে। গোত্রছাড়া হয়ে মাচার উপর বসে আছেন। তাঁকে দেখে কাজের কথাবার্তা আর এগুল না।

আপনি এসেছেন নায়েব মশায়? ভালো, ভালো, এইস্থানেই চার্টি সেবা হোক তবে।

অর্থাৎ প্রকারান্তরে উঠতে বলা হচ্ছে তাঁকে। গোপাল না না—করেন: আমার জন্ম পাকশাক ওদিকে হয়ে আছে।

রাত অনেক হয়েছে। যেতে তো অনেকক্ষণ লাগবে। তাই বলছিলাম, কাজ কি ঝঞ্ঝাট করে? যা-হোক দুটো মুখে দিয়ে এইখানে গড়িয়ে পড়লে হত।

গোপাল বলেন, উঁহু, ঘেরিতে কত কাজ আমার! সালতি সঙ্গে আছে। সাঁ করে চলে যাবো। আমি উঠি।

গগন বলে, ভর জোয়ার—কোটালের মুখ। বাঁধের কানা অবধি জল উঠেছে। এই রাতে সালতিতে উঠতে যাবেন না। খলজিতে মাটি পাবে না, একটু কাত হলে সামলাতে পারবে না। এক কাজ কর হারাধন, সালতিতে উঠে কাজ নেই। ডিঙিতে করে তুই আলায় তুলে দিয়ে আয় নায়েব মশায়কে। বাঁধে ছেড়ে দিস নে। রাত্তিরবেলা উড়ো কাল—একেবারে আলায় তুলে দিয়ে তবে ফিরে আসবি।

আলো ধরে খুব খাতির করে ভরদ্বাজকে নিজেদের ডিঙায় তুলে দিয়ে গগন ফিরে এলো। উঠানে এসে দাঁতে দাঁত রেখে বলে, শালা ওৎ পেতে বসেছিল। আমি এসে না তুলে দিলে রাতের মধ্যে নড়ত না। ঘাঁতঘোঁত বুঝে নিত, মানুষজন চিনে রাখত। হারাধনকে তাই একেবারে আলায় তুলে দিয়ে আসতে বললাম, পথে-ঘাটে না ছেড়ে দেয়। চাঁদ ডুবে যায়, আর বসে রয়েছ কেন তোমরা?

অন্নদাসীর শাপশাপান্ত বন্ধ হয়েছে। পাড়া নিঃশব্দ। রাত ঝিম ঝিম করছে। ভাঁটার টান ধরল বুঝি এইবার। বানের জল কলকল করে খালে পড়ছে, সেই আওয়াজ। জন পাঁচ-সাত মরদ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল: থুড়ি বুড়ো-হালদার, মান রেখো বাবা, জাল টেনে তুলতে ঘাম ছুটে যায় যেন।

মাছ ধরবার আগে বুড়ো-হালদারের নাম স্মরণ নেয়। তিনি সদয় হলে মাছ পড়ে ভালো। সে দেবতার বিগ্রহ নেই, পূজা-প্রকরণ কিছু নেই, পুরাণে পাঁজিতে কোন রকম তাঁর খবর মেলে না। তবু আছে নামটা। থুড়ি বলে মাটিতে থুতু ফেলে বেরিয়ে পড়ে মাছ-মারারা। বুড়ো-হালদার জলের মাছ তাড়িয়ে এনে জালে ঢোকাবেন। যদি ছিপ নিয়ে বসো, তোমার চারে ভুলিয়ে ভালিয়ে ভাল মাছ নিয়ে আসবেন। থুড়ি, থুড়ি, থুড়ি বুড়ো-হালদার।

## নয়

আর এদিকে ঢেকুর তুলে গগন দেখি, মাদুর পাতবার উদ্যোগে আছে। ঠেসে এসেছে প্রচুর, খাড়া হয়ে বসে থাকবার তাগত নেই। জগা ও বলাই উঠে পড়ে চালা ঘরের দিকে চলল। রান্না-খাওয়া এবারে। তার পরে চক্ষু বুজে পহরখানেক পড়ে থাকা। হর ষড়ুই শুধু মাত্র গগনকে নিমন্ত্রণ করল, ঘেরির মালিক বলেই সমাদর দেখাল। জগা-বলাইর সঙ্গে কতবার এক ডিঙিতে গিয়েছে, মুখে এত খাতির, কিন্তু তাদের বলল না। তা হলে একটা রাত্রির রান্নার হাঙ্গামা কাটানো যেত।

বলাই বলে, না-ই বলল, গিয়ে পড়লে কে ঠেকাত? এই যে, এসে গেছি ষড়ুই মশায়। নেমন্তন্ন করতে তোমার ভুল হয়েছিল, তা বলে আমরা ভুল করব কেন?

জগা বলে, মনে আমার উঠেছিল কথাটা। ভরদ্বাজ এসে পড়ে গোলমাল করে দিল। তার উপরে বড়দা আমার উপরে আলার ভার দিয়ে গেল যে। চৌধুরিগঞ্জের ঐ শয়তানগুলোর মুখ মিষ্টি, মনে মনে ওরা কোন প্যাঁচ কষছে কে বলবে?

বাঁধের উপর পড়ে ফিরে তাকিয়ে দেখে। কী আশ্চর্য, হেরিকেন জ্বলছে এখনো। শুয়ে পড়েও আলো জ্বালিয়ে রাখে, বড়দা যে লাট সাহেব হয়ে উঠল! ঠাহর করে দেখে, উঁহু—শোয়নি এখনো, কী কতকগুলো কাগজ নিয়ে আলোর সামনে এসে পড়ছে। জরুরি বস্তু নিশ্চয়, দিনের আলো অবধি সবুর সইল না। কেরোসিন পুড়িয়ে পড়ে নিতে হচ্ছে। শয়তানগুলোর মুখ মিষ্টি, মনে মনে ওরা কোন প্যাঁচ কষছে কে বলবে?

পেট মানে না, অতএব ঘরে এসে রান্নার জোগাড়ে বসতে হয়। বিশেষ করে হর-ষড়ুইয়ের বাড়ির ভোজে রকমারি আয়োজনের কথা শুনে ক্ষিধেটা যেন বেশি বেশি আজকে। জগন্নাথ উনুন ধরাচ্ছে, বলাই চুপচাপ বসে। সর্বকর্মে সহকারী বলাই, কেবল এই রান্নার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে। রাঁধাবাড়া শেষ হবার পরেই তার কাজ—খাওয়া, এবং বাসনকোশন ধোওয়া। জগা যা-হোক কিছু জানে, কিন্তু বড় আলসেমি রান্নার ব্যাপারে। বাদাবনে নয়, উনুনের ধারেই যেন বাঘ। মানুষ কি জন্যে বিয়ে করে, জগা কখনো কখনো ভাবতে যায়। জলজ্যান্ত একটা মেয়েলোক ঘাড়ে তুলে নেয়, অপারগ হলেও যাকে আর নামানোর উপায় থাকে না। ভাবতে গিয়ে তখন এই রান্নার কথা মনে ওঠে। আগুনের তাপে বসে রান্নার ঝামেলা পুরুষমানুষের পক্ষে অসহ্য, মরীয়া হয়ে তাই মেয়েলোক বিয়ে করে বসে। লোকজন রেখে যে চলে না, তা নয়। শহরের হোটেলে, দেখ গিয়ে, দশাসই জোয়ানরা রাঁধাবাড়া ও দেওয়া থোওয়া করছে। শহর কেন, কুমিরমারিতেই তো গদাধর শানা পৈতে ঝুলিয়ে ভটচাজ্জি হয়ে এই কাজ করে দু-পয়সা পাচ্ছে। তবে ঐ ব্যবস্থার মুশকিল, রাঁধুনি পুরুষকে মাইনে দিতে হয় নগদ টাকা। এবং মাইনে-করা মানুষ হলেই কেখনো আছে কখনো নেই। বিয়ে-করা পরিবার নিয়ে এই ঝঞ্ঝাট নেই, তারা কায়েমি বস্তু।

কাঁচা কাঠ কেটে রেখেছে জঙ্গল থেকে, ভাল রকম শুকোয় নি। উনুন ধরাতে গিয়ে হয়রাণ—পালা করে ফুঁ দিচ্ছে একবার জগা একবার বলাই। এমনি সময়, অবাক কাণ্ড, এতখানি পথ ভেঙে গগন এসে ঘরে ঢুকল।

কি করছ? অ্যাঁ, ভাতটাও চাপাওনি দেখছি এতক্ষণে?

বলাই আশ্চর্য হয়ে বলে, শোওনি বড়দা, বাঁধের উপর টহল দিয়ে বেড়াচ্ছ?

জগা বলে, পরের ভাত পেয়ে ঠেসে চাপান দিয়ে এসেছ, পেটের মধ্যে ফুটছে সেগুলো। ভাত ষড়ুইয়ের কিন্তু পেটটা যে নিজের—সেটা বুঝি তখন মনে ছিল না?

গগন গম্ভীর। এসব রসিকতার জবাব না দিয়ে সে বলে, গায়ের জোর দিয়ে উনুন ধরানো যায় না রে! কায়দা-কৌশল

আছে। কাঠ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উনুনের দফা নিকেশ করেছ—সরো, আমি ধরিয়ে দিয়ে যাই।

জগার অভিমানে লাগে। বলে, কাঁচা কাঠে উনুন ধরবে কি! ঘরাইর কাণ্ড, এক গাদা কাঁচা গেঁয়োকাঠ কেটে রেখেছে। আবার তা-ও বলি,—বাদার মধ্যে খুঁজে খুঁজে শুকনো কাঠ কেটে আনব, সে ছুটিই বা পাচ্ছি কোথা? নৌকা বাওয়ার এক দিনের তরে বিরাম নেই। ওসব হবে না বড়দা, ডিঙি একদিন কুমিরমারি না গিয়ে বাদার দিকে চালিয়ে দেবো। আগেভাগে বলে রাখছি, তখন দোষ দিতে পারবে না।

গগন তাড়াতাড়ি বলে, আমি বসছি। দেখবে এবারে কাঁচা কাঠ জ্বলে কি রকম দাউদাউ করে। ফুঃ ফুঃ—

খান কয়েক খামের চিঠি হাতের মুঠোয়। সেগুলো উনুনে দিল। ফুঃ ফুঃ—

ফুঁয়ের জোরে অথবা এই চিঠির ইন্ধনে উনুন এবারে ধরে গেল।

ফুরসৎ পেয়ে জগা জিজ্ঞাসা করে, চিঠি বুঝি বরাপোতা থেকে নিয়ে এলে? অত চিঠি কে লিখল?

গগন বলে, গরজ বিনে কে কোন কাজ করে? যাদের গরজ তারাই লিখেছে। এত চিঠি এক দিনে আসে নি, বিস্তর দিন ধরে জমে ছিল বয়ারখোলার তৈলক্ষের কাছে। হঠাৎ কোন খেয়াল হল, ঠিকানা কেটে এক সঙ্গে সব পাঠিয়ে দিয়েছে। তার পরে পিওনের ঝোলার মধ্যেই পড়ে আছে কত কাল। ঘড়ুয়ের বাড়ি পিওনেরও নেমন্তন্ন, আজকে সে চিঠি দিয়ে দিল।

বলাই বলে, কষ্ট করে লিখেছে—একেবারে উনুনে দিয়ে দিলে বড়দা? কি লিখেছে?

গগন বলে, কী এমন হীরে-মুক্তো যে প্যাঁটরা ভরে রাখতে হবে? পয়সা খরচ করে চিঠি পাঠায় কি 'কেমন আছ ভাল আছি'র জন্যে? দুটো-চারটে কথা পড়েই মাথা চনমন করে উঠল। স্থির থাকতে পারিনে। চলে এলাম শলা-পরামর্শ করতে। আবার শাসানি দিয়েছে, টাকা না পাঠালে সব সুদ্ধ এসে পড়বে।

জগা ঘাড় নেড়ে বলে, বড্ড ভয়ের কথা—

বলাই অভয় দিচ্ছে, বাদা জায়গার পথ ঠিক করে যমরাজা আসতে পারে না, এখানে আসবে মানবেলার মেয়েছেলে। দূর!

গগন চলে গেছে। খেয়েদেয়ে বলাই-জগা গড়িয়ে পড়ল। এদের কাজ পোহাতি-তারা উঠবার পর। এখন যাদের কাজ, তারা সব বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পনের-বিশ মরদ বেরিয়েছে নানান দিকে। গগন নিশ্বাস ফেলে এক এক সময়: মূলধন থাকলে মাছ-মারার লোক পনের-বিশ থেকে পঞ্চাশে তোলা যেত। মাছের দরদাম করে ব্যাপারিরা তো ঝোড়া নৌকোয় তুলল, দামটা আগাম ফেলে দিতে হবে গগনের। টাকা হলে নৌকোও করা যেত আর একটা। পুরানো দিনকাল নেই বটে, তা হলেও কাঙালি চক্কোত্তির পথে এগুনো যেত অনেক দূর! খালি হাতে কত আর খেল দেখিয়ে পারা যায়? আবার এরই মধ্যে চিঠির পরে চিঠি। বনে এসেও ত্রাণ নেই। কত জন্মের মহাজন যে বিনি-বউ! সাগরের নিচে ডুবে থাকলেও বোধ করি সাগর সেঁচে হিড়হিড় করে টেনে তুলত।

টিপিটিপি পা ফেলে সাঁইতলার পনের-বিশ মরদ নানান দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু এক চৌধুরিগঞ্জ নয়—ছোট-বড় নানা ঘেরিতে, যে যায়গায় যখন সুবিধা। হাতে খেপলাজাল, কোমরে বাঁধা বাঁশের বুনানির খালুই। আলোর কথাই ওঠে না, যত অন্ধকার ততই তো মজা। দিনমানে নিরীহ ভাবে ঘুরে ফিরে মনে মনে আঁচ করে আসে, কোন ঘেরির কোন অঞ্চলে আজকের অভিযান। ঘোরাফেরারই বা কী এমন দরকার—এ তল্লাটের সকল সুলুক-সন্ধান মাছমারাদের নখদর্পণে। দিনমানেই চলতে গিয়ে পদে পদে সাপ দেখবেন আলের উপরে, বাঁধের উপরে। রাতের অন্ধকারে বেপরোয়া এরা চলাচল করে, অথচ সাপে কেটেছে কেউ কোনদিন শোনে নি। কেমন যেন বুঝসমঝ আছে সাপে আর মানুষে—প্রায় একই জাতের জীব। কেউ যায় গড়িয়ে গড়িয়ে বুকে ভর দিয়ে, কেউ বা পা টিপে টিপে বঙ্কুকের মতন বাঁকা হয়ে। ঝিমঝিম করে চতুর্দিক, রাত্রিচর কোন পাখি পাখার ঝাপটার অন্ধকারে দোলা দিয়ে মাথার উপর দিয়ে হয়তো বা উড়ে গেল। ঝপাং করে আওয়াজ একবার জলে—জাল ফেলল কোন মাছ-মারা। পাহারার লোক এদিক-সেদিক ছড়িয়ে আছে, ডিঙি-সালতি পাঁচ-সাতখানা। সাঁ-সাঁ করে ছুটেছে সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে। ডাঙার বাঁধে মানুষ ছুটেছে হেরিকেন দুলিয়ে শব্দসাড়া করে। কোথায় কে? আন্দাজি জায়গাটায় এসে দেখা যাবে, সদ্য জাল ঝেড়েছে—তার শেওলা-শুগলি পড়ে আছে কতকটা। মানুষ উধাও। তখনই হয়তো বা কানে আসবে অনেক দূরে ঠিক অমনি জাল ফেলার শব্দ। ছোট আবার সেদিকে। রাত দুপুরে এ-ঘেরিতে ও-ঘেরিতে নিত্যি দিনের লুকোচুরি খেলা চলেছে।

আগে এত দূর ছিল না। বেশি মাছ ধরে পচিয়ে ফেলে মুনাফা কি? এখন জায়গা হয়েছে—গাঙ আর খালের মোহানায় গগন দাসের আলা। মাছ মেরে সোজা এনে নামাও আলার উঠানে। ব্যাপারিতে ব্যাপারিতে রেশারেশি—আট আনা, দশ আনা, এগারো আনা, সাড়ে-এগারো, বারো। দর শুনে রাগে গা আগুন। পুরোঝুড়ি নিয়ে এলাম—পারশে, বাগদা-চিংড়ি, ভেটকির বাচ্চা—কানা ব্যাপারিরা দেখেও না চোখ তাকিয়ে? বারো আনা বলে কোন বিবেচনায়? বারো আনা হলে জলের মাছ জলে ঢেলে দেবো। নয় তো বরাপোতার বাজারে নিয়ে হাতে কেটে বেচে আসব। তাতেও কোন না পাঁচ-সিকে দেড়-টাকা হবে!

এক টানে মাছের ঝুড়ি নিয়ে আসে নিজের দিকে; হয় ঘড়ুই বলে, রাখো, রাখো—রাগলে কাজকর্ম হয়? আচ্ছা, আরও দু-আনা ধরে দিচ্ছি। চোদ্দ আনা। উঁহু, এক আধলা নয় এর উপরে।

বউ অন্নদাসী ওৎ পেতে আছে উঠানের এক দিকে। একা সে নয়, পাড়ার আরও যত মেয়েলোক। মাছ-মারাদের বউ-বোন-মা-পিসি। বসে আছে সেই কখন থেকে—পান-তামাক খায়, চুপি চুপি গল্পগুজব করে নিজেদের মধ্যে। মাছের দরদাম হচ্ছে, সচকিত হয়ে উঠে সেই সময়টা। বিক্রি পাকা হয়ে গগনের খাতায় লেখা পড়ল, তড়াক করে উঠে এসে মেয়েলোকে অমনি হাত পাতবে। খাতাওয়ালা তক্ষুণি দাম মিটিয়ে দেবে, এই হল দস্তুর। দিতে হবে মেয়েলোকের হাতে। পুরুষের হাতে পড়েছে কি

অন্ততপক্ষে আধাআধি গায়েব হবে নেশাভাঙের জন্ত। নেশা করে পড়ে থাকবে, পরের দিন আর জাল নামবে না। চোদ্দ আনার দুটো পয়সা তোলা কেটে রেখে গগন সাড়ে-তেরো আনা দিয়ে দিল অন্নদাসীর হাতে। আরও দুটো পয়সা আদায় হবে ব্যাপারি হয় যদু্ই যখন দাম শোধ করবে, চোদ্দ আনার জায়গায় সাড়ে চোদ্দ আনা দেবে। পয়সা আঁচলের মুড়োয় বেঁধে বউ চলে গেল। রাধেশ্যামের এর পরে আর কাজ নেই বেলা আড়াই প্রহর অবধি। স্নান করে মাথায় টেরি কেটে ঘুমাক পড়ে পড়ে— বউ বাজারঘাট রান্নাবান্না সেরে এসে ডেকে তুলবে। খাওয়াদাওয়ার পর পুনশ্চ শুয়ে পড়ুক অথবা যা খুশি করুকগে। কাজ আবার সেই নিশিরাত্রে। ভোরের মুখে ভরতি খালুই নিয়ে উঠবে গগনের আলায় তবে আর ঝগড়াঝাটি হবে না, বউ মন্দ বলতে যাবে না পুরুষকে।

সকালবেলা পাড়ায় মধ্যে কাণা শশী।

রাধেশ্যাম কই গো? পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছ, রাত্তে কাজকর্ম হয়েছে তবে ভাল। বেশ, বেশ!

চোখ কচলাতে কচলাতে রাধেশ্যাম উঠে বসল। শশী বলে, নায়েব মশায় এক পালি এই চাল পাঠিয়ে দিল।

কেন, চাল কেন?

তোমার বাড়ির চেঁচামেচি শুনে গেল। দয়ার প্রাণ, দয়া হয়েছে, আবার কেন?

রাধেশ্যাম খাতির করে ডাকে, উঠোনে কেন শশী, দাওয়ার উপর উঠে বোসো। পান-তামাক খাও। কি কি বলল, শুনি সমস্ত কথা।

হোগলার চাটাই পেতে দিল শশীকে। ঘরের ভিতরে ঘুরে এসে বলে, পান নেই শশী। পান খাবে তো বিকেলে এসো। বউ বরাপোতা গেছে, পান খয়ের লবঙ্গ সব এসে পড়বে।

হুঁ, ঘুমের রকম দেখেই বুঝেছি। বড়লোক হয়ে গেছ আজকে। বাবু তো বাবু—রাধেশ্যাম বাবু।

ঐ তো মজা। আজ নবাব, কাল ফকির। কাল উপোস গেছে, আজকে ডবল খাওয়া খেয়ে নেবো। চাল ফেরত দাওগে শশী। কাল দিলে কাজে লাগত। ঝগড়া-কচকচি যখনই হবে, বুঝে নিও, সেদিন বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। তখন নিয়ে এসো।

তামাক খেতে খেতে শশী চোখ পিট-পিট করে বলল, চাল ফেরত দিয়ে মুনাফা কি? নায়েব কি ঘরের থেকে এনে দয়া দেখায়? মনিব মেরে দিচ্ছে, ফেরত দিলেও সেই মনিব অবধি ফেরত পৌঁছবে না।

রাধেশ্যাম বলে, তবে থাক।

শশী আর গোটা কয়েক টান দিয়ে রহস্য-ভরা কণ্ঠে বলে, বউ তোমার ফিরবে কতক্ষণে?

সকল পথ দৌড়াদৌড়ি, গাঙের ঘাটে গড়াগড়ি। গাঙের পারাপার আছে, দেরি খানিকটা হবে বই কি!

তবে চলো। চালের কুনকে হাতে করেই যাচ্ছি।

রাধেশ্যাম বুঝেছে। উৎসাহের সঙ্গে তড়াক করে দাওয়া থেকে নামল। বলে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, বউ এসে পড়বার আগে।

যেতে যেতে ফাঁস করে একবার নিশ্বাস ছাড়ে: অর্ধপিশাচ মাগি। রাত জেগে জাল বেয়ে মরি, তা যদি দু'গণ্ডা পয়সা হাতে নিতে দেয়! ধর্মের কল বাতাসে নড়ে—পারলি কই আটকাতে? এক কুনকে চাল বিক্রি করে একটা আধুলি তো নিদেন পক্ষে।

কাণা শশী দেমাক করে: আমাদের ঐ ঝামেলা নেই। এন্তাজারির ধার ধারিনে। দু-পয়সা রোজগার করব তো সে দুটো পয়সাই আমার। যা ইচ্ছে করব, গাঙের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও কথা নেই!

অন্নদাসী এসে পড়বার আগেই বাড়ি ফেরার কথা, ফিরে এলো এক প্রহর রাতে। একা একা এসেছে, শশী সাহস করেনি পাড়ার মধ্যে এসে অন্নদাসীর মুখোমুখি পড়তে। বাজারে বুঝি ক'টা মুড়ির মোয়া কিনে খেয়েছিল বউ, তারপর বাড়ি এসে রাঁধাবাড়া করে চুপচাপ বসে আছে। কাল উপোস গেছে, আজও মুখে ভাত পড়েনি এখনো। ঘরে এসে রাধেশ্যাম হাউহাউ করে কাঁদে। কান্নার চোটে বাচ্চা দুটো জেগে উঠে কাঁদতে লাগল। পুরুষ ঠেকায় না বাচ্চাদের ঠেকায়, অন্নদাসীর এই এখন মুশকিল।

রস অর্থাৎ তাড়ি গিলে এসেছে। রস খেলে মন নরম হয়, মায়াদয়া উথলে ওঠে। কিন্তু পয়সা কোথায় পেল? অন্নদাসী নানান কায়দায় জেরা করে। জালে আজ বেরুল না এদিকে রাধেশ্যাম, বেরুবার অবস্থাও নেই। যা ছিল পাইপয়সা অবধি হরচন্দ্র করে এসেছে। রাত পোহালে আবার তো দিন হবে, কালকের দিনের উপায়?

রাগ হলে অন্নদাসীর জ্ঞান থাকে না। পরের দিন সোজা চলে গেল চৌধুরিগঞ্জের আলায়। ভরদ্বাজ তখন নেই। বাঁধ ঘুরতে বেরিয়েছেন। বাঁধ বাঁধা, এবং বাঁধ কেটে ঘেরিতে নোনা জল তোলার সময় এইবার। সেই সবের তদারকি হচ্ছে। রান্নাঘরে কালোসোনা। খাচ্ছে। রাত্তে ভাত বেশি হয়ে যাওয়ায় কড়াই শুদ্ধ ভাতে জল ঢেলে রেখেছিল। সেই কড়াই থেকে খেয়ে নিচ্ছে। অন্নদাসী হুমকি দিয়ে পড়ে: চাল দাও—

চাল? কেন, তোমায় চাল দিতে হবে কেন?

কানা শশী কাল দিয়ে এসেছিল তো আজও দিতে হবে।

মুখের দিকে তাকিয়ে কালোসোনা ফিক করে হাসল: দেবার মালিক আসুক। এসে যা হয় করবে। বেলা চড়ে উঠেছে, আসবে এইবারে। নায়েবমশায় গা ঘামিয়ে মনিবের কাজ করে না।

গব গব করে খেয়ে নিচ্ছে। আর শুনছে রাধেশ্যাম ও কানা শশীর কাণ্ড। খেয়েদেয়ে কড়াইটা এগিয়ে দেয়: অমন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে বউ! বোসো। ঘাটে নিয়ে বসে বসে কড়াইখানা মেজে দাও। তোমায় দেখে তাড়াতাড়ি অবসর করে দিলাম। ঘষামাজা আমি তেমন পেরে উঠিনে।

কড়াই দেখে অন্ন মুখ সিঁটকে বলে, কী করে রেখেছ? হাতে ধরতে ঘেন্না করে। নাম কালো তো যা ছোঁবে তাই অমনি কালি-ঝুলি মাখা হয়ে যাবে।

ঘাটে বসে কড়াই মাজে অন্নদাসী। নতুন কড়াই কেনার পরে মাজে নি বোধ হয় কোনদিন। অন্নকে দেখে খেয়াল হল। পরের গতর দেখলে খাটিয়ে নেওয়া অভ্যাস এদের। দুই আংটার নিচে দু-খানা পায়ে চেপে ধরে খড় আর ভাঙা-হাঁড়িকুড়ির চাড়া দিয়ে সজোরে ঘষছে। উপোসের পর উপোস দিয়েও গায়ে কিন্তু বেশ

র। দুই সন্তানের মা, আরও গোটা দুই পেট থেকে পড়েই গেছে—বাঁধন-আটা শরীরখানা তবু চেয়ে দেখতে হয়।

ভরদ্বাজ দলবল নিয়ে ফিরলেন। মাজা কড়াই হাতে নিয়ে দাসী ঘাট থেকে উঠে এলো। ভরদ্বাজ তারিপ করেন: পরিষ্কার রকর্ম তোমার হে! রূপোর মতন ঝকঝকে করে ফেলেছ।

অন্নদাসী বলে, খোরাকির চাল দিতে হবে। সেইজন্যে দাঁড়িয়ে াছি নায়েব মশায়। কালকের চাল বরবাদ হয়ে গেছে। আজকে জে হাতে করে নিয়ে যাব।

ভরদ্বাজ বলেন, ও, রাধেশ্যামের বউ তুমি? ফ্যাসাদের কথা দ। একদিন দিয়েছি বলে, রোজই দিয়ে যেতে হবে?

কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখালেন কেন নায়েবমশায়? বলে খ টিপে অন্নদাসী হাসল।

ভরদ্বাজ তাকিয়ে দেখে বললেন, আচ্ছা থাকো তুমি। ওদের সঙ্গে ারে আসি তাড়াতাড়ি। তোমার সব কথা শুনব।

জগা বলল, ফুলতলায় যাব বড়দা। ঢোলক ছেয়ে আনব, আর চাল খঞ্জরি পাওয়া যায় কিনা দেখতে হবে! এ জোড়া ক্ষয়ে গছে।

গগন বলে, তুমি ঢোলক ছাইতে গেলে কুমিরমারি মাল পৌঁছবে কেমন করে? এত জন মাছ-মারা, তাদের উপায়টা কি? তারা কি খাবে?

এক দিনের তো মামলা। নয়তো বড় জোর দুটো দিন। কত ব্যাপারি আছে—হর ঘড়ুই, মুলুক মিঞা, বুদ্ধীশ্বর—ওদের চালিয়ে নিতে বলো।

ওরা বেয়ে দেবে মাছের নৌকো, তবেই হয়েছে! ছাগলের পায়ে ধান পড়লে লোকে গরু কিনত না। নৌকো নিয়ে পৌঁছতে বিকেল করে ফেলবে—খদ্দেরপত্তোর সমস্ত তখন সরে গেছে, মাছ পচে গোবর।

জগন্নাথ খুশি হয়েছে অন্য সকলকে ছাগল বলা এবং তাকে গরুর সম্মান দেওয়ার জন্য। তবু বলল, আমি যদি কাজ ছেড়ে চলে যাই? এমন তো কতবার হয়েছে। এক কাজ নিয়ে পড়ে থাকব, সে মানুষ আমি নই।

তুমি ছাড়লে আমি তোমায় ছাড়ব না—

কথার কথা নয়, মনে মনে জগার সম্পর্কে রীতিমত শঙ্কা। যে রকম খেয়ালি লোক, এক লহমায় ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়া অসম্ভব নয় তার পক্ষে। গগন তা হতে দেবে না। ভোর-রাত্রে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে মোটরবাস ধরা। এক জীবনের মৃত্যু হয়ে পুনর্জন্মে এসে গেল। এত দিনে এইবার মনে হচ্ছে, চেপে বসার দিন এসেছে। গগন বলে, যেখানে যাবি আমি তোর পিছন ধরব জগা। দেখি, পালাস কোথা। কোন দিন তোকে আর পালাতে দেব না।

আরও খুশি জগন্নাথ। খোশামুদি পেলে আর সে কিছু চায় না। বলে, আমি যদি মরে যাই বড়দা—

গগন আগুন হয়ে বলে, মরণের ডাক ডাকবে না বলছি। ভাল হবে না। মেরে খুন করে ফেলব বাবদিগর বাজে কথা মুখে আনলে।

জগা হেসে ফেলে বলে, আচ্ছা—আচ্ছা, ঘাট মানছি। থাক এবারে বড়দা। কিন্তু রাধেশ্যাম যে ঢোলক ছিঁড়ে দিয়েছে, গানবাজনা না হলে টিকতে পারবে সন্ধ্যের পর? বলো সেটা। তা হলে চুপচাপ থেকে যাই।

ক'দিন কেটে যায় বিনা সঙ্গীতে। সত্যি, অসহ্য। দিনের আলো যতক্ষণ থাকে, সে একরকম। রাত্তে একেবারে ভিন্ন জগৎ। অকারণ ভেড়িতে চলাফেরা কোরো না, কেউটে সাপ। জলে পা দিও না, কুমির। গাছের উপর কুঁকুঁ করছে, বানর। হরিণের ডাক আসে ওপারের বাদাবন থেকে, এক একবার তার মাঝে বাঘের হামলা। কলকল করে জল নামছে একটানা কোন দিকে। জোলো হাওয়ায় গোলবনে পাতা ঝিলমিল করে। এরই মধ্যে আপাতত নিষ্কর্মা কয়টি প্রাণী অন্ধকারে আলাঘরের ভিতর। সেই কত দূরের কুমিরমারি থেকে কেরোসিন কিনে নিয়ে আসে, কেরোসিন দুর্মূল্যও বটে। ভোর-রাত্রে কেনাবেচার সময়টা আলো জ্বলে। পারতপক্ষে আলো আর কোন সময় জ্বালতে চায় না। এমন কি রাতের খাওয়াও অনেক দিন অন্ধকারে। খালটুকু পার হয়ে গিয়ে ঘন অরণ্য। এ-পারেও ছিটে জঙ্গল। চুপচাপ অন্ধকারে বসে থেকে বুকের মধ্যে কাঁপে। মনে হয়, জমে গিয়ে জঙ্গলের গাছ হয়ে যাচ্ছে ওরাও যেন। হঠাৎ এক সময় গগন চেঁচিয়ে ওঠে, গান না-ই হল, কথা বলছ না কেন তোমরা? মুখের বাক্যি হরে গেল? গতরের খাটনি এত খাটতে পার, মুখের ভিতরে জিভটা নাড়তেই কষ্ট?

জগন্নাথ আবার এক দিন বলে সেই কথা বলে, ঢোলক ছেয়ে না আনলে চলছে না বড়দা। চলে যাই ফুলতলায়।

আজ গগন এক কথায় মত দিয়ে দেয়: যাও—

সকালবেলা মাছের নৌকো নিয়ে কুমিরমারি যাব। হরও যাবো-যাবো করছে, ফুলতলায় ওর কি সব কাজকর্ম। দু-জনে আমরা কুমিরমারি থেকে টাপুরেনৌকোয় চলে যাব। আমাদের খালি ডিঙি বলাই বেয়ে নিয়ে আসবে। তা সে পারবে।

গগন ভেবে বলে, উঁহু, কাল নয়—পরশুও নয়। পাঁজি দেখে দিন বলে দেব।

হর ঘড়ুই রয়েছে। হেসে উঠে সে বলল, জগা কি বউ আনতে যাচ্ছে যে পাঁজি দেখতে হবে?

গগন বলে, জ্যোৎস্না-পক্ষ পড়ে গেল। অষ্টমীতে যেও তোমরা। মরা গোনে এমনই মাছ কম, তার উপরে জ্যোৎস্না হয়ে অসুবিধা বেশি।

আবার বলে, সে-ই ভাল। অল্পসল্প যে মাছ আসবে, বরাপোতায় হাতে কেটে বেচা যাবে, আর ব্যাপারিদের কেউ ডিঙি নিয়ে কুমিরমারি আনাগোনা করে। তো আরও ভাল। মুলুক মিঞা পারতে পারে। সে যা হয় হবে অষ্টমী থেকে ছুটি রইল জগা। মাছ-মারাদেরও বলে দেবো, বুঝেসমঝে জাল নামাবে—মাল কাটানোর দায়ি রইল না ক'টা দিন। সত্যিই তো, দু-চার দিনের ছুটি না পেলে মানবে বাঁচে কেমন করে? আর শোন—ঢোলক আনো মন্দিরা আনো, যদি ইলিশ মাছ উঠে থাকে তা-ও নিয়ে এসো একটা। অবিত্তি করে এনো। মোণা মাছ খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেল।

…যাচ্ছে অন্ততপক্ষে আধাআধি পায়ের … যে-কেউ করে পড়ে থাকবে, … না হয় রাত আনার ছুটো … । দিয়ে … ? বলাই ছাড়বে না। …তেয় তার সঙ্গে সহমরণে

## দশ

…কত দেখাতে নেই। দেখালে বিপদ ঘটে। দেখ … রকম ভরদ্বাজের! সেই একদিন দয়া পরবশ-হয়ে অন্নদাসীর … চাল পাঠাল, তারপরে অন্নদাসী খুঁচি হাতে নিজে চৌধুরিগঞ্জের আলায় এসে পড়ে। এক-আধদিন নয়, দায়ে পড়লেই আসবে চলে। রাধেশ্যাম জালে যায় নি, কিম্বা জালে তেমন মাছ পড়েনি—একটা-কিছু হলেই হল। যেন দাবি ভরদ্বাজের উপর। আর রাধেশ্যামও জো পেয়ে গেছে। হাতের নাগালে ছুটো চারটে পয়সা পেল তো কাউকে কিছু না বলে শুট করে নেশায় বেরিয়ে পড়ল। অথবা জাল হাতে করে বেরিয়ে কোন এক আড্ডায় গিয়ে বসল। কিম্বা মনের সুখে নিদ্রা দিল কোথাও পড়ে পড়ে। শেষরাত্রে জালগাছা জলে চুবিয়ে এনে শুকনো মুখে বলবে, বুড়ো হালদার দিলেন না আজ কিছু। আসলে হল, শৌখিন মানুষ—মেজাজখানা অবিকল বাবুভেয়ের মতো। জাল বেয়ে জলকাদা ভেঙে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে মন চায় না। করতে হত নিতান্ত পেটের দায়ে। এখন দেখছে, কাজে ঢিল দিয়েও উপোস করতে হয় না। হেন অবস্থায় যে রকম ঘটে—খাটনিতে মোটে গা নেই। বউকে তাড়া দেয়, ভরদ্বাজের কাছ থেকে চাল নিয়ে আসবার জন্ত। গড়িমসি করলে মারগুতোনও দেয়।

অন্নদাসীকে গোপাল বলেন, এমন খাসা তোর গতরখানা ঐ হতভাগার সঙ্গে নিত্যি নিত্যি চেঁচামেচি করতে যাস কি জন্তে? নিজে রুজিরোজগার করলেই তো হয়।

ফিক করে হেসে অন্নদাসী বলে, মরণ!

হাসি দেখে আরও মাথা ঘুরে যায় গোপালের। তবু শান্তভাবে বলেন, রোজগার করে খাবি, তার মধ্যে মরণ ডাকবার কি হল রে?

অন্নদাসী বলে, কি রকমের রোজগার বলে দাও না নায়েব মশায়—

গোপাল সতর্কভাবে এগোন: এই ধর না কেন, এবার থেকে, ভাবছি, আমি নিজে রান্না করব। তুই তার যোগাড়যন্তোর করে দিবি।

কালোসোনার হল কি?

গোপাল বলেন, দূর! মেছোঘেরির কাজ-কর্মে আছি তা বলে মানুষটা মোটেই কম নই আমি। ব্রাহ্মণ-সন্তান, দেশে বিস্তর যজন-যাজন। লোণারাজ্যে নানান ভজোকটো। তাই ভাবলাম, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি, এখানে কে দেখছে, এক সময় কলকাতায় গিয়ে আচ্ছা করে গঙ্গায় ডুব দিয়ে সব অনাচার ধুয়ে দিয়ে আসব। তা বেটা কালোসোনার এমন রান্না, অন্নপ্রাশনের অন্ন অবধি পেটের তলা থেকে উপরে বেরিয়ে আসে। খেতে গিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হই। আপন হাত জগন্নাথ। তুই যদি ভরসা দিস অন্ন, পৈতে কোমরে গুঁজে হাতা-খুন্তি নিয়ে লেগে যাই আবার।

সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন তার পানে: কতক্ষণের কাজ? কাজকর্ম সেরে রাঁধা ভাত খেয়ে ড্যাং-ড্যাং করে ঘরে চলে যাবি। কি বলিস?

কাজকর্মগুলো বাতলে দিন, তবে শুনি।

উনুন ধরানো, বাসন মাজা, বাটনা বাটা। খাবার জল বয়ে আনতে হবে না, ফুলতলায় সেই বাবুদের টিউকল থেকে মিঠা জল ধরে নৌকোয় করে নিয়ে আসে।

আর কিছু নয় তো? বলুন নায়েব মশায় সমস্ত খোলসা করে।

দেখা গেল, অন্নদাসী মুখ টিপে টিপে হাসছে। গোপাল বলেন, মেয়েমানুষের মন দেবতাও জানেন না। তোর মনের অন্দরে আর কোন কাজের শখ, আমি তা কেমন করে বলব রে!

টাপুরে বলে থাকি আমরা, ইংরেজিনবিশ আপনারা বলেন শেয়ারের নৌকো। ফুলতলা আর বয়ারখোলার মধ্যে চলাচল। কুমিরমারির ঘাট মাঝে পড়ে। কুমিরমারি থেকে টাপুরে ধরে জগন্নাথরা ফুলতলায় গেছে। নতুন-ছাওয়া ঢোলক গলায় ঝুলিয়ে ঐ নৌকোতেই আবার ফিরে আসবে। আসবে বয়ারখোলা অবধি। সেখানে মেছো-নৌকো পাওয়া গেল তো ভাল। নয় তো হেঁটেই মেরে দেবে নতুন রাস্তার নিশানা ধরে।

হর ঘড়ুইকে সঙ্গে নেওয়া মিছে। তার মাথায় খালি ঘুরপাক খায়, ছুটো পয়সা আসবে কেমন করে? পয়সা, পয়সা, পয়সা,—পয়সা কি কড়মড় করে চিবিয়ে খাবি রে বাপু? প্রাণধারণের দায়টুকু মিটে গেলেই হল। কুমিরমারি থেকে রাস্তা হয়ে যাচ্ছে, চৌধুরিগঞ্জ ছাড়িয়ে রাস্তা চলে যাবে আরও নাবালে। সাগর অবধি চলে যাবে, এই রকম শোনা যায়। অতদূর যাক না যাক, সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নয়। রাস্তার একটা চেহারাও দাঁড়িয়েছে মোটামুটি—মাটি ফেলেছে অনেক জায়গায়, বন কেটে দিয়েছে। পায়ে হাঁটা চলে। রাস্তাটা পাকা করে এবং ছোট-বড় গোটা তিনেক পুল বানিয়ে দেয় যদি, তখন লরী চলবে। হবে নিশ্চয় তাই। কাঙালি চক্কোত্তির ছেলে অনুকূল চৌধুরি যখন উঠে পড়ে লেগেছে, ওদের স্বার্থ রয়েছে, কাজ শেষ না করে তখন ছাড়বে না। নাকের সিধে রাস্তা, ডিঙিতে এ-খাল থেকে ও-খালের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতে হবে না আর তখন। কত দিন লাগতে পারে ঐ রাস্তায় খোয়া ফেলতে? এক বছর—ছু-বছর? হয়ে গেলে তখন এক ঘণ্টার মধ্যে কুমিরমারি। আর কুমিরমারি একেবারে ঘরের দুয়োরে হয়ে গেল তো বেচা-কেনা সেখানেই বা কেন? গঞ্জ জায়গা হলেও যত খেয়ো-খদ্দের ওখানে—তারা কতই বা মাল টানবে, কি দাম দেবে? ব্যবসা তাতে কত আর কাঁপানো যায়? এক ঘণ্টায় কুমিরমারি এসে গেলাম তো মোটরলঞ্চে মাল নিয়ে ফেল ফুলতলায়। বড় পাইকারেরা বরফ চাপিয়ে ওখান থেকে কলকাতা শহরে চালান দেবে। কলকাতার মানুষ ছাড়া ট্যাঁকের জোর কার?

হর ঘড়ুই এমনি সব মতলবে মশগুল। আড়তওয়ালাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে, পড়তা খতিয়ে দেখছে। ধৈর্য ধরতে পারে না।

আচ্ছা, রাস্তা যত দিন লরী চলবার মতন না হচ্ছে, লোকের কাঁধে শিকে-বাঁকে মাল যদি কুমিরমারি পৌঁছে দেওয়া যায়? সময় কত লাগে, মুনাফার দিক দিয়ে কি পরিমাণ সুবিধা?

হরর মুখে এই সমস্ত কথাই কেবল, মনে মনে এই ভাবনা। জগা দোকানে চাল ছাইতে দিয়ে এসেছে। একটা দিন পরে দেবে। রেল-ষ্টেশন থেকে সামান্য দূরে ঘাট। আঁকা-বাঁকা গাঙ দু-পারে মানুষজনের ঘরবসত ছাড়িয়ে তেপান্তর ধানবনগুলো পার হয়ে গিয়ে অরণ্যভূমে পথ হারিয়ে শতেক ডালপালা ছেড়ে এক সময়ে অবশেষে দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর রেললাইন চলল ঠিক উল্টোমুখো। দালান-কোঠা ঘন হচ্ছে ক্রমশ। হতে হতে শেষটা শহর কলকাতা—দালান আর পাকা-রাস্তা ছাড়া একটুকু মাটির জমি নেই, মাটি যেখানে পয়সা দিয়ে কিনতে হয়।

জগা আর বলাই ফুলতলা ষ্টেশনে চলে যায় এক সময়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রেলগাড়ির চলাচল দেখে। কত মানুষ নামল এসে শহর কলকাতা থেকে, ফর্শা জামা-কাপড় পরনে। ঘাটে গিয়ে কেউ কেউ তাদের নৌকোয় চাপে। নৌকোয় উঠে জামা খোলো। খোলস খুলে ফেলে যেন বাঁচল। পুঁটলি খুলে গামছা বের করে গা-হাত-পা ঘষে ঘষে শহরের কেতা-কানুনও মুছে দিল যেন ঐ সঙ্গে। জামা খুলে ফেলে দাঁড় ধরল। মচ-মচ করে দাঁড় পড়ছে। জলে আলোড়ন। সাঁ-সাঁ ছুটছে নৌকো।···আবার দেখ, বাদা অঞ্চলের কত নৌকো এসে ধরছে ফুলতলার ঘাটে। ঘাটে এসেছে জোয়ান-মরদরা অমনি গামছায় জড়ানো গেঞ্জি-কামিজ গায়ে চড়ায়। কনুই ভরতি লোহা ও তামার মাদুলির রাশ জামার নিচে ঢেকে যায়। অব্যবহারে ধনুকের মতন বেঁকে-যাওয়া চটি—পা ধুয়ে ফেলে চটিজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তারা কলকাতার গাড়ি ধরতে চলল।

জগারা দেখে এই সব। নৌকোয় উঠে মাঝিদের সঙ্গে গল্পগুজব করে। তামাক খায়, নানান জায়গার খবরাখবর শোনে। ষ্টেশনের অফিস-ঘরে টরে-টক্কা বেজে যায়, চোঙার মুখে ষ্টেশনের মাষ্টারবাবু অদৃশ্য কার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। এ-ও হল দূরের তল্লাটের খবরাখবর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না ষ্টেশনের বাবুদের কাছে। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢোকাই যায় না।

অনেক রাত্রি। বাদাবনের বুকের উপর পাষাণ চাপা—শব্দসাড়া একেবারে নেই। মরা গোনে গাঙখালগুলোও যেন তটের কাছে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ চিৎকার। চেঁচাচ্ছে কে গলা ফাটিয়ে: সর্বনাশ হয়েছে, মারা গলাম। কে কোথা আছ, এসো শিগগির।

ঘুমের ঘোর গগন ধড়মড়িয়ে ওঠে। রাধেশ্যামের গলা যেন! অনেক দূর থেকে বোধ করি কালীতলারও ওপাশ থেকে—চেঁচাল বার কয়েক। তার পরে চুপচাপ। ওটাকে নিয়ে আর পারা যায় না—আবার কোন্ কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে। আগুপিছু না ভেবে এক একটা দুঃসাহসিক কাজে নেমে পড়ে, তখন আর খোয়ারের পার থাকে না। আজকে হয়তো মেরেই ফেলেছে একেবারে। নয়তো দু-বার তিন বারের পর একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল কেন?

ছটফট করছে গগন। নিজে বেরুবে না, রাত্রিবেলা একা-দোকা তার পক্ষে বেরুনো ঠিক নয়। যত ঘেরিওয়ালার রাগ তার উপরে। চতুর্দিকে মাছ পাহারা দেওয়া নিয়ে তোলপাড় পড়ে গেছে—সবাই জানে, কলকাঠি টিপছে সে-ই নতুন-ঘেরির আলায় বসে। কামরার বাইরে কবাটের ধারে হর ঘড়ুই শুয়ে পড়ে চটাপট শব্দে মশা মারে, ডাক দিলেই সাড়া পাওয়া যায়। আজকে সে নেই—ফুলতলায় চলে গেছে জগা/বলাইর সঙ্গে। তার জায়গায় শুয়েছে বুদ্ধীশ্বর। দোসর একজন থাকা উচিত—মানুষটিকে সেই জন্যে ডেকে আনা। দিনমানে পুরো মানুষই বটে, কিন্তু রাত্রে শুয়ে পড়বার পর শুকনো কাঠ একখানা। ধাক্কাধাক্কি করেও সাড়া মিলবে না। ধরে ঠিক মতো বসিয়ে দিলে তো বসে রইল—একটু কাত হয়েছে কি গড়িয়ে পড়বে আবার মেজেয়।

দরজা খুলে বেরিয়ে গগন ডাকছে, ওঠ দিকিনি একটু বুদ্ধীশ্বর—

শেষটা কলসির জল নিয়ে ঢেলে দিল খানিক গায়ের উপর।

উঁ—

গগন খিঁচিয়ে ওঠে: মানুষটা মরল কি থাকল, খবর নিবি তো একবার?

বুদ্ধীশ্বর জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, আলো জ্বালো—

গগন হেরিকেন ধরাচ্ছে। বুদ্ধীশ্বরের তবু উঠবার গা নেই। শুয়ে শুয়ে চোখ পিটপিট করছে।

উঠলি কই?

বুদ্ধীশ্বর বলে, উঠে কি হবে? শড়কি-লাঠি তো চাই। শুধু-হাতে যাওয়া যায় না রাত্রিবেলা।

সেবস্তুও দুর্লভ নয়। কামরার মধ্যে একটা কোণে লাঠি-শড়কি থাকে। দেয়ালে ঝোলানো মেলতুক-রামদা। কখন কোন বিপদ এসে পড়ে, অস্ত্রশস্ত্র হাতের কাছে রাখতে হয়। কামারের গড়া বেপাশি বন্দুক ও একটা আনবার ইচ্ছা, কিন্তু চৌধুরি বাবুদের শত্রুতার ভয়ে সাহস করছে না। পুলিশ ডেকে হয়তো ধরিয়ে দিল।

নতুন ধার-দেওয়া চকচকে শড়কি বের করে নিয়ে এলো তো তখন বুদ্ধীশ্বর বলছে, বড়-শিয়ালে ওটাকে মুখে করে নিয়ে গেছে—বুঝলে বড়দা? গিয়ে কি হবে? রাধেশ্যাম কি আছে? এতক্ষণে কাঁহা-কাঁহা মুলুক—

গগন রীতিমত চটে গিয়ে বলে, নড়বার ইচ্ছে নেই, সেই কথাটা বল না স্পষ্ট করে। আলো রে শড়কি রে হেনোতেনো করে আমায় তবে খাটালি কি জন্যে?

বুদ্ধীশ্বর বলে, তুমি যাচ্ছ না কেন বড়দা। পায়ে পায়ে গিয়ে দেখে এলো।

যাবার হলে তোকে তবে তেল দিই? এতক্ষণে কতবার আসা-যাওয়া হয়ে যেত।

ঘুমটা ভেঙেছে বটে বুদ্ধীশ্বরের। উঠে বসে সে বলল, তা যাই বলো, একলা মানুষ আমি যাব না। পাড়ার লোকজন ডাক, সকলের মধ্যে থেকে তবে আমি যেতে পারি।

ঠিক এমনি সময় বাঁধের উপর কলরব। ডাকাডাকি করতে হল না, ছুটেছুটেই আসছে জনকয়েক। মুলুক মিঞার কণ্ঠটাই প্রবল: সর্বনাশ হয়েছে বড়দা। নতুন বাঁধ ভেঙে গেছে।

পিছনে শিরোমণি সর্দার। সে বলে ওঠে, ভেঙেছে না কেটে দিয়েছে।

বৃন্দাবনের উদ্বেগ প্রবল হয়ে উঠল এতক্ষণে। বলে, রাধেশ্যাম চেঁচিয়ে উঠল যে একবার। তার খোঁজ নিয়েছ—বলি, সে কোথায় ?

মুলুক মিঞা বলে, খানার মধ্যে—

শিরোমণি বলে, সেই তো! চেঁচানি শুনে জাল-টাল তুলে নিয়ে ছুটেছি। নতুন বাঁধের খানিকটা কেটে হারামজাদারা গাঙের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যারাত্রে কেটেছে বোধ হয়। ভাঁটার পয়লা মুখ এখন। পুরো ভাঁটা এমনি থাকলে ঘেরির অর্ধেক জল বেরিয়ে যাবে। মাছ যা জন্মেছে সমস্ত নিয়ে গাঙে পড়বে। কপাল ভাল যে রাধেশ্যাম কাটা-গর্তে পড়ল। তাইতে জানাজানি হয়ে গেল।

মুলুক মিঞা বলে, জাল ঘাড়ে করে বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। নেশায় টরটরে, চোখ মেলে যায় না তো!

গগন বলে, হাত-পা ভাঙেনি তো ?

শিরোমণি সহজ কণ্ঠে বলে, তুলে ধরে কে দেখতে গেছে ? ঐ দেহ টেনে হিঁচড়ে বাঁধের উপর তোলা দু-একজনের কর্ম! পড়ে আছে, সেইটে খুব ভাল। ঝিরঝির করে জল বেরুচ্ছিল, দেহখানা পড়ে সেটা আটক হয়ে আছে।

মুলুক মিঞা জুড়ে দেয়, আছে ভালই। খানায় পড়েছে না ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে, সে বোঝবার মতন হুঁসজ্ঞান নেই।

ছুটল সকলে। জগা নেই বলে মাছের ডিঙির চলাচল বন্ধ। মাছ-মারারা কাজে ঢিলটান দিয়েছে, সাঁইতলার পাড়ার মধ্যে শুয়ে অনেকে আজ ঘুম দিচ্ছে। এ ব্যাপার কদাচিৎ ঘটে। পাড়াসুদ্ধ গিয়ে জমল বাঁধের উপরে। এই তবে শুরু হয়ে গেল ও-তরফের কাজকর্ম —নৌকো সরানোর পালটা শোধ। রাধেশ্যামকে টেনে তুলেছে, হাউহাউ করে সে এখন কাঁদছে। চরের কাদামাটি কেটে এনে চাপাচ্ছে ভাঙা জায়গায়। মাটি দাঁড়ায় না, জলের টান বেড়েছে এখন। পাড়ায় ঢুকে ক'জনে তখন ছাউনিসুদ্ধ এক চাল খুলে এনে আড়াআড়ি বসিয়ে দিল। বুদ্ধিটা বড় ভাল। খোঁটা পুঁতে দাও, চাল শক্ত করে বাঁধো খোঁটার সঙ্গে, মাটি চাপান দাও এবার ওদিকে। জলের টানে মাটি আর ভেসে যাবে না। একটু-আধটু যায়ও যদি, মাছ বেরুতে পারবে না—চালে আটক হয়ে থাকবে।

গোপাল পরদিন অন্নদাসীকে বললেন, রাত্তে গণ্ডগোল শুনলাম যেন তোদের ওদিকে ?

আমাদের মানুষটা জখম হয়ে পড়ে আছে।

সে কি রে ?

মোটামুটি সমস্ত শুনে নিয়ে গোপাল বললেন, একবার ইচ্ছে হল, যাই দেখে আসি। কিন্তু গেলে হয়তো কথা উঠত। ধর্ম দেখতে এসেছে, বলত লোকে।

তা কেন। বলত, কাজটা কদ্দূর কি দাঁড়াল নায়েব মশায় খোদ তার তদারকে এসেছেন।

গোপাল বলেন, দেড় কোদাল মাটি ফেলে কলবেনে ঘেরি বানিয়েছে। মাটি ধুয়ে বাঁধ ফাঁক হয়ে গেল, তার জন্ত আমরা বুঝি দায়ি ? তুইও বুঝি সেই কথার উপর গেরো দিয়ে রেখেছিস ?

অন্নদাসী বলে, চোখে যখন দেখা নেই, ছেঁড়া-কথার দাম কি ? কিন্তু চাল চারটি আজ বেশি করে ফুটিয়ে দিতে হবে নায়েব মশায়। আমার একলার পেট জ্বালে হবে না। যে-মানুষ শুয়ে পড়ে রয়েছে, তার জন্যে বেড়ে নিয়ে যাব।

গেরো কেমন দেখ। সে-ই বা কেন ওদিকে মরতে যায় ? হয়েছে কি তার ?

পা-গতর চুরমার হয়ে গেছে, এই তো বলছে। পায়ে খুব চোট লেগেছে।

কচু হয়েছে। পড়েছে তো হাত তিন-চার নিচে, পাথরের শরীরে কি হয় তাতে ? তুইও যেমন!

অন্নদাসী ঘাড় নেড়ে মেনে নেয়: সে কথা ঠিক। ও-মানুষ অমনি। কায়দায় পেয়েছে তো সহজে ছাড়বে না। এই পা-হাত-পা ব্যথা নিয়ে ছ-মাস এখন নড়ে বসবে না। আমার জ্বালা—এক এক থালা ভাত নিয়ে গিয়ে মুখের কাছে ধরো।

[ ক্রমশঃ।

## সব্যসাচী কে ?

"ডাক্তার নিজের বক্ষদেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, কি বলছিলে ভারতী, এর মূল্য বোঝবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাকে দেননি ? মিছে কথা! শুনবে আমার সমস্ত ইতিহাস ? ক্যানটনের একটা গুপ্ত-সভার মধ্যে সুনিয়াৎ সেন আমাকে একবার বলেছিলেন—

ভারতী হঠাৎ ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, কারা যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠছে—

ডাক্তার কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, পকেট হইতে ধীরে-সুস্থে পিস্তল বাহির করিয়া কহিলেন, "এই অন্ধকারে আমাকে বাঁধতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ নেই।"—পথের দাবী, শরৎচন্দ্র।

ডক্টর পঞ্চানন ঘোষাল

একদিন কচুরীগলি চিৎপুর অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল ছিল। আজও যে তার ঐতিহ্য খুব বেশী ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। গলির মুখেই ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছে একটি ত্রিতল পাকা বাড়ী। কিন্তু তার আশে-পাশে ও পিছনে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখা যায় শুধু ছোট বড় মাটকোঠা। এই সব মাটকোঠার অধিকাংশ একটি তলা-সম্বলিত হলেও মধ্যে মধ্যে দ্বিতল মাটকোঠাও দেখা যায়। চাঁচিবেড়ার উপর মাটির প্রলেপ দিয়ে এই সকল কুঠরীগুলি তৈরী হলেও দেওয়ালে দেওয়ালে বহু ছিদ্র ও ফাঁক থেকে গিয়েছে। কিন্তু তাতে এখানকার ছোট ছোট জানালা বিহীন কক্ষের বাসিন্দাদের ক্ষতি না হয়ে বরং লাভই হয়েছে। কারণ, একমাত্র এই ফুটা ও ছিদ্রগুলিই ঐ সকল অন্ধকার কক্ষগুলির ভিতর আলো ও বাতাস প্রবেশের পথ সুগম করে দিয়েছে।

এই বস্তীর প্রধান পথটিকেই বলা হত কচুরীগলি। গলিটি অপরিসর একটি গলি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রধান গলিটি হতে দুই পাশের এধারে ওধারে যে সকল উপগলি বেরিয়েছে সেইগুলির পরিধি আরও ছোট। কোনও প্রকারে সেই সকল পথ দিয়ে দুইটি ক্ষীণকায় লোক একত্রে কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু তাতেও এইখানকার বাসিন্দাদের সুবিধে বই অসুবিধে নেই। কারণ এরা কেউই শহরের অন্যান্য বাসিন্দাদের মত সাধারণ মানুষ নয়। সাধারণ মানুষ এদের মানুষ বলে কোনও দিন স্বীকারও করেনি। অথচ এই সকল ঘৃণ্য মানুষেরা কোনও বন্য জন্তু-জানোয়ারও নয়। জন্তু-জানোয়ার বলে এদের মনে না করলেও সাধারণ মানুষ এদের একই সঙ্গে ভয় ও ঘৃণা করে। এইজন্য তারা এদের জন্তু-জানোয়ারের মতই এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে থাকে।

এইবার প্রশ্ন উঠবে এরা তাহলে কারা? এরা মানুষ, অমানুষ, না অতিমানুষ? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হলো এই যে, ওরা এর কোনোটিই নয়। এরা হচ্ছে মনুষ্যত্বের সহিত সম্পর্ক বিহীন এক প্রকার অসামাজিক জীব। এরা হচ্ছে এই শহরের বস্তিবাসী নিকৃষ্ট শ্রেণীর রূপজীবিনী, ও তাদের প্রতিপালক সিঁদেল চোর ও তালাতোড়ের দল। সভ্যমানুষ এদের ঘৃণাই করে থাকে, কিন্তু ততোধিক ঘৃণা করে এরা সভ্যমানুষকে। এরা এখানে সভ্যসমাজের সহিত সম্পর্ক-বিরহিত নিজেদের জন্যে একটি পৃথক সমাজ গড়ে নিয়েছে। এখানকার মেয়েরা ঐ সকল চোর বদমাসদের দ্বারা প্রতিপালিত হলেও তারা একান্ত ভাবে কোনও দিনই ঐ সকল পুংরাক্ষসদের উপর তাদের জীবনধারণের জন্য নির্ভরশীল হওয়া পছন্দ করে না। তাই তারা সকাল-সন্ধ্যায় একত্রে ঐ নামকরা কচুরীগলির মোড়ে সেজে-গুজে শীকার ধরবার জন্য ওত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে। নাইট ও ডে-সিফ্ট খেটে ফিরবার পথে বহু দরিদ্র-নারায়ণ শ্রমিক এদের খপ্পরে পড়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। এই সকল নারীরা এদের যেমন আপ্যায়িত করে তেমনি এদের গাঁটের মধ্যে যা পয়সা থাকে তা সুবিধা পেলে কেড়েও নেয়।

এই দিন ছিল শনিবারের হপ্তার দিন। সারা দিন ধরে দরিদ্র শ্রমিকরা তাদের শ্রমার্জিত হপ্তার টাকা কয়টি ট্যাঁকে গুঁজে এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে থাকে। তাই সকাল থেকে সস্তা জাপানী রঙিন ব্লাউজ ও শাড়ীপড়া হাড়-জির-জিরে শীর্ণকায় বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা তাদের পাতলা লাল চটিতে ফট ফট আওয়াজ তুলে ঐ গলির মুখে দল বেঁধে ঘুরাঘুরি করছিল। এরা ছাড়া আরও একদল পাপ ব্যবসায়ীর দল এই পথের উপর তাদের ব্যবসা ফেঁদেছে। এরা হচ্ছে এই অঞ্চলের জুয়োড়ীর দল। বস্তীর ঘরগুলিতে স্থানাভাবের কারণে এরা রাস্তাতেই আড্ডা বসায়। ঐ সকল মেয়েদের ন্যায় এরাও দরিদ্র শ্রমিকদের জাতশত্রু। এই সকল জুয়াতে প্রকৃত ভাগ্য পরীক্ষা কম ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এখানে প্রবঞ্চনা ও রাহাজানির আধিক্যই বেশী। এই সব জুয়ায় হাতসাফাই-এর কেরামতি ব্যর্থ হলে টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়া হয় গায়ের জোরে।

চিৎপুরের অপরিসর রাজপথের উপর দিয়ে ট্রাম গাড়ীতে জোড়াপুকুর থানার থার্ড অফিসার চিরঞ্জীব বাবু জন চার পাঁচ সিপাহী সমভিব্যাহারে এই সময় জোড়াবাগানের রিপোর্ট রুম থেকে থানায় ফিরছিলেন। হঠাৎ ট্রামের উপর থেকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো অদূরের বস্তীর মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া কুচুরীগলির এই কুখ্যাত উপপথটির উপর। তাঁর বুঝতে দেরী হলো না যে, এই দিনের এই সকল হতভাগিনী দেহব্যবসায়ীদের জরাজীর্ণ হাড্ডিসার দেহের প্রাচীরের আড়ালে স্থানীয় গুণ্ডা বদমায়েসরা অন্যদিনের মত এই দিনেও ঐ স্থানে জুয়ার অভিনয় সুরু করে দিয়েছে। একবার তাঁর মনে হলো, 'তা আর কি করা যাবে। এমনিই ঐ সব এখানে রোজই হয়। সেই কোন সকালে থানা হতে বার হয়েছেন। এইবার কোয়ার্টারে ফিরে স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম করতে হবে। ওদিকে তাঁর স্ত্রী সারদামণি তাঁর অপেক্ষায় নিশ্চয় এখনও পর্য্যন্ত অনাহারে বসে রয়েছেন কিংবা অপেক্ষা করে করে শেষে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে ভাবছেন, 'এখনো তাঁর স্বামী ফিরে এলেন না কেন?' কিন্তু এইরূপ ক্লীব চিন্তা চিরঞ্জীব বাবু বেশীক্ষণ তাঁর মনে স্থান দিতে পারলেন না। তাঁর কর্ত্তব্যপরায়ণ নিয়মানুবর্ত্তী মন অল্পক্ষণ পর হুঙ্কার দিয়ে যেন বলে উঠলো, না না। তা হতে পারে না। এদের হাতে-নাতে গ্রেপ্তার করবার সুযোগ এর পর এমনি ভাবে আর না-ও আসতে পারে।

চলায়মান ট্রামের মধ্যে কয়েকজন সিপাহী-শাস্ত্রী ও একজন থানা-অফিসারের উপস্থিতি কচুরীগলির কুখ্যাত বদমায়েস ও জুয়োড়ীদের পাহারাদার মিতুই শা'র চোখ এড়ায় নাই।

এক্ষণে ট্রামখানিকে যাত্রিদলসহ কুচুরীগলির মুখ অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে যেতে দেখে লোকটি নিশ্চিন্ত হয়ে দূরে দণ্ডায়মান সাকরেদদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো। এই নিতুই শা'র সহিত মধুরাম বিঠ্‌ঠলভাই প্রভৃতি আরও কয়েকজন পাহারাদার আশে-পাশে মোতায়েন ছিল। জুয়োড়ীদলের নেতাদের সাবধান করে দেবার জন্য কোনও প্রকার সঙ্কেত প্রদানের প্রয়োজন হলো না বুঝে উৎফুল্ল হয়ে এরা পরস্পর পরস্পরকে মাত্র চোখের ইসারা করে মূকভাষায় জানিয়ে দিলো, 'যাক বাঁচা গেল। আজকের রোজগারটা তা'হলে আর মাঠেই মারা গেল না।' কিন্তু তাদের এই ভুল ভাঙতে বেশীক্ষণ আর দেরী হলো না। হঠাৎ সচকিত হয়ে তারা দেখলো, চিৎপুর রোডের ডানদিককার বাড়ীগুলোর গা ঘেঁসে জোড়াপুকুর থানার থার্ড অফিসার চিরঞ্জীব বাবু তাঁর সাথী সিপাহী-শান্ত্রীদের সহিত অতি দ্রুত পদবিক্ষেপে কচুরীগলির মধ্যে ঢুকে পড়ছেন। পুলিশের দলকে এই ভাবে দৌড়ে আসতে দেখে সেখানকার মোতায়েন পাহারাদাররা মুখে আঙুল পু'রে হু-উ হুস্ শব্দে হুইসেলের ধ্বনি তুলে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্যদিকে সেখানে সুরু হলো হতভাগিনী শীর্ণকায়া রূপজীবিনীদের ঘোড়দৌড়। কে কতো আগে আশেপাশের সঙ্কীর্ণ উপপথগুলির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবে। এইজন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর প্রতিযোগিতা সুরু করে দিলে। কিন্তু এই দিন পুলিশের দল এই সকল মেয়েদের পাকড়াও করতে আসেনি। ঐ সকল মেয়েদের রাস্তার উপর ফেলে যাওয়া সস্তা দামের চটি জুতাগুলো ভারি বুটের আঘাতে এদিক-ওদিক ছিটকে ফেলতে ফেলতে পুলিশের এই ক্ষুদ্র দলটি ঐ কুখ্যাত গলির শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত দৌড়ে এসে অতি কষ্টে ঐ দলের মাত্র কয়েকজন জুয়োড়ীদের ধরে ফেলতে সমর্থ হলো।

এই সকল পুরানো পাপীরা অভ্যাস ও চিন্তন দ্বারা এই সব পাপ ব্যবসায়কে তাদের জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র পন্থারূপে বেছে নিয়েছে। কালক্রমে তারা তাদের এই সব ব্যবসায়কে তাদের এক অধিকারের সামিল বলে বিশ্বাস করতেও সুরু করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তারা পুলিশেরও যে তাদের এজন্য গ্রেপ্তার করবার অধিকার আছে, তাও তারা স্বীকার করে নিয়েছে। তাই পুলিশের এবংবিধ শত্রুতামূলক ব্যবহারে তাদের মধ্যে কোনও প্রতিবাদ বা প্রতিশোধের স্পৃহা স্থান না পেলেও তারা এই আকস্মিক হামলা হতে ত্রাণ পাবার জন্য আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে বিরত হলো না। তবে এইরূপ একটা সামান্য ব্যাপারে এইরূপ এক কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের একটি বিশেষ কারণও ঘটেছিল। তা' না হলে এই সব সামান্য মামলায় সামান্য কয়েকটি টাকা জরীমানা দিয়ে আসাই তারা সমীচীন মনে করতো। এই দিন এদের অনেকেরই পকেটে হিস্যা টাকা ও সোনা-দানা মজুত তো ছিলই, এমন কি সারা দিন ধরে এ সত্য ও মিথ্যা জুয়ার থালে টাকা জমেছিল আশাতীত রূপে অধিক। এই মাগ্‌গিগণ্ডার দিনে এইগুলি নির্ব্বিকারে পুলিশের হাতে তুলে দিতে তাদের অন্তরাত্মা আদপেই সায় দিলে না।

দ্রুতগতিতে পথের উপর থেকে জন ছয় সাত প্রকৃত জুয়োড়ীর সহিত কয়েকজন লোভী শ্রমিককেও পাকড়াও করা মাত্র শেষোক্তদের মধ্য হতে কয়েকজন আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলো। ইতিমধ্যেই তারা তাদের সদুপায়ে অর্জ্জিত শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত আক্কেল সেলামী দিয়েছে। এক্ষণে আবার তাদের পুলিশের খপ্‌পরে পড়ে আদালতের বিচারে আরও অর্থদণ্ড দিতে হবে এবং তা তারা দিতে অপারগ হলে তাদের সোজা পাঠিয়ে দেওয়া হবে জেলে। যে কয় দিন তারা জরীমানা অনাদায়ের জন্য সরকারী জেলে থাকবে, সেই কয় দিন স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালনার্থে উপার্জ্জনেও তারা অক্ষম হবে।

এদের মধ্যে আত্মারাম নামক একজন শ্রমিক সাহস করে চিরঞ্জীব বাবুর পা দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বললো, 'হুজুর মেরি মা বাপ। মেরি বালবাচ্ছা ভুখাসে মর যায়েঙ্গি।' তার এই কাতরোক্তির কোনও জবাব দিবার পূর্ব্বেই একজন সিপাহী তার চুল ধরে টেনে তুলে হুমকী দিয়ে উঠলো, 'চুপসে খাড়া হো যাও। বদমায়েস কাঁহাকো। বাল বাচ্ছাকো বাস্তে এতনা চিন্তা রহিতো তু জুয়াখেলনে নেহী আতী। তব তো তু জরুর মেরী মাফিক এক সিপাহী বান যাতি হো।' সিপাহীর এই শ্লেষোক্তির জবাব দিবার মত ঐ দরিদ্র শ্রমিকের না ছিল ভাষা, না ছিল শক্তি বা সময়। এমন কি এ বিষয়ে চিন্তা করবার মতন এমন কোনও এক মনের অধিকারীও সে ছিল না। তবুও এই ধর-পাকড়ের হট্টগোলের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর উচ্চ হতে উচ্চ করে সে কোনও রকমে একবার মাত্র তার হৃদয়ে বেদনা জানিয়ে বলে উঠলো, 'ক্যা করে সাব! কেনি কালস আ গিয়ে থি। হামি লোক কি সমঝে থি, ই লোক সব বৎমাস আছে।'

শ্রমিক আত্মারামের কথা কয়টি চিরঞ্জীব বাবুর কানে গিয়েছিল। তিনি তাঁর চুলটি মুঠি করে ধরে বার কতক নাড়া দিয়ে বললেন, 'যাস্তি বাৎ মাৎ বলো, চুপ্‌সে খাড়া রহো।' 'কুছু বলনে তো তো থানামে আকর চলো'।

দরিদ্র শ্রমিক দরিদ্র হলেও সে এই শহরেরই একজন নাগরিক। আর সকলের ন্যায় তাকেও চোর বদমায়েসদের হামলা হতে রক্ষা করতে এই শহরের পুলিশ বাধ্য। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সে অবৈধ ভাবে জুয়াখেলার জন্য যেমন অপরাধী, তেমনি তাকে এই সব জুয়াড়ীদের হাত হতে রক্ষা না করতে পারার জন্যে পুলিশও অপরাধী। কিন্তু এই বিশেষ সত্যটি তার অন্তরাত্মা উপলব্ধি করতে পারলেও তার বহিরাত্মা ভাষায় তা প্রকাশ করতে অক্ষম ছিল। এমন কোনও দার্শনিক বা চিন্তানায়কের সন্ধান তারা তখনও পায়নি যে কি না এই সম্পর্কে একটিমাত্র প্রতিবাদের ভাষা তাদের মুখে তুলে দিতে পারে। অগত্যা ভাষাহীন এক মূক মানবরূপে পুলিশ দলের অনুগামী হওয়া ভিন্ন তার জন্য কোনও উপায় ছিল না।

শাস্ত্রিবেষ্টিত দরিদ্র শ্রমিক আত্মারাম ক্ষুণ্ণ মনে ভাবছিল তার স্ত্রী মুখীয়ার কথা। বিহারের সুদূর এক পল্লীতে আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে সে একাই তার শিশু পুত্রটিকে মানুষ করে তুলছে! এমনিই তো সে তার কাছে কতো অপরাধী। এক্ষণে এই মাসে মণিঅর্ডারে টাকা ক'টি সময় মত না পেলে সে হয়তো ধরে নেবে যে তার স্বামী বুঝি আর ইহ জগতেই নেই। পরে সব কথা তাকে বুঝিয়ে বললে সে কি বিশ্বাস করবে যে তাদের জন্যে সে কয়েকটি উপরি টাকা উপার্জ্জনের জন্য জুয়া খেলতে এসে পুলিশ হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল?

[ ১০৮৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ]

## ॥ আলোকচিত্র ॥

সূর্য্যাস্ত —গৌর চক্রবর্তী

রাজহংস —নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়
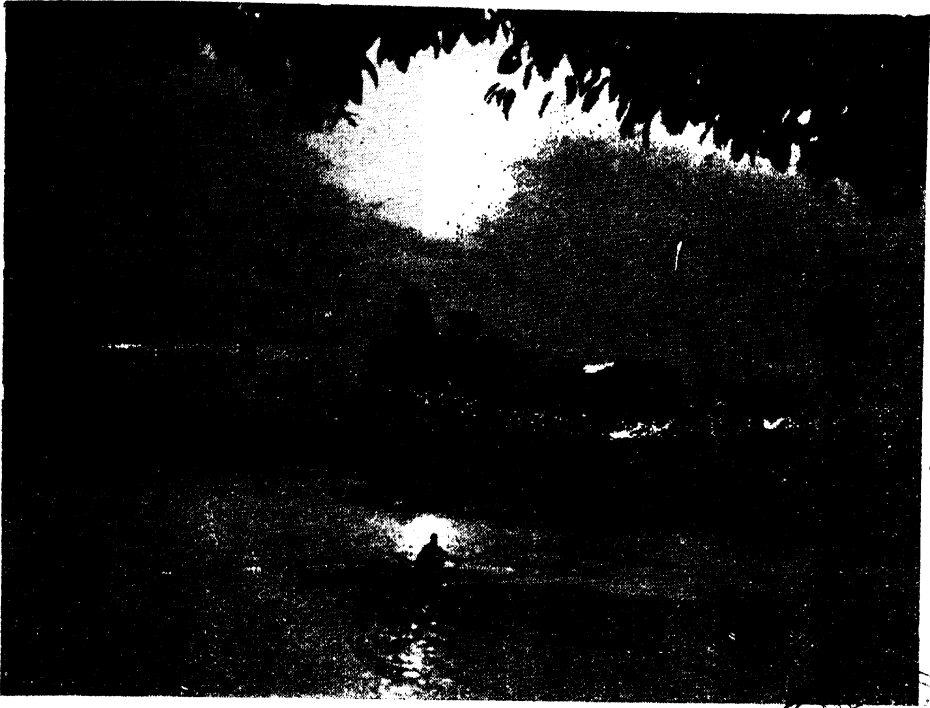
—শিপ্রা দত্ত

শিশুমহল

—অজয়কুমার দাস

—মোহন চক্রবর্তী

মহারাণীর স্মৃতি

—অমিতকুমার সরকার

—লতিকা মিত্র

—মাখন দাস

শিশুমহল

—করবী ঘোষ

—অজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

—অনিলকুমার ঘোষ

ভোরের আলো —আশুতোষ সিন্‌হা
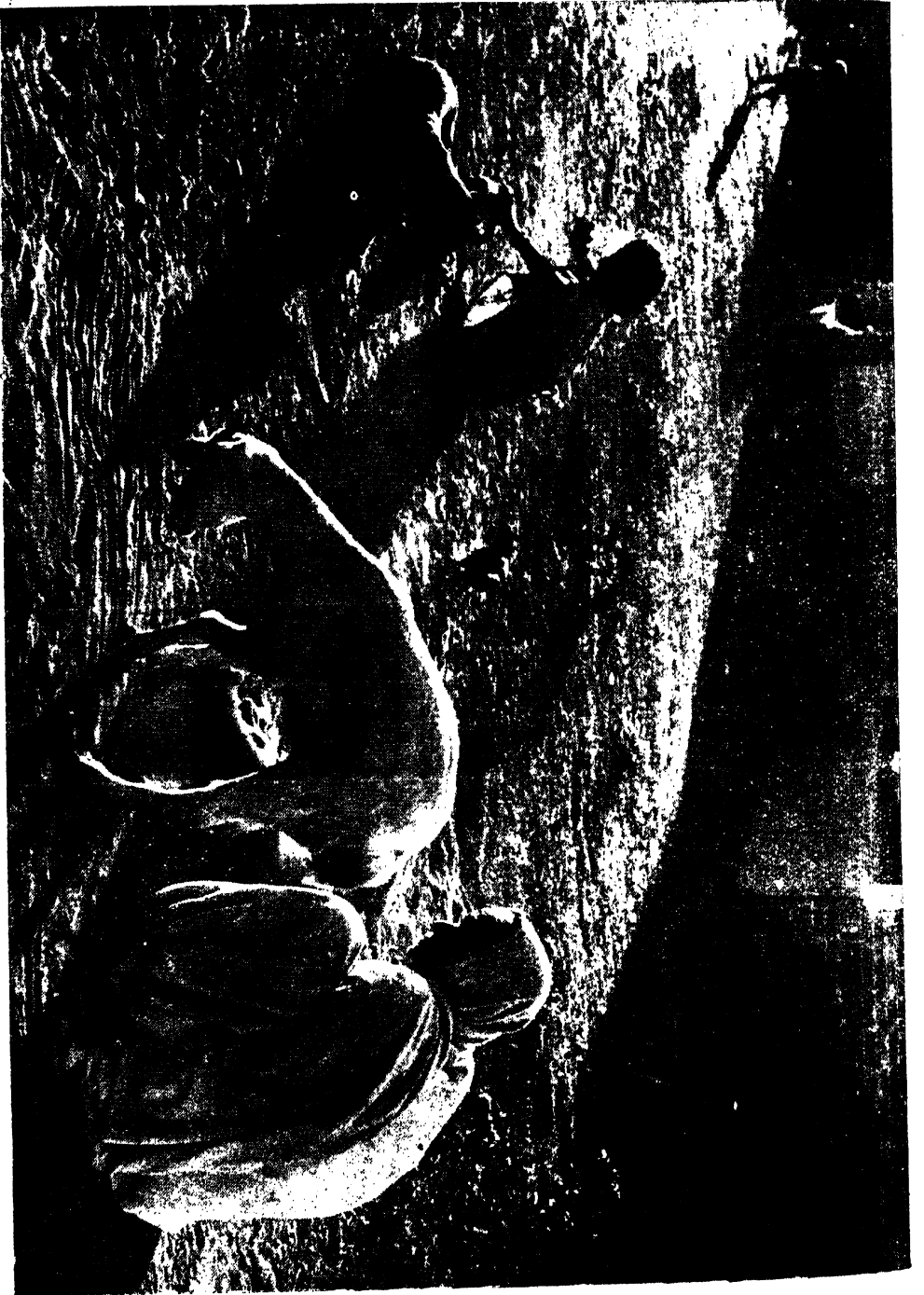
## ভুলের বোঝা

আমরা চিরদিন ভুলের বোঝা, বোঝার ভুলে টেনে টেনেই চলি।

নেতাজী ও আই-এন-এর ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়ানো। কোহিমা, ইম্ফল বা মণিপুরের পতন, আর বাঙলার দুর্ভিক্ষসৃষ্টি, এ-ও তেমনি জড়ানো। সময়ের আগুপিছু কোনো কথা নয়। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে জাপানও জড়িয়ে গেছে তেমনি, অতি অন্তরঙ্গভাবে। কংগ্রেসের প্রচেষ্টায় নয়, পার্টিশান করেও নয়। ভারত সীমান্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে জাপানী ওকুপেশান যদি না ঘটত, ভারতের পূর্বদিগন্তে নেতাজীরও অভ্যুদয় যদি না হোত, কংগ্রেসের শতেক প্রচেষ্টায় ও শত আবেদন-নিবেদনেও ভারতে চার্চিল-রাজত্বের অবসান সুদূরপরাহত ছিল। পরন্তু নেতাজীর অনুসরণে একজন নেতাও ভারতে থাকলে, পার্টিশান না-মেনে নিয়েও, শুধু বাঙলার ইতিহাস নয়, ভারতের ইতিহাস লেখা দিত সম্পূর্ণ নতুন অক্ষরে। সে কথা ভেবে দেখার সময় হয়েছে আজ।

যে পুরুষের আবির্ভাবে লোকসমাজে মহান পরিবর্তন সঙ্ঘটিত হয় তিনি মহাপুরুষ। এ আবির্ভাব কদাচিৎ ঘটে। যুগ-যুগান্তে এক আধ বার। তখন কল্পান্তর। যীশু, বুদ্ধ, মহম্মদ মহাপুরুষ। নেতাজীও। মহাপুরুষ কি মহাত্মা? নেতার কাছে যা সমস্যা, যে ভবিষ্যৎ ঝাপসা, মহাপুরুষের কাছে তা জলের মতো স্বচ্ছ। সমস্যা সমস্যাই নয়। প্রভাত-সূর্যের প্রভাবের ন্যায় মহাপুরুষের দ্যুতির প্রভা চিরভাস্বর।

নেতা কে? হিন্দু-মুসলমান কি একটা সমস্যা? ওর সমাধান কি পার্টিশান? না পাকিস্তান?

নেতাদের মোহের মাশুল পাকিস্তান। নেতৃত্বের লোভে যেচে নেওয়া সেই পার্টিশান দ্বিতীয় বার। হায় রে নেতৃত্ব! এক শিখণ্ডীর কোপে দ্বিখণ্ডী নয়, ত্রিখণ্ডী বাঙলা। আরও নানা জটিল সমস্যা। এখনও চলছে। প্রথম কি কেউ বুঝেছিলে সে কথা? একই মায়ের পেটের সন্তা। মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব পেয়ে, মায়ের কাছেই দেখা দেবে সতীনের বেশে? কানে দেবে সুড়সুড়ি, আর নাকে ঢালবে সরষে তেল? ঘুম-পাড়ানী মন্ত্র। যেমন অসহনীয়, তেমনি মর্মান্তিক। ওরা আসল সৃষ্টি ফেলে গেল—কুতবমিনার আর তাজমহল। সে কি ও ভুলতে পারবে চিরদিন? এর কোল, মিল আর টাটায়, চোখ কি ওর টাটায় না?

খাল কেটে লাভ হোল বেশ। কুমীর এলো ঘরে। বঙ্গদুরের লোনা জল তাও এলো। চার পাশে ভারতের শত্রু ছিল না কোন। নিয়তির লেখন। আর অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস! মায়ের বুকে টেনে দেওয়া দীর্ঘ ক্ষত। তার বুক চিরে সেই আশীর্বাদ। সে কি ফলবে না? নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান। রজ্জু সাপ হতে কতক্ষণ? ঘরের মাঝে পার্টিশানের রান্নাঘর। তাতেই ওঁৎ পেতেছে আমেরিকা। এ ইঁদুর ধরার ফাঁদ পাতা।

স্বর্ণলঙ্কার রাবণ। এক তুচ্ছ সীতার লোভে। লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলে তার ভাইকে। একই মায়ের পেটের ভাই। সেই তাড়িয়ে দেওয়া ভাই হয়েছেন বিভীষণ। ফলাফল? সেই হয়েছে রাম-না-হতে রামায়ণ। লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি। বংশের দুলাল রইল কই একটি দিতে বাতি?

মনের গোল বাইরে টেনে ঘরের ভিতর বিদেশ সৃষ্টি করো।

# না-জানা-কাহিনী

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## তালবেতাল

কী লাভ হোল?

কে জানতো, পার্টিশানে এত মজাই থাকবে? রাডক্লিফ তো কম রসিক ছিলেন না। তাঁর নিজের রসিকতা নিজে দেখে আজও তিনি মুগ্ধ হতেন নিশ্চয়। উত্তর-বাঙলার সীমানা বরাবর রেলের লাইন এক যায়গায়। তার একখানা পাটী হিন্দুস্থান। অপর খানা পাকিস্তান। মানে, আপনি ট্রেণে চড়েছেন। রেলের একই কামরার ওপাশে পাকিস্তান, আর এপাশে হিন্দুস্থান। অর্ধ-নারীশ্বর তবু কল্পনায় আসে। কামরায় লম্বালম্বি লাইন টেনে, পাশাপাশি আধখানা পাকিস্তান, আর অর্দ্ধেক হিন্দুস্থান। কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে। চোখে ভেসে ওঠে উনপঞ্চাশের সেই কাহিনী। ট্রেনের গা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। যেন রক্তগঙ্গায় বান ডেকেছে। নারী-বৃদ্ধ-শিশুর কাটা হাত-পাগুলো আজও যেন পড়ে আছে বেলেঘাটার ভাগাড়ে। আরও আছে। হিন্দুস্থান পাকিস্তান গতায়াত করছেন দিনে-রাতে চার বার করে। কারণ সীমানা-রেখা গেছে উঠোনের ঠিক মাঝখান দিয়ে। হিন্দুস্থানে শোবার ঘর। আর রান্নাঘর পড়েছে পাকিস্তানে। সব চাইতে মজা বেশী নদীর জলে। জলটা পুরো পাকিস্তানের। নদীর পাড়েই বসত করি। এক ফোঁটা জলে অধিকার নেই। জমিটা আমাদের, জলটা ওদের। জলের ধারটা সীমানারেখা। স্থির নয়। জোয়ার ভাঁটার সরে সরে যায়। একবার এদিকে, একবার ওদিকে। গরমকালে জল কম। বর্ষাকালে বাড়ছে। অর্থাৎ পাকিস্তান এদিকে এগিয়ে আসছেন। ভাবছি আরও মজা কালের গর্ভে। যেদিন ঐ নদীতে বান ডাকবে, সেদিন কার অবস্থা কী হবে। হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে উঠছে যে ভারতীয় ঐক্য (unity) ও ঐতিহ্য, ধূলিসাৎ হয়ে গেল তা বিলাত যাওয়া বিলাতী শিক্ষার ফলে। "ডিভাইড" যার চরম পন্থা, তার কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের ফলে। রাডক্লিফের নির্মম রসিকতা? না, মোক্ষম মারণাস্ত্র—জেরুজালেমের শিক্ষা? না, আমাদেরও নির্বুদ্ধিতার চরম উৎকর্ষ?

রণক্লান্ত রেঙ্গুন সহর এখন অনেক শান্ত। লোক চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। লুঠপাঠ কোলাহল বন্ধ। যানবাহনের সংখ্যা নগণ্য—মিলিটারীই বেশী। আমরা পাঁচজনে সহরটাকে পায়ে হেঁটে জরীপ করে চলেছি। উদ্দেশ্য আই-এন-এর কারখানা দেখা। পরিচ্ছন্ন সহর। রাস্তাগুলো সমকোণী ক্রশ। এখন যে রাস্তায় পড়েছি, ওটা অপেক্ষাকৃত জনবিরল। বাড়ীঘর ফাঁকা-ফাঁকা। মাঝখান বরাবর আইল্যাণ্ড আর মস্ত এক সারি কৃষ্ণচূড়ার গাছ। ছায়াশীতল। দোকান অনেক কম। নেই বললেও চলে। রাস্তায় নাম নেই কোথায়ও। সাইনবোর্ডও নেই যে রাস্তার নাম দেখবো। একটা চালের পাহাড় রাস্তায় ভেঙ্গে পড়ে আছে যুগযুগান্ত, এক প্রান্তে। রাস্তাটাই বন্ধ। বস্তার পর বস্তা ভর্তি চালের গুদাম। পাহাড় সমান উঁচু টিনের শেড। সবটাই ভেঙ্গে পড়েছে রাস্তায়

পুরো রাস্তাটা ব্লক করে। বর্ষাও হয়েছে। কেউ সে চাল ছোঁয়নি। সরায়ও নি। পচে গন্ধ হয়েছে। লোকজন চলেছে তারই উপর দিয়ে। এ সেই বস্তু। যার অভাবে বাঙলায় লক্ষ লক্ষ লোক মরেছে না খেতে পেয়ে। আমার হাজার হাজার মা-বোন গলা চিরে রক্ত বের করেছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। দলে দলে ছুটেছে সহর পানে একটুখানি ফ্যান পাওয়ার আশায়। রাস্তায় রাস্তায় ওরা কুকুরের মতো আর্তনাদ করে ফিরেছে তারই প্রত্যাশায়। মরেছে ইতর জন্তু জানোয়ারের মত, শেয়াল-কুকুরেরও বাড়া। চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল এল। বুটের তলায় ওগুলো মাড়িয়ে চলেছি মনের ঝাল মিটিয়ে।

আই-এন-এর কারখানাটা সুবার্বে। ভারি ভারি যন্ত্রগুলো—ডাইস, হ্যামার, কামারশালের হাঁপর, ফোর্জ, নেহাই সবই পড়ে আছে তেমনি। ভাঙ্গাচোরা গাড়ীও পড়ে আছে কিছু। হাল্কা যে জিনিষগুলো, সেগুলো অরাজক সময়ে কাজে লেগেছে। লুঠের সহায়তা করেছে দরজা জানালা গড়তে। ন্যাশনাল আর্মির এক বন্ধু সর্দার গুরুজিৎ সিং তিনি ছিলেন সঙ্গে। দেখালেন সমস্ত ঘুরে ঘুরে চারিদিক। বললেন নেতাজীর এক কাহিনী। এই রেঙ্গুনের ঘটনা। তার আগে আরও দুই-একটা কথা বলা দরকার।

## প্রি-পার্টিশান

বৃটিশ আর্মিতে তিনটে কিচেন—মানে, রান্নাঘর। হিন্দু, মুসলিম ও বৃটিশ। আমরা বলি, লঙ্গর। মর্মে লাগা খেতচর্মের বড়াই। ওদের কিচেন আলাদা, রেশান আলাদা বলে। বৃটিশ রেশান দামেও অনেক বেশী। মাখনও থাকে। আমাদের বেলায় ঘণ্টা। আই-ও-আর রেশান বলতে যা হীন হয়, তা কৃষ্ণচর্মের সবার প্রাপ্য। মাঝ দুবেলার তক্। যারা নিরামিষ নয়, তাদের জন্য আসে ছাগল, পাঁঠা, খাসি আর ভেড়া। লড়াই বাধলো ঐ নিয়ে। বারো রুচি, তেরো হাঁড়ি, কেউ যাবো না কারো বাড়ি। আমাদের সনাতনী রীতি, হাঁড়িতে লড়াই। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হোল, হাঁড়ি আলাদা হোল। সঙ্গে উনুনও। আমরা পাঁঠা খাব, ছাগল খাব না। হাঁস খাব, মুরগী খাব না। এটা খাব তো, ওটা খাব না। কারো ছোঁয়া তো খাবই না। আরও আছে। যেমন পুলিশের চৌকা। যতজন বিহারী, প্রত্যেকের একটি করে চৌকা—উনুন। দোবেজী, চৌবেজী, পাণ্ডেজী। সব একটি করে রান্নাঘর। এ আমাদের সনাতনী বৈশিষ্ট্য। ছোঁয়াতে germ-এর ভয় নয়, ধর্মের ভয়। জাত, আধ্যাত্মিকতা সব evaporate করে।

যে জন্তু কাটা আসে, ও নিয়ে তর্ক ওঠে না। তর্ক কেবল জ্যান্তর বেলায়। প্রশ্ন উঠলো কাটা নিয়ে। পাঁঠা কাটা হবে—হালাল, না ঝটকা? হালাল মানে—জবাই। রসিয়ে রসিয়ে কাটা। আর ঝটকা মানে, এক কোপে সাবাড়। হিন্দুরা বাঙলায় বলে, বলি। হিন্দুরা বললে—হালাল খেতে নেই। শাস্ত্রের নিষেধ। ওটা মানতেই হবে। মুসলমানরা বললে—ঝটকা খাওয়া আমাদের শাস্ত্রেও নিষেধ আছে। হিন্দুর ঝটকা, মুসলমানের হালাল। দুটো মিলে গোল বাধাল। একটা আর একজনের গলা দিয়ে তলায় নামতে চায় না। আটকে আটকে যায়। আর খৃষ্টানের গলা —— আদের গলায় ও দুটোই জলের মত গলে যায়। বৃটিশ আর্মিতে হিন্দু মুসলমানের কিচেন এর ফলে আলাদা হোল। প্রি-পার্টিশান। মানে প্রিপারেশান ফর পার্টিশান। সুতরাং রেশান আলাদা হোল। রান্না আলাদা। কাজেই ছাগল খাসি অনুপাত করে ভাগ হোত। যে যার খুশীমত পাঁঠার ল্যাজে কাট। এ হোল বৃটিশের বন্দোবস্ত।

আই-এন-এতেও ঐ ঝগড়া এলো। মিটমাট করতে যায়েল হলেন বড় বড় সবাই। খোদ বৃটিশ সিংহ ঐ প্রশ্নে ল্যাজ গুটিয়েছেন তিন পাকে। হিন্দু, মুসলিম ও বৃটিশ। বলির পাঁটা তিন কোপে কেটে। কথা উঠলো খোদ কর্তার কানে। তিনি হলেন চিন্তান্বিত। দেশের জন্য বিদেশে থেকে যুদ্ধ। সংখ্যায় নগণ্য। সাপ্লাই যৎসামান্য। প্রবল বৃটিশ, আমেরিকা আর ভারতীয় সৈন্য। বানের জলের মত আসছে। তারপর রান্নাঘরে হাঁড়ি নিয়ে লড়াই। রেশিও অনুপাতে ভাগ করে দিলেন আস্ত পাঁঠা। বলে দিলেন, চড়ানোর আগে কাটা মাংস আর একবার তিনি দেখতে চান। সবাই খুশী। যে যার খুশীমত ল্যাজে কাট। কাটাও হোল। কেউ হালাল, কেউ ঝটকা। কাটা মাংস দুটোই পাশাপাশি। এ পাশে ঝটকা, আর ও-পাশে হালাল। ও দুটোই লাল। উনুনে চড়বে এবার। উনিও এলেন। বাঃ! বেশ! চমৎকার! সবাই বললেন। দুটো মিশিয়ে দাও। উনি বললেন, দেখেই বললেন। তাঁর আদেশে ঝটকা আর হালালে মিলে গেল। কোনখানা হালাল? আর কোনখানাই বা ঝটকা? চিহ্নই রইল না। তোমরা চিনে নাও।

ফলে কেউ খেল, কেউ খেল না। যারা খেল, মোটের উপর তারা ভাগে অনেক বেশীই পেল এবং ফূর্তি করেই খেয়ে নিল। যারা খায় নি, প্রথম তারা ঠকলো। মনের রাগ মনে রেখে শেষ পর্যন্ত তারাও তাতে যোগ দিল। পরে দেখা গেল সবাই তা খাচ্ছে। ঝটকা? না, হালাল? কৈ? সে প্রশ্ন কেউ তুলছেই না।

ইনিই সেই অমর মহাপুরুষ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। ভারতের নয় সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যিনি নেতাজী নামে পরিচিত।

মান্দের নয়, জাভার একটি বছর নয়েকের ছেলে। ফুটফুটে চেহারা। আমাদের ক্যাম্পের কাছেই ওদের বাড়ী। জিজ্ঞেস করেছিলাম। so you know Netaji?

—Yes. I know Netaji বলে তৎক্ষণাৎ এ্যাটেনশান হয়ে ও স্যালুট জানালো তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায়। সেই বাসু, বৃটিশের কাছে যিনি terror আমেরিকান ইন্‌টেলিজেন্সের কাছে যিনি puzzle, আর আই-এন-এর যিনি সৃষ্টিকর্তা। যাঁর নামে সমগ্র ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে একদিন দপ করে জ্বলে উঠেছিল বিপ্লবী বহ্নিশিখা। বৃটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। (চাপা দেওয়া হোল।) এ-আই-সি-সির সভাপতি নির্বাচিত হয়েও, যাঁকে (অহিংস) কৌশলের চাপে পড়ে একধা সরে দাঁড়াতে হয়েছে। যাঁর মাথার ওপর ছিল কয়েক লক্ষ টাকার ডিক্লারেশান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

হায় নেতাজী! হায় বাস্তহারা ছিন্নমূলের দল! নেতাদের মোহের ভুল নয়, এ লোভের মাশুল তোমরা গুণে গুণে দাও।

## পোয়ে নাচের সন্ধ্যা

কারখানা থেকে বেরিয়ে ফেরবার পথে খাটি-সেডের স্ট্রীট। দুধারে অনেক বড় হোটেল। সবই চীনাদের। কয়েকটা পুরো

গেটের দুপাশে মাথা-সমান উঁচু দুখানা বোর্ড। আর তাতে ক্ষীণ বাস নৃত্যপরা অপ্সরীদের ছবি। হাতে আঁকা। আবেশে পা দুটো অবশ হয়ে আসে, এমনি সেই চুম্বক-আকর্ষী মনোহারী বিজ্ঞাপন। তাতে ক্যাপশানগুলো কলা, পোয়ে, রুম্বা, চা-চা-চা, কানিপ্সো। সবই সূত্রবিহীন নৃত্যের ব্যাপার। অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্যও একদিন হয়েছে। হোটেলে নয়, পাবলিক প্লেসে। এক সুন্দরী তরুণীর সাদর সৌজন্যে।

সুন্দরীর সাহচর্য ঘটেছে অতি আকস্মিক ভাবে। সহচরী নয়, মহিলা বন্ধু। ঐশ্বর্যশালী পিতার একমাত্র কন্যা। অপরূপ তনুশ্রী বর্মা-ভারতীয় সংমিশ্রণে। পিতা বাঙ্গালী, আর মাতা বর্মী। ভদ্রলোক ভাগ্য অন্বেষণে একদিন এসেছিলেন বর্মায়। তারপর রেঙ্গুনে আসেন এক ঠিকাদারী চাকুরী পেয়ে। সেখানে থেকে এই সহরে চারখানা বিরাট বাড়ীর মালিক। চার জন বিধবাকে বিয়ে করার পর। প্রথম তিনজনই নিঃসন্তান। চতুর্থ পক্ষেও একমাত্র কন্যা। বর্মায় বাঙালী পুরুষের কদর আছে, বিশেষত মেয়েদের কাছে। তারা টিকলো নাক, টানা চোখ ও চিকণ কালো চুলের খ্যাতিতে খ্যাতিমান।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায়। দুজনে যখন পৌঁছেছি, পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। পোয়ে নাচের আসর। পাশাপাশি বসেছি দুজনে। সামনে চিত্রবিচিত্র নানান দেশের মহিলা। সম্ভ্রান্ত ও নিমন্ত্রিত। পিছনে মিলিটারী অফিসার। আরও পিছনে নানা রঙের, নানা রকমের দর্শক।

উপরের আলো সব নিবে গেল। জ্বলে উঠলো পায়ের আলো। ইলেকট্রিক নয়, মোমের। সামনের পর্দা সরে গেছে আস্তে আস্তে। ফুলবাগানে সবুজ পাতায় রং-বেরংয়ের ফুল। দূরে আরও পিছনে জলপ্রপাত। সেই রঙীন ব্যাকগ্রাউণ্ডে ভেসে উঠলো ভেনাসের মর্ম্মর-প্রতিমা। অতি নিপুণ কারিগরের সুনিপুণ হাতে গড়া যেন অজন্তার প্রতিচ্ছবি। কাজল-টানা ভুরুর নীচে কৃষ্ণ-কাজল আয়ত চক্ষু—নিষ্পলক। তীরের চেয়েও তা তীক্ষ্ণ—হীরের চেয়েও তা উজ্জ্বল। সুঠাম ষোড়শী-দেহ সুন্দরলক্ষণহীন; কিন্তু নিষ্প্রাণ, নিথর। প্রস্ফুটিত হয়েছে যৌবনের রেখা—নিরাভরণ। ক্ষীণ লতায় গাঁথা কোমল কচি পাতার মেখলা। কটিদেশের আবরণ। সে কি আবরণ? না, আভরণ? আঁধার-ঘেরা পাদ-প্রদীপের আলো। আরও মধুর, আরও নয়নাভিরাম। কিছু সময় মনে সংশয়। প্রতিমা পাষাণ? কি পাষাণ নয়? বিমূঢ় দর্শক বিস্ময়ে হতবাক্। সহসা মাতাল সুরে পাগল করা বৃন্দাবনের বাঁশীর সুর। বহু দূরে। ক্রমে তা নিকটে এলো।

কোন্ মায়াবিনী যাদুকরীর সোনার কাঠির পরশে জানি না, ওদের চোখে মৃদু পলক। সেও পলক মাত্র। সহসা হাততালিতে সে চলঘর ফেটে পড়বার উপক্রম। সে পাষাণী দেহ ক্রমে লীলায়িত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কুসুম-কোমল চরণ-ঘাতে নৃত্যপরা নিরাবরণ সখিদলের প্রথম আঁখিপাতেই লক্ড হলেন বড় বড় অফিসার। দু'জন বৃটিশ মেজর আর সামলাতে পারেন নি নিজেদের সেই দৃশ্য দেখে। এক লাফে একেবারে মঞ্চের উপর, দুধারে বসলেন। অপূর্ব সেই দৃশ্য। দুই পাশের দুই শোভা যেন হনুমান আর জাম্বুবান! মধ্যিখানে উর্বশীদের পোয়ে নাচের মনোহরণ পালা! দৃশ্যের পর দৃশ্য! উপরে হুর-পরীদের আনাগোনার, নাচের ভীড়ে ওঁরা দুজন তেমনি বসে রয়েছেন তখনও। নিরাবরণ, নিরাভরণ ষোড়শীদের সূত্র দুর্ভিক্ষ নাচের আরও অনেক রকমফের—ডানাওয়ালা পরী ইত্যাদি ছিল। কিন্তু কপালের লিখন! কোন্‌টা রুম্বা, কোন্‌টা পোয়ে, কোন্‌টা চা-চা-চা, তা বিচার করা ভাগ্যে আর ঘটেনি। পাশেই বসে নিমন্ত্রণ-কর্ত্রী। বন্ধুনীর দিকে ফিরে তাকাতেও এর পর আর ভরসা হয়নি। না বলে চলে এসেছি এক ফাঁকে। কখন্, তা নিজেও জানি না।

বর্মা, সুমাত্রা, জাভা আর মালয়ের বিখ্যাত নাচ যে দেখেছি, ওভাবে চলে আসার পর সেকথা বলার চেয়ে এখন না বলাই সমীচীন।

## প্রতি-আবর্তন

জাহাজ-ডুবির পর থেকে সহর ছেড়ে আবারও সেই বর্মার জঙ্গলে। এবার উখিয়া নয়, বুথিডং। যে ইউনিটে ঠাঁই, আমি তাদের ষ্ট্রেংথে নই। ও সি মেজর ল'লেন, খাস বৃটিশ। অর্থাৎ সদ্য আমদানী। লোক ভাল, তবু বাঙালীর নামে হাড়ে চটা। কারণ, তাঁর থিসিস্—দুজন বাঙালী 'বাসু' এ যুদ্ধে জাপানীদের নেতা। তাঁরাই যুদ্ধ বাধিয়েছেন যার ইচ্ছে। ওঁকে বোঝাই, এক বাসু যুদ্ধ বাধার অনেক পরে ভারত ছেড়েছেন। কিন্তু সেকথা কে শোনে? ওঁদের কাছে বাঙালী ব্রেন রীতিমত ভয়ঙ্কর। বোধ হয় বিক্রেতের ট্রেনিং। ওঁদের কথা উঠলেই বলেন,—ওকথা বলো না। Basus are great puzzles—বিরাট প্রহেলিকা! মাথা খারাপ করে দেয়। সত্যি ওঁরা আজও প্রহেলিকা!

আমাদের জাহাজ-ডুবির কথা শুনে সাহেব সদয় হয়ে বললেন,—Go, whereever you like. Enjoy six months' leave. Boss্কে ধন্যবাদ দিলাম। যদিও নিয়ম নয়।

ভদ্রলোকের দিল দরিয়া। কিন্তু মাথাটায় মহাকালের ভ্যাকুয়াম। কড়া হুকুম—সন্ধ্যার রোল কলে প্রত্যহ অন্ততি মাছি চাই। বেশী হলে পুরস্কার। কম হলে সাজা। সাড়ে চার শ' লোক। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মাছি ভর্তি থলে। আর মাছি ধরার জাল। মাছি মারছে সবাই। কিন্তু রোজ অত মাছি মিলবে কোথা থেকে? ওরা সবাই মরে শেষ হয়েছে। আর মাছি পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত সেই মাছির খোঁজে সবাই মিলে ধাওয়া করেছে পায়খানায়। মাটিতে গর্ত কেটে তার ওপর বন্ধ দেওয়া কাঠের ঢাকনা। প্রথম শ্রেণীর রেলের কামরায় যেমন থাকে। কতকগুলো লোক lid খুলে তার কাছেই ওৎ পেতে বসে আছে ভর দুপুর, সন্ধ্যে বেলাতক। মাছি ধরছে। সেই মাছি ধরা জাল আর থলে ওদের হাতে। কখন্ একটা মাছি ভিতর থেকে বেরুবে, কে জানে? বসে আছে হাঁ করে। ভিতর থেকে মাছি বেরোলেই—খপ্! অর্থাৎ খপ্ পরে! সারা দিন-রাত ঐ একই কাজ—অর্থাৎ মাছি মারা। আমরা জানতাম মাছি মারা কেরাণীর নাম। এখন দেখছি মাছি-মারার ও সি। সব বাঙালী মিলে ওঁর নতুন designation—পদবীকরণ।

লম্বা ছুটি ছয় মাসের। তবু ভারতে ফিরে যাব না। কারণ বহু আপন জন দুর্ভিক্ষে মরেছে। তাদের স্মৃতি এখনও মুছে

যায় নি। কালো বাজার আর অর্থের স্ফীতি, লোকের প্রকৃতিরও আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সবাই অর্থের লালসায় হন্যে হয়েছে। লোক-লজ্জা, ভয়, ন্যায়-অন্যায়ের বালাই নেই। সুতরাং কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরে দেখে শুনে সায়েবকে বলতে হোল, আর ছুটি চাই না। সায়েব শুনে খুশী হয়ে পাঠালেন সমুদ্র-কূলের এক ইউনিটে।

সী-বীচ্। দিনের বেলায় তাঁবুতে বসে' অফিস। আর রাতের বেলায় সেই তাঁবুতেই নিদ্রা। চার পাশে অনেক খাদ ট্রেঞ্চ, ট্রেঞ্চ রাতে থাকার জন্যে। আর ছোট ছোট গাছ। কোন গাছ কাটা বা তার ডাল-পাতা ভাঙ্গাও নিষেধ। ওতে আত্মগোপনের ব্যাঘাত ঘটে। চার পাশে ভারতীয় সৈন্য। মাঝখানটায় জঙ্গল। সেই জঙ্গলে আবার খাদ। উপরে তাঁবু। তারও উপরে গাছপালা। আরও উপর থেকে দেখা যাবে না। এখানে থাকেন সবাই শ্বেত। কেন্দ্রের জঙ্গলটা আরও ঘন। সেখানে খোদ ও সি। তাঁর গর্তটা দেখবার মতো। বেশ বড়। অফিস, বিলেট, বাথ, প্রিভি, ডাইনিং পর্য্যন্ত তার ভিতর। আবার ঐটুকুর ভিতর বল-নাচেরও আসর জমে। দিনের বেলায়, দুপুরে কচিৎ উপরে উঠলেও, রাতের বেলায় মরে গেলেও ওঁরা সে খাদ ছেড়ে উপরে উঠবেন না। ওর ভিতর খানা-পিনা, শৌচাশৌচ ও শয়ান। স্নাইপারের ভয়। যদি বলা হয়,—সাহেব! স্নাইপার নেমেছে একটা কাল রাতে। দশ মাইল ওদিকে। ব্যস্! ওরা দশ দিন সে খাদের মধ্যে ডুবে থাকবে। সাদাদের গাল দিতে,—তোমাকে স্নাইপার ধরুক —বলাই যথেষ্ট।

সিগন্যালিং অফিসার! সূক্ষ্ম কাজ, আরও টপসিক্রেট। মেসেজ আ'স যায়, সমস্তই শূন্য কোডে—cypher কোড্, ডিকোড্, ওরা নিজেরাই করে। কারণ 'কী' থাকে ওদেরই হাতে। যেখানে সামনা সামনি লড়াই চলেছে, সেখান থেকে খবর আসছে। কিছুটা খবর আসতে আসতেই চুপ হয়ে গেল। ব্যস! ওর দফা ওখানেই গয়া! আমার স্থান নির্দেশ ও সির পাশেই। ভদ্রলোকের শখ আছে। ভূতের জঙ্গল, আর গর্তের ভিতর বসবাস। কিন্তু তাঁর রসবোধের বিন্দুমাত্র প্রত্যয় ঘটেনি। অফিসে সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে গুটিকতক তরুণী কেরাণী চাই। ওঁরা কি কাজ করেন, সে ওরাই জানেন, আর জানেন ভগবান! স্নাইপারের ভয় কমলে, একজনকে জীপে তুলে নিয়ে বেড়াতে যান নির্জন সমুদ্রতীরে, খোলা হাওয়ায়। ফেরেন একটু রাতে; আর বিকেল বেলায় শ্বেতচর্মের ভয় থাকে কম। ওরা সবাই তখন গার্ল-হাণ্টার।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায়। রোল কলে একজনের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। এটি সার্জেণ্ট। রোজকার পাশ ওয়ার্ড নূতন আসে, এই সন্ধ্যেবেলায়। এবং এই রোল কলেই তা সবাইকে জানানো হয়। রাতের বেলায় কেউ চ্যালেঞ্জ করলে, বা অচেনা লোক, এই পাশ ওয়ার্ড থেকেই ধরা পড়ে যায়—সে দোস্ত, কি দুষমন। এ হচ্ছে রাতের আইডেনটিটি। দূর হতে সেন্ট্রি দেখেছে, কোন লোক আসছে। সে চ্যালেঞ্জ করবে ট্রেঞ্চের উপর মুখ তুলে—

—Halt, who comes there ?

জবাব এলো—Friend.

—pass-word ?

Moon.

সে রাতে 'মুন্' ছিল পাশ ওয়ার্ড। বলতে পারলেন না, ভুলে গিয়েছেন। শুনলেন ব্রেনগানের আওয়াজ—ঠাট-ঠাট-ঠাট-ঠঠ—ব্যস। ওখানেই আপনার গয়া। (ভয় নেই। বাড়ীতে টাকা ঠিকই যাবে, যদি allot থাকে। বছর দুই তো বটে। তারপর হঠাৎ দেখলেন টাকা বন্ধ হয়ে গেছে।) কিন্তু শ্বেতচর্মের কথা আলাদা। ওরা পাশ-ওয়ার্ড মনে রাখার ধার ধারে না। বলে, সার্জেণ্ট অমুক ক্যাপ্টেন অমুক ইত্যাদি। অমনি 'পাশফ্রেণ্ড' এবং খটাশ। অর্থাৎ স্যালুট।

রাত এগারটা হবে। শুয়ে আছি আপন গর্তে। সবে ঘুম এসেছে। আওয়াজ এলো সেন্ট্রি পোষ্ট থেকে।— Halt, who comes there ? ঘুমটা ভেঙ্গে গেল আচমকা। উত্তরটা শুনতে পাইনি। খানিক পরে আবার—

Halt, who comes there ?

কোনো সাড়া নেই। কান খাড়া করে আছি। কারণ, স্নাইপারের উৎপাত বড্ড বেশী। ওরা একলা আসে, ছোট্ট একখানা ছুরি হাতে করে। আর পুরো চার পাঁচ শ' লোকের সাবাড় করে চলে যায় রাতারাতি। ট্রেঞ্চে নেমে ঘুমন্ত মানুষের গলার নলীতে একটা করে সুড়সুড়ি—ক্যাচ এবং এক পোঁচেই শেষ।

আবারও আওয়াজ এলো। Halt, who comes there ? এক মিনিট। তারপরই সুরু হোল—ঠাঠ-ঠ-ঠ-ঠ!

এ অটোমেটিক মেশিন গানের ফায়ার। গুলী বেরোয় জলের ধারায়। সব চুপচাপ। একটু বেশী নিঝুম মনে হোল। চলমান পৃথিবী যেন হঠাৎ থেমে গেছে। কতক্ষণ কেটেছে? আধঘণ্টা? বেরিয়ে এলেন ও সি। সঙ্গে সাঙ্গোপাঙ্গ। আমিও। পোষ্টে পৌঁছতে ও সি জিজ্ঞাসা করলেন। ক্যা হুঁয়া সেন্ট্রি!

—হুজুর, এক দুষমন আয়া থা।

দুষমনের কথায় একটু ভড়কে গেলেন। ক্ষণেক পরে সাহস সঞ্চয় করে বললেন,—কাঁহা পর।

—উধার পড়া হ্যায়, সাব!

অন্ধকার চতুর্দিক। কোথাও আলোর লেশ নেই। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালা একেবারেই নিষেধ। বিড়ি বা সিগারেট খাওয়াও নিষেধ। স্নাইপারদের অব্যর্থ সন্ধান। বিড়ি ধরিয়ে দেখ মুখে। বহুদূর থেকে সেই অন্ধকারেই ওরা রাইফেলের নিশানা ধরবে। এবং একটি গুলী বেরোবে তার রাইফেল থেকে। একবার বিড়ির টানে যেটুকু আলো বেরোয়, তাই যথেষ্ট। গুলী ঠিক মুখের ভিতর দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে চলে যাবে।

দূরে আবছা মতো একটা কি পড়ে রয়েছে তখনো। গার্ড কমাণ্ডারেরও সাহস ফিরে এসেছে এতক্ষণে। চারদিকেই জঙ্গল, গাছপালা আর অন্ধকার। উৎসাহে কমাণ্ডার এগিয়ে গেল দেখতে। সে এক বীভৎস দৃশ্য ভূমিতলে শয়ান। রক্তবন্যায় স্নান করা সে দেহ। অনেক বুলেট ওর বুকখানাকে ফোকরা করে তার ভিতর দিয়ে চলে গেছে। মুখে টর্চ ফেলে চমকে উঠলেন ও সি। আমরাও। এ সেই সন্ধ্যের রোল কলে হারানো সার্জেণ্ট, আবার ফিরে এসেছে। গার্ল হাণ্টিংয়ের ব্যাপার। কিন্তু এত রাতে? আর এভাবে কেন? গাল দুটো অস্বাভাবিক ফুলো। ঠোঁট সেলাই করা সুচ সুতো দিয়ে

খুঁড়ে। হাত শক্ত করে দড়ি দিয়ে বাঁধা। পাদুটো ঢিলে করে বাঁধা। পিঠের শিরদাঁড়া বরাবর একখানা আস্ত লম্বা কাঠ হাঁটু অবধি। বসা, উপুড় হওয়া, নিজের হাতে নিজের বাঁধন কাটা বা খোলা মুখ দিয়ে ওসব চলবে না। চলতে পারবে, কিন্তু দৌড়ানর রাস্তাও বন্ধ—ধোপার গাধা করে দেওয়া। ধরাধরি করে সে দেহ খাদে নিয়ে আসা হয়েছে, সেই রাতেই!

প্রভাতে উঠেছি খোদার নাম জপ করে। কী বিশ্রী রাতটা কাল কেটেছে। পাশের খাদে একটা আস্ত মড়া। চারদিকেই ঘন জঙ্গল দূরে দূরে খাদ, আর সে খাদেও একজন করে লোক। কোন মানুষের শব্দ নেই। আলোও আলতে নেই। সমস্তটা রাত মনে হচ্ছে ভূত দেখেছি। একজন সৈনিকের প্রতি চরম কর্তব্য পালনের জন্য ও সি সবাইকে ডেকেছেন। এ দৃশ্য আগে দেখিনি। পরেও আর দেখব না। বর্ব্বরতা বটে। এবং অমানুষিক। এতদিনে বুঝেছি, হাড়ঝুনো বৃটিশ আর এ্যামেরিকান সৈন্যদের কেন জাপানী স্নাইপারের নামে হাড় কাঁপে। সে সেপাই থেকে জেনারেল পর্যন্ত। জাপানকে ওরা মুখে বলে তুচ্ছ, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ভীষণ ডরায়। শ্রদ্ধাও করে। মুখের সেলাইটা কেটে দেওয়া হয়েছে। মুখের ভিতর পাওয়া গেছে একটা কাটা পেনিস—পুরুষাঙ্গ। ওটা ওর নিজেরই। কেটে জাপানীরাই আবার পার্শেল করে পাঠিয়েছে, হারিয়ে না যায়। নিজের লোকের হাতে ওর মৃত্যুর ব্যবস্থা অবধারিত করে ওরা ওকে ছেড়ে দিয়েছে। অদ্ভুত ভবিতব্য। দৌড়ানর উপায় নেই, দুপায়ে বাঁধা। যেন ধোপার গাধা। শোয়া বা বসারও উপায় নেই, গুলীর মুখে আত্মরক্ষা করারও। হাত উঁচু করে নিষেধও করতে পারবে না। হাতও শক্ত করে বাঁধা। মুখে কথা বলে গুলীর হাত থেকে বাঁচবে, সে রাস্তাও বন্ধ করেছে, মুখ সেলাই করে। তারপর আরও—নিজের জিনিষে মুখ ভর্তি। ওর ভবিতব্য ওরা সাব্যস্ত করেই ছেড়েছে এবং ঠিক সময় মত।

একই fat হলেও ঘিয়ে আর ক্যাষ্টর অয়েলে থেকে যায় আকাশ-জমির তফাৎ। হাজার মেশামেশি, হাজার কালচারের বড়াই করে ও দোহাই পেড়েও থেকে যায় সাদায়-কালায় সেই আকাশ-জমীন ফারাক, শেষ পর্যন্ত। এক ঘৃণ্য সম্পর্ক পরম্পরে এবং শ্বেত মর্মে এর উৎপত্তি। পৃথিবীতে সাদা-কালার ঘৃণ্য সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে ওরা, একই ভগবানের সৃষ্টি হয়েও। আর তার প্রকৃত প্রত্যুত্তর দিয়েছে এরা, জাপানীরা। এই যুদ্ধে অতি নির্মম, আর নিষ্ঠুর ভাবে। কালো কালচারের দেশ চায়না, ভারত বা পারস্যও নয়। এশিয়ার কোনো জাতি নয়। একা মাত্র জাপান। তার স্নাইপার।

ওকে যথাস্থানে পাঠান হয়েছে এখানকার শেষ কৃত্য সমাধা করে।

[ক্রমশঃ।

# একটি করুণ কামনা

## শেফালি সেনগুপ্তা

বাধাবন্ধহারা অনিকেত যাত্রিক
হে সময়! যাযাবর বিহঙ্গ পথিক
তোমার ডানার চিহ্নে কবোষ্ণ বন্ধনের সামান্য আভাস
কিংবা নীড়ের স্বপ্ন, ভীরু ভীরু বাসনার ক্ষণ অভিলাষ
নেই নেই লেখা নেই নেইকো কোথাও
না দেখা হাওয়ার মত নিত্য উধাও
তুমি বহু দূর নামহারা কোন নিরুদ্দেশে।
কত মরু-মাঠ-বন-জনপদ সাগরের পারে ভেসে ভেসে।
তোমার চলার গান সৃষ্টি-সূচনার
তোমার চলার দান প্রলয় আঁধার,
হে সময়! অতিক্রান্ত দুরন্ত সময়।

ভাঙা-গড়া লীলাভরা কত না খেয়ালী খেলা মাটি পৃথিবীর
এই প্রান্ত কিনারায়।
এই যাওয়া-আসা সবই মনে হয় জল-লিপি এই দিন সূচনার
দিনাবসানের
তাই নিয়ে ইতিহাস গড়ে ওঠে অনিবার কত না যুগের।
সময়ের চঞ্চুপুটে চলমানও কেঁপে ওঠে আয়ু তার পদ্মপত্রে নীর।
পরিণাম ভীরু যুগ বড় অস্থির।
বেলা যায় দিন যায়। চকখড়ি ছবি আর স্থায়ী কতক্ষণ?
হয়তো এখনো তারা করেনি গ্রহণ
পৃথিবীর পূর্ণস্বাদ। এর যত তপ্ত দিন প্রসন্ন প্রভাত
বিষণ্ণ গোধূলি বেলা তারাময় নির্বেদ ক্ষমাস্নিগ্ধ রাত।

চলতি কালের সাথে পৃথিবীর এই শুভ-দৃষ্টির মুখ
সে সুখের স্বাদ নিতে সামান্য কালক্ষেপ হয় যদি হোক।
শুধু এই প্রার্থনা হে সময়! আগামীকে এত শীঘ্র এনো না, এনো না।
জানে না জানে না কেউ। জ্বলবে কি জ্বলবে না—
আগামীর বাতি-ঘরে একটি আশার দীপ। প্রেম-উজ্জ্বল।
সুকঠিন দুঃখ-রাতে যার থেকে আলো পাবে দিক্‌ভ্রান্ত
আশাভঙ্গ মানুষের দল।
সেই যুগ আসবে কি ভর দিয়ে তোমার ডানায়?
মনে শুধু সংশয়। হে সময়, যাযাবর বিহঙ্গ সময়!

# চম্পা তার নাম

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

৩

চন্দনের ফাঁদে সত্যি-ই বিচিত্রবর্ণ এক পাখী ধরা দিলো একদিন। ধবধবে শাদা রঙ। সুন্দর একটি ঝুলে পড়া ল্যাজ। গলায় আর ডানায় ময়ূরকণ্ঠি রঙে আঁকিজোকাটা। ছিপছিপে একমুঠো দেহ। নরম পালকগুলিতে যেন শরতের ঝুরো শাদা মেঘ ঝরে পড়ছে। চম্পার হাতে ব'সে সেই পাখী এদিকে ওদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে অসহায় ভাবে চায়। চুণির মতো লাল চোখে ভয়। দেখে দুঃখ হয় চম্পার। চন্দন অনেক ক'রে বলা সত্ত্বেও সব ভুলে গিয়ে পা থেকে কেটে নেয় সুতো। উড়ে যায় পাখী। রেগে যায় চন্দন। মুঠো ক'রে চুল ধ'রে ঝাঁকি দেয়। চড় মারে। ছুটে চলে আসে চম্পা। সারাদিনে মা কখন ঘরে আসছে ঠিক নেই। চলে যায় নদীর ধারে সেই বটগাছের তলায়। চেয়ে দেখে বালি ভেঙে গরুর গাড়ী চলেছে। তার গাঁয়ের মানুষ চলেছে হাটে। দেখে বাপের কোলের কাছে ব'সে চলেছে মেয়ে। দুই ছোট হাত ভরে চুড়ি পরে আসবে। তারই সমবয়সী রূপাকে সে না ডেকে পারে না। বলে—কোথায় যাচ্ছিস?

রূপা বলে—মেলাতে। তুই যাবি না?

চম্পা বলে—না। মেলাতে মেয়েদের যেতে নেই। মেলাতে ডাকু আসে। ধরে নিয়ে যায় ছোট মেয়েদের।

রূপা আর তার সমবয়সীরা শৈশবের নিষ্ঠুর কৌতুকে হেসে গড়িয়ে পড়ে। বলে—কে নিয়ে যাবে তোকে? কে আছে তোর?

জোয়ান দুটো বলদের ল্যাজ মলে প্রতাপ তার ঢাকা গাড়ী নিয়ে আসে। চন্দন সব সওদা সামলে বসে আছে চিকণের পোষাকে। মাথায় টুপী দিয়ে। দুনিয়ার অবিচার আর বেইমানি দেখে চম্পার ছোট্ট বুকটা ভেঙে যেতে চায়। গরুর গাড়ীগুলো চলে যায় দূর থেকে দূরে। চম্পা ভাবে এই এতজনের এতজন আছে। শুধু তারই কেউ নেই কেন?

বটগাছের ঝুরির আঁধারে সাপের বাসা আছে হয় তো! ভয় করে না চম্পার। হেলান দিয়ে বসে কাঠ-বেড়ালীর ঘরসংসার দেখে সময় কেটে যায়। তারপর মাঝ আকাশের সূর্য পশ্চিমে হেললে তার মা-কে যখন পথের বাঁকে দেখা যায়, তখন ঘরে ফেরে চম্পা। কিন্তু ভোর হতে না হতে ছুটে আসে চন্দন। দুই হাত ভ'রে পুতুল আর পানিফলের জিলিপী এনেছে। ভাব যখন হয়, তখন আর গতকালের ঝগড়ার কথা মনে থাকে না চম্পার। দুনিয়াটা ভালো হয়ে যায়। নিজের খুসীতে সব কিছু আরো সুন্দর মনে হয়।

আঁধার ঘনালে আকাশে তারা ফোটে। চন্দন শেখায় চম্পাকে—রামজী, লছমনজী আর সীতামাঈয়া—সবাই তারাগুলোর মালিক।

—এত জান তুমি?—চন্দনের দিকে সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে থাকে চম্পা। চন্দন বলে—আমি আর কি জানি? আমার দাদা সব জানে।

যেমন করে নদীটা চলেছে, তেমনি সহজ করেই চলে যায় চন্দন আর চম্পার দিনগুলো। কিন্তু সে হিসেব মানতে চাইলো না ডেরাপুরের সমাজ।

গাঁয়ের কুয়োতলা মেয়েদের জমায়েতের জায়গা। সেখান থেকে দুর্গা শুনে এলো প্রথমে। শুনে জ্বলতে জ্বলতে এলো বাড়ী। স্বামীর ওপর ফেটে পড়লো। বললো—শহরবাজারের কানুন গাঁয়ে চালু হলো? সাহেবদের পাদ্রীরা ঘুরে ঘুরে বলে বেড়ায়, মেয়েদের বিয়ে দিও না। সেই কানুনই চালু করলো অনন্তর বিধবা।

স্বামীকে বোঝাল দুর্গা। বললো—সুরজ অমনি! চোখে আঙুল না দিলে বুঝতে চায় না। মেয়ের বারো বছর বয়স হলো, বিয়ে দেয় না কেন?

—সে অনাথ। তার কে আছে?

—কেউ না থাকে ত তোমরা ব্রাহ্মণদের দই-মিঠাই খাইয়ে বিধান নাও। সকলের ঘাড়ে খরচ-খরচা ভাগ করে নাও। ঐ মেয়েকে গ্রাম থেকে বিদায় করো। ওর সব কিছুই অমঙ্গলের। আর ঐ মেয়েটার সঙ্গে আমার ছেলে দিন-রাত ঘুরছে?

দুর্গার কথায় মনে হলো, কোম্পানীর থানা-চৌকি যদি এত কাছে না হতো, তবে ঐ মেয়ে আর তার মাকে নির্ভয়ে ডাইনী অপবাদ দিয়ে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিতো। কিন্তু কোম্পানী সরকার সে সব বোঝে না। দুর্গার মনে হলো চম্পার বিষ নজরে বুঝি চন্দন কোন দিন জলে ডুবে যায়, কি সাপেই কাটে।

এতে ক'রেই সাড়া পড়লো গাঁয়ে। সুরজকে বাড়ী বয়ে উপদেশ দিয়ে এলো সবাই। গাঁয়ের পাঁচ জন পুরুষ মানুষ তার বাড়ী বয়ে এসে তাকে অবহিত করলো। কারো প্রতিবাদ করলো না সুরজ, কিন্তু বুকে যেন তার আগুন জ্বললো। সবাই অভিজ্ঞ চোখে ঘর দোর দেখে বুঝলো, এতে কোন খরচই উঠবে না। তখন সকলেই কথা দিলো যে নিখরচায় একটি ছেলে দেখে দেবে।

এমন আচমকা ঝড় উঠলো তাকে ঘিরে, বিভ্রান্ত হয়ে গেল চম্পা। ভাসাভাসা কথাগুলো শুনে সে কিছুই বুঝলো না। মনে হলো মা-ও যোগ দিয়েছে এই নিষ্ঠুর চক্রান্তে। তার ঘর থেকে বেরুতে

মানা। চন্দনের সঙ্গে খেলা দূরে থাক, সামান্য মিললেও দোষ। বুড়ী কৌশল্যার ইদানীং কোন কাজ থাকে না। বিয়ে নিয়ে অনেক কথা সে শুনিয়েছে চম্পাকে। চন্দনের সঙ্গে তার যে খুব সুন্দর জোড়ী হয়, এই ধরণের কথা সে কৌশল্যার কাছেই শুনেছে। বিয়ের কথা শুনে মন্দ লাগে নি চম্পার। বেশ তো! কেমন তার বাড়ীতেও বরাত আসবে। তার নতুন কাপড় হবে। মিঠাই খাবে, গহনা পরবে সে। সমবয়সী মেয়েদের বিয়ে সে দেখেছে। বিয়ের প্রসঙ্গে চন্দনের কথা তার একবারও মনে হয়নি। তাই সকলের ব্যবহার চম্পার কাছেই দুর্বোধ্য ঠেকলো।

আর কিছু না হোক, দুর্গার বাপের বাড়ীর জোর ছিলো। তার দুই পাটোয়ারী ভাই কানপুর থেকে ডাক-গাড়ীতে এলো বোনের জরুরী এত্তালা পেয়ে। ভাইদের দেখে দুর্গা দুধ-মিছরী এনে অভ্যর্থনা জানালো। শহরবাসী ভাইদের খাতিরে প্রতাপকে ক্ষেতীমানুষের অভ্যেস ছাড়িয়ে জামা পরালো। গলার কাছে মেরজাই-এর বোতাম এঁটে বসলো। শালারা বললো—উট দাগ হোতে থে, মাকড়া আভি দাগ হোনে কো আরে। অনন্তর বিধবার হয়েছে সেই দশা। ভাবছে ছেলেকে বশ ক'রে বিয়ে দেবে মেয়ের রূপ দেখিয়ে। প্রতাপ সাব, চন্দন আমাদের এক বোনের এক ছেলে। তাকে আমরা শহরে বিয়ে দেব। ঘিয়ের বাত্তি জ্বালাব। ডেরপুর থেকে পাঁচ মাইল অবধি চৌকি বসিয়ে রোশ্‌নি করবো। গাঁয়ে থেকে ওর আখের নষ্ট হচ্ছে না?

বৌয়ের এই সব বাড়াবাড়িতে এমনিতেই চটে ছিলো প্রতাপ! এবার জানান্ দিলো রাগ। বললো—কুটুম্ব এসেছো, কুটুম্বের মতো চলে যাও—আমার ঘরের কথা নিয়ে দামী মাথা ঘামাবার দরকার কি?

তার পর ঘরে এসে বৌকে শাসন করলো—তিলকে তাল ক'রে তুলেছ, এখন এর ঠেলা সামলাবে কে? মেয়েমানুষের কথা শুনলে এমনই হয়।

বাপের কাছে সাময়িক ভাবে ছেলেকে পাঠালো প্রতাপ। দুই পাটোয়ারী তাদের কথা বা পরামর্শ রইলো না দেখে মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলদ জুড়লো গাড়ীতে।

আর গাঁয়ের দশজনের কাছে সুরজকুঁয়ারী জানতে পারলো, তার মেয়ের বিয়ের কথা চলছে। কোন্ গাঁয়ের ছেলে? কেমন ঘর? খোঁজ-খবরে জানা গেল, বর ঠিক করেছে পণ্ডিত কেশবরাম। ছেলের বাবা বুঝি ভাগের কিষাণ। নিজের বলতে কিছু নেই। এর-তার জমিতে চাষ করে। আধা ফসল পায়। শুনে ফুলতে ফুলতে সুরজ গেল প্রতাপের বাড়ী। কৌশল্যার নাতিকে শিখণ্ডী ধরে রেখে কথা বললো প্রতাপের সঙ্গে। বললো—আমার শ্বশুর তোমার বাবার দোস্ত। আমার চম্পার বাবা ছিলো তোমার দোস্ত। আজ মাথার ওপর কেউ নেই বলে চম্পাকে তোমরা ভাসিয়ে দেবার মৎলব করেছ? এ বিয়ে দেব না আমি!

—কেন? কি হয়েছে? কোন শয়তান তোমার কান ভারী করেছে? কার কাছ থেকে কি খবর পেলে? চম্পাকে আমরা ভাসিয়ে দিচ্ছি? একটা মোষ আর পঁচিশ সিক্কা টাকা কবুল করেছি, সেটা আমার গাঁট থেকে যাচ্ছে না? গচ্ছা দিয়ে কেউ শত্রুতা করে? চম্পার জন্যে আমার দুখ্‌দরজ নেই?

সুরজ আজ আর কোন কথার যুক্তি শুনবে না। বাচ্চার ওপর থাবা বাড়ালে হরিণী বাঘের ওপরেও রুখে যায়। এই জীবধর্ম। চম্পার শুভাশুভের প্রশ্নে ঘা লেগেছে। তাই এমন করে রুখে উঠেছে সুরজ। সুরজ বলে।—দুখদরদের নমুনা দেখেছি আমি। আর দরদী আমি চাই না। এই বিয়ে দেব না আমি!

—ছোট মুখে মস্ত বড় কথা হয়ে যাচ্ছে না চম্পার মা?

এবার কালো কাপড়ের ঘোমটা ফেলে সুরজ সতেজে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো। টকটকে লাল হলো মুখ। স্পষ্ট গলায় সুরজ বললো—আমি তোমার নিমকের ভাগদার নই। আমাকে তুমি কথা শুনিও না। আর ওপরে গৈবীনাথ আছেন, ছেলের মাথায় হাত রেখে তাঁর কাছে জবাবদিহি ক'রে নিজের ইন্‌সাফ ঠিক রাখো। আমার মেয়ের বিয়ের কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার মোষের চেয়ে আমার লড়কীর জানের দাম অনেক বেশী!

সুরজের মুখে চড়া কথা কেও কোনদিন শোনেনি। তাই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে চেয়েই রইলো প্রতাপ। আর মনের দুঃখে ও তেজে সুরজ আবার বললো।—খাজনা তহশীল তুলতে কোম্পানী সাহেব তাঁবু ফেলেছে রসুলাবাদে। দরকার বুঝি তো সেখানেই যাব আর্জি নিয়ে। বলব যে, আকাশে সূর্য চাঁদ উঠছে এখনো, কোম্পানী সকলকে বিচার দিচ্ছে মনোমত, আর একটা অনাথার ওপরেই যত অবিচার? কি করেছি আমরা তোমাদের?

সুরজের এই ধৃষ্টতায় কেশবরাম প্রমুখ সমাজের মাথা যাঁরা, তাঁরা চটে আগুন হলেন। পণ্ডিতজী বললেন।—পাপীর শাস্তি গৈবীনাথ দেবেন। আকাশ থেকে বাজ পড়বে। ভয়ংকর শিক্ষা হবে।

দিনকাল খারাপ। আগে হলে কেশবরামের কথাই হতো আইন। ইচ্ছেমতো শাস্তি দেওয়া চলতো সুরজকে। কিন্তু কোম্পানী সরকারের সবই বিচিত্র। চুরি করলে, ডানহাত খানা কেটে নেয় না এরা। জেলে বসিয়ে ফাটকে চোরকে খাওয়ায়। অচ্ছুৎকে একই রকম শস্তি দেয়। তা ছাড়া এ জেলার খাজনা তহশীল যার হাতে সে সাহেবের মন মেজাজের ঠিক নেই। অনেক সাহেব আছে যারা মানুষের সঙ্গে নিজে কথা কয়না। সাহেবের চাপরাশীকে ঘি, বকরা ভেট দেবে। জোড়ায় জোড়ায় বকরা পাঠাবে সাহেবের রসুইখানায়। সাহেবের খানসামাকে হাতে গুঁজে দেবে সিক্কাটাকা ক'টা। তবে সাহেবের কানে উঠবে কথা। জবাবটা আসবে অমনি হাত ফিরতি হয়ে। সে রকম সাহেবের কাছে কথা পৌঁছাতে সাহস পায় না সবাই। নেহাৎ পয়সার জোর না থাকলে তেমন জায়গায় লোক পাত্তা পায় না।

রসুলাবাদের সাহেব সে জাতের নয়। তুমি কোম্পানী সাহেব। তুমি সরকার সাহেব। তুমি নিজের গেরমানিতে নিজে থাকো না কেন? তা নয়, সকলের নালিশ ফরিয়াদ নিজে কানে শোনা চাই। বাবুর্চি জবরদস্তি ক'রে কোন বুড়ীর বকরা এনেছিলো। হাঁকডাক করতে বুড়ীর কথা শুনে রুখে গেলেন সাহেব। বাবুর্চিকে নাকে খৎ দেওয়ালেন। আর আট আনার বকরার বদল চার টাকা হাতে ক'রে পেলো বুড়ী। বুড়ী বললো—সাহেব তুমি আমার ছেলে। বেঁচে থাকো বেটা। লাখ বেটার বাবা হও।

শুনে হেসে গড়িয়ে গেলেন সাহেব। চাপরাশী বললো—সাহেব বিয়েই করেনি। কি বকছো বুড়ী? যাও, আপন কাজে যাও।

বুড়ীর তোবড়ানো গালে জল ঝরে পড়লো। বললো সরকার, ভগবান করে তুম লাখো সাল জীও ঔর গরীবোঁকে ভালা করতে রহো!

সাহেব বুড়ীর কাছে এসে সস্নেহে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বললেন—সরকার তোমার ভালো করবার জন্তে এসেছে বুড়ী মাঈ। এই কথা তুমি তোমার গাঁয়ের মানুষকে বুঝিয়ে দিও। যাও, মনের খুশীতে চলে যাও নিজের কাজে।

এই সাহেবের ব্যবহারে তাঁর পেশকার নায়েব কেরাণীরা সবাই লজ্জিত। এমনি জবরদস্ত মেজাজের সাহেব হ'লে তাঁর আমলা কর্মচারী পয়সা করে কি করে? সাহেব যদি খানাপিনা আর শিকার নিয়েই ব্যস্ত থাকে, তা হ'লে কাজ করে পেশকার নায়েব। সাহেবের ঘরেও দু' পয়সা আসে, আর কর্মচারীরা সকলেই কোঠা তোলে দেশে ঘরে। দেওয়াল খুঁড়ে লোহার পেটিতে রূপোর টাকা জমায় দু-চার শো।

এ সাহেব তেমন নয়। সুরজ যদি আর্জি নিয়েই যায়, কে জানে হয় তো গাঁ শুদ্ধ মানুষকেই তলব ক'রে বসবে। কানোরীর গঙ্গারাম তুলীর যে বদহাল করেছিলো সাহেব। গঙ্গারামের বোন হলো সতী। সদর থেকে বিশ মাইল দূরে গ্রাম। তবু কথা ঠিকই পৌঁছলো সাহেবের কানে। গঙ্গারামের জরিমানা হলো। মেয়েটার শ্বশুর আর গঙ্গারাম দুই উত্তোক্তাই পচছে কানপুরে হাজতে।

সাত পাঁচ ভেবে তাই সুরজকে শাপ দিয়েই ক্ষান্ত হলো কেশবরাম। প্রতাপ চটলো বললো কাজ ভাল করলো না চম্পার মা। আখেরে ভাল হবে না।

সে কথা শুনে সুরজ নিরানন্দ হাসলো। আখেরের চিন্তা করে কে? যার বর্ত্তমানটা ঠিক আছে। সুরজের জীবনটা কি? হাল ভাঙা ফুটো ফাটা নৌকোর মতো জলে ভিজছে, ঝড়ে ঝাপটাচ্ছে। আখেরের কথা ভেবে এই ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটাকে ভাসিয়ে দেওয়া চলে কি? চম্পাকে কাছে টেনে সুরজ বললো—চম্পা, তোর আর আমার দুঃখের দিন সুরু হলো। ভয় পাস না। আমি যতদিন আছি তোকে বুক দিয়ে বাঁচাবো। শক্ত হ'তে হবে। পারবি তো?

দুঃখের দুর্দিনে চম্পার বয়স যেন সত্যিই বেড়ে গিয়েছে। সে মাথা নাড়লো। জানালো হ্যাঁ, পারবে।

—আর চন্দন।

চন্দনের নাম কেন? অবাক হয়ে তাকায় চম্পা। চন্দনের নামটাকেও ভয় করতে হবে? পরিহার করতে হবে? সে নামটা আর উচ্চারণ করা চলবে না? শুধু তাকিয়ে থাকে চম্পা। সুরজ বলে—চন্দনের কোন দোষ নেই। কিন্তু তার সঙ্গে আর যেন মিশোনা। ওদের আমাদের মধ্যে দরিয়ার সমান ফারাক বেটি। ওর থেকে তোমার কোন ভালো হবে না।

এবারও ঘাড় নাড়ে চম্পা। এ কয়দিন ধরে সবাই তাকে শুধু দোষ দিয়েছে, সমালোচনা করেছে, বকেছে। মাও সেই কথাই বলছে। কেমন করে যেন চম্পা বোঝে, যে মনের ভাবটা চেপে রেখে জবাব দিলেই খুশী হবে না। চম্পা সম্মতি জানায়।

রক্তরাগে আকাশ রাঙিয়ে আজও স্বর্ণসন্ধ্যা নামে। সেই সোনালীমায়ার কুহকে ভুলে একঝাঁক পাখী নামে মাটিতে। চম্পাদের উঠোনে টুকটুকে লাল ঠোঁট দিয়ে গম খুঁটে খুঁটে তোলে। সহসা ঝটপট ডানার শব্দে সম্বিৎ ফিরে চায় চম্পা। রেশমী সুতোয় ফাঁদ পেতেছিলো চন্দন। সেই ফাঁদে পা বেধেছে আবার সেই বিচিত্রবর্ণ পাখীর। ধবধবে শাদা রঙ, ঝুলে পড়া ল্যাজ আর গলায় ময়ূরকণ্ঠি আঁজি। সেই পাখী? একদিন ছেড়ে দিয়েছিলো। আবার নির্বোধ পাখী ধরা দিতে এলো? হয় তো সে পাখী নয়। তার জোড়াই হবে! চুনীর মতো চোখে ভয়। চম্পা আস্তে করে ফাঁদের সুতো কেটে দেয়। উড়ে যায় পাখী। একনিমিষে সন্ধ্যার সোনালী মায়া ডানায় মেখে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। আনমনা চেয়ে থাকে চম্পা। ঐ পাখিটা উড়ে যেতে পারবে চন্দনের ফাঁদ থেকে। কিন্তু হাজার ইচ্ছে থাকলেও চম্পা এই পরিবেশের বাঁধন শাসন থেকে চলে যেতে পারবে না। তার দু'খানি পা ঘিরে অনেকরকম বাধা।

ছোট বুকখানা সহসা উদ্বেল হয়। রুক্ষচুল কপাল থেকে সরিয়ে চম্পা আকাশের দিকে চেয়ে মনে-মনে অদ্ভুত এক ইচ্ছে জানায়। পাখীটা যেন চলে যায় দূরে। দূরে, অনেক দূরে অনেক ওপরের আকাশ দিয়ে। হে ভগবান, পাখীটাকে যেন কেউ কোনদিন ধরতে না পারে।

ধরা পাখী ছেড়ে দিয়ে মেয়ের চোখে জল পড়ছে দেখে সুরজ তাকে সান্ত্বনা দিলো।

—অমন পাখী কতো ধরা পড়বে তোর ফাঁদে।

না। আর পাখী চায় না চম্পা। আকাশের পাখী পোষ মানিয়ে তার গান শোনবার ইচ্ছে তার চলে গিয়েছে।

৪

প্রতাপের বাবা চমন বড় আজব মানুষ। প্রতাপ বা তার দোসর অন্যান্য সব গেরস্তি মানুষের বুদ্ধিতে চমনের কুলকিনারা মেলে না।

চমনের রক্তেই লড়াইয়ের নেশা। যে নেশা জীবনকালে ধরেছিলো চমন, সবই ছেড়েছে। কিন্তু লড়াই করবার নেশা তার গেল না। যুদ্ধ ফিরতি মানুষ। মুখে মোটে লাগাম নেই। বলে—তোর বাপদাদা তোকে ঐ কটা চোখ দিয়েছে, আর ওকে দিয়েছে কঞ্জুষ স্বভাব। ও পরদাদার দেওয়া জিনিষ যা নিয়েই পয়দা হয়েছিস, তা কি ছাড়তে পেরেছিস? এই লড়াইয়ের নেশাও আমি নিয়েই এসেছি দুনিয়ায়। তোরা কি বুঝবি?

ঝুলে পড়া ভ্রূ কাঁপিয়ে হাসে চমন। বলে—কিষাণ কা হাতিয়ার পাশনি। পাশনির এক এক কোপে কিষাণ দশটা গেঁহু চারার মাথা কাটে। আমার বাপদাদা ছিলো রোহিলখণ্ডে নবাবের ফৌজে। এক এক কোপে মাথা নিত দুষমনের। আরে ভাই, আমি সেই সিপাহীর ঘোড়া—কুছ না হয় তো থোড়া থোড়া এলেম নিয়ে জন্মেছি জানলে?

চমন নিজে পিণ্ডারী যুদ্ধে নেপাল যুদ্ধে লড়েছে! যোগ্যতা ছিল। তবে চড়ামেজাজের জন্তে উন্নতি হয়নি। সব ছেড়ে ছুড়ে এক সাফাখানার কাঁপার হয়ে তার কি লাভ হলো? বুঝতে পারে না তার গাঁয়ের লোক। প্রতাপের বুড়ী মা শেষদিন অবধি

দুঃখ করে গিয়েছে। চন্দনের বাপ-দাদা ছিলো রোহিলখণ্ডের নবাবের ফৌজে। নবাবের ফৌজে হাবিলদার হয়ে চন্দনের বাপ পয়সা করে নিয়েছিলো।

ফারসী ছাপার আকবরী মোহরে তার চামড়ার গেঁজেটা ভর্তি থাকতো। সকলেই জানতো চিকনরামকে নাড়া দিলে টাকা পড়বে। আর সেও রেশমী জামা পরে নাগরায় রুপোর বোল লাগিয়ে বাহাদুরী দেখিয়ে বেড়াত।

শ্বশুরের গল্প এই পর্য্যায় পর্যন্ত ব'লে চন্দনের বৌ বলতো—ময়ূরের মতন জানলি প্রতাপ ? তোর দাদা ছিলো ঐ রকম। দিমাকটা ছিল কম। ময়ূর কেমন পেখম খুলে বাহার দেখায় ? আর শিকারী কেমন তীর ছুঁড়ে ঘায়েল করে পালক উঠিয়ে নিয়ে বস্তা বাঁধে। ঠিক সেই রকম।

সত্যি সত্যি সেই টাকার লোভেই তার ভাই সিপাহীরা তার গলা দু' খানা করে ফাঁক করলো এক হল্লা ফুর্তির রাতে।

চন্দন সরকারী ফৌজে ঢুকলো যখন সকলেই ভাবলো এবার গুছিয়ে নেবে চন্দন। প্রথমটা একটু অসুবিধে হয়েছিলো। সাহেবদের সঙ্গে মেল'-মেশা করতে, কথাবার্ত্তা বুঝতে। সাহেবদের সঙ্গে কাজ করতে যাবে চন্দন, জেনে থেকে যত শোক বিলাপ করতে বসলো বৌ আর মা, ততই চিন্তিত হলো গাঁয়ের সমাজ। কেশবরামের মামা লছমীনাথ তখন গৈবীনাথের সেবাইত। এদিকে নর্মদায় স্নান করেছে। ওদিকে অমরনাথও দর্শন করে মিঠাই চড়িয়ে এসেছে। কাশীধামে ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে দেখেছে, আবার দ্বারকাপুরীতে ভোগরাগ দেখে নারিকেল প্রসাদ পেয়েছে। তীর্থধামের বিবরণ তার মুখে মুখে। মহা পুণ্যবান মানুষ। সেই এসে বোঝাল চন্দনকে। কম্বলের আসন পেতে পদ্মাসনে বসলো। হাতে রুদ্রাক্ষ জড়িয়ে চোখে মুখে কথা কইলো। বললো—সাহেব লোকদের দেখে এসেছি জব্বলপুর। তাদের কাছে গেলে ধর্ম থাকবে না। তাদের ফৌজে গেলে মুসলমানের সঙ্গে খানাপিনা লাগাতে হবে। পরবের দিনে সাহেব লোক কোরবানি করবে গো-মাতা। আমার চাচেরা ভাই বলেছে। তার ঘর এলাহাবাদ, সেখানে অনেক সাহেব থাকে।

সমবেত জন লছমীনাথের কথা শুনে জিভ কেটে ছি ছি করলো। সায় পেয়ে লছমীনাথ আরো উৎসাহে বললো—আরে ভাই, দেখে এলাম আমি কানপুরে। ব্রহ্মাবর্ত্তে স্নান করতে গিয়েছিলাম। সাহেব লোক বুড়ো বুড়ো সিপাহীকে বলছে উল্লু গাধা। আর বুড়ো-বুড়ো দাড়িওয়ালা সাহেবরা ভূতের মতো পোষাক পরেছে পা পর্যন্ত ঢাকা—গলায় একটা তামার কাঠি ঝুলিয়েছে ফিতের সঙ্গে। আর ঘুরে ঘুরে বলছে—পুতুলপুজো ক'রো না! মহাদেব লছমী ও তেত্রিশকোটি দেবতার কথা মিছে! মেয়েদের বিয়ে দিও না! সাহেবদের সঙ্গে আমাদের কথা ? ওদের মেয়েরা পুরুষের মতো ঘোড়া চ'ড়ে বেড়ায়, মুখ ঢাকে না, মাথা ঢাকে না! সাহেবের ফৌজে গেলে আমাদের জাত-ধর্ম থাকবে না।

তবুও গেল চন্দন। একখানা দরজার মতো বুকের পাটা, হাতের কবজীতে অসম্ভব জোর। ড্রিল প্যারেড শিখে রংরুটদের অনেক দিন কাটে। ভাগ্যক্রমে চন্দন পড়লো কর্ণেল ম্যাকমোহনের নজরে। অনেককে ডিঙিয়ে হলো রেগুলার সিপাহী।

উনবিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক। কোম্পানীসাহেবকে লড়তে হচ্ছে সাল ভোর। সিপাহীর তালকাটি যে বসে বসেই মিলবে, তেমন সুবিধে নেই। যেখানে যেখানে লড়াই করবার অবকাশ হলো, সেখানে চন্দন বীরত্ব দেখালো প্রচুর। আরো কি, ভাগ্যক্রমে সে রয়ে গেল ম্যাকমোহনের রেজিমেণ্টে। তখন সাহেবরা ছিলেন অনেকটা খোলামেলা। নেপালে গিয়ে লড়তে হচ্ছে, পিণ্ডারীদের উৎখাত করতে লড়তে হচ্ছে, আবার বুন্দেলখণ্ডে দুই রাজ্যের মধ্যে মালিকানার ঝগড়া, সেখানে গিয়েও লড়তে হচ্ছে। সব সময় সিপাহীদের সঙ্গে বাস। ম্যাকমোহন চমৎকার হিন্দী শিখেছিলেন। চন্দনের সঙ্গে গল্প করতেন, শিকার করতেন, এমন কি মেলায় গিয়ে পুতুলনাচও দেখেছেন মাথায় কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে। ম্যাকমোহনের ভাগ্নে ব্রাইটের কথা চন্দনের মনে পড়ে। ষোল বছরের ছোকরা। যেমন বদমেজাজ', তেমনই নিষ্ঠুর। রক্তে বেশ খানিকটা ভারতীয় ভেজাল আছে বলেই কালা নেটিভদের ওপর বড্ড রাগ। মামার ওপর তার বেশ তাচ্ছিল্য ছিলো। কি করছে এখন কে জানে! নামকরা কর্ণেল হয়েছে। কানপুরে আছে। জবরদস্ত মেজাজ। গালাগালি না দিয়ে কথা কয় না। ম্যাকমোহন অনুমতি দিয়েছিল বলে সহজ ভাবেই চন্দন ব্রাইটকে ছোটসাব ব'লে ডাকতো। একদিন জঙ্গলে গিয়ে হরিণ মারবে ব্রাইট আর তাকে টিপ শেখাচ্ছে চন্দন, সহসা ব্রাইট ঘুরে দাঁড়ালো। বললো—খবরদার আমাকে ছোটসাব বলো না।

অবাক হয়ে গেল চন্দন। বিশ্রী ইতর কতকগুলো গালি দিয়ে ব্রাইট বললো—আমি ঐ বুড়োর মতো হাবা নয়! তুমি নেটিভ, ব্যবহারে বেশী বেড়ে যেও না। সহ্য করবো না!

চন্দনের সেদিন মনটা বিশ্রীরকম খিঁচড়ে গেল। ব্রাইটের সঙ্গে সেদিন থেকেই সে বেশ খানিকটা তফাৎ রেখে চললো। তবে এই বলে সান্ত্বনা দিলো যে, ব্রাইটের মতো সকলে নয়।

আরো কি, এই ব্রাইটের জন্তেই তার অবনতি হলো। তখন সে রেজিমেণ্টে পে-হাবিলদার। ব্রাইট কোয়ার্টার-মাষ্টার সার্জেণ্ট। ব্রাইটের টাকার দরকার আর মেটে না। হরদম ধার করে সে চন্দনের কাছ থেকে। টাকার দরকার পড়ে বটে ছোকরা সাহেবদের। পে-হাবিলদারের এমনধারা ধার দেওয়া বে-আইনী। তবে আইনের দিকটা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলা হয়। আইনের ঝামেলা তুলে এ বিষয়ে হৈ-চৈ করবে কে ? টাকার দরকার কমাণ্ডার থেকে ব্রিগেডিয়ার, সব সাহেবেরই হয়। তা বিয়ে করলে সাহেবদের টাকা দরকার হয়, তার একটা মানে বোঝে চন্দন। ঘরে আওরৎ আসা মানেই গলায় শেকল পরলো মরদ। যাদের মেম-বৌ জোটে না, তারা সুন্দর দেখে দেশী মেয়ে নিয়ে তাঁবুতে তোলে। কি দিশী বিবি, কি মেমসাহেব, সকলেই গয়না চায়। মাইনেতে কুলোয় না সাহেবদের। শিষ দিতে দিতে ঢুকতেই হয় চন্দনের তাঁবুতে। পালকের কলমে সই করে টাকাটা নিয়ে লুকিয়ে ফেলতে হয় দোষী দোষী মুখ করে।

কিন্তু সে টাকা শোধ হলো না, এমনটি একবারও ঘটেনি। সাহেবরা কথা দিয়ে প্রায়শঃ ভোলে না। সে কথা বলবেই চন্দন। ব্রাইট সকল দিকেই সৃষ্টিছাড়া। আজ একশো, কাল পঁচিশ,—বড় মুস্কিলে পড়লো চন্দন। ম্যাকমোহনকে জানাতে ভরসা হয় না। এদিকে আজকে ব্রাইট জুয়া খেলছে, কাল তার তাঁবুতে ডাক পড়ছে

নাচওয়ালী মেয়েগুলোর। হঠাৎ একেবারে হাজার টাকার ধাক্কায় পড়লো চমন। ব্রাইটের হাতে এক পয়সা নেই। বাধ্য হয়েই কথা তুলতে হলো কর্ণেলের কানে। শুনে ম্যাকমোহন ক্ষেপে গেলেন। ব্রাইটের হয়ে টাকাটা তাঁকেই দিতে হলো, কিন্তু ফৌজী কানুনের বিরোধিতা করেছে চমন, তাকেও ক্ষমা করতে পারলেন না। ব্রাইট তাঁর পুত্রস্থানীয়। তাঁর উত্তরাধিকারী। কিন্তু তাই বলে তার অন্যায়ের প্রশ্রয়ই বা তিনি দেবেন কি করে? কোর্ট মার্শালে চমনের হলো অবনতি। টাকা ফেরৎ দেবার সময় বেঁধে দেওয়া হলো চমনকে। কাগজে-কলমে ব্রাইটকে ধরা গেল না। তার সই কোথাও ছিল না।

ম্যাকমোহনের ওপর চমনের রাগ নেই। নিজের পুঁজিপাটা এনে বৃদ্ধ চমনের হয়ে টাকা ফেরৎ দিলেন। উন্নতির খাতায় লাল ঢ্যারা পড়লো চমনের নামের পাশে। ব্রাইটের তলব পড়লো ম্যাকমোহনের সঙ্গে একলা শিকারে যাবার। মামাভাগ্নের মুলাকাতটা কি রকম হয় জানতে উৎসুক ছিলো সবাই। হাতে রুমাল বেঁধে ব্রাইট ফিরলো মুখ লাল, চুল উস্কোখুস্কো করে। আর ম্যাকমোহন? তাঁর বিমূঢ় দৃষ্টি। কপালে একটা আঘাতের চিহ্ন। এমন ভাবে ফিরলেন, যেন পায়ের তলায় মাটি পাচ্ছেন না।

বদলী হয়ে গেল ব্রাইট। শোনা গেল উইল বদলিয়েছেন ম্যাকমোহন। টাকা পয়সা দিয়ে যাচ্ছেন কানপুরের অনাথ ক্রীশ্চান ছেলেমেয়েদের এক প্রতিষ্ঠানে। চমনের সঙ্গে সহজ ব্যবহারে ঠিক যে বাধা পড়লো তা নয়, তবে স্পষ্টই বুঝতো চমন, মনে আঘাত পেয়েছেন সাহেব নিষিদ্ধ মাংসখেকো ম্লেচ্ছটার ব্যবহারে। হাজার হলেও বোনের ছেলে। একদিন বন্দুকের নল পরিষ্কার করতে করতে চমনকে বলেও ফেললেন, কতকটা আত্মগত ভাবেই—কি জানো, মানুষ শুধু চেষ্টাই করতে পারে, তবে ফলাফলের আশা করতে নেই। কখনো গীতা শুনেছ?

সাহেবের মুখে রামায়ণ মহাভারত গীতার কথা শুনে শুনে তাজ্জব চমন। সে শুধু রামজী সীতাজীর কহানী জানে। রামলীলা আর দশেরা ছাড়া ধর্মপাটের সঙ্গে যোগ নেই।

তেমন সাহেব আর হবে না। বুড়োর ওপর রাগ নেই চমনের। তবু ফৌজীকানুনকে মনে হলো অবিচার। দোষী যে, সে মনের সুখে রইলো। পর-পর উন্নতি হলো। ভুগে মরলো নিজে। নিঃসন্দেহে সে কমবখৎ হতভাগ্য। তাই পেনসন হবার আগেই আধা পেনশান নিয়ে সে সরে পড়লো। কর্ণেল ম্যাকমোহন নিজের সুনাম বিপন্ন করেও কোর্টমার্শালে দাঁড়ানো দোষী চমনকে সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। হলো এই সাফাখানা কীপারের চাকরী। এখানে যে কীপার থাকবে, তার শিকারের অভিজ্ঞতা থাকলে ভাল হয়। কেন না আশে-পাশে কুমায়ুনের জঙ্গল। সাহেবরা নৈনীতাল-মুসৌরী যাবার পথে এই চমৎকার ডাকবাংলোটিতে দু' রাত থাকেন, ডাক্তারের অতিথি হয়ে। তাঁদের জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত। এখানে হণ্ট করা মানেই শিকার খেলতে যাওয়া। আর কি চমৎকার জায়গা! শিকারের পক্ষে উৎকৃষ্ট। ম্যাকমোহন চমনের সম্পর্কে লিখলেন,—'As far as 'Shikar' is concerned, there is not, ( to my knowledge ), a second person to replace him. He has learned his ways in a jungle. (Martindale will vouchsafe to his Nepaul exploits). He knows how to handle a gun. Moreover, he is a perfect sportsman. I consider him one of the best amongst the ex-service men ( both European and Native ).'

কথায়-বার্তায় কোনদিনও সাহেবের উচ্ছ্বাস ছিলো না। সার্টিফিকেটটি মোটা কাগজের লেফাফায় মুড়ে হাতে দিয়ে বললেন—এবার আমি যাব। তুমি অনেক দিন ধরে আমাকে লোভ দেখিয়েছ হিমালয়ের ভালুকের। আর কাশ্মীরী হরিণ? সেই বাজির কথা নিশ্চয় ভুলে যাওনি?

চমন চলে যাবার সময়েও রোদে-পোড়া জলে-ভেজা তামাটে মুখখানা কুঁচকে হাসতে লাগলেন। বললেন—যাও। আপনা ঘর মেঁ ঘি কে দিয়া জ্বালাও। অর্থাৎ তুমি তৈরী হও। অতিথি হয়ে আমি যাচ্ছি।

খাকী সার্ট-প্যাণ্ট আর পট্টিবাঁধা পায়ে ভারী জুতো পরে চমন এই জীবনটায় চমৎকার খাপ খেয়ে গেল। মাইনে আট টাকা। তা সিপাহী হয়েও তো কত বছর সেই সাত টাকাতেই ঘষতে হয়েছিল? মন্দ পুষিয়ে যায় না। সাফখানা থেকে একটু-আধটু মলমপট্টির বিনিময়ে গ্রামবাসীরা দুধ, মধু, মাছ ইত্যাদি আনে। মাঝে মাঝে গাদাবন্দুকে পলতে লাগিয়ে চমন হরিণ মারে। মাংস ভাগ বাঁটোয়ারা হয়। তা ছাড়া সাহেবদের কাছে চামড়া বা শিং বিক্রী করেও যে কিছু হয় না তা নয়। গাঁয়ে গেলে আর ভাল লাগে না চমনের। কি নিস্তরঙ্গ জীবন! ছেলের জীবনযাত্রা তার পছন্দ নয়। শুধু কলাই গম বাজরার গল্প। দর কখনও তেজী, কখনও মন্দা, শুধু সংসারের কথা তবে নাতির প'রে তার টানটা অসম্ভব। বৌ ঘোমটা দিয়ে শশুরের পায়ে তেল দিতে দিতে বলে—আর কাজ করবার দরকার কি? আপনাকে সেবা করতে পারলাম না, আমার ভাগ্যই বা কেন এমন হলো! কবে ছেড়ে আসবেন?

—হবে হবে। ব'লে বুঝ দেয় চমন। বলে—এখনও কাজ করতে পারছি, কাজ করে নিই। তারপর তো তোমাদের ভরসাতেই চলে আসব বেটি।

সকালে চমন ডন বৈঠকী দেয় আর দুধ-ছোলা খায়। চন্দনকে নিয়ে নদীতে স্নান করতে যায় আর বলে—মরদ হবি তো ফৌজে যাবি নাম লিখাবি। নিয়ে যাব কর্ণেল সাহেবের কাছে। বাপ রে —এই হাতীর মতো মানুষ, সুরজদেবের মতো লাল রঙ, গলার আওয়াজে শেরও ভেগে যায়। দিয়ে দেবে সার্টিফিকিট, চলে যাবি ফৌজে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে বালক। চমন বলে—ড্রিল করবি, লেফ্‌ট রাইট—প্যারেড করবি—চলবি কুচে, বাপ রে! লড়াই করবি, দম্ দম্ কামান ছুটবে, ঝম্‌ঝম্ উর্দি বাজবে—দেখবি!

এই সব ব'লে চমন জলে তিন ডুব দিয়ে লোটা ভরে জল নিয়ে উঠে বলতে বলতে চলে বাড়ীর দিকে—

রাম রাম সীতারাম প্রেমসে বোলো সীতারাম
এক নাম রাম বোলো পুরা করো জনমকে কাম।

বাড়ী ফিরে গরম দুধ মিছরী খেয়ে চৌকিতে বসে বসে আর্শী ধরে চুল ফেরায় চমন। টিকি বাঁধে। তখন চন্দন বলে—বড়

হ'তে আর কত দিন আছে দাদা? চন্দন হা-হা ক'রে হাসে। বলে—এ দুর্গা! এ বিটিয়া!

—পিতাজী! ব'লে সাড়া দিয়ে এসে দাঁড়ায় দুর্গা। শশুর বলে—আরে চন্দন যে চললো আমার সঙ্গে! চন্দনও সিপাহী বনতে চায়!

হেসে চলে যায় দুর্গা। কিন্তু চন্দনের মাথা থেকে চিন্তাটা যায় না।

এবার চম্পাকে নিয়ে গোলমাল হলে পরে যখন চন্দন এলো চন্দনের কাছে, তখন চন্দন সব শুনলো একটু একটু ক'রে। প্রথমে নয়। তেজী ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে এলো চন্দন। সুন্দর কিশোর মুখে বিদ্রোহের ভাব। পনেরো বছর বয়েস। কাঁধ ইতিমধ্যেই চওড়া হয়ে উঠেছে। এক পেটি কাঁধে ঝোলানো তাতে জামাকাপড়। কি হয়েছে না হয়েছে কিছু বললো না। তবে বিদ্রোহের ভাব পরিস্ফুট।

সঙ্গে এসেছিল যে মানুষ তার মুখেই সব শুনলো চন্দন। শুনে রাগে যত না হোক, বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হ'য়ে মেঝেতে থুথু ফেললো। এরকম কথা কে কবে শুনেছে? থাকে বটে এক একটা মেয়ে। বদ নসীব নিয়েই তারা আসে। সেই ছয় দিনের দিন রাতে, নবজাতকের যখন ছয় দিন বয়েস, তখন দরজার গোড়ায় তিলুয়া, ঘি, গুড়, জ্বলন্ত প্রদীপ রাখতে হয়। কেন না কে না জানে, সেই রাতে লছমীমাঈ নবজাতকের কপালে লিখে দিয়ে যান? সেবা নেন, প্রসাদ করেন, তারপর লিখে দিয়ে যান, কার কপালে কতটুকু সুখ-দুঃখ জুটবে। চম্পার কপালে যে এত দুঃখ লিখে দিয়েছেন তা কে জানে না? আর সেই মেয়েটার সঙ্গেই চন্দনের বিয়ে দেবার মতলব করেছে সুরজ? অনন্তের বৌ? নিশ্চয় করেছে। নইলে মেয়ে এত বড় হলো, সে বিয়ে দেয় না কেন? ও মা, মেয়েকে পতিতই বা করে না কেন গাঁয়ের সমাজ? চন্দন ভাবলো কেশবরামের ধড়ের ওপর মাথাটা ফাঁপা। এখনকার পুরুষগুলোও যেন না-মরদ। এই কেশবরামের মামা লছমীনাথ কি কম তেজস্বী ছিলো? না ঘাড়ে রোখ চাপলে সে কারু পরোয়া করতো? চন্দনের মনে নেই হাবিলদার শোভালালের কথা? পুরোন রোখ ছিল বলে কি রকম ক'রে লছমীনাথ তাকে পতিত করলো সামান্য কারণে? লড়াইয়ের সময়ে যমুনা পার হয়েছিলো শোভালালের দল। গল্পচ্ছলে প্রকাশ পেলো লড়াইয়ের ভুয়োখবর পেয়ে তারা যখন তাড়াহুড়ো ক'রে নৌকোয় উঠলো, তাদের সঙ্গে এক ভিস্তিও উঠলো।

এই কথা শুনে লছমীনাথ চোখ লাল ক'রে জাহির করলো কি, ভিস্তি, নিশ্চয় মুসলমান ছিল। তার মশক তবে কিসের চামড়ার ছিলো? শোভালাল বড়ই বিপন্ন হলো। মোটা, বেঁটে, ভালমানুষ শোভালালের মুখখানা মনে পড়লে আজও চন্দনের হাসি পায়। সে বেচারী যতই বোঝাতে চেষ্টা করলো, যে গোঁড়া হিন্দু হাবিলদারের ভিস্তি, সেও হিন্দু, এক নৌকোয় গিয়েছিলো ব'লে কি হলো? লছমীনাথ চোখ বুজে জয় বাবা গৈবীশ্বর, রাম রাম জপতে লাগলো। বিপন্ন হয়ে শোভালাল লছমীনাথের পায়ে পড়লো আর লছমীনাথ লাফিয়ে উঠে—সত্যনাশ হো গিয়া ধর্মনাশ হো গিয়া, ব'লে হুলুস্থুল কাণ্ড করলো। তারপর আর কি? পুনর্বার পঞ্চায়েৎ। ভরা আসরে লছমীনাথের ফৌজে যোগদানে ধর্মনাশের আশু সম্ভাবনা সম্পর্কে বিরাট গলাবাজি। আলোচনার সূত্র ধরে আরো আরো পাপীদের টেনে আনা হলো। শোভালাল ভাবলো, মরেছি যখন, একলা কেন একসঙ্গে মরি। সব টেনে জড়িয়ে নিই। সে তখন আরো আরো সঙ্গী-সাথীদের নাম প্রকাশ করলে। লছমীনাথের আনন্দ আর ধরে না। প্রায়শ্চিত্তের এক লম্বা ফর্দ সে ধরে দিলো। অনেক টাকা দিতে হলো লছমীনাথকে। তবে সব জাতে উঠলো। জল-চল হলো।

এদের কি সে হিম্মত আছে? চম্পা আর তার মাকে গাঁ থেকে তাড়ালেই বা কি? বুঝতে পারে না চন্দন। তার জন্মকালের অভিজ্ঞতায় এ রকম কোন পরিস্থিতিতে সে পড়েনি। একবার ভাবে বেদম প্রহার দেয় ছেলেটাকে। আবার ভাবে জন্ম থেকে ওকে ওর বাপ-মা কোন দিন মার-ধোর করেনি? এখন মারতে গেলে কি আর মানবে তাকে? বড় মুস্কিলে পড়লো বুড়ো। ফৌজের গল্প আর লড়াইয়ের কীর্তি কাহিনীর বস্তা খুলে ধরে দেখলো, তাতে আর চন্দনের আগ্রহ নেই। কি করে যে আবার সেই ছোটবেলার মতো সহজ সরল সম্পর্কটা ফিরিয়ে আনা যায় কে বলবে? হঠাৎ দুর্বোধ্য হয়ে ওঠার জন্যে নাতির ওপরেও রাগ হলো। নিজে বিড়বিড় করে বৌয়ের বংশ তুলে গালি দিলো। নিঃসন্দেহে এ সব এসেছে মাতুল-বংশ থেকে। তার বংশে তো কোন গলদ নেই? কারণ খুঁজতে খুঁজতে মনে হলো হ্যাঁ। বৌয়ের বাপের বাড়ীর ব্যাপারটা সত্যিই গোলমেলে। সেই পাটোয়ারী ভাই দুটো কেমন কুটিল আর ধূর্ত দেখতে?

সাত-পাঁচ ভেবে কিছু না বলাই সমীচীন বোধ করলো চন্দন।

চন্দনের দাদার ডিউটি থাকে টাইম বেঁধে। চন্দন তাই অনেকখানি সময় পেলো। প্রথমটা এসেছিলো সন্দেহ মনে নিয়ে, এক রোখা ভাবে। কিন্তু দাদা কিছুই বললো না! শাসনের চেষ্টাও করলো না। আর গাঁয়ের অন্যান্য বুড়োদের মতো ঝুড়ি ঝুড়ি আজে বাজে উপদেশও দিলো না। দিলে তার শ্রদ্ধা ভক্তি চ'টে যেতো। তার মার মতো হাঁউমাউ করে কান্নাকাটি গালাগালি যে করবে না দাদা, সে ত জানতোই চন্দন। কিন্তু এমনিধারা নীরবতাও সে আশা করেনি। এবার তার শ্রদ্ধাটা ভালো ক'রে কায়েম হলো। হাজার হলেও ফৌজী মানুষ। তার দাদা একটা মানুষের মতো মানুষ।

সাহেবদের সম্পর্কে এত গল্প শুনেছে চন্দন। দেখলো সাহেবরাও তার দাদাকে খাতির করে। দুই জন সাহেব এসেছিলো নৈনীতালের পথে। শিকার বিষয়ে তারা দাদার সঙ্গে রীতিমতো আলোচনা করলো। সব শুনলো। ছোকরা সাহেবটি বললো—ফিরতি পথে বাঘ আমার একটা চাই-ই চাই।

চন্দনের রেখাঙ্কিত মুখে অভিজ্ঞ শিকারীর হাসি ভেঙে পড়লো। বললো—সাহেব শের শিকারে নসীবটাই সব। হুজুরের নসীবে থাকে তো শের আপনার মিলবেই। আর যদি নসীব বেইমান হয় তো সামনে শের রয়েছে আপনার চোখে পড়বে না। আর সব জানোয়ারের সেরা হচ্ছে শের। তার হুঁসিয়ারীর সঙ্গে টেক্কা দিতে অনেক বুদ্ধি খেলাতে হয়। আবার এমন মানুষও আছে যার সামনে শের এক পলকে চলে আসে।

শেষ অবধি চন্দন জবনা দিলো বাধ না হোক, ভালো সম্বর একটা সে দেবে সাহেবকে।

দাদার সঙ্গে সাহেবদের শিকারে সাহায্য করতে মন্দ লাগলো না চন্দনের। যংকুট হয়ে বোকার মতো সে অনেকদিন ঘষতে চায় না। চটপট হাবিলদার হতে চায়, আর আশ্চর্য, কোন কৃতিত্ব দেখিয়ে যদি একেবারে সুবাদার হয়ে বসতে পারে তাহ'লে তো কথাই নেই। ইতিমধ্যে বন্দুক কাঁধে রেখে অভ্যেস করা, বন্দুকের ধাক্কা সহ্য করা, এই সবের মহড়া চলতে লাগলো। চন্দনকে স্বীকার করতেই হলো যে নাতি একজন পাকা বাহাদুর। একজন জঙ্গী জোয়ান।

দু'জনের মধ্যে একবারও গ্রামের কথা বা চম্পার প্রসঙ্গ উঠলো না। চম্পা নামে যে কোন মানুষের সঙ্গে চন্দনের পরিচয় আছে, তা মনে হলো না। চন্দন খুসী হলো। ভাবলো ঘাড় থেকে ভূত নেমেছে ছেলেটার।

কিন্তু বিস্মরণ অত সহজ কি? আর এই রকম তাজা বেপরোয়া মন কি ভুলতে পারে? ষোল বছরের কিশোর-মন আহরণ করে। চারি পাশ থেকে আহরণ করে বেড়ে ওঠে। বয়ঃসন্ধির এক আশ্চর্য গোধূলি মুহূর্তে, মন যখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছে, তখনই পরিবারবর্গ আর গ্রামবাসীর নির্বোধ ব্যবহারে চন্দন চম্পার সম্পর্কে ধাক্কা খেয়ে সচেতন হলো। আর এ-ও বুঝলো যে, এ প্রসঙ্গের আলোচনা কেউ সহ্য করবে না। সামান্য কথা দশজনের কানাকানিতে হয়ে উঠবে একটা মস্ত কিছু।

এখানে অরণ্যভূমির শোভা অপরূপ! হিমালয়ের এই অধিত্যকায় ঋতু পরিবর্তনে রাজসমারোহ নামে। ফল-ফুলের প্রাচুর্য-সম্ভার। শীত সমাগমে লাল ও হলদে পাতাগুলি ঝরিয়ে ফেলবার দৃশ্যও অপূর্ব! জঙ্গলের পথে ফিরতে ফিরতে সহসা এক দিন জানোয়ারের নৈশ জলপানের জায়গা আবিষ্কার করলো চন্দন। সুঁড়িপথ এসে নেমেছে কাকচক্ষু জলের কোলে। সেই পথে নানা আরণ্যক প্রাণীর পায়ের ছাপ। একটি চিত্তল হরিণ জল খাচ্ছিলো আর চকিত তাকাচ্ছিলো এদিকে-ওদিকে। কোমল দেহ। সাদা সাদা ফুট। কান খাড়া করে কোনো শব্দ আসে কি না আসে শুনছিলো চিত্তল। চন্দনের পায়ের চাপে মট্ করে শুকনো একটা ডাল ভাঙলো আর এক নিমেষে গতিভঙ্গীতে লীলায়িত একটি রেখা সৃজন করে অদৃশ্য হয়ে গেল হরিণ। বনজামের নিচু ডালে বসেছিলো একটা ময়ূর। কি মনে ক'রে ঘাড় বাঁকিয়ে সে-ও ডেকে উঠলো। আবার সব চুপচাপ। সুন্‌সান্ নিস্তব্ধ। জামগাছের বেগুনী রঙের ফুল টুপটাপ ক'রে পড়ছে জলে তা-ও শোনা যাচ্ছে। হরিণটা যেখানে মুখ ডুবিয়েছিলো, সেখানে জলে চক্রাকার রেখা শির-শির করে কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে ভেঙে মিলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করে চম্পার জন্যে মন খারাপ হয়ে গেল চন্দনের। নদী পেরিয়ে ওপারের জঙ্গলে দু'জনে কতদিন গিয়েছে। সেখানে এমনি চকিত চোখে হরিণ-শিশুকে দেখে চন্দন ভেবেছে, এক দিন ঠিক ধরবে বনের হরিণ। চম্পাদের আঙিনায় কচি বাজরার শীষ এনে খাওয়াবে বন্দীকে।

এত দূরে চলে এসে আর এমন নিঃসঙ্গ অবকাশে অনেক কথা মনে হয় চন্দনের। মনের আকাশটাও যেন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। এত দিনের পরিচিত রঙ ছাড়াও দূরান্তের অচেনা রঙের হাতছানিও সে আকাশে দেখা যায়। সেই আকাশের পটভূমিকায় সুন্দর ও করুণ একটি তারার মতোই মনে হয় চম্পাকে। হঠাৎ মনটা ব্যথিত হয়েছে চম্পার জন্যে।

এখন যেন চন্দন আবছা বোঝে, চম্পাদের ঘরের চালে খড় ছিলো না। চম্পার আঙিনায় তালিমারা থাকতো। চম্পার মা তাদেরই আঙিনায় বসে নিমগাছের ছায়ায় জাঁতা ঘুরিয়ে ডাল পিষেছে কত দুপুর ধরে। আর চম্পা? চন্দনের মনে পড়ে কত দুপুরে চম্পা খেতে যায়নি ঘরে। হেসে বলেছে—জানো না? ছট্ পুজোর আগের দিন বুঝি খেতে আছে?

আরো মনে পড়ে কত, কত দিন যখন তারা সবাই মিলে মেলা দেখতে গিয়েছে, হাটে গিয়েছে, নদী পেরিয়ে, তখন চম্পা কেমন একলা বটগাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকতো। ছেঁড়া কাপড় কাটিতে জড়িয়ে পুতুল বানিয়ে খেলতো চম্পা। চম্পারা বড় গরীব।

আরো মনে হয়, চম্পার কেউ নেই। চম্পা বড় একা। মনটা খারাপ হয়ে যায় চন্দনের। এই বন-জঙ্গলে নতুন পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে যে আনন্দ হয়েছিলো, তার সুর কেটে যায়। অনেক কথা মনে হয় না। মনে হয় শুধু একখানা ছবি। অনেক কথাবার্তা অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে। চলে আসবার কথাবার্তা ঠিক। বট গাছটার ঝুরি ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে, আর হাতে একটা কি যেন গুঁজে দিয়ে ছুটে চলে গেল চম্পা। তারই একখানা ছুরি। একদিন বুঝি লুকিয়ে রেখেছিল চম্পা তাকে জব্দ করবে বলে। এখন চন্দনের মনে হলো গাছপালার আলো-ছায়া মাখা ভরা দুপুরের রাস্তা দিয়ে কেমন একলা মেয়ে ছুটে চলে যাচ্ছিলো চম্পা। কেমন ছোট আর একলা দেখাচ্ছিলো তখন। [ ক্রমশঃ।

## নাম

[ *S. T. Coleridge*-এর "NAME" কবিতার অনুকরণ ]

একদা সুদিনে প্রিয়ার করিনু জিজ্ঞাসা
কি নামে ডাকিবো তোমা কাব্য-গীতে আশা
শ্রুতি বা পুরাণোক্ত কী মধুর নামে
পার্বতী, পঙ্কজা, বাণী
সীতা, শান্তা, রাধারাণী
শ্রমতি, সুমনা, সুধা, সুনন্দা, সুদামে?

শুনিয়া সুন্দরী মোর উত্তরিলো "হায়,
নামের কী মূল্য প্রিয় শূন্যে যা মিলায়
যা তোমার ছন্দে খাপে করো নির্বাচন
ডাকো মোরে ইন্দু-ইলা
ডাকো শশি, বিন্দু, লীলা
'শুধুই তোমার' বলি ডাকো অনুক্ষণ।"

অনুবাদ: শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার।

(উপন্যাস)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নীলিমা দাশগুপ্ত

সুপ্রিয় অনেক যোগ-বিয়োগ হিসেব ক'রে মীনাক্ষীর কাছে দুপুরে এসেছে আজ। এ সময় সুবর্ণবালা ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে থাকেন, তা জানে সুপ্রিয়। স্কুল-ফাইন্যালের ফল বার হয়নি এখনও, দেরী আছে, কিন্তু সুপ্রিয় তার ছাত্রীদের খবর যোগাড় করেছে ভেতর থেকে, দু'জনেই পাশ করেছে···সুমনা থার্ড ডিভিশনে, মীনাক্ষী কিন্তু সেকেণ্ড ডিভিশনে পাশ করেছে। মীনাক্ষীর সংবাদে সুপ্রিয় বিস্মিত হ'য়েছে যত, তত আনন্দ পেয়েছে। কাল বিকেলে খবরটা পেয়েই মীনাক্ষীদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলো সুপ্রিয়, তারপর আবার ফিরে গিয়েছে, অপেক্ষা করেছে আজকের দুপুরের জন্য। সুপ্রিয়র বরাত ভাল আজ। দরজার কড়া নাড়তেই যে দরজা খুলে দিলো, সে মীনাক্ষী। আনন্দ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো মীনা—মাষ্টার মশাই, আজ আপনাকে মনে মনে আমি ভয়ানক ডাকছিলুম—

কেন, বিয়ের নেমন্তন্ন করবে বুঝি? ঘরে ঢুকে চপল গলায় বললে সুপ্রিয়।

ধ্যেৎ, আজ বাড়িতে কেউ নেই তাই—খুব মজা ক'রে গল্প করা যাবে।

হাসিমুখে সুপ্রিয় প্রশ্ন করলো, কোথায় গেছেন সকলে?

মীনাক্ষী বললো, দাদু আর দিদাই গেছেন দক্ষিণেশ্বরে আর মা গেছেন ডি-এস-পি সোমেনের বাড়িতে, তাকে ছোটোজামাই হিসেবে পাকড়াতে। খিল-খিল ক'রে ঝংকার তুলে হেসে উঠলো মীনাক্ষী, তারপর সদর দরজায় খিল দিয়ে সুপ্রিয়কে ডেকে নিয়ে ওপরে ওর পড়ার ঘরে এলো। হুড় হুড় ক'রে চেয়ারটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললো, মাষ্টারমশাই, বসুন। আচ্ছা, আপনাকে আমি মনে মনে ডাকছি কী ক'রে তা বুঝলেন বলুন তো? চোখ-মুখ উজ্জ্বল ক'রে সুপ্রিয়র দিকে তাকালো মীনা।

সুপ্রিয় হাসলো—মীনাক্ষী, তুমি কী বড় হবে না?

কেন, আমি কী ছোটো আছি নাকি?

শুধু ছোটো নয়, ভয়ানক ছেলেমানুষ—

ছেলেমানুষ! ওদিকে মা যে সব সময় বলেন, আমি এখন বড় হ'য়েছি—এ কোরো না, সে কোরো না, তা কোরো না—মীনাক্ষীর চোখে সরল বিস্ময়। মীনাক্ষীর শরীরের দিকে চোখ রেখে অল্প একটু হাসলো সুপ্রিয়, মস্ত একটা সুখবর নিয়ে এসেছি মীনাক্ষী, কি খাওয়াবে আগে বল?'

মীনাক্ষীকে বিন্দুমাত্র আর চিন্তা করবার অবসর না দিয়েই, তারপর বলে ফেললো সুপ্রিয়, তুমি সেকেণ্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছো।

আনন্দে বাচ্চা মেয়ের মত লাফিয়ে উঠলো মীনা।

সত্যি মাষ্টারমশাই? উঃ! কী ভয়ানক মজা! যাক বাবা, একটা মস্ত ফাঁড়া কাটলো, এবার আমি খুব মন দিয়ে পড়াশুনোয় লেগে যাব—বি-এ পাশ আমাকে করতেই হবে, আর ফাঁকি নয়। সুপ্রিয় মীনাক্ষীর উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে আবার হাসলো।

আর অমন ফাঁড়া তোমার আসবে না মীনাক্ষী, তার আগেই তোমার মা'র চেষ্টায় তুমি আর একটা বিয়ে পাশ ক'রে ফেলবে।

মীনাক্ষী মুখ লাল ক'রে বললো, কী-ই যে বলেন, আমি আর কাউকে বিয়ে কচ্ছি আর কি—

তবে কা'কে? সুপ্রিয় কৌতুক-চোখে তাকালো মীনাক্ষীর দিকে।

ওমা! এমন সুখবরটা দিলেন, আর আপনাকে খালিমুখে বসিয়েই রেখেছি—ছুট দিলো মীনা।

সুপ্রিয় মনে মনে ভাবলো, বাজে কথা না বললে মীনাক্ষী পালাতো না, গল্প করা যেত বেশ, খাবার আনার আগেই হয়তো সুবর্ণবালা এসে যাবেন। কী বিশ্রী অনুসন্ধিৎসু চাউনি ভদ্রমহিলার! সুপ্রিয়র মত স্পষ্টবক্তাও কথার খেই হারিয়ে ফেলে ওঁর সামনে, ভেতরে ভেতরে ঘামতে থাকে পর্যন্ত। বেজার বেজার মুখ ক'রে টেবিলের একপাশ থেকে বাসী খবরের কাগজখানাই হাতে তুলে নিলে সুপ্রিয়। ডানহাতে একটা রেকাবীতে ডবলডিমের মামলেট আর দুটো টোষ্ট নিয়ে, আর বাঁহাতে জলের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলো মীনাক্ষী। মীনাক্ষীর অতি উত্তাপ-ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলো সুপ্রিয়। দুপুরের গরমে আর উনুনের আঁচে মুখ টকটকে লাল, কিন্তু, সেজন্য নয়, মুখের ভাবটা হঠাৎ কেমন একরকম করুণ দেখাচ্ছে।

সুপ্রিয়র অবাক চোখের দিকে তাকিয়ে, সুপ্রিয়কে কোনো প্রশ্ন করবার অবকাশ না দিয়েই মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, আপনার মিষ্টি খাওয়া আর একদিন পাওনা রইলো মাষ্টারমশাই, বাড়িতে এখন ঠাকুর-চাকর পর্যন্ত নেই।

মীনাক্ষী, তুমি এত ফর্মাল! আমি কী সত্যি এখন খেতে চেয়েছি? দেখো তো তোমার মুখের চেহারা কেমন হয়েছে?

ও কিছু নয়, মীনাক্ষী রেকাবীটা টেবিলের ওপর রেখে যেই জলের গ্লাসটা রাখতে গেছে, অসাবধানে বাঁহাতের ঝোলানো কাপড়টা উঠে গেছে একটু, সে দিকে চোখ পড়তেই সুপ্রিয়র গলা দিয়ে অস্ফুট একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, এ কি! মীনাক্ষীর বাঁহাতে প্রায় দু' ইঞ্চি মত সদ্য একটা ফোস্কা। জলের গ্লাসটা নামিয়ে তাড়াতাড়ি

আবার বাঁহাতটা ঢেকে ফেলেছে মীনাক্ষী, কিছু না মাষ্টারমশাই, একটুখানি ঘিয়ের ছিটে লেগেছে হাতে।

চেয়ার ঠেলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো সুপ্রিয়, মীনাক্ষীর সামনে এসে সন্তর্পণে হাতের কাপড়টা সরিয়ে ফোস্কাটা দেখলো, আচ্ছা মীনাক্ষী, এতক্ষণ একটু নারকেল তেলও কী লাগাতে পারনি? এতবড় ফোস্কা পড়তো না তাহলে। বাড়িতে বার্ণল নেই?

মীনাক্ষী ঘাড় নাড়লো।

যাও, শীগগির, নারকেল তেল আর একটু ময়দা নিয়ে এসো—

মীনা একটু কুণ্ঠিত গলায় বললো, আনছি। কিন্তু আপনি ওটুকু খেয়ে নিন, মামলেট একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।

হোক্, সুপ্রিয়র গলা কঠিন শোনালো, দেরী করো না, যাও—

প্রতিবাদ করলো না মীনাক্ষী। নারকেল তেলের বোতল আর কাগজে করে একটু ময়দা নিয়ে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো। মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকালো সুপ্রিয়, হাসছো যে, জ্বালা করছে না?

করছে, একটু-একটু। ঠাকুর এসে গেছে কিনা, আমাকে ময়দা আনতে দেখে জিগ্যেস করলো, মীনুদিদি, ময়দা দিয়ে করবে কী? আঠা? দাও, আমিই আঠা বানিয়ে দেই। তাই ঠাকুরের কথা শুনে হাসছি।

আর হাসে না, এদিকে এসো তাড়াতাড়ি—সুপ্রিয় নিজের বাঁ হাতের তালুতে একটু ময়দা নিয়ে তার ওপর অল্প একটু নারকেল তেল ঢেলে নিয়ে মলমের মত বানালো, তার পর ধীরে ধীরে অত্যন্ত মমতার সঙ্গে মীনাক্ষীর ফোস্কার ওপর লাগিয়ে দিতে লাগলো। আরামের নিশ্বাস ফেললো মীনাক্ষী, আঃ! একদম আর জ্বালা নেই।

হুঁ। সুপ্রিয়র মুখে হঠাৎ গাম্ভীর্য নামলো, মলম লাগাতে লাগাতেই বললো, মীনাক্ষী, আমি তোমার মঙ্গল চাই, সেজন্য—

আমিও আপনার—কথার শেষ না শুনেই জবাব দিলো মীনা।

সুপ্রিয়র গাম্ভীর্য রইলো না, হেসে ফেললো, শোনো মীনাক্ষী, মা'র অবাধ্য হ'তে হয় না, পৃথিবীতে মা'র মত—

এ কথা আমি বইতে পড়েছি মাষ্টারমশাই।

সুপ্রিয় আবার গম্ভীর হ'তে চেষ্টা করলো, ছেলেমানুষি করো না মীনাক্ষী, আমার কয়েকটা কথা শোনো, তুমি কেবল অবাস্তব সোনালী স্বপ্ন দেখে চলেছো। মা'র সঙ্গে কোনো কিছু নিয়ে মন কষাকষি করো না। পৃথিবীর রূঢ়তা থেকে তোমাকে আড়াল ক'রে রাখতে হলে সব দিক দিয়ে একজন খুব শক্ত মানুষের দরকার।

মীনাক্ষী লজ্জা ভুলে প্রশ্ন করে বসলো, আপনি শক্ত নয়?

উত্তর দিতে একটু দেরী হলো সুপ্রিয়র, তার পর ধীরে ধীরে বললো, শারীরিক অর্থে আমি খুব মজবুত বটে, কিন্তু আর্থিক শক্তিতে আমি একেবারে দুর্বল, খুবই দুর্বল—

আর মানসিক?

সুপ্রিয় বিস্মিত হ'য়ে মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকালো। এতো খুব অপরিণত মনের কথা নয়। দেখলো, মীনাক্ষী জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে। সুপ্রিয় চেষ্টা ক'রে হাসলো একটু, মীনাক্ষী মানসিক শক্তির ওজনটা আমার ভেবে দেখা হয়নি।

আমার ভাবা হ'য়ে গেছে, আপনি এবার ভাবুন—মীনাক্ষী মুখ ঘুরিয়ে চোখ রাখলো জানলার বাইরে।

আশ্চর্য বিস্ময়ে সুপ্রিয় মীনাক্ষীর আপাদমস্তক তাকালো একবার। মীনাক্ষীর বাঁ হাতখানা সুপ্রিয়র হাতের মধ্যেই ধরা ছিলো এতক্ষণ, আলতো একটু চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে হাতখানা ছেড়ে দিলো। খুব আবছাগলায় ডাকলো, মীনা শোনো! এদিকে চাও।

মীনাক্ষী মুখ ফিরিয়ে সুপ্রিয়র দিকে তাকালো, তোমার এ কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে মীনাক্ষী, কিন্তু, শোনো মীনা, সুপ্রিয়র কণ্ঠস্বর কিছুটা বা ভারি কিছুটা বা উচ্ছল শোনাচ্ছিলো, সেটাকে একেবারে তাড়িয়ে লঘুগলায় বললো, গরীবের ঘরণী হলে রান্নাবাড়া সমস্ত কাজকর্ম নিজের হাতে করতে হয়, তা জানো তো? ডিমের অমলেট ভাজতে গিয়ে হাতের অবস্থাখানা যা করে বসেছো, তাহলে তো মাসের অর্দ্ধেক দিন আমাকে না খেয়েই অফিস যেতে হবে'।'

এবার মীনাক্ষী অনেকক্ষণ ধরে হাসলো, আপনি বুঝি এই জন্ম ভয় পেয়েছেন? আমি হাত পোড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে সেকথা ভেবেছি, কাল সকাল থেকেই আমি বাড়ির কাজ করে হাত পাকাবো, রতনকে বলবো—তুই বসে ক'দিন জিরো, তারপর আমি কোমরে কাপড় পেচিয়ে ঘর ঝাঁট দেব, বাসন মাজবো, কাপড় কাচবো। সুপ্রিয়কে সশব্দে হাসতে দেখে একটু যেন থতমত খেয়ে গিয়ে কথার মোড় ঘোরালো মীনাক্ষী, তেল ঘি দিয়ে কিছু রান্না না করলেই হলো—কি দরকার? দাদুর মত সমস্ত সেদ্ধ খাব, ভাতের মধ্যে ছেড়ে দেব আলু-পটল-ঝিঙে-ঢেঁড়স—

সুপ্রিয় ধরিয়ে দিলো, কাঁচকলা-উচ্ছে-চিচিঙ্গে-বরবটি—বলে হো-হো করে হেসে উঠলো সুপ্রিয়। তারপর প্রশ্ন করলো, ভাতের ফ্যানগালা নিয়ে কি করবে মীনাক্ষী? সে তো আরো শক্ত ব্যাপার, হাতে পায়ে যদি গরম ফ্যান পড়ে যায়, তাও তো বটে—মীনাক্ষীর সুন্দর মুখে চিন্তার ছায়া পড়লো, আর সুপ্রিয় দুচোখে বিস্ময় নিয়ে মীনাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছে মীনাক্ষীর এই দুর্ব্বার প্রেম ও ঠেকাবে কী করে?

মীনাক্ষী এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু অসহায় ভাবে বললো, ফ্যান গালতে খুব অসুবিধে হয় যদি, তাহলে না হয় ফ্যান গালবো না, ফ্যানভাত খাব। দাদুর কাছে শুনেছি ফ্যানভাত খুব পুষ্টিকর।

হো-হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলো সুপ্রিয়, থাক আর ভাবে না। ভাতের ফ্যান গালতে আমি জানি।

জানেন? তবে আর কী—চোখমুখের ভাব একেবারে সহজ করে নিশ্চিন্তের নিশ্বাস ফেললে মীনাক্ষী। আর মীনাক্ষীর মুখের এক ঝলক সোনালী আভার দিকে তাকিয়ে সুপ্রিয় সুস্মিত মুখে বললো, এতখানি ভাবতে পারলে মীনা, 'আর আপনিটা ছাড়তে পারলে না?

মীনাক্ষী সলজ্জে হাসলো, পরে বলবো।

উঁহু, আজই সবকিছুর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'য়ে যাক—কৌতুক কণ্ঠ সুপ্রিয়র। মীনাক্ষী যে রান্নাবাড়ার কথা নিয়ে বেশ গভীর ভাবে চিন্তা করছিলো সেটা বোঝা গেলো ওর পরের কথায়।

তাছাড়া, আমি যদি বি-এ পাশ ক'রে ফেলতে পারি, তাহলে দু'জনে মিলে চাকরী করবো। বাড়ির কাজের জন্ম রেখে দেব একজন কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড—রান্নাও করবে, ঘরের কাজও করবে। বাড়ির খাওয়া হয়তো সব দিন খাবোও না আমরা, এমনও হ'তে পারে হয়তো এক অফিসেই দু'জনে চাকরী করছি—

হ্যাঁ, হয়তো একই ঘরে একই টেবিলে পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি

বসে কাজ করতেও পারি আমরা—আবার হো-হো ক'রে হেসে উঠলো সুপ্রিয়।

—কে রে মীনা? সুবর্ণবালা একেবারে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ ভাবে সুপ্রিয়র একেবারে মুখোমুখি আর কোনোদিন হ'ননি উনি। বুকের ভেতরটা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে সুবর্ণবালার। তার উত্তাপে সমস্ত চোখমুখ একেবারে টকটকে রাঙা। এর আগের দিন, সোমেনের মাতা মনোরমা সুবর্ণবালাকে প্রায় পুরো আশ্বাসই দিয়েছিলেন। ছেলে যখন নিজের মুখে নিখুঁত সুন্দরী বলেছে আর উনি যখন দাবী দেওয়ার কোনো প্রসঙ্গ তুলবেন না, তখন বিয়েতে আর বাধাটা কোথায়—তাই ভেবেই হয়তো অমন আশ্বাস দিতে পেরেছিলেন মনোরমা। ছেলের সামনে বসে আজ আশীর্বাদের দিন ঠিক করবেন, এই কথা ছিলো। আজ সোমেন খোলাখুলি ভাবে অসম্মতি জানিয়ে সুবর্ণবালার সমস্ত ভরসা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। পুত্রের আচরণ অত্যন্ত অসংগত মনে হয়েছে মনোরমার কাছে। উনি পাশের ঘরে পুত্রকে ডেকে কৈফিয়তের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, তোর মনে যদি এই ছিলো, আগে মানা করলিনে কেন? সুবর্ণ বেয়ান পাতিয়ে রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি মিষ্টি বানিয়ে নিজে ব'য়ে এনে আমাদের খাওয়ালো, সে সব হজম ক'রে আমি এখন কোন মুখে ওর সামনে দাঁড়াবো?

স্নেহের হাসি হেসে উত্তর দিলো সোমেন, উনি তো শুধু একটু মিষ্টি খাওয়ালেন, আর অন্য অন্য মেয়ের বাবা মায়েরা যে প্রতি শনি-রবিবার আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে, অজস্র অর্থ ব্যয় ক'রে বিরাট বিরাট পার্টি দিচ্ছেন—ও কিছু নয়, মেয়ের মা হ'লে অমন কত কিছু করতে হয়।

ছেলের এই নির্লজ্জ উক্তিতে মনোরমা একেবারে কাঠ হ'য়ে গেলেন। পাশের ঘরে বসা সুবর্ণবালা ক্ষীণ আশা নিয়ে উৎকর্ণ হয়েছিলেন। সোমেনের এই কটূক্তি শুনে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেন নি। পুড়তে পুড়তে ফিরে এসেছেন।

সুবর্ণবালার আকস্মিক আগমনে সুপ্রিয় এবং মীনাক্ষী দুজনেই চমকে ঘাড় ফেরালো। ওদের মন এমন ভাবে ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছিলো, ঠিক এই মুহূর্তে সুবর্ণবালার উপস্থিতিকে স্বীকার করে নিতে ওদের দেরী হয়ে গেলো একটু। সুপ্রিয় সরে গিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু বসলো না। যেন আসন্ন ঝঞ্ঝার সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার জন্য ও মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকলো। আর মীনাক্ষী ডানা গুটিয়ে নিয়ে মার দিকে ফিরে খুব উচ্ছ্বাসের সুর বলতে চেষ্টা করলো,মা, মাষ্টার মশাই খবর নিয়ে এসেছেন, আমি ম্যাট্রিক পাশ করে গেছি—ভেতরের ছাইচাপা আগুন যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সুবর্ণবালায় গলায়, কেন, গেজেটের পাট কী উঠে গেছে নাকি আজকাল?

মীনাক্ষী মাকে শান্ত করার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, বা রে! কত কষ্ট করে মাষ্টার মশাই আমার খবরটা আগে এনে দিলেন—

আগে খবর দিয়ে কী রাজ্যিপাট তোমার হাতে তুলে দিলেন শুনি? জিভের ধার দিয়ে কেটে কেটে কথাগুলি বললেন সুবর্ণবালা। সুপ্রিয় দরজার দিকে যেতে যেতে সুবর্ণবালাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আপনি রাগ করবেন না, আমি চলে যাচ্ছি—

হাঁ, তাই যাও বাছা, আর জেনে যাও, এ বাড়ির চৌকাঠ আর কোনোদিন ডিঙোতে পারবে না। আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার এত ফষ্টিনষ্টি কিসের? তুমি ভাব যে, আমি কিছু বুঝিনে—না?

মীনাক্ষী কান্নাগলায় ডাক দিলো, মা!

সবেগে ঘাড়টা ফিরিয়ে তিক্ত গলায় বললেন সুবর্ণবালা, তুই চুপ কর মীনা, চাল নেই চুলো নেই, যে নাকি আমার মেয়ের কড়ে আঙুলের যোগ্য নয়—তার স্পর্দ্ধা তো কম নয়? সুবর্ণবালা নিজের জ্বালার আগুনে যেন অঙ্গার করে দিতে চাইলেন সুপ্রিয়কে।

মীনাক্ষী দুহাত দিয়ে দুকান সজোরে চেপে ধরে যেন ককিয়ে কেঁদে উঠলো, মাষ্টার মশাই শীগগির চলে যান এখান থেকে, শীগগির—শীগগির—নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো সুপ্রিয়। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ও ভাবতে লাগলো। কী অদ্ভুত নিয়তির পরিহাস! আনন্দ দিতে এসে সমস্ত আনন্দ ম্লান করে দিয়ে গেলাম মীনাক্ষীর। নিচে নামতেই নির্মাল্য হাতে শিশিরকণার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। শিশিরকণার সঙ্গে মৌখিক একটু আলাপ হয়েছে সুপ্রিয়র। হঠাৎ কী মনে হলো, নিচু হয়ে শিশিরকনার পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে।

সুন্দর স্নিগ্ধ হেসে শিশিরকণা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, সুখী হও, শান্তি পাও, মনস্কামনা পূর্ণ হোক তোমার। সুপ্রিয় ক্ষীণ হাসলো একটু, দাদু কোথায়? আমি মীনাক্ষীর পাশের খবর নিয়ে এসেছিলেম—

উনি স্নানের ঘরে ঢুকেছেন। মীনুমা পাশ করেছে—এ কৃতিত্ব তো মীনুর চেয়ে তোমারই বেশী বাবা, তোমার পরিশ্রম ভগবান সার্থক করেছেন। আর একদিন অবশ্যই এসো, তোমার মিষ্টি খাওয়ার নিমন্ত্রণ রইলো। উত্তরে সুপ্রিয় একটু ম্লান হেসে চলে গেলো।

কি রকম একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতা নিয়ে সুপ্রিয়কে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেলো এ রাস্তা ও রাস্তা, বারে বারেই মনে পড়লো ওর, অমন হাত পুড়িয়ে অমলেট ভেজে নিয়ে এলো মীনাক্ষী, কিন্তু তা ওর খাওয়া হয়নি। একটা ডাক্তার খানা চোখের সামনে পড়াতে ভেতরে ঢুকে গিয়ে বার্ণল চাইলো একটা, তারপরে সেটা হাতে নিয়ে আনমনে এক পা এক পা ক'রে আবার এলো মীনাদের বাড়ির পথে, ওর মনের দ্বিধা কয়েক মুহূর্ত ভাবালো ওকে, তারপর ও আস্তে আস্তে কড়া নাড়লো, রতন খুলে দিলো দরজা, কাগজে মোড়া বার্ণলের টিউবটা রতনের হাতে দিয়ে সুপ্রিয় বললো, এটা মীনু দিদিমণির হাতে এখুনি দিও। রতন আচ্ছা বলে ছোট্ট প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলো, আর শোনো আবার ডাকলো সুপ্রিয়, এটা মীনুদিদির হাতেই দিও, আর কারো হাতে নয়। ভৃত্য রতন ভেতরে হাসি চেপে আবার ও বললো, আচ্ছা।

সমস্ত রাস্তাটা অদ্ভুত খাপছাড়া সব চিন্তা করতে করতে হোষ্টেলে ফিরে এলো সুপ্রিয়। হোষ্টেলে ঢোকার মুখে মনে হলো ওর গোটা হোষ্টেল বাড়িটাই যেন দাঁত বার ক'রে ওকে মুখ ভেংচাচ্ছে। মূর্তিমান অনাসৃষ্টি ও না হ'লে পরীক্ষার পর হোষ্টেলে থেকে, রোজ কেউ একই স্বাদের ডাল চচ্চড়ি খায় আর হোষ্টেল বাড়ির কড়িকাঠ গোণে? এমন যে, সে নিজের অবস্থা বিস্মৃত হয়েছিলো কী বলে। অন্যায্য গঞ্জনা দেননি সুবর্ণবালা, ঠিকই করেছেন। নিজের ঘরে ঢুকে আলো জ্বালালো না সুপ্রিয়।

হোক অন্ধকার। অন্ধকারই ভাল। ঘর থেকে একটা টুল

নিয়ে সামনের ছোটো বারান্দায় এসে চুপ করে বসে রইলো সুপ্রিয়। আজকের এই অকল্পিত অঘটনের জন্ত ওর অন্তর বারে বারে তিরস্কার করছে ওকে।

তুমি যখন মীনাক্ষীর সত্যকার হিতাকাঙ্খী, তুমি যখন চাওনা তোমার মত হতচ্ছাড়ার সঙ্গে মীনাক্ষী ঘর বাঁধে, তখন নিরালা খুঁজে খুঁজে আজ দুপুরে ওর কাছে যাওয়ার কি দরকার ছিলো? কাল বিকেলে মীনাক্ষীর পাশের সংবাদটা কি দিয়ে আসতে পারতে না তুমি? ওর দাদু জিতেন্দ্রনাথের কাছে খবরটা দিয়ে এলেই হতো, কিম্বা ওর দিদাই, কিম্বা ওর মা। তুমি যখন মীনাক্ষীর মনের মহলের খবরটা জানতেই পেরেছিলে, আর তুমি যখন বড়াই করে এলে মীনাক্ষী, আমি তোমার মঙ্গল চাই, অমন সুন্দর সদ্য প্রস্ফুটিত কুঁড়ির মত একটা মেয়ে যার মনের ওপর পৃথিবীর নগ্নতার কোনো ছাপ পড়েনি, স্থূল পার্থিব জীবনের কোনো প্রশ্ন জাগেনি—তখন কি তোমার উচিত ছিলো না ওর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করা? ছিলো। কিন্তু, আমি ওর মনের সুরভি মাখতে গিয়েছিলেম একটু, আর কোনো দুরভিসন্ধি ছিলো না আমার, এই ধূলোর ধরণীতে এমন স্বর্গীয় সৌরভ আমি আর কারো কাছে গিয়ে পাই নি তো! —সাফাই গেওনা সুপ্রিয়, সদ্য প্রস্ফুটিত কুঁড়ির কাছে তুমি আর বলতে বাকী রেখেছো কী?...

সুপ্রিয়র পাশের ঘরে প্রায় ওরই সমবয়সী আর একটি ছেলে আছে, হরিরঞ্জন দাশগুপ্ত। বাপ নেই, মা ওর কাকার আশ্রয়ে চাটগাঁয়ে থাকেন। কাকাই কলকাতায় রেখে পড়াচ্ছেন ভাইপোকে। পাকিস্থানে যাওয়ার আগেকার হাঙ্গামাগুলোকে পোয়াতে রাজি নয় হরিরঞ্জন, তাই ছুটি ছাটাতেও হোষ্টেলেই থাকে। থার্ড ইয়ারের কেমিষ্ট্রি অনার্সের ছাত্র ও। ছেলেটি আমুদে, পরোপকারী এবং অপরের সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল। নিজের ঘরের আলোর প্রক্ষিপ্ত রশ্মিতে বারান্দায় টুলে বসা সুপ্রিয়কে দেখে ফেললো হরিরঞ্জন।

সুপ্রিয়দা'! হরিরঞ্জন ঘর থেকেই হাঁক দিলো, জলদি চলে আসুন, তোফা কফি রেডি—

চিন্তাজাল ছিন্ন হলো সুপ্রিয়র, অনুচ্চকণ্ঠে সাড়া দিলো, না ভাই হরিরঞ্জন, এখন কিছু খেতে ইচ্ছে নেই। সুপ্রিয়র অন্তরে বিষণ্ণ ধিক্কার বিদ্রূপ করে চলেছে সমানে,—ভাল লাগছে না, কিছু ভাল লাগছে না ওর।

হরিরঞ্জন বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিয়ে চীজের স্যাণ্ডুইচ খেতে খেতে চলে এলো, কী ব্যাপার সুপ্রিয়দা'? আপনি তো একা ব'সে থাকার লোক নয়, তাও আবার অন্ধকারে—উজ্জ্বল আলোর সামনে সুপ্রিয় সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়লো।

কী ভাবছেন অন্ধকারে বসে? চোখ বড় ক'রে আবার সপ্রশ্ন করলো হরিরঞ্জন।

সুপ্রিয় ভাবলো, এখানে বসে থাকলে অনবরত কৈফিয়ত তলব

করতে থাকবে হরিরঞ্জন, তার চেয়ে ও ঘরে গিয়ে কফি খাওয়াই ভাল। উঠে পড়লো সুপ্রিয়। কফিতে এক চুমুক দিয়ে সুপ্রিয় আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

হরিরঞ্জন অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে সুপ্রিয়র মুখের চেহারা দেখলো, তারপর বললো, সুপ্রিয়দা', আপনি কি প্রেমে পড়েছেন?

হঠাৎ চমকে উঠলো সুপ্রিয়, ওর কাপ থেকে খানিকটা কফি চলকে পড়লো মাটিতে।

হুঁ—হুঁ, ধরে ফেলেছি—হরিরঞ্জন দুষ্টুমির হাসি হেসে মাথা নেড়ে বলতে লাগলো।

একটা বড় চুমুক দিয়ে কফিটুকু শেষ করলো সুপ্রিয়, তারপর কাপটা নামিয়ে রেখে, দুকাঁধ ঝাঁক দিয়ে যেন নিজেকে সচেতন করে নিয়ে বললো, তারপর হরিরঞ্জন, তুমি নিজে প্রেমে পড়েছো বুঝি?

রক্ষে করুন, ও ব্যাধি যেন আমার কাঁধে না চাপে,—অন্ধকারে অমন একলা বসে বসে ভাবতে আর তারা গুণতে পারবো না আমি। সুপ্রিয় এবার হাসলো একটু, প্রেমে পড়লে, অন্ধকারে বসে বসে ভাবতে হয় বুঝি?

নয়—? আমার রুমমেট অশোক প্রেমে পড়েছে কিনা, ও ব্যাধির লক্ষণ—আমার সব জানা হয়ে গেছে।

কি রকম লক্ষণ, সব শুনি? সুপ্রিয়র কণ্ঠস্বর তরল। হরিরঞ্জনের সান্নিধ্য ওর ভাল লাগছে।

হরিরঞ্জন সুপ্রিয়র জন্য চীজের স্যাণ্ডুইচ বানাতে বানাতে বললো আপনার ফার্স্ট ষ্টেজ, না ফাইন্যাল ষ্টেজ?

সুপ্রিয় হাসলো, দুটোর লক্ষণই বলো, মিলিয়ে দেখি আমি কোন্ ষ্টেজে পড়ি।

আচ্ছা, তাহলে শুনুন,—ধরুণ ফার্স্ট ষ্টেজ, অর্থাৎ আপনি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছেন অথচ আপনি এখনও জানেন না যে, সে আপনার প্রেমে পড়েছে কিনা। তখন আপনার সুতীক্ষ্ণ নজর হবে নিজের চেহারা আর সাজ-পোষাকের দিকে। রোজ বিকেলে পাজামা-পাঞ্জাবীর পাট ভাঙবেন, সকালে অনেক সময় দিয়ে নিপুণ ভাবে দাড়ি কামিয়েও বিকেলে আপনার প্রেমিকার কাছে যাওয়ার আগে আবার বার কয়েক দাড়ির ওপর ব্লেড বুলিয়ে নেবেন, মেয়েদের মত ফেস-পাউডার, ম্যাক্স ফ্যাক্টার মাখতে শুরু করবেন, কিন্তু মেজে-ঘসে চেহারাটাকে শেষ পর্যন্ত এমন ভাবে দাঁড় করাবেন—যেন উদাস-উদাস ভাব, সাজ-পোষাকের দিকে আদৌ নজর নেই আপনার, আর সে সময়টা অনুক্ষণ ঠোঁটে একটা হাসি বজায় রাখতে হবে। সে হাসির রূপ হলো সবজান্তা হাসি প্লাস বৈষ্ণবীয় হাসি, মানে ও দুটোর রাসায়নিক রেজাল্ট আর কী। তার পর, সাজ-পোষাক সুসম্পূর্ণ ক'রে আয়নার সামনে এগিয়ে-পিছিয়ে, কাত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বার কয়েক দেখে নিয়ে আপনি বার হোলেন সেই গত দিনের নির্দ্ধারিত জায়গাটার উদ্দেশ্যে—লেকে, ইডেনগার্ডেনে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে, আউটরাম ঘাটে, কফিহাউসে, কিম্বা প্রেমে পড়ার মত আরো কত নিরালা জায়গা আজকাল তৈরী হয়েছে সেখানে। প্রেমিকের এসব খবর আবার নখদর্পণে হওয়া চাই। সেজন্য প্রক্সি দেওয়ার ব্যবস্থা করে কলেজ ফাঁকি দিয়ে আপনি অল-সেকশন ম্যাপ্‌খানা পকেটে নিয়ে নিরালা নিভৃতের সন্ধানে বার হোলেন। যাক, জায়গা মিললো আর আপনিও প্রেমিকাকে নিয়ে সেখানে কাটিয়ে এলেন সন্ধ্যেটা; যেখানে বসেছিলেন আপনারা, সেখানে সবুজ ঘাসের বিন্যাস থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার সুদৃশ্য সিল্কের রুমালখানা বিছিয়ে বসিয়েছেন প্রেমিকাকে, তাজা রজনীগন্ধার ডাঁটিও উপহার দিয়েছেন, কিন্তু হায়! আজও আপনার মন জানা হলো না,—শুধুমাত্র দুটো ঠোঁট-টেপা হাসি উপহার দিয়েছে আপনাকে। আপনি হোষ্টেলে ফিরে এসে অন্ধকারে বসে বসে খানিক যৌন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আর আকাশের তারা গুণলেন, তার পর নামমাত্র খেয়ে, সেই দোমড়ানো রুমালটা বুকে চেপে ধরে শুয়ে পড়লেন, এপাশ-ওপাশ আর সোওয়াগজি দীর্ঘশ্বাস, তার পর রাত সোওয়া ন'টাতেই টেনে টেনে জিগ্যেস করবেন,—হরিরঞ্জন! রাত কত ভাই?

সুপ্রিয় সশব্দে হেসে উঠলো, অশোক, এই সব করতো নাকি?

আহা বেচারা! অনুপস্থিত অশোকের উদ্দেশ্যে একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—হরিরঞ্জন, খালি পেটে ঘুম আসবে কোথা থেকে? সারারাত এপাশ ওপাশ ক'রে, ভোর রাতে উঠে কুঁজো থেকে দু'গ্লাস জল গড়িয়ে ঢক ঢক ক'রে খেয়ে শুয়ে পড়লো আর ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেলা প্রায় আটটা, ঘড়ি দেখেই লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে ছুট দিলো রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে একটু গরম জল যোগাড়ের আশায়, সাবান গরম জল দিয়ে ভাল ক'রে আবার দাড়ি কামাতে হবে তো। হরিরঞ্জনের মুখের কপট-করুণ অভিব্যক্তিতে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো সুপ্রিয়।

হরিরঞ্জন মুখের সেই ভাব বজায় রেখেই বললো, হাসবেন না সুপ্রিয়দা', বেচারা নিশি পাওয়া অশোক! ক'দিন দেখলাম বায়রণ নিয়ে খুব ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করেছে,—স্থানে-অস্থানে, কারণে-অকারণে বায়রণের একটা লাইন কোট করে যাচ্ছে: দি ডেজ অফ আওয়ার ইউথ আর—দি ডেজ অফ আওয়ার গ্লোরি, তারপর একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি, এক খণ্ড গীতবিতান কিনে প্রাণপণে বেসুরো রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে চলেছে,—জিগ্যেস করলুম, কী হলো রে অশোক? ঢুলু ঢুলু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে টেনে টেনে অশোক বললে—সুরের আবতি করি তারে খুঁজি চেতনার নীলে,—তারে? কারে—বুঝলুম, কিন্তু, চেতনাটা নীল না লাল, সবুজ না বাদামী—এ নিয়ে ভবিষ্যতে মৌলিক গবেষণা করার ইচ্ছে আছে আমার।

সুপ্রিয় সহাস্যে বললো, তারপর?

তারপর? কেন, আপনি তো সেটা জানেন, হোষ্টেলের ছোঁড়ারা পেছনে লেগে ওর বেসুরো সংগীত বন্ধ করলো। ঘাড় নাড়লো সুপ্রিয়।

—তারপর দেখি, নোট বই, রাফ বই, টেকসট বই—সব কিছুতেই সামনে যা পাচ্ছে তাতেই অশোক লিখে চলেছে একটা লাইন—আমার প্রেমের মন্ত্র তার বুকে পদ্ম হ'য়ে ফোটে, কিন্তু বাড়ি যাওয়ার সময় অশোকের যা মুখের চেহারা দেখলাম, যা বিষণ্ণ চোখ দেখলাম, তাতে বুঝলুম—পদ্ম আর ফোটেনি, সাপলা ফুটলেও ফুটতে পারে।

উচ্চকণ্ঠে হেসে প্রশ্ন করলো সুপ্রিয়, আর ফাইন্যাল ষ্টেজ হ'লে?

হরিরঞ্জন খাওয়ার সব ডিসপ্লেটগুলি ঘরের কোণের টেবিলে জড়ো ক'রে রেখে হাত ধুয়ে সুপ্রিয়র পাশে এসে বসলো। এক নজর

সুপ্রিয়র মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললো, ফাইন্যাল ষ্টেজ, মানে, এখন আপনাদের মন জানাজানি হ'য়ে গেছে···অর্থাৎ সব ক'টা হার্ডেল রেস পার হয়ে এসেছেন আপনি, অশোক তো এ ষ্টেজ পর্যন্ত এগোয় নি, আমার আর এক বন্ধু, তেরো নম্বর রুমের কমলাপ্রসাদের কাছে শুনেছি, এ ষ্টেজটা অত হাল্কা-কাঁপা নয়, একটু নিরেট—এখন আপনি আপনার রাইভাল কিম্বা রাইভালদের পরাজয় সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত, এখন আপনার অন্তহীন আগ্রহ শুরু হবে—আপনার প্রেমিকার কী ভাল লাগে আর কী লাগে না, কিসে তার অনুরাগ আর কিসের প্রতি তার বিরাগ, খেতে ভালবাসে না খাওয়াতে ভালবাসে, ছবি আঁকতে ভালবাসে না দেখতে ভালবাসে, ধরতে ভালবাসে না ধরা দিতে, কাঁদতে না কাঁদাতে···এই আর কী, এই ষ্টেজে এই সব খুটিনাটি আবার আপনার নখদর্পণে হওয়া চাই। এসব জানার জন্য আপনার একটা অলসেকশন মনথলিতে কুলুবে না, প্রেমিকার ছোটো ছোটো ভাইবোনকে এনতার টফি লজেন্স ঘুষ দিয়ে জানতে হবে, ছোটো ভাই-বোন না থাকলে, প্রেমিকার মাকেই মিষ্টি করে—মাসীমা-মাসীমা ডেকে তাঁর হাতের আলুনী কিম্বা নুণে পোড়া তরকারী—একসেলেণ্ট বলে তারিফ করে উবু হয়ে ঘরের ছেলের মত বসে খেতে খেতেও জেনে নিতে পারেন।

সুপ্রিয় যেন মুগ্ধ-বিস্ময়ে হরিরঞ্জনের কথাগুলো শুনছিলো। কথা বলার ভঙ্গিমায় মনে মনে ভাবছিলো—এ তো ওরই স্বগোত্র একেবারে। উঠে দাঁড়িয়ে হরিরঞ্জনের পিঠে একটা আলতো থাপ্পড় দিয়ে হাসিমুখে বললো—সাবাস হরিরঞ্জন! জিতা রহো। হরিরঞ্জনের কথায় মনের বিক্ষোভের মেঘ অনেক ফিকে হয়ে গেছে ওর। নিজের ঘরে চলে এলো সুপ্রিয়।

ইন্দ্রাণীর পাশ করার খবর এলো টেলিগ্রামে। তার কয়েকদিন পর বিস্তারিত খবর এলো চিঠিতে, অল্প কয়েকটা নম্বরের জন্য ফার্ষ্ট গ্রেড স্কলারশিপ মিস করেছে ইন্দ্রাণী, হিষ্ট্রীতে ও ইংরিজীতে লেটার পেয়েছে এবং ইংরিজীতে ওই ফার্ষ্ট হয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটো সংবাদ আসার পরই অরুণেশের একান্ত ইচ্ছে হয়েছিলো, ইন্দ্রাণীকে ও নিজের মুখে কনগ্রাচুলেশন জানায়, কিন্তু ইন্দ্রাণীর সাক্ষাতের সুযোগ কিছুতেই পায়নি। ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ও আনন্দের স্রোত কয়েকদিন বয়ে চললো সমানে। তবে খাওয়া দাওয়াটা ঘরোয়া, অবশ্য রথীনবাবু, অমলবাবু আমন্ত্রিত হতেন রোজই কিন্তু রণেনের অনেক ইচ্ছে সত্ত্বেও কোনো পার্টি দিলেন না সর্ব্বাণী। ঘরোয়া ভাবেই একদিন রাত্রের খাওয়া খাওয়ালেন বান্ধবীর বাড়ির সবাইকে আর একদিন দুপুরের খাওয়া খাওয়ালেন অনীতা রায় ও তাঁর স্বামীকে। নীলা নেমন্তন্ন না পেয়েও সে ক'দিন রোজই ভরপেট খেয়ে বাড়ি ফিরতো, আর খাওয়ার টেবিলে বসে একেবারে কম খাওয়ার জন্য রোজই মিথ্যে অজুহাত দিতো এক একটা। নীলার না খাওয়ার প্রকৃত কারণ জানতো কেবল অরুণেশ। বোনের দিকে মিটি মিটি চেয়ে কেবল হাসতো ও, আর নীলা সকলের চোখ আড়াল করে নিষেধের অনুনয় করতো চোখ দিয়ে।

হঠাৎ একদিন ম্যাল রোডে সর্ব্বাণীর সঙ্গে অরুণেশের দেখা হয়ে গেলো। সর্ব্বাণী একলাই। নভেল্টি ষ্টোরস থেকে ইন্দ্রাণীর ব্লাউজের জন্য কিছু পশম কিনে ফিরছিলেন। অরুণেশের সঙ্গে শুধু চোখের পরিচয় আছে, ডেকে কেউ কোনো দিন কারো সঙ্গে কথা বলেননি। অরুণেশ কিন্তু এগিয়ে এলো, সর্ব্বাণীর দিকে চেয়ে হাসি মুখে জিগ্যেস করলো, মাসীমা। আমাদের মিষ্টি খাওয়াবেন না?

সর্ব্বাণী অত্যন্ত লজ্জাবোধ করলেন, সেই বিব্রত ভাবটা কাটাবার জন্য সর্ব্বাণী খুব জোর দিয়ে বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আজই বিকেলে এসো অরুণেশ, আজ তোমার মিষ্টি খাওয়ার নেমন্তন্ন রইলো।

আজকেই? অরুণেশের চোখ উজ্জ্বল।

কেন, আজ কোনো এনগেজমেণ্ট আছে না কি তোমার? তাহলে কাল এসো।

না, না আমার কোনো এনগেজমেণ্ট নেই, আজ একটু যেন ত্রস্ত শোনালো অরুণেশের কণ্ঠস্বর, আজই আসবো আমি—

আচ্ছা, তাহলে আজই এসো কিন্তু—হাসিমুখে চলে গেলেন সর্ব্বাণী।

অরুণেশ ভাবতে ভাবতে চললো, আজ বিকেলে নীলাকে কোথায় পাঠানো যায়, খুব জোর বাঙলা পাঠ চলেছে 'নীলায়, নিত্যি-নোতুন বাঙলা বই পড়ার নেশাতেও 'পেয়ে বসেছে ওকে। আগামী বৎসর ম্যাট্রিক দিচ্ছে নীলা, ইন্দ্রাণী ওকে পরামর্শ দিয়েছে, ম্যাট্রিকটা হিন্দিতেই দাও, কিন্তু আই-এতে তুমি বাংলা নেবে নিশ্চয়ই, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটিতে বাংলা প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা আছে কিন্তু বাংলা পড়ানোর ব্যবস্থা নেই। বাংলা পেপার নিয়ে তুমি নিজে বাড়িতে প্রস্তুত হ'য়ে পরীক্ষা দিতে পার, আপত্তি নেই তাতে। ইন্দ্রাণী ও নীলা দুজনেই এ ব্যাপার নিয়ে মহা উৎসাহে লেগে গেছে, একজন সিরিয়াসলি পড়ায়, আর একজন প'ড়ে। তাই একটি বিকেল বাদ দেয় না নীলা। এক অরুণেশ ছাড়া বাড়ির সকলেই জানেন, নীলা নিয়মিত ইভনিং-ওয়াক ক'রে ফিরলো। অরুণেশ একটা সিদ্ধান্ত স্থির ক'রে দ্রুত পায়ে ফিরে এলো বাড়ি। বোনেদের হাতে চারটে দিয়ে বললো, রিগ্যালে দেখলাম—এ মিলিয়ান পাউণ্ড নোট—এসেছে, যা তোরা আজ দেখে আয়গে—আমার এত ভাল লেগেছিলো, আমি এটা তিনবার কলকাতায় দেখেছি।

নীলা লাফিয়ে উঠে বলতে যাচ্ছিলো, দাদা, তুইও চল—কিন্তু তিনবার দেখেছে শুনে আর অনুরোধ করলো না। শেলিও বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে এবার, রোজ না হ'লেও একদিন দু'দিন বাদ সিনেমা দেখা চলছেই ওর, রোজই সঙ্গী হয় গিরীন তালুকদার, ওকে যেন কুক্ষিগত ক'রে ফিরছে শেলি। এনগেজমেণ্ট হ'য়ে গেছে ওদের, তবু যেন ভরসা করা চলে না পুরুষদের। সে তিক্ত নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে শেলির। বছর দুই আগে সকলেই লেফ্‌টেনণ্ট পাকড়াশির সঙ্গে সময়ে অসময়ে দেখেছে ওকে। তখন শেলি ছিলো লাজুক নম্র, শান্ত ভীরু, কিন্তু পাকড়াশির ইচ্ছের মাত্রা ছাড়িয়েই ঘোরাঘুরি শুরু করেছিলো ও। নিভৃত বনস্থলীতে কত মেদুর সন্ধ্যা মদির হয়েছিলো পাকড়াশির দাক্ষিণ্যে, রাতের খাওয়া বাড়িতে না খেয়ে—কত নৈশভোজন সেরেছিলো ঐ পাকড়াশির পাশে ঘেঁসাঘেসি বসে ডেভিকোতে সিসিলে।

কাশ্মীর বদলি হলো পাকড়াশি। যাওয়ার সময় শেলির কাছে বিদায় নিতে এসে, শেলির চিবুক নেড়ে আদর করে গদগদ গলায় বলেছিলো, কাশ্মীর ননক্যামিলি এ্যারিয়া এডিকলেয়ার

করেছে, তাই আমাকে একলা যেতে হলো ডিম্মারি, না হলে বিয়ে না করে তোমায় আমি সঙ্গে না নিয়ে এক পা নড়তেম না, তোমার বিরহে ভূস্বর্গ কাশ্মীর আমার কাছে গোবি হয়ে উঠবে ইত্যাদি। তারপর চোখ ছলছলিয়ে বিদায় নিয়েছিলো সুকুমার পাকড়াশি। ছ'মাস বাদে দিল্লী বদলি হলো পাকড়াশি, আর তার দু'মাস বাদেই শেলি বান্ধবী রিনির বাড়িতে, বেড়াতে গিয়ে ইলাস্ট্রেটেড উইকলির যুগল ছবির পাতায় দেখে ফেললো, পাকড়াশির সস্ত্রীক ছবি। এক পাঞ্জাবিনীকে প্রায় বুকের কাছে নিয়ে দুজনে পাল্লা দিয়ে দাঁত বের করে হাসছে। রিনির সামনেই কেঁদে ফেলেছিলো শেলি। বান্ধবীর মাথায় মৃদু মৃদু কয়েকটা টোকা দিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে রিনি বললো, তুই একজন মিলিটারির জন্ত চোখের জল ফেলছিস শেলি? পুঃ। আমি ও জাতটাকে দুটি চক্ষে দেখতে পারিনে, দে অলওয়েজ রাণ আফটার গার্লস। মনের সে ক্ষত মেলাতে শেলির সময় লেগেছিলো। তারপর একদা দেখা গেলো নম্র লাজুক শেলি হুড়মুড় করে কথা বলছে, দুড়দাড় করে চলছে, কারণে অকারণে গিটগিরী দিয়ে হাসছে আর তারপর বগলদাবা করে ফিরছে গিরীন তালুকদারকে নিয়ে।

ভাইকে বললো না অবশ্য কিন্তু তখুনি ফোনে কনট্যাকট করলো গিরীনের সঙ্গে—বিকেল পাঁচটায় রিগ্যালের গেটের সামনে হাজির হওয়া চাই।

অরুণেশ যখন ক্যাথলিক ক্লাবের গেট দিয়ে ঢুকলো, তখন ওর বুক দুরু-দুরু কিন্তু কোনো এক রোমাঞ্চিত আশায় উদ্বেল। তখন আকাশে কনে দেখা আলো, বাতাসে অনেক সুর আর অরুণেশের মুখেও যেন বেলা শেষের উপচে পড়া আলো। সর্ব্বাণী সামনেই ছিলেন, সাদরে ড্রইংরুমে নিয়ে বসালেন অরুণেশকে। রমেনও ওপর থেকে নেমে এলেন তখুনি। কিন্তু, ইনা কৈ? ইন্দ্রাণী? দুরন্ত ইচ্ছের ভিড় চোখে বুকে। অরুণেশের চোখ ঘুরলো ড্রইংরুমের এপাশে ওপাশে, বাইরে—করিডোরে। সমস্ত ধমনী দিয়ে কী যেন অনুভব করতে চাইছে অরুণেশ। মনের আনাচে কানাচে উথাল পাথাল ঢেউ-এর শব্দ। মনটা যেন ভারি মাতলামি শুরু করেছে অরুণেশের। ড্রইংরুমে রমেন সর্ব্বাণীর মুখোমুখি বসে হেসে হেসে সৌজন্যসূচক কথা বলতে আর একেবারেই ইচ্ছে করছে না। একছুটে গোটাবাড়িটা পরিক্রমা করে এলে কেমন হয়? কেমন হয় খানিকটা ছুটোছুটি করলে?

কোথায় আছে ইন্দ্রাণী? ঘরে, পড়ার টেবিলে? না—বাগানে, অনেক আকাশের নিচে? নাকি কোমরে কাপড় পেচিয়ে ওর জন্য খাবার বানাচ্ছে কিছু? দমকা বাতাস এসে নড়িয়ে-গুড়িয়ে-উড়িয়ে দিয়ে গেলো গাছ-গাছালি আর মেঘগুলিকে। সার্সির কাচ দিয়ে চোখ পাঠিয়ে দিলে অরুণেশ। মুহূর্তে গাছপালা আর আকাশের চেহারা যেন একেবারে অন্তরকও হ'য়ে গেছে, নতুন স্পন্দন, নতুন অনুভূতি। আশ্চর্য একটা সাড়া দিচ্ছে পৃথিবী আকাশকে, পৃথিবী আর আকাশের মিতালি দেখতে লাগলো অরুণেশ। ঝির-ঝির ক'রে বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। বৃষ্টির এত রং, এত রূপ, আগে কৈ, এত খেয়াল ক'রে দেখেনি তো! হেমন্তের গোধূলি আলো মেখে পশ্চিম-পাঁচিল ঘেঁসা বুড়ো উইলো গাছ দুটো ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে আর তার ওপরে রূপোলী মেঘের দল বুকে নিয়ে বিরাট আকাশখানা।

অরুণেশ! চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—সর্ব্বাণীর কণ্ঠস্বরে অরুণেশ চোখ ফিরিয়ে আনলো, হাসলো অদম্য আকাঙ্খা নিয়ে অরুণেশের দুটি চোখ, ড্রইংরুমের দরজা পর্যন্ত আর একবার পিছলে এলো তারপর বললো,—এত খাবার কী একলা খেতে পারি? আপনি··· আপনারাও সবাই খান একটু—কথা শেষ করে চোখে সমর্থনের দাবী নিয়ে রমেনের দিকে তাকালো অরুণেশ। রমেন বললেন, আমাকে এক কাপ চা দিতে পারো সর্ব্বাণী! সর্ব্বাণীও চা নিলেন। তারপর চা খেতে খেতে গল্প করতে লাগলেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী? অস্থির চেতনাটা ছিনিমিনি খেলছে অরুণেশের মনের সঙ্গে। আর মুখের আলো একটু একটু করে নিবছে।

ধীরে ধীরে চা খেলো অরুণেশ, তার চেয়েও ধীরে ধীরে খাবার খেলো: হয়তো চুল বাঁধছে ইন্দ্রাণী···হয়তো—

মুখের ভাব অম্লান রেখে দেড় ঘণ্টার ওপর রমেন সর্ব্বাণীর কথার উত্তর হেসে হেসে দিলো অরুণেশ, আর পারে না—

উঠে দাঁড়ালো অরুণেশ, আর ওর দুরন্ত নাছোড়বান্দা ইচ্ছেটা যেন ওকে দিয়ে বলিয়ে ছাড়লে, ইন্দ্রাণী···ইন্দ্রাণী কোথায়? এত মিষ্টি খেলুম অথচ ওকে কনগ্র্যাচুলেটই করা হলো না।

রমেন সর্ব্বাণী দুজনেই কিছুটা থতমত খেয়ে গেলেন। সর্ব্বাণী একটু কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন, ইনু বাড়ি নেই, এই ক্যাথলিক ক্লাবের চৌদ্দ নম্বর স্যুইটে ওর এক বন্ধু আছে, সেখানে বেড়াতে গেছে—সর্ব্বাণীর কণ্ঠস্বরের কুণ্ঠার সুরটা অরুণেশের কানে বাজলো।

অরুণেশ যেন যন্ত্রচালিতের মত পা ফেলে পা ফেলে ক্যাথলিক ক্লাবের গেট পেরিয়ে বার হলো। রমেন সর্ব্বাণী দুজনেই গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন—তখনও ঠোঁটের কোণে ছিটে ফোঁটা হাসি বজায় রেখেছিলো অরুণেশ।

হাঁটছে অরুণেশ, হাঁটছে--ভারি পা দুটোকে টেনে টেনে নিয়ে হাঁটছে। চলার গতি একেবারে মন্থর, একেবারে ঢিলে ঢালা। আকাশে সোনালী রূপোলী কোনো আলো নেই—আলোর কোনো রেখা নেই পর্যন্ত। একটানা পাণ্ডুর একটা ছায়া আকাশে।

বারে বারে ইন্দ্রাণীর দুর্ব্বোধ্য আচরণের কথা মনে পড়ছে।

[ ক্রমশঃ।

# ব্যাবিলনের রাজকন্যা

( ভলতেয়ার থেকে )

## পঁয়ষট্টি

ঈরলা জিজ্ঞেস ক'রলে, কে এই তরুণী যুবতী, যিনি রূপবান অমৃতজীবনের সংগে যাপন ক'রছিলেন অমন আনন্দ-প্রহরগুলি ?

ওরা ব'ললে, ইনি একজন অতিবখ্যা অভিনেত্রী। এর প্রতিভার সংগে আছে সংগীত-অভ্যাস, লালিত্য-মাধুর্য্য-সংমিশ্রিত।

হা ভগবান! হা মহাশক্তিমান ওরোসমাদে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে বললেন ব্যাবিলনের রূপবতী সম্রাট-দুহিতা অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে, কে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছে? আর তা কা'র জন্ত? আর সেই পুরুষটি যিনি আমার জন্তই অস্বীকার ক'রেছেন বিয়ে ক'রতে অতো অতো রাজকন্তাদের, আজ কিনা ত্যাগ করছেন আমাকেই একজন অপ্রধানা 'সেকেণ্ড রেট' গ্যালিক রমণীর জন্ত। না, এ অসম্মান স'য়ে আমি বাঁচতেই পারবো না।

সম্রাটকুমারি, বললে ঈরলা, তরুণেরা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্ত পর্য্যন্ত এ ভাবেই গড়া। এমন কি যদি তা'রা স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোনো পরমাসুন্দরীরও প্রেমে অত্যাসক্ত হয়, সময়ে সময়ে তা'রা অবিশ্বাসী হবেই, হবেই তা'র প্রতি সরাইখানার ঐ দাসী মেয়েটির সংগে।

সবই ফুরোলো, ব'ললেন রাজরাজকন্তা, আর ওঁর মুখ দর্শন ক'রবো না। আমি যতোদিন বেঁচে থাকবো, ততোদিন।

এসো আমরা এই মুহূর্ত্তেই চ'লে যাই। আমার একশৃঙ্গাশ্বদের সুসজ্জিত করা হোক।

ফিনিক্স বললে, রাজরাজকন্যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না জেগে ওঠেন অমৃতজীবন, ততক্ষণ অন্ততঃ অপেক্ষা করুন। আমি তাঁ'র সংগে কথা ব'লবো'খন।

কথা ব'লবার উপযুক্ত ও নয়, ব'ললেন রাজরাজকন্তা। তুমি আমার ক্ষতি ক'রবে, ক'রবে অসন্তুষ্টি, গভীর ভাবেই। ও মনে ক'রবে কী, জানো? ভাববে, আমিই তোমায় অনুরোধ ক'রেছি ওকে ভর্ৎসনা ক'রতে। ইচ্ছে ক'রেছি, ওর সংগে মিটমাট ক'রতে, পুনর্মিলন ঘটাতে।

আমায় তুমি যদি একবিন্দু ভালোবাসো তবে সে যে অপমান ক'রেছে তা'র সংগে আর যোগ দিও না এই অসম্মান-অর্ঘ।

ফিনিক্স ব্যাবিলনের রাজরাজকন্যার নিকটেই নিজ জীবনের জন্ত ছিলো ঋণী। সুতরাং সে রাজরাজকন্তার আদেশ অমান্ত ক'রতে পারলে না।

রাজরাজকন্তা আবার বেরিয়ে পড়লেন তাঁর সহচরদের সঙ্গে।

## ছেষট্টি

কোথায় চ'লেছি আমরা, সই? শুধোলে ঈরলা।

কোথায় যে যাচ্ছি নেই তা'র কোনো সুসমঞ্জস ধারণা, আবার উত্তর ক'রলেন রাজরাজপুত্রী। প্রথম যে-পথটি পাবো, চ'লতে থাকবো সে-পথ ধ'রেই আমরা। যতোক্ষণ আমি অমৃতজীবনের ছায়া থেকে চিরতরে স'রে থাকি, পরম সন্তুষ্টই আমি।

ফিনিক্স অসামান্তা রাজরাজকন্যা ফর্মোজান্তের চেয়েও ছিলো বেশী জ্ঞান-বৃদ্ধ। এর কারণ, তার কোনো প্যাসানই ছিলো না। পথে যেতে যেতে সে সান্ত্বনা দিতে লাগলে রাজরাজকন্তাকে। রাজরাজকন্তার বিবেচনায় আনলে সে; ব'ললে, দোষ ক'রলে অন্তে, অথচ শাস্তি নেবো নিজে, প্রতিজ্ঞা যা'রা করে, তা'রা খুব দুঃখের ব্যাপারই ঘটায়।

তারপর আরেকটা কথা। অমৃতজীবন যে খুবই বিশ্বস্ত, এর প্রমাণও তো উনি দিয়েছেন সুমহান ভাবে। এবং অনেক অনেকই দিয়েছেন। আর যদি এক মুহূর্ত্তের জন্ত উনি আত্মবিস্মৃত হয়েই থাকেন, তার জন্তে কী রাজ রাজকন্তা ওঁকে ক্ষমা করতে অক্ষম?

ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি উনি, যদিও মহা ওরোসমাদের আশীর্বাদ বর্ষিত হয়নি ওঁর ওপরে!

এর পর থেকে উনি নিশ্চয়ই হবেন প্রেমে এবং ধর্ম্মে আরো বেশী সত্যনিষ্ঠ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার ইচ্ছে ওঁকে নিশ্চয়ই উত্থাপিত করবে নিজের উর্দ্ধে।

এর ফলে রাজরাজকন্তা সুখী হবেন আরও।

রাজরাজকন্যার বহু বহু পূর্ব্বে অনেক অনেক রাজকন্যাই এ ধরণের সত্যভঙ্গ ক্ষমা ক'রেছেন। সকলেই, ক্ষমা করাটাই যে সুবিধেজনক তা বুঝতে পেরেছিলেন।

দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত দিলে সে, কাহিনীর পর কাহিনী বর্ণনা করলে সে রাজরাজকন্যার কাছে। গল্প বলার ভংগী ও আর্ট তা'র এমনই অত্যুত্তম ছিলো যে, অসামান্তা রাজরাজকন্তা ফর্মোজান্তের চিত্ত পরিশেষে হ'লো শান্ততর এবং তিনি বেশ শান্তিও পেলেন।

রাজরাজকন্যার মনস্তাপ হলো; বললেন, তাড়াতাড়ি চলে না এলেই যেনো ভালো হতো। আমাকে দেখলে ও নিশ্চয়ই লজ্জা পেতো খুব।

একশৃঙ্গীরা আমার খুব জোরে ছুটছে যে, তাই নয়? বললেন আক্ষেপের সংগে রাজরাজকন্তা। ঈরলা জিজ্ঞেস করলে থামাবো কী?

না থাক। চলছে চলুক। এগিয়ে চলাই ওদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

সাহস হলো না রাজরাজকন্যার পুনরায় ফিরে যেতে।

এক দিকে ক্ষমা করবার এবং অন্ত দিকে ক্রোধ দেখাবার বাসনা, এক দিকে প্রেম অন্ত দিকে অসার বল্গা অহমিকা; এই দোটানায়

ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে, রাজরাজকন্যা হাঁকাতে লাগলেন তাঁর খড়্গকশৃংগীদের। বিশ্ব পর্য্যটন করতে লাগলেন তিনি পিতৃ-বায়ালের ভবিষ্যৎবাণীর অনুক্রমে।

## সাতষট্টি

ঘুম ভাঙতেই অমৃতজীবন শুনলে—অনামাঙ্কা রাজরাজকন্যা ফর্মোজান্তে আর তাঁর ফিনিক্স এসেছিলো, আবার চলেও গেছে তারা, শুনলে, রাজরাজকন্যা কী রকম নিরাশা-সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। এবং কেমন বড়বার মতই ক্রোধের আগুনে হয়েছিলেন প্রজ্বলিত তিনি।

শুনলে সে আরো, রাজরাজকন্যা প্রতিজ্ঞা করেছেন কখনও ক্ষমা করবেন না তা'কে।

ওঁর পেছনে অনুসরণ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই আর, চীৎকার করে সে বললে, হত্যা দেবো যেয়ে ওঁর পায়ে।

তার বন্ধুবর্গ কর্ম্মবিমুখীদের দল ছুটে এলো তাড়াতাড়ি, এই ঘটনার সংবাদ পেয়ে। তারা সকলেই বুঝাতে লাগলে, ললিত-কলাশ্রীদের বুকে এবং শান্তিময় সুমার্জ্জিত আমোদ-আনন্দের কোলে আমরা যে মনোহর জীবন-যাপন করি, তার সংগে তুলনাই হয় না আর অন্য কিছুরই।

সহরের রসোত্তমা এবং সেরা রূপসী মহিলারা, যাদের ঘরে অভিনয়গুলি চমৎকার ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়, প্রত্যেকেই তারা আপনাকে আপ্যায়িত করতেই তাদের দিনটিকে সংরক্ষিত করে রেখেছে।

অপেরা-গায়িকা এতক্ষণ ড্রেসিং টেবিলে বসে চকোলেট খাচ্ছিলো হেসে হেসে, গেয়ে গেয়ে এবং ছেনালি করে করে সুপুরুষ অমৃত-জীবনের সংগে।

অমৃতজীবন অবশেষে বুঝতে পারলে অপেরা-অভিনেত্রীটির সামান্য একটি রাজহংসীর জ্ঞান-বুদ্ধিও নেই।

অমায়িকতা, আন্তরিকতা, সরলতা এবং উদারতা ও সাহসই ছিলো এই সুমহান রাজপুত্রের চারিত্রিক উপাদান। বন্ধুদের কাছে সে তার ভাগ্য বিপর্যয় এবং ভ্রমণ বৃত্তান্ত সমস্তই বর্ণনা করেছে। তারা সকলেই জানে অমৃতজীবন ব্যাবিলন রাজরাজকন্যার দ্বিতীয় জ্ঞাতিভাই। মিশরের মহীপতিকে তিনি যে মারাত্মক চুম্বন করেছেন সে ঘটনাও পরিবেশন করা হয়েছে তাদের নিকটে

আত্মীয়দের মধ্যে এই ধরণের ফষ্টি বা তামাসাগুলি নজরের বাইরেই থাকে। নয়তো সংসার-জীবনটাই সীমাশেষহীন কলহে কলহে কাটাতে হয়।

কোনো কিছুই বিচলিত করতে পারলে না অমৃতজীবনকে অনামাঙ্কা রাজরাজকন্যা ফর্মোজান্তের পেছনে ছুটে যেতে। কিন্তু বিশৃঙ্খল গাড়ীখানি মেরামত না হওয়ায় তিন দিন সে বাধ্য হলো—সেই কর্ম্মবিমুখীদের সংগে আনন্দোৎসবে এবং আমোদ-প্রমোদে কাটাতে।

অবশেষে বিদায় নিলে সে প্রগাঢ় আশ্লেষে পরমোফ করে তাদের সবাইকে। স্বদেশের সব চেয়ে বড়ো শিখরি-হীরকখণ্ডগুলি তাদের ভিতরে উপহাররূপে বিলিয়ে দিয়ে সে বললে, তোমরা সব সময়েই হাল্কা প্রাণ ও তুচ্ছামোদী থেকো। এই ধরণের জীবনেই তোমাদের সৌন্দর্য্য বাড়ে আরো বেশী, আর খুব বেশী সুখী হও তোমরা।

জার্মাণেরা প্রাচীন মানুষ, য়্যালবিয়নের অধিবাসীরা হচ্ছে প্রৌঢ়, আর গলের অধিবাসিগণ শিশু। আমি তাদের সংগে খেলাধুলা ও মাতামাতি করতে ভালোবাসি।

## আটষট্টি

অমৃতজীবনের পথ-প্রদর্শকদের কোনো কষ্টই হ'লো না, ব্যাবিলনের রাজপুত্রী যে-যে পথ দিয়ে রওনা হয়েছেন অনুসরণ করতে সে পথগুলি! রাজরাজপুত্রী আর তাঁর মহাবিহঙ্গটিই ছিলো একমাত্র প্রসঙ্গ বা সংলাপ। জনপদবাসিগণ সকলেই তখনও উৎসাহ ও প্রশংসায় পরিপূর্ণ। দেখো দেখো, আকাশের বুক চিরে বাড়ীখানা যাচ্ছে ঐ কেমন! এই আনন্দোচ্ছসিত ধ্বনিই দিকে দিকে হচ্ছিলো প্রতিধ্বনিত!

পীরেনীজ-এর পাদদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট ও ড্রুইডেরা তাকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও খঞ্জনী-নৃত্যে না নাচিয়ে ছাড়লে না।

পীরেনীজ পেরুতেই শেষ হলো সব আমোদ-আহ্লাদ বা আনন্দ। দীর্ঘকাল ব্যবধানে-ব্যবধানে যদি কোনো সংগীত তার কর্ণগোচর হয়ে উঠছেলো তবে সে সংগীতের সুর ছিলো শোক-সকরুণ।

অধিবাসীরা পথ চলছিলো গাম্ভীর্য্যের সংগে সুতো-পরানো জপমালা ও একখানি ছোরা বেল্টে জড়িয়েই। গোটা জাতিটাই ছিলো কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত, মনে হচ্ছিলো এটা যেনো তাদের কান্না-পর্ব্ব।

পান্থদের প্রশ্ন করলে অমৃতজীবনের ভৃত্যেরা। উত্তর পেলে শুধু আকারে ইংগিতে। কোনো বাসাবাটীতে যেয়ে উঠতেই গৃহস্বামী উত্তর দেয় মাত্র তিনটি অক্ষরেই, ঘরে নেই কিছু। দেড় ক্রোশ দূরে লোক পাঠাতে পারি, জিনিষপত্রের জন্য, অবশ্য বিশেষ যদি প্রয়োজন হয় কোনো কিছু।

প্রশ্ন করা হলো এই মূকদের, ব্যাবিলনের পরমাসুন্দরী রাজরাজকন্যাকে কী দেখেছো এ পথে যেতে কখনও?

তারা উত্তর দিলে আরো কম সংক্ষেপেই, আমরা দেখেছি তাঁকে অংশেই। লোকে যতো বলে ততো রূপদক্ষা নয়। শুধু কালো চামড়াই সুন্দর। ফটিক-কণ্ঠী উনি, পৃথিবীতে যা সব চেয়ে কুশ্রীতম বস্তু। আমাদের দেশে কার্য্যতঃ গোচর হয় না এ জাতীয় বস্তু।

বেটিশ বিধৌত প্রদেশে এসে পৌঁছে গেলো অমৃতজীবন।

বেটিয়ার অধিবাসীরা দাবী করতো, যে কোনো ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করা কাজ নয় আমাদের। আমাদের প্রতিবাসী গলেরাই এসে চাষ-আবাদ করবে'খন আমাদের দেশটা। এই ছিলো তাদের ধারণা।

টীরীয়েরা শুধু যে এই দেশ আবিষ্কার করেছিলো, কৃষি-শিল্পেরও করেছিলো প্রচলন, তাই নয়; সঙ্গে করে এনেছিলো কিছু প্যালেস্তাইনবাসীদেরও। সেই থেকে এই প্যালেস্তাইনীয়েরা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়, যদি অর্থ উপার্জ্জন করবার সুযোগ পেয়ে গেছে এক্টোটুকু তারা। সিকিউরিটি সমূহের ওপরে শতকরা পঞ্চাশ টাকা হার সুদে টাকা ধার দিয়ে, এরা বলতে কি, দেশটার সমস্ত অর্থই করে ফেলেছিলো করায়ত্ত।

এর ফলে বীটিকার অধিবাসীরা মনে করতো প্যালেস্তাইনীয়েরা

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP

ছিলো যাদুকর ; আর সেকালে যারাই ঐন্দ্রজালিকতা দোষে অভিযুক্ত হতো, তাদেরই পুড়িয়ে ফেলতো ইনকুইজিটর সম্প্রদায়।

পুরোহিতেরা প্রথম তাদের শীকারকে সুন্দর বেশভূষায় সুসজ্জিত করতো, তাদের সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিতো। এবং খুব ভক্তির সংগেই প্যালেস্তাইনীয়দের নিজেদেরি প্রার্থনা সকল করতো উচ্চারণ, যখন এদিকে শান্ত ধীর আগুনে বধ্যটিকে দগ্ধ করা হতো।

## উনসত্তোর

ব্যাবিলনের রাজরাজকন্যা এসে নাবলেন সেই নগরেই পরবর্তীকালে যা 'সেভিল' নামে পরিচিত।

রাজরাজকন্যার বাসনা, অগ্রসর হয়ে যান বেটিস নদীতে পাল তুলে দিয়ে। ইচ্ছে, ফিরবেন টায়ারের পথে ব্যাবিলনে। দেখা করবেন ফের পিতা বেলুসের সংগে। চেষ্টা করবেন ভুলে যেতে, অসম্ভব যদি না হয়, তাঁর অবিশ্বস্ত প্রিয়তমকে। আর নয়তো বলবেন, বাবা ওঁকেই করবো আমি বিয়ে।

দু'জন প্যালেস্তাইনীয়কে তিনি ডেকে পাঠালেন। এরা সব রকমের রাজসভোচিত কাজগুলি করবে। এরা তাঁকে দেবে তিনটি জাহাজ। ফিনিক্স এদের সংগে প্রয়োজনীয় সব কিছু বন্দোবস্ত করে নিয়েছে।

সরাইওয়ালার স্ত্রী ছিলো খুব ভক্তিমতী। তার স্বামীও তার কম সমকক্ষ ছিলো না। ইনকুইজিটরিয়াল ড্রুইডদের সংগে তার ছিলো অন্তরঙ্গতা অর্থাৎ কিনা সে ছিলো একজন গুপ্তচর।

ইনকুইজিটরিয়াল ড্রুইডদের উপদেশ দিতে সে কসুর করেনি। সে তাদের জানালে, আমার ঘরে আছে একজন যাদুকরী। আর আছে দু'জন প্যালেস্তাইনীয়বাসী।

এরা শয়তানের সংগে প্যাক্‌ট বা চুক্তি করেছে। শয়তান বৃহৎ সুবর্ণ-বিহঙ্গের ছদ্মবেশে আত্মগোপন করে আছে।

সুপ্রচুর পরিমাণ হীরকের অধিকারিণী স্ত্রীলোকটি।

তবে নিশ্চয়ই সে ডাইনী। ইনকুইজিটরেরা তক্ষুণি মন্তব্য করলে। তারা বললে, রাত্রি নেমে আসুক না। মজা দেখাবো'খন।

অপেক্ষা করতে লাগলো তারা রাত্রির অন্ধকারের। রাত্রি এলেই তারা ফেলবে ঘেরাও করে স্ত্রীলোকটির সেই দুশো গাত্ররক্ষীদের, তাদের একশৃঙ্গাশ্বগুলির সংগে যারা ঘুমুচ্ছিলো সুপ্রকাণ্ড আস্তাবলগুলিতে। ইনকুইজিটরেরা ছিলো ভয়ানক কাপুরুষ।

দুয়োরগুলোকে চারদিক থেকে রুদ্ধ করে খুব ভালো ক'রে ইনকুইজিটরেরা বন্দী ক'রলে রাজকন্যা ও তার সখী ঈরলাকে।

ফিনিক্সকে তারা ধরতে চেষ্টা করেছিলো কিন্তু পারেনি। সে গেছে উড়ে, পালিয়েই। ডানাগুলো যতো বেগে তাকে নিয়ে ছুটতে পেরেছিলো ততো বেগেই সে পড়েছিলো তাড়াতাড়ি অদৃশ্য হয়ে।

## সত্তর

ফিনিক্স যা সন্দেহ করেছিলো, হলো তাই-ই। ভেবেছিলো সে, অমৃতজীবনের সংগে দেখা হবে গল থেকে সেভিলের পথে নিশ্চয়ই।

ঘটলোও তাই।

ভিতরে ৬ নীটিকার সীমান্তে আসতেই দেখা পেলে সে অমৃতজীবনের। হাল্কা প্রাণ ও তুচ্ছামোদী থেকো। এই যব। সৌন্দর্য্য বাড়ে আরো বেশী, আর খুব বেশী সুখী হও

নিবেদন করলে সে, রাজরাজকন্যার বড়ো বিপদ। তার প বিপদের যথাযথ বিবৃতি দিলে।

অমৃতজীবনের মুখে শব্দ বেরুল না। আতংকিত হয়েছিলো খুবই, রুষ্টও হয়েছিলো প্রচুর।

সঙ্গে সঙ্গে সে সেজে-গুজে নিলে। সোনার মোড়া ইস্পাতে বর্ম্মচর্ম্ম দিয়ে ঢেকে নিলে গা। বারো ফুট লম্বা বর্শা নিলে হাতে দু'টি নিলে বল্লম। তীক্ষ্ণধার তরোয়ালটিকে বেঁধে নিলে কোষে।

তরোয়ালটির নাম ছিলো "বজ্র"। বজ্রের মতই পারতো ফেলতে দু'খণ্ড করে, এক আঘাতেই, ঐ তরোয়াল, গাছ, পাথর। এব ড্রুইডদের। সুশ্রী মস্তক আবৃত ক'রলে সে স্বর্ণ-শিরস্ত্রাণে, যব ও অর্ষ্ট্রিচের পালকে অলংকৃত।

এ ছিলো ম্যাগোগের সুপ্রাচীনতম বর্ম্মচর্ম্ম। অমৃতজীবনের বোন সর্পদেবী তাঁকে এ সমস্ত উপহার দিয়েছিলো, শক-বর্ষ দিয়ে যাত্রা ক'রবার কালে। তার তাঁর সংগে গুটিকয় যে-অনুচর ছিলো তা'রাও, তার মতো, ছিলো অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, খড়গশৃঙ্গী-অশ্বারোহী।

অমৃতজীবন ফিনিক্সকে ক'রলে আলিংগন। চুমু খেলে বুকে ধ'রে।

এই খেদোক্তিটুকুই সে ক'রলে, মহা অপরাধী আমি মহাপাপী। আমি যদি কর্ম্ম-বিমুখীদের নগরে অপেরা-গায়িকার কোলে না ঘুমিয়ে প'ড়তুম তবে নিশ্চয়ই ব্যাবিলনের পরমারূপসী রাজরাজপুত্রী এরূপ ভয়ংকর সংকটে প'ড়তেন না। এক্ষুণি আমাদের ছুটতে হবে ইনকুইজিটরদের উদ্দেশে।

## একাত্তোর

অমৃতজীবন এসে আশু পৌঁছে গেলো সেভিল-এ। পনেরো শো আলগুয়াজিল অর্থাৎ সার্জেন্ট ও গ্রেফতারী কর্ম্মচারী রক্ষা ক'রছিলো আবেষ্টনীর দ্বার-পথগুলি। সেখানে দুশো গঙ্গাতীরবর্ত্তীয় ও তাদের খড়গশৃঙ্গী অশ্বগুলি ছিলো অবরুদ্ধ অবস্থায়। খেতে ছিলো না তাদের অতি সামান্যও খাদ্য বা তৃণখণ্ডটুকুও।

সব কিছুই আয়োজন করা হ'চ্ছিলো সেই উৎসর্গ-পর্ব্বের জন্যই, যা' তা'রা ঠিক ক'রে রেখেছিলো ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজরাজকন্যা, তাঁর সখী ঈরলা এবং দু'টি ধনী প্যালেস্তাইনবাসীর জন্য।

ইনকুইজিটর-প্রধান ছোট ছোট ইনকুইজিটরে পরিবৃত হ'য়ে বিচারাসনস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো ইতোমধ্যে। সেভিলীয়দের জনারণ্যের কটিদেশে ঝুলছিলো সূতো-বাঁধা জপমালাদাম। পরস্পর হাতধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়েছিলো তা'রা। মুখে তাদের কোনো বাক্যস্ফূর্ত্তি ছিলো না।

পরমরূপসী রাজরাজকন্যা, তাঁর সখী ঈরলা এবং প্যালেস্তাইন-যুগলকে উপস্থিত করা হ'য়েছিলো। তাঁদের হাত বাঁধা ছিলো পিঠ মোড়া ক'রে। ক্যাগুলোয় সুসজ্জিত ছিলো তাঁ'রা।

গ্যারেট বা চিলেকোঠার জানালার পথে ফিনিক্স ঢুকলে সেই কারাকক্ষে। সেখানে গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়েরা এই অবসরে দুয়োরগুলোকে ভাঙছিলো।

অপরাজেয় অমৃতজীবন বাইরে থেকেই তাদের ক'রছিলো চুরমার। সকলেই আবার ছুটে গেলো সুসজ্জিত ; সকলেই

প্রতিষ্ঠিত এক একটি খড়গশৃংগী তুরঙ্গের পিঠে। অমৃতজীবন আগে আগে সকলের।

ম্যালগুয়াজিল, বেতন-সেবক রক্ষীদল ও ইনকুইজিটরীয় পুরোহিতদের পরাস্ত ক'রতে অমৃতজীবনের কোনো ক্লেশ স্বীকার ক'রতেই হয়নি একেবারে। প্রতিটি একশৃংগাশ্ব একেবারে তাদের ডজনখানেককে কাবু ক'রে ফেললে। অমৃতজীবনের বজ্র যাঁ'র সংঘাতে এসেছে তাঁকেই ক'রেছে দ্বিখণ্ডিত। জনারণ্য পলায়নপর হ'লো কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত এবং নোঙরা চুনোট করা গলবস্ত্র পরিহিত অবস্থায়। তখনো তাদের হাতে ছিলো সেই পবিত্র জপমালাগুলি।

অমৃতজীবন হাত বাড়িয়েই পাকড়াও ক'রলে বিচার আসনে উপবিষ্ট ইনকুইজিটর প্রধানকে। চিতায় নিক্ষেপ ক'রলে সে তা'কে। চিতা জ্বলছিলো আয়োজিত হ'য়ে গজ চল্লিশেক দূরে।

ছোটো ছোটো ইনকুইজিটরদেরও সে পাকড়াও ক'রলে। ছুঁড়ে ফেললে সে তাদের ঐ অগ্নিকুণ্ডে একটি একটি ক'রে।

তারপর—

অমৃতজীবন সাষ্টাঙ্গ প্রণত হ'লো সম্রাট-কুমারী অসামান্যা ফর্মোজান্তের পাদপীঠে।

উঃ! কী নিরুপম এবং প্রেমযোগ্যই না তুমি হ'য়েছো, প্রিয়তম! ব'ললেন ব্যাবিলনের অসামান্যা রাজকন্যা। কী ভালোই না তোমায় বাসতুম আমি, কী সমুচ্চ পূজাই না তোমার ক'রতুম যদি না আমার প্রতি তুমি বিশ্বাসঘ্ন হ'তে একজন অপেরা-গায়িকাতে আসক্ত হ'য়ে।

## বাহাত্তোর

অমৃতজীবন অসামান্যা রাজরাজকন্যার সংগে শান্তিপ্রীতি স্থাপন করছিলো, গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়েরা চিতার চুলায় স্তূপীকৃত করছিলো ইনকুইজিটরদের সকলেরই দেহগুলি আর আগুনও দাউ-দাউ ক'রে লেলিহানভাবে উঠছিলো অগ্রশিখ হ'য়ে। এমন সময় অমৃতজীবন চেঁচিয়ে উঠলে, একটা কী লক্ষ্য ক'রে দূরে।

ও কী? এক দল সৈন্যবাহিনীর মতোই যেনো এগিয়ে আসছে এদিকে, তাই না?

একজন প্রাচীন ক্ষিতিপতি, মুকুটের শোভা প'রে এগিয়ে আসছেন। তাঁর গাড়ী টানছিলো দড়ি-বাঁধা আটটি গর্দ্দভ। শ'খানেক আরো অন্য গাড়ী আসছিলো তাঁর পিছু-পিছু। সুগন্ধী মুখ বিশিষ্টেরা আসছেন তাদের সংগে; কালো পরিচ্ছদ ও গলবস্ত্রগুলি পরিহিত ছিলেন তারা, খুব সুশ্রী সুশ্রী অশ্বে চড়ে এগুচ্ছেন তারা; তৈলসিক্ত কেশবিশিষ্ট জনারণ্য পেছনে পেছনে পায়ে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হ'য়ে আসছিলো নীরবেই।

প্রথমেই অমৃতজীবন তার গঙ্গাতীরবর্তীদের শ্রেণীবদ্ধ ক'রে নিলে নিজের চারদিকে। তারপর সে গেলো এগিয়ে বর্শা হাতে অগ্রসরদলের সংগে।

তাকে দেখতে পাওয়ামাত্রই সেই অগ্রসরমান ক্ষিতিপতি মাথার মুকুট উন্মোচন করলেন, গাড়ী থেকে পড়লেন নেবে, অমৃতজীবনের জিনের রেকাব চুম্বন করলেন। তারপর বললেন এই কথাগুলি, হে বিধাতৃপ্রেরিত মানব, আপনি মনুষ্যজাতির অনিষ্টকারীদের মহাশত্রু ও প্রতিহিংসাগ্রাহী, আপনি আমার স্বদেশের মুক্তিদাতা, আপনি আমার পরিত্রাণকর্ত্তা।

এই সমস্ত পবিত্র কিম্ভূতকিমাকারগুলি যাদের আপনি উৎসন্ন ক'রেছেন এই দেশ থেকে, এরা ছিলো আমার মনিব, সপ্ত মহাপর্ব্বতের সেই প্রাচীন মানুষটির নামে। আমাকে এরা বাধ্য ক'রেছিলো সহ্য ক'রতে এদের পাপাপরাধিনী শক্তিকে। আমার প্রজারা আমায় অবশ্য ত্যাগ ক'রতোই যদি আমি চেষ্টা ক'রতুম সেই উৎপীড়নকারীদের ঘৃণ্যজঘন্য অত্যাচার সংবরণ ক'রতে।

এখন আমি স্বস্তিতেই নিশ্বাস নিতে ও রাজত্ব ক'রতে পারি। আর সেজন্য ঋণী আমি আপনার নিকটেই।

তারপর তিনি সশ্রদ্ধভাবেই চুম্বন ক'রলেন অসামান্যা রাজরাজকন্যা ফর্মোজান্তের হাতখানি। ব'ললেন, অনুগ্রহ ক'রে উঠে বসুন আমার এই আট গাধায় টানা গাড়ীতে, অমৃতজীবন, আপনার সখী ও ফিনিক্সকে সংগে নিয়ে।

রাজসভা-শ্রেণী সেই দুটি প্যালেস্তাইনীয় তখনো ভূমির উপরে ছিলো সাষ্টাঙ্গ প্রণত, আতংকে ও কৃতজ্ঞতায়; তারাও উঠলো। একশৃংগাশ্বরূঢ় সৈন্যদল অগ্রসর হ'য়ে চ'ললো বীটিকার রাজার পিছনে পিছনে, তাঁ'র রাজপ্রাসাদের দিকে।

একটি মহিমাঢ্য জাতির রাজমর্য্যাদার প্রয়োজনানুক্রমেই গাধাগুলি চ'লছিলো পদব্রজগতিতেই। সুতরাং অমৃতজীবন এবং অসামান্যা ফর্মোজান্তে সময় পেয়েছিলেন নিজেদের কীর্ত্তি-কলাপ বর্ণনা করতে।

বীটিকার রাজা ফিনিক্সের সংগেও আলাপ ক'রলেন। ফিনিক্সের খুব প্রশংসা ক'রলেন তিনি, খুব আদরও ক'রলেন, চুমু খেলেন শ'খানেক বার।

ব'লতে লাগলেন তিনি, পশ্চিমের জনবর্গ মাংস খায় জীবদের, আর বুঝতে পারে না তাদের ভাষা একেবারে। তাঁ'রা কী প্রকার অজ্ঞ, নিষ্ঠুর এবং অসভ্য, তা বুঝলুম এখন। শুধু গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়েরাই প্রকৃতিকে এবং মানুষের প্রাচীন মর্য্যাদাকে রক্ষা ক'রে এসেছে আজ পর্য্যন্ত।

তারপর তিনি আবার ব'ললেন, সর্ব্বোপরি, স্বীকার করি, মরণশীলদের মধ্যে সব চেয়ে বর্ব্বর হ'চ্ছে এই ইনকুইজিটরেরা, যাদের হাত থেকে অমৃতজীবন এই সবে মুক্ত ক'রেছেন পৃথিবীকে। আমি আপনাকে আশীর্ব্বাদ করি বার বার। ধন্যবাদ দি' বারংবার।

রূপদক্ষা অসামান্যা ফর্মোজান্তে এর মধ্যে ভুলে গিয়েছেন অপেরা-গায়িকার ব্যাপারটা একেবারে। তাঁ'র সর্ব্ব আত্মা পরিপূর্ণ হ'য়ে প'ড়েছিলো সেই বীরেন্দ্র-বল্লভেরই শৌর্য্যে-বীর্য্যে যিনি তাঁ'কে রক্ষা ক'রেছেন

অমৃতজীবনের কানে কানে তিনি ব'ললেন, শুভশুদ্ধা, অকলংকো আমি। মিশরের মহীপালকে আমি যে চুম্বন দিয়েছিলুম সে সম্পর্কে নিরংকুশা, অপাপবিদ্ধা আমি।

তারপর শোনালেন তা'কে ফিনিক্সের পুনর্জন্ম-কথা।

অমৃতজীবন পেলে পবিত্র আনন্দের আস্বাদ। মাতালের মতো হ'য়ে উঠলো সে সাংঘাতিক প্রেমোন্মাদনায়।

## তিয়াত্তোর

বীটিকার রাজা শুধোলেন রূপবান অমৃতজীবন, রূপশ্রী-লতিকা অসামান্যা ফর্মোজান্তে এবং রূপদক্ষ ফিনিক্সকে, এর পর আপনারা কী ক'রতে ইচ্ছে করেন?

আমার সম্পর্কে এই বলি, ব'ললে অমৃতজীবন ; আমার সংকল্প হ'চ্ছে এই : ব্যাবিলনে যাবো ফিরে। আমি সে দেশের ভাবী উত্তরাধিকারী। রাজরাজেশ্বর খুড়ো মশায় প্রাচীন বেলুসের কাছে আমার দ্বিতীয় জ্ঞাতিবোন অসামান্যা কর্মোজ্জ্বলের কর-পদ্ম প্রার্থনা ক'রবো। অবশ্য উনি যদি আমার সংগে গঙ্গাতীরবর্ত্তীয়দের দেশে বাস ক'রতে না চা'ন, তবে।

আমার সংকল্প, ব'ললেন অসামান্যা রাজরাজকন্যা, নিশ্চয়ই আমার দ্বিতীয় জ্ঞাতিভাই-এর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া। তবে, আমার মনে হয়, সব দিক দিয়েই সাধু হয় যদি আমি ফিরে যাই আমার জনকের নিকটেই। এর প্রধান কারণটুকু এই। তিনি আমায় বসরায় তীর্থযাত্রা ক'রতে পাঠিয়েছিলেন। আর তাঁ'র জন্যেই আমি বিশ্ব-পর্য্যটক।

আমার কথাটাও শুনুন, ব'ললে ফিনিক্স, আমি অনুগমন ক'রবো এই দু'টি স্নেহপরায়ণ ও মহান উদার প্রেমিক-যুগল যাবেন যেখানে যেখানে, সেখানেই।

ন্যায়ানুমোদিত কথাই ব'লেছেন আপনারা, ব'ললেন বীটিকার রাজা। তবে কিনা, ব্যাবিলনে ফিরে যাওয়া যে-রকম সোজা মনে ক'রছেন, মোটেই তা' নয়।

সে-দেশের সংবাদ আমি পেয়ে থাকি রোজই। টায়ীয় জাহাজগুলো আসে সে খবরে পূর্ণ হ'য়ে।

আমার প্যালেস্তাইনীয় কোষ-পতিরাও এ সংবাদ সরবরাহ ক'রে থাকে। কারণ, তাঁ'রা জগতের সবজাতির লোকদের সংগেই সংযোগ রক্ষা ক'রে চলে।

ইউফ্রেটিস ও নীল নদের ধারে কাছে সব দেশগুলোই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েছে ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে। লকদের ক্ষিতিপাল দাবী করেছেন, তাঁর মহিষীর উত্তরাধিকার প্রত্যর্পণ করা হোক। তার সঙ্গে রয়েছে ত্রিশ লক্ষ অশ্বারোহী যোদ্ধা।

মিশর-মহীন্দ্র এবং ভারত-ভূপাল টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটীস নদের কূলগুলি উৎসন্ন করছেন। প্রত্যেকেরই সংগে রয়েছে ত্রিশ লক্ষ সৈন্য। তাঁদের এ আক্রমণের কারণ, তাঁরা প্রতিহিংসা নিতে চান। ব্যঙ্গ-পাত্র হয়েছেন এজন্যই।

এদিকে মিশর-মহীন্দ্র দেশে নেই দেখে তার শত্রু, ইথিয়োপিয়ার অধিপতি মিশরকে উপদ্রুত করেছেন ত্রিশ লক্ষ সৈন্যের পুরোভাগে থেকে।

আর ব্যাবিলন-সম্রাটের ষাট লক্ষ পদাতিক সৈন্যের বেশী নেই কিন্তু তাঁকে রক্ষা করতে।

## চুয়াত্তোর

আমি স্বীকার করছি একটা কথা, আরো ব'ললেন বীটিকার অধীশ্বর। প্রাচ্য মহাদেশ এতো সৈন্য সমাবেশ করেছে এই কথাটা যখন শুনি, আর শুনি যখন তাদের আশ্চর্য্যজনক ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমকের কথা, তখন তাদের সংগে আমাদের এই ক্ষুদ্র বিশ ত্রিশ হাজার সৈন্যদের তুলনাই করতে পারিনে। আমাদের এই সৈন্যদের খাওয়ানো পরানোই দুষ্কর। এই বিশ্বাস করতেই লোভ জাগে প্রাচ্য মহাদেশ সৃষ্টি হওয়ার বহু বহু আগে। মনে হয় আমরা কেয়স বা অব্যক্ত থেকে এইমাত্র পরশুই বেরিয়ে এসেছি, আর বর্ব্বরতা থেকে মাত্র গত কাল।

মহারাজ, বললে অমৃতজীবন, পরবর্ত্তী আগমনকারিগণ কখনো কখনো আদি আগমনকারীদের চেয়েও ওপরে ওঠেন। আমার দেশের লোকদের বিশ্বাস, মানুষ প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিলো ভারতবর্ষেই ; কিন্তু আমি এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে পারিনি।

আর তুমিই বা বললেন বীটিকার অধীশ্বর ফিনিক্সকে, কী মনে করো এ সম্পর্কে ?

মহারাজ, বললে ফিনিক্স, আমি এখনও খুবই তরুণ : সুতরাং প্রাচীনকাল সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান নেই আমি। সাতাশ হাজার সূর্য্যমুখ মাত্র আমি দর্শন করেছি। আমার জনক দেখেছেন ষাটগুণ সাতাশ হাজার সূর্য্যমুখ। তিনি বলতেন, তিনি শুনতেন তার বাবার মুখ থেকে।

প্রাচ্য মহাদেশ সর্ব্বদাই ছিলো খুব জনবহুল এবং ঐশ্বর্য্যশালী অন্যান্য মহাদেশগুলি অপেক্ষাও। তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন ; সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তুরই আদি উৎস-ভূমি গঙ্গাতীর।

এইরূপ মত পোষণ করবার মতো এমন আত্মম্ভরিতা আমার, নেই, অবশ্যই স্বীকার করি। আমি বিশ্বাসই করতে পারিনে, য়্যালবিয়নের শেয়ালেরা, আল্পস পর্ব্বতের কাষ্ঠোগণ আর গলদেশের নেকড়েরা আমাদের দেশোদ্ভূত। যেমন এ কথাও আমি বিশ্বাস করিনে, আপনাদের দেশের ঝাউ ও ওক গাছগুলি ভারতবর্ষের তাল-নারিকেল বৃক্ষগুলি থেকে জন্মেছে।

তবে তুমিই বা জন্মালে কোথা থেকে ? জিজ্ঞেস করলেন বীটিকার রাজা।

আমার ধারণা নেই কোনো এ সম্পর্কে, বললে ফিনিক্স।

আমার জ্ঞাতব্য একমাত্র এই : কোথায় চলেছেন পরমরূপসী অসামান্যা ব্যাবিলন-সম্রাটকুমারী ও আমার প্রিয়বন্ধু অমৃতজীবন।

## পঁচাত্তোর

আমার সন্দেহ হয় যথেষ্টই, উত্তর করলেন বীটিকারাজ, মাত্র দু'শো খড়গশৃংগী তুরঙ্গকে সম্বল করে উনি পারবেন কিনা পথ কেটে চলতে অতো অতো প্রতি ত্রিশ লক্ষ সৈন্য বাহিনীর মধ্যে দিয়ে ?

কেনোই বা নয়, বললে অমৃতজীবন।

বীটিকা-নৃপতি অনুভব করলেন, কেনোই বা নয় ? এর মাহাত্ম্য মহিমা। কিন্তু তাঁর মনে হলো নিছক মহিমা সংখ্যাতীত বাহিনী সমূহের বিপক্ষে যথেষ্ট নয়।

আমি আপনাদের একখণ্ড উপদেশ দিতে চাই, বললেন তিনি, সেটা আর কিছু নয় এটুকু ছাড়া। ইথিওপিয়ার পৃথ্বীপালের সংগে যেয়ে মিলিত হোনগে। এই কৃষ্ণকায় পৃথ্বীপালের সংগে আমি সম্পর্ক রক্ষা করে চলি আমার প্যালেস্তাইনীয়দের মাধ্যমেই। তাঁর কাছে আপনাদের জন্য দিয়ে দেবো পরিচয়পত্র একখানি।

তিনি মিশর-মহীন্দ্রের মহাশত্রু। তিনি খুবই আনন্দিত হবেন—তার বিরুদ্ধে আপনাদের মৈত্রী বলে যুক্ত হলে।

আপনাদের সাহায্য করতে পারি আমি দু'হাজার সৈন্য দিয়ে, এরা খুব অপ্রমত্ত, আর খুব সাহসীও।

আর আপনি ইচ্ছে করলেই পীরেনীজ পাদভূমি অধিবাসী বাস্ক বা গাস্কনদের থেকেও অনুরূপসংখ্যক সৈন্য যোগাড় করতে পারবেন।

আপনার একজন যোদ্ধাকে পাঠান। খড়্গশৃংগাখের পিঠে চড়ে, কিছু হীরকখণ্ড নিয়ে সে যাক। এমন কোনো বাস্ক নেই, যে তার বাপের দুর্গ অর্থাৎ নিজের কুটির ত্যাগ করবে না আপনার সেবা করতে।

তারা খুব পরিশ্রমী, সাহসী ও আমোদ-বিলাসী। তাদের সংস্রবে আপনারা খুবই হবেন আনন্দিত।

এদিকে ওদের আসবার অপেক্ষা করতে করতে, আমরা আয়োজন করবো উৎসব ও ভোজনের, প্রস্তুত করবো জাহাজগুলোকে আপনাদের যাত্রীর জন্য।

দুঃখ রয়ে গেলো আমার আপনাদের জন্যে, তেমন কিছুই আমি করতে পারলুম না, আপনারা যে উপকার আমার করেছেন, তার প্রতিদানে।

অমৃতজীবন পরম আনন্দে ডগমগ। সম্রাটকুমারী রূপোত্তমা অসামান্যা ফর্মোজান্তেকে আবার ফিরে পাওয়ার সীমাহীন সুখে সে অতি সুখী। অতি সুখী সে পুনর্মিলিত প্রেমের সম্মোহনগুলি সমস্তই আলাপ পরম্পরায়, শান্তিতেই উপভোগ করে। সদ্যোজাত প্রেমের সম্মোহনগুলির প্রায় সমানই এই সম্মোহনগুলি। শীঘ্রই উপস্থিত হ'লো দর্পী ও উৎফুল্ল গ্যাসকন দল, নাচতে নাচতে খঞ্জনি বাজনার সংগে। অন্য দর্পীও গম্ভীর বীটিকায় সৈন্যদলও পড়েছিলো প্রস্তুত হয়ে।

কৃষ্ণচর্ম বুড়ো বীটিকা পতিপ্রেমিক যুগলকে আলিংগন করলেন সুকোমল ভাবে। তাঁদের জাহাজগুলো তিনি ভর্তি করালেন নানা প্রকারের শয্যা, দাবা খেলার সেট, কালো পোষাক পরিচ্ছদ, গলবন্ধ, পেঁয়াজ, ভেড়া, মুর্গী, ময়দা ও প্রচুর রসুন দ্রব্যে।

নিরাপদে আপনারা পৌঁছে যান, এই প্রার্থনা করি আমি, বললেন বীটিকার রাজা, প্রার্থনা করি একনিষ্ঠ, অচঞ্চল প্রেম ও বিজয়ের অধিকারী হোন আপনারা।

## ছিয়াত্তোর

জাহাজ ভিড়লো এসে সেই তীরে যেখানে, জনশ্রুতি মতে, বহু শতাব্দীর পর ফিনিসীয় রাণী ডাইডো, টায়ার নগরী ত্যাগ করে অহংকারী কার্থেজ নগরের প্রতিষ্ঠা করেন, এক খণ্ড ষাঁড়ের চামড়াকে চিরতে চিরতে ক'রে সুতোর আকারে।

দর্পী কার্থেজ তখনো হয়নি সমুদ্র বন্দরে পরিণত; কতিপয় নুমিডীয় সেখানে ছিলো; রৌদ্রে শুকোচ্ছিলো তারা মাছ ধরবার জালগুলো।

তীর ধ'রে ওঁরা চলতে লাগলেন।

অবশেষে এসে পৌঁছে গেলেন সুপবিত্র নীলনদের আদিমুখে। এই উর্বর দেশটির প্রান্তে ক্যেনোপাস বন্দরে বাণিজ্যিক জাতিদের জাহাজগুলি আশ্রয় ভোগ করছিলো। কেউই জানতো না কেনোপাস দেবতাই প্রতিষ্ঠা করেছেন কি না এই বন্দরটি, অথবা ওখানকার অধিবাসীরাই উদ্‌ভাবন করেছেন কি না এই দেবতাকে, বা নক্ষত্র ক্যানোপাস থেকে নাম হয়েছিলো কি না এই বন্দরের বা ঐ নগরের নাম থেকেই নামিত হয়েছিল ঐ নক্ষত্রটি। ক্যানোপাস হিন্দুদের ঋষি অগস্ত্য।

এখানেই ইথিওপিয়ার অধীশ্বর, তচনচ করে সমগ্র মিশর, দেখতে পেলেন অপরাজেয় অমৃতজীবন এবং পূজনীয়া ফর্মোজান্তে জাহাজ থেকে নাবছেন। একজনকে দেখে তার মনে হলো ইনি নিশ্চয়ই সমর দেবতা; অন্যকে মনে হলো রূপশ্রী দেবতা।

অমৃতজীবন বীটিকা নৃপতির পরিচয়পত্র তাঁকে অর্পণ করলেন।

ইথিওপীয়ার অধীশ্বর প্রথমেই বিচিত্র উৎসবাদির আয়োজন করালেন, বীরযুগের অপরিহার্য নিয়ম অনুসারে।

সেই উৎসবে তাঁরা আলোচনা করলেন, মিশর-মহীন্দ্রের ত্রিশ লক্ষ সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করবো, এই আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য। পৃথিবীর বুক থেকে অবলুপ্ত করতে হবে ভারত-ভূপেন্দ্রের ত্রিশ লক্ষ যোদ্ধপুরুষকে; শক-সাম্রাজ্যের সুমহান যাঁর ত্রিশ লক্ষ সৈন্যকেও নির্মূল করতে হবে, যিনি সুপ্রকাণ্ড, অহংকারী ও বিলাসী ব্যাবিলন নগরীকে অবরোধ করেছেন।

দু'সহস্র বীটিকার যোদ্ধা এসেছিলো অমৃতজীবনের সংগে; তারা বললে, ব্যাবিলন নগরীর মুক্তির জন্য ইথিওপিয়ার অধীশ্বরের প্রয়োজন নেই। আমাদের পক্ষে যথেষ্ট এটাই, যে আমাদের নরপতি আমাদের আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন ব্যাবিলন নগরী রক্ষা করতে। আমরাই যথেষ্ট এই সমরাভিযানের পক্ষে।

গ্যাসকনেরা জানালে, আমরা অনেক যুদ্ধেই এ পর্যন্ত সাফল্যের সংগে এসেছি বিজয়ী হয়ে। একেলাই আমরা মিশরীয়, ভারতীয় ও শক সাম্রাজ্যের সৈন্যদের পরাভূত করতে পারবো। আমরা বীটিকার সৈন্যদের সংগে একত্র রওনা হয়ে যেতে পারি, আর তা একটিমাত্র সর্তে। বীটিকীয়গণ রক্ষা করবে আমাদের পশ্চাৎভাগ।

শ'তুয়েক গঙ্গাবর্ত্তীয়েরা মিত্রপক্ষীয়দের এই অহংকৃত দাবী শুনে হাস্য সংবরণ করতে পারলে না। তারা নিবেদন করলে, শুধু শ' খানেক খড়্‌গশৃংগীদের নিয়েই আমরা জগতের সমস্ত মহীশ্বরদেরই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য করবো।

সম্রাটকুমারী রূপোত্তমা অসামান্যা ফর্মোজান্তে তাদের শান্ত করলেন বিজ্ঞতায় এবং মনোমুগ্ধকর বাক্যজালে।

অমৃতজীবন ইথিওপিয়ার কৃষ্ণবর্ণ অধীশ্বরকে উপহার দিলে তার গঙ্গাতীরবর্ত্তীদের, তার খড়্‌গশৃঙ্গীদের, বীটিকায়দের, গ্যাসকনীদের, আর তার সুন্দর বিহঙ্গটিকে।

সমস্ত কিছুই শীঘ্র তৈরী হলো যাত্রা করে যেতে মেমফিস, হেলিওপলিস, আরসিনো, পেত্রা, আর্টেমাইট, সোরা, এ্যাপামিয়ার মধ্য দিয়ে, আক্রমণ করতে সেই তিন মহা ভূপতিকে।

এবং আরম্ভ করতে কখনো না বিস্মৃত হওয়ার উপযুক্ত সেই মহাসমরটিকে যার তুলনায় আজ পর্য্যন্ত লোকে যে সমস্ত যুদ্ধ করেছে তা সমস্তই শুধু কুক্কুট বা বর্ত্তকদের যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়।

## সাতাত্তোর

সকলেই জানেন—ইথিওপিয়াপতি সম্রাটকুমারী পরম রূপসী অসামান্যা ফর্মোজান্তের প্রেমে পড়েছিলেন। এবং তাঁকে বিছানায় করেছিলেন বিস্মিত ও আতংকিত যখন সুমধুর নিদ্রা এনেছিলো তাঁর চোখের পাতা দুটি বন্ধ করে।

আপনারা স্মরণে রাখবেন—অমৃতজীবন এই দৃশ্যের সাক্ষী ছিলো। তার মনে হয়েছিলো দিনরাত্রি শুয়েছিলো এক বিছানায়।

আপনাদের একথাও অজানা নয়। অমৃতজীবন এই অসম্মানে ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হ'য়ে হঠাৎ তার "বজ্র" নামক তরবারিখানি নিষ্কোষিত ক'রে সেই উদ্ধত নিগ্রোর উচ্ছৃংখল মস্তকটি দ্বিখণ্ডিত ক'রে ফেলেছিলো এবং মিশর থেকে ইথিওপীয়দের সকলকেই দিয়েছিলো বহিষ্কৃত ক'রে।

এই সমস্ত আশ্চর্য্যজনক ঘটনা মিশরের ইতিবৃত্তে লিপিবদ্ধ হ'য়ে আছে। সত্যি নয় কী?

যশ শতমুখে ঘোষণা করলে অমৃতজীবনের বিজয়ে। সমূহ সেই তিন মহীশ্বরের উপরে, যাদের পরাস্ত করেছিলো সে বীটিকায় থেকে সমাগত সৈন্যদল, গ্যাসকনগণ এবং তার খড়্‌গশৃঙ্গী অশ্বদের সহায়তা নিয়ে।

রূপসী ফর্মোজান্তেকে অমৃতজীবন প্রত্যর্পণ করলে তাঁর পিতারই হাতে। উদ্ধার করলে সে রাজরাজেন্দ্রের মহিষীকে, উদ্ধার করলে তাঁর সমস্ত অনুচরদের, যাদের সকলকেই পরিয়েছিলেন দাসত্ব-শৃংখল মিশ্রদেশীয়দের মহীপতি।

শকবর্ষের সুমহান খাঁ ঘোষণা ক'রলেন, আপনার সামন্ত নৃপতি আমি আজ থেকে। আমার মুকুটখানি রাখলেম আমি আপনার পায়ের নিকটে।

অমৃতজীবন তাঁকে যত্ন ক'রে তুলে, মুকুটটি পুনরায় মাথায় পরিয়ে দিয়ে, আলিংগন ক'রলে আন্তরিক ভাবে: ব'ললে, ক্ষমা ক'রলুম আমি আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে। আর—

আর রাজকন্যা সর্ব্বদেবার সংগে আপনার বিয়ে হ'লো অনুমোদিত—হেসে হেসে উচ্চারণ ক'রতেই ব্যাবিলন-সম্রাট ব'ললেন, অবশ্যই, সর্ব্বান্তঃকরণেই।

অপরাজেয় ও উদার অমৃতজীবন ব্যাবিলন-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্বীকৃত হ'য়ে নগরীতে প্রবেশ ক'রলে বিজয়-গৌরবে ফিনিক্সের সংগে, শ'খানেক করদ-নৃপতির উপস্থিতিতে।

অমৃতজীবনের পরিণয়োৎসব, সম্রাট বেলুস ইতঃপূর্ব্বে যে উৎসবের আয়োজন ক'রেছিলেন মহীপালদের অভ্যর্থনা-কল্পে, তাঁকে সমস্ত প্রকারেই ক'রেছিলো অতিক্রম।

বৃষ এপিসকে রোষ্ট ক'রে খেতে দেওয়া হ'য়েছিলো নিমন্ত্রিতদের। অমৃতজীবন কিন্তু মাথায় ঠেকিয়েই তা'র সম্মান রেখেছিলো।

মিশর-মহীন্দ্র ও ভারত-ভূপাল টোষ্ট-এ সম্মানিত ক'রলেন—রাজবরবধূটিকে, জয়োচ্চারণ ক'রে নব-পরিণীত রাজ-দম্পতির।

ব্যাবিলনের পাঁচশো বড়ো বড়ো মহাকবি-কবি বিবাহ-উৎসবের গৌরববর্দ্ধন ক'রলেন "মধুর-মিলন" স্তুতি গেয়ে, কবিতায় ও নাটিকায়।

নবরাজ-দম্পতির অসামান্য প্রেমকথা, অসামান্য মহান আদর্শ, এবং অসামান্য বিশ্ব-পর্য্যটন প্রেমানুরাগবশে—সমস্তই উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছিলো নানা দিক দেশ থেকে সমাগত নর্ত্তকীদের মূক-অভিনয়ে, কিন্তু অপ্সরা-বিনিন্দী সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমেই।

**সমাপ্ত**

# দূরতমাস্থ

জগন্নাথ ঘোষ

তবুও এলে না তুমি। কি চিন্তায় সমস্ত সকাল
কেটে গেছে। হাওয়ায় কেঁপেছে পর্দা। যেন তাই
একান্ত গোপনে, মনের আঁচলে তুমি রক্তলাল
মৌসুমি ফুলের রঙ ছড়িয়েছ। সর্বদাই
ভয়ের কোটরে বসে চুপি-চুপি আকাশের নীলে
দুচোখ বাড়িয়ে দিই। জানালার শার্সিতে রাখি
মাথা আর যেন শুনি, প্রেমের ভিক্ষায় দিয়েছিলে
যা, সমস্ত মিলিয়ে যাবে। ঘর নিঃসঙ্গ একাকী।

নিতান্তই একা। এই ঘর। নিস্তব্ধ পালঙ্কে শুয়ে
ভাবি, তুমি এলে না।
আজকে আসবে বলেছিলে।
তোমার হাতের লেখা। বাঁকান অক্ষরগুলো নুয়ে
পড়েছে হৃদয় ভাষ্যে প্রণয়ের উচ্ছ্বসিত মিলে।

যাকে ভুলতে চাও, তার আদিগন্ত মনের ঠিকানা
সম্পূর্ণ পাওয়ার আগে, তুমি দূরে গেছ, মেলে ডানা।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

[ সি, এফ, অ্যাণ্ড্রুজ লিখিত 'What I Owe to Christ' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ]

## কেমব্রিজ মিশন দিল্লী

এই ভারতবর্ষে এসে অবধি এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা আমি পদে পদে বারে বারে উপলব্ধি করেছি। এই অভিজ্ঞতা এত বার আমাকে স্পর্শ করেছে যে, একে আমার আর আশ্চর্য বা অভাবনীয় বলে মনে হয় না। এখানে যখনই আমি কোনো নূতন লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি বা কোনো নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, তখনই নিতান্ত অপ্রতিরোধ্য ভাবে যিশুখৃষ্টের উপস্থিতিকে যেন আমি অনুভব করেছি। এই অনুভূতিকে সহজভাবে প্রকাশ করা শক্ত, স্থূলভাবে যদি বলতে হয় তাহলে এই কথাই বলতে পারি যে, বিভিন্ন নূতন লোকের মুখে আমি খৃষ্টকেই দেখেছি, প্রতিটি নূতন পরিবেশের মধ্যে অনুভব করেছি যে খৃষ্ট সেখানে বিরাজমান।

আমি স্থির জানি যে এ হোলো অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির কথা,—ভাষা দিয়ে একে বোঝা যায় না। কিন্তু ভারতীয় জীবনের মূলে আমার এই অলৌকিক খৃষ্টোপলব্ধিকে এমনি সোজাসুজি ভাবে ছাড়া বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ভারত-চেতনার মর্মমূলে খৃষ্টের প্রকাশ,—এই প্রকাশ ভারতের সঙ্গে আমার পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেনি। বরং এরই ফলে ভারত ও ভারতবাসী অতি সহজে আমার এতো আপন হয়ে উঠেছে।

এই উপলব্ধির সার্থকতম নিদর্শন সুশীলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ে। যিশু,—যিনি মহান মানব, পালক,—তাঁর যে মুখ শিশুকাল থেকে আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে, সেই মুখের প্রতিচ্ছবি সুশীলের মুখে আমি দেখেছিলাম। তাছাড়া কেবল বাইরের চেহারাতে নয়, অন্তরেও সুশীল ছিলেন খৃষ্টেরই মতো।—তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে খৃষ্টের অন্তর-মাধুর্য প্রকাশ পেত।

অবিলম্বে আমাদের বন্ধুত্ব এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হোলো। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন ইংরেজ মিশনারী। তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। তখন এমনি প্রথা ছিল অধ্যক্ষের পদে আর একজন ইংরেজই যে বৃত হবেন তা স্বয়ংসিদ্ধ। সুশীল আমাকে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করতে বললেন। আমার মনে হোলো এ প্রথাটা মোটেই সমর্থনীয় নয়। কুড়ি বৎসরের অধিককাল সহ-অধ্যক্ষের পদে আসীন রয়েছেন সুশীল তাঁর নিজের দেশের এই শিক্ষায়তনে। তিনি অধ্যক্ষ হতে পারবেন না, তাঁকে অতিক্রম করে অধ্যক্ষের পদ পাবে একজন নূতন বিদেশী,—শুধু ইংরেজ, এই অধিকারে? এ বড়ো অন্যায়! আমি এই প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ করলাম এবং সুশীল যাতে অধ্যক্ষ পদ পান, তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। মিশনের অন্যান্য অনেক অভিজ্ঞ সদস্য উদ্বেগ প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত আমার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোলো। সুশীল হলেন অধ্যক্ষ, তাঁর অধীনে কাজ করবার পরম সৌভাগ্য আমি লাভ করলাম। এ না হোলে কত বড়ো ভুল করা হোতো তা এখন বুঝতে পারি। অচিরেই প্রমাণিত হয়েছিল যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ হবার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন সুশীল।

সুশীল রুদ্রের মতো দিল্লীতে আরো অনেকে ছিলেন, যাঁদের সান্নিধ্যে আমি খৃষ্টের সান্নিধ্য অনুভব করেছি। বিশেষ করে সাধুপ্রাণ বৃদ্ধ মুসলমান মুন্সী জাকাউল্লা নিবিড়ভাবে আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন। অনুপম তাঁর চরিত্র শান্ত-সমাহিত ব্যবহার। তাঁর পরিচয় আমি বিস্তারিত ভাবে অন্য একটি গ্রন্থে লিখেছি।

মুন্সী জাকাউল্লা আমাকে পুত্র বলে ডাকতেন, পুত্রজ্ঞানে আমাকে স্নেহ করতেন। এক সময়ে তাঁর সনির্বন্ধ আহ্বানে প্রত্যেক দিন তাঁর বাড়িতে আমাকে যেতে হতো। প্রতিদিন আমাকে কাছে পেতে তাঁর যেমন আগ্রহ ছিল, তাঁর সঙ্গ লাভের জন্যে আমারও তেমনি ছিল প্রতিদিনের উদ্‌গ্রীবতা। আমার সঙ্গে ধর্মালোচনা করতে তিনি বড়ো ভালো বাসতেন। আমরা খোলাখুলি আলোচনা করতাম উভয়ের ধর্মের কথা। কিন্তু তাঁকে ধর্মান্তরিত করার বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্যও কখনো আমার মনে জাগে নি। তিনি অখৃষ্টান, কিন্তু তাঁর মধ্যে আমি খৃষ্টকে বিরাজমান দেখতাম। তাই তাঁর সংস্পর্শে এসে আমার আনন্দের অবধি ছিল না।

এক মুসলমানের সঙ্গে এক জন খৃষ্টান-মিশনারীর এমনি ঘনিষ্ঠতা, অথচ যার মধ্যে বিধর্মীকে খৃষ্টান ধর্মমতে দীক্ষিত করার কোনো উৎসাহ বা চেষ্টা নেই, এমনি সম্পর্ক সেদিনে নিতান্ত বিরল ছিল। অন্য মুসলমানদের পক্ষে এই সম্পর্ক সম্বন্ধে ভুল বোঝার সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু সুশীলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব এ ব্যাপারেও আমার সহায় হয়েছিল। অখৃষ্টানকে খৃষ্টান ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আনার জন্যে সুশীলের যে কোনো ব্যাকুলতা নেই, বরং এমনি ধর্মান্তরিত করণের পন্থাকে সুশীল যে অপছন্দ করেন তা দিল্লীর সকলেই জানত। আমি সুশীলের বন্ধু, অতএব সুশীলের প্রতি যে আস্থা, তার কিছু অংশ আমারও ভাগ্যে জুটেছিল।

দিল্লীর আর এক বন্ধুর কথা স্মরণ করি। ইনি এক জন শিখ-সর্দার, পাতিয়ালার রিজেন্সী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট। তাঁকেও

আমি অনুরূপ শ্রদ্ধা করতাম তাঁর চরিত্র-মাধুর্যের জন্যে। ধর্মের গভীর রূপ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা হোতো, ধর্মমত নিয়ে তর্ক হোতো না। ঈশ্বর-প্রেমে তর্কের স্থান নেই। আমার সাহচর্য তিনি খুবই কামনা করতেন এবং ক্রমে ক্রমে আমাদের বন্ধুত্ব অতি গভীর হয়েছিল। যখনই তাঁর কাছ থেকে আমি বিদায় নিতাম, তিনি আমাকে আলিঙ্গন করতেন। আবার দুহাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে নিতেন পুনর্বার দেখা হলে। ঈশ্বরভক্তিমূলক তাঁর স্বরচিত কয়েকটি উর্দু গ্রন্থ তিনি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

এই দুজন পরম ধার্মিক বৃদ্ধ বহুদিন হোলো শান্তির ক্রোড়ে চির আশ্রয় লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আমার মর্মমুকুরে চির-উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাঁদের কথা লেখবার সময় তাঁদের প্রীতি-উদ্ভাসিত মুখ যেন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতার ভাব পাঞ্জাবের বিভিন্ন মিশন কেন্দ্রে প্রচলিত ছিল না। এই পরধর্ম-অসূয়াকে আমি ঘৃণা করতাম। আমি একলাই যে প্রগতিবাদী ছিলাম তা নয়, কেমব্রিজ মিশনের কয়েকজন তরুণ সদস্যের মনোভাবও এ বিষয়ে উদার ছিল। কিন্তু পাঞ্জাবের অনেক মিশনারী একেবারে ভিন্ন আদর্শের লোক ছিলেন। রক্ষণশীলতা আর উদারনীতির অনিবার্য মতবিরোধ মাঝে মাঝে উত্তপ্তরূপ ধারণ করত। তখন মিটমাটের জন্যে মাঝখানে এসে দাঁড়াতেন আমাদের বিশপ, তিনি ছিলেন মধ্যপন্থাচারী। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের জন্যে বিশপ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এমনি যুদ্ধে জয়লাভ করে একজন অন্ধ মৌলবীকে তিনি খৃষ্টান করেছিলেন বলে তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। কিন্তু তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে সেদিন আর নেই, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মিশনারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনও দরকার।

এই ভারতবর্ষ তখন আমার কাছে নিতান্ত অপূর্বজ্ঞাত, সম্পূর্ণ নূতন। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ধর্ম,—সম্যক পৃথক পরিবেশ। এই অনেককে আপন করে নেবার মতো কতোটুকু মানসিক প্রস্তুতি আমি সঙ্গে করে এনেছিলাম। ইয়র্কশায়ারের প্রান্তরে বিশপ ওয়েষ্টকটের সঙ্গে ভ্রমণকালে যে উদার উপদেশবাণী তাঁর কাছ থেকে আমি লাভ করেছিলাম, সেই ছিল আমার শ্রেষ্ঠ পাথেয়। প্রাচীন খৃষ্টধর্মের সংস্কার বিহীন আদর্শকে ভারতবর্ষে প্রচার করবার উদ্দেশ্য ছিল কেমব্রিজ মিশনের। এই মিশনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিশপ ওয়েষ্টকট। তাই বিদেশে এতো ইংরেজ মিশনারী গিয়েছেন, তাঁদের অনেকের চেয়ে অধিকতর সংস্কার-বিমুখতার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। অধ্যাপক ঈ জি ব্রাউনের কাছ থেকেও আমি অনেক শিক্ষা ও উৎসাহ লাভ করেছিলাম, সে কথা এখন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। অধ্যাপক ব্রাউন ছিলেন আমাদের কলেজেরই সদস্য। প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম। ভারতে আসার পূর্বে তাঁর কাছে আমি প্রায়ই যেতাম, প্রাচ্য দেশ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ ভরা আলোচনা পরম আগ্রহের সঙ্গে শুনতাম। তাঁর শিক্ষাতেই আমি ইসলাম ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হই। এই শিক্ষা দিল্লীতে আসার পর আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল।

পূর্বপ্রস্তুতি কিছুটা থাকলেও মনের মধ্যে বিকৃত সংস্কারও ছিল যথেষ্ট, গভীর তাদের শিকড়। উত্তরাধিকার সূত্রে তারা প্রাপ্ত, শিশুকাল থেকে রক্তে তাদের অধিষ্ঠান। আমার পিতৃদেবের রক্ষণশীল বিশ্বাস ছিল যে ভারতবর্ষ বৃটেনের অধিকার। এই সংস্কার আমারও অবচেতন মনের মতো গভীরে বাসা বেঁধে ছিল তা আপাত কল্পনার নাগালের বাইরে। এক এক সময়ে নিতান্ত বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করতাম যে, এই সংস্কারের শিরা-প্রশিরা মনের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে নীচু থেকে কতো নীচুতে নেমে আছে, সেখান থেকে তাদের নির্মূল করে উচ্ছেদ করা কত শক্ত।

সংস্কার থেকে মুক্তির প্রয়াসে কার্পণ্য ছিল না আমার। এই প্রয়াসে আমার সবচেয়ে বড়ো সহায় ছিলেন সুশীল। আমার মধ্যেকার জাতিগত দম্ভ বা সাম্রাজ্যবাদী অহমিকার বহিঃপ্রকাশ যখনই তাঁর নজরে পড়েছে, তখনই সেই কলংক থেকে আমার মনকে মুক্ত করতে তিনি চেষ্টা করেছেন, তাঁরই সাহায্যে ধীরে ধীরে আমি অনেক ক্ষুদ্রতর মালিন্য পরিহার করতে পেরেছি। তিনি আমাকে যতো ভালো করে চিনেছিলেন, ততো বেশি করে ভালোবেসেছিলেন। আমার কথা-বার্তায় বা আচরণে জাতি-ধর্মের অহংকারের প্রকাশ দেখে কখনো তিনি অসহিষ্ণু হননি। ইংরেজদের সঙ্গে সংস্পর্শ তাঁর বহুদিনের, ইংরেজ চরিত্র তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। রাজনীতি বা ধর্ম, যে ক্ষেত্রেই হোক, আক্রমণাত্মক ব্যবহারের নিঃশংক অথচ উদার প্রতিরোধের জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন।

জোরের সঙ্গে সুশীল আমাকে বলতেন, চার্লি, মাঝে মাঝে সেণ্ট পলের পত্রাবলী পড়তে আমার কষ্ট হয়। ইনি যেন তোমাদের এই ইংরেজদের মতোই একজন, সর্বদা চেষ্টা করছেন অপরের বুকে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে। একজন লোককে স্বধর্মের আওতায় আনবার জন্যে দেশ অতিক্রম করছেন, সমুদ্র পার হচ্ছেন। এমন পরমত অসহিষ্ণুতা, নিজের ধর্ম বিশ্বাসকে খাড়া করবার জন্যে এমনি জবরদস্তি স্বয়ং খৃষ্টের মধ্যে কিন্তু নেই। সংগোপনে আপনি আবেগে বীজ থেকে জীবন স্ফুরিত হবে, এই হোলো খৃষ্টের শিক্ষা। এই আয়াসহীন স্বাভাবিক বিকাশকে তোমরা বোঝো না, পূর্ব দেশই বোঝে এই বিকাশের অন্তর্নিহিত শক্তি।

সেণ্ট পলের ধর্ম প্রচারের এমনি সমালোচনা হয়তো পূর্ণাঙ্গ নয়। যিশু খৃষ্টের পর সেণ্ট পলই পরোপকারের শ্রেষ্ঠ বন্দনা গান করেছেন, তাঁর বাণী শুধু মুখের কথা নয়, আপন জীবনের অভিজ্ঞতা ও নিরবচ্ছিন্ন সেবাব্রত থেকেই সে বাণী নিঃসৃত। কিন্তু ধর্ম গ্রন্থের মাধ্যমে যতোই আমি খৃষ্ট চরিত্রকে হৃদয়ংগম করেছি ততোই আমি দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছি যে কী ধর্মে ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পশ্চিম পূর্বের সঙ্গে যে ব্যবহার করে চলেছে তা অসমর্থনীয়। পশ্চিমের জাতীয় আভিজাত্য আর সাম্রাজ্যের অহংকার খৃষ্ট চরিত্রের প্রেম ও মমত্ববোধের তা সম্পূর্ণ বিপরীত। খৃষ্ট বলেছেন, শৃগালদেরও মাটির নিচে গর্ত আছে, পাখিরও বাসা আছে বৃক্ষচূড়ায়, কিন্তু মানবপুত্রের মাথা রাখবার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। এমনি হঠাৎ হঠাৎ চমক জাগানো আঘাত লাগানো কথা বলতেন সুশীল। তাঁর সেই সব কথার আঘাতে আমার নিরুপদ্রব মনের আত্মতৃপ্তির অর্গল ভেঙে যেত, অপসৃত হোতো অহমিকার আড়াল, কিন্তু খৃষ্টের মুখোমুখি তিনি দাঁড় করাতেন আমাকে।

মত আমার যতোই উদারনৈতিক থাক, ইংলিশ চার্চের গণ্ডীর মধ্যে আমি ছিলাম। আর এই গণ্ডী ছিল সুশীলের কাছে অসহ্য। প্রতি রবিবার প্রভাতে আমরা একযোগে উপাসনা করতাম,

প্রার্থনা করতাম প্রভুর আশীর্বাদ। কোনো বিশেষ ধর্মমতে যারা বিশ্বাসী, তারাই কেবল প্রভুর আশীর্বাদের অধিকারী, এ কথা সুশীলের মনঃপূত ছিল না। ধর্মান্তরিত হতে হবে, গণ্ডীর মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে, তবেই কেবল খৃষ্ট ঈশ্বরের সন্তানরূপে তোমাকে গ্রহণ করবেন, নইলে তুমি অপাঙ্‌ক্তেয়, তুমি আশ্রয়হারা, একথা কি খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থে কোথাও লেখা আছে? এই ছিল সুশীলের বিক্ষুব্ধ অন্তরের প্রশ্ন। প্রভু নিজেই কি বলেননি সে এমনি সংকীর্ণ ধর্ম নয়? সর্বমানবের প্রতি প্রভুর যে অপরিসীম অনন্ত করুণা। সেই করুণাকে খণ্ডিত করব আমরা? কোন্ সাহসে, কোন্ অধিকারে? খৃষ্ট নিজে বলেছেন,—শিষ্য যদি তার প্রভুর মতো হয় তাহলেই যথেষ্ট। প্রভুর গরিমাকে খণ্ডন করবে শিষ্য কোন্ ক্ষমতায়? সুশীল ক্ষুব্ধ মনে বারে বারে এই কথা বলতেন।

ইংলণ্ডের হাইচার্চের ধ্যান ধারণা ও নিয়ম নিষেধ ভারতবর্ষের মাটিতে বপন করা ও পালন করা যে অসম্ভব, শীঘ্রই আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। পরীক্ষার সম্মুখীন হতে বিলম্ব হোলো না। ইংরেজ মিশনারী এবং ভারতীয় এক ধর্ম সম্মেলনে প্রস্তাব হোলো যে সকলে একসঙ্গে মিলে এক প্রার্থনা-সভায় যোগ দেবেন, সমবেত ভাবে একযোগে উপাসনা করবেন, আশীর্বাচন শ্রবণ করবেন বৃদ্ধ প্রেসবিটেরিয়ান সাধু রেভারেণ্ড ডাক্তার চ্যাটার্জির মুখ থেকে। এক মুহূর্তের জন্মে দ্বিধা এলো আমার মনে, পরক্ষণেই বুঝলাম যে অসার অ্যাংলিকান কৌলীন্যের গর্ব নিয়ে পৃথক থাকতে আমি পারব না, ভারতীয় খৃষ্টানদের সঙ্গে এই অপূর্ব প্রেমযজ্ঞে আমাকে যোগ দিতেই হবে। সুশীল আর আমি একসঙ্গে গেলাম। আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটা কিছুই না, কিন্তু আমার জীবনে এ এক পরম শুভ সৌভাগ্য। সংস্কারের নিগূঢ় বন্ধনের একটি গ্রন্থি খুলল। যদি না খুলত, খৃষ্টের সর্বমানবিক অনন্ত প্রেমধারা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমার জীবন বিফল বিশুষ্ক হয়ে থাকত।

মানুষের নাটমন্দিরে পৌঁছবার পথে নানা দ্বার নানা অর্গল। এবার থেকে একের পর এক অর্গল ভাঙতে লাগল, নব নব অভিজ্ঞতার পরিচয় পেতে লাগলাম আমার যাত্রাপথে। একবার এক গ্রীষ্মকালে ম্যালেরিয়ার উপর্যুপরি আক্রমণে আমার দেহ অত্যন্ত দুর্বল, সবচেয়ে কষ্ট অনিদ্রা, এমন সময় সি বি ইয়ং নামে দিল্লীর একজন তরুণ ব্যাপটিষ্ট মিশনারী আমাকে শহরের বাইরে এক মিশনে নিয়ে গেলেন। সৎ সামারিটানের মতো আমার সেবা শুশ্রূষা করে তিনি আমাকে নীরোগ করে তুললেন। আমার শুশ্রূষা করতে করতে তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে কথা দিলাম যে তাঁর মিশন গির্জায়, তাঁর হয়ে আমি উপাসনা সভা পরিচালনা করে আসব, কেন না তা নইলে তাঁর গির্জায় উপাসনা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু লাহোরের বিশপ আমাকে সাবধান করে দিলেন যে এ করলে তাঁর এলাকায় আমার ধর্মযাজনার অধিকার বাতিল হয়ে যেতে পারে।

এ ঘটনা ঘটেছিল প্রায় কুড়ি বছর আগে। আজকালকার দিনে এমন অনুশাসন অন্তত পাঞ্জাবে অসম্ভব। কিন্তু সেদিন এমনি সমস্যা এক আশু সিদ্ধান্তের সংকটরূপে আমার সামনে উপস্থিত হোলো। আমি বিশপকে জানালাম যে তাঁর প্রতি আমার ধর্ম গোষ্ঠীগত আনুগত্য নিরংকুশ, কিন্তু এ ব্যাপার আমার আনুগত্যের নয়, বিশ্বাস ও ভক্তির। অতএব এ ক্ষেত্রে আমি ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করব, কোনো মানুষের নয়। এই ভাবে ধীরে ধীরে গ্রন্থির পর গ্রন্থি মোচিত হয়েছে, ভাগ্য আমাকে উন্মুক্ততর কর্মের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

তাছাড়া ইংলণ্ডে যে সব সমস্যার প্রায় সমাধান হয়ে গিয়েছিল,—এখানে সেই সব সমস্যা ফুটে উঠতে লাগল। ইংলণ্ডে থেকে বিশপ ওয়েষ্টকট আর ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপের পক্ষে উনচল্লিশ অনুশাসনে' সই করা এক কথা, আর ভারতে 'শিশু গির্জার' মাথায় সেই শাসনাবলীকে চাপিয়ে দেওয়া অন্য কথা। ইংলণ্ডে থাকতে যেদিন আজকের পদে আমি বৃত হই সেদিনও এই অনুশাসনের বিরুদ্ধে আমার বিবেকের বাধা আমি অনুভব করছিলাম। সেই বাধা এখন মনের মধ্যে অপ্রতিবোধ্য ব্যাকুলতার রূপ নিল। মনে হতে লাগল,—সেই প্রথম দিন কেন এই অনুশাসনকে স্বীকার করেছিলাম? অন্যায় করেছিলাম, কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছিলাম সেদিন।

দিল্লীর এক ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ মিশন-সভায় লাহোরের বিশপ ও কলকাতার মেট্রোপলিটান বিশপের উপস্থিতিতে সুশীল এই সব অনুশাসনের প্রতিবাদ করে এক প্রবন্ধ পড়লেন। তিনি অকপটে বললেন যে, এই সব অনুশাসনের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করতে পারেননি, সেইজন্যে তিনি ধর্মযাজক হতে অস্বীকার করেছিলেন। আমার মত যখন চাওয়া হোলো, তখন আমি সুশীলের মতেই সায় দিলাম, প্রবীণ পিতাগণের নির্দেশ থেকে উদ্ধৃত করে বললাম, যে শৃংখল আমরা বহন করতে পারি নি, আমাদের পূর্বপুরুষরা বহন করতে পারেননি, এই শৃংখল অন্য ভক্তদের গলায় চড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়।

বিদ্রোহের আভাস দেখে উভয় বিশপ বিচলিত হলেন। এদিকে আমার অন্তরে জমতে লাগল গভীর সংশয়ভাব। মনে হতে লাগল,—এই ভারতবর্ষ আমার পথ বন্ধন-মুক্তির পথ। সময় ঘনিয়ে আসছে, অনতিবিলম্বে আমাকে দৃঢ়নিশ্চয় হতে হবে,—কার আমি সেবক? মানুষের, না ঈশ্বরের?

ক্রিসমাসের এক প্রত্যুষে চূড়ান্ত মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। প্রভাতী প্রার্থনা-সভায় আমরা উপস্থিত। আমার সমস্ত অন্তর তখন প্রেমানন্দে উদ্বেলিত,—খৃষ্ট আমার, প্রভু আমার, তোমাকে যে বিশ্বাস করি সে তোমারই আশীর্বাদ, তোমাকে যে ভক্তি করি সে তোমারই করুণা। পৃথিবীতে শান্তি,—মানুষে মানুষে সম্প্রীতি—এ তোমারই আদর্শ, এই আদর্শের বন্দনা-গান ধ্বনিত হোক দিগ্‌দিগন্তরে, এই সঙ্গীত-অমৃতে প্লাবিত হোক লোক-হৃদয়। আমি আর সুশীল পাশাপাশি ধ্যানোপাসনা করলাম।

তারপর প্রভাতী প্রার্থনা আরম্ভ হোলো। অধিকাংশই ভারতীয় খৃষ্টান। সাদা পোষাক-পরা শিশুর দল এক কোণে। তারা বন্দনাগীতি গাইবে। আমি তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে। গান আরম্ভ হোলো। নিষ্পাপ সরল শিশুদের কোমল কণ্ঠের গান। কিন্তু এ কী গাইছে তারা? গানের মধ্যে গর্জন উঠছে, অভিশাপ ফুটছে,—ওরে অবিশ্বাসী, ওরে বিধর্মী, ধ্বংস হবি তোরা, শিয়রে নামবে তোদের অনন্ত সর্বনাশ! ঐ সংগীত-মন্ত্রের কী যে ভয়ংকর অর্থ তা শিশুরা বোঝে না, আর তাদের সরল অজ্ঞতার সুরে

সভায় বয়স্ক ভক্তেরা অশ্রান্তভরে যোগ দিয়েছে, যান্ত্রিক ভাবে কণ্ঠ মিলিয়েছে ঐ গানে। এখানে ওখানে দু-একজন ভক্ত হয়তো আছেন,—হয়তো সুশীলেরই মতো কেউ,—নিরুদ্ধ তাঁদের কণ্ঠ। তাঁদের বিবেক আপ্লুত হয়েছে, তারা মৌন বেদনায় স্মরণ করছেন খৃষ্টের আপন মুখ নিঃসৃত চিরসত্য বাণী,—বিশ্বাসী শিশুদের বিবেককে যে কলুষিত করে, সে যেই হোক, পাথর বাঁধা হোক তার গলায়, সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হোক তাকে।

প্রার্থনা শেষ হোলো। আকাশে সূর্য্য, অন্ধকার নেমে এল আমার মনে। সুশীল অনুপস্থিত ছিলেন, বাড়ি পৌঁছতে তিনি বললেন,—আর কতোদিন এই বীভৎস দাসত্বের গ্লানি আমরা বহন করব? আমার ছেলেকে আমি কি বলেছি জানো? একটি কাজ কখনো যেন সে না করে, জীবনে যেন সে মিশনারী না হয়!

সুশীলের কণ্ঠে ক্লিষ্ট আত্মধিক্কার।

আজ আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি আর নিজেকে প্রশ্ন করি,—যখন আমায় বুকের নিভৃত মনিকোঠায় ঈশ্বরের সর্বসংশয় বিহীন বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, সর্ববন্ধন মোচনের আহ্বানে রোমাঞ্চিত হয়েছিল আমার হৃদয়, তখন কেন ছিলাম স্তব্ধ হয়ে? কেন ঘোষণা করিনি সংস্কারের বিরুদ্ধে আমার চরম বিদ্রোহ দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায়? নিজেদের মনেই আবার আমায় প্রশ্নের উত্তর পাই, হয়তো তখনো সময় আসেনি, পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস জাগেনি। তখনো ভেবেছিলাম, বাইরে যেতে হবে না, ভিতর থেকে যুদ্ধ করলেই চলবে। এই যুদ্ধে সুশীলের নির্দেশ ও সহানুভূতি ছিল আমার শ্রেষ্ঠ সহায়।

ইতিমধ্যে বৃহত্তর অন্যায় ও গভীরতর পাপের সম্বন্ধে আমি অবহিত হয়েছিলাম, জাতি বিভেদ বর্ণবিদ্বেষ এই পাপ। খৃষ্টধর্মের বিশ্বপ্লাবী পবিত্র শান্তিধারা এই পাপ-বিষে পৃথিবীর সর্বত্র কলুষিত। এই অন্যায়ের ফলে বিশ্বে খৃষ্টবিশ্বাসী মানবসমাজের ঐক্য খান খান হয়ে ভেঙে গেছে। এই পাপের বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ হয়েও অকুতোভয়ে অবিশ্রাম যুদ্ধ করতে হবে, নইলে অপ্রতিরোধ্য সর্বনাশ। ছোট খাটো লড়াই যতো গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, মানবতার এই বৃহত্তর সংগ্রামের কাছে সে সব তুচ্ছ।

## সিমলা পাহাড়

গত পরিচ্ছেদে আমি যদি পাঠকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে থাকি যে, দিল্লীতে যে কয় বৎসর আমি ছিলাম আমি শুধু ধর্মগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সমানে বিদ্রোহই করেছি। যার ফলে শেষ পর্যন্ত আমার বিশপের সঙ্গে আমার প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে, তাহলে তা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা হবে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার সঙ্গে আমার মতবিভেদ ঘটলেও বিশপ আমাকে গভীর ও অকপট স্নেহ করতেন কোনো কারণেই সেই স্নেহ খর্ব হয়নি। আমি জানতাম যে, আমার কোনো কোনো সিদ্ধান্ত তাঁর অত্যন্ত দুঃখের কারণ হয়েছিল। কিন্তু আমার এ-ও বিশ্বাস ছিল যে, অন্যান্য নানা ব্যাপারে আমি তাঁকে যথোপযুক্ত সাহায্য করতে ও প্রচুর আনন্দ দিতে পেরেছি। তাঁর ও আমার উভয়েরই প্রভু যে খৃষ্ট, সেই পরম প্রভুকে আমি কতো ভালোবাসতাম তা তিনি জানতেন। এই ছিল আমার শ্রেষ্ঠ আশ্বাস।

লাহোরে তাঁর বাড়ির নাম ছিল বিশপবোর্ণ। যখনই লাহোরে গিয়েছি, তাঁর গৃহকে আমার আপন গৃহ মনে করেছি আমি। আমার আতিথ্য বিশপের অত্যন্ত প্রিয় ছিল, প্রাণখোলা সমাদর আমার প্রতি ছিল তাঁর। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখ, আনন্দোজ্জ্বল আহ্বান ও উদার আলিঙ্গন প্রতিবার প্রমাণ করত আমাকে দেখলে ও কাছে পেলেই সত্যিই তাঁর কতো ভালো লাগে।

দিল্লীতে আসবার অনেক দিন আগে থেকেই আদর্শ খৃষ্টান মিশনারীরূপে এই বিশপ লিফ্রয়কে আমি অন্তরে বরণ করে নিয়েছিলাম। তিনি আইরিশম্যান ছিলেন। তার মতো সাহসী অথচ নম্র ব্যক্তি আমি খুব কমই দেখেছি। প্রাণবন্ত ঔদার্য ও অকুতোভয় বলিষ্ঠতার এক অনন্যসাধারণ সমন্বয় ছিল তাঁর চরিত্রে। চরিত্রগুণে তাঁর সঙ্গে আর একটিমাত্র পুরুষের আমি তুলনা করতে পারি,—ইনি হচ্ছেন বিশপ মণ্টগোমারি। ইনিও আইরিশ, জীবনের শেষ কয় বৎসর ইনি এখন নিভৃতে ডোনেগালে অতিবাহিত করছেন। বিশপ লিফ্রয় বহু বৎসর নীরব সহিষ্ণুতায় দেহযন্ত্রণা ভোগ করার পর শান্তির ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করেছেন।

নিজের জীবনকে বিশপ লিফ্রয় কঠোর নিয়মানুবর্তিতার বন্ধনে বেঁধে রেখেছিলেন। ভয় কাকে বলে তা তিনি জানতেন না, কোনো ব্যক্তিগত বিপদকে তিনি কখনো গ্রাহ্য করেন নি। খৃষ্টরাজত্বপ্রসারের কর্তব্য-অভিযানে যে কোনো অজ্ঞাত বন্ধুর পথে আগুয়ান হতে কদাচ মুহূর্তের দ্বিধা ছিল না তাঁর। খৃষ্টের নামে খৃষ্টান সেবার কোনো নব অনুপ্রেরণায় যে কোনো দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় যতো আনন্দ পেতেন এতো আনন্দ আর কিছুতেই পেতেন না। ধর্মের জন্য আত্মনিবেদনের নূতন উত্তম ও অভীপ্সা নিয়ে তাঁর সম্মুখীন হলে সাহায্য ও উৎসাহদানে তাঁর কার্পণ্য ছিল না।

দিল্লীতে প্রথম কয়েক বৎসর আমি অত্যন্ত খুসিমনে নিজেকে কলেজের কাজে ব্যাপৃত রেখেছিলাম, সুশীলের আনুকূল্যে স্থানীয় বন্ধুসৌভাগ্যও লাভ করেছিলাম যথেষ্ট। তার পর ধীরে ধীরে আমার মনে সেই অপ্রতিরোধ্য আকাঙ্ক্ষা নূতন করে জেগে উঠল। দীনজন সহবাসের আকাঙ্ক্ষা। কলেজের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করেও এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায় সন্ধান করতে লাগলাম ও প্রথমে সুশীলকে আগের মনোবাঞ্ছার কথা বললাম।

পুরানো দিল্লীতে শবজীমণ্ডী বলে একটি এলাকা আছে, আমাদের কলেজ থেকে সাইকেলে সহজেই সেখানে যাওয়া যায়। এই এলাকায় সমাজ বহির্ভূত অস্পৃশ্য চামারদের বাস। এই চামারদের মধ্যে কয়েকজন খৃষ্টান হয়েছিল। আমরা তাদের জন্য একটি ছোট গির্জা বানিয়ে দিয়েছিলাম, এই গির্জায় ধর্মযাজকরূপে আমি মাঝে মাঝে গিয়েছি। ঐ চামারদের সঙ্গে বাস করবার বড়ো বাসনা হোলো আমার। কাছেই ওদের এলাকা, কলেজের কাজও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

সুশীল আমার পরিকল্পনায় সায় দিলেন কিন্তু আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শংকা প্রকাশ করলেন। আমি মিশন-কর্তা অ্যালনাটের কাছে আমার ইচ্ছাটি ব্যক্ত করলাম ও তাঁর নির্দেশমতো লাহোরে গিয়ে বিশপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বিশপ আমার

অভিপ্রায় শুনে কী যে আনন্দলাভ করলেন তা আমার এখনো মনে আছে। আমার এই নবতীর্থবাসের প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতি দিলেন।

দুঃখের কথা আমার এই পরিকল্পনা সফল হয়নি। দিল্লীর কালব্যাধি ম্যালেরিয়া হোলো চরম প্রতিবন্ধক। এই ব্যাধির উপর্যুপরি আক্রমণ আমাকে এমন অবস্থায় নিয়ে এল যে এক সময় ভয় হোলো যে ভারতবর্ষে আমার আর থাকা চলবে না, চিরদিনের মতো ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হবে।

বৎসরের পর বৎসর রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করি, আর প্রতিবার হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে বেশ কিছুদিন ধরে পাহাড়ে কাটাতে হয়। এই দুরবস্থা অবশ্য আমার জীবনে আশীর্বাদ হয়েই দেখা দিয়েছিল। কেন না, সিমলার পার্বত্য-প্রবাসে দু'জন আশ্চর্য মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমি লাভ করেছিলাম। এক জন স্যামুয়েল ষ্টোক্‌স, অ্যামেরিকান কোয়েকার, নিবাস ফিলাডেলফিয়া রাজ্যের জার্মান টাউন শহর। ষ্টোকসের সূত্রেই পরিচিত হয়েছিলাম সাধুসুন্দর সিং-এর সঙ্গে। সুন্দর সিং-এর বয়স তখন অল্প, পাঞ্জাবের বাইরে নিতান্ত স্বল্প-পরিচিত।

দীনজন সঙ্গে বসবাসের আকুলতা আমার মতো এই দু'জনের মনেও ছিল।

তবে আমি যা পারিনি, তাঁরা তা পেরেছিলেন, সফল হয়েছিল তাঁদের অভীপ্সা। প্রাচীন যুগে সাধু ফ্রান্সিস খৃষ্টের পদানুসরণ করেছিলেন প্রভুর নামে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করে, একটির বেশি দুটি পোষাক সঙ্গে না রেখে, নিঃস্ব হয়ে। সেই নিঃসম্বল পরম আত্মনিবেদনের পথের পথিক হয়েছিলেন আমার এই বন্ধুদ্বয়ও। খৃষ্টধর্মের প্রথম শতাব্দীতে যখন ভক্তিমানের অকলংক অন্তর বিশ্বাসে অনুরাগে পরিপ্লুত ছিল, তখনকার আত্মত্যাগের আনন্দ-উজ্জ্বল আদর্শের কাহিনী আজকাল আমরা পড়ি। এই দুই মহাপুরুষ তাঁদের আপন জীবনযাত্রার আলোকে পাঞ্জাবের আত্ম-বিস্মৃত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই প্রাচীন আদর্শকে উদ্ভাসিত করেছিলেন। তখন আমার দেহ মন দুর্বল, সেই অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ও একত্র জীবনযাত্রা আমার পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল।

ষ্টোক্‌স এবং সুন্দর সিং-এর সঙ্গে প্রধানত সিমলার পার্বত্য-অঞ্চলেই আমার দেখাশোনা হোতো। মাঝে মাঝে তাঁরা সমভূমিতে নেমে আসতেন, নগ্নপদে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করতেন। যখনই দিল্লীতে আসতেন সুশীলের বাঁধা আমন্ত্রণ ছিল তাঁদের জন্যে। উভয়ের এক জনও একবার উপস্থিত হওয়ামাত্র সারা বাড়িতে যেন আনন্দোৎসব শুরু হয়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠত, আমি ভাবতাম, যিশুর নাম নিয়ে তাঁদের মতো সহজ সরল জীবন বরণ করে আমি কেন গ্রামের আর পর্বতের পথে পা বাড়াতে পারি নে?

পর পর কয়েক বৎসর ধরে গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে সুশীল, সুশীলের দুই পুত্র আর আমি সিমলা থেকে হিন্দুস্থান তিব্বত রোডে পদব্রজে বার হয়ে পড়তাম। দিল্লীতে তখন প্রচণ্ড গরম। তিব্বত রোডের এক বাঁকে বাড়েরি বলে একটি জায়গায় আমাদের প্রিয় বন্ধু মিসেস বেটস-এর বাড়ি। সে গৃহে আমরা সাদর আতিথ্য লাভ করতাম। মিসেস বেটস বিধবা। তাঁর স্বামীর চা-বাগান ছিল। এখন সে বাগান নিষ্ফলা, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরও তিনি পাহাড় ছেড়ে যেতে চাননি।

রাস্তা থেকে পাঁচ হাজার ফুটের অধিক নিচে পর্বতশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে শতদ্রু নদী। দূরে মাথার উপরে হিমালয়ের সুবিশাল তুষারশৃঙ্গরাজি। রাস্তার এই বাঁকের পর হিন্দু বসবাসের শেষ। এখান থেকে পথের দু-ধারে ধর্মচক্রশোভিত নানা বৌদ্ধমন্দির। তিব্বত বেশি দূরে নয়।

বাড়েরি পর্যন্ত পৌঁছবার অনেক আগেই হিন্দুস্থান-তিব্বত রোডের ধারে নরখাণ্ডা থেকে দূরে হিমালয়ের তুষাররাজি সুন্দর দেখা যায়, যদি অবশ্য উজ্জ্বল দিন থাকে। সমতল থেকে ছাব্বিশ হাজার ফুট উঁচু সে শৈলপ্রাচীর অর্দ্ধ বৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে। নরখাণ্ডা থেকে 'হাটু' পর্বত-চূড়ায় ওঠা খুবই সহজ, সেখান থেকে আরো অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে। চূড়ার পর চূড়া, গভীর নিম্নভূমি পর্যন্ত সমস্ত পর্বতগাত্র জুড়ে বিরাট বিরাট গাছের জটলা, ঘন অন্ধকার আদিম অরণ্য।

একদিন প্রত্যূষে আমি আর আমার বিশপ নরখাণ্ডা থেকে হাটু পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করলাম, উদ্দেশ্য পর্বত শিখর থেকে তুষার-সৌন্দর্য দর্শন করব। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য যে, চূড়ায় গিয়ে পৌঁছানো মাত্র চারিদিক ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেল,—মেঘের অন্তরালে হারিয়ে গেল সামনের দৃশ্যপট। পায়ের নিচের মাটিটুকু কেবল দেখা যায়, সেখানে নানা ফুলে ছাওয়া একটি কার্পেট যেন বিছানো। সারা পর্বতচূড়া জুড়েই এমনি মনোহর পুষ্পগালিচা। দূর শৈলশ্রেণীর রূপ থেকে দৃষ্টি বঞ্চিত হলেও নিতান্ত চোখের কাছে ঈশ্বরের এই অপূর্ব সৃষ্টি দেখে আমরা ধন্য হলাম।

পর্বতচূড়ায় গায়ে একটি চাতালের উপর আমরা বসলাম। বিশপ তাঁর প্রার্থনা-গ্রন্থটি বার করে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা আরম্ভ করলেন। আমি যোগ দিলাম।

আস্তে আস্তে আমরা পড়তে লাগলাম, হে ঈশ্বর, আমরা তোমার বন্দনা করি, তোমাকে হৃদয়াসনে বরণ করি জীবন-প্রভুরূপে। হে পরমপিতা চিরন্তন, সমগ্র বিশ্বের পূজা-উপচার তুমি গ্রহণ করো।

'হে যিশু, হে খৃষ্ট, তুমি গৌরবের রাজাধিরাজ—'

এই ক'টি কথা যে মুহূর্তে আমরা উচ্চারণ করলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘাবরণ ভেদ করে পূর্ব গগনে সূর্য প্রকাশিত হোলো, আলোকের গৌরবচ্ছটায় উদ্ভাসিত হোলো দিগন্তর। অপসৃত কুয়াশার অন্তরাল ভেদ করে সম্মুখে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হোলো, দেখলাম হিমাদ্রির অনন্ত তুষার, শ্বেত-ধবল শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ রবিকিরণের স্বর্ণমুকুট পরে নিঃসীম স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশ্যে মাথা তুলেছে। আমাদের চারিধারের ও নিম্নের সমস্ত দৃশ্য তখনো কুয়াশায় ঢাকা, তাই উপরের ঐ তুষারশৃঙ্গরেখা যেন আমাদের অত্যন্ত কাছাকাছি বলে মনে হোলো, ওদের আকাশচুম্বী ললাট যেন এক অনির্বচনীয় মাধুর্য গাম্ভীর্যে ঠিক মর্মের মাঝখানে উদ্‌ঘাটিত হোলো। প্রকৃতির এই আশ্চর্য গরিমার সহসা প্রকাশে আমরা দুজনেই মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলাম, তারপর আনন্দের নবীন আবেগে আবার উচ্চারণ করলাম—'হে খৃষ্ট, গৌরবের রাজাধিরাজ তুমি, পরমপিতার অমৃতপুত্র তুমি!'

এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের সুস্পষ্ট রূপ বহুদিন পর্যন্ত আমার মানসপটে জাগ্রত ছিল। সেদিন সেই পর্বতশিখরে প্রভাত-সূর্যের আশ্চর্য গৌরবের মধ্যে আমি সত্যই যেন অমৃতপুত্র খৃষ্টের জ্যোতি-বিভাসিত মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

একবার বৎসরের শেষের দিকে স্যামুয়েল ষ্টোক্‌স ও সুন্দর সিং নিকটবর্তী পর্বতমালা অতিক্রম করে ওপারে যাত্রা করেছিলেন। পথিমধ্যে প্রচণ্ড শীতে সুন্দর সিং অশক্ত হয়ে পড়েন। ষ্টোক্‌স তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে থাকেন। তিনিও শেষ পর্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়েন। সেই নিঃসঙ্গ শীতরাজ্যে দুজনেই অজ্ঞান হয়ে যান। চেতনালুপ্তির পূর্বমুহূর্তে উভয়েই মনে হয় জীবনের শেষ মুহূর্ত বুঝি উপনীত। দেহের শেষ শক্তিবিন্দু যখন অন্তর্হিতপ্রায়, সেই মুহূর্তে এক অবর্ণনীয় আনন্দে সহসা ষ্টোকসের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়,—তিনি দেখেন, প্রভু তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, শক্তি দিচ্ছেন। ষ্টোকসের নিজ মুখ থেকেই তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা আমি শুনেছি।

শেষ পর্যন্ত তুহিন-মৃত্যুর কবল থেকে তাঁরা রক্ষা পান। একদল পাহাড়ী অশ্বারোহী যাত্রী তাঁদের মূর্ছিত ভূ-লুণ্ঠিত অবস্থায় দেখতে পায় ও তুলে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেয়।

আরও একবার ষ্টোকসের জীবন সাংঘাতিক বিপন্ন হয়েছিল। তখন সুশীল ও আমি তাঁদের সঙ্গে সিমলা পাহাড়ে আছি। একটি পাহাড়ী ছেলে ষ্টোকসের সঙ্গে অনেকদিন ছিল, খৃষ্টান হবার সাধ তার। ষ্টোকস ছেলেটিকে দীক্ষিত করলেন। এতে স্থানীয় পাহাড়ীরা তাঁর উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হোলো। গোপনে গোপনে তারা চক্রান্ত করল, সমভূমি থেকে পাহাড়ী রাস্তায় তিনি যখন ফিরবেন তখন তাঁকে আক্রমণ করবে।

এই ষড়যন্ত্রের কথা আমরা ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। একদিন বারোরি-র বাড়িতে বসে সুশীল আর আমি নীরবে পড়াশুনা করছি এমন সময় বাইরে প্রচণ্ড কোলাহল উঠল। ত্রস্তব্যস্ত হয়ে বাড়ি থেকে বার হলাম। দেখি সুশীলের ছেলে সুধীর ও দীননাথ বলে আর একজন ভারতীয় খৃষ্টান যুবক আমাদের আগেই পথে পৌঁছেছে ও ক্রুদ্ধ পাহাড়ীদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমাদের,—মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে ধুলায় লুটিয়ে পড়লেন ষ্টোকস,—কপালের উপর গভীর এক রক্ত-ঝরা ক্ষত, সারা দেহ মৃত্যু-পাণ্ডুর।

পুরো এক দিন এক রাত ষ্টোকস অচৈতন্য হয়ে রইলেন, আমরা একে একে তাঁর বিছানার পাশে বসে তাঁর সেবা করতে লাগলাম। অজ্ঞান অবস্থায় সমানে অস্ফুট বেদনা-কাতর শব্দ তাঁর মুখ থেকে বার হতে লাগল। তারপর যখন কথা ফুটল, বারে বারে ভাঙা হিন্দীতে তিনি বলতে লাগলেন, তাঁকে যারা মেরেছে তাদের কোনো শাস্তি যেন না হয়।

একটু সুস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, তিনি সিমলা শহরে যাবেন। কোনো আপত্তি শুনলেন না। সিমলার ডেপুটি কমিশনারের কাছে তাঁকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হোলো। যারা তাঁকে হত্যা করতে গিয়েছিল, তাদের হয়ে তিনি ডেপুটি কমিশনারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। যারা ধরা পড়েছিল, তাদের সকলের মুক্তি তিনি আদায় করলেন।

একসঙ্গে আমরা ছিলাম হিমালয়ের ক্রোড়ে,—এক চিন্তা আর আদর্শ, আর খৃষ্টের প্রতি একই একনিষ্ঠ অনুরাগের আনন্দ নিয়ে,—নানা বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতাকে একসঙ্গে অনুভব করে। মনে পড়ে, একবার পাহাড়ীদের মধ্যে কলেরার প্রাদুর্ভাব হোলো,—একসঙ্গে আমরা রোগী ও মুমূর্ষুদের সেবায় নিযুক্ত হলাম। দুঃখ পেয়েছি, আনন্দও পেয়েছি, আনন্দ বেদনার লীলাপ্রভু যিশুখৃষ্ট নিরন্তর আমাদের অন্তরে বিরাজ করেছেন।

চারিদিক পর্বতে ঘেরা, মাঝখানে শান্ত জনপদ। এই পরিবেশ সাধু সুন্দর সিং-এর বড়ো প্রিয় ছিল। নিঃসঙ্গতা ছিল তার কাম্য, একাকীত্বের মধ্যে খৃষ্টের ধ্যানে তাঁর অন্তর আবিষ্ট হোতো। বারেরি থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট নিচুতে কোটগড় নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র খৃষ্টান গির্জা ছিল। একজন বৃদ্ধ জার্মান মিশনারী ও তাঁর বয়স্কা স্ত্রী কী শীত কী গ্রীষ্ম এই ধর্মমন্দিরে বাস করতেন। শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট এই মিশনারীর নাম রেভারেণ্ড বিউটেল। বিউটেল দম্পতির প্রায় সারাজীবনই হিমালয়ের এই পার্বত্য অঞ্চলে কেটেছে। এঁরাও ছিলেন আমাদের বন্ধু।

ষ্টোকসের ছিল একটি শিশু-পরিবার। একটি শিশু অন্ধ, আর একটি খঞ্জ। তিনটি ছিল কুষ্ঠরোগীর সন্তান, যদিও তাদের কুষ্ঠ হয়নি সর্বহারা মানুষের সমাজে প্রত্যেকটির জন্য চরমতম দুর্দশা থেকে কুড়িয়ে এনে ষ্টোকস তাদের প্রতিপালন করেন। এমনি উচ্ছল উল্লাসভরা শিশুর দল আমি আর কোথাও দেখিনি। প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালোবাসে, হিংসা নেই, ঈর্ষা নেই, জীবনের সামান্য ভাগ্যকে খুসীমনে একসঙ্গে ভাগ করে নেয়। চমৎকার তাদের সাহচর্য !

সাধু সুন্দর সিং-এর নির্জনতা-প্রীতি ছিল অনন্যসাধারণ। প্রায়ই তিনি অদৃশ্য হতেন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাঁর কোনো খোঁজ থাকত না। আবার একদিন নীরবে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে সেবার কাজে হাত মেলাতেন। কোথায় যে তিনি যেতেন তাও জানত না কেউ। কোটগড়ের অদূরে অরণ্যের মধ্যে একটি গুহা ছিল। সেই গুহায় তিনি সারাদিন যিশুর উপাসনা ও ধ্যান করতেন।

সাধু সুন্দর সিং-এর মতো মহৎ আত্মা আমি অতি অল্পই দেখেছি। বিরল মানুষ ছিলেন তিনি, বিরল তাঁর মতো মহত্ত্ব। খৃষ্ট তাঁর প্রভু, খৃষ্ট তাঁর অন্তর দেবতা,—এই দেবতার অতীন্দ্রিয় স্পর্শে বিভোর তাঁর চৈতন্য। তাঁর জীবনের মূলে ছিল অনন্য-পরায়ণ আত্মনিবেদন। হিন্দুস্থান রোড ধরে অগ্রসর হয়ে নিষিদ্ধ দেশ তিব্বতে প্রবেশ করবেন, প্রভু যিশুর নাম প্রচার করবেন সে রাজ্যে, এই ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। ভয়ংকর বিপদ-সংকুল গিরিবর্ত্ম পার হতে হয় সে আকাঙ্ক্ষাপূরণে। কষ্টের অবধি নেই, মৃত্যুর বাধা পদে পদে। ১৯০৮ সালে কোটগড় থেকে বহুদিনের নিরুদ্দেশ যাত্রায় অতিবাহিত করেছিলেন সাধু সুন্দর সিং। তখন তিনি এই পথ অতিক্রম করেছিলেন। ১৯১১ সালের গ্রীষ্মকালের শেষভাগে আবার তিনি এই পথে যাত্রা করেছিলেন। পদে পদে মরণের হাতছানি,—কতো কষ্ট তিনি সহ্য করেছিলেন, কতো বিপদ জয় করেছিলেন, কেউ তা জানে না।

বারেরিতে অবস্থান কালের একটি মহা উত্তেজনাকর ঘটনার কথা মনে পড়ে। তখন গ্রীষ্মকাল। খবর রটল যে সুন্দর তিব্বত থেকে হিন্দুস্থান-তিব্বত রোড ধরে একজন ইউরোপীয় পর্যটক আসছেন। কয়েক দিন পরে তিব্বতী পথপ্রদর্শক সমভিব্যাহারে

পর্যটক এসে পৌঁছলেন। সেদিন রবিবার,—আমরা বারেরি থেকে কোটগড় গির্জায় সান্ধ্য-প্রার্থনা সভায় গিয়েছিলাম। দেখি, এক অপরিচিত দাড়িওয়ালা ব্যক্তি গির্জায় এসে উপস্থিত। তিনিই বিখ্যাত সোয়েন হেডিন।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর একটি সুন্দর কাজ সোয়েন হেডিন করলেন। গত দুবছর ধরে তিনি সমানে পর্যটন করে এসেছেন, সেই সঙ্গে তাঁর সঙ্গে একটি সোনার ক্রোনোমিটার যন্ত্র থাকত। বিধাতা তাঁকে আবার নিরাপদে সভ্যসমাজে পৌঁছে দিয়েছেন এই কৃতজ্ঞতায় তিনি সেই মূল্যবান যন্ত্রটি গির্জায় দান করলেন।

দীননাথের ভাই অমরনাথ ছিল আমার ছাত্র। সে তখন অসুস্থ অবস্থায় বারেরিতে আমাদের কাছে ছিল। আমি তার শুশ্রূষা করতাম। বিখ্যাত পর্যটকের আগম আবির্ভাবের খবর শোনামাত্র তার উত্তেজনার সীমা নেই, কিন্তু রোগশয্যায় শায়িত সে, কেমন করে তাঁকে দেখতে পাবে? আমি সোয়েন হেডিনকে অনুরোধ করলাম তিনি যদি নবখণ্ডা যাত্রার পথে বারেরি হয়ে যান, তাতে রুগ্ন ছেলেটির অভিলাষ পূর্ণ হবে। হেডিন সানন্দে রাজি হলেন। রোগশয্যার পাশে বসে তিনি অনেকক্ষণ ধরে অমরনাথের সঙ্গে গল্প করলেন, তাঁর অভিযানের নানা রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনালেন। রোগীর দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চরিতার্থতার পুলকে। অমরনাথের রোগমুক্তি ঘটেনি, তার স্বল্পায়ুর প্রতি সোয়েন হেডিনের এই অনুগ্রহ মূল্যহীন দান। বিদায় নেবার সময় সোয়েন হেডিন আমাদের বললেন, গত দু বছরের অধিক কালের মধ্যে ইউরোপীয় ভাষায় এই দ্বিতীয়বার তিনি কথা বললেন। এর আগের বার বলেছিলেন গিরিবর্ত্মের মধ্যে একদল কফেশীয় মিশনারীর সঙ্গে। শৈলরাজির মধ্যে অজ্ঞাত জগতের এতো গভীরে তিনি হারিয়ে ছিলেন এতোদিন।

পাহাড়ী পথ বেয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে তিব্বতীরা মাঝে মাঝে এপারে আসত তাদের পশুদল নিয়ে। সে সব দ্রব্যের বদলে তারা নিয়ে যেত পাঞ্জাবের তাঁতে বোনা পছন্দসই কম্বল। শতদ্রু নদীর উপত্যকায় রামপুরের বিখ্যাত বাৎসরিক হাটে এই কম্বল বিক্রী হোতো। সুন্দর সিং যখন আমাদের সঙ্গে থাকতেন তখন তিনি প্রায়ই এই সব আগন্তুক তিব্বতীদের সঙ্গে আলাপ জমাতেন ও তিব্বতী ভাষা শিখতে চেষ্টা করতেন। সুন্দর সিং দৃঢ়নিশ্চয় ছিলেন যে খৃষ্টের অমোঘ বাণী কণ্ঠে নিয়ে তিনি আবার নিষিদ্ধ তিব্বতে ফিরে যাবেনই, যদি তাতে নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করতে হয় তাও স্বীকার। আগের বার তিনি যখন গিয়েছিলেন তখনও মৃত্যুর শৃংখলে তিনি বাঁধা পড়েছিলেন। তখন তাঁর অল্প বয়স দেখে করুণা করে অনিবার্য জীবনাবসানের হাত থেকে তিব্বতী রমণীরা তাঁকে বাঁচিয়েছিল।

নিঃসঙ্গ মানুষ ছিলেন সাধু সুন্দর সিং। খৃষ্টপ্রেমের বন্ধুরতম পথে একলা চলার ব্রত ছিল তাঁর। এই ব্রতপালনের অহর্নিশ স্বপ্নে ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ আনন্দ। তাঁর কাছে যখনি আমি বসতাম, কোনো কথা প্রায় হোতো না, কিন্তু সেই নীরব সহ-অবস্থিতির মধ্যে আমি যেন এক অনির্বচনীয় অতীন্দ্রিয় ভাবে খৃষ্টের সান্নিধ্য অনুভব করতাম। পরবর্তী জীবনে তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেছিলেন,—ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে গিয়েছিলেন। তাঁর কথা শোনবার জন্যে দেশ বিদেশে সহস্র সহস্র লোক ভিড় করেছে, তাঁর বাণীকে অমৃত সম জ্ঞান করেছে। কিন্তু বহুদেশের বহু মানুষের শ্রদ্ধা ও স্তুতিতেও তাঁর চরিত্রের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। সারল্য বিনয়ের প্রতিমূর্তি ছিলেন তিনি,—প্রশংসাবাদ তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। জনকোলাহলের প্রান্তে তিনি অপসরণ করতেন নিজেকে,—নিভৃত ধ্যানে তাঁর প্রভুর মুখোমুখি বসতেন তিনি।

গত চার বৎসর পূর্বে সুন্দর সিং-এর সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা হয়। সেই সাক্ষাৎ আমার পরম সৌভাগ্য। বিশেষ করে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই তিনি সিমলা বাজারে ম্যালের নিচে ভারতীয় গির্জায় এসেছিলেন। রোগজীর্ণ তাঁর মূর্তি, কতো ক্লান্ত, কতো অশক্ত। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় খৃষ্টপ্রসঙ্গে তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, শ্রান্তিরূপ যেন অপসৃত হোলো এক মুহূর্তে। আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

তারপর থেকে বহু বার নানাভাবে সন্ধান করেছি, কিন্তু সাধু সুন্দর-সিং সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য সংবাদ আমি পাই নি। জনশ্রুতি এই যে, তাঁর স্বাস্থ্য আরো ভেঙে পড়ে, দৃষ্টিশক্তিও দুর্বলতর হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও খৃষ্টের মহিমা প্রচারের দুর্বার আবেগে তিনি পুনর্বার তিব্বত দেশের অভ্যন্তরে যাত্রা করেন।

এই সংবাদ সত্য কি না, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তিনি জীবিত আছেন কি না তাও জানা নেই।

প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, এই তিন বৎসরে সাধু সুন্দর সিং-এর কোনো সংবাদ কেউ জানে না। ভারতে যাঁরা তার বন্ধু ছিলেন ও তাঁর গভীর স্বাস্থ্যহানির কথা জানতেন তাঁদের ধারণা তিব্বতের পথে তিনি দেহ-রক্ষা করেছেন। হয়তো আজও জীবিত, হয়তো তাঁর পথিক আত্মা মৃত্যুর সিংহদ্বার অতিক্রম করে পরম শান্তির পথে যাত্রা করেছে। একটি বিষয়ে কিন্তু কোনো অনিশ্চয়তা নেই। পরমপ্রভু খৃষ্ট তার আবির্ভাবের মহামুহূর্ত থেকে আজও পর্যন্ত মরজগতে মানবসমাজে যে অন্তহীন অকৃপণ কৃপা বিতরণ করে চলেছেন, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ সাধু সুন্দর সিং-এর খৃষ্টসম নিবেদিত জীবন। তাঁর জীবনাদর্শের তুলনা এ যুগের সারা খৃষ্টান-সমাজে দ্বিতীয় নেই। [ ক্রমশঃ।

অনুবাদক—নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

"Lastly, there is the love of God; we become whole with God. But God as we know Him is either infinite love or infinite pride and power, always one or the other, Christ or Jehovah, always one half excluding the other. Therefore, God is for ever jealous. If we love one God, we must hate this one sooner or later, and choose the other. This is the tragedy of religious experience. But the Holy Spirit, the unknowable, is single and perfect for us."

—LOVE AND LIFE. *D. H. Lawrence*

# ভুতোদা বনাম আফিসের মেয়ে.

বিমল আর বিনয় বসেছিল। উত্তেজিত হয়ে ঢুকলেন ভুতোদা।

ভুতোদাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ! কালে কালে কি হোল!

বিমলঃ আবার কি হোল ?

ভুতোদাঃ জানিস আমাদের ছোটবেলায় বড়লোকের বাড়ীর বৌ মেয়েদের পাল্কী শুদ্ধু নদীতে ডুবিয়ে আনা হোত যাতে মুখ কেউ না দেখতে পায়। আর এখন বুড়োধাড়ী মেয়েরা সব আপিসে কাজ করে বেড়াচ্ছে ?

বিনয়ঃ তাতে আপনার হোল কি ?

ভুতোদাঃ আমাদের মধুপুরের কেলো এখানে এক সদাগরী আপিসে কাজ করে। কাল গিয়েছিলাম দেখা করতে। ঢোকার মুখেই এক রংচং মাখা আধুনিকা পথ আটকালো। ইংরাজীতে চটাং চটাং করে কি বলল।

আমি বললাম "মা লক্ষী আমাদের কেলোর সঙ্গে একটু দেখা করব।" অনেক বোঝানোর পরে বলল "ও, মিষ্টার রে—আপনার শ্লিপ পাঠান।" চেয়ারে ঠ্যাং তুলে একটু আরাম করে বসেছি বলে—"ঠিক করে বসুন। আপিসটা কি বাড়ীঘর পেয়েছেন?"

বিমলঃ ঠিকই তো বলেছে!

ভুতোদাঃ কাজকরা মেয়েদের আমি দুচোখে দেখতে পারিনা। ওদের বাড়ীঘরে মন থাকেনা। শুধু এদিকওদিক ঘুরে বেড়ানো আর চটাং চটাং ইংরিজী বুলি।

বিমল আর বিনয়ের একবার চোখ চাওয়া চাওয়ি হয়ে গেল। ভুতোদাকে আর একবার জব্দ করা যাবে।

বিনয়ঃ ভুতোদা, আজ তো রবিবার। চলুননা আমার পিসে মশায়ের বাড়ী। গড়পারের ওদিকটা আপনার দেখা হয়ে যাবে আর আলাপ পরিচয়ও হবে।

ভুতোদাঃ তা যাব এখন।

বিকেলে গড়পারে বিনয়ের পিসের বাড়ীতে ভুতোদা বিমল আর বিনয়।

বিনয়ঃ এই যে ভুতোদা, আমার পিসতুতো বোন মিলি। ও একটা ব্যাঙ্কে চাকরী করে।

ভুতোদা (অপ্রসন্ন): চাকরী করে? তা বেশ, তা বেশ

মিলিঃ কেন চাকরী করা আপনি পছন্দ করেননা?

ভুতোদাঃ (ভয়পেয়ে): না, না, কেন করবনা। তবে মা আমরা বুড়ো মানুষ। মেয়েদের ঘরের কাজকর্ম্ম করাই পছন্দ করি।

মিলিঃ (মুখ টিপে হেসে) ও এই কথা।

বিমলঃ মিলি আমাদের খাওয়াবিনা?

মিলিঃ নিশ্চয়ই!

মিলি সযত্নে মেঝে পরিষ্কার করে সবাইকার আসন পেতে খাবার পরিবেশন করল। ভুতোদা অবাক হয়ে দেখছিলেন। হাবভাব দেখে তো ঘরের লক্ষীই মনে হচ্ছে!

বিমলঃ (আড়চোখে তাকিয়ে) ভুতোদা, চাকরী করা মেয়ে। কাছে যাবেন না। কামড়ে দিতে পারে।

ভুতোদাঃ থাম্।

খেতে বসে

ভুতোদাঃ খাবার তো অনেক করেছো মা। মাছের ঝাল, মাংস, আলুপটলের ডালনা। ঠাকুর রেঁধেছে নিশ্চয়ই।

মিলিঃ না, বাড়ীর রান্নাবান্না আমিই করি।

ভুতোদাঃ তা বেশ। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ। এতো খেতে পারবনা। কিছুটা তুলে রাখো।

মিলিঃ খানই না আপনি। না খেতে পারলে পাতেই রেখে দেবেন।

ভুতোদাঃ বাঃ বাঃ খাসা স্বাদ হয়েছে তো। নাঃ পড়ে আর কিছু থাকলনা। আর একটু ডালনা দাওতো। কি দিয়ে রেঁধেছ মা? তেল তো মনে হচ্ছেনা!

বিমলঃ কি দিয়ে আবার। 'ডালডা' দিয়ে।

ভুতোদাঃ (চটে)—আবার রসিকতা করছিস?

মিলিঃ না সত্যিই খাবার দাবার সব 'ডালডায়' রাঁধা।

ভুতোদাঃ আমি তো জানতাম ভাজাভুজি মিষ্টি ফিষ্টিই 'ডালডায়' হয়!

মিলিঃ না সব রান্নাই 'ডালডায়' ভাল হয়।

বিনয়ঃ শেষ শেষ ভুতোদা। শেষে চাকরী করা মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হোল।

ভুতোদাঃ আহা, আমাদের মিলিমা তো একজন। আরো যে হাজার হাজার মেয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে এমনটি—

মিলিঃ না ভুতোদা, মেয়েরা চাকরি করে জীবনযাত্রা স্বচ্ছল করার জন্যেই। বাড়ীর কাজেও তারা কোন অংশে খারাপ নয়।

বিমলঃ ভুতোদা, এবার কি সব চাকুরে মেয়ের বাড়ীতেই খেয়ে দেখবেন নাকি।

বাসব ঠাকুর

এক নম্বর ব্রিজের দক্ষিণ দিকে বস্তির একটা ছোট্ট ঘরে খোলা জানলাটির বাঁশের গরাদের মধ্যে দিয়ে ছিটকে পড়েছে এক ফালি প্রভাতের সূর্য্যকিরণ। সেদিন ছিল রবিবার, তাই বস্তির অনেক লোকই কাজে যায়নি। একদল কুলির সরদার রামস্বরূপ হুঁকো টানতে টানতে দাওয়ায় বেরিয়ে আসে। বুধোকে এক পাশে বসে থাকতে দেখে বলে—আচ্ছা, তোর কি হয়েছে বল দেখি আজ-কাল? সব সময় তুই মুখ গোমড়া করে থাকিস, কাজেও তোর যেন আর মন নেই। সেই একদিন রাতের বেলা আমরা সবাই যখন একটু মাল খেয়ে বেহুঁস হয়েছিলুম তখন তুই না কি কোথায় চলে গিয়েছিলি, তারপর ফিরেছিলি একবারে ভোরবেলায়। ঠিক করে বলতো কোথায় গিয়েছিলি সেদিন? তারপর থেকেই দেখছি তোর এই হাল।

দেখ রামস্বরূপ, মিছে ঘ্যান্-ঘ্যান্ করিস নি, আমার কাজ তোর পছন্দ না হয় তো আমায় ছেড়ে দে।

আরে রেগে উঠছিস কেন? এই সকালবেলা আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছি না কি? আমি কি বলেছি, তোর কাজ আমার পছন্দ হয় না? কিন্তু তোর এই অবস্থা দেখলে আমাদের কষ্ট হয় বলে বলছিলুম। নে এটা নে, আমি শিয়ালদার কল থেকে চানটা সেরে আসি, বলে সে বুধোর দিকে হুঁকোটা এগিয়ে দিয়ে দাওয়া থেকে নেমে কলতলার পথ ধরে।

রামস্বরূপ চলে গেলে বুধো হুঁকোয় টান না দিয়ে সেটাকে এক পাশে নামিয়ে রাখে, তারপর নিজের ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বার করে সেটা ধরিয়ে সেই দাওয়াতেই একা বসে টানতে থাকে। ওর পিছন দিকে ঘরের দরজায় ছেঁড়া শাড়ীর পর্দাটা সরিয়ে কখন যে পেয়ারী এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ও খেয়ালই করেনি। একটা আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে চাইতেই পেয়ারীর সঙ্গে ওর চোখাচোখি হয়ে গেল পেয়ারী তার ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি এনে ঘাড় দুলিয়ে দাঁড়ালো, কিন্তু বুধো সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আপন মনেই বিড়ি টেনে চললো। ওর এই নির্লিপ্ততা পেয়ারীর যেন অসহ্য হয়ে ওঠে, তাই সে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠে, আমাদের দেখে তো মুখ ঘুরিয়ে নিবিই! হাকিম-বেলেস্তারার মেয়ে না হলে তোর তো আর পছন্দ হয় না আজকাল, কিন্তু মনে রাখিস তোর আমার মতন লোকের ওদের দিকে শুধু চেয়ে থাকাই সার হবে। আমরা ছোট লোক। আমাদের ওপর খুসি হলে ওরা এক টাকা হয়তো বখসিস দিয়ে দেবে, কিন্তু ওদের সমান হতে দেবে না কোন দিন।

বুধো মুখ বিকৃত করে চেঁচিয়ে ওঠে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই সব কথাই জানিস। আর হাকিম-বেলেস্তারার মেয়েকে আমি পছন্দ করি বা না করি তোর তাতে কি আসে যায় রে?

আমার আবার কি! কিন্তু আজকাল আমায় দেখলে অমন করে মুখ ঘুরিয়ে নিস কেন বলতো? আমি তোর কি করেছি রে? চোরবাগানের সেই ভাঙা বাড়ীতে ইটের গাদায় যখন কার্ত্তিক মাসের শীতে সারারাত পড়েছিলি, ইট বইতে এসে সেই তো পেরথম তোকে দেখতে পেয়েছিলুম, তখন যদি আমি তোর জন্যে একবাটি গরম চা করে না নিয়ে আসতুম তা হলে তুই কি সেদিন উঠতে পারতিস নাকি? তারপর এক মাস যখন জ্বরে ভুগলি তখন আমি না থাকলে কে তোকে নিজের পয়সা দিয়ে ওষুধ জোগাত রে? তখন তোর গায়ে তো ছিল ক'খানি শুধু হাড়। আমি না বললে সরদার তোকে কাজে নিত নাকি? এখন যেই হাতে একটু পয়সা এসেছে আর গায়ে একটু গত্তি লেগেছে অমনি আমরা তোর পর হয়ে গেলুম, না রে? মিনসেদের জাতটাই এমনি নেমকহারাম।

দেখ, তোরা দুজনে কি মতলব করেছিস বল দেখি, সকালে দু-মিনিট নিরিবিলি একটা বিড়ি খাবো তারও যো নেই! কেবল প্যান প্যান, ঘ্যান ঘ্যান—যা আমি চললুম।

না, না, যাসনে মাইরি, একটু বসে যা, চা-টা হয়ে গেছে, আমি এখুনি এনে দিচ্ছি। বলে পেয়ারী ঘরে গিয়ে একটা হাতলভাঙা পেয়ালায় করে চা এনে বুধোর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, এই নে চা-টা খেয়ে নে। তবে আমরা তো আর হাকিম-বেলেস্তারার মেয়ে নই, আমাদের হাতের চা আবার তোর ভাল লাগবে কিনা কে জানে!

পেয়ারীর কথার শেষে বুধো আবার উত্তেজিত হয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে উঠে পড়ে বলে, নাঃ, আমি চললুম।

পেয়ারী ছুটে এসে ওর একটা হাত ধরে ফেলে বলে, আমার মাথা খাস এখুনি যাসনে, চা-টা খেয়ে নে। মাইরি ও সব কথা আমি আর কখনও তুলবো না। সত্যিই আমার ঘাট হয়েছে। সে চায়ের কাপটা বুধোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতে থাকে, হ্যাঁ রে, তুই কি আমার দিকে চেয়ে দেখবিনি একটু? আমার সমস্ত যৌবনকালটা কি ওই বুড়োটার সঙ্গেই কাটাতে হবে নাকি? তুই-ই খালি আমার

দিকে ফিরে তাকাসনে, কিন্তু রাস্তা-ঘাটের লোকগুলোর জন্যে আমি তো চলতে পারিনি মাইরি। ওরা আমার দিকে চেয়ে চেয়ে কি দেখে বলতো? যত সব বেহায়া যেন পেলে আমায় খেয়ে ফেলবে। আর শিয়ালদার কলে চান করতে গেলে তো ছোঁড়ারা সব কাক চিলের মতো ঘিরে দাঁড়ায়। তবে সাহস করে কোনদিন কিছু করতে পারে না, আমাকে ভয় পায় কি না। খালি যার কাছে আমার না দেবার কিছুই নেই সেই শুধু আমায় দেখলে না। বুধোর দিকে করুণ চোখে চেয়ে বলতে বলতে পেয়ারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দেব মাইরি, সত্যি বলছি, সরদারের কাছ থেকে আজ অবধি যা পেয়েছি সব মিলিয়ে দশ ভরি সোনা, আর পঞ্চাশ ভরি রূপোর গহনা হবে। ওইগুলো নিয়ে তুই আর আমি বম্বে চলে যাই তো আমাদের আর কোন ভাবনাই থাকে না। আমার একার গতরে যা উপায় হবে তাতে আমাদের দু-জনার চলে যাবে। তুই শুধু পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকবি। আর সর্দার টেরও পাবে না আমরা কোথায় আছি।

পেয়ারীর কথায় বাধা পড়ে। কারণ, বুধো চায়ের কাপটা টান মেরে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চা শুদ্ধ কাপটা একটা ইটের উপর লেগে ধড়াস করে একটা আওয়াজ করে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে। দাঁতে দাঁত চেপে বুধো বলে ওঠে, দেখ, তোর মতন চারটে মেয়ে এলেও আমায় খারাপ করতে পারবে না। তুই এখন সর্দারের বৌ। সর্দার আমার বন্ধু। তোরা জানিস না কৃতজ্ঞতা কা'কে বলে। তোরা মেয়ে জাত সব পারিস, মানুষের গলায় ছুরি দিয়ে হাসতে পারিস, তাই মনে করেছিস আমিও বিশ্বাসঘাতক হতে পারি। বুধো ততক্ষণে রাস্তায় নেমে পড়েছিল। সে পুলের দিকে যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে বললে, সর্দারকে বলে দিস, কাল থেকে আমি আর কাজে আসবো না।

চায়ের কাপটা ভেঙে ফেলে বুধোকে অমন করে চলে যেতে দেখে পেয়ারী যেন ক্ষেপে ওঠে। সে চেঁচিয়ে বলে, আচ্ছা যা, যা—কলকাতায় তোর মত ছোঁড়ার অভাব আছে নাকি? কুকুরকে নাই দিলেই মাথায় ওঠে, কিন্তু এটাও মনে রাখিস, পেয়ারী সর্দারণীকে অপমান করে আজ অবধি কেউ পার পায়নি। বুধো ততক্ষণে পুলের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাগে গজ্ গজ্ করতে করতে পেয়ারী ঘরে ঢুকে ধড়াস করে দরজায় খিল দিয়ে দেয়।

অন্ধ ভিখিরীকে মা একটা পয়সা দেবে, এক মুঠো চাল দেবে মা? দু' মুঠো চাল আর একটা বাসি রুটি পেয়ে পাশের খোলার ঘরের দরজা ছেড়ে ভিখিরীটা পেয়ারীর দরজার সামনে এসে ডাকে। একবারে সাড়া না পেয়ে আবার সে ডাকে, মা অন্ধ নাচারকে—ওর কথা শেষ হয় না।

দরজা খুলে বেরিয়ে এসে পেয়ারী খেঁকিয়ে ওঠে, যা এখান থেকে, যত সব জোচ্চোর ভিখিরীতে সহরটা যেন ছেয়ে গেছে, বেরো, বেরো বলছি। ভিখিরী বেগতিক দেখে তাড়াতাড়ি গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পেয়ারী তখনও চেঁচিয়ে বলছে, অন্ধ, নাচার, না আরও কিছু, আমাকে শেখাতে এসেছ, কি করে অন্ধ হতে হয়! আমার বাপ বলে ঐ করেই তো আমায় আঠারো বছর বয়স অবধি রাজার হালে রেখে এসেছে। ও আবার কিছু শক্ত কাজ নাকি? দুটো রং করা কাচ চোখের ভেতর আটকে দিলেই তো হল। আজ বাবা যদি বেঁচে থাকতো, তা হলে এই বুড়ো সর্দারের সঙ্গে ঘর করতুম নাকি?

পেয়ারী নিজের মনে বকেই চলেছিল, ওর খেয়াল ছিল না স্নান সেরে সর্দার কখন ওর পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছে। পেয়ারীর মুখে নিজেকে বুড়ো বলতে শুনে সর্দার ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে ওঠে, বুড়োর সঙ্গে ঘর করতে অতই যদি ঘেন্না, তো একটা কচি ছোঁড়াকে দেখে-শুনে নে না। তোর জাল-অন্ধ বাপের সঙ্গে যেমন রাজার হালে থাকতিস আবার তেমনি থাকবি। আর তোর জাল-অন্ধ বাপকে হপ্তায় হপ্তায় আমি যদি টাকা না জোগাতুম তাহলে তোদের খাওয়া জুটতো না কি? সে কথা মনে রাখবি কেন?

সর্দারকে দেখে পেয়ারী এবার যেন ক্ষেপে ওঠে। যা, যা, তুই না থাকলে বুঝি আমার আর কেউ ছিল না? টেকো মাথার দেমাক দেখ না। বলে আমাদের গাছতলার তাঁবুর পেছনে পাঁচ তলা বাড়ীর মালিকের ছোট ছেলেও আমার জন্যে তখন পাগল, আর ও ভাবে ঐ বুড়ো হাড় ছাড়া আমার আর গতি ছিল না। আর কচি ছোঁড়া এবার জুটিয়ে নেবই তো। বুড়ো বয়সে নিজের ঘর যদি সামলাতে না পারিস—বন্ধু। অমন বন্ধু অনেক দেখেছি। যেই তুই চান করতে গেলি, অমনি কি না তোর ঘরের মেয়ে মানুষের হাত ধরে পিরীত করতে চায়? তখন হ্যাঁচকা মেরে হাত সরিয়ে নিতেই তো কাপটা শুদ্ধ পড়ে গেল। ঐ দেখ না, ভেঙ্গে পড়ে আছে, একটা বুড়োর সঙ্গে থাকে বলে কি পেয়ারী সর্দারণীর কোন ইজ্জত নেই? ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করলুম যখন, তখন আবার বলে কি না সর্দারকে বল্‌সি যদি তো, বলবো

তুই-ই আমার হাত ধরে ছিলি। বুড়োই হোক আর জোয়ানই হোক, যার সঙ্গে ঘর করি, মেয়েমানুষের সেই হল মরদ। তাই বলে ঐ আঁস্তাকুড়ের কুকুরটা আমায় বেইজ্জত করে যাবে? এত বড় আস্পর্দ্ধা?

সর্দ্দারের তখন মাথাটা ঘুরতে আরম্ভ করেছে, ও যেন ইচ্ছে করেই। বুঝতে চায় না পেয়ারী কার কথা বলছে, তা ক্ষীণ কণ্ঠে একবার জিগ্যেস করে, কার কথা বলছিস, কোন বন্ধু রে।

পেয়ারী বলে—কে আবার। ঐ তোর প্রাণের বন্ধু, বুধো রে, বুধো!

সর্দ্দারের মুখ দিয়ে যেন একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে যায় বুধ্‌বো। শালা, হারামীর বাচ্ছা,...শালাকে আমি খুন করবো। না না, কখনও হতে পারে না, এ তুই বানিয়ে বলছিস।

কলতলায় যাওয়ার সোজা রাস্তাটা রেল লাইনের উপর দিয়ে। পেয়ারী কোমরে একটা গামছা জড়িয়ে, হাতে একটা বালতি নিয়ে কলতলার উদ্দেশ্যে রেল লাইনের উপর দিয়ে ততক্ষণে হাঁটতে সুরু করেছিল।

সর্দ্দারের শেষ কথাটা শুনেই সে আবার ফিরে দাঁড়িয়ে খেঁকিয়ে ওঠে, হ্যাঁ আমি তো বানিয়ে বলবোই, নিজে পারিস না বলে ঘরের মেয়ে মানুষ সামলাতে তুই যে একটা আঁস্তাকুড়ের কুকুর ধরে আনবি, তা কি করে জানবো ছিঃ ছিঃ! তুই একটা মরদ না কি? চাস তো যা তোর বন্ধুর পায়ে ধরে আবার ডেকে আন।

রামস্বরূপ কি একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নজরে পড়লো পেয়ারীর পেছনে মাত্র কয়েক গজ দূরে সাড়ে আটটার ডায়মণ্ডহারবার লোকাল ব্রিজের তলা থেকে বেরিয়ে উল্কার মত ছুটে আসছে। দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠলো, পেয়ারী সরে আয় শীগ্‌গির সরে আয়, ঘরের দাওয়া থেকে নেমে সে দৌড়ে পেয়ারীকে লাইন থেকে সরিয়ে আনবার আগেই বেরিয়ে গেল ইঞ্জিন।

রামস্বরূপ সর্দ্দারের চোখের ওপর দিয়ে আর রেল লাইনের উপর লুটিয়ে পড়লো পেয়ারীর রক্তাক্ত দেহ। হাতের বালতিটা ছিটকে পড়লো কয়েক গজ দূরে।

পুলিশ আর লোকজনের ভীড়ের ভেতর থেকে লাস নিয়ে যেতে বেজে গেল পাঁচটা।

বেলা গড়িয়েছে। সকালের ঐ ঘটনার পর সারাটি বস্তি যেন থম্ থম্ করছে তখন। সন্ধ্যার সেই কালো পর্দ্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল একটি দিন। কে জানে বুধো তখন কোথায়! ওর সহকর্ম্মী কাল্লু ওর ঘরে গিয়ে দেখে, দরজাটা খোলা। ঘরে মাল পত্র কিছু নেই। বস্তি ছেড়ে সত্যই ও চলে গেছে। হয়তো ও তখন অন্য এক সহরের পথে পাড়ি দিচ্ছে, নয়তো এই সহরেই অন্য এক বাস্তুতে গিয়ে নতুন একটা ঘর খুঁজতে ব্যস্ত। পেয়ারী যে এ জগতে আর নেই, সে খবরও কোন দিন পাবে কি না কে বলতে পারে?

# মিছে সবই মায়াময়

### শ্রীশিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিছে সবই মায়াময়, ঝুটা নয় গোলাপের হাসি
আর সাচ্চা এ ধরায় ছুটি কথা আমি ভালবাসি।

*　*　*　*

আকাশের বুকভরা গ্রহতারা যে প্রেমের টানে
দূরে দূরে ঘুরে ঘুরে ছুটে চলে অনাগত পানে।
কেন্দ্রের চারিধারে শক্তির অণু যার বলে
ধরা-বাঁধা পথ ধরে আলোকের বেগে ছুটে চলে।
সেই প্রেম-রেণু-ঝরা ভর করে মধুকর ফুলে
বুক-ফাটা গোলাপের প্রাণকোষে বীজ ভরে তুলে।
ঝরে দল পাকে ফল কখনো বা বন্যার ঝড়ে
নূতনের দেশে এসে ভেসে ভেসে বাসভূমি গড়ে।
পাহাড়ের হাড় ফুঁড়ে টানে রস তাহাদের মূল
রূপে রসে ভরপুর জেগে ওঠে শত শত ফুল।

*　*　*　*

অবিরাম ছুটে চলা জোনাকীর মত নেবা জ্বলা
নব নব পরিবেশ তার সাথে মিলে-মিশে চলা।
পদে পদে সংগ্রাম আশা ভয় সংঘাতময়
প্রাণভরা গোলাপের জীবনের আধা পরিচয়।
বাকীটুকু অকপট শিশুবৎ মনখোলা হাসি
এক সাথে ফুটে ওঠা আর শুধু ভালবাসাবাসি।

স্পেনসার সুব্রত দত্ত
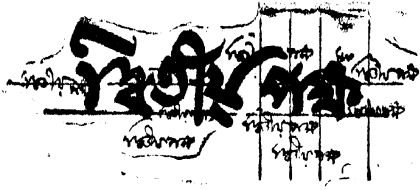
ব্রম্পটন রোডে বাস চলা আরম্ভ হয়েছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ছে ঘরে, মাইকেলের ঘুম ভেঙে গেছে। কাল রাতে ভাল ক'রে ঘুম হয়নি। নতুন বিছানায় কেমন যেন ওর অস্বস্তি লাগছিল। অথচ এই ফ্ল্যাটে সে কত বার এসেছে। এই ঘরে তখন সেরাফিনা থাকতো। সেরাফিনা—মাইকেলের বান্ধবী 'জিনের' ফরাসী দেশের বান্ধবী। তার লণ্ডনে থাকার 'পারমিট' ফুরিয়ে যাওয়াতে তাকে চলে যেতে হোল। ঘর খালি আছে তার। জিন পুরো ফ্ল্যাট-এর ভাড়া দেয়।

গতকাল রাতে মাইকেল শেষ 'টিউব' মিস করে রয়ে গেছে এখানে। জিন হঠাৎ ওর বান্ধবী অ্যালিসনের পার্টিতে আটকা পড়েছে। ফিরতে অনেক রাত হবে। মাইকেল র'য়েই গেল—সে রাতের মত।

মেরীর কথা মনে আসছিল। মেরী ওর প্রথমা স্ত্রী। প্রথমা প্রেমিকাও। মোটা-সোটা আলগা শ্রী, ভাল মানুষ মেরী—যে মাইকেলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে ভেবেই দিন কাটাত, নিজের দিকে তাকাবার সময় হ'তো না তার। মাইকেল কি ভালবাসে আর কি ভালবাসে না—তার মাইকেলের চেয়ে বেশী জানা ছিলো, অবাক লাগতো মাইকেলের, মেরীর বয়সের অন্য মেয়েরা—মেরীর চেয়ে কত তফাৎ। তবু মাইকেল মেরীকে এড়াতে পারে নি।

মাইকেলের বাড়ী দক্ষিণ-আয়র্ল্যাণ্ডে 'কেরীতে', সে ডাবলিনের সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। এঞ্জিনিয়ার হবার শখ ছিল তার, কিন্তু তা পড়ার সুযোগ ঘটেনি কেরীতে। ওর বাবার জোত-জমি কিছু ছিল, ওট আর আলুর চাষে কোন ক্রমে চলতো সংসার। ডিগ্রী পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাই মাইকেল এলো মাষ্টারী করতে। হয়তো মাইকেল ওলিয়ারী, 'আওয়ার লেডী অব ভোলায়ারস' ক্যাথলিক স্কুলে মাষ্টারী করেই জীবন কাটাত। কিন্তু আবার সে নতুন করে আরম্ভ করলো। নতুন জীবন। লণ্ডনে দিনে কাজ আর রাতে পড়া। আর তা মেরীর মৃত্যুর পরে।

মেরী একই গ্রামের মেয়ে, ওর বাবা চার্চের সংগে যুক্ত ছিলো কি এক ব্যাপারে। গলায় চেনের সংগে তার মস্ত এক লকেট ঝুলতো 'সেণ্ট বারনাবাসের।' তার আচার ব্যবহার সব কিছুর মধ্যে ছিল এক আন্তরিকতা আর তার টানেই মাইকেল এসেছিল ওর কাছে। বিয়ের পরে মাইকেলের একটা কথা মনে পড়ে, মেরী বলেছিল আমায় তোমার চির দিন ভালবাসতেই হবে। কারণ তুমি না বেদীতে শপথ ক'রেছ বাইবেল হাতে to love and cherish you for ever till death us depart তাহলে? মাইকেল ওর বিশ্বাসের গভীরতায় সেদিন মুগ্ধ হয়।

জিনের বাড়ীতে সেরাফিনের ঘরে শুয়ে মাইকেল মেরীর কথা ভাবে। ভোরবেলায় খামারে মোরগ ডাকার সংগে সংগে সে উঠে পড়তো। তারপর আনতো মাইকেলের জন্য গরম চা। বিছানায় চা খাওয়া মাইকেলের বিলাস। আর তার সেবায় মেরীর তৃপ্তি। মাইকেল হয়তো ওকে কখনও সাহায্য করতে গেছে, কিন্তু বাধা পেয়েছে সংগে সংগে, থাক না মাইকেল?

অমিলও ছিল তাদের, মাইকেল চাইতো মেরী একটু খেলা ধূলো করে। সে নিজে ভাল টেনিস খেলোয়াড়, মেরী যদি ওর সংগে খেলতো, মেরী কিন্তু র‍্যাকেটও ছোঁবে না। মাইকেল কিছুতেই তাকে রাজি করাতে পারেনি।

টেনিস র‍্যাকেটে লণ্ডনে ওর নতুন জীবনের সূত্রপাত। ক্ল্যাপহাম কমনের টুর্নামেণ্টে মিক্সড ডাবলসের লটারীতে ওর পার্টনারের নাম উঠলো মিসেস জিন সেয়ার্স। মাইকেল কি সেদিন জানতো ওদের পার্টনারসিপের টার্ম।

জিনের অফিস শহরের পশ্চিম দিকে, সিটিতে। জিন সেক্রেটারীর কাজ করে। সেক্রেটারী ও কোন দিনও হ'তে চায়নি। কিন্তু কালস্য কুটিলাগতি। কাজ ওকে নিতে হ'লো ঘটনাচক্রে। বিয়ের আগে ষ্টেনোগ্রাফী শখ করেই শিখেছিল—ওর বাবা কোনও দিন চায়নি যে মেয়ে নটা-পাঁচটা আপিস করে। ওর বোন ফ্রান্সিসের বিয়ের পরদিন হঠাৎ ষ্টেনোটাইপিষ্টের কাজ নিয়ে বাবার Flat ছেড়ে আর্লসকোর্টের বেড সিটিং রুমে চলে আসে। ওর মা বাবা দুজনের আপত্তিতে জিন বলেছিল 'তোমাদের সংগে থাকায় তোমাদেরও অসুবিধে আমারও অসুবিধে। সন্ধ্যেবেলায় ডিনারের ঠিক আগে না পৌঁছলে চলবে না, কোথাও দেরী করে থাকলে তোমাদের টেলিফোন কর'তে হবে—নয়তো তোমরা অনর্থক ভাববে। এত বাঁধন আর স্নেহ আমার সইবে না। তার চেয়ে বরং আলাদা থাকি। তোমাদেরও স্বস্তি আমারও। জিন তখন টেডের সংগে এনগেজড। বাবা জানতো, মেয়ে আর ক'মাস বাদে চলে যাবে। তাই সে আপত্তি করেনি, টেডের সংগে বিয়ে হবার সাত মাস বাদেই ওদের ডিভোর্স হয়ে যায়। Incompatibility। এর পরিধি বড় বেশী। তখন জিনের বয়স কুড়ি। আর ওর স্বামী টেডের বয়স তখন বাইশ।

সেরাফিনার সঙ্গে তখনই ওর আলাপ। টেনিসে উভয়ের আগ্রহ থাকায় সখ্যতা নিবিড় হোল। তারপরে দুজনে ব্রম্পটন রোডের ফ্ল্যাট-এ চলে এলো। সে আজ দু' বছরের কথা।

মাইকেল স্মৃতির রোমন্থন করে। ব্রম্পটন রোডের ফ্ল্যাট। সেরাফিনার বিছানা। মেরীর সেবা। আহা, যদি কেউ এক কাপ গরম চা এনে দেয়! আর একটু ঘুমোলে চলবে।

২

জিনের ওঠার আগেই মাইকেল উঠে পড়ে, পকেটে ওর মায়ের চিঠি। বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে—জবাব দেওয়া হয়নি অনেক দিন। আগে প্রতি সপ্তাহে ওর মা লিখতো—আর লিখতো ওর ছোট দু' ভাই। বোনেরাও মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর করতো। জিন একদিন ওকে প্রশ্ন করেছিল তোমার ক'জন ভাই-বোন—অনেক বুঝি? কথার পেছনে খোঁচা ছিল—কারণ সাধারণ ইংরেজ আইরিশদের family planning নিয়ে প্রায় কটাক্ষ করে। ক্যাথলিক দেশ আয়র্ল্যাণ্ড। family planning সেখানে ধর্মের চোখে অন্যায়, তাই আইরিশদের সংসার বড়—আবার ভাই-বোনদের ভালবাসাও ইংরেজের তুলনায় গভীর। জিনের প্রশ্নে মাইকেল বলেছিল, কেন আমার যদি অনেক ভাই-বোন থাকে তাতে তোমার কি? মাইকেলের রাগ বুঝতে পেরে জিন শুধু বলেছিল Sorry Michael।

মায়ের চিঠিতে এক কথা। মাইকেল কবে বাড়ী ফিরবে—তার কোর্স তো শেষ হয়ে গেছে। আলুর চাষ ভাল হয়নি বিশেষ—আর জনি আর টমি দুজনেই প্রায় বেকার, টমি লণ্ডনে আসতে চায়, মাইকেল কিছু সুবিধে করতে পারে কিনা, নয়তো সে ক্যানাডায় যাবে। প্রথম প্রথম মাইকেল বাড়ীর চিঠি পেলে খুশী হ'তো বড়, কিন্তু আজ তা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনার মত বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে গেছে। অলস মুহূর্তে তবু মায়ের কথা মনে পড়ে। কাল শাল দিয়ে মাথায় ঘোমটা দেওয়া মায়ের মুখ। আর কদাচ মনে পড়ে মেরীর মুখ লাল রং এর এপ্রন-পরা মেরী। সেই মেরী টাইফয়েডে মারা গেল। পোড়া দেশ! এখনও টাইফয়েডে লোক মরে—আর তার দুশো মাইল পাশের দেশ একথা শুনে হাসে! চিঠির কি জবাব দেবে, মাইকেল ভাবে। টমি লণ্ডনে আসতে চায়, কি করবে সে? তার লেখা-পড়ার দৌড় বেশী দূর নয়। লণ্ডনে অবশ্য কাজ আছে। গতর খাটান কাজ। মজুরের কাজ। Building Industry-তে কাজ আছে প্রচুর। কিন্তু সে কাজ নেওয়া মানে—গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসান। সপ্তাহের পাঁচ দিন উদয়াস্ত পরিশ্রম। আর সপ্তাহান্তে 'পাব'এ গিয়ে বীয়ার খাওয়া। তার চেয়ে টমির না আসা ভাল।

চিঠি লেখা অসমাপ্ত করে মাইকেল হঠাৎ কিচেনে চলে আসে। বেসিনে রাশ-করা ওর উচ্ছিষ্ট বাসন। জিন ওঠার আগেই ও তা মুক্ত করে জিনকে অবাক করবে। বেচারা এখনও বোধ হয় ওর ঘরে ঘুমোচ্ছে, হয়ত গত কালের পার্টির Hang-over-এ কষ্ট পাচ্ছে। বেশী মদ খাবার পরের দিনের মাথা-ব্যথা। বাসন ধুতে মাইকেলের একদম ভাল লাগে না, এটা ঠিক পুরুষের কাজ নয় ও মনে করে। জিন বলে, এটা হোল পেছিয়ে পড়া দেশের মনোবৃত্তি। যে জাত যত পেছিয়ে, তার মেয়েরা তত বেশী পুরুষের অনুগত। পুরুষ মনে করে—তারা বুদ্ধিজীবী। আর নারী কর্মজীবী। অতএব গৃহস্থালীর কাজ নারীর। কারণ এতে মস্তিষ্ক নেই। অতএব বাসন ধুতে না চাওয়া মাইকেলের আইরিশ মনোবৃত্তি। জিন কিন্তু মাইকেলের ফ্ল্যাটে যে কত বার ওর উচ্ছিষ্ট মুক্ত করেছে তার শেষ নেই। তবে তার পেছনে আছে ওর মাইকেলের প্রতি দরদ। বাসন ধোওয়া সেরে—সিটিং রুমে ফিরে মাইকেল দেখে, জিন বসে আছে। হাতে তার গরম চা। নিজের বেড-রুমের রিং-এ সে চা তৈরী করে এনেছে মাইকেলের জন্ত।

কাল রাতে কেমন পার্টি হোল? মাইকেল প্রশ্ন করে। খুব হৈ-চৈ নিশ্চয় হয়েছে। অত রাত্ত করে আসা যখন। . .

ভীষণ হৈ-চৈ হয়েছে মাইকেল। আমাদের টেনিস club-এর সেক্রেটারীও ছিল। সে তোমার কথা বলছিল।

কি বলছিল আমার সম্বন্ধে? মাইকেল প্রশ্ন করে। তুমি একটা খেলা-পাগল জিন বলে। একটু পরে সে হঠাৎ প্রশ্ন করে আচ্ছা, মাইকেল, আমি যদি টেনিস খেলতে না জানতাম, তুমি নিশ্চয় আমাকে ভালবাসতে না, না?

এ তো স্বতঃসিদ্ধ। তাহ'লে তো তোমার সঙ্গে আমার আলাপই হোত না। ভালবাসা তো দূরের কথা।

ঠিক বলেছ মাইকেল! আমি হঠাৎ কেন এমন বোকার মত প্রশ্ন করছিলাম। আচ্ছা—মাইকেল? আর এক কথা?

কি কথা জিন? মাইকেল বলে। কিন্তু দুজনেই চুপ করে থাকে। ওরা দুজনে দুজনকে জানে অথচ জানে না। মাইকেল অনেক বার জিনকে তার ভালবাসার কথা ব'লেছে। কিন্তু জিন আজও তা বলেনি। আজ কি সে কিছু বলতে চায়? হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। জিন উঠে এসে তা ধরে। সিরিলের টেলিফোন। সিরিল—জিনের বন্ধু। মাইকেলের তাকে বিশেষ পছন্দ হয় না। সিরিল জিনকে লাঞ্চের নেমন্তন্ন ক'রে। জিন কিন্তু তা গ্রহণ করে না। অজুহাত দিলো Hang over, মাইকেল যে তার flatএ উপস্থিত সে কথাও উল্লেখ করল না।

চিঠির প্যাড গুছিয়ে মাইকেল উঠে পড়ে, কোথায় যাচ্ছ? জিন বলে।

বাড়ীতে যাই জিন—আজ অনেক কাজ বাকি।

মাইকেল জবাব দেয়, আমার সংগে লাঞ্চ খেলে পারতে জিন বলে। রাঁধতে তো হবে আমায়। না জিন চলি। সন্ধ্যেবেলায় ক্লাবে এসো। আলগোছে একটা চুমু খেয়ে মাইকেল বেরিয়ে পড়ে।

৩

মেঘ করেছে আকাশে। লণ্ডনের আকাশ। সব সময়ে প্রায় মেঘলা থাকে—বৈচিত্র্য নেই মেঘে। জিন আকাশের দিকে তাকায়, মাইকেল এই মেঘ দেখতে ভালবাসে—ও ভাবে। কি আছে এই মেঘে? ছেঁড়া-ছেঁড়া ধোঁয়াটে ঘোলা মেঘ! মাইকেল এই মেঘের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে পারে, মেঘ কেন দেখে মাইকেল? মেঘ চিরে যদি কখনও নীল আকাশ বেরিয়ে আসে, জিন ভাবে এ বরং ভাল। এ তো মাইকেলের চোখের রং। আইরিশ চোখ। নীল-চোখ!

# ॥ মাসিক বসুমতীর এজেন্ট-তালিকা ॥

বর্তমানে মাসিক বসুমতীর ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচার বাঙলার সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের পত্রিকার এজেন্ট-তালিকা লক্ষ্য করিলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কলিকাতার বাহিরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মাসিক বসুমতী প্রাপ্তির সুবিধার জন্য আমরা বর্তমান সংখ্যা হইতে আমাদের এজেন্ট-তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করিব। মাসিক বসুমতীর সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা এজেন্টদের ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে পারিবেন। কেবলমাত্র কলিকাতা অঞ্চলের আনুমানিক পাঁচ শত বিক্রেতার নাম এই তালিকায় নাই।

## ॥ বাঙলা দেশ ॥

### হাওড়া ●

শ্রীকাশীনাথ সাহা —আমতা
শ্রীঅশোককুমার চ্যাটার্জ্জী —বেলুড়

### হুগলী ●

শ্রীঅমূল্যচরণ আঢ্য —শেওড়াফুলি
শ্রীমদনমোহন গাঙ্গুলী —মগরা ও ত্রিবেণী
শ্রীগঙ্গাধর দে —শ্রীরামপুর
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য —ভদ্রেশ্বর ও বৈদ্যবাটী
শ্রীললিতমোহন দত্ত —হুগলীঘাট
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র কুমার —সিঙ্গুর
শ্রীমণিভূষণ সিং —আরামবাগ
শ্রীবৈদ্যনাথ মুখার্জ্জী —নবগ্রাম, কোন্নগর

### বর্দ্ধমান ●

শ্রীঅমরকৃষ্ণ দত্ত —চিত্তরঞ্জন
মেসার্স বাগচী ব্রাদার্স —কুলটি
শ্রীভূতনাথ দাস —দাঁইহাট
শ্রীকৃষ্ণসাধন সরকার —ধাত্রীগ্রাম
শ্রী এস, প্যাণ্ডে —বর্দ্ধমান
শ্রীজয়দেব মুখার্জ্জী —ওয়ারিয়া
শ্রী কে, সি, নাথ —পানাগড়
শ্রীরেণুপদ পাল —জে, কে, নগর
শ্রীতারাপদ রায় —বরবণি
শ্রীতপনজ্যোতি চ্যাটার্জ্জী —সীতারামপুর
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে —রাণীগঞ্জ
শ্রী বি, কে, আইচ —বর্দ্ধমান
শ্রীপঞ্চানন মোদক —কালনা
শ্রী এইচ, সি, ঘোষ —বার্ণপুর ও আসানসোল
শ্রীসুন্দরগোপাল সেন —গলসি
শ্রীসুশীলকুমার রায় চৌধুরী —জামুরিয়া

### বীরভূম ●

শ্রীমানিকচন্দ্র সাহা —রামপুরহাট
শ্রীমণিমোহন চন্দ্র —নলহাটী
শ্রীমন্মথকুমার ব্যানার্জ্জী —শিউড়ি

### বাঁকুড়া ●

শ্রীগজেন্দ্রচন্দ্র কর্মকার —বিষ্ণুপুর
শ্রী বি, পাল —সোনামুখী
শ্রীদ্বিজপদ দাস —বাঁকুড়া

### মেদিনীপুর ●

শ্রীপঞ্চানন চৌধুরী —ঝাড়গ্রাম
শ্রীনীলমণি বোস —বালিচক
মেঃ মিশ্র নিউজ এজেন্সী —কলাইকুণ্ডা
শ্রীভাস্করচন্দ্র পাল —গড়বেতা
শ্রী জে, এন, আচার্য্য —মহিষাদল
শ্রী আই, বি, ঘোষ —চন্দ্রকোণা রোড
শ্রীহরিসাধন পাইন —ঘাটাল
শ্রীমতী কনকলতা দেবী —খড়্গপুর
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী —মেদিনীপুর

### মানভূম ●

শ্রীবিমলকান্ত রায় —কুমারধুবি ও বরাকর
শ্রী এম, এম, চক্রবর্ত্তী —হরিশ্চন্দ্রপুর
শ্রীঅবনীমোহন দাশ —পুরুলিয়া

### চব্বিশ পরগণা ●

শ্রীসুশীলকুমার ভট্টাচার্য্য —ইছাপুর
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাস —কাকদ্বীপ
মেঃ বি, এল, সাহা এণ্ড সন্স —ব্যারাকপুর
শ্রীশীতলকুমার মুখার্জ্জী —কাঁচড়াপাড়া
শ্রী রায় নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরী —টাকী

### নদীয়া ●

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন —শান্তিপুর
শ্রীঅহিভূষণ মালাকার —বেলডাঙ্গা
শ্রীহরিচরণ প্রামাণিক —নবদ্বীপ

### মুর্শিদাবাদ ●

শ্রীবিশ্বনাথ দাস —ধুলিয়ান
শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত —মুর্শিদাবাদ
শ্রীহরিপদ সাহা —জিয়াগঞ্জ
মেঃ ঘোষ লাইব্রেরী —বহরমপুর ও খাগড়া

### মালদহ ●

শ্রীসুনীলকুমার শেঠ —মালদা কোর্ট

### কুচবিহার ●

শ্রীঅমূল্যরতন রায়গুপ্ত —দিনহাটা
শ্রীঅনিলরঞ্জন চক্রবর্ত্তী —কুচবিহার

### জলপাইগুড়ি ●

শ্রী এ, ধর চৌধুরী —আলিপুরদুয়ার
শ্রীসতীশচন্দ্র বোস —মল-জংশন
শ্রী এস, এন, নন্দী —জলপাইগুড়ি
শ্রীমতিলাল সরকার —কালচিনি

### দার্জ্জিলিং ●

শ্রী ডি, এন, বড়াল —কালিম্পং
শ্রীমতী শচীরাণী দেবী —শিলিগুড়ি টাউন

### পঃ দিনাজপুর ●

শ্রী এ, কে, চ্যাটার্জ্জী —বালুরঘাট

### পূর্ণিয়া ●

শ্রী এস, কে, ভাদুড়ী —ফরবেসগঞ্জ

### ত্রিপুরা ●

শ্রীমানিক ভট্টাচার্য্য —আগরতলা

## আসাম

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত —হাইলাকান্দি
মেসার্স শিলং স্পোর্টস —শিলং
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ —কমলপুর
শ্রী বি, কে, চৌধুরী —শিলচর
শ্রীমতী কনকরাণী গাঙ্গুলী —তিনসুকিয়া
শ্রী এম. আর. ভট্টাচার্য্য —মাকুমজং
শ্রীচিত্তরঞ্জন ভায়েল —তেজপুর
মেঃ পি, এস, জৈন এণ্ড কোং —ইম্ফল
শ্রী জে চক্রবর্ত্তী —গোয়ালপাড়া
মেঃ ন্যাশান্যাল লাইব্রেরী —ডিব্রুগড়
শ্রীআশুতোষ মিত্র —চবুয়া
শ্রী বি, চক্রবর্ত্তী —লোহোআঙ্গ
শ্রীকালাচাঁদ বণিক —করিমগঞ্জ
শ্রীত্রিলোচন রায় —ধুবড়ী

## বিহার

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী —রঘুনাথপুর
শ্রীপরিতোষ মুখার্জ্জী —ধানবাদ
শ্রীসুজিতকুমার সরকার —কান্ডরাসগড়
শ্রীমনোমোহন চ্যাটার্জ্জী —মজঃফরপুর
মেঃ ক্যাপিটাল বুক ডিপো —রাঁচী
মেঃ গয়া মিউজিক্যাল ষ্টোরস —গয়া
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার —কাটিহার
শ্রীরাধারমণ মিত্র —মুঙ্গের
মেঃ অমৃতলাল থ্যাকার এণ্ড কোং —ঝরিয়া
শ্রীরামব্রিচপ্রসাদ —লোহারদাগা
শ্রী এইচ, এন, চ্যাটার্জ্জী —ধানবাদ
মেঃ চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং —হাজারীবাগ টাউন
শ্রীদেবনারায়ণলাল —দিনাপুর
শ্রীবাচ্চু সিং —পাটনা
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ —সিন্দ্রি ও পাথারদিহি
শ্রীকরুণাসিন্ধু রায় —বেরমো
শ্রীকুঞ্জবিহারী গাঙ্গুলী —জামালপুর
শ্রীদীনেশচন্দ্র বিশ্বাস —বরজামদা
মেঃ ইউনাইটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স —টাটানগর

## সাঁওতাল পরগণা

শ্রী জে, এন, সাহা —পাকুড়
শ্রীমন্মথনাথ দাস —বৈদ্যনাথধাম
শ্রীবটকৃষ্ণ মিত্র —মধুপুর

## বোম্বাই

শ্রী জি, এম, ঘোষ চৌধুরী —বাইকুল্লা, বোম্বে

## উত্তর প্রদেশ

মেসার্স মিকাডোস বেনারস নিউজ পেপার এজেন্সী —বেনারস
শ্রী এস, বি, মিত্র —লক্ষ্ণৌ
শ্রীসুচারুমোহন গোস্বামী —নিউ দিল্লী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস —নিউ দিল্লী
মেঃ সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সী —নিউ দিল্লী
মেঃ কিতাব ঘর —নিউ দিল্লী
মেঃ ইণ্টারন্যাশানাল ষ্টোর্স —এলাহাবাদ

## মধ্য প্রদেশ

মেঃ এ, এইচ, মিত্র সরকার এণ্ড কোং —ভিলাই ও দুর্গ

## উড়িষ্যা

শ্রী বি. দত্ত —রৌঢ়কেল্লা
মেঃ এ, এইচ, মিত্র সরকার এণ্ড কোং —ব্রজরাজনগর
প্রতিমা নিউজ এজেন্সী —খুড়দা
শ্রীউদয়নারায়ণ দাস —ভদ্রক

---

**মাসিক বসুমতীর প্রচার ও প্রসার বাঙলা দেশের বিস্ময়!!**

---

## মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

### ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

| | |
|---|---|
| বার্ষিক রেজিষ্ট্রী ডাকে | — ২৪৲ |
| ষাণ্মাসিক " | — ১২৲ |
| প্রতি সংখ্যা " | — ২৲ |

### ভারতবর্ষে

| | |
|---|---|
| (ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক | — ১৫৲ |
| " ষাণ্মাসিক সডাক | — ৭·৫০ |

### ভারতবর্ষে

প্রতি সংখ্যা ১·২৫

| | |
|---|---|
| বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে | — ১·৭৫ |

### পাকিস্তানে (পাক মুদ্রায়)

| | |
|---|---|
| বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ | — ২১৲ |
| ষাণ্মাসিক " " " | — ১০·৫০ |
| বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " " | — ১·৭৫ |

---

● মাসিক বসুমতী কিনুন ● মাসিক বসুমতী পড়ুন ● অপরকে কিনতে আর পড়তে বলুন ●

মাইকেলের হঠাৎ চলে যাওয়া ওর ভাল লাগেনি। সিরিলকে মাইকেল হিংসে করে, সিরিলের টেলিফোন ওকে চঞ্চল করেছে সন্দেহ নেই। নয়তো কাল সারা রাত একলা থেকে যাবার পর আজ হঠাৎ চলে যাওয়া খাপছাড়া নয় কি? আইরিশগুলো এমনি হয়। Moody! আইরিশদের moodএর কথা ওকে অনেকে বলেছে বারে বারে। মাইকেলের সংগে ওর ঘনিষ্ঠতা অনেকের পছন্দ নয়। কিন্তু জিন এতো স্বাধীনচেতা যে ওর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেউ ওর সংগে আলোচনা করে না—কারণ তার পরিণাম অপ্রিয় বাদানুবাদ।

মাইকেলকে সে ভালবাসে কি না ভাবে। এতো মিষ্টি ওর স্বভাব—এতো সহানুভূতি মাখান, এতো দরদ। আবার এক এক সময়ে কি যেন হয় ছেলেটার। রাগ করে না—অথচ চুপ করে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মুখ ভারি করে, এমন moody ছেলেকে নিয়ে ঘর করা চলে না। ঘর করা কি জিন তা জানে! টেডের সংগে সে সাত মাস বিবাহিত জীবন কাটিয়েছে। আবার ভুল সে করবে না।

আজ বাড়ী গেলে কেমন হয় মায়ের কাছে? জিন ভাবে। অনেক দিন তো যাওয়া হয়নি, মা-বাবার খবরও নেওয়া হয়নি, ওর দিদি ফ্রান্সিসেরও, সময়ই বা কখন। আর তা ছাড়া ফ্রান্সিসের সংগে ও ইচ্ছে করেই দেখা করে না। ওর প্রাক্তন স্বামী টেডের সংগে ফ্রান্সিসদের এখনও বেশ ভাব। যাতায়াতও চলে। ফ্রান্সিসের স্বামী হিউ বলেছে যে ওদের বন্ধুত্ব যদিও বৈবাহিক সূত্রে গড়ে উঠেছে তবু জিনের ডিভোর্সের পরে তা শেষ করে দেবার কোনও মানে নেই। অতএব টেড আজও ফ্রান্সিসদের বাড়ীতে যায়, আর ফ্রান্সিসরাও আসে টেডের ফ্লাট-এ—যেখানে জিন আর টেড তাদের নীড় বেঁধেছিল। আজও সে নীড় আছে। বোধ হয় ভাড়া। জিন তাই ফ্রান্সিসদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করেছে, শুধু বাড়ী যাওয়া বন্ধ করেনি, ওদের সংগে সহজ সম্পর্কও যতদূর পারে কমিয়ে দিয়েছে। শেষ গিয়েছিল হিউ-এর জন্মদিনে। টেড আসবে জানলে কখনই যেত না। পাঁচজনের মধ্যে টেডের সংগে দেখা হওয়া আর দস্তুর হাসি হেসে Hallo Ted বলা ওর এত খারাপ লেগেছিল যে বলার নয়। ফ্রান্সিসের সংগে এই নিয়ে ওর ঝগড়াও হ'য়ে গেছে। ওকে পাঁচজনের সামনে বিপর্যস্ত করার জন্যই নাকি ফ্রান্সিস টেডকে আসতে বলে—একথা জিন বলতে চায়। ফ্রান্সিসও ওকে ছেড়ে কথা বলেনি। টেড হিউ-এর বিশেষ client। অতএব হিউ যদি টেডকে তার জন্মদিনে বলে তাতে জিনের কি বলার আছে? এই নিয়েই দুই বোনে মনান্তর।

মায়ের কাছে যাবে স্থির করে জিন ডায়াল করে টেলিফোনে। ফোন ধরে ওর মা। Hallo mummy কেমন আছ তোমরা? জিন বলে।

ওর মা বেশ অবাক হয়। শনিবার দিন সকালে এই সময়ে জিনের ফোন? আর তাও এতদিন পরে হঠাৎ। ভালই আছি জিন আমরা। ধন্যবাদ ওর মা বলে।

তোমাদের ওখানে কি সকালে চলে আসব মা—লাঞ্চের আগে?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই এসো, তোমার বাবা খুব খুসী হবে। তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না মা—এই হঠাৎ আসাতে?

না না, কোনও অসুবিধে হবে না জিন! চলে এসো এখানে। জনকে একটা সারপ্রাইস দেওয়া যাবে—জন জিনের বাবার নাম।

সারাটা দুপুর আর বিকেল জিন মায়ের কাছে কাটিয়ে এলো। বাবার বাড়ী—অথচ কেমন যেন মনে হয়, ওপরতলায় সিঁড়ির পাশের ঘরটা যেখানে ও আর ফ্রান্সিস দুজনে থাকতো ঠিক তেমনই আছে। ড্রেসিং টেবলের কাচে ওদের দুজনের ছুড়োছুড়ির আঁচড়? সেই আঁচড়ের দাগ আজও বর্তমান। সেই Candlestion এর bed-cover, ওয়েজ-উডের পাউডার কেস, সবই তেমন। কাবার্ড খুললে ও হয়তো ওর বিয়ের আগের ড্রেসিং গাউনও দেখতে পাবে। কতবার ও মাকে বলেছে ওর ছেলেবেলার অব্যবহার্য জিনিষ salvation Armyতে দিয়ে দিতে। কিন্তু মা যেন কেমন। যা কিছু আছে সব কিছু আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। মায় মনের দিক দিয়েও তাই। ওর বিয়ের দু মাস আগে ও যখন আর্লস-কোর্টের বেড সিটিং রুমে চলে আসে মা তাতে ঘোর আপত্তি করে। শেষে যখন মা তার চোখের জল ফেলেছে তখন জিন বলেছে, Please don't be ridiculous mummy. I hate too much of affection. মা অবশ্য এর পর আর কিছু বলেনি। আজ জিনের ধারণা হোল যে, ওর মা আর ফ্রান্সিস দুজনেই মাইকেলের সংগে ওর ঘনিষ্ঠতা খুব অনুমোদন করে না। ফ্রান্সিস খেলার মাঠে মাইকেলকে দেখেছে। ওর মা ওর 'ফরেনা'র বন্ধুর কথা জিগ্যেস করেছে একবার আলগোছে। 'আইরিশ'দের কেউ কেউ 'ফরেনার' বলে থাকে, তবে তেমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।

আজ ওর মা যখন বলল, তার ফরেনার টেনিস পার্টনার কেমন খেলছে—জিনের তা মোটেই ভাল লাগেনি। ওর বাবা কিন্তু ঠিক তেমনি আছে, হৈ-চৈ করা হাসিখুসী ভাব। জিনের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে মামুলী প্রশ্ন ছাড়া অন্য প্রশ্ন করেনি। জিনের বিয়ের সময় ওর বাবাই মাকে বুঝোয় এই বলে: আ ডোরিন, তুমি নিজে ছেলেমানুষ আছ বলে মনে কোর না, তোমার মেয়ে সেই ছোট্ট মেয়েটি আছে যে পোনি-টেল চুল বেঁধে ইস্কুল যেত, ওর উনিশ বছর বয়স হয়েছে—আর ভাল-মন্দ বিচার করার বুদ্ধি ওর আছে। মেয়ে তোমার অন্য পাঁচজনের তুলনায় বেশী চালাক তো কম নয়। ওর ব্যক্তিগত জীবনের এই বিরাট সমস্যাও বুঝুক। কারণ এর ফল-অফল সবই ওর নিজের, তোমারও নয়, আমারও নয়। ওর মা বলেছিল, জন তোমার মেয়ের বুদ্ধি বেশী বলেই আমার ভয়।

টেডের সংগে ওর ডিভোর্সের আগে ওর মা আর ফ্রান্সিস দুজনেই বুঝোতে চেয়েছে যে, ছোটখাট খুঁটিনাটি অমিল প্রত্যেকের সংসারে হয়, আর টেড অন্য মেয়ের সংগে প্রেমে পড়েনি, কেন তাহ'লে ডিভোর্স করা?

জিন বলেছিল, তোমরা বিয়ের একটা দিকই দেখ। ভালবাসা। আমি তা দেখি না। ভালবাসাকে আমি বিশেষ দামও দিই না—এ শুধু লঘু মনের অলস কল্পনা। টেডকে আমি বিয়ে করেছি ভালবাসি বলে নয়, ভালবাসার জন্য বিয়ে করা তো হাস্যকর

ব্যাপার। আমার বিয়ের ভিত্তি একে আশ্রয় করে ওঠেনি অথচ একে অস্বীকার করেও ওঠেনি। আমার ভিত্তি দুজনের বোঝা-পড়ায়। এতে যদি ফাঁক থাকে আমি তা যোড়া দেব না। টেডও জানে, এই ফাঁকের কথা। ওর দৈনন্দিন জীবনের সংগে বোঝা-পড়া ক'রে একটা সামঞ্জস্য আনাতে চাই না আমি। আমার কাছে আমার প্রাত্যহিক জীবন সব চেয়ে বড়। সেখানে বোঝা-পড়া নেই। অতএব good bye.

ডিভোর্স হয়ে গেল। প্রতিদিনের তুচ্ছ ব্যাপারে মনোমালিন্যে যে ছোট মেঘ জমতো মনের কোণে একদিন বিরাট হয়ে তা সবটুকু আকাশ ছেয়ে দিল। জিন ক'দিন আগেই চলে এসেছিল অন্য ফ্ল্যাট-এ। টেডও যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বাড়ী 'লীজ' নেওয়া ছিলো টেডের নামে। তাই জিন বলেছিলো ওকে থাকতে। টেড তাই রয়েই গেলো—ভগ্ন-নীড়ে। একলা।

আজ পাঁচ মাস বাদে মায়ের কাছে এসে জিন দেখলো—ওর জগৎ আর ওর মার জগৎ কতো আলাদা। ওর পৃথিবীর চলার ছন্দ দ্রুত। ও যখন হার্ডকোর্ট টেনিসে রিটার্ণ ভলি মারে তার গতির মত ওর জীবন। ওর মায়ের জীবন অলস—মন্থর। ওরা 'প্লেসিং' করে মানিয়ে নেয়। প্লেসিং করে নিজেদের পয়েন্ট বাড়ায়। জিন তা মানে না।

বাড়ী ফিরে এলো জিন। সন্ধ্যেবেলায় মাইকেল ক্লাবে আসবে। ক'দিন পরে 'পাটনার' 'বারোতে' কমপিটিশন। জোর প্র্যাকটিশ চাই।

৪

হঠাৎ প্যাডীর সংগে মাইকেলের দেখা হয়ে গেল ফিঙ্ক-এর 'পাব'এ। অফিস ফেরতা কখন সখন মাইকেল ক্ল্যাপহাম কমনের ফিঙ্কের সরাইখানায় আসতো ড্রাফট গীনেশ খেতে। গীনেশ বীয়ারের আদি বাড়ী আয়র্ল্যাণ্ডে। আর বীয়ার কুলের কৌলীন্য গীনেশ মস্ত বড় কুলীন। যে একবার এর ঠিক স্বাদ পেয়েছে তার পক্ষে একে অস্বীকার করা বড়ই কঠিন। ড্রাফট-গীনেশ আবার সব 'পাব'এ পাওয়া যায় না। ফিঙ্কে ড্রাফট গীনেশের টানে মাইকেল আসতো— সেলুনে। লণ্ডনে আসার পর প্রথমে মাইকেল অবশ্য 'সেলুন লাউঞ্জে' যেত না। দু কারণে। এক তার পয়সার টানাটানি—কেন একই জিনিষের জন্য ও বেশী দাম দেবে সেলুনে বসে। তার চেয়ে 'পাবলিক বারে' বসে খাওয়া ভাল। আর দ্বিতীয়তঃ সেলুনে সে ঠিক নিজেকে মানাতে পারতো না। ওর মনে হোত ইংরেজ জাত এখানেও ভদ্রতার মুখোস পরে বসে আছে, ওজন করে কথা বলছে। পাব্‌এ ওরা আরও স্বাভাবিক। ওর এ ধারণা অবশ্য পরে বদলেছিল। ফিঙ্কের সেলুন লাউঞ্জেই ওর দেখা হোল প্যাডীর সংগে। প্যাডী কেরীর লোক। একই গ্রামের, ওর বাবার প্রচুর পয়সা ছিল আর ছিল রেসের ঘোড়া। আয়র্ল্যাণ্ডে সব আইরিশই স্বপ্ন দেখে যে তাদের ঘোড়া ইংলণ্ডের গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল জিতবে। রেসের ঘোড়ার পেছনে ওরা যথাসর্বস্ব খরচ করবে। বাজি খেলে নয়—পরিচর্যায়। প্যাডীর বাবার ব্যবসায়ে প্রচুর লোকসান হওয়াতে আর প্যাডী নিজে বেশী লেখাপড়া

মা জানাচ্ছে—কাজের খোঁজ এলো লণ্ডনে। কাজ পেয়েছে সে 'ব্রিক লেয়ারের'।

মাইকেলের কিছু আগেই প্যাডী এসেছিল। কয়েক পাত্র তার খাওয়াও হয়ে গেছে। মাইকেলকে দেখেই সে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো। মাইকেল লজ্জিত হোল—একে আইরিশদের গুণ্ডা, গোলমেলে বলে বদনাম আছে। তার ওপর এই পাঁচ জনের সামনে চীৎকার, প্যাডীকে একটু বুঝিয়ে বলার সুযোগও নেই। কাউন্টারএ মাইকেল ছুটো গীনেশের ফরমায়েস করে। কয়েক পাত্র দু'বন্ধু খাবার পর প্যাডী ওকে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করে এখানে 'Poteen' কোথায় পাওয়া যায় কি না। Poteen চোলাই করা আইরিশ মদ। হুইস্কীর সমগোত্রীয়। মাইকেল ঘাবড়ে যায়—যদি কেউ শোনে ও ভাবে, তাই প্রসংগ বদলে সে বলে কেরীর খবর বলো প্যাডী কে কেমন সব আছে। প্যাডী হঠাৎ চুপ করে গেল।

কি ব্যাপার, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ কেন? মাইকেল বলে। তুমি গ্রামের কথা জিগ্যেস ক'রছ তাই অবাক হয়েছি। তুমি তো ইংরেজ হ'য়ে গেছ মাইকেল! কেরীর খবরে তোমার কি আসে যায়?

আমি ইংরেজ হ'য়েছি? কে একথা বলে? আর তুমিই বা কি বাকি রয়েছ তাহলে—ঝাঁঝাল স্বরে মাইকেল বলে।

মাইকেল, আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমার মত লেখাপড়া জানা নই, ঘরে আমার রুটী নেই। লেখা-পড়া শেষ করে তোমার এখানে থাকার প্রয়োজন কি? আবার শুনলাম—তুমি নাকি এদেশে বিয়ে করছ?

আমার সম্বন্ধে তাহলে অনেক খবরই তোমরা রাখ, মাইকেল ব্যংগ করে বলে। আর তুমি আমার ইংরেজ হয়ে যাওয়ার কথা বলছিলে না? না আমি ইংরেজ হইনি—তবে ইংরেজরা যে গায়ে পড়ে অন্য কারুর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না—এটা তা যদি আমি আমার দেশের একটা লোককেও শিখাতে পারতাম।

আমার এমন কোন মাথা ব্যথা ছিল না—প্যাডী বলে। আসবার ক'দিন আগে একটা গাধায়-টানা গাড়ীর খোঁজে তোমাদের বাড়ীর দিকে যাই। দেখা হোল তোমার বুড়ী মায়ের সংগে। তার কাছে তোমার খবর পেলাম। তুমি টমিকে লণ্ডনে আসতে বারণ করেছ—সে ক্যানাডায় গেল। ক্যানাডায় গেলে ফেরার সম্ভাবনা কম। তোমার ফেরার সম্ভাবনা বেশী, তাই বলছিলাম।

মাইকেল চুপ করে থাকে। প্যাডীর পাত্র শেষ হওয়ায় সে দু'জনের পাত্র নিয়ে কাউন্টারে আসে। আর দু' পাইট গীনেশ চাই। মাইকেল বাড়ীর কথা ভাবে। টমি তাহলে ক্যানাডায় গেছে। এ খবরও পায়নি, ওরই দোষ, বাড়ীতে ও কত দিন চিঠি দেয় না, জিনের বাড়ীতে ব'সে লেখা অসমাপ্ত চিঠি এখনো পড়ে আছে। ওর নিজের আসার কথা মনে পড়ে, অগাষ্টের সন্ধ্যে 'লিভিং' রুমে সকলে বসে। আর কয়েক ঘণ্টা ওর ট্রেণের সময় আছে, কালো রং শাল গলায় জড়িয়ে ওর মা স্যাণ্ডউইচ-এ মাখন লাগাতে লাগাতে হাতের পেছন দিয়ে চোখের জল মুছছিল, পাড়ার Vicar এসেছে ওর সঙ্গে দেখা করতে, বোনেরা আসতে পারেনি—জনি আর টমি দু' ভাই আগুনের ধারে বসে। আগুন জ্বালবার দরকার ছিলো না—কিন্তু হয়ত পাড়ার দু'-পাঁচজন আসতে পারে ভেবে ওর মা আগুন জ্বালিয়েছিল চুল্লীতে, Vicar এর কথাগুলো মনে পড়ে, কপালে ওর Holy oil ছোঁওয়ালো—মাইকেল বিদেশে যাচ্ছে, মা-মেরীর শুভাশীর্বাদ সংগে থাকুক। ওর মাকে সেই কথাগুলো বলা, এতো তিন সালের মামলা। মাইকেল তারপরে এনজিনিয়ার হয়ে কেরীতে আসবে মিসেস ওলিয়ারী। এ তো ক্যানাডায় যাওয়া নয়—যে যাওয়া মানে ফেরার পথ বন্ধ করে দেওয়া। লণ্ডন তো পাশের শহর। সেই তিন বছর কেটে গেছে মাইকেলের পরীক্ষাও শেষ। আজ আর ওর ফেরার উৎসাহ নেই, কেরীতে কাজ না থাকলেও একটু দূরে 'লিমারিকে' মাইকেলের কাজ পাওয়া কঠিন নয়, কিন্তু সেখানের জীবন আর লণ্ডনের জীবনের সংগে এত পার্থক্য যে, মাইকেল 'লিমারিকে' যাওয়ার কথা ভাবে না। তার ওপর আছে জিন। ওদের দু'জনের বাঁধন আরও নিবিড় করে বেঁধেছে টেনিস। মাইকেলের সে দয়িতা—মাইকেল এমন একজনকেই চেয়েছেন যে তার পাশে এসে দাঁড়াবে টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে। সে মিসেস জিন সেয়ার্স, পাটনীর মাঠে মাইকেল তাকে দেখে—উইম্বলডনের কোর্টে যাকে সে দেখার স্বপ্ন দেখে। লিমারিকে সে কোথায় হারিয়ে যাবে। জিনের বন্ধু বান্ধব, সমাজ গণ্ডী সব কিছু লণ্ডনে। তাকে কি ভাঙা চলে? মাইকেল তা বলতে পারবে না।

দু' পাইট গীনেশ নিয়ে প্যাডী ফেরৎ এলো, কি ভাবছ অত সাত-পাঁচ? প্যাডী ওকে প্রশ্ন করে। আমি তোমাকে কাউন্টার থেকে নজর করছিলাম। কিছু না—খেলার কথা মাইকেল বলে। ও টেনিস—সে তো তোমার স্বপ্ন, প্যাডী বলে।

আর কয়েক ঘণ্টা দু'জনে রাউণ্ডের পর রাউণ্ড বীয়ার খেয়ে গেল, মাইকেলের মধ্যে ঘুমন্ত আইরিশকে প্যাডী জাগিয়েছে। ঘড়ির কাঁটা এগারোটার ঘরে, মালিক ঘণ্টা দিয়ে জানান দিলো আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে দোকান বন্ধ হবে। একটু হুড়োহুড়ি পড়েছে টয়লেটে যাবার। প্যাডী উঠে এলো একটু টলতে টলতে। আরও দু' পাইট গীনেশ চাই।

ফিঙ্ক-এর পাব, রাত এগারোটা বেজে গেছে। 'পাবের' দরজা বন্ধ। দোকানের সামনে ছোটখাট জটলা। তবে কে কি বকছে ঠিক বোঝা যায় না। যার নেশা হয়নি সে এই হিমে দাঁড়িয়ে থাকবে না। মাইকেল আর প্যাডী, দু'জনে বেরিয়ে এলো—দু'জনের কাঁধে দু'জনের হাত, এনজিনিয়ার আর ব্রিক লেয়ার, কেরীতে খেলার শেষে ওরা এমনি করে ফিরতো, দু'জনের গলায় পুরোনো গান।

'When I die do not bury me at all, Just pickle my bones in alcohol. Put a bottle of bear at my feet and my head, and if I don't rise you know that I am dead.'

৫

পাটনীর টুর্ণামেণ্টে থার্ড রাউণ্ডে ওরা দুজনে এবার হেরে গেলো। অপ্রত্যাশিত কারণে ওরা ভেবেছিল ট্রোফি ওরাই নেবে। মাইকেল

অবশ্য খুব বেশী হতাশ হয়নি, কি আসে যায় এতে? জিন কিন্তু একেবারে দমে গেল। আমার দ্বারা আর এর চেয়ে ভাল খেলা চলবে না—মাইকেলও বলে। এবারে তো এত প্র্যাকটিস করেছি Mixed doubles এ থার্ড রাউণ্ডে হারলাম আর womens' singles এ Semifinal এ, ভাবছি খেলা ছেড়ে দি। মাইকেল তো অবাক! জিনের খেলা ছাড়া মানে মাইকেলের জীবনের একটা দিক খালি হয়ে যাওয়া। তার অনেক আপত্তিতে জিন বুঝবে না। সে একদিন ভেবেছিল যে টেনিস খেলাকে অবলম্বন করে যদি সে সকলের সামনে আসতে পারে তো সেটা মস্ত লাভ। আজ যখন সে আবিষ্কার করেছে যে এ তার নাগালের বাইরে, তখন এ চেষ্টায় লাভ কি? মাইকেল জিনকে পার্টনার করে খেলায় যে কতখানি আনন্দ পায় সেটা ও ঠিক বোঝে না। খেলার প্রসংগে সে বলে, আমাদের বোঝাপড়ায় সামঞ্জস্য কমে গেছে; কারণ তুমি যখন ওভার হেড হিট করলে আমার তখন কভার করার কথা, আর বারে বারে এই ভুল আমি করছি। অথচ তুমি নেলীর সংগে যখন খেলছিলে ওকে পার্টনার করে ও ঠিক মানিয়ে নিচ্ছিল। আমার মনে হয়, তুমি যদি নেলীকে পার্টনার করতে তাহলে final set তোমাদের হোত।

নেলীকে পার্টনার করে খেলার মধ্যে যে আনন্দ পাই না। মাইকেল বলে।

বোকার মত কথা বোল না মাইকেল, জিন বলে।

টুর্ণামেন্ট খেলছ—জেতবার জন্য, নাম করার জন্য, আনন্দের জন্য নয়।

জিনের কথাই রইলো। খেলা সে বন্ধ করলো বলতে গেলে। নেলী হলো মাইকেলের নতুন পার্টনার। দেড় বছরের বন্ধুত্বে, জিনের সম্বন্ধে মাইকেলের যে ধারণা হয়েছে তা অভ্রান্ত প্রমাণিত হোল। জিনের কথায় আবেগ নেই, যুক্তি আছে। নেলীর পার্টনারসিপে চেলসীর টুর্ণামেন্টে ওরা final এ জিতলো। নেলী বয়সে জিনের চেয়ে কিছু বড় হলেও পরিশ্রম করতে পারে প্রচুর।

জিনের সংগে আজ-কাল ওর উইক এণ্ড ছাড়া দেখা হয় না। যে কথা মাইকেল অনেক দিন ধরে ভেবে রেখেছে আজ কি তা বলার সময় হয়েছে—ও ভাবে, জিনের সংগে ওর অনেক অমিল—তবু জিনের সাহায্য অনেকখানি ওর কাছে। মেরীর সংগে তুলনা করলে অবশ্য তুলনাই হয় না। মেরীর ছিল মাতৃত্ব—তার ঠাঁই অন্দরে, বহির্জগতে সে অপটু। জিনের মধ্যে মাইকেল দেখে প্রান্তরের লীলা। সে অপরিসীম অথচ অনুদার। তার সখ্য, তার রম্যতা অন্য জগতের, মাইকেল অনেক বার ভেবেছে, কি পেয়েছে জিন তার মধ্যে যে সে এত কাছে এসেছে—অথচ স্বীকৃতি দেয়নি?

গত সপ্তাহে ভেবেছিল সে জিনের স্বীকৃতি যাচাই করবে। অথচ মাইকেল নিজের মনের কথাও ঠিক জানে না। ঘর বাঁধা, মস্ত কথা। জিন বলে ঘর বাঁধার যুক্তি Convenience এ। বিয়ের একমাত্র যুক্তি পরস্পরের সুবিধায়। যখন পুরুষ আর স্ত্রী, উভয়ে বুঝবে যে তাদের সম্বন্ধ সামাজিক বাঁধনে বাঁধলে পরস্পরের সুযোগ সুবিধের পরিধি বড় হবে, তখনই ঘর বাঁধা বিধেয়, স্বীকৃতি যাচাই করতে গিয়ে মাইকেল চুপ করে সন্ধ্যেটা জিনের flat এ কাটিয়ে এলো। সেদিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল, আর বৃষ্টির ছাট সাসির কাচেতে বারে বারে আঘাত করে ফিরে যাচ্ছিল। অনেক দিন আগে মাইকেল বলে, এমন বৃষ্টিঝরা সন্ধ্যেতে ঘর অন্ধকার করে চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে। জিন তা ভোলেনি—তাই আজ আর কোন কথা হোল না। ঘরের কোণে টেবল ল্যাম্পের এক স্তবক আলো রইলো—নরম আলগা শান্ত, দুজনে বসে রইলো। এই জিন সোয়ার্সের হিসেব মাইকেল মিলোতে পারেনি।

আর পারলো না আর এক হিসেবের। সেদিন জিন ওর flat এ এসেছিল। ওকে না জানিয়েই! আসার কথা ছিল নেলীর। উইক-এণ্ডের টেনিস প্র্যাকটিশের জন্য। দরজায় রিং শুনে মাইকেল দরজা খুলে বলেছিলো, এত শীগগির নেলী! তারপর জিনকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।

বসার ঘরে এসো মাইকেল, কথা আছে—জিন বলে।

কি ব্যাপার—জানান না দিয়ে হঠাৎ! পরশু টেলিফোনেও কিছু বলোনি আসার কথা। যদি না থাকতাম? মাইকেল বলে। তুমি তো শনিবার থাক্‌ই এই সময়ে। তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে এলাম মাইকেল। আমি ক্যানাডায় যাচ্ছি। সিরিলের সংগে দু'তিন সপ্তাহের মধ্যেই।

মাইকেল চুপ করে থাকে। জিন দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে Canada তে যাচ্ছে—এর আয়োজন নিশ্চয়ই অনেক আগে থেকে হয়েছে। অথচ ব্যাপারটা সে মাইকেলের কাছে সম্পূর্ণ গোপন

রেখেছে। বিশ্বাস ভংগের প্রশ্ন আসে না কারণ জিন কোন দিন বিশ্বাস ন্যস্ত করতে বলেনি। মাইকেল নীরবতা ভাঙে না।

তুমি যে চুপ করে আছ, একটা কিছু বলো ?

কি শুনতে চাও ? আমি খুব খুশী হয়েছি ? তবে সিরিলের ব্যাপারটা—হেসে উঠলো জিন সেয়ার্স। ভাঙা কাচের টুকরোর মত তার হাসি ছড়িয়ে পড়লো, সেন্টিমেন্টাল আইরিশ, আমাকে এত mean কেন মনে করছ ? সিরিলের সংগে আমার কিছুই হয়নি, হলে নিশ্চয়ই জানতে। অন্ততঃ তুমি।

তাহলে সিরিলের সংগে চলে যাওয়া কেন ?

চলে যাওয়া বোল না মাইকেল, বলো যাওয়া, সিরিল Beresley Brosএ সেলস-এ ভাল কাজ পেয়েছে Canadaতে—আর আমার কাজ ওই যোগাড় করেছে। টেলিভিশনে ইণ্টারভিউ নেওয়া, আমি ভেবে দেখলাম আমার স্বাচ্ছন্দ্যের কথা। এখানে এই সামান্ত টাকায় আমার চলে না। আমার খরচ করার অভ্যেস টেড বাড়িয়ে দিয়েছিল। ওকে বিয়ে করার আগে খুব হিসেবী না হলেও বেহিসেবী ছিলাম না। টেডের যথেষ্ট পয়সা—আর সে আমাকে খরচ করতে উৎসাহিতও করতো। কত দিন প্রথম শ্রেণীর রেস্তোরাঁয় যাইনি মাইকেল—ভিত্তোসের পরে। একটা ভাল হলিডেও করিনি। আজ তার সুযোগ এসেছে। ক্যানাডায় অনেক পয়সা—আমার নিজের আয়-ব্যয়ের বাজেট অনেক বড় হবে। কেন নিজেকে বঞ্চিত করি মাইকেল এই আনন্দ থেকে। জীবন কবে আছে, কবে নেই।

জিন চলে গিয়েছিল কিছু পরে, তার পরের দিন ওর flatএ যাবার অনুরোধ করে। অন্ধকার ঘরে মাইকেল একা বসে থাকে। কেরীর কথা মনে আসে। কেরীতে ওর বাড়ী—আয়র্ল্যাণ্ডে। সেখানে অন্ধকার ঘরে ওর মা এই সন্ধ্যেতে হয়তো একা চুপ করে বসে আছে। কালো রং-এর শাল দিয়ে মাথায় ঘোমটা দেওয়া। Widow pension-এর টাকায় তার দিন চলে কায়ক্লেশে। পুব দিকের জানলা দিয়ে সে তাকিয়ে আছে—যেদিকে তার বড় ছেলে মাইকেল গেছে। সে নিশ্চয়ই এবার ঘরে ফিরবে এনজিনিয়ার হয়ে। উঠোনে ডেজী আর ডেলিয়ার ভিড়। কেরীর বাতাসে ভিজে ইউক্যালিপ্টাসের গন্ধ। ত্রিপত্রী শ্যামরকের সবুজতা—আর রোডোডেনড্রনের লালিমার বর্ণাঢ্য। কেরী কি অনেক দূর ?

সামনের চার্চের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে। সন্ধ্যে ছ'টা। মাইকেলের ধ্যান ভাঙে। নেলীর আসার সময় হয়েছে। আজকে ওদের practice-এর দিন।

# যাতনার ধূলি গায়ে মেখে

বুদ্ধদেব গুহ

যাতনার ধূলি গায়ে মেখে
তুমি চলে গেছ অনেক দিন
অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে
মানুষও যখন হৃদয়হীন
তোমার বেদনা বুঝবে কে ?

অথচ জীবন ধন্য হোক
সবার পরশে, প্রেম-শিখা
হৃদয়ে হৃদয়ে আলো ছড়াক,
উষার আলোয় দিক দেখা
সার্থক ভোর হিরণ্ময়
যেন শিল্পীর ছবি আঁকা।
এই মনরথে জেগেছিলে
তুমিও সেদিন। ছিল আশা,
তবে দূরে চলে গেলে কেন
ফুরালো কি প্রাণে ভালবাসা ?

তবুও তোমার শান্তি নেই
যেখানেই যাও নীল আকাশ
স্বদেশের এই ধূলোমাটিই
তোমার স্বপ্ন প্রাণোল্লাস।
তবে আর কেন সঙ্গোপন
তুমি তো বোঝ এ তোমার দেশ
বড় বিপন্ন জনজীবন
খোলো খোলো তব ছদ্মবেশ।

# পাখী

রত্নাবলী সেনগুপ্ত

একটু আগেও সব ঠিক ছিল
ডাক্তার এলো
ডাক্তার গেল
তখনো কথা কইছিল।
বাইরে অঝোরে বৃষ্টি
মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমক,
আমায় বললে, ও-ঘর থেকে
কবিগুরুর ফটোটা খুলে আনো
এখানে রাখো মাথার কাছে
'খেয়া' বইখানা দাও।

ও-ঘরে যেতেই
শব্দ শুনে ফিরে এলাম
এ ঘরে সব শেষ,
ঠিক তখনি দমকা হাওয়ায়
দরজাটা খুলে গেল
প্রাণ যেন সত্যিই পাখী
শূন্যে-মহাশূন্যে মিলাল।
আর কি আশ্চর্য
তখনি বৃষ্টি থেমে, এক ফালি হলদে রোদ
বারান্দার রেলিং-এ ছড়ালো।

"সৃজন করিলা বিধি বরমাল্য দিয়ে
গীতি মঙ্গল গাহিতেছে দিগ্ বধুগণ,
সমীরণ করে তায় পুণ্য গন্ধ দান,
ধরণীর স্নেহধারা হ'লো অকৃপণ!"
KOKO-KANTHER
রাঙ্গাজবা
ককো
ক্যানথার
সার্থক সৃষ্টি ককো-ক্যানথার।
উচ্ছ্বসিত জয়ধ্বনি শুনি দিকে দিকে। উচ্চমানের গন্ধদ্রব্য করিয়াছে ককো-ক্যানথারকে দেবভোগ্য। সুনির্ব্বাচিত স্নেহ-পদার্থসমূহ করিয়াছে উহাকে অনন্য। কেশতৈলজগতে পরম বিস্ময়-রূপে এলো ককো-ক্যানথার—কেশ ও মস্তিষ্কের বলিষ্ঠ রসায়ন। শুদ্ধ ও পবিত্র।
ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রসাধন-শিল্পী
রাঙ্গাজবা কেমিক্যাল
কলিকাতা

আবদুল আজীজ আল-আমান

টিকে দড়িতে টান দিয়ে রসবোঝাই ভাঁড়টার গলান ধরে ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল দিদার বক্স ! প্রায় গলা-গলা রস। লম্বা খেজুরগাছটার মাথায় দাঁড়িয়ে ভাঁড় খুলতে বিশেষ সতর্ক হতে হয় দিদার শিউলীকে। পুরানো ক'য়ে পা দিয়ে গাছের গলা জড়িয়ে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনছে রসবোঝাই ভাঁড়টাকে। বেশ ভারী। কনুয়ের নীচে থেকে সারা হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মাংসপেশী সরে গিয়ে মাঝে মাঝে উঁচু-নীচু হয়ে গিয়েছে। তামাটে শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। হাতের ভার সামলাতে কখন ঠোঁট দুটোকে এক করে ভীষণ জোরে চেপে ধরেছে। তারপর ভাঁড়বোঝাই রসটা বাঁ-হাতে ধরে গাছের কপালিটা আঙুল দিয়ে ভাল করে মুছে নিয়ে নতুন আর একটা ভাঁড় পেতে দিয়ে নেমে এল দিদার শিউলী। ভাঁড়ের রসটা টিনে ঢালতে গিয়ে একটু থামল। ভাঁড় থেকে বনতুলসী আর ভাঁটগাছের পাতাগুলো বের করে ফেলে দিতে দিতে আপন মনেই বলে উঠল, রোজ তোগা বোনাই গাছ কেটে রেখে যায়—খেতে মজা লাগে। আজ রস গিলিসনি কেন রে শালারা ? গুঁতো—ঠেলার নাম বাবাজী। তারপর হেঁ হেঁ করে হেসে উঠল দিদার শিউলী—সার্থকতার হাসি।

বাগদিপোতার বেড়ের কাঁথির মাথা থেকে আরো দুটো গাছের রস পেড়ে নিয়ে বাড়ীর পথে পা বাড়াল দিদার। সূর্যটা তখন পূবের আকাশে কোদালে-কুড়ুলে মেঘে রঙ ছড়িয়ে ঠেলে উঠছে।

আমন ধানের ক্ষেত ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসে দিদার। শীষ-নোয়া

ধানগাছগুলো দু' পাশ থেকে আলের ওপর এসে পড়েছে। টোপ-টোপ শিশির জমে আছে ঘাসের ডগায়, ধানের পাতায়, বেণার ঝোপে হাঁটু থেকে নীচের দিকটা একেবারে ভিজে গেছে। হিমেল হাওয়ায় খিল ধরে আসে।' বাঁকে টিনবোঝাই রসের দোলনের তালে তালে দ্রুত পা ফেলে দিদার। জোল পেরিয়ে মটর-মুসুরির ক্ষেত। ও পাড়ার ইয়াজদ্দী বুড়ো ধামা-পালি নিয়ে মটরশুঁটি তুলতে এসেছে। এখন আলের ওপর চকমকি ঠুকে তামাক সেজে খেতে বসেছে ভুড়ুক ভুড়ুক করে। দিদারকে দেখে আশান্বিত দৃষ্টি মেলে তাকাল। মিনতি জানাল রোজকার মত, আজ এটটু রস আকিস বাবা—এই এক গেলাস টাক। দোহাই বাবা !

কটমট করে দিদার একবার তাকাল শুধু। দ্রুতপায়ে ক্ষেত পার হয়ে যেতে যেতে বলল, শালার আকাল দেশে কি মেলাতে নি। মুই শালা গায়ের রক্ত পানী করে গাছ কাটলুম এবার সকালবেলা বিলিয়ে দাও। দু ঝত সব।

বাড়ীর কাছে সোনার ভুঁইয়ের আলে এসে আর একবার চেঁচিয়ে উঠল দিদার, এই—এই দোব সেরে এক ঘায়ে—সোজা করে ধরে লেজাতি পার না। আলের ধারের তেউড়গুলো আর হবে না শালীদের জ্বালায়।

ছাগল দুটাকে টানতে টানতে কঠোর দৃষ্টি মেলে তাকাল আয়েশা। সাপিনীর মত স্তব্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তারপর কঠোর কণ্ঠে বলল, কি ? তীক্ষ্ণাগ্র তীরের মত বাতাস কেটে কেটে সারা মাঠময় এই সুতীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ছড়িয়ে গেল।

দিদারও থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ভয়ে নয়—তুল্য প্রতিযোগী পেয়ে। তা ছাড়া অপরাধ তো তার নয়। তার ক্ষেতের ফসল খেয়েছে সে বলেছে। বলেছে বেশ করেছে। আরো বলবে। ভয় কি। কোমরে হাত রেখে চেঁচিয়ে উঠল, কি আবার! কানা হয়ে গেছ নাকি—দেখতি পাও না। বলি ছাগল তো পুষেছ গণ্ডা কতক। বেঁধে পোষ, সব শালার মুক বন্ধ। এই এই—আবার খায়। দেখ বাপের নাম ভোলাব। ঢোড়ার বিষনি আবার ফুঁসে ওঠে।

ফুঁসে ওঠা ইংগিতটা অর্থপূর্ণ। এবং দিদার এটা বলেছে ইচ্ছে করেই। গায়ের ঝাল মিটিয়ে। কালকের ঘটনাটা যেন তাকে হিংস্র করে তুলেছে। আকস্মিক অপমানটা ভুলতে পারছে না কিছুতেই। তারও হয়ত কিছু দোষ ছিল, তা থাক। কিন্তু এতটা হবে ও আশাই করতে পারেনি। ছাগল বেঁধে মাঠ থেকে ফেরার পথে জাবা বাঁশঝাড়ের গোড়ায় কঞ্চি কুড়ুচ্ছিল আয়েশা। মাঠেই যাচ্ছিল দিদার। কিন্তু দুর্দমনীয় কামনার আবেগে ঐ বাঁশ-ঝাড়টার গোড়ায় ছুটে এল। দাঁড়াল আয়েশার কোল ঘেঁষে। দুই পুরুষ্ট বুক যেন একে অপরের উত্তাপ অনুভব করে। তারপর লালসামদির চোখে তাকাল দিদার। ব্যাকুল আবেগে কাঁপা-কাঁপা গলায় বললো, সই যে—তা···

ব্যস, ঐ পর্যন্ত। কথা আর শেষ হয়নি। নির্জন নিস্তব্ধ বাঁশবাগানটা গুম শব্দে কেঁপে উঠলো। দিদারের প্রশস্ত পুরুষ্ট বুকে সজোরে কিল মেরে চাপা আক্রোশে যেন ফেটে পড়ল আয়েশা, বেহায়া লজ্জা নিক। তারপর অবহেলায় কঞ্চির বোঝাটা কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ীর পথে পা বাড়াল। আর বাজপড়া ঝলসান

তালগাছের মত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দিদার। আত্মবিহ্বল হয়ে ভাবল, তাই তো এ কি হল! কিন্তু ক্ষণিক। পরক্ষণেই একটা হিংস্র আদিমতা তীক্ষ্ণাগ্র দন্ত-নখর বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ল দেহের অলিতে-গলিতে। সে উত্তেজনায় আত্মবিহ্বলতা কেটে গেল দিদারের। দৃষ্টি নয়—আগুন। মশালের এক গুচ্ছ ছটা, শুকনো বাঁশপাতার ওপর খস-খস করে পা ফেলে এগুতে এগুতে গৃহপ্রত্যাগতা নৃত্য-দোদুল চপল আয়েশার দিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, আচ্ছা।

এখনকার এ চাপা আক্রোশ আর কটূক্তি এই 'আচ্চা'র-ই ফল।

আয়েশা বে-পরওয়া। বুক টান করে দাঁড়ায়। দু'টি সুগোল বিশাল স্ফুটমান পুষ্পের স্তবকের মত মনে হয় বুকটাকে। বলে, এতটা বাড়াবাড়ি ভাল হ'বে না—হ্যাঁ। পথ আগলে দাঁড়াও কেন? আবাদ খায়, ছাগল ধরে খোঁড়ে দেবে—গাল দিও না খবরদার। ঘরে তোমার মা-বুন নি কো?

রসবোঝাই টিন দু'টো কাঁধে নিয়ে উদ্ভ্রান্তর মত ছুটে আসে দিদার। প্রতিশোধ-স্পৃহায় যেন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। ছাগলের একটা দড়ি ধরে সজোরে টান দিয়ে বলে, ছাগল আজ পণ্ডেই দোব। শুধু শুধু আবাদ খাবে রোজ। বড্ড আস্কারা পেয়ে গেছ।

আয়েশার চোখ দুটো এবার জ্বলে ওঠে। বলে, মনে থাকে যেন—হাত থেকে ছাগল কেড়ে নিয়ে খোঁড়ে দেওয়া। আজ দুপুরে সব কথা বলবো মোড়লকে।

চীৎকার করে ওঠে দিদার, রেখে দে তোর মোড়ল। ভয় করিনে—হ্যাঁ।

কিন্তু মনে মনে দিদার ভীত হ'য়ে ওঠে। মোড়লটা যেন আজকাল বড্ড বেশী আয়েশার বাড়ী যাতায়াত করে। তা' ছাড়া অপরাধের পরিমাণটা যেন তারই বেশী। আবাদ খায়নি—অথচ হাত থেকে ছাগল কেড়ে নেওয়া যায় কি করে? ছাগলের দড়ি ছেড়ে দিয়ে হন হন করে চলে যেতে যেতে বলে, খবরদার—আর যেন কোন দিন এরকম না দেখি।

পিছন থেকে ফুঁসে ওঠে আয়েশা, ইস্—ভারী আমার মরদ রে! তারপর দু'জনা দুই বিপরীত পথে পা বাড়ায়। কিছু দূর এসে আপন মনে খিল-খিল করে হেসে ওঠে আয়েশা। বেশ মজা করা গেল সকাল বেলাটা। আবার সেই খিল-খিল হাসি।

শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন সকালের মত কুহেলিময় মনে হয় আয়েশাকে। ওকে বোঝা যায় না। ও এমনিই।

আয়েশা অত্যন্ত সুন্দর!

এক, দুই, তিন—হ্যাঁ সাতটাই আছে। পুকুর থেকে হাঁসগুলোকে তুলে এনে কঞ্চি আর বাঁশের চটায় ঘেরা 'গুপী'র মধ্যে তুলে দিল আয়েশা। দুপুর বেলাটা হাঁসগুলোকে এমনি করে আটক রাখতে হয়। পথে-ঘাটে কেউ থাকে না। কয়েক বার পুকুর থেকে হাঁস নিয়ে গেছে শিয়ালে। 'গুপী'র মধ্যে হাঁসগুলোকে তুলে দিয়ে আর একবার গুণে দেখল আয়েশা। না—ঠিক আছে।

তিনটে হাঁস ডিম দিচ্ছে। আরো দু'টো ডিম দেবে সত্বর। আয়েশা ঠিক বোঝে ক'দিনের মধ্যে কোন হাঁসটা ডিম দেবে। ডিম দেওয়ার সময় হাঁসের পা হয়ে ওঠে তেলের মত পিছিল আর চকচকে। ও বলে রং ফেরে। এটা হাঁসের যৌবনশ্রী—লাবণ্য আর রূপ। তাছাড়া ডাকের স্বর ও সুর পাল্টে যায়। প্যাঁক প্যাঁক করে গাঁ-গ্রাম মাথায় করে চেঁচায় না—একটু যেন নম্রভাবে ডাকে। কেমন যেন মোলায়েম মিষ্টি সুর ঝরে পড়ে। দূর থেকে হাঁসের ডাক শুনে আয়েশা বলে দিতে পারে হাঁসটা ডিমালো কি না। আয়েশার দৃষ্টি কখনো ভুল দেখে না। আরো দুটো হাঁস সত্বর ডিম দেবে। গায়ে গায়ে পালকে পালকে তার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। স্বরে তার ইংগিত।

'গুপী'র কাছ থেকে পিলের কাছে এসে বসল আয়েশা। তেইশটা হাঁসের পিলে উঠেছিল—বিক্রি হয়ে গেছে কিছু। এখন আছে গোটা পনের। আয়েশাকে দেখে ওরা কিলবিল করে ডেকে ওঠে। শামুকের ভাঁড়টা নিয়ে ওদের কাছে গিয়ে বসল আয়েশা। শিলের ওপর নোড়া দিয়ে মিহি করে পিষে ভেঙে দেবে গুগলি শামুক। কোমল একদলা মাংসপিণ্ডের মত হলুদ গায়ে আধ ইঞ্চিটাক দু'টো বাজু নিয়ে শিলের কাছে ছুটে আসবে পিলেগুলো। শিলের চারপাশ ঘিরে দাঁড়াবে। তারপর ছোট লাল কচি ঠোঁট দিয়ে গপ গপ করে খেয়ে নেবে উপরের শক্ত আবরণ সমেত গুগলি-শামুকগুলো। ঝিনুকগুলো শক্ত আবরণ সমেত ভেঙে দেবে না। প্রথমে মাথাটা ঠুকে একটু ভেঙে নেবে। তারপর আর একটা শক্ত ঝিনুকের সাহায্যে খোলা দুটো বিস্তৃত করে

ভিতর থেকে টেনে আনবে কোমল মাংসপিণ্ড ; তারপর সেই ঝিনুকের সাহায্যেই কেটে দেবে টুকরো টুকরো করে। তখন এমনি করেই পাশে বসে গুগলি আর ঝিনুক ভেঙে ভেঙে খাওয়াচ্ছিল পিলেগুলোকে, হঠাৎ ওপাড়ার আজিমোন বুড়ী এসে হাজির। বেশ সোরগোল তুলেই এল—যেমন আসে অন্য সময়, ও আয়েশা খাতুন—বলি কেমন আছিস র‍্যা!

উত্তরে আয়েশা কেবল একটু মুখ তুলে তাকাল। কাছে সরে এসে আজিমোন বুড়ী আবার শুরু করল, বা—এইতো ম্যালা পিলে রয়েছে। মুই মনে করি সব শেষ হয়ে গেছে। তারপর আরো কাছে সরে আসে আজিমোন বুড়ী। অন্তরঙ্গতার সুরে বলে, খুকীটা কাল যাবে শ্বশুরবাড়ী। আর ওর এই ধর না আশ্বিন, কার্ত্তিক···ন' মাসে পড়েছে। কবে কি হয় কিছু বলা যায় না। মুই বলি এখানে থাক—তা' শাউড়ী মাগী ধরেছে লে জাবে। তা লে জাক—যার চিজ তার ঘরে থাক। তা ওরে দুটো পিলে পাখী না দে শুধু পাঠাই কি করে বল? তাই···

আয়েশা অনেক আগেই বুঝেছিল ব্যাপারটা। মুখ না তুলে শামুক ভাঙতে ভাঙতেই বলল, পিলে লিবে—পয়সা লেয়েছো?

এবার যেন একটু ঝাঁঝ ফুটে বেরোয় বুড়ীর কণ্ঠে। বলে পয়সা না তো কি মাঙনা দিবি নাকি? কবে তোর কাছ থেকে ধারে লিগিচি র‍্যা?

ধারে বুড়ী বহু বার নিয়ে গিয়েছে ডিম, পিলে—পয়সা আদায় করতে যে কি বেগটাই পেতে হয়েছে আয়েশাকে! সব মনে পড়ে তবুও আর সে কথা তোলে না। বলে, ছ' আনা করে আর দিতি পারব না। পিলে অনেক বড় হ'য়েছে—আট আনা করে পড়বে।

বুড়ী কোন উত্তর দেয় না—নীচু হ'য়ে আহাররত পিলেগুলোর লেজ ধরে ধরে টানে। লেজ ধরে টেনে ডাকের শব্দেই বোঝা যায় মেয়ে-পুরুষ। বাচ্চা অবস্থায় মেয়ে-পুরুষ চেনার এ ছাড়া কোন পথ নেই। লেজ ধরে টানলেই মেয়েগুলো পিক-পিক করে ডেকে উঠবে—পুরুষগুলো ডাকবে না, ছটফট করবে কেবল। ডাকলেও শব্দ বেরুবে না ভাল করে। মেয়েদের ডাক অনেক বেশী তীক্ষ্ণ।

তিনটি মেয়ে পিলে বেছে নিল আজিমোন বুড়ী। তারপর মাজাটা সোজা করে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুতপায়ে পথ চলতে চলতে হেঁকে বলল, পয়সা কাল দোব মা—আজ একটাও নি।

শামুক ভাঙা ফেলে দ্রুত দৌড়ে ছুটে এসে বুড়ীর হাত ধরল আয়েশা, ও সব হ'বে না চাচী—পয়সা দে, তবে পিলে লে যাও।

প্রথমে আকুতি জানাল আজিমোন। তারপর আঁচল থেকে একটা সিকি খুলে আয়েশার হাতে দিয়ে যেন ঝড়ের বেগে উড়ে যেতে চাইল। কিন্তু আয়েশার গায়ে শক্তি অনেক। একটা পিলে কেড়ে নিয়েছে আর শাসিয়েছে কাল সব দাম দিয়ে যাওয়ার জন্তে।

বাঁশবনের কোলে ঐ ছোট্ট ঘরটায় আবার নিস্তব্ধতা নেমে আসে। সংগ্রামের পালা শেষ হ'য়েছে। এমন সংগ্রাম রোজই হয় এখানে। ডিমের পয়সা আদায়ের জন্তে, পিলের পয়সা আদায়ের জন্তে কখনো বড় হাঁস-মুরগীর পয়সা আদায়ের জন্তেও। ও সব গাসওয়া হ'য়ে গেছে।

পিলেগুলোর খাওয়া হ'য়েছে পেট পুরে—টোঁসাগুলো বেশ ভার ভার। ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সব। ওদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল আয়েশা। দুপুরের এই বিরল নিস্তব্ধতায় ওর মনটা কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। কত কী-ই মনে পড়ে। এ সময়টায় নিজের মনটাকে আর ধরে রাখা যায় না কিছুতেই। আয়েশা বসে ভাবে। পিলেগুলো তার সামনে কিলবিল করে ঘুরে বেড়ায়।

দীঘির উত্তর পাড়ের কবরডাঙার দিকে তাকিয়েই যেন ভাবনাগুলো ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে আয়েশার। ওখানেই শুয়ে আছে তার মোড়লদের ছেলের মত গোরা স্বামী। ওহো, লোকটা কত ভালই না ছিল! একেবারে আসমানের ফেরেস্তার মত। নামাজ পড়ত, রোজা রাখত, কত উপকার করত লোকের। আর রাতের বেলা আয়েশাকে টেনে নিয়ে গান বলতো মধুর। দরুদ শরীফ পড়া শিখিয়ে দিত আর শেখাত নামাজের সুরে। কিন্তু মাত্র ক'টা মাস। শ্বশুরবাড়ীর পথঘাটগুলোও তখন ভাল করে পুরানো হয়নি, সকল আত্মীয় কুটুম্বদের সাথেও তখন আপন-আপন ভাব হয়নি আয়েশার। তারপর নেমে এল সেই কাল-সন্ধ্যা—বাদল-সন্ধ্যা। রোয়া মাঠের আলেই কামড়েছিল সেই কালকুট। মরা লাশটাকে নিয়ে যখন সকলে ধরাধরি করে রোয়াকের ওপর তুলল তখন রাতের অন্ধকার বেশ গাঢ় হ'য়ে উঠেছে।

শীতের হাওয়া বয়। আশ-পাশে দুপুরবেলাকার বিরল নিস্তব্ধতা। এই শীতের দুপুরেও একটা 'পানী-পাখী' করুণ কণ্ঠে 'ফটিক জল' বলে সারা। ডাকটা সকরুণ আর্তনাদের মত শোনায়। আয়েশার চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। বুকফাটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আর ভাবে, জলজ্যান্ত মানুষটা কোথায় গেল? আর দেখা হবে না সারা জীবনে!

না—বিগত দিনগুলোর মধুর স্মৃতি নিয়ে স্বপ্ন রচনা করার অবসর নেই আয়েশার। সামনে কঠোর বাস্তব। শামুক ফুরিয়েছে—এখুনিই তুলে আনতে হবে। মাঠে বাঁধা ছাগলগুলোকে ঠাঁই-নাড়া করে দিয়ে আসতে হবে। আর ঐ সাথে গোসলটাও সেরে আসতে হবে। চোখ মুছে শামুকের ভাঁড়টা নিয়ে মাঠের পথে পা বাড়াল আয়েশা।

পাকরা ছাগলটা খোঁটার দড়ি জড়িয়ে জড়িয়ে ম্যা-ম্যা করে সারা হয়। আর একটু জড়ালে দম বন্ধ হ'য়ে হয়ত মরে থাকতো। আয়েশা দ্রুত হাতে ছাড়িয়ে ঠাঁই-নাড়া করে দিল। অন্যান্য ছাগলগুলোও আয়েশাকে দেখে ওর দিকেই মুখ তুলে তাকিয়ে থাকে। ওরা বোঝে মনিব এসেছে—আশা-ভরসায় বুঝি বুকটা ফুলে ওঠে ওদের। যার যা অসুবিধা দূর হবে। নতুন কচি ঘাসে ঝলমলান জায়গাটায় গিয়ে আরো দু'গাল খেতে পাবে।

মাঠ থেকে বাড়ীর পথে কিছু দূরেই নতুন পুকুর। কতকালের পুকুর কেউ জানে না, তবুও ওর নাম রয়ে গেছে নতুন পুকুর। কোমর-সমান পানীতে নেমে বুক ডুবিয়ে পাঁক থেকে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে তুলে আনে গুগলি, ঝিনুক, গেঁড়ে শামুক। সামনে নিস্তব্ধ পানীর ওপর ভাঁড়টা ভেসে থাকে। শামুকগুলোর কাদা ধুয়ে টপটপ করে ফেলে দেয় ওর মধ্যে।

ফুলের মত...
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
Rexona
BLENDED WITH CADYL
রেক্সোনা সাবানে থাকে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তোলে!
একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান
R.P. 152-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিমিটেড এর পক্ষে হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক ভারতে প্রস্তুত।

পুকুরের মাঝখানটায় কোন ঘাস, গাছ-গাছালি নেই—পানী ওখানে গভীর। ঘাস, লতাপাতা হ'য়েছে কিনারায়—আর ওরই ফাঁকে ফাঁকে ফুটেছে কলমি ফুল, নাল ফুল। লতাপাতাগুলোকে দু'হাতে সরিয়ে সরিয়ে শামুক তুলে তুলে এগিয়ে যায় আয়েশা। হঠাৎ আকস্মিক ভাবে লাফ মেরে ঠেলে ওঠে—তারপর ভয়াতুর কণ্ঠে বলে, বাবা কি অবিরোদ সাপ! পুকুরপাড়ের ঝোপ-জঙ্গল থেকে একটা বড় সাপ ব্যাঙ তাড়া করে মোটা একটা রসির মত সোঁৎ করে লাফ মেরে পড়ল পুকুরের ঘনকালো পানীতে, তারপর তীরের মত পানী কেটে কেটে এগিয়ে গেল।

সাঁপটার দিকেই তাকিয়ে ছিল আয়েশা। হঠাৎ পুকুরের পশ্চিম পাড়ে দৃষ্টি পড়তে সে কঠোর হ'য়ে উঠলো। ভাঁটগাছগুলোর ভিতর হ'তে প্রস্তুত পশুর মত ভয়াতুর পদক্ষেপে বন ঠেলে ঠেলে বেরিয়ে গেল দিদার শিউলী। ক্ষণিক কঠোর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল আয়েশা। তারপর বিস্তীর্ণ পুকুরের উপর ঘনায়মান দুপুর বেলাকার বিরল নিস্তব্ধতাকে আন্দোলিত করে খিল-খিল করে হেসে উঠল আয়েশা। বলল, ওরে আমার পুরুষ রে?

তারপর অকস্মাৎ শরীরটার অনেকখানি ডুবিয়ে দিয়ে আবেগ ভরে শামুক তুলতে লাগল।

কোন কোন সময় নতুন পুকুরের কিনারায় বসে উপুড় হ'য়ে ঘন কালো পানীতে মুখ দেখে আয়েশা। স্বামী থাকতে আয়নায় মুখ দেখতে নিষেধ করে দিয়েছিল। বলেছিল, আয়নায় মুখ দেখতেনি। ওর সামনে দাঁড়ালে ওর ভিতর শয়তান রূপ ধরে দাঁড়ায়। আয়নায় মুখ দেখা পাপ!

আজ কিন্তু পড়ন্ত বেলায় মুখ দেখার জন্যে নতুন পুকুরের ঘন কালো নিস্তরঙ্গ পানীর ধারে গিয়ে দাঁড়াল না আয়েশা। কানা-উঁচু থালাটাকে ভাল করে মাজল, তারপর আধা-অন্ধকার ঘরটার ভিতরে গিয়ে কলসী থেকে পরিষ্কার পানী ঢেলে থালাটা বোঝাই করল। থালাটাকে মাঝখানে রেখে দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দিল। তারপর লম্ফটা জ্বালিয়ে লোটার ওপর উঁচু জায়গায় রেখে বসল থালার সামনে। লম্ফর বাত্তিটা জোর করেই দিয়েছিল। বন্ধ ঘরের অন্ধকারে লম্ফর শিখটা বল্লমের ফলার মত জ্বলতে থাকে। থালার পানীতে নীচু হ'য়ে মুখ দেখে আয়েশা। মাঝে মাঝে হাসে নিজের মনেই। দাঁত ঝিকমিকিয়ে ওঠে। বুকের কাপড় ফেলে প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ অঙ্গটাকেও প্রতিবিম্বের মধ্যে দিয়ে দেখতে চায় আয়েশা। বন্ধুক্লালের ভাঙা চিরুণীটা দিয়ে চুল আঁচড়ায়। তেল দিয়ে মুখ-হাত জবজবে করে প্রসাধন শেষ করে। তারপর আলো নিবিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। পানীবোঝাই থালাটাও নিয়ে আসে। উঠানের মাঝখানে রেখে স্পষ্ট দিনের আলোয় আর একবার ভাল করে মুখটা দেখে নেয় আয়েশা। তারপর পানীটা ফেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দ্রুত গ্রামের দিকে পা বাড়াল।

দখিণ পাড়ার কলাবাগানের পাশটা দিয়ে যেতে যেতে বলে, ও দিদারের মা চাচী—কেমন আছ?

কাঁথা-সেলাই থেকে মুখ তুলে দিদার মা। বলে, অ আয়েশা বুঝিন? তা' আয় একটু বসবি আয়। তুই যে আর একদম আসিস নে?

আয়েশা জানত ঠিক এমন করে ডাকবে দিদারের মা আর সে গিয়ে বসবে দিদারের ঘরের দখিণ রোয়াকের ওপর। রোয়াকের ওপর বসতে বসতেই বলল, হ্যাঁ চাচী—কই তুমি তো এবার পিলে দিলে না?

ঘরের মধ্যে দিদারের তখন ঘুম ভেঙে গেছে। উৎকর্ণ হয়ে মড়ার মত পড়ে আছে চুপচাপ।

বুড়ী উত্তর দেয়, আর পারিনে মা! চোখের মাতা খেয়ে বসেছি, আগের মত কাজ কাম পারিনে। কাঁথায় সেলাই দিতে দিতে সুঁই সুতো এগিয়ে দিয়ে বলে, সুতোটা একটু পরিয়ে দে মা!

কথা বলার বুঝি ভাল সুযোগ পায় আয়েশা। বলে, তা ছেলের বিয়ে দাও চাচী—সব দুঃখু ঘুচে যাবে। বৌ ভাত রাঁধবে, কাজ করবে। তুমি দু'দিন সুখে খেতে পাবে। কথা বলতে বলতেই একবার আড় চোখে জাফরিঘেরা জানালার দিকে কটাক্ষ হানল আয়েশা। আবেগে, উল্লাসে আর নেশা ধরা উত্তেজনায় দিদার ওখানেই দাঁড়িয়েছিল। চোখে চোখ পড়তেই যেন একটু পিছিয়ে সরে গেল।

হঠাৎ আয়েশার কণ্ঠটা বেশ জোয়াল হয়ে ওঠে। আবেগে যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে স্বরটা। অকস্মাৎ বুড়ীর হাতটা চেপে ধরে এক অনতিক্রম্য উল্লাস-ব্যাকুলতায় বলে, একটা গল্প বল না চাচী, সেই আগে যেমন বলতে?

বুড়ী অবাক হ'য়ে তাকায় খানিক। তারপর দন্তহীন টোল-খাওয়া মুখবিবরটা বিস্তৃত করে হেসে বলে, তা গল্প বলার সময় বটে।

হাত ছেড়ে দিয়ে ছোট মেয়ের মত এবার গলাটা জড়িয়ে ধরে। তারপর সেই একই আবদার, অচ্ছো ছোট দেখেই বল।

বুড়ী হাসে। বলে, আ মলো—তোর আজ হ'লো কি! আচ্ছা গলা ছাড়—বলি শোন—

তারপর গল্প শুরু হয়। সেই চিরপরিচিত গল্প, এক বাদশার বিবি। জানিস—বড় বিবি আর ছোট বিবি। তা' পরে—

গল্প তখন ভাল ভাবে জমে উঠেছে—অকস্মাৎ আসন ছেড়ে উঠে পড়ল আয়েশা। বলল, আজ থাক্ চাচী, আর একদিন এসে শোনব। তারপর দ্রুত গতিতে বাড়ীর পথে পা বাড়াল।

গল্প থামিয়ে মুখে ঈষৎ হাসির ছাপ নিয়ে বুড়ী বলে, তা' চলে গেলি—একেবারে পাগল যেন! তারপর কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ নরম করে বলে, আহা—বাছা আমার একলা থাকে গো, কি কাজ পড়েছে হয়তো।

অজদালির পুকুরের পাশ দিয়েই বাড়ী যাওয়ার পথ। বাড়ীর পথে দ্রুত যেতে যেতে হঠাৎ পাশ কাটিয়ে পুকুরপাড়ের ভাঁটগাছ আর কাশবন ঠেলে ওর মধ্যে গিয়ে বসে পড়ল আয়েশা। চোখ পড়ে রইল তার পথের ধুলোয়। তা' ছাড়া ভারী পায়ের শব্দ তার অচেনা নয়। যা' ভেবেছিল তাই—আয়েশার অনুমান মিথ্যে হয়নি। ভারী পা ফেলে ফেলে দ্রুত চলেছে দিদার। কেঁচোর তোলা শুকনো মাটির ঢিল নিয়ে ভাঁটগাছের ভিতর থেকে ক্ষিপ্রহাতে মারল দিদারের গায়ে। স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল দিদার। এদিক ওদিক তাকাল অনর্থক। তারপর আবার পথ চলা শুরু করল।

কাশের বন আর ভাঁটগাছ ঠেলে ঠেলে সন্তর্পণে বেরিয়ে পথে

নামল আয়েশা। পথে নেমে চারদিকটা একবার তাকিয়ে নিল ভাল করে। তারপর নির্জন পথের বৈকালিক স্তব্ধ আবহাওয়াকে সচকিত করে খিল-খিল হাসিতে ভেঙে পড়ল। বেশ কিছু দূরেই দিদার শিউলী স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেছে। দ্রুত নিকটে আসতে আসতেই আয়েশা বলল, বলি শিউলীর পো, ইদিকে যে খুব জোরে পা চালিয়েছ—যাবে কোথায়? মাঠ তো উদিকে।

কিছুক্ষণ যেন সম্মোহিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল দিদার। তারপর ঈষৎ হেসে উত্তর দিল, মোর সয়ার বাড়ী গো!

ডাগর ত্ব'টি কালো চোখ অকস্মাৎ যেন সকৌতুকে নেচে উঠল। সমগ্র দেহটাকে মৃদুল হাওয়ায় আলোকলতার মত সবেগে আন্দোলিত করে বলল, আবার সয়া আছে নাকি তোমার? কিন্তু মনে থাকে যেন ইদিকে পা বাড়ালে ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব।

কি উত্তর দেওয়া যায়, ভেবে না পেয়ে আয়েশার অনুগমন করতেই পথ থেকে অকস্মাৎ এক মুঠো ধূলো তুলে নিয়ে ক্ষিপ্র হাতে দিদারের গায়ে ছুড়ে দিয়েই দ্রুত পদে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল আয়েশা। দেহের কানায় কানায় অপূর্ব হিল্লোল জাগিয়ে লাবণ্যের ঝিলিকে ঝলকিত করে পথের বাঁকে হেলে দুলে মিলিয়ে গেল যেন কোন মায়াবিনী! দূরাগত কল্লোল-গানের মত বাতাসে বাতাসে তখনো ছড়িয়ে আছে খিল খিল হাসির রেশ।

স্তব্ধ হয়ে গেছে দিদার। গায়ের ধূলো ঝেড়ে পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। কি করবে ভেবে পেল না।

চোখ বন্ধ করে উৎকর্ণ হ'য়ে আর একবার শব্দটা ভাল করে শুনল আয়েশা। আরো একবার। শেষ পর্যন্ত চিন্তিত না হয়ে পারল না। একটা অকল্যাণ আশঙ্কায় গাঢ় অন্ধকারের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। ডোব থেকে হাঁস-মুরগীর ঝটপট শব্দ আর করুণ ডাকটা সমান তালেই ভেসে আসছে। হ'ল কি? এই তো কিছুক্ষণ আগে ডোবের দোরটা ভাল করে পরীক্ষা করে বার থেকে অনেকগুলো ইট সাজিয়ে দিয়ে এসেছে। কই এমন তো কিছু তখন দেখে নি। তা' হ'লে?

তা' হ'লে আজ একটা কিছু হ'তে পারে। যে অলক্ষুণে চিন্তাটা এতক্ষণ প্রাণপণে এড়িয়ে চলেছে আয়েশা, সেটাই এবার সুবিপুল আন্দোলনে গর্জ্জন-মুখর হ'য়ে আছড়ে পড়ল তার মনের উপলে।

সাপ! 'গখরো' সাপ!!

পরশু রাতে ঢেবার মার ডোবে গিয়ে হাঁস-মুরগীগুলোকে সব শেষ করে দিয়েছে। ছুটো হাঁস, তিনটে মুরগী আর একটা মোরগ। মোরগটা জামায়ের জন্তে রেখে দিয়েছিল। সাপে সব দিল শেষ করে। আহ—ঢেবার মার আছড়া-পিছড়ি করে সে কি কান্না!

লম্ফটা জালিয়ে উঠে বসল আয়েশা। ছোট লাঠিটা নিয়ে বাঁশের দরজা ঠেলে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। হঠাৎই হাঁস-মুরগীর ডাকটা বন্ধ হ'য়ে গেল। একেবারেই নিস্তব্ধ। কেবল রাতের হাওয়া পূব পাশের তালগাছের শুকনো পাতাটাকে নাড়াচ্ছে হড়মড় করে।

তবুও নিঃসংশয় হ'তে পারেনি আয়েশা। আলো হাতে করে উঠানে নামতেই ত্ব'টি অদ্ভুত জলন্ত চোখ ঝিলিক মেরেই তার সামনে দিয়ে দ্রুত রাতের অন্ধকারে মেঠো পথের দিকে মিলিয়ে গেল। প্রায় সাথে সাথেই চিৎকার করে ওঠে আয়েশা, ও-মা, 'হাটকুড়ো শ্যাল'।

ডোবের কাছে আলো এনে রাগে, বিস্ময়ে আর দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলল আয়েশা। পা আর মুখ দিয়ে টেনে টেনে ডোবের দোর থেকে ইটগুলো সব সরিয়ে ফেলেছে। তারপর মুখ গলাবার চেষ্টা করেছে দরজা ভেঙে। কাঁচা বাঁশের মজবুত চটা দিয়ে তৈরি নতুন দরজাটা আর ভাঙতে পারেনি। হতাশ হয়ে শেষে পায়ের ধারাল বাঁকা নখ দিয়ে মাটি টেনে টেনে দেওয়ালের মাঝে গর্ত করার চেষ্টা করেছে। আয়েশা না উঠে এলে হয়ত গর্তটাই শেষ পর্যন্ত করে ফেলতো, তারপর গর্তের ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এক এক করে ধরে ধরে নিয়ে যেত পুকুরপাড়ের ভাঁটবনের মধ্যে। সকালে যে আগে উঠতো সে দেখতে পেত পুকুরের দখিণ পাড়টার চারপাশে শাদা-কালো 'পাখনা' পড়ে রয়েছে মুরগী-হাঁসের। তার পর সেই সাতসকালেই পুকুরপাড়ের পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠতো, ওরে বাবা রে —কার সব্বোনাশ করেছে রে—সারা পাড়াটা সোরগোলে মাতোয়ারা হ'য়ে যেত সেই সকালবেলায়।

লম্ফটা মাটিতে রেখে দরজাটা আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করে ইটগুলো সাজিয়ে দিল। তার পর গোটা ছুই ঝাঁপড়ালো কুল-কাঁটার ডাল টেনে এনে খুঁটির সাথে ত্ব'পাশ দিয়ে মজবুত করে বেঁধে দিল। সতর্কতার আর কিছু বাকী নেই। লম্ফটা হাতে নিয়ে চারপাশটা আর একবার ভাল করে দেখে নিজে ঘরের মধ্যে চলে এলো। বিছানায় বসে আবোল তাবোল চিন্তা করে নিল একচোট। তারপর ধীরে ধীরে উত্তেজনাটা কেটে গেলে আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। প্রতিদিনের অভ্যাস মত সেই কথাগুলোই ফিস ফিস করে বলল, আল্লা-রসুল, খোদা মালেক। তার পর কাঁথা গায়ে টেনে দিয়ে চোখ খুলে অন্ধকারের দিকে চাইতেই এক অন্তহীন কামনার পাহাড় তার বুকের ওপর চেপে বসল। প্রতি রাতেই এমন হয়।

সারাদিনটা কাটে কাজের মধ্য দিয়ে—সব কিছু যেন ভুলে থাকে সে সময়। মধ্যে মাঝে দুপুরের বিরল নিস্তব্ধতায় কিছু মনে পড়লে পত্র-পল্লবে আছাড় খাওয়া মর্মর ধ্বনির মত একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়েই যেন সেগুলোকে ঝেড়ে ফেলা যায়। চিন্তাটা আবার নতুন করে জমে উঠতে না উঠতে হয়তো কোন কাজ এসে পড়ে সামনে। সব সমস্যার সমাধান হয়। সব জ্বালা ভোলা যায়। কিন্তু রাতের অতলান্ত নিঃসীম অন্ধকারে যখন আকাশ পৃথিবী এক হয়ে যায় নিজের অঙ্গটাকেও আর দেখা যায় না—কেবল বুকের স্পন্দনই যখন, স্পষ্ট তালে শোনা যায়, তখন দুই সুগোল স্তনভার যেন দুই বিকশিত পুষ্পের স্তবকের মত বাসনার রং-এ রঙীন হয়ে অনন্ত কামনার সৌরভে ভরপুর হয়ে ওঠে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন জোয়ার জাগে, মাতাল হয়ে ওঠে দেহ-মন। একটা বহুল-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন যেন নিবিড় হয়ে ওঠে চোখের পাতায়। তখনই চোখের সামনে এসে ধীরে ধীরে ধরা দেয় সকলেই। মৃত স্বামী, দিদার শিউলী, ইয়াজুদ্দি রাখালের ছেলে করিম, আর মোড়লের ঐ ফর্সা সেজো ছেলে আহসান। আশ্চর্য! আহসানকেও মনে মনে কামনা করে আয়েশা। আহসানকে

যতবার দেখেছে ততবারই তার মনে হয়েছে, আহ, ঐ রাঙা লোকটা যদি তাকে ধরে একবার চুমো খায়।

কাঁথাটা গায়ে টেনে দিয়ে অন্ধকারে চাইতেই আজ কিন্তু দিদার শিউলীর অবয়বটাই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আয়েশার সমগ্র চিত্তকে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করছে। আয়েশা ওর নাম দিয়েছে 'হাঁদারাম'। একেবারে বোকা—কিছু বোঝে না। সামান্য এক মুঠো ধুলো গায়ে দিতেই সব সাহস যেন উবে গেল লোকটার। আর একবার সাহস হ'ল না। কেন—সেও তো দিতে পারত এক মুঠো ধুলো কিংবা ছুটে এসে ধরতে পারতো হাতটা। হাতটা ধরে বলতে পারত, এবার! না—সে সাহস নেই দিদার শিউলীর। একেবারে বোকা—হাঁদারাম। অন্ধকার রাতটাকে সচকিত করে আপন মনেই একচোট হেসে নিল আয়েশা। কিন্তু হঠাৎ-ই হাসি থামিয়ে একটা চিন্তায় যেন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল! চিন্তাটা চকিতে মনের মধ্যে একবার দেখা দিয়েই যেন গর্জনমুখর হয়ে উঠতে চাইছে। বিছানায় উঠে বসল আয়েশা। তার মনে হ'ল আজ রাতে দিদার আসবে তার ঘরে। নিশ্চয় আসবে। আবেগ ভরে কাঁথাটা গা থেকে ফেলে দিয়ে সে দরজার কাছে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ভারী পায়ের ধীর শব্দ শোনার জন্যে দেহ মন যেন ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ অধীর ভাবে অপেক্ষা করেও তেমন কিছু শোনতে পেল না আয়েশা। ভারী পা ফেলে এসে দরজায় একটিবার মাত্র ক্ষীণ টোকা দিলেই দরজা খুলে তাকে দুরন্ত কামনার আবেগে জড়িয়ে ধরবে—কিন্তু না, তেমন কিছুই হল না। একবার ভাবল, অতিকষ্টে চুপি-চুপি হয়ত দরজা পর্যন্ত এসেছে দিদার, সঙ্কেত-ধ্বনি করতে পারছে না ভয়ে। যা হাঁদারাম! উন্মত্তের মত দরজা খুলে বাইরে এল আয়েশা। হরিণীর মত কামনা-মদির দু'টি চঞ্চল চোখ অনর্থক ঘুরে বেড়াল অন্ধকারের বুক চিরে চিরে। বাতাসের দোলায় তালগাছের শুকনো পাতাটায় তেমনি করেই শব্দ উঠছে। আর কিছু না।

দরজা বন্ধ করে ছুটে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল আয়েশা। বহুদিন পর বালিশে মুখ গুঁজে দুরন্ত কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে এক অদ্ভুত উত্তেজনায় যেন গর্জন করে উঠল আয়েশা, খোদা তোর 'এনছাব' নিকো—তুই আমার স্বামীডার মাথা খালি। ওরে সব্বোনেশে…

প্রহরের শিয়ালগুলো বাঁশতলার ভিতর হ'তে, ভাটবনের মধ্য থেকে ডেকে উঠল এক সাথে। চুলোর পাড় আর গোলার তলা হ'তে কুকুরগুলো তার জবাব দিল লম্বা ডাকে!

নিশীথ রাত্রি একবার কেঁপে উঠল। গ্রাম পার হ'য়ে, ধানক্ষেতের উপর দিয়ে রংমহলের কোলে গিয়ে মিলিয়ে গেল সে ডাক। তারপর নেমে এল চরম নিস্তব্ধতা। বিপুলা পৃথিবী আর অনন্ত আকাশ—একে অপরের দিকে তাকিয়ে রইল নির্বাক হয়ে।

ঐ ডাকেই ঘুম ভেঙে গেল আয়েশার। দুই নারিকেল গাছের মাঝ দিয়ে যে রাস্তাটা বাগানের ভিতর থেকে একেবারে বৈঠকখানার সামনে এসে মিলেছে ঐ রাস্তার উপরেই এসে বসে ডিমওয়ালা। তারপর রয়ে রয়ে সকালের কোলাহল মুখর আবহাওয়াকে সচকিত করে হেঁকে উঠব, আণ্ডা আছে গো-ও-ও-ও। গো কথাটার ওপর অস্বাভাবিক রকমের জোর দিয়ে টেনে লম্বা করে পল্লীর অলিতে গলিতে ছড়িয়ে দেয়। সোরগোল ওঠে মেয়ে মহলে আর কোলাহল পড়ে যায় ছেলে-মেয়েদের দলে। তারা বায়না ধরে বিস্কুট খাবে ডিমওয়ালার কাছ থেকে। গোল পুরু বিস্কুট। ধারটা দাঁতের মত কাটা-কাটা। মাঝখানটায় অনেকখানি স্থান জুড়ে লাল, নীল, সবুজ রং-এর ফোটা দেওয়া। এ বিস্কুট গাঁয়ের আজিমোনদের দোকানে পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় কেবল ঐ ডিমওয়ালার কাছে। মায়ের কাছ থেকে একটা-দুটো ডিম আদায় করে হাওয়ার ভর করে ছুটে আসে ছেলেমেয়ের দল। একটা ডিমের বদলে চারটে বিস্কুট। বিস্কুট কিনে আর বাড়ী আসবে না কেউ—ভাগ দিতে হবে ছোট ভাই-বোনদের। ওখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাবে অথবা ছুটে পালিয়ে যাবে মাঠের দিকে। বিস্কুটের চারপাশ খেয়ে মাঝখানের রঙীন অংশটা রেখে দেবে সকলে। ঐ জায়গাটা নাকি সব থেকে 'মজুন'।

আবার ডাক দিল ডিমওয়ালা, আণ্ডা আছে গো-ও-ও-ও।

ঐ ডাকে চট করে ঘুম ভেঙে গেল আয়েশার। রাতে কান্নাকাটি করে কখন ঘুমিয়েছিল খেয়াল নেই কিন্তু যখন ঘুম ভাঙল তখন সকালের পর্যাপ্ত আলোয় আকাশ-বাতাস ভরে গেছে। জানলা দিয়ে বড় নারকেল গাছের মাঝপাতার দিকে চাইতেই আয়েশা দেখল, সকালের নম্র-মধুর কমলা-রোদে রঙীন হয়ে উঠেছে পাড়াটা। ভোর থেকে হাঁসগুলো চাপ্টা হলুদ ঠোঁটে প্যাঁক প্যাঁক করে ডাক শুরু করেছে। দরজায় ঠোকরাচ্ছে মাঝে মাঝে। উঠে পড়ল আয়েশা কাঁথাটা গা থেকে ফেলে মস্ত একটা হাই তুলতে তুলতে তার মাঝেই অস্পষ্ট করে উচ্চারণ করল, আল্লা-রসুল, খোদা-মালেক।

রোদ উঠে গেলে ফজরের নামাজ হয় না আর। কাজা পড়তে হয়। নামাজ পড়ল না আয়েশা—এমন কি মুখও ধুলো না। ঘ[illegible] থেকে উঠে গিয়ে ডোবের দোর খুলে দিল। ঝটপট করে ডাক ছেড়ে বেরিয়ে এল হাঁস-মুরগীর দল। উঠানের ফাঁকা আলো-হাওয়ায় এ[illegible] বাজু দুটো সবেগে আন্দোলিত করে পায়ের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁ[illegible] সমেত মাথাটা উঁচু করে গলা দুলিয়ে বড় সাইজের রঙীন মোরগা[illegible] উচ্চৈঃস্বরে ডেকে উঠল, কু কু, কু-উ-উ…

দরজা খুলে এক পাশে রেখে সাগ্রহে ডোবের মধ্যে উঁকি দি[illegible] আয়েশা। তিনটে নয়—আজ চারটে ডিম গড়াগড়ি খাচ্ছে ডোবে[illegible] অসমতল মেঝেয় হাঁস-মুরগীর গুয়ের ওপর। লম্বা বাঁশের বাখা[illegible] দিয়ে ডিমগুলোকে টেনে হাতে করে তুলে পরিষ্কার করতে গি[illegible] দেখল, একটা ডিম ফেটে গিয়েছে। পাঁচ দিন ডিম বিক্রি হয়নি-গোটা ষোল ডিম জমেছে। পালির মধ্যে তুষ দিয়ে ডিমগুলো সাজিয়ে নিল আয়েশা। তার পর পালি হাতে দ্রুতপায়ে ঘর ছে[illegible] বেরিয়ে পড়ল।

ডিমওয়ালাকে ঘিরে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে জটলা পাকাচ্ছে[illegible] চিতের ঘনকালো বেড়ার ফাঁকে দাঁড়িয়ে ডাক দিল আয়েশা, শামচো[illegible] —অ শামচোন!

ফুটফুটে ডাগর মেয়েটা ডাক শুনে ছুটে পালিয়ে গেল বা[illegible] দিকে। ডিমওয়ালা শুনেছিল ডাকটা। তা ছাড়া প্রত্যেক ডিমওয়[illegible] ভাল ভাবে চেনে আয়েশাকে। নিজের স্বার্থে শেষ পর্যন্ত ডিমওয়া[illegible]

একটা ছেলেকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে পাঠিয়ে দিল আয়েশার কাছে। পালি-বোঝাই ডিম নিয়ে ফিরে এল ছেলেটা। এক হাত মুঠো করে এক চোখ বন্ধ করে মুঠোর আগায় ডিম নিয়ে সূর্যের দিকে চেয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বারটা ডিম বেছে নিল ডিমওয়ালা; চারটে ডিম ফেরত দিয়ে দাম মিটিয়ে দিল তারপর। কিন্তু বেঁকে বসল আয়েশা, সব ডিম না নিলে সে ডিম বিক্রি করবে না। তা ছাড়া চিকের বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে বেশ জোরেই শুনিয়ে দিল ডিমওয়ালাকে, কোথাকার আণ্ডাওয়ালা তুমি—জাড়কালে আণ্ডা বুঝি খারাপ হয়? সবে মোটে পাঁচ দিন হয়েছে।

লাঙল কাঁধে ঐ পথেই মাঠে বেরিয়েছিল দিদার। সব শুনে গম্ভীর কণ্ঠে ডিমওয়ালাকে শাসন করল, বলি মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকাতে চাও নাকি? ওসব চলবে না হ্যাঁ। শীগগির দাম মিটিয়ে দাও।

ষোলটা ডিমের দাম তুষের ওপর রেখে পালিটা দিদারই তুলে দিল আয়েশার হাতে। বিজয়ীর মত হাসি মুখে এগিয়ে গেল দিদার, এটা তার পক্ষে একটা বিজয় বৈই কি! কিন্তু না—কোন প্রতিফলন দেখা গেল না আয়েশার মুখে। হঠাৎ সে যেন ভীষণ গম্ভীর হয়ে পড়েছে। হাসি মুখে পালিটা এগিয়ে দিতে দিতে বলে, সয়া, আমার ডিম বেচেই যে বড় লোক হয়ে যাবে গো!

কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে দিদারের হাত থেকে পালিটা নিয়ে আয়েশা বাড়ীর পথে পা বাড়াল।

সামান্য ঘটনাটা যে এতদূর গড়াবে তা আশা করেনি কেউ। পরীবানু নয়, আয়েশাও নয়। মুরগী পাখীকে এমন মারধোর অনেকেই করে, তাই বলে এমন একটা অঘটন ঘটে যাবে ভাবতে পারেনি কেউ।

ধান সিদ্ধ করে পরীবানুর মা মেলে দিয়েছিল উঠানে। রোয়াকের ওপর বসে লম্বা লগী নিয়ে হাঁস-মুরগী চৌকি দিচ্ছিল পরীবানু। মুরগীগুলো ভীষণ চালাক। অসতর্ক মুহূর্তে কোন ফাঁকে এসে পড়ে ধানে; তারপর গবাগব বার কয়েক খেয়ে চম্পট দেয়। বার বার আসে আর ছুটে পালায়। একই মুরগী জ্বালাতন করে বার বার। তাড়িয়ে দিলেও আবার আসে। লাল কালোয় মেশান পাকরা ডেগী মুরগীটা বার বার জ্বালাতন করায় রেগে গিয়েছিল পরীবানু। শেষে মারার মতলব নিয়ে ইচ্ছে করেই ধান খেতে দিয়েছিল পরী। নির্বিঘ্নে ধান খাওয়ার কাজে যখন বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মুরগীটা ঠিক তখন তাক করে করে বাখারী ছুড়েছে পরীবানু—আর সাথে সাথেই দুপুরের কড়া রোদে তীব্র আঘাত সহ্য করতে না পেরে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে মুরগীটা। ছুটে এসে ঘুরে পড়া মুরগীর ওপর ধামা চাপা দিয়ে বাজিয়েছে পরীবানু। না কিছুতেই কিছু হয়নি ঘাড় সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি মুরগীটা। সংবাদ পেয়ে পাগলের মত ছুটে এসেছে আয়েশা। ব্যাকুলভাবে ভূলুণ্ঠিত মুরগীটাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে সব দেখে শুনে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছে। এমনিতেই কথা কম বলে আয়েশা—এখনো বেশী কিছু বলে নি। কেবল মুরগীটা নিয়ে চলে যাওয়ার সময় বলেছে, এই তোমগা বিচার—অবলা পরাণীডার মেরে ফেলে দেলে।

ফুঁসে উঠেছে পরীবানুর মা। হ্যাঁ বিচার মোদের নিক—তোমার আছে। সেই সকাল থেকে খাচ্ছে—কাঁহাতক সহ্য করা যায়।

হলই বা। না হয় দুটো ধান খেয়েছে, ধীরে ধীরে বলে আয়েশা, তাই বলে অবলা পরাণীডার মেরে শেষ করে দিতি হয়?

আবার ফুঁসে উঠতে চেয়েছে পরীবানুর মা। কিন্তু অকস্মাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেছে নতুন আক্রমণে। আসলে মুরগীটা এখন আয়েশার নয় সমীরদের। আয়েশার কাছ থেকেই কিনেছিল ওরা। তবুও আয়েশা কাঁদছিল। হাঁস-মুরগীর ওপর অত্যাচার হলে ও না কেঁদে থাকতে পারে না। সংবাদ পেয়ে ছুটে এল সমীরের মা—সারা পাড়াটা মাথায় করেই ছুটে এল। এবং সংগ্রাম ক্ষেত্রে হাজির হয়ে যে বাদ-প্রতিবাদ এতক্ষণ ক্ষীণ ভাষায় প্রবাহিত হচ্ছিল তাকে গর্জ্জনমুখর করে তুলল, বলি অ পোড়াকপালীর মা—আমার পাকীডারে মারলি—তোর বেটা মরে যাক।

এবার সত্য সত্যই কোমর বাঁধল পরীবানুর মা। তারপর গ্রামের অর্ধেকটাকে সচকিত করে চেঁচিয়ে উঠল বলি অ আঁটকুড়ির মা—নিজের বেটার মাতা খেয়ে আমার বেটার মাতা খাতি এয়েছো।

এর পর আর বাদ-প্রতিবাদ হয়নি। হয়েছে চুলোচুলি। পাশে যারা ছিল তারা শুনেছে অব্যক্ত গোঙানি। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি আর টানাটানির পর যখন রণে সমাপ্তির রেখা পড়ল তখন দেখা গেল উভয়ের পরনের ছেঁড়া কাপড়ে অনেকখানি করে রক্তের ছোপ পড়েছে।

এর পর আর খানিক হাঁকডাক হয়েছে—তারপর যে যার বাড়ীর পথে পা বাড়িয়েছে। আয়েশা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরো খানিকক্ষণ। শেষে সে-ও বাড়ীর পথে পা বাড়াল।

পরীবানুর মা সর্বশেষ আক্রোশে ফেটে পড়ে ভাতারের মাথা খেয়ে দিগগজ মাগী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ—ঝগড়া বাধাবার জন্যি গা নিশপিশ করে—হ্যাঁ?

কিছু বলে না আয়েশা। বেশী কিছু বলার অভ্যেসও তার নেই। কথাগুলো শুনে কেবল একটু ফিরে তাকাল। তারপর বাড়ীর পথে ফিরে গেল।

বাঁশবনের কোণে ছোট্ট ঘরটার রোয়াকের ওপর নির্বাক বেদনায় বসে থাকে আয়েশা। বুকটায় যেন আজ হঠাৎ বড় ব্যথা জেগে ওঠে। কত বসন্ত কত জ্যোৎস্নায় যে ব্যথা পলে পলে বঞ্চিত হয়েছে বুকের মাঝে তার সবটুকুই আজকের এই বিরল মধ্যাহ্নের নীরবতায় যেন বাইরে আসার পথ খোঁজে। গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে আয়েশা চোখ দিয়ে অশ্রু গড়ায়। কত কথাই মনে পড়ে। স্বপ্নের মত ভাসে। বহু দুর্ব্বল মুহূর্তে যে কথা বার বার মনে হয়েছে আয়েশার—সেই কথাই আজ আবার একান্ত হয়ে ওঠে বাসনালোকে। অশ্রুর উষ্ণ ফোটায় তারই গোপন বাণী সঞ্চিত হয়ে ওঠে।

হাঁসের পিলেগুলো গুপীর মধ্যে কিলবিল করে ডাকে, মুরগীর দল উঠানের জঞ্জালগুলোয় পায়ের বল পরীক্ষা করে, ঝুঁটি তোলা পাকরা মোরগটা রোদের মাঝে অনর্থক ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

সব দেখেও যেন কিছু দেখে না আয়েশা! নিস্তব্ধ মূর্তিটার অন্তর গলে গলে যেন অশ্রু ফোঁটায় ফোঁটায় বেরিয়ে পড়ে।

হঠাৎ সোরগোল তুলে আদল গায়ে বাড়ীর মধ্যে আসে দিদার। বলে, কই সয়া, এক গ্লাস পানী দাও দিনি?

সোরগোলটা আবার হঠাৎ-ই বন্ধ হয়ে যায়। আয়েশাকে কাঁদতে দেখে একেবারে নির্বাক হ'য়ে যায় দিদার। আয়েশার এ মূর্তি সে তো আর কোন দিন দেখেনি!

ধীরে ধীরে আয়েশার সামনে এসে বসে দিদার। তারপর যেন কাঁদ-কাঁদ গলায় বলে, তুমি এমন করে কাঁদ কেন সয়া, পরাণডা মোর জ্বালা করে যে।

তবুও কোন কথা বলে না আয়েশা। একবার তাকায়ও না। ছল ছল চোখে দূর আকাশের দিকেই সে যেন তাকিয়ে থাকে। মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বাতাসটা কেবল একটা ঘূর্ণি মাথায় নিয়ে তাল গাছটার ওপর দিয়ে বয়ে যায়।

দিদার আবার বলে, তোমারে কানতি দেখলি মোর পরাণডা সত্যি যেন কি রকম করে ওঠে। আর কেঁদ না। একটু থেমে আবার বলে, কি হয়েছে কি, বল দেখি?

না—তবুও কোন কথা নেই আয়েশার মুখে।

অনেকক্ষণ বসে থেকে ধীরে ধীরে উঠে পড়ে দিদার। গামছাটা তুলে কোমরে বাঁধে। তারপর পা তোলে।

হঠাৎ মেঘলা আকাশে যেন বিজলী খেলে যায়। কিন্নরী কণ্ঠে খিল খিল করে হেসে ওঠে আয়েশা। ফিরে তাকায় দিদার। এ হাসির কোন অর্থ খুঁজে পেল না সে। অশ্রু মুছে নিয়ে আয়েশা বলে, তা' পানিডা খেয়েই যাও।

পানী আনতে যাওয়ার সময় হঠাৎ দিদারের পায়ের দিকে নজর পড়ে। তারপর আতঙ্কে শিউরে উঠে বলে আয়েশা, ও খোদা, পাডারে একি করেছো। কি করে কাটল?

ম্লান হাসি ও আনন্দে ঝিলমিলিয়ে উঠল দিদারের। বলল আলুর পিলি দিতে গিয়ে পাসনী কোদালে কেটে গেছে।

ঝপ করে পায়ের কাছে বসে ক্ষতস্থানের আশ পাশ থেকে ধুলো পরিষ্কার করতে করতে ধরাগলায় আয়েশা বলল, একি সব্বোনাশ করেছ এঁ্যা। পাডা যে দুখান হয়ে গেছে।

চোখের পানী তখনো মিলিয়ে যায়নি। নতুন করে আবার দেখা দিল। আবেগে উচ্ছ্বাসে দিদারের পা চেপে ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল আয়েশা। তারপর দ্রুত উঠে চুণ হলদি গরম করতে বসল।

এ কান্নারও কোন অর্থ খুঁজে পেল না দিদার।

## প্রেম ও পরমায়ু

[ Porphyria's Lover—Browning ]

সেদিন সজল সন্ধ্যা
ঝর-ঝর বারিধারা ঝরে অবিরল
প্রমত্ত পবন প্রমথিয়া চলে বন-উপবন
লুণ্ঠিত শিথিল বাহু তরুরাজি
বিকম্পিত সরসী-হৃদয়।
হেন কালে দ্বার খুলে নীরব চরণে
ঘরে এলো মোর্ পরিকিরিয়া
পদপাতে বিবশিয়া হৃদয় শোণিত
থেমে গেল কলকোলাহল
ঝটিকানর্ত্তন আর কুহেলী-কম্পন

রুদ্ধ কক্ষদ্বারে
নতজানু প্রিয়া মোর কৃশানু সকাশে
দানিল প্রথম সেবা
রক্তরশ্মি দীপ্তি লভি নিরালা নিলয়
প্রসন্ন-সহাস মূর্ত্তি।

অনুবাদক—সুকুমারী দাশ

## ছায়াচিত্রিত

চিত্ত দাস

যন্ত্রণায় দাঁড়িয়ে থাক্ বোবার মত রাত্ত—
বাক্যাহত দেয়ালে সেই মুখের ছায়াছবি
সমাদৃত কখনো নয় যতই মুছে যাক
অন্তহীন ছায়ায় পটে, তবুও মেশা সবই।
ডুবেছে দিন স্মৃতির ঘরে আলোক সরণিতে
শিয়রে তার স্তব্ধতার সৌধ জাগে আজো
সেখানে বুঝি বারংবার দগ্ধ চেতনাতে
অশ্রুগাঢ় শ্রাবণে আঁকা মুখের ছবি কারো।
হারায় যদি হারাক দ্বীপ বুকের পারাবারে
ফিরবে না সে মোহের চোখে শিশির-ধোয়া দৃষ্টি
সে বুঝি তার দু'হাতে দেয় দূরের চরাচরে
চৈত্রজাগা প্রহর শুধু: আলোর ভুলে বৃষ্টি।
যদিও চারদেয়ালে বাঁধা, তবুও ফেরা ঘরে
ভুলেই তারি মুগ্ধ ছায়া মুছবে না সে রঙ
দুর্দ্দছেঁড়া সুরের হাত, অগ্নি হাহাকারে
অশ্রুমতী না হয় হোক রজনটী মন।

আনাতোল ফ্রান্স

লুই তখন রাজা, সে সময়ে ফ্রান্সে ছিল এক গরীব ওস্তাদ। দেশে তার কমপিয়েন-এ, নাম বারনাবে। সহরে সহরে স ঘুরে বেড়াত নানা রকম শারীরিক শক্তি আর কৌশল দেখিয়ে।

মেলার দিন জনবহুল স্থানে সে বিছিয়ে দিত একটি পুরোন শতছিন্ন গালিচা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আর সরল লোকদের আকর্ষণ ক'রে বাক্‌চাতুর্যে এটা পেয়েছিল এক বৃদ্ধ ওস্তাদের কাছ থেকে, আর কথাগুলো ব্যবহার করত একেবারে অবিকৃত রেখে, এমন ভাব অবলম্বন করত যা মোটেই স্বাভাবিক নয়; নাকের ওপর বসিয়ে দিত একটি টিনের থালা ভারসাম্য বজায় রেখে—লোকেরা এটা দেখত অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

কিন্তু যখন হাতের ওপর দেহের ভার রেখে, মাথা নীচের দিকে, পা দিয়ে শূন্যে ছুড়ে ছুড়ে ধরত দু'টি সীসের বল—সূর্যের আলো প'ড়ে যে-গুলো উঠত ঝলমল ক'রে, অথবা যখন দেহটি বেঁকিয়ে পা ঠেকিয়ে দিত কাঁধের ওপর অর্থাৎ দেহকে দিত একটি বৃত্তের পূর্ণরূপ আর এই অবস্থায় বারোটি ছুরি পা দিয়ে শূন্যে ছুড়ে দিয়ে ধরত চারদিক থেকে —উঠত প্রশংসার গুঞ্জন আর হ'ত অর্থবৃষ্টি গালিচার ওপর।

কিন্তু তবু, গুণের বিনিময়ে যারা জীবিকা অর্জন করে তাদের মত কমপিয়েনের বারনাবের জীবন নির্বাহে কষ্টের সীমা ছিল না।

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে তার রুটি জোগাড় করত, কিন্তু তবু তার দুঃখ প্রাপ্যের চেয়ে বেশীই ছিল—পিতা আদামের ভুলের জন্য।

তা ছাড়া তার ইচ্ছানুরূপ পরিশ্রমও সে করতে পারত না। কিন্তু তার সুন্দর ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য, গাছের পক্ষে যেমন ফুল ও ফল প্রদানের জন্য সূর্যের উত্তাপ আর দিনের আলোর ছিল প্রয়োজন। শীতে সে ছিল পত্রহীন বৃক্ষ, মৃতপ্রায়। ঠাণ্ডা মাটি হয়ে উঠল তার অসহ্য। ঝিঁঝিঁপোকার মত, যার কথা বর্ণনা করেছেন ফ্রান্সের মেরী, কষ্ট পেতে লাগল ঠাণ্ডা আর ক্ষিধের খারাপ সময়ে। কিন্তু তার হৃদয় ছিল সরল। এ সব কষ্ট সে জীবনে সহ্য করতে লাগল। অর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করে নি। মানুষের অবস্থার বৈষম্যের সম্বন্ধে কিছু ভাবাও ছিল তার বুদ্ধির বাইরে। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—এ-জন্ম যদি হয় খারাপ পরজন্ম ভালো না হয়েই যায় না। এই তাকে ধরে রেখেছিল। ধাপ্পাবাজ, চোর, অসৎদের সে কথনো অনুসরণ করে নি, যারা তাদের আত্মা বিক্রি করেছে অপশক্তির কাছে। দেবতার নামে সে কখনো অপবাদ দেয়নি। জীবন যাপন সে করত সদ্ভাবে। গরমেও তার পানের মাত্রা কখনো ছাড়িয়ে যেত না। সে ছিল ভালোমানুষ, ধর্মভীরু আর পিতৃ-মাতার অত্যন্ত ভক্ত, যখন সে গির্জায় প্রবেশ করত কখনো ভুলত না নতজানু হ'য়ে বসে দেবতার মায়ের মূর্তির সামনে জানাতে এই প্রার্থনা।

জননি, গ্রহণ করো আমার জীবনের ভার—যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার মৃত্যু হয় দেবতার ইচ্ছায়, আর মৃত্যুর পর স্বর্গের আনন্দ যেন আমি পাই।

বৃষ্টির সন্ধ্যায় একা চলেছে সে—বিষণ্ণ ক্ষুব্ধ—হাতের নীচে জীর্ণ গালিচায় জড়ানো তার বল আর ছুরি। খুঁজছে একটু আশ্রয় রাতের মত—অভুক্ত। দেখা হ'ল এক পাদ্রীর সঙ্গে—একই পথে যাচ্ছিল তারা। বারনাবে জানাল তাকে নমস্কার ভদ্রভাবেই। এক সঙ্গে যেতে যেতে তারা কথাবার্তা আরম্ভ করল।

—বন্ধু, তোমার সমস্ত পোষাক সবুজ কেন? এতে কি তোমাকে লোকে একটি রহস্যময় পাগল ব'লে মনে ক'রবে না?

—মোটেই না—পিতা, উত্তর দিল বারনাবে।—যেমন আমাকে দেখছ—আমার নাম বারনাবে—। আমার প্রদেশের আমি ওস্তাদ কসরৎকার। এ প্রদেশ হ'ত জগতের শ্রেষ্ঠ, যদি সবাই এখানে খেতে পেত প্রত্যেক দিন।

—বন্ধু বারনাবে, যা বলছ সে বিষয়ে সচেতন হও—বললে পাদ্রীটি। আশ্রম-প্রদেশের চেয়ে সুন্দরতর প্রদেশ আর কিছু নেই। এখানে করা হয় দেবতার পবিত্রার স্তব আর সাধুদের, আর মঠ-জীবন একটি অনির্বাণ সামগান—পরমদেবতার উদ্দেশে।

বারনাবে উত্তর দিল: পিতা, আমি স্বীকার করছি অত্যন্ত মূর্খের মত কথা ব'লেছি। আপনার প্রদেশের সঙ্গে আমার প্রদেশের কোন তুলনাই হয়; না যদিও একটি লাঠির মাথায় একটি মুদ্রা রেখে সেটা নাকের ওপর বসিয়ে তার ভারসাম্য রক্ষা করায় কৃতিত্ব পাচ্ছে। কিন্তু সে-কৃতিত্ব আপনার ধারে কাছেও যায় না। আপনার মত আমিও চাই প্রত্যহ প্রার্থনা করতে বিশেষ ক'রে মেরীমাতার কাছে; যাঁর ওপর আছে আমার ঐকান্তিক ভক্তি। আমি সানন্দে পরিত্যাগ করব এই বৃত্তি যা আমার পরিচয় বহন করছে সোয়সেঁ থেকে বোভে পর্যন্ত ছ'শ'র ওপর গ্রাম ও নগরে এই মঠের জীবন গ্রহণ করবার জন্য।

ওস্তাদের সরলতা পাদ্রীর হৃদয় স্পর্শ করল। তার বিবেচনা ছিল, দেখলেন তিনি বারনাবের অন্তরে সদিচ্ছা, যাদের সম্বন্ধে বলেছেন

আমাদের রাজরাজ, 'শান্তি হোক পৃথিবীতে তাদের জন্য!'এ-জন্ত তিনি তাকে বললেন: বন্ধু বারনাবে, এসো আমার সঙ্গে, আমি তোমাকে গ্রহণ করব মঠের একজন হিসেবে—সেখানে আমি মঠাধ্যক্ষ। মের'কে যিনি মরুভূমিতে পথ দেখিয়েছিলেন তিনিই আমাকে 'রেখেছেন তোমার পথে—তোমাকে মুক্তির পথে পরিচালিত করবার জন্ত।

এই ভাবে বারনাবে হ'ল একজন পাদ্রী। মঠের সাধুরা, যেখানে তাকে গ্রহণ করা হয়েছিল, মেরীর মহিমা-কীর্তনে প্রতিযোগিতা শুরু করল, তাদের সমস্ত জ্ঞান আর ক্ষমতা—যা ভগবান তাদের দিয়েছিলেন, সেবায় নিযুক্ত করল।

"মঠাধ্যক্ষ, তিনি রচনা করলেন মধ্য-যুগীয় ধর্ম-ভাব-অনুসারে মেরীর মহিমা-সংক্রান্ত পুস্তক।

মরিস সুদক্ষ হাতে রচনা করলেন তার প্রতিলিপি চামড়ার ওপর। আলেকজাণ্ডার করলেন তার ওপর নানা সূক্ষ্ম-কারুকার্য। সেখানে দেখা গেল স্বর্গের রাণী সলোমনের সিংহাসনে সমাসীনা। পায়ের কাছে সজাগ চারটি সিংহ, মাথার জ্যোতি-চক্রের ওপর উড়ন্ত সাতটি পায়রা, পবিত্র আত্মার সাতটি গুণ: ভয়, দয়া, কলা, শক্তি, বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান। তাঁর পাশে স্বর্ণ-কুন্তলা ছ'জন সখি: মানবতা, চাতুর্য, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, পবিত্রতা, আনুগত্য। তাঁর পায়ের কাছে দুটি নিরাবরণ মানব-শিশু—সম্পূর্ণ শুভ্র—করুণাপ্রার্থী। এরা আত্মা—প্রার্থনা করছে তাদের মুক্তির জন্য, নিশ্চয়ই অব্যর্থ ভাবে, সর্বশক্তিময়ের বিধান।

আলেকজাণ্ডার অপর একটি পৃষ্ঠায় এঁকেছেন: মেরীর দৃষ্টিতে ইভ, ভুল আর মুক্তির উপায়, নারী নির্যাতিতা আর মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। এই সুন্দর পুস্তকটিতে আছে আরো: কূপ, উৎস, লিলিফুল, চাঁদ, সূর্য আর ঘেরা বাগান 'কান্তিকে' যার বর্ণনা পাওয়া যায়—স্বর্গের দ্বার আর দেবতাদের নগরী, এখানেই আছে মেরীর প্রতিমূর্তিগুলো।

অত্যন্ত কোমল-হৃদয় মারো মেরীর সন্তানদের একজন। পাথরের ওপর ফুটিয়ে তুলত নানা মূর্তি সারাদিন ধরে—দাড়ি, ভ্রূ আর চুল সব সাদা হয়ে যেত ধূলোয়। চোখ থাকত ফুলো—সর্বদাই জল পড়ত গড়িয়ে। কিন্তু যথেষ্ট বয়েস হলেও শক্তি আর আনন্দের অভাব ছিল না তার। স্পষ্টত: স্বর্গের রাণী তাঁর সন্তানদের বার্দ্ধক্যে রক্ষা করতেন। মারোর রূপ দিয়েছিলেন তাঁর মূর্তির: একটি রথের ওপর উপবেষ্টিতা, কপালে একছড়া মুক্তোর মালা আর বস্ত্রের ভাঁজে সযত্নে ঢেকে দিয়েছিলেন পা-দুটি—যার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টারা ব'লেছেন: ভালোবাসি যাকে আমি সে এক অবরুদ্ধ উদ্যান। কখনো কখনো সে ফুটিয়ে তুলত তাঁর মূর্তি শিশুর সরলতা আর সুন্দর ভঙ্গিমায়—যেন তা' বলছে: রাজা তুমি আমার রাজা।

কবিও ছিল সেই মঠে, যারা রচনা করত লাতিন ভাষায় আনন্দময়ী মেরীর সম্মানার্থ নানারকম শ্লোক। সেখানে ছিল একজন পিকার্—নোত্তরদামের অলৌকিক ঘটনাগুলো অমার্জিত ভাষায় সমিল-কাব্যে প্রকাশ করত।

প্রত্যেকেই যখন ভগবানের উদ্দেশে নিযুক্ত নানা কাজে বা প্রার্থনায়—বারনাবের দুঃখ হ'তে লাগল—তার আছে শুধু অজ্ঞতা আর সরলতা।

ছোট বাগানটিতে যেখানে আর মঠের ছায়া পড়ত না, বেড়াতে বেড়াতে বারনাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলত আর বলত: হতভাগ্য আমি, কেন না অন্যান্য ভাইদের মত মেরীর যথাযোগ্য উপাসনা ক'রবার সামর্থ নেই আমার—মেরী যার প্রতি আমার সমস্ত হৃদয় নিবেদিত হায়, অশিক্ষিত আমি, জানি না উপাসনার বিধি, তাকে ডাকবার জন্ত আমার জানা নেই কোনো প্রার্থনা, কোনো শ্লোক, কোনো মন্ত্র, আমি শিল্পী নই, ভাস্কর নই, ছন্দ ও মিল দিয়ে তোমার উদ্দেশে কাব্য রচনার ক্ষমতাও নেই আমার, আমার কিছু নেই, কিছু নেই, হায়!

এমনি ক'রে সে কাঁদত আর দুঃখ করত। একদিন রাত্রে পাদ্রীরা মিলে গল্প-গুজব করছিল, তাদের একজনের মুখে শুনতে পেল এক সাধুর কথা, যে শুধু মেরীনাম জপ করা ছাড়া আর কিছুই জানত না। তার অজ্ঞতার জন্ত সবাই তাকে উপহাস করত। কিন্তু যখন সে মারা গেল তার মুখ থেকে বেরুল পাঁচটি গোলাপ, মেরী নামের পাঁচটি অক্ষরের সম্মানার্থে। এই ভাবে হ'ল তার মহত্ত্ব প্রকাশিত।

এই গল্প শুনে বারনাবে আরো একবার চমৎকৃত হ'ল। মেরীর করুণা তাকে অভিভূত করল। কিন্তু এই আনন্দময় মৃত্যুর উদাহরণে তার দুঃখের কিছু উপশম হ'ল না। তার হৃদয়ে ছিল আগ্রহ, সে চাইত স্বর্গের মেরীর সেবায় লাগতে।

সে উপায় চিন্তা করতে লাগল কিন্তু কিছুই ভেবে পেল না। যত দিন যায় তার দুঃখও বেড়ে চলে। একদিন সকালে সে জেগে উঠল খুসী হ'য়েই—ছুটে গেল নিজের ছোট্ট ঘরটিতে—রইল সেখানে একা এক ঘণ্টার ওপর। মধ্যাহ্নে আবার ফিরে এলো।

এই সময় থেকে সে প্রত্যেক দিন যেত সেই ঘরটিতে যখন সে থাকত একা—অনেকটা সময় সে কাটাত সেখানে, অন্যান্য পাদ্রীরা যখন তাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজে বা যান্ত্রিক নিয়মে থাকত নিযুক্ত। আর্তি হ'ল তার অবসান—দুঃখের হ'ল শেষ।

এমনি একটি অদ্ভুত চরিত্র সবারই মনে জাগাল কৌতূহল। মঠের প্রত্যেকেই ভাবতে লাগল বারনাবে দল ছাড়া হ'য়ে একা একা করে কি?

মঠাধ্যক্ষ, যার কাজ প্রত্যেকের স্বভাব নিখুঁতভাবে জানা, ঠিক করল বারনাবে কে লক্ষ্য করবে যখন সে থাকে একা।

এক দিন বারনাবে ছিল তার ঘরে একা, যেমন সে থাকে—মঠাধ্যক্ষ এলো দু'জন সঙ্গী নিয়ে, দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে কি হচ্ছে ভেতরে।

তারা দেখল মেরীর মূর্তির সামনে বারনাবে—পা ওপরে, মাথা নীচে ছ'সীসের বল আর বারোটি ছুরি শূন্যে ছুড়ছে আর ধরছে পা দিয়েই। দেবমাতা মেরীর সম্মানার্থে সে করত যে সব খেলা যাতে সে সব চাইতে বেশী প্রশংসা পেয়েছে। বুঝতে না পেরে যে সরল লোকটি তার ক্ষমতা আর জ্ঞান নিযুক্ত করেছে মেরীর সেবায়—চেঁচিয়ে উঠল তারা, ধর্মদ্রোহী!

মঠাধ্যক্ষ জানত যে বারনাবের হৃদয় নির্দোষ; কিন্তু তাকে মনে করল অপ্রকৃতিস্থ। তারা তিন জন তাকে তৎক্ষণাৎ বের ক'রে দিতে এলো—কিন্তু দেখল—নেমে আসছেন মেরী বেদীর ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে—তার সবুজ ওড়না দিয়ে মুছে দিলেন বারনাবের কপালের ঘাম।

মঠাধ্যক্ষ আভূমি-প্রণত হ'লেন—উচ্চারণ করলেন, যারা সরল তারাই সুখী—তাদেরই ঘটবে দেব-দর্শন।

—আমেন! সাধু দু'টি বললে মাটি চুম্বন ক'রে।

অনুবাদক—শ্রীরবি গুপ্ত।

সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্য
গিনি গোল্ড জুয়েলারী স্পেশালিষ্ট
এম, বি, সরকার
এণ্ড সন্স
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
ফোন:-৩৪-১৭৬১ ১৬৭/সি ১৬৭ সি/১ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২ গ্রাম-ব্রিলিয়ান্টস
ব্রাঞ্চ-বালিগঞ্জ-২০০/২/সি রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-১৯ ফোন- ৪৬-৪৪৬৬
শোরুমের পুরাতন ঠিকানা ১২৪,১২৪/১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
কেবলমাত্র রবিবার খোলা থাকে
ব্রাঞ্চ-জামসেদপুর ফোন- জামসেদপুর- সিটি-২৫৫৮এ
B.B.

# হাসিনাবিবি

মঞ্জু দাশগুপ্ত

কার্যোপলক্ষে বাঙ্গালোর যেতে হবে। এর জন্ত দু'দিন আগেও প্রস্তুত ছিলাম না। উচ্চাঙ্গ-সংগীতের একজন প্রচণ্ড ভক্ত আমি। দু'দিন আগে কেনা ত্রিশটাকার সিজন টিকিটটি এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে ভাবতে গিয়ে মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু যেতে হবেই। যথাসময়ে রওনাও দিলাম। বিষণ্ণ বিকেলের মুহূর্তে যখন মাদ্রাজ মেল ছাড়লো। মনে হল মনের ছেঁড়া তারে আর সুরযোজনা করা যাবে না। ট্রেনের বাঁশী বাজলো। এবার যাত্রা হল সুরু। এখন থেকে শুধু ভাবব—যাচ্ছি, যাচ্ছি। পেছনে পড়ে থাকবে দূরের কলকাতা। আমার সাধের গীতের জলসা।

গংগা, কাবেরী, গোদাবরী, কৃষ্ণা পেরিয়ে গিয়েছিলাম মহীশূর পর্য্যন্ত। সেখান থেকে ফিরছি আবার বাঙ্গালোরে। মহীশূর ছাড়িয়ে চলেছি শ্রীরংগপত্তনের পথে। টিপু সুলতানের স্বপ্ন, টিপুর যুদ্ধক্ষেত্র, টিপুর শেষ নিঃশ্বাস জড়িয়ে কাবেরী নদী বেষ্টিত দ্বীপ এই শ্রীরংগপত্তন। দূরে দেখা যাচ্ছে চামুণ্ডেশ্বরী পাহাড়। ওর ওপরে আছে মহীশূর রাজাদের কুলদেবতা শ্রীমা চামুণ্ডেশ্বরী। সমস্ত পাহাড়টা দিনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাতের অন্ধকারে দেখেছিলাম আলোয় ঝলমল রহস্যভরা রূপে।

শ্রীরংগপত্তনের এ পথটি ভারী সুন্দর। একাধারে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক মিলনের প্রতিচ্ছবি যেন তুলে ধরেছে। ভেসে ওঠে চোখের সামনে বীর হায়দার আলি ও তার যোগসূত্র টিপুর সমাধি স্থান। টিপুর গোলাঘর, দরিয়াভবন, দুর্গ সব কিছু ঐ সমাধির মধ্যেই চির-নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। এই সেই শ্রীরংগপত্তন—সিপাহী বিদ্রোহেরও আগে যেখানে এক মহান উত্থান সম্ভাবনা চুরমার হয়ে গেছে। বিদেশী ষড়যন্ত্রের হীনতায়, আপন দেশবাসীর বিশ্বাস-ঘাতকতায়। যত দেখি—ততই মনের পাতায় ইতিহাসকে হাতড়ে চলি—এই মুহূর্তে। ঠিক এই মুহূর্তে শতাব্দী পূর্বের ঘটনাগুলি মূর্ত হতে পারে না? কিন্তু কিছুই যে নেই, নেই, কিছু নেই। শুধু স্মৃতি। একটি অতি সাধারণ প্রস্তরফলক। তাতে লেখা ইংরাজীতে—টিপুর মৃতদেহ এখানে পাওয়া গেছে। মৃত। সত্যিই কি অতীতের সব কিছু মৃত? নতুন করে শ্রীরংগপত্তন কি আবার নব পটভূমিকায় সেজে উঠতে পারে না? আর এক উত্থানের ইতিহাস বহন করে?

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেলাম। কোথা থেকে যেন সুর ভেসে আসছে। অপূর্ব মিষ্টি গলা, নিখুঁত স্বরবিন্যাস। অতি স্পষ্ট উচ্চারণ। কে গায়? কামরার মধ্যে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। না, কেউ নয় তো। তবে কি শ্রীরংগপত্তনের মাটিতে ছন্দপতন ঘটে নি? মৃত শ্রীরংগপত্তন থেকে নির্ঝরিণী সুরধারার হারিয়ে যায় নি? খানিক বাদেই আবিষ্কার করলাম তাকে। জীর্ণ মলিন ছিন্ন বেশ, কিন্তু মুখশ্রী বুদ্ধিদীপ্ত। বসেছিল এক কোণে। জড়সড় হয়ে। গাইছিল মীরার ভজন। আত্মহারা হয়ে ডাকছে—'মীরাকে প্রভু, গিরিধারী নাগর', একটার পর একটা গান সে গেয়ে চলেছে। এমন আত্মবিহ্বল হয়ে এমন পরিস্থিতিতে এমন গান কেউ গাইতে পারে ধারণার বাইরে। কম্পার্টমেন্ট শুদ্ধ যাত্রী বিস্মিত, মুগ্ধ। এ গলা, এমন দরদী সুরেলা স্বর। কি করে অবহেলার জগতের এই মানুষটি পেল?

হঠাৎ ট্রেনটা গতি কমায়। সামনেই ষ্টেশন। মেয়েটির দৃষ্টি পড়ে যাত্রীদের ওপর। গান থামিয়ে দেয় সংগে সংগেই। মাথায় অনেকটা আচল টেনে দেয়। কেমন এক ধরা পড়ে যাওয়া অপরাধীর ভাব। কিন্তু যাত্রীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও এক ঝলক প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ও আত্মপ্রকাশ করল। একে একে অনেক কথা বলল। ওর জীবন। ওর দুঃখের কাহিনী।

হাসিনাবিবি ওর নাম। পাঞ্জাবের এক ছোট গ্রামে ওর জন্ম। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে। ওর বাপজানের ছিল একটি ছোট দোকান। আর রহমানচাচা সামান্য কয়েক বিঘা জমিতে চাষ আবাদ করত ও অবসর সময়ে গান গাইত। জাতিতে ওরা মুসলমান। কিন্তু রহমান গাইত মীরার ভজন। বলত, আরে ভজনের মত গান আছে! এ গানে সব ভগবানকেই ভজন করা যায়, কৃষ্ণও যে আল্লাও তো সেই।

হাসিনা ছিল ওর চাচাজানের সবচেয়ে প্রিয়। সেও যত আবদার করত রহমানেরই কাছে। বলত, তুমি আমায় ভজন শেখাও। শুনে হামিদাবিবি চটে উঠতো, দুদিন বাদে সাদী হবে। গান বাজনা শিখে কি হবে? ঘরের কাজ শেখ। স্ত্রীর কথায় হাসিনার বাপজানও সায় দিতো। শুধু রহমানচাচা বলতো, বেটি, ওদের কথা শুনিস না। তোর এমন মিঠা গলা দিয়ে জগতকে তাক লাগিয়ে দিবি। এমন গলা তুই ছেড়ে দিস না।

সত্যিই একদিন ওর গলা আরও মিষ্টি ছিল। নিজেই নিজের গান শুনে আত্মহারা হয়ে যেত। আর চাচাজানকে বলত, শিখিয়ে দাও। শিখিয়ে দাও। ঠিক মীরা যেমন ভজন গাইত, ঠিক তেমনি ভাবে আমি গাইতে চাই। আমি কিছুই চাই না আর চাচাজান। শুধু গান। শুধু গান।

কিন্তু বয়স বাড়তে চলল। মুসলমান সমাজে বিয়ে না হলে অনেক ফ্যাসাদ। হাসিনা সজল চোখে বলে ওঠে, আমরা অদৃষ্ট নিয়ে জন্মাই। লেখাপড়া শিখিনি তো। কিসমৎ কেবলই আমাদের তাই বঞ্চিত করে। অবাক হয়ে শুনছি ওর কথা।

যথাসময়ে আর পাঁচজন মুসলমান মেয়েদের মত ওরও বিয়ে হয়ে গেল। সাদীর আগে শুনেছিল হাসিনা, ওর ভাবী পতির বিরাট কারবার, ঘরে কোনও অভাব নেই। সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবে। পাড়া প্রতিবেশী শুনে বলে, তোর বরাত ভাল হাসিনা। শুনছি গফুর মিঞা দেখতেও সুন্দর।

শুধু রহিমচাচা আড়ালে ডেকে বলে, তোর মুখ শুকনো কেন বেটি। বল কি হয়েছে।

হাসিনা কেঁদে ফেলে। আচ্ছা চাচাজান! আমি কি টাকা চেয়েছি? আমাকে কি তোমরা অভাবে রেখেছ? তুমি তো জান আমি কি চাই। বল, সত্যি করে বলতো। যেখানে আমার সাদী হবে, তারা আমার গান কেড়ে নেবে না তো?

মনে আছে তার, সেদিন বাপজান কেমন যেন এক বিষণ্ণের হাসি হেসেছিল। তার আদরের হাসিনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, বোকা মেয়ে! তোর গানের দাম দেবে না এমন আহম্মক কেউ আছে না কি দুনিয়ায়?

হাসিনার বিয়ে হয়ে গেল। দৈর্ঘ্যে ছ' ফুটেরও বেশী বলবান গফুর মিঞার পাশে হাসিনার নিজেকে যেন বড় অসহায় মনে হচ্ছিল। যাবার সময়—এবাড়ীর সংগে সকল দাবী চুকিয়ে দেবার মুহূর্তে হাসিনা কেঁদে ওঠে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। রহিমচাচা কাঁদে, কাঁদে আব্বাজান, কাঁদে আম্মা। কাঁদতে কাঁদতে চাচাজান বলে গফুর মিঞাকে, আমাদের এ বেটির গলা ভারী মিঠা। ও গাইতে বড় ভালবাসে। তুমিই ওর কদর বুঝবে।

গফুর মিঞা হাসিনাবিবির পতি, ওর ইজ্জৎ, ওর সম্মান, ওর ভবিষ্যৎ, স্বপ্ন সব-কিছু। তার ঘরে এসে দেখলো সেখানে অনেক লোক। মিঞাসাহেবের আত্মীয়জন। প্রথম গ্রহণে কোনও ত্রুটি দেখলো না হাসিনা। কিন্তু ক'দিন যেতেই সে বুঝলো এখানকার আদবকায়দা ওর বাপের ঘর থেকে একেবারেই আলাদা। এখানকার জগত আর একরকম। এরা কথা বলে বেশী, বলায়ও বেশী। জীবনের স্থূলতাই যেন এদের সবখানি। বোঝে কারবার, অর্থ প্রতিপত্তি। বোঝে রঙীন চমকদার শাড়ী, বেনারসী জর্দা, মেহেদী রংএ রঙীন জীবন। এর বাইরে মানুষের যে ভাবনার জগত থাকতে পারে এখানকার মানুষ কল্পনা করতে অক্ষম। সে অক্ষমতা শুধু এদেরই না, তার পতি, তার স্বপ্ন, তার ইজ্জৎ গফুর মিঞার মাঝেও হাসিনা সেই ভয়ঙ্কর সত্যকেই দেখে। তবে কি ভাবের ঘরে সে সর্বস্বান্ত হতে চলেছে?

একদিন ঠাট্টা করে মিঞাসাহেব বলেছিল—কি বিবি! তুমি না কি গান গাইতে পার? কই শুনলাম না তো!

কিন্তু এটা যে ঠাট্টা, প্রথমে সে বোঝে নি।

সাগ্রহে বলেছিল শুনবে? শুনবে তুমি আমার গান? তুমি বললেই আমি গাইব।

গফুর হেসে উঠেছিল। সশব্দে। প্রকাণ্ড এক তামাসা শুনছে যেন। পাগল! ঘরের জেনানারা নাচ-গান করবে এটা কি ভালো ওতে স্বভাব খারাপ হয়।

শেষ রায় দিয়ে গেল হাসিনার ভাগ্যনিয়ন্তা—তার পতি, তার স্বপ্ন, আশাভরসার একমাত্র মানুষ। এত বড় অমিল! এতখানি প্রভেদ! তবু ভালবেসেছিল, সত্যিই ভালবেসেছিল সে গফুর মিঞাকে। এমন এক জোয়ান মানুষকে আশ্রয় করে ভালবাসার স্বপ্ন সে সত্যিই দেখেছিল। তবে কি সব মিথ্যে হয়ে যাবে? মরিয়া হয়ে সে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—বল। আমাকে। একবার বল, তুমি সেদিন তামাসা করেছ। ওটা তোমার মনের কথা নয়। একবার বল, তুমি গান শুনবে, আমার গান শুনবে?

কিন্তু হায়! হাসিনার ভাবের ঘরে সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে। তার চাচাজানের সাধ চিরদিনের মত চুরমার হয়ে গেছে। আর স্বর উঠবে না। আর সে গাইবে না। ডাকবে না তার গিরিধারী গোপালকে। যার কথা বলতে বলতে রহমান চাচা বলত, বুঝলি বেটি! ভজনের মত গান হয় না। এ গানে আল্লাও সাড়া দেবে। আর যে গান শুনতে শুনতে তার চাচাজানের গুরু শিবদাসবাবাজী বলতেন, ভজনই তুমি গাইবে বেটি। তোমার গান শুনতে শুনতে মনে হয় এ দুনিয়ায় আবার মীরা এসেছে। তাই আবার জন্ম নেবে মানুষের ভগবান। ভক্তের ডাকে নেমে আসবে স্বর্গ থেকে।

এর পরের ঘটনাগুলি এল দুঃস্বপ্নের মত। ধর্মের কুৎসিত বিবাদ নিয়ে গড়া দাংগা! দাবানল জ্বলে উঠলো সারা পাঞ্জাবে। গফুর মিঞাদের গ্রামেও। স্বামী সংসার সব নিয়ে তারা পালিয়ে এল দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মহীশূরের এক গ্রামে। কোথায় কেমনভাবে হাসিনার চাচাজান, আব্বাজান ভাইবোনেরা আছে, কোনও খবরই পাবার উপায় নেই। পাগলের মত হয়ে উঠেছে হাসিনা। এমন দুর্ভাগ্য নেমে এল কেন তার ওপর? সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, ভজন ছেড়েছি। খোদা তুমি তাই কি আমায় আজ এ শাস্তি দিচ্ছ? এল আরও ভয়াবহ দুঃখের রাত। ভুলবে না কোনও দিন। সে রাত ভুলবে না হাসিনা বিবি। শুনলো ধর্মের কুৎসিত ভেদনীতি তার আদরের চাচাজানের ঘরের সবাইকে মৃত্যুর পরপারে ঠেলে দিয়েছে। চাচাজান নেই, আব্বাজান নেই, আম্মা নেই। নেই কিছু নেই। তার খোদা, তার গিরিধারী গোপালও তাকে ছেড়ে চলে গেছে। তার জীবন আজ শূন্য। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো।

সেই দুর্যোগভরা দিনগুলিতে গফুর মিঞাকে সে আঁকড়ে ধরেছিল, স্রোতের মুখে ভেসে-যাওয়া কুটোর মত। মিঞাসাহেব বলে, কি করবে হাসিনা! এ অদৃষ্টের হাত। খোদার ইচ্ছা। এর ওপর আমাদের হাত নেই। শান্ত হও।

স্বামীর পা জড়িয়ে সে কেঁদে উঠেছিল, তুমিই আমার সব দুঃখ দূর করে দাও। তুমি আমার ইজ্জৎ, আমার স্বপ্ন, আমার আশ্রয়। একমাত্র ভরসা, ভালবাসার মানুষ। তোমার মত করে তোল আমাকে। তোমার কাছে—খুব কাছে আমাকে টেনে নাও।

গফুর মিঞা সব বোঝে। বোঝে না শুধু হাসিনা বিবির মুখের এ কথাগুলি। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে। বিরক্ত হয়ে পড়ে। এ ধরণের কথা এমন ভাবে এ পরিবারের কেউ

শুনতে কখনও অভ্যস্ত নয়! মনে হয়, এ সব যেন সংসারের সহজ কথাবার্ত্তা নয়, এ যেন গল্পের মানুষগুলির কথার মত।

হাসিনাবিবি আবার হাসে। চোখের জল মুছে ফেলে। সহজ—আগের থেকে আরও অনেক সহজ ভাবে কথা বলে। রঙীন শাড়ী পরে হাসে, মেহেদী রঙে রঙীন হবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, বেনারসী জর্দার ফরমাইস দেয়। আগের চেয়ে অনেক বেশী কথা বলে, পরনিন্দা পরচর্চ্চাতেও ঠিক এখানকার মানুষের মত যোগ দেয়। অবাক কাণ্ড! গফুর মিঞা তবু খুসীই হয়। উপহারের মাত্রা সে বাড়িয়ে দেয়। আজ জরিবসানো কাঁচুলী। কাল রঙীন রকমারি বেলোয়ারি চুড়ি বা জামদানী আসমান রংএর শেরওয়ানী।

হাসিনাবিবি হাসে। মনে মনে বলে, এসব কি চেয়েছিলাম? মুখে বলে বেশ হয়েছে। তুমি খুসী, তাতেই আমার সুখ। এর বেশী আমি চাই না গো। চাই না।

গফুর মিঞা বুঝলো কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়, এ আবার কি ধরণের কথা? তোমার জন্য এনেছি—তোমার পছন্দ কি না তাই বলবে। তা না যত সব ঢংএর কথা। একদম বরদাস্ত করতে পারি না।

হাসিনাবিবি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কেন—কেন সে পারছে না মিশিয়ে দিতে? তার স্বামীকে সম্পূর্ণ খুসী করতে? তবে কি মীরার মত তাকেও দিওয়ানা হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে? মনে পড়ে রহমান চাচার কথা। বলেছিল বেটি। তোর গলা আল্লার দান। তুই ওকে নষ্ট যদি করিস তবে জানবি এর চেয়ে বড় পাপ আর কিছুতে নেই। পাপ! সত্যিই কি সে দিনের পর দিন পাপ করে যাচ্ছে? স্বামীকে ভালবাসতে গিয়ে সে কি আল্লার অভিশাপই কুড়োচ্ছে?

একদিন সে গফুরকে বলে, দেখ আমার বড় ভয় করে মাঝে মাঝে। মনে হয় খোদা যেন ওপর থেকে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। তুমি বল তো আমি কি কোনও পাপ করেছি?

মাঝে মাঝে বড় আবোল-তাবোল বকো হাসিনা! কেন বল তো? তোমাকে কি আমি ভালবাসি না? তুমি যা চাও আমি কি দিই নি? বল? সোহাগ মিশিয়েই কথাগুলি বলে যায় গফুর।

না না। একথা বল না। ভালবেসেছ, অনেক দিয়েছ। আমার মত দুর্ভাগিনীকে তুমি পায়ে রেখেছ। তবু আজ একটা ভিক্ষে চাইছি। দেবে? বল দেবে?

তোমাকে আমার অদেয় কিছু নেই। ভিক্ষে চাইছ কেন? গফুর মিঞাকে আজ বড় ভাল লাগছে তার। মনে হচ্ছে এমন স্বামী খোদারই আশীর্বাদে সে পেয়েছে। আজকের রাত সে নিষ্ফল হতে দেবে না।

আদরে আদরে যখন তাকে অস্থির করে তুলেছিল মিঞাসাহেব, হাসিনাবিবি খুব আস্তে আস্তে বলল, শুনবে? একটা গান?

চমকে ওঠে গফুর। হঠাৎ এত দিন বাদে এ কথা কেন?

জান আজ ক'দিন থেকেই চাচাজানের কথা মনে পড়ছে। তিনি বলতেন আমার গলা আল্লার দান। একে নষ্ট করলে পাপ হবে।

গফুর এক মুহূর্ত্তে বদলে গেল। কেমন যেন বীভৎস রূপান্তর চোখ-মুখে তার, হাসিনা দেখলো। পাপ হবে! তা কি করতে চাও? বাজারে গান করবে? ইজ্জৎ-এর কথা ভুলে?

হাসিনা তবু ভয়ে ভয়ে বলেছিল, গাইব তো মীরার ভজন! রোজ তোমার এই ঘরটিতে বসে, তোমার পাশে। এতেও ইজ্জৎ যাবে?

মুসলমানী হয়ে তোমার হিন্দুদের ভজন গাইতে লজ্জা করবে না? এরকম বেইজ্জতি বেসরমী কাজ আমার ঘরে চলবে না। স্পষ্ট বলে রাখছি।

গফুরের উগ্র কথায় কেঁদেছিল হাসিনা। জড়িয়ে ধরেছিল তার পা দুটি। রাত শেষে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে ক্ষমা কর। আমার কেউ নেই। আছ তুমি। আমার অন্ধকারের একমাত্র তুমিই রোশনাই। আমি ভাল বুঝি না, মন্দ বুঝি না। তোমার মত আমাকে তৈরী করে নাও।

এ কথায় মিঞাসাহেবের মন কতখানি ভিজেছিল সে জানে না। কিন্তু দুদিন বাদে যখন সে শুনলো তার স্বামী আবার সাদী করতে চলেছে, তখন হাসিনা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এক বিবি থাকতে তুমি ফের সাদী করবে? এতে তোমার ইজ্জৎ যাবে না?

মিঞা গোঁফে একটু মোচড় দিতে দিতে হেসে বলেছিল, মুসলমানের ঘরে বেশী বিবিতে দোষ নেই।

দোষ নেই! এ জগতে আর সকলে ভুলতে পারে এ কথায়। হাসিনাবিবি নয়। সে অন্য ধাতুতে গড়া। তার চাচা রহমানের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। ভালমন্দকে সে মানুষ বিশেষে কেমন করে আলাদা করে দেখবে?

ঘরের জেনানারা গান গাইলে ইজ্জত যায়। আর জেনানার অসম্মান করে আর এক জেনানাকে সাদী করলে বেসরমী কাজ হয় না? এ কেমন নিয়ম? এ নিয়ম সে মানবে না। সে ছাড়বে। এজন্য সে সব-কিছু ছাড়বে। তার ঘর, তার স্বামী, তার জীবনের সম্ভাবনা, সব কিছু। এবার সে সত্যিই দিওয়ানা হয়ে যাবে।

ঘর ছাড়লো সেই রাতেই। যেদিন গফুর মিঞার দ্বিতীয় সাদীর তারিখ। কিন্তু কোথায় সে যাবে? এই শ্রীরংগপত্তনের পথে সে দিশেহারা হয়ে যায়। টিপুর গড়া মসজিদে গিয়ে বসে। বলে খোদা! আজ আমায় ঘরছাড়া করেছ। এবার তুমি ছাড়া আমায় দেখবে কে? চামুণ্ডেশ্বরী পাহাড়ের মাথায় উঠে শক্তিরূপিণী মাতৃমূর্ত্তিকে প্রার্থনা জানায়, শক্তি দাও। আমায় শক্তি দাও। তুমি তো জগজ্জননী। সকলের মা। আমায় পথ দেখাও। পথ দেখাও।

দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে গেল তার সেই গ্রামে। সুদূর পাঞ্জাবে বাবাজানদের ঘরে। কিন্তু ঘর কোথায়? সব যে পুড়ে ছারখা[র] হয়ে গেছে! কেউ নেই—তার স্বপ্নেভরা সেদিনের সেই গ্রা[ম] চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। সেখানে চেনা-জানা কারুর দে[খা] পেল না। নতুন নতুন মুখ। হতাশ হয়ে যখন ফিরছে তখন দে[খা] পেল শিবদাস বাবাজীর। রহমান চাচার গুরু। হাতে তার সে[ই] চিরপরিচিত তারের যন্ত্রটি। মুখে সেই ভজন। মীরার ভজন।

রহিমচাচাকে স্মরণ করে দুজনেই খুব কাঁদলো খানিকক্ষ[ণ]

তার পর চলে এল সেখান থেকে শ্রীরংগপত্তনে। এবার আর একা নয়। সংগে শিবদাসবাবাজী। হাসিনা বলেছিল, সে কিছুতেই হবে না। আমার সংগে তোমাকে যেতে হবেই। বাপ-বেটিতে এবার ভজন গাইব। দু-চার পয়সা যা পাব, তাতেই চলে যাবে আমাদের।

জিজ্ঞাসা করলাম, এত দূরে এসেছ কেন? শিবদাসবাবাজী যেখানে ছিল, সেখানেই তো থাকতে পারতে?

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো—ভুলে যেতে যাই—তবু এ পোড়ানসীবে ভুলতে পারি না তাকে কিছুতেই। স্বামীকে ভোলা মেয়েদের কাছে যে কত শক্ত, নিজেকে দিয়েই তা বুঝি। পাশের গ্রামেই থাকে। ভাবি হয়তো কখনও কখনও দেখা হবে।

দেখা হয়েছে কখনও?

মিথ্যে বলব না—হয়েছে বৈ কি দু'-একদিন। আমাকে ঘরে যেতেও বলেছিল। বলেছিল আমি তার প্রথম বিবি। ঘরের কর্ত্রীত্ব আমাকেই সে দেবে। কিন্তু আমার ইজ্জৎ? আমি তা হারাব কেন? সতীনের ঘর করা যে বেসরমী কাজ। আজ চাচাজান ইহলোকে নেই। কিন্তু স্বর্গ থেকে আমাকে ঠিকই আশীর্বাদ করছেন।

আসল কথাটি জানো? আমার কিসমৎ ভারী খারাপ। এক মুসাফির আমার ছেলেবেলায় কপাল দেখে বলেছিল এ কথা। কিন্তু চাচা বলত—আমি আমার গান দিয়ে কিসমৎ জয় করব। জানি না, কি আমার নসীবে আছে। ধন চাই না, দৌলত চাই না, রাজা হবার স্বপ্ন দেখি না। শুধু আল্লাকে বলি—আমার ইজ্জৎ যদি কোনোও দিন হারাই তো মীরার ভজন যেন আমাকে চিরকালের মত ছেড়ে যায়। আমি যেন পাথর হয়ে যাই। হাসিনাবিবি কাঁদে, বহুদিনের বহুপ্রায় অশ্রু অঝোরধারে নেমে আসে। মনটা ভারী হয়ে ওঠে আমাদের।

মাদ্রাজ ষ্টেশন থেকে ট্রেণ ধরলাম। ফিরছি কলকাতায়। সেখানে পৌঁছে হয়তো আর কোনও সংগীতাসর উপভোগ করার সুযোগ পাব। কিন্তু সেজন্য এতটুকু আশা বা কাতরতা বোধ করলাম না। বারে বারেই মনে পড়তে লাগল হাসিনাবিবিকে, শ্রীরংগপত্তনকে আর সবার উপর হাসিনাবিবির অপূর্ব সুরেলা নিখুঁত কণ্ঠস্বরকে। আর সেই সংগে একটা প্রশ্ন মনে এল।

সত্যিই কি এ দুনিয়াটা কিসমৎ-এরই খেলা? অদৃষ্টের পরিণাম? এ জায়গায় অদৃষ্ট রাজা করে, অদৃষ্টই রাজাকে পথের ধুলায় নামিয়ে দেয়। ভাগ্যেই টিপুর উত্থান সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল, আবার ভাগ্যের ফেরেই শ্রীরংগপত্তনের সব গৌরব একটি প্রস্তরফলকের মাঝে নষ্ট হয়ে গেল! আর এই কিসমতের ফেরেই হাসিনাবিবির মত প্রতিভাবতীরা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো তাই। কিসমৎই এ দুনিয়ার সব!

তবু বলব। অবহেলার জগতের সেই হাসিনাবিবি, আত্ম-প্রতিষ্ঠার ঘরে প্রবেশের ছাড়পত্র যে কোনও দিন পেল না, সেই আমাকে শ্রীতের জলসার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান শোনার ভাগ্য এনে দিয়েছিল। শ্রীরংগপত্তনের পথে, বাঙ্গালোরগামী ট্রেণের কম্পার্টমেন্টে। কোনও দাম দিয়েই যা পেতে হয়নি।



# তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও

শ্রীমতী শান্তি সেন

আদিনাথ হে শিবশঙ্কর
নীলকণ্ঠ তুমি চন্দ্রচূড়।
অল্পে তুষ্ট তুমি আশুতোষ
দীনতম অর্ঘ্যে তব সন্তোষ
প্রণমি তোমারে গঙ্গাধর!

শরণ লইনু চরণতলে
ভকতি ভিখারী নয়নজলে
সকল গ্লানি মুক্ত কর।

ভস্ম-বিভূষণ ত্রিলোচন
অহিভূষণে তনু বিমোহন
মৃত্যুঞ্জয় তুমি মহেশ্বর!

পতিনিন্দায় সতী দেহ ত্যজে
রুদ্ররূপে তাই ভোলানাথ সাজে
সম্বর ঐ রূপ প্রলয়ঙ্কর।

তব নয়নের রোষাগুনে
পঞ্চশরের মৃত্যু আনে
তবু বিশ্বেশ্বর ক্ষমাসুন্দর।

অশিবের মাঝে তোমারে চাই
আঘাতেও যেন পরশ পাই
বসুন্ধরার তুমি বেদনা হর।

নিখিল এ বিশ্বের পরিত্রাতা
কলুষ বিনাশন মুক্তিদাতা
জাগো, তব যোগনিদ্রা ছাড়।

অনাদি অতীতের মহাকাল
ছিন্ন করি এক জটাজাল
নব জীবনের সৃষ্টি কর।

'অমৃতের পুত্র' এ দেববাণী
অন্তরে অন্তরে দাও আনি
ধরণীর দীনতা চূর্ণ কর।

পঞ্চাননের প্রসন্ন হাসি
দিকে দিকে উঠুক বিভাসি
যাত্রাপথ হোক সত্যে সুন্দর।

# ভাবি এক, হয় আর

দিলীপকুমার রায়

## জর্মণি

### চব্বিশ

পরদিন সকালে পল্লব ঠিক ন'টার সময় ফ্রাউ ক্রামারের কাছে হাজির। সেদিন আইরিনের সঙ্গে ওর ইতালিয়ান পড়ার পালা। পল্লবের কান পড়ে থাকে সিঁড়িতে পদশব্দের দিকে। ফ্রাউ ক্রামার ইতালিয়ানে যথাবিধি দু'-একটা প্রশ্ন করলেন, কিন্তু পল্লবের উত্তর দিতে ক্রমাগতই বেধে বেধে যায়। ফ্রাউ ক্রামার কথাবার্তা রেখে একটি ইতালিয়ান কবিতার বই বার করে বললেন: আজ নীরস কথাবার্তা ছেড়ে একটু কাব্যচর্চা করা যাক্—কেমন? এখন তো তুমি অনেকটা শিখেছ—না না, ভয় নেই, কঠিন কবিতা নয়—খুব সরল কবিতাই ধরব, সরল অথচ সুন্দর—ঠিক যেমন কবিতা তুমি চাও, কেমন?

ব'লে রেনাতো ফুচিনির একটি কবিতা ধরলেন ওর সামনে: "Oggi Ieggiamo insieme una bella poesia italiana."১

পল্লব পড়ে মৃদু স্বরে:

"Dicea la primavera : Io porto amore
e ghirlande de fiori et di speranza."

ব'লে খুশি হ'য়ে ফ্রাউ ক্রামারের মুখের দিকে চায়: বুঝতে পেরেছি।

কি বুঝলে, বলো তো? ফ্রাউ ক্রামারের চোখে কৌতুকের আভা।

পল্লব সুকণ্ঠে বলে: এর মানে: বসন্ত ঋতু বলল: আমি আনি প্রেম আর ফুলের মালা আর...speranza মানে আশা না?—তাহ'লে আশার মালা।

ফ্রাউ ক্রামার হেসে বললেন: পাশ। কিন্তু কবি ইতালিয়ান হ'য়েও ভারতীয় বসন্তের মনের কথা কেমন ধরেছেন বলো তো?

পল্লব লাল হ'য়ে ওঠে: যান, আপনি ভা—রি...

ফ্রাউ ক্রামার পাদপূরণ করলেন: না, দুষ্টু নয়—দরদী। ব'লেই পাশের ঘরে গিয়ে এক পেয়ালা চকোলেট আর একটি সুন্দর কেক এনে ধরলেন ওর সামনে: আজ ইতালিয়ান পড়া থাক, তুমি সানন্দে খাও আর খেতে খেতে ফরাসিতেই বলো—যা মন চায়। আজ আমি বক্তা নই—শুধু শ্রোতা।

পল্লব চকোলেটের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বলে: "Mille grazie."২

ফ্রাউ ক্রামার তর্জনী তুলে শাসিয়ে: না, বলিনি আজ পড়া নয়—ছুটি? causons en francais.৩

পল্লব হেসে ফরাসিতে বলে: কি বলিয়ে নিতে চাচ্ছেন, বলুন তো?

পরশু আইরিনের সঙ্গে অপেরা কেমন লাগল। ব'লেই হেসে: না না—ভয় নেই, আমি তো তোমার বান্ধবী নই ভাই, যে মনের কথা শোনাবে। আমাকে বলো—যা সবাইকে বলা যায়।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: না, ফ্রাউ ক্রামার। আপনাকে এমন কথাও বলতে পারি, যা সবাইকে বলা চলে না—তবে কিনা আগে একটু অভয় দিতে হবে।

ফ্রাউ ক্রামার হেসে বললেন: সে-অভয় নাতাশা দিয়ে গেছে—আজই সকালে।

পল্লব চমকে ওঠে: নাতাশা?

হ্যাঁ। কিন্তু মুখ অমন ফ্যাকাশে না করলেও চলবে। সে তোমার গুণগানই করেছে, দোষ ধরেনি একটিও: তুমি কি ভদ্র অথচ ভাবুক, প্রতিভাবান অথচ সংযমী—এই ধরণের তারিফ। শেষে বলল—আইরিনের সঙ্গে তোমারই ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় ওরা সবাই কি রকম খুশি হয়েছে—এ ছাড়া বলে ফিক করে হেসে—আইরিনের পছন্দকেও ওরা দোষ দেয়নি একটিবারও—বিশ্বাস কোরো।

পল্লব অপ্রতিভ মুখে হেসে বলে: এতটা র'টে গেছে?

ফ্রাউ ক্রামারও হাসলেন: সেই জন্যেই না কবির—মানে বসন্তের বাণী তোমাকে শুনিয়ে দিলাম: যে, তিনি যখন আসেন তখন মনের মালী আশার ফুল দিয়ে গাঁথে প্রেমের মালা। এইই হয়ে এসেছে ভাই—আবহমান কাল।

কিন্তু মালা ছিঁড়েও তো গেছে কতবারই?

সেটা হ'ল 'না'-র দিক।

কি 'না' কি নেই?

আছে, অথচ থেকেও নেই—কেন না খতিয়ে 'হাঁ'-ই জেতে।

পল্লব একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: কিন্তু শুনতে পাই—বসন্ত দুদিনের?

সে মিথ্যে বসন্ত—যার কারবার ক্ষণিকের ফুল নিয়ে।

সত্যি বসন্ত কি আছে এ জগতে? মানে অঝরা ফুল?

বাইরে নেই। তবে সে ফোটে আমাদের অন্তরের বাগানে—মানে, যদি তাকে চাইবার মতন করে চাইতে পারি। কাব্যের ভাষা ছেড়ে গদ্যের কোঠায় এলে বলা যায়—প্রেমই অঝরা ফুল।

কিন্তু যাকে প্রেম ব'লে মানুষ মনে করে, যদি সে প্রেম না হয়?

ফ্রাউ ক্রামার একটু হাসলেন যেন আনমনা হাসি, পরে বললেন: এ হল সংশয়ীর কথা। অর্থাৎ যাকে প্রেম বলছি সে যদি মোহ হয়—এই না? কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কি ধরে নেওয়া হচ্ছে না যে বেঠিক প্রেম মোহ হতে পারে কিন্তু ঠিক প্রেম মোহ নয়? বলে একটু থেমে: তবে একথা মানি যে, বিশ্বাস করতে রাজি নয় প্রথম থেকেই তাকে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়। কারণ বিশ্বাস মানেই আগে থেকে ধরে নেওয়া। তাই বলা চলে যে জগতে জগতে দু শ্রেণীর মানুষ আছে: স্বভাবে বিশ্বাসী, আর স্বভাবে অবিশ্বাসী। গেটে বলেছিলেন: Ich bleibe beim gla bigen orden৪ আমি গেটের দলে—বিশেষ করে প্রেমের ক্ষেত্রে

পল্লব একটু চুপ করে থেকে বলল: শুনতে ভালো লাগে বৈ কি কিন্তু ভুলও তো হয় বিশ্বাসের পথে চলতে গিয়ে?

ফ্রাউ ক্রামার বললেন: হয় তো বটেই। কিন্তু ভাই, মুশকিল এই যে, ভুলের নামেই যে ভয়িয়ে ওঠে সে কোনো দিনও নির্ভুলের সন্ধান পায় না। বলে একটু থেমে মৃদু হেসে; একটা উপমা মনে আসছে। কালচার করা মুক্তা জানো তো?

---

১। আজ দুজনে একটি সুন্দর ইতালিয়ান কবিতা পড়ি এসো।

২। ইতালিয়ান ভাষায়—সহস্র ধন্যবাদ।

৩। ফরাসিতেই কথা বলি এসো।

৪। আমি বিশ্বাসীদের দলেই নাম লেখাতে চাই।

জানি। মিতার কল্যাণে—বিশেষ ক'রে।

দেখে কী মনে হয়েছিল ?

কী মনে হয়েছিল ? বাঃ—মুক্তো ছাড়া আর কী ?

ঠিক্। সংসারে সাড়ে পনর আনা লোকই এই রায় দেবে। মানে—মেকিকে দেবে সাঁচ্চার পদবী। কিন্তু জহুরী এক আঁচড়ে ব'লে দেবে কোন্‌টা সাঁচ্চা আর কোনটা মেকি।

পল্লব করুণ ভাবে মাথা নাড়ে: উপমাটি শুনতে চমৎকার ফ্রাউ ক্রামার, কেবল যে প্রেমে পড়েছে তার কোন কাজে আসে না। কেন—বলি। অনেক জহর যাচাই করতে করতে তবে যাচনদার জহুরী হ'য়ে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রেমের সঙ্গে যার প্রথম পরিচয় প্রেমকে যাচাই করবার তাগিদই যে সে বোধ করবে না। এমন কি পাকা জহুরীরা যদি বলেন এ প্রেম সাঁচ্চা নয়—মেকি, তা হ'লেও সে তার নিজের কাঁচা অভিজ্ঞতাকেই চরম ব'লে মেনে নেবে। চুষিকাঠি চুষে যে-শিশু আনন্দে অধীর, তাকে দেখে প্রবীণরা কৃপার হাসি হাসতে পারেন, কিন্তু তাতে ক'রে শিশুর মনে হয় কি একবারও যে এ-চুষিকাঠি মাতৃস্তন নয় ?

ফ্রাউ ক্রামার হেসে বললেন: কিন্তু ভাই, এ-ও তো পাল্টা উপমা। খৃষ্ট বলেছিলেন: ভূত দিয়ে ভূত ছাড়ানো যায় না। কিন্তু তুমি যা বলছ তার মর্ম আমি জানি ঠেকে শিখে। বলি শোনো, যখন কথাটা ওঠালেই।

চকোলেটের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ফ্রাউ ক্রামার বললেন: এ-জরাজীর্ণা যখন তোমার আইরিণের মতনই তরুণী ছিল—ও বোধ হয় রূপেও তার চেয়ে কম ছিল না—তখন একটি ইহুদি যুবককে সে ভালোবেসেছিল। সে সময়ে আমার মনে হ'ত বৈ কি যে আমি যে-রকম ভালোবেসেছি সে-রকম ভালোবাসা কেউ কাউকে বাসে নি। মনে হ'ত পথে আমার বুক পেতে দিতে পারি ডেভিডের পায়ে কাঁটা-কোটা ঠেকাতে। কিন্তু সেই ডেভিড আমাকে পেতে-না-পেতে মদ জুয়া ও স্বৈরিণী নিয়ে মেতে উঠল। হয়ত বাঁচতাম না, কিন্তু বাঁচাল একজন—সে অনেক কথা, বলতে গেলে রাত্রি সকালেও কুলোবে না। কিন্তু তার পর কী হ'ল শোনো। নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে যে আমাকে বাঁচালো সে আমার প্রেমে পড়ল। এই মানুষটিই এবেরার ক্রামার।

আপনার স্বামী ?

হ্যাঁ। কিন্তু কেমন ক'রে তাকে ভালোবাসতাম শোনো। সংক্ষেপেই বলব—ভয় নেই।

না না—সংক্ষেপ কেন ?

ফ্রাউ ক্রামার হেসে বললেন: কারণ ফেনিয়ে বলতে গেলে সে-ফেনাই বড় হয়ে উঠবে—আসল কথাটা চাপা প'ড়ে যাবে।

ব'লে চকোলেটের পেয়ালাটিতে ফের চুমুক দিয়ে ফ্রাউ ক্রামার ব'লে চললেন: এবেরার ছিল একটু অদ্ভুত মানুষ। আমাকে তার সঙ্গ দিত সাগ্রহে—আমার জন্যে কত যে ভাবত ব'লে শেষ করতে পারব না—বলতে কি, সে পাশে না দাঁড়ালে হয়ত আমি বাঁচতাম না কারণ এক কালব্যাধি আমাকে আক্রমণ করেছিল—যক্ষ্মা।

যক্ষ্মা ?

হ্যাঁ। কিন্তু সে এ দারুণ ছোঁয়াচে রোগকেও ভয় করে নি একদিনের জন্যেও। সানাটোরিয়ামে তিন বৎসর সব কাজ ছেড়ে আমার পাশে একটি কুটীর নিয়ে রইল। অথচ একদিনও মুখ ফুটে বলে নি আমাকে ভালবাসে—উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা তো দূরের কথা।

তিন বৎসর বাদে যখন আমি সেরে উঠলাম তখন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে ডেভিডের স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে গেছে, আর সে শূন্য স্থান পূর্ণ ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে এই লাজুক, স্বল্পভাষী সুহৃদ। কিন্তু আমি তাকে বিবাহ করতে চাইলাম না, বললাম: যক্ষ্মা সারে না। কখন আবার পড়ব কে জানে ? তুমি কোনো স্বাস্থ্যবতীকে বিয়ে করো। তোমার সবই আছে—স্বাস্থ্য, যৌবন, আদর্শ, সম্পত্তি —তুমি কেন এক রুগ্নার দুর্ভর ভার বইবে সারাজীবন ? এবেরার মৃদু হেসে বলল: তোমার ভার আমার কাছে ভগবানের বরদান, আর তোমার সহযাত্রী হবার চেয়ে বড় আদর্শ কাকে বলে—আজো আমার অজানা।'

আমি রাজী হলাম না, এক গভর্ণেসের কাজ নিয়ে চলে গেলাম পোলাণ্ডে—ওয়ার্স'য়। তখন বাধ্য হ'য়ে এবেরার গেল আমেরিকায়। সেখানে প্রচুর টাকা করে ফিরে এল সোজা পোলাণ্ডে। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে একটি মার্কিন সুন্দরীর প্রতিও আকৃষ্ট হয়, কিন্তু তাকে বিবাহ করবার মনে ঠাঁই দিতে পারে নি। ঠিক এই সময়ে সে-মেয়েটির বাপের অসুখ হয় ব্রেজিলে। সে চলে যায় সেখানে। তারপরে সে অনেক কাণ্ড—প্রায় নাটুকে কাণ্ডই বলব—সব বলার দরকার নেই। মোট কথা এই যে এই সুন্দরীর যে-মোহ তার মনে জমে উঠেছিল—কয়েক মাসের অদর্শনেই গেল উবে। অথচ আমার প্রতি ওর টান একটুও কমে নি। নৈলে সে পোলাণ্ডে ফিরে এসে আমাকেই ফের ধরবে কেন ? আমার ভাঙা মনে তখন প্রেমে বিশ্বাস ফিরে এল, কারণ আমি এর আগে সত্যিই বিশ্বাস করতে পারি নি যে আমি তাকে মুক্তি দিলেও সে মুক্তি চাইবে না।

পল্লবের হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠল: তারপর ?

ফ্রাউ ক্রামারের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এল: তারপর আর কী ? আমাদের বিবাহ হ'ল—আমার বয়স তখন পঁয়ত্রিশ, এবেরারের চল্লিশ। কিন্তু আমাদের দেহ-মন যেন পরস্পরের ছোঁওয়ায় —সে যে কী হয়ে গেল কেমন ক'রে বর্ণনা করব ? আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলাম যাদুকরের যাদুদণ্ডের ছোঁওয়ায় ঘটে অঘটন। আমাদের চেতনাও তেমনি যেন বদলে গেল মায়াবী প্রেমের ছোঁওয়ায়। আমাদের ভালোবাসার মধ্যে তখন না ছিল যৌবনের রঙিনতা, না উচ্ছ্বাসের ফেনিলতা। কিন্তু যা-কিছু দেখি—মনে হ'ত যেন অপরূপ···দিনের পর দিন বহন ক'রে আনত এক—সে কিসের বার্তা বলবার ভাষা খুঁজে পাই না ভাই, তোমাকে বোঝাবো, কেমন ক'রে ? কেবল একটা উপমা দেব—উপমায় তোমার আপত্তি সত্ত্বেও। দিনের পর দিন মনে হ'ত যেন সে আমার বুকের নিশ্বাস হয়ে বুক ভরে আছে—বাঁচা সম্ভব হয়েছে তারি জন্যে—যদিও বেঁচে আছি যে—নিশ্বাসের বরে তাকে হৃদয় বরণ করলেও মন মেপে তল পায় না।

পল্লব চুপ করে রইল। ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ নিশ্চুপ। ফ্রাউ ক্রামার রুমালে চোখ মুছে বললেন: এতটাই যখন বললাম তখন বাকিটুকুও বলি শোনো। ব'লে একটু থেমে: যুদ্ধের সময়ে আমরা সর্বস্বান্ত হ'য়ে সুইডেনে যাই। এবেরারের সেখানে একটি বন্ধু ছিল সে এবেরারকে নিয়ে একটা নতুন ব্যবসা ফাঁদবার

প্রস্তাব করে এ ব্যবসায় এবেরার দ্রুত উন্নতি করে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই···ফ্রাউ ক্রামার ফের চোখ মুছে ব'লে চললেন: আমরা সেদিন গিয়েছিলাম ষ্টকহল্‌মের একটি হ্রদে বেড়াতে—নৌকা করে। হঠাৎ ঝড় উঠল। আমি ভয় পেয়ে উঠে ওর কাছে এসে বসতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ে যাই। এবেরার তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দেয়। আমরা কেউই সাঁতার জানতাম না। এই সময়ে একটি ষ্টীমার আমাকে তোলে। কিন্তু এবেরার ষ্টীমারে উঠেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল। ওর হার্ট দুর্বল ছিল—তার উপর বৃদ্ধ বয়স। ওকে আর বাঁচানো গেল না।

একটু থেমে গাঢ় কণ্ঠে ফ্রাউ ক্রামার বলে চললেন: এত বড় আঘাতও আমি সইতে পারলাম শুধু ওর কথা ভেবে। জীবনে যে আমাকে ধারণ করেছিল সাথী হয়ে, মরণেও সে আমার সহায় হল—রইল অবিস্মরণীয় হয়ে থেকে আমার পথের পাথেয় হয়ে। আজ তাই কেবল একটা কথাই আমার মনে বাজে ফিরে ফিরে প্রিয়গানের ধুয়োর মতন: যে, আমার ভাগ্যের সীমা নেই, কেন না আমি জেনেছি সেই সর্বজয়ী প্রেমকে যে খুব কম দম্পতির কাছেই আসে তার স্বরূপের মহিমায় দীপ্ত হয়ে—যাকে শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যও প্রকাশ করতে পারে নি—পারবে না কোনো দিনো। —এমন প্রেম যাকে ···কী ব'লে বোঝাবো—শুধু বলা ছাড়া যে সে পৃথিবীর হ'য়েও অপার্থিব, ঠিক যেমন ফুল মাটির হয়েও মাটি ছাড়া, শিখা প্রদীপের হয়েও পিলসুজের কেউ নয়—যার আনন্দ পরশমণির মতনই ধুলোকে ক'রে দেয় সোনা।···অথচ আশ্চর্য এই···যে, যে-যাদুকরকে আমি দেখেছি জেনেছি চিনেছি, যার যাদুকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—তাকে তাদের কাছে প্রত্যক্ষ করানো যায় না যাদের কাছে সে না বেচে ধরা দিয়েছে। তাই তো যারা জানেনি একে—তারা শুনলে অবিশ্বাসের হাসি হাসে, কিন্তু যে একবার জেনেছে সে তো না মেনে পারে না ভাই। বলতে বলতে তাঁর চোখ চিকিয়ে উঠল ফের।

পল্লব সন্তর্পণে তাঁর হাতের 'পরে হাত রেখে বলে: হয়ত বুঝেছি ফ্রাউ ক্রামার, কারণ আমিও এ-যাদুকরকে আজ মেনেছি জানার ফলেই···তার ছোঁওয়ায় আমার দৃষ্টিও রূপান্তর হয়েছে বলে···বলে থেমে: কেবল একটা প্রশ্ন করতে পারি কি এ-সম্পর্কে?

কী?

আপনার প্রথম প্রণয়ীর প্রতি আপনার টানের কথাও তো ভোলা যায় না।

মানে?

মানে সে সময়ে তো আপনার মনে হয়েছিল যে সেই টানটাই আপনার জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য?

ফ্রাউ ক্রামার ওর চোখের দিকে চেয়ে বললেন: অর্থাৎ তুমি পরখ করে দেখতে চাও?

পল্লব চুপ করে থাকে। ফ্রাউ ক্রামার বললেন: কিন্তু পরখ করবে কী করে? কিছুদিন দূরে গিয়ে থেকে?

## পঁচিশ

'ম্যান অ্যাণ্ড সুপার ম্যান'-এ প্রথম থেকে ট্যানারের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আইরিন উসখুস উসখুস করতে থাকে। ও ইংরাজি ভালো বলতে না পারলেও বুঝতে পারত খুব কঠিন না হ'লে। নারী সম্বন্ধে ট্যানারের নানা উক্তিতে তাই ক্ষণে ক্ষণে ওর মুখ লাল হয়ে উঠছিল। শেষে যখন রিকি-টিকি-ট্যাভিকে ট্যানার বলল যে যে-মেয়েটিকে ট্যাভি ভালোবাসে সে-মেয়েটি তাকে গিলে খাবে আরো এই জন্যে যে "She makes you will your own destruction" তখন আইরিন জ্বলে উঠে বলল: ঢের হয়েছে, চলো। পল্লব ওকে আর একটু বসতে বলল—অন্তত প্রথম অঙ্কটা শেষ না হলে উঠে-যাওয়াটা ভালো দেখায় কি? কিন্তু আইরিন কিছুতেই রাজি না। অগত্যা পল্লব উঠে আসে। আশ-পাশের দর্শকরা একটু আশ্চর্য হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাইরে এসে পল্লব বলল: দেখলে—সবাই কী রকম বিরক্ত হল অভিনয় যখন জমে উঠছে তখন আমাদের পথ ছেড়ে দিতে?

আইরিন চলতে চলতে তীব্র কণ্ঠে বলল: হোক গে বিরক্ত। অসহ্য হলেও মানুষ সয় কেবল এক ক্ষেত্রে—যেখানে বেঁধে মারা হয়।

পল্লব মৃদু সুরে টুকল: কিন্তু যেখানে সহ্য না-করাটা দৃষ্টিকটু হ'য়ে ওঠে সেখানেও কি আমরা সহ্য করি না?

আইরিন ফুটপাতে পা দাপিয়ে বলল: করি তো আমরা অনেক কিছুই, কিন্তু যা করি তাই কি ভালো? শ-র জগৎ জোড়া নাম ব'লেই কি তিনি কথায় কথায় মেয়েদের অপমান করলেও স'য়ে থাকতে হবে?

পল্লব মৃদু সুরে আপত্তি করল: শ-র ব্যঙ্গকে তুমি ঠিক বোঝো নি। তিনি মেয়েদের অপমান করতে চান না—তবে মেয়েদের মধ্যে একটি বিশেষ জাতির মেয়ে আছে যারা বাইরে সুশীলা অথচ ভিতরে ভিতরে ফন্দিবাজ মতলবী—তাদের নিশানা ক'রেই হানেন তাঁর ব্যঙ্গবাণ।

ও একটা কথাই নয়। শ' চান বাহাদুরি দেখাতে। তাই ভদ্রতা শালীনতা শোভনতাকে নিশানা ক'রে তীরন্দাজী ক'রে তাঁর এত আনন্দ।

পল্লব বলল: না আইরিন। শ' যদি এতটা অসার হ'তেন তা হলে সারা জগতের চিন্তাশীল মানুষও তাঁর কথা এত মন দিয়ে শুনত না। বড় বৈজ্ঞানিক যেমন স্বতঃসিদ্ধ সত্যকেও ভিন্নমিশ করেন মহত্তর সত্যে পৌঁছতে, শ-ও তেমনি চলতি নৈতিকতাকে অপদস্থ ক'রে পৌঁছতে চান একটি উচ্চতর নৈতিকতায়। তাই তাঁর একটি প্রধান বাণী: যা-ই চক-চক করে তাই সোনা নয়। তুমি রাগ ক'রে উঠে না এলে দেখতে ট্যানার ব্যঙ্গের ছদ্মবেশে বলেছেন অনেক শুধু সৎকথা নয়, ভাববার কথা। আর যাই বলেছেন—বলেছেন এমন দীপ্তিময় ক্ষুরধার ভাষায় যে-ভাষা সৃষ্টির কোঠায়ই পড়ে—আর সবাই জানে সত্যিকার সৃষ্টি করতে পারে মাত্র কেবল দু'-চারজন প্রতিভাধর।

আইরিন একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: আমাকে মাফ কোরো পল, আমি জানতাম না তুমি শ'র ভক্ত।

ভক্ত ঠিক নই। তবে তাঁর লেখা থেকে অনেক কিছু শিখেছি ব'লে তাঁকে শ্রদ্ধা করি। যার কাছে কিছু পাই, তার কাছে যেটুকু পাই সেটুকুর কথাই মনে রাখি—যা পাইনি সে নিয়ে মাথা বকিয়ে কী হবে?

আইরিন একটু চুপ ক'রে থেকে বলে: এ কথাটা বেশ লাগল। কেবল—বলব একটা কথা?

নিশ্চয়।

রাগ করবে না ?

পল্লব হাসে : তোমার 'পরে রাগ ?

করোনি কখনো ? সাবধান! ব'লে তর্জনী তুলে শাসিয়ে : মিথ্যা বোলো না কিন্তু হে সত্যনিষ্ঠার শ'র পূজারী!

কিন্তু শ'র পূজারী হ'লেই কি তাঁর সাহস বর্তায় ?

তার মানে সত্যকে বরণ করতে এখনো ভয় পাও—মানছ ?

পল্লব হাসল : না মেনে পারি—যখন পদে পদে ডরাই কতকিছুকে ? তাছাড়া সত্যকে বরণ করা তো আর একটা—কী বলব—কেক খাওয়া নয়, যে গ্রহণ করলাম আর ফুরিয়ে গেল। জীবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বরণেরও বিকাশ, নয় কি ?

অত গুরুগম্ভীর কথা ব'লে আমাকে হকচকিয়ে দিও না, লক্ষ্মীটি!

পল্লব হাসে : হকচকিয়ে দিই বুঝি আমি ? অকারণ রাগ করে কে ?

আইরিন কটাক্ষ করে : অকারণ ?

পল্লব আন্দাজ করে প্রশ্নটির তাৎপর্য, কিন্তু কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না—এমন সময়ে ওরা এসে পড়ে একটা নির্জন বাগানের সামনে। আইরিন বলে : চলো, একটু বসবে—না, রাত হয়েছে ব'লে ফের ডুরিয়ে উঠবে ?

পল্লব বলে : ডরিয়ে যদি উঠি তবে সে রাত হওয়ার জন্যে হবে কোত্থেকে ? ব'লে হাতঘড়ির পানে চেয়ে : মোটে সাড়ে ন'টা—চলো, বসা যাক। বেশ নির্জন এখানে। চাঁদও সবে উঠেছে—যোগাযোগটা ঘটেছে ভালো।

ওরা পার্কের মধ্যে একটা ঝাউয়ের কুঞ্জে ঢুকে পাশাপাশি বসে বেঞ্চিতে।

আইরিন বলল : এবার বলো। এড়িয়ে গেলে শুনব না কিন্তু।

কী বলব ?

যা আমি শুনতে চাই—আমার প্রশ্নের উত্তর।

কোন্ ?

পরশু রাগ করেছিলাম কেন জানো না ?

পল্লবের বুকের রক্ত দ্রুত বয়, কিন্তু কুণ্ঠায় নয়—একটা অনামা সম্ভাবনায়। বলে : যদি বলি—পরশু সত্যিই বুঝতে পারি নি—তবে কি বিশ্বাস করবে ?

আইরিনের সুর হঠাৎ বদলে গেল : যদি বলি তোমাকে যতটা বিশ্বাস করি ততটা কখনো কাউকে করিনি, তবে তুমি বিশ্বাস করবে ?—কাছে স'রে এসো।

পল্লবের দেহে শিহরণ জাগে, আইরিনের কাছে এসে ব'সে ওর কটিবেষ্টন করে।

আইরিন ওর কাঁধে মাথা রেখে হেসে বলে : কিন্তু আজ বুঝতে পেরেছ—মানছি।

কী ?

পরশু রাগ করেছিলাম কেন ? ব'লেই মুখ তোলে, পল্লব ওকে গালে চুম্বন করে। আইরিন দু' হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধ'রে সোজা ওর ওষ্ঠাধরে পৌঁছে দেয় নিজের ওষ্ঠাধর। পল্লব আর পারে না—সব ভুলে ওকে বার বার চুম্বন করে···অধরে, গণ্ডে, গ্রীবায়, চুলে।

দেহের মধ্যে দিয়ে যেন সুধার স্রোত ব'য়ে যায়। পল্লব মনে মনে নিজের সঙ্গেই তর্ক করে আশ-পাশের নির্জন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে। অন্যায় ?···কিসের অন্যায় ? প্রেম ···না মোহ ? ওকে বিবাহ করার বাধা ? দূর! কোথায় বাধা ? সব বাধার বাঁধ আজ বালির বাঁধের মতন ধুয়ে মুছে একাকার হ'য়ে গেছে। সব সংশয় নিরস্ত। দেশ, জাতি, আত্মীয়-স্বজন—এমন কি কুকুমের নিষেধকেও মনে হয় আজ অবাস্তব···ছায়াময়। হঠাৎ মনে প'ড়ে যায় শুধু একটা কথা—মোহনলালের : প্রেম বনাম মোহ—এ-তর্ক উবে যায় ভাই যখন দেহের প্রতি অণু আকুল অধীর হ'য়ে ওঠে তার সান্নিধ্যে—যাকে দু'দিন আগেও চিনতাম না। তখন শুধু এক কামনা উদগ্র হ'য়ে ওঠে : নিজেকে বিলিয়ে দেবার—কোনো নিষেধ, কোনো অনুশাসন না মেনে।

আবেশে মন ভরে গেছে। মাথার উপরে চাঁদকে মনে হয় সুহৃৎ। পাশের গাছের পাতায় পাতায় বেজে ওঠে আনন্দ-মর্মর।

পাশের একটা কাফে থেকে ভেসে আসে বেহালা ও পিয়ানোর সঙ্গতে একটি গানের সুর—ওর অতি প্রিয় গান যেটি আইরিনই ওকে শিখিয়েছিল—ব্রাহমসের একটি বিখ্যাত গান :

"Wie bist du meine Koenigin
durch sanfte Guete Wonne-voll."

ও মনে মনে গায় ঐ সুরে সুর মিলিয়ে ওর নিজের তর্জমা :

"আমার জীবনে রাণী হ'য়ে এলে কেমনে গো লহমায় ?
এলে আনন্দে, এলে মঙ্গলে—অফুর কোমলতায়!"

চমক ভাঙল আইরিনের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে। আকাশে একটি তারা জ্বল-জ্বল করছে। আইরিন বলে : ঐ তারাটি আমার তারা।

শুকতারা ?

হ্যাঁ। আমি এই তারাটিকে ভালোবাসতে শিখি কোথায় জানো ? রিগাতে।

পল্লব টুকল : মস্কোতে বলো।

আইরিন একটু আশ্চর্য হয়ে বলল : নাতাশা তোমাকে বলেনি ?

না তো!

আমার সম্বন্ধে কিছুই বলেনি ? বলে নি আমি রিগাতে এগার মাস কী ভাবে দিন কাটিয়েছি কয় বৎসর আগে ?

পল্লব কণ্ঠে একটু অভিমানের সুর টেনে বলে : সে হয়ত ভেবেছিল—তোমার কথা তুমিই বলবে।

আইরিন পল্লবের করচুম্বন ক'রে বলে, রাগ কোরো না পল! আমি কি কোনো দিন ভেবেছিলাম যে তুমি আমার হবে ?—হ্যাঁ তাই, তাই—সে এমন কথা যে বলা যায় শুধু একজনকেই।

পল্লব ওর কণ্ঠ জড়িয়ে বলল : তা হ'লে বলো তাকে যে আজ, তোমার ভাষায়, তোমার হ'য়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছে তোমাকে।

আইরিন ওর গালে ঠোনা মেরে বলে : তুমি ভা—রি দুষ্টু। তুমি আমার হবার আগে কি আমি তোমার হ'তে চাই নি ? ফিরিয়ে দিল কে ?

পল্লব হেসে বলে : রূপকথায় পড়েছি বটে কোন এক রাজকন্যা রাজপুত্রকে ছেড়ে বরণমালা দিয়েছিলেন এক বাঁশিওয়ালাকে। কিন্তু যখন দিয়েছিলেন তখন বেচারি বাঁশিওয়ালা স্বয়ম্বরাকে মালা হাতে কাছে আসতে দেখে কি ভয় পায় নি বলতে চাও ?

যাও—কেবল বিনিয়ে বিনিয়ে কথার মারপ্যাচে আমাকে জব্দ করেই তোমার যত আনন্দ!—কিন্তু শোনো, আজ বলব তোমাকে। তোমাকে বলতে ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু হলে হবে কি, তোমাকে একলা পেয়েছি কবে বলো—মানে পরশু রাত্তের আগে?

আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। কিন্তু আজ বলবে তো সত্যি?

বলতে পারি, কিন্তু সে বড় দুঃখের কাহিনী। মানুষকে আনন্দ দেওয়াই ভালো—দুঃখ দিতে কে চায় বলো?—না না, মুখ অমন কোরো না, আমি বলছি গো বলছি। আর বলব তোমাকে যা কাউকে বলিনি। খুশি তো এবার?

শোনবার আগেই খুশি? ব্ল্যাংক চেকে সই?

পাখি তো আজ দেখি পড়ছে বেশ! ব'লে আইরিন পল্লবের ডান-হাতটি নিজের গলায় জড়িয়ে নিজের মুঠোর মধ্যে সে হাতটির মণিবন্ধ চেপে ধ'রে সুরু করল, আমি বলছি ১৯১৭ সালের কথা। জানি না রুশবিপ্লবের কোনো ইতিহাস তুমি পড়েছ কি না। যদি না প'ড়ে থাকো তবে জেনে রাখো যে সে সত্যিই ইতিহাস—মানে, অকল্পনীয়।

পড়েছি লেনিনের অভ্যুদয়ের কথা—আজও তিনিই তো সর্বেসর্বা?

তা তো বটেই। তবে তাঁর এখন খুব অসুখ—সেরে উঠবেন কি না বলা কঠিন। অবশ্য ডাক্তারদের বুলেটিন আশাপ্রদ, কিন্তু জানোই তো—কোথায় একবার পড়েছিলাম, মানুষ বোকা বনে দু'বার—যখন সে উপকার ক'রে ভাবে প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা, আর যখন ভাবে—ডাক্তারের কথা শুনে চললেই ভাঙা শরীর জোড়া লাগবে। কিন্তু ঠাট্টা রেখে বলি এবার।

আইরিন একটা দীর্ঘনিশ্বাস টেনে ব'লে চলল: আমি বলছি বিপ্লব যখন ঠিক সুরু হয় তখনকার কথা। উঃ, সে সময়ে রাশিয়ার কী যে অবস্থা! কখন কী হয় কেউ জানে না। ওদিকে জার, জারিনা, যুবরাজ আলেক্সি ও তার চার বোন—রাজকন্যা, সাইবিরিয়ার বন্দী, রাজদণ্ড কেরেনস্কির হাতে। এদিকে লেনিন সুইৎজর্লণ্ড থেকে ফিরে এসে উঠে প'ড়ে লেগেছেন কেরেনস্কির বিরুদ্ধে। বিপ্লবীদের অন্দরমহলে তখনো মতভেদ প্রবল। এক দল চায় কেরেনস্কিকে হাতে রাখতে, আর এক দল উগ্রপন্থীরা চায় রাতারাতি লেনিনকেই সর্বেসর্বা ক'রে তুলে ধরতে। এক কথায়, বলশেভিক পার্টির তখন জীবন সমস্যা। কবে কী হবে কেউই বলতে পারে না। ১১শে জুলাই কেরেনস্কি লেনিনকে গ্রেপ্তার করবার হুকুম দিলেন। কিন্তু লেনিন ধরা পড়বার আগেই ছদ্মবেশে ফিনল্যাণ্ডে গিয়ে রইলেন সেখানে গা ঢাকা হ'য়ে। দেশময় হুলুস্থুল, সর্বত্র রকমারি বিদ্রোহীর দল রকমারি নেতাকে খাড়া ক'রে উড়িয়ে দিয়েছে অরাজকতার ঝাণ্ডা। আমরা তখন মস্কোতে।

হঠাৎ একদিন শুনলাম—পেট্রোগ্রাড থেকে রাজধানী তুলে আনা হবে মস্কোতে—লেনিন সদলবলে ফিরে এলেন ব'লে। দাদা বিষম ভয় পেয়ে দিদিদের পাঠিয়ে দিলেন ফিনল্যাণ্ডে—হেলসিন্‌কিতে আমাদের এক মামার কাছে। আমাকে পাঠালেন রিগাতে—তাঁর এক এস্থোনিয়ান বন্ধুর কাছে।

আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না দাদাকে ছেড়ে যেতে। কিন্তু দাদার সবচেয়ে ভাবনা হ'ল আমাকে নিয়েই, কেন না আমি সুন্দরী—কাজেই অরাজকতায় সবচেয়ে বিপদ আমারই। কেঁদে বললেন তোর গায়ে কেউ হাত দিলে আমি আত্মহত্যা করব। কী করি? দাদাকে নিরুদ্বেগ করতেই আমি গেলাম একা রিগায়।

তখনো, মনে রেখো, আমাদের জর্মণদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। লেনিন চাইছেন সন্ধি করতে, কেরেনস্কি—যুদ্ধ চালাতে। বিখ্যাত ব্রেস্ট-লিটভস্কের সন্ধি হয় ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে। আমি যখন রিগায় গেলাম তখনো জর্মনরা রিগা দখল করে নি, যদিও রিগায় রুশ সৈন্য মজুদ আছে। দাদা ভাবলেন মস্কোর চেয়ে অন্তত রিগা নিরাপদ, কারণ আমেরিকা যুদ্ধে নেমেছে ১৯১৭ সালে—জর্মনরা নিশ্চয় রাশিয়াকে ছেড়ে ফ্রান্সের দিকেই ছুটবে।

কিন্তু আমি রিগায় পৌঁছনোর কয়েক মাসের মধ্যেই—ওরা সেপ্টেম্বরে—জর্মণ সৈন্য রিগা দখল করল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। ওদিকে বিপ্লব, এদিকে আমি শত্রুপুরীতে—জর্মণদের নজরবন্দী। না পাই মস্কো থেকে দাদার কোনো খবর, না হেলসিন্‌কি থেকে দিদিদের চিঠি।

কথায় বলে বিপদ একা আসে না। আমার সবচেয়ে বড় বিপদ হ'ল আমার পোড়া রূপ নিয়ে। সতের বছরের সুন্দরী ফুলফোটা মেয়ে—মৌমাছির দল চারদিকেই। তাছাড়া আমার মধ্যে ছিল অফুরন্ত প্রাণশক্তি—কোনো পুরুষ মানুষের সঙ্গে একটু মিশতে না মিশতে ঘনিয়ে উঠত—বুঝতেই পারছ। অমন বাঁকা হেসো না বলছি, ভালো হবে না। এ হাসির কথা নয়—রিগাতে আমার অবস্থা যদি দেখতে হাপুশ নয়নে কাঁদতে। কিন্তু ঠাট্টা থাক্, শোনো চুপ করে—কান্না-কান্না মুখ ক'রে। ব'লে হেসেই গম্ভীর হয়ে: দাদার যে-বন্ধুর বাড়িতে ছিলাম সেখানেও ঐ বিপদ হ'ল। তিনি দেখতে দেখতে আমার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠলেন। তাঁর স্ত্রী আমাকে সত্যিই ভালোবাসতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে করেন কী বলো? বাইরে শত্রু, ঘরে অশান্তি। শেষে একদিন আর না পেরে কেঁদে বললেন আমাকে, যে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

তারপর অনেক কাণ্ড। আমি সে আশ্রয় ছেড়ে বহু কষ্টে পেলাম এক মিউসিক হলে চাকরি। মিউসিক হলের অধ্যক্ষের স্ত্রী আমাকে দেখেই ভালোবেসে ফেললেন, তাই পেলাম এক ব্যালেতে বিশিষ্টা নর্তকীর পদ।

কিন্তু আবার সেই একই বিপদ। আমার সখীর স্বামী আমার পিছু নিলেন। কাজেই সেখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে হলাম এক হোটেলের পরিচারিকা। সেখানে বিপদ এল আর এক পথ দিয়ে হোটেলের ম্যানেজার ছিলেন—যাকে বলে ডাকসাইটে বদমায়েস তিনি হোটেলের ধনী বাসিন্দাদের জন্যে গোপনে গভীর রাতে নগ্ন নৃত্যের ব্যবস্থা করে বিস্তর উপায় করতেন। তিনি আমাকে ধরলেন—নগ্ননৃত্য করতে হবে। বিস্তর টাকা—ইত্যাদি।

আমি রাজি হলাম না। তিনিও ছাড়েন না। শেষে ভ[illegible] দেখালেন যে, আমি রাজি না হলে তিনি আমাকে বরখাস্ত করবেন আমি সময় চাইলাম।

সে হোটেলে একটি জর্মণ অফিসার ছিল—নাম কেসলার। [illegible] আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে আমাকে প্রায়ই ডাকত তার ঘ[illegible] নানা কাজের অছিলায়। আমার বুঝতে বাকী রইল [illegible] তার নেক নজরের অর্থ। কিন্তু সেখান থেকে ফের সরে য[illegible]

ভাবতে ভাবতে আর এক মুশকিল হল এই যে একটু একটু করে মানুষটিকে আমার নিজেরও ভালো লেগে গেল। তাছাড়া হাজার হোক ছেলেমানুষ তো—তাই তিনি আমাকে এখানে ওখানে থিয়েটারে সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইলে রাজি হতাম—বিশেষ করে এইজন্যে যে তিনি আমার প্রতি আসক্ত টের পেলেও—ঐ যে বললাম—তাঁর সঙ্গ আমার বেশ ভালো লাগত। কারণ তাঁর মধ্যে আর যাই থাক অভদ্রতার লেশও ছিল না। তিনি চেষ্টা করতেন আমাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে, কিন্তু ভদ্রভাবে—জোর জুলুম করে নয়। আমাকে নানা উপহার দিতেন, তাঁর মোটরে করে এখানে ওখানে বেড়াতে নিয়ে যেতেন, নানা রেস্তরাঁয় নিয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে নাচতেন ও আমাকে খাওয়াতেন, কিন্তু ভদ্র ব্যবহারের সীমা না পেরিয়ে। ফলে ধীরে ধীরে আমিও তাকে—কী বলব ? ভালোবেসে ফেললাম বলব না কিন্তু দূরে রাখতে পারলাম না, বা চাইলাম না—যাই বলো।

পল্লব রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শোনে। আইরিন বলল: না অমন মুখ কোরো না—পতন যাকে বলে তা আমার হয় নি, এখনো আমি অক্ষত কুমারীই আছি—কিন্তু হয়ত থাকতে পারতাম না যদি না—ভগবানের দয়ারই বলব—যদি না এই সময়ে ঘটত একটা দুর্ঘটনা বা অঘটন—যাই বলো। হ'ল কি, একদিন রাতে কেসলারের এক অফিসার বন্ধু—নাম হুবার—আমাকে নিয়ে যেতে চাইলেন ডিনারে। এঁকে আমি মাঝে মাঝেই দেখতাম আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে—আর কী দৃষ্টিতে বুঝতেই পারছ। এ লোকটিকে আমার প্রথম থেকেই ভারি খারাপ লেগেছিল। কাজেই আমি তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম। তাঁর মুখ লাল হ'য়ে উঠল, কিন্তু কিছু বললেন না।

দিন দুই পরে তিনি সেই হোটেলেই একটি ঘর নিলেন। আমার ভারি ভয় হ'ল। আমি কেসলারকে বললাম। কেসলার বলল: কোনো ভয় নেই—আমি আছি। আমার মনে কিন্তু কেমন একটা আবছা আশঙ্কার ছায়া পড়ল—যাকে বলে 'প্রিমনিশন'।

আমার মন মিথ্যা বলে নি: হুবার শুধু আমার লোভেই হোটেলে ঘর নিয়েছিল। একদিন রাতে সে তার ঘরের ঘণ্টা টিপল। সে এমন ঘর নিয়েছিল যার চেম্বার মেড ছিলাম আমিই—কেসলারের পাশের ঘরেই তার ঘর।

আমি ঘরে ঢুকতেই দেখলাম তার মাতাল অবস্থা। সে আমার কাছে হেসে এগিয়ে এল। আমি পেছিয়ে গিয়ে দোরের হাতল ধরতেই সে আমাকে চেপে ধরল। আমি চিৎকার ক'রে উঠলাম, সে আমার মুখ চেপে ধরল। তারপর ধ্বস্তাধ্বস্তি। কিন্তু তার সঙ্গে জোরে আমি পারব কেন ? সে আমাকে জাপটে ধ'রে তার বিছানার উপরে নিয়ে গিয়ে ফেলল। আমি তার হাত কামড়ে ধ'রে মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে আপ্রাণ চেঁচিয়ে উঠলাম—বাঁচাও বাঁচাও ব'লে।

ভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই কেসলার বেরুচ্ছিল তার ঘর থেকে। আমার চিৎকার শুনে হুবারের ঘরে ঢুকল। আমি তখন বিছানায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে—পশুটা আমাকে এমন চেপে ধরেছে যে আমার নড়বারও জো নেই, এমনি সময়ে কেসলার তর্জন ক'রে উঠল: এ কী!

হুবার আমাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কেসলার দ্রুত জর্মণ ভাষায় তাকে কী বলল বুঝতে পারলাম না। উত্তরে হুবার চড়া সুরে বলল: বেরিয়ে যাও। কেসলার বলল: বেরিয়ে যাব—তবে ওকে নিয়ে। হুবার ফের দ্রুত জর্মণে কী বলল বুঝতে পারলাম না কিন্তু এটুকু বোঝা গেল যে তার অর্থ গালিগালাজ, কেন না শেষে চেঁচিয়ে বলল: Verdammt Heuchler! ৫ ব'লেই আমার দিকে চেয়ে ফরাসি ভাষায় বলল: খুব বন্ধু পেয়েছ—ওর স্ত্রী আছে। কেসলার আমাকে ইঙ্গিত করতেই আমি দোর খুলে বেরিয়ে গেলাম। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে সে কী কান্না! সব পুরুষই কি এক জাতের ? কারণ কেসলার আমাকে বলেছিল যে সে অবিবাহিত। তাই আমার আশা ছিল যে সে আমাকে বিবাহ করবে। আইরিন রুমালে চোখ মুছল।

পল্লব ওর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল: থাক, আর বলতে হবে না।

আইরিন গলা পরিষ্কার করে নিয়ে শান্ত কণ্ঠেই বলল: না, যখন সুরু করেছি, শেষ করি। আমি পরদিনই ভোরে উঠে চলে গেলাম সোজা সেই মিউসিক হলের অধ্যক্ষের স্ত্রীর কাছে। তিনি সব শুনে আমাকে তাঁর এক বন্ধুর কাছে পাঠাবার প্রস্তাব করলেন। আমি কেঁদে বললাম: আমি নিঃস্ব—তার উপরে জানোই তো আমার রূপই হয়ে দাঁড়িয়েছে আমার বিষম শত্রু। যেখানেই যাব সেখানেই এই ব্যাপার হবে। একটি মাত্র উপায় আছে—যদি কোনোমতে পালিয়ে মস্কো ফিরতে পারি—কিন্তু রিগা থেকে বেরুবই বা কী করে ? তিনি ভেবে বললেন: আচ্ছা, তাই হবে—তোমাকে রিগা পার করে দেব—আমরা এমন মেক-আপ জানি যে তোমাকে দেখাবে আধাবয়সী কুশ্রী! কিন্তু তুমি আর দেরী কোরো না। বলেই আমার মুখে নানারকম পটি লাগিয়ে ময়লা গাউন পরিয়ে দীন মজুরের স্ত্রী সাজিয়ে সেইদিনই নিজে মোটরে ক'রে নিয়ে গেলেন লুকিয়ে। তারপর গভীর রাতে আমাকে হাঁটাপথে রিগার সীমান্ত পার করে দিলেন, রেভেল পর্য্যন্ত আমার ট্রেণভাড়া দিয়ে সেখানে আমার এক পিতৃবন্ধু ছিলেন তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লাম। তিনি আমাকে আদর করে ঠাঁই দিলেন। পরদিনই নিউমোনিয়ায় আমি শয্যা নিলাম। তিনি দাদাকে তার করলেন। দাদা এলেন। বাঁচবার আশা ছিল না, কিন্তু দাদাকে দেখে ভরসা এল—শংকা কেটে গেল—ফিরে এলাম দাদার সঙ্গে। দাদা বললেন—লেলিনের হাতে এখন রাজদণ্ড—অরাজকতা কমছে—বোধ হয় শেষরক্ষা হলেও হতে পারে। বলতে বলতে আইরিন ঝর ঝর ক'রে কেঁদে দু হাতে মুখ লুকোয়। পল্লব ওর মাথা বুকে টেনে নিয়ে চুপ করে বসে থাকে: ওর শিরায় শিরায় বয়ে যায় কোমলতার প্রবাহ। একটু পরে আইরিন মুখ তুলে চোখ মুছে বলে: কেবল একটা কথা বলো বলো সত্যি করে বল—লক্ষ্মীটি! আমি তোমার ভার হব না তো ?

পল্লব হেসে বলে: একটা গল্প বলি শোনো। এক যে ছিল মন্দির। মন্দিরের মধ্যে ছিল একটি শূন্য বেদী, পটুয়া নিয়ে এল এমন একটি প্রতিমা যাকে দেখলেই প্রাণ ভরে যায়। প্রতিমাটি ছিল জীবন্ত, আর সে ঠিক এই প্রশ্নটিই করেছিল বেদীকে। বেদী উত্তরে কি বলেছিল বলতে পার ?

আইরিন ওর বুকে মুখ ডুবিয়ে হেসে বলে, পারি—বলেছিল—বলেই ছড়া কাটে: ভারি দেখে ভয় পায় যে—তার নাম তো নয় পূজারী।

পল্লব ওকে চুম্বন করে পাদপূরণ করে: আর একটু বলেছিল: বলিহারি, বলিহারি, বলিহারি। দুজনেই হেসে ওঠে। [ক্রমশঃ।

৫। Damned hypocrite, ভণ্ড, পাষণ্ড।

# বিপ্লবের সন্ধানে

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ আমার পুরানো স্মৃতিকথা লিখতে বসে একটা নতুন টাটকা শোকস্মৃতি মনটাকে বার বার বিক্ষিপ্ত, বিচলিত, পীড়িত করে তুলছে। প্রথমে সেই কথাটাই বলে নিই।

হিন্দু হোষ্টেল থেকে আমার গহনা আনার কথা আগে বলেছি। যে পুলিন বসুর কাছ থেকে গহনা এনেছিলুম, তিনি আমার লেখা পড়ে এক বন্ধুকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে বুধবারে ( ১৮ই মার্চ ) সকালে, এবং আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, ও কাঙালদা'র কথা জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছিলেন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরে পুরানো বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হব, কত কথা বলবো এবং শুনবো, ভেবে একটা নতুন রকমের আনন্দ বোধ করছিলুম। শুক্রবারের সকালে ভবানীপুর বকুল বাগানে তাঁর বাসায় গেলুম, এবং প্রথমেই দেখা হল তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলুম, পুলিন বাবু?

তিনি বললেন, পুলিন বাবু বুধবার শেষ রাত্রে থম্বোসিসের প্রথম আক্রমণে মারা গেছেন!

যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত! ভুল ঠিকানায় এসেছি, না ভুল শুনেছি, কিছু বুঝতে না পেরে খানিকক্ষণ বেকুফের মতন তাঁর মুখপানে চেয়ে থাকলুম—তার পর বুঝলুম, সত্যিই অঘটনটা ঘটেছে। তাঁর পুত্র প্রণব বসুর সঙ্গে দেখা করলুম।

সান্ত্বনা দেবার আছেই বা কি, আর সান্ত্বনার মূল্যই বা কি! আর সান্ত্বনার কথা বলতে আমার লজ্জা করে, মনে হয়, মুখস্ত বাজে কথা। কাজেই, কি করেন, বলেই কথা শুরু করলুম।

কথায় কথায় তাঁর বাবার এক পুরানো বন্ধুর কথা বললেন, সুহৃদ রায়—বড়লোক, খনির মালিক, তাঁকে মাইনিং পড়াবার নাম করে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কার্যত কিছুই ব্যবস্থা করেননি। ফিরে এসে তিনি চাকরী করছেন।

আমার মনে পড়লো সুহৃদ রায়ের কথা। বললুম, এক সুহৃদ রায় হিন্দু হোষ্টেলে থাকতেন, ধরা পড়ার পর সরকারী সাহায্যে বিলেত গিয়েছিলেন। প্রণব বললেন, হ্যাঁ, তিনিই ডক্টর সুহৃদ রায়।

মনে একটা নাড়া লাগলো, আর একটা পুরানো কথাও মনে পড়ে গেল। পঞ্চাননের হাতে গুলী লাগার খবর আমিই হিন্দু হোষ্টেলে পৌঁছে দিয়েছিলুম, এবং খবর শুনেই সুহৃদ রায় যেন সশঙ্কিত ও ব্যতিব্যস্ত ভাবে বলেছিলেন—পঞ্চাননকে বলে দেবেন, ধরা পড়লে যেন কিছুতেই কনফেশন না করে। শুনে আমার ভাল লাগেনি—এ কথা আবার বলে দিতে হয় নাকি?

সেই সুহৃদ রায় পুলিন বসুর মতন আরো কত লোকের ওপর চাল মেরে বেড়াচ্ছেন! অবশ্য এমন দৃষ্টান্ত সে যুগে এ যুগে আরো অনেক আছে।

এই পুলিন বসু ছিলেন তখনকার দিনে হিন্দু হোষ্টেলের বেশ বড় একটা গ্রুপের চীফ।

যে পুলিন মুখার্জি ওরফে ঠাকুরের স্বীকারোক্তির ফলে আমরা বহু লোক গ্রেপ্তার হয়েছিলুম (বসুমতীতে ছাপার ভুলে হয়েছে পুলিশ মুখার্জি।) তিনি কলেজ স্কোয়ার থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে গিয়ে ঢুকেছিলেন হিন্দু হোষ্টেলে। পুলিশ সমগ্র হিন্দু হোষ্টেল ঘিরে ফেলে তন্ন তন্ন করে খানাতল্লাসী করে ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা প্রকাণ্ড দলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পরে কতকজনকে রেখে বাকিদের ছেড়ে দেয়। পুলিন বসু তখন চেতলায় তাঁর কাকার বাসায় থেকে এম-এস সি পড়ছিলেন। পুলিশ তাঁকে এস বি অফিসে ডাকিয়ে নিয়ে যায়, এবং সেখানেই গ্রেপ্তার করে, ডিফেন্স অ্যাক্টে।

আর একটা কথাও বলতেই হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শুনতে পেয়েছি, আমার বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে লেখা অনধিকার চর্চা কারণ আমি লীডার নই। কথাটা এক দাদাকে বললুম। তিনি বললেন, তা তো বটেই; আগের দিনের কাজ থাকলে আজ যে পংক্তিতে বসতে পেতো না, সেই লীডার বিপ্লব আন্দোলনের কথা লিখবে!

আমার মনে পড়ছে কবি বিমল ঘোষের একটা কবিতার কথা তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, হায় কবি! তুমি তাজমহলের মধ্যে শুধু সাজাহানকেই দেখলে? লক্ষ মজুর শিল্পীর শ্রম ও নিষ্ঠা দিকে একবারও নজর পড়লো না?

আমারও বক্তব্য হচ্ছে, বিপ্লবান্দোলনের তাজমহলের সাজাহা তোমরা, আর আমি এক সামান্য মজুর। তোমরা ভু যাবেই, কিন্তু তবু আমি আছি। তোমাদের পেছনেই যে বিপ্লবে সন্ধানে এক দিন বেরিয়েছিলুম, আজ অবস্থা বদলে গে তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে; আমার মতন মজুরের বিপ্লবের সন্ধ আজো শেষ হয়নি। তোমাদের বিপ্লব আন্দোলনের ক্যাপিট্য

তোমাদেরই থাক, আমি শুধু আমার কথাটুকুই বলবো, কোন মালিকের কথাই মানবো না।

তারপর আর একটা কথা—লেখার মধ্যে ভুলচুক। ভুলচুক কিছু কিছু থাকবেই—সকলের লেখাতেই আছে। এর কারণ একাধিক।

প্রথমত—বাইরের দুনিয়ার মতন গুপ্ত সমিতির মধ্যেও কিছু কিছু গুজব চলে। বাইরের গুজব কাল্পনিক—যেমন কানাইলাল সম্বন্ধে লোকে বহুকাল পর্যন্ত বলেছে যে, কে নাকি কাঁঠালের মধ্যে রিভলভার পুরে জেলে কানাইলালের কাছে পাঠিয়েছিল, আর সেই রিভলভার দিয়ে কানাইলাল নরেন গোঁসাইকে খুন করেছিল।

পরবর্তীকালের জেলের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝেছি,—টাকায় না হয়, এমন কাজ নেই। শুনেছিও—জেলের এক সাহেব ওয়ার্ডার মোটা ঘুস খেয়ে কাজটা করেছিল। অবশ্য,—নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশী বাবুদের সাহায্যের জন্য সব ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত, এমন দেশী ওয়ার্ডার, সান্ত্রী, জমাদারও জেলে দেখেছি।

গুপ্ত সমিতির সকলে সকল কথা জানতে পারেনা বলেও টুকরো খাপছাড়া কথা জোড়াতালি দিয়ে অনেকে একটা কিছু গল্প খাড়া করে, যেটার কিছু ভিত্তি থাকে বটে, কিন্তু তবু ভুলই। পরে অনেক কথা প্রকাশ হওয়ার পর ঠিক কথাটা জানা যায়।

অনেকদিনের পুরোনো কথা বলে সাল-তারিখ সম্বন্ধেও ভুল হয়—এবং অনেক সময় একজনের কাজ আর একজনের নামেও চলে যায়। ধারাবাহিকতার মধ্যেও ভুল হয়—আগের কাজ আর পরের কাজও ঘুলিয়ে যায়।

আমার লেখার মধ্যে ইতিমধ্যেই দু'-চারটে খুচরো ভুল ঢুকে প'ড়ছে। যেমন—রাসবিহারী বসু জাপানে চলে যান ১৯১৫ সালে—১৬সালে নয়,—এবং যে জাহাজে যান,—সেটাতে যাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নয়,—পি, এন, ঠাকুর।

তারপর—অনেকদিন পর্যন্ত আমরাই শুনে এবং বলে এসেছি, যে-ম্যাভারিকে জার্মাণ অস্ত্র আসছিল,—ব্যাঙ্ককে সেটা ধরা পড়ে যাওয়ায় জার্মাণ কন্সালের আদেশে জাহাজটা ডুবিয়ে দেওয়া হয়। অথচ পরে সরকারী রিপোর্টে এবং যাদুদার বইতেও সত্য কথা জানা গেল।

সরকারী রিপোর্ট অনেকটা নির্ভরযোগ্য হলেও—তাতে সব কথা পাওয়া যায় না,—যেমন ভূপতিদার কথা সিডিশন কমিটির রিপোর্টে নেই—অথচ যাদুদার বইয়ে আছে,—তাঁকে ১৯১২ সালেই বিদেশে পাঠানো হয়েছিল,—তিনি ইউরোপ ঘুরে আমেরিকায় যাচ্ছিলেন,—কিন্তু ইউরোপে যোগাযোগ ছিন্ন হওয়ায় অর্থসঙ্কটে পড়ে দেশে ফিরে আসেন।

তারপরে 'দাদা' যতীন মুখার্জ্জির সঙ্গে বালেশ্বরে যাওয়ার কথা হয়, এবং সেখানে থেকে নরেন ভট্টাচার্য ও ফণী চক্রবর্তীর সঙ্গে বাটাভিয়ায় যাওয়ার কথা। কিন্তু পরে সে ব্যবস্থার পরিবর্তে তাঁকে ওসাকায় রাসবিহারী বসুর কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু যাত্রাপথেই ফিলিপাইনের কাছে সমুদ্রবক্ষেই তিনি গ্রেপ্তার হন। তাঁকে হংকং হয়ে সিঙ্গাপুরে এনে আটক রাখা হয় সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে। তিনি বলেন আমি পর্যটক, দেশভ্রমণে বেরিয়েছি,—আর কিছুই জানি না। কাগজপত্র যা ছিল তা তিনি সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলেন। অনেক অত্যাচার করেও তাঁকে স্বীকারোক্তি করানো যায় নি। কিন্তু তবু তাঁকে ফাঁসীর আসামীর মতন এগারো মাস নির্জন কারাবাসে রাখা হয়। তার পর উর্দ্ধতম কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট পরীক্ষা করে তাঁকে আর এক বে-আইনী আইনে বন্দী করে রাখে। তিনি কয়েক বছর সিঙ্গাপুর জেলে আটক থাকার পর ভারতে প্রেরিত হয়ে রাজবন্দী হন।

এ বিবরণ আমি শুনেছি স্বয়ং ভূপতি দার মুখেই। যাদুদা'র বইয়ে আর একটা কথা আছে। জার্মাণ অস্ত্র পাওয়ার পর বিপ্লবী অভ্যুত্থানে কলকাতা দখল করার ভার পড়েছিল নরেন ভট্টাচার্য এবং বিপিন গাঙ্গুলীর ওপর, তার সঙ্গে প্রয়োজন মত 'ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্তের ভার পড়েছিল ফণী চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার এবং ব্রজেন দত্তের ওপর।

রডা কোম্পানীর বন্দুক চুরির ব্যাপারে অনেকে বলেন, হরিদাস দত্ত, শ্রীশ পাল, নরেন ঘোষচৌধুরী প্রভৃতিরও হাত ছিল। ব্যাপার হ'চ্ছে শ্রীশ মিত্র বা হাবুর কাজের পর মাল সরানো ব্যাপারেই এঁদের হাত ছিল, যেমন আরো অনেকের ছিল।

সে সময়ে টালার পঞ্চানন ম্যাণ্টন কোম্পানীর বন্দুকের দোকানে কাজ করতেন। পিস্তলগুলো নতুন রকমের বলে তার ব্যবহারের কায়দা শিখিয়ে দেওয়ার জন্যে পঞ্চাননের ডাক পড়তো। জার্মাণ ষড়যন্ত্রের অস্ত্রের মধ্যেও ঐ পিস্তল আসার কথা ছিল বলে' যতীনদা'র সঙ্গে পঞ্চাননেরও বালেশ্বরে যাওয়ার কথা ছিল। নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগে হঠাৎ দাদা রওনা হন বলে পঞ্চাননের তখন যাওয়া হয়নি। তখন গেলে অবশ্য আর ফিরতে হত না। পঞ্চাননের ডাকনাম ক্যাঙা—পাড়ার ছেলেদের ক্যাঙাদা।

বালেশ্বরে একটা বৃটিশ সামরিক ঘাঁটি ছিল কামান ও গোলার শক্তি পরীক্ষার জন্যে। সেদিকটাতে কাউকে যেতে দেওয়া হত না। সেই ঘাঁটি আক্রমণ ও ধ্বংস করার জন্যেই বালেশ্বরে আড্ডা তৈরী করা হয়েছিল, এবং সেখানে 'দাদা' গিয়ে বসেছিলেন প্রধানত সেই উদ্দেশ্যে যাতে সেখানে জার্মাণ অস্ত্র নির্বিঘ্নে নামানো যায়।

যাই হোক, সরকারী রিপোর্টে ওরা জুলাই ব্যাঙ্কক থেকে পাঞ্জাবী বিপ্লবী আত্মারামের চিঠি নিয়ে যে বাঙ্গালী বিপ্লবীর কলকাতায় আসার কথা বলা হ'য়েছে, তিনি হ'চ্ছেন উকীল কুমুদ মুখার্জি।

১৯১৩ সালে ভোলানাথ চ্যাটার্জি ব্যাঙ্ককে যান বাঙ্গালী বিপ্লবীদের একটা ঘাঁটি এবং পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ছদ্মবেশী সাধু ননী মহারাজ (ননী বসু)। তখন ব্যাঙ্কক থেকে ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত একটা রেল লাইন তৈরী হচ্ছিল, এবং সে কাজে জার্মাণ ইঞ্জিনিয়ার এবং অনেক পাঞ্জাবী নিযুক্ত ছিল। যে ইঞ্জিনিয়ার অমর সিংয়ের পরে মান্দালয় জেলে ফাঁসি হয়েছিল, তিনি ছিলেন তাদের একজন। ভোলানাথ এই উকীল কুমুদ মুখার্জি এবং ইঞ্জিনিয়ার অমর সিংকে রিক্রুট করেছিলেন।

সাংহাই থেকে কিছু অস্ত্র ব্যাঙ্ককে আসবার কথা ছিল এবং ব্রহ্ম সীমান্তে প্যাকো নামক স্থানে সে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার বন্দোবস্ত হয়েছিল অমর সিংয়ের মারফৎ। বন্দোবস্ত হয়েছিল, আমেরিকা থেকে হেরম্ব গুপ্ত কর্তৃক প্রেরিত জার্মাণ অফিসার বোহেম ব্যাঙ্ককে

আসবেন বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা দিতে এবং সময় হলে তাঁরা ঐ অস্ত্র নিয়ে প্রথম আক্রমণ করবেন।

কুমুদ মুখার্জি কলকাতায় এসে জার্মাণ অস্ত্রের জাহাজ সম্পর্কে 'দাদা'দের খবর দিলেন এবং তার পর অবনী মুখার্জি সিঙ্গাপুরে ধরা পড়ায় তাঁর নোটবুকে অনেক ঠিকানা ও নাম পেয়ে অমর সিংকে গ্রেপ্তার করে মান্দালয়ে ফাঁসী দেওয়া হয়। সাংহাইয়ে আরো অনেকে ধরা পড়ে।

ভোলানাথ আগেই কলকাতায় আসেন এবং পরে গোয়ায় গিয়ে ধরা পড়েন। তাঁর আগে মার্টিনের (নরেন ভট্টাচার্য) সঙ্গে যে 'আর একজন বাঙালী' বাটাভিয়ায় গিয়েছিলেন, তিনি ফণী চক্রবর্তী এবং তিনিই পরে সাংহাই গিয়ে ধরা পড়েন।

জার্মাণ ষড়যন্ত্রে সকল বিপ্লবী পার্টিই যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে কাজ করবে স্থির হয়েছিল, কিন্তু ঢাকা অনুশীলন পার্টির তাতে নামগন্ধ নেই—অথচ সে যুগে যুগান্তর আর অনুশীলন, এই দু'টো মাত্র বিপ্লবী দলই ছিল বলে সকলেই জানে। ব্যাপার কি? কাজেই বিপ্লবী দল সম্বন্ধে কয়েকটা কথাও এখানে বলা দরকার।

আদি অনুশীলন সমিতি কলকাতায় স্থাপিত হয়েছিল প্রধানত ব্যারিষ্টার পি, মিত্র প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে। তার পর পি, মিত্রেরই নির্দেশে ঢাকায় অনুশীলন সমিতি গড়তে পাঠানো হয় পুলিন দাসকে (পুলিন দাসের বাড়ী ফরিদপুরের নড়িয়া গ্রামে), এবং তিনি সেখানে অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সারা পূর্ববঙ্গে তার শাখা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সামরিক শৃঙ্খলায় গুপ্ত বৈপ্লবিক সংগঠনে পরিণত করেন সমিতিকে।

তখন কলকাতায় অনুরূপ সমিতি ছিল আত্মোন্নতি সমিতি—ময়মনসিংহে সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমিতি, বরিশালে বান্ধব সমিতি প্রভৃতি। এ ছাড়া আরো সমিতি ছিল—কোথাও সন্তান সমিতি, কোথাও শক্তি সমিতি, কোথাও ব্রতী সমিতি ইত্যাদি। ১৯০৮ সালে সমিতিগুলো বেআইনী হয়ে যাওয়ার পর কলকাতার অনুশীলন সমিতির প্রচারপত্রের নামানুসারে 'যুগান্তরওয়ালা' বলতে বলতে পুলিশ তাদের যুগান্তর পার্টি নাম দেয় এবং ঢাকায় অনুশীলন পার্টির অপরিবর্তিত নামের থেকে পৃথক পার্টি হিসেবে যুগান্তর পার্টি নামটাই পার্টির মধ্যেও চালু হয়ে যায়।

আত্মোন্নতি সমিতির বিপ্লবী দলের (বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি) নাম চালু হয়ে যায়, ক্যালকাটা পার্টি বলে। পূর্ববঙ্গের যেসব বিপ্লবী দল ঢাকা অনুশীলন পার্টির শাখা নয়, তারা সবাই যুগান্তর পার্টির অন্তর্ভুক্ত হয় যেমন হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরী প্রমুখ নেতাদের (জুনিয়র সুরেন ঘোষ নরেশ চৌধুরী) নেতৃত্বে ময়মনসিংহের দল,—ফণী চক্রবর্তী, নরেন ঘোষ-চৌধুরী ও মনোরঞ্জন গুপ্তের সঙ্গে শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের বরিশাল দল; ফরিদপুরের পূর্ণ দাস ও সন্তোষ দত্তের দল (অসহযোগ আন্দোলনে শান্তি সেনা সংগঠন করে পূর্ণ দাস বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন); এ ছাড়া উত্তরবঙ্গে বগুড়ার যতীন রায়, রাজসাহীর সতীশ সরকার, পাবনায় গোপেন রায়, যশোহরের কবিরাজ বিজয় রায় প্রভৃতির দল।

আদি যুগান্তরের উপেন দা' পরবর্তী যুগান্তর পার্টিকে তাই ঠাট্টা করে বলতেন দাদা কোম্পানি লিমিটেড। মোটের উপর, ঢাকায় অনুশীলনের পৃথক দলীয় মনোভাব এবং ব্যবহারের বিরোধীদের জোট এক বৃহৎ পার্টি হয়ে যায়।

পুলিন দাস ১৯০৮ সালে কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে ৩ নম্বর রেগুলেশনে গ্রেপ্তার হয়ে চোদ্দ মাস বিনা বিচারে আটক থাকার পর মুক্তি পেয়ে ঢাকায় যান। তাঁর অদ্ভুত সাংগঠনিক প্রতিভা দেখে পি মিত্র মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখনই বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের পথ ধরার বিরোধী ছিলেন, এবং ঢাকা অনুশীলনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বিপ্লবান্দোলনের ক্ষতির আশঙ্কায় বাধিতও হয়েছিলেন।

তারপর ১৯১০ সালে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় পুলিন দাস প্রভৃতির গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে এত বিচলিত হয়েছিলেন যে, হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ) মারা যান।

তখন সোনারং জাতীয় বিদ্যালয় ছিল অনুশীলনের একটা বড় ঘাঁটি, এবং মাখন সেন (পুলিন দাসের লেফ্‌টেন্যান্ট) ছিলেন নেতা। তিনি পরে কলকাতায় চলে আসেন এবং যতীন মুখার্জির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। তিনি যতীন মুখার্জির বালেশ্বর গমনের খবর জানতেন বলে অনেকে পুলিশের বালেশ্বরের সন্ধান পাওয়া সম্পর্কে মাখন সেনের বদনাম রটিয়েছিল। কিন্তু অত বৃহত্তর সূত্র বর্তমানে তাঁর বদনাম দেওয়ার মূল্য কতটুকু?

বালেশ্বরের ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম ছিল কলকাতার হ্যারি এণ্ড সন্সের ব্রাঞ্চ। হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সে খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার হয় আগষ্ট মাসে এবং পুলিশ বালেশ্বরে যায় সেপ্টেম্বরে।

যাই হোক, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পর নরেন সেন প্রমুখ যাঁরা অনুশীলনের নেতা হয়েছিলেন,—জার্মাণ ষড়যন্ত্রে তাঁরা যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে সকল দলের সামিল হননি, তাই সরকারী রিপোর্টে তাদের নামগন্ধ নেই। ফলত যুগান্তর ও অনুশীলন পার্টির ভিন্ন গোষ্ঠী এইখানে আরো পোক্ত হল।

হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সে হরিদার ছোট ভাই মাখন চক্রবর্তীও গ্রেপ্তার হন, এবং পরে রাজবন্দী হন। গ্রেপ্তারের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল-সতের বছর।

ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামের পরিচালক শৈলেশ্বর বসুর জেল হয়, এবং কটক জেলে তিনি থাইসিসে আক্রান্ত হন। তারপর কয়েক বছর ভুগে মুক্তির পর তিনি মারা যান। তাঁর আর দুই ভাইও—শ্যাম এবং কানাই—রাজবন্দী হয়েছিলেন, এবং শেষ পর্যন্ত থাইসিসেই মারা গিয়েছিলেন।

শ্রমজীবী সমবায়ে যখন স্বয়ং টেগার্ট পুলিশ নিয়ে হানা দেয়, তখন অমরদা' দোকানেই ছিলেন,—কিন্তু ঠিক পুলিশ পৌঁছাবার আগেই খবর পেয়েছিলেন। টেগার্ট যখন এক দরজা দিয়ে ঢুকছে,—ঠিক তখনই অন্য দরজা দিয়ে অমরদা' কিছু গোপনীয় কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেলেন,—খরিদ্দারের মতন। দীর্ঘকায় বিশাল বপু উজ্জ্বল গৌরকান্তি অমরদা'কে সহস্রলোকের ভিড়ের মধ্যেও চেনা যায়, কিন্তু পুলিশ তখনও তাঁকে চিনতো না। তারপরে তাঁর দীর্ঘ ফেরারী জীবনের কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি অপূর্ব!

শ্রমজীবী সমবায় থেকে ধরা পড়েন রাম মজুমদার এবং সুধাংশু মুখার্জি—তাঁরা পরে রাজবন্দী হন। শ্রমজীবি সমবায়ের অন্যতম কর্মচারী প্রমথ বিশ্বাস থাকতেন টালায় ক্রিকেট খেলোয়াড় পার্ট

বাড়ীতে (পরাণ মুখুজ্যের বাড়ী)। তিনিও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, কিন্তু পরে ছাড়া পান।

তিনি ছিলেন বসন্ত ও মন্মথ বিশ্বাসের আত্মীয়। মন্মথ বিশ্বাস ফেরারী অবস্থায় মাঝে মাঝে এক আধ রাত তাঁর কাছে আশ্রয় নিতেন।

'দাদা' যতীন মুখার্জিরও সেটা জানা ছিল, একদিন তিনিও গিয়ে সেখানে উঠেছিলেন। পিছন পিছন পুলিশও হানা দিয়েছিল। তখন পাটুবাবুই নাকি প্রমথের নির্দেশে তাঁকে বাড়ীর পিছন দিয়ে পাচার করে' দেন।

জিতেন লাহিড়ী '১৩ সালে আমেরিকায় যান এবং পরে জার্মাণ-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। '১৫ সালের মার্চ মাসে তিনি ভারতে এসে 'দাদা'দের খবর দেন জাভার (বাটাভিয়ার) সঙ্গে যোগস্থাপন করতে। তিনিও পরে গ্রেপ্তার ও রাজবন্দী হন।

যশোরের মাগুরার সত্যেন সেন আমেরিকায় যান ১৯১২ সালে এবং সেখানে গদর পার্টিতে যোগ দেন। '১৫ সালে তিনি পিংলের সঙ্গে কলকাতায় আসেন বাংলা ও পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের যোগাযোগ সম্পর্কে কাজ করার জন্য। পিংলে পাঞ্জাবে গিয়ে এক ক্যান্টনমেন্টে বোমাসহ ধরা পড়ার পর যে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা হয়, সত্যেন সেনকেও গ্রেপ্তার করে সে মামলায় জড়ানো হয়। কিন্তু তিনি খালাস হন, এবং রাজবন্দী হন। মামলায় গদর দলের অ্যাপ্রুভার তাঁর কাছে নানাভাবে ব্যক্তিগত উপকার ও সাহায্যের ঋণ স্মরণ করে চক্ষুলজ্জায় তাঁকে সনাক্ত করেনি। পিংলের ফাঁসি হয়।

যে নরেন ঘোষচৌধুরী ও ফণী চক্রবর্তীর (বরিশাল পার্টি) হাতিয়া থেকে জার্মাণ-অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পূর্ববঙ্গ দখল করার কথা ছিল, ষড়যন্ত্র বানচাল এবং গ্রেপ্তার ও ফেরারের হিড়িকে টাকার প্রয়োজনে সেই নরেন ঘোষচৌধুরীর নেতৃত্বে শিবপুরে (নদীয়া বর্ডার) এক ডাকাতি হয়, এবং আরো আট জনের সঙ্গে তিনিও ধরা পড়েন। এক জনের ১০ বছর জেল বাদে বাকি সকলের সঙ্গে তাঁরও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তিনি আন্দামানে যান সদলে।

আর ফণী চক্রবর্তী মার্টিনের সঙ্গে আগেই বাটাভিয়াতে গিয়েছিলেন, (সরকারী রিপোর্টের ভাব একজন বাঙ্গালী) এবং সেখান থেকে সাংহাইয়ে গিয়েই ধরা পড়েছিলেন। সাংহাই থেকে হাতিয়ায় যে অস্ত্রের জাহাজ আসার কথা, তাতেই তাঁর ফেরবার কথা ছিল। তাঁকে ধরে সিঙ্গাপুরে আনা হয়। সেখানে তাঁকে এমন ভাবে রাখা হয় এবং এত অত্যাচার করা হয় যে, তার মাথার সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। '১৮ সালের শেষে ভূপতিদার সঙ্গে তাঁকেও ভারতে আনা হয়। তারপরই হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়।

যাই হোক, ষড়যন্ত্র প্রকাশ হওয়ার পর নেতারা চন্দননগরে আশ্রয় নিলেন অনেকে এবং কলকাতায়ও থাকতে হল অনেককে। ফেরারী কর্মী, যাঁরা অনেকে তখনও পুলিশের নজরে পড়েননি, বেশ কিছু লোক ফেরারী নেতাদের লুকিয়ে রাখার কাজে খাটতে লাগলেন। জীবন চ্যাটার্জি হলেন তাঁদেরই একজন।

টেগার্টও উঠে পড়ে লাগলো ফেরারীদের ধরার জন্যে। তার নিচেই গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা বসন্ত চ্যাটার্জি, বার্ধত টেগার্টকেও চালান তিনিই। সুতরাং বিপ্লবীরা তাঁকে খতম করার চেষ্টারও মাতলো। দুবার চেষ্টা বিফল হওয়ার পর তৃতীয়বারে তারা সফল হল।

একদিন সন্ধ্যার আগে শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট দিয়ে বসন্ত চ্যাটার্জি ও তাঁর বডিগার্ড সাইকেলে যাচ্ছেন—হঠাৎ একদল ভদ্রলোক তাঁকে সামনে থেকে আক্রমণ করলো, সঙ্গে সঙ্গে বডিগার্ডকেও। রিভলভার সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও কেউ তা ব্যবহার করার অবকাশই পেল না। গুলীর পর গুলী করে বসন্ত চ্যাটার্জির মৃতদেহ দেখে তারা বড় রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে রাস্তার ভিড়ে মিশে গেল।

বডিগার্ড সঙ্গে সঙ্গে মরেনি। সে বলেছিল, একজনকে সে দেখলে চিনতে পারবে। কিন্তু সেও বাঁচলো না, কাজেই পুলিশ ক্লোন হদিসই পেল না। সুতরাং এর পর টেগার্ট এবং সমগ্র গোয়েন্দা বিভাগ প্রায় ক্ষেপে গেল। যেখানে যত সন্দেহজনক ঘাঁটি ও লোক ছিল সর্বত্র খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তারের ধুম লেগে গেল, এবং গ্রেপ্তারের পরই চলতে লাগলো টর্চার—অত্যাচার, পিটুনি, মার এবং বহুবিধ নতুন নতুন বীভৎস কাণ্ড। বসন্ত চ্যাটার্জি নিহত হন ৩০শে জুন।

এই অবস্থায় একদিন বোধ হয় ৪ঠা জুলাই কলেজ স্কোয়ার থেকে তাড়া করে হিন্দু হোস্টেল ঘেরাও করে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে পুলিন মুখার্জি ওরফে ঠাকুরকে, যিনি টালায় ঢাকদের বাড়ীর আড্ডায় ছিলেন, এবং যাঁর নাম পুলিশের খাতায় অসংখ্য খুন ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল।

এঁর সম্বন্ধে অতুলদা বলতেন, ওর গায়ের মাংস একটু একটু করে সাঁড়াশী দিয়ে ছিঁড়লেও ও কনফেশন করবে না। বস্তুত সাঁড়াশী দিয়ে মাংস ছেঁড়া বাদে সব রকম অত্যাচারই তাঁর ওপর হয়েছিল, এবং বেশ কিছুদিন তিনি সব সহ্য করে দৃঢ়ও ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সব বলে ফেললেন।

তিনি ছিলেন অনুশীলন পার্টির ওপর ভীষণ খাপ্পা। জার্মাণ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হওয়া, দাদার মৃত্যু, এ সবের ফলে মনটা ছিল তারো বিষিয়ে। শোনা যায় পুলিশ তাঁকে নিছক চোর ডাকাত ক্রিমিন্যাল বলে এবং অনুশীলন পার্টিকে খাঁটি বিপ্লবী বলে সুখ্যাতি ও তারিফ করে আরো ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। এই শেষ খোঁচাতেই উটের পিঠ ভেঙ্গে পড়লো। ঠাকুর বিস্তারিত ভাবে তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করে পুলিশকে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি নিতান্ত চোর-ডাকাত নন। মনস্তাত্ত্বিক পরিণতিটা ভাববার মতন। এর আরো নানা রকমের দৃষ্টান্তও আছে।

ফলে অজস্র লোক ধরা পড়তে লাগলো। বিপ্লব প্রচেষ্টার এ পর্ব শেষ হয়েছে—জের টানা বৃথা; সব মুছে ফেলে ভবিষ্যতে নতুন করে আবার যদি বিপ্লব গড়ে তোলা যায়—সেই আশায় বেঁচে থাকাই ভাল—এই ছিল তখনকার দিনে অনেকেরই মনোভাব, যাঁরা কনফেশন করছিলেন। সরকারী সিডিশন কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে—তাঁদের অনুসন্ধানের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে গুরুতর শ্রেণীর ২৫০টা স্বীকারোক্তি। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের স্মৃতিকথার (বিপ্লবের পদচিহ্ন) মধ্যেও অনেকের নামসহ এই কথাটা আছে। বারীন ঘোষ এবং তাঁর কথায় আরো অনেকে মানিকতলা বোমা কেসে স্বীকারোক্তি করেছিলেন। হেম দাস (কানুনগো) করেননি।

যাই হোক, আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে এক দিন সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের এক নাটক 'মৃচ্ছকটিক' অভিনীত হয়েছে ষ্টার থিয়েটারে।

আমাদের দলের করালীরও তাতে পার্ট আছে, তার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেছি। থিয়েটার ভাঙতে রাত প্রায় শেষ হয়েছে। আমি একা ফিরেছি, প্রায় ভোরে। বাড়ীর কাছে এসে দেখি, পুলিশের ভিড়। মাথাটা একবার ঘুরে গেল, চন্দননগরের কথা মনে হল।

দূর থেকেই পাড়ার একজন লোক দেখিয়ে দিল আমাকে—পুলিশ কয়েক জন এগিয়ে এল—আমি গিয়ে বাড়ীতে ঢুকলুম, পুলিশের ভিড়টাও ঢুকলো।

আমি সটান পায়খানার দিকে এগোলুম, দেখি দিদি দাঁড়িয়ে আছে। আমি যেতেই আমার হাতে কিছু কুচো কাগজের টুকরো গুঁজে দিয়ে বললে, তুই পায়খানায় যা, আমি জল দিচ্ছি। একজন পুলিশ গিয়ে তফাতে দাঁড়ালো। বাড়ীর বাইরেটাও পুলিশ ঘিরে রেখেছে। আমি বুঝলুম, দিদি কাগজগুলো পায়খানায় ফেলতেই আসছিল, এমন সময় আমি এসে পড়েছি। পুলিশের শুভাগমন বার্তার সঙ্গে সঙ্গে দিদি টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে আন্দাজে কিছু 'সন্দেহজনক' কাগজ নষ্ট করার চেষ্টা করেছে।

পায়খানায় কাগজগুলো ফেলে দিয়ে ভাবতে লাগলুম, ব্যাপারটা নেহাৎ চন্দননগরের মতন হবে না। ঠিক কি রকম হবে, তা ভাববার কোন সূত্রও পাই না—যেন সামনেটা শুধু অন্ধকার। কোর্ঠ সম্পর্কে কোন কথাই আজও মনে নেই।

পুলিশ তাড়া দিল, বেরিয়ে এলুম। তার পর চললো ভিতর ও বার বাড়ী খানাতল্লাসী। হরি হরি! টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা স্লিপের শেষ টুকরা পাওয়া গেল,—"Please do not fail to meet us at Satyababu's lodge.—Karali"—তাড়াতাড়িতে বোধ হয় দিদির পুলিশের দিকে নজর রাখতে গিয়ে মনটা একটু বিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

পুলিশ জিজ্ঞাসা করলে এটা কি? বললুম, আমাদের লাইব্রেরীর অ্যানিভারসারীতে নাটক অভিনয় হবে বলে সেক্রেটারী করালী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন,—এবং সত্যবাবুর বাড়ীতে রিহার্সেলের ব্যবস্থা হয়েছিল।

কথাটা সত্যিই—কিন্তু কাগজের টুকরোটা সন্দেহজনক রীতিমতন। সত্যবাবু—সত্যচরণ নিয়োগী (টালার বর্তমান রেঙ্গুন-ফেরৎ সত্যচরণ নিয়োগী নয়) আমাদের দলের সতীশ নিয়োগীর খুড়তুতো ভাই—আমাদের দলের লোক নন। তিনি গ্রেপ্তারও হননি এবং কলকাতায় কনট্রোলার জেনারেলের অফিস থেকে দিল্লীতে বদলী হয়ে, এখন রিটায়ার করে এসে শ্যামবাজারে আছেন। তাঁরা তখন হারুদের সেই বাড়ীতেই ভাড়া থাকতেন যেটা আগে ছিল ফেরারীর আড্ডা।

আমাদের বাড়ীর সব পুরুষদের গ্রেপ্তারের কথা ছিল,—পাওয়া গেল মাত্র দুজন—আমি আর ভাগ্নীজামাই জ্ঞানানন্দ গোস্বামী। আমরা চললুম পুলিসের সঙ্গে, আর বাড়ীতে রইলো দিদি, ভাগ্নী আর এক পিতৃহীন ভাগ্নে,—যাকে দিদি মানুষ করছিল (বর্তমানে যে ভবানীপুরের ফুটবল খেলোয়াড় বি রায়, তখন খুব ছোট—কাউন্সিলার দুলাল মুখুজ্যের সহপাঠী)।

আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললো লর্ড স্ট্রীট থানায়—টেগার্টের অত্যাচারের ঘাঁটি। গেটের ভেতরে ঢুকে গাড়ী থেকে নেমে অফিসের দালানে উঠতেই ঘরের দরজায় দেখা দিলেন এক অফিসার—মনোজ বোস। তাঁর বাঁ হাতে একটা কালো মোটা রুল ঘুরছিল। আমাদের দুজনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে Who is Habu? (আমার ডাকনাম ছিল হাবু) আমি বললুম—আমি। বলার সঙ্গে সঙ্গে ধড়াস করে একটা চড় পড়লো গালে, কান পর্যন্ত চেপে, কানে তালা লেগে গেল, চোখে সরষে ফুল দেখলুম। অবস্থাটা আন্দাজ করে নিলুম—চন্দননগরের চালাকি চলবে না।

ভাগ্নীজামাই কেঁদে ফেললে। তাকে নাম জিজ্ঞাসা করতে সে নাম বললে। শুনে কর্তা জিজ্ঞাসা করলেন—বিদ্যাভূষণ? সে বললে, না আমি পণ্ডিত টণ্ডিত নই—অমুক জায়গায় চাকরী করি—ওঁর ভাগ্নীজামাই। বুঝলুম, হারুদের বাড়ীর অন্য ফেরারীদের খুঁজছে—সেখানে একজনের নাম ছিল বিদ্যাভূষণ। ওদের এনকোয়ারীর একটু হদিস পেলুম, মনে হল। তার পর ভাগ্নীজামাইকে সরিয়ে নিয়ে গেল। পরে শুনলুম, তাকে সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে দিয়েছে। বাড়ীতে হাঁড়ি চড়েছে সে ফেরার পরে।

যাই হোক, আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে জেরা শুরু হল। কতকগুলো নাম করে' জিজ্ঞাসা করলে এরা কোথায়? সব নাম মনে নেই, চিনিও না, মনে আছে শুধু সতীশ চক্রবর্তী, বিদ্যাভূষণ আর বোধ হয় জীবনের নাম।

বললুম, জানি না কিছুই এবং কাউকে চিনিও না। বলামাত্র দুড়দাড় করে রুলের বাড়ি কনুইয়ে, কাঁধে, হাঁটুর পাশে আর তার সঙ্গে গালি—বললে তোমার অমুক যে সব কথা বলে দিয়েছে। বলে আর মারে। এমনি কিছুক্ষণ চললো।

চুপ করে ঢোক গিলে গিলে সেগুলো হজম করলুম। তারপর নিয়ে গিয়ে বন্ধ করলো একটা সেলে! পাশাপাশি চারটে সেল, দরজার কাছে কম্বলে বসে আছে এক একজন। বুঝলুম আমাকেও এদের মত এখন জীইয়ে রাখলো।

সেলে একখানা নোংরা কম্বল ছাড়া আর কিছুই নেই। জামা জুতো খুলে অফিসে রেখে দিয়েছে। জল খেতে চাইলে দরজার গরাদের ফাঁকে হাত পাততে হয়—পাহারাওয়ালা জল ঢেলে দেয়। খেতে দিল চিমড়ে মুড়ি আর তেতো মুড়কি এক পয়সার আন্দাজ দু'বেলাই। কিন্তু আহারে রুচি থাকলে তো খাদ্যের রুচি বিচার! জলখাবার জন্যে ঐ একমুঠোই যথেষ্ট।

সেলে এসেই ব্যথা ভুলে গিয়েছি—মনটা প্রবল বেগে হাতড়ে বেড়াচ্ছে—কি বলেছে ঠাকুর আমার সম্বন্ধে, কতটুকু জানতে পেরেছে ওরা? আমাদের বাড়ীটা যে ফেরারীদের একটা আশ্রয়স্থল, একথা ছাড়া আর কোন কথা ঠাকুর বলতে পারে কি? কেন বলবে?

আর কে কে ধরা পড়লো বা পড়লো না, জানি না। ধরা পড়ে কেউ কিছু বলেছে কি? অনেক লোক আছে, যারা পার্টির লোক নয়, অথচ পার্টির লোকের বন্ধু হিসেবে ফেরারীদের সাময়িক ভাবে আশ্রয় দেয়। পার্টির লোকও এখন কিছু আছে, যাদের শুধু এই টুকুই কাজ। অন্য কাজ তাদের দিয়ে করানো হয় না, যাতে তারা পুলিশের নজরে পড়তে পারে। এই শ্রেণীতে পড়লে আমার ওপর দিয়ে পার পাওয়ার পথ করে' নেওয়া যায়।

অস্ত্র-শস্ত্রের সংস্পর্শ নেই, ফেরারীও নই, খুন ডাকাতির মধ্যেও নাম পাবে না। অনেক কথা জানি বলে সন্দেহ করারও কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। অত্যাচারের মাত্রা খুব বেশী না হতেও পারে।

# মনের মতো কাজ পেতে হ'লে

কাজে সেরা ও দামে সুবিধে ব'লেই ন্যাশনাল-একো রেডিও এবং ক্লিয়ারটোনের জিনিস বিখ্যাত। আর তা-ও এত বিভিন্ন রকমের পাওয়া যায় যে আপনার যেমনটি চাই বেছে নিতে পারবেন।

## ন্যাশনাল একো
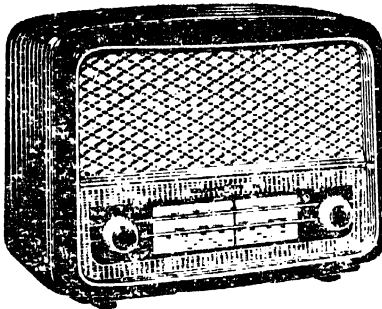
ন্যাশনাল-একো রেডিও মডেল ইউ-৭১৭-এসি/ডিসি; ৫ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড, ন্যাশনাল-একো'র বড় সেটের মত অনেক বিধি-ব্যবস্থা এতে আছে।
মনসুনাইজড্ ২৫০৲ টাকা
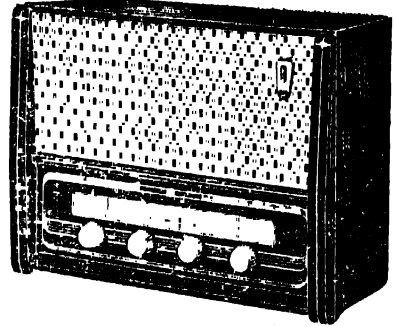
ন্যাশনাল-একো মডেল ৭২২-এসি অথবা এসি/ডিসি; ৬ ভালভ, ৩ ব্যাণ্ড; খুব ভাল কাজ দেয়; এই ধরণের রেডিওর মধ্যে সেরা।
মনসুনাইজড্ ৩৩৫৲ টাকা

## Kleertone ক্লিয়ারটোন বাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম

**ক্লিয়ারটোন বৈদ্যুতিক ওয়াটার হীটার—**
কল ঘুরালেই গরম জল পাওয়া যায়: ৫ থেকে ১৮ গ্যালন জল ধরে
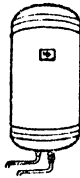
**ক্লিয়ারটোন সিংক্রোনাস বৈদ্যুতিক দেওয়াল ঘড়ি—**
অসাধারণ নির্ভরযোগ্য। ৭ রকম সাইজে এবং সুন্দর সুন্দর রঙে পাওয়া যায়

**ক্লিয়ারটোন কুকিং রেঞ্জ—**
দুটো প্লেট দেওয়া উনুন, প্রত্যেকটির আলাদা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে। শক্তি ৫,৫০০ ওয়াট পর্যন্ত

**ক্লিয়ারটোন বাতি, ফ্লুরেসেণ্ট টিউব এবং ফিক্স্‌চার—**
পরিষ্কার ঝকঝকে আলো অথচ খরচ কম পড়ে
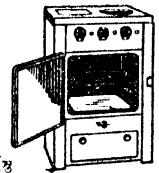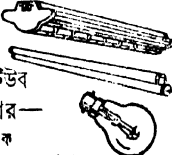
**ক্লিয়ারটোন ঘরোয়া ইস্ত্রি—**
ওজন ৭ পাউণ্ড; ২৩০ ভোল্ট—৪৫০ ওয়াট; খুব পুরু ক্রোমিয়াম কলাই করা
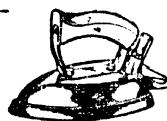
**ক্লিয়ারটোন বৈদ্যুতিক কেট্‌লি—**
ক্রোমিয়াম কলাই করা; ৩ পাঁইট জল ধরে; ২৩০ ভোল্ট—৪৫০ ওয়াট

জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাইভেট লিমিটেড

GRA

৩ ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ • অপেরা হাউস, বোম্বাই • • ফ্রেজার রোড, পাটনা
১/১৮ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ • ৩৬/৭৯ সিলভার জুবিলী পার্ক রোড, বাঙ্গালোর
যোগধিয়ান কলোনি, চাঁদনি চক, দিল্লী • রাষ্ট্রপতি রোড, সেকেন্দরাবাদ

বেশী হতেই পারে না। সুতরাং ঘাবড়াবার কিছু নেই, বিশেষত যখন বাড়ীতে ফেরারী পায়নি।

কিন্তু হিসেবগুলো থেকে যে পলায়নের মনোবৃত্তি ধরা পড়ছে! না—মন দুর্বল হলে চলবে না—কিন্তু রোক দেখানোরই বা দরকার কি? তাতে শুধু অকারণ অত্যাচারের মাত্রা বাড়ানো হবে। সুতরাং বোকাও সাজতে হবে, টাইটও থাকতে হবে। তারপর যা থাকে কপালে!

বিকেলে এক পাহারাওলা চাবি নিয়ে আসছে দেখে মনে করলুম আমায় নিতে আসছে—মনে মনে তৈরী হলুম, কিন্তু না, পাশের সেলের লোককে নিয়ে গেল। কান খাড়া করে থাকলুম অনেকক্ষণ—না—কিছুই শোনা যায় না। তাকে আবার রেখে গেল। এইবার বোধ হয় আমায় নেবে। না—নিলে না।

একটু রাত হলে আবার এল। কুকুর এগিয়ে এলে যেমন বিড়ালের রোঁয়া খাড়া হয়ে ওঠে, তেমনি অবস্থা আমার—এবার আবার আমাকেই নিলো।

অফিসে এক টেবিলে এক বাবু বসে কাগজপত্র ঘাঁটছেন, আমাকে এক দিকে দাঁড় করিয়ে রাখলো। অনেকক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, নাম কি? বাড়ী কোথায়? ইত্যাদি—। তারপর বোঝাতে শুরু করলেন, যা জান, সরলভাবে বললে ছেড়ে দেবে—সকলেই বলছে—যোয়ান ছেলে জীবনটাকে নষ্ট করবে কেন ইত্যাদি। আমি চুপ করে থাকলুম, এবং শেষে বললুম—আমি কিছুই জানি না—কি বলবো?

তিনি উঠে চলে গেলেন। আবার বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আর এক অফিসার এলেন, হাতে রুল। "বলবে"—"কিছু জানি না"। শুরু হল মার। আগের মারের ব্যথাগুলো টের পেলুম, কিন্তু ভাববার কি অবসর আছে? মার ঠেকাবার চেষ্টাতেই হাঁপিয়ে গেছি।

"হারুকে চেননা?" "সে পাড়ার ছেলে, চিনবো না কেন?" "হারুদের ভাড়াটে ঠাকুর?" "সে তো তাদের রাঁধুনী বামুন।" আবার মার।

"হারু ঠাকুরকে নিয়ে তোমার বাড়ী যায়নি? তোমার বাড়ী ওরা থাকেনি? হারু যে সব কথা বলে দিয়েছে।"

"সে, একদিন ওদের ভাড়াটেদের দেশ থেকে লোক এসেছিল, শোবার জায়গা ছিল না বলে আমাদের বাড়ী খালি আছে জানতো বলে শোবার ব্যবস্থা করেছিল। আমি আর কিছুই জানি না।"

"এখনো ন্যাকামি?" বলে আবার যা কতক।

মনে মনে ভাবলুম, এই ন্যাকামির ওপরই শেষপর্যন্ত দাঁড়ানো যাবে। কর্তা পাশের ঘরে চলে গেলেন। আমি আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর আমাকে আবার সেলে নিয়ে গেল।

তারপর দুটো দিন আর কিছু করলো না। রাত্রে আবার নিয়ে গিয়ে খাড়া করলো একটি মেয়েছেলের সামনে—বছর চব্বিশ-পঁচিশ বয়েস, আধ ময়লা কাপড় পরনে—গরীব গৃহস্থের মেয়েও হতে পারে, "বড়লোকের বাড়ীর ঝিও হতে পারে। ভাবভঙ্গী শান্ত ও ভদ্র।

অফিসার বললে, দেখ ভাল করে। মেয়েটা চুপ করে আছে, আমার মনে মহা উৎকণ্ঠা—ভয়ে ভুল করে সনাক্ত করে বসলে কি হবে কে জানে! বললুম, আমাকে যদি কোথাও দেখে থাক, বল। মেয়েটা ঘাড় নেড়ে জানালে,—না। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আবার সেলে নিয়ে গেল।

পঞ্চম দিন বিকেলে প্রিজন ভ্যানে তুললে। ভাবলুম, বোধ হয় জেলে নিয়ে যাবে। কিন্তু নিয়ে গেল ডালোণ্ডা হাউসে। সেটা আগে পুলিশ ট্রেনিং স্কুল ছিল—আলিপুরের। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড মাঝে অর্ধচক্রাকার সেলের সারি, সামনে চওড়া বারান্দা—সেলগুলা বড় ও পরিষ্কার।

সেলে সেলে খাটে বসে আছেন বাবুরা—আর বারান্দায় বরাবর পুলিশ পাহারার খাট। পায়খানায় যাওয়ার ধুম পড়ে গেল। দেখলুম আমাদের পাড়ার প্রায় সকলেই আছেন। [ক্রমশঃ।

# প্রতিবিম্ব

## প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখি মুগ্ধ-বিস্ময়ে
কল্পনার নিতল সমুদ্রে নুড়ি ঘাঁটি আমি—
বিচিত্র কবিতার সুর বর্বর আওয়াজ হানে, দ্রুততালে বিলম্বিত লয়ে।
নিঃশব্দে ডুবুরীর চোখে ত্রস্তপদে নামি
ভাবনার গভীর গুহায়, অসীম অন্ধকারে :
সময় প্রহর গোণে লেখনীর মুখস্রাবী রুদ্ধ যন্ত্রণায়,
মুক্তি পায় শব্দাক্ষরে অর্থহীন কাব্যের ভারে,
চিন্তা রেখাময় হয় কুঞ্চিত কপালে, আর কথা হাতড়ায়,
নিথর শিলীভূত মন ক্রমশঃ ঘনত্ব মাপে পারদের মানে
চাতুর্যের ফেনা কাঁপে কুশলী শব্দের কাতনায়।
ভ্রষ্টপথ, ভ্রান্ত দিক, বিক্ষিপ্ত মনন অজ্ঞাত কিসের সন্ধানে,
ভাষা খোঁজে ইতস্ততঃ, ব্যঞ্জনা ও অর্থের খাজনায়।
মাথা নামে, হাত চলে, রেখা আঁকে মনের যানায় ;
পুনরায় প্রতিবিম্ব দেখি আলোর বর্তুলে, মৌন মন, নিহত বিস্ময়।

# বৌদ্ধ পঞ্চশীল

আশা রায়

ভগবান বুদ্ধের বাণীর মূল কথা হইতেছে—শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা।

তিনি যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে যুগে দেশের প্রচলিত ধর্ম স্তরের পর স্তরে অনেক কুসংস্কার ও অপসত্যের আবর্জনায় আবৃত হইয়াছিল। তৎকালে ধর্মাচরণ ছিল আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরে দেবতাদিগের প্রীতি সম্পাদন। ইহকালে অভীষ্ট পূরণ ও পরকালে সুখ কামনায় যাগ-যজ্ঞের দ্বারা পুণ্যার্জ্জন। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতগণই ছিলেন ঐ সকল ক্রিয়া-কাণ্ডের অধিকারী, তাই স্বকীয় স্বার্থ ও প্রাধান্য রাখিতে দিতেন প্রতিযোগিতার উৎসাহ, যার ফলে মাসের পর মাস আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন থাকিত যজ্ঞ-ধূমে, ধরাতল সিক্ত থাকিত শত শত মূক পশু-বলিদানের রক্তস্রোতে। যজ্ঞের বিপুল ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ধনিগণ শোষণ করিত সমাজের নিরীহ দরিদ্র শ্রেণীকে, তাহাদের ঠেলিয়া দিত দুঃখ-দুর্দশার মুখে পুণ্যলাভের স্তোক বাক্যে। অপর শ্রেণী সাধু-সন্ন্যাসিগণ, আত্মনিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রসাধনকেই শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ বলিয়া মনে করিত, প্রকৃত সত্যের পথ, মুক্তির পথ কি, তাহা বিচারপূর্ব্বক অনুধাবন করিত না।

ভগবান বুদ্ধ অপরিসীম ত্যাগ কঠোর তপস্যা দ্বারা জীবের জন্ম, জরা, মরণ দুঃখের হেতু অবহিত হইলেন এবং মানবের মুক্তির পথ আবিষ্কার করিলেন। মহামনীষী সূক্ষ্ম যুক্তি দ্বারা সকল শাস্ত্রের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন, তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করিলেন এবং জ্ঞান ও যুক্তিসিদ্ধ মুক্তির পথ ঘোষণা করিলেন। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মের যদি কোথাও পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়া থাকে, তবে তাহা বৌদ্ধধর্ম্মেই হইয়াছে। তাই স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো বক্তৃতায় দৃপ্ত, উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"Buddhism is the fulfilment of Hinduism."—বৌদ্ধধর্মে হিন্দুধর্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মানবের জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখের দুর্জ্ঞেয় হেতু পরম্পরায় জটিল সমস্যার সকল সমাধান যদি কোথাও হইয়া থাকে, তাহা ভগবান বুদ্ধের নির্দ্দেশিত মার্গেই হইয়াছে। তাই এই ধর্ম্ম চরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়া এক সর্ব্বজনীন ধর্ম্মরূপে দেশ-দেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই মহান ধর্ম্মের মাধ্যমে প্রাচ্যে সমগ্র এশিয়াতে ও পাশ্চাত্যে দেশ-দেশান্তরে মৈত্রীলাভ করার সুযোগ পাইয়া পরস্পরের ভাবধারার আদান-প্রদানে ভারতে এই নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, ভারত জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে-শোভায় জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, সে যুগ ভারতের স্বর্ণময় যুগ।

বৌদ্ধধর্ম্মে শীল পালনের বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। পুণ্য কামনায় আনুষ্ঠানিক যাগ-যজ্ঞের আড়ম্বর বা কৃচ্ছ্রব্রতের সেই কালে, সত্যদ্রষ্টা শ্রীবুদ্ধ প্রথমেই ঘোষণা করিলেন, "বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও আত্ম-নিগ্রহে পরমার্থকে জানা যায় না।" যোগিশ্রেষ্ঠ লোকোত্তর সাধন দ্বারা যে নিগূঢ় সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা জগতের শাশ্বত সত্য। তাই শত শতাব্দীর পরেও মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য, যিনি সার্ব্বত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের অন্তলে অন্তর্হিত ও লুপ্তপ্রায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন, তিনিও বুদ্ধের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "যোগিনাম্ রাজ-চক্রবর্ত্তিন্।"

তত্ত্বদ্রষ্টা বুদ্ধ বলিলেন—মনই ধর্ম্ম সমূহের পূর্ব্বগামী, মনকে পূর্ব্বক জান। পূজা অর্চ্চনার বাহ্যিক সমারোহে বা আচার নিয়মের গোঁড়ামিতে মন পবিত্র হয় না, বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী কর, মনকে গঠন কর, সেখানেই সকল সত্যের সন্ধান পাইবে। এই আত্মদর্শন ও মনঃশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করার আহ্বান, তৎকালীন চিন্তাধারায় সম্মুখে বিস্ময় ও বিপ্লব সৃষ্টি করিল, মানবের ভাবজগতে ইহা এক কল্যাণদায়ী নবযুগের সঞ্চার। তিনি বলিলেন, মনকে পবিত্র কর, মনের কলুষতা, চঞ্চলতার মূলে আছে তৃষ্ণা অর্থাৎ বাসনা, বাসনা দমনের উপায় মনঃসংযম, তাই তাঁহার ধর্ম্ম-শাসনের প্রথম উপদেশ শীল পালন।

ধনি-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, স্ত্রী-পুরুষ, সকল মানব দুঃখমুক্ত হউক, এই একমাত্র ছিল বাসনাবিজয়ী বুদ্ধের বিশ্বজনীন বাসনা। ব্যক্তিগত জীবনে এই শীলানুসরণ সমাজেরও বিবেক উদ্‌বুদ্ধ করিয়া মঙ্গলপ্রসূ হইবে, সর্ব্বদ্রষ্টার এ উদ্দেশ্যও আমরা দেখিতে পাই। কেবল সদ্‌গ্রন্থ বা ধর্ম্মপুস্তক পাঠে চিত্ত নির্ম্মল হয় না, চিত্তের মলিনতা দূর করিতে প্রয়োজন শীল পালনের।

> ন গঙ্গা যমুনা চাপি সরভূ বা সরস্বতি
> নিম্নগা বাচিরবতী মহী চাপি মহানদী।
> সক্কুনন্তি বিসোধেতুং তম্মলং ইধ পাণিনং
> বিসোধয়তি সত্তানং যং বে সীলজলংমলং।

গঙ্গা, যমুনা, সরভূ, সরস্বতী, অচিরাবতী ও মহী প্রভৃতি মহানদীর জলও প্রাণীদের পাপমল ধৌত করিতে পারে না। বরং শীলাচরণ রূপ জলই প্রাণীদের ময়লা বিশুদ্ধ করিতে পারে। চিত্ত বিশুদ্ধ না হইলে মানসিক অনুশীলন (সমাধি—ধ্যান) করা ও চিত্তশক্তিকে জাগ্রত করা যায় না, চৈতসিক অভিনিবেশ ব্যতীত সমাধি ও প্রজ্ঞালাভ হয় না।

'দুল্লভঞ্চ মনস্সত্তং' মনুষ্য জন্ম দুর্ল্লভ এই জন্য যে, মানুষ মনের অধিকারী। অন্যান্য জীবের স্বীয় মনের অস্তিত্ব উপলব্ধি নাই এবং মনোবৃত্তি যেটি যখন প্রবল হয়, সেই অনুযায়ী সে ক্রিয়া করে, শুভ-অশুভ বিচারশক্তি নাই। একমাত্র মানুষের চিত্তবৃত্তির উপর আধিপত্য অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ চালনা ও নিরোধের ক্ষমতা আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পঞ্চশীলের কথা বর্ত্তমানে অনেকেই শুনিয়াছেন; ইহা শুনিতে সহজ ও সাধারণ। আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া আমরা বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে এই নীতির অনুবৃত্তি বা ইহারই রূপান্তরিত অনুকৃতি শুনিয়া আসিতেছি, তাই আজ ইহা মামুলী হিতকথা বলিয়া মনে

হয়। কিন্তু ইহা সর্বপ্রথম ভগবান বুদ্ধেরই শ্রীমুখ-নিঃসৃত। এই নীতি শুনিতে যত সহজ, বাস্তবিক পালন তত সহজ নহে। এ প্রবন্ধ তৎবিষয়ক পর্য্যালোচনার নগণ্য প্রয়াস মাত্র। জগতে সর্বত্র ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল বুদ্ধের কাল হইতে অত্যাপিও একই পদ্ধতিতে পালি ভাষায় আবৃত্ত হয়।

প্রথম শীল

"পানাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।"

প্রাণিহত্যা জীবহিংসা হইতে বিরত থাকিব—এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, জীবন সকলেরই প্রিয়, সকলেই মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত সুতরাং নিজের সহিত তুলনা করিয়া কাহাকেও আঘাত বা হত্যা করিবে না। তিনি বুঝিয়াছিলেন লোভ, হিংসা, দ্বেষ, বৈরভাব সকল অশান্তির কারণ, তাই সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাবনা করিতে বলিয়াছেন যথা—

"উদ্ধং যাব ভবগ্‌গা চ অধো যাব অবীচিতো
সব্বে সত্তা সব্বে পানা অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্জাহোন্তু,
অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, দুক্‌খা মুচ্চন্তু,
যথালদ্ধ সম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু।"

উর্দ্ধদিকে ভবাগ্র অবধি নিম্নদিকে অবীচি পর্যন্ত সকল সত্ত্বগণ সকল প্রাণিগণ শত্রুহীন হউক, বিপদহীন হউক, রোগহীন হউক এবং সুখে বাস করুক। দুঃখ হইতে মুক্ত হউক এবং লব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক।

দ্বিতীয় শীল

"আদিন্নাদানা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিয়ামি।"

অদত্ত দান গ্রহণ (চৌর্য্যবৃত্তি) হইতে বিরত থাকিব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। অদত্ত দান গ্রহণ করিব না ইহার অর্থ কেবল চুরী করিব না তাহাই নহে, যাহা আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেওয়া হইবেনা তাহা গ্রহণ না করা। অপরের অসহায়তা বিপদ ভীতি অক্ষমতার সুযোগে উৎকোচ সুদ অতিরিক্ত মুনাফা ইত্যাদিতে অবৈধ সুবিধা দ্বারা অর্থ আদায়ও অদত্ত দান গ্রহণের পর্য্যায়ে পড়ে, কারণ এ সকল স্বেচ্ছাকৃত দান নহে। অর্থ সম্পদ তৃষ্ণার শেষ নাই, পরিণামে এই তৃষ্ণা দুষ্টক্ষত শরীরকে গ্রাস করিয়া ধ্বংস করার ন্যায় মানবের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করে।

তৃতীয় শীল

"কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিয়ামি।"

কামে ব্যভিচার হইতে বিরত থাকিব এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। এখন দেশকাল পাত্রভেদে ব্যভিচার কথার বিভিন্ন অর্থ হয়। একদেশে এককালে একরূপ সামাজিক নিয়ম ও নীতি প্রচলিত থাকে, তাহার পরবর্ত্তীকালে ভিন্নরূপ হয়। এ দেশে এক স্বামী বহু স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, সেরূপ তিব্বতে এক স্ত্রী বহু স্বামী গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং ইহা প্রশ্ন হইতে পারে মানুষ কোনটি পালন করিবে! প্রকৃতপক্ষে এই শীল পালনের উদ্দেশ্য ইহাই যে, যাহার জন্য মানুষের ছলনা, কপটতা ও প্রতারণার আশ্রয় লইতে হয়; তাহা হইতে বিরত থাকা অর্থাৎ যে, যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত, সেই সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া পুরুষ ও নারীর অবৈধ মিলনই ব্যভিচার, ইহা হইতে বিরত থাকার বিধি পালন। অবৈধ কামাচার বহু অনর্থের কারণ।

চতুর্থ শীল

"মুসাবাদা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিয়ামি।"

মিথ্যা বাক্য হইতে বিরত থাকিব এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। স্বার্থ ও লোভের জন্য, দোষ ক্ষালন ও প্রবঞ্চনার জন্য মিথ্যা বাক্য বলিয়া আমরা চিত্তকে কলুষিত করি। উদ্দেশ্যসাধন, অভীষ্ট পূরণের জন্য গোপনতা কপটতা ও ভণ্ডামির আশ্রয় লওয়াও মিথ্যাচার। এক মিথ্যা বহু মিথ্যার জনক ইহার বিষক্রিয়া চিত্তকে বিষিক্ত করে।

পঞ্চম শীল

"সুরা মেরয়মজ্জ পমাদট্‌ঠানা বেরমণী সিকখাপদং সমাদিয়ামি।"

মাদক দ্রব্য ও উত্তেজক ওষধি সেবনের প্রমত্ততা হইতে বিরত থাকিব—এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। এ সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য, যে কোনও মাদক দ্রব্যের মত্ততা অনেক কিছু বিপত্তি অনর্থ ও ধ্বংসের কারণ হয়। আমাদের জাতীয় জনক মহাত্মা গান্ধী মাদক বর্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন; সুখের বিষয় ভারত সরকার ইতোমধ্যে এ সম্বন্ধে উদ্যোগী হইয়াছে।

এই শীল সমুদয়ের প্রত্যেকটি নাস্তিকবাচক সংকল্পের মধ্যে দ্ব্যর্থক অর্থ রহিয়াছে যেমন প্রাণিহিংসা করিব না অর্থাৎ সর্বজীবের প্রতি এইরূপ মৈত্রীপূর্ণ ভাব জাগ্রত করিব যে মনে হিংসা আসিবেই না। অদত্ত দান গ্রহণ করিবনা অর্থাৎ চিত্তকে এরূপ লোভশূন্য করিব যে পর দ্রব্য আকাঙ্খা আসিবে না ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এই পঞ্চশীল সংকল্পের একটি তাৎপর্য্য এই যে একক বা সমবেতভাবে যখনই বুদ্ধ বন্দনা হয় তখনই ত্রিশরণের সহিত প্রত্যেক বৌদ্ধ, পঞ্চশীল আবৃত্তি করেন; দৈনন্দিন পুনরাবৃত্তি প্রতিজ্ঞা বাক্যের প্রাণ সঞ্চার করে এবং তাহা অনুশীলনের প্রেরণা যোগায়।

এই শীল পালনের আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে চিন্তাশীল মনীষী যে নীতি পালনের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার প্রয়োজনীয়তা অদ্যাপিও অপরিহার্য্য। ইহার নৈতিক শক্তি ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবন উভয়কেই শান্তি ও কল্যাণের পথে চালিত করে। সে কারণ স্বাধীন ভারত বর্ত্তমানে তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে রাষ্ট্রনীতির পঞ্চশীল (Pancha Sila) চুক্তিতে প্রবর্ত্তন করিয়াছে।

ব্যষ্টিগত ভাবে পঞ্চবিধ শীল পালনের বৈশিষ্ট্য এই যে, চিত্তের অসদ্‌বৃত্তি অর্থাৎ ষড়রিপুর প্রভাব ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া সদবৃত্তি সকল জাগরিত হয় এবং চিত্তের প্রশান্তভাব আনয়ন করে। এখন আমরা যদি আমাদের চিত্তের যথার্থ অধিকারী হই তবে এ সকল পালন দুরূহ হয় না। কিন্তু যেখানে চিত্ত আমাদের বশবর্ত্তী নহে বরং নানা রিপু সমূহের বশবর্ত্তী সেখানে সমাধির (ধ্যান) অনুশীলন অসম্ভব ও নিষ্ফল। চিত্তের স্থৈর্য্য ও প্রশান্তিলাভের অনুশীলন অর্থ চিত্তের মোহমুক্তি, চিত্ত যেখানে চঞ্চল ও নানা বৃত্তির দাস সেখানে মুক্তি পাইবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না; সুতরাং চিত্তকে বাসনা বিমুখ বন্ধনমুক্ত করিতে মনঃসংযম অর্থাৎ শীলপালনের প্রয়োজন—ধম্মচরণে পি ন ভবতি অসীলস—শীলহীনের ধর্ম্মাচরণও হয় না; তাই সমাধির মূল ও আদি কথাই শীল এই জন্ম মৃত্যুর

কালচক্রের অবিরাম আবর্ত্তন হইতে মুক্ত হইবার জন্ত অভ্যাসের দ্বারা চিত্তকে সংস্কারমুক্ত ও সংহত করিলে তাহা মনঃশক্তির উপর ক্রমিক অভ্যাসের সংকল্প যোগায়, এই অভ্যাসই কালে চিত্তের তন্ময়তা আনে, তখন অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ধীরে ধীরে প্রতিভাত হয়। এই জ্ঞান পরিশেষে অনাবিল শান্তি ও শাশ্বত সত্যের উপলব্ধি আনয়ন করে এবং প্রজ্ঞা ও নির্ব্বাণের পথে চালিত করে।

"সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু"

## ঠগী ও পিণ্ডারী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য মধ্যপ্রদেশ বিখ্যাত। বিন্ধ্য পর্ব্বতের সারি তার বুকে সুদূর-বিস্তৃত গহন শ্যামল বনানী দর্শকের মন মুগ্ধ করে আবার আতঙ্কে ভরে তুলে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে এ সমস্ত নিবিড় অরণ্যসঙ্কুল পর্ব্বতমালা ভয়ঙ্কর প্রকৃতি দস্যু, ঠগ ও পিণ্ডারীদের আবাস স্থল ছিল। তারা দিনে লোকালয়ে এসে অমানুষিক অত্যাচার লুঠতরাজ করত, আর রাত্রের অন্ধকারে পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় নিত। তাদের অত্যাচারে মধ্যপ্রদেশ, বিশেষ করে জব্বলপুর ও নিকটস্থ সহর গ্রামের অধিবাসীরা আতঙ্কে থর থর করে কাঁপত। ঠগ ও পিণ্ডারীরা এক একটি দল গঠন করে তাদের সেনাপতি নির্ব্বাচিত করত। এরা বুন্দেলখণ্ড থেকে মাদ্রাজ এবং গুজরাট থেকে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত হানা দিত। ওরা যে গ্রামে পৌঁছত খবর পেলেই সে গ্রামবাসীরা ঘর সংসার ফেলে উর্দ্ধশ্বাসে নিজের প্রাণ নিয়ে পালাত।

এদের পৈশাচিক অত্যাচারে সন্ত্রস্ত হয়ে অধিবাসীরা মনের শান্তি হারাল। বাংলা ও অন্যান্য দেশে যাদের ঠগী বলা হত তাদের দলেও অনেক পিণ্ডারী ও ঠগী থাকত। মায়েরা শিশুদের ঘুম পাড়াবার সময় বর্গীর ভয় দেখিয়ে ছড়া বলতেন,—

খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

পিণ্ডারী ও ঠগীরা দশহরার পর তাদের অভিযান সুরু করত। তারা লুঠতরাজ করে সব জিনিষপত্র ত কেড়ে নিতই, উপরন্তু মানুষদের কারণে অকারণে হত্যা করতে কুণ্ঠিত হত না। এরা এদের সর্দ্দারকে সহবরিয়া বলত। এদের নিষ্ঠুরতার অন্ত ছিল না। এরা লোহা আগুনে দিয়ে লাল টকটকে করে তুলত, আর সেই সব জ্বলন্ত লোহা দিয়ে লোকদের শরীরে ছ্যাঁকা দিত। কখন বা মশাল জ্বালিয়ে জীবন্ত লোককে পুড়িয়ে মারত, কখন বা উত্তপ্ত

ছাই বা লঙ্কাগুঁড়া ভরা ঝাল মুখে ঠেসে দিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করত। পিণ্ডারী সর্দারদের মধ্যে দৌলত সিং ও মোতি সিং প্রসিদ্ধ ছিল। লোকেরা তাদের যমের ন্যায় ভয় করত। এবং যেমন দেবতার নামে মানত করে তেমনি বিপদে পড়লে তাদের নামে মানত করত। দৌলত সিং অত্যন্ত ক্রুর প্রকৃতির ছিল। তার একটি চক্ষু কাণা ছিল, কিন্তু সে একচক্ষু নিয়েই যা অত্যাচার করত তার তুলনা ছিল না। বৃটিশ সরকারের অনুচরেরা হয়রাণ দৌলত সিংকে পাকড়াও করতে। দৌলত সিং সদলবলে এক একদিন এক এক স্থানে হানা দিয়ে লুঠতরাজ করত ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের জঙ্গলে, গুহায় আত্মগোপন করত। একদিন দৌলত সিং-এর দল লুঠতরাজ করে এক পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় নিল ও খুব স্ফূর্ত্তি করে রান্নাবান্নার আয়োজন করতে লাগল। রান্নার কাঠে আগুন দেবার পর খুব ধুঁয়া বেরুল। আর সেই ধুঁয়ার অনুসরণ করে পুলিশরা দৌলত সিংকে ধরে ফেলল। বিচারে দৌলত সিং-এর ফাঁসী হল।

তারপর দেখা দিল পিণ্ডারী আমীর খাঁ। জবলপুর ও আশে-পাশের বাসিন্দারা তার নামে থরথর করে কাঁপত, যে যেদিকে পারত ছুটে পালাত। লোকেরা তার হাতে পড়ার চেয়ে নরকবাসও শ্রেয়ঃ মনে করত। আমীর আলী নিজহস্তে ৭০০ ব্যক্তির প্রাণনাশ করেছে। আমীর আলীর আসল আক্রমণের স্থান ছিল সাগর ও নর্ম্মদার আশেপাশের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি। একবার সিহোরা বলে একটি স্থানে এক ইংরেজ অফিসার যাত্রা করলেন, নিরাপদ হবে বলে তাঁর সঙ্গে এসে বহু যাত্রী জুটল। আমীর আলী ছদ্মবেশ ধরে ঐ দলে ভিড়ে গেল তাদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব পাতাল। তারপর একদিন যাত্রীদের তার বাক্‌চাতুর্য্যে ভুলিয়ে ইংরেজ অফিসারের দল ছাড়িয়ে তাদের নিয়ে আগে আগে অগ্রসর হল। শিকারপুর গ্রামে পৌঁছে হতভাগ্য স্ত্রী-পুরুষদের একে একে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করল ও মাটিতে পুঁতে ফেলল। একটি ছোট বালক ছিল, তাকে না মেরে বললে, চল তুই আমার শাকরেদ হবি। কিন্তু বালকটি আমীর আলীকে প্রত্যুত্তরে গালি দিতে লাগল তখন আমীর আলী তার গলা কেটে ফেলে চলে গেল। আমীর আলীর সন্ধানে নিযুক্ত গুপ্তচর বালকটির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে গ্রামের দলপতিকে খবর দিল। চল্লিশ জন সশস্ত্র লোক আমীর আলীর খোঁজে চলল, কিন্তু আমীর আলী সুকৌশলে তাদের কয়েকজনকে হত্যা করে পালিয়ে গেল।

ফিরিঙ্গিয়া বলে আর একটি নামকরা ঠগী গলায় ফাঁস দিয়ে ক্রমান্বয়ে ষাটজনকে মেরে ফেলে। এজন্য সে স্থানের নাম হয়েছে ষাঠরূপ।

ভোঁসলের রাজত্ব সময় পর্য্যন্ত এ সমস্ত ঠগ ও পিণ্ডারীদের অমানুষিক উপদ্রব ছিল। ১৮২৩ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এদের দমন ও নির্ম্মূল করেন। পিণ্ডারীদেরই আর এক শাখা হল ঠগী, এরা পিণ্ডারীদের চেয়েও নিষ্ঠুর। ঠগীরা যাত্রীদলের মধ্যে সুকৌশলে ঢুকে যেত এবং এক এক জনের সঙ্গে তিন তিন জন ঠগী ছদ্মবেশে থাকত। দলপতির সঙ্কেত পেলেই অতর্কিতে গলায় রুমাল ফাঁস দিয়ে যাত্রীকে মেরে ফেলত। আর তখুনি মাটিতে পুঁতে ফেলত। এজন্য শিকার ধরবার পূর্ব্বেই একদল ঠগী কোন নালা বা বিলে মৃতদেহ পুঁতবার জন্য জায়গা খনন করে রাখত, কোন সময়ে সুবিধা না হলে তারা নিজেদের আবাস স্থানেই মৃতদেহ পুঁতে তার উপর বিছানা পেতে রাখত, যাতে কেউ সন্দেহ না করে।

ঠগীরা নিজেদের পেশাকে এক বড় বিদ্যা বলে মনে করত এবং সেজন্য তাদের নানারূপ সংস্কার ছিল। দেবী ভবানী তাদের আরাধ্যা দেবী ছিলেন এবং যত মনুষ্য হত্যা করা হত, তা সবই দেবীর নিকট বলিস্বরূপ গণ্য করা হত। এজন্য যারা দীক্ষিত ঠগী, তারা নরহত্যাকে পাপ মনে করত না বা অনুতাপ করত না। হিন্দু মুসলমান যে কোনো জাতের লোকই ঠগী ধর্ম্মে দীক্ষা নিতে পারত।

বিখ্যাত ঠগী আমীর আলী ফাঁসীর পূর্ব্বে তার যে জীবন বৃত্তান্ত বলে গিয়েছে তা থেকে উদ্ধৃত করছি :

"দশহরার দিন আমাকে ঠগধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া স্থির হল। প্রথমে এরা আমাকে স্নান করিয়ে আনল, তারপর নতুন শ্বেতবস্ত্র পরাল। আমার গুরু আমার হাত ধরে নিয়ে এল এক কক্ষে। সেখানে দলের সব প্রধানরা ধৌত শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে বসেছিল, আমার গুরু এগিয়ে গিয়ে বললে, ভাই সব, তোমরা একে দলভুক্ত করতে চাও কি না?"

সভাস্থ সকলে উত্তর দিল, হাঁ আমরা রাজী। তখন সবাই আমার গুরুর সঙ্গে উঠে দাঁড়াল এবং আমাকে এক খোলা ময়দানে নিয়ে এল। আমার সাথী দু'হাত যোড় করে উপরের দিকে চোখ তুলে গম্ভীর স্বরে বলল, হে ভবানী জগতের মাতা, তোমার দীন ভক্তকে দয়া করে রক্ষা করো। তুমি এমন কোন শুভচিহ্ন প্রকাশ করো যাতে আমরা তোমার অভিপ্রায় বুঝতে পারি।

ক্ষণিক সময় আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর আমার মাথার উপর এক বৃক্ষের ডালে একটা ছোট প্যাঁচা ডাকতে শুরু করল। এটা শুনেই সর্দ্দাররা আনন্দে চীৎকার করে, উঠল জয় ভবানী মাতার জয়!

আমার সাথী আমার গলা ধরে বলল, বন্ধু এবার তুমি খুশী হও, তোমার ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন। প্যাঁচার ডাক খুব শুভলক্ষণ, আমাদের ভাগ্যে এমন শুভচিহ্ন মিলে নাই, ভবানী মাতা তোমার উপর খুবই প্রসন্ন।

আবার সে আমার হাতে ধরে সেই কক্ষে নিয়ে গেল এবং আমার ডানহাতে একটা সাদা রুমাল ও একটা কোদাল দিয়ে বলল, এই ধরো আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের সম্বল। কোদাল বুক পর্য্যন্ত উঠিয়ে আমাকে একটা ভয়ঙ্কর শপথ করতে বলল। আমি বাঁ হাত আকাশে তুলে ঐ শপথ করলাম আর বললাম, আজ হতে আমি ভবানীর সেবক। এর পর আমি কোরাণ-শরীফের নাম নিয়ে আবার ঐরকম ভয়ঙ্কর শপথ করলাম। এর পর আমাকে গুড়ের সরবৎ পান করতে দিল ও আমাকে ঠগী বানাবার উৎসব-পর্ব্ব শেষ হল।

তখন আমার গুরুকে সর্দ্দাররা খুব ধন্যবাদ দিল আর আমাকে বলল—তোকে সাবাস, তুই খোদার সবচেয়ে পুরানো পন্থা অনুযায়ী অর্থ উপার্জ্জনের পথ অবলম্বন করেছিস। তুই শপথ করেছিস যে আমাদের সঙ্গে থেকে বিশ্বাস ও খুসীর সহিত এভাবে অর্থ রোজগার করবি এবং আমাদের এই গুপ্তপন্থা কাউকে বলবিনে। আর তোর কাছে যদি কোন লোক পড়ে তবে যেভাবেই হোক

তাকে হত্যা করবি, ছেড়ে দিবি না। কেবল আমাদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ যারা, তাদের প্রাণ বধ করবি না, কারণ ঐসব লোককে দেবী ভবানীর পছন্দ নেই। ধোবী, তেলী, লোহার, মেথর, ভাট, নাচওয়ালা, ফকীর, এরা শাস্ত্রনিষিদ্ধ লোক। এছাড়া অজস্র লোকদের কায়দায় এনেই মেরে ফেলবি ও লুঠতরাজ করে সব নিয়ে নিবি। শুধু একটা খেয়াল রাখবি। শুভলক্ষণ দেখে কাজে নামবি। আমাদের যা উপদেশ দিবার সব দিয়ে দিলাম, এবার তুই তোর রোজগারের পথে নেমে পড়। আর যা শিখবার বাকী থাকে তা তোর গুরু সুবিধে মত শিখিয়ে দেবে।

আমি তখন উত্তর দিলাম—সর্দার, তুমি আমাকে যথেষ্ট উপদেশ দিয়েছ, আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমার সাথী থাকব। খোদার কাছে প্রার্থনা জানাই। তিনি যেন আমাকে শীঘ্রই এমন কোন সুযোগ দেন, যার দ্বারা আমি আমার কৃতিত্ব আর তোমার প্রতি অনুরাগ দেখাতে পারি। এভাবে আমি ঠগধর্ম্মে দীক্ষা নিলাম প্রসন্ন চিত্তে।

যখন ঠগীরা রোজগারের জন্য ঘর ছেড়ে বের হয়, তখন শুভলক্ষণ দেখে বের হতে হয়। ছোট হোক বড় হোক সব ঠগীই শুভ লক্ষণ দেখে কাজে নামবে। আমি যেদিন প্রথম শিকার ধরতে নামলাম তখন শুভ লক্ষণের অপেক্ষায় রইলাম। প্রথমে একজন অভিজ্ঞ ঠগ হাতে কোদাল নিয়ে 'কে খুনী' বলতে বলতে প্রথমে অগ্রসর হল, তার পেছনে পেছনে আমার পিতা ইসমাইল। আর তিন জমাদার আর এদের পেছনে বাকী সব ঠগীরা। আমার পিতা ইসমাইল এই দলের নায়ক ছিল। সে জলভরা একটি ঘটী রশি দিয়ে ঝুলিয়ে মুখে করে নিয়ে চলল, যদি এই ঘটী পড়ে যায় তবে যাত্রা অশুভ, এ বছর বা তার পরের বছর দলের সবাই মৃত্যুমুখে পড়বে সুনিশ্চিত। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে আমার পিতা দক্ষিণ দিকে মুখ করে বাঁ হাত বুকের উপর রেখে আকাশের দিকে চোখ তুলে চীৎকার করে বললে,—"হে জগন্মাতা, আমাদের রক্ষাকর্ত্রী, যদি তুমি আমাদের এই যাত্রা শুভ মনে কর এবং তুমি অনুমতি দাও, তবে আমাদের কোন শুভলক্ষণ দেখাও।" তখন সবে জয় ভবানীমাতার জয় বলে চীৎকার করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল উদগ্রীব হয়ে, কি জানি মাতা ভবানী কি শুভ লক্ষণ দেখান। আধ ঘণ্টার মধ্যে বাঁ দিকে শুভ লক্ষণ হল। দক্ষিণ দিক থেকে একদল গাধার ডাক শুনা গেল, আর শোনা গেল বহু লোকজনের কলরব।

এর চেয়ে শুভলক্ষণ আর কি হতে পারে? এক বছরের মধ্যে এমন ভাল শুভলক্ষণ দেখা যায় নি। একদল বণিক গাধার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে দূরদেশে যাত্রা করেছে, বেশ বড় রকম লুঠের মাল পাওয়া গেল। সবাই আনন্দে কোলাকুলি করে জয় ভবানী মাতার জয় বলে চেঁচিয়ে উঠল।

প্রথম শিকারেই আমার হাতযশ হয়ে গেল। তারপর এ হাতে যে কত খুন করেছি, কত ধনসম্পত্তি লুঠ করেছি তার ইয়ত্তা নেই।

আমীর আলী বলতে লাগল, ঠগীরা নিজেদের শিকারকে বাণিজ্য বলত আর এক রকম গুড়ের সরবৎ বানিয়ে গরম করে খেত, তাদের বিশ্বাস এটা খেলে দয়ামায়া দূর হয়ে যায়। এটা একবার খেলে নাকি ঠগ হবার জন্য এত ইচ্ছে হয় যে, সে ব্যক্তি ধনী হলেও বা তার সুখের সংসার থাকলেও সে ঠগী হবার জন্য পাগল হয়ে যাবে।

কয়েকটি ঠগী দলের নেতা এই আমীর আলীর ফাঁসীর পর ঠগীদল কতক সংযত হয়। বুকে পাথর রেখে তারপর চড়ে বসে লোকদের মেরে ফেলা, ও বাপমায়ের চোখের সামনে শিশুহত্যা করা পিণ্ডারীদের দৈনিক কর্ম্ম ছিল। এরা ক্রমশঃ নৃশংসতা ও বর্ব্বরতায় এরূপ শক্তিশালী হয়ে উঠল যে রাজারাজড়ারাও তাদের ভয় করে চলতে শুরু করলেন। করীম খাঁ পিণ্ডারী এরূপ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে রাজাদের নিকট থেকে তার বাৎসরিক চব্বিশ লক্ষ টাকা আয় হত।

সিন্ধিয়া আর হোলকার নিজ নিজ শত্রু দমন করবার সময়ে প্রথমে শত্রুদের উপর এদের লেলিয়ে দিতেন। এরা শিকারী কুত্তার মত শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, লুঠতরাজ করে শত্রুদলকে ব্যতিব্যস্ত করে তাদের ক্লান্ত করে তুলত, তখন সেনাপতিরা তাদের সৈন্যদল নিয়ে রণক্ষেত্রে নেমে অনায়াসে শত্রু দমন করতেন। মধ্যপ্রদেশে এই ঠগীদের দমন করলেন শ্লীমন সাহেব। তিনি ১৮২৬ সাল থেকে ১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত ২০০০ হাজার ঠগী ধরে ফাঁসী দিয়েছেন ও কতককে কালাপানিতে যাবজ্জীবন দীপান্তরিত করেছেন। ১৮৪৮ সালের ভিতর তিনি ২০০ বছরের পুরানো ঠগী ব্যবসা বন্ধ করেন। যে ঠগীরা অন্য ঠগীদের ধরিয়ে দিয়েছে, তাদের পরিবার পালন করবার জন্য জব্বলপুরে এক ঠগী কারখানা স্থাপন করা হয়; সেখানে তাদের শতরঞ্চি, দড়ি ইত্যাদি তৈরী করার কাজ শিখান হত। ক্রমে ক্রমে ঠগী বংশধররা এ সমস্ত কাজ-কর্ম্ম শিখে নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে লাগল ও ঠগী ব্যবসা একেবারে লোপ পেয়ে গেল দেশ থেকে।

## করোটি

### প্রতিমা দাশগুপ্ত

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় তৃতীয় রত্ন বরাহ মিহির কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভ্রমণবিলাসী ছিলেন। ভ্রমণবিলাসী বলতে অবশ্য বোঝায় না যে তাঁর ভ্রমণের-বিলাস নগর-উপনগরে দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত ছিল। প্রত্যহ পূর্বাহ্নে ও সায়াহ্নে উজ্জয়িনীর উপকণ্ঠে কম পক্ষে দুই সহস্র গজ পদচারণা না করলে রাত্রের নিদ্রা তাঁর ব্যাহত হোতো। এক সায়াহ্নে এই ভাবে বিচরণ করতে করতে অন্যমনস্ক ভাবে তিনি বহু দূর চলে গেলেন। যখন তাঁর চৈতন্য হোলো তখন তারকিনী রজনীর পট-ভূমিকায় কৃষ্ণপক্ষের অর্দ্ধভগ্ন চাঁদ ধীরে ধীরে পূর্বদিগবর্ত্তী হোচ্ছে। স্থানটি নির্জ্জন ও চারধারের বায়ুমণ্ডল ধূম্রবর্ণে ধূমায়িত। একটি শৃগাল দৌড়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল, তাঁকে দেখে ভয়ে কি অন্য কারণেই হোক পশ্চাদপসরণ করলো। কোন জায়গাতে তিনি এসে পড়েছেন ঠিক নির্ণয় করতে পারছিলেন না, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই অদূরে শাখাহীন বৃক্ষের উপরে পেচকের ঘূৎকার শব্দে, মাথার উপরে উড্ডীয়মান বিশাল খেচরের পক্ষ বিধূননের আওয়াজে স্থানটির যথার্থরূপে নিরূপণে তাঁর বিশেষ দেরী হোলো না। চমকিত হোয়ে তিনি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হোতে লাগলেন। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর কঠিন কোন বস্তুর সংঘর্ষে পায়ের অঙ্গুলিতে আঘাত প্রাপ্ত হোয়ে পতনোন্মুখ হোতে হোতে টাল সামলে নিলেন। অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জের ও ক্ষীয়মাণ চন্দ্রের অস্ফুট আলোয় তিনি

দেখতে পেলেন উক্ত বস্তুটি মহাশঙ্খ সদৃশ শুভ্র। তাঁর কৌতূহল হোলো, নীচু হোয়ে জিনিসটি কুড়িয়ে নিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেটি পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলেন তাঁর অনুমান অভ্রান্ত। জিনিসটি একটি নরকপাল। কিন্তু বরাহ মিহিরের কৌতূহল জাগ্রত হোয়েছিল অন্য কারণে। করোটিটি সম্পূর্ণ অবিকৃত আছে, উপরন্তু তার কপালের উপর লেখাগুলি এখন পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট হোয়ে ফুটে আছে। কি তাঁর খেয়াল হোলো, করোটিটি নিজের উত্তরীয়ে আবৃত করে গৃহে নিয়ে এলেন।

গভীর রাত্রে যখন পত্নী খনা বিভোর হোয়ে নিদ্রা দিচ্ছেন তখন তিনি শয়নঘরের প্রদীপ জেলে পেটিকার অভ্যন্তর থেকে করোটিটিকে বের করে এনে প্রদীপের কাছে এসে বসলেন। তার কপালের উপর কিয়ৎ পরিমাণে মাখন লেপন করে প্রদীপের শিখার উপর ধরলেন, লেখাগুলি আরও স্পষ্ট হোয়ে ফুটে উঠলো। আগ্রহ সহকারে ঝুঁকে পড়ে লেখাগুলি তিনি পাঠ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। নিশাবসানে গভীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে করোটিটিকে পুনর্বার পেটিকারুদ্ধ করলেন। আপন মনে উচ্চারণ করলেন "সমস্তই বুঝতে পারলাম···কিন্তু তোমার সর্ব্বশেষ পরিণতির অবস্থাটা ঠিক বোধগম্য হোলো না।" কিছুক্ষণ পেটিকাটির দিকে চেয়ে থেকে আবার তিনি নিজের মনে বলে উঠলেন, "হতভাগিনী!"

বরাহ মিহির করোটির ললাটে বিধাতাপুরুষের লিখনের যে পাঠোদ্ধার করেছিলেন তা এই:—পার্থিব জগতে এই করোটির পঞ্চ ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট দেহের অধিকারিণী ছিল এক অপরূপ লাবণ্যময়ী শ্রেষ্ঠিকন্যা। বয়ঃপ্রাপ্তা হোলে তার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি বহু দূর বিস্তৃত হোয়ে পড়ে এবং দূরবর্ত্তী দেশের অনুরূপ বিত্তশালী এক বণিক উপযাচক হোয়ে কন্যাটির পাণি যাচ্ঞা করে। কন্যাটির পিতার দিক থেকে তাকে প্রত্যাখ্যাত করার কোন কারণ ছিলো না —কারণ রূপে, গুণে, বৈভবে সত্যই সেই বিদেশী বণিক জামাতৃ-পদ লাভের অতি উপযুক্ত। কিন্তু কয়েকটি কারণে কন্যাটির পিতার মন কিঞ্চিৎ পরিমাণে দ্বিধাগ্রস্ত হোয়েছিল। প্রথমতঃ তাঁর ভাবী জামাতা অতি দূরনিবাসী, দ্বিতীয়তঃ সে নিজেই উপযাচক হোয়ে নিজের বিবাহের ব্যবস্থা করতে এসেছে, সঙ্গে অভিভাবক বা কোন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউই নেই। তাকে এ বিষয়ে প্রশ্নাদি করে উত্তর পাওয়া যায়, তার পিতামাতা তার বাল্যকালেই গতাসু হোয়েছেন এবং তার পিতার অগ্রজ, অনুজ কেহই নেই। আর তার ঐশ্বর্য্যলোভী দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনদের উপর সে বড় একটা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাই নিজের জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভার নিজের উপর ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তার আর গত্যন্তর নেই।

দ্বিমনা হোয়ে শ্রেষ্ঠী বিদেশী সেই বণিকের হস্তেই কন্যা সমর্পণ করতে সম্মত হোলেন। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে শ্রেষ্ঠিকন্যা স্বামীর ঘর করতে গেল। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে যখন সে স্বামীর গৃহে উপস্থিত হোলো, নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তার অশ্রুধারার উৎস আপনা থেকে শুষ্ক হোলো। বিবাহের পূর্ব্বে স্বামীর বর্ণিত কোথায় তার সেই ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর, অগণিত দাস-দাসী, বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা? ঐ যে অদূরে দণ্ডায়মান গুটিকয় মৃন্ময়-কুটির ঐ কি তার স্বামীর বিশাল অট্টালিকা? সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ মলিন বসন পরিহিত কয়েকটি নর-নারীই কি তার স্বামীর অগণিত দাসদাসী? অনুজ্জ্বল কয়েকটি বর্ত্তিকা আর কুটিরের প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধ মৃৎনির্ম্মিত কলস হণ্ডিকার রাশিই কি তার সেই বিপুল ঐশ্বর্য্যাড়ম্বর? প্রদোষের অন্ধকারে স্বামীর উত্তরীয়ে আবদ্ধ শ্রেষ্ঠিকন্যার অঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন থর থর করে কেঁপে উঠলো। শঙ্খে ফুৎকার দিয়ে দণ্ডায়মান লোকগুলির মধ্যে কয়েকজন নারী তাদের সেই কুটির অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়ার পরই তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোকগুলি যে কুৎসিত রসালাপ আরম্ভ করলো তাতে শ্রেষ্ঠিকন্যার বক্ষস্পন্দন রহিত হওয়ার উপক্রম হোলো।

অনতিকালের মধ্যে কিশোরী শ্রেষ্ঠিকন্যা তার স্বল্প কয়েক বৎসরের জীবনের চরমতম সত্য আবিষ্কার করলো তার প্রবঞ্চিত পিতা যার হাতে তাকে সমর্পণ করেছেন, সে ঐশ্বর্য্যশালী বণিক নয় ও তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কেউই কোনকালে ঐ পর্য্যায়ভুক্ত ছিলো না। তার স্বামীর আসল বংশপরিচয় সে কুম্ভকার। বিধাতা পুরুষের ভ্রমক্রমে কুম্ভকারের ঘরে তার স্বামী রাজোচিত রূপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল আর তারই সুযোগ নিয়ে সে প্রতারণা করে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে শ্রেষ্ঠিকন্যাকে।

শ্রেষ্ঠিনন্দিনী হিন্দুকন্যা। সে জানতো হিন্দুর মেয়ের অদৃষ্ট স্বামীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে ও অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত। তাই অন্তর্নিহিত অশ্রুজলের উৎসকে সবলে রুদ্ধ করে তার কায়-মন-প্রাণ উৎসর্গ করলো কুম্ভকার স্বামীর সেবায়। দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলো তাকে ভালবাসতে। মনকে প্রবোধ দান করলো; এই যদি আমার ভবিতব্য তবে তাকে খণ্ডাবে এমন কি মহাশক্তি পৃথিবীতে আছে? কুম্ভকার স্বামীর অতি স্থূল বাক্‌বিন্যাসে ততোধিক স্থূল আচার ব্যবহার রীতিনীতিতে শ্রেষ্ঠিকন্যার সারা দেহে মনে মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহের অঙ্কুর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো। সবলে তাকে প্রতিহত করে সে গুমরে উঠতো, তুমি যে হিন্দুর মেয়ে।

মহাকাল কাউকে ভালোবাসে না, ঘৃণাও করে না। সকলের প্রতিই সে সমভাবে উদাসীন। নিজের আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হোয়ে নিয়মিত এগিয়ে চলে, সে শ্রেষ্ঠিকন্যার কষিত কাঞ্চন বর্ণ পাণ্ডুর রং ধারণ করে, মুখের বিশীর্ণতা গভীরতর হয়। স্বামিগৃহে এসে আরও যে একটি রূঢ় বাস্তবের সম্মুখীন হতে হয়েছিল—সেটি তার স্বামীর জীবিকার্জ্জনের পদ্ধতিটা উপলব্ধি করে। কত বার সে স্বামীকে বলেছে, তুমি সৎপথ গ্রহণ করো, ভগবান আমাদের মঙ্গল করবেন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের তরবারিতে শ্রেষ্ঠিকন্যার সদুপদেশকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে সে কপটাচারী। বলেছে, তোমার পিতা যে আমার চেয়ে বেশী সৎব্যবসায়ী তা তো পূর্ব্বে জানা ছিলো না। তা হোলে তো আমার কষ্টার্জ্জিত কয়েক মাষা সোনা তোমাকে লাভ করবার জন্য তোমার পিতাকে উৎকোচ দিতে হোতো না। এ তথ্যও শ্রেষ্ঠিকন্যার জানা ছিলো না, তার বিক্ষত হৃদয়ে আর একটি নূতন ক্ষতের সৃষ্টি হোলো, তার দহনজ্বালা আরো একটু তীব্রতর হোলো।

সন্ধ্যায় তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জেলে শ্রেষ্ঠিকন্যা কুটিরে প্রবেশ করলো। শয়নকক্ষের প্রদীপ জেলে স্বল্পপরিসর বাতায়নের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করলো সে। সান্ধ্য গগনে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে উজ্জ্বল একটি তারা, সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শ্রেষ্ঠিকন্যার চোখ অশ্রুভারে পূর্ণ হোলো। তার দূরবর্ত্তিনী মায়ের স্নেহরাশি কি ফুটে উঠেছে ঐ নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্যের ভেতর!

নির্বোধ শ্রেষ্ঠিকন্যা জানে না যখন সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল, তখন এই সন্ধ্যা তারা আজকের মতোই দীপ্তিমান ছিল। আবার যখন সে এ পৃথিবীতে থাকবে না তখনও তার ঔজ্জ্বল্যের বিন্দুমাত্র হ্রাস হবে না। মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারা, সুখ-দুঃখের অনেক ওপরে বাস করে সে। একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শ্রেষ্ঠিকন্যার অন্তর মন মথিত করে বার বার ধ্বনিত হোতে লাগলো, মানুষের জীবনে বেঁচে থাকাটা কি এত বেশী প্রয়োজন? ছেদ পড়লো তার চিন্তায়। কুটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে তার স্বামী, হাতের অভ্যন্তরে অংশুপত্রের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত কি একটা বস্তু বহন করে। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে সে বললো, একটি উপহার সামগ্রী আজ তোমার জন্য এনেছি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠিকন্যা তার দিকে তাকাতেই তার স্বামী আগের মত হেসে বললো, মুখে প্রকাশ না করলেও কুম্ভকার বলে আমার প্রতি তোমার যে বিরূপ ভাব তা কি আমি অনুভব করতে পারি না ভেবেছো? পত্রের আচ্ছাদন উন্মোচন করতে করতে সে বললো, আমার দুর্নাম ঘোচাবার জন্য আর কতকটা তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যই আজ এনেছি আমার এই সামান্য উপহার। স্বর্ণ তন্তুখচিত বহুমূল্য শাটী কুম্ভকারের গৃহের মৃদু প্রদীপের আলোয় ঝলকিত হোয়ে উঠলো সাপের চোখের ক্রুর দৃষ্টির মতো। শ্রেষ্ঠিকন্যা সেদিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তার স্বামী এই নীরবতা লক্ষ্য করে নিষ্ঠুর বিদ্রূপে তাকে উপহাস করে উঠলো, কি পছন্দ হোলো না, গরীবের এই উপহার শ্রেষ্ঠিকন্যার?

শ্রেষ্ঠিকন্যা ধীরে ধীরে উত্তর দিল, এ মূল্যবান ক্ষৌমবস্ত্র তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনেছো? কুম্ভকারকে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হোলো না, কুটির হোতে অপরিচিত এক পুরুষকণ্ঠ ভেসে এলো—মূর্খ কুম্ভকার! কুবেরের সমগ্র রত্নভাণ্ডার যার কাছে উজাড় করে ঢেলে দিলেও যার যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় না, তাকে এসেছো তুমি তুচ্ছ একখানা শাটী দিয়ে প্রলুব্ধা করতে?

চমকিতা হোয়ে শ্রেষ্ঠিকন্যা বলে উঠলো কে? বৃহৎ অতি স্থূলকায় মেদাচ্ছন্ন এক ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করতে করতে হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললো, ভয় নেই কুম্ভকারণী! উদ্ধত কুম্ভকারের স্পর্দ্ধার সমুচিত শাস্তি দেওয়ার জন্যই আজ আমার এখানে আগমন। যে রত্ন শোভা পায় ইন্দ্রের প্রাসাদে, কুম্ভকারের সাধ্য তাকে মৃৎকুটিরে বন্দিনী রাখার? পদাঘাতে দূর করো ঐ নগণ্য শাটী আর কণ্ঠে ধারণ করো এই রত্নমালা, তোমার যোগ্য আভরণ। বলতে বলতে সে স্থূল ব্যক্তি অগ্রসর হোলো শ্রেষ্ঠিকন্যার দিকে হস্তে ধৃত একটি রত্নমালা বহন করে। নির্ব্বাক-বিস্ময়ে শ্রেষ্ঠিকন্যা বিস্ফারিত নয়নে সে দিকে তাকিয়ে রইলো, স্খলত অবগুণ্ঠন টেনে দিতেও ভুলে গেল। তার বিস্ফারিত চোখের দৃষ্টি আরও বিস্ফারিত করে দিয়ে বিদ্যুৎ ঝলকের মতো কক্ষের বাহির হোয়ে এলো তার কুম্ভকার স্বামী···মুক্ত অর্গল দুটি বাহির হোতে রুদ্ধ করে দিতে দিতে স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললো, তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান যে ব্যক্তি ইনিই যথার্থ বণিক। আমার মতো প্রবঞ্চক নন। এঁর সেবা করো, তোমার আমার দু'জনের জীবন ধন্য হবে। এক মুহূর্ত্ত পর আবার তার কণ্ঠস্বর শ্রুত হোলো ভয় নেই, কয়েক দণ্ড পর আবার আমি ফিরে আসবো।

নারীজীবনের চরমতম অপমান ঘটবার আগেই শ্রেষ্ঠিকন্যা কোন রকমে ঘর হোতে বের হোয়ে আসতে পেরেছিল। সে স্থূল ব্যক্তি কিছুদূর তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, কিন্তু বিশাল দেহের গুরুভারে অল্পক্ষণের মধ্যেই শ্রান্ত হোয়ে নিবৃত্ত হল। শ্রেষ্ঠিকন্যা পিছনে ফেলে এলো তার কুম্ভকার স্বামীর গৃহ, তার বিবাহিত জীবনের স্বল্প কয়েক মাসের লজ্জার জনক অভিজ্ঞতা। গ্রামের প্রান্তে নদীতটে এসে তার কৃশ দেহ আর তাকে বহন করে নিয়ে যেতে পারলো না, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লো সেই বালুকারাশির ওপর। প্রত্যূষে চোখ মেলে সে দেখলো এক বৃদ্ধ তার মুখে বারি সিঞ্চন করছে। তাকে চোখ মেলতে দেখে পরম স্নেহে বৃদ্ধ তাকে প্রশ্ন করলো তুমি কে মা? শ্রেষ্ঠিকন্যা তাকে শুধু বললো তুমি আমাকে পিতার গৃহে পৌঁছে দেবে? মনিবন্ধে পরিহিত অবশিষ্ট স্বর্ণবলয় দুখানি খুলবার উপক্রম করতে করতে বললো, এই বলয় জোড়া তোমাকে আমি পারিশ্রমিক দেবো। বাধা দিয়ে বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললো ও এখন থাক মা! বলো কোথায় তোমার বাপের ঘর, সেখানে আমি তোমায় পৌঁছে দেবো। আমার নিজের নৌকাই বাঁধা আছে এই ঘাটে।

যে দীর্ঘপথ অতিক্রান্ত করে শ্রেষ্ঠিকন্যা স্বামিগৃহে পৌঁছেছিল পুনরায় সেই বিপরীত পথ অতিক্রান্ত করে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সে পিতৃগৃহে পৌঁছলো। কেউ তাকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এগিয়ে এলো না। বৃদ্ধ মাঝি তাকে বললো, মা গো, এবার তা হোলে আমি যাই। নীরবে শ্রেষ্ঠিকন্যা তার দিকে তাকিয়ে রইলো শুধু। সে চলে যাওয়ার উপক্রম করতে তাড়াতাড়ি শ্রেষ্ঠিকন্যা বললো, কই তোমার পারিশ্রমিক নিয়ে গেলে না? যেতে যেতে মাঝি একবার ফিরে তাকালো, তারপর তার পদক্ষেপ দ্রুত হোলো।

দ্বিপ্রহরে স্নান-আহারাদি সমাপন করে ধনদাস শ্রেষ্ঠী বহির্গৃহে বসে তামাকু সেবন করছিলেন, অদূরে আগুয়ান সঙ্কুচিতা, শীর্ণা বালিকাটির দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ামাত্র বলে উঠলেন কে? কন্যা পিতার কাছে নিজের পরিচয় দেওয়ার অবকাশমাত্র পেলো না। শ্রেষ্ঠী উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করতে লাগলেন কে? কে? কে? শ্রেষ্ঠির উচ্চ কণ্ঠস্বরে গৃহের পরিজনরা একে একে বেরিয়ে এলো, প্রাণপণে কক্ষের দ্বার আকর্ষণ করে প্রস্তরমূর্ত্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো শ্রেষ্ঠিকন্যা! শ্রেষ্ঠিগৃহিণী বাইরে বেরিয়ে এলেন, দ্বারের অন্তরাল থেকে শ্রেষ্ঠিকন্যার দেহ সবেগে নিপতিতা হোলো মায়ের বক্ষের ওপর।

আদ্যোপান্ত শ্রবণ করে ধনদাস শ্রেষ্ঠী গম্ভীরমুখে বললেন, "ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি।" তারপর কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন—ত' হোলেও তোমাকে পুনর্বার স্বামিগৃহে ফিরে যেতে হবে মা। কন্যার মুখ শ্বেতবর্ণ ধারণ করলো। শ্রেষ্ঠিগৃহিণী সভয়ে বাধা দিয়ে বললেন, না না। তাঁর দিকে তাকিয়ে শ্রেষ্ঠী বললেন—চুপ। ওর ললাটের লেখা ওকে ভোগ করতে দাও। ওর যথোপযুক্ত স্থান ওর স্বামিগৃহ থেকে ওকে বঞ্চিতা করে আনবার অধিকার তো বিধাতা আমাদের দেননি।

কন্যাকে বহু সদুপদেশ বিতরণ করলেন শ্রেষ্ঠী। মা, স্বামিগৃহ শুধু মাত্র গৃহ নয়, সে গৃহ তোমার তীর্থ। স্বামী অসচ্চরিত্র হোন, রোগগ্রস্ত হোন, নীচকুলোদ্ভব হোন, তাঁর আশ্রয়ই তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়···নিজের সুখ সুবিধার দিকে না তাকিয়ে কায়মন-প্রাণে

তাঁর সেবা করে যাবে। সাব্যস্ত হোলো দুই দিবস পরে স্বয়ং শ্রেষ্ঠী কন্যাকে নিয়ে তার স্বামিতীর্থে রেখে আসবেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠীকে ক্লেশ করতে হোলো না পরদিনই তাঁর জামাতা শ্বশুরালয়ে এসে উপস্থিত হোলেন। বিনয়াবনত হোয়ে লজ্জিত মুখে সে শ্বশুর-শাশুড়ী সমীপে ব্যক্ত করলো অতি চিরাচরিত ব্যাপার যা সর্ব্বত্র ঘটে থাকে তুচ্ছ দাম্পত্য-কলহ। শ্রেষ্ঠী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন···শ্রেষ্ঠিগৃহিণী কিন্তু আশ্বস্তা হোলেন না। কয়েক দিবস জামাতাকে তাঁদের গৃহে বাস করবার অনুরোধ জানালেন। তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হোলো না।

এই কয় দিবস জামাতার অতি বিনয় নম্র শান্ত ব্যবহারে, সংযত আচরণে তার প্রতি শ্রেষ্ঠিগৃহিণীর সংশয় ভাব অনেকটা দূরীভূত হয়ে এলো। ভাবলেন আহা কত ভুল-ত্রুটি তো মানুষের জীবনে এমন হয়। শ্রেষ্ঠিকন্যার কাছে স্বামী এবার একেবারে ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করলো। তার দুটি হাত ধরে সানুনয়ে অশ্রুসজল চোখে বার বার উপরোধ জানালো এবারের মতো তুমি আমাকে ক্ষমা কর একবার আমাকে ভালো হওয়ার, তোমার যোগ্য হওয়ার অধিকার দাও, আবার আমার গৃহে ফিরে চলো। মায়ের মতো কন্যাও ভাবলো ত্রুটি বিচ্যুতি কি মানুষের হয় না?

পক্ষকাল পর শ্রেষ্ঠিকন্যা নব নব রতন ভূষণে সজ্জিতা হোয়ে প্রফুল্লমনে আবার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তীর্থে ফিরে চললো। পিতা আশীর্ব্বাদ করলেন, "সর্ব্বদা পতির আজ্ঞা মেনে চলো, নিয়ত তাঁর সেবা করে নিজেকে ধন্য করো মা!" মার মুখে কোন আশীর্ব্বাণী এলো না—অশ্রুহীন চোখে তাদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

গ্রামের প্রান্তে এসে শিবিকাবাহীদের বিদায় দিল কুম্ভকার। স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললো—চলো কিছুদূর এগিয়ে নৌকাযোগে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি, শিবিকা আরোহণের চেয়ে তা আরও সুখপ্রদ হবে। শিবিকা থেকে অবরোহণ করে স্ত্রী স্বামীর পশ্চাদ্‌গামিনী হোলো। বন্ধুর কঠিন মৃত্তিকার রুক্ষতায় তার পদযুগল বার বার আঘাত প্রাপ্ত হোচ্ছিল। সম্মুখের দিকে একবার দৃষ্টি চালনা করে দেখলো, জনহীন প্রান্তর নিকষ আঁধারে অবলুপ্ত। অদূরে নদীর নিরবচ্ছিন্ন জলোচ্ছ্বাসের ধ্বনিতে কি এক অশুভ আশঙ্কার আভাস পেয়ে বার বার শ্রেষ্ঠিকন্যার হৃদয় কম্পিত হোয়ে উঠছিল। ছিদ্রহীন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে দিয়ে কোন নক্তচারী পক্ষীর গুরু-গম্ভীর স্বর ধ্বনিত হোলো। সভয়ে শ্রেষ্ঠিকন্যা স্বামীর হস্ত ধারণ করলো—অস্পষ্ট কণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করলো এ কোন জায়গা? প্রত্যুত্তরে স্বামী ও তার বাহুমূল আকর্ষণ করলো হয়তো বা অভয় দান করবার জন্যই।

মুহূর্ত্ত পর শ্রেষ্ঠিকন্যা শুনতে পেলো স্বামীর কণ্ঠস্বর, ভীতা হচ্ছো কেন? দুই দণ্ড পর যে স্থানে তোমাকে গমন করতে হবে তারই মধ্যপথ দিয়ে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হোয়েছে। স্বামীর কথার তাৎপর্য্য ঠিক অনুধাবন করতে না পেরে শ্রেষ্ঠি-কন্যা তার মুখের দিকে তাকালো। তার বাহুর ওপর স্বামীর হস্তের চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোতে লাগলো। প্রবল ভীতির শিহরণ শ্রেষ্ঠিকন্যার প্রতি শিরার ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। স্বামীর হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা করতেই অন্য হাতে কুম্ভকার তার কবরী আকর্ষণ করে দুরন্ত ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে বললো স্বেচ্ছাচারিণি! পিত্রালয়ে অভিসার করতে আসা হোয়েছিল! দাঁড়া, সে সাধ তোর জন্মের মতো মেটাচ্ছি—বলতে বলতে কটিবন্ধের গ্রন্থি থেকে বার করে আনলো তীক্ষ্ণ ছুরিকা।

সভয়ে আর্ত্ত চীৎকার করে শ্রেষ্ঠিকন্যা দেহের সমস্ত শক্তি উজাড় করে নিজেকে মুক্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করলো। কিন্তু সাধ্য কি তার কুম্ভকারের লৌহ-মুঠি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে। কুম্ভকারের তীক্ষ্ণ ছুরিকার এক আঘাতে বিভক্ত হয়ে গেল শ্রেষ্ঠিকন্যার মরাল গ্রীবা দেহের কাণ্ড থেকে। রক্তলোলুপ পশুর মতো তার দেহ থেকে কুম্ভকার অলঙ্কার, শাড়ী ইত্যাদি খুলে নিয়ে শ্রেষ্ঠিকন্যার কবন্ধটা পদাঘাতে ফেলে দিল অদূরবর্ত্তী নদীর জলে।

পূর্ব্বের মতো আজ রাত্রেও বরাহ মিহির করোটিটিকে পেটিকায় স্থাপন করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, আজও তোমার শেষ পরিণতি বোধগম্য হোলো না। তোমার ললাটে বিধাতা পুরুষের লিখনের সমাপ্তি এখনও হয়নি।

আজ ত্রিরাত্র অবধি খনা দেবী লক্ষ্য করছেন রাত্রি গভীর হোলে স্বামী বরাহ মিহির শয়ন কক্ষের প্রদীপ জ্বেলে ঝুঁকে পড়ে কি একটা জিনিস বহুক্ষণ ধরে পর্য্যবেক্ষণ করেন ও পরে সেটি পেটিকা বন্ধ করে রাখেন। পরদিন প্রভাতে পেটিকা খুলে সভয়ে খনা দেবী জিনিসটি আবিষ্কার করলেন। প্রথমে তিনি বিস্মিতা হোলেন। তাঁর স্বামী কি পিশাচসিদ্ধ হোতে প্রয়াসী হোচ্ছেন? অল্প পরে আবার তাঁর মনে নানা সংশয় দেখা দিল। তবে কি এই করোটিটি তাঁর স্বামীর কোন পূর্ব্ব প্রণয়িনীর? যার স্মৃতি এখনও তাঁর মনে বিদ্যমান? সম্প্রতি বোধ হয় তাঁর সেই প্রণয়িনীর মৃত্যু ঘটেছে আর স্মৃতিস্বরূপ তার এই করোটিটিকে সযত্নে স্বামী পেটিকারুদ্ধ করে রেখেছেন, এবং গভীর রাত্রে গোপনে এটিকে হস্তধৃত করে অশ্রু বর্ষণ করেন। খনা দেবীর অনুমান অভ্রান্ত করতেই কোথা হোতে একটি টিকটিকি টিক-টিক করে উঠলো। প্রবল ঈর্ষায় খনা দেবীর অন্তর মন দহিত হোলো।

বরাহ মিহির তাঁর কৌতূহল দমন করতে পারছিলেন না। ভাবলেন, উজ্জয়িনীর বৃদ্ধতম জ্যোতির্বিদের নিকট তিনি করোটিটিকে নিয়ে গিয়ে তার অবশিষ্ট লিখনের পাঠোদ্ধার করাবেন। তাই অসময়ে দ্বিপ্রহরে গৃহে ফিরে করোটিটি সংগ্রহ করতে এসে শূন্য পেটিকা খুলে বিস্মিত হোলেন। পত্নী খনা দেবীকেও নিকটে কোথাও দেখতে পেলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে শয়ন কক্ষে দণ্ডায়মান থাকবার পর তিনি শ্রবণ করলেন অদূরে কোথা হোতে নিরন্তর গম্ভীর কোন ধ্বনি ভেসে আসছে। কুতূহলী হোয়ে ঘরের বাহিরে এসে আবিষ্কার করলেন কিয়ৎ দূরে উন্মুক্ত ঢেঁকিশালা হোতে ঐ ধ্বনি ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তিনি কি চিন্তা করলেন পরে সন্তর্পণে ঢেঁকি-শালার পশ্চাতে উপনীত হোয়ে বংশপত্রের আচ্ছাদনের ভিতর দিয়ে দেখলেন খনা দেবী স্বয়ং ঢেঁকিশালায় কি একটা বস্তু ঢেঁকির মুষল দিয়ে কুটন করছেন। বিপুল বিস্ময়ে বরাহ মিহির প্রণিধান সহকারে দেখলেন, কুট্টিত জিনিসটি সেই করোটি। নির্ব্বাক হোয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর ধীরে ধীরে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন বরাহ মিহির। শয়ন গৃহে প্রবেশ করে শূন্য পেটিকাটির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্বগত উচ্চারণ করলেন, 'তোমার এই সর্ব্বশেষ পরিণতিটাই এত দিন পর্য্যন্ত আমার বোধগম্য হয়নি।'
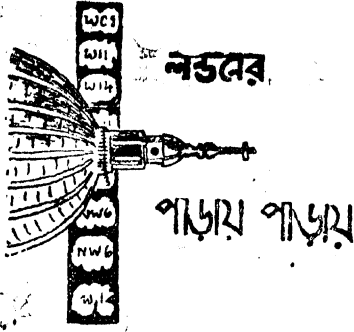
[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

## হিমানীশ গোস্বামী

**Business-lady and gentleman would like to rent ground-floor rooms or flat in N. London in order to breed a litter of Wire Fox terriers, very careful tenants, no children.—Advt. in *Our Dogs*.**

প্রথম থেকেই আমি বি, বি, সি বা বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের প্রচারের সঙ্গে পরিচিত হই। প্রথমত রেডিও শুনে, এবং পরে বি, বি, সির বাংলা প্রোগ্রামে যোগ দিতে গিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে। বাংলা প্রোগ্রাম বি, বি, সি রেখেছে তাতে নিশ্চয় খুব সৎকাজ হয়েছে, কারণ বাঙালীরা এর ফলে কিছু কিছু টাকা পায়। আর যে কাজে বাঙালীরা কিছু পেয়ে যায় তা নিশ্চয়ই সৎ কাজ। আমিও টাকার জন্য অন্যের লেখা সংবাদ পড়েছি। মোট দুবার। সে লেখা তৃতীয় শ্রেণীর, বক্তব্য আর কিছু নয়, চুটিয়ে বৃটিশদের প্রশংসা করা। তাও যদি লেখা ভাল হত বা অন্তত বুদ্ধিমানের মত লেখা হত। অবশ্য বৃটিশরা টাকা দিচ্ছে তাদের প্রশংসা করবার জন্য, কিন্তু তা বলে অমন জঘন্য লেখার জন্য নিশ্চয় নয়। আমি দুবার ঐ রকম অন্যের লেখা সংবাদ পড়ে দুবারই আপত্তি করলাম, বললাম লেখা অনেকখানি পালটাতে হবে। কিন্তু দুবারই বলা হল আমাকে যে তা সম্ভব নয়। এর পর আর বি, বি, সির দিকে পা বাড়াইনি। এই প্রসঙ্গে আমার অরুণ পালিতের কথা মনে পড়ে। অরুণ পালিতও বি, বি, সির ডাকে বাংলা প্রোগ্রামে যোগ দিতে গিয়েছিল। কন্‌ট্রাক্ট সই হয়ে গিয়েছে পাঁচ মিনিট সংবাদ পড়বে সে, এবং পাবে দেড় গিনী—একুশ টাকার কাছাকাছি। অরুণ লেখাটা একবার পড়লো—ঠিক বিশ্বাস হল না—দুবার পড়ল, না ঠিকই দেখেছে সে। যত রাজ্যের ভুল খবর দেওয়া মে-দিবস সম্পর্কে এক অনবদ্য অবদান। অরুণ বললো, অমন রচনা তার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়, অতএব মাথায় থাক দেড় গিনী, সে রাস্তার দিকে পা বাড়ালো। কেবল পা বাড়ালো তাই নয়, পা বাড়িয়ে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটের থেকে সাত নম্বর বাস ধরে ব্লেনিম ক্রেসেন্টে এসে গল্পটা বললো। সে খুব উৎফুল্ল ভাবে বলেছিল কাহিনীটা। বলেছিল সেদিনই সে বি, বি, সি, কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখবে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আর চিঠিটা লেখেনি। আমার যতদূর ধারণা বি, বি, সির বাংলা প্রচার তারপরও চলেছিল, এবং এখনও চলছে। বাংলাদেশে সে প্রচারের কোনো অর্থ হয়না—কজন লোকই বা অলওয়েভ সেট খুলে বসেন লণ্ডনের ঐ অপূর্ব সংবাদ শুনবার জন্য।

বি, বি, সির ঐ বিদেশী ভাষায় প্রচার একটা বাজে খরচ বলে অনেকে মনে করেন। ওখান থেকে, সঠিক কটা ভাষা মনে নেই, তবে অন্তত ত্রিশটি ভাষায় বৃটিশ মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়। অনুমতি না নিয়ে ইণ্ডিয়া হাউসের কোনো কর্মচারী কোনো প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করলে তার চাকরী যায়। যাওয়াও উচিত।

কোনো কোনো লোক বলে থাকেন, বিদেশে ওভাবে প্রচার না করে ভাল ইংরিজি বই সে সমস্ত দেশে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে প্রচারের ব্যবস্থা করলে ফল আরো ভাল হয়। আমার মনে হয়, তার চাইতেও ভাল হয় নগদ টাকা দেওয়া। লোকে ধন্য ধন্য করবে, বি, বি, সি থেকে সংবাদ প্রচারের কোন প্রয়োজনই হবে না।

বৃটেনে রেডিও প্রায় সমস্ত বাড়ীতে। সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এবং কখনো তারও পরেও সার্ভিস চলে। প্রায় প্রথম থেকেই বি, বি, সি প্রচারিত গান বাজনা বক্তৃতা নাটক ইত্যাদি শুনে শুনে কথা বুঝতে চেষ্টা করেছি। বৃটেনের এই ছোট দেশেও যে কতরকম কথায় ভঙ্গী তারও পরিচয় পেয়েছি প্রথমে ঐ রেডিও থেকেই।

আমাদের প্রথম প্রথম তাদের কথা বুঝতে সত্যিই খুব অসুবিধে হত। লণ্ডনের ককনি, ওয়েলশএর চাষী বা কেন্টের জমিদারের ভাষার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। আর স্কটল্যাণ্ড? তাহ'লে পুলকের কথা বলতে হয়। পুলক স্কটল্যাণ্ডে গিয়ে আমাকে লিখলো সে কাউকে কিছু বোঝাতে পারছে না, কারুর কথা সে বুঝছে না। ছবি এঁকে, অঙ্গভঙ্গী করে সে মোটামুটি কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। তারা বাসকে বলে বুস, ডাউনকে বলে ডুন, টাউনকে বলে টুন। আর সবচেয়ে আশ্চর্য কথা বলে মনে হয়েছিল যখন পুলক লিখেছিল, "আমার ল্যাণ্ডলেডি বি, বি, সি'র সংবাদ শোনেন না, কারণ এক বর্ণও তিনি বুঝতে পারেন না।" ইংরিজি বুঝতে আরো বেশি সময় লাগে যাঁরা অন্য দেশে ইংরিজি শিখেছেন তাঁদের।

আমাদের এডমনটোর রোডের বাড়ীর যে ঘরে আমি স্থান পেলাম সেটি আসলে ছিল আমাদের পুরোনো বন্ধু অমিতাভ দত্তের। অমিতাভ দত্ত ভারতবর্ষে চলে আসায় তার ঘরটায় আমি এসেছিলাম। এসে দেখি, তার ঘরে প্রচুর জিনিষপত্র পড়ে রয়েছে—সেগুলো শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায়নি। লণ্ডনে যারা কয়েক বছরের জন্য বাসা বাঁধে, তাদের অনেক জিনিষ না চাইতেই জুটে যায়। বিশেষ করে কেউ ভারতবর্ষে ফিরে যাবার সময় অনেক জিনিষই নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না, যেমন খাবারের প্লেট, কাপ, নানা রকম ভাঙা সুটকেস—সেগুলোতে জিনিসপত্র রাখাই চলে, কিন্তু তা নিয়ে কোথাও যাওয়া চলে না। ইচ্ছে না থাকলেও যত দিন যায় লণ্ডনে, তত জিনিসপত্রের বোঝা জড়ো হ'তে থাকে। সেগুলো এমন জাতের জিনিষ, যা না যায় ফেলা, না যায় রাখা। ঘরগুলো ছোট হওয়াতে রাখবার জায়গাও থাকে না। তা ছাড়া লঙ্কার গুঁড়ো, শুকনো পেঁয়াজ, টিনে করা মটরশুঁটি, টিনে করা মাংস এগুলোও জুটে যায়, না চাইতেই। কেউ ভারতবর্ষে ফিরে আসবে শুনলে অনেকেই কিছু দিন আগে থেকে তার বাড়ীতে যাতায়াত আরম্ভ করে—সব সময় বন্ধুত্বের খাতিরেই তা নয়—প্রায়ই দেখা যায় কাচের কুঁজো কিংবা

কাপ প্লেটের জন্যও। এ নিয়ে নানা রকম মন কষাকষি চলে। কারুর হয়তো একটা কম্বল আছে—কম্বলটা ভাল। ল্যাণ্ডলেডি সব বাড়িতে কম্বল প্রচুর দেবেই তার কোনো মানে নেই। অনেক ল্যাণ্ডলেডি ভাড়াটেকে কম্বল দেওয়াটা বিলাসিতার সমান মনে করে। বিশেষত' ভাড়াটের রঙ যদি কালো হয় তাহ'লে তো তাকে কম্বল দেওয়া মানে টাকা ছুঁড়ে জলে ফেলে দেওয়ার সমান। অতএব একখানা দুখানা কম্বল কাউকে কাউকে কিনতে হয়। এগুলো অবশ্য প্রায়ই যাবার সময় ফেলে যেতে হয়। অতএব এই কম্বল বা অন্যান্য ফেলে যাওয়া জিনিস সম্পর্কে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে মন কষাকষি সুরু হয়। কেউ কম্বল কেউ গ্রামোফোনের রেকর্ড, কেউ বই, কেউ পেন্সিল এসব পাবার জন্য প্রায় ছেলেমানুষী সুরু করে। এগুলো যে তারা কিনতে পারে না তা নয়—কিনতে পারে, কিন্তু তারা প্রমাণ করতে চায় প্রত্যেকেই সবচেয়ে বড় বন্ধু, কারণ তাকেই ভাল জিনিস দিয়ে গেছে।

অমিতাভের ভারতবর্ষের যাওয়ায় সময় এমনি কাণ্ড হয়েছিল। অনেক কিছু বিলি করেও অনেক কিছু রয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে খান কুড়ি রেকর্ড ছিল বাংলা এবং ইংরিজি। আর ছিল একটা বেহালা। ওর জন্য অবশ্য ভুল বোঝাবুঝিও অনেক হয়েছে। ঐ বেহালা ঘরে প্রকাণ্ড জায়গায় রাখার ফলে বেশ কয়েকজন পরিচিত লোকের সঙ্গে মন কষাকষি হয়ে গিয়েছিল। অনেকে ধরে নিয়েছিলেন যে বেহালা যখন ঘরে আছে তখন নিশ্চয় আমি তা বাজাতে পারি—পারিনা বললে কেউ বিশ্বাস করে না। বন্ধুত্ব শেষ পর্যন্ত আর বজায় রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু বাজালে আরো তাড়াতাড়ি পরিচিতেরা দূরে চলে যান। কখনো আমার সঙ্গে দেখা করতে আর আসেন না। খুব পরিচিত লোকেরা কখনই আমাকে বেহালা বাজাতে অনুরোধ করেননি।

লণ্ডনে আসবার আগে আমরা শুনেছিলাম ওখানে আমাদের সমস্ত বন্ধু-বান্ধবেরা বিয়ে করেছে গোপনে। যদিও ঠিক বুঝতাম না যে যদি তারা গোপনেই বিয়ে করে থাকে তাহলে খবরটা দেশে পৌঁছুলো কেমন করে? আমরা বন্ধু বান্ধবদের দেখলাম তারা একাই রয়েছে। তাদের বললাম, চালাকি নয়, বৌ কোথায় বার করো। তারা তো অবাক। আমরা ধরে নিলাম যে তারা বিয়ে ব্যাপারটাকে ভয়ানক গোপনে রেখেছে। আর আশ্চর্যও হলাম, কারণ বিয়ে করে গোপনে রাখা সেটা তাদের একটা বেজায় কেরামতি। বিশেষ ক্ষমতা না থাকলে সেটা সম্ভব হয় না। আশ্চর্য হলাম এই ভেবেও যে আমাদের বন্ধুদের প্রত্যেকেই বিয়ে করেছে আর তাদের প্রত্যেকেই ব্যাপারটা লণ্ডনে গোপনে রেখেছে কেমন করে? তাদের বাড়ীতে সম্ভব অসম্ভব সমস্ত সময়ে উপস্থিত হয়েছি কিন্তু দেখেছি বন্ধুরা কেউ শুয়ে শুয়ে রেডিও শুনছে, নইলে সসেজ ভাজছে, নয়তো চান করছে অথবা ঘুমুচ্ছে তাদের বৌদের দেখা পাইনি। ব্যাপারটা তাতে আরো সন্দেহজনক মনে হ'য়েছিল। আমরা সপ্তাহ দুয়েক খুঁজেই একটা সত্য আবিষ্কার করেছিলাম সেটা হ'ল এই: বন্ধুরা বিয়ে করেনি। কিন্তু যা জানতে আমাদের সপ্তাহখানেক লেগেছিল তা বার করতে অনেকের পক্ষেই বহু বছর সময় লাগে। ওখানে বিয়ে করাটা খুব অ-সাধারণ অবশ্য নয়। আমাদের মনস্তাত্বিক ওস্তাদ নির্মল রায় লণ্ডনে বহুদিন ধরে গবেষণা করছে কেন ভারতীয় ছেলেরা বিদেশে লেখাপড়ায় ফেল করে। ও একদিন বলেছিল যে ভারতীয় ছেলেদের শতকরা ষোলভাগ বিয়ে করবার সম্ভাবনা। যারা দু' বছরের কম থাকে তাদের দিয়ে করবার সম্ভাবনা শতকরা পাঁচেরও কম।

গোপনেও দু' একজন বিয়ে করে থাকেন। কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য। আর সেগুলো নামেই গোপন—আসলে সকলেই সেটা জানে। নির্মল ইঁদুর এবং ভারতীয় ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা করছে। তবে ও ফেল করবার সংবাদ পেলেই উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে, কারণ তাতে ওর একটা করে কেস বাড়ে। তার হাতে থাকে এক বিরাট প্রশ্নপত্র, সেই প্রশ্নপত্র নিয়ে ছাত্রদের কাছে যায়। ও স্বভাবতই যায় ফেলকরা ছাত্রদের কাছে। ফেলকরা ছাত্ররা এতে খুব খুসি হয় না। অথচ নির্মলের এই কাজ। লণ্ডনের যে সমস্ত ছাত্রেরা নির্মল সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে তাদের সবাই অন্তত একবার যে ফেল করেছে সে বিষয়ে প্রায় বাজী রাখা চলে। ফেল করার অনেকগুলি কারণের মধ্যে নির্মল দেখিয়েছে যে একা একটা ঘর নিয়ে থাকলেও লোকে ফেল করে, দুজনে মিলে থাকলেও ফেল করে, ল্যাণ্ডলেডির বাড়ীতে পেয়িং গেষ্ট হয়ে থাকলেও ফেল করে। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে ফেল করবার জন্য কোন বিশেষ কারণের প্রয়োজন হয় না। তবে ভারতীয় ছাত্রদের চাইতে যে ইংরেজরা বেশি ভাল করে সব সময় তাও নয়। আবার যারা নিজে আয় করে পড়াশুনা করে তারাও যে বেশি ফেল করে তা নয়। বাড়ী থেকে টাকা এনে পড়েও অনেকে ফেল করে।

ছাত্রেরা পরীক্ষা দিলে পাস এবং ফেল দুরকমই হয়। ইংল্যাণ্ডেও হয়, ভারতবর্ষেও হয়।

লণ্ডনে প্রচুর কাচ। এত কাচের ব্যবহার দেখে একটু আশ্চর্যই লাগে। দেশে আলো কম, ঠাণ্ডা বলে কাচের বিরাট জানালাই তো প্রশস্ত। তাতে আলো ঢোকে, কিন্তু বাতাস ঢোকে না। রোদ্দুর ঘরে ঢোকে, কিন্তু ঠাণ্ডাটা বাইরে আটকে যায়। দোকানের শো

স্কটসপাইন এবং উইপিং-উইলো গাছ

কেসে বিরাট কাঁচের ব্যবহার। বাড়ীতে, বিশেষ করে আধুনিক বাড়ীগুলিতে কাচের ব্যবহার বেশ বেড়ে চলেছে। ইংল্যাণ্ডেও যে আধুনিক বাড়ী তৈরী হচ্ছে সেটা কিরকম শোনায়। তবে সুখের কথা আধুনিক বাড়ীর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই।

আমাদের পাড়াটা একটু পুরোনো ধরনের। এই পাড়া থেকে কয়েক মিনিট হাঁটা পথ শেফার্ডস বুশ অঞ্চল। সেখানে ঘুরে ঘুরে একদিন পুরোনো বাড়ীগুলি দেখলাম।

এই পাড়াতেই বাস করতেন মাইকেল মধুসূদন। রাস্তার নাম উড লেন। নম্বর চোদ্দ। এখানে মাইকেল ঠাণ্ডা জলে চান করতেন ভয়ানক শীতের মধ্যেও। তখন মধুসূদনকে বছরে একবার বাড়ীভাড়া দিতে হত। বাড়ীওলা এবং ভাড়াটেদের সম্পর্ক খুব ভাল ছিল না। লণ্ডনে খুব কম বাড়ী ছিল, বাড়ীভাড়াও ছিল প্রচুর। মধুসূদন সখ করে ঠাণ্ডা জলে চান করতেন না। তিনি একটি চিঠিতে চান করা সম্পর্কে লিখেছেন: It is a fearful trial to one's nerves! এখনো বাড়ীওলার সঙ্গে যে গোলযোগ হয় না তা নয়। তবে কালো লোকদের সঙ্গে ল্যাণ্ডলেডির গোলযোগ একটু বেশি মাত্রায় হয়ে থাকে।

এডনমোর রোডের ফ্ল্যাট থেকে চলে যাবার কথা হল কারণ মিষ্টার বোসের আর এইরকম জীবন ভাল লাগছিল না। আমাদেরও ভাল লাগছিল না বিশেষ করে কার্লোর ত একেবারেই নয়। সে দু একবার বলেওছিল যে হয় সমস্ত রান্নায় নারকেল দিতে হবে নয়তো সে বাড়ী ছেড়ে দেবে। স্থির হল আমি এবং আমার পিসিমা এবং পিসতুতো ভাই (কয়েকদিন আগে এসেছে) একটা ফ্ল্যাট নেব আর রাণীদিরা আলাদা একটি ফ্ল্যাট নেবেন। কার্লোকেও বলা হল নিজের জন্য আস্তানা খুঁজে নিতে।

বাড়ী খুঁজতে বেরুতাম মাঝে মাঝে। ঐ পাড়ায়, আর্লস কোর্টে ব্যারন্‌স কোর্টে। কোথাও বাড়ী মিলত না। অনেক ল্যাণ্ডলেডি বলতো ফোনে, বাড়ী আছে। কিন্তু সেখানে গেলে তারা আমাদের গায়ের রঙ দেখে বলতো, ভাড়া হয়ে গিয়েছে। দুঃখিত।

এটা যে বর্ণবিদ্বেষ তা নয়। ভারতীয়রা বা নিগ্রোরা অনেকেই বাড়ীকে ব্যবহার করে না—করে অপব্যবহার।

আমাদের অধিকাংশই ঘরের মধ্যে পেঁয়াজ এবং শুকনো লংকা ভাজি, সে গন্ধে অনেকেই টিঁকতে পারে না। তা ছাড়া ইংরেজ কেন, ভারতীয় বাড়ীওয়ালাও অনেক আছেন যাঁরা ভারতীয়দের বাড়ীতে রাখতে চান না।

বাড়ী না পেয়ে অবশেষে একদিন শরণাপন্ন হ'লাম বেলাদির। বেলাদি বললেন হ্যাম্পষ্টেডে তাঁদের ফ্ল্যাটটাই আমরা নিতে পারি। ফ্ল্যাটটার সঙ্গে লাগানো এক বিঘের বেশি বাগান, বারান্দা, দু'খানি ঘর, রান্না ঘর টেলিফোন ইত্যাদি। ভাড়া সপ্তাহে চার গিনি। রাস্তার নাম লিণ্ডফিল্ড গার্ডনস। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলাম যে ঐ বাড়ীটিই আমরা নেব, কারণ বাড়ী খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হচ্ছিলাম। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমরা যে সমস্ত বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হই তার কোনোটাই প্রায় আমাদের পছন্দ হয় না, ভাড়া বেশি মনে হয়—আর যদি ভাড়া ঠিক মনে হয় তো বাড়ীওয়ালা আমাদের পছন্দ করে না। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমি একদিন আর্লস কোর্টের ডগলাস ওয়েষ্ট নামের এক বাড়ীর দালালদের অফিসে এসে হাজির হ'লাম। তাদের বাড়ী খুঁজবার জন্য টাকা দিতে হয় অগ্রিম। তিন গিনি—বা প্রায় তেষট্টি টাকা। জমা দেবার আগে পর্যন্ত তারা অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেছিল—খুব ভদ্রতা করেছিল। কিন্তু টাকা পাবার পরই চটপট কথাবার্তা সেরে একজন মহিলা কর্মচারী বললেন: প্রতি সপ্তাহে তোমাকে বাড়ী ভাড়ার বিজ্ঞাপন পাঠাব, যদি বিজ্ঞাপন দেখে কোনো ফ্ল্যাট পছন্দ হয় তবেই তার ঠিকানা দেবো। ঠিকানা কাগজে ছাপানো পাবে না। তবে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে মনে হয়।

তিন চারদিন অপেক্ষা করতেই একখানা চিঠি এসে হাজির। তাতে বারো চোদ্দটা ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপন। কোনোটিই সাপ্তাহিক ছ সাত পাউণ্ড-এর কম নয়। দু একটিতে লেখা আছে ভারতীয়দের নেওয়া হবে না। কোনটিতে শিশু বা কুকুর থাকলে ভাড়া দেওয়া হবে না। আর একটি দুটিতে লেখা আছে ভাড়া ছ পাউণ্ড কিন্তু গায়ের রঙ কালো হ'লে সাত পাউণ্ড। প্রথম সপ্তাহে কোথাও যাওয়া হ'ল না। দ্বিতীয় সপ্তাহে দু একটি ফ্ল্যাট চার পাঁচ পাউণ্ডের মধ্যে বিজ্ঞাপনে দেখে ডগলাস ওয়েষ্টের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করতে গেলাম যখন, তখন তাঁরা বললেন, এখুনি দেখে কোন লাভ নেই কারণ, ফ্ল্যাটগুলি ভাড়া হ'য়ে গিয়েছে।

ঐ বাড়ীর এজেন্টের দরজায় দিব্যি ভীড় দেখতে পেলাম। বিশেষ করে রঙ যাদের কালো। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি খুব আন্তরিক ভাবে কাজ করতো বলে আমার মনে হয়নি। কারণ, আমরা বহুদিন অপেক্ষা করেও তাদের কাছ থেকে কোনো রকম সত্যিকারের সাহায্য পাইনি। পরে লোকেদের কাছে শুনেছি লণ্ডনে বাড়ীর দালালরা সবাই খুব সৎ নয়। দু একটি কেস পড়েছি খবরের কাগজে, এই ভাবে প্রচুর টাকা অনেক কম্পানী জনসাধারণের কাছ থেকে মেরে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তো বিলেতে আইন করতে বাধ্য হ'ল যে বাড়ী খুঁজে না দিতে পারলে দালালের টাকা মিলবে না। এখন অবস্থার উন্নতি হ'য়েছে দালালেরা সত্যিই বাড়ী খুঁজছে। আর বাড়ীর সমস্যাও অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে আসছে তাতে সন্দেহ নেই। প্রতি বছর প্রচুর বাড়ী তৈরী হ'চ্ছে ওখানে।

লণ্ডনের অধিবাসীদের মধ্যে উদ্ভিজ্জ অধিবাসী আছে প্রচুর। আমি গাছপালার কথা বলছি। বসন্তে এবং গ্রীষ্মে লণ্ডন সবুজ হ'য়ে ওঠে। এত বেশি গাছ কোনো সহরে আছে বলে আমার মনে হয় না। গাছগুলির সৌন্দর্য্যও অসাধারণ, ওক, এলম, অ্যাশ, স্কটস পাইন বীচ, বার্চ, লাইম, পপলার, হলি বা ইউ গাছ এ সমস্তই লণ্ডনের পাড়ায় পাড়ায় দেখতে পাওয়া যায়। পপলারের ছায়া ঠাণ্ডা, সেই ছায়ায় বসলে সমস্ত প্রকৃতিকে ভাল লেগে যায়। আর আছে উইপিং উইলো বা কাঁদুনে উইলো। এ গাছ জলের ধারে হয় বেশির ভাগ আর ডাল নুয়ে পড়ে জলের উপর। মনে হয় যেন কেঁদে কেঁদে গাছ পুকুর করে ফেলেছে। গাছের সৌন্দর্য ইংল্যাণ্ডে যেমন করে বোঝা যায় আর কোনো দেশে তেমন করে বোঝা যায় কি না জানি না। জগদীশচন্দ্র বসুর পদার্থ বিদ্যা থেকে উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করার মূলেও হয়তো এই বিলিতি গাছদের সৌন্দর্য।

এডনমোর রোডে আমার জানালা দিয়ে বাইরে দেখা যেত হর্স চেষ্টনাটের গাছ। হর্স চেষ্টনাটের পাতাগুলি কাঁঠাল পাতার চেয়েও

বড় আর ওর গোছা গোছা ফুল দূর থেকে মনে হয় যেন জ্বলন্ত মশাল। ফুলের রঙ সাদা। এই গাছ জানালার এত কাছে ছিল যে মাঝে মাঝে এটা থেকে ফুল ছিঁড়ে নিতে অসুবিধা হ'তনা। এখানে মৌমাছির সংখ্যাও সামান্য নয়। এখানে অবশ্য মৌমাছির চাষ করা হয়। বুনো মৌমাছিও প্রচুর। এক সের মধুর দাম খৎ সামান্য, দু টাকার কিছু বেশি। দোকানে দোকানে টিনে বা বড় মুখ ওয়ালা বোতলে মধু পাওয়া যায় কিনতে। সেগুলো রুটির সঙ্গে খেতে বেশ লাগে।

এডনমোর রোডের পাড়ায় পোর্টো বেলো রোডের মত হাট নেই। কিছু দূরে হ্যামারস্মিথ, সেখানে শনিবারে হাট বসে রাস্তায়। কিন্তু দশ মিনিটের হাঁটা পথ সেখানে গিয়ে আমরা কখনো হাট করিনি। পাশে কিছু দোকান ছিল, আর ছিল লায়ন্স ষ্টোর্স। লায়ন্সের খাবার দোকানে যেমন খাওয়াও যায়, তেমনি তাদের দোকান থেকে শুকনো চা কফি কেক রুটি এ সমস্ত কেনা যায়। তাদের যে মাংস, মাছ চাল ডালের দোকান ছিল তা জানতাম না। একমাত্র এডনমোর রোডের পাড়াতেই দেখেছি। এদের দোকানটিতে মনে হয় দাম একটু বেশি নিত, জিনিস সমস্তই খুব ভাল পাওয়া যেত। সবই বাছা বাছা জিনিস। দোকানে টিনের অংশও কম নয়। টিনের মধ্যে মাংস, মাছ, সসেজ, রান্না করা মাংস, কাঁচা আপেলের টুকরো, চিনির সঙ্গে কমলা লেবু মেশানো, ঘন দুধ, অলিভ তেল কত রকমের যে জিনিস পাওয়া যায় তার সীমা সংখ্যা নেই। বাজার না করেও কেবল টিনের খাবার খেয়েও অনেক দিন কাটানো যায়। অনেক সময় কাঁচা ফলের চাইতে টিনে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রাখা ফল বেশি সুস্বাদু হয়। আম পর্যন্ত আমরা টিনে ভর্তি কিনেছি। ভারতীয় নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সেগুলোর চালান আসে। রাণীদি এসে রান্না করা সুরু করলে কার্লো চটে গিয়ে বাড়ী খুঁজতে সুরু করলো নিজের জন্য, আর বাড়ীর রান্না না খেয়ে প্রচুর টিনের খাবার খেতে সুরু করলো। অধিকাংশই মাংস—আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে চালান আসে সেগুলো। একটিন মাংসের দাম দু'শিলিং, দু'বেলা একজনের চলে যায়।

কার্লোর স্বপাক খাওয়া দেখে মনে হ'ল ওকে একটু জব্দ করা যাক। ও চার পাঁচটা টিন কিনে রাখতো, মাংসের, আনারসের ইত্যাদি। আমি এবং বল্টু ঠিক ঐ রকম আকারের অন্যজিনিসের টিন আনলাম—তার কোনটায় রয়েছে দুধ, কোনটায় আম। সেগুলো এনে লেবেলগুলি জলে ভিজিয়ে তুলে বদলে দিলাম। ওর টিনগুলির লেবেলগুলিই ঠিক রইল, কিন্তু ভেতরের জিনিস গেল বদলে।

কার্লো একদিন শনিবারে দেরি করে এসেছে। আমাদের তখন খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে। কার্লো এসে প্রথমে মার্গারিন দিয়ে পেঁয়াজ ভেজে হলুদ নুণ লঙ্কা এবং নারকেল দিয়ে বেশ মেশাচ্ছে। তারপর সে মাংসের টিন নিয়ে এসে খুলতে আরম্ভ করলো টিন খোলা যন্ত্র দিয়ে। টিন খুলে সে হতভম্ব। তার মধ্যে আম। সে লেবেলটা পড়লো—তাতে লেখা আছে মাংস—অথচ ভেতরে আম।

গজগজ করতে লাগল। আমরা বললাম, ব্যাপারটা কি? কার্লো বললো, কালে কালে কতই না দেখব। মাংসের টিনে আম! আমরা বললাম কই দেখি! বলে প্লেটে সবাই আম নিয়ে খেয়ে শেষ করে দিলাম। কার্লো তখন আর একটা টিন নিয়েছে তাতেও লেখা আছে মাংস, এবারে সে টিন থেকে বার হ'ল মধু! এর পর সে পর পর পাঁচটা টিন খুলে ফেললো, আর একটা আনারসের টিন থেকে বেরুলো হেরিং মাছ, দুধের টিন থেকে বেরুলো ষ্ট্রবেরী!

ক্ষেপে গিয়ে সে সমস্ত টিন দোকানে দিয়ে এল ফেরত। দোকানদারকে আগেই শেখানো ছিল। দোকানদার তাকে ফেরত দিয়ে দিল। নতুন একটা মাংসের টিন নিয়ে সে বাড়ীতে এসে যখন খুললো, তখন···পাওয়া গেল কৌটো ভর্তি জ্যাম!

কার্লো এবারে রেগে নাচতে আরম্ভ করলো। এত বেশি সে কখনো রাগেনি বা নাচেনি এর আগে। সে নাচতে নাচতে বলতে লাগলো, ইংরেজরা বদমাইশ! তাদের জাতের আর উন্নতির আশা নেই!

আমরা ওর জন্ম রান্না করেই রেখেছিলাম—ওকে তাই খেতে দিলাম। কিন্তু ওর গজগজানি আর কিছুতেই থামে না। পরে তাকে যখন বোঝালাম এটা আমরাই করেছি তখন সে স্থির করলো আবার সে চেয়ার মেরামত করবে। কিছুতেই তাকে চেয়ার মেরামত করা থেকে নিবৃত্ত করা গেল না।

অর্থাৎ বাড়ীতে আর একটি চেয়ার কম পড়ল। কার্লো যদি এমনি মেরামত করতে থাকতো তাহ'লে শীগগিরই সে বাড়ীতে চেয়ার আর থাকত না। কিন্তু সব সমেত ও দুটো চেয়ারই মেরামত করেছিল। ল্যাণ্ডলেডি খুঁত খুঁত করেছিলেন, কিন্তু টাকা আদায় করেননি।

কার্লোর বাড়ী সিংহল। কাজ করত ইণ্ডিয়া হাউসে। ভারতীয় এই অফিসে ভারতীয় কজন মাইনে পান জানিনা, তবে শ' তিন চার যে ভারতীয় নন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইণ্ডিয়া হাউসে মরিশাসের লোক, আফ্রিকান, ইংরেজ সবাই কাজ পান। একবার একটি জার্মান মেয়েকেও কাজ করতে দেখেছি। এমন কি ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট—মিলিটারি এবং এয়ার ফোর্সের বাড়ীতেও অভারতীয় লোককে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দেখেছি। ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত মনে হয়েছে আমার। কারণ লণ্ডনে আমাদের

চুল কাটিয়ে এসেছি না বলে দিলে কেউই বিশ্বাস করত না।

অফিস থেকে কি কি কেনা বেচা হয় তার হিসেব যে কোনো অন্য রাষ্ট্রের পক্ষে জানার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

লণ্ডনে যতদিন গেল তত দেখলাম চোখের সামনে সমস্ত জিনিসের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের পাড়ার কাফেতে, লায়ন্সের দোকানে, বাসে, টিউবে সর্বত্র এক পেনি আধ পেনি করে দাম বাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জিনিসপত্রের দাম, গ্যাসের দাম বেড়ে চলতেই লাগল। এই দামের গতি খুব কম সময়েই কমতির দিকে দেখেছি। এমন কি বৃটেনের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস ছিল একেবারেই দাতব্য। যে কোনো অপারেশন এবং যে কোনো ওষুধ যে কোনো লোকই বিনামূল্যে পেতে পারত—এমন কি চশমার পর্যন্ত দাম দিতে হ'ত না। কিন্তু আস্তে আস্তে এগুলোর জন্য কম হ'লেও মূল্য দিতে হ'ল লোকদের। বিনা মূল্যে চশমা পাওয়া গেল না, কিন্তু সস্তা করা হ'ল। কিন্তু যেমন হয়ে থাকে, সস্তার তিন অবস্থা—সে চশমার ফ্রেম ছ' মাসের বেশি টিকলে লোকেরা "সেলিব্রেট" করে। দোকানে ঢুকে বন্ধু-বান্ধব পাড়ার লোকেদের বীয়ার খাইয়ে দেয়।

আগে প্রেসক্রিপশনে ওষুধ পাওয়া যেত বিনা মূল্যে। তার পর স্থির হ'ল, প্রতি প্রেসক্রিপশনে এক শিলিং দিতে হবে। এখন প্রতি ওষুধের জন্য এক শিলিং দিতে হয়। একেও নামমাত্র মূল্যই বলা চলে, কারণ একশো টাকা দামের ওষুধও বারো আনায় পাওয়া যায়। একথায় আমাদের অবাক হবারই কথা।

ইংরেজেরা চোরা কারবার করে—ওষুধেও চোরা কারবার করে, গাঁজা, ভাঙ, আফিঙও তারা গোপনে বিক্রি করে। তবে ইংরেজরা সুযোগ পেলেও সবাই চোর হয় না। অধিকাংশ লোক সৎ প্রকৃতির হওয়ার জন্যই এ রকম নিয়ম চালু রাখতে পারে তারা। তা ছাড়া পুলিস অপরাধীদের বার করবার জন্য সব সময় চেষ্টা করে বলে অপরাধীরা প্রায়ই ধরা পড়ে। সবাই যে টাকার অভাবেই চুরি করে তা নয়। আমাদের দেশেও বহু ব্যবসায়ীর টাকার অভাব নেই, কিন্তু তারা ভেজাল দিয়ে লোক খুন করছে রোজ—টাকার জন্য। এটা এক রকমের অভ্যেস। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজরা চোর নয়। ইংরেজরা সব জিনিস চুরি করে না। যেমন খবরের কাগজ এবং দুধ। দোকানদার সমস্ত খবরের কাগজ রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যায়—লোকেরা সেখানে পয়সা রেখে কাগজ নিয়ে আসে। বাড়ীর বাইরে থাকে দুধের বোতল, চুরি করার পক্ষে এর চাইতে সহজ ব্যাপার আর আর কিছু নেই। অথচ এগুলি কিছুতেই চুরি হয় না।

—একেবারেই কি দুধের বোতল চুরি হয় না?

—হয়তো দু একটি হয়। কিন্তু বোতল চুরি না হলেও দুধ চুরি হয়।

—সে আবার কি রকম কথা? চুরি তো হয়।

—হ্যাঁ হয়। কিন্তু এর জন্য মানুষ দায়ী নয়।

—তবে কে?

—তবে বলি। এর জন্য দায়ী হল পাখি। ও পাখির নাম হল ব্লু টিট। এর চেহারা ছোট, গায়ের রঙ প্রধানত নীল কিন্তু পিঠের উপরে খানিক সবুজ, পেটের কাছে হলুদ রঙ এবং মাথার উপর সামান্য লাল। এই পাখিগুলি দুর্দান্ত। এরা মানুষের বাড়ীতে বাসা নেবার জন্য ঘুরে বেড়ায়। গোল্ড ফিঞ্চ পাখী যেমন খুঁজে বেড়ায় বাস-গর্ত, এরা তেমনি খুঁজে বেড়ায় মানুষের বাড়ী। আর এরা দুধ খায়।

আগে বোতলে থাকতো কাগজের ঢাকনা। কাগজ খুলে দুধ খেতে এই ব্লু টিটের ছিল সুবিধে, এখন ধাতুর ঢাকনা ব্যবহার হয়। কিন্তু ব্লু টিট এ ঢাকনাও খুলতে শিখেছে। লণ্ডনের বেশ কিছু দুধ ব্লু টিটে চুরি করে খায়।

দুধ সস্তা এ দেশে। এক পাইন্টের দাম সাত পেনি। মাখমের সের তিন টাকারও কম। দুধ সবাই খায় বলে মনে হয়। হয় দুধ নয়তো চা বা কফী—মোট কথা প্রচুর দুধের ব্যবহার। অথচ লণ্ডনে গরু নেই। এক কোলকাতার মাড়োয়ারী ভদ্রলোক লণ্ডনে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন লণ্ডনের দুধ কলে তৈরি হয়, কারণ সমস্ত লণ্ডনে গরু নেই! গরু না থাকলে তার দুধ আসে কোথেকে?

আসে লণ্ডনের বাইরে থেকে। বাইরে গরুদের যত্নে রাখা হয়। কিন্তু মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে বোঝানো দায়। তিনি কিছুতেই বুঝবেন না যে গরুর খাঁটি দুধ স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে পেতে হ'লে লণ্ডনের বাইরেই ভাল। লণ্ডনের বাইরে প্রচুর ঘাস আছে। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দুঃখিত হয়েছিলেন খুব। তিনি বলেছিলেন, গরুর দুধের জন্য নয়, গরু যে দেবতার সমান—অন্তত সেজন্যও কিছু কিছু গরু লণ্ডনে রাখা উচিত।

এই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সম্পর্কে আরো দুটো গল্প আছে। ইণ্ডিয়া হাউসে রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ মূর্তি আছে—সেটিকে দেখে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের নাম তাঁর জানা আছে—খুব বড় কবি—কবিতা লিখে এত খাতির পেয়েছিলেন যে তাঁকে ভারতবর্ষের প্রথম হাইকমিশনার করে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত তিনি উনসত্তর গিনি খরচ করে একটা টেলিভিশন কিনেছিলেন। কেবল কেনা নয়—কোলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। তিনি কোলকাতায় লোকদের অবাক করে দিতে চেয়েছিলেন।

কোলকাতার লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে আমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করি না।

আমরা যখন জাহাজে আসি তখন বহু লোক বলে দিয়েছিল যে লণ্ডনে চুল কাটার ব্যাপারে সাবধানে থাকতে। নাপিতেরা নাকি মাথায় কাঁঠাল ভাঙে। আমি আর পুলক বসু এক জাহাজে এসেছিলমে, আমরা লণ্ডনে চুল কাটাবার ভয়ে জাহাজে চুল কাটিয়ে নিয়েছিলাম।

কিন্তু লণ্ডনে গিয়ে দেখলাম সেখানেও চুল কাটার প্রয়োজন। চুলকাটা খবরের কাগজের মত অনেকটা। খবরের কাগজের সঙ্গে চুল কাটার সম্পর্ক আমাদের দেশে আছে। এতে গায়ে চুলও পড়ে আর খবরের কাগজটিও নষ্ট হয়। তা ছাড়া একবারে যেমন এক বছরের মত খবরের কাগজ কিনে রাখা যায় না, তেমনি একবারে এক বছরের মত চুলও কাটিয়ে রাখা যায় না।

লণ্ডনে চুল কাটাতে যেতেই হল। দেখলাম খুব যে শক্ত ব্যাপার তা নয়। চুল কাটাতে পাঁচ মিনিট সময় লাগে, দু শিলিং দাম লাগে আর দু পেনি বকশিস দিতে হয়। কিন্তু একে হেয়ার কাট বলেনা, বলে ট্রিম। লণ্ডনে সবাই ট্রিম করে। যারা হেয়ার

কাট করায় তাদের খরচ হয় প্রচুর। দু তিন পাউণ্ড পর্যন্ত খরচ হতে পারে। অতএব আমরা একটি মাত্রই জপ করতাম আর তা হল, কেবল ট্রিম করে দাও।

সব সময় চুল কাটাবার পর বোঝা যেতনা চুল কাটা হয়েছে কিনা। আমরা প্রায়ই চুল কাটিয়ে এসে বন্ধুবান্ধবদের বলতাম যে চুল কাটিয়ে এসেছি। না বলে দিলে কেউই প্রায় বিশ্বাস করত না।

এইখানে একটি ঘটনা বলবার লোভ সামলাতে পারছিনা। সাধন ঘটকের ফ্ল্যাটে প্রতি শুক্রবার রাত্রে কন্ট্রাক্ট ব্রিজ খেলা হত। আসলে সেখানে ঝগড়াই বেশি হত। সেখানে অবতার সিং মারওহা, সুনীত রায়, অনিল আইচ, গডবোলে, নটরাজ শর্মা, সুনীল চ্যাটার্জি ইত্যাদি সবাই খেলতে যেত, আমিও যেতাম। ঘটক বলত, ব্রিজ খেলতে আস কেন, লুডো খেললেই পারো? এই খেলাটার একটি ব্যাপার আমার মাথায় এখনো ঢোকে না—তা হল নিজে ছাড়া আর সবাই কেন ভুল খেলে? যাই হক, এই খেলায় কিঞ্চিৎ বাজি রাখা হত। প্রতি পয়েন্টে এক পেনি। একবার সারারাত্রি খেলে অনিল আইচ দশ শিলিং জিতেছিল। অনিল খেলা শেষ করে দেখলো শুক্রবারটা কেমন করে শনিবার হয়ে গেছে। নটা বেজে গেছে।

দশটার সময় তার একজন ইংরেজের সঙ্গে দেখা করার কথা পিকাডিলিতে।

হন্তদন্ত হয়ে সে ছুটে বেরুলো।

পিকাডিলিতে এসে দেখলো বেলা তখন সাড়ে ন'টা, ইরসের মূর্তি, লাল লাল বাস, ব্যস্ততা চারদিকে।

আর লোক। চারিদিকে লোকজন।

সারারাত্রি তার ঘুম হয়নি। অন্যমনস্ক ভাবে সে তার গালে হাত দিতেই চমকে উঠলো।

দেখা করতে হবে ইংরেজের সঙ্গে। কিন্তু দাড়ি! ঘুম!!

ঢুকে পড়লো চুলকাটার দোকানে। চেয়ারে বসলো।

দাড়ি কামিয়ে দাও—বললো নাপিতকে। বলে সে চেয়ারে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল।

নাপিত ঐ অবস্থাতেই দাড়ি কামালো। তার মুখ ম্যাসাজ করে দিল, চুল টেনে টেনে দিল। মাথায় তেল মালিশ করে দিল। আধ ঘণ্টা লাগল প্রায়।

অলরাইট সার!

ঘুম ভাঙল অনিলের। হ্যাঁ অলরাইট তো বটেই। কিন্তু দশটা বাজে। এই নাও পয়সা—বলে দশ শিলিঙের নোটটা দিল নাপিতের হাতে। নাপিত নোট নিয়ে দেখলো। একটু হেসে বললো, আপনার ভুল হ'য়েছে। অনিল বললো, ও খুচরো নেই বুঝি? কী বিপদ?

নাপিত বললো, খুচরো দোকানে যথেষ্টই আছে তবে দশ শিলিং চার্জ নয়—চার্জ সাড়ে বারো শিলিঙ। আরো আড়াই শিলিঙ চাই, নাপিত বিল দেখালো:

দাড়ি কামানো—দেড় শিলিং
ম্যাসাজ —দশ শিলিং
তেল —এক শিলিং

মোট সাড়ে বারো শিলিং

অনিলের ঘুম ভেঙে গেল। সে একশিলিং বকশিস সমেত সাড়ে তেরো শিলিং নাপিতকে দিয়ে বেরুলো। এখনো অনিলের দাড়ি কামাতে গিয়ে প্রতিবারই সে কথা মনে পড়ে। আর একটি ছেলে, নাম তার প্যাটেল। মে ফেয়ারের ফ্যাশন দুরস্ত এক চুল কাটার দোকানে সে ভুল করেই ঢুকে পড়ে একদিন। যখন সে বেরোয় তখন তার পকেট থেকে তিন পাউণ্ড কমে গিয়েছে।

চুল কাটতে তার লেগেছিল তিন পাউণ্ড। দোকানদার তাকে কি ভেবেছিল কে জানে। হয়তো ভেবেছিল ভারতীয় মহারাজাই হবে। তাকে খাতির করেছিল মহারাজারই মত।

তার সাপ্তাহিক মাইনে ছিল তিন পাউণ্ড পোনের শিলিং ন পেনি। দু পেনির এদিক ওদিক হ'লে তার সমস্ত বাজেট গোলমাল হ'য়ে যায়। সে বাড়ীতে খায় দুধ রুটি আর ভেজিটেবল, কখনো দু'একটা সস্তা হেরিং মাছ। কখনো সে সিনেমায় যায় না। কোনো বন্ধুর সঙ্গে সে প্যারিস বা রোম কেন, লণ্ডনের আঁশে পাশের উইণ্ডসর বা সেন্ট অলবানসে সে যায় নি। যাওয়ার মত তার অবস্থা ছিল না। সে ভাবতেই পারত না লণ্ডন থেকে বাইরে কেউ যেতে পারে। অফিস বাড়ী এবং পড়াশুনা এই ছিল তার জীবন।

সেদিনই তাকে দিতে হবে ঘর ভাড়া, দেড় পাউণ্ড। থাকে হাম্পস্টেডের ভারতীয় বাড়ীওয়ালা বেনারসীর বাড়ীতে।

লাঞ্চের পর সে যখন চুল কেটে অফিসে ফিরে এল তখন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখছে। কী করবে সে। কোথায় যাবে, কেমন করে সপ্তাহ চালাবে? অথচ দোকানদার যখন জিজ্ঞেস করেছিল, চুলটা কি রাজা ষষ্ঠ জর্জের মত করে কেটে দেব? সে আপত্তি করেনি। সে দাম জিজ্ঞেস করেনি।

চরম দুরবস্থায় ভারতীয়রা যা করে সে তাই করলো। হাসপাতালে গেল। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের বাড়ী ভাড়া বাকী পড়ে গেলে তারা হাসপাতালে যায়। তাদের পক্ষে এটা আশীর্বাদ—কারণ এর ফলে থাকা খাওয়ার খরচ বেঁচে যায়। জিনিস-পত্রগুলো বন্ধুর বাড়ীতে রেখে দেয়।

কেউ তাই লণ্ডনে হাসপাতালে গেলে চলতি কথাই ছিল: ও কি ছুটিতে কন্টিনেন্টে যাচ্ছে। সে জন্যই কি টাকা জমাচ্ছে?

না কি প্রচুর ধার হ'য়েছে?

এই তিনটে কারণ ছাড়া কেউ হাসপাতালে যাবেই বা কেন? হাসপাতালে যাওয়ার আরো কতকগুলি কারণ আছে—সেখানে কেবল বাড়ী ভাড়া খাওয়ার খরচই যে বাঁচে তা নয়—সেখানে সর্বদা ঘর গরম—গ্যাসের খরচ নেই। অত ভাল খাওয়া সাধারণ হোটেলে পাওয়া যায় না। ওখানে পড়াশুনা করবার মত প্রচুর সময় পাওয়া যায়। সিনেমা দেখানো হয়—বিনামূল্যে। পাওয়া যায় নার্সের যত্ন। ল্যাণ্ডলেডির কাছ থেকে যা পাওয়া অসম্ভব। "অসুস্থ" থাকলে মাইনে বেশি পাওয়া যায়। ন্যাশনাল ইনসিওর্যান্স থেকে টাকা পাওয়া যায়। আর একটা সুবিধে আছে যদি কোন অসুখ থাকেই, সেটাও সারানো যায় হাসপাতালে।

এত সুবিধে অতএব হাসপাতালে যাবে না কেন?

প্যাটেলও তাই করেছিল। প্রয়োজন কেবল একটি ডাক্তারের সার্টিফিকেট। লণ্ডনে চেনা ডাক্তার সার্টিফিকেট দিতে কার্পণ্য করেন না। এ রকম সার্টিফিকেট দিতে ডাক্তারের একটি পয়সাও খরচ হয় না। [ক্রমশঃ।
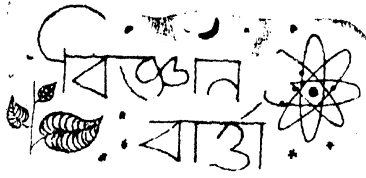
# রেডিও আবিষ্কার ও জগদীশচন্দ্র

১৯০০ সাল। প্যারিসে সে বছর বিরাট প্রদর্শনী। এ উপলক্ষে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক বৈঠক বসবে। দেশ-দেশান্তরের মনীষিগণ নিজ নিজ প্রতিভা প্রকাশে স্বদেশের মহিমা বিস্তৃত করবেন আজ এই প্যারিসে। দেশভক্ত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তখন ফ্রান্সে। তিনি প্রশ্ন করছেন—"এই জার্মান, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী প্রভৃতি বুধমণ্ডলীমণ্ডিত মহারাজধানীতে তুমি কোথায় বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব ঘোষণা করে? সে গৌরবর্ণ প্রতিভামণ্ডলীর মধ্যে হতে এক যুবা যশস্বী বীর বঙ্গভূমির, আমার মাতৃভূমির, নাম ঘোষণা করিলেন—সে বীর জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক—"

বলা বাহুল্য, মাতৃভূমির মুখোজ্জলকারী এই বিজ্ঞান-সাধক হলেন আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি কর্ণু লিখছেন—

"আপনার আবিষ্ক্রিয়ার ফলে বিজ্ঞান বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। দু' হাজার বছর পূর্বে আপনার পূর্বপুরুষগণ মানব সভ্যতায় অগ্রণী ছিলেন এবং বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় জগতকে পথ নির্দেশ করেছিলেন।"

যে ভারত একদিন জ্ঞানে বিজ্ঞানে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর তা আর রক্ষিত হয় নি। ভাস্করাচার্য্যের পর প্রায় সাত শ' বছর ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে এক নিরবিচ্ছিন্ন অন্ধকার যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে জগদীশচন্দ্রের আবির্ভাব তাই ভারতের ইতিহাসে অতি স্মরণীয় ঘটনা।

উদ্ভিদ-বিদ্যায় জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণার ফল আজ সাধারণ বাক্যে পরিণত হয়েছে। গাছের যে প্রাণ আছে, অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় বোধশক্তিও আছে এ কথা আজ কে না জানে? বৃক্ষের জন্ম মৃত্যু ও বৃদ্ধি, বাহিরের আঘাতে প্রতিক্রিয়া, জড়বস্তুর অবসাদ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যে নূতন তথ্য সন্নিবেশ করেছেন তা পৃথিবীর একজন বিশিষ্ট জীবতত্ত্ববিদ রূপে তাঁকে স্বীকৃতিদান করেছে। জগদীশচন্দ্রের অবদান কিন্তু প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে নি, উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে গবেষণার আগে তিনি বেতার তরংগ বিষয়েও মনোনিবেশ করেছিলেন। আজ যে কোন সাধারণ জ্ঞানের পুস্তকে রেডিও আবিষ্কারক রূপে ইতালীর এক বৈজ্ঞানিকের নাম আমরা দেখতে পাই—বেতার-তরংগ উদ্ভবের ষাট বছর পরে আজ যখন এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ স্থির হয়ে এসেছে, তখন জগদীশচন্দ্রের জন্ম-শত-বার্ষিকী উপলক্ষে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের এই বিচিত্র অধ্যায়টি অনুত্তেজিত মনে আর একবার আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা একটু গোড়ার থেকে সুরু করছি।

## আলোকের স্বরূপ ও অদৃশ্য আলো

পুকুরে ঢিল ফেললে ঢেউ জাগে, আলোও তেমনি একপ্রকার কম্পন সৃষ্টি করে। এই কাঁপনের ফলেই সূর্য্যের কিরণ নয় কোটি আঠাশ লক্ষ মাইল অতিক্রম করে পৃথিবীতে এসে পড়ে, অথবা সুদূর তারকার আলো লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ (১) Light Year অতিক্রমের পর আমাদের চোখে ধরা দেয়। পুকুরের ঢেউ মানে জলের কাঁপন, কিন্তু আলো কাঁপন জাগাবে কিসে? জলে নয়, বাতাসে নয় (জল বা বাতাস যেখানে নেই সেখানেও আলো থাকতে পারে)—হয়গেন্স (Haugens) বললেন, ইথারে—কল্পনা করো, সারা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী একটি পদার্থ রয়েছে, তার নাম ইথার। আলো মানে এই কাল্পনিক ইথারের কাঁপন। ইথারের এই স্পন্দন যখন আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন তা আলোর অনুভূতি জাগায়। এই স্পন্দন সেকেণ্ডে চার শ লক্ষ কোটিবার হলে আমাদের কাছে লাল আলো বলে প্রতীয়মান হয়। এর দ্বিগুণ স্পন্দনে বেগুনি আলো দেখায়। কম্পন-সংখ্যা এর কম বা বেশী হলে কিন্তু কিছু দেখা যাবে না। অত্যন্ত মৃদু বা তীক্ষ্ণ শব্দ যেমন আমরা শুনতে পাই না—আমাদের দর্শন ক্ষমতারও তেমনি একটা সীমারেখা আছে। কিন্তু দেখতে না পেলেও ইথারের এই তরংগকে আমাদের আলো বলতে হয়—নূতন এক প্রকার আলো বা অদৃশ্য আলো—আলো কিন্তু যার সাহায্যে কিছু দেখা যায় না। অদৃশ্য আলো কথাটা কিন্তু ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। আলো মাত্রই তো অদৃশ্য, যদিও তা আমাদের দেখার কাজে সাহায্য করে—যেমন যে জিনিসটি দিয়ে ঝাড়ু দেওয়া হয় তা আসলে নোংরা হলেও ঘরদোর পরিষ্কার রাখে। অদৃশ্য আলো অদৃশ্য তো বটেই, উপরন্তু দেখার কাজেও সাহায্য করে না।

## ফ্যারাডের চিঠি ও বৈদ্যুতিক প্রভাব

১৮৩২ সালে মাইকেল ফ্যারাডে রয়েল সোসাইটিতে একটি চিঠি লেখেন, সাম্প্রতি তা প্রকাশ পেয়েছে। এই পত্রের মর্মবস্তু আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। তার আগে বিদ্যুৎ বা চুম্বকের একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা প্রয়োজন। বিদ্যুৎপূর্ণ অর্থাৎ চার্জড্, charged পদার্থের কাছে রাখলে বিদ্যুৎ পরিবাহী যে কোন পদার্থ (conductor) চার্জড হয়ে থাকে (চিত্র এক) একে আমরা বলি বৈদ্যুতিক প্রভাব (Induction)।

চিত্র এক। ক বিদ্যুৎপূর্ণ পদার্থ। বিদ্যুৎপূর্ণ পদার্থের প্রভাবে খ-ও বিদ্যুৎপূর্ণ বা চার্জড হলো।

---

১। এক বছরে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল অর্থাৎ $৩ \times ১০^{১০}$ সেন্টিমিটার।

চুম্বকের ক্ষেত্রে এই প্রভাব-বিশিষ্ট রেখায় সঞ্চারিত হয়, তা হলো চুম্বকবল-রেখা (magnetic lines of force) (চিত্র দুই)। ফ্যারাডে বলছেন—চুম্বক বা বিদ্যুতের প্রভাব সঞ্চারকে আমি জলের
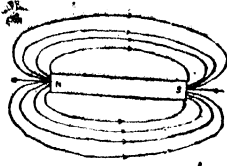
চিত্র দুই। চুম্বকবল রেখা। N ও S
যথাক্রমে চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু।

ঢেউয়ের সংগে তুলনা করতে চাই। এ বিষয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা করা আমার ইচ্ছে, কিন্তু সময়াভাবে এখন তা সম্ভব হচ্ছে না।

## বিদ্যুৎ-তরংগ

একচল্লিশ বছর পূর্বে ফ্যারাডে যা অস্পষ্টরূপে অনুমান করেছিলেন ১৮৭৩ সালে তাঁরই দেশের বৈজ্ঞানিক ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল তা দুরূহ গণিতের সাহায্যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যাক্সওয়েলের মতে, আলোক ও বিদ্যুৎ সমধর্মী, আলো হলো তড়িৎ-চুম্বকের তরংগ-বিশেষ (electro magnetic waves)। আলোর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি তড়িৎ-চুম্বকের পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব বলে ঘোষণা করেন; বিদ্যুৎ হলো আসলে এক প্রকার অদৃশ্য আলো।

ম্যাক্সওয়েলের জীবিত কালে তাঁর এই মতবাদ স্বীকৃত হয় নি। কিন্তু ১৮৮৭ সালে জার্মাণীর হেনরিচ হার্টস ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্বের উপর নির্ভর করে সত্যই একদিন বিদ্যুৎ-তরংগ সৃষ্টি করলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে বসে হার্টস দেখালেন, তাঁর সৃষ্ট এই বিদ্যুৎ-তরংগ সাধারণ আলোর ন্যায় দর্পণে প্রতিফলিত হয়, বায়ু থেকে জল বা কাচে প্রবেশ করার সময় বেঁকে যায় (প্রতিসরণ refraction), ইত্যাদি। অর্থাৎ বিদ্যুৎ-তরংগ যে সত্যই এক প্রকার অদৃশ্য আলো (২) তাতে আর সন্দেহ রইলো না।

বিজ্ঞানের একটি নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটন করে হার্টস মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। কিন্তু তাঁর আবিষ্কার সারা পৃথিবীতে বহু গুণী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। রেডিও আবিষ্কারের ইতিহাসে তাঁরা প্রত্যেকেই স্মরণীয়। ফ্রান্সের ব্রাঁলি (E. Branly), ইংলণ্ডের লজ (O. Lodge) এবং রাশিয়ার পোপভ (A. Popov) এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এঁদেরই একজন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের এই অতি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়টি আমরা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

## হার্টস্‌-এর যন্ত্র

ধাতুর দুটি পাত আছে (ক্যাপাসিটার, Capacitor), (৩) তাদের একটি তামার তার দিয়ে যোগ করা হলো। এবার তারের মধ্যপথে কেটে ছোট দুটি বল (discharge ball) বসানো হয়েছে, মাঝখানে খানিকটা ফাঁক, বল দুটি রুমকর্ফের যন্ত্র (Ruhmkorff Induction Coil) এর সাথে যোগ করা (চিত্র তিন)। হার্টস্‌ সামান্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করে বিদ্যুৎ-তরংগ সৃষ্টি করেন (Hertz's vibrator)। স্প্রিং
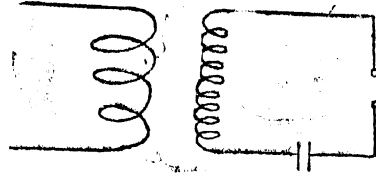
ট্রান্সফরমার ক্যাপাসিটার
চিত্র তিন: হার্টস্‌-এর যন্ত্র (HERTZ VIBRATOR)

(spring)কে টেনে ধরে হঠাৎ ছেড়ে দিলে যেমন তারের কুণ্ডলীর মধ্যে স্পন্দন জেগে ওঠে, বিদ্যুৎ-তরংগও অনুরূপ উপায়ে সৃষ্ট হয়। রুমকর্ফের যন্ত্র বা ট্রেন্সফরমার (৪) (transformer) যে উচ্চ চাপের (high voltage) বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে, তা দুটি বলের মধ্যে খানিকটা ফাঁক থাকার ফলে স্পার্ক (spark) দেবে। তার মানে, আগে ছিল বিদ্যুতের টান। এখন তা সহসা তাপের আকারে বেরিয়ে গেল (discharged)। রুমকর্ফের যন্ত্র বা ট্রেন্সফরমারের বিদ্যুৎ পরবর্তী (alternating) অর্থাৎ ক্রমাগত দিক পরিবর্তন করে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ (current) প্রতিবার দিক পরিবর্তনের সময় দুটি বলের মাঝে স্পার্ক দেয়—একবার বিদ্যুতের টান এবং পরক্ষণেই তা ছাড়া পাওয়া, এরূপে বিদ্যুৎ-তরংগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

---

২। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অদৃশ্য আলো মাত্রই বিদ্যুৎ-তরংগ নয়। অবলোহিত বা অতিবেগনী আলো (Infrared ultraviolet rays) রনজেন রশ্মি (X-ray) ইত্যাদিও আসলে আলো, যার সাহায্যে আমরা দেখতে পাই না। বিদ্যুৎ-তরংগ সর্বাধিক দীর্ঘ হয়ে থাকে অর্থাৎ স্বল্পতম স্পন্দনে সৃষ্ট, যেমন—সেকেণ্ডে এক হাজার বার স্পন্দনে সৃষ্ট বিদ্যুৎ-তরংগ দৈর্ঘ্যে ১৮৭ মাইল (৩০০ কিলোমিটার) হবে।

৩। বায়ু বা প্যারাফিন তেলে বিচ্ছিন্ন দুটি ধাতুর পাত। এই ব্যবস্থা বৈদ্যুতিক ক্ষমতা (capacity) বাড়িয়ে তোলে। পরবর্তী প্রবাহেই একমাত্র ক্যাপাসিটার কাজ করে।

৪। অল্প চাপের বিদ্যুৎ হতে বেশী চাপের বিদ্যুৎ সৃষ্টির উপায় বিশেষ প্রধান অংশ দুটি তারের কুণ্ডলী—প্রথম কুণ্ডলী (Primary Coil) এর সংগে ব্যাটারী যোগ করলে দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ প্রভাবিত হবে (দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে তারের ফের বা আবর্তনের সংখ্যার উপর তা নির্ভর করে) ব্যাটারীর বিদ্যুৎ পজেটিভ থেকে নিগেটিভ—একমুখী চলে, ট্রেন্সফরমারের ক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তী বিদ্যুৎস্রোতের (A. C.) প্রয়োজন। একমুখী বা পরবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ হোক না কেন, রুমকর্ফের যন্ত্র বা ট্রেন্সফরমারের দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে পরবর্তী বিদ্যুৎস্রোতই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

## কৃত্রিম চক্ষু

কিন্তু সত্যই যে তরংগ উৎপন্ন হচ্ছে তার প্রমাণ কি? খালি চোখে বোঝার উপায় নেই; কারণ বিদ্যুৎ আসলে আলো হলেও তার সাহায্যে আমরা দেখতে পাবো না। হার্টস্ যন্ত্রের সাহায্য নিলেন, একে আমরা "কৃত্রিম চক্ষু" (Hertz resonator) বলতে পারি। গঠন অত্যন্ত সাধারণ। ধাতুর একটি চক্র, তাতে এক জায়গায় কাটা, প্রান্তে দুটি বল। বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এসে পড়লে কৃত্রিম চক্ষু দুটি বলের মাঝে স্পার্ক দেবে। এরূপে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের অস্তিত্ব ধরা পড়ে।

আলোর সাথে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাদৃশ্য প্রমাণ করাই ছিল হার্টসের গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। তার যন্ত্র-কৌশল অত্যন্ত প্রাথমিক। তাঁর সৃষ্ট তরঙ্গ পরীক্ষার কাজেও সবিশেষ উপযুক্ত ছিল না। হার্টস অবশ্য এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। সে যা হোক, তাঁর গবেষণার গুরুত্ব কোন ক্রমেই হ্রাস করা যায় না। হার্টসের পর এডোয়ার্ড ব্রাঁলি একটি বিশিষ্ট যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন, তার নাম 'ব্রাঁলি টিউব' (Branly tube)।

## এডোয়ার্ড ব্রাঁলি

১৮৯০ সালে ব্রাঁলি লক্ষ্য করেন যে, ধাতুচূর্ণের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-তরংগ প্রবাহ করার ফলে চূর্ণের বিদ্যুৎ রোধশক্তি (Resistance) সহসা বহুগুণ কমে যায়, (অর্থাৎ পরিবহন ক্ষমতা বা conductivity বেড়ে যায়)। এই বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে তিনি তাঁর বিদ্যুৎ-তরংগ সন্ধানী যন্ত্রটি (Branly tube) তৈরী করেন—একটি নলের দু' প্রান্তে দু'টি রূপার দণ্ড ঢুকিয়ে মাঝের ফাঁকা জায়গায় ধাতুর চূর্ণ ভরা আছে (চিত্র চার)। প্যারিসের বিজ্ঞান পরিষদে তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথা ব্যক্ত করেন, কিন্তু জানা গেল, ইতিপূর্বেই ১৮৮৫ সালে ইতালীর ওনেষ্টি (F. Calzecchi-Onesti) ধাতুচূর্ণের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন। ব্রাঁলির যন্ত্রকে অনেকে তাই 'ব্রাঁলি-ওনেষ্টি টিউব' বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এ বিষয়ে ওনেষ্টিরও পূর্বগামী হলেন সুইডেনের একজন বিজ্ঞানী (Munk of Rosenscheld), তিনি ১৮৩৫ সালেই কঠিন পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতা বিষয়ে একটি গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছিলেন। সে যা হোক, ব্রাঁলির "কৃত্রিম চক্ষু" হার্টসের যন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী কার্য্যকরী।

## ওলিভার লজ

ব্রাঁলির যন্ত্রকে উন্নততর করেন লজ। তিনিই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, বিদ্যুৎ-তরংগের প্রভাবে বিদ্যুতের পরিবহন ক্ষমতায় যে পরিবর্তন দেখা যায়, ধাতুচূর্ণকে নাড়া দিলে পর তা পুনরায় পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। লজের এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ-তরংগ প্রবাহের ঠিক পরে 'টিউবে'র ধাতুচূর্ণকে আলোড়িত করার জন্য তিনি যান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। টেলিগ্রামের যন্ত্রে যেমন করে টরে টক্কা (dot and dash) শব্দের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ করা হয় (বৈদ্যুতিক সংযোগের স্থায়িত্বের উপর এই শব্দ সৃষ্টি নির্ভর করে), লজের যন্ত্রেও তেমনি বিনা তারে অনুরূপ উপায়ে টেলিগ্রাফের সংকেত (কথা নয়) প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছিল। লজ এরিয়েল ব্যবস্থারও প্রথম প্রবর্তন করেন (আচার্য্য জগদীশচন্দ্রও প্রায় একই সময়ে)। তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, গ্রাহক যন্ত্রে এরিয়েলের স্পন্দন প্রেরক যন্ত্রে এরিয়েলের (অ্যান্টিনা) স্পন্দনের সমান হলেই একমাত্র বেতার-তরংগ ভাল ধরতে পারা যাবে—যেমন দুটি শব্দ যদি সমান কম্পনজাত হয়, তা হলে মিলিত ধ্বনিটি সহজেই জেগে ওঠে (৫) (গ্রাহক যন্ত্রে এরিয়েলের স্পন্দন-সংখ্যা ক্যাপাসিটারের পাতগুলির দূরত্ব পরিবর্তন করে সংযত করা যায়)। ১৮৯৪ সালে লজ তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে ল্যাবরেটরীর বাইরে বিনা তারে টেলিগ্রাফের সংকেত প্রেরণে সফল হয়েছিলেন।
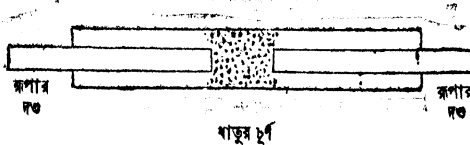
চিত্র চার। 'ব্রাঁলি টিউব' বা কৃত্রিম চক্ষু।

## আলেকজেণ্ডার পোপভ

প্রতি বৎসর ৭ই মে রাশিয়ায় 'রেডিও দিবস' পালিত হয়ে থাকে। ১৮৯৫ সালের ঐ তারিখে পোপভ রাশিয়ার পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন পরিষদে তাঁর উদ্ভাবিত একটি যন্ত্রের কার্য্যপ্রণালী প্র... করেন। যন্ত্রটি হলো লজের যন্ত্রেরই একটি পরিবর্তিত ... ব্রাঁলির টিউবের সংগে পোপভ একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ... ভাবে বেঁধে দিলেন যে, ঘণ্টা বাজার আগে হ... ধাতুচূর্ণে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। আকাশের পরিব...
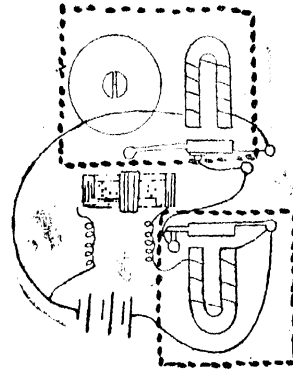
চিত্র পাঁচ। পোপভের ঝড়-সংকেতক যন্ত্র (STORM INDICAT...

---

৫। শব্দ কাঁপনের ফলেই সৃষ্ট হয়ে থাকে। বাজাবার সময় তারের কাঁপন, কথা বলার সময় ব... কাঁপন ইত্যাদি।

বিদ্যুৎচাপের উপর নির্ভর করে তিনি ঝড়-সংকেতক (Storm Indicator) এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন। রুশ কর্তৃপক্ষ এই যন্ত্রের উদ্ভাবকরূপে পোপভকে রেডিও আবিষ্কারকের সম্মান দিয়েছেন। ১৮৯৭ সালে পোপভ প্রায় দু' মাইল (৩ কিলোমিটার) দূরে বেতারে টেলিগ্রাফের সংকেত প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে মার্কনি ১৪½ মাইল দূরে সংকেত পাঠাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

## মার্কনি ও জগদীশচন্দ্র

বেতার-তরংগ নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যখন এই সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তখন আধুনিক বিজ্ঞান-কেন্দ্র হতে অনেক দূরে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। ভারতের এই বিখ্যাত কলেজে তখন ল্যাবরেটরী বলে কিছু ছিল না। সে যা হোক, হার্টসের বিদ্যুৎ-তরংগ সৃষ্টির কথা তিনি যথাসময়েই জানতে পেরেছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর বাংলা আলোচনা ১৮৯৪ সালে প্রকাশ পায়। জগদীশচন্দ্র তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে লিখছেন—"লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম না, ভিতর হইতে কে সমালোচক সাজিয়া বলিতে লাগিল—এত যে কথা রচনা করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি? ইহার কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা? জবাব দিলাম যে, সব বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন, আমি সে সব কি করিয়া নির্ণয় করিব? তাহাদের অসংখ্য কল-কারখানা ও পরীক্ষাগার আছে, এখানে তাহার কিছুই নাই, অসম্ভবকে কি করিয়া সম্ভব করিব? ইহাতেও সমালোচকের কথা থামিল না। অগত্যা ছুতার কামার দিয়া তিন মাসের মধ্যে একটা কল প্রস্তুত করিলাম।"

অসম্ভব সম্ভব হলো, সে হলো ১৮৯৪ সালের কথা, এই বৎসরেই নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজে এক পরীক্ষার আয়োজন হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে বিদ্যুৎতরংগ সৃষ্টি করা হলো, দেওয়াল ভেদ করে তা পাশের ঘরে রাখা একটি পিস্তলের গুলী ছুড়ল। (৬) পরাধীন দেশের অভিশাপ—জগদীশচন্দ্রের এই পরীক্ষা বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত হয় নি। সে যা হোক, পর বৎসর তাঁর পূর্বতন অধ্যাপক লাফোঁর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় বাংলার ছোটলাট স্যার উইলিয়ম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে জগদীশচন্দ্রের বিদ্যুৎতরংগ দুটি রুদ্ধ ঘর ভেদ করে ৭৫ ফিট দূরে তৃতীয় কক্ষে একটি লোহার গোলা নিক্ষেপ করে পিস্তলের আওয়াজ তোলে এবং বারুদের স্তূপ উড়িয়ে দেয়। জগদীশচন্দ্র প্রবর্তিত তারহীন যন্ত্রের সাহায্যে শীঘ্রই এক বৃটিশ রণতরীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সংকেত প্রেরণ করা সম্ভব হলো। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে এক মাইল দূরে তাঁর বাসভবনে বিদ্যুৎ-তরংগ পাঠাতে মনস্থ করেছিলেন, তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রটি উন্নয়ন করে এই দূরত্ব ক্রমশঃ আরো বর্ধিত করাও সম্ভব ছিল, কিন্তু অবিলম্বে তাঁকে বিলাত যাত্রা করতে হয়।

বিলাতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বৃটিশ এসোসিয়েশনে তাঁর যন্ত্রটি প্রদর্শন করেন। লজ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রকে তিনি তাঁর যন্ত্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট ও কার্য্যকরী বলে প্রকাশ্য সভায় স্বীকার করেন। এই সভাতেই বৈজ্ঞানিক প্রিস (Preece) জানান যে, ইতালীর গুলিলমো মার্কনি (Guglielmo Marconi) ইতিমধ্যে সোয়া এক মাইল দূরে বেতার-সংকেত প্রেরণ করতে পেরেছেন। সে হলো এক্‌স্‌-রে (X-ray) আবিষ্কারের বছর—, ১৮৯৬ সালের শেষ ভাগের কথা। পর বৎসর বিলাতের এক বিশিষ্ট পত্রিকায় ৫ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় জগদীশচন্দ্রের যন্ত্রকে তৎকালে প্রবর্তিত সকল বেতার যন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রের কৌশল গোপন রাখেন নি, টেলিগ্রাফ কোম্পানীর মালিকেরা তাঁকে নানা ভাবে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে তিনি কোন দিনই পণ্যবস্তু হিসাবে মনে করতে পারেন নি। ১৮৯৭ সালের প্রারম্ভে মার্কনি বেতার-যন্ত্রের পেটেন্ট গ্রহণ করেন। বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারকরূপে তিনি স্বীকৃত হলেন। অতঃপর জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের অন্য শাখায় মনোনিবেশ করেন।

রেডিও আবিষ্কার কাহিনীর এ হলো গোড়ার কথা। এর পরে বেতার যন্ত্র নানা ভাবে উন্নত হলো, কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখানে আসে না।

## জগদীশচন্দ্রের অবদান

রেডিও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের অবদান আমরা অত্যন্ত অল্প কথায় ব্যক্ত করলাম। উৎসাহী পাঠক আচার্যদেব লিখিত "অব্যক্ত" (৭) গ্রন্থে তাঁর বিস্তৃত বিবরণ পাবেন। রেডিও আবিষ্কারক-রূপে স্বীকৃত না হলেও বিদ্যুৎ-তরংগের ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু কাল আগেও বেতার গ্রাহক যন্ত্রে যে ক্রিষ্টাল বা দানার ব্যবস্থা ছিল (Crystal set radio) জগদীশচন্দ্রই তাঁর প্রবর্তক। তিনিই প্রথম লক্ষ্য করেন যে গ্যালিনা ইত্যাদি কয়েক প্রকার দানার দুই বিপরীত পার্শ্ব দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ বিভিন্ন হয়ে থাকে (৮)।

লজের সমসাময়িক ভাবে তিনি স্বাধীন ভাবে "এরিয়েল" (aeriel)-এর প্রবর্তন করেন (লজ এরিয়েল ব্যবস্থার পেটেন্ট গ্রহণ করেছিলেন)। লজ বলেছিলেন, বিদ্যুৎ-তরংগের ফলে ধাতুচূর্ণে বিদ্যুৎপ্রবাহের রোধশক্তি কমে যায়, জগদীশচন্দ্র দেখালেন পটাসিয়াম ধাতুর ক্ষেত্রে তা ব্যতিক্রম—এমন কি বিপরীত। আলো বা বিদ্যুৎ-তরংগ সর্বমুখী—অর্থাৎ সমান ভাবে দশ দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু টুর্মালিন ইত্যাদির ভিতর দিয়ে সাধারণ আলো

---

৬। সাধারণ আলোর পক্ষে ইট পাটকেল অস্বচ্ছ হলেও বিদ্যুৎ তরংগ বা অদৃশ্য আলো সহজেই ইটের দেওয়াল ভেদ করে যেতে পারে। এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। সবুজ আলো লাল কাচের ভিতর দিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু সাদা কাচের মধ্যে সহজেই যায়। কোন পদার্থ এক আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হতে পারে কিন্তু অন্য আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হতে পারে কিন্তু অন্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ।

৭। অব্যক্ত—জগদীশচন্দ্র বসু। নব সংস্করণ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত।

৮। বিষয়টি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন উইলিয়ম্ ব্রেক, ১৮৭৪ সালে।

একমুখী ( Polarised ) হয়ে যায়। জগদীশচন্দ্র দেখান যে, বিশেষ কোন দানার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-তরংগও একমুখী হতে পারে। এ সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক গবেষণা "অদৃশ্য আলোক" প্রবন্ধে অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত আছে। "সর্বদলী" যন্ত্র "রাডার" উদ্ভাবনেও জগদীশচন্দ্র একজন প্রধান পথিকৃৎ, অতি সূক্ষ্ম বেতার-তরংগ সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক গবেষণা পরে বিস্তারিত হয়ে এই বিচিত্র যন্ত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। (১)

১। এ বিষয় জগদীশচন্দ্রের মূল্যবান অধিকার পরে আবার অধিকার করতে হয়েছিল।

### কৃতজ্ঞতা

কালেক্টেড ফিজিক্যাল পেপার্স—স্যার জে, সি, বোস।

অব্যক্ত—জগদীশচন্দ্র বসু।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু—চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু—হিজ লাইফ এণ্ড ডিসকভারিস্—প্রফেসার গেডিস্। আলেকজাণ্ডার পোপভ—এম, রাডোভস্কি।

### জয়-পরাজয়

জগদীশচন্দ্র বলতেন—"কর্ণের জীবনব্যাপী ব্যর্থতা ও পরাজয় শিশুকাল হইতে আমার মনকে আঘাত দিত। কর্ণের সেই কথা—'আমি সূতই হই আর সূতপুত্রই হই, আমার জন্ম দৈবাধীন, কিন্তু আমার পৌরুষ আমার নিজের'—চিরদিন আমার মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করিয়া আসিয়াছে।" স্বদেশের কোন এক প্রসিদ্ধ সভায় তিনি যখন তাঁর আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ পাঠ করেন, তখন সভাস্থ সকলেই তাঁর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও তাঁকে নানা ভাবে বাধা পেতে হয়েছিল। তাঁর আবিষ্কার অপরে নিজের বলে দাবী করেছেন—এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়। ফলে তাঁর বহু বৎসরের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছিল। বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় জগদীশচন্দ্র বলছেন—এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর, বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। এ কথা একমাত্র জগদীশচন্দ্রই বলতে পারেন। তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হলো, কিন্তু অপরের মধ্যে দিয়ে তা সফল হয়েছিল।

অশোককুমার দত্ত।

# একটু রোদ

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

এই একটু রোদ
ঝির-ঝির হাওয়ায় উড়ছে একঝাঁক কপোত
সাগরের লোণা জল সোনা-সোনা রোদে
ছাপায় গাঙের বালুচর।

একটা গাঙচিল
জল ছোঁয় ঝিলমিল
নীল ক্যানভাসে শুধু মেঘের দুরন্ত মিছিল।

একটা পাক-খাওয়া বিকেলে
তোমার আঁচল ওড়ে না
আকাশের নীল ক্যানভাসে
তোমার ছবি ওঠে না।

একটা অদেখা বিকেল
আর তোমার লজ্জা-রাঙা একটি চুমা ;
আমার ঘাটে ফেরী হেঁকে যায়
সদ্য-ফোটা গোলাপ তাই
রঙ মুছে ঝরে যায়।

এই একটু রোদ
এখানে ছড়িয়ে ওখানে জড়িয়ে
আমার মুক্তির রোদ
দেওয়া-নেওয়া নিয়ে মাটির পুতুল গড়ি
তবু উড়ে যায় স্বপনপরী।

# সুদূরপ্রসারী আলো

শেখ আবদুল জব্বার

সুদূরপ্রসারী আলো
দু' ডানায় আঁকা বর্ত্তমান পৃথিবীও ছবি
অনন্ত দিগন্তে যাত্রী যুগ যুগ বর্ষ বর্ষ দূরে——

তোমায় চিনবে সে কি লক্ষ লক্ষ যুগান্তের দেশ
আপনার প্রতিচ্ছবি তোমার আলোক
দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ-সভ্যতার শৈলচূড় 'পর
আসীন তোমার দীপ্তি খুঁজবে কি নেমে তারা
ইতিহাস বিদর্ভ নগর।

কবে কোন্ দেশ বুকে গোপন আনন্দ
অজন্তা, মাহেঞ্জোদড়ো, শ্রাবস্তীর পথে পথে
কিম্বা আরো বহুদূর জগতের দুই চোখে ভালো
লাগা, সে তনিমা কন্যা খোদিত ভাস্কর্য্য
প্রতিভাত রূপ ছুঁড়ে কালের রহস্যাবৃত ভগ্নস্তূপ বুকে
সুর কাল ছন্দ।

আজ এই আকাঙ্খার নতুন বিজ্ঞান
পাবে কি তোমার সূক্ষ্ম সেই অভিজ্ঞান, দ্রুতগতি বেগে
বিদর্ভ নগরে আলা মৌন যে প্রভাত
সুদূরপ্রসারী আলো।

এবার খেলাধুলা বিভাগে প্রচুর সংবাদ জমে আছে। যার বিস্তারিত আলোচনা এ স্বল্প পরিসর স্থানের মধ্যে একান্তই অসম্ভব। সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতিটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

## ক্রিকেট

আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য পাকিস্তান ক্রিকেটে যে উন্নতি করেছে তা অনস্বীকার্য্য। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে দুটি টেষ্টে জয়লাভ করে 'রাবার' লাভ করেছে।

ভারতের মাটিতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়রা যে সুনিপুণতার পরিচয় দিয়েছিল, সে গৌরব কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে পাকিস্তানের কাছে পরাজয় বরণ করে। তিনটি টেষ্ট খেলার মধ্যে দুটি পাকিস্তান জয়লাভ করেছে এবং অপর খেলায় পরাজয় বরণ করেছে।

প্রথম টেষ্ট—করাচীতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ১০ উইকেটে পরাজিত করে পাকিস্তান দল প্রথম টেষ্টে জয়লাভ করে প্রমাণ করল ভারত অপেক্ষা পাকিস্তান দল ক্রিকেটে শক্তিশালী। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয় বোলার গিলক্রিষ্টকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়ায় বোলিং-এ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল কিছুটা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তবুও এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, পাকিস্তানের ফাষ্ট বোলার ফজল মহম্মদ ও স্পিন বোলার নসিমুল গনির প্রশংসনীয় বোলিং পাকিস্তান দলকে জয়লাভ করতে সবিশেষ সাহায্য করেছে। টেষ্ট খেলায় বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী সোবার্স সমেত পাঁচ জন খেলোয়াড় কোন রাণ না করেই আউট হয়ে গেছেন। ১৪৬ রাণে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে এবং শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্তান দল প্রথম ইনিংসে ৩০৪ রাণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। চতুর্থ দিনের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ২৪৫ রাণে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ করে। পাকিস্তান দলের মাত্র ৮৮ রাণের প্রয়োজন। পরের দিন প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাণ সংগ্রহ করে ১০ উইকেটে পাকিস্তান দল বিজয়ী হয়।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ১৪৬ (বুচার নট আউট ৪৫, কানহাই ৩৩, হোল্ট ২১, ফজল মহম্মদ ৩৫ রাণে ৪ উইঃ নসিমুল গণি ৩৫ রাণে ৪ উইঃ, ডি সুজা ৫০ রাণে ২ উই)।

পাকিস্তান—১ম ইনিংস—৩০৪ (হানিফ মহম্মদ ১০৩, সঈদ আমেদ ৭৮, ইমতিয়ান আমেদ ৩১, ওয়াদির মহম্মদ ২৩, ওয়েসলী-হল ৫৭ রাণে ৩ উইঃ গিবস ১২ রাণে ৩ উই; কোলীস্মিথ ৩৬ রাণে ২ উইঃ)।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস ২৪৫ (সলোমান ৬৬, বুচার ৬১, হাণ্ট ২১, গিবস ২১, সুজাউদ্দীন ১৮ রাণে ৩ উইঃ, মামুদ হোসেন ৫১ রাণে ২ উইঃ)।

পাকিস্তান—২য় ইনিংস ৮৮ (কোন উইকেট না হারিয়ে) সঈদ আমেদ ৩৩ নট আউট, আইনাজ বাট ৪১ নট আউট)।

[ পাকিস্তান ১০ উইকেটে বিজয়ী ]

## দ্বিতীয় টেষ্ট

ঢাকায় দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল ৪১ রাণে পরাজিত হওয়ায় পাকিস্থান দল রাবার লাভ করেছে। এই খেলায় দুই দলই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোলায়িত হয়। শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থান দল ৪১ রাণে জয়লাভ করে। প্রথম টেষ্টে হানিফ মহম্মদ হাতে চোট পাওয়ায় দ্বিতীয় টেষ্টে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। সেই দিক থেকে পাকিস্থানের জয়লাভ সত্যই প্রশংসনীয়। ম্যাটিং উইকেটে খেলার ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়রা আশানুরূপ খেলতে পারেননি। দ্বিতীয় টেষ্টের ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল।

পাকিস্থান—১ম, ইনিংস—১৪৫ (ওয়ালিস ম্যাথিয়াজ ৬৪, সুজাউদ্দীন ২৬, হল ২৮ রাণে ৪ উইঃ রামধীন ৪৫ রাণে ৩ উইঃ)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস—৭৬ (সোবার্স ২৯, আলেকজাণ্ডার ১৪, ফজল মামুদ ৩৩ রাণে ৬ উইঃ নসিমুল গণি ৪ রাণে ৩ উইঃ)

পাকিস্থান—২য় ইনিংস—১৪৪ (ম্যাথিয়াজ ৪৫, সঈদ আমেদ ২২, ইজ্জাজ বাট ২১, এ্যাটকিনসন ৪২ রাণে ৪ উইঃ হল ৪১ রাণে ৪ উইঃ রামধীন ১০ রাণে ৪ উইঃ)

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—২য় ইনিংস—১৭২ (সোবার্স ৪৫, স্মিথ ১৩, এ্যাটকিনসন ২০, ফজল মামুদ ৬৬ রাণে ৬ উইঃ মামুদ হোসেন ৪৮ রাণে ৪ উইঃ)

[ পাকিস্থান ৪১ রাণে বিজয়ী ]

## তৃতীয় টেষ্ট

লাহোরের তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচের খেলায় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল এক ইনিংস ও ১৫৬ রাণে প্রথম ইনিংসের খেলায় জয়লাভ করেছে। প্রথম ইনিংসে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল সর্ব্বসমেত ৪৬৯ রাণ সংগ্রহ করে। এবারের টেষ্টে পাকিস্থানের তথা বিশ্বের সর্ব্বকনিষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় মুস্তাক মহম্মদ প্রথম টেষ্ট খেলায় গৌরব অর্জ্জন করেন। বিপুল রাণে পিছিয়ে থেকে পাকিস্থান দল ব্যাট করতে থাকে। দলগত শক্তি এ টেষ্টে পাকিস্থানের কম ছিল, হানিফ মহম্মদ টেষ্টে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত ২০৯ রাণে পাকিস্থান দলের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্থান দল 'ফলো অন' করতে বাধ্য হয়। শেষ পর্য্যন্ত পাকিস্থান দল ১০৪ রাণে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ করলে ২ ইনিংস ও ১৫৬ রাণে পরাজয় বরণ করে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ—১ম ইনিংস ৪৬৯ (কানহাই ২১৭, সোবার্স ৭২, সলোমন ৫৬, স্মিথ ৩১ আলেকজাণ্ডার ২১, এ্যাটকিনসন ২০, নসিমুল গণি ১০৬ রাণে ৩ উইকেট, ফজল মামুদ ১০৯ রাণে ২ উইকেট, সঈদ আমেদ ১৯ রাণে ১ উইকেট)

পাকিস্থান—১ম, ইনিংস—২০৯ (ইজ্জাজ বাট ৪৭, ইমতিয়াজ আমেদ ৪০ ওয়াকার হোসেন ৪১ সঈদ আমেদ ২৭, হল ৮৭ রাণে ৫ উইকেট)

পাকিস্থান—২য় ইনিংস—১০৩ ( মকসুদ আমেদ ৩৩, ওয়াকার হোসেন ২৮, রামধীন ২৫ রাণে ৪ উইঃ গিবস ১৪ রাণে ৬ উইঃ ও এ্যাটকিনসন ১৫ রাণে ৩ উইঃ )

[ ১ ইনিংস ও ১৫৬ রাণে বিজয়ী ]

* * * *

গতবারের সংখ্যায় বলেছিলাম খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবো। ইংলণ্ড সফরের জন্য যে দল মনোনীত হয়েছে এবং ভারতের ক্রিকেটের উপর যে ইংলণ্ডের অধিবাসীদের বিশেষ একটা আস্থা নেই, সংবাদের এই সংবাদ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে—"There are no queues at any of these grounds for the purchase of Test tickets. As the cricket correspondent of the "News Chronicle" points out, if any one would like to see a test or two, then he or she can make the necessary application for tickets at Leisure."

এপ্রিলের ১৭ তারিখে সম্ভবতঃ ভারতীয় দল ইংলণ্ড-এ গিয়ে পৌঁছাবে। কবে কোথায় ভারতীয় দল টেষ্ট খেলবে তা নিম্নে দেওয়া হ'ল।

১ম টেষ্ট—৪ঠা জুন, টেন্টব্রিজ, নটিংহাম। ২য় টেষ্ট—১৮ই জুন, লর্ডস। ৩য় টেষ্ট—২রা জুলাই, লীড্স। ৪র্থ টেষ্ট—২৩শে জুলাই, ওল্ড টাফোর্ড। ৫ম টেষ্ট—অগাষ্ট ২৩ কেনিংটন ওভাল।

ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় দলের নির্বাচন এবং ভারতীয় ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের কাদা ছোড়াছুড়ি অনেক হয়েছে। প্রাক্তন অধিনায়ক গোলাম আমেদ পদত্যাগ করেছেন, তার স্থানে সার্ভিসেস দলের মুদিয়াকে গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

ডিঃ কেঃ গাইকোয়ার্ড ( অধিনায়ক )—বরোদা দলের অধিনায়ক। বয়স ৩০ বৎসর। ভারতের পক্ষ থেকে ৬টি টেষ্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯৫২ সালে ভারতীয় দলের পক্ষে ইংলণ্ড সফরে অংশ গ্রহণ করে একটি মাত্র টেষ্ট খেলেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ১৫০০ বেশী রাণ করেছেন। টেষ্ট-ম্যাচে উল্লেখযোগ্য রাণ-সংখ্যা ৪৩।

পঙ্কজ রায়—( সহঃ অধিনায়ক ) বাংলা দলের অধিনায়ক। বয়স ৩১ বৎসর। ভারতীয় দলের পক্ষে তিনি ইংলণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্থান, সিলোন প্রভৃতি দেশে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সর্বসমেত ২১টি টেষ্টে খেলেছেন। ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে প্রথম উইকেট মানকড়ের সংগে জুটিতে ৪১৩ রাণ সংগ্রহ করেছিলেন।

নরী কনট্রাক্টর—ভারতীয় দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান। বয়স ২৫ বৎসর। বাঁ হাতে ব্যাট করেন। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫ সালে প্রথম টেষ্ট খেলার সুযোগ পান। ভারতীয় দলের পক্ষে সিলোন সফরে প্রতিনিধিত্ব করেন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে এবারে পঞ্চম টেষ্টে ৯২ রাণ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

পিঃ জিঃ যোশী—ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য উইকেট কিপার। বয়স ৩২ বৎসর। ১৯৫৩ সালে ভারতের পক্ষ থেকে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে অংশ গ্রহণ করেন। যোশী ভাল ব্যাট করতে পারেন।

নরেন তামানে—ভারতের এক নম্বর উইকেট হিসাবে গণ্য করা বর্তমানে। বয়স ২৭ বৎসর। ১৯৫৪—৫৫ সালে ভারতের পক্ষ থেকে প্রথম টেষ্ট খেলার সুযোগ লাভ করেন। পাকিস্থান ও সিলোন সফর করেন ভারতের পক্ষ থেকে। ২৭টি ক্যাচ এবং ষ্টাম্পড ১৪ জন এবং ১৬টি টেষ্টে সর্বসমেত ৪১ জন খেলোয়াড় আউট হয়েছেন। ভাল ব্যাট করতে পারেন।

সুভাষ গুপ্তে—ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বোলার। বয়স ২৯ বৎসর। ২৬টি টেষ্টে ১১৭টি উইকেট লাভের গৌরব অর্জন করেন। ১০২' রাণে ৯টি উইকেট লাভ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ডান হাতে লেগ-ব্রেক বল দেন।

চাঁদু বোরদে—ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য তরুণ ব্যাটসম্যান ও সর্ববিষয়ে পারদর্শী খেলোয়াড়। বয়স মাত্র ২৪ বৎসর। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সফর করেন। ডান হাতে ভাল লেগ-ব্রেক বল দিতে পারেন এবং একজন সুদক্ষ ফিল্ডস ম্যান।

আর, বি, দেশাই—ভারতীয় দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। বোম্বাই ইউনিভারসিটির ছাত্র। বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। ডান হাতে মিডিয়াম পেস বল দেন। এবারের টেষ্টে সর্বপ্রথম খেলার সুযোগ পান।

এঃ জিঃ কৃপাল সিং—ভারতীয় দলের অন্যতম ব্যাটসম্যান। বয়স ২৫ বৎসর। প্রথম টেষ্ট খেলতে নামেন নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং শতাধিক রাণ করেন। ভাল অফ-ব্রেক বল দেন এবং কাছের দিকে ফিল্ড করেন।

সুরেন্দ্রনাথ—সার্ভিসেস দলের খেলোয়াড়। বয়স মাত্র ২২ বৎসর। এবারই প্রথম টেষ্ট খেলার গৌরব অর্জন করেন। ডান হাতে মিডিপেস বল দেন। ভাল ফিল্ডিং করেন।

মঞ্জেকার—ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। ভারতীয় দলের পক্ষ থেকে ইংলণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্তান, সিলোন-এ প্রতিনিধিত্ব করেন। ইংলণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে শতাধিক রাণ করেন।

অরবিন্দ আপ্তে—ভারতের অপর একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান। বয়স ২৪ বৎসর। মাদ্রাজের বিরুদ্ধে ৭২ রাণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

উম্রিগড়—ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। বয়স ৩৩ বৎসর। ভারতের পক্ষ থেকে তিনি আট বার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেছেন। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে খেলে ২০০০ অপেক্ষা বেশী রাণ সংগ্রহ করেন। ২২৩ সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত বেশী রাণ।

জয়সিমা—জয়সিমা ভারতীয় দলের একজন তরুণ ব্যাটম্যান। লেগ সাইড দিয়ে ভাল মিডিয়ম পেস বল দেন। বয়স মাত্র ২০ বৎসর। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৫২ রাণ ব্যক্তিগত বেশী রাণ।

ঘোরপাড়ে—ঘোরপাড়ে ডান হাতে ব্যাট ও বল করেন। বয়স ২৮ বৎসর। পাঁচটি টেষ্ট খেলেছেন।

নাদকার্নি—বাঁ হাতে ব্যাট করেন এবং স্পিন বল দেন। বয়স ২৭ বৎসর। নাদকার্নি ভারতের ভবিষ্যৎ মানকড় বলে আশা করা যাচ্ছে। তিনি মাত্র দুটি টেষ্ট খেলেছেন। একটি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে এবং অপরটি নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে।

ডিঃ এম মুদিয়া—গোলাম আমেদ পদত্যাগ করায় তাঁর শূন্য

স্থান পূরণ করার জন্য সার্ভিসেস থেকে মুদিয়াকে নেওয়া হয়েছে। বয়স ২৯ বৎসর। সার্ভিসেস দলের একজন নির্ভরযোগ্য বোলার। ডান হাতে অফ-ব্রেক বল দেন। রণজি ট্রফির খেলায় ১৬০২১ রাণের গড়পড়তায় উইকেট লাভ করেন।

*    *    *    *

ইডেনে উদ্যানে মোহনবাগান ও এ্যালবার্ট স্পোর্টিং-এর চ্যাম্পিয়ানসিপ খেলাটি দর্শকরা যে ভাবে নষ্ট করে দিয়েছে, তা সত্যই এক লজ্জাকর বিষয়। উচ্ছৃঙ্খল দর্শক ও সমর্থকরা যে ভাবে খেলাটি নষ্ট করলে তা ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি মলিন অধ্যায়ের সূচনা করল। শেষ পর্য্যন্ত খেলাটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

*    *    *    *

রণজিঁ প্রতিযোগিতায় বোম্বাই দল বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। এটা ছিল রণজি প্রতিযোগিতার রজত জয়ন্তী বৎসর। বোম্বাই দল ৪২০ রাণে বাংলাকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে।

রণজি প্রতিযোগিতার ২৫ বছরের ইতিহাসে বোম্বাই দল বার রণজি ট্রফি লাভ করেছে। সর্ব্ব-বিষয়ে পারদর্শী বোম্বাই দল যোগ্য সম্মান লাভ করেছে। নিম্নে সংক্ষিপ্ত ফলাফল দেওয়া হইল :—

বোম্বাই—১ম ইনিংস-২১৪ (এইচ আমরোলীওয়ালা ১৩১, এম এম ভালভী ৫৮, হারাদিকার ৩৮, এ, এল ওয়াদেকর ২৪; পি, চ্যাটার্জ্জী ৭৬ রাণে ৬ উইঃ, ডি, এস, মুখার্জ্জী ৮১ রাণে ৩ উইঃ)

বাংলা—১ম ইনিংস—১৭৬ (পি, রায় ৫৩, পি, ভাণ্ডারী ৩৬, জে, গিলক্রিষ্ট ২২, পি, চ্যাটার্জি ২১। হরদিকার ২৪ রাণে ৪ উইঃ দেশাই ৫৮ রাণে ৩ উইঃ)

বোম্বাই—২য় ইনিংস—৫৩৬ (১ উই ডিক্লে) (এম, এল, আপ্তে ১৫৭, আর, বি, কেনী ১১১, ওয়াদেকার ৮৫, আমরোলী ওয়ালী ৪৪, ভালভী ৩৬ নট আউট, তামানে ৩১, আর বি, দেশাই ৩০ নট আউট, পি চ্যাটার্জ্জি ১১৬ রাণে ৪ উই : ডি, এস মুখার্জ্জি ৫৩ রাণে ২ উইঃ এস বসু ১২৫ রাণে ৩ উইঃ)

বাংলা—২য় ইনিংস—২৩৪ (পি, রায় ১৫, কে সিলেট ৫৮, পি ভাণ্ডারী ৩৮; পই ৪৬ রাণে ৪ উইঃ আর দেশাই ৩৭ রাণে ৪ উইঃ আর দেশাই ৩৭ রাণে ৪উইঃ)

(বোম্বাই ৪২০ রাণে বিজয়ী)

## হকি

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় ভারতীয় রেল দল উপর্য্যুপরি তিন বছর জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করলো। হায়দ্রাবাদে গোসা মহল পুলিশ ষ্টেডিয়ামে রেল দল ১—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে হারিয়ে জাতীয় হকির চ্যাম্পিয়ান সিপ লাভ করলো। এবারকার জাতীয় হকিতে সর্ব্ব সমেত ২৮ টি দল যোগ দিয়েছিল। এর মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি। এবারকার খেলা হয়েছে বহুদিন ধরে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী খেলেছে বাংলা দল। রেল দলের সংগে সেমি ফ্যাইনালে বাংলা তিন দিন খেলতে হয়। বাংলা খেলোয়াড়রা ভাল খেলেও নিতান্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ পরাজয় বরণ করেছে। সেমিফ্যাইনালে দুটি পরাজিত দলের খেলায় বাংলা পাঞ্জাবকে ৩-১ গোলে হারিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। এবারকার জাতীয় হকির খেলায় উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখা দিয়েছে। কলকাতার হকি লীগের উপর আগামী বার আলোচনা করব।

## বিশ্ব টেবিল টেনিস

বিশ্ব টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপানের পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়রা সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্যের পরিচয় দিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করেছে। টেবিল টেনিসে নতুন চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন এবার প্রজাতন্ত্র চীনের উদীয়মান খেলোয়াড় হাং কুয়ো তুয়ান। ফ্যাইনালে তিনি হাঙ্গেরীর কীর্তিমান খেলোয়াড় ফেরেঙ্ক সিডোকে পরাজিত করেছেন। এ বিষয়ে, উল্লেখ করা যেতে পারে, ফেরেঙ্ক ১৯৫৩ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন। ১৯৫২ সাল থেকে বিশ্ব টেবিল টেনিসের প্রতিযোগিতায় জাপান আধিপত্য বিস্তার লাভ করে আসছে। ১৯৫৩ সালে জাপান অংশ গ্রহণ করেনি। ১৯৫৭ সালের ষ্টকহোমের প্রতিযোগিতায় ঠিক হয়, প্রতি দুই বৎসর অন্তর এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এবারের প্রতিযোগিতার পর নূতন নিয়ম অনুযায়ী ১৯৬১ সালে চীনের পিকিং সহরে এ খেলার আসর বসবে।

এবারের প্রতিযোগিতায় ৪০টি দেশের পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। দলগত ভিত্তিতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতার সোয়েদলিং ও কাববলিন কাপের অনুষ্ঠিত হয়। পরে আরম্ভ হয় পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসের খেলা। আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও বিশ্ব-প্রাধান্য প্রতিযোগিতার ৭টি পুরস্কারের মধ্যে ৬টি পুরস্কার লাভ করেছে জাপান।

সোয়েদলিং কাপে ভারত এবার ভালই খেলেছে। জাপান ও যুগোশ্লাভিয়ার মত শক্তিশালী দিক থেকে ভারতের তৃতীয় স্থান অধিকার প্রশংসনীয়। নিচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানসিপের ফাইন্যাল খেলার ফলাফল দেওয়া হইল :—

সিঙ্গলস ফ্যাইনাল—সেন্ট ব্রাইড ভেস—হাং কুয়ো তুয়ান (প্রজাতন্ত্র চীন) ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৫ ও ২১-১৪ পয়েন্টে ফেরেঙ্ক সিডোকে (হাঙ্গেরী) পরাজিত করেন। মহিলাদের ফ্যাইনাল—গিষ্ট প্রাইজ—কামাকো মাৎসুদাকি (জাপান) ২১-১৩, ২১-৭, ১৮-২১ ও ২১-১৮ পয়েন্টে ফুজি এগুচিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস—ইরাণকাপ-ইচিরো ওগিমুরা ও টি মুরাকামি (জাপান) ১৭-২১, ১৯-২১, ২১-১৯, ২১-১৯ ও ২১-১৪ পয়েন্টে এল ষ্টিপেক ও লিভোনেস্কিকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস—পোপ কাপ—টি নাম্বা ও কে ইয়ামাইজুমি (জাপান) ২১-১৯, ২১-১৫ ও ২১-১৪ পয়েন্টে ফুজি এগুচি ও কে মাৎসুজাকিকে (জাপান) পরাজিত করেন। মিক্সড ডাবলস—হেডুসেক কাপ—ইচিরো ওগিমুরা ও ফুজি এগুচি (জাপান) ২১-১৪ ২১-১৭ ও ২১-১৪ পয়েন্টে টি মুরাকামি ও কে মাৎসুজাকিকে (জাপান) পরাজিত করেন।
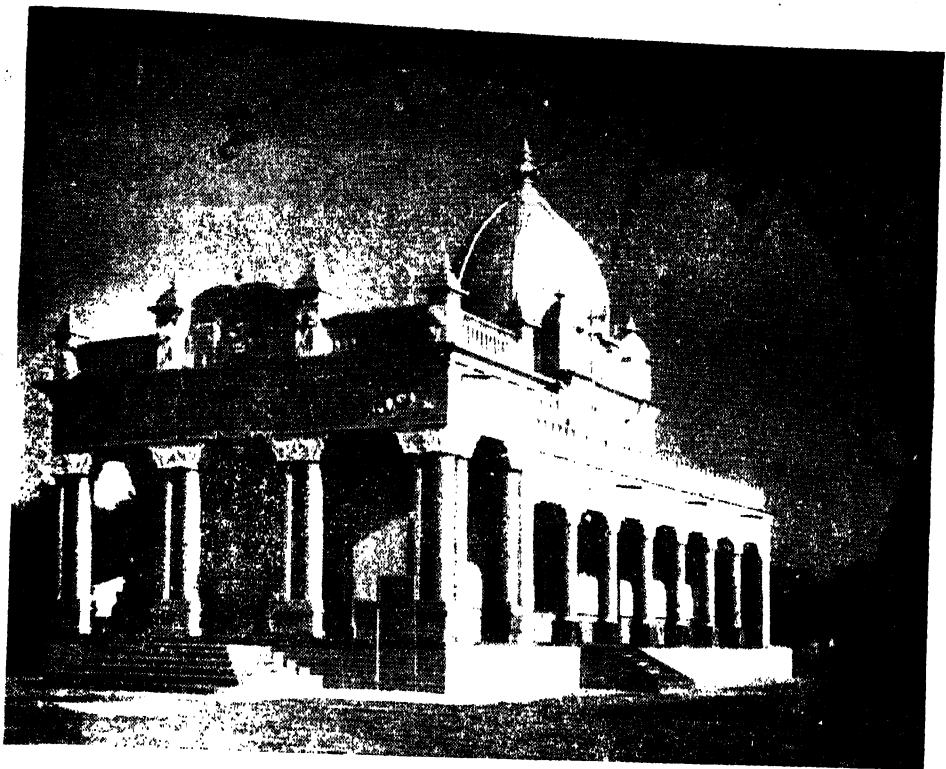
শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ( বাঁকুড়া )

—রামকিঙ্কর সিংহ
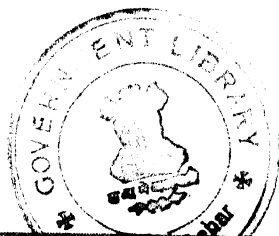


অবাক পাথবা

—দেবেশ মজুমদার

পুরীর সমুদ্র —রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়
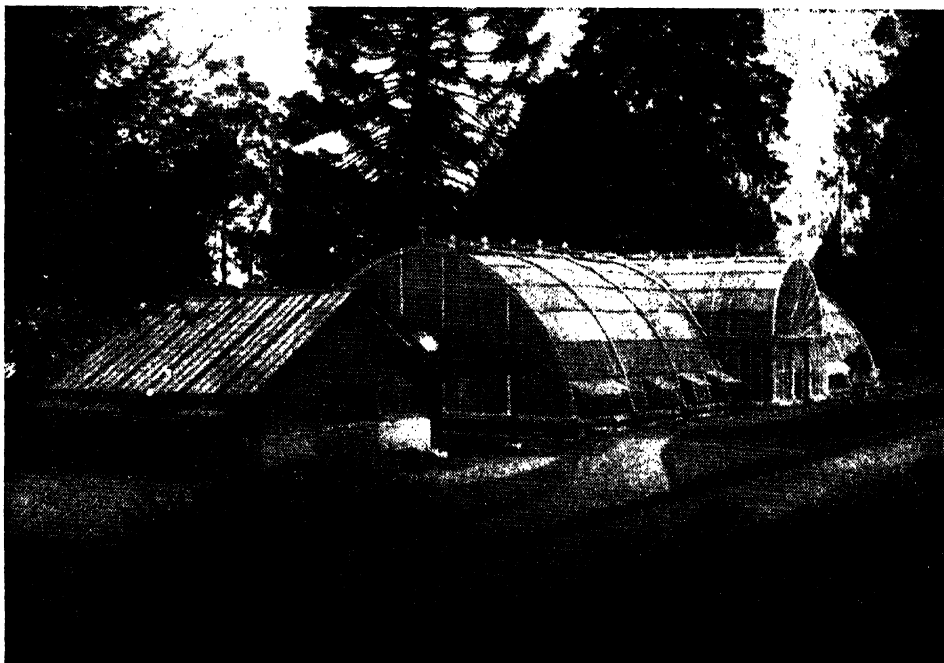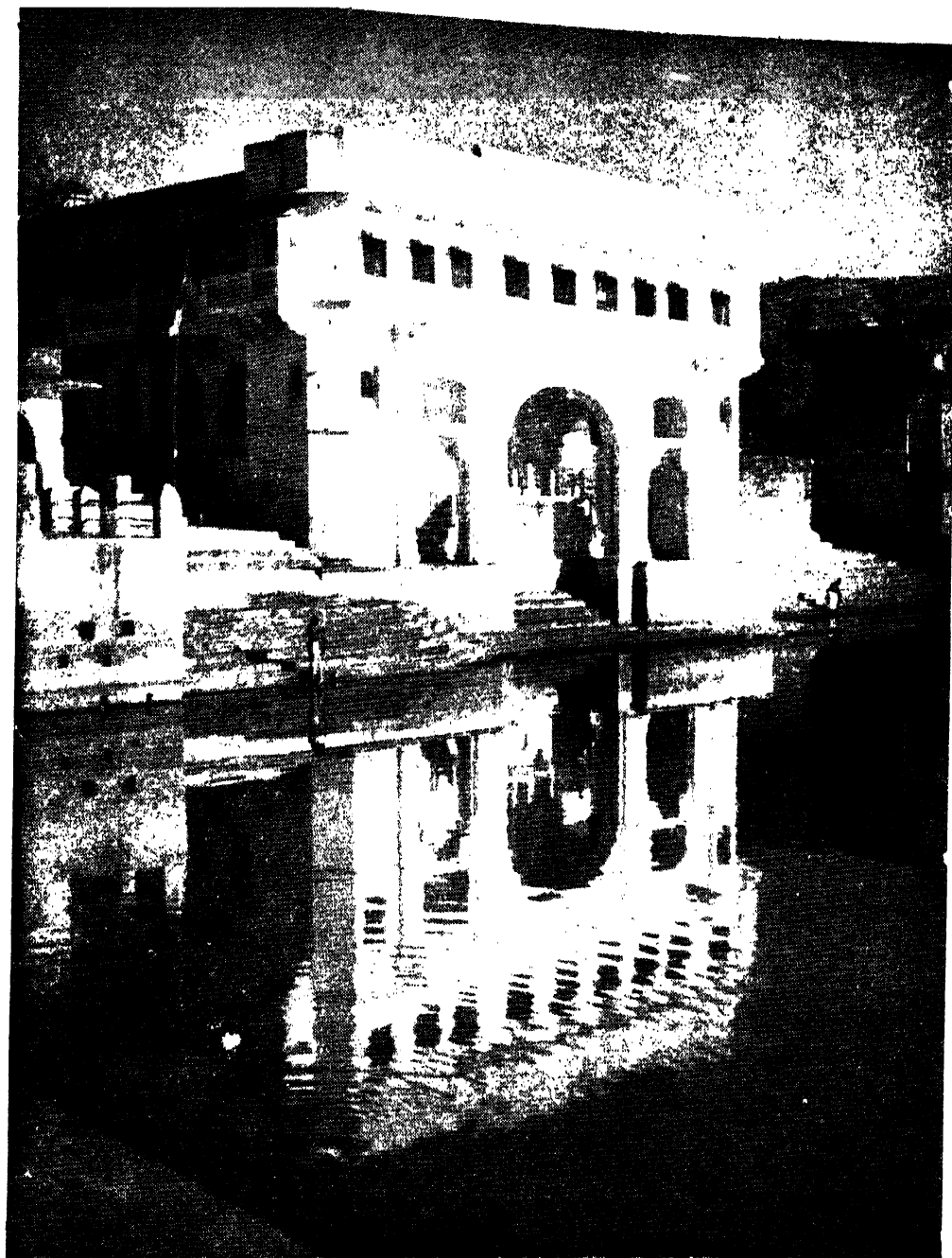
বোটানিকাল উদ্যান ( দার্জ্জিলিং —রথীন রায়

পুষ্কর লেক ( আজমীর )



—নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র

হোমকুণ্ড

—নিতু সরকার

কবি কর্ণপূর-বিরচিত

# আনন্দ-বৃন্দাবন

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

অনুবাদক—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
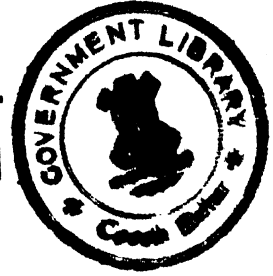


১৬। "পুণ্যের কপাল, নইলে কি আর এমন হয়! তা নাহলে ঐটুকু ঐ ছেলে যার মুখ থেকে চোখ ফেরানো যায় না—যে আমাদের নয়নের অমৃত—সে বাঁচে! মা জননী, সার্থক করেছে ছেলে তার মায়ের ভালবাসা। দুয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে ভালবাসার দুধ। তোমার ভাগ্যের জোরেই এখন স্বস্তি এসেছে। ছেলে ভাল আছে মা, ছেলে ভাল আছে। ব্রজপতির আর তোমার মান বাঁচিয়েছে ঐ ছেলে, ভাগ্য ফিরিয়েছে ঐ ছেলে।

ফাঁড়া কেটেছে। উঠে বসুন। অনিষ্টের আশঙ্কা করে বৃথা আর মনকে কষ্ট দেবার প্রয়োজন নেই।

মনের সুর বড় বিশ্রী, বড় জ্বালায়।
হাসছে খুসছে গো, ওই এখুনি,
ছেলেকে আপন কোলে
ফিরে পাবেন গো মহারাণী।
সত্যিই দুঃখু রাখবার আর ঠাঁই নেই।

চিরাশ্বাস বহন করে নিয়ে এল পুরন্ধ্রীদের বাণী। যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলেন ব্রজরাণী। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে জন্ম নিল যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যই যেন আবার জন্মদান করে গেল এক শোকোচ্ছ্বাসের। যথা :—

এইখানেই তো বাছাকে আমি বসিয়ে রেখেছিলুম, কী লজ্জা, আমি কিনা বইতে পারিনি আমার বাছনিকে। আর আমার পোড়া-কপালের রূপ ধরে কিনা এল ঝড়, চুরি করে নিয়ে পালাল মাণিককে।

১৭। একরত্তি ছেলে, তার আবার ভার! তাও বইতে পারল না তার মা! এ আমার দুর্দৈবের সুখের খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ননীর মত তুলতুলে আমার দুলাল; মায়ের কোলে থেকেও যে কিনা ব্যথা পায়, সে কেমন করে আজ সইল বলো, সই, ধূলো-কাঁকর কাঁটায় অমন দুর্দান্ত বর্ষণ?

…"রাক্ষসীর বিষদুধ থেকে যিনি আমার বাছাকে বাঁচিয়েছেন, শকট পতন থেকে যিনি আমার বাছাকে বাঁচিয়েছেন, সেই তিনিই আবার এবারও তাকে বাঁচিয়েছেন; বিধাতা তাকে রক্ষা করুন।"

…"ওলো, এই তোদের বলে রাখছি, এখন যদি পরমেশ্বরের দয়ায় বাছা আমার কোলে ফেরে, তাহলে এক পলকের জন্যেও তাকে কোল থেকে আর নামতে দেব না।"

…"ওলো, তোরা যা, চারদিকে খুঁজে দেখ, ঝড়ে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল আমার বাছাকে, কোথায় ফেলল গো। আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার আগেই তাকে আমার কাছে খুঁজে নিয়ে আয়।

বলতে বলতে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা গেলেন ব্রজরাণী।

১৮। পুরন্ধ্রীরা পুনর্বার তাঁকে আশ্বাস দিলেন। কিন্তু কা'কে আশ্বাস দেবেন? ব্রজরাণীকে ততক্ষণে যে অধিকার করে বসেছে এক সুতীব্র বিহ্বলতা। তিনি তখন পূর্ণ প্রাণহীনার মত। পদ্মটি সলিল হয়ে গেছে মুখে। যেন তিনি অন্তরের অভ্যন্তরে বহন করে রয়েছেন সূর্যের মত জ্বলন্ত একটি নিদারুণ জ্বালা, আর আর তার তাপে পুড়ে যাচ্ছে সকলের হৃদয়।

অলিন্দে এই কাণ্ড চলছে, আর ব্রজপুরের সিংহদ্বারের সম্মুখ, পরাজিত চূর্ণীভূত তৃণাবর্তের বুকের উপর দ্রুত উঠে বসছেন রণ-রসিক বালকৃষ্ণ…সংগ্রামের সূত্রপাতে অতি-সমীচীন বিজয়লক্ষ্মের মত।

তৃণাবর্তের সে কী বিপুল দেহ…যেন একটি বিরাট কণ্টকবন আর তার উপরে বালকৃষ্ণ ফুটে উঠলেন প্রস্ফুটিত অপরাজিতা-ফুলের মত। যেন একটি তৃণস্তম্বাচ্ছ-জীর্ণ সরোবরে মৃণালদণ্ডের উপর ফুলে উঠল…নীলকমল। পুঞ্জীভূত ঘনান্ধকারের শিখরে যেন জ্বলে উঠল…দীপাঙ্কুর। মহামোহের সায়রে যেন টলমল করে উঠল এক বিন্দু পরমজ্ঞানের অমৃত। রুক্ষ মরুর বালুকায় প্রকাশ পেল যেন এক সুরতরুর অত্যাশ্চর্য অঙ্কুর। মরি মরি, চরমদুঃখের বৃক্ষ-শাখায় এ কোন্ আনন্দ-চঞ্চল কৌসুম-সুখের প্রতিমা!

১৯। একে একে দলে-বিদলে সেখানে উপস্থিত হয়ে গিয়ে-ছিলেন অগণিত গোপেরা। তাঁরা যখন দেখলেন—এতটুকুও আতঙ্ক নেই ছেলেটির, তখন কার্য্যান্তরে চলে গেলেন অনেকেই। যাঁরা রইলেন তাঁদের মধ্যে একদল বললেন—

"বেটা পামর, কর্মকাণ্ডের একটা বিঘ্ন…অমরদের অভ্যুত্থান সহ্য করতে না পেরে হিংসায় ফুলতে ফুলতে ঝড়ের মূর্তি ধরে পৃথিবী জ্বালায়…সেই বেটা কিনা শেষ পর্যন্ত চুরি করতে এসেছিল ব্রজরাজকুমারকে! দুষ্কর্মের বিষের জ্বালায় খাক হয়ে বাছাধনকে এবার আর ফিরতে হল না ঘরে। আকাশ থেকে খসে পড়েছেন সত্ত মাটিতে। দেখেছ হে মাটির সঙ্গে পামরটার একেবারে সেলাই হয়ে গেছে ধড়।"

২০। আর একদল বললেন—

"বুঝেছ হে, এই বালকটিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর। ঈশ্বর না হলে আর এত প্রতা বাড়ে মহাপ্রভাবের! দানব শ্রেষ্ঠদের প্রাবল্য ঘটেছে বুঝতে পেরে, দানব বধের নিমিত্তই ধরাধামে অবতরণ করেছেন সাদা নবীন। শাণিত অস্ত্রের মত ইনি অমোঘ। প্রথমেই মারলেন পুতনাকে, তারপরেই ভাঙলেন শকটটাকে, অধুনা ঘায়েল করেছেন পৃথিকম্প এই দানবটাকে। এতটুকুও মন ভাঙেননি মানবের।

২১। আর একদল বলে উঠলেন—

না হে না, মহারাজ শ্রীনন্দের জন্মজন্মান্তরের তপস্যার পুণ্যবলেরই জয় হয়েছে হে। তা না হলে কি আর এই সমস্ত আপদের দমন হয়? পদান্তর দেখি না যে।

২২। গদগদ চিত্তে এই সব বলতে বলতে পুরবাসীরা

নিঃসঙ্কোচে অঙ্কে তুলেন লীলাশিশুটিকে। গায়ে আঁচড়টি লাগেনি ছেলের। আশ্চর্য্য! লব্ধ মহাধনের মত তাঁকে তুলে নিয়ে তাঁরা পৌঁছে গেলেন রাজ-অন্তঃপুরে। অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল আত্মীয়দের।

২৩। তাঁদের বিপুল হুর্ষধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করতেই পুরন্ধ্রীরা বুঝে নিলেন সব মঙ্গল।

এর পরে যখন আনন্দের বিরাট ঢেউ নাচিয়ে ঘরে এলেন দনুজ-দমন, তখন সেই অঙ্গ ভঙ্গে রঙ্গে নেচে উঠল পুরন্ধ্রীদের হৃদয় শতদল

মুখের ফুল খসিয়ে তাঁরা বলে উঠলেন—

মা জননী তোমার কপাল কোল দুইই ভালো। তুমিই পুজনীয় জগতে। তোমার ভাগ্যই আজ উদ্ধার করে কোলে ফিরিয়ে এনেছে তোমার দুলালকে। এতটুকুও টস্কায়নি মা, টস্কায়নি।

আনন্দের ভাষা ভেট পাঠাবেই তার রস। দাবদগ্ধ বনভূমি হঠাৎ যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেল ভরা মেঘের ধারা জলে। প্রীতিতে ঝলমল করে উঠল মায়ের মন, নব-শ্যামল হয়ে গেল, স্নেহে রমণীয় হয়ে গেল। সে কোথায়, সে কোথায়···বলতে মুখ খুলে বসল উৎকণ্ঠার কলিগুলি। বশে এলে মূর্চ্ছাদেবী। শিশিরে-ভেজা পদ্মের মত নয়ন মেলে, স্বনামের, শিষ্টাচারের ও সুনামের নবানুরাগিনী হয়ে, নন্দদুলালকে দেখাবেন বলে, উঠে বসলেন যশোদা ; কিন্তু সব যেন ঘুলিয়ে যায়। আনন্দ কি তবে ভুলিয়ে দেয় আত্মাকেও ?

২৪। অজাস্ত পুরন্ধ্রীরা মহিমা গান করে উঠলেন লীলাশিশুর। মৃতসঞ্জীবনী ঔষধের মত এই যে এই নিন বলতে বলতে মায়ের কোলে তাঁরা সঁপে দিলেন মায়ের দুলালকে।

২৫। হারানিধি কোলে এলেন।

মায়ের চোখে ছলছলিয়ে উঠল তৃকার্ত্ত এক আশীর্ব্বাদ। এতকাল আনন্দের রাশি রাশি অনুভূতিতে বইতে পারেননি যাঁরা, সেই ইন্দ্রিয়গুলিরও হঠাৎ যেন এক নিমেষে নেত্রোন্মেষ ঘটল। স্তিমিত হয়ে এল মায়ের মন। ছেলেকে মা বললেন—

"ওরে, জন্ম থেকেই তুই আমাকে বড্ড জ্বালাচ্ছিস! এতো ভাল কথা ভাল স্বভাব নয় তোর। আর সত্যিই, তোকেই বা আমি দুষি কেমন করে? বাইরে ফেলে রেখে আমিই তো গিয়েছিলুম ঘরের ভিতরে। ওরে ছেলে, কাঠের চেয়েও কঠোর—তোর মায়ের প্রাণ। নামেই আমি মা। তবু তো তুই, মায়ের—নাম মাত্তোর আমার মধ্যে ছিল বলে রাগ করিস নিকো আমার উপর ; রাগ করে চলে যাসনি।···যাক এই তো আবার ফিরে এসেছিস! আর এখন তোর দোষ নেই। নিতান্তই নিরপরাধ, নারে? বড্ড ভালবাসিস তোর মাকে, না রে? ওরে আমার লোকাতীত ছেলেরে, আমারি হয়েছিল অপরাধ।"

এই কথা বলতে বলতে, ছেলেকে কোলে নাচাতে নাচাতে মা যশোদা সানন্দে ছেলের মুখে ধরিয়ে দিলেন তাঁর উথলে-ওঠা বুকের দুধ। পান করলেন লীলাশিশু,···যিনি নর-সঙ্কাশ, যিনি মূর্ত্তানন্দ।

ইতি আনন্দ-বৃন্দাবনে বাল্যলীলা বিস্তারে শকট-তৃণাবর্ত্ত-বিবর্ত্তো নাম চতুর্থঃ স্তবকঃ।

## পঞ্চম স্তবক

১। তারপর একদিন—ব্রজপুরের পরমেশ্বরী তখন লালন করছিলেন তার তনয়টিকে, তাঁর সেই সমস্ত আশার বিশ্রাম স্থলটিকে, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল—হাই তুলছেন তাঁর ছেলে। আহা, ছেলের মুখ যেন পদ্মফুলের গয়না পরিয়ে দিল তাঁর সুখকে। এবং সেই মুহূর্ত্তে তিনি তাঁর ছেলেয় হাঁ-এর মধ্যে পরম বিস্ময়ে দেখতে পেলেন, পৃথিবী, পাহাড়, সাগর, নগর, গাছ-গাছালি সমস্ত। হাঁ তো নয়, যেন ভুবনের ভাঁড়ার ঘর। এবং বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, সেই ভাঁড়ার ঘরে তিনি দেখতে পেলেন নিজেকে এবং নিজের স্বামীকেও। পৃথিবীতে এমন কি কেউ কখনো দেখেছে? অলৌকিক কাণ্ড যত ছেলের!

২। তার পর আর একদিন ছেলেকে কোলে নাচিয়ে খেলা দিচ্ছিলেন নন্দরাণী—কী যেন কি সাধ হল তাঁর মনে। ছেলের মুখের পদ্মকোষটিকে নিরীক্ষণ করতে করতে রঙ্গ করে বললেন—

ওরে ছেলে, হাই তোলো তো দেখি। মুখের ভিতরখানা তো একবার দেখা। অঙ্কুরের মত কচি কচি দাঁত উঠল কি না দেখিয়ে দে রে লক্ষ্মীটি।

হাঁ করলেন ছেলে। এবং মা দেখলেন আ মরি মরি, কী সুন্দর দাঁত বেরিয়েছে গো! আহা, যেন ছেলের মাড়িতে মগ্ন হয়ে রয়েছে নিজেরই স্তনের দুধের কণা।

৩। শ্রীমতী পুষ্টি দেবীর অহরহঃ সেবা পেয়ে, শিশু চাঁদের মত দিকে দিকে কিরণ ছড়িয়ে বাড়তে লাগলেন লীলাশিশু। বাপ মা তাঁকে কোলে বুকে গলা জড়িয়ে বেঁধে রাখতে চান, কিন্তু ছেলের এদিকে কাণ্ড দেখ! কচি কচি হাতের পাতায় ভর দিয়ে হাঁটু চালিয়ে হামা টেনে কি না মজা দেখায়। একেই বলে, অকালে হলেও সকালে ফোটা।

নরম নরম হাতের পাতায় ভর দিয়ে,
নধর নধর হাঁটুর মালাই চাকি টানতে টানতে,
আস্তে আস্তে এগিয়ে যান ছেলে।
আর, ঝুন্ ঝুন্ করে সেই বেজে ওঠে কোমরের গোঠ,

অমনি চমকে উঠে থমকে থামেন তিনি। হকচকিয়ে পিছন দিকে কণ্ঠ ঘোরান নন্দন, ফ্যাল ফ্যালিয়ে তাকান।

ওরে দুষ্টু, আনন্দ বাড়ানোর এত বিদ্যেও তুই জানিস!

আবার কখনও হামা দিয়ে দিয়ে গুট্ গুট্ করে ছেলে চলেন। চলতে চলতে এসে হাজির হন রত্নসাজ অলিন্দে। অলিন্দের উপর দিকে ঝোলানো আছে মণি-দাঁড় ; দাঁড়ের পাখীদের ছায়া পড়ে কুট্টিমে ছায়া দোলে ; আর নব শিশু তাঁর অরুণ কোমল আঙুলের পাপড়ি দিয়ে ধরতে যান সেই ছায়া। কী চালাক ছেলে হয়েছে মা, আনন্দে শীষ দিয়ে ওঠেন বাড়ীর মেয়েরা।

৪। এমন কি কখনো কখনো আবৃত-চৈতন্যের মত সেই বাল্য-মূর্ত্তি···যিনি অতি সুকুমার, যিনি অতি রমণীয়, যিনি পূর্ণজ্ঞানঘন··· তিনিও নিজের জ্ঞান হয়েছে, এই কথাটি বোঝাবার উদ্দেশ্যে আশ্রয় নেন নানান্ কৌতুকের।

মেয়েরা হাসতে হাসতে মিষ্টিমুখে যেই জিজ্ঞাসা করতেন—ও ছেলে, তোমার মুখ কই, চোখ কই, কান কই?

ছেলেও ঝটপট আঙুলের পাপড়ি নাচিয়ে দেখিয়ে দিতেন...মুখ, চোখ, কান।

আবার যেই তাঁরা জিজ্ঞাসা করতেন—ও ছেলে, তোমার দাঁতগুলো কোথায়?

সেই কি না ছেলে পদ্মকুঁড়ির মত হাত দিয়ে ঢেকে ফেলতেন তাঁর হাঁ! আ মরি মরি, যেন তাঁর মুচকি মুচকি হাসিখানি স্পষ্ট বলে দিচ্ছে, বেরোয়নি তো।

উপনন্দের পত্নী এক দিন জিজ্ঞাসা করেছেন—বল তো বাছা, কে তোমার মা, কে তোমার বাবা?

অমনি কি ছেলের মুখ কোমল হয়ে গেল অনতি হাসিতে। তার পরেই হঠাৎ তুলতুলে আঙুলগুলো নাচাতে নাচাতে তর্জ্জনী তুলে তিনি দেখিয়ে দিলেন একটি একটি করে...এই মা-কে, এই বাপ-কে। হাসির হুল্লোড় বহে গেল প্রিয়জনদের মধ্যে।

৫। ছেলে কথা কইতে পারে কি না দেখবার নবীন আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এলেন ধাত্রী। বাণীতে বাৎসল্যরসের রেশ একটু মেখেন চড়িয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি—বল তো চাঁদ, এঁদের দুজনের নাম কি?

অমনি লীলাশিশুর মুখ থেকে মিষ্টি মিষ্টি স্পষ্ট বেরিয়ে এল গোটা গোটা অক্ষর—মা তা, মা তা, মা তা।

বাণীর রহস্যটি অলক্ষ্য রয়ে গেল সকলের। কিন্তু সে রহস্য বড় মনোহর। 'মাতা'-র আদ্য বর্ণ ও 'তাত'-এর আদ্যবর্ণ নিয়ে (সংস্কৃতের মাত্রা ছাড়িয়ে অপভ্রংশে) প্রকাশ হল এই "মা তা"। দুজনের কি কখনও একটা নাম হয়? তাই যেমন অপভ্রংশ প্রশ্ন, তেমনি ছেলের এই অপভ্রংশে উত্তর-দান।

৬। কখনো কখনো লীলাশিশু হামা দিয়ে দিয়ে চলেন। মণিকুট্টিমে নিজের ছায়া দেখে চমকে উঠে থেমে যান। কী সুন্দর সেই চমকে-ওঠাটি। হাত দিয়ে মুছতে থাকেন ছায়া। কিন্তু ছায়া কি মোছা যায়, ছায়া ছায়া হয়েই থাকে। আর ছেলের ভয় হয়। ভয়েই যেন কুঁচকে গিয়ে হামা ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মায়ের কোলে।

৭। দেখতে দেখতে কিছুকাল অতীত হল। মণি-দেয়াল ধরে সবেমাত্র উঠে দাঁড়াতে পারেন লীলাশিশু। প্রথম পা ফেলতেই ছেলের মনে হল, এই বুঝি বা পড়লেন। একটি আঙুল বাড়িয়ে যেই হাত ধরতে যাবেন দেয়ালের গায়ের নিজ দেহের ছায়ার, অমনি নিরালম্বের মত পা টলতে টলতে পড়ে গেলেন তিনি।

ম্লান হয়ে যায় ছেলের মুখ। মায়ের মুখের পানে চান আর কেঁদে ওঠেন। দৌড়ে আসেন মা, নিজের আঙুলটিকে ধরিয়ে দেন ছেলের হাতে, হাঁটি-হাঁটি পা-পা...চলতে শেখান ছেলেকে। আর দেখতে দেখতে ছেলের রোদন-ম্লান মুখচন্দ্র জ্যোৎস্না ঝরায় হাসির, আহ্লাদে চমকে ওঠে মায়ের প্রাণ।

৮। তারপরে সেই সময়টি এল যখন পা ছড়িয়ে লীলাশিশু চলতে পারলেন। চলেন, আর বুকের উপর নেচে নেচে ওঠে গলার হার। দেখবার লোভে ব্রজরাজের সীমা থাকে না কৌতুকের। মাতা এবং পিতা দুজনের সামনেই তখন তামাসা করে শিশুকে আদেশ দেন ধাত্রী—শ্রীমুখরা তাঁর নাম,—

ঐ থালাটা নিয়ে এসতো বাবা, আচ্ছা ঐ পিঁড়েটা—আচ্ছা ঐ ঘটিটা।

অমনি ছেলে চলেন ছুট ছুট পা ফেলে, থালা আনতে, পিঁড়ে আনতে, ঘটি আনতে, একটি একটি করে। যেটি আনতে পারবেন, হাসতে হাসতে দুহাতে সেটিকে তুলে ধরেন, নাড়ুসনুদুস ভুঁড়ির উপর টেসান দিয়ে রাখেন, তারপরে জিরোতে জিরোতে আস্তে আস্তে নিয়ে আসেন সেটি। আর যে ক্ষেত্রে পটুতা চলবে না, ছোঁয়ামাত্রই সে বস্তু বর্জন।

৯। আর ঠিক কি সেই সময়েই ব্রজরাজের সামনে এসে উপস্থিত হবেন উপনন্দের পত্নী, সনন্দের পত্নী। যাঁর রাতুল চরণে মাথা নত করে ধন্য হন ভক্তগণ, সেই লীলাশিশুকে তাঁরা দেখতে এসেছেন। এসেই দেখেন, ছেলের, ঐ কাণ্ড! টপ করে তাঁরা ছেলেকে এ কোল থেকে ও কোলে তুলে নেন, বলেন—

"ফেলে দাও, ও সব ফেলে দাও। তুমি ঈশ্বরপুত্র, ঈশ্বর তুমি, তোমাকে কি ও-সব মানায়? কচি কচি গায়ে কি অত বই সয় লো? বলতে বলতে তাঁরা গঞ্জনা দিয়ে ওঠেন ধাত্রীকে, ছেলের হাত থেকে কেড়ে নেন থালা।

১০। আর একদিন জনৈকা বিনোদিনী কৌতুকচ্ছলে ছেলেকে যেই বলেছেন—

"একবার নাচত দেখি কৃষ্ণমণি, নাচলে পরে খেতে দেব ক্ষীর-নবনী।"

অমনি ছেলের থৈ-থৈ করে সে কী সুন্দর নকুলে নাচ গো! আর ঠিক কি তালে তালে পা পড়ছে! পা-ফেলার ভঙ্গিটিও পাকা! সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দেখবার বটে অভিনয়!

মায়ের ঠোঁটে হাসির ঝড় বয়। আর একদিন কোনো রসিকা মস্করা করে যেই বলেছেন—

"তোর বুকে ওটা কিসের দাগ, মাণিক?
সোনার পুতলীর মত দেখতে যেন?
ও বুঝি তোর বৌ?"

অমনি ছেলের মাথা কাঁপানোর সে কী ধুম! অস্ফুট ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে, হাসিয়ে দেন সবাইকে।

আর একদিন—যেহেতু ছেলে তাঁর মাথায় একটু বড় হয়েছে, অতএব তাকে ভবিষ্যুক্ত হতে হবে, এই ভেবে নন্দরাণী কিঞ্চিৎ মজা করে ছেলের মোহন কটিতটে যেই পরিয়ে দিতে গেছেন ছোট্ট আর অতি সুক্ষ্ম একটি পীত ধটি, অমনি ছেলে কোকিয়ে চেঁচিয়ে সারা। কোথা থেকে এ আবার অনভ্যাসের উপদ্রব জোটানো। দু হাত দিয়ে ধটিটিকে খুলে ফেলতে ফেলতে চেঁচিয়ে ছেলে রাঙা করে ফেললেন নিজের মুখ। নন্দরাণী ঢলে পড়লেন হাস্যে।

আর একদিন—যখন আবার ছেলে এসে বিভ্রম ঘটাবে সেই ভয়ে, গোপনে ব্রজপুরের পুরস্ত্রীরা প্রীতিভূষণ দিয়ে সাজাচ্ছিলেন তাঁদের ব্রজরাজমহিষীকে, এমন সময় চপল বালক সত্যিই এসে হাজির; বলা নেই কওয়া নেই, মায়ের গা থেকে জোর করে খুলে ফেলতে লাগলেন গয়না। কী দস্যি ছেলে বাবা! এতোতেও শেষ নেই, যেটি যেখানকার নয় সেই গহনাটি সেইখানে পরিয়ে দিয়ে আবার কি না সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে মায়ের গা!

১১। তার পর একদিন তিনি এলেন, যিনি শ্রীভগবানের বাল্য-লীলাবলোকনহেতু শ্রীভগবানের অগ্রজন্মা হয়ে প্রকট হয়েছিলেন। ঋতের মানমহিমা তাঁর মধ্যে ছিল নিত্যবর্ত্তমান। তাই তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ, তাঁকে বন্দনা করতেন সিদ্ধ মুনিচারণদের সঙ্ঘ। অদ্বিতীয়

হয়েও দ্বিতীয়রূপে শ্রীভগবানের সহচর হয়ে তিনি সমুৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁকে কিয়ৎকাল গর্ভে ধারণ করেছিলেন···ব্রহ্মাদিবন্দ্য শ্রীদেবকের কন্যার চেয়েও যিনি ধন্যা এবং তাঁর চেয়েও যিনি ধর্ম্মময়ী, শত শত পুণ্যের যিনি অবরোহিণী সেই দেবী শ্রীরোহিণী।

অগ্রজের সঙ্গে মিলিত হলেন অনুজ। এ মিলন যেন স্ফটিকের সঙ্গে মহামরকতের মিলন, চন্দ্রমার সঙ্গে মেঘাঙ্কুরের মিলন, শ্বেতপদ্মের সঙ্গে নীলপদ্মের মিলন, ভাঙা-ভাঙা জ্যোৎস্নার সঙ্গে তিমিরাঙ্কুরের মিলন। যমুনার নীল জলে যেন নেচে উঠল শুভ্রহংস।

মনুষ্যশিশুর লীলাকেও গঞ্জনা দিয়ে তাঁর সঙ্গে বাল্যখেলায় মেতে উঠলেন নীলাশিশু।

আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুই ছেলের খেলা দেখতে থাকেন জননী! একটির অঙ্গ থেকে শুভ্র স্ফটিকের জ্যোতিঃ বেরোয়, অন্যটির বেরোয় ইন্দ্রনীলমণির জ্যোতিঃ। কী আলসে খেলার রসেই না নেচে উঠে ঐ মিলে যায় দুই জ্যোতিঃ। মরি, মরি, ও বুঝি চঞ্চল চরণে চলে চলে বেড়ায় দুটি সাগর···নীল সাগর আর শঙ্খসাগর? শরীর আলাদা হলে হবে কি, দুটি আলোর দুই যখন এক হয়ে যায়, তখন কোথায় লোপ পেয়ে যায় মায়ের ভেদবুদ্ধি,··তিনি রামে হন কৃষ্ণমতি, কৃষ্ণে হন রাম-ভ্রমা।

তার পরেই চীৎকার দিয়ে ওঠেন,—

ঐ দেখ গো, ষাঁড়গুলো শিঙ বাঁকিয়ে দাপাদাপি করছে ওখানে, আর ছেলে দুটো দৌড়েছে সেই দিকে। কী হবে গো একটুও ভয়-ডর নেই।

ঐ দেখ, সাপ ধরতে ছুটেছে! এ আবার কেমন খেলা? ওরে তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? দৌড়ে গিয়ে ছেলে দুটোকে ধর।

ঐ রে, পুড়ল এবার পুড়ল, আগুনের ঝোঁটন ধরেছে ছেলে!

মা যশোদা দেখতে থাকেন আর অনুতাপে করুণায় ও শঙ্কায় অঙ্কিত হয়ে যায় তাঁর মতি।

১২। তারপর একদিন ব্রজরাজ-ভবনে সঙ্গোপনে সমুপস্থিত যদুকুলাচার্য্য মুনি 'গর্গ'। শ্রীনন্দের কাছে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন শুদ্ধসত্ত্বধন-দাতা শ্রীবাসুদেব। গর্গমুনি যদুকুলের পরমহিতৈষী। তাঁর করুণার প্রসারে ক্ষয় হয়ে যেত যদুকুলের পাপ-প্রবাহ। যজ্ঞ-বিতানের মত মন্ত্রাত্মা, সূর্য্যাদিতত্ত্বে কপিলাবতার, স্বরসমূহের মত শ্রুতিসম্পন্ন, সর্বকরণ-বিষয়ে অতি কৌশলী,—তাঁর কাছে শ্রীবসুদেব প্রার্থনা করেছিলেন···স্বপুত্রের নামকরণ।

ব্রজনাথভবনে তিনি এলেন,—

> নদীনাথ সাগরের মত···দৈন্যহীন হয়ে,
> তমোঘ্ন সূর্যের মত—অজ্ঞানধ্বংসী হয়ে,
> মহাস্থির কুলপর্বতের মত,
> মহাবর্ষণ প্রাবৃট মেঘের মত,

তাঁর হৃদয়ের, বুদ্ধির, ধৃতির, যত্নের তুলনা নেই সংসারে। যখনি বা যেখানে তিনি শুভাগমন করেন—তখনি বা তথায় সমৃদ্ধা হয়ে ওঠেন পর-লক্ষ্মী। মহাতপস্যায় প্রসিদ্ধ প্রভাবে তিনি স্বনামে প্রবর্তন করেছিলেন গর্গ-বংশ।

১৩। ব্রজরাজ শ্রীনন্দ তাঁর পদ প্রান্তে উপস্থিত হয়ে গেলেন। যথাশোভন সম্মান নিবেদন ক'রে আচার্য্যকে করলেন অভিবাদন। পাদ্য অর্ঘ্য বিধানে সমাধা করলেন পূজা। তারপরে পুলকিত হৃদয়ে তাঁর পাদোদক উপস্পর্শ করে নিভৃতে তাঁকে আহ্বান করে সবিনয়ে বললেন—

মুনিদের করুণা স্বভাবতঃই নীতি-প্রফুল্ল। ভবাদৃশ মুনিজনের দৃষ্টিপাত মাত্রেই পবিত্র হয়ে যায় জন্মমরণাদি লক্ষণ জাগতিক সমস্ত ব্যাধি। তার উপর যিনি আপনার চরণোদক পানের অধিকারী হয়েছেন তিনি যে জ্ঞান-সুখী হবেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতেই পারে না। আমারও আজ তাই ঘটেছে। অগাধ হয়ে উঠেছে আমার সৌভাগ্য-সম্পত্তি। চিরকল্যাণ নিয়ে আসেন আপনারা। পাপের বাহুল্য থেকে আপনারাই মুক্তি দেন জীবকে। আপনাদের অণু-পরমাণু পদরেণুই পবিত্র করে তোলে ভুবন। আপনাদের শুভাগমনই সৌভাগ্য। সেই ভাগ্যটি যাঁরা অবিশ্রান্ত কামনা করেন, নানামুখী হয়ে ছুটে চলে তাঁদের আশা। সেই অবিশ্রান্ত আশা অনায়াসেই আজ আমার পূর্ণ হয়ে গেছে। ফল ধরেছে এতদিনকার অফলা ভাগ্য-বৃক্ষ।

আপনি নিষ্কাম। তবুও দেখতে পাচ্ছি আপনার মধ্যে বিকসিত হয়ে উঠেছে একটি কামনা,—আপনি আমাকে কৃতার্থ করতে চান।

সংসার আপনার কাছে ব্যথার মত। নিরাময়তনু আপনি। কী প্রয়োজনে আপনি এখানে শুভাগমন করলেন, কেমন করেই বা তা প্রশ্ন করি?

কিন্তু ভয় হয়, হয়ত অসন্তোষের কাজ কিছু করে ফেলেছি। তাই অপরিমিত উৎকণ্ঠায় এত ক্লান্ত হয়ে উঠেছে আমার মন যে এতটুকুও বিলম্ব আর সইছে না। আপনি নির্লোভ। সম্মান আপনাকে সন্দীপ্ত করে রেখেছে। অতএব আমার প্রার্থনা,—

ভগবন্, শ্রীবসুদেব আমার প্রিয়সখা। দুন্দুভির মতই তিনি প্রসিদ্ধ ঘোষ, এবং আমারও ঘোষ বংশ প্রসিদ্ধ। এখন যদি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদের পুত্রদ্বয়ের নামকরণ করে দেন, তাহলে আপনার আশীর্ব্বাদে আমি অনুগৃহীত হই, গৃহী হই, তৃপ্ত হই। যাঁরা নীতিজ্ঞ তাঁদের কাছে বেশী কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

১৪। অনুকূল উত্তর দিলেন মুনি,—

ব্রজনাথ, সুদক্ষিণ আপনার বিবেচনা। দম্ভহীন আপনার প্রার্থনা। সদা-বিনয়ী আপনি। বিশ্ব বশীভূত হয় বিনয়ে। দূরে থাকলেও কুমুদকে ফোটায় চাঁদ। তেমনি দূর থেকেও আপনার কল্যাণ করা, আপনার অভীষ্টসাধন করা আমার পক্ষে সমীচীন।

কিন্তু মহারাজ, নৃশংস কংস সহ্য করতে পারেন না কোনো মনুষ্যের কল্যাণ। এ কথা সর্ব্বজন-বিদিত। অথচ আজ জগতে এমন কেউ নেই যিনি বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন কংসের।

নিজে তিনি একটি মূর্ত্তিমান খল। খ-লতায় যে ফল ধরে তার নাম দুঃখ। তিনি তা জানেন এবং জেনেও তিনি নিরুদ্বেগে উদ্বেলিত করে চলেছেন মনুষ্যবর্গকে···বিষফলের মত। স্বর্গের দেবতাদেরও জয় করে বসে আছেন। পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তাঁর প্রতাপ, আবৃত হয়নি সে তেজঃ। বিশেষ করে···বসুদেবের পুত্রটি অধুনা কোথায় রয়েছেন এই হয়েছে তাঁর জপ। পার্বত্য সর্পের মত নিঃশ্বাস ফেলছেন নিয়ত। সাবধানে আছেন।

১৫। তিনি জানেন, আমি যদুকুলের আচার্য্য। আমি যদি এখন আপনার এই আচরণীয় কার্য্যটির অনুষ্ঠান করি, তাহলে, হে

ব্রজরাজ, তাঁর রাজপুরুষেরা যাঁরা ছদ্মবেশে চতুর্দ্দিকে ফিরছেন, তাঁরা তাঁর কাছে নিবেদন করবেনই সে বৃত্তান্ত। তাঁরা ভোজবংশীয় কুলাঙ্গার। আপনার সুখের ব্যাঘাত ঘটাবেনই। তরুকোটরান্তর্গত অগ্নির মত তাঁরা জ্বলছেন। নিদারুণ আঘাত করবেন আপনাকে। অতএব এই নামকরণ প্রবন্ধ আমার পক্ষে দুষ্কর।

১৬। আচার্য্য গর্গের ভাষণে চিন্তা-কবলিত হল শ্রীনন্দের পরমা ধৃতি। তিনি অনুভব করলেন অসহ্য বেদনা। তৎসত্ত্বেও পুনর্বার বললেন—আচার্য্যদেব ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনি জীবন্মুক্ত। কোনো জীবন্ত মনুষ্য আপনাকে যে হিংসা করবেন এ অসম্ভব। আমার উপর আপনার স্নেহও অক্ষয়; এবং আমার এই ভবনে দু'টা চোখও নেই। বাইরের লোক এ প্রসঙ্গ জানতেই পারবেন না। এ ভরসা আমি রাখি। আপনি ভবতাপহারী পরম মঙ্গলের মূর্ত্তি। এই শুভানুষ্ঠান আপনি যদি সম্পন্ন করেন, তাহলে নিষ্প্রয়োজন বাদ্যাদির শুভাড়ম্বর। অদ্যাদি সঙ্কল্প-বাক্যেই এবং আপনার স্বস্তিবাচনেই কেবল এক্ষেত্রে শুভকর্ম্মটি সম্পন্ন হওয়াই বিধেয়।

১৭। ব্রজরাজের নিবেদনে প্রসন্ন হয়ে উঠল আচার্য্য গর্গের শ্রীমুখ। মুখের সেই অবস্থা হল যা হয় কাচ-গর্গরীর, বিকাশিত হয়ে গেল অন্তরের স্নেহ-রস।

এবং ঠিক সেই সময়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে গেলেন মাতৃদ্বয়...শ্রীযশোদা ও শ্রীরোহিণী। তাঁদের দুই কোলে দুই ছেলে।

ব্রজেশ্বরীর কোলে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখে উতলা হয়ে উঠল মুনির মন। তর্ক জাগল তাঁর মনে,—

১৮। আহা এটি কি? এটি কে!

...এ কি একখানি অকৃত্রিম রত্নদীপের অঙ্কুর!
ধ্বংস করতে এসেছেন অনাদিমোহের তামসিকতা?
...এ কি আমার নয়নসম্মুখে রূপ ধরে দাঁড়িয়েছেন
ঈশ্বর-প্রতিপাদক নিখিল উপনিষদের প্রামাণ্য?
...আজ এ কোন্ কুসুমের আবির্ভাব হল আমার
সৌভাগ্যকল্পতরুর কাননে?
...আহা, ইনিই কি তবে আমার সান্দ্রানন্দ-সমুদ্রের
জন্মভূমি?
কেউ বলেন—'ব্রহ্ম',
কেউ বলেন—'জগৎকর্ত্তা';
অন্যেরা প্রতিপাদন করে বলেন—'আত্মা';
উত্তমোত্তমেরা বলেন—'ভগবান';...সেই তিনিই কি আজ।

যিনি দেশাতীত, যিনি কালাতীত, অনবসান যাঁর তীব্র তেজঃ,—আমার সেই দেবতাই কি আজ কোল জুড়ে পেয়েছেন পরমপ্রকাশ নন্দদয়িতার?

১৯। আহা, আমার বিস্ময়ে পা পড়ছে না মাটিতে! আমার সেই বিস্ময়—যেন কোল আলো করে রয়েছেন মায়ের। মায়ের কোলে থেকেও,—আমার রাঙা চোখে যেন বুলিয়ে দিচ্ছেন কর্পূরের স্নিগ্ধাঞ্জন; মৃগমদের প্রলেপ মাখিয়ে দিচ্ছেন সর্ব্বাঙ্গে; যেন ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে দিচ্ছেন অগুরু ধূপের সৌরভে। আমার চেতনায় ঘনিয়ে এসে এ কোন প্রবেশে কমল আনন্দের নীল মেঘ?

আমার টলিয়ে দিয়েছেন ধৈর্য্যকে, থরথর করে কাঁপছে আমার শরীর, কাঁপছে আমার প্রত্যেক রোমের ভিৎ। বিপুল বিলোপ ঘটিয়ে দিয়েছেন আমার প্রজ্ঞার! নামকরণের জন্যে আমি এলেম, আর আশ্চর্য, আমারি কিনা লোপ হয়ে যাচ্ছে নাম? এ কী অসীম দান!

২০। তাহলে এখন কী করি?
ঐ দুখানি চরণ—
যদি এই দুহাত দিয়ে ধরি,—
লোকে বলবে উন্মাদ হয়ে গেছে গর্গ;
আর যদি বক্ষে তুলে নি ঐ স্বর্গ—
লোকে বলবে—অতিচপল মন;
তাও যদি না করি,
উৎকণ্ঠায় ছিন্ন হয়ে যাবে ধৈর্য্যের বন্ধন।

২১। হয় যদি তা হোক্, তাহলেও—
আজ আমার জন্ম সত্য হল, সফল হল;
আজ আমার দুনয়ন সফল হল;
বিদ্যা, তপ, কুল, সমস্তই সফল হল;
আমার এই যদুকুলের আচার্য্যতা—
ভগবতী আচার্য্যতা—
কৃতার্থ হল, অতিসফল হল।

২২। ভাবতে ভাবতে আচার্য্য গর্গের মনে হল তিনি যেন আনন্দসিন্ধুতে স্নানে নেমেছেন। যেন এই মাত্র পান করেছেন পীযূষ। যেন তিনি জেগে জেগেই ঘুমিয়ে রয়েছেন। যেন তাঁর মধ্যে অভ্যুত্থিত হয়েছে জ্ঞান, অথচ তিনি মুগ্ধ; যেন তাঁর অভ্যন্তরে কাঁপছে জীবন অথচ তিনি মূর্চ্ছিত; যেন তাঁর নয়নে নেমেছে দর্শন, অথচ তিনি অন্ধ।

কী যেন তিনি শুনছেন, তবুও যেন তিনি কালা;
কী যেন কী বলছেন, তবুও যেন তিনি বোবা;
ধৈর্য্যের পায়ে নিজে বেড়ি পরিয়েছেন, তবুও
যেন তিনি চপল।

যেন তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—প্রেমলক্ষণ একটি ক্ষণ।

এই হেন যখন তাঁর অবস্থা, তখন তাঁর কাছে কুমার দুটিকে নিয়ে এলেন মাতৃদ্বয়। মাঙ্গলিক বিধান অনুসারে স্বস্তিবচন করলেন আচার্য্য গর্গ। উদ্যত হলেন নামকরণ করতে। প্রথমেই খণ্ডন করলেন অখিল অশুভ এবং কল্যাণীয় কুমারদ্বয়ের আপৎ-শান্তির উদ্দেশ্যে সংকল্প করলেন—পদভঞ্জন করবেন তাঁদের নামার্থের। বললেন—

২৩। এইটি বসুদেবের পুত্র। দৈহিক পরাক্রমে ইনি দেবতাদের চেয়েও প্রবল, শ্রেষ্ঠ। মল্লযুদ্ধাদি ক্রীড়ায় ইনি খেলাতে পারবেন দাবিয়ে রাখতে পারবেন দেবতাদেরও। অতএব এঁর নাম রাখা যেতে পারে 'বলদেব'। কিন্তু হাস্যোচিত হয়ে উঠতে পারে এই ঐতিহাসিক নাম। ইনি মহাপুরুষ ভবিষ্যতে পাপ-সঙ্কর্ষণ করবেন—এই অর্থে এঁর নাম সঙ্কর্ষণও রাখা যেতে পারে। সমুচিতও হয় বটে। কিন্তু মহারাজ, এঁর মধ্যে আমি এমন একটি সর্ব্বাভিরমণীয়তা দেখতে পাচ্ছি যার জন্যে রাম নামেই এঁর ঘটবে প্রসিদ্ধি। অতএব 'বলে'র খেলা দেখিয়ে একদিন যিনি বিশ্বের রমণীয় হয়ে উঠবেন, তাঁর নাম-করণ হোক 'বলরাম'।

২৪। আর শ্রীমতী যশোদা দেবি, আপনার এই আত্মজটি—ভগবৎ-ভক্তিযোগের মত। কারণ, এঁর মধ্যে ঘটেছে শুক্ল-রক্ত-শ্যাম-পীত এই চতুর্বর্ণের ভাব-মিশ্রণ। এঁর প্রকৃত বর্ণে রয়েছে ইন্দ্রনীলমণির নীলতা। থাকাসত্বেও, সত্যত্রেতাদি প্রত্যেকটি যুগের করুণা-কান্তি আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে এঁর বিগ্রহ এবং গ্রহণ করেছে বলেই এঁর শরীরে প্রকটিত হয়েছে অনেক বর্ণতা। সত্যযুগে যখন অবিকৃত থাকেন ধর্ম তখন ঐ বিগ্রহের বর্ণ হয় 'শুক্ল'। ত্রেতায় যখন তুল্য-জ্বালা হন ত্রি-অগ্নি ( অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি ) তখন বিগ্রহের বর্ণটি হয় "রক্ত"। দ্বাপরে সন্দেহাতীত ভাবে বর্ণটি হয় শ্যাম। এবং মূর্ত্তিমান কলিযুগে, বিগ্রহের বর্ণটি হয় "পীত"।

ক-ঋ-ষ-ণ-অ''এই পাঁচটি বর্ণের সমবেত্তি হয়েছে ঐ বিগ্রহের মধ্যে। তাই এঁর "কৃষ্ণ" নাম। ঐ নামের ক-ঋ-ষ-ণ···এই চারটি বর্ণের আনুকূল্যে ঐ বিগ্রহ ধারণ করে চতুর্যুগের চারটি রঙ। 'অ'-তার স্বরাদি বর্ণের আদিভূত। ঐ অ-বর্ণের আনুকূল্যে, স্বয়ং যিনি আদিভূত তিনি ধারণ করতে থাকেন নীল ইন্দ্রমণির সাবর্ণ্য। ঐ বিগ্রহের তখন আখ্যা হয় কৃষ্ণ।

যাঁরা ভজনা করেন তাঁদের পাপটি:ক ইনি 'কর্ষতি', অর্থাৎ দূর করে দেন, যাঁরা অনুরক্ত তাঁদের মনগুলিকে ইনি 'কর্ষতি', অর্থাৎ টানেন। 'কৃষি' ধাতু সত্তার্থ, 'ণ' ধাতু আনন্দার্থ; এবং এই হেতুই, এবং সত্তানন্দরূপতা রয়েছে বলেই এই বিগ্রহের মুখ্য নাম "কৃষ্ণ"।

কখনও কখনও, মহারাজ, লোকে এঁকে 'বাসুদেব' নামেও উদ্‌ঘোষণা করেন। যেহেতু তাঁদের মতে,···মায়া জন্মহীন ইনি বিযুক্ত 'বসুদেব' থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

যখন ভাগবতে ( ১০।৮।১৯ ) কথিত হল ইনি "নারায়ণসমো গুণৈঃ"—তখন সরস্বতী সেই আত্মগত অর্থটিকেই ব্যাখ্যা করেছিলেন, —"এবং নারায়ণ গুণাবলীতেও এঁর সমান; অংশিত্বের দিক দিয়ে শুধু যে ইনি অভিন্ন তা নয়, উপচারতঃ ( ধর্ম-ব্যবহারের দিক দিয়ে ) সকলেই এঁকে "নারায়ণ"-ও বলবেন।"

২৫। তারপরে আচার্য্য গর্গ আরও বললেন—"ব্রজরাজ, আর কত বলি, আমাদের মত মনুষ্যের বাগ বিষয় হতেই পারে না এঁর মহিমা। ইনি আপনার সর্ব্ব-সৌভাগ্যের ফল। এরই আনুকূল্যে আপনি পার হয়ে যাবেন দুর্গতির সাগর; লাভ করবেন দুরধিগম্য মনোরথ! যাঁরা রতিমন্ত হবেন এঁতে সর্ব্বজ্ঞেরাও প্রণিধান করতে পারবেন না তাঁদের সৌভাগ্য। মহারাজ, স্মরণে রাখবেন কুত্রাপি প্রকাশনীয় নয় এই অতি-রহস্য।"

এই বলে তিনি কোলে তুলে নিলেন দুটি কুমারকে। এবং কুমার দুটিও যেন এক পলকে বিনষ্ট করে দিলেন তাঁর আর্ত্ত উৎকণ্ঠা। পুলকাঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর তনু। নয়নভরে তিনি কৃষ্ণকে দেখলেন এবং আপন মনে বললেন—

"মরি মরি, কী অদ্ভুত জ্যোতির উজ্জ্বলতা! নীলোৎপল, নীলকান্তমণি, নীল মেঘ, নীলাঞ্জন ইত্যাদি ভৌতিকদের সঙ্গে এই অভৌতিক তেজের কি উপমা দেওয়া সাজে? এ তেজঃ যে অতীন্দ্রিয়। মণি আর মণির দ্যুতির মত। এই তেজঃকেই বৈদান্তিকেরা অর্চ্চনা করেন 'ব্রহ্ম' বলে।"

২৬। বলতে বলতে সাদরে ও অভিলাষের অতি-আবেগে তিনি আলিঙ্গন করলেন কৃষ্ণকে। কিন্তু একটি ক্ষণ। তার পরেই তাঁকে তুলে দিলেন পিতা শ্রীনন্দের ক্রোড়ে।

বিদায় নিয়ে তিনি উঠলেন। তাঁকে অভিবাদন করলেন ব্রজপতি। কুমার দুটিকে যখন আশীর্ব্বাদ করলেন জ্যোতির্ব্বিদ গর্গ তখন ব্রজপতির দূর হয়ে গেল দুশ্চিন্তা, এবং তাঁর চিত্তের ভিত্তিতে যেন লিখিত হয়ে গেল আনন্দ। মুনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেও কিছু পথ এগিয়ে নিয়ে গেল সেই আনন্দ। প্রস্থান করলেন মুনিবর।

[ ক্রমশঃ।

# উপনিষদমালা

কেমন করিয়া বর্ণিব বলো মোহন-মুরতিখানি  
অনুভবে শুধু পেয়েছি তাঁহার কমল-কোমল পানি  
আমার হৃদয়ে কত না গোপনে  
তাঁর আনা-গোনা শুধু মন জানে  
সে কি অপরূপ মধুময় রূপ প্রসন্ন মুখখানি  
কী যে আনন্দে ভরে গেছে প্রাণ-মন জানে আমি জানি।

তাঁহারি জ্যোতির কণাটুকু পেয়ে ভুবনে কত না আলো  
আকাশে-বাতাসে যাঁহার পরশ না জানি সে কত ভালো  
তাঁর পাশে হীন সূর্য্য-চন্দ্র  
সেই যে আমার জগৎ বন্দ্য  
তাঁহার বিহনে বিদ্যুতে আর আগুনেতে শুধু কালো!  
তাঁহারি জ্যোতির কণাটুকু পেয়ে ভুবনে কত না আলো।

অনুবাদ—পুষ্প দেবী।

পরদিন আবার যাত্রা শুরু হোলো।

এবারের পথ আর পথ নয়। মাঝে মাঝে নাম মাত্র পথের চিহ্ন আছে, বাকী সবটাই একাকার হয়ে আছে। পথ আবিষ্কার করে নিতে হয় যাত্রীকে। একটি পদক্ষেপের পরেই নতুন পদচিহ্ন এঁকে চলতে হয়।

ভাগ্যিস তিয়েলিং ছিল তাই রক্ষা। তা না হলে লাংটুতেই ওদের অভিযান শেষ করতে হতো।

আরো তীব্র শীত পড়লো এবার। যতই তুষাররাজ্যের দিকে এগুচ্ছে ওরা ততই কম্বলগুলো ভালো করে জড়িয়ে নিতে হচ্ছে। চামড়ার জামাগুলো আরো টাইট করে নিতে হয়।

হঠাৎ একজন শেরপার চোখে পড়লো রাস্তার ওপর একটা জুতোর ছাপ। সবাই গোল হয়ে দাঁড়ায় সেখানে। হিমলোকবাসী ইয়েতির পদচিহ্ন নয়। স্পষ্ট জুতোর চিহ্ন। শান্তনু বুঝলো এ নিশ্চয়ই সেই পলাতক শংকরীপ্রসাদের। তাহলে এই পথ দিয়েই সে এগিয়ে গেছে। বুকটা একবার ধক্ করে ওঠলো তার।

রাত্রে তিয়েলিং গল্প আরম্ভ করলেন সেই ইয়েতিদের নিয়ে উপাখ্যান আর চীন দেশের অদ্ভুত গল্প।

লালী জিগ্যেস করে, আচ্ছা, ওরা কি রকম জীব? কখনও কোনো ছবি দেখিনি ত?

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

আগে আমি বিশ্বাস করতুম না, শান্তনু বললে, কিন্তু সেদিন ত স্বচক্ষে দেখলুম।

কিশোর বললে, আমিও দেখেছি, কিন্তু এতো দূরে আর এমন আবছা আলোয় যে, ভাল করে বোঝা গেল না। তবে যা দেখেছি তাতে ওদের মানুষ মনে হয় না।

না মানুষ ত নয়, বললেন তিয়েলিং। আধা মানুষ, আধা গোরিলা বলতে পারো। লম্বায় ওরা ৬ ফুট থেকে ১২ ফুট পর্যন্ত হয়। গায়ে ঘন লোমের আবরণ, যেন জামা পরেছে। মুখে কিন্তু লোম নেই। অনেকটা মানুষের মত। পায়ের ছাপ তোমরা দেখেছো। অনেকে ফটোও তুলেছে ঐ পদচিহ্নের।

বড় অদ্ভুত তো, ব'লে উঠলো লালী। এ কথা যেন বিশ্বাস করা যায় না যে আজও পৃথিবীতে এমন জীব আছে যার কোনো ছবি তুলতে পারলো না মানুষে।

ওরা মানুষকে ভয় করে, তাই দূরে দূরে থাকে, তিয়েলিং বলতে লাগলেন। আর সেখানে ওরা থাকে তার ঠিকানা মানুষ পায়নি। হয়তো কোনো গভীর জঙ্গল কিম্বা কোনো গুহা হবে। যাই হোক, সে অতি দুর্গম স্থান। তোমরা যদি জেগে থাকতে পারো তাহলে একটা গল্প বলবো।

ইয়েতির গল্প নিশ্চয়ই, আমি সারা রাত জাগতে পারি, বলে ফেললো লালী। কিশোর, শান্তনু এরাও প্রস্তুত। মোটা কম্বল জড়িয়ে বসলো সবাই। বাইরে ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে তখন। গভীর রাত্রে তাঁবুর ভেতর অল্প আলোয় তিয়েলিং-এর মুখটা উজ্জল হয়ে উঠলো। শান্তনুর মনে হলো, ছেলেবেলায় সেই পাথর-কাকুর কথা। তিয়েলিং শুরু করেন তার গল্প।

অনেক দিন আগে আমাদের চীন দেশে একটি ছেলে, তার নাম চুংপো। চুংপোর বাবা চিত্রকর। চুংপোও ছবি আঁকে। ঘরের দেওয়ালে, ঘরের মেঝেতে খড়ি দিয়ে, পোড়া মাটি দিয়ে কত ছবিই না আঁকে সে! পাড়ার লোক দেখে অবাক হয়ে যায়। বাঃ কি সুন্দর! দেখ দেখ সারসটা কী জীবন্ত। পাখীটা যেন উড়ছে।

চুংপোর মনে হয়, সত্যি যদি জীবন্ত ছবি আঁকতে পারতুম। এমন কি হয় না, যা আঁকলুম তা উঠলো জীবন্ত হয়ে?

চুংপো লেখাপড়া করে বাড়ীর কাজ করে আর তার বাবার কাজে সাহায্য করে। এই ভাবে দিন কাটছে। একদিন নদীর ধার দিয়ে আসছে চুংপো। বাঁশের পোলের কাছে কে যেন বসে আছে দেখলো সে। সাহসী ছেলে চুংপো।

কাছে যেতে দেখে এক বুড়ো, মাথায় লাল রঙের টুপি, মস্ত লম্ব সাদা দাড়ি-গোঁফ। পাশে রয়েছে একটা আলিমারা বোঁচকা। ভগবান জানেন কি আছে তাতে। তবে ছেলেধরা নয় তো? দূরে পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে বুড়ো।

খুট ক'রে একটু শব্দ হতেই বুড়ো তাকালো চুংপোর দিকে আঃ, বুড়োর মুখখানা কী মিষ্টি!

এসো খোকা, দেখো তো পাহাড়টা কেমন হয়েছে, বললে বুড়ো।

চুংপো অবাক! বুড়ো বলে কি, এ যেন তার তৈরী পাহাড়, ত বলছে কেমন হয়েছে বল তো। নিশ্চয়ই মাথা খারাপ লোকটার।

কই বললে না? বুড়ো আবার বলে। ঐ উঁচু চুড়োটার পা ঐ ছোট চুড়ো কেমন, মানাচ্ছে না?

হ্যাঁ, ভগবানের সব জিনিষই মানানসই, চুংপো বললে।

না, না, না, ওটা আমার তৈরী। তাই তো জিগ্যেস করছি তোমায়।

তুমি নিশ্চয়ই পাগল, চুংপো বললে। তোমার কেউ নেই?

তুমি বিশ্বাস করছো না, আমি একটা ম্যাজিক জানি। পৃথিবীর সেরা ম্যাজিক—দেখবে? এই বলেই বুড়ো তার থলি হাতড়ে বার করলো খানিকটা কাগজ আর রঙ-তুলি।

রঙ-তুলি দেখেই চুংপোর মনটা নেচে উঠলো। তার পর বুড়ো চটপট খানিকটা রঙ গুলে নিলো আর তুলি দিয়ে কাগজের ওপর আঁকলো একটা সারস পাখি। আঁকা হতেই কাগজটা ধরে আস্তে একটু ফুঁ দিতেই সারসটা কাগজের পাতা ছেড়ে উঠে পড়লো আর ডানা মেলে উড়তে লাগলো। কী আশ্চর্য! ঠিক যেন জীবন্ত সারসের মতই উড়ছে সে। চুংপো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

দেখলে ত? এখন বিশ্বাস হচ্ছে? বুড়ো বললে।

আমায় দেবে তুলিটা? আমি আঁকলেও ঐ রকম হবে? তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে চুংপো।

বুড়ো খানিকটা হেসে নিলে, তার পর বললে, হ্যাঁ হবে। এই তুলি দিয়ে যে আঁকবে, তার ছবিই জীবন্ত হবে। তবে একটা কথা—

কি?

কথা হচ্ছে, লোককে আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যেই শুধু তুলির এই গুণ থাকবে।

বুঝেছি।

তার পর সেই বৃদ্ধ চুংপোর হাতে দিল তুলিটি। কি সুন্দর ওটি, সোনার ওপর কত কারুকাজ নক্সা-করা আর কি ভারি। তুলির লোমগুলিও সোনালি রঙের। সেটিকে হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে আসছে চুংপো। ঐ যা, রঙ তো নেওয়া হলো না? চুংপো পেছন ফিরলো, কিন্তু কোথায় সেই বুড়ো! সেখানে কেউ যে কখনও ছিল, তা মনেই হলো না।

চুংপো বাড়ীতে এসে আঁকলো এক সারস। ফুঁ দিতেই সেই সারস কাগজ ছেড়ে আকাশে উড়লো। সবাই অবাক! সে একটি সুন্দর ফুলগাছ আঁকলো আর সেটি বাবার ছবি আঁকার ঘরের পাশে বসিয়ে দিল। তাতে যা ফুল হয়, সে ফুল কেউ কখনও দেখেনি।

চারি দিকে ছড়িয়ে পড়লো চুংপোর নাম। দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসে দেখতে—সবাই দেখে অবাক! চুংপোর বাড়ীতে নিত্য লোকের ভিড় জমে যায়।

একদিন চুংপো সারাদিন বসে বসে একটি সুন্দর বাগান আঁকলো। বাগানে বড় বড় ফলের গাছ, আশ্চর্য ফুলের গাছ, পাখি, ছোট একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। কাচের মত স্বচ্ছ তার জল।

জলে মাছ নেই কেন? বলে উঠলো মিমি। মিমি তার পাশেই ছিল কি না। মিমি ঐ গ্রামের জমিদারের মেয়ে। সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে, যেন চাঁদের আলোর মত রং। চুংপোর সাথী সে। মিমিও চুংপোকে খুব ভালবাসে। ঐ বাগানটি মিমির বড় প্রিয়।

কয়েকটা আঁচড়ে নানা রং দিয়ে মাছ আঁকলো চুংপো। তারপর নদীতে ছেড়ে দিল তাদের। স্বচ্ছ জলে কী সুন্দর দেখাচ্ছে তাদের! নড়ে চড়ে খেলা করছে তারা, যেন রামধনুর টুকরো। মিমি খিল-খিল করে হেসে ওঠে।

একটু পরেই মুখ ভার করে বলে, কই চুংপো একটা প্রজাপতি নেই তোমার বাগানে?

চুংপোর আর কতক্ষণ লাগে। বড় বড় ডানাওয়ালা প্রজাপতি আঁকলো কতকগুলো, তাদের ডানায় ছোঁয়ালো নানা রং। তারপর তারা যখন উড়তে লাগলো তখন মিমির আনন্দ আর ধরে না। লাফিয়ে লাফিয়ে সে খেলা করে তাদের সঙ্গে। তারপর হাঁফিয়ে গিয়ে যখন বসেছে তখন আবার তার মুখ ভার। একটা কুঞ্জবন যদি থাকতো তার মধ্যে বসতে পারতুম তো, বললে মিমি।

তার জন্যে ভাবনা? চুংপো আবার বসে যায় আঁকতে। বিচিত্র লতা তার বাহারে পাতা আর ফুল দিয়ে ঘিরে রইলো কুঞ্জবনকে। নীচে কী মিষ্টি ছায়া! ওরা দুজনে বসলো।

আর কিছু বায়না করো না কিন্তু, বললে চুংপো।

না, আর একটা জিনিস শুধু চাইবো, বললে মিমি। তোমার বাগানটা ঘুরে বেড়াতে ত কষ্ট হয়। একটা ছোট ঘোড়া চাই আমার। সাদা রং আর গোলাপি মখমলের মত নরম কেশর।

চুংপোকে আবার বসতে হলো আঁকতে। ঘোড়া আঁকতে তার ভাল লাগে। সূক্ষ্ম রেখায় সুন্দর করে আঁকলো সে। একটু পরেই সেই ছবির ঘোড়া মাটিতে দাঁড়িয়ে।

বাঃ কী সুন্দর! বলে উঠলো মিমি। সে তার গায়ে হাত দিতে যায়। ঘোড়াটি সরে সরে যায় ঝোপের দিকে। মিমি একটি লবঙ্গ-গাছের পল্লব খেতে দেয় তাকে। ভয়ে ভয়ে যেন সেই শুভ্র জীবটি এগিয়ে আসে। হাত থেকে ডালটি টেনে নেয়। সবুজ ঘাসের ওপর দুধের মত সাদা ঘোড়াটি সত্যিই অপূর্ব দেখাচ্ছিল। তার চোখ দুটি ঘন কালো, লম্বা গোলাপি রঙের কেশর।

আস্তে আস্তে মিমির সঙ্গে তার ভাব হলো। কিন্তু তার পিঠে চাপতে ভয় করে মিমির। ঘোড়াটি যেন তা বুঝতে পারে। সে পা মুড়ে নীচু হলো, যেন সে পিঠে চাপার কথাই বলছে।

চুংপোর ছবি থেকে বেঁচে উঠলো ছোট সাদা ঘোড়া

মিমিরও ভয় কাটতে দেরী হলো না, অতোটুকু ঘোড়াকে আবার ভয় কি ?

পিঠে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ঘোড়া, তারপরে ছোট্ট একটি লাফ দিল, ঘোড়া যেমন লাফায়। কিন্তু মাটিতে পা পড়ার সময় মিমি বুঝতে পারলো না। যেন একরাশ কাশফুলের গদিতে সে বসে আছে। সে ধরে রইলো ঘোড়ার ঘাড়ের লম্বা কেশর। বললে, আরও জোরে ছোট, ঘোড়া...

বাগানের এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। চুংপোও আছে ওদের পেছনে। সত্যি কথা বলতে কি, চুংপো একটা পাখি নিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েছে কি, অমনি সেই তুষার ধবল ঘোড়া একটি লাফ দিয়ে ছুট দিল। মিমির মুখে ভয় এবং আনন্দ, সে দূর থেকে বললে, বিদায় চুংপো। চুংপো অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই অবকাশে ঘোড়া বাগান পার হয়ে বড় রাস্তায় পড়েছে।

মিমি, মিমি ফিরে এসো···ফিরে এসো···

চুংপো দেখলো দূরে পাহাড়ের দিকে মিমিকে নিয়ে হাওয়ার বেগে উড়ে চলেছে শুভ্র ঘোড়া, তার পায়ের থেকে উড়ছে ধূলোর মেঘ। চুংপো ছুটলো অনেক দূর কিন্তু পশ্চিমে যেদিকে থাকে থাকে পাহাড় উঠেছে সারি সারি সেই দিকে সাদা একটি ছুটন্ত বিন্দু ক্রমেই মিলিয়ে গেল। সেই সময়ই সূর্যের শেষ আলো মুছে গেল আকাশ থেকে। দিগন্তের দিকে চেয়ে চুংপো কেঁদে ফেললো।

হঠাৎ তার মনে হলো, সেও একটা ঘোড়ায় চেপে অনুসরণ করবে মিমিকে, ফিরিয়ে আনবে তাকে। তার তুলিটা চাই এখখুনি! কিন্তু ভাগ্যে তার অন্যরকম লেখা ছিল।

সে বাগানে এসেই দেখলো, জমিদার রক্তচক্ষু নিয়ে দাঁড়িয়ে। চুংপোর কোনও কথাই সে শুনলো না, তার মেয়েকে এনে দিতে হবে। সে যে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে এ বিষয়ে জমিদার আর তার উগ্র সাঙ্গোপাঙ্গের সকলেরই কোনো সন্দেহ ছিল না।

তারপরে রাজার কাছে বিচারার্থ গেল জমিদার। চুংপোকে ধরে নিয়ে গেল রাজার দুষমণ সেপাইরা।

বড় দুঃখের গল্প, তাই না ? আজ এই পর্যন্ত থাক। ওদিকে দেখ ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। তিয়েলিং এই পর্যন্ত বলে থামলেন। সকলের চোখে-মুখে গভীর ব্যথার ছাপ!

এদিকে সকালে আলো ফোটবার আগেই তাদের তৈরী হতে হবে। এতক্ষণ কারুরই মনে ছিল না যে তারা এক দল অভিযাত্রী।

তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে রওনা হলো সকলে।

তিয়েলিং বললেন, পথ ক্রমে যত দুর্গম হচ্ছে ততই আমরা আমাদের গন্তব্যের কাছাকাছি আসছি মনে রাখবে। দেখ দেখি শান্তনু, এখানে কতকগুলো কেমন অদ্ভুত রকমের পাথর। ফেরার সময় সংগ্রহ করতে পারো এগুলি। তোমার কাজে লাগবে। শান্তনু দেখলো সত্যিই তাই। সে সেখানে 'একটা নিশানা রাখলে যাতে ফেরার পথে চোখে পড়ে।

ঘোড়ায় চেপে লালী বললে, লামাজী, তোমার গল্পের ঘোড়ার মত এখন যদি আমার এই বাহন উধাও হয়ে ছোটে, তোমাদের খুব সুবিধা। কেউ ধরবে না তোমাদের।

ছবির ঘোড়া এটি নয়, বললেন তিয়েলিং। তা যদি হতো আমিই ওতে চেপে বসতাম।

গল্পটা শেষ না হয়ে মনটা খচ-খচ করছে, বললে কিশোর। এমন সময় শেরপারা সাবধান করে দিলে—আর কথাবার্তা নয়! সামনে খাড়া পাহাড়। পথ সরু এবং পিছল। অন্যমনস্ক হলেই বিপদ!

[ ক্রমশঃ।

## গেটম্যান

### শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

এই পৃথিবীতে এসে যাঁরা পরের কল্যাণ-সাধন করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ব'লে গ্রহণ করেন, তাঁদের নশ্বর দেহ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাদের পুণ্য-স্মৃতি অবিনশ্বর হয়েই সকলের চিত্ত চিরদিনের জন্তে অধিকার করে থাকে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন। আজ আমি এই রকমই একজন অমর ব্যক্তির কথা বলতে বসেছি। গত দুর্গাপূজার কয়েক দিন আগেকার কথা। দিকে দিকে যখন ফুটে উঠেছে মহানন্দের ছবি, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যখন মহোৎসবের আয়োজনে মাতোয়ারা, সারা বাংলা যখন আনন্দময়ী মায়ের শুভাগমন প্রতীক্ষায় উন্মুখ,—ঠিক সেই সময়ে এক শোকাবহ ঘটনা একজন অখ্যাতনামা গেটম্যানকে অমরত্বের মহিমায় অভিষিক্ত করে গেছে। এই গেটম্যানের নিঃস্বার্থ আত্মদান ইতিহাসে স্মরণীয়।

তখন বৈকাল পাঁচটা হবে। চব্বিশ-পরগণা জেলার বনগ্রাম মহকুমা থেকে একখানা ট্রেণ দ্রুতগতিতে আসছিল—রাণাঘাটের দিকে। লৌহশকট নক্ষত্রবেগে চলেছে তো চলেছে। এই লাইনে রাস্তা ক্রশিং-এর কতকগুলি গেট পড়ে। যখন ট্রেণখানা বনগ্রাম রাণাঘাট লাইনের লেভেল ক্রশিংএর বাইশ নম্বর গেটের কাছাকাছি এসেছে, গেটম্যান গেট বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। গেট বন্ধ থাকায় কোন লোক আর রাস্তা পার হতে পারল না। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে একটি তিন বছরের শিশু অকস্মাৎ তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে গেটের মধ্যে এসে দাঁড়াল। অবোধ শিশু বুঝে না যে সাক্ষাৎ যম দুরন্তবেগে তার দিকে ছুটে আসছে। শিশু তার ধীর পা ফেলে চলেছে তো চলেছে। শিশু তখন লাইনের মধ্যস্থলে! ট্রেণ যে খুব কাছেই এসে গেছে সে জ্ঞান তো তার নেই। সে যে অবোধ শিশু। ট্রেণ-ড্রাইভার বিপদজ্ঞাপন বাঁশীর আওয়াজ দিল। গেটম্যানের প্রাণ কেঁপে উঠল। সে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো গেটের কাছে। সে দেখল, একটা ছোট্ট ফুটফুটে শিশু গুট-গুট করে চলেছে লাইনের দিকে। ওদিকে ট্রেণ আসছে দৈত্যের মতো বিরাট আকৃতি কলেবর নিয়ে শিশুটিকে গ্রাস করতে। গেটম্যাম চীৎকার করে উঠল, সর্ব্বনাশ ছেলেটি যে গেল!

গেটম্যানের মনে কর্ত্তব্যের আহ্বান এলো। নিমেষ মধ্যে সে নিজের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে ইঞ্জিনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কি দুঃসাহসিক কাজ! কি মনের তেজ! কি অদ্ভুত স্বার্থত্যাগ! নিজের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ইচ্ছা করে কে ঠেলে দিতে পারে? কার মনে এ জোর আছে? গেটম্যান এক ঝটকায় শিশুটিকে লাইনের বাইরে ছুঁড়ে দিল। শিশুকে বিপদ থেকে মুক্তি করল নিমেষের মধ্যে। কিন্তু ইঞ্জিন এসে ভীষণভাবে ধাক্কা দিল গেটম্যানকে। আঘাত পেয়ে গেটম্যান কয়েক গজ দূরে ছিটকে পড়ল।

ট্রেণ থেমে গেল। ড্রাইভার, গার্ড-সাহেব নেমে এলেন ট্রেণ

থেকে। গেটম্যান তখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে পড়ে। তখন তার সজীব দেহ নিঃসাড় হয়ে গেছে। গার্ড-সাহেব তাড়াতাড়ি তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে রাণাঘাটের দিকে রওনা হলেন। গেটম্যানের আঘাত লেগেছিল অত্যন্ত গুরুতররূপে। তাকে কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হলো ; কিন্তু সে আর তার জ্ঞান ফিরে পেল না !

এই গেটম্যানটিকে কেউ চেনেন না, কেউ এর নাম জানেন না। কারণ, প্রথমেই বলেছি, আমি একজন অখ্যাতনামা লোকের কথা বলছি। তবে আজ সে জগতের কাছে খ্যাতনামা ব্যক্তি বলে পরিচিত হলো। তার অদ্ভুত আত্মদান তাকে অমর করে তুলল। ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে তার নাম লেখা হয়ে গেল। এর নাম কুঞ্জ দাস। এ ছিল ঋষি সম্প্রদায়ভুক্ত, কাজ করত বনগ্রাম-রাণাঘাট লাইনের লেভেল ক্রসিং-এর বাইশ নম্বর গেটে। আর যে শিশুটিকে সে বিপদ থেকে মুক্ত করল—এ শিশুটি হচ্ছে দেবগড় নিবাসী শ্রীশিবপদ ভট্টাচার্য্য মশাইএর পুত্র।

## জ্যান্ত সিগারেট !

### যাদুরত্নাকর এ, সি, সরকার

সেবার বিলেত যাবার পথে ব্যাটোরী জাহাজে একটি ম্যাজিক দেখিয়ে যাত্রীমহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলাম। এই খেলাটা সন্ধ্যাবেলায় ডেকের আলো অন্ধকার কোণেই সাধারণতঃ দেখাতাম। জনৈক যাত্রীর কাছ থেকে চেয়ে নিতাম একটি সিগারেট। তার পরে এই সিগারেটটিকে বাঁ হাতের চেটোর উপরে রেখে ডান হাতে তার উপরে 'পাস' দিতাম। আস্তে আস্তে নড়েচড়ে উঠত এই সিগারেট—কখনও কখনও বা ডান হাতের সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে ভেসেও উঠত। এই আজব কাণ্ড দেখানো শেষ হয়ে গেলে, যার সিগারেট তাকে ফেরৎ দিয়ে দিতাম। তিনি এই সিগারেটটি আর খেতে

সাহস পেতেন না, ভূতের দৃষ্টি পড়েছে সিগারেটে, কী আবার হয় কে জানে। কেমন ক'রে এই খেলাটা দেখাতাম, তাই এখন বলছি শোন :—

আমার গায়ে থাকতো কালো কোট। এই কোটের বুকের সঙ্গে আমি ঝুলিয়ে রাখতাম ফুট দেড়েক লম্বা একটি খুব সরু কালো সুতো। এই সুতোর প্রান্তে লাগানো থাকতো একটি ছোট্ট ছুঁচ। এই ছুঁচটাতেও কালো রঙ লাগানো থাকাতে আধো অন্ধকারে বোঝা যেতো না এর অস্তিত্বের কথা। সিগারেটটা হাতে নিয়ে কথা বলার অবসরে কৌশলে এই ছুঁচটা আমি ফুটিয়ে দিতাম সিগারেটের ভেতরে লম্বালম্বি ভাবে। এর পরে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের উপর দিয়ে সুতোটা চালিয়ে দিয়ে হাত ওঠা-নামা করলেই সিগারেট নড়তে থাকবে আর হাতটা সামনের দিকে প্রসারিত করলেই সিগারেট উঠে আসবে হাতের সঙ্গে। পরে সিগারেট থেকে ছুঁচটা টেনে বের করে নিলে কোন রহস্যের ছাপই থাকবে না সিগারেটের উপরে।

যাদুবিদ্যায় উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ লেখকের সঙ্গে জবাবী কার্ডে পত্রালাপ করতে পারো এই ঠিকানায়। A. C. SORCER *Magician*, Post Box 16214 Calcutta-29

## চাঁদের দেশে

### শ্রীহরপ্রসাদ ঘোষ

চাঁদের দেশে যাবার চেষ্টা আজ-কাল বেশ ভাল ভাবেই চলছে। বিভিন্ন দেশের বিখ্যাত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা ভীষণ চেষ্টা করছেন চাঁদের খবরাখবর সংগ্রহ করতে। বিশেষ করে চাঁদের যে দিকটা আমরা আজ পর্য্যন্ত দেখতে পাই না, সে-দিকে কি আছে সেটা জানবার জন্য তাঁদের আগ্রহ আজ-কাল ভয়ঙ্কর। আমরা এতদিন পর্য্যন্ত চাঁদের আগ্নেয়গিরিগুলি মৃত বলে জানতাম কিন্তু কিছুদিন হ'ল জানা গেছে যে সেই সকল আগ্নেয়গিরি হ'তে এখনও অগ্ন্যুৎপাত হয়। এখন চাঁদের দেশে বা চন্দ্রলোকে প্রাণী আছে কিনা সে বিষয়ে জানবার জন্য বৈজ্ঞানিকদের আগ্রহ খুবই বেড়ে গেছে। অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন যে, চাঁদে জল ও বায়ু নেই, সুতরাং ওখানে প্রাণী নেই ; কারণ জল ও বায়ু ছাড়া কোনও প্রাণী বাঁচতে পারে না। ফ্ল্যামারিয়ন প্রভৃতি জ্যোতিষীরা চাঁদের মধ্যে সবুজ ও হলদে রং লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের মত এই যে, যদি উদ্ভিদ চাঁদের উপরে না থাকে তা'হলে এই রং এল কোথা হ'তে। আবার অনেকে বলেন যে, পৃথিবীর মত চাঁদের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ অর্থাৎ শীত বা উষ্ণ কোনওটাই বেশী নয়। সেখানে প্রধানতঃ দু'টি ঋতু বর্ত্তমান—গ্রীষ্ম ও শীত। সুতরাং হয়ত প্রাণী থাকতেও পারে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, চাঁদ এত বেশী ঠাণ্ডা যে, সেখানে কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করাও যায় না। তবে একটা কথা যে, পৃথিবী হ'তে চাঁদের উৎপত্তি হ'লেও চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে পুরানো। কারণ চাঁদ পৃথিবী হতে সৃষ্ট হ'বার পর যখন ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হ'য়ে কঠিন আকার ধারণ করল, তখনও পৃথিবী বাষ্পময় ও জলময়। তখনও পৃথিবী এখনকার মত কঠিন আকার ধারণ করেনি। তাহলে পৃথিবীতে যখন জীব সৃষ্ট হ'য়েছে তা'র আরো আগে চাঁদে জীব সৃষ্ট হওয়া বেশী সম্ভব। কারণ জীবের উপযোগী স্থান পৃথিবীর আগে চাঁদকেই আমরা দেখতে পাই।

আমাদের পৃথিবীতে যেমন ৩০ দিনে এক মাস হয় চাঁদের দেশে কিন্তু ২৭ দিনে (২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট) এক মাস হয়। পৃথিবীর সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্রায় এক বৎসর সময় লাগে।

পূর্ণিমা রাতে চাঁদকে দেখতে মনে হয় একেবারে গোল। মনে

হয় যেন সেদিন আমরা চাঁদকে সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে পাই। কিন্তু তোমরা শুনলে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে যে, পূর্ণিমা রাত্তে আমরা চাঁদের অর্দ্ধেকটা সম্পূর্ণ দেখতে পাই। বাকী অর্দ্ধেকটা এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। যদিও রাশিয়া ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকেরা আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করছেন যে, চাঁদের যে-দিকটা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ সে দিকটায় কি আছে সে-বিষয়ে সঠিক ও বিস্তারিত ভাবে জানতে এবং অল্প সময়ের মধ্যে যে তাঁরা সফল হ'বেন সে বিষয়ে এক রকম নিঃসন্দেহ।

তোমরা জেনে রাখ যে, পূর্ণিমার রাতে যেদিন আমরা চাঁদের অর্দ্ধেকটা সম্পূর্ণ দেখতে পাই সেই পূর্ণিমার রাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয় আর অমাবস্যার রাতে যে দিন চাঁদকে আমরা দেখতে পাই না সে দিন সূর্য্যগ্রহণ হয়। আরও জেনে রাখ যে, অমাবস্যার পর হ'তে একটু একটু করে চন্দ্রকলার বৃদ্ধি হ'তে হ'তে যখন আমরা চন্দ্রের অর্দ্ধেকটা সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে পাই অর্থাৎ অমাবস্যার পর দিন হ'তে পূর্ণিমার রাত্র পর্য্যন্ত সময়টাকে শুক্লপক্ষ এবং পূর্ণিমার পর দিন হ'তে একটু একটু করে চন্দ্রকলার হ্রাস হওয়া বা কমে যাওয়া হ'তে অমাবস্যার দিন পর্য্যন্ত সময়টাকে আমরা কৃষ্ণপক্ষ বলি।

তোমরা জান যে, চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ। চাঁদ আকারে পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট। উনপঞ্চাশটা চাঁদ যদি একসঙ্গে পাশাপাশি রাখা যায় তাহলে পৃথিবীর সমান হয়। আর ছয় কোটি কুড়ি লক্ষ চাঁদ যদি একত্রিত করা যায় তাহলে আমাদের সূর্য্যের সমান হবে।

এই চাঁদ পৃথিবী থেকে এত ছোট হলেও চাঁদের ক্ষমতা কিন্তু অনেক। চাঁদ পৃথিবীকে এবং প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে আকর্ষণ করছে। তোমরা জান যে, পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। সুতরাং চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর জলের ওপরেই বেশী। আর জল তরল বলে পৃথিবীর স্থলের চেয়ে জলই চাঁদের আকর্ষণে ফুলে ওঠে। (যদি কোনও জিনিষ হাতে করে ওঠাবার চেষ্টা কর তাহলে সেই জিনিষটা তোমার হাতের দিকে সহজেই তোমার হাতের আকর্ষণে উঠে যাবে) সেই রকম চাঁদ যখন ঠিক আমাদের মাথার ওপরে থাকে তখন পৃথিবীর সেই ভাগের সমুদ্রের জল চাঁদের আকর্ষণে উর্দ্ধে উত্থিত হয় অর্থাৎ চাঁদ এ জলকে যেন ওপরে টেনে নেয়। কিন্তু জল উর্দ্ধে উত্থিত হলেও বেশীক্ষণ সেই ভাবে থাকতে পারে না। তাই আকর্ষণ একটু অল্প হলেই জল নিজের ভারে নীচু দিকে গড়িয়ে পড়ে প্রবল বেগে স্থলের দিকে ধাবিত হয়। একেই বলা হয় জোয়ার এবং পৃথিবীর যে দিকটা হতে জল আকর্ষিত হয়, স্বভাবতঃই সে দিকটায় জল কমে যায়। সুতরাং সেদিকটায় তখন ভাটা। জোয়ারের সময় ভেবো না যে, পৃথিবীতে হঠাৎ জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। পৃথিবীর জল সমানই থাকে। শুধু চাঁদের আকর্ষণে যেদিকটায় জল ফুলে উঠল সেদিকটায় আমরা জল বেশী পাই বলে জোয়ার বলি আর অপর দিকটায় জল তখন কম থাকে বলে আমরা সেদিকটায় ভাটা বলি। সূর্য্যের আকর্ষণেও জোয়ার হয় কিন্তু সূর্য্য অনেক দূরে থাকায় আকর্ষণ এত অল্প হয় যে, চাঁদের আকর্ষণের জোয়ার অপেক্ষা অনেক কম হয় এবং এত অল্প জোয়ার ভাটা হয় যে আমরা একরকম অনুভব করি না। অমাবস্যায় ও পূর্ণিমার দিনেই জোয়ারের তেজ বেশী হয়; কারণ এই দুই দিনে চাঁদ সূর্য্য ও পৃথিবী প্রায়ই একই লাইনে থাকে। এই জোয়ার কিন্তু আমাদের ফসল উৎপাদনে খুব সহায়তা করে। সুতরাং চাঁদ শুধু যে যামিনীকে জ্যোৎস্না-পুলকিত করে তা নয়; মানব-জীবনের প্রভূত উন্নতি সাধনও করে।

## লক্ষ্মীর ঝাঁপি

### পরিতোষ মুখোপাধ্যায়

দাংগা বলে একটা ছেলে ছিল। ছেলেটা কিন্তু মোটেই দাংগাবাজ নয়। তবে তার ওমনি নাম হল কেন, বলছি।

একটা গাঁয়ে একবার শালপিয়ালের বনে খুব ঝড় উঠল। সাঁওতাল কুলিকামিনরা দাংগা বাঁধিয়ে বসল সিপাইদের সংগে। সিপাইরা ওদের মারধোর করেছিল আর ফসল ছিনিয়ে নিয়েছিল কিনা, তাই ঠিক এই দাংগার সময়টিতে হাত মুঠো করে, পা ছুঁড়ে আর ওয়াঁও ওয়াঁও করতে করতে এল ওই ছেলেটা। তাই তো ওর নাম হল দাংগা।

দাংগা ছেলেটা আসলে শান্ত-শিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট—হাবাগোবা, ক্যাবলা গোছের। সব্বাই তাই ওকে রাগাতো, মাথায় গাঁট্টা মারতো, ল্যাং মারতো। এমন কি একটা বিচ্ছিরিচ্ছিরি পেঁচি পর্য্যন্ত ওকে ভেংচি কাটতো। কিন্তু কে জানত যে ছাই-এর আবডালে লুকিয়ে আছে একটুকরো আগুন—জ্বলজ্বলে দগদগে। একদিন তাই দাংগা ওলোট-পালোট করে দিলে সবকিছু; ক্যাবলা ছেলেটা দাংগা বাধিয়ে বসল, আর বাধাবি ত বাঁধা—একেবারে খাস লক্ষ্মীর সংগে। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর ঝাঁপি বাঁচানোই যে এক বিষম দায় হয়ে পড়ল।

আর হবে নাই বা কেন? দুসন্ধ্যে দুপেট ভাতও জুটতো না ওদের। তাই না সেদিন রেগে গেল দাংগা। খেলাধুলো করে ঘুটঘুটে আঁধারে বাড়ী ফিরে এসেছে। এসে দেখে—ঘর অন্ধকার, যেন অমাবস্যের রাত। মা বলল: তেল নেই দাংগু, আলো জ্বালবো কি করে?

: থাকগে, আলো জ্বালতে হবে না তোমায়। পেট চোঁ-চোঁ করছে, এবেলাও কিছু খাবার দেবে না?

মা আঁধার সাঁতরে হাতড়াতে হাতড়াতে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। বলল: খু-ব খিদে পেয়েছে, না রে? পাবেই তো—সোনাটা সকাল থেকে কিচ্ছু খায় নি! এই তো মুংরা এল বলে। ও তোমাকে খাবার দিয়ে যাবে।

: মুংরা আসবে না ছাই! আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, এমন জ্বলছে পেটের মধ্যে। রাগে ফুলতে লাগল দাংগা।

মা বলল: আর কষ্ট থাকবে না আমাদের, দেখো। মা লক্ষ্মীর কৃপায়—

: কিপা না ছাই। রাগে আর খিদেয় থরথর করে কাঁপতে লাগল দাংগা। এক সময় মায়ের হাতের বেড়ি ছাড়িয়ে দৌড়ে ছিটকে পড়ল চৌকাঠের ওপারে—বারান্দায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার ফুঁড়ে দৌড়োতে দৌড়োতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জলাংগি নদীর পাশে বাঁজা মাঠটায়।

মা ডাকতে লাগল গলা ছেড়ে। শাল-পিয়ালের হাওয়ারা উড়ে এসে দাংগুকে খবর দিল—তোমার মা ডাকছে। দাংগু শুনলে

না সে কথা। হাঁটতে হাঁটতে, দৌড়োতে দৌড়োতে চলে এল যেখানটায় আকাশটা নেমে এসেছে মাঠের শেষে। ওখানে গিয়ে হাত তুলে দাঁড়ালো। নীল আকাশটা ওকে আদর করে তুলে নিল ওদের রাজ্যে।

নীল মেঘের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল দাংগা। তারার আলোয় চকচক ঝকঝক করছে পথ। হাঁটতে হাঁটতে একটা পুরীর সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো দাংগা। ঝলমল করছে চারদিক। জলতরংগের মত একটা মিষ্টি সুরের ঢেউ হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। এত বড় বাড়ীটায় কে থাকে বলো তো? ওপর দিকে তাকিয়ে কিন্তু দাংগার চক্ষু ছানাবড়া! মস্ত একটা সিংহ। প্রায় মাইলটাক চওড়া তার হাঁ-র মধ্যে জলজ্বল করছে কয়েকটা অক্ষর: বৈকুণ্ঠ।

খুশিতে নেচে উঠল দাংগা। এই বৈকুণ্ঠের খোঁজেই সে বেরিয়েছিল। লক্ষ্মীর কাছে তার একটা আর্জি আছে।

দ্বারোয়ানের হুঁ্যাঙের ফাঁক গলে গুটি গুটি ঢুকে পড়ল দাংগা। কেউ কোথাও নেই। ভালোই হল। গট গট করে হেঁটে রাজবাড়ীর দরজায় এসেই দেখে—সে এক এলাহি কাণ্ড। রাণী—মানে মা লক্ষ্মী বসে আছেন পালংকে, ময়ূরের পালক দিয়ে বানানো বালিশে হেলান দিয়ে। দেবদাসীরা চামর দুলিয়ে হাঁপিয়ে পড়েছে। নাচ আর গানে রাজবাড়ীটাই যেন একজন নটী।

খুব ভাল লাগলো দাংগার। ও করল কি, পেছনের দরজা দিয়ে আড়ালে আবডালে ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে। মতলব হল, গান শুনে রাণীমার মনটা যখন উথলে উঠবে সুযোগ বুঝে ঠিক তখনই আর্জিটা পেশ করবে। দাংগা গুটি মেরে বসল পালংকের নীচে একটা পায়ার আড়ালে।

কিন্তু কে জানতো এমন হবে। একটা মেয়ে নাচের ভংগিতে এক সময় প্রায় শুয়ে পড়ল পাতার মতো। সবাই টুং টাং শব্দ করে উঠল। ওই দেশে হাততালির রেওয়াজ নেই। এই সুন্দর নাচটা দেখাতে দেখাতে এক সময় মেয়েটার চোখ দুটো ভয়ে আঁতকে উঠল। গান থামল, থামল নাচ। মেয়েটার মুখ রা-হারা। ও খালি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল খাটের নীচে। আর যায় কোথা, সবাই ধরাধরি করে টেনে বার করল দাংগাকে! দাংগা তো ভয়ে ঘামতে লাগলো দর-দর করে।

রাণী লক্ষ্মী বললেন: ওকে হাওয়া করতো একটু, ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছে! ঘেমে নেয়ে উঠেছে ছোকরা।

ধড়ে প্রাণ এলো দাংগার। গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল রাণীর সামনে।

রাণী বললেন: তুমি কে বট হে?

দাংগা ফিটফাট জবাব পাড়ল: আমার নাম শ্রীযুক্ত দাংগারাজ নীল।

বুঝেছি—বুঝেছি। দাংগারাজ নীল—কী মতলব হে তোমার?

হাতজোড় করে দাংগা হাঁটু গেড়ে বসল লক্ষ্মীর পায়ের কাছে। মাথা নীচু করে বলল: হে মহারাণী, লক্ষ্মীর ঝাঁপির মালিক, আপনার কাছে ছোট একটুকুন ভিক্ষে চাইতে এসেছি—যদি অভয় দেন তো বলি।

লক্ষ্মীরাণী হাত তুলে মাথা নেড়ে অভয় দিলেন।

দাংগা শুরু করল: আমি গরীব মায়ের ছেলে। অনাহারে মারা যাই। পৃথিবীতে এখন খিদে-তেষ্টায় কারুর মনেই শান্তি নেই। আপনার লক্ষ্মীর ঝাঁপির দু-একটা কণা যদি দয়া করে—

: কী-ই, এই সামান্য কারণে তুমি বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করেছ কার হুকুমে?

: কেমন করে হুকুম নেবে মহারাণী? নাচে আর গানে সবাই মশগুল। আর আমি সকাল থেকে কিছু খাবার না পেয়ে—

: বুঝেছি ছোকরা, তুমি জানো না যে পৃথিবীর পাপী মানুষদের এখানে ঢোকবার হুকুম নেই? এই বলে লক্ষ্মীরাণী তাঁর বাহন প্যাঁচার দিকে ফিরে বললেন: আচ্ছা বলতো একে এখন বন্দী করে রাখা উচিত কি না?

মহারাণী অনেক কঠিন কঠিন বিষয়ে প্যাঁচার বুদ্ধি না নিয়ে কিছুটা করেন না।

প্যাঁচা একটু ভেবে মুচকি হেসে বলল: ঠিকই বলেছেন। আজকের রাতটা অন্ততঃ আটক থাক।

দাংগা আটক রইল বন্দিশালায়।

রাত্তিরবেলা দাংগার ঘুম এল না। কত ভাবনা খেলে গেল ওর মনে। কী খিদে পেয়েছে? তা পাক, কিন্তু মা যে কী ভাবছে দাংগার জন্যে। হয়ত কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে বিছানা বালিশ—না না, মা শোয়নি আজ; মা-ও আজ রাত্তে ঘুমোবে না। দাওয়ার ওপর একা একা চোখের ডালা খুলে বসে আছে।

অনেক রাত হল। বৈকুণ্ঠের জলতরংগ থামল। ঘুমে ঢুলে এল দাংগার চোখ। এমন সময় দেখে থপ থপ করে এগিয়ে আসছে একটা প্যাঁচা। হ্যাঁ, লক্ষ্মীর বাহন সেই প্যাঁচাটাই। দাংগা ভয়ে জবুথবু হয়ে বসল।

কিন্তু আশ্চর্য, প্যাঁচাটা কোন রাগের কথাই বলল না। বেশ ভালমানুষের মত ওর মুখোমুখি বসে পড়ে বলল: ত্যাখো ভাই, তোমার জন্যে আমার খু-ব দুঃখ হচ্ছে।

দাংগা কড়া জবাব দিল: হয়েছে, আর থাক। তুমিই তো বললে আটকে রাখতে।

: হ্যাঁ তা বলেছি। কেন বল তো? তোমার সংগে দুটি কথা কইব ভাই। তুমি কি ভাবো আমি খু-উ-ব সুখে আছি এখানে?

: কেন, দুঃখু কিসের? বেশ তো নাচগান হচ্ছে, স্বয়ং লক্ষ্মীর বাহন হয়ে কর্তালি করেছ সবার ওপর।

: না গো, না। ঐ লক্ষ্মীরাণীই আমার পিঠে চেপে বসেন, আর আমার যে কি ব্যথাটাই না লাগে সারাটা গায়ে। দম আটকে আসে। এখানে একা-একা একটু ফাঁকা জায়গায় উড়ে বেড়াবার ফুরসৎ নেই। আর শুনেছি তোমাদের হাওয়েই কত প্যাঁচা, কত সব পাখী ডালে ডালে দোল খায়।

: ঠিকই শুনেছ। তবে এখানে দেখছ না কত দুঃখ। আমি কি আর সাধ করে এখানে এসেছি? খেতে পাইনে দুবেলা পেট ভরে। বাবা মারা গিয়েই না আমাদের এই দশা। আর তাই আমাকে আটকে রাখলে লক্ষ্মী,—খাবার তো দিলেই না। ওদিকে মা এই নিশুতি রাতে দাওয়ায় বসে চোখের জল ফেলছে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল দাংগা। প্যাঁচার চোখেও জল এল।

প্যাঁচা বলল : আমার মনটাও হাঁসফাঁস করছে এদেশ ছেড়ে পালাবার জন্তে।

: কেমন করে পালাবে ? মহারাণী টের পেলে—

: আরে রাখো ও কথা, টের পাবে কেমন করে ? তোমাকেও আমি বাঁচাতে পারি।

ওর চোখ দুটো ডবল ডবল করে উঠল। প্যাঁচাকে জড়িয়ে ধরে বলল : সত্যি ? কেমন করে ?

: শোন, এখন বেশী গোল করো না— তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি! কিন্তু একটা কথা—তোমাদের দেশে তো খাবার নেই, এককাজ করতে হবে। কাল দুপুরে তুমি চলে এসো এখানে। বৈকুণ্ঠ দিনের বেলা ঘুমোয়। তার কারণ, রাণী বেরোতে পারেন না—আমি চোখে দেখতে পাই না দিনের বেলায় তাই। পালংকের নীচেই আছে লক্ষ্মীর ঝাঁপি। চাবি আছে কোথায় তাও আমার জানা। তুমি চলে এসো, ওই ঝাঁপির কাছে আমি বসে থাকি রোজ। ওর থেকে দু-একটা সোনাদানা নিয়ে আমরা দুজনে সটকে পড়ব। কিন্তু একটা কথা—তোমাকেই পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার পিঠে চড়ে বসবে, কোন কষ্ট হবে না।

দাংগা বলল : তার চেয়ে এখনই চল না ? তুমি তো এখন চোখে দেখতে পাচ্ছো।

: চুপ, চুপ। অত জোরে কথা বলো না। মহারাণী এখন জেগে আছেন। সামনে বসিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গদের দিয়ে দিনের আদায় বুঝে নিচ্ছেন! ওসব ঝাঁপিতে জমা পড়বে।

এক সময় দাংগা বলল : দেখ ভাই, চুরি তো করব—কোন পাপ হবে না তো ?

: আরে পাপ কিসে ? তুমি খেতে পাচ্ছো না, তাই দুটো সোনাদানা দেবো। এমন তো নয় যে লক্ষ্মীর ঝাঁপিশুদ্ধ নিয়ে যাচ্ছো!

এই বলে প্যাঁচা ওর হাতের বাঁধন কেটে দিল কুট কুট করে। বলে দিল : দেশে গিয়ে আবার ভুলে যেয়ো না আমাকে। মনে রেখো তোমাকে সোনাদানা দেবার জন্তেই আমি আজ রয়ে গেলাম এখানে।

: তোমাকে ভুলতে পারি আমি ? দুপুরের আগেই আমি চলে আসবো দেখো।

নীল আকাশটা ওকে কোলে করে নামিয়ে দিল মাঠের মধ্যে। দাংগা বুদ্ধি করল এক। ও বাড়ী ফিরে গেল না। মা আর ছাড়বে না তাহলে। কাল এক সংগে টাকাপয়সা পকেটে করে মায়ের আঁচলে নিয়ে লুকোবে। একটা গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ল দাংগা।

ঘুম ভাঙতেই শোনে গাছের ডালে দুটো পাখী কথা কইছে। কী কথা! কান পাতলো দাংগা। একটা পাখী বলছে : কে হারে, কে জেতে বলা যায় না।

অন্য পাখীটা তখন বলছে : তা ঠিক। অসুরদের শক্তি তো কম না। তবে দেবতারা টাকাপয়সার খরচ এদিকে খুব কমিয়ে দিয়েছেন। সব যুদ্ধের জন্তেই ব্যয় হবে। ভাখো না মানুষের কী দুর্দশা!

প্রথম পাখী তখন বলল : তবু দেবতারাই জিতুন এই প্রার্থনা করি। অসুর স্বর্গ জয় করলে ধরায় আর সুখ থাকবে না।

এবার দাংগা বুঝলো ব্যাপারটা। ঠাকুমার কাছে ও অসুরদের গল্প শুনেছে। মস্ত মস্ত দানোর মত চেহারা, মানুষ দেখলেই লক লক করে ওঠে জিভ। মা গো, এই অসুরগুলো যদি একবার জেতে তো—

চমকে উঠল দাংগা। আপন মনে ভাবল : লক্ষ্মীর ঝাঁপি খুলে সোনাদানা চুরি করার মতলব তো কেঁদেছি, কিন্তু ও পয়সায় যে যুদ্ধের খরচ চালাবে দেবতারা। এ পয়সা সে কি করে আনবে ? শেষ কালে টাকা কড়ির অভাবে যদি দেবতারা হেরে যান তো পৃথিবী বলতে কিছু থাকবে না।

তাহলে ? ওদিকে প্যাঁচাকে ও কথা দিয়ে এসেছে—এখানকার সবুজ বন বাদাড়ের দোলনায় তাকে একটু দোল খাওয়াবে। পরের দিন ও চলে গেল প্যাঁচার কাছে। ভণিতা না করে সটান কথাটি পাড়ল দাংগা : বন্ধু, দেবতা আর অসুরে নাকি লড়াই ?

: হ্যাঁ, কী যে হয় ঠিক বলা যাচ্ছে না। প্যাঁচা বলল।

: তা বলোনি কেন আমায় এতক্ষণ ? শোন বন্ধু, এই বিপদের সময় আমি সোনা-দানা চুরি করব না। অসুররা যদি একবার জিতে যায় তো কী পাখি, কি মানুষ কিছু থাকবে না। কোথায় বা থাকবে তুমি আর কোথায় বা আমি!

প্যাঁচা বলল : তা ঠিক বলেছ ভাই! জলের মতো পয়সা খরচ হচ্ছে যুদ্ধের জন্তে! তা আমাকে নিয়ে চল তাহলে, আর দেরী কেন ?

দাংগা চোখের ভংগি করে বলল : না, প্যাঁচা। তুমি ভেবে দেখ লক্ষ্মীরাণী এখন কত ব্যস্ত! তোমাকে না হলে তাঁর এক দণ্ড চলে না। কি তুমি কি আমি সবারই চেষ্টা করা উচিত যাতে করে দেবতারা জিতে যান।

ওর কথা শুনে সেই বিতিকিচ্ছিরি প্যাঁচারও চোখ ফুটল। আনন্দে গান গেয়ে উঠে বলল : ঠিক বলেছ বন্ধু, তোমায় ধন্যবাদ! দেবতারা হারলে—

: হ্যাঁ, তুমি আমি কেউই বাঁচব না। কোথায় তুমি দোল খাবে ডালে ডালে ?

শান্ত-শিষ্ট ল্যাজ-বিশিষ্ট হাবা-গোবা-ক্যাবলা ছেলেটা তখন ফিরে এলো বাড়ী। বাড়ীতে সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। মায়ের চোখের জল ঝরছেই। নোংরা কাপড়, তার ওপর মাথাটা ঝাঁকড়া। ঘরটা অগোছালো। কিছু খাবার নেই। মুংরা আসেনি। ওকে দেখেই মা এসে লুফে নিল। কোলে তুলে চুমো খেতে লাগল অনেকগুলো। বলল : কোথায় ছিলি এতক্ষণ দুষ্টু ছেলেটা ?

দুষ্টু ছেলেটা তখন সব কিছু খুলে বলল মাকে।

মা ওর কথা শুনে আনন্দে কী যে করবে ভেবেই পায় না। শেষকালে বলল : ঠিক করেছ তুমি, ঠিক করেছ।

: মুংরা আসেনি মা ? আমরা খাবো কি!

: ওই তো মুংরা আসছে, দেখ না। আর আমাদের দুঃখ থাকবে না। ওর হাতেই ওই ছাখ মা, লক্ষ্মীর ঝাঁপি!

ডালভাঙা ক্রোশ দূরে চুপী গ্রামের হাট থেকে ফিরছে মুংরা। মুংরা হল এক সাঁওতাল ছেলে। ওই এখন দাংগাদের সুমুখের মাঠটা চাষ করে। সোনার ফসল বেচতে যায় দূরের মাঠে। মুংরা না থাকলে দাংগারা বাঁচতো কি করে!

ওকে দেখে দাংগা ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো পুকুর-পাড়ের সরু পথটার বাঁকে।

## বাইশ

জেমস ব্যারীর Peter Pan ১৯০৪ সালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে প্রতি বছরই পুনরভিনীত হয়েছে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অবশ্য অভিনয় বন্ধ ছিল। বার্ণার্ড শ'র Androcles and the Lion সেন্ট জেমস থিয়েটারে আট সপ্তাহ চলেছে এবং পরে দুবার অতি অল্পকালের জন্য পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। অতি ক্ষুদ্র নাটক, পূর্বরঙ্গ, প্রথম এবং দ্বিতীয় অংকে নাটক শেষ, কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও অত্যন্ত ব্যয়বহুল নাটক। অভিনয়ের জন্য ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ চাই, কারণ দ্বিতীয় অংক অতি দ্রুততালে অতিক্রম করতে হয়, নাটকে সতেরটি চরিত্রকে কথা বলতে হয় তার মধ্যে আবার সিংহ অন্যতম। এ ছাড়া রোমান সেনাদল, ক্রীশ্চান, মল্লযুদ্ধকারীর দল, ভৃত্যদল, সম্রাটের রক্ষিবাহিনী, পশুশালার রক্ষক দল, ক্রীড়া প্রদর্শক এবং দাস দল—এক বিরাট গোষ্ঠী, পোষাক পরিচ্ছদের খরচও উপেক্ষণীয় নয়। নাটকের গান অবশ্য আছে, এবং সমালোচকরা নিন্দা বা প্রশংসা যাই করুন, চিত্ত-চমকপ্রদ এবং চিত্ত-বিনোদক নাটক Androcles সন্দেহ নেই।

রেভারেণ্ড জেমস মরগান গিবন নামক জনৈক ধর্মযাজক এই নাটকের মধ্যে খৃষ্টধর্মের প্রতি শ্লেষ এবং আক্রমণ দেখে ব্যথিত হয়ে এক প্রতিবাদ করেন। জর্জ বার্ণার্ড শ' Daily News পত্রিকায় তার যে উত্তর দেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চিঠিতে খৃষ্টধর্ম যীশুখৃষ্ট সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র সুস্পষ্ট মতবাদ প্রকাশিত হয়েছে। পত্রটি দীর্ঘ, তার সামান্যতম অংশমাত্র এইখানে উদ্ধৃত করছি—

Nobody who is not in the literal and scriptural senses of the two words a damned fool, can possibly see Androcles and mistake the direction of my sympathies, but my sentiments may be diseased and sentimental and cowardly. Most men who take the blood and iron pose would say so.

এই কারণেই Androcles যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তখন বার্ণার্ড শ' শতাধিক পৃষ্ঠার এক ভূমিকা এবং পরিশেষে পাঁচ পৃষ্ঠার মন্তব্য যোগ করেছিলেন। ছোট নাটকের পক্ষে বিরাট ভূমিকা। এই ভূমিকার ফলে বার্ণার্ড শ'র বক্তব্য সম্পর্কে প্রতিবাদ তীব্রতর হয়ে উঠল। খৃষ্টধর্ম এবং যীশু খৃষ্ট সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'কে বহু আলোচনা করতে হয়েছে, খৃষ্ট ধর্ম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কি তা এই ভূমিকায় সুস্পষ্ট। গসপেল বা সুসমাচার সম্পর্কে এমন তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ খৃষ্টতত্ত্বকে বিচার করার এমন প্রয়াস, লেখকের সততার পরিচায়ক। Androcles and the Lion-এর ভূমিকায় যীশুখৃষ্ট সম্পর্কে বার্ণার্ড শ'র শ্রদ্ধা এবং ভক্তি অতিশয় সুস্পষ্ট। বারাব্বাস এবং যীশু সম্পর্কে বিচার করতে গিয়ে পরিশেষে বার্ণার্ড শ' বলেছেন—The question seems a hopeless one after 2000 years of resolute adherence to the old cory of—"Not this man, but Barabbas."

খৃষ্টান সমাজের কাছে এই মূল্যবান ভূমিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু মাত্র জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মকে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে গ্রহণ করা,

ভবানী মুখোপাধ্যায়

এক জিনিষ, সেই ধর্মের মূল সূত্র বিচার এবং বিশ্লেষণ করে নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ধর্মকে বিচার করার মধ্যে যথেষ্ট সাহসিকতা এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োজন।

এই ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বার্ণার্ড শ'র জননী মিসেস কার শ'র মৃত্যু ঘটে। তখন তাঁর বয়স ৮৩ বছর, এর আটাশ বছর আগে শ'র পিতৃবিয়োগ ঘটেছে। বার্ণার্ড শ' জননীর অন্ত্যেষ্টির সমস্ত ব্যবস্থা করলেন, চার্চ অব ইংলণ্ডের রীতি অনুসারে শেষকৃত্য এবং দেহাবশেষ ভস্মীভূত করা হবে। বার্ণার্ড শ'র মা কিন্তু কবরস্থ হলেই খুসী হতেন আগুনে তাঁর ভয় ছিল। বার্ণার্ড শ' আগুনের পূজারী, তাই আগুনের ব্যবস্থা, গ্রীনভিল বার্কারকে সঙ্গে নিয়ে বার্ণার্ড শ' জননীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে গেলেন। জীবনে জননীর সঙ্গে সংযোগ তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না, বার্ণার্ড শ' বুঝেছিলেন ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে যে স্বাভাবিক আত্মীয়তার সূত্রে একদা তিনি আবদ্ধ হয়েছিলেন, আজ তার অবসান ঘটবে। গ্রেনভিল বার্কার Dubedat-এর ভূমিকায় (Doctor's Dilema) অভিনয় করেছেন, এবং বিশেষতঃ সেই অংশ—Such a colour ! garnet colour, waving like silk. Liquid lorely fiame flowing up through the bay leaves, and not burning them well, I shall be a flame like that.....

বার্ণার্ড শ' তাঁর জননীর বহ্নিমান চিতা সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন। ফেরার পথে বার্ণার্ড শ' অতিশয় মুখর হয়ে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। সেই সময় গ্রানভিল বলেছিলেন—You certainly are a merry soul, Shaw !

সেই দিন সন্ধ্যায় সপ্তাহান্তিক পার্টি সিডনী ওয়েবের New Statesman প্রকাশিত হবে, তারই পার্টি। নতুন পত্রিকার উদ্দে ফেবিয়ান মতবাদের প্রচার। বার্ণার্ড শ' জননীর অন্ত্যেষ্টি শেষ করে পার্টিতে এসে হাজির হলেন, অগ্নিকুণ্ডের পাশে সোফা টেনে নিয়ে বসে বললেন—মিলিটারিরা শোকযাত্রায় কি সঙ্গীত হওয়া উচিত

ঠিক জানে, যাবার সময় শোক-সঙ্গীতে বিষাদের সুর আর ফেরার পথে প্রাণ-মাতানো চড়া সুর। সহসা বার্ণার্ড শ' লক্ষ্য করলেন, সবাই তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছে, সমবেদনাহীন নীরবতা। তিনি সজোরে বলে উঠলেন—Don't think that I am a man who forgets the dead!

তবু সকলে মনে করল, বার্ণার্ড শ' মৃত্যুকে লঘুভাবে গ্রহণ করেছেন, তিনি হৃদয়হীন। বার্ণার্ড শ' শুধু বললেন—It is of no more use, so away with it.

উদ্বোধন সভার পক্ষে এ এক বিশ্রী অবস্থা। বার্ণার্ড শ'কে সমসাময়িক ঘটনার ওপর একটা কলম লেখার জন্ম বলা হয়েছিল, কিন্তু নবনিযুক্ত সম্পাদক ক্লিফোর্ড সার্প বললেন—লেখাটা বেনামী হওয়া প্রয়োজন, দায়িত্বসম্পন্ন মানুষ বার্ণার্ড শ' স্বনামে যা কিছু লেখেন তাতে গুরুত্ব দেন না, তাঁদের ধারণা এ দায়িত্বজ্ঞানহীনের রচনা।

এই সম্পাদকের বয়স তখন সবে কুড়ি পেরিয়েছে, বার্ণার্ড শ'র প্রতি তাঁর এতটুকু শ্রদ্ধা ছিল না। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর বার্ণার্ড শ' দেখলেন, তাঁর রচনা নির্মম ভাবে পরিবর্তিত করা হয়েছে। তিনি অভিযোগ করলেন না, কারণ তার নিজের কুড়ি বছর বয়সের কথা মনে হল, সেইকালে তিনিও এর চেয়ে নির্মম ছিলেন।

এর পরই Androcles and the Lion মঞ্চস্থ হয়। তখন সারা পৃথিবীতে আসন্ন মহাযুদ্ধের পদধ্বনি। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অম্লমধুর নাটকে পরিতৃপ্ত ইংরাজ-সমাজকে দেখে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। জার্মাণির সামরিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইংলণ্ডকে হুঁসিয়ার করা হয়েছে, বার্ণার্ড শ' নাকি সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলেন, 'যুদ্ধ হলে আমি জার্মাণীর দলে, সেই আমার আত্মিক স্বদেশ।'

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে ন্যাশানাল লিবারেল ক্লাবে 'The Case for Equality' সম্পর্কে বার্ণার্ড শ' বক্তৃতা দেবেন স্থির হল। এই দিনটিকে তিনি এক স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করলেন। বার্ণার্ড শ' জানতেন, এই সভায় বহু খ্যাতনামা রাজনৈতিক, অর্থনীতিবিদ, লেখক, সাংবাদিক প্রভৃতি উপস্থিত থাকবেন। বার্ণার্ড শ' তাঁর বক্তৃতা রচনায় মনোনিবেশ করলেন। মানব জীবনের যা কিছু অশুভ তার ভিত্তি মূলে কি আছে তার বাস্তবানুগ বিচারের প্রয়োজন, যদি উল্লেখনীয় কারণ হয় তাহলেও তা বিবেচনা করা উচিত। আশ্চর্যের বিষয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক কিছু আজো অনাবিষ্কৃত, কারণ নীতির দিক থেকে তা নিষিদ্ধ। এর মূল কারণ মানবিক নয় প্রচলিত নীতি মাফিক। যেমন ধরা যাক যৌন নীতি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে যৌন-মনোবিজ্ঞানীদের পদে পদে সুষ্ঠ-শব্দ প্রয়োগ করতে হোঁচট খেতে হয়েছে। বার্ণার্ড শ' বলতে চান যে প্রতি পদে শালীনতা বা শিষ্টাচারকে শিকেয় তুলে স্পষ্টাস্পষ্টি সব বলতে হবে। বার্ণার্ড শ' নিজের এক নতুন বিশেষণ সৃষ্টি করলেন—'Artist-Biologist', এই নব্য জীববিজ্ঞানীর বীক্ষনাগার সমগ্র পৃথিবী। চেতন-অবচেতন, মন, উদ্দেশ্য, অভীপ্সা, স্মৃতি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি যা কিছু আমাদের সমস্তা সব কিছুই বার্ণার্ড শ'র নতুন গবেষণার বিষয়বস্তু।

শ'র আগেও বায়োলজিষ্ট ছিলেন অনেক, কিন্তু তাঁরা আর্টিষ্ট নয়। Androcles and the Lion-এর খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাসীদের মতো শেষ সংকটময় মুহূর্তও হাসা যায়। ক্রীশ্চানরা তবু এমন একটি কারণের জন্ম প্রাণ দেয় যা তারা বিশ্বাস করে, আর পৃথিবীর তরুণ দল দিশেহারা হয়ে এমন ব্যাপারের জন্ম প্রাণ বিসর্জন করছে যার সম্পর্কে কিছুই তার জানা নেই।

যে-পৃথিবী মোটা লাভ আর প্রচুর আয়ের জন্ম মানুষ উন্মাদ হয়ে ছুটছে সেখানে আয়ের সমতা রক্ষার কথা বলা বাতুলতা মাত্র। তবে সব কিছু বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিকল্পনাই মানুষ উদ্ভট মনে করে তাই বার্ণার্ড শ' বলতে চান যে যুদ্ধ আসন্ন, তার কারণ আয়ের অসাম্য। এই অসমতার ফলে যে সামাজিক-সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে তার ফলেই পৃথিবী আজ বিস্ফোরণের সামনে এসে পড়েছে।

ন্যাশনাল লিবারেল ক্লাবের শ্রোতারা অল্পকালের মধ্যেই বার্ণার্ড শ'র করতলগত হয়ে পড়লেন, বিশেষতঃ তিনি যখন বললেন—আয়ের সমতার ফলে সমগ্র সমাজেই পারস্পরিক বিবাহসূত্রে বদ্ধ হতে পারবে, উঁচু-নীচ, ছোট ঘর—বড় ঘরের বালাই থাকবে না, ফলে যাকে খুশী বিয়ে করা চলবে। মানব জাতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটবে।

"আমরা অতি নির্বোধ মানুষ, আমরা কুদর্শন। দেখতে বিশ্রী। আমাদের মন ছোট, কোনো ভব্যতা নেই। এর মূল কারণ আমরা যে সমাজে মানুষ তার ভিত্তি অসাম্যে অসমতাই এই যুগের অভিশাপ।"

সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী চমৎকৃত, বিস্মৃত, অভিভূত। সেই দিন ন্যাশনাল লিবারেল ক্লাবের সেই সভায় অ-রোমাণ্টিক বার্ণার্ড শ' সবাইকে চমকিত করে বললেন নতুন কথা, প্রেম এবং অবাধ জীবতাত্ত্বিক নির্বাচন সম্পর্কে। এ এক বৈপ্লবিক উক্তি!

"আমার একজন মহিলাকে ভালো লাগল। তার প্রেমে পড়লাম। বুদ্ধিমান সমাজে এ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য, আমি নমস্কার করে সেই মহিলাকে বললাম—মাফ করবেন, আপনাকে বড়ো ভালো লাগছে, যদি ইতিমধ্যেই কাউকে বাগদান না করে থাকেন, আমার নাম ঠিকানা রাখুন, ভেবে দেখবেন আমাকে বিয়ে করতে পারেন কি না?—"বর্তমান কালে সে সুযোগ কোথায়। এমন হতে পারে যাকে পছন্দ হল, সে হয়ত দাসী, তাকে বিবাহ করা যায় না' নয়ত ডাচেস তিনি আমাকে বিয়ে করবেন না! ফলে স্বাভাবিক যৌন-নির্বাচনের পরিবর্তে শ্রেণীগত নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে, অর্থাৎ অর্থকরী নির্বাচন। একথা কি বলা প্রয়োজন এর ফলে নিকৃষ্ট প্রজনন ঘটছে এবং অস্বাভাবিক সমাজ গড়ে উঠছে।"

এই বিষয় বস্তুই বার্ণার্ড শ'র পরবর্তী নাটক Pygmalion—এ বিশদ ভাবে রূপায়িত হয়েছে।

## তেইশ

শ' চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট কি? বার্ণার্ড শ'র জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিচার করার অর্থ তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী এবং সেই সম্পর্কিত কাহিনী নিয়ে আলোচনা, সে আলোচনাও প্রচুর, তার দ্বারা বার্ণার্ড শ'র বহুমুখী জীবনের বিভিন্ন দিক দেখানো সম্ভব, তিনি মহৎ, তিনি চমৎকার, তিনি ব্যঙ্গবাগীশ, তিনি দুর্মুখ,

জ্ঞানী, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ইত্যাদি বহু কথা বলা যায়। মানুষ বার্ণার্ড শ'র ঠ্যাং ভাঙে, পা মচকিয়ে যায়, তিনি স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে কাঠ কাটেন, এ সব তথ্যও অনেকে জানেন। বার্ণার্ড শ' নিজে বলেছেন, আমার জীবন বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু এই সব ছাড়িয়ে, তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক বিচার করলে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই যোগসূত্র গভীর অর্থপূর্ণ।

বার্ণার্ড শ'র জীবনী কার অজানা? অথচ বার্ণার্ড শ'র জীবনীতে বিষয়বস্তুর প্রচুর সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও বার্ণার্ড শ'র যেন জীবনী নেই। আত্মপরিচয়ের সূত্রে বার্ণার্ড শ' একদা মিসেস ক্যামবেলকে লিখেছিলেন—

He is ( Shaw ) a mass of imagination with no heart. He is a writing and talking machine. He cares for nothing really but his mission, as he calls it, and his work.

জর্জ সিলভেষ্টার ভিয়েরেক বার্ণার্ড শ'র শান্ত জীবনধারা সম্পর্ক প্রশ্ন করেছিলে একবার, শ' তার উত্তরে বলেন—

An author of my sort must keep in training like an athelete. How else could he wrestle with God as Jacob did with the angel ?

বার্ণার্ড শ' একটি ব্যক্তিবিশেষ মাত্র। উচ্চতর আদর্শ এবং অভীপ্সার পরিপূর্তির জন্য তিনি যীশুখৃষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পারিবারিক জীবনের সুখনীড় থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, শ' বলেছেন —You can not serve two divinitles, God and the person you are married to.

আধুনিক জগতে এই ধরণের মনোভংগী সম্পন্ন মানুষের জীবনে কি হয়? ঈশ্বরের সঙ্গে আজীবন সংঘর্ষের পরিণতি কি? এই কারণে প্রশ্ন ওঠে শ' কি বুঝেছিলেন কি তাঁর পথ? কি তাঁর আকাঙ্খা? তা যদি না হয়, তাহলে সেই বস্তু কি?

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কুড়ি বছরের অজ্ঞাত, অখ্যাত আইরিশ তরুণের লণ্ডনে আবির্ভাব হল, আরো কুড়ি বছর কাটলো, তারপর লণ্ডন শহর জানলো একজন নতুন সমালোচক, চিন্তানায়ক, উপন্যাসকার, বিদূষক এবং সর্বোপরি নবীন নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মধ্য য়ুরোপ এবং আমেরিকায় তাঁর খ্যাতি পৌছালো। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আনাতোল ফ্রাঁর মৃত্যুর পর বার্ণার্ড শ' য়ুরোপের বিদগ্ধ সমাজের মহান নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। বার্ণার্ড শ'র রচিত নতুন নাটক বিশ্বসাহিত্যের একটা বিশিষ্ট সংবাদ। ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ এর মধ্যে সেণ্ট জোনের ভূমিকায় আমেরিকায় অভিনয় করেছেন উইনফ্রেড লেনিহাম, ইংলণ্ডে সিবিল থর্ণ ডাইক প্যারীতে লুডমিলা পিটোয়েক আর বার্লিনে এলিজাবেথ বার্গনার। বার্ণার্ড শ'র সত্তর পূর্তি উপলক্ষ্যে New York Times লিখেছিল—probably most famous of the living writers.

নাটক এবং অন্যান্য গ্রন্থের খ্যাতির সঙ্গে তাঁর নাটকের চিত্ররূপও খ্যাতিলাভ করল। প্রতি সপ্তাহে সকল রকম সম্ভাব্য ব্যাপারে বার্ণার্ড শ'র অভিমত নিয়মিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে লাগল।

আর কোনো লেখক কি খ্যাতির শীর্ষদেশে এমন ভাবে উঠেছেন? নিজের জীবনকালে তাঁর ওপর যে পরিমাণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচিত হয়েছে তা কি আর কারো জীবনে ঘটেছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পর বার্ণার্ড শ'র মৃত্যু পর্যন্ত অন্ততঃ চল্লিশখানি প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার বিষয়বস্তু বার্ণার্ড শ'। সাহিত্যের ইতিহাসে সাফল্যের এমন চমকপ্রদ বৃত্তান্ত বিরল। বার্ণার্ড শ'র কোনো গ্রন্থ Gone with the Wind এর মতো বিক্রী হয়নি কিংবা কোনো নাটক Tobacco Road এর মতো সুদীর্ঘকাল মঞ্চে অভিনীত হয়নি, তথাপি শুধু অর্থনীতির দিক্ থেকেও বার্ণার্ড শ'র যে সাফল্য। তথাকথিত জনপ্রিয় লেখকদের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি, কারণ বার্ণার্ড শ'র গ্রন্থাবলীর বিক্রী অনিশ্চিত গতিতে বেড়েছে এবং নাটকগুলি বার বার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

ফ্রয়েড বলেছেন আর্টিষ্টের জীবন হচ্ছে অধিকতর সম্মান, অর্থ, খ্যাতি, ক্ষমতা এবং ভালোবাসার সন্ধানে ঘোরা। এই সংজ্ঞানুসারে বার্ণার্ড শ'র জীবন সার্থকতম। তবে বার্ণার্ড শ'র জীবনের দুঃখ কি? কিসের বিষাদ তাঁকে ঘিরে রেখেছিল? যে পৃথিবীকে শ' প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছেন, তা থেকে বিদায় নেওয়ার জন্যই কি এই মানসিক বিষাদের অন্ধকার তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল? এই বাহ্য, এই যুক্তি অসার্থক। সম্মান, সাফল্য, অর্থ, খ্যাতি, নারীর ভালোবাসা ইত্যাদি বার্ণার্ড শ'র জীবনে শ্রাবণের ধারার মত বর্ষিত হয়েছে। তবু বার্ণার্ড শ'র জীবনের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য এই সব মোহ এবং মায়া থেকে তাঁর নিস্পৃহ নিরাসক্তি। সেই প্রসঙ্গে কিছু বলতে হলে শ' এমন ভাবে উল্লেখ করতেন যেন তা জর্জ-বার্ণার্ড শ' নামক অপর এক ব্যক্তির সম্পত্তি। ফ্রয়েড আর একটি লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন—তার নাম ক্ষমতা, শক্তি। বার্ণার্ড শ'র ক্ষমতা লাভ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে শুধু আরো পাঁচজন লেখকের মতো, তাতে পেট ভরে ত মন ভরে না।

বার্ণার্ড শ' প্রধান মন্ত্রিত্বের পদলোভী ছিলেন কি? সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ক্ষমতা তাঁর কাম্য নয়। স্থূল ব্যক্তিগত অভিলাষ বার্ণার্ড শ'র কাছে দুর্জ্ঞেয়, অচিন্ত্যনীয়। বার্ণার্ড শ'র জীবনে অধ্যাত্ম সম্পদ ছিল প্রচুর পরিমাণে, একটা কিছু করার অন্তর্নিহিত আবেগ তাঁর মনে ছিল, বার্ণার্ড শ'র চাইতেও বড়ো কিছু সত্তার মধ্যে তার অভিব্যক্তিই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। তাই লোকে যখন জর্জ বার্ণার্ড শ'র অহং এবং লেখক সত্তার দিকে মনোযোগ দিয়েছে তাঁর বাণীর মর্ম উপলব্ধি করেনি, তখন তিনি হতাশ হয়েছেন। সাধারণে বার্ণার্ড শ'র সামান্য সত্তায় মনোযোগ দিয়েছে, অসামান্য সত্তাকে উপেক্ষা করেছে, লক্ষ্যই করেনি, এই তাঁর হতাশা, এই তাঁর জীবনের চরম ট্রাজেডি। বার্ণার্ড শ'র জীবনের লক্ষ্য ছিল আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে সভ্যতাকে সংরক্ষণ করা, অথচ আমরা যা তাই থেকে গেলাম, আর সভ্যতায় ক্রমশঃ মরিচা ধরে এল, বার্ণার্ড শ'র জীবনে এই অবস্থা ক্লেশজনক এবং গভীর বেদনাময়। বার্ণার্ড শ' তাই বলেছেন—"I have produced no permanent impression because nobody has ever believed me."—এই বার্ণার্ড শ'র অসাফল্যের স্বীকৃতি। কার্লাইলও এমনই একদিন সখেদে বলেছিলেন—"They call me a great man now, but no one believes what I have told them."

কার্লাইলের মৃত্যুর তিন বছর পরে বার্ণার্ড শ' ফেবিয়ান সোসাইটির তরফ থেকে লিখেছিলেন—"We had rather face a civil war than such another century of suffering as this has been."

এর পর এসেছে বিংশ শতাব্দী, এসেছে কাইজার উইলহেম, হিটলার, মুসোলিনীর যুগ। ১৯৩২-এ ফেবিয়ান সোসাইটিতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বার্ণার্ড শ' সখেদে বলেছেন—'বিগত আটচল্লিশ বছর ধরে ফেবিয়ান সোসাইটি এবং এদেশের আরো অনেক সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিচ্ছি, যতদূর দেখেছি সে সব অরণ্যে রোদন হয়েছে।

তাতে কি আসে যায়, অনেকে এই কথাই বলবেন। পৃথিবীর হালচাল সম্পর্কে অনেকে স্বচ্ছন্দ স্বস্তিতে থাকতেই চান, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীটাই অন্য রকম। তাঁরা বলবেন, বার্ণার্ড শ' হঠাৎ লিখে, বক্তৃতা দিয়ে আর চিন্তা করে পৃথিবীর গতি পালটিয়ে দেবেন এই দুরাশা রাখেন কেন, মার্কসীয় সমালোচকের মতে এর নাম "The bourgeois illusion,"—চার্চিল এই সব মার্কসীয় শব্দ ব্যবহার না করেও তাঁর Great Contemporaries গ্রন্থে বার্ণার্ড শ' সম্পর্কে এই অবজ্ঞাই প্রকাশ করেছেন, বার্ণার্ড শ'কে লঘুভাবেই তিনি গ্রহণ করতে পারেন, অন্যভাবে নয়। বার্ণার্ড শ' বার বার বলেছেন—"The real joke is that I am earnest."

বার্ণার্ড শ'কে একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার কারণও তিনি স্বয়ং। নিজের খ্যাতি বৃদ্ধির প্রয়োজনে তিনি মৃত্যুর চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে বলেছিলেন, আমি যাই করি না আমার খ্যাতির ক্ষতি হবে না, আমার খ্যাতির ভিত্তি একেবারে সুদৃঢ়, সেক্সপীয়ারের মতোই অনতিক্রম্য।

এই লোকই আবার অন্যত্র বলেছেন—In order to gain a hearing it was necessary for me to attain the footing of a privileged lunatic with the license of a jester....এই বাতুল বিদূষকের নাম জি, বি, এস। গোড়া থেকেই জি, বি, এস-এর পরিচিতির পরিধি জর্জ বার্ণার্ড শ' নামক ব্যক্তিটির চাইতেও অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। জি, বি, এস বিদূষক, ভাঁড় মাত্র, তাঁর কথায় হাসতে হয়, রাগ করতে নেই, দোষ ধরতে নেই, গুরুত্ব আরোপ করতে নেই। জি, বি, এস নামক সিন্ধবাদের হাত থেকে বার্ণার্ড শ' কোনোদিন নিষ্কৃতি পাননি, যে প্রক্রিয়ায় বার্ণার্ড শ' খ্যাতিলাভ করেছিলেন সেই জি, বি, এস এই তার মূল বক্তব্য সাধারণের কাছে বোধগম্য করার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছিল। বিস্ময়ের বিষয় যে, জর্জ বার্ণার্ড শ'র এত প্রচণ্ড খ্যাতি সত্ত্বও প্রভাব একেবারে শূন্য বলাই চলে।

বার্ণার্ড শ'র জীবনের এই বিদূষকের মুখোস তাঁর রচিত নাটকাবলীতেও প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর নাটক তাই প্রহসন বা মেলোড্রামা। বিখ্যাত নাট্য সমালোচক ইগন ফ্রিডেল বলেছেন—বার্ণার্ড শ' সযত্নে অতি তিক্ত বড়িকে চিনির আবরণে মণ্ডিত করেছেন, তাঁর দর্শকরাও চতুর, তাঁরা চিনিটুকু চেটে নিয়ে তিক্ত বড়িটাই পরিত্যাগ করেছেন।

দর্শকের লোভে বার্ণার্ড শ' একটা বিশেষ ভঙ্গী এবং পদ্ধতি

অবলম্বন করেছিলেন। দর্শক এসেছে ভীড় করে, কিন্তু তাদের ওপর লেখকের কোনো প্রভাবই নেই। বার্ণার্ড শ'র ধারণা ছিল My reputation shall not suffer—এ এক উদ্ভট মনোবিলাস। বিদগ্ধ সমাজ এবং জনসাধারণ উভয়ের হাতেই বার্ণার্ড শ'র বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। বিদগ্ধ সমাজের সাফল্য আংশিক। তরুণ সমাজে বার্ণার্ড শ'র প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল, তার নাটকের পাত্র পাত্রীর সংলাপ এডমণ্ড উইলসনের ভাষায়—An explanation that burned like a poem.

উইলসনের মতে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকের উদীয়মান সমাজ বার্ণার্ড শ'কে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু কতকগুলি নর-নারীর জীবনাদর্শ বার্ণার্ড শ'র আদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে তা বলা কঠিন হবে। তাঁর প্রভাবে বিবাহ, পরিবার, শিক্ষা ব্যবস্থা, বিজ্ঞান, ধর্ম, এবং ধনতন্ত্র সম্পর্কে ক'জন মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে কে বলবে? মার্কস, ডারউইন বা ফ্রয়েড প্রভৃতি অন্যান্য চিন্তানায়কের চাইতেও বার্ণার্ড শ'-প্রভাবিত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ত।

কিন্তু বার্ণার্ড শ'র কাছে এই বাহু, এই প্রভাবও নেতিবাচক। বার্ণার্ড শ' একজন কাণ্ডাপাহাড়ি প্রচারবিদ্ মাত্র, এই ধারণাই মানুষের মনে জাগল। এইচ, জি ওয়েলস বা বড়ো জোর আনাতোল ফাঁসের সঙ্গে বার্ণার্ড শ'র নাম যুক্ত হল, এই পর্য্যন্ত।

respectability, Conventional virtue, filial affection, modesty, sentiment, devotion to woman, romance—এই সাতটি মহাপাতককে যখন বার্ণার্ড শ' আক্রমণ করলেন তখন সকলেই তাঁকে মন-প্রাণ দিয়ে সমর্থন করলেন, কিন্তু যখন বার্ণার্ড শ' বললেন—Conscience is the most powerful of all the instincts and the love of God is the most powerful of all the passions?—এই উক্তির পর বার্ণার্ড শ'র সমর্থক চোপসানো বেলুনের মতো সঙ্কুচিত হয়ে গেল! শ'র এই মতবাদ সম্পর্কে ধার্মিক এবং অ-ধার্মিক-গোষ্ঠী—বার্ণার্ড শ'কে হয় উপেক্ষা করলেন নয় প্রতিবাদ করলেন।

পত্র-পত্রিকায় বার্ণার্ড শ' সম্পর্কে নতুন মূল্যায়নের ইঙ্গিত ১৯০১ খৃষ্টাব্দেই ধ্বনিত হল, তাঁরা লিখলেন যে নতুনত্বের মোহে তরুণ দল শ'কে অভিনন্দিত করেছিল তারাও ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়ছে।

এই মন্তব্যের উপলক্ষ্য চেসটারটন-কৃত বার্ণার্ড শ' সম্পর্কিত মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থে চেসটারটন বার্ণার্ড শ' সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করেছেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ডি, এচ, লরেন্স বললেন—বার্ণার্ড শ' আর এইচ, জি, ওয়েলসের যুগ সম্পর্কে বিদ্রোহ ঘোষণা করার কাল এসেছে। এর পর ডিকসন স্কট নামক জনৈক তরুণ সমালোচক (প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত) বার্ণার্ড শ' সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁর বক্তব্য ছিল বার্ণার্ড শ' মূলতঃ ১৮৮০-র লণ্ডনের সৃষ্ট শিশু মাত্র।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি টি, এস, এলিয়ট বার্ণার্ড শ'কে এডওয়ার্ডিয় যুগের মানুষ,—প্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই ভাবে কয়েকজন শক্তিমান সমালোচক প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন—বার্ণার্ড শ' একজন ভীমরথী-প্রাপ্ত বৃদ্ধ।

বার্ণার্ড শ'র বন্ধু উইলিয়াম আর্চার ইদানীং বার্ণার্ড শ' সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করতেন। তিনি বললেন—বার্ণার্ড শ' Grand old man—তখনো বার্ণার্ড শ'র সত্তর বছর পূর্ণ হয়নি।

বার্ণার্ড শ' যথারীতি মন্তব্য করলেন—"Not taking me seriously is the Englishman's way of refusing to face facts."

বার্ণার্ড শ'র একটি গোপন অস্ত্র ছিল, যদিও তা আর শেষ পর্যন্ত গোপন ছিল না, তার নাম 'কপট উন্মা'। বার্ণার্ড শ'র এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ গঠনের চতুর' কৌশল নয়, কারণ যাদের প্রতিভা নেই এ তাদেরই অস্ত্র। বার্ণার্ড শ' যথেষ্ট প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। বার্ণার্ড শ' শুধু মাত্র শিল্পিপ্রতিভা বা শিল্পী খ্যাতিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁর লেখনীটিকে তিনি শাণিত তরোয়াল হিসাবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। বার্ণার্ড শ' তাঁর বক্তব্যের শ্রোতা শুধু সাহিত্যিক বা সাহিত্যরসিকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, সারা পৃথিবীতে মানুষই তাঁর লক্ষ্য, তাঁর প্রতিভাকে তিনি নিজস্ব নীতির দাসত্বে নিয়োগ করেছিলেন। বার্ণার্ড শ'র উদ্ধত মনোভঙ্গীর মুখোস এক হিসাবে তাঁর আত্মাহুতি। স্বেচ্ছায় বার্ণার্ড শ' সাহিত্যিক-খ্যাতি বিসর্জন দিয়েছেন আর অনিচ্ছায় স্বীকার করেছেন যে চিন্তানায়ক হিসাবে তাঁর প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছে, তাই বলেছেন—"I see there is a tendency to begin treating me like an arch Bishop—"

বার্ণার্ড শ' নিজের বিশেষণ সৃষ্টি করেছিলেন—Artist—philosopher, তাঁর সমালোচকদের মতে তিনি আর্টিষ্ট এবং দার্শনিক, দুই দিক থেকেই অসার্থক হয়েছেন। [ক্রমশঃ।
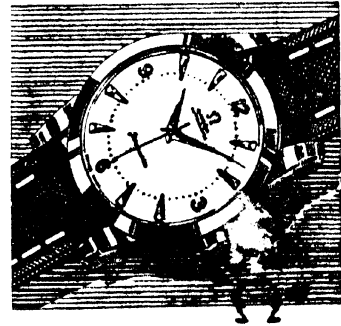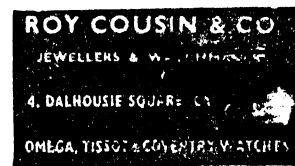
## বইয়ের বিজ্ঞাপন

'বিজ্ঞাপন' বা 'প্রচার' শব্দটি এখনও আমাদের বাঙলা দেশে তথা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসাধন সামগ্রী (Toilet) এবং অন্যান্য কয়েকটি ব্যবসায় যেন সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। বর্তমানে স্নো, পাউডার, ক্রীম, কেশতৈল, গন্ধদ্রব্য, গহনা-অলঙ্কার, সাজসজ্জার অন্য উপকরণ ছাড়া প্রচারের ক্ষেত্রে যদিও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে—যান-বাহন, যোগাযোগ, বিমান, রেলওয়ে, জলযান প্রভৃতির প্রেম-বিজ্ঞাপন—যা আমরা দৈনিক দেখতে পাই দৈনিক সংবাদপত্রে। আর বাকী থাকলো খাদ্যদ্রব্য—যথা টফি, লজেন্স, বিস্কুট, তেল, ঘি, ডালদা এবং অন্যান্য মিষ্টান্ন উল্লিখিত তালিকার মধ্যে আরও একটি নাম জুড়ে দেওয়া যায়—বইয়ের বিজ্ঞাপন। এদের আবার দৈনিক সংবাদপত্রে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়। পাল-পার্বণ, বিয়ের মরশুম, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, শারদীয়া পূজা, নববর্ষ-উৎসব ইত্যাদি শুভদিনের হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে বই আজ প্রায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছে। শিশুদের রাঙা টুকটুকে বই, কিশোরদের গল্প-সাহিত্য (অবশ্য ভুতুড়ে আর আজগুবি কাহিনী বেশী); বয়স্কদের জন্য আছে নানা রকমের আকর্ষণ। বই এখন না কি ম্যাগনেটের মত পাঠক-পাঠিকাদের আকর্ষণ করছে।

গ্লামার-গার্ল দেখেছেন কেউ? নিশ্চয়ই দেখেছেন। কলকাতার বুকে, আশে-পাশে, বালীগঞ্জ-বেহালা থেকে দমদম-বরানগর যাঁরাই ঘুরে বেড়িয়েছেন পদব্রজে কিম্বা হাওয়া-গাড়ীতে তাঁদের চোখ থেকে গ্লামার-গার্লের দল অদৃশ্য থেকে যায়, কথাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। বই এখন বই-প্রকাশের রকমারি পোষাকে শোভাবর্ধন করছে গহনা-অলঙ্কারের পাশাপাশি। বইয়ের প্রচ্ছদে এমন সব ছবি—যাদের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তেমন কিছুই যোগসূত্র না থাকলেও—সুডৌল নারীমূর্তি হতেই হবে। সাহিত্যের মলাটে এখন কেবল তাই লক্ষ্য করবেন—নারীমূর্তির সূক্ষ্ম এ্যানাটমি। আখ্যান বস্তুতে নারীচরিত্র থাক বা না থাক কভার মানেই এখন প্রকৃতির চুলচেরা ডিসেকশন। সুতরাং গ্লামার-গার্লের সমতুল্য বইয়ের বিজ্ঞাপন কেমন ধারায় চলছে—আমাদের আজকের আলোচ্য এই।

এ আলোচনায় আলোকপাত করতে হলে বাঙলা বইয়ের বিজ্ঞাপনের প্রথম ভাগ, ধারাপাতের বিজ্ঞাপন থেকে হাল-আমলের পুস্তক প্রচার পদ্ধতিকে পটভূমিকায় রাখতে হয়। আমরাও তাই রাখতে চাই নতুবা গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন মূল্য থাকে না।

বারান্তরে বাঙলা দেশের পুস্তক-প্রচার আমাদের একটা সত্যিকার সিরিয়াস আলোচ্য। পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, প্রকাশক সম্পর্কের প্রধান মাধ্যম বইয়ের প্রচার—বইয়ের বিজ্ঞাপন। বহু মূল্যবান বাঙলা সাহিত্যের ধারা ইতিহাসে পুস্তক প্রচার পদ্ধতির রীতিনীতি ও কলাকৌশল বাঙলা সাহিত্যের পরিপুষ্টিতে রক্তবৃদ্ধির কাজ করেছে। অর্থাৎ রক্তদান করেছে। এই আলোচনায় আমরা সকলকেই অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাই।

# উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

## নারীর উক্তি

বাঙলা দেশকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে এক নবতর চেতনার জন্ম দিলেন যে ঠাকুর-পরিবার, জাতীয়-জাগরণের ইতিহাসের পাতায় যাঁদের নাম লেখা আছে অম্লান অক্ষরে, যে পরিবারের যুগবরেণ্য সন্তানদের কল্যাণে দেশের সংস্কৃতি হয়েছে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর, সেই বিশিষ্ট বংশেরই সার্থকনাম্নী সুযোগ্যা নন্দিনী পরম শ্রদ্ধাস্পদা ইন্দিরা দেবী-চৌধুরাণী মহোদয়া। বাঙলাদেশের সারস্বত সমাজে যাঁর অবদান যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব বহন করে। দিকপাল সাহিত্যস্রষ্টা স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী বীরবলের তিনি সহধর্মিণী। ইন্দিরা দেবীর 'নারীর উক্তি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১১২০ সালে, তারপর প্রায় চল্লিশ বছর পরে ১১৫৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর লেখিকার ৮৬তম জন্মদিবসে বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি লেখিকার পাণ্ডিত্যের, মনীষার ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করে। বাঙলার নারীকুলের গৌরব এই বরণীয়া বিদুষীর চিন্তাশক্তির গভীরতা, দৃষ্টিভঙ্গীর ঔদার্যের ও গঠনধর্মী মনের ছাপ পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠছে তাঁর রচনার মাধ্যমে। প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কন করেছেন শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু। প্রকাশক বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। দাম আড়াই টাকা মাত্র।

## শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন

সাহিত্য-জগতের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের গভীর ও নিবিড় যোগাযোগ বাঙলাদেশের জনসাধারণের কাছে কখনই অজানা নয়। বাঙলা-সাহিত্যের নবগঠনে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিধর্মী লেখনী যে কতখানি সহায়তা করেছে, তা বাঙালী-সাহিত্যপাঠকদের মর্মে মর্মে উপলব্ধ। কিন্তু এ কথা হয় তো অনেকেরই অজানা থাকতে পারে যে, দেশীয় রাজনীতির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগাযোগ কিছু কম নিবিড় ছিল না। পথের দাবীর স্রষ্টা যে রাজনীতির সঙ্গে নিজে কতখানি জড়িত ছিলেন সে বিষয়ে অনেকেরই ধারণা হয় তো খুব সুস্পষ্ট নয়। শরৎচন্দ্রের বৈচিত্র্যে ভরপুর অসামান্য জীবনকথা বহুজনের দ্বারাই এ পর্যন্ত লিখিত হয়েছে কিন্তু কেবলমাত্র তাঁর রাজনৈতিক জীবন অবলম্বন করে কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। উপরোক্ত গ্রন্থটিকে সে অভাব দূরীকরণের প্রকৃষ্ট সহায়ক বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রন্থকার দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নিজে বাল্যকাল থেকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবন্ধু এঁর গুরু।

রাজনীতি-বিষয়ক বহু কর্মকে কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। অতীতের সেই সকল ঘটনা যথোচিত নিষ্ঠাসহকারে তিনি লেখনীর দ্বারা অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। এই গ্রন্থটি যেমনই সুখপাঠ্য তেমনই তথ্যপূর্ণ। লেখকের নিজের চোখে দেখা এবং নিজের জীবনের সঙ্গে জড়ানো বহু ঘটনা নিখুঁত ভাবে রূপায়িত হয়েছে সাহিত্যের পাতায় বাঙালী পাঠক এই গ্রন্থ পাঠে দলবন্ধু, রাজনীতিক শরৎচন্দ্র এবং তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু কাহিনী সম্পর্কে আলোকিত হবেন। বিশেষ করে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে জানবার মত অনেক তথ্যই অপরিসীম কুশলতার সঙ্গে গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। লেখক শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ গান্ধী রোড। দাম দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে

ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ—যা দেখে দেখে শেষ করা যায় না, সারা জীবন পর্যটন করার পরও মনে হয়—কি দেখলুম এত বড় দেশ, সে তুলনায় কিছুই তো দেখা হল না—বিশাল এই ভারতবর্ষ, তার দর্শনীয় স্থানও সংখ্যাতীত। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন এক একটি অঞ্চল, এক একটি নগর, এক একটি মন্দির, প্রাসাদ তপোবন, যাঁরা তা করে উঠতে পারেন না তাঁরা ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করেই ভ্রমণপিপাসু মনের তৃষ্ণা মেটান। বাঙলাসাহিত্যের পুষ্টির ক্ষেত্রে ভ্রমণ-সাহিত্যেরও অবদান অনেকখানি, অস্বীকার করার উপায় নেই—যে শুধু বর্তমানকালেই নয়, বিগতকালেও পূর্বসূরী সাহিত্যিকদের লেখনীজাত বহু ভ্রমণ কাহিনী তৎকালীন পাঠকদের দরবারেও অসামান্য জনপ্রিয়তায় বিভূষিত হয়েছে। ভারতের প্রতিটি অঞ্চল আপন আপন ঐতিহাসিক অসামান্যতায় উজ্জ্বল। কোন কোন অঞ্চলের সমৃদ্ধি আবার ইতিহাসের গণ্ডিকে অতিক্রম করে পৌরাণিক কাহিনীর দ্বারা পুষ্ট। এক কথায় ভারতের প্রতিটি অঞ্চলই আপন আপন ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রসিদ্ধ। রমাপদ চৌধুরী, রামপদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ, কণপ্রভা ভাদুড়ী, বেণু গঙ্গোপাধ্যায়, অপূর্বরতন ভাদুড়ী, পূর্ণিমা সরকার, ইলা মজুমদার প্রমুখ আরও অনেক লেখক-লেখিকার ভারতের এক-একটি অঞ্চল সম্পর্কিত ভ্রমণমূলক এক-একটি রচনা একত্রে সংকলিত করে উপরোক্ত গ্রন্থটি সৃষ্ট হয়েছে। এর ভূমিকা রচনা করেছেন প্রখ্যাত কথাশিল্পী অন্নদাশঙ্কর রায়। এই গ্রন্থখানি সাহিত্যামোদী ও ভ্রমণপিপাসু এই উভয় সম্প্রদায়কেই সমপরিমাণ আনন্দ দিতে পারবে বলে বিশ্বাস করি। গ্রন্থটি সুসম্পাদিত, তবে ভারতের বহু অঞ্চলই সংকলন থেকে বাদ পড়ে গেছে, সেগুলি যুক্ত হলে গ্রন্থের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্পাদন কর্মে দক্ষতা প্রকাশ করেছেন বাঙলার প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক শ্রীগোপালদাস মজুমদার। গ্রন্থটির বহুল প্রচার আমাদের কাম্য। প্রকাশক—গোপালদাস পাবলিশার্স, ২৮।৩ ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬, পরিবেশক ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দাম—সাড়ে পাঁচ টাকা মাত্র।

## গাড়ী-ঘোড়ার গল্প

রঙের ও রেখার মাধ্যমে শৈল চক্রবর্তীর চিত্রসৃষ্টির দক্ষতা বাঙলা দেশের রসিক-সমাজে সুবিদিত বহুকাল যাবৎ। তবে মাসিক বসুমতীর তথা আজকের দিনের পাঠক সমাজে লেখনী ও ভাষার মাধ্যমে শৈল চক্রবর্তীর সাহিত্য সৃষ্টির দক্ষতার কথাও অবিদিত নয়। তাঁর রচিত উপরোক্ত গ্রন্থটি সম্প্রতি ভারত সরকারের দ্বারা ১৯৫৮ সালের বাঙলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে। যান-বাহনের সৃষ্টি ও ক্রমপ্রগতির বিশদ ইতিহাস শিশুদের উপযোগী করে লেখক এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। আজকের দিনে যানবাহনের যে জয়যাত্রা আমরা দেখতে পাচ্ছি—তারই সৃষ্টি কেমন করে হল কেমন করে তারা পরিচিত হল, জনপ্রিয়তা পেল, মানুষের কাজে এল—তারই বিস্তারিত বিবরণী এখানে যথেষ্ট দরদ, আন্তরিকতা সর্বোপরি প্রকৃত পরিশ্রম সহকারে লেখক পরিবেশিত করেছেন। যুগের পর যুগ ধরে যানবাহনের ক্রমপ্রগতি আবর্তন-বিবর্তন এক অপূর্ব ভঙ্গিমায় গ্রন্থটিতে চিত্রিত হয়েছে। আর স্বভাবতঃই যানবাহনের প্রসার প্রসঙ্গে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ইতিহাসও ধরা পড়েছে লেখকের লেখনীর মধ্যে। সেই আদিম অসভ্যযুগের ব্যবহৃত গাড়ীগুলি থেকে শুরু করে—পৌরাণিক যুগের রথাদির বিষয়ে বর্ণনা করে আজকের এই অতিসভ্য যুগের মোটর, উড়োজাহাজ পর্যন্ত লেখকের আলোচ্য। শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে বড়রাও এ বই পড়ে আনন্দ পাবেন। গ্রন্থে সন্নিবেশিত ছবিগুলিও লেখকেরই আঁকা। প্রকাশক—চণ্ডীচরণ দাস অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, ১৫০ ধর্মতলা ষ্ট্রীট। দাম—এক টাকা মাত্র।

## ফেরারী ফৌজ

বহুর মধ্যেও যিনি একক, নির্বিশেষের মধ্যেও যিনি বিশেষ, সকলের মধ্যেও যিনি স্বতন্ত্র—তাঁর কর্মমূল্য যেমনই অসাধারণ তেমনই অপরিমাপ্য। আজকের দিনের কবিদের প্রসঙ্গে এই পর্যায়ে সর্বাগ্রে মনে পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম। বিংশ শতকের প্রথম দশকে জন্মগ্রহণ করে তৃতীয়-চতুর্থ দশকের সন্ধিক্ষণে কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়ে সৃষ্টিধর্মী লেখনীর মাধ্যমে বাঙলার কাব্যলোককে অমূল্য অবদানে ভরিয়ে তুললেন, উন্নত করলেন, সমৃদ্ধ করলেন যাঁরা—বন্দিত কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্থান তাঁদের পুরোভাগে। কবির ফেরারী ফৌজ দীর্ঘদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল, সম্প্রতি তার একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ফেরারী ফৌজ-এর কবিতাগুলি কবির অভিনব অনুভূতির, অন্বেষণধর্মী মনের, শাশ্বত উপলব্ধির চিহ্ন বহন করে। কল্পনার প্রাচুর্যে, চিন্তাশক্তির বৈভবে, ভাবধারার ঔজ্জ্বল্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাগুলি যেমনই অননুকরণীয় তেমনই অবিস্মরণীয়। ফেরারী ফৌজে সন্নিবেশিত কবিতাগুলির মধ্যে কাক ডাকে, ইঁদুরেরা, পাখিদের মন, ইস্পাত, ফেরারী ফৌজ, সুড়ঙ্গ, জনৈক, আজিকালের বুড়ী, জয়, প্রাচীন পদ্ধতি কোন, সংশয়ক, তিনটি গুলি প্রভৃতি কবিতাগুলিকে বাঙলাদেশের অতুলনীয় কাব্যসম্পদের মধ্যে কয়েকটি মহামূল্য রত্ন বলে অভিহিত করলে অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট হতে হয় না। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনে যথাযথ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন শ্রীঅজিত গুপ্ত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ গান্ধী রোড। দাম—দু' টাকা মাত্র।

## জাল প্রতাপচাঁদ

উপন্যাসের মধ্যে জাতীয়তার স্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ স্বর্গীয় সঞ্জীবনচন্দ্র (সঞ্জীবচন্দ্র নামে সাহিত্যজগতে খ্যাত) চট্টোপাধ্যায়ের নাম শক্তিমান সাহিত্য স্রষ্টাদের তালিকা থেকে বাদ দেবার নয়। পালামৌ, জাল প্রতাপচাঁদ প্রমুখ রচনাগুলি তাঁর অমর সাহিত্যসৃষ্টির উজ্জ্বল নিদর্শন। তাঁর শেষোক্ত গ্রন্থটি দীর্ঘকাল বাদে পুনঃ প্রকাশ লাভ করেছে। এ কথা কারোরই অজানা নয় যে, জাল প্রতাপচাঁদ গ্রন্থটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করে লেখা, ইতিহাসকে সাহিত্যে সমাদরে আসন করে দিয়েছেন সঞ্জীবচন্দ্র, তাঁর লেখনীর প্রসাদে ইতিহাস সাহিত্যের মাধ্যমে এক অনবদ্য রূপ লাভ করল। বর্ধমানরাজ তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচা.দর কাহিনী সম্বন্ধে নতুন করে বলার কিছু নেই, সকলেরই সুবিদিত কাহিনী। প্রতাপচন্দ্রের জীবনেতিহাস, তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর আত্মজনের কুৎসিত ষড়যন্ত্র, তাঁর প্রতি ভাগ্যদেবতার অসামান্য রোষ, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস, জীবনদেবতার বিমুখতাই গ্রন্থে মুখ্যতঃ স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া তৎকালীন বাঙলায় কোম্পানীর আমলের শাসন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থা এবং এই ঐতিহাসিক মামলায় বাঙলাদেশের তদানীন্তন কৃতী পুরুষদের অভাবনীয় সমাবেশের একটি নিখুঁত আলেখ্য অপরিসীম নিপুণতার দ্বারা গ্রন্থে চিত্রিত হয়েছে। পাঠক-পাঠিকা এই গ্রন্থের মধ্যে প্রতাপচাঁদকে কেন্দ্র করে বিগত দিনের বাঙলাদেশের সকল দিক কেন্দ্র করা একটি ত্রুটিহীন প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সঞ্জীবনীসুধা শীর্ষক সঞ্জীব-জীবনী এই গ্রন্থে যুক্ত হয়ে গ্রন্থের মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীপৃথী দেবশর্ম্মা। প্রকাশক কে, গাঙ্গুলী য়্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮বি লালবাজার ষ্ট্রীট। দাম—দু'টাকা মাত্র।

## ফোকলা দিগম্বর

গত শতাব্দীর সাহিত্যাকাশে যে দিকপাল নক্ষত্রদের দেখা গিয়েছিল, বর্তমান শতাব্দীতেও যাঁদের রশ্মি অম্লান ছিল—সেই দিকপাল সাহিত্যরথীদের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭—১৯১৯) সাহিত্য পাঠক-পাঠিকার নমস্য। সহজ পটভূমিকায়, সরল পরিবেশে, সাবলীল ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের মুন্সীয়ানা চিরকাল ধরে আকর্ষণ করে আসছে বহু জ্ঞানীগুণীরও শ্রদ্ধা। তাঁর অমর সৃষ্টি কঙ্কাবতীর পরেই উল্লেখ করতে হয় ফোকলা দিগম্বরের নাম। ত্রৈলোক্যনাথের রচনাবলী প্রধানতঃ হাস্যরসাশ্রিত, তবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে নিছক হাসিই সেই রচনা জুড়ে নেই, সেই রচনার আনাচে-কানাচে থেকে শুরু করে সারা অঙ্গ জুড়ে হাসির সঙ্গে সঙ্গে সমান ভাবে তাল রেখে চলেছে গভীর কান্না। সমাজের গলদ, দুর্নীতি, দোষত্রুটি পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। কিন্তু কোথাও ত্রৈলোক্যনাথের রচনা ভারগ্রস্ত কৃত্রিম বা অন্তঃসারশূন্য কেবলমাত্র উচ্ছ্বাসের সমারোহ হয়ে পড়েনি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি বাস্তবতার সীমারেখা কোথাও অতিক্রম করেনি। ফোকলা দিগম্বরও একটি সামাজিক উপন্যাস, গরীব মেসো-মাসীর দ্বারা প্রতিপালিত কুসী নাম্নী একটি বারো তেরো বছরের মেয়ে এর নায়িকা। উপন্যাসের পরিধি সীমিত নয়, এদেশ ওদেশ জুড়ে ব্যাপক তার গতি। আমাদের সমাজের একটি দিকের এক পূর্ণাঙ্গ ও সত্য চিত্র এই উপন্যাসটির মাধ্যমে পরিবেশিত করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীশঙ্কর দাশগুপ্ত। এই বহুজনপ্রিয় গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশ সার্থকতা লাভ করুক—এই কামনাই করি। প্রকাশক—কে, গাঙ্গুলী য়্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ৮বি লালবাজার ষ্ট্রীট। দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## রূপসী রাত্রি

যে শক্তিমান সাহিত্যশিল্পীদের সৃষ্টিধর্মী লেখনীর কল্যাণে বর্তমান শতাব্দীর সাহিত্যসম্ভার সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁদেরই মধ্যে একজন। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসটি তাঁর অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টিরই একটি উজ্জ্বল নিদর্শন বলা যেতে পারে। এই উপন্যাসে প্রেমের এক মহিমোজ্জ্বল অনুপম চিত্র অচিন্ত্যকুমারের সুতীক্ষ্ণ লেখনীর দ্বারা অঙ্কিত হয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের মতে প্রেমের সার্থকতা সম্ভোগে নয়, করুণায়। নিরবচ্ছিন্ন সুখের পরিবর্তে দুঃখের মধ্যে দিয়েই প্রেমের প্রকৃষ্ট বিকাশ অর্থাৎ দুঃখ আর করুণার মধ্যে দিয়ে যে প্রেমের গতি প্রবহমান সেই প্রেম সার্থক, সফল, জয়ী। গ্রন্থটি পাঠ করে চরিত্র সৃষ্টিতে, ঘটনাবিন্যাসে—সংলাপ যোজনায় অচিন্ত্যকুমারের যাদুকরী সৃজনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসটির সব চেয়ে-বড় সম্পদ এর ভাষা, যেমনই লালিত্যপূর্ণ, তেমনই জোরালো, তেমনই হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থের নামকরণটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কনে শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত। প্রকাশক—আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

## জলতরঙ্গ

অভিনব বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধির সিংহদ্বারের অভিমুখে বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগমনে যাঁরা সহায়তা করে এসেছেন বা আজও আসছেন, বনফুল (ডাঃ শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) নিঃসন্দেহে তাঁদেরই মধ্যে একজন। বৈচিত্র্যই বনফুলের লেখনীর একমাত্র ভূষণ নয়, অপরিমেয় সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যেরও তিনি অধিকারী। আজকের দিনের সমস্যাসঙ্কুল বাঙালী সমাজের নারী জীবনযাত্রার চলার পথে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করবে, সে সম্বন্ধে বনফুলের সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ দিকনির্দেশ পূর্বোক্ত উপন্যাসটির মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাদের মন কোন ধাতুতে গড়ে উঠবে, কি ভাবে গঠিত হবে তাদের চরিত্র, কোন্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে তাদের জীবন, এই সম্পর্কে বনফুলের সারবান অভিমত উপরোক্ত উপন্যাসটির আকারে রূপ নিয়েছে। বনফুলের মতে আজকের দিনের সমাজ নারীর কাছে অনেক কিছু আশা করছে। পুরুষের তুলনায় নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য কোন অংশেই কম নয়। যে কোন অবস্থায়, যে কোন পরিবেশকে একটি সহজ, গঠনধর্মী, সহানুভূতিপ্রবণ মন নিয়ে নারীকে গ্রহণ করে নিতে হবে। "যেমন শোভে কমল হাতে, তেমনই শোভে বাজ"—ঠিক এই ধরণের নারীচরিত্রই আজকের দিনে বনফুলের মতে ক্ষয়িষ্ণু সমাজের সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করতে পারবে। বর্তমানকালের ক্ষয়িষ্ণু সমাজে এই ধরণের নারীচরিত্রই প্রয়োজনীয়। টলটলায়মান অবস্থায় কবল থেকে এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজকে রক্ষা করার

ক্ষেত্রে এই ধরণের নারী-চরিত্রের গুরুত্ব উপেক্ষা করার নয়। "জলতরঙ্গ"এর প্রধান চরিত্র সুখপুরের বনস্পতি মিশ্রের মেয়ের বর্ণনা। সাহিত্য পাঠকদের কাছে জানি, আজকের দিনে নতুন করে বলতে হবে না যে চরিত্রাঙ্কনে বনফুল সিদ্ধহস্ত। উপন্যাসের একটি বিশেষ চরিত্র ভুবনকাকার চরিত্রটি তাঁর এক অতুলনীয় সৃষ্টি। এই যুগধর্মী উপন্যাসটির আবেদন পাঠকচিত্তে সাড়া জাগাবে, বিশ্বাস করি। আলোচ্য বিষয়ে চিন্তাশীল পাঠক বনফুলের সঙ্গে দ্বিমত হবেন বলে মনে হয় না। সর্বাঙ্গসুন্দর এই উপন্যাসট রসজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার দরবারে যথাপ্রাপ্য সমাদর লাভ করুক—এই আমাদের কাম্য। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীঅজিত গুপ্ত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩, গান্ধী রোড। দাম—চার টাকা মাত্র।

## সাগরে হাওরে

সাম্প্রতিক কালের মধ্যে যে সকল লেখিকার কল্যাণে বাঙলা সাহিত্য পুষ্টির পথে এগিয়ে চলেছে শেফালি নন্দী তাঁদের অন্যতমা। শ্রীমতী নন্দী মৌলিক রচনা ছাড়াও বহু বিদেশী গ্রন্থের সার্থক অনুবাদ করে হাত মিলিয়েছেন খ্যাতির সঙ্গে। তাঁর উপরোক্ত উপন্যাসটি কমলা নাম্নী একটি কুরূপা নারীকে কেন্দ্র করে লেখা। কমলার জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার জীবন-সংগ্রামের মানে, তার জীবনের গূঢ়তম প্রশ্ন লেখিকার রচনার প্রসাদে উপন্যাসটিতে অপরিসীম নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটে উঠেছে। তাঁর লেখায় কৃত্রিমতা নেই, আড়ষ্টতা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই। কমলার চরিত্রটি যথেষ্ট দরদ, সহানুভূতি ও আন্তরিকতা দিয়েই তিনি লেখনীর মাধ্যমে উপন্যাসের পাতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা শ্রীমতী নন্দীর ভবিষ্যৎ সাহিত্য-জীবনের ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে আশা পোষণ করি। যশস্বী চিত্রশিল্পী শ্রীপূর্ণ চক্রবর্তী প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন। প্রকাশক পপুলার লাইব্রেরী ১১৫/১ বি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## নক্ষত্রের রাত

বর্তমানকালে যে সকল তরুণ সাহিত্যসেবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, শ্রীমতী নন্দীও তাঁদেরই একজন। তাঁর নক্ষত্রের রাত উপন্যাসটি তাঁর দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। আজকের দিনের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের অনূঢ়া কন্যাকে পাত্রস্থ করার ব্যাপারে জনক-জননীর সমস্যা উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। লেখক মধ্যবিত্তের সমাজকে সকল দিক থেকে খুঁটিয়ে দেখেছেন যথাযথ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে। মধ্যবিত্তের জ্বালা, দুঃখ, বেদনা লেখকের রসঘন মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। মধ্যবিত্তের জীবনেতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায়ের প্রতি লেখক জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই উপন্যাসটির মাধ্যমে। দিনেশ, মাধুরী, রমা, চিনু, বুলা, বুলার মা, যমুনা, কাবেরী প্রভৃতি চরিত্রগুলি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। উপন্যাসটি যেমনই যুগোপযোগী তেমনই এর আবেদনও চিরকালীন। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীঅজিত গুপ্ত। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩ গান্ধী রোড। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা মাত্র।

## সেতুবন্ধন

বাঙলা দেশের সাহিত্যজগতে "প্রিয়া ও মানসী" গ্রন্থকার গৌতম সেন নবাগত নন। উল্লেখিত গ্রন্থটি ছাড়াও আরও বহু গ্রন্থের রচয়িতা তিনি। আজ দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙলা সাহিত্যের তিনি সেবা করে চলেছেন। তাঁর বর্তমান উপন্যাসটি সামাজিক পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে লেখা। ঘরোয়া পরিবেশে, বাহুল্য বর্জন করে, সরলভাবে আপন বক্তব্য লেখক উপন্যাসটির মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন পাঠকদের দরবারে। সমাজ ও মানুষের প্রতি লেখকের গভীর মমত্ববোধ, উদার মনোভাব ও সহানুভূতি-সম্পন্ন মনের পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসটি পাঠ করে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বলিষ্ঠ, ভাষা সাবলীল, বর্ণনভঙ্গী মনোরম। লেখনী ও ভাষার সাহায্যে রঞ্জন, রাণী, অমরেশ, কল্যাণী, দত্ত মশাই, চৌধুরীমশাই, চরণ প্রভৃতি চরিত্রগুলি অঙ্কনে লেখকের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকাশক—কলিকাতা পুস্তকালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। দাম—দু' টাকা মাত্র।

## আবরণ

বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে সমারসেট মম্ কৃতী শিল্পী। তাঁর উপন্যাসগুলি পৃথিবীর পাঠক-সমাজে সমাদৃত। অনেক ভাষাতেই উপন্যাসগুলির অনুবাদ হয়েছে। "পেণ্টেড্ ভেইল" মম্-এর অপূর্ব সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থটিরই উপরোক্ত নামে অনুবাদ করেছেন সুজন বিশ্বাস। পেণ্টেড্ ভেইলে মম-এর যে সমবেদন মনের পরিচয় পাওয়া যায়—সুজন বিশ্বাসের অনুবাদে তা কোথাও ব্যাহত হয় নি। মম্-এর সৃষ্টি যুগ ও বাস্তবধর্মী। প্রেমের বিচিত্র গতি এক এক সময় সুস্থ ব্যক্তিকেও তার সাধারণ কর্তব্য ভুলিয়ে তাকে চোরাবালির দিকে টেনে নিয়ে যায়। পেণ্টেড ভেইল-এর নায়িকা উপনিবেশের এক সুন্দরী ইংরাজ বীজাণুবিদের স্ত্রী এক সুদর্শন কর্মচারীর প্রেমে মুগ্ধা হন। তাদের গোপন অভিসারের কাহিনীও বর্ণিত আছে। মহিলার স্বামী গোপন অভিসার জানতে পেরে হংকং-এর এক পল্লীগ্রামে কলেরা অধ্যুষিত অঞ্চলে স্ত্রীকে নিয়ে চলে যান। সেইখানে মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে জীবনে আর একটা সুস্থ দিক দেখতে পান। এই সময় স্বামীর মৃত্যু তাকে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দেয়। এই উপন্যাসে মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অনুবাদ-সাহিত্যে আগন্তুক হয়েও ইনি পাঠকের মনে রেখাপাত করেন। এঁর ভাষা সাবলীল ও মর্মস্পর্শী। উপন্যাসের প্রধান বিষয়বস্তু মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুবাদে সুন্দর ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। যে দুঃসাহস নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন, তাতে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদে কতকগুলি ইংরাজী ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োগ যদিও উপযোগী, তবুও এই ভাবগুলি বাংলায় প্রকাশ করলে সুষ্ঠু হ'ত। বানান ভুল মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। প্রকাশকরা এই বিষয়ে এখনও উদাসীন। আবরণ রসোত্তীর্ণ হয়েছে এবং অনুবাদ-সাহিত্যের পথে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ ঘোষণা করছে। প্রচ্ছদপট ও অঙ্গসজ্জাতে রুচির পরিচয় আছে। যদিও বিষয়বস্তুর সঙ্গে একটু যেন বেমানান। প্রচ্ছদচিত্র অঙ্কন করেছেন শ্রীগণেশ। প্রকাশক—বিচিত্রা, ৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। দাম—পাঁচ টাকা মাত্র।

## নোয়াখালী গীতিকা

( বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনে পরিবেশিত )

মিথিলাধিপতি মহারাজ আদিশূরের বংশধর নোয়াখালী জিলার ভুলুয়া পরগণার প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিশ্বম্ভর শূরের দ্বাদশ বংশধর রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাবুপুর পরগণার প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। কাব্যনায়ক রাজচন্দ্র তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। বাল্যকালেই তিনি পিতৃহীন। খুল্লতাত রাজেন্দ্রনারায়ণের আদরে লালিত-পালিত। জমিদারনন্দন যৌবনের উশৃঙ্খলতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। দেশ-বিদেশে রাজেন্দ্রনারায়ণের সুযশঃ পরিব্যাপ্ত। সিন্দুর কাইতের গ্রামের জঙ্গল কাটিয়া তিনি বৃহৎ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে হাট বাজার স্থাপন, রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ, দীঘি-পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়া তিনি প্রজাগণের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হন। রাজপ্রাসাদের তোরণ সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে তিনি ৬০ ঘর বৈরাগীর বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এখানে ভিক্ষোপজীবিনী শ্যামপ্রিয়া নাম্নী এক বৈষ্ণবী বাস করিত।

১ম সঙ্গীত

ধুয়া—" অরে অরে অরে অরে অরে অরে অরে।
চৌধ্রী সাজিলা রে, চৌধ্রী সাজিলা রো।"
চৌধ্রী ছিল রাজি নারায়ণ রাজ্যের অধিকারী।
হিন্দুর কাইতের জঙ্গল কাটি বানাইল রাজবাড়ী॥
আউগ দেউড়ী, মাইজ দেউড়ী, দেউড়ী সারি সারি।
হাইস করি তোলাইছে চৌধ্রী রাজগঞ্জ কাছারী॥
যে কালে রাজিন্দ্র খুড়ার গায়ে বল ছিল।
জাইত ঘর বৈরাগীর যায়গা আগ দরজায় দিল॥
নাটুয়া নাটুনী কত, ছিল সারি সারি।
কত রঙ্গে চঙ্গে চইলত সব নাগরী॥
চৌধ্রী ছিল রাজনারায়ণ রসিয়া নাগর।
জল টাঙ্গনের উপর করে দিল খোলাসার ঘর॥
সবার চরণে আমি করিয়া ভকতি।
মন দিয়া শুনেন সবে রঙ্গমালার পীরিতি॥

বাবুপুরের নিকটবর্ত্তী আহ্লাদীনগর বা তালেবপুর গ্রামে আত্মারাম নড়ের বাস। তাহার যুবক পুত্র গোলাপ নড় ও কুমারী কন্যা রঙ্গমালা। রঙ্গমালা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও রূপলাবণ্যবতী অপূর্ব্ব সুন্দরী। তাহার অসামান্য রূপমাধুরী দর্শনে কেবল যুবকগণ নহে, সুন্দরী নারীগণও মোহিত হইত। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে "নসীরাম" নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিত। তাহার পুত্র "রামগতি" দেখিতে কদাকার ও কুব্জপৃষ্ঠ। একদা রামগতি রঙ্গমালাকে চলার পথে দেখিয়া রূপমুগ্ধ হয় এবং রঙ্গমালার পিতা আত্মারামকে ও ভ্রাতা গোলাপ নড়কে প্রচুর অর্থদানে বশীভূত করিয়া রঙ্গমালাকে বিবাহ করে কিন্তু বিবাহ রাত্রেই রঙ্গমালা কদাকার রামগতিকে লাথি মারিয়া বাসরঘর হইতে তাড়াইয়া স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ করিয়া দেয়।

২য় সঙ্গীত

চারি চৌক্ষে দুই জনে যে হইল।
অগ্নির ফুলকী যেন রঙ্গ জলিয়া উঠিল॥
বাঁশ বনে আগুন দিলে গিরা ফুডি যায়।
তেন মত জলি উঠে রঙ্গমালার গায়॥
একেতরে রামগতি দাউদে খাইছে অঙ্গ।
দেখিলে তোর রূপ আনন্দ হয় ভঙ্গ॥
উঁচনেচ, ভাঙ্গিয়া বুক হইছে মোচা।
মখের দিকে চেইনতে লাগে চৈত-মাইয়া পেঁচা॥
গুঁজার রূপ রঙ্গমালা যখনে দেখিল।
আলগা পিছা হাতে করি, দৌড়াইতে লাগিল॥
তুই কইরবি বিয়া গুঁজা তুই কইরবি বিয়া।
আত্মারামের হাতনলাইয়া মাইয়া নিরে তোরতুন দিল বিয়া॥
লাথিমারি রাম গত্যারে ফালাইয়া দিল।
কেবাড় ভাজি রামগত্যা উভগা লড় দিল॥
যে দিন লাগাইত রঙ্গমালা চিন্‌ল আপন পর।
একদিন ও না কইরল্য রামগত্যা গুজার ঘর॥

উদ্ভিন্ন-যৌবনা রঙ্গমালা স্বীয় হৃদয়ের প্রেমাঙ্কুরটিকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। দিন দিন তাহার অন্তরের ক্ষুধার বাড়বানল জলিয়া উঠিল; একদিন শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবী ভিক্ষা করিতে করিতে রঙ্গমালার পিতা আত্মারাম নড়ের বাড়ী আসিয়া পড়ে। সে খঞ্জনী বাজাইয়া বাজাইয়া "রাধা-কৃষ্ণ রসাল প্রেম-সঙ্গীত করিতে থাকে।

৩য় সঙ্গীত

মনের মানুষ ভবে মিলে না সৈ গো কি করি তাই বল না।
মনের মানুষ মিল্লে পরে মনে মনে মিলে না॥
মনের মানুষ যদি পেতাম মন প্রাণ সঁপে দিতাম।
অগো তার মন আমি নিতেম কই সেই মানুষ ত পেলাম না।

সুললিত প্রেমসঙ্গীত শুনিয়া রঙ্গমালার পিপাসিত হৃদয় আকুল হইল, শ্যামপ্রিয়ার সহানুভূতি পাইয়া তাহার মনের কপাট খুলিয়া গেল।

৪র্থ সঙ্গীত

শুন চাই·  ামপ্রিয়া উদ্ধব কালিয়া।
নিবেছিল চিত্তের আগুন দিলি গো জ্বালিয়া ॥
ধনের লোভে বাপ আমার বিচার না করিয়া।
রামগত্যা গুঁজার কাছে মোরে দিল বিয়া ॥
আমার ভাইয়া গোলাপ রাইয়া চক্ষু দুটি খাইল।
বাড়ীর কাছে রসিক থুই গুঁজারতুন বিয়া দিল ॥
যেদিন থেকে আমি রঙ্গ চিন্‌ছি আপন পর।
একদিনও না কৈরল্যাম রামগত্যা গুঁজার ঘর ॥
যৈবনভারে আমার পরাণ পোড়ে সতত।
কইলজা আমার বিষেয়ে গেল টেণ্টার থাইয়ের মত ॥
এই কথা শ্যামাপ্রিয়া গায় যখনে শুনিল।
বাঁশমুড়ার ইলবিষ যেন ফড়কিয়া উঠিল ॥

মুহূর্ত্তের মধ্যে শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর মাথায় এক ষড়যন্ত্র পাকাইয়া ঠল। সে আত্মসম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি রাজবাড়ীর কাচারীতে জচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল।

৫ম—সঙ্গীত

ধুয়া— ঠমকে ঠমকে চলে শ্যামপ্রিয়া বৈষ্টবী।
ঝলমল করে রূপ আহা মরি মরি ॥
খুঞ্জনী বাজায় আর চৌধ্রীর দিকে চায়।
শ্যামপ্রিয়াগা ঠারণ লইছে এমন দেখা যায় ॥
শুন চাই গো শ্যামপ্রিয়া, কই তোমার ঠাই।
ঠার মারিয়া বৈভনদিদি গো আইলা কিসের লাই ॥
যদি রাজচন্দ্র চৌধ্রী প্রেমের খোঁজ পায়।
আজাইর গা রাইত ছক্কত করি টাঙ্গন দৌড়াই যায় ॥

শ্যামপ্রি· বৈষ্ণবী দূতীর কার্য্য করিয়া রাজচন্দ্র ও রঙ্গমালার াপন সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে এবং পরে উভয়ের সম্মতি নিয়া বাহের দিন ধার্য্য করে। রঙ্গমালা বিবাহের পূর্ব্বে স্নানযাত্রায় লিল।

৬ষ্ঠ—সঙ্গীত

পয়লা অমৃতারা, পদ্মতারা, সোনামালা।
জয়তারা কালীতারা, কলাবতী কাঞ্চনমালা ॥
মুগাদাসী, বেত তোলানী রাই।
চলনা গো সব সখিয়ে জল ছেয়ানে যাই ॥
ধুয়া—চল নাগরী নিয়ে যাগরী যমুনার বারি আইনতে যাব।
আগে আগে রঙ্গমালা জল ছেয়ানে যায়।
পিছে পিছে শ্যামপ্রিয়াগায় বাইচালি খেলায় ॥
পিছুমুখী রঙ্গমালায় নগর করি চায়।
শ্যামপ্রিয়াগা নাচন লাইগছে এমন দেখা যায় ॥
শুন শুন বৈভন দিদিগো তোরে ভালবাসি।
যেগায় তালে নাচন লইছ বেপার লাইগছে কি ॥
শুন শুন রঙ্গমালা তুমি জান না।
আমি বুড়াকালে পীরিত বাদে থাইকতাম পারি না ॥
এইনা শুনি দাসীগণ চুল চাপি ধরিল।
গুড়ুম গুড়ুম করি কেবল কিলাইতে লাগিল ॥

আশকিল, পাশকিল, কিল অজাগর।
চৌদ্দবুড়ি মাইরছে কিল খেঁড়ির উপর ॥
এমন কিল কিলাইছে তাইনরে আরে কইউম কি।
গুঁইল পিডনি পিডন দিল বাঁশের জিঙ্গলা দি ॥

বংশীবিশারদ রাজা রাজচন্দ্র ঘোড়ায় চড়িয়া মিলন-মন্দিরের দিকে যাত্রা করিল।

৭ম—সঙ্গীত

যখনেরে মহারাজ বাঁশীর দিল টান।
নগরুয়া কামিনী গো উড়িল পরাণ ॥
এই মতে মহারাজ টাঙ্গন দৌড়াই যায়।
নগরুয়া কামিনীরা থিয়াই রঙ্গ চায় ॥
কেহ কেহ বোলে অগো মুখে লইয়া পাণ।
কথ্‌খুন যায় বিদেশী বন্ধু পুন্নিমাসের চাঁদ ॥
কোন বধূ খাড়াই রইছে চালের কোনা ধরি।
কথ্‌খুন যায় বিদেশী বন্ধু প্রাণী নিল হরি ॥
এমন রসিক বন্ধু যেই না দেশে আছে।
সেই দেশের রমণীরা কেমন করি বাঁচে ॥"

মিলন-রাত্রে রঙ্গমালা তাহার প্রেমাস্পদের নিকট পিতা আত্মারাম নড়ের নামে একটি বৃহৎ দীঘি খনন করাইয়া উচ্চ নহবতখানা প্রস্তুত পূর্ব্বক দিবারাত্রি সঙ্গীত অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া পরে মগ-সর্দ্দার রামা দ্বারা তাহা কার্য্যে পরিণত করাইয়া লয়। ক্রমে ক্রমে খুল্লতাত রাজেন্দ্রনারায়ণ ভ্রাতুষ্পুত্রের

অসাধু প্রেমকাহিনী জ্ঞাত হন। দীঘি প্রতিষ্ঠা উৎসবে নীচ জাতীয় নড়গণের মর্য্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ও রঙ্গমালার সহিত অবাধ মিলনের সুবিধার জন্য রাজচন্দ্র ভুলুয়া ও বাবুপুর পরগণার সমস্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ভদ্রলোকগণকে এবং জনতা ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নিমন্ত্রণ-পত্র দেন। পরে রঙ্গমালার পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও খুল্লতাত রাজেন্দ্রনারায়ণকেও প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করেন। রাজেন্দ্রনারায়ণ ভ্রাতুষ্পুত্রের অপকার্য্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাপতি চান্দ ভাণ্ডারীকে আত্মারাম নড়ের বাড়ীতে প্রেরণ করেন। চান্দ ভাণ্ডারী সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, বিরাট মহোৎসব। প্রকাণ্ড তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে। নহবতে গীতবাদ্যের মধুর তান। সহস্র সহস্র মগ রামা সর্দ্দারের নেতৃত্বে বিশাল দীঘি খনন করিতেছে। আত্মারাম নড় ও গোলাপ নড় প্রভৃতি বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত। ক্রোধে চান্দ ভাণ্ডারীর অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। রাজেন্দ্রনারায়ণের সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত একখানি পত্র রাজচন্দ্রের হাতে দিয়া তাঁহাকে রাজকাচারীতে পাঠাইয়া দিয়া এবং পূর্ব্ব-পরিকল্পিতরূপে রাজচন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগিনী দুর্গাবালার হাতে এক গ্লাস ভাঙ্গের সরবৎ খাওয়াইয়া নেশার ঘোরে তাঁহাকে অচেতন করিয়া রাখিয়া সসৈন্য রঙ্গমালার পিতার বাড়ী আক্রমণ করিল। চান্দ ভাণ্ডারীর সৈন্যগণের সঙ্গে রমা সর্দ্দারের নেতৃত্বে পরিচালিত মগ শ্রমিকদের বিরাট যুদ্ধ হয়। রমা সর্দ্দার ও হাজার হাজার মগশ্রমিক যুদ্ধে নিহত হয়, অবশিষ্ট পলায়ন করে। চান্দ ভাণ্ডারী যুদ্ধে জয়ী হইয়া রঙ্গমালার গৃহে প্রবেশ করতঃ প্রথমত রঙ্গমালার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। পরে আত্মসম্বরণ করিয়া নট বাড়ীতে আগুন জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া দেয় এবং পরে গোলাপ নড় ও রঙ্গমালাকে একই সঙ্গে হাড়ীকাঠে ফেলিয়া তরবারির এক আঘাতে উভয়ের মস্তকচ্ছেদন করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে রঙ্গমালা তাহার ভাই ও তাহার জীবন রক্ষার জন্যে সেনাপতি চান্দ ভাণ্ডারীর নিকট অনেক কাকুতি, মিনতি করে কিন্তু চান্দ ভাণ্ডারীর পাষাণ হৃদয় কিছুতেই বিগলিত হইল না।

৮ম—সঙ্গীত

"রঙ্গমালা বলে চান্দ ধরি তোমার পায়।
আমারে মারিলে মা দুঃখিনীর না রবে উপায়॥
চৌধ্রীয়ে কৈরাছে প্রেম শুন আমার কথা।
তার জন্য কেন চান্দা কাট আমার মাথা॥
রাজচন্দ্র কৈরাছে প্রেম ধরি হাতে পায়।
আমার মুণ্ড কাট তুমি কাহার কথায়॥
এ সময় যদি দেইখ তাম রাজচন্দ্রের মুখ।
তুই চান্দা কাইট্‌তি কল্লা না পাইতাম দুখ॥
এ সময় শুইনতাম যদি রাজচন্দ্রের কথা।
তুই চান্দা কাইট্‌তি কল্লা না পাইতাম ব্যথা॥
মাইর না মাইর না চান্দা তোমায় ভালবাসি।
খুশী থাক মোরে লই হই তোমার দাসী॥
শুন শুন চান্দ ভাণ্ডারী কই তোমার তরে।
ছোট ভাই গোলাপের মার কি প্রকারে॥
আমি কইয়াছি দোষ মারিবা আমারে।
আমার ভাইয়া গোলাপ রাইয়া দোষ নাহি করে॥
ইহারতুন্ অধিক দুঃখ আর কিছু নাই।
তারতুন্ অধিক দুঃখ মার সোদর ভাই॥
তারতুন অধিক দুঃখ মা'র মনে হয়।
যার সামনে ভাজন বেটার মরণ হয়॥
বিদেশে বিঘাটে যার বেটা মরি যায়।
পশুপক্ষী না জানিতে আগে জানে যায়॥
মায় সে কেমনে জানে গৃহেতে বসিয়া।
দিবা-নিশি আগুন জ্বলে পুত্রের লাগিয়া॥
দুঃখের উপরে দুঃখ না যায় খণ্ডন।
কাটা ঘায়ের মধ্যে যেন মাখিল লবণ॥

—শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী।

# রেকর্ড-পরিচয়

"এইচ-এম-ভি" ও "কলম্বিয়া"র প্রকাশিত নতুন রেকর্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

## হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82818—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে প্রাণবন্ত দু'খানি আধুনিক গান—"এই নীল নির্জন সাগরে" ও "এখনো এই রাত।"

N 82819—"আরো একটু না হয়" ও "নয়নের জলে" আধুনিক গান দু'টি গেয়েছেন—রবীন্দ্র-সংগীতখ্যাতা কুমারী পূরবী সরকার।

N 82820—জনপ্রিয় শিল্পী শ্যামল মিত্রের দু'খানি জননন্দিত আধুনিক গান—"মন মেতেছে নীল আকাশে" ও "সূর্যমুখী সূর্য খোঁজে।"

N 82821—"গীতালি গীতাঞ্জলি" ও "একটি ফুলের মত"—মিষ্টি সুরের আধুনিক গান দু'খানি গেয়েছেন কুমারী [illegible] ঘোষাল।

N 82822—সুবীর সেনের গাওয়া "কালো মেঘে ডম্বরু" ও "ওগো শকুন্তলা"—ছন্দপ্রধান দু'খানি সুন্দর আধুনিক গান।

N 82823—"আজ মনের মালঞ্চে" ও "হারিয়ে গেল জীবন"—কুমারী পূরবী দত্তের সুরেলা কণ্ঠের অভিব্যক্তি।

## কলম্বিয়া

GE 24933—প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সংগীত-শিল্পী কুমারী কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়ের গাওয়া "রাতের গভীরে কে গো" ও "বলেছি তোমারে"—কণ্ঠ মাধুর্যে অতুলনীয় দু'খানি রাগপ্রধান ধরণের আধুনিক গান।

GE 24943—শ্রীমতী গীতা দত্তের (রায়) গাওয়া দু'খানি স্বরপ্রধান আধুনিক গান—"জানিতে চেয়েছো তুমি" ও "মাটির ভুবনে যদি।"

GE 24944—শিল্পী শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২) অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত দু'খানি অতুলপ্রসাদী গান।

# আমার কথা (৫১)

## সঙ্গীত কলানিধি পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে

এক এক জন মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত কর্মপটুতা নিয়ে, সেইরূপ প্রতিভা ও সাধনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই-এর বালকেশ্বরে। তিনি ছিলেন একাধারে সঙ্গীতের

প্রভৃত প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের আবিষ্কারক, সম্পাদক ও অনুবাদক। উত্তর-ভারতের সমস্ত বিখ্যাত ওস্তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মার্গসঙ্গীতাবলীর সংগ্রাহক ও প্রকাশকর্তা, মার্গসঙ্গীতের ইতিহাস ও ওস্তাদদের জীবনী, মার্গসঙ্গীতের পাঠ্যপুস্তক ও অভিনবভাবে সমস্ত প্রধান রাগের পরিচয় জ্ঞাপক 'লক্ষণ-গীত' এবং মার্গসঙ্গীতের উৎপত্তির লেখক, সমস্ত রাগকে ১০টি ঠাটে ভাগকারী এবং সহজ অথচ চমৎকার স্বরলিপির পদ্ধতির উদ্ভাবক।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কৈশোরে তিনি কাশীর বিখ্যাত পান্নালাল বাজপেয়ীর শিষ্য জীবনলাল মহারাজ তাঁর শিষ্য বল্লভ দাস দামলজী ও আলি হুসেন বীণকারের শিষ্য গোপালগীর জয়রাজগীরের কাছে সেতার শিক্ষা করেন। বছরের পর বছর সাধনা করে সেতারে তিনি অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ক্রমে ১৮৮৪ সালে তিনি বোম্বাই-এর বিখ্যাত 'জ্ঞান উত্তেজক' মণ্ডলী'তে যোগদান করেন। এই মণ্ডলী তৎকালে সঙ্গীত শিক্ষার প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছিল। সঙ্গীত-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কলেজীয় শিক্ষা চলতে থাকে। তিনি ১৮৮৫ সালে বি-এ ও ১৮৮৭ সালে এল-এল-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আইন-ব্যবসায় সুরু করেন করাচীতে। আইন-ব্যবসায় তাঁর পেশা হলেও সঙ্গীত সাধনাই তাঁর নেশা ছিল।

যে সময়ে 'জ্ঞান উত্তেজক মণ্ডলী'তে যোগদান করেন, সে সময় সেই মণ্ডলীতে বিখ্যাত ধ্রুপদী রাওজী-বুওয়া বেলবাগকর আলি হুসেন খাঁ ও তাঁর মাতুল বিলায়েত হুসেন খাঁর কাছে অনেক বছর ধরে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। যখন উক্ত মণ্ডলীতে নৈপুণ্য প্রদর্শনকামী সঙ্গীতজ্ঞদের পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত সাব-কমিটির সভ্য তাঁকে মনোনীত করা হয়, তখন থেকেই তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে সংস্কৃতপুথি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন এবং সেই সব পুথির অধ্যয়নও চলে নিঃশব্দে (১৮৯০)। তিনি প্রায় ১৫ বছর ধরে হিন্দী, তেলেগু, ইংরেজি, বাংলা ও গুজরাতী ভাষায় সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থরাজি পাঠ করতে থাকেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে ঐ মণ্ডলীতে ও নানাস্থানে সঙ্গীত, সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এর পর তাঁর সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করার সুযোগ আসে। বিভিন্ন দেশে সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা ও বিভিন্ন দেশের লাইব্রেরীগুলিতে সঙ্গীতের গ্রন্থাবলী ও নানা পুস্তক সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। এ সমস্ত ঘটে ১৮৯৬ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত। লক্ষ্ণৌ-এর সঙ্গীতজ্ঞ তালুকদার ঠাকুর মহম্মদ নবাব আলি খাঁর সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে ; যিনি পণ্ডিতজীর কাছে নজির খাঁকে ( ইনি 'কলা নজির' নামেই বিখ্যাত ) তাঁর পদ্ধতি ও লক্ষণ-গীতগুলি শেখবার জন্য প্রেরণ করেন ( ১৯১১ )। ১৯১৪ সালে তিনি বোম্বাই-এর Good Life League-এর বাড়ীতে ক্লাস খুলে সঙ্গীত শিক্ষা দান করেন। ১৯১৫ সালে বরোদায় প্রথম নিখিল ভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনের আহ্বান ও তার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তিনিই করেন। বরোদার মহারাজের কাছে উটকামণ্ডে গিয়ে কিছুকাল বাস করেন ও তাঁকে সঙ্গীত সম্বন্ধে উৎসাহিত করেন এবং বরোদায় সঙ্গীতের স্কুল স্থাপন করতে স্বীকার করান ( ১৯১৭ )। এই বছরেই তিনি গোয়ালিয়রে গিয়ে মহারাজকে উপযুক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী সঙ্গীত শিক্ষা দানের গুরুত্ব স্বীকার করান ও সেখানকার বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে গভীর ভাবে আলোচনা করেন। বরোদার ষ্টেট মিউজিক স্কুল ও গোয়ালিয়রের মাধব মিউজিক কলেজের ভাবী শিক্ষকদের সঙ্গীত ও তার শিক্ষাদানে প্রকৃষ্ট পদ্ধতির শিক্ষা দেন। এই বছরেই তিনি ভারত ধর্ম মণ্ডল হতে 'সঙ্গীত কলানিধি' উপাধি লাভ করেন। পরের বছরে দিল্লীতে দ্বিতীয় নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে বিরল ও কঠিন রাগগুলি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে আলোচনা করেন। ১৯১৮ সালে তিনি রামপুরের নবাবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৯ সালে কাশীতে তৃতীয় নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে কম প্রচলিত রাগগুলির নিয়ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ১৯২৪ ও '২৫ সালেও তিনি লক্ষ্ণৌতে ৪র্থ ও ৫ম নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে যোগদান করেন।

অতঃপর তিনি রায় রাজেশ্বর বালী ও রায় উমানাথ বালীর সহায়তায় ও যুক্তপ্রদেশের ( বর্তমান উত্তর প্রদেশের ) গভর্ণর ম্যারিস সাহেবের সহানুভূতিতে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজনককারকে অধ্যক্ষ করে লক্ষ্ণৌএ ম্যারিস কলেজ অব হিন্দুস্থানী মিউসিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই কলেজ ১৯৩৯এ স্থাপিত ভাতখণ্ডে ইউনিভার্সিটি অফ ইণ্ডিয়ান মিউসিকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ধরমপুরের মহারাজা 'সঙ্গীত ভাব' গ্রন্থের লেখক। ১৯২৭ সালে মহারাজার আমন্ত্রণে তিনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গীত ও তার শিক্ষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন।

তিনি স্বরচিত বইগুলির সমগ্র আয় থেকে যাতে তাঁর বইগুলি পুনঃ প্রকাশিত হয় তার জন্য এক ট্রাষ্ট গঠন করেন। সঙ্গীতের উন্নতির জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম অবর্ণনীয়। পুণার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরোধে বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গীত শিক্ষকদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান ইত্যাদি করেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং ১৯৩৩ সালে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। তিন বছর শয্যাশায়ী হয়ে ১৯৩৬ সালে তাঁর কর্মজীবনের অবসান হয়। দীর্ঘকাল শুধু যে তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রানুশীলন, সঙ্গীত চর্চা করেছেন তা নয় বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনায় তার শাস্ত্র জ্ঞানের প্রতিভার স্বাক্ষর সমুজ্জল হয়ে রয়েছে।

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া গেল। এই বিবরণীটি সংগ্রহের জন্য আমি লক্ষ্ণৌ নিবাসী বন্ধুবর শ্রীনির্মলচন্দ্র দে'র নিকট ঋণী। ক্রমিক পুস্তক মালিকা ১ম ভাগ ( বালক বালিকাদের জন্য ১০টি রাগের, প্রত্যেকটির আদিরস বর্জিত দুইটি করে সহজ দ্রুত খেয়াল ও সরগম, ১৯১৯ ), ২য় ( ১০টি রাগের প্রত্যেকটির সরগম ও লক্ষণগীত এবং কয়েকটি ছোট ( দ্রুত ) ও বড় খেয়াল, ধ্রুপদ, ধামার ও তারানা ( তেলে না ), নিজের উদ্ভাবিত, সহজ, সরল ও উত্তম স্বরলিপিতে, ১৯২১ ), ৩য় ( ১৭টি রাগের ঐ, ১৯২৮ ), ৪র্থ ( ২০টি রাগের ঐ ১৯৩২ ), ৫ম ( ২০০ রাগের ঐ ১৯৩৫ ), ৬ষ্ঠ ( ২০০ রাগের ঐ, ১৯৩৭ ), হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি ( উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের শাস্ত্র ও ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী সমেত ) ১ম ভাগ ( ১৯১৩ ), ২য় ( ১৯১০ ), ৩য় ( ১৯১৪ ) ৪র্থ ( ১৯৩২ ), শ্রীমল্লক্ষ্য সঙ্গীতম্ ( 'চতুর পণ্ডিত' ছদ্মনামে, সংস্কৃত পদেও সমস্ত প্রধান রাগের শাস্ত্রসম্মত নিয়ম, পূর্বগামী অনেক লেখকের মত শ্রুতি অনুযায়ী নয়, পরন্তু ৭টি বিশুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বর অনুযায়ী,

১৯১০ ); অভিনব রাগমঞ্জরী ( সংস্কৃত পদ্যেও সমস্ত প্রধান রাগের স্বরূপ, ১৯২১ )। শাস্ত্রপ্রবেশ তিন ভাগ ( সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাবে, উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের নিয়ম ও বিজ্ঞান। ক্রমিক পুস্তক মালিকায় দেওয়া মরাঠি অংশের হিন্দী অনুবাদ; স্বরমালিকা ( নিজের আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনুযায়ী দশটি ঠাটে বিভক্ত করে বহু রাগের সরগম, ১৯১০ ); লক্ষণ গীত, তিনভাগ ( ২৫০টি রাগের নিয়ম, সেই সব রাগে গেয়, স্বরচিত গীতাবলীতে, ১৯১২ ); A short historical survey of the music of upper India ( ১৯৩৪ ); A comparative study of the music syskhas of the 15th, 16th, 17th and the 18th centuries ( ১৯৩৫ ); A Philosophy of music.

তিনি যেসব প্রাচীন সংস্কৃত পুথি ও আধুনিক সংস্কৃত বই সম্পাদন ও প্রকাশ করেছেন—১৪৭০ খৃষ্টাব্দে রামামাত্য প্রণীত, স্বরমেল কলানীধি ( ১৯১০ ); পণ্ডিত সোমনাথের রাগ বিরোধ প্রবেশিকা ( শ্রুতি সম্বন্ধে, ১৯১১ ); পুণ্ডরীক বিট্‌ঠলের সদরাগ চন্দ্রোদয় ( ১৯১২ ), রাগমালা ( ১৯১৪ ও রাগমঞ্জরী ( ১৯১৪ ); ভাতখণ্ডের 'লক্ষ্য সঙ্গীতম্' অবলম্বনে হায়দরাবাদের আপ্পা তুলসীর লেখা রাগ কল্পদ্রুমাঙ্কুর ( ১৯১৩ ), চন্দ্রিকাসার ( ১৯১৩ ) রাগচন্দ্রিকা ( ১৯১৩ ) সঙ্গীত সুধাকর ( ১৯১৩ ); উক্ত লেখকের রাগলক্ষ্যণম্ ( ১৯১৪ ) অভিনব তালমঞ্জরী ( ১৯১৪ ) ও চত্বারিংশদ-ষট-রাগ নিরূপণম্ ( ১৯১৪ ); লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিনী ( ১৯১৮ ); শ্রীনিবাস পণ্ডিতের রাগতত্ত্ববিবোধ ( ১৯১৮; পণ্ডিত বেঙ্কটমুখীর চতুর্দণ্ডী প্রকাশিকা ( ১৯১৮ ); ভাবভট্টের অনুপ সঙ্গীতবিলাস ( ১৯২১ ); সঙ্গীত পারিজাত প্রবেশিকা ( ১৯১১ ); অষ্টোত্তর শত তাললক্ষণম্ ( ১৯১১ ); সুগম রাগমালা ( ১৯১৮ ), রাগ তরঙ্গিনী ( ১৯১৮ ); হৃদয় কৌতুক ( ১৯১৮ ), হৃদয় প্রকাশ স্বরামৃতোদ্ধার ( ১৯১১ ); সঙ্গীত রত্নাকর ও সঙ্গীত দর্পণ গুজরাতীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয় ( ১৯১১ )।

# তোমাকে

শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জোনাকির আলো যেন খেলা করে তুহিন আঁধারে,
ক্রিজেল পাখীর সুর শোনা যায় চাঁদের দুয়ারে।
পিরমিজ পাহাড়ের কোলে, ভালো-লাগা প্যারিস সহরে,
সিসিলি দ্বীপের তটে, দিক্‌হারা সাগর-জোয়ারে
তোমাকেই পেয়েছি যে খুঁজে।

গভীর স্বপ্নালু রাতে যদি চোখ আসে বুজে,
স্মৃতির ডায়েরীখানি মেলে ধরি কল্পনার মাঝে
পথচলা মানস আলোকে,—
বোমারু-বিদগ্ধ কোন যাত্রীহীন মুমূর্ষু জাহাজে
মুহূর্তের দৃষ্টিতেই চিনেছি তোমাকে।

পিয়ালের ঘুম ভেঙে যায়।
শিখরি শিখর 'পরে একখানি সোনালী থালা
সতেজ সরসী-নীরে সোনা ঢেলে দেয়।
তখনও জাগেনি কেউ, শুধু পিয়ালের ঘুম টুটে যায়—
সেখানেও পেয়েছি তোমায়।

সুমেরুর প্রান্তে কোন এস্কিমো পল্লীতে,
সভ্যতা পিছিয়ে গেছে দূরে হিমবাহ 'ঘাতে,
ধরণীর সীমা যেথা চেয়ে থাকে নিঃসীম অনন্তে
সেখানেও দেখেছি তোমাকে।

টাইফুন-ক্লান্ত সাগরে, বা সাহারার বালু-ঝটিকায়,
মৃত্যুহীন প্রাণ নিয়ে 'ক্যারাভন্' ছুটে চলে যায়।
নিউগিনি জঙ্গলে কিম্বা শব্দহীন গিনি-উপকূলে,
দারুচিনি-দ্বীপ আর অতলান্ত সাগর-সলিলে,
তোমায় পেয়েছি দেখা—শীতহীন অলস বৈকালে।

জীবনের কাকলি-কূজনে—
আধেক ঘোমটা-টানা বাংলার কুলবধূসাজে
কোমল লতার মত
আনত নয়ন দুটি লাজে অবনত—
এ বেশে ত দেখিনি তোমায়!

মন আমার ক্ষুদ্রগণ্ডী বিচ্ছিন্ন করে
ছুটে যায় প্রলয়ের সঙ্গীত সভাতে,
সেখানেই মিলিব তোমাতে
কবে ও কোন্ দুর্যোগের রাতে।

সাত্যকি

১০

হাজারীবাগ যাবার একটা 'টি প' পেয়ে গেলুম। অনেকখানি রাস্তা। দূরের 'ট্রিপ' লাভ বেশী। খাটনিও বেশী। যাতায়াতে দিন পাঁচেক লাগবে।

পামাকে বললুম, দিন কয়েক ফিরতে পাবো না। কত দিতে হবে বলো ?

মাঝে মাঝে উধাও হওয়া আমাদের কাজের একটা অঙ্গ। পামা জানে। কখনো প্রশ্ন করে না। ওর এসব গা সওয়া হয়ে গেছে।

—কদ্দূর যাচ্ছ ? পামা জিজ্ঞেস করল।

—হাজারীবাগ।

—ও।

—কত দিতে হবে বল ?

—তোমার যা ইচ্ছে।

—আমার ইচ্ছে মানে ? দরকার তোমার। কাজেই চাইবে তুমি। আর তা ছাড়া, সংসার তো আমি চালাই না। যে চালায়, সেই ভালভাবে জানে।

—সুদাস বাবু থাকবেন নাকি ?

পামার প্রশ্নে চমকে উঠলুম। তাইতো সুদাস থাকবে আরো কিছুদিন, নাকি আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই সে তার রাস্তা ধরবে বুঝতে পারলুম না। আর তা ছাড়া, সে যে চলে যাবে এমন কথা তো সে কৈ বলেনি। ভাবনায় পড়লুম।

সুদাস সব সমস্যার সমাধান করে দিলো নিজে থেকেই। স্বেচ্ছায় সে বলল, তোমাদের তো দূরের ডাক এসেছে। অতএব আমিও পাট গোছালুম এখানে থাকার।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রতা দেখালুম, তুমি ইচ্ছে করলে কিছুদিন থেকে যেতে পার।

—না না, সুদাস বলল, সেটা ভাই ঠিক হবে না। আর তা ছাড়া এখানকার কাজ আমার এক রকম সারা হয়ে গেছে। যেটুকু আছে, তা আজ শেষ করে ফেলব।

—আমরা তো অনেক দূর যাচ্ছি। মাঝে মাঝে এখানে এসে পামাকে দেখে যেও বুঝলে ?

সুদাস সম্মতি জানাল।

একটা বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কখন বেরুবে ?

—সন্ধ্যের সময় রওনা হব। আমি জানালুম।

—তবে এক কাজ কর। তোমাদের সঙ্গে আমি কিছু দূর যেতে পারি। অবশ্য যদি গাড়ীতে জায়গা থাকে।

আনন্দের সঙ্গে বললুম, এ আর বেশী কথা কী। যাবার সময় তোমায় তুলে নিয়ে যাবো।

অন্য সময় ওকে নিতে কখনো রাজী হতুম না। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। সুদাস যদি এখনি চলে যেতে চায়, তা হলে আমি এখনি তৈরী। বাড়ী থেকে ওকে চলে যেতে মুখ ফুটে আমি বলতে পারতুম না। ও নিজে থেকেই যখন বলেছে, তখন আমি খুব স্বস্তি বোধ করলুম। গলা থেকে কাঁটা নেবে গেলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, এ যেন তার চেয়েও বেশী। তবু ভয় হয়, নোনা জল একবার ঢুকে পড়েছে ক্ষেতে। শস্য বাঁচানো যাবে কি ?

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবছিলুম। কানাইএর বিয়ে দিতে হবে। পামাকে টাকা দিতে হবে। 'ষ্টেপনী' নিতে হবে। বাড়তি তেল আলাদা টিনে করে নিতে হবে। এলোমেলো সব কথা।

কখন একটু তন্দ্রা এসে সব ভুলিয়ে দিলো বুঝতে পারলুম না।

যখন চোখ খুললুম, তখন দেখি পামা আমার মাথার কাছে বসে চুলের ভিতর হাত বোলাচ্ছে আস্তে আস্তে। চোখ রগড়ে নিয়ে ওর হাত ধরলুম।

খুব ঠাণ্ডা হাত পামার। মুখ বিষণ্ণ। বড় বড় চোখ দুটো কী গভীর। ব্যাকুল এক জিজ্ঞাসা ওর চোখে। বিস্মিত হলুম। আরো কতবার বাইরে গেছি। কতদিন ওর কাছে থাকিনি। কৈ এমন উতলা তো ওকে কখনো হতে দেখিনি। আজ ওর এত ভয় কেন ? পামা কি কোন অনাগত বিপদের আশঙ্কায় বেদনাহত ?

মুখে কিছু না বলে ওর আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। সরু সরু লম্বা আঙুলের ডগায় হলুদের ছাপ। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে কালো কালো লম্বা মাছ-তরকারী কাটার দাগ। এমন সুন্দর হাতে যদি কখনো কিছু করতে না হত। ভাবতে বেশ লাগে।

হাত বাড়িয়ে নিয়ে পামা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। আমার কপালে হাত রেখে আস্তে আস্তে বলল, অনেকদিন দেরী হবে ফিরতে ?

হেসে বললুম, হ্যাঁ দেরী তো হবেই। যদি গাড়ী মাঝরাস্তায়

—তা সত্যি। বৃষ্টিতে বোঝাই গাড়ী চালানো একটা ঝকমারি। নাও তুমি এদিকে এসো। আমি চালাই। তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম করো।

কানাই গুম হয়ে ষ্টীয়ারিং ধরে বসে রইল। নড়বার নাম করছে না দেখে বললুম, বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়ে গেছে খেয়াল আছে বোধ হয়? এখন গাড়ী পাকা রাস্তায় তুলতে বেশ বেগ পেতে হবে।

—কিন্তু আমি যে একটু খাবো বললুম। কানাই এবার আব্দার করল।

—বেশতো যাও খেয়ে এসো।

—বারে। আজ যে ড্রাই-ডে! তুমি না হলে হবে না।

—ও, এই কথা। চলো চেষ্টা করে দেখা যাক।

একটা আড্ডায় গিয়ে উঠা গেল। তিনজন বসে জলে ভেজানো ছোলা, একটু গুড়, আদা দিয়ে মৌতাত করছে। আমরা দু'জন গেলুম। সাদর অভ্যর্থনা করে বসাল।

ছোট নীচু ঘর। বেড়ার গায়ে অনেক জায়গায় মাটি নেই। ওপোরে খোলার ছাউনি। বাতাসে দু'চারটে খোলা এদিক-ওদিক হয়েছে। এক কোণায় বসানো আছে একটা বালতি। জল পড়ছে টিপ টিপ করে। মাঝখানে জ্বলছে একটা লম্ফ। কালো ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। মাটির মেঝে স্যাঁতসেতে। খবরের কাগজ বিছিয়ে আসন করা হয়েছে।

কোন কথা না বলে যে-যার গেলাস নিয়ে ব্যস্ত। মন রঙীন হয়ে আসছে এমন সময় হঠাৎ একজন প্রস্তাব করে বসল, মুণ নেই। আলুনি। আলুনি।

মুণ চাই, মুণ চাই, সবাই বলে উঠল।

কানাই অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। ও হকচকিয়ে গেছে। মুণ চাই কথার মানে বুঝতে ওর কষ্ট হচ্ছে। সবাই চুপচাপ। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এখন টিপ-টিপ করে। মনে হচ্ছে অনেক রাত। ব্যাঙ ডাকছে একঘেয়ে বিশ্রী আওয়াজ করে। আমাদের ছায়াগুলি দেওয়ালের গায়ে খুব বড়বড় দেখাচ্ছে। হাওয়ায় লম্ফের শিখা কাঁপছে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ছায়াগুলিও কাঁপছে। ঘর বিড়ি সিগারেট আর লম্ফের ধোঁয়ায় ভরে গেছে।

ওদের মধ্যে একজন হঠাৎ উঠে বাইরে বেরিয়ে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এল। একা নয়। সঙ্গে একটি কিশোরী। শীর্ণ দেহ। রুক্ষ চুল। ভীরু চাউনি।

সঙ্কুচিত পদক্ষেপে ঘরে ঢুকে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ওপোর হাতদুটো মুঠো করে ধরা। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ে দেখতে চায়, পাতালে প্রবেশ করা এখনি ওর পক্ষে সম্ভব কি না।

কানাই আর আমি বিব্রত বোধ করলুম।

বেশ বুঝতে পারলুম, নারকীয় তাণ্ডব আরম্ভ হলো বলে। এ এক জঘন্য পরিস্থিতি। কোথায় এই বাদলার রাতে একটু জমিয়ে ...র, তা নয় যত পাশবিক উল্লাস। মন রি-রি করে উঠল।

...কজন জোর করে মেয়েটিকে বসিয়ে দিলো।

...র থাকতে পারলুম না। কানাইকে সঙ্গে করে ...এলুম। বৃষ্টিভেজা হাওয়ায় জোরে জোরে নিশ্বাস

কানাই বলল, খুব জায়গায় নিয়ে এসেছিলে যা হোক।

—তোমার জন্যেই তো আসা। নইলে আমি আসতুম না কি।

—বাপ। আর যেতে চাইবার নাম করবো না। চলো এখন ভালোয় ভালোয় গাড়ীটা রাস্তায় তুলতে পারলে হয়।

কানাই যেমন কোন কাজে হঠাৎ উৎসাহিত হয়, তেমনি হঠাৎ ওর উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। ওকে যদি সেদিন আমি নিয়ে না যেতুম, তবে আমার ওপোর রাগ করত। আবার নিয়ে যখন গেলুম, তখন ওখানকার বীভৎস কার্যকলাপে ব্যথিত হয়ে ফিরে আসায় দুঃখিত হলো ঠিকই, কিন্তু সব দোষটা আমার ওপোর চাপাতে পারল না।

আজ সিনেমায় যাবে বলে বায়না ধরেছে। আমি ওকে যেতে বারণ করব না, ও জানে। আমাকে সঙ্গে যেতে বলছিল কর্তব্য হিসাবে। আর কিছু নয়। আমি কেন এড়িয়ে যেতে চাই, তাও জানে। পামার এত কাছে থেকে, এত দূরে যেতে আমি নারাজ। তাই কানাই অন্যায় আব্দার আমার ওপোর করল না। চা খাবার পর জব্বরকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, তুমি কাল তৈরী থেক। ছেলেদের নিয়ে যাব পিকনিক করতে। আমার আসতে বেশী দেরী হবে না।

শ্রীমন্ত উঠে এসে পাশে বসল। একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, রাগ না করো তো একটা কথা বলি, ভায়া।

আমি বললুম, চলুন না। রাগ করব কেন?

—কানাই-এর এবার একটা বিয়ে দাও।

মহিম যোগ দিল, আমারো তাই মত। আর ক'দিন এ রকম ভাবে কাটাবে ছেলেটা।

—দেখুন, বিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে ঠিকই। তবে ওর মেয়ে পছন্দ হচ্ছেনা।

—কি যে বল, ভায়া। বাংলা দেশে মেয়ের অভাব। একটা-দুটো পছন্দ হচ্ছে না বলে হাল ছেড়ে বসে থাকা যায় কখনো? শ্রীমন্ত বলল।

—বেশ তো, আপনাদের সন্ধানে ভালো মেয়ে আছে?

—বিলক্ষণ।

—শুধু ভালো মেয়ে দেখলেই তো চলবে না। পাত্রীপক্ষ আবার ওকে পছন্দ করে কিনা, তাও দেখতে হবে তো।

—বিলক্ষণ। শ্রীমন্ত আবার বলল, আমার সন্ধানে একটা মেয়ে আছে। কামদেবপুরের শিববাবুকে চেনো তো?

—কোন শিববাবু?

—ঐ যার কাঠগোলা আছে গো। মস্ত বড় কাঠের কারবারি। তার সঙ্গে এক রকম কথা হয়েই আছে। সে তোমাদের চেনে। খালি তোমরা গিয়ে একদিন মেয়ে দেখে এসো। পছন্দ হলেই লাগিয়ে দোব।

—একদিন-ট্যাকদিন বাদ দাও, শ্রীমন্ত। মহিম বলল, দিন ঠিক করে ফেলো আজই, কবে যাওয়া হবে। শুভ কাজে দেরী করা ঠিক নয়।

কি জানি কেন কানাই-এর বিয়ের কথা সুদাসের মুখ থেকে প্রথম দিন শুনে যে উত্তেজনা হয়েছিল, আজ আর তার চিহ্নমাত্র নেই। গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর এ তো

সত্যি কথা, বিয়ে করতে হলে ঠিক বয়েসেই বিয়ে করা ভাল। বেশী বয়েসে বিয়ে করা যায়, কিন্তু বিয়ের যে আনন্দ, উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা থাকে, তা ঠিক ঠিক উপভোগ করা যায় না। এদিকটায় আমার এত দিন খেয়াল হয়নি। আশ্চর্য্য!

কর্ম্মিতকর্মা লোক শ্রীমন্ত। দিন-ক্ষণ ঠিক করে ফেলল। মহিম পূর্ণ সহযোগিতা জানাল।

ভাদুড়ী মশাই হাত কচলাতে কচলাতে এসে বললেন, ভাল জিনিস আছে, স্যর! একটু করে চলবে নাকি?

লাফিয়ে উঠল মহিম। যেন হঠাৎ পায়ের কাছে কেউটে দেখতে পেয়েছে।

—আমি চলি ভাই, নয়ন। বলতে বলতে মহিম উঠে দাঁড়াল।

মহিমের হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে বললুম, এত ব্যস্ত হবার কী আছে। দাঁড়ান না, আমিও যাবো। আজ আর ও-সব চলবে না, ভাদুড়ী মশাই!

চিন্তামণি ভাদুড়ী ক্ষুন্ন হল।

বাড়ির দিকে যখন যেতে শুরু করলুম, তখন একটা অলস চিন্তা পেয়ে বসল। কানাইকে বিয়ে দিয়ে আলাদা করে দিতে হবে। একসঙ্গে থাকতে নিশ্চয় ও রাজী হবে না। হওয়া উচিতও নয়। আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা নেই। প্রতিষ্ঠা দূরের কথা, সামান্য সম্মানটুকু পর্যন্ত নেই। একে লরীওয়ালা, তার ওপর বাস করে অজ্ঞাতকুলশীল স্ত্রীলোকের সঙ্গে। ভাগ্যিস ব্যবসা জগতে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। কিন্তু বিয়ের জগতে এর দাম অত্যন্ত বেশী। অতএব স্বেচ্ছায় না হলেও, কানাই-এর ভবিষ্যৎ বাঁচাতে হলে, ওকে সমাজের মুখের দিকে চেয়ে আমার এ স্বার্থত্যাগ করতেই হবে—কানাইকে আলাদা করে দিতে হবে।

রাস্তার কুকুর একটা আমায় দেখে চিৎকার শুরু করে দিল। দেখাদেখি আরো কয়েকটা কোত্থেকে এসে জুটল। বাড়ি পর্য্যন্ত ঘেউ-ঘেউ করতে করতে এলো।

দরজা খুলে পামা একপাশে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে জামা খুলতে খুলতে হঠাৎ একটা প্যাকেটের দিকে নজর পড়ল। খবরের কাগজে মোড়া। রঙীন সুতো দিয়ে বাঁধা বেশ প্যাকেটটা।

সেদিকে পামার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললুম, ওটা কি?

পামা বিরস মুখে বলল, খুলে ভাখো।

দেখলুম প্যাকেটের মধ্যে আছে শাড়ী, ব্লাউজ, সায়া সব নতুন এবং সব একটা করে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পামার দিকে চাইতেই পামা বলল, সুদাস বাবু এনেছেন আমার জন্তে। আমি খুলিনি।

হেসে বললুম, সত্যি সুদাসের নজর আছে।

পামা বলল, যার নজর থাকলে খুশী হতুম বেশী, তার কিন্তু নেই।

—আমি জানতুম না, তোমার শাড়ী ব্লাউজ নেই।

—জানা-না-জানার কথা নয়। সুদাস বাবু কী জানতেন আমার শাড়ীর দরকার?

হো-হো করে হেসে বললুম, তবে সুদাস যাদুমন্ত্র জানে বল?

—যাদুমন্ত্র জানেন কিনা জানি না। তবে একটা জিনিস ঠিকই জানেন।

—সেটা কী? আমি জানতে চাইলুম।

—নেহাৎ-ই শুনবে।

—হাঁ, বলো না। শুনতে বেশ ভাল লাগছে।

—শুনলে কিন্তু ভাল লাগবে না।

—তবু বল।

—উনি ভালবাসার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে জানেন।

চমকে উঠিনি। সুদাস সবে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করেছে। আর আমি শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি অনেক আগে। ওকে আরো কতদূর এগুতে হবে, ও জানে না। বোধ হয় জানতে চায়ও না। সুদাস ধনের দালাল। এখন আবার মনের দালালিও ধরবে নাকি?

আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্তে পামা বলে চলল, তোমরা চলে যাবার দিন দুই পরে একদিন সুদাস বাবু এসে ওগুলি রেখে যান। যাবার সময় বলে গেলেন, দেখুন, হয়তো অন্যায় করছি। কিন্তু আপনাকে ছেঁড়া কাপড়ে ঠিক মানায় না বলেই, এগুলি এনেছি। যদি ইচ্ছে হয় পরবেন, আর না-হয় ফেলে দেবেন।

—তবে পরোনি কেন?

—অন্যের জিনিষ নিতে আমার ভাল লাগে না, বলে।

একটা কথাতেই পামার মনের সব কথা ধরা পড়ল। মুখে আমাকে রাগাবার জন্তে যাই বলুক না কেন, মনে-প্রাণে ও আমাকে ছাড়া আর কাউকে যে ভালবাসে না, চায় না, তা আমি জানি। আর জানি বলেই সুদাসের মতো লোককে ঘরে আনতে আমি এতটুকু দ্বিধা করিনি। কিন্তু আমার অহঙ্কারের এ পরীক্ষা বড় বেশী কঠিন হচ্ছে নাকি পামার পক্ষে? কিন্তু একবার যখন পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেছে, তখন তার শেষ পর্য্যন্ত যেতে হবেই।

বসে বসে ভাবছিলুম। পামা সুদাসের দেওয়া শাড়ী ব্লাউজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার বুকের ওপোর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবার পর বলল, তুমি কী বোঝ না, সুদাস বাবু কী চান আমার কাছে? তুমি আমায় আর কত অপমান করতে চাও? বল, বল।

বলবার কিছু তখন ছিল না। নিজের ব্যক্তিত্বের ওপোর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। শুধু ভরসা ভবিতব্য।

রাত অনেক হল। নিষুতি রাত। কান্নায় ভরা রাত। [ ক্রমশঃ।

[ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ]

স্মলেখা দাশগুপ্তা

অফিস এনভেলাপের মতো লম্বাটে ধরণের একটা এনভেলাপ।

কিন্তু চেহারাটা অফিস এনভেলাপের মতো হলেও কাগজটা নয়। চিঠিটা খুলবার আগে মঞ্জুকে এনভেলাপটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু দেখতেই হলো এবং একটু সময় তাকিয়ে থাকতেও হলো। কারণ চোখ দুটোই থেমে রইল তার।

ধূসর রং-এর অতি মূল্যবান এ্যাণ্টিক কাগজের এনভেলাপ। কোন গুণীর হাতে আঁকা গাঢ় ধূপ রং-এর একটা লতা সাদা ফুলের রাশি নিয়ে সেই ধূসর রং-এর এনভেলাপটাকে লতিয়ে লতিয়ে জড়িয়ে রয়েছে। যেন চিঠিটার মুখ আঠা দিয়ে নয় লতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া ওপরে লেখা ওর নামের অক্ষর দুটোর প্রথমটা যেন লতা ধরে ফুলের দিকে হাত বাড়াচ্ছে দ্বিতীয়টা ফুলের নাগাল পেয়ে তার ভেতর মুখ রেখেছে। এমনিতেই দামী জিনিষের একটা নিজস্ব দামী চেহারা আছে—তার সঙ্গে যদি আবার ব্যক্তির রুচি আর শিল্পীর নৈপুণ্য যোগ হয় তবে যে তার কি চেহারা হয়—এনভেলাপটার দিকে তাকিয়ে যেন মঞ্জু তাই একটু দেখে নিল। তারপর যে চামচেটা দিয়ে গরম ভাত নেড়ে চেড়ে ঠাণ্ডা করে করে মুখে তুলছিল তারই ডাঁটটা দিয়ে টেনে টেনে এনভেলাপের মুখটা খুলে তার ভেতরের চার ভাঁজ করা ইংরেজী নেমন্তন্ন পত্রটা বের করল। পত্রটাও সাদা কাগজে লেখা সাদা পত্র নয়। তার গায়ও অস্পষ্ট রেখায় নিখুঁত হাতের আঁকা ছবির পর ছবি। কোথাও একটি মেয়ে তার সাপের মতো শরীরটায় একটা জোর পাক খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তার ঘাগরার ঘের ঘুরছে সারেঙ্গীবাদক তবলাবাদক আর সমঝদারদের নাক ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কোথাও একটা হাত গালে আর একটা হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে উঁচু পর্দায় তান ধরার ভঙ্গীতে উক্ত দেশী গায়িকা। কোথাও সাঁওতালী নারী-পুরুষের মিলিত গ্রাম্য নৃত্য। আর এই অস্পষ্ট ছবিগুলোর ওপর সামনে এগিয়ে'আসা লেখায় লেখা রয়েছে নেমন্তন্ন-পত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং প্রোগ্রাম।

মঞ্জু অমিতার হাতে চিঠিটা তুলে দিয়ে খাওয়ায় মনোযোগ দিল।

—পড়বো ?

মুখের আদ্দেক পথে চামচেটা থামিয়ে একটু আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে অমিতার দিকে তাকালো মঞ্জু। তারপর চামচেটা মুখে ঢুকিয়ে বললো—ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত চিঠিগুলি বাদ দিয়ে যেও—নইলে একটু—লজ্জা করবে আমার। চিঠিটা একটু রোমাণ্টিক কিনা।

—তবে না হয় থাক না। চিঠিটা বাড়িয়ে ধরল অমিতা মঞ্জুর দিকে। কিন্তু সেই বাড়িয়ে ধরার চিঠিটা মঞ্জুর দিকে যতটা এগুলো তার চাইতে তার কাছেই বেশী রইল।

—থাকবে ? আচ্ছা থাক। না—থাকবারই বা কি আছে। মাঝের পাতার হাতে লেখাটুকু না পড়লেই তো হলো।

কিন্তু চিঠি খুলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চিঠির বাঁ দিকেই সব প্রথম নজর গিয়ে পড়ল অমিতার। হেসে উঠল সে। —বড় তো চিঠি!

—কেন কম হলো কিসে ? দুই ভ্রূ বাঁকিয়ে তুলে মঞ্জু অমিতার দিকে তাকালো।

—'এসো' এই তো একটি কথা—ভদ্রলোক লিখেছেন দেখতে পাচ্ছি।

—আর কি লিখবেন ?

—কিন্তু এটাকে তো রোমাণ্টিক চিঠি বলে না।

—বলে না !

মাথা ঝাঁকালো অমিতা ডাইনে বাঁয়ে—না।

চামচে প্লেটে শব্দ তুলে দূরের ভাত কাছে টেনে আনতে আনতে গম্ভীর কণ্ঠে মঞ্জু বললো—এর চাইতে রোমাণ্টিক চিঠি আর কি হতে পারে ? এই একটিমাত্র কথা 'এসো' কে ভেঙ্গে দশপাতার রোমাণ্টিক চিঠি লেখা যায়। এঁরা কি তা করতে পারেন ? বয়স ব্যক্তি এবং মর্যাদা অনুযায়ী প্রকাশভঙ্গি হবে তো।

চিঠি থেকে চোখ তুলে বড় বড় করে অমিতা তাকালো মঞ্জুর দিকে। এ যে বিরাট ব্যাপার গো! লাঞ্চ পার্টি, ককটেল পার্টি—যাবে নাকি তুমি এ্যাঁ ?

খাওয়া শেষ করে চামচ প্লেট টেবিলের তলায় নামিয়ে রাখল মঞ্জু। জল খেলো পুরো গ্লাস-ভর্তি। তারপর আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে চেয়ার ঠেলে উঠে একেবারে খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ল টান হয়ে চোখ বুজে। আর সে ভাবে বন্ধ চোখেই বললো দেরী আছে। সেপ্টেম্বরের আট তারিখ আসতে বাকী আছে আরো আট নয় দিন। এই শনিবারের পরের শনিবার। ভেবে দেখা যাবে। তুমি ভাই লক্ষীবৌদি, যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যেও। আর অমিতা দরজা বন্ধ করে বারান্দাটুকু পার হয়ে গিয়ে ওর ঘরে ঢুকবার আগেই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ল মঞ্জু।

ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে শরীর গলিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মিনি বেড়ালটা। টেবিলের তলায় নামিয়ে রাখা মঞ্জুর খালি ডিসটা শুঁকল খানিকক্ষণ নাকে, তারপর অন্ধকারপ্রায় ঘরে আয়াস করে টেবিলের উপর শোবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে পায়ের ধাক্কায় রজতের নেমন্তন্ন-চিঠিটা ফেলে দিল টেবিলের নীচে। আর বিকেল বেলা রামুর ঝাঁটার ঠেলায় সে চিঠি গিয়ে পড়ল খাটের নীচে। ধুলো পড়ে চিঠিটার উপর লেখা মঞ্জুর নামটা ঢেকে উঠতে যদিও দু চার দিন সময় লাগল—মঞ্জুর মন হতে সে চিঠির কথা মুছে গেল তক্ষুণি। সেই যে বেলা তিনটায় বৌদির হাতের উপাদেয় জাউ ভাত খেয়ে সে ঘুম দিল সেই ঘুম ভাঙ্গল তার পিসিমার সন্ধ্যা-আরতির কাঁসর-ঘন্টা আর শঙ্খের গম্ভীর শব্দে। চোখ মেলেই প্রথমে মনে হলো এবার উঠে তৈরী হয়ে জয়াদের বাড়ী ওকে একবার যেতেই হবে—যাওয়াটা নিতান্ত দরকার। কিন্তু না চাইল শরীরটা ওর বিছানা ছেড়ে উঠতে না চাইল পা দুটো চলতে। লোকটার সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হওয়া না হওয়ার

উদ্বেগ অশান্তি মনে নিয়েও মঞ্জু পড়ে রইল বিছানায়ই। পাশ বালিশটা জড়িয়ে ধরে এপাশ ওপাশ করতে লাগল আর তারই ভেতর বার বার চোখ গিয়ে পড়তে লাগল ওর ল' কলেজের প্রসপেকটাস পাঠরতা ইজিচেয়ারে উপবিষ্ট মৌরীর দিকে। ওর জাগার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের প্রসপেকটসের উপর থেকে মৌরীর দৃষ্টি যে ওর উপর ঘুরে গেল এবং কপালে আর ভ্রূতে তার অসন্তোষ আর অপছন্দের ঢেউ খেলে গেল, মঞ্জুর লক্ষ্য তা এড়ালো না। অমিতার কাছে সব খবরই শুনেছে। সে—মানে যে মিথ্যেগুলো মঞ্জু বলেছে অমিতাকে। অমিতা বিশ্বাস করেছে, মৌরী করেনি সেটাই মৌরী তার কপালে ভাঁজে, তার ভ্রূর কম্পনে কাঞ্চনে বোঝাল মঞ্জুকে। বুঝল মঞ্জু মৌরীর দিকে তাকিয়ে চোখ দুটোকে মিটমিট করতে লাগল সে। কিছু বলে মৌরীকে ঠাণ্ডা করা দরকার। কিন্তু মৌরী বলে, সত্যটা কি, আমার পক্ষে তা বাড়ী বসে বোঝা সম্ভব নয় কিন্তু মিথ্যাকে মিথ্যা আমি বুঝতে পারি। আমার কাছে মিথ্যে বলবিনে মঞ্জু! আমার ভারি খারাপ লাগে যাদের—ভালোবাসি তাদের মুখে মিথ্যে শুনলে।

কিন্তু সত্য বলবার উপায়টা কি? এখন যদি জয়াদের বাড়ীর ঘটনার সত্য বর্ণনা সে মৌরীর কাছে দেয় তবে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে! সে কি আর বাড়ী ছেড়ে বাইরে এক পা শীগগির বেরুতে পারবে? আতঙ্কে কালো হয়ে মৌরী তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে না। পথে পেলেই লোকটা তার ওপর লাফিয়ে পড়বে এবং ওকে পথে পাওয়ার জন্যই যে গুণ্ডাটা আহার-নিদ্রা ছেড়ে ওত পেতে বসে আছে এই বিশ্বাস থেকে মৌরীকে কেউ হটাতে পারবে। এমন কি বাড়ীর খোঁজ করেও যে সে কেন প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে এসে হাজির হবে না মৌরী তাও বুঝে ওঠতে পারবে না। দুষ্ট লোক শয়তান লোক তো তাই করে। মিথ্যা যে তাই কত সময় উল্টো পক্ষের কথা ভেবেই বলতে হয় মৌরী তা বোঝে না। সে সব মিথ্যাকেই এক জাতে নিয়ে গিয়ে ফেলে এবং মিথ্যা মাত্রকেই একেবারে জাতিচ্যুত করতে চায়। কিন্তু মৌরী স্বীকার করুক আর নাই করুক, মানতে চাক আর নাই চাক মঞ্জুর বিশ্বাস সমাজ সংসার থেকে আরম্ভ করে স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রগুলোকে পর্যন্ত ভাঙন ধরার হাত থেকে—ভেঙে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী এবং মিথ্যার ভিত অনেক বেশী জোরালো সত্যের ভিতের চাইতে।

—হাঁ তা নয় তো কি? আজকের ভালোবাসা ভালোলাগা কাল না-ও থাকতে পারে। কিন্তু মিথ্যা ভালোবাসা—চিরকাল বাসা যায়।

পরের দিন সকাল বেলা ইতিহাসের মোটা মোটা গোটাকয়েক বই নিয়ে অতি মনোযোগের সঙ্গে মঞ্জু পড়তে বসলো। অপর টেবিল থেকে তাকিয়ে একটু বাঁকা হাসল মৌরী।

—হাসলি যে বড়?

—পড়তে বসেছিস দেখে।

—বাঃ পড়তে হবে না? একটা প্রথম শ্রেণীর অনার্স চাই-ই চাই যে।

—কিন্তু আমি তো তোর প্রফেসর নই, তোর পরীক্ষার খাতাও আমার কাছে আসবে না। আমার কাছে বই নিয়ে বসে লাভ কি?

বই ঠেলে রেখে ঘুরে বসল মঞ্জু মৌরীর দিকে।—দেখ দিদি, তুই কেবল সকলের ফাঁকি ধরতে পারিস আর বুঝিস তাই না? আমরা আর পারি নে? তোর দুই চোখের তলায় যে মেঘের রং দিনে দিনে দানা বেঁধে উঠছে সে বুঝি ল' কলেজে ভর্তি হবার চিন্তায়? এই যে সবুর সইছে না—আমি বলেছি এনে দেবো তবু চলে গিয়েছিস প্রসপেকটাস আনতে। বই কিনেছিস পুরোনো দোকান চষে। সকাল হতেই স্নান সেরে তৈরী হয়ে বসে গিয়েছিস পড়তে কিন্তু এখনও ভর্তি হবারই সময় আসে নি—এ বুঝি পাশের চিন্তায়?

—তোর কি মনে হয়?

—ফাঁকি।

—মানে?

—মানে হলো ঐ যে বলেছিলাম, যুক্তি পেছন ফিরলেই মন তার রং তুলির ছবি আঁকার কাজ আরম্ভ করে দেবে। সে এখন তাই দিতে চাচ্ছে আর তুই তাকে বই-পত্তর নিয়ে ধমকে রাখতে চাচ্ছিস। আর মনমতো কাজ—করতে না পারার মনের-মেঘ তোর চোখের দু'কোণ জুড়ে এসে জমছে।

—ঐ ভদ্রলোক কি তোকে উকিল রেখে গেছেন নাকি?

—জাননি। কিন্তু গেলে ভালো করতেন। তবু আমার কাজ আমি করছি—বা তার কাজ আমি বন্ধুর মতো করে রাখছি যতটুকু আমার পক্ষে সম্ভব। সময় যদি আসে ভালো ফিজ আদায় করা যাবে। সুপার কনস্টেলেশনের সিঙ্গিল টিকিট একটি অন্তত আদায় করতেই হবে। আঃ, তার পর কায়রো—জুরিখ—জেনেভা—লণ্ডন ভাবতে পারি নে রে দিদি—কল্পনা করতে পারি নে!

—ভদ্রলোকটিকে যখন তোর এতোই পছন্দ তখন তুই তাকে বিয়ে করে ফেল না? তবেই তোর স্বপ্নও সহজেই সফল হয়ে যায়।

—ইস্ দিদি রে! একেবারেই তোর মুখে মানায় এমন কথা হলো না এটা। সে যাক্ আমার পাত্র ঠিক আছে—আরে ভালো কথা, রজত বাবুর নেমন্তন্নের চিঠিটা বৌদি দেখিয়েছিল তোকে? পাত্র কথাটার সঙ্গে সঙ্গে রজত বাবুর নামটা মনে এলো বলে তুই যেন আবার ভেবে আকুল হোস নে যে তাকেই আমি পাত্র ঠিক করেছি। চিঠিটা ভদ্রলোকের ছবিতে—কাগজে—আহ্বানে মূল্যবান তাই দেখেছিস কি না জিজ্ঞাসা করছিলাম।

—কিন্তু তোর নির্বাচিত ব্যক্তিটির নাম আগে শুনি?

—নাম ঠিকানা কি করে বলি বা কি করেই বা দেখাই বল। ঠিক রয়েছে মনে মনে। মনের ঠিকের সঙ্গে বাস্তব ব্যক্তির সাক্ষাৎ—নাঃ এখনও ঘটেনি।

মনের নির্বাচনকে বিশ্বাস করিস নে। তার মতো অবিশ্বাসী নেই। বাস্তব ভালো লাগার সঙ্গে সঙ্গে সে দিব্য ভালোমানুষের মতো চেহারা পাল্টাতে থাকে। ঐ যে বাস্তব সাক্ষাৎ ঘটেনি কথাটা বলতে গিয়ে একটু থামতে হলো, নাক ঝেড়ে নাঃ বলতে হলো, ঐ ফাঁক দিয়েই একেবারে বিপরীত চেহারার কেউ এসে যাবে যার সঙ্গে মনের নির্বাচিত ব্যক্তির কিছুই মিলতে চাইবে না—সাবধান!

—এমন খোলাখুলি ভাবে নিজের মনের কথাটা বলে দিলি?

—কি বললাম আমার মনের কথা খুলে?

—সুদর্শন বাবুকে ভালো লেগে গেছে।

—যা খুশী তাই বানিয়ে বানিয়ে বলবি!

—তোর মনের নির্বাচনে আস্থা হারানোর জ্ঞানটা সেই কথাই বলে। কিন্তু তোর মনের নির্বাচনে ভুল ছিল না—ভুল করেছিস তুই—এ তোকে আমি বলছি।

মঞ্জু কলেজে বেরুবার মুখে মৌরী জিজ্ঞাসা করল—কোথায় তোর সেই মূল্যবান নেমন্তন্ন-চিঠি? খুঁজে পেলাম না তো! তা দরকার নেই চিঠির। বৌদি বলল, লাঞ্চের আর ককটেল পার্টির নেমন্তন্ন। গিয়ে উপস্থিত হবি না তো? তারিখ কবে?

—তুই যদি রোজ একবার করে না-যাবার কথাটা স্মরণ করিয়ে না দিস তবে যাবো না—কারণ আমার মনেই থাকবে না সে কথা। কিন্তু কেবল মনে করিয়ে দিলে কি করব বলতে পারিনে।

অনার্স ক্লাশটা করেই মঞ্জু গিয়ে উপস্থিত হলো জয়াদের বাড়ী। গিয়ে দেখল সেই এক মহাকাণ্ড! জয়ার মা জয়াকে শোবার ঘরেই ঘড়া ঘড়া জল ঢেলে স্নান করিয়ে তুলে তার চুল মাথা মুছছেন। ঘর থৈ-থৈ করছে জলে। কি ব্যাপার? না, সেই যে মঞ্জু কাল জয়ার কানে মুখ রেখে বলে গেছে, এক পাও ঘর ছেড়ে সে মঞ্জুর সঙ্গে ছাড়া বেরুতে পারবে না—কারু সঙ্গেই না—কোন কারণেই না; সেই কথায় অটল হয়ে বসে আছে জয়া। তাকে শোবার ঘরের দরজার উল্টো পিঠেও মা নিয়ে যেতে পারছেন না। বাধ্য হয়েই মেয়েকে ঘরে স্নান করাচ্ছেন তিনি। মঞ্জু আসবার সময় যখন বুঝিয়ে আসে ঘর থেকে নয়, বাইরের দরজার বাইরে সে যাবে না। তখন জয়া সহজেই বুঝে মাথা নাড়ে কিন্তু পরদিন গিয়ে একই কথা শুনতে হয় তাকে, ঘর থেকে বের করা সম্ভব হয়নি জয়াকে। কিন্তু এ ছাড়া তার চাল-চলন প্রায় স্বাভাবিকই বলা চলে। জয়া পাগল নয় এ যেমন সত্য সে যে সুস্থ নয় তাও তেমনি সত্য। ভালো একটা মানসিক চিকিৎসার দরকার। দরকার তার ভালো খাওয়ার। একটা প্রাইভেট টিউশনির জন্য না বলল এমন বন্ধু নেই—এমন পরিচিত নেই। অমিতার কাছে হাত পাতল। মৌরীর কাছে ধার চাইল। ডান হাতের বালাটা খুলে রেখে দিল পরতে ভালো লাগে না বলে। তারপর একদিন সেটাকে বেরুবার সময় ভরল ব্যাগে।

মৌরী অমিতা নেমন্তন্নের কথা মনে করালো না। মঞ্জুরও পুরো সপ্তাহের ভেতর একবারের জন্য মনে পড়ল না সেই পার্টির কথা বা সবুজ কালীতে মোটা পার্কারের মোটা অক্ষরে লেখা রজতের সেই সাগ্রহ আহ্বান 'এসো'। দিনগুলো যেন ওর মুখে লাগাম পরিয়ে ওকে নিয়ে ছুটে চলল। কিন্তু ঠিক আটই সেপ্টেম্বর সকালবেলা ঘুম ভেঙেই যখন ওর মনে পড়ল আজ আটই সেপ্টেম্বর। আজ রজতের সেই পার্টির দিন—যখন রজতের 'এসো' লেখাটা রজতের চোখের নীরব ডাকের মতো হয়ে ওর সামনে ভেসে উঠল, তখন মঞ্জু সত্যি একটু আশ্চর্য্যই হয়ে গেল। আশ্চর্য্য হলেও না-যাওয়া সম্বন্ধে সে এতই স্থিরনিশ্চয় যে, একবারও সে কথা নিয়ে আর মাথা ঘামালো না। সময়মত স্নান খাওয়া-দাওয়া সেরে, বালিশের তলায় চেপে রাখা দু'দিনের পরা তাঁতের শাড়ীটা পরে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল সে কলেজে। শনিবারের কলেজ। একটার সময় ক্লাশ থেকে বেরিয়ে কলেজ লনে এসে দাঁড়াতেই আবারও ওকে বিস্মিত করে দিয়ে যখন নেমন্তন্ন পত্রের সেই 'এসো' ডাকটা রজতের গলায় ডাক দিল 'এসো মঞ্জু'। আমোদ বোধ করল মঞ্জু। ভারি আশ্চর্য্য তো। নিজের শাড়ী কাপড় জামা জুতো ব্যাগ সব কিছুর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে আনল সে—নাঃ, এর জন্য আবার শাড়ী কাপড়ের কথা ভাবতে হবে নাকি? বেশ যাওয়া যাবে। গেলও।

কিন্তু গিয়ে উপস্থিত হয়ে একটু ভড়কেই গেল যেন সে। অভ্যর্থনারত যে মেয়েটি মিষ্টি হেসে একটি করে লক্ষ্ণৌর ব্রেকপ্রিন্স ছেলেদের কোটের আর মেয়েদের খোঁপায় পরিয়ে দিচ্ছিল, তার হাত মুহূর্তের জন্য থমকে গেল মঞ্জুর কাছে এসে। কিন্তু ঐ মুহূর্ত মাত্রই। তারপরই তেমনি হেসে মঞ্জুর ভেঙে-পড়া খোঁপাটি বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে গুঁজে দিল সে তার মাথায় একটি ছোট্ট গোলাপ। হাতে দিল একটি সুবাসিত সিল্কের রুমাল। এটা বোধ হয় মেয়েদের জন্য বিশেষ উপহার। তারপর হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল প্রবেশ-পথ। সব চাইতে কোণের দিকটা বেছে নিয়ে গিয়ে বসল মঞ্জু। বসে আবার তাকালো মঞ্জু সংবর্ধনারত মেয়েটির দিকে। যেন আঁকা ছবি! লাল সোনা-বুটির বাসন্তী রং বেনারসী শাড়ীর কোচা পদ্মফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে আছে পায়ের কাছে। আঁচল দুলছে মেঝে ছুঁয়ে। লিপষ্টিক রঞ্জিত লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটিতে একটু মিষ্টি হাসি যেন মেপে রেখে দিয়েছে। গায়ের রংটা মিশে গেছে শাড়ীর রংএর সঙ্গে। ছবি—কিন্তু ছবি নয়, তাই ছবির চাইতে সুন্দর লাগছে। কিন্তু শুধু এই একটি মেয়েই তো নয়! মঞ্জু হলঘরের যে দিকে চোখ ফেরাতে লাগল, কেবল ঠিক এই একই রকম ছবি যেন দেখতে লাগল। শুধু শাড়ীর রং আর ব্লাউজের ছাঁটকাটের যা তফাৎ। মেলায় ডালা সাজিয়ে বসবার আগে শিল্পী যেন অতি যত্নে একই রকমের কতকগুলো সুন্দর সুন্দর পুতুল গড়িয়ে নিয়ে এসেছে। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

একটা হোটেলের ভেতর যে কি এলাহি কাণ্ড-কারখানা আছে, মঞ্জু যেন কল্পনা করে উঠতে পারে না। এই একটা করিডোর দিয়ে ঢুকে যেন দিশাহারা হয়ে যেতে হয়। শাহেবাজাদির 'ওপেন এয়ার' রেঁস্তোরা—দেখেই সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল—এর ভেতর আবার এমন একটা রাজকীয় ভোজনকক্ষ এলো কোথা থেকে। বিরাট হলঘরটার চারদিকটা টেবিলে চেয়ারে সাদা টেবিলক্লথের ঢাকনার

র ফুলদানীতে ফুলে সাজানো। মাঝখানটায় মস্ত একটা চত্বর লি। সেখানে দলে দলে সবাই ঘুরছে—কথা বলছে। পরিচিত চ্ছ—পরিচিত করছে। এক পাশে লম্বা লম্বা টেবিলের উপর কত রকমের যে খাবার, তার নামও মঞ্জু জানে না, জানার কথাও নয়। কানটা ফরাসীদেশীয়, কোনটা চৈনিক, কোনটা বা বিলিতি। প্লেট ভূস কাঁটা-চামচে পাঁজা করা সাজানো হয়েছে—বুফে পার্টি। তোল ও খাও—যার যেমন ইচ্ছে আর অভিরুচি।

এখনও খাওয়ার দিকে সাড়া পড়েনি। সবার হাতে হাতে ঘুরছে তরল পানীয়ের গ্লাস। বয়-বাবুর্চি ঘুরছে ছোট ছোট ট্রে-তে ভর্তি গ্লাস নিয়ে। ফুরুচ্ছে আর হাতে তুলে দিচ্ছে। চোখ লাল হয়ে উঠেছে। কারু কারু পা টলছে। মেয়ে-পুরুষ কেউ বাদ যাচ্ছে না। মঞ্জু বার দুই-তিন ভীড়ের ভেতর রজতকে দেখল—হ্যাণ্ডশেক করছে। অতিথিদের সাদরে ভেতরে নিয়ে আসছে। কারুকে বসাচ্ছে। কারু সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। বয়কে ডাকছে। নিজ হাতে গ্লাস তুলে দিচ্ছে। হাসিমুখে আবার আর এক দলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রবেশপথের কাছে গিয়ে সেই অভ্যর্থনারত মেয়েটির পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে। আবার এসে ভেতরে ঢুকছে। দুটি মেয়ে একটা দূরের টেবিলে বসে লেডিস ড্রিঙ্ক নিচ্ছিল আর খাচ্ছিল—খাচ্ছিল আর নিচ্ছিল। মঞ্জু সেদিকেই তাকিয়েছিল এক লক্ষ্যে। কারণ একটি মেয়েকে এর ভেতর সে চেনে অর্থাৎ এক দিন দেখেছে—সেই প্রথম যেদিন রজতকে সে নেমন্তন্ন করতে আসে, সেদিন এই মেয়েটিই এসেছিল। রজত যাকে ড্রয়ার খুলে টাকা দিয়েছিল। একটিই পরিচিত মুখ দেখছিল বলেই হয়ত মঞ্জু সেদিকে তাকিয়েছিল, হঠাৎ দৃষ্টির আকর্ষণেই বোধ হয় পাশের দিকে তাকাল। দেখল, রজত পাশের চেয়ারে বসে ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে আছে। ও তাকাতেই নিজেকে সহজ করে ফেলে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল—কখন এলে ?

বাঁ পিঠের আঁচলটা টেনে ডান কাঁধের উপর দিয়ে নিয়ে আসতে আসতে মঞ্জু বললো—অনেকক্ষণ।

রজতের দিকে তাকালো মঞ্জু। মাথার পাতলা চুল—একটু উসকো-খুসকো। যেন ঝোড়ো বাতাস মাথার উপর দিয়ে বয়ে না গেলেও পাতলা হাওয়ার ঝাপটা এরই ভেতর দু একটা গেছে। চোখ দুটোও সামান্য লাল হয়ে উঠেছে। কাঠ চাঁপা রংএর স্যুট। কোটের বুক থেকে মুখ বাড়িয়ে ব্রেকপ্রিজ যেন রজতকে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করছে—প্রিজ আমি না তুমি ? ঠোঁট দুটো দেখলে মনে হয় এতক্ষণ ভিজে ছিল—এখন শুকিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। তক্ষুণি গ্লাস নামিয়ে রেখে গেল বয়। তাকালো মঞ্জুর দিকে। রজত আদেশ করল—লিমন। বয় ছুটল লিমন আনতে। আর তক্ষুণি এনে নামিয়ে দিয়ে গেল লিমনের গ্লাস।

গ্লাসটা মুখে তুলতে গিয়েও কেন যেন তুলল না রজত। টেবিলে রাখ' গ্লাসটা হাত ধরে রেখে বলল—তুমি এসেছ বলে আমি ভারি খুশী হয়েছি মঞ্জু। আমার কেবল মনে হচ্ছিল তুমি এলে না। আর খারাপ লাগছিল। কলেজ থেকে এসেছ একেবারে ?

নিজের সজ্জার দিকে ফের আর একবার চোখ বুলিয়ে এনে মজা-পাওয়া ভাবে হাসল মঞ্জু। বললো—এইরূপ রং আর সরসতার ভেতর আমাকে একেবারেই মানাচ্ছে না বুঝতে পারছি—উঠব ?

—মানুষের দুর্বলতা নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই মঞ্জু বুঝলে। দাঁড়াও আসছি—বলে কাদের ঢুকতে দেখে যেন রজত তাড়াতাড়ি উঠে গেল। তাদের ভেতরে এনে কারু কারু সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বয়ের হাত থেকে ড্রিঙ্কের গ্লাস তুলে নিয়ে নিজ হাতে ধরে দিতে লাগল রজত।

মদ আর মদ—চোখে আর হাতের গ্লাসে যেন লাল রংএর ঢেউ খেলছে সবার। এর পরই বোধ হয় শুরু হবে লাঞ্চ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল মঞ্জু। এঁরা কোন জগতের মানুষ ? মঞ্জুদের জগতের সঙ্গে এঁদের জগতের মিল আছে কি ? মঞ্জুদের শরীরের রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিল আছে কি মিল আছে কি এঁদের শরীরের রক্ত-মাংসের ? মিল আছে কি সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা, আশা-নিরাশার ? এঁরা কোথায় বাস করে ? কি ভাবে ? কি চায় ? এঁ্যা, এঁদের চাওয়ার বস্তু কি পৃথিবীতে—টাকা ? চাকরী ক্ষমতা ?

চেয়ারে এসে বসল রজত। রাখলাম একা বসিয়ে কতক্ষণ তাই না ? সিগারেট ধরালো সে। কি ভাবছিলে এমন তন্ময় হয়ে ?

—ভাবছিলাম ভাগ্যিস খেলে বড়লোকদের পেট ভরে। ঘরের এমাথা ওমাথা লম্বা টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো খাবারের দিকে তাকিয়ে থেকে জবাব দিল মঞ্জু। তারপর রজতের দিকে চোখ ফিরিয়ে এনে চলে গেল একেবারে অন্য প্রশ্নে। আচ্ছা, ঐ যে মেয়েটি দরজায় সবাইকে ফুল পরাচ্ছে সে মেয়েটি কে ? মঞ্জুর এ প্রশ্নের কারণ আছে। পার্টিটা যখন রজতের তখন তার আত্মীয় কেউ হতে পারে। তাই কিনা সেটাই জানতে চাইল সে। অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল রজত—আমি চিনিনে। টাকার বিনিময়ে এরা এসব কাজ করে।

—আহা, আপনার হাত দিয়ে গেল এ কাজটা! আর একদিন আগে। আপনার সঙ্গে দেখা করলে এ কাজটা আমি পেতে পারতাম ? যদিও চেহারাটা—তা এটুকু খাতির আপনি করতেন না আমাকে ? নিশ্চয়ই করতেন। ইস! একটা মস্ত কাজ হাতছাড়া হয়ে যাবার মতো করুণ মুখ করল মঞ্জু।

তাকিয়ে রইল রজত। এই উঠে যাওয়ার ভেতর আরো দু-এক ঢোক হয়ত খাওয়া হয়ে গেছে তার। চোখ দুটো আর একটু লাল আর একটু স্ফীত হয়ে উঠেছে।

—আচ্ছা, একটু নড়ে চড়ে বসে জিজ্ঞাসা করল মঞ্জু—আপনার কত—কত টাকা খরচ হবে এই পার্টিতে ? অ-নে-ক তাই—না ?

—টাকার অঙ্কটা জানতে চাইছ ?

—বললে শুনতে চাইছি।

—রজত ছাইদানে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। হাজার পাঁচ সাত।

—হাজার পাঁচ সাত! বিস্ময়টা ভেতরে ঠেলে মঞ্জু। তা পাঁচ হাজারও যা সাত হাজারও তো তাই ও একই কথা তো—সেই তো।

যদিও রজত বার বার উঠে গিয়ে সঙ্গ দিয়ে অভ্যর্থনা করে—কথা বলে আপ্যায়ন করে আনতে লাগল তবু দ্বিতীয় দৃষ্টি সকৌতুকে

ঘুরে যেতে লাগল মঞ্জু আর রজতের উপর দিয়ে। চোখে চোখে—জিজ্ঞাসা উঠতে লাগল—এই মেয়েটি কে? রজত মুখের স্বাদ বদলে নিচ্ছে একটু। বিম্বাধর চেপে মন্তব্য করল একটি মেয়ে।

প্লেট কাঁটা চামচের শব্দ উঠল। হাতে হাতে প্লেট নিয়ে যার যার মনমতো খাবার তুলে নিতে লাগল ডিসে। রজত এগিয়ে গিয়ে নিজ হাতে তুলে দিতে লাগল সবার ডিসে এটা ওটা সেটা। তারপর এসে বসল ফের মঞ্জুর কাছে। আর সঙ্গে সঙ্গে বয় এনে রাখল মঞ্জুর কাছে খাবার ডিশ। তোমার পছন্দ আমি জানিনে। আমার পছন্দমতোই তাই নিয়ে এসেছি। দেখো খেয়ে।

—কিন্তু আজ আমার উপোস।

—উপোস? কিসের? হাতের গ্লাস নামিয়ে সোজা হয়ে বসল রজত।

—আজ আমার প্রার্থনার দিন।

—কিসের প্রার্থনা দিন?

—ভগবান! মানুষকে শুভবুদ্ধি দেও। ব্যাগটা তুলে নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল মঞ্জু। ব্যাগটা টেনে নিল রজত।

—বেশ তা করো আর আমার জন্ত না হয় একটু বিশেষ ভাবে আলাদা করে করো। কিন্তু তার জন্ত উপোসের দরকার কি?

—উপোস না করলে প্রার্থনায় জোর ধরে না। ব্যাগটা—

ব্যাগটার জন্য রজতের দিকে হাত বাড়িয়ে একেবারে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো মঞ্জু। আপনাকে আটকে রাখছি—আমারও ভালো লাগছে না আর। আমি এখন যাই?

সেদিন পার্টি শেষে রজতকে তার বন্ধুরা যতই বার বার সাবধান করতে লাগল, রজত খালি পেটে র'ড্রিঙ্ক গুলো আর গলায় ঢেলো না। কৌচে মাথা রেখে জড়িত জিভে রজত ততই এক জবাব লাগল—আজ আমার উপোসের দিন। আমি আজ উপোস করে কেবল প্রার্থনা করবো। [ ক্রমশঃ।

# ফেদারিকো গর্সিয়া লোরকার দুইটি কবিতা

## নার্শীসাস

নার্শীসাস।
তোমার সুবাস।
এবং প্রবাহিত নদীর গভীরতা।

আমি ছিলুম তোমার তীরে।
প্রেমের পুষ্প নার্শীসাস।

ঝিকিমিকি করে তোমার শ্বেত আঁখির ওপর
ছায়া এবং ঘুমন্ত মৎস্য।
পাখি এবং প্রজাপতি অনেকে
রঞ্জিত করে আমায়।

তুমি যত ক্ষুদ্র আমি দীর্ঘ কত।
প্রেমের পুষ্প নার্শীসাস।

ভেকেরা কেমন চঞ্চল!
তারা রাখে না স্থির আয়না
যাতে প্রতিবিম্বিত
তোমার ও আমার অস্থির প্রলাপ।

নার্শীসাস
আমার বেদনা
এবং আমার বেদনার সত্তা।

## সিজিগাস

মা,
আমায় ইচ্ছে আমি হই রূপো।

বাছা,
তুমি যে বড় শীতল হবে।

মা,
আমায় খুশী আমি হই জল।

বাছা,
তুমি যে বড় শীতল হবে।

মা,
আমায় তবে সূতোয় আঁক তোর বালিশে।

এই তো ঠিক,
এতেই হবে।

অনুবাদক—কমলেশ চক্রবর্তী।

# অধস্তন পৃথিবী

[ ১৪৪ পৃষ্ঠার পর ]

হঠাৎ এই সময় পুলিশি দলের সকল উৎসাহ ডুবিয়ে দিয়ে রাড়ী বদমায়েসদের সর্দ্দার বদরী মিয়া চীৎকার করে বলে উঠলো 'এ এ লখমী মা। এ সরোয়তী বিবি। দেখোত না হামোনে রূকড় লে চলি।' এই সময় সর্দ্দারজীর নিকট প্রায় চারশো টাকা য়ার হিস্যা জমা দিল। সময়মত এইগুলি কাউর মারফৎ পাচার রে দিতে পারলে সে এক শান্তশিষ্ট মেষ শাবকের ন্যায় পুলিশের াগে আগেই থানায় এসে হাজির হতো। কিন্তু ঐ টাকা কয়টির নরাপত্তার জন্যে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো।

কথা কয়টিতে জুয়োড়ী সর্দ্দারের যে কোন একটি আবেদন কিংবা সঙ্কেত ছিল তা বুঝতে শাস্ত্রিদলের ক্ষণমাত্রও দেরী হলো না। ক্ষণিকের মধ্যেই আশে-পাশে উপপথ সমূহ হতে বেপরোয়া আধবয়সী বৃদ্ধা ও যুবতী কয়েকটি নারী গাছকোমর বেঁধে ঝাঁটা হাতে ক্ষুদ্র পুলিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুরু হলো সেখানে এক অভূতপূর্ব্ব খণ্ডযুদ্ধ। প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ঝটাপটি ও কামড়াকামড়িও চললো। প্রতিরোধ করতে গিয়ে দুই-একজন শাস্ত্রীকে তাদের হাতে ও ঘাড়ে এদের কেউ কামড়েও দিলে। সহসা পুলিশের নিকট এসে পড়লো এক দারুণ সমস্যা। তারা আসামীদের পাকড়াও করে রাখবে, না তাদের ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করবে! ওদিকে চারি পাশ থেকে শাস্ত্রিদলের উপর সমানে ইষ্টক বর্ষণ সুরু হয়েছে। নিকটে এমন একটি কোঠা বাড়ী নেই যেখানে পিছিয়ে এসে তারা আশ্রয় নিতে পারে। গুণ্ডার দল তাদের এখন নির্ম্মূল করে দিতে বদ্ধপরিকর। শাস্ত্রীদের একটি লোকও জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারলে তাদের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। দূর হতে চিরঞ্জীব বাবু ও তাঁর শাস্ত্রী দল লক্ষ্য করলো যে এক দল লুঙ্গিপরা লোক ছুরী হাতে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অদূরে চিৎপুর রোডের মোড়ে এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটতে দেখে বহু ব্যক্তি জড় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাদের ইচ্ছা থাকলেও এদের হাত হতে পুলিশকে রক্ষা করবার কারুর সাহস ছিল না। ইতিমধ্যে ছুরী হাতে এখানকার বাছা বাছা গুণ্ডাদের এগিয়ে আসতে দেখে জনতার প্রায় প্রতিটি মানুষই ঘটনাস্থল হতে অতি দ্রুত সরে পড়তে আরম্ভ করলো।

এইরূপ সঙ্কট অবস্থায় পড়ে সাধারণতঃ মানুষের স্বভাবতঃই যা চিন্তা আসে পুলিশের দলের লোকেদেরও সেই একই চিন্তা এলো। এঁদের কেউ কেউ তখন চিন্তা করতে সুরু করেছেন, সেই একই অনাদি কালের বিপদতারণ মন্ত্র। ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন বা না করুন সেই ঈশ্বরের কথাই তাঁদের এই আপৎ কালে প্রথম মনে পড়লে। এমন সময় উৎফুল্ল হয়ে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে কার একটা প্রাইভেট লরী পাকড়াও করে একদল সশস্ত্র বাহিনী সহ থানার সেকেণ্ড অফিসার প্রণববাবু ঘটনা স্থলে এসে গিয়েছেন। এই দলের আগে আগে ধুতিকুর্তা দরিদ্র শ্রমিক আত্মারাম এই সশস্ত্র বাহিনীকে পথ দেখিয়ে আনছিল। কখন যে এই ডামাডোলের মধ্যে আসামী আত্মারাম মুক্তিলাভ করে থানায় ছুটে গিয়ে পুলিশের বিপদের কথা সেখানে জানিয়ে এসেছে তা এতোক্ষণ পুলিশ পুঙ্গব চিরঞ্জীববাবু বা তাঁর শাস্ত্রিদলের কেউ জানতেও পারেন নি।' কিন্তু এ জন্য তাকে কৃতজ্ঞতা জানবার তাঁদের সময় কোথায়? এখোন তাঁদের প্রথম কর্ত্তব্য হলো ঐ সকল দুর্দ্দান্ত খুনে গুণ্ডা বদমাসদের খুঁজে বার করে এখুনি তাদের শায়েস্তা করা। কিছুটা প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছাও যে তাদের মনে জাগে নি তা'ও নয়। দেখতে দেখতে শাস্ত্রিদল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আশে পাশে বাড়ীগুলির ভিতর নির্ব্বিচারে প্রবেশ করে হামলা সুরু করে দিল। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বাস্তগুলির কক্ষে কক্ষে কয়েকটি ঘোমটা পরা সলজ্জা নারী ব্যতীত আর কারুর সন্ধানই তারা সেখানে পেলেন না—পরিশেষে দেখা গেলো যে এক আত্মারাম ছাড়া তাঁদের আর কোনও আসামীই সেখানে উপস্থিত নেই।

'এতো বড়ো একটা ঘটনা ঘটে গেলো', চিন্তিত মনে প্রণব বাবু বললেন, 'এতোগুলো সিপাহী শাস্ত্রী জখম হলো! এমন কি খোদ চিরঞ্জীব বাবুর মুখে পর্য্যন্ত এরা ঝাঁটার কাটা ফুটিয়ে রক্তপাত করে দিলে। এই অবস্থায় শুধু হাতে তো থানায় ফিরে যাওয়া যায় না। উঁহু এখান থেকে এখুনিই কিছু শাসনতান্ত্রিক এরেষ্ট করা দরকার। নির্ব্বিচারে ধরপাকড় করে এখানে একটা প্যানিক করে না দিলে এখানকার বদমায়েসদের বুক ফুলে যাবে। এর ফলে এইরূপ অঘটন এখানে বারে বারে সঙ্ঘটন হতে পারে। এই অবস্থায় সাধারণ শাস্ত্রীরা স্বল্পসংখ্যায় এখানে পাহারা দিতে পর্য্যন্ত ভয় পেতে পারে। না না, চিরঞ্জীব বাবু! আপনার মুখে নোংরা ঝাঁটার কাঁটা ফুটে গিয়েছে, দেরী করলে টিটেনাস রোগাক্রান্ত হয়ে মারা পর্য্যন্ত পেতে পারেন। এখুনি আপনার হাসপাতালে গিয়ে ইনজেক্সন নেওয়া যে দরকার, তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনাকে আরও একটু আটকে রাখবো। আসুন, সকলে মিলে এখান-ওখান থেকে জোয়ান জোয়ান দেখে কয়েকজন করে লোক পাকড়াও করে আনি।

অপরাধীদের তো কাউকেই এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি না; রুমাল দিয়ে মুখ হতে ঝরে পড়া রক্তের কয়েকটা ফোঁটা পুঁছে ফেলে চিরঞ্জীব বাবু উত্তর দিলেন, এখোন কয়েকটা নির্দ্দোষী লোককে ধরে নিয়ে গেলে কি কোন সমস্যার সমাধান হবে?

না, তা যে একেবারে হবে না তা নয়। প্রকৃত দোষীরা তো বুঝবে না যে কে দোষী এবং কে বা নির্দ্দোষী। তাই কয়েকজন নির্দ্দোষীদের ধরা পড়তে দেখে দোষীরাও নিশ্চিত রূপে ভীত হয়ে পড়বে। তারা বুঝবে যে তা'হলে পুলিশ একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে নেই। এই ভাবে হায়রান হওয়ার পরে এই সকল নির্দ্দোষীরা নিজেদের সংগঠিত করে ঐ সকল বদমায়েসদের ভবিষ্যতে বাধা দান করবে। এদের মধ্যে যারা ভীতু প্রকৃতির তারা অবশ্য কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাইবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা নিজেদের স্বার্থেই গোপনে থানায় এদের সম্বন্ধে খবর দিয়ে আসবে। এরা শুধু বদমায়েস খুনে গুণ্ডাদেরই ভয় করে চলে। এখন থেকে এরা পুলিশকেও ভয় করবে। এরা যখন বুঝবে যে রামে মারলেও মেরেছে আর রাবণে মারলে তারা মরেছে; তখন তারা স্বভাবতঃই রামের পক্ষ অবলম্বন করতে বাধ্য হবে। থাক, ও-সব কথা, এতো দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে পুলিশের কাজ করা চলে না। তাছাড়া এ অঞ্চলে একটি মাত্র ভালো লোকও আছে ব'লে তো আমার মনে হয় না। প্রকৃত পক্ষে এই বিষয়ে এরা দোষী না হলেও অন্য আর এক বিষয়ে এরা

দোষী; এদের মধ্যে দুই-এক জন নির্দোষী থাকলেও দোষীদের প্রতি এরা সকল সময়েই সহানুভূতিশীল—তা না হলে এই অঞ্চল থেকে বাস উঠিয়ে এরা অন্যত্র চলে যেতো। আসুন, আসুন আর দেরী করবেন না। আরও একবার ঐ বস্তীগুলির ভেতর ঢুকে এদের ধরতে চেষ্টা করা যাক। আইয়ে ভাই জোয়ান লোক, তুরন জলদী—

প্রণব বাবুর হুকুম পাওয়া মাত্র সিপাহীদের দল ছুটাছুটি করে আশে-পাশের কক্ষগুলি হ'তে এবং পানের দোকান হতে নির্বিচারে প্রায় বিশ জন লোককে পাকড়াও করে রাস্তার উপর এক রকম গরু-ভেড়ার মতই জড় করলো। পুলিশের এই আকস্মিক তৎপরতায় হতভম্ব হয়ে গিয়ে তারা সামান্য প্রতিবাদ করতেও সাহসী হয় নি। এ ছাড়া এই আকস্মিক রাউণ্ড আপের ফলে এদের সাত-আট জনের পকেট থেকে বে-আইনি চরস, গাঁজা ও অহিফেনের পুরিয়াও পাওয়া গিয়াছে। এদের একজনের পেটের কাপড় হতে আবার একটি সিঁদকাটিও বেরিয়ে পড়লো।

এই সকল বেআইনী দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি এই সকল হতভাগ্যদের হেপাজত থেকে উদ্ধার করতে পারায় প্রণব বাবুর মত চিরঞ্জীব বাবুও খুশী হয়ে পড়েছিলেন। যাক তা হলে কয়েকজন প্রকৃত বদমায়েসও ধরা পড়েছে। থানায় নিয়ে গিয়ে বাছাই করে এদের মধ্যে যদি সত্যই কেউ নির্দোষী থাকে, তাহলে তাদের না হয় মুক্তি দেওয়া যাবে। তবে এজন্য যদি তাদের কিছু হায়রাণি হয়ে থাকে তো তার জন্য দায়ী তাদের ভাগ্য। ভাগ্যের তারতম্য এই পৃথিবীতে না থাকলে মানুষ হয়েও কেউ গরীব। কেউ ধনী, কেউ সাধু, কেউ বা চোর হয়ে উঠে কেন? দেশে দেশে এমন বহু মানুষ আছেন, যারা ধনী-নির্ধনীকে একীভূত করার দাবী করে থাকেন। কিন্তু তারাও কি কোনও দিন পুলিশ, সাধু ও চোরকে একত্রিত করবার চিন্তাও করতে পেরেছেন? এই একটিমাত্র উদাহরণ দ্বারা ঐ সকল নির্বোধ মানুষদের সকল যুক্তি খণ্ডন করে দেওয়া যায়। এই একই প্রকার চিন্তা প্রণব ও চিরঞ্জীব বাবুর মনে অলক্ষ্যে উদয় হয়ে তাদের মনের সকল দ্বিধা নিমেষে বিদূরিত হয়ে গেল। অবশ্য তাদের পেশাগত অভ্যাসও যে এ বিষয়ে তাদের বিশেষ রূপে সাহায্য না করেছে, তাও নয়। কিন্তু এই নিশ্চিন্ততার মধ্যেও তাদের মধ্যে অপর একটি দুশ্চিন্তা এসে উপস্থিত হলো। কারণ এই সময় তাদের উপকারী বন্ধু আত্মারাম ব্যতীত স্থানের মূল ঘটনার প্রকৃত আসামীদের আর একজনও সেখানে উপস্থিত ছিল না। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তাঁরা ও ব্যাপারে কৈফিয়ৎ দেবেন কি?

'তা' হলে প্রণব বাবু, এইবার দ্বিধাগ্রস্ত মনে চিরঞ্জীব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, এই আত্মারামকে নিয়ে এখন কি করবেন। আসামীকে একবার ধরে তো বে-আইনী ভাবে আর ছেড়ে দেওয়া যায় না। অন্তত: বে-আইনী জুয়া খেলার জন্যও তার নামে একটা কেস তো লিখতেই হবে। শুধু তাই না, তাকে আদালতে সোপর্দ্দও করে জরীমানা করিয়েও আনতে হবে। আমার কিন্তু স্যার এজন্য বড়ো লজ্জা করছে। এই ভাবে আমাদের উপকারে প্রত্যুপকার করতে দেখে ও নিশ্চই অবাক হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, আখেরে মুক্তি পেয়ে আমাদের প্রত্যুপকারের প্রণালী সম্বন্ধে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করে দিয়ে তাদের কেমন আমাদের উপর আরও বিষিয়ে তুলবে। কিন্তু ও কোনও দিনিই বুঝবে না যে আমরা এই বিষয়ে ওর চেয়েও অনেক বেশী অসহায়। এ'কথা স্বীকার্য্য আমরা মানুষের উপকারার্থে তাদের বিষফোঁড়ার উপর অস্ত্রোপচার করে থাকি। কিন্তু সেই ক্ষতে প্রলেপ অর্পণ করে কি ভাবে ঐ ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হয়, তা আমরা জানি না। আমার মতে এই জন্যই প্রাচ্যটী দেশেই সাধারণ মানুষ পুলিশের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও কোনও দিনই পুলিশের উপস্থিতি তারা পছন্দ করে নি। না, না, স্যার। আত্মারামের প্রতি আমাদের এইরূপ ব্যবহার শুধু অবিচার নয়, অনাচারও বটে। বরং স্যার ভেবে দেখুন, ওকে কোনও রূপে পুরস্কৃত করা যায় কি'না।

'আমাদের জীবন এই ভাবে রক্ষা করার জন্য ওকে পুরস্কার দেওয়ার কথা বলছেন? ওসব বিষয় অবশ্য পরে ভেবে দেখা যেতে পারে', আত্মারামের প্রতি একটু সলজ্জ দৃষ্টি হেনে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, 'কিন্তু মনে রাখবেন যে এই ন্যায় অন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচারের ভার রাষ্ট্র আমাদের উপর অর্পণ করে নি। এই জন্য এই ব্যাপারে আমাদের কোনও দায়িত্বও নেই। তা'ছাড়া আমরা একটি সুবৃহৎ গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যে বাস করে থাকে। এখানে ম্যজোরিটির স্বার্থের জন্য মাইনরটির স্বার্থ তো প্রতিদিনই বলি দেওয়া হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সব দেশের আইন সমূহও এই ভাবে প্রণীত হয়েছে। আর আমরা হচ্ছি এই সব নির্মম আইনের ক্রীতদাস। তবে আমাদের করণীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের ঔচিত্য সম্বন্ধে যদি মনের মধ্যে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় তাহলে উহা আমাদের মনের দিক থেকে নিশ্চয়ই ক্ষতিকর হবে। এমন কি দেশের সৈন্যরা কিংবা শান্ত্রিদল ঐ রূপ দ্বিধাযুক্তমনে অধিকারী হলে রাষ্ট্রবিশেষেরও অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে।

উভয় অফিসারের এমনি কথোপকথনের মধ্যে আরও কিছুটা সময় অতিবাহিত হলো। যে কটি সিপাহী শান্ত্রীর দল স্ব স্ব জমাদারদের নেতৃত্বে বস্তীর অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল তারাও একে একে ফিরে এলো। কোনও দল এলো মুখ চুপ করে একান্ত রূপে রিক্ত হস্তে কোনও বস্তীবাসীকে আসামী রূপে সঙ্গে না নিয়ে। কোনও দল দুই একজন অনুরূপ হতভাগ্য বস্তীবাসীকে পাকড়াও করেও এনেছে। এইবার আসামীসহ শান্ত্রিদল থানার দিকে যাত্রা করবে বুঝে দরিদ্র আত্মারাম চিরঞ্জীব বাবুকে জিজ্ঞাসা করলো, 'হামরা উপর কেয়া হুকুম বাবু সাব।'

চিরঞ্জীব কৃতজ্ঞতা সূচক দৃষ্টিতে আসামী আত্মারামের দিকে একবার তাকালো মাত্র। তাঁর অভিমত সে ইতিপূর্ব্বেই প্রণব বাবুকে জানিয়ে দিয়েছে। এইখানে সিনিয়র অফিসার বিধায় প্রণব বাবুই পুলিশ দলের নেতা। চিরঞ্জীব বাবু প্রণব বাবুর মতই একজন শিক্ষিত মানুষ হলেও এইখানে তাঁর কোনও মতামত প্রকাশ করবার কোনও অধিকারই নেই। তাই চিরঞ্জীব বাবু নিঃশব্দে আত্মারামকে অঙ্গুলী হেলনে প্রণব বাবুকে দেখিয়ে দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরালো।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আবছায়া সারা বস্তীটিকে ঢেকে দিয়েছে। এই সুযোগে বদমায়েসরা শান্ত্রিদলকে পুনরায় আক্রমণ করতে পারে। তাই আর দেরী না করে শান্ত্রিদল তাড়াতাড়ি থানার দিকে ফিরে চললো। [ক্রমশঃ।

## শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[ কলিকাতার নব-নির্ব্বাচিত পৌরপাল ]

কলিকাতা করপোরেশনের কার্য্যকলাপ পরিচালনার ব্যাপারে আমি দলগত রাজনীতির ঊর্দ্ধে থাকব এবং করপোরেশনের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলির চেয়ে নাগরিকদের সেবা করার ব্যাপারেই যাতে কাউন্সিলারদের দৃষ্টি বেশী নিবদ্ধ থাকে সেজন্ত সকলের নিকট আমি আবেদন করছি, কয়েক দিন পূর্ব্বে এই কথাগুলি বলেন—নব-নির্ব্বাচিত মেয়র শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

সে যুগের বিখ্যাত নাগরিক কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের কমিশনার কাউন্সিলার এবং আলীপুর বারের সভাপতি স্বর্গত রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র বিজয়কুমার কলকাতায় ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের আদি নিবাস জীরাট বলাগড়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবার নাম স্বর্গীয় সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মায়ের নাম দেবরাণী দেবী।

বিজয়কুমার ১৯২০ সালে সাউথ সুবারবন (মেন) স্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯২৪ সালে সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি-এ ও ১৯২৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরের বছর তাঁর পিতামহদেবের সহকারী হিসাবে আলীপুর কোর্টে যোগদান করেন। ১৯৩১ সালে তিনি ডাঃ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী সুজাতা দেবীকে বিবাহ করেন। সহাধ্যায়ীদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিচারপতি মল্লিক বীরেন্দ্রকিশোর রায় প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র হিসাবে ১৯২১ সালে বিজয়কুমার অসহযোগ আন্দোলনে জড়িত হন এবং কিছু কাল পড়াশুনা বন্ধ রাখেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মনোনয়নে ১৯৪০ সালে তিনি করপোরেশনের নির্ব্বাচনে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ব্যারিষ্টার বি, সি চ্যাটার্জ্জিকে পরাজিত করে প্রথম কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪৪ সালেও কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে তিনি শ্রীরণদেব চৌধুরীকে পরাজিত করে আবার পৌরসদস্য হন। বিগত উনিশ বছর যাবৎ তিনি পৌরসভার বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য বা চেয়ারম্যান হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তার মধ্যে ১৯৫৩-৫৭ সাল পর্য্যন্ত জল সরবরাহ কমিটির সভাপতি হিসাবে লরী সহযোগে বস্তীতে জলসরবরাহ ও গভীর স্তরে নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্যাবলী তাঁর কর্ম কৃতিত্বের নিদর্শন। বিল্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁর দ্বারা বকেয়া প্ল্যানসমূহ সত্বর কার্য্যকরী করা ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিল্ডিং সার্ভেয়ার নিয়োগ—সকলের সমর্থন লাভ করে।

১৯৫৬ সালে এক সভায় তিনি দৃঢ়ভাবে 'বাংলা-বিহার একত্রীকরণ' প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন। কংগ্রেস দলভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রস্তাবটি সমর্থন না করার কারণস্বরূপ তিনি বলেছিলেন, "I owe my allegiance to God and people and not to party when matter of public interest comes." ১৯৫৪ সালে কলিকাতা করপোরেশনের কয়লা সরবরাহ চুক্তির বিষয়টি তিনি নতুন রূপে সম্পাদন করেন।

বর্ত্তমানে তিনি নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান, কালীঘাট মন্দির সমিতি, ক'লকাতা পোর্ট কমিশনার্স ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন। নিজে খেলাধূলা না

করলেও বিভিন্ন ক্রীড়ানুষ্ঠানে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়মিত দেখতে পাওয়া যায়।

ভবানীপুর উপ-নির্ব্বাচনে (বিধান সভা) শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নিকট তিনি পরাজয় বরণ করেন। কেন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—এই কথার উত্তরে তিনি বলেন যে, কংগ্রেসসেবী হিসাবে এই তাঁর কর্ত্তব্য ছিল।

তিনি জানান যে, ক'লকাতা পৌরসভার আর্থিক ও আইনসংক্রান্ত প্রশ্নে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পরামর্শদাতা ছিলেন—তাঁর পূজনীয় পিতামহ। চল্লিশ বছর ধরে এর সঙ্গে জড়িত থাকাকালীন তিনি Estates, Finance ও General Purposes Committee-গুলির বহু সংস্কার করেন। বর্ত্তমান বালীগঞ্জ এলাকা তাঁরই দূরদর্শিতায় উন্নত হয় ও Mackenzie Act এ পৌরসভার ক্ষমতা সঙ্কোচনে অন্যান্যের সঙ্গে পদত্যাগে 'সাবাস আটাশ'এর অন্যতমরূপে পরিগণিত হন। আগেই বলেছি, বিজয়কুমার বহুদিন পিতামহের প্রধান সহকারী হিসাবে কাজ করেন এবং করপোরেশনে প্রতিটি সভায় দর্শক হিসাবে উপস্থিত থেকে "Dignity of Chair" সম্বন্ধে
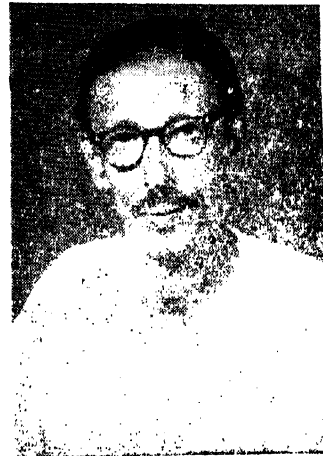
শ্রীবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্যক জ্ঞানলাভ করেন। এই জন্যই আশা করা যায় যে, চারিত্রিক সততায়, দৃঢ় মননশীলতায়, পৌরসভার অভিজ্ঞ সদস্য হিসাবে ও মানবদরদীরূপে তাঁর পৌরপালের আসনে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন কার্য্যকলাপ এক স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যেতে পারবে।

## শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও ভারতের বিশিষ্ট আইনজ্ঞ]

মানুষের জীবনের সাফল্যের জন্য প্রথমেই যেটি চাই সে হচ্ছে উদ্যম ও অধ্যবসায়। এ দুটি মূলধন থাকলে যত প্রতিকূল অবস্থাই থাকুক মানুষকে পিছিয়ে দিতে পারে না। সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে সম্ভব হয়ে উঠে তার নিশ্চিত উন্নতি ও অগ্রগতি। এর জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ও পাটনা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনে। বাঙ্গালী-মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ ক'রে নিজের উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বলে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্ত্তমান কালে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় প্রবাসী বাঙ্গালী বাংলার বাইরে থেকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেছেন বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর সুমিষ্ট ব্যবহার, ন্যায়পরায়ণতা ও সততার জন্যে তিনি সর্ব্বশ্রেণীর জনমানবের মধ্যে একটা বিশিষ্ট আসন লাভ করেছেন। বাংলার বাইরে বাঙ্গালীর শারীরিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহশীল। তাঁর মতে বাঙ্গালীসমাজের ঐক্য সাধনই হচ্ছে বাঙ্গালীজাতির উন্নতির শ্রেষ্ঠ সোপান। সৎভাবে জীবন-যাপন এবং ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারাই পৃথিবীতে মহৎ কার্য্য সাধিত হয় বলে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুস্পষ্ট অভিমত। বর্ত্তমান ক্ষয়িষ্ণু বাঙ্গালী জাতি যদি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে, তা হ'লে বাঙ্গালী তাদের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধার ক'রতে নিশ্চয়ই সমর্থ হবে।

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরব কালীকুমার জন্মগ্রহণ করেন কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে শাঁখারীপাড়া রোডে ১৮৯৭ সালে। রাঁচী জিলা স্কুল থেকে ১৯১৩ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর চলে যান হাজারীবাগে এবং সেন্ট কলম্বস কলেজ থেকে একে একে, আই, এ ও বি, এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হলেন এসে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইতিহাসে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সসম্মানে। তারপর ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ থেকে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুর বৃত্তিলাভ করেন। তারপর তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশের গোড়ার দিকে তিনি আইন ব্যবসা না করে যাতে অন্য কিছু করেন, সেজন্যে প্রায় দেড় বৎসরকাল পড়াশুনো বন্ধ রাখেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের ভাষাতেই বলা যায় আমাদের পরিবারের সকলেই আইন ব্যবসায়ী, এজন্যে আমি স্থির করলুম যে আমি আইন পরীক্ষা দোব না। এজন্য প্রায় দেড় বৎসর পড়াশুনো বন্ধ রেখে ব্যবসা করতে থাকি।

কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে যিনি একজন কৃতী আইন ব্যবসায়ী ও আইনবিদ্ হবেন এবং হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করবেন, খুব বেশীদিন তিনি অন্য কোন ব্যবসায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারলেন না। তাই ১৯২২ সালে তাঁকে পুনরায় আইন পরীক্ষা দিতে হল এবং কৃতিত্বের সঙ্গে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুরস্কার লাভ করলেন।

এবারে তিনি সত্যিকারের আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হলেন, প্রথমে রাঁচীতে উকিল হয়ে আইন ব্যবসা আরম্ভ করলেন। এ হলো ১৯২২-২৩ সালের কথা। কিন্তু এখানকার সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে না। ব্যাপক কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য তিনি ১৯৩০ সালে এডভোকেট হিসেবে যোগদান করলেন পাটনা হাইকোর্টে। এডভোকেট হিসেবে তিনি বহু প্রখ্যাত আইনবিদের জুনিয়ার হিসাবে কাজ করেছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার সার আলি ইমাম, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, শ্রী কে, সি, দত্ত, সুশীলমাধব মল্লিক প্রমুখ প্রখ্যাত আইনবিদদের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বহু প্রসিদ্ধ মামলা পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে মতিহারী ষড়যন্ত্র মামলা, চাইবাসা তহবিল তছরূপ মামলা প্রভৃতি কয়েকটি মামলার নাম এখানে করা যেতে পারে।

১৯৪৩ সালে সরকার স্থির করেন যে, হাইকোর্টের আইন ব্যবসায়ীদের মধ্য থেকে জেলা জজ নিযুক্ত করা হবে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলাতেই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এ জন্য সরকার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে উক্ত বছরই প্রথমে মজঃফরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ নিযুক্ত করেন। ১৯৪৩ সালে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি একে একে মজঃফরপুর, ভাগলপুর, গয়া এবং পাটনা জেলায় কৃতিত্বের সঙ্গে জেলা ও দায়রা জজের কাজ করেন। তার পর তিনি বিহার সরকারের আইন পরামর্শদাতা (লিগেল রিমেমব্রেন্সার), বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারী, ব্যবস্থা পরিষদের সেক্রেটারী প্রভৃতি বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে সুনামের সঙ্গে কাজ করে ১৯৫২ সালে পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি সুনামের সঙ্গে পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করে উক্ত বছর জুলাই মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

বিচারপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও ভারত সরকার তাঁকে অবসর দিলেন না। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে ভারত সরকার নির্ব্বাচন ট্রাইব্যুনালের একক জজ নিযুক্ত করলেন। ট্রাইব্যুনালের জজ হিসেবে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদ্বয় শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং ডাঃ কেশকারের মামলা ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ প্রমুখ প্রায় ৩০ জন মন্ত্রীর নির্ব্বাচন মামলা করেন।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করলেও বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বকালীন উন্নতির জন্যে তিনি এখনও সচেষ্ট।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন ক্রীড়ামোদী, ছাত্রজীবনে লাঠি ও ছোরা খেলা ও অন্যান্য খেলা-ধূলাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ব্যায়ামাগার শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টাতেই প্রথমে তৈয়ারী হয়। তিনি ছিলেন তখন ছাত্র। স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যেই তিনি একাজে সাফল্য অর্জন করেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রসিদ্ধ টেনিস খেলোয়াড়, এখনও তিনি টেনিস খেলায়

অংশ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় লেখক হিসেবেও সুপরিচিত। তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করে সুনাম অর্জ্জন করেছেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পরলোকগত সত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আমরা এই নিরহঙ্কারী বন্ধুবৎসল, সুদর্শন এবং সর্ব্বোপরি বাঙ্গালীর দরদী বন্ধুর দীর্ঘজীবন কামনা করি। তিনি আরও বহুদিন বেঁচে থেকে বাঙ্গালী জাতির উন্নতি বিধান করুন এই কামনাই করি।

## ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

[ রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক-অধ্যাপক ]

প্রতিকূল অবস্থা, নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি ও সাংসারিক বিপর্যয় যে অকৃত্রিম সাহিত্য-সাধনাকে কোনমতে ছিন্নভিন্ন করতে পারে না—একনিষ্ঠ, আদর্শবান, নিরলস সাহিত্য-সেবক ও বর্ত্তমান বর্ষের রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' রচয়িতা অধ্যাপক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের জীবনেতিহাস আলোচনা করলে এই কথাই বার বার মনে পড়ে।

নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার হরিনারায়ণপুর গ্রামে ১৩০৬ সালে ডক্টর ভট্টাচার্য্য এক বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃদেব স্বর্গত রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ছিলেন বংশের প্রথম ইংরাজী শিক্ষিত সন্তান। জ্যাঠামশাই ছিলেন বিখ্যাত স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত কালিদাস তর্কভূষণ। বাড়ীতে নিয়মিত পূজা পার্ব্বণাদি ছাড়াও বহু পণ্ডিতের সমাবেশ ও যাত্রা, কবিগান, পাঁচালী পাঠ, কথকতার অনুষ্ঠান হত আর বালক উপেন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত শুনতেন সবই।

গ্রামের বিদ্যালয় থেকে ১৯১৬ সালে প্রবেশিকা, পাবনা কলেজ থেকে ১৯১৮ সালে আই, এ, ও ইংরেজী অনার্স সহ রাজসাহী সরকারী কলেজ থেকে ১৯২০ সালে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই সময় বাবার মৃত্যু, সাংসারিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থাভাব উপেন্দ্রনাথকে কর্ম্মসংগ্রহে নিয়োজিত করে। বাইশ বছর বয়সে তিনি হলেন এক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষকতার দিকে ঝুঁকে পড়লেন—১৭।১৮ বছর পরে কুষ্টিয়া মহকুমা হাইস্কুলের প্রধানের পদ গ্রহণ করলেন। যদিও ১৯২৩ সালে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ, পাশ করেন, তবুও ছাত্র বয়সে মার কাছে শোনা রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতির গ্রন্থাদি এবং তাঁর অন্যতম শিক্ষক ও বাংলাদেশের বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন রায়ের নিকট জাতীয়তাবাদ ও বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসাস্বাদন উপেন্দ্রনাথকে বাংলাভাষার ও সাহিত্যের গভীরতায় প্রবেশের জন্য উন্মুখ করে তোলে। সেইজন্য ১৯৩৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, টি, পাশ করার পরের বছর তিনি বাংলা সাহিত্যে এম, এ, পাশ করেন। যতীন্দ্রমোহনের উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালবাসার দরুণ তিনি লোকান্তরিত নেতার একটি জীবনকথা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

১৯৪৩ সালে উপেন্দ্রনাথ মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক হন—১৯৪৬ সালে তিনি কলিকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে যোগদান করেন এবং বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতার জয়পুরিয়া কলেজে অধ্যাপনায় রত।

বিদ্যালয়ের দ্রুত পাঠ্য হিসাবে তাঁর লেখা "বঙ্গের বীরসন্তান" যথোচিত উচ্চ প্রশংসিত হয়।

তাঁর জীবনে রবীন্দ্র সাহিত্যের যে অসামান্য প্রভাব বিদ্যমান তার সাক্ষ্য দিচ্ছে তাঁর লেখনী। রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র সম্পর্কিত একাধিক বহুল সমাদৃত গ্রন্থ তাঁর সারগর্ভ লেখনী থেকে জন্ম নিয়েছে। যথা রবীন্দ্র কাব্যপরিক্রমা এবং রবীন্দ্র নাট্য পরিক্রমা এবং শীঘ্রই প্রকাশিত হবে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও উপন্যাসের উপর সমালোচনা ও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও পত্রসাহিত্যের উপর আলোচনা।

১৯৩৭ সালে ডক্টর ভট্টাচার্য্য প্রথম বাউল সম্প্রদায় ও বাউল সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন। কুষ্টিয়ায় শিক্ষকতা করার সময় তিনি মুসলমান বাউল খোদাবক্স ফকির ও চাঁকসা ফকিরের কাছে প্রথম অনুপ্রেরণা ও এই সম্প্রদায়ের তথ্যাদি অবগত হন। হিন্দু বাউলের মধ্যে নবদ্বীপ সম্প্রদায় এঁকে অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৪০ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় শিলাইদহতে নিখিলবঙ্গ পল্লীসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে চার দিন কেবলমাত্র বাউল সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ায় বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। উপেন্দ্রনাথ ৮।১০ বৎসর ব্যাপী বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করে বাউলদের আখড়া ও গৃহে অতিথি হয়েছেন—তাঁহারাও এসেছেন তাঁর গৃহে—আর এই ভাবেই গড়ে উঠেছে এক অখণ্ড আত্মীয়তা। মতামত জানার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে তাঁকে বাউলদের কাছে—তার ফলস্বরূপ তিনি বাউল ও বাউল-সঙ্গীত জেনেছেন বিশদভাবে। বঙ্গ বিভাগের পর তাঁর লক্ষ্য হল এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম-শাখার সাহিত্য রক্ষা ও সাধনার পরিচয় প্রদান। প্রায় পনের শত বাউল গান সংগ্রহ করেছেন—তার মধ্যে পাঁচ শ'রও বেশী গান তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "বাংলার বাউল ও বাউল গান" এ সন্নিবেশিত হয়েছে।

অক্লান্ত শ্রম ও আন্তরিক নিষ্ঠাসহকারে রচিত এই গ্রন্থটিই

ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৮ সালে তিনি যুগপৎ ভাবে সম্মানিত হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়দত্ত ডি লিট ও ভারত সরকারদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির দ্বারা।

উপেন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনায় সবচেয়ে বড় উৎসাহদাত্রী তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী পাবনার রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট আইনজীবী সীতানাথ অধিকারীর মেয়ে শ্রীমতী কিরণপ্রভা দেবী।

## শ্রীমতী রাণী ঘোষ

( গোখেল মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা )

শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাদান যে কত মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারে, তা আজীবন শিক্ষাব্রতী, চিরকুমারী ডক্টর আশালতা সোদামিনী ওরফে রাণী ঘোষের সঙ্গে পরিচয়ে জানতে পারা যায়। ঠাকুরদাদা ও বিশিষ্ট মিশনারী রেভারেণ্ড এন্ড্রু হার্ড এই উভয়ের স্মৃতি বিজড়িত তাঁর নামকরণ। ১৮৯৯ সালের ২০শে মে শ্রীমতী ঘোষ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ৺মন্মথনাথ ঘোষ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসাবে আসাম ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেন। মাতা ৺হেমলতা দেবী ছিলেন শ্রীহট্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ৺জয়গোবিন্দ সোমের কন্যা। ঋষি বঙ্কিমের সহপাঠী ব্যাজরা-খলগুনী গ্রামের ( হুগলী ) ৺শ্যামাচরণ ঘোষ অল্পবয়সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করায় আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক অনাদৃত হন কিন্তু তাঁহার দৃঢ়চেতা সহধর্ম্মিনী ৺অভয়কালী দেবীর কৃতিত্বেই প্রত্যেকটি সন্তান সুশিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হন। দানশীল বিহারীলাল মিত্রর অন্তরঙ্গ বন্ধু মন্মথনাথ ১৮৮০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Cobden Medal পান।

শ্রীমতী ঘোষ কিছুকাল বাড়ীতে লেখাপড়া শিখে কলকাতার Pratt Memorial Schoolএ ভর্ত্তি হন ও পরে ডায়োসেসন থেকে ১৯১৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা, ১৯১৯ খৃঃ আই-এ, ১৯২১ খৃঃ ইংরাজীতে অনার্স সহ বি-এ এবং ১৯২২ সালে প্র্যাকটিক্যালে প্রথম স্থানসহ বি-টি পাশ করেন। এর পর কয়েকমাসের জন্য পারিবারিক বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমলতা সরকারের অনুরোধে মহারাণী স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯২৩ সালে স্বর্গীয়া সরলা রায়ের (মিসেস পি, কে, রায়) আহ্বানে তিনি গোখেল মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেই সময় সেখানে মাত্র ১৮ জন ছাত্রী ও ছয়টী শ্রেণী ছিল। ১৯২৪ সালে শ্রীমতী রাণী ঘোষ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Teachers Diploma ও ১৯২৫ সালে এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বি-বার্ষিক Advance Course of Psychology & Pedagogy ডিপ্লোমা গ্রহণান্তে পরের বছর ভারতে ফিরে আসেন। সেই সময় তিনি ডক্টর ড্রিভার, অধ্যাপক টমসন স্যার টি পি, নেনী ও স্যার সিরিল বার্ট এর কাছে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩০ সালে তিনি পরলোকগত গিরীন্দ্রশেখর বসু ও ডক্টর সুহৃৎচন্দ্র মিত্রের অধ্যাপনায় Experimental সাইকোলজিতে এম-এ পাশ করেন। তখন তিনি গোখেল শিক্ষায়তনের উন্নতিকল্পে অসাধারণ পরিশ্রমের সঙ্গে অবোধ শিশুদের শিক্ষার বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। দীর্ঘ বাইশ বছরের সাধনার পর ১৯৫২ সালে তিনি পুনরায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং Associate of University of London Institute of Education ( 6 to 7 years of age) হন। তাঁর শিক্ষণীয় বিষয় ছিল Problem childএর শিক্ষাধারা। আসা-যাওয়ার পথে তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন স্থান ও মিশর পরিদর্শন করেন।

১৯৫৬ সালে এক দুর্ঘটনায় শ্রীমতী ঘোষ পায়ের আঘাতের দরুণ পি. জি. হাসপাতালে অবস্থান করেন। সেই সময় রোগশয্যায় তিনি "Measuring Intelligence of Bengali Pupils of Infant Schools" শীর্ষক তথ্যপূর্ণ এক থিসিস রচনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করেন। ১৯৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে Ph. D. উপাধি দিয়ে যথার্থ একজন জ্ঞান-তপস্বিনীর সমাদর করলেন।

বিলাতী গানবাজনা ও খেলাধূলা যদিও প্রথম জীবনে তাঁর অবসর বিনোদনের পন্থা ছিল, বর্ত্তমানে তিনি নানাবিধ পুস্তক পাঠের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিতা রেখেছেন।

এঁর অন্যতম ভ্রাতা এ. এম. এন. ঘোষ Oil & Natural Gas Commissionএর ত্রয়ী সদস্যের অন্যতম। ভগিনী সুনীতি ঘোষ গভর্ণমেন্ট হিন্দু ট্রেনিং ইনঃ-এর অধ্যক্ষা।

শ্রীমতী ঘোষ বেঙ্গল উইমেন এডুকেশন লীগের সহঃ সভানেত্রী, A. I. F. Educational Associationsএর যুগ্ম-সম্পাদিকা, ফেলো অব রয়াল জিওগ্রাফী সোসাইটী, জুভেনাইল কোর্টের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতা সিনেটের সদস্যা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িতা আছেন। শিশু ও মেয়েদের শিক্ষাকে যে তিনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন—তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তৎপরিচালিত গোখেল মেমোরিয়াল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। তাঁর সুপরিচালনায় ও প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য আজ ঐ প্রতিষ্ঠানটি বাংলা তথা ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা শিক্ষায়তন রূপে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। আলাপ-আলোচনার শেষে সহজাত বিনয়ের সঙ্গেই তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাত্রী বাঙলার মহীয়সী মহিলা পরলোকগতা সরলা রায়ের উদ্দেশ্যে।

শ্রীমতী রাণী ঘোষ

## মজুরী-কাঠামোর তারতম্য

শুধু শিল্প-সংস্থা বা কারখানা নয়, যে কোন কর্ম-সংস্থাতেই দেখা যাবে, সকল কর্মীরই মজুরী বা বেতন একই হারে নির্দ্ধারিত হয় না। একটি দেশের সংগে অপর দেশের কিম্বা একই দেশের একটি বিশেষ অঞ্চলের সংগে অপর অঞ্চলের মজুরী বা বেতন-কাঠামোর তুলনামূলক বিচার করলেও এই তারতম্য বা পার্থক্যটি লক্ষ্য পড়বে। এমনটি কেন হয়, সে অবশ্য একটি স্বাভাবিক প্রশ্ন—আর মনের ভেতর এ প্রশ্নের উত্তর পেতেই হবে যেমন করেই হোক। বলা বাহুল্য, কর্মসংস্থাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা যাতে বিপর্যস্ত না হতে পারে, ঈপ্সিত কাজটি এগিয়ে যেতে পারে স্বচ্ছন্দ গতিতে, প্রধানত: এরই জন্ত পূর্বোক্ত জিজ্ঞাসার সংগত উত্তর না পেলেই নয়।

কাজ করবার যোগ্যতা ও দক্ষতার তারতম্যের জন্তই একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেও কর্মীদের বেতন বা মজুরীর তারতম্য হতে পারে এবং এ হলে সাধারণ অবস্থায় প্রশ্ন উঠতে পারে না। কার্যক্ষেত্রে যে বেশী দায়িত্ব বহনে সক্ষম হবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে অধিক কাজ ও উন্নত ধরণের কাজ দেখাতে পারবে, বেতন বা মজুরীও অন্যদের তুলনায় তার বেশী না হয়ে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে বলা যায় এ আবারও, আলোচ্য নীতিটি ঠিক ঠিক অনুসরণ করে বেতন বা মজুরী-কাঠামো স্থিরীকৃত হলো যেখানে, সেখানে মালিক-শ্রমিক প্রশ্ন বা অসন্তোষের অবকাশ সত্যিই স্বল্প।

আবার, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনাক্রমেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেতন বা মজুরীর তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন, একটি দেশের রাজধানী বা বাণিজ্য-নগরীতে যেখানে সব জিনিষই দুর্লভ না হোক, দুর্মূল্য অর্থাৎ জীবনযাত্রার ব্যয় ও ঝুঁকি অত্যধিক, সেখানকার কর্মী বা শ্রমিকের বেতন-ভাতা বেশী না হলে চলতে পারে না। আর বাহিরের শহর ও শিল্পকেন্দ্রগুলি, যেখানে সবকিছুই বলতে গেলে অপেক্ষাকৃত সস্তা ও সহজলভ্য অর্থাৎ জীবনযাত্রার ব্যয় ও ঝুঁকি তুলনায় কম, সে সব স্থলে একই মান বা পর্য্যায়ের কর্মী হওয়া সত্বেও মাস-মাহিনা কম থাকতে পারে। মজুরী বা বেতন-কাঠামোর এই তারতম্য বা পার্থক্যকে খানিকটা স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

অর্থনীতি অনুসারে মজুরীটা হচ্ছে আসলে শ্রমিকের শ্রমের মূল্য। যে যেমন শ্রম (কায়িকই হোক কি মানসিকই হোক) নিয়োজিত করবে কার্য্যক্ষেত্রে, মজুরী প্রাপ্য হবে তার সেই অনুপাতেই। এই সাধারণ ব্যবস্থাধীনে শ্রমিকের বেতন বা মজুরী যে কম-বেশী হবে অর্থাৎ সকলেরই যে একই হারে মাস মাহিনা হবে না, সে সহজেই অনুমেয়। কেন না, সকল কর্মীই সমশ্রমশীল হবে, সমান সুদক্ষ ও কর্মতৎপর হবে—চাইলেও এমনটি প্রায় হয় না। চাওয়া ও পাওয়া ইংরাজীতে যাকে বলা হয় Demand and supply, এই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রশ্নটিও বেতন বা মজুরী নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে একটি বড় কথা। প্রয়োজন হওয়া মাত্র যেখানে প্রত্যাশার অতিরিক্ত অথচ যোগ্যতাসম্পন্ন লোক হাজির, সে ক্ষেত্রে মাস-মাহিনা বা বেতন নির্ণীত যা হবে, প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত কর্মী সে ভাবে পাওয়ার প্রত্যাশা বা সম্ভাবনা না থাকলে মাস-মাহিনা তার চেয়ে অধিক হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। মোটের উপর, মজুরী বা বেতন-কাঠামো সমাজ-কাঠামো তথা সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সেজন্তেই পুঁজিবাদী সমাজের

সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মজুরী নীতির পার্থক্য স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়।

বেতন-কাঠামো নির্দ্ধারণের ব্যাপারে কিম্বা মজুরী বিভিন্নতার অবসান ঘটানোর ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি অপরিহার্য্য কি না, এই নিয়েও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ধনতন্ত্রবাদী সমাজে মালিকপক্ষ অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন বা ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে চান না। এমন কি, তাঁদের একটি শ্রেণীর মতে ট্রেড ইউনিয়ন কার্য্যকলাপের দরুণ আলোচ্য প্রশ্নটি গত সার্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যেও মীমাংসিত হয়নি বা হতে পারেনি। অপর দিকে শ্রমিক পক্ষ বা ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কাছে এই যুক্তিটি মোটেই গ্রাহ্য নয়। পরন্ত তারা দাবী রাখেন—মজুরী-কাঠামো নির্দ্ধারণ এবং মজুরীর অযৌক্তিক তারতম্য হ্রাসকল্পে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গুরুত্ব অনেকখানি। এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, আপোষ-আলোচনা বা শ্রমিক-মালিক বুঝাপড়া মারফৎ যে ব্যবস্থাটি হবে, অবস্থাধীনে সেইটি মেনে নিতে কোনক্রমেই আপত্তি চলে না। বেতন-কাঠামো এই ব্যবস্থায় স্থিরীকৃত হলে, বেতন বা মজুরীর তারতম্যের প্রশ্নটি ক্রমে মিটে যাওয়া সম্ভব, এরূপ আশা নিরর্থক নয়।

## এদেশে নারকেলের উৎপাদন

নারকেল গাছ ও নারকেল ফল আমাদের বহু প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এর কাণ্ডে যেমন খুঁটি, কড়ি, বরগা প্রভৃতি তৈরী হয়, তেমনি হয় এর পাতায় ঘরের চালা, বাগড়ায় জ্বালানী, ছোবড়ায় দড়ি, মালায় হুঁকা ইত্যাদি। নারকেল তেল সত্যি একটি মূল্যবান পণ্য—নারকেল ফলটিও যতই স্বাদু, ততই পুষ্টিকর। এক কথায় নারকেল গাছ ও ফলের কোন অংশই অপ্রয়োজনীয় বা মূল্যহীন নয় মানুষের কাছে।

সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী ভূমি অর্থাৎ লবণাক্ত মৃত্তিকা নারকেল গাছ জন্মাবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং মাদ্রাজ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল প্রভৃতি অঞ্চলে নারকেলের চাষ বহু পূর্ব্ব থেকেই চলে আসছে। কিন্তু তবু একটি কথা বলতে হবে—এখন অবধি ভারতে পর্য্যাপ্ত নারকেল উৎপন্ন হয় না। সাবান, প্রসাধন দ্রব্য, মার্গারিণ প্রভৃতি শিল্পের প্রয়োজনীয় নারকেল তেলের জন্ত ভারতকে আজও নির্ভর করতে হচ্ছে বিদেশের উপর। দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা অনুযায়ী নারকেল পাওয়ার ব্যবস্থা হলে এই পর-নির্ভরতা আপনি কেটে যাবে, এ বলা বাহুল্য।

নারকেল উৎপাদনের দিক থেকে ভারত সমগ্র বিশ্বে এখনও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ভারতের মধ্যে অবশ্য মাদ্রাজরাজ্যেই নারকেলের চাষ অন্যান্য স্থানের তুলনায় বেশি। তারপরই নাম করা চলে যথাক্রমে বোম্বাই, বাংলা ও উড়িষ্যার। সরকারী হিসাবে প্রকাশ—এই উপমহাদেশে প্রায় ১৫ লক্ষ ৮৭ একর জমিতে নারকেলের চাষ হয়। কিন্তু একটু আগেই বলা হ'ল—আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নয়। আজও বিদেশী বাজার থেকে এদেশে নারকেল ও নারকেলজাত পণ্য আমদানী করতে হয় প্রচুর—যার মূল্য সরকারী হিসাব অনুসারেই প্রায় ১৫ কোটি টাকা।

ভারতে নারকেলের উৎপাদন বাড়াবার জন্য জাতীয় সরকার পরিকল্পনা অনুযায়ী চেষ্টা যে করছেন না, এমন নয়। উন্নত শ্রেণীর নারকেল চাষ বৃদ্ধি এবং কীট-পতঙ্গের আক্রমণ থেকে নারকেল বাঁচানো সম্পর্কে প্রচারকার্য্যের জন্য সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি প্রদর্শনী কেন্দ্র খোলা হয়েছে বা হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলির অনেকেই নারকেলের উৎপাদন বৃদ্ধির একটি না একটি বাস্তব কর্ম্মসূচী নিয়েছেন। তাঁদের দাবী অনুসারে বলতে পারা যায়—দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা কালের শেষাশেষি উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে প্রায় ৩৫ কোটি। আর গবেষণা মারফত এই তথ্যটি জানা গেছে, নিয়মিত চাষাবাদ ও উপযুক্ত সার প্রয়োগ ও যে যে পোকা-মাকড় নারকেলের রিপু, উহাদের বিনাশের যদি ব্যবস্থা হয়, তা হলে ফলন বৃদ্ধি না পেয়ে পারে না। সরকারী দাবী মেনে নিয়ে এ-ও বলতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হলে নারকেলের উৎপাদন বাড়ানো যাবে শতকরা ৫৫ ভাগ।

বিভিন্ন রাজ্যে নারকেল চাষ সমধিক জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য সরকারী উদ্যম ও প্রচেষ্টা চলেছে, এ স্বীকার করেও বলতে হবে এই প্রচেষ্টাকে আরও সুসংহত ও সম্প্রসারিত না করলে তাড়াতাড়ি প্রত্যাশিত সুফল লাভের সম্ভাবনা নেই। প্রাপ্ত সরকারী হিসাব অনুসারে দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার গোড়ার দিকে ভারতে নারকেল ফলন হয় প্রায় সাড়ে ৪ শত কোটি। উৎপাদন আরও বাড়াবার তাগিদ ও প্রয়োজনীয়তা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে নারকেল প্রদর্শন কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। ইত্যবসরে একমাত্র কেরল রাজ্যেই আলোচ্য প্রদর্শন কেন্দ্র খোলা হয়েছে ২৩৪টি। অন্ধ্র প্রদেশেও এই শ্রেণীর পাঁচ শতাধিক কেন্দ্র স্থাপিত হবার কথা। বোম্বাই-এর কচ্ছ এলাকায় বিগত ডিসেম্বর মাসে একটি প্রদর্শনকেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং এই স্থানে অনুরূপ আরও একটি কেন্দ্র স্থাপিত হবে, এরূপ নির্দ্ধারণ রয়েছে। অপরদিকে মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা রাজ্যে প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপিত হবে যথাক্রমে ১৫০টি ও ২৪টি।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলতে হয়—নারকেল গাছের পরম শত্রু হচ্ছে কতকগুলি বিশেষ ধরণের কীট-পতঙ্গ। বস্তুতঃ কীটাদির আক্রমণে কোটি কোটি টাকার নারকেল বিনষ্ট হয় এই দেশেই। পোকা-কবলিত হলে কিংবা কোন রোগাক্রান্ত হলে গাছগুলি স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হয়ে পড়ে, আর দুর্ব্বল গাছ ভাল ফল দিতে পারে না, সংখ্যার দিক থেকেও ফলন কম হবে। নারকেল গাছের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক যে পোকা, সে হচ্ছে গোবরে পোকা বা গণ্ডারে পোকা। এই পোকার আক্রমণ হলেই গাছের ফলন অপ্রত্যাশিত ভাবে কমতে থাকে। এই জাতীয় বৃক্ষের আরও কয়টি প্রধান শত্রু—কালো মাথা শুঁয়োপোকা (নারকুলে), লাল নারকুলে পোকা, উইপোকা। সমুদ্র এলাকায় বা নদী-নালার পাশে নারকেলের চাষ যেখানে রয়েছে, নারকুলে শুঁয়োপোকার আক্রমণ সেখানেই বেশি হতে দেখা যায়। লাল নারকুলে পোকার আক্রমণ হলে প্রথমটায় সেরূপ ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু কিছু দিন বাদেই দেখা যাবে—আক্রান্ত নারকেল গাছের কাণ্ড শুকিয়ে গেছে এবং তার পর গাছটি আর বেশি সময় বাঁচতে পারলো না। উইপোকার দলবদ্ধ আক্রমণেও নারকেল গাছের ক্ষতি হয়ে থাকে অতিমাত্র।

পূর্ব্বেই বলা হল—পোকার আক্রমণ ছাড়াও নারকেল গাছের বিপদ আছে নানা রোগের দিক থেকে। যেমন, মাহালি বা ফলপচা রোগ, কুঁড়িপচা রোগ, গুঁড়িপচা ও শিকড়পচা রোগ, গুঁড়ির রসঝরা রোগ, পাতাপচা রোগ, নারকেল পড়া রোগ, পাতাদাগী রোগ, পাতা কমা বা পেন্সিল-ডগা রোগ, শিকড়ি রোগ। এ সকলের কবলে পড়েই নারকেল গাছের অকালমৃত্যু ঘটে কিংবা ফলন অস্বাভাবিক ভাবে কমে যায়। সুতরাং পোকার আক্রমণ যেমন রোধ করতে হবে, তেমনি দেখতে হবে—উল্লিখিত ধরণের ভয়াবহ রোগগুলি কি ভাবে নিবারণ করা যায়। এসব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সরকারী উদ্যম ও জনসাধারণের প্রচেষ্টার মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের ব্যবস্থা হলে এদেশে নারকেলের উৎপাদন বাড়বেই। পক্ষান্তরে, উৎপাদন আশানুরূপ বর্দ্ধিত হলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের পথও প্রশস্ত হবে অনেকখানি।

## এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের একটি দৃশ্য মুদ্রিত হইয়াছে।

আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীবিতাস মিত্র

১লা মে :: রূপবাণী • ভারতী • অরুণায়

# বাঙলা ছবি ও ১৩৬৫

সংখ্যার দিক থেকে গত কয়েক বছরের তুলনায় এ বছর অনেক কম ছবি মুক্তিলাভ করেছে। এ বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা চল্লিশটিও নয়। মোটে আটত্রিশটি। সাধারণতঃ বছরের প্রথম ন' মাসের শেষে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা এই রকম দাঁড়ায় কিন্তু এবারে সারা বছরে মুক্তি পেল মোট আটত্রিশখানি ছবি। পাঠক-পাঠিকার দরবারে ছবিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করা হল :

( ১ ) যোগাযোগ ( ১২।১ থেকে ৫ সপ্তাহ ), কাহিনী রবীন্দ্রনাথ চিত্রনাট্য—বিনয় চট্টো, সঙ্গীত—হরিপ্রসন্ন দাস, আলোকচিত্র —অমল বন্দ্যো, সম্পাদনা—সুবোধ রায়, প্রযোজনা—'রিদম' সম্পাদিকা—শ্রীমতী আশা মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী উষা খান ও স্বর্গীয় পি, এন, রায়, পরিচালনা—নীতীন বসু, রূপায়ণে—জহর, বসন্ত, অসিত, উৎপল, অমর, মঞ্জু, ভারতী, রীতা, নেপথ্যে—দ্বিজেন মুখো ও ছবি বন্দ্যো। ( ২ ) নূপুর ( ১১।১ থেকে ৫ সপ্তাহ ) কাহিনী—নীহার গুপ্ত, সঙ্গীত—আলী আকবর, আলোকচিত্র—জি, কে, মেহটা, সম্পাদনা—দুলাল দত্ত, নৃত্য—অনাদিপ্রসাদ, পরিচালনা—দিলীপ নাগ, রূপায়ণে—ছবি, কমল, নীতীশ, বিকাশ, আশীষ, জীবেন, ভানু, জহর, তুলসী চক্র, বেচু, তিলক, সরযূ, সন্ধ্যা, মঞ্জু, সাবিত্রী, জয়শ্রী। ( ৩ ) শ্রীশ্রীমা ( ২৬।১ থেকে ৮ সপ্তাহ ) কাহিনী ও পরিচালনা—কালীপ্রসাদ ঘোষ, সঙ্গীত—অনিল বাগচী, আলোকচিত্র —বিদ্যাপতি ঘোষ, সম্পাদনা—রবীন দাস, শ্রেষ্ঠাংশে—গুরুদাস বন্দ্যো, ও অনুভা গুপ্তা, অন্যান্যাংশে—পাহাড়ী, নীতীশ, মোহন, জীবেন, নবকুমার, ভুবন, হরিধন, চন্দ্রশেখর, শিবকালী, বিভু, সমর, সরযূ, মলিনা ছায়া, পদ্মা, ভারতী প্রণতি, বাণী, সুদীপ্তা, অপর্ণা, রাণীবালা, লক্ষ্মী, মল্লিকা, নেপথ্যে— ধনঞ্জয় ভট্টা, ও প্রতিমা বন্দ্যো। ( ৪ ) ডেলি প্যাসেঞ্জার, ( ২।২ থেকে ৪ সপ্তাহ ) কাহিনী—শৈলেশ দে, চিত্রনাট্য ও সংলাপ—বিজয় গুপ্ত, সঙ্গীত—শ্যামল মিত্র, আলোকচিত্র—বিজয় দে, সম্পাদনা— রমেশ যোশী, পরিচালনা—সাধন সরকার, রূপায়ণে—ছবি, কমল, প্রবীর, তুলসী, লাহিড়ী, সন্তোষ, হরিধন, নৃপতি, সুখেন, মলিনা, পদ্মা, তপতী, রাণীবালা, সাধনা, নিভাননী, শিখা দাস, নেপথ্যে—শ্যামল মিত্র, ও আলপনা বন্দ্যো। ( ৫ ) অযান্ত্রিক ( ৯।২ থেকে ৫ সপ্তাহ ) কাহিনী—সুবোধ ঘোষ, সঙ্গীত—আলী আকবর, আলোকচিত্র—দীনেন গুপ্ত, সম্পাদনা—রমেশ যোশী, কাহিনী সম্প্রসারণ ও পরিচালনা—ঋত্বিক ঘটক শ্রেষ্ঠাংশে কালী বন্দ্যো. এবং 'জগদ্দল' অন্যান্যাংশে ডি, জি, অনিল, গঙ্গাপদ, কৃষ্ণধন, তুলসী চক্র, সতীন্দ্র, জ্ঞানেশ, দীপক, কাজল, সীতা, আরতি ( ৬ ) ভানু পেল লটারি ( ১৬।২ থেকে ৬ সপ্তাহ ) কাহিনী—কনক মুখো, সঙ্গীত—নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র—কানাই দে, সম্পাদনা —অমিয় মুখো, পরিচালনা—এম, জি, এস, ইউনিট ( তত্ত্বাবধায়ক দিলীপ দে চৌধুরী ), নামভূমিকায়—ভানু বন্দ্যো, অন্যান্যাংশে—কমল, বীরেন, জহর, কুন্তলা, ইরা, লিলি, নেপথ্যে—শ্যামল মিত্র ও মঞ্জুলা সেনগুপ্তা। ( ৭ ) কালামাটি ( ২৩।২ থেকে ৭ সপ্তাহ ) কাহিনী— রমাপদ চৌধুরী, চিত্রনাট্য—পীযূষ বসু, আলোকচিত্র—অনিল বন্দ্যো, সঙ্গীত—রবিশঙ্কর, রবীন্দ্রসঙ্গীত তত্ত্বাবধানে—অরবিন্দ বিশ্বাস, সম্পাদনা—সুবোধ রায়, পরিচালনা—তপন সিংহ, রূপায়ণে—অসিত, অনিল, অনুপ, জীবেন, দিলীপ, ভানু, জহর, অরুন্ধতী, তপতী, নমিতা, মানসী, বুলা, যন্ত্রে—রবিশঙ্কর, দক্ষিণামোহন, আশীষ, অলোক, কণ্ঠে—দ্বিজেন মুখো, মৃণাল প্রতিমা ও বাণী দাশগুপ্তা। ( ৮ ) লুকোচুরি ( ১২।৩ থেকে ১৫ সপ্তাহ ) কাহিনী—রূপক, সঙ্গীত—হেমন্ত মুখো, আলোকচিত্র—অশোক দাশগুপ্ত সম্পাদনা— হৃষীকেশ মুখো, প্রযোজনা—কিশোরকুমার, পরিচালনা—কমল গঙ্গো, রূপায়ণে কিশোর,, অনুপ ( বম্বে ), সমীর, বিপিন, মণি চট্টো, নবেন্দু, অসিত, অরবিন্দ, নৃপতি, অজিত, মালা, অনিতা, রাজলক্ষ্মী, সতী, নেপথ্যে—হেমন্ত, কিশোর, গীতা ও রুমা। ( ৯ ) বাঘা যতীন (১২।৩ থেকে ৫ সপ্তাহ ) কাহিনী ও পরিচালনা—হিরণ্ময় সেন, সঙ্গীত—দেবেশ বাগচী, আলোকচিত্র—জি, কে, মেহটা, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু ও বৈদ্যনাথ চট্টো, শিল্প—গৌর পোদ্দার, শব্দ—গৌর দাস, গান—শান্তি ভট্টা, নামভূমিকায় রবীন রায়, অন্যান্যাংশে—ধীরাজ, শিশির বটব্যাল, ছন্দা, বেচু, ভানু, বিপ্লব, ছায়া, জ্যোৎস্না, মঞ্জু বন্দ্যো, নেপথ্যে—ধনঞ্জয়, প্রদ্যোত, প্রতিমা, আরতি, ( ১০ ) স্বর্গমর্ত ( ১৯।৩ থেকে ৪ সপ্তাহ ) কাহিনী— প্রতাপ মুখো, সংলাপ—শৈলেশ দে, সঙ্গীত—কালীপদ সেন, আলোকচিত্র—অনিল গুপ্ত, সম্পাদনা—কমল গঙ্গো, পরিচালনা— অসীম পাল,—রূপায়ণে—বিকাশ, মিহির, তরুণ, অমর, তুলসী চক্র, নবদ্বীপ, নৃপতি, ছন্দা, অজিত, মঞ্জু, লীলা, এবং ভানু ও জীবেন, নেপথ্যে—সতীনাথ মুখো ও গায়ত্রী বসু। ( ১১ ) ও আমার দেশের মাটি ( ২৬।৩ থেকে ৪ সপ্তাহ ) কাহিনী—ফণী সরকার, প্রযোজনা ( অন্যতম ) ও সঙ্গীত—অপরেশ লাহিড়ী, আলোকচিত্র— সুবোধ বন্দ্যো, সম্পাদনা—অজিত দাস, পরিচালনা—পথিকৃৎ, রূপায়ণে—ছবি, পাহাড়ী, ডি, জি, জীবন, রবীন, দীপক, পদ্মা, মানসী, নমিতা, অপর্ণা, শিপ্রা সাহা, নীলিমা, করালী, নেপথ্যে—হেমন্ত, শচীন দেববর্মণ, মান্না, প্রসূন আব্বাসউদ্দীন, কানন, গোবিন্দ, গোপাল, ভূপেন, মণীন্দ্র, রসরাজ, শৈলেন, লতা, বাঁশরী, মানসী। ( ১২ ) তানসেন ( ১।৪ থেকে

৩ সপ্তাহ) কাহিনী ও চিত্রনাট্য—বিমল মিত্র, সঙ্গীত—রবীন চট্টো, আলোকচিত্র—বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা—সন্তোষ গঙ্গো, পরিচালনা—নীরেন লাহিড়ী, নামভূমিকায়—অমিতাভ ও অসীমকুমার, অন্যান্যাংশে—ছবি, পাহাড়ী, নীতীশ, মিহির, অর্ধেন্দু, গোপাল, রঞ্জন, জহর, অনুভা, রীতা, তন্দ্রা, শ্যামল যন্ত্রে—বীরেন্দ্রকিশোর, দবীর খাঁ, কণ্ঠে—রমেশ, ভীমসেন, কানন, ধনঞ্জয়, প্রসূন, মানব ও ছবি বন্দ্যো। (১৩) জোনাকির আলো (৯।৪ থেকে ৩ সপ্তাহ) কাহিনী—সত্য বন্দ্যো, সঙ্গীত—ভূপেন হাজারিকা, আলোকচিত্র—অজয় মিত্র। আবহ-সঙ্গীত—নচিকেতা ঘোষ, সম্পাদনা—তরুণ দত্ত, পরিচালনা—অসিত সেন রূপায়ণে—পাহাড়ী, অসীম, জহর, তুলসী চক্র, হরিধন, তিলক, দেবাশীষ, অনুভা, বাণী, আশা, নেপথ্যে—ভূপেন, পূর্ণ ও লতা। (১৪) নাগিনী কন্যার কাহিনী (২৩।৪ থেকে ৭ সপ্তাহ), কাহিনী—তারাশঙ্কর, সঙ্গীত—রবিশঙ্কর, আলোকচিত্র—শৈলজা চট্টো ও অনিল বন্দ্যো, নৃত্য—দেবেন্দ্র শঙ্কর, সম্পাদনা—সুবোধ রায় পরিচালনা—সলিল সেন, রূপায়ণে—ছবি, প্রবীর, কালী বন্দ্যো, অজিত, কালী চক্র, সত্য, দিলীপ, অনুপ, সতু, মঞ্জু, মঞ্জুলা, সন্ধ্যা, নেপথ্যে—মৃণাল, শৈলেন, আলপনা, গায়ত্রী, সন্ধ্যা, গীতা। (১৫) ডাক্তার বাবু (২৩।৪ থেকে ৮ সপ্তাহ) কাহিনী—বিজন ভট্টা, চিত্রনাট্য ও গান—প্রণব রায়, সঙ্গীত—রাজেন সরকার, আলোকচিত্র—দীনেন গুপ্ত, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চট্টো ও অমিয় মুখো, পরিচালনা—বিশু দাশগুপ্ত, রূপায়ণে—কমল, উত্তম, গঙ্গাপদ, অনুপ, তরুণ, ভানু, তিলক, পদ্মা, সাবিত্রী, কাজল, অপর্ণা, নেপথ্যে—মানবেন্দ্র ও সন্ধ্যা মুখো। (১৬) সাধক বামাক্ষ্যাপা (৫।৫ থেকে ৭ সপ্তাহ) কাহিনী—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, সঙ্গীত—অনিল বাগচী, আলোকচিত্র—সন্তোষ গুহরায়, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চট্টো, পরিচালনা—নারায়ণ ঘোষ, নামভূমিকায়—গুরুদাস বন্দ্যো, অন্যান্যাংশে—ছবি, কানু, নীতীশ, মিহির নরেন্দু, তুলসী চক্র, হরিধন, নৃপতি, শ্রীমানী, জ্যোতি, মলিনা, পদ্মা, মেনকা, রত্না, ইরা। (১৭) শিকার (৮।৬ থেকে ৯ সপ্তাহ) কাহিনী—রাসবিহারী লাল, সঙ্গীত—হেমন্ত মুখো, আলোকচিত্র—সুহৃদ ঘোষ, আবহ সঙ্গীত—রবীন চট্টো, সম্পাদনা—বিশ্বনাথ নায়েক, পরিচালনা—মঙ্গল চক্র, রূপায়ণে—উত্তম, অসিত, নির্মল, দীপক, মিহির, অরুণ, অমর, দেবাশীষ, অরুন্ধতী, ভারতী, নমিতা, কমলা, আশা, সন্ধ্যা। (১৮) জলসাঘর (২৩।৬ থেকে ৮ সপ্তাহ) কাহিনী—তারাশঙ্কর, সঙ্গীত—বিলায়েৎ হোসেন, আলোকচিত্র—সুব্রত মিত্র, সম্পাদনা—দুলাল দত্ত, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—সত্যজিত রায়, শ্রেষ্ঠাংশে—ছবি বিশ্বাস, অন্যান্যাংশে—গঙ্গাপদ, কালী সরকার তুলসী লাহিড়ী, প্রতাপ, পিনাকী পদ্মা তৎসহ রোশনকুমারী ও আখতারীবাই, যন্ত্রে—দক্ষিণামোহন, সালামৎ বিসমিল্লা, ওহায়েদ, লড্ডন। (১৯) ইন্দ্রাণী (২৩।৬ থেকে ৮ সপ্তাহ) কাহিনী—অচিন্ত্যকুমার, চিত্রনাট্য—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত—নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র—বিশু চক্র, সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চট্টো, পরিচালনা—নীরেন লাহিড়ী, রূপায়ণে—ছবি, পাহাড়ী, উত্তম, বিমান, জীবেন, গঙ্গাপদ, বিভু, বাবুয়া, অলক, চন্দ্রা, সুচিত্রা, তপতী, নমিতা, অপর্ণা, সীতা, কেতকী, সাধনা, শ্যামলী, নেপথ্যে—হেমন্ত, মহম্মদ রফী ও গীতা। (২০) পুরীর মন্দির (২২।৬ থেকে ৬ সপ্তাহ) কাহিনী—অশ্বিনীকুমার ঘোষ, চিত্রনাট্য—মণি বর্মা, সংলাপ—বিজয় গুপ্ত, সঙ্গীত—কালীপদ সেন, আলোকচিত্র—কানাই দে, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চট্টো ও রবীন সেন, তত্ত্বাবধান—দিলীপ মুখো, পরিচালনা—মণি ঘোষ, রূপায়ণে—জহর, কমল, নীতীশ, অসীম, গুরুদাস, অমর, দ্বিজু, দীপ্তি, বাসবী, মিতা, বাণী, শ্যামলী, নেপথ্যে—ধনঞ্জয়, সতীনাথ, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, ইলা। (২১) নীলাকন্ঠ (৩০।৬ থেকে ৩ সপ্তাহ), কাহিনী—অনন্ত চট্টো, সঙ্গীত—শৈলেশ দত্তগুপ্ত ও সিদ্ধেশ্বর মুখো, আলোকচিত্র—প্রভাত ঘোষ, সম্পাদনা—রমেশ যোশী, পরিচালনা—সতীশ দাশগুপ্ত, রূপায়ণে—ধীরাজ, পাহাড়ী, নবকুমার, সত্য, বীরেন, অনুপ, বিভু, তিলক, দেবাশীষ, চন্দ্রা, সুনন্দা, তাপসী, তপতী, প্রীতিধারা, বুলবুল, সীমা, নেপথ্যে—প্রসূন, মানবেন্দ্র, গায়ত্রী, বাণী, পূরবী মুখো। (২২) যৌতুক (২৮।৭ থেকে ১০ সপ্তাহ)—কাহিনী—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গো, চিত্রনাট্য—বিমল মিত্র, সঙ্গীত—হেমন্ত মুখো, আলোকচিত্র—দীনেন গুপ্ত সম্পাদনা—রমেশ যোশী, পরিচালনা—জীবন গঙ্গো, রূপায়ণে—কমল, উত্তম, বীরেন, জীবেন, কালী সরকার, শিশির বটব্যাল, তুলসী চক্র, মলিনা, সুমিত্রা, শিলা, নেপথ্যে—হেমন্ত, লতা, গীতা। (২৩) ধূমকেতু (২৮।৭ থেকে ৫ সপ্তাহ) কাহিনী ও পরিচালনা—গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, সঙ্গীত—সন্তোষ মুখো, আলোকচিত্র—দিব্যেন্দু ঘোষ, সম্পাদনা—নোনা বসু, প্রযোজনা—শিশির মিত্র, রূপায়ণে—ছবি, ধীরাজ, পাহাড়ী, নীতীশ, অসিত, অজিত, মিহির, শিশির মিত্র, জহর, সবিতা, গীতা, শিবানী, নেপথ্যে—শ্যামল মিত্র। (২৪) সূর্যতোরণ (৫।৮ থেকে ১২ সপ্তাহ) কাহিনী ও গান—গৌরীপ্রসন্ন, সঙ্গীত—হেমন্ত মুখো, আলোকচিত্র—বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চট্টো, পরিচালনা—অগ্রদূত, রূপায়ণে—ছবি, কমল, বিকাশ, উত্তম অসিত, কালী বন্দ্যো, মিহির, শিশির, গঙ্গাপদ, বীরেশ্বর, ভানু জহর, তুলসী চক্র, দীপক, চিত্রা, শোভা, কবিতা কমলা অধিকারী, নেপথ্যে—হেমন্ত ও সন্ধ্যা মুখো। (২৫) শ্রীশ্রীতারকেশ্বর (১২।৮ থেকে ৪ সপ্তাহ), কাহিনী—সুকুমার গঙ্গো, চিত্রনাট্য ও সংলাপ—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত—পবিত্র চট্টো, আলোকচিত্র—দিব্যেন্দু ঘোষ, সম্পাদনা—অর্ধেন্দু চট্টো ও রাসবিহারী সিংহ, পরিচালনা—বংশী আশ, রূপায়ণে—কানু, মহেন্দ্র, কমল, নীতীশ, নবকুমার জয়নারায়ণ, ভূপেন, সন্তোষ, বাবুয়া, অলোক, পদ্মা, শোভা, অপর্ণা রেণুকা, স্বাগতা, কেতকী, নেপথ্যে—ধনঞ্জয়, প্রসূন, মানবেন্দ্র, ডাঃ গোবিন্দগোপাল, অমর পাল, প্রতিমা, মাধুরী। (২৬) মর্মবাণী (১৯।৮ থেকে ৫ সপ্তাহ), কাহিনী—মনোজ ভট্টা, সংলাপ, প্রশান্ত চৌধুরী, সঙ্গীত—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, আলোকচিত্র (১) পরিচালনা—অনিল গুপ্ত ও (২), গ্রহণ—জ্যোতি লাহা, সম্পাদনা—কালী রাহা, পরিচালনা—সুশীল মজুমদার, রূপায়ণে—ছবি, কানু অসীম, অনুপ, মিহির, চন্দ্রা, ছায়া, মঞ্জু, সাবিত্রী, সুপ্রিয়া সুদীপ্তা, কবিতা, নেপথ্যে—আল্পনা বন্দ্যো ও সুমিত্রা সেন (২৭) কংস (২৬।৮ থেকে ১০ সপ্তাহ), কাহিনী—প্রফুল্ল রায় কাহিনী, পরিবর্ধন ও অতিরিক্ত সংলাপ—বিমলচন্দ্র ঘোষ, সঙ্গীত—অনিল বাগচী, আলোকচিত্র—সুহৃদ ঘোষ, সম্পাদনা—রবীন দাঃ

পরিচালনা—এম, কে, জি, ইউনিট, নাম ভূমিকায়—কমল মিত্র, অন্যান্যাংশে—জহর, নীতীশ, বিশ্বজিৎ, অজিত, গুরুদাস, জয়নারায়ণ, সৌরেন, জহর, তুলসী চক্র, তুয়া, আদিত্য, চন্দ্রশেখর, শ্রীমানী, মলিনা, পদ্মা, ভারতী, দীপ্তি, বাণী, শ্যামলী, কেতকী, আরতি, (২৮) রাজধানী থেকে (২।১ থেকে ৪ সপ্তাহ), গোগোলের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য—মৃণাল সেন, সঙ্গীত—নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র—শৈলজা চট্টো, সম্পাদনা—সুবোধ রায়, পরিচালনা—নির্মল মিত্র, রূপায়ণে—কালী বন্দ্যো, উৎপল, জীবেন, অমর, পারিজাত, জহর, তুলসী চক্র, হরিধন, তুয়া, নৃপতি, অজিত, শ্রীমানী, মঞ্জু, মঞ্জুলা, নেপথ্যে—হেমন্ত মুখো ও সবিতা বন্দ্যো। (২৯) লালু ভুলু (১৭।১ থেকে ১৪। সপ্তাহ), কাহিনী—বাণভট্ট, চিত্রনাট্য ও গান—শৈলেন রায়, সঙ্গীত—রবীন চট্টো, আলোকচিত্র বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ, সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চট্টো, পরিচালনা—অগ্রদূত, নাম ভূমিকায়—সুখেন ও পরেশ, অন্যান্যাংশে—অজিত, শিশির বটব্যাল, গঙ্গাপদ, গৌর, পারিজাত, অতনু, হরিমোহন, সমরকুমার, শোভা, কাজল, কমলা, গীতা দে, সুব্রতা, কমলা, সীমা, নেপথ্যে—মানবেন্দ্র, প্রতিমা, ও পরিমল দাশগুপ্ত (মাউথ অর্গ্যান)। (৩০) জন্মান্তর (১৮।১ থেকে ৬ সপ্তাহ) কাহিনী—শ্রীপ্রহ্লাদ, সঙ্গীত—সরোজ কুমারী, আলোকচিত্র—সন্তোষ গুহ-রায়, সম্পাদনা—শিব ভট্টা, পরিচালনা—অসীম বন্দ্যো, রূপায়ণে—জহর, পাহাড়ী, অসিত, কালী বন্দ্যো, নির্মল, বীরেন, নৃপতি, বাবুয়া, দেবাশীষ, শ্যামল অরুন্ধতী, তপতী, রেণুকা, অপর্ণা, নেপথ্যে—হেমন্ত, সন্ধ্যা, প্রতিমা। (৩১) নৌকাবিলাস (২৪।১ থেকে ৫ সপ্তাহ) কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত—পবিত্র চট্টো, আলোকচিত্র—দেওজীভাই, সম্পাদনা—বৈদ্যনাথ চট্টো, পরিচালনা—সুধীর মুখো, রূপায়ণে—মিহির (মুখো), অনুপ, শীতল, পদ্মা, সাবিত্রী, অনুরাধা, হাসি, নিভাননী, পূর্ণিমা, নেপথ্যে—ধনঞ্জয়, শ্যামল, মানব, ডাঃ গোবিন্দগোপাল, ছবি, আলপনা, মাধুরী, কল্যাণী, তারা এবং তৎসহ অধ্যাপক রাধিকামোহন মৈত্র। (৩২) মরুতীর্থ হিংলাজ (২১।১০ থেকে…) কাহিনী—অবধূত, সঙ্গীত—হেমন্ত মুখো, আলোকচিত্র (১) পরিচালনা—অনিল গুপ্ত, (২) গ্রহণ—জ্যোতিলাহা ও (৩) বিশেষ দৃশ্য—বীরেন গুপ্ত, নৃত্য—প্রভাত ঘোষ, সম্পাদনা—কমল গঙ্গো, পরিচালনা—বিকাশ রায়, রূপায়ণে—পাহাড়ী, বিকাশ, উত্তম, অনিল, রাজা, দিলীপ দে, প্রতাপ, তুয়া, গুম, চন্দ্রা, সাবিত্রী, আভা বন্দ্যো, নেপথ্যে হেমন্ত, শম্ভু কাওয়াল, লতা, গীতা। (৩৩) নীল আকাশের নীচে (৮।১১ থেকে…) কাহিনী—মহাদেবী বর্মা, সঙ্গীত—হেমন্ত মুখো, আলোকচিত্র—শৈলজা চট্টো, সম্পাদনা—সুবোধ রায়, প্রযোজনা—হেমন্ত ও বেলা মুখো, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—মৃণাল সেন, প্রধান ভূমিকায়—কালী বন্দ্যো, অন্যান্যাংশে—বিকাশ, অজিত, কালী চক্র, অজিত, মঞ্জু, স্মৃতি, সুরুচি, প্রিয়া এবং বহু চৈনিক অভিনয় শিল্পিবৃন্দ। (৩৪) চাওয়া পাওয়া (১৫।১১ থেকে…) কাহিনী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত—নচিকেতা ঘোষ, আলোকচিত্র (১) পরিচালনা—অনিল গুপ্ত ও (২) গ্রহণ—জ্যোতি লাহা, সম্পাদনা—দুলাল দত্ত, পরিচালনা—যাত্রিক, রূপায়ণে—ছবি, উত্তম, জীবেন, অমর, অমিল, তুলসী চক্র, শ্যামল, অলক, সুচিত্রা, ভারতী, নেপথ্যে—হেমন্ত ও সন্ধ্যা মুখো। (৩৫) ঠাকুর হরিদাস (২৮।১১ থেকে…) চিত্রনাট্য ও সংলাপ বিপ্রদাস ঠাকুর (শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুসরণে) সঙ্গীত—অনিল বাগচী, আলোকচিত্র—প্রবোধ দাস, সম্পাদনা ও উপদেশন—রাজেন চৌধুরী, ঠাকুর, পরিচালনা—গোবিন্দ রায়, নাম ভূমিকায়—নির্মলকুমার, অন্যান্যাংশে—ছবি, পাহাড়ী, কমল, অজিত, মলয়, সলিল, তুলসী চক্র, শ্রীমানী, বিভু, তিলক, অলক, পদ্মা, শোভা, সুমিত্রা, তপতী, শিপ্রা সাহা, সীমা, নেপথ্যে হেমন্ত, ধনঞ্জয়, শচীন, মৃণাল, অলোক, অধীর সন্ধ্যা, প্রতিমা, ছবি, গায়ত্রী নির্মলা, কল্পনা। (৩৬) বিচারক (২৮।১১ থেকে…) কাহিনী—তারাশঙ্কর, সঙ্গীত—তিমিরবরণ, আলোকচিত্র—অজয় মিত্র, সম্পাদনা—হরিদাস মহলানবীশ, পরিচালন—প্রভাত মুখো, রূপায়ণে—ছবি, পাহাড়ী, উত্তম, অনুভ, রবীন, চন্দ্রা, অরুন্ধতী, দীপ্তি, বাণী হাজরা, নেপথ্যে—হেমন্ত, মৃণাল ও উৎপলা। (৩৭) শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু (১৩।১২ থেকে…) কাহিনীসূত্র—পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী, সংলাপ—প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর, অতিরিক্ত সংলাপ শৈলেশ দে, সঙ্গীত—রথীন ঘোষ, আলোকচিত্র—অনিল বন্দ্যো, সম্পাদনা—কমল গঙ্গো, পরিচালনা—অসীম পাল, নাম ভূমিকায়—অনিল চট্টো, অন্যান্যাংশে—পাহাড়ী, নবকুমার, শিশির, রাজা, তরুণ, রবীন, জয়নারায়ণ, জহর, অজিত, চন্দ্রা, অপর্ণা, সন্ধ্যা রায়, শীলা, রীতা, মায়া, নেপথ্যে ধনঞ্জয়, তরুণ, মানব, পান্নালাল, সনৎ, সাগর, শৈলেন, ইলা, নির্মলা। (৩৮) শ্রীরাধা (১৩।১২ থেকে) কাহিনী—সঙ্গীত পবিত্র চট্টো, আলোকচিত্র—দিব্যেন্দু ঘোষ, সম্পাদনা—সুকুমার মুখো, পরিচালনা—সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার, নামভূমিকায়—সবিতা বসু (চট্টো), অন্যান্যরূপে মহেন্দ্র, নবকুমার, জয়নারায়ণ, সমীর, শ্রীমানী, নৃপতি, নবদ্বীপ, তুয়া, ছায়া, পদ্মা, রেণুকা, গীতা সিং, গীতশ্রী, শিখা, নেপথ্যে—হেমন্ত, ধনঞ্জয়, তরুণ, সতীনাথ, শচীন, মৃণাল, মানব, পান্না, সন্ধ্যা, ছবি, আলপনা, প্রতিমা, ইলা, কল্যাণী, নির্মলা, সবিতা বন্দ্যো, বাণী দাশগুপ্ত।

১৩৬৫ সালে বাঙলা ছবিতে যে সব শিল্পীকে প্রথম অভিনয় করতে দেখা গেল তাঁদের মধ্যে—কিশোরকুমার, অনুপকুমার (বম্বে) রবীন রায়, পরেশ ধর, মলয়কুমার, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, জ্ঞানেশ মুখো, প্রফুল্ল ঘোষ, নবেন্দু চট্টো, মিহির মুখো, শ্রীমান দীপক, রীতা রায়, মঞ্জুলা বন্দ্যো, অনুরাধা গুহ, তাপসী রায়, কুন্তলা চট্টো, বাণী হাজরা, তন্দ্রা বর্মণ, শিপ্রা সাহা, সীতা মুখো, প্রিয়া চট্টো, রীতা দত্ত, মল্লিকা মল্লিক, বুলা ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অন্ততঃ এক বছর বাদে এই বছর আবার বাঙলা ছবিতে যাঁদের অভিনয় করতে দেখা গেল তাঁদের মধ্যে—ভি, জি, কানু বন্দ্যো, মহেন্দ্র গুপ্ত, বিমান বন্দ্যো, শুভেন মুখো, সমীরকুমার, মণি ঘোষ ও বর্মা, রাজা মুখো, ভুবন চৌধুরী, জ্যোতির্ময়কুমার, হারাধন বন্দ্যো, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, রঞ্জন মুখো, স্বরূপ মুখো, অমরেশ কুমার, অবিনাশ দাস, তারা ভট্টা, কার্ত্তিক সরকার, অশোক সরকার, সুধাংশু মুখো, অমূল্য সান্যাল, পিনাকী সেনগুপ্ত, সমরকুমার, শ্রীমান শ্যামল, শ্রীমান, গুম, অমিতাভ, দেবাশীষ, ছায়া দেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা সুমিত্রা দেবী সুনন্দা দেবী, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, অনিতা গুহ, নমিতা সিংহ, মানসী সোম, সুদীপ্তা রায়, পূর্ণিমা দেবী, সুরুচি সেনগুপ্ত, শ্রীমতী গীতশ্রী, কেতকী দত্ত, গীতী দে, অমিতা বসু, মণিকা ঘোষ, চিত্রা মণ্ডল, রেখা মল্লিক, শ্রীমতী মনোরমা, শ্রীমতী হাসি, লক্ষ্মী গঙ্গো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

## সমবায় কৃষি ব্যবস্থা

"সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে যে সকল কৃষক উহাতে যোগদান করিবে তাহাদের জোতের উপর মালিকানা স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে কি না, প্রত্যেক কৃষকের কাছেই উহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। নিজের জোতের জমির উপর কৃষকদের একটা বিশেষ দরদ ও টান আছে। লাঙ্গল যার মাটি তার, এই দাবী লইয়া দীর্ঘকাল তাহারা আন্দোলন করিয়াছে, সংগ্রাম করিয়াছে। তাহাদের এই সংগ্রাম যখন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে সেই সময় তাহাদের পাওয়া অধিকার সমবায় কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা তাহাদের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। বহু কৃষকের জমি সম্মিলিত করিয়া সমবায় ব্যবস্থায় আবাদ করা হইবে।• যদি কোন কারণে কোন কৃষক সমবায়ের মধ্যে থাকিতে না চায়, তাহা হইলে তাহার জমি সে আবার ফিরিয়া পাইবে কি না, তাহাও আর একটি গুরুতর প্রশ্ন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু যোতমলে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, কৃষিকার্য্যে সমবায় প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ভূস্বামীরা ভূমির মালিকানা হইতে বঞ্চিত হইবেন না, কেবল মাত্র সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করাই উহার উদ্দেশ্য। তাঁহার এই উক্তিতে কৃষকদের মন হইতে একটি আশঙ্কা দূর হইবে সন্দেহ নাই। সমবায় কৃষি ব্যবস্থায় যোগদান করিলে কৃষক তাহার জমির স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে না, প্রধান মন্ত্রীর উক্তিতে আশ্বাস পাওয়া গেলেও কোন কৃষক যদি সমবায় ব্যবস্থার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে চায়, তাহা হইলে সে তাহার জমি ফিরিয়া পাইবে কি না, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা পাওয়া গেল না।" —দৈনিক বসুমতী।

## রপ্তানীর নীতি

"ভারতে বাইসাইকেল তৈয়ারীর সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সংবাদটি যেমন চিত্তাকর্ষক, রপ্তানীর বাধাবিঘ্ন সম্পর্কে বিবরণটি তেমন হতাশাব্যঞ্জক। গত ছয় বৎসরের মধ্যে এদেশে তৈয়ারী সাইকেলের সংখ্যা তিন গুণেরও বেশী চড়িয়া গত বৎসর দশ লক্ষের উপর উঠিয়াছে। ইহা দ্বারা স্থানীয় চাহিদা পূরণের পরেও প্রতিবেশী দেশগুলিতে রপ্তানী করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তব পক্ষে গত বৎসর রপ্তানী হইয়াছে মাত্র ১১৪খানি। ইহার প্রধান কারণ হইল, বিদেশে বিক্রয়-মূল্য ও এদেশে পড়তা খরচের মধ্যে বিরাট পার্থক্য। ভারতে পড়তা খরচের সহিত তুলনায় বিদেশে বিক্রয়-মূল্য সাইকেল প্রতি গড়পড়তা ৪৫৲ টাকা কম। কারখানার পক্ষে সেরূপ লোকসানের ঝুঁকি লইয়া সাইকেল রপ্তানী করা সম্ভব নয়। তাই, সাইকেলের কারখানাগুলি ঘরোয়া ব্যবস্থানুসারে এদেশে বিক্রয়ের উপর হাজার-করা তিন ভাগ উৎপাদন "কর" আদায় করিয়া রপ্তানীকারীদের মধ্যে বিতরণ করিতেছে। রপ্তানীকারীরা বিদেশে প্রেরিত প্রতি সাইকেলের জন্য পাইকারী দরের এক-পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত সাহায্য পাইয়া থাকে। ফলে রপ্তানী সম্পর্কে মূল্যের অসুবিধা সমাধান হইলেও অন্য দিকে একটি জটিল-সমস্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। উৎপাদন-কর হিসাবে সংগৃহীত টাকাটা এদেশে সাইকেল ক্রেতাদের নিকট হইতেই আদায় হইয়া থাকে—অর্থাৎ বিদেশে রপ্তানীর ফলে এদেশে বিক্রয়-মূল্য চড়িয়া যায়। ভারতের মত দরিদ্র দেশে ইহাও বাঞ্ছিত নহে। পড়তা খরচ হ্রাস না করিলে এ সমস্যার সমাধান অসম্ভব।" —যুগান্তর।

## শিল্প-উন্নতি চাই

"বর্ত্তমানে ভারতের অনেক শিল্পেই আধুনিক উন্নত ধরণের কলকব্জা নাই। এই ধরণের কলকব্জা না বসাইলে দেশে শিল্পপণ্যের পড়তা ব্যয় কিছুতেই হ্রাস পাইতে পারে না। শিল্পব্যবসায়ী মহলে একচেটিয়া ব্যবসা ও জোটের ফলেও দেশের ভিতরে এবং বাহিরে শিল্পপণ্যের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোম্পানি আইনের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য শিল্পের অর্থসঙ্গতির বহুল পরিমাণে অপচয় হইতেছে বলিয়াও, শিল্পপণ্যের পড়তামূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। উহার প্রতিকারার্থ উক্ত আইনেরও সংশোধন আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট ও বিদেশী পুঁজিপতিগণ উৎপাদন ব্যয় সাহায্য করিলে শিল্পের মূলধনের অভাব—যাহার জন্য শিল্পপণ্যের বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহার প্রতিকার হইতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে শিল্পের কাঁচামাল অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিলে কেবল দেশের শিল্পগুলির স্বল্পব্যয়ে উৎপাদনবৃদ্ধির পথই প্রশস্ত হইবে না, উহার ফলে বিদেশে এই সব পণ্য অধিকতর পরিমাণে রপ্তানী হইতে পারিবে। এই সব কারণে শিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধি এবং দেশের রপ্তানীবৃদ্ধির জন্য বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী উপরোক্ত যেসব বিষয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার আমরা সমর্থন জানাই। আশা করি, এই সব ব্যাপারে তিনি অবিলম্বে আন্তরিক মনোভাব লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

## মৎস্যজীবী সমস্যা

"পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীদের সম্পর্কে সরকারের কোন সুষ্ঠ নীতি তো নাই-ই, বরং এই সমস্যা সম্পর্কে সরকার বরাবর পরম ঔদাসীন্যই দেখাইয়া আসিয়াছেন। সরকারের মৎস্য চাষ ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনাটি একেবারেই নীতিহীন। ইহাকে কোন পরিকল্পনাই বলা চলে না। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সরকার গভীর সাগরে মাছ ধরার নাম করিয়া সাগরের জলে অনেক টাকা ঢালিতেছেন। পুকুরের মালিকদের মৎস্য উৎপাদন ও গবেষণার জন্য ধার-কর্জ্জ দিবার জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দও করা হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ মৎস্য উৎপাদন ও সংগ্রহে ব্যয়িত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। মৎস্যজীবীদের সম্পর্কে সরকারের ঔদাসীন্য আরো প্রকট। প্রকৃত মৎস্যজীবীরা যাহাতে জলকরের একক দাবিদার হইতে না পারে তাঁহার জন্য "মৎস্যজীবী" বলিয়া একটি নূতন শব্দ তৈরী করিয়া অমৎস্যজীবী ধনীদের আইনতঃ জলকরের দাবিদার করা হইতেছে। ভূমি সংস্কার ও জমিদারী দখল আইনে এই মালিকদের হাতে প্রচুর জলকর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে জলকর সম্পর্কে সামন্তবাদী কায়েমী স্বার্থকে পোষণ করার এক গভীর চক্রান্ত চলিতেছে।" —স্বাধীনতা।

## নেহরুর সমবায়

"পণ্ডিত নেহরুর এবার মাথায় ঢুকিয়াছে সমবায়। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সভায় তিনি বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছেন সমবায় চাষ তিনি প্রবর্ত্তন করিবেনই, যে সকল কংগ্রেস-সদস্য ইহা পছন্দ করেন না তাঁহারা দল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন। এ বিষয়ে কোনরূপ সমালোচনা তিনি সহ্য করিতে রাজী নহেন। সমবায় সমিতি সব দেশে সব জায়গায় সব রকম লোক নিয়া চলে না। সমবায় চাষ সম্পর্কে রাশিয়া এবং চীন যে সমস্ত পরীক্ষা করিয়াছে তাহা আমাদের দেশে আদৌ প্রচলন করা সম্ভব অথবা বাঞ্ছনীয় কি না, সে বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। ষ্টালিন যে সমবায় চাষ প্রচলন করিয়াছিলেন ক্রুশ্চেভ বলিয়াছেন, তাহা সফল হয় নাই; গবর্ণমেণ্ট অফিসারদের দ্বারা চাষী ফার্ম্ম পরিচালন করিতে গিয়া লাল ফিতা এবং বুরোক্রাসির অন্য সমস্ত পাপ কৃষিক্ষেত্রেও ঢুকিয়াছে, তাহাতে ক্ষতিই হইয়াছে। চীনে মাও সে তুং হাজার হাজার বছরের সুপ্রাচীন চাষ পদ্ধতি বদলাইয়া যাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা ধোপে টিকিবে কি না জানিবার জন্য এখনও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। আমাদের দেশে যেখানে মন্ত্রিসভায় পারস্পরিক সহযোগিতা নাই, পার্টিতে নাই, শিক্ষিত লোক পরিচালিত একটা প্রাথমিক স্কুল ম্যানেজিং কমিটিতেও নাই, নেহরুর নিজের ক্যাবিনেটেও নাই, সেখানে গ্রামের লোক হঠাৎ সমবায় নীতি মানিয়া কাজ করিতে সুরু করিয়া দিবে—ইহা আমরাও মানিতে পারি না। নেহরু মুখে বলেন গণতন্ত্র, কাজে তিনি ডিক্টেটর। এত বিরাট ভাবে দেশব্যাপী সমবায় পদ্ধতি চালাইবার আগে উহা লইয়া আলোচনার জন্য যে সামান্য একটু ধৈর্য্য দরকার তাহাও তাঁহার নাই। তিনি সাফ বলিয়া দিয়াছেন—হয় মামেকং শরণং ব্রজ, নচেৎ দূর হও। মামেকং শরণং ব্রজ—কথাটা যাঁর তিনি পূর্ণ পুরুষ, একথা বলিবার অধিকার তাঁর আছে। নেহরুর নাই। সমবায় সমিতিগুলি দেশে যেভাবে চলিতেছে, যেভাবে পুলিশ, সিভিল সাপ্লাই এবং সমবায় বিভাগের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর সমিতি উৎপীড়নের নূতন ইঞ্জিনে পরিণত হইয়াছে তাহাতে যে কোন সুস্থ লোক শঙ্কিত হইবেন। ক্ষমতালোভী লোকের দারিদ্র্যের দিকটা কম থাকে, নেহরুর জিদের ইহাই কারণ।"

—যুগবাণী (কলিকাতা)

## কাজ দাও, খেতে দাও

"জেলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ঘুরলে যে কথা শুনতে পাওয়া যায়, যে অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়, তার মর্ম হচ্ছে কাজ দাও খেতে দাও। এই ভয়াবহ রূপ বীরভূমের ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়া গিয়াছে কি না সন্দেহ। উপর্য্যুপরি অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির ফলে বীরভূমের ভাগ্যবিধাতা বিরূপ। মজুরদের কাজ নেই। সরকার থেকে টেষ্ট রিলিফ খোলা হচ্ছে, তাও পর্য্যাপ্ত নয়। মাঝে মাঝে বন্ধ রয়েছে। সরকার থেকে প্রচার হচ্ছে ভয় নেই, কাউকে মরতে দিব না। শুধু মুখের কথায় সান্ত্বনা দিলে তাদের পেট ভরবে না। আসলে চাই কাজ। মধ্যবিত্তদের কথা চিন্তা করেন। তাদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। সরকার অনেক পরিকল্পনা সৃষ্টি করেছে কিন্তু মধ্যবিত্তদের কিছু সুরাহা হয়েছে বলে মনে হয় না। আজও অনেকে অভুক্ত অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় আছে। বাঁচার অধিকার তারা কেন পাবে না? মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের মেরুদণ্ড, সেই মেরুদণ্ড যদি কোন কারণে ভেঙ্গে পড়ে রাষ্ট্রের নিশ্চয় মঙ্গল হবে না। জেলা শাসক অবশ্য মধ্যবিত্তদের দুরবস্থার কথা স্বীকার করেছেন এবং তিনি তাহাদের কথা চিন্তা করছেন। এটা নিশ্চয় শুভ লক্ষণ। জেলায় অনেক মন্ত্রী সফর করেছেন বা করছেন। তাঁদের কাছে জেলার দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সমাজ যাতে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় তার ব্যবস্থার দাবী জানায় আর এ যদি করেন তবে এই সব মন্ত্রীরাই হবেন প্রকৃত জনপ্রতিনিধি।"

—গ্রামের কথা (বীরভূম)।

## একটি জলন্ত প্রমাণ

"কৈলাসহর মহকুমান্তর্গত কাঞ্চনবাড়ীর একটি অভিযোগে বলা হইয়াছে, তথাকার একটি সমবায় সমিতি মৎস্য চাষের পরিকল্পনা রূপায়নের উদ্দেশ্যে দুইটি ঝিল বন্দোবস্তের আবেদন করে তিন বৎসর পূর্ব্বে। তিন বৎসর পূর্ব্বের আবেদনটি আজও না-গ্রহণ না-বর্জন অবস্থায় রহিয়াছে। মৎস্য খাদ্য-সামগ্রীর একটি প্রধান অঙ্গ এবং এই মৎস্যের জন্যই ত্রিপুরা সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্ব-পাকিস্তানের উপর নির্ভরশীল। পূর্ব্ব-পাকিস্তান হইতে মৎস্য আমদানী করিতে যে সমস্ত ঝঞ্ঝাট রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিয়া বলিতে পারি, ত্রিপুরায় মৎস্য-সঙ্কট ভয়াবহ। মৎস্য চাষ ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব ও করণীয় কম নহে। আজও সরকারী প্রচেষ্টায় মৎস্য চাষ বাড়িয়াছে, এমন প্রমাণ পাই না। বেসরকারী উদ্যোগে মৎস্য চাষের প্রচেষ্টাও আমলাতন্ত্রের দাপটে খর্ব্ব হইতেছে। কাঞ্চনবাড়ীর ঘটনাটিই জলন্ত প্রমাণ। সরকারও কোন কিছু করিবেন না, জনসাধারণকেও করিতে দিবেন না, তাঁহারা পাইয়াছেন কি?"

—সেবক (আগরতলা)।

## সমুদ্রগড়—পূর্ব্বস্থলী

"ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের ছোটখাটো ষ্টেশনের প্লাটফরম হইল কিন্তু সমুদ্রগড় ও পূর্ব্বস্থলীর কপাল ফিরিল না। অথচ এই দুইটি ষ্টেশনই খুব গুরুত্বপূর্ণ, বহু দুর্ঘটনাও ঘটিয়া গিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণকেই এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। তদ্বির ও তাগাদা ব্যতীত এ সময় যে কোন কাজই হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য।"

—পল্লীবাসী (কালনা)

## সংস্কার প্রয়োজন

"এতদঞ্চলে ভেড়ীবাঁধ, খালপাড় ও পুল আদির মেরামতী অভাবে কয়েকটি স্থান গত বৎসর কৃষিচাষের যথেষ্ট হানি ঘটিয়াছে যাহার ফলে ঐ সব অঞ্চলবাসীদের দুর্দ্দশা চরমে দাঁড়াইয়াছে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষও উহা বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। তন্মধ্যে কাঁথি ও মগরা বেসিনের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। প্রতি বৎসর জলনিকাশী অব্যবস্থায় এই অঞ্চলের দারুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়া প্রজা সাধারণের দুর্গতির একশেষ হইতেছে। সরকার ক্ষুদ্র পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষিচাষের উন্নতি প্রয়াসী। এজন্য আ ঐ সব অঞ্চলের খালপাড়, বাঁধ ও পুলগুলির সংস্কার জন্য ইতিপূ আলোচনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। এ সর্ব্বত্র খাল-বিল আদি শুকাইয়া গিয়াছে। এবং ঐ সমস্ত ক

হাত দেওয়ার এখন উপযু সরকারী কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন রতঃ, কাঁথি বেসিনের অন্তর্গত কাঁথি সহর সংলগ্ন সেরপুর মজবাদ মৌজার গ্রাম্যভেড়ীগুলি স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড া লোক ও গো-পশু আদি যাতায়াতের অযোগ্য হই স্থানে উহা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত। এই বিষ সিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের তীব্র দৃষ্টি আ ছি।" —নীহার ( কাঁথি )।

"বৰ্দ্ধমান বিজয়চাঁদ হা অভিযোগ আসিতেছে। নানাপ্রকার দুর্নীতি, অব অবহেলা, রোগীদের প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহার প্রভৃতি বহুনা। হাসপাতাল যাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন, জীবন-মরণের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত, তাঁহারা যদি হেলা করেন তাহা হইলে নিদারুণ পরিতাপের কথ হাসপাতালের অব্যবস্থা এমন পর্য্যায়ে আসিয়াছে দেওয়ালে পোষ্টার পড়িয়াছে। প্রতিকার গড়িয়া উঠিয়াছে। এমন কি নার্স ও ডাক্তারদে প্রাচীরপত্রও দেখা যাইতেছে। অসুবিধা যে য়। কিন্তু যাঁহারা স্বেচ্ছায় আৰ্ত্তসেবার ভার গ নিরাময়ের দায়িত্ব লইয়াছেন, তাঁহারা হৃদয়হীন হইবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ভযোগ করিয়াছেন তাঁহাদের অবিশ্বাস করিবার রা হাসপাতালের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে খোঁজখবর প্রকাশ করিয়াছি। সমালোচনাও করিয়াছি। নাই। স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর, স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি কিন্তু অবস্থার তথাপি পুনরায় বলিতে বাধ্য হইতেছি আৰ্ত্ত র ভার লইয়া যাঁহারা হাসপাতালে নিযুক্ত ইহাকে নিছক পেশা বা বৃত্তি হিসাবে ধরি দুঃখের কথা। চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য নয় এক মহান্ ব্রত হিসাবে গ্রহণ না করি কোন সান্ত্বনা পাইবে না।"
—বৰ্দ্ধমানবাণী।

স্ত্রী-শিক্ষা

"গ্রামাঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষার কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে সব কিছু ব্যর্থ হতে বসে আমাদের মহকুমার কথা ধরা যাক, পাঁচ লক্ষ জনসংখ্যার অধিবাসী সমন্বিত কোন বালিকা বিদ্যালয় নাই। ালয়টি উচ্চতর পর্য্যায়ে পৌঁছেছে, বাকী লয়ের অনুমোদন পেয়েছে। কিন্তু ভর্ত্তি হতে পারে না, কেন না কোথা ক্রম শ্রেণীর ছাত্রীদের নাকি অবস্থা বেশী মেয়েদের ভর্ত্তি না করলে দেখা দিবে। এ ছাড়া আর একটা

নিয়ে সহরে বাস করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু মেয়েদের লেখা চান। সংসারের স্বাভাবিক অভাব-অভিযোগের লেখাপড়া শিখুক, এই রকম ইচ্ছা বড় মেয়ে রাখার বিশেষ কোন ব্যবস্থা সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একটি বড় হোষ্টেল প্রয়োজন। এই বৎসর যাতে বড় দেখে ঘর-ভাড়া নিয়ে বেশী মেয়েদের রাখার ব্যবস্থা হয় তার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি। মেয়েদের স্কুলে বেশী সিট হোষ্টেলের ভাল ব্যবস্থা না হলে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার হবে না, সংহার হয়ে যাবে।"
—নির্ভীক ( ঝাড়গ্রাম )।

## ষ্ট্যাম্পের আকাল

"সাহাপাড়া :—( খড়গ্রাম ) গত ৩১শে মার্চ খড়গ্রাম বি-ডি-ও অফিসে মৎস্যজীবীদের জন্য লোন দেওয়ার দিন ছিল। ঐ দিন সাহাপাড়া হইতে ১ জন এবং পদমকান্দি হইতে ৬ জন খড়গ্রাম বি-ডি-ও অফিসে টাকা আনিতে যায়। কিন্তু ষ্ট্যাম্পের জন্য সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সম্ভব অসম্ভব সকল রকম চেষ্টা করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত ৮ জন ষ্ট্যাম্পের জন্য টাকা না পাইয়া ফিরিয়া আসে। জনৈক ভুক্তভোগীর বিবরণে প্রকাশ যে, বহু অনুনয়-বিনয়ের পর খড়গ্রামের ভেণ্ডার ৫ খানির বেশী ষ্ট্যাম্প দিতে কোন প্রকারেই রাজী হন নাই। অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া চাঁদা করিয়া একজনকে ষ্ট্যাম্প আনিতে কান্দি পাঠান হয় এবং তিনিও বিফল হইয়া ফিরিয়া আসেন। অবশেষে বহু অনুসন্ধানের পর খড়গ্রাম হইতে ৪ মাইল দূরে মাত্র ২ খানি পাওয়া যায়। চরম হয়রাণি ভোগ করিয়া রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত ৭ জন টাকা লইয়া এবং ৮ জন শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়।"
—জনমত ( মুর্শিদাবাদ )

## আসানসোলের অসহায় পল্লী অঞ্চল

"মহকুমার অধিকাংশ পল্লীতেই জলের অভাবে প্রায় প্রতি বৎসর অজন্মা লাগিয়াই আছে। জমি যাহা আছে, তাহা অধিকাংশ স্থানেই অন্য রাজ্য বা জেলা হইতে আগত ধনী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার জন্য জমির মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ক্রমে ক্রমে অধিকৃত হইতেছে। অবশিষ্ট জমির একটা বিরাট অংশ পরিত্যক্ত কয়লাখনির জন্য ধ্বসিয়া শুধু অন্নসঙ্কটই সৃষ্টি করিতেছে না—মানুষকে সুদীর্ঘ দিনের বাস্তুভিটা ছাড়িয়া উদ্বাস্তু হইতে হইতেছে। গত সংখ্যায় প্রকাশিত হীরাপুর থানার ভরতচক কোলিয়ারীর চতুর্দ্দিকস্থ এলেকা ও গ্রাম বিপজ্জনক এলেকা বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং অধিবাসীদিগকে তৎপরতার সহিত তাহাদের বাসস্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলা হইয়াছে। কোলিয়ারী হইতে কয়লা তুলিয়া লইবার পর মৃত্তিকার নীচে যে অজস্র সুড়ঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাহা কোলিয়ারী মালিক বালু দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে বাধ্য বলিয়া বিধান আছে। কিন্তু ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের নিকট সাধারণ মানুষের জীবনের অপেক্ষা বৈভবান কোলিয়ারী মালিকদের শোষণের অংশীদার হওয়া বেশী মূল্যবান। আমরা ঐ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে এইরূপ বিপর্য্যয়ে অসহায় পল্লীবাসীর দুর্দশা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছি।

সুড়ঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে, ঐ

জীবন্ত সমাধি হইয়াছে

এমন ঘটনাও আমরা দেখিয়াছি। বৃটিশ রাজত্বে আমরা ইহার প্রতিকারের আশা করি নাই। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর এখনো যদি এই অসহায় অবস্থা চলিতে থাকে, তাহা হইলে এই স্বাধীনতার মূল্য কি? যাহারা বাহির হইতে আসিয়া এখানকার গ্রামবাসীদের জমি দখল করিবে, বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করিবে, তাহারা কিন্তু গ্রামবাসীদিগকে তাহাদের প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করিবে না, তাহাদের জলকষ্টের প্রতিকার করিবে না, বাস্তহারাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিবে না কেন, তাহা আমরা জানিতে চাই। ভরতচক অঞ্চলের অসহায় অধিবাসীদের পুনর্ব্বাসন ও নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা দেশবাসী অবিলম্বে জানিতে চায়।"

—দামোদর (বর্দ্ধমান)।

## কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ

"হুগলী জেলা পরিবহন কর্ত্তৃপক্ষ চুঁচুড়া হইতে ২নং রুটের বাস টার্মিনাস স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রায় ২৫ বৎসর পরে এই পরিবর্ত্তনে সহরবাসী সকলেই বিস্মিত। চুঁচুড়া সহরে জেলার সরকারী কার্য্যালয় অবস্থিত। এমন কি বর্দ্ধমান বিভাগীয় কমিশনার, ওয়েষ্টার্ণ রেঞ্জের ডি, আই. জি'র কার্য্যালয়ও এই চুঁচুড়াতেই অবস্থিত। স্কুল, কলেজ, বাজারহাট, সিনেমা, হাসপাতাল, ফেরীঘাট, কোর্ট-কাছারী প্রভৃতি জনসমাগমের স্থলগুলির অতি সন্নিকট চুঁচুড়া টাওয়ার ক্লকের নিকট বাসগুলি থাকায়, যাত্রিগণের সুবিধা হইত। তাহা ছাড়া রৌদ্র ও বৃষ্টিতে কাছাকাছি দোকান ও কোর্ট বিল্ডিং প্রভৃতিতে তাঁহারা আশ্রয় লইতেও পারিতেন। বাস টার্মিনাস স্থানান্তরের এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি ও ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইবে। আমরা এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্ম জেলার সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছি।" —বর্তমান ভারত (চকবাজার)।

## শোক-সংবাদ

বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক দেশবিশ্রুত সুধীবর মহামহোপাধ্যায় আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহোদয় গত ২১শে চৈত্র ৮৬ বছর বয়সে দেহরক্ষা করেছেন। নীরব জ্ঞান-সাধনার মধ্যে দিয়ে সরস্বতীর যে সকল সেবকদের সমগ্র জীবন অতিবাহিত, বিধুশেখরের স্থান তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই জ্ঞানসাধকের বিদ্যার্জনের, সূত্রপাত বারাণসীতে। বারাণসী থেকেই ইনি 'শাস্ত্রী' উপাধি প্রাপ্ত হন ও বেদান্ত এবং ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গম হন। বারাণসীতে সংস্কৃত শাস্ত্রে অর্জন করলেন ব্যুৎপত্তি, শান্তিনিকেতনে আয়ত্তে আনলেন পালিশাস্ত্র। ১৩১১ সালে ইনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকরূপে যোগ দেন ও ভবিষ্যতে কবিগুরুর একজন বিশিষ্ট সহচর ও শান্তিনিকেতনের শ্রীবৃদ্ধি কার্যের অন্যতম বিশিষ্ট সহায়করূপে পরিগণিত হন। প্রথম জীবনে ইনি সংস্কৃতভাষায় কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন ও ভবিষ্যৎজীবনে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচায়ক সারগর্ভ বহু গ্রন্থ রচনা করে দেশীয় সাহিত্যের মর্যাদাবৃদ্ধি করেন। ১৯৫৭ সালে ইনি সম্মানাত্মক দেশিকোত্তম (D. lit) উপাধি লাভ করেন এবং ১৯৫৮ সালে স্বাধীনতাদিবস উপলক্ষে ভারতের কয়েকজন শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিতপ্রবরের সঙ্গে ভারতীয় সরকার কর্তৃক সম্মানিত হন। আচার্য শাস্ত্রীর অতুলনীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদানসমূহ তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর তিরোভাবে সংস্কৃতির একজন স্মরণীয় উপাসকের অভাব ঘটল।

বাঙলার তথা ভারতের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডাঃ অমলকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় ১৬ই চৈত্র ৬৭ বছর বয়সে গিরিডিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদারবংশে এঁর জন্ম। মহানগরীর অন্যতম প্রাক্তন পৌরপাল শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায়চৌধুরী এঁর অগ্রজ। ১৯১৪ ও ১৯১৭ সালে ইনি যথাক্রমে এম, বি ও ডি, এম উপাধি লাভ করেন। ডেমন্ষ্ট্রেটাররূপে আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজে ইনি যোগ দেন ১৯১৬ সালে, তারপর ঐ কলেজেই আরও কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ আসন অলঙ্কৃত করে ১৯৫৫ সালে কলেজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হন'১৯৫৭ সালে অধ্যক্ষের পদ ইনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল য়্যাসোসিয়েশানের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল সুনিবিড়। ১৯৪৮ সালে ইনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী উৎসবের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ডাঃ রায়চৌধুরীর মৃত্যুতে সারা ভারতের চিকিৎসা জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন ঘটল।

বাঙলার সুবিখ্যাত জীবনীকার ও সাহিত্যসেবী মন্মথনাথ ঘোষ ২৪এ চৈত্র৭৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলীর প্রবর্তক-সম্পাদক প্রসিদ্ধ সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ইংরাজী ও বাঙলা উভয় ভাষায় যশস্বী কবি অতুলচন্দ্র ঘোষ এবং বাঙলায় 'ওমর খৈয়ামে'র অনবদ্য স্রষ্টা কান্তিচন্দ্র ঘোষছিলেন যথাক্রমে এঁর পিতামহ, পিতৃদেব ও অনুজ। ১৯০৫ সালে ইনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও কর্মজীবনে ভারতীয় অডিও য়্যাকাউন্টস বিভাগে যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে উচ্চপদে সমাসীন ছিলে। রাজা দক্ষিণারঞ্জন, ভোলানাথ চন্দ্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র প্রভৃতি বাঙলার চিরস্মরণীয় সন্তানদের জীবনীগ্রন্থগুলি মন্মথনাথের সাহিত্যকীর্তির অন্যতম পরিচায়ক এগুলি ছাড়া গত তিরিশ বছর ধরে বহু পত্র-পত্রিকায় অজস্র প্রবন্ধ রচনা করে দেশীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

বাঙলার বর্ষীয়ান বিপ্লবী নেতা ও সর্বজনপরিচিত প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সঙ্ঘগুরু মতিলাল রায় চন্দননগরে ৭৭ বছর বয়সে ২৭এ চৈত্র লোকান্তরিত হয়েছেন। মতিলালের জীবনে প্রাককাল থেকেই ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি যুগপৎ অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। ইনি শ্রীঅরবিন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এ সত্যতঃ অরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার ফলেই তাঁর সমস্ত শক্তি গঠনমূলক কার্যে প্রয়োগ করেন। অনেকগুলি গ্রন্থের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং কয়েক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেরও তিনি স্রষ্টা।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

...গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারি"... শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৩৭শ বর্ষ—পৌষ, ১৭ সংখ্যায় 'চার জন' প্রবন্ধে লেখক কলিকাতায় আমি থাকার সময় আমার নিকট যে সব তথ্য আমার বিষয় সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর প্রবন্ধে ছাপার কালে তাতে ৩৮২ পৃঃ ২য় কলম, ১৪ লাইনে যোগেশ চন্দ্র হালদার স্থলে ভুলক্রমে "কেনারাম হালদার" লিখেছেন তাছাড়া ৩৮৩ পৃঃ (২য় কলমে) ১২ লাইন থেকে ১৭ লাইন পর্যন্ত লিখেছেন আর্টে মডেল বসিয়ে আঁকার কথা আমি যা' তাঁকে বলেছি তা তিনি বুঝতে পারেননি। এরূপ ভুল থাকা উচিত নয় বিবেচনায় আপনাকে লিখছি, অনুগ্রহ করে সংশোধনী দিয়ে দেবেন পরে সংখ্যায়। বিবৃতি এইরূপ হবে :—

..."সব কিছু নিখুঁত হওয়া সত্ত্বেও তাদের সব ছবিতেই মডেল বসিয়ে আঁকার আড়ষ্টতা—আঁকার সময়েও কাটে না—বরং স্থায়ী হয়ে যায় তাদের ছবিতে। তাই ভাল বা বিলাতি একাডেমিক আর্ট দেখলে মনে হয় যেন প্রাণহীন শরীর। বৈজ্ঞানিক জটিল প্রণালীতে আঁকার ফলে স্বাভাবিক সহজ ও সহজ ভাবে আঁকার মাধুর্য তাতে নেই। এইখানেই অসিতকুমারের কাছে পরিষ্কার হয় এবং যে বিদেশের চিত্র-শিল্প বস্তু দেখে দেখে যা আঁকা হয় তার তুলনায় বিশেষ করে মন থেকে আঁকার সাবলীলতার যে অজস্রতা তা অনেক উচ্চে।" আমাকে এই অংশে ছাপা হয় এক কপি ডাক যোগে আমার উল্লেখিত ঠিকানায় পাঠালে বাধিত হব।—যোগেশচন্দ্র হালদার।

## পত্রিকাসমালোচনা

গত মাঘ (১৩৬৫) সংখ্যায় পত্রিকায় ইন্দুমতী আচার্য লিখিত 'মাধুরী আছে ছড়ায়ে' রসরচনাটি বেশ উপভোগ্য বলে মনে হয়েছে। এ জাতীয় বাস্তব-ঘেঁষা হাল্কা প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আজকাল যথেষ্ট। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একমাত্র আলোচ্য রচনাটি সম্পর্কে আমি অবিমিশ্র প্রশংসা করতে পারছি না। তার একমাত্র কারণ লেখাটি একান্তভাবে পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। অভিভাবকদের উপর যে পরিমাণ 'ঝাল-ঝাড়া' হয়েছে তা মোটেই বাস্তবানুগ নয়, যদিও আংশিক সত্য হিসেবে তাকে স্বীকার করা যায়। আর প্রাইভেট-টিউটারদের উপর কটাক্ষপাতটুকুও সর্বতোভাবে ন্যায়সঙ্গত হয় নি।' আমার মনে হয়, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাইভেট-টিউটারের ভূমিকা শুধু অপরিহার্য নয়, বিশেষ কার্যকরও বটে। পরিশেষে এইটুকুই বলতে চাই যে, আজকাল দুঃসহ শিক্ষক-শিক্ষিকাবর্গ যে কর্তব্যবোধের পরিচয় দিচ্ছেন তা মারাত্মক। তাঁরা যেন ফাঁকি দেওয়া আর ভুল বোঝানোর দায়িত্ব নিয়েছেন বলে মাঝে মাঝে ভ্রম হয়। তাঁদের জগতেও খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, কম মাধুরী ছড়িয়ে নেই। সেটুকু স্বীকার করে নেওয়া ও সমালোচনা করবার মত moral courrage কি আমরা আশা করতে পারি না?—শ্রীমতী লীলা বসু, ৫১/১ শ্যাম বোস রোড, কলকাতা।

আমার বসুমতীখানি পেয়ে বড় সুখী হলাম। নির্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা পাঠিয়ে সুখী করবেন। সংসারের কাজের অবসরে বাংলা নানা রকম কাগজ আমার সাথী। সবের মধ্যে আমার সব চাইতে প্রিয় পত্রিকা।—শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, গোরক্ষপুর।

আপনার বহুল প্রচারিত মাসিক পত্রিকায় গত পৌষ সংখ্যায় ডাঃ উপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের "বাউল গান" শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সাহিত্য রসিক মাত্রেই আনন্দের খোরাক পাবেন। গত অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় "কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ পথের পাঁচালী" সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছেন, তজ্জন্য তাঁকে এবং সেই সঙ্গে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ পৌষ সংখ্যার পর বন্ধ হ'য়ে গেল কেন? আমরা অধীর আগ্রহে তাঁর এই প্রবন্ধের প্রতীক্ষা করছিলাম কিন্তু গত মাঘ ফাল্গুন সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধ না থাকায় হতাশ হয়েছি। তিনি নীরব হ'য়ে গেলেন কেন? ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অনুরোধ তিনি যেন বিভূতিভূষণের অন্যান্য উপন্যাসকে ভিত্তি করে এরূপ আলোচনা করেন এবং আপনার নিকটও অনুরোধ, আপনি এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর হোন। আগামী চৈত্র সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধ আপনার পত্রিকায় স্থান পাবে বলে আশা করছি। দিলীপ রায়ের "ভাবি এক হয় আর" এক কথায় অপূর্ব! মাসিক বসুমতীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়। পোঃ রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া।

মাসিক বসুমতীর আমি নিয়মিত গ্রাহিকা নয়, কিন্তু পাঠিকা, আগে আমাদের বাড়ীতে পত্রিকা নেওয়া হতো, এখন আর হয়ে উঠে না, আমরা ২।৩ জনে মিলে একটি পত্রিকা কিনি। ১।১০ টি পরিবারে পড়ি, একখানি শেষ হলে দিন গুণি আর একটির আশায় আমি আরও ২।১টি পত্রিকা জোগাড় করে পড়ি কিন্তু বসুমতীর তুলনা হয় না। বসুমতীতে নূতন নূতন লেখকদের ছোট ছোট গল্প উপন্যাস পড়ে কি যে আনন্দ পাওয়া যায় প্রকাশ করবার মত ভাষা নেই। সাহিত্য পরিচয়ে লেখকের আসল নাম জানা যাচ্ছে এটা একটা খুব আনন্দের বিষয়। আমার মত অনেক পাঠিকাই যাঁদের আসল নাম জানবার কৌতূহল হয়েছিলো, আমার মত আশা তাঁদেরও মিটবে। সুলেখা দাশগুপ্তের বর্ণলী তুলনা হয় না! নীলিমা দাশগুপ্তের ইন্দ্রাণীর প্রেম পাঠক-পাঠিকাদের বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠছে। বারি দেবীর বাতিঘর চতুর্থ ভাগ করে আরম্ভ হবে?—শ্রীগায়ত্রী ঘোষাল। সুখচর। ২৪ পরগণা।

### বাঙলা সাহিত্যে ছদ্মনাম

অগ্রহায়ণ ও মাঘ সংখ্যায় অনেকগুলি ছদ্মনামের তালিকা দেখিলাম। আমার জানা কয়েকটি নাম পাঠাইতেছি, পূর্বে প্রকাশিত না হইয়া থাকিলে সংযোজিত করিতে পারেন। পরিশেষে "কল্লোল যুগ" বইটিতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক লিখিত হইলেও মোহিতলাল মজুমদারের "কৃত্তিবাস ওঝা" ছদ্মনামটি সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। শ্রীসজনীকান্ত দাস দয়া করিয়া এ বিষয়ে আলোকপাত করিলে বাধিত হব।

| | ছদ্ম নাম | আসল নাম |
|---|---|---|
| ১। | আনন্দকুমার ঠাকুর | প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় |
| ২। | শ্রী লাহিড়ী | প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী (কার্টুনিষ্ট) (কাফী খাঁ ওরফে পিসিএল) |
| ৩। | চিত্রগুপ্ত | মনোমোহন ঘোষ |
| ৪। | ধনঞ্জয় বৈরাগী | তরুণ রায় |
| ৫। | নিবিড়ানন্দ ইর জনবিশ | নলিনীকান্ত সরকার |
| ৬। | প্রচল | প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী |
| ৭। | পরিব্রাজক | নির্মলকুমার বসু |
| ৮। | প্রসাদ | ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ |
| ৯। | ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় | তারাদাস মুখোপাধ্যায় |
| ১০। | বলাহক নন্দী | নীরদচন্দ্র চৌধুরী |
| ১১। | বৈকুণ্ঠ শর্মা | সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় |
| ১২। | বিষ্ণু শর্মা | বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র |
| ১৩। | মাধব্য | মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (রামধন্থ) |
| ১৪। | মাঠব্য | ঐ |
| ১৫। | স্কট টমসন (ইংরাজী নয় বাংলাই) | প্রমথনাথ বিশী |
| ১৬। | সঞ্জয় | নির্মলকুমার বসু |
| ১৭। | হাবু শর্মা | তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ১৮। | হাহা হুহু | নলিনীকান্ত সরকার |

—শ্রীকিশলয় সেন। কস্তুরবা নগর, মাদ্রাজ।

## গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

Please accept subscription for Monthly Basumati for the first six months of 1366 B. S. —Avarani Debi, Kanpur.

মাসিক বসুমতীর উন্নতির কামনা জানিয়ে নিজেকে আগামী বছরের (১৩৬৬) গ্রাহিকা করে নেওয়ার জন্য বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম—সুজাতা মুখার্জ্জী, Lohhindwara (M. P.)

মাসিক বসুমতীর বাংলা ১৩৬৬ সালের ১ বৎসরের চাঁদা ১৫৲ অগ্রিম পাঠাইলাম। আগামী বৈশাখ হইতে আমাকে গ্রাহিকা করিয়া নিয়মিতভাবে পত্রিকা পাঠাইবেন। Dubrajpur Girls Junior High School, Birbhum.

I am remitting herewith Rs. 7·50 being the subscription of the monthly Basumati for 6 months from Baisakh to Aswin,—Mrs. Bela Sen-Gupta, Hakimpara, Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর বৈশাখ '৬৬ হইতে আশ্বিন '৬৬ চাঁদা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইবেন। Sm. Madhabika Chatterjee P. O. Bhubaneswar, Puri.

Sending Rs. 7·50 as subscription for the Journal for six months from Baisakh '66 B. S.—Amita Sannyal, Amingaon, Assam.

আগামী সনের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠালাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাবেন।—শ্রীমতী বিভা মুখোপাধ্যায়, দিল্লী।

I am remitting you a sum of Rs. 15/- being the subscription of your magazine for a period of one year commencing from Falgoon. —Nirupama Das, Assam.

১৩৬৫ সালের পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র মাসের জন্য ৫৲ এবং ১৩৬৬ সালের মাসিক বসুমতীর জন্য ১৫৲ অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম।—শ্রীলেখা মিত্র, বর্দ্ধমান।

Sending herewith Rs. 7·50 for Monthly Basumati for 6 months.—Reba Samadder, Alipore-duar, (Jalpaiguri).

আগামী ১৩৬৬ সনের জন্য মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম। আশা করি প্রতি মাসে নিয়মিত সময়ে পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—মহাশ্বেতা দাশগুপ্ত, Assam।

আগামী বৎসরের জন্য ১৫৲ পাঠাইলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নাম গ্রাহিকার তালিকায় রাখিয়া বাধিত করিবেন।—Sm. Biva Bhattacharyya, New Delhi.

আগামী বৎসরের মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠাইলাম।—রেণু মিত্র, জবলপুর।

চৈত্র হইতে আমার ছয় মাসের চাঁদা ৭৷৷০ টাকা পাঠাইলাম। পত্রিকা নিয়মিত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—আরতি মুখোপাধ্যায়, Bulandshahr. U. P.
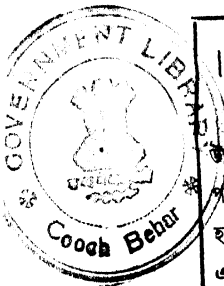


## ॥ ১৩৬৫ সালের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা ॥

বাঙলা দেশের সর্ব্বজনপ্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীর প্রচার ও চাহিদা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৩৬৫ সালের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যার পত্রিকা বাজারে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বিক্রীত ও নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। উক্ত সংখ্যাগুলির জন্য আর কেহ আবেদন জানাইবেন না, এই অনুরোধ। পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পত্রিকা প্রকাশের পনেরো দিন পূর্ব্বে জানাইতে হইবে।